বৈশাখ

১৩৭৮

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৭৮

সূচীপত্র

জ্যৈষ্ঠ
১৩৭৮

প্রবাসী— জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮

সূচীপত্র

আষাঢ়
১৩৭৮

প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৭৮

শ্রাবণ
১৩৫৮

প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৭৮

সূচীপত্র

ভাদ্র
১৩৭৮

প্রবাসী—ভাদ্র ১৩৭৮

প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩৭৮

সূচীপত্র

কাত্তি
১৩৭

প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৭৮

সূচীপত্র

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

সূচীপত্র

পৌষ
১৩৭৮

প্রবাসী—পৌষ, ১৩৭৮

মাঘ
১৩৭

প্রবাসী—মাঘ, ১৩৭৮

প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৭৮

সূচীপত্র

প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৭৮

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

বৈশাখ ১৩৭৮

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাকিস্থানের যুদ্ধের কথা

১৯৪৭ খৃঃ অব্দে যখন ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয় তখন, সেই সময়ে, ভারতবর্ষের রাজ্যাধিকারী ছিল বৃটেনের রাজশক্তি। এই বিভাগকার্য্য ঐ কারণে বৃটেনের পার্লামেন্টে, গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৪৭ নামধেয় আইন পেশ ও প্রনয়ন করিয়া বিশ্বরাষ্ট্রমহলে গ্রাহ্য করিয়া লওয়া হয়। ঐ আইন অনুসারে জগতজন সভায় এই কথাটাই মূলতঃ প্রমাণ করিবার ব্যবস্থা হয় যে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ এক জাতির লোক নহেন; মুসলমানগণ বিভিন্ন জাতির মানুষ; তাহাদের কৃষ্টি ভিন্ন, ভাষা উর্দ্দু এবং ঐতিহ্যের ধারা পৃথক পথে চালিত ইত্যাদি ইত্যাদি। উর্দ্দু ভাষাটি যাহারা বলে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন হিন্দু এবং ভারতের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান প্রায় সাতশত বৎসর একত্র বাস করিয়াছে প্রভৃতি কথা বহুবার বহুলোকে বলিলেও বৃটিশ সমর্থিত মিথ্যার উপরেই তখন ভারত বিভাগ হইয়া যায় এবং মুসলমানগণ এক অপর রাষ্ট্র গঠন করিবার অধিকারী হইয়া মুসলিম লীগ রাষ্ট্রীয়দলের মারফত নিজেদের স্বাধীনতা বৃটেনের হাত হইতে গ্রহণ করে। সেই সময়েই ডোমিনিয়ন অফ পাকিস্থান গঠিত হয় ও মহম্মদ আলি জিন্না সেই রাষ্ট্রশাসন করিবার জন্য বৃটিশ রাজশক্তি দ্বারা রাজ-প্রতিনিধি বা গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। এই ডোমিনিয়ন অফ পাকিস্থান তাহা হইলে ভারতবর্ষের মুসলমান জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবি মানিয়া লইয়া তাহাদের স্বরচিত রাষ্ট্রীয়দল মুসলীম লীগের জনগণের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া গঠন করা হয় এবং এই গঠন কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পরে নবসৃষ্ট রাষ্ট্রশক্তি ঐ মুসলীম লীগের হস্তেই তুলিয়া দেওয়া হয়।

জিন্নার মৃত্যুর পরে মুসলীম লীগ তাঁহার সমতুল্য কোনও নেতা না পাওয়াতে সম্ভবতঃ শক্তিহারা হইয়া যায় এবং সেই কারণে ১৯৫৮ খৃঃ অব্দে ইসকন্দর মির্জ্জা যে সময় পাকিস্থানের রাষ্ট্রনেতা, সেই সময় পাকিস্থানের রাজশক্তি সামরিক বাহিনীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ইহার কারণ এই ছিল যে তৎকালীন প্রধান সেনাপতি আয়ুব খান

ইসকন্দর মির্জ্জাকে বুঝাইয়াছিলেন যে শান্তিপূর্ণভাবে রাজশক্তি তাঁহার হস্তে তুলিয়া দেওয়া না হইলে তিনি শক্তি প্রয়োগে তাহা হস্তগত করিয়া লইতে দ্বিধা করিবেন না। কিন্তু এই কার্য্য গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৪৭ অনুগত হয় নাই। ডোমিনিয়ন অফ পাকিস্থান যে কারণে রচিত হয় তাহার মূলে ছিল মুসলমানদিগের তথাকথিত পৃথক জাতিত্বের অধিকার। পাকিস্থানের মুসলমানদিগের প্রতিনিধি ছিল মুসলীম লীগ দল; সামরিক বাহিনীর সহিত মুসলমান ধর্ম্মের কোনও আইন গ্রাহ্য সম্বন্ধ ছিল না বা থাকা অসম্ভব ছিল বলা যায়। আয়ুব খানকে পাকিস্থানী মুসলমানদিগের খলিফা অথবা প্রধান মোল্লা বলা চলিত না; সুতরাং তাঁহার রাজ্যাধিকার দখল শুধু গায়ের জোরেরই উপর নির্ভরশীল ছিল, ধর্ম্মের সহিত সেই রাজশক্তি আহরণের কোনও সম্পর্ক ছিল না বা থাকিতে পারিত না। আয়ুব খানের সামরিকভাবে শাসনশক্তি কাড়িয়া লওয়া এই কারণে ভারতবিভাগের মূল কারণ অনুগত ছিল না এবং যখন তিনি ঐভাবে গায়ের জোরে শাসনশক্তি কাড়িয়া লইলেন তখনই বৃটিশ পার্লামেন্টের উচিত ছিল গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৪৭ বাতিল করিয়া তাঁহাকে বহিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করা। কিন্তু বৃটিশ রাজশক্তি নিজেদের জন্য সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী হইলেও পরের বেলায় তাঁহাদের সে বিশ্বাস সুবিধাবাদ অনুসরণে বিপরীত পথে চলিতে পারাতে কোনও বাধা দেখা যাইত না। পাকিস্থান ভারতের অঙ্গে কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিবে ও ভারতকে কমজোর করিয়া রাখিবে ইহাই বৃটিশের মতলব ছিল ও এখনও আছে। এই কারণে তখন বৃটিশ আয়ুব শাহীর সমর্থন করে এবং পরে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শক্তির প্রতিষ্ঠাও বৃটিশ উত্তম রূপেই গ্রাহ্য করিয়া লয়। অর্থাৎ এই যে দুই জাতির কথা উঠাইয়া দেশ বিভাগ করা, ইহা বৃটিশের একটা দেশ বিভাগ করার ছুতামাত্র ছিল; মুসলমান "জাতির" কথা সত্য সত্যই কিছু ছিল না। কারণ পাকিস্থান গঠন হইবার পর হইতেই পশ্চিম পাকিস্থানীগণ পূর্ব্ব পাকিস্থানকে শোষণ করিয়া নিজেদের সুবিধাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে থাকে। এক জাতি বলিয়া বাঙালী মুসলমানদিগকে নিজেদের স্বজাতি বলিয়া সমান সমান সুবিধার ভাগবাট কোন সময়েই পশ্চিমারা করে নাই। বাঙালীরাও উর্দ্দু কখনও তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করে নাই। বাংলাকে তাহারা নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া শেষ অবধি পাকিস্থানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ ইসলামাবাদের (রাওলপিণ্ডির) উপনিবেশ নহে এবং হইবে না; এই কথাই হইল সেখ মুজিবুর রহমানের স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলনের মূল কথা। কারণ ঝড়ঝঞ্ঝায় পূর্ব্ব বাংলা বিধ্বস্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রাননাশ ঘটিলেও ইসলামাবাদ কোনও বাঁধ বাঁধিবার ব্যবস্থা না করিয়া রাজস্বের অর্থে নিজের ইমারতাদি আরও বৃহত্তর ভাবে গঠন করিবার ব্যবস্থাই করিতে তৎপর থাকিত।

পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণ পাকিস্থান গঠনের উদ্দেশ্য অগ্রাহ্য করিয়া যেভাবে চলিয়া আসিতেছেন তাহাতে তাঁহারা গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৪৭ এর বিরুদ্ধতা করিতেছেন বলিয়া তাহাদের সামরিক শাসন কোন কেহই মানিতে বাধ্য নহে। পরন্তু মুসলমান জনসাধারণ নিজ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ও সামরিক শাসন উচ্ছেদ করিতে আইনতঃ পূর্ণরূপে অধিকারী। সামরিক শাসনরীতি অন্যায়, আইন বিরুদ্ধ ও ক্ষুদ্র গণ্ডির স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা মাত্র। তাহার বিরুদ্ধতা করা শুধু আইন সমর্থিত নহে; তাহা সকল মুসলমানের কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব। এই কারণে যখন ইয়াহিয়া খান বলেন যে সেখ মুজিবুর রহমান রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী তখন তিনি ভুলিয়া যান যে তিনি নিজে গায়ের জোরে রাজশক্তি কাড়িয়া লইয়াছেন ও তাহার বিরুদ্ধতা করিলে তাহা রাজদ্রোহ নহে। যেখানে জোর যার মুল্লুক তার নীতি অনুসরণ করা হয় সেখানে জোর করিয়া রাজশক্তি কাড়িবার চেষ্টা কখনও রাজদ্রোহ হইতে পারে না। মুজিবুর রহমান যাহা করিতেছেন

তাহাতো অন্যায় ও নীতি বিরুদ্ধ নহেই, উপরন্তু তিনি সেই কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া পাকিস্থানের জনসাধারণের অধিকাংশ নির্ব্বাচকের দ্বারা সমর্থিত প্রমাণ হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধির কার্য্য। ইয়াহিয়া খানের কার্য্য শুধু সেনা বাহিনীর প্রধান সেনাপতির কার্য্য। তিনি সাধারণের মত অনুসারে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন নাই। তিনি আয়ুব খানকে হটাইয়া শক্তি কাড়িয়া লওয়াও জনমত অনুসারে করেন নাই—নিজ ইচ্ছায় ও নিজকৃত ষড়যন্ত্রের দ্বারাই করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সামরিক রাজ সাধারণ তন্ত্র, মুসলমান "জাতির" প্রতিনিধিত্ব অথবা পাকিস্থানের জন্মকালের গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৪৭ আইন সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ও সেই রাজের প্রতিষ্ঠা শুধু চীন, রুশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের সুবিধাবাদের উপরেই নির্ভরশীল ছিল ও আছে। কিন্তু পূর্ব্ববাংলা অথবা ভারত ও পাকিস্থানের কোন অংশের মানুষই ঐ সকল বিদেশী জাতির মতানুসারে নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য নহেন। সম্মিলিত জাতি সংঘ ও অনেক বিদেশী জাতিই জগতের বহু অন্যায়ের সমর্থন করিয়া আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব কলহ জাগ্রত রাখেন। কিন্তু তাহাদের সমর্থন থাকিলেই অন্যায় ন্যায় হইয়া যায় না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে (১) ইয়াহিয়া খানের সামরিক রাজ অন্যায় ও বেয়াইনী ও তাহার বিরুদ্ধতা রাজদ্রোহ নহে, (২) ঐ সামরিক রাজ্য ধ্বংস চেষ্টা সকল পাকিস্থানীর কর্ত্তব্য ও ন্যায্য প্রচেষ্টা এবং (৩) ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন করিয়া বিশ্বজাতি সংঘ ও রুশ—চীন—আমেরিকা—বৃটেন একটা অতি প্রকট মানবতা বিরুদ্ধ অন্যায়ের সমর্থন করিতেছেন।

ইয়াহিয়া খানের হত্যা-বিলাস

কোনও জাতির অথবা কোন রাজশক্তির অকারণ নরহত্যার অধিকার নাই বা থাকিতে পারে না। ইসলামের নামে প্রজাতন্ত্র গঠন করিয়া নিরস্ত্র প্রজাদিগকে সৈন্যবাহিনীর দ্বারা যথেচ্ছা হত্যা লুণ্ঠন ও ধর্ষণের চাপে নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করাও কোন জাতি, নেতা, রাজশক্তি বা সেনাপতির পক্ষে ন্যায্য কার্য্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আয়ুব খান অথবা ইয়াহিয়া খানের সামরিক-রাজপ্রতিষ্ঠা অন্যায়, বেয়াইনী ও ভারত বিভাগের মূল উদ্দেশ্য বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল। সকল মুসলমানের কর্ত্তব্য ছিল যে ১৯৫৮ খৃঃ অব্দে যখন পাকিস্থানে সামরিক রাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন হইতেই সেই রাজত্বের উচ্ছেদ চেষ্টা করা। কিন্তু রুশ-চীন-আমেরিকা ও বৃটেনের প্ররোচনায় পাকিস্থানের জনসাধারণ বহুকাল সেই চেষ্টা করে নাই। বর্ত্তমানে কিছুকাল পূর্ব্বে স্বয়ং ইয়াহিয়া খান পাকিস্থানের সাধারণকে বলেন যে অতঃপর নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিনিধিদিগের দ্বারা উপযুক্ত ও ন্যায্য ভাবে প্রজাতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা করা হইবে। ইয়াহিয়া খান নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিয়া জগতকে এই কথাই বুঝিতে দিলেন যে তাঁহার মতে সামরিক-রাজ ন্যায্য রাজ্যশাসন ব্যবস্থা নহে এবং সেই জন্যই তিনি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিতেছেন। নির্ব্বাচনে যখন দেখা যাইল যে আওয়ামী লীগ শতকরা প্রায় একশত জন নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সক্ষম হইয়াছে ও অতঃপর ইয়াহিয়া খানের রাজত্বের অবসান ঘটিবে; তখন ইয়াহিয়া খান পুনর্ব্বার সামরিক রাজ চালিত রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার ফলে আওয়ামী লীগের নেতা সেখ মুজিবুর রহমানের সহিত ইয়াহিয়া খানের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। সেখ মুজিবুর রহমান প্রথমতঃ শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ করিয়া ইয়াহিয়া খানকে ন্যায়ের পথে ফিরাইয়া আনাইবার চেষ্টা করিলেন। ইয়াহিয়া খানও শান্তির পথে চলিবার অভিনয় করিতে থাকিলেন ও গোপনে হাজার হাজার সৈন্য আনাইয়া পূর্ব্ব বাংলা ছাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেই মনে হইল যে যথেষ্ট সৈন্য আসিয়া গিয়াছে, তিনি তখনই সেখ মুজিবুর রহমানের সহিত আলোচনা বন্ধ করিয়া

কঠোর শক্তি প্রয়োগে পূর্ব্ব বাংলার জনসাধারণকে দমন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। প্রথম কয়েক দিনেই পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আনিত সৈন্যবাহিনীর হস্তে বহু সহস্র নিরস্ত্র মুসলমান ও হিন্দুর প্রাণ নষ্ট হইল। ইহাদিগের মধ্যে অধ্যাপক, শিক্ষক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদিগকেও নির্ব্বিচারে হত্যা করা হইল। পাকিস্থানের নৌবাহিনী চট্টগ্রামের উপর গোলা বর্ষণ করিয়া কয়েক সহস্র নরনারী ও শিশুকে হত্যা করে। কুমিল্লা, ঢাকা, যশোহর, রাজশাহী প্রভৃতি সহরে বিমান আক্রমণ করিয়াও বহুনির্দ্দোষ লোককে হত্যা করা হয়। ইয়াহিয়া খান নাৎসি জার্ম্মানীর বর্ব্বর ভীতির ভীষণতার-সৃষ্টি করিয়া রাজত্ব কায়েম রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশজন অধ্যাপককে হত্যা করিবার অন্য কি আবশ্যকতা বা সামরিক প্রয়োজনীয়তা কল্পনা করা যাইতে পারে? ছাত্রীদিগের নিবাস ভবন হইতে বহু ছাত্রীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবারই বা কি কারণ দেখান সম্ভব? গৃহ জ্বালাইয়া দেওয়া, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি এবং কারখানাগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়াও পূর্ব্ব পাকিস্থানবাসীকে দমন করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকিতে পারে না। অযথা যেখানে সেখানে গোলা বা বোমা বর্ষণ করিলে যে নরনারী শিশু নির্ব্বিশেষে যে কেহ মরিতে পারে সে কথা যুদ্ধ বিশারদ ইয়াহিয়া খানের অজানা নহে।

এই ভাবে হত্যাকাণ্ড ক্রমবর্দ্ধনশীল ভাবে চলিতেছে এবং ইয়াহিয়া খানের মতে তাহা পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ নিজস্ব ব্যাপার ও সে সম্বন্ধে অন্য জাতির কেহ কথা বলিলে তাহা পাকিস্থানের একান্ত নিজের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের এ কথা অবিদিত নাই যে তিনি মানবতা বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিলে যে কোন জাতির যে কেহ তাঁহার বিরুদ্ধবাদ, এমন কি তাঁহাকে আক্রমণও করিতে পারে। ইয়াহিয়া খানের নারী ও শিশু হত্যা অথবা অধ্যাপকদিগকে নিহত করিবার কোন রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অধিকার থাকিতে পারে না। রাজ্যশাসনের উদ্দেশ্য হইল শান্তিরক্ষা, নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা এবং সকল প্রজার সকল ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ। ইয়াহিয়া খান যাহা করিতেছেন তাহা অরাজকতার চুড়ান্ত ও সকল আইন উচ্ছেদের মূল অপরাধ। তাঁহার কোনও অজুহাতের কোন মূল্য নাই। তিনি মানবতার বিরুদ্ধে চরম দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও মানবজাতির সকল আদর্শ নাশের দোষে দুষ্ট। জার্ম্মানীর নাৎসি নেতাদিগের মত তাঁহারও প্রাণদণ্ড হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে পাকিস্থানী অপপ্রচারের মূল কথা হইতেছে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে নানা প্রকার নিন্দাবাদ। যেন হিন্দুস্থানই মুজিবুর রহমানকে ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বলিয়াছে। হিন্দুস্থান ইয়াহিয়া খান পূর্ব্ব বাংলার জনগণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করার অগ্রে এই বিষয়ে কোনও কথাই বলে নাই। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হইতেছে দেখিয়া হিন্দুস্থান তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। দ্বন্দ্বের মূলে রহিয়াছে নির্ব্বাচন করাইয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া কথা না রাখিয়া সামরিক শাসন পদ্ধতি মোতায়েন রাখা, এবং তাহার জন্য দায়ী ইয়াহিয়া খান নিজে। তাঁহাকে নির্ব্বাচন করাইতে কি হিন্দুস্থান বলিয়াছিল? না কথার খেলাপ করিয়া গায়ের জোরে সামরিক স্বৈরাচার চালিত রাখিতেই হিন্দুস্থান ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দিয়াছিল? দোষটা সম্পূর্ণ ইয়াহিয়া খানের নিজের। মুজিবুর রহমান সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং ইহাতে বাহিরের কোনও কাহারও দোষ কিছুমাত্র নাই।

শক্তিশালী জাতিগুলির বর্ব্বরতা সম্বন্ধে প্রতি ক্রিয়া

পশ্চিম পাকিস্থানের সৈন্যগণ পূর্ব্ব বাংলার নিরস্ত্র নরনারীর উপর যে নির্ম্মম ও বর্ব্বর আক্রমণ চালাইয়াছে তাহা দেখিয়াও যে বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ জাতিগুলি তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেছেন না ইহা আধুনিক রাষ্ট্রীয় জগতের জাতীয় চরিত্রের একটি অতি ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কথা ও চরম অবনতির নিদর্শন। সশস্ত্র সেনাবাহিনী সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্দ্দয় ভাবে সহস্র সহস্র বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বালক, বালিকা, নরনারী ও

শিশুকে হত্যা করিতেছে এবং বাছাই করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র, ছাত্রীদের দেওয়ালের গাত্রে দাঁড় করাইয়া গুলি করিতেছে। এরূপ বর্ব্বরতা নাৎসি জার্ম্মানীতে কিম্বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় মাইলাই-এর আমেরিকান সৈন্যদের জঘন্য অমানুষিকতার ক্ষেত্রেও দেখা যায় নাই। শুধু একটি সহরের ছাত্রীনিবাস হইতেই পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্যগণ চারি শতাধিক ছাত্রীদিগকে ধরিয়া নিজেদের ছাউনিতে লইয়া গিয়াছে এবং আরও শতাধিক ছাত্রী সেই স্থলে আত্মহত্যা করিয়া পশুদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সভ্যতার মহা মহা কেন্দ্র আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া বা চীনদেশে কিন্তু এই পাশবিক কার্য্যের কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। রাষ্ট্রীয় সুবিধাবাদ এমনি করিয়াই জগতের উচ্চ শিক্ষিত মানব সমাজের নেতাদিগকে অমানুষ করিয়া তোলে। পূর্ব্ব বাংলায় অন্ততঃ ছয় সাত লক্ষ নরনারী শিশু নিহত হইয়াছে ও তাহাদের দেহ যত্র তত্র যেমন তেমন করিয়া নদীর জলে বা চাষের ক্ষেত্রে ঢুকাইয়া দিয়া পাক সেনাগণ নিজেদের প্রভুদিগের হুকুম তামিল করিয়াছে। এই প্রভুগণ জগতের নিকট নিজেদের "পাক", পবিত্র ও পুণ্যবান, বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ইহাদের অপেক্ষা অধিক অপবিত্র ও মূর্ত্তিমন্ত পাপ কেহ হইতে পারে বলিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু বিশ্বের মহা মহা জাতিগুলি ইহাদের মহাপাপ দেখিয়াও দেখিতেছেন না।

ইন্দিরার দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী দারিদ্র্যের উপর যুদ্ধ চালাইয়া ভারতবর্ষ হইতে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিবেন বলিয়া দেশবাসী জনসাধারণকে জানাইয়াছেন। ইহার জন্য প্রথমে দেখা যাইতেছে যে তিনি দারিদ্র্য দূর না করিয়া ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের উপরেই আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারতে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অতি অল্পই আছে। যাহারা আছে তাহারা স্বাধীনতার যুগে ক্রমবর্দ্ধনশীল রাজস্ব দিয়া ততটা আর ঐশ্বর্য্যবান থাকিতেছে না। যথা যদি কাহারও বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকা হয় তাহা হইলে তাহাকে রাজস্ব দিতে হয় সাক্ষাৎভাবে প্রায় ৫০,০০০ টাকা। তৎপরে সে ব্যক্তি কোন কিছু ক্রয় করিলেই যে সকল পরোক্ষ রাজস্ব দিতে হয় তাহাও সাধারণতঃ ১০,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ সে ব্যক্তি এক লক্ষের মধ্যে ৬০,০০০ ষাট হাজার বা ততোধিক টাকা রাজস্ব হিসাবে দিয়া ৪০,০০০ টাকা নিজ ঐশ্বর্য্য হিসাবে রাখিতে পারে। বর্ত্তমান কালে সভ্য জগতে, এমন কি কোন কোন কম্যুনিষ্ট দেশেও বাৎসরিক ৪০,০০০ টাকা উপার্জ্জন করা সাধারণ কথা। আমেরিকায় বহুলোকের বাৎসরিক বেতন ২০।৩০ হাজার ডলার (১৫০০০০।২২৫০০০ টাকা) হইয়া থাকে। বৃটেনে চাকুরী করিয়া অনেকেই ৪০০০ ৫০০০ পাউণ্ড (৭২০০০।৯০০০০ টাকা) পাইয়া থাকে। ইউগোস্লাভিয়াতে ঐ রূপ বেতন বিরল নহে। ঐ সকল দেশে রাজস্ব অনেক কম। আমাদের দেশে কাহারও বাৎসরিক আয় ৪৫০০৲ টাকা হইলেই তাহাকে আয়কর দিতে হয়। আমেরিকাতে অন্ততঃ বাৎসরিক ২২৫০০ টাকা বেতন না হইলে কাহাকেও আয়কর দিতে হয় না।

আমাদের দেশে কাহারও গৃহে ৩ খানা ঘর থাকিলে অথবা কাহারও একটা মোটর গাড়ী থাকিলেই তাহাকে "বড়লোক" বা বিত্তবান বলা হয়। সভ্যজগতে প্রায় সর্ব্বত্রই বাসস্থান, যানবাহন, পোষাক পরিচ্ছদ, পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি সকলেরই আছে। ভারতবর্ষে কোন বড় সহরে একটা ৩।৪ কামরার "ফ্ল্যাট"এর ভাড়া মাসিক ৫০০।১০০০ টাকা হয়। গাড়ী থাকিলেই তাহার উপর মাসিক ৫০০শত টাকা ব্যয় করিতে হয়। উপযুক্ত ভাবে কাপড়-চোপড় পরিলে ও তাহা ধোলাই ইস্ত্রি করাইলে মাথা পিছু মাসিক ২৫।৩০ টাকা খরচ হয়। পুষ্টিকর খাদ্য; অর্থাৎ দৈনিক অপর খাদ্যের সহিত আধসের দুধ, ২টা ডিম, আধপোয়া বা তিন ছটাক মাছ মাংস, মাখন ও কিছু ফল খাইলে মাথাপিছু দৈনিক ৫।৬ টাকা খরচ হয়। একটা পরিবারে যদি পাঁচজন লোক থাকে তাহা হইলে সেই পরিবার খাদ্যের উপর দৈনিক ২৫।৩০ টাকা বা মাসিক ৭৫০।৯০০ টাকা ব্যয় করে। আমাদের

দেশে মানুষের উপার্জ্জন অল্প, রাজস্ব অধিক; কিন্তু শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি অপর দেশের মত সরকারী খরচে হইতে পারে না। সেই জন্য এক এক পরিবারের শিক্ষার উপর মাসিক ১০০।২০০ টাকা এবং চিকিৎসার জন্য ১০০।১৫০ টাকা ব্যয় হয়। তাহা হইলে ভালো-ভাবে বসবাস করিতে উচ্চ-মধ্যবিত্ত চালে থাকিলে বাড়ীভাড়া, গাড়ী, বস্ত্র, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতিতে একটা পরিবারের মাসিক ২৫০০ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ইনসিওরেন্স, সঞ্চয়, সামাজিক ব্যাপারে ব্যয় প্রভৃতি ধরিলে উহা ৩০০০।৪০০০-এ দাঁড়াইতে পারে। অর্থাৎ আমাদের দেশের হারে মাশুল খাজনা রাজস্ব দিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইলে মাসিক ৫০০০৲ টাকা বেতন পাইলে ভালো ভাবে থাকা সম্ভব হয়। তাহা অপেক্ষা অল্প উপার্জ্জনে পাশ্চাত্য জগতের সহিত তুলনীয় ভাবে কেহ দিন কাটাইতে পারে না। সুতরাং শ্রীমতী ইন্দিরা যাহাকে "আমিরী" বলিয়া দমন চেষ্টা করিবেন তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধারণ জীবন যাত্রা মাত্র—আমিরী নহে। এবং সকল "আমির" এর সকল অর্থ কাড়িয়া লইয়া সমান ভবে ভাগ বাট করিলে ভারতের মানুষের মাথা পিছু আয় বাৎসরিক ৩০০৲ টাকাই থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ "গরিবী" দূর করিতে হইলে দেশের সর্ব্বত্র সকল মানুষের উপার্জ্জন ও উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। দ্বিগুণ, চতুগুণ বা দশগুণ বাড়াই-লেও আমাদের জীবন ধারা পাশ্চাত্যের সমতুল্য হইবে না। গরিবী দূর করা তাহা হইলে সম্পদ ভাগবাটের সমস্যা নহে; উৎপাদন ও উপার্জ্জনের সমস্যা।

চীনের আত্মপর বিবেচনা

পাকিস্থানের সামরিক বাহিনীর ইচ্ছা ও মতামত যদি ঐদেশের জনসাধারণের অন্তরের অভিলাস ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা ব্যবস্থার মূল্য নির্দ্ধারণের সহিত একার্থ হইত তাহা হইলে ধরা যাইতে পারিত যে ইয়াহিয়া খানের স্বৈরাচার ও পাকিস্থানের জনসাধারণের রাষ্ট্রমতের অভিব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু বস্তুতঃ বিষয়টা ঐরূপ সহজ সরল নহে। কারণ ইয়াহিয়া খান সামরিক শক্তির অপব্যবহারে পাকিস্থানের জনমতকে দাবাইয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত করিতেছেন। এমন কি ঐ জনসাধারণের উপরেই গোলাগুলি চালাইয়া পাকিস্থানের সৈন্যগণ প্রায় ৪।৫ লক্ষ পূর্ব্ব পাকিস্থানবাসী বাঙালীকে হত্যা করিয়াছে। তাঁহাদের অপরাধ তাঁহারা ইয়াহিয়া খানের সৈন্যদের হুকুমে ক্রীতদাসের মত উঠিতে বসিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা চাহেন সাধারণতন্ত্রের অতি সাধারণ রাষ্ট্রীয় অধিকার ব্যবহারে নিজেদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া লইতে। ইয়াহিয়া খান চাহেন পাকিস্থানের জনসাধারণকে শোষণ করিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের ১২।১৩টি ঐশ্বর্য্যশালী পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইয়া এবং ঐ দেশের যত বড় বড় চাকুরী ব্যবসা প্রভৃতি আছে তাহার অধিকাংশ বাছাই করা পশ্চিম পাকিস্থানের মানুষ-দিগের জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়া পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনগণকে কাঠকাটা ও জল তোলার জন্য নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে। পাকিস্থানকে বিভিন্ন রাষ্ট্র করিয়া গঠন করিবার সময় মহম্মদ আলি জিন্না যে সকল কথা বলিয়াছিলেন—অর্থাৎ সব মুসলমান এক জাতি ও তাহাদের সকল উন্নতির ব্যবস্থা একভাবে করা প্রয়োজন—সে সকল কথা পাকিস্থানের সামরিক প্রভুদিগের আজ আর মনে রাখিবার প্রয়োজন হয় না। আজ পূর্ব্ব পাকিস্থান হইয়াছে পশ্চিম পাকিস্থানের উপনিবেশ। পূর্ব্ব পাকিস্থানের বাঙালী মুসলমান পশ্চিমের মুসলমানদিগের সহিত এক জাতি নহে। তাহারা নিম্নস্তরের মানুষ ও তাহাদের জন্য সকল ব্যবস্থা অল্পব্যয়ে ও পশ্চিমাদিগের সুবিধা বুঝিয়া করিতে পাকিস্থানী রাষ্ট্রীয় আদর্শে বাধে না। সুতরাং পূর্ব্ব বাঙলার মানুষ পৃথক হইতে চাহে ও পৃথক প্রায় হইয়াছেও। তাহাদের নেতা সেখ মুজিবুর রহমান আজ পশ্চিম পাকিস্থানের সৈন্য বাহিনীর সহিত ঘোর সংগ্রামে নিযুক্ত। পাকিস্থানী সৈন্যগণ সহস্র সহস্র নির্দ্দোষ নরনারী বালক বালিকা ও শিশুদিগকে

নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া নিজেদের অল্পদিনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত করিতেছে। এই মহাপাতকের বিরুদ্ধে শুধু এক ভারত প্রতিবাদ করিতেছে। অন্যান্য দেশ পাকিস্থানের বেয়াইনী সরকারের বেয়াইনী বর্বরতার বিরুদ্ধে কিছু বলিতেছে না। কারণ তাহারা পাকিস্থানের "নিজের ঘরের কথা" সমালোচনা করা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় রীতি বিপরীত ও কায়দা বিরুদ্ধ কার্য্য মনে করে। কিন্তু যে "ঘরের কথা"টা মানব ইতিহাসের একটা অতি ভয়ঙ্কর মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী অপরাধ, যাহার ফলে সহস্র সহস্র নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছে; সহস্র সহস্র দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বেয়োনেট বিদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে, কয়েক শত অধ্যাপককে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া গুলি মারিয়া হনন করা হইয়াছে; সে কথাটা পাকিস্থানের সামরিক পশুদিগের একান্ত নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার কথা হইতে পারে না। যাহা মানবতার সকল আদর্শ, সকল নীতিকে পদদলিত করিয়া মনুষ্যত্বের সর্ব্বনাশের প্রকট ও বিকট উদাহরণরূপে বিশ্বমানবের সম্মুখে নিজের ভীষণতা উৎকটভাবে ব্যক্ত করিতেছে; তাহার উচ্ছেদ এবং যাহারা সেই অপরাধে অপরাধী তাহাদের প্রবলভাবে দমন করার চেষ্টা করা সকল মানুষের কর্ত্তব্য। কেহ যদি শিশু হত্যা বা নারী ধর্ষণ করে ও সে যদি বলে যে ঐ মহা অপরাধ তাহার একান্ত নিজস্ব কথা ও অপরের সেই কার্য্য প্রতিরোধ করিবার কোন আন্তর্জাতিক রীতি সঙ্গত অধিকার নাই, তাহা হইলে সেই পাপাত্মাকে কঠিন হস্তে শাসন, দমন ও নিপাত করিতে কাহারও দ্বিধা করিবার আবশ্যক হইতে পারে না। সকল চোর, ডাকাত, জালিয়াত, নরহন্তা ও অপর প্রকারের অপরাধীই বলিতে পারে অপরাধ তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত অধিকারে তাহারা করিতেছে; অপরের তাহাতে কিছু আপত্তি করিবার নাই। কিন্তু ঐ প্রকার নীতিবাদ অপরাধীর অপরাধের সাফাই মাত্র; এবং তাহার কোনই মূল্য মানবতার অধিকার-বিচারে ধর্ত্তব্য নহে। শিশু ঘাতকের শিশু হত্যা, ধর্ষকের ধর্ষণ তাহার নিজস্ব ব্যক্তিগত কার্য্য ও অপরে তাহার অপরাধের সমালোচনা করিবে না ও তাহাতে বাধা দিবে না; এরূপ তর্ক শ্রবণ করা ও সমর্থন করাও অপরাধ। আন্তর্জাতিক কায়দা কানুন যদি নারী ধর্ষণ ও শিশু হত্যাকারীকে বাঁচিয়া যাইতে সাহায্য করে তাহা হইলে সেই আন্তর্জাতিক নিয়মেরও অবিলম্বে উচ্ছেদ প্রয়োজন।

চীনদেশ সম্প্রতি ভারতবর্ষকে ধমক দিয়াছে যে ভারত পাকিস্থানের নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। চীন দেশ অবশ্য কদাপি অপরের কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। চীন শুধু তিব্বত দখল করিয়া সেই দেশের কয়েক লক্ষ লোককে হত্যা করিয়াছে; ভারতের ২০,০০০ হাজার বর্গমাইল জমি দখল করিয়াছে; উত্তর ভিয়েৎনামের লোকেদের অস্ত্র সরবরাহ করিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উপর আক্রমন চালাইবার সুবিধা করিয়া দিতেছে এবং পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্থানের হত্যা কাণ্ডে সহায়তা করিতেছে। চীনের ধর্ম্মের অভিনয় বড়ই হাস্যকর এবং তাহা দেখিয়া জনসাধারণ কি মনে করিবেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। পাকিস্থানের বহু দুষ্কার্য্যের সহায়তা করিয়া চীন জগতের নিকট নিজ সুনাম হারাইয়াছে। পাকিস্থানের সৈন্য ও রসদ লইয়া যাইবার ব্যবস্থাতেও চীন বর্ত্তমানে পাকিস্থানকে সাহায্য করিতেছে।

পাকিস্থানে নিজেদের ভিতরে যুদ্ধ চলিতেছে। আওয়ামী লীগ পাকিস্থানে সংখ্যা গরিষ্ঠ। সামরিক দল সংখ্যায় অল্প। সুতরাং পাকিস্থান বলিতে আমরা অওয়ামী লীগকে মানিয়া লইলে তাহাতে আপত্তির কি আছে? সামরিক দল কোন আইনে পাকিস্থানের রাজ অধিকারে অধিকারী? গায়ের জোরে? যদি তাহা হয় তহা হইলে আওয়ামী লীগেরও গায়ের জোর দেখাইবার অধিকার আছে। এখন অবধি গায়ের

জোরের পরীক্ষায় আওয়ামী লীগ পরাজিত হয় নাই। সম্ভবতঃ হইবেও না।

কদর্য্য ও ঘৃণ্য বর্ব্বরতার সমর্থন করিয়া চীন শুধু নিজের অপযশের বোঝা ভারি করিতেছে। ভারতে কিছু কিছু অপরিণত বুদ্ধি মানুষ আছে, যাহারা চীনের প্রগতিশীলতা ও রাষ্ট্রমতের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। পৃথিবীর মানুষ এক সময় খৃষ্টিয় সাম্রাজ্যবাদীদিগের ধর্ম্মমতের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের সাম্রাজ্যবাদকে স্কন্ধে বহন করিয়া নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রমাণ করিত। আজ সেইভাবে কোন কোন নির্ব্বোধ চীনের মতামতের জেল্লা দেখিয়া তাহাদের পররাষ্ট্র দখল ও পরের দেশে নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধির প্রচেষ্টা দেখিয়াও দেখিতে চাহে না। অন্ধভক্তি ও বিশ্বাসের ইহা অপেক্ষা প্রকট উদাহরণ আর কোথাও পাওয়া সহজ হইবে না। চীন সুবিধাবাদী। পাকিস্থান ভারতের কোন কোন স্থান বেদখল করিয়া লইয়া সেই সকল দেশাংশ চীনকে খয়রাতি করিয়া চীনের নেক নজরে আসিয়াছে। সুতরাং চীন পাকিস্থানের সকল মহাপাপের সাফাই গ্রাহ্য করিয়া লইয়া নিজের সুবিধাবাদের চূড়ান্ত প্রমাণ দিতেছে। ভারত এখন অবধি পাকিস্থানী সৈন্যদিগের বর্ব্বরতার যে নিন্দা ও সমালোচনা করিয়াছে; তাহা অত্যন্তই মোলায়েম এবং পাকিস্থানী পাশবিকতার কিছুমাত্র উপযুক্ত প্রতিবাদ নহে। বিশ্বের সকল জাতির কর্ত্তব্য পাকিস্থানকে সামরিকভাবে আক্রমন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যে অমানুষের শাস্তি কিরূপ হওয়া আবশ্যক। কয়েকশত পাকিস্থানী সামরিক কর্ম্মচারীকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলাইলে তবেই তাহাদের নির্ম্মম পশু প্রবৃত্তি কিছুটা উত্তর তাহাদিগকে দেওয়া হয়। এবং পাকিস্থানী সামরিক বাহিনীর সকল সৈন্যকে একশত করিয়া কশাঘাত বেকসুর দেওয়া আবশ্যক। কারণ তাহারা মনুষ্য নাম ধারণের যোগ্য নহে এবং তাহাদের যথাযোগ্য শাস্তি দিতে হইলে আমাদের নিজেদেরও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া পুরাকালের রীতিতে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হয়।

চীনের ধৃষ্টতার জবাব দিতে হইলে প্রথমত বলিতে হয় যে চীন অপরকে উপদেশ না দিয়া নিজের চালচলন ঠিক করিবার চেষ্টা করিলে চীনের ও অপর জাতিগুলির সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ চীন পাকিস্থানের মহাপাপের সমর্থন করিয়া শেষাবধি কোনভাবেই লাভবান হইতে পারিবে না।

শ্যামলীর কবি রবীন্দ্রনাথ

রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী

'শ্যামলী' রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্তপর্ব্বের কাব্য। গ্রন্থটির প্রকাশকাল, ভাদ্র-১৩৪৯। অন্তপর্ব্বেই কবির পূর্ণতা-বোধের ধ্রুব সাধনার সুরু। এই পর্ব্বে কবিচেতনা সকল রহস্য ও ব্যাঞ্জনা কে পরিহার করে একটি স্থির উপলব্ধিতে নিবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাববন্ধনকে দীর্ঘকাল আশ্রয় করে থাকেনি। ভাব-বিবর্ত্তন রবীন্দ্র-কাব্যে একটি নিগূঢ় নিয়ম। জীবনের প্রতিটি পর্য্যায়ে তাঁর কবিমানস ভিন্ন রূপ ও কল্পনাকে গ্রহণ করেছে এবং ভাব বিসর্জনের অনুরূপ কল্পনা ও আবেগের প্রকাশভঙ্গিকে অনুসরণ করে সার্থক পরিণতি লাভ করেছে। ভাবের মুক্তি-বন্ধনের প্রেরণাই রবীন্দ্র-কবিমানসের প্রকৃত পরিচয়। রবীন্দ্র-রচনা সম্ভার তাই কবির কালানুক্রমিক ভাববিবর্ত্তনের ফসল স্বরূপ,-তাঁর মনোঋতুর ফুল ও ফল। কবি তাঁর নিজের কাব্যরসাস্বাদনের পথরেখা নির্দ্দেশ করে বলেছেন, 'আমার কাব্যের ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে'। এই কাব্যানুভূতির বিচিত্র প্রকাশ পর্য্যায়ক্রমে রবীন্দ্রকাব্যে প্রতীয়মান। কাব্যসৃষ্টির প্রতি পর্ব্বে কবি দুরূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে তিনি কোন সময় পাঠকচিত্তকে ভাব ও সুরের মোহজালে আবিষ্ট করেছেন; অবার কোন সময় কালোচিত স্বভাব ধর্ম্মের অনুভূতি ও ভাব-প্রবাহের প্রজ্ঞানে কাব্যরসপিপাসুদের মনকে গভীর-ভাবে আচ্ছন্ন করেছেন। অবশ্য কবির সকল প্রচেষ্টাই একটি ঐক্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। অন্ত পর্ব্বে, কবি জগতের নানা ঘটনা-পরিবেশে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করে বাস্তব জীবনের সকল রূপ ও রস উপভোগ করেছেন এবং সেই সঙ্গে পাঠকচিত্তকেও একাধিকবার তরলে শ্যামলে কঠিনে কোমলে মিশিয়ে এক বিচিত্র বাস্তবানুভূতি সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবির অন্তপর্ব্বের কবিতাগুলিতে বাস্তবের রূঢ় জীবনের অসম্ভব্যতাও স্পন্দিত হয়েছে। যেখানে আধুনিক জীবনের ব্যঞ্জনা, প্রাত্যহিক অনুসৃত দেহী প্রেমের দৈন্যও বিধৃত হয়েছে। তবু একথা স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্ব পর্ব্বের কবিতার সঙ্গে আলোচ্য পর্ব্বের কবিতা-গুলির কিছু রূপ-ভেদ ঘটলেও কোথাও রসের প্রভেদ ঘটেনি। রোমান্টিক সৌন্দর্য্য ও অবেগ কবিতাগুলির রস পরিণতি।

অন্তপর্ব্বস্থিত কবিতাগুলিতেও রবীন্দ্র কবিমানসের ভাব বিবর্ত্তনের ধারাটি যথাভূতভাবে প্রসারিত। কবির রচনারীতি ও ভাববৈচিত্র্য কালানুক্রমিক রূপান্তরের মধ্যাদিয়ে এই পর্ব্বে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। পরিণতি যুগের পরই পূর্ণতার যুগ, আর অন্তপর্ব্বেই রবীন্দ্র কবি-মানস বিচিত্র কল্পনা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এক কথায়, এই পর্ব্বটি পূর্ণতার দূতী-স্বরূপ। পূর্ণতা-যুগেই কবিচিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশ। অন্য পর্ব্বের মত এ পর্ব্বেও কবি তাঁর নবজাগ্রত চেতনার আলোকে কব্যকলার অপরীক্ষিত বিষয়গুলি নিয়ে নানা পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সেইসঙ্গে কাব্যরীতির কালোচিত স্বভাবধর্ম্মের বিষয়-টিকেও নবজাগ্রত চেতনা ও অনুভূতির আলোকে নিরীক্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন; অর্থাৎ মানুষের প্রত্যক্ষতার অন্তরালে যে সত্যবস্তু অপ্রত্যক্ষ রয়েছে তাকে উপলব্ধির জন্য কবি সচেষ্ট হয়েছেন। তাই শেষ পর্ব্বের কাব্য-গুলিতেও কবি মনের ভাববিবর্ত্তন পুনরাবৃত্ত হয়েছে। 'শ্যামলী'-কাব্যটিতেও তার পরিচয় উৎসারিত।

কবির পূর্ণতা যুগের কাব্যগুলিতে এক নতন

ছন্দরীতি ও ভাবকল্পনা অনুসারিত। কাব্যরীতির-নবত্ব, সংগীতের মুর্চ্ছনা সংগীতধর্ম্মিতা পরিহার করে এক নতুন গদ্য ছন্দে নির্ভরশীল। ছন্দরীতি ধ্বনিপ্রবাহের আশ্রয়ে ও কল্পনাবেগের আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের প্রবাহমানতায় শুধু অন্তরের ভাবছন্দকেই স্বীকার করেছে; বহিরূপাশ্রিত ছন্দকে আবাহন করেনি। ফলে, কাব্যে এমন একটি বিশিষ্ট সুর ধ্বনিত হয়েছে যা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতাগুলির সুরধ্বনি হতে অনেকাংশে বিভিন্ন। এই বিশেষ যুগের কাব্য-কবিতায় কবি প্রবর্ত্তিত নতুন ছন্দ-রীতি অন্তঃমিল মুক্তক ছন্দ না হলেও এর রীতি স্বরূপতা যে এক সার্থক পরীক্ষারই চরম পরিণতি, একথা অনস্বীকার্য্য। গদ্যের দৃঢ়কাঠিন্য ও অনুভূতির প্রবহমান গতির মধ্যে বিশ্ববস্তুর তুচ্ছ-অস্তিত্বকে আপন স্বরূপ প্রকাশ করার সার্থক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে নতুন ছন্দের প্রতি আকর্ষণ করেছে। 'পুনশ্চ,' 'শেষ সপ্তক, 'পত্রপুট' ও শ্যামলী এই কাব্য-চতুষ্টয়কে নবত্বক ছন্দরীতির এক সাফল্যের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। গদ্য কবিতার সার্থক প্রকাশ ঐ কাব্যগুলিতে সপ্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে গদ্য-কবিতার পরীক্ষামূলক সূত্রপাত। সেই পরীক্ষা 'শেষ-সপ্তক' 'পত্রপুট' ও শ্যামলী'তেও পুনরাবৃত্ত হয়েছে। 'শ্যামলী কবির শেষ পরীক্ষামূলক কাব্যগ্রন্থ। এর পর তিনি আর নতুন ছন্দরীতিতে কাব্য রচনা করেন নি।

ছন্দের ক্ষেত্রে উক্ত কাব্যচতুষ্টয়ে যে বিবর্তন গতি পরিলক্ষিত তার স্বরূপ পরবর্ত্তী বাংলা কাব্য কবিতায় নিঃসন্দেহে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নতুন ছন্দরীতি প্রবর্ত্তন রবীন্দ্র কবি ভাবনায় কোনরূপ আকস্মিক ঘটনা বা গভীর মোহবশে নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি দীর্ঘকাল কোন নির্দ্দিষ্ট ছন্দরীতি ও ভাববন্ধনকে আশ্রয় করে পরিতৃপ্ত থাকেনি। পরিণতি যুগের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থেও এক নতুন ছন্দরীতি পরিলক্ষিত। 'বলাকা' ও 'লিপিকা' কাব্যদ্বয়কে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। একথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য যে, কাব্যের প্রাণশক্তির উৎস সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন। আর সেই সাধনার প্রতিটি পর্য্যায়ে তাঁর রচনারীতি বিচিত্র কল্পনার আশ্রয়ে বিভিন্ন রূপপরিগ্রহ করেছে। তাঁর জীবন ও কাব্য সাধনার যোগসূত্রটি নিরবিচ্ছিন্ন। জীবনকে কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে রবীন্দ্রকাব্যস্বরূপকে নিরীক্ষণ করার কোন উপায় নেই। কাব্যই কবি-জীবনের পরম সত্তা,—তাঁর অন্তর্নিহিত চৈতন্য। সেই কাব্যসত্তা জীবনবহির্ভূত নয়; বরং অন্তরেরই প্রকাশ।

'পত্রপুট' 'ছন্দ' ও 'শ্যামলী',—এই তিনটি রচনা একই সালে গ্রন্থিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে কবির অতিপ্রিয় মাটির ঘরখানিকে উদ্দেশ্য করে 'শ্যামলী' কাব্যখানি রচিত। ঐ ঘরখানি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি পত্রে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন,—

"মাটির বাড়ীটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল-দেওয়ালে মূর্ত্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করছে।"

[চিঠিপত্র—২ পৃঃ ১০৮]

উক্ত কাব্যগ্রন্থটির 'শ্যামলী' নামকরণের তাৎপর্য্য সম্পর্কে আচার্য্য সুকুমার সেন লিখেছেন,—

'শ্যামলীতে স্নিগ্ধ কোমল বাঙালীমেয়ের নিত্যকালের জীবনের রূপটিই দৃষ্টি অধিকার করিয়াছে। তাই কাব্যের নাম 'শ্যামলী'।

যাইহোক, নামকরণের তাৎপর্য্য বিচারে শ্যামলী কাব্যখানি যে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাহিত্যকার বা কবি যখন কোন বিশেষ ধরণের সাহিত্য কর্ম্মে অবতীর্ণ হন, তার নামকরণের মধ্য দিয়েই ওই উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়টিকে তিনি আভাসিত করেন। তাছাড়া কাব্য, নাটকাদির ক্ষেত্রে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে, কোন একটী বিশেষ তত্ত্ব বা ভাবাদর্শকে দৃষ্টির সম্মুখে রেখে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। কবি বা সাহিত্যকারের অভিপ্রায় কিংবা রচনার অন্তর্লীন ভাবসত্য যদি কাব্য কাহিনীর মূল বিষয়বস্তুর ওপর

আলোকপাত না করে, তাহলে গ্রন্থের নামকরণে যথেষ্ট ত্রুটি থেকে যায়। 'শ্যামলী' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত কবিতা-গুলি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সেখানে একটী তত্ত্ব বা ভাবাদর্শ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বিশেষ একটি তত্ত্বকে যেন কবি বাণীরূপ দিতে চেয়েছেন; আর সেই তত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব ছাড়া কিছু নয়। কবি মাত্রেরই বিষয়-বস্তুকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। বস্তু বা বিষয় গৌরবের ওপরই কবিকল্পনার একান্ত প্রতিষ্ঠা।

শ্যামলী কাব্যে কবি বিষয়বস্তুকে অগ্রাহ্য করেননি। ঐ কাব্যখানি বিষয়বস্তু ও রচনারীতিতে পরিচিত জীবনকেই ভিত্তি করেছে। কবির সৌন্দর্য্যচেতনায় বিষয়বস্তু পূর্ণ স্বরূপতায় মূর্ত্তিলাভ করেছে। কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় অনুরূপ সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় উৎসারিত। বলাবাহুল্য, কবির সৌন্দর্য্যচেতনা মঙ্গল প্রতিমারই পূর্ণস্বরূপ। সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিই প্রকৃত মঙ্গল মূর্ত্তি। প্রবৃত্তির সংঘাতে এবং চিত্তের অশুদ্ধতায় একে কোনদিন অর্জন করা যায় না। সৌন্দর্য্যকে কবি উপলব্ধি করেছেন হৃদয়ের গভীরতায়, দৃষ্টির ব্যাপকতায়। তাই তার চোখে সকল আনন্দ দেয়-বস্তু আনন্দসুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

শ্যামলীতে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যচেতনা রোমান্টিক ভাবালুতায় এক স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। রচনা-রীতিও এক ভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকে আশ্রয় করে সার্থক পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্র কবিমানসের এ এক ভিন্ন স্বরূপ। কবি যেন কালের প্রবহমান গতি চাপল্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী রোমান্টিকতা ও অতিবিস্তৃত বাসনা প্রাত্যাহিক জীর্ণতায় হঠাৎ যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। পরিবেশগত প্রত্যক্ষের রমনীয়তা তাঁকে যেন অধিকতর আকর্ষণ করেছে। তাঁর কল্পনাবৃত্তি পূর্ব্বের তুলনায় এখানে নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। যৌবনের অতি পল্লবিত উচ্ছ্বাস, কামনা ও আবেগের মোহজাল কাটিয়ে তিনি যেন এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। মানুষের প্রত্যক্ষতার অন্তরালে যে অপ্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু নিহিত রয়েছে, তাকে প্রত্যক্ষ-প্রীতির সমসূত্রে গ্রথিত করে এক বিচিত্র রসাস্বাদনে উন্মুখ। অবশ্য এ সকলের মূলে রয়েছে অস্তিত্বের প্রবাহের সঙ্গে কবি আত্মার একটি যোগ সংস্থাপন; চেনার মধ্যে অচেনার রহস্য অনুভব। কবিমানসের বিকাশের দিক হতে এর মূল্য অনস্বীকার্য্য।

শ্যামলীতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাবৃত্তির চেয়ে বাস্তব-বোধ এবং বর্ণন প্রাধান্য পেয়েছে। গভীর ভাব ব্যঞ্জনায়, বক্তব্যের স্পষ্টতায় এবং অনুভূতিশীল কাব্যময় বাক্-ভঙ্গীতে শ্যামলীর কয়েকটি কবিতা ঐশ্বর্য্যবান। অনেক কবিতা আবার স্মৃতিবহ। কল্পনাবৃত্তি এখানে আবেগ উচ্ছ্বাসের মোহ পরিত্যাগ করে দুর্লভ স্মৃতি চারণায় নিমগ্ন। স্মৃতি রোমন্থনকে আশ্রয় করে কবি কল্পলোকে মানসযাত্রা করেছেন। তাঁর আবেগ ও উপলব্ধি একটি গভীর প্রশস্তিতে আচ্ছন্ন। বৈদগ্ধের সংমিশ্রণে দৃষ্টি-চেতনা হয়ে উঠেছে ধ্যানগম্ভীর, প্রত্যক্ষ ও শাণিত। ভাবাবেগ কিছুটা মোহনির্মুক্ত। রচনারীতিতেও বৈরাগ্যের প্রতিভাস পরিলক্ষিত। এক বিমিশ্র রসাবেশে ভাববাদী কবি যেন নিমগ্ন। পরিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহের সংগে তিনি নিজেকে একাত্ম করে তাদের রস উপভোগ করছেন এবং পাঠকচিত্তকেও সেই রসা-বেশে আবিষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্যামলীতে এই বিচিত্র রসাবেশের পালা চলেছে।

চিত্র ও তত্ত্বের সমন্বয়ে শ্যামলীর কয়েকটি কবিতা অনবদ্য। প্রত্যক্ষ ও পরিমিতির মধ্যেও চিত্রগুলি রমণীয় মূর্তি লাভ করেছে। চিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে কবি-মনের একটি নিবিড় স্পর্শ। চেনা-অচেনার মিশ্রিত চিত্রাবলীকে কবি আত্মপ্রকাশের কাজে ব্যবহার করেছেন। চিত্রগুলি ভাবানুভূতির প্রগাঢ়তায় কোথাও অতিরঞ্জিত রূপপরিগ্রহ করেনি, কল্পনা ও ভাব বিকারে অতিকৃত হয়ে মায়া মোহে পর্যবসিত হয়ে পড়েনি এবং অকিঞ্চিতকর আবেগ ও উপলব্ধির ব্যাপকতায় বিমূর্ত্ত হয়ে ওঠেনি। চিত্র ও তত্ত্বের সংগে বিষয়গুলি এক অপূর্ব্ব সৌহার্দসূত্রে বাঁধা পড়েছে। শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলি বিচিত্র কল্পনার আশ্রয়ে এবং চিত্র সংগীতের মাধুর্য্যে রমণীয়তা লাভ করেছে। তাছাড়া

একটি বিশেষ ভাবকলাঙ্কিত শিথিল মুহূর্ত্তকে জানা-অজানার রহস্যে ধরে রাখার প্রচেষ্টাও চিত্রগুলিতে পরিলক্ষিত। বাস্তবের ক্ষণ অনুভূতি কবি চিত্তে বিচ্ছুরিত হয়ে নানা চিত্ররূপ সৃষ্টি করেছে। সৌন্দর্য্যের দৃষ্টিতে কবি সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন এবং চিত্রযোজনার প্রভাবে পাঠকচিত্তে একটা ভাবের আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন। চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনের গভীরতর উপলব্ধি। পরিণত জীবনে তিনি বাস্তবের গূঢ়তম সত্যের অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন; মানবাত্মাকে অপূর্ব্ব গৌরব ও মহিমা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আন্তর অনুভূতিকে এই উপলব্ধির আধার বলে স্বীকার করেছেন। কবির এই গভীর নীতিবোধ স্বাভাবিক পরিবেশ চিত্রণ ও ঘটনা সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

শ্যামলীতে বাইশটি মাত্র কবিতা। উক্ত কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ছন্দমুক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'শ্যামলী' পর্য্যন্ত গদ্যছন্দই তাঁর আত্মপ্রকাশের বাণীবাহক। জীবনের পরিঘাটে এসে তিনি ভাববাদীর জীবন থেকে নির্ব্বাসিত হতে চেয়েছেন এবং বাস্তব-স্পৃষ্ট লঘু, শিথিল, অবান্তর ঘটনাসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। গদ্য ছন্দই তাঁর মোহমুক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় এবং প্রধান গৌরবস্থল। স্বাধীন অনিয়মিত প্রবাহের অবাধ আধিপত্যের ওপর এই ছন্দ একান্ত নির্ভরশীল। এই বিশেষ রীতি-পরীক্ষায় কবির প্রেমানুভব স্বভাবতই স্তিমিত। কল্পনার গতি কতকটা অনিয়ন্ত্রিত, মন্থর ও অলস। কতকক্ষেত্রে লঘু-গুরু বিচিত্র চিন্তার মাঝে যৎসামান্য দৃশ্যরূপ দেখা দিয়েছে। দৃশ্যগুলিতে সর্ব্বত্র একটা সহজ সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি কবিতায় চিত্র ও দর্শন যেন পাশাপাশি চলেছে। চিত্র সেখানে নেপথ্যে পরিপ্রেক্ষিতের কাজ করেছে। তবু তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা আঁকাবাঁকা এলানো ছড়ানো' রূপটি পাঠক-মনকে এক অপরূপ রমণীয়তায় মুগ্ধ করে। আবার কয়েকটি কবিতায় চিত্র স্পষ্ট চিত্রে আশ্রিত নয়। চিত্রকলা সেখানে মননধর্ম্মী। দু একটি কবিতায় কবির নিসর্গ প্রীতি ভাবুকতা মুদ্রিত হয়েছে। নিসর্গ অবগাহনের পর তিনি যেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা আত্মিক সম্পর্ক রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অনুভূতির সূক্ষ্মতায় কবিতাগুলি স্মরণীয় মূর্ত্তি লাভ করেছে।

শ্যামলীর কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রেমানুভব ভিন্নরূপ নিয়েছে। 'কড়ি ও কোমল' এর যুগে রূপতৃষ্ণায় ব্যাকুল কবি রূপকে নারীর দেহের দুয়ারে ধরতে চেয়েছেন। প্রেমানুভবের স্বরূপ এখানে দেহাশ্রিত। এ প্রেমানুভবে আছে শুধু কামনা, ব্যাকুলতা আর উচ্ছ্বাস। সম্ভোগ-বাসনা, আসঙ্গ-লিপ্সা কবিকে ইন্দ্রিয়চঞ্চল করে তুলেছে। আকুল কণ্ঠে কবি বলেছেন, 'কাহারে জড়াতে চায় দুটি বাহুলতা'। কিন্তু বিদেহী সুন্দর সত্তাকে কখনও দেহাশ্রিত প্রেমের সংকীর্ণতায় ধরা যায় না। দেহাশ্রিত প্রেমের ঊর্দ্ধলোকে যে বিরাট প্রাণৈশ্বর্য্য বিরাজ করছে তা হয়ত তখন কবির ধ্যানধারণায় অজ্ঞাত। তাই কাব্য হিসেবে কড়ি ও কোমলের সনেটগুলি উচ্চাঙ্গের হয়নি।

শ্যামলীর গোড়ার দিকের কবিতাগুলি ঘরোয়া প্রেম ও পরিবেশ চিত্র নিয়ে লেখা। মানব জীবনের ভাঙ্গা-চোরা প্রাত্যহিক জীবনচিত্রগুলি কবির কল্পনায় নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। ইতিপূর্ব্বে দাম্পত্য জীবনের কোন ছবি চিত্রগীতিতে এমন রমণীয় আকারে স্মরণীয় মূর্তিলাভ করেনি। 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে নিস্তরঙ্গ বিবাহিত জীবনের সাধারণ প্রেম প্রত্যহ জীবনের মহিমাকে স্বীকার করে নেয়নি। ঐ কাব্যে কবি প্রেমশক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। প্রেম সেখানে প্রণয়ী যুগলের কাছে বন্ধন নয়,—আত্মার মুক্তি। প্রেমশক্তি পার্থিব বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে আত্মিক মুক্তির পথে নিয়ে যায়। দেহজ বাসনাকে সে অগ্রাহ্য করে, মৃত্যুকে বরণ করতে আমোঘ শক্তির প্রেরণা দেয়। তাই 'মহুয়া'র প্রেমানুভব স্বতন্ত্র জাতের-বৃহত্তর বাস্তব থেকে উদ্দীপিত এক বিশিষ্ট আদর্শলোকের।

পক্ষান্তরে শ্যামলীর প্রেমানুভব যেন কবির প্রৌঢ়ত্বের স্বপ্নবিলাস। কবি প্রদীপ্ত যৌবনে রূপ এবং অনুভূতিকে একটি পরিপূর্ণ আকারে চিহ্নিত করতে পারতেন। সেই রূপ ও অনুভূতিকে আশ্রয় করে তিনি বিশ্বসভার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়তেন। কিন্তু একান্ত পরিণত বয়সে রূপ ভাবানুভূতি উভয়ই তাঁর চেতনায় সুস্পষ্ট আকারে ধরা পড়ছেনা। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'জীর্ণ জীবনে আজ রঙ নেই, মধু নেই।' ফলে, তিনি বিশ্বসত্তার একটি বিশিষ্ট পরিণাম লাভ হতে বঞ্চিত। 'শ্যামলী' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ আপেক্ষ কয়েকটি কবিতায় পরিদৃষ্ট। এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। ঐ কাব্যখানির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন,—শ্যামলীতে লালিত্য ও সাবলীলতা খসিয়া পড়িয়াছে,—ভাষার দৃঢ়তাও সংহতির দিকে ঝুঁকিতেছে। যে বাকভঙ্গি ছিল মধুর ও লীলায়িত, রূপক প্রতীতে আচ্ছন্ন, আবেগে, আবেশে কম্পমান, সেই বাকভঙ্গি ক্রমশঃ যে রূপ লইতে আরম্ভ করিল তাহা প্রত্যক্ষ, শাণিত, বিদ্যুৎ-ঝলকিত ভাবে ও ব্যঞ্জনায়, অর্থে ও ধ্বনিতে সুস্পষ্ট ও সবল'। ডঃ রায়ের উক্তিটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। শ্যামলীতে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কল্পনার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হয়েছে। এখানে লালিত্য ও সাবলীলতা খসে পড়লেও বা প্রেমানুভব পরিপূর্ণতার বার্তা বহন না করলেও প্রত্যক্ষের রমণীয়তা কোথাও এতটুকু ম্লান হয়নি। শ্যামলীর কাব্যকার নিজ মনের ক্ষণিক আবেশে তার সহজ প্রকাশ খুঁজেছেন। অরঞ্জিত কল্পনার পরিমিতিতে কবিতাগুলি স্বাদে ভিন্নতর হয়ে ওঠেনি।

প্রেমের কবিতায় দেহবাদের বিরোধিতা অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। দেহগত প্রেমে কামনার কলঙ্ক আছে প্রাত্যাহিক জীবনের গতানুগতিকায় বা জীবন-যাত্রার পৌনঃপুনিকতায় দেহগত প্রেম নিষ্প্রভ। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নিসর্গ প্রীতিরসিক ও ভাববাদী কবির কাছে দেহাশ্রিত প্রেম সর্বথা স্বীকৃত নয়। তাঁর প্রেমানুভূতি নৈর্ব্যাক্তিক। এই বিচিত্র প্রেমচেতনা বাস্তবের নরনারীকে সাময়িকভাবে আশ্রিত করলেও মুহূর্ত্তমধ্যে তা এক অনির্ব্বচীয় রহস্যলীলায় পরিণত হয়েছে। তবে প্রয়োজনে প্রেম আপত্তিকর নয় বলেই কবির অনেক কবিতায় দেহাশ্রিত প্রেমের চিত্র আছে কিন্তু প্রেমের বলতে আমরা যা সচরাচর বুঝে থাকি, সে রকম কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে নেই বললেই চলে। এই বিষয়টি উল্লেখ করে আচার্য্য বিভূতি চৌধুরী মন্তব্য করেছেন,—'কবির প্রেমসম্পর্কিত কবিতা-গুলিকে শুধুমাত্র প্রেমের কবিতা আখ্যা না দিয়ে প্রেম-রসের কবিতা বললে বোধহয় অধিকতর হৃদয়গ্রাহ্য হত'। 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রেমের কবিতা-গুলিকেও প্রকৃত প্রেমের কবিতা বলে আখ্যায়িত করা যায় না। কবিতগুলিতে প্রেমের দৃশ্য থাকলেও সে প্রেম পরিপূর্ণতার বার্ত্তা বহন করে না। সেখানে দার্শনিক মননের পরিচয় সুস্পষ্ট। শ্যামলীর কবি প্রেয়সীকে নতুনরূপে আবাহন করেছেন। প্রেয়সীর প্রতি প্রেমানুভব এস্থলে আশা-নিরাশার ভাবখণ্ডে বিখণ্ডিত। রোমান্টিক মনের উপলব্ধিটি একটী বিশেষ ভাবপ্রবাহে চিহ্নিত। এমন একটি বিশেষ উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য হল,—নিসর্গ আত্মীয়তাও নয়; আবার সুদূর কল্পনাও নয়। কেবল অস্তিত্বের সঙ্গে আত্মার একটা সৌহার্দ স্থাপন। এর মধ্যে কোন গভীর উদ্দীপনা বা প্রগাঢ় প্রেরণার উৎসার নেই; আছে শুধু বাস্তবের তুচ্ছ অস্তিত্বকে আপন স্বরূপে প্রকাশ করার এক প্রাণময় বাসনা। শ্যামলীতে রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রেমচেতনার সুর ধ্বনিত হয়েছে, এবং সেই সুর আধ্যাত্মিক ও রহস্যবাদের রসে ভরপুর। অবশ্য একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, গভীর আত্মোপলব্ধি ঘটলে দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হতে বাধ্য। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-চেতনার গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন; পরিণতমনের গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ তাঁকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। পূর্ণত্ব্য পর্ব্বের

কাব্যগুলিতে সেই নব চেতনার সুর এক বিশেষ আকারে পরীক্ষিত। এ সুর অকৃত্রিম, আন্তরিক ও উপলব্ধি-লব্ধ।

শ্যামলী মূলতঃ প্রেমকাব্য। আবেগমুখর বাস্তব প্রেমের কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে বিরল। কচিৎ দু'একটি কবিতায় যদিও সন্ধান পাওয়া যায় তাকে কবির প্রেমানুভবের পরিপূর্ণ স্বরূপ বলে ধরে নেওয়া যায় না। কবির প্রেমচেতনা তাঁর অতিবিস্তৃত কল্পনাপ্রবণ মনের একটি বিশিষ্ট অনুভূতি মাত্র। শ্যামলীর অনেকগুলি কবিতায় কবি-মনের এরূপ সংবৃত কল্পনা প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রেমানুভূতি জীবনকে কখনো অস্বীকার করেনি; কারণ জীবনকে অস্বীকার করলে সত্যকে অস্বীকার করতে হয়। সত্য প্রকাশধর্ম্মী; প্রকাশেই তার চরম সার্থকতা। সত্যকে উপলব্ধি করতে হয় অন্তরে; সত্যের আলোকেই অন্তর-আত্মার সার্ব্বাঙ্গিক বিকাশ। প্রেম সত্যের এক সহজ প্রকাশ। প্রেমের আলোকে সত্যের স্বরূপ উৎসারিত। প্রেমের আধার ব্যতীত সত্যের স্ফুরণ নেই।

প্রেম জীবনের আত্মিক শক্তি। একত্বের মধ্যে সে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, আবার জীবনযাত্রার অনন্ত বিচিত্রতার মধ্যে একত্ব অনুভব করে। এই বৈশিষ্ট্যই প্রেমের স্বরূপভূত ধর্ম্ম। প্রেম চেতনায় দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, সীমা ও অসীমের মধ্যে কোন অভিন্নতা নেই। সীমা ও অসীম উভয়ের সঙ্গেই কবির একটা নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। কবি বলেছেন,—

'বুদ্ধি দিয়ে যখন আমরা তত্ত্বের বিচার করি, তখন দ্বৈত ও অদ্বৈতের প্রভেদের প্রাচীর আমাদের কাছে বিরাট হয়ে ওঠে।

'শ্যামলী'গ্রন্থের দ্বৈত কবিতায় বাস্তব জীবনের তুচ্ছ প্রেমের মধ্যে অসামান্যতার গৌরব সংকীর্তিত হয়েছে। প্রাত্যহিক প্রেমের বাস্তব সম্পর্কটি চেনা-অচেনার সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গে বিজড়িত। প্রেয়সী কবির কাছে অচেনার বাণীবাহক। অচেনার ভাবকল্পনায় তার অধিষ্ঠান। সে রহস্যময়ী। যুগানুক্রমে সকল পুরুষের প্রেমচেতনায় এক অপরূপ রহস্যের ইন্দ্রজাল রচনা করে আসছে। রহস্যময়তার মধ্যেই তার আত্মপ্রকাশ। এই আদি ধ্যানপ্রতিমা সকল সৃষ্টিকর্ম্মের রূপকার। পুরুষ তার অন্তরে নানাভাবে ঐ রূপকারকে সাধনা করে আসছে। কবিও সেই রূপকারের সাধক। তাই তিনিও ধ্যানের প্রতিমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমি তোমার কারিগরের দোসর, কথা ছিল তোমার রূপের পরে মনের তুলি আমিও দেব বুলিয়ে, ভরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।'

প্রেয়সী, প্রেমাস্পদের কাছে শুধু সামান্য রমণী নয়, সে যেন এক দুর্জ্ঞেয় প্রেরণা। তার মধ্যে রয়েছে নিত্যকালের স্নিগ্ধ শ্যামল একটি ধ্যানমূর্ত্তি। এই ধ্যান-প্রতিমাই যুগযুগান্ত ধরে মানুষকে শিল্প, সংগীত ও কাব্যে প্রেরণা দিয়ে আসছে। রূপ এবং বর্ণের স্বতন্ত্র্য-তায় এ ধ্যানমূর্ত্তি যেন এক রহস্যময়ী প্রাণপ্রতিমা। পুরুষের প্রেমচেতনায় নারী একটি স্বরূপভূত সত্ত্বা—নানা বর্ণ ভূষণে বিভূষিতা। পুরুষের কামনাই নারীর সৌন্দর্য্য; কামনার বর্ণ-দ্যুতিতেই নারী-সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ। আবার এই সৌন্দর্য্য চেতনার গভীরে প্রবেশ করে পুরুষ তার নিজের পরমানন্দ সুন্দর সত্ত্বাটিকে আবিষ্কার করতে পারে। মানবাত্মা সেখানে চিরসুন্দর, চির-পবিত্র ও আনন্দময়।

'......জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।'

দ্বৈত কবিতাটিকে নিছক প্রেমের কবিতা বলে আখ্যায়িত করা যায় না। প্রেম এখানে বাস্তবভিত্তিক হলেও প্রাণশক্তির ওপর তার প্রতিষ্ঠা। এ প্রেমে বন্ধন নেই, আছে মুক্তি। এ প্রেমশক্তি পার্থিব বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে, আত্মাকে মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়।

'শেষপ্রহর' কবিতাটি দাম্পত্যজীবনের একটি প্রেমচিত্র। কবিতাটি চিত্রধর্মী। কবির রোমান্টিক মন শুধুমাত্র বাস্তবকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, নানা চিত্র সংযোজনে পরিমণ্ডিত করে এবং তার ওপর ভাবকল্পনার রঙ চড়িয়ে, সুন্দরভাবে পরিবেশন করে আনন্দ পায়। রোমান্টিক

মনের তুলিতে আঁকা বাস্তব চিত্রে কবিকল্পনার দ্যুতি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এবং সেই আলোকে সকল বিশ্ব-বস্তু একটি রমনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। কবিতাটীতে কল্পনার অতিরেক নেই, আছে শুধু দাম্পত্যজীবনের প্রাত্যহিক মান-অভিমানের স্থূল বর্ণনা এবং পরিবেশগত চিত্রকল্পনা।

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে 'আমি' কবিতাটি মনন সম্পন্ন। তত্ত্বনির্ভর কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের আত্মচিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে। অধ্যাত্মদৃষ্টি জীবনের অন্যতম প্রধান সম্পদ। তাই কবি-মানসের বিকাশের দিক হতে কবিতাটির মূল্য অনস্বীকার্য্য।

বিষয়বস্তুকে কবি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। তাঁর সৌন্দর্য্য-চেতনায় সকল বিষয়বস্তু এক অপরূপ বৈশিষ্ট্যে ধরা পড়ে।

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।'

রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় 'এক' কোন তত্ত্ব নয়, সে তাঁহারই 'আমি, বা 'বিশ্ব আমি'। এই তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করে কবি জীবন ও জগৎকে কখনো সীমার কোটি থেকে দেখেন আবার কখনও অসীমের কোটি থেকে দেখেন। কবি বলেছেন, আমার জীবনের Realisation দু'প্রকারের একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি, আর একটি উপনিষদের সমস্ত অভিব্যক্তির অতীত অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি (জীবন দেবতা)। দুয়ের মধ্যেই আছে আত্মোপলব্ধির আনন্দ, সকল বিরোধের সংগতি সাধন। রবীন্দ্রনাথের আত্মজ্ঞান, আনন্দেরই আত্মপ্রত্যয়-স্বরূপ। এখানে কোন সংস্কারের জটিলতা নেই, দ্বন্দ্ব নিরসনের অভিব্যক্তি নেই, আছে শুধু রূপচঞ্চল বিহ্বলতা।

দর্শন-আত্মিক কবি-হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে আনন্দের সুরলহর তুলেছে,-বিশ্বব্যাপী প্রাণসত্তার যে প্রতীতি উপলব্ধ, তাই কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান। এই আনন্দময় রূপকল্পনাই ভাববাদী কবির প্রাণধর্ম।

আত্মজ্ঞান বা আত্মদৃষ্টি মানুষের কাছে এক জ্যোতির্ময় শিখা-স্বরূপ। এর আলোকে মানুষ ধ্রুব-লোকের পথে অগ্রসর হতে পারে। অবশেষে অসীম প্রজ্ঞালোকে সে আবিষ্কার করে সেই অনাদি উৎস যেখানে উপনীত হলে সকল বিরোধ ও দ্বন্দ্বের অবসান হয়। রবীন্দ্রনাথ অসীমকে দেখেছেন সীমার বৈচিত্র্যের মধ্যে; অব্যক্তকে, ব্যক্তের রূপলোকে। তাঁর মতে, সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশ। উভয়কে অবিচ্ছিন্ন করে দেখার অর্থ, মায়াজালে আরও জড়িয়ে পড়া। সীমা ও অসীমের মিলনস্থলটি নিঃশোক। সেখানে এক স্থির প্রশান্তি নিত্য বিরাজমান। আত্মা সেখানে পবিত্রময়, আনন্দময় ও প্রাণময়। অসীমের পূজারী কবি সীমা থেকে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে লুণ্ঠন করে অসীমের মাঝে লীন হতে চেয়েছেন। তাঁর কথায়—'মানুষ যখন জানতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনই মানুষ বুঝতে পারে,—এই রহস্যই প্রেমের রহস্য, এই তত্ত্বই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব; এইখানেই মানুষের গৌরব।...সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য্য, সীমাই অসীমের আনন্দ" ['সীমা ও অসীমতা' : পথের সঞ্চয়]। সৌন্দর্য্য যেদিন অন্তর-আত্মাকে স্পর্শ করে, সেদিন তার মধ্যে অসীম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্তরাত্মা যাকিছু নিজের সীমায় আয়ত্ত করেছে, তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীম রূপে উপলব্ধি করতে উৎসুক। প্রথমে 'আমি' অস্তিত্বরূপে একটি স্বরূপ-ভূত অস্তিত্ব; সত্যের সারভূত সংকলন হিসেব প্রতিষ্ঠিত, তারপর সেই আমি আর সীমার মধ্যে স্থির হয়ে বসে নেই,—সেখানে সে অহরহ অসীমের দিকে ছুটে চলেছে। তাই' অসীম যিনি,—তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশকে বা এককে বহুর মধ্যে উপলব্ধি করাই কবির জীবন-সাধনা।

'সম্ভাষণ' কবিতাটিতে বাস্তবপ্রেমধর্মিতার ছাপ সুস্পষ্ট। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বর্ণহীন প্রেম একটি বিশেষ কলমুহূর্তের বর্ণলোকে উদ্ভাসিত। এ প্রেমে তখন দৈনন্দিনতার কালিমাতে কিছু থাকেনা। অন্তরের ধ্যানলোকে এক অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্য্যে তার স্বরূপ

প্রতিভাত। অবশ্য প্রত্যহের জীর্ণতায় সেই সৌন্দর্য্য-স্বরূপ বিশিষ্ট পরিণাম লাভ হতে বঞ্চিত। বাস্তবের আটপহরে 'সম্ভাষণ' তাই ক্ষণমুহূর্ত্তের মাধুরিমায় অশোভন বলে মনে হয়।

কবিতাটিতে যুগধর্মিতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মনন স্বভাবতই গতিধর্ম্মী। রূপদক্ষ শিল্পীর মত তিনিও বিশ্বাস করেন, জীবনসংঘাতেই, জীবনের জাগরণ। সম্ভাষণের নায়ক-নায়িকা ভাবলোকের পথযাত্রী হলেও, বাস্তবের রূপ-বৈচিত্র্যকে অপ্রত্যক্ষ করেনি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের রূপকতায় তারা রমণীয়। বাস্তবের কোন একটি বিশেষ অবসরেই যেন তাদের স্বরূপ চিহ্নিত। কবিতাটির বিষয়বস্তু উভয় বর্ণনগত চিত্ররীতি ও ভাবকল্পনার অনুরঞ্জনে পৃথক রসাবেশে পরিবেশিত।

অপরূপ চিত্র ময়তায় এবং বর্ণনবিন্যাসের চারুতায় 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটি সমুজ্জ্বল। প্রণয়ীর প্রেমচেতনায় প্রেয়সী লীলাসঙ্গিনী রূপে অনুভূত। সকল বিচ্ছেদের মধ্যেও সে প্রণয়ীর ধ্যানলোকে একটি বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করে বিরাজমান। এই প্রেমানুভবের অন্তরালে এমন একটি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে যা বিশ্বের লীলা বৈচিত্র্যের ওপর বিস্মৃতির মায়াজাল বিস্তার করেছে। একালের সকল সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রীতিরসে আভাসিত হলেও, সেগুলি সুদূরের পরিচয়বাহী স্মৃতি মাত্র। দুই ব্যবধান অতি দুরব্যাপ্ত, সন্দেহ নেই; কিন্তু তা হলেও প্রেম-চেতনায় যতটুকু রূপান্তর পরিলক্ষিত, তা কেবল কালের প্রবহমান গতির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। অবশ্য এই ব্যবধান একটি রহস্যেরই প্রতীক। রহস্যালোকেই সৃষ্টির সকল ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। নর-নারীর মানবীয় প্রেমের লীলা-বৈচিত্র্যও সুবিস্তীর্ণ রহস্যলোকে পরিব্যপ্ত। এ প্রেম যুগ-যুগান্ত বাহিত। বহুকালগত বলেই এ প্রণয়-সম্পর্ক একান্তভাবে অচ্ছেদ্য।

রোমান্টিক মনোভাবের বিশিষ্ট স্বরূপ হল, তার কল্পনা-মূলক ব্যাপ্তি। প্রণয়ী নিজেকে ও প্রণয়ের পাত্রীকে অসীমকালের মধ্যে ব্যাপ্ত দেখেছে। তাদের প্রেম কোন কালে লুপ্ত হয়নি। বহুকালগত চেতনায় আজও মূর্ত্ত হয়ে আছে।

'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।

কবির প্রেমচেতনা এখানে অতি বিস্তৃত কল্পনাপ্রবণ মনের একটি বিশিষ্ট অনুভূতি। এ অনুভূতি রহস্যময় নিগূঢ়তায় আচ্ছন্ন। পুর্ব্ব-প্রণয়ের স্মৃতি চারণে কবি কোথায় এতটুকু অতিশয়তার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি।

'কালরাত্রে' কবিতায়, কবি পূর্ণতার ছবি এঁকেছেন। জাগতিকবোধের মধ্যেই কবির জীবনসাধনা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। বিশ্ব জুড়ে যে প্রাণের লীলা চলেছে, সেই প্রাণলীলার সকল সৃষ্টি এক অপরিমেয় আনন্দরসে আপ্লুত। কবি যখন বিশ্ব-প্রাণের লীলাবৈচিত্র্যে আপন প্রাণলীলাকে যুক্ত করেন, তখনই তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে অবগাহন করেন। প্রকৃত মুক্তির আনন্দে তাঁর সকল মন প্রাণ আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে।

জীবধাত্রী বসুন্ধরার সকল সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অন্তরালে এক মহাশক্তি বিরাজমান। তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতীক। তাঁর সৌন্দর্য্যদ্যুতিতে সমস্ত সৃষ্টজগৎ আলোকিত। উপরন্তু তিনি প্রেমের এক অপরূপ রসমূর্ত্তি—সর্ব্ব-সময়ে-সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তাঁর নিত্য সৌন্দর্য্যের ক্ষয় নেই, লয় নেই। কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক ঐ ভাবমূর্তিকে বাস্তব জীবনের সহস্র জীর্ণতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। একমাত্র গভীরতর জীবনবোধের মাঝেই তাঁর স্বরূপোপলব্ধি সম্ভব।

কবির অনুভূতিলব্ধ জীবনদর্শন এখানে সত্যানু-সন্ধানে ব্যাপৃত। বাস্তব জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি অন্তরের নিভৃত স্বপ্নলোকে বিচরণ করেছেন; জীবনের-চরম ও পরম স্বার্থকতার সন্ধান করেছেন। বিশ্বের লীলাবৈচিত্র্য তাঁর হৃদয়ে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে কবি মানবাত্মার অপূর্ব্ব গৌরব ও মহিমা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করেছেন। এক অনুপলব্ধ আনন্দে তাঁর মন প্রাণ ভরে উঠেছে।

বিশ্বপ্রাণের সংগে নিজেকে মিলিত করে তিনি এক পরম পূর্ণতা লাভ করেছেন ঃ

'মন দাঁড়িয়ে উঠল ;
বললে, আমি পূর্ণ।'

'স্বপ্ন' কবিতাটিতে কবিহৃদয়ের এক চিরন্তন রহস্যময় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। তিনশো বছর আগেকার একটি শ্রাবণ রাত্রির সঙ্গে আজকের রাত্রিটি, কবির মননকল্পনায় যেন এক নিবিড় ঐক্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। দর্শনভারাক্রান্ত হলেও কবিতাটির চিত্র-মাহাত্ম্য এতটুকু খর্ব্ব হয়নি। বাস্তবাশ্রিত চিত্রগুলি যেন এক একটি অনির্ব্বচনীয় অনুভবের প্রতীক। বিস্ময়কর অনুভূতি রবীন্দ্র কবিমানসের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ; আর এই বৈশিষ্ট্য বস্তু বা বিষয়গৌরবের ওপর একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য কবিতায় কবির সহজ রহস্যব্যঞ্জনার গভীর পরিচয় সত্য অনবদ্য। রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত স্বপ্ন কবিতাটির সংগে শ্যামলীর 'স্বপ্ন' কবিতার নাম ও ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও, রসাস্বাদনের দিক হতে কবিতাদুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবিতায় উজ্জয়িনীর প্রতি কবির হৃদয়ানুভব যেমন অনুভববেদ্য, তেমনি প্রীতি-সম্পর্কিত। ভাষার কারুকৃতি ও কাব্যময় কল্পনার পরিণতি কবিতাটিকে বিশেষ মর্য্যাদা দান করেছে।

'অমৃত' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক সৃষ্টি। কবিতাটীতে ঘটনা এবং পরিবেশচিত্র একটি গভীর ঐক্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। দুয়ের ঐক্যমূলে রয়েছে কল্পনার মৌলিকতা এবং রোমান্টিক ভাবানুভূতির রাগরঞ্জিত। ঘটনা-পরিবেশের বর্ণনা কল্পনার অতিকৃতি থেকে কবিতাটিকে রক্ষা করেছে।

বাসনাজড়িত প্রেমার্তি প্রেম নয় ; – মোহ। মোহ-ময়তা জীবনে আত্মবিস্মৃতি আনে এবং আত্মবিস্মৃতির পরিণাম, প্রেমজীবনের পরিসমাপ্তি। প্রেমের মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পেয়েচে অমিয়া। প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে নিজেকে অতি সঙ্কুচিত না করে বহুর সংগে কল্যাণকর কাজে নিজেকে যুক্ত করে জীবন সত্বাকে সে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছে। আত্ম-ব্যাপ্তিতেই প্রেমের পরিপূর্ণ সার্থকতা। অমিয়া সেই সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। তাই দেহজ কামনাকে পরিহার করে সে মহতী প্রেমের আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে, প্রেম একটি তত্ত্ববিষয়। এর বৈচিত্র্য যেমন সীমাহীন, আকর্ষণ তেমনি অব্যর্থ। প্রেমের মধ্যে কবি মুক্তাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায়,—প্রেমের পথই, মুক্তির পথ। নিত্য গতিই প্রেমের নিত্য স্ফূর্ত্তি। এর গতিপথ শান্ত সংযত স্বাধিকারে অপ্রমত্ত। ধূলিধূসর জীবনের যাবতীয় উপকরণ পবিত্র প্রেমের কাছে অতি তুচ্ছ। উপকরণের মধ্যে রয়েছে আসক্তি। আসক্তিযুক্ত অন্তরে অকলঙ্কিত প্রেমের আস্বাদন অসম্ভব। একমাত্র আসক্তিমুক্ত হৃদয়েই আত্মসংবৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

ভালবাসাই সেই অমৃত
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ
বুঝবে একদিন।

বাস্তবধর্মী কবিতাটিতে আধুনিক জীবনদ্বন্দ্বের ব্যঞ্জনা আছে, কল্পনার বিস্তার আছে এবং সর্ব্বোপরি কবিত্বের স্বাদ আছে। জীবনবৃত্তের দৃশ্যধর্ম্মী ঘটনা মাঝে মাঝে কবিতার স্বাদকে ভুলিয়ে গল্পের রসমাধুর্য্যে নিক্ষেপ করে।

'চিরযাত্রী' কখনো পুরনো দিনের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। তাঁর তেজোদীপ্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে পুরাতনের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি বিদ্রোহী বীর। নবযুগ রচনার কাজে জাতিকে শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সংস্কারজর্জরিত দীন ও বিপন্ন মানবাত্মার অহরহ ক্রন্দন তাঁকে উদ্বেল করে তুলেছে। তাই এক মহাজাগরণ ব্রত গ্রহণ করে, সকল অন্যায়, অত্যাচারকে শাণিত করে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে তিনি বদ্ধপরিকর। নবযুগ রচনার কাজেনিজের যাত্রাপথে তিনি জাতিকে

আহ্বান জানাচ্ছেন। যাত্রাপথ বন্ধুর হলেও, এর মধ্যে পথ করে চলতে হবে।

এ হেন বিদ্রোহী চিরনতুনের প্রতীক চিরযাত্রীকে কবি বন্দনা করেছেন। কবিতাটিতে আহ্বানের যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তা পুরোপুরি হৃদয়স্পর্শী না হলেও, এর কাব্যরূপ স্বভাবতই সকলকে আকৃষ্ট করে। ভাব ও চিত্রের সংযোজনে কবিতাটি রচিত হলেও, ভাবকল্পনা কোন নির্দ্দিষ্ট চিত্রে আশ্রিত হতে পারেনি।

'বিদায়বরণ' কবিতায় স্মৃতি-বিস্মৃতির কত স্বপ্ন-ছবি কবির মনলোকে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। কালের গতিতে স্মৃতিচিত্রগুলি অস্পষ্ট বলে মনে হলেও, কল্পনার আলোকে তারা উজ্জ্বল। পরিণত বয়সে কবির স্বপ্ন-চেতনা মন্থর এবং আবেগস্তিমিত; সেখানে কোন সুস্পষ্ট ভাবরূপের উত্তরণ সম্ভব হয় না। কিন্তু তাহলেও কবির সুদূরপ্রসারী ভাবকল্পনায় কোনরূপ অসংগতি লক্ষ্য করা যায় না। আলোচ্য কবিতায় অনুভূতি-স্পৃষ্ট লঘু, শিথিল মুহূর্ত্তগুলি রূপরসে পরিমণ্ডিত হয়ে একটি অখণ্ড সুরের অনির্ব্বচনীয় সুপর্নারূপে প্রতিভাত হয়েছে। প্রদীপ্ত যৌবনের স্বপ্নছবিসমূহ ঝাপসা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কবির কাছে সেগুলি সত্য ও প্রাণস্পর্শীরূপে ধরা দিয়েছে।

'অপরপক্ষ' এবং 'বঞ্চিত' কবিতা দুটির বিষয়বস্তু অভিন্ন। কবিতা দুটি মূলতঃ চিত্রধর্ম্মী। চিত্র-যোজনার কাজে কবির ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁর শিল্পবোধ স্বাভাবিক পরিবেশচিত্রন ও ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

'অপরপক্ষ' কবিতাটিতে নায়কের বিষাদব্যাকুল মনোভাব একটি বিশেষ চিত্র-রীতিতে আভাসিত হয়েছে। বঞ্চিত কবিতায় নায়িকার জীবনে যে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে ভাগ্যবিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস। বাস্তবের উভয় রূপ ও ভাবকে রবীন্দ্রনাথ কাজে লাগিয়েছেন। কবিতাটিতে যেমন আধুনিক জীবনের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি ঘটনা-চক্রের মধ্যে রূঢ় জীবনের সম্ভাব্যতাও পরিস্ফুট হয়েছে। কোনখানে কল্পনার অতিরেক নেই। বর্ণনারীতি মাঝে দৃশ্যধর্ম্মী চিত্রের অবতারণা কবিতাকে সমৃদ্ধি দান করেছে।

শান্ত করুণ রস কবিতাটির কাব্যবীজ; আর এ সকরুণতার প্রকাশ ঘটেছে কতকগুলি চিত্রের মাধ্যমে কবির বার্দ্ধক্যজনিত স্বপ্নদৃষ্টি কবিতাটিতে ছায়াপাত করেছে। বাস্তব কল্পনার গতিও এস্থলে অলস ও মন্থর।

'অকালঘুম' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের স্মৃতিচারণ। যৌবনের একটি স্মরণীয় দিনের প্রণয় সম্পর্কিত চিত্ররূপ রসে আপ্লুত হয়ে কবিচিত্তকে আবিষ্ট করেছে।

প্রেয়সী কবির কাছে চির পরিচিতা। তাকে তিনি বহুভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন; কখনো দৈনন্দিন জীবনের কর্ম্মব্যস্ততায়, অবার কখনো চিরাচরিত অভ্যাসের জীর্ণতায়। প্রাত্যহিক জীবনের পৌনঃ-পুনিকতায় প্রেয়সী কবির দৃষ্টিতে এক অপরিচিত সাধারণ নারী মাত্র। কিন্তু হঠাৎ এই প্রেয়সীর স্বরূপ একটি বিশেষ ক্ষণমুহূর্ত্তের রমণীয়তায় তাঁর কাছে অপরূপ বলে মনে হয়।

উক্ত কবিতায় গৃহকর্ম্মশ্রান্ত প্রেয়সীর ঘুমে অচেতন কায়ামূর্ত্তিটি কবির কাছে যেন একটি রহস্যময় সৌন্দর্য্য-সত্তা। প্রেয়সী তার অচেনা একাকীত্বে এক অসামান্য রূপ প্রতীতে সমুজ্জ্বল। বাস্তবের জীর্ণতায় কবি প্রথমে প্রেয়সীকে সম্পূর্ণভাবে চিনতে পারেন না; কারণ বাস্তব দৃষ্টি, প্রাত্যাহিকতার মালিন্যে দোষদুষ্ট। কিন্তু এক অচেনা অনুভবের অসামান্যতায় প্রেয়সীর অপরূপ সৌন্দর্য্যসত্তা হঠাৎ তাঁর চেতনায় মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। 'অকালঘুম' কবিতাটীতে সেই বিশেষ চেতনার অনুস্যূতি সুস্পষ্ট।

কবিতাটির ভাববস্তু অসামান্য রসমাধুর্য্যে পরিবেশিত। চেনার মধ্যে অচেনার এবং নিকটের মধ্যে সুদূরের ভাবকল্পনা কবিতাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্ণনা-রীতি মাঝে মাঝে দর্শনভারাক্রান্ত হয়ে উঠলেও কাব্যদেহে অনুভূতিশীল লঘু মুহূর্ত্তকে রহস্যে ধরবার

একটা সার্থক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত। কবির প্রৌঢ়ত্বের স্বপ্নচেতনা জীবনবেগের গতিপ্রবাহকে কোথাও অস্বীকার করেনি।

'তেঁতুলের ফুল' কবিতায় অতীতের কল্পচিত্র কবিকে এক বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে নিয়ে গেছে। পুরানো কালের তেঁতুল গাছটি তাঁর কাছে যেন মূক ইতিহাসের সভাপণ্ডিত; সুদূর অতীতের পরিচয়বাহী সত্বা। যুগের কত উত্থান পতন সে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করেছে। তার স্মৃতিপটে ভিড় করে রয়েছে সেকালের কত মানুষের বিচিত্র কাহিনী,—সুখদুঃখে বিজড়িত প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কতশত ইতিবৃত্ত।

......বর্ত্তমানের সচল মুহূর্ত্তগুলি একে একে কাল-স্রোতে অতীতের ঘন অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তেঁতুল গাছটি অতীতের তারালোকে বসে বর্ত্তমানের হারিয়ে-যাওয়া জীবনস্বপ্নকে জাগিয়ে তুলছে। এর ফাঁকে সুদক্ষ কারিগরের মত সে নানা আলেখ্য রচনা করে চলেছে। তার স্মৃতিপটে অতীত ও বর্তমানের অজস্র ঘটনাচিত্র নিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে। চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে প্রাণবন্ত। স্মৃতিদর্পণে ঐগুলির প্রতিফলন, প্রত্যক্ষ ও শাণিত। মানব সভ্যতার ইতিহাসও ঠিক এমনি অজস্র স্মৃতিবিজড়িত ঘটনাচিত্রের প্রেক্ষাপট।

'তেঁতুলের ফুল' কবিতাটিতে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে দর্শনতত্ব নানাভাবপরিবেশের মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্বচেতনা কেবল অতীতকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠেনি, বর্ত্তমানের সঙ্গেও তার নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। জীবনের যা কিছু রম্য, তার মধ্যেও প্রেমের ইন্দ্রজালিক প্রভাব পরিলক্ষিত। জীবনবেগের মূল থেকে সে জীবনকে প্রতি মুহূর্ত্তে এক নূতন প্রেরণায় উজ্জীবিত করছে; জীবনের গতিপ্রবাহে নতুন ছন্দের লহরী তুলে জীবনকে নবীন সুষমায় অভিষিক্ত করছে।

প্রেমের কবিতা হলেও 'হারানো' কবিতার বিষয়বস্তু পুরোপুরি প্রেমসর্ব্বস্ব নয়। প্রেমোপলব্ধি, রোমান্টিক কবিমানসের বিশিষ্ট ধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমানু-ভবের মধ্যে এক রহস্যময় নিগূঢ়তার সন্ধান পেয়েছেন।... রোমান্টিক কবিমাত্রেই সুদূরের পিয়াসী। সুদূরের প্রতি আকর্ষণ তাদের চিরদিনের। অতীতের সীমা ছাড়িয়ে আদির প্রতি একটা গভীর মোহ তাঁদের অনুভূতিতে ইন্দ্রজাল রচনা করে। "জিজ্ঞাসু" রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রী ভবানীশঙ্কর চৌধুরী এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করে বলেছেন,—'Noble Savage রোমান্টিক কবির এক প্রিয় কল্পনা। রোমান্টিক কবিমানসের আর একটি স্বরূপ,-কল্পনামূলক ব্যাপ্তি। 'হারানো মন' কবিতায় কবি একটি অনাদিযুগের এক অপরূপ প্রণয়-মাধুর্য্যে নিজেকে পরিব্যাপ্ত দেখেছেন :

> 'আনমনা আদি প্রকৃতি
> তার উপরে বিছিয়েছে আপন স্বত্ব
> নিজের অজানিতে।

মিলন-বিরহে প্রেম চিরকাল মধুময়। আদিকালের কাব্যগাথায় কত প্রেমিক-প্রেমিকার বিচিত্র প্রণয়লীলা অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই অতি পুরাতন প্রেম যুগযুগান্ত ধরে রূপ রূপান্তরিত হয়ে একালের প্রণয়যুগলের মধ্যে বর্ত্তমান।

কবির ভাবকল্পনায় মানবীয় প্রেমের অসামান্যতা পুনঃপুনঃ সঞ্চারিত হয়েছে। একালের প্রেমানুভব কেবল একালেই সীমাবদ্ধ নয়,—এ অনুভব অতিদূরব্যাপ্ত, অসীমের সংগে যুক্ত। এর প্রকৃত স্বরূপ রহস্যময়,—অলৌকিক মানদণ্ডে নির্দ্ধারিত। যুগানুক্রমে বিশ্বে যাবতীয় সৃষ্টির যেমন রূপান্তর ঘটেছে, প্রথম জন্মসিদ্ধ প্রেমও তেমনি বিভিন্ন রূপের আধারে রূপান্তরিত হয়ে এক একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই সেকালের প্রেমচেতনা একালেও লুপ্ত হয়নি।

প্রেমবিষয়ক কবিতাটি কাল্পনিকতায় সমৃদ্ধ। স্থানে স্থানে প্রণয়ের স্পর্শানুভূতি থাকলেও প্রেমের পরিপূর্ণ স্বরূপ কবির ভাবকল্পনায় কোথাও মূর্ত্ত হয়ে ওঠেনি। একান্ত পরিণত বয়সের রাগবৃত্তি এখানে সুন্দরভাবে কাজ করেছে। প্রেমচেতনায় তাই কোন সার্থক ভাব-রূপের উত্তরণ সম্ভব হয়নি।

'দুর্ব্বোধ' কবিতার নায়িকা নবনী সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে নায়ক কুশল সেনকে। কিন্তু প্রেমাস্পদের হৃদয় জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রণয়স্বপ্নে সত্যি ব্যর্থকাম নবনী। প্রেমাস্পদের কাছে সে কোন সময় নিজেকে দেহাশ্রিত প্রেমে ধরা দেয়নি। মঙ্গলশ্রী-বিভাসিত প্রেমকে কখনও দেহের সীমায় সংকীর্ণ করতে চায়নি। সে চেয়েছিল, প্রেমের সাধনায় মুক্তির আনন্দ। কিন্তু প্রাত্যহিক অনুসৃত দেহীপ্রেমের দৈন্য তার এই প্রণয়স্বপ্নকে ব্যর্থ করেছে। বাস্তব প্রেমের এই পরিণাম চিরন্তন।

প্রণয়ী কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে নবনী। তবু তার প্রেম সাধনায় কোন সময় ছেদ পড়েনি। মহত্তর প্রেম-সাধনার মুক্তিমন্ত্রে যেন সে দীক্ষা নিয়েছে। তার উদ্দেশ্য, আত্মসংবৃত প্রেমের গভীরে প্রবেশ করে কুশলের হৃদয় জয় করবে। যাই হোক, প্রেমের সাধনায় নবনী অবশেষে আত্মিক মুক্তি লাভ করেছে। মুক্তির আনন্দে হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন ঘুচে গেছে। একমাত্র মুক্ত আত্মাই আত্মিক আনন্দের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

"দুর্ব্বোধ" একটি আখ্যানমূলক কবিতা। কবি-কল্পনা এখানে স্তিমিত এবং অনুভূতির গতিও কতকটা অনিয়ন্ত্রিত। অতি পরিণত বয়সের রাগবৃত্তি ঠিক এরকমই হয়ে থাকে।

'মিলভাঙ্গা' কবিতাটি স্মৃতিবহ। যৌবনের প্রথম প্রেমের আবেগমুখর অনুভূতি কবিকে মোহাবিষ্ট করেছিল। অতি পরিণত বয়সেও তিনি সেই অনুভূতির কথা ভুলতে পারেননি।

প্রেমের ব্যাপ্তি অসীম। সম্ভাব্যতার গণ্ডীবদ্ধে তাকে ধরে রাখা যায় না। সীমা ও অসীম—দু'য়েরেই সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। প্রেমরাগিনীর ছন্দে প্রাত্যহিকতার ম্লানিমা নেই, ভোগ চঞ্চলতার স্পর্শ নেই ও অতি দুরন্ত আবেগ নেই। এ রাগিনীতে আছে এক বিপুল কর্ম্মশক্তির প্রেরণা, —আত্মার অনমুভূত আনন্দ উপলব্ধি। মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রেমের গভীরে আছে ভোগ-বৈরাগ্য। মুক্তাত্মা বৈরাগ্যের গৈরিক রঙে রঞ্জিত। মুক্ত আত্মাই শুধু দেহাতীত প্রেমের চিদানন্দ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে।

মিলভাঙ্গা কবিতায় কবি যৌবনের চেতনাকে অতিশায়িত করেছেন। যৌবন অর্থে রূপলাবণ্যের নির্ঝর লেখা, বয়ঃসন্ধির এক মদমুকুলিত মধুমাসের স্বর্ণরেখ। রাগে অনুরাগে অনুরঞ্জিত—হাসি অশ্রুতে অনির্ব্বচনীয়। যৌবনরসে উজ্জ্বল দিনগুলি প্রেম প্রীতিরসে আভাসিত। যৌবনের একটি বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করে যে প্রেম গড়ে ওঠে, তার স্মৃতি জীবনের শত আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্যেও বিলুপ্ত হয় না। একেই বলি, প্রেমের ইন্দ্রজাল। পরিণত বয়সে প্রেমপ্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটলেও, সেই বিচ্ছেদ প্রকৃত সত্য নয়। বিচ্ছেদের মধ্যে প্রেম মুক্তির আস্বাদ আনে, অনন্তের সুরে জীবন ছন্দকে ধ্বনিত করে।

নিছক প্রেমের কবিতা হলেও 'মিলভাঙ্গা' কবিতায় হৃদয়াবেগের কোনরূপ প্রাধান্য নেই; কল্পনার উদ্দীপন বা দেহাশ্রিত কামনার দীপ্তি নেই। কবিতাটির অন্তঃস্থল থেকে একটি বিচিত্র সুরের গুঞ্জন ধ্বনিত হলেও, তা পঞ্চমরাগের ঝঙ্কারে দূরবিস্তৃত হয়ে পড়েনি।

"বাঁশী-ওয়ালা" কবিতাটিও প্রেমবিষয়ক। প্রেমের স্বরূপ-পরিচয় কবিতাটিতে উৎসারিত হয়েছে। প্রেম ভিন্ন সত্যের স্ফুরণ নেই, আনন্দের উৎসার নেই। প্রেমেই জীবনের পরিপূর্ণতা-জীবনের সার্ব্বাঙ্গিক বিকাশ। এই বিকাশের পথে কোথাও এতটুকু বাধা বা অসংগতি নেই। জীবনে প্রেম অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব এবং একত্বের মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। প্রেমের ধর্ম্মই তাই। কিন্তু সার্থক প্রেমের সাধনায় ক'জনই বা সিদ্ধিলাভ করে? প্রাত্যহিক জীবনের একটানা স্বার্থ, দৈন্য, বঞ্চনা - প্রেমসাধনার পথে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। এমন দ্বিধা-খণ্ডিত, সংশায়িত মনে কখনও সার্থক প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় না।

প্রেম জীবনের বেদীস্বরূপ। সাধারণ নারীও প্রেমের জ্যোতির্ময় আলোকে নবীন সত্তারূপে প্রতিভাত। কবির দৃষ্টিতে সে তখন অসামান্য।

'প্রাণের রস কবিতায় কবির গভীর-মননশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

সারা-বিশ্বজুড়ে অস্তিত্বের লীলা চলেছে। 'অনন্ত-কালব্যাপী বিশ্বের এই প্রাণলীলা,—অনির্ব্বচনীয় এর প্রকাশ,—নিবিড়তম এর অনুভূতি। এই প্রাণলীলায় কবির প্রাণও সমাহিত। বিশ্বের সকলপ্রাণের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগসূত্র। কবি বলেছেন-"জগতে কোন প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সংগে তার যোগ।...আমার মন-প্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্তকালের সংগে যোগযুক্ত। [প্রাণ ও প্রেম : শান্তিনিকেতন]

দেহ এবং মনের সম্পর্কটি অচ্ছেদ্য। প্রাণ কেবল একা দেহের নয়, মনেরও প্রাণ আছে। প্রাণের মত মনেরও সর্ব্বত্র গতিবিধি। মনের ভাবতরঙ্গ নিয়ত আবর্ত্তিত বিবর্ত্তিত হচ্ছে, কোনরূপ বিধি-নিষেধের মধ্যে সেই ভাবচেতনা আবদ্ধ নয়। অতীত ও বর্ত্তমান,—দু'য়েরই সংগে প্রাণের চিরদিনের মিতালী। দু'টি সত্বা একত্র হয়ে সারাবিশ্বে আন্দোলিত হচ্ছে।

বিশ্বের সকল সৃষ্টিবৈচিত্র্য, আনন্দরূপেরই প্রকাশ। বৈচিত্র্যরূপ কখনো অধ্যাত্মগত অর্থে অসীম, আবার কখনো জাগতিক অর্থে সীমিত। বিকাশ ও বিনষ্টির মধ্যে তার প্রতিনিয়ত রূপান্তর ঘটছে। সকলের মাঝে সে কেবলই নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ করছে।

রূপ গতিশীল। তার সীমা ও গতি দুইই আছে। কবির কথায়—রূপের সীমায় জগৎ সীমাবদ্ধ—কেবল গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।'

প্রাণসত্তার দু'টি সুর,—একটি আনন্দের, অপরটি কর্ম্মের। দু'টির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটির অভাবে অপরটি নিষ্ক্রিয়। প্রাণের অস্তিত্বই প্রাণের আনন্দ। প্রাণের আনন্দে তার অস্তিত্ব। রূপ তার বৈচিত্র্যময় গতিপথে এক পরম অস্তিত্বের আনন্দকে নিয়ত প্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে গতিতত্ব একটি মুখ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে এই তত্বকে নানাভাবে তাঁর সৃষ্টিকর্ম্মে প্রকাশ করেছেন। গতিতত্ব তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধি। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে গতিতত্ব স্বীকৃত না হলেও কবির জীবনদর্শনে তা অস্বীকৃত হয়নি। গতিতত্বের প্রেরণা প্রকৃত প্রাণের প্রেরণা। যুগানুক্রমে ঐ প্রেরণা। সৃষ্টিলোকের সকল বন্ধনকে ছিন্ন করে নতুনের আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রাণের রস কবিতাটি মননসম্পন্ন অধ্যাত্মদৃষ্টির পরিচয়ে ঐশ্বর্য্যবান। কবিমানসের বিকাশের দিক হতে এর মূল্য অপরিসীম।

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে বর্ণন কবিতাটি তত্ববর্জ্জিত এক কাহিনীকাব্য। বিষয়বস্তু প্রেমসম্পর্কিত। পরিবেশ-চিত্র এবং ঘটনার বর্ণন কৌশল অতি মনোরম। শ্যামলীর অধিকাংশ কবিতায় চিত্র এবং তত্ব পাশাপাশি চলেছে। অবশ্য সকলক্ষেত্রে তত্ব কোন স্পষ্ট চিত্রে আভাসিত হয়নি, কবিতাটির ভাববস্তু, আখ্যায়িকা-জাতীয় হলেও এখানে কোন তত্বের প্রাধান্য নেই। শুধু চিত্রকাব্য দেহের আড়াল থেকে প্রেক্ষণের কাজ করছে।

কবিতার ঘটনাবস্তু নিতান্ত বাস্তবাশ্রিত। চিত্র মুখ্য এবং ঘটনা গৌণ। ঘটনাপরিবেশের মধ্যে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতে রমনীয়তাধিক্য ফুটে উঠেনি; বরং প্রাত্যহিক অনুসৃত দেহীপ্রেমের দীনতাই অভিব্যক্ত হয়েছে।

মর্ত্ত্যবাসনার মধ্যে প্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করা যায় না। বাসনাশ্রিত দেহীপ্রেম শুধু আত্মতৃপ্তির পথে ধাবিত হয়। এ প্রেম অশান্ত, অসংযত এবং অতৃপ্ত। এ হেন প্রেমার্তি আত্মতৃপ্তি ছাড়া কিছু নয়। এখানে আছে শুধু মোহময়তা এবং আত্মবিস্মৃতি।

দেহাশ্রিত প্রেম নায়ককে আশাহত করেছে। তার প্রেমার্তি অভ্যাসের জীর্ণতায় মোহস্পৃষ্ট। যৌবনধর্মী ভাবস্বপ্নের আবেশটুকু কবি কাটাতে চেয়েছেন। কবিতাটি তাঁর অতি পরিণত বয়সের শান্ত দৃষ্টি এবং নিরাসক্ত মনের পরিচায়ক।

শ্যামলীর 'সম্ভাষণ' কবিতাটিকে প্রেম বিষয়ক কবিতা বললে কিছু অন্যায় বলা হয় না।

প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে মানুষের প্রণয়রহস্য অপরূপ সৌষম্যতায় প্রতিভাত। মানবমনের অনুভূতি এবং প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র এক অপরূপ ভাবসৌন্দর্য্যে পরিমণ্ডিত। প্রকৃতি ও মানুষের এই যে সম্বন্ধ, তা কোনরূপ বন্ধনে আবদ্ধ নয়। এ সম্বন্ধ চিরকালের। কবি কখনও দুয়ের সৌন্দর্য্যকে এক করেননি।

প্রেয়সী চিরদিনই প্রেমিকের অন্তর্লোকে একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যসত্তা, যুগে যুগে সে বিভিন্ন ভাবরূপে প্রেমিককে মুগ্ধ করেছে। আধুনিকা চারু কেবল একালেরই নয়; তার সঙ্গে কবির সম্বন্ধ চিরকালের। বিগত দিনের অবন্তিকা বিভিন্ন ভাবরূপে কবির দৃষ্টিতে আধুনিকা চারুতে রূপান্তরিত হয়েছে। কবির ভাষায় জীবনে এক একসময় দুর্লভ মুহূর্ত্ত আসে, যখন প্রত্যহের মালিন্য বলতে কিছু থাকে না, তখনই স্বপ্নদৃষ্টিতে প্রেমের অমরাবতী ফুটে ওঠে। যে সম্ভাষণ বাস্তব সংসারে বিসদৃশ বলে মনে হয়, বাস্তবের সেই দুর্লভ লগ্নটিতে তা তখন সদৃশ্যস্বরূপে প্রতিভাত হয়।

কবিতাটিতে আবেগের অতিরেক না থাকলেও কল্পনার উচ্চতা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

শান্তিনিকেতনে কবির অতিপ্রিয় শ্যামলী ঘরখানিকে উদ্দেশ্য করে 'শ্যামলী' কবিতাটি রচিত। মাটির এই ঘরখানি কবির কাছে যেন শান্তির নীড়। তৃণতরুলতার শ্যামল পরিবেশে ঘরখানি অবস্থিত বলে কবি এর নামকরণ করেছেন, 'শ্যামলী'।

মাটির বাসা মানুষের পরম নির্ভর আশ্রয়স্থল। মাটি 'শ্যামল কোমল'। তিনি পরম স্নেহময়ী। তাঁর স্নিগ্ধ স্পর্শে, মানুষের সকল শ্রান্তির অবসান,—নিরবসান। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত জীবকুল মাটির বুকে অপরিমেয় শান্তি লাভ করে। মাটির বহিরাবরণে অন্তরালে এক সজীব আত্মা বিদ্যমান। এই জীবন্ত মাতৃসত্তা সর্ব্ব উপদ্রব সহা,—জীবধাত্রী বসুন্ধরা। লক্ষ লক্ষ জীবকুলকে তিনি অহরহ প্রতিপালন করছেন।

মাটি মানুষের অন্তিম আশ্রয়। শেষ জীবনে কবি শ্যামলীতে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ঘর-খানির শান্তশ্রী পরিবেশ তাঁর অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল বলে মনে হয়েছে। আচার্য্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়,—'কবি মৃত্তিকার সঙ্গে মানুষের মিতালি পাতাইতে চাহিয়াছেন। "শ্যামলী" কবিতার আলোচনায় উক্ত মন্তব্যটি সুপ্রযুক্ত। অতি পরিণত বয়সে মর্ত্য-প্রীতি রসিক কবির তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি মাটির মহিমাকে সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করে মাটির বুকে মানুষের চিরকালীন হৃদস্পন্দন শুনিয়েছেন।

'শ্যামলী' কাব্যটি কবির প্রৌঢ় ঋতুর যৌবন-চেতনা আপন অঙ্গে সর্ব্বত্র বহন করছে। কাব্যে কখনো কখনো কবিচেতনা গভীর অনুভূতি এবং স্পন্দন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কাব্যাঙ্গিকের বৈচিত্রতার সংগে কবির শান্ত প্রত্যয়টি গভীরভাবে যোগযুক্ত হয়েছে। অতএব মননের প্রাধান্য এখানে অতি স্বাভাবিক। কবি যে চারুচিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তা পূর্ব্বাপর অনুভূতি রশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল। পাঠকের কাছে ভাব ও চিত্র দুটি স্বতন্ত্র বস্তু বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে এরা অভিন্ন এক অশরীরী অনুভূতির মধ্যে এই দুয়ের উৎস নিহিত। প্রকাশের পূর্ব্বে এমন একটি অনুভূতি কবির মানসপটে রূপরেখায় আঁকা হয়ে যায়। ভাবময় রূপ তখন রসময় অরূপতায় লীন হয়ে যায়।

কাব্য কেবল রূপের সমষ্টি নয়,—আত্মসমাহিত ভাবেরই অনুধ্যান। ভাবকে কোন রূপমায়া দিয়ে ধ্বনি তরঙ্গের লহর তুললে, সহৃদয় পাঠকমনে তা আবিষ্ট করবেই। ঐন্দ্রজালিক কবি রবীন্দ্রনাথ সে রহস্য ভালভাবেই জানেন। বাইরের যে জগৎ তার সংগে মানুষ বিচিত্র সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। ঐ সম্বন্ধের ফলে মানুষের মনে কতকগুলি ভাবের উদ্ভব হয়। ভাবগুলি নিঃসন্দেহে লৌকিক। আলঙ্কারিকেরা বলেন, লৌকিক ভাবগুলি যখন অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই তা কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হয়। একমাত্র অলৌকিক প্রাপ্ত বিভাব ও অনুভাবই পাঠকের

মনে রমণীয়ভাবের উদ্বোধন করে। 'শ্যামলী' কাব্যে রবীন্দ্র ভাব-চেতনার রূপান্তর ঘটেছে। এভাব-চেতনার স্বরূপ, আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে ব্যাকুলতা। নিরাসক্ত মন নিয়ে তিনি যেন নিত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। স্মৃতি রোমন্থন মূলক কবিতাগুলিতে আদর্শকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্ণনা-রীতিতেও তাঁর ভাষাসন্ধানের ব্যাকুলতা উচ্চারিত হয়েছে। এরূপ প্রয়াসের মূলে শিল্পাদর্শের যথেষ্ট পরিচয় উৎসারিত।......

ভাবের আস্বাদিত অবস্থার নামই রস। সংবৃতের অবস্থায় রসের প্রকাশ। কবি প্রকাশের কুশলতায় সুন্দরকে পাঠকজনের হৃদয়সংবেদ্য করে তোলেন, ভাবকে রসে পরিণত করেন। তাঁর রসচেতনা পাঠকের আত্মাকে সীমাহীন ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ আলোকের মনিকার। অতীন্দ্রিয় লোককে তিনি ভাব-রূপ কুশলতায় আলোকিত করতে পারেন। অতীন্দ্রিয় লোককে যা ব্যঞ্জিত করে, তাই রস। শ্যামলীর বিষয়বস্তু পরিচিত জীবনকে ভিত্তি করলেও, রসানুভূতি ও আবেগই এর সার্থক পরিণতি।

উল্লেখপঞ্জী

১। রবীন্দ্রনাথ : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
২। রবীন্দ্রনাথ : মনোরঞ্জন জানা
৩। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
৪। চিত্রসংগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী : ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় পর্ব্ব) ডঃ সুকুমার সেন।
৬। রবীন্দ্র-জীবনী (৪র্থ পর্ব্ব) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর ইতিহাস সাধনা ও আচার্য যদুনাথ সরকার

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তি

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস মুখ্যতঃ বাঙ্গালী মনীষার কৃতি ও কীর্ত্তির স্বাক্ষরে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিপুরুষের নাম—যেমন বালগঙ্গাধর তিলক, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র জওহরলাল নেহেরুকে বাদ দিলে আর বিশেষ কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বাংলা দেশের দিকে নজর দিলে এক নিঃশ্বাসে কমপক্ষে পঁচিশ তিরিশজন প্রতিভাধর পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। বস্তুতঃ রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ—এই তিন মনীষীই নব্যভারতের সুদৃঢ় বনিয়াদ রচনার প্রধান স্থপতি। যে অক্লান্ত অধ্যবসায়, অপরিসীম আত্মত্যাগ ও অকৃত্রিম নিষ্ঠার বলে এই তিন স্রষ্টাপুরুষ আধুনিক ভারতের ধর্ম্ম-শিক্ষা-সমাজ-জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। ভারত-ইতিহাসের যে অধ্যায়টি রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে, রামমোহন থেকে তার সুচনা এবং সুভাষচন্দ্রে এসে তার পরিসমাপ্তি। অর্থাৎ ঐ কালে বাংলা দেশের আকাশ অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভাস্বর জ্যোতিষ্কগণের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। বস্তুতঃ এই সকল মহামানবের আবির্ভাবের মিছিলে যাঁরা পদক্ষেপ করেছেন তাঁরা সকলেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও এক একটি দিকের দিকপাল। তাঁদের সাধনায় ও আরাধনায় বাংলার তথা ভারতের সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি সবকিছুই প্রাচীন ভাবধারা মুক্ত হয়ে নতুনরূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতের চিরাগত ঐতিহ্য-সংস্কার যা যুগে যুগে আবর্ত্তিত বিবর্ত্তিত হয়ে চলছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তার প্রাণরস শুকিয়ে যাওয়ায় মুমূর্ষু অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছিল, এখন তা নবজীবন লাভ করে বৈচিত্র্যের নানা শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম্মজগতে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ, দর্শনবিজ্ঞানে রামেন্দ্রসুন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রলাল এবং রাজনীতি ও সমাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন, ভূদেবচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, রাজনারায়ণ, ব্রহ্মবান্ধব, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি সকলেই নতুন পথের পথিকৃৎ। এঁদের অবদানে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীজাতি ধন্য, সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী গর্ব্বিত, বিশ্বলোকও বিশ্বাসী চমকিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এক কথায় এই স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষপরম্পরার অলোকসামান্য কাহিনী ও এঁদের অভূতপূর্ব্ব মনীষার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ কেবল নব্যধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক বা উদ্গাতা ছিলেন না, হিন্দু ধর্ম্মকে তার বহু কালাগত কুসংস্কার ও গ্লানি থেকে মুক্ত করতেও অগ্রণী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সনাতন হিন্দুধর্মের যে শাশ্বত মূল্যবোধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে অবলুপ্তপ্রায় হয়েছিল তাকে পুনরাবিষ্কার করে নবতন মূল্যবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। পুরাতনের সঙ্গে নবতনের শিক্ষা ও ধর্ম্মগত সমন্বয়সাধন, প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে প্রতীচ্য বিজ্ঞানের একটা সামঞ্জস্য বিধানই ছিল এই তিন ব্যক্তিপুরুষের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই তিন মনীষীর পর যাঁদের অবদান অগ্রগণ্য তাঁদের মধ্যে "বন্দেমাতরম" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বীররসের উদাত্ত ঝঙ্কার ও অমৃতাক্ষর ছন্দের মেঘমন্দ্র ধ্বনির স্রষ্টা

মধুসূদন, বিশ্বমানবতা বোধের কবি রবীন্দ্রনাথ, আর দিব্যজীবনএর দিশারী শ্রীঅরবিন্দ উল্লেখযোগ্য। অপর দিকে সকল ধর্ম্মের সারাৎসার জ্ঞান ও ভক্তির অদ্বৈত-সাধক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর তাঁর বিশ্ববিজয়ী শিষ্য ও শিবমন্ত্রের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দীর পুরোধারূপে আজও বিরাজমান। উনবিংশ শতাব্দীতে আর যে সকল মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞার অধিকারী হলেও উপরোক্ত ব্যক্তিগণের প্রভাবমুক্ত বলা চলে না। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বিগত শতাব্দীর পূর্ব্বসূরী অথবা উত্তরসূরীগণ সকলেই ভারতের অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং ভারতের শাশ্বত ধর্ম্মসাধনার ও সংস্কৃতির আপাত বিরোধ ও বৈপরীত্যের মধ্যে যে সমন্বয়ের বাণী যুগে যুগে উচ্চারিত হয়েছে তারই মহিমাকে পুনরাবিষ্কার করেছেন। প্রতীচ্য থেকে পাওয়া বিজ্ঞানের আলোকে প্রাচ্যের অধ্যাত্ম দর্শনকে বিচার বিশ্লেষণ করে তার মূলগত সত্যকে বা শাশ্বত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এক কথায় উনবিংশ শতাব্দীর সকল মনীষীই ছিলেন ভারতসাধক। অর্থাৎ ভারতাত্মার অন্তর্নিহিত যে বাণী ভারত-ইতিহাসের নানা যুগে তার পতন ও অভ্যুদয় বন্ধুরপন্থায় বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে তারই সারমর্ম উপলব্ধি করে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা এবং নবলব্ধ জ্ঞানের সহায়তায় তার পুনর্মূল্যায়ন করাই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাই কাব্য, সাহিত্য, চারুকলা সমাজ, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সব সাধনার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতে আর যে একটি বস্তু সার্থকতা লাভ করেছিল সেটির নাম ইতিহাসসাধনা এবং এই বিষয়ে যে মনীষীর অবদান শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জ্জন করেছিল তিনি স্বনামধন্য আচার্য্য যদুনাথ সরকার।

আচার্য্য যদুনাথের ইতিহাস সাধনা সম্পর্কে কিছু বলার পূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীতে যেসকল মনীষী ইতিহাস রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং যাঁদের সাক্ষাৎপ্রভাব যদুনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এই প্রসঙ্গে সেই সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ১৮২৬ সালে ডফ্ সাহেবের 'হিষ্টরি অফ্ দি মারহাট্টাস' ও ১৮২৯ সালে টড্ সাহেবের 'এ্যানালস অফ্ রাজস্থান' প্রকাশিত হলে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের অতীত গৌরব ও বীরত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রথম অপক্ষপাত পরিচয় লাভ করলেন। তারপর কানিংহাম্ সাহেবের 'শিখদের ইতিহাস' এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তাঁদের মনে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হল। এই সব বিদেশী পণ্ডিতদের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দেশের যিনি ইতিহাস সাধনায় প্রথমে পদক্ষেপ করলেন তাঁর নাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল স্বসম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল 'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণীবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক' রচনা প্রকাশ করা। বস্তুতঃ এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রথম ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। রাজেন্দ্রলালের 'শিবাজীর চরিত্র' (১৮৬০) 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' (১৮৬১) গ্রন্থ দুটি ইতিহাস-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ রচনার পুরোধা বললে ভুল হবে না। রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক ইতিহাসসাধকের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২) 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩)—দুই দেশের রাজকার্য্য সংক্রান্ত ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলেও ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস' (১৮৯৫) এবং 'বাংলার ইতিহাস' (১৯০৫) মূল্যবান ঐতিহাসিক রচনার নিদর্শন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন এক হিসাবে রাজেন্দ্রলালের মন্ত্রশিষ্য। অর্থাৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেমন 'এশিয়াটিক সোসাইটির' স্তম্ভরূপে পুরাতত্ত্ব চর্চায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তেমনি প্রাচীন পুঁথির ও ঐতিহাসিক উপকরণের অনুসন্ধানে জীবনব্যাপী ব্রত গ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁর 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' ও 'বৌদ্ধধর্ম্ম'

ছাড়াও' ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) একাধারে ছাত্র ও গবেষকদের সমাদর লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসগ্রন্থে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর্য্যদের ভারত আগমন প্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ করে ল্যান্সডাউন পর্য্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের 'এ হিষ্টরী অফ্ সিভিলিজেসন ইন এন্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' এবং 'ইকনমিক হিষ্টরী অফ্ ইণ্ডিয়াও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এ যুগে ইতিহাস রচনায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অন্য সকলের তুলনায় অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের 'সমর সিংহ' (১৮৮৩), 'সিরাজদ্দৌল্লা' (১৮৯৮) 'সীতারাম রায়' (১৮৯৮), 'মীরকাশীম' (১৯০৬) লেখকের গভীর অধ্যবসায় ও জ্ঞানের পরিচয়।

আচার্য্য যদুনাথের ইতিহাসসাধনা সম্পর্কে কিছু বলতে হলে প্রথমেই তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। যদুনাথ সরকারের জন্ম হয় রাজসাহী জেলার করচমাড়িয়া গ্রামে (২৮শে অগ্রহায়ণ ১২৭৭ বা ১০ই ডিসেম্বর ১৮৭০)। তাঁর পিতা রাজকুমার-সরকার ভূম্যাধিকারী হয়েও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সরলতা ও অনাড়ম্বর মাধুর্য্যের প্রতীক। কৈশোর বয়স থেকেই তিনি যদুনাথের মনে ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে যুগের বিভিন্ন জেলা শাসক ও বিচার-পতিগণের কাছ থেকে ইতিহাসসংক্রান্ত মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয় করে পুত্রের মধ্যে ঐ গুলির প্রতি অনুরাগ অনুপ্রবিষ্ট করতে যত্নবান ছিলেন। ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের প্রতিষ্ঠা অর্জনের মূলে তাঁর পিতার প্রভাব যে কার্য্যকরী হয়েছিল সে কথা স্মরণ করেই উত্তরকালে তিনি লিখেছেন: "যাঁকে দেখে আমার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি তিনি আমার পিতা। তিনি আমার বালক-চিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়েছেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল। আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হলো কি করলে কো[illegible] জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্যসত্যই সার্থক করা যায়।"

ছাত্র হিসেবে যদুনাথ যে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সবই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯১ সালে তিনি ইংরাজী ও ইতিহাসে ডবল অনার্স নিয়ে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরের বছরই (১৮৯২) সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রতিপত্রে তাঁর নম্বর শতকরা ৯০ এরও অধিক ছিল। পরীক্ষার ফল প্রকাশের ছয়মাস পরে (১৮৯৩, জুন) তিনি রিপন কলেজের (বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এর পরে তিনি একই সঙ্গে বিদ্যাসাগর কলেজেও অধ্যাপনা করেন। এম এ পাশ করার পর তাঁর গবেষণা-কর্ম্মে অধিক আগ্রহ জন্মায় যার ফলে ১৮৯৭ সালে তিনি প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তির জন্য অধ্যয়নকালে তিনি ইংরাজী ব্যতীত ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তাঁর পাঠ্য বিষয়ভুক্ত করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি আই-ই-এস (ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস) লাভ করে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০২ সালে তিনি পাটনায় গমন করেন এবং একনিষ্ঠভাবে অধ্যাপনা কর্ম্মে রত হন। এই সময় তিনি ইংরজী সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও সাগ্রহে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। পাটনায় অবস্থানকালে "খোদাবক্স" গ্রন্থাগার তার কাছে নতুন জগতের সন্ধান দিল। একাগ্রচিত্তে তিনিই এই গ্রন্থাগারের সমুদয় গ্রন্থ পরপর অধ্যয়ন করে চললেন এবং অভিনিবেশ সহকারে পুঁথিগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা ছেড়ে পুরাপুরীভাবে ইতিহাসের অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

১৯১৭ সালে যদুনাথ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯১৯ সালে ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার (উপাচার্য্য) নিযুক্ত হন। এবং ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৫ সালে (১৩২২ সন) বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ইতিহাস শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি তিনবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (১৩৪২-৪৩-৪৭ ও ১৩৫৪)। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৪৪ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৩ সালে তিনি লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো বা সদস্যরূপে সম্মানিত হন। ১৯২৬ সালে তিনি সি আই ই এবং ১৯২৯ সালে তিনি নাইট খেতাব লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ থেকে বিদায় নিতে মনস্থ করার পর সেখানকার কর্তৃপক্ষগণ যদুনাথ সরকারকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তখন তাঁর বয়স ৭৮ বৎসর। এরপর তিনি সবরকমের কর্মজগৎ থেকে অবসর নিয়ে জীবন যাপন করেন এবং জীবনের শেষ দশায় বেশ কিছুদিন শারীরিক পীড়া ও বার্দ্ধক্যজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কষ্টভোগ করার পর ১৯৫৮ সালে দেহত্যাগ করেন (ইংরাজী ১৯ শে মে ও বাংলা ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫)।

আচার্য্য যদুনাথের জীবন কথার পর তাঁর ইতিহাস সাধনার বিষয় উল্লেখ করা যাক। পাটনায় অবস্থান কালেই খোদাবক্স গ্রন্থাগারই তাঁর মনে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। যদিও ইতিপূর্ব্বে তিনি 'India of Aurangzib, Topography, Statistics and Roads' নামে তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তবু তাতে তাঁর মন আদৌ তুষ্ট না হওয়ায় তিনি এই বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করার সময় মোঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সম্রাটগণের চরিত্র ও জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনাবলী, যা এযাবৎ তথ্যের অভাবে এবং বিদেশী ঐতিহাসিকগণের নানা অভিসন্ধিমূলক অথবা পক্ষপাতদুষ্ট রচনার গুণে কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে অর্দ্ধসত্য কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল তাকে পুনর্বিন্যাস করে সত্যকার বিজ্ঞানসম্মত রচনার মর্য্যাদা দিয়ে বিশদভাবে প্রকাশ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। এই কর্ম্মে ব্রতী হয়ে কেবলমাত্র খোদাবক্স গ্রন্থাগার নয় ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের পাঠাগার থেকে তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করলেন। এলিয়ট, ডাউসন, খাপি খাঁ রচিত 'আলমগীর নামা, মসীর-ই আলমগীরি, আদাব-ই আলমগীরি ছাড়া অনেক ফার্সী ভাষায় রচিত দলিল দস্তাবেজ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেন। ইংরাজী ফরাসী ভাষা ব্যতীত অহম, মারাঠী রাজস্থানী ও গুরুমুখী ভাষায় রচিত অজস্র ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র ও রোজনামচা থেকে ইতিহাসের উপযোগী মালমসলা আহরণ করলেন। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে উপকরণ, ঘটনার সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রভৃতি লাভ করার পর সেগুলির সত্যতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করলেন। প্রায় বিশ বছরের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের পর তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ঔরঙ্গজীবের ইতিহাস' (History of Aurangzib, পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে ১৯২৪ সালে আত্মপ্রকাশ করল। শাহজাহানের রাজত্বের সূচনা থেকে ঔরঙ্গজীবের শেষদিন পর্য্যন্ত মোঘল সাম্রাজ্যের গৌরবজনক ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক রাঙ্কের 'History of the Latin and Germanic Peoples গ্রন্থের ন্যায় আচার্য্য যদুনাথের 'History of Aurangzib দীর্ঘ গবেষণাপ্রসূত মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ।

ইতিহাস যে কেবল নীরস ঘটনাসমাবেশ নয় তারপশ্চাতে যে বৈজ্ঞানিক মনন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির প্রয়োজন এবং ঘটনা সংগতির মূলে যে প্রমাণিকতা, যৌক্তিকতা ও পারিপাট্য অত্যাবশ্যক একথা অনেকেই বিস্মৃত হন।

ফলে অধিকাংশক্ষেত্রেই ইতিহাস হয় একদেশধর্ম্মী অর্দ্ধসত্যের প্রচারণা অথবা কয়েকটি অমূলক কাহিনীর অসংলগ্ন সংগ্রহ। কিন্তু আচার্য্য যদুনাথ ইতিহাসকে তার সত্যকার মূল্যে এবং ঐতিহাসিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর হাতে ইতিহাস রূপকথা উপকথা আজব অলীক কাহিনীর সমাবেশ না হয়ে জীবন্ত সরস বস্তুতে পরিণত হয়েছে যা ইতিহাসাগ্রহী পাঠক সমাদর না করে পারবেন না। তিনি যে অসাধ্য সাধন করেছেন তা কোনও এক ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় অভাবনীয়। ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ অধিকার থাকার দরুণ যদুনাথের ইতিহাস হয়েছে যেমন মনোজ্ঞ তেমনি সরস ও যুক্তিনির্ভর। তাঁর ভাষা যেমন সাবলীল, বলার ভঙ্গীও তেমনি সরল। "Style is the man"—যদুনাথ তাঁর ইতিহাসে এই সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

উইলিয়াম্ আরভিনের লেটার মোঘলস্ (Later Mughals) গ্রন্থটি সম্পাদনাকালে (যাতে নাদিরশাহের আক্রমণ সম্বন্ধে আচার্য্য যদুনাথের প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল) মোঘলযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল নিবিড় আকার ধারণ করে। তারপর ঔরঙ্গজীবের রাজত্ব সম্পর্কে গবেষণাকালে যদুনাথ মারাঠাজাতির ইতিহাসের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। সেই সঙ্গে শিবাজীর ব্যক্তিত্বসমন্বিত চরিত্রও তাঁকে মুগ্ধ করে ঔরঙ্গজীব ও শিবাজী যেন একই মুদ্রার দুই দিক। এঁদের সম্বন্ধে যে ধারণা পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক পরিবেশিত হয়েছে যদুনাথ তা একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। অতীতকে বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক যদি বিচারকের আসনে আসীন হন তাহলে সব কিছুই যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় যদুনাথ তা ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই তাঁর ঔরঙ্গজীব হয়েছে এমন এক ব্যক্তি যিনি সব পাপ থেকে মুক্ত, নির্ব্বুদ্ধিতা বা জড়তা যাঁর স্বভাববিরুদ্ধ এবং সব থেকে ঘৃণ্য। বস্তুতঃ যদুনাথের ঔরঙ্গজীব কুটবুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, রণনীতির সুকৌশলে, রাজ্যশাসন ও পরিচালন দক্ষতায় নির্ভীকতায়, ক্ষমাহীন মায়ামমতা-বর্জিত ব্যক্তিত্বের প্রজ্বলন্ত প্রতীক। এঁর অর্দ্ধশতাব্দী প্রসারিত রাজত্ব যেন গ্রীক নাটকের ট্র্যাজেডীর মত নিয়তির দুর্নিরীক্ষ ও অপ্রতিরোধ্য বিধানের অমোঘ বন্ধনে আবদ্ধ এবং নিশ্চিত পরিণতির অনুগামীতা প্রদর্শন করছে। তাঁর শিবাজীর চরিত্র ও সকল প্রকার অবাস্তব কল্পনা থেকে মুক্ত। এখানে তিনি এক মহামানবের মহনীয়তাকে যথাযথভাবে অঙ্কিত করেছেন। শিবাজীর ইতিহাস উপন্যাস নয়, সত্য ঘটনা, প্রেম কাহিনী নয়, রীতিমত বৈজ্ঞানিক তথ্যে নির্ভরশীল। এখানে মারাঠা জাতির উদয় ও বিলয় নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে মুখরিত হয়েছে। যদুনাথের শিবাজী এই প্রমাণ তুলে ধরেছেন যে হিন্দুজাতি অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই রাজ্যস্থাপন করতে পারে বা শত্রুকে পরাজিত করতে পারে। বর্ত্তমান যুগের হিন্দুর জন্যে শিবাজী এই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যে তাঁরা যদি স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত হন তাহলে কোন শক্তিই তাঁদের হটিয়ে দিতে পারবে না।

যদুনাথের অপর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'মোঘল সম্রাজ্যের পতন' (Fall of the Mughal Empire) চার খণ্ডে সমাপ্ত। ১৯৩২ সাল থেকে সুরু করে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে অভিনিবিষ্ট থেকে তিনি এই সুমহান কার্য্য সম্পন্ন করেছেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গিবনের 'দি রোমান ডিক্লাইন এণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' (The decline and fall of the Roman Empire) এর মত যদুনাথে এই ইতিহাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচনা নাদিরশাহের প্রত্যাবর্ত্তন থেকে আরম্ভ করে আকবর ঔরঙ্গজীবের কাল উত্তীর্ণ হয়ে আখ্যায়ী যুদ্ধের বিবরণ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের উপজীব্য। সামরিক ইতিহাস হিসাবেও এই গ্রন্থ তুলনাহীন। পানিপথের যুদ্ধের বর্ণনা, মাধাজীসিন্ধিয়ার মালওয়া অভিযান ইত্যাদি তিনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। বিরাট মারাঠা সাম্রাজ্যর পতনের কারণ যে পারম্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গৃহবিবাদ থেকেই উদ্ভূত তা যদুনাথ অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কমপক্ষে আটটি ভাষা থেকে

উপাদান সংগ্রহ করে তবে যদুনাথ এই অমর গ্রন্থ রচনা করেছেন। অন্যান্য ভাষার মধ্যে ফার্সী, মারাঠি ও পর্তুগীজ ভাষাকে তিনি গুলে খেয়েছিলেন বললে ভুল হবে না। শুধু ভাষা শেখাই সব নয়, মারাঠাদেশে ত্রিশ বত্রিশ বার এবং আগ্রা দিল্লী রাজপুতানা বারো তেরো বার বেড়িয়ে এসেছেন প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক কীর্ত্তিবাহী স্থানগুলির নানা নিদর্শন স্বচক্ষে পরীক্ষা করার পর তাঁদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হয়ে তবে লেখনী ধারণ করেছেন। মেকলের 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' যেমন বিশ্ববন্দিত যদুনাথের 'মোঘল যুগের ইতিহাস' তেমনি পৃথিবীর ইতিহাসানুরাগীদের সমাদরের সামগ্রী। আবার ইংরেজের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস রচনায় টনি সাহেব যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন ভারতবর্ষের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনায় যদুনাথ সমান কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। জীবনব্যাপী ইতিহাস সাধনার সিদ্ধিতে যদুনাথ পৃথিবীর সেরা ঐতিহাসিকগণ থুসি ডাইডিস, গীবন, র‍্যাঙ্কে বা মেকলের সমকক্ষতা লাভ করলেও দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আজও তাঁর প্রতি যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে সমর্থ হন নি। আমাদের দেশের যাঁরা ইতিহাসের খ্যাতনামা অধ্যাপক অথবা ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থের প্রণেতা তাঁরা অনেকেই যদুনাথের শিষ্য হলেও তাঁর সমগ্র রচনা প্রচারে নিজেদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রয়োগ করতে অথবা স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন নি। তাই তাঁর রচনা অধিক ছাত্রের নিকট অবহেলিত, অর্দ্ধ পরিচিত অথবা অজ্ঞাত। অধ্যাপকের মনে তাঁর রচনার কলেবর যেমন নিরুৎসাহ সঞ্চার করে তেমনি গবেষকগণ এই সকল গ্রন্থ স্পর্শ করতে যেন সদাই সন্ত্রস্ত। অথচ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এগুলি যেমন সরস,এর রচনাভঙ্গী ও ভাষারীতিও তেমনি মাধুর্য্যভরা এবং হৃদয়গ্রাহী। ইংরেজী সাহিত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সৌষম্যের পরিচায়ক এই গ্রন্থে তার সবই যেন বিধৃত।

আচার্য্য যদুনাথ কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বাংলা ভাষায়ও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঐগুলির নাম যথাক্রমে (১) শিয়ারউল মুতাখরীন (২) শিবাজী (৩) মারাঠা জাতির ইতিহাস। এ ছাড়া বহু ইংরাজী ও উর্দ্দু সরকারী বিবরণও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

বার-ভূঁইঞাদের ইতিহাস সম্বন্ধে যদুনাথ নতুন আলোক সম্পাত করেছেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তাদের দান যে খুব বেশী ছিলনা—প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এমন উক্তি যদুনাথ খুব সহজেই করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর লেখনীতে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের পূর্ব্ব গৌরব অনেক ম্লান হয়ে গেছে।

আচার্য্য যদুনাথের জীবন তপস্বীর ন্যায় জ্ঞানের গভীরতর সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিরত্ন আহরণে অতিবাহিত হয়েছে। জ্ঞানের এষণায় তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে গেছেন। ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে বিশারদ হওয়ায় তাঁর চিন্তা নিত্য নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন বিলাতের টাইমস পত্রিকার লিটারেরী সাপ্লিমেণ্ট বা 'সাহিত্য সাময়িকী''র নিয়মিত পাঠক। ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ বিষয়েও তাঁর কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ ও আলোচনা রেখে গেছেন। তাঁর 'কবি হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' (প্রবাসী ভাদ্র ১৩:৪) 'বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য' (প্রবাসী মাঘ ১৩১৭) রজনীকান্ত সেন (জাহ্নবী ১৩১৮) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের প্রতি যদুনাথের সর্ব্বাধিক আকর্ষণ ছিল। তিনি স্বতোপ্রণোদিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী ও রাজসিংহের ভূমিকা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ ও গল্পের ইংরাজী অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আচার্য্য যদুনাথের বহুবিধ গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সালে তাঁর 'অচলায়তন' নাটক যদুনাথকেই উৎসর্গ করেন।

বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের প্রতিও যদুনাথের অকৃত্রিম আনুগত্য ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত বিখ্যাত বৈষ্ণব কাব্যগ্রন্থ ও জীবন চরিত—"চৈতন্যচরিতামৃত" স্মরণে তিনি ইংরাজীতে "চৈতন্যের জীবন ও উপদেশ"—Chaitanyas life and teachings রচনা করেন এবং এই গ্রন্থটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হলে বৈষ্ণবরসিক ব্যতীত ইংরাজী শিক্ষিতদের প্রশংসাপত্র লাভে সমর্থ হয়েছিল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আচার্য্য যদুনাথের সম্প্রীতির সম্পর্ক থাকায় তাঁর অধিকাংশ রচনা ঐ দুই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

যদুনাথের বহুমুখী প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধের সীমিত পরিধিতে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

যদুনাথের জীবন উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীগণের ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আদর্শব্রতী, নির্ভীক তেজস্বিতার মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি যে পরিমাণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন তার চেয়ে অধিক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। আত্মনির্ভরশীলতা ছিল তাঁর সবচেয়ে মহৎ গুণ। সত্তর বৎসর বয়সেও তিনি স্বহস্তে নিজের মাল বহন করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে অনেক আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ ব্যথা ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু স্থিতধীমুনির মত তিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ হয়ে দিন যাপন করেছেন। পূর্ব্বসূরীর ঐতিহ্য সংস্কারে তিনি যেমন বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীগণের রচিত সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি একসময়ে স্বীকার করেছিলেন "সংস্কৃতকাব্য ও উপনিষদ, ইউরোপীয় কাব্য, ইতিহাস ও জীবনী, বাংলার তো কথাই নেই—এগুলি আমাকে এক নূতন রাজ্য দিয়েছে। আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রণালী প্রবর্ত্তনে।'

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" এর সভাপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁকে যে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়েছিল তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"তোমার ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতীয় মধ্যযুগে মোঘল শাসনের সমগ্র কাল আমাদের যুগে আমাদের চোখে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইয়াছে, মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজীব ও মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী আজ বহু কল্পনাচ্ছন্ন নীহারিকা রূপ হইতে তোমারই গবেষণা গৌরবে বাহুল্য-বর্জ্জিত অথচ ভাস্বরমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছেন। তোমার জ্ঞানের আলোকসম্পাতে বহু মিথ্যা ভস্মসাৎ হইয়াছে।"

দেশ বিভাগ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভ যদুনাথকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছিল। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি শেষ বয়সে তিনি গভীর অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। বাংলা দেশের কলকাতা মহানগরীর বিদেশী মূর্ত্তিগুলি ভাস্কর্য্য শিল্পেরও ঐতিহাসিক মূল্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হওয়ায় ঐগুলির অপসারণ তাঁকে পীড়িত করেছিল। একটি পত্রে তিনি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে লিখেছিলেন: এই মূর্ত্তিগুলি অপসারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু তাতে ইতিহাসের পাতা থেকে ইংরেজ শাসন কি মুছে ফেলা যাবে?

আচার্য্য যদুনাথের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এই: "জগতে কোনো খাঁটি জিনিস, কোন সাধুপ্রচেষ্টা, কোন সত্যজ্ঞান নষ্ট হয় না। ফল পাবার আকাঙ্খা না করে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাও, ভগবান সেটাকে বাঁচিয়ে রাখবেন।"

গবেষকদের উদ্দেশ্যে তিনি এই বাণী উচ্চারণ করছেন যোগসাধনের তপস্বীর মতই আমাদের গবেষককে শ্রম সহিষ্ণু জীবন যাপন করতে হবে, দীর্ঘকাল কঠোর দারিদ্র্য সহ্য করে তারপর সিদ্ধি আসবে।" আচার্য্য যদুনাথের এই মূল্যবান উপদেশটুকু বর্ত্তমান বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ স্মরণে রাখলে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের ন্যায় তাঁরাও যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে স্মরণীয় হবার কীর্ত্তি অর্জ্জন করবেন তা বলাই বাহুল্য।

এ্যালবাম

(গল্প)

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

দখিনের জানলাটা খোলামাত্র আলোবাতাস এসে ঘর ভরে যায়। এজন্যেই জানলাটা খুলতে চায়না মিনতি। মিনতি রায়। প্রায় সব সময়ই বন্ধ রাখে। কেননা জানলাটার সামনে দাঁড়ালেই গোটা অতীতটা এসে সামনে দাঁড়ায়। সরীসৃপের মতন মুখ উঁচিয়ে। যাকে ঢেকে রাখতে চেয়েও পারেনা মিনতি। তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে না থাকলেও ফেলে আসা অতীতটাকে উলটে পালটে দেখতে হয়। বলা যায় দেখতে বাধ্য হয়। আর তখনই দখিনের জানলাটা খুলে দাঁড়ায় মিনতি। জানলাটাই যেন অতীত দেখার আয়না।

জানলা খুললে চোখে পড়ে একফালি ফাঁকা জমি। সবই ঘাসে ঢাকা। তারপর পানা ভর্ত্তি এক ডোবা। মাথার ওপর এক চিলতে অনাবৃত আকাশ। শহুরে জীবনে স্বর্গের সামিল। গোটাকয়েক নারকেল গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। মিনতির রোজকার সাথী ওরাই। ডোবার পর আবার শহুরে বাড়ির ইঁটপাজর।

মিনতির মিতালি ছিল একদিন ওই অনাবৃত আকাশ, আকাশের গায়ে লেপটে থাকা আলো হাওয়ার সংগে। প্রাণভরে ওদের আস্বাদ পেতে চাইতো। আজ আর চায়না। একথা জানে মিনতি সেদিনের চাইতে আলো হাওয়ার দরকার আজ ওর আরও বেশী। ইচ্ছে করেই সে প্রয়োজনকে দূরে সরিয়ে রাখে মিনতি। তাই জানলাটা বন্ধ রাখে সব সময়। চার দেয়ালে আবদ্ধ এই ঘরটাই ওর প্রকৃত আশ্রয়। এ যেন জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে পরিবেষ্টিত পোতাশ্রয়ে আশ্রয় পাওয়া।

আগে জানলা খুলতো দুপুরের নির্জনতায় নয়তো বিকেলের স্নিগ্ধ পরিবেশে। খটখটে শহুরে প্রাণটা এসে জানলার ওপর আঘাত করতো। হয়তো আজও করে একই রকম। তবে তাকে আর আগের মতন নিতে পারে না মিনতি। দিন ছিল অন্যরকম। জানলার কাছে দাঁড়ালেই কবিগুরুর কথাগুলো মনে পড়তো, 'বেলা যে পড়ে এলো সখী জলকে চল'। মনের মধ্যে কবির সেই গ্রাম্য বালিকাবধুর জন্যে একটু মমতার সঞ্চার হ'তো। তখনই যেন ওই আকাশ আলো হাওয়ার মূল্যটা দানা বেঁধে উঠতো।

আজ সব কিছুরই ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনেছে মিনতি। এখন ওর হিসেবনিকেসের পালা। লাভলোকসানের হিসেব অবশ্য করে না মিনতি। কোনদিনই করেনি। খাপছাড়া অপ্রয়োজনীয় হিসেব আজকের।

নিজের কাছে নিজের পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না। মিনতিরও নয়। তবু ইচ্ছে করেই তাকায়না আয়নার দিকে। কিন্তু একেবারে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয় নিজের চোখকে। মিনতিও পারে না। আয়নাটায় চোখ পড়ে কখনো সখনো। অন্যমনস্কতার মাঝে হঠাৎ নিজেকে খুঁজে পায় মিনতি। হিসেব করে বয়েসের। পঁইত্রিশ [illegible]

গেছে। স্বাস্থ্য অটুট। দেহের বাঁধুনী আজও যৌবনের মধ্যগগনের মতন। কালো লম্বা চুল এখনো ফুরফুরে। বিনুনি করলে মাথার ওপর ফণাধরা সাপ বলে মনে হয়। গায়ের ফর্সা রং আগের মতনই। রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা। ঝকঝকে দাঁত। সব মিলিয়ে একটা পারিপাট্যের ভাব বজায় আছে আজও।

অতনু একদিন রসিকতা করে বলেছিল, কনে সাজিয়ে আবার তোমাকে চালিয়ে দেওয়া যায় মিনু।

বিনুনি নিয়ে খেলা করছিল সেদিন অতনু। বিয়ের অনেকদিন পর। শংকরের বয়স তখন আট। এখন শংকর দশ। শংকরও একদিন মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মা তুমি কি সুন্দর।

ছেলের অদ্ভুত কথায় হাসলো মিনতি। এ যেন অতনুর কথারই প্রতিধ্বনি। রাগ করেনি। ছেলের দুগাল টিপে চুমো খেয়ে কোলে নিয়ে বললো, কে বলেছে ?

শংকর বললো, সবাই বলে।

মিনতি সুন্দর না ছাই।

শংকর চলে যাওয়ার পর সেদিন আয়নায় নিজেকে ভালো করে দেখেছিল মিনতি।

আজও আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বৈশাখের প্রচণ্ড গরমের পর খানিকটা বৃষ্টি হয়েছে কাল। বাতাসে তাই হিমেল স্নিগ্ধতা। আকাশে মিঠে রোদ ঝলমলে। নীল আকাশ। শাদা খণ্ড মেঘ এদিকে সেদিকে। বেলুনের মতন ভাসছে।

এঘরটা এখন নির্জন। শংকর স্কুলে। বাড়ির আর সবাই ঘুমিয়ে। নিরুদ্বেগ ওরা। কেবল মিনতিই নানান ঘটনার জাল বুনে চলে। রোজই নির্জন এই অবসরটুকু পায় মিনতি মাঝে মাঝে দখিনের জানলাটা খোলে। খুললেই ঝ'ড়ো হাওয়ায় স্মৃতির এ্যালবাম খুলে যায়।

পরিবর্তন খানিকটা যে হয়নি মিনতির এমন নয়। নিজের চোখেও ধরা পড়ছে ইদানিং। মুখের হাসিতে ফ্যাকাসে ছাপ পড়েছে। চোখে নেমে এসেছে ধূসর পাণ্ডুরতা। কপালে আর সিঁথেয় সিঁদুর নেই। বেশি শাদাটে মনে হয় জায়গাদুটো। যেন ব্যঙ্গ করে মিনতিকে। একেক সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মনটা। ইচ্ছে হয় একছোপ সিঁদুর লাগিয়ে ওই ব্যঙ্গকে গলা টিপে মারে। মনে হয় বাইরের জগৎটাই যেন মিনতির নিষ্ঠুর পরিণতি নিয়ে ব্যঙ্গ করছে। হুল ফুটতে থাকে ওর শরীরে। চারপাশের ষড়যন্ত্রের হাসিটাকে ঘুষি মেরে বন্ধ করতে চায়। এ যেন ষড়যন্ত্রের জালে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মারার পরিকল্পনা। বাইরে আসতে চায় মিনতি। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হয়।

মনে পড়ে শ্বাশুড়ীর সেই হুলফোটানো কথাগুলো। রেজিষ্ট্রি বিয়ে হয়েছিল ওদের। বিয়ের পর চারপাঁচ বছর কোন সন্তান হয়নি ওদের।

শ্বাশুড়ী বলেছিলেন, ওরা বাপু আজকালের মেয়ে। মা হওয়া ওদের সাজেনা। সন্তান ওদের কাছে শ্যালকুকুরের মতন।

মাঝে মাঝে মাত্রা থাকতো না। কুৎসিত মন্তব্যও মুখে আটকাতো না।

বলতেন, আমাদের কালে মেয়েদের বিয়ে হ'তো একরত্তি বয়েসে। তাই কেলেংকারিও ছিল না এখনকার মতন। বুঝিনা বাপু আজকাল কিসব ওষুধবিষুধ বেরিয়েছে। মেয়েগুলোও তাই খেয়ে ধিঙ্গিপনা করছে। আর ছেলেধরার ফাঁদ পাতছে।

শ্বাশুড়ীর খোঁচাটুকু বুঝতো মিনতি। ওদের বিয়ের জন্যে পুরোপুরি মিনতিকে দায়ী করতে চাইতেন তিনি। নিজের ছেলেকে বেকসুর খালাস। বোবার শত্রু নেই জানতো মিনতি। তাই প্রতিবাদ করতো না। প্রতিবাদে ঝড় ওঠে। তিক্ততা বাড়ে। যা মিনতির কাম্য নয়। অতনুর কাছেও এ নিয়ে কোনদিন একটা কথাও বলেনি।

কিন্তু মিনতি জানে সহ্যের সীমা ছাড়ালে বোবাও প্রতিবাদ করে। মিনতিরও মাঝে মাঝে তাই হয়। প্রতিবাদের ইচ্ছাটা পাক খেয়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

তখন চারপাশের সবকিছুকে দুমড়ে মুচড়ে ধ্বংস করতে চায় মিনতি। অবশ্য মিনতি এও বুঝেছে ওর আগের সেই সংযম কোথায় হারিয়ে গেছে। নিজের ওপর কোন কর্তৃত্বই যেন নেই আজ। একেক সময় মনে হয় রক্তমাংসের সেই মানুষটাকে টেনে এনে প্রতিবাদ করে। কিন্তু সে পথে তালাচাবি মারা। চিরদিনের জন্যে। অতনুই তালাচাবি দিয়ে গেছে। কোথায় গেছে জানে না মিনতি।

অতনুর টেবিলের ওপরকার ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় মাঝে মাঝে। মনের মধ্যে প্রতিবাদের ইচ্ছে। পারে না। ধীরে ধীরে নিবে যায় ইচ্ছের আগুনটুকু। কুঁকড়িয়ে আসে অসংযত মনোভাব সাপের মতন। গভীর শান্ত চাউনি অতনুর চোখে। বিশ্বাস হয় না এ অতনুর ছবি। মনে হয় অতনু ওই ছবির মধ্যেই রয়েছে।

নিজের আসন্ন মৃত্যুটাকে তিলে তিলে দেখে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল অতনু। চিকিৎসাও করাতে দেয়নি এজন্যেই। ক্রমশ এগিয়ে আসা মৃত্যুর সংগে মিনতিরও সেই প্রথম পরিচয়।

অতনু বলেছিল, যা ঘটবেই তাকে তুমি রুখতে পারবে না মিনু। মানুষের হাত ওখানে অচল। যে টাকাগুলো মৃতের জন্যে ব্যয় করবে রেখে দিলে আসছে দিনে তোমাদের অনেক কাজ লাগবে।

চিরদিন অতনু এককথার মানুষ। ওর 'না'-কে 'হ্যাঁ' করতে কোনদিন কেউ পারেনি।

তবু মিনতি বলেছিল। আজকাল ড্যামেজ্‌ড্‌-হার্ট বদলও তো হচ্ছে।

একটু হাসলো অতনু। একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

তারপর বললো, তুমি ডঃ বার্নার্ডের কথা বলছো মিনু? ডঃ বার্নার্ডের জন্ম আমাদের এই হতভাগা দেশ কোনদিন দিতে পারবে না। জানোই তো নোবেল বিজয়ী ডঃ খোরানাকে দুঃখে দেশ ছাড়তে হয়েছে।

অতনুর মৃত্যুটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল মিনতি। দেখেশুনে মনে হ'য়েছে আনুষ্ঠানিক মৃত্যুটা যেন মৃত্যুই নয়। প্রকৃতিরাজ্যে প্রতিমুহূর্তে কত মৃত্যুই তো ঘটছে। কিন্তু মিনতির এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আগে আর হয়নি। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যেত মিনতির। যুদ্ধ করতো নিজের সংগে। একেক সময় ভবিষ্যতের শূন্যতার ছবি ওর মনের মধ্যে তোলপাড় করতো।

প্রত্যাশিত মৃত্যুই হ'লো অতনুর। মিনতির কাছে একটুও অপ্রত্যাশিত মনে হয়নি। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার কাছে মানুষের অসহায়তার ছবিটাই ফুটে ওঠলো মিনতির চোখে। তবু মিনতির বৈষয়িক মনটা এ সত্যকে মেনে নিতে পারেনি সেদিন।

শাশুড়ী ঠেস দিয়ে বললেন, সময় মতন চিকিৎসে করালে কি এমনটি হতো কক্‌খনো? বিয়ের পর ছেলের ওপর কি মায়ের কোন অধিকার থাকে? ভাব করে বিয়ে হ'লে তো কোথাই নেই। যাবার বেলায় তো আমার ছেলেই গেলো।

শরীরে অসহ্য জ্বালা ধরে ছিল মিনতির। ছুটে এলো ঘরে। দরজাটা বন্ধ করে দিলো। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো। অতনুর ছবিটা চেপে ধরলো দুহাতে। কাঁপছে মিনতি।

ছবিটাকেই বললো, বলো—বলো কি অন্যায় করেছি আমি? ভালোবাসাটা কি আমার একলারই ছিল? তুমি কি কেবল অভিনয়ই করেছিলে? ভালই যদি বেসেছিলে তবে এ চরম শাস্তি আমায় কেন দিলে? এ কি আমার প্রায়শ্চিত্ত? বইয়ের পাতায় তোমরা ভালোবাসার জয়গান করো। ওগুলো তবে মিথ্যে—মিথ্যে। মিথ্যে দিয়ে মানুষকে ভোলাও তোমরা। সমাজ আজও যা মানতে পারেনি, বলো সেই বুজরুকি-গুলো পুড়িয়ে ফেলি। তুমি শুধু একজনের ছেলেই ছিলে? আর—আমি···আমি···

মাগো—মা দরজা খোল।

শংকরের করাঘাত পড়তে থাকে দরজার ওপর। স্কুল থেকে ফিরলো শংকর। রোজেই ফেরে এই সময়।

মিনতির মনের ঝড়ো হাওয়া এই সময়টাকে ঢেকে রেখেছিল। নিজেকে সংযত করে মিনতি। চোখের জলটুকু মুছে ফেলে তাড়াতাড়ি। তারপর দরজা খুলে দেয়।

বিকেল হয়ে গেলো। এখনো তুমি ঘুমোচ্ছো—ঘুমোচ্ছোই। শংকর বললো।

হাসতে চেষ্টা করে মিনতি। বলে, ঘুমোচ্ছি কই?

তবে দরজা বন্ধ করে কি করছিলে?

একটা চুমো খায় মিনতি শংকরের গালে।

বলে, দরজা বন্ধ করে তোমার কথাই ভাবছিলাম বাপ। ভাবছিলাম শংকর আমার মস্ত বড় হ'য়ে চাকরি করতে যাবে। লালটুকটুকে একটা বউ এনে দেবো। তখন শংকর মাকে ভুলেই যাবে।

বলতে বলতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে মিনতি। জানলা দিয়ে চোখ চলে যায় দূরের আকাশটার দিকে। চমক ভাঙ্গে শংকরেরই কথায়।

শংকর বলে, দরজা বন্ধ ক'রে কেউ ভাবে বুঝি?

বাঃ—নইলে যে সব ভাবনাই আকাশে পালিয়ে যাবে।

চেয়ারে বসে খাবার খায় শংকর। পা দোলাতে থাকে। শংকরের বইগুলো গোছাতে থাকে মিনতি।

মিনতিই বলে, বউ একে আমাকে মনে থাকবে শংকর?

বউএর প্রসঙ্গে শংকরের লালটুকটুকে মুখটা আরও লাল হ'য়ে ওঠে।

বলে, যাও—তুমি বড় দুষ্টু। বউকে আমি আনবোইনা।

কেন রে?

বউ বড় দুষ্টু।

কে বলেছে?

ঠাকুমা।

চমকে ওঠে মিনতি। শরীরটা আবার কাঁপতে থাকে। হুল ফুটতে থাকে শরীরের আনাচে কানাচে। ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিতে চায় শংকরের গালে। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, না না, সব মিথ্যে—মিথ্যে। এভাবে ওকে ক্ষতবিক্ষত করার অধিকার কারও নেই।

অতনুর ছবিটার দিকে আবার চোখ পড়ে মিনতির। একেকবার মনে হয় অতনুর মুখে ব্যঙ্গের হাসি। ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে হয় ছবিটাকে দূরের ওই পানাভরা ডোবায়। সব স্মৃতি ডুবিয়ে দিতে চায় পানার তলে এঁদো জলে। পারে না। অতনুর চেহারাটা আবার বদলে যায়। সেই শান্ত গভীর বিশ্বাসী চোখদুটো ভাসতে থাকে। যেন শংকরেরই প্রতিচ্ছবি।

শংকরের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায় মিনতি। অতনুর ছবিটাকে সাক্ষি রেখে নিজের সংগে যুঝতে থাকে। ছেলের সংগে অভিনয়ের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে। সত্যিই এ অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। অতনুর মৃত্যুর পর থেকে এভাবেই অভিনয় করে আসছে মিনতি। মিনতি জানে শংকর বড় হ'লে ওর কাছে এ-অভিনয় ধরা পড়বে। সেদিনের কথা ভাবেনা মিনতি। ভবিষ্যৎকে তলিয়ে দেখা ওর কোনদিনের স্বভাব নয়। অতীতটাই ওর কাছে একটা ভার। ইচ্ছে থাকলেও নামাতে পারে না। কালনাগিনীর মত কোন্ ছিদ্রপথে এসে হাজির হয়।

চকভৃগু আর আত্রাই। আজও আঠার মতন লেপটে আছে গায়। ধূলোবালি আর কাদায়ভরা গ্রাম্যপথ। আম-জাম-কাঁঠাল ঘেরা নির্জন বাড়ি। বাঁশঝাড়ের খটাখট শব্দ। যেন ভৌতিক উল্লাস। কাক-চিল-কোকিলের নিয়মিত মহড়া। বাড়ির নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া মৃদুস্রোত আত্রাই। চকভৃগু মিনতি রায়ের সুখদুঃখের সাথী। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতনই হয়ে গিয়েছিল নদীটা। ফেলে আসা জীবনটা আজও মাকড়সার জাল বিস্তার করে রেখেছে মিনতির চারদিকে।

সেদিনের কথাটা ভাবলে আজও মিনতির গা শিউরে ওঠে। শরীরের রক্ত হিম হ'য়ে আসে। হাত পা হয়ে আসে অবশ। শিরাগুলো হয়ে পড়ে শিথিল। অতনুর জীবনে যে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছে মিনতি সেই

মৃত্যুই যেন ওর নিজের জীবনে মুখব্যাদান করে এগিয়ে আসছিল। আর কিনা ওই অতনুই কোথ্‌থেকে ঝড়ো কাকের মতন ছুটে এলো। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে মিনতির প্রায় নিভে-যাওয়া-প্রাণটুকুকে পুঁটলি বেঁধে ছিনিয়ে আনলো।

বারো বছরের কিশোরী মিনতি। বর্ষার সূচনা-লগ্নে সেদিন ওকে সাঁতারের নেশায় পেয়ে বসেছিল। প্রথম বর্ষার উচ্ছ্বাসে আত্রাই সেদিন মাতোয়ারা। প্রাণের উদ্দামতা মিনতির শিরায় শিরায়। গা ভাসিয়েছিল আত্রাইএর বুকে। রোজই এমন ভেসে বেড়ায় মিনতি। এ এক ছেলে খেলা ওর কাছে। আত্রাই যেন ওর পোষমানা ময়না কিন্তু সেদিন.........?

আজও ভেবে পায়না মিনতি কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল। হয়তো বা বিধাতাপুরুষেরই ইচ্ছেয় ঘটেছিল ব্যাপারটা। হঠাৎ একটা চোরাস্রোতে পড়ে গেল মিনতি। এক ঝটকায় টেনে নিয়ে গেল ওকে বহুদূর। সেদিনই আত্রাই প্রথম বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল। সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হলো মিনতির। বেয়াড়া স্রোতটা ওকে বাঁকের মুখে বাঁশঝাড়টার কাছে এনে ফেললো। সেখান থেকে মাঝনদীতে নিয়ে চললো। প্রাণপণ চেষ্টা করছে মিনতি। পারছে না। হাতপা অবশ হয়ে আসছে। গলাটা কে যেন চেপে ধরছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চোখদুটো অন্ধকার। চারপাশের সবকিছু যেন দুলছে। নীল অসম্ভব নীল সবকিছু। মনে হ'লো নীল আকাশের বুক দিয়ে মিনতি যেন কোন নীলদেশে এগিয়ে চলেছে।

কোথ্‌থেকে অতনু এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। আঠারো বৎসরের জোয়ান অতনু। আলতোভাবে গা ভাসালো। মিনতির চুল ধরে টেনে তুললো বালুর চড়ে। অতনুর বলিষ্ঠ বাহুও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সেদিন। জ্ঞান হলে বালুর ওপর বসেছিল মিনতি। খানিকটা তফাতে অতনু। সিক্তবসনা মিনতির দিকে তাকিয়ে ছিল। মিনতির ফর্সা মুখে আর গায়ে তখনো কয়েক ফোঁটা জল চিকচিক করছে। মুক্তোর মতন। দু'এক ফোঁটা ঝরেও পড়লো গা বেয়ে। আত্রাইএর বেয়াড়া জল। মুখে যেন কুট হাসি। যৌবনের জোয়ার আসেনি এখনো মিনতির গায়ে। বয়ঃসন্ধির উষার আলোর ঝিকিমিক এখানে সেখানে।

মিনতি বসেছিল মাথা নিচু করে। হাঁটু মুড়ে। শরীর তখনো কাঁপছে ওর। নীরবতা ভাঙ্গালো অতনুই।

বললো, বর্ষার জল নেমেছে। এ সময় একলা সাঁতার কাটতে আছে ?

ভ্রুর নিচ থেকে তাকায় মিনতি। ভিরু দুটি চোখ। বিভীষিকার ছায়া লেগে আছে এখনো। কোন কথা বলেনা মিনতি। অতনুও বেশ গম্ভীর। কেমন যেন চিন্তিত। নদীর ও-পারের আকাশটার দিকে তাকিয়ে। অতনুর গাম্ভীর্য এই প্রথম। এই প্রথম অতনুকে চিন্তা করতে দেখছে মিনতি। যা অতনুর পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক।

অতনুই আবার বললো। তিস্তার কথা মনে নেই ? ডুবলে কি সাংঘাতিক ব্যাপার হ'তো! মুখ তোলেনা মিনতি। মাথা নিচু করে বসে থাকে। অতনু সেভাবেই অকাশের দিকে তাকিয়ে। একটুও ব্যঙ্গের স্পর্শ নেই ওর কথায়। চিন্তার গভীর তল থেকে বেরিয়ে এসেছে কথাগুলো। আজকের অতনু ওর ওই কথাগুলো একেবারে নতুন। অতনুর সেই চাঞ্চল্য সেই বেয়াড়াপন। কোথায় হারিয়ে গেছে।

জলে ঝাপসা হয়ে এলো দুচোখ মিনতির। কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে বালুর ওপর। আত্রাইয়ের তৃষ্ণার্ত নিষ্ঠুর বালু নিমেষে তা শুষে নিল। অতনু বুঝতে পারে মিনতি কাঁদছে।

সেখানে বসেই বললো অতনু। বাড়ি যাও মিনু। ভাববে সবাই। বকলে আমার নাম করোনা কিন্তু।

উঠে দাঁড়ায় অতনু। একটা কথাও বললোনা আর। বালুর চড়া ভেঙ্গে বাঁশবনের আড়ালে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হ'লো অতনু। মিনতিকে ফাঁকি দিতে পারলোনা অতনুর গলার স্বরটা। কেমন যেন ভেজা মনে হচ্ছিল॥

আজও হিসেব করে পায়না মিনতি সেদিনের ঘটনাটা বিধাতাপুরুষের কোন্ ইচ্ছেয় ঘটেছিল। অতনুর সংগে মিনতির জীবনটাকে বাঁধাই হয়তো ভাগ্যনিয়ন্তার ইচ্ছে ছিল সেদিন। আর সে কোন্ অতনু? যাকে ঘৃণা করতো মিনতি। অন্তত সেদিনের আগে পর্যন্তও। চকভুগুর বেয়াড়া বখাটে ছেলে অতনু। সবরকম দুষ্টচক্রের নেতা। বিরক্ত করতো মিনতিকে পথেঘাটে। গায় পড়ে ভাব করতে চাইতো। এড়িয়ে চলতো মিনতি অতনুকে। রেহাই পেতোনা বড় বেশী অতনুর সজাগ দৃষ্টির হাত থেকে। চিঠিও ছুঁড়ে দিয়েছিল মিনতির দিকে কয়েকবার।

আজও ভাবলে অদ্ভুত লাগে মিনতির। স্কুলে যাচ্ছিল সেদিন। বড় পেয়ারাতলা দিয়ে। ধুপ করে একটা পাকা পেয়ারা পড়লো সামনে। বেশ বড়। এভাবে পড়ে মাঝে মাঝে এ গাছের পেয়ারা। পেয়ারা মিনতির চিরদিনের প্রিয়।

কামড় দিল পেয়ারাটায় মিনতি। আলতোভাবে আধাআধি দুভাগ হয়ে গেলো। ভেতরে ছোট এক টুকরো কাগজ। শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল মিনতির। চকিতে চারপাশটা একবার দেখলো মিনতি।

মোটা কাঁঠালগাছের আড়ালে উৎসুক দুটি চোখ। অতনুর চোখদুটোকে চিনতে পারে মিনতি। মাথায় ওর আগুন জলতে থাকে। ছুঁড়ে মারলো পেঁয়ারাটা অতনুকে তাক করে। স্কুলের দিকে পা চালালো হন্‌হনিয়ে। পেছন ফিরে তাকায়নি একবারও।

বিয়ের পর এই ব্যাপারটা নিয়েই রসিকতা করেছিল অতনু।

বলেছিল, পেয়ারাটা না খেয়ে ফেরত দিলে ভাল হ'তো।

মিনতি বলেছিল, না খেয়েই দেওয়া হ'য়েছিল। মেয়েরা হ্যাংলা নয় ছেলেদের মতন।

অতনু বললো, হ্যাংলা নয়। তবে ঘুড়ি উড়িয়ে সুতো টানতে খুব ওস্তাদ।

মিনতি বললো। মেয়েরা ঘুড়ি ওড়ায়। সুতোও টেনে রাখে। কিন্তু ছেলেদের মতন ভোঁ-কাট্টা করে না।

অতনু একটু মুচকি হেসে বললো, ঘুড়ি উড়িয়ে ভোঁ-কাট্টা করাতেই তো আনন্দ। কার সুতোয় কত ধার আছে বোঝা যায়।

মিনতি বললো, হুঁ—মেয়েগুলোকে ঘুড়ির মতন কাটতে না পারলে তোমাদের মন ভরেনা। কি নিষ্ঠুর পুরুষ জাতটা।

দখিণের খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়ালে ছবির মতন মনে পড়ে সেই ভয়ংকর রাতটার কথা! সুন্দর হয়েই এসেছিল রাতটা। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনও তিথি ছিল বোধহয়। চাঁদের আলো ম-ম করছিল চক্‌ভুগুর আকাশে। বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে। আত্রাইয়ের বুকে আর বালুর চড়ে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এক আলো-আঁধারী কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই সময়ই দ্রুম্...দ্রুম্...দ্রুম্......

বোমা আর গুলীর মিলিত আওয়াজ। একটা হল্লার শব্দ ভেসে এলো আত্রাইয়ের বুকের উপর দিয়ে। এমন ঘটনা নতুন নয় মিনতির কাছে। রাজনৈতিক ঘোরে ওদের এই ক্ষুদে মফঃস্বল শহরটাও তেতে উঠেছে। চকভুগুর ভাতের হাঁড়িতেও আজ রাজনীতি।

অতনুই বলেছিল একদিন। ভুয়ো গণতন্ত্রে দেশের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয় মিনু। মার্ক রাজনীতির ঘেরা টোপ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

মিনতি বলেছিলো, তোমাদের পথে তো ভালোবাসা প্রেম এ সবের কোন স্থান নেই।

ম্লান হাসলো অতনু। তারপরই মুখটা ওর শক্ত হয়ে উঠলো। কিসের এক আবেগ চঞ্চল করে তুললো অতনুকে।

বললো, জানি মিনু, কেন তুমি ওকথা বলেছো। তোমাদের ধারণা এপথে যারা আসে তাদের মনগুলো পাথুরে। আচ্ছা, আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো

প্রেম-ভালোবাসা যার মধ্যে নেই সেকি মানুষের জন্যে কিছু করতে পারে?

হঠাৎ অতনু মিনতির একটা হাত টেনে নিলো। নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বললো, ছাখতো মিনু, আমার এই বুকটার মধ্যে ভালোবাসার ঘাটতি আছে কিনা।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো মিনতি। আকাশ বাতাস থমথমে। আত্রাইয়ের বুকে কি একটা ভাসছে। মানুষ বলেই মনে হয়। সাঁতরে এপারে আসছে। গাটা ছম্‌ছম্ করতে থাকে মিনতির। এমনি গা ছম্‌ছম্ করেছিল আরেক দিন। সেদিন অতনু কাগজের ঠোঙায় দুখানা তাজা বোমা দিয়েছিল মিনতিকে।

অনুনয় করে বলেছিল, অন্য কোথাও রেখে ভরসা পাচ্ছি না। তাই তোমার কাছেই নিয়ে এলাম মিনু। আমি জানি তোমার কাছ থেকে কেউ জানতে পারবে না।

সাতটা দিন মাত্র। ফাটবার ভয় নেই।

তেজ আর গভীর বিশ্বাস অতনুর চোখে। প্রত্যাশায় চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করছে। ঠোঙাটা দিয়ে আর দাঁড়ায়নি অতনু। আর মিনতি? মিনতি যেন স্বপ্ন দেখছিল। ভাবতেই পারে না ওর হাতে দুটো তাজা বোমা। এখুনি হয়তো ফাটতে পারে মাটিতে পড়ে। গা ছম্‌ছম করে। হাত কাঁপতে থাকে। নানান অলীক কল্পনা মনে আসে। একবার মনে হ'লো আত্রাইয়ের জলে ছুঁড়ে দেয় ঠোঙাটা। আত্রাই ঠাণ্ডা করুক রাজনৈতিক হলকা।

আলমারিতে বইয়ের আড়ালে রেখেছিল বোমা দুটো। সাতটা দিন এক অজানা আশংকায় কাটলো মিনতির। আলমারির পাশেই খাট। ভাল ঘুম হ'তো না রাতে। মাঝে মাঝে চম্‌কে জেগে উঠতো। স্বপ্নে দেখতো বোমা দুটো ফেটে গেছে। জেগে উঠে বুঝতো শরীরটা ওর গরম হয়ে গেছে। একেক সময় রাগ হ'তো অতনুর ওপর। মিনতির মাথার ওপর এভাবে খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না। অতনু কি এভাবেই মিনতির ভালোবাসার মূল্য বিচার করছে? আলমারির কাঁচে অতনুর মুখটা ভেসে উঠতো। সেই বিশ্বাস আর প্রত্যাশা। অতনুর কথাটা কানের কাছে বাজতো, আমি জানি তোমার কাছ থেকে কেউ জানতে পারবে না। কথার খেলাপ করেনি অতনু। সাতদিন পরই নিয়ে গিয়েছিল ঠোঙাটা।

অতনুই সাঁতরে এসে এপারে উঠলো। দূর থেকেও চিনতে অসুবিধে হয়নি মিনতির। চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে অতনুর ভেজা শরীরটা। দৌড়ে আসছে অতনু। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ায় মিনতি।

অতনু......?

ধাবমান অতনুকে ডাকলো মিনতি।

চমকে ফিরে দাঁড়ায় অতনু।

তবু ভাগ্যি তুমি। আমি ভাবলাম—

বলতে গিয়ে থেমে যায় অতনু। কেমন একটা চাঞ্চল্য ওর মধ্যে।

একি! রক্ত......!

ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর মিনতির। যেন ভূত দেখছে।

আস্তে মিনু আস্তে, চাপা গলায় বললো অতনু। এতদিন আমরা রক্ত দিয়েছি। এবার দিন বদলের পালা। তাই রক্ত গায় মেখে এলাম।

অতনুর ভিজে কাপড়ে রক্তের দাগ। বিভীষিকার মতন মনে হল মিনতির। মিনতির কথা বলার শক্তিটুকু শুকিয়ে গেছে। অতনু অধৈর্য। মিনতির একটা হাত টেনে নেয়।

বলে, মিনু, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না। এখুনি পালাতে হবে শহর ছেড়ে। কোথায় যাবো ঠিক নেই। সব নির্ভর করছে দলের নির্দেশের ওপর।

মিনতি চেয়ে থাকে অতনুর দিকে। চোখ ঝাপসা জলে। অতনুকেও দেখা যায় না ভালো। অতনু দেখতে পাচ্ছে মিনতির চোখের কোণে যেন গোটা চাঁদটাই ধরা পড়েছে।

ছিঃ মিনু। এ সময় কাঁদতে আছে ?

খানিক্ষণ নীরবে কাটলো। রাত্রি আর চাঁদ নীরবতার সাক্ষি। আত্রাই নীরব। গাছের ডালে শুধু একটা রাতজাগা পাখির আওয়াজ।

হঠাৎ মিনতিকে কাছে টেনে নেয় অতনু। ঠোঁটে আর গালে নিবিড়ভাবে চুমো খায়। এতদিনের সব রুদ্ধ আবেগ আজ পথ পেয়েছে। আগ্নেয়গিরির লাভার মতন বেগে বেরিয়ে আসছে। এক জান্তব আবেগে অতনু সবলে মিনতিকে নিজের দেহের মধ্যে মিশিয়ে দিতে চাইছে। অথচ যেন আশা মিটছে না। মিনতি প্রতিরোধবিহীন। স্খলিত আঁচলটাকে তুলতেও ভুলে যায়।

কালের গতিশীল স্রোত বসে থাকে না। একেকটা দিন চলে যায় নিজেকে লেফাফায় আটক করে। স্রোতের সামনে নীরব দর্শক মিনতি। পাথরে গড়া মূর্তির মতন। কোন জাদুমন্ত্রে নিশ্চল হয়ে গেছে।

দক্ষিণের জানালাটা খোলে। লেফাফার একেকটা মুখ খুলে যায় তখনই।

আজও জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মিনতি। হিমেল বাতাস আর ভিজে রোদ জানলায় মাতামাতি করছে। ডোবায় অসংখ্য পানাফুল ফুটেছে। মাথা দোলাচ্ছে ওরা। শংকর এখনো ফেরেনি স্কুল থেকে। বিকেল গড়িয়ে এলো প্রায়। শংকর থাকলে মন হালকা থাকে মিনতির। শংকর না থাকায় দুপুরটা যেন আর যেতে চায় না। বোঝাই মালগাড়ি মনে হয় নিজেকে।

মিনতির জীবনের অবলম্বন শংকর। শিবরাত্রির সলতে। নিরাশার অন্ধকারে কল্পনার টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। শংকরকে ঘিরে কত কল্পনার টুকিটাকি মিনতির। তবু মাঝে মাঝে একটা ভয় এসে ওর কল্পনার পুতুলখেলাকে ভাঙ্গতে উদ্যত হয়। তখনই মনে পড়ে অতনুর সেই কথাগুলো। রোগশয্যায় বলেছিল।

আমাদের অসমাপ্ত কাজ আমাদের ছেলেরা সম্পূর্ণ করবে মিনু। শংকরকে তুমি সেভাবেই তৈরী করো। ওকে আমি কিছুতেই ওপথ মাড়াতে দেবোনা।

মিনতির ভাঙ্গা গলায় নৈরাশ্য। অতনুর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক।

অতনুই বললো, ডাক যেদিন আসবে সেদিন ও নিজেই ঝাঁপ দেবে মিনু। তখন কি আঁচলে বেঁধে রাখতে পারবে ?

নির্মম প্রশ্ন অতনুর। মিনতি কোন কথা বলেনা।

অতনুই আবার বললো। পরিবারের মানুষগুলোই আমাদের আপন। দেশটাকে আমরা নিজের বলে ভাবতে পারছি না। জানো মিনু, ঠিক এজন্যেই আজও আমরা পিছিয়ে রয়েছি।

বলতে বলতে অতনুর কপাল কুঁচকে এলো। একটা হতাশার ভাব ওর মধ্যে। রুগ্ন অতনুর আদর্শবাদের প্রতিবাদ করেনা মিনতি। কিন্তু সেদিনও মানতে পারেনি ওই আদর্শবাদ। আজও নয়। কোনদিন পারবেওনা। ডাক এলে শংকরকে নিয়ে চলে যাবে কোন দূরদেশে। আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখবে।

মাগো দরজা খোল।

শংকরের করাঘাত দরজার ওপর।

দরজা খোলে মিনতি। বইয়ের ব্যাগটাকে টেবিলে ছুঁড়ে দেয় শংকর। বিছানায় লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ে। একটা হাই তোলে।

মিনতি বলে, কি হ'লো, এসেই শুয়ে পড়লি যে। শরীর খারাপ করছে ?

শংকর বললো, ছাত্রদের সংগে পুলিশের কি মারামারি।

চমকে ওঠে মিনতি। বলে, কেনরে ?

ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল।

কি জন্যে ধর্মঘট করেছিল ?

মিনতি গম্ভীর। কালবৈশাখীর মেঘের মতন থমথমে। ভিতরে একটা আলোড়ন অনুভব করে।

শংকর বললো, ছাত্ররা মিছিল করেছিল। আরেকদল ছাত্র মিছিলে বোমা মেরেছে। অমনি

লাগলো মারামারি। পুলিশ চলে এলো। দুজন ছাত্রের মাথা ফেটে গেল।

চুপ শংকর। ওকথা বলতে নেই।

তুমি কিছু বোঝনা মা। আমাদের ছাত্রনেতাই তো সেদিন বলেছিল আমাদের দাবী মানতে হবে। আমাদের চাকরি দিতে হবে। নইলে আমরা ধর্মঘট করবো মিছিল করবো—

শংকর......।

থরথর করে কাঁপছে মিনতি। ষড়যন্ত্র। ওর চারিদিকে ষড়যন্ত্র। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মারতে চাইছে ওকে। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে মিনতির। চারদিকে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। ভাবতে পারছে না মিনতি পাগল হয়ে যাবে কিনা। অতনুর ছবিটার দিকে চোখ পড়ে। হাসছে অতনু। একি ব্যঙ্গের হাসি? অতনুর কথাটা যেন কানের কাছে বাজতে থাকে। ডাক যেদিন আসবে সেদিন ও নিজেই ঝাঁপ দেবে। তখন কি আঁচলে বেঁধে রাখতে পারবে? কানে আঙুল দেয় মিনতি। ভূমিকম্পে পৃথিবীটা যেন দুলছে। মিনতির চোখের সামনে ভাসতে থাকে মিছিলের প্রতিচ্ছবি। শংকরও রয়েছে তাতে। হাত নাড়ছে। চিৎকার করছে। মিনতির ডাক শুনতে পাচ্ছে না। মাথাটা দুলতে থাকে মিনতির। চিৎকার করে ওঠে, না না না......এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না।...

দড়াম করে দখিনের জানলাটা বন্ধ করে দেয়।

শংকরকে বুকে চেপে ধরে।

শংকর—শংকর...!

বুকের ওপর শংকরকে আষ্টেপৃষ্ঠে পিষতে থাকে মিনতি। হতভম্ব শংকর তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

(পাঁচ)

কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যে নিয়াসো শহরে একটা স্কুল ছিল। সেখানে শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত নিগ্রো-শিশুদের ভর্তি করা হ'ত। জর্জ নিয়াসো শহরের সেই স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হবার জন্য কার্ভার দম্পতির কাছে অনুমতি চাইলো। জর্জ তাঁদের ছেড়ে চ'লে যাবে, এটা তাঁরা ভাবতেই পারেননি কোনো দিন। তাই জর্জের এই চলে যাবার প্রস্তাবে প্রথমে তাঁরা কিছুতেই রাজি হ'লেন না। কিন্তু এও তাঁদের অজানা ছিল না যে, জর্জ একদিন চলে যাবেই, চিরদিন তাকে তাঁরা নিজেদের কাছে কাছে ধ'রে রাখতে পারবেননা।

জর্জের বয়স এখন সবেমাত্র দশবছর। তা ছাড়া, জন্ম থেকেই সে রুগ্ন আর দুর্বল। সে কি পারবে তাদের ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে? জর্জের বয়স যদিও দশ বছর, কিন্তু তার চেহারা দেখে তাকে সাত আট বছরের বেশী বয়সের ছেলে ব'লে মনেই হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা, সে এখনো বড় অসহায়, বড় দুর্বল, অন্যের উপর বড় বেশী নির্ভরশীল। তাকে খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে হয়, শোবার কথা মনে করিয়ে দিতে হয়, পোশাক পরিচ্ছদ পরার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। কিছুই তার মনে থাকে না। এমন অবোধ শিশুকে কি এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়? মাতৃসমা আন্টি সুসানের বুক বিদীর্ণ ক'রে এই প্রশ্নটাই বার বার জাগে। মোজেস কার্ভারও ছেলেটাকে পুত্রস্নেহে পালন করেছেন। জর্জ চ'লে যাবে একথা ভাবতে তাঁর মনও হাহাকার ক'রে ওঠে, কার্ভার দম্পতি জর্জের প্রস্তাবে রাজি হ'তে পারলেন না।

চেহারায় জর্জ দুর্বল এবং কৃশকায় হ'লেও তার মানসিক শক্তি কম ছিল না। তার মনের জোর ছিল প্রবল এবং ইচ্ছাশক্তি ছিল অনমনীয়। এই দুই প্রবল শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত কার্ভার দম্পতিকে হার মানতে হ'ল। জর্জকে নিয়াসো শহরের স্কুলে গিয়ে ভর্তি হবার অনুমতি দিলেন তাঁরা।

জর্জের যাত্রা শুরু হ'ল।

একক, নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় পথিকের পথযাত্রা। যাত্রা শুরু হ'ল কঠিন পর্বতময় বন্ধুর এবং দুরারোহ জ্ঞানতীর্থের পথে। আন্টি সুসান জর্জের জন্য একটা জামা ও পায়জামা তৈরি করে দিলেন তাঁর স্বামীর পরিত্যক্ত পুরণো পোশাক থেকে কাপড়ের টুকরো বের করে নিয়ে। বেঁটে খাটো দুর্বল চেহারার মানুষ জর্জের গায়ে সে পোশাকটা একটুও মানানসই হ'ল না, কেমন যেন বেশী ঢিলে আর খাপছাড়া।

তা হোক্। সেজন্য জর্জের মনে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। সেই বেমানান পোশাক পরেই জর্জ নিয়াসো শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল।

কিন্তু জর্জের বিদায়পর্ব হ'ল খুবই করুণ এবং বেদনাদায়ক। কার্ভার দম্পতিকে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখে জর্জের দুই চক্ষুও জলে ভ'রে গেল।

পথে যেতে যেতে একদল শ্বেতাঙ্গ কৃষকের সঙ্গে জর্জের প্রথম সাক্ষাৎ, তারা তো তার কিম্ভূতকিমাকার পোশাক দেখে হেসেই খুন। চোখা চোখা বিদ্রূপ-বাণে তারা জর্জকে বিদ্ধ ক'রতে লাগলো। কিন্তু জর্জের কোন দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে এসব-গ্রাহ্যই করে না। জীবনের লক্ষ্য স্থির ক'রে সে তার নব-জীবনের জয়যাত্রায় বের হয়েছে। কর্তব্য-

সিদ্ধির পথে যত দুস্তর বাধাই আসুক না কেন সে তাকে জয় ক'রে চ'লে যাবে, তার জীবনের লক্ষ্য যে আকাশের ধ্রুব-নক্ষত্রের মতো স্থির অচঞ্চল, একথা সে ভুলতে চায় না। কেউ ভোলাতে চাইলেও ভোলাতে পারবে না। তার সামনে র'য়েছে মহিমময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সাফল্যের মহাতীর্থ আর সেই পথে যাত্রী আজ সে একা—এই মন্ত্র বুকে নিয়ে জর্জ এগিয়ে চ'ললো অজানা পথে।

তার এখন চলা, শুধুই চলা। সম্মুখ পানে এগিয়ে চলা। তার এখন শুধু পথচলাতেই আনন্দ। এসব অতি তুচ্ছ ঘটনার দিকে নজর দেবার সময় কই তার? তার যে এক মুহূর্তও থামবার সময় নেই।

মহৎ আদর্শ, বিপুল আকাঙ্খা ও দুর্জয় আত্মবিশ্বাস সম্বল ক'রে জর্জ যে পথচলা আরম্ভ ক'রেছে তার শেষ কোথায় তা সে জানে না বটে, কিন্তু সে স্থির জানে মহাতীর্থের উত্তরণের পথে তার সঙ্গী কেউ নেই। তার আদর্শ, তার আকাঙ্খা, তার আত্মবিশ্বাসই তার সেই মহাযাত্রার পথের পাথেয়, অজানার অন্ধকারে দীপশিখা।

বিদায় নিয়ে চ'লে আসবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে আঙ্কেল মোজেস কার্ভার জর্জের জামার পকেটে পুরো এক ডলারের নোট ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন পথখরচের জন্য।

জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জর্জের মনে কোন মিথ্যা মোহ ছিল না। এতটুকু বয়সেই সে বাস্তবকে মেনে নেবার শক্তি অর্জন করেছে। মোজেস কার্ভার ক্ষেত-খামারের ও কৃষির কাজ জর্জ কার্ভারকে ভালোভাবেই শিখিয়েছেন এবং আন্টি সুসানের সঙ্গে সঙ্গে থেকে জর্জ কার্ভার গৃহস্থালীর কাজকর্মও সব ভালো করে শিখে নিয়েছে, যেমন বাসন মাজা, উনুন ধরানো, রান্না করা, কাপড় কাচা, মেসিনে সেলাই করা ইত্যাদি। জীবন-যুদ্ধে সংগ্রাম করে বাঁচবার এবং জয়ী হবার জন্য আবশ্যক সব হাতিয়ারই কার্ভার দম্পতি সযত্নে জর্জের হাতে তুলে দিয়েছেন।

"বেঁচে যদি থাকো, জীবনে প্রচুর কাজ করার সুযোগ পাবে জর্জ," আন্টি সুসান জর্জকে ব'লে দিলেন, "আর একটা কথা মনে রেখো, দুঃখে-কষ্টে প'ড়লে সাহস হারিয়ো না, অভিভূত হয়ো না। বীর যে সেই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করে। এমন যদি কখনো হয়, দারিদ্র্য তোমাকে গ্রাস করার জন্য মুখ বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে কিংবা বিপদ থেকে মুক্ত হবার তুমি কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছো না, তখন বিনা দ্বিধা-সঙ্কোচে চ'লে এসো আমাদের কাছে। এ বাড়ী তোমার নিজের, যখন খুসি এখানে ফিরে আসবার পূর্ণ অধিকার তোমার আছে, তুমি এ বাড়ীরই ছেলে, একথা ভুলে যেয়ো না।"

সেই ধূলিধূসরিত পথে পা রাখবার আগে জর্জ এ কথা একবারও ভাবেনি তার এই যাত্রা হবে সুদীর্ঘ কালের যাত্রা, দীর্ঘ দশবছর পরে আবার তার ফিরে দেখা হবে আঙ্কেল মোজেস ও আন্টি সুসানের সঙ্গে।

নিয়াসো শহরে গিয়ে যখন জর্জ পৌছালো তখন বিকেল আর নাই, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বেলাশেষের আলো ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হ'য়ে নেমে এসেছে। পথ চ'লতে চ'লতে জর্জ মাঝখানে এক জায়গায় বিশ্রাম নেবার সময়ে আন্টি সুসানের সযত্নে সাজিয়ে দেওয়া হাতে গড়া রুটি আর এক টুকরো শূয়োরের মাংস খেয়ে আহারের পর্ব সমাধা করে নিয়েছিল, তাই এখন আর তার ক্ষিদে পায়নি। কিছু না খেলেও এখন তার চলবে। কিন্তু যে জিনিষটা এখন তার সবচেয়ে বেশী দরকার তা হ'ল ঘুম। একটু ঘুমোতে না পারলে তার চলছে না। তাছাড়া, রাত্রির অন্ধকারও এখন ঘন হয়েছে। রাত্রে ঘুমোবার জন্য একটা জায়গা চাই।

নিয়াসো শহরের শহরতলীর পথ হেঁটে যেতে যেতে জর্জ সৌভাগ্যক্রমে সেই পথেরই ধারে এক জায়গায় একটা গোলাবাড়ী দেখতে পেলো। নির্জন জায়গা। ধারে কাছে কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। গোলা-বাড়ীর দরজা খোলা রয়েছে। জর্জ সেই গোলাবাড়ীতে প্রবেশ করার আগে একটু ইতস্তত ক'রলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা [illegible]

নির্বান্ধব এই পুরীতে প্রবেশ করা তার উচিত হবে কি না। সে জাতিতে নিগ্রো ব'লে তাকে অনেকবার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গদের হাতে লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহ্য কর্‌তে হ'য়েছে। সেই ভয় এখনো তার সঙ্গ ছাড়েনি। সেই গোলাবাড়ীর উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেই তার চোখে প'ড়লো স্তূপীকৃত ক'রে রাখা খুব উঁচু একটা খড়ের গাদা, কাছে-পিঠে সেখানেও কোথাও কোন লোকজন নাই, নীরব নিরিবিলি জায়গা। জর্জ খুঁজে পেতে একটা সিঁড়ি জোগাড় করে সেই সিঁড়ির সাহায্যে খড়ের গাদার চূড়ায় গিয়ে উঠলো, তারপর শরীরটা বেশ টান টান করে হাত-পা ছড়িয়ে তার উপরে শুয়ে পড়লো। আর শোয়া মাত্রই ঘুম। দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যেই জর্জের দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। গভীর, নিরবচ্ছিন্ন, অব্যাহত ঘুম।

রাত শেষ হ'তে তখনো অনেকটা সময় বাকী ছিল। প্রায় রাত থাকতেই জর্জের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলে চাইলো। সে যেখানে শুয়ে আছে সে জায়গাটা তার সম্পূর্ণ অজানা অচেনা। প্রথমটা সে ঠিক বুঝতে পারলো না। পরে একে একে তার সব কথাই মনে প'ড়লো। আগের দিন সকাল বেলায় সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে আঙ্কেল মোজেসের সে বাড়ী থেকে এ জায়গাটা অনেক দূরে। তাড়াহুড়ো করে জর্জ খড়ের গাদা থেকে নেমে এলো তারপর এক দৌড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

আবার সেই রাস্তা। সে এখন রাস্তার মানুষ। কিছুটা পথ হাঁটবার পরই জর্জের ভীষণ ক্ষিদে পেলো। আণ্টি সুসান যে খাবার তৈরি ক'রে সঙ্গে দিয়েছিলেন তা তো কালই ফুরিয়ে গিয়েছে, ব্রেক-ফাষ্ট করবার মতো সামান্য খাবারও তার সঙ্গে নেই। বিষণ্ণ মনে জর্জ রাস্তার পাশে জমা করা একটা স্তূপের উপরে উঠে ব'সলো।

আঃ কী চমৎকার আর লোভনীয়। জর্জ বুকভরা একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিল। সামনের বাড়ি থেকে ভাজা মাংসের মিষ্টি গন্ধ আসছে। জানালা খোলা। সেই খোলা জানালার মধ্য দিয়েই বাতাসে গন্ধটা ভেসে আসছে।

জর্জ হঠাৎ কাঠের স্তূপ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে সেই বাড়ীর বন্ধ দরজায় টোকা দিল। খর্বাকৃতি গাট্টাগোট্টা চেহারা ও তামাটে রঙের একজন স্ত্রীলোক দরজা খুলে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার অদ্ভুত আকৃতি দেখে স্ত্রীলোকটির প্রথমে বেজায় হাসি পেলো। কিন্তু হঠাৎ যেই মাত্র তিনি জর্জের মুখের দিকে তাকালেন তার হাসি কোথায় নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল। জর্জের চোখে মুখে তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় কাতর অভিব্যক্তি তাঁর চোখে পড়লো। বিগলিত করুণায় মহিলাটির সমস্ত অন্তর ভরে গেল। সন্তানের জন্য মায়ের অন্তরে যে স্নেহক্ষুধা দেখা দেয় মহিলাটি সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই স্নেহক্ষুধা অনুভব ক'রলেন। তিনি যে মা। তিনি জর্জের দুখানি হাত ধ'রে তাকে ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে তাই না? আমি বুঝতে পারছি তুমি ভয়ানক ক্ষুধার্ত। এবং এক্ষুনি তোমার গরম গরম চা ও ব্রেক-ফাষ্ট দরকার কেমন, আমার অনুমান সত্যি কিনা, বলো।"

"হ্যাঁ মহাশয়া, "জর্জ স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশী জোরের সঙ্গেই কথা কয়টি উচ্চারণ ক'রলো। "কিন্তু একটা কথা, আপনি আমাকে যে খাবার খেতে দেবেন আমি তো তার দাম দিতে পারবো না কারণ আমি কপর্দকশূন্য। আমার একটা প্রস্তাবে আপনি রাজি থাকেন তবেই আমি আপনার কাছ থেকে খাবার নিয়ে খেতে পারি। প্রস্তাবটা হ'ল এই আপনার দেওয়া খাবারের প্রতিদানে আমি আপনার কাজ ক'রে দিতে চাই।"

"আচ্ছা, সেসব কথা পরে হবে, আগে কিছু খেয়ে তো নাও বাছা," মহিলাটি স্নেহের স্বরে ব'ললেন।

খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর ক'রে নাও তবে তো কাজ করার শক্তি পাবে।

বাইরে থেকে দেখে সহজে বোঝাই যায় না কাঠখোট্টা পুরুষালি চেহারার এই মহিলাটির অন্তরে কোথাও স্নেহের কণামাত্র আছে। কৃষ্ণকায়া মহিলাটিকে দেখে প্রথমেই মনে উদিত হ'য়েছিল জর্জের আণ্টি সুসানের স্নেহবিহ্বল মূর্তিখানি আর তাঁর অজস্র স্নেহ-চুম্বনের কথা। এঁরা দুজনই এক জাতের, দুজনেই মা, দু'জনের হৃদয়ে একই স্নেহ-করুণার উৎস প্রবাহিত। এদের দু'জনকে দেখলে সর্বাগ্রে জননী ম্যাডোনার মূর্তি মানসপটে ভেসে ওঠে, মা বলে ডাকতে ইচ্ছা হয়। ভগবান এই দুজন মহিলার চোখে কাজল আর তুলি দিয়ে একই স্নেহের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছেন। দুজনেরই শ্বেতশুভ্র বসনভূষণের মধ্যে দিয়ে আপন হৃদয়ের নির্মল শুভ্রতা ফুটে বেরুচ্ছে।

মহিলাটি জর্জের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন, বললেন, আমার নাম মারিয়া ওয়াট্‌কিন্স, আমি ধাত্রীর কাজ করি।"

জর্জ ধাত্রী কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে মিসেস মারিয়া ওয়াট্‌কিন্সের মুখের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। মহিলাটি বুঝতে পেরে ব'ললেন, "আমরা এই পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি, মানুষকে পৃথিবীতে এনে বিশ্বের প্রথম আলো প্রদর্শন করানোই আমাদের কাজ। মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয় তার সেই প্রথম জন্মলগ্নে আমরাই হাত পেতে তাকে ধারণ করি, তাই আমরা ধাত্রী।" জর্জ তবুও কিন্তু কিছুই বুঝলো না, কিন্তু মুখে সে আর সে কথা প্রকাশ ক'রলো না।

মারিয়া ওয়াটকিন্সের স্বামী মিঃ অ্যাণ্ড জনসেবা-মূলক কাজ ক'রে বেড়ান এবং এখনো তেমন কোন একটা জনসেবার কাজে শহর থেকে দূরে কোথাও গিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে।

জর্জ তার নিজের জীবনবৃত্তান্ত আগাগোড়া সব মিসেস মারিয়া ওয়াটকিন্সের কাছে খুলে বললো। তাঁর মতো দরদী শ্রোতা পেয়ে জর্জের মনের দুয়ার আপনা থেকেই খুলে গেল। জর্জ ব'ললো: জানেন আণ্টি মারিয়া, আমার জীবনখাতার প্রথম পৃষ্ঠাটাই রক্তমাখা। আমার মায়ের সঙ্গে আমাকেও দস্যুরা লুট ক'রে নিয়ে গিয়েছিল তারপর মা কোথায় চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল, আর আমি মাকে জীবনে কখনো দেখতে পেলাম না! আমার মায়ের স্মৃতি আমার জীবন থেকে মুছে গেছে। শুধু আণ্টি সুসানের মুখে মায়ের কথা যেটুকু যা শুনেছি তা-ই আজ আমার একমাত্র সম্বল। মায়ের কোলছাড়া হ'য়ে আমি কিভাবে ফিরে এলাম, কিভাবে বড় হ'লাম, সেসব কথা আজ আমার ভালো ক'রে মনে পড়ে না। শুধু বড় হ'য়ে যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলাম, আমি আর আমার বড় ভাই জিম একেবারে নিরাশ্রয় হ'য়ে ভেসে যাইনি, কার্ভার দম্পতি দয়া ক'রে শুধু যে আমাদের ঠাঁই দিলেন তাই নয়, তাঁরা আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার ক'রলেন। শুধুই ঠাঁই দিলেন ব'ললে অকৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকবে না। তাঁরা মা-বাবার মতো অকৃত্রিম সন্তানস্নেহে আমাদের লালনপালন ক'রেছেন, আমাদের অন্তরে আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত ক'রে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পৃথিবীবীতে বেঁচে থাকবার উপযুক্ত ক'রে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা আমাদের মানুষের অধিকার আদায় ক'রে মন্ত্র কানে দিয়েছেন।

জর্জের মর্মন্তুদ জীবনকাহিনী শুনে মিসেস মারিয়া ওয়াটকিন্সের বুক যেন দুঃখে ফেটে গেল, তিনি ব'ললেন "তুমি আমাদের সঙ্গেই বাস করো। আমাদের সন্তান নেই, তুমি আমাদের সন্তানের অভাব পূর্ণ করো। নিয়াসোর স্কুলেই তো প'ড়বে বলে তুমি ঠিক ক'রেছ, তাই যদি হয়, আমাদের এখানে থেকেও তো তা অনায়াসে হ'তে পারে। তোমার সদ্য ছেড়ে আসা মাকে যেমন তুমি আণ্টি সুসান বলে সম্বোধন ক'রতে আমাকেও তেমনি তুমি আণ্টি মারিয়া ব'লে ডেকো। কেমন, রাজি আছো তো?"

জর্জ শুধু আশ্রয়ই পেলো না সেই সঙ্গে সে পেলো নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন-যাপনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই বিধাতা তার অদৃষ্টে এসব মিলিয়ে দিলেন। এমনি ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে জর্জ তার জীবনে তৃতীয় একজন মায়ের সান্নিধ্য লাভ ক'রলো। তার প্রথম মা তার আপন গর্ভধারিণী জননী মেরী, দ্বিতীয় মা আণ্টি সুসান যিনি প্রকৃত মাতৃস্নেহ দিয়ে তাকে লালনপালন ক'রেছেন, এবং তৃতীয় মা এই আণ্টি মারিয়া ওয়াটকিন্স। ইনিই বোধহয় জর্জের মায়েদের মধ্যে সবচেয়ে ধৈর্যশীলা এবং একটু বেশী স্নেহপরায়ণা; পরোপকার প্রবৃত্তি তাঁর জন্মগত সংস্কার। সব সময় তিনি পরোপকার করার সুযোগ খুঁজে বেড়ান। কেউ অভাবে বা অন্য কোনরকম দুঃখকষ্টে আছে খবর পেলেই তিনি তার কাছে ছুটে যান। কে কোথায় দীন দরিদ্র আতুর নিরাশ্রয় আছে তিনি খুঁজে বেড়ান। সাহায্যের ডালি নিয়ে তার দরজায় উপস্থিত হন। নিজের শেষ কপর্দক পর্যন্ত তার দুঃখমোচনে ব্যয় ক'রতে কুণ্ঠিত হন না।

মিসেস মারিয়া ওয়াটকিন্স ধাত্রীর কাজ করেন। অনেক সময়ে দূরের পল্লীগ্রাম থেকেও তার ডাক আসে। তখন শূন্য ঘরে তালা লাগিয়ে রেখে মনে একটা দুশ্চিন্তার ভার নিয়ে তাকে যেতে হয়। এখন জর্জ রইলো, যেখানে প্রয়োজন এখন থেকে তিনি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারবেন, এই বেশ ভালো ব্যবস্থা হ'ল। এতদিন পর্যন্ত কোথাও যেতে হলে মারিয়া যাবার আগে একটি মেয়ের উপরে সংসারের তদারকি করার ভার দিয়ে যেতেন, এখন থেকে আর তারও কোন দরকার হবে না। জর্জ ঘর গৃহস্থালীরও সব কাজ বেশ ভালোই ক'রতে পারে।

জর্জ আণ্টি মারিয়ার বাড়ীতে বাস ক'রে তাঁর সব কাজ ক'রে দেবার বিনিময়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করে নিয়েছে, এ কথা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু আরও বড় জিনিসও সে পেলো, সে জিনিসটা হ'ল অধ্যয়ন ও বিদ্যাশিক্ষা করার প্রচুর সুযোগ এবং পর্যাপ্ত সময়।

মিসেস মারিয়া ওয়াটকিন্সের বাড়ীর বেড়া ডিঙোলেই ভাঙাচোরা যে কাঠের বাড়ীটা নজরে পড়ে সেইটেই হ'ল নিয়াসো শহরের নিগ্রো শিশু বিদ্যাভবন। একখানা মাত্র অতি অপ্রশস্ত কামরার মধ্যে ঘেঁষাঘেষি ক'রে পাতা খান তিনচারেক শক্ত কাঠের বেঞ্চি, পঁচাত্তর জন ছাত্রের জন্য বসবার ব্যবস্থা। শিক্ষকও মাত্র একজন। শিক্ষকমশাইর নাম মিঃ ফ্রষ্ট, তার গোল টেকো মাথা দেখতে অবিকল বিলিয়ার্ড খেলবার বলের মতো, তেমনি তেলতেলে মসৃণ আর চকচকে। শিক্ষক মশাইর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া কোন উচ্চ ডিগ্রী ছিল না বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি ব'লতে যা বোঝায় তিনি তাই ছিলেন। ছাত্রদের মানিয়ে নেবার ক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল।

স্কুলটা জর্জের বেশ মনের মতো হ'ল, স্কুলের পরিবেশটাও তার ভালো লাগলো। তাই একদিনের জন্যও সে ক্লাস কামাই ক'রলো না। সপ্তাহে ছয়দিন সে স্কুলে যায়, রবিবার দিন তার বন্ধের দিন। বন্ধের দিন না বলে বরং বলা যেতে পারে রবিবার হচ্ছে তার উপাসনার দিন।

আফ্রিকান মেথডিষ্ট চার্চে যে প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান হয় জর্জ নিয়মিতভাবে তাতে যোগ দেয়। সেখানেও একটি দিনের জন্যও সে অনুপস্থিত থাকে না। গির্জার যে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে উপাসনা পরিচালনা করেন তিনি লিখতে প'ড়তে জানেন না বাইবেল পাঠ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু তাঁর অন্তরের আকুল প্রার্থনা নিশ্চয় ভগবানের চরণে গিয়ে পৌছায়। তিনি যেভাবে যতখানি দরদ দিয়ে ভগবানের মহিমা ব্যাখ্যা করেন তাই দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে তিনি জানেন ভগবানের প্রাণের কথা কেমন করে পাঠ করতে হয়"— পরিণত বয়সে জর্জ কার্ভার একদা আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। এই সৎ এবং সচ্চরিত্র ভালোমানুষ পুরোহিতের সুমিষ্ট ব্যবহারে জর্জ গভীর-ভাবে মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

আণ্টি মারিয়া এবং তাঁর স্বামী আঙ্কেল অ্যাণ্ডি দুজনেই ভগবানে বিশ্বাসী এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন।

তাঁরা সন্দেহাতীতরূপে যীশুর প্রচারিত ধর্মসঙ্গীতের এই কথাটা বিশ্বাস করতেন যে, "কৃষ্ণকায় নিগ্রো খৃষ্টানদেরও জোর গলায় কথা বলবার অধিকার আছে। গির্জায় গিয়ে তারা উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনার মন্ত্র আওড়াতেন এবং জর্জও সমানে তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধর্মসঙ্গীত গান করতো। কিন্তু রবিবারের বাকী সারাদিন মারিয়া ও তাঁর স্বামী নীরবে অতিবাহিত করতেন। আন্টি মারিয়া বলেন, "রবিবার দিনটা হচ্ছে নীরব নিরবচ্ছিন্ন উপাসনার দিন।" আন্টি মারিয়ার জীবনের এই মহৎ দৃষ্টান্ত জর্জ কার্ভার সারাজীবন অনুসরণ করেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মসাধনার মধ্যে রবিবার দিন নীরব উপাসনার অভ্যাস তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন।

নিয়াসো শহরের নিগ্রোদের স্কুলে জর্জ এসে ভর্তি হবার দিনকয়েক পরে তার দাদা জিমও এসে সেই স্কুলে ভর্তি হল।

জর্জ এবং জিম জন্ম থেকেই আমুদে স্বভাবের এবং অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয়। সবাইকে সারাক্ষণ মজার মজার কথা ব'লে মাতিয়ে রাখে। অন্যকে হুবহু অনুকরণ করে অবিকল তার মতো আচার-আচরণ করে, কথা বলে, এবং অনেক সময়ে তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও করে। ছাত্ররা তাদের কৌতুক প্রাণ ভ'রে উপভোগ করে।

জিম অবশ্য বেশীদিন জর্জের সঙ্গে নিয়াসো শহরে একসঙ্গে থাকলো না, পড়াশুনাও ক'রলো না। সে ছিল চঞ্চল প্রকৃতির। কোথাও বেশীদিন শান্তশিষ্ট হয়ে স্থিরভাবে থাকা তার ধাতে সইতো না। এমনি ভাবে একদিন ভোরে উঠে তাকে আর কেউ দেখতে পেলো না। নিয়াসো শহর ছেড়ে সে কোথায় যে উধাও হ'ল কেউ জানতে পারলো না। কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত তার কোন খবরই পাওয়া গেল না। তার ঠিকানা পর্যন্ত সে রেখে যায়নি তাই জর্জের পক্ষে তার কাছে একখানা চিঠি লেখাও সম্ভব হ'ল না। এও অবশ্য একটা কারণ, কিন্তু চিঠি লিখতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ যেটা তা হল ডাকটিকিট কিনবারও পয়সা ছিল না জর্জের কাছে।

নিয়াসো শহরের অধিবাসী বহুলোকের সঙ্গে ইতিমধ্যেই জর্জের আলাপ পরিচয় হয়েছে, এমন কি অনেকের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতাও হ'য়েছে। তার সরল অমায়িক ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ভালোবাসে। সে সকলের বাধ্য ও অনুগত। সে কখনো কারুর কথায় 'না' বলে না। পাড়া-প্রতিবেশি সকলের ফাইফরমাস খাটে, বৌ-ঝিদেরও অনেক কাজ ক'রে দেয়, আর, বাড়ীতে ফিরে এসে সে তার সব খবর আন্টি মারিয়ার কাছে সবিস্তারে গল্প করে। আর তাই নিয়ে তার কত অহংকার। কিন্তু জর্জের কথার মাঝখানে তাকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে আন্টি মারিয়া বলেন, "তোমার হামবড়া ভাব থামাও তো! সে কথা আমি দিনরাত সবসময়ে তোমার আঙ্কেল অ্যাণ্ডিকে বলি তোমাকেও সেই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। শোনো, কতোখানি বেশী কাজ ক'রেছ সেটা খুব বড় কথা নয়। বড় কথা হ'চ্ছে তোমার কাজ সুষ্ঠুভাবে এবং ত্রুটিবিচ্যুতিহীন ভাবে তুমি সম্পন্ন ক'রতে পেরেছ কিনা! আমাকে সেই কথাটা আগে বলো দেখি।

মিসেস মারিয়া ওয়াটকিন্সের এই রূঢ় সত্যভাষণ ভালো না লাগলেও বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জর্জ আন্টি মারিয়ার রূঢ় অথচ স্পষ্ট ও সত্য কথাগুলির যথার্থতা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো।

একদিন জর্জ এক জায়গা থেকে এক ডজন রাজহাঁসের ডিম সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলো এবং বাচ্চা ফোটাবার জন্যে তা'য়ে বসিয়ে দিল। যথাসময়ে বারোটা ডিম থেকেই বারোটা বাচ্চা ফুটে বের হ'ল। খাঁচা বানিয়ে যেখানটাতে রাজহাঁসের বাচ্চাগুলিকে রাখা হ'ল তারই সংলগ্ন ছিল জর্জের সব্জির উদ্যান। এই উদ্যান নিয়ে জর্জের গর্বের আর অন্ত ছিল না। ক্ষেতের শাকসব্জি যাতে হাঁসের বাচ্চাগুলি নষ্ট ক'রে ফেলতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সে উদ্যানের চারদিক ঘিরে মোটা ও মজবুত বেড়া তৈরী করে দিল।

কয়েকদিন পরে সেই বেড়ার কয়েকটা খুঁটি আলগা ও

নড়বড়ে হ'য়ে গেল এবং বেড়ার সেই বন্ধপথ দিয়ে রাজ হাঁসের বাচ্চাগুলি অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করে ফসল নষ্ট করে দিতে লাগলো। মিসেস মারিয়া উদ্যানের বেড়াটা মেরামত ক'রে দেবার জন্যে জর্জকে বহুবার তাগাদা করেছেন কিন্তু জর্জ তেমন গা করেনি, রোজই বলতো, আসছে কাল বেড়াটা আমি মেরামত করে দেবো তুমি ঠিক দেখে নিয়ো আণ্টি। কাল আমার নিশ্চয়ই সময় হবে।

কিন্তু সময় আর কখনোই হয় না।

দিনের পর দিন চ'লে যায়।

অবশেষে যেদিন সত্য সত্যই জর্জের সময় হ'ল সেদিন আর বেড়া মেরামত করার প্রয়োজন থাকলো না, ঠিক যেমন নৌকোর মাঝি জোয়ার আসবে ব'লে ক্ষণ গুণতে থাকে, কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে কখন যে জোয়ার আসে, আবার চলেও যায় এবং ফের আবার ভাটার টান শুরু হয় তা সে জানতে পারে না। জর্জেরও অবস্থা ঠিক তাই হ'ল।

একদিন হ'ল কি, জর্জদের পাড়ার কতগুলি ছেলে এসে তাকে ধ'রে ব'সলো, জর্জকে তাদের খেলায় যোগ দিতে হবে। ছেলেরা সকলেই জর্জের প্রায় সমবয়সী। জর্জের নিজেরও অবশ্য খুব যে বেশী অনিচ্ছা ছিল তা নয়। খেলার ওপর তার দারুণ লোভ, সেই গুলিখেলার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। উদ্যানের ভাঙা বেড়া যে সেইদিনেই মেরামত ক'রবে ব'লে আণ্টি মারিয়াকে সে কথা দিয়েছে তাও জর্জ বেমালুম ভুলে ব'সলো। খেলতে খেলতে হঠাৎ একসময়ে বিদ্যুৎচমকের মতো সে কথাটা মনে প'ড়তেই জর্জ উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ীর পানে ছুটলো। যখন গিয়ে বাড়ীতে পৌছলো, দেখলো তার সাধের সব্জির উদ্যান লণ্ডভণ্ড, ডালপালা ভেঙে ছত্রকার। হাঁসের বাচ্চাগুলি আর কিছু বাকী রাখেনি, সব শাকসব্জি নিঃশেষ ক'রে মুড়িয়ে খেয়েছে। সমগ্র উদ্যানের কেমন যেন হতশ্রী লক্ষ্মীছাড়া চেহারা।

জর্জের ভীষণ কান্না পেলো। রাগে দুঃখে দিশেহারা হ'য়ে সে হাঁসগুলির পিছনে ছুটলো তাদের শাস্তি দেবে ব'লে। কিন্তু তারা ততক্ষণে পালিয়েছে এবং সাঁতার কেটে পুকুরের মাঝবরাবর চ'লে গিয়েছে।

পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে জর্জ ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাঁসগুগুলিকে তাড়াতে লাগলো। হাঁসগুলি পারের কাছাকাছি, নাগালের মধ্যে এসেছে ব'লে জর্জের যখন মনে হ'ল সে জলে নেমে তাদের ধ'রবার চেষ্টা ক'রলো। কিন্তু ধ'রতে তো পারলোই না, নিজেই পা পিছলে পুকুরে প'ড়লো। নাকানি-চোবানির একশেষ! সারা শরীর এবং জামাকাপড় জলে কাদায় মাখামাখি হ'য়ে তার এক কিম্ভুতকিমাকার চেহারা হ'ল।

জর্জ জামাকাপড়ে কাদা মাখামাখি হ'য়ে সেই ভাবে বাড়ী ফিরে এলো। তার সারা শরীর বেয়ে জল গড়িয়ে প'ড়ছে। রাগে দুঃখে আর লজ্জায় জর্জের মুখের চেহারা হ'য়ে উঠেছে অত্যন্ত করুণ, দেখলে মায়া হয়। আণ্টি মারিয়া তাই আর জর্জকে কোন শাস্তি দেবার কথা ভাবতে পারলেন না। এমনিতেই তার শাস্তির একশেষ হ'য়েছে। তিনি শুধু একটু ধমকের সুরে ব'ললেন, "আশা করি, এবার তোমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে। যাও এক্ষুনি গিয়ে জামাকাপড়-গুলি ধুয়ে ফেল, তারপর সেগুলিকে ভালো করে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিয়ে ইস্ত্রি ক'রে নাও। আর একটা কথা, আবার সময় করে উদ্যানটা ফের নতুন ক'রে তৈরি করতে পারো কিনা চেষ্টা ক'রে দেখ।"

পরদিন ভোরবেলায় প্রাতরাশের টেবিলে গিয়ে দেখলো জর্জ, লবণজাড়িত শূয়োরের মাংস আর ভাজা ডিম প্লেটে ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দেখে লজ্জায় জর্জের মুখ আপেলের মত রাঙা হ'য়ে উঠলো, কুণ্ঠিত স্বরে সে ব'ললো, "আণ্টি মারিয়া, তোমার সব উপদেশ আমি মনে রেখেছি, কিছুই ভুলিনি। আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রতে চেষ্টা ক'রবো। এই যে তুমি আজ এতো খাদ্যদ্রব্য তৈরি ক'রেছ, কতো কঠোর পরিশ্রম কতো কাজ তুমি সারা দিন ধ'রে করো আমি তা অন্তরে অন্তরে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করি,

এবং তুমি বিশ্বাস করো. আমিও তোমার আদর্শ অনুসরণ ক'রে চ'লতে চেষ্টা ক'রবো।"

"হ্যাঁ "মিসেস মারিয়া ওয়াটকিন্স হেসে উত্তর দিলেন."আরো একটা কথা তোমায় বলি, হাঁসগুলিকে তা'য় বসাবার আগে তোমার সব্জির উদ্যানের ভাঙা বেড়াটা মেরামত ক'রে নিয়ো।"

(ছয়)

জর্জের বড় ভাই জিম স্বভাবের দিক দিয়ে একটু বেশী অস্থির, বেশী চঞ্চল, তার সে অস্থিরতা আত্মিক চেতনার এক স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। তার স্বভাবের গভীরে কে যেন লুকিয়ে ব'সে থেকে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, কিছুতেই তাকে স্থির থাকতে দেয় না। জিম তার এই সদা-অস্থির প্রকৃতির জন্যেই যেন অনেকটা বন্ধনমুক্ত, স্নেহ-ভালোবাসা তাকে কোথাও বেশীদিন আকর্ষণ ক'রে রাখতে পারে না। জর্জ এতটা বন্ধনমুক্ত নয়, একটু আদর একটু স্নেহ পেলে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু জিম তা নয়, যে জগৎকে সে বুঝতে পারে না, উপলব্ধি ক'রতে পারে না সেই গভীর রহস্যাবৃত অপরিচিত জগতের অন্ধকারে পথহারা পথিক যেন একজন সে, মাত্র তের বছর বয়সেই একটা কথা সে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে, নিয়াসো স্কুল তাকে আর কিছুই দিতে পারবেনা, তারও আর এখান থেকে কিছু গ্রহণ ক'রবার নেই। এই স্কুল থেকে তার যতটুকু শেখবার ছিল সে তা শিখে নিয়েছে। তার আরো জ্ঞান চাই, আরো আলো চাই, সেই জ্ঞান এবং আলোর সন্ধানে তাকে এখনো অনেকটা পথ খুঁজে খুঁজে চলতে হবে অন্ধকারের মধ্যে আবার নতুন আলোর দেখা পেতে হবে।

কিছুদিন পরে জর্জ একটা খবর পেলো, কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের উচ্চ শিক্ষা দেবার জন্য কান্সাসে একটা ভালো স্কুল আছে। আর ঠিক সেই সময়েই একটি পরিবারের নিয়াসো শহর থেকে ফোর্ট স্কট অভিমুখে যাত্রা করার কথা সে শুনতে পেলো। তাদের সঙ্গে সেও যেতে পারে কিনা একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি। মনে মনে সঙ্কল্প স্থির ক'রে জর্জ সেই পরিবারের কর্তা ব্যক্তির সঙ্গে দেখা ক'রলো। তিনি প্রথমটায় কিছুতেই রাজি হ'তে চাচ্ছিলেন না। পরে অবশ্য জর্জ অনেক অনুনয়-বিনয় করবার পরে তিনি আর জর্জকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, তার প্রস্তাবে তাঁকে সম্মত হ'তে হলো।

কিন্তু জর্জের বাধা এলো অন্যদিক থেকে। আণ্টি মরিয়া এবং অঙ্কেল অ্যাণ্ডি তাকে গভীরভাবে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে ফেলেছিলেন, জর্জও তাদের দুজনকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল। সেই বন্ধন ছিন্ন করা এখন কারুর পক্ষেই আর সহজ নয়। কিন্তু কোনই উপায় নেই। যেতে জর্জকে হবেই। তার সামনে জীবনের সুদীর্ঘ পথ পড়ে আছে, সেই পথ তাকে অতিক্রম ক'রতে হবে বড় হ'তে হবে, মানুষ হ'তে হবে। এবং শুধু নিজের জীবনের উন্নতিই তার কাম্য নয়, আরো যে লক্ষ অগণিত কৃষ্ণকায় নিগ্রো দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে পশুর মতো জীবন কাটাতে বাধ্য হ'চ্ছে তাদেরও সকলকে মুক্ত ক'রতে হবে। জীবনের সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই জর্জের চ'লে যেতে হবে, তাই মারিয়া দম্পতির স্নেহের বন্ধন ছিন্ন না ক'রে তার আজ দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। জ্ঞানের সন্ধানে, মুক্তির অন্বেষণে যে যাত্রা সে শুরু ক'রেছে তা তাকে সার্থক ক'রতেই হবে। এখানে, এই মাঝপথে থামলে চ'লবে না। তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছোতে হ'লে বারে বারে এই ভাবে তাকে প্রিয় পরিজনদের ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে অজানা ভবিষ্যতের দিকে।

তার পর ?

তারপর আর এক নতুন শহর নতুন পরিবেশ নতুন বন্ধুবান্ধব অপরিচিত অজস্র মানুষের ভিড়। সুখ দুঃখ, হিংসা ভালোবাসা, আনন্দ আতঙ্কে-মেশা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ। এই নিয়েই তো মানুষের জীবন। তারপরে...আলোকের রাজ্যে উত্তরণের উদ্দেশ্যে বন্ধুর দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ ধ'রে আবার নতুন ক'রে যাত্রা শুরু—

"এসেছে আদেশ—
যাত্রা কর যাত্রীদল।
বন্দরের কাল হল শেষ।"

ক্রমশঃ-

লক্ষ্মী ঃ রামানুজের ধর্ম্মতত্ত্বে

রমেশকুমার বিল্লোরে

অনুবাদক—সত্যকাম সেনগুপ্ত ও চিন্ময়ী বসু

প্রাচীন এবং তৎপরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শিল্পে-সাহিত্যে লক্ষ্মীর উপস্থাপনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সবিস্তারে আলোচনা করে গেছেন। (১ ধন-জ্ঞান, বিত্ত-সৌভাগ্য, সদ্‌গুণ-সৌন্দর্য্য, যশ-শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি নানা সুফলদায়ক গুণের দেবীরূপে লক্ষ্মীকে কল্পনা করার প্রথা সুপ্রচলিত। ব্রহ্মসূত্রের বিখ্যাত টীকা শ্রীভাষ্যের রচয়িতা শ্রীরামানুজাচার্য্যের (খ্রীষ্টীয় ১১শ—১২শ শতক) অনুগামীদের নিকটে লক্ষ্মী যে বিশেষরূপে পরিচিতা, তাই এ নিবন্ধের মূল উপজীব্য।

রামনুজের ধর্মমত শ্রীবৈষ্ণববাদ নামে খ্যাত। এই ধর্মে গুরু বা দীক্ষাদাতা ভক্তের অধ্যাত্মিক সাধনায় এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। আদর্শ গুরু বা আচার্যকে হতে হবে 'নিরহঙ্কারী', পর-'সমৃদ্ধিপ্রিয়' (অর্থাৎ, অপরের অধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি যত্নবান), এবং যশ বা বিত্তের মোহমুক্ত বা 'খ্যাতি-লাভ-নিরপেক্ষণম্'। গুরু একান্তই স্নেহবান্, এবং শিষ্যের ভগবদ্‌প্রাপ্তির পথ সুগম করার সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করেন। ২

এই 'গুরু'গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন লক্ষ্মী (ধর্মতত্ত্বানুসারে বিষ্ণুর ভার্যা বলে বর্ণিত)। তিনি ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে বিরাজিত, এবং তিনি ভক্তের প্রতি ভগবানের কৃপা বর্ষণ করে থাকেন। লক্ষ্মী অতীব মমতাময়ী। মাতা সদাই মাতৃস্নেহে অভিভূত হয়ে সন্তানের শত দোষক্ষালণে তৎপর। তাই লক্ষ্মী স্নেহময়ী মাতার সঙ্গে তুলনীয়।

রামানুজের মতে ভগবৎ কৃপালাভের পথে শ্রীর (লক্ষ্মীর) এই মধ্যস্থের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ববর্তী 'পঞ্চরত্ন' এবং 'নারায়ণ-বিষ্ণু' থেকে মূল আহরণকারী এই বৈষ্ণববাদ শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে এভাবে গুরুত্বদান করা হয়েছে; ফলে সঙ্গতভাবেই এই ধর্মমতের নামকরণ করা হয়েছে শ্রীবৈষ্ণববাদ। ৩

রামানুজের ধর্মতত্ত্বে লক্ষ্মীর এই বিশিষ্ট ভূমিকা-গ্রহণ সত্যই অনন্যসাধারণ। পূর্ববর্তী যুগের ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, অথবা জৈন—কোনও সাহিত্যেই দেবী লক্ষ্মীকে এরূপ ভূমিকায় কল্পনা করার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৪

১। গোপীনাথ রাওয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ Elements of Hindu Iconography (Vol, I part II) পৃঃ ৩৭২-৩৭৫ এবং জে. এন. ব্যানার্জীর Development of Hindu Iconography পৃষ্ঠা-৩৭০-৩৭৬ ছাড়াও উল্লেখ্য Foreigners in Ancient India and Laksmi and Saraswati in Art and Literature (সম্পাদনা ডি. সি. সরকার : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৭০) পৃঃ ১৫৮-১৬২

২। এস. শ্রীনিবাসাচার ও আয়েঙ্গার, Illustrated Weekly of India, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃঃ ১১-১২।

৩। „

৪। ব্যানার্জী, জে. এন., পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম, পৃঃ ৬০।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদঃ পরিমল গোস্বামী)

[১৮৮৬ সনে ত্রৈলোক্যনাথ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় হস্তশিল্প প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে ইংল্যাণ্ডে যান। সেই উপলক্ষে তিনি A Visit to Europe নামক ৪০০ পৃষ্ঠার একখানি অতি মূল্যবান বই লেখেন। অনুবাদের কিছু অংশ অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাসীতে সমগ্র অনুবাদটি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।]

প্রথম অধ্যায়

১৮৮৬ সনের ১২ই মার্চ তারিখ 'নেপাল' নামক জাহাজখানা বম্বে হইতে ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিল। সেদিনের সেই বসন্ত সন্ধ্যায় 'নেপাল' বেশ একটা গর্বিত ভঙ্গিতে ভারত সমুদ্র পাড়ি দিয়া এডেন বন্দরের দিকে চলিতেছিল, এবং সেদিন জাহাজখানা যতগুলি হিন্দুর মিলিত হৃৎস্পন্দন অনুভব করিয়াছিল এমন আর কখনও কোনও ডাকবাহী জাহাজ করে নাই। তাহার গর্ব অহেতুক ছিল না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৃহৎ পরিণাম সার্থক করিয়া তুলিতে ইংল্যাণ্ডের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাহা সে পালন করিয়াছে এই বাষ্পপোতের সাহায্যেই। সে তাহার সুবৃহৎ ভারত সাম্রাজ্যের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া বহু ভারত-সন্তানকে জাতিভেদের বাধা ভাঙিয়া সংস্কার ও আচার সমূহের উর্ধ্বে উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে বর্তমান সভ্যতার একেবারে উৎসমুখে আনিয়া নূতন শিক্ষা ও জ্ঞানালোক গ্রহণ করিতে উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছে। জাহাজে কত জাতীয় মানুষ! স্ত্রী, ভগিনী ও শিশুসন্তানসহ এক দীর্ঘদেহ লাহোরের পঞ্জাবী, দিল্লীর দুইজন হিন্দু বণিক, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক লালা, আলিগড়ের জনৈক মুসলমান, দুইজন বাঙালী ব্রাহ্মণ, ওড়িস্যার এক কায়েথ, গোয়াবাসী দুইজন খ্রীষ্টান—সবাই চলিয়াছেন ভারত ভাগ্য নিয়ন্তার দেশে, যদিও প্রত্যেকের লক্ষ্য পৃথক। ভারতের অনেকগুলি জাতিরই প্রতিনিধি সেদিন নেপালের ডেকে আসিয়া সমবেত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা সবাই দেখিতে লাগিলেন—ভারত সমুদ্রের জলরাশি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সবুজাভ বর্ণ হারাইয়া নীলে রূপান্তরিত হইতেছে, ক্রমে তাঁহাদের জন্মভূমি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে, মহালক্ষ্মী পাহাড়ে আছাড়-খাওয়া ঢেউগুলির শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সূর্য তাহার দিনের কর্তব্য শেষে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ক্রমে সে তাহার অধঃস্থিত জগতে চোখধাধানো আলোকপাত বন্ধ করিয়া দিল, তাহার বৃত্ত-দেহটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল,

ক্রমে তাহার তেজ মন্দ হইয়া আসিল এবং অবশেষে রক্তরাঙা আভরণ পরিয়া পশ্চিম আকাশ গাঢ় রক্তিমার অপরূপ মহিমায় রঞ্জিত করিয়া দূর দিগন্তের নীল তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। তার পর সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল, পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল, ক্রমে বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে ঢেউয়ের দোলায় জাহাজের দোলনের সঙ্গে নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব দুলিতে লাগিল। তীরভূমি এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কোলাবা আলোক-স্তম্ভের ঘূর্ণমান শীর্ষ হইতে আলোর ঝলকানি দেখা যাইতেছে, তাহার সাহায্যে দূরের নাবিকেরা অ্যাপোলো-বন্দরের পথ চিনিয়া লইতেছে। আমরা সবাই এখন একসঙ্গে ডেকের উপর সমবেত হইয়া, আমাদের সম্মুখে এখন যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া আছি। অন্ধকার যত গাঢ় হইতেছে, ততই অনুপ্রভা বিশিষ্ট (ফস্‌ফোরিক) তরঙ্গের শাদা ফেনা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই আলো ঝলমল তরঙ্গসমূহ আমাদের জাহাজের গায়ে অবিরাম আঘাত হানিতেছে! আমরা দেখিতেছি আর নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছি। আলাপের বিষয় কে কত দূর যাইবে, সমুদ্রযাত্রার বিপদ কি কি, সামুদ্রিক-পীড়ার দুঃখ, ইত্যাদি যখন যাহা আমাদের অনভিজ্ঞ মনে আসিতেছে, তাহা। ভারতীয় মহিলাগণ তাঁহাদের স্বাভাবসিদ্ধ লাজুকতা ও শিশুসুলভ স্বভাব লইয়া এক কোণে জড়ো সড়ো হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা আমাদের চারিদিকে সীমাহীন সমুদ্র বিস্তারের দৃশ্যে কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা দোলন অনুভব করিতেছেন।

ভারতীয়দের পরস্পর পরিচিত হইতে বিলম্ব হয় না। আমাদের সামাজিক অভ্যাস এমন যে আমরা পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারি না। আমরা আমাদের সুখ দুঃখ আমাদের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করিয়া লই। অপরিচিতের নাম, জাতি, কি করা হয়, কোথায় নিবাস, কোথায় যাইবেন, উপলক্ষ কি, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা আমাদের বিবেচনায় অশিষ্টতা নহে। এক ভারতীয় অন্য ভারতীয়কে, দেখা হইতেই, "এই যে ভাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" এই প্রশ্নটাই প্রথমে করে—উভয়ে একই দিকের পথিক হইলে। আবার এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে ঠগেরাও তাহাদের দুষ্কার্য চালাইবার সুবিধা পায়, এবং এইভাবেই চোরেরাও সরলমতি লোকদিগকে ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া থাকে।

যাহা হউক জাহাজের বুকে, আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা অল্পসংখ্যক ভারতীয় পরস্পর সেই অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত মানুষদের মধ্যে যতটা সম্ভব পরিচিত হইলাম।

যাত্রীবাহী জাহাজের চরিত্র আমাদের অনেক যাত্রীরই জানা ছিল না। ইহাকে নানা বিলাস সমগ্রী ও ভোগ্য সম্বলিত একখানি প্রকাণ্ড ধনীগৃহের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমে ডেকের কথা ধরা যাউক। ডেক সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট কাঠের তক্তার পাটাতন, এবং তাহা দীর্ঘ রবারের নলের সাহায্যে প্রবল জলের ধারায় ধুইয়া পরিষ্কার করিবার পূর্বে প্রতিদিন সকালে বালি ও নারিকেলের ছোবড়ার সাহায্যে ঘষিয়া দেওয়া হয়। মাঝখানে কাটা দুটি ভাগে ভাগকরা নারিকেলের মালাসমেত ছোবড়া ব্যবহার করা হয় এই কাজে। যাত্রীরা এখানে দুই পাশের দীর্ঘ খোলা পথে যাতায়াত করিয়া ভ্রমণ ব্যায়াম করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। অথবা ইচ্ছা হইলে ক্যানভাসে আবৃত স্থানে বাসিয়া দাবা অথবা ঐ জাতীয় কোনো বৈঠকি খেলা খেলা যাইতে পারে। সব আয়োজনই সেখানে উপস্থিত। কোনও কোনও জাহাজে ধূমপানের জন্য পৃথকভাবে সজ্জিত কক্ষ অছে। যখন সমুদ্রের দৃশ্য, উড়ন্ত মাছ ও অন্যান্য দর্শনীয়তে আর ততটা আকর্ষণ থাকে না, প্রথম দর্শনের উল্লাস কাটিয়া যায়, তখন দীর্ঘ সময়ের একটানা একঘেয়েমির ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে অনেকে এই কক্ষে আসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। আবহাওয়া অনুকূল থাকিলে মাঝে মাঝে ডেকের উপর পিয়ানো টানিয়া আনিয়া

কোনো মহিলা বাজনার সাহায্যে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। নিচে দুটি দীর্ঘ সারিতে জাহাজের দুই পাশে ক্যাবিন, প্রত্যেক ক্যাবিনে দুই তিন অথবা বেশি সংখ্যক বার্থ বা ঘুমাইবার স্থান আছে। তবে অধিকাংশ যাত্রীই সমস্তটা দিন ডেকে কাটায়, অনেকে আবার রাত্রিও কাটায়, অবশ্য যদি যদি ঠাণ্ডা না থাকে। অনেক জাহাজে ডাইনিং স্যালুন দুই সারি ক্যাবিনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত, আবার কোথাও একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত চওড়া দিকের সবটাই ডাইনিং স্যালুনরূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে খাওয়া শেষ হইলে স্থানটি বসিবার জন্য অথবা লেখাপড়া করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করিয়া উপরের ডেক যদি প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা গুমোট গরমে থাকিবার অযোগ্য হইয়া উঠে, তখন।

লোহিত সমুদ্রে অনেকের সর্দি-গর্মি হয়, কিন্তু তার কারণ অতিভোজন, এমন অনুমান করা হইয়াছে। সকালের চায়ের সময় ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে। প্রাতরাশ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে। লাঞ্চ ১টা হইতে ২টার মধ্যে। ডিনার ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে। ইহাই দৈনিক আহারের সময় তালিকা। সকাল ও বিকালের চা ব্যতীত অন্য সময়ের আহার বেশ পুষ্টিকর ও সারবান, এবং পদেও বহুবিধ। অবশ্য অধিকাংশ ডিশেরই প্রধান উপকরণ মাংস। রুটি, ভাত, আলু ও শাকসব্জীর, প্রচুর পরিবেশন। সুতরাং নিরামিষভোজীর অসুবিধা নাই কিছু। ইচ্ছা হইলে হিন্দু জাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে পৃথক রান্না করিয়া। উনুন এবং পাত্রের ব্যবস্থাও আবশ্যই জাহাজের কর্মীরা করিয়া দিবে। এই জাতীয় যাত্রী-জাহাজে ছোটখাটো একটি লাইব্রেরি থাকে, সামান্য কিছু খরচ করিয়া বই পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন কোন জাহাজে আবার 'লেডীজ রুম' থাকে, যাহারা ধূমপান করে না তাহারা সেখানে গিয়া বসিতে পারে, পিয়ানো সেই কক্ষেই থাকে। সুতরাং একটি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী জাহাজ, কার্যত, সুসজ্জিত নানা বিলাসদ্রব্যে পূর্ণ এবং সভ্যজীবনের যাবতীয় উপভোগ্য আয়োজন পূর্ণ একটি প্রাসাদ বিশেষ।

জাহাজের দিনগুলিতে আর কোন বৈচিত্র্য নাই, সুতরাং উল্লেখযোগ্যও বিশেষ কিছু নাই। আমরা সব সময়েই ঘন নীল জলের বিরাট এক চক্রাকার বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করিয়াছি, তাহার পরিধি-রেখায় সমস্ত নীল আকাশখানি নত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে— যেন অতি বিরাট এবং উত্তাল এক কটাহ উল্টা হইয়া সমুদ্রকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই, মাঝে সাঝে দেখা যায় শাদা রঙের সামুদ্রিক চিল সহজে সমুদ্রের উপর নামিয়া বসিতেছে এবং ঢেউয়ের ওঠানামার সঙ্গে ওঠানামা করিতেছে। জাহাজ তাহার কাছে অগ্রসর হইলে আকাশে উড়িয়া কখনও জাহাজের এপাশে কখনও ওপাশে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শিকারপ্রিয় যাত্রী ক্যাবিনে ছুটিয়া বন্দুক লইয়া আসিতে না আসিতে, জাহাজ পর্যবেক্ষণ শেষ করিয়া সে অন্যদিকে চলিয়া যাইতেছে। শিকারী দেখিতে পায় শুধু বহু দূরে একটি শ্বেতবিন্দু শাদা ঢেউয়ের ফেনার মধ্যে কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে উড়ন্ত মাছের ঝাঁক হঠাৎ জলথেকে কয়েক ফুট উঁচুতে উঠিয়া কে কতদূরে উড়িয়া যাইতে পারে তাহার পাল্লা চালায়। চলার পথে অনেকগুলি হার মানিয়া জলে পড়িয়া যায়, শেষ পর্যন্ত দুই তিনটি টিকিয়া থাকে, কিন্তু তাহারাও ক্লান্ত হইয়া হারিয়া যায়, একটি মাত্র শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে এবং তাহারও দৌড় শেষ হয়। কখনও হয় তো দিনের শেষে সেদিনের ঘটনা ডায়ারিতে লিখিতে বসিয়াছি এমন সময় দূরাগত অন্য জাহাজের আবির্ভাব ঘোষণা করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, আমরা ডায়ারি লেখা ফেলিয়া ডেকে ছুটিয়া আসিলাম। ডায়ারি আমরা অবশ্য প্রথম কয়েকদিন মাত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমেই অলসতাবশত বাকি পড়াতে শেষে লেখা ছাড়িয়া দিলাম। ডেকে ছুটিয়া আসিয়া কোথায় দূর জাহাজের চিহ্ন সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। কেহ কেহ চোখে দূরবীণ লাগাইয়া দূরের কালো বিন্দু দেখিতে

লাগিল। ক্রমে তাহার আকার বৃদ্ধি পাইয়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সেই জাহাজ ও আমাদের জাহাজের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় হইল, জাহাজের নাম ও গন্তব্যস্থল আমাদের জানা হইয়া গেল।

এইভাবে দিন কাটিবার পর, বম্বাই ছাড়িবার ছয় দিন পরে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এডেন বন্দরের রুক্ষ পাহাড়-গুলি প্রকাশিত হইল। চারিদিকে সবুজের মধ্যে বাস করিয়া অভ্যস্ত চোখে এই উলঙ্গ খাড়া পাহাড়গুলি অত্যন্ত প্রাণহীন এবং মরুভূমিতুল্য বোধ হইতে লাগিল। এগুলি আগ্নেয়গিরি-জাত পাহাড়। সূর্য মাথার উপর উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ইহাদের গলিত লাভায় গঠিত অঙ্গ ব্রাউন, ধূসর, ঘন সবুজ প্রভৃতি বর্ণ প্রতিফলিত করিতে লাগিল। এই-সব পাহাড়ে অগ্ন্যুৎপাতের পরে যে-সব গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার উপর এডেন শহর। এটি অ্যারাবিয়া ফেলিক্স-এর অন্তর্ভুক্ত ইয়েমেনের দক্ষিণ উপকূলে ছোট্ট এডেন উপদ্বীপের অংশ। আমাদের জাহাজ ক্রমে অগভীর জলে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং বন্দরের কাছে আসিবার সময় জল ঘোলাটে হইয়া উঠিল। নোঙ্গর ফেলামাত্র ছোট ছোট নৌকা ও ক্যানু তীরভূমি হইতে আসিয়া আমাদের প্রায় ঘিরিয়া ধরিল। ছোট ছোট কৃষ্ণকায় বালক নৌকা হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া "আমি ডুবছি" "আমি ডুবছি" বলিয়া অবিরাম চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার অর্থ, কেহ যদি দয়া করিয়া একটি দুআনি জলে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা ডুবিয়া তাহা তুলিয়া লইবে। এ বিষয়ে তাহারা একেবারে পাকা ওস্তাদ। ডেকের দশ ফুট উচ্চতা হইতে একটি দুআনি ফেলিবা মাত্র তাহারা উহা জলের ভিতর হইতে কুড়াইয়া লইবার জন্য ডুব মারিবে। জল স্বচ্ছ, মাটি পর্যন্ত দেখিতে কষ্ট হয় না, উহারা দুআনিটি ফেলিবামাত্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া ডুবিতে থাকে, এবং মাটিতে পৌঁছিবার আগেই তাহা ধরিয়া ফেলে। ইহারা অধিকাংশই আফ্রিকার সন্তান। সোমালি উপকূল হইতে যাহারা কিছু রোজ-গারের আশায় আসিয়া থকে ইহারা তাহাদেরই বংশধর। তাহারা এডেনে আসিয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং কিছু রোজগার হইলে স্ত্রী সন্তানাদি ফেলিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। মায়েরা তখন আবার নতুন আগন্তুকের আশ্রয়ে যায়। এরাও সেই একই স্থানের বাসিন্দা। তাদের ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা, চুরি অথবা "ডাইভিং" দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। অন্য মুসলমানেরা তাহাদের পুরুষদের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, সোমালিরা তাহাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অদ্ভুত রীতি কয়েকটি আরব উপজাতির মধ্যেও প্রচলিত। আমাদের জাহাজে অনেক ইহুদি ও আরব উটপাখীর পালক ও ডিম বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এডেন হইয়া যে-সব যাত্রী যাতায়াত করে তাহারা এই পালক প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া থাকে, স্ত্রীলোকের টুপির শোভাবর্ধনের জন্য এই পালক দরকার হয়। প্রধানত এই পালকগুলি সোমালি উপকূল হইতে আনা হইয়া থাকে। খুচরা বিক্রয়ের জন্য চারিটি করিয়া পালকের এক-একটি গোছা বাঁধা হয় এবং সর্বোৎকৃষ্টগুলি কুড়ি হইতে ত্রিশ টাকা দামে বিক্রয় হইয়া যায়। কালো পালক পছন্দসই নহে, তাহার দাম এক টাকা হইতে আট টাকা। আফ্রিকায় উটপাখী শিকার করা হয় স্ত্রীপাখীর সাহায্যে। শিকারী তাহার পাখার আড়ালে থাকিয়া স্ত্রীপাখীটাকে বন্য উটপাখীর দিকে চালাইয়া লইয়া যায়, এবং যথেষ্ট কাছে আসিলে বিষাক্ত তীরের সাহায্যে তাহাকে মারিয়া ফেলে।

এডেনে আমরা জাহাজ হইতে তীরে নামিলাম, নামিবার পরে স্থানটিকে আরও বেশি নির্জীব বলিয়া বোধ হইল। নাবিকদের মধ্যে একটি কৌতুক প্রচলিত আছে যে, এডেনের কোনো গাছের পাতা ছেঁড়া অথবা কোন গাছের ক্ষতি করা চরম অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এটি হাসির ব্যাপার এই কারণে যে, এডেনে কোন গাছই নাই। ছোট ছোট গুল্ম কিছু কিছু দেখিয়াছি, কিন্তু শুষ্ক আবহাওয়া সেলিউলার টিস্যু বা কোষকলা

কমাইয়া ছোট ছোট কাঁটা গাছ উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে। আরবদের শহর এখান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে, সেই শহর পাহাড়-ঘেরা, সেখানে ছোট-খাটো একটি বাগান আছে, কিন্তু সেখানে একটিও বড় গাছ নাই। যে সব উদ্ভিদ ভারতবর্ষে বনস্পতিতে পরিণত হয়, এডেনে তাহা গুল্মের অপেক্ষা বড় হইতে পারে নাই। এই বাগানে দেখিলাম আমাদের বক ফুলের গাছ (Sesbania grandiflora, Pers.), তাহাতে ফুলও ফুটিয়াছে কিন্তু গাছটি পাঁচ ফুট দীর্ঘও নহে। এডেনের সর্বাপেক্ষা মনোহর জিনিস জলাধারগুলি। এডেন বন্দরের পত্তনের সময় হইতে জল যোগানের প্রশ্নটি সব সময়ে কঠিন মনে হইয়াছে, এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে নানা চেষ্টাই হইয়াছে। বৃষ্টি যাহা হয় তাহা নিতান্তই তুচ্ছ, সমস্ত বৎসরে মাত্র তিন হইতে চারি ইঞ্চি। বহু পূর্ব হইতেই এই সামান্য বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইয়াছে। এবং তাহা শুধু এডেনের জন্য নহে, আরবের সকল অংশের জন্যই। ২৫০০ বৎসর পূর্বে মারেব-বাঁধ এই উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হইয়াছিল। এরকম পঞ্চাশটির বেশি জলাধার রহিয়াছে, কিন্তু মেরামতের অভাবে তাহাদের মধ্যে মাত্র তেরটি ভিন্ন অন্য সমস্তগুলিই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। যে তেরটি ব্যবহার্য আছে সেগুলি লাহেজের সুলতানের সহযোগিতায় ব্রিটিশ সরকার নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। এই জলাধারগুলি হইতে লোকেদের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল প্রতি ১০০ গ্যালন এক টাকা হিসাবে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু এই জল পানের উপযোগী নহে। সম্প্রতি সমুদ্রের লোনা জল পাতিত করিয়া তাহা হইতে বিশুদ্ধ পানীয় প্রস্তুত করিবার জন্য সরকার এবং প্রাইভেট কম্পানি উভয়েই কয়েকটি কনডেন্সার স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে বাষ্প শীতলীকৃত হইয়া জলে পরিণত হয়। এডেনের বাজার ভারতের কোনও বাজার হইতে ভিন্ন নহে—সেই একই অপরিচ্ছন্নতা—একই অনিয়ম এখানেও। কিন্তু ইংরেজ যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই সঙ্গে আনিয়াছে বাণিজ্য শান্তি এবং সমৃদ্ধি। পূর্বতন অত্যাচারী স্বভাবের শাসনকর্তাদের ব্যবহারে এবং গত শতকের অবিরাম ক্ষমতার লড়াইয়ের দরুন এডেনে তাহার প্রাচীন বাণিজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহার সেই বিনষ্ট বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছে। আমরা এখানে অনেক কফি-হাউস দেখিলাম, সেখানে আরব ও সোমালিরা দিবারাত্র কফি পান করিতেছে। মহম্মদের সময় হইতে সুরা অথবা সুরাজাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ হওয়াতে আরবগণ অন্য বিকল্প উত্তেজকের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কফি তাহাদেরই আবিষ্কার। অন্য একটির নাম 'কাথ'—কাথা নামক একটি উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত। ইয়েমেনের পাহাড়ে ইহার জন্ম। আরবরা ইহা হইতে প্রস্তুত নেশার দ্রব্য চিবাইয়া খায়—খুব আনন্দদায়ক উত্তেজক এটি। এক সময়ে কথা উঠিয়াছিল, কফি ও কাথও তাহাদের খাওয়া উচিত কি না, কারণ পবিত্র কোরানের নির্দেশ "সুরা বা যে কোনও নেশার দ্রব্য ব্যবহার করিও না।" লব্ধপ্রতিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞগণ এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু দিন ধরিয়া বিতর্ক চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া দিলেন ফকরউদ্দীন মাক্কি ও অন্যান্য শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতাগণ। ফলে আজ কফি ও কাথ ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুদের বিস্ময়কর সব ক্রিয়াকলাপ বা কীর্তি আবিষ্কারের জন্য আমার দেশের যাঁহারা কল্পনার বিস্তারে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুনিয়া খুশি হইবেন, ইবন এল মোজাহির নামক জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন, এডেন, দশশির নামক দানবরাজ কর্তৃক "আন্দামান" রূপে ব্যবহৃত হইত। দশশির অর্থাৎ দশ মাথাওয়ালা রাবণ। এই রাবণ যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের এডেনে নির্বাসনে পাঠাইত। কথিত আছে, এডেনের পাহাড়গুলির মধ্যে কোথাও

একটি কূপ আছে, তাহার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের উপযুক্ত একটি সুরঙ্গ-পথ আছে। এই সুরঙ্গ-পথ সম্পর্কে উক্ত ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "মহম্মদ বিন মাসুদের পিতা মুবারক ইল শারোনি মৌলা আমাকে বলিয়াছেন, উক্ত দশশির দানব অযোধ্যা প্রদেশ হইতে রাম হায়দারের স্ত্রীকে খাট সমেত চুরি করিয়া আকাশ পথে চলিবার সময় জেবেলসিরা পাহাড়ের মাথায় বিশ্রাম করিবার সময় রাম হায়দারের স্ত্রীকে বলিয়াছিল, আমি তোমার মানুষের দেহটিকে একটি জিনে বদল করিব এমন ইচ্ছা। তাহাতে দুইজনের মধ্যে বচসা বাধিয়া উঠিল, তখন বানর-বেশী হনুবীত নামক এক এফরীত তাহা শুনিতে পাইয়া একরাত্রির পরিশ্রমে উজ্জইন বিক্রম নামক নগর হইতে সমুদ্রের নিচে দিয়া সুরঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিয়া জেবেল সিরার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইল, পাহাড়ের মাথায় একটি কাঁটাগাছের নিচে রাম হায়দারের স্ত্রী ঘুমাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঠে তুলিয়া সেই সুরঙ্গ-পথে ভোরবেলা উজ্জইন বিক্রমিতে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহাকে তাহার স্বামী রাম হায়দারের হাতে সমর্পণ করিল। রাম হায়দারের দুইটি সন্তান হইল লথ (Luth) ও কুশ। রাম হায়দারের স্ত্রীর কাহিনী অতি দীর্ঘ, কিন্তু সেই সুরঙ্গ-পথ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে।"—প্রাচীনকালে ভারতবাসী ও আরবদের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরের বৃত্তান্তে সিংহলে দশমুণ্ড রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, বহু পরবর্তী যুগের বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছে, এবং সীতা উদ্ধারের কাহিনীটিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শহর হইতে জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, জাহাজ নোঙর তুলিয়া বন্দর ত্যাগের আয়োজন করিতেছে। এডেনের জন্য প্রেরিত মালসমূহ আগেই খালাস করা হইয়াছে, তোলা হইতেছে অধিকাংশই কফির চালান। আমাদের জাহাজের বার্জ-বোটসমূহে একটি স্টীমলঞ্চ আসিয়া ভিড়িয়াছে। তাহা হইতে কয়লা ও জল যথারীতি 'নেপাল'-এ তোলা হইল। যথাসময়ে নোঙরের কাছে কর্মীরা যে যাহার স্থান গ্রহণ করিল। ক্যাপটেন জাহাজের ব্রিজে দাঁড়াইয়া হুকুম দিলেন—'হীভ আপ'—নোঙর উঠাও। সব কাজ নীরবে সমাধা হইল, তাড়াহুড়া নাই, ছুটাছুটি নাই, সবই শুধু কাজ, নিপুণ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হইল। একটি মুহূর্ত বাজে নষ্ট হইল না। জাহাজের এই কর্মশৃঙ্খলা, এই ডিসিপলিন দেখিয়া আমাদের অবাক লাগে। প্রত্যেকে তাহার কর্তব্য বিষয়ে পূর্ণ সচেতন, সবই তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত তৎপরতার সঙ্গে করিয়া গেল। এই শিক্ষার জন্যই ঝড়ের সময় উত্তাল তরঙ্গমালা পর্বত সমান উঁচু হইলেও কোথাও লেশমাত্র ভুলভ্রান্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে না।

আমরা ১৮ই মার্চের অপরাহ্নে এডেন ত্যাগ করিলাম। সেইদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা আরবদের বাব্-দরওয়াজা—বাবেল মাণ্ডেব প্রণালী অতিক্রম করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পেরিমের আলোক-স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। এটি লোহিত সমুদ্রমধ্যস্থ ছোট্ট একটি দ্বীপ। দ্বীপটির অবস্থান লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে। এতকাল ইহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, ইহা কোন দেশ কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই, স্থায়ীভাবে কেহ ইহাতে বাসও করে নাই। অবশেষে ১৮৫৭ সনে ইংরেজরা এইখানে একটি আলোক-স্তম্ভ স্থাপন করে এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিবারও ব্যবস্থা করা হয়। পর্টুগীজ সমুদ্র অভিযাত্রী আবুকের্কে ১৫১৩ সনে এই দ্বীপে আসিয়াছিলেন, তিনি ইহার একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি ক্রস্ স্থাপন করিয়া যান। ১৭৯৯ সনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি অস্থায়ীভাবে দ্বীপটি দখল করে, এই সময়ে নেপোলিয়ন ঈজিপটের পথে ভারত আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। 'লেজ অভ ইণ্ড' (ভারত-গাথা) নামক কাহিনীতে ফরাসীরা যে এই দ্বীপটি দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন

কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, এইটি জানিতে পারিয়া ইংরেজরা দ্বীপটিকে স্থায়ীভাবে দখল করিয়া লয়। কথিত আছে একখানি ফরাসী যুদ্ধজাহাজ এই দ্বীপে ফরাসী পতাকা উড়াইবার গোপন নির্দেশসহ এডেনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই জাহাজ এডেনে পৌঁছিলে তথাকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ফরাসী যুদ্ধজাহাজের অফিসারদিগকে সৌজন্যবিধি অনুযায়ী ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ডিনারের পরে যখন প্রচুর মদ্যপান আরম্ভ হইল তখন ফরাসী ক্যাপটেন ব্রিটিশ রেসি-ডেন্টকে গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। একথা শুনিবামাত্র ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এডেন হইতে গান-বোট পাঠাইয়া পেরিম দ্বীপটিকে দখল করিয়া লইলেন। আমাদের লোহিত সাগর পার হইতে চারিদিন লাগিল। শুনিলাম মাত্রাতিরিক্ত গরম বশতঃ সমুদ্রপথের এই অংশটি যাত্রীদের পক্ষে সব সময়েই বিশেষ ক্লেশকর হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের যাইবার সময় উত্তর দিকের শীতল মৃদু হাওয়া বহিতেছিল, অতএব আমাদের বেশ আরামেই কয়টা দিন কাটিয়া গেল। যাইবার পথে আমরা অনেকগুলি পাথুরে দ্বীপ পার হইয়া গেলাম, ইহারা জলের উপরে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। একটা স্থানে এরকম সাতটি দ্বীপ আছে, নাবিকরা এই দ্বীপগুলির নাম দিয়েছে 'সেভেন অ্যাপোসল্‌স্' (খৃস্টি দুত)। লোহিত সাগরে অনেক শুশুক দেখা গেল, উহাদের স্ফূর্তির খেলায় আমরা বেশ আমোদ অনুভব করিতেছিলাম। দূর হইতে আমাদের দেখিয়া ছুটিয়া নিকটে চলিয়া আসে এবং আসিয়াই কত রকমভাবে খেলা করে। কখনও সাঁতার কাটে, কখনও লাফাইয়া শূন্যে উঠিয়া আবার ডুবিয়া যায়, কখনও ছুটাছুটি করে। এই সমুদ্রপথে যাইতে অনেক সময় তীরভূমি দেখা যায়, কখনও আফ্রিকার দিকের, কখনও আরবীয় দিকের। আফ্রিকার দিকের তীরভূমি প্রবাল গঠিত নিমজ্জিত পাহাড়ের সারিতে ভরা, জাহাজ চলার পক্ষে তাহা বিপজ্জনক। আরও একটুখানি ভিতরের দিকে সমুদ্রের সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উঁচু পাহাড়ের সারি। এগুলি মাসাওয়া ও সুদান পর্বত মালা। আঠা ও রজনের উৎপত্তিস্থল। পূর্ব উপকূলও একই রকমের অসমান এবং এবড়ো-খেবড়ো। যতদূর দৃষ্টি যায়, উচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে জমি বহুভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়গুলি দূর হইতে বড়ই শুষ্ক এবং রসহীন বলিয়া বোধ হয়। সুয়েজ খালের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই দুপাশের দুটি তীরভূমি নিকটবর্তী হইতেছে। সম্ভবত এই স্থানেই বাইবেল-বর্ণিত মোজেস্-পীড়নকারী ফারাও-এর অধীন ঈজিপটের দুর্বৃত্ত দল কর্তৃক ইসরায়েলবাসীরা যখন তাড়িত হইতেছিল, তখন তাহাদের পথ নিরাপদ করিবার জন্য লোহিত সাগর শুকাইয়া গিয়াছিল। সুয়েজের দিকে অগ্রসর হইবার সময় আমাদের জাহাজ আফ্রিকার কূল ঘেঁষিয়া যাইতেছিল। আমরা ২৩শে তারিখে বেলা ১০টায় সুয়েজে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই খানে "নেপাল" ভারতীয় ডাক ঈজিপটের রেল বিভাগে বিলি করিয়া দিল, সেখানে হইতে উহা বদ্বীপ পারে আলেকজান্দ্রিয়ায় চলিয়া গেল। সেখানে পি অ্যাণ্ড ও কম্পানির আর একখানি জাহাজ সেই ডাক তুলিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেখান হইতে উহা ব্রিন্দিসি নামক ইটালির বন্দরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখান হইতে রেলপথে পুনরায় উহা কালে বন্দরে, এবং কালে হইতে চ্যানেল পারে লণ্ডনে চলিয়া যাইবে। সুয়েজে আমরা জাহাজ হইতে নামি নাই, কারণ সময় খুব কম ছিল। ডাক বিলি হইবামাত্র আমরা যাত্রা করিয়া সুয়েজ খালে প্রবেশ করিলাম।

এই খালটি আধুনিক এনজিনিয়ারিং বিদ্যার একটি বৃহত্তম কৃতিত্ব। সুয়েজ যোজক নামক সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডটি এশিয়া ও আফ্রিকাকে যুক্ত রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহা লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগর হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। অতএব যেসব জাহাজ পূর্ব এশিয়া হইতে ইউরোপে যাইত, তাহাদিগকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া

কলিকাতা হইতে লণ্ডনের দূরত্ব ৭,৯৫০ মাইল, এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ১১,৪৫০ মাইল। সুতরাং যোজক কাটিয়া দেওয়াতে ৩,৫০০ মাইলের দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই যোজক কাটিয়া পথ করিবার সুবিধার কথা চিন্তা করা হইয়াছে, এবং কাটিবার জন্য নানারূপ চেষ্টাও হইয়াছে। প্রায় ২৫০০০ বৎসর আগে নাইল নদী হইতে লোহিত সমুদ্র পর্যন্ত একটি খাল কাটা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পলিমাটিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, যদিও তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। নেপালিয়ান যখন ঈজিপ্টের প্রভু তখন তিনি একবার বড় জাহাজের পথ করিবার জন্য সুয়েজ যোজক কাটিবার উদ্দেশ্যে জমি জরিপ করাইয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসীরা ওদেশ হইতে বিতাড়িত হওয়াতে সে পরিকল্পনা আর কাজে পরিণত হইতে পারে নাই। অবশেষে ডি লেসেপ্স্ নামক এক ফরাসী এনজিনিয়ার একাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করিলেন এবং তাহার ফলে সমগ্র মানবজাতির অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, ইহাতে বাণিজ্যজগতে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়াছে। ওখানকার জমি বালিপ্রধান, আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে, যাহার জন্য সারা দেশটাই একটা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, এবং পানীয় জলের অভাব ছিল, এবং তাহার পরেও—লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের জলতলের লেভেল অসমান। এই সব অসুবিধার ভিতর কাজ করিতে হইয়াছে। দুইয়ের মধ্যবর্তী কয়েকটি ছোট ছোট হ্রদ ছিল, ডি লেসেপ্স্ তাহার সুবিধা গ্রহণ করিয়া খাল সেগুলির সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন। ঐ হ্রদের জল তিক্ত স্বাদের। তাই তিনি নাইল নদীর মিঠা জল পাইপের সাহায্যে আনাইয়া লইয়াছিলেন। খননের জন্য এবং জলের নিচের মাটি কাটিয়া তুলিবার জন্য নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিলেন। এক কথায় অসীম ধৈর্য এবং বুদ্ধিকৌশলে তিনি সকল অসুবিধাই দূর করিয়াছিলেন। তিনি এমন গভীর ভাবে এই খালটি খনন করিলেন, যাহাতে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ ঐ খালের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। তবে ইহা দুইটি জাহাজ পাশাপাশি চলিবার মত প্রশস্ত নহে। সেজন্যে স্টেশনের স্থানে ইহা বেশি প্রশস্ত করা হইয়াছে। স্থলে যেমন সিংগ্‌ল্ রেল লাইন হয়, এই খালও সেই রীতিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয় আর একটি খাল ইহার পাশে কাটিয়া ডবল লাইন জাহাজপথ করিবার পরিকল্পনা করা হইতেছে। সুয়েজ খাল কাটিতে অনেক কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। ডি লেসেপ্স্ একজন দরিদ্র ফরাসী এনজিনিয়ার। তিনি নিজে ইহার জন্য কোনও টাকা দিতে পারেন নাই, সে ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না, তিনি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন জয়েণ্ট স্টক রীতিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া। বুদ্ধি, শিক্ষা, গঠন ক্ষমতা, সাহসিকতাপূর্ণ কর্মোদ্যম এবং কাজ আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে লাগিয়া থাকা—এই গুণগুলি থাকিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না। যে সব ব্যক্তি সুয়েজ খাল কাটিবার মত কৃতিত্বের অধিকারী তাঁহাদের দ্বারা জাতির মুখ উজ্জ্বল হয়। জাতির মূল্য তাহার কৃতিত্বের দ্বারাই স্বীকৃত। এই কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত। খালটিকে নৌবাহনের উপযুক্ত রাখিতে বেশ কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ আলগা বালি অবিরাম উপর হইতে পড়িয়া খালটি ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েকটি জায়গায় ইহার পার্শ্বদেশে পাথরের গাঁথনি দিয়া রক্ষা করিতে হইতেছে। অন্য কয়েকটি স্থানে আবার শরগাছ ও সেজ্‌গাছ রোপণ করিয়া তাহাদের শিকড়ের সাহায্যে মাটিকে ভাঙনের হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু তবু তলা হইতে মাটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য ড্রেজার যন্ত্রকে সর্বদাই কাজে খাটাইতে হয়। রাত্রিকালে জাহাজ চলাচল করিতে দেওয়া হয় না। সেজন্য খাল পার হইয়া যাইতে আমাদের দুইটি দিন লাগিয়াছিল। তাহার পর পোর্ট সৈদ, খালের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বর্তমানে বিদ্যুতের আলো সম্বলিত জাহাজকে রাত্রিতেও খাল পার হইতে দেওয়া হয়।

আমরা পোর্ট সৈদে জাহাজ হইতে নামিলাম, কিন্তু

তখন সন্ধ্যাকাল, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তাই বিশেষ কিছুই দেখা হইল না। কয়েকটি কফি-হাউস থিয়েটার গৃহ ও জুয়া খেলার আড্ডা মাত্র দেখা গেল। যাবতীয় ইউরোপীয় সমাজের নিচের তলার ওঁছা লোকেরা এইখানে আসিয়া সমবেত হয়। এই কারণে পোর্ট সৈদ দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত। ২৫শে মার্চ রাত্রিকালে আমরা পোর্ট সৈদ ছাড়িয়া ভূমধ্যসাগরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। ঈজিপ্‌টে অনেক নূতন যাত্রীর আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন বিশেষ মতবাদসম্পন্ন অ্যামেরিকান মিশনারি ছিলেন। জাহাজে এত বড় একদল উচ্চাঙ্গের ধর্মজ্ঞানহীন লোককে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে আমাদের মধ্যে তাঁহার মতে ভজাইবার জন্য কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। একেবারে গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইলেন। তাহার পর স্বর্গের বিদ্রোহ-কথা এবং অ্যাডাম ও ঈভের জন্মবৃত্তান্ত, অর্থাৎ তাহাদের পতনকথা এবং তাহার ফলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইল সে কথা। আমরাও পাল্টা আমাদের জন্মবৃত্তান্ত শুনাইতে লাগিলাম। আমরা ব্রাহ্মণেরা স্রষ্টার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ক্ষত্রিয়রা আসিয়াছে তাঁহার হাত হইতে, বৈশ্যগণ আসিয়াছে তাঁহার জানু হইতে এবং আমাদের চাষবৃত্তিধারীরা আসিয়াছে তাঁহার পাদদেশ হইতে। আমাদের শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা শুনিয়া তিনি খুব হাসিলেন, এবং বলিলেন, ও শাস্ত্র কিম্ভূত এবং মিথ্যা। বলিলেন, এরকম ছেলেমি গল্পে আমরা বিশ্বাস করি কি করিয়া। তিনি অতঃপর স্যাটান (শয়তান) সম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন স্যাটানের আনন্দ সে যেখানে বাস করে সেইখানে মানুষের আত্মাকে লইয়া যাওয়ার কাজে, এবং সে স্থানটি খুব আরামের নয়, সে কথাও তিনি বলিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং সেজন্য তিনি আমাদের সেই মহা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। এই সব মনোহর আলোচনা সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বাইরে হাওয়ার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, আবহাওয়া অস্বস্তিকর, উত্তাল তরঙ্গ জাহাজের গায়ে আঘাত হানিতেছে, জাহাজ বেশিরকম দুলিতেছে এবং সমস্ত ডেকখানাই শীকরসিক্ত হইতেছে। মিশনারি ও তাঁহার শ্রোতাগণ—সবারই পেটের ভিতর মোচড় দিয়া উঠিল। অধিকাংশ যাত্রী এইবার সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হইল, আমি কিন্তু রক্ষা পাইয়া গেলাম, অতএব অন্যেরা এই পীড়ার দরুন কি রকম বোধ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

২৮শে মার্চ রবিবার মল্টা দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর ভালেট্টা বন্দরে প্রবেশ করিলাম। মল্টা ভূমধ্যসাগরস্থ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত স্থান। আফ্রিকা হইতে ইহার দূরত্ব ১৭৯ মাইল, ও সিসিলি হইতে ৫৮ মাইল। পরিষ্কার সকাল, আমরা মাউণ্ট এটনার চূড়া দেখিতে পাইতেছিলাম, অথচ তাহার দূরত্ব ছিল ১২৮ মাইল। আমরা ভালেট্টার গভর্মেণ্ট হাউস ও অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমোক্তটি শ্বেত মর্মরের প্রশস্ত সিঁড়ি সম্বলিত বৃহৎ সৌধ। ইহার একটি কক্ষে আমরা কারুকার্যখচিত মূল্যবান্ পর্দার বহু নমুনা দেখিতে পাইলাম। এগুলি পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত এবং দুইশত বৎসরের পুরাতন। গভর্মেণ্ট হাউসের সংলগ্ন একটি অস্ত্রাগার আছে। সেণ্ট জনের নাইটগণ মুসলমানদের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করিত। সেই সময় যে অস্ত্র তাহারা ব্যবহার করিত, তাহাও সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। দুইটি দলিলও অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র, যাহার সাহায্যে সাত শত বৎসর পূর্বে জেরুসালেমের সেণ্ট জনের 'অর্ডার অভ দি নাইটস' গঠন করা হয়। অন্যটি একটি চুক্তিপত্র। ইহার তারিখ ৪ঠা মার্চ ১৫৩০। ইহার সাহায্যে সম্রাট পঞ্চম চার্লস, রোড্‌স্ হইতে তুর্কীগণ কর্তৃক বিতাড়িত বীর নাইটদিগকে মলটার দ্বীপসমূহ দান করিয়াছিলেন। সেণ্ট জন ক্যাথীড্রালও দেখা হইল, সেখানে মূল্যবান অনেক কারুকার্যখচিত মর্মর প্রস্তরের নমুনা এবং ব্রাসেলস-এ প্রস্তুত পরদার নমুনা সংগৃহীত আছে।

এখান হইতে আমরা নাইটদের হাসপাতাল দেখিতে গেলাম। বেশ বৃহৎ অট্টালিকা এটি, ইহার একটি কক্ষ পাঁচ শত ফুটের অধিক দীর্ঘ, অথচ তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কোনও কড়িকাঠ অথবা কেন্দ্রে স্তম্ভ নাই। একটি গীর্জায় ভূগর্ভস্থ খিলান গৃহের এক দেয়ালের খোপে মংক বা কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীদের শুষ্ক মৃতদেহ রক্ষিত আছে দেখিলাম। মোটের উপর মল্টা—অতীত ইতিহাসের দিক্ হইতেই হউক, অথবা ইংল্যাণ্ড ও ভারতের প্রধান পথের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ আউট-পোস্ট রূপে ইহার বর্তমান অবস্থানের দিক্ হইতেই হউক—খুবই আকর্ষক বলিতে হইবে। নাইটদের নির্মিত ইহার দুর্গসমূহ এখন বৃটিশ সরকার কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এগুলি সম্পূর্ণরূপে দুর্ভেদ্য দুর্গ। কয়েকজন নাইটের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ভালেট্টা নেপোলিয়নের দখলে আসিলে কাফফারেল্লি নেপোলিয়নকে বলিয়াছিলেন, "জেনারেল, (নেপোলিয়ন তখন জেনারেল ছিলেন) ভিতর হইতে কেহ যদি দুর্গের দরজা খুলিয়া দেয়, তবেই আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব। আর দুর্গটি যদি সম্পূর্ণ শূন্য থাকে তবে আমরা বাহির হইতে সহজে প্রবেশ করিতে পারিব না।" মলটাবাসীরা খুব শক্ত সমর্থ, সাহসী এবং ঝোঁকের মাথায় কাজ করায় অভ্যস্ত। ছোরা মারার দিকে এদের কিছু আকর্ষণ আছে। ইহারা গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। স্ত্রীলোকদের অবয়ব সুন্দর এবং চোখ কালো। ইহাদের ভাষায় শতকরা ৭৫ ভাগ আরবী শব্দ আছে, তাহাতে মনে হয় ইহাদের পূর্বপুরুষ আরব হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে একটি লোকেরও আরবদের মত ডিম্বাকৃতি মুখ দেখা যায় না। মলটা এমনই একটি পাথরের ছোট্ট দ্বীপ যে, এখানে যে জমিতে চাষ হয় সেখানকার মাটি সিসিলি দ্বীপ হইতে আমদানি করিতে হইয়াছে। যাহাই হউক পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যেটুকু মাটি পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহার সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। এবং তাহার ফলে সেখানে শস্য এবং ফলের গাছ জন্মান সহজ হইয়াছে, মলটার কমলালেবু সমগ্র ইউরোপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমরা মলটা ত্যাগ করিলাম। আমাদের জাহাজের মুখ এখন জিব্রলটারের দিকে, সেইখানে আমাদের দ্বিতীয় বিরাম। আবহাওয়া শান্ত, জল যেন কাঁচের একটি আবরণ। সামুদ্রিক পীড়ার হাত হইতে আক্রান্তগণ এত দিনে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে মিশনারিটিও তাঁহার ধর্মে দীক্ষার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন।

খ্রীস্টান ধর্মের স্বপক্ষে তাঁহার যুক্তির উত্তরে আমাদের ভিতর হইতে এক বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, খ্রীষ্টান না হইলে লোকে সৎ হইতে পারে না, আপনার এ ধারণা ভুল। সব খ্রীস্টান সৎ নহে, এবং সব হিন্দু অসৎ নহে। আর শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুরা জাতি হিসাবে বেশি শান্তিপ্রিয়, বেশি করুণাবান্, এবং বেশি ধর্মভীরু। এখন সৎ হিন্দুর খৃীস্টান হওয়ার অপেক্ষা অসৎ খৃীস্টানের সৎ হওয়া বেশি দরকার। খৃীস্টান ধর্ম 'প্রতিবেশীকে ভালবাস' এই শিক্ষা দেয়, আর হিন্দুধর্ম বলে সবাইকেই সকল প্রাণীকেই আত্মবৎ মান্য কর। হিন্দু ধর্মে পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা দিয়াছে এই—"সৎ কাজ করা পুণ্য, অসৎ কাজ করা পাপ"। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে দেখা যায়, খৃীস্টানরাও খৃীস্ট ধর্মের সকল বিধি মানে না, হিন্দুরাও তাহাদের স্বধর্ম অনুসরণ করে না। এ বিষয়ে অবশ্য অপরাধের পাল্লাটা হিন্দুদের দিকেই বেশি ভারী। হিন্দু ধর্মে এত দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে যাহাতে বাহিরের কেহ যদি হিন্দুদের সব যুক্তিহীন এবং হাস্যকর আচার আচরণ দেখে, তাহা হইলে সে যে আহত হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বিধবাদাহ এবং শিশু হত্যা ভারতীয়দের একটি চিরস্থায়ী লজ্জা বলা যাইতে পারে। এবং একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সব নিষ্ঠুর প্রথা খৃীস্টিয়ান ধর্মের জন্যই—অথবা খৃীষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উদার নীতির জন্যই রহিত হইতে

পারিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণকে আধা-দেবতা রূপে মান্য করা হয়—কিন্তু তাহা তাহার পবিত্রতা অথবা দেবত্বের জন্য নহে, সে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া। মোটের উপর কতকগুলি বিশেষ খাদ্য না খাওয়াকেই এখন ধর্মপালন রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। চুরি, মিথ্যা-ভাষণ এবং নরহত্যার চেয়েও নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ জঘণ্যতর অপরাধ। এই সব পাপানুষ্ঠানে হিন্দু জাতিচ্যুত হয় না, কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে হয়। নীচ জাতীয় কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করা অপেক্ষা গোহত্যা বড় পাপ। ভারতীয়দের অনেক সদ্‌গুণকেও মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া এমন আকার দেওয়া হইয়াছে যাহাতে এখন তাহা পাপরূপে গণ্য। সকল জীবের প্রতি করুণাপরায়ণ হইবার শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। অতএব তাহারা অভাবগ্রস্ত লোককে ভাড়া করিয়া আনিয়া ছারপোকা জাতীয় কীট দ্বারা তাহার রক্ত পান করায়। ইহাই যদি হিন্দু ধর্মের প্রথা হয় তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের খৃীস্টান অথবা মুসলমান হইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, প্রাচীন ভারতের প্রাজ্ঞগণ, তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ও বিদ্যা লইয়া বর্তমানের আচরিত নীতি, তাঁহা-দের উত্তরপুরুষগণ কর্তৃক পালিত হইবে, এমন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বন্ধু বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা এদেশে যাহাদের মন মুক্ত, তাহারা এই সব প্রথা নিশ্চয়ই পালন করে না। উত্তরে বলি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা সত্য নহে। আমাদের সমাজের গঠন এমন যে তাহা করা সহজ নহে। ইহার জন্য যে বৃহৎ ত্যাগ ও মনোবল দরকার তাহা আমাদের দেশের জনসাধারণের নাই। অন্তরে অন্তরে যাহা করণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা সাহসের অভাবে করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত যাবতীয় কুপ্রথারই তাহারা সমর্থক হইয়া পড়ে। অনুমান করে, এই সব প্রথা পালন এবং তাহার সমর্থনই দেশপ্রেম। অতঃপর নিজেদের এবং নিজেদের অপেক্ষা অল্পশিক্ষিতদের চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত এবং প্রতারিত করিবার জন্য এ সবের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করে।"

আমরা এক্ষণে আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষিয়া চলিতেছি। জাহাজে একজন অনেকদিনের অস্ত্রাগার রক্ষক ছিল, সে বাল্যকাল হইতে এ পথে বহুবার যাতায়াত করিয়াছে। সে আমাদের ট্রিপোলি, টিউনিস মরোক্কো উপকূলের বিশেষ বিশেষ স্থলচিহ্নগুলি চিনাইয়া দিতে লাগিল। পৃথিবীর সকল অংশে ধর্মের নামে কত নিষ্ঠুর কাজই না লোকে করিয়াছে। সম্ভবত মাউন্ট আরারাট ও পিলার্স অভ হারকিউলিস পর্যন্ত যতগুলি দেশ ও সমুদ্র আছে সেই সব দেশে ধর্মের নামে লুণ্ঠন, নৃশংসতা, হত্যা, ইত্যাদি যত সংঘটিত হইয়াছে এমন আর পৃথিবীর কোনও অংশে হয় নাই। ক্রুসেডের পরে (ক্রুসেড—ক্রসচিহ্নিত পতাকার আশ্রয়ে তুরস্কের কাছ হইতে খৃীস্টানদের পবিত্র ভূমি কাড়িয়া লইবার সামরিক অভিযান) মলটার নাইটগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মহম্মদের অনুগামীদের দেখিলেই তাহাদের হত্যা করিয়া নির্মূল করিয়াছে। এটি হইল ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের ঘটনা। অপর পক্ষে পশ্চিম টিউনিসের ট্রিপোলির এবং মরোক্কোর মুয়ারগণ তিনশত বৎসর ধরিয়া তাহাদের অপরাজেয় দস্যুজাহাজগুলির সাহায্যে তাহাদেরও ধর্মীয় তৎপরতা প্রমাণের জন্য হাজার হাজার খৃীস্টানকে দাস বানাইয়াছে, তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। হতভাগ্য শেখ সাদী তাঁহার গুলিস্তানে লিখিয়া গিয়াছেন—প্যালেস্টাইনের পাহাড়ে একটি নির্জন স্থানে তিনি নমাজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় খৃীস্টানেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ট্রিপোলির হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া দিল। ঐ একই পদ্ধতিতে মুয়ার জলদস্যুরা জাহাজ আটক করিয়া প্রতি বৎসর হাজার হাজার খৃীস্টানকে ধরিয়া লইয়া উত্তর আফ্রিকার বাজারে কেনাবেচা করিয়াছে।

৩১শে মার্চ বুধবার সকালে স্পেনের পর্বতশ্রেণীর তুষারাবৃত চূড়া দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গোটা অন্তরীপ পার হইয়া আসিলাম এবং সমস্ত দিন

ধরিয়া স্পেনের উপকূল বরাবর চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া পৌঁছিলাম জিব্রলটারে। জাহাজ নোঙর ফেলিল বিখ্যাত দুর্গের সম্মুখে। এখানে যখন পৌঁছিলাম তখন আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল এবং বৃষ্টি পড়িতেছিল। তাই আমরা বাহির হইতে পারিলাম না। কিন্তু পরদিন সকালে আমরা ডেক হইতে, ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের চাবিকাঠি স্বরূপ এই জিব্রলটারের ক্ষমতাসীন অবস্থানটি দেখিতে পাইলাম। ইহার দুর্গের ফটকেও একটি চাবি ঝুলিতেছে। খাড়া পাহাড়ের উপর দুর্গটি নির্মিত। এই পাহাড় ও ইহার বিপরীত আবীলা নামক আফ্রিকার পাহাড়কে প্রাচীনকালে পিলার্স অভ হারকিউলিস বলা হইত। ভূমধ্যসাগর ও অ্যাটলান্টিকের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জিব্রলটার প্রণালীর দুই বিপরীত দিকে এই দুই পাহাড় স্তম্ভের মতই অবস্থান করিতেছে। জিব্রলটার প্রায় একটি দ্বীপের মত। মূল স্পেন ভূখণ্ডের সঙ্গে ইহা সংকীর্ণ বালুকাময় জমির দ্বারা যুক্ত। মনে হয় পূর্ব্বে কোনওকালে এই অংশ জলে ঢাকা ছিল। প্রকৃতি হইতেই জিব্রলটারকে কঠিন করিয়া গড়া হইয়াছে, তদুপরি বর্তমান উন্নত সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ইহাকে দুর্ভেদ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। ১৭০৪ সনে ইংলিশ ও ডাচ নৌবহরের মিলিত আক্রমণে স্থানটি স্পেনের হস্তচ্যুত হয়। সেই সময় হইতে এটি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়া আছে, যদিও মাঝে মাঝে বলপ্রয়োগে অথবা কৌশলপ্রয়োগে ইহাকে পুনর্দখল করিবার চেষ্টা হইয়াছে। একবার ব্রিটিশরা এখানে যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, সেই সময়ে স্পেনের এক রাণী এইরূপ শপথ গ্রহণ করেন যে, যতদিন ঐ স্থানে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন থাকিবে, ততদিন তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই শপথ পালনের যোগ্য ছিল না। দুর্গের উপর বারংবার নিষ্ফল আক্রমণ করিয়া হাজার হাজার স্পেনীয় যোদ্ধা বৃথাই জীবন হারাইল। ব্রিটিশ পতাকা তবু উড্ডীন রহিল। অবশেষে ব্রিটিশ শাসক [illegible] পতাকাটি নামাইয়া লইলেন, যাহাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করিয়া শপথ ভঙ্গের দায় হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। ১৭৭৯ হইতে ১৭৮০ সন পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া জিব্রলটারের অবরোধ সময়ে ফরাসী ও স্পেনীয়গণ একযোগে এখানকার দুর্গ আক্রমণ করিতেছিল। যে জাহাজ হইতে তাহারা গোলাবর্ষণ করিতেছিল তাহার পার্শ্বদেশ পুরু করিয়া খড়ের গদিতে আবৃত রাখা হইয়াছিল যাহাতে প্রতিপক্ষের গোলা আসিয়া জাহাজের পার্শ্বভেদ না করিতে পারে। চারিশত অতি ভারী ওজনের কামান এই দুর্গের উপর আক্রমণ চালাইতেছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শাসনকর্তা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, কেমন করিয়া এইসব গদি আঁটা জাহাজগুলিকে ধ্বংস অথবা বিতাড়িত করা যাইতে পারে। শোনা যায় এক মাতাল সৈন্য বলিয়াছিল, জ্বলন্ত গোলা কামানে পুরিয়া শত্রুকে ঘায়েল কর। শাসনকর্তা এ প্রস্তাব পছন্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ কামানগুলিতে আগুন-রাঙা গোলা পুরিয়া শত্রু জাহাজগুলিতে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। সেই অতি তপ্ত গোলাগুলি খড়ের গদিতে গিয়া যুক্ত জাহাজগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বহু জাহাজ পুড়িয়া গেল, কিন্তু সমগ্র নৌবাহিনী তখনও ধ্বংস হয় নাই। তারপর যখন এইরূপ গোলা চারি হাজারেরও অধিক নিক্ষিপ্ত হইল, তখন সব শেষ হইয়া গেল। দুর্গের দৃঢ়তা কতখানি তাহা বুঝিতে পারা যায় উভয়পক্ষের হতাহতের সংখ্যা দেখিয়া। এই গোলা বিনিময়ে শত্রুপক্ষের ২০০০ এর উপরে লোকক্ষয় হইয়াছিল, ব্রিটিশপক্ষে হত ১৬ জন এবং আহত ৬৮ জন। ক্ষয়ক্ষতির এই অসমতার আরও কারণ দুর্গের কামানসমূহ পাহাড়ের গায়ে বহু সুরঙ্গ কাটিয়া সেইসব সুরঙ্গের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছিল। আমরা সেই সুরঙ্গগুলি হইতে কামানসমূহের মুখ একটুখানি করিয়া বাহির হইয়া আছে তাহা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম। ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী জিব্রলটার প্রণালী দৈর্ঘ্যে ১২ [illegible]

(১ লীগ=৩ মাইল), এবং প্রস্থে পশ্চিম দিকে ৮ লীগ ও পূর্ব্ব দিকে ৫ লীগ।

১লা এপ্রিল তারিখে আমরা জিব্রলটার প্রণালী পার হইয়া আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলাম। আকাশ পরিষ্কার, সূর্য্যালোক উজ্জ্বল; তাই আমরা জলের মহাবিস্তার স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে পড়িল, মাত্র চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর শেষ সীমা মনে করা হইত। এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসী নাবিকও এই মহাসমুদ্রে অভিযান চালাইতে সাহসী হইত না। কিন্তু তাহার পর হইতে জগতে কি পরিবর্তনটাই না ঘটিয়া গেল। সভ্য মানুষ এখন পৃথিবীর সকল অংশে তাহার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। এক-ঠ্যাংওয়ালা মানুষের এবং লম্বা কানওয়ালা মানুষের জাতির লুপ্তি ঘটিয়াছে। এই মানুষেরা এক কান পাতিয়া শুইত আর এক কানে গা ঢাকিত। কিন্তু এই মহাসাগরের পরে যে অজানা মহাদেশ ছিল, তাহাতে যে পরিমাণ আশ্চর্যজনক সব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন আর কোথাও ঘটে নাই। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে নিরেট ঘন অরণ্যের পথে পাইন গাছের পাতায় পাতায় শব্দ জাগাইয়া সান্ধ্য বায়ু প্রবাহিত হইতে বাধা পাইত, সেইখানে এখন বড় বড় শহর সৌধসমূহ স্বর্গের দিকে উচ্চ শির তুলিতেছে। শক্তিশালী রেল-এনজিন, আগের দিনের বাইসন এবং হরিণেরা যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত মনে অর্দ্ধনিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুইয়া শুইয়া জাবর কাটিত, সেইখানে এখন রাজকীয় বিলাস-পূর্ণ দরবার গৃহতুল্য কক্ষসমূহ নিম্নভূমিতে এবং পাহাড় পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। সেখানে মাটি এবং জল হইতে এখন কোটি কোটি মানুষের আহার, বস্ত্র ও বিলাসিতার উপকরণ আহরিত হইতেছে, অথচ সেই একই স্থানে পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক আরণ্যক মানুষ শিকার করিয়া বা মাছ ধরিয়া কোনোরকমে বিপজ্জনক জীবন কাটাইত। যে মানুষ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের সদ্ব্যবহার জানে, প্রাচুর্য্য তাহার ভোগে আসে। যাহারা তাহা জানে না, তাহাদের উচিত সেইসব মানুষকেই স্থান ছাড়িয়া দেওয়া, যাহারা তাহা জানে। আমেরিকায় এবং অষ্ট্রেলিয়ায় তাহাই হইয়াছে বর্মাতেও তাহাই হইবে, এবং পৃথিবীর অন্য সব স্থানেও তাহাই হইবে।

আবহাওয়া শান্ত ছিল, তথাপি পশ্চিম দিক্ হইতে বড় বড় ঢেউ আসিয়া জাহাজের পাশে আঘাত করিতে লাগিল, আর তাহার ফলে জাহাজটি বেজায় রকম দুলিতে লাগিল। প্রত্যেকটি দোলাতে জাহাজের একটা ধার কাত হইয়া পড়িতেছিল এবং ডেক ঘিরিয়া যে উচ্চ বেষ্টনী থাকে জল প্রায় তাহা স্পর্শ করিতেছিল। তখন ডেকে হাঁটিয়া বেড়ান অসম্ভব, বসিয়াও স্বস্তি ছিল না, কারণ জাহাজ যখন তাহার একটি পাশের উপর ভর করিয়া কাত হইতেছিল, তখন আমাদের সমুদ্রে পড়িয়া যাইবার ভয় ছিল। বিছানায় শুইলে সেখান হইতে গড়াইয়া যাইবার ভয়। টেবিলে প্লেট, ডিশ প্রভৃতি কাঠের একজাতীয় ক্রেমে আটকান ছিল, অন্যথা সেগুলি নিচে পড়িয়া চূর্ণ হইত। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন শান্ত আবহাওয়াতেই এই, ঝড় উঠিলে জাহাজের কি অবস্থা হয়? আর একজন উত্তরে বলিলেন, তেমন অবস্থায় জাহাজ তাহার অক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। উপকূলের কাছে এমন অবস্থা হইলেও অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরের এই অংশে জাহাজ চলাচল, বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী পথে সব সময়েই সহজ এবং নিরাপদ থাকিয়াছে। স্থলভাগ হইতে কিছু দূরে ট্রেড উইণ্ড বা আয়ন বায়ু সমভাবে বহিয়া থাকে। গ্রীষ্ম অঞ্চলের সমুদ্রে যেমন সাধারণত ঝড়ের আবহাওয়ার দেখা মেলে এখানে সেরকম নহে। পূর্ব্ব দিনের পাল তোলা জাহাজে ভ্রমণের তুলনা করা হইত ধীরস্রোতা নদীপথে চলার সঙ্গে। স্পেনবাসীরা খুব উচ্চকণ্ঠেই এই সমুদ্রের সদয় ব্যবহারের গুণগান করে, কারণ এই সমুদ্রই তাহাদের হঠাৎ একদিন বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়াছিল, ইহারই জন্য তাহাদের শক্তি সম্পদ্ এবং খ্যাতিলাভ হইয়াছে। তাহারা ইহার নাম দিয়াছে "লেডীজ সী"—মহিলাদের সমুদ্র, কারণ এখানকার মন্দ বায়ু ইহার বুকে যে মনোহর চপল তরঙ্গ

জাগায় তাহাতে সমুদ্রপারের এল ডোরাডোতে, অর্থাৎ স্পেনের অ্যামেরিকা বিজয়ীদের কাল্পনিক স্বর্ণভূমিতে, যাইবার জন্য অবলাদেরও মনে যথেষ্ট সাহস জাগে। হায়! Golfo de las damas! হায় মহিলাদের সমুদ্র! এককালে স্পেনবাসীদের মনে কি মাদকতাই না জাগাইয়াছিল। আর আজ কি অধঃপতন! ভয়ের সমুদ্র বে অভ বিস্কেতে যখন প্রবেশ করিলাম তখন সমুদ্র শান্ত ছিল। এই উপসাগরটি যে কিরকম অস্থির এবং উদ্দাম সে বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত শুনিলাম। কিন্তু আমরা বেশ আরামেই এটি পার হইয়া গেলাম। বে অভ বিস্কেতে আমরা একটি তিমি দেখিলাম, সে তাহার নাক দিয়া ফোয়ারা উড়াইতেছিল। ইহা ভিন্ন কয়েকটি হাঙরও আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর আসিয়াছিল। ৫ই এপ্রিল ভোরবেলা আমরা এডিস্টোন আলোকস্তম্ভ ছাড়াইয়া গেলাম। এটি সমুদ্রের মাঝখানে নির্মিত। ইহার পরেই আমরা প্লিমাথ বন্দরে গিয়া পৌঁছিলাম। এটি ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। এইখানে আমাদের জাহাজ কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া মল্টা ও জিব্রলটার হইতে প্রেরিত ডাক খালাস করিল। অনেক যাত্রী রেলপথে লণ্ডন যাইবার জন্য এইখানে নামিয়া গেল। আমরা জাহাজেই রহিলাম। জাহাজে প্লিমাথ হইতে লণ্ডন চব্বিশ ঘণ্টার পথ। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূল বরাবর আমরা চলিতে লাগিলাম। ভারত সমুদ্রে অথবা লোহিতসাগরে আমরা অন্য জাহাজ কমই দেখিয়াছি। ভূমধ্যসাগরে এবং অ্যাটল্যান্টিকে জাহাজের সংখ্যা অনেক বাড়িল, কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলে দেখিলাম অসংখ্য জাহাজ চারিদিকে যাতায়াত করিতেছে, আমরা এখানে বাণিজ্যের বড় সড়কে উপস্থিত। ৬ই এপ্রিল সকালবেলা আমরা টেম্স নদীর মুখে আসিয়া পড়িলাম। আমরা গ্রেভ্স এণ্ড টিলবেরি ছাড়াইয়া গেলাম এবং দ্বিপ্রহরে লণ্ডনের নিকটস্থ অ্যালবার্ট ডকে আসিয়া পৌঁছিলাম। (ক্রমশঃ)

শহীদ হেমন্তদা

চিত্তরঞ্জন দাস

আমাদের সর্বজনপ্রিয় হেমন্তদা আর ইহজগতে নেই। বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী'৭১ প্রকাশ্য দিবালোকে কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথ শ্যামপুকুর স্ট্রীটে লোক-চক্ষুর সম্মুখে আততায়ীর সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে নৃশংসভাবে তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁর আসন আজ শূন্য। তিনি এখন শহীদ।

হেমন্তদার হত্যাকারীর সঠিক সংখ্যা জানা নেই। কিন্তু উহা যে উক্ত ঘটনাস্থলে দর্শকসংখ্যার চেয়ে অধিক ছিল, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, জনবহুল কলিকাতার রাজপথ সাধারণতঃ অত্যধিক রাত্রি ভিন্ন কদাচ জনশূন্য হয় না। তদ্ভিন্ন যে কোনও ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটবার উপক্রম হলেই সেখানে জনতার ভীড় হয় অসম্ভব, বিশেষতঃ দিবালোকে। সুতরাং উক্ত ঘটনার দিনও যে সেখানে জনতার ভীড় কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব ছিল, এরূপ ধারণা করবারও কোন হেতু নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে দর্শকের মধ্য থেকে কেউই তো এগিয়ে এলোনা তখন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ কিংবা হেমন্তদাকে আততায়ীর অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা রুখে দাঁড়াবার সৎসাহস বাঙালী আজ সর্বতোভাবে হারিয়ে ফেলেছে। হেমন্তদাকে ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করবার সামান্য প্রচেষ্টাও আমরা করিনি অথচ জীবনাবসানের পর তাঁর জন্য আমরা গভীর শোক করছি, আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করছি, তৈরী করছি, সহস্র সহস্র লোকের শোণিত দিয়ে শহীদ-বেদী। কিন্তু হেমন্তদার বিক্ষুব্ধ আত্মা কি উহা দ্বারা প্রশমিত হবে, না জনতার অশ্রুজলে উহা বিগলিত হবে?

প্রসঙ্গতঃ মাইকেল-এর একটি কবিতাংশ উল্লেখ করছি:

"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবন নদে!"

জন্ম হ'লে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী এবং উহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রকৃতির এ নিয়ম লঙ্ঘন করবার শক্তি মানুষের নেই। সুতরাং মৃত্যুর কবল থেকে কারুর পক্ষেই যে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয় এবং জীবনের যে কোন মুহূর্তেই যে সে মৃত্যু উপনীত হতে পারে, এ ধারণা বা বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষেরই আছে বা থাকাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু সে মৃত্যু তার করাল বদন ব্যাদান করে কখন যে কাকে গ্রাস করতে ছুটে আসবে, সে দিনক্ষণ কারুর পক্ষেই পূর্বাহ্ণে কখনও জানা সম্ভব নয়। তবে স্বাভাবিক মৃত্যুই যে সকলেরই কাম্য, ইহা অনস্বীকার্য্য। পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুজনিত প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথা বা শোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু যেখানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ অকালে কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যু অথবা এবম্বিধ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সেখানে সে ব্যথা বা শোকাগ্নি সহজে নির্বাপিত হতে পারে না। কত বড় নির্মম, পাষণ্ড বা উন্মাদ হলে হেমন্তদার মত সরল, নির্ভীক, চরিত্রবান, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে এরূপ নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করতে পারে, সহজেই তা অনুমেয়। সুতরাং মানুষের বিচারে সে হত্যাকারী নিষ্কৃতি পেলেও ঈশ্বরের দরবারে তার মুক্তি নেই।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে একসময়ে হেমন্তদার রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলাম, কিন্তু বহুদিন যাবৎ রাজনীতি কিংবা দলীয় গণ্ডির বাইরে থাকায় তাঁর সঙ্গে ইদানীং কোন সংরক্ষণের প্রয়োজন বা সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক হেমন্তদার উপর কখনও শ্রদ্ধা হারাইনি এবং কখনও কোথাও তার

সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে অন্তত: দুপাঁচ মিনিটের জন্যও সৌজন্যমূলক আলাপ আলোচনা হত। সকলের সঙ্গেই তিনি প্রাণখোলা মধুর হাসি সহকারে বাক্যালাপ করতেন। অহংকার কিম্বা আত্মাভিমান বলে তার কিছুই ছিল না। বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা এমনকি মন্ত্রী পদাধিষ্ঠিত হয়েও তিনি অনেক সময়ে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেননি। এ হেন একজন খাঁটি দেশসেবকের এরূপ নৃশংসভাবে জীবনাবসানের জন্য নিদারুণ ব্যথা গভীর শোক বিশেষভাবে অনুভব করছি।

দেশের বর্তমান রাজনীতি যে এত ঘৃণ্য, এত নোংরা, এত বীভৎস হবে, ইতিপূর্ব্বে সম্ভবতঃ আমরা কেউকথনও কল্পনা করতে পারিনি। ক্ষমতার লোভ মানুষকে যে কিভাবে অমানুষ কিংবা উন্মাদ করে তোলে, পশ্চিম বাংলার প্রচলিত দৈনন্দিন রাজনৈতিক খুনের খতিয়ানই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উন্মাদ ভিন্ন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে মানুষ খুন করা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং আজকের এই নৃশংস খুনোখুনির জন্য প্রকৃতপক্ষে যারা দায়ী, তাদের উন্মাদ ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। যারা খুন করে কিম্বা খুনের নির্দেশক বা প্ররোচক, তারা সকলেই উন্মাদ। তাব এ হেন রাজনৈতিক উন্মাদনা বন্ধ করবার জন্য সকলেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিৎ, নইলে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার ধ্বংস যে অনিবার্য্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

হেমন্তদা শহীদ হয়ে সমগ্র জাতির চিত্তে স্মরণীয়, বরণীয় এবং অমর হয়ে রইলেন। কিন্তু যারা তাঁকে নির্বাচনী-রণক্ষেত্র থেকে অপসারণের নিমিত্ত এরূপ নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করলো, (কারণ হেমন্তদা ছিলেন অজাতশত্রু এবং একমাত্র নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন তাঁকে হত্যা করবার অন্য কোন হেতুই ছিল না) তারা রইলো জনমানসে অতি ঘৃণ্য হিংস্রপশু সদৃশ। অতএব হেমন্তদার বলিই যেন পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক শেষ বলিরূপে গণ্য করা হয় এবং তাঁর পবিত্র শোণিত দ্বারাই যেন রাজ্যের নরনিধন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় এবং আর যেন এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হয়, নেতৃবৃন্দের নিকট ইহাই আমার একমাত্র নিবেদন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি হেমন্তদার অমর অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত হোক শান্ত হোক—পশ্চিম বাংলার রাজনীতি কলুষমুক্ত হোক। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

নির্দ্ধারিত ৪ঠা নভেম্বর দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হল। সভাপতি মশাই অবশ্য এই সভায় যোগ দিলেন না। কাজ চালনার জন্য সভাপতির পদে লালা লাজপত রায়ের নাম প্রস্তাব করা হল। যমনাদাস মেহেতা এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন যে যখন ওয়ার্কিং কমিটীর কার্য্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা হবে তখন ঐ কমিটীর কোন সদস্যের পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করা অসঙ্গত। তিনি সভাপতি পদের জন্য ডাঃ মুঞ্জের নাম প্রস্তাব করলেন। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় লালা লাজপত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

প্রথমেই মহাত্মা গান্ধী উঠে সভাপতির অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি সদস্যদের নিকট আবেদন জানালেন যে তাঁরা যেন ভাবুকতা সরিয়ে রেখে দেশের পরিস্থিতি স্বীকার করেন।

যমনাদাস মেহেতা বললেন যে সভাপতি মশায়ই একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি এই সভা আহ্বান করিতে পারেন সুতরাং এই সভা আইনসঙ্গত নয়। সভাপতির রুলিং বাধ্যতামূলক। তিনি প্রস্তাব করলেন যে এই সভা ভেঙ্গে দেওয়া হোক। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

এরপর বিদর্ভের নেতা আনে বললেন—সভাপতি মশায় স্পষ্টভাবে রুলিং দিয়েছেন যে বাংলা ও মাদ্রাজের অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচন বাতিল সুতরাং ঐ দুই প্রদেশের সদস্যগণ এই সভায় যোগদান করার অধিকার নেই। তিনি দাবি করলেন যে সভাপতির রুলিং পবিত্র ও চূড়ান্ত। তিনি প্রস্তাব করলেন বিতর্কিত দুই প্রদেশের প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে সভার কার্য্য হোক। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

বিহারের জনৈক সদস্য বললেন যে প্রস্তাব থেকে সভাপতির ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মতানৈক্যের কথা বাদ দেওয়া হোক।

মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সংশোধনী প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হল। মাত্র ৭ জন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

এই সভায় প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল—আইন অমান্য আন্দোলন।

মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বহু সংশোধনী প্রস্তাবও করা হয়। সমস্ত অগ্রাহ্য হওয়ার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে—

যেহেতু বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জাতীয় সঙ্কলন পরিপূরণের একমাসের বেশী সময় নেই এবং যেহেতু আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার ও কারাগারে প্রেরণের সময় জাতি যেভাবে খাঁটি অহিংসা পালন করে অনুকরণযোগ্য আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিপাদন করেছে এবং সেহেতু স্বরাজ অর্জনের জন্য জাতির পক্ষে আরও দুঃখবরণ ও শৃঙ্খলা পালনের ক্ষমতা প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয় অতএব অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী প্রত্যেক প্রদেশকে [illegible] নিজের দায়িত্বে নিম্নলিখিত সর্তের উপযোগী যেভাবে ভাল বিবেচিত হয়—তদনুসারে ট্যাক্স বন্ধ করা সহ আইন অমান্য করার ক্ষমতা দিচ্ছে—

(১) ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে হাতে

সুতাকাটা জানতে হবে এবং তার প্রতি প্রযোজ্য কর্ম-সুচীর সেই অংশ তাকে পালন করতে হবে—যথা বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে হাতে কাটা সুতোয় হাতে বোনা পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে এবং ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের ঐক্যে বিশ্বাসী হতে হবে। খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিকারে ও স্বরাজ অর্জনে অহিংসার একান্ত প্রয়োজনে বিশ্বাসী হতে হবে। যদি সে হিন্দু হয় তাহলে তাকে নিজ আচরণ দ্বারা দেখাতে হবে অস্পৃশ্যতা যে জাতীয় কলঙ্ক তাতে সে বিশ্বাসী।

(২) গণ আইন অমান্যের ক্ষেত্রে একটি জেলা বা তহশীলকে একটি কেন্দ্ররূপে ধরতে হবে এবং সেখান থেকে সংখ্যার অধিকাংশকে পূর্ণ স্বদেশী হতে হবে। হাতে কাটা সুতোয় এবং হাতে বোনা বস্ত্র পরতে হবে এবং অসহযোগের অন্যান্য শর্তগুলি বিশ্বাস করতে অথবা কার্য্যে দেখাতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে আইন অমান্যকারী সাধারণ তহবিল থেকে ভরণপোষণের আশা যেন না রাখে। এবং দণ্ডপ্রাপ্ত আইন অমান্যকারী পরিবারের লোকেরা তুলো পেঁজা, সুতো কাটা বা হাতে কাপড় বোনা বা অন্য কোন উপায় দ্বারা তাদের ভরণ-পোষণ করবে আশা করা যায়।

আরও প্রকাশ থাকে কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আবেদনক্রমে ওয়ার্কিং কমিটী আইন অমান্যের সর্ত শিথিল করতে পারবে যদি কমিটী অনুসন্ধান দ্বারা সন্তুষ্ট হয় যে এই সর্ত পরিত্যাগ করা উচিত।

পরদিনও অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হল সেদিন এক প্রস্তাব দ্বারা সামরিক অথবা অসামরিক কর্মচারীদের সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হল। ঐ প্রস্তাবে বলা হল যে কমিটী প্রকাশ করছে যে গভর্ণমেণ্টের সামরিক অথবা অসামরিক কর্মচারীদের চাকুরি ত্যাগ করার ঔচিত্য বা অনৌচিত্য সম্বন্ধে মত দেওয়া এবং প্রকাশ্য ভাবে ঐ সকল কর্মচারীদের গভর্ণমেণ্টের, যে গভর্ণমেণ্ট ভারতের জনগণের বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠের আস্থা ও সমর্থন হারিয়েছে—সেই গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের জন্য আবেদন করার মৌলিক অধিকার আছে।

মৌলানা হজরত মোহানী কোন একটি বিশেষ স্থানে আইন অমান্য আরম্ভ করায় বিপদের প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে তাতে সেই বিশেষস্থানে শক্তি কেন্দ্রভূত করে আইন অমান্য দমন করার সুযোগ গভর্ণমেণ্ট পাবে। যুগপৎভাবে দেশের সর্বত্র আইন অমান্য আরম্ভ না করলে কোন লাভ হবে না।

স্থির হল গুজরাটের সুরাট জেলার বারদৌলিতে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আরম্ভ করবেন।

আরও স্থির হল যে ১৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার হিজ রয়েল হাইনেস প্রিন্স অব ওয়েলসের, বোম্বাই বন্দরে অবতরণের দিন সমস্ত দেশে হরতাল পালিত হবে। কোন প্রকার অসৌজন্য প্রকাশের জন্য এই হরতাল হবে না। আমলাতান্ত্রিক শাসনে ভারতের জনগণের দুঃখ দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই হরতালের উদ্দেশ্য।

নির্দিষ্ট দিনে কলিকাতায় পূর্ণ হরতাল হল। হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতিকে পর্য্যন্ত পদব্রজে কোর্টে আসতে হয়েছিল, বিচারপতি চট্টোপাধ্যায় মশায় ধুতি পরে হেঁটে কোর্টে এসেছিলেন। অধিকাংশ উকিল ব্যারিষ্টার অনুপস্থিত ছিলেন। হরতালের দিন কলকাতায় কোন গোলমাল হয়নি।

বোম্বাইতে হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারেনি। সহরের উত্তর প্রান্তে গুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়।

হরতালের পরদিন বাংলা গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ স্বেচ্ছাবাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করল।

বোম্বাইয়ের অশান্তির জন্য মহাত্মা পরাজয় স্বীকার করে আইন অমান্য স্থগিত রাখলেন এবং ১৯শে নভেম্বর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনশন আরম্ভ করলেন। ২৩শে

নভেম্বর বোম্বাইয়ের নেতাদের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন।

যুবরাজের প্রতি অসম্মান ভারত গভর্ণমেন্ট নীরবে সহ্য করল না, দেশের সর্বত্র দমননীতি অবলম্বন করে ধরপাকড় আরম্ভ হল।

৩রা ডিসেম্বর লাহোরে পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিসে হানা দিয়ে লালা লাজপত রায় ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

কলকাতার বিখ্যাত প্রসিদ্ধ বক্তা অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠান হল।

৭ই ডিসেম্বর বড়বাজার অঞ্চলে শোভাযাত্রা-পরিচালনার সময় কয়েকজন মহিলা সহ শ্রীমতী বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হন। এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে সহরের সর্বত্র ছড়িয়ে গেল এবং জনগণের বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। এই অভূতপূর্ব কাজের জন্য তদানীন্তন গভর্ণরের এক্‌জিকিউটিভ কউন্‌সিলের সদস্য মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রতিবাদস্বরূপ লাট সাহেবের ভোজনসভা ত্যাগ করে গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন।

৮ই ডিসেম্বর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে গ্রেপ্তার করে ৬ মাসের জন্য তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করা হল।

ঐ তারিখে কলকাতায় লাটভবনে গভর্ণর লর্ড রোনালডসের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার হয়। তার দুদিন পরে ১০ই ডিসেম্বর যখন দেশবন্ধু বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সঙ্গে তাঁর গৃহে চা-পান করছিলেন তখন তাঁরা উভয়েই গ্রেপ্তার হন। তারপর মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি অন্যান্য বাংলার নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হল।

১২ ই ডিসেম্বর দিল্লীর অন্যতম নেতা আসিফ আলী এবং ১৪ই ডিসেম্বর মাদ্রাজের অন্যতম নেতা চক্রবর্তী রাজাগোপালচারীও গ্রেপ্তার হলেন।

এইসকল ঘটনার মধ্যে আগামী আমেদাবাদ কংগ্রেসের প্রস্তুতি পর্ব চলছিল।

আমেদাবাদে কংগ্রেসের জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন বল্লভভাই প্যাটেল।

সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতিপদের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাম সুপারিশ করে।

১৯শে নভেম্বর অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাম সভাপতিপদের জন্য চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবন্ধু দাশের স্থলে নূতন সভাপতি নির্বাচন জন্য ২৪ ডিসেম্বর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভা আহুত হয়, সেই সভায় অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন দিল্লীর প্রসিদ্ধ হাকিম আজমল খাঁ।

এই সকল ঘটনার সময় সপরিষদ বড়লাট কলকাতায় এলেন। বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের এক ডেপুটেশান ২১ শে ডিসেম্বর বড়লাট সাহেবের নিকট যায়। ঐ ডেপুটেশনের সদস্য ছিলেন মাদ্রাজের স্যার বিশ্বেশ্বরায়া। শেষাদ্রী আয়ার ও শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, বোম্বাইয়ের লালজী-নারায়ণজী ও যমনাদাস দ্বারকাদাস, বাংলার স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, ফজলুল হক, আবুল কাসেম ও ঘনশ্যামদাস বিড়লা, বিহারের সৈয়দ হাসান ইমাম্, যুক্তপ্রদেশের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু ও পাঞ্জাবের ভাগবৎ রাম।

এই সময় মালব্যজী ভাইসরয়ের সঙ্গে একটা 'গোল টেবিল' কনফারেন্সের আয়োজনের জন্য তিনি জেলে গিয়ে দেশবন্ধু দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা সকলেই গোল টেবিলে মিলিত হতে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীজীর সম্মতিই আসল। পরিকল্পনার সমস্তটাই নির্ভর করছিল মহাত্মা গান্ধীর উপর।

গান্ধীজী কলকাতায় ২১ ডিসেম্বর আসেন, তিনি মালব্যজীকে জানালেন প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের

সদস্যদের নাম তাঁকে না জানালে তিনি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রেখে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারবেন না।

গান্ধিজী কলকাতার নাগরিকদের ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজের আগমন উপলক্ষে হরতাল পালনের জন্য আহ্বান করলেন।

ইতিমধ্যে মহাত্মা আগামী জানুয়ারী মাসে আইন অমান্যের জন্য গুজরাতকে প্রস্তুত হতে বললেন। যদি বারদৌলি এবং আনন্দ গণ-আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত না হয় তা হলে ব্যক্তিগত আইন অমান্য করা হবে।

[২]

এই পটভূমিকায় আমেদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অধিবেশনের তারিখ স্থির হয়েছিল ২৭শে ডিসেম্বর।

এবারকার কংগ্রেসের গুরুত্বের জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখের কয়েকদিন আগে থেকে নেতাগণ আমেদাবাদে উপস্থিত হতে লাগলেন। ২১শে ডিসেম্বর নির্বাচিত এ্যাকটিং সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ, দিল্লীর অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা ডাঃ আনসারীকে সঙ্গে নিয়ে আমেদাবাদ ষ্টেশনে রাত্রিকালে অবতরণ করে ষ্টেশনের বিশ্রাম-কক্ষে অবস্থান করেন। ঠিক হয় যে পরদিন প্রাতঃকালে মুসলীম লীগের নির্বাচিত সভাপতি মৌলানা হসরত মোহানী পৌঁছুলে উভয়কে একসঙ্গে শোভাযাত্রা করে তাঁদের জন্য নির্ম্মিত বাসগৃহে নিয়ে যাওয়া হবে।

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে গত ১৯১৬ সাল থেকে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের অধিবেশন একই স্থানে একই সময়ে হয়ে আসছে।

২২শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে হসরত মোহানী, বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছোটানী সাহেব, সরলা দেবী চৌধুরাণী, এন্‌, সি, কেলকার ও করান্দিকরসহ আমেদাবাদ পৌঁছুলেন।

কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল এবং অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আব্বাস তায়েবজী কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সভাপতিদ্বয়কে পুষ্পমাল্যে শোভিত করে ষ্টেশনের গেটের বাইরে নিয়ে গেলেন। ষ্টেশনের প্রবেশদ্বার (গেট) খদ্দরের উপর অঙ্কিত মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিকৃতি ও পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল।

ষ্টেশনের গেটের বাইরে অপেক্ষমান গাড়ীতে করে শোভাযাত্রা সহকারে সভাপতিদ্বয়কে নিয়ে যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল খদ্দরের ইউনিফরমে এবং "ঈশ্বর ও দেশের জন্য" গুজরাতি অক্ষরে ছাপা ব্যাজে শোভিত স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং মঙ্গল বনিতা আশ্রম ও গুজরাত বিদ্যাপীঠের ৮০ জন খদ্দরপরিহিতা মহিলা। সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে শোভাযাত্রা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় প্যাণ্ডেলের নিকট কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী অফিসের নিকট পৌঁছয়। সেখান থেকে নিকটস্থ মোসলেম নগরে হাকিম আজমল খাঁ, ছোটানী ও ডাঃ আনসারীকে তাঁদের জন্য নির্ম্মিত গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী সবরমতী আশ্রম ত্যাগ করে খাদি নগরে তাঁর জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত কুটীরে উঠে এলেন।

বাংলার প্রতিনিধিদের একদল ২২ শে ডিসেম্বর দিল্লীর পথে আমেদাবাদ রওনা হন। আমি যদিও তখন কলিকাতাবাসী তথাপি পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে সেই দলে যোগ দেই। আমেদাবাদের হীরালাল মেহেতো ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে কলকাতায় বাস করতেন। তিনি কলকাতা করপোরেশনের কংগ্রেস পক্ষের কাউনসিলার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

আমরা দিল্লীতে গাড়ী বদল করে মিটার গেজ ট্রেণে

আমেদাবাদ রওনা হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ আমেদাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছুলাম। উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকগণ বাংলার অন্যান্য প্রতিনিধিদের খাদি নগরে নিয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে কলকাতা থেকে রাজসাহীর শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী নামে একটি যুবক কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছিল। সে অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে না গিয়ে আমার সঙ্গী হল। হীরালালবাবুর বাড়ীতে তাকে নিয়ে যাওয়া দৃষ্টিকটু হবে বলে তাকে আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেও তাকে নিরস্ত করতে পারলাম না। কাজেই তাকে সঙ্গে নিতে হল। আমরা একটা টাক্সী ভাড়া করে হীরালালবাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে পৌঁছলাম। হীরালালবাবু সস্ত্রীক কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমেদাবাদ এসেছিলেন। তাঁরা এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গিয়ে একটি ঝুলন্ত দোলনায় বসতে দিলেন। এ এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। আমরা এভাবে বসতে কখনই অভ্যস্ত হইনি বা এভাবে অভ্যর্থনাও কোথাও দেখিনি। পরে দেখেছিলাম যে আমেদাবাদের ঘরে ঘরে দোলনা ঝুলছে এবং মেয়ে-পুরুষ অবলীলাক্রমে দোলনায় বসে দুলে দুলে বিশ্রাম করছে। রাস্তায় গাছের ডালে ঝোলান দোলনায় তরুণীদের দোল খেতে দেখেছি।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গৃহকর্ত্তা আমাদের আহ্বান করে খাওয়ার জন্য রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। খাবার-ঘরেও একটি দোলনা ঝুলতে দেখলাম। একজন তরুণী তখন দোল খাচ্ছিল।

আমাদের বসবার জন্য পাতা পিঁড়ির সামনে একটি করে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পিঁড়ি রক্ষিত ছিল। আমাদের বসার পর সেই সামনের পিঁড়ির উপর থালায় খাবার রাখা হল। অবশ্য সমস্তই নিরামিষ। সমস্ত ভারতের মধ্যে গুজরাত হিন্দুদের মত নিরামিষাশী আর কোথাও নেই। এখানে নিয়ম মিষ্টি থাকলে প্রথমে মিষ্টি, তারপর পর্য্যায়ক্রমে ভাত, ডাল, তরকারি পরে ফুলকা এবং অনুরূপ ডাল তরকারি পুনরায় ভাত এবং ফুলকা খেতে দেয়।

আহারের পর আমরা শয়নকক্ষে গিয়ে বিশ্রাম করলাম।

ক্রমশঃ

চিন্তার সংকট

সুশীতল দত্ত

সমগ্র দেশ একটা অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক-অস্থিরতার মধ্যে আজ আবর্তিত হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আর সমাজজীবন আজ নৈরাশ্যে ভরা। আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি মানুষের আস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, ছাত্র-সমাজ ও যুবসমাজে এসেছে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অপরাধপ্রবণতা। এর থেকে সমাজজীবনে এসেছে রিক্ততা আর এরই ফলে বিভিন্ন সমস্যা সমাজ ও দেশকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার কোন প্রতিকার না হ'লে দেশের উন্নতি ও প্রগতি ব্যাহত হবে। এসত্যকথা টুকু বর্তমান নেতারা সঠিক অনুধাবন করতে পারছেন বলে মনে হয় না। বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এগুলির সৃষ্টি একদিনে হয়নি। নেতৃত্বের ধোঁয়াটে চিন্তা ও সত্যাবিমুখতার ফলস্বরূপ ঐ সব সমস্যা আত্মপ্রকাশ করেছে। আর এই সত্যাবিমুখতা এসেছে মানসিক দৈন্য থেকে। জাতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি হয়েছে কুয়াশাচ্ছন্ন। আমাদের ধারণা জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে চিন্তার সংকট দেখা দিয়েছে সেই ১৯৪৬।৪৭ সাল থেকেই—যেদিন অখণ্ড ভারতের উপাসকরা খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নিয়েছে। মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্বের ভারত-বিভাগের দাবীকে উপেক্ষা ও বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্রুক্ত অবনতিতে জাতীয় নেতারা উৎকণ্ঠিত হলেন, আর সেই উৎকণ্ঠা তাঁদের স্বচ্ছ চিন্তাধারাতে এনে দিল বিভ্রান্তি যার পরিণতিতে, এলো দেশ-বিভাগের স্বীকৃতি। ক্রুরবুদ্ধির কাছে শুভ বুদ্ধির হল পরাজয়, তবু প্রচারিত হলো দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করিনা। অস্বীকার করার বিভ্রান্তিকর রটনা। এই দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ মেনে নিলেন জাতির নেতৃত্ব যাঁদের হাতে। ঠিক হলো পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ হবে ১৯৪৫ সালের নির্বাচিত আইনসভার সদস্যদের ভোটে আর সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে গণভোটে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে তখনকার সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলীম লীগ আর হিন্দুরা কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছিল। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের মুসলমানরা সংখ্যাধিক্য, আইনসভাগুলিতে ও তথৈবচ। সুতরাং এদের দুই প্রদেশ বিভক্ত হলো। কিন্তু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলার বেলায় চিন্তা এসে আবার দ্বিধাগ্রস্ত হলো। সীমান্ত প্রদেশে ১৯৩৭সন থেকেই সীমান্ত গান্ধীর দল আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এরা অখণ্ড-ভারতের উপাসক ও কংগ্রেসে অনুগত। সুতরাং সেখানে ব্যবস্থা হলো গণভোটের। সেখানে কিন্তু আইনসভার সদস্যদের মত নেওয়া হলোনা। সীমান্ত গান্ধী তাঁর কংগ্রেস-সহকর্মীদের মত ফেরাতে পারেন নি, কংগ্রেস তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন না। তিনি তখন গণভোট বাধ্য হয়ে বয়কট করলেন, সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্থানের কুক্ষিগত হলো। কংগ্রেস যদি গণভোটে সীমান্ত গান্ধীকে সাহায্য করতো তাহলে গণভোটের ফল বিপরীত হতে পারতো। তেমনি আসামের বাংলাভাষাভাষী শ্রীহট্ট জেলাকে গণভোটে দেওয়া হল। ভোটের কারচুপি ও তখনকার অসমিয়া নেতাদের দূরদৃষ্টির অভাবে শ্রীহট্ট জেলাকে পাকিস্থানে দেওয়া হলো। আর সেই নেপথ্য ঘটনার অন্তরালে আসামের তদানীন্তন নেতৃত্বের দেউলিয়াপনার কথা পুরানোদিনের অনেকেই জানেন। এর থেকে প্রমাণিত হবে নেতারা মুখে এক কথা বলেছেন আর কাজে করেছেন অন্যরকম। আদর্শের সঙ্গে আপোষ

করেছেন। সত্যের মুখোমুখি হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলেছেন।

এই দেশ-বিভাগের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগ করে সীমান্ত পার হ'য়ে এসেছেন যাঁদের সঠিক পুনর্বাসন আজও হয়নি। পশ্চিমে দেখেছি কিছুটা পুনর্বাসন হয়েছে, কিন্তু পূর্বপ্রান্তে যা হয়েছে তা নৈরাশ্যজনক।

পুনর্বাসনে যে মানবিক চিন্তার ও কল্যাণকর সাধনার প্রয়োজন মুখ্য ছিল তাকে অবহেলা করে তার সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। প্রাদেশিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধিকে সামনে রেখেছে যার ফলে উদ্বাস্তু বাঙ্গালী দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে আজও যারা শান্ত হতে পারেনি আজও উদ্বাস্তুরা ভারতের একটা বিরাট সমস্যা। সমাজের একটা অংশ অশান্ত থাকলে সমাজ কখনও শান্ত থাকতে পারে না। কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থার মূলেও স্বচ্ছ চিন্তাধারার অভাব। আমাদের সৈন্যদের তাড়া খেয়ে পাকিস্থানীরা পালাচ্ছে। জয় যেখানে হাতের কাছে, আমরা ধর্ণা দিলাম রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে।

সেই নালিশের বিচার আজ উনিশ বৎসরেও ফয়সালা হয়নি। ভারতবর্ষ সেজন্য খেসারত দিচ্ছে। এখানে শান্তির নামে অশান্তিকে ডেকে আনা হয়েছে। কাশ্মীর ভারতের অংশ কারণ—কাশ্মীর গণপরিষদ ভারতভুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেছে ও ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। সহজ সত্যকে প্রচার না করে আমরা নানা বিভ্রান্তির কাজ করেছি যার ফলে সমস্যা হয়েছে জটিল।

আসামের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী জাতীয় নেতৃত্ব; যাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছে বর্তমান অহমিয়া নেতৃত্বের স্বৈরতন্ত্রী ধ্যানধারণায়। স্মরণাতীত কাল থেকে আসামে বহু খণ্ডজাতীয় লোক বাস করে আসছে।

প্রায় বিশ-বাইশ লক্ষ বাংলাভাষাভাষী লোক বাস করছেন সেখানে। আর অসমীয়াভাষাভাষী লোকেরা যাঁরা আসামের উপর মাতব্বরী দাবী করেন তাঁরা আসলে সমগ্র আসামের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। আজ স্বাধীন নাগারাজ্যের দাবীতে নাগা অধিবাসী অঞ্চলে একটা অস্থিরতার ভাব চলেছে, যার প্রভাব আস্তে আস্তে সমগ্র আসামকে করে তুলেছে একটা আগ্নেয়গিরির মত। যার স্ফুলিঙ্গ যে-কোনো সময় সমস্ত আসামের সংহতি নষ্ট করে দিতে পারে। আজ আবার স্বতন্ত্র খাসিয়া ও লুসাইয়ের দাবী জোরদার হয়ে উঠেছে। তারপর আসামের উত্তর সীমান্তে আছে হলদে নেকড়ের দল, তিনদিকে পাকিস্থানের শ্যেনদৃষ্টি, আর ভিতরে বিভেদপন্থীর দল।

অথচ প্রথম দিক থেকে অসমীয়া নেতারা যদি দৃষ্টিতে স্বচ্ছ ও আকাঙ্খায় সংযত হতেন, আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি সাহসের সঙ্গে সমস্যার মোকাবিলা করতে পারতেন তবে বর্তমান অবস্থার উদ্ভব হতো না।

বর্তমানে সমস্যা হয়েছে সুকঠিন। আর সমাধান হয়ে উঠছে দুরূহ। সহজ সত্যকে স্বীকার করে পরস্পরের অবিশ্বাস দূর করতে পারলে যে আসাম হতে পারতো উন্নত আর প্রগতিশীল সীমান্তরাজ্য, সে আসাম আজ সমস্যায় ভরা শান্তিব্যাহত ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ। সাম্প্রতিক যে বিশৃঙ্খলতা দেখা গেল তার পরিণতি ভয়াবহ এবং এর ফলে বিপর্য্যয় যদি আসামে ঘটে তবে তার প্রতিক্রিয়া হবে সমগ্র বাংলায় ও ভারতে। সমগ্র আসামের অবস্থা এমন যায়গায় এসে পৌঁছেছে যে আসামের বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্র রক্ষা করা একটা কঠিন ব্যাপার। ইতিমধ্যে আসামের পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বারকয়েক প্রস্তাব নিয়েছেন কিন্তু কোন প্রস্তাবই বিবদমান পক্ষগুলির কাছে গৃহীত হয়নি। আমরা মনে করি নাগা, খাসিয়া, লুসাই, কাছাড় ও অসমীয়াভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে গোষ্ঠী ও ভাষার ভিত্তিতে পুনর্বণ্টন করে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে রাখার প্রস্তাব ভারতীয় একতা ও স্বাধীনতার স্বার্থে সকল পক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হতে পারে।

বর্তমানে ত্রিপুরা ও মণিপুরের মত ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে, তাঁরা সকলে স্বয়ংশাসিত ইউনিট হয়ে একজন রাজ্যপাল ও একটিমাত্র হাইকোর্টের অধীনে

থাকবেন। আমাদের ধারণা এমন একটি প্রস্তাব তাঁদের কাছে রাখা উচিত। আশা করি এই প্রস্তাব সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। সকলের স্বাতন্ত্র ও আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হবার সুযোগ আসবে, এবং এতে আসাম তথা জাতীয় একতার ভিত্তি সুদৃঢ় হবে।

সর্ব্বভারতীয় ভাষা নিয়ে আজ যে তাণ্ডব নৃত্য দেশ জুড়ে চলছে—আর তার উপরে বন্দুক দাগাতে হচ্ছে প্রশাসনিক কর্ত্তাব্যক্তিদের, তার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। ধর্মের ভিত্তিতে ও যুগ-প্রয়োজনে ব্রিটিশ আমলেও আমাদের মধ্যে যে একতা ছিল স্বাধীনতার পর যাকে আমরা সেদিনও Emotional Integrity বলে গর্ব অনুভব করেছি—আজ আন্দোলনের ফলে ভারতের সেই সংহতি ও শক্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং ভারতবর্ষ বহুধা বিভক্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই প্রবণতা যদি সাহসের ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করা না হয়।

মূঢ়তা যদি দেশাত্মবোধকে আচ্ছন্ন করে তা'হলে দেশ বিভক্ত হবে ও দূর্বল হবে। অথচ সংবিধানে বর্ণিত দেশের যে চোদ্দটী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, গত উনিশ বৎসরে তাদের উন্নতি করার জন্য উপযুক্ত মনোনিবেশ করা হয়নি। হিন্দীপ্রেমিকেরা সমগ্র ভারতে হিন্দী ভাষা চালানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন অথচ অন্য ভাষাভাষী রাজ্যের জনসাধারণের কথা ভাবতে পারছেন না বা ভাবছেন না। ভোটের জোরে স্বৈরতন্ত্রী ভাবধারণার বশবর্ত্তী হয়ে সমগ্র ভারতে হিন্দী ভাষা চাপাতে উন্মত্তের মত সমস্ত দেশে একটা অবিশ্বাসের ঘন ছায়া জনমানসে এনে দিয়েছেন যার ফলে দক্ষিণ দেশে এসেছে বিক্ষুব্ধ জনমানসের ক্রোধের আগুন যে আগুন পোড়াতে পারে সমগ্র দেশের শান্তি। অথচ দেশের রাজনৈতিক নেতারা আজও গোষ্ঠিগত ও আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর সমাধান করার প্রয়াস করছেনা। আর দেশে যে আন্দোলন হচ্ছে তার পুরো-ভাগে আছেন ছাত্রসম্প্রদায় ও চাকুরীপ্রার্থী যুবকের দল, দেশের অগণিত জনসাধারণের এ নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই।

একটী মাত্র ভাষাকে যোগাযোগরক্ষাকারী ভাষারূপে রাখতে হবে বলে যে দাবী তা অযৌক্তিক, আবার তেমনি ইংরাজীকে রাখার যে দাবী তার পিছনে কোন নৈতিক সমর্থন নেই। কারণ দীর্ঘকাল আমরা একটা বিদেশী ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্য্যাদা দিয়ে রাখতে পারি না। সুতরাং আমাদের মতে সংবিধানে স্বীকৃত চৌদ্দটী ভাষাকেই সমমর্য্যাদা দিয়ে রাজ্যগুলিকে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষার প্রসার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া উচিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শেখার জন্য ইংরাজী তত দিন থাকুক যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের ভাষায় সে সব লেখা ও অধ্যয়ন সম্ভব না হয়। আর ইংরাজী ও হিন্দীকে যোগাযোগকারী ভাষা হিসাবে চলতে দেওয়া হউক, আর দেওয়া হউক আঞ্চলিক সব ভাষাকেই সংসদে ব্যবহারের স্বীকৃতি ও সুযোগ।

আঞ্চলিক ভাষাগুলি উন্নত হলে দেশের বর্তমান উত্তাপ প্রশমিত হবে। সকলের মধ্যে বিশ্বাস ও একতার ভাব জাগ্রত হবে। এবং কালক্রমে আমরা সকলে মিলেমিশে ও সকলের সম্মতিতে ইংরাজীকে বিদায় দিতে পারবো—আমাদের ভাষা সমস্যায় জর্জ্জরিত হওয়ার কোন প্রয়োজন হবে না। ধৈর্য্য প্রজ্ঞা আর মননশীলতার অধিকারী না হলে কোন সমস্যা সমাধান করা কঠিন। স্বাধীনতা লাভের আগে দেশে যে একতাবোধ জাগ্রত ছিল, আদর্শলাভে যে সুকঠিন প্রতিজ্ঞা ছিল, স্বজাত্যবোধ যে প্রবল ছিল, স্বাধীনতা-লাভের পর সে সব বৃত্তি নষ্ট হলো কি কারণে তা' আজ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের জন্য যে প্রেরণায় ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদসম্পন্ন ব্যক্তি একত্রে কাজ করেছেন, স্বাধীনতা-লাভের পর সে প্রয়োজনবোধ ম্লান হয়ে পড়ায় ও নেতৃত্বের বন্ধ্যাত্ব আশায় বিভিন্ন দল ও দলনেতা আত্মপ্রকাশ করেছেন। এর কারণ আদর্শরূপায়ণে মতপার্থক্য, ব্যক্তিগত নেতৃত্বলাভের স্পৃহা আর স্বার্থান্বেষী লোকের নেতৃত্বপদে অনুপ্রবেশ। যারফলে সমআদর্শের লোকেরা পর্য্যন্ত একত্রে কাজ করতে

পারছেন না একটা সৈরতন্ত্রী ভাবধারা সমস্ত রাজনৈতিক গগনকে করেছে আচ্ছন্ন, চতুর্থ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে বিভিন্ন রাজ্যে দলত্যাগের ফলে কয়েকটী রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা আত্ম-প্রকাশ করেছে। দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট হবার উপক্রম হচ্ছে। আর মানুষের মনে এসেছে সর্বগ্রাসী নৈরাশ্য এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থিক অনিশ্চয়তা। কৃষিভিত্তিক দেশে কৃষির প্রতি যতটুকু দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, যোজনা-কমিশন সেদিকে ততটুকু দৃষ্টি দেননি পরন্তু ভারী শিল্পের দিকে নজর দিয়েছেন বেশীকরে কিন্তু এ-গুলির রূপায়ণে যে মেধা ও কল্যাণ-বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল কার্য্যত ততটুকু পাওয়া যায়নি। আর যে ফললাভ এ-সব থেকে পাওয়া যাবে তা আসবে কয়েক বৎসর পরে সেসময় পর্য্যন্ত বুভুক্ষু মানুষ ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবে না। জীবনধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান তার চাই এবং এখনই চাই। রাজনৈতিকক্ষেত্রে পুরাপুরি সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে কুণ্ঠা ছিল আর এই কুণ্ঠা স্বাভাবিক আর বর্তমান প্রগতির যুগে মৃতপ্রায় ধনতন্ত্রের উপরও আস্থা রাখা সম্ভব নয়। তারই সঙ্গত ফলরূপে Socialistic pattern of societyর প্রতিষ্ঠাকেই আমাদের রাজনৈতিক আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। উপযুক্ত সততার সহিত এ-ব্যবস্থা অনুসৃত হওয়া উচিত। পুরানো ধনতন্ত্র বা তিনশ' বৎসর আগেকার সমাজতন্ত্রের মতবাদ আজকের দিনের আরো উন্নত সমাজব্যবস্থার পক্ষে উপযুক্ত নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থ-নীতিকে স্বীকার করা হয়েছে আদর্শের দিক থেকে ভাল, আগামীদিনের উন্নত সমাজ তাকে গ্রহণ করবে সাদরে কিন্তু ভারতের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে তার বর্তমান অবস্থায় বিড়ম্বনা বাড়াবে মাত্র। দেশের মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজকল্যাণ যাঁদের চিন্তায় গৌণ; রাজনৈতিক হানাহানিতে প্রশাসন যেখানে দুর্বল, সেখানে বিড়ম্বিত হচ্ছে দেশের জন-সাধারণ।

মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে জীবনের সর্বস্তরে যে নৈরাশ্য ও বিশৃঙ্খলা এসেছে তার মূলে আছে নেতৃত্বের বিড়ম্বনা।

স্বাধীনতালাভের পর আমাদের ছাত্রসমাজের কাছে ও যুবসমাজের কাছে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কোন আদর্শ-বাদী নেতৃত্বের আবেদন নেই। জাতীয় সংগ্রামের গৌরবময় দিনের উজ্জ্বল ইতিহাস ও আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিভার যে স্ফুরণ হয়েছিল সেই বস্তু বা কথা তাদের চোখের সামনে ধরে রাখবার প্রচেষ্টা নেই। যে আধ্যাত্মিকতা ছিল আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র, যে ধর্ম এনেছিল আমাদের একতাবোধ; তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা একান্তভাবে ঝুঁকে পড়েছি বিজ্ঞান ও তান্ত্রিকতার দিকে। বেদ ও উপনিষদের নির্দেশিত পথ ছেড়ে আমরা অতি মাত্রায় পাশ্চাত্যের পথে চলেছি। যে পাশ্চাত্য জীবনের সুখ ও শান্তির জন্য পথ খুঁজে আমাদের বেদ আর উপনিষদে।

গান্ধীর জীবনাদর্শ ও গান্ধীবাদ নিয়ে সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন আলোচনা না হওয়ার ফলে দেশের যুবসম্প্রদায় কার্ল মার্কসের ও মাওবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর এর পিছনে আছে প্রচার, রাষ্ট্রীয় অর্থানুকুল্য আর নিষ্ঠাবান কর্মীর দল। অথচ মূলতঃ গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদ প্রায় একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত। ব্যতিক্রম উদ্দেশ্যলাভের প্রকৃতি নিয়ে আর গান্ধীবাদের ভিত্তি হলো আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মীয় অনুশীলনের উপর যা ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টীর সঙ্গে সমানভাবে প্রবাহিত।

হিংসা ও অকল্যাণের পথকে শ্রেয়রূপে গ্রহণ না করে কল্যাণ ও শান্তির পথে সুস্থ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় যদি দেশের নেতারা এখন সততার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারেন আর সমস্ত প্রশাসনযন্ত্রকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করে সমাজকল্যাণের প্রতি নিয়োজিত করতে পারেন তা'হলে দেশের নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের ভাব তিরোহিত হবে। শান্তি ও প্রগতির পথের সন্ধান মিলবে। আর এ-জন্য চাই চিন্তার সংকটমোচন ও নির্মল চিন্তা।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীর চন্দ্র রাহা

(১)

ছোট বেলায় গাঁয়ের স্কুলে অভয় যখন পড়ত, তখন ক্লাশে তীর্থপতি মাষ্টার বাংলা বই পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন—দেখরে, যদি বড় হতে চাস, তবে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনটা নদীর মত। দুর্নিবার বেগে সামনের দিকে শুধু এগিয়ে যেতে হবে। তীর্থপতি মাষ্টারের কথার মাঝেই অভয় প্রশ্ন করেছিল—কোথায় যেতে হবে স্যার ?

—কেন, কালা নাকিরে তুই ? শুনতে পাসনে। এগিয়ে যেতে হ'বে—শুধু চলতে হ'বে—থামলে চলবে না। বইখানা খুলে তীর্থপতিবাবু আবার পড়াতে সুরু করছিলেন, কিন্তু আবার হল প্রশ্ন। এবার কিন্তু তীর্থপতিবাবু রেগে গেলেন।

অভয় প্রশ্ন করল—এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কোথায় স্যার—তীর্থপতিবাবু নিজের টাক মাথা চাপড়ে চীৎকার করে বললেন—অন্য কোথাও না। আমার মাথায়—মাথায়—। এমন বোকচন্দর আর দেখিনি বাবা। ক্লাস-শুদ্ধ ছেলে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। টেবিলের ওপর বেতগাছটা সশব্দে আছড়িয়ে তীর্থপতিবাবু হাঁকলেন, এইও চুপ চুপ। ক্লাস নিস্তব্ধ হল। কিন্তু অভয়ের চিন্তা স্তব্ধ হল না। এগিয়ে যেতে হবে কোথায় ? মনের মধ্যে বার বার ধ্বনিত হতে লাগল—তাকে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কথাটা ঠিক বুঝল না। মাষ্টারমশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, অভয় আর প্রশ্ন করতে সাহস করল না। অভয় এতে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। মাষ্টারমশাইরা তো পড়াবার জন্যেই স্কুলে আসেন। আর পড়াবার জন্যেই তো মাইনে পান। কিন্তু—কিন্তু এ হয় কেন ?

একবারের বেশী দুবার প্রশ্ন করলে, ওঁরা তেড়ে মারতে আসেন কেন ? ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাস ছাড়েন বটে, কিন্তু তারপর আর দেখা নাই। লাইব্রেরীর ঘরে বসে বিড়ি টানতে টানতে খালি গল্পই করেন।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে অভয় ভাবতে থাকে, এগিয়ে যেতে হবে। তাকে এগিয়ে যেতে হ'বে—

অনেকদিন পর বড় হয়ে ছোটবেলার এই কথাটা অভয় ভাবত। অভয়দের গাঁয়ের নাম পলাশপুর। এই গাঁয়েতেই অভয়ের জন্ম। এই গাঁয়ের চৌধুরীবাবুরা খুব ধনী আর গাঁয়ের জমিদার। কিন্তু সারা বৎসর ওঁরা কলকাতাতেই থাকেন। গাঁয়ের এতবড় বাড়ীতে শুধু মাত্র চাকর, দারোয়ান, নায়েব গোমস্তরাই বাস করে। একমাত্র আশ্বিন মাসে যখন দুর্গোৎসব হয়, তখন দিন-কয়েকের জন্য ওঁরা দেশের বাড়ীতে আসেন। সেই সময়ে গাঁয়ের শ্রী যেন কিছুটা ফিরে যায়। ছোটবেলার সেই-সব সুখকর স্মৃতি: বড় হয়ে আজ যেন অভয় সব দেখতে পায়। বর্ষা বিদায় নিয়েছে। আকাশে সেই কালো কালো ভারী মেঘ আর নেই। এখন সাড়া নীল আকাশে, সাদা সাদা মেঘগুলো—অকারণে ব্যস্ত হয়ে হালকা তুলোর মত অজানা দেশে ভেসে যাচ্ছে। সোনার মত শরতের আলো,—জলে স্থলে ছড়িয়ে পড়েছে। পুকুর খাল বিল জলে টলমল করছে। ওদিকে বিস্তারিত ধান ক্ষেত। যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু সবুজ ধানের চারা, বাতাসে দুলে দুলে এর ওর গায়ে

পড়ছে। বনে বনে—গাছে গাছে নানান পাখী খুসীতে শিষ দিচ্ছে—ডাকাডাকি করছে। এ পাড়া—ওপাড়ায় পূজার বাজনা বাজছে। গ্রামের দূর রেল-ষ্টেশন থেকে, ইঞ্জিনের শব্দ আর বাঁশী বাতাসে ভেসে আসছে। কলকাতার গাড়ী। সকলেরই আত্মীয় স্বজন ফিরে আসছে নিজ নিজ ঘরে। গ্রাম্য রাস্তার দুইপাশে আম-বাগান। শান্ত—স্নিগ্ধ। কোথাও বা রাস্তার ধারে ধারে শিউলি ফুলের গাছ। সারা মেঠোপথ, সাদা ধপধপে শিউলি ফুল ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। নির্জ্জন—শান্ত গ্রাম। ছায়াঢাকা—পাখীডাকা। লোকের কোলাহল কম। কর্কশ শব্দ—বা বিজাতীয় কোনও কর্কশ কণ্ঠের কথা নাই। গোয়ালারা ব্যস্ত হয়ে কাঁধে দুধের বাঁক নিয়ে চলছে। চলছে রাখালবালকেরা গরুর পাল নিয়ে। হাটুরেরা মাথায় শাকসব্জী আর তরকারীর বোঝা নিয়ে হাটের উদ্দেশ্য ছুটছে। মন্দিরের মাঝ থেকে, মাঝে মাঝে ভেসে আসে ঘণ্টা আর শাঁখের শব্দ। পুরোহিতমশাই গায়ে নামাবলী জড়িয়ে, সংস্কৃত শ্লোক বলতে বলতে, যজমানের বাড়ীতে চলেছেন। পশ্চিমবাংলার পল্লীর এই অপরূপ সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও খুঁজে পাওয়া শক্ত। পশ্চিমবাংলার এই অংশটা বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণভাগে। প্রাচীনকালে এই দেশকে গৌড় বলা হত। পশ্চিমবাংলা মুখ্যত তখন চারি অংশে ভাগ ছিল। গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় আর পুণ্ড্র। পলাশপুর গ্রামটি দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যে। রাঢ় দুইভাগে বিভক্ত। একটি উত্তর রাঢ় অন্যটি দক্ষিণ রাঢ়। ইতিহাসের কথা আমরা জানি। এই গৌড়ে একজন অতি শক্তিশালী রাজা ছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়ে রাজা হন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। যতদূর জানা যায়, মহারাজ শশাঙ্ক বাংলার প্রথম রাজা, যিনি এই দেশের নিজ ভৌগোলিক সীমানা আরও বাড়িয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের সীমা পশ্চিমে মগধ, দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই মহারাজ শশাঙ্ককে আমরা ভুলে গেছি। পশ্চিমবাংলার সেই স্বনামধন্য, প্রতাপশালী মহারাজ শশাঙ্ক। যাঁর শৌর্য্যে, বীর্ষে, মগধ, উড়িষ্যা থর থর করে কেঁপে উঠত, সেই অসামান্য মহারাজকে আমরা আর স্মরণ করি না। তাঁর শৌর্য্য, বীর্য, অমিত ক্ষাত্রতেজ সবকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু ভুলে যায়নি অভয়, রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সেই কবিতাটি, মাঝে মাঝে আওড়ায়—

—সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য জম্বুদ্বীপ
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্মের প্রদীপ—
তাহে ধন্য গৌড়, যাহে ধর্মের বিধান
সাধকরি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান।

তীর্থপতি মাষ্টার অভয়কে যতই ঠাট্টা করুন, কিন্তু অভয়ের মনের ভেতর তীর্থপতি মাষ্টারের সেই কথাটা বার বার গুনগুন করতে থাকে। এগিয়ে চল—এগিয়ে চল—। হাঁ,—তাকে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? সেদিন অভয় ছোট ছিল—পড়ত গাঁয়ের স্কুলে—তখন কথাটার মানে বুঝতে পারেনি। এর অর্থটা—অবশ্য পরে বুঝেছিল।

অভয়ের বাবারা দুই ভাই। বড় যোগেশ্বর। ইনি থাকেন উত্তরবঙ্গে মালদহ সহরে। যখন তাঁর বয়স ষোল সতের, তখন একদিন হঠাৎ বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হলেন। কোথায় যে গেলেন কেউ জানে না। হঠাৎ দীর্ঘ পনর বৎসর পর, একদিন যোগেশ্বরের খবর পাওয়া গেল। যোগেশ্বর তাঁর বাবার নামে পাঠিয়েছেন দুশো টাকা আর একখানা পত্র। ইতিমধ্যে যোগেশ্বরের মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে সেই যোগেশ্বরের মা বিছানা নিয়েছিলেন আর ওঠেননি। তখন অভয়ের বাবা গোপেশ্বরের বয়স খুব অল্প। অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে, দাদাকে হারিয়ে গোপেশ্বর যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। লেখাপড়া বেশী শেখেননি। গাঁয়ের পাঠশালায় কিছু পড়াশোনা করেন, আর—লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। যোগেশ্বরের বাবা রামগতি দত্ত, ছেলের পড়াশুনো ব্যাপারে কড়াকড়ি করেন নি। এক ছেলে নিরুদ্দেশ—স্ত্রীও পুত্রশোকে ইহলোক

ত্যাগ করেছেন। এই রকম মর্মান্তিক শোকে, রামগতি দত্ত,—একমাত্র পুত্র গোপেশ্বরকে দিনরাত বুকের মধ্যে জড়িয়ে বসে থাকতেন। রামগতি দত্তর আর্থিক অবস্থা, কোন কালেই স্বচ্ছল ছিল না। কোনরূপে শুধু প্রাণটাই বেঁচে ছিল। দুঃখ দারিদ্র্য দৈন্যের সঙ্গে অহোরাত্র যুদ্ধ করতে করতেই দিন কাটাচ্ছিলেন। নিজে বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না। গাছপালা লাগিয়ে সামান্য জমিজমা চাষ করে, যৎসামান্য উপায় হ'ত। তাতে সংসারে স্বচ্ছলতা ছিল না। আশা ছিল বড় ছেলে যোগেশ্বরকে, কোন রকমে লেখা-পড়া শিখিয়ে, চৌধুরী বাবুদের ধরে, একটা হিল্লে করে দেবেন। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে গেল। অকস্মাৎ যোগেশ্বর হ'ল নিরুদ্দেশ। বহু বৎসর পর, যখন যোগেশ্বরের খবর এল, তখন রামগতি দত্ত একরকম মৃত্যুশয্যায়। জীবনটা আছে এই পর্য্যন্ত। উঠবার বসবার কোন ক্ষমতাই নেই। জীর্ণঘরের মাঝে, মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথা কম্বলের মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। ইতিমধ্যে গোপেশ্বরের বিয়ে হয়েছে পাশের গাঁয়ে। প্রথম সন্তান ঐ অভয়। অনেকদিন পর যোগেশ্বরের খবর যখন এল, তখন বৃদ্ধ রামগতি দত্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। গোপেশ্বর বলল—বাবা দাদার চিঠি এসেছে। আর আপনার নামে দুশো টাকা পাঠিয়েছেন। বৃদ্ধকে কোন-রকমে বসিয়ে অতিকষ্টে ফরমে সহি করা হল। দুজন সাক্ষীর সই নিয়ে, নগদ একটা টাকা বখশীষ নিয়ে পিওন চলে গেল। এর কয়েকমাস পর, রামগতি দত্ত মারা গেলেন। সমস্ত চিন্তা—দুঃখ—দৈন্যের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে বোধকরি মরণেই বেঁচে গেলেন।

পিতার মৃত্যুসংবাদ যথারীতি যোগেশ্বরকে জানানো হলো। কিন্তু যোগেশ্বর নিজে এলেন না। এলো চিঠি আর পিতৃশ্রাদ্ধের খরচের জন্য কিছু টাকা। ভাইকে লিখে জানালেন যোগেশ্বর, ভাই সংসারে এই হয়। মৃত্যু সকলেরই হবে– তাই দুঃখ করোনা। শ্রাদ্ধ-শ্রান্তির জন্য টাকা পাঠালাম। এখন কাজকর্ম্মে এত ব্যস্ত যে, আমার যাবার উপায় নেই।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হবার পর গোপেশ্বর লিখেছিল—দাদা বহুদিন তোমায় দেখিনি—বড় দেখতে ইচ্ছে হয়। আর এখানকার এই বাড়ী—সামান্য বিঘা কয় সম্পত্তি যা আছে, তার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। উত্তরে যোগেশ্বর জানান, ভাই ওখানকার বিষয় অতি সামান্য। ও তোমারই। ওর কোন কিছু ভাগ নেব না। আর আমায় দেখতে চেয়েছ—সে বেশ ভাল কথা। যখন পত্র দেব তখন এসে দেখা করে যেও। এরপর আইন-সম্মতভাবে আমি ওখানকার বিষয় তোমার বরাবর ব্যবস্থা করে দেব।

লোকমুখে জেনেছে, দাদা এখন মস্ত বড় লোক। মালদা সহরে অনেক ক'খানাই বাড়ী করেছেন। নানা-রকম ব্যবসা—ইটের ভাটা—বহু বাগান ইত্যাদি করেছেন। ছেলে মেয়েতে চার পাঁচটি। স্ত্রী নাকি খুব বড় ঘরের মেয়ে। কিন্তু কি ভাবে যে, যোগেশ্বর ঐ সব বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন, সে খবর গোপেশ্বর জানে না।

অভয় বড় হয়েছে। গাঁয়ের স্কুলের পড়া শেষ হল। কিন্তু এর পর যে কোথায় পড়বে সে চিন্তা। চৌধুরী বাবুরা প্রতিবৎসরই বলেন, গাঁয়ে জুনিয়ার হাইস্কুল করব কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। পূজোর শেষে কলকাতা চলে যাওয়ার পর আর কোন কথাই ওঁদের মনে থাকেনা। মনে পড়বে, আবার আগামী বছর, যখন ওঁরা গাঁয়ে আসবেন। এই আশায় আশায় অনেক বছর চলে গেল কিন্তু স্কুল আর হ'লনা। অভয়ের এখন ভাবনা হয়েছে কোথায় পড়বে। মনের মধ্যে, দিনরাত তীর্থপতি মাষ্টারের কথাটা গুন্‌গুন্ করে ফিরছে। খেয়ে ঘুমিয়েও কোন শান্তি নেই। এগিয়ে যেতে হ'বে তাকে আরও এগিয়ে যেতে হ'বে। কিন্তু কোথায় সে যাবে। কোন্ পথ ধরে হাঁটবে? একথা বলে দেবার, বা সৎ-পরামর্শ দেবার কেউ নেই। বাবার কাছে তার পড়ার কথা বলা বৃথা। বাবার ধ্যান জ্ঞান, ঐ যৎসামান্য জমি।

সেই অন্ধকার থাকতে ভোরবেলা বেরিয়ে যান, আর আর ফেরেন দুপুর দুটোয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জমির

পেছনে এত খেটেও, ফসল যা হয়, তা যৎ-সামান্য। হ'বেই-বা না কেন? সুধু জমি থাকলেই তো ফসল হয় না। ভাল বীজ ভাল সার আর ঠিক সময় মত চাই জল। বৃষ্টি যখন হয়, তখন টাকার অভাবে মাঠে চাষ দেওয়াই হয়না। চাষ যদি বা হয়, তবে ভাল বীজ কেনার টাকা যোটেনা। সারের কথা বাদই দিলাম। নমঃ বিষ্টু নমঃ বিষ্টু-করে দু চার ঝুড়ি ছাই পাঁশ কাদা আর চাটিখানি গোবর সার দিয়ে কি জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়ে। দেবতা যদি দয়া করেন, তবেই সময়মত বৃষ্টি হয়। নতুবা কাঠফাটা রোদে জমি ফেটে ফুটি-ফাটা হয়। সে বৎসর আর কষ্টের শেষ থাকে না। কোন-দিন অনাহার,—কোনদিন একবেলা খেয়ে কাটাতে হয়। এমনি অবস্থা বহুদিন গেছে। অভয় এখন বাবার অবস্থা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু ছোট ভাই বোন দুটী তো বুঝতে চায় না। তারা খেতে চায় দুটো খেলার পুতুল চায়। ওরা লুচি-পোলাও-মাছ-মাংস চায় না। পেটভরে দুটো ভাত-ডাল চায়। ভাতের সঙ্গে মাছ বা অন্য তরকারি প্রত্যাশা করে না। দুটো মুড়ি, একটু গুড় এই তারা চায়। কিন্তু পোড়াকপাল ওদের। অনেকদিন ভাত পায় না। অভয় তাকিয়ে সব দেখে। তার বাবা, মার মুখে হাসি নেই—কেমন যেন থমথমানি ভাব। বাবার সেই একই সাজ। সেই সাত তালি কাপড়, ছিটের ছেঁড়া হাফ্ সার্ট এ ছাড়া দ্বিতীয় পোষাক নেই। বর্ষার ছাতি, বা শীতকালে পায়ের জুতো, মোটা চাদর তাও যোটে না তার। মায়ের অবস্থা দেখেছে অভয়। ছেঁড়া শাড়ী,-তা হাত দিলে গলে যায়। মাথায় তেল যোটেনি যে কতদিন, তার হিসেব কে জানে। দুই হাতে ক্ষয়ে-যাওয়া শাঁখা—মুখ শীর্ণ কোটরাগত দুটি চোখ—সমস্ত দেহে শুধু কাঠিন্য। মায়ের কাছে কথাটা বলল অভয়।

মা বললেন—পড়বি? কিন্তু কোথায় পড়বি বাবা। কে তোকে মাইনে যোগাবে—খেতে দেবে থাকতে দেবে। ওঁকে বলা বৃথা। তুই বড় হয়েছিস্, এখন সংসারের অবস্থা সবই তো বুঝতে শিখেছিস তো সমস্তই দেখতে পাচ্ছ মানিক্।

কি যেন ভাবছিল অভয়। একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা মা, অভয় কিছু বলতে গিয়ে চুপ করল।

—কি বাবা? কিছু বলবি—

—আচ্ছা মা, জেঠাবাবুকে একবার লিখলে হয় না, তিনিতো বড়লোক। বাবা যদি তাঁকে একখানা চিঠি দেন। মুখে একটা শব্দ করে সরোজিনী বললেন, আঃ আমার কপাল। যে জেঠা একখানা পোষ্টকার্ড লিখে খোঁজ নেননা, তিনি কি গরিব ভাইপোর পড়ার ব্যবস্থা করবেন। যে নিজের ভাই, বড় তাঁরই খোঁজখবর নেন। এই তো উনি তিনখানা পত্তর দিলেন। বাড়ি ভেঙ্গে যাচ্ছে—সারান না হ'লে বসবাস করা যাবেনা। এই গত সনে আমরা একরকম উপোস দিয়ে কাটালাম। একবেলা খেয়ে এর ওর কাছে ভিক্ষে করে, খুদ, ফ্যান খেয়ে, কি কষ্টেই না দিনগুলো গেল। তখনও উনি কত দুঃখ জানিয়ে পত্তর দিলেন, কিন্তু একটা পয়সা দেননি। হুঁ—তাঁরা আবার তোকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করবে। আঃ আমার কপাল। অভয় ভাবছিল অন্য কথা। তাকে যে পড়তেই হবে মানুষ হতে হ'বে। দুঃখ কষ্ট তো আছেই। দুঃখ দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হ'বে। তীর্থপতি মাষ্টার পড়াতে পড়াতে কত কথাই না বলেন। দেশের বড় বড় লেখক যাঁরা যাঁরা প্রাতঃস্মরনীয় ব্যক্তি, তাঁরা জীবনযুদ্ধে বার বার কত দুঃখ, কষ্ট সহ্য করে, তবে না বড় হয়েছেন। বিদ্যাসাগরের কথা সেদিন বলেছিলেন, তীর্থপতিবাবু। তবে? উনি যদি অত কষ্ট করে, বড় হ'তে পেরেছিলেন, তবে অভয় কেন পারবেনা? দুঃখ মনে করলেই দুঃখ। দুঃখ কষ্টকে আসন না দিলেই হ'ল। অভয় হাজার দুঃখ-কষ্ট-অনাহার গ্রাহ্য করেনা। না—না তাকে আরও দূরে এগিয়ে যেতে হ'বে।

অভয় মাকে বলল—তবুও তুমি বাবাকে বল। আচ্ছা আমিই বলব। না হয়, আমিই জেঠাবাবুকে চিঠি দেব। তিনি বড়লোক, কেন গরীব ভাইপোকে লেখাপড়া শেখাবেন না। এটা তো তাঁরও কর্ত্তব্য। জান মা, এটা তাঁরও কর্ত্তব্য কাজ। বইয়ে লেখা আছে—কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করা পাপ।

জেঠাবাবু তো বুদ্ধিমান—জ্ঞানবান। তবে এই সহজ কথাটা কি তিনি বুঝবেন না। দেখো তুমি তিনি ঠিকই পত্তর দেবেন। সরোজিনী ছেলের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সস্নেহে হেসে, ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বলেন, ভগবান যেন তাই করেন বাবা। তোর বাবার ঐ মলিন মুখ আর দেখতে পারি নে। সমস্তদিন খাটা খাটুনি করে, দুমুঠো পেট ভরে খেতে পায় না। খিদের সময় মানুষটাকে কোনদিনই পেটভরে খেতে দিতে পারলাম না। ভাতের থালা যখন ওঁর সামনে দিই, তখন আমার কান্না আসে।

অভয় বলে, মা এই খারাপ দিন চিরকাল থাকবে না। এ কিন্তু দেখো। ভগবান যাদের সহায়, তাদের আবার ভয় কি মা। মাষ্টারমশাই সেদিন বললেন সৎপথে যারা থাকে ভগবান তাদের ভালবাসেন। মা, আমরা তো মন্দ কাজ করিনে মা। আমি যদি জেঠাবাবুর কাছে যাই, তখন খোকনটা খুব কাঁদবে। দিনরাত দাদা, দাদা করে খালি কোলে চড়তে চায়। ও খুব কাঁদবে কিন্তু—আর খুকীর দিকে লক্ষ্য রেখো মা। লেখাপড়া বাদ দিয়ে শুধু যেন পুতুল খেলে না। সরোজিনী বললেন পাগল ছেলের কথা শোন। বলে কোথাও কিছু নেই—ঠাকুর দেখসে। আগে জেঠা চিঠি দিক, নিয়ে যাবার কথা লিখুন, তারপর লাফঝাঁপ করিস। যে জেঠা তা আবার পত্তর দেবে। তোকে কাছে রেখে পড়াবে—আঃ আমার কপাল।

[২]

অভয় চুপ করে বসে রইল না। যতদিন না জেঠাবাবুর চিঠি আসে ততদিন সে কেন চুপ করে বসে থাকবে। পাশের গাঁয়ের ছেলে মন্মথ ম্যাট্রিক পাশ করেছে। দিনকতক কলকাতায় গিয়ে, কমাস যেন কোথাও চাকরীও করেছিল। কিন্তু টিকে থাকতে পারল না। এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে, বোধ করি কোন চাকরী যোটাতে না পেরে বাড়ী এসেছে। বাড়ীর কাছেই সে একখানা ছোটখাট মুদীখানার দোকান খুলে বসেছে। অভয় ঠিক করল, ক্লাস সেভেনের পুরোনো বই চেয়ে চিন্তে এনে, মন্মথর কাছেই পড়বে। মন্মথ যখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে, তখন অংক ইংরাজী দুই পড়াতে পারব। ট্রানসেলেশন, ইংরেজী রচনা, এগুলো একটু দেখে দিলেই হবে। অভয় উঠে পড়ে, বই যোগাড় করতে থাকে।

সেদিন বই যোগাড়ের জন্যই অভয় অন্য একটা গাঁয়ে যাচ্ছিল, পথে বিষ্টু জেলের সঙ্গে দেখা।

বিষ্টু বলল, বাবা অভয় আমার ছোট ছেলেটা যে গোল্লায় গেল। আমি থাকি সারাক্ষণ পুকুরে, খালে বিলে জাল নিয়ে। ছেলেটার নেকাপড়া হচ্ছে না। আমি বলি, মাস মাস তিনটে করে টাকা দেব, ছোঁড়াটাকে নিয়ে রোজ ঘণ্টা খানেক বসলে যাহোক কিছু হয়। নইলে ওর দাদার মত গুণ্ডা হয়ে যাবে। আরে, ওরা তো হাকিম হুকিম হতে পারবে না, তবে কিনা সামান্য লেখাপড়া না জানলে কি হয়। একেবারে আমাদের মতো চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে থাকবে। অভয় হাতে যেন স্বর্গ পেল। তিন তিনটে রূপোর টাকা,—এ কম কথা নয়। অভয় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

অভয় বলল, আজ থেকেই পড়াব। অভয় ভাবল, আগে থেকে মাকে খবর দেব না। মাসের শেষে, মায়ের জন্যে একখানা নূতন সাড়ী কিনে দিয়ে অবাক করে দেবে। অভয় সেদিন থেকে পড়াতে লাগল। বিষ্টুর বউ খুব খুসী। পড়ান শেষ হ'লে, বিষ্টুর বউ,—কলার পাতায় মুড়ে খান বার কোটা রুই মাছের টুকরো অভয়ের হাতে দিয়ে বলল, ভাই বোনে খেয়ো বাবা। ছেলেটার যদি মতি ফেরাতে পার, তবে খুব উপকার হয় বাবা। ওর দাদাটা তো মানুষ নয়—একেবারে গোল্লায় গেছে। কাজকম্ম করে না—শুধু গাঁজা মদ খেয়ে টো টো করে বেড়ায়। বাড়ী এসে শুধু ঝগড়া করবে—খেতে দাও বলে চেঁচামেচি করবে। তাই বলছি বাবা, এ ছেলেটা যদি কিছু শিখতে পারে, সেই চেষ্টা দেখ বাবা।

অভয় মাছ নিয়ে একরূপ নাচতে নাচতে বাড়ী ফিরল। মাছের স্বাদ ওরা ভুলেই গেছে—তার উপর পাকা রুই মাছ। কলাপাতা মোড়া এত মাছ দেখে সবাই অবাক।

সরোজিনী বললেন—এত মাছ কোথায় পেলি খোকা। অভয় কোন কথা না বলে, শুধু হাসতে থাকে। খোকন নাচতে নাচতে বলে, এই বড় মাছ আমি খাবো কিন্তু। এটা খাবে বাবা—এটা মা—এটা দাদা—আর ঐ ওটা দিদি খাবে—

খুকী ফোঁস করে ওঠে—ঈস্ ওটা কত ছোট। ওটা খেতে গেলাম আর কি—। মা বলেন, সত্যি কে মাছ দিল রে? অভয় ভেবেছিল মাসের শেষে একখানা নূতন সাড়ী কিনে, মাকে অবাক করে দেবে। কিন্তু আর তা হল না। মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। তাই সবকথা বলল অভয়। মা শুনে হেসে অভয়কে বুকে চেপে ধরে বললেন—ভগবান তোকে বাঁচিয়ে রাখুন। আর কি আশীর্ব্বাদ করব বাবা—। সরোজিনীর দুই চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

মন্মথ ম্যাট্রিক পাশ করে, মাস কয় কলকাতায় ছিল। আশা যদি একটা চাকরী যোটাতে পারে। মাস কয় সাময়িকভাবে একটা চাকরী করেছিল, শেষে সে চাকরী চলে যায়। তারপর বহু ঘোরাঘুরি করে আর কোন চাকরী যোটাতে পারেনি। মিথ্যেমিথ্যি, এ দুয়োর সে দুয়োর ঘুরে ঘুরে শুধুমাত্র হায়রানী সারই হয়েছে। অবশেষে ফিরে আসতে হল গাঁয়ের বাড়ীতে। মন্মথ অভয়কে দুঃখের কথা বলছিল। না—এমনি এমনি চাকরী হওয়া কঠিন। পেছনে কোন সুপারিশ করবার লোক না থাকলে, চাকরী হওয়া কঠিন। নিজের লোক যদি থাকে তবেই হয়। যাদের হাতে চাকরি তাদের তেল দিতে হয়।

অভয় অবাক হয়ে বলল, তেল? তেল দিলেই চাকরী। তা দু'একসের তেল কেন কিনে দিলে না অভয়দা—

মন্মথ হেসে বলল, দুর বোকা, ওরে দোকান থেকে দু এক ভাঁড় তেল কিনে দিলে কিছু হবে না। এ হচ্ছে অন্য তেল। বেশ করে রগড়ে রগড়ে পায়ে মাখাতে হবে—হাটবাজার করে দিতে হবে। তবে যদি তিনি প্রসন্ন হন। এ ছাড়া আরও কিছু আছে—এই সব করার পর যদি তিনি প্রসন্ন হন—

অভয় অবাক হয়ে যায়। চাকরি করতে হ'লে এত সব কাজ করতে হয়?

অভয় বলে—তিনি আবার কে?

মন্মথ হাসে। হেসে বলে, যিনি চাকরি দেবার মালিক। অভয়, শুধু তেল দেওয়া, বা ফাই-ফরমাস খাটলেই দেবতা তুষ্ট হন না। ওর সঙ্গে উপযুক্ত দক্ষিণাও দিতে হয়। পাঁচ পয়সা দক্ষিণা দিলে এসব দেবতা সন্তুষ্ট হ'বার নয়। ভগবান সন্তুষ্ট হ'তে পারেন, কিন্তু এইসব জ্যান্ত দেবতার পকেটে দু চারশো গুঁজে দিতে না পারলে তোমার আশা গেল।

অভয় অবাক হয়ে এইসব কথা শোনে।

মন্মথ বলে, তাই এই অবস্থা। নগদ দু চারশো আমি কোথায় পাব? শুধু শুধু পায়ে তেল রগড়ালে কি দেবতা তুষ্ট হ'ন। হন না। নগদ টাকা পকেটে না পড়লে, ও দেবতা তুষ্ট হবার নন। তোমার তবে সব আশা গেল। শেষে গাঁয়ে এসে, এই সামান্য দোকানটুকু খুলে বসলাম। তা, তুই যদি পড়তে চাস্, তা আসিস। ক্লাস সেভেনের একখানা ইংরাজী বই, আর অংকের বই যোগাড় কর। অংক আর ইংরাজী, এ দুটো ভাল করে শিখলে পাশ আটকায় না। কিন্তু এ গাঁয়ে তো স্কুল নেই—তা তুই পড়বি কোথায়?

অভয় বলল, আমার এক জেঠামশাই মালদহে থাকেন। খুব বড়লোক। জেঠাবাবুকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। যদি তিনি মত করেন, তবে ওখানেই পড়ব। নইলে আর পড়া হবে না। আচ্ছা মন্মথদা আমি ভাবছি, জেঠাবাবু এখন কি করবেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা চৌধুরী বাবুদের বললে, ওঁরা কি আমার কোনও ব্যবস্থা করেন না।

মন্মথ এবার গভীরভাবে তাকিয়ে দেখে অভয়কে। অত্যন্ত সরল মুখ বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ। পড়বার জন্য কি গভীর আগ্রহ। মন্মথর খুব দুঃখ হয়। হায়, এই সব ছেলেরা অর্থাভাবে পড়তে পায় না। অথচ কোন সহৃদয় দেশবাসী এই রকম দরিদ্র মেধাবী ছেলেদের যদি পড়ার কোন ব্যবস্থা করে দেন, তবে কি তাঁদের টাকা জলে পড়ত। না পড়ত না। বরং এদের এই জ্ঞান বুদ্ধি, পরে দেশ ও দেশবাসী উপকৃত হ'ত। কিন্তু কত প্রতিভাই না - এমনিভাবে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মন্মথ বলল,—অভয়, ওঁরা হলেন পয়সাওয়ালা লোক। ওঁরা তোমার—পড়ার কথা ভাবতে চান না। ওঁদের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান পয়সা—কিসে টাকা হয়—টাকায় টাকা বাড়ে এইটুকু মাত্র ওঁরা জানেন। ওঁরা বছরের মধ্যে, দুচারদিন গাঁয়ে আসেন বটে। তুমি কি ভেবেছ ওঁরা এই গাঁয়ের টানে আসেন। না তা মোটেই না। ওঁরা আসেন গাঁয়ের লোকদের ঐশ্বর্য্য দেখাতে। দুদিন ধুমধাম করে পূজো করেন—ভাতডাল লুচি সন্দেশ ছড়িয়ে, আমাদের মত দীন দরিদ্রের মুখে ওঁদের জয়ধ্বনি শুনে ওঁরা তৃপ্তি পান। ওঁরা শুনতে আসেন, আমাদের মুখে ওঁদের জয়ধ্বনি। ওঁদের চাল-চলন—কথাবার্ত্তা, গহনা আর জামা কাপড়ের বাহার দেখে আমাদের চোখ ঝলসিয়ে যায়। এটাই ওঁদের পরম লাভ। ওঁরা কি তোমার লেখাপড়ার জন্যে খরচ করবেন।

ভুল—কখনই না।

অভয় মিনমিনে গলায় বলল,—ভাবছিলাম একবার দেখা করব। মন্মথ হাসল। মন্মথ বলল, দেখা করে বিশেষ কিছু হবে না। একগাদা ধর্ম্ম উপদেশ শুনবে, আর নানান্ নীতি উপদেশ অবশ্য শুনতে পাবে। ওঁরা বলবেন—লেখাপড়া কেন বাপু। যাও, বিজনেস কর। বলবেন, ইয়ং বেঙ্গলীরা বিজনেস লাইনে এণ্টার করছেনা তাই দেশের এই অবস্থা। ইয়ং বেঙ্গলীরা খালি চায়, চেয়ারে বসে, খাতা লিখতে। চায় খালি পরিশ্রম কর। মাঠে ঘাটে, চাষ আবাদ কর লাঙ্গল ধর। শক্ত হাতে শাবল গাঁইতি ধর। খালি চাকরি আর চাকরি। না-না যাও—যাও। মন্মথ হেসে বলল ওঁদের কথাগুলো আমি হুবহু বললাম। আমি এই বাক্যগুলো শুনে এসেছি কিনা—মন্মথ একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, অভয় চা খাওতো? অভয় অবাক হয়ে বলল, চা? না অভ্যেস নেই—কিন্তু মন্মথ শুনল না। এক কাপ চা আর দুটো নোনতা বিস্কুট দিয়ে বলল, খাও লজ্জা কেন? মন্মথ সখেদে বলল। এই ছোট গাঁয়ে, এই ছোট তেল নুনের দোকান দিয়ে সারা জীবন কাটাতে হ'বে। কলকাতার দিনগুলোর কথা মনে হয়। কত কি—আর কী সুন্দর। একদিন দেখে এলাম খিদিরপুর ডক। উঃ কত দেশ-বিদেশের জাহাজ। ওরা ঐসব জাহাজ করে, পাড়ি দেয় সমুদ্র। কত বিদেশে যায়। এই পৃথিবীতে যে কত ভাল ভাল দেশ রয়েছে কত রকমের লোকজন কত রকম ভাষা তা আর কি বলব। বিদেশের কথা বাদ দে। এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কত দেশ রয়েছে, তাই বা কি দেখলাম। মন্মথ মুখটা অতি বিষণ্ণ করে, বসে থাকে।

অভয় বলল, আমারও আর এ গাঁয়ে থাকতে ভাল লাগে না। কিন্তু কি করব তাই ভাবছি। মন্মথর উদাস চোখের ওপর বুঝি ভেসে ওঠে, দূর দেশান্তরের ছবি। আইভিলতায় ছাওয়া পাহাড়ের কোন অন্ধকার গুহা,—অজানা সমুদ্রের সুনীল জলরাশি, পর্ব্বতের উপত্যকায় মেষপালকের দল—সুদুর মহাসাগরের কোন জন-বসতিহীন অরণ্যসমাকুল দ্বীপের ছবি, মন্মথর মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে। চমকভেঙ্গে মন্মথ বলে, বুঝলি অভয়, কাল থেকে পড়তে আসিস্।

কিন্তু কি জানিস্, এ গাঁয়ে থাকলে মানুষ হ'তে-পারবিনে। এ-গাঁয়ের বাতাস বিষ। এখান থেকে ছিটকে বেরুতে না পারলে আর রক্ষা নেই। যদি তুই পালাতে না পারিস, তবে কি হ'বে জানিস?

—কি হ'বে?

মন্মথ উত্তেজিত হয়ে বলল, কি হ'বে দেখছে

পাচ্ছিসনে, গাঁয়ের লোকদের দিকে তাকিয়ে। ঐ লাঙ্গল-ঠেলা, চাষ-আবাদ করা, সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে তামাকটানা। এর চেয়ে বেশী যদি কাজ থাকে, তবে এর ওর দোকানে বসে, পরের নিন্দেবান্দা করা। সকাল সকাল দুটো পেটে দিয়ে, সারারাত ছেঁড়া মাদুরে ঘুম আবার সেই সকাল। সেই এক কাজ এক চিন্তা একরকম জীবন। এমনি করতে করতে বুড়ো হবি দাঁত পড়বে চুল পাকবে তারপর একদিন গঙ্গাপানে ঠ্যাং।

মন্মথ হাঃ-হাঃ করে হাসতে থাকে।

অভয় নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, উঃ তোমার কথা শুনেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। না এখানে আমি থাকতে পারব না। ওর তীর্থপতি মাষ্টারের কথা মনে পড়ে যায়। এগিয়ে চল এগিয়ে চল থামলে চলবে না এগিয়ে যেতে হবে। অভয় এখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে তাকে কোথায় এগিয়ে যেতে হ'বে। অভয় বলে—আজ চললাম মন্মথদা। কাল আসব।

অভয় একবার করে ডাকঘরে যায়। ডাকঘর একটু দূরে। রোজ চিঠি বিলি হয় না। এ সব গাঁয়ে, সপ্তাহে দুদিন ডাক বিলি হয়। যাদের একটু দরকার বেশী তারা নিজে ডাকঘরে গিয়ে চিঠিপত্রের খোঁজ করে। কিন্তু রোজ ডাকঘরে যাওয়ার গরজ কারুর নেই। এসব গাঁয়ে কালে ভদ্রে কারুর চিঠি আসে। মণি-অর্ডার তো আসেই না। কে আর কাকে টাকা পাঠাবে? মাঝে মাঝে এর ওর নামে, নানা রকমের বিজ্ঞাপনের বই আসে। মাঝে মাঝে, কারুর নামে আসে লটারীর টিকিটের বই। কখনও বা কারুর নামে, নার্শারীর আলু, পাট, বেগুনের তালিকা-বই। বিজ্ঞাপন প'ড়ে, কেউ কেউ এক টাকায় হাজার জিনিসের জন্য টাকা পাঠায়। শেষে পার্শেল যখন আসে, তখন তার ভিতরের বস্তু দেখে, ক্রেতা শুধু কপাল চাপড়াতে থাকে। তার গোটা টাকাটাই নষ্ট। সূর্য্য নন্দী কবে যেন লটারীর টিকিট কেটেছিল। অবশ্য ওর নামে কোন প্রাইজ ওঠেনি। কিন্তু মাস মাস, গাদা গাদা লটারীর টিকিট বিক্রীর জন্যে কাগজ আসে। সূর্য্য নন্দী বলে, আরে লটারীর টাকা কি আমাদের কপালে হয়। ওসব বড়লোকদের কপালে বাধে। সবাই তেলা-মাথায় তেল ঢালে। বুঝলেনা, জলেই জল বাধে।

অভয়ের ডাকঘরে যাওয়া যেন এক নেশা হয়েছে। গাঁয়ের পিওনকে বলে ও যতীন কাকা, একবার ভাল করে দেখুন না। আমার নামে, বা বাবার নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা? যতীন পিওন চিঠিগুলো একবার দেখে নিয়ে বলে, না আসেনি তো। কিন্তু রোজ রোজ তুই ডাকঘরে আসিস কেন? এই এতখানি রাস্তা, তারপর এই রোদ। চিঠিপত্র এলে ঠিক দিয়ে আসব। কেন তোদের বাড়ীতে কেউ আসবে নাকিরে?

—না, আসবে না কেউ। আমার জ্যেঠাবাবুর একটা খুব দরকারী চিঠি আসার কথা। সেইজন্যে আসি। অভয় খুব মন মরা হয়ে, সেই তীব্র রোদে পুড়তে পুড়তে চলতে থাকে। রোদ যেন বিষ ছড়াচ্ছে। ধু ধু করছে মাঠ। যেদিকে চাও কোথাও একটুও জল নেই। গাছ লতা-পাতা সব যেন পুড়ে কাল হয়ে গেছে। পাখীরা ডাকছে না, গরু বাছুর এখন আর কেউ মাঠে নেই। রাস্তায় কোন জনমানুষ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। অভয় পথ চলতে চলতে সেই নিস্তব্ধ, রৌদ্রভরা পথের একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তার ধারে ধারে এখানে ওখনে বহু বাবলাগাছ। সমস্ত গাছে হলদে হলদে ফুল ধরেছে। একজোড়া ঘুঘুপাখী, বোধ করি রোদের জন্য, গাছের ডালে, আশ্রয় নিয়ে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে... ঘু-ঘু-ঘুর-র—এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে তপ্ত রৌদ্রপ্লাবিত বাতাসের মাঝে, ঘুঘুপাখীর ডাকটায় যেন অদ্ভুত সৌন্দর্য্য রয়েছে। বন পেরিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে কাঁটা বনের ওধারে চলে যাচ্ছে ঘুঘুপাখীর অদ্ভুত ডাক। চোখের ওপর হাত ঢাকা দিয়ে, অভয় চুপ করে

বসে পড়ে বাবলা গাছতলায়। অতি নরম ঘাস পাশে পাশে ছোট ছোট গাছগুলি হাওয়ায় দুলছে। গরম হাওয়াতে এই মাঠের মাঝে, অভয়, এক আশ্চর্য্য বিহ্বলতার মাঝে ডুবে যায়। প্রকৃতির একি পরম অপরূপ রূপ। উপরে রৌদ্রপ্লাবিত নীল আকাশ ধ্যাননিমগ্ন। শূন্যে শূন্যে রৌদ্রদগ্ধ উষ্ণ বাতাস যেন হাহাকার করে বয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে মাথা উঁচু করা একাকী তালগাছটা যেন নির্দয় রৌদ্র বাতাসের বিরুদ্ধে উর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা জানাচ্ছে। রিক্ত-রসহীন, এই বৈরাগী গ্রীষ্মের পৃথিবী যেন মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে সকরুণভাবে ভিক্ষা করছে শ্রাবণের ঘন স্নিগ্ধ জলধারার জন্যে। দুপুরের মধ্য দিনের, এই কঠিন শুষ্ক শূন্যতার মাঝে পাখীরা গান ভুলেছে। রাখাল-বালক আশ্রয় নিয়েছে, কোন ছায়াঘন নিবিড় তরুতলে। পাখীর গান আর শোনা যায় না। বেণু বাজে না—গরু-বাছুরের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। তবুও এই নির্জ্জন রৌদ্রদগ্ধ উষ্ণ প্রান্তরের মাঝে, ছায়াঘন বাবলাগাছতলায় নীচে বসে, প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ দেখে, অভয় আবিষ্ট নয়নে চেয়ে থাকে। বুঝি সে দেখে রহস্যময় প্রকৃতির মাঝে, সেই অনাদি অনন্ত রহস্যময় পুরুষের লীলাখেলা। সে শুনতে পায়, রুদ্রের আহ্বান। কার যেন সন্তপ্ত নিঃশ্বাস গায়ে এসে লাগে। তাপিত আকাশ থেকে কি যেন ভেসে আসে। বুঝি রুদ্র ভৈরবের ডাক চল্ চল্ এগিয়ে চল্। এই দ্বিপ্রহরের ধ্যাননিমগ্ন নীরব নিস্তব্ধতার মাঝে, অভয় যেন ডুবে যায়। মন ভেসে যায়, আর এক জগতের মাঝে। এই দৃশ্যমান জগৎ মাঠ ঘাট বন প্রান্তর, প্রদীপ্ত সূর্য্য, অনন্ত নীল আকাশ, সব যেন ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসে। আস্তে আস্তে সব যেন এক গভীর অন্ধকারের মাঝে তলিয়ে যায়। অভয় মহাশূন্যের মাঝে ভেসে যাচ্ছে। অদ্ভুত সে দৃশ্য। আলো-আঁধার মেশা। এ দিন কি রাত, সন্ধ্যা না সকাল কিছু বোঝা যায় না। কোথায় সে যেন চলেছে হু হু শব্দে ঝড়ের বেগে শূন্য পথে ভেসে। কে নিয়ে যাচ্ছে—কিসে নিয়ে যাচ্ছে তাও বোঝা যায় না। শুধু সে বোঝে, সে যেন মহাশূন্যের মাঝে সাঁ সাঁ শব্দে ভেসে ভেসে উড়ে যাচ্ছে। শুধু চোখের ওপর ভাসছে, বৃহৎ বৃহৎ গাছ, যেন আকাশ ছুঁয়ে, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের ডালপালা পাতার ভেতর দিয়ে তীব্র হাওয়ার স্রোত প্রচণ্ড শব্দ করে ছুটে চলছে আর কিছু না। কোথাও কোনও জনপ্রাণী নেই, কোন শব্দ নেই—এক অনন্ত শূন্যতার মাঝে, শুধু সে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। তারপর, আর কিছু মনে করতে পারে না অভয়। হঠাৎ যেন সে এক প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পায়, অভয় চীৎকার করে ওঠে ওঃ—। অভয় সচেতন হয়ে, চারিদিকে তাকায়—আশ্চর্য্য হয়ে তাকায়। একি কোথায় সে? সে কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিল। না প্রচণ্ড রোদের জন্যে মাথা ঘুরে উঠেছিল। অভয় এবার ব্যস্ত হয়ে হাঁটতে সুরু করে।

ক্রমশঃ

একম্

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
তড়িৎ-কণারা এই যুক্ত জগৎ যেই
প্রাণ বলে : সম্ভবামি।
কোটি কোষ প্রাণী-দেহে মিলে যেই এক স্নেহে
মন বলে : সম্ভবামি।
মনোবৃত্তিরা সেই এক সুরে মিললেই
জাগ্রত অন্তর্যামী ।।

স্বয়ং এর নিয়তি সোঽহং ।।
দেহ তার অভ্যাসে জলবায়ু ভালবাসে
দেহাত্ তো দেহেরই রকম।
প্রাণের বাঁচা ও বাড়া গড়ে রাজ্যের ধারা
রাজ্যেই প্রাণ জঙ্গম।
অতীতের এক জ্ঞানে, আগামীর এক ধ্যানে
মনই দেশ, দেশিকোত্তম।
আত্মায় সব দেশ সমবেত এক বেশ
মহামানবের সঙ্গম ।।

রবীন্দ্রনাথকে

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তুমি এক পরিচিত কবি
আমাদের আত্মার মতন
এই দেশের পথে ঘাটে
ফসলের উচ্ছ্বাসে সমাহিত প্রান্তরে
নদীর কল্লোলে পরিচিত বন্দরে,
অথবা বিদেশের নগরে নগরে
একান্ত আপন জনের মতো
ঘুরেছো অনেক।
ট্রেনে ট্রামে বাসে
অথবা শহরের পথে পথে
গলির সংকীর্ণ সীমায়
চেনা-অচেনা মানুষের প্রাত্যহিক জীবন দেখেছো
প্রণয়ীর একান্ত ভাবালুতায়।

কখন হঠাৎ আপনার স্বাতন্ত্র্যে
উজ্জ্বল হয়ে
স্থির ধ্রুবতারার মতো
অন্ধকার রাত্রিতে পথ দেখিয়েছো
অগুণতি মানুষকে,
যারা সত্তার কান্না শুনতে শুনতে
প্রাত্যহিক জীবনে ক্লান্ত।
অসংখ্য প্রাণের মিছিলে
রেখে গেলে জীবনের অন্বয়,
দিয়ে গেলে প্রাণের কিনারে কিনারে
বাঁচিবার ললিত আশ্বাস।
কিন্তু আজ তোমাকে খণ্ড খণ্ড করি
তোমার সকল আশ্বাসের বাণী
দারুণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করি।
কিন্তু হে কবি, তোমাকে দগ্ধ করতে গিয়ে
আমরা নিজেরাই দগ্ধ হয়ে মরি,
তোমাকে যতো আঘাত করি
আমরা তততো আহত হয়ে
অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁদে মরি।
কারণ তুমি আর আমরা যে
একই সত্তা হয়ে গেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দেবতার লীলাভূমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ, হে চিরদীপ্ত!
অলোকলোকের অশোক দুলাল, পুণ্যশুভ্র ধর্মনিত্য!
দলি' বিলাসের মায়াবিনী কায়া ওগো নিষ্কাম অমলকান্তি!
কত দিশাহারা জনে দিলে দিশা, ভীরু অশান্তে ভরসা শান্তি!

তামসিকতার ক্লিন্ন নিগড়ে শৃঙ্খলিতের দুঃখ দৈন্য
ঘুচাতে হে দেবসেনানী তোমার তুলিলে গড়ি' বেদান্তী সৈন্য!
হীন লোকাচারে মিথ্যাবিহারে ছিল যারা চির-পথভ্রান্ত;
তোমার অভ্যুদয়ে হ'ল নব অরুণোজ্জ্বল পথের পান্থ।

হে মহানুভব! বরি' দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস,
জানিলে তাঁহার বরে—তুমি চির-জীবন্মুক্ত, শিবের অংশ।
পরশে তোমার তাই তো ঘটিল অঘটন, যারা ছিল নগণ্য,
তোমার বীর্য-পরশমণির ছোঁওয়ায় পলকে হল হিরণ্য।

প্রাচী প্রতীচির মাঝে সেতু বাঁধি সিন্ধুর বাধা করিলে লুপ্ত,
ঐন্দ্রজালিক! জাগালে—যাহারা পরাধীনতায় ছিল নিষুপ্ত।
গীতা ও পুরাণ, ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন, উপনিষদ, তন্ত্র,
কণ্ঠে তোমার ঝঙ্কৃত হ'য়ে জগন্মাতার অভয় মন্ত্র।

একাধারে ধ্যানী মনীষী, জাতির স্রষ্টা—দিল যে ধ্যানের দীক্ষা,
করিত কত না সংশয়ী মন প্রাণ নিরাশায় যার প্রতীক্ষা,
মানুষ দেবের করুণা-পরশে দিব্য জীবনে বিকশে মর্ত্যে—
তোমার মহান্ জীবন-বিকাশে জানিল তারা এ-স্বর্গ সত্যে।

ব্রহ্মচারী যে স্বাধিকারে তার, শুধু অমৃতেরি জপিল তৃষ্ণা,
প্রেমের মুকুট দেখি' শিরে যার লাজে মুখ ঝাঁপে লালসা কৃষ্ণা,
সে-তুমি বিলালে দুহাতে তোমার সাধনালব্ধ মণিকা রত্ন
স্বার্থ-ভুলিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় রহিয়া মগ্ন!

সপ্ত ঋষির দেদীপ্যমান লোক হ'তে নেমে তব বরেণ্য
জীবন আহুতি দিয়ে প্রেমানলে করেছিলে ধূলি-ধরণী ধন্য।
এসো ফিরে আজ হে দেবদিশারি, বিলাতে মুগ্ধে মুক্তি শান্তি,
দিব্য তেজের ওঙ্কারে তব বিনাশি' বেসুরা বাসনা-ভ্রান্তি।

কোরাস

অন্নের পথ বিদায়ে, বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
খুলালে জ্ঞানালোক তৃতীয় নয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা অন্ধ।

রবি প্রণতি

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

একদা বৈশাখ-শেষে রাত্রির আঁধার অবসানে
জন্মান্তের সুপ্তি ভেঙে ধরণীর আনন্দ-আহ্বানে,
প্রভাত-সূর্যের স্নিগ্ধ ক্রমোজ্জ্বল রশ্মিপথ বাহি'
কে আসিল মর্তলোকে স্বর্গের অমৃত গান গাহি ?
বঙ্গ-কাব্য-কুঞ্জবনে কে আনিল ভাস্বর প্রভাত ?
সে রবীন্দ্রনাথ।

বাণীর নীরব বীণা কার শুভ জন্মলগ্ন-ক্ষণে
আপনি উঠিল বাজি সুগম্ভীর মধুর নিক্কণে ?—
বিশ্বের হৃদয়-তন্ত্রে ফল্গুসম সে ধ্বনি- লহরী
অনাহত সপ্ত সুরে জাগাইল অধরা মাধুরী।
কাহার ভাবনা-তুলি আঁকিয়াছে অরূপের ছবি ?
সে যে বিশ্বকবি।

যে দেশের মহাকবি অমর বাল্মীকি, বেদব্যাস,
সারদার বরপুত্র শ্রেষ্ঠ রত্ন-কবি কালিদাস।—
সে দেশে নূতন ক'রে কে পেয়েছে কবিগুরু-খ্যাতি,
অনন্ত কালের গর্ভে কে জ্বালিল চিরন্তন ভাতি,
কে নিজ মহিমা বহে আপন নামের সাথে সাথ ?
সে রবীন্দ্রনাথ।

আজি তাঁর জন্মদিন পুণ্যতিথি পঁচিশে বৈশাখ।
সর্বত্র বাজিছে তাই আনন্দের পাঞ্চজন্য শাঁখ।
বিশ্বজন-চিত্ত আজি বিনম্র আনত শ্রদ্ধাভরে
অনন্ত মহিমোজ্জ্বল রবির বন্দনা-গান করে।
আমি তাহাদের সাথে ভক্তি-অর্ঘ্য, বিনত প্রণাম
রাখিয়া গেলাম।

মর ও অমর

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

দেখি নাই আমরা কী। জন্মিয়াছি লয়ে মরদেহ, মোরা মর্তবাসী।
ধরাবক্ষে ধরণীর ধূলি লয়ে খেলি—কভু কাঁদি, কভু মোরা হাসি।
শুনিয়াছি অমরায়, অমরের চক্ষে নাহি জল, বক্ষে নাহি দুখ।
দিবারাত্রি কাটে তাঁহাদের নৃত্যে, গানে। অমরায় সদা হাসিমুখ।
আছে কল্পতরু। আছে কামধেনু। আর আছে অপ্সরার ভ্রূভঙ্গবিলাস
নাহি স্বর্গে বিচ্ছেদ বেদনা, হৃদয়ের কাতরতা, নাহি দীর্ঘশ্বাস।
আছে কাছে? থাক। গেছে চলে? যাক। অমরের কাছে
উভয়ই সমান।
শতবর্ষ ছিল সাথী, গেল সে হারায়ে। থামিল না তব নৃত্যগান।
আমরা অমর নহি। ক্ষণে ক্ষণে লভি মৃত্যু। দৈন্যদুঃখ শোকভরা
মেঘরৌদ্র বরষায় স্নিগ্ধশ্যামা দয়ামায়াময়ী মাতা বসুন্ধরা।
দুদিনের সাথী ছেড়ে গেলে দুদিনেরও তরে, আঁখি দুটি করে ছলছল।
ক্ষুদ্রতুচ্ছ প্রাণী, তাহাদেরো মৃত্যু হেরি আমাদের ঝরে অশ্রুজল।
আমরা দেবতা নহি। মর্তবাসী নর। আমাদের নাহি 'চিন্তামণি'।
স্বজনেরা আমাদের নয়নের মণি। তাহাদের শ্রেষ্ঠ বলে গণি।
হেরি যবে স্নেহভরা মাতাপিতা পুত্রকন্যা, প্রিয়ার আনন,
গণি মোরা তুচ্ছ তার কাছে—কল্পতরু, কামধেনু, নন্দনকানন।
স্বর্গ থাক দেবতারি তরে। মর্তবাসী আমাদের তাহে ঈর্ষা নাই।
সুখ দুঃখ মায়াভরা ধরিত্রীর কোলে, বার বার আসিবারে চাই।
শোক তাপ দুঃখোপরি যে আনন্দরূপ রহিয়াছে, তারে নাহি ভুলি—
"আবার আসিব" বলি, যাব শিরে নিয়ে মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

সানাই

(নাটিকা)

কুমারলাল দাশগুপ্ত

গ্রামের ছায়াঢাকা পায়ে-চলার পথ। তার একপাশে পুরোনো শিবমন্দির, আর একপাশে দীঘি। দীঘিও অনেক কালের, বাঁধা ঘাট ভেঙ্গে পড়েছে, শেওলায় ঢেকে গেছে জল।

বেলা পড়ে এসেছে, পথ দিয়ে আসে বিনয়, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, পাকা চুল, চোখে চশমা, কাঁধে ধবধবে পইতে। ঘাটের কাছে এসে বিনয় দাঁড়ায় চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, তারপরে ঘাটে এসে রানার উপর বসে। একটু পরে কাঁখে কলসী নিয়ে আসে সুমিত্রা, থানধুতি পরা, বয়স চল্লিশের কিছু উপরে। ঘাটে বিনয়কে দেখে সে থমকে দাঁড়ায়।

সুমিত্রা—ওমা বিনুদা কবে এলে ?

বিনয়—আজ সকালে।

(সুমিত্রা কলসী নামিয়ে রেখে প্রণাম করে)

বিনয়—(বিব্রত ভাবে) থাক, থাক।

সুমিত্রা—তুমি বুঝি বিয়েতে এসেছো বিনুদা ?

বিনয়—হাঁ, দাদার বড়ছেলের বিয়ে, আসতেই হোলো।

সুমিত্রা -আজই তো বিয়ে। কনে কে জানো তো ?

বিনয়—শুনেছি উপেন বোসের মেয়ে। উপেন তোমার খুড়তুতো ভাই, তাই না ?

সুমিত্রা—হ্যাঁ বিনুদা, মায়া আমার ভাইঝি। বড় ভালো মেয়ে ; যেমন দেখতে সুন্দরী তেমন বিদ্যাবুদ্ধি। বি,এ পাশ করেছে।

বিনয়—দাদা বল্লেন ছেলে নিজে মেয়ে পছন্দ করেছে।

সুমিত্রা—(একটু হেসে) হ্যাঁ তাই, ছেলেবেলা থেকেই ওদের ভাব।

বিনয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। অনেকদিন পরে দেখা হলো, তাড়াহুড়ো না থাকে তো বসো।

সুমিত্রা—না, তেমন তাড়াহুড়ো নাই। (বিনয়ের পাশে বসে) বউদি এসেছেন ?

বিনয়—(মাথা নেড়ে) না, রমা আসেনি।

সুমিত্রা—(একটু আশ্চর্য হয়ে) কেন ?

বিনয়—সময় নেই।

সুমিত্রা—দুএকদিনের তো ব্যপার।

বিনয়—সেটুকু সময়ও নেই। কয়েকটা মহিলা-সমিতির সভানেত্রী, কত কাজ। তা ছাড়া—

সুমিত্রা—তা ছাড়া কি বিনুদা ?

বিনয়—(একটু ইতস্তত করে) গ্রাম তেমন পছন্দ করেন না।

সুমিত্রা—গ্রামে অনেক অসুবিধে আছে।

বিনয়—জানোতো বড়লোকের মেয়ে।

সুমিত্রা—(একটু হেসে) আবার বড়লোকের বউ। শুনেছি তুমি মস্ত উকিল, অনেক টাকা উপার্জন করো।

বিনয়—শ্বশুরমশায়ের কৃপায়। তাঁর হুকুমে আইন পড়তে হলো। বড় উকিল ছিলেন, তুলে দিয়ে গেছেন।

সুমিত্রা—ভালই তো।

বিনয়—এবার তোমার কথা শুনি। কবে এলে এখানে ?

সুমিত্রা—কাল এসেছি বিনুদা। বিয়ে বলে আমারও আসা হলো, তা না হলে দেশে আসা হতো না। বিয়ের পরে মাত্র দুবার দেশে এসেছি। উনি মারা গেলে দাদা আমাকে আনতে মোরাদাবাদ গিয়েছিলেন, আমার আসতে দিলেন না।

বিনয়—শুনেছি মস্ত ব্যবসাদার তোমার ভাশুর।

সুমিত্রা—হ্যাঁ বিনুদা। কিন্তু পশ্চিমে থেকে ওঁরা সবাই আধা-পশ্চিমে বেনে গেছেন। প্রথম প্রথম ওখানে গিয়ে আমার কি কষ্ট হোতো তা তোমাকে কি বলবো বিনুদা। দেশের জন্যে প্রাণ কাঁদতো।

বিনয়—আমি বুঝি সুমি।

সুমিত্রা—জানো বিনুদা, কি শুকনো দেশ মোরাদাবাদ, গাছপালা খুব কম, সবুজ প্রায় চোখেই পড়েনা। মনে পড়তো ছায়া-ঢাকা এই পথঘাট, জলভরা দীঘি, সবুজ বাঁশবন, আর আম জামের বাগান। জনালা দিয়ে পথের মোড়ে একটা আমগাছ দেখা যেতো, সেটাকে পরম আত্মীয় বলে মনে হোতো। ইচ্ছে হোতো পালিয়ে চলে আসি।

বিনয়—কোলকাতা গিয়ে প্রথম প্রথম আমারও ঠিক ঐ রকম মনে হোতো।

সুমিত্রা—কতজনকে মনে পড়তো চুপি চুপি কাঁদতাম।

বিনয়—বুঝি সুমি।

সুমিত্রা—(একটু হেসে) এখন সয়ে গেছে। ওঁরা বনেদি বড় লোক, গয়না দিয়ে গা ভরে দিয়েছিলেন, সেগুলো ভারী বোঝা মনে হোতো। আলমারি ভরতি দামী দামী শাড়ী, তেল, আলতা, সেন্ট, পাউডার, পোমেড, আমার ওসব ছুঁতে ইচ্ছে করতো না। মনে হোতো যদি গোটাকয়েক বকুল ফুল পেতাম তাহলে তার গন্ধে বুক জুড়িয়ে যেতো।

বিনয়—যখন দেশে এসেছো তখন থেকে যাও কিছুদিন।

সুমিত্রা—ইচ্ছে তো করে, কিন্তু হুকুম এলেই ফিরে যেতে হবে।

বিনয়—তাই তো।

সুমিত্রা—(বিনয়ের দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ বিনুদা, তোমাকে বড্ড রোগা দেখাচ্ছে; শরীর ভাল নেই বুঝি?

বিনয়—একটা না একটা লেগেই আছে। ব্লাড প্রেসার মাঝে মাঝে বেড়ে যায়।

সুমিত্রা—(চিন্তিত ভাবে) তাই নাকি। চিকিৎসা হচ্ছে তো? বড় ডাক্তার দেখিয়েছো তো?

বিনয়—চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না। এখন অনেকটা ভাল।

সুমিত্রা—শুনলাম তোমার ছেলে উকিল হয়েছে। টাকারও অভাব নেই, তবে এত খাটো কেন বিনুদা, এখন কাজ কমিয়ে দাও, বিশ্রাম করো।

বিনয়—আমার কপালে বিশ্রাম নাই সুমি।

সুমিত্রা—কেন বিনুদা।

বিনয়—ঐ টুকুই জেনে রাখো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি করি জানো?

সুমিত্রা—বলো শুনি।

বিনয়—সকাল বেলা উঠে চা খেতে খেতে কাগজে চোখ বুলোই। তারপরে আপিস-ঘরে গিয়ে বসি, মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা সলাপরামর্শ চলে ন'টা নাগাদ। তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে একঘণ্টার মধ্যে নাওয়া-খাওয়া পোশাক-পরা শেষ করে মোটরে উঠি। কোর্ট তো যুদ্ধক্ষেত্র। বাড়ী ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা লাগে।

সুমিত্রা—বলো কি বিনুদা।

বিনয়—(একটু হেসে) এখনও শেষ হয়নি। ধৈর্য ধরে শোনো। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে কোর্টের ধড়াচুড়া ছেড়ে বিশ্রাম করি। তারপরে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠি।

সুমিত্রা—ওমা, আবার গাড়ীতে ওঠো কেন? বাড়ী ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ো না কেন?

বিনয়—সামাজিক জীব সন্ধ্যাবেলা বিছানায় শোয় না। কোনদিন তোমার বৌদিকে নিয়ে বাজার করতে বেরোই, কোনদিন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে পার্টিতে যাই, আবার যেদিন নিজের বাড়ীতে পার্টি থাকে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করি।

সুমিত্রা—বিনুদা, তুমি গানবাজনা ভালবাসতে, সে-সব কখন করো তা তো বল্লে না।

বিনয়—আমি কোনদিন গাইতাম বাজাতাম নাকি?

সুমিত্রা—ওমা, সে কি কথা। তুমি কি সুন্দর গাইতেঃ বেহালা বাজাতে।

বিনয়—গানবাজনা ছেড়ে দিয়েছি সুমি।

সুমিত্রা—কেন বিনুদা ?

বিনয়—সময়ের বড্ড অভাব, আমার এক মুহূর্ত নষ্ট করা চলে না। টাকা উপার্জন করতে হবে, টাকা চাই, টাকা চাই। আমি যদি বসে পড়ি, চলতে না চাই তাহলে পিঠে চাবুক পড়বে। আমার স্ত্রী বড় লোকের স্ত্রী, আমার ছেলেমেয়ে বড়লোকের ছেলেমেয়ে, তারা কারো কাছে ছোট হতে পারবে না। যারা উঁচুতে উঠেছে তারা আরো উঁচুতে উঠতে চায়, যাদের বেশী আছে তারা আরো বেশী চায়।

সুমিত্রা—তুমি নিজের কথা একটুও ভাব না বিনুদা।

বিনয়—আমার নিজের জন্যে কিচ্ছু ভাববার নেই।

সুমিত্রা—তার মানে আমি জানি বিনুদা।

বিনয়—(সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে) কি জানো তুমি সুমি ?

সুমিত্রা—তুমি যা ছিলে আর তা নাই।

বিনয়—(হাসতে হাসতে) অর্থাৎ বিনুদা মরে গেছে।

সুমিত্রা—ওসব বোলো না বিনুদা।

বিনয়—অথচ ঐটাই সত্য কথা।

সুমিত্রা—ও কথা থাক। তুমিও অনেককাল পরে দেশে এলে, থাকবে তো কিছু দিন ?

বিনয়—দিনদুই থাকবো।

সুমিত্রা—মাত্র দুদিন।

বিনয়—(হেসে) আর কত ?

সুমিত্রা—গ্রাম আর সে গ্রাম নেই বিনুদা।

বিনয়—পথ দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম সত্যিই কত পরিবর্তন হয়েছে। দত্তদের অতবড় বাড়ীটা ভেঙ্গে পড়েছে রায়েদের নতুন বাড়ী হয়েছে। ষ্টেশন থেকে গাঁ পর্য্যন্ত পাকা সড়ক হয়েছে।

সুমিত্রা—ধীরে ধীরে সব বদলে যাচ্ছে বিনুদা।

বিনয়—এ দীঘিটা দত্তদের। কি ছিল, কি হাল হয়েছে। ঘাটের সিঁড়িগুলো ভেঙ্গে গেছে, চাতালের আধখানা নেই। ছেলেবেলায় সারাদিন এইখানেই কাটতো।

সুমিত্রা—তখন কানায় কানায় জল থাকতো, কতো সাঁতার কেটেছি।

বিনয়—তোমাকে কে সাঁতার শিখিয়েছিল ?

সুমিত্রা—(হাসতে হাসতে)। তুমি, তুমি হাত ধরে টেনে ডুব জলে নিয়ে ছেড়ে দিতে, আমি হাত পা ছুড়তে ছুড়তে কোনমতে ঘাটে এসে উঠতাম। কি দুষ্টু যে ছিলে।

বিনয়—দুষ্টু আমি ছিলাম না তুমি। ইস্কুল থেকে দুপুরবেলা পালিয়ে আসতে কে বলতো ? রায়েদের বাগান থেকে আম চুরি করে আনতে কে বলতো ?

সুমিত্রা—বাবা, তোমার সে সব কথা মনেও আছে।

বিনয়—মনে থাকবে না। সে আর কতদিনের কথা।

সুমিত্রা—কি যে বলো, সে যে এক যুগ আগেকার কথা, তিরিশ বছর, হয়তো আরো বেশী।

বিনয়—তা হবে, মনে হয় যেন কালকের কথা।

সুমিত্রা—তাইতো মনে হয়।

বিনয়—তুমি তখন দেখতে বড্ড বিশ্রী ছিলে।

সুমিত্রা—ইস্।

বিনয়—চোখ দুটো ছোট ছোট, নাকটা থাঁদা, দাঁতগুলো উঁচু।

সুমিত্রা—(হেসে ফেলে) ছেলেবেলায় ঐসব বলে আমাকে রাগিয়ে দিতে।

বিনয়—(সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে) তোমার চেহারা তেমন বদলায় নি।

সুমিত্রা—চল্লিশ পার হয়ে গেছে বিনুদা।

বিনয়—তা হয়তো গেছে, কিন্তু গায়ের রং তেমনি ফুটফুটে আছে, চোখ দুটো—

সুমিত্রা—(মুখ ঘুরিয়ে) থামো বিনুদা।

বিনয়—চুল একটিও পাকে নি।

সুমিত্রা—(হেসে) চুল পেকেছে; এই দেখো (একগোছা চুল নিয়ে দেখায়)

বিনয়—দু চারটে। আমার দেখছো সব পেকে গেছে।

সুমিত্রা—আমার চেয়ে তুমি কতই বা বড়।

বিনয়—অনেক অনেক বড়।

সুমিত্রা—কি যে বলো বিনুদা, মাত্র দু বছরের বড়। আগে তো তোমাকে নাম ধরেই ডাকতাম। মনে নেই এই ঘাটেই একদিন মা ধমক দিয়ে বলেছিলেন "বিনু তোর চেয়ে দু বছরের বড়, ওকে দাদা বলবি।"

বিনয়—সুমি।

সুমিত্রা—কি বিনুদা।

বিনয়—এই ঘাট অনেক কিছুর সাক্ষী, তাই না?

সুমিত্রা—(একটু হেসে মাথা নাড়ে)

বিনয়—ঐ যে ওপাশের রানা, ওর নীচে একখানা ইটে কি লেখা আছে?

সুমিত্রা—তোমার নজরে পড়েছে বিনুদা।

বিনয়—আমি ঘাটে এসে বসেই লক্ষ্য করেছি, দেখলাম এখনও আছে। ইট ক্ষয়ে গেছে, হয়তো আর কেউ পড়তেও পারবে না। কেবল তুমি আর আমি পারবো।

সুমিত্রা—তুমি ছুরি দিয়ে কেটে কেটে আমার নাম লিখেছিলে।

বিনয়—আমি লিখেছিলাম "সুমিত্রা"। পরদিন এসে দেখি সুমিত্রার পাশে লেখা আছে "বিনয়"। কে লিখেছিল সুমি?

সুমিত্রা—(হেসে) আমি জানিনা।

বিনয়—আমি জানি।

(হঠাৎ দূর থেকে সানাই এর মিঠে সুর ভেসে আসে, দুজনে চুপ করে শোনে)

বিনয়—সুমি।

সুমিত্রা—কি বিনুদা?

বিনয়—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোলোনা কেন?

সুমিত্রা—(একটু চুপ করে থেকে বিনয়ের কাঁধের পইতে দেখিয়ে) ঐ জন্যে।

বিনয়—আমি বামুনের ছেলে আর তুমি কায়েতের মেয়ে এই জন্যে—তাই না?

সুমিত্রা—(নিঃশব্দে মাথা নাড়ে)

বিনয়—মাকে বলেছিলাম "আমি সুমিকে বিয়ে করবো।" কথাটা বাবার কানে গেল, বল্লেন "আমরা ব্রাহ্মণ মনে থাকে যেন, এবংশে কোন অনাচার হয়নি, হবেনা।"

সুমিত্রা—সেই থেকে মা তোমার সঙ্গে মিশতে আমাকে বারণ করে দিয়েছিলেন।

বিনয়—কিছুদিন পরে আমাকেও কোলকাতা পাঠানো হলো।

(দুজনে চুপকরে বসে থাকে দূর থেকে সানাইএর সুর ভেসে আসে)

বিনয়—সুমি।

সুমিত্রা—কি বিনুদা?

বিনয়—সানাই বাজছে শুনছো?

সুমিত্রা—শুনছি।

বিনয়—আমার বাড়ীতেই বাজছে, আজ আমার ভাইপোর বিয়ে তোমার ভাইঝির সঙ্গে। আজ কেউ বাধা দেয়নি।

সুমিত্রা—না বিনুদা।

বিনয়—আজ চাটুয্যেদের বাড়ীতে সানাই বাজছে, বোসেদের বাড়ীতেও সানাই বাজছে—আশ্চর্য।

সুমিত্রা—তাই তো ভাবি বিনুদা।

বিনয়—তুমি বলছিলে তিরিশ বছর কেটে গেছে।

সুমিত্রা—হ্যাঁ বিনুদা।

বিনয়—তিরিশ বছর আগেকার যে দুটি ছেলেমেয়ে পরস্পরকে ভালবাসতো তারা আজ কোথা বলতে পারো?

সুমিত্রা—(চুপকরে থাকে)

বিনয়—তুমি জানো অথচ বলবে না। আমি বলছি শোনো, তারা এখনও আছে, তারা লুকিয়ে আছে, একজন আমার মধ্যে, আর একজন তোমার মধ্যে।

সুমিত্রা—জানি বিনুদা।

বিনয়—এক একদিন তারা বেরিয়ে আসে, দুজন দুজনকে নাম ধরে ডাকে। কাছে যেতে চায়।

সুমিত্রা—(চুপ করে থাকে)

বিনয়—আমার যে স্বপ্নগুলো গাঁয়ের পথে হারিয়ে গিয়েছিল, আজকের ঐ সানাইএর সুরে তারা আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে।

সুমিত্রা—কেমন স্বপ্ন বিনুদা ?

বিনয়—শুনে হাসবে না তো ?

সুমিত্রা—হাসি যদি পায় হাসবো।

বিনয়—তাই হেসো। শোনো তাহলে বলি, ত্রিশবছর আগে এক সন্ধ্যায় যদি সানাই বাজিয়ে চাটুয্যেদের ছেলে বিনয়ের সঙ্গে বোসেদের মেয়ে সুমিত্রার বিয়ে হোতো তাহলে কেমন হোতো ?

সুমিত্রা—তুমি বলো।

বিনয়—আমি গ্রামের ছেলে গ্রামেই থাকতাম।

সুমিত্রা—তারপর।

বিনয়—শুনে তুমি হাসলে না ? তুমি শহরে যেতে চাইতে না ?

সুমিত্রা—না, আমি গ্রামের মেয়ে গ্রামেই থাকতাম। তারপর বলো।

বিনয়—শোনো, গ্রামের আলোছায়ায় প্রেমের যে সহজ সুরটি তোমার আমার বুকে বেজে উঠেছিল সারা জীবন দুই বুকে সেই সুর বাজতো। এই পুকুরে যেমন আমরা সাঁতার কেটেছি তেমনি সাঁতার কাটতাম, বকুল তলায় যেমন দুজনে ফুল কুড়িয়েছি তেমন দুজনে ফুল কুড়োতাম।

সুমিত্রা—তারপর।

বিনয়—যেমন করে দুজনে খেলাঘর গড়ে তুলতাম, তেমন করেই দুজনে গড়ে তুলতাম আমাদের সত্যিকার ঘর।

সুমিত্রা—(চুপ করে থাকে)

বিনয়—দিনের কাজে দুজনে থাকতাম পাশাপাশি। তার পরে অনেক রাতে তোমার যখন ঘরের কাজ শেষ হোতো তখন তুমি খোঁপায় একটি গন্ধরাজ গুঁজে আসতে আমার কাছে, দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিয়ে আমি এসে দাঁড়াতাম তোমার পাশে ধরতাম হাতখানা—

সুমিত্রা—(হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) ওমা, সন্ধ্যা যে লেগে এলো, কথায় কথায় বেলা কেটে গেছে। চলি বিনুদা।

(কলসী তুলে নিয়ে সুমিত্রা ঘাটে নেমে জল ভরে, তারপরে কলসী কাঁখে নিয়ে চাতালে ভিজে পায়ের দাগ রেখে গাঁয়ের পথ ধরে চলে যায়। একটু পরে বিনয়ও ওঠে, দূরে সানাই বাজতে থাকে।)

স্বীকৃতি

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

আটশত মিটার দৌড়ের দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—Mal Whitfield আর Arthur Wint। অলিম্পিকের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এই দুটি নাম। আজও সবাই আবেগভরা চিত্তে এই দুটি নাম স্মরণ করে।

Mal Whitfield দোহারা গঠন এবং মধ্যমাকৃতির। তীব্রগতি এবং সাবলীল তার পদক্ষেপ। দৌড়ের শুরু থেকে শেষ অবধি ছুটে যায় সে অপ্রতিহত গতিতে।

জ্যামাইকার দীর্ঘদেহী যুবক Arthur Wint। উচ্চতায় সাড়ে ছয় ফিট। চেহারার আর এক বিশেষত্ব তার—নিম্নাঙ্গটি উর্দ্ধাঙ্গের তুলনায় অস্বাভাবিক দীর্ঘ। দীর্ঘ তার প্রতিটি পদক্ষেপ। দৌড়ের সময় দীর্ঘপদক্ষেপে অনায়াসভঙ্গিতে সকলকে পিছনে ফেলে সহজভাবে এগিয়ে যান তিনি। তাঁর এই দীর্ঘপদক্ষেপের দৌড় কেবলমাত্র তীব্রগতি সম্পন্ন জিরাফের দৌড়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৪৮ সালে অলিম্পিকে ৮০০ মিটার দৌড়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গিয়েছিল একবার বিপুল উত্তেজনা আর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে Mal Whitfield, Arthur Wint কে পরাজিত করে বিজয়ী সাব্যস্ত হন।

কিন্তু পরবৎসর ১৯৪৯ সালে Wint তিনবার Whitfield কে তিনটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেন।

এরপর এল হেলসিঙ্কী অলিম্পিক, ১৯৫২ সাল। আবার দুই পুরাণ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখা গেল অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গণে।

এবার শুরু হবে আটশত মিটার দৌড়। Arthur এবং Malকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে।

লক্ষ লোক সমাগত—স্টেডিয়ামের সকলেই জানে জীবন মরণ পণ করে কি প্রচণ্ড এই দৌড় আজ চলতে থাকবে। ম্যালও একথা জানে। আর জানে আর্থার।

আরম্ভ হল দৌড়। প্রথম চক্রে দেখা গেল সবার আগে ছুটে চলেছেন আর্থার নিজস্ব সহজ ভঙ্গিমায়। ম্যাল তখন আছেন পঞ্চম স্থানে।

চলেছে দৌড়। হঠাৎ Malকে রবারের মতন বেড়ে গিয়ে আর্থারকে পিছনে ফেলে একহাত এগিয়ে যেতে দেখা গেল। তীব্রগতি এবং সমান তালে ছুটে চলেছেন তারা। একজন মাঝারি পদক্ষেপ এবং তীব্র গতিতে আর অপরজন সহজ এবং দীর্ঘ পদক্ষেপে। শেষ চক্রের শেষ বাঁকের মুখ পর্য্যন্ত চলল দৌড় এই রকম।

অতঃপর এখন বাকী রইল শেষ তিরিশ গজ সোজা (flat) দৌড়। ম্যালের নিরবিচ্ছিন্ন গতিবেগ একটু বিঘ্নিত হতে দেখা গেল। অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন তিনি। পা দুটি যেন একটু কাঁপছে। এসময় আর্থারকে বেরিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করতে দেখা গেল। কিন্তু Mal দাঁতে দাঁত চেপে দুরত্বের ব্যবধান একটুও কমতে দিলেন না।

মনে হচ্ছে ম্যালের গতিবেগ যেন একটু কমে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা গেল পরিশ্রমে বিকৃতমুখে প্রাণ-পণে Mal পূর্বগতিবেগ বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন।

অতঃপর ফিতাস্পর্শ করে দৌড় শেষ করলেন তারা দুজনে, মাত্র একহাতের ব্যবধানে। উইন্ট কোনরকমেই ঘোচাতে পারলেন না ‘এই এক হাতের ব্যবধান।

দৌড় শেষে উইন্ট তার কোন এক বন্ধুকে বলেছিলেন "এ যে কি দৌড় হয়েছে, ভাই! তা তোমরা কেউ জান না আর বুঝতেও পারবে না কেউ তা। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে মাত্র এক হাত দূরে অবসন্ন ম্যাল ছুটে চলেছে। দেখছি তার পেশীগুলি সব শক্ত হয়ে গিয়েছে। আর বুঝতে পারছিলাম ম্যাল তার মহাশক্তির শেষ পর্য্যায়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ক্লান্তি বিদীর্ণ শরীরে কিছুই করতে পারলাম না। শুধু কেবল এক হাতের ব্যবধানে আমি পরাজিত হচ্ছি এই দেখতে দেখতে আমি দৌড় শেষ করলাম। আমার শেষ শক্তিটুকু পর্য্যন্ত কে যেন নিংড়ে বার করে নিয়েছে। তাই বলছিলাম এ দৌড় তোমরা কেউ বুঝবে না।"

এরই নাম স্বীকৃতি

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এবারের নির্ব্বাচনী-নিড়ানে বহু আগাছার সঙ্গে অনেক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষেরও পতন ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র ভারতে একই অবস্থা। ভোটারগণ তাহাদের মনোমত সদস্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন—ইহাতে কাহারো কিছু বলিবার কিংবা আপত্তি করিবার কোন হেতু থাকিতে পারে না। কিন্তু আদি কংগ্রেসের নেতা এবং স্বতন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারি এবার নির্ব্বাচন সম্পর্কে নব-কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যে প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অশোভন, আপত্তিজনক। পরাজয়ের গ্লানি মিটাইতে তাঁহারা যে পথে চলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের চিত্তদাহ হয়ত কিঞ্চিত প্রশমিত হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে—তাঁহাদের সুনামের (এখনও যদি থাকে!) সমাপ্তি ঘটিবে।

সমস্ত নির্ব্বাচনটাকে "টাকার খেলা" বলিয়া অভিহিত করবার কি কারণ আছে তাহা আমরা বুঝিলাম না। পরাজিত বিরোধী পক্ষের নেতারা বলিয়াছেন এই নির্ব্বাচনে নব-কংগ্রেসের ভোট ক্রয় করিতে অন্তত ৮০ কোটি কিংবা তাহারও বেশী অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে—যদিও এই অর্থ ভোটারসংখ্যার তুলনায় অতি অকিঞ্চিতকর। ধরিয়া লইলাম বিরোধী আদি কংগ্রেসের এই অভিযোগ কিছুটা সত্য—কিন্তু তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ভোটক্রয়ের ব্যাপারে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সূচনা করে কংগ্রেস। তৎকালীন প্রখ্যাত নেতা এবং তাঁহার প্রধান নেতারা টাকার খেলা দেখাইয়া ভোট ভাগানো ক্রিয়া কর্ম্মে অতি পারদর্শী ছিলেন কিন্তু এই [illegible]

স্বার্থের কারণে এ কার্য করেন নাই। দেশের ভাল হইবে এইজন্য তাঁহারা যে কোন নীতি গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে মিঃ সি আর দাশ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "ফরোয়ার্ড" নামক দৈনিকের প্রথম সংখ্যার প্রথম সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়—Nothing is too mean to achieve our aim (goal)—(এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হয়েন)। ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের এবং ইংরেজদের ভারত হইতে খেদাইবার জন্য ভালমন্দ যে কোন উপায় গ্রহণে কোন আপত্তি নাই এই মতবাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন—প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ পত্রিকাতেও সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রতিবাদ করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করা যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৫।৩।৭১) প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য :

দ্বন্দ্বের জয়-পরাজয় দুই-ই আছে—তা সে দ্বন্দ্ব খেলারই হউক আর প্রণয়েরই হউক, নির্বাচনেরই হউক আর রণক্ষেত্রেরই হউক। তবে খেলার দ্বন্দ্ব সমান-সমান হইতেও পারে, কিন্তু অন্যত্র তাহার অবকাশ নাই। রণে-প্রণয়ে-নির্বাচনে হয় হার নয় জিত—মাঝামাঝি কিছু তো সেখানে দেখা যায় না। প্রেমে ব্যর্থ হইলে অনেকে বিবাগী হইয়া যায়, কেহ কেহ আত্মঘাতীও হয়, বিস্তর লোকে আবার সব ভুলিয়া গিয়া দিব্য অপরকে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার করে। রণে হারিলে চরম বিপত্তিও ঘটিতে পারে, আবার দিনকতক পরে নূতন শক্তি সঞ্চয়

পারে। নির্বাচনের ফলশ্রুতিও কতকটা একই রকমের। *নির্বাচনে তেমন-তেমন ক্ষেত্রে পরাজয় ঘটিলে কাহারও কাহারও রাজনৈতিক জীবনের উপর* পরিসমাপ্তির যবনিকা নামিয়া আসে। আবার কেহ হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট হইতে বিজয়মাল্য কাড়িয়া লইবার সুযোগ খোঁজে উপ-নির্বাচনে কিংবা পরের দফা নির্বাচনে।

তাহাতে সে জোটের নেতারা বিলাপ করিলে কেহ বিস্মিত হইত না, কিন্তু তাঁহারা প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিবেন এমনটা কেহ আশা করে না। অথচ নির্বাচনে নব-কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়া আদি কংগ্রেসের প্রধান শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং তাঁহারই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া স্বতন্ত্র-প্রধান শ্রীরাজাগোপালাচারি যে মন্তব্য করিয়াছেন সে তো প্রায় প্রলাপের মতোই শোনাইয়াছে। পরাজয়ের বেদনাতেও অমন ধরণের কথা তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হওয়া সঙ্গত হয় নাই। তাহাতে না বাড়িয়াছে তাঁহাদের মর্যাদা, না দলের।

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার ধারণা এবারের নির্বাচন নাকি সোজা পথে চলে নাই অর্থাৎ বাঁকা করিয়া তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহার নির্গলিতার্থ হইতেছে—নির্বাচনে এবার কিছু কারচুপি ছিল। সে অভিযোগের সমর্থন করিয়াছেন শ্রীরাজাগোপালা-চারি। তাঁহার মতে এবারের নির্বাচনে গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কথাটা অনেকটা নাচিতে না জানিলে কী আছে? দুই-একটা কেন্দ্র সম্পর্কে অভিযোগ উঠিলেও না হয় কথা ছিল, কিন্তু যে নির্বাচনে পাঁচ শতর উপর আসনের জন্য লড়াই চলিয়াছে সেখানে ব্যাপকভাবে চালাকি করা হইয়াছে—এ কথা অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়।

মনে হইতেছে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এবং শ্রীরাজাগোপালা-চারি এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তাই আঘাতটা তাঁহাদের বুকে বড় বেশী বাজিয়াছে। তাই তাঁহারা অমন কলঙ্ককর উক্তি করিয়াছেন এক রকম আত্মহারা হইয়া। তাঁহাদের খেয়াল নাই তাঁহারা কলঙ্কের ডালি তুলিয়া দিতেছেন সেই ভোটারদের মাথায়, যাঁহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে পুড়িয়া শারীরিক কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়াছেন। গণতন্ত্রে এ দেশের সাধারণ নাগরিকের যে নিষ্ঠা তাহার তুলনা বিশ্বের প্রথম সারির গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও মেলে না। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও শ্রীরাজাগোপালাচারির মতো প্রবীণ রাজনীতিকরা যদি পরাজয়ের আঘাত হাসিমুখে সহ্য করিতে না পারেন তাহা হইলে নির্বাচনে যে হারে তাহার তো বটেই তাহার দলপতিরও মাথাকাটা যায় গভীর লজ্জায় পরাজয়ের গ্লানিতে। তাই বলিয়া তাঁহাদের মাথা খারাপ হইবে কেন? সন্দেহ হইতেছে পরাজিত হইয়া কোনও কোনও দলীয় নেতার তাহাই বুঝি হইয়াছে। নহিলে তাঁহারা এমন সব অসংলগ্ন কথা বলিতে শুরু করিবেন কেন? চার দলের জোটের নির্বাচনে যে শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে তৎপরের কথা উঠানকে দোষ দেওয়ার মতো শুনাইতেছে। নির্বাচকমণ্ডলীর মন পাইবার সাধনা নির্বাচনের আগে সকল দলই করিয়াছে। সে সাধনায় সকলেই ব্যর্থ এক নব-কংগ্রেস ছাড়া। তাহার ডাকে লক্ষ লক্ষ নরনারী যেভাবে সাড়া দিয়েছে তাহা বিস্ময়কর। তাহাতে পরাজিত দলগুলি বেদনা ও লজ্জাবোধ করিতে পারে। কিন্তু ইহাতে নির্বাচন সম্বন্ধে কটাক্ষ করিবার হইলে তো বড়ই আশঙ্কার কথা। এ ব্যাপারে শ্রীমিনামাসানির আচরণ বরঞ্চ শোভন ও সঙ্গত। অকুণ্ঠচিত্তে জনগণের রায় তিনি মানিয়া লইয়াছেন। তেমন করাই অন্যদেরও উচিত ছিল। গণতন্ত্রে তাহাই নিয়ম। নির্বাচনে হারিলে কেহ অযথা রুষ্ট হয় না, জনগণের সিদ্ধান্তকে মাথা পাতিয়া লয়। নহিলে জনমতের কোনও মূল্য থাকে না।

শ্রীপ্রফুল্ল সেন এবং অতুল্য ঘোষকে ধন্যবাদ—

সংবাদে প্রকাশ জনগণের রায়ে নব কংগ্রেসই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে আদি

কংগ্রেসের পুরোধা নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন শনিবার আমাদের কাছে একথা বলেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং এবারকার অন্তর্বর্তী নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভায় এখন পর্যন্ত নির্বাচিতদের মধ্যে আদি কংগ্রেস সদস্য শ্রীসেন রাজ্যের সমস্ত কংগ্রেস নেতা ও কর্মীকে জনগণের ওই রায় মেনে নিতে বলেছেন।

এই কথা যাঁর তিনি একদিন যদি শুধু একদল থেকে অন্য দলে নয় এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতে আসতেন তাহলে আজ "এক এবং অদ্বিতীয়" নয় এই রাজ্যের আবার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন।

শ্রীসেন এদিন রাত্রে একটি বিবৃতিতে বলেন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে জনগণ শ্রীজগজ্জীবন রামের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং কংগ্রেসবিভক্ত হওয়ার পর যে বিতর্কের অবতারণ হয়েছে তার অবসান ঘটল।

শ্রীসেন আদি কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ শাখার একটি জরুরিসভা ডাকার অনুরোধ জানিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় কংগ্রেস ভবনে শ্রীসেন আদি কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার পর ওই বিবৃতিটি প্রকাশ করেন।

ডঃ চন্দ্র আমাদের জানান তিনি প্রফুল্লবাবুর বিবৃতির সঙ্গে একমত।

আদি কংগ্রেসের ওয়ারকিং কমিটির সদস্য শ্রীঅতুল্য ঘোষও এক সাক্ষাৎকারে আমাদের বলেন: আমি সর্বান্তকরণে প্রফুল্লদার বিবৃতিকে সমর্থন করি।'

অতুল্যবাবু জানান, এদিন সকালে প্রফুল্লবাবু তাঁর সঙ্গে আলোচনার পরই ওই বিবৃতিটি তৈরি করেন।

শ্রীসেন আমাদের সঙ্গে আলোচনাকালে বলেন: "কংগ্রেসের একজন প্রবীণ সক্রিয় কর্মী হিসাবে আমি মনে করি নব কংগ্রেসকেই দেশের মানুষ জাতীয় কংগ্রেস বলে গ্রহণ করেছে। সুতরাং এখন আমাদের কী করা উচিত তা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিই ঠিক করে দিক। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবেন আমি তা মেনে নেব।"

এর পরে অতুল্যবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি আমাদের বলেন: আমি প্রফুল্লদার বিবৃতির সঙ্গে একমত। কংগ্রেস বলতে এখন ওই সংগঠনকেই বোঝায়। যাঁর নেতা শ্রীজগজ্জীবন রাম। নির্বাচনে সারা দেশের মানুষ যে রায় দিয়েছেন তাতে আর দুই কংগ্রেস থাকার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

অতুল্যবাবুও জানান এখন আদি কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটিই ঠিক করবে কী হবে। তিনি জানান সারা ভারতের আদি কংগ্রেসের হয়ে কোন কথা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রশ্নে তিনি বলতে পারেন যে প্রফুল্লদার বিবৃতিতে আমাদের সকলেরই কথা বলা হয়েছে এবং আমি নিশ্চিত যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি শ্রীসেনের বিবৃতিকে একবাক্যে সমর্থন জানাবে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্পর্কে অতুল্যবাবু বলেন, জনগণ নব কংগ্রেসকে সি পি এম-বিরোধী দল বলেই ধরে নিয়েছেন। এবং দেশের মানুষ এটাও ভেবেছেন যে নব কংগ্রেসই একটি স্থায়ী সরকার গড়তে সক্ষম।

নির্ব্বাচনের পরাজয়কে এইভাবেই গ্রহণ করা সমীচীন এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

বিপদ হইয়াছে এখন সকল কংগ্রেসী ঝানু এবং প্রায় স্থবির নেতাদের লইয়া যাঁহারা কালের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে জানেন না।

একবারে নায়ক হইয়া বসিবার পর তাঁহারা অনন্তকাল নেতার আসন অধিকার করিয়া থাকিবেন, কিন্তু স্থবির নেতারা ভুলিয়া যান যে যথাসময়ে কালকে স্বীকার না করিতে পারিলে মহাকাল তাঁহাদের ঘাড় ধরিয়া কালপুকুরে নিক্ষেপ করিবে।

বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিহীন কংগ্রেসী নেতারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে যথাসময়ে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। দেশের যুবসমাজে আজ নব চিন্তাধারার শুভ সুপ্রকট এখন। সময় হইয়াছে এই যুব সমাজের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ অর্পণ করা। যুবসমাজ বহু প্রকার ভুল হয়ত করিবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারাই দেশের এবং জাতির কল্যাণ করিতে পারিবে।

এ বিষয়ে আমাদের কংগ্রেসী প্রপিতামহ বয়স্ক নায়কদের আমাদের সিনেমা এবং থিয়েটারে যাঁহারা নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা অবসর-গ্রহণে বয়স অতিক্রান্ত হইলেও নায়কত্ব ছাড়িতে সহজে রাজী হয়েন না'। তাঁহারা মনে করেন নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করিবার দাবী চিরকালের (বহু নাম করা যায়)।

বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটাগার্বো—যশের এবং খ্যাতির চরম শিখরে উঠিয়া—মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে—সিনেমা-জগত হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, বিশেষ করিয়া সিনেমা নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রে কি দেখিতে পাই?-এমন কি নিমতলার পথে চলিবার সময়ও, সুযোগ পাইলে তাঁহারা অন্তিম—নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় একটা চরম অভিনয় করিতে পাইলেও নিজেদের জীবন সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

কংগ্রেসী নায়কদের সহিত সিনেমা-থিয়েটার নায়কদের চরিত্রগত একটা অদ্ভুত মিল দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষ যে তাঁহাদের আর ষ্টেজে দেখিতে চায় না, দেখিলে খুশী অপেক্ষা বিরক্তই বেশী হয়, এই সামান্য বিষয়টা তাঁহাদের অতিবুদ্ধিস্ফীত পক্ক মস্তকে প্রবেশ করে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লোহার হাতুড়ির ঘা দিয়া তাহা প্রবেশ করিয়া দেওয়া না হয়।

এবারের নির্ব্বাচনী নিড়ানিতে কংগ্রেস (এবং অন্যান্য প্রায় সবকয়টি, আগাছা 'আপকা-ওয়াস্তে' তথা-কথিত রাজনৈতিক দল) উৎপাটিত হইয়াও এখনও তাঁহাদের চেতনা হয় নাই, এখনও তাঁহারা আশা করিতেছেন যে আর একবার, অর্থাৎ পরের বার তাঁহারা তাঁহাদের স্তোকবাক্যের-গদাহাতে প্রতিপক্ষদের ধরাশায়ী করিতে পারিবেনই। ইহাকেই বলে মানুষের অন্তহীন আশা—! সুখের দিন বিগত হইলেও, সুখস্বপ্ন যায় না।

"মরিয়া না মরে রাম
এ-কেমন বৈরী!"

স্বাগত।

এবারের নির্ব্বাচনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের দু-জন ছাত্র শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এবং শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় নির্ব্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সংবাদে আমরা আনন্দিত। এই ছাত্র দুইজন নব-কংগ্রেস দলভুক্ত হইলেও তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনাসভায় সকল শ্রেণীর এবং সকল দলীয় ছাত্র ছাত্রী যোগদান করেন। বিজয়ী দুইজন ছাত্রদের বয়স ২৬।২৭ এর মধ্যে। আমরা আশা করি—এই দুইজন যুবক-ছাত্র কোন দলীয় নিচতার শিকার হইবেন না এবং দলীয় নিচতার চক্রে পড়িয়া নিজেদের কোনভাবে হেয় করিবেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি যেন সদা স্বচ্ছ থাকে, তাঁহাদের আদর্শ যেন—দেশ, জাতি এবং মানুষের কল্যাণের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হয়, মানুষের সেবাই যেন হয় তাঁহাদের ধর্ম্ম। বিদেশী রাজ-নৈতিক গুরুমহাশয়দের মন্ত্র যেন আমাদের দেশের মহাজনদের প্রতি অতি-ভক্তি এবং নিষ্ঠার কারণে, এই দুইজন যুবক তথা বাঙ্গলার সমগ্র যুবসমাজকে যেন বিভ্রান্ত না করে। আমরা আশা করিতে থাকিব বাঙ্গালী আদর্শবাদী যুবজন নিজেদের কর্মনিষ্ঠা এবং জাতি ও দেশেয় প্রতি কর্ত্তব্যবোধের প্রেরণায় তাঁহারা অশক্ত অথর্ব্ব এবং ক্ষমতালোভী অকর্ম্মার দলকে যেন জাতীয় নেতৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য করিয়া বাঙ্গলা দেশের এক নবজীবন তথা নবপ্রেরণার সঞ্চার করেন। বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী আজ ভারতের

অন্যরাজ্যের অধিবাসীদের নিকট উপহাসের পাত্র। এই উপহাসকের দল বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ঘৃণা এবং উপহাস করিবার সময় নিজেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন বোধ করে না। নিজেদের প্রতি সামান্য একটু দৃষ্টিদান করিলে, তাহারা দেখিতে পাইত, তাহারা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই শ্রেয় নহে। বরং তাহার উল্টা! এখনো বাঙ্গালীর যুবসমাজে প্রাণের সহিত কর্ম্মের যে উদ্দীপনা দেখা যায়—অন্যত্র তাহা নাই।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীসভার কি হইবে?

নির্ব্বাচনের ফলের উপর বিচার করিলে দেখা যায় যে কোন দল কিংবা জোট একক দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে নাই এবং সেই কারণ কোন দলই তাহার গরিষ্ঠতা প্রকাশ্যভাবে প্রমাণ করিতে না পারিলে সরকার গঠনের দাবি করিতে পারে না, দাবি করিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এ-দিক দিয়া রাজ্যপাল শ্রীধাবন জ্যোতি বসু তথা সি পি এম এর দাবি নাকচ করিয়া কোন অন্যায় করেন নাই। আজ পর্য্যন্ত (২১।৩।৭১) জ্যোতি বসু বারবার তাঁহার দলের সরকার গঠনের দাবি পরিত্যাগ করেন নাই—এমন কি তাঁহার দলভুক্ত জনৈক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হুমকী দিয়াছেন যে—যেহেতু সি পি এম একক দল হিসাবে ১১০টি আসন পাইয়াছেন এবং এই সংখ্যা অন্য যে কোন দল অপেক্ষা বেশী, অতএব জ্যোতিবাবুকে অবিলম্বে সরকার গঠন করিতে না দিলে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ আরম্ভ করা হইবে। এ-রাজ্যের জনগণ নাকি সি পি এম নামক দলের উপর তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে রায় দিয়াছে! অতএব রাজ্যপালের আর টালবাহানা করিবার কোন অধিকার নাই, চট্‌পট গণপতি জ্যোতি ঠাকুরকে সাদর নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ্যের ভালমন্দ তাহার হস্তে অর্পণ করুন!

সি পি এম বর্ণিত এ-রাজ্যের জনগণ বলিতে এই পার্টির দলীয় এবং সমর্থকদের বুঝায়—ইহার বাহিরে যাহারা সি পি এম ভক্ত কিংবা সমর্থক নহে, তাহারা 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং গণতন্ত্র বিরোধী—অতএব ইহাদের সমূলে উৎপাটিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গে একটি নির্ভেজাল বলিষ্ঠ এবং সি পি এম ইচ্ছিত গণতন্ত্র অবশ্যই কায়েম করিতে হইবে যেমন করিয়াই হউক!

এবং এই গণতন্ত্র অর্থাৎ সি পি এম। রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সদা সংগ্রামী সি পি এম নায়করা আজ তাঁহাদের অতি ঘৃণিত, বিশ্বাসঘাতক বৈমাত্র ভ্রাতা-সদৃশ সি পি আই নায়কদের পায়ে অতি বিনীত এবং তাঁহাদের স্বভাববিরোধী কাতরতার সহিত তৈলদান করিতেছেন! সি পি আই সমর্থনপুষ্ট সি পি এম সরকার একবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে- এই পার্টির কর্ত্তারা বিশেষ করিয়া জ্যোতিঠাকুর রাজ্যপুলিস এবং অন্যান্য বিরোধীদের একবার প্রকৃষ্টভাবে সমঝাইয়া দিবেন কত ধানে কত চাল! এই হুমকিটা তিনি বহু পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন।

এরূপ অবস্থায় আমাদের সকরুণ নিবেদন এই যে সরকার গঠন যে-পার্টি জোট করুক না কেন, শ্রীজ্যোতি বসুর হস্তে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিশেষ করিয়া পুলিস বিভাগ (তথা 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার') যেন অবশ্যই সুদক্ষ প্রশাসক এই সি পি এম নায়কে অর্পিত হয়। প্রয়োজন হইলে এইজন্য আমরা রাষ্ট্রপতির দরবারে আবেদন নিবেদন জানাইব। এবং গণ-ডেপুটেশনেও যাইব—ইহার ব্যয়ভার অবশ্য জ্যোতি ঠাকুর মহাশয়ের গণতহবিল হইতেই দেওয়া হইবে।

সি পি এম বিশেষ করিয়া ইহার বিশেষ কয়েকজনকে আমরা সোঁদর বনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলিয়া মনে করি। হঠাৎ কি তাঁহাদের নখ এবং দন্ত ভোঁতা হইয়া গেল। যে কারণে স্বভাবগত কারণ-অকারণ গর্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতি শত্রু দলের নিকট ন্যাকা-কান্না এবং কাতর আবেদন জানাইতে বাধ্য হইলেন? বিধাতার কি পরিহাস!

২৩।৩।৭১ তারিখের সংবাদে জানা যায় যে অজয় মুখোপাধ্যায় এর নায়কত্বে বাঙ্গলায় ৮জোট মিলিত সরকার গঠিত হইবে। ভাল কথা কিন্তু

ইহার পরিণতি আবার সেই আগের যুক্তফ্রণ্টের মত হইবে না তো? ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়।

সি পি এমের আগামী গণবিক্ষোভ!

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত সরকার কে বা কাহারা গঠন করিবে তাহা আজ পর্য্যন্ত (২৪-৩-৭১) অনিশ্চিত। কিন্তু সংখ্যালঘুতা সত্বে শ্রীজ্যোতি বসু তথা সি পি এম দাবি করিতেছে যে একমাত্র তাহারাই এ-রাজ্যে মন্ত্রীত্ব গঠন করিবার অধিকারী, কারণ সি পি এম রাজ্য বিধানসভায় ২৮০টি আসনের মধ্যে ১১০টি আসন দখল করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে সি পি এম-এর আসন সংখ্যা ১১০ হইলেও—অন্যদিকের ১৭০টি আসনের তথা নির্ব্বাচিত এম এল এ-দের কোন মূল্যই নাই! সি পি এম যদি সরকার গঠন করিতে না পারে (না পারার সম্ভাবনাই অধিকতর)—তাহা হইলে বাংলা এবং বাঙালীকে রক্ষা করিবার পবিত্র কারণে, সি পি এম প্রবলতম এক গণবিক্ষোভ আরম্ভ করিতে বদ্ধ-পরিকর।

প্রস্তাবিত 'গণতান্ত্রিক গণবিক্ষোভ' সার্থক করিতে হইলে চাই বন্দুক, বোমা, ছোরা-ছুরি, লাঠি-সড়কি, তীর-ধনুক প্রভৃতি গণতান্ত্রিক বিশুদ্ধ অস্ত্রাদি। এ-বিষয়ে প্রস্তুতিপর্ব্ব ভালই চলিতেছে এবং সি পি এমের দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, শান্তিপুর, বরানগর প্রভৃতি আরো নানাস্থানের—জানা ও অজানা স্থানের স্থানীয় আপিস তথা ডিপোগুলিতে বিবিধপ্রকার মারাত্মক অস্ত্রাদির বৃহৎ 'স্টকপাইল' করা হইয়াছে। পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত এবং প্রকাশিত সংবাদ হইতেই ইহা জানা গেল। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, নিজেরা সরকার গঠন করিতে না পারিলে সি পি এম অন্য কোন দলকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে দিবে না বোমা, ডাণ্ডাবাজী এবং অন্য নানাবিধ গণতান্ত্রিক জনবিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া!

পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার এখন কেন্দ্রের হস্তে—কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভালভাবেই বুঝিতেছেন—কিন্তু এবারও কি তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বে-আইনী হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিতে গত-বারের মত কেবলমাত্র 'কৃত সংকল্প' ঘোষণা করিয়া কালক্ষেপ করিবেন?

এ-রাজ্যে মানুষ-মারা উন্মাদনার জন্য কি যথেষ্ট পাগলাগারদ নাই?

(এই মন্তব্য প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই বাঙলার নূতন সরকারের রূপ দেখা যাইবে। অজয়বাবু যদি মুখ্যমন্ত্রী হয়েন তবে তাহাকে সর্ব্বভাবে পরনির্ভর হইতে হইবে।)

বিযুক্ত কংগ্রেস কি সংযুক্ত হইতে পারে না?

নির্ব্বচনে ঠেঙানী খাইয়া কংগ্রেস (ও) এখন চিন্তা করিতেছে আবার দুই কংগ্রেস এক পরিবারভুক্ত হইতে পারে কি না। এই বিষয়ে বাঙলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি আদি কংগ্রেস নেতারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে কংগ্রেস বলিতে এখন একমাত্র নব-কংগ্রেসকেই বুঝায়—জনগণ এই রায় দিয়াছে। আদি কংগ্রেসের এ-পারের বাঙলার নেতারা আবার ভাঙা কংগ্রেসকে এক করিবার বিষয়েও তাঁহাদের মত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাব সময়োচিত এবং উত্তম। কিন্তু—নব-কংগ্রেসের দেশবন্ধু দৌহিত্র শ্রীসিদ্ধার্থ রায় যে-ভাবে এবং যে-ভাষায় আদি কংগ্রেসের সংযুক্তাভি-লাসী নেতাদের প্রকাশ্যভাবে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন যে বাঙলার শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং আরো কয়েকজন নেতাকে কখনই নব-কংগ্রেসভুক্ত করা হইবে না।

ইহারা দরখাস্ত করিতে পারেন, কিন্তু দরখাস্তগুলি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা হইবে নব-কংগ্রেসের কেমিক্যাল ব্যালান্সে। কেবল বিচার বিবেচনাই নহে, পাপী দরখাস্তকারীদের পাপের জন্য বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও হয়ত করা হইবে। 'হেট কংগ্রেস' স্লোগান রচনা করিয়া এবং সক্রিয় দল সি পি আই-এর সহিত হাত মিলাইয়া এই দল এবং অন্য কয়েকটি সমধর্ম্মী "মারো কংগ্রেস" রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা

করিতে নব-কংগ্রেসের কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নাই, কিন্তু মাত্র তিনবছর পূর্ব্বের সমধর্ম্মী এবং সহকর্ম্মীদের সম্পর্কে সিদ্ধার্থবাবুর এত স্পর্শ-কাতরতা কেন? ব্যক্তিগত কলহ এবং দ্বেষ-বিদ্বেষই কি বড়ো কথা হইল? সামান্য ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে উঠিয়া তিনি কি পরাজিত 'শত্রু'—এবং যেসব শত্রু আজ প্রায় আশ্রয়প্রার্থীর অবস্থায় পতিত, সিদ্ধার্থবাবু তাহাদের ক্ষমা করিয়া এক ছাতার তলায় দাঁড়াইতে দিবেন না—এই সামান্য মহানুভবতা তাঁহার নিকট হইতে আশা করা অন্যায় হইবে কি? তাহা ছাড়া পুরাতন কংগ্রেসের কে বা কাহারা নব-কংগ্রেসে যোগ দিবেন, কাহাদের আবার নব-কংগ্রেস দলভুক্ত করা হইবে, তাহা সিদ্ধার্থ রায় মহাশয়ের একলার উপর নির্ভর করে না। আশা করি নব-কংগ্রেসেরও আবার একটি নব-সিণ্ডিকেট উদ্ভব হইবে না।

আমরা আশা করিব শ্রীসিদ্ধার্থ রায় হঠাৎ ক্ষমতায় আসিয়া নিজেকে বেসামাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন না। তপস্যায় সার্থকতা লাভ করিতে হইলে সিদ্ধার্থের মত তপস্যার প্রয়োজন আছে।

শ্রমিক তোষণ-পোষণে কলিকাতা পৌরসভার ব্যাঙ্ক ফেল

এবারের কলিকাতা কর্পোরেশনে যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে মোট ঘাটতির অঙ্ক প্রায় ৯ কোটি টাকার। বাজেট সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমত—

"গত বৃহস্পতিবার (২১-৩-৭১) কলিকাতা পৌরসভার অর্থ কমিটীর চেয়ারম্যান পৌরসভায় আগামী বৎসরের বাজেট পেশ করিয়াছেন। আগামী বৎসরে পৌরসভার আয় ১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা এবং ব্যয় ২২ কোটি ১৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। আগামী বৎসরের বাজেটে ৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ঘাটতির সঙ্গে বর্তমান বৎসরের ৪ কোটি ২৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ঘাটতি মিলাইয়া আগামী বৎসরে পৌরসভাকে মোট ৮ কোটি ৭৫লক্ষ ৬ হাজার টাকা ঘাটতির সম্মুখীন হইতে হইবে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার পৌরসভাকে বিভিন্ন দায় মিটানোর জন্য সাড়ে ৬ কোটি টাকা দিয়াছিলেন, সি এম ডি-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পৌরসভা ৯৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে দুই ভাবে টাকা না পাইলে পৌরসভার ঘাটতি আরও বাড়িয়া যাইত এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখা আরও কঠিন হইয়া পড়িত। বর্তমান আর্থিক বৎসরে বৃহত্তর কলিকাতায় অকট্রয় শুল্ক বসিয়াছে। রাজ্য সরকার ওই টাকার কত অংশ কলিকাতা পৌরসভাকে এবং কত অংশ বৃহত্তর কলিকাতার অন্যান্য পৌরসভাকে দিবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার পৌরসভাকে যে সাড়ে ৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছিলেন, ওই টাকা 'অকট্রয়' শুল্কের অংশ হইতে হয়তো বাদ দেওয়া হইবে। ঘাটতি বাজেটের জন্য পৌরসভার নিকট হইতে সি আই টির বার্ষিক প্রাপ্য ১ কোটি টাকা পৌরসভার আগের মতোই না দেওয়ার সম্ভবনাই বেশী। এবং সেক্ষেত্রে সি আই টি'র পক্ষে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখা কঠিন হইয়া পড়িবে।

কোন সংস্থার বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলে তাহা সাধারণত দুই-ভাবে পূরণের চেষ্টা হয়। এক আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা এবং দুই, অপচয় এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করা। পৌরসভাকে কেহ কর বৃদ্ধি করিতে বলিবে না কারণ তাহা হইলে সৎ নাগরিকদের উপর করের বোঝা বাড়িবে এবং অপর দিকে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে। পৌর-কর আদায়ের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ত্রুটিমুক্ত করিয়া পৌরসভা অনায়সেই আয় বাড়াইতে পারেন কিন্তু বর্তমান বৎসরে ৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকারও বেশী ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের আগে পৌরসভা টালিগঞ্জ যাদবপুর এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ডের বকেয়া কর মুকুব করিয়াছেন।

প্রথমবার ২৫ লক্ষ টাকা ও দ্বিতীয়বার ৪২ লক্ষ টাকা বকেয়া কর মুকুব না করিলে বর্তমান বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ ৬৭ লক্ষ টাকার মত হ্রাস পাইত। কলিকাতায় কসাইখানা হইতে কার্যত তেমন কর আদায় হয় না, ওই কর-ফাঁকি বন্ধ করার ব্যাপারে অর্থ কমিটীর চেয়ারম্যান কোন প্রস্তাব করেন নাই। পৌরসভার বিরুদ্ধে কোন-না কোন অজুহাতে মামলা ঠুকিয়া দিয়া অনেক করদাতা পৌরকর এবং অনেক ব্যবসয়ী লাইসেন্স-ফী বাকী রাখিয়া থাকেন। মামলা ঠুকিলেও সময়মতো কর প্রদানের জন্য আইনগত ব্যবস্থা চালু করিলে একদিকে পৌরসভার আয় বাড়িত এবং অপর দিকে পৌরসভার মামলার সংখ্যাও হ্রাস পাইত।

পৌরসভার ঘাটতির পরিমাণ বাড়িতেছে, টাকার অভাবে রাস্তাঘাট মেরামত হয় না, আবর্জনার স্তূপ জমিয়া থাকে। অথচ 'বরা' কমিটির বরাদ্দের পরিমাণ ৪৬ লক্ষ ২১ হাজার টাকা হইতে বাড়াইয়া ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। ঘাটতি বাজেট, কাজেই পৌর তহবিলে টাকা না থাকার অজুহাতে বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ড আদৌ কোন টাকা পাইবে কি না সন্দেহ। সি এম ডি এর বস্তি উন্নয়ন-প্রকল্পের কাজের ব্যাপারে যখনই বিশেষ বিশেষ এলাকা অগ্রাধিকার পাইল, তখনই সি-এম-ডি-এর বিরুদ্ধে কলিকাতা পৌরসভার বিরোধিতা কার্যত বন্ধ হইল। বরা কমিটীর টাকা ব্যয় হইতেছে অথচ কলিকাতার প্রায় ৪ হাজার গ্যালিপীট ও ম্যানহোলে কোন ঢাকনি থাকে না। বরা কমিটীর টাকা কামাইয়া বরং মশক নিবারণী, আবর্জনা অপসারণ ও অন্যান্য প্রকল্পের জন্য আরও বেশী অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। পৌরসভার ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিশ্চয়ই সাহায্য করা দরকার। বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন প্রকল্প অনুসারে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করার জন্য পৌরসভা টাকা পাইবে। কিন্তু সেই টাকা যে নির্দিষ্ট প্রকল্পে খরচ

হইবে বর্তমান বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা মনে হইতেছে না। যেমন সি-এম-ডি এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা পৌরসভাকে রাস্তা মেরামতের জন্য ২০ লক্ষ টাকা, পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা এবং জলনিকাশী ও পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ৪৬ লক্ষ অর্থাৎ মোট ৯৬ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। পৌরসভা রাস্তা মেরামতের জন্য প্রদত্ত ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা পিচ কিনিতে খরচ করিয়াছেন। দুইটি বুলডোজার কিনিতে ৮লক্ষ টাকা এবং ট্রাক কিনিতে ২২ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। ওই ট্রাক কিনবার ব্যাপারেও একই কোম্পানির কিছু ট্রাক ১০ হাজার টাকা বেশী দামে কিনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার পানীয় জল ও জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্য যে ৭৬ লক্ষ টাকা দিয়াছেন তাহার বেশীর ভাগ অন্য খাতে খরচ হইতেছে। এইসব কারণে আগামী বৎসরের পৌর-বাজেট খুবই নৈরাশ্যজনক।

প্রতি বৎসর ঘাটতি বাজেট পেশ করা গত কিছুকাল যাবত কলিকাতা পৌরসভার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এবারেও তাহাই এবং ইহার জন্য পৌরমেয়র প্রধানত দায়ী এবং দোষী করিয়াছেন অর্থাৎ ধমক দিয়া কেন্দ্র হইতে ভিক্ষা না পাওয়াতেই নাকি পৌরসভার এই অবস্থা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে পৌরসভার কর্ম্মী এবং শ্রমিককে প্রতিপালন করিতেই পৌরসভা নাজেহাল। অথচ ইহাও সত্য যে যে সংখ্যক শ্রমিক বেতন পাইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কত হাজার শ্রমিক যে প্রকৃত এবং কত হাজারের খাতায় নাম ছাড়া কোন প্রকার অস্তিত্বই নাই তাহা কেহ বলিতে পারে না।

প্রকৃত শ্রমিকসংখ্যা স্থির করিবার প্রাণপন চেষ্টা করিবার ফলে পৌরসভার অন্তত দু জন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কমিসনার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, কমিসনার শ্রীকুট্টিও চলিলেন।

অথচ কেন এবং কি কারণে রাজ্য সরকার এবং বর্ত্তমানে কেন্দ্র সরকার এই পৌরসভাকে বাতিল করিতে আগ্রহী নহে তাহা কলিকাতার করদাতারা বুঝিতে পারে না। আমাদের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব নিয়মিত খাজনা দিয়া পৌরসভার সদস্য এবং এক শ্রেণীর কর্ম্ম-হীন বেকার নবাবদের আরাম-বিলাসের ব্যবস্থা করা।

সঙ্কশাস্য

হিংস্র পশুদিগের সহিত সত্যাগ্রহ চলেনা

বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভকালে তদ্দেশের নেতা সেখ মুজিবুর রহমান পাক-সামরিক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐ সৈন্যগণ সত্যাগ্রহের জবাবে নিরস্ত্র বাঙালী নরনারীর উপরে যে নির্ম্মম ও বর্বর অত্যাচার আরম্ভ করিল তাহাতে সত্যাগ্রহ চালানো অসম্ভব হইল। শিশু হত্যা ও নারী ধর্ষণ ব্যাপকরূপ ধারণ করিলে উৎপীড়কদিগের সহিত অহিংস অসহযোগ চলে না। তখন সে উৎপীড়ণের নিবারণ শুধু অস্ত্র চালাইয়া ও আততায়ীর মুণ্ডপাত করিয়াই সম্ভব হইতে পারে। পরে তাহাই হইল। ১২ই মার্চ্চ অবধি অবস্থা কি ছিল তাহা করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত "যুগশক্তি" সাপ্তাহিকের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়ঃ

আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার আদায় করার জন্যে সেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব্ববঙ্গে যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিয়াছেন, তাহা এখন পূর্ণ প্রকোপে চলিতেছে। প্রাত্যহিক ধর্ম্মঘটের দরুণ সরকারী প্রশাসন কার্য্যতঃ অচল হইয়া পড়িয়াছে, এবং জনতার চাপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইতেছে। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকেরা যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন করিতেছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের রেডিও স্টেশনগুলির উপর পশ্চিম পাকিস্তানী নিয়ন্ত্রণ এখন নাই বলিলেই চলে, বেতার কর্ম্মীরা আওগামী লীগের কর্মসূচী এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে প্রচার করিতেছেন।

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক এয়ার মার্শাল আসগর খান পূর্ব্ববঙ্গ সফরান্তে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে চার পাঁচ দিনের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী না মানিলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। তিনি বলেন যে পূর্ব্ববঙ্গকে স্বাধীন ঘোষণা করিবার জন্য শেখ মুজিবুরের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়িতেছে এবং আর দেরী করিলে এই দাবী কোনক্রমেই ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বঙ্গের নবনিযুক্ত গবর্ণর মেজর জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাইতে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অস্বীকৃত হন, ফলে তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুরেয় সহিত আলোচনা করার জন্য ঢাকা যাত্রা করিতেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব

অহিংস অসহযোগ যখন অসম্ভব হইল, পাক সেনা-বাহিনী যখন নির্দোষ নিরস্ত্র নরনারী শিশুর রক্তে বাংলার বুক ভিজাইয়া দিল, তখন সেই নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর আক্রমণের প্রতিবাদ অস্ত্র দিয়া করিতে হইল। শেখ মুজিবর রহমান তখন তাঁহার [illegible]

উত্তরে গুলি চালাইতে নির্দ্দেশ দিলেন এবং যুদ্ধের আগুন ব্যাপকভাবে পূর্ব্ব বাংলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

"যুগবাণী" সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে বর্ত্তমানে পূর্ব বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম কিভাবে চলিতেছে।

স্বাধীন বাঙলা দেশ পিপলস রিপাবলিক বা লোকতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু বাধামুক্ত হয় নাই। পরদেশী সৈন্যরা মর্মন্তুদ অত্যাচার চালাইতেছে, লক্ষ লক্ষ বাঙালী নরনারী হত ও আহত হইয়াছে। মুহূর্তে মুহূর্তে পরিস্থিতি পাল্টাইতেছে, তাই কাল কী ঘটিবে আমরা জানি না, খেসারত অনেক দিতে হইবে সন্দেহ নাই। রক্তের বন্যা বহিতেছে, মৃতদেহের স্তূপ জমিতেছে, কিন্তু বাঙালীকে বুকের রক্ত আরও অনেক ঢালিতে হইবে। প্রাণ দিতে হইবে, প্রাণ লইতেও হইবে।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ট্যাঙ্ক, বিমান, রকেট, কামান, বন্দুক ইত্যাদির সাহায্যে লক্ষ লক্ষ বাঙালী মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করিতেছে। রণাঙ্গনের কঠোর মুহূর্তে আজ বাঙালী নিজেকে খুঁজিয়া লইতেছে। এই দুঃসময়েই বোঝা যাইতেছে প্রকৃতই কে কার ভাই, কে কার বন্ধু ও শত্রু।

মুক্তিফৌজ চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার দিক হইতে ঢাকার দিকে রওনা হইয়াছে। সারা পূর্ব্ববঙ্গে জনতার প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। পথে পথে পরিখা খনন করা হইয়াছে, গাছ ফেলিয়া পাক সৈন্য চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সৈন্যদের আক্রমণ করা হইতেছে। উপর হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করা হইতেছে, কিন্তু জনগণের মনোবল তাতে এতটুকুও দমে নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের নামে, যেমন সূর্য সেনের নামে মুক্তিফৌজের ব্রিগেড তৈরী হইয়াছে।

মুক্তি ফৌজের মূল কেন্দ্র চট্টগ্রামে স্থাপন করা হইয়াছে। সেখান হইতে মুজিবুর নিজে চতুর্দ্দিকে নির্দ্দেশ পাঠাইতেছেন। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক গুরুত্ব আছে। ইহা বার্ম্মার কাছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম মিজোল্যাণ্ডের কাছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ বার্ম্মা হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। মিজোল্যাণ্ডে মিজোদের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা আজও দেখা যায়। ঐ গোটা অঞ্চলে ঘরে ঘরে রহিয়াছে নেতাজীর ছবি। স্বাধীন বাংলার মুক্তিফৌজ সেই ঐতিহ্যকে বরণ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছে চীন। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ যদি জনগণের মুক্তির লড়াই হয় তবে পূর্ববঙ্গের বর্তমান যুদ্ধ চীনের চোখে মুক্তির লড়াই নয় কেন? চীন ইয়াহিয়া খাঁকে অস্ত্রশস্ত্র দিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে জনগণকে হত্যা করার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে সোভিয়েত রাশিয়ার ট্যাঙ্ক, আমেরিকার জেট বিমান ও চীনের সমরাস্ত্র। আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী, তাদের ভূমিকায় অভিনবত্ব নাই, কিন্তু বিপ্লবী রাশিয়া ও চীন আজ এই পৈশাচিক ভূমিকা লইয়াছে কেন? কেন তারা ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া বাঙলার জনগণের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার হাতকে শক্ত করিতেছে? এ কৈফিয়ৎ এশিয়ার জনগণের কাছে তাদের দিতেই হইবে।

বাংলার স্বাধীন সার্ব্বভৌম লোকতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে নতুন সম্ভাবনা লইয়া সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বের সমৃদ্ধতম অঞ্চল হইবে এই বাঙলা। এখানে খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন, মৎস্য ও পশুপালন প্রভৃতির যে সম্ভাবনা আছে জগতে আর কোথাও সে সম্ভাবনা নাই ইহা মার্কিণ গবেষকরা সুদীর্ঘ গবেষণার শেষে জানাইয়াছেন। নদীনালা, পাহাড়, কয়লা, লোহা, কল-কারখানা, মাঠ-ঘাট কি নাই এখানে? বিশেষই গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র বাহিত অঞ্চলের মতো দেশ আর কোথায় আছে!

আমরা নতুন উষার উদয়ে নব বাঙলার আবির্ভাবও দেখিব এই আশা লইয়া অপেক্ষা করিতেছি। সেই বাঙলায় গড়িয়া উঠিবে এক স্বাধীন শোষণমুক্ত সমাজ। সেখানে অত্যাচার থাকিবে না, অন্যায় থাকিবে না, দারিদ্র্য থাকিবে না, থাকিবে না ভয়, মোহ, অন্ধতা। কুসংস্কার ও গোঁড়ামির কোন স্থান সেখানে থাকিবে না। ধর্মের কারণে নরহত্যা আর সেখানে দেখিব না। বিদেশী মতবাদের ও বিদেশী চক্রের উস্কানিতে বাঙালী যুবক বাঙালী যুবকের বুকে ছুরি বসাইবে না। বিপ্লবের ভাবধারার জন্য আর আমাদের মার্কস ও মাও সে তুঙের দরবারে ছুটিতে হইবে না। আমাদের নিজেদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ও বৈপ্লবিক আদর্শই আমাদের প্রেরণা দিবে। মাও সে তুঙের চেয়েও মুজিবর রহমান অধিক গণসমর্থন পাইয়াছেন ও অধিকতর দক্ষতায় বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছেন। বিপ্লবের ইতিহাসে লেনিন স্তালিনের চেয়েও মুজিবর রহমানের নাম অধিকতর জাজ্বল্যমান থাকিবে।

সি পি এম্ এর হাহাকার

পশ্চিম বাংলায় ইন্দিরা-কংগ্রেসের নির্বাচনে শতাধিক আসন দখল একটা ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয় ঘটনা। যে কংগ্রেস প্রফুল্ল সেন—অতুল্য ঘোষ এর নেতৃত্বে জনমন হইতে প্রায় পূর্ণ নির্বাসিত হইয়াছিল; সেই কংগ্রেসকে আবার রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা একটা অতিবড় অসাধ্য সাধনের কার্য্য, বলিতেই হইবে। "যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে শ্রীঅধীর রঞ্জন দে এই সম্বন্ধে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে চীন অনুরক্ত প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের কংগ্রেসের পুনরুত্থানে প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে। এই উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ইন্দিরা কংগ্রেসের বিস্ময়কর সাফল্যে আমরা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই। যে দেশে একটা কচু গাছে সিঁদুর লেপিয়া দিলে দলে দলে লোক আসিয়া পূজা দেয়—যে দেশে ভণ্ড নেতার কপালে আঙ্গুল চিরিয়া রক্তের ফোঁটা দেওয়া হয়, সেই দেশে সমাজ-তন্ত্রের ফাকা-বুলির মিথ্যা জয় ঢাকের শব্দে দলে দলে লোক আসিয়া ইন্দিরা গান্ধীর চরণে পুষ্পার্ঘ দিবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। ইন্দিরা কংগ্রেসের এ সাফল্য ব্যক্তি পূজার সাফল্য কোন নীতির সাফল্য নয়—কংগ্রেসের সাফল্য নয়। এস্ কে পাতিল একটি খাঁটি সত্য উক্তি করিয়া দেশবাসিকে সতর্ক করিয়াছেন—দেশ দ্রুত ফ্যাসীবাদের দিকে চলিয়াছে ইন্দিরার জয় যাত্রা ও হিটলারের জীবনের প্রাথমিক জয় যাত্রা এক। জাতির ভাগ্যাকাশে উদয়কালে হিটলারও ঠিক ইন্দিরার মতই দেশবাসির অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়াছিলেন—ঠিক এই ভাবেই পূজিত হইয়াছিলেন। এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করিয়া ইন্দিরা কোন পথে যান তাহা সতর্ক ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহার পিতা জওহরলাল নেহরু ক্ষমতার দম্ভে হিটলারকেও পিছনে ফেলিয়াছিলেন। দেশ ও জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নেহেরু মন্ত্রীসভার কাহাকেও না জানাইয়া এবং লোক-সভার সম্পূর্ণ অগোচরে বেরুবাড়ী পাকিস্থানর চরণে উপহার দিয়াছিলেন। নেহেরু দেশটাকে মতিলাল নেহেরুর সম্পত্তি বলিয়া ধরিয়াছিলেন। তনয়া ইন্দিরা পিতার প্রতিচ্ছবি বলিয়াই প্রচারিত হয়। পাতিলের উক্তি পরাজিতের খেদোক্তি বলিয়া মনে করা ভুল হইবে।

এই রাজ্যে ভোটাররা কংগ্রেসকে আস্তাকুঁড়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। এই মৃত দেহকে কবর হইতে উঠাইয়া আনিয়া শুধু প্রাণদান নয়—এক বিশাল মহীরূহরূপে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে—অষ্টরম্ভা দল, বাংলা কংগ্রেস এবং এই কৃতিত্বের শতকরা আশীভাগ দাবী করিতে পারেন অজয় মুখার্জি একা। ইহার উপরে আছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার মাধ্যমে প্রচণ্ড সরকারী প্রচার যন্ত্রের মদত্। তলায় তলায় গোপন আঁতাত থাকিলেও অষ্টরম্ভা দল এবং বাংলা কংগ্রেস এই নির্বাচনে পৃথক পৃথক ভাবে লড়িবার ভান করিয়াছে। এই

দুই দলই (বাংলা কংগ্রেস ও অষ্টরম্ভা দল) তাহাদের নির্ব্বাচনী প্রচার কার্য্যে দিবা রাত্র সি পি এম দলের মুণ্ডপাত করিয়াছে, পিতৃপুরুষ উদ্ধার করিয়াছে—ইন্দিরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নাই। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি এবং অষ্টরম্ভা দলের "লীডোর" দল সি পি আই দলের নেতা ভূপেশ গুপ্ত ও অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি নির্ব্বাচনী ভাষণে প্রকাশ্যে ইন্দিরার স্তুতিগান করিয়াছে। পদ-বন্দনা করিয়াছে। ইন্দিরা বলিয়াছে—"মেরী হাত মজবুত করো ম্যা সোসালিজম দেউঙ্গী—গরীবি হটাউঙ্গি" আর অজয় মুখার্জি, ভূপেশ গুপ্ত—হীরেণ মুখার্জি বলিয়াছেন—ইন্দিরার হাত শক্ত করুন।

কংগ্রেসের কবর হইতে উঠিয়া আসাতে অজয় মুখার্জি ও সি পি আই দলের অবদান অসামান্য। ইন্দিরা অকৃতজ্ঞ না হইলে ইহাদের পুরস্কৃত করিবেন।

বৃটিশ সংবাদপত্রে পূর্ব্ববাংলার কথা

পূর্ব্ববাংলায় ৭।৮ লক্ষ নরনারী ও শিশু হত্যা করিবার পরে দেখা যাইতেছে বৃটেনে ইয়াহিয়া খানের সুনাম কিছুটা ম্লান হইয়াছে। অবশ্য যে সকল সংবাদপত্র রক্ষণশীল সরকারের সমালোচক শুধু সেই সকল পত্রিকাতেই পাকিস্থানের সামরিক সরকারের নিন্দাবাদ কিছু কিছু করা হইতেছে। "গার্ডিয়ান" সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে যে সেখ মুজিবুর রহমানকে ইয়াহিয়া খান পরিস্কার বুঝিতে দিয়াছিলেন যে নির্ব্বাচনান্তে সংখ্যা গরিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় দলের হস্তে শাসন-ভার দেওয়া হইবে। আওয়ামী লীগ যখন জয়লাভ করিয়া শাসনভার দাবি করিল তখন ইয়াহিয়া খান মুজিবুর রহমানের সহিত আলোচনার অভিনয় করিয়া সময় কাটাইতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই অবসরে পূর্ব্ববাংলার জনসাধারণকে সামরিক শাসনের কঠিন হস্তে দমন করিবার আয়োজন করিতে থাকিলেন। এই আয়োজন এতই উত্তমরূপে করা হইয়াছিল যে ইয়াহিয়া খান যে মুহূর্ত্তে আলোচনা বিফল হইল বলিয়া ঢাকা ত্যাগ করিয়া ইসলামাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সে মুহূর্ত্ত হইতেই ইয়াহিয়া খানের সৈন্যদল বাংলার জনসাধারণের উপর আক্রমন আরম্ভ করিল। "গার্ডিয়ান" পত্রিকার হিসাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্থানী সৈন্য বাহিনী প্রায় ১৫০০০ নিরস্ত্র বাঙালী সাধারণকে হত্যা করে। তাহারা বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস প্রভৃতির উপর আগ্নেয়াস্ত্র চালনা করে এবং বহু শিক্ষক ও ছাত্রদিগের মৃত্যু ঘটায়।

পাকিস্থানের পশ্চিমাংশের নেতা ভুট্টো এই হত্যা-কাণ্ডকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে "ভগবানকে এইজন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত"। ভুট্টোর ভগবান কথাটা ঠিকভাবে শুনিয়াছেন কিনা, এখনও বোঝা যাইতেছে না। "গার্ডিয়ানের" লিখিত মন্তব্যের কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে: সেনাবাহিনীর কার্য্য অত্যন্ত পাশিবকভাবে পরিচালিত করা হয়। আক্রান্ত জনগণ অধিকাংশই নিরস্ত্র ছিল। ঢাকাতে তোপ ও ট্যাঙ্ক হইতে চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া জনসাধারণের নিবাস কেন্দ্রগুলির উপর গোলা বর্ষণ করা হয়। ফলে ৭০০০ হাজার অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয় ও ফলে একটি বাসস্থানেই ২০০শত ছাত্র নিহত হয়। আর একটি স্থানে এত অধিক মৃতদেহ ছিল যে সকল দেহ একটা বিরাট কবর খুঁড়িয়া তাহাতে গোর দেওয়া হয়। শুক্রবার দিন সৈন্যগণ পুরাতন সহরে (ঢাকার) যায় ও সেখানে সেখ মুজিবুরের বহু সহায়ক আছে বলিয়া সেই অঞ্চল বিদ্ধস্ত করিতে আরম্ভ করে। যাহারা পালাইতে চেষ্টা করিল তাহাদের গুলি করিয়া মারা হইল। যাহারা বাড়ীর ভিতরে রহিল তাহাদের পুড়াইয়া মারা হইল। সৈন্যগণ হালকা হালকা বাড়ীগুলিতে আগুন লাগাইয়া দিতে লাগিল। অন্য জনগণকে বন্দুক দেখাইয়া বাহিরে আনিয়া দলে

দলে মেসিন বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া হত্যা করা হইল।"

এই বর্ণনা বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে এগারটা হইতে শুক্রবারের অবসান পর্য্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী হত্যা-কাণ্ডের বর্ণনা। সংবাদপত্রের সংবাদদাতা মার্টিন-অ্যাডনেকে ঢাকা হইতে বিতাড়িত করা হয়। তিনি বলেন: "বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে এগারটায় বাংলার বসন্তের শেষ হয় এবং তখন সৈন্যবাহক যানগুলি ঢাকায় আগুন ও তলোয়ার লইয়া প্রবেশ করিল। .... আগুন বিশেষভাবে দেখা দিল বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে। সেখানে রাত্রি ১১৷৹টার সময় হইতে রকেট নিক্ষেপ করিয়া আগুন ধরাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। নয় ঘণ্টা পরেও সে আগুন জলন্ত ছিল।

"আমরা যখন চব্বিশ ঘণ্টা পরে সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাই তখনও ঢাকা জ্বলিতেছিল এবং যাহারা সামরিকভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই নিরস্ত্র ছিল।.........একথা অবশ্যই বলিতে হয় যে সৈন্যবাহিনী যেভাবে আক্রমন চালায় তাহা অবস্থা বিচারে একান্তভাবেই নিস্প্রয়োজন ছিল।"

"গার্ডিয়ান" সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয়ভাবে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "ঢাকায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা বিশ্ব মানবের ও মানব জাতির সকল উচ্চাকাঙ্খার বিরুদ্ধে একটা গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্যজাত মহা অপরাধ। এই অবস্থায় কাহারও মধুর ভাষণে নিবিষ্টভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে।"

সাময়িকী

সিংহলে বিদ্রোহাত্মক হাঙ্গামা

শ্রীমতী বন্দরনায়িকী সিংহলের সর্ব্বেসর্ব্বা শাসনশক্তি পরিচালিকা। তিনি সিংহলের সিংহলী বাসিন্দাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য নানাভাবে অপর সিংহলবাসীদিগের সুখ-সুবিধা ও ন্যায্য অধিকার খর্ব্ব করিয়া নিজশাসন-কালে বহু বৈধ ও অবৈধ ব্যবস্থা করিতে বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়া আসিতেছেন। এই অবস্থায় সকলে আশা করিতে পারে যে শ্রীমতী বন্দরনায়িকীর রাজত্ব দৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিতভাবেই চলিতে থাকিবে; কারণ যে শাসক অন্যায়ভাবেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থপরতার সহায়ক হয়; তাহার প্রতিপত্তি সকল রাষ্ট্রেই সচরাচর প্রবল ও চিরবর্দ্ধনশীল থাকে। কিন্তু আজকাল সর্বত্রই সকল রাষ্ট্রে এমন সকল অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া অত্যন্তই কঠিন হয়। সিংহলেও শ্রীমতী বন্দরনায়িকীর বিপরীত এমন একটা হিংস্র দল গড়িয়া উঠিয়াছে যাহারা শাসনশক্তিকে অমান্য করিয়া নরহত্যা, লুঠ, সম্পত্তি ধ্বংস প্রভৃতি কার্য্য করিতে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে। কিছু কিছু পুলিশ ও অপরাপর রাজকর্ম্মচারীদিগকে এই বিদ্রোহী দলের লোকেরা হত্যা করিয়াছে। ইহারা দোকানপাট লুঠ, গৃহদাহ ও রাবারবৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া রাজপথ অবরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাপ্রকার রাজদ্রোহের কার্য্য করিতেছে। শ্রীমতী বন্দরনায়িকী এই রাজশক্তির উচ্ছেদকারক দলের লোকেদের দমন করিবার জন্য সিংহলের নানাস্থলে সময়ে সময়ে ২৪ ঘণ্টা সান্ধ্য আইন জারি করিতেছেন। নানাপ্রকার দমনকার্য্যও তিনি নানাভাবে সাধিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এইসকল পদ্ধতি ফলপ্রসূ হইতেছে না। তিনি সম্প্রতি সকল বিদেশী সাংবাদিকদিগকে সিংহল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন। তাহাতে সিংহলের শাসনকার্য্যের বৈদেশিক সমালোচনা আরো প্রবল হইয়া উঠিবে ও শ্রীমতী বন্দরনায়িকীর সুশাসক বলিয়া যে খ্যাতির আকাঙ্খা তাহা পূর্ণ হইবার আশা বহু দূরে চলিয়া যাইবে। সিংহল সরকারের উচিত ছিল সিংহলী ব্যাতীত অপর সকল সিংহলবাসীর যে সকল অভিযোগ আছে তাহা যথাযথভাবে বিচার করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। শুধু সিংহলীদিগের স্বার্থসিদ্ধি করিলেই সিংহল শাসন সুসাধিত হয় না। কারণ সিংহলের অধিবাসীগণ নানাজাতীয় এবং সংখ্যায় তাহারা অত্যল্প নহে। বহুশত বৎসর যাহারা কোন দেশে থাকে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক অধিকার অস্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। যদি বিদ্রোহী-দিগের দাবি অর্থনৈতিক না হয়, শুধু শাসকগোষ্ঠীকে উল্টাইয়া নতুন দলের লোকের প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য হয়; তাহা হইলে বিষয়টা অন্যরূপ ধারণ করে। বাহিরে যাহা প্রকাশ করা হয় তাহাতে উভয় পক্ষই নিজ নিজ উচ্চ আদর্শ প্রচার করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে যে তাহারা একটা মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে কিন্তু অপর পক্ষের অন্যায় আচরণের জন্য সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব হইতেছে না। সিংহলের শাসকগোষ্ঠীর আদর্শবাদ পবিত্র ও বিশ্ব মানবীয় সুনীতির ছাঁচে ঢালা নহে, একথা আমরা বহুকাল হইতেই জানি। বিদ্রোহী

দলই যে কোন অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত, এমন কথাও বলা কঠিন। তবে হিংসার পথে চলা সর্ব্বদাই মানুষকে দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত করে; সেই কারণে যখন উভয় পক্ষই যুদ্ধে প্রবৃত্ত তখন উভয়কেই সংযমের আদর্শ বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে বলা যাইতে পারে। তবে সে কথা কেহ শুনিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাংলার মুক্তিফৌজের যুদ্ধবার্ত্তা

করিমগঞ্জ (আসাম) হইতে প্রকাশিত যুগশক্তি সাপ্তাহিকে মুক্তিফৌজের যুদ্ধ সংক্রান্ত যে সকল খবর বাহির হইয়াছে তাহা হইতে ঐ সংগ্রামের ব্যাপকভাবের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা উহার কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলা দেশকে স্বাধীন ঘোষণা করার পর হইতে এখন পর্যন্ত ঘটনার গতি যেভাবে চলিতেছে তাহাতে ইয়াহিয়া খানের জঙ্গীশাহী হইতে বাংলা দেশের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ববঙ্গের সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে ঢাকা সহ অধিকাংশ বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সহর বর্তমানে মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, দিনাজপুর প্রভৃতি সহরে মুক্তি ফৌজের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের অণুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নাই, কারণ সেনাবাহিনী সুরক্ষিত ছাউনীর বাহিরে আসিতে চাহিতেছে না। ঢাকা এবং যশোর কেন্টনমেন্ট দখল করার জন্য মুক্তি বাহিনী প্রচণ্ড লড়াই চালাইতেছেন। চারিদিকে কোণঠাসা হওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনী অসামরিক জনগণের উপর এখন বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ফলে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ এই সংগ্রামে তিন লক্ষাধিক বাঙালী এখন পর্যন্ত নিহত হইয়াছেন।

এদিকে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গে জঙ্গীশাহীর এই বর্ব্বরতা রোধকল্পে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ দাবী করিয়াছেন। ভারতীয় পার্লামেন্ট গত বুধবার এক সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাংলা দেশের এই সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাকিস্তান রেডিয়ো এই প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ভারত সরকার পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে।

বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজ বৃহস্পতিবার (২-৪-৭১) আথাউড়ার নিকটে শত্রু বাহিনীর একটি অস্ত্রাগার দখল করিয়া নিয়াছে।

সমুদ্র ও আকাশপথে নতুন সৈন্যবাহিনী আসিয়া পৌঁছানোর পর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, রংপুর, যশোহর এবং খুলনায় এখন তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছে। বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলায় মুক্তি ফৌজ ও পাক সৈন্য-দের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়।

পাকিস্তানী বিমানবাহিনী রাজশাহী, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও যশোহর শহরের উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়াছে। শহরগুলি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া জ্বলিতে থাকে। ময়মনসিংহ শহর এখনও মুক্তি ফৌজের দখলে আছে। বৃহস্পতিবার (২-৪-৭) পাক বিমানবাহিনীর ৬ খানা স্যাবার জেট বিমান কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরে বোমা বর্ষণ করিয়া প্রচুর লোককে হতাহত করে।

গত বুধবার (১-৪-৭১) মধ্যরাত্রে অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া স্বাধীন বাংলার মুক্তি বাহিনী কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী গোটা সীমান্ত এলাকা দখল করিয়া নিয়াছেন। ই, পি, আর-এর বাঙালী সৈন্যরা এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিয়াবাইল, আটগ্রাম, কানাইর ঘাট, আমলশীদ, মানিকপুর, জকিগঞ্জ, লক্ষীবাজার ইত্যাদি প্রতিটি ই,পি,আর পোষ্টের পাঞ্জাবী সৈন্যরা এই আক্রমণে নিহত হইয়াছে। আমলশীদে বেশ কিছুক্ষণ সংঘর্ষ চলে, যাহার ফলে মুক্তি ফৌজের দশজন আহত

হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। এই এলাকা দখল করিয়া মুক্তি ফৌজ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র একটি লঞ্চে বোঝাই করিয়া শেওলা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে তাহারা শ্রীহট্টের মুক্তি ফৌজকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রকাশ। এ দিকে শ্রীহট্ট সহরের পুলিশ লাইনে এবং খাদিমনগর বাগানে ই, পি, আর হেডকোয়ার্টারে মুক্তি ফৌজ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়াছে।

সুনামগঞ্জের মুক্তি ফৌজ সুনামগঞ্জ শহরটি দখল করিয়া এখন শ্রীহট্টের পথে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ বিরতি

বিগত ৮ই মার্চ্চ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ বিরতি দীর্ঘ সাতমাসকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ইউ এ আর, জর্ডান ও সিরিয়ার সেনাবাহিনী আবার সজাগভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। লিখিবার সময় অবধি কোন যুদ্ধ আরম্ভ না হইয়া থাকিলেও যে কোন সময় হইতে পারে। হইলে, সেই যুদ্ধে রুশিয়া ও আমেরিকা কতটা অংশ গ্রহণ করিবে তাহার উপরেই যুদ্ধের প্রসার ও তীব্রতা নির্ভর করিবে। সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক অবস্থা যাহা দেখা যায় তাহাতে রুশিয়া ইসরায়েলকে ধমকানি দেওয়া এবং কিছু কিছু হাওয়াই অস্ত্র দিয়া আরবদিগকে আত্মরক্ষায় অধিক সক্ষম করা ব্যতীত কিছু করিতে অগ্রসর হয় না। আমেরিকাও অর্থ ও অস্ত্র দিয়া ইসরায়েলকে জোরাল করিয়া থাকে; এমনকি ইসরায়েলের বহুসৈন্য হয়ত ইহুদি রাজ্যের নাগরিক হইবার পূর্ব্বে আমেরিকার নাগরিক ছিল ও তাহাদিগের যুদ্ধ শিক্ষাও আমেরিকার সৈন্য বাহিনীতেই হইয়া থাকবে অনুমান করা যায়। বিষয়টা গভীর-ভাবে চেষ্টা করিলে বোঝা যায় যে আমেরিকা ও রুশিয়া কোনদলের পুরাপুরি জয়লাভ চাহে না। সুতরাং তাহাদের মতলব পশ্চিম এশিয়াতে পরস্পর বিরোধী দুইটি রাষ্ট্র গোষ্ঠী গড়িয়া তোলা যাহাতে ঐস্থলে কোনও এরূপ জোরাল সামরিক শক্তির উত্থান ও গঠন সম্ভব না হয় যে শক্তি দুনিয়ার সামরিক আসরে প্রবল ও বৃহৎ আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। এই একই ধরণের মতলব হইতে ভারত ও পাকিস্থান বিভাগ করা হইয়াছিল ও ফলে ঐ দুইটি রাষ্ট্রের কোনটিরই সামরিক ক্ষমতা সেইরূপ হয় নাই যাহাতে আমেরিকা অথবা বৃটেনকে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ নিষেধ বলিবার সামর্থ্য এখানে কাহারও গড়িয়া উঠা সম্ভব হইতে পারিত। ইসরায়েল যদি সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান প্রভৃতি দেশগুলিকে গ্রাস করিয়া রাজ্যবিস্তার করিতে পারিত; তাহা হইলে সেই বৃহত্তর ইসরায়েল ইয়োরোপের অনেক জাতিকেই চোখ রাঙাইয়া কথা বলিতে পারিত। আরবদেশও যদি মিলিত হইয়া এক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিত তাহা হইলে সে আরব অস্ত্রের বা অর্থের কাঙাল হইয়া রুশিয়ার দ্বারে ধর্ণা দিতে বাধ্য হইত না। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তির ভীষণতা কেহ গঠন করিয়া লইতে পারিতেছে না। মনে হয় এই অবস্থাই থাকিবে এবং যুদ্ধ আবার আরম্ভ হইয়া বিস্তৃত হইবে না। কারণ আন্তর্জাতিক আসরের বড়কর্ত্তাদিগের ইচ্ছা নহে যে যুদ্ধের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায়।

নির্ব্বাচকদিগের নামের তালিকা

সাধারণতন্ত্র যদি জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষণ কার্য্য যথাযথ ভাবে করিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে সেই ব্যবস্থার মূল কথা হইল দেশবাসীর নামধামের পূর্ণ ও যথার্থ তালিকা প্রণয়ন করা। যদি দেশবাসী কে বা কাহারা এ কথা সত্যভাবে তালিকাভুক্ত না করা হয়; যদি যে সকল দেশবাসীর কোনও অস্তিত্ব নাই সেই সকল কাল্পনিক ব্যক্তিদের নাম দিয়া তালিকা পূর্ণ করা হয়; যদি যাহারা আছে তাহাদের নাম তালিকায় না থাকে এবং যদি মৃত ও অন্যস্থলে চলিয়া গিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিদের নাম তালিকা হইতে

বাদ না দেওয়া হয়; তাহা হইলে ঐ তালিকা অনুসরণ করিয়া নির্ব্বাচকদিগকে ডাকিয়া ভোট দেওয়াইলে সে নির্ব্বাচন একটা বিরাট মিথ্যার অভিব্যক্তি হইয়া দাড়ায়। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে দেখা গিয়াছে যে যাহারা তালিকা প্রণয়নের ভার প্রাপ্ত ছিল তাহারা যথেচ্ছা তালিকাতে নাম সংযোগ ও তাহা হইতে নাম কাটাকাটি করিয়াছে। ১৯৬৭, ১৯৬৯ এ যাহাদের নাম ছিল অনেকের নাম এখন তালিকায় নাই। এই নামগুলি কে কাটিল? কেন কাটিল? ইহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। যাহাদের নাম নুতন করিয়া যোগ করা হইয়াছে সেই সকল মানুষ সত্য সত্যই আছে না শুধু রাষ্ট্রীয় দলের ভোট বাড়াইবার জন্য মিথ্যা করিয়া সৃজিত, ইহারও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। আর একটা কথা। কার্ড অফ আইডেন্টিটি বা পরিচয় পত্র (ফটো) চিত্র সম্বলিত কেন করা হয় না? বহুকাল ধরিয়া বলা হইতেছে যে ভারতের সর্ব্বত্র সকল সাবালক ও সাবালিকার পরিচয় পত্র গ্রহণ বাধ্যতা মূলক করা আবশ্যক। ইহা না করিলে ছদ্মনামধারীদিগের অপরাধ প্রবণতায় বাধা দেওয়া কখনও সম্ভব হইবে না। একথা সর্ব্বজন বিদিত যে রাষ্ট্রীয় দলগুলি মৃতব্যক্তি, নিবাসস্থলে অনুপস্থিত ব্যক্তি, কাল্পনিক ও মিথ্যা রচিত নামের মানুষ প্রভৃতি নানা প্রকারের লোকের বেনামী ভোটের ব্যবস্থা করিয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ চেষ্টা করিয়া থাকেন। সরকারী আফিসে দফতরে থানায় আদালতে বহু কর্ম্মচারী আছে যাহারা এই অন্যায়ের সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু এই সাধারণতন্ত্রের আদর্শ নাশ কারক ও উদ্দেশ্য ধ্বংসকারী অপরাধ দমনের ব্যবস্থা করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা এখনও কোথাও হইতে দেখা যাইতেছে না। ইহা লইয়া সর্ব্বসাধারণের আন্দোলন করা উচিৎ।

জনমত কোন দিকে যাইতেছে

ভারতবাসীগন আবহমান কাল হইতেই ন্যায় বিচার ও সকল বিষয়ের অনুশীলন বিশ্লেষনের সম্বন্ধে আগ্রহশীল। অন্ধ বিশ্বাস কোনও সময়েই ভারতীয়দিগের মনে অজ্ঞানতার অন্ধকার অধিককাল বিস্তৃত করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই। এই কারণে আধুনিকতার প্রগতির আবেগ জাগ্রত হইবার বহু শত এমন কি সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয়গণ সামাজিক রীতি নীতি জীবনধারার গতি ও দিক পরিবর্ত্তন করিতে, কোন সময়েই অন্ধ বিশ্বাসজাত মানসিক অসাড়তা দেখান নাই। জৈন, বৌদ্ধ বৈষ্ণব প্রভৃতি নুতন নুতন আধ্যাত্মিক জাগরণ ও বিকাশ কখনও সম্ভব হইত না যদি ভারতের মানুষ প্রমাদ গ্রস্থ মনে সকল নুতনত্বকে দূরে সরাইয়া রাখিতে চিরতৎপর হইত। সকল নুতন আদর্শ ও বিশ্বাসকেই ভারতীয়গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত থাকে; এবং ঐ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনেই মার্কসবাদ মাওবাদ প্রভৃতিও ভারতের জীবন ক্ষেত্রে যাচাই হইয়া যাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। কয়েক লক্ষ ভারতীয় ঐ সকল বিজাতীয় বিশ্বাসের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া সেই গুলির জীবনের কোন কোন অঙ্গে বাস্তব রূপায়ন চেষ্টা করিয়া ভারতের জনসাধারণকে ঐ সকল আদর্শের মূল বিচার করিতে সাহায্য করিয়াছেন। ফলে মনে হয় ভারতবাসী জনসাধারণ ঐ সকল বিশ্বাস ও তজ্জাত সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আস্থাবান হইতে সক্ষম হ'ন নাই ব্যক্তির অধিকার ও সেই অধিকার বাজায় রাখিয়া সামাজিক দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য পালন যে সম্ভব এবং সেই ব্যবস্থাই যে কম্যুনিজম অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় শ্রেয় ও মানব হিতকর এই কথাই আজ ভারতীয়েরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। সামাজিক ও সমষ্টিগত ভাবে মানুষের উন্নতি সাধন করিয়াও ব্যক্তির সকল ন্যায় অধিকার রক্ষা করা সম্ভব। আজ এই বিশ্বাসই ভারতে প্রবল।

অপর রাষ্ট্রগুলি "বাংলাদেশ" কে মেনে নেবে কি না

শেখ মুজিবুর রহমান আইনসঙ্গত ভাবে জন প্রতিনিধিত্ব অর্জ্জন করিয়া প্রথমে ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করেন সামরিক শাসনের শেষ

করিয়া শাসন ভার আওয়ামী লীগের হস্তে অর্পন করিতে। ইয়াহিয়া খানের সেইরূপ কোনও ইচ্ছা কোন সময়েই ছিলনা এবং ইয়াহিয়া যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ব্ব পাকিস্থানে বহু সৈন্য আনাইয়া দেশের উপর সামরিক দখল পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আওয়ামী লীগকে বেয়াইনী ও শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজদ্রোহী ঘোষণা করিয়া পূর্ব্ববাংলার জন সাধারণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। সেই আক্রমণের বর্ব্বরতার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কত লক্ষ নরনারী ও শিশু হত্যা; কত শত গ্রাম জ্বালাইয়া অঙ্গারে পরিণত করা এবং কত লুঠপাট এই আক্রমণের সহিত জড়িত রহিয়াছে তাহার পূর্ণ ইতিহাস যদি কোনদিন লিখিত হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে পাকিস্থানের তথা কথিত মুসলমানী এক জাতীয়তা কতবড় মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাকিস্থানের পশ্চিম অঙ্গের মুসলমান সৈন্যগণ পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুসলমান ভ্রাতাদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করেনা। নয়ত তাহাদিগকে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া, নিরস্ত্র হওয়া সত্বেও সর্ব্বত্র গোলাগুলি চালাইয়া ও বিমান হইতে বোমা ফেলিয়া হত্যা করিত না।

শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগামীদিগের অস্ত্রশস্ত্র অল্পই ছিল। পুলিশ ও বাঙালী সৈন্যগণ তাঁহার দিকে আসিয়া যাইলেও তাহৎদের নিকট ৪০।৫০ হাজার সাধারণ বন্দুক ব্যতীত অপর অস্ত্র, অর্থাৎ যন্ত্র বন্দুক বা তোপ ছিল না। অস্ত্রাগার লুন্ঠন করিয়া ও পাকিস্থানী সৈন্য বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডার হইকে কাড়িয়া লইয়া অন্যান্য অস্ত্র কিছু কিছু আওয়ামী লীগের হস্তে আসিয়াছে। তাহা হইলেও সুসজ্জিত, ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী বোমারু বিমান, কামান, মর্টার রকেটাস্ত্র ও ছোট বড় মেসিন গান লইয়া যেখানে পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী হাল্কা অস্ত্রধারী মুক্তি ফৌজের সহিত সংগ্রাম করিবে, সেখানে সম্মুখ সমরে মুক্তিফৌজের জয়লাভের সম্ভাবনা অল্পই। সেইজন্য এখন হইতেই মুক্তি ফৌজ সামনা সামনি না লড়িয়া অনেক ক্ষেত্রেই ছোটবড় সহর গুলিতে পাকিস্থান সৈন্যগণকে কোন কোন স্থান দখল করিতে দিয়া, তাহাদিগকে নানা ভাবে আকস্মিক আক্রমণে বিদ্ধস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে এইভাবে তাহারা পাকিস্থান সেনাদলকে ক্রমশঃ ঘায়েল করিয়া আনিতেছে ও পূর্ব্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলগুলিতে নিজেদের প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রসারিত করিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় বলা যায় যে পূর্ব্ববাংলার চার ভাগের তিন ভাগ মুক্তি ফৌজের দখলে আছে; কিন্তু তাহারা পাকিস্থান বাহিনী যুদ্ধ চেষ্টা করিলে অধিক যুদ্ধ না করিয়া সরিয়া যাইতেছে ও পরে নানাদিক হইতে গোরিলা আক্রমণ করিয়া ঐ সৈন্য দিগকে আত্মরক্ষার্থে সদা জাগ্রত ও চির তৎপর থাকিতে বাধ্য করিতেছে। কখন কখন পাকিস্থান সৈন্যগণ দখল ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে এবং তখন মুক্তিফৌজ স্থানগুলিকে পুনরাধিকার করিতেছে।

এইরূপ অবস্থায় বলা যাইতে পারে যে উভয় বাহিনীই নানা স্থানে নানাভাবে দেশ দখল করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং সময়ে সময়ে দখল ছাড়িয়া সরিয়াও যাইতেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগামীগণ বলিতেছেন যে তাঁহারা কোথাও কোথাও রেলগাড়ীও চালাইয়া রাখিতেছেন এবং দেশবাসীর অধিকাংশই এখন তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। তাঁহারা স্বাধীন বাংলাদেশের নুতন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া পাকিস্থানের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিয়াছেন। পৃথিবীর অপর রাষ্ট্রগুলিকে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের রাষ্ট্রগঠন কার্য্য রাষ্ট্রনীতি অনুসরণে করা হইয়াছে। কারণ আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া দেখাইয়াছে যে শতকরা ৯৮ জন পূর্ব্ববাংলাবাসী তাহাদের সপক্ষে আছে। পৃথিবীর অপর রাষ্ট্রগুলির কর্ত্তব্য তাহাদের এই নব প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রকে নব গঠিত রাষ্ট্র বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং রাষ্ট্রপ্রতিনিধি অদলবদল করা আরম্ভ করা। শুনা যাইতেছে যে কয়েকটি রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে মানিয়া লইয়াছে। সেগুলি কোন কোন রাষ্ট্র তাহা

জানা যায় নাই; তবে অনেকে বলিতেছেন যে আমেরিকা রুশিয়া, বৃটেন ও ইউএ আর এইভাবে এই নুতন রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে স্বাধীন বাংলা সহজে অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে। তখন ট্যাংক, তোপ, বিমান পাইতে কোন বাধা থাকিবে না। এবং সেই ব্যবস্থা যদি হইয়া যায় তাহা হইলে পাকিস্থানের পক্ষে আর বাংলাদেশের উপর প্রভাব বিস্তার সম্ভব থাকিবে না।

স্বাধীন বাংলা দেশকে যদি অপর রাষ্ট্রগুলি মানিয়া লয় তাহা হইলে তাহার ফলে পাকিস্থানে অপর পরিবর্ত্তন ঘটিবে নিঃসন্দেহ। যথা কাশ্মীরের মানুষ বাঙালীর অবস্থা দেখিবার পরে আর পাকিস্থানের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে চাহিবে বলিয়া মনে হয় হয় না। আজাদ কাশ্মীরও সম্ভবতঃ সত্যকার আজাদ অবস্থা চাহিবে ও পাকিস্থানী সৈনদিগকে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিবে। পাখতুনদিগের ইচ্ছা যে তাহারা স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন করিবে। তাহারাও হয়ত পাকিস্থানের কার্য্য কলাপ দেখিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে। শুনা যায় যে বালুচিদিগেরও ইয়াহিয়া খানের স্বৈরাচারী রাজনীতি পছন্দ নহে। তাহারাও বলিতে পারে, মুসলমান একজাতি নহে, বহুজাতি, বঙ্গভাষাভাষী এবং জীবন যাত্রায় বহুপথের পথিক। বালুচিগণ আর উর্দ্দু ভাষায় কথা বলিবে না, ইসলামাবাদে গিয়া হুকুম শুনিবে না এবং বালুচিস্থানকে মাতৃভূমি বলিবে—পাকিস্থান নামক ঐতিহ্যহীন রাষ্ট্র অন্তর্গত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিবে না। এইরূপ পরিস্থিতি হইলে মনে হয় না যে পাকিস্থান বলিয়া কোন রাষ্ট্র আর কোথাও থাকিতে পারিবে। শুধু পাঞ্জাব ও সিন্ধু মিলিয়া ঐ রাষ্ট্র গঠিত থাকিতে পারে, কিন্তু সিন্ধু কি পাঞ্জাবের অধীনে থাকিতে চাহিবে? সম্ভবত তাহা হইবে না।
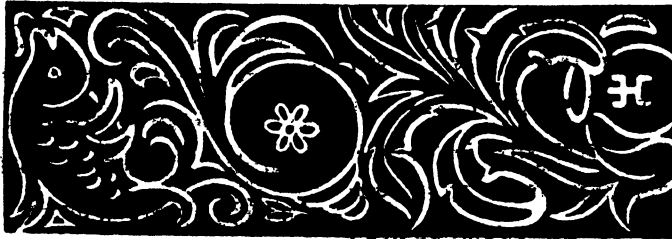
দেশ-বিদেশের কথা

লাওসের কাহিনী

লাওসে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আমেরিকার খ্যাতি বৃদ্ধি হয় নাই। হাজার হাজার দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্য জীবন বিপন্ন করিয়া লাওসে অনুপ্রবেশ করিল এবং আবার অনেক অধিক ক্ষতবিক্ষতভাবে আমেরিকার হেলিকপ্টার ধরিয়া ঝুলিয়া ও তাহাদের সাহায্যে উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া কোনপ্রকারে নিজদেশে ফিরিয়া আসিল। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্যসংখ্যা উত্তর ভিয়েৎনামের তুলনায় অধিক, অথচ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম যুদ্ধে নামিলেই সকলে বলে তাহারা উত্তর ভিয়েৎনামের অধিক সৈন্য থাকায় যুদ্ধে হটিয়া গিয়াছে। এইপ্রকার অবস্থা হয় কি করিয়া? উত্তর ভিয়েৎনাম কিভাবে অধিক সৈন্য উপস্থিত করিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সর্ব্বত্র হটাইয়া দেয়? ইহা আমেরিকার শেখান সমর কৌশলের তুলনামূলক হীনতা প্রমাণ করে না কি? দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উচিত অপর দেশ হইতে সাময়িক কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা করা। লাওসে আমেরিকান হেলিকপ্টার বাহিনী ৪০০০০ বার অভিযানে বাহির হইয়াছে। ফলে লাভ কি হইয়াছে বোঝা যায় নাই। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের লাওস অনুপ্রবেশ বাহিনীর শতকরা ২০ জন কচুকাটা হইয়াছে; এবং সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেও সক্ষম হয় নাই।

লেফ্‌টেনাণ্ট ক্যালির প্রাণদণ্ডের আদেশ

বিগত ১২ই নভেম্বর হইতে কয়েকমাস ধরিয়া ছয়জন সামরিক কর্ম্মচারী লেফটেনাণ্ট ক্যালীর অপরাধের বিচার করিতে বসিতেছিলেন। অপরাধ ছিল ১৬ই মার্চ্চ ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মাই লাই নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রামে ২২ জন ভিয়েৎনামবাসীকে হত্যা করার। ক্যালী স্বয়ং ঐ দিন গ্রামের দক্ষিণে একটা পথে কয়েকজন পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করে এবং কিছু পরে আর এক স্থলে একটা নালার ভিতরেও কয়েকজনকে হত্যা করে। ক্যালী বিচারকদিগের নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু বলে যে সে উচ্চতর কর্মচারীদিগের হুকুম অনুসারে ঐ কার্য্য করিয়াছিল। আমেরিকান সামরিক আইন অনুসারে কোন সৈন্য কিন্তু কোন বেআইনী হুকুম মানিতে বাধ্য নয়। ক্যালীকে কেহ নিরপরাধ নিরস্ত্র নরনারী-শিশুকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়া থাকিলেও ক্যালীর সে আদেশ মানিয়া অপরাধের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার কোনও বাধ্যতামূলক দায়ীত্ব ছিল না। না। ক্যালীর পক্ষের উকিল তাহার সমর্থনে বলেন যে ক্যালী সমাজের রীতি অনুসরণে সামরিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল ও তৎপরে সামরিক গতানুগতিকতার ফলেই হত্যাকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল। হত্যার জন্য সমাজই দায়ী; ক্যালী ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী নহে। বিচারকগণ বলেন যে তাঁহারা ক্যালীর বিচার করিতেই বসিয়াছেন; সমাজের বিচার করিবার তাঁহাদের অধিকার বা প্রয়োজন নাই। উকিল আরও বলেন যে যুদ্ধে যখন বিমান হইতে বোমা ফেলা হয় অথবা যখন তোপ দাগিয়া কোন সহর দখলের চেষ্টা হয় তখন কত নিরস্ত্র ও নির্দ্দোষ নরনারী, বালক-বালিকা ও শিশু নিহত হয় তাহার হিসাব কে রাখে? মাওৎ সে তুঙ্গ বলেন "যে সমুদ্রে গেরিলাগণ সন্তরণ করে সেই সমুদ্র শুকাইয়া—অর্থাৎ গ্রামবাসী চাষাদিগকে নির্ম্মূল

করিয়া দিলে তবেই গ্যেরিলার শেষ হইতে পারে। গ্রামগুলিকে ছারখার করিয়া দিলে সেইসঙ্গে গ্যেরিলারও শেষ হইবে।" কিন্তু ঐ সকল কথা বলিয়া হত্যাকার্য্য অপরাধ নহে প্রমাণ হয় না। জাপানী জেনারেল ইয়ামাসিতাকে ২৫০০০ অসামরিক নরনারীকে হত্যা করাইবার জন্য ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। অনেক জর্ম্মণ সেনাপতি ও রাষ্ট্রনেতাকেও এইরূপ অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। হত্যাকার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকাই তাহার কারণ ছিল। ভিয়েৎনামে গত ছয় বৎসর ধরিয়া প্রত্যহ ৬৮ জন করিয়া নরনারী-শিশু প্রভৃতি প্রাণ হারাইয়াছে বলিলে যে নিজ-হস্তে হত্যাকার্য্য করিয়াছে তাহার অপরাধের সাফাই দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত ও সাক্ষাৎভাবে হত্যার সহিত সংযোগ রাখা এক কথা এবং মৃত্যুর সহিত পরোক্ষ ও স্থানকালগত সম্বন্ধ অন্য কথা। সকল কথা বিচার করিয়া লেফটেনাণ্ট ক্যালীর উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

দারিদ্র্য দূর করিবার সংকল্পের কথা

ভারত সরকার দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে দৃঢ় সংকল্প। রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি পার্লামেন্টের উভয় অঙ্গের সংযুক্ত অধিবেশন উদ্বোধন করিবার সময় এই সংকল্পের কথা আরও দ্ব্যর্থবার্জ্জতভাবে বলেন। তিনি বলেন দারিদ্র্য দূর করিবার প্রতিশ্রুতি পালন করা হইবেই। ভারতের জনসাধারণ শ্রীমতী ইন্দিরার শাসক কংগ্রেসকে নির্ব্বাচনে যে ভাবে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে এই সরকারকে যেমন করিয়াই হউক দেশের দারিদ্র্য দূর করিতেই হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রীতি, পদ্ধতি ও কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করা হইতেছে। কিন্তু কার্য্য দুরূহ এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু কষ্ট না করিলে অসাধ্য। ভারত সরকার সেই কার্য্যে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র করিয়াছেন। পরিকল্পনা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিবে

দারিদ্র্য নিবারণ করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোথাও দুই মত নাই। সকলেই চাহেন যে দেশের সকল নর-নারীশিশুর আহার, উপযুক্ত নিবাস, পরিধান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা যাহাতে করা হয়। কিন্তু পণ্ডিত জবাহরলালের কারখানা গঠন পরিকল্পনা ও পরে শ্রীমতী ইন্দিরার ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও আরও কোন কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান জাতীয় ভাবে গঠন বা সরকারী পরিচালনায় আনয়ন; কোন কিছুতেই দেশের দারিদ্র্য দূর হইবার বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় নাই। এই সকল বিফলতার মূলে আছে রাষ্ট্রনেতা ও সরকারী আমলা-দিগের সকল কার্য্যে অক্ষমতা। শ্রী ভি ভি গিরি বা শ্রীমতী ইন্দিরা কোন কার্যে অবতীর্ণ হইলেই সেই কার্য্য বাস্তবে করিবার ভার পাইয়া থাকেন আমলাগণ অথবা রাষ্ট্রক্ষেত্রের পাণ্ডারা। উভয় গোষ্ঠীর লোকেরাই প্রথমতঃ অক্ষম এবং দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য যে পরিশ্রম, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে তাহা না থাকা। সুতরাং যত উত্তম রীতি, পদ্ধতি ও কর্ম্মসূচী স্থির করাই হউক না কেন; অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তিদিগের হস্তে কার্য্য ভার দেওয়া হইলে সফলতা লাভ অসম্ভব হইবে। সেই জন্য যাহারা কাজ করিবে তাহারা ভোটের বাজারের দালাল অথবা "সেকসন সাব-সেকসন" আবৃত্তিকারী সরকারী চাকুরে হইবে না এই মনে রাখিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাহারা রাষ্ট্রক্ষেত্রের বা সরকারী চাকুরীর দফতরের মানুষ নহে। অথচ তাহারা কর্ম্মক্ষম। এই সকল মানুষের মধ্য হইতে বাছিয়া লইতে হইবে, সেই সকল ব্যক্তিকে যাহারা দেশের মঙ্গল ও উন্নতির আদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রক্ষেত্রের মতলববাজ ও চাকুরে মহলের মাতব্বরদিগের হস্তেই কার্য্যভার যথাসময়ে ন্যস্ত করা হইবে। ইহার কারণ ঐ দুই জাতীয় স্বার্থপর ও নিষ্কর্ম্মা লোকেরাই রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া বসিয়া থাকে। ইহারা "জাতীয়" কার্য্য মাত্রকেই নিজেদের অধিকারভুক্ত বিশেষ ক্ষেত্রের অন্তর্গত বলিয়া বিচার করিয়া থাকে এবং সেইজন্য অপর সকল জমিদারী উঠাইয়া দেওয়া

হইলেও ইহাদের "জমিদারী" কেহ উঠাইয়া দিতে পারে না।

সামরিকভাবে শাসনশক্তি আহরণ

আধুনিক কালে যে সকল প্রচলিত উপায়ে শাসন-শক্তি আহরণ করা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে নির্বাচন হইল শান্তিপূর্ণ, সুসভ্য, আইনসঙ্গত ও রাষ্ট্র-সংবিধান নির্দ্দিষ্ট উপায়। অন্য উপায় হইল সামরিক ভাবে, গায়ের জোরে, আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া শাসন অধিকার কাড়িয়া লওয়া। ইহাকে ইয়োরোপীয়গণ ফরাসী ভাষা ব্যবহারে কু দে'তা (Coup d'etat) বলিয়া থাকে। সম্প্রতি ঘানার প্রধানমন্ত্রী রাইট অনারেবল ডাঃ কে. এ. বুসিয়া একটা আলোচনায় বলেন যে ১৯৬০ খৃঃ অব্দকে যদি আফ্রিকার স্বাধীনতার বৎসর বলা যায় তাহা হইলে সেই বৎসর হইতে যদি আফ্রিকায় ২৫ বার সামরিকশক্তি ব্যবহারে রাজ্যভার ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে দেখা যায়; তাহা হইলেও ১৯৬৬ খৃঃ অব্দ হইতে এই জাতীয় কার্য্য ক্রমশঃ সংখ্যায় কম হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আলোচনাতে অংশ গ্রহন করেন পশ্চিম জার্মান পত্রিকা ,ডার স্পিগেল" এর একজন প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধির মতে আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় অবস্থা ক্রমশঃ দক্ষিন আমেরিকার মত হইয়া আসিতেছে কারণ দক্ষিণ আমেরিকার মতই আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিতেও সামরিক শক্তি ব্যবহারে রাজশক্তি কাড়িয়া লওয়ার অভ্যাস প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ডাঃ বুসিয়ার মতে আফ্রিকা ক্রমশঃ প্রজাতন্ত্র অবলম্বনে সুসভ্যভাবে দেশ শাসনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের এই ভারতীয় অঞ্চলে দেখা যায় যে গায়ের জোরে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করিয়া লওয়াটা তেমন ভাবে প্রচলিত হয় নাই। কোন কোন রাষ্ট্রীয় দল শাসনশক্তি ছিনতাই-এ বিশ্বাস থাকিলেও সেই কার্য্য করিতে এখনও তেমন সক্ষমতা দেখাইতে পারে নাই। পাকিস্থান এ কার্য্যে আমাদিগের তুলনায় অনেক অধিক দক্ষতা দেখাইয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গ সংস্কৃতির কথা : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, দ ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য দশটাকা।

নামেই গ্রন্থের পরিচয় স্পষ্ট হইয়াছে। বঙ্গসংস্কৃতি বলিতে যা বোঝায় তারই গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে চারিটি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্ব্বকথা, দ্বিতীয় বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, তৃতীয় কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়, চতুর্থ বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা।

এ কথা খুবই সত্য, আমাদের দেশে সংস্কৃতির প্রচেষ্টা উনিশ শতকেই হইয়াছে। তবে এইসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রচেষ্টা কেবলমাত্র নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর জন্যই হয় নাই, উদারচেতা ইউরোপীয়েরা ইহার জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে বাংলাদেশে যে নব্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে ইহা অনস্বীকার্য। ইহার জন্য আমরা ইংরেজের নিকট কৃতজ্ঞ।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কথা বলিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন 'গ্রন্থাগার বর্তমান যুগের বিশ্ব-বিদ্যালয়। ......অস্থায়ী বড়লাট চার্ল্স থিওফিলাস মেটকাফকে উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর আবির্ভাব। আর ইহার প্রতিষ্ঠার মূলে ইংরেজ ও বাঙালী উভয়েরই হাত বিদ্যমান। ডিরোজিও শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্র গ্রন্থাগারিকরূপে এই প্রতিষ্ঠান-টিকে বিবিধ বিদ্যার আধার করিয়া তুলিয়াছিলেন।'

নিবেদনের এই অংশটি তুলিয়া ধরিয়া আমি এই কথাই বলিতে চাই, এইভাবে গ্রন্থকার প্রতিটি বিষয়ের জন্মকাল হইতে আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শুধু ইতিহাসই নয়, ইহা একটি প্রামাণিক দলিল। এইরূপ একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার দেশের এবং দশের মঙ্গলসাধন করিলেন। ইহাতে শুধু পাঠকমাত্রই উপকৃত হইবেন না, যাঁহারা গবেষণা করিবেন তাঁহাদেরও উপকারে লাগিবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডি লিট, প্রকাশন বিভাগ : তথ্য ও বেতার যন্ত্রক ভারত সরকার। মূল্য সাড়ে ছয়টাকা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনী অজানা বোধহয় কাহারও নাই। কিন্তু এই গ্রন্থখানি যেরূপ তথ্যবহুল এবং ঘটনাবহুল তাহাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপকৃত হইবেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ বড় আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় স্বার্থ তুলিয়া ধরিতে আইনের খুঁটি-নাটি সম্যকরূপে প্রয়োগ করিতে পারায় তাঁহার সাফল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও কাজ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন, কেবলমাত্র এই পথেই ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব।

তিনি বাস্তববাদী ছিলেন। হুমায়ুন কবীর ভূমিকায় একস্থলে বলিয়াছেন : "আলাপ আলোচনা ও আপোষের মাধ্যমে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করলে তা আসবে ধাপে ধাপে। বারবার তিনি একথাই বলেছিলেন, প্রত্যেকটি লাভ সংহত এবং তাকে ভিত্তি করে লক্ষ্যাভিমুখে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসই হবে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি কতখানি ছিল প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি উক্তিতে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্য্যকরী। হওয়ার দশ বছরেরও আগে তিনি বলেছিলেন যে রাজনৈতিকক্ষেত্রে পরবর্ত্তী

অগ্রগতি হবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ও সঙ্ঘবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার।

ডাঃ দাশগুপ্ত দেশবন্ধুর অন্যতম সুহৃদ ছিলেন। দেশবন্ধুর আশা ও আন্দোলনের অনেক কথাই তিনি জানিতেন। তাই এই গ্রন্থে আমরা এমন অনেক কথা পাই যাহা পূর্বানুস্মৃতি নয়। দেশবন্ধুর স্মৃতি অবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিবার জন্য আমরা গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাই।

বেদস্তুতি: শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য্য, ৫ সি কাটুয়াখটী লেন, কলিকাতা—২৫। মূল্য ৩.০০।

বেদের কয়েকটি সূত্র লইয়া ইহার কাব্যানুবাদ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কাজটী দুরূহ, কিন্তু অনুবাদের গুণে ইহা সুললিত হইয়াছে। বেদের পঠন-পাঠন আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে, তাই অনেকের নিকটই ইহা অজ্ঞাত। অথচ বেদ প্রাচীন ভারতের একটি সম্পূর্ণ সংস্কৃতির ধারক। লেখক সত্যই বলিয়াছেন, "বেদ ভারতীয় তথা বিশ্বের মানব সংস্কৃতির প্রাচীনতম-শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারতীয় সংস্কৃতির যে কিছু কল্যাণ-মূলক সনাতন নীতি এবং সংস্কৃতি, তাহার সমস্তই বেদ-কেন্দ্রী। বেদ তাহাদের মানসমূর্তি, অস্থি-মজ্জা, তাহাদের সবকিছু।"

জানি না, বেদের কাব্যানুবাদ পূর্ব্বে হইয়াছে কিনা, সেদিক দিয়া কবি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া কাব্যানুবাদের গুণে ইহা সকলের কাছেই সুখপাঠ্য হইবে। একথা বলিতে লজ্জা নাই, জনসাধারণ বেদের বিষয়বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, সেই অভাব গ্রন্থকার পূরণ করিলেন। ইহাতে 'বেদ'কে জানিবার সৌভাগ্য সকলের হইবে। মন্ত্রাংশের জটিল অংশগুলির অনুবাদ সত্যই দুরূহ। ইহার পদ্যানুবাদ যে এমন সহজ হইতে পারে ইহা ধারণা করাও যায় না। ইহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইখানে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:

"মর্তের জীবনালোকে কেন আর ফিরে ফিরে চাও
অই মৃত্যু! যাও চলে যাও
অন্য পথ ধরি,
যেই অন্ধকার পথে দিবস শর্বরী
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন দেবগণ করে না গমন,—
সেই পথে চল সর্বক্ষণ।"

সার্থক হইয়াছে তাঁর রচনা। বেদপিপাসু, অধ্যাত্ম-চেতা নরনারী তাঁহার এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

আকাশ প্রদীপ: সুখরঞ্জন রায়, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

বইখানি রূপক আখ্যানকাব্য। অধ্যাপক সুখরঞ্জন আজ পরলোকগত। এককালে তিনি রসগ্রাহী সমালোচকরূপে সাহিত্যিক-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। কাব্যক্ষেত্রেও তিনি অনেক অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান কাব্যগ্রন্থটি তিনটি কালপর্বে বিভক্ত। প্রথম, সন্ধ্যা—দ্বিতীয় নিশীথকাল, তৃতীয় উষা।

কাব্যখানিতে আধুনিকতার ছাপ থাকা সম্ভব নয়, কারণ তিনি সেকালের কবি। ছন্দোবদ্ধ কবিতা এবং সুখপাঠ্য। যেমন—

অস্তগগনে আগুন লেগেছে
জ্বলিয়া উঠিছে রক্তলেখা,
ধরণীতে লভে যে আলো মরণ।
পারে শোভে তার চিতার রেখা।
আলো আঁধারের অধর মিলন
ধীরে সুনিবিড় হইয়া আসে,
তমালকোমল প্রিয়তমকোলে
আলোসতী হাসে মৃত্যুহাসে।

কবি হয়ত আধুনিক কাব্যরুচির অভিনন্দন পাবেন না—তাঁর বিষয় নির্বাচন ও কবিত্বরীতি সবই এ যুগে বিরল ব্যতিক্রম। কিন্তু বিদগ্ধজনের কাছে ইহার সমাদর হবে এবং ইহাও বলিব, অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতির কবিত্বময় প্রকাশে যে শক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর, বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।

গৌতম সেন

দুইটি কেরালা মহিলা

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা

পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে জনসাধারণের উপর রাজস্বের চাপ ভারতবর্ষে অত্যন্তই অধিক। অন্যান্য দেশে যতটা রোজগার হইলে রাজস্ব দেওয়া সুরু হয় ভারতবর্ষের মানুষকে তাহার এক-চতুর্থাংশ আমদানি হইলেই সরকারকে রাজকর দিতে আরম্ভ করিতে হয়। যথা আমেরিকায় আয়কর দেওয়া আরম্ভ হয় ২২৫০০ টাকা বাৎসরিক আয় হইলে; ভারতে হয় ৫০০০ টাকা হইলেই। ইহা ব্যতীত ভারতে অসংখ্য দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক আদায় হইয়া থাকে; যে-রূপ অন্য দেশে হয় না। এইরূপ অবস্থায় শ্রী ওয়াই, বি, চওয়ান অর্থমন্ত্রী মহাশয়, যে আরও অধিক রাজস্ব আদায়ের কথা তুলিয়াছেন তাহা এই গরীবদেশের গরীব জনসাধারণের পক্ষে আশঙ্কার কথা। তিনি বলিতেছেন যে তাঁহাকে অন্ততঃ আরও ১৭৫ কোটি টাকা এই বৎসর তুলিতে হইবে। অর্থাৎ একটা গরীব পরিবারে যদি পাঁচজন লোক থাকে তাহা হইলে সেই পরিবারের লোকেদের উপর বাৎসরিক ১৫।২০ টাকা অধিক রাজস্ব দিবার ভার চাপান হইবে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রায় অর্দ্ধেক মানুষ নিদারুণ দারিদ্র্যবশতঃ বেশীরভাগ আবগারী ও অন্যান্য রাজকর দেয় না ও সেইজন্য অপরাপর লোকের উপর রাজস্বের চাপ অধিক হইয়া পড়িয়া থাকে। সুতরাং যে সকল পরিবার পুরাপুরি রাজস্ব দিবে তাহাদের স্কন্ধে রাজকর পরিবার পিছু ৪০।৫০ টাকাও পড়িতে পারে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে তাহার পরিবারের ব্যক্তিদের খতে মাসিক ৪।৫ টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইবে। যেখানে পাঁচজনের ভরণ-পোষণ করিতে হয় এবং পরিবারের আয় মাত্র মাসিক ৭৫/১০০ টাকা, সে ক্ষেত্রে চার-পাঁচ টাকা মাসিক দেওয়া সহজ কথা নহে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব হইতেই যদি রাজস্বের চাপ মাসিক দশ টাকা থাকে তাহার উপরে টাকায় আটআনা চাপ বৃদ্ধি হইলে গরীবের জীবন নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। রাজস্ব বাড়াইতে চাইলে চওয়ান মহাশয় কি

উপায়ে অধিক রাজস্ব আদায় করিতে সক্ষম হইবেন তাহা বিচার করিলে মনে হয় তিনি কোন কোন আবগারী শুল্ক বাড়াইবেন এবং হয়ত রেলভাড়া, মাশুল, ডাক-টিকিটের মূল্য প্রভৃতি বৃদ্ধি করিবেন। যাহাই করুন, ভারতের মানুষ এখনই অত্যন্ত অধিক রাজকর দিয়া নিষ্পেষিত হইয়া রহিয়াছে। চাপ বাড়িলে তাহারা মহা কষ্টে পড়িবে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলা

কোন কোন সমালোচক পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ঐ দুই দেশের বর্তমান অবস্থার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছেন। এই সকল সমালোচকগণ যাহা নাই তাহা জোর করিয়া দেখিতে পাইতেছেন বলিয়া তৃপ্তিলাভ করেন; কারণ পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় অবস্থার সহিত পশ্চিম বাংলার অবস্থার কোনও সাদৃশ্য আছে বলিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করিতে পারেন না। পূর্ব্ব বাংলায় শতকরা ৯৮ জন মানুষ আওয়ামী লীগের সমর্থক ও ঐ লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রেহমানের অনুরক্ত ভক্ত। আওয়ামী লীগ স্বদেশ-ভক্ত, মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, নিজদেশের ভাষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির পূজারী উন্নত চরিত্রের মানুষ দিয়া গঠিত ও চালিত। ঐ লীগের সভ্যদিগের অধীনে যদি পূর্ব্ব বাংলার শাসনকার্য্য চালিত হয় তাহা হইলে পশ্চিম পাকিস্থানের সংখ্যালঘু অবাঙালীদিগের পূর্ব বাংলা লুঠ করিয়া নিজেদের সমৃদ্ধি বাড়ান চলিবে না দেখিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক শাসকগোষ্ঠীর হর্তাকর্তাবিধাতা ইয়াহিয়া খান, আওয়ামী লীগকে উড়াইয়া দিবার জন্য সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সহস্র সহস্র নরনারী-শিশুদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, সাহিত্যিক, আইনজীবি, ব্যবসাদার, কারখানার কর্ম্মী প্রভৃতিকেও দলে দলে হত্যা করা হইতে থাকে। আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার বাঙালী জাতি যাহাতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া না যায়, সেইজন্য স্বাধীন বাংলা দেশ গঠন করিয়া পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। ফলে এখন অবধি পাকিস্থানের প্রায় ২০০০০ সৈন্য নিহত ও ততোধিক সৈন্য আহত হইয়াছে। পূর্ব বাংলার বহু সহর, বিমান ঘাঁটি, রেলপথ ও পাকা রাস্তা পাকিস্থানীদিগের দখলে আছে; কিন্তু পূর্ব্ব বাংলার ৬০০০০ গ্রামের ৫০০০০ হাজারের অধিক গ্রাম আওয়ামী লীগের অধিকারে রহিয়াছে। এই সংগ্রামে স্বদেশভক্ত আওয়ামী লীগের বিজয় শেষ অবধি হইবেই হইবে। এই কারণে হইবে যে তাহারা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, আত্মত্যাগী, নির্লোভ মুক্তি যোদ্ধা। তাহাদের শত্রুপক্ষ হইল পরদেশ লুণ্ঠন আকাঙ্খী, অত্যাচারী, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত বর্ব্বরের দল।

পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় কলহ ও পারস্পরিক খুন জখম লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু এই সকল দলই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদিগের দল; এমন নহে যে একদল বিদেশী এই দেশবাসী বাঙালীদিগকে লুণ্ঠন করিয়া অপর দেশে সেই লুণ্ঠনলব্ধ ঐশ্বর্য্য লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং কোন লুণ্ঠনরত বিদেশী সৈন্যবাহিনী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য সহরে যে ভাবে পাকিস্থানী সৈন্যগণ কয়েক লক্ষ নরনারী-শিশুকে হত্যা করিয়াছে ও ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ, গৃহদাহ এবং জনসাধারণকে নির্যাতন করিয়াছে; সেইরূপ গণহত্যা ও বর্ব্বরতার চূড়ান্ত পশ্চিম বাংলায় কেহ করে নাই। পশ্চিম বাংলার অরাজকতা পূর্ব্ব বাংলার ঘোর অমানুষিকতাজাত বর্ব্বর ধ্বংসলীলার তুলনায় মশক দংশনের সমতুল্য। কোথাও কোন অন্যায় থাকিলেই তাহার আকৃতি প্রকৃতি বিচার না করিয়া তাহার সহিত হিটলারের অন্যায়ের তুলনা করা ন্যায়শাস্ত্র অনুগত নহে। পশ্চিম বাংলার উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল অবিচার ও অন্যায় করিয়া থাকেন; তাহা আপত্তিকর ও মহাপক্ষপাত দোষ দুষ্ট হইলেও মাওৎ-সে-তুঙ্গের তিব্বত দখলের সহিত তুলনীয় নহে। সকল তুলনাই মাত্রা রাখিয়া করিতে হয়। পূর্ব্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার অবস্থা যে তুলনীয় নহে সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইয়াহিয়া খান এক মহা পামর মনুষ্যত্বহীন নরমেধধারী

হিংস্রপশু সদৃশ জীব। তাহার সহিত তুলনা করা যায় এরূপ মহাপাপী মানব-ইতিহাসে অল্পই আছে। পশ্চিম বাংলায় অথবা দিল্লীতে নীচলোক অনেক থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ইয়াহিয়া খানের সমগোত্রের অমানুষ কেহ নাই। এই সকল তুলনার কষ্ট-কল্পিত চেষ্টা করে যাহারা তাহারা সচরাচর ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বি রাষ্ট্রীয় দলের লোক। রাষ্ট্রক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য তাহারা ঐ জাতীয় কথা বলিয়া থাকে। বলিবার সময় তাহারা মনে রাখে না যে সামান্য মাত্র কোন প্রকারের সাদৃশ্য থাকিলেই দুইটি বিষয় তুলনীয় হয় না। কেহ কাহাকে অন্ধকার গলিতে ছুরিকাঘাত করিয়াছে ও কোথাও কেহ বা কাহারা শতশত ব্যক্তিকে গুলি চালাইয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে; এই দুইটি এক কথা নহে। গুলি চলিলেই জালিওয়ানওয়ালাবাগ হয় না। বোমা ফেলিলেই তাহা হিরোসিমা অথবা নাগাশাকির এটম বোমার মহা প্রলয়ের সহিত এক কথা হইতে পারে না। একটি নারী হরণ এবং ইয়াহিয়া খানের সৈন্যদিগের ঢাকা হইতে শত শত ছাত্রীকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া সমস্তরের অপরাধ নহে। দুইশত স্কুলের ছেলেকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া গুলি করিয়া হত্যা করার সহিত কোথাও কোন বালককে গুলি মারা এক জাতীয় নির্ম্মমতা নহে। কুড়িলক্ষ নরনারীশিশুকে বিতাড়িত করিয়া নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া ও একটি পরিবারকে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য করার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে। হিটলারের চল্লিশ লক্ষ ইহুদিকে নৃশংসভাবে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা এবং সাম্প্রদায়িক কলহে দুই দশজন লোককে নিহত করা এক কথা নহে। কালাপাহাড়ের সহস্র মন্দির ধ্বংস ও নকশালদিগের একটা স্কুলগৃহ ভাঙ্গিয়া দেওয়াও তেমনি এক শ্রেণীর অন্যায় কার্য্য নহে। সামান্য বর্ষণ ও মহাপ্লাবন, এক ব্যক্তির মৃত্যু ও মহামারিতে সহস্রাধিকের মরণ, একটা খড়ের ঘর জ্বলিয়া যাওয়া ও ঢাকা সহরের অর্দ্ধেক অগ্নিগর্ভে চলিয়া যাওয়া; এই সকল এক প্রকারের ঘটনা নহে। সুতরাং এই সকল অবাস্তব অর্থহীন তুলনার দ্বারা শুধু ইয়াহিয়া খানের মহাপাতকের সাফাই গাওয়া হয় মাত্র। ইয়াহিয়া খান সাধারণ অপরাধী নহে। তাহার পাপ পৃথিবীর ইতিহাসের মহাপাপীদিগের বর্ব্বরতা ও অমানুষিকতার কাহিনীর সহিত একত্রে মানব কলঙ্কের ইতিবৃত্তে লিখিত থাকিবে।

বাংলাদেশের মুক্তি-ফৌজ আবার আক্রমণে লাগিয়াছে

পাকিস্থানের নৌবহর ও বিমানবাহিনী এখন পূর্ণ শক্তিতে বাংলাদেশে পাক সৈন্যদিগের সহায়তায় নিয়োজিত হইয়াছে। যতদূর অবধি যুদ্ধ জাহাজ চলে ততদূর জাহাজ হইতে কামান দাগিয়া বৃহৎ বৃহৎ নদীতীরের সহরাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছে। পাকিস্থানী বিমান সর্ব্বত্র উড়িয়া গিয়া বোমা ফেলিয়া সহর গ্রাম জ্বালাইয়া পুড়াইয়া উড়াইয়া ধ্বংস করিতেছে। সৈন্যবাহিনীও সকল রাজপথে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী ও কমাণ্ডকারে যাতায়াত করিয়া রাজপথ পার্শ্ববর্তী বাঙালীর নিবাস ক্ষেত্রগুলি জনশূন্য করিয়া, সেই সকল স্থানে অবাঙালী পাকিস্থানীদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই যুদ্ধ সকল প্রকার আধুনিক হাতিয়ারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রাণশক্তির সংগ্রাম। হাতিয়ারের পিছনে যে মানুষ আছে সে পেশাদার সৈন্য; তাহার যুদ্ধ যে অন্যায় যুদ্ধ সে কথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে জানে। সে যে নরনারীশিশু নির্ব্বিশেষে হত্যাকাণ্ড চালায় ও নারীদিগের উপর পাশবিক অত্যাচার করে সে জন্য তাহার মনে অনুশোচনা না থাকিলেও সে মানুষ হিসাবে নিজের নীচতা অনুভব করে। ঐ কারণে তাহাদের মানসিক শক্তিবোধ বা "মরাল" ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে থাকে এবং সেই আত্মবিশ্বাসের অভাব হইতে তাহাদের হাতের হাতিয়ার উৎকৃষ্ট হইলেও যুদ্ধ ক্ষমতা নিস্তেজ হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ পেশাদার সৈন্যগণ দেশভক্তি উদ্বুদ্ধ স্বার্থ ও আত্মভোলা মুক্তি-ফৌজের কষ্টলব্ধ অল্পশক্তির অস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না এই কারণে উপযুক্ত অস্ত্র না থাকিলেও মুক্তি-ফৌজ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে দ্বিধা করিবেনা এবং

করিতেছেও না। সর্ব্বত্রই মুক্তি-ফৌজের যোদ্ধাগণ পাকিস্থান বাহিনীকে আক্রমণ করিতেছে এবং শতশত পাক সৈন্য প্রতিনিয়ত হতাহত হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত ২০০০০ পাকিস্থানী সৈন্য নিহত হইয়াছে। আহতের সংখ্যা উহার দ্বিগুণেরও অধিক হইবে.

মুক্তি-ফৌজ এখন রাজপথ রেলপথ হইতে দূরের গ্রাম সকলে থাকিয়া গ্যেরিলা যুদ্ধ চালাইতেছে। এইরূপ গ্রামের সংখ্যা ৫০,০০০ হাজারের অধিক এবং সেই সকল গ্রামের লোক সংখ্যা ৫।৬ ।কোটি হইবে। সহরে যেখানে পাকিস্থানীদিগের দখল জোরাল, সেখানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধবাদী কিছু কিছু মানুষ ইয়াহিয়া খানের সমর্থন করিয়া বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিতেছে। কিন্তু গ্রামে ঐ মুসলীম লীগ ও জমায়েত-এল-উলেমা দলের লোকেরা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। যুদ্ধ কিছুকাল গ্যেরিলা পদ্ধতিতে চলিবে; পরে ধীরে ধীরে অস্ত্রবল ও যুদ্ধশিক্ষা বৃদ্ধি হইলে মুক্তি-.ফৌজ পূর্ব্ব বাংলার সহরগুলি পুনরাধিকার চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমানে মুক্তি-ফৌজ সর্ব্বত্র পাকিস্থান বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে ও তাহার ফলে পাকিস্থানের সৈন্যগণকে সকল সময়ে আক্রান্ত হইতে প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে। পাকিস্থান সেনাবাহিনী ও তাহার সহায়ক নৌবহর ও বিমানগুলি এখন অবধি পাঁচলক্ষের অধিক বাংলা দেশবাসীকে হত্যা করিয়াছে। এই বিরাট গণহত্যার ভিতরে অসংখ্য বালক-বালিকা শিশু ও নারীর দেহান্ত ঘটিয়াছে। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুকে মাতার সহিত একই সঙ্গে গুলি করিয়া মারিতে পাক সৈন্যগণ কোন বিবেক দংশন অনুভব করে নাই। চট্টগ্রামের বস্তিতে ও কুমিল্লায় গুলিতে নিহত শিশুদিগের দেহ ও তৎসঙ্গে তাহাদের রক্তাক্ত খেলার পুতুল অনেক স্থলেই পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। এই অহেতুক পাশবিক নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা পৃথিবীর বর্ব্বরতার ইতিহাসে অল্পই পাওয়া যায়।

বৃটেন ও আমেরিকার পাকিস্থান সমর্থন

যদিও বৃটেনের কোন কোন সংবাদপত্র ও রাষ্ট্র-কর্ম্মী পূর্ব্ববাংলায় পাকিস্থানের গণ-হত্যা বিষয়ের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং কোন কোন বৃটিশ প্রতিষ্ঠান উৎপীড়িত বাংলাদেশবাসীদিগের সাহায্যে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হইলেও বৃটিশ সরকার তৎপরিচালিত বি বি সি বেতার প্রচার প্রতিষ্ঠান পাকিস্থানের চূড়ান্ত বর্ব্বরতা বিশ্ববাসীর নিকট হাল্কা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। পূর্ব্ব বাংলায় তেমন কিছু হয় নাই, কিছু কিছু মানুষ এখানে ওখানে মারা গিয়াছে; কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে। নারীহরণ অথবা ঢাকার ছাত্রীনিবাসের ৪০০ শত তরুণীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পাক সৈন্যদিগের হস্তে অর্পণ প্রভৃতি নারকীয় কার্য্যকলাপের কোন উল্লেখ নাই। ২০০ শত স্কুলের বালকদিগকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া গুলি বর্ষণে হত্যারও কোন উল্লেখ নাই। হ্যাঁ, কিছু গোলমাল হইয়াছিল কিন্তু এখন অবস্থা শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক ইত্যাদি ইত্যাদি। বি বি সি ও বৃটিশ মন্ত্রী দপ্তরের সহায়ক হইল আমেরিকার রাষ্ট্র কেন্দ্রের কথকগণ। তাহারাও পূর্ব্ব বাংলার পাঁচলক্ষ নিহত নরনারী শিশুর দেহ গৃধিণীভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু দেখে না। অবশ্য এটম বোমা বিধ্বস্ত হিরোসিমা ও নাগাশাকিও তাহাদের বিচলিত করে নাই। বৃটিশ সামরিক শক্তি জালিওয়ানওয়ালা বাগ ঘটাইয়াও তাহা গর্ব্বস্ফীত বক্ষেই বীরত্বের চরম নিদর্শন বলিয়া বিশ্ববাসীকে দেখাইতে লজ্জা অনুভব করে নাই। সুতরাং সুদূর বাংলাদেশে যদি বীরপুঙ্গব ইয়াহিয়া খান দুই দশ লক্ষ নরনারী শিশু প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া জগৎ রাষ্ট্রক্ষেত্রে পাকিস্থান নামধেয় কৃত্রিম উপায়ে গঠিত একটা মিথ্যা জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে; তাহাতে বৃটিশ ও আমেরিকান রাষ্ট্রনীতিবিদদিগের মুখ রক্ষা হয়; এবং তাহার জন্য গরীব বাংলাদেশবাসীর সর্ব্বনাশ হইলেও আফশোস করিবার কি আছে? প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্ব

মহাযুদ্ধে তাহা হইতে কিছু অধিক মানুষ নিহত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধবৃদ্ধা অনেক ছিল। আজ পৃথিবীতে কে তাহাদের জন্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছে? এই অবিচলিত দার্শনিক মনোভাব ওয়াশিংটন ও লণ্ডনে উচ্চস্তরের রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া চলিয়াছে। ২০০ শত শিশুর প্রাণ অথবা ৪০০ শত তরুণীর মর্য্যাদা এই উচ্চাঙ্গের আদর্শ রক্ষার জন্য অল্পমূল্য বলিয়াই আমেরিকান ও বৃটিশ মানবীয় মূল্য বিচারকগণ হিসাব করিতেছে। আমাদের অন্তর বলিতেছে বর্ব্বরতাকে মানবসমাজে অবাধ বসবাস করিতে দেওয়া বর্ব্বরতার সমর্থন। সেইজন্য সভ্যজাতির মানুষের উচিত নহে প্রাণ থাকিতে একজন নারীর মর্য্যাদারও হানী হইতে দেওয়া। যে মানুষ নামের যোগ্য সে কখনও একটি শিশুকেও কেহ হত্যা করিতেছে দেখিলে তাহাকে বাঁচাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। রীতি ও পদ্ধতি রক্ষার খাতিরে অতিবড় মহা পাপকে মানিয়া লওয়া বা প্রশ্রয় দেওয়া মানবসভ্যতার পরিচায়ক নহে—ইতিহাসে চেঙ্গিস খান, নাদির শা কিম্বা হিটলার জন্মিয়াছিল বলিয়া ইয়াহিয়া খানকে মানিয়া লইতে হইবে একথা যাহারা ভাবে তাহারা মনুষ্যত্বহীন।

ত্রিশ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভারতে প্রবেশ

প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সম্ভবত পূর্ব্ববাংলা হইতে ত্রিশলক্ষ নূতন উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করিবে। এই প্রবল বন্যায় দেশত্যাগ করিয়া পলায়নের কারণ হইল পাকিস্থানী সামরিক শাসকদিগের নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীর গণহত্যা, অমানুষিক অত্যাচার, অনাচার ও ব্যাপক গণবিতাড়ন কার্য্য। লিখিবার সময় অবধি পাঁচলক্ষাধিক নরনারী শিশু হত্যা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু সহস্র স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক, কবি, গায়ক, সাহিত্যিক, দার্শনিক প্রভৃতি বাছাই করা মানুষ ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব্ব বাংলার জাতীয় প্রতিভা সমূলে উৎপাটিত করিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে সাধারণ মানুষ উচ্চশ্রেণীর মানুষের অভাবে দিকবোধ হারাইয়া পশ্চিম পাকিস্থানের সেনাপতিদের কথায় উঠিতে বসিতে কোনও আপত্তি করিতে না পারে। ইহার মধ্যেই পাশবিক চরিত্র পাকসৈন্যগণ বহু সহস্র নারী হরণ করিয়া লইয়া যায়। ৪০০ শত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীও ইহাদের সহিত বন্দিনী হইয়া পশুদিগের ছাউনীতে চালান হইয়াছিল। এখন যে ত্রিশ লক্ষ উদ্বাস্তুকে বিতাড়িত করিয়া ভারতে পলাইয়া আসিতে বাধ্য করা হইয়াছে ইহারা বহু সংখ্যায় গ্রামবাসী এবং ইহাদের গৃহ ও জমি জায়গায় পাকবাহিনী চেষ্টা করিয়া অবাঙালী পাকিস্থানীদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিশ লক্ষ বাড়িয়া এক কোটি হইতে সহজেই পারিবে যদি পাকিস্থান বাংলাদেশ পূর্ণরূপে দখল করিয়া লইতে সক্ষম হয়। কেননা সেই অবস্থায় হয়ত গণহত্যা অপেক্ষা গণ বিতাড়ন শাসন প্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে অধিক বাঞ্ছনীয় মনে হইতে পারে। এক কোটি পাকিস্থানী অবাঙালী আনিয়া বসাইতে পারিলে পূর্ব্ব বাঙলা দখলে রাখা সহজ হইবে মনে হইতে পারে। অবশ্য পাকিস্থান সামরিক শাসক গোষ্ঠী সম্ভবত পূর্ব্ব বাংলা পূর্ণরূপে দখল করিতে পারিবে না। সুতরাং উদ্বাস্তুর সংখ্যা ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষের অধিক না হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল লোকদিগকে শুধু পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিহারে না থাকিতে দিয়া আরও দূরে দূরে পাঠান ব্যবস্থার দিক হইতে অধিক কার্য্যকরী হইবে। পশ্চিমবঙ্গে মানুষের বসতি খুবই ঘন এবং এখানে অধিক লোকবৃদ্ধি সকল দিক হইতেই কষ্ট ও গোলমালের সৃষ্টি করিবে। শ্রীমতী ইন্দিরা ঠিক কি ভাবে এই বিরাট জনসংখ্যার পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা করিবেন তাহা আমরা জানি না। তবে পশ্চিম বাংলায় কুড়ি-পঁচিশ লক্ষ অতিরিক্ত মানুষের বসত ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

পাকিস্থান ও ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধি-দিগের স্বদেশগমন ব্যবস্থা

ঢাকা ও কলিকাতার কূটনৈতিক প্রতিনিধিদিগের আর কোন কাজ নাই। উভয় দফতরই পাকিস্থান ও

ভারত সরকার বন্ধ করিয়াছেন এবং উভয় দফতরের কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই এখন স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করা আবশ্যক। কিন্তু পাকিস্থান নিজের চিরানুসৃত মতলববাজি অবলম্বন করি। এই সামান্য যাতায়াতের বিষয় লইয়াই এখন অবধি রুশিয়া, নেপাল, ইরান ও সুইৎজারল্যাণ্ডের সাহায্যে কাজটি হইবে বলিয়া প্রথমে ব্যবস্থা করিয়া ও পরে তাহাতে আপত্তি করিয়া ঐ সকল প্রতিনিধিদিগকে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন না করিতে দিয়া ঢাকা ও কলিকাতাতেই থাকিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। সভ্যজগতে পাকিস্থানের মত রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব থাকা উচিত নহে; কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেন আরম্ভে এবং রুশিয়া ও চীন পরে ঐ মিথ্যাশ্রয়ী পরধন লুণ্ঠনাকুল বর্ব্বর নেতৃবর্গ চালিত রাষ্ট্রকে সভ্যজগতের কলঙ্কস্বরূপ মোতায়েন রাখিয়া নিজেদের ন্যায় অন্যায় বোধের অভাব ও বিবেকহীনতা প্রমাণ করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা পূর্ব্বেরমতই রহিয়াছে

প্রত্যহ প্রাতে সংবাদপত্র পাঠ করিলেই দেখা যায় যে কোন প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছে অথবা কোন ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করিয়া নয়তো গুলি বা বোমা মারিয়া হত্যা করা হইয়াছে। "গতকল্য পাঁচ ব্যক্তি" কিম্বা "হেড মাষ্টার" "রাজকর্মচারী" বা "রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি"মৃত আহত কি নিরুদ্দেশ, এইরূপ খবর প্রত্যহই সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হইতেছে। শত শত ব্যক্তিকে ধরপাকড় করা হইতেছে কিন্তু তাহার ফলে অরাজকতার শান্তি হইতেছে না। কয়েক শত খুন জখম, লুঠ গৃহদাহ প্রভৃতি হইলেও ধরা পড়িয়া প্রায় কেহই শাস্তি পাইতেছেনা। প্রেসিডেন্টের শাসন, বামপন্থীদিগের রাজ্যভার গ্রহণ ও কংগ্রেসদলের দেশ পরিচালনা, যাহাই হইতেছে না কেন অরাজকতার দিক দিয়া কোনও অবস্থান্তর হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে শীর্ষস্থানীয় লাট বেলাট, মন্ত্রী উজির নাজির বদল হইলেও যখন ফল কিছু হইতেছেনা তখন ঐ সকল বড় বড় মহারথীদিগের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না,হইবেও না। অর্থাৎ বড় কর্ত্তাগণ অরাজকতা দমন বিষয়ে কোনও-ভাবে ক্ষমতাশীল বা দায়ী নহেন। ইনিই হউন বা উনিই হউন আইনভঙ্গের তোড় ও অপরাধের বন্যা সমান গতিতে চলিতে থাকিতেছে। গভীরভাবে বিষয়টার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে রাজকার্য্য এদেশে বড় কর্ত্তাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয় না; হয় নিম্ন স্তরের ও কিছু উচ্চ স্তরের আমলাদিগের দ্বারা। সুতরাং অরাজকতা দমন কার্য্য যদি না হইতেছে তাহা হইলে সেজন্য দায়ী আমলাগণ। আমলাদিগকে যদি অতঃপর নিজেদের চাকুরী রাখিতে হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে অরাজকতার শেষ না হইলে তাহাদের চাকুরীর শেষ হইবে। ইহা হইল অরাজকতা দমনের দিকের কথা। অপর দিকে আছে অরাজকতার উৎসাহ ও উস্কানির কথা যাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী রাষ্ট্রীয় দলের নেতাগণ। যদি রাষ্ট্রীয় দলের নেতা ও অর্দ্ধনেতাগণ শত শত নাগরিকের অপঘাত মৃত্যুর কারণ হ'ন তাহা হইলে ঐ সকল রাষ্ট্রীয় দলের দ্বারা রাষ্ট্রের, দেশের বা জনসাধারণের কোনও লাভ হইতেছে বলা চলেনা। সুতরাং রাষ্ট্রীয়দলগঠন যদি অপরাধপ্রবণতার সহায়ক হয় তাহা হইলে সেইগুলি আর আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না বলিতে দোষ কি থাকে? রাষ্ট্রীয় দলগুলিকেও বলা আবশ্যক যে তাহাদের কার্য্য-কলাপের ফলে যদি দেশের মানুষ উত্তরোত্তর আরও নরঘাতক, লুঠেড়া ও অইনভঙ্গকারী হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে রাষ্ট্রীয় দলগঠন বে আইনী ঘোষণা করা হইবে।

এখন কথা হইল যে আমলাদিগকে নানা দোষ থাকিলেও দমনকরার সৎসাহস রাষ্ট্রক্ষেত্রের উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের নাই। কারণ তাঁহারা সকল কার্য্যের জন্যই ঐ আমলাদিগের উপর নির্ভরশীল। যদি কোন সৌভাগ্যের আবির্ভাবে দেশের উচ্চস্থানীয় নেতাগণ কর্ম্মে ক্ষমতাবান হইয়া পড়েন তাহা হইলে দেশের অবস্থা উন্নত হইতে পারে। আর ঐ রাষ্ট্রীয় দলগুলির নেতাগণও যদি কখন সত্য সত্যই দেশপ্রেম অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হ'ন তাহা হইলে তখন দেশের

মানুষের সৌভাগ্যরবিও দীপ্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কিন্তু তেমন দিন কখনও আসিবে কি? সেই জন্য মনে হয় জনসাধারণেরই ব্যবস্থা করিয়া কিছু করিতে হইবে।

সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রীয়করণ

ভারত সরকারের ব্যবসাদারী সমাজবাদ বা সোসিয়ালিজম আবার একটা বৃহৎ ব্যবসায় রাষ্ট্র করায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবসায়টি হইল জীবন বীমা ব্যতীত অপর সকল সাধারণ বীমার কারবার; যথা অগ্নিবীমা, মোটর গাড়ী বীমা, চুরী ডাকাতি লুঠ প্রবঞ্চনা বীমা, দুর্ঘটনা ভূমিকম্প রেলজাহাজ বিমান সংক্রান্ত বীমা, চালানের মাল বীমা প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের বীমা হয় এবং ভারতবর্ষে ঐ সকল বীমার অনেকগুলি দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান আছে। এখন হইতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান কয়েকটি রাষ্ট্রীয় করপোরেশনের হস্তে চলিয়া যাইবে এবং যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বকার প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীদার বা মালিক ছিলেন তাঁহাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকা দেওয়া হইবে।

সমাজবাদীদিগের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ হইল ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের দ্বারা জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গলের হানী হয় এবং ব্যবসা রাষ্ট্রকরায়ত্ত করিলে জনসাধারণকে কোনও-ভাবে শোষিত হইবার সম্ভাবনায় সম্মুখীন হইতে হয় না। উপরে বর্ণিত সাধারণ বীমা যে ভাবে করা হয় তাহাতে তাহা রাষ্ট্রের ব্যবসায় হইলেও ব্যক্তিগতভাবে জনসাধারণের কোন লাভ লোকসান হইবে বলিয়া মনে হয় না। জীবন বীমা রাষ্ট্র করায়ত্ত করিয়া যেরূপ জনসাধারণের লাভ অথবা লোকসান হইয়াছিল এ ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহ সেইরূপই হইবে। সুতরাং এই ব্যবসায়টি রাষ্ট্রকরায়ত্ত করিয়া সমাজবাদের কোন আদর্শ সিদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ব্যবসায় করিয়া জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা, শোষণ অথবা ক্ষতিগ্রস্থ করার উদাহরণ ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। আড়তদার কৃষাণকে দাদন দিয়া অথবা [illegible] তাহার কষ্ট উৎপাদিত ফসল ক্রয় করিয়া লইয়া কৃষাণকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে। অন্যান্য কারখানাজাত বস্তুর মূল্যের যথার্থ ন্যায্য প্রাপ্য অংশ শ্রমিক পায় না, পুঁজিপতি পুঁজির শক্তিতে তাহার প্রাপ্য হইতে অধিক আদায় করিয়া লয়। ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, পাঠ্যপুস্তক লেখক, যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ, স্থপত প্রভৃতি বহু সুকৌশলী কর্ম্মবিশারদ সাধারণ মানুষের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অতিরিক্ত লাভের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যে, সৌন্দর্য ও সুরুচির খোরাক জোগাইতে এবং বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর সরবরাহে বহুভাবে অত্যধিক লাভের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। ইহা ব্যতীত টাকার লেন-দেন, ধার ক্রয় বিক্রয়ে, গৃহ নির্ম্মাণে ও ভাড়া দেওয়াতে, জুয়া খেলা ও চিত্ত-বিনোদনের নানান ব্যবস্থায় মানুষকে প্রবঞ্চনা করার ক্ষেত্র অনন্ত বিস্তৃত। রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে না গিয়া ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন কেন তাহা সহজেই বোধগম্য। জনমত তুষ্টির সহজ পথ সন্ধানই এই সকল কার্য্যের কারণ। অধিকতম সংখ্যক ব্যক্তির অধিকতম লাভ ও সন্তোষবিধান এই জাতীয় প্রচেষ্টার হেতু নহে।

বিদেশী জাতিসভায় পাকিস্থানী অপপ্রচার

পাকিস্থানী অপপ্রচারের সংবাদ হইতে বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে পাকিস্থান প্রথমতঃ তাহার গণহত্যা, নারী নির্য্যাতন, শিশু, ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, লেখক ও অপরাপর গুণীজনগণকে হত্যা প্রভৃতি অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। পাকিস্থান সামরিকবাহিনী আত্মরক্ষার্থে কিছু কিছু গুলি বর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে কিন্তু যে কারণে অধিক মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে তাহা হইল সাম্প্রদায়িক কলহ। বাঙালীগণ অবাঙালী-দিগকে আক্রমণ করিয়া এই সকল মারাত্মক কলহের আরম্ভ করিয়াছিল ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই মিথ্যা কিন্তু বাজারে চালান সম্ভব হয় নাই। যেখানে পাঁচ লক্ষ বাঙালী নিহত ও ত্রিশ লক্ষ বাঙালী দেশ হইতে বিতাড়িত সেখানে বাঙালীদিগের অপরকে আক্রমণের কষ্টকল্পিত উপকথা চালান অত্যন্তই কঠিন কার্য্য।

দ্বিতীয় মিথ্যাটা হইল পূর্ব্ব বাংলার অধিবাসীদিগের বর্ণনা লইয়া। পূর্ব্ব বাংলায় নাকি শুধু বাঙালীদের বাস নহে। বহু অবাঙালী ঐ ভূখণ্ডে বাস করে ও মুজিব নামধেয় এক ব্যক্তি একটা শুধু বাঙালীদের দ্বারা গঠিত দল পাকাইয়া অবাঙালীদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছিল। ন্যায় ও সুবিচারের প্রতীক পাকিস্থান সরকার এই অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া অসহায় অবাঙালীদিগের রক্ষার্থে পূর্ব্ব বাংলার মুজিবদলের অত্যাচারীদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন মাত্র। ভারতবর্ষের পাকিস্থান বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীগণ ঐ মুজিবদলের লোকেদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে উৎসাহ দিয়াছে। ফলে কোথাও কোথাও কিছু গোলাগুলি চলিয়াছে। কিন্তু পাকিস্থান হইতে লক্ষ লক্ষ সৈন্য কোনও যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই কেন পূর্ব্ব বাংলায় পাঠান হইল এবং ২৫-২৬ মার্চ্চ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা সহরের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী নিবাস কালীবাড়ি ও আরও বহু স্থান কেমন করিয়া ধ্বংস হইল তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ কেহ দেখাইতে সক্ষম হয় নাই। ত্রিশ লক্ষ মানুষ ভিটামাটি ফেলিয়া কেন পলাইল; পাঁচ লক্ষ মানুষ কি করিয়া মরিল, সহস্র সহস্র মৃতদেহ কেন যত্রতত্র পড়িয়াছিল; এ সকল প্রশ্নের উত্তর কেহ দেয় নাই। শত শত বিদেশী ব্যক্তি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছে তাহার বর্ণনা শুনিয়াই জগতবাসী আজ পাকিস্থানীদিগের বর্ব্বরতা, পাশবিকতা ও অমানুষিক অত্যাচারের বিষয়ে পূর্ণ অবগত। এমত অবস্থায় মিথ্যা প্রচার করিয়া বিশেষ সুবিধা হইবে না। তাহা হইলেও পাকিস্থানীদিগের চেষ্টার অভাব দেখা যাইতেছে না।

পূর্ব্ব বাংলার সহরগুলির অবস্থা

পূর্ব্ব পাকিস্থানে পাকা রাস্তার অভাব বিশেষ প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এই রাস্তার অভাব বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙালীদিগের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য খুবই সাহায্য করিয়াছে। কারণ পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী পাকা রাস্তা না থাকিলে কোথাও যাইতে পারে না এবং পূর্ব্ব বাংলার অধিকাংশ গ্রামে পাকা রাস্তা ধরিয়া পৌঁছান যায় না। সেই জন্য ঐ দেশের গ্রামাঞ্চল সৈন্যদিগের কবলে নাই এবং বাংলাদেশের মুক্তি-ফৌজ বহু স্থলেই গ্রামগুলি দখল করিয়া স্বাধীন বাংলার শাসন বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট, রাজশাহি, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া, বাখরগঞ্জ ও চালনা প্রভৃতি সহরগুলির অধিকাংশই সৈন্যদিগের কবলে রহিয়াছে; তবে কম বেশি। অনেক সহরে সৈন্যগণ ছাউনিতে ও বিমানবন্দরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও সহরের অপর সকল এলাকায় স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না। এই সকল সহরে পাকিস্থান ও বাংলাদেশ উভয় শক্তিরই উপস্থিতি লক্ষিত হয়। ঢাকা সহর সৈন্যগণের হস্তেই পূর্ণরূপে রহিয়াছে। চট্টগ্রাম সহরের কোন কোন অংশে পাকিস্থান বিরোধী ব্যক্তিরা এখনও ঘোরাফেরা করে। কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি সহরের অবস্থাও ঐরূপ। ইহাতে মনে হয় মুক্তি-ফৌজ আবশ্যক হইলে পাকিস্থানীবাহিনীর উপর চাপ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম আছে। কিন্তু সেই চেষ্টা করিবার এখনও সময় হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তখন হয়ত অনেক সহর পুনরায় স্বাধীন বাংলার অধীনে চলিয়া যাইবে।

আচার্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

(এক মহান্ প্রাচ্যতত্ত্ববিদের জীবন কাহিনী)

অনিলকুমার আচার্য

প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এক অবিস্মরণীয় নাম। পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল তাঁ. মৃত্যু হয়েছে। এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে কালধর্মে তাঁর স্মৃতি আজ জনসাধারণের মনে ম্লান হয়ে এলেও তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য, বহুমুখী বিদ্যাবত্তা ও অনুপম চরিত্র মাধুর্য্যে সমসাময়িক বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সুধী-সমাজের শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

আজ থেকে একশ বছর আগে ১৮৭০ সনের ৩০শে জুলাই সতীশচন্দ্র নবদ্বীপের এক বিখ্যাত শাস্ত্রবিৎ, বিদ্যানুরাগী ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সমগ্র ছাত্রজীবন কৃতিত্বের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। বিভাগীয় মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা থেকে এম, এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সরকারী বৃত্তি ও নানা স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৮৯৩ সনে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে এম, এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি "নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী সভার" পরীক্ষায় বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে "বিদ্যাভূষণ" উপাধি লাভ করেন। সতীশচন্দ্রের জীবনী পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে এক প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বলেছেন, "এ উপাধি তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল। বিদ্যা ও আচার্য্য সতীশ চন্দ্র পরস্পর ভূষ্য-ভূষণভাব ধারণ করিয়াছিল।"

সতীশচন্দ্র খুব সহজ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাই অধ্যাপকের পদ লাভ করে তিনি মাত্র অধ্যাপনার কাজেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। জন্মসূত্রে লব্ধ ঐকান্তিক বিদ্যানুরাগ দিন দিনই তাঁকে অধিক থেকে অধিকতর বিদ্যানুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, যার ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি প্রাচ্যবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে অসামান্য ব্যুৎপত্তি ও অবাধ বিচরণশীলতা লাভ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান-সরস্বতীর পায়ে স্বহস্তরচিত অঞ্জলিপ্রদান ব্রতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এই সহজাত বিদ্যানুরাগের বশেই কৃষ্ণনগরে একাধারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরূপে তাঁর অভিনব জীবনের সূচনা হয়। অধ্যাপনার অবসরে সমস্ত বাকি সময়টুকু তিনি বঙ্গের তদানীন্তন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃত কবি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্নের নিকট কাব্য ও অলঙ্কার শিক্ষায় এবং বঙ্গের তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদুনাথ সার্বভৌমের নিকট ন্যায়দর্শনশিক্ষায় নিয়োগ করেন এবং স্বীয় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অশেষ পরিশ্রমের ফলে এই সমস্ত শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

এইভাবে একাধারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরূপে অসামান্য নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের ফলেই তরুণ অধ্যাপকের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বৎসমাজে ছড়িয়ে পড়ল এবং অচিরেই বঙ্গীয় সরকার তাঁকে বৌদ্ধগ্রন্থ সমিতির (Buddhist Text Society) গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যে নিযুক্ত করলেন। এই কাজের সূত্রে তিনি কয়েকটি বহুমূল্য পালিগ্রন্থ অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা এবং কয়েকটি

অতিশয় তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ মনীষীদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন।

এই ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির সূত্রেই স্বনামখ্যাত তিব্বতপর্যটক ও গবেষক রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সি আই ই মহোদয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। শরৎচন্দ্রের অনুরোধে সতীশচন্দ্র বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক তিন বছরের জন্য তিব্বতী ইংরেজী অভিধানকোষ রচনার কাজে নিযুক্ত হন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সন পর্য্যন্ত তিনি দার্জিলিংএ বাস করেন। কোষপ্রণয়ন কাজের অবসরে তিনি সুপণ্ডিত লামা ফুন্‌ছোগ ওয়াংভানের তত্ত্বাবধানে (ওয়াংভান তখন দার্জিলিং-এ বাস করছিলেন) তিব্বতী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়েই (১৯০১ সনে) তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম পালি ভাষায় এম, এ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর পরীক্ষক বিশ্ববিশ্রুত বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রীস্ ডেভিসের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সনে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক সে সময়ে ভারত পরিভ্রমণরত তাসিলামার দ্বিভাষী নিযুক্ত হন এবং উক্তকার্য অতিশয় সুযোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করে তাসিলামার ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। ১৯০৬ সনের নববর্ষে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। বোধ হয় এত অল্প বয়সে আর কেউ এই উপাধি লাভে সমর্থ হন নি।

১৯০৭ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সহযোগী ভাষাতত্ত্ব-সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ সনে "Mediaeval School of Indian Logic' নামক বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে তিনি Ph. D ডিগ্রী ও গ্রিফিথ প্রাইজ লাভ করেন। এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মনীষীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে একজন অতিশয় সুযোগ্য ও সুদক্ষ অধ্যক্ষের নিয়োগের প্রশ্নটি নানা কারণে অতিশয় গুরুত্ব লাভ করে। বঙ্গের তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর এ ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর স্যার আশুতোষের মতামত চেয়ে পাঠান। স্যার আশুতোষের পরামর্শ অনুসারে লেঃ গভর্ণর তথা বঙ্গীয় সরকার সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সতীশচন্দ্রকে এই পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এই নিয়োগ সাপেক্ষে আরও সর্বাঙ্গীন শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সনের জুন মাসে তিনি সরকার কর্তৃক সিংহলে প্রেরিত হন। সিংহলে অবস্থানকালে তিনি কলম্বোর বিদ্যোদয় কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত বৌদ্ধ মহাস্থবির সুমঙ্গলের তত্ত্বাবধানে ছয়মাসকাল পালিভাষা ও বৌদ্ধদর্শনের উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেন। পরে ১৯১০ সনের প্রথম ছয়মাস তিনি কাশীধামে কুইন্স কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মনীষী ডক্টর এ, ভেনিসের তত্ত্বাবধানে বিশ্রুতকীর্তি পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, শিবকুমার শাস্ত্রী, জীবনাথ ঝা, বামাচরণ ন্যায়াচার্য প্রমুখ বিবুধবরেণ্যর নিকট সংস্কৃত সাহিত্য ও আর্যদর্শনের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি জর্জ থিবোর নিকট ফরাসী ও জার্মান ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন শাখায় ও হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে সর্বাঙ্গীন শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯১০ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ প্রাতঃ-স্মরণীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যে পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন, উত্তরসূরী রূপে সেই পদের অধিকার লাভের জন্য আচার্য সতীশচন্দ্রকে যে অমানুষিক পরিশ্রম ও অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্যের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত শুধু বর্তমান যুগে কেন, যে কোন যুগেই একান্ত বিরল।

কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের মত গুরুদায়িত্বপূর্ণ

সম্মানজনক পদ লাভ করেও আচার্য সতীশচন্দ্র তাঁর আজীবন আচরিত বিদ্যাভ্যাস হতে ক্ষান্ত হননি। ১৯১২ ও ১৯১৬ সনে তিনি সরকার প্রবর্তিত তিব্বতী ভাষায় ব্যুৎপত্তিমূলক পরীক্ষাসমূহ পাশ করে যাবতীয় বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ও তিব্বতীভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পালিভাষায় সুপণ্ডিত ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় লব্ধকীর্তি অধ্যাপক আচার্য সতীশচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য এবং হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের ফলশ্রুতিস্বরূপ ঐ সময়ে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য ও ধর্মসভার সভাপতি-পদে বৃত হন। ১৯১৩ সনে বারানসীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত দিগম্বর জৈনসভার তিনি মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৪ সনে তিনি যোধপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শ্বেতাম্বর জৈনসভার এবং হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলনেরও সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯১৬ সনে যশোহর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন এবং ১৯১৯ সনে প্রথম প্রাচ্য বিদ্যাসম্মেলনের সভাপতিত্বের এবং পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষতার ভারও তাঁর উপরই ন্যস্ত হয়। তাছাড়া, কলকাতা সাহিত্য সম্মেলন, ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলন এবং অন্যান্য বহু বিবিধসভায় সভাপতিরূপে তিনি কবি কালিদাস ও তাঁর জন্মস্থানের উপর অতিশয় তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সন পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন।

আজীবন বাণীর সাধক সতীশচন্দ্র তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনে (মাত্র ৫০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়) সারস্বত সাধনার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে রেখে গিয়েছেন, যে কোন যুগের নিরিখেই তার তুলনা একান্ত বিরল। ভাষাতত্ত্ব, সাংখ্যদর্শন, বেদান্তদর্শন জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের উপর তিনি বহু তথ্যমূলক ও অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে সুধীসমাজের শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ভারতবর্ষ ও সিংহলে বহু প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার পুরাতত্ত্ববিদ্‌রূপেও তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ প্রমুখ সংস্কৃত নাট্যকারগণের উপর তাঁর রসঘন অথচ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী তাঁকে নিপুণ সমালোচক তথা সাহিত্যরসিকরূপে চিহ্নিত করেছে। ভর্তৃহরির 'ভট্টিকাব্য' ও শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটক তিনি অতিশয় সুযোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন এবং প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য, শিলালিপি প্রভৃতি সূত্র থেকে ভারতের একটি নাতিবৃহৎ ইতিহাস রচনা করে অনেক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর পুস্তক সংখ্যা ২২, প্রবন্ধের সংখ্যা ইংরেজী ৭৭ ও বাংলায় ৬০টিরও বেশি। এই সব প্রবন্ধ Indian Mirror, Don, Bengali, Journal of the Royal Asiatic Society, Journal of the Mohabodhi Society, বঙ্গদর্শন, ভারতবর্ষ, ভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ও নানা আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু আচার্য্য সতীশচন্দ্রের অমর কীর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি ভাষায় লিখিত 'ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস, (A History of Indian Logic)। এই বিপুলাকার গ্রন্থে তিনি প্রাচীন গৌতম সম্প্রদায়, বৌদ্ধ ও জৈনসম্প্রদায়, (উহাদের ভারতীয়, চৈনিক ও তিব্বতী প্রস্থানভেদ) এবং নব্য গঙ্গেশ সম্প্রদায় এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর ন্যায় গ্রন্থাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাস এবং প্রত্যেক গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন। উক্ত গ্রন্থ রচনায় সুদীর্ঘ বার বছর কাল তিনি যে অমানুষিক পরিশ্রম করেন, তার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৯১৯ সনে তিনি দারুণ পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন। এই অবস্থায়ই রোগশয্যায় শায়িত থেকে তিনি উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন এবং ১৯২০ সনের ২১শে এপ্রিল উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা ও মুখবন্ধ সম্পূর্ণ করেন। এর মাত্র

চারদিন পরে ১৯২০ সনের ২৫শে এপ্রিল তিনি দেহত্যাগ করেন।

উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এক বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বলেছেন, "তিনি যে বিশাল মহীরুহ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, উহার ফলভোগ বিধি-বিড়ম্বনায় তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া না উঠিলেও ভাবী যুগের রসাস্বাদের উদ্দেশ্যে সেই মহাবৃক্ষের ফলচ্ছায়া চিরতরে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। অদ্যাপি কোন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য গবেষক এই মহাগ্রন্থখানির বার্তিক রচনায় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন নাই। কারণ, আচার্য সতীশচন্দ্র ন্যায় দর্শনের যে সকল তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত কোন নূতন তথ্য এখনও পর্য্যন্ত আর কোন গবেষক অনুসন্ধানে লাভ করিতে পারেন নাই।"

কিন্তু আচার্য সতীশচন্দ্র দুর্ধর্ষ নৈয়ায়িক মাত্রই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাহিত্য-রসিক, বাগ্মী ও এক অতি সরস, স্নিগ্ধমধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। বঙ্গভাষায় রচিত "ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য" প্রভৃতি গ্রন্থ ও অন্যান্য বহু সরসমধুর রচনাবলী তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা ও সাহিত্যরসিকতার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য বহন করে। সুগভীর পাণ্ডিত্যের সহিত স্নিগ্ধ সরসমধুর ব্যক্তিত্বের ও অতুলনীয় চরিত্রমাধুর্যের এই সমন্বয়ের ফলে তিনি সমসাময়িক বাংলা ভারতবর্ষের বিদ্বৎ-সমাজে সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনশ্রদ্ধেয় একটি আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সতীশচন্দ্রের চরিত্রের এই বিশেষ দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে জনৈক বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ সমালোচক বলেছেন, "আচার্য সতীশচন্দ্র ছিলেন অজাতশত্রু...... সর্বজনপ্রিয়। বহুক্ষেত্রে এইরূপ দেখা গিয়াছে যে দুইজন পরস্পর শত্রু আচার্য সতীশচন্দ্রের অনুরক্ত সুহৃদ্। অপর সকল বিষয়ে নিদারুণ মতভেদ থাকাসত্ত্বেও সতীশচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভা সম্বন্ধে তাঁহারা উভয়েই একমত। ইহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত, একদিকে স্যার আশুতোষ ও অপরদিকে ইংরেজ সরকার। পরস্পর বিরোধী এই দুই মহাশক্তি তুল্যভাবে আচার্য সতীশচন্দ্রের অনুকূলতা করিয়া আসিয়াছেন চিরদিন।"

আজ অর্ধ শতাব্দী গত হল, সতীশচন্দ্র তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেছেন। কিন্তু তাঁর লোকোত্তর পাণ্ডিত্য ও অমূল্য গ্রন্থাবলীর ফলশ্রুতিতে তিনি আজও বিদ্বৎসমাজের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার পুণ্যস্মৃতির প্রতি বর্তমান যুগের শিক্ষিতসমাজ বিস্মৃতিপরায়ণ না হন, এই উদ্দেশ্যে তাঁর জন্মশত বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই অকিঞ্চিৎকর বাঙ্ময় অঞ্জলি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নিবেদন করছি।

বিকৃত বুদ্ধির ফাঁদে

[একটি অকল্পিত গল্প]

গুরুপদ দাস

"One of the sublimest things in the world is plain truth."

পড়ন্ত বিকেলের কমলা রঙের রোদ উড়ন্ত গাংচিলের সোনালী ডানায় থরথরিয়ে কাঁপছে তখন। আমরা সবাই বালিয়াড়িতে। ওদিকে, সারিবদ্ধ হোটেলগুলোর সম্মুখের অঞ্চলে ভিড় বেশী। স্বর্গদ্বারের পাশের শ্মশানভূমির ঠিক মুখোমুখি এদিকটায় জনসমাগম অপেক্ষাকৃত কম। প্রায় ফাঁকা ফাঁকাই বলা চলে। দাদা বসে বসে সেদিনের স্টেটসম্যানখানা ওল্টাচ্ছেন। আদিত্যকে নিয়ে আমি ও সনাতন পাশেই বসে আছি। গল্প করছি আর বছর দুয়েকের শিশু—দুষ্টু আদিত্যটাকে সামলাচ্ছি। সনাতন একটি সরকারী কলেজের ইংরেজীর তরুণ অধ্যাপক। ফরাসী সাহিত্যও তার যথেষ্ট পড়া আছে। অধুনাতন বিশ্বের সাহিত্য সম্পর্কে অনেক খবর বলছিলো সে। আমার বয়েসটা তার থেকে সাত আট বছর বেশী হলেও সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞানটা স্বল্পই। তাই মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি শুনছিলাম তার কথাগুলো। ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে মাঝে মাঝে আমাকে দু'-একটা কথা বলতেও হচ্ছিলো বৈকি। পাশাপাশি বসেছিলাম আমরা। কথা বললেও, দৃষ্টি আমাদের প্রসারিত ছিলো এদিকের সৈকত বরাবর। কিছু দূরেই দুই কিশোর—আশিস ও চিনু বসে বসে বালির ঘর তৈরী করছে আর ভাঙছে। সমুদ্রের তটরেখা ধরে বৌদি ঝিনুক কুড়িয়ে আঁচল ভরতে ভরতে চলেছেন। ঢেউয়ের পর ঢেউ জীমূতমন্দ্রে তীরের ওপর আছড়ে পড়ছে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে আর সরসর করে দুধের মতো সাদা ফেনা অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে দিচ্ছে, বিছিয়ে দিচ্ছে। বৌদির আলতারাঙা পায়ের পাতা স্পর্শ করতে পাওয়ার লোভেই যেন ঢেউগুলোর এই মাতামাতি। কখনো কখনো ভিজিয়ে দিচ্ছে, ডুবিয়ে দিচ্ছে বৌদির পা-দুটো আর শাড়ীর প্রান্তটুকু। আদিত্য'র একটা হাত মুঠোয় ধরে আমি বসে বসে সনাতনের কথা শুনছি আর অপলক দুটি চোখ মেলে দেখছি ঢেউগুলোর সেই মাতলামি, ক্রমে বৌদি অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। স্পষ্ট করে তেমন কিছুই যেন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, পরনের পাকা ধান-রঙের শাড়ির অস্পষ্ট আভাসটুকু ছাড়া। সেদিক থেকে তখন চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমি।

এই সময় দাদা হঠাৎ কাগজ থেকে মুখ তুলে চশমাটা খুললেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে লেনস-দুটো মুছলেন। তারপর পুনরায় চোখে লাগিয়ে নিয়ে ঘাড় সোজা করে দূরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠলেন, আশা—আর যেও না, ফিরে এসো।

কিন্তু ঝিনুকের নেশা পেয়ে বসেছে তখন বৌদিকে। দাদা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ডাকলেন। এবার বৌদিকে ফিরতে দেখা গেলো। মাঝে মাঝে হেঁট হয়ে তেমনি ভাবে আঁচল ভরতে ভরতে মন্থর পায়ে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন আমাদের কাছে। মানবতন্ত্রী সার্ত্র-র-এর অস্তিত্ববাদী ভাবনার আলোচনা থামিয়ে আমরা হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখে মুখে তাঁর বিরক্তির অন্ত নেই যেন। তখনই, আর ঠিক তখনই ধরা পড়লো, বৌদির নাকে নাকছাবিটা নেই। লক্ষ্যটা অবশ্য প্রথমে দাদারই পড়েছিলো। পাশেই বসেছিলাম আমরা। দাদাকে বিস্ময়ের সুরে

বলতে শুনলাম, আরে, তোমার নাকছাবিটা কোথায়!

দাদা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদি নাকের বাঁ পাশে ডানহাতের আঙ্গুলটা বুলিয়েই চমকে উঠে বললেন, ওমা, তাইতো! মুখখানা তাঁর যেন কালো হয়ে গেলো মুহূর্তেকেই। ততক্ষণে চোখে চমকের ঘোর নিয়ে আমরাও উঠে দাঁড়িয়েছি।

আঁচলের একটা খুঁট ঝিনুককে বোঝাই হয়ে বৌদির বাঁ হাতের মধ্যে ধরা। বালির ওপর বসে পড়ে অন্য খুঁটটা ছড়িয়ে বিছিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকলেন। কোনো এক সময় সে খুঁটটা নাকি বাতাসে তাঁর মুখের ওপর এসে পড়েছিলো। আঁকড়িটাও বুঝি ছোট ছিলো একটু, যদি আলগা হয়ে গিয়ে আঁচলের সে অংশটুকুতে জড়িয়ে উঠে এসে লেগে থাকে তাই এই খোঁজা। কিন্তু না, মিললো না কোনো হদিস তার।

বৌদির মুখের আলোটা দপ করে নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মুখগুলোও অন্ধকার হয়ে উঠেছিলো। ততক্ষণে বালিয়াড়ির ওপরের ঝিনুক কি কাঁকড়া কিছুই আর তেমন ভালভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাছাড়া, নাকছাবির মতো অতোটুকু একটা জিনিস স্বর্গদ্বারের পাশের শ্মশানভূমির সামনের বালিয়াড়ির সমগ্র অঞ্চলটা খুঁজে বের করার মতো চিন্তাটা যেমনই অবাস্তব তেমনই হাস্যকর, তাই হয়তো আমরা সেদিক দিয়েও গেলাম না। আশিস-চিনুকে ডেকে নিয়ে স্বর্গদ্বারে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার পাশেই 'ধীর সমীর' বাড়িটার ভাড়ানেওয়া ঘর-দুখানায় ফিরে এলাম আমরা সবাই।

বিয়েতে ঠাকুমার দেওয়া উপহার—সেই হীরের নাকছাবির শোকে বৌদির মুখখানা খুব সঙ্গত কারণেই থমথমে ও ভার ভার হয়ে রইলো সর্বক্ষণ। সেই ঠাকুমা ইহলোকে আর নেই। বছর পাঁচেক হলো গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর। নাকছাবির সঙ্গে ঠাকুমাকেও এতদিন পরে যেন নতুন করে হারিয়ে বৌদি গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। বৌদিকে তাঁর কাস্কেট ও বটুয়াটা একবার খুঁজে দেখতে বললেন দাদা, মাথার বালিশের ঢাকাটাও, কিন্তু বৌদির দিক থেকে তেমন কোনো সাড়া মিললো না বলেই মনে হলো।

রাতে ছোটোদের খাওয়ার পর, যখন আমরা তিন জন— দাদা সনাতন আর আমি খেতে বসেছি, তখন পরিবেশনরতা বৌদির থমথমে মুখখানার দিকে তাকিয়েই হয়তো দাদা একসময় ঠাট্টার সুরে বলে উঠলেন,

আহা, হলুদ বনে বনে—
নাকছাবিটা হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—

আমি ও সনাতন হাসতে থাকলাম। কিন্তু বৌদির মেঘ কাটলো না, বিষাদ ঘুচলো না। শুধু দাদার প্রতি তীব্র একটি কটাক্ষ হেনে বললেন, আমার বাপের বাড়ির দেওয়া জিনিস, তোমার দুঃখ কেন হবে বলো? তোমাদের টাকায় তো আর কেনা নয়, তাহলে নিশ্চয় দুঃখ হতো! বলেই তিনি তরকারির ডেকচিটা নিয়ে সোজা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

আমি ও সনাতন বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গেই ভেবে দেখেছি, বৌদির মনে আনন্দ কি সুখ থাকা আর সত্যিই সম্ভব নয়। সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলেই আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। আগের দিনগুলোর মতো আর সমুদ্রের ধারে কেউ যাইনি বা বাইরের রোয়াকেও বসিনি। শুধু দাদাকেই যা নির্বিকার চিত্তে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে যেতে দেখলাম।

ভোর না হতেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিলো আমার। পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে, আমাদের দোরটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম বাড়ি থেকে। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধারের ফ্লুওরেসেন্ট আলো-গুলো সব তখন নিবেছে অবশ্য। হোটেলগুলোর পাশের তেরপল-ছাওয়া চায়ের দোকানে বাসীমুখেই এক কাপ চা খেয়ে সমুদ্রের ধার বরাবর হাঁটতে থাকলাম। মনটাকে আমার একটু প্রফুল্ল করা দরকার। আমি সঙ্গে এলাম, আর এমন একটা ক্ষতি হয়ে গেলো এঁদের। ছোটোখাটো হলেও, ক্ষতি তো বটে। অকারণেই

নিজেকে যেন কিছুটা দায়ী বলে মনে হতে লাগলো আমার। তাই স্বল্পক্ষণের জন্যে ওঁদের মাঝখান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলাম একটু। সপ্তা'খানেক থাকবো এখানে আমরা। তার মধ্যে আরো যে কি ঘটবে, কে জানে। ভেবে মনটা ঈষৎ শঙ্কিত হলো।

ওঁদের সঙ্গে, মানে এই সানন্দবাবুর ফ্যামিলির সঙ্গে, মনের আত্মীয়তা ছাড়া অপর কোনো সম্বন্ধ-সূত্রের সংযোগ বা বন্ধন নেই আমার। আর তা থাকার কথাও নয়। ওঁদের বর্ণ প্রথম, আমার চতুর্থ। আমার সঙ্গে এসেছে চিনু—আমার কাকার ছোটো ছেলে। বৌদির প্রায় সমবয়সী সনাতন সানন্দবাবুর নিজের ছোটো ভাই। আশিষ ও আদিত্য দাদা-বৌদির দুই সন্তান। বছর দেড়েক আগে আমি আর দাদা, অর্থাৎ সানন্দবাবু, একই স্কুলে ছিলাম। উনি প্রধান শিক্ষক, আমি একজন সহকারী শিক্ষকমাত্র। বর্তমানে সানন্দবাবু লিলুয়ার একটি প্রখ্যাতনামা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আমি আমার সেই পুরনো স্কুলেই রয়ে গেছি। এক সময়ে আমি ছিলাম সামান্য একজন ম্যাট্রিকউলেট ড্রয়িং-টীচার। এই দাদা-বৌদির চেষ্টায় সাহায্যে ও প্রেরণায় কয়েকটি পরীক্ষার সিঁড়ি অতিক্রম করে কর্মস্থলে কিছুটা মর্যাদা ও কৌলীন্যের অধিকারী হতে পেরেছি আমি। তাই এঁদের প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

কিছুদিন ধরে বৌদির শরীরটা নাকি তেমন ভালো যাচ্ছিলো না। সেই কারণে একটু হাওয়া বদলানোর জন্যে এখানে এলেন। খবর দিয়ে দাদা আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ওঁদের কিছু সাহায্যে লাগতে পারি —এই উদ্দেশ্যে।

সমুদ্রসৈকত ধরে হাঁটছিলাম। সমুদ্র তখন অন্ধকারময় দিগন্তের কোল থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তীরের দিকে ফুঁসে ফুঁসে ছুটে আসা মাতাল ঢেউগুলোর মাথায় ঝিলিক দিয়ে নাচছে, হাসছে পেঁজা তুলোর মতো সাদা ফেনার রাশ। স্বল্পান্ধকারে ঢাকা, পুবের ঝাপসা ঝাউবনের পেছনের ক্ষীণ অস্পষ্ট আলো ক্রমে ধূসর আর কালো হয়ে মাথার ওপর দিয়ে সোজা চলে গিয়ে শেষে পশ্চিমদিকের একটি জায়গায় গাঢ় অবিমিশ্র অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। রাতে বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিলো এক পশলা। ভিজে জমাট বালিয়াড়ির রঙ ল্যাভেণ্ডার ফুলের মতো ধূসর। বাতাসটাও কেমন যেন ভিজেভিজে। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের বেলাভূমিতে সরোষে, জলদগম্ভীর নিনাদে আছড়ে পড়ার, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার ও দুধের মতো সাদা ফেনার আস্তরণ বুকে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিস্তৃত হওয়ার খেলা দেখতে দেখতে কখন যে স্বর্গদ্বার অতিক্রম করে তার পাশের শ্মশানভূমির সামনাসামনি স্থানটায় এসে পৌঁছেছি, খেয়াল ছিলো না। মাসটা জ্যৈষ্ঠ। তবুও ভোরের হাওয়ায় কেমন যেন একটু শীত শীত করছিলো। তাই আর অধিক দূর না গিয়ে জলের কোল ঘেঁষে বালিয়াড়ির ওপর বসে পড়লাম একসময়। জানি, সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখার সময় এটা নয়। তার জন্যে আসতে হয় ফাল্গুন কি চৈত্রে। এখন সূর্য উত্তরদিকে অনেকটা সরে গেছে। তাই সেদিকে বিশেষ মন ছিলো না। বসে বসে দেখলাম, সামনে আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত সুনীল জলরাশি আর দু'পাশ ও পেছনের বালিয়াড়ির ওপর থেকে ধূসর রঙের ওড়নাটা কিভাবে ধীরে ধীরে সরে গেলো। নিকটের অনেক কিছুই স্পষ্ট থেকে ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। এখানে সেখানে ছোটো ছোটো কাঁকড়া গর্তের মুখের বালি সরিয়ে জড়ো করে তারই আড়ালে উঁকি মারতে থাকলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফরসা হয়ে আসা পূর্বদিকের ঝাউগাছগুলোর মাথায় আবীরের রঙ ধরলো। অনেক দূরে ঢেউয়ের মাথায় ভাসছে যে জেলে-ডিঙ্গিগুলো, সেগুলোও স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অল্প দূরে ঢেউয়ের বাধা অতিক্রম করে একখানা ডিঙ্গি জলে নামাতে জন-চারেক নুলিয়াকে কসরত করতে দেখা গেলো। এখানে সেখানে নুলিয়াদের ছেলেগুলো সমুদ্রকে প্রণামী দেওয়া পয়সার সন্ধানে জলে নেমে পড়েছে তখন। হাঁটুর ওপর থুঁতনি রেখে বালিয়াড়িতে বসে আছি। জলের এত কাছাকাছি যে এর মধ্যে

ঢেউয়ের ফেনা কয়েকবার আমার চপ্পল ছুঁয়ে গেছে। ভাবছি, এইবার কি এর পরের বার, নয়তো তার পরের বার নিশ্চয়ই আমাকে উঠতে হবে। উঠিয়ে তবে ছাড়বে। এইবার একগাদা জুঁই ফুলের মতো সাদা ফেনার রাশ ছড়িয়ে বিছিয়ে পড়ে বালির ওপর মিলিয়ে যেতেই সকালের সোণালী রোদে কি যেন একটা চকচক করে উঠলো আমার চোখের সামনে। একটা ঢেউ আসার আগেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে দু'পা নেমে গিয়ে চকচকে জিনিসটা হাতে তুলে নিয়েই চমকে উঠলাম! প্রভঞ্জনবৈরী চিরকল্লোলিত সমুদ্র যদি মুহূর্তেকের জন্যেও সহসা চিত্রার্পিতের মতো স্থির নিশ্চল ও স্তব্ধ হয়ে যেতো, তাহলেও বোধ হয় আমি এতোটা চমকিত হয়ে উঠতাম না। এ যে বৌদির গতকাল বিকেলে হারিয়ে যাওয়া সেই হীরের নাকছাবি! মুঠোয় পুরে নিয়ে উধ্বর্শ্বাসে ছুটতে যাচ্ছিলাম বাসার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কি একটা চিন্তা ঠিক তড়িৎপ্রবাহের মতোই মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে খেলে যাওয়ায় পা-দুটো আমার যেন ভারি ও অবশ হয়ে উঠলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ধপ করে বসে পড়লাম বালিয়াড়ির ওপর।

আমি ভাবতে বসেছি। বৌদির হীরের নাকছাবিটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে কল্লোলিত সমুদ্রের সামনে বসে আমি ভাবছি আর ভাবছি.........। আমি ওঁদের আপনজন নই,.........ওঁরা বিশ্বাস করবেন তো আমাকে ?.........আমার কথায় ? হারিয়ে-যাওয়া নাকছাবিটা ফিরে পাওয়ার এই অভাবনীয়, অকল্পনীয় ঘটনাটা ?.........ভাববেন না তো যে এটা আমিই সরিয়ে.........ছি, ছি, এসব কি ভাবতে বসেছি আমি! আত্মধিক্কারে সারাটা মন আমার ভরে উঠলো। বৌদির স্বর্গতা ঠাকুমার পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত নাকছাবিটা সমুদ্র সেচ্ছায় আমার হাতে তুলে দিয়েছে, বিনা আয়াসে—নেহাত দৈববশেই আমি উদ্ধার করতে পেরেছি, পরমুহূর্তেই আমি আবার ভাবছিলাম আর মনের তলায় তৃপ্তি এবং শ্লাঘার স্বাদ মাখানো এক সুখ পাচ্ছিলাম।

কতক্ষণ যে এভাবে আচ্ছন্নের মতো বসেছিলাম তা বলতে পারবো না, তবে তা যে বেশ কিছুক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। হারিয়ে-যাওয়া জিনিস যখন আমিই ফিরে পেয়েছি তখন যেভাবেই হোক তা বৌদিকে ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতেই হবে আমাকে। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, বৌদি সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার আগে, দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো যে বটুয়াটার মধ্যে ইয়ারিং নেকলেশ কঙ্কন—আরো সব কি কি যেন খুলে রাখেন, সুযোগ বুঝে সকলের অজ্ঞাতে কোনো এক সময় নাকছাবিটা তারই ভেতর রেখে দেবো আমি, আর একাজটা নিশ্চয় খুব সহজেই করতে পারবো।

নাকছাবিটা পকেটের মধ্যে ফেলে বাসায় ফিরে এলাম। এসে দেখলাম, সনাতন আশিস চিনু—সবাই এঘরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে তখনো। বৌদিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, দাদা আদিত্যকে নিয়ে তার ও চায়ের জন্যে দুধের সন্ধানে গেছেন। আমাকে স্টোভটা ধরাতে বলে বৌদি টুথব্রাশে পেস্ট নিয়ে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে প্রথমে রোয়াক, তারপর উঠোন পার হয়ে ওপাশের বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। স্টোভ বৌদির ঘরেই। উপযুক্ত সময় বুঝে নাকছাবিটা পকেট থেকে বের করে আমি অনায়াসেই বৌদির বটুয়ার মধ্যে ফেলে দিতে পারলাম।

সিংহদ্বারের কাছে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট গিয়েছিলাম বাজার করতে। বৌদির ফরমাশ মতো মাছ আলু পটল চিনি শালপাতা কেরোসিন—আরো যেন কি কি সব সাইকেল-রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে ফিরলাম। এসেই শুনলাম প্রতিদিনের মতো সেদিনও সমুদ্রে স্নান করতে যাওয়ার আগে গয়নাপত্তর খুলে বটুয়ার মধ্যে রাখতে গিয়ে বৌদি নাকছাবিটা পেয়ে গেছেন। তার ভেতরেই ছিলো সেটা। দেখলাম, খুশির জোয়ার নেমেছে সকলেরই মুখে, বৌদি প্রসন্নহাসির দীপ্তি-মাখা দুটি চোখের কোণায় আমার খুশিটাও যেন লক্ষ্য

করলেন বলে মনে হলো। স্বস্তির নিশ্বেস ছেড়ে বাঁচলাম আমি।

এবার পুরোদমে চললো আমাদের আনন্দ-হুল্লোড়। পরের দিনই রিজার্ভড কারে আমরা সবাই ঘুরে এলাম সাক্ষীগোপাল কোণারক ভুবনেশ্বর গৌরীকুণ্ড-দুধকুণ্ড উদয়গিরি-খণ্ডগিরি—এই সব। চিল্কার অন্য পথ। আরো একটি পুরো দিনের হাঙ্গামা। বৌদি বললেন, এবারে ওটা থাক, বাচ্চাদের নিয়ে এভাবে হয়রানি... পরের বারে এসে অবশ্যই যাবেন। তাই চিল্কাটা এবার হলো না। ওটা বাদই থেকে গেলো। সেদিন ফিরতে বেশ রাত হলো আমাদের।

ভোরে বেলাভূমির বাতাস দেহে-মনে মেখে, সকালে সকালে সমুদ্রস্নানের মাতামাতি নিয়ে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করে, বিকেলে সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়িতে বসে গল্প করে, সন্ধ্যের পর সাইকেল-রিকশায় পুরী টাউনটা এবং তার ভেতরের ও আশে-পাশের মঠ-মন্দিরে ভরা পুণ্যস্থানগুলো বেড়িয়ে আর হ্যাণ্ডিক্রাফট-এর দোকানগুলোয় প্রতিদিনই প্রায় কিছু না কিছু কেনাকাটা করে সমুদ্রের সফেন তরঙ্গের মতোই দিনগুলো আমাদের একটির পর একটি যেন কোথায় হারিয়ে মিলিয়ে যেতে থাকলো। এখন সবাই খুশী, সবাই তৃপ্ত। অথচ নাকছাবিটা হারিয়ে যাওয়ার পর বৌদির মনের অবস্থা দেখে আমাদের সকলেরই যেন একটা অনুচ্চারিত স্থির ধারণা হয়ে গিয়েছিলো, সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে আর দু'-এক দিনের মধ্যেই নিশ্চিত আমাদের পুরী ছেড়ে যেতে হবে। বৌদির নাকছাবি যে আমাদের আনন্দে বাধা ঘটাতে পারেনি তার জন্যে সমুদ্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম আমি, আর ধন্যবাদ জানালাম আমার বুদ্ধিমত্তাকে, যে অদ্ভুত কৌশলে নাকছাবিটা তার পূর্ণ মর্যাদার স্থানে পুনঃসংস্থাপন করতে পেরে সকল দিক রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

পুরো একটি সপ্তাহের পর পুরী-হাওড়া এক্সপ্রেস একদিন সকাল সাড়ে পাঁচটা-পৌনে ছ'টায় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিলো আমাদের। লাল-কোর্তা-পরা রেল-কুলিদের মাথায় মালপত্তর তুলে দিয়ে আর কিছু টুকিটাকি জিনিস হাতে নিয়ে আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের সামনে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম সবাই। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে দাদা গেলেন দু'খানা ট্যাকসি ধরতে। ওঁরা যাবেন টালায়, আর আমি ও চিনু মধ্যহাওড়ার একটি অঞ্চলে। মালপত্তর মাথায় কুলি-দুটো অস্থির হয়ে দাদা ও সনাতনকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে, ওয়াটার-বটল কাঁধে আশিস-চিনু তাদের সঙ্গ নিলো। সামনেই এখন ব্যস্ততার সময়। তাই সুযোগ বুঝে ডান হাতের ব্যাগটা নামিয়ে আর বাঁ হাতে আদিত্যকে বুকে চেপে রেখেই আমি বৌদির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললাম, বৌদি, সুবিধে করতে এসে হয়তো অনেক অসুবিধে করে ফেলেছি! তার জন্যে কিন্তু ক্ষমা করবেন আমাকে।

উত্তরে বৌদি ঠাট্টার সুরে টেনে টেনে বললেন, আ—হা—রে।

আমি হাসিমুখে বৌদির মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমাকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে এক সময় বৌদি নাকছাবিটায় আঙুল রেখে সহসা বলে উঠলেন, কি দেখছেন? এটা তো? এটা আছে, আর থাকবে। ভয় নেই আপনার, আর কখনো হারিয়ে গিয়ে বিব্রত করবে না আপনাকে।

আমি স্তম্ভিত।

বৌদি আমার মুখের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে তেমনিই হাসতে হাসতে বলতে থাকলেন, আচ্ছা, সেদিন অতো ভোরে উঠেই খুঁজতে ছুটেছিলেন? আপনার উইলফোরস আছে বলতে হবে। পেয়েও তো গেলেন ঠিক। এ যে ভাবা যায় না। হারানোটাও যেমন ভাবতে পারি না, তেমনি পাওয়াটাও। জানেন, এটা আমি বড়ো একটা খুলি না। লজ্জা কেন, আমি ছাড়া আর কেউ জানে না,

জানবেও না কোনদিন। বলুন, আমি ঠিক বলছি কিনা।

আমার দৃষ্টি তখন নত হয়ে বৌদির পায়ের ওপর স্থির, নিবদ্ধ।

ঠিক এই সময়েই ট্যাক্সি ঠিক করে দাদা ফিরে পড়লেন। তারপর ট্যাক্সিতে জিনিসপত্তর তোলার ও সকলকে উঠিয়ে দেওয়ার আবার একচোট হুড়োহুড়ি পড়লো।

ওহে দিব্যেন্দু, চিনুকে নিয়ে কাল কি পরশু একবার এসো আমাদের ওখানে। —কথা ক'টা চেঁচিয়ে বলতে বলতেই দাদা ট্যাক্সিতে উঠে দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক দিলেন। উত্তরে আমি যেন কি বলতে যাচ্ছিলা *কিন্তু ট্যাক্সির জানলার ফাঁক দিয়ে বৌদির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দু'হাত জোর করে কপালে ঠেকিয়ে বৌদিকে আর একবার প্রণাম জানাতে গিয়ে দেখলাম* সেই হাসিটুকু তখনো মুখে ঠিক তেমনই লেগে আছে।

ওদের ট্যাক্সি ছুটলো টালার উদ্দেশ্যে, আর আমাদেরটা মধ্যহাওড়ার একটি অঞ্চলের দিকে।

ট্যাক্সিতে বসে সারাক্ষণ শুধু একটা কথাই ভাবতে থাকলাম, আশ্চর্য, ব্যাপারটা বৌদি ধরে ফেললেন কিভাবে!

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

[সাত]

নিয়াসো থেকে ফোর্ট স্কট শহরের দূরত্ব পঁচাত্তর ইল। মালপত্রে বোঝাই গাড়ীতে চড়ে এই পথ তিক্রম করতে সাতদিন সময় লাগলো। পথচলার ময়ে দুর্ভোগও কিছু কম হ'ল না।

গন্তব্য স্থলে পৌঁছে জর্জের প্রথম কাজ হ'ল কিছু াদ্যের জোগাড় করা এবং রাত্রে ঘুমোবার জন্য একটা তরা খুঁজে বের করা। দুটোই জর্জের সামনে জটিল মস্যা হ'য়ে দেখা দিল। নিগ্রোরা আমাদের দেশের চ্ছুৎদের মতো অপাংক্তেয় মার্কিন মুল্লুকের শ্বেতাঙ্গদের াছে, নিগ্রোদের সামনে তাদের দরজা আপনা াপনিই বন্ধ হ'য়ে যায়, জর্জকে দেখেও বহু বাড়ীর রজা এমনিভাবে বন্ধ হ'য়ে গেল। সে অনেকের াছে আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কউ তাকে আশ্রয় দিল না। শুধু তাই নয়, অনেকের ুখে ফুটে উঠলো তীব্র ঘৃণা, কুকুর-বেড়ালের মতো দূর-্র ক'রে জর্জকে তাড়িয়ে দিল তারা। জর্জ কী ক'রবে ঠক ক'রতে পারছিল না। কিন্তু শক্ত মেরুদণ্ডের মানুষ ুলেই জর্জ হতাশায় ভেঙে প'ড়লো না। তা ছাড়া ভগবানে ছিল তার অবিচল নিষ্ঠা। সে স্থির ানতো ভগবান তার জন্য কোথাও না কোথাও নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন।

জর্জ পথ চলতে চলতে খবর পেলো, একজন লোকের দরকার এক বাড়ীতে, সে সেই বাড়ীর গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রলো কিন্তু তিনি বললেন "চাকর আমার চাই না। আমার একজন বেশ জোয়ান আর শক্ত সমর্থ চাকরাণী দরকার।"

"দেখুন, একজন চাকরাণী আপনার যেসব কাজ ক'রে দেবে আমিও তা ক'রতে পারবো, বোধহয় একজন চাকরাণীর চাইতে একটু ভালই পারবো। আমি রান্না ক'রতে পারি, বাসন মাজতে পারি, কাপড় কাচতে ও ইস্ত্রি ক'রতে পারি, জামা-কাপড় সেলাই ক'রতে পারি, চিকনের কাজ জানি, ঘরদোর ধুয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে পরিস্কার ক'রতে পারি, এবং প্রয়োজন হ'লে ঘর-দরজা মেরামতও ক'রতে পারি, এসব কাজ ছাড়াও, আমি মালির কাজ জানি। আপনার উদ্যানের পরিচর্যায় এবং খামার তত্বাবধানের কাজ দিলে তাও আমি খুব ভালোভাবে ক'রতে পারবো।"

গৃহকর্ত্রীর নাম মিসেস পেইন। তাঁর মুখে স্পষ্ট একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো। তিনি জর্জকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে রীতিমত ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললেন। জর্জ বুঝলো এই পরীক্ষায় পাশ ক'রতে না পারলে এখানে তার চাকরি হবার সম্ভাবনা নেই। শেষ পর্যন্ত মিসেস পেইন এই ব'লে জর্জকে বিদায় ক'রতে চাইলেন তুমি তো দুধের বাচ্চা, কাজের যে লম্বা ফিরিস্তি তুমি দিলে অতো কাজ কি আর তোমার পক্ষে করা সম্ভব হবে। না বাছা, তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে ব'লে মনে হয় না।

জর্জের মুখ বেদনায় কালো হ'ল, কাতরকণ্ঠে সে ব'ললো "আমি আপনার কাছে মিথ্যে কাজের বড়াই করিনি। সত্যিই এসব কাজ আমি পারি। আপনি না হয় একবার কাজ করিয়ে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখুন। যদি আমি না পারি আপনি আমাকে বিদায় ক'রে দেবেন।

মহিলাটি মনে ভেবেছিলেন, অন্যসব কাজ পারলেও ছেলেটা রান্না ক'রতে কিছুতেই পারবে না। আর রান্না করতে জানে না বললেই ছেলেটাকে অমনি বিদায় করে দেওয়া যাবে। তাই তিনি জর্জকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা খোকা, তুমি রান্না ক'রতে নিশ্চয়ই পারো না।

কিন্তু মহিলাকে অবাক ক'রে দিয়ে জর্জ ব'ললো, হ্যাঁ আমি খুব ভালো রান্না ক'রতে পারি।"

জর্জের চোখে মুখে আশার ক্ষীণ আলো জ্ব'লে উঠলো।

"আচ্ছা বেশ, আমি এখনই আমার স্বামীর জন্য ডিনার তৈরি ক'রতে যাচ্ছি, তিনি দুপুরে এসে খাবেন। তোমাকে একটা কথা আগে থেকেই ব'লে রাখছি বাছা, আমার স্বামী একজন উঁচুদরের ভোজনরসিক, রান্না ভালো না হ'লে তার মুখে রুচবেনা। কি, ভালো করে রান্না ক'রতে পারবে তো ?"

মিসেস পেইনের এ ধরণের প্রশ্ন শুনে জর্জ মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হ'ল, কারণ আন্টি মারিয়ার কাছে সাধারণ রান্নাই শুধু সে শিখেছে। ভোজনবিলাসীদের উপযুক্ত ভোজ্যদ্রব্য সে কখনো রাঁধেনি। কিন্তু তথাপি একটুও না দমে, বরং সাহসে ভর করে সে ব'ললো, "আপনি যদি দয়া করে এ বিষয়ে আমাকে একটু সাহায্য করেন, ভালো রান্নার পদ্ধতিটা যদি একবার দেখিয়ে দেন, আপনার কাছ থেকে শিখে নিয়ে আমি ঠিক সেইভাবে রান্না করতে পারবো। দেখবেন, আপনার নিজের তৈরী খাবার আপনার স্বামী যেমন পছন্দ করেন আমার রান্না খাবারও তিনি নিশ্চয় তেমনি পছন্দ ক'রবেন।"

"সেই ভালো", মিসেস পেইন এবার জর্জকে কাজে বহাল ক'রতে রাজি হ'লেন।

তিনি রান্নাঘরে গিয়ে রান্না শুরু ক'রলেন, আর জর্জ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে গভীর মন দিয়ে তার রান্না দেখতে লাগলো। কোন খাবারে তিনি কি মসলা দেন লক্ষ্য ক'রতে লাগলো। জর্জ তার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অদ্ভুত স্মরণশক্তির গুণে মিসেস পেইনের সব খুঁটিনাটি কাজগুলি অতি সহজে আয়ত্ত করে নিল। মাংস রাঁধার, পুডিং তৈরী করার নিয়ম সব সে শিখলো।

চাকরিতে বহাল হবার পরের দিন জর্জ ডিনারের সব খাবার নিজেই রাঁধলো। ডিনারের টেবিলে সাজানো এক একটা খাবার তুলে মুখে দেন আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন মিঃ পেইন। প্রশংসা শুনে আনন্দে ও গর্বে জর্জের মন ভরে যায়, নিজের রন্ধন-কৃতিত্ব সম্বন্ধে তার মনে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

মিঃ পেইন তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে উচ্ছ্বাসিতকণ্ঠে ব'লে ওঠেন, "ওঃ আজ তুমি যা রেঁধেছ সত্যিই অপূর্ব। প্রত্যেকটা খাবারই উপাদেয় হ'য়েছে। আজকের মতো এমন চমৎকার রান্না তুমি আর কখনোই করোনি।"

কিন্তু এর একটা খাবারও আমার তৈরী নয়। আমি রান্নাঘরে ঢুকিইনি। যা কিছু খাবার খেলে সবই জর্জ কার্ভার রান্না ক'রেছে, "মিসেস পেইন হেসে উত্তর দিলেন।

এমনিভাবে জর্জ কার্ভার পেইন-পরিবারের একাধারে পাচক এবং সহকারীর পদে নিযুক্ত হ'ল। দু'তিন সপ্তাহ যেতে না যেতে জর্জ এমন একজন পাকা রাঁধুনী হয়ে দাঁড়ালো যে, খোদ মিসেস পেইনকেও এখন অনেক বিষয়ে জর্জের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। ফোর্ট স্কট শহরে অনুষ্ঠিত রুটি তৈরীর প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে জর্জ কার্ভার প্রথম স্থান অধিকার করে যখন শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর সম্মান লাভ ক'রলো এবং সেরা পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরলো সেদিন মিসেস পেইনের মতো সুখী ও আনন্দিত আর কেউ হয়নি।

রান্নাবান্না ও ঘরের আর সব কাজ শেষ করে জর্জের হাতে প্রচুর সময় উদ্বৃত্ত থাকে, এই সময়টা সে কিভাবে ব্যয় করে এ তার কাছে একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো। বইপত্রও কিছু সঙ্গে নেই যে, পড়াশুনা করে সময় কাটাবে। কী করবে সারাটা দিন ভেবে পায় না জর্জ। একদিন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সে গিয়ে মিসেস পেইনের কাছে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি জর্জের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন, বিশেষ-

ভাবে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পড়াশুনার দিকে জর্জের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। কাজেই জর্জকে স্কুলে ভর্তি হবার অনুমতি দিতে তিনি দ্বিধা করলেন না। মিসেস পেইনের কাছ থেকে শুধু অনুমতি নয় সহানুভূতিপূর্ণ যে ব্যবহার পেলো তাইতে স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করার আগ্রহ জর্জের শতগুণ বেড়ে গেল। পরদিন সে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হল।

প্রথম ভর্তি হবার দিন থেকে জর্জ কার্ভার নিয়মিত-ভাবে প্রত্যহ স্কুলে যেতে আরম্ভ ক'রলো এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে পেইন-পরিবারের কাছে সে প্রমাণ দিয়ে দেখালো, সে সব কাজেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার ক্ষমতা রাখে। রান্নায় সে যেমন ওস্তাদ তেমনি পড়া-শুনাতেও তার স্থান সবার উপরে। ক্লাসের কোন ছেলে তাকে পড়াশুনায় হারাতে পারে না। জর্জ যে কাজে যখন হাত লাগায় সেই কাজেই সে তার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রেখে দেয় এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল তার চরিত্রের এই যে কোনো কাজই তাকে একবারের বেশী দু'বার দেখিয়ে দিতে হয় না।

শিক্ষিকা একদিন ক্লাসে পড়াবার সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ওজার্ক পাহাড় সম্বন্ধে দু'একটা কথা ব'ললেন অমনি মুহূর্তের মধ্যে জর্জ কার্ভারের বাড়ীর কথা মনে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এক অব্যক্ত বেদনায় মনটা তার ভারী হয়ে উঠলো, চোখের পাতা ভিজে গেল। জর্জ খাতা পেন্সিল নিয়ে আপনমনে ছবি আঁকতে বসে গেল। ক্লাশের পড়ার দিকে আর তার মন রইলো না, মন তার ভেসে চলে গেল কতো শহর-গ্রাম-মাঠ পেরিয়ে সেই ওজার্ক পাহাড়ের কোলে ছায়াঢাকা একটি পল্লীর এক গৃহকোণে যেখানে র'য়েছেন আঙ্কেল মোজেস কার্ভার এবং আন্টি সুসান। জর্জ ছবির পর ছবি এঁকে যেতে লাগলো খাতার পাতায় তার পিছনে ফেলে-আসা মিসৌরির ডায়মণ্ড গ্রোভের মধুর দিনগুলির কথা স্মরণ করে।

হঠাৎ শিক্ষয়িত্রীর ডাক শুনতে পেয়ে জর্জ কার্ভারের স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেল : "জর্জ কার্ভার!"

"আজ্ঞে।"

"আমার কথা কি তুমি মন দিয়ে শুনছো না?"

"না মাদাম," জর্জের মুখ দিয়ে সত্য কথাটাই বেরিয়ে এলো। তার দুর্দশা দেখে তার সহপাঠীরা কেউ একটুও দুঃখিত তো হ'লই না, বরং অনেকেই উল্লাসে হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

শিক্ষয়িত্রীও একটু রাগান্বিত হয়েই যেন জর্জকে ব'ললেন, "তোমার খাতা নিয়ে আমার কাছে এসো তো, দেখি কী ক'রছো তুমি!"

ভয়ে আর লজ্জায় জর্জের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করলো। সে এক পা দু-পা ক'রে ধীরে ধীরে শিক্ষয়িত্রীর টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

শিক্ষয়িত্রী প্রথমে বেশ কিছুটা অবহেলার ভঙ্গীতেই জর্জের হাত থেকে খাতাখানা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু খাতার দু-একটা পৃষ্ঠা ওল্টাবার পরেই তার মুখের ভাব অন্যরকম হ'ল। অবজ্ঞার বদলে ফুটে উঠলো গভীর বিস্ময়। নতুন একটা কিছু আবিষ্কার ক'রেছেন যেন তিনি, একটা নতুন জগৎ, এক নতুন বিস্ময়কর প্রতিভা; মুহূর্তের মধ্যে শিক্ষয়িত্রীর যেন বড় রকমের একটা ভাবান্তর ঘটলো। কষ্টে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে তিনি ব'ললেন, "মনে হচ্ছে যেন একটা পাহাড় আর সেই পাহাড়ের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি গ্রাম, গ্রামের শান্ত পরিবেশে গ'ড়ে ওঠা পল্লীজীবনের ছবি! কেমন, তাই কিনা?"

"হ্যাঁ, তাই বটে!" জর্জের গলার স্বর তখনো ভয়ে কাঁপছিলো। সে নিশ্চিত জানতো, তার অদৃষ্টে বেত্রাঘাত কিংবা তিরস্কার—একটা না একটা অবশ্যই জুটবে। কিন্তু তার কোনটাই তাকে শিক্ষয়িত্রীর কাছ থেকে পেতে হল না দেখে জর্জ যারপরনাই অবাক হল। শিক্ষয়িত্রী বরং তার সঙ্গে বেশ সহৃদয় ও সুমিষ্ট ব্যবহার করলেন। এটা জর্জের অপ্রত্যাশিত। তিনি তাকে কাছে ডেকে বসিয়ে এবং আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমার মধ্যে সত্যিকারের শিল্পপ্রতিভা রয়েছে জর্জ কার্ভার। তুমি যদি সে বিষয়ে যত্নবান

হও, অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করো ভবিষ্যতে তুমি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হতে পারবে। তোমার ছবি আঁকা শেখা উচিত।

সহপাঠিরা বিমূঢ়ের মতো চেয়েছিলো জর্জে'র দিকে, তাদের মুখ থেকে অবজ্ঞার ভাব তিরোহিত হ'য়েছে, তাদের উল্লাস আর চীৎকার থেমে গিয়েছে। শিক্ষয়িত্রী মিস ফস্টার জর্জে'র আঁকা ছবিখানি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্লাসের সব ছাত্রকে দেখালেন। বললেন, দেখ তোমরা, তোমাদের সহপাঠী জর্জ কার্ভার কি সুন্দর একখানা ছবি এঁকেছে। ছাত্ররা সবাই একবার করে জর্জে'র দিকে তাকায়, আবার পরক্ষণেই তার আঁকা ছবিখানির দিকে চেয়ে দেখে, তাদের দৃষ্টি থেকে ঝ'রে প'ড়ছে আনন্দ ও গর্বে মেশানো উচ্ছল প্রশংসা।

জর্জে'র একজন সহপাঠী ছাত্র তার মনের আবেগ কিছুতেই চেপে রাখতে না পেরে হঠাৎ চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, "আমাদের জর্জ কার্ভার একজন প্রকৃত শিল্পী।"

শিক্ষয়িত্রী মিস ফস্টারও মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত," এবং জর্জ কার্ভারের দিকে চেয়ে বললেন, "আমি মিস ব্লেকের সঙ্গে তোমার শিল্প-প্রতিভা সম্পর্কে কথা বলে দেখবো তিনি তাঁর শিল্প বিদ্যালয়ে তোমাকে ভর্তি করে নিতে পারেন কিনা।"

মিস ব্লেকও কান্সাস নিগ্রো স্কুলের একজন শিক্ষিকা। তিনি মিস ফষ্টারের মুখ থেকে জর্জ কার্ভারের শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কে সব কথা শুনলেন এবং নিজের শিল্প বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তি করে নিতে আনন্দে রাজি হলেন।

জর্জ কার্ভার শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্তি হ'য়ে প্রথম কিছুদিন পেন্সিল ও রবার দিয়ে ছবি আঁকা অভ্যাস ক'রলো। তারপর যখন তার রঙ ও তুলির সাহায্যে রঙীন ছবি আঁকবার সময় এলো তখন জর্জ একটা সমস্যায় প'ড়লো। রঙ—তুলি পয়সা না হ'লে জোগাড় করা সম্ভব নয়, কিন্তু রঙ এবং তুলি কিনবার পয়সা সে পাবে কোথায়? তার প্রতিভা আছে, কিন্তু পয়সা নেই। দারিদ্র্যের অভিশাপে তার সব গুণ নষ্ট হ'তে বসলো কিন্তু জর্জ কার্ভার সহজে দমবার ছেলে নয় এবং তার শিল্পপ্রতিভাই সমস্যা সমাধানের উপায় বের ক'রতে তাকে সহায়তা ক'রলো। কান্সাসের বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে নানা স্থানের জলাভূমি ও জলাশয় থেকে সে লাল, নীল ও হলুদ রঙের কাদামাটি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসে ছবি আঁকবার উপযুক্ত চমৎকার রঙ তৈরি ক'রলো। কুল ও আমলকি প্রভৃতি টকজাতীয় কয়েকরকম ফল এবং কয়েকরকম গাছ গাছড়াও শাকসব্জি থেকেও সে আরো অনেকগুলি রঙ বানিয়ে নিল। জর্জের শিল্পপ্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী একাধারে দুটো জিনিষই ছিল। শিশু বয়স থেকেই তার জানার আগ্রহ অপরিসীম, যা কিছু সে দেখেছে বা শুনেছে সবকিছুই তার মনের এই জানার আগ্রহকে উদ্দীপিত ও সঞ্চালিত করেছে। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত মন নিয়ে সে এই জগৎটাকে বুঝতে চেয়েছে। গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে সে জগতের নানান রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে ব্যগ্র হ'য়েছে। সে জানতো, সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষকে অগ্রসর হ'তে হয়, বহু দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রতে হয়। এসবের জন্য জর্জ নিজেকে ক্রমান্বয়ে তৈরি করে নিচ্ছে। তার জীবনে সবচেয়ে গৌরবের মুহূর্ত দেখা দিল সেইদিন যেদিন মিস ব্লেক তার আঁকা ছবিগুলি নিয়ে একটি শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রলেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্ররা সবাই তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন অভাবিত একটা কারণে জর্জ কার্ভারকে শুধু মিস ব্লেকের শিল্পবিদ্যালয়ই নয়, ফোর্ট স্কট শহরই পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র চ'লে যেতে হ'ল। কারণটা হ'ল এই, একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে জর্জ কার্ভার ডাক্তারখানার দিকে যাচ্ছিল, যেতে যেতে পথে এক বীভৎস নারকীয় দৃশ্য দেখে ভয়ে তার মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেল, তার সমস্ত শরীর থর থর কাঁপতে লাগলো।

ফোর্ট স্কট শহরের জেলখানার সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জর্জ দেখলো, বর্বর শ্বেতাঙ্গরা দল

বেঁধে একজন নিগ্রো কয়েদীকে জেলের ভিতর থেকে টেনে হিচঁড়ে বাইরে বের ক'রে এনে নির্দয়ভাবে প্রহার ক'রছে, গরু ঘোড়াকেও মানুষ অমন নিষ্ঠুরের মতো মারে না। কিন্তু শুধু প্রহার ক'রেই বর্বর লোকগুলি ক্ষান্ত হ'ল না, জেলখানার সামনে যে পার্ক ছিল সেই পার্কের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল নিগ্রো কয়েদীকে, তারপর অনেক কাঠ সংগ্রহ ক'রে বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড জেলে তার মধ্যে হতভাগ্য নিগ্রোকে ফেলে দিল জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার উদ্দেশ্যে। নাটকের শেষ অঙ্ক দেখার জন্য জর্জ আর সেখানে দাঁড়াতে পারলো না। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ফোর্ট স্কট শহরে বাস করার বাসনা জর্জের চিরদিনের মতো লুপ্ত হ'ল। সে হতভাগ্য নিগ্রো কয়েদীর অদৃষ্টে শেষপর্যন্ত কী ঘটেছিল তা জর্জ কার্ভার আর কোনদিনই জানতে পারেনি।

মিসেস পাইনের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে জর্জ তার নিজের ঘর থেকে তার যা সামান্য জিনিষপত্র ছিল তাই গুছিয়ে নিয়ে সকলের অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি করে আবার রাস্তায় নেমে এলো। সে আর কোনোদিকে কোন কিছুর প্রতি তাকালো না। শুরু হ'ল আবার তার পথচলা। দ্রুত পদক্ষেপে সে সামনের দিকে এগিয়ে চ'ললো, যত তড়াতাড়ি শহরের বাইরে গিয়ে পোঁছোতে পারে। পরিচিত কোন লোকজনের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় সেজন্য সে মানুষ গাড়ীঘোড়ার ভিড় এড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটতে লাগলো।

আবার নতুন করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বের হ'য়েছে জর্জ কার্ভার। এবারও তার সঙ্গীসাথী কেউ নেই। সে একা, যাযাবর পথিকের জীবন তার। কিন্তু তথাপি হৃদয়ের কোণে তার কোনোখানে হয়তো ছিল কারুর স্নেহের প্রেমের উষ্ণ স্পর্শ লাভ করার আকাঙ্খা, তারই জন্য তার সারা অন্তর তৃষ্ণায় অধীর, হাহাকারে পরিপূর্ণ। সে আলোর ভিখারী, এই সহৃদয়তা এই আলো পাবার আশায় আকুল হ'য়ে সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেরিয়েছে কতগুলি বছর ধ'রে—কানসাস থেকে ওলাথ এবং মিনিপোলিস পর্যন্ত। তার এই ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনে বহু বিচিত্র এবং বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে বার বার তাকে প'ড়তে হ'য়েছে। কখনো বিপদ দেখা দিয়েছে ভয়ঙ্কর মুখব্যাদান ক'রে, তাকে গ্রাস ক'রে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু বিপদে জর্জ কার্ভার ভয় না পেয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছে তার সামনে, জয় করেছে তাকে। শ্বেতাঙ্গরা কতবার তাকে অন্যায়ভাবে অপমান ক'রেছে, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ক'রেছে, অন্তরে সে তাতে গভীর দুঃখ পেয়েছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কখনো বিদ্বেষভাব পোষণ করেনি, তাদের জন্য মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে সে ব'লেছে "ওরা নির্বোধ, তাই ওরা বুঝতে পারছে না যে, কী অন্যায় ওরা ক'রছে। ওদের তুমি ক্ষমা করো প্রভু।"

এইসব দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং অপমান সহ্য করার মূলে জর্জ কার্ভারকে শক্তি জুগিয়েছে তার মহৎ জীবনাদর্শ ও মহৎ জীবনে অধিকার অর্জন করার দুরন্ত হৃদয়াবেগ। তাই জীবনে কখনো সে কোন কাজকেই হীন বা অসম্মানজনক ব'লে মনে করেনি, সব রকম বৃত্তি সে তার জীবনে অবলম্বন ক'রেছে—মুচি, মেথর মুদ্দোফরাস, ছুতোর মিস্ত্রী, ধোপা, বাবুর্চি সব সে হয়ে দেখেছে। জর্জ কার্ভার তার জীবনের মণিকোঠায় সব কাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে রেখেছে। তাই প্রতিকূল অবস্থা যত ভয়ঙ্কর মূর্তিতেই দেখা দিক না কেন সে এতটুকু ঘাবড়ায় না, বিপদের ঝড় যখন আসে দুর্বার সাহসের সঙ্গে সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন ফুটে ওঠে তার চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা তার আশ্চর্য ব্যক্তিসত্বা ও অদ্ভুত মানসিক বল।

জর্জ কার্ভার জীবন-পথের সাহসী পথিক।

আট

উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পরেই জর্জের চেহারায় বড় রকমের একটা পরিবর্তন দেখা গেল।

ব জর্জ কার্ভার ছিল রোগা হ্যাংলা চেহারার হঠাৎ গায় হ'ল দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন, উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট।

একদিন জর্জ খবর পেলো তার দাদা জিম ক্যান্সাসের ফোর্ট ভিলায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে মারা গিয়েছে। দাদার মৃত্যুতে জর্জ খুবই দুঃখ পেলো। আপনার জন ব'লতে তার আর কেউ রইলো না এ পৃথিবীতে, তার নাড়ীর টান, রক্তের সম্পর্ক কেউ আর অনুভব ক'রবে না। এত বড় এই পৃথিবীতে জর্জ কার্ভার আজ থেকে সম্পূর্ণ একা।

জিমের মৃত্যুতে জর্জ দারুণ আঘাত পেলো মনে, তার পারিবারিক বন্ধনের শেষ সূত্রটুকু ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসী জর্জ কার্ভার নিজেই নিজের মনের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেলো। যারা তার আত্মীয় নয়, আপনজন নয়, নিঃসম্পর্কিত পর—এখন থেকে সেইসব পর থেকে পর লোকদের স্নেহ-ভালোবাসা, তাদের দরদ ও আন্তরিক সহানুভূতি তার জীবনে অমূল্য সম্পদে পরিণত হ'ল, এখন থেকে জর্জ কার্ভার সেইসব নিঃসম্পর্কীয় পরকেই নিজের রক্তমাংসের আত্মীয়রূপে গণ্য করার জন্য মনটাকে তৈরি ক'রে নিল।

এখন জর্জের সম্পূর্ণ যাযাবর জীবন। উদ্দেশ্যহীনের মতো স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও সে স্থির হয়ে বেশীদিন থাকতে পারেনা, তার মন অধৈর্য হ'য়ে ওঠে। ভগবান তাকে ঘর বাঁধবার জন্যে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বাস ক'রবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠাননি, তা সে ভালো ক'রেই জানে। কিন্তু এই যে তার অস্থিরতা, এই যে চিত্তচাঞ্চল্য, যা তাকে কোথাও বেশী দিন স্থির হ'য়ে থাকতে দেয় না তা দূর হবে কিসে?

একদিন জর্জ কার্ভার তার অস্থির মন নিয়ে এমনি উদ্দেশ্যহীনভাবে মিনিপোলিস শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন একজন মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল। জর্জকে মহিলাটির ভালো লাগলো, তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। মহিলাটি দরদ দিয়ে জর্জের দুঃখময় জীবনের সব কাহিনী শুনলেন।

এই মহিলার বাড়ীতেই জর্জ কার্ভার আশ্রয় পেলো। শুধু আশ্রয় পেলো ব'ললে ভুল বলা হবে। জর্জ সেই মহিলাটির সন্তানের স্থান অধিকার ক'রলো। আন্টি লুসি সেমুর হ'লেন জর্জ কার্ভারের জীবনে তার চতুর্থ মা।

লুসি সেমুর পেশায় ছিলেন ধোপানী—কাপড় কাচা এবং কাপড় ইস্ত্রি করাই তাঁর কাজ। জর্জ কার্ভারও কিছুদিনের মধ্যে কাপড় কাচা এবং ইস্ত্রি করার বিদ্যাটা আন্টি সেমুরের কাছ থেকে বেশ ভালো করে শিখে নিল। এ বিষয়ে তার খ্যাতিও ছড়িয়ে প'ড়লো। লোকে বলাবলি করতে শুরু করলো জর্জ কার্ভারের মতো চমৎকার কাপড় ধোলাই ক'রতে এবং ইস্ত্রি করতে মিনিপোলিস শহরে আর কোন ধোপাই পারে না। জর্জ কার্ভার মিনিপোলিস শহরের সেরা রজক। লুসি সেমুরের জীবনে এবার খানিকটা বিশ্রাম উপভোগ করার সময় মিললো। তিনি জর্জের উপরে সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লেন।

আন্টি লুসি মাঝে মাঝে জর্জকে উৎসাহ দেবার জন্য তার প্রশংসা করে বলেন, "তোমার মতো এমন চমৎকার কাপড় কাচতে মিনিপোলিস শহরে আর যে কেউ পারে আমার তা মনে হয় না!"

কিছুদিন পরে জর্জ কার্ভার মিনিপোলিস শহরের বড় সড়কের ধারে ভালো একখানা দোকানঘর ভাড়া নিয়ে সেই দোকানঘরে নিজস্ব লণ্ড্রি খুলে বসলো। তার ব্যবসা জমে উঠতে বেশীদিন দেরি হল না। শুধু যে শহরের অধিবাসীরাই তার কাছে কাপড় কাচাতে আসে তাই নয়, শহরতলীর লোকরাও তার লণ্ড্রীতে এসে ভিড় করে। রোজ বহু চিঠি তার কাছে আসতে লাগলো দূর দূর জায়গা থেকে।

এ ছাড়াও জর্জ যে একজন অভিজ্ঞ উদ্ভিদ চিকিৎসক সে খবরটাও কেমন ক'রে যেন মিনিপোলিস শহর ছাড়িয়ে গ্রামের লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে প'ড়েছে। আশেপাশের বহু গ্রাম থেকে কৃষকরা দল বেঁধে জর্জ কার্ভারের কাছে আসতে আরম্ভ করলো, বহু কৃষক জর্জ

কার্ভারকে তাদের গ্রামে যাবার জন্য চিঠি লিখে পাঠালো, সে যেন তাদের কৃষির ফসলগুলি পরীক্ষা করে দেখে। জর্জ কার্ভার সবার সব চিঠির উত্তর দেয়, তাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ক্ষেতের ফসল, মাটির উর্বরা-শক্তি প্রভৃতি পরীক্ষা করে বেড়ায় এবং এমনিভাবে তার জনপ্রিয়তা এমন বেড়ে গেল যে, বিশ্রামের অবসর সে খুবই কম পায়।

জর্জ কার্ভারের নামে যত চিঠি আসে সব চিঠি পায় না। ঠিকানা ভুল করে পিওন তা অন্য জায়গায় বিলি করে। মিনিপোলিস শহরে জর্জ কার্ভার নামে একজন অধিবাসীও ছিল, পিওন লোক চিনতে ভুল করে জর্জের উদ্দেশে লেখা বহু চিঠি সেই শ্বেতাঙ্গের বাড়ীতে দিয়ে এসেছে। এই অসুবিধা এড়াবার জন্য জর্জ স্থির করলো তার নাম শুধু জর্জ কার্ভার রাখলে চলবে না, জর্জ এবং কার্ভার, এই শব্দদুটোর মাঝখানে আরও একটি অক্ষর বসাতে হবে।

কিন্তু কী অক্ষর বসানো যায়?

কোন অক্ষরটা বসালে ভালো হয়, জর্জ চিন্তা করতে ব'সলো। অনেক চিন্তার পর W অক্ষরটা তার মনের মতো হ'ল। কিন্তু আন্টি লুসি যখন জর্জের কাছে বিশেষ ক'রে W অক্ষর পছন্দ করার কারণ জানতে চাইলেন তখন জর্জ মনের কথাটা ব্যাখ্যা করে তাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারলো না, অসহায়ের মতো আন্টির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। জর্জকে তার এই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন আন্টি লুসি। তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন, সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়ে ব'ললেন, W অক্ষরটাকে তুমি Washington-এর আদ্যাক্ষর হিসাবে গ্রহণ করো। তোমার মতো এমন শান্তস্বভাব ও সৎ চরিত্রের লোক আমি খুব কমই দেখেছি এবং তোমাকে দেখে সর্বাগ্রে কার কথা প্রথম মনে হ'য়েছিল জানো? আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের কথা। তুমি তাঁর মতোই সৎ, উদার এবং সাহসী, তাঁর মতোই কর্তব্যনিষ্ঠ। আজ থেকে তোমার নাম দিলাম আমি জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।"

"আপনাকে কী বলে যে আমি ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাই না," জর্জ হেসে উত্তর দিল। "তবে আপনার কথাই সত্য হোক, আজ থেকে আমার নতুন নামকরণ হ'ল জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।"

সেই দিন থেকে জর্জ কার্ভার নিজে নাম স্বাক্ষর করার সময় সংক্ষেপে লিখতে আরম্ভ করলো G. W. Carver.

মিনিপোলিস বিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর যেদিন সমাবর্তন উৎসবে সনদ বিতরণ করা হ'ল সেদিনই শুধু সবাই বিস্মিত হ'ল জেনে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে সবার উপরে স্থান পেয়েছে, প্রথম হ'য়েছে। কিন্তু জর্জ কার্ভার নিজে সমাবর্তন উৎসবের সভায় যোগদান ক'রতে পারেনি, কারণ যে বিশেষ ধরণের উৎসব সাজে সজ্জিত হ'য়ে উপাধি গ্রহণের জন্য উৎসবে যোগ দিতে হয় সে পোশাক তার ছিল না। পোশাক ক্রয় ক'রার মতো পয়সাও তার ছিল না।

জর্জ কার্ভারের যাদের সঙ্গে কোন না কোন সূত্রে একবার পরিচয় হ'য়েছে তাদের সকলকেই সে তার বন্ধু বলে মনে করে এবং সেইসব বন্ধুদের দেবার উদ্দেশ্যে সে তার সমুদয় সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে নানা রকম উপহার কিনে আনে। এইভাবে তার হাত এখন একেবারে খালি। সে পরিকল্পনা করে রেখেছিল কলেজে ভর্তি হবার আগে একবার সে তার এইসব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসবে। কিন্তু কান্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য সে যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল ইতিমধ্যে তার জবাব এসে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাকে এক চিঠিতে জানিয়েছে, জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারকে যদি আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে পাই তবে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করবো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ যেদিন আরম্ভ হবার কথা জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সেইদিন দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ ডানকান ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর অফিসে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, কিন্তু তিনি তখন অতিশয় জরুরী এমন কাগজপত্র দেখার কাজে ব্যস্ত

ছিলেন যে, জর্জের তক্ষুণি তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি মিললো না। কাজেই জর্জকে অধ্যক্ষের অফিস-ঘরের বাইরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণটা জর্জের চোখে প'ড়লো, সারা প্রাঙ্গণটা ঘিরে একটা পুষ্পোদ্যান, অজস্র রকমারি ফুলে উদ্যানটা ভ'রে আছে।

আণ্টি সেম্যুরের বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে অনেকটা পথ জর্জকে হেঁটে আসতে হয়েছে। এই সুদীর্ঘ পথ সে কিভাবে পার হ'ল ভেবে সে নিজেই অবাক না হয়ে পারলো না। সেই কখন ভোরে রাত থাকতে বেরিয়েছে, পথে কোথাও একটু থামেনি বা বিশ্রাম নেয়নি। হেঁটেছে। শুধুই অবিশ্রান্তভাবে হেঁটেছে। এখন ব্যথায় তার পা দুটো টনটন করছে।

ডাঃ ব্রাউনকে কাগজপত্র থেকে মাথা তুলে বাইরের দিকে তাকাতে দেখে জর্জের মনে আশার সঞ্চার হ'ল, মুখখানা আনন্দে আশায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। আবার কিছুটা আশঙ্কাও দেখা দিল মনে, বুক ভয়ে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

জর্জ কার্ভারের সর্বাঙ্গে একবার ভালো করে দৃষ্টি বুলিয়ে ডাঃ ব্রাউন তাকে একবার দেখে নিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা ক'রলেন "আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?"

বিনীতকণ্ঠে জর্জ উত্তর দিল, "স্যার, আমার নাম জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলাম সেই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে এবং আমাকে জানানো হ'য়েছে আমি ছাত্ররূপে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হয়েছি। তাই আমার নাম ভর্তির খাতায় রেজেষ্ট্রি করার জন্য আমি এসেছি।"

"তুমিই জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার? কান্সাস থেকে আসছো?" অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ." ধীর কণ্ঠে জর্জ উত্তর দিল।

"আমি খুবই দুঃখিত যুবক, তোমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য ডেকে পাঠানো আমাদের প্রকাণ্ড ভুল হয়েছে। আমরা ভাবিনি যে, তুমি একজন নিগ্রো। আমাদের এই হাইল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নিগ্রো ছাত্রদের ভর্তি করি না। তুমি এখন যেতে পারো যুবক! "বলে ডাঃ ব্রাউন জর্জকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আদেশ দিলেন।

ডাঃ ডানকান ব্রাউনের কথাকয়টা জর্জ কার্ভারের কানের মধ্যে গলানো সিসার মতো প্রবেশ করলো, তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি স'রে যাচ্ছে মনে হল, সে স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে পারছিল না। চোখের জলে তার দুইচোখের দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে গেল। পথ দেখতে পাচ্ছিল না। অতি কষ্টে জর্জ দরজার কপাট ধরে কোন রকমে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু, এই কি তার জীবনের শেষ কথা?

এখানেই কি সে চিরদিনের মতো থেমে থাকবে? আর এগোবে না?

না।

তার চলার পথের এখানেই পরিসমাপ্তি নয়। যেমন ক'রেই হোক, আর যেভাবেই হোক, সামনের দিকে তার এগোতেই হবে। পথ খুঁজে বের ক'রতেই হবে।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার রাস্তায় নেমে প'ড়লো।

নয়

অপমানের কাঁটা জর্জের সর্বাঙ্গ বিদ্ধ ক'রতে লাগলো।

এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতার অগ্নিদাহ বুকে নিয়ে সে একা একা খানিকক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। কিন্তু ব্যর্থতায় ভেঙে প'ড়লো না বা সাহসও হারালো না। মাথা উঁচু রেখে, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দৃঢ় পদবিক্ষেপে জর্জ কার্ভার অজানা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য তৈরি হ'ল। বিপদ ঝড়ঝঞ্ঝা এবং প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রে বেঁচে থাকবার অভিজ্ঞতা সে তার জীবনে আগেও বহুবার লাভ ক'রেছে, জর্জ কার্ভারের কাছে এটা

মোটেই নতুন নয়। তাই, বিপদ ঘনিয়ে আসতে দেখলেই সে সেই বিপদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। বিপদের সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচাই জর্জ কার্ভারের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব, পরাজয় স্বীকার না করাই তার শিক্ষা। আত্মগ্লানি অনুভব করার পরে কখনো প্রয়োজন হ'তে পারে এমন কাজ সে যে করেনি এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। সেইজন্যই ডাঃ ব্রাউনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'য়েও জর্জ মনে কোন গ্লানি অনুভব করলো না। এ ছাড়াও সবচেয়ে বড় কথা, আত্মগ্লানির আগুনে যারা দগ্ধ হয়, জর্জ মনে করে তারা নিজেদের পতন নিজেরা ডেকে আনে। সেই পতন সে তার নিজের জীবনে কিছুতেই ডেকে আনবে না এই হ'ল জর্জ কার্ভারের স্থিরসঙ্কল্প।

জর্জ কার্ভার তার জীবনের প্রথম প্রত্যূষেই একটা আশ্চর্য্য জিনিষ আবিষ্কার ক'রেছিল। সে জিনিষটা হ'ল এই যে, একদিকে একটা দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলে আর এক দিকের দুটো দরজাই খুলে যায়, কে যে খুলে দেয় তা তার জানা নেই বটে, কিন্তু এ ঘটনা ঘটতে সে দেখেছে। হাইল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা তার সামনে বন্ধ হয়ে গেলও, সে নিশ্চয় জানে আর কোথাও অন্য কোন কলেজে তার স্থান হবেই। পরিচিত বন্ধুবান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে অনেকেই তার জন্য আন্তরিক দুঃখিত হ'ল, সহানুভূতি জানালো।

তখন মাঠ থেকে ফসল কেটে তোলার মরশুম শুরু হ'য়েছে। কৃষকরা দলে দলে মাঠে নেমে পড়েছে। কাজে সাহায্য করার জন্য তাদের অনেকেরই বাড়তি জনমজুর নিযুক্ত করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। জর্জ কার্ভার তেমনি একজন কৃষকের ক্ষেতে জনমজুর খাটবার চাকরি পেলো। সারাদিনভর জর্জ মাঠে ফসল তোলার কাজ করে এবং সন্ধ্যাবেলায় তার নিজের আস্তানায় ফিরে এসে সে প্রদীপ জ্বালিয়ে বই নিয়ে প'ড়তে বসে। অনেক রাত অবধি জেগে পড়াশুনা করে। জর্জের দৃঢ় বিশ্বাস, হয় আগামী বছর না হয় তার পরের বছরে সে অন্য কোথাও আর কোনো একটা কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ নিশ্চয়ই পাবে।

মাঠে ফসল কাটার কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ে একদিন জর্জ খবর পেলো, গভর্ণমেন্ট থেকে লোকদের কাছে পশ্চিম কান্সাস প্রদেশে জমি বিলি করা হ'চ্ছে। ইতিমধ্যেই যারা সেখানে গিয়ে জমি নিয়েছে এবং সেই জমিতে ঘরবাড়ী তৈরি ক'রে বাস ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে তাদের বলা হ'চ্ছে বাস্তুভিটের বাসিন্দা। জর্জ কার্ভারের মনেও ইচ্ছা জাগলো আমিও কেন চেষ্টা করি না। এরকম একখণ্ড জমি পেলে বেশ ভালোই হবে। আমার নিজের জমি হবে। ঘরবাড়ী হবে; আমি আমার ইচ্ছামতো চাষবাস ক'রে ফসল ফলাতে পারবো।

এইসব চিন্তা করে জর্জ কার্ভারও একখণ্ড জমির জন্য দরখাস্ত পাঠালো—নেস কাউন্টিতে বিলার শহরের উপকণ্ঠে ১৬০ একর জমি সে চাইলো। জমি পেতে তার বেশীদিন দেরি হল না। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জর্জ দেখলো, সারা শহরে পঁচিশ-ত্রিশখানার বেশী বাড়ী নেই; আর দোকান র'য়েছে মাত্র একখানা। লোকের বসতি খুবই কম। দোকানের মালিক হচ্ছেন ফ্র্যাংক বিলার এবং তার নাম অনুসারেই নতুন শহরটির নাম হয়েছে বিলার শহর। ক্ষুদ্র শহরটিকে ঘিরে চারদিকে মাইলের পর মাইল শুধু অনাবাদী সমতল ভূমি। সে জমিতে ফসল ফলাবার জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়ে গিয়েছে। জমি তৈরী হ'লে লোকেরা সেই জমিতে যাতে ফলফুলের বাগান কিংবা শস্যক্ষেত্র তৈরী করতে পারে একটি পরিকল্পনা অনুসারে সেইভাবে কাজ করা হ'চ্ছে।

১৮৮৬ সালের শেষ ভাগ। তখন ফসল উৎপাদনের সময় নয়। জর্জ কার্ভার বন থেকে নিজের হাতে কাঠ কেটে নিয়ে এসে, তাই দিয়ে এবং বেনে ঘাস ও লতা-পাতার সাহায্যে সুন্দর একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে ফেললো, কুঁড়েঘরের দেওয়াল ও মেঝে মাখনের মতো নরম মাটি দিয়ে লেপে দিল। ঘর তৈরীর কাজ শেষ ক'রে জর্জ কার্ভার নিকটবর্তী পশুপালন কেন্দ্রে একটি

চাকরির জোগাড় করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে প'ড়লো একদিন। চাকরি একটা যদি পায় তবে বসন্তকাল পর্যন্ত চালিয়ে যাবে এই হ'ল জর্জের মনের ইচ্ছা।

দিগন্তজোড়া বিশাল প্রান্তর, সেই প্রান্তরের মাঝখানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পশুপালন কেন্দ্রটি স্থাপিত, তার সঙ্গে আছে গোচারণ ভূমি। এই পশুপালন কেন্দ্র ও গোচারণভূমির চারদিক বেষ্টন ক'রে র'য়েছে ঘন বেনে-ঘাসের জঙ্গল। জঙ্গল এত গভীর যে, তার মধ্যে বাঘ-সিংহ লুকিয়ে থাকলেও সহজে টের পাবার উপায় নেই।

এই দিগন্তখোলা বিশাল প্রান্তরে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তুষার-ঝঞ্ঝা যখন দেখা দেয় তখন তার তাণ্ডব নৃত্যের তালে তালে মরণের ডঙ্কা বেজে ওঠে, ভয়ে অতি সাহসী মানুষের বুকও দুরু দুরু ক'রে কাঁপতে থাকে। জর্জ কার্ভার একবার নিজের বুদ্ধির দোষে অসাবধান হবার ফলে বিশাল প্রান্তরের মধ্যে ভয়ঙ্কর তুষার-ঝঞ্ঝার কবলে প'ড়ে প্রাণ হারাতে ব'সেছিল।

সেদিনকার সেই শীতের ভোরবেলার কথা জর্জে আজও স্পষ্ট মনে আছে। রৌদ্রালোকে উজ্জ্বল, সুন্দর ঝলমলে সকাল, তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে। জর্জ কার্ভারের মনিব মিঃ ষ্টিলি সার্জেন্ট দূরে একজায়গায় মালের সরবরাহ পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, যাবার আগে জর্জকে সতর্ক ক'রে দি'য়ে বলে গিয়েছিলেন, আমার হয়তো ফিরতে এক সপ্তাহ দেরী হবে, এই সময়টাতে তুমি খুব সাবধানে থেকো, বাইরে বেশী বেরিয়ো না। আর রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে দরজার পাল্লাটা ঠিকমতো বন্ধ হ'ল কিনা, ভাল করে দেখে নিয়ো। পাল্লাটা খিল দিয়ে বন্ধ ক'রতে ভুল না হয় যেন। এ দেশের হিমপ্রবাহ আর তুষার-ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর পাজি জিনিস, তারা মৃত্যুর করাল ছায়া বিস্তার করে ধেয়ে আসে, যা সামনে পায় তাই গ্রাস করে। এখন শীতকাল। এ সময়ে যে কোন মুহূর্তে তার আবির্ভাব ঘটতে পারে।

ক্রমশঃ

একাদশী

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

উনিশ শতকের মাঝামাঝি।

বীরসিংহগ্রাম। জ্যৈষ্ঠমাস। সবে ভোর হচ্ছে। সারারাত্রি গাছের পাতাটী নড়েনি। আজ ভোরেও নড়ছে না। আকাশের মুখ নিষ্ঠুর। নির্মল। নির্মেঘ। কঠিন নির্লিপ্ত নীল। কদিনের উৎকট গুমোট গরমে ভোরের পাখীগুলোও যেন তাদের ভোরের ডাকাডাকি ক্ষিদে তেষ্টায় চেষ্টার অভিযান চঞ্চলতা খাদ্য অন্বেষণ ভুলে গেছে। ছোট ডোবা পুকুরের মাঝখানগুলো ফেটে চৌচির। এক ঝিনুক জলও সেখাকে দেখা যাচ্ছে না। চারদিকের মাঠ ক্ষেত বাগান বন-জঙ্গলও যেন ধু-ধু করছে।

মাতা ভগবতী দেবী ঘরের মধ্যে কি কাজ করছিলেন। পিতা গোশালায় তৃষ্ণার্ত্ত গরুদের দেখা শোনা করছিলেন। কৃষাণদের সঙ্গে।

বিদ্যাসাগর বাড়ী এসেছিলেন। ঘরের দাওয়ায় বসে কি একটা বই দেখছিলেন।

সহসা একটা তীক্ষ্ম আর্ত্ত চিৎকার কাছের এক বাড়ী থেকে ভোরের স্তব্ধতা চিরে ভেদ করে কানে এলো সকলের। কান্নার মত? আর্ত্তনাদের মত? কারুকে আর্ত্তভাবে ডাকাডাকির মত? "ওরে, ওরে মারে! ওরে শানু। ওমা শানু মুখ খোল, হাঁ কর, এই জলটুকু মিছরীর জলটুকু খেয়ে নে মা। ওমা শানু ভোর হয়ে গেছে মা। গলা ভিজিয়ে নে-মা। —আবার আর্ত্ত ক্রন্দন। (শাশুড়ীকে) ওগো, ওমা এ-যে হাঁ করে না মা, মুখ যে শক্ত হয়ে বেঁকে গেছে, ওমা।"

চিৎকারের শব্দে দেখতে দেখতে পাড়ার কাছের বাড়ীর প্রতিবেশীরা পথচলতি লোক—বাড়ীর সব পরিজন পিতা পিতামহী কাকা-কাকী ভাই-বোন সবাই সে-বাড়ীর ঘরে প্রাঙ্গনে জড় হয়েছেন।

শান্তশীলা বা শানুর মার হাতে মিছরী ভেজানো জলের ঘটী। দু'চোখে জলের ধারা। শানুর ধুলো মাখা চুলগুলি খোলা। জলে ভিজে লুটোপুটী। মাথাটী ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। শানুর চোখ বোজা। বিবর্ণ পাঙাস মুখ। শুকনো বিবর্ণ ঠোঁট দু'খানি। গতকাল কার অসহ্য গরমে উপবাসে কচি মুখখানি কাজললতার মত সরু কালীবর্ণ হয়ে গেছে।

মা মেয়েকে নাড়া দিচ্ছেন। গলায় গালে মুখে হাত বুলিয়ে ডাকছেন। 'ওমা শানু জলটুকু খা। কাল সারারাত জল জল করেছে মা আমার। আমি দিই নি। বলেছি এই ভোর হয়ে এলো এইবার দোব। ওমা শানু চোখ চা মা। সবাই বারণ করলে দিতে। কেন দিলাম না ওমা। বললে, পাপ হবে। জনতার দিকে চেয়ে শাশুড়ী ও স্বামীর দিকে চেয়ে—ওমা, এ-যে মুখ খোলেনা মা। শাশুড়ীর সামনে যে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেন না তা মনে নেই 'ওমা এ-যে চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে মা।' ওগো একবার কবরেজ মশাইকে ডাকাও না। মেয়ে যে আবার কাঠ হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধা পিতামহী জননীর পাশে এসে বসলেন। নাতনীর মুখে ঠাণ্ডা লোলচর্ম হাতখানি বুলিয়ে দিতে লাগলেন। শানুর মুখ প্রশান্ত আর কঠিন। মুখে কালকের কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই। পিতা কাকে কবিরাজ ডাকতে পাঠালেন। সমবেত কারা চুপি চুপি বললে, 'গা গরম আছে তো? জ্ঞান আছে তো?......বেঁচে আছে তো।' কে একজন মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে বললে, 'জিভ উল্টে গেছে যে গো'।

বিহ্বল জননী কেঁদে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওগো না গো। বেঁচে আছে মা আমার। এই জলটুকু

খেলেই কথা বলতে পারবে। ওমা শানু। ওঠ মা। চেয়ে দেখ মা জল এনেছি।'

ভগবতী দেবী পাশে এসে বসেছিলেন। তাঁকে বললেন, 'ও খুড়িমা একবারটী তুমি ডাক না মা। ও-যে তোমাকে খুব ভালো বাসে মা।' বললেন, 'কাল বিকালেও হু'ফোঁটা গঙ্গাজল চেয়ে ছিল। 'বলেছিলো মা একটু গঙ্গাজল দেবে? গলাটা ভিজিয়ে নি।' গলা ফেটে যাচ্ছে। চিরে যাচ্ছে মা, দোষ হবে?

তিনি শাশুড়ীর কাছে একটু গঙ্গাজল চেয়েছিলেন। শাশুড়ী দ্বিধাভরে ঠাকুর ঘরের কমণ্ডলু থেকে একটু জল দিতে এলেন।

হঠাৎ স্বামী এসে পড়লেন। গঙ্গাজল কি হবে? শানিকে দিচ্ছ। মহা পাতক হবে যে, জানো না? সাত জন্ম ধরে তোমার বৈধব্য হবে। মহা পাপ হবে। একবিন্দু জল বিধবার মুখে দেওয়া জন্ম জন্মান্তরেও দুর্ভাগ্য নিজের বৈধব্য ডেকে আনা। ওর গলায় বুকে গামছা ভিজিয়ে ভিজিয়ে দাও না। তাতেও ঠাণ্ডা হবে। একাদশীতে জল দিয়ে আমার মরণ ডেকে এনো না।

পুত্রের অকল্যাণভীত শাশুড়ী গঙ্গাজল সরিয়ে রাখলেন। আর দিলেন না। সংস্কারমূঢ় বৈধব্যভীত তিরস্কৃত জননী ভিজে গামছা দিয়ে কন্যার গা বুক গলা ভিজিয়ে দিতে লাগলেন। বিহ্বল চোখে মেয়ে চুপি-চুপি জননীকে বললে 'আঃ গামছাটা বেশ ঠাণ্ডা। একটু ভিজে গামছা জিবের মধ্যে দিয়ে দেবে? জিবটা বড্ড শুকিয়ে যাচ্ছে মা। একটু ভিজিয়ে নি।'

জননীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। যদি মুখে জল চলে যায়। গামছা নিংড়ে ঢোক গিলে ফেলে। তাঁর পাপ হবে। হ্যাঁ, মহাপাপ হবে। স্বামী বলে গেলেন। বিকাল গেছে, সন্ধ্যা রাত গেছে। তারপর সে কখন গভীর রাত্রে শুকনো কাঠ গলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। একাদশী উপবাসিনী মেয়ের প্রায় উপবাসিনী ব্যাকুল বিভ্রান্ত জননী উপবাসিনী পিতামহী সারারাত্রি জানলার দিকে প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে থেকেছেন। কখন ভোর হবে। ভোর হবার আগেই আম কেটে ফল ছাড়িয়ে চিনি মিছরী ভিজিয়ে গুছিয়েছেন। দশবছরের বালিকার বৈধব্যের পারণ ব্যবস্থা দ্বাদশীর দিনে। সে আম খেতে চেয়ে ছিল কবে একদিন। মনে ছিল মার।

ভোর হয়ে গেছে তারপর। কিন্তু রাত্রি দুটার পর সেই সে যে নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল আর জাগেনি। জল চায়নি। পাশ ফেরেনি। জননী তার গায়ে মুখে গলায় সিক্ত বস্ত্র গামছা জড়িয়ে দিয়ে নিজেও ঘুমিয়েছেন।

তারপর? ভোর হয়েছে, সকাল হয়েছে। শানুকে আর জাগানো গেল না, থাচ্ছে না। টাকরা জিভে লেগে আড়ষ্ট হয়ে গেছে মেয়ের মুখ। কি হল? কি করে কি হয়েছে—কেন এমন হ'ল—কখন এমন হয়েছে কেউ জানেন না।

উপবাস অভিজ্ঞ—পাড়ার বর্ষীয়সী গৃহিণীরা অনেক উপদেশ দিতে লাগলেন। নানা কণ্ঠে নানারকম আশ্বাস আর ভয়ের কাহিনীও শোনা যেতে লাগল।

ক্রমে এ-বারে কবিরাজও এসে পড়লেন। শানুর গলায় ফোঁটা ফোঁটা মিছরীর জল দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু গলা দিয়ে তা নামলনা একবিন্দুও। জিভ্ আড়ষ্ট, চোয়াল কঠিন হয়ে আছে।

বিজ্ঞ কবিরাজ বললেন, জোর করে জল দিলে শ্বাস নালীতে জল গিয়ে বিষম খেলে বিপদ হবে।

বিপদ? শোকে বিহ্বল লজ্জাহীন জননী ভগবতী দেবীকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে কেঁদে বললেন, 'আর বিপদ, কি হবে খুড়িমা! ওকি আর আছে? আর উঠবে কি। ওমা শানু।

• • • •

কতবেলায় ভগবতী দেবী বাড়ী ফিরে এলেন।

পতি ও পুত্র দাওয়ায় বসেছিলেন।

দু'জনেই পতি ও পুত্র জিজ্ঞাসা করলেন 'কার অসুখ? কি হয়েছে? সামলেছে?

ভগবতী দেবী শুষ্ক কণ্ঠে বললেন 'না, অসুখ নয়। শানিকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

পুত্র জিজ্ঞাসা করলেন 'শানি ? কি হয়েছে শানুর ?' পাড়ার মেয়েটি না।

জননী ভগবতী দেবীর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো বললেন, 'কাল শানুর একাদশী গেছে। এখনো অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছে, মুখ খোলেনি।'

স্তম্ভিত পিতা ও পুত্র বললেন, 'শানুর একাদশী ? শানি একাদশী করেছে ? ওঃ এই গরম! কালকের এই গরম। ওই কাঁচ মেয়েটাকে একাদশী করিয়েছে।'

ভগবতী দেবীর চোখ থেকে আরো কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো। করিয়েছে। শ্বশুর বাড়ীর এখানের সবাই বলেছে, তাতো করতে হবেই! কাল অর্দ্ধেক রাত অবধি জল জল করেছে। মা, ঠাকুমা ভোরের আশায় সব আকাশের দিকে চেয়ে বসে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে জিভ্ চোয়াল কাঠ হয়ে গেছে। সকালে কবরেজ এসেছে কিছু করতে পারেনি এখনো।'

মাতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরেরও চোখে জল ভরে গেল। কুলীন ঘরের বুড়ো বরে বছর দেড় আগে শানুর বিয়ে হয়েছিল আট বছরে! এই মাস দুই হল বিধবা হয়েছে। পাড়ার মেয়েটা! সবাই চেনেন।

নোলক পরা মল পায়ে ডুরে কাপড় পরা হাসিভরা মুখ একটীর কুমারী মেয়ের আকৃতি তাঁদের চোখে ভেসে এলো।

জননী বললেন, 'বছরে একদিন শিবরাত্রি জন্মাষ্টমীর ব্রত নয়। ন'মাস ছ'মাসের উপস ব্রত নয়। মাসে দুটো নির্জলা একাদশী। কি করে ওই সব কাঁচ মেয়েগুলো করবে। একি সত্যি শাস্ত্রের বিধান ?

পিতা বললেন, না-না, এ-বিধান শাস্ত্রের নয়।

পুত্র বিদ্যাসাগরও বললেন হ্যাঁ মা এ-বিধান শাস্ত্রের হতে পারে না। এ-লোকাচার, দেশাচার।

তখনো সকাল। বেলা হয় নি। কিন্তু মাঠে মাঠে আকাশে আকাশে বাড়ীর উঠানে আঙিনায় আগুনের মত উগ্র গরম বাতাসহীন রোদ ছড়িয়ে পড়ছে! বেলা তখনি যেন দুপুর মনে হচ্ছে।

তিনজনেরই মনে যেন একই কথা। কাল শানুর একাদশী গেছে। আর দু'বছর আগের কুমারী মেয়ে শানুর ডুরে শাড়ী পরা বালিকা মূর্ত্তি।—

সঙ্গে সঙ্গে এবার তিন জনের চোখের সামনে ভেসে এলো গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে কত 'শানু' কত মেয়ে হাজার হাজার উপবাস ক্লিষ্ট তৃষ্ণার্ত্ত বিশুষ্ক মৃদুমুখ শিশু বালিকা বিধবা—অসংখ্য মূঢ় অশক্ত স্থবির বৃদ্ধা নারীর মুখ। নানা বয়সের নারীর বিশুষ্ক মূর্ত্তি।

ভগবতী দেবী,'তা তোরা শাস্ত্র বিচার করে সমাজকে ভুলটা বুঝিয়ে দেনা বাবা।'

পিতা সচকিত হয়ে বললেন, 'ঠিক কথা। ঈশ্বর তুমি বিচার কর না।'

(তারপর বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। বিদ্যা মমতা করুণায় মানবতার মহাসাগর। শুধু একটীই যাঁর নাম বিদ্যাসাগর। কালাতীত প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর স্মরণে)

স্মৃতিজোয়ারে উজান বেয়ে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(এক)

অতীতে যা ঘটেছে তার ছাপ একটা থাকেই থাকে। মনস্তত্ত্ববিদেরাও এ-বিষয়ে একমত যে, মানুষ কিছুই ভোলে না—চেতনমন যাকে ধরতে পারে না পুঁজি হয় অবচেতনে। কিন্তু কালের স্থূলহস্তাবলেপ অনেক দাগ মুছে দেয়—যার ফলে ছাপটা থাকলেও নানা রেখা ঝাপসা হ'য়ে আসেই আসে। আসুক না। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন—সেই সব সুন্দর স্মৃতিই আমাদের বিকশমান ব্যক্তিরূপকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় যাদের অবদান আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, শ্রীমন্ত করে। আমি এই জাতের স্মৃতিরই বেসাতি করতে চাই। দিনের পর দিন তারা শনৈঃ শনৈঃ আবছা হয়ে আসে? বেশ তো। রবীন্দ্রনাথ আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—চলা মানেই ভোলা—চলি ব'লেই ভুলি আর ভুলি ব'লেই চলি। আমার স্মৃতিমন্দিরে সেই সব ঘটনার (বা অঘটনের) নথিপত্রই মজুদ থাকুক যারা আমাকে অতীতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে এগিয়ে চলার প্রেরণা দিয়েছে। বাউল বলেন: এই সব নথিপত্র দলিল দস্তাবেজ কালাতিপাতে মরেও মরে না, ঝ'রেও ঝরে না।

বাউল আমাদের মন টানে আর একটি কারণে: আমাদের জীবনকে সে রওনা করিয়ে দিতে চায় "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথে"—সেইসব আসক্তি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যারা আমাদের মনকে বাঁধে ভ্রান্তির নাগপাশে। তাই মহাকবি গেটে বলতেন: "You must do without—you must do without" বিখ্যাত কবি এ-ই-ও শেষ জীবনে এই কথাই বলতেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গানে আস্থায়ীর মতন: "বোঝা হালকা করো, বোঝা হালকা করো।" শেষ জীবনে তিনি গৃহ স্বজন জন্মভূমিও ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন "বৈরাগীর একতারা" হাতে। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় নিয়তি আমাকে প্রতিপদেই এ পরম পরিণতিরই দিকে ঠেলে এসেছেন—ছাড়িয়ে নিয়েছেন সব কিছু থেকে যা আমি আদৌ ছাড়তে চাই নি। তাই মধ্য যৌবন থেকে আমার জীবন কেটেছে প্রবাসেই বলব। বাংলাদেশের জন্যে আজো প্রাণ কাঁদে। মুজিবর রহমানের "বাংলাদেশ" ধুয়া সংবাদপত্রে পড়বামাত্র বুকের তারে বেজে ওঠে "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।" কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে? সেই দেশ থেকেই আমাকে দূরে দূরে কাটাতে হ'ল। যোগসূত্র বজায় রাখতে যেয়ে বছর বছর ছুটে যাই। কিন্তু নিয়তি যে চান না আমি বাংদেশের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ি। তাই ফের ফিরে আ[illegible] জীবনে—পণ্ডিচেরিতে, পুনাতে।

আজ মনে হয় নিয়তি অকারণ ঘটান নি এ-অঘটন। বাংলা দেশকে বেশি কাছে থেকে দেখলে হয়ত আমি অশান্ত হয়ে উঠতাম, হয়ত ভুলে যেতাম (কে বলতে পারে) যে জননী জন্মভূমির চেয়েও গরীয়সী জগন্মাতা—the mother of mothers, বন্ধুর চেয়েও প্রিয় গুরু, বান্ধবীর চেয়েও আদরণীয়া শিষ্যা যে নিজেকে গড়ে তুলতে চায় গুরুর আদর্শে। কিন্তু এ-উদাসী সুরে আলাপ বেশিক্ষণ করলে স্মৃতিকথার পর্বে পৌঁছতে শুধু যে দেরী হয়ে যাবে তাই নয়—পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি হবারও সম্ভাবনা। হ'লে তাঁদের দোষ দেওয়াও চলবে না, কারণ নৌকা

নেতিই ঠাকুরের শেষ বাণী নয়, ইতি ইতিই হ'ল প্রজ্ঞার চরম এজাহার :

নয় এ-জীবন মায়াকানন, আনন্দ নয় ভ্রান্তি,
তুমি আছ, তাই ব্যথায়ো বিছায় গভীর শান্তি।
অশ্রুমেঘও তোমায় চিনি'
হয় ঝলকে সৌদামিনী,
তোমার উষায় নিশার বুকেই জাগে সোনার কান্তি।
বাধাই জয়ের দেয় ভরসা, দুঃখে নামে শান্তি।

এই আনন্দবাণীকে (উপনিষদের ভাষায়, "আনন্দী" হওয়ার প্রতিশ্রুতিকেই) শ্রীঅরবিন্দ জীবন বিধাতার "Everlasting Yes"* ব'লে বর্ণনা করবেন। বৈরাগ্য যখন আমাদের আসক্তির বন্ধণ থেকে টেনে তোলে তখন সে হয় গীতার ভাষায় "সমুদ্ধর্তা" "মৃত্যু সংসারসাগর থেকে কামনা বাসনা লোভ—এরাই তো আমাদের ঘুরিয়ে মারে চোখবাঁধা বলদের ম'ত। যেমনি পাই নিষ্কামনার আলো মন গান গেয়ে ওঠে :

"অনিন্দ্যসুন্দর! অন্তর চায় তোমাকে কান্ত!"
এই গান যার গায় প্রাণ—হয় তোমার পথের পান্থ।
দাও মন্ত্র এই সাধনার—
ভক্তি-সরল আরাধনার,
"আমার আমার" ক'রেই ঘুরে মরে পথভ্রান্ত
"তো[illegible]" গেয়ে হব তোমার পথের পান্থ।
[illegible] বললে
[illegible] ঘনায় অকালে চারিদিকে।
[illegible]
শুধু কোথা প্রেমিকের সর্বাস্তিবাদের অঙ্গীকার?...
তারিণী-করুণাহাসি, স্বর্ণোজ্জ্বল শিখরবিহার?

দুই

আজ যখন সুভাষের কথা মনে পড়ে তখন মন সায় দেয় জোরালো সুরে "আনন্দ নয় ভ্রান্তি।"

আমার জীবনে নির্মল আনন্দের শিখরবাণী প্রথম ঝলকে উঠেছিল সুভাষেরই স্নেহে, তার ব্যক্তিরূপের মাধ্যমে। দিনে দিনে কত কিছুই তো ঝাপসা হ'য়ে এসেছে স্মৃতিলোকে, কিন্তু আজও যেন প্রত্যক্ষের মতন অনুভব করি তার দৃষ্টি হাসি সর্বোপরি, স্নেহসম্ভাষণ যার পরশমণির স্পর্শে তার তিরস্কার ও শাসনও হয়ে উঠত আমার কাছে আদরণীয়। কালিয়দমনে নাগপত্নীরা কৃষ্ণকে বলেছিল: "ক্রোধো হি তে অনুগ্রহ এব সম্মতঃ"—প্রভু তোমার ক্রোধও যে তোমার প্রসাদ"। সুভাষের শাসনকে আমার সত্যই মনে হ'ত প্রসাদ। সে কাছে এসে বসলে সমস্ত মন সজাগ হ'য়ে উঠত। এক কথায় ভালোবাসা যে মানুষের সমস্ত চিত্তকে কীভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে, যেমন ক'রে প্রেমাস্পদের তুচ্ছতম ছোঁওয়াও আমাদের গ্রহিষ্ণুতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে—এককথায়, ঘরোয়া চেতনার একঘেয়েমি কাটিয়ে মানুষ কোন্ পথ দিয়ে নিমেষে পুলকশিহরণের রংমহলে পৌঁছতে পারে—আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম এক, তাকে ভালোবেসে, দুই তার ভালোবাসা পেয়ে। না ভুল হ'ল: তার ভালোবাসা আমাকে উল্লসিত করলেও আমি সত্যিই সে-উল্লাসকে গৌণ মনে করতাম—একটুও বাড়িয়ে বলা নয়। মুখ্য ছিল চিরদিনই তাকে এমন ভালোবাসতে পারা যার বরে বুকে জাগে বল, প্রাণে শিহরণ, চোখে আলো। তাই ডাক ছেড়ে বলতে ইচ্ছা হয় যে. এমন প্রেম জগতে সত্যিই আছে যার ছোঁওয়ায় চোখের ঠুলি খ'সে পড়ে, মনে হয় যা পেয়েছি তা আমার। প্রাপ্যের চেয়ে আনেক বেশি। পাছে আমার দরদী ক্রিটিকরা বাঁকা হেসে বলেন "জানি জানি, উচ্ছ্বাসী হিরো ওয়ার্শিপয়ের কথা—to be taken with a grain of salt, তাই একটি ঘটনার কথা বলি—যদিও মনে হয় এ-কথা বলেছি কোথায় যেন। তবু ঘটনাটি এতই স্মরণীয় যে পুনরুক্তি হ'লে ভাগবত অশুদ্ধ হবে না—আরো এই জন্যে যে, এটির উল্লেখ করছি এক নব পটভূমিকায়—context এ।

ঘটনাটি এই: আমি সুভাষকে বরাবরই বলতাম: "সুভাষ তুমি জাতি-সংগঠকের—Nation-builder—আধার হ'য়ে এসেছ, তুমি রাজনীতি ছাড়ো—ও তোমার স্বধর্ম নয়। তুমি তোমার পবিত্র চরিত্র ও তেজস্বী প্রতিভা নিয়ে জাতিকে গ'ড়ে তোল—আমাদের মন-প্রাণকে তামসিকতা থেকে মুক্ত করো।"

সুভাষ বলত "তুমি বড় মাটিছাড়া দিলীপ। জাতি-

সংগঠন করবে কী করে যদি পদে পদে বিদেশী দস্যুরা তোমার সর্বস্বহরণ করে? আমাদের সব আগে হ'তে হবে স্বাধীন—জাতিসংগঠন করতে পারে শুধু স্বাধীন মানুষ।"

আমি একথায় কোনোদিনই পুরোপুরি সায় দিতে পারি নি। কারণ রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রমুখ মহাজনেরা পরাধীন অবস্থায়ও জাতিকে গ'ড়ে তুলেছেন কমবেশি—যদিও আমি মানি স্বাধীন পরিবেশে এঁদের সংগঠনশক্তি চতুর্গুণ শক্তিশালী হ'ত। কিন্তু তবু যখন রাজনীতির আখড়ায় মানুষের ঈর্ষা দ্বেষ স্বার্থের ডামাডোল আমাদের কানকে বধির করত তখন মন পালাই পালাই করত।

এহেন আমাকে সুভাষ একদিন বলল: দেশবন্ধু স্বরাজ পার্টি গঠন করছেন। তিনি চান নদীয়া থেকে তুমি দাঁড়াও ইলেকসনে নদীয়ায় মহারাজ ক্ষৌনীশচন্দ্রের বিরুদ্ধে।

শুনে আমি দমে গেলাম, কিন্তু গোঁ ছাড়লাম না। বললাম: "সুভাষ, মাপ করো ভাই, এ আমি পারব না—না, দেশবন্ধু বললেও নয়। তবে তুমি যদি বলো, আমি রাজী হব অনিচ্ছায়। কারণ তোমার নির্দেশকে আমি না করতে পারি না তুমি জানো।"

সুভাষ বলল: "না, তোমার যখন এত অনিচ্ছা তখন আমি তোমাকে বলব না ইলেকশনে দাঁড়াতে—আরো এইজন্যে যে, আমি মনে করি তুমি বাইরে থেকেও আমাদের সহায় হতে পারবে গান গেয়ে নানা আসরে স্বরাজ্য পার্টির জন্যে চাঁদা তুলে।"

আমি বললাম: "এতে আমি রাজী সুভাষ—একশোবার। গান গাইব দেশের জন্যে এ তো আমার প্রিভিলেজ—যদিও ভাই" বলেছিলাম আমি করুণ হেসে "জেলে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। তবে তুমি যখন বলছ, তখন স্বদেশী গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

হয়ত এ-সংলাপের কথা আগে লিখেছি, যদিও—কোথায় লিখেছি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে বোধহয় আগে যা লিখেছি তার সঙ্গে আজকের অনুলিপির বেশি গরমিল হবে না। অতীতের অনেক কিছু নানা সময়ে নানা আলোয় ফুটে ওঠে—তাই গরমিল কিছু হয়ত থাকতেও পারে। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য এই যে, সুভাষের নির্দেশ আমার মন অনিচ্ছায়ও বরণ করত—খানিকটা "তোমার ইচ্ছা হোক পূর্ণ" ছন্দে। একেই আমি বলছি প্রেমের একটি শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমি যা চাই তা নয়—তুমি যা চাও আমি তাই করব তোমার মনের মতন হ'বে—এ-সাধনায় আমি সিদ্ধিলাভ যদি নাও করি তবু সেই সাধনাই হবে আমার পরম পুরস্কার। প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেম—তার কি দোসর আছে?

তিন

পরের কথা আগে বলা হ'ল। হোক। স্মৃতিচারণের ঐ তো মস্ত সুবিধে: খুশখেয়ালে চলা তার স্বধর্ম। কেবল একটা কথা এখানে বলার মতন ক'রে বলা হয় নি—যদিও যৌবনের প্রথম প্রেম এই বর্ণনার মধ্যে রয়েছে আমার বক্তব্যটি আত্মগোপন ক'রে।

ভাষ্য এই যে, যৌবনের প্রথম প্রেমের মধ্যে এমন একটা গরিমা আছে যার তুলনা সত্যিই নেই। কেন নেই বলি খুলে।

মানুষ পদে পদে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে। বুদ্ধি দিয়ে পরে সে-অভিজ্ঞতাকে পরিপাক করার সঙ্গে সঙ্গে এ-অভিজ্ঞতা তার বিকাশের সহায় হয়। যৌবন বিকাশ-উন্মুখ, কিন্তু বিকশিত নয়। তাই তার অনেক সময়েই ঠিকে ভুল হয়। হবেই—কারণ এই ভ্রান্তির মধ্যে দিয়েই আসে অভ্রান্তির দিন, যেমন বেদনার মধ্যে দিয়েই আসে নবচেতনার আলো। কিন্তু যৌবনের মধ্যে এই নাবালকত্ব—immaturity—থাকলেও (যার ফলে সে বার বার ছায়াকে কায়া ব'লে বরণ করে) তার মধ্যে একটি আশ্চর্য শক্তির উন্মেষ হয়—দিতে চাওয়া। পরিণত বয়সে বন্ধুলাভের সঙ্গে যখন যৌবনের বন্ধুপ্রীতির তুলনা করি তখন দেখি—যৌবন স্বভাবে দিলদরিয়া, যেখানে প্রবীণ হয়ে ওঠে সাবধানী—ঘা খেয়ে। শরৎচন্দ্র একটি কথা আমাকে

বলতেন প্রায়ই আমার মনে গেঁথে গেছে: "দিলীপ, বিশ্বাসঘাতকতা শুধু কৃতঘ্নকেই ছোটো করে না, যাকে বঞ্চনা করে তাকেও একটু না একটু খাটো করে রেখে যায়।"

স্বভাবে যে উদার দানশীল মহৎ সে অবশ্যই বার বার ঘা খেলেও উদারই থাকে মোটের উপর। কিন্তু তবু তার মনের মধ্যে একটা পিছুহটার ভাব থেকেই যায়। ফলে আগে যে-দান করতে সে এগিয়ে আসত অকুণ্ঠে, পরে সে-দান করে ঈষৎ সকুণ্ঠে। যৌবনে—যখন স্বপ্নভঙ্গ disillusionment—হয় নি তখন তরুণ মন চলে বেপরোয়া চালে কারণ এইই যে তার স্বভাব তথা স্বধর্ম। সুভাষের পরেও আমার ভাগ্যবশে আমি মহৎ বন্ধু পেয়েছিলাম স্বদেশে তথা বিদেশে। কিন্তু সে বন্ধুত্বের মণিমহলে শুধু মণিই জমেনি—সাবধানী মন হাত খাটো করেছিল বৈকি—সব সময়ে নয়, কিন্তু অনেক সময়েই। কিন্তু যৌবন বদান্য ও অনভিজ্ঞ ব'লে আরো বেপরোয়া তাই দেবার সময় হাত খাটো করবার কথা তার মনেও আসে না। তাই সে রবীন্দ্রনাথের সুরে গায় তরুণকে সামনের দিকে ঠেলে:

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

বিশেষ ক'রেই সুভাষের সম্পর্কে কবিগুরুর এ-কথাটির আমি মর্মজ্ঞ হয়েছিলাম, তাই উপলব্ধি করেছিলাম—একবার নয় বারবার—যে, খৃষ্টদেব মিথ্যা বলেন নি যখন তিনি গেয়েছিলেন: It is more blessed to give than to receive"

ভাগ্যের বশে যা পেয়েছ তুমি দান,
তারো চেয়ে সৌভাগ্য তাহার দান করে যার প্রাণ।

সুভাষের সঙ্গে মধুর প্রেমের মাধ্যমে আমি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করি ঈশার এ-মহাবাক্যের অপরূপ দীপ্তিকে।

চার

কন্টিনেন্টের পর্ব সুরু করবার আগে মনে প'ড়ে গেল একটি ঘটনা যাকে বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের প্রবীণোক্তির একটি চমৎকার ভাষ্য।

বলেছিলাম, মানুষ যখন বিশ্বাস ক'রে ঘা খায় তখন তার মন কিছুটা পিছিয়ে আসে, ফলে আগে সে যে দান করতে এগিয়ে আসত সহজ আনন্দে পরে সে-দান করবার আগে সাত পাঁচ ভাবে যার বাদী সুর—ফের ঠকব না তো?

আমার একটি প্রিয় মাদ্রাজী বন্ধু বিলেতে আমার কাছে মাঝে মাঝেই টাকা ধার করতেন—এক পাউণ্ড দু-পাউণ্ড তিন পাউণ্ড...করতে করতে একুনে পনেরো ষোলো পাউণ্ড দাঁড়িয়ে গেল। বন্ধু মানুষ—ধার চাইলে না করাও যায় না, বিশেষ যখন হাতে টাকা রয়েছে। কিন্তু তবু দেখতাম সে থিয়েটার ভ্রমণ হৈ চৈ সব তাতেই যথেচ্ছ অর্থব্যয় করছে তখন মন একটু ক্ষুণ্ণ হতই। সংস্কৃতে কোথায় পড়েছিলাম কৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে: "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।" কিন্তু এ-বন্ধুটি তো দরিদ্র নন্, তার উপর তীক্ষ্ণধী। টাকা শোধ দেব-দেবই ব'লে তিন সত্য ক'রেও কথা রাখতে চান না? অথচ তাগাদা করতে ভালো লাগে না—বিশেষ ক'রে সতীর্থকে।

কিন্তু অতঃপর ঘটল এক অভাবনীয় কাণ্ড। বন্ধুটি আমাকে একদা বললেন: "দিলীপ চলো হ্যারডে আমি একটি ওভারকোট কিনবো—তুমি দেখবে মাপসৈ হয়েছে কিনা।"

গেলাম তাঁর সঙ্গে। অবাক্! আঠারো গিনির ওভারকোট! সুভাষ বা আমি কেউই ১২।১৩ গিনির বেশি খরচ করিনি ওভারকোটের জন্যে। এ যে একেবারে Swell ওভারকোট বাবা! অথচ আমার কাছে যা ধার করেছেন তার অর্ধেক বা সিকিও শোধ করতে চায় না।

তারপর হ'ল আর এক কাণ্ড। একদিন বন্ধুর সঙ্গে আমি গিয়েছি (লণ্ডনে) শেক্সপীয়র হাটে। আমার গাইবার কথা। বন্ধুটি আমার গান সত্যিই ভালোবাসতেন।

গানের পর ক্লোকরুমে তিনি ওভারকোট আর খুঁজে

পেলেন না। চকচকে দামী নতুন ওভারকোট—কে হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে। ফলে আরো মুস্কিল—বন্ধুকে তাগাদা দিই কেমন ক'রে? কেবল মনে আছে মনে অনুদার ভাব এসেছিল: "বেশ হয়েছে খুব হয়েছে!" *বলল ক্ষুব্ধ মন। পরে এ জন্য অনুতাপ হ'ল—কিন্তু সেটা দ্বিতীয় রিয়াকশন—প্রথম 'রিয়াকশন' হ'ল নিছক উল্লাসই* বটে। সুতরাং দেখলাম স্পষ্ট মন ক্ষোভবশে খানিকটা ছোট হয়ে গেছে বৈ কি।

তারপর বহুবৎসর কেটে গেছে। দ্বিতীয়বার য়ুরোপযাত্রা ১৯২৭ সালে। প্রথমে গ্রীস, তারপর প্যারিস তারপর লণ্ডন হয়ে বার্মিংহাম। সেখানে আমার বন্ধু সার্জন ডাক্তার পার্ডি আমার হার্ণিয়ার অপারেশন করবেন—কম টাকা লাগবে তাই বার্মিংহাম প্রয়াণ। পার্ডির ওখানেই উঠলাম। বিকেলে সেখানকার এক মনোরম নার্সিং হোমে তিনি আমাকে পেশ করলেন। তাঁর ফী চল্লিশ পাউণ্ড, তবে আমার কাছ থেকে নেবেন মাত্র পঁচিশ। আমি বালিশের নিচে ছ'সাতটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট মজুদ রাখলাম—তিনি চাইলেই দেব।

সন্ধ্যায় কি একটা বই নিয়ে পড়ছি এমন সময়ে এক ভারতীয় যুবকের প্রবেশ—কোন্ প্রদেশের মনে নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত।

যুবকটি দুদিন আগে ডাক্তার পার্ডির ওখানে আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে অনেক আঁওপাছু করে খোঁজ নিয়ে এসেছেন নার্সিং হোম-এ।

বললেন: "আমার শেষ ডাক্তারি পরীক্ষা সামনের সপ্তাহে। তার আগে আমাকে একটা মোটা ফী জমা দিতে হবে পঁচিশ পাউণ্ড। বাড়ী থেকে আমার টাকা আসবেই তবে দেরিতে। কিন্তু কালই ফী জমা না দিলে আমি পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাব না। আমার বাবা গরীব—আমাকে আর একবৎসর এখানে রাখতে পারবেন না। কাজেই এ-পঁচিশ পাউণ্ড আজই জোগাড় করতে না পারলে আমার বিলেতে আসাই বিফল হবে—ডাক্তারিতে ফাইনাল পাশ না করেই দেশে ফিরতে হবে। এককথায়—সর্বনাশ।"

আমার বালিশের নিচে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড ম[illegible] তাকে তৎক্ষণাৎ দিতে পারি। কিন্তু একেবারে অ[illegible] কুলশীল যে! আর ধক করে মনে পড়ল আমার তামিল বন্ধুটির কথা যে আমার কাছ থেকে পনের পা[illegible] ধার করে শোধ না দিয়ে আঠারো গিনির ওভার[illegible] কিনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল শরৎচ[illegible] কথা: যে, মানুষ বিশ্বাস করে ঘা খেলে শুধু যে [illegible] আঘাত দেয় সে-ই ছোট হয়ে যায় তাই নয়, [illegible] আহত হয় তার মনের প্রসারও কমে যায়ই যায়। ত[illegible] যখন এ-যুবকটি এসে আমার কাছে সাহায্য চাইল তৎ[illegible] কেমন যেন এক অস্বস্তি পেয়ে বসল আমাকে। আ[illegible] হ'লে তাকে চাইবামাত্র দিতাম পঁচিশ পাউণ্ড, কি[illegible] তামিল বন্ধুটির নির্লজ্জ আচরণের কথা মনে হতেই এ[illegible] সাবধানী সুর আমাকে যেন ধমকে বলল: "ওকে জা[illegible] না যখন, কেমন করে এত টাকা দেবে এককথায়?"

যুবকটি বুদ্ধিমান্, আমার কুণ্ঠায় দুঃখ পেলেও বুঝল বলল: "আমি জানি—পঁচিশ পাউণ্ড দিতে আপনা[illegible] কেন বাধছে। বাধবার কথাও বটে। কিন্তু আ[illegible] একান্ত অসহায় হয়েই আপনার কাছে হাত পেতে[illegible] —বিশেষ করে এই জন্যে যে, আপনি সুভাষ বোসে[illegible] বন্ধু। আমি বহু চেষ্টা করেও পরীক্ষার ফী জোগা[illegible] করতে পারি নি। তাছাড়া ভারতীয় যুবকদের হা[illegible] এত টাকা প্রায় কখনই থাকে না বললেও চলে। ত[illegible] আপনি ধনী, উদার ও দেশের দশের একজন, আপ[illegible] আমাকে না করবেন না ভেবে বড় আশা করে এসেছি—এ-ফী জোগাড় করতে না পারলে আমাকে অকূলপাথা[illegible] পড়তে হবে। তাই আমার মিনতি—আপনি আমা[illegible] বিশ্বাস করুন, আমি ঠক কি মিথ্যুক নই। আমা[illegible] পিতৃদেব আমাকে তার করেছেন ৫।৭ দিনের মধ্যে[illegible] আমাকে টেলিগ্রামে টাকা পাঠাবেন।" বলতে বলতে তার চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

তার অশ্রুকণ্ঠী প্রার্থনায় আমার মন ভিজে উঠল। আমি বললাম: "আপনি কাঁদবেন না, ভাগ্যক্র[illegible] টাকা আমার বালিশের নিচেই আছে—আমার সার্জনে[illegible]

তবে তিনি বন্ধু লোক—সবুর সইবে।" বলে কে দিলাম পাঁচটি পাঁচ পাউণ্ডের নোট। সে চোখ ছে চলে গেল।

কিন্তু সে প্রস্থান করার পরেই আমার মধ্যেকার ছোট-আমি আমাকে ধিক ধিক ক'রে উঠল "কী ব'লে এক অজ্ঞাতশীলকে এত টাকা দিলে শুনি? জানো না কি—টাকার জন্যে মানুষ কত নিচে নামে? অন্ততঃ টেলিফোনে ডাক্তার পার্ডি'কে জিজ্ঞাসা করতেও তো পারতে যে ও সত্যিই ডাক্তারি পাশ দিতে যাচ্ছে কি না? তবে কথায় বলে না a fool and his money are soon parted!......ইত্যাদি।

কিন্তু তার পরেই আমার মধ্যেকার বড়-আমি জেগে উঠল, বলল "কিন্তু যদি ও সত্যি কথা ব'লে থাকে তাহলে তো ওর তিন বৎসর এদেশে পড়া বিফল হ'ত।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মন আনন্দে ভ'রে গেল।

* * *

অপারেশন হ'য়ে গেল। আমি তখনো শয্যাশায়ী, কষ্টে পাশ ফিরি। সাত আট দিন কেটে যাবার পরেও সে এলনা দেখে আমি ডাক্তার পার্ডিকে সবকথা খুলে বললাম। শুনে তিনি মেঘলা মুখে বললেন: "আমাকে আপনি কন্‌সাল্ট করলে আমি খোঁজ নিতে পারতাম খুব সহজেই।"

ফের দমে গেলাম। আনন্দকে ছাপিয়ে সংশয়ের ফণা দেখা দিল।...

আটদশদিন বাদে সে-ছাত্রটি নার্সিং হোমে এসে আমাকে প্রণাম ক'রে পঁচিশ পাউণ্ড নোটে দিয়ে বলল: "আপনি আমাকে ত্রাণ করেছেন বড় দুঃসময়ে। আমি আপনার কাছে কী যে কৃতজ্ঞ! বলতে বলতে চোখ মুছল।

আমি অর্ধশয়ান অবস্থায় তার মাথা আমার বুকে টেনে নিলাম। শিশুর ম'ত তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম গাঢ় কণ্ঠে "আমাকে বাঁচালে ভাই, আমার মধ্যেকার বড়-আমিকে জাগিয়ে দিয়ে। তোমাকে দিতে পারা সত্ত্বেও না দিলে আমার নিজের চোখে আমি ছোট হয়ে যেতাম। তাই আমিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ জানবে। আমিও চোখ মুছলাম।

---

*Only the everlasting No has neared.
But where in the hover's everlasting Yes?
The smile that saves, the golden peak of things? (Savitri III : 2)

ক্রমশঃ

মাটি এখনও কাঁদে

(নাটিকা)

তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম। চালা ঘরের দাওয়া। বিকেল বেলা দাওয়ায় বসে রহমন চাচা হুঁকো টানছেন। জয়ন্তর প্রবেশ]

রহমন—(উৎফুল্ল হয়ে) এস, এস জয়ন্ত এস। শুনছি তুমি কতদিন পরে গ্রামে এসেছ, অথচ!

জয়ন্ত—তাইতো দেখা করতে এলাম চাচা।

রহমন—কোলকাতা থেকে কবে এসেছ?

জয়ন্ত—তিন চারদিন হল এসেছি। সারা গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম চাচা। পুরানো বন্ধু বান্ধব, পরিচিত পরিজন সবার সঙ্গে দেখা করে বেড়াচ্ছি। সময় করে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু চাচা, আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা সবচেয়ে বেশী ছটপট করছিল। মামুদ, নাজমা—এরা সব কোথায়?

রহমন—আছে, আছে—সবাই আছে। তুমি আগে আমার পাশে এসে বস বাবা। কতদিন পরে দেখা। ১৭।১৮ বছর হল না? সেই দাঙ্গা, দেশ ভাগ—তুমি পালালে ও পারে, আমরা তোমার বাবা মা পড়ে রইলাম এপারে।

জয়ন্ত—চাচী যে মারা গেছেন, বাবার চিঠিতে জেনেছিলাম। চাচীকে কোনদিন ভুলব না। কিন্তু নাজমা, মামুদ এরা সব কোথায়?

রহমন—নাজমা ভেতরে আছে। কাজে ব্যস্ত। তোমার গলা পেয়েছে যখন, আসবে ঠিক। মামুদ, চটকলে কাজ করে। সেই সকালে বের হয়, ফেরে সন্ধ্যের সময়। ছুটি শুধু শুক্রবার। আর সব কি খবর তোমার বল?

জয়ন্ত—কি আর বলব চাচা! যেখানে মানুষ জন্মায়, তার সঙ্গে যেন নাড়ীর টান থাকে। স্বদেশেই থাকি আর বিদেশেই, সেই জায়গাটির জন্য মনটা টনটন করে ওঠে। ছেড়ে গিয়েছিলাম বলেই এমন করে বুঝেছি।

রহমন—ঠিক বলেছ।

জয়ন্ত—ফিরে এসে দেখলাম, কিছুই বদলায়নি। হয়ত দু চারটে নতুন ঘর, দু দশটা নতুন মুখ নজরে পড়েছে। কিন্তু ছেলেবেলার সব স্মৃতি নিয়ে গ্রামটা যেন দু হাত বাড়িয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে নিল।

রহমন—(হুঁকা টানিতে টানিতে খুসি মনে) তাতো হবেই। তোমার বাবা মাকে এসে কি রকম দেখছ?

জয়ন্ত—ওঁদের দেখতে এসেছি। আপনারা যখন আছেন ভাববার কিছু ছিল না। তবু আমি নিজের আগ্রহে এসেছি। সব দেখতে, জানতে একটা প্রত্যয়কে ফিরে পেতে।

রহমন—তুমি নিশ্চয়ই হতাশ হওনি জয়ন্ত?

জয়ন্ত—না

রহমন—তোমার বাবা মা কেন দেশ ছাড়েন নি বলতো জয়ন্ত?

জয়ন্ত—পৈতৃক জমিবাড়ীর মায়াটা ছাড়তে পারেন নি বলেই তখন মনে হয়েছিল। আমি তখন ছেলে মানুষ। কোন কিছুর ওপর তেমন মায়া নেই, বুদ্ধিও নেই।

রহমন—সম্পত্তির মায়াই শুধু নয় জয়ন্ত। ঐ যে তুমি বললে—নাড়ীর টান। তাই। আমি আর আমার মাটি এ দুটো জিনিষ আলাদা নয়। যারা ভাবে হয় তারা বেকুব, নয় শয়তান।

জয়ন্ত—হ্যাঁ, চাচা—বাবা লিখতেন—মাটি কখনও বিষাক্ত হয় না। একটা মনগড়া দাগ কেটে—এটা তোমার, এটা আমার বললেই কি তাই হয়ে যায়?

রহমন—বাঃ জ্ঞানী লোকের মত কথা। তোমার বাবার এ অঞ্চলে পণ্ডিত বলে খ্যাতি আছে। জয়ন্ত, তুমি কিন্তু নিজে থেকে পর হয়েছ, আমরা তোমাকে পর করিনি।

জয়ন্ত—চাচা, ভুল বুঝবেন আমাকে। আপনার নিশ্চয়ই সব মনে আছে। আমার তখন কাঁচা জোয়ান বয়স। একসঙ্গে স্কুলে পড়া বন্ধুরা পরস্পরের কি রকম শত্রু হয়ে উঠল। "রক্তের বদলে রক্ত চাই"—সে কি উন্মাদনা, উত্তেজনা। দল গড়তে হল। মেরেছি, খুন করেছি। রক্তে ভেসেছি, ভাসিয়েছি। এক সময় মনে হল আমরা সংখ্যায় অল্প—হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। তারপর-তারপর—।

রহমন—প্রাণভয়ে পালালে। (হাসতে লাগলেন)

জয়ন্ত—হ্যাঁ, পালালাম।

রহমন—কিন্তু যারা পালাতে পারল না, তাদের কথা তো ভাবলে না?

জয়ন্ত—উপায় ছিল না চাচা!

রহমন—বুঝি, সব বুঝি। দেশের জন্য মাটির জন্য প্রাণটাকে তুচ্ছ করা চাই। বিদেশ থেকে আমাদের যদি কেউ আক্রমন করে—আমরা কি দেশ ছেড়ে পালাব? ভাইয়ে ভাইয়ে লড়িয়ে দেওয়া ছিল একটি বিদেশী চাল—নতুন কায়দায় তাঁবে রাখার ফন্দি। আমরা সবাই বেকুব বনেছি। এই যে নাজমা—আয় এদিকে আয়—এ যে তোর জয়ন্তদা। (নাজমা দাওয়া ছেড়ে ধীর পায়ে নেমে এল)

জয়ন্ত—কি রে নাজমা কি কচ্ছিলি এতক্ষণ? কখন থেকে বসে আছি জানিস?

নাজমা—জানি। (ডাগর চোখ মেলে চেয়ে রইল)

জয়ন্ত—কি দেখছিস?

নাজমা—কিছু না।

জয়ন্ত—সেই ফ্রক পরা মেয়ে, কত ডাগর হয়েছিস্। লজ্জা করছে?

নাজমা—না। দেখছি, তুমি কি আমাদের সেই জয়ন্তদা?

জয়ন্ত—চিনতে পারছিস না?

নাজমা—পারব না কেন। আমার দাদার পরম বন্ধু—জয়ন্তদা, তাকে কখনও ভোলা যায়।

জয়ন্ত—হ্যাঁরে, তোর দাদা কখন ফিরবে? এসে পর্য্যন্ত মামুদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

নাজমা—আরও কিছুক্ষণ বস না। এসে পড়বে। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দাদাও কম ব্যস্ত নয়।

জয়ন্ত—সেও তো আমার বাড়ি গিয়ে দেখা করতে পারত!

নাজমা—(অর্থপূর্ণ হেসে) দাদা বলছিল—ও আগে এসে দেখা করে কিনা দেখি!

জয়ন্ত—তাই নাকি! কিন্তু কেন? সে আগে দেখা করলে কি ছোট হয়ে যাবে?

রহমন—মামুদের আগে দেখা করা উচিত ছিল। ছোটবেলা থেকে ওরা কত অন্তরঙ্গ। যেখানে জয়ন্ত, সেখানেই মামুদ—যেখানে মামুদ, সেখানেই জয়ন্ত।

নাজমা—হ্যাঁ, খুব অন্তরঙ্গ ছিল—তাই না ছোরা-ছুরি মারামারির বেলায় দুই বন্ধু পাশাপাশি থাকতে পারেনি। মুখোমুখি লড়েছিল।

রহমন—নাজমা! (ধমক দিল—কিছুক্ষণ সবাই নীরব) ওসব কথা ভুলে যাও তোমরা।

নাজমা—পরে জয়ন্তদাকে আর দেখতে পাই না। অনেকে পালিয়েছে, পালাচ্ছে ভাবলাম, দাদা যখন জয়ন্তদার বন্ধু, ভয় কি! দাদাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম—দাদা সব বললে।

জয়ন্ত—নাজমা, তুই তখন ছেলেমানুষ, সব কথা জানিস না।

নাজমা—আমার জেনে কাজ নেই। শুধু এইটুকু জানলাম, তুমি আমাদের তেমন করে ভাল বাসতে না।

রহমন—(হো হো করে হেসে উঠে) ঠিক বলেচিস বেটী, ঠিক বলেচিস।

নাজমা—সত্যি করে বলতো জয়ন্ত দা, তুমি কি দাদার ভয়ে পালিয়েছিলে?

জয়ন্ত (হেসে) অনেকটা তাই। মামুদ কি তাই বলেছিল?

নাজমা—তা মনে নেই। তবে আমার তাই মনে হয়েছিল। আর মনে হয়েছিল এ আবার কি রকম বন্ধুত্ব। বন্ধুই যদি হবে, মারামারি করবে কেন? ভয় পাবে কেন?

জয়ন্ত—অন্যায়থেকে ভয়ের জন্ম। যে অন্যায় করে না, সে নির্ভীক। এখন বুঝি। কিন্তু দাদাকেও প্রশ্নটা করে দেখেছিস কোন দিন?

নাজমা—করেছি। দাদা তোমার মত পরিস্কার জবাব দিতে পারেনি।

রহমন (হাসতে হাসতে) তাহলেতো মিটেই গেল। যা, জয়ন্তর জন্যে চা'টা নিয়ে আয়।

নাজমা—এই যে যাই। চায়ের সঙ্গে কি খাবে বল জয়ন্তদা?

জয়ন্ত—চাচীর হাতের কি খেতে ভালবাসতাম মনে নেই?

নাজমা—আমিতো তখন ছেলেমানুষ, মনে থাকবে কেন? কি, ঠিক মনে আছে তো?

(জয়ন্ত হাসতে থাকে—নাজমা হাসতে হাসতে চলে যায়)

জয়ন্ত—চাচা নাজমা ঠিক তেমনি আছে। ট্যাকট্যাকে কথা অবশ্য এখন আরও গুছিয়ে বলতে পারে। তবে মনটা তেমনি সরল। অভিমান করার ওর কারণ আছে।

রহমন—তাতো আছেই। পেছনের কথা সব ভুলে যাও। এইযে আলী সাহেব। আসুন, আসুন—এই দেখুন কে এসেছে

(স্কুলের হেডমাষ্টার আলীসাহেবের প্রবেশ)

আলী—এই যে জয়ন্ত! আমাদের জয়ন্ত! তুমি কবে এসেছ? এস এস কাছে এস।

(অভিভূত হয়ে জয়ন্ত কাছে আসতেই বুকে জড়িয়ে ধরেন)

জয়ন্ত, তুমি যে ফিরে এসেছ এযেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। বাঃ বাঃ বেশ বড় সড় হয়েছ। কেমন আছ বল?

জয়ন্ত—ভাল আছি। আমাকে মনে ছিল স্যার?

আলী—তা মনে থাকবে না। তুমি আমার স্কুলের সেরা ছেলে ছিলে। কিন্তু তুমি এতদিন আমাদের ভুলে ছিলে কি করে বল?

জয়ন্ত—না স্যার আমি আপনাকে ভুলিনি। কাউকে ভুলিনি ভোলা যায় না।

আলী—তাহলে আমিই বা তোমাকে ভুলব কি করে? মাষ্টারদের এক আধটা সন্তান থাকেনা। হাজার হাজার-কাউকে ভুললে চলেনা প্রত্যেকের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এসব কথা যাক কি করছ, কেমন আছ বল?

জয়ন্ত—বিয়েটা পাশ করেছি। চাকরি করছি।

আলী বাঃ বাঃ—। আবার চলে এস জয়ন্ত। দেশের ছেলে গ্রামের ছেলে তোমাদের কি এসব ফেলে থাকা চলে?

জয়ন্ত—তাই আসতে পারলে ভাল হত।

আলী—হত নয়—তাই হওয়া চাই। কি বলুন রহমন সাহেব?

রহমন—নিশ্চয়ই।

আলী—নিজের অধিকার চাইলে পাওয়া যায় না। আদায় করে নিতে হয়। দরকার হলে কেড়ে নিতে হয়।

রহমন—তাইতো বলেছিলাম, পেছনের কথা সব ভুলে যাও জয়ন্ত। আপনার গল্প করুন। আমি কলকেটা পাল্টে আসি। (প্রস্থান)

আলী—হ্যাঁ, পেছনের কথা সব ভুলে যেতে হবে।

জয়ন্ত—তাইতো ভুলতে এসেছি স্যার।

আলী—মানুষ মদ খেলে মাতলামী করে। ঘোর কেটে গেলে আবার সেই মানুষ। আমরা মদ খেয়ে মাতাল হয়েছিলাম। আমাদের ঘোর কাটছে।

জয়ন্ত—(আগ্রহভরে) সত্যি স্যার। ঘোর কাটছে?

আলী—হ্যাঁ কাটছে। তুমি নিজে বুঝতে পারছনা?

জয়ন্ত—পারছি স্যার। কিন্তু একি একেবারে কেটে যেতে পারে?

আলী—নিশ্চয়ই পারে। আন্তরিক চেষ্টা থাকা চাই—আগ্রহ থাকা চাই। এসব থাকলেই আল্লার দোয়া মাথার ওপর উজাড় হয়ে পড়বে।

জয়ন্ত—পেছনের ইতিহাসটা যেন প্রাকৃতিক বিস্ফোরণ ও বিভীষিকার স্মৃতি।

আলী—এসবেরও প্রয়োজন ছিল। ওসবের মধ্যে যে সত্যিকারের কোন শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, এমন ক'রে শেখার সুযোগ আমাদের হতনা। আচ্ছা চলি—তুমি একদিন এস আমার কাছে।

জয়ন্ত—আসছে শুক্রবার গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করে আসব।

আলী—এস, নিশ্চয়ই এস। মনে রেখ, এই আমাদের নালা জল জঙ্গলে ভরা মাটি, মাথার ওপর ঐ যে উদার অনন্ত আকাশ-এর মধ্যে দিয়ে আমরা আবহমান কাল বিচরণ করে বেড়াব অকুতোভয় অকুণ্ঠ চিত্তে। ভয় কি? (প্রস্থান)

(জয়ন্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে—হঠাৎ মামুদ ঢুকে থমকে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখ। দুজন দুজনের দিকে অপলকে চেয়ে। মামুদ একপা একপা করে এগিয়ে সামনে দাঁড়াল)

মামুদ—(রহস্যপূর্ণ হাসি) ভয় পেলি নাকি জয়ন্ত?

জয়ন্ত—(সহজ হেসে দুহাত বাড়িয়ে মামুদকে জড়িয়ে) মামুদ ভাই।

মামুদ (বাধা দিলনা। একটু অপেক্ষা করে আস্তে জয়ন্তকে জড়িয়ে ধরল) কবে এসেছিস?

জয়ন্ত—এইতো তিন চার দিন হল।

মামুদ—আয়! (দাওয়ার পাসাপাশি বসে) বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

জয়ন্ত—হ্যাঁ অনেকক্ষন গল্প করেছি। একটু আগে ভেতরে গেছেন।

মামুদ—আর নাজমা?

জয়ন্ত—হ্যাঁ। নাজমা কত বড় হয়ে গেছে। লজ্জায় তার জয়ন্তদার সামনে আসছিলনা।

নাজমা—আগের মত কি আর ছোট আছি। নাও জয়ন্তদা ধর। তোমার চাচীর মত করতে পেরেছি কিনা দেখ।

মামুদ—ও! করেছিস। চাচীর রান্না তোর মনে আছে জয়ন্ত?

জয়ন্ত—মনে থাকবে না? কি যে বলিস?

মামুদ—নাজমা, তোর জয়ন্তদাকে নেমন্তন্ন করে রাখ কাল রাতে। মায়ের হাতের রান্না খাওয়াবি।

নাজমা—বেস! তাই কথা রইল জয়ন্তদা।

জয়ন্ত—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই কথা রইল। গ্রামটার কিছুই বদলায়নি, বুঝলি মামুদ। মনে হচ্ছে, এই কদিন আগেও আমি এখানে ছিলাম।

মামুদ—(সহজ হতে পাচ্ছেনা। চাপা অস্থিরতা) ভাল

জয়ন্ত—তুই কেমন আছিস বল?

মামুদ—ভালই আছি। তোর খবর বল? তোর দেশের খবর!

জয়ন্ত—আমার দেশ মানে? যে দেশে মানুষ জন্মায় সেটাই তার দেশ।

মামুদ—তাহলে পালিয়েছিলি কেন?

নাজমা—ওসব কথা থাক দাদা। এতদিনে দেশের ছেলে দেশে ফিরেছে।

মামুদ—ঘরছাড়া উড়ো পাখীর উড়ো স্বভাব হয় রে নাজমা।

নাজমা—তার মানে।

মামুদ—তার মানে, উড়ো পাখীতো! কদিন ঘরে থাকে স্থাখ!

নাজমা—ছিঃ ও কথা বলতে নেই। উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে সকলে, তাইতো—

মামুদ—তা বটে। কিন্তু এখনতো কোন গোলমাল নেই। এবার উড়তে চাইলে ডানা দুটো কেটে দেব।

নাজমা—(হেসে উঠল জোরে) হ্যাঁ তাই দিও। আমার রান্না আছে। যাই। কাল এস জয়ন্তদা।

মামুদ—আমি বদলেছি নাকি রে?

জয়ন্ত—(সাদরে কাঁধে হাত রেখে) আমার তো মনে হয় না। এক কালে আমাদের কাঁধে ভুত চেপেছিল।

মামুদ—আর এখন?

জয়ন্ত—ভুত কি আর চিরদিন ঘরে থাকে? তা হলে তো সব ভুতের রাজত্ব হয়ে যাবে।

মামুদ—বেশ বলেছিস। (হঠাৎ দাঁড়িয়ে) ঐ যে বাঁকা বনটা, তার পাশের জঙ্গল—তোর মনে আছে?

জয়ন্ত—হ্যাঁ, মনে আছে।

মামুদ—কি মনে আছে?

জয়ন্ত—ঐ জঙ্গলটায় আমরা ভূত সেজে পাশবিক নৃত্য করেছিলাম, মনে থাকবে না?

মামুদ—তুই আমার দলের চারটেকে ছোরা মেরে ঘায়েল করার পর আমি এসে পড়ি। তারপর—

জয়ন্ত—তার আগে তুই আমাদের বেশ ক'জনকে একেবারে সাবাড় করেছিলি, সেটা ভুলিস না।

মামুদ—(কঠিন মুখে)তারপর দুই ওস্তাদের ঐ বাঁশবনে মুখোমুখি দেখা। জয়ন্ত আর মামুদ। তারপর—

জয়ন্ত—তারপর—তুই আমার হাতের ছোরাটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিলি। কিন্তু আমাকে আর খুঁজে পেলি না।

মামুদ—(উত্তেজিত হয়ে) হ্যাঁ, তন্ন তন্ন করে কত খুঁজেছি। কাপুরুষ! পালিয়ে গেলি। পেলাম আজ। ১৮ বছর পর—আয় মামুদ ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরলি। বাঃ বাঃ (বিকারগ্রস্থের মত হাসতে লাগল)

জয়ন্ত—(গভীর স্বরে) আশ্চর্য্য! তুই এখনও এ সব কথা ভুলতে পারিসনি মামুদ।

মামুদ—দেখ জয়ন্ত! এ সব কথা কে না ভুলতে চায়। আমি জানি, যে কোন একটা বিশ্বাসকে আমরা বিশ্বাস করেই পেতে পারি। আমি সেই চেষ্টাই করছি। কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছি না। সে পথ রক্তেভেজা পথ, না অন্য কিছু জানি না। তুই যা এখন। এ সমস্যার সমাধান কাল হবে যদি সাহস করে আসিস।

(বেগে প্রস্থান। জয়ন্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে)

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

(রাত গভীর। ঘন জঙ্গল। জয়ন্তর হাত ধরে মামুদের প্রবেশ)

মামুদ—(স্বরে চাপা উত্তেজনা) আয় জয়ন্ত। এখানে একটু বসা যাক।

জয়ন্ত—খাওয়া, দাওয়া সেরে কাঁকে বেড়াবি বলে বের হলি—এইটাই কি বেড়াবার জায়গা?

মামুদ—(একটা গাছের গুড়ির ওপর বসে) বস্‌না বস্‌না এখানটা। এ জায়গাটা আমাকে বড় টানে জয়ন্ত।

জয়ন্ত—কেন?

মামুদ—কেন! (অস্থির হয়ে) বুঝতে পারছিস না?

জয়ন্ত—পারছি। এ জায়গাটার একটা স্মৃতি আছে—সেটা নারকীয় হিংস্রতায় ভরা।

মামুদ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। কাল তোকে যে সমস্যার কথাটা বলেছিলাম—এইটাই আমার সমস্যা। আমি এই স্মৃতিটা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

জয়ন্ত—কি করলে ঐ স্মৃতিটা ভোলা যায় ভেবে দেখেছিস?

মামুদ—নাঃ কিছু বুঝতে পারি না। তোর ভয় করছে না জয়ন্ত?

জয়ন্ত—ভয়! কাকে ভয়? তুই আমি একসঙ্গে যেখানে আছি, ভয় কি?

মামুদ—সেদিনও তো একসঙ্গে ছিলাম।

জয়ন্ত—সেদিনের কথা আজকের কথা এক নয়।

মামুদ—কেন নয়? (সামলে) না না ঠিক বলেছিস। যাক এসব কথা। কি করছিস? চাকরি?

জয়ন্ত—হ্যাঁ। তুইও তো চাকরি করিস?

মামুদ—ও এমন কিছু নয়। মিলের চাকরি, কুলি-মজুরের কাজ। তুই কোথায় কাজ করিস?

জয়ন্ত—কোলকাতায়, কাস্টমসে।

মামুদ—তাহলে তো বড়লোক হয়েছিস। ওরা ভাল মাইনে দেয় শুনেছি।

জয়ন্ত—হ্যাঁ মন্দ নয়।

মামুদ—আমার কথা তোর মনে ছিল জয়ন্ত?

জয়ন্ত—কি যে বলিস।

মামুদ—না, মানে—বন্ধু হিসেবে না শত্রু হিসেবে ?

জয়ন্ত—দুটোই। ভাবতাম, এত বড় আপনজন কি করে যে—। কি রে উঠে পড়লি কেন ?

মামুদ—(উত্তেজিত ভাবে মাটিতে কি খুঁজছে) বলে যা কি বলছিলি।

জয়ন্ত—কি খুঁজছিস ?

মামুদ—সেই জায়গাটা খুজছি।

জয়ন্ত—কোন জায়গাটা ? যে জায়গাটা মারামারি হয়েছিল ?

মামুদ—হ্যাঁ, হ্যাঁ যে জায়গাটা তুই চারটেকে ঘায়েল করে ফেলে দিয়েছিলি।

জয়ন্ত—(এগিয়ে এসে খুঁজতে খুঁজতে) এইখানটা হবে।

মামুদ—তুই ছোরা হাতে কোনখানটায় দাঁড়িয়েছিলি ?

জয়ন্ত—ঠিক মনে পড়ছে না।

মামুদ—না না আমি যখন তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিলাম ছোরাটা ?

জয়ন্ত—এইখানটা হবে ?

মামুদ—ঠিক মনে আছে তো। তবে দাঁড়া এখানে, আমি আসছি।

(বেগে প্রস্থান)

(জয়ন্ত একা পায়চারি করছে। পাতা মাড়ানর শব্দ। কে এগিয়ে আসছে।)

জয়ন্ত—কে ? কে ?

(ঝোপের ফাঁকে নাজমার মুখ)

নাজমা—জয়ন্তদা।

জয়ন্ত—কে। নাজমা।

নাজমা—তুমি পালাও জয়ন্তদা।

জয়ন্ত—কেন পালাব ?

নাজমা—দাদার মতিগতি তুমি বুঝতে পারছ না ?

জয়ন্ত—খুব বুঝতে পারছি।

নাজমা—তোমার প্রাণের ভয় নেই ?

জয়ন্ত—না।

নাজমা—(কাতর হয়ে) তোমার হাতে কিছু নেই। তুমি নিজেকে বাঁচাবে কি করে ? এখনও বলছি পালাও।

জয়ন্ত—না। পালালে এ সমস্যার নিষ্পত্তি হবে না।

নাজমা—তোমার দুটি পায় ধরি জয়ন্তদা। জেদ কর না, পালাও।

জয়ন্ত—তুই পালা। তোকে এখানে দেখলে আস্ত রাখবে না। ঐ বোধ হয় আসছে।

(নেপথ্যে—জয়ন্ত জয়ন্ত। নাজমা ঝোপের আড়ালে লুকোলো)

মামুদের দ্রুত প্রবেশ—হাতে সাবল

মামুদ—যাক, পালাস নি ?

জয়ন্ত—পালাব কেন ?

মামুদ—এইখানটায় বলেছিলি না ?

(মামুদ সাবল নিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল)

জয়ন্ত—কি করছিস ?

মামুদ—চুপ।

জয়ন্ত—ওখানে কি আছে ?

মামুদ—চুপ, একটা জিনিস খুঁজছি।

(হঠাৎ একটা মরচে পড়া ছোরা পেয়ে চীৎকার করে ওঠে)

পেয়েছি পেয়েছি। দেখ দেখ চিনতে পারিস। ভাল করে দেখ জয়ন্ত। এই নে। ধর। (হাতে দিল)

জয়ন্ত—আমার সেই ছোরাটাই মনে হচ্ছে রে।

মামুদ—মনে হচ্ছে নয়। এটাই তোর ছোরা। পুঁতে রেখেছিলাম এতদিন।

জয়ন্ত—কেন রে।

মামুদ—(উত্তরোত্তর উত্তেজিত) একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে। দে, আমার হাতে। (হাতে ফেরৎ পেয়ে—হেসে উঠে) ফেরৎ দিয়ে দিলি—কি বোকা !

জয়ন্ত—তার মানে ?

মামুদ—কিছু না তোর ভয় করছে না জয়ন্ত ?

জয়ন্ত—([illegible] কণ্ঠে) বার কয়েক তো বললি কথাটা। আমি ভয় পেলে কি তুই খুসি হবি ?

মামুদ—এঁ্যা, কি বললি ?

জয়ন্ত—ভয় পেলে কি তোদের বাড়ী যেতাম ? এত রাতে তোর সঙ্গে একা এখানে আসতাম ? তুইতো কাল বলেছিলি একটা বিশ্বাসকে বিশ্বাস করেই পাওয়া যায়।

মামুদ—(ছোরাটা দেখকে দেখতে) এঁ্যা হঁ্যা, হঁ্যা, ঠিকই তো বলেছি।

জয়ন্ত—আমার মনে হচ্ছে, তুই ভয় পেয়েছিস মামুদ।

মামুদ—(চমকে উঠে) না।

জয়ন্ত—হঁ্যা, তুই ভয় পেয়েছিস।

মামুদ—না।

জয়ন্ত—হঁ্যা।

মামুদ না। কিসের ভয়, কাকে ভয় ?

জয়ন্ত—তোর মনের মধ্যে একটা মারাত্মক সংকল্প আছে।

মামুদ—সংকল্প ! কিসের সংকল্প ?

জয়ন্ত—সেই সংকল্প তোকে তাড়া করে ফিরছে। তুই তার ভয়ে আতঙ্কিত। (ধমক দিয়ে) তুই ভয় পেয়েছিস।

মামুদ—(চেঁচিয়ে) না আমি ভয় পাইনি।

জয়ন্ত—বেশ, এবার তবে বাড়ী চল। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।

মামুদ—তোর ঘুম পাচ্ছে। আমার চোখে ঘুম নেই চোখদুটো জ্বালা করছে। এ ছোরাটার একটা সংকল্প আছে। ঠিক বলেছিস।

জয়ন্ত—ওটা মরচে ধরে গেছে। ধার নেই।

মামুদ—তাতে কি হয়েছে !

জয়ন্ত—আবার ধার দিয়ে নিতে হবে।

মামুদ—কি বললি—আবার ধার দিতে হবে ?

(নেপথ্যে নাজমা—দাদা, জয়ন্তদা)

মামুদ—(হঠাৎ চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল) নে তৈরী হয়ে নে, এক মিনিট সময় দিলাম। (ছোরা উঁচিয়ে দাঁড়াল)

জয়ন্ত—(হাসিমুখে বুক চিতিয়ে) আয়, আমি তৈরী।

(নেপথ্যে নাজমা—দাদা, জয়ন্তদা)

মামুদ—তৈরী। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিস। পালাবার সুযোগ দিয়েছিলাম পালাস নি। বোকা। হাতে ছোরাটা দিয়েছিলাম—ফেরৎ দিলি। বোকা। (মামুদ ছোরা হাতে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে) তোর হাতে অস্ত্র নেই। নে সাবলটা তুলে নে।

জয়ন্ত—দরকার নেই, আমার অস্ত্র বিশ্বাস।

মামুদ—বিশ্বাস। হা-হা-হা। খুনকে বদলা খুন।

(ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে নাজমার আর্ত চীৎকার—দাদা, জয়ন্তদা—থমকে দাঁড়াল। হাতটা থর থর কাঁপছে)

মামুদ—(বিভ্রান্ত) জয়ন্ত, আমার হাত কাঁপছে তুই পালাতে পারলি না। হাতে তোর কিছু নেই—আছে বিশ্বাস। আমার হাতে সেই ছোরা। পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি পারব না, পারব না। (কেঁদে ফেলে ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জয়ন্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে। নেপথ্যে নাজমা চিৎকার করতে করতে কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। চোখে জল মুখে হাসি।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীর চন্দ্র রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খাতা পত্র নিয়ে মন্মথর দোকানের কাছে আসতেই অভয় থমকে দাঁড়াল। দোকানঘর হাট করে খোলা—কেউ নেই। মন্মথদের বাড়ীর ভেতর ভারী গোলমাল হচ্ছে শুনল। মন্মথর গলাও শুনতে পেল। ওর বাবা যেন কি বলছেন গলা ফাটিয়ে, আর মন্মথও রেগে জোরে জোরে উত্তর দিচ্ছে।

অভয় ভাবল মন্মথদার হ'ল কি? গুটি গুটি পায়ে দোকানের কাছে এল, কিন্তু দোকানে ঢুকলনা। দোকানে তো কেউ নেই। তাই, এখন শূন্য দোকানে ঢোকা ঠিক কিনা তাই ভাবল অভয়। চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এদিকে ওদিক চাইল অভয়। না একটা লোকেরও দেখা সাক্ষাৎ নেই। এখন এই অসময়ে কোনও খরিদ্দারের আসবার কথাও নয়। কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে যাওয়ার পর, একসময় মন্মথ এসে দোকানে ঢুকল। গামছাখানা দিয়ে, বাতাস খেতে খেতে মন্মথ বলল, কিরে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? তা এসেছিস্ কতক্ষণ?

আয়—আয় উঠে আয়—

অভয় বলল, এত বেলা হয়ে গেল, এখনও স্নান খাওয়া সারনি মন্মথদা।

মন্মথ একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, হবে, কোত্থেকে? মনে হয়, অনেকক্ষণ এসেছিস্। বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়াও নিশ্চয়ই শুনেছিস্ না—সত্যি বলছি, এবার আমায় পথ দেখতে হ'বে বুঝলি অভয়। এখানে আর থাকা চলবে না। কোনমতেই আর থাকা চলবে না।

—কেন হল কি? বাবার সঙ্গে ঝগড়াই বা কেন?

মন্মথ হাসল। বিড়িতে দু চারটে টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল একটা কথা আছে না। কোথাও কিছু নেই ঠাকুর দেখলে। আমার তো এই সামান্য দোকান। দিনে কোনদিন একটাকা বা কোনদিন দশবার গণ্ডা পয়সা বিক্রী হ'ল। এতে কি সংসার চলে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয়না। এই-তো অবস্থা। এর ওপর বাবা আমাকে না জানিয়েই আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তাই ঝগড়া—

অভয় হেসে বলল, বাঃ,ভালই তো। দিব্বী লুচি সন্দেশ খাবো। অনেকদিন ভাল মন্দ খাইনি মন্মথদা। এখন তোমার বিয়ে হ'লে, একদিন পেটভরে লুচি সন্দেশতো খেতে পাব। মন্মথ বলল, একদিন লুচি মণ্ডা খেয়েই তো সারা জীবন চলবে না।

ঘাড়ের ওপর আর একটা বোঝা চাপলে ঘাড় ভেঙ্গে যাবে যে—। আর কি জানিস্। আর তো আমার

ওই—আয় তো বাড়ছেনা—কিন্তু খাওয়ার মুখ বাড়িয়ে আরও কষ্টে পড়তে কে চায়? বলি খাবো কি—বাসি আকার ছাই। অভয় বই কখানা একপাশে রেখে বলল, এখন চান খাওয়া করে নাও মন্মথদা। আমি বসি—

মন্মথ গায়ে তেল মাখতে-মাখতে বলল, হ্যাঁ বস্। তুই কিন্তু দেখে নিস অভয়, বিয়ে আমি করব না। যে দিকে দু চোখ যাবে, চলে যাব। যাবার আগে তোকে পেটভরে লুচি সন্দেশ খাইয়ে দিয়ে যাব। আমি ঠিক বলছি এদেশ ছেড়ে চলে যাব। রোজ রোজ সেই নেই নেই রব, সেই ঝগড়া গোলমাল আর সারাজীবন, এই বনের রাজ্যে থেকে নূন তেল বিক্রী করতে মন চায় না। আমার একটা পেট, যেমন করেই হোক চালিয়ে নেব। এ তুই দেখে নিস্—

অভয়ের মনটা খারাপ হ'ল। সন্দেশ বা সিনেমার নামেও কোন আনন্দ হ'ল না। এই বনের রাজ্যে একমাত্র মন্মথই যা লেখা পড়া জানে। আর যারা দু একজন আছে, তারা কোন কিছু বলে দেয়না—এমন সব হিংসুকে। তারা চায় না যে, আর কেউ লেখা পড়া শিখুক বা কোন উন্নতি করুক। তারা চায় সবাই যেন, ওদের মত হয়, এই গাঁয়ে সারা জীবন কাটাক। কিন্তু উপায় কি? এখনও জেঠাবাবুর কোন চিঠি-পত্র এল না। মন্মথ যদি চলে যায়—তখন কি হ'বে? অভয় আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে।

মন্মথ বলল, বুঝলি অভয়, এই পোড়া গাঁ ছেড়ে, তেড়ে ফুঁড়ে বেরুতে না পারলে জীবনে আশা নেই। উন্নতি যদি করতে চাস, তবে এদেশ থেকে পালা। হাঁ—পালিয়ে যা। তুই কখনও কলকাতায় গিয়েছিস?

অভয় বলল—কলকাতা। না। নামটাই শুধু শুনেছি। কার সঙ্গে যাব আর কোথায় বা থাকব। ঐ নবদ্বীপ পর্য্যন্ত আমার যাওয়া। বাড়ীর কাছে যে কালনা কাটোয়া, কেষ্টনগর তাও যাই নি। কে নিয়ে যাবে? আচ্ছা মন্মথদা দিল্লী বোম্বাই এসব অনেকদূর না—? আর খুব বড় সহর—না মন্মথদা? অভয় মন্মথর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।—দিল্লী? তা বড় হবেনা। ওটা যে ভারতের রাজধানী। খুব বড়—মস্ত বড়। দিল্লীতে আমিও যাই নি। শুধু লোকের মুখে শুনেছি। বুঝলি অভয়, থাকতে যদি হয়, তবে দিল্লীতেই থাকতে হয়। ঐ খানে একটা কিছু করতে পারলে—আঃ কি মজা। কাউকে যেন বলিসনে। আমার ইচ্ছা দিল্লী যাব। ওখানে অনাথ কাকা থাকেন। তুই তো অনাথ কাকাকে দেখিসনি। খুব ভাল লোক। অনাথ কাকা আমার আপন কাকা নন। তা না হ'লে কি হ'বে—আমায় খুব ভালবাসেন। আমি ওঁর ওখানেই যাব। কিন্তু খবর্দ্দার, এসব কথা আর কাউকে যেন বলিসনে।

অভয় বলল—সত্যি যাবে মোনাদা? তা কবে যাচ্ছ—

হেসে মন্মথ বলে, তার কি ঠিক আছে। যাব বললেই কি হুট করে যাওয়া যায়। টাকাপয়সা গুছিয়ে নিয়ে, একদিন সটকান দেব। তবে মাস দুইয়ের এদিকে তো নয়ই। অভয়ের বুক থেকে পাষান ভার নেমে গেল। এর মধ্যে জেঠাবাবুর কি কোন খবর আসবেনা? হ্যাঁ—নিশ্চয়ই এসে যাবে। অভয় বই খুলে, বসে বলে, তুমি যাও মোনাদা। চান করে ভাত খেয়ে এস। আমি ততক্ষণ পড়ি। গোটা কয় অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে হবে।

মন্মথ বলে—হ্যাঁরে তুই ভাত খেয়েছিস্—

—হুঁ—। সে অনেকক্ষণ—

মন্মথ বলল—নে এক কাজ কর। আমার সঙ্গে চাট্টি ভাত খা। কেনরে লজ্জা কিসের? কোন্ সকালে খেয়েছিস্ সে সব কবে হজম হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা ভাত না-খাস-তেল মাখিয়ে মুড়ি মুড়কী দিচ্ছি। গেলাসে খাবার জল থাকল। তুই বসে বসে খা। খবর্দার, খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কোন লজ্জা করতে নেইরে গাধা। আমি ততক্ষণে ছুটো খেয়ে আসি। অভয়ের সত্যই খুব খিদে লেগেছিল। কোন সকালে একটু কলাইয়ের ডাল আর কচু ভাতে দিয়ে ভাত খেয়েছিল। খিদেয় এখন পেট চুঁই চুঁই করছে। কিন্তু

গরীব মানুষের ছেলেদের অত খিদে লাগলে, মা বাবা কোথায় পাবে? অভয় তাই খিদে লাগলেই পেট-ভর্ত্তি করে জল খায়। মন্মথর দেওয়া তেল মাখা একথালা মুড়ি-মুড়কী দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। এত তেল চুব-চুবে মুড়ি খেতে মা কত ভালবাসেন। খোকন কতদিন মুড়কী খেতে চেয়েছে। এই একথালা মুড়ি মুড়কী একসঙ্গে কোনদিন তারা খায়নি। এযে তাদের একদিনের খাদ্য। অভয় খেতে খেতে ভাবতে থাকে, মোনাদা সত্যি কত ভাল। যদি কোনদিন সে রোজগার করতে পারে—সে মানুষ হয়, তবে এই উপকার কখনো ভুলবেনা। অভয় বার বার তাই মনে করতে থাকে। হঠাৎ খড়মের খটখট শব্দে সচকিত হয়ে অভয় দেখল, সামনে মন্মথর বাবা যুগলকাকা দাঁড়িয়ে। যুগলবাবুকে অভয় ভারী ভয় করে। ভারী বিশ্রী স্বভাবের লোক। যেমন ঝগড়াটে তেমনি হিংসুকে লোক 'দড়ার মত পাকানো পাকানো চেহারা মাথায় চুল নেই বললেই হয়। সেই চুলহীন মাথাটি জোড়া মস্ত টাক। কিন্তু কি বিশ্রী সেই মাথা। মাথায় বোধ করি কোনদিন তেল দেয় না—যেমন ময়লা-তেমনি অপরিষ্কার। চিমসে শুকনো মুখে হাসি নেই।

কদাকার কাল ঠোঁটের উপর শোভা পাচ্ছে একজোড়া কাঁচা পাকা জোয়াল গোঁফ। যুগলবাবু আড়-চোখে অভয়ের দিকে তাকিয়ে একটা বিশ্রী শব্দ করে বললেন—হেঁ—। বলি তুই অভয় নাকিরে? তা এখানে কি করছিস—অভয়ের মুড়ি খাওয়া অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছিল। আমতা আমতা করে বলল, এই পড়তে—আমি মোনাদার কাছে—।

—পড়তে? ঐ মোনাটার কাছে। এঃ পড়তে আসি খুব বড় পণ্ডিতের কাছে পড়তে আসিস।

কি আমার ছেলে উনি আসেন পড়তে। পড়তে এসে বসে বসে মুড়ি মুড়কী গিলছিস। কে দিল এসব? মোনা বুঝি। তা পয়সা দিয়েছিস—না ফোকটসে পরের জিনিষ একথালা মারছিস। বেটা আমার দানছত্র খুলেছেন। সর্বনাশ করবে আমার। ইদিকে একটা পয়সা চাইলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে আসে। বলে, পয়সা নেই—পাব কোথায়?

যুগলবাবু বিশ্রী ভাবে তাকিয়ে থাকেন অভয়ের দিকে। ওঁর কুটীল দুটি চোখ জলতে থাকে। গোঁপ-জোড়া বিশ্রীভাবে নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। মন্মথর আসতে তখনও দেরী আছে। যুগলবাবু এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলেন, এই ছোঁড়া, নে যুৎ করে এক কলকে তামাক সাজ দেখি। ঐ দেখ তামাক টিকে কলকে। কিন্তু খবর্দ্দার, তামাক সেজে আগুণ দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে, যেন দুই দমে কলকে কাঁক করে দিসনে। বলি, তামাক টামাক খাস তো—

অবাক হয়ে অভয় বলে—আমি—

একটা ধমক দিয়ে যুগলবাবু বলেন—হাঁ—হাঁ—লবাবপুত্তর তোকেই বলছি। বলি, তামাক টামাক খাস তো—আশ্চর্য্য হয়ে, অভয় বলে—ছিঃ তামাক খাব কেন?—ঈস—কি আমার গুড্ বয়রে—। বলি বিড়ি বার্ডসাই—টানিস তো—।

গম্ভীর হয়ে, অভয় বলল, নাঃ—

বকের মত পা ফেলে অভয়ের কাছে এসে, বললেন—দেখি তোর হাত। ইস্ কি আমার গুড্ বয়রে—। ইনি বিড়ি বার্ডসাই খান না। আমি বাবা মুখ দেখলেই, পেটের খবর বলে দিতে পারি। নে ভাল করে কলকেয় ফুঁ দে—।

যুগলবাবু ওর হাত থেকে কলকে নিয়ে হুঁকো টানতে থাকেন। এক এক সময় ৎোৎ করে ধোঁয়া গিলে, খক্ খক্ করে কেশে, ঘরের মাঝেই থুতু ফেলতে থাকেন। অভয় অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে, ভাবে, কি বিতিকিচ্ছি লোক। ভারী বিশ্রী ভারী-বিশ্রী। অভয় বেশ বুঝতে পারে, যুগলবাবু কি ধরণের লোক। তাতেই ছেলের সঙ্গে বনিবনা হয়না।

অভয় ভাবে, এমন লোকের সঙ্গে পৃথিবীর কোন লোকেরই বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়। নিরস মাধুর্য্যহীন

অতি-রূক্ষ কর্কশ কথাবার্ত্তা। এঁর চেহারা দেখলেই মনে বিতৃষ্ণা জাগে।

হঠাৎ তামাক খাওয়া থামিয়ে যুগলবাবু বলেন—দেখি তোর জামার পকেট। কাপড়ের খুঁট কাছা সব দেখা। অবাক হয়ে অভয় বলে—বাঃ—কেন —

—কেন? ওরে আমার গুড্ বয়রে। বলি, একা এতক্ষণ দোকানে বসে আছিস্। পয়সা টয়সা সরিয়েছিস কিনা তাই দেখছি হুঁ—হুঁ—বাবা, এযে ঘোর কলি কাল। নিজের ছেলেকেও বিশ্বেস নেই। আর তুই তো পর কোথাকার কে—। না—না দেখা—জামার পকেট—। দেখি জিভের তলা—হাঁ কর দেখি—।

রাগে অভয়ের সর্বশরীর জ্বলে উঠল। থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে বলল—কি ভেবেছেন আপনি। আমি কি চোর—। কি ভেবেছেন— যা তা বলছেন—

বিশ্রীভাবে মুখখানাকে আরও কুৎসিত করে, যুগলবাবু বললেন—এঃ তেজ দেখনা। উনি সাধু-পুরুষ একবারে ধম্যপুত্তুর যুধিষ্ঠির। ন্যাকা—ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেন না—আঃ মোলো যা—

মন্মথর খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। দোকানে ঢুকেই অভয়ের চেহারা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বলল—কিরে অভয় কি হ'ল। যুগলবাবু ছেলের দিকে একটা বিষ-দৃষ্টি হেনে; হুঁকা হাতে করে, খড়মের খট খট শব্দ করতে করতে একদিকে চলে গেলেন। মন্মথ অবাক হয়ে বলল—বাঃ কি হ'ল। বাবা তুমি কিছু বলেছ অভয়কে। কিন্তু যুগলবাবু তখন আর সেখানে নেই।

মন্মথ অবাক হ'য়ে বলল—কি হ'লরে অভয়। বাবা কি কিছু বলেছেন? মন্মথর কথায় অভয়ের দুই চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। এতক্ষণ যে অশ্রু, শুধুমাত্র মর্ম্মান্তিক অপমানে বরফের মত জমে ছিল, তা হঠাৎ মন্মথর একটি মাত্র সহানুভূতি মাখা কথায় গলে ঝরে পড়তে লাগল। মনে হ'ল কে যেন শিশির ভরা ফুলগাছে এই মাত্র নাড়া দিল। কাঁদ কাঁদ স্বরে অভয় বলল, যুগলকাকা বললেন, কাছা কোঁচার খুঁট দেখা—পকেট দেখা। বললেন, এতক্ষণ একলাটি—দোকানে আছিস্ নিশ্চয়ই পয়সা সরিয়েছিস্। আর—আর—একথালা মুড়ি খাচ্ছিস্ পয়সা দিয়েছিস্? মন্মথর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ থেকে বলল—এই সব কথা বাবা বললেন—? পয়সা চুরির কথা—মুড়ি খাওয়ার কথা—ছিঃ-ছিঃ। তবেই দেখ এমন লোকের সঙ্গে বাস করা যায়। সাধে আমি বলছি—চলে যাব এখান থেকে। যাকগে ওসব কথা। নে বের কর বই—অঙ্কগুলো দেখা—

বই খুলতে খুলতে অভয় বলল, কি করে উনি এসব কথা বললেন, তাই ভাবছি মোনাদা। মুড়ি খেতে দেখে বললেন, খুব ফোকটসে মাগনা মাগনা খাচ্ছিস আমাকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে নিয়ে বললেন—তুই বিড়ি খাস—তামাক খাস—। আরও কত কি—

মন্মথর আর অঙ্ক বোঝান হয় না। পেনসিল হাতে করে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে। আজ অভয়েরও পড়ায় মন বসতে চায় না। মনের ভিতরকার বাঁধা সুর যেন কেটে গেছে। বিশ্রী কথাগুলো এখনও কানের কাছে যেন বার বার ঘুরছে। অভয় ভাবে, আচ্ছা খারাপ লোক। যেমন বিশ্রী চেহারা, তেমনি বিশ্রী সব কথাবার্ত্তা। মনটাও ঠিক চেহারাখানার মত। অথচ ওরই তো ছেলে মোনাদা—। কিন্তু কি ভাল মন কি সুন্দর কথাবার্ত্তা—কি সুন্দর ব্যবহার।

মন্মথ বলল—বুঝলি অভয়। বাবা গুরুজন তাই গুরুজনের নিন্দে করতে নেই। তা বলে, যেটা সত্যি, তাতো বলতে হয়। আমার বাবার মনটাই খারাপ। এই দেখনা সেদিন যে ঝগড়া হচ্ছিল, তার কারণটা কি জানিস? এইতো সামান্য ছোট্ট দোকান। সারাদিন বসে বসে হয়ত একটা টাকা কিংবা দশ বার আনা বিক্রী হয়। লোকে এসে ধার চায়, ধারও দিতে হয়। বাবা কোন কিছু করেন না—সামান্য জমিতে যে ধান হয়, তাতে এতগুলো লোকের কিছু হয় না।

তিন চার মাসের পর সব ধান ফুরিয়ে যায়। এর ওপর একগাদা দেনা। এরই মধ্যে বাবা এক কাণ্ড করে বসেছেন।

অভয় বলল—সে আবার কি? কি কাণ্ড আবার করলেন—হেসে মন্মথ বলল, পাঁচশো টাকার বরপণ নিয়ে আমার ঘাড়ে একটা কালো মেয়ে চাপাতে চাচ্ছেন। বলে নিজে পাইনে খেতে—শঙ্করাকে ডাক—নিজেদেরই পেট চলে না—তখন আর একটা বোঝা—সাত তাড়াতাড়ি ঘাড়ে চাপাবার মতলব। ঐ পাঁচশ টাকার লোভ—তাতেই আমার সঙ্গে ঝগড়া।

অভয় বলল, তবে তুমি বিয়ে করছ না। আচ্ছা—ভাবলাম দু একদিন ভালমন্দ খাব—। তাও হ'ল না—

মন্মথ বলল, পাগল হয়েছিস। এই অবস্থায় কেউ বিয়ে করে। সাধ করে আবার কেউ বোঝা বাড়াতে চায়। এমনি তো ঘরে টেঁকা দায়। বিয়ের পর তবে আর বাড়িতে কাক চিল বসবে না। হাঁ তোকে বলেছি—পেট ভরে লুচি মিষ্টি খাওয়াবো—তোর আর আপশোষ থাকবে না।

অভয় বলল—দেখ মন্মথদা—এমনি এমনি খাওয়া আর বিয়ের খাওয়া কত তফাৎ। বিয়ের ব্যাপারই আলাদা। কেমন বরযাত্রী হয়ে ভীন দেশে যাব। নোতুন বউ আসবে বাজনা বাদ্যি কত কি হ'বে—তার মধ্যে খাওয়া দাওয়া এ এক আলাদা ব্যাপার—

মন্মথ যেন দুঃখিত হয়ে বলল, তুইও দেখছি বাবার দিকে। আরে গাধা, বিয়ে তো মাত্র একটা রাতের ব্যাপার। তারপর আমোদ আহ্লাদ বাজনা বাদ্যিও সব ফুরিয়ে যাবে। তারপর কি হবে ভাবিস। কোথায় চাল—কোথায় ডাল—শত রকমের বায়না—হাজার রকমের খরচ তা জানিস। উহুঃ—মরে গেলেও এ শর্মা ওপথে পা বাড়াবে না। এখন ঝাড়া হাত পা খাসা আছি। একদিন পুট করে চলে যাব—

মন্মথ কি ভেবে বলল, চ—কালকেই নবদ্বীপে যাব। তোকে সিনেমা দেখাব। কিন্তু ফিরব সেই শেষ ট্রেনটায়। তোর মাকে বলে যাবি। আমার কাল নবদ্বীপে একটা বিশেষ কাজ আছে।

অভয় বলল—তুমি তো নবদ্বীপে সপ্তাহে দু-তিন বার করে যাও। এত কি কাজ। মালপত্র আনতে নাকি?

—মালপত্র আর কত আনব বল? যা আছে তাই বিক্রী হয় না। মহাজনকে টাকা না দিলে, শুধু হাতে কি বার বার মালপত্র দেয়। আগের ধারের টাকা না মেটালে কি নতুন মালপত্র দেয়? তা নয়রে। আমি একটা জিনিস শিখতে চাই। উমেশ দরজীর দোকান আছে সেই দোকানে জামার ছাটকাট শিখতে যাই। কি করে সেলাই করতে হয়, কল চালাতে হয়, সার্ট, কোট, সায়া, ব্লাউজ এ সবের মাপ, কাটা এসব শিখতে যাই। জানিস আমার ইচ্ছে আছে, দরজীর কাজটা ভাল ভাবে শিখে নিয়ে, বিদেশে বেরিয়ে পড়ব। হাতের কোন কাজ জানা থাকলে, শুধু একটা কাঁচি আর ফিতে সম্বল করে, পেটের ভাত রোজগার করতে পারব। দরজীর কাজটা ভালমত জানা থাকলে বুঝলিনে, পেটের ভাতের অভাব হবে না।

অভয় যেন অবাক হয়ে যায়। ওর দুই চোখে অতি বিস্ময়ভাব ফুটে ওঠে। অভয় বলে—ও বাব্বাঃ তোমার পেটে অনেক বুদ্ধি আছে মন্মথদা। দরজীর কাজও শিখছ—দোকান চালাচ্ছ—আবার বই বাঁধার কাজও জান। এর মধ্যে যে কোন একটা করেই তো, তুমি টাকা রোজগার করতে পারবে মোনাদা—

হেসে মন্মথ বলল, ওরে অত সহজ নয়রে। টাকা রোজগার করা বড় কঠিন জিনিস। আর দরজীর কাজ শিখলেই, টাকা আসে না। দোকানে খুলতে অনেক টাকা চাই। থাকগে ও কথা—। কথা ঠিক থাকল—কাল যাবি। মাকে বলে রাখবি বুঝলি—

[৪]

অভয় ইতিপূর্ব্বে কখনও সিনেমা দেখেনি। নবদ্বীপ সহরে দু চার বার মাত্র এসেছে। বাবার সঙ্গে গিয়েছে এই মাত্র। বাজারের ভীড়ে ঘুরেছে—লোক-জনের বেচাকেনা দেখেছে ঝগড়া গোলমাল শুনেছে। হাট বাজার শেষ হ'লে, সস্তা তেলেভাজার দোকানে বসে, দু-চার আনার তেলেভাজা খাবার খেয়েছে এই মাত্র। গোপেশ্বর ছেলেকে বলেছেন—খোকা ঐ দেখ—ঐটে হিন্দুস্কুল। খুব বড় স্কুল—দেখছিস কত বড় বাড়ী—। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মস্তবড় দোতলা বাড়ী—কত বড় বড় ঘর। চারদিকে উঁচু পাঁচিল—মাঝে লোহার রেলিং দেওয়া মস্ত দরজা। ভেতরে কি সুন্দর বড় মাঠ—আর ফুলের বাগান। খুব বড় বড় চওড়া সিঁড়ি উঠে গিয়েছে, দোতলার দিকে।

অবাক হয়ে অভয় বলে—এটা বুঝি খুব বড় স্কুল? এটাই শুধু একটা স্কুল নাকি? না আর স্কুল আছে—

—আছে। এতবড় সহরে কি একটা স্কুল হয়। আরও অনেক কটা আছে। দেখছিসনে কত বাড়ী—কত লোকজন। তেমনি ছাত্রও অনেক। ছেলেদের স্কুলের মত, মেয়েদের স্কুল আছে। কলেজ আছে।

অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখে। অভয়ের বড় ইচ্ছা বাসে চড়ে। কিন্তু স্টেসন যেতে দুজনের ছ'আনা পয়সা ভাড়া লাগবে। কিন্তু শুধু শুধু সখ করে মোটর বাসে চড়ে ষ্টেসনে গিয়ে কি লাভ। ঐ পয়সা কটা থাকলে, তাদের একদিন চলে যায়। বাবার যে কি অবস্থা, তা অভয় ভালভাবে জানে। তাই বাবাকে বলতে অভয় চায় না। বাবাকে মনের ইচ্ছে বললেই, গোপেশ্বর তখুনি বলবেন, তাই চ খোকা বাসে করেই যাই। কিন্তু অভয় তা চায় না। আজ পর্য্যন্ত অভয় মোটর বাসে চড়েনি। অভয় বাবার সঙ্গে এসে মোটরে না চড়ুক, সিনেমা না দেখুক—এসব ছাড়াও অন্যান্য অনেক জিনিষই যোগেশ্বর ছেলেকে দেখিয়েছেন। মহাপ্রভুর বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছেন ছেলেকে, অভয় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে চৈতন্য দেবকে। ভক্তি ভরে প্রণাম করেছে। অভয় ইতিহাসে পড়েছিল মহাপ্রভুর কথা। একদা মা শচীদেবীকে কাঁদিয়ে, ঈশ্বরপ্রেমে বেরিয়ে পড়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সেদিন নিমাইয়ের দুটী চোখ শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণকে। সেদিন তাঁর সেই চোখের সম্মুখ থেকে সমস্ত বিশ্বজগৎ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ইহ জগতের সকল সুখ, দুঃখ, মায়া, মমতা —মা শচীদেবী, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া, সব ছিল তুচ্ছ। এক অসীম অনন্ত প্রেমের অমৃত পানের জন্য, যে জীবন গৃহের সকল বাধাবন্ধনকে ভেঙ্গে বেরিয়েছিল সেকি গণ্ডীবদ্ধ বদ্ধ জলাশয়ের জলকে পছন্দ করে? অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখেছে। কিন্তু মনে মনে কি জানি কেন, একটা শব্দ আচম্বিতে ক্ষণিকের জন্য জেগে উঠেছিল—উঃ কি নিষ্ঠুর। পরক্ষণে সে ভাবকে দমন করে, অভয় মনে মনে সহস্রবার ক্ষমা চেয়েছিল—হে ঠাকুর তুমি আমায় ক্ষমা কর। বহুদিন আগেকার একটি রাত্তের দৃশ্যের কথা ভেবে অভয় অত্যন্ত ব্যাথিত হয়েই ঐ কথাটি মনে মনে উচ্চারণ করেছিল।

সেই নবদ্বীপ আজ আর নেই—সেই সমাজ সেই শচীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, স্বয়ং মহাপ্রভু সবই কালস্রোতে কোথায় ভেসে গেছেন। কিন্তু কতদিন আগের কথা। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের সেই দৃশ্যটী, মাতা শচীদেবী, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার উদ্বেগ—দুঃখ—অশ্রু, আজ সমস্ত একত্রী-ভূত হয়ে দেখা দিল, এই ক্ষুদ্র বালক অভয়ের বুকে। তারই সেই অনন্ত দুঃখ ব্যথার বহিঃপ্রকাশ ধ্বনিত হল—বালকের অন্তরে—ঠাকুর তুমি কি নিষ্ঠুর—সব কিছু দেখার পর অভয় গোপেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করল—বাবা বল্লালসেনের বাড়ী কোনখানে ছিল কিন্তু বল্লালসেনের বাড়ী যে কোথায় ছিল, তার সংবাদ গোপেশ্বর রাখেন না।

—বল্লাল সেনের বাড়ী। এই নবদ্বীপেই যেন ছিল। এসব কি আজকের কথা বাবা। সব ভেঙ্গে চুরে গেছে।

মনে হয়, মা গঙ্গাই সে সব নিয়েছেন। অভয়ের মনে বহু প্রশ্ন জাগে। অভয় 'মৃণালিনী' বইখানা পড়েছিল। পশুপতির কথা মনে আছে। বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, রাজ্যের সেনাপতি পশুপতি। তার প্রতিফলও ভালভাবে পেয়েছিল পশুপতি। ইতিহাস বলে, মাত্র সতের জন, অশ্বারোহী আক্রমণ করে নবদ্বীপ দখল করে। কিন্তু এযে অবিশ্বাস্য কথা। তখন সেই নবদ্বীপের চারধারে ছিল ঘন আমবন। আমবনের আড়ালে ছিল হাজার হাজার যবন সৈন্য। ওদিকে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি পশুপতির লোভ আর লালসায় রাজার সমস্ত সৈন্যদল সেদিন বিপথে পরিচালিত হয়েছিল। অভয় শুনেছিল, নবদ্বীপের আর পাড়ে মায়াপুর ও বল্লালদীঘি। বল্লালসেনের রাজধানী নাকি ওখানেই ছিল। অভয়ের খুব ইচ্ছে হয়, বল্লাল দীঘি যেতে। সেদিন কথায় কথায় মন্মথই ঐ কথাটা বলেছিল। আরও বলেছিল, সরকারের লোকজন নাকি জায়গাটা খুঁড়ে, রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বের করেছে। অভয়ের বড্ড ইচ্ছে হয় বল্লাল সেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে। না—বাবাকে সে বলবে না। এসব জিনিষ বাবাকে বলে, বিশেষ লাভ নেই। তার বাবা, নানান জ্বালায় জ্বলছেন। দু বেলা দু মুঠো ভাতের সংস্থানের জন্য উদয়াস্ত খেটে মরছেন। এ কথা, সে মোনাদাকেই বলবে।

অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হ'ল অভয়ের। রাধাবাজার মোড়ে বাসখানা থামতেই, অনেক লোকজন নেমে গেল। মন্মথ আর অভয় ওরাও নেমে গেল। অভয়ের মোটর বাসে চড়ার ইচ্ছেটা মন্মথই পূর্ণ করল। ষ্টেসন থেকে, সারাপথ সে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। এর আগে, এত কাছে থেকে এই অদ্ভুত গাড়ী মোটর বাসকে সে দেখেনি। আজ গাড়ীতে বসে, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছে, চালকের হাতের গোলাকার চাকাটির দিকে। সর্ব্বক্ষণ ঐ গোল চাকাটা, একবার এদিক ওদিকে নাড়াচ্ছে লোকটা। ঐতো গাড়ী চালাচ্ছে। এক একবার ভয়ে, বসবার সিট্ আঁকড়ে ধরছে অভয়। সামনে দেখা গেল, আর একটা মোষের গাড়ী পাহাড় প্রমাণ পাট বোঝাই দিয়ে ধীরে ধীরে আসছে। ঐ তো সরু রাস্তা। আর পাট বোঝাই গাড়ীর পেছনে কয়লার গাড়ী আর ঘোড়ার গাড়ীর সার। ভয়ে অভয়, চোখবন্ধ করে মন্মথর একটা হাত জড়িয়ে ধরে কিন্তু নাঃ—কি আশ্চর্য্য গাড়িটা থেমে গেল। মোটর-খানা আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়লা বোঝাই গাড়ীর দিকে তাকিয়ে অভয় অবাক হয়ে যায়। এতো কয়লা—এ যে কয়লার পাহাড়। এত কয়লা কি হবে? অভয় জানে না—এ তো অতি সামান্য কয়লা। এ রকম বহু গাড়ী গাড়ী কয়লা দরকার।

রাধাবাজারে নেমে, মন্মথ বলে, সিনেমা আরম্ভ হতে এখনও দেরী আছে। দেখছিস্ কত বড় বাড়ী। এইখানেই বায়োস্কোপ হয়। এখন চ—একটু কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্। সামনে মস্ত বড় খাবারের দোকান। দোকানে ঢুকে অভয় অবাক হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে কত টেবিল চেয়ার টেবিলগুলো সাদা পাথর ঢাকা। এর মধ্যে কত লোক যে খাচ্ছে তা গুণে শেষ করা যায় না। লোকজন, কর্ম্মচারী, ক্রেতাতে সারা দোকান গম্ গম্ করছে। কত যে খাবার কত হরেক রকমের কত বিভিন্ন আকৃতির খাবার কাঁচের আলমারীতে সাজান রয়েছে। গম্ গম্ করছে একপাশে মস্ত বড় উনুন। ঝুড়ি ঝুড়ি, কচুরী, নিমকি আর সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে। ওপাশে চারজন লোক শুধু ময়দা ডলছে কেউ সিঙ্গাড়া কচুরী তৈরী করছে। সিঙ্গাড়া ভাজা হতে না হতেই তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। অভয় অবাক হয়ে যায়। মস্ত বড় কাঁচের আলমারী। বড় বড় থালায় কত রকমের সন্দেশ। অভয় দুই চোখ বড় বড় করে, তাকিয়ে থাকে। এমন সন্দেশ এমন খাবার এর আগেও কখনো দেখেনি। তাদের গাঁয়ে রথযাত্রার মেলা হয়। বড় বড় খাবারের দোকান আসে। সেখানে সে দেখেছে শুধু রসগোল্লা, বোঁদে,

জিলিপি আর তেলেভাজা খাবার। কিন্তু এ সব খাবারের আকৃতি আর গড়ন কত অদ্ভুত—আর কি সুন্দর। এ সব তো আগে কখনো দেখেনি নামও জানে না,—আর ওর স্বাদ যে কি তাও জানে না। এ সবই অদ্ভুত আর আশ্চর্য্য। পৃথিবীতে সন্দেশ মিষ্টির যে এত নাম আছে—এত বিভিন্ন আকার এত সুন্দর কারুকার্য্যময় হতে পারে, তা কোন দিনই তার ধারণাতে আসেনি। অভয় অবাক হয়ে ভাবে।

একসময় মন্মথর হাতের ঠেলায়, ওর চমক ভেঙ্গে যায়। মন্মথ বলে, কিরে খা—। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে—

অভয় অবাক হয়ে দেখে, মস্ত বড় কাঁচের ডিসে, কে যেন কখন খাবার দিয়ে গেছে। লুচি তরকারী কত রকমের মিষ্টি—।

অভয় বলে, ও বাব্বাঃ—এত খাব কি করে—মন্মথ বলল—অত আবার কোথায়? নে-নে সুরু কর। মন্মথ খেতে আরম্ভ করে। অভয় এদিক ওদিক তাকায় আর খায়।

মন্মথ বলে, আস্তে আস্তে খা। এটা রাজভোগ আর এই হ'ল বরফি। দেখছিস্ কেমন গোলাপ জলের সুগন্ধ। পেট ভরে খা। আর মিষ্টি নে—কি বলিস্।

—না-না খুব পেট ভরে গিয়েছে—

মন্মথ বলে, সে কিরে? এইটুকু খাস্ তুই। না-না-লজ্জা করিসনে। ছানার জিলিপি আর পানতোয়া খা—। খুব ভাল খেতে।

দোকানের ছোকরা চাকরটি ডিসে করে, পানতোয়া আর জিলিপি দিয়ে গেল।

অভয় বলল, মোনাদা—আজ তোমার অনেক খরচ হয়ে গেল।

—ওঃ তাই বুঝি। খরচের কথা ভাবিসনে। তোকে তো বলেছিলাম আমি, পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াবো। তারপর একদিন হুট্ করে বেরিয়ে পড়ব। আর আমায় দেখতে পাবিনে। আবার কবে আসব কোথায় যে যাব—কোথায় থাকব, তা জানেন ভগবান। বুঝলি অভয়, দেশে থাকলে আমি বাঁচব না। বুঝলি আমাদের জীবনটা কাটছে, পচা ডোবার মাঝে। দিনরাত আমরা পচা ডোবায় ডুবছি—আর উঠছি—। এতেই ভাবছি, আমরা বেশ আছি। কিন্তু এই কি বেঁচে থাকারে। পৃথিবীটা কত বড়—কত নানান্ দেশ নানান ধরণের লোকজন। এ সব কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। শোন্—যদি দরজীর কাজ ভাল করে শিখে নিতে পারি, তবে একখানা কাঁচি আর মাপের ফিতে হাতে করে বেরিয়ে পড়ব। একটা পেট তো ঠিক চলে যাবে।

অভয় বলল—মোনাদা তুমি একটা পাশ করেছ। এছাড়া অনেকগুলো বিদ্যেও শিখেছ। কিন্তু আমি কি করি তাই ভাবছি। কোন রকমে ম্যাট্রিকটা যদি পাশ করতে পারি, তবেই একটা রাস্তা পাওয়া যায়। এরপরে—মাটির ভাঁড়ে করে চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে, মন্মথ একটা বিড়ি ধরাল। একসময় খাবারের দাম দিয়ে, মন্মথ বলল—চ, মাল কটার ব্যবস্থা করে টিকিট কিনব। মাল কটা ঐ দোকানেই থাকবে। ওরা বাঁধা ছাঁদা করে রাখবে—যাবার মুখে নিয়ে যাব। চ—পান খাইগে। দোকানে মাল পত্রের ফর্দ্দখানা দিয়ে,ওরা সিনেমার সামনে এসে দাঁড়াল। উঃ—কি লোক—কি ভীড়।

মন্মথ বলল—দেখছিস্ কি ভীড়। তিন হপ্তা ধরে এই বই চলছে—তবুও ভীড় কমে না। না—কমদামী টিকিট পাওয়া যাবে না দুখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিগে। অভয়ের কানে কোন কথা ঢুকছে না। সে অবাক হয়ে, সব দেখছে। কি সুন্দর বাড়ী। বারান্দা—মেজে যে এত মসৃণ, মনে হয় পা পিছলে যাবে। সারা দেওয়ালে কত ছবি—। অভয় অবাক হয়ে, দেখতে থাকে। হঠাৎ কোথায় যেন বাজনা বেজে উঠল—গান সুরু হল। হুড়-হুড় করে লোকজন

আসছে। এমন তো কোনদিনই সে দেখেনি। এত লোক এত ভীড়। টিকিট কেনার জন্যে কি রকম সব ঠেলাঠেলি করছে। অভয়কে দাঁড় করিয়ে রেখে, মন্মথ বলল, এখানে দাঁড়া, আমি টিকিট কেটে আনি। অভয় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে অবাক হয়ে তাকায়। অভয়ের কেমন যেন লজ্জা আর ভয় ভয় লাগে। নিজের জামা কাপড়ের দিকে চেয়ে, লজ্জাও লাগে তার। কি সুন্দর সুন্দর কাপড় জামা পরে লোকজন এসেছে। মেয়েদের সাজ পোষাকের যেমন ঘটা—আর গায়ে কত গহনা। অভয় মেয়েদের দেখে অবাক হয়ে যায়। পায়ে জুতো হাতে ঘড়ি কি চমৎকার সব চেহারা—অনেকক্ষণ পর মন্মথ এসে বলল, আর দেরী নেইরে চ এখন বসিগে। ওর হাত ধরে মন্মথ এগুতে থাকে। দরজায় টিকিট দেখিয়ে হলের ভেতর ঢুকে পড়ে।

অভয় বলে, ও মন্মথদা—বড় অন্ধকার যে—

—আয়, আমার হাত ধর। একজন লোক ওদের চেয়ার দেখিয়ে দিল—এই আপনাদের সিট। পাশা-পাশি দুটো চেয়ার। অভয় অবাক হয়ে যায়। এর আগে ও কোনদিন সিনেমায় ঢোকেনি। অভয় শুধু চারধারে তাকায়। সব জানালা বন্ধ—দরজা বন্ধ কালো কালো পর্দা ঝুলছে দরজা জানালায়—ঘর আলকাতারার মত জমাট অন্ধকার। মাথার ওপর বন্ বন্ করে পাখাগুলো ঘুরছে—কোথায় ক্রীং ক্রীং করে শব্দ হ'ল।

অভয় বলে, কোথায় সিনেমা হ'বে মোনাদা—সব যে অন্ধকার—দেখব কি করে?

মন্মথ বলল, সামনে ঐ তো মস্ত পরদা—ঐ দিকে তাকা। ঐ আরম্ভ হচ্ছে—ঐ দেখ...। হঠাৎ অভয়ের কানে এল মেশিনের ঝক্ ঝক্ শব্দ...দোতলার কোনও ঘর থেকে একটা আলো পড়ল পরদার ওপর...তারপর—দুটো চোখ বিস্ফারিত করে, অভয় তাকিয়ে থাকে। এ-যেন রূপকথার দেশ। সব যেন সত্যি। সত্যিকার মানুষ যেন হাসছে—কথা বলছে। হু-হু শব্দে ট্রেন যাচ্ছে—কী ভীষণ বন—কোথাও পাহাড় কত মন্দির...

হঠাৎ একসময় মন্মথ বলল—এইবার আসল বই সুরু হল। বইখানার নাম "মায়ামৃগ"। খুব ভাল বই —মন দিয়ে দেখ—। মন্মথ আর কথা বলে না। অভয় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে, ছবি দেখতে থাকে। অভয়ের কাছে এ সব অদ্ভুত—ও অভিভূত হয়ে যায়। এমনটি আর কখনও দেখেনি। ওদের গাঁয়ের অনেকেই বায়স্কোপ দেখেছে। তারা বায়স্কোপের কত গল্প করে। কিন্তু অভয় প্রথমে এতটা উৎসাহী ছিল না। এরা সত্যিকারের মানুষ নয়। এরা ছায়া মাত্র। তাদের গাঁয়ে, বারোয়ারী তলায়, কোথাকার যেন এক যাত্রাদল এসেছিল। তাদের কথা অভয় আজও ভুলতে পারেনি। কিন্তু কি যে বই হয়েছিল, তা তার মনে নেই। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লেগেছিল, একটা ছোট ছেলের ভূমিকা। কি সুন্দর গান না সে গেয়েছিল। সে গান যেন আজও সে শুনতে পাচ্ছে। আর একটা লোককে তার খুব ভাল লেগেছিল। লোকটা কি রকম হাসাচ্ছিল—হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল। কিন্তু আজ যা দেখল, এর যেন তুলনা হয় না। হঠাৎ এক সময় আলো জ্বলে উঠল। দুই চোখ রগড়ে, চারদিকে তাকাল অভয়। একি এর মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল নাকি?

মন্মথ বলল—চা খাবি।

অভয় বলল—শেষ হয়ে গেল নাকি?

—না হাফ টাইম। কিরে ভাল লাগছে—ওই দেখ চাওয়ালা—নে চা খা। অভয়ের খুব মজা লাগছে—মাথার ওপর বন্ বন্ করে পাখা ঘুরছে—চারদিকে কত আলো—কত লোকজন। কিন্তু ওর ভয় না জানি কত রাত হল। আবার ট্রেন পাওয়া যাবে কখন কে জানে। ওর মনে শুধু খচ্ খচ্ করছে। এমন মজার ব্যাপার—সে একাই দেখছে। তার মা, খোকন, গীতা—এরা দেখতে পেল না। একা একা সে অমন খাবার খেয়েছে। বার বার মা, গীতা আর খোকনের কথা মনে হয়েছে।

তার ইচ্ছা হচ্ছিল—ঐ খাবার থেকে কিছুটা রেখে, বাড়ী নিয়ে যায়। কিন্তু ভারী লজ্জা লাগছিল। এক সময় আবার আলো নিভে যায়, সিনেমা সুরু হয়। অভয় অবাক হয়ে সামনের পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে থাকে। কোথা দিয়ে যে, সময় চলে যায়, তা তার খেয়াল থাকে না। তার সারা মন উধাও হয়ে যায়। ছবির গল্পের নায়ক নায়িকাদের সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নার ভেতর ও হারিয়ে যায়।

এক সময় সিনেমা শেষ হয়। চারদিকে আবার আলো জ্বলে উঠে। সবিস্ময়ে ছবির পর্দ্দার দিকে তাকায়। কোথায় গেল ওরা—। এত গান, কত কথা, কত হাসি—কত সুখ দুঃখের কথা সব গেল কোথায়? সামনের বোবা পর্দ্দাখানি শূন্য।

মন্মথ বলে—অভয় চল। আগে দোকানে যাই। মালপত্র বুঝে নিই। অভয় হাঁটতে থাকে। চোখের ওপর ভাসতে থাকে, "মায়া মৃগ" ছবির অদৃশ্য নায়ক ও নায়িকাদের মুখগুলো। মনে হয়, সব স্বপ্ন সবই যেন কী এক অতি অদ্ভুত আশ্চর্য্য জগতের কথা। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য জগৎ কি সত্যি কোথাও আছে? সত্যি কি এমনি হয় নাকি? ওর সমস্ত মন এক অদ্ভুত ভাবের বন্যায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ক্রমশঃ

পরব্রহ্ম, মুক্তি ও মানবীয় চিন্তা ব্যবস্থা সমূহ

অনুবাদক—শ্রীঅরবিন্দ বসু

[শ্রীঅরবিন্দের—"The Hour of God" গ্রন্থে প্রকাশিত "Purna Yoga—Para Brahma, Mukti and Human thought Systems" শীর্ষক নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

পরব্রহ্ম হলেন নিরপেক্ষ (absolute) এবং যেহেতু তিনি নিরপেক্ষ সেইহেতু তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে নামিয়ে আনা যায় না। তুমি অনন্তকে জানতে পার কিন্তু নিরপেক্ষকে জানতে পার না। সৎ বা অসৎ এর মধ্যে সকল বস্তুই হ'ল আত্মচেতনায় বা চিদাত্মায় সৃষ্ট নিরপেক্ষর প্রতীক। পরাৎপরকে তার প্রতীকের দ্বারা ততটাই জানতে পারা যায়, প্রতীকগুলি যতটা তাকে প্রকাশ করে বা তার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু সমস্ত প্রতীকের সমগ্র যোগফলও নিরপেক্ষর প্রকৃত জ্ঞানের সমান হয় না। তুমি পরব্রহ্ম হতে পার কিন্তু তুমি পরব্রহ্মকে জানতে পারনা। পরব্রহ্ম হওয়ার অর্থ হল—আত্মচেতনার মধ্য দিয়ে পরব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন করা। কারণ এখনও তুমি তৎ, শুধু তুমি আত্মজ্ঞানে শব্দে বা প্রতীকে নিজেকে বাইরে প্রক্ষেপ করেছ পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে যার মাধ্যমে তুমি বিশ্বকে ধারণ করে আছ। সুতরাং শব্দ (terms) বা প্রতীক শূন্য পরব্রহ্ম হতে হলে বিশ্বের বাইরে তোমাকে লীন হয়ে যেতে হবে।

যে-পরব্রহ্ম স্বকীয় প্রতীকশূন্য তা হলে তুমি এখন যা নও তেমন কিছু হবে না, সমগ্র বিশ্বের ক্রিয়াও থেমে যাবে না। তার মানে শুধু এই যে, পরমেশ্বর প্রকট চৈতন্যের মহাসাগর থেকে তাঁর নিজের প্রসরণের একটি ধারা বা গতিকে ফিরিয়ে দেন তাতে যার থেকে সকল চেতনা উদ্ভূত হয়েছিল।

যাঁরা বিশ্বাত্মক চেতনার বাইরে চলে যান তাঁরা যে সকলেই পরব্রহ্মে যান এমন নয়। কেউ কেউ অব্যাকৃত প্রকৃতিতে যান, অন্যেরা ভগবানের মধ্যে লীন হন। কেউ কেউ প্রবেশ করেন বিশ্বের বোধহীন প্রকাশ শূন্য (অসৎ, শূন্য) এক অন্ধকার অবস্থায়। আবার কেউ কেউ বিশ্বের সম্বন্ধে বোধহীন প্রকাশময় আলোকজ্জ্বল অবস্থায়—শুদ্ধ অদ্বৈত আত্মায় বা শুদ্ধ সৎ বা বিশ্বের সমূলে,—অন্যেরা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে, চিৎ বা সৎ এর তত্ত্বে একটা সাময়িক সুষুপ্তির অবস্থায়। এসবগুলিই মুক্তির প্রকারভেদ এবং অহং ভগবানের মায়া বা প্রকৃতির কাছ থেকে যে-কোনও একটির দিকে যাবার প্রবণতা পায় যার দিকে পরমপুরুষ তাকে চালিত করতে চান। যাঁদের তিনি মুক্ত করতে চান তথাপি জগতে রাখতে চান, তাঁদের বিধি জীবনমুক্ত করেন বা পুনরায় তাঁদের জগতে প্রেরণ করেন তাঁর বিভূতিরূপে, তাঁরা দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবিদ্যার এক সাময়িক আবরণ গ্রহণ করতে রাজী হন কিন্তু তা' তাদের বদ্ধ করতে পারেনা এবং তা তারা অতিসহজেই ছিন্ন করতে কিংবা ত্যাগ করতে পারে।

সুতরাং পরব্রহ্ম হওয়ার লালসা একটা আলোকময় মোহ, বা মায়ার সত্ত্বিক লীলা; কেননা কেউই বদ্ধ নয়, মুক্ত নয়, এবং কারও মুক্ত হবার প্রয়োজনও নেই, আর সবই ভগবানের লীলা, পরব্রহ্মের বিকাশের খেলা। ভগবান কোনও বিশেষ বিশেষ অহং এর মধ্যে এই সাত্ত্বিক মায়া ব্যবহার করেন তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যের ধারায় তাঁদেরকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণের জন্য এবং তা-ই হল ঐ সব ব্যক্তিদের পক্ষে একমাত্র সঠিক এবং সম্ভাব্য পথ।

কিন্তু আমাদের যোগের লক্ষ্য বিশ্বে জীবমুক্তি। জগতে মুক্ত হয়ে আমাদের বাস করতে হবে। জগতের বাইরে মুক্ত হয়ে নয়, আমাদের মুক্ত হবার প্রয়োজন আছে সেই কারণে অথবা অন্য কোনও কারণে নয়, কিন্তু আমাদের মধ্যে ভগবানের এই অভিপ্রায়—সেই জন্যেই। (জগতে মুক্ত হয়ে আমাদের বাস করতে হবে।)

পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আত্মসংসিদ্ধির জন্য জীবন্মুক্তকে পরব্রহ্মের—প্রান্তদেশে স্থিত হতে হয় কিন্তু তা অতিক্রম করতে হয় না। সেই সীমা থেকে তিনি যে বিবরণ নিয়ে ফিরে আসেন তা' হ'ল এই যে, 'তৎ' আছে এবং আমরাও 'তৎ', কিন্তু 'তৎ' কি বা কি নয়,—বাক্য যেমন তা বর্ণনা করতে পারেনা, মন তেমনি পারেনা তাকে নির্ণয় করতে।

পরব্রহ্ম নিরপেক্ষ বলে কোন নির্দিষ্ট নাম বা ধারণার দ্বারা তাঁকে বর্ণনা করা যায় না। তা 'সৎ' নয়, অসৎও নয়; কিন্তু এমন কিছু সৎ ও অসৎ দুই-ই যার প্রাথমিক প্রতীক; আত্মা, অনাত্মা বা মায়া নয়: ব্যক্তি বা নৈর্ব্যক্তিক নয়, গুণ বা নির্গুণ নয়, চৈতন্য বা অচৈতন্য নয়; পুরুষ বা প্রকৃতি নয়; দেবতা, মানুষ বা পশু নয়; মুক্তি বা বন্ধন নয়; কিন্তু এমন কিছু এ-সবই যার প্রাথমিক বা তার থেকে প্রাপ্ত সাধারণ বা বিশেষ প্রতীক। তবুও, আমরা যখন বলি,—পরব্রহ্ম ঈদৃশ বা তাদৃশ নয়, তার মানে হ'ল—তৎ তার স্বরূপে, একটি বা অন্য কোনও প্রতীক বা সব প্রতীকের সমষ্টির দ্বারা সীমিত নয়। এক হিসাবে পরব্রহ্মই সবকিছু এবং সবকিছুই হল পরব্রহ্ম আর কিছুই নেই যা এই সব হতে পারে। নিরপেক্ষ বলে পরব্রহ্ম যুক্তিতর্কের অধীন নয় কেননা ন্যায়ের প্রয়োগ শুধু বিশিষ্টের (determinate) ক্ষেত্রে। যদি আমরা বলি নির্বিশেষ (absolute) 'বিশেষ' কে অভিব্যক্ত করতে পারেনা সুতরাং বিশ্ব মিথ্যা বা অসৎ তা'হলে আমাদের সেই উক্তি হবে বিশৃঙ্খল চিন্তার প্রকাশ। নির্বিশেষের স্বরূপই হল এই যে, আমরা জানিনা,—তা কি বা কি-নয়, তা কি করতে পারে বা পারেনা; আমাদের এ-রকম ধারণা করার কোনও হেতুই নেই যে, এমন কিছু আছে যা তা করতে পারেনা কিংবা তার নির্বিশেষতা (নিরপেক্ষতা) কোনও রকম অপারংগমতার দ্বারা সীমিত। আমাদের এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয় যে, আমরা যখন সব কিছুকে অতিক্রম করে যাই তখন আমরা একটি নির্বিশেষ বিন্দুতে উপনীত হই, আমাদের এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয় যে বিশ্ব হল ক্রমোন্মীলনের গতি ধারায় একটি প্রকাশ যা নির্বিশেষ থেকে সম্ভূত। কিন্তু এ-সকল শব্দ ও বাক্যাংশ হল—অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করতে বুদ্ধিগত উক্তি মাত্র। আমরা যা দেখি তা' যতটা পারি ভাল করে বিবৃত করব, কিন্তু অপরে যা দেখে বা বিবৃত করে তার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই, বরং আমরা তা' গ্রহণ করব এবং তারা যা' দেখেছে ও বর্ণনা করেছে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে তার স্থান নির্দেশ করব ও তার ব্যাখ্যা করব। যারা অপরের দৃষ্টি (vision) অথবা তাদের বিবরণের স্বাধীনতা ও মূল্য অস্বীকার করে তাদের সঙ্গেই আমাদের বিরোধ; যারা নিজেদের দৃষ্টির বিবরণ দিয়ে সন্তুষ্ট তাদের সঙ্গে নয়।

বিশ্বে সত্তার যে ব্যবস্থা ভগবান আমাদের কাছে আমাদের সত্তার অবস্থা (status of being) বলে প্রকট করেছেন, যে কোনও দার্শনিক বা ধর্মীয় মতবাদ হল তার একটা বিবরণ মাত্র। আমরা যতক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে কর্ম করি ততক্ষণ আমাদের মন যাতে কিছু অবলম্বন করতে পারে সেই কারণে এ রকম বিবরণ করা হয়। কিন্তু অপরের সাক্ষাৎ দৃষ্টি (vision) যে ভাবে সাজানো হয় আমাদের দর্শনও যে ঠিক সেই ভাবেই সাজানো হবে তার কোনও প্রয়োজন নেই; আমাদের মনের গঠনের উপযুক্ত চিন্তা ব্যবস্থা যে, ভিন্ন ভাবে গঠিত অন্য কোনও মনের উপযোগী হবে—তাও নয়। সুতরাং আমাদের নিজস্ব মতে অন্ধ গোঁড়ামিহীন দৃঢ়তা, এবং সকল মতের সম্বন্ধে দুর্বলতাহীন

সহিষ্ণুতা আমাদের বুদ্ধিগত দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত। এমন অনেক বিরোধী পক্ষের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে যারা তোমার চিন্তা ব্যবস্থার প্রতিবাদ করবে এই কারণে যে, একটি বা অন্য কোনও শাস্ত্রের সঙ্গে, একটি বা অন্য কোনও মহান প্রামাণ্যের (authority) সঙ্গে তোমার চিন্তা ব্যবস্থাগুলির কোনও সঙ্গতি নেই,—সে অর্থারিটি দার্শনিক বা সাধু বা অবতার যাইহোক না-কেন।—তাহলে মনেরেখ যে, কেবলমাত্র উপলব্ধি ও অনুভূতিরই বাস্তবিক গুরুত্ব আছে। কোনও মতবাদের স্বপক্ষে শঙ্কর কি যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন কিংবা বিবেকানন্দ বুদ্ধি দিয়ে সত্তা সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছিলেন, এমনকি রামকৃষ্ণ তাঁর বহুল ও বিচিত্র উপলব্ধির থেকে কি বলেছিলেন,—সে সকলের ততখানি মূল্য আছে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যতখানি তুমি গ্রহণ করতে পার এবং নিজের অভিজ্ঞতায় আবার নূতন করে পেতে পার। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের, সাধু অথবা অবতারদের অভিমত স্বীকার করা উচিত সূত্র হিসাবে, বন্ধন হিসাবে নয়। তুমি যা দেখেছ বা ভগবান তাঁর বিশ্বাত্মক ব্যক্তিত্বে অথবা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বা কোনও উপদেষ্টা গুরু বা দিশারীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত ভাবে,—যোগের পথে তোমাকে যা প্রদর্শন করাতে সংকল্প করেন—তোমার পক্ষে তাই প্রয়োজনীয়।

ভগবান বা পরাপুরুষ হলেন—এক বিশেষ ধরণের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অভিমুখীন অব্যক্ত ও অপ্রকাশ্য পরব্রহ্ম, যাঁর দুটি চিরন্তন বিভাব হল আত্মা ও জগতি বা বিশ্ব। আত্মা নিজের প্রতীকে বিশ্বে সর্বভূত হয়, তেমনি বিশ্বও যখন জ্ঞাত হয় তার সব প্রতীক আত্মায় পর্যবসিত করে। ভগবান যেহেতু পরব্রহ্ম সেইহেতু তিনি স্বয়ং নিরপেক্ষ পরাৎপর, আত্মা বা মায়া অথবা অনাত্মা নন, তিনি সৎ বা অসৎ নন, সম্ভূতি বা অসম্ভূতি, সগুণ বা নির্গুণ, চৈতন্য অথবা জড়ও নন; পুরুষ বা প্রকৃতি নন, আনন্দ বা নিরানন্দ নন, মানুষ, দেবতা অথবা পশু নন। তিনি এ-সব কিছুর অতীত এ-সব কিছুই জগৎরূপে তাঁর দ্বারা বিধৃত ও তাঁর অন্তর্গত। তিনিই এই সব এবং এ-সব কিছুই তিনিই হয়েছেন।

পরব্রহ্ম ও পরাপুরুষের একমাত্র প্রভেদ হ'ল এই যে, প্রথমটির সম্বন্ধে আমরা এই বুঝি যে, এটি হল আমাদের বিশ্বসত্তার অতীত। এখানে প্রকট বটে কিন্তু তবুও অপ্রকাশ্য; আর দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হল এই যে, এটি আমাদের বিশ্বের সমীপে প্রসরণশীল কিছু, অপ্রকাশ্য হলেও এখানে প্রকট এ যেন রামায়ণ বা হোমরের ইলিয়ডের কোনও অনুবাদ পড়তে গিয়ে কোনও অনুবাদক যা ধরতে পারেন না সেই অনধিগম্য 'বিষয়টুকুর দিকে লক্ষ্য রেখে বলি,—"এ-রামায়ণ নয়, ইলিয়ড্ নয়", তবুও কিন্তু তা মূলের ভাব ও অর্থের কিছুটা তুলনামূলকভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে দেখে বলি, "এ বাল্মীকি, এ হোমর।" দৃষ্টিভঙ্গীর এই ভিন্নতা ছাড়া এর মধ্যে আর কোনও প্রভেদ নেই। উপনিষদ-গুলি পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন, "তৎ" এবং যখন পরা পুরুষ-এর কথা বলেন, তখন বলেন 'স'।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপরাহ্ন একটার সময় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করিলাম। সেই সময়ে বহুরকম ভাবাবেগে আমার হৃৎপিণ্ড ভীষণভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে ইংল্যাণ্ডের কথা শিশুকাল হইতে পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এবং সেই ইংরেজজাতি যাহার সঙ্গে বিধাতার অভিপ্রায়ে আমরা মিলিত হইয়াছি, আমি এখন সেই ইংল্যাণ্ড এবং সেই ইংরেজদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি যে ইংরেজদের স্বপরিবেশে আসিয়া দেখিতে পাইব, এবং যে সব গুণের জন্য বর্তমানে তাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিকটে আসিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইলাম, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিতেছি যে, এইক্ষণে সম্ভবতঃ আমি আমার স্বদেশে জাতিচ্যুত হইয়াছি। যে পুরাতন পল্লীগ্রামে [২৪ পরগণার শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে] আমাদের বংশ চারিশত বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি (১২৫৪ সালে, খৃঃ ১৮৪৭), যেখানে আমার শৈশব কাটিয়াছে, সে স্থানকে আমি আর আমার বলিয়া মনে করিতে পারিব না। সেই আমার জানালার দিকে চাওয়া বেঁটেখাটো পুরাতন আম গাছটি,যাহার দিকে তাকাইলেই যেন আমাকে বলিত, "আমি তোমার পিতাকে এখানে জন্মিতে ও মরিতে দেখিয়াছি, আমি তোমার পিতামহকে দেখিয়াছি। আমি এখানে তোমার সাতপুরুষের জন্মমৃত্যু দেখিয়াছি"—সেই গাছ তাহার ছায়ায় আমাকে আর দেখিতে না পাইয়া সম্ভবতঃ দুঃখবোধ করিবে। পরিবারের জ্যেষ্ঠগণ, যাঁহাদের কোলেপিঠে মানুষ হইলাম, তাঁহারা এক্ষণে আমাকে অপবিত্র বলিয়া দূরে পরিহার করিবেন। কিন্তু আমার নিজের জন্য আমি দুঃখিত নহি, যাহাদের সঙ্গে আমার ভাগ্য একত্রে জড়িত, তাহাদের জন্যও আমার দুঃখ নাই। আমি আমার দেশবাসীর অযৌক্তিক সংস্কারের জন্য দুঃখিত। যে বিশ্বাস আন্তরিক, তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকিলেও আমি নৈতিক ভীরুতা এবং অসৎ বিরোধিতাকে ঘৃণা না করিয়া পারি না; যাঁহারা হিন্দুর বিলাত যাওয়ার বিরোধী, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে তাঁহারা খুব উচ্চস্থানীয়। এবং তাঁহারা স্বদেশে রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের সকল বিধিবিধান পদদলিত করিয়া থাকেন, অপেক্ষাকৃত অল্প অগ্রসর প্রদেশে—বম্বাইতে, পঞ্জাবে, রাজপুতানায় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এই ক্ষতিকর কুসংস্কার ইতিমধ্যেই দূর হইয়াছে। বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিলে যুবকদের জাতিচ্যুত করার অনিষ্টকর প্রথা একমাত্র অধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত বঙ্গদেশেই আছে। আমরা এক শতাব্দী কাল ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়াছি, এবং পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাতেও যদি আমাদের মত ক্ষয়প্রাপ্ত জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ যে কত বেশি দরকার এই প্রাথমিক সত্যটি আমরা না শিখিয়া থাকি তাহা হইলে এই এমন চরম অনুকূল অবস্থাতেও আমাদের প্রগতিপথের এই মন্থর গতির জন্য

দেশের ইংরেজ শাসকেরা দুঃখ বোধ না করিয়া পারেন না। আমি বৈষয়িক কোনও সুবিধালাভের জন্য এখানে আসি নাই। কুসংস্কারের বিপরীত যে স্রোত এখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই স্রোতে আমি এক বিন্দু জল যুক্ত করিব ইহাই আমার অভিপ্রায়। প্রকৃতির অমোঘ বিধান এই স্রোতের অনুকূলে। প্রতিদিন ইহার শক্তি বাড়িতেছে। এবং সে সময় অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, যখন বর্তমানের যাঁহারা স্রোতের মুখ ঘুরাইয়া দিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের অবস্থা, অসহায় বিধবাদের যাহারা স্বামীর চিতায় পুড়াইয়া মারিতেন তাঁহারা এখন হিন্দুসমাজের চোখে যেমন, তেমনি ঘৃণ্য হইবে।

আমরা জাহাজ হইতে নামিবামাত্র আমাদিগকে তত্ত্বাবধানের জন্য যে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার হেপাজতে চলিয়া গেলাম। তিনি খুবই চতুর এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মালপত্র শুল্ক অফিস পার হইয়া আসিল, এবং আমরা রেলগাড়িতে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হইলাম। লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে আসিতে আমাদের আধঘণ্টা লাগিল। এখানে ব্লুমসবেরিতে অবস্থিত "মিউজীয়াম হোটেল" অভিমুখে যাইবার জন্য ঘোড়াটানা ক্যাব লইলাম। লণ্ডন পার হইবার সময় সর্বদিকের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রত্যেকটি জিনিস ঝকঝকে তকতকে—পথ বাড়ি দোকান—সব। পথে কোথাও দুর্গন্ধ নাই, কোথাও জঞ্জাল জমে নাই। দোকানের কাঁচের জানালাগুলি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কাঠ বা পিতল এবং লোহা দোকান বা বাড়ি তৈরিতে যাহা কিছু লাগিয়াছে, সবই ঘষামাজার গুণে আয়নার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে। দরজার সিঁড়িগুলি পর্যন্ত নিয়মিত সাবান জলে ধোয়ার ফলে চকচক করিতেছে। দোকানের ভিতরের জিনিসগুলি সুরুচি-সঙ্গতভাবে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্থানে রক্ষিত। লণ্ডন কি রকম, তাহা কলিকাতার এসপ্লানেড অঞ্চল দেখিলে আংশিক অনুমান করা যাইবে। সভ্য দেশের নগর কিরূপ হওয়া উচিত এসপ্লানেড দেখিলে তাহারও কিছু পরিচয় মিলিবে। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। আমাদের ধর্মের বিধানসমূহে অনেক দিক হইতেই হিন্দুদিগকে পৃথিবীর পরিচ্ছন্নতম জাতিদের অন্যতম রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু আমরা এ বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতও সে সব বিধি সব সময়ে নহে। সে সব বিধিবিধানের উপর ধর্মের আবরণ পড়াতে তাহার বাস্তব রূপটি আমরা দেখি না, তাহা দেখিতে পাইলে আমরা সে সব নিয়মকে বেশি শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম। খুব অল্পদিন হইল আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ধূলা, নোংরা জিনিস বা অস্বাস্থ্যকর জল হইতে বিপজ্জনক সব ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জানা বুদ্ধির দিক হইতে জানা। হাতেকলমে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পবিত্রতম শাস্ত্র অনুযায়ী যে জল আত্মার পক্ষে পরম কল্যাণকর, সেই জল দেহের পক্ষে অতি মারাত্মক। স্যানিটারি বা স্বাস্থ্যের জন্য যে পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক, সে বিষয়ের নির্দেশগুলি ব্যাপকভাবে পালন করিলে বিরাট পরিমাণ দুঃখদুর্দশার হাত হইতে আমরা বাঁচিতে পারি। বিজ্ঞান যদি সত্য হয় তাহা হইলে, তাহাকে অবহেলা করাতে যে পরিমাণ নিষ্ঠুর হত্যালীলা আমাদের মধ্যে সংঘটিত হইতেছে কে তাহার পরিমাপ করিবে? ব্যাপকভাবে প্রতিনিয়তই যে ভ্রাতা-ভগিনী-পুত্র কন্যা-বন্ধু ও প্রতিবেশীদের হত্যা করা হইতেছে! যাহাদের মৃত্যু আমাদের বেদনার কারণ তাহাদিগের অনেককে কি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম না? ইহার উত্তরে যাহা বলা হইবে তাহা যেন আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। তাহা হইলে আমরা আমাদের ঔদাসীন্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া ব্যাধির বিলম্বিত ব্যর্থ নিরাময়ের চেষ্টা না করিয়া ব্যাধির প্রতিষেধ ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। যাহাতে ব্যাধি না হয় তাহা করিতে পারিতাম। আকবর কিংবা পিটার দি গ্রেটের মত জবরদস্ত শাসক থাকিলে

আমাদের যা জানা উচিত, তা জানিতে ও শিখিতে বাধ্য করিতে পারিতাম।

আমরা হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানেও সেই একই পরিচ্ছন্নতা। বসিবার ঘরের দেওয়ালগুলি ছবির দ্বারা সাজান, ম্যান্টলপীস সুদৃশ্য চিনা-মাটির পাত্র ও গেলাসে সাজান, আগুনের পাশে অ্যামেরিকা ও আফ্রিকা হইতে ক্রীত ঘাসফুলের শীষের সাজ, মেঝেতে মোটা কার্পেট, কারুকার্য খচিত সোফা ও চেয়ার সমস্ত ঘরে অনেক রহিয়াছে, এবং প্রকাণ্ড ভারী টেবিল ঘরের মাঝখানে রক্ষিত,তাহার উপরে ছবির অ্যালবাম ও লিখিবার সরঞ্জাম সমূহ রহিয়াছে। শুইবার ঘরে, কফি-ঘরে, ডাইনিং ঘরে একই জাতীয় রুচির প্রকাশ। মনে রাখা প্রয়োজন যে এটি খুব উচ্চশ্রেণীর হোটেল নহে। যে সব বণিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পল্লীবাসী শহরে অল্প দিন বাস করিতে আসে শুধু তাহারাই এখানে থাকে। ল্যাণ্ডলোর্ড ও তাঁহার পরিচারিকাগণ আমরা উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের তত্ত্বাবধানে লাগিয়া গেল, হোটেলে যাহারা ছিল তাহাদের প্রতি মনোযোগ দিতেছি দেখিয়া তাহারাও গর্ব অনুভব করিতে লাগিল, এবং প্রত্যেকেই আমাদের সম্মুখে তাহাদের গুণপণা প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহার যাহা কিছু গুণ আছে সে সবের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইলাম। ইহাদের মধ্যকার একজন নাম স্বাক্ষর দেখিয়া কোনো ব্যক্তির চরিত্র বলিয়া দিতে পারে। সে তাহার বিদ্যা দেখাইবার জন্য আমাদের নাম সই করিবার উদ্দেশ্যে একখণ্ড কাগজ অমাদের সম্মুখে রাখিল। জাহাজে থাকিবার কালে শুভাধ্যায়ী অনেক ইংরেজ বন্ধু আমাদের লণ্ডনের প্রতারকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছিলেন। অতএব যখন আমাদের স্বাক্ষর চাওয়া হইল তখন বেশ কিছু ভয় পাইলাম। ভাবিলাম ইহার পিছনে জালিয়াতির উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব। আমার বম্বাইয়ের বন্ধু মিস্টার গুপ্তকে বলিলাম আপনি আগে সই করুন। মিস্টার গুপ্তে মিস্টার ইউ সি মুখার্জিকে কনুয়ের ঠেলা মারিলেন, মুখার্জি আমাকে ঠেলা মারিলেন। আমাদের ইতস্তত: ভাব দেখিয়া অটো-গ্রাফ-প্রার্থী একখানি পকেট বুক বাহির করিয়া দেখাইলেন তাহাতে শত শত ব্যক্তির স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের সন্দেহ আরও বাড়িয়াই গেল। সিঁদেল চোরও সততা প্রমাণের জন্য তাহার সিঁদকাঠি দেখাইতে পারে। যাহাই হউক শেষ পর্যন্ত মরীয়া হইয়া আমাদের নাম স্বাক্ষর করিলাম। সুখের বিষয় অদ্যাবধি আমাদের কোনো অনিষ্ট হয় নাই। পরে অভিজ্ঞতা যাহা হইয়াছে তাহা হইতে এইখানে বলা উচিত মনে করি যে, আমি আমাদের সন্দেহের কথা কিছু বাড়াইয়া বলিয়াছি।

পরদিন আমরা প্রদর্শনীতে গেলাম। ডক্টর ওয়াট আমাদের পূর্বেই ভারত হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছি-য়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। তিনি সন্ধ্যাবেলা আমাদের তাঁহার বাড়িতে লইয়া গেলেন এবং অক্সফোর্ড স্ট্রীটের থেকে দূরে অবস্থিত ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ ও হোয়াইট হল প্যালেস দেখাইলেন। পথটি দৈর্ঘ্যে কুড়ি মাইল, পথের এক অংশের নাম অক্সফোর্ড স্ট্রীট, লণ্ডনের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত অবধি পথটি অনেকগুলি নামে বিভক্ত। জীবনে যতগুলি সেতু দেখিয়াছি তাহার মধ্যে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজটি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমরা ৭ই এপ্রিল (১৮৮৬) তারিখের হিমেল সন্ধ্যায় সেই অপরূপ সুন্দর সেতুটির উপর দাঁড়াইয়া যখন নিম্নে প্রবাহিত টেমস নদীর রূপালী জল দেখিতেছিলাম, তখন সেই দৃশ্যের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিসত্তা যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেতুটি দৈর্ঘ্যে ১১৬০ ফুট প্রস্থে ৮৫ ফুট, এবং দুইধারে পায়ে চলার পথ ১৫ ফুট করিয়া প্রশস্ত। লণ্ডনে বাস কালে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে এই সেতু হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে এমন খবর পড়িয়াছি। আমরা হোয়াইট হল প্রাসাদের দৃশ্য ক্ষণকালের জন্য মাত্র দেখিয়াছি, এবং প্রথম চার্লস-এর যে স্থানে শিরশ্ছেদন করা হইয়াছিল তাহার নিকটস্থ জানালাটাও দেখিয়াছি।

আমরা প্রতিদিনই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যাবেলাটা আমরা লণ্ডন শহর দেখিতে বাহির হইতাম। একদিন প্রিন্স অভ ওয়েলস আসিলেন প্রদর্শনী দেখিতে। সার ফিলিপ কানলিফ ওয়েন আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রিন্সকে বেশ সদাশয় মনে হইল, তিনি আমাদের সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমরা সার জর্জ বার্ডউডের সঙ্গেও পরিচিত হইলাম। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভারতবন্ধু। আমাদের সাহিত্য আমাদের ধর্ম এবং আমাদের প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। মনে হয় আমাদের দেশের কারুশিল্পের সঙ্গে তিনিই বিদেশীদের মধ্যে সর্বাধিক তথ্যজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ দি ইনডাষ্ট্রিয়াল আর্টস অভ ইণ্ডিয়ার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা ভারতীয়দের প্রতি এবং তাহাদের কর্মনৈপুণ্যের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে ভরা। ইউরোপের লোকদের নিকট ভারতীয় শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে এই বই বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছে। আমরা ইংল্যাণ্ডে সার জর্জ বার্ডউডের তত্ত্বাবধানে ছিলাম, এবং তিনি সর্বদা আমাদের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইংরেজদের সমাজের শ্রেষ্ঠ দিকটি তিনিই আমাদিগকে দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয় তিনি বর্তমানে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত আছেন। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থে অনেক তথ্য জানা যাইবে বলিয়া মনে করি।

ভূগর্ভস্থ রেলপথেই আমরা এ সময়ে অধিকাংশ সময়ে যাতায়াত করিতেছিলাম। লণ্ডনের এটি একটি বিস্ময়। মেট্রোপলিটান রেলওয়ে ও ডিষ্ট্রিক্ট রেলওয়ে—এই দুটি প্রতিষ্ঠান ইহার মালিক। এই রেলওয়ে ইনার সার্কল ও আউটার সার্কল-এ বিভক্ত। প্রথমোক্তটি ঘনবসতি-পূর্ণ মধ্য লণ্ডনে অবস্থিত—খিলান করা ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গের ভিতর দিয়া লাইন স্থাপিত। স্টেশনগুলি বাহিরে নির্মিত, যদিও উপরের জমি হইতে নিচের স্তরে, চওড়া সিঁড়ির সঙ্গে উপর নিচে যুক্ত। দুটি সার্কল-এ ৪৮টি স্টেশন আছে। সকাল সাড়ে সাতটা হইতে বেলা সাড়ে বারো অথবা একটা পর্যন্ত প্রতি তিন মিনিট অন্তর ট্রেন। প্রত্যেকটি যাত্রী বোঝাই। কয়েকটি স্টেশন বেশ বড়, এই সব স্টেশনে তিন অথবা চারটি প্ল্যাটফর্ম আছে, এখান হইতে ট্রেনগুলি বিভিন্ন দিকে যায়। কোনও স্টেশনে বিভিন্ন দিক হইতে আসা দুই-তিনটি পর্যন্ত ট্রেন এক সঙ্গে দেখা যায়। এঞ্জিনের শব্দে যাত্রীদের চলাফেরার তৎপরতা ইত্যাদি মিলিয়া খুবই একটা কর্মব্যস্ততার মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে। তাহা না দেখিলে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের মত এখানে যাত্রীরা চিৎকার করে না। রেল স্টেশনে অথবা সাধারণের মিলন স্থানে, এমন কি বাড়িতেও সবাই চাপা স্বরে কথা বলে। আমাদের উচ্চ স্বরে কথা বলা অভ্যাস, তাহাতে এখানে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরিয়াছিল, যদিও মুখে কিছু বলে নাই। বুঝিতে পারিলাম উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করাই ভাল। বোর্ডে লেখা "এইখানে প্রথম শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন", "এইখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন", "এইখানে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন"। এই সমস্ত নির্দেশ প্ল্যাটফর্মের এক এক অংশে ঝোলান আছে। যাত্রীরা প্রয়োজন মত সেই সেই বিভাগে অপেক্ষা করে, এবং ট্রেন আসিলে সম্মুখেই তাহাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর গাড়ি দেখিতে পায়।

স্টেশনগুলি বিজ্ঞাপনে ভরা। এত, যে, দুটি বিজ্ঞাপনের মাঝখানে এক ইঞ্চি স্থানও ফাঁকা আছে কি না সন্দেহ। এই বিজ্ঞাপনে প্রথমে বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। একটি স্টেশনের নাম মনে হয় "পিয়ার্স সোপ" অথবা "কলম্যানস মাস্টার্ড"। গাড়িগুলির ভিতরেও বিজ্ঞাপনে ভরা। মানুষ জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বোধ করে সেসমুহের মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা

শস্তা সেই সব জিনিসের বিজ্ঞাপন এগুলি। এবং অদ্ভুত সব ছবি আঁকিয়া গুণাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে। যে অমৃত পানীয় দ্বারা হতভাগ্য মানবজাতি তাহাদের পার্থিব দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পারে, তাহা অবশেষে চেরি ব্র্যাণ্ডির ভিতর পাওয়া গিয়াছে। এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে অপূর্ব ছবি আছে তাহাতে দেখা যায় এক হটেনটট (দক্ষিণ আফ্রিকার এক জাতীয় আদিবাসী) দম্পতি ঐ অমৃত পান করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মুখেচোখে একেবারে স্বর্গীয় দীপ্তি। শাদায় কালোয় যে জাতিভেদ এ বিষয়ে কত না অভিযোগ শোনা যায়। কৃষ্ণকায়দের আর ভয় নাই, শ্বেতকায়রা তাহাদের আর বর্ণবৈষম্যের জন্য খাইয়া ফেলিবে না, কারণ একবার মাত্র পিয়ার্স সোপ মাখামাত্র কৃষ্ণতম ব্যক্তিরও মুখ শ্বেতকায়দের মত হইবে। বিজ্ঞাপন শিল্পে মিস্টার পিয়ার্স ওস্তাদ ব্যক্তি। পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ ইহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। যেখানেই যাই পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপন হইতে মুক্তি নাই। এমন কি 'পেনি' মুদ্রাগুলিতেও পিয়ার্স সোপ নামক যাদু-মন্ত্রটির ছাপ দেখা যাইবে। ক্রমাগত 'পিয়ার্স সোপ'-এর বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে কত লোক পাগল হইয়া গিয়াছে, কে জানে? মিস্টার পিয়ার্সের সাবান ব্যাপক বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাপকভাবে বিক্রি হওয়া উচিত। রেল স্টেশনে, রেলগাড়িতে, এবং যে সব প্রাচীরে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে সেখানে পিয়ার্স সোপ, পথে বড় বড় বোর্ডে পিয়ার্স সোপ, স্যাণ্ডুইচ বালকেরা (পিঠের দুই ধারে বিজ্ঞাপন বহনকারী) পথে পথে ঘুরিতেছে পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপন লইয়া, ওম্‌নিবাসে পিয়ার্স সোপ, স্টীমারে পিয়ার্স সোপ, সব স্থানে পিয়ার্স সোপ! বিজ্ঞাপন-দাতাদের মতে এই বিজ্ঞাপনের খরচ বহু কোটি ক্রেতার মধ্যে ভাগ হইয়া যায় বলিয়া প্রতি ক্রেতার ভাগে সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পড়ে। কিন্তু সেই ভগ্নাংশ যে কত, তা আমাদের জানিবার উপায় নাই। বহু লোক এই বিজ্ঞাপনের কাজে নিযুক্ত আছে। ছাপাখানার লোক, এনগ্রেভার, স্যাণ্ডুইচ বালকেরা এবং অন্যান্য ছাড়াও যে সব এজেন্ট এই কাজের ভার নেয়, তারাও এতে যথেষ্ট উপার্জন করে। ইহারই জন্য নূতন নূতন পেন্টের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে, নূতন টাইপ, নূতন বোর্ড এবং নূতন যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

রেল স্টেশনের কি নাম তাহা জানিতে হইলে আলোর দিকে তাকাইতে হইবে, সেখানে কাঁচের উপর তাহা লেখা রহিয়াছে। এই পথে এতগুলি ট্রেন যাতায়াত করা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যবস্থা, সম্পাদনা এমন মনোযোগের সহিত করা হয় যে দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। অমরা ঐখানে উপস্থিত থাকাকালে ভূগর্ভস্থ রেলপথে এক জার্মান ভদ্রলোকের মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ট্রেন চলিবার সময় তাঁহার মাথা জানালা দিয়া বাহির করিয়া অন্য কামরার যাত্রীদের দেখার বদ্ অভ্যাস ছিল। একবার কিসে মাথায় ধাক্কা লাগিয়া কিছু আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি সতর্ক হন নাই। শেষ বার যখন তিনি জানালার বাহিরে মাথা গলাইয়াছেন সে সময়ের খিলানের একটি প্রলম্বিত পাথরে গুঁতা লাগিয়া মাথাটি প্রায় চূর্ণ হইয়া গেল। এই দুর্ঘটনার তিন দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুরঙ্গ পথের রেলওয়ে ছাড়াও বহু সাবার্বান ও প্রাদেশিক রেলওয়ে লণ্ডনের চারিদিকেই বর্তমান রহিয়াছে। লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশন হইতে গ্রেট ঈস্টার্ণ রেলওয়ে ক্যামব্রিজ ও অন্যান্য স্থানে গিয়াছে। কিংস ক্রস হইতে স্কটল্যাণ্ডের দিকে গিয়াছে গ্রেট নর্দার্ন রেলওয়ে। প্যাডিংটন হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে। ইউস্টন রোড হইতে ম্যানচেস্টার-লিভারপুল-স্কটল্যাণ্ডে গিয়াছে লণ্ডন অ্যাণ্ড নর্দার্ন রেলওয়ে। ইউস্টন রোড হইতে স্কটল্যাণ্ডের দিকে গিয়াছে মিডল্যাণ্ড রেলওয়ে। লণ্ডন চ্যাটহ্যাম অ্যাণ্ড ডোভার রেলওয়ে ইংল্যাণ্ডের সহিত অস্টেণ্ড ও ক্যালের পথে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে যুক্ত করিয়াছে। লণ্ডন ব্রাইটন অ্যাণ্ড সাউথ কোস্ট রেলওয়ে পোর্টসমাথ-এর দিকে গিয়া নরম্যাণ্ডির পথে লণ্ডনের

সঙ্গে প্যারিসকে যুক্ত করিয়াছে। সাউথ ঈস্টার্ন রেলওয়ে ফোকস্টোন ও ডোভার গিয়াছে, সেখান হইতে বুলয়েন, ক্যালে ও অস্টেণ্ড প্রভৃতি স্থানগামী ডাকবাহী স্টীমারের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছে।

শহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি বহু ওমনিবাস চলাচল করে। ওমনিবাসগুলি আকারে বড়, ভিতরের আসনগুলি গদি আঁটা, উপরতলায় বেঞ্চ। ট্রামগাড়ির মত ইহারা নিয়মিত সময় ধরিয়া পর পর যাতায়াত করে, এবং ঘোড়ায় টানে। এই বাস রেলের উপর চলে না। দুটি সুরঙ্গ পথের রেলওয়ে কম্পানি বৎসরে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রী বহন করে। ওমনিবাস বহন করে ? কোটি ৮০ লক্ষ যাত্রী। ইহা ভিন্ন টেম্‌স নদীতে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর লণ্ডনের কর্মব্যস্ত অংশের একধার হইতে অন্যধার পর্যন্ত স্টীমবোট ছাড়ে। চেলসী হইতে লণ্ডন ব্রীজ এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা কর্মচঞ্চল জনসমাগমে পূর্ণ। এই বোটগুলি মাঝখানে বিশেষভাবে নির্মিত কয়েকটি স্থানে থামে। এগুলি স্টেশনের কাজ করে। লণ্ডনের পথের ক্যাবগুলি কি তাহা বুঝাইবার জন্য আমি যদি আমাদের দেশের ছ্যাকড়া গাড়ির সঙ্গে এগুলির তুলনা করি তাহা হইলে ক্যাবের অপমান করা হইবে। এবং তাহাতে যে ধারণার সৃষ্টি হইবে তাহাও একান্তই ভ্রমাত্মক। এক কথায়, ক্যাব খুব উচ্চশ্রেণীর চারচাকার গাড়ি, শক্তিশালী সুপুষ্ট উজ্জ্বল ঝকঝকে দেহধারী ঘোড়ায় এগুলিকে টানে। ইহার সঙ্গে কলিকাতার কঙ্কালসার ঘোড়ায় টানা জীর্ণ, নোংরা, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির তুলনা করা চলে না। ভারতবর্ষে বলদ যে কাজ করে এখানে সেই কাজ দীর্ঘাঙ্গ দৃঢ় পেশীযুক্ত ঘোড়ায় করিতেছে দেখিলে ভারতীয়ের চোখ জুড়ায়। ইহারা ক্ষেত্রের যাবতীয় কৃষিকাজে লাগে, ট্রাক টানে (যাহা আমাদের গোরুর গাড়ি করে) এবং খালে নৌকা টানে। রুটি অথবা মাংস যাহারা গাড়িতে করিয়া বিলি করে তাহাদের গাড়িটানা ঘোড়া খুব সুদর্শন না হইলে তাহা তাহাদের পক্ষে সম্মানজনক বোধ হয় না। দুচাকার গাড়িকে হ্যানসম বলে। লণ্ডনে ১৩০০০ এর বেশি হ্যানসম আছে। ভিড়ের পথে একের পর এক এমন বিরামহীনভাবে চলিতে থাকে যে তখন রাস্তা পার হওয়া বিপজ্জনক বোধ হয়। সেজন্য অনেক ক্রসিং-এর স্থানে খানিকটা স্থান পথের মাঝখানে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে যাহাতে পথচারীরা অর্ধেক পথ পার হইয়া এইখানে কিছুক্ষণ দম লইতে পারে। এখান হইতে পরে সুবিধামত পথের অপরার্ধ পার হয়। এত রকমের এবং এত বেশী সংখ্যক যানবাহন এবং তা সব সময়েই যাত্রীপূর্ণ, তাহাতে মনে হইতে পারে পথগুলি বোধ হয় পথচারীশূন্য। আদৌ তাহা নহে। পথে এত লোক পায়ে হাঁটিয়া চলে যে, এবং তারা তাদের অভ্যস্ত রীতিতে ভারতীয়দের তুলনায় এমন দ্রুত চলে যে, দুজন লোকও পাশাপাশি এক সঙ্গে হাঁটিয়া যাইবার জায়গা খুব বেশি পায় না, অথচ তাহারা পাশাপাশি চলে, একজন আর একজনের পিছনে সারিবদ্ধ অবস্থায় চলে না। পথ চলিতে পরস্পর গুঁতোগুঁতি হয় না। অথবা আমরা যেমন করি, দুজন বিপরীত দিক হইতে আসিয়া মুখোমুখি হইলে কে কোন দিক ছাড়িয়া দিব তাহা ভাবিতে কিছু সময় নষ্ট হয়, এখানে তেমন ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ এখানে পথচারীরা পথের ডান ধার দিয়া চলে এবং যানবাহন বাঁয়ের ধার দিয়া চলে। পথের দুই ধারেই পথচারীরা গাড়ির বিপরীত মুখে চলে, তাই তাহাদের কখনও পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আগতকে পাশ কাটাইতে হয় না।

কর্মে চঞ্চল ব্যস্তত্রস্ত বহু মানুষের ভিড় যে কি বস্তু তাহা দেখিতে হইলে লণ্ডন শহরে সকাল নয়টা হইতে দশটার মধ্যে গিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আমাদের দেশে মেলা হয়, সেখানেও হাজার হাজার লাখ লাখ লোকের ভিড় হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের এই সব ভিড় কেমন যেন প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয়। কারাগারের বন্দীরা বাধ্যতামূলক কাজ করিবার সময় যেমন নিষ্প্রাণ চোখে তাকায়, অথবা ভারতের যে সব অংশে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রথা প্রচলিত সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের মুখের চেহারা যেমন, ভারতীয়দের সাধারণ মুখের ভাবেরই

সেগুলি কিছু পরিবর্ধিত সংস্করণ। ভারতীয়দের ভাগ্যে-সমর্পিত মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইবে এ মুখের মালিক বহু চিন্তার পর স্থির করিয়াছে তাহার জন্মিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, সে এ সংসারে আসিয়াছে নীরবে অন্যায় সহ্য করিবার জন্য, ইহা যেন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিয়া গিয়াছে। ক্ষুদে রাণা অথবা ইউরোপীয় ট্যুরিস্টদের ঝামপান বহন করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত মোট-বাহীরা হিমালয়ের খাড়া পথে উঠিবার সময় যেমন কাতর ভাবে পরিশ্রম করে, সেও তেমনি সমস্ত জীবন বন্দীর মত কাজ করিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে উচ্চস্তরের ভারতীয় বুদ্ধিজীবী, প্রকৃতির শক্তির কাছে পরাভূত হইয়া, নিজের গড়া এক কল্পজগতের আশ্রয়ে বাস করে এবং সেই জন্যই তাহার মন অসুস্থ হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই মানসিক অসুস্থতা ক্রমশই বিষাক্ততর হইতে থাকে, এবং কোনও ব্যক্তি যদি প্রথমজীবনে দেশের নেতৃস্থানীয় হইবার মত উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া থাকে তবে তাহার এই মানসিক অসুস্থতা ব্যাপকভাবে দেশের কল্যাণের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠে। বয়স বৃদ্ধিতে তাহার সম্মান বাড়ে এবং ছোটরা তাহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মনে করে, তা সে কথা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে যত অসম্ভব অবাস্তব অথবা অনিষ্টকরই হউক না কেন। আসলে সমস্ত জাতিটাই একটা মানসিক ধর্মভ্রষ্টতায় ভুগিতেছে, আমার স্বদেশবাসীরা ইহাকেই বলিয়া থাকেন চরম ধর্মানুবর্তিতা। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাহাদের দৃষ্টি প্রাণহীন। এইখানে ৬৩২ একর পরিমাণ ক্ষুদ্র স্থানটি, যাহা 'সিটি' নামে অভিহিত, সেই-খানে সকালে আসিয়া ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ আন্তরিকতাপূর্ণ বাস্তব জীবনের প্রবল বেগে প্রবাহিত স্রোতের দৃশ্যটি না দেখিলে কোনও হিন্দুর পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই স্থানটুকুতে প্রতিদিন আটলক্ষ নরনারী এবং সপ্ততি সহস্র শকট ছুটিয়া চলে। এটি পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড, ইহা হইতে পৃথিবীর দিকে দিকে ধমনীসমূহ বিস্তৃত হইয়া বাণিজ্য-শোণিত শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ইহারই প্রেরণায় গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে এস্কিমোরা হিমশৈলের ভিতর সীল শিকার করিতেছে, তিমি শিকারীরা মেরু সমুদ্রে জীবন বিপন্ন করিতেছে, চীনারা পাহাড়ের ঢালু দেহ হইতে চায়ের পাতা ছিঁড়িতেছে, আফ্রিকাবাসীরা সীমাহীন মরুবুকে উটপাখীর দলকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। এখানে ভাগ্য তাহার নিজ প্রাপ্য পায়, গুণ তাহার পুরস্কার পায়, কেহ ঐশ্বর্যলাভ করে, কেহ বা নিঃস্ব হয়, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় কত কে তাহার হিসাব করিবে?

এই জনস্রোতে ধনী ব্যাঙ্কারকে দেখা যাইবে, যিনি অতি কঠিন সংগ্রামের পথে চলিয়া আজ সাফল্যের পথে প্রশান্তমুখ। তিনি সৎ পথে, পরিশ্রমের পথে, মিতব্যয়িতার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার একটা বাঁধা পথ ছিল, একটি কর্মপদ্ধতি ছিল, এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা কি করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন এবং কোনও সুযোগই তিনি ছাড়েন নাই। তিনি যে উচ্চ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা দৈবাৎ হয় নাই। হইয়াছে তাঁহার অদম্য ইচ্ছার জন্য, ইচ্ছার শক্তির জন্য। তিনি এখন প্রশস্ত উদ্যানযুক্ত প্রাসাদতুল্য বাড়ির মালিক। এ বাড়ি শহরতলীতে অবস্থিত। পাহাড়ী অঞ্চলে তাঁহার সুরক্ষিত মৃগদাব আছে। তাঁহার সন্তান-দের শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ গভারনেস রাখা হইয়াছে, মেয়েদের পরিচর্যার জন্য সুইস পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁর পরিবার রাজভোগ আহার করিয়া থাকেন, খাইবার টেবিলে ভোজ্য উপকরণগুলি দেখিলেই তাহা জানা যায়। একদিনের ভোজনের নমুনা দিই। প্রাতরাশের জন্য মাংস (হ্যাম) ও ডিম, সোল-মাছ, মটন-চপ, ভীল কাটলেট, অক্স-টাং, নানা জাতীয় রুটি, সব্জী চা ও কফি। ব্যবসায়ী লোক বলিয়া প্রাতরাশ অন্য ধনী গৃহস্থের তুলনায় কিছু পূর্ব্বেই (সকাল ৮-৩০) শেষ হইয়া যায়, এবং কিছু ক্রুততন্ত্রের সঙ্গে। উক্ত ব্যাঙ্কার সিটির একটি রেস্টোরাণ্টে লাঞ্চ খাওয়া শেষ করেন। পরিবারের অন্যান্যরা অপরাহ্ণ দেড়টার সময় বাড়িতে

যে লাঞ্চ খান, তাহার তালিকা এইরূপ—ইম্পীরিয়াল স্যুপ, স্যামন মাছের মেয়োনেজ (ডিমের কুসুম, জলপাই তেল ও ভিনিগার অথবা লেবুর রস দিয়া প্রস্তুত এক-প্রকার সস্, অন্য খাদ্যের সঙ্গে মিশাইয়া খাইবার চাটনি বিশেষ), স্যামন মাছের আচার, গলদা চিংড়ির স্যালাড, ইয়র্ক হ্যাম, ট্রাফলসহ কবুতর মাংসের পাই, (ময়দার খোলসে ট্রাফল নামক ছত্রাক সহ পুর রূপে ব্যবহৃত ভাজা), মেষশাবকের ফোরকোর্টার (সম্মুখ মাংস), বীফ-এর সিরলয়েন (মধ্য পার্শ্বদেশের মাংস); ভিকটোরিয়া জেলি, স্ট্রবেরি ক্রীম, ফ্রেঞ্চ পেস্ট্রি, ভেনিস্ ব্রেড, ম্বাউট কেক, (পূর্বকালে উৎসবে ব্যবহৃত গুরুপাক কেক) ভোজনের শেষ পর্বে আনারস ও ফিলবার্ট-নাট। এতৎসহ হক, ক্লারেট, শেরী ও শ্যামপেন প্রভৃতি সব পানীয়। বৈকালের চা সাদাসিধা, অর্থাৎ চায়ের সঙ্গে শুধু রুটি, কেক, কিছু ঠাণ্ডা মাংস ও জিভের মাংস। অতঃপর ৭টায় ডিনার। ডিনারে পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসেন। ডিনারের খাদ্যতালিকা—কচ্ছপ মাংসের স্যুপ, টার্বট মাছ ও গলদা চিংড়ির চাটনি, সোল মাছের ভাজা খণ্ড, ভেনিসনের (হরিণের) পিছন দিকের মাংস, মেষের পিছন দিকের মাংস, বীফের রোস্ট সিরলয়েন, রোস্ট ডাক্, সিদ্ধ মুর্গীছানা, আনারসের ক্রীম, ফলের মাসেডোয়ান (নানা কাটাফলের মিশ্রণ), কেক, চীজ, বিস্কুট, আঙুর, ফুটি, ফিলবার্ট (বাদাম জাতীয়) ওয়ালনাট; শ্যামপেন, শেরী হক, ক্লারেট, এবং পোর্টওয়াইন পানীয়। মহিলাগণ বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, ছুঁচের কাজ করিয়া অথবা ইংরেজী, জার্মান অথবা ফরাসী নভেল পড়িয়া সময় কাটান। মেয়েদের শিক্ষায় জার্মান ও ফরাসী ভাষা অপরিহার্য। তিনি তাঁহার প্রথম দুইটি কন্যাকে শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে পাঠাইয়াছেন, ছোট জন হাইডেলবার্গে আছে, কারণ জার্মানীতে শিক্ষাগ্রহণ বর্তমানের একটি ফ্যাশান। একটি কন্যা ভাষাবিদ্ রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ফরাসী ও জার্মান ছাড়াও সে স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান ভাষা ভাল তাহার কিছু দখললাভ হইয়াছে। পরিবারের আরও দুইজন মহিলা উচ্চ বিজ্ঞানে শিক্ষিতা। এই শ্রেণীর মহিলারা সাধারণতঃ একটুখানি কঠোর প্রকৃতির হইয়া থাকেন, ইহাদিগকে বলা হয় "ব্লু স্টকিং।"

ডিনারের পরে ব্যাঙ্কারের বৈঠকখানায় সময় কাটে সর্বাপেক্ষা সুখের। এক সন্ধ্যার বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। ডিনার শেষ হইবামাত্র সকলে এই কক্ষে আসিয়া মিলিত হইলেন। ঘরের একধারে অগ্ন্যাধার—সেখানে সমস্ত ঘরকে উষ্ণ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, প্রত্যেকেই তাহাতে আরাম বোধ করিতেছেন, বাহিরের অন্ধকার সেই পরিবেশকে আরও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, কারণ সেই অন্ধকারে সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া সবেগে বায়ু বহিতেছে এবং প্রবল তুষারপাত হইতেছে। যেখানে একটুখানি আড়াল, সেইখানেই তুষার আশ্রয় লইতেছে। দেরিতে ফেরা পিতাকে একটি মেয়ে দরজা খুলিয়া দিতেছে। গৃহকর্ত্রী পরিবারের সমাবেশ-স্থলের শীর্ষে বসিয়াছেন, চেয়ারে বসিয়া তিনি সূচীকার্য চালাইতেছেন, ছোটরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, কেহ মেঝের উপরে, কেহ সোফার উপরে, কেহ বেঁটে চেয়ারে; কুকুরটি ঘুমাইয়া আছে, ছোটরা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছে, বিরক্তও করিতেছে। ইউরোপ হইতে সদ্য আসা ছোট মেয়েটিকে পিয়ানো বাজাইতে অনুরোধ করাতে সে পিয়ানোতে গিয়া বসিয়া গান গাহিতেছে, একজন নিমন্ত্রিত অতিথি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া স্বরলিপির পাতা উল্টাইতেছে। গৃহকর্তা চেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। গান গাওয়া শেষ হইলে মেয়েটি সবার প্রশংসা লাভ করিল। নয় বৎসরের মেয়েটিকে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে বলা হইল। সে খুব সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিল। কবিতার বিষয়টি বাহিরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ মিলিয়া গিয়াছিল। কাহিনীটি এই—একটি লাইফ-বোটের চালকের স্ত্রী খুব অসুস্থ ছিল। যে রাত্রির ঘটনা সে রাত্রিটি বড়ই দুর্যোগপূর্ণ ছিল। স্বামীটি তাহার দুইখানি হাত নিজের

মৃত্যু আসন্ন। স্ত্রীটিও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। নীরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রি, বাহিরে অতি প্রবল ঝড়। এই ঝড়ের শব্দ ভেদ করিয়া দূর হইতে বিপন্ন এক জাহাজের তোপধ্বনি শোনা গেল, বিপদের ইঙ্গিত এটি। ঝড়ের গর্জন, পাহাড়ী উপকূলে ঢেউ ভাঙ্গার গর্জন। আরও একটি তোপধ্বনি। বোটম্যানকে এবারে যাত্রী রক্ষার জন্য যাইতে হইবে। ঘরে মুমূর্ষু স্ত্রী, বাহিরে কর্তব্যের আহ্বান। বোটম্যানের দ্বিধা, কিন্তু স্ত্রী বলিল, "জ্যাক, তোমাকে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতেই হইবে, তুমি আমাকে লইয়া থাকিও না, ওঠ। আমাদের পুত্র অ্যালফ্রেড পাঁচ বৎসর বিদেশে আছে, কে জানে হয়ত সেও এমন ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যে কোথাও সমুদ্রে রহিয়াছে, সেও হয়ত ঐ বিপন্ন জাহাজের লোকদের মতই অন্য কোথাও কোনও জাহাজে একইভাবে বিপন্ন হইয়াছে। তুমি যাও, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত আমাকে আর জীবিত দেখিতে পাইবে না, কিন্তু জ্যাক তোমার কর্তব্যপালনের জন্য তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করিবে, আলফ্রেডও আশীর্বাদ পাইবে। মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা যখন হইবার নহে, তখন আমি মৃত্যুর মুহূর্ত উপস্থিত হইলে আনন্দের সহিত আমার আত্মাকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিব, যিনি আমাদের কল্যাণের জন্যই যাহাকিছু করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" জ্যাক ও তাহার সহকর্মীরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে বিপন্ন জাহাজ লক্ষ্য করিয়া লাইফ-বোটটি সেই বিক্ষুব্ধ ঝটিকার মধ্যে ভাসাইয়া দিল। কিন্তু জাহাজটি ততক্ষণে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, একটিমাত্র ছেলে প্রাণপণে তাহার মাস্তলটির দাঁড় জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। মাস্তলটি ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। বহু কষ্টে উহারা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল, তাহাতে নিজেদের জীবনও ভীষণভাবে বিপন্ন হইয়াছিল। জ্যাক আবিষ্কার করিল, সেই ছেলেটি তাহারই পুত্র অ্যালফ্রেড। বহুকাল সে নিখোঁজ ছিল, এতদিনে পাওয়া গেল তাহাকে। উহারা ঘরে ফিরিয়া দেখে জ্যাকের স্ত্রী তখনও জীবিত। তাহার অসুখ ক্রমে ভাল হইয়া গেল। উহারা পরে সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। ছোট্ট মেয়েটি এই কবিতাটি এমন জীবন্তভাবে আবৃত্তি করিল, এবং শেষ অংশটির পুনরাবৃত্তি করিল যে উপস্থিত সকলেই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। এইভাবে সম্মানিত ইংরেজরা দিন যাপন করিয়া থাকেন। যদি কেউ অতিথিরূপে এই জাতীয় নির্দোষ আনন্দভোগের শরিক হইয়া থাকেন, তবে তিনি ইংরেজগৃহের এই উষ্ণ পরিবেশটি স্মরণ করিবামাত্র, ইংরেজদের আনন্দ উপভোগের এই উচ্চ এবং পরিমার্জিত রুচির কথাও স্মরণ না করিয়া পারিবেন না। এই দুঃখপীড়িত সংসারে মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর আর কি আনন্দভোগের কল্পনা হইতে পারে?

জনতা হইতে আর একটি যুবকের কথা পাশাপাশি উপস্থিত করিতেছি। এই যুবকটি এক দোকানের কর্মচারী। সে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, দেখিতে মোটামুটি মন্দ নয়, এমন একটি স্ত্রীলোকদের পোষাক প্রস্তুতকারিণী মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। সুতরাং পিতা তাহাকে ত্যাজ্য করিয়াছেন। এই দম্পতি তাহাদের এক বৎসরের একটি শিশুসন্তান সহ সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং ব্যয়ে পৃথকভাবে বাস করে। এই ত্রিশ শিলিং হইতে তাহাদের দুটি ছোট কামরার জন্য ভাড়া দিতে হয় সপ্তাহে ৮ শিলিং। ঘরের জন্য যে বিছানা আসবাবপত্র দরকার তাহা তাহারা ধারে কিনিয়াছে, মূল্য কিস্তিবন্দীভাবে শোধ করিতে হয়। এইরূপ 'হায়ার পার্চেজ' পদ্ধতি লণ্ডনে এখন খুব প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতায় ঠেলাগাড়ি বা গোরুর গাড়ির চালকদের প্রায় এইরকম পদ্ধতিতে প্রতিদিন ঋণদাতার ঋণ শোধ করিতে হয়, উচ্চ সুদ সহ। পার্থক্য এই যে, এখানে কিস্তির টাকা সপ্তাহান্তে দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে ১০ শিলিং দিয়া ৫০ পাউণ্ডের আসবাব কিনতে পাওয়া যায়। যে যুবকটির কথা বলিতেছি তাহাকে তাহার ক্রয় করা জিনিসগুলির জন্য সপ্তাহে ৫ শিলিং করিয়া দিতে হয়। সে কিনিয়াছে ৩ পাউণ্ড দামের কার্পেট, ১ পাউণ্ডের

আয়না ও স্ট্যাণ্ড সহ হাতমুখ ধুইবার পাত্র, ২ পাউণ্ড দামের সোফা, ছয়খানা চেয়ার কিনিয়াছে ১ পাউণ্ড ২ শিলিঙের, মেহগনি ড্রয়ার ৫ পাউণ্ডের, তিনখানা টেবিল ৭ পাউণ্ডের, পেরাম্বুলেটর ১ পাউণ্ড ১০ শিলিঙের, বইয়ের তাক ১ পাউণ্ডের, মোট খরচ হইয়াছে ২৫ পাউণ্ড ১২ শিলিং। সপ্তাহে পরিবারের খাইবার খরচ প্রায় ১৫ শিলিং ৬ পেনি। ভাগ করিলে দাঁড়ায়—মাংস ৬ শিলিং, রুটি ২ শিলিং ৪ পেনি, সব্জী ১ শিলিং ৯ পেনি, মাখন ১ শিলিং, চা, চিনি, দুধ ২ শিলিং, পরিজের জন্য ওটমীল ১ শিলিং ৭ পেনি, বিয়ার ১ শিলিং ২ পেনি। মোট ১৫ শিঃ ১০ পেঃ। বাকি থাকে ১ শিলিং ২ পেনি, তাহা কয়লা, সাবান, কাপড়, ধোলাই খরচ ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট নহে। কিন্তু তার স্ত্রী কিছু শেলাইয়ের কাজ করিয়া যাহা পায়, তাহাতে ঘাটতি পূরণ হইয়াও সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। তাহা দ্বারা ইহারা ক্রমে অবস্থার কিছু উন্নতি করিয়া লইতেছে। সে নিজ হাতে রান্না করে এবং কাপড় ধোয়া ব্যতীত আর সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ করে। সাড়ে সাতটায় প্রাতরাশ খায়, খাদ্যসামগ্রী পরিজ রুটি মাখন ও চা। অপরাহ্ন ৭টার সময় তাহারা ডিনার খায়। রবিবারে গরম মাংস খায়, সোমবারে সেই মাংসই ঠাণ্ডা খায়, এবং মঙ্গলবারে তাহার স্টু খায়। বুধবারে নতুন আর এক খণ্ড জয়েন্ট (মাংস) আসে। সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত তাহা দ্বারা চালাইয়া লয়। বাড়ি হইতে যাহাদের অনেক দূরে কাজ করিতে হয়, তাহারা, যাহার যেমন সাধ্য তেমনি ভোজনালয়ে বাহিরেই ডিনার খাইয়া লয়। এই রকম ডিনারের খরচ ৬ পেনি অথবা বেশি। ৬ পেনিতে এক প্লেট মাংস ও সব্জী দেওয়া হয়। কেহ কেহ ডিনার ৪ পেনিতেও সারিয়া লয়। তাহারা খায় পর্ক (শূকর মাংস) চপ ও পেঁয়াজ ভাজা। শুধু এ রকম খাদ্য, পরিবেশনকারী ভোজনালয় অনেক আছে। ইংল্যাণ্ডে সব জিনিসেরই দাম চড়া, তাই এখানে কোনো গরীব লোক কত কমে তাহার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে তাহা বলা কঠিন। এমন লোক আছে পরিবারের পাঁচ ছয়টি সন্তান সহ যে সপ্তাহে ১ পাউণ্ড খরচে চলিতে পারে। ভারতবর্ষের হিসাবে ইহা অনেক বেশি শুনাইবে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাহা নহে। ভারতবর্ষে একটি লোক দিন ১ পেনি (৪ পয়সা পরিমাণ) দ্বারা চালাইতে পারে, এবং বহু জিনিস সে বাদ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাহা চলে না, এখানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে অনেকগুলি জিনিস অপরিহার্য। এই যুক্ত রাজ্যের অনেক স্থানে গরীব মানুষ কদাচিৎ মাংস কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য রাখে। তাহাদের প্রধান খাদ্য আলু রুটি ও ওটমীল। একজন ভারতীয় ছাত্র ইংল্যাণ্ডে ৩০ শিলিঙে খাওয়া ও থাকার খরচ চালাইতে পারে, কিন্তু কাপড়চোপড় ধোয়া, রেলভ্রমণ এবং অন্যান্য বিষয়ে আরও ৩০ শিলিং খরচ বাদ দিয়া চলিতে পারে না। এ সব খরচ আগে অনুমান করা না থাকিলেও, তাহাকে করিতেই হইবে। মধ্যবয়সী কোনও ভদ্রলোক এখানে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে আসিলে তাঁহার সপ্তাহে ৫ পাউণ্ডের কমে চলিবে না।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব

গৌতম সেন

রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনায় আমরা দেখতে পাই এক ঋষিকে। যিনি মন্ত্র-দ্রষ্টা—যার চোখে মমতাঞ্জন, যিনি পৃথিবীকে অবলোকন ক'রে বলছেন—"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।" প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও যা কিছু সুন্দর সবকেই কবি নন্দিত করেছেন তাঁর কাব্যে ও সঙ্গীতে। এ উপনিষদের দৃষ্টি। এ দৃষ্টিভংগী তিনি পেয়েছিলেন কিছুটা উত্তরাধিকার-সূত্রে। তাঁর পারিবারিক পরিবেশও ছিল এর অনুকূল। তাঁর উপলব্ধি কবির উপলব্ধি—মনের কল্পনায়, সাধকের আত্ম-বিলোপের মধ্যে। নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন, "উপনিষদের ভিতর দিয়ে পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষের সংগে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, সাধারণতঃ বাংলাদেশে ধর্ম্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে, আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্তসমাহিত।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব যে তাঁর উপরে কতখানি কাজ করেছে, তা এক কথায় বলা যায় না। অতি প্রত্যূষে তাঁকে শয্যা থেকে উঠিয়ে মহর্ষি বলতেন, সূর্য-প্রণাম করো, সূর্যোদয় দেখবে না? যিনি অন্ধকার দূর করছেন, যিনি প্রতিপালক, যার স্পর্শে সমগ্র প্রাণী-জগৎ উদ্ভিত-জগৎ সঞ্জীবিত হচ্ছে—যিনি সব পাপ দূর করছেন, তাঁকে জানো।

বুঝবার মতো বুদ্ধি বালকের ছিল না। নিয়ত-অভ্যাসের ফলেই সকল আচরণ তার সাত্ম্য হয়ে গিয়েছিল। বালককে সঙ্গে ক'রে পিতা আসতেন উপাসনা-গৃহে। সুর করে তিনি প্রতিদিন উপনিষদ পাঠ করতেন। বালক বসে তন্ময় হয়ে শুনতো। বুঝবার মতো বুদ্ধি তার ছিল না, কিন্তু না বুঝলেও, ঐ বালকের অবচেতন মনে ঐ মন্ত্র দাগ রেখে যেতো রবীন্দ্রনাথ পরেও কতবার বলেছেন, বোঝো আর নাই বোঝো পড়ে যাও—একদিন তার অর্থ নিজের মনেই ধরা পড়বে।

তাই বলছিলাম, কবির অধ্যাত্ম-চেতনার মূলে রয়েছে এই উপনিষদ্। 'গীতাঞ্জলি' তো তারই মর্মবাণী। রবীন্দ্র-সাহিত্যে আত্মসম্মানের যে-চিত্র আমরা দেখতে পাই, তার মূলেও সেই আত্মশক্তির উদ্বোধন। কোনো বাইরের শক্তিতে নয়, আত্মার শক্তিতেই তাঁর চৈতন্যের বিকাশ।

"বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখে-তাপে-ব্যথিত-চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।"

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায়, বহু প্রবন্ধে বহুবার বলেছেন। তাঁর আত্মসম্মান তাঁকে আত্মমুখী করেছে। যাঁরা জীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি করেছেন, তাঁরাই আত্মাকে সম্মান করতে পারেন। তাঁদের চিত্ত বিরাট উপলব্ধির মহান আনন্দে সদা প্রদীপ্ত, তাই তাঁরা নির্ভীক, কোনো কারণেই তাঁরা আত্ম-অপমান বা আত্ম-অবনতির পঙ্কে অবলিপ্ত হতে চান না।

রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টি এই নিখিল বিশ্বের নিত্য নবীনরূপে যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছে, তা উপনিষদের ঋষিবর্ণিত সত্যের মতোই নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং

নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, তা 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।' এই অবর্ণনীয়কেই তিনি সারাজীবন বর্ণনা করবার প্রয়াস পেয়েছেন, এই শব্দাতীতকে শব্দের মালায় গেঁথে বঙ্গবাণীকে উপহার দিয়েছেন,'অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার আকুলতাই তাঁর ছন্দে, গন্ধে, রূপে, রসে প্রকাশিত। ব্রহ্মের স্বরূপ কি তা কেউ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারেন নি—রবীন্দ্রনাথও পারেন নি। কিন্তু তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির অপূর্ব উজ্জ্বল প্রকাশ কেবল তাঁর কাব্যকেই উদ্ভাসিত করেনি, তাঁর চরিত্রে, তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকেও মহিমামণ্ডিত করেছে। যেসব ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ সংসারত্যাগী, বৈরাগ্যের সাধনাতেই যাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত, তাঁরা সংসারের অবিচার অত্যাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মদর্শী হয়েও, সেরূপ উদাসীন থাকতে পারেন নি—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ—"

তিনি সংসারের সমাজের অত্যাচার অবিচার দুর্নীতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন না। 'মানুষের ধর্ম্ম' প্রবন্ধে তিনি এই কথাই বলেছেন ভিন্নরূপে—"আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সে-মহান-পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সেকথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেন না, আমার বুদ্ধি-মানব বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার কল্পনা মানব-কল্পনা। ......মানব নাট্য-মঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই যে দেখা, একে ছোট বলব না। এও সত্য। জীবন-দেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।"

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ করলেও, আমরা দেখতে পাই যে, মূলতঃ তিনি কবি ছিলেন, ব্রহ্মোপলব্ধির বিচিত্র লীলা, সীমার মাঝে অসীমের আবির্ভাব, তাঁর বিরাট সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে নানাভাবে নানা ছন্দে নানা রূপ-ভঙ্গিমায় রসিক-পাঠক-সমাজকে মুগ্ধ করেছে। তবু বলব, রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও ঋষি। তিনি বিষয়কে বিষয় ভাবেই, দেহকে দেহ দিয়েই ধরতে ছুঁতে চেয়েছেন। অধ্যাত্ম-দ্রষ্টার মতো বিষয়কে কেবল আত্মার সহায়ে, শরীরকে অশরীর সহায়ে আলিঙ্গন করে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। মর-জীব হিসেবে তিনি মর-বস্তুর রসগ্রহণ করে চলেছেন। অথচ এই মরত্বেরই মধ্যে আবার অমরত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, দেহকে দেহভাবে ধরেই তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন আত্মিক অদেহী একটা কিছু। এই দ্বৈতের বৈপরীত্যের সমন্বয় তাঁর উপলব্ধির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীর সঙ্গে কবির এই প্রীতিমাখা সান্নিধ্য কবি-চিত্তে নতুন সত্যের সন্ধান দিলে। এই পৃথিবী-প্রীতিকে অবলম্বন করে কবির জীবন-দর্শনের অন্যতম দিক ক্রমান্বয়ে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করলো। সুন্দরী ধরণীর মায়াময় রূপ, মায়াবাদী দার্শনিকের মতো কবির চোখে নিছক্ মায়ারূপে প্রতিভাত হলো না। ধরণীর অসীম রূপ-বৈচিত্র্য কবি-চিত্তে বহন করে আনলো এক পরম সার্থকতার ইঙ্গিত। উপনিষদের ভাবধারায় অভিষিক্ত কবি উপলব্ধি করলেন, সেই অদৃশ্য পরমসুন্দর এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত খণ্ড-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অনন্তকাল ধরে বিচিত্রভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে রূপায়িত হয়ে উঠেছেন। সীমার ভিতর দিয়ে অরূপকে, বন্ধনের ভিতর দিয়ে মুক্তিকে পাবার সাধনা কবির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

"জন্মেছি যে মর্তলোকে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে—"

কবির সুদীর্ঘ জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত এই দৃষ্টি-ভঙ্গী গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে, আর তার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিপুল সৃষ্টির বিভিন্ন ধারায়—কাব্যে, গল্পে, নাটকে, সঙ্গীতে।

কবির এই জীবন-দর্শন শুধুমাত্র কাব্যবিলাসে পর্যবসিত হয়ে থাকেনি। পৃথিবীকে অবলম্বন করে তাঁর পরমসুন্দরের সাধনা সার্থক হয়েছে প্রত্যক্ষ স্তরে গিয়ে। তিনি বলেছেন--

"চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর
দেয় না তবুও ধরা
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।"

সেই পরমসুন্দরের দর্শনে কবির জীবন সার্থক ও ধন্য, কিন্তু সে আনন্দানুভূতি তো ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই কবি বললেন,

"দেখেছি, দেখেছি সেই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায় ভাষা না যোগায় মুখে
ধন্য আমি সে কথা জানাই কারে
পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে।"

উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি রূপ দেখা যায়। একটি মূর্ত, অপরটি অমূর্ত; একটি মর্ত্য বা মরণশীল ও পরিবর্তন-শীল, অপরটি অমর্ত্য; একটি স্থিত রূপ, অপরটি গমনশীল রূপ; একটি সৎ বা ব্যক্তরূপ, অপরটি অব্যক্ত-রূপ। আবার সেই উপনিষদেই আছে—'তদ্ এজতি তন্নৈজতি' তা চলে, আবার চলেও না। এই পরম সত্যকেও দুইরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে—এক পরম সত্য নির্বিশেষে এক, অন্যটি পরম পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ এই পরম পুরুষেরই পূজারী ছিলেন। যিনি 'পুরুষম্ মহান্তম্' যিনি অকায় অব্রণ হয়েও নিহিতার্থ, অর্থাৎ নিহিত হয়েছে সকল অর্থ যাঁতে, তাই বহুধা শক্তিযোগে অনেক বর্ণের বিধান করছেন, যিনি শান্ত অদ্বৈত হয়েও, আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিশেষ প্রকাশ লাভ করছেন। সেই পরম সত্য পরমপুরুষ বলেই 'আমি পুরুষে'র সঙ্গে সেই পরমপুরুষের নিত্য সম্বন্ধ, এবং সেই 'আমি'র সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধেই সেই পরমপুরুষও রবীন্দ্রনাথের কাছে নিত্য 'তুমি' বলেই ধরা দিয়েছেন। এই পরমপুরুষ এই 'আমি'টাকে বাদ দিয়ে আপনাতে আপনি পূর্ণই শুধু নন, 'আমি'র যোগেই তাঁর পূর্ণতা—যেমন পূর্ণতা সুরের যোগে সঙ্গীতের। সুর ছাড়া, গানের মধ্যে বিকাশ ছাড়া তার আপনাতে আপনি সমাহিত কোনো রূপ নেই, সত্যও নেই। সুরের মধ্যে সে যতখানি আপনাকে নিঃশেষে ছড়ায়ে দেয়, সঙ্গীত ততখানি সত্য হয়ে ওঠে। 'আমি'-টির হলাম সেইরকম সুরের বিস্তার —'আমি'র বিস্তারেই 'তুমি'র বিস্তার, 'আমি'র সত্যেই 'তুমি'র সত্য। "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো" সেইখানে আমিই শুধু তুমি নয়, তুমিও আমি। আমি শুধু আছি নয়, আমার মধ্যে সমস্তই আছে—আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু-পরমাণুও থাকতে পারে না।

আসল কথা, তোমার মধ্যেই নিহিত নই আমি, আমার মধ্যেও নিহিত তুমি, তোমার মধ্যে প্রস্ফুটিত আমি। "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।" তাইতো সারা জগৎ জুড়ে এত আনন্দের আয়োজন, এত সৌন্দর্যের পরিবেশন। পরম সত্তার সঙ্গে তাঁর মিলন হবে বলেই না এত সাজসজ্জা এত আড়ম্বর।

"তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে
ঊষা এসে পূর্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা।"

কবির এই চেতনা যেদিন এলো, বুঝলেন, ভগবান শুধু ধরা দিতে প্রস্তুত নন, তিনি ধরা দিয়েই বসে-ছিলেন। কেবল কবি ভুল পথে তাঁকে খুঁজেছিলেন।

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে
দেখতে আমি পাইনি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানে চাইনি।

* * *

তুমি মোর আনন্দ হয়ে
ছিলে আমার খেলায়
আনন্দে তাই ভুলেছিলাম
কেটেছে দিন হেলায়।"

কিংবা—

"আছি রাত্রি দিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ করে,
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বার।
তাই তো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।"

এই আবিষ্কারের পর কবির কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। "তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি আছি আমি আছি—"চেতনার এই স্তরে 'আমি নেই' এই আতংকের একটু খাদ্ হয়ত আছে। কবির এই 'অয়মহং ভোঃ'-এর মধ্যে আছে 'স অহং', 'অয়ম্ অহং নয়। আত্মবিলোপের চেয়ে আত্মপ্রত্যয় প্রবল। অবশ্য রবীন্দ্র-কাব্যে এর পরের কথাও আছে—"আলো জ্বালো, একবার ভাল ক'রে চিনি," যখন অপ্রমত্ত মিলন হলো, রজনীর তিমির-মন্দির মন্দ্রিত ক'রে বৈদিক ঋষির মতো তখন তাঁর ধ্যানে এলো—

"নাই সৃষ্টিধারা
নাই রবিশশী গ্রহতারা
আমি নাই, গ্রন্থি নাই,
তোমার আমার
নাই সুখ দুঃখ ভয়, আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হ'ল সব
আকাশে নিস্তব্ধ এক শান্ত অনুভব
তোমাতে সমস্ত লীন তুমি আছ একা
আমিহীন চিত্তমাঝে একান্তে তোমারে শুধু দেখা

* * *

নাই সময়ের পদধ্বনি
নিরস্ত মুহূর্ত স্থির দণ্ডপল কিছুই নাহি গণি

রহস্যঘন সম্মিলিত রূপের সম্যক জ্ঞানই হলো ঔপনিষদ জ্ঞান। সেই অধ্যাত্মবাদ—সেই তৎস্বরূপের কাছে উপনীত হওয়াই ঔপনিষদের তাৎপর্য। মন্ত্র বলি কাকে, যা মনকে উদ্দীপিত করে ত্রাণ করায়, যে সংযত-বাক্। এই বাকসমষ্টি সংহিত বা সংগৃহীত হলেই তাকে বলি সংহিতা। ব্রাহ্মণে আছে ক্রিয়াকাণ্ড। আরণ্যকে আছে সার ভাগ বা অন্ত্য। উপনিষদ হলো এই সারভাগ। এতেই পাওয়া যায়, যা আছে বা সৎ তার সম্পূর্ণ জ্ঞান—যে জ্ঞানে আমার চিৎ বা চিত্ত আনন্দে ভরে ওঠে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের স্বরূপ। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, উপনিষদের চারটি খুঁটি—নিত্যোঽনিত্যানাং অনিত্যের মধ্যে নিত্য যিনি "চেতনশ্চেতনানাম্" ঘুমন্ত-দের মধ্যে যিনি জাগ্রত, সোঽহং তিনি আমি আর অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি সেই। অন্নবিস্তার এই হলো উপনিষদের ভিত্তিভূমি।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল, অগ্রগতির সাধনা, চলার সাধনা। 'চরৈবেতি চরৈবেতি।' তাঁর ব্রহ্ম পরিবর্তন-শীল প্রকৃতির মধ্য দিয়েই নিয়ত বিবর্তনশীল, একটি স্বতঃসিদ্ধ স্থিতিশীল তত্ত্বমাত্র নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে কত বিচিত্র সাধনার সমাবেশ। কোনো এক জায়গায় কবি থমকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন নি। তাঁর জীবন-রথ লক্ষ্যশূন্য পথে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছে, গৃহী হবার বাসনা তাঁর নেই।

"গৃহী কহে, নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ভয় লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো। রথী কহে,
যেতে হবে আগে।
কোনখানে শুধাইল। রথী কহে
কোনোখানে নহে,
শুধু আগে। কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে
গৃহী কহে।
কোথাও না, শুধু আগে। কোন্ বন্ধু সাথে
হবে দেখা।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৪ অপরাহ্ণে হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে হাকিম সাহেবের অ্যাকটিং সভাপতির পদের সুপারিশ অনুমোদন করা হয়।

তার পর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী বিষয়-নির্বাচনী সভায় রূপান্তরিত হল। প্রধান আলোচ্য প্রস্তাবটি ছিল অতিশয় দীর্ঘ ও ব্যাপক। প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন মহাত্মাগান্ধী।

এই প্রস্তাবে প্রয়োজন হলে অসহযোগের কর্মসূচী এবং ব্যক্তিগত ও ব্যাপক আইন অমান্য স্থগিত রাখার ব্যবস্থা ছিল। কংগ্রেস কর্মীদের আসন্ন গ্রেপ্তারের পরি-প্রেক্ষিতে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করার ক্ষমতা সহ সমস্ত ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীর উপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা ছিল। উত্তরাধিকারীদেরও ঐ সকল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছিল। প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর উত্তরাধি-কারীকে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অনুমোদন ছাড়া গভর্ণমেন্টের সহিত কোন চুক্তি করা বা কংগ্রেসের ক্রীড পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি।

এই প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলতে থাকে। রাত্রি অধিক হওয়ায় সভার কার্য্য ২৫শে তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি হয়, আলোচনা সে দিনেও শেষ না হওয়ায় অধিবেশন ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে।

এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন হজরত মোহানী (বর্তমান বৎসরের নির্বাচিত মুসলীম লীগের সভাপতি)। তিনি একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা যে সকল শব্দদ্বারা হিংসামূলক কার্য্যের সম্ভাবনা বা তার চিন্তা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করার কথা আছে সেগুলি বাদ দিতে বলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ইসলাম তাঁকে হিংসাত্মক কাজে সম্মতি দিয়েছে সুতরাং সে পথ তিনি রুদ্ধ করতে চান না। যখন বলা হল তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে হলে কংগ্রেস ক্রীডের পরিবর্তন করা আবশ্যক তখন তিনি ক্রীড পরিবর্তনের একটি প্রস্তাব আনলেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হল যে "কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায় দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে স্বরাজ অর্জন করা।

চার ঘন্টা আলোচনার পর হসরত মোহানী ও তাঁর ৫২জন সমর্থকের সংশোধনী ও ক্রীড পরিবর্তনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। পরে মহাত্মাগান্ধীর মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

(৪)

২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল। ১৯০১

সালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আমেদাবাদে অষ্টাদশ অধিবেশনের ১৮ বৎসর পর বর্তমান অধিবেশন।

প্রায় ১৫ একর জমির উপর দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় পরিবেষ্টনের মধ্যে কংগ্রেস-প্যাণ্ডেল নির্মিত হয়েছিল। প্রাকারের প্রধান প্রবেশদ্বার আমেদাবাদের প্রসিদ্ধ "তিন দরওয়াজার" অনুকরণে নির্মাণ করে তার নাম দেওয়া হয়েছিল "লোকমান্য তিলক দরজা।" দ্বারের উপরিভাগে ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছিল এবং তার নীচে একটি সুবৃহৎ চরকা রক্ষিত ছিল। প্রধান প্রবেশদ্বার থেকে প্যাণ্ডেলের প্রবেশদ্বার "স্বরাজ দরজার' মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেকটা "তিলক দরজা" ও "স্বরাজ দরজার" মধ্যে একটি ডিম্বাকৃতি ফোয়ারা পরিশোভিত সুবিন্যস্ত উদ্যানের ভিতর দিয়ে প্যাণ্ডেলে প্রবেশের পথ নির্মাণ করা হয়েছিল। 'স্বরাজ দরজার' বাইরে কারারুদ্ধ প্রধান প্রধান কংগ্রেস কর্মীদের নাম খোদিত করে একটি কাষ্ঠফলক রাখা হয়েছিল। সুবৃহৎ প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তর সম্পূর্ণ খদ্দর দ্বারা আবৃত এবং পুষ্পপল্লবে ও প্রধান প্রধান নেতাদের ফটো ও আলেখ্যচিত্রে সুশোভিত করা হয়েছিল। প্ল্যাটফরমের মধ্যস্থলে রাখা হয়েছিল নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ও তার বাম পাশে লোকমান্য তিলকের আবক্ষ প্রতিকৃতি। বক্তৃতামঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল প্ল্যাটফরমের সম্মুখভাগে প্রায় প্যাণ্ডেলের মধ্যস্থলে। পরদানসীন মহিলাদের জন্য বসবার পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জন্য যে অস্থায়ী খদ্দরের কুটিরগুলির নগর নির্মিত হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল খাদি নগর। এই নগরের মধ্যস্থলে মহাত্মা-গান্ধীর অবস্থানের জন্য একটি বিশেষ কুটির নির্মিত হয়েছিল। প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য জল সরবরাহের কল, শৌচাগার, পয়ঃপ্রণালী আলো, রান্নাঘর, হাঁসপাতাল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাম অফিস প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সকল পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদিনগর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট" নিযুক্ত হয়েছিল।

খাদিনগরের নিকটেই একটি রাস্তার ব্যবধানে কংগ্রেসের মুসলমান-প্রতিনিধি, মুসলিম লীগের ও খিলাফৎ কমিটীর প্রতিনিধিদের জন্য একটি অনুরূপ সহর নির্মিত হয়েছিল যার নাম দেওয়া হয়েছিল "মোসলেম নগর"।

অন্যান্যবারের ন্যায় অধিবেশনের নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই প্যাণ্ডেল দর্শক, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও প্রতিনিধি দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। এবারে প্যাণ্ডেলের ভিতরে ভীড়ের চাপ পূর্বের ন্যায় অধিক ছিল না তার কারণ অভ্যর্থনা সমিতি তার সদস্যদের জন্য ও দর্শকের জন্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ করেছিল তিন-হাজারে। তা ছাড়া গত নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত সংবিধান অনুসারে কংগ্রেসে প্রতিনিদের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ হয়েছিল।

প্যাণ্ডেলের ভিতরে প্রবেশ করে দেখা গেল যে প্রতিনিধিদের বসবার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্ব পূর্ব বারের মত ডায়াসের উপর প্রধান প্রধান নেতাদের জন্য ভাল ভাল চেয়ার ও ডায়াসের সম্মুখ ভাগ জুড়ে লম্বা টেবিলের ব্যবস্থা আর নেই। তাঁদের বসবার ডায়াসের উপর খদ্দরের ফরাস বিছানো ছিল। সভাপতি মশায়, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতাদের জন্য কতকগুলি তাকিয়া রাখা হয়েছিল।

ডায়াসের নীচে সম্মুখভাগে বিস্তীর্ণ স্থান প্রদেশ অনুসারে বিভক্ত করে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের জন্য খদ্দরের সাদা চাদর পেতে দেওয়া হয়েছিল। বাংলা দেশের জন্য চিহ্নিত ব্লকে বাংলার অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমি আসন গ্রহণ করলাম। যতদূর মনে পড়ে দর্শকদের জন্য পূর্ববৎ গ্যালারীর ব্যবস্থা ছিল।

প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণের পর ডায়াসের উপর নববেশে মহাত্মা গান্ধীকে দেখে বিস্মিত হলাম। মুণ্ডিত মস্তক, শিখাধারী, কটিবস্ত্র পরিহিত গান্ধীজীকে

এই প্রথম দেখলাম। এই বেশ ধারণ বর্তমান বৎসরের প্রথম ভাগে ওড়িষা ভ্রমণের ফল।

ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকেও আমেদাবাদে শীত ছিল না। প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রচণ্ড গরমে প্রতিনিধি-গণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ইলেকট্রিক ফ্যানের কোন বন্দোবস্ত ছিল না তবে প্রচুর তালপাতার পাখা প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়েছিল, শুভ্র খদ্দর পরিশোভিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর যুবক যুবতীগণ অতি সুশৃঙ্খল-ভাবে অনবরত জল বিতরণ করে প্রতিনিধিদের তৃষ্ণা নিবারণের সহায়তা করাছল। অনেক স্বেচ্ছাসেবককেই বাঙালী বলে ভ্রম হয়েছিল। অনেকের চেহারার সহিত বাঙালীর চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল। পরে পথে ঘাটে ট্রেনে অনেক গুজরাতির সঙ্গে বাঙালীর চেহারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি এবং অনেককে বাঙালী বলে ভুল করেছি।

কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সভাপতি তিনজনের মধ্যে দুজন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও সি রাজাগোপালাচারী কারারুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করতে সক্ষম হন নি।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটির সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে এ্যাকটিং সভাপতি হাকিম আজমল খাঁ সভামণ্ডপে প্রবেশ করে ডায়াসে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

প্রথমে সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত গীত হল। তারপর বোম্বাইয়ের গান্ধর্ব্য বিদ্যালয়ের স্বেচ্ছা-সেবিকা সংঘ একটি হিন্দী সংগীত এবং তারপর কুমারী রাইহানা তায়েবজী তিনটি গুজরাতি জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন।

সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সংক্ষিপ্ত হিন্দী অভিভাষণ পাঠ করলেন। তিনি অভিভাষণ পাঠ করতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় নিলেন। এটাও একটা নূতন পরিবর্তন। এতদিন আমরা সুদীর্ঘ বক্তৃতায় অভ্যস্ত হয়ে এসেছি। এবার এই পরিবর্তন সকলেরই ভাল লাগল।

বল্লভভাই প্যাটেল মশায় সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা জানিয়ে অন্যান্য কথায় পর বললেন—যে তাঁরা আশা করেছিলেন যে স্বরাজপ্রাপ্তির উৎসবের জন্য তাঁরা এখানে মিলিত হবেন এবং সেই দিনের উপযুক্ত ব্যবস্থায় আয়োজনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা সেই আনন্দদায়ক ঘটনাকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য মিলিত হতে পারেন নি। তাঁদের পরীক্ষা এবং এই মহৎ পুরস্কার লাভের উপযুক্ত করার জন্য ভগবান তাঁর অপার করুণায় তাঁদের জন্য দুর্ভোগ পাঠিয়েছেন। সুতরাং কারাবরণ, নির্য্যাতন, জোরপূর্বক খানাতল্লাসী, কংগ্রেস অফিস ও স্কুলের ধ্বংস সাধনকে আসন্ন স্বরাজের নিশ্চিত সঙ্কেত মনে করে এবং তা আমাদের মুসলমান ও পাঞ্জাবী ভ্রাতাদের ক্ষতের উপর প্রলেপ মনে করে প্রতিনিধিদের আনন্দ দান ও অভ্যর্থনার জন্য যে সকল সাজসজ্জা, গান-বাজনার কর্মসূচী ও অন্যান্য কাজের যে আয়োজন করা হচ্ছিল তার কোন পরিবর্তন করা হয় নি।

তার পর তিনি বললেন যে তিনি দাবি করতে পারেন যে তাঁরা চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে অহিংস থাকতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা তাঁদের দুর্বলতা জয় করে গভীর ও সুস্পষ্টভাবে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন।

হিন্দু মুসলমান ঐক্যই হল এর প্রত্যক্ষ প্রতীক। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁরা পরস্পরকে অবিশ্বাস করে এসেছেন এবং শত্রু ভেবেছেন কিন্তু আজ তিনি গর্বভরে জানাচ্ছেন যে তাঁদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এখন বন্ধুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁরা একযোগে কাজ করছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা পার্শী, খৃষ্টান, ও অন্যান্য দেশবাসীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

খেতাব পরিত্যাগ ও আইনজীবিগণের ব্যবসা পরিত্যাগ বিষয়ে তাঁরা এমন কিছুই দেখাতে পারলেন না যার জন্য তাঁরা গর্ব অনুভব করতে পারেন।

কাউনসিল বয়কট ব্যাপকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, একথা বলা যেতে পারে কারণ ভোটাররা বিপুল সংখ্যায় নির্ব্বাচনে যোগ দেয় নি।

তিনি আরও বললেন যে যেখানে দু বৎসর আগে চরকা ছিল না বল্লেই হয় সেখানে এখন অন্ততপক্ষে ১,১০,০০০ চরকা চালানো হয়েছে।

তিনি তারপর মদের দোকানে পিকেটিংয়ের কথা বললেন। অস্পৃশ্যতা নিবারণের কাজ সম্বন্ধে জানালেন যে একাজ অনেক অগ্রসর হয়েছে।

তারপর তিনি জানালেন যে বারদৌলি ও আনন্দ তহশীলে আইন-আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে।

উপসংহারে তিনি বললেন যে যদিও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁদের মধ্যে সশরীরে উপস্থিত নেই কিন্তু তাঁর বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক ও আত্মত্যাগী আত্মা তাঁদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তিনি ধর্মভাবে পূর্ণ উদ্দীপনাময় অভিভাষণ পাঠিয়েছেন।

অভিভাষণ শেষ হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হাকিম আজমল খাঁকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

নূতন সংবিধান অনুসারে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচনের প্রথা লুপ্ত হয়েছে।

সভাপতি মশায় "আল্লা হো আকবর" ধ্বনির মধ্যে অভিভাষণ দিতে মঞ্চোপরি উঠলেন তিনি উর্দ্দুতে তাঁর অভিভাষণ পড়লেন।

তিনি আসন গ্রহণ করার পর সোয়েব কুরেশী (ইনি কিছুদিন মহাত্মা গান্ধীর জেলে থাকার সময় ইয়ং ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর পাকিস্থানে চলে যান।) সভাপতির অভিভাষণের ইংরাজি অনুবাদ পড়ে শোনালেন।

সভাপতি মশায় তাঁর অভিভাষণে বলেছেন, যে কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দমননীতির ফলে নির্বাচিত সভাপতি কারারুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে পারলেন না। তিনি বাংলার এই মহান দেশভক্ত নেতার নানাবিধ গুণের বর্ণনা করে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট স্থানের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন যে সি আর দাশ অন্তকার সভার সভাপতিত্বের পরিবর্তে কারাবরণ করে দেশের অধিকতর সেবা করেছেন। তাঁর গ্রেপ্তার জাতীয় কর্মীদের হৃদয়ে অধিকতর পরিমাণে তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সমগ্র দেশকে অধিকতর কর্মের ও ত্যাগের প্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি দাশ মশায়ের স্থান পূরণের অক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

তারপর তিনি বললেন যে দীর্ঘ বক্তৃতার দিন গত হয়েছে এবং এখন কাজের সময় এসেছে। তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের সময় থেকে এ পর্য্যন্ত দেশের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। কর্ম্মীগণ যেরকম হৃষ্টচিত্তে স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকার করেছে ও করছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় হাস্যমুখে কারাবরণ করছে তাতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য কে অস্বীকার করতে পারে?

তারপর সভাপতিমশায় যুবরাজের (Prince of Wales) ভারতে আগমন উল্লেখ করে বললেন যে তাঁর সঙ্গে ভারতবাসীর কোন বিবাদ নেই কিন্তু যতদিন খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ অর্জন না হয় ততদিন যুবরাজকে আন্তরিক অভ্যর্থনা করার মনোভাব দেশে আসবে না।

তারপর তিনি যেসকল প্রকৃত দেশভক্ত মডারেট ভ্রাতাগণ জাতীয়তার ক্ষেত্রে এখনও তাঁদের যোগ্য স্থান গ্রহণ করেন নি তাঁদের কথা উল্লেখ করলেন, তিনি আশা প্রকাশ করছেন যে তাঁরা শীঘ্র তাঁদের ভুল বুঝে জাতীয় আন্দোলনে স্থান গ্রহণ করবেন।

এরপর তিনি মালাবারে মোপলা বিদ্রোহের মর্মন্তুদ ঘটনা উল্লেখ করে বললেন যে মোপলাদের প্ররোচিত করে উচ্ছৃঙ্খল আক্রমণের জন্য গভর্ণমেন্টই সম্পূর্ণ দায়ী। যে উপায় দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে তা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই ধিক্কার না দিয়ে পারবেন না। যেসকল হিন্দু মোপলাদের দ্বারা

ধর্মান্তরিত বা অন্য প্রকারে নির্য্যাতিত হয়েছে সেই সকল হিন্দুদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তিনি নিশ্চিত যে এই সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা অল্পসংখ্যক বিপথগামী লোকের কাজ। বাকী মোপলারা তাঁদের (কংগ্রেসীদের) মতই এই সকল কার্য্যগুলি নিন্দা করতে প্রস্তুত। তথাপি তিনি ইসলামের সুনাম সামান্য পরিমাণেও কলঙ্কিত হওয়া পছন্দ করেন না এবং তিনি আন্তরিকভাবে এই সকল ধিক্কৃত ঘটনার জন্য দুঃখিত হয়েছেন।

উপসংহারে তিনি বললেন যে দেশ এখন ভয়াবহ আলোড়ন অনুভব করছে এবং একথা বলতে কোন পয়গম্বরের দরকার হয় না যে এটা নব ভারতের জন্ম যন্ত্রণা যা আমাদের প্রাচীন দেশের গৌরবময় ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করবে এবং ভারত জগতের জাতিগণের মধ্যে গৌরবময় স্থান গ্রহণ করবে।

কোরেসী সাহেব সভাপতির ভাষণের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ শেষ করে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর ডাঃ আনসারী (একমাত্র কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক যিনি কারাপ্রাচীরের বাহিরে ছিলেন) ভারতের বহুস্থান থেকে প্রেরিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কংগ্রেসের শুভেচ্ছাসূচক টেলিগ্রামগুলি পাঠ করলেন।

তারপর সভাপতি মশায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে আহ্বান করে কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু দাশ ও তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতী বাসন্তীদেবী যে দুটি বাণী পাঠিয়েছেন তা পড়ে শোনাতে বললেন।

শ্রীমতী নাইডু নিম্নলিখিত দেশবন্ধুর বাণী পাঠ করলেন :—

সংগ্রামের একমাত্র উপায় যা আমাদের নিকট উন্মুক্ত আছে তা হল অসহযোগ এবং তার কর্মসূচী আমরা পর পর দুটি কংগ্রেসের অধিবেশনে গ্রহণ করেছি। আমরা এই মতবাদের ভক্ত এবং এর নীতি সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

অসহযোগ কি? এ সম্বন্ধে আমি মিষ্টার স্টোকসের ভাবগর্ভ উক্তির উদ্ধৃতির চেয়ে ভাল কিছু করতে পারব না। "এ হল নিবারণ যোগ্য অসাধু কাজে অংশগ্রহণে অস্বীকার করা। এ হল অবিচার মেনে নিতে বা গ্রহণ করতে অস্বীকার করা। সংশোধনযোগ্য অন্যায় মেনে নিতে অস্বীকার করা অথবা এরূপ পরিস্থিতির নিকট নতি স্বীকার করা যা ন্যায়ের দাবির পরিপন্থী এবং তার ফলে যারা স্বার্থের অথবা সুবিধার জন্য অন্যায় বা অন্যায় চিরস্থায়ী করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদের সঙ্গে কাজ করতে অস্বীকার করা।

বলা হয়েছে যে অসহযোগের মতবাদ হচ্ছে নেতি-বাচক মতবাদ। আমি স্বীকার করি যে এই মতবাদ নেতিবাচক কিন্তু আমি দাবি করি যে প্রকৃতপক্ষে এ ইতিবাচক। আমরা ত্যাগ করছি গ্রহণ করবার জন্য। এই হল মানবের প্রচেষ্টার পূর্ণ ইতিহাস। যদি পরাধীনতা অন্যায় হয় তা হলে যেসকল এজেন্সি আমাদের পরাধীনতা চিরস্থায়ী করতে চাইছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা অসহযোগ করতে বাধ্য। এটা নেতিবাচক কিন্তু, এ আমাদের স্বাধীন হওয়ার এবং স্বাধীনতা যে-কোন মূল্যে অর্জন করার সঙ্কল্পকে সমর্থন করছে।

আমি স্বীকার করি না যে এটা হতাশার মতবাদ। এটা হল আশা প্রত্যয় এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে অসীম বিশ্বাসের মতবাদ। যখন দুঃখবরণকারীদের জেল-খানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের মুখ দেখলেই উপলব্ধি করা যায় যে জয় আমাদের হয়ে গেছে। তেজস্বী ও কুশলী মোহাম্মদ আলী ও সৌকত আলী অহৈতুক জীবন ধারণ ও নির্য্যাতন বরণ করেন নি, লালা লাজপত রায়, যিনি মনোবলে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের ন্যায় বন্দুকের সম্মুখীন হয়েছেন, বিনা কারণে আমলা-তন্ত্রের হুকুম তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিনা কারণে কারাগারে চলে যান নি এবং বিনা কষ্টে নরকুলশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গভর্ণমেন্টের হুকুম অমান্য করে তাঁর সম্পদ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কারাবরণ করেন নি,

যে ছাত্ররা মাতৃভূমির আশা ও গৌরবের পাত্র সেই ছাত্রদের কথা আমি ভুলব না। আমার রাজনৈতিক জীবনের প্রবাহকেন্দ্র থেকে আমি তাদের লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছি সেই কারণে ছাত্রগণ যেরকম আশ্চর্য্য-জনক সাহস ও অবিচলিত আনুগত্য দেখিয়েছে আমি তার সাক্ষী। এই আন্দোলনের পেছনে অনুপ্রেরণা আছে, ত্যাগ আছে, জয় আছে, ছাত্ররাই স্বাধীনতার পথের মশালধারী। স্বাধীনতার পথের তারাই তীর্থযাত্রী।

উপরোক্ত বাণী শোনানোর পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বললেন যে এই বাণী বাংলার মহান বীর যিনি অদ্যকার কংগ্রেসের সভাপতির মসনদের শোভা বর্দ্ধন করার পরিবর্তে জাতির স্বাধীনতার জন্য নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছেন তাঁর নিকট থেকে তূর্য্য-ধ্বনির মত আমাদের নিকটে এসে পৌঁছেছে। শ্রীমতী নাইডুর এত উক্তি তুমুল হর্ষধ্বনি দ্বারা সমর্থিত হল।

তারপর শ্রীমতী নাইডু দেশবন্ধুর সহধর্মিনী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর বাণী পড়ে শোনালেন। পরে তিনি ইংরাজীতে লেখা দুটি বাণীই হিন্দীতে বুঝিয়ে দিলেন।

বাণী পাঠ শেষ হতেই সভাগৃহ "দেশবন্ধু দাশ কী জয়" বাসন্তী দেবী কী জয়" ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

অতঃপর মুন্সী আকতার খাঁ একটি উর্দ্দু জাতীয়-সঙ্গীত গেয়ে শোনালেন।

গান শেষ হওয়ার পর সভাপতি মশায় পরদিনের অধিবেশনের সময় ঘোষণা করলেন বেলা দেড়টায়।

সেদিনের মত সভার কার্য্য শেষ হল। সভান্তে আমি খাদিনগর, মোসলেম নগর প্রভৃতি ঘুরে দেখে হীরালাল মেহেতার ভবনে প্রত্যাগমন করলাম।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা
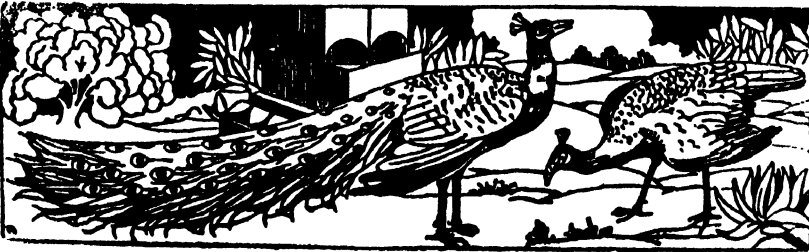
হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে আবার নূতন এক যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রী সভার তথা সরকারের জন্ম হইয়াছে বিগত ২ রা এপ্রিল, ১৯৭১ সালে। জন্মের তারিখটি ১লা এপ্রিল হইলে সব দিক হইতে সঙ্গত হইত। যাহা হোক মন্ত্রী সভার অর্থাৎ এ-পোড়া রাজ্যের নূতন সরকার যখন জন্মলাভ করিল, ইহাকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই, কিন্তু একটা বিষয়ে আমাদের মনে যথেষ্ট ভয় এবং সন্দেহ আছে—এই নবজাতকের শুভ অন্নপ্রাশন—(ছয় মাসে পরে) আনন্দ উৎসবে আমরা অর্থাৎ সর্ব্বভাবে পীড়িত, উৎপীড়িত এবং নিপীড়িত বাঙ্গালী সাধারণ জন যোগদান করিবার অবকাশ পাইব কি না। এ কথা বলিতেছি এই কারণে যে এই নবজাতক সরকারের পেঁচোয় পাইয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সর্ব্বপ্রকার অশুভ সম্ভাবনাই বিদ্যমান রহিয়াছে!

নূতন রাজ্য সরকারের প্রধান দুইজন—শ্রীঅজয় এবং শ্রীবিজয়, শক্তহাতে হাল ধরিবেন অবশ্যই, কিন্তু যে-মন্ত্রীসভার ভারসাম্য—এমন কি জীবন মরণ নির্ভর করে কয়েকটি 'ছটাকী' দলের মর্জ্জির উপর এবং যে মর্জ্জি দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত সবিশেষ জড়িত সর্ব্বক্ষেত্রে, সেই মন্ত্রীসভার জীবনকে বোবি-ফুড খাওয়াইয়া পাকা কিন্তু অনভিজ্ঞ সার্জ্জন ধাবন কতদিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন? যে শিশু জন্মক্ষণ হইতেই রোগাক্রান্ত সে শিশুর পক্ষে কালক্রমে বলবান হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। এ-বিষয়ে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নাই। অচিরে প্রমাণ হইবে অজয় বিজয় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, শত্রুর মুখে' বিশুদ্ধ ছাই দিয়া, তাঁহাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইবেন কি না। আমরা সর্ব্বতোভাবে অজয়-বিজয়ের জয় কামনা করিতেছি। তবে একটা কথা বলিব—শ্রীঅজয়কে নিমিত্তের-ভাগী মুখ্যমন্ত্রী না করিয়া শ্রীবিজয়ের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল, কারণ আসলে তিনিই এবার রাজ্যের প্রধান সেনাপতি এবং নব-গঠিত সংযুক্ত দলগুলির প্রধান শরিক।

সদ্য-গঠিত নব যুক্ত-ফ্রন্টের মধ্যে ছটাকী দলগুলিকেই ভয় বেশী—বা ৪ জন সদস্য লইয়া এই দলগুলি একদিকে যেমন ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে, অন্যদিকে তেমনি ইহারা ভারসাম্য বিনষ্ট করিতেও পারে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যুক্তফ্রন্টের বড় শরিকদেরও পুঁচকে মাতব্বরদের নিকট বহু সময়, বিশেষ করিয়া বিধান সভায় অতি প্রয়োজনীয় বিলের ভোটদানের সময় ফ্রন্টের একান্ত ক্ষুদ্র শরিকদলগুলির বড় শরিকদের নিকট "মূল্য" আদায় করিয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বে বহুবার দেখা গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাইবে। দর কষাকষি ইতিমধ্যে সুরু হইয়াছে (১১।৪।৭১)

সরকার গঠনকারী বিভিন্ন তথা-কথিত রাজনৈতিক দলগুলির সামগ্রিকভাবে পশ্চিম বঙ্গ এবং বঙ্গবাসীর প্রতি কোন প্রকার কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে হয় না। বিবিধ দলের অধিনায়কদের নেতা না বলিয়া 'অপনেতা' বলাই বোধহয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। দেশের এবং জাতির পরম বিপদের সময়েও এইসব অপ-নেতারা—নিজেদের দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন না এবং শেষ পর্যন্ত ইঁহাদের শিকারের বলি হয় একদিকে পার্টি-সমর্থক এবং অন্য দিকে সাধারণভাবে দেশের নিরীহ মানুষ। দল অপদল—দুই দল—

ইহাদের বেকুফী এবং রাজনৈতিক জুয়াবাজীর খেসারত দিতে হইতেছে—সাতে-নাই পাঁচে-নাই রাম-হরি-যদুকে। এমত অবস্থায় যাঁহারা দেশ এবং জাতিকে ভালবাসেন এবং বাঙ্গালীর প্রকৃত কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদের প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত, দেশের মানুষকে এই রাজ্যের দুষ্ট ব্যাধি অপ-নেতাদের দুষ্ট-প্রচার এবং অপ-আদর্শের আত্মঘাতী প্ররোচনায় বিভ্রান্তিকর মোহ হইতে মুক্ত করা। একথা অবশ্য স্বীকার করি যে জনগণকে চিরকাল মোহমুগ্ধ এবং মিথ্যা স্তোকবাক্যে বিভ্রান্ত করিয়া রাখা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে একটি ইংরেজি বাক্যের কথা উল্লেখ করিতে পারি—

Yon can fool some of the people all the time, all the people some of the time, but not all the people all the time.

বিকারগ্রস্ত মানুষের বিকার-মুক্তি যখন ঘটিবে, সেই বিষম ক্ষণে অন্ধকার জন-প্রতারক, আমাদের জীবনের দুষ্ট এবং আত্মকেন্দ্রিক দুষ্ট নেতাদের কপালে কি লিখন আছে, তাহা ইতিহাস-পাঠকদের অজানা নাই—বিশেষ করিয়া ফরাসী মহা-বিপ্লবের ইতিহাসে তৎকালীন নেতাদের ইতিহাস। গিলোটিন নামক গলাকাটা যন্ত্রে কি ভাবে কতশত নেতা, অপনেতা এবং হঠাৎ নেতাদের মুণ্ডগুলি দেহ চ্যুত হইয়া মাটিতে লুটায় তাহার কথা অন্ধকার :অপসে-বন-গিয়া নেতাদের একবার স্মরণ করিতে কাতর আবেদন জানাইয়া—এবারের মত এ-বিষয়ের ইতি করিলাম।

কেন্দ্র-করুণার কারণে কম্যুদের কাতর ক্রন্দন!

কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে পশ্চিমবংগের কয়েকজন সংসদ সদস্য, বিশেষ করিয়া সি পি এম দলভুক্ত সদস্যরা কেন্দ্রকে পশ্চিমবংগের প্রতি সুবিচার করিতে এবং এই রাজ্যকে—আবার পুনর্গাসিত করিবার জন্য আবেদন জানান। এই আবেদন জানাইবার সময় তাঁহারা—'ওপারের' বাংলার প্রতি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতে বলেন। পাক সরকার ইহাকে সর্বভাবে বঞ্চিত করিয়া রাজশক্তিকেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে সর্বদিক দিয়া 'সৌভাগ্য'মণ্ডিত করিতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ ২০।২২ বৎসর ধরিয়া নিপীড়িত পূর্ব্ববংগ আর সহ্য করিতে পারিল না এবং নিজেদের মুক্তির জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল। বিশ্বাস রাখি 'বাংলা দেশ' শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে পাক কবলমুক্ত করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবেই।

আমাদের সি পি এম সদস্যরাও প্রচ্ছন্নভাবে পশ্চিম-বংগ সম্পর্কে কেন্দ্রকে এই হুমকি দিয়াছেন! কিন্তু এই হুমকী দিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশপ্রেমী কম্যুনেতারা কি একবার নিজেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন? 'বাংলা দেশ'—সমগ্রভাবে, আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে, শেখ সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশ-নির্দেশমত কাজ অর্থাৎ যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। বাংলাদেশ যুদ্ধ করিতেছে—দেশের সাধারণ (কমন) শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা—পশ্চিমবংগে কোন্ পথে চলিতেছি—যুদ্ধ করিতেছি কাহার, কোন্ 'কমন এনিমির' বিরুদ্ধে? আমাদের 'সদা-সংগ্রামী' রাজনৈতিক দল-গুলি সংগ্রামে লিপ্ত কোন্ শত্রুর বিরুদ্ধে?

শতদল-কণ্টকিত এ-পোড়া রাজ্যে সদাসর্ব্বদা দলীয় যুদ্ধই চলিতেছে—এবং হতাহত হইতেছে নিরীহ নির্দ্দলীয় সাধারণ মানুষ। আমাদের এই দলগুলির মধ্যে প্রধান দুইটি দলের দেশের মানুষের প্রতি কোন কর্তব্য নাই। ইহাদের চলা-ফেরা শোয়া-বসা সবই বিশেষ দুইটি বিদেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রের নেতাদের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই দল দুইটির নেতা এবং সমর্থকদের মুখ দিয়া "জয় বাংলা জয় বাংলা" এই ধ্বনি কখনও কি বাহির হইবে? পরপদলেহনকারী মানুষ প্রভুর পদেই তাহাদের সবকিছু অর্পণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। প্রসাদ লাভের জন্য পিতৃত্বও অস্বীকার করে।

'বাংলাদেশের' সর্ব্বজনস্বীকৃত জননেতা শেখ মুজিবরের কথা স্মরণ করিয়া এ-পারের বাংলার নেতাদের

তাঁহাদের উচিত হয় আদি গঙ্গার জলে, আর না হয় ধাপা নামক সর্ব্বজঞ্জালধারিণীর বুকে নিজেদের 'কবরিত' করা! শেখ মুজিবরের ধারে-কাছেও আমাদের ধাপ্পা-বিশারদ নেতারা শতবর্ষ তপস্যা করিয়াও যাইতে পারিবেন কি?

আজ যে-সব কম্যু এবং অন্যান্য বাম নেতারা পশ্চিমবংগের জন্য আকুল ক্রন্দন করিয়া কেন্দ্র-করুণার উদ্রেক করিবার প্রয়াসে দিল্লীর পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত করিতেছেন, তাঁহারা দয়া করিয়া ক্ষণিকের জন্য অশ্রু-বর্ষণ স্থগিত করিয়া, একবার ভাবিয়া দেখুন—এ পোড়া রাজ্য এবং রাজ্যবাসী বাঙালীর বর্তমান বিষম অবস্থার জন্য দায়ী কে এবং কাহারা। পশ্চিম বংগের বন্ধ কলকারখানাগুলি চালু করিতে আজ তাঁহারা কেন্দ্রকে চাপ দিতেছেন, কিন্তু একদা চালু এবং উন্নতিশীল কল-কারখানাগুলি বন্ধ হয় কাহাদের, বিশেষ করিয়া কোন্ দুইটি দলের শুভ-প্রয়াসের কারণে? এখন কল-কারখানাগুলি আবার চালু না হইলে শ্রমিক ইউনিয়ন রাজ-রাজড়া এবং রাজচক্রবর্তী মহাশয়দের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতেছে, কারণ চালু কলকারখানা অচল করাই যাহাদের একমাত্র কাজ—শ্রমিক-কল্যাণের অজুহাতে শ্রমিকদের সর্ব্বনাশ করাই যাহাদের জীবন-ব্রত এবং জীবনী-সংগ্রহের একমাত্র উপায়, তাঁহাদের পক্ষে বন্ধ কলকারখানার অর্থই হইল রোজগারের সহজ পথ বন্ধ হওয়া।

সচলকে অচল করা এবং অচলকে মৃত্যুপথে ঠেলিয়া দেওয়ার সর্ব্বনাশা খেলা আর কতদিন কম্যু এবং কম্যুদের সহযাত্রী, সহকর্ম্মী, সহমর্ম্মী এবং সহধর্ম্মী (প্রকৃত ধর্মের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি মানব অকল্যাণকর দুষ্ট-মনের দুষ্ট অপচিন্তার ফলে উদ্ভূত বিকৃত ধর্মের কথা।) দলগুলি চালাইবে? বাঙালীর শুভ বুদ্ধির শুভ চেতনা জাগ্রত হইতে লাগিবে কত দিন?

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ঝড় উঠিবে!

একদিকে নূতন সরকার কাজ আরম্ভ করিবার প্ল্যান ঠিক করিয়াছেন, অন্যদিকে ৬-পার্টির সি পি এম নিয়ন্ত্রাধীন প্রকৃত এবং শাস্ত্র-সম্মত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টও—বিধানসভার অধিবেশন সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 'ডিমোক্র্যাটিক' আন্দোলন, তথা জন-সংগ্রাম আরম্ভের ডাক দিয়াছে। নূতন সরকার নাকি বাঙ্গলার জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নহে, এবং সেইহেতু এ-সরকার 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং মাত্র জনকয়েক সংখ্যা-লঘিষ্ঠ বুর্জ্জুয়া, জোতদার এবং লুঠেরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়েই অবহিত থাকিবে, প্রকৃত জনগণ বাঁচুক মরুক—এ-সরকার তাহা কখনই দেখিবেনা, কারণ তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতমুখী, দেশের ও রাজ্য-বাসীর কল্যাণের প্রতি বিমুখ! সি পি এম তথা শ্রীমান জ্যোতি বসু ঠিকই ধরিয়া ফেলিয়াছেন অজয়-বিজয়ের প্রথিত নূতন সরকারের ঠিক রূপটি! বাঙ্গলার সাধারণ ভোটদাতারা যদি বুদ্ধিমান হইত, তাহা হইলে সি পি এম পার্টিকে অন্তত পক্ষে ১৫০ আসনে নির্ব্বাচিত করিয়া আমাদের বহু ঝামেলা হইতে বাঁচাইতে পারিত। বিধাতার-মার কে ঠেকাইবে? আরো কিছুকাল যখন কপালের লিখনে, দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ আছে—তখন তাহা ভোগ না করিয়া উপায় কি?

কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যোতি বসু এবং অন্যান্য কয়েকজন সি পি এম নেতা অজয়-বিজয় সরকারকে ৮-পার্টি ডিমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট সদস্যদের প্রতি নিবেদন জানাইয়াছেন যে তাঁহারা যেন এ-রাজ্যের নূতন সরকারের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া রাজ্যে সাচ্চা এবং নিখাদ গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করিতে সাহায্য করেন। বলাবাহুল্য ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে তাহা সি পি এমের নেতৃত্বে গঠিত হইবে এবং জ্যোতি বসু মুখ্য-মন্ত্রীর পদে বসিয়া স্বরাষ্ট্র দপ্তরেরও কর্ত্তা হইবেন অবশ্যই। সে যাহাই হউক—এবার জ্যোতিবাবুর কণ্ঠে আর সে সিংহ গর্জ্জন নাই কেন? গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে এবার যেন ছাগকণ্ঠের 'ট্রেমোলো', প্রায় ক্রন্দনের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। এ-সুর কি কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য একটা নূতন ষ্ট্র্যাটেজি?

সি পি এম—তাহাদের নব-গণতান্ত্রিক আন্দোলন [illegible]

গণ-গণ্ডগোল সুরু করিবে যেদিন প্রথম বিধানসভার অধিবেশন বসিবে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। আমরা অবশ্যই আশা করিব যে সি পি এম এবং তাহার আশ্রিত অন্য পাঁচটি দল—আবার কলকাতার রাজপথেই জোরদার রাজনীতি প্রবাহিত করিতে প্রয়াস পাইবে—যাহার ফলে শহরের শতকরা ৯০।৯৫ জন অধিবাসীর জীবন হইয়া উঠিবে দুর্ব্বিসহ। কলকারখানা, সর্ব্ববিধ সরকারী বেসরকারী সংস্থার, এমন কি হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ প্রভৃতির কার্য্য প্রায় অচল হইবে এবং রাজ্যবাসী দুঃখী মানুষদের জীবিকা অর্জ্জনও বিঘ্নিত হইবে অহরহ, রাজ্য, জেলা, এমন কি পাড়া ও রাস্তা ওয়ারী 'বন্‌ধের' কল্যাণে। আজ (২৮-৪-৭১) এ-বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নহে, তবে এই সংখ্যা প্রবাসী প্রকাশিত হইবার পুর্ব্বেই আমরা আমাদের (অ) মঙ্গল বিধাতা রাজনৈতিক অপ-এবং উপ-দেবতাদের জলসার পরবের পূর্ণ বিকাশ উপভোগ করিতে থাকিব আশা করি।

নব মুখ্য-মন্ত্রীর (তৃতীয় দফা) কর্ত্তব্য কি?

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এখন আর আদর্শবাণী প্রচার এবং "প্রশাসনকে আরো জোরদার করিব"—এই প্রতিশ্রুতি মূল্যহীন বেকার। গত কিছুদিন হইতে খুনের সংখ্যা গড়ে প্রতিদিন ৫ হইতে প্রায় ১০।১১তে দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ সহজ কথায় কলিকাতা (বৃহত্তর কলিকাতা সমেত) এবং কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতেই প্রত্যহ অন্তত সাত আটটি করিয়া নিরীহ সাধারণ মানুষ নিহত হইতেছে—সন্দেহে অনেকে গ্রেফ্‌তারও হইতেছে, কিন্তু গত ৮।১০ মাসে যাহারা পুলিসের হাতে ধরা পড়িয়াছে—তাহাদের বিচার কি হইল কিংবা কবে হইবে কেহই বলিতে পারে না। প্রশাসনের এই দীর্ঘসূত্রতা এবং অকর্ম্মণ্যতা মানুষের মনে ক্রমশঃ একটা অবিশ্বাসের ভাব জাগ্রত করিতেছে এ-রাজ্যে প্রশাসকদের বিরুদ্ধে। এই অবিশ্বাস যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা মানুষও হিংস্র হইয়া নিজেদের নিরাপত্তার জন্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে যেমন করিতেছে 'বাংলাদেশ' বাসীরা।

অজয়-বিজয় সরকারের এখন একমাত্র পথ এ-রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার নষ্টামী যদি বন্ধ করিতে হয়—তাহা হইলে 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর' নীতি গ্রহণ করা। কিন্তু এই নীতি অবলম্বন করার পথে অনেক কাঁটা এবং বর্ত্তমান সরকারের ছোট ছোট পঁুচকে শরীক দলগুলি। নিজের পার্টির এবং বিভিন্নমুখী আদর্শ রক্ষার জন্ত অজয়-বিজয় সরকারের নিকট হইতে সব দলই মূল্য-স্বরূপ 'পাউণ্ড অব ফ্লেশ' আদায় করিবেই—এবং যাহার ফলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আবার বিধানসভা বাতিল হইবে। তাহার পর জ্যোতি বসুর দল সরকার গঠনে ব্যর্থ হইলে আবার আমাদের প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচিত রাবার ষ্ট্যাম্প রাষ্ট্রপতির শাসন জারি, এবং সেই শাসন-কালেও আমরা বারবার শুনিব পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করিতে সরকার আরো কৃতসংকল্প।

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সমাজ দেহমন আজ প্লো পয়জন আক্রান্ত

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর এ-সর্ব্বনাশের শেষ কি এবং কবে—কয়েকশত কিংবা কয়েক হাজার নিরীহ বাঙালীর অকালে মোক্ষলাভ দুঃখের কথা; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ এবং আশঙ্কার কথা, দুইটি কমিউনিষ্ট পার্টি এবং সহধর্ম্মী, সহমর্ম্মী অন্য কয়েকটি সহ-অকর্ম্মী তথাকথিত পলিটিক্যাল ফ্যাকড়া দল বাঙ্গালী পারি-বারিক জীবনে যে ধস্ সৃষ্টি করিয়াছে, বিকৃত এবং বিষাক্ত 'আদর্শ' প্রচারের দ্বারা, তাহার পরিণাম। তাহা কি এবং কোথায় তাহা ভাবিয়া পাই না। শতকরা প্রায় ৫০।৬০টি পরিবারের একমাত্র আশা-ভরসাস্থল যুবক এমন কি বালকদের চিত্তে এমন একটা বিষম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহাদের সকল পারিবারিক কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব চ্যুত করিয়া পথে নামাইয়াছে—একটা ঝুটা এবং

আমাদের এবং দেশের ভবিষ্যত আশা যুবজনদের আজ অবস্থা হইয়াছে 'না ঘরকা না ঘাটকা।' চোখের সামনে 'বাঙ্গলা দেশের' মহা বিদ্রোহের এবং দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া 'বাঙ্গলা দেশের' মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে ব্রতী যুবকদের নিস্বার্থ জীবন দান—বাজারে বাজারে লাখে লাখে আমাদের নীতিহীন, বিজাতীয় আদর্শে আস্থাবান রাজনৈতিক পার্টি বস্‌দের চিত্তে কোন অনুপ্রেরণা দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে—বিকারগ্রস্ত চিত্তে কোন সত্য এবং সৎ আদর্শ ঘেঁসিতে পারে না।

নেতা এবং পার্টি বস্‌ মহারাজের দল 'বিদ্রোহ' সার্থক করিতে সকল শ্রেণীর বাঙ্গালী যুবকদের আকুল আহ্বান জানাইতেছেন। কিন্তু তাহারা নিজেদের পরিবারভুক্ত, বিশেষ করিয়া সন্তানদের 'বিদ্রোহের' আবর্ত্তের বাহিরে রাখিয়াছেন। গণমহারাজ শ্রীজ্যোতি বসু তাহার একমাত্র পুত্রকে সযত্নে এবং অতি সতর্কে সর্ব্ববিধ ঝড়ঝাপট এবং সংগ্রামের আওতার বাহিরে রাখিয়াছেন, সি পি এম কট্টর সদস্য শ্রীরামবল গোঁয়ার ও শুধু তাই নহে তিনি নিজের ক্ষেতখামার এবং ধানের গোলাগুলিও অতি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন স্বনামে-বেনামে। ব্রেজনেভ দাসগুপ্তও প্রায় তাই। প্রতিটি প্রায় ২ টাকা মূল্যের সিগার তাঁহার চাই-ই—প্রত্যহ অন্তত ১০।১২টি। ভদ্র এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী-পরিবারের শিক্ষিতা মেয়েরাও কম্যু-জালের শিকার হইতেছেন দলে দলে, এমন কি বিবাহিতা শিক্ষিতা মেয়েদের পারিবারিক-জীবন নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে শালীনতা বোধও লুপ্তপ্রায়।

আজ আমাদের অবস্থা এমনই এক পর্য্যায়ে আসিয়াছে—যখন অভিভাবক তাঁহার অধীন পরিবারের ছেলে মেয়েদের, শাসন করা দূরে যাক্—পরিবার কল্যাণ এবং তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে কোন কথা বলিতেও ভয় পাইতেছেন। এখন অভিভাবকের কর্ত্তব্য শুধু এইটুকুই যুবজন এমন কি নেহাত ১২।১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিবে রাজনৈতিক পার্টির বস্‌ মহারাজগণ। একথা বলা বাহুল্য যে পার্টি বসদের নিজের বাড়ী এবং পরিবারভুক্ত যুবক এবং বালকদের সকল প্রকার 'সংগ্রাম' এবং বিষাক্ত রাজনৈতিক অপ এবং দুষ্ট প্রচারের বিভ্রান্তি হইতে বহু দূরে রাখা হইতেছে সযত্নে।

আলোচ্য সমস্যাটি অতি গুরুতর এবং এ-বিষয় বিশদ আলোচনার আশু প্রয়োজন। আগামীবারে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

পশ্চিমবঙ্গে নব-যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা

শ্রী অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে এ-রাজ্যে আবার একটি নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হইয়াছে—এই সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা এবং আইন সঙ্গত শাসন ব্যবস্থার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছুই কঠোর হস্তে কার্য্যকর করা হইবে, বিশেষ করিয়া গণহত্যা এবং সেই সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার হামলাবাজী দমন করিতে এই সরকারও কৃতসঙ্কল্প যেমন কেন্দ্র সরকারও প্রায় গত ১০।১১ মাস ধরিয়া কৃতসংকল্প। শ্রীমতী গান্ধীও প্রধান মন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক এবং 'নিয়মমাফিক' নরহত্যা লুঠতরাজ, নক্সালী অনাচার প্রভৃতি বন্ধ করিতে তাঁহার অনড় কৃতসঙ্কল্পের কথা বারবার ঘোষণা করিতে দ্বিধা করে নাই। কিন্তু পাঁজি-পুঁথি দেখিয়া কবে কোন তারিখ হইতে সরকারী 'কৃতসঙ্কল্প' বাস্তবে দেখা দিবে তাহ কেহই এখন পর্য্যন্ত ঘোষণা করেন নাই। এখনে চিন্তার পালা চলিতেছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে গ প্রতিদিন অন্তত চার পাঁচটি (কখনো কখনো দিে ১০।১২টিও) বেপরোয়া নরহত্যা এখনো অবাে চলিতেছে!

১৯৭০ সালের ১৯এ মার্চ হইতে আজ (১২।৪।৭১

প্রাণ বলি দিয়াছে। ঘাতকদের কবলে একজন হাইকোর্টের বিচারপতিও প্রাণ দিয়াছেন—এপ্রিল (১৯৭১) প্রথম দিকে। রাজ্যের নিয়ম শৃঙ্খলার অবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসনে যাহা ছিল, আজ (২০।৪।৭১) পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—অবস্থার ক্রম অবনতিই হইতেছে এ-কথা বলা অসঙ্গত হইবে না! রাজনৈতিক হত্যার ঘটনাও দিনের পর দিন বৃদ্ধিমুখেই চলিয়াছে!

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার এই দুঃসহ গতিরোধ না করিতে পারিলে প্রায় মৃত ব্যবসা বাণিজ্য এবং বর্ত্তমানে অচল কলকারখানাগুলি পুনরায় সচল করা এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে—১৯৭০ সালে কোন প্রকার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এই কয়েকটি রাজ্যে ঘটে নাই—জম্মু এবং কাশ্মীর, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লী, গোয়া-দামান-দিউ, মণিপুর, নেফা এবং চণ্ডীগড়।

১৯৭০ সালের মার্চ মাস হইতে ১৯৭১ সালের ২২এ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে; অন্ধ্রপ্রদেশে ১১টি, কেরলে ৬টি, মহারাষ্ট্রে ১টি এবং মহিশুরে ১টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে ৫৪৬টি রাজনৈতিক কারণে প্রাণ হারায়।

ইতিমধ্যে এ-রাজ্যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আবার ব্যাপকতালাভ করিতেছে। (একজন শ্রদ্ধেয় বিচারপতিকে কোন রাজনৈতিক কারণে গুলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল—কে বলিবে।)—নরহত্যার যে হিসাব দেওয়া হইল, তাহাতে কিছু ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু এই হিসাব কম করিয়াই ধরা হইয়াছে—গত এক বৎসরে এ-রাজ্যে গুম খুন যে কত হইয়াছে, তাহার হিসাব ঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারে না। খাল-বিল, ডোবা, পথে মাঠে ঘাটে প্রাপ্ত মৃতদেহগুলি হিসাবে নাই।

আমাদের নব-মন্ত্রীসভা তাঁহাদের প্রারম্ভিক ৭-দফা কার্য্যসূচী প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারও তাঁহাদের ৩২ দফা কার্য্য সূচী ঘোষণা করেন—কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যসূচীতে যে দফাটি ধরা বা উল্লিখিত হয় নাই সেই অনুচ্চারিত দফা অর্থাৎ রাজ্য এবং রাজ্যের জনগণের সর্ব্বাঙ্গিক দফারফা তাঁহারা সযত্নে এবং সর্ব্বপ্রথমে গর্জন করিয়া সার্থক করেন।

আমাদের সদ্যজাত শিশু সরকার বলিতেছে তাঁহাদের প্রথম কাজ হইবে এ-রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই সঙ্গে জনমনে ফিরাইয়া আনা নিরাপত্তার ভাব। হত্যার রাজনীতি সর্ব্বতোভাবে দমন করিয়া আবার আইন শৃঙ্খলার সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সবই ভাল এবং এ-রাজ্যের পক্ষে আজ অত্যাবশ্যক—কিন্তু কার্য্যসূচী ঘোষণার পরে বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হইলেও আজ পর্য্যন্ত (২৮-৪-৭১) বাস্তবে কিছুই দেখা গেল না। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে ইতিপূর্ব্বে প্রায় ১০।১২ মাস ধরিয়া কেন্দ্র সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষ করিয়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বারবার, বহুবার ঘোষণা করিয়াছেনএবং বলিয়াছেনযেমন করিয়াই হউক—এ-রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজ এবং স্বাভাবিক গতি দান করিবেন। খুবই ভাল কথা এবং পূণ্য প্রতিশ্রুতি—তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না—কিন্তু দুঃখের কথা, কথাই যদি কাজ হয় এবং কাজই যদি কেবল কথা বলা হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে প্রশাসকদের অমৃত ভাষণ শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করা ছাড়া আর কোন প্রকার লাভ-ক্ষতির কথা আলোচনা করা নিরর্থক। আমাদের নূতন সরকারের মুখ্য মন্ত্রী যদি তাঁহার তথা তাঁহার সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপাইত করিতে আন্তরিক প্রয়াস করেন এবং আর কিছু না হউক রাজ্যের বিনষ্ট শান্তি শৃঙ্খলা যদি ফিরাইয়া আনিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে রাজ্যও জন-নিরাপত্তা দান করিতে পারেন তাহাহইলে পশ্চিমবঙ্গ নামক কলোনীরআদিবাসী বাঙ্গালী সাধারণ কৃতজ্ঞ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে অজয়-বিজয়ের জয় ঘোষণা করিবে।

সন্ধ্যা-গায়ত্রী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়

ছায়াচ্ছন্ন বনতলে তৃণশয্যা 'পরে
ছিনু পড়ি' জড়তার অবসাদ ভরে
তুচ্ছ মৃত্তিকার ঢেলা— শীতল ধূসর ;
সহসা স্পর্শিল আসি তব দীপ্ত কর
মধ্যাহ্ন গগন হতে, তব শুভ্র জ্যোতি
বর্ষিল অজস্র ধারে। ছিল না শকতি
সে রশ্মি ফিরায়ে দিব স্ফটিকের মত
বিচ্ছুরিয়া জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ শত শত
মলিন মাটির অঙ্গে তবু জ্বলেছিল
দু' চারটি বালুকণা ; তবু চলেছিল
হিম দেহে মৃদু তপ্ত জীবনের স্রোত
প্রাণের বিচিত্র ছন্দ বহি'—ওতপ্রোত।

তার পরে অরণ্যের অবকাশ পথে
হেরিনু তোমার যাত্রা জ্যোতির্ময় রথে
পশ্চিম দিগন্ত পানে।
অস্তে গেছ তুমি,
অন্ধকার ঘিরে আসে মৌন বনভূমি।
প্রাণতপ্ত জীবনের প্রবাহ আবার
হিম হয়ে আসে, ছায়াম্লান দেহে আর
জ্বলে না বালুকাকণা ; তবু করি ধ্যান
তোমার দীপ্তির সেই অকৃপণ দান।

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান

শ্রীসুধীর নন্দী

বঙ্গবন্ধু,
তুমি কি পারবে ওদের সঙ্গে ?
শোননি,
সেদিন ওরা আমাদের
একপাল ভয়ার্ত মেয়েকে ধ'রে এনে
রণাঙ্গনে খাড়া করে দিয়েছিল ;
শিখণ্ডীর দল,
তোমার লোকেরা অস্ত্রসম্বরণ করেছিল
মহারথী ভীষ্মের মত ।
কৈ পারেনি ত,
আপনার মা বোনেদের গায়ে অস্ত্র হানতে !

তবুও তুমি হানাদারদের সঙ্গে লড়বে ?
পেরেছ তুমি মসজিদ ভেঙ্গে দিতে
কালীমন্দিরের চূড়ো ধুলোয় লুটিয়ে দিতে—
চট্টলের কৈবল্যধাম কলুষিত করতে ?
পারবে তুমি রাত্রির অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলে ঢুকে
গুহ ঠাকুরতা, তার বৌ আর ঘুমন্ত ছেলেটাকে
গুলি ক'রে মারতে ?
না, তুমিতো পারোনি,
পারবেও না কোনদিন ।
নারীঘাতী, শিশুঘাতী কি হ'তে পারবে তুমি ?

পারবে মায়ের বুকে মুখ রেখে
যে সন্তান ঘুমিয়ে আছে
তাকে বেয়নেটবিদ্ধ করতে ?
পারবে নাপাম বোমা দিয়ে গ্রাম-বাংলা জ্বালিয়ে দিতে
পারবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে
হাজার হাজার
না, না, হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে—

—কারো হাত নেই, পা নেই,
মাথাটা আবার কারো বা উড়ে গেছে
নাড়ীভুঁড়ি গলগল ক'রে বেরিয়ে পড়েছে
শাণিত বেয়নেটের খোঁচায়।
না, মুজিবর,
তুমি তা পারবে না ;
তোমার মেয়ে রোশেনারা
তোমারই মত,
তার কথা আমরা ভুলিনি।

তোমরা কেউই এ কাজ পারবে না।
দেশের জন্য আত্মবলি,
হ্যাঁ, তা তোমরা পারো ;
কিন্তু জঘন্য নরবলি,
লুঠ, ধর্ষণ, গৃহদাহ,
গুপ্তঘাতকের ভূমিকা
তোমার নয়।
তাই ত তুমি গোটা বাংলাদেশের বন্ধু,
বঙ্গবন্ধু,
সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদী নেতা।

বাঙলা দেশের একচ্ছত্র জননায়ক!
জনাব মুজিবর রহমান।
তাইত তোমার একটি নাম
সংখ্যা গণনার অতীত একটি মহৎ জনতার হৃদয়ে
খোদাই করা হচ্ছে :
হীরে দিয়ে, সোনা দিয়ে মোড়া সেই নামটি॥

সংবাদপত্র

পুষ্পদেবী

কাহার তরেতে প্রতিটি ঘরেতে ব্যাকুলিত দুটি আঁখি
সমগ্র মন করে নিমগন কারে বুক 'পরে রাখি'।
যতকিছু কাজ সবি ভুলে যায়
কাহার মাঝারে নিজেরে হারায়
কখনো বক্ষে কখনো কোলেতে আসি' সেই লয় ঠাঁই,
সকলি শূন্য না হেরি তাঁহারে বাতায়ন পথে চাই।

এই প্রীতি শুধু ক্ষণিকের তরে তার পর দিন হায়
গৃহজঞ্জাল হয়ে পড়ে থাকে, ফিরে কেহ নাহি চায়।
কেহ বা আগুনে তাহারে পুড়ায়
কেহ বা বাঁধিতে তারে লয়ে যায়
তাহার জীবন সমাদর পায় শুধু ক্ষণিকের তরে,
গৃহজঞ্জাল করে নিক্ষেপ মুড়ে কেহ তার পরে।

নব পরিণীতা বধূর দিকেও তখন ফিরায় মুখ
কাহারে জানিতে কাহারে চিনিতে তার এই উৎসুক
অভিমানিনীর স্ফুরিত অধর
পায় না তখন কোন সমাদর
বলিতে কি লাজ অফিসের কাজ তাও যেন ভুলে থাকে,
কখন বক্ষে, কখন কোলেতে সমাদর ভরে রাখে।

হয়ত ইহাই জগতের রীতি স্থায়ী কোন কিছু নয়
তাহারি মহিমা প্রভাতফেরীতে এমন দৃষ্ট হয়
দেখেও তবু ত বোঝে না ত হায়
এই সংসারে জীবন বিকায়

অনন্য

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

রেল-ব্রীজের নীচে
প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার নীড়ে,
কুলী বা কেরানীর পায়রা-খোপ ঘরে,
সামুদ্রিক জেলে-নৌকার সহজ সংসারে
ভ্রাম্যমাণ বাউলের একতারায়,
কিংবা কোন প্রেমিকের মৃত্যু-পণ কান্নায়
সে বেঁচে থাকতে চায়।
সে কাঁদে মৃতের শোকে ;
আবার উদ্দাম হয় সামুদ্রিক ঝিনুকের খোঁজে।
মাটির প্রদীপ হাতে যে-মেয়েটি তুলসীতলায়
প্রাণের প্রণাম জানায়—
সেখানে সে বাঁচতে চায়।
পৃথিবীতে অনিরুদ্ধগতি
সে এক অমর প্রাণ।
জীবনের কোনো লগ্নে তার কাছে পরাজিত
হিংস্র নাদির কিংবা রক্তলোভী বর্বর তৈমুর।
মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সৃষ্টি-লীন
বে-হিসেবী নীরো।
সে বাঁচে অনেক ভীড়েও—
ও-প্রান্ত ও এ-প্রান্তের সকল বন্দরে।
পৃথিবীতে আমাদের সকল আকাঙ্খা
এবং স্বপ্নের মধুরিমায় .
অনন্য সে :
একান্তই বেঁচে থাকতে চায়

অমৃতস্য পুত্রা

সংগ্রামসিংহ তালুকদার

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" এই ঋষিবাক্য বিশ্বমৈত্রীর মহান্ ধারক। কিন্তু এই "অমৃতস্য পুত্রা"র অর্থ কি? অমৃতের পুত্র। অমৃত কি? মৃত ও অমৃত এই দুই অবস্থা। প্রথমে মৃত কি তা না জানলে অমৃতের ধারণা আমাদের হয় না।

মৃত্যু বিষয়ে গীতা বলেছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ (গীতা ২-২২)

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নূতন দেহ লাভ করেন। মৃত্যু হল কোনও একটি অবস্থার শেষ। অবস্থান্তরই মৃত্যু। প্রত্যেক অবস্থারই একটি অন্তরায় আছে! এই অন্তরায়ই প্রকৃতি আচারিত অবস্থার শেষ। এই অবস্থা, যা প্রকৃতিগত কারণে স্থূল (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য), সেই অবস্থা যখন শেষ হয়ে যায় ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যের বাহিরে চলে যায় তাকেই সাধারণত আমরা মৃত্যু বলে ধারণা করি। এইরূপ স্থূল দেহত্যাগ বা যে কোনও প্রকার স্থূল অবস্থার অবসানকেই সাধারণভাবে আমরা মৃত্যু বলে জেনে থাকি। এই যে 'শেষ' বা 'মৃত্যু' এ বিষয়ে জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক ভীতি আছে। এমন জীব নাই যার মৃত্যুভয় নাই। ব্যাধ যখন শিকারের সন্ধানে গভীর বনে প্রবেশ করে তখন মৃগকুল ও পক্ষীগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করে। ক্রুদ্ধ ফণিনীর দর্শনে কার প্রাণ না মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হয়? এই যে প্রকৃতিগত বা স্বভাবজাত মৃত্যুভয় এ জীবমাত্রেরই অন্তরে চেতনারূপে বর্তমান। মৃত্যুই যে স্থূল দেহের অবসান বা স্থূল দেহের অবসানই যে চরম দুঃখকর অবস্থা, এ চেতনা জীবমাত্রেরই সহজাত। যদিও কেহই (জীবমাত্রেই) এ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পায় না তবুও এই অবস্থার নিবৃত্তির জন্য সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। মহাভারতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম্ম এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, "এই পৃথিবীতে সব চাইতে আশ্চর্য্য কি?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥ (মভা)

প্রতি নিমেষে জীবসকল মৃত্যুর অন্তরালে চলে যাওয়া সত্ত্বেও যারা জীবিত আছে তারা নিজেদের অমর মনে করে। এ বিভ্রান্তি মহাআশ্চর্য্য হতে পারে। কিন্তু এ স্বভাবজাত। কোনও এক অবস্থার শেষই যদি মৃত্যু হয় তবে আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর কবলে পতিত হচ্ছি। তবে মৃন্ময় সংসার বলতে আমাদের কোনও বাধা নাই। শৈশব থেকে বাল্যকাল, শৈশবের মৃত্যু, বাল্য থেকে কৈশোরে বাল্যকালের মৃত্যু, কৈশোর থেকে যৌবনে কৈশোরের মৃত্যু, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে যৌবনের মৃত্যু, প্রৌঢ়ত্ব থেকে বৃদ্ধত্বে প্রৌঢ়ত্বের মৃত্যু, বৃদ্ধত্ব থেকে জরায় বৃদ্ধত্বের মৃত্যু, জরা থেকে দেহপাতে জীবলীলার অবসান। এই যে প্রতি অবস্থার মৃত্যু বা অবসান এ সঙ্ঘটিত না হলে আমরা দেহের বৃদ্ধি, জ্ঞানের উন্মেষ ও জীবনের স্বাধীনতা কিছুই লাভ করতে পারি না। সেই সেই অবস্থার "অবসান" বা "মৃত্যু" যদি না থাকত তবে কোনও কিছুরই বিকাশ বা পূর্ণতা সম্ভব হত না। আমাদের এই দেহের ভিতরে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ কোষ সকল পুরাতন বা অকর্ম্মণ্য হয়ে

মৃত্যুর দ্বারে চলে যাচ্ছে ও তার স্থানে নূতন কোষের সঞ্চার হচ্ছে। এতে আমাদের দেহের বৃদ্ধি, দেহের কান্তির বিকাশ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের সজীবতা, জ্ঞান ও আনন্দের উৎপত্তি হচ্ছে। বাহিরের প্রকৃতিতেও আমরা দেখতে পাই পুরাতন প্রতিনিয়ত নূতনের জন্যে স্থান করে দিচ্ছে। পৃথিবীর জীব-গোষ্ঠীর বা মানব-গোষ্ঠীর ধারাও একইভাবে পুরাতনের বিলোপ বা মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নূতনের প্রাণসঞ্চার করে চলেছে। প্রতি অবস্থাই সঙ্গ বা সঙ্কল্প দিয়ে বা গুণরূপ চেতনা দিয়ে নবীনকে প্রতিনিয়ত আরও উন্নততর অবস্থায় বা অবস্থান্তরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

এইভাবে বিদ্যা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা অব্যাহতরূপে মানবজীবনে প্রবাহিত হচ্ছে। এ মৃত্যুরই দান বা মৃত্যুই জীবনের শ্রেষ্ঠাংশে জীবনের জয়-গান করছে অনন্ত রাগে, অনন্ত মূর্চ্ছনায় ও অনন্ত ও অখণ্ডনীয় প্রবাহের ধারায়। এই মৃত্যুর ভিতর দিয়েই আমরা প্রতিনিয়ত নূতন জন্ম লাভ করছি। আমাদের এই জীবনেই বহু জন্ম-জন্মান্তর হচ্ছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম জনমান্তর।" এই জন্ম জনমান্তরের অর্থ এই মৃত্যুময় জগতে শত সহস্র হতাশা, শোক, দুঃখসম মৃত্যু থেকে নবীন আনন্দে আত্মচেতনায় পুনরায় জাগ্রত হওয়া। এ মৃত্যুও মৃত্যু। কিন্তু মহাপ্রয়াণ নয়। জীবলীলা বা জীব-জীবনের লৌকিক অবসানকেই মৃত্যু বলা হয়। আরও বিশদভাবে বললে বলা যায়—চিৎ শক্তি সম্পন্ন নিত্য স্বরূপ অজর অমর শাশ্বত চিন্ময় জীবাত্মা যখন সঙ্কল্প, বিকল্পাত্মক প্রাণময় কোষে আবদ্ধ দেহরূপ মরণ-শীল আধার পরিত্যাগ করে নিত্যলীলায় অবগাহন করেন তাকেই মৃত্যু বলে।

অখণ্ড অব্যক্ত ভাসমান যে অদ্বৈতরূপ জীবন তার নানাত্ব দর্শনই মৃত্যু। শোক, দুঃখ, সুখ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ রূপ যে নানাত্ব তাই মৃত্যু-রূপ। বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ এই জগতে নানাত্ব নাই। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" যে এই জগতে নানাত্ব দেখে সেই মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়। নানা দর্শনই অজ্ঞানতা ও অজ্ঞানতাই মৃত্যু। অজ্ঞানতা যদি মৃত্যু হয় তবে অজ্ঞানতা জিনিষটা কি? এই জীব লোকে দেখতে পাই, আমি যেমন সংসারধর্ম্ম পালন করছি অন্য দশজনেও সেইরূপ করছে। কাউকে অজ্ঞান বলে মনে হয় না। অর্থের কড়াক্রান্তি হিসাব বিষয়ের ভাগ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণ, অর্থ উপার্জ্জন, ব্যবসায়, বাণিজ্যে, রাজসেবায়, দেশ ও দশের সেবায়, ধর্ম্ম আচরণে, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সকল স্তরে সকলেই এক-একজন ধুরন্ধর। যদি বলি, তুমি অজ্ঞান, অমনি মহারুষ্ট হয়ে উঠবেন ও বলবেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে অজ্ঞান বলা?" তা হলে কাউকে অজ্ঞান বলা যায় না। কথাটা অনেকাংশে সত্য। অন্ধকারের ভিতরে থাকতে থাকতে যেমন অন্ধকার গা' সহা হয়ে যায় ও সেই অন্ধকারে কোনও কর্ম্ম করতে আর অসুবিধা হয় না, তেমনি মোহান্ধকার রূপ অজ্ঞানতায় থাকতে থাকতে সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়। অন্ধকারে থাকতে থাকতে যখন আলোকের উদয় হয় তখন যেমন পূর্ব্ব অবস্থাকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়, তেমনি মোহান্ধকার রূপ অজ্ঞানতার ভিতরে যদি অনুভাবাত্মক জ্ঞানের উন্মেষ হয় তখন এই মৃত্যুরূপ অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়। শুধু জ্ঞান বলব না। অনুভাবাত্মক জ্ঞান বলি। তাতে শুধু এক শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানই বুঝায়—অজ্ঞানতাই মৃত্যু ও ব্রহ্মজ্ঞানই অমৃত। মহাভারতে ব্যাসদেব শুকদেবকে বলছেন—

> "এষা পূর্ব্বতরা বৃত্তি ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
> জ্ঞানবানেব কর্ম্মাণি কুর্ব্বণ সর্ব্বত্র সিদ্ধতি।
>
> (মভা-শা ২৩৭-১)

"জ্ঞানবান্ হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াই সিদ্ধিলাভ করা। ইহাই ব্রাহ্মণের পূর্ব্বকালের পুরাতন বৃত্তি।" আমার ধারণা, এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ রূপক। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু যে সে-ই ব্রাহ্মণ।

গীতায় এ কথার পূর্ণ সমর্থন পাই—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ (৪-১৩)

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

ইতি মাং যোঽভি জানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে॥"

গীতা (৪-১৪)

"আমি অকর্ত্তা হইয়াও গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের স্রষ্টা বা কর্ত্তা। সকল গুণ ও কর্ম্মের স্রষ্টা বা কর্ত্তা হইয়াও যে আমি সকল কর্ম্মেই অলিপ্ত এ বিষয় যে ব্যক্তি অবগত আছে সে বর্ণ বিভাগ অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে অলিপ্ত থাকে।" এই হ'ল শুদ্ধ জ্ঞান ভাগ। সুতরাং শূদ্রও যদি ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হয় তবে সে নিজ কর্ম্মভাগে লিপ্ত থেকেও ব্রাহ্মণ পদ-বাচ্য। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও যদি ব্রহ্মস্বরূপ অবগত না হয় তবে সে শূদ্রের পদবাচ্য। এতে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে ব্রহ্মবাদী যে সেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। মনুতে ও মহাভারতে বলা হয়েছে যে মানবকুলে শ্রেষ্ঠ কে?

"ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।

কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তার কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥

(মনু ১-৯৬-৯৭ ও মহা-উদ্যোগ ৫-১৩২)

"ব্রাহ্মণের ভিতরে যে বিদ্বান্, বিদ্বানের ভিতরে যে কৃতবুদ্ধ, কৃতবুদ্ধের ভিতরে কর্ত্তা ও কর্ত্তার ভিতরে যে ব্রহ্মবাদী সেই শ্রেষ্ঠ মানব।" ব্রহ্মবাদীর বর্ণভেদ নাই। তা হলে যে কোন মানব ব্রহ্মবাদী হতে পারেন। প্রশ্ন হচ্ছে কি ভাবে ব্রহ্মবাদী হওয়া যায় অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়া যায়?

এই জগৎ কর্ম্মময় ও স্রষ্টা নিজে মহাকর্ম্মী। আমাদের জীব-জীবনে কোনও অবস্থাতেই কর্ম্মবিরতি অসম্ভব। স্থূল দৃষ্টিতে আজিকার কর্ম্মময় জগতে কর্ম্মহীন হওয়ার অর্থ দারিদ্র্য ও ক্লীবত্ব। গীতাও কর্ম্মভাগকেই জীব জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ বলেছেন। কর্ম্মই জীবনের গতি ও কর্ম্মই অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র পথ। কিন্তু ব্যাসদেব শুকদেবকে বলছেন, "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু বিদ্যয়া তু

"কর্ম্মের দ্বারাই জীব বদ্ধ হয় ও বিদ্যার দ্বারাই মুক্ত হয়।" কিন্তু গীতায় এর মীমাংসা করা হয়েছে যে শুধু কর্ম্ম করে কেউ বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না। আসলে যে মনোবৃত্তি নিয়ে কর্ত্তা কর্ম্ম করেন সেই মনোবৃত্তিই কর্ম্মফলের গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য সর্ব্ব অবস্থায় দায়ী। অধ্যাত্ম রামায়ণে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন—

প্রবাহ পতিতঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।

বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব॥"

কর্ম্মের প্রবাহে পতিত মনুষ্য সংসার বাহ্যতঃ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াও অলিপ্ত থাকে।

অধিকন্তু কর্ম্মকেই জীবনের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কর্ম্ম না করলে জীবনে কোনও সার্থকতাই আসে না। মহাভারতে গোকাপিলীয় সংবাদে কপিল মুনি স্যূমরশ্মিকে বলছেন—

"শরীরপক্তি কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ।

কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে রস জ্ঞানে চ তিষ্ঠতি॥"

(মভা-২৬৯,৩৮)

শরীরের রোগ বহিষ্কারের জন্যই কর্ম্মসকল আছে। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম ও চরমগতি। কর্ম্মের দ্বারা শরীরের কষায় অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ রোগ বিনষ্ট হইলে পর রস-জ্ঞানের আকাঙ্খা হয়।

কি এই রসজ্ঞান? কঠোপনিষদে বলা হয়েছে

"রসো বৈ সঃ।

রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥"

"তিনিই রস স্বরূপ। তিনিই যখন রস স্বরূপ বা সকল রসের আধার তখন এই রসজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই— অমৃত স্বরূপকেই উপলব্ধি হয়"। তবে এই রস স্বরূপ অমৃতকে উপলব্ধি করতে হ'লে কর্ম্ম অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সে কর্ম্ম কি প্রকার? স্বার্থহীন কর্ম্ম। কর্ত্তব্যবোধ সংসারের সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে নিজ স্বার্থত্যাগ করলেই অমৃতের আস্বাদন লাভ হয়।

কৈবল্য ও নারায়ণোপনিষদেও বর্ণিত আছে—

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন,

"কর্ম্মের দ্বারা, প্রজার দ্বারা, অথবা ধনের দ্বারা নহে, ত্যাগের দ্বারাই কেহ কেহ অমৃতত্ব লাভ করেন।

ত্যাগ কি কর্ম্ম নয়? ত্যাগ স্বার্থহীন কর্ম্ম। স্বার্থহীন কর্ম্মই অমৃতত্ব লাভের সোপান। গীতাতেও এই বাক্যের পুনঃ পুনঃ সমর্থন আছে যে নিস্বার্থ বা নিষ্কাম কর্ম্মই অমৃতত্ব লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

আমরা দেখতে পাই যে অচেতন কর্ম্ম কাহাকেও বন্ধনও করে না, মুক্তও করে না। তার প্রতি কর্ত্তার মনের যে কামনা হয় তাই বন্ধন ও মুক্তির কারণ হয়। তা হ'লে নিস্বার্থ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করে জ্ঞান লাভের জন্য বা রস-জ্ঞানের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করলে সকল মনুষ্যই অমৃতের আস্বাদন লাভ করতে পারে। এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। বৈদিক যুগে ঋষিগণ রাজর্ষিগণ নিস্বার্থ কর্ম্মের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করেছিলেন। নিস্বার্থ কর্ম্মের সংজ্ঞা একটু বিষদভাবে বলা প্রয়োজন। আমি মনে করি কোনও ব্যক্তি যখন নিস্বার্থভাবে কর্ম্ম করে তখন তার ভিতরে 'স্বার্থহীন' ভাবে কর্ম্ম করবার জ্ঞান নিশ্চয়ই বর্ত্তমান থাকে। স্বার্থহীন ভাবে কর্ম্ম করবার জ্ঞান উপজাত হ'ল বলেই সে কর্ম্মে জ্ঞানযুক্ত হ'ল। এদিকে তার কর্ম্ম নিস্বার্থ সুতরাং নিষ্কাম। তা হ'লে জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ নিবৃত্ত কর্ম্ম সে করল। এই নিবৃত্ত কর্ম মনু স্মৃতিতে আছে ও গীতাতে একে নিষ্কাম কর্ম্মই বলা হয়েছে। জ্ঞান যদি উপজাত না হয় তবে কর্ম্ম নিষ্কাম হতে পারে না। হারীত স্মৃতিতে (৭, ৯-১১) জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

"যথাশ্বা রথহীনাশ্চ রথাশ্চাশ্বৈর্বিনা যথা।
এবং তপশ্চ বিদ্যাচ উভাবপি তপস্বিনঃ॥
যথান্নং মধুসংযুক্তং মধু চান্নেন সংযুতম্।
এবং তপশ্চ-বিদ্যাচ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ॥
দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"

অশ্ব ব্যতীত রথ ও রথ ব্যতীত অশ্ব যেরূপ অসম্পূর্ণ সেইরূপ সাধকের বিদ্যা ও তপস্যার সেই ভাব। যেরূপ অন্নের ভিতরে মধু ওতপ্রোতরূপে বর্ত্তমান সেইরূপ তপস্য ও বিদ্যা একত্র হ'লে এক মহাঔষধ প্রস্তুত হয়। পক্ষীগণের গতি যেমন দুই পক্ষ ভিন্ন হয় না তেমনি কর্ম্ম ও জ্ঞান মিলিত না হ'লে ব্রহ্ম বা অমৃতত্ব লাভ হয় না। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রেরণা জাগলেই জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছে বুঝতে হবে। যখন কোন ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ও সেইরূপ কর্ম্ম করতে থাকে তাকে "অমৃতের পুত্র" বলতে বাধা কি। শুকদেবের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব বললেন—

যাবানাত্মনি বেদাত্মা,
তাবানাত্মা পরাত্মনি।
য এবং সততং বেদ,
সোহমৃতত্বায় কল্পতে॥

(মভা-শা, ২৩৮,২২)

আপন দেহের ভিতরে যতখানি আত্মা, অন্যের দেহেও ততখানি আত্মা আছে, যে সর্ব্বদা এটা জানে সেই অমৃতত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়।

ঈশোপনিষদে আছে—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম্ম) এই দুইটি পরস্পরের সহিত যে ব্যক্তি জানে সে অবিদ্যায় (কর্ম্মের) দ্বারা মৃত্যু পার হয়ে বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে।

বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এত উচ্চ অবস্থায় আরোহণ করেছিলেন যে সর্ব্বভূতকে আত্মবৎ অমৃতের অংশই মনে করতেন। আসলে আমরা সকলেই অমৃতেরই সন্তান। শুধু স্বার্থত্যাগ করে সকলকে আত্মবৎ দর্শন করে অমৃতের আস্বাদন লাভ করা আমাদের কাছে একটুকুও কঠিন নয়।

বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে :—

"যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ" (বৃহ ২,৪,১৪)

যার সকলই আত্মময় জ্ঞান হয়েছে, সে সাম্য বুদ্ধির দ্বারাই সকলের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে। এ ভাবের

কথা প্রায় সকল উপনিষদেই অল্প বিস্তর পাওয়া যায়। ভারতীয় ভাবাদর্শের বৈশিষ্ট্যই এইখানে। আত্ম-দৃষ্ট, আত্ম-জাগ্রত হয়ে আত্মানুভূতির ভিতর দিয়ে বিশ্ব জীব-গোষ্ঠীকে আত্মবৎ বিচার করা। নিজেকে জানলেই জগৎসংসারকে জানা হল। এই ভাবধারা ভারতের শিরায় শিরায় এমন ওতপ্রোত হয়ে মিশে রয়েছে যে নিরক্ষর সহজিয়া সম্প্রদায় বা বাউল সম্প্রদায়ের ভিতরেও এই ভাবাদর্শের পূর্ণ প্রসার দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শন বলছেন—"দশের উপকার কর" কিন্তু ভারতীয় দর্শন বলছেন "নিশ্চয়ই দশের উপকারই তোমার ব্রত। কিন্তু সেটা করবার পূর্ব্বে নিজের উপকার কর—অর্থাৎ নিজেকে পরার্থে নিয়োজিত করবার পূর্ব্বে নিজ আত্মানুভূতি জাগ্রত কর—"। মহা সমস্তসঙ্কুল এই আধুনিক জগতে কেউ ত অন্যের কথা ভাবে না। যদিও বা ভাবে, নিজ স্বার্থে ভাবে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত, আত্মানুভূতি ব্যতীত নিজ স্বার্থ কখনও অপনোদন হয় না। নিজে যদি স্বার্থহীন হই তবেই আমার আহ্বানে সকল জগৎ জেগে উঠবে নিস্বার্থ কর্ম্মে। কারণ আমিও যে অমৃতের সন্তান তুমিও সেই অমৃতের সন্তান, আমি সেই অমৃতে বিধৃত তোমার নিকটতম জ্ঞাতি। এখানে আমরা যিশুখ্রীষ্টের—Universal Fatherhood of God and brotherhood of mankind রূপ ভাবাদর্শের পূর্ণ সমর্থন পাই। ব্যক্তিগত বৈরিতা, সমাজগত, ধর্ম্মগত, বর্ণগত, জাতিগত ও দেশগত সকল বৈরিতা দূর করে সবাইকে ডেকে বলতে হবে :

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি—
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

হে সুরলোকবাসী অমৃতের সন্তানগণ তোমরা শ্রবণ কর, আমি তমিস্রার পরপারে সেই মহান্ অবিনাশী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জেনেছি। তাঁকে জানলে জীব মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। এ ভিন্ন অন্য কোনও পথ নাই।

পিছনের জানালায়

(নলিনীমোহন সান্যাল)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত সাহিত্য সম্মিলনের সভায় সাংবাদিকপ্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আসছেন সভাপতি হয়ে—তাঁকে কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিল। বাংলা-সাহিত্যের দিক্‌পাল নির্ভীক নিরপেক্ষ যুক্তি-তথ্য-নিষ্ঠ সাংবাদিক মনীষী সম্মাননীয় পুরুষ, ওঁকে তো যে কোন আশ্রয়ে তুলে দেওয়া ঠিক হবে না। ওঁর যোগ্য আশ্রয়ের সন্ধান করা হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ, কর্মপরিষদের প্রবীণ সভ্য নলিনীমোহন সান্যাল বললেন, যদি অসুবিধা বোধ না করেন তো আমার বাড়ীতে ওঁর থাকার ব্যবস্থা করতে পারি।

আমরা তো হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম, ওর চেয়ে যোগ্য আশ্রয় এই শহরে আর কোথায় আছে! বয়সে উনি রামানন্দবাবুর চেয়ে কিছু বড়ই হবেন—সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ পুরুষ, একটি দুটি নয়—অনেকগুলি ভারতীয় ও বিদেশীয় ভাষার উপরে দখল আছে, উপাধিও ভাষাতত্ত্বরত্ন এম এ। এককালে শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন—বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। বাংলা ইংরেজী তো জানেনই ভাল—হিন্দীতেও রীতিমত দখল আছে। আগ্রা কলেজ থেকে বেরিয়ে ওই প্রদেশেই কিছুদিন শিক্ষকতা করেন এবং ঐ সময়ে হিন্দী সাহিত্যে গল্প প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হন—তখনও কয়েকটি হিন্দী পত্রিকায় ওঁর লেখা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আবার তামিল ভাষাতেও রীতিমত পণ্ডিত ব্যক্তি। তিরুবল্লুবরের বিখ্যাত গ্রন্থ কুরল উনিই প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন। তেলেগু এবং মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী এবং পাঞ্জাবী, ওড়িয়া ও অসমীয়া, প্রায় সব কটি ভারতী ভাষার সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আরও এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য মনীষার অধিকারী—জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে আটাত্তর বছর বয়সে হিন্দী সাহিত্যে গবেষণা চালিয়ে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এ হেন গুণীর আশ্রয় মনীষী রামানন্দের পক্ষে যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ ছাড়া কি।

নলিনীবাবু সর্বপ্রযত্নে অতিথির সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেন। যে ঘরখানায় রামানন্দ বাবু থাকবেন—তার লাগোয়া একটি বাথরুম লাগিয়ে কমোডের ব্যবস্থা করলেন—ঘরটি চুণকাম করালেন এবং ছবি, টেবিল, সোফা প্রভৃতি আসবাবপত্র দিয়ে সাজালেন পরিপাটি করে, একখানা লম্বা টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখলেন অতিথিকে উপহার দেবার বইগুলি—সবগুলিই নিজের রচনা—বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, তামিল আরও কোন্ কোন্ ভাষার ঠিক মনে নাই। যে ভাষায় লেখা বইগুলি, উপহার পৃষ্ঠায় সেই ভাষায় উৎসর্গ পত্র লিখলেন, নাম সই করলেন। রামানন্দবাবু তো বইগুলি উপহার পেয়ে মহা খুশী।

নলিনীবাবুকে প্রথম দেখি শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের ভবনে। ওখানে প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্য আসর বসত, পূর্ণিমা সম্মিলন। সেই আসরে স্থানীয় যুবক ও কিশোরেরা মিলে গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করতেন, আলোচনা করতেন; সঙ্গীতের ব্যবস্থাও থাকত। আসরটি খুবই ছোট। বড় জোর দশ পনের বিশজন সাহিত্য-প্রেমী প্রতি সম্মেলনে আসতেন—

বর্ষাকালে হাজিরা তো আরও কম। পরিষদের সম্পাদক ছাড়াও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য জনা তিন-চার নিয়মিত আসতেন,— ওঁরা পরিষদ ভবনের কাছে-পিঠে থাকতেন,— বয়স কম, সেই কারণে উৎসাহী। এঁরা ছাড়াও আর একজন নিয়মিত হাজিরা-দেওয়া সভ্য ছিলেন নলিনীবাবু। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স—কিন্তু উৎসাহ উদ্যমে যুবাপুরুষকেও হার মানান। এমনই প্রবল ছিল তাঁর সাহিত্য-প্রীতি। রৌদ্র বৃষ্টি শীত কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ ছিল না—লেখার খাতাটি নিয়ে যথাসময়ে পরিষদ-সভায় এসে বসতেন। সেইদিন তিনি একটি গল্প পড়লেন—গ্রীক পুরাণ থেকে, নিজেই অনুবাদ করেছিলেন গল্প। বললেন, ওই পুরাণের কয়েকটি গল্প অনুবাদ করে একখানি বই বার করবার ইচ্ছে আছে। চমৎকার সাবলীল ভাষা—গল্প বলার ভঙ্গীতে সহজ করে লেখা। ভাল লাগল। তারপরেও আরও কয়েকটি গল্প উনি পড়েছিলেন,—স্বকৃত উপন্যাস সুভদ্রাঙ্গীর পাণ্ডুলিপি থেকেও মাঝে মাঝে পড়তেন। যতদূর স্মরণ হয়—উপন্যাসটি সেকালের বিচিত্রা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। অনূদিত গ্রন্থ কুরুলের সম্বন্ধেও একবার যেন কিছু বলেছিলেন। প্রায় প্রতিটি সভাতেই সভাপতিত্ব করতেন। নিজের প্রবাস-জীবন, হিন্দী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের, কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারি সুন্দর গল্প করতেন। একটি আশ্চর্য্য জিনিস লক্ষ্য করেছি—যা কিছু সুন্দর—সাহিত্যগুণান্বিত—মানুষের চিত্তবৃত্তিকে প্রসারিত ও উন্নত করে তারই কথা বিশেষ করে বলতেন। কখনও তাঁর মুখে লেখার অপকর্ষতা নিয়ে নিন্দাভাষণ শুনিনি।

সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যে তরুণ সম্প্রদায় প্রগতি-বাদী সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে কিছু ময়লা আবর্জনা টেনে এনেছিলেন—তা নিয়ে সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার দাবিতে বেশ কিছু সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। শ্লীল অশ্লীলের সীমারেখা নিয়ে দুটি প্রবল দলে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ধর্ম, আধুনিক কাব্য, ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে চিরায়ত সাহিত্যমূল্য নিরূপণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যরথীরাও ক্ষান্ত ছিলেন না। মোট কথা বাদ-প্রতিবাদে সর্বত্রই জমে উঠেছিল আসর। সাহিত্য তবে বাদ-প্রতিবাদের বেগটা তেমন তীব্র হয়ে উঠেনি।

স্বভাবতঃই সভাপতিরূপে প্রবীণ সাহিত্যসেবী সান্যাল মহাশয়ের কাছে কিছু শোনার প্রত্যাশা করেছিল তরুণ সভ্যেরা। সান্যাল মহাশয় কিন্তু বিষয়টির উপর খুব গুরুত্ব দেন নি। উনি যা বলেছিলেন—এতদিন পরে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা কঠিন। তবে ওঁর মোটামুটি বক্তব্য ছিল এই রকম—চিরকালই সাহিত্যে নূতন সৃষ্টির দাবি নিয়ে এক-একটি দলের উদয় হয়—তারা পুরাতন নীতি নিয়ম শৃঙ্খলা নিয়ে চলে না। এদের উত্তম সৃষ্টির পাশে পাশে মন্দ সৃষ্টির জঞ্জাল প্রচুরই জমে। বয়স বিচারে একটিমাত্র অভিমতকে শিরোধার্য করবে কেন মানুষ। যেহেতু ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। কাজেই নূতন পুরাতনে মতভেদ অনিবার্য। এখন এত যে হৈ হৈ হট্টগোল হচ্ছে, এক সময়ে এটা মিলিয়ে যাবে। যা সত্যিকারের ভাল জিনিস তার বিনাশ নেই—সে থাকবেই। জঞ্জাল অপসৃষ্টি কোথায় ভেসে যাবে—খুঁজেও পাবে না।

এমনি ধারা অনেক কথা। কিন্তু তরুণদের কাছে এই আপোষমূলক কথা ভাল লাগেনি; নিজেদের সৃষ্টিকে উত্তম সাহিত্য-কর্ম বলে স্বীকার করানোর ধৈর্যহীনতাই সম্ভবতঃ এই মনোভাবের মূলে সক্রিয় ছিল। ওরা মাঝে মাঝে পুরাতন ধারাকে বিদ্রূপ করে কিছু বলতে চাইত, সান্যাল মশায় মৃদু মৃদু হাসতেন। ভাবটা এই রকম—ওহে বাস বাস সবুরে মেওয়া—; ফুলের উগ্র গন্ধ ও নয়নলোভন বর্ণশ্রী তো থাকবেই—তবু ফুলই বৃক্ষ-জীবনের চরম বস্তু নয়—ফুলের পরিণতি ফল। তারই মধ্যে থাকে জীবনী শক্তিদায়ক রস—এবং নব জীবন-সৃষ্টির সহায়ক বীজ। এই পৃথিবীর যাবতীয় জীবনধারা এই নিয়মেই অনুবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। এর অন্যথা নাই। অপেক্ষা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অপেক্ষা করেই আছি—দীর্ঘদিন হ'ল অপেক্ষা করছি। সাহিত্যের কমল বনে মত্ত করীর দাপাদাপিতে ক্রমশঃ পাঁক ঘুলিয়ে উঠছে—; বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ, মানবপ্রীতি, সৌন্দর্য সৃষ্টির সুর ঝঙ্কার উগ্র দেহ-কামনার কোলাহলে স্তিমিতপ্রায়—বাস্তব চিত্রকেরা অতি ঠাণ্ডা সাংস্কৃতিক ভোজ্যের গুণকীর্তনে নবযুগের একাংশ আদিরস-স্তুতিনির্ভর সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে পরমোৎসাহে।—পুরাতন সাহিত্যসাধকদের ভবিষ্যদ্বাণী

একজন সব্যসাচীর কাহিনী

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিক—Rifle Shooting প্রতিযোগিতা। সদা চঞ্চল, হাস্যময় উদ্দাম, উচ্ছল কে ঐ যুবক? বিশ্বের সেরা প্রতিযোগীরা এসেছে আজ এই অলিম্পিকের আসরে। ফলাফল এখানে অনিশ্চিত। সকল হৃদয়ই এখানে দ্বিধাশঙ্কিত। কিন্তু কে অবিচলিত এই যুবক। ডান হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিয়েছে সে। কেমন সহজ ও অকম্পিত হাতে সেটি তুলে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সন্ধানস্থলের অক্ষিগোলকটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে সে।

আগ্নেয়াস্ত্র গর্জ্জন করে উঠল। অব্যর্থ লক্ষ্য। দেখা গেল নিক্ষিপ্ত গুলি অক্ষি-গোলকের মধ্যস্থল ভেদ করে চলে গেছে।

প্রতিযোগিতা চলতে থাকল। কিন্তু আশ্চর্য্য! যুবকের নিক্ষিপ্ত গুলি প্রতিবারেই লক্ষ্যস্থলের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানটিকে বিদীর্ণ করে চলে যায়।

অতঃপর অলিম্পিক উৎসবের মাধ্যমে বিজয়ীর নাম ঘোষিত হয়—K. Takacs, বেলজিয়ামের প্রতিনিধি এই যুবক।

এরপর সুদীর্ঘ চার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ভাগ্যদেবী তার খেয়াল চরিতার্থ করেছেন বহুলোকের ভাগ্যে বহু প্রকারে। কত সম্ভাবনাময় জীবন তার নিষ্ঠুর পরিহাসে বিফল প্রতিপন্ন হয়েছে। কত সার্থক জীবন নির্ম্মমভাবে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। তা হলেও অলিম্পিকের আসর কিন্তু অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যথা—নিয়মে, যথা—নির্দ্দিষ্ট সময়ে।

এবার অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হল হেলসিংকীতে। সাল ১৯৫২।

পুনরায় আরম্ভ হল Rifle Shooting প্রতিযোগিতা। সকলে অবাক্ হয়ে একজন প্রতিযোগীর দিকে লক্ষ্য করে আছে। ডান হাত জামার পকেটের ভেতর রেখে বাঁ হাতে ধরে আছে সে আগ্নেয়াস্ত্র। এবারও এই যুবক সকলকে স্তম্ভিত করে পূর্ব্বের অলিম্পিকের বীরের মতন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করল।

কিন্তু কে এই যুবক। এ যেন পূর্ব্ব অলিম্পিক বীরের প্রতিচ্ছবি। তবে কি বেলজিয়ামের সেই যুবকই আবার স্বর্ণপদকের অধিকারী হল? কিন্তু সে তো অস্ত্র ধরেছিল ডান হাতে।

সকল সন্দেহের নিরসন করে প্রচারিত হল অলিম্পিক ঘোষণা—"পূর্ব্ব অলিম্পিকের শীর্ষস্থানাধিকারী বেলজিয়ামবাসী যুবক K. Takacs-এর পুনরায় স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব।" তবে এবার বিশ্বজয় করেছে সে ডান হাতের বদলে বাঁ হাতে।

গত অলিম্পিকের পর ছ'মাস না যেতেই এক মোটর-দুর্ঘটনায় তার ডান হাতটি বিসর্জন দিতে হয়, সুতরাং আজ বাঁ হাতে তার এই বিশ্বজয় প্রচেষ্টা, যা আজ সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে।

এ বিষয়ে একটি ইংরেজী কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে—

"Trust no future, however plesant
Let the dead past bury its dead,
Act, act in the living present
Heart within and God o'erhead." ...

শোক সংবাদ

অর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিগত ২৫ শে চৈত্র ১৩৭৭ বৃহস্পতিবার পুরুলিয়াতে অর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর। তিনি কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার শারীরিক মানসিক শক্তিসামর্থ্য অটুট ছিল। ৮২।৮৩ বৎসর বয়সে তিনি নিজ সুলিখিত সুবৃহৎ গ্রন্থ "কৌরবকাহিনী রচনা শেষ করেন এবং বৎসরাধিক কাল পূর্বে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখর চট্টোপাধ্যায় পুরুলিয়ায় স্বনামধন্য আইনজ্ঞ ৺নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও তিনি নিজেও আইন ব্যবসায়ে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই রাজনীতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন ও তাঁহাদের পুরুলিয়ার বাসভবনে বহুবার বহু দেশনেতাগণ একত্রিত হইয়া নানান রাজনৈতিক আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষা আন্দোলনের সময় বিহার সরকারের অপর লোকেদের সহিত অর্দ্ধেন্দুশেখরকেও গ্রেফতার করিয়া কারাবদ্ধ করিয়াছিল। এই দুষ্কর্ম্মের জন্য বিহারের রাষ্ট্রনেতাদিগের বিশেষ অখ্যাতি হইয়াছিল। সকল পরিস্থিতিতেই অর্দ্ধেন্দুশেখর অবিচলিতচিত্তে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর থাকিতেন ও তাঁহার গুণেই তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারের সকল ব্যক্তি পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা তাঁহার পুত্রকন্যা ও স্বজনদিগকে আমাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তক পরিচয়

শ্রমিক সমস্যা ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন : সমর দত্ত, অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্—কলিকাতা। মূল্য তিনটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রকৃতপক্ষে এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হইয়াছে দেশ স্বাধীন হইবার পরে। এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা গ্রন্থকার তাহাই এই পুস্তকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রমিক-সমস্যার সমাধানই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অভাব-অভিযোগ সকলেরই আছে এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টাকে কে না সমর্থন করিবেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সার্থক হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা বাঁকা পথে গিয়া নিয়তই হোঁচট খাইতেছে। ইহার কারণও আছে, রাজনৈতিক দলের প্রভাবে পড়িয়া ইহাদের সকল আন্দোলনই তাহাদের স্বার্থে নিয়োজিত হইতেছে। এক কথায় তাহারাই আন্দোলন পরিচালিত করিতেছে।

এখন দেখা যাক্, ট্রেড ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা কোথায়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন : "সাধারণতঃ শ্রমিক-গণের কর্ম্মসংক্রান্ত নানা বিষয়ে মালিকগোষ্ঠীর কাছ থেকে শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেওয়াই ট্রেড-ইউনিয়নের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা সমস্যার সমাধানে অনুসৃত বিভিন্ন সরকারী নীতি সম্বন্ধে ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা এবং প্রয়োজনমত ওই সকল নীতি-সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির সঙ্গে শ্রমিকস্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। সেইজন্য কোন ট্রেড-ইউনিয়ন যদি এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ না করে এবং কেবলমাত্র শ্রমিকদের কোনরকমে কিছু টাকাকড়ি পাইয়ে দিয়েই আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহলে আর যা কিছু হোক্, প্রকৃত শ্রমিক-কল্যাণ হয় না।"

আজকাল আন্দোলন করাটাই একটা রাজনীতি। শ্রমিকদের যাঁহারা এই কাজে নামাইয়াছেন তাঁহারা আর যাহাই করুন শ্রমিকদের মঙ্গল করিতেছেন না। এই দলে পড়িয়া তাহারা আপন মঙ্গলামঙ্গলও ভুলিয়া গিয়াছে। এককথায় তাহারা দলের ক্রীড়নক গ্রন্থকার এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যেমন একস্থানে বলিয়াছেন : "ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে যদি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেই আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংশ্লিষ্ট থাকা অবাঞ্ছনীয়।"

অথচ এবারের ভোটযুদ্ধে শ্রমিকরাই একদলের বড় সহায়ক ছিল। তাই দেখা যায় ট্রেড-ইউনিয়ন দলের চাপে পড়িয়া নিজেদের সত্তা তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

"আপন স্বাধীন সত্তা বাঁচিয়ে শ্রমিকসঙ্ঘের রাজ-নৈতিক দলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে আপত্তির কোন কারণ নেই যদি অবশ্য সেই রাজনৈতিক দলটি শ্রমিকসঙ্ঘের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়। বৃটেনে লেবার পার্টির সংগে নিকট সম্বন্ধ রেখে শ্রমিক সঙ্ঘ কাজ চালায়। বৃটেনের অধিকাংশ বৃটিশ ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের

এখন কথা উঠতে পারে, রাজনীতি লইয়া তাহাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনই বা কি? এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন: "বিভিন্ন প্রকারের কর্মে নৈপুণ্যলাভ করবার জন্য শ্রমিকগণ উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ চায়। শুধু তাই নয়, তাদের সন্তান-সন্ততিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা, উপযুক্ত বাসস্থান, চিকিৎসালয়, প্রসূতি-সদন ইত্যাদিও তারা দাবী করে থাকে। কিন্তু এইসকল দাবী দাওয়া পূর্ণ করতে হলে সরকারী হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক কারণ সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে এই ধরণের দাবী মেটান সম্ভব নয়। দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিক-শ্রেণীকে মালিক এবং সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী অভিযান চালিয়ে রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ করতে হয়।

এই দৃষ্টান্তগুলি হ'তে সহজেই বোঝা যায় যে ট্রেড-ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সমধর্মী না হ'লেও এ দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমাদের মৌল সমস্যা হ'ল—ট্রেড-ইউনিয়নের চৌহদ্দির মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর কি ধরণের এবং কিভাবে রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত তাই নিয়ে। অনেকের মতে শ্রমিকশ্রেণীর উচিত রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে বৃহৎ শিল্পগুলিকে অধিকার করে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু কোন স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই কৌশল প্রযোজ্য কিনা তা বিশেষ চিন্তার বিষয়।"

দুঃখের বিষয় দেশের ট্রেডইউনিয়নগুলি শ্রমিক-কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না দিয়া রাজনীতির প্রতিই গুরুত্ব দিতেছে। শ্রমিকদের যেভাবে নাচানো হইতেছে, তাহারা সেইভাবেই নাচিতেছে। এই ট্রেডইউনিয়নগুলির কিভাবে চলা উচিত, এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে: "স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অবস্থার কথা বিবেচনা করে এদেশের ট্রেডইউ-নিয়নগুলির নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায় করার আন্দোলন করা ছাড়াও সংগঠনমূলক কর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত। একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে শ্রমিকশ্রেণীর মর্য্যাদা রক্ষা করা এবং বহু অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণীকে তার নিজস্ব অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ট্রেডইউনিয়নের প্রথম এবং প্রাধান কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রমিক স্বার্থরক্ষা করার অর্থ এই নয় যে বৃহত্তর সামাজিক কর্তব্যপালনে এবং জাতীয় স্বার্থ পরিপূরণে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাত-সারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া। ভারতবর্ষের পুনর্গঠন এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দেশের সকল শ্রেণীর সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। জাতীয় স্বার্থের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে এদেশের ট্রেড-ইউনিয়ন-গুলির এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাঘাত না ঘটে এবং জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংকট দেখা না দেয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকগণের চাকুরীর অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি এবং চাকুরী লাভের সম্যক সুযোগ সবকিছু নির্ভর করে দেশীয় শিল্প সম্প্রসারণের উপর। শিল্পোৎপাদনে পুঁজি, সংগঠন এবং শ্রম—এই তিনটি জিনিষই অপরিহার্য। শ্রমশক্তি ব্যতিরেকে পুঁজি ও সংগঠন ফলপ্রসূ নয়। পুঁজি ও সংগঠনের অস্তিত্বহীনতায় শ্রমশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। এই কারণে শ্রমিক মালিক উভয়পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উভয় পক্ষেরই দৃষ্টিভঙ্গী সহযোগিতামূলক হওয়া উচিত।

সম্প্রতি শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিক-শ্রেণীর অংশগ্রহণ নীতি এবং শিল্প-সংস্থায় শ্রমিক শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত নীতি গৃহীত হবার পর ট্রেড-ইউনিয়ন-গুলির উপর অধিকতর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। শ্রমিক ও মালিকের পারস্পারিক বৈরীভাবাপন্ন ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের উপরই এই নীতিগুলির সাফল্য নির্ভরশীল। মালিকপক্ষের দেখা উচিত শিল্পসংস্থাগুলি শ্রমিক-শোষণের কেন্দ্রে পরিণত না হয়ে যেন শ্রমিক-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অনুরূপ ট্রেডইউনিয়নের সহযোগিতায় স্বাধীন ভারতের শিল্পোদ্যোগ যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সে-বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণীরও সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

"শিল্পে শান্তি এবং উন্নততর শিল্পোৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের ট্রেডইউনিয়নগুলির সুসংগঠিত হবার সময়

এসেছে। একাধিক ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশনের পরিবর্তে একটি ফেডারেশনের অস্তিত্বই বিশেষভাবে কাম্য। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ এবং রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও এই একক ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশনের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল ইউনিয়নের সংযুক্ত হওয়া উচিত। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই ধরণের একটি সংঘবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত ট্রেডইউনিয়ন ফেডারেশন যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইরকম ফেডারেশনের ইউনিটগুলি যদি আঞ্চলিক ভিত্তিতে সুসংগঠিত হয় তাহলে এই কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার শিল্পসমস্যার সমাধান যে ক্রমশঃ সহজসাধ্য হয়ে উঠবে এই রকম ধারণা করা বোধ হয় ভুল হবে না। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ইউনিয়নের সমবায়ে গঠিত আঞ্চলিক ইউনিট এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ইউনিটের সমাহারে গঠিত একটি সুসংবদ্ধ ফেডারেশনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনমান উন্নয়ন এবং বহু কষ্টার্জিত ট্রেডইউনিয়ন অধিকার সংরক্ষণের কার্যাবলী অত্যন্ত সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হবে।"

বইখানিতে এইরূপ বহু বিষয় লইয়া আলোচিত হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া পূর্ব্বে কেহ লেখেন নাই। জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক। সকলেরই উপকারে লাগিবে। এদিক দিয়া বইখানির একটি মূল্য আছে।

গৌতম সেন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত একটি বিদ্যাসাগর চরিত্র ব্যাখ্যান "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর বিদ্যাসাগরের সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। সেই কারণে এই প্রবন্ধের একটা বিশেষ মূল্য আছে। আমরা প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ন্যায় ও অন্যায়, সাম্য ও বৈষম্য, সত্য ও অসত্য, ইহার মধ্যে কোনটীতে মানবচিত্ত উন্মাদগ্রস্ত করে? কোনটীর জন্য মানুষ প্রাণ মন সমর্পণ করে? সাম্যের পরিবর্তে বৈষম্য যদি ফরাশি বিদ্রোহের অধিনায়ক-দিগের লক্ষ্যস্থলে থাকিত তাহা হইলে কি তাঁহারা সেরূপ ক্ষিপ্ত হইতে পারিতেন? অনুসন্ধান করিয়া দেখ; যেখানেই মানবচিত্ত ভবিষ্যতের কোন আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উন্মাদগ্রস্ত হইতেছে, সেখানে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাই দেখিতে চাহিতেছে; এবং এই গুলিই হৃদয়ে থাকিয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে। বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যদেশে ভূমিকম্পের ন্যায় যে ঘন ঘন সমাজকম্প হইতেছে, ধনী, দরিদ্র, রাজা প্রজাতে যে ঘোর বিদ্রোহ চলিতেছে, সেখানেও মানুষের দৃষ্টি সত্য, ন্যায়, প্রেম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিন্তু সত্য, ন্যায়, প্রেম প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ। অতএব যদি বলি যে স্বয়ং ঈশ্বর মানবআত্মাতে নিহিত থাকিয়া মানবসমাজকে আপনার অভিমুখে লইতে চাহিতেছেন, তাহা হইলে কি অত্যুক্তি হয়? ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত আছেন বলিয়াই আমাদের এ প্রকার বাতুলতা রহিয়াছে। ইহা হৃদয়বাসী ঈশ্বরের নিশ্বাস; ইহা তাঁহারই ফুৎকার। এই বাতুলতাতেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আমরা জগতের অসত্য, অন্যায়, অপ্রেমের বিষয় চিন্তা করিয়া পাগল হইতে পারি, এই টুকুই আমাদের মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব কেন, এটুকু আমাদের দেবত্বও বটে; কারণ এখানে দেব-মানবে সম্মিলন। যদি বল সকলে ত পাগল হয় না, আমি বলি, মনুষ্যনামধারী সকলে ত মানুষ নয়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা এরূপ পাগল মানুষ দুইচারিজন পাই। তাহা না হইলে মনুষ্যসমাজের গতি কি হইত? আমি এরূপ একজন পাগল মানুষের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পাগল বলিতেছি? যিনি গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করিয়া, জগতের, ধনধান্য সম্ভোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের আরাম, বিশ্রাম, আত্মীয়তাদির সুখ পায়ে ঠেলিয়া, পরের জন্য আপনাকে দুরন্ত শ্রমে নিক্ষেপ করিলেন, হাজার হাজার টাকা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেন, যিনি

অম্লানচিত্তে লোকনিন্দা ও নির্যাতনের মুকুট মাথায় তুলিয়া পরিলেন, যিনি লোকনিন্দার বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বালবিধবাদিগকে কর্দম হইতে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, এমন মানুষকে পাগল বৈ আর কি বলিব? বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিলে দেহরাজ্যের সামান্য জীবনে কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না? তিনি নিজের শ্রমের অন্ন কি সুখে আহার করিতে পারিতেন না? নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে পণ্ডিতকুলের মধ্যে যশস্বী হইয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রোড়ে কি বাস করিতে পারিতেন না, আর বঙ্গদেশে এমন কোন পদ কে অধিকার করিয়াছে, যাহা বিদ্যাসাগর মনে করিলে অধিকার করিতে পারিতেন না? কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দিলেন না। কি যেন কিসের জন্য তাঁহাকে পাগল করিয়া জগতের মহৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিয়া দিলেন।

আমরা সচরাচর বলি, তিনি দেশমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য পাগল হইয়াছিলেন; তিনি পরদুঃখে কাঁদিয়াছিলেন; ওটাত বাহিরের মানুষের কাজ। তাঁহার ভিতরের মানুষটা কি ছিল, অগ্রে তাহাই একটু আলোচনা করা যাউক। তাহা কি, যদ্দারা বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব হইয়াছিল? যাহা তাঁহাকে পার্থিব ধনমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতে দেয় নাই, যাহা তাঁহাকে সোজাপথে নিজ অভীষ্টের দিকে লইয়া গিয়াছিল? এ জগতে সোজাপথে চলা কি বড় সহজ? একটা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কি সোজাপথে চলা যায়? যদি গগনে ধ্রুবতারা না থাকিত, তাহা হইলে নাবিকগণ কি সোজা পথে চলিতে পারিত? সেইরূপ এই তেজস্বী পুরুষসিংহগণ যে জীবনে সোজা পথে চলিয়াছেন, তাহার মূল কি? আমি এ জীবনে যে অল্পসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে চলিতে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার মধ্যে একজন প্রধান। আমি যখন আট বৎসরের বালক, তখন প্রথমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। সেই দিন হইতে আমাকে ভালবাসিতেন, এবং সেইদিন হইতে আমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি, এমন সোজাপথে চলিবার মানুষ আমি অল্পই দেখিতেছি। আমি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর পার্শ্বে দুই একটা উৎকট দোষও দেখিয়াছি; কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ চরিত্রের সোজাপথে চলা যখন স্মরণ করি, তখন আর কোনও দোষের কথা মনে থাকে না; বলি, হায়! হায়! এমন মানুষ আর কতদিনে পাইব?

তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড কি? সে কি জিনিস যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজাপথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাহা মানব জীবনের মহত্ত্বজ্ঞান। কথাটি শুনিতে ছোট, কিন্তু ফলে অতিশয় বড়। তুমি আমি এ জগতে কি হইব বা কোন্ স্থান অধিকার করিব, তাহার অনেকটা ইহার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি স্বীয় জীবনকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখ, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাতেই সন্তুষ্ট হইবে, যদি মহৎ করিয়া দেখ, তবে মহত্ত্বের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়িবে। তাহা হইলে জীবনের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনকে বড়ই উচ্চ বোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্তগুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রাকার বনজ গুল্মসকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষ-সিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে স্বসমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া উর্দ্ধশির হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পাখানা তুলিয়া টক্ করিয়া লাথি মারিতে না পারি।" ঠিক কথা! এরূপ তেজস্বী পুরুষের নিকটে রাজারাজড়া কোথায় লাগে? সমগ্র দেশের লোকের বাহু একত্র বাঁধিলে এমন একটা মানুষকে আঁকড়াইয়া ধরা ভার। তিনি স্বদেশবাসী-দিগকে বিধবা-বিবাহ বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন বটে, বাহিরে দেখিতে শাস্ত্রের

দোহাই দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন শাস্ত্রের উপরে উঠিয়া শাস্ত্রকে আদেশ করিয়াছিল,—"আমি এইটা চাই, তোমাকে ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে।" শাস্ত্র তাঁহার হস্তে কাদার তালের ন্যায় যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই দিয়াছিল। এই মনুষ্যত্বের বিক্রম সম্বন্ধে কেবল একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই; উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বও দেশে ও শাস্ত্রে ধরে নাই, উছলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখকাতর হৃদয় ছিল; সেই জন্যই কাহারও প্রতি অত্যাচার দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে কোনও মনুষ্যত্বের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কারের চেষ্টা এইজন্য; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ-প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিবারণের চেষ্টাও এই জন্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানব-জীবনের পক্ষে এত হীনতা মনে করিতেন যে, তাঁহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। অনেকে জানেন তিনি এক কথায় পাঁচশত টাকার চাকুরী ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার মূলে কি? এই অদম্য, অনমনীয় মনুষ্যত্ব। ডিরেক্টর তাঁহাকে এরূপ কিছু কাজ করিতে বলিলেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় সত্যানুগত নহে। তিনি সে কথা ডিরেক্টরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, ডিরেক্টর শুনিলেন না; বলিলেন "you must! you must!" এই শব্দদ্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বের উপরে জলন্ত অয়োগোলকের ন্যায় পড়িল। তিনি আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না, এ চাকুরী তাঁহার বিষবোধ হইতে লাগিল, কেহই তাঁহাকে তাহাতে রাখিতে পারিল না। তৎপরে স্বয়ং লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া পুনরায় [illegible] পদে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর যখন বলিলেন, "তোমার ব্যয়নির্বাহ হইবে কিসে?" তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"আপনি কি মনে করেন যে আপনাদের দ্বারস্থ না হইলে আমার দিন চলিবে না? আপনি ভাবেন কি? এই কলিকাতা শহরে আমি ৫৲ টাকাতে দিন চালাইতে পারি।" তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার প্রধান কারণ রাজপুরুষদিগকে দেখান যে, তাঁহাদের দাসত্ব না করিয়া তিনি সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ।

পূর্বে যে বর্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, যাহা মানবপ্রকৃতির গভীর রহস্য, এবং যাহা মানব-জাতির মুখপাত্র স্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে, উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরের অন্তরে যাহা চাহিতেন, তাহার সহিত তুলনাতে বর্তমানকে তাঁহার এতই হীন বোধ হইত, যে বর্তমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে সহিষ্ণুতা হারাইতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে যখন আর তাঁহার পূর্বের ন্যায় খাটিবার শক্তি ছিলনা, তখন এই অতৃপ্তি ভূগর্ভশায়ী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছিল; প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঐ অনল আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎ-পাতের ন্যায় জ্বালারাশি প্রকাশ করিত। তাঁহার কোমল ও পরদুঃখকাতর হৃদয়ে বর্তমান সমাজের অসারতা, কৃত্রিমতা ও অসাধুতা এতই আঘাত করিত যে, বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় তাঁহাকে যাতনাতে অস্থির করিয়া তুলিত। এমন কি তিনি ক্ষোভে দুঃখে ঈশ্বরকে গালাগালি দিতেন। একদিন তিনি কোন এক হতভাগিনী বিধবাকে দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; তখন তাঁহার পরিচিত কয়েকজন বন্ধু বসিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তিনি বলিলেন,—"এই জগতের মালিককে যদি পাই, তাহলে একবার দেখি;

এ জগতের মালিক থাকলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে?" এই বলিয়া কিরূপে দুষ্ট লোকে ঐ বিধবাটির সর্বস্ব হরণ করিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন, ও দরদর ধারে তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ফল কথা এই যে, তিনি যত সত্বর স্বদেশবাসীদিগকে অগ্রসর দেখিতে চাহিতেন, তাহারা তত সত্বর অগ্রসর হইবার লক্ষণ দেখাইত না বলিয়া, তিনি তাহাদের প্রতি অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় বিরাগ বর্ষণ করিতেন।

বর্তমানে অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যৎ-রচনার শক্তিও তাহার ছিল। তিনি নিজ অন্তরে ভাবী ভারতের কি ছবি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও স্থানে সমগ্রভাবে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দেশমধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন ও বহুবিবাহ-নিবারণাদির চেষ্টা দ্বারা তিনি জানিতে দিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজের একটি ছবি তাঁহার হৃদয়ে ছিল, তিনি সেই ছবির দিকে স্বদেশকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; এবং শীঘ্র যায় না বলিয়া সহিষ্ণুতা হারাইতেছিলেন। সেই ছবিটির সমগ্র আয়তন ও পরিসর নির্দেশ করিবার উপায় নাই, কিন্তু স্থূলতঃ তাহার মূলভাবটি নির্দেশ করা যাইতে পারে। বর্তমান সময়ের প্রত্যেক যুগ-প্রবর্তক ব্যক্তির ন্যায় তিনি পূর্ব ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানে, আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্য-জ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় তাহার প্রমাণ। হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসিদেশ-প্রসিদ্ধ কোম্‌ৎ দর্শন বিষয়ে সর্বদা বিচার হইত। একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় উঠিয়া গেলেন, মিত্র মহাশয় উপস্থিত বন্ধুদিগকে বলিলেন, "বাবা রে একটা giant! দেখ্‌লে কেমন বুদ্ধি বিদ্যার দৌড়! মানুষটার যেমন heart প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগই সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতীচ্য জগৎ হইতে যে কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্য-জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন; প্রাচ্য প্রীতি, ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্মশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন; এই প্রাচ্য প্রতীচ্যের একত্র সমাবেশের গুণেই তিনি বর্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অদ্ভুত সমাবেশ করিয়া নবসাহিত্যের আবির্ভাব করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় মানব-চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। সে কার্য এখনও চলিতেছে ও পরেও চলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কে এই ইয়াহিয়া খান?

দখলদার হানাদার পাকিস্থান সামরিক বাহিনীর নেতা ইয়াহিয়া খানের যে বাংলাবাসীদিগকে দমন করিবার কোন ন্যায়-নীতি-রীতি বা আইন সঙ্গত অধিকার নাই; এই কথা "যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে। সেই আলোচনার কিছুটা এইখানে পুণঃ মুদ্রিত করা হইল।

পূর্ব বাংলায় আগুন জ্বলিয়াছে—সেখানে ধ্বনিত হইতেছে সেখ মুজিবর রহমানের শঙ্খনাদ—তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর—"রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব।" এই মহান বাণী আজ পূর্ব্ববাংলার অগণিত নরনারীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া অগণিত নরনারী আজ স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অত্মোৎস্বর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। স্বৈরাচারী জঙ্গী শাসনের মুখপাত্র ইয়াহিয়া খাঁর বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের উপর পাশবিক আক্রমণ চালাইতেছে।

দিয়াছে। ঢাকা সহরের রাজপথে জনগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া পাক্ বাহিনীর ট্যাঙ্কগুলি ঘর্ঘর নিনাদে চলিতেছে। বিমান হইতে নিরস্ত্র জনতার উপর বোমা বর্ষিত হইতেছে—বন্দুক, কামান, মেসিনগান ও আধুনিক মারণাস্ত্রগুলি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গর্জন করিয়া পিপীলিকার মতই অবহেলে জনগণকে হত্যা করিতেছে, সেখানে সত্যই আজ "স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ হতে রক্তশুষি করিতেছে পান লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার।" তথাপি পূর্ববাংলার জনগণ আজ "সংকুচিত ভীত ক্রীত দাসের" মত লুকাইতেছে না তাহারা উন্নত শিরে এই অন্যায়কে প্রতিরোধ করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা সত্যই আজ দাঁড়াইয়াছে—"উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধুলি আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক।"

স্বৈরাচারী জঙ্গীশাসনের প্রতিভূ ধূর্ত্ত ইয়াহিয়া মনে করিয়াছিলেন যে সুদীর্ঘ জঙ্গী শাসনের ফলে পূর্ব্ববাংলার জনগণের মনোবল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে এবং তাহারা হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। তাই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া গণতন্ত্রের মুখসের আড়ালে থাকিয়া সৈন্যবাহিনীর হাতে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করিতে ও পূর্বপাকিস্তানকে চিরকালের জন্য আইনসঙ্গত ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণভূমি উপনিবেশে পরিণত রাখিতে তিনি এক চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের রূঢ় আঘাতে তাঁহার এই অলীক পরিকল্পনা তাসের ঘরের মতই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সেখ মুজিবর রহমন উন্নত শিরে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পূর্ব বাংলার সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবী তুলিয়া ধরিলেন। স্বপ্নভঙ্গে ক্রুদ্ধ ইয়াহিয়া খাঁ তখন স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

কে এই ইয়াহিয়া খাঁ? কি সর্ত্তে তিনি পূর্ব বাংলার জনগণের প্রভু হইতে চান? কোন অধিকারে তিনি জাতীয় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধীদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিতে অথবা জনগণের নির্ব্বাচিত জাতীয় পরিষদের সংবিধান রচনায় বাধা দিতে সাহসী হন? ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে। গণতান্ত্রিক সরকারের অক্ষমতা, ব্যর্থতা ও দুর্নিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান সিকান্দার মির্জ্জা গায়ের জোরে সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়াছিলেন। বন্দুকের মুখে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া রাষ্ট্রের প্রধান হইয়া বলিয়াছিল সৈন্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আয়ুব খাঁ এবং তাঁহারই প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ আয়ুবের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়া রাষ্ট্রপতি সাজিয়াছেন। সিকান্দার মির্জ্জা, আয়ুব অথবা ইয়াহিয়া কেহই পূর্ববাংলা বিজয় করেন নাই। তাঁহারা কেহই পূর্ববাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নহেন, এমনকি তাঁহারা পূর্ববাংলার মানুষ পর্যন্ত নন। তাই পূর্ব্ববাংলার উপর তাঁহাদের কি সত্ত আছে সেই প্রশ্ন তুলিবার সময় আসিয়াছে। নৈতিক বিচারে ইয়াহিয়ার সৈন্যদল আজ পররাজ্য আক্রমণকারী দস্যু, মানবত্মাকে শৃঙ্খলিত করিবার ও জনগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার অভিলাষী বর্ব্বর হানাদার। কেন ইয়াহিয়া খাঁকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইবে? এই বিংশ শতাব্দীতেও কি মধ্যযুগীয় মুসলমানী কায়দায় প্রাসাদ বিপ্লবের সাহায্যে শাসনকর্ত্তা পরিবর্ত্তনের নীতি স্বীকৃতি পাইবে?

মুজিবরের পশ্চাতে থাকিয়া পূর্ব্ববাংলা জনগণ আজ মৃত্যুপণ করিয়া লড়িতেছে। তাহাদের কর্ত্তব্য তাহারা করিতেছে কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? তাহারা বিশেষ করিয়া ভারত কি আজ মূক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? স্ফীতকায় অপমানের কবর হইতে লাঞ্ছিত দুর্গত মানবাত্মাকে রক্ষা করিতে তাহারা কি একটি অঙ্গুলি হেলনও করিবে না? প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

বলিয়াছেন যে তিনি একথা চিন্তা করিতেছেন, তবে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির কথাওতো স্মরণ রাখিতে হইবে। পাকিস্তান কোন আন্তর্জাতিক রীতি কবে মানিয়াছে—ইয়াহিয়া খাঁ কোন গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে দেশের শত্রু আখ্যা দিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে। মুজিবর "বাংলা দেশ" এর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইয়াহিয়ার বাংলা দেশের শাসন রজ্জু হস্তে রাখিবার কোন নৈতিক অধিকারই নাই। আজ মুজিবরের স্বাধীন বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিয়া তাঁহার অনুরোধে দেশ হইতে আক্রমণকারী বিদেশী হানাদের দূর করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলে কোন আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘিত হইবে? আমেরিকা যদি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারে, রাশিয়া যদি পোল্যাণ্ডে ট্যাঙ্ক বাহিনী লইয়া অভিযান করিতে পারে, তবে ভারতই বা স্বাধীন বাংলা দেশে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবে না কেন?

মাওবাদের কথা

সুশীলানন্দ সেন "যুগজ্যোতি" পত্রিকায় মাওবাদ ও নকশাল পন্থার একটা তুলনা মূলক আলোচনা করিয়াছেন। ইহার কোন কোন অংশ বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। যথা:

মাও সে তুঙের বাণী ও কার্য্যকলাপ প্রথমাবধি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে আজ বামপন্থী কম্যুনিষ্ট ও নক্সালপন্থী বর্ণিত একদল যুবকের কার্য্যকলাপ তাতে সমর্থন যায় না। মাও সে তুঙ পণ্ডিত ও দেশভক্ত ব্যক্তি এবং তাঁকে যে ভাবে ত্রিমুখী শত্রুর প্রতি তাঁর সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি নিয়োগ করতে হয়েছিল তা বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বহুমুখী বিপদের প্রতিরোধে তাঁকে যে পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার অন্যথা সম্ভব ছিল না তবু তিনি দায়িত্বহীন অরাজকতা সৃষ্টি করার প্রশ্রয় দেন নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য তাঁরই বাণী উদ্ধৃত করে প্রমাণ করা যে তাঁর নামে যে সব কুকার্য্য আজকাল চলেছে তাতে তার কোনই সমর্থন পাওয়া যায় না।

প্রথমত: দেখা যাক শিক্ষা ও বিদ্যালয় সমূহের উপর আক্রমণ। মাও-সে-তুঙ-বলেছেন "......the Communist Party must be good at winning intellectuals, for only in this way will it be able to organize great strength for thc War of Resistance... Without the participation of the intellectuals victory in the revolution is impossible. (Selected Works of Mao Se-Tung Vol II page 301, Foreign Languages Press, Peking 1967)

কেম্যুনিষ্ট পার্টি বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব অর্জন করতে যত্নবান হবেন, কারণ এইভাবেই তারা যুদ্ধে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতিত বিপ্লবে জয়লাভ করা অসম্ভব।'

তিনি আরো বলেছেন :......the proletariat cannot produce intellectuals of its own without the help of the existing intellectuals"—'প্রলেটারিয়েত (শ্রমজীবীরা) বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ভিন্ন নিজেরা বুদ্ধিমান ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারে না।'

'Intellectual' বলতে তিনি বলেন: The term 'intellectual' refers to all those who have had middle school or higher education and those with similar educationai levels. They include university and middle school teachers and staff membets, university and middle school students, primary school teachers, professional engineers and technicians among whom the university and middle school-students occupy an important position.' (page 303 Voi. II).'

বুদ্ধিজীবী বলতে তিনি মনে করেন তারাই যে সকল ব্যক্তি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অথবা উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, কিম্বা ঐ পর্যায়ে শিক্ষা অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহকর্মী এবং সেখানকার ছাত্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার ও প্রয়োগবিদ্ সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের ছাত্রদের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।'

এই বিদ্যালয়গুলিই কিন্তু নক্সালাইটদের আক্রমণের সর্বপ্রথম লক্ষ্য বস্তু! মনীষীদের (intellectuals)মর্মর মূর্তি ও তাঁদের ছবি চূর্ণ-বিচূর্ণ করাই এঁদের প্রধান কার্য্যকলাপ। এ মাও সে তুঙ বাণীর পরিপন্থী।

কালচারাল ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "This should centre on promoting and spreading the knowledge and skills needed for the war (সে সময়ে চীন জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল) and a sense of national pride among the masses of the people Bourgeoisie liberal educators, main of letter journalists, scholars and technical experts should be allowed to come to our base areas and co-operate with us in running school and newspapers and doing other works. We should accept into our schools all intellectuals and students etc (Vol. II page 448)

এর মূল উদ্দেশ্য হবে যে, যে জ্ঞান এবং নিপুণতা যুদ্ধের সহায়ক সেই সকলের উন্নতিবর্ধন ও বিস্তার করা এবং দেশের সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে জাতীয় গর্ব্ববোধ সঞ্চার করা বুর্জোয়া উদার শিক্ষকবর্গ, পণ্ডিতগণ, সাংবাদিক, উচ্চশিক্ষাবিদ্ ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শীদের আমাদের মধ্যে আনতে হবে এবং তাঁহার সাহায্যে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান, সংবাদপত্র পরিচালনা এবং অন্যান্য কাজ করতে সাহায্য নিতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে সমস্ত জ্ঞানী, শিক্ষিত ব্যক্তি ও ছাত্রদের গ্রহণ করিতে হবে ইত্যাদি" কোথাও তিনি বিদ্যালয় ও বিদ্যমান শিক্ষায়তনের ধ্বংসের কথা বলেন নাই এবং লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বলেন নাই।

মাও সে তুঙ তাঁর শ্রমনীতি আলোচনা করে বলেছেন:

Once a contract between labour and capital is concluded, the workers must observe labour discipline and the Capitalists must be allowed to make some profit. Otherwise factories will close down, which will neither help the war nor benefit the workers. particularly in the rural areas, the living standards and wages of the workers should not be raised too high, or it will give rise to complaints from the peasants, create unemployment among the workers and result in decline in production.' (Vol. II page 445)

'শ্রমজীবী ও মূলধন নিয়োগকারীর মধ্যে একবার চুক্তি মীমাংসা হলে শ্রমিকের পক্ষে শ্রম নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক এবং যে মূলধন নিয়োগ করেছে তাঁকে কিছু মুনাফা দিতেই হবে। অন্যথায় কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে;—তা হলে যুদ্ধের কোন সাহায্য হবে না ও শ্রমিকদেরও কোন উপকার হবে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে জীবিকার মান এবং পারিশ্রমিকের বেশি উন্নতি হতে দেওয়া উচিত হবে না, কারণ তা হলে কৃষকেরা অসন্তুষ্ট হবে। শ্রমিকদের মধ্যে বেকার বৃদ্ধি পাবে এবং পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের অবনতি ঘটবে।'

যে কোন স্তরেই তিনি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতের অবনতি বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই।

কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন...'they should be true in word and resolute in deed, free from arrogance and sincere in consulting and co-operating with the friendly-parties and armies, and they should be models in inter party relations within the united front. Every

Communist engaged in Government work should set an example of absolute integrity, of freedom from favouritism in making appointments and of hard work for little remuneration. Seeking the lime light and so on, are most contemptible, while selflessness, working with all one's energy, whole hearted devotion to public duty, and quiet hard work will command respect. Communists should work in harmony with all progressives outside the party and endeavour to unit entire people to do away with whatever is undesirable. It must be realized that communists form only a small section of the nation, and that there are large numbers of progressives and activisists outside the party with whom *we* must work. It is entirely wrong to think that we alone are good and no one else is any good, (Vol. II page 197-98)

গণতান্ত্রিক রিপাবলিক বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্র আজ পূর্ব্ব বংলায় গঠিত হইয়াছে ও যাহার সহিত পাকিস্থানের সামরিক বাহিনী এখন একটা অন্যায় ও অধর্ম্ম প্রেরোচিত গণহত্যাকারী বর্ব্বর যুদ্ধে লিপ্ত ; সেই নূতন রাষ্ট্রের বিষয় "যুগবাণী" পত্রিকায় বলা হইয়াছে—

স্বাধীন সাবভৌম গণতান্ত্রিক রিপাবলিক রূপে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উহাকে স্বীকৃতি-দানের প্রশ্নটি আর এড়াইয়া যাওয়া চলে না।

ভারতবর্ষ কি আরও ইতস্ততঃ করিবে? রাজা-গোপালাচারি বলিয়াছেন ভারত যেন এখন কোনামতেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়, কারণ স্বীকৃতি দিলেই নাকি যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। 'হিন্দুস্থান টাইমস' 'কারেন্ট' প্রভৃতি সংবাদপত্র ও পত্রিকাও স্বীকৃতিদানের বিরুদ্ধে লিখিতেছে। এরা খোলাখুলি বলিতেছে যে স্বাধীন বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদেরও একটা বড়ভরসা-স্থল হইয়া দাঁড়াইবে এবং ভারত রাষ্ট্রেও বাঙালীদের আর কোণঠাসা করিয়া রাখা যাইবে না। ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের এবং বাঙালী বিদ্বেষীদের একটা বাংলাদেশ-বিরোধী মনোভাব ক্রমেই দানা পাকাইয়া উঠিতেছে। তারা বলিতেছে যে বাংলাদেশ যদি একবার স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে দাঁড়াইয়া যায় তবে কলিকাতার রাস্তার ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। সোজা কথায়, পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীকেও আর শোষণ করা চলবে না, আমরা যতদূর শুনিতেছি বিড়লা, বাজোরিয়া ইত্যাদি বাঙালী শোষক গোষ্ঠীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে এরা ভয় পায় নাই, কারণ পকেট বুঝিয়া টাকা দিতে পারিলে তথাকথিত বামপন্থীদের যে কিনিয়া রাখা যায় সেকথা উপলব্ধি করিতে তাদের সময় লাগে নাই। কিন্তু এবার মুস্কিল দেখা দিয়াছে দুইদিকে। প্রথমত শোষণের কবল হইতে বাঙালী জাতির মুক্তির অভিযান সুরু হইয়াছে। দ্বিতীয়ত খাটি বিপ্লবী শক্তির আবির্ভাব বাঙালী জাতির মধ্যে ঘটিয়াছে—বিপ্লবব্যবসায়ী প্রতারকদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।

বাংলাদেশের যুদ্ধে ভারত কতটা সাহায্য করিবে বুঝিতেছি না। তবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী খুব সতর্কভাবে চলিয়াও বাংলাদেশের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করিয়াছেন। তিনি অনাবশ্যক জটিলতা বাড়ান নাই, চীনকে পূর্ববঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ার কোন অজুহাত দেন নাই, বরং আন্তর্জাতিক কুটনীতি তিনি এত সুন্দরভাবে মানিয়া চলিয়াছেন যে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সমস্ত প্রচার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তান প্রচার করিয়াছিল এবং চীন উহা সমর্থন করিয়াছিল যে ভারত নাকি পাকিস্তানের উচ্ছেদের জন্য সৈন্য পাঠাইয়া, অস্ত্র পাঠাইয়া, মুজিব বাহিনীকে সাহায্য করিতেছে। কেনো বিদেশী সাংবাদিক বা পর্যবেক্ষক বা কূটনীতিবিদ এই অভিযোগ সত্য বলিয়া মনে করে

না। বিদেশী সাংবাদিকগণ এমনকি বিদেশী সরকারগুলিও বলিয়াছে যে ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলায় নাই। মার্কিণ রাষ্ট্রদূত কীটিং বলিয়াছেন বাংলাদেশে যাহা ঘটিতেছে তাহাকে আর পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বলিয়া মানা যায় না। উহা একটা মানবিক ব্যাপার এবং সেভাবেই ঘটনাগুলির বিচার করিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে হত্যা করা, বৃদ্ধ ও শিশুদেরও খুন করা, সাধারণ নাগরিকদের ঘর বাড়ি জ্বালাইয়া দেওয়া ও বোমা ফেলিয়া উড়াইয়া দেওয়া, অধ্যাপক ও ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করা—এইসব পাইকারী হারে জহ্লাদ-বৃত্তি বিদ্রোহ দমনের নামে চলিতে পারে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে বারো শত মাইল দূর হইতে আসিয়া যুদ্ধ করাটা কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হইতেই পারে না বাংলা দেশে যাহা চলিতেছে তাহা গৃহযুদ্ধও নয়, তাহা একটা জাতির বিরুদ্ধে অপর একটা জাতির যুদ্ধ। গৃহযুদ্ধ হইলে এক পক্ষে একশ্রেণীর বাঙালী থাকিত। অপর পক্ষে আর এক শ্রেণীর বাঙালী থাকিত কিন্তু বাংলা দেশের বাঙালী জনসাধারণ সকলেই আছে একদিকে, অপরদিকে আছে ইয়াহিয়া খানের দখলদার বাহিনী। মহামতি মাও সে তুঙ একে কী করিয়া পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলিয়া আবার শয়তান শিরোমণি ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্রকেই সাহায্য দিতেছেন তাহা বোঝা শক্ত নয়; তিব্বতে তিনি যে পাপ করিয়াছেন ইয়াহিয়ার এই পাপাচার তাহারই সমগোত্রীয়। মাও সে তুঙ সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় তিব্বতী জাতিকে পরাধীন করিয়া, নগ্ন অমানুষিক অত্যাচারের সাহায্যে তাহাদের উচ্ছেদ করিয়া তিব্বতকে একটা কলোনিতে পরিণত করিয়াছেন। ইয়াহিয়া মাও সে তুঙের প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করিতেছেন। মাও সে তুঙ তাঁর নারকীয় নীতির এই সার্থক অনুসারীকে সমর্থন তো করিবেই।

সাময়িকী

বৃটেনের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী

বেকার সংখ্যাবৃদ্ধি ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া চলিয়াছে বলিয়া বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যেরূপ খরচের হার হইলে, মাল বিক্রয় ও রপ্তানি করিয়া বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাস্থ্যবান হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা হীথের নাই। কারণ বেতন যদি হ্রাস করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে শ্রমিক-দিগের সহিত সংঘাতের নিশ্চয়তা আরও নিশ্চয়ভাবে দেখা দিবে। তাহা ছাড়া বৃটেন যদি ইউরোপের সমবেত অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মাণী, ইটালি, লাকসেমবুর্গ ও হলাণ্ডের সহিত তাল রাখিয়া অগ্রগমণে প্রস্তুত হইতে চান তাহা হইলে বেতনের হার কমাইলে সংঘাতটা সামলান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কারণ বর্ত্তমানে যদি ঐ সকল দেশের পুরুষ শ্রমিকদিগের ঘণ্টা হিসাবে বেতনের হার তুলনা করিয়া দেখা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বৃটেনের সহিত যে সকল দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা সেই দেশগুলির ঐ বেতনের হার বৃটেন অপেক্ষা অধিক তাহা হইলেও ঐ দেশগুলি রপ্তানি বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা হারায় নাই। বেতনের হার (পুরুষদের প্রতি ঘণ্টায়) দেখা যায় নিম্নলিখিতরূপ আছে :

বৃটেন	—	৯ টাকা ৬০ পয়সা
বেলজিয়াম	—	৯ টাকা ৭৫ পয়সা
ফ্রান্স	—	৮ টাকা ৭৫ পয়সা
পশ্চিম জার্ম্মাণী	—	১২ টাকা সাড়ে সাত পঃ
ইটালি	—	৬ টাকা ৬০ পয়সা
লুকসেমবুর্গ	—	১২ টাকা সাড়ে সাত পঃ
হল্যাণ্ড	—	৯ টাকা ৪৫ পয়সা

ঐ সকল বেতনের হার হইতে দেখা যায় যে পশ্চিম জার্ম্মাণী ও লুকসেমবুর্গের তুলনায় ইটালিতে অর্দ্ধেক বেতন দেওয়া হয়। বৃটেনের তুলনায় পশ্চিম জার্ম্মাণী শতকরা ত্রিশ টাকা অধিক বেতন দিয়া থাকে। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে উৎপাদিত বস্তুর উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট বিচারে সকল দেশের সকল উৎপাদিত বস্তুরই একটা বাজার থাকে ও মূল্যের পার্থক্য দ্বারা বস্তু সকল বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কে কত বস্তু রপ্তানি করিতে পারে তাহার উপর তাহার বিদেশী মুদ্রার পাওনা স্থির হয় এবং কত বিদেশী বস্তু আমদানি করে তাহা দ্বারা স্থির হয় বিদেশের অর্থ বদলের বাজারে আমদানিকারক দেশের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা। এই নেওয়া দেওয়ার দ্বারাই নানা দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য স্থির হয়। অবশ্য সেটা হয় খোলা বাজার থাকিলে। অনেক সময়েই বিনিময় হার সরকারী বোঝাপড়ার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহা বজায় রাখিবার জন্য স্বদেশের মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হারে বিক্রয় ও বিদেশী মুদ্রা সেই হারে ক্রয় সরকারীভাবে করা হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে পশ্চিম জার্ম্মাণীর মার্ক আমেরিকান ডলারের তুলনায় নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক দামে বিক্রয় হইতেছে। জাপান, হল্যাণ্ড, সুইৎজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মুদ্রাও নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আমেরিকা ঐ সকল মুদ্রা সহস্র সহস্র কোটি হিসাবে কিনিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে নিজেদের বাজারে বিক্রয় করিতেছে ও তাহার ফলে সহস্র সহস্র কোটি ডলার অন্য দেশের বাজারে গিয়া জমা হইতেছে। ইহার ফলে ডলার অনতিবিলম্বে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হারে আর বিক্রয় হইবে না। চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক অধিক হইয়া যাইলে মূল্য হ্রাস হওয়াতে কোন বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে না। বৃটেনের [illegible]

নির্দ্দিষ্ট হারে বিণিময় হয়। ডলারের নিম্ন গমন হইলে তাহা পাউণ্ডে প্রতিফলিত হইবে এবং ফলে পাউণ্ডের আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য হ্রাস করিতে হইতে পারে। এডওয়ার্ড হীথ এই সকল কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে বিশেষ সক্ষমতা দেখাইতেছেন না। যতটা মনে হয় বৃটেনের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপেরদিকেই যাইবে।

পাকিস্থানের টাকার পতন

এক আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে পাকিস্থানী রুপেয়া পূর্ব্বকালে চার হইতে পাঁচ টাকার মাঝামাঝি দরে বদল হইতেছিল। ইহা বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা। পরে পাকিস্থান নানা দুস্কর্ম্মে জড়াইয়া পড়িয়া আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্ব্বল হইয়া যায়। বৎসরাধিক কাল হইতে পাক রুপেয়া ডলারে দশ টাকা হিসাবে বদল হইত। এখন কিছুদিন হইতে হংকং-এর বাজারে এক ডলার চৌদ্দ পাক রুপেয়া দিয়া ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং পাকিস্থা-নের টাকার আন্তর্জাতিক মূল্য পূর্ব্বের তুলনায় এক তৃতীয়াংশে নামিয়াছে বলা যায়। সেইজন্য এখন পাকিস্থানের মুদ্রার আন্তর্জাতিক মূল্য নুতন করিয়া স্থির করিতে হইবে। সেই মূল্য যদি আরও কমিয়া যায়, ও সেরূপ হইবার সম্ভাবনা খুবই অধিক, তাহা হইলে এক ডলার পনের পাক রুপেয়া হইতে পারে। অর্থাৎ তাহা হইলে পাকিস্থানী টাকা ভারতীয় টাকার সহিত ২:১ হারে বিনিময় হইবে। এক টাকায় দুই পাকিস্থানী টাকা হইলে সেই বিনিময় হার রক্ষা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। এখন ভারতীয় দ্রব্যাদি যথা সরিষার তেল, কয়লা, ইস্পাত, নানা প্রকার ঔষধ পাকিস্থানে ভারতের দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় হয়। দূর দেশ হইতে আমদানি করা ইস্পাত কয়লা প্রভৃতি পাকিস্থানে আমদানি করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত যদি বিভিন্ন বস্তু পাকিস্থানে পাঠায় তাহা হইলে তৎ-পরিবর্ত্তে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য, চামড়া, তুলা প্রভৃতি এদেশে আনা যাইতে পারে। এই বাণিজ্যের প্রসার অসম্ভব হইবে না।

সিংহলের রাষ্ট্রীয় অবস্থা

সিংহলে যে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি লক্ষিত হইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে শ্রীমতী বন্দরনায়কীকে নির্ব্বাচন কালে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল সেই সকল বামপন্থী ব্যক্তিরাই এখন তাঁহার বিরুদ্ধতায় আপ্রাণ নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার কারণ শ্রীমতী বন্দরনায়কী যে সকল আশার কথা ভোট পাইবার জন্য বলিয়াছিলেন পরে তিনি সেই সকল কথা রাখেন নাই। অর্থাৎ সিংহলে যে ৭০০০০০ মানুষ বেকার ও যাহাদের মধ্যে কয়েক সহস্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, সেই সকল বেকারদিগের কোন উপার্জ্জনের পথ খুলিয়া দিতে শ্রীমতী বন্দরনায়কী সক্ষম হ'ন নাই। যাহারা অল্প বেতনে চা বাগানে ও নারিকেল বাগানে কাজ করে তাহাদেরও কোন আর্থিক উন্নতি হয় নাই। অবস্থা দেখিয়া চীনের অনুচর উত্তর কোরিয়ার কোন কোন ব্যক্তি ঐ সকল অসন্তুষ্ট জনগণকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করিতেছিল ; তাহারা নিজেদের মাওৎসেতুঙ ভক্ত বলিয়া প্রচার করে নাই, বলিয়াছিল তাহারা চেগুয়েভারিষ্ট, কেননা ইহাতে মানুষ চীনের সহায়তার কথা সহজে বুঝিবে না। কিন্তু শ্রীমতী বন্দরনায়কী উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধিদিগকে সিংহল হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া চীনের বন্ধুত্ব হারাইয়া বসিলেন। তদুপরি তিনি বুরজোয়া বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী বুরজোয়া শ্রেষ্ঠ এডওয়ার্ড হীথের নিকট অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করিয়া নিজের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী আরও প্রকটভাবে ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। এখন বৃটিশ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সিংহল সৈন্যবাহিনী গুয়েভারিষ্ট তথা মাওয়িষ্ট বিদ্রোহী দিগকে দমন করিতে নিযুক্ত। বহু বিদ্রোহীকে নিহত করা হইয়া, অনেককে গ্রেফতার করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান এবং গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। কিন্তু দূরে দূরে অরণ্য অঞ্চলে বিদ্রোহীগণ এখনও সবলভাবে বিরাজমান রহিয়াছে এবং তাহাদের পূর্ণরূপে দমন করিতে এখনও সময় লাগিবে মনে হয়। শ্রীমতী বন্দরনায়কী বৃটেনের রক্ষণশীল নেতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজের

পূর্ব্ব প্রচারিত আদর্শ ত্যাগ করিয়া এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মত আবার বদলাইতে কোন বাধা না থাকিতে পারে।

বৃটিশ সাংবাদিকদিগের পূর্ব্ব বাংলা ভ্রমণ

কয়েকজন বৃটিশ সাংবাদিক পাক সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্ববাংলায় অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন। ইহারা শুনা যায় লণ্ডনের পাকিস্থান হাই-কমিশন ও শ্রী এডওয়ার্ড হীথের দ্বারা বাছাই করা ব্যক্তি। ঢাকায় পাকিস্থানী সামরিক কর্ম্মচারীগণ এই সাংবাদিক-দিগকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সহিত পরিচিত করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে খবর শুনিয়া অবস্থা বিচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনা যায়, যে ইয়াহিয়া খানের সমর্থক কোন কোন মুসলীম লীগের লোক এই সাংবাদিকদিগকে সরকারীভাবে প্রচারিত মিথ্যাগুলি শুনাইয়াছেন। সৈন্যবাহিনী নির্দ্দোষ এবং হতাহত ব্যক্তিগণ সবাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে মরিয়াছে এবং জখম হইয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাটা হইয়াছে বাঙালী ও অবাঙালীর মধ্যে। অর্থাৎ অবাঙালীরা যে সকলেই ইয়াহিয়া খানের সৈন্যদলের লোক, সে কথাটা চাপিয়া কথাটা ভিন্ন রঙ্গে রাঙ্গাইয়া দেখান হইয়াছে। ঢাকার ধ্বংসাবশেষের কোন কোন গৃহ পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া ফেলা হইতেছে, যাহাতে অতঃপর ইয়াহিয়া খানের নিরস্ত্র জনগণের উপর তোপ চালনার প্রমাণ লোক চক্ষে বীভৎসভাবে উপস্থিত না থাকে। এবং পাকিস্থানের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন জাতিগুলি মনুষ্যত্বের সকল আদর্শ জলে ফেলিয়া দিয়া পাপাত্মা ইয়াহিয়ার মহা পাতকের সাফাই গাহিতে লাগিয়াছেন। বৃটিশ সাংবাদিকদিগের মধ্যে দুইজন শুনা যায় গায়ের জোরে যত্রতত্র ঘুরিয়া খবর লইয়া বেড়াইয়াছেন। সাজান কথা ও সত্য ঘটনার বর্ণনার পার্থক্য দেখিয়া এই দুই ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া সেই বিষয় লিখিয়াছেন; কিন্তু সেই খবর তেমন করিয়া প্রচার করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ সাংবাদিক মহলে এখন এই নৃশংস গণহত্যা ও ঘোর অত্যাচার অনাচারের কথা অর্দ্ধসত্য ও পূর্ণ মিথ্যার প্রলেপ দিয়া তাহার চরম অমানুষিকতা কমাইয়া দেখাইবার চেষ্টা চলিতেছে। উদ্দেশ্য পাকিস্থানকে কোন রকমে জোড়া-তালা দিয়া বাঁচাইয়া রাখা। কিন্তু একথা সর্ব্বজন গ্রাহ্য যে পাকিস্থান আর পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে না। পশ্চিম পাকিস্থানের মানুষ পূর্ব্ব বাংলায় যাহা করিয়াছে তাহা কেহ কখনও ভুলিবে না এবং দুই পাকিস্থানের মিলন অতঃপর অসম্ভব।

পূর্ব্ব বাংলার যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি

পাকিস্থানের সেনা বাহিনী, পাকিস্থান বিমান ও নৌবাহিনীর সাহায্যে অনেকগুলি পূর্ব্ব বাংলার সহর দখল করিয়া উত্তমরূপে ও দৃঢ়ভাবে সেই সহরগুলিতে সামরিক রাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আরও কতকগুলি সহরে পাকিস্থানীগণ নিজেদের ছাউনীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও সহরে যথেচ্ছা ঘোরাফেরা করিতে পারে না; কারণ সহরে অলিতে গলিতে আওয়ামী লীগের সমর্থক লোক অনেক থাকায় সেইরূপ ঘোরাফেরা নিরাপদ নহে। ব্যাপকভাবে গণহত্যা করাও ঐ সকল স্থলে সম্ভব হয় নাই; কারণ সৈন্যবল অল্প থাকায় সেইরূপ কার্য্য সহজ সাধ্য মনে হয় নাই। যে সকল বড় বড় রাজপথ পূর্ব্ব পাকিস্থানের নানা সহরের সংযোগ রক্ষা করে তাহার মধ্যে অনেকগুলি রাস্তা পাক সেনাদিগের অধিকারে আছে; কিন্তু সেই সকল রাজপথ অতিক্রম করিয়া এদিক ওদিক যাওয়া আসা করিতে আওয়ামী লীগের সৈন্যগণ কোনও অসুবিধা বোধ করে না। ১৭০০ শত মাইল রাজপথগুলির সকল অঙ্গ পাহারা দিবার মত সৈন্যবল পাকিস্থানের নাই এবং সেই কারণে রাজপথগুলি সৈন্য-গণের দখলে থাকিলেও সেগুলি বহু স্থলে বহু সময়ে প্রহরীহীনভাবে খোলা পড়িয়া থাকে।

পূর্ব্ব বাংলার গ্রামের সংখ্যা কমবেশী ষাট হাজার। এইগুলির মধ্যে শতকরা দশটি গ্রাম সহরের নৈকট্য হেতু পাকিস্থান সেনা বাহিনীর অধীনে আছে বলা যায়। কিন্তু এই গ্রামগুলি খালি করিয়া বহু লোক পলাইয়াছে। গ্রামান্তরে ও ভারতে। অবশিষ্ট গ্রামগুলি সেনাবাহিনীর

হাতের বাহিরে। সেই সকল স্থলে অধিকাংশ গ্রামবাসী সেখ মুজিবুর রহমানের ভক্ত ও নিজেদের বাংলাদেশ-বাসী বলিয়া মনে করে। ইহাদিগের সহিত সৈন্যদলের কোন সংঘাতও নাই এবং নাই কোন সংস্রব। কিন্তু যদি পাক সৈন্যগণ কখন পূর্ব্ব বাংলাকে পূর্ণরূপে পাকিস্থানের কবলে আনিতে চাহে তাহা হইলে এই সকল গ্রামও দখল করিতে হইবে। বর্ষার পূর্ব্বে সে চেষ্টা করা সম্ভব হইবে না। বর্ষার পরে হয় মুক্তি ফৌজ শক্তি, সংখ্যা ও অস্ত্রসস্ত্র বৃদ্ধি করিয়া সহরগুলির উপর আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিবে; নয়ত সৈন্যবাহিনীই ব্যবস্থা করিয়া গ্রামাঞ্চল দখল চেষ্টা করিবে। কি হইবে তাহা নির্ভর করিবে পাকিস্থানের এবং মুক্তি ফৌজের অবস্থার উপরে। মুক্তি ফৌজ অস্ত্রসস্ত্র ও অপর সাহায্য পাইবে বলিয়াই মনে হয় পাকিস্থানের আর্থিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থা দুর্ব্বল হইবে বলিয়া সকলে মনে করেন। কারণ জগৎবাসী জনগণ মুক্তি ফৌজকে সাহায্য করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং পাকিস্থান ক্রমে ক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস হওয়ার ফলে দেউলিয়া হইবার পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ষার পরে যুদ্ধ আমাদের মতে প্রবলতর হইবে এবং কোন কোন সহর মুক্তি ফৌজের দখলে আসিবে। পাকিস্থান তখন আওয়ামী লীগের সহিত সন্ধি স্থাপন চেষ্টা করিবে, কিন্তু মুক্তি ফৌজ সম্ভবত পূর্ণ স্বাধীনতাই পাইবার চেষ্টা করিবে।

পশ্চিম বাংলায় অরাজকতা

পশ্চিম বাংলায় যে অরাজকতার আবর্ত্তে পড়িয়া প্রত্যহই দুই দশ জন ব্যক্তি প্রাণ হারাইতেছে, সেই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে না। পুলিশ যথেষ্ট শক্তি পাওয়া সত্ত্বেও এই আইন ও শৃঙ্খলা বিনাশবাদী ব্যক্তিদের দমন করিতে সক্ষম হইতেছে না। ইহার কারণ বুদ্ধির অভাব অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অপারাধীদিগের সহিত সহযোগিতা, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কিন্তু যে কারণেই হউক, যদি পুলিশ তাহার একান্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যে, কর্ম্মশক্তি দেখাইতে না পারে তাহা হইলে পুলিশের জন্য দেশবাসী যে অর্থব্যয় করেন সে অর্থ অপব্যয় হইতেছে বলিতে হয়। দেশবাসীকে রাজস্ব দিতে বাধ্য করিয়া সেই রাজস্ব অপব্যয় করার অধিকার কোন শাসক গোষ্ঠীকেই দেওয়া উচিত কার্য্য নহে কিন্তু যাঁহারা প্রাদেশিক বিধান সভায় সংখ্যাগুরু ও সেই জন্য রাজ্য-শাসনে নিযুক্ত তাঁদের সরাইয়া দেওয়া যায়। না বিরুদ্ধদল যতটা মনে হয় অরাজকতার সমর্থক। সুতরাং তাঁহারা যে শাসক গোষ্ঠীকে সরাইয়া রাজ্যশাসন ভার লইলে অরাজকতা দুর করিবেন এই আশাও করা যায় না। এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য যে শাসন যাঁহারা করিবেন বলিয়া দেশে অরাজকতা চলিতে দেন, যে কোনও কারণেই হউক; তাঁহাদিকে অর্থাৎ তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে না থাকিতে দেওয়া। দক্ষিণ পন্থীগণ কর্ম্মে অক্ষম এবং বাম পন্থীগণ অপরাধীদিগের সমর্থক। এইরূপ অবস্থায় সকল রাষ্ট্রীয় দলই বেকার ও শাসনে অক্ষম। আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে ভারতে রাষ্ট্রীয়দল গুলিকে উঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কারণ সেই দলগুলি জনসাধারণকে কোনও রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসরণ করিতে শেখায় না। শেখায় ষড়যন্ত্র, ধর্ম্ম, দর্শন, দেশদ্রোহীতা ও বেয়াইনী কার্য্য কলাপ। ভারতীয়েরা যদি নীতি অনুগতভাবে কার্য্যকরী রাষ্ট্রীয় দল গঠন করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের দল গঠনের অধিকার না দেওয়াই উত্তম। মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে ভোট দিবে এবং যাহারা সেই ভাবে নির্ব্বাচিত হইবে তাহারা মন্ত্রীদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া শাসন কার্য চালাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে না। অন্ততঃ রাজ্য শাসনের অভিনয় করিয়া সকল শাসন কার্য্য অচল করিয়া তোলা বন্ধ হইবে।

দেশ-বিদেশের কথা

বৃটেনের সংবাদপত্রের কাহিনী

সরকারীভাবে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় ইংরেজীতে বৃটেনের সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে সহজ ও সরল ভাষায় কবে কিভাবে বৃটেনের সংবাদপত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই কাহিনী বলা হইয়াছে। বৃটেনের সংবাদপত্রগুলির প্রারম্ভিক ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় সংবাদপত্র লেখকগণ লণ্ডন হইতে কফির আড্ডা (দোকান) ও অন্যত্র লব্ধ গল্প গুজব সংগ্রহ করিয়া মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে সেই সকল সংবাদ লিখিয়া পাঠাইতেন। সেগুলি হইত চিঠির মতন করিয়া লিখিত। মুদ্রন কার্য্য তখন প্রচলিত হইয়াছে (১৫০০খৃঃ অঃ) কিন্তু কোন কিছু মুদ্রিত করিতে হইলে সরকারী অনুমতি (লাইসেন্স) ব্যতীত তাহা করা দণ্ডনীয় ছিল। এই অনুমতি পাওয়া কঠিন ছিল ও সেইজন্য সংবাদ-"পত্র"গুলি হস্তলিখিত পত্রই হইত। ১৬৯১খৃঃ অব্দে ঐ জাতীয় কড়াকড়ির অনেকটা লাঘব হয় এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছাপা হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীগণ যাহা ছাপা হইত তাহা পাঠ করিয়া ছাপার উপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিলে তবেই তাহা ছাপা হইতে পারিত (সেনসরশিপ), এবং এই কারণে ছাপা সংবাদপত্র থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিখিত পত্রগুলিও চলিতে থাকে। ১৬৯৩খৃঃ অব্দে ছাপা বিষয়গুলি সরকারী অনুমতি ব্যতীত ছাপা না হইতে দেওয়ার আইন শুধুমাত্র দুই বৎসরের জন্য পুনঃপ্রণয়ন করা হয়। ১৬৯৫খৃঃ অব্দে ঐ সেনসরশিপ আইন উঠিয়া যায়। এইভাবে বৃটেনের মুদ্রন কার্য্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়।

ছাপার সম্বন্ধে আইন কানুনই ঐ স্বাধীনতার পথে একমাত্র অন্তরায় ছিল না। পার্লামেন্টের আলোচনা প্রভৃতির সংবাদ প্রকাশ করাও বিপদজনক ছিল কেন না ঐ জাতীয় সংবাদ প্রকাশ করিলে অনেক সময় প্রকাশকদিগকে আদালতে গিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হইত। "সিডিশ্যস লাইবেল" অপরাধের জন্য অনেককে জরিমানা দিতে এবং কারাদণ্ড ভোগ করিতেও হইত। কোন কোন বিচারক বিশ্বাস করিতেন যে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে কোন সমালোচনা করা হইলেই তাহাকেই ঐরূপ রাজদ্রোহাত্মক মানহানিকর অপরাধ বলিয়া ধরা উচিত। সংবাদপত্রের উপর ১৭১২খৃঃ অব্দে একটা স্ট্যাম্প মাশুল বসান হয় ও তাহার উপরে কাগজের শুল্ক, বিজ্ঞাপন শুল্ক প্রভৃতি আরও অপর রাজকর বসান হয়। ইহার ফলে সংবাদপত্রগুলি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই এবং শাসক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ও দমন স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। ১৭৯২খৃঃ অব্দে প্রকাশকদিগের উপর নানা প্রকার জুলুম করাতে জনমত রাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে এবং প্রকাশকগণও নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন জোরাল করিয়া তোলায় আইন করিয়া নির্দ্ধারিত হয় যে অতঃপর শুধু এক বিচারকের মতের উপর রাজদ্রোহাত্মক মানহানির বিচার নির্ভর করবে না। বিচারকের সঙ্গে থাকিবে জুরি ও জুরির মতের উপরেই অপরাধ সাব্যস্ত হইবে। ইহার পরে ঐজাতীয় অভিযোগ কম হইতে আরম্ভ হইল। সরকারী সংবাদ নিয়ন্ত্রণও শক্তি হারাইল। এই সময়ের প্রায় ৫০ বৎসর পরে সংবাদপত্রগুলি পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইভাবে সরকারী অভিভাবকত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অবসান ও নানাবিধ খাজনা মাশুল উঠিয়া যাইবার পরে আরও দুইটি কারণে সংবাদপত্রগুলির প্রচার ক্রমশঃ অধিকভাবে বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে। প্রথম কারণ

হইল ১৮৪০খৃঃ অব্দে রেল লাইনের গঠন ও দ্রুত গমনাগমনের ব্যবস্থা বৃদ্ধি। ইহার ফলে ১৯০০খৃঃ অব্দে লণ্ডনের সকল সংবাদপত্রই একদিনের মধ্যে বৃটেনের সর্ব্বত্র পৌছিয়া যাইতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে সকালবেলাতেই কয়েকঘণ্টার মধ্যে সংবাদপত্রগুলি লণ্ডন হইতে বৃটেনের প্রায় সর্ব্বত্র গিয়া উপস্থিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় সংবাদপত্র বিস্তার ও প্রসার সহায়ক বিষয়টি হইল শিক্ষার বিস্তার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রসারের ফলে সংবাদপত্র ক্রয় করা ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া দাঁড়ায়।

১৬৯৫ খৃঃ অব্দে সংবাদ পত্রগুলি স্বাধীনতা লাভ করিলে পরে ১৭০২খৃঃ অব্দে বৃটেনের প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্রের জন্ম হয়। ইহার নাম ছিল দি ডেলি কুরাণ্ট (The Daily Courant) ইহার পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭১৯খৃঃ অব্দে দি ডেলি পোষ্ট। রবিনসন ক্রুসো লেখক ড্যানিয়েল ডিফো এই সংবাদ পত্রটির একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনিই বৃটেনের সংবাদ পত্র পরিচালকদিগের প্রথমদিকের একজন পথপ্রদর্শক অতঃপর আরও ককেটি সংবাদপত্র বাহির হয় কিন্তু সেগুলির কোনটিই দীর্ঘকাল চলে নাই

১৭৬৯খৃঃ অব্দে, যদিও সংবাদপত্রগুলির উপর নানা প্রকার খাজনা মাশুল তখনও সেগুলির অধিক প্রচারের অন্তরায় হিসাবে পূর্ণরূপে উপস্থিত ছিল তবুও অপর কারণে ঐ বৎসরটি বৃটিশ সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়। ঐ বৎসর মর্ণিং ক্রনিকল্ (Morning Chronicle) এর সংস্থাপনা হয়। এই সংবাদপত্রের নাটক সমালোচক ছিলেন উইলিয়াম হ্যাজলেট্ট (William Hazlett). ১৭৭২খৃঃ অব্দে মর্ণিং পোষ্ট (Morning Post) স্থাপিত হয়। ইহাতে লিখিতেন চার্লস ল্যাম্ব (Charles Lamb) ও স্যামুয়েল কোলরিজ (Samuel Coleridge). ১৭৮৫খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইল দি ডেলি ইউনিভারসাল রেজিষ্টার (The Daily Universal Register). ইহাই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ১৭৮৮খৃঃ অব্দে হইল দি টাইমস The Times; যে নাম ইহার অদ্যাবধি রহিয়াছে। পরবর্ত্তি শতাব্দীতে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট উঠিয়া যাওয়ার পরে বৃটেনের প্রায় সহরে সহরে সংবাদপত্র প্রকাশ আরম্ভ হয়।

১৭৯১খৃঃ অব্দে দি অবজার্ভার (The Observer) নামক রবিবারের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই কাগজটি এখনও চলিতেছে। বর্ত্তমানে রবিবারে যে সকল সংবাদপত্র বাহির হয় সেইগুলির মোট বিক্রয় হয় প্রায় আড়াই কোটি খণ্ড। স্ট্যাম্প অ্যাক্ট উঠিয়া যাইবার পরেই দি ডেলি টেলিগ্রাফ The Daily Telegraph) প্রকাশিত হয় ও তাহার মূল্য ২পেনি ধার্য্য হয়। পরে উহার মূল্য কমাইয়া এক সময় এক পেনি করা হয়। ১৮৬১খৃঃ অব্দে দি ডেলি টেলিগ্রাফের বিক্রয় দি টাইমসের দ্বিগুণ হইয়াছিল। ১৮৭১খৃঃ অব্দে ইহার দৈনিক বিক্রয় হইত ২৪০,০০০। ১৮৫০খৃঃ অব্দে কোনও দৈনিকের বিক্রয় ৫০০০০এর অধিক ছিল না বলিয়া বিচার করা হয়।

শিক্ষার বিস্তারের ফলে পাঠকদিগের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। তাহাদের রুচি ও তদনুসারে গঠিত চাহিদা সংবাদপত্র প্রকাশকদিগের রচনা সংগ্রহ কার্য্যে গঠনমূলক প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। লেখকগণও অতঃপর শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচি পাঠকদিগের সন্তোষের জন্য নিজেদের লেখার গুনাগুণ বিচার করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে দৈনিক সংবাদ পত্রের বিক্রয় বৃদ্ধি বিশেষ দ্রুতগতি লাভ করিল। ১৯০০ খৃঃঅব্দে দি ডেলি মেল (The Daily Mail) এর বিক্রয় হয় দৈনিক ৯৮৯২৫৫। ১৯১৬খৃঃঅব্দে ঐ সংখ্যা ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। পরে ডেলি একসপ্রেস (Daily Express) ও ডেলি মিরর (Daily Mirror) বিক্রয় সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করে, ১৯১২ খৃঃঅব্দে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারক শ্রমিক জনপ্রিয় ডেলি হেরাল্ড (Daily Herald) বিক্রয় ক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দৈনিক ২০ লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইতে থাকে।

ইহার পরে কয়েকজন বৃহৎ ব্যবসায়ী সংবাদপত্র

ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন ও ফলে সংবাদপত্র প্রকাশ ব্যবসার ক্ষেত্রে "জাতে উঠিতে" সক্ষম হয়। লর্ড বিভারব্রুক (Lord Beaverbrook) যাহার লর্ড হইবার পূর্ব্বে নাম ছিল ম্যাকস এটকেন Max Aitken) ও লর্ড জুলিয়াস সাওথউড (Lord Southwood) যিনি পূর্ব্বে ছিলেন এলিয়াস (Julius Elias) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। লর্ড বিভারব্রুক দেউলিয়া প্রায় ডেলি একস-প্রেসকে নবকলেবর দান করিয়া সংবাদপত্র মহলে প্রবল শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া ছিলেন। লর্ড সাউথউড ডেলি হেরাল্ড পত্রিকার মালিক হইয়াছিলেন ১৯২৯খৃঃ-অব্দে। পরে বৃটেনে সংবাদপত্র যাহাতে একচেটিয়া মালিকদিগের কবলে না যায় তাহার জন্য নানা চেষ্টা করা হয়। এই সকল চেষ্টার ফলে সংবাদপত্র গুলির উন্নতি হয় অথবা অবস্থা উল্টা পথে যায় সে কথার আলোচনা এইক্ষেত্রে করিবার আবশ্যক নাই।

সামাজিক সুনীতি অথবা তথাকথিত লোক দেখানো সমাজতন্ত্র

চোখ খুলিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় সে ভারতের জনসাধারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ক্ষেত্রে যে দুঃখকষ্ট ও অভাবের তাড়নায় সতত জর্জ্জরিত থাকেন তাহার মূলে আছে একটা সর্ব্বব্যাপী অন্যায়, অবিচার দুর্নীতির প্রভাব। এই অন্যায় অবিচার ও দুর্নীতি যে সকল ক্ষেত্রে উপর হইতে নিচের দিকে চালিত হয়; অর্থাৎ শুধু রাজশক্তি, ধনবল বা উপরওয়ালাদিগের দোষেই জনসাধারণ উৎপীড়িত হয়; এমন কথা কেই জোর গলায় বলিতে পারে না। যাহারা উপরের মানুষ নহে তাহাদের দুস্কর্ম্মের ধাকাও বহুলোকে বহুক্ষেত্রে সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সমাজে অশান্তি অন্যায় ও অভাব বিস্তৃতভাবে দেখা দেয়।-যথা গরীব লোকের অভাবের মূলে প্রধানতঃ সামাজিক বিধি ব্যবস্থার দোষ থাকিলেও যাহারা গরীবের উপর সাক্ষাৎ ভাবে জুলুম করে; যথা দোকানদার, ভেজালদার, সুদখোর মহাজন, উচ্চভাড়ার অতি নিকৃষ্ট বস্তির বাড়ীওয়ালা, গুণ্ডা, জুয়াড়ী ইত্যাদী; সেই সকল দুর্জ্জন-দিগকে উচ্চস্তরের মানুষ বলা চলে না। তাহাদের অনাচার নিবারণ করিতে হইলে কেবল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ করিলে তাহা সম্পন্ন করা যায় না। অথবা চোরাই ভোট সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রীত্বলাভ করিলেও কোন বামপন্থী নেতা সেই অন্যায় রোধ করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। খাদ্যে, ঔষধে ও সকল প্রকার দ্রব্যে ভেজাল যাহারা দিয়া থাকে তাহারা ক্রেতাকে টাকায় আট আনা ঠকাইবার চেষ্টাতেই ঐরূপ অন্যায় করে। দোকানদার ধারে বিক্রয় করিবার অজুহাতে দরিদ্র ক্রেতাকে ওজনে, মূল্যে ও অন্যভাবে ঐ অনুপাতেই বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই সকল অন্যায় নিবারণ না করিলে জন-সাধারণ কখনও সুখে জীবন কাটাইতে সক্ষম হইবে না। উপর হইতে যে সকল অন্যায় প্রবল ধারায় সাধারণের উপরে প্রবাহমান হয়, সেই সকল অন্যায় বহুক্ষেত্রেই চোখে দেখা যায় না। অর্থাৎ পুলিশের জুলুম বা উৎকোচ আদায়, রেলগাড়ীতে মানুষের চাপে অর্দ্ধমৃতপ্রায় অবস্থায় গমনাগমন, অথবা অর্থনীতির মূল ব্যবস্থার অস্বাস্থ্যকর ক্লেদ সিঞ্চিত অবস্থা প্রভৃতি রাষ্ট্র ও সমাজের অপরাধ হইলেও সকল মানুষকে তাহা প্রকটভাবে সর্ব্বদা ভারাক্রান্ত করে না। বাজারে এক পয়সার জিনিস তিন পয়সায় বিক্রয় প্রত্যহই হইয়া থাকে ও তাহাতে মূল অন্যায় ও দারিদ্র্য আরই কষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি নিবারণ চেষ্টা সেই কারণে অতি আবশ্যক এবং তাহার চেষ্টা না করিয়া শুধু কনট্রোল (নিয়ন্ত্রণ), রাষ্ট্রীয়করণ ও সমাজবাদের নিদর্শনাত্মক কিছু কিছু লোকদেখানো নিয়মকানুন প্রবর্ত্তন করিলেই কোন বিশেষ সমাজ মঙ্গলকর সংস্কার কার্য সুসাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কোনও ব্যক্তি বা পরিবার কুড়ি বা পঁচিশ একরের অধিক জমি রাখিতে পারিবে না স্থির করিলে কাড়িয়া লওয়া জমি দিয়া সমাজের অসংখ্য নিঃসম্বল চাষীর সকলকে জমি দেওয়া সম্ভব হইবে না। "পার্টি" সমর্থক কোন কোন ব্যক্তির লাভ হইতে পারিবে হয়ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষের ব্যবস্থার পক্ষে উপযুক্ত নহে; সে কথাটাও মনে রাখা আবশ্যক। পাঁচলক্ষ টাকার অধিক মূল্যের গৃহ কাহারও থাকিবে না, নিয়ম করিলে যাহারা উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অল্প ভাড়ায় অপরকে বাস করিতে দিত তাহারা আর সে কার্য্য করিবে না। কিন্তু এক হাজার টাকায় চালাঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে মাসিক ২৫৷৩০ টাকা ভাড়া আদায় চলিতে থাকিবে। বস্তির বাড়ীওয়ালাদিগের লাভ হয় শতকরা বার্ষিক ৩০৷৪০ টাকা হারে। পাকাবাড়ী হইতে আয় হয় শতকরা বার্ষিক ১০৷১২ টাকা। এই দুই-এর মধ্যে কোনটি ন্যায় ও সুবিচার সঙ্গত তাহা চিন্তা করা প্রয়োজন। কোন মহিলা কুড়ি, ত্রিশ বা পঞ্চাশ ভরির অধিক ওজনের সোনার গহনা রাখিতে পারিবেন না বলাও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর চাপ দিবার ব্যবস্থা। রাষ্ট্র যদি স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে চান তাহা হইলে মহিলাদিগের গহনা কাড়িয়া লইয়া তাহা করিতে যাওয়া চূড়ান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কথা। রপ্তানি বৃদ্ধি না করিতে পারিলে দেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে সঞ্চিত স্বর্ণ ক্রমে ক্রমে বিদেশে চলিয়া যায়। মহিলাদের গহনা বিদেশে চলিয়া যায় না—তাহা জাতীয় সম্পদ। সুতরাং সেই স্বর্ণতেও হস্তক্ষেপ করিয়া রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উভয় ভাবেই নির্ধন অবস্থা প্রাপ্ত জাতীয় মঙ্গলের কথা নহে। সামাজিক ন্যায়, সুবিচার ও সুনীতির পরিচায়কও নহে।

চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালচারি প্রতিভাবান, প্রাজ্ঞ ও রাষ্ট্রকার্য্যে বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার সহিত আমাদের নানা বিষয়ে মতের অনৈক্য থাকিলেও তাঁহার কোন কোন কথা প্রণিধান যোগ্য। তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমাজবাদ-সংক্রান্ত বিলি ব্যবস্থা লইয়া 'স্বরাজ্য' (ইংরেজী) সাপ্তাহিকে লিখিয়াছেন যে "জাতির আবশ্যক ও জাতিকে অবশ্য দেওয়া কর্ত্তব্য সংবিধান সঙ্গত সুবিচার ও সুনীতি সংস্থাপক ব্যবস্থা। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ, রোজগার রাজতহবিলজাত করা, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তির হস্তচ্যুত করার ব্যবস্থা প্রভৃতি তথাকথিত সমাজবাদ বা সোসিয়ালিজম সেই সুবিচার ও সুনীতির প্রতিষ্ঠা নহে। পুরাতন কংগ্রেসও যদি শ্রীমতী ইন্দিরার ভোট আহরণ চেষ্টা অনুগত প্রচারের কথাগুলিই পুনরুচ্চার করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা হইলে শ্রীমতী ইন্দিরারই শক্তিবৃদ্ধি হইবে—ন্যায়, সুবিচার ও সুনীতির প্রতিষ্ঠা হইবে না। এই কথা বলিবার পরে তিনি আরও বলেন যে "এই সমাজবাদ নামধেয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফলে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি হইবে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব হইতে থাকিবে। ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে সর্ব্বশক্তিমান রাষ্ট্রশক্তির কবলে ক্রীতদাসের মত বাস করিতে বাধ্য হইবে। শ্রমিকাদিগের এই কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহাদের জানা প্রয়োজন যে সংবিধানে যে সকল ব্যক্তিগত মানবীয় অধিকার সর্ব্ব সাধারণকে নিঃসর্ত্তে নিশ্চয় ও স্থায়ীভাবে দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সকল অধিকারই এখন সমাজবাদের দোহাই দিয়া বেহাত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।"

অর্থাৎ যথার্থ সমাজবাদের পরিবর্ত্তে আমরা যাহা পাইব তাহা হইল রাষ্ট্রের একচেটিয়া সমাজ শোষণ ক্ষমতা লাভ ও আমলাদিগের হস্তে সকল দেশবাসীর নিপীড়নের ব্যাপক ব্যবস্থা। সকলেই রাষ্ট্রের বেতনভোগী ভৃত্য হইলে রাষ্ট্রের সেই একাধিকার ধননায়কদিগের একাধিকার হইতে আরও প্রবল হইবে; কারণ ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক বা কর্মী উন্নততর পাওনা আদায় করিবার জন্য লড়িতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম কঠিন হয়। স্বাধীনতা বলিতে যে ইচ্ছার বিকাশ ও আকাঙ্খার উপলব্ধির কথা আমরা বুঝিয়া থাকি; রাষ্ট্রের জাঁতাকলে নিষ্পেশিত হইয়া, রাষ্ট্রের হুকুমের চাকর হইয়া দিন কাটান সে স্বাধীনতা নহে। সুতরাং রাষ্ট্র যদি একাধিকারে একমাত্র ধনিক হয় ও জনসাধারণ যদি সেই ধনিকের নিযুক্ত কর্ম্মী হয় তাহা হইলে সেই অবস্থায় কেহ মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে কখনও সক্ষম হইতে পারে না। বহু ধনিক থাকিলে তাহাদের বহুভাগে বিভক্ত ধনবল তেমন প্রবল হইতে পারে না। তাহা ব্যতীত রাষ্ট্রও যদি নিজে ধনিক না হয় তাহা হইলে রাষ্ট্র কর্ম্মীর

প্রতি ন্যায় ও সুবিচারের ব্যবস্থা করিতে যথাযথ তৎপরতা দেখাইতে কখন কার্পণ্য করিবে না।

পাকিস্থান মিথ্যার বন্যা বহাইতেছে।

বাংলাদেশে পাকিস্থানী সামরিক শক্তিমানগণ মুসলীম এক জাতীয়তার মুখোস পরিয়া মানবতা বিরুদ্ধ যত মহাপাপ করিয়াছে এখন সেই সকল চরম দুস্কর্ম্মের জবাবদিহি করিবার সময় উপস্থিত হওয়ায় ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান ও অপরাপর পাশবিকতার মহারথীগণ যে ভাবে মিথ্যাকথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা সকলের মনে এই কথাই জাগ্রত করিতেছে, যে ঐ সকল ব্যাক্তিরা শুধু অমানুষ ও মনে প্রাণে হিংস্র পশুর মতই নহে, উহারা নির্লজ্জতা ও সত্যমিথ্যাবোধহীনতার শেষ সীমা লঙ্ঘন করিয়া ঘৃণ্য বর্ব্বরতার চরমে পৌছিয়া গিয়াছে। বর্ব্বরদিগের এটুকু সাহস থাকে যে তাহারা পাপ করিলে তাহা ঢাকিবার জন্য ভীত মনে কোন অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য মিথ্যার অবতারনা করে না। পশুজগতেও মিথ্যা কথা বলিবার রেওয়াজ নাই। পাকিস্থানের নারীধর্ষক, শিশুঘাতক, নিরস্ত্রজনের উপর বিমান হইতে বোমা বর্ষণকারী কাপুরুষ নরপশুদিগকে কেহ সাধারণ স্তরের মানুষ বলিয়া মনে করে না। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা যেভাবে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া চলা যায় না। শত শত বাঙালী স্ত্রীলোক ও শিশুকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া পরে যদি বিদেশী সাংবাদিকদিগকে বোঝান হয় যে সকল রক্তপাত, হত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতির মূলে আছে সাম্প্রদায়িক কলহ, পাক সৈন্যগণ সেই দ্বন্দ্ব থামাইবার জন্যই শুধু কিছু কিছু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে মাত্র; তাহা হইলে সে কথাগুলি নিছক মিথ্যা তাহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। কেননা সাম্প্রদায়িক কলহ ২৫শে মার্চ অবধি পূর্ব্ব বাংলায় ছিল না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবর রহমনের সহিত যখন ঐ দিন অবধি রাষ্ট্রশক্তির হাত বদলের ব্যবস্থার আলোচনা করিতেছিলেন তখনও মতদ্বৈধ ছিল ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবরের মধ্যে। ২৫ শে মার্চ মাঝরাত্রে সেখ মুজিবর রহমানকে ইয়াহিয়া খানের আদেশে গ্রেফতার করিয়া নিরুদ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক কলহ লাগিয়া গিয়া আওয়ামী লীগের ১৫০০ লোক ঢাকায় গুলি খাইয়া নিহত হইল। এই কলহ থামাইতে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের পুলিশ সম্পূর্ণরূপে নিস্ক্রীয় রহিয়া গেল। থামাইবার ভার পড়িল ইয়াহিয়া খানের সদ্য আমদানি করা পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্যদের উপর। তাহারা প্রথমে দেখিল যে সাম্প্রদায়িক কলহ করিতেছে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ এবং যত সাহিত্যিক, চিকিৎসক ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রক্ষেত্রের কর্ম্মী, ইহারাই। সুতরাং ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত্রি হইতে শুরু করিয়া তৎপরে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সৈন্যগণ ১৫০০ বাছাই করা লোককে গুলি করিয়া মারিল, ছাত্রছাত্রীদিগের বাসস্থান গোলা দিয়া উড়াইল এবং বস্তিগুলিতে আগুন লাগাইল। সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে ২০ লক্ষ হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে পূর্ব্ব পাকিস্থানের সকল সহর ত্যাগ করিয়া ভারতে পলাইয়া আসিল। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক কলহের একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে ইহাতে বাঙালী মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা আওয়ামী লীগের সভ্য তাহারাই শুধু আক্রান্ত হইল; জমায়েত-এল-উলেমা অথবা মুসলীম লীগের সমর্থকগণ শান্তিপূর্ণভাবে সৈন্য-দিগের সহিত সহায়তা করিতে লাগিল। কথা হইল যে মিথ্যা কথা বলিলে তাহার জের বহুদূর অবধি ব্যাপ্ত হইয়া যায়। উচ্চশিক্ষিত খ্যাতনামা লোকদের হত্যা করিয়া তাহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করিয়া মরিয়াছে বলিলেই তাহা কেহ বিশ্বাস করে না। শত শত ছাত্রীকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া সেনাদের ছাউনীতে বন্ধ করিয়া রাখিলে সে কথাও ঢাকা থাকে না। যাহারা পলাইয়া আসিয়াছে তাহাদের অনেকেরই পরিবারের দুই দশজন নিহত, আহত বা ধর্ষিত হইয়াছে। তাহাদের গ্রামগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই সকল

করিলেই জানা যাইবে। যে "সাম্প্রদায়িক" যুদ্ধ হইয়াছে তাহার একদিকে ছিল ইয়াহিয়া খানের অবাঙালী সৈন্যগণ ও অপরদিকে ছিল নিরস্ত্র নির্ব্বিবাদী বাঙালী জনসাধারণ। বাঙালীদের মধ্যে যাহারা মুসলীম লীগ ও জমায়েত-এল-উলেমা দলের লোক তাহারা সৈন্যদের সহায়ক ছিল। পুলিস ছিল বাঙালী এবং আওয়ামী লীগের দিকে। বিষয়টা বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক একেবারেই ছিল না। ছিল রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের কথা। আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল পূর্ব্ব বাংলার শতকরা ৯৮ জন মানুষ। সেই জন্যই দশ জাহাজ সৈন্য আনিয়া ইয়াহিয়া খানকে ঐ রাষ্ট্রীয় কলহে অবতীর্ণ হইতে হয়। সেই জন্যই বাছাই করিয়া নরহত্যার ব্যবস্থা। শুধু নারী ধর্ষণ, অপহরণ ও শিশু হত্যাটা পাকিস্থানী নরপশুদিগের স্বভাব ও প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

পাকিস্থানের মিথ্যা কথা বলার আরম্ভ তাহার জন্ম হইতেই। ভারতের দ্বিজাতির (হিন্দু ও মুসলমান) কথা একটা অতি প্রকট মিথ্যা। তাহা দিয়াই পাকিস্থানের আরম্ভ। পরে যখন পাকিস্থান কাশ্মীর দখল চেষ্টা করে তখন বলে যে সেই অভিযান পাঠান জাতীয় জনগণই করিয়াছিল। বহুকাল এই মিথ্যা চালাইবার চেষ্টা করিয়া শেষ অবধি পাকিস্থান স্বীকার করে যে তাহাদের সৈন্যগণই নিজেদের সরকারী উর্দ্দি ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য পাঠান সাজিয়া ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। পাকিস্থান সকল দুস্কর্ম করিয়াই তাহার একটা মিথ্যা বিবরণ প্রচার করে। ইহা একটা দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেদিন যে একটা ভারতীয় বিমান জোর করিয়া লইয়া গিয়া লাহোর বিমান বন্দরে নামাইয়া ধ্বংস করা হইল; সে কার্য্য করিয়াছিল দুইজন পাকিস্থানী গুপ্তচর। তাহারা লাহোরে পৌঁছাইলে পাক সরকার তাহাদিগকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র মহা আড়ম্বর করিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিমান নিয়ন্ত্রণ সভাকে পাকিস্থান জানাইল যে ঐ বিমানটি ভারতই লাহোরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া ধ্বংস করায়। উদ্দেশ্য পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এই নির্ব্বোধের মিথ্যার নেশার অভিব্যক্তির কোন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করাও হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পাকিস্থান নির্লজ্জ আবেগে মিথ্যার বন্যা প্রবল গতিতে চির বহমান রাখিয়াই চলিতেছে; তাহার মিথ্যার দফতর অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য। তাহারা শুধু সাধারণ অতিরঞ্জন করিয়াই তৃপ্ত হয় না, তাহাদের মিথ্যা প্রতিভাবান অসত্যের পূজারীদিগের সৃজন শক্তির পরিচয় দেয়।

আর একটা ব্যাপক মিথ্যা এখন প্রচার করা হইতেছে। ইহা হইল পূর্ব্ব বাংলার যুদ্ধের সম্বন্ধে। ভারত নাকি বহু বৎসর হইতেই সেখ মুজিবুর রহমানের সহকর্ম্মীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাইয়া ঐ দেশে বিদ্রোহ করাইবার চেষ্টা চালাইতেছে। এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে ভারতের অস্ত্র, ভারতের সৈন্য ও ভারতের প্রেরনাই আসল যাহা কিছু। বস্তুতঃ পাকিস্থানই বহুকাল হইতেই ভারতীয় নাগা, কুকি, মিজো প্রভৃতি জাতিগুলির অনেক ব্যক্তিকে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া বিদ্রোহ করিতে শিখাইয়া আসিতেছে। এখনও পাক সৈন্যদিগের সহিত মিজো বাহিনী সংযুক্ত আছে। ভারতের ক্ষমতা নিশ্চয়ই অসম্ভবরূপে প্রবল, নয়ত আওয়ামী লীগ ৯৮ : ২ অনুপাতে পূর্ব্ব বাংলায় নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিল কেমন করিয়া? পূর্ব্ববাংলার অর্দ্ধ-লক্ষাধিক গ্রামে যে পাকিস্থানকে কেহ মানে না; তাহাও ভারতের কর্ম্মশক্তির পরিচায়ক। হায় পাকিস্থান।

বঙ্গে বর্ষা

শৈলেন সাহা

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৭৮

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাক-বাংলাদেশ নিস্পত্তির স্বরূপ বিচার

পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণ বাংলাদেশের বড় শহরগুলি দখল করিয়া এবং যত্রতত্র সৈন্য পাঠাইয়া, বিমান আক্রমণ করিয়া এবং নৌবহর হইতে গোলা দাগিয়া নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। ফলে বহু নিরস্ত্র বাংলা দেশ বাসী হতাহত হইতেছে, লুঠতরাজ, গ্রাম জ্বালান, নারীহরণ ও বাছাই করা লোকেদের হত্যা করাও ব্যাপকভাবে চলিতেছে; কিন্তু প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ঠিক হইতেছে না। কারণ প্রত্যহই কিছু কিছু পাক সৈন্য প্রাণ হারাইতেছে ও তাহা হইতে আরও অধিক সংখ্যক পাকসেনা আহত অবস্থায় হাসপাতালে যাইতেছে। সামরিক শাসন সহায়ক মুসলিম লীগ ও জমায়েত-এল-উলেমা দলের লোকেদের মধ্যেও প্রত্যহই কিছু কিছু লোকের প্রাণ যাইতেছে। এই সকল আক্রমণ করিতেছে বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ এবং ইহারা কে এবং কোথায় লুকাইত থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতেছে সে সম্বন্ধে পাকিস্থানীগণ বিশেষ কিছু জানে বলিয়া মনে হয়না। প্রত্যহ শতাধিক ব্যক্তি হতাহত হওয়া এবং দৈনিক ১৷৷০/২ কোটি মুদ্রা ব্যয়ভার বহন করা পাকিস্থানের মত দেউলিয়া রাষ্ট্রের পক্ষে মহা কঠিন সমস্যার কথা। পাকিস্থানের টাকা পূর্বে ডলারে পৌনে পাঁচটাকা হারে বিনিময় হইত। যুদ্ধের পূর্বেই সেই হার ছিল দশ টাকা = এক ডলার। যুদ্ধের প্রথম মাসে সেই বিনিময় হার দাঁড়ায় ১৪ টাকা = ১ ডলারএ। লিখিবার সময় ঐ বিনিময় হার দাঁড়াইয়াছে ২০ টাকা পাকিস্থানী = ১ ডলার আমেরিকান। অর্থাৎ পাকিস্থান অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়া এক চতুর্থাংশেরও নিচে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এমত অবস্থায় পাকিস্থান যুদ্ধ চালাইতে ক্রমশঃ অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপরে জগত জাতি সংঘের সহানুভূতি হারাইয়া পাকিস্থান এখন টাকা ধারও পাইতেছে না, মোটা টাকা সাহায্য হিসাবেও পাওয়া তাহার পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব হইতেছে। সুতরাং পাকিস্থানকে এই সংগ্রাম বন্ধ করিয়া বাংলা দেশের সহিত একটা নিস্পত্তি করিতেই হইবে। নতুবা পূর্ব

ও পশ্চিম উভয় পাকিস্থানই রাষ্ট্র হিসাবে লোপ পাইবে। দুরবস্থার চূড়ান্ত হইলে অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়াই প্রাণ বাঁচান শাস্ত্র অনুমোদিত পন্থা। মুসলীম শাস্ত্রও সম্ভবত তাহাই বলে। সুতরাং পাকিস্থান যদি বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া সকল সৈন্যসামন্ত লইয়া পশ্চিম পাকিস্থানে চলিয়া যায় তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার বিশেষ কিছু থাকিবে না। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে পাক সেনা বাহিনীর কর্ত্তাগণ চেষ্টা করিবে বাংলা দেশ যাহাতে অন্ততঃ নামেও মানিয়া লয় যে তাহারা পাকিস্থানেরই অঙ্গ। এবং সেনা বাহিনীরও কিছু কিছু অংশ বাংলাদেশে থাকিতে পাইবে এই ব্যবস্থারও চেষ্টা হইবে। অসামরিক শাসন কার্য্য মাত্রই বাংলা দেশবাসী নিজ হস্তে লইতে পারিবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহিলেই যে বাংলাদেশ বাসী তাহাতে রাজী হইবে একথা কে বলিতে পারে? যেভাবে নরনারী-শিশু নির্বিশেষে পাক সৈন্যগণ হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে তাহাতে বাংলাদেশবাসী তাহাদের নিজদেশে থাকিতে দিতে সহজে রাজি হইবে না। যে ভাবে বাছাই করিয়া বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাতে পাকিস্থানের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখিতে কি বাঙালী আর কখনও চাহিবে? আওয়ামী লীগের অল্প সংখ্যক সভ্যকে খাড়া করিয়া "রাজি আছি" বলাইয়া লইলেই তাহাতে ঘোর শত্রুতার আগুন নিভিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। এবং পাক সেনাদল সংখ্যায় কমিয়া যাইলেই মুক্তি ফৌজ প্রবল ভাবে আক্রমন করিয়া তাহাদিগকে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করিবে বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ নিষ্পত্তিটা লোক দেখান ভাবে কিম্বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন তেমন করিয়া সম্পন্ন করিয়া লইলেই তাহা টিকিবে না। সে নিষ্পত্তি মুক্তি ফৌজের মানিয়া লওয়া আবশ্যক এবং তাহার পরে ষাটলক্ষ মানুষকে নিষ্পত্তি অনুযায়ী ঘরে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তার পরে কথা উঠিবে অকারণে প্রাণহানী, অঙ্গহানী সম্পত্তি ও মান সম্ভ্রম নাশ প্রভৃতি নানা প্রকারের ক্ষতি পূরনের কথা। সে ক্ষতি পূরণ কে করবে। আর আছে অপরাধীর শাস্তির কথা। পাঁচলক্ষ মানুষকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া, সহস্র সহস্র নারীর উপর অত্যাচার করিয়া পাক সামরিক শাসন কর্ত্তারা কি বেকসুর বিনা শাস্তিতে ছাড়া পাইয়া যাইবে? অমানুষিক বর্ব্বরতা কি তাহা হইলে বিশ্বের দরবারে কোনও অপরাধ নয় বলিয়া ধার্য্য হইবে?

সংবিধান সংশোধন

বর্ত্তমান কালে সাধারণতন্ত্রের পরিচালনা কতকগুলি অলিখিত মূল স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। এই মূল স্বীকৃতীগুলি যদি কোন নির্ব্বাচনে বিজয়ী রাষ্ট্রীয়দল অস্বীকার করিয়া সংবিধান সংশোধন করিয়া দেশের সমাজনীতি পরিবর্ত্তন চেষ্টা করে তাহা হইলে সেই দলকে প্রথমতঃ দেশ বাসীকে পরিস্কার ও পূর্ণরূপে নিজেদের সংবিধান সংশোধন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে হয় ও শাসন কার্য্য হইতে ইস্তাফা দিয়া ঐ নুতন অভিপ্রায়ের ভালমন্দ বিচারের উপর নির্ভরশীল ভাবে দেশবাসীর নিকট আবার নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে হয়। দেশবাসী যদি তাহাদিগের নুতন রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায় জানিয়া বুঝিয়া তাহাদিগকে পুনরায় নির্ব্বাচিত করেন তাহা হইলে জানা যায় যে ঐ রাষ্ট্রীয় দলের অভিপ্রায় সম্বন্ধে দেশবাসীর সহানুভূতি আছে। এই ভাবে পুনঃনির্ব্বাচন চাহিবার রীতি এইজন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে সচরাচর দেশবাসী কোনও একটা রাষ্ট্রীয় দলকে কোন কারণে দেশবাসীর মঙ্গল সাধন সক্ষম বিবেচনা করিয়া নির্ব্বাচিত করেন। ঐদল যদি নির্ব্বাচিত হইবার পরে পূর্ব্বপ্রচারিত অভিপ্রায় বর্জ্জন করিয়া কোনও নুতন ধান্দায় আত্মনিয়োগ করে তাহা হইলে দেশবাসীর তাহাদিগকে শাসন কার্য্যে রাখা না রাখার পুনর্বিচারের একটা অধিকার জন্মায়। অর্থাৎ ধরা যাউক, এক দেশের জন সাধারণ কোন রাষ্ট্রীয় দলকে অপর কোন দেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার জন্য নির্ব্বাচন করিলেন। অতঃপর দেখা যাইল ঐ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ভাবে যুদ্ধ সমাধান করিবার

চেষ্টা করিতেছে। এই অবস্থায় ঐ দলকে নিজেদের কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া পুনর্নির্ব্বাচনে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা আবশ্যক। অর্থাৎ যখনই কোন শাসকদল দেশের শাসন পদ্ধতি বা সমাজনীতি লইয়া কোন সম্পূর্ণ নূতন পথে চলিতে চাহে; তখনই পুনঃ নির্ব্বাচনের কথা উঠে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেসময় সদলে নির্ব্বাচনে নামিয়া বিশেষ সক্ষমতার সহিত জয়লাভ করেন সে সময় তাঁহার জনসাধারণকে জ্ঞাপিত কর্ম্মের তালিকার মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা লাঘব করা অথবা অপর কোন সাধারণ তন্ত্রের মূল স্বীকৃতির পরিবর্ত্তন কারী কথা ছিল না। "দারিদ্র দূর কর" বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান গুলিকে জাতীয় ভাবে চালান হউক অথবা ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য সীমিত করা হউক এইজাতীয় কথাই সে সময়ে বলা হইত। এখন যদি পার্লামেন্টে সংখ্যা গুরুত্ব ভারী রকম হওয়াতে শ্রীমতী গান্ধী ইচ্ছা করেন যে তিনি আইন করিয়া সকল আইনের মূল স্বয়ংসিদ্ধ অলিখিত অবলম্বন গুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সংখ্যাগুরুদলের যথেচ্ছাচার রীতির প্রতিষ্ঠা করিবেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উচিত হইবে প্রধানমন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়া পুনঃনির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া। দেশবাসী যদি তাঁকে ভারতীয় সমাজের মূল রীতিনীতি, বিশ্বাস ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনের অধিকার নিঃসর্ত্তে হাতে তুলিয়া দিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি পুনঃনির্ব্বাচনে আবার বিজয় পতাকা উড়াইয়া আসিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইবেন। তখন তিনি যাহাই করিবেন তাহা দেশবাসীর ইচ্ছা অনুসারে করা হইতেছে বলিয়া ধার্য্য হইবে। নতুবা তিনি যদি দারিদ্র দূর করিবার প্রতিশ্রুতির উপর শক্তি আহরণ করিয়া সেই শক্তি ব্যবহারে দারিদ্র্য দূর না করিয়া নানা প্রকার পুরাতন অঙ্গীকার, বিশ্বাস ও রীতি নীতির উচ্ছেদ করিতে তৎপর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সেরূপ কার্য্য দেশবাসীর সহিত বিশ্বাস রক্ষা করা হইবে না। দেশবাসীও বুঝিবার সুবিধা পাইবেন যে ব্যাঙ্ক ও সাধারণ বীমা কম্পানি গুলিকে রাষ্ট্রীয় করিয়া লইলে তাহাতে দেশবাসীর দারিদ্র্য কতটা দূর হওয়া সম্ভব হইতে পারে। ইহাও দেখিতে হইবে যে দারিদ্র্য দূরকরণের উপযুক্ত ও কার্য্যকারী পন্থাই বা কি।

হত্যার প্রবাহের নিবৃত্তি কোথায়?

প্রকাশ্য দিবালোকে উন্মুক্ত রাজপথে, গৃহে প্রবেশ করিয়া, ট্রেনে বাসে নরহত্যা হইতেছে। গোপনে অজানা স্থানে একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহাদের দেহ যত্রতত্র নিক্ষেপ করিয়া যাওয়াও একটা দৈনন্দিন ব্যপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শতশত ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে এবং অবস্থা বিচারে মনে হয় যে শেষ পর্য্যন্ত ঐ সংখ্যা কয়েক সহস্রে দাঁড়াইবে। কে কাহাকে কেন হত্যা করিয়াছে এই প্রশ্নের উত্তর যাহারা দিতে পারে, যাহাদের কর্ত্তব্য ঐ প্রশ্নের জবাব দেওয়া, সেই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষক পুলিশ বাহিনী না থামাইতে পারিতেছে এই হত্যাকাণ্ড, না পারিতেছে হত্যাকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারাধীন করিয়া তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করাইতে। পুলিশের উপরওয়ালা দেশ শাসক মন্ত্রীমণ্ডলীও এই অবস্থার কোনও উন্নতি চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছেনা। তাঁহারা বক্তৃতার ফাঁকা আওয়াজ দিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু নিষ্কর্ম্মাদিগকে অপসৃত করিয়া কর্ম্মক্ষম লোকেদের কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছেন না। যাহারা গোপনে অপরাধিদিগের সহায়তা করিতেছে তাহারাও অবাধে নিজেদের দুস্কর্ম্ম করিয়া চলিতেছে; কোন নেতা বা মহানেতা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতেছেন না।

যাহারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাহারা সকলে একজাতীয় মানুষ নহে। অনেক চোর ডাকাত গুণ্ডা দেশের অরাজক অবস্থা দেখিয়া নিজেদের কার্য্য সহজ করিবার জন্য যাহারা তাহাদের বাধা দিতে পারে, অথবা যাহারা দুস্কর্ম্মে প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাদের হত্যা করিয়া কাঁটা তুলিতেছে বলা যায়। পুলিশের কর্ম্মচারীদিগের প্রাণহানীর মূলে অনেক ক্ষেত্রেই আছে চোর

ডাকাত ও গুণ্ডার দল। এই সকল চোর ডাকাত ও গুণ্ডাদিগের মধ্যে আবার অনেকে আছে যাহারা রাজকর্ম্মচারী পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় দলের নেতাদিগের সহিত জড়িত। কোন কোন "ওয়াগণ লুণ্ঠক" রাষ্ট্রীয় দলের লোকেদের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কারবার চালায়। চোর ডাকাত লুঠেড়াগণও রাজকর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রীয় দলের লোকেদের সাহায্য পাইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রীয় দলের লোকেদের সমাজবিরোধী অপরাধীদিগের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য করা অসম্ভব কার্য্য নহে। প্রয়োজন শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের ইচ্ছা ও চেষ্টার। সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা যথাযথ ভাবে ব্যক্ত হয়না এবং তাহার কারণ উচ্চস্তরের ব্যক্তিদিগের সহকারীদিগের অপরাধীজনের সহিত ঘনিষ্ট সংযোগ। এই ক্ষেত্রে সুনীতি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সে কার্য্য সর্ব্বব্যাপী হইয়া দাঁড়াইবে ও তাহার জন্য বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও রাষ্ট্রকর্ম্মীর সমবেত প্রচেষ্টার আবশ্যক। আমাদের দেশে কথায় কথায় বিরাট সভা ডাকিয়া দেশের উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে দেশ ক্রমশঃ চোর ডাকাত খুনী গুণ্ডা লুঠেড়াদিগের কবলে চলিয়া যাইতেছে। দেশ নেতারা এই অবস্থার উন্নতির জন্য সভা আহ্বান করেন না কেন। তাঁহারা যদি দেশে অরাজকতা নিবারণ না করিয়া দল পাকাইয়া অরাজকতা আরও বাড়াইয়া তুলিবার আয়োজন করেন তাহা হইলে দেশবাসীর কর্ত্তব্য হইবে তাঁহাদের জন নেতৃত্ব হইতে অপসৃত করা। অর্থাৎ জননেতা, রাজকর্মচারী, সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় দল, কর্ম্মী সংঘ, ছাত্র সঙ্ঘ প্রভৃতির সমবেত চেষ্টার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না হইলে দেশে সেই সর্ব্বব্যাপী অপরাধ বিরোধীতা কখনও জাগ্রত হইবে না যাহাতে অপরাধীগণ ক্রমশঃ দেশের জীবন স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শক্তিহারা হইয়া যায়।

এইরূপ চেষ্টার কোন লক্ষণ ত দেখা যাইতেছেই না বরঞ্চ দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দল, কর্ম্মী সংঘ, ছাত্র সংঘ প্রভৃতি নিজ নিজ সেনা বাহিনী গঠন করিয়া পরস্পরের উপর হিংস্র আক্রমণ চালাইবার আয়োজন করিতেছে। যত খুন খারাপি চলিতেছে তাহার মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রীয় দল, কর্ম্মী সংঘ ও ছাত্র সংঘ প্রভৃতির পারস্পরিক সংগ্রামের ফলে ঘটিতেছে। রাষ্ট্রীয় দলের খুনাখুনী অসংখ্য এবং তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্মীসংঘের ঝগড়ার ফলে রানীগঞ্জ কয়লা খাদ এলাকায় বারে বারে নরহত্যা করা হইয়াছে। ছাত্রদিগের বিবাদকলহ শেষ অবধী অনেক স্থলেই মারাত্মকরূপ ধারণ করে। ছাত্রগণ শুধু পরস্পরকে হত্যা করিয়াই কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করে না; শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ও রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর ছাত্রদিগের বিষদৃষ্টি প্রায়ই গিয়া পড়িয়া থাকে।

দেশের আইন মনে হয় যেন শুধু নির্ব্বিরোধী সাধারণ ব্যক্তিদিগের জন্যই প্রণীত হইয়াছে। রাজ-কর্ম্মচারী, রাষ্ট্রীয় দলের সভ্যবৃন্দ, ছাত্র ও কর্ম্মী সংঘ যেখানে নিজেদের মনের আবেগ কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ করেন সেখানে আইনের কোন বাধা মানা হয় না। অতি সামান্য রাস্তায় গাড়ী চালাইবার নিয়ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার আইনই যথেচ্ছা অবহেলা করিয়া চলিলে পুলিশের লোকের কোন অপরাধ গণ্য হয় না। রাষ্ট্রীয় দল, ছাত্র বা শ্রমিক সংঘের লোকেরা সাধারণের জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি, জোর করিয়া টাকা আদায়, ভয় দেখাইয়া বা প্রহারাদি করিয়া কাজ করাইয়া লওয়া অথবা কোন ন্যায় সঙ্গত কার্য্য না করিতে বাধ্য করা ইত্যাদি সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে পরের জমির ফসল কাটিয়া লওয়া, পরের জমি বা গৃহ দখল করা, ঘরবাড়ী কারখানা প্রভৃতি ভাঙ্গাচোরা, এমনকি অপরের গৃহাদি আক্রমণ করিয়া খুনজখম অবধি করা একটা চলিত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কার্য্যেই রাষ্ট্রীয় দলগুলির, কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর এবং দেশের শক্তিমান মানুষের সহায়তা অধিক ক্ষেত্রেই থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং এই যে দেশব্যাপী আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও আইন ভাঙ্গিয়া যথেচ্ছাচার করার প্রচলন ইহার মূলে

রহিয়াছে তথাকথিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের দেশের সর্ব্বনাশ করিবার সুনিয়ন্ত্রিত চেষ্টা। ঐ সকল মহারথীদিগের সহায়ক রহিয়াছে সর্ব্বত্র। অধ্যাপক, শিক্ষক, শ্রমিকনেতা, রাজকর্ম্মচারী, মন্ত্রী প্রভৃতি সকল জাতীয় ব্যক্তির মধ্যেই যে সকল নেতা বিপ্লবের নাম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা গুপ্ত চক্রান্তের অভিসন্ধি সিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহাদের সহায়কদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষয়টা তাহা হইলে একটা বা একাধিক সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বাস বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র। এবং ইহা হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলেও প্রয়োজন হইবে ব্যাপক ব্যবস্থার। সে ব্যবস্থা আইন করিয়া করা সম্ভব হইবে না; কারণ আইন চক্রান্তকারীদিগের নিকট সাদা কাগজে কালির ছাপ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীগণ এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার এবং অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানও এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে দেশের জনসাধারণের শতকরা ২০ হইতে ৩০ জন মানুষ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এই দেশদ্রোহিতার সহিত লিপ্ত রহিয়াছে। ইহাকে ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে দুইটি কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—যথাশীঘ্র সম্ভব। পরে দেখিতে হইবে কি করিয়া জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম ও নিজ জাতি ও সমাজের উপর বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। পরের মুখ চাহিয়া নিজেদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও জীবনাদর্শ উচ্ছেদ করিয়া একটা চরম মানসিক দারিদ্র্য ও দাসত্ব মাথায় তুলিয়া লওয়া অবিলম্বে বন্ধ করাই হইবে এই প্রচেষ্টার গভীরতম উদ্দেশ্য।

দিল্লীতে সরকারীখাতের টাকা অপহরণ চেষ্টা

দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যকলাপ ও বিলি-ব্যবস্থা কি প্রকার তাহা সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নহে। ইহার কারণ যে বহু ব্যবস্থাই উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদিগের ইচ্ছা অনুসারেই হইয়া থাকে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি, নীতি বা পদ্ধতি অনুসরণে কোন কার্য্য যে সর্ব্বদা করা হইবে এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। এই ধরণের কার্য্যকলাপের যে কুফল হয় তাহার একটা প্রমান সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন একটা ব্যাঙ্কে রক্ষিত তহবিল হইতে এক ব্যক্তি ষাটলক্ষ টাকা উঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া সেই অর্থ বেহাত করিবার চেষ্টা করে। এই অপরাধে ঐ ব্যক্তির পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে। শুনা যায় ঐ ব্যক্তি টেলিফোন করিয়া ব্যাঙ্কের কোন খাজাঞ্চিকে ষাটলক্ষ টাকা বাহির করিয়া রাখিতে বলে ও উক্ত খাজাঞ্চিও ঐ বিরাট অর্থভার বাহির করিয়া উহাকে দিয়া দিন। এই কথাটা জানাজানি হইলে উপর-ওয়ালাদিগের নির্দ্দেশে টাকা যে উঠাইয়াছে ও যে খাজাঞ্চি দিয়াছে উভয়কেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঐ টাকাও সম্ভবত পাওয়া যায়।

কথা হইতেছে যে তহবিলে ষাট লক্ষাধিক টাকা রাখা হয় সেই তহবিল হইতে টাকা বাহির করার এরূপ ঢিলাঢালা ব্যবস্থা কেমন করিয়া হইল। আমাদের যাহাদের ব্যাঙ্কে টাকা থাকে তাহাদের টাকা উঠাইতে হইলে লিখিতভাবে টাকা উঠাইতে হয়। কাহার সহি এবং সহির নমুনাও ব্যাঙ্কের নিকট রাখা থাকে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে টাকা উঠাইতে একাধিক লোকের সহি আবশ্যক হয়। দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের উপরোক্ত তহবিল হইতে দেখা যাইতেছে ষাট লক্ষ টাকা হয় মুখের কথায় নয়ত একজন সাধারণ কর্ম্মচারীর সহির উপরেই বাহির করা সম্ভব ছিল। এই তহবিলটি কি প্রকারের এবং ইহার অর্থ কোন দফতরের কার্য্যের জন্য দেওয়া হয় ও ইহার খরচই বা কাহার আদেশে করা হয় প্রভৃতি নানান কথা জনসাধারণের মনে এই টাকা চুরীর চেষ্টার পরে উদিত হইতেছে। কিন্তু এই সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া দেশবাসীকে বুঝাইবার কোনও চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার করেন নাই এবং করিতে-ছেন না। ইহাতে সকলের মনে হইতেছে যে দিল্লীর

কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীর কষ্ট অর্জ্জিত অর্থ রাজস্ব হিসাবে অতিরিক্ত হারে আদায় করিয়া লইয়া সেই অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন। যে সরকার ষাট লক্ষ টাকা যাহার তাহার হেফাজতে ফেলিয়া রাখে, সেই সরকারের টাকার টানাটানি আছে এবং যথা ইচ্ছা রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজন আছে, একথা অতঃপর মানুষে বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। রাজস্ব আদায় কমাইলে দেশবাসীর হস্তে মূলধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। রাজস্ব আদায় করিয়া দেশের সাধারণের উপার্জ্জনের টাকা তছনছ করা অর্থনীতি সাপেক্ষ কার্য্য নহে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের মূল্যবান মূর্ত্তি অপহরণ ও বিদেশে চালান

ভারতের পুরাকালের শিল্পকলার রস অভিব্যক্তির নৈপুণ্যের পরিচায়ক বহু স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র নানা স্থলে এখনও রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন কলাকৌশলের নিদর্শন ভারত সরকারের ১৯০৬ খৃ অব্দের ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষা আইন অনুসারে কাহারও দ্বারা স্থানান্তরিত করা হইতে সংরক্ষিত। কিন্তু বহু স্থলে ভারত সরকার ঐ সংরক্ষণমূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন নাই এবং সেই সকল স্থলের শিল্পকলা সম্পদ যে জাতীয় ঐশ্বর্য্য এবং ব্যক্তিগত ভাবে ক্রয় বিক্রয় করা যাইবে না, একথা পরিষ্কার ভাবে বলা হয় নাই। ব্যক্তিগতভাবে যে সকল শিল্পৈশ্বর্য্য রক্ষিত আছে সেগুলি সম্বন্ধে যে আইন আছে তাহাতে সেইগুলি ভারতের অভ্যন্তরে ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে কিন্তু দেশের বাহিরে পাঠান যায় না। শিল্পকলার কোন মৌলিক নিদর্শন, যাহার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য আছে, তাহা বিদেশে প্রেরণ করা আইন বিরুদ্ধ। যদিও ভারত সরকার কখন কখন স্বেচ্ছাচার প্রনোদিত ভাবে ভারতের কোন কোন মহামূল্যবান মূর্ত্তি ও চিত্র বিদেশের শিল্প সংগ্রহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য ভারতের বাহিরে যাইতে দিয়াছেন। আমাদের যতটা মনে পড়ে কিছুকাল পূর্ব্বে ইতালির কয়েকটা পুরাতন মূর্ত্তির নকল সংস্করণের পরিবর্ত্তে ভারতের কোন কোন অমূল্য ভাস্কর্য্যের নিদর্শন ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য গোপনে যত পুরাতন মূর্ত্তি ও চিত্র বিদেশে বিক্রয় করিয়া পাঠান হয় তাহার তুলনায় ভারত সরকার বিদেশে শিল্পবস্তু তত অধিক সংখ্যায় পাঠান না।

আর একটা কথাও বলা চলে। ভারত সরকারের হেফাজতে বহু পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী কলা ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ হিসাবে রক্ষিত আছে। অনেকগুলিকে "মিউজিয়ম" নাম দেওয়া হইয়াছে ও অনেকগুলি পুরাতন শিল্পকলাকেন্দ্রের সহিত একই স্থানে আছে। কলিকাতার "ভারতীয় প্রদর্শনশালা" এইরূপ জাতীয় সংগ্রহের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্যবান শিল্পসঞ্চয় কেন্দ্র। এই মিউজিয়াম হইতে শুনা যায় বহু মূল্যবান বস্তু হৃত হইয়াছে। অন্যান্য 'মিউজিয়ম' হইতেও সংগ্রহ বস্তু অপহরণ হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়। সুতরাং সরকারী রক্ষণাবেক্ষণও যথেষ্ট নিরাপদ নহে বলিয়া মনে হয়। কি করিয়া ভারতের ভাস্কর্য্য ও চিত্র সম্পদ চোর ও বেয়াইনি রপ্তানীকারীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করা যায় তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজকার্য্য নহে। কারণ ঐ সকল কার্য্যে বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিযুক্ত থাকে। বিদেশী চোরাই মাল পারাপারকারীদিগেরও ঐ কার্য্যে সহায়তা আছে। আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের রাজকর্ম্মচারীগণও অনেক সময় আইন ভঙ্গকারীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। কোন একজন অপহরণকারীকে ধরিয়া সাজা দিলেই এই ব্যবসায় বন্ধ হইবে না। কারণ ইহাতে প্রচুর লাভ আছে ও টাকার জন্য জেলে যাইবার লোক অনেক পাওয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ রাঘব বোয়াল দুই চারিজনকে শাস্তি দিতে পারিলে ঐ ব্যবসায়ে মন্দা পড়া সম্ভব হইতে পারে।

চীনদেশ কেন বাংলাদেশকে সমর্থন করে না

পৃথিবীতে অনেক লোক আছেন যাঁহারা চীনদেশের বর্ত্তমান শাসকদিগের আদর্শবাদ সম্বন্ধে মনে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। চীন পৃথিবীর সকল মানবের সাম্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং জনগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারভিত্তিক সংগ্রাম ক্ষেত্রে চীন সর্ব্বদাই জনগণের সমর্থক। এইরূপ প্রচার চীন করিয়া থাকে, সুতরাং

চীনের ঐরূপ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস আছে বলিতে কোন বাধা নাই; শুধু দেখিতে হয় যে কার্য্যক্ষেত্রে চীন ঐ আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলে কিনা। তিব্বত দখল করিয়া চীন যদি তিব্বতের জনসাধারণের হস্তে রাজশক্তি ছাড়িয়া দিয়া তিব্বতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিজেরা সবলভাবে রাষ্ট্রাধিকার দখল করিয়া অধিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা না করিত তাহা হইলে অন্তত জনগণের অধিকার সম্বন্ধে চীনের দরদ কথায় প্রচার করা চলিত। কিন্তু চীন স্বাধীনতাকামী লক্ষ লক্ষ তিব্বতীকে হত্যা ও কঠোরভাবে দমন করিয়া সেইরূপ প্রচারের পথ বন্ধ করিয়া দিল। কথায় মানব অধিকার সমর্থন আমেরিকাও সর্বদা করিয়া থাকে। বৃটেন অন্তত দশ-বিশটা বা ততোধিক দেশকে সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ হইতে মুক্তি দিয়া মানব স্বাধীনতা রক্ষক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু চীন এই উভয়দেশকেই বুর্জ্জোয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। শুনা যায় যে চীন সিংহলের চে গুইভেরার ভক্ত বিপ্লবীদিগকে নেক নজরে দেখে না এবং শ্রীমতী বন্দরনায়েকীর বিপ্লবী দমন নীতির সমর্থন করে। অথচ জনগণের স্বাধীনতা-ঘাতক, মানবজাতির অবাধ শোষণে বিশ্বাসী বুর্জ্জোয়াস্য বুর্জ্জোয়া পাকিস্থান চীনের পরম বন্ধু। আদর্শবাদের দিক দিয়া এই বন্ধুত্ব অসম্ভব এবং ইহার কোনও সাফাই মার্কসবাদী চীনাগণ জগৎবাসীর নিকট দিতে অক্ষম। সুতরাং একথা মানিতেই হয় যে চীন আদর্শবাদ পরিচালিত নহে; কূটনৈতিক সুবিধাবাদই চীনের রাষ্ট্রীয় প্রেরণা। চীনের মতে পাকিস্থান যদি সবলভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডের একটা বিরাট অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সক্ষম হয়; ভারত তাহা হইলে তাহার সাধারণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা এশিয়ার মানবের নিকট সবল রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলিয়া খাড়া করিতে পারিবে না। ঐ সাধারণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা কম্যুনিষ্ট চীনের নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহার বিনাশ সাধন করিতে পারিলে সংখ্যালঘিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তি গঠিত একদলীয় কম্যুনিষ্ট প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। সুতরাং যদি কোথাও কোন ক্ষুদ্র সামরিক গোষ্ঠীর প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে সাধারণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শ বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে চীনের পক্ষে সেইরূপ সামরিক একাধিপত্যের সহায়তা করা নিজ সুবিধার অনুসরণমাত্র। এই বৃহত্তর স্বার্থের কথা না থাকিলে চীন হয়ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থন করিত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্থান যদি ভাঙিয়া যায় তাহা হইলে ভারতের প্রতিষ্ঠা শক্তিমান হইবে ও চীনের পক্ষে এশিয়ার জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় চীন যে পাকিস্থানের গণহত্যার সহায়ক হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

বৃটেনের ইয়োরোপের মিলিত জাতিসংঘের সহিত যোগদান

বৃটেনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিগত দুইশত বৎসরের যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা তাহার মূলে ছিল পৃথিবীর বহুদেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য। ইহার মধ্যে একটা অতি বৃহৎ অংশ ছিল বৃটেনের "কমনওয়েলথ"এর অন্তর্গত দেশগুলির ব্যবসা। বর্তমানে বৃটেন যে ইয়োরোপের মিলিত জাতিসংঘের সহিত অর্থনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে তাহাতে বৃটেনের অর্থনীতি একটা নূতন ছাঁচে ঢালা হইয়া যাইবে এবং পুরাতন ব্যবসা বাণিজ্যের আকার প্রকার পরিবর্তিত হইয়া নূতন সম্বন্ধ গঠিত হইবে ও পুরাতন সম্বন্ধ বাতিল হইবে। বর্তমানে বৃটেনের যে বিরাট আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় চালিত আছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তাহার মোট পরিমাণ আমদানী প্রায় ৮০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ও রপ্তানী ৭০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই ব্যবসায় ভাগ করিয়া দেখিলে যাহা দেখা যায় তাহা মোটামুটি নিম্নলিখিত ধরণের বলা যায়:—

দেশ	আমদানী	রপ্তানী
ক্যানাডা	৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ড	৩০০ মিলিয়ন পাউণ্ড
অষ্ট্রেলিয়া	২০০ ” ”	৩০০ ” ”
নিউজিল্যাণ্ড	২০০ ” ”	১২০ ” ”
ভারতবর্ষ	১০৭ ” ”	৬৭ ” ”
হংকং	১২৫ ” ”	৮৭ ” ”
জাম্বীয়া	১০৫ ” ”	৩৪ ” ”
নাইজিরিয়া	১০৫ ” ”	৭৭ ” ”
ইউনাইটেড স্টেটস	১২০০ ” ”	৮৬০ ” ”
জাপান	১০৪ ” ”	১২৪ ” ”
কুয়ায়েট	১৭১ ” ”	৪০ ” ”
সাউথ আফ্রিকা	৩০০ ” ”	২৮৫ ” ”
লিবিয়া	১৫০ ” ”	৪২ ” ”
ইতালি	২২২ ” ”	১৯০ ” ”
স্পেন	৯৮ ” ”	১১৫ ” ”
সুইৎজারল্যাণ্ড	১৭৪ ” ”	১৬৭ ” ”
ফ্রান্স	৩২৪ ” ”	২৯০ ” ”
বেলজিয়াম	১৮২ ” ”	২৮০ ” ”
হল্যাণ্ড	৪০৯ ” ”	২৭৮ ” ”
ওয়েষ্ট জার্মানী	৪৬৬ ” ”	৩৬৬ ” ”
ডেনমার্ক	২৪৬ ” ”	১৯২ ” ”
নরওয়ে	১৭৯ ” ”	১৪০ ” ”
সুইডেন	৩৩২ ” ”	২৯৪ ” ”
ফিনল্যাণ্ড	১৭০ ” ”	৯৯ ” ”
সোভিয়েট ইউনিয়ন	১৯৭ ” ”	৯৬ ” ”

ইয়োরোপীয়ন কমন মার্কেটের সকল দেশের সহিত বৃটেনের আমদানী ব্যবসায় হয় ১৬০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ও রপ্তানী ব্যবসায় ১৪১০ মিলিয়ন পাউণ্ড। সকল দিক দিয়া দেখিলে বৃটেন তাহার নূতন অর্থনৈতিক পন্থা অনুসরণে মার খাইয়া যাইতে পারে। এই পথে চলিলে তাহার জাহাজী কারবার ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। যন্ত্রপাতি রপ্তানীরও লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা।

নূতন অর্থনৈতিক পরিবেশে বৃটেনের সহিত ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবে। এই সকল দেশের সহিত এখন বৃটেনের মোট বাৎসরিক আমদানী রপ্তানী ব্যবসায় হইল উভয় খাতে প্রায় ৫৫০০ মিঃ পাঃ করিয়া অর্থাৎ সকল জাতির সহিত মোট ব্যবসায়ের এক তৃতীয়াংশ। এই ব্যবসায় যদি কিছু কিছু বাড়িয়া যায় এবং অপরাপর জাতির সহিত ব্যবসায় যদি সমান হারে কমিয়া যায় তাহা হইলে বৃটেনের কোন লাভের আশা দেখা

(এর পর ৩৫৯ পাতায়)

রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

১৯৩৪ সালের ২৬শে আগষ্ট (৮ই ভাদ্র ১৩৪১) অতুলপ্রসাদের লোকান্তর গমনের সংবাদ লাভ করে মর্ম্মাহত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "আমি অতুলপ্রসাদের মৃত্যু স্বীকার করি না। এক সুরলোক হইতে তিনি আরেক সুরলোকে গেলেন। এই মর্ত্ত্য-লোকে তিনি আপন আসন সাধনায় যে সঙ্গীতময় সুরলোক রচনা করিয়াছিলেন সমস্ত জীবনের বেদনা-ভরা সাধনার অবসানে ভগবানের করুণায় পূর্ণ প্রেমময় সুরলোকে তিনি আজ প্রয়াণ করিলেন। এই সুরলোক তাঁহাকে অমৃতময় শক্তি দান করিবেন।"

এই ঘটনার বাত্রিশ বছর পূর্ব্বে কবিগুরুর এক জন্ম-দিনে অতুলপ্রসাদ একটি পত্রে লিখিলেন: "বঙ্গ সাহিত্যতীর্থের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত, ধর্ম্মে সিদ্ধ ও অগ্রণী, সঙ্গীতকুঞ্জের মাধব, বাংলার দুলাল এবং আমার পরম ভক্তিভাজনের চরণে আজ প্রণত হইতেছি। কায়মনোবাক্যে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের ধর্ম্ম, স্বদেশানুরাগ, সাহিত্য-সৌজন্যের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকুন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের সম্পর্ক কিরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধানুরাগ ও স্নেহমিশ্রিত ছিল তা বোঝাবার পক্ষে উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটি নিশ্চয়ই সহায়তা করবে।

বয়সের হিসেবে অতুলপ্রসাদ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দশ বছরের কনিষ্ঠ। অতুলপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল ঢাকায় ২০শে অক্টোবর ১৮৭১ সালে (কার্ত্তিক ১২৭৮) এবং বাল্যজীবন বা শিক্ষারম্ভ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পরিচিত হওয়া দূরে থাক তাঁর নাম পর্য্যন্ত শোনার সুযোগ পাননি। ১৮৮৯ সালে তিনি যখন কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হলেন সেই সময় সহপাঠীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা শুনলেন। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং সেটা নিয়ে ছাত্রমহলে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে। চিত্তরঞ্জন তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে মেধাবী ছাত্রদের অন্যতম। অতুলপ্রসাদ ছিলেন তাঁর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত এবং আত্মীয় সম্পর্কে যুক্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে অথবা গোলদীঘির পাড়ে ছাত্রদের যে আলোচনার সভা বসত তাতে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও হত আলোচ্য বিষয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মনোমোহন ঘোষ, তারকনাথ পালিত প্রভৃতির অধিক অনুরাগী ছিলেন।

বি-এ পাশ করার পর ১৮৯০ সালে চিত্তরঞ্জন বিলাত যাত্রা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদও বিলাত যাত্রার বাসনায় অধীর হয়ে উঠলেন। অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অনমনীয় প্রচেষ্টার পর অতুলপ্রসাদের আকাঙ্খা পূর্ণ হ'ল। ১৮৯০ সালের নভেম্বর মাসে

তিনিও বিলাত যাত্রা করলেন; তাঁর সঙ্গী হলেন দুজন সহপাঠী—জ্যোতিশচন্দ্র দাশ এবং নলিনীকান্ত গুপ্ত। জাহাজের ডেকে আর একজন যাত্রীর সঙ্গে এঁদের আলাপ হল—তাঁর নাম জ্ঞান রায়। এই জ্ঞান রায়ই অতুলপ্রসাদকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দেন এবং তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতসাধনার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে অতুলপ্রসাদকে প্রায়ই ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে যেতে হত। সেখানে চিত্তরঞ্জন ব্যতীত মনোমোহন ঘোষ ও তাঁর সহোদর অরবিন্দ ঘোষ নিয়মিতই হাজিরা দিতেন। পরে দ্বিজেন্দ্রলাল লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছালে এঁদের সঙ্গে মিলিত হন, যার ফলে সেখানে একটি ভারতীয় সংস্কৃতির চক্র গড়ে ওঠে।

১৮৯২ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করে অতুলপ্রসাদ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন এবং ৮২নং সার্কুলার রোডে বাড়ী ভাড়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করলেন। এই সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে "খামখেয়ালী সঙ্ঘ" নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ অধিনায়ক। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সংস্থার নামকরণ করেছিলেন এবং এর অন্যতম সভ্য ছিলেন। অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম যথাক্রমে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজ জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ইত্যাদি। সঙ্গীত, বক্তৃতা, কাব্যপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে হাস্যরসের অবতারণাই ছিল এই সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য।) সভার আরম্ভে একজন সভ্য হাস্যরস মিশ্রিত একচরণ গান সুরু করতেন সঙ্গে সঙ্গে অন্য সভ্যগণ একস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে হাসির কলরোল তুলতেন। অবনীন্দ্রনাথ সেই সময় তাঁর চিত্রাঙ্কন সাধনা বন্ধ রেখে এস্রাজ নিয়ে বসতেন। বিখ্যাত সঙ্গীতরসিক রাধিকামোহন গোস্বামী মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়ে সভার গৌরব বর্দ্ধন করতেন। সভার শেষে সদস্যদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করাও ছিল এই সঙ্ঘের একটি উল্লেখযোগ্য প্রথা বা অঙ্গ। মাঝে মাঝে সদস্যদের বাড়ীতেও তাঁদের আমন্ত্রণে এই সঙ্ঘের বৈঠক বসত।

অতুলপ্রসাদ একদিন ঠাকুরবাড়ীতে খামখেয়ালী সঙ্ঘের এক বৈঠকে উপস্থিত হলে সরলাদেবীর চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটল। সেদিন সভার আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বরচিত গান গাইলেন এবং সভাস্থ সকলে তাঁর সুমধুর কণ্ঠে পরিতৃপ্ত হবার পর উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যেন কিছুটা রসিকতা করার উদ্দেশ্যে অতুলপ্রসাদকে গান শোনাতে অনুরোধ করলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সলজ্জকণ্ঠে এবং কম্পিত আবেগে অতুলপ্রসাদ গান গাইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই উভয়ের সম্পর্ক নিকটতর হয়ে গেল। এরপর অতুলপ্রসাদ ঘন ঘন রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভের আশায় প্রায়ই জোড়াসাঁকো যেতে থাকলেন এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শুনে যেমন পরিতৃপ্ত হলেন তেমনি রবীন্দ্রনাথের সমক্ষে স্বরচিত গান পরিবেশন করে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতরচয়িতা ও সঙ্গীত-সাধকের সমাদর লাভ করে ধন্য হলেন।

একবার রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে অতুলপ্রসাদের বাস-ভবনে 'খামখেয়ালী সঙ্ঘের' বৈঠক বসল। সন্ধ্যা হতে আরম্ভ করে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে সঙ্গীত ও হাস্যরসের পরিবেশনে সমাগত সভ্যদের আনন্দ-বর্দ্ধন করলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ তার-পরেও সারারাত্রিব্যাপী কীর্ত্তনের আলাপে মশগুল হয়ে রইলেন।

প্রাত্যহিক কর্ম্মজীবনের চাপ যখনই তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করত তিনি সব ঠেলে ফেলে ছিরে রবীন্দ্র-নাথের কাছে ছুটে যেতেন। এক বর্ষার দ্বিপ্রহরে অতুল-প্রসাদ তাঁর হাইকোর্টের কাজ অসমাপ্ত রেখে পথে নামলেন এবং সোজা গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমক্ষে হাজির হলেন। কবি তখন নিজের কক্ষে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে বর্ষার কবিতা আবৃত্তিতে ও

বর্ষার গান গাইতে মগ্ন। লোকেন পালিতও মাঝে মাঝে বিদেশী কবিদের কবিতা থেকে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। এমন সময় অতুলপ্রসাদকে পেয়ে তাঁরা খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন। দিনের শেষে যখন অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তখন কবিগুরু তাঁকে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের পরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন এবং সমস্ত বর্ষাকাল অতুলপ্রসাদ নিয়মিতভাবে কবিগুরুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ও তাঁর গান শুনে বিপুল আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর জীবনের এই একটানা আনন্দের স্রোতে বাধা পড়ল। কলকাতা হাইকোর্টে অতুলপ্রসাদের পসার ভালো না জমায় এবং সংসারে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দেওয়ায় তিনি কলকাতা ত্যাগ করে রংপুরে চলে গেলেন। সেখানেও তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হলেন না। এদিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নিকটতর আত্মীয়কন্যার সঙ্গে প্রেমসম্পর্ক তীব্র হওয়ায় তাঁর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনিবার্য্যভাবে দেখা দিল। নিজের মাতুল-কন্যার (হেমকুসুম) সঙ্গে বিবাহিত হওয়া দেশাচারের সমর্থনলাভের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় (১৯৩১ সালে) উভয়ে বোম্বাই থেকে স্কটল্যাণ্ড যাত্রা করলেন এবং সেখানে বিবাহ সম্পন্ন করে সুইটজারল্যাণ্ডে কিছুদিন কাটিয়ে লণ্ডনে উপস্থিত হলেন এবং ওল্ডবেলীতে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করলেন। কিন্তু এখানেও বিধি বাম হয়ে রইলেন। একদা ফ্রান্সে মহাকবি মধুসূদন যেমন অর্থসঙ্কটে পড়েছিলেন এখানে অতুলপ্রসাদকে সপরিবারে সেই একই দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হল। তাঁর যমজ শিশুপুত্রদের একজন মাত্র দুদিনের জ্বরে ভুগে প্রাণত্যাগ করল। তারপর জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন ব্যর্থতাকে সম্বল করে অতুলপ্রসাদ বিদেশে অধিকদিন অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। ১৯০৩ সালে তাই লক্ষ্ণৌ এসে জীবনের নতুন অধ্যায় সুরু করলেন। লক্ষ্ণৌএ আসার কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদের অর্থসঙ্কট দূর হল এবং ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি প্রতিষ্ঠার উচ্চশিখরে আরোহণ করতে লাগলেন।

তাঁকে কেন্দ্র করে লক্ষ্ণৌয়ের যা কিছু প্রতিষ্ঠান সব নবরূপ পরিগ্রহ করল। সেখানকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় সেবাসমিতি ছাড়া সমাজসেবামূলক সংস্থা না জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান সব কিছুর তিনি হলেন অন্যতম কর্ণধার। সাহিত্য ও সঙ্গীতরসিক সমাজেরও তিনি হলেন পৃষ্ঠপোষকদের পুরোধা। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপত্র 'উত্তরা' তাঁরই অর্থানুকূল্যে ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই প্রকাশিত হয়। তিনিই ছিলেন ঐ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক এবং তাঁর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' যা পরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' নামে পরিচিত হয় তার দ্বিতীয় বৎসরের অধিবেশনে (কাশীতে অনুষ্ঠিত) রবীন্দ্রনাথ যে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন তার মূলেও ছিল অতুলপ্রসাদের সাক্ষাৎসম্পর্ক এবং সক্রিয় সহযোগিতা।

বিদেশ থেকে লক্ষ্ণৌয়ে ফিরে আসার পর অতুল-প্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পুনরায় পত্রালাপ করলেন। ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন রামগড়ে অতিবাহিত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। রামগড় লক্ষ্ণৌ হয়ে যেতে হয়। তাই অতুলপ্রসাদের কথা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবতঃই মনে পড়ল এবং সঙ্গেসঙ্গে তিনি অতুলপ্রসাদকে রামগড়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। রামগড় কাঠগুদামের কাছাকাছি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা প্রায় তিনশ' বিঘে জমির ওপর রবীন্দ্রনাথের বাগানবাড়ী 'হৈমন্তী'। বাগানে পেয়ারা, আপেল, আখরোট, পীচ, খোবানী প্রভৃতি ফলন্ত গাছের সমারোহ। মর্ত্তলোকে এমন সুরম্য কাননে স্বয়ং কবিগুরুর সঙ্গলাভের আমন্ত্রণ অতুলপ্রসাদ কি কখনও প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যা ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে রামগড়ে উপস্থিত হলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বদরিকাশ্রম তীর্থ দর্শন করে এবং হিমালয়ের আরও কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করে চিত্রশিল্পী মুকুল দে এবং রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁর স্নেহের

পান্ন সুরসঙ্গীতশিল্পী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে সমবেত হলেন। এর পর অতুলপ্রসাদের আগমনে গান এবং সুরের রীতিমত প্লাবন সৃষ্টি করল। রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অন্তরঙ্গ শিষ্য দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সাহেবও এসে জুটলেন। আহারে বিহারে আনন্দে সবাই যেন মাতোয়ারা হয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ অজস্রধারে গান রচনা করে চলেছেন, দীনেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির সুর সংযোজনা করছেন আর রসিকজন তা শ্রবণ করে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি করেছেন।

বর্ষার এক ক্ষান্তবর্ষণ রাত্রে রবীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্র নাথও কতকগুলি বর্ষাসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। এর পর কবিগুরু অতুলপ্রসাদকে বললেন: 'অতুল আমাদের দেশের একটা হিন্দী-গান গাও তো হে ?

অমনি উৎসাহিত হয়ে অতুলপ্রসাদ গান ধরলেন 'মহারাজ কেওঁরিয়া খোল বর্সাক বুঁদ পড়ে'(বলাবাহুল্য সেই গান শুনে সকলে মুগ্ধ হলেন। এমনকি এণ্ডরুজও এমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি ভাবে গদ গদ হয়ে সুরহীন কণ্ঠে আরম্ভ করলেন—'মহারাজ কেওঁরিয়া খোল।

রামগড়ে রবীন্দ্রনাথের মধুর সঙ্গ অতুলপ্রসাদকে কি পরিমাণ অভিভূত করেছিল তা তিনি একটি রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। অতুলপ্রসাদের সেই 'রবীন্দ্রস্মৃতি'র অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল:

"....সেবার রামগড়ে কবির গান রচনার একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম। তিনি যে ঘরে শুইতেন আমার শয্যা সেই ঘরেই ছিল। আমি দেখিলাম তিনি প্রত্যহ ভোর না হইতেই জাগিতেন এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বাটীর বাহির হইয়া যাইতেন। একদিন আমার কৌতুহল হইল। আমিও তাঁহার পিছুপিছু গেলাম। আমি একটি বৃহৎ প্রস্তরের অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম তিনি একটি সমতল শিলার উপর উপবেশন করিলেন। যেখানে বসিলেন তাহার দুইদিকে প্রস্ফুটিত সুন্দর শৈলকুসুম। তাঁহার সম্মুখে অনন্ত আকাশ এবং হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তুষারমালা বালরবি-কিরণে লোহিতাভ। কবি আকাশ এবং হিমগিরি পানে অনিমেষ তাকাইয়া আছেন। তাঁহার প্রশান্ত ও সুন্দর মুখমণ্ডল উষার আলোকে শান্তোজ্জ্বল। তিনি গুণ গুণ করিয়া তন্ময় চিত্তে গান রচনা করিতেছেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।' আমি সে স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম এবং তাঁহার সেই অনুপম গানটির সঙ্গরচনা ও সুরবিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ তাহা দেখিলাম এবং তিনি নামিয়া আসিবার পূর্ব্বেই পলাইয়া আসিলাম। আর একদিন প্রাতে শুনিলাম তিনি তেমন করিয়া গান রচনা করিতেছেন—'ফুল ফুটেছে মোর ডাইনে বাঁয়ে পূজার ছায়ে।' এইরকম করিয়া প্রায় প্রাতে লুকাইয়া তাঁহার গান রচনা শুনলাম আর বাণীর বরপুত্রের দেবময় সেই মূর্ত্তি হিমালয়ের কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম।"

দশদিন রামগড়ে কাটাবার পর অতুলপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ ফিরে এলেন। একদিকে তাঁর আইন-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা অন্যদিকে সঙ্গীতসাধনা দুই ক্ষেত্রেই তিনি যশোলাভ করেছেন। কিন্তু এর মাঝেও নিরবচ্ছিন্ন সংসারসুখের পরিচয় ছিলনা--কোথায় যেন বিরাট একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল অথবা বলা চলে কোথায় যেন একটা ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর পারিবারিক জীবন বা দাম্পত্যজীবনে যেন কালো মেঘের একটা ছায়া কোথাথেকে ঘনিয়ে এসেছিল যার জন্যে ১৯১৬ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং কলকাতায় এসে চিত্তরঞ্জন দাশ, সত্যপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) প্রভৃতির অনুরোধে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস করতে আরম্ভ করলেন।

এইসময়ে 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। বিশেষতঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হল। সত্যেন্দ্রনাথ অল্প-সময়েই অতুলপ্রসাদের গানের বিশেষ অনুরাগী হয়ে উঠলেন। এরপর অতুলপ্রসাদ শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার

য় প্রতিষ্ঠিত 'মনডে ক্লাবের' সভ্যভুক্ত হলেন। এই ক্লাবের বৈঠকও সকল সভ্যদের বাড়ীতে আহূত হ'ত। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন সুকুমার রায়ের ভ্রাতৃদ্বয় সুবিনয় রায় ও সুবিমল রায়, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, অমল হোম, জিতেন্দ্র বসু, ডাঃ দ্বিজেন মৈত্র, ডাঃ কালিদাস নাগ, প্রশান্ত মহলানবীশ, হিরণকুমার সান্যাল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীশচন্দ্র সেন, গিরিজাশঙ্কর রায়, জীবনময় রায় ইত্যাদি আরও অনেকে। অতুলপ্রসাদের বাসভবনে মাঝেমাঝে এই ক্লাবের বৈঠক বসত। এবং প্রত্যেক বৈঠকেই অতুলপ্রসাদ স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করতেন।

এইসব সাহিত্যিক ও সুধীজনদের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করলেও অতুলপ্রসাদ অন্তরের স্থৈর্য্যকে যেন স্পর্শ করতে সক্ষম হননি। মনে মনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ লাভের আকাঙ্খা প্রবল হওয়ায় তিনি শান্তিনিকেতন যাত্রা করলেন এবং সেখানে কয়েকদিন কাটাবার পর কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। কিন্তু মানসিক অবসাদ বা অসাচ্ছন্দ্য তবুও দূর হলনা। এক ফরেষ্ট অফিসার-বন্ধুর সঙ্গে লঞ্চে সুন্দরবন পরিভ্রমণ করতে গেলেন। তারপর একবার নিজের জন্মভূমি ঢাকা যাত্রা করলেন। সেখান থেকে লাকসাম হয়েগেলেন দার্জ্জিলিং। তাঁর পত্নী তখন পুত্রকে নিয়ে দার্জ্জিলিংয়ে ছিলেন। স্ত্রীর অনিচ্ছায় তাঁর সঙ্গে অতুলপ্রসাদের সাক্ষাৎকার ঘটল না। তবে গোপনে পুত্রের সঙ্গে ক্ষণেকের জন্য মিলনের সুযোগ হল।

বিষণ্ণ মন নিয়ে অতুলপ্রসাদ কলকাতায় ফিরে এলেন এবং আবার লক্ষ্ণৌর পথে পা বাড়ালেন। কলকাতা ত্যাগ করবার দু'চারদিন পূর্ব্বে (২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৭) মনডে ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানান হল।

লক্ষ্ণৌএ এলে তাঁর কর্ম্মব্যস্ততা বেড়ে গেল এবং এবং সঙ্গীতচর্চ্চাও পুরোদমে চলতে থাকল। মাঝে-মাঝে তিনি কলকাতায় এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন এবং আত্মীয়-আত্মীয়াদের গান শুনাতেন।

১২৯৩ সালের মার্চ্চমাসে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কাছথেকে একটি পত্র পেলেন। ঐ পত্রে কবি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন যে বোম্বাই যাওয়ার পথে তিনি তিন চারদিন লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করবেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অতুলপ্রসাদ স্থানীয় বাঙ্গালী যুবকসমিতির কর্ম্মীদের আহ্বান জানালেন। রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনার প্রস্তুতি চলতে থাকল। অতুলপ্রসাদের কেশরবাগের বাড়িটি সুসজ্জিত করা হল। সব আয়োজনই রাজকীয়। কবিগুরুর শুভাগমন হল। মহম্মদাবাদের মহারাজার ল্যাণ্ডো গাড়ীটি পত্রপুষ্পে মাল্যে শোভিত হয়ে ষ্টেশন-থেকে কবিকে নিয়ে এল। রাজপথ জনাকীর্ণ। মিছিলের অগ্রপশ্চাৎ থেকে উৎসারিত হচ্ছে সহস্র কণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনি? বিখ্যাত সানাই বাদক তালিম হোসেন ও তাঁর সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ সুরের ঝরণা বইয়ে দিলেন। তারপর যথাসময়ে অতুলপ্রসাদের রচিত গান—'চাহরে আজি ভারতমার প্রতি' সুললিত কণ্ঠে গাইলেন পাহাড়ী সান্যাল (খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা তাঁর আসল নাম নগেন্দ্রনাথ সান্যাল) কবিগুরু অতীব তুষ্টমনে অতুলপ্রসাদ ও বাঙালী যুবকসমিতির উৎসাহীসভ্যদের আশীর্বাদ জানিয়ে লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করলেন। লক্ষ্ণৌয়ে থাকার সময় ঘরোয়া বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ যে গান শুনিয়ে-ছিলেন তারই সূত্রধরে বোম্বাই থেকে এক পত্রলিখলেন:
সেদিন তোমার দরবারে শেষ গান গেয়ে এলুম। শেষের পরের গানের] কথা সেদিন আমাকে বলেছিলে। গাড়ীতে চলতে চলতে সেই পরের গানটি বানিয়েছি:
"তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি, কেউ কি তা' জানে।"

লক্ষ্ণৌ-এ অতুলপ্রসাদের বাসভবন ছিল সাহিত্য-সাধকদের মিলনক্ষেত্র। প্রতি রবিবারই সেখানে গুনীও রসিকদের সমাবেশ দেখা যায়। যাঁরা এই রবিবা-সরীয় অনুষ্ঠানে নিয়মিত যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়,

রাধকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় দাশগুপ্ত, ডাক্তার বিজনবিহারী· অধ্যাপক শম্ভুশরণ রসরাজ, শিল্পী অসিতকুমার হালদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই বছরই অর্থাৎ ১৯২৩ সালে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের প্রথম পরিচয় হয়। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই দুজনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করে। অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে কেবল গান শুনিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁকে একাধিক গান শিখিয়েছিলেন। বস্তুতঃ অতুলপ্রসাদ, ধূর্জ্জটি প্রসাদ আর-দিলীপকুমার এই তিন সুরশিল্পী ও সঙ্গীতসাধকদের রসজ্ঞ মিলন বাংলা সঙ্গীত সৃষ্টির ইতিহাসে একটি গৌরবজনক অধ্যায়।

পরের বছর অতুলপ্রসাদ দার্জ্জিলিংয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন সদলে সেখানকার 'আশনটুলি' নামক ভবনে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী এবং অবনীন্দ্রনাথ জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। অতুলপ্রসাদ কবিগুরুর উপস্থিতির সংবাদ পেয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। একদিন ঘুমরক্ পাহাড়ের চূড়ায় তাঁদের বনভোজনের ব্যবস্থা হল। সেই সমাবেশে অতুলপ্রসাদ গাইলেন : 'মিছে তুই ভাবিস মন' আর রবীন্দ্রনাথ শোনালেন তাঁর পিতৃদেব রচিত গান : 'তোমার কাছে শান্তি চাব না'।

১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌতে সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন হল। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনে সম্মানিত অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হলেন। ঠিক হল কেশর বাগের ওয়াজিদ আলী সাহেবের বারদুয়ারীতে আসর বসবে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সঙ্গীত-শিল্পীরা এসে হাজির হলেন। বোম্বাই থেকে এলেন ভাতখণ্ডে ও তাঁর প্রিয় শিষ্য রতন ঝনকার। আর এলেন বরোদার সভাগায়ক আলিবান্দা, মাইহারের আলাউদ্দীন খাঁ, মথুরার চন্দন চৌবে। তাছাড়াও এলেন হাফিজ আলি খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, ফিজা হোসেন, মোরাদ খাঁ ইত্যাদি। বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্ব করলেন রাধিকা-মোহন গোস্বামী। দিলীপকুমার রায় এসে উঠলেন ধূর্জটি-প্রসাদের বাড়ীতে। অতিথির সমাগমে অতুলপ্রসাদের গৃহও পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বহু সঙ্গীত-রসিকগণের উপস্থিতিতে পরপর কয়েকদিন রাত ধরে সুরের লহরী ছুটল। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত এই দ্বিবিধশিল্পের সুরালাপে ও তান বিস্তারে এক অপূর্ব্ব আবহের সৃষ্টি হল। সম্মেলন অন্তে উপস্থিত ব্যক্তিগণের উদ্যোগে বিশেষত পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রেরণায় এবং রাজরাজেশ্বর-বলীর পৃষ্ঠপোষকতায় কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌএ 'মরিস কলেজ অফ হিন্দুস্থানী মিউজিক' প্রতিষ্ঠিত হল।

এই বছরের শেষাশেষি দিলীপকুমারের আহ্বানে অতুলপ্রসাদ শিমুলতলায় গেলেন এবং সেখানে কয়েক দিন কাটাবার পর ১৯২৭ সালের ১লা জানুয়ারী দুজনে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্র-নাথ দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। কবিগুরুর ইচ্ছানুসারে গানের আসর বসল। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রমা দেবীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইলেন "তোমার বীণা আমার মন মাঝে" আর অতুলপ্রসাদ শোনালেন তাঁর স্বরচিত গান—"আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো? নববর্ষের প্রথম দিনটি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় অনুরণিত হয়ে উঠল।

পরের দিন কবির সঙ্গে দুজনে আবার মিলিত হয়েছেন। নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলেছে। একসময় মৃত্যুর কথা উঠল। কবি বললেন, মৃত্যুর পরে আমাদের চৈতন্য লোপ পায় না। একটু থেমে আবার বললেন, 'তবে আমাদের সে চৈতন্য এ চৈতন্যের জের টেনে চলে না।' অতুলপ্রসাদ কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলতে অনুরোধ করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলতে থাকলেন, "কি রকম জান, আমাদের জীবনে কি অনেক সময়েই অদল বদল হয়ে যায় না কোন অভাবনীয় কিছু একটা ঘটলে। একটা পাহাড় ভাঙ্গচুর হলে যেমন সমস্ত দৃশ্যটা থাকে অথচ আগাগোড়া বদলে যায় অনেকটা তেমনি।... যেমন ধরো এটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত মনে রেখো—ধরো এমন

ত হতে পারে যে মৃত্যুর পরে আমাদের পক্ষে প্রিয়জনের দূরে থাকা ও কাছে আসার মধ্যে আর কোন তফাৎ থাকবে না। তাই মৃত্যুর চৈতন্য রইল বলতে আমি বুঝি না যে সেটা হল এই চৈতন্যের সম্প্রসারণ। আমার মনে হয় যে খুব সম্ভব সে চৈতন্যের মধ্যে একটা মূলছন্দ যায় বদলে।”...

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ সম্পর্ক ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঘনঘন তাঁকে নিজের কাছে পেতে চান। কিন্তু সংসারের নানা প্রতিবন্ধকতায় অতুলপ্রসাদের পক্ষে তাঁর কাছে সব সময় যাওয়া সম্ভবপর হয় না। এমনই এক অবস্থায় কবি অতুলপ্রসাদকে লেখেন: তুমি আমার কাছে মোটেই আস না। এসে চলে যাও বড় তাড়াতাড়ি। বল কবে আসছ? কবে দেখা হবে? অতুলপ্রসাদও জবাবে লেখেন 'হবে হবে দেখা হবে।'

অতুলপ্রসাদ সম্পাদিত 'উত্তরা' পত্রিকা তখন সাহিত্যিক সমাজে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। সেই সময় অর্থাৎ ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজার পর রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে লিখলেন:

'মনে সঙ্কল্প ছিল বিজয়া দশমীতে তোমাকে কবির আশীর্বাদ পাঠাব।.........বিশেষ কিছু নয়, আমার স্বরচিত গুটিকতক বই। সম্পাদকের সমালোচনার জন্যে নয়, সমঝদারের সম্ভোগের জন্যে। এই সামান্য উক্তি থেকে নিশ্চয়ই অনুমান করা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের কাব্যরসজ্ঞতার সম্বন্ধে কতখানি নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন।

১৯৩০ সালের মে মাসে অর্থাৎ মহাত্মাগান্ধীর লবণ-আন্দোলনের কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদ প্রিভি কাউন্সিলে একটি মামলার তদ্বির করতে বিলাত যাত্রা করলেন। লণ্ডনের গোল্ডার্স গ্রীন অঞ্চলে মিসেস লোকেন পালিত তখন বসবাস করছিলেন। অতুলপ্রসাদের আগমন সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁকে সাদরে আহ্বান জানালেন তাঁর গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করতে। মিসেস পালিত বিদেশিনী হলেও তাঁর স্বামীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা থাকায় বারম্বার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এদিকে অতুলপ্রসাদ লণ্ডনে এসেছেন এই খবর পাওয়া মাত্র প্রবাসী ছাত্রসমাজের অধিকাংশই একে একে মিসেস পালিতের বাসভবনে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। সঙ্গীতানুরাগী ছাত্রের দল তাঁর গান শুনতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় প্রত্যহই সেই ভবনে সঙ্গীতের আসর বসতে থাকল। অতুলপ্রসাদ এক একদিন এক এক সুরে গান গেয়ে শোনান: 'তব অন্তর এত মন্থর আগে তো তা জানিনি' অথবা 'মনরে আমার তুই বেয়ে যা দাঁড়' কিম্বা 'ভেবেছিনু নাই বা এলে ওহে ভবনদীর মাঝি' ইত্যাদি।

এর কিছুদিন পরেই খবর এল রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণ শেষ করে লণ্ডনের দিকে আসছেন। ফলে সেখানকার ভারতীয় সমাজে বেশ একটা নাড়া পড়ে গেল। অতুলপ্রসাদ সবচেয়ে বেশী সুখী হলেন।

উডব্রুক থেকে লণ্ডনে এসে রবীন্দ্রনাথ বিড়লা প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় অতিথিশালা আর্য্যভবনে উঠলেন (৩০শে মে ১৯৩০)। অতুলপ্রসাদও কালক্ষেপণ না করে তাঁর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলেন কবিগুরু চারজন তরুণশিল্পী—রণদা উকিল, ধীরেন দেবশর্ম্মা, ললিতমোহন সেন ও সুধাংশু রায়চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনারত। এই শিল্পীগণ ইতিপূর্ব্বেই লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে ফ্রেসকো চিত্র অঙ্কনের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই চারজন শিল্পীর সঙ্গে অল্পক্ষণেই অতুলপ্রসাদের যেন মিতালী হয়ে গেল। তাঁরা এসে অতুলপ্রসাদকে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। সেদিন তাঁরা নিজেদের ঘরখানি সাজিয়ে, ফুলদানিতে ফুল রেখে, ধূপ জ্বালিয়ে, ভারতীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে সশ্রদ্ধভাবে অতুলপ্রসাদকে অভিনন্দিত করলেন। চা পান পর্ব্ব সমাপ্ত হলে তাঁরা অতুলপ্রসাদকে গান শোনাতে অনুরোধ করলেন। মধ্য-

রাত্রি পর্য্যন্ত চারবন্ধু তাঁর গান শুনতে শুনতে নিবিড় আনন্দ উপভোগ করলেন।

ঐ বছর অক্টোবর মাসে লণ্ডন থেকে ফিরে অতুলপ্রসাদ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুদিন লক্ষ্ণৌয়ে থাকার পর চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য কলকাতায় চলে এলেন। তখন বৈশাখ মাস। কলকাতায় সাহিত্যসেবী ও রবীন্দ্রানুরাগীগণ 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত। অতুলপ্রসাদের কলকাতা আগমন শোনামাত্র অমল হোম ছুটে এলেন এবং বললেন এবারে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠানে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে এবং কিছু বলতে হবে। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বন্ধুদের অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন এবং একটি স্বরচিত গানে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন যার প্রথম চরণ: 'গাহো রবীন্দ্র জয়ন্তী বন্দন'।

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে অতুলপ্রসাদ আবার লক্ষ্ণৌ ফিরে এলেন। কিন্তু তার পরে প্রায়ই চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতা যেতে হত। কলকাতায় এলেই তাঁর বাসস্থানে গানের আসর বসত। একবার রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হলেন। সেই আসরে দিলীপকুমারও গান গাইলেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদের স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙ্গে পড়তে থাকল। ১৯৩২ সালের মে জুন মাসে তিনি কিছুদিনের জন্য কার্সিয়াং গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এলেন লক্ষ্ণৌয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না পারলেও পত্রালাপ অব্যাহত রেখেছেন। ঐ বছরই ২২শে জুলাই তারিখে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "তোমার আম্রাতক পাওয়া গেল। ভোগ সুরু হল। লাগছে লক্ষ্ণৌর টপ্পার মত। নবাবী স্বাদ, অম্লটুকুর মধ্যে গন্ধ ও রস আঁট হয়ে আছে। তোমার কাছ থেকে যা কিছু আসে তার সঙ্গে কিন্তু খাম্বাজের মিল পাওয়া যায়।" অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবালুতাশূন্য গুণগ্রাহীতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

এই বছর ডিসেম্বর মাসে গোরক্ষপুরে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' অতুলপ্রসাদ সভাপতি রূপে আমন্ত্রিত হলেন। শরীর দুর্ব্বল থাকা সত্ত্বেও তাঁর দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করলেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাব ভাষা ও ভঙ্গীর নানা বৈচিত্র্যের আলোচনা করে বঙ্কিম মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান অবদান সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন। সাহিত্যে বাস্তবতার স্থান আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন: "বাস্তবতাকে বর্জ্জন করলে সাহিত্য চলে না একথা স্বভাবসিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেউই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেন নাই। সত্যের উপর সাহিত্যের আসন। তবে সব মলিন সত্য বা কুৎসিত বাস্তবতাই সাহিত্যের আধার নয়। কতকগুলি বাস্তবতা সুসাহিত্যে বর্জ্জনীয়। কেননা সাহিত্যের আশ্রয় শুধু সত্য নয়, শিব ও সুন্দর সাহিত্যের আশ্রয়। যে সাহিত্যে অ-শিব, অ-সুন্দর সে সাহিত্যে যত বাস্তবতা থাক না কেন তা পরিত্যাজ্য।"

এরপর এক বছর না যেতেই অতুলপ্রসাদের শারীরিক অসুস্থতা আরও বাড়ল। চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি কিছুদিনের জন্য পুরীতে সমুদ্রতীরে বাস করতে গেলেন (এপ্রিল ১৯৩৪)। কিছুদিন থাকার পর তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। মহাত্মা গান্ধী সেই সময় পুরীতে এসেছেন। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে তিনি ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত। খবর পাওয়ামাত্র তিনি গান্ধীজী সকাশে উপস্থিত হলেন। গান্ধীজী অতুলপ্রসাদের গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। বিশেষতঃ 'কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে' এই গানটি মহাত্মাজীর অতি প্রিয় গান ছিল। অতুলপ্রসাদ গানটি হিন্দীতে অনুবাদ করে গান্ধীজীকে শোনালেন। গান্ধীজী বিশেষভাবে তারিফ করলেন। আরও কয়েকদিন যেতে না যেতেই অতুলপ্রসাদের কাছে পুরীর জীবনযাত্রা একঘেয়ে মনে হল। তাই তিনি পুরী ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌর পথে কলকাতায় ফিরে এলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘটনার পাকচক্রে এবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল না। তিনি কলকাতায় নেমেই সরাসরি

লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন। এরপর মাত্র তিনমাসের মধ্যেই তাঁর জীবনাবসান হল। শোকাহত রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় উচ্চারণ করলেন :

'বন্ধু তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্ত্য ধরণীতে
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে॥" ইত্যাদি

(২)

রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের ব্যক্তিজীবনের মূল্যবান ঘটনাগুলি উল্লেখ করা হল। অতঃপর এই দুই ব্যক্তি-পুরুষের সৃজনীশক্তির সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের কোনও তুলনাই করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী আর অতুলপ্রসাদের রচনা একমুখী। রবীন্দ্রনাথের কবিমানস কৈশোর থেকে সাহিত্যকে অবলম্বন করে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নিরঙ্কুশ গতিতে অগ্রসর হয়েছে। তাঁর জীবনের যা কিছু অনুভূতি, যা কিছু প্রতিবেদন, যা কিছু রসসৃষ্টি সবই নানাধর্ম্মী ও বৈচিত্রবাহী। কাব্য, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, চিত্রকলা, সঙ্গীতকলা, নৃত্যকলা, নাটক, লঘু রচনা বা গুরুরচনা—সব কিছুকেই বাহন করে তিনি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে উন্মোচিত করেছেন। তথাপি এই বহুধা-বিস্তৃত সৃষ্টির মধ্যে গীতরচনায় যেন তিনি অধিকতর সার্থকতা প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ তাঁর সকল সৃষ্টির মূলে গীতধর্ম্মিতা যেন একান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে যার ফলে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি হয়েছে একটি নিরবচ্ছিন্ন গীতিপ্রবাহ।

সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে অতুলপ্রসাদের গান রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নগণ্য। অতুলপ্রসাদ তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যে মাত্র আড়াইশোটি গান রচনা করে গেছেন আর রবীন্দ্রনাথের এযাবৎ প্রকাশিত গানের সংখ্যা তিন সহস্রেরও অধিক। পৃথিবীর আর কোনও গীতিকবির প্রকাশিত রচনা এ পর্য্যন্ত এই সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারেনি। আবার অতুলপ্রসাদের রচিত আড়াইশো গানের মধ্যে গীতরসিক বা কাব্যপাঠকগণ মাত্র দুশো পাঁচটি গানকে গ্রন্থাকারে আবদ্ধ হতে দেখেছেন। অতুলপ্রসাদের প্রথম প্রকাশিত গীতিকাব্যগ্রন্থের নাম ছিল 'কয়েকটি গান' (১৯২৫)। ১৯৩১ সালে তাঁর জীবিতাবস্থায় 'গীতিগুঞ্জ' নামে একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ও ১৯৫৭ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৬৪ সালে (মাঘ ১৩৭১) 'গীতিগুঞ্জ' পুনর্মুদ্রিত হয় এবং ১৯৬৬ সালে (১৩৭৩) এর যে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাই অতুলপ্রসাদের সর্ব্বাধুনিক গীতিসংগ্রহরূপে প্রচলিত। তাঁর অধিকাংশ গানের স্বরলিপি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক "কাকলি" নামে প্রকাশিত হয় এবং এ পর্য্যন্ত 'কাকলি'র পাঁচটি খণ্ড আত্মপ্রকাশ করেছে।

সৃষ্টি সামর্থ্যের দিক থেকে দেখলেও রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের পার্থক্য যে সুস্পষ্ট তা বলা বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগে যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বা যে পরিবেশে লালিত বর্দ্ধিত হয়েছিলেন তা তাঁর প্রতিভার স্ফুরণের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ ছিল বাঙালীর ভাব-সাধনার ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাল। এই সময় বাঙালীর জীবন-সাধনায় যেমন আধ্যাত্মিক চেতনার চরমবিকাশ ঘটেছিল তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মাহাত্ম্যবোধ বা মানব-প্রেম এবং দেশাত্মবোধ দেশধ্যান অত্যুগ্র আকার ধারণ করেছিল।

অবশ্য এর পাশাপাশি প্রকৃতিপন্থা বা প্রাকৃতিক লীলাদর্শনের গভীর আকৃতি বা আনন্দও অভিব্যক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুজ গীতকার হিসেবে যাঁরা

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বা যাঁদের কৃতি ও কীর্ত্তি অমরত্বের দাবী করতে পারে সেই দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬ -১৯১৩) রজনীকান্তসেন (১৮৬৫-১৯১০) ও অতুলপ্রসাদ (১৮৭১-১৯৩৪) এবং এঁদের উত্তরসাধক নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-) সকলেই ছিলেন অল্পবিস্তর একই ঐতিহ্যের অনুগামী বা একই সাধনমার্গের পথিক। তথাপি রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা অনস্বীকার্য। এর কারণ কি? কারণ রবীন্দ্রনাথ শৈশবে তাঁর পরিবারের প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিষ্ণুভট্ট ও যদুভট্টের নিকট সঙ্গীত-সাধনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন, তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের পরিশীলিত ভাব ও উচ্চআদর্শ অনুযায়ী সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন, অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে পিয়ানোর সুরে গান রচনার সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলেন। তারপর বিলাত প্রবাসকালে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের সুরসম্পদের মূল্যবান অংশ আহরণ করেছিলেন। তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে তদানীন্তন কলকাতার উচ্চমানসম্পন্ন সঙ্গীতসমাজের সঙ্গে নিজেকে যেমন একাত্ম করে নিয়েছিলেন তেমনি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনার উপযোগী সঙ্গীতসৃষ্টিতে ব্রতী হয়ে নিরলস সাধনার বলে ধাপে ধাপে সিদ্ধির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে গ্রাম-বাঙলার লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে তিনি ঐ সৃষ্টিকর্ম্মের অন্তর্নিহিত প্রাণ ধারাটিকে আবিষ্কার করেছিলেন যা উত্তরকালে তাঁর প্রেরণাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতশিক্ষা হয়েছিল তাঁর মাতামহের কাছে? কৈশরে পিতৃবিয়োগের পর অতুলপ্রসাদ তাঁর মাতামহ মহর্ষি কালীনারায়ণ গুপ্তের তত্ত্বাবধানে লালিত বর্দ্ধিত হন। কালীনারায়ণ একই সঙ্গে কবিতা ও গান রচনা করতেন। তারপর অতুলপ্রসাদ ও পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গান গাইতেন, হোলির গান রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অতুলপ্রসাদের বাবা ডাঃ রামপ্রসাদ-সেনও হোলির গানরচনায় পারদর্শী ছিলেন এবং অতুলপ্রসাদ অতিশয় বাল্যকালে তার কিছু কিছু শ্রবণ করেছিলেন। মাতামহ যেসব গান রচনা করেছিলেন তার একটি সঙ্কলন 'ভাবসঙ্গীত' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই গ্রন্থখানি মাতামহ একদিন অতুলপ্রসাদকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন—অতুল, তোমাকে এমন গান লিখতে হইবে। উত্তরকালে অতুলপ্রসাদ যেসব হোলির গান রচনা করেছেন তার প্রেরণা যে তিনি বাল্যকালে পিতা ও পিতামহের কাছে পেয়েছিলেন তা মনে করলে বোধয় ভুল হবেনা।

প্রথম জীবনের এই শিক্ষার পর অতুলপ্রসাদ অবশ্য বিলেত গিয়েছিলেন এবং সেখানকার পাশ্চাত্য সুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এমন কি একসময় তিনি ইউরোপের সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী হয়েছিলেন এবং স্ত্রীকে বলেছিলেন: 'চমৎকার লাগছে আমার ওয়েষ্টার্ণ মিউজিক।'

কিন্তু ব্যারিষ্টারী পাশ করে আসার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে অকৃত্রিম স্নেহসম্বন্ধ গড়ে ওঠে সেই সুযোগে তিনি ব্রহ্ম সঙ্গীতেরও সুরসাধনার বিভিন্ন সূত্রগুলির সন্ধান লাভ করেন। পরে লক্ষ্ণৌ প্রবাসকালে উত্তরভারতীয় সঙ্গীতের অপরিসীম মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন যা তাঁর রচনাকে চিরায়ুতা প্রদান করেছেন।

সঙ্গীতসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় অতুলপ্রসাদের প্রধান লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে রবীন্দ্রনাথ যেমন অন্তরের প্রয়োজনে অর্থাৎ গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য বা অন্যান্য সামাজিক ও প্রতীক নাটকের উপযোগী গান রচনা করেছিলেন অতুলপ্রসাদ তা করেননি। এমনকি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেও রবীন্দ্রনাথকে অনেক সঙ্গীত রচনা করতে হয়েছিল যার সংখ্যার পাশে অতুলপ্রসাদের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত আদৌ উল্লেখযোগ্য-নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বৃহৎ অংশ তাঁর অরূপরতন, কালমৃগয়া, তপতী, তাসের দেশ, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা, প্রায়শ্চিত, পরিশোধ, ফাল্গুনী, বিসর্জ্জন, বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা, শাপমোচন ও শ্যামা

ইত্যাদি নাটকের প্রয়োজনে লিখিত হয়েছিল। গান ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা, ছড়া, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্টির বাহকতায় নিজকে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ একমাত্র তাঁর গানকেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম্মের শিল্পরূপ (artform) হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কেবলমাত্র অন্তরের তাগিদে গান রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন তাঁর অন্য শিল্পের সংরাগ আছে অতুলপ্রসাদের গান তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং স্বনির্ভর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র গানকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন: পূজা, স্বদেশ-প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। তাঁর নাট্যগীতির অনেকগুলিকে এই ছয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে 'পূর্ণাঙ্গ' গীতবিতান সংগ্রহে এই ছ'টি পর্য্যায়কে প্রথম ভাগ হিসেবে গ্রহণ করে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানগুলি পৃথকভাবে পরিবেশিত হয়েছে এবং ভানুসিংহের পদাবলী, নাট্যগীত, জাতীয়-সঙ্গীত, পূজা ও প্রার্থনা, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, প্রেম ও প্রকৃতি, পরিশিষ্ট এই নয়টি বিভাগে গ্রথিত হয়েছে।

অতুলপ্রসাদের 'গীতিগুচ্ছ' গ্রন্থে সঙ্কলিত গান-গুলির বিভাগ পাঁচটি। ঐ গুলি যথাক্রমে (১) দেবতা (৫৪) (২) প্রকৃতি '৩০) (৩) মানব (৫২) (৪) বিবিধ (৫৭) (৫) পরিশিষ্ট (১১)। ভূমিকায় প্রদত্ত একটি গানকে ধরলে এই গ্রন্থের মোট গানের সংখ্যা দাঁড়ায় দুশতপাঁচটি। বলাবাহুল্য এই শ্রেণীকরণ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অতুলপ্রসাদের বিশেষ কোন প্রকার সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়না। তবে তাঁর কবিমানসের প্রবণতা সম্বন্ধে কিছুটা হদিস পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের গীতিরচনার বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে এলে অথবা উভয়ের শিল্পসৃষ্টির তুলনামূলক মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করলে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয়ী ও ধর্ম্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ নিগূঢ় সংবেদনার অনুবন্ধী। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটি প্রত্যয় ছিল যেটিকে বলা চলে স্বভাবকে অবলম্বন করে স্বাভাবিকতা থেকে উত্তরণ। তিনি উনবিংশ-শতাব্দীর জীবনসাধনায় লালিত বর্দ্ধিত হয়েও ছিলেন একান্তভাবে বিংশশতাব্দীর নব্যচিন্তায় সর্ব্বাধুনিক। এই কারণে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের ভক্তি উন্মাদনা বা জনমানবের প্রতি ভক্তিপ্রাণতার দৃষ্টান্ত তাঁর গানে নাই। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় শৈব, কৃষ্ণ, গঙ্গা বা শক্তির কোনও আরাধ্য দেবদেবীর কোন স্তোত্র রচনা করেননি। তথাকথিত ভক্তিমূলক গান রচনাও ছিল তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁর 'পূজাপর্যায়ের গানগুলি হৃদয়স্বামীর নির্ব্বিশেষ অনুভূতির অভিব্যক্তি এবং তাঁরই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নিবেদন।

গান সম্পর্কে অতুলপ্রসাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অতিশয় স্পষ্ট এবং মানবিক। রবীন্দ্রনাথকে যে অর্থে ভূমির কবি বলা হয় সেই একই অর্থে অতুলপ্রসাদকে বলতে হবে ভূমির কবি। মৃত্তিকার কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত হবার বাসনা থাকলেও অতুলপ্রসাদ ছিলেন আগাগোড়াই মর্ত্ত্যলোক-চারী। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অমর্ত্ত্য জীবনের আশঙ্কা বা অমর্ত্ত্য প্রেমের আস্বাদ তিনি লাভ করতে সক্ষম হননি। উপনিষদের আলোকে আলোকিত রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ঋষিদের মত উচ্চারণ করেছিলেন 'একোহং বহুস্যাম' অর্থাৎ এক আমি বহু হইব। সৃষ্টির প্রয়োজন মেটাতে এক যেমন বহুরূপ পরিগ্রহ করে তেমনি আবার কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে সেই বহু একেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। বাইরের বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরের একাকিনীই রবীন্দ্রনাথের আজীবন পরিচালিত করেছে। তাই তাঁর জীবনবেদ একের চরণে রাখিলাম বিচিত্রের মর্ম্ম-বাঁশী। রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর 'জীবনদেবতার' বেদীমূলে প্রদত্ত প্রধানতম অর্ঘ্য। আজীবন তিনি কেবল গানের মালা গেঁথে গেছেন। এই মালার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'অনন্ত অমৃত ও আনন্দ'

রবীন্দ্রনাথের গানের দূরপ্রসারী পটভূমির তুলনায় অতুলপ্রসাদের গানের পটভূমির পরিসর অত্যন্ত স্বল্প ও সীমিত। রবীন্দ্রনাথের গীতিকল্পনা পূর্ণতার অভিসারে দুর্নিবার গতিতে ছুটে গেছে এক লোক থেকে

লোকান্তরে।' কিশোর কবির 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গীতিপ্রবাহ সুরু হয়েছিল সৃষ্টির প্রচণ্ড উন্মাদনায় যা সাগর ভূধরকে অতিক্রম করে চলে গেছে। সেই অলক্ষিত চরণের অশরণ চলায় এগিয়ে গিয়ে কবি একবার পিছু ফিরতেই যা দেখলেন তা হল :।

'নিশীথে প্রভাতে যা কিছু পেয়েছি হাতে,
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।'

তারপর সেই যাত্রা যখন প্রায় লক্ষ্যস্থলে কবিকে পৌঁছে দিল তখন তিনি বলে উঠলেন :

'আমি পৃথিবীর কবি
তার যেথা ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার
জাগিবে তখনি।'

অতুলপ্রসাদ নিশ্চয়ই নিজেকে পৃথিবীর কবি বলে দাবী করতে পারবেননা। তিনি একান্তভাবে বাঙ্গালী কবি এবং বড়জোর বলাযায়, ভারতীয় কবিদের একজন। রবীন্দ্রনাথের স্থায় দূরেক্ষণী দৃষ্টিভঙ্গীর বা অতিশায়ী কল্পনার অধিকারী তিনি ছিলেন না। তিনি খণ্ডকালের পরিমিত পরিধীরমধ্যে নিজের কল্পনাকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। সুরের বাহকতা ছাড়া তাঁর আর কোন অবলম্বনই ছিল না। গান তাঁর 'দুঃখ সুখের সাথী, সঙ্গী দিন রাতি'। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আলোকের কবি, আনন্দের কবি : অতুলপ্রসাদ বিষন্ন বিভাবরীর কবি, বেদনার কবি। রবীন্দ্রনাথের জীবন সার্থকতায় সুন্দর, সিদ্ধিতে ভরপুর; অতুলপ্রসাদের জীবন ব্যর্থতার বঞ্চনায় বিড়ম্বিত ও বৈরাগ্যে বিধুর। হৃদয়ভরা দুঃখকে চেপে রেখে তিনি কণ্ঠে গান ধরেছেন। তথাপি ইংরেজ কবি কীটেসের মত কখনও বলতে পারেননি My heart aches and a drowsy numbness pains my sense। নির্বেদ সান্ত্বনা আর অত্যাজ্য ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে তিনি সব দুঃখকে ভুলতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা মন্ত্র ছিল 'তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও'। মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগে দিলীপকুমারকে বলেছিলেন' জান মন্টু কি আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে? 'কি অতুলদা' বলেন দিলীপকুমার। উত্তর আসে 'শ্মশানে যেদিন আমাকে নিয়ে যাবে সেদিন চিতায় শুয়ে হঠাৎ যেন একবার সকলের দিকে চেয়ে হেসে চোখ বুজোই।' প্রতিকূল জীবনের ধুসর ছায়াচ্ছন্নতায় পিষ্ট হয়েও গানকে তিনি কখনও ম্লান সুরে মলিন করে তোলেননি। তথাপি তাঁর গানের সুরে যে বেদনার গভীর স্পর্শ কবির অজান্তে লেগে গেছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন গেয়েছেন :-'সীমারমাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন-সুর' অথবা 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে' কিম্বা 'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই' অতুলপ্রসাদ তখন শুনিয়েছেন :

'ওগো নিঠুর দরদী, একি খেলছ অনুক্ষণ?
তোমার কাঁটায় ভরাবন, তোমার প্রেমে ভরা মন।'

আবার রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছেন : আনন্দের সাগর থেকে এসেছেন আজ বান, অতুলপ্রসাদ তখন শুনিয়েছেন :

"মনোদুঃখ চাপি মনে হেসে নে সবার মনে
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা জানাস প্রাণের
বেদন।"

দুঃখের দারুণ জ্বালায় দগ্ধ হয়েও তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস ত্যাগ করেন নি। বরং তিনি আস্তিক্য বুদ্ধিতে অধিকতর বলীয়ান হয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন :
"কালে যখন আছেন হরি
তোর যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়"
কিম্বা :
'সাধো এ জীবনে তব অভিলাস হরষে কিম্বা বেদনে।'

* * *

অথবা 'নাহি বুঝি কান্না হাসি
দারিদ্র্য সম্পদরাশি

তোমা ছাড়া সুখ দুঃখ
সকলি বালাই।'

* * *

আরও : 'দুঃখের মাঝে পাবিরে তুই সুখের দেখা
সেই দেখাতেই হবে রে তোর সকল দেখা।'

অধিকন্তু : 'দুঃখেরে আমি ডরিব না আর
কণ্টক হোক কণ্ঠের হার
জানি তুমি মোরে করিবে অমল
যতই অনলে দাহিবে।'

পরিশেষে : 'জীবন হাটে কিনিতে সুখ কিনে আনি
কেবলি দুখ
বেদনাভরা বুক তোমায় জানিনে বলে।'

* * *

যে তোমার পেয়েছে খবর তার সবাই
আপন কেহ নয় পর
বিশ্ব তাহার ঘর।'

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে অতুলপ্রসাদের এই দুঃখ কোনও অর্থনৈতিক কারণসঞ্জাত নয়, এই দুঃখ তাঁর সাংসারিক পরিবেশের বিরূপতা থেকে উদ্ভুত। তিনি যতই এর নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন ততই দুঃখের বোঝা তাঁকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত জাগতিক সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার সকল অনুভূতি ছাড়াও বিশ্বাতীত রসচেতনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবনবোধকে অবলম্বন করায় তাঁর আবেদন হয়েছে আরও গভীর এবং মর্ম্মস্পর্শী। তিনি এই একটী গানেও ব্যক্ত করেছেন :

'অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোকতাপ নাহি নাহিরে।"

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসাধনা এক হিসেবে পূর্ণতার আরাধনা। তাঁর সদাজাগ্রত ও নিত্য পরিবর্তনশীল মনন মানুষ ও প্রকৃতি, জগৎ ও জীবন সব কিছু থেকে উপাদান সংগ্রহ করার পর বস্তুলোক থেকে ভাবলোকে অনুপ্রবেশ করেছে এবং মরমী কবি সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনবোধের গভীরতর প্রদেশে বিচরণ করে ভূমানন্দ লাভ করেছেন। এইভাবে পথ চলার পর তিনি যখন গীতভারতীর মন্দিরের সম্মুখে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন তখনই দেখেছেন :

'সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে।'

তারপর আত্মহারা কবি অবিরাম চলার ভঙ্গীতে গেয়েছেন :

যেমন : 'গানের সুরের আসনখানি পাতি
পথের ধারে'

* * *

কিম্বা : আসা যাওয়ার পথের মাঝে গান গেয়ে মোর
কেটেছে দিন'

* * *

অথবা : 'গানের ভেলায় বেলা অবেলায়
প্রাণের আশা
ভোলা মনের স্রোতে ভাসা।'

কখনও কখনও ক্ষণিকের জন্য থেমে আত্মজিজ্ঞাসায় নেমেছেন :

যেমন : 'হেথা যে গান গাইতে আসা
আমার হয়নি সে গান গাওয়া
আজও কেবলই সুরসাধা
আমার কেবল গাইতে চাওয়া।'

কিম্বা : 'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব নাকো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো'

অথবা : 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি।'

পরক্ষণেই আবার আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে নির্দ্বিধা হয়েছেন এবং বলেছেন :

'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।'

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, তবে বর্ত্তমানে তার প্রয়োজন নেই। তাই

যেগুলি সর্ব্বাধিক পরিচিত তারই কিছু উদ্ধার করে দেখান হল।

অতুলপ্রসাদের গীত সাধনাও অকৃত্রিম ও অনন্য। বাঙলা গীত রচনার ক্ষেত্রে সে যুগে তিনিই একমাত্র স্রষ্টা যিনি গানকে তাঁর অন্তর্নিহিত ভাবপ্রকাশের উপযোগী অন্য নিরপেক্ষ আঙ্গিক রূপে ব্যবহার করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন:

'মিছে তুই ভাবিস মন?
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন।'

অথবা: 'একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়নজলে।'

* * *

কিম্বা: ভুলে যা দুঃখের দাহন
ডুব দিয়ে গান সুধার রসে।

* * *

আরও: 'হানো যদি খরবাণ, আমারও তো আছে গান
আমি সম্মুখে রহিব তারে ধরি।'

অধিকন্তু:

'কেন যে গাহিতে বলে, জানে না জানে না তারা
যে সুরে গাহিতে চাহি, আমি যে সে সুর হারা।'

গান অতুলপ্রসাদের সকল আপদকালের পরমনির্ভয় আশ্রয়। এর থেকে তিনি সদাই সান্ত্বনা উপলব্ধি করেছেন। যেমন:—

'ওগো দুঃখ সুখের সাথী, সঙ্গী দিন রাতি সঙ্গীত মোর
তুমি ভব মরু প্রান্তর মাঝে শীতল শান্তির লোর।'

* * *

অথবা: ভয়ে যবে ভাঙবে পরাণ
কণ্ঠে যেন থাকে রে গান
ঝড়ে হাওয়া লাগলে পালে
আরও বেগে যাবি তরি।'

গান সম্পর্কে অতুলপ্রসাদের কোনও ছলনা বা লুকোচুরি নেই। তাঁর অন্তরের তাগিদ ছাড়া এবং জীবনের আরাধ্য বস্তুর নিকটলব্ধ প্রেরণা ব্যতিরেকে তিনি কখনও গান রচনা করেননি। তিনি তাই অকপটে বলেছেন:

সবাই কহে নূতন সুরে গাও
নূতন প্রেমের নূতন গান শুনাও
আমি যে গো করতে নারি আর মনের সাথে গানের ছলনা।'

* * *

অথবা:

'যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই
গানটি যখন হয় সমাপন তোমার পানে চাই।'

কিম্বা: তাপিত আমি তপ্ত তপনে
মুক্তি সঙ্গীত গেয়ে যা গোপনে
কনক শ্রাবণে এ মরু জীবনে
ঢেলে দে স্বপন-অমিয়া।

রবীন্দ্রনাথের আজীবন কাব্যসাধনা তাঁর গানের বাণী-রচনায় যে অনবদ্য সার্থকতা প্রদর্শন করেছে তার সঙ্গে তুলনায় অবশ্যই অতুলপ্রসাদের সিদ্ধি অনেক পশ্চাৎপদ। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী যেমন সুমধুর তেমনি শব্দধ্বনি গভীর ভাবব্যঞ্জক এবং চিত্রকল্প অতিশয় সংহত। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভার আলোকসম্পাতে অতুলপ্রসাদের চিত্ত ও যে বিশেষভাবে আলোকিত হয়েছিল তা তাঁর গানের বাণীগুলি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে বিলম্ব হয় না। রবীন্দ্রনাথের অনেক বহু পরিচিত চরণের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের গানের চরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

যেমন: রবীন্দ্রনাথের—

'আমার পরাণ যারে চায় তারে নাহি পায় গো।'

আর: অতুলপ্রসাদের—

'যাহারে ধরিতে চাহি তারেই নাহি পাই গো।'

কিম্বা: রবীন্দ্রনাথের—

'আমায় বলো না গাহিতে বোলো না
একি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা।'

এবং: অতুলপ্রসাদের—

হৃদে জাগে শুধু বিষাদ রাগিণী

কেমনে গাহিব হরষ গান ?

আমায় বোলোনা বোলোনা গাহিতে গান।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যেমন নাথ, প্রভু, স্বামী অথবা সখি, সজনী ইত্যাদি সম্বোধন ব্যবহার করেছেন, অতুলপ্রসাদ সেগুলি ব্যতীত কাণ্ডারী, নিঠুর দরদী, দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, পাগল, খ্যাপা, ভোলা, প্রাণসখা, ধনী, জীবনমণি, সুহাসিনী, রঙ্গরাণী ইত্যাদি যদৃচ্ছাক্রমে প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু বাণীরচনায় মূলতঃ রবীন্দ্র-অনুগামী হয়েও অতুলপ্রসাদ মাঝে মাঝে তাঁর গানে যে ভাব বিভোরতার দুর্লভ রূপকল্প সৃষ্টি করেছেন তাতে রবীন্দ্রপ্রভাব অবর্তমান। বাউল ও ভাটিয়ালী গানের মত তাঁর গানের বাণী সরল ও দ্ব্যর্থহীন। বাংলা লোক-সঙ্গীতের প্রাচীন রচয়িতাদের অলঙ্কার-প্রীতি বা অনুপ্রাস-সৃষ্টির আকাঙ্খা তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। ফলে তিনি তাঁর গানে সেই রীতির পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী হন। একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগে অথবা আক্ষরিক মিলের সঙ্গীতসৃষ্টিতে বা ধ্বনি-বৈচিত্রে তাঁর গানের বাণী শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে চমৎকৃত করেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

যেমন : 'যে পথে বন্ধু বন্ধু : দেশে চলে বন্ধুর সাথে

আমি সেই পথে যাব সাথে।'

* * *

কিম্বা : 'তব তরণী তরঙ্গ করে কত রঙ্গ'

* * *

অথবা : 'তুমি মধুর অঙ্গে নাচো গো রঙ্গে

নূপুর ভঙ্গে হৃদয়ে'

* * *

আরও : 'নয়নে চরণে বসনে ভূষণে গাহো গো

মোহন রাগ রাগিণী।'

অধিকন্তু : 'জটিল পঙ্কিল জীবনের পথে

কেমনে আসিবে নন্দন রথে ?'

পরন্তু : 'আজি বরষে বরষা বিরহ বারি।'

এই অলঙ্কার-প্রীতি অর্থাৎ শব্দালঙ্কারের এই সার্থক-তার উৎকর্ষ হিসেবে বলা যায় :

'ছেঁড়া পাপড়ি ধরে ধরে গেলাম বহুদূরে

পথের মাঝে পথ হারিয়ে ঘরে এলাম ঘুরে।'

আরও দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

যেমন : 'মম জীবন মরণ ধরম শরম

সকলি লীন পুলকে।'

* * *

অথবা : 'নিজে সে নীরব হয়ে রয়

শোনে সে ফুল যে কথা কয়।'

গানের বাণীতে সুরসংযোজনায় রবীন্দ্রনাথ অভ্রংলিহ কীর্তি স্থাপনা করে গেছেন। দেশী-বিদেশী সকলসুরকে মিশ্রিত করে গানের তাল, লয়, ছন্দ, রাগরাগিণী, মীড়, মূর্চ্ছনা সব কিছুকে নতুনভাবে আত্মসাৎ করে রবীন্দ্রনাথ তাকে আধুনিকতার সাজসজ্জায় সজ্জিত করেছেন। তিনি যেমন প্রাচীন অবলুপ্ত সুরকে পুনরাবিষ্কার করেছেন তেমনি চলমান সুরের প্রাণস্পন্দনকে বৈচিত্র্যে, বৈদগ্ধে, বৈভবে শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপের সজীবতা প্রদান করেছেন। তিনি ভাবসঙ্গীতে যেমন ক্লাসিক সুরের বিস্তার সৃষ্টি করেছেন তেমনি লোক সঙ্গীতের উপেক্ষিত সুরছন্দে বিদেশী সুরের স্পর্শ দিয়ে তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করতে গেলে অবশ্য কূলকিনারা মিলবেনা তবে গীতরসিকদের সুপরিচিত কয়েকটি গানের প্রথম চরণ উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

যেমন ভাবসঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

মন্দিরে মম কে আসিল হে।'

... ...

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু'

* * *

'অন্তরে জাগিছে অন্তরযামী।'

* * *

'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু।'

বর্ষাসঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে'

* * *

অাঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডমরু বাজিল গম্ভীর গরজনে।'

লোক-সঙ্গীতের মধ্যে উদ্ধারযোগ্য :

'আমার মন মানে না—দিন রজনী'

* * *

'ভালোবেসে সখী, নিভৃত যতনে
আমার নামটি লিখো—তোমার মনের মন্দিরে।

কিন্তু লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বোধহয় চরম উৎকর্ষ দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের 'মরিলো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে?' এই গানটিতে। আমাদের চিরাগত নায়িকার যে কল্পনা বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাকে নতুন রঙের স্পর্শ দিয়েছেন। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ রাধিকাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টিতে সেই রাধিকার প্রতিফলন নেই বরং অন্য এক নায়িকার নবজন্ম ঘটেছে। অথবা বৈষ্ণব কবিদের যে রাধিকার স্মৃতি প্রায় বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুনর্জন্মদান করেছেন।

গানের কথায় সুরসংযোজনার ক্ষেত্রে যারা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে এইযুগে দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের নামই উল্লেখযোগ্য। আবার দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ন্যায় য়ুরোপীয় সুরের প্রবাহ, নাটকীয় আবেদন বা স্পন্দন অতুলপ্রসাদের সুরে দেখা যায় না। এই বিষয় তিনি একক ও অনন্যসদৃশ। বাংলা গানে বিশেষ কয়েকটি ধারা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। যেমন গজল, লাউনি, কার্জার ইত্যাদি। তাঁর গানে ঠুংরীর চাল প্রাধান্য লাভ করেছে। লক্ষ্ণৌ-প্রবাসের ফলে তিনি উত্তর ভারতের সঙ্গীত-রীতি ও সুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং সেই সুরসম্ভার থেকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করে বাংলা গানে অনুপ্রবিষ্ট করেছেন। তাঁর গান অন্তর্মুখী হওয়ায় ভৈরবী সুর অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। অতুলপ্রসাদের গানে সুরের সারল্যের সঙ্গে রাগরাগিণীর অবিমিশ্রতা এবং তালের অবলীলাক্রম তাকে বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দিয়েছে। তাছাড়া অতুলপ্রসাদের গানে বিদেশী সুরের প্রভাব নেই বললেই হয়। গুজরাটী খাম্বাজ, বৃন্দাবনীসারং, পিলু সাস্তরণ প্রভৃতির আহরণে তাঁর ভজন গানগুলির আবেদন হয়েছে সত্যই অতুলনীয়। উত্তরভারতের বসন্তঋতু, হোলি উৎসব, ফাগুয়া, রঙের ঝাড়ি, ঝুলা তাঁর গানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখযোগ্য :

যেমন.: 'আজি হরষ সরসি কী জোয়ারা!
প্রাণ যেন মিলত কূল কিনারা।'

* * *

অথবা : 'শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে
তোরা আয় গো, কে ঝুলিবি আয়।'

কিম্বা : 'এসেছি অাঁধারে খুঁজিতে তোমারে
নিভায়ে ঘরের আলো
মোহন মুরলী তব হে মম মাধব
শুনো, অাঁধারে বাজে ভালো।'

অতুলপ্রসাদের অন্তরঙ্গ রসিকদের মধ্যে দিলীপকুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন সবচেয়ে বড় বোদ্ধা যাঁদের সমাদর কেবল অকুণ্ঠ ছিল না—অত্যন্ত অকৃত্রিমও বটে। এক চাঁদনী রাতে অতুলপ্রসাদ একটি গান রচনা করেছিলেন যার প্রথম দুই চরণ—

চাঁদনী রাতে কে গো আসিলে!
উজল নয়নে কে গো হাসিলে?

এ গানটি শোনামাত্রই দিলীপকুমার বলে উঠেছিলেন—এ যে একটা সুরের হাওয়া। বাংলায় ঠুংরীর এ আমেজ আপনার আগে কেউই আনেন নি। বিশেষ এ গানটির পেলব কবিত্বের সঙ্গে দেশ রাগিনীর নতুন চাল।' আর একটি গান :

'হেম যমুনায় প্রেমতরী বায়
(কে) ডাকে আমায়—আয় গো আয়
প্রভাতবেলায় সোনার ভেলায়
কেমনে চলে যাবে হায়?'

এই গানটি শুনে দিলীপকুমার মন্তব্য করেছিলেন—'দেশের সঙ্গে পিলুর এ ধরণের মিশ্রন অপূর্ব'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানে বলেছেন 'আমি সেতারেতে তার

বেঁধেছি, আমি সুরলোকের সুর সেধেছি।' এটি নিছক তাঁর গানের কথা নয়—তাঁর প্রাণের কথাও বটে। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে সুরলোকের সকল সুরকে আমদানী করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ যেমন অতি-মানসের আলোককে মানবের মনোজগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথও 'Music of the spheres' সুরলোকের সুরকে ধরে এনেছেন। সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে সঙ্গীতরসিক ধূর্জটিপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের তুলনা করে বলেছেন: "অতুলদা, আপনি বাংলা ভাষায় ঠুংরী এনেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে আপনি যোগসূত্র বজায় রেখেছেন, এই যোগসূত্রের সাহায্যে বাউল, কীর্ত্তন ভাটিয়ালির মালা গাঁথা আপনার মৌলিকত্ব।...রবীন্দ্র-নাথের মৌলিকত্ব আরও উচ্চস্তরের। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাষা ও ভাবের দিক দিয়ে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে তাকে উপযুক্ত নতুন সুরে মূর্ত্ত করা আরো শক্ত। দ্বিতীয়তঃ গত দশপনর বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ সুরে একটা সম্পূর্ণ নতুন ধারা এনেছেন যার সঙ্গীত-মূল্য তানসেনকৃত দরবারী কানাড়া কিম্বা মিয়া কি মল্লার অপেক্ষা কম নয়। একসময় ছিল যখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের ছকে গান বসাতেন। যখন দেশীয় সঙ্গীত অর্থাৎ বাউল, কীর্ত্তন ভাটিয়ালের স্রোত তাঁর প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করল তখনই তিনি নিজের সন্ধান পেলেন, স্বাধীন হলেন।...অবশ্য এ কথা ঠিক যে কোনও ওস্তাদী সুরে তৈরী করলে আপনার গান রবীন্দ্রনাথের গান অপেক্ষা ভালো লাগবে, কারণ আপনার গানের সুর বিশুদ্ধ পান্তের। আপনার গানে খুব বেশী মুসলমানী চালের আমেজ আছে, তবে সে আমেজ ধ্রুপদের মত নয়।"

বাংলা গানের কথায় সুরসংযোজনায় অতুলপ্রসাদ যথেষ্ট কৃতিত্ব ও নবত্ব প্রদর্শন করেছেন তা অনস্বীকার্য্য। তথাপি একথা স্মরণ রাখতে হবে তিনি সর্ব্বপ্রকারে রবীন্দ্রপ্রভাব কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হননি। তাই যাঁরা এই দুই প্রকার গান পাশাপাশি রেখে বিচার করবেন তাঁদের কাছে উভয়ের সুরের হুবহু মিল বা সুরের আঙ্গিকের (layout) সাদৃশ্য খুঁজে পেতে কিছুই বিলম্ব হবে না। বলা বাহুল্য কয়েকটি গানে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সুরকে যে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথের—'সফল করো হে প্রভু আজি সভা' এবং 'তব যে অমল পরশ রস'—এই গান দুটির সুরের সঙ্গে যথাক্রমে অতুলপ্রসা-দের—'এসো হে এসো হে ভারতভূষণ, মোদের প্রবাস ভুবনে' এবং 'তব চরণতলে সদা রাখিও মোরে' গানের সুরের হুবহু মিল আছে। আবার আঙ্গিকের মিল হিসেবে অতুলপ্রসাদের—'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' রবীন্দ্রনাথের—'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটির সঙ্গে তুলনীয়। অধিকন্তু অতুলপ্রসাদের 'কেন এলে মোর ঘরে' 'হরি হে তুমি আমার' যথাক্রমে সুরের আঙ্গিকের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের—'জেনো প্রেম চিরঋণী' এবং 'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ পানে'-র সঙ্গে সমগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় পার্থক্য হিসেবে অতুল-প্রসাদের সুরের সবচেয়ে যে উল্লেখযোগ্য অবদান তা হল এই যে তিনি বিদেশী সুরের সাহায্য তাঁর গানে খুব অল্প পরিমাণেই গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেন দেশী ও বিদেশী দুই শ্রেণীর সুরকে সমন্বিত করে বাংলা গানের প্রাণশক্তিকে দ্বিগুণিত করেছেন, অতুলপ্রসাদ কেবলমাত্র দেশী সুরের আশ্রয়েই তাঁর গীতস্পন্দনকে চিরায়ুতা দান করেছেন। অতুলপ্রসাদের মুষ্টিমেয় কয়েকটি গান (যেমন 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী) ব্যতীত সব রচনার সুর সম্পূর্ণ দেশজ এবং বিদেশী সুরের ছোঁয়া-বর্জ্জিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ উভয়েই দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করে বাংলা গীতিকাব্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও অতুলপ্রসা-দের দেশপ্রেম কিন্তু অভিন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম আত্মবোধ জাগৃতির অন্যতম পন্থা আর অতুলপ্রসাদের দেশপ্রেম জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কারের বর্ণনায়

আত্মহারা। এই কারণে সাধারণ মানুষের কাছে অতুলপ্রসাদের স্বদেশীগানের আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত। একই কারণে তাঁর 'মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা অথবা' হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর' অতুলপ্রসাদের দেশধ্যানের বা প্রাচীন সংস্কৃতির গৌরব বন্দনায় বাঙ্গালীর রসলোকে সবচেয়ে সমাদৃত। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলার বৈষ্ণব পদকর্তাদের রীতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে নিজের প্রতিভার আলোকে 'ভানু সিংহের পদাবলীর' অমর গীতিকাব্য রচনা করেছেন অতুলপ্রসাদ তেমনি 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে' রচনার দ্বারা বিরহীর প্রাণের গভীর আকুতিকে গীতছন্দে রূপায়িত করেছেন যা বিদ্যাপতির যুগে আমাদের কল্পনাকে পৌঁছিয়ে দেয়।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতরাজির সৃজনীমহিমা, বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব, সুরের মাধুর্য্যকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিয়ে কেউ যদি তাঁর একটিমাত্র গানে তাঁর ঐ সকল উৎকর্ষের নির্য্যাস বা নিঃশ্রেয়সকে উপলব্ধি করতে তৎপর হন যাতে রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা, জীবনবেদনা, জীবনপ্রেরণা এবং জীবনপ্রেষণা একাধারে বর্ত্তমান তবে সে গানটি এই :

"আছে দুঃখ' আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা।
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে।
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে॥
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ।
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥"

পক্ষান্তরে অতুলপ্রসাদের যে গানটি রসগ্রাহী ব্যক্তির মানসলোকে সবচেয়ে নাড়া দেয় এবং যাতে তাঁর জীবনবোধ তাঁর সৃজনী-বৈশিষ্ট্য পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয়েছে সেটি এই :

"তুমি গাও, তুমি গাও গো।
গাহো মম জীবনে বসি, বেদনে বাঁধা জীবনবীণা
ঝঙ্কারি বাজাও গো—
তুমি গাও।
তোমার পানে চাহিয়া, চলিব তরী বাহিয়া।
অভয় গান গাহি ভয় ভাবনা ভুলাও।
তুমি গাও।
দগ্ধ যবে চিত্ত হবে এ মরু সংসারে
স্নিগ্ধ করো মধুর সুরধারে।
তোমার যে সুরে ছন্দে পাখিরা গাহে আনন্দে
শিষ্য করি আমারে সে সঙ্গীত শিখাও
তুমি গাও।"

রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন আনন্দের মাঝে অপূর্ণতা নেই, বিরহে বিচ্ছেদ নেই, তাঁর দুঃখ যেমন সান্ত্বনাহীন নয়—অতুলপ্রসাদের গানে কিন্তু সেই অনুভূতি অবর্ত্তমান। তাঁর গানে বিরহ যেমন দীর্ঘস্থায়ী, তার আর্তিও তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। তাই গীতরসিকদের উদ্দেশে তিনি এই মিনতি রেখেছেন :

"আমার করুণ গানে
যদি দুঃখস্মৃতি আনে
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিও আঁখি।"

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এইবার একজন খেলনার দোকানের কর্মী মেয়ের কথা বলি। তাহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। সে তাহার বন্ধুকে বলিতেছিল, শুধু ভালবাসা হইলেই সে বাঁচিতে পারে, তাহার বেশী আর তাহার কিছু দরকার নাই। বড়ই বেদনাদায়ক তাহার অবস্থা। তিন বৎসর পূর্বে এক শনিবার রাত্রে সাধারণ স্নানাগারে ছয় পেনি খরচ করিয়া একটি নাচঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সেইখানে তখন বল্-নাচ চলিতেছিল। লণ্ডনে এরকম বল্-নাচের সাপ্তাহিক বা অর্ধসাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ঘটিয়া থাকে। সাধারণ স্নানাগারের মত এই নাচের আয়োজনও কোনও কোনও ব্যক্তি কিছু লাভের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে। যে সব তরুণ-তরুণীর মন একটুখানি কোমল ও স্নেহাতুর তাহারাই এই জাতীয় নাচঘরের পৃষ্ঠপোষক। তাহারা এখানে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী খুঁজিতে আসে। আমি যে মেয়েটির কথা বলিতেছি সে এখানে এক রেলওয়ের প্লেটপাতা মিস্ত্রির সঙ্গে নাচিতেছিল। সময়টা তাহাদের খুবই আনন্দের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। পরদিন ঐ যুবকটি মেয়েটির কর্মস্থলে সেই খেলনার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সে জানিত ৭টার আগে দোকান বন্ধ হইবে না, তবু সে অনেক আগে আসিয়াছিল। অবশেষে দুইজনের দেখা হইল, এবং মেয়েটিকে সে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে চাহিল। মেয়ে তাহার বাড়ির ঠিকানা পরিষ্কারভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, তথাপি 'অন্যমনস্ক' যুবক পথ হারাইয়া ফেলিল, কিন্তু ভুল পথে চলায় মেয়েটি যে কেন আপত্তি করিল না তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। কত পথ যে তাহারা ঘুরিল এবং অবশেষে হাইড পার্কে পৌঁছিয়া সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল এবং পরে এক গেলাস করিয়া পোর্টওয়াইন পান করিয়া আরও একটুখানি শান্তিলাভ করিল। প্রথমে মেয়েটি উহাতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু যুবকটির পীড়াপীড়িতে অবশেষে রাজি হইল। ইহার পর হইতে যুবকটি প্রতিদিন ঐ খেলনার দোকানে নিয়মিত আসিয়া মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল—সোজা পথে নহে অবশ্যই, যতদূর সম্ভব ঘোরা পথে, যে সব পথ তাহার বাড়িতে যাইতে পার হইয়া যাইবার কোনও দরকারই নাই এমন সব পথে। একদিন মেয়েটিকে সে থিয়েটারে লইয়া গেল, এবং সে-জন্য ৬ শিলিং ৪ পেনি খরচ করিল। অর্থাৎ দুইখানা টিকিট ৪ শিলিং, বরফ ১ শিলিং, দুই গেলাস পোর্ট-ওয়াইন ৮ পেনি, ওমনিবাস্ ৮ পেনি। অবশেষে ঘনিষ্ঠতা একটি ক্রান্তি মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন এবং রাত্রি মেয়ের মিষ্টি চেহারাটি যুবকের মন ভরিয়া রাখিল এবং মেয়েটিরও সেই অবস্থা। ঘড়ি

সেদিন ৭টা বাজিতে এত বিলম্ব করিতেছে কেন, কখন সে বাহির হইয়া যুবকের সহিত মিলিত হইবে। এক রবিবার দুইজনে হাইড পার্কের একখানি বেঞ্চিতে পাশাপাশি নীরবে বসিয়া সারপেনটাইনের জলে বন্য হাঁসদের খেলা দেখিতেছিল। যুবকটিই সে নীরবতা প্রথম ভঙ্গ করিল। সে তাহার প্রেম নিবেদন করিল মেয়েটিকে, এবং বলিল সে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে। মেয়েটি প্রথমে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তাহার পর তাহার দুটি চক্ষু ভিজিয়া উঠিল, অবশেষে যুবকটির প্রশস্ত বক্ষে মাথাটি রাখিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা"। তবে ইহাও বলিল যে সে তাহার পিতামাতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করিতে পারিবে না। যুবক সহজেই মেয়ের পিতামাতার সম্মতি আদায় করিল এবং উহারা পরস্পর বিবাহের জন্য 'এন্‌গেজ্‌ড্‌' হইল, শপথে আবদ্ধ হইল। সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর তাহারা পরস্পর শপথবদ্ধ অবস্থায় রহিল, তাহার কারণ তাহারা বিবাহের পক্ষে কম বয়স্ক ছিল, উপরন্তু ঐ যুবকের উপার্জন এমন ছিল না যাহাতে সে একটি পরিবার পালন করিতে পারে। অভিভাবকেরা এই সব কথাই বলিলেন, অতএব তাহারা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইল। অল্পদিন পূর্বে ঐ যুবক অন্য একটি রেলওয়েতে বেশি বেতনের কাজ পাইয়া এইবার বিবাহের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু হায় পুরুষের অস্থিরমতিত্ব! সাত দিনের ছুটি লইয়া যুবকটি মারগেটে চলিয়া গেল—বলিয়া গেল লণ্ডন শহরের ধোঁয়া দেহ থেকে নিষ্কাশিত করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ফেরান। একটি প্রমোদভ্রমণে বোটের উপর একটি মেয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়, তাহার মুখ আরও সুন্দর, এবং তাহাকে দেখিবামাত্র সে তাহার প্রেমে পড়িয়া যায়। মেয়েটিও তাহার মনোযোগ প্রত্যাখ্যান করে না। তাহাদের সম্পর্ক তখনও কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিতে পারে নাই, কারণ প্রেমিক যুবকের মনে তখন বিশ্বাসভঙ্গের ভয়টা বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কথা হয় তাহারা লণ্ডনে পুনরায় মিলিত হইবে। সে ফিরিয়া আসামাত্র তাহার উদাসীন ব্যবহার আগের মেয়েটির লক্ষ্য এড়ায় না। ক্রমেই যুবকটি মেয়েটির নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, শেষে একদিন অবস্থা চরমে উঠিল যখন যুবকটি তাহার নূতন প্রণয়িনীকে লইয়া তাহার সম্মুখে দেখা দিল। মেয়েটির হৃদয় ভাঙিয়া গেল এ দৃশ্যে, কিন্তু তাহার নারীজনোচিত অহঙ্কার চরমতম ঘৃণার দ্বারা তাহার প্রণয়ীর নীচ ব্যবহারকে অভ্যর্থনা জানাইল। কিন্তু স্ত্রীলোকের হৃদয় হইতে ভালবাসার ছাপ একদিনে মুছিয়া যায় না, ভালবাসা আন্তরিক হইলে তাহার কোমল হৃদয়ে তাহা একটি গভীর ক্ষত রাখিয়া যায়। একটিমাত্র বন্ধুর কাছেই সে তাহার গভীর বেদনার কথা চোখের জলের সঙ্গে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, আর যদি কিছু নাও থাকে তবু শুধু ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়া সে বাঁচিতে পারে।

এরকম ঘটনা অবশ্য সাধারণতঃ যাহা ঘটে তাহার ব্যতিক্রম। এরকম মিলন এবং এরকম অগ্রসর হওয়া সাধারণতঃ পরিণয়েই আসিয়া শেষ হয়। ভালবাসা লাভের জন্য প্রণয়ীর দিক হইতে যে প্রণয় নিবেদনের পালা চলিতে থাকে, সেই সময়টার সঙ্গে যে ভালবাসার স্বপ্নময় অনুভূতি, প্রণয়িনীকে দেখিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, মিলনের সুখানুভূতি, বিচ্ছেদের বেদনা, আশা ও সন্দেহের দোল, এবং অন্যান্য অনেক অপার্থিব আনন্দকর ছোটখাটো বিষয় বিজড়িত, তাহা যখন ভাঙিয়া পড়ে, সেই দিন অতীত হইলে সেই সব সুখস্মৃতি আবার মনে জাগিতে থাকে। প্রাচ্য দেশের যুবকের মনে ভালবাসার সাময়িক মোহ অবশ্যই জাগে, কিন্তু ভালবাসার রোমান্স বা ভালবাসার সঙ্গে দীর্ঘকাল মনে যে রহস্যময়, স্বপ্নময়, অপার্থিব রভসরসের লীলা চলিতে থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা কমই লাভ করিতে পারে। দেশের প্রথা তাহাকে জীবনের একটি মধুর উদ্দীপনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

কিন্তু যাঁহার এই রীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইবার প্রবল যুক্তি রহিয়াছে, তিনি ভারতীয় উপন্যাস লেখক। প্রেমকে পরিহার করিয়া উপন্যাস রচনা হ্যামলেটকে বাদ

দিয়া হ্যামলেট নাটক অভিনয়, অথবা রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ রচনা, একই কথা। সেই জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রাচীন কালের আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে হয়, যেকালে যুবতীরা স্বেচ্ছায় যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন। অথবা তাঁহাকে মুসলমান আক্রমণকারীদের যুগের পটে কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিতে হয়, অথবা আরও পরের প্রাথমিক ব্রিটিশ যুগে, যখন বাংলা পল্লী ডাকাতদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইত, সেই সময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। চার্লস ডিকেনস এ জন্য অপহৃত হইবার আশঙ্কা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপের ঐতিহাসিক রোমান্স লেখকেরা তাঁহার হাতে খুব ভাল ব্যবহার পান নাই।

স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে দেখা যায় প্রাচ্যগণ এই রোমান্সের অভাবে পীড়িত হয় নাই। অন্ততঃপক্ষে পারিবারিক আনন্দের ক্ষেত্রে তাহারা ইংরেজরা তাহাদের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে। পিতামাতা পিতৃব্য খুড়ী পিসি ভাই ভগ্নী শ্যালক জামাতা ভ্রাতুষ্পুত্র পৌত্রপৌত্রী এবং যাবতীয় নিকট বা দূর আত্মীয় সহ যে পরিবার, তাহা ইংরেজের স্বামী স্ত্রী সন্তান ও শাশুড়ি মিলিয়া যে পরিবার তাহা হইতে অধিকতর শান্তিপূর্ণ। ভারতীয় স্বামী স্ত্রী অন্য লোক স্ত্রী হইলে কেমন হইত বা স্বামী হইলে কেমন হইত তাহা তুলনা করিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না, এবং সেই জন্য তাহারা নিজ নিজ ভাগ্য লইয়া খুশি থাকে। শৈশব হইতেই তাহারা একত্র বাড়িয়া উঠে, এবং তাহারা পরস্পরকে পছন্দ করিয়া লয়, এবং অল্প বয়সেই তাহাদের যে সন্তান জন্মে তাহারই প্রতি তাহাদের স্নেহ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আরও একটি কথা, ঝগড়াবিবাদ করিতে ত কিছু তেজের দরকার হয়।

কিন্তু ইহাতে সুখ থাকুব বা না থাকুক, ভারত যদি পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে তাহার বর্তমানের এ অবস্থা চলিতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে মেয়েদের নূতন কল্পনা, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিলে তাহা তাহারা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটুখানি ধৈর্যহীন হইতে পারে, এবং সেজন্য পারিবারিক শান্তিও কিছু বিঘ্নিত হইতে পারে, কিন্তু এ সব সামান্য ত্রুটিকে বেশি রকম বাড়াইয়া দেখিয়া ইহার অপরিমিত সুফলকে অগ্রাহ্য করা প্রভুত্ববিলাসী পুরুষদের দ্বারা চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। শিশু বিবাহ অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে, এবং স্ত্রীলোককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এবং শুধু ভারতে নহে পৃথিবীর সমস্ত দেশে। যাহাই হউক চীনারা তাহাদের patrise potestas বা সন্তানের উপর পিতৃ-অধিকার লইয়া গর্ব করুক, ব্রিটিশ ভারতে কোনো আকারেই থাকা চলিবে না। ভারতীয় পিতামাতাদিগকে একথা মানাইয়া লইতে হইবে যে তাহাদের একজন অসহায় জীবকে বিক্রয় অথবা সম্প্রদান করার কোনও অধিকারই নাই—দানের পাত্র যত উপযুক্তই হউক না কেন। গত একপক্ষ কালের মধ্যে আমার পরিচিত জনৈক ব্রাহ্মণ ৩০০ টাকা মূল্য দিয়া চারি বৎসরের একটি কন্যাকে তাহার মায়ের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়াছে। এ জাতীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং সে সব কথা শুনিলে হিন্দুসমাজের অতিবড় স্তাবকও আতঙ্কিত হইবেন। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নামে হাজার হাজার শিশুকে ক্রয় অথবা বিক্রয় করা হইয়া থাকে। ধর্মই যদি এই দুষ্কার্যের মূলে রহিয়া থাকে তাহা হইলে যাঁহারা ন্যায়েরপক্ষে তাঁহারা এ ধর্মকে সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা যেমন সদ্যোবিধবা বৃদ্ধামাতাকে চিতায় পুড়াইতে পারেন না, দেবতার কাছে নরবলি দিতে পারেন না, তেমনি ছোট মেয়েকে কিনিতে অথবা বিক্রি করিতে পারেন না।

কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি এই যে তাহারা শিক্ষা পাইলেই ভ্রষ্টা হইবে। আমি বলি এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অনেক ইউরোপীয় প্রথা আমি সমর্থন করি না বটে, এবং তাহাদের রীতিনীতি এদেশে আসুক তাহাও চাহি না, কিন্তু এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতেছি

ইউরোপের মেয়েরা তাহাদের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত স্বাধীনতা এবং সকল বিষয়ে পরনির্ভরতা ত্যাগ সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ দুর্নীতি আছে, তাহা হইতে তাহা বেশি নহে। কলকাতার ঝিদিগের আচরণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ, আর লণ্ডনের বারাঙ্গনাদের আচরণের উপর নির্ভর করিয়া ও-দেশের নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ, একই জাতের। নৈতিক বিচারে নিষ্কলঙ্ক থাকা ও সম্মানরক্ষা করা ভারতীয় নারীর কাছে যতটা মূল্যবান্, ইংরেজ নারীর পক্ষেও ততটা মূল্যবান্। নারীর কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে প্রবল নিষ্ঠার উপরে ইংরেজ পুরুষের স্বতঃই একটা নির্ভরতা আছে। যদি না থাকে, তবে ইংরেজ নারী তাহা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার শক্তি রাখিয়া থাকে। ভারতীয় নারী যে নমনীয়তা, অহঙ্কারহীনতা, সুরুচি, স্নেহপ্রবণতা, ধর্মপরায়ণতা, আত্মসম্মানবোধ, সদ্‌গুণপ্রিয়তা প্রভৃতির স্বভাবতঃই অধিকারী তাহাতে তাহাকে ঘরে তালাবদ্ধ না রাখিলে তাহাকে বিশ্বাস নাই, সে সমস্ত গুণই হারাইয়া বসিবে এরূপ মনে করা আমাদের পক্ষে অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। মোট কথা, যে নারীকে বিশ্বাস করা যাইবে না, তাহাকে পালন করিয়াই বা লাভ কি? ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানীরা স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ-বন্ধন পবিত্র বন্ধন। সম্ভোগের নহে, মানুষের জীবনের কর্তব্যের দাবীতে এই বন্ধন। ইহা ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্যের বন্ধন, আত্মার সঙ্গে আত্মার বন্ধন। নরনারীর সম্পর্কের বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব পৃথিবীর অন্য কোথাও কেহ এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। তথাপি প্রাচীন যুগের সেই ব্রাহ্মণ ঋষিদের অরণ্যগৃহে যে আলো মৃদুভাবে জ্বলিয়াছিল, বহির্জগতের গভীর অন্ধকারে তাহার দীপ্তিকম্পন মুহূর্তের জন্যও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বাহিরে সমস্তই অন্ধকার, এবং তখন হইতে যতগুলি সভ্যতার স্তর আসিয়াছে তাহাতে বিচিত্র জাতির বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রবলভাবে সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছে। অরণ্যের সেই প্রজ্বলিত আলো আজ নির্বাপিত। অতএব আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, যে সম্মানজনক সম্ভ্রম ব্যবহার ইউরোপের নারীগণ পাইয়া থাকেন, আমাদের দেশে তাহার সাক্ষাৎ মেলা ভার। এখানে কোনও যুবতী বর্তমান প্রথাকে অমান্য করিয়া দেখুক, তার প্রতি শিভাল্‌রি কেহ দেখাইবে না, বর্বরোচিত ব্যবহার করিবে। তাহার এই অভিনব ব্যবহার, এবং সে যে এরূপ ব্যবহার করিতেছে ইহা অসম্মানজনক ইহাই বিবেচিত হইয়াছে এতকাল, তাই তাহার এরূপ সাহস দেখিলে তাহাকে সবাই অন্যায়ভাবে সন্দেহ করিবে, মনে করিবে সে ভ্রষ্টা। এবং সেজন্য তাহাকে যতভাবে পারে উত্যক্ত করিবে। পুরুষ তাহার আদিমকালের পুরুষদের নিকট হইতে স্ত্রীলোক সম্পর্কে যে ধারণা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, যাহা এখনও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেছে, তাহা এক-মাত্র দূর হইতে পারে যদি সে স্বভাব-সরল মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। মেয়েরা এখন স্বাধীনভাবে পথে বাহির হইলে তাহাদিগকে চারিদিকের অতি নোংরা পরিবেশকে ঘৃণা করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হইবে। কারণ জাতীয় চরিত্র অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই ত্রুটিতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সময়ের পূর্বেই, এমন অবস্থায় আমাদের মধ্যে যাহারা দুঃসাহসী হইয়া, যেখানে গভীর অন্ধকার ছিল, সেখানে সহসা আলোর প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে, তাহাকে একটা বেদনাদায়ক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া কিছুকাল চলিতেই হইবে। তাহাদিগের জয় হউক। স্ত্রীলোকদের এই অস্বাভাবিক অবস্থা আমাদের দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। ইংরেজ মায়ের মত আমাদের মা হোক, তাহার মত সে আমাদের সন্তান পালন করুক, তরুণীরা দুর্দান্ত যুবকদের মহৎ কাজে প্রেরণা দিক, স্ত্রীগণ স্বামীদের নিরাপদে চালনা করিয়া জীবনের আবর্ত উত্তীর্ণ করিয়া দিক, সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন মহিলারা আমাদের

গোল্লায়-যাওয়া সমাজকে পরিমার্জিত, পুনরুজ্জীবিত এবং বলিষ্ঠ করিয়া দিক—তাহা হইলে মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে।

আমাদের লণ্ডন পৌঁছিবার পরের দিন দেখিলাম, 'ডেলি নিউজ' খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছে যে, মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন এইবার আয়ার্ল্যাণ্ডে উন্নত ধরণের শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য পার্লামেণ্টে একটি বিল উপস্থিত করিতেছেন, এবং ইহার দ্বারা ঐ হতভাগ্য দেশের সকল অশান্তি ও বিবাদ চিরতরে মিটিয়া যাইবে। ইহাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিবে, এবং ইংল্যাণ্ডের সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডকে চির সখ্যসূত্রে বাঁধিবে। আমরা মাসখানেক বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে প্রথম পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদের গর্ভে কোন্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত লুকাইয়া আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ইংরেজসমাজে ইহার জন্য যে ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘটিবে বাহিরে তাহার কোনও লক্ষণই দেখিলাম না, দূরাগত কোনও শব্দও কানে আসিল না। কিন্তু আমাদের ভুল হইয়াছিল। বাহিরের শান্তভাবের তলায় তলায় রক্ষণশীল লণ্ডনের মন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। ঐ বৃদ্ধ গ্ল্যাডস্টোন আরও কি অনিষ্ট করিয়া বসে তাহা ভাবিয়া উদ্বেগের আর সীমা ছিল না। গ্ল্যাডস্টোনের পরিকল্পিত প্রস্তাবসমূহের খবর ইতিমধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিপক্ষ দল চিৎকার করিতেছিল, গেল গেল, আয়ার্ল্যাণ্ড হাতছাড়া হইল। আমাদের আসিবার চারদিন পূর্ব্বে গিল্ড হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভায় আয়ার্ল্যাণ্ডকে 'হোম রুল' প্রদানের বিরোধিতা করিয়া প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া এই বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করা হইয়াছিল, সেইদিন সকাল হইতে পার্লামেণ্ট হাউসে মেম্বার ও দর্শকদের কি প্রকার ভিড় হইয়াছিল, বিলের কি রকম অভ্যর্থনা লাভ ঘটিয়াছিল, কিভাবে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল, পার্লামেণ্টের অধিবেশন কিভাবে ভাঙিল, সে সব ইতিহাসের কাহিনী, এই বিবৃতির পক্ষে তাহা অবান্তর। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন বিলটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সমর্থন করিতে গিয়া ভুল করিয়াছিলেন, সেই বিষয়টিই আমার মনে সে সময়ে বিশেষ ছাপ আঁকিয়াছিল। তাঁহার বিরোধীরা বিদ্রূপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এরূপ নিরেট নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ইহার পূর্ব্বে কি কোনও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ উচ্চারণ করিয়াছেন? ন্যায়! সুবিচার! যেন একমাত্র ভাবাবেগ দিয়া পৃথিবী শাসিত হইতেছে! বিদেশী বেদখলকারীদের হাত হইতে যে সব দেশপ্রেমিক দেশকে মুক্ত করিতে চাহিতেছে তাহাদের হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে অথবা নিরপরাধ শহরের উপর গোলাবর্ষণের সমর্থনে ওকালতি করিবার জন্য এ জাতীয় মহৎ নীতিকথা তুলিয়া রাখা উচিত ছিল।" এ রকম ব্যাপক একটি নীতির ব্যাপারে—যেখানে স্বার্থপরতাকে প্রায় সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে—সেখানে মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন আপন দেশের লোকের ন্যায়বিচার বিষয়ে একটু অতিবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ন্যায়ের পক্ষে অতি জোরালো যুক্তি থাকিলেও তাঁহার স্বদেশবাসীকে বুঝিতে তাঁহার ভুল হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এরূপ একটি জরুরি যুগান্তকারী বিষয়ে ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়প্রিয়তার উপরে যে গ্ল্যাডস্টোনের মত একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন তাহাতে ইংরেজ জাতির গৌরবই সূচিত করে।

পূর্ব্বদেশসমূহে এমন জিনিস অজ্ঞাত। আমাদের দেশে যখন সুখ-শান্তির যুগ ছিল, যখন অনেক বিষয়ে আমরা নৈতিক মানের উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলাম, এবং যে স্তরে ইউরোপীয়গণ এখনও উঠিতে পারে নাই, সেই যুগেও আমরা কখনও এরূপ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কথা চিন্তা করি নাই। চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে জেনিভা কন্‌ভেন্‌শনের ফলাফলকে শিশু বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের নৃপতিগণ পররাজ্য হরণ করাকে কখনও পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন না। অথবা পরাজিত জাতির জনগণের অবনত স্বাস্থ্য, শিক্ষার

অভাব দূর করিবার জন্য বা নৈতিক মান উন্নত করিবার জন্য নির্দ্দেশাদি পাঠাইয়া অথবা নূতন কোনও বিধান রচনা করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের সমান স্তরে উন্নীত করিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। যুদ্ধ করিয়া দিগ্বিজয় করাতে ধর্ম্মের অনুমোদন ছিল, এবং ঐখানেই সব শেষ। বিজয়ীর আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। একমাত্র ইংরেজ জাতির বিধানসমূহ হইতেই আমরা নীতির দিক হইতে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি সমালোচনা করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমরা সব বিষয়েই চরমে গিয়া উপস্থিত হই। নিজেরা দুর্ব্বল এবং ক্ষমতাহীন, তাই আমরা বিবেচনাহীনভাবে শক্তিশালী জাতির ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করি। মানুষের চরিত্র স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ, সেজন্য তাহাকে আমরা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা আশা করি ইংরেজ সর্ব্বদা ন্যায়সংগত কাজ করিতে বাধ্য। আমরা আমাদের স্বর্গবাসী দেবতাদের নিকট হইতে যতটুকু প্রত্যাশা করি, ইহা তাহা অপেক্ষা বেশি! সমুদ্র মন্থনের কথা স্মরণ করুন। সেখানে দেবতা ও অসুরদের মিলিত শ্রমে যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহা হইতে অসুরদিগকে প্রতারণা পূর্ব্বক দেবতারা বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানের যে-কোনও আইনজীবী বলিবেন, আইনতঃ এবং ধর্ম্মতঃ তাহার অংশ অসুরদিগের প্রাপ্য। অথবা স্মরণ করুন দ্রৌপদীর রূপমুগ্ধ দেবতারা তাঁহার উপর কি শঠতার খেলাই না খেলিয়াছিলেন, যদিও তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যদি ইংরেজ হইতাম, তাহা হইলে ঈজিপ্ট ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজদের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিয়া তাহাদের শিরে যে তিরস্কার বর্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমি গর্ববোধ করিতাম। আমি ইহাকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বলিয়া মনে করিতাম। প্রাচ্যদেশবাসীরা ইংরেজচরিত্রকে মনে মনে তাহাদের নিজেদের দেবতাদের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে। অন্যায় কোনও কাজকেই আমি সমর্থন করি না, পৃথিবীটা যেমন, তেমনিভাবেই তাহাকে মানিয়া লই, এবং নিজেদের স্বার্থে এমন অবস্থায় পড়িলে কতখানি ন্যায়ের পথ হইতে আমরা সরিয়া যাইতাম, সেকথা ভাবিতে চেষ্টা করি। জাতীয় নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে সমালোচনা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা বুদ্ধিমানের সমালোচনা হওয়া চাই।

আমার মতে আমাদের দেশে যাকে বলা হয় পবিত্রভাবে অন্যায় করা, এমন কি সেদিক দিয়া বিচার করিলেও ইংরেজ জাতিকে প্রশংসা করিতে হয়, কারণ ইহাতে প্রমাণ হয়, দেশে অনেক সুচিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে এরূপ কাজ করিতে হইলে ধাপ্পা দিবার এবং প্রতারিত করিবার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে এই দল সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং প্রতি বৎসরই ইহার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা না হইলে দাসত্বপ্রথা দূর হইত না, ক্যাথলিকদের অক্ষমতা দূর হইত না, আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ তাহার জন্য ব্যবস্থিত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না, অথবা অ্যালাবামার সমস্যাও বিনাযুদ্ধে মিটিত না। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন এই দলকেই আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু হয় তিনি ইহার ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেখিয়াছিলেন, অথবা তিনি বেশি দাবি করিয়া বসিয়াছিলেন। কারণ আয়ার্ল্যাণ্ড সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এই চরম আত্মত্যাগ ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে আশা করা চলে না, যদিও মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের বিলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ভুল বোঝার ফলেই এই বিরোধিতা। ইংল্যাণ্ডের এত কাছে একটি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস। কিন্তু মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন তাঁর বিলে এই বিচ্ছিন্নতা কখনও চাহেন নাই।

মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন যে নীতিকে সমর্থন করিতেছিলেন তাহার প্রধান শক্তি ব্রিটিশ স্বার্থের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল। এবং সে নীতির মধ্যে যেটুকু ন্যায়নিষ্ঠার কথা ছিল তাহা ছিল নিতান্তই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিবেচনা। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন প্রথমটির উপরে বেশি জোর না দিয়া দ্বিতীয়টির উপর অতি বেশি জোর দিয়াছিলেন, সেই জন্যই তা ব্যর্থ হইল। বাহিরের

কোনো দর্শক যদি সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন, গ্ল্যাডস্টোন খুব সহজেই বিরোধীদের উত্তেজনা প্রশমিত করিতে পারিতেন, এবং সম্মানের সঙ্গে, আরও প্রবল-ভাবে, এবং সাফল্যের অধিকতর সম্ভাবনার সঙ্গে, তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে যে তাঁহার আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নাই, আয়ার্ল্যাণ্ডকে শান্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং দুই দেশের মধ্যে সহৃদয়তার বন্ধনই পরিকল্পিত, তাহা দেখাইয়া দিতে পারিতেন। যে কোনও উপায়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এবং সাধারণ-ভাবে সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান দরকার মনে করি, কারণ এই বিরাট শক্তি—যে শক্তি পৃথিবীর চারিদিকে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, তাহা ধ্বংস হইলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হইবে, এবং রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসে যে বিপৎপাত ঘটিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বিপৎপাত ঘটিবে। এমন কি সভ্যতাকেই ইহা কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া দিবে। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন ও তাঁহার পার্টি পরে তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেশ জুড়িয়া "আয়ার্ল্যাণ্ড গেল গেল" কোলাহলে "কাগজে বর্ণিত ইউনিয়ন"-এর কথা কোথায় ডুবিয়া গেল। আয়ার্ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ইউনিয়ন আছে কি?—কখনও ছিল কি? না, ছিল না। আয়ার্ল্যাণ্ডকে সব সময়ে পরাজিত এবং অধিকৃত দেশরূপে গণ্য করা হইয়াছে। তাহার নিজস্ব একটি পার্লামেণ্ট ছিল কিন্তু তাহার কোনো স্বতন্ত্র ক্ষমতা ছিল না। মাত্র সতের বৎসরের (১৭৮৩-১৮০০) জন্য ছিল। স সময়ে '২৩-জর্জ-৩, অধ্যায় ২৮' দ্বারা আইন ও বিচার বভাগীয় পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী বদ্রোহের ফলে সে সময়টা ছিল অব্যবস্থিত, অতএব এই ক্ষমতার পরীক্ষা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। দশে বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল, কখনও তাহা প্রকাশ্যে, খনও গোপনভাবে। সাতশত বৎসর পূর্ব্বে চতুর্থ পোপ য়াড্রিয়ান ঐ দেশের জমি অ্যাংলো-নরম্যানদের নিজে-দর মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার অধিকার দিয়াছিলেন।

সেই সময় হইতেই আয়ার্ল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের যখনই ঘরে বা বাইরে কোনও সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার সুযোগ লইতে ছাড়ে নাই। ইংল্যাণ্ড যতকাল প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিরূপে গণ্য ছিল, ততদিন আয়ার্ল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অশান্তি অগ্রাহ্য করা চলিত, কিন্তু যুদ্ধ-শক্তিতে ইউরোপের দেশগুলি ইংল্যাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে, সে এখন আর আয়ার্ল্যাণ্ডকে বর্তমান অবস্থায় থাকিতে দিতে পারে না। আয়ার্ল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে ইংল্যাণ্ডের সংগে যুক্ত করিতেই হইবে। ইহার জন্য মাত্র দুইটি পথ উন্মুক্ত আছে। তাহার একটি হইতেছে মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বন্ধুত্বের পথে অগ্রসর হওয়া। আর অন্যটি হইতেছে জার্মানরা পরাজিত আলসাস প্রদেশের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে সেইরূপ করা। অর্থাৎ আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদিগকে আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেশটি ইংরেজের দ্বারা ভরিয়া তোলা। কিন্তু এরূপ একটি চরম পন্থা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আইরিশ-দিগকে রাষ্ট্রে শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরূপে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি তাহারা এ সুযোগের অপব্যবহার করে তাহা হইলে সমস্ত জগৎ তাহাদিগকে ধিক্কার দিবে এবং তখন ইংল্যাণ্ড তাহার আত্মরক্ষার জন্য যদি অশান্ত লোকদের সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে তাহা হইলে সে সকলের সমর্থন পাইবে। প্রথমতঃ ইংল্যাণ্ড যথেষ্ট প্রবল, সুতরাং আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার সে করিতে পারে। আর যদি দেখা যায় তাহা ব্যর্থ হইল, তখন সে তাহাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। তৃতীয় পথ, আধা-অনিচ্ছাজাত বলপ্রয়োগ, এবং ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন, কিন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর এবং অকারণ সময় নষ্ট। শেষ পর্যন্ত ইহাতে কোনও ফল লাভ হয় না। আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পর্কে যে বিতর্ক চলিতেছে তাহা ভারতবাসীরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে। কারণ তাহারা জানে এমন দিন আসিতেছে—এবং সে দিন যত দূরেই থাক—ইংল্যাণ্ডকে আরও বৃহৎ হোম রুল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে;

—এবং সেটি ভারতের জন্য হোম রুল। ইংল্যাণ্ডের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া কোনো ভারতীয়েরই কাম্য নহে, ভারতীয়ের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্খা ব্রিটিশ কলোনির সুবিধাগুলি ভোগ করা। তাহারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের জাতীয়করণ চাহে।

একজন ভারতীয়ের চোখে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে বসিয়া এখানকার এই রাজনৈতিক তৎপরতা, কর্মব্যস্ততা ও উত্তেজনা দর্শন করা একটি অভিনব ঘটনা। পূর্ব্ব দেশসমূহে কমনওয়েলথ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে রাজ-ব্যক্তিত্বই একমাত্র নীতিনির্দ্দেশকরূপে গণ্য। দেশের মালিক রাজা, তিনি তাঁহার খুশিমত দেশটিকে বিক্রয় করিতে পারেন, কাউকে বিলাইয়া দিতে পারেন, দেশের ভাগ্য লইয়া জুয়া খেলিতে পারেন। ভারতের যখন সুদিন ছিল, এ রকম ঘটনা তখন ঘটিয়াছে, এবং তখন লোকেরা পৌরুষ দেখাইয়া তাহারা প্রতিবাদ জানায় নাই, তাহার পরিবর্তে তাহারা ঘরে বসিয়া নিজের মাথার চুল ছিঁড়িয়াছে এবং স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের লোকের আচরণ অন্য জাতীয়। সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি রাষ্ট্রশক্তির এক একটি অঙ্গ এবং অংশ। তাহারা নিজেদের মূল্য জানে, দায়িত্ব বোঝে, এবং তাহারা বিশ্বাসভাজন। আয়ার্ল্যাণ্ডের হোম রুলের বিষয়ে যখন বিতর্ক চরমে উঠিয়াছিল তখন জনসাধারণ যে সম্মানজনক ব্যবহার করিয়াছিল তাহা অবশ্যই একজন ভারতীয়ের পক্ষে আনন্দদায়ক। থিয়েটারে, রেল-গাড়িতে, ওম্নিবাসে এবং অন্যান্য সমস্ত স্থানে আলোচনার বিষয় গ্ল্যাডস্টোন, হোম রুল, ইউনিয়ন ও সেপারেশন। সেপারেশন সর্বনাশ, আয়ার্ল্যাণ্ড পৃথক হইয়া যাইবে? ফ্যাশানেবল জেণ্টলম্যানগণ তাঁদের ক্লাবে, বণিকেরা তাঁহাদের অফিসঘরে, যন্ত্রশিল্পীরা তাঁহাদের কারখানা ঘরে, ক্যাবচালকেরা ক্যাবে বসিয়া, রেস্টোরাণ্টে পরিবেশক পরিবেশিকাগণ রেস্টোরাণ্টের গুপ্তপ্রকৃতির লোকেরা পানালয়ে বসিয়া, রেলওয়ে পোর্টারগণ, খবরের কাগজের বিক্রেতাগণ, প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লইয়া সব সময় আলোচনা করিতেছে। লণ্ডনে এক লোককেও দেখিলাম না যে গ্ল্যাডস্টোনকে সমর্থন করে তাঁহার অনুগামীগণ মফঃস্বলবাসীগণ, বিশেষ করিয়া স্কটল্যাণ্ডবাসীরা। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের সম্পর্কে যা পর্যন্ত যাহা শোনা গেল তাহার অর্ধেকও যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে মনে হইবে তাঁহার অপেক্ষা বড় প্রতারক পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করে নাই পক্ষান্তরে তাঁহার যাহারা সমর্থক তাহারা গ্ল্যাডস্টোনকে প্রায় দেবতা মনে করে। একদিন আমি এক খণ্ড পেলমেল গেজেট কিনিয়াছিলাম সাউথ কেন্সিংটন রেলওয়ে স্টেশনে। সেখানে একটি লোক দাঁড়াইয়া ছিল সে আমার হাতে কাগজ দেখিয়াই মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনকে অকথ্য ভাষায় গাল পাড়িতে লাগিল। সে যাহা সব বলিয়াছিল, তাহার ভিতরের একটি কথা—মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন "বুড়ী ধোপানী"। ইহা শুনিয়া একজন বলিল, "তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে তাঁহার হাত দুটি নিষ্কলঙ্ক আছে।" দলগত সূক্ষ্ম রাজনীতিতে এখনও আমরা অভ্যস্ত নহি, সেজন্য মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের বিল উপলক্ষে দেশের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা গেল, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশ্য এই উত্তাপ কমিয়া যাইবে, আয়ার্ল্যাণ্ড হোম রুল পাইবে, এবং দুই দেশের সংযুক্তি কাগজেই আবদ্ধ থাকিবে না, হৃদয়েরও মিলন ঘটিবে, এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা এই উন্মাদনার যুগ স্মরণ করিয়া তখন হাসিবে। ১৭৮০ সনে গ্রাট্টান বলিয়াছিলেন—(গ্রাট্টান আইরিশ আইনজীবী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ) "আমি আর কিছুই চাহি না, আমি আমার স্বদেশীদের সঙ্গে শুধু স্বাধীনতার হাওয়া নিশ্বাসে টানিতে চাহি। তোমাদের শৃঙ্খল ভাঙা ও তোমাদের গৌরব চিন্তা করার বাহিরে আমার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। যতদিন পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের দীনতা কুটিরবাসীর ছিন্নবস্ত্রে ব্রিটিশ শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্ করিতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট থাকিব না। সে বিবস্ত্র থাকিতে পারে, কিন্তু সে শৃঙ্খলিত থাকিবে না। আমি দেখিতেছি সময় আসিয়া গিয়াছে, প্রাণ জাগিয়া

উঠিয়াছে, ঘোষণার বীজ বপন করা হইয়াছে; এবং যদিও উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণ মত পরিবর্তন করেন, উদ্দেশ্য টিকিয়া থাকিবে, এবং সাধারণ্যে ভাষণদানকারী বক্তার (প্রোটান নিজে আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন) মৃত্যু হইলেও তিনি যে অনির্বাণ অগ্নিশিখা বহন করিতেছিলেন তাহা বাহককে অতিক্রম করিয়া জ্বলিতে থাকিবে, এবং স্বাধীনতার নিশ্বাস পুণ্যাত্মাদের বাণীর মতই তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে থামিবে না।" মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনও এখন এই জাতীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন।

আমাদের লণ্ডন পৌঁছিবার পরেই আমরা, নিহিলিস্টদের একটি সভা লণ্ডনে হইতেছে এই মর্মে একটি সংবাদ পড়িয়াছিলাম। (ইহারা না নাস্তিবাদী)। একজন ভারতীয়ের পক্ষে একজন জীবন্ত নিহিলিস্টকে দেখা কৌতূহলোদ্দীপক। সভা যেখানে হইতেছিল সেখানে আমি গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পৌঁছিবার পূর্বেই সভার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। নিহিলবাদ কি বস্তু সে বিষয়ে আমার মনে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। তাহারা কি চাহে তাহাও জানি না। অতএব তাহারা বিপথগামী একদল উগ্রপন্থী, অথবা মানবকল্যাণকামী কোন দল যাহারা অন্যায়ভাবে তাহাদের সময়ের বহু পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছে তাহা বলিতে পারিলাম না। যাহাই হউক এরূপ দৃঢ়নিষ্ঠ উদাসীন মানবযূথ পৃথিবীতে সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। লোকে আত্মবিসর্জন দেয় বিশেষ একটা উদ্দেশ্য লইয়া। কেহ স্বর্গ কামনায় অবর্ণনীয় দুঃখ বরণ করিয়া মারা যায়। তাহার মৃত্যুর প্রেরণা যোগায় স্বর্গ। তাহার ধারণা মৃত্যুর পর তাহার আত্মা স্বর্গে উড়িয়া যাইবে। গাজি মুসলমানরা স্বর্গে সুন্দরী হুরি, অমৃতের স্ফটিক ঝর্ণা ও অন্যান্য নানা সুখ লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করে। হিন্দু নারী নিজেকে পুড়াইয়া মারে পরজীবনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া। দেশপ্রেমী এবং যোদ্ধা মৃত্যু বরণ করে দেশের জন্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়া এবং যে কারণের জন্য মৃত্যু বরণ করিতেছে তাহা ন্যায়সঙ্গত এই ধারণা লইয়া। কিন্তু নিহিলিস্টের মনে কোন্ আশা? নিহিলিস্ট পুরুষ অথবা নারী সকলেই আত্মা অথবা ঈশ্বর এবং ভবিষ্যৎ জগৎ বিষয়ে বিশ্বাসহীন। নিহিলিস্ট পুরুষ অথবা নারী (নারীর সংখ্যাই বেশি) আত্মোৎসর্গ করে একটি অলীক ধারণার বশবর্তী হইয়া। খুবই দুঃখের বিষয় যে, ইহাদের আত্মোৎসর্গ নিরপরাধের রক্তে কলঙ্কিত। একটি ধারণার জন্য লড়াই করা অথবা প্রাণ দেওয়া ভারতীয় মনের পক্ষে কল্পনাতীত। কিন্তু এ ব্যাপার ইউরোপে প্রায় সর্বজনীন, সেখানে কোনো একটি নীতির জন্য মানুষ প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিতে সর্বদা প্রস্তুত। একটি বালকের সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা বলি। সে যেভাবে আহত হইয়াছিল, তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে কিভাবে চোখের পাশে ক্ষতচিহ্ন আঁকিল জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, অন্য একটি ছেলের সঙ্গে তাহার লড়াই হইয়াছে। সে বলিয়াছিল "তোর বোনের চোখ টেরা।" তাই তাহাকে আমি আক্রমণ করিয়াছিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সত্যই কি তোমার বোনের চোখ টেরা? সে বলিল, না, না, আমার কোনও বোনই নাই। তাহা হইলে লড়াই করিতে গেলে কেন? সে বলিল, আমি নীতির জন্য লড়াই করিয়াছি। বোন থাকুক বা না থাকুক সে কেন বলিবে যে তোর বোনের চোখ টেরা?—লড়াই করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি বটে।

গৌরবরণ

শ্রীসীতা দেবী

মানুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু সাধ থাকে, কারো বা বেশী, কারো বা কম। গরীব মানুষের সাধ মনে উঠে মনেই মিলিয়ে যায়, কারণ সে জানেই যে তার সাধ পূর্ণ হবার নয়। সংসার, সমাজ অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে রেখেছে, তা পার হওয়া কোনোদিনই তার সাধ্যে কুলোবে না। বিত্তবান্ ঘরে যার জন্ম সে প্রাণপণে চেষ্টা করে সাধ পূর্ণ করতে, যদি না নিয়তি দেবী বাধা দেন। তা হলেও সে সহজে হাল ছাড়ে না।

গুপ্তবাড়ীর তমালিনী ঠাকুরাণীর হ'ল সেই দশা। বেশ বড়লোকের মেয়ে, তবে বাপের বাড়ীর রূপোর যত নামডাক, রূপের তত নয়। তমালিনী দস্তুর মত কাল, মুখশ্রীও ভাল নয়। অন্য আর-এক বোন ততটা কাল নয়, তার বিয়েতে তত ঠেকতে হয়নি। তমালিনীর বেলা অনেক খোঁজাখুঁজি করতে হল। যেমন তেমন পাত্র হলে ত চলবে না, বেশ উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্র যদি বা জুটল ত দর-দস্তুর করতে হল অনেক দিন ধরে। শেষে অনেক টাকা খসিয়ে তবে তমালিনীকে পার করা গেল। শ্বশুরবাড়ীর লোকগুলি নিতান্ত মন্দ নয়। বউ দেখতে মোটে ভাল নয়, এ মন্তব্য খানিকটা শুনতে হল বই কি, তবে অন্য কোনোদিকে তার সঙ্গে কেউ বিশেষ একটা খারাপ ব্যবহার করল না। কাল মেয়ে বটে, তবে তার বাপ টাকা ঢেলে দিয়েছে অজস্র, কাজেই তাকে বেশী দুর-ছাই করা চলবে না, এটা সবাই ধরে নিল। এমন কি স্বামী নবীনকৃষ্ণও বাইরে কোনো অপছন্দর ভাব প্রকাশ করলেন না।

তমালিনীর মনের ভিতরটা কিন্তু চাপা অভিমানে ভরে গেল। মানুষের গায়ের রংটাই কি সব? তার আর কিছুর কোনো মূল্য নেই? বেশ, সেও এখন থেকে এটা মনে রেখে চলবে। রূপ আর রূপোই সব, আর কিছুকে কোনো দাম সেও দেবে না। মায়ের উপর রাগ হল, জানেন কেবল ঠাকুর-ঘরে বসে ঘণ্টা নাড়তে আর রান্না-ঘরে বসে হাঁড়ি ঠেলতে। আজকাল কতরকম ওষুধ-বিসুধ বেরিয়েছে, কত প্রসাধনের জিনিষ বেরিয়েছে, তাতে শ্যামবর্ণও কত চকচকে হয়ে ওঠে। সে ত নিজের চোখে পাড়ার শৈলীকে দেখেছে। তারই মত ত কাল ছিল শৈলী, এখন কেমন পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেজে গুজে বেরোলে কেউ নাক সিঁটকোবে না। আর বাবার কথা ত ছেড়েই দাও, তিনি টাকা উপায় করেন বটে কিন্তু সে টাকা ভোগে লাগছে কার? খালি মেয়ের শ্বশুর-বাড়ীর থলি ভরাট হচ্ছে। যাক্, বিয়ে যখন হল, তখন তার ছেলেপিলেও হবে, সংসারও হবে, কিন্তু আর সে ঠকবে না কোনোখানে।

তমালিনীর সংসার বেশ কিছুদিনের মধ্যেই ভরে উঠল। পরে পরে দুটি ছেলে হল, বছর চারের মধ্যেই। শ্বশুর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শাশুড়ীকে অনেক সময় দিতে হতে লাগল তাঁর শুশ্রূষার জন্যে, কাজেই

সংসারের ভার অনেকটা এসে পড়ল তমালিনীর হাতে। বাড়ীর ঝি-চাকরদের একটু আশা ছিল যে বউদি ত ছেলেমানুষ, তাকে সহজেই ঠকান যাবে। কিন্তু কার্য্য-কালে দেখা গেল বউদির মুঠি অনেক বেশী শক্ত, গিন্নী-মায়ের চেয়ে। গিন্নীমা একটু ভালমানুষ গোছের, অঙ্কশাস্ত্রটাও তত জানা নেই, মোটামুটি একটা হিসেব তাঁকে বেশ বুঝিয়ে দেওয়া যায়; অত বিশদ বিবরণ তিনি শুনতে চান না, শুনলেও দু-চার পয়সার এদিক ওদিক যে বিশেষ ধরতে পারতেন, তা নয়। কিন্তু তমালিনী বিদুষী না হলেও যোগ-বিয়োগ ভাল মতেই জানতেন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিল না।

বুড়ী ঝি মোক্ষদা বলল চাকর কানাইকে, "বাবাঃ, ইনি দেখি সেরের উপর সওয়া সের! গিন্নীমার কাছ থেকে দু' পয়সা এদিক ওদিক হলে কিছু এসে যেত না। আমি ত পানের খরচটা চালিয়েই নিচ্ছিলুম।"

কানাই বলল, "এরা হল গে আজকালকার ইস্কুলে লেখাপড়া শেখা মেয়ে, এদের কাছে হিসেবের গরমিল হবার জো আছে?"

মোক্ষদা ঠোঁট উল্টে বলল, "আহা, কত না লেখা-পড়া। ইস্কুলে তিন চারটে কেলাশ হয়ত পড়েছে। ও ত আমাদের বস্তির মেয়েরাও আজকাল পড়ে। গিন্নীমা বলেছিল না, দাদাবাবুর বিয়ের সময় কলেজে পড়া মেয়ে আনবে না। তারা গুরুজনকে ভক্তি ছেদ্দা করে না।"

কানাই বলল, "আবহাওয়াই আজকাল এইরকম। পাঠশালেই পড় আর কলেজেই পড়, সবাই যেন এক এক গুরুমা। দেখনা আমার সঙ্গে কেমন তেড়ে তেড়ে কথা বলে? হবে ত আমার নাতনীর বয়সী।"

কর্ত্তা রোগশয্যায়, গৃহিণী তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত, নবীন-কৃষ্ণ সংসারের সাতে পাঁচে থাকতে ভালবাসেন না। তিনি খান দান, কলেজে পড়াতে যান, বাড়ীতেও বেশীর ভাগ সময় নানারকম বই মুখে করে বসে থাকেন। বিয়ে করেও তাঁর হাবভাবের বেশী পরিবর্ত্তন হয়নি। তমালিনীর সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাবার তিনি বেশী তাগিদ অনুভব করেননি। তমালিনী অবশ্য প্রথম প্রথম এতে খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সখীদের কাছে নানারকম রসাল গল্প শুনে তাঁর মনেও নানারকম প্রত্যাশা জেগেছিল, তবে ক্রমে এটা তাঁর সয়ে গেল। এত বড় সংসারের ভার তাঁর কাঁধে তার উপর আবার একটা মেয়েও হয়ে বসল, ছোট ছেলে বিমলের যখন পাঁচ বছর বয়স। কাজেই রসালাপ করবার সময় বা কোথায়? টাকাকড়ি জমানোর দিকে তমালিনী প্রথম থেকেই মন দিয়েছিলেন, গোড়া থেকে টাকা সঞ্চয় না করলে এই যে তিনটি কালো কালো পাথুরে গোপালের জন্ম দিয়েছেন, এদের প্রয়োজনে যখন আণ্ডিল আণ্ডিল টাকার দরকার হবে, তখন তিনি পাবেন কোথা থেকে? নিজে অবশ্য গহনাগাটি অনেক এনেছিলেন বাপের বাড়ী থেকে, কিন্তু নগদ টাকা ত আর ছালাগুত্তি করে নিয়ে আসেননি? সেটাই ত বেশী দরকার? কাজেই গাদাখানিক ঝি-চাকর রেখে টাকা নষ্ট করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এরা ত এসে শুধু হাঙরের মত খায় আর চুরি করে, কাজ কতটুকু বা এদের কাছ থেকে পাওয়া যায়? যতদূর পারতেন, ঠিকে ঝি রেখেই তিনি কাজ সারতেন। কেনা-কাটা, ভাঁড়ার বার করা, সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যাতে কেউ পয়সা সরাতে না পারে।

একদিকে শুধু তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ছেলেমেয়ে তিনটিই শ্যামবর্ণ। বড় ছেলে নির্ম্মল তাঁরই মত কাল, ছোট ছেলে বিমল এক পোঁছ কম। মেয়ে কমলিনীও শ্যামবর্ণ, এখনও বাচ্চা আছে, বড় হয়ে কেমন দাঁড়াবে তা এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। কিন্তু তমালিনী চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখলেন না। ছেলেমেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ বড় ঘরের ছেলেমেয়ের চেয়ে এক তিল কম বাহারের হল না। তাদের রংকে পালিশ করার চেষ্টাও অব্যাহত ভাবে চলতে লাগল। দেশী বিলাতী যতরকম প্রলেপ দেওয়া চলে সবই চলতে লাগল। ছেলেমেয়েদেরও এ বিষয়ে গবেষণা করতে তিনি উৎসাহ দিতে লাগলেন। মসুর ডাল, কমলালেবুর খোশা

বাঁটতে বাঁটতে ঝিদের হাতে ফোস্কা পড়ে গেল! সর ময়দা মাখা, আর কাঁচা দুধে মুখ ধোওয়ার চোটে, দুধের বিল বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল।

তমালিনীর শ্বশুর-শাশুড়ী এখন বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন। কর্ত্তা ত প্রায় অথর্ব্ব, গিন্নীও যেন আদর্শ পতিব্রতার মত সমান সমান অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তাঁরা এখন খালি খান, ঘুমোন এবং সারাদিনরাত অস্ফুট আর্ত্তনাদ করেন। বেশ ভাল থাকলে পূজোর ঘরে কিছু সময় কাটান এবং ছেলে-বউয়ের সমালোচনা করেন। তবে তমালিনীর গৃহস্থালির ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করেন না।

ছেলেমেয়ে সব বেশ বড় এখন। ছেলে দুজনই কলেজে পড়ছে, মেয়েও স্কুলে পড়ছে। নবীনকৃষ্ণ এখনও কলেজে পড়াচ্ছেন এবং বাড়ীতে নিজে পড়ছেন। খানিক মোটা হয়েছেন, চুলও পাতলা হয়ে গিয়েছে, স্বভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। তমালিনী এত বেশী খাটেন ও এত বেশী দুশ্চিন্তা করেন যে তাঁর আর মোটা হওয়া হয়নি। তা হলেও গিন্নীবান্নি-সুলভ চেহারা খানিকটা হয়ে এসেছে।

নবীনকৃষ্ণ সংসারের দিকে বিশেষ একটা নজর দেন না। এ সবের ভার গৃহিণীরই হাতে, তিনি শুধু টাকা দিয়ে খালাস। নিজের হাত-খরচের জন্যেও কিছু রাখেন না নিজের হাতে। যখন যা দরকার হয়, গিন্নীর কাছে চেয়েই নেন। কিন্তু হাজার অন্যমনস্ক হলেও তিনি মানুষ ত? ছেলেমেয়েদের প্রসাধনের ঘটা মাঝে মাঝে তাঁর চোখে পড়তে লাগল। ঝিদের গজগজানিও মধ্যে মধ্যে কানে আসত। প্রথম প্রথম তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না, ভাবতেন সব মেয়েই প্রথম ছেলেপিলে হলে ঐ রকম করে। এটা তাদের ছেলেবেলার পুতুল খেলারই একটা উত্তর কাণ্ড। কিন্তু এ যে দেখি আর শেষ হয় না। ছেলেগুলো বড় হয়ে গেল, কলেজে ঢুকল, কিন্তু তখনও তাদের মা একই ভাবে খেলছেন। এ কি কাণ্ড। ছেলেপিলের স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে যে? তারা লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হবে যে? এসব কি মাকাল ফল তৈরী করার ব্যবস্থা?

শেষে না পেরে একবার বলেই ফেললেন, "হ্যাঁ গো, এ কি হচ্ছে? মেয়েকে না হয় ঝামা ঘস্‌ছ ঘস, কিন্তু ছেলেগুলোকেও কেন? ওরা কি যাত্রাদলের রাজপুত্র হবে যে ওদের অত রংএর বাহার দরকার? এরপর লোকে টিট্‌কিরি দেবে যে?"

গৃহিণী মুখ-ঝামটা দিয়ে বললেন, "আহা, এর পর ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হবে না? দেখতে এসে যখন সব নাক সিঁটকে চলে যাবে, তখন লোকের বাহবাতে তোমার পেট ভরবে?"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "ছেলের রং শ্যামবর্ণ হলে কখনও কেউ নাক সিঁটকয় বলে ত শুনিনি। মেয়েদের সম্বন্ধে আগে ঐ বোকামিটা ছিল বটে, কিন্তু এখন সেটাও অনেকটা কমে গেছে।"

তমালিনী বললেন, "হ্যাঁ, তুমি ত সবই জান। ঘরে ঘরে গিয়ে দেখে এসেছ। বলি, তোমাদের বাড়ী নাক সেঁটকান হয়নি, যখন কাল বউ এল?"

নবীনকৃষ্ণ কিছু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "যদি হয়েও থাকে ত আমি জানি না। আমি নিজে ওসব কিছু করিনি। মানুষের চামড়াটার কি রং তাই নিয়ে আমি তাদের বিচার করি না। যাই হোক, ছেলে-দুটোর মাথা খেও না এইসব বেয়াড়া ভাবনা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে। তাদের ভাল করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে, যাত্রার দলের সং সাজলেই চলবে না।" স্বামী স্ত্রীতে অনেকক্ষণ তর্কাতর্কি হল এই নিয়ে। নবীনকৃষ্ণ নিতান্ত ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ, না হলে ঝগড়াই বেধে যেত সেদিন। কিন্তু হাজার বক্‌বক্‌ করেও কর্ত্তা বা গিন্নী, কেউ কারো মত পরিবর্ত্তন করতে পারলেন না। নবীনকৃষ্ণ গৃহিণীকে সুবুদ্ধি দেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এখন ছেলেদের মধ্যে মধ্যে সদুপদেশ দিতে লাগলেন। মেয়েকেও বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে খালি রং ফরশা হলেই মনুষ্য-জন্ম সার্থক হয় না,

আরো অনেক কিছু দরকার হয়। ছেলেদের একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল, তারা পড়াশুনোর দিকে মনটা একটু বেশী করে দিল, এবং ঘরের মধ্যে মাতৃআজ্ঞা পালনে তৎপর থাকলেও বাইরে পোশাকের জাঁকজমকটা খানিক কমিয়ে ফেলল। কামালিনী বাবার কথায় কর্ণপাত করা বেশী প্রয়োজন বোধ করল না, তার ধারণা, মেয়ে কি-রকম করে মানুষ করতে হয় তা মা যতটা বোঝেন, বাবার ততখানি বুঝবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। কাজেই সে যেমন চলছিল চলতে লাগল। স্কুলে তার ক্লাসে জনকয়েক বড়লোকের মেয়ে ছিল, তাদেরই যথাসাধ্য অনুকরণ করে সে দিন কাটাতে লাগল।

নির্ম্মল বেশ ভাল করেই বি এস সি পাস করে বেরোল। তমালিনী তখন থেকেই ঘটকী ডাকিয়ে বড় ছেলের জন্যে একটি ফরশা বউ এবং মেয়ের জন্যে একটি বেশ ভাল দেখতে জামাইয়ের ফরমাশ দিয়ে রাখলেন। কর্ত্তা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এরই মধ্যে কেন? ছেলেটাকে অত্যন্ত এম এস সিটা পাস করতে দাও। নইলে তোমার ফরশা বউ এসে খাবেন কি? আর তোমার কন্যারত্ন ত এখনও স্কুলের গণ্ডিই পার হতে পারেননি।"

তমালিনী বললেন, "আহা, যেদিন দরকার সেদিন বললেই যেন কাজ হয় আর কি? আমার বিয়ে দিতে পাঁচটি বছর খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছিল। দিদি আমার চেয়ে ফরশা ছিল, তারও কোন্ না তিন বছর লেগেছে। কথায় বলে লাখ কথায় বিয়ে, তা লাখ কথা কি একদিনেই বলা হয়ে যায়? কতবার কত সম্বন্ধ আসবে, দেখতে আসবে পঞ্চাশবার, দর কষাকষি হবে ছ'মাস ধরে তবে না বিয়ে?"

নবীনকৃষ্ণ বললেন "বাবাঃ, এ যে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত একেবারে। শুনলেই ভড়কে দেশ ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে।"

তমালিনী বললেন, "তোমার ভয় নেই গো, ভয় নেই। তোমায় একটা কথাও বলতে হবে না, সব আমি দেখব। খালি বিয়ের দিন বরকর্ত্তা সেজে গিয়ে বিয়েটা করিয়ে আনবে, আর মেয়ের বিয়ের দিন একটু উপোস করবে আর কন্যা সম্প্রদান করবে। আর যা কিছু করবার আমি করব, তবে আমার কোনো কাজে বাগড়া দিও না, তাহলেই হবে।"

কর্ত্তা বললেন, "নেহাৎ বেয়াড়া রকম যদি কিছু না কর, তাহলে আমি বাগড়া দেবই বা কেন?"

গিন্নী বললেন, "কোন্টা বেয়াড়া আর কোন্টা নয়, সে নিয়ে ত মতে মিলবে না? এখন থেকে ঝগড়া করে কি হবে, আগে সময় ত আসুক।"

বাঙালীর সংসারে বিয়ে করতে চাইলে বর বা কনে জোটে না, এমন অভাজন ক'টাই বা আছে? তমালিনীর ছেলেমেয়েরা ত সকল দিক দিয়েই যোগ্য, খালি দেখতে খুব সুন্দর নয়। তা সেটুকু ত্রুটির ত তিনি খেসারত দিতে পুরোপুরি তৈরি হয়ে আছেন। মেয়ের ভাল বর পাওয়ার জন্যে তিনি দুহাতে খরচ করতে রাজী আছেন। বউ যাঁরা আসবেন তাঁরাও হা-ঘরের ঘরে আসবেন না। তাঁদের নিজের বাড়ীঘর আছে, ভাড়া-বাড়ীতে তাঁরা থাকেন না। দেশে জমি-জমা আছে। ছেলেরাও বেশ ভালভাবে পাস করছে, ভাল চাকরিই তারা করবে। এতদিন ধরে গহনা গড়িয়ে গড়িয়ে তিনি সিন্দুক ভর্ত্তি করেছেন, তার বেশীর ভাগটা যদিও কমলিনী পাবে, তাহলেও দুই বউয়ের জন্যে গা সাজান গহনা থাকবে। আত্মীয়-বন্ধু সবাই এ খবর জানে, গহনাগুলি অনেকে চাক্ষুষ দেখেওছে।

কমলিনীর ত মুখস্থ হয়েই গিয়েছে, কি কি সে পাবে এবং বউরাই বা কি পাবে। তার মনটা এ বিষয়ে একটু ঈর্ষাকাতর আছে। মাঝে মাঝে মাকে বলে, "বউদিদের জন্যে অত গহনা রাখবার কি দরকার? তারা ত বাপের বাড়ী থেকেই ঢের গহনা পাবে?"

মা বলেন, "তার ঠিক কি? খুব সুন্দর মেয়ে পেলে আমি গরীবের ঘর থেকেও আনতে পারি। সে ক্ষেত্রে গহনাগাটি আমাকেই বেশী করে দিতে হবে।"

কমলিনীকে এ সম্ভাবনাটা স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু মনটা তার ভার হয়ে থাকে।

নির্ম্মলের কলেজের পড়া শেষ হয়ে গেল। ফল খুব ভালই হল, এবং তার চেয়েও ভাল হল আর একটা ব্যাপার, সে বেশ ভাল গোছের একটা চাকরিও পেয়ে গেল। তমালিনীকে আর পায় কে? মেয়েও এবার ম্যাট্রিক দিয়েছিল। তার ফরশা হওয়ার দিকে যত ঝোঁক ছিল, পড়াশুনোর দিকে তার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকও ছিল না, কাজেই পাস করলেও একেবারে থার্ড ডিভিশনের শেষের দিকেই হল তার স্থান। এতে তার কোনো লজ্জা হল না, সে তখন আনন্দে বিভোর, তার ক্লাসের মেয়েরা তাকে বলেছে যে এতদিনের সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার ফলে তার রং নাকি বেশ কিছু পরিষ্কার হয়েছে। এতে নিশ্চয়ই তার বিয়ের সম্ভাবনা বেড়েছে, থার্ড ডিভিশনে পাস ত কি হবে? নিশ্চয়ই তার এমন ঘরে বিয়ে হবে না যেখানে বউদের চাকরি করে খেতে হয়? তমালিনীও এতে বিশেষ কিছু নিরুৎসাহ বোধ করলেন না। মেয়েদের লেখাপড়া ত শুধু বিয়ের বাজারে দর বাড়ানর জন্যে? নইলে আসলে আর ওতে কি কাজ হয়? তিনি নিজেই বা কি লেখাপড়া শিখেছিলেন? গোটাকয়েক চিঠি লেখা আর সংসারের হিসেব রাখা, এছাড়া আর কি লেখাপড়ার কাজ তাঁকে করতে হয়েছে? বি এ, এম এ পাস মেয়েরাও সংসারে ঢুকে এইই ত করে? তাঁর নিজের মা ত লিখতেও জানতেন না, মুখে মুখে ভুল সংস্কৃতে শ্লোক আওড়াতেন

"কিঞ্চিৎ পঠনম্ বিবাহং কারণম্।"

কিন্তু এদিকে ত ঘটক ঘটকীতে বাড়ীর উঠোন চষে ফেলবার উপক্রম করল। ঘটকরা তত সুবিধা করতে পারল না, কারণ আগমন মাত্রই নবীনকৃষ্ণ তাদের চট্পট্ বিদায় করে দিতে লাগলেন। বললেন, "ওসব ভাবনা অমার নয় মশায়, আমার অন্য কাজ আছে। গৃহিণীই এসবের ব্যবস্থা করছেন। গুটি বারো ঘটকী তাঁর সঙ্গে লেগে আছে। তাদের হটিয়ে যদি আপনারা বরকর্ত্রীর কাছ অবধি পৌঁছতে পারেন তা হলে কিছু কাজ হতে পারে।" কাজেই ভদ্রলোকদের রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। ঘটকী মহোদয়ারা এদিকে দুবেলা হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন, গাদাগাদা ফোটোগ্রাফ আর চিঠিপত্র আনতে লাগলেন, এবং মেয়ে দেখতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণও জুটতে লাগল অনেক। প্রথমেই ত তমালিনী নিজে যেতে পারেন না, সেটা তাঁর স্বামীর পক্ষে মর্য্যাদা-হানিকর হবে, খানিকটা কথাবার্ত্তা এগোলে না-হয় তিনি যেতে পারেন। ছবি দেখে ত কিছু বোঝা যায় না, ফোটো-গ্রাফারদের পয়সা ধরে দিলে তারা কাল পেঁচী মেয়ের পদ্মিনীর মত ছবি তুলে দিতে পারে। ঘটকীরাও ঘুষ খেয়ে সারাক্ষণ হয়কে নয় করছে। কাজেই তমালিনী বিমল এবং কমলিনীকে কাজে লাগাবার সঙ্কল্প করলেন। কাছাকাছি যেসব পাড়ার থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগল, তার মধ্যে অনেকগুলি মেয়েকেই কমলিনী চেনে স্কুলের মাধ্যমে। হয় মেয়েই সেখানে পড়ত, নয়ত তার দিদি বা বোন পড়ত। সরাসরি অনেককে সে প্রত্যাখ্যান করে দিল। "ওমা, ও মেয়ে ফরশা না হাতী। আমার চেয়ে একটুও ফরশা নয়। মাগো মা, ঘটকীগুলো কি দারুণ মিথ্যেবাদী!"

আরো অনেক বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে বিমলের পরিচয় আছে। আড়াল আবডাল থেকে অনেক মেয়েকে সেও দেখেছে। সামনাসামনিও দেখেছে, কারণ আজকাল বাঙালী ঘরের পর্দ্দানশীনত্ব ত অনেক পরিমাণেই ঘুচে গেছে। দাদার বন্ধুদের সঙ্গে অনেক বাড়ীতেই মেয়েদের আলাপ পরিচয় হয়ে যায়। এইভাবে কিছু কিছু মেয়ে বাছাই চলতেও লাগল। তমালিনীর পছন্দমত গৌরাঙ্গী কন্যা খুব চট করেই কিন্তু পাওয়া গেল না। বরং কন্যাপণের টাকার অঙ্কটা শুনে দু-চারটে চলনসই রকম ভাল পাত্রের সন্ধান মিলল। তমালিনীর বড় ছেলেরই আগে বিয়ে দেবার পরিকল্পনা ছিল। বাড়ীর প্রথম বিয়ে খুবই ঘটা করে দেবার কথা। এটা কমলিনীও প্রাণ ভরে উপভোগ করে এই

ছিল তমালিনীর ইচ্ছা। মেয়েরই যদি আগে বিয়ে হয়ে যায় তাহলে হয়ত সে কিছুই দেখতে পাবে না। বিদেশে যদি শ্বশুরবাড়ী হয় তাহলে তখনি তখনি কি আর তারা বাপের বাড়ী আসতে দেবে? সুতরাং তিনি মেয়ের সম্বন্ধগুলি একেবারে প্রত্যাখান না করলেও ছেলের বিয়ের দিকেই বেশী মনোযোগ দিতে লাগলেন।

এর মধ্যে এক কাণ্ড হয়ে বসল। কমলিনীর পড়াশুনা করবার ইচ্ছা বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু স্কুলের সহপাঠিনীরা যখন কলেজে ঢুকল, তখন সেই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? সেও কলেজে ঢুকল। দিন-কয়েক কলেজে যাবার পরই একদিন একেবারে মায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, "ওমা, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে কিছু ত জান না? দিব্যি লুচি ভাজছ বসে।"

তমালিনী হক্‌চকিয়ে হাতের খুন্তি ফেলে দিয়ে বললেন, "কেন রে, কি হল?"

"তুমি ত বাঙলাদেশের সব জায়গায় ঘটক পাঠাচ্ছ ফরশা বউয়ের জন্যে, আর দাদা এদিকে এক কাল মেয়ের সঙ্গে ভাব করে বসে আছে।"

তমালিনী কপালে করাঘাত করে বললেন, "ও মা, আমি কোথায় যাব! পেটে পেটে ছেলের এত দুর্ব্বুদ্ধি? এমনিতে দেখায় যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। আসুক আজ বাড়ীতে, দেখব একবার তাকে, আর তার বাপকে। তুই জানলি কি করে?"

"কি করে আবার। সেই মেয়ের ছোট বোন যে আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হল। আমার নাম শুনেই ছুটে এসে আমার হাত ধরল, বলল, 'তোমাকে চিনি না ভাই, কিন্তু তোমার দাদাকে খুব চিনি, তিনি ত প্রায় রোজই আমাদের বাড়ী আসেন।' পাশে আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে হিহি করে হেসে বলল, 'এরপর ওর দিদিও কমলিনীদের বাড়ী যাবেন।' তাইতে সব ফাঁশ হয়ে গেল। আমি খোঁজ করে জানলাম তখন যে সে মেয়ে কিছুই ফরশা নয়। বোনটা ত আমারই মতন।"

তমালিনীর লুচিভাজা শিকেয় উঠল। দুম করে কড়াটা নামিয়ে তিনি ঝিকে ডাক দিলেন, "ওগো ছাতুর মা, শোন। তোমার খাবার জল আনা এখন থাক, এই লুচি ক'খানা ভেজে তোলো দেখি," বলেই নিজের শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। মেয়েকে ডেকে বললেন, "দ্যাখ কমা[illegible] অমতে যদি ছেলে বিয়ে করে [illegible] খানা গহনা দেব না আমি। থাকবেন এখন ন্যাড়া মুড়ো হয়ে।"

কমলিনী বলল, "আহা, তাই যেন হয়? বাবা রাগ করবেন না? আর ওরাও ত কিছু গরীব লোক নয়, ওরা নিশ্চয়ই মেয়েকে গা সাজিয়ে গহনা দেবে।"

"দেখা যাবে এখন কে কিরকম বড় লোক। আজ-কাল সহজে কিছু কেউ কাউকে দিতে চায় নাকি? নিজের ছেলেমেয়েকে শুদ্ধ্‌ ঠকায়। আর এ ত আমার স্ত্রীধন, এর উপর কারো কোনো অধিকার নেই, যাকে খুশি দেব, যাকে খুশি দেব না।

কমলিনী বলল, "তাহলে মা, বড় বউয়ের গহনার ভাগটা তুমি আমাকে দিয়ে দিও।"

তমালিনী ধমকে উঠলেন, "নে, নে, এখনই কালনেমির লঙ্কাভাগ করতে হবে না। আগে দেখি ত কাল বউ কেমন আমার ঘরে ঢোকে।"

বিকেলে কর্ত্তা আর নির্ম্মল বাড়ী আসামাত্র তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। তমালিনী একদিকে আর একদিকে বাপ আর ছেলে। নবীনকৃষ্ণ সব শুনে বললেন, "তা এতে রাগারাগির কি আছে? বিয়ে যে করবে, বউ নিয়ে ঘর যে করবে, তার কথা একেবারে চলবে না এ কি করে হয়? তার যদি শ্যামবর্ণ মেয়ে পছন্দ হয় আর সে মেয়ে যদি সকল দিক দিয়ে যোগ্য হয়, তাহলে আপত্তি করার আমি ত কোনো কারণ দেখি না।"

তমালিনী বললেন, "তা দেখবে কেন? এ সব ইচ্ছা করে শত্রুতা সাধা নয়? আমি ফরশা বউ চাই কিনা, তাই ইচ্ছে করে খুঁজে পেতে একটা কাল মেয়ে ঠিক করেছে।"

নবীনকৃষ্ণ বললেন "কি যে বাজে বক তার ঠিক [illegible]

কি কারণে শত্রুতা সাধতে যাবে তোমার সঙ্গে? আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে মেয়ে দেখে আসছি। কি রে নির্ম্মল, তুই কি মেয়ের বাড়ীতে পাকা কথা দিয়েছিস?"

নির্ম্মল এতক্ষণ গোঁজ মুখে দাঁড়িয়ে বাবা-মার ঝগড়া শুনছিল। এখন বলল, "একরকম পাকা কথাই বলতে পার। সুলতাকে বলেছি আমি তাকেই বিয়ে করতে চাই, মা-বাবাকে জানিয়ে তার মা-বাবার কাছে প্রস্তাব করাব।"

তমালিনী বললেন, "আর আমরা যদি মত না করি?"

"তাহলে ওকে হয়ত বিয়ে করতে আমি পারব না কিন্তু অন্য কোথাও বিয়ে আমি নিশ্চয়ই করব না।"

তমালিনী বললেন, "হায় রে কলিকাল! কি বেহায়াপানা, মা, মা, মা! মা-বাপের সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা তুই বল্‌ছিস কি করে? আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন এমন কথা মা-বাপের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো ছেলে বললে তাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে সমাজ থেকে বার করে দিত।"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "এখন তোমার ঐতিহাসিক গবেষণা রাখ ত। আমাদের খেতেটেতে দেবে কিছু, না কাল মেয়ে পছন্দ করার অপরাধে আমরা এখন থেকে উপোস করব?"

তমালিনীকে অগত্যা তখনকার মত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হল। তিনি রান্নাঘরে ফিরে গেলেন। নবীনকৃষ্ণ ছেলের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "যা, হাত মুখ ধো গিয়ে। ওদের বাড়ীর ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যা। আজই চিঠি লিখব সেখানে, পরশু তরশুর মধ্যে মেয়ে দেখার পর্ব আমি চুকিয়ে ফেলতে চাই।"

এক টুকরা কাগজে মেয়ের বাড়ীর ঠিকানা লিখে বাপের হাতে দিয়ে নির্ম্মল নিজের ঘরে ঢুকে গেল। বাড়ীময় সাড়া পড়ে গেল। নির্ম্মলের ঠাকুর্দা ও ঠাকুরমা শুনলেন, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও ঘন্টা-কয়েকের মধ্যে খবর পৌঁছে গেল। এধার ওধার থেকে সবাই এসে জুটতে লাগলেন: কেউ তামাসা দেখতে, কেউ সমবেদনা জানাতে। মোটের উপর তমালিনী যত ভোট পেলেন, নবীনকৃষ্ণও প্রায় ততই পেলেন। তাঁর বৃদ্ধা মা বললেন, "এ আবার বউমার বাড়াবাড়ি। নিজের এমনকি দুধে আলতায় রং? আমরা কি ওকে নিয়ে ঘরে তুলিনি?"

ভাবী বউয়ের বাড়ী চিঠি লেখা হল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাগ্রহ আহ্বান এল মেয়ে দেখে যাবার জন্যে। নবীনকৃষ্ণও দেরি করলেন না, দু'চারজন আত্মীয় বন্ধু নিয়ে মেয়ে দেখতে চললেন।

তমালিনী মহা উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে রইলেন। ফরশা না হলে বউ করতে রাজী হবেন না, এ তিনি প্রায় ঠিক করেই রেখেছিলেন। ছেলে করুক না রাগ। বাবার কথাই কি সব, মায়ের কথা কিছু নয়? কর্ত্তা অবশ্য জোর করলে বিয়ে হয়েই যাবে, তবে তমালিনী যতটা পারেন, অসহযোগ করে যাবেন।

কর্ত্তা মেয়ে দেখে ফিরে এলেন। বললেন, "চমৎকার মেয়ে, পরিবারও বেশ ভাল। তোমার আপত্তি করবার কোনো কারণই নেই। বি এ পরীক্ষা দেবে, অতি সুশ্রী চেহারা, সুন্দর গান গাইতে পারে। আবার কি চাই?"

তমালিনী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "রং বেশ ফরশা?"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "না, তা নয়। এই তোমার বিমলের মত হবে।"

তমালিনী বললেন, "তবে এ বিয়েতে আমার মত নেই।"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "আচ্ছা, আমি নির্ম্মলকে ডেকে দিচ্ছি, তুমি তাকে সে কথা বলে দাও।"

বাপের ডাকে নির্ম্মল এসে দাঁড়াল। নবীনকৃষ্ণ বললেন, "শোন, এ বিয়েতে তোমার মায়ের মত নেই, কারণ মেয়ে ধব্‌ধবে ফরশা নয়। আমার কোনো অসম্মতি নেই। এরপর কি করবে তা তুমিই স্থির কর।"

নির্ম্মল খানিকক্ষণ চুপ [illegible]

বিয়ে আমি করব না। এই বিয়ে নিয়ে বাড়ীতে একটা প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁটি হোক এ আমি চাই না। সেটা আমার পক্ষে একটা লজ্জার ব্যাপার হবে। কিন্তু অন্য কোথাও বিয়ে আমি করব না। এখানে থাকবও না। U. K.-তে গিয়ে পড়বার একটা স্কলারশিপ আমি পেয়েছি, সেইটে নিয়ে জানুয়ারি মাস থেকে আমি চলে যাব।'

বলেই গট্ গট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তমালিনী বিছানায় পড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। নবীনকৃষ্ণ এ হেন পরিস্থিতিতে কি করা উচিত, তা তখনই ঠিক করতে না পেরে বাইরের ঘরে চলে গেলেন।

তমালিনী সারারাত কান্নাকাটি করে বুঝলেন যে ভোটে সমান সমান হলেও আসলে তিনি হেরেই গেছেন। এ বিয়ে না হলে কর্তা ভীষণ চটে যাবেন আর অপমানিত বোধ করবেন। হয়ত কথা বলাই বন্ধ করে দেবেন। আর ছেলে যদি সত্যিই দেশ ছেড়ে চলে যায় ত সর্বনাশ। এটা তমালিনী কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। সবাই দুর-ছাই করবে তাঁকে। বুড়োবুড়ীও তাঁকেই দোষী করবেন। তাঁরা যদি কাল বউ নিয়ে ঘর করে থাকতে পারেন, তবে তমালিনী কেন পারবে না? কি এমন সে স্বর্গের সিঁড়ি পিছলে পড়েছে যে সে কাল বউ ঘরে তুলতে পারবে না? তাই বলে অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে দেশছাড়া করবে? এ যে দেখি অতি বাড়।

ভোরে উঠেই তিনি নবীনকৃষ্ণকে ঠেলা মেরে তুলে দিয়েছিলেন, বললেন, "ওগো, তোমার গুণের ছেলেকে বলে দাও, যে, তিনি যাকে খুশি বিয়ে করুন, আমি বাধা দেব না। তাঁকে দেশত্যাগী হতে হবে না। তবে শত্রুতা যা সাধল আমার সঙ্গে তা আমার মনে থাকবে। আমার কাছ থেকে আর যেন কিছু প্রত্যাশা না করে। তার বউ মাথায় করে আমি নাচব না তা যেন মনে রাখে।"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "সে রকম প্রত্যাশা সে বা তার বউ কেউই করবে না। তোমার অমতে বিয়ে হচ্ছে এ কথা ত কারো জানতে বাকি নেই? ভদ্রতাটা বজায় রেখে চল যদি তাহলেই যথেষ্ট হবে। আমি নির্ম্মলকে জানিয়ে দিচ্ছি।"

বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। সামনের মাঘ মাসেই বিয়ে। সময় বেশী হাতে নেই। যদিও ছেলের বিয়েতে উদ্যোগ আয়োজন মেয়ের বিয়ের সমান করতে হয় না, তবুও কিছুটা ত করতে হয়? কিন্তু তমালিনী একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে বসে রইলেন। নবীনকৃষ্ণ তাঁকে কোন অনুরোধ করলেন না, বাইরের কাজ তিনি এবং তাঁর দুই ছেলে মিলে করতে লাগলেন। অন্দরের কাজ নিয়ে হল বিপদ্। গৃহিণী ত অসহযোগ করে বসে আছেন, তিনি কিছু করবেন না। বৃদ্ধা গৃহিণী এখন সব কাজের বার, তিনি কথা বলা ছাড়া কিছুই পারেন না। কমলিনী একেবারে ছেলেমানুষ, কোনো অভিজ্ঞতাও তার নেই। নবীনকৃষ্ণ তখন বুদ্ধি করে তাঁর এক বিধবা দিদিকে এনে উপস্থিত করলেন। তিনি পাকা মানুষ, তাঁর সাহায্যে কাজ কোনোমতে এগোতে লাগল। বিয়ের দিন-দশ আগে নবীনকৃষ্ণ তমালিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বউকে বরণ করে তুলবে কে?"

তমালিনী গম্ভীর ভাবে বললেন, "শাশুড়ী ঠাকরুণ রয়েছেন, তিনিই তুলবেন, তাঁরই ত তোলার কথা?"

"তুমি বউকে মুখ দেখে কি দেবে? মাও ত খালি হাতে দেখবেন না?"

"তোমার মায়ের ব্যবস্থা তুমি কোরো বাপু, আমি তার কিছু জানি না। ও ছেলে আমার মান রাখেনি, আমি ওর বউ দেখে কিছু দিতে টিতে পারব না।"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "তোমার বউ দেখে কাজ নেই, সেখানে যেওই না। মায়ের ব্যবস্থা আমি করছি। নির্ম্মল তোমার সঙ্গে কোনো শত্রুতা করেনি, করছ তুমিই।" বলে তিনি চলে গেলেন, এবং মা ও দিদির সঙ্গে পরামর্শ করে নূতন বউয়ের জন্য এক জোড়া বালা গড়াতে দিয়ে দিলেন।

কমলিনী ভয় পেয়ে বলল, "মা, কি করছ? বাবা ভীষণ রাগ করছেন। অন্ততঃ বড় সীতাহারটা বউদিকে দাও।"

তমালিনী বললেন, "করুকগে রাগ। আমি কি তোর বাবাকে ভয় পাই নাকি? আমার স্ত্রীধন, দেব না আমি। বিমল যদি পছন্দ মত বউ আনে, সব গহনা আমি সেই বউকে দিয়ে দেব।"

বিয়ের দিন এসে পড়ল। অনেক বরযাত্রী নিয়ে শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মধ্যে নির্ম্মল ফুল দিয়ে সাজান গাড়ীতে চড়ে বিয়ে করতে চলে গেল। বরের ঠাকুরমাই মায়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেন। তমালিনী নাক চোখ মুছে নিজের ঘরে বসে রইলেন।

পরদিন বাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। আজ বউ আসবে, কাল বউভাত। আত্মীয়-স্বজনে ঘর ভরে গেল। পাড়া-প্রতিবেশীরাও অনেকে দল বেঁধে এলেন। সব চেয়ে সংখ্যায় বেশী হল, পাড়ার আশেপাশের বস্তির বালক-বালিকা আর শিশুর দল। তাদের কেউ ডাকেনি তবে তাদের চলে যেতে বলবারও সাহস কারো হল না। তারাই আসর মাৎ করল সবার চেয়ে। রসুনচৌকির বাজনাও তাদের কলকোলাহলে চাপা পড়ে গেল।

বর-কনের গাড়ী এসে পড়ল। শাঁখ বাজল, হুলুধ্বনি উঠল, গেটের কাছে শানাইএর বাজনাও তীব্রতর হল। নবীনকৃষ্ণ আর কমলিনী গাড়ী থেকে নামলেন, পিছনে গাঁটছড়া বাঁধা নির্ম্মল আর সুলতা। তাদের নিয়ে এসে উঠোনের ছাঁদনাতলায় দাঁড় করান হল। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ অস্ফুট স্বরে বলাবলি করলেন, "সুন্দর বউ হয়েছে বাপু, ফরশা না হয় না-ই হল। কি চুল দেখেছ, আজকাল এরকম দেখা যায় না।"

তমালিনীর শাশুড়ী কম্পিত হাতে বরণ সারলেন কোনোমতে। তারপর বউকে উঠিয়ে নিয়ে ঘরে বসান হল। দিদি-শাশুড়ী নূতন বালা দিয়ে নাতবউয়ের মুখ দেখলেন। এমন সময় নবীনকৃষ্ণের দিদি জোর করে তমালিনীকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "আজকে দশজনের মধ্যে লোক হাসাতে পারবে না বাপু। যা হয় কিছু দিয়ে এখন বউয়ের মুখ দেখ, পরে তোমার যা খুশি কোরো।"

তমালিনী সত্যিই ত তখন মারামারি করতে পারেন না? নিজের হাতের দুগাছা সোনার চুড়ি খুলে বউয়ের হাতে পরিয়ে তার মাথায় এক মুঠো ধান-দূর্ব্বা ছড়িয়ে দিয়ে হন্‌হন্ করে চলে গেলেন। সবাই একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, তারপর চুপ করে গেল।

পরদিন বউভাত। যত ঘটা হবে বড় ছেলের বিয়েতে ভাবা গিয়েছিল, ততটা হল না অবশ্য, তবে একেবারে বেমানানও কিছু হল না, একরকম ভালয় ভালয়ই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেল।

সংসারযাত্রা আগেরই মত চলতে লাগল। বাড়ীতে একজন লোক বাড়ল মাত্র। তমালিনী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে দেখলেন যে তাঁর অসহযোগটা কেউ গায়েই মাখছে না, এমনভাবে চলছে ফিরছে যেন কোথাও কিছু হয়নি। বউয়ের ঘরের দিকে তিনি যানই না, বউও যেন চেষ্টা করে তাঁকে এড়িয়ে চলে।

দিন কাটতে লাগল এবং বিমলের শেষ পরীক্ষার সময় এসে গেল। তার মা বললেন, "দেখো বাপু, ফেল টেল কোরো না যেন। ভাইয়ের বিয়েতে ত পড়াশুনো ছেড়ে খুব নাচানাচি করলে, এখন শেষ রক্ষা কোরো।"

বিমল বলল, "সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, আমি ঠিক আছি।"

ঠিক যে আছে তা সে প্রমাণও করে দিল। শুধু যে ফেল করল না তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। তমালিনী শুদ্ধ গালে হাত দিয়ে বললেন, "বাবাঃ, এই সব ছেলে আমার পেটে জন্মাল কেমন করে?"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "দুঃখ কি? মেয়েটিকে দেখে সান্ত্বনা লাভ কোরো। ফরশা হবার এত সখ, তা মগজের

ভিতরটাই শুধু ফরশা হয়েছে।" কমলিনী শুনে রাগে নাক ফুলিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

তমালিনীর এদিকে আবার কাজ বেড়ে গেল। বিমলের জন্য আবার ঘটকীরা হাঁটতে শুরু করল। তমালিনী বিমলকে ডেকে বললেন, "দেখ বাপু, আমার কাছে সোজা কথা। মেয়ের সন্ধান ত ঢের আসছে, আমি তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বলছি, কিন্তু তুমি ত কোথাও আগের থেকে কালিন্দী টালিন্দী জুটিয়ে বসে নেই? তাহলে বল, আমি এখন থেকে হাত গুটোই। কমলির ভাবনাটাই ভাবি। তারও ত বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবার জো হয়েছে।"

বিমল হেসে বলল, "আরে বাবা, না। আমি এখন একটা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি, অন্যদিকে মন নেই।"

মেয়ে দেখা চলতে লাগল। কিন্তু এবারেও ঠিক যেমনটি চান তমালিনী, তেমনটি চট করে জুটল না। ফরশা দু-একটা চলনসই মত জুটল বটে, তবে কেউ তিনবার ম্যাট্রিক ফেল, কেউ হাতীর মত মোটা। তমালিনী মুখে যাই বলুন, মনে মনে জানেন যে বড় বউটি বেশ সুন্দরী আর সুশিক্ষিতা, ফরশা হলেও ওসব মেয়ে সুলতার পাশে বড়ই নিরেশ দেখাবে। তবু মেয়ে বাছাই চলতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কমলিনীর জন্যে ভাল পাত্রের সন্ধান হতে লাগল।

বিমলের তখন সত্যিই বউয়ের চেয়ে চাকরির ভাবনাই বেশী হয়েছিল। বাবার ত অবসর নেবার বয়স হয়ে আসছে, এরপর সে কি দাদার রোজগারে খাবে নাকি? মাকে মাঝে মাঝে হেসে বলতে লাগল, "মা, তোমার ঘটকীদের বলে দাওনা যে আমাকে যদি কেউ ৫০০৲টাকার একটা চাকরি দেয়, তাহলে আমি যেমন মেয়েই হোক বিয়ে করতে রাজী আছি।"

মা বলতেন, "যা, যা, আর বাঁদরামি করতে হবে না। এবারে যত দেরিই হোক আমার পছন্দমত বউ আনবই।"

অধ্যবসায়ের ফল কোনো না কোনো সময়ে ফলেই। ভাগ্যলক্ষ্মী হঠাৎ এতদিন পরে তমালিনীর প্রতি একটু প্রসন্না হলেন। কমলিনীর একটি বেশ ভাল পাত্র জুটে গেল। ছেলে বেশ গৌরবর্ণ সুশ্রী। পড়াশুনো করেছে, চাকরিতেও ঢুকেছে। বাপ বেঁচে আছেন, এখনও চাকরি করেন। নিজের বাড়ী আছে কলকাতায়। ঐ একই ছেলে। মেয়ে অবশ্য দুজন আছে, তবে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। নিজেদের ছেলের জন্যে তাঁরা সুশ্রী পাত্রীই চাইছিলেন। তবে কমলিনীর বাবা যদি মেয়ের রূপের অভাব রূপো দিয়ে ভরিয়ে দেন তাহলে কমলিনীকে তাঁরা পুত্রবধূরূপে ঘরে নিতে রাজী আছেন।

নবীনকৃষ্ণ শুনে বললেন, "এ ত গেল ছেলের মা-বাবার কথা। ছেলে নিজে রূপবান্, বউ রূপহীনা হলে তাঁর পছন্দ হবে?"

তমালিনী বললেন "সে বাপু মেয়ের ভাগ্যের কথা। মা-বাপ বাইরের সব কিছুই দেখে শুনে দিতে পারে কিন্তু মেয়ে-জামাইয়ের মনের মিল হবে কি না তার ব্যবস্থা ত কিছু করে দিতে পারে না? কেন, ছেলে বলেছে নাকি ওরকম কিছু?"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "এখন অবধি ত কিছু শুনিনি। তবে বিয়ে হতে ত এখনও ঢের দেরি। বরের জ্যাঠা মারা গেছেন পাঁচ মাস আগে। তাঁর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ না হওয়া অবধি তাঁরা ছেলের বিয়ে দেবেন না। তার মধ্যে বরের মতামত জানবার ঢের সময় পাব।"

ভাগ্যলক্ষ্মী তখনও মুখ ফেরাননি। এর পরের সপ্তাহেই বিমলের একটা মোটামুটি ভাল চাকরির সম্ভাবনা দেখা দিল। চাকরি ভাল, মাইনেও ভাল কিন্তু চাকুরি স্থান বড় দূরে, একেবারে সিংহল দ্বীপে। তমালিনী বেশ কাতর হয়ে পড়লেন। "ওমা গো, কতদূর দেশে যাবে, এইটুকু ছেলে? এ যে প্রায় বিলেত যাওয়ারই সামিল? সমুদ্রও পার হতে হবে?"

নবীনকৃষ্ণ বললেন, "তবে তাতে জাত যাবে না। শ্রীরামচন্দ্রও ত গিয়েছিলেন, তাঁর ত জাত যায়নি?"

নির্ম্মল হেসে বলল, "মা, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ওখানের মেয়েরা বেশীর ভাগই বড় কাল। বিমল তোমায় বিপদে ফেলবে না।"

তমালিনী বললেন, "যা, যা, বথামি করতে হবে না।"

বিমল চলেই গেল। তমালিনী দিন-কয়েক খুব কান্নাকাটি করলেন। তবে ছেলের চিঠিপত্র সব নিয়মমত আসতে লাগল, তাই ক্রমে ক্রমে সামলে গেলেন। মেয়ের বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে, পাকা দেখাটা একটু আগেই হবে, তার আয়োজন করতে খুব খাটতে হচ্ছে। ছেলের বিয়েতে যেমন হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলেন, মেয়ের বেলা তেমনি দুগুণ করে খাটতে হতে লাগল।

সেদিন দুপুর বেলা সবে খেয়ে দেয়ে একটু গড়িয়ে নিতে যাবেন, এমন সময় সদর দরজার কাছে একটা হাঁকাহাঁকি শোনা গেল। টেলিগ্রাম এসেছে। সেদিন রবিবার তাই বাবুরা সব বাড়ী ছিলেন। তাড়াতাড়ি সই করে টেলিগ্রামটা নিয়ে নির্ম্মল খামটা ছিঁড়ে ফেলল। এক লাইন পড়েই চীৎকার করে উঠল, "বাহবা ছেলে, বাহবা! আমাকে একদম হারিয়ে দিয়েছে।"

তমালিনী হাঁকাতে হাঁকাতে বললেন, "কি হয়েছে শীগ্‌গির বল্।"

নির্ম্মল বলল, "বিমল একেবারে বিয়ে করে বউ নিয়ে আসছে, কাল দুপুরে কলকাতা পৌঁছবে।"

নবীনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই আমরা জানলাম না, একেবারে বউ নিয়ে হাজির?"

নির্ম্মল বলল, "বউ তাদের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যালের আত্মীয়া। প্রিন্সিপ্যাল কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি বিয়েটা চুকিয়ে দিল। নাও মা, হল ত তোমার ফরশা বউ? এর চেয়ে ফরশা আর বাংলা দেশে কোথাও খুঁজে পেতে না।"

তমালিনী হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। "ও রে, আমার কি সর্ব্বনাশ হল রে! কত জন্মের শত্তুর সব আমার পেটে এসে জন্মেছিল রে। এ মেলেচ্ছ বউ নিয়ে আমি কি করব? এক ফোঁটা জলও পাব না মরণকালে তার হাতে! হে ভগবান্, এ কি করলে?"

বাড়ীতে মহা হৈ চৈ বেধে গেল।

স্মৃতির জোয়ারে উজান বেয়ে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[পাঁচ]

অথ কন্টিনেণ্ট পর্ব। কন্টিনেণ্ট শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত যে স্মৃতি। তবে বলব শুধু সেই সব স্মৃতির কথা যা পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগাবে।

পঞ্চাশ বৎসর আগে কেম্ব্রিজে আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম কন্টিনেণ্টের নানা অবদান সম্বন্ধে। প্রথম অবদান—ইংলণ্ডের সংস্কৃতির চেয়ে কন্টিনেণ্টের সংস্কৃতি বেশি উদার। এর কারণ, ইংলণ্ডের অধিবাসীরা দ্বীপাবদ্ধ থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছে "ইন্সুলার"। ডীন ইঙ্গের Outspoken Essays-এ একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম ইন্সুলার বলতে কি বোঝায়। বোঝায় মনের সঙ্কীর্ণতা। ইংলণ্ডের বাসিন্দারা বিদেশী "ফরেনার" বলতে নাসিকা কুঞ্চিত করে—যেন ইংরেজই বিধাতার আদুরে ছেলে, বাকি সব জাত—হ্যাঁ আছে, তবে থেকেও নেই, না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। রূল ব্রিটানিয়া! টমসন সাহেবের গর্বোক্তি শুনতাম মন্ত্রবত্র :

Rule, Britannia, rule the waves ;
Britons never shall be slaves.

সুভাষ উঠতে বসতে বলত : "আমাদেরও গাইতে হবে এই গান—

Indians never shall be slaves.

কিন্তু বৃটিশ-সিংহের গর্বগর্জনে আপত্তি করলেও বৃটিশ জাত যে একটা মস্ত জাত এ সম্বন্ধে কারুর মনেই সন্দেহ ছিল না। আমরা যা বলাবলি করতাম তাকে ছড়ার রূপ দেওয়া মন্দ কি :

ছোট্ট একটি দ্বীপের মানুষ হ'ল কেমন ক'রে
বিশ্বব্যাপী—নয় তো শুধু হাঁকডাকেরি জোরে!
যা যেখানেই গ'ড়ে তোলে রাজ্যপাট নতুন!

ইংরাজেরা গর্ব করতে পারে বৈকি। মানুষ গৌরবী হয় তো সংখ্যার দৌলতে নয়—কীর্তির মহিমায়। ইংরাজ জাতের সর্বতোমুখী কীর্তিকে অস্বীকার করবে কে? রণপোতসজ্জা, শাসনদক্ষতা, উপনিবেশ গড়ার অসামান্য নৈপুণ্য, বিজ্ঞান, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিয়মানুবর্তিতা, সঙ্ঘ গড়ার প্রতিভা, স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়ানো, মহাজনদের সৃষ্টি—একমাত্র সঙ্গীতে ওরা পেছিয়ে। বার্ণার্ড শ অবশ্য তাঁর অতুলনীয় শেভিয়ান হাসি হেসে বলতেন : অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের মাটির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ এই যে সেখানে চমৎকার কবর গড়া যায়—কিন্তু আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম এ-দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনস্বীকার্য বিদ্যাবত্তায়।

প্রথম ধাক্কা খেলাম শ্রীশরৎ দত্তর কাছে। তিনি বললেন: ইংরাজ বড় নেশন কিন্তু আরো বড় জর্মন। বলে আমাদের কাছে জর্মনমহিমার গুণগান শুরু করলেন। বললেন : "ওরা ধরতে গেলে একলাই লড়েছে মিত্র-শক্তির চারটি নেশনের সঙ্গে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইতালি, জাপান। যদি শুধু আমেরিকা লুসিটানিয়া ডোবানোর জন্যে রেগে না যোগ দিত তাহলে আজ য়ুরোপে ছত্রপতি হত জর্মনিই—আর কেউ নয়।" বলে বলতেন প্রায়ই : "কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে আমরা কন্টিনেণ্টে যাই না—ছুটি কেবল ইংলণ্ডে বড় চাকুরে হতে।"

আমি কন্টিনেণ্টের ভক্ত হয়েছিলাম প্রথম থেকেই রোলাঁর লেখা পড়ে। যতদূর মনে হয় সুভাষ ও আরো অনেক বাঙালী ছাত্রকে শ্রীশরৎ দত্তই বেশি করে উস্কে দেন জর্মনির কাছে শক্তির শিক্ষানবিশি করতে।

কিন্তু আমার প্রিয়তম জাতি ছিল—ফরাসী। জর্মন ভাষা শিখে ও জর্মনিতে এক বৎসর [illegible]

জাতিকেই কন্টিনেন্টের মধ্যমণি মনে করতাম। রোলাঁই আমাকে প্রথম জর্মনিতে গিয়ে গানের তালিম নিতে বলেন—নইলে হয়ত আমি গান শিখতে প্যারিসেই যেতাম—আরো এই জন্যে যে, ফরাসী ভাষাকে আমার মনপ্রাণ বরণ করেছিল বরণমালা দিয়ে, জর্মন ভাষা আমার কাছে বরণীয় মনে হয় পরে—জর্মন গান শিখে, জর্মনির নানা সিম্ফনি সঙ্গীতে রস পাওয়ার পরেও গেটে প'ড়ে।

অনেকের ধারণা, আমি ও দেশের সঙ্গীতে অভিজ্ঞ। ভুল। আমি ওদের নানা জাতের গানের রসজ্ঞ হয়ে উঠতে পেরেছিলাম মাত্র—তা-ও বহু কষ্টে—ওদের গান-বাজনা ক্রমাগত শুনে শুনে। যাকে বলে অনুশীলন। কিন্তু ওদের কান হার্মনিকে যেভাবে শোনে আমি বহু চেষ্টা ক'রেও সেভাবে শুনতে পারি নি। এ-কথার ব্যাখ্যা করতে হ'লে অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হবে যা নীরস—বৈয়াকরণিক কচকচি। তাই শুধু এইটুকু বলেই থামি যে, আমি জর্মন ও ইতালিয়ান ভাষায় গাইতে শিখে এসব গানের অন্তর্নিহিত রসের কিছুটা খবর পেয়েছিলাম ব'লে এ-দুই ভাষার নানা গানের সুরের হাওয়ায় বাংলা গানের বাগানে ফুল ফুটিয়েছিলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিই, সরস দৃষ্টান্ত তাই পেশ করা চলে।

আমি একটি রুষ জিপসি-সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে রুষ ভাষা না জেনেও আপ্রাণ চেষ্টায় উচ্চারণ মাত্র শিখে গানটিকে আয়ত্ত ক'রে তার বাংলা রূপ দিই আমার একটি জনপ্রিয় গানে, যেটি আমি আমার গীতিকিন্নরী শিষ্যা উমা বসুর সঙ্গে গ্রামাফোনে গেয়ে বাইরণের মতন আবিষ্কার করি এক সুপ্রভাতে যে আমি যশস্বী হয়ে পড়েছি। ("I woke one morning and found myself famous.") গানটির প্রথম চরণ ইয়াৎসেগাইন... বাংলা প্রতিরূপটি এই (অবিকল ঐ একই সুরে গেয়):

অকূলে সদাই চলো ভাই, ছুটে যাই।
ভালোবেসে বাঁশিরেশে ভাবে যে সে : "ভয় নাই।
ধাও প্রাণ, গাও গান বরদান এই চাই :
কূল ছাড়ি' যেন তারি অভিসারী তরী বাই।"

রঙিন মেলায় বাসনায় উছলি'
শুনি হায়, আলেয়ায়—ধ্রুবতারা মুরলী।
"ধাও প্রাণ...........তরী বাই।"

অপারবিজয় বরাভয় স্বনিল।
হৃদিতারে ঝঙ্কারে সে-রাগিনী রণিল।
"ধাও প্রাণ...........তরী বাই।"

এ-গানটি এ-বৎসর বিখ্যাত রুষ দাবাড়ু (Grandmaster) আলেক্সিস সুএটিন ও তাঁর এক রুষ সঙ্গিনীকে আমাদের মন্দিরে শুনিয়েছিলাম—আগে মূল রুষ গানটি গাইবার পর আমার গানটি গেয়ে। শুনে তাঁরা কী যে খুশী। রুষ মহিলাটি বললেন : "আমার উচ্চারণ নির্ভুল হয়েছে।" জানি না এ সত্যি প্রশংসা না সুভদ্র কম্প্লিমেন্ট। (মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মন্দ্র কাব্যের : "শীলতার অন্য নাম শুভ্র মিথ্যা কথা"।)

যখন প্রসঙ্গটা এসে গেল তখন বলি—গ্র্যাণ্ডমাস্টার আমার দাবাখেলার সুখ্যাতি করলেন অকুণ্ঠেই—মনে হয় শুধু শীলতার প্রেরণায়ই নয়, কারণ বিশেষ ক'রে শেষ বাজিটা তাঁর সঙ্গে প্রায় ড্র হ'তে হ'তে একটা ছোট্ট ভুলের জন্যে হেরে গেলাম। কেম্ব্রিজে আমার সুনাম হয়েছিল দাবাড়ু ব'লে। অতগুলি কলেজের প্রতি কলেজে পাঁচটি করে দাবাড়ু খেলেছিল পরস্পরের সঙ্গে। আমাদের কলেজে আমি হ'লাম ফার্স্ট বোর্ড অর্থাৎ নেতা, ও ফাইনালে এক কলেজের সঙ্গে খেলায় জিতে গেলাম। আমাকে ওদের "হাফ ব্লু" দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তখন সাহেবরা আমাদের প্রতি বিমুখ তাই আমি "হাফ-ব্লু" হ'তে পারি নি।

মরুক গে অবান্তর কথা। তবে পুরোপুরি অবান্তর নয়—স্মৃতিচারণে এ-সব মনোজ্ঞ স্মৃতি পাংক্তেয় হবার দাবি করতে পারে।

গানের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সঙ্গীত সম্বন্ধে রোলাঁই ছিলেন আমার শিক্ষাগুরু। আমাকে কত যে চিঠি

এ-প্রসঙ্গে শুধু ব'লে রাখি যে, আমি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে পারঙ্গম না হয়েও যে রসজ্ঞ হ'তে পেরেছিলাম তার জন্যে ধন্যবাদার্হ নিশ্চয়ই রোলাঁ। কিন্তু তিনি ওদেশের অপেরার মর্মজ্ঞ হয়ে আমাকে অপেরার রসজ্ঞ করতে চেষ্টা করলেও অপেরা আমি ভালোবাসতে পারি নি। অপেরার যন্ত্রসঙ্গত—অর্কেস্ট্রা—আমার ভালো লাগলেও কণ্ঠসংগীতে আমার সুরেলা কান প্রায় বধির হয়ে আসত, মনে পড়ত প্রবচন—কান ঝালাপালা, প্রাণ পালাপালা। তবে কয়েক বৎসর ক'ষে ওদের গানে আরো তালিম নিলে হয়ত অপেরারও রসজ্ঞ হ'তে পারতাম—কে বলতে পারে? কত কী-ই তো আমাদের প্রথমে প্রতিহত করে যা পরে আমাদের মন টানে। রোলাঁ নিজেও একসময়ে হ্বাগনারের একটি অপেরার বজ্রনিনাদ শুনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠে চ'লে এসেছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন—সংগীতের রসজ্ঞ হ'তে হ'লে প্রথম চাই সুরের কান, দ্বিতীয়—ধৈর্য। এ-কথা কে না মানবে? আমার নিজের বেলায়ই তো দেখেছি—জর্মন ভাষা আমার প্রথম আদৌ ভালো লাগেনি। পরে জর্মন গান গাইতে শিখে আবিষ্কার করি তার ওজঃশক্তি তথা মাধুর্য। ওদের দেশে গীতিকারদের মধ্যে গৌরবের শীর্ষে আসীন জর্মন-গীতিকার। তারপর কে সে, নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে—রুষ, কেউ বলে ফরাসী, কেউ বলে পোল, কেউ বলে চেক, কিন্তু জর্মন গানই যে সংগীতে কোহিনুর এ-সম্বন্ধে মতভেদ নেই। ম্যাথিউ আর্নল্ড তাঁর প্রখ্যাত সনেটে শেক্সপীয়রের সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

"Others abide our question. Thou art free."

আমরা বিচার করি অন্য যত কবি-প্রতিভার,
শুধু তুমি একা সব বিচারের সমূর্ধ্বে আসীন।

জর্মন সংগীতকারদের সংগীত-প্রতিভার সম্বন্ধেও একথা খাটে।

[ছয়]

সুভাষ ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে ফিরে কয়েকমাসের মধ্যেই জেলে যায়। ও প্রস্তুত ছিল জেলে যেতে। বলত প্রায়ই: "স্বাধীনতা গাছের ফল নয় যে পেড়ে খেলেই চলবে—স্বাধীনতার জন্যে চাই দেশমাতৃকাকে ভালোবেসে তাঁর জন্যে দুঃখবরণ।" আজ পূর্ববঙ্গের মুক্তিবীরদের দৃষ্টান্ত দেখে এ-কথা আরো মনে পড়ে।

ওর জেলে যাওয়ার খবর কোথায় পেয়েছিলাম মনে নেই—প্যারিসে না বার্লিনে। তবে মনে আছে—শুনে প্রবল "হোমসিকনেস" আমাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু ও আমাকে লিখেছিল, জর্মনিতে গানে যথাসাধ্য তালিম নিয়ে তবে দেশে ফিরে দেশসেবায় লাগতে। ও প্রায়ই বলত: "যে বড় হ'তে চায় আত্মপ্রসাদের বখশিস পেতে, সে দুর্ভাগা। কিন্তু বড় হওয়া চাই, কারণ বড় হ'লে দেশের সেবায় কৃতী হওয়া সহজ হয়।" তাই দেশে ফিরে দেশবন্ধুকে নেতৃপদে বরণ ক'রে ও আমাকে যে-চিঠি লেখে তাতে পই পই করে আমাকে মানা করেছিল ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে। যে-সাধনার জন্যে জর্মনি-প্রয়াণ সে-সাধনায় যেন সিদ্ধিলাভ করে তবে ফিরি।

যতদূর মনে পড়ে—আমি পারিসে এক ওমরাও (fonctionnaire) মহোদয়ের ঘরে প্রথম আতিথ্য গ্রহণ ক'রে ফরাসী ভাষায় আরো পাকা হয়ে যাই বার্লিন। শ্রীশরৎ দত্ত আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন এক ফ্রাউ কির্সিঙ্গীর-এর কাছে। আমি সোজা গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হই। তিনি সানন্দেই আমাকে জর্মন ভাষায় তালিম দিতে শুরু করলেন। এ-মহিলাটির কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। কত যে লাভ করেছিলাম তাঁর অহেতুক স্নেহের অবদানে। আমাকে তিনি বলতেন তাঁর Enkel—নাতি। আমি বাধ্য হয়ে তাঁকে ডাকতাম Grossmutter—দিদিমা। এঁর সম্বন্ধে আমি আমার "ভাবি এক হয় আর"-এ অনেক কিছুই বলেছি যার ষোলো আনা না হোক অনেক কিছুই সত্য। তাই সেসব কথার পুনরুক্তি করব না। তবে তাঁর সালঁ-পার্টিতে পাসপোর্ট পেয়ে আমি এত লাভবান্ হয়েছিলাম যে সে-সম্বন্ধে কিছু বলি যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন নিযুতপতি—মিলিয়নেয়ার। যুদ্ধের পরে জর্মন মার্ক প'ড়ে যেতে মিলিয়ন

মার্ক হয়ে দাঁড়াল—তুচ্ছ, গ্রাসাচ্ছাদনও চলে না তার দৌলতে। আমি যখন বার্লিনে যাই তখন এক পাউণ্ডে চার-পাঁচ হাজার মার্ক পেতাম। কাজেই থাকতাম রাজার হালে। দিদিমাকে নিয়ে যেতাম সেরা সিম্ফনি-কন্সার্টে—জগদ্বিখ্যাত নিকিশের পরিচালনায়। কখনো কখনো অপেরাতেও নিয়ে যেতাম দামী সীট-এ—৫০০/৬০০ মার্ক খরচ করে। দুঃখ হ'ত ভাবতে যে তিনি প্রতিদানে আমাকে কোনো কন্সার্টে বা অপেরায় নিয়ে যেতে পারতেন না ভালো সীটে। কিন্তু বেদনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছিল তাঁর আশ্চর্য তেজস্বিতা। তাঁর এক মেয়ে প্যারিসে ধনীর গৃহিণী। আর এক মেয়ে মস্কোয় এক সঙ্গতিপন্ন স্বামীর আদরিণী। দুজনেই অপরূপ সুন্দরী (তাঁদের আমি পরে দেখেছিলাম)—শুধু সুন্দরী নয়, বিদুষী তথা স্নেহশীলা। তাঁরা বারবার বলতেন মাকে তাঁদের কাছে গিয়ে থাকতে। কিন্তু বৃদ্ধা ছিলেন অনমনীয়া। আমাকে বলেছিলেন: "আমি তেরোটি ভাষা জানি, ছাত্রীও পাই, কাজেই কেন পরের গলগ্রহ হব?" ইংরাজী, ফরাসী, জর্মন, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, পোলিশ এমন কি রুষ ভাষায়ও তিনি স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারতেন। সুইডিশ, নরওয়েজিয়ান, ডেনিশ ভাষাও জানতেন। আমি তাঁর কাছে প্রথমে জর্মন ভাষায় তালিম নিই, তারপর ইতালিয়ান ভাষায়। ইতালিয়ান ভাষায় বেশিদূর এগুতে পারিনি সময়াভাবে, কিন্তু জর্মনে স্বচ্ছন্দে আলাপ করতে পারতাম—যদিও আমার সবচেয়ে ভালো লাগত ফরাসী ভাষা। দিদিমা আমাকে তাঁর লাইব্রেরি থেকে ভালো ভালো বই দিতেন পড়তে। কিন্তু পড়বার আমি বেশি সময় পেতাম না। ওখানে Sternes Conservatorium-এর অধ্যক্ষের কাজে দিদিমা আমাকে পেশ করে দিতে তিনি এক রুষ বেহালাবাদক ও এক হাঙ্গেরিয়ান সুগায়কের কাছে গান বাজনা শিখতে উপদেশ দেন। বেহালা আমি তিন চার মাস পরে ছেড়ে দিই, কারণ দিদিমা বললেন: "তোমার প্রতিভা গানের, বেহালা শিখে কী হবে? সমস্ত শক্তি একমুখী করো—গানই শেখো।"

কথাবৎ কার্য। আমি উঠে পড়ে লাগলাম কণ্ঠ-সাধনা করতে—আর অল্পদিনের চাষেই প্রচুর ফসল ফলল। শিক্ষক য়েকেল্যুস (Jekelius) আমাকে বললেন আমি যদি মাত্র পাঁচটি বৎসর গান শিখি তবে অপেরা গায়ক হয়ে নাম কিনতে পারব। আমি তাঁকে সাফ বলে দিলাম, অপেরা-গায়ক হবার কোনো উচ্চাশাই আমার নেই—আরো এই জন্যে যে, অপেরা গায়কদের গায়কী আমার কর্ণপটহকে দুঃখ দেয়। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন: "Jammerschade!" (শেক্সপীয়রের ওথেলোর ভাষায় এর অনুবাদ: "The pity of it!")

কিন্তু আমার তিনি মস্ত উপকার করেছিলেন---(১) ইতালিয়ান পদ্ধতিতে গলা সাধতে শিখিয়ে; (২) জর্মন গানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে; (৩) তাঁর উৎসাহে আমার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য উন্নতি ঘটিয়ে, যেন জাদুবলে। তাঁর কাছে কণ্ঠসাধনার যে পদ্ধতি শিখেছিলাম দেশে ফিরেও শুধু যে নিজে সে-সাধনাকে বরণ করেছিলাম তাই নয়, একাধিক শিষ্য-শিষ্যাকেও তালিম দিয়েছিলাম যার মধ্যে দুজন পরে নাম করেন—শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা বসু। গোবিন্দগোপাল আমার নির্দেশে কণ্ঠসাধনা করে যে লাভবান্ হয়েছিলেন একথা তিনি আজও স্বীকার করেন। দুঃখ এই যে, গীতিরাণী উমার কণ্ঠ অকালে নীরব হয়ে গেল। ১৯৪১ সালে তাকে মৃত্যু আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সে আজ থাকলে আমার শ্রেষ্ঠ গানের এমন রূপ দিত যার ফলে সকলকে স্বীকার করতে হ'ত গানগুলির সুরকৃতি। কিন্তু হারানো খেই ধরি ফের। ফিরে আসি জর্মনিতে।

বার্লিনে ও প্যারিসেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় কন্টিনেন্টের সংস্কৃতির সঙ্গে, আমি দেখতে পাই য়ুরোপকে তার বিশাল পটভূমিকায়। ইংলণ্ডে থেকেও জর্মন গান শেখা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডে এত জাতের বন্ধুবান্ধবী লাভ হ'ত না। জর্মনিতে আমার যে কত বন্ধু লাভ হয়েছিল যাঁরা আমাকে তাদের প্রীতির

বরণমালা দিয়ে ধন্য করেছিল, কত পবিত্রহৃদয়া বান্ধবী তাদের আনন্দমেলায় যোগ দিতে ডেকে আমাকে উল্লসিত করত, কত গায়ক আমার গান শুনে আমাকে উৎসাহিত করত তার যথাযথ বর্ণনা কী করে করব? কিন্তু একটি কথা না বললেই নয়: জর্মনজাতির নিষ্ঠা ও পৌরুষ আমাকে অভিভূত করলেও আমি তাদের সঙ্গে মিশে প্রথম জানতে পারি কেন তারা ইংরাজবিদ্বেষী হয়েছে। শুনতাম স্পষ্ট তাদের অন্তরে ইংরাজদ্বেষের গুরুগুরু গর্জন। টের পেয়েছিলাম ওরা ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছে আর এক বিশ্বযুদ্ধের জন্যে। ওরা বিশ্বাস করত সত্যিই যে ওরা প্রভুজাতি—হিটলারের ভাষায় Herrenvolk. জর্মন দেশভক্তিও ছিল কম উগ্র নয়—Deutschland ueber alles—জর্মনি সবার উপরে—ছিল ওদের জাতীয় সঙ্গীত। ইংরাজ বলত: বৃটানিয়া সমুদ্র-রাজ্ঞী। ওরা বলত: জর্মনজাতি welt-bezwinger—জগজ্জয়ী। ফরাসীরা গাইল:

Aux armes citoyens !
Formez vos bataillons
Marchons marchons......

লঘুগুরু ছন্দে এর তর্জমা:

ধর ভীম অস্ত্র পুরবাসী!
রচি' বিজয়িসংঘ অবিনাশী!
চল আগে...চল আগে......

জাতীয় দর্পের সঙ্গে জাতীয় দর্পের সংঘাত......যুদ্ধ যে ফের গর্জে উঠবে এ তো দুই আর দুইয়ে চারের লজিক।

এ-সমস্যার সমাধান কোথায়—এর ওর তার সঙ্গে আলোচনা করতাম। কিন্তু কোনো সুষ্ঠু উত্তর পেতাম না। কেবল যাঁদের মত আমি মূল্যবান্ মনে করতাম তাঁরা সবাই একবাক্যে বলতেন: জাতীয়তা—nationalism-এর যুগ গত। এঁদের শিরোমণি ছিলেন দুজন: রোলাঁ ও রাসেল। বার্লিনে রুষদেশের যা খবর পেতাম আমার রুষ বন্ধুবান্ধবীর মুখে তাতে মনে হ'ত না যে রাশিয়া আন্তর্জাতিকতার ধার ধারে।

এই সময়ে আমি হঠাৎ শ্রীমানব রায়ের সঙ্গে সংস্পর্শে আসি। তিনি তাঁর এক বাহনকে দিয়ে আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি গুপ্তভাবে আছেন। সে-সময়ে বার্লিনে বলশেভিকদের সবাই এড়িয়ে চলত। বিশেষ ক'রে জর্মন, ফরাসী ও রুষ উদ্বাস্তরা।

আমার বুকের মধ্যে গুরুগুরু করে উঠল। আমি কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে ইতিমধ্যে সংস্পর্শে এলেও মানব রায় তখন ছিলেন বিপ্লবীদের মুকুটমণি। মানব রায়ের সঙ্গে কথা কয়ে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। এমন দীপ্ত বুদ্ধি আমি আর কোনো বিপ্লবীর মধ্যেই দেখি নি—না হেরম্ব গুপ্তর, না বীরেন চট্টোর, না পিলাইয়ের, না ভুপেন দত্তর। এঁদের একটা আড্ডা ছিল—সপ্তাহে একদিন করে তাঁরা জমায়েৎ হতেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে—প্রবচনটি অকাট্য। নৈলে কি নিরীহ দিলীপকুমারও সেখানে গিয়ে তারস্বরে প্রেমের গান করেন? বিশেষ করে আমার মুখে "মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে" শুনে স্বামীজির ভ্রাতা মহাবিপ্লবী ভুপেন্দ্র দত্ত মুগ্ধ। যখনই গাইব ঐ গানটি গাওয়াই চাই। আমি মনে মনে ভাবতাম চাপা হেসে: এমন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীও কি না প্রেমের গান শুনে উচ্ছ্বসিত।" তখন আমার কণ্ঠ য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে সাধনা করে হয়েছিল শিখরচারী। আমার সম্বন্ধে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ Mrs. Cousins একদা বলেছিলেন: "Dilip sings like a king" রাজারা দস্তু গায়ক এ আমার জানা ছিল না, কিন্তু খোদ ভুপেন্দ্র দত্ত যখন "মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে" শুনে উজিয়ে উঠলেন তখন মনে হয়েছিল যে, রাজা হয়ত বিপ্লবীকেও মোহিত করতে পারে যদি সে ইতালিয়ান পদ্ধতিতে কণ্ঠসাধনা করে রাজকীয় ধ্বন্যালোকে পৌঁছয়। কিন্তু ঠাট্টা রেখে বলি মানব রায়ের কথা। যেমন অমায়িক তেমনি আলাপী। হাসতেও পটু অথচ বিতণ্ডাতেও দুর্ধর্ষ। আমি বলশেভিকদের সম্বন্ধে যা যা শুনেছিলাম বলতে তিনি আমাকে অপ্রতিবাদ্য যুক্তিজালে হারিয়ে দিয়ে

হেসে বললেন: পরের মুখে ঝাল খাবেন না দিলীপ বাবু—চলুন মস্কোয়, যাবেন?" আমি তো আতঙ্কেই সারা। ওখানে গেলে আর ফিরতে পারব না—বলেছিল আমাকে একবার বন্ধু শহীদ সুরবর্দি—যার কথা পরে বলছি। মানব রায়কে এ-কথা বলতেই তিনি হো হো করে হেসে উঠে বললেন: "আমি জামিন দিলীপ বাবু, চলুন।" আরো কি কি কথা হয়েছিল মনে নেই, কেবল তাঁর শেষ অনুরোধটি ভুলি নি কেননা আমার বুদ্ধির তিনি তারিফ করেছিলেন। বলেছিলেন: "আপনি দেশের সুসন্তান, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে, প্রতিভায়। আমরা চাই এমনি রিক্রুট। ওল্ড ফোগিদের দিয়ে কাজ হবে না—তাদের দিন শেষ হয়েও এসেছে। রুষদেশে এখন একটা নবজাগরণের যুগে এক আশ্চর্য নবাশিহরণ"......ইত্যাদি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনে কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে পড়লাম। বললাম: "আচ্ছা, আপনাকে আমি ভেবে উত্তর দেব।" তিনি বললেন: "ভাবুন যত ইচ্ছে, কেবল বাজে লোককে কনসাল্ট করবেন না।"

অতঃপর আরো একদিন তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল জানাতে যে আমি যেতে ভয় পাচ্ছি, কেননা লণ্ডনের হাই কমিশনর এন সি সেন আমাকে তার করেছেন: যেও না মস্কো। গেলে তোমার পাসপোর্ট আর তোমার কোনো কাজে আসবে না।

কিন্তু তবু মানব রায়ের অসামান্য বুদ্ধি তর্কযুক্তি আমি ভুলতে পারি নি। শুনেছি শেষ বয়সে তিনি মত বদলেছিলেন এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নাকি তাঁরি জন্যে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। তবে একথা সত্য কি না জানি না, তদন্ত করতেও মন চায় নি কোনো-দিনই। মানব রায়ের মনীষার স্মৃতিই অটুট থাকুক আমার মনে।

বঙ্গদেশে গুরুর ভূমিকায় জৈন দান

রামপ্রসাদ মজুমদার

বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা, বিশেষতঃ বৈদিক কালের কথা বলতে গেলে অধিকাংশ পণ্ডিতই একটু নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন। তাঁরা সহজেই বলে উঠবেন যে বাঙ্গালী ত বৈদিকযুগে পক্ষীসদৃশ তুচ্ছ ও অনার্য্য ছিল, তীর্থক্ষেত্র ছাড়া কেউ এদেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত, ইত্যাদি। প্রাচীন বিবিধ বর্ণনার বিশ্লেষণ ক'রে আমার ধারণা এই, যে, রক্তগত দিক দিয়ে, এমন কি কৃষ্টির দিক দিয়েও বাঙ্গালী যে অনার্য্য ছিল বা ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণী বাদে অন্যেরা অনার্য্য ছিল একথা বলা যায় না। বরং রক্তে ও কৃষ্টিতে তারা আর্য্য ছিল এমন কথা বলারও কিছু যুক্তি আছে। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে বহু জাতিতত্ত্ববিদ্ই আর্য্যনামে একটি জাতির অস্তিত্ব মানেন না। কতকগুলি মাথার মাপ বা খুলি নিয়ে বা রং ইত্যাদি দেখে জাতিনির্ণয় ক'রে রিজলী সাহেব বা কেউ যদি বাঙ্গালীর মধ্যে অনার্য্য বা দ্রাবিড়, মঙ্গলজাতির রক্ত দেখে থাকেন তবে সে দেখাকে কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বলে নিতে হবে? বস্তুতঃ এইসব ক্ষেত্রে নানামুখী সংশয় আছে; যেমন, দ্রাবিড় ও মঙ্গল-এরা অনার্য্য কি না এবং অগণিত বা বহুলসংখ্যায় বঙ্গদেশে ২।৪ হাজার বছর পূর্ব্বে এসেছিল কি না। এদিকে কমবেশী দু হাজার বছর পূর্ব্বের সঙ্কলিত নিম্নোক্ত গ্রন্থ মহাভারত, জৈন গ্রন্থ ভগবতীসূত্র, প্রজ্ঞাপনাসূত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি হ'তে বাংলার বিভিন্ন অংশে আর্য্যদেশ ছিল তা সুস্পষ্ট জানা যায়।

এ প্রবন্ধে উক্ত ব্যাপারটি নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন এই কারণে যে, যে পটভূমিকায় বা কালের সন্ধিক্ষণে জৈন গুরুরা বঙ্গের বিভিন্ন অংশে এসেছিলেন ও শিষ্য-সম্প্রদায় তৈরি করেছিলেন সেই ভূমিকা ও ভূমি সত্যিকারের অনার্য্য বা অসভ্য ছিল না। বাঙ্গালীর আর্যত্ব সম্বন্ধে যাদবপুর (২৪ পরগণা) প্রাচ্য সম্মেলনের Summary Paper, ১৯৬৯, ও অন্যান্য পত্রিকায় পূর্ব্বেই কিছু লিখেছি। এখন দু চার কথায় বঙ্গপ্রসঙ্গে বৈদিক-ও বৌদ্ধ-পর্ব বিষয়ে কিছু বলে নিই; পরে জৈন গুরুদের কথা বলছি। কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, অহিংসা, প্রভৃতি বিষয়ে বৌদ্ধ-জৈনমত বৈদিক সাহিত্যেও দেখা যায়।

(ক) বঙ্গে বৈদিক-পর্ব (৭০০-খৃঃ পূঃ)

(১) শতপথ ব্রাহ্মণে বিদেঘ মাথব (বিদেহ মাধব) কোসল-বিদেহের মর্য্যাদা বা সীমায় যাচ্ছেন আর সদানীরা নদী "অনতিদগ্ধা অগ্নিনা" রয়েছে বলা হয়েছে। এথেকে প্রাচ্য বা বাঙ্গালী অগ্নিপূজক নয় ব'লে অনার্য্য, এটি যুক্তিসিদ্ধ নয়; কারণ অনতিদগ্ধ শব্দের অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে দগ্ধ অন্ততঃ অদগ্ধ নয়। তা ছাড়া অগ্নিপূজক না হলেই কি রক্তে অনার্য্য হবে?

(২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখি বিশ্বামিত্র গাথী (ঋগ্বেদে—গাথিনঃ') তাঁর পুত্রদের শাপ দিয়ে বলছেন—তোরা 'দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ' অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুণ্ড্র প্রভৃতিতে পরিণত হ। এথেকে পুণ্ড্র প্রভৃতি রক্তে অনার্য্য—এটি বলা ঠিক নয়। পুণ্ড্র শব্দে প্রায়ই রাজসাহী বিভাগের অংশ বা ব্যাপকতর অংশ ধরা হয়, কিন্তু দস্যু হলেই কি রক্তের ভিন্নতা হয় বা বিশ্বামিত্রকে আমরা আর্য্যঋষি বলেও কেমন করে তাঁর পুত্র বা তদ্বংশীয়দের রক্তে অনার্য্য বলতে পারি?

(৩) সবচেয়ে বড় যুক্তি দেখান হয় ঐতরেয় আরণ্যক হতে। এতে ২।১এ আছে:-

প্রজা হ তিস্রোঽত্যায়মায়ং-স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গা-বগধা-শ্চেরপাদা স্ত্বন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।

সায়ণাচার্য্য (-১৪শ শতক) ও পরবর্ত্তী আনন্দগিরি

'তিস্রঃ প্রজাঃ'কে চতুর্বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপে ধরেছেন, তাদের পথ-লঙ্ঘনের (রীতি লঙ্ঘন) কথা বলেছেন, বঙ্গ, অবগধ (বগধ) ও চেরপাদের বা ঈরপাদের ব্যাখ্যা দেশবাচক না ধ'রে বৃক্ষবাচক বা প্রাণীবাচকরূপে ধরেছেন। একজনের ভাষ্যে বঙ্গাঃ= "বনগতা বৃক্ষাঃ", অপর ব্যাখ্যায় বঙ্গাঃ="বং জ্ঞানং গময়ন্তি" (যে তে)। দেখা যাচ্ছে যে অনার্য্যত্বের কথা কেউ বলছেন না; লয় ব্যাখ্যামতে বঙ্গাঃ=যাঁরা জ্ঞানের উপদেষ্টা। বয়ঃ শব্দ পক্ষী অর্থে পরবর্ত্তীকালে প্রযুক্ত হতে পারে; তা হলেও ঋগ্বেদে কয়েকজন বয়ঃ ঋষির (সুপর্ণ প্রভৃতি) কীর্ত্তি বলা আছে। ঋগ্বেদের "স্বস্তি নস্তার্ক্ষো'ঽরিষ্টনেমিঃ..." মন্ত্র প্রসিদ্ধ। একত্রে বঙ্গ, বগধ (বহুমতে মগধ) ও চেরপাদ এই তিন নাম থাকায় ভাণ্ডারকর মহাশয় এই তিনটি অঞ্চল কাছাকাছি ছিল ব'লে মনে করেন। স্থূলসীমারেখাও দেওয়া কঠিন বটে তবে দুই আড়াই হাজার বছর পূর্বে লাঢ় (রাঢ়) প্রভৃতি দেশ বিখ্যাত থাকায় বঙ্গ স্থূলতঃ পূর্ব্ববঙ্গ হতে পারে, বগধ শব্দ বহু পরবর্তী নাম বগ্ড়ী (অনেকের মতে ব্যাঘ্রতটী-শব্দজাত) বা বকদ্বীপের তথা 'বাগদী' শব্দের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে, কিন্তু চেরপাদ কোন্ দেশ বা দেশীয় তা বলা কঠিন, একপাদ দেশ নয়ত? মার্কণ্ডেয় পুরাণাদিতে প্রাচ্যে একপাদ দেশের নাম আছে, মঙ্গলকাব্যেও ভ্রমণ-পথ বর্ণনায় এর নাম আছে এবং ঐ দেশ বর্দ্ধমান-প্রেসিডেন্সী বিভাগের সীমান্তের স্থান হতে পারে। উক্ত শ্লোকের 'অর্ক' শব্দের অর্থ সূর্য্য (তেজোময় পদার্থ?) প্রভৃতি না হয়ে যদি বহু পরবর্ত্তীকালে প্রাপ্ত নাম 'আরাকান্' (বঙ্গে 'রখিয়াং') বা ঐরূপ কোন দেশকে বোঝায় তা হলে বিস্ময়েরই বা কি আছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে ত্রিবিধ প্রজা বা তিন-দেশীয় লোকের পথ অতি লঙ্ঘন করার কাহিনী ঋগ্বেদাদির ঋষিরাও জানতেন। ঋগ্বেদ ৮।১০১ সূক্তে 'জমদগ্নি ভার্গব' ঋষি পবমান দেবতার (সোম?) উদ্দেশে উক্ত শ্লোকের ধরণে লিখেছেনঃ—

"প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ু-র্ন্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে।
বৃহদ্ধ তস্থৌ ভুবনেষ্বন্তঃ পবমানো হরিত আবিবেশ॥ ১৪"

অথর্ববেদেও ১০।৮।৩এ ঐ-ভাষায় উক্ত স্থূল মর্ম্ম রয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জমদগ্নি প্রভৃতি রাজা হরিশ্চন্দ্রের সময়ের। "বঙ্গ" তথা প্রাচ্যঅঞ্চল বহু ঋষির জানা ছিল দেখা যাচ্ছে। বেদাঙ্গ পাণিনিসূত্র (খৃঃ পূঃ-৫ম-শতক) প্রভৃতিতে গৌড়, 'ঘ্যঞ্ মগধ—' (ঘ্যঞ্ গণপাঠে দ্বিস্বরান্ত অঙ্গ, বঙ্গ) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে "মনো হ বৈ ঋষভ আস।" প্রয়োগ দেখা যায়। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র ঋষভদেব পুরাণাদি মতে আদি জৈন। এঁর আত্মীয় সাংখ্যকার কপিল দক্ষিণবঙ্গের দ্বীপে পূজিত।

(খ) বঙ্গে বৌদ্ধপর্ব্ব (৫০০ খৃঃ পূঃ)

বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থের প্রাচীন টীকা-গ্রন্থ হতে জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধ 'অস্সপুর, কজঙ্গলা (মুখেলুবন,) কম্মাস্সধম্ম, কোটিগাম,...চম্পা (গগ্গরা), চাতুম, সুম্ভ দেশের (পাঠভেদ সেতক), নগরক,...'ব্রহ্ম'-অঞ্চল ("world") প্রভৃতি ঘুরে গেছেন। উক্ত অস্সপুর হয়ত জৈন ভগবতীসূত্রের অচ্ছাপুরী। কজঙ্গলাকে রাজমহলের (পূর্ণিয়ার পাশে) নিকটে প্রাচীন পাল-যুগের কজঙ্গল বলা যায়। কোটিগাম দ্বারা 'রাঢ়ের রাজধানী' দিনাজপুর প্রভৃতি সহ সংশ্লিষ্ট কোটিবর্ষের অঞ্চল সূচিত হয়ে থাকতে পারে; ১৬৬০খৃঃ এ ফন্ দেন্ ব্রুকের ম্যাপে বর্দ্ধমান-বিভাগীয় অংশে 'ত্রিপেনি'র (ত্রিবেণী) দক্ষিণে Coatgam স্থান রয়েছে। চম্পা ভাগলপুর সংশ্লিষ্ট। 'সুম্ভ' বা সুহ্মদেশ ১২শ শতকের কোষগ্রন্থ প্রভৃতি মতে রাঢ়ের সমার্থক (বা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত)। ব্রহ্ম অঞ্চল পুরাণের ব্রহ্মোত্তর (হয়ত Barmhator পরগণা সংশ্লিষ্ট বা মুর্শিদাবাদের Berhampur-সংশ্লিষ্ট) বা বঙ্গদেশের পূর্বে ব্রহ্মদেশকেও বোঝাতে পারে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধদেব বর্দ্ধমান বিভাগে ও তার পশ্চিমোত্তর প্রান্তে ঘুরে গেছেন। এই বুদ্ধদেবেরই প্রত্যক্ষ শিষ্যরূপে

বঙ্গীস (বঙ্গীশ বা বঙ্গরাজ) থেরা বিখ্যাত, এই থেরা বা স্থবির দেশভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন ও থেরগাথার ৭১।৭২টি শ্লোকের রচনাকারী, তাছাড়া বৌদ্ধ মিলিন্দ পঞ্‌হো (বা মিনান্দারের প্রশ্ন) গ্রন্থে তিনি বিখ্যাত। তাঁর (৫ম শতক খৃঃ পূঃ) বঙ্গ যুক্তবঙ্গের অংশবিশেষ হবে মনে হয়।

উক্ত 'দেশক' স্থলে রাজা উদায়ী বুদ্ধসহ আলোচনা করেন ও বুদ্ধ এখানে উদয়-সুত্ত ও তেলপত্ত জাতক প্রচার করেন। (মললসেকের-এর Dic. of Pali-দ্রঃ।

(গ) বঙ্গে জৈনগুরু খৃঃ পূঃ

খৃষ্টপূর্ব্বকালেই বঙ্গদেশ বৈদিক মত ও বৌদ্ধ মতকে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অন্ততঃ উক্ত ও (অনুক্ত) বিভিন্ন মতের আস্বাদ পেয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। এখন দেখা যাবে যে জৈন-গুরুরাও তৎকালে প্রাচ্যে ও বঙ্গদেশে তাঁদের মত-প্রচার করেছিলেন। ঋষভদেব হ'তে মহাবীর পর্য্যন্ত (৫০০ খৃঃপূঃ) মোট তীর্থঙ্কর ২৪ জন; এঁরা বিভিন্ন সময়ে জৈনমত প্রচার করে-ছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বঙ্গদেশের অংশ বিশেষে এসে ঘুরে গেছেন। মহানন্দ পুস্তকে (১।২৬ পৃঃ) প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই মর্ম্মে লিখেছেন, জৈনদের প্রাচীন অঙ্গসূত্র ও কল্পসূত্র হতে জানা যায় যে:

(১) শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতির বংশে জাত ২২তম তীর্থঙ্কর নেমিনাথ সিন্দুরে বা রাঢ়ে (সিন্দুর-প্রসঙ্গ কল্পিত বোধ হয়) ভিক্ষুধর্ম্ম প্রচার করেন; এবং (২) ৮০০ খৃঃপূর্বাব্দে (এটা স্থূল হিসাব মনে হয়) ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী সিন্দুর বা রাঢ়ে (এখানেও সিন্দুর নাম কল্পিত) বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে চাতুর্য্যাম ধর্ম প্রচার করেন। বঙ্গপ্রান্তে পরেশনাথ (সমেত শিখর) পাহাড়ে এঁর স্মৃতি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে প্রাকৃত জৈনগ্রন্থে লাঢ়, লাঢা, লাটা প্রভৃতি বিভিন্ন লিঙ্গে (প্রাচ্য-প্রসঙ্গে) ব্যবহৃত হয়েছে, এবং আমরা প্রায়ই এগুলিকে রাঢ়ের রূপান্তর বলে মনে করি। সংস্কৃতে বিভিন্ন গ্রন্থেও রাঢ় ও রাঢ়ার প্রয়োগ আছে, উভয়ের মধ্যে অল্পবিস্তর ভেদ থাকাও অসম্ভব নয়। পালিতে 'লাল' (শেষের ল বিশেষ জাতীয়, ল ও ড এর মধ্যবর্ত্তী) শব্দই রাঢ় স্থলে দেখি। জৈন ভগবতীসূত্র হতে জানা যায় যে ভিক্ষাচর্য্যার (সম্ভবতঃ উক্ত ভিক্ষুধর্ম) ৪টি বিভাগ, ভিক্ষার স্থান, ভিক্ষাদাতার মনোভাব, ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ আয়ারাঙ্গ সুক্ত (আচারাঙ্গ সূত্র, ১।৮।৩ প্রভৃতি দ্রঃ) হতে জানা যায় যে ২৪তম তীর্থঙ্কর মহাবীর শিষ্যদের নিয়ে রাঢ়া জনপদে আসেন; এই স্থান পথবিহীন, ও অধিবাসীরা রূঢ় ও আচার-বিহীন বলে তাঁরা মনে করেছেন। এই গ্রন্থে রাঢ়া=বজ্জ ভূমি ও সুব্‌ভ ভূমি (বজ্র ও সুহ্ম)। এই বর্ণনা হতেও বোঝা যায় যে মধ্যযুগীয় টীকা বা কোষ-লেখকদের মত "সুহ্মা রাঢ়াঃ" দ্বারা সুহ্ম=রাঢ় বা রাঢ়া নয়; তাছাড়া এই জনপদের মধ্যে বিহারেরও কিছু অঞ্চল থাকা সম্ভব।

জৈনগ্রন্থ 'কল্পসূত্রে' স্থবির-তালিকায় নিম্নরূপ বিবরণ দেখা যায়। ৫ম স্থবিররূপে আর্য্য যশোভদ্রের নাম। পরে বা পরবর্ত্তীকালে 'প্রাচীন'-গোত্রের আর্য্য ভদ্রবাহু ও 'মাঠর'-গোত্রের আর্য্য সম্ভূতিবিজয়—এই দুই স্থবির। উক্ত ষষ্ঠ স্থবির ভদ্রবাহুর ৪জন 'কাশ্যপ'-গোত্রীয় শিষ্যমধ্যে একজন হলেন গোদাস। ইনি 'গোদান-গণ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের সম্প্রদায় ভেদের নানা নাম—গণ, কুল, শাখা। এ সম্বন্ধে এক মত এই যে একগুরু হতে (পরে) প্রচলিত সম্প্রদায় হচ্ছে গণ; ঐরূপ একাধিক গুরুর পরে প্রচলিত সম্প্রদায় হচ্ছে কুল, কখনও কখনও কুলকে শাখারূপে ধরা হয়। বিভিন্ন প্রাচীন জৈন লেখে (inscription) শ্রাবক বা দাতার পরিচয়ে 'শাখা' ও 'গচ্ছ' প্রভৃতির পরিচয় দেখা যায়। উক্ত গোদাসের সম্প্রদায়ে ৪টি শাখা: (১) তাম্রলিপ্তিকা; (২) কোটি-বর্ষীয়া; (৩) পুণ্ড্র বর্দ্ধনীয়া; ও (৪) দাসী খর্বটিকা। প্রথম তিনটি শাখার নামই দেখা যাচ্ছে বঙ্গদেশের এক বিরাট অংশের নামে; ৪র্থটি বঙ্গে না বাইরে তা বলা কঠিন। ৪টি নামের মধ্যে ৩টি নাম হতেই বঙ্গদেশে জৈনগুরু গোদাস প্রভৃতির প্রভাব দেখা যায়।

(১) তাম্রলিপ্তিকা স্থূলতঃ বর্দ্ধমান বিভাগের দক্ষিণাংশ পড়ে। (২) কোটিবর্ষ নিয়ে মতভেদ থাকলেও তা বঙ্গদেশেই। জৈন পঞ্ঞাবনা সূত্রে (প্রজ্ঞাপনা) বলা হয়েছে, 'কোড়িবরিষ, লাটায়ে', নেমিচন্দ্র-টীকায় বর্ণনা 'লাটাসু কোটিবর্ষম্', এক পুঁথিতে 'লাঢাসু—'। লাট বা রাঢ় বা রাঢ়া বৰ্দ্ধমান বিভাগের কিয়দংশ নিয়ে পড়বে, তাম্রলিপ্ত-অংশ বাদে। কোটিবর্ষকে কিন্তু দিনাজপুরের মধ্যে ধরা হয়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! ভগবতীসূত্রেও কোটিবর্ষকে রাঢ়ের রাজধানী ধরা হয়েছে আর সেই কোটিবর্ষ কিভাবে দিনাজপুরে পড়ে? এর সহজ ব্যাখ্যা এরূপে হ'তে পারেঃ—(ক) দেড়-দুই হাজার বছর পূর্বে রাঢ়ের বা রাঢ়ার মধ্যেই দিনাজপুর অঞ্চল ছিল; বা (খ) দুই স্থানেই পৃথক ভাবে ঐ নামের স্থান থাকতে পারে। (৩) পুণ্ড্রবর্দ্ধন দ্বারা সাধারণত রাজসাহী বিভাগের পূর্ব বা উত্তরপূর্ব অংশকে ধরা হয়—অন্তত গুপ্তশাসন কালে। বগুড়ার মহাস্থান গড়ে এক গুপ্তলেখে 'পুন্দনগল' শব্দ আছে তাকে সংস্কৃত বা শুদ্ধরূপে পুণ্ড্র-নগর বলে ধরা হয়। একাধিক পুণ্ড্র-রাজ্য ছিল ও পৌণ্ড্র বা পৌণ্ড্রক রাজ্যটি পুণ্ড্র হতে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পৃথক ছিল এরূপ মনে করাও বোধ হয় দোষের নয়। কোন কোন পণ্ডিত (তথা S B E. XXII, কল্পসূত্র, এর সম্পাদক) উক্ত সূত্রের পুণ্ড্রকে ছোটনাগপুর অঞ্চল বলে মনে করেন। (৪) দাসীখর্বটিকা একটি নূতন নাম। পূর্বোক্ত তিন নামের সাহচর্য্যে ও অন্যান্য কারণে এটিও বঙ্গদেশে বা পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে স্থিত ছিল মনে হয়। মহাভারতে পাণ্ডবদের প্রাচ্যজয় প্রসঙ্গে তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি সহ 'কর্বট' স্থানের উল্লেখ আছে। ডঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তাম্রলিপ্তের সঙ্গে কর্বটাদির উল্লেখ দেখে কর্বট'কে মেদিনীপুরের 'করবার' জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করেন। এ ধারণা বোধ হয় দুর্বল, কারণ স্থানগুলি জয়ের বা বাস্তব ক্রম অনুসারে আদৌ সাজান নয়, তা ছাড়া প্রাচ্যে কর্বটাশন নামে একটি গিরির কথাও বহু প্রাচীন গ্রন্থে আছে। খর্বট শব্দের দুর্গবিশেষরূপে ব্যাখ্যা মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, অন্যত্রও ব্যাখ্যা বা স্থানবর্ণনায় ঐ নাম আছে। কর্বট কি খর্বট শব্দের রূপভেদ?—কর্কোট নাগ-সংক্রান্ত (আরাকান) নয় ত? রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জৈনদের সোমপুর বিহার ছিল, একথা কেউ কেউ বলেন।

চাণক্য নন্দবংশধ্বংসকারী ও মৌর্য্যকালের। এঁর জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কোনও মনীষীর মতে (সম্ভবতঃ কানিংহামের) তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী; কিন্তু এর প্রমাণ নেই, পক্ষান্তরে দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র তাঁর স্থবিরাবলি-চরিত গ্রন্থে (৮।১৯৪) (জৈন স্থবিররূপে) চাণক্যের জন্মস্থানাদি এইভাবে দিয়েছেন :—

"ইতশ্চ গোল্লবিষয়ে গ্রামে চণকনামনি।
ব্রাহ্মণোঽভূচ্চনী নাম তদ্ভার্য্যা চ চণেশ্বরী ॥১৯৪
বভূব জন্মপ্রভৃতি শ্রাবকত্ব (?) চণশ্চনী।...
চণী চাণক্য ইত্যাখ্যাং দদৌ তস্যাঙ্গজন্মনঃ।
চাণক্যোঽপি শ্রাবকোঽভূৎ...। ২০০"

চাণক্য নামটি আসলে অপত্য-প্রত্যয়ান্ত বোধ হয়, পিতৃনামাদিও 'চণ' শব্দসহ সংশ্লিষ্ট। জন্মস্থান গোল্ল=বিষয় ও চণক গ্রাম কোথায় তর্কের বস্তু। চতুষ্কোণ পত্রিকায় মাসকতক পূর্বে 'হাওড়া' প্রবন্ধে আমি দেখাতে চেয়েছি যে (বৃহত্তর) হুগলীর (goli) মধ্যে চাণক (মঙ্গলকাব্যে চাণকের ঘাট; চার্ণক-পূর্ব লেখায়; ২৪-পরগণায় গঙ্গার অদূরে) হয়ত চাণক্যের জন্মভূমি। জৈন কথাকোষ প্রভৃতি গ্রন্থেও চাণক্যের নাম। চাণক্য বোধ হয় দুজন, একজন বৃদ্ধচাণক্য। পঞ্চতন্ত্রে "চাণক্যাদীনি নীতিশাস্ত্রগণ" রয়েছে, চাণক্য-শ্লোক বাঙ্গালীরও আদরের গ্রন্থ।

সেনযুগের লেখমালায় দানগ্রহীতাদির পরিচয় দানকালে গোত্র, প্রবর, অনুপ্রবর প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে; জৈনদের গোত্র, শাখা প্রভৃতির সঙ্গেও এদের সম্বন্ধ থাকতে পারে। প্রাচীনতম সরস্বতী মূর্ত্তি তথা অম্বিকা-যক্ষিণীর (দুর্গা-সহ সংশ্লিষ্ট বলা হয়) মূর্ত্তি জৈনদের মধ্যেই দেখা গিয়েছে। "বঙ্গদেশে জৈন প্রভাব" নামে প্রবাসী পত্রিকায়, মাঘ ১৩৭৭এ একটি প্রবন্ধে এরূপ প্রসঙ্গের আলোচনা করেছি। মুর্শিদাবাদে মধ্যযুগের বহু জৈন মন্দির দেখা যায়।

উপসংহারে এইটুকু বলি যে জৈন নামে বা নামভেদে জৈনগুরুদের বহু শিক্ষা আমারা গ্রহণ করেছি; জৈনেরাও ব্রাহ্মণ্য-সম্প্রদায় তথা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের আত্মীয় ও বহু-বিষয়ে নিকটবর্ত্তী। জৈন-প্রাকৃতে বা ঐরূপ বিবরণীতে বাঙ্গালীর ভাষারও বহুদিক লুকিয়ে আছে।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ষ্টেশনে এসে শুনল, গাড়ী কিছু "লেটে" আসছে। প্লাটফর্মের ওপর বকুল গাছের তলায় মন্মথ বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, আঃ কি সুন্দর বাতাস। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

অভয় বলল, ষ্টেশন থেকে অনেকখানি হাঁটতে হবে। বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। মা বোধ হয় আলো জেলে বসে থাকবেন। খোকন, গীতা বোধ করি ঘুমুচ্ছে। অভয় একটা পাঁউরুটি, আর পয়সাকতকের বিস্কুট কিনেছিল। খোকনের জন্য একটা পুতুল, আর গীতার জন্যে দুহাত লাল ফিতে। ওরা সকালবেলায় উঠে, এ সব পেয়ে কি খুসীই না হবে। অভয়ের শুধু বার বার মনে হ'তে লাগল, আজ কত ভাল ভাল খাবার খেলাম, কি সুন্দর ছবি না দেখলাম—অভয়ের মন শুধু খচ্ খচ্ করতে থাকে। একা একা ভাল ভাল খাবার খেয়ে, ভাল ছবি দেখে এতে আনন্দ কোথায়? এ আনন্দ পুরোপুরি সম্পূর্ণ নয়—এ অর্দ্ধেক, এ যেন ছাড়া ছাড়া—সব ফাঁকা। নিরবচ্ছিন্ন, পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝে কোথায় যেন মস্ত বড় ফাঁক থেকে গেছে। সর্বক্ষণ তার মনে হয়েছে, —তার নিভৃত গ্রামের প্রান্তে, অতি দীন হীন বাবা, মা, ভাই-বোনের কথা। অভয় মনে মনে বারবার দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করে, যদি ভগবান্ কখনও দিন দেন, তবে এইরকম আনন্দ করে,—এমনি আনন্দ করবে সে। কিন্তু তা কতদিনে? কবে তা হবে—সীমাবদ্ধ অতীতের দিনগুলো শুধু বিষাদময়—দুঃখ আর দারিদ্র্যের ক্লেদাক্ত ইতিহাস। বর্ত্তমান তাও সুখকর নয়। কিন্তু সম্মুখের ভবিষ্যৎ দিনগুলির জন্য সে প্রতীক্ষা করছে। তার আগামী দিন—তার সোনালী স্বপ্নমাখা ভবিষ্যৎ দিনগুলির রহস্যময় বুকে কি যে আছে —তা কে জানে। বিস্তৃত অসীম—অনন্ত ভবিষ্যৎ দিনগুলির গর্ভে, তার জন্যে, বিধাতাপুরুষ কি লিখে রেখেছেন তা জানেন তিনি। অভয় মনে মনে বলে, ঠাকুর আমায় মানুষ হ'তে দাও—আমায় বড় হ'তে দাও,—মঙ্গল কর।

একসময় সচকিত হয়ে ওঠে অভয়। ট্রেন আসছে —সার্চ লাইটের আলোর বন্যায়, সমস্ত প্লাটফর্ম ভরে গেছে—যাত্রীদের মাঝে সাড়া পড়ে গেছে। এরই মধ্যে মন্মথ বেঞ্চিটার ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অভয় ধাক্কা দিয়ে ডাকল—মোনাদা, ও মোনাদা, গাড়ী এসে পড়েছে যে—। ধড়মড় করে উঠে, মন্মথ বলে—আঃ, গাড়ী আসছে—। বেড়ে ঘুম এসেছিল কিন্তু। ঠাণ্ডা বাতাসটায় ভারী ঘুম এসেছিল।

আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে বসে মন্মথ। গাড়ী তখন এসে দাঁড়িয়েছে। তীব্র হুইসল্ বাজিয়ে ইঞ্জিন জল নিতে গেল। প্লাটফর্মে হৈ চৈ—ফেরীওয়ালা-কুলি-চা-ওয়ালা সকলের হাঁকাহাঁকি খুব ভাল লাগছে অভয়ের। তার মনে হয়, এমনি আলো-ভরা এমনি হৈ চৈ—ব্যস্ততা—ঠেলাঠেলির মধ্যে সারা জীবন যদি কোনও অনির্দ্দেশ দেশে যেতে পারে, তবে কেমন মজা। সারারাত সারাদিন ধরে সারামাস বছর এমন কি সারা জীবন ধরে যদি রেলগাড়ী শুধু ছুটতে থাকে—মাঝে গাড়ী থামবে, আসবে আলো, আসবে লোকজনের গোলমাল চীৎকার তারপর আবার গাড়ী ছুটবে—। মাঝে মাঝে খালি ছোট ছোট ষ্টেশন। লোক উঠবে নামবে—কিন্তু সে নামবে না। শুধু গাড়ীর জানালা দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবে। অজানা দেশের অজানা ষ্টেশনের—নামহীন অপরিচিত যাত্রীরা যাবে আর আসবে শুধু। জানালায় বসে বসে সে শুধু সব দেখবে—আর দেখবে। কোন কথা নয় কোন শব্দ নয়। সে মাত্র নিব্বাক্ দর্শক। অজানা লোকদের দেখবে, দেখবে ছোটছোট গাঁ বনজঙ্গল নদী পাহাড়। কোথাও দেখবে পাখীরা দল বেঁধে উড়ছে-ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছে চাষীরা—গরুর পাল ঘাস খাচ্ছে—। সে শুধু সমস্ত ঘটনা সমস্ত দৃশ্যের সমস্ত মানুষের আসা-যাওয়ার মূক সাক্ষী হয়ে থাকবে চিরকাল। সত্যি চিরকালের মতন এমনি ট্রেণ কি পাওয়া যায় না। যে ট্রেণ শুধুই চলবে—শুধুই ছুটবে—কোনদিন থামবে না—যার গতিপথ থাকবে অসীম অনন্ত সীমাহীন কোনও রাজ্যে।

হাতের ঠেলায় অভয়ের চমক ভাঙ্গে। মন্মথ বলছে, এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? সত্যি তো। অভয় ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার পরিচিত ষ্টেশনে এসে গাড়ী থেমেছে—। তাড়াহুড়ো করে ওরা নেমে পড়ে। যাত্রীরা কল্‌বল্ করে রাস্তায় হাঁটছে। কারুর হাতে লণ্ঠন—কারুর হাতে টর্চ লাইট। কেউ হাঁকছে—শ্যামপুর যাচ্ছ কে গো—। বলি, ও বিষ্ণুদা—দাঁড়াও বাপু। অন্ধকারে কি শেষে সাপের ঘাড়ে পা দেব—

মন্মথ বলে, পলাশপুরের লোক নেই নাকি? কিন্তু মনে হচ্ছে, খোকনকে একবার দেখেছিলাম। মন্মথ হাঁকে—খোকন—ও খোকন। দূর থেকে কে যেন সাড়া দেয়—কে ডাকে, অ্যাঁঃ—

মন্মথ উত্তর দেয়—দাঁড়া একসঙ্গে যাব। আমি মন্মথ রে। উত্তর আসে—পা চালিয়ে এস গো। আমরা বটতলায় দাঁড়িয়ে আছি—। যা আঁধার বাপরে! দুবার ডাকতেই, সরোজিনী এসে দরজা খুলে দিলেন। উঃ কতখানি রাত হ'ল খোকা। আমি সেই থেকে জেগে বসে আছি। গাড়ীর শব্দ শুনতে পাই আর ভাবি এই বুঝি আসছিস। খোকন গীতা এই কতক্ষণ হ'ল ঘুমোল। ছেলেটা মেয়েটা কত বার জিজ্ঞেসা করেছে, মা, দাদা কখন আসবে—

অভয় বলল—বাবা ফিরেছেন নাকি?

সরোজিনী বলেন—নে হাত মুখ ধো। হুঁ-আজ সকাল সকাল ফিরেছেন। উত্তর ঘরে ওদের নিয়ে ঘুমুচ্ছেন। অভয় মায়ের হাতে বিস্কুট, রুটি, পুতুল, আর লাল রঙের ফিতেটা দিয়ে বলল, গীতা আরখোকনের জন্যে আনলাম। জান মা, কি সুন্দর বায়োস্কোপ দেখলাম। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হয় সব সত্যি। মোনাদা বলল, বিলেতে নাকি ছবির লোকেরা কথা বলছে। আমায় খুব চাট্টি ভাত দাও মা। একেবারে দুটোখানি। তুমিও বসে পড়, রাত তো কম হয়নি। মোনাদা, অনেক খাবার খাইয়েছে—।

সরোজিনী নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে বললেন, যা পারিস খা, চাপাচাপি করে খাসনে বাবা। ওতে পেট খারাপ করে। আজ তবে, মন্মথর অনেক খরচ হ'ল। কি বললি, ছবিতে কথা বলছে। সে আবার কি রে? জ্যান্ত মানুষের মত কথা বলবে।

অভয় বলল মোনাদা, তাই বলল। বিলেতে সেই ছবি দেখাচ্ছে, হুবহু জ্যান্ত মানুষের মত কথা

বলছে। বুঝলে মা, মোনাদা, আর এগাঁয়ে থাকবে না। ওর বাবার সঙ্গে খালি ঝগড়া হয়। আমায় বলেছে দরজীর কাজ শিখে নিয়ে চলে যাবে এ দেশ থেকে।

সরোজিনী বললেন, তা সে ভালোই তো। পুরুষ ছেলে বিদেশে না গেলে কি জীবনের উন্নতি হয়। এই গাঁয়ে থেকে ঐ ছোট দোকান থেকে কি আর আয় হয়। গাঁয়ের দোকান—লোককে ধার না দিলে রাগ করবে। আবার ধার দিয়ে, সে ধার যে শিগ্রী শোধ দেবে—না, তা দেবে না!

অভয় বলল, মা, আজ কোন চিঠিপত্তর আসেনি?

—চিঠি? কই না তো। অভয় উঠে পড়ল। তার পেটে আর জায়গা নেই। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে।

সরোজিনী রান্নাঘরের কাজ শেষ করে, দরজায় শেকল তুলে দিলেন। একবার গোয়ালঘরটা দেখে এলেন। ছাগলের ঘরটাতে উঁকি দিলেন, নতুন দুটো বাচ্চা হয়েছে—ভয় হয় পাছে শেয়ালে নেয়। সেবার তো দুটো বাচ্চাকেই শেয়ালে নিয়েছিল।

সরোজিনী বললেন—চ বাবা। অনেক রাত হয়েছে-এবার শুয়ে পড়গে। বাইরে অন্ধকার রাত। বাঁশবনের ওদিক থেকে একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ ভেসে আসছে। রাত-চরা দু একটি পাখী পাখার ঝাপটা দিয়ে, এ গাছ থেকে অন্য গাছে যাচ্ছে। উঠানের ওপর পেয়ারা গাছটায় বুঝি বাদুড় এসে বসল। পাকা পেয়ারা একটাও থাকবে না। সরোজিনী বললেন। অভয়ের চোখে ঘুম আসছে—তার মনে হচ্ছে সে ট্রেণে করে কোথাও যাচ্ছে। কখনও আলো কখন অন্ধকার। পাশের গাছপালা চলে চলে যাচ্ছে—সরে যাচ্ছে। ওর ট্রেণ যেন অন্ধকার ভেদ করে, শুধু ছুটছে আর ছুটছে। কোন্ দেশে যাবে—কোন দেশে এ যাওয়ার শেষ, তা কেউ জানে না। বুঝি এ ট্রেণের যাত্রাপথের শেষ-সীমানা নেই। অজানা—অচেনা পাহাড় জঙ্গল দেশ ঘুরে ঘুরে বুঝি চিরকাল—চির জীবন শুধুই চলবে আর চলবে—থামবে না।

সকাল বেলায় খোকন আর গীতা, দাদার দেওয়া জিনিষ পেয়ে ভারী খুশী। গীতা আর খোকন বিস্কুট নিয়ে একটু একটু করে খাচ্ছে। এ যেন অতি বহুমূল্য সামগ্রী। অভয়ের মনে হয়, হায় রে কী কপাল। সামান্য বিস্কুটটুকু পেয়ে কতই না খুশী। যদি কখনও টাকা হয়, তবে পেটভরে ভাল ভাল খাবার খাওয়াব। অভয়ের মনে কত সাধ জাগে। মায়ের গায়ে কোনদিনই এক রতি সোনা দেখিনি। তার মা—চিরকাল ছেঁড়া সাড়ী পরে কাটাচ্ছেন। মাথায় গায়ে একটু তেল নেই, গায়ে নেই একটা জামা। ভাল সাড়ীর কথা ভাবা তো স্বপ্ন। একটা আস্ত সাড়ী দু বছরের মধ্যে মা পরেছেন কি না, তাও মনে পড়ে না। বাবার অবস্থা তো জানে অভয়। কোনরকমে দিন চলে। সামান্য লংক্লথের একটা পাঞ্জাবি, অতি সন্তর্পণে, সাবান দিয়ে ধোয়ান আছে। যদি কোথাও বিশেষ দরকারে যেতে হয়, তবে বাবা-সেটি গায়ে দেন। নিজের হাতে ধুতি কাচেন, জামা-কাপড়ে সাবান দেন। যে পুরানো কাপড় অন্য কেউ কাচলে নিশ্চয়ই ছিঁড়ে ফেলবে। খুব কমদামী এক জোড়া জুতো আছে বটে, কিন্তু তাও তোলা থাকে। গাঁয়ের মধ্যে জুতোর দরকার হয় না। গায়েও কিছু থাকে না—থাকে শুধু কাঁধে গামছা। আটহাতি ধুতি পরে কাজকর্ম করেন। বাড়ীর কাছে দু-চার ঝাড় কলাগাছ—দুটো লেবু গাছ—কিছু তরিতরকারীর বাগান আছে। কিছু বিক্রয় হয়—বাকী নিজের ব্যবহারে লাগে। কিন্তু দিনকাল পড়েছে খুব খারাপ। কোন রকমে দিন চলে যায়।

সরোজিনী বললেন, হ্যাঁরে খোকা, তোর জ্যেঠার তো কোন পত্তর এলো না। মনে হয় আসবেও না। ওনারা হলেন বড়লোক। গরীব ভাইয়ের কথা কি মনে আছে? মনে নেই। উনি বলছিলেন, আমার তো পড়াবার ক্ষমতা নেই। দত্তবাবুদের দোকানে যদি কাজে ঢুকিস, তবে এখন দেবে দশ টাকা। বছরে দুখানা কাপড় আর গামছা। এরপর কাজ শিখলে মাইনে বাড়িয়ে দেবে।

অভয় বলল—বাবা বলছিলেন নাকি?

—হাঁ বাবা। সংসারের হাল তো দেখছিস। নুন আনতে পান্তা ফুরুচ্ছে। ছেলে মেয়েটা দুটো মুড়ি, দুটো ভাত একটু মাছের জন্যে দিনরাত কি কান্নাই না কাঁদে। এর ওর বাড়ীতে দুধ মাছ দেখে খেতে চায়। ওরা অবুঝ। ওরা আর কার কাছে যাবে—সব আবদার মায়ের কাছে। ভগবান্ যে এ দুঃখ কবে ঘোচাবেন, তাই আমি ভাবি। আমার কপালের মত, ওরাও কি এই খারাপ অদেষ্ট করে, আমার কোলে এসেছে। তাই আমি ভাবি বাবা—সবই আমাদের কপাল।

সংসারের অবস্থা সবই অভয়ের জানা। তবুও অভয় স্বপ্ন দেখতে থাকে। মুদীখানার দোকানে ঢুকলে শেষে ঐ দোকানেই তার সমাধি হবে। তার সকল স্বপ্ন—সবই শেষ হবে। কিন্তু তাকে এগিয়ে যেতে হবে। হোক দুঃখ কষ্ট, তবুও সে হাল ছাড়বে না। জ্যাঠাবাবুকে আবার সে চিঠি দেবে।

অভয় মন্মথকে বলল, মোনাদা, জ্যেঠাবাবুর তো কোন চিঠিপত্তর এল না। এদিকে বাবা বলছেন, —দত্তবাবুদের মুদীখানার দোকানে ঢুকলে যা তোক কিছু পাওয়া যাবে—

মন্মথ বলল, তোর বাবা বুঝি বলছেন। দেখ্, সব সংসারের এই একই অবস্থা। সত্যি একটা কিছু না করলেও তো সংসার চলে না। আমি বলি, লেখাপড়া তুই ছাড়িসনে। যেটুকু সময় পাবি—যখন ইচ্ছে তখন, আমার কাছে এলে আমি পড়াব। তা—একদম বসে থাকিসনে—। কথায় বলে—বসে থাক—না ব্যাগার খাটি। আর একটা চিঠি লেখ্। এর মধ্যে যদি খবর এসে যায় তবে ভাল। না হয় অন্য কোন ব্যবস্থা। তা দু-এক মাস না-হয় লেগে যা দত্তবাবুদের দোকানে।

দুইজনেই নিঃশব্দে বসে থাকে। মন্মথ একমনে বিড়ি টানতে থাকে। বেলা হয়েছে অনেক। এর মধ্যে রোদ খাঁ খাঁ করছে। গ্রামের সরু পথ জনশূন্য। দূরে দূরে বাবলা বন—আম আর বাঁশ বন। একটানা সুরে একটা কাক ভাঙ্গা গলায় কা-কা করে চেঁচাচ্ছে। বনে জঙ্গলে শীর্ণ গরুগুলি খাদ্যের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উলঙ্গ চাষীর ছেলে কাদা মেখে, কোন মজা পুকুর, বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তাদের হাতে মাছ ধরার পলো আর পাতায় মোড়া ছোট ছোট মাছ। অভয় চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

অনেক বেলায় বাড়ী ফিরতেই সরোজিনী বললেন, হ্যারে খোকা, এতখানি বেলা হল, কোথায় ছিলি বাবা। ভাত রেঁধেছি কোন্ সকালে—সব ঠাণ্ডা পাথর হয়ে গেল যে। উনি তোর কত খোঁজ করছিলেন। এই-মাত্তর খেয়ে ছিপগাছটা হাতে করে বেরুলেন। বললেন, কতদিন যে ছেলেরা মাছের মুখ দেখেনি—যাই একবার ছিপ নিয়ে। অভয় নেচে উঠল। অত্যন্ত আগ্রহভরে বলল—বাবা কোন্ পুকুরে মাছ ধরতে গেলেন মা। সঙ্গে আর কে গেল?

সরোজিনী বললেন, ও পাড়ার তোর ছোট কাকা, আরও কে কে যেন আছে। ঐ মাতুর বিলে গেছেন। অভয় তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসল। তার ইচ্ছে সেও মাতুর বিলে যায়। কিন্তু সরোজিনী বাধা দিলেন।

সরোজিনী বললেন, খেয়ে দেয়ে একটু চুপ করে শুয়ে থাক। খোকন, গীতা ওরা ঘুমুচ্ছে। বেলা পড়লে গরুটাকে বাঁধতে হবে—খড় কাটতে হবে। বাগানে কতকগুলো পেঁপে গাছ বসাব। মেয়েটা, যেন কোথা থেকে ভাল ভাল চারা এনেছে। আমি বাগানের জায়গা সাফ্ করে রেখেছি। বিকেলে আর কোথাও বেরুসনে। ভালকথা—একবার দত্ত মোটকাবাবুর বাড়ী যাস তো। ওঁর গিন্নী একবার ডেকেছে—

অভয় বলল, বাবাঃ ঐ শাঁখচুন্নীর বাড়ীতে! কেন কি দরকার। ওদের বাড়ীতে যেতে ইচ্ছে করে না। কি ক্যাটক্যাটে অহঙ্কারী কথা। গায়ে একগাদা সোনা ঝুলিয়ে উনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। অমন লোকের মুখ দেখলেই অযাত্রা—

সরোজিনী বললেন, ওসব কথা বলতে নেই বাবা। ওরা বড়লোক মানুষ—কে কোথায় শুনতে পেয়ে এখনি সাতখান করে লাগানি-ভাঙ্গানি করবে। কি দরকার

আমাদের ওসব কথায়। নিশ্চয়ই কিছু দরকার পড়েছে —তাই ডেকেছে। যাস একবার। শুনে আসবি কি দরকার—

অভয় বলল, গেলেই কি নিস্তার পাওয়া যাবে না। আরও বারকয়েক তো দেখেছি। এটা কর—সেটা কর —এটা আন—সেটা আন করে দুঘণ্টা খাটিয়ে নেবে। সেবার দোকান থেকে চিনি, গুড়, আরও সব কি কি জিনিস নিয়ে এলাম, বসে বসে কতবার যে হিসেব করল, তার ঠিক নেই। শেষে আমার সামনে প্রত্যেকটা জিনিষ ওজন করল। বলে কিনা চিনি কম হয়েছে। ওসব লোকের কোন উপকার করতে নেই। বয়স তো অনেক হল, কিন্তু সাজন দেখগে—। সকালে একবার হাঁড়ি চড়াবে—রাত্রে—আর রান্না নেই—। কি করে যে খায় ওরা—

সৌদামিনী বললেন, বড়লোকদের খাওয়ার দরকার কি। টাকা, গহনা নেড়ে চেড়েই ওদের পেট ভরে যায়। আমি কি জানিনে বাবা। পাড়া-প্রতিবেশী হিসেবে তাই ওঁর অসুখের সময় পাঁচটা টাকা ধার নিয়েছিলাম, শেষে বারগণ্ডা পয়সা সুদ নিল। একটা আধলাও ছাড়ল না। পাড়াঘরে দায়ে-দৈবে ধার নেয় তা বলে সুদও নিতে হবে।

মোটকা বাবুর আসল নাম অনাথ রায়। অনাথ রায় থাকেন কলকাতায়। মস্ত বড় ব্যবসায়ী—নিজের নামে খানকয় বাস, লরী আছে। দৈনিক কাঁচা টাকা আমদানী যথেষ্ট। তার ওপর আছে—নানান ব্যবসা। বড় বাজারে খানকয় দোকান। মোটকা বাবু লম্বায়-চওড়ায় বিশাল। মেদবহুল প্রকাণ্ড দেহকাণ্ডের সঙ্গে প্রকাণ্ড মাথা—ভুঁড়িটাও দর্শনীয়। ভগবান অকৃপণ ঔদার্য্যে, মোটকাবাবুর দেহে, মাংসের ভাগটা বড় বেশী করে দিয়েছেন। গাঁয়ের লোক, আসল নামটা ভুলে সংক্ষেপে ডাকে মোটকাবাবু বলে। অনাথ রায় একমাস অন্তর বাড়ী আসেন। কিন্তু দু-একদিনের বেশী বাড়ী থাকেন না। স্ত্রী থাকেন—আর একটি মেয়ে। ঝি আছে—সেই সমস্ত কাজকর্ম করে। ভগবান, মোটকা বাবুর স্ত্রীর বেলায় ঠিক উল্টোটি করেছেন। মোটকা-বাবুর স্ত্রীর নাম অন্নদাসুন্দরী। কিন্তু নামের সঙ্গে আসল নামের কোন সম্বন্ধই নেই। খাড়া ছ ফুট লম্বা গায়ের রঙ কালো, মাথায় যৎসামান্য চুল—সিঁথির চুল সবই উঠে গেছে—কিন্তু লম্বা সিঁদুরের রেখা বেশ মোটা হয়ে কেশহীন মস্তকে শোভা পায়। বড়লোকের স্ত্রী—তাই গায়ে গলায় সোনায় ভর্ত্তি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—। আচার-ব্যবহার—কথাবার্ত্তায় এমন যে, লোকে নাম দিয়েছে শাঁখচুন্নি। আড়ালে-আবডালে অবশ্য বলে থাকে। তাঁর সম্মুখে বলবার সাহস কোথায়। মেয়েও মায়ের মত— কথাবার্ত্তায় ঠিক যেন পাকাবুড়ী, যেন আশি বৎসরের ঠাকুরমা—। বড়লোকের বউ। এখানে সম্পত্তি আছে প্রচুর। মস্ত বড় দুটি পুকুর। ধানের জমি, আম কাঁঠালের বাগান—নারিকেল বাগান। তাই মোটকাবাবুর গিন্নী কলকাতা ছেড়ে ডেরা বেঁধেছেন এখানে। এখানে অভাব নেই কিছুই। গরুর দুধ হয় অনেকটা, তা গোয়ালার কাছে বিক্রী করেন। এছাড়া আম, কাঁঠাল, বাঁশ, খড়, জমির ধান, পুকুরের মাছ এসব নিজে বিক্রী করেন। এই সব টাকা, কর্ত্তার হাতে যায় না। এইসব টাকা নিজের—। এই টাকা সুদে খাটে। বাগান পুকুরের আগলদার হরেকেষ্ট এ হাট সে হাটে ধান চাল কিনে আনে—আর হাটে হাটে বাগানের জমির ফসল বিক্রী করে। এই আগলদার হরেকেষ্টর সঙ্গেই একদিন ভুলকাম ঝগড়া শুরু হ'ল। হরেকেষ্ট নাদনঘাটের হাটে যায়, সেখান থেকে চাল গুড় ধান এসব জিনিষ কিনে এনে ব্যবসা করে। হঠাৎ গেল ধানের দাম বেড়ে। হরেকেষ্ট একদিন কথায় কথায় মোটকাবাবুর গিন্নীর কাছে কথাটা বলে ফেলেছিল। আর যায় কোথায়। টাকার লালসা বড় লালসা। এ দেখতেও সুখ—নাড়লে চাড়লেও সুখ। অন্নদাসুন্দরী বললেন, তবে হরেকেষ্ট, আমার একশ টাকার চাল কিনে আনবি। সে একশ টাকার চাল কিনেছিল হরেকেষ্ট। কিন্তু সর্ত্ত ছিল চার টাকার ওপরে যেন চাল না কেনে। হরেকেষ্ট চার টাকা মণ দরে পঁচিশ মণ চাল কিনেছিল। কিন্তু সে চাল ছিল

কিছু ভাঙ্গা। আর নিজের ব্যবসার জন্যে সে ভাল চাল কিনেছিল সাড়ে চার টাকা দরে। কিন্তু লোকে সেই ভাঙ্গা চাল কিনতে চায় না। তখন হরেকেষ্টর হ'ল অপরাধ। কেন সে খারাপ চাল আনে। হরেকেষ্ট বলে, ভালরে ভাল, আমার চালের দাম যে বেশী। আপনি তো মা-ঠাকরুণ বললেন, চার টাকার বেশী খবর্দ্দার কিনবিনে। এখন আমার দোষ কিসের বলুন। কিন্তু দোষ যাই হোক, সেই ভাঙ্গা চাল, হরেকেষ্টর ঘাড়েই মোটকাবাবুর গিন্নী চাপালেন। মাসখানেক যাবার পর, সেই টাকা আর সুদ চাইলেন হরেকেষ্টর আছে। কিন্তু গরীব মানুষ হরেকেষ্ট,—হুট্ করে অত টাকা পাবে কোথায়। তার চাল সব সময় নগদ পয়সায় বিক্রী হয় না—একে ওকে ধার দিতে হয়। কিছু নগদ বিক্রী হয় আর বেশীর ভাগ হয় ধারে। নগদ বিক্রীর টাকা দিয়ে, আবার নূতন মাল আনতে হয়। লোকের কাছে ধারের টাকা কি শিগ্রী আদায় হয়। আর যা দিনকাল পড়েছে—। সেই নিয়েই লাগল ঝগড়া।

অন্নদাসুন্দরী বলেন, সুদ এক পয়সা ছাড়তে পারব না। একমাসের ওপর হয়ে গেল, নগদ কড় কড়ে একশটা টাকা তোর ঘরে পড়ে রয়েছে। ওই চালতো মশ করে, বেশী দামে বিক্রী করেছিস্। আর সুদ তা কম করেই ধরেছি। তবে টাকা দিতে দেরী কেন।

হরেকেষ্ট বলল, আমি কি অস্বীকার করছি। কিন্তু মা আমি তো নগদ টাকা নিইনি। আপনার চাল আমি নিজে যেচে যেচে কিনে আনতে চাইনি। আপনিই নিজে কিনতে দিলেন, বললেন চার টাকার ওপর যেন না হয়। এখন হুট করে টাকা চাইছেন—আর অযথা চাপ দিচ্ছেন। কিন্তু অন্নদাসুন্দরী কোন ওজর আপত্তি শুনতে চান না। এই নিয়েই লাগল তুলকাম ঝগড়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরেকেষ্টকে সুদ-শুদ্ধ সব টাকা দিতে হ'ল। গরীবমানুষের প্রাণে সব সয়। গরীবের দুঃখ বোঝে গরীব। বড়লোক বুঝতে পারে না—বুঝতে চায় না। টাকার লালসা, হৃদয়ের সমস্ত শুভবৃত্তি, সৎবুদ্ধি দয়া, স্নেহ, ভালবাসা সবকে ঢেকে দেয়—শুধু জেগে থাকে টাকার লালসা, বিষয়ের লালসা। হরেকেষ্ট মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে মোটকাবাবুর গিন্নীর টাকা শোধ দিয়েছিল। হরেকেষ্ট গাঁয়ে মাতব্বর লোকদের কাছে নালিশ করেছিল। কিন্তু গরীবের নালিশ বড়-লোকের বিরুদ্ধে, সেখানে বিচার কি হবে। কারণ মোটকাবাবুর গিন্নীর বিরুদ্ধে কে কথা বলবে। অনেকেই যে তাঁর কাছে বাঁধা। কেউ টাকা ধার করেছে—কেউ ভাগে জমি করে— কেউ পুকুরের মাছ কিনে ব্যবসা করে। মোটকাবাবু অনাথ রায় বড়লোক মানুষ—পয়সার অবধি নেই। যখন গাঁয়ে আসেন-তখন চারিদিকে রৈ রৈ রব। লোকজন হুজুর হুজুর করতে করতে ছুটে আসে। এমন কি মন্মথর বাবা যুগলবাবুও বাদ যান না। তিনি এলে মস্ত বড় খাসী কাটা হয়—সহর থেকে চন্দ্রিকা সা'র দোকান থেকে আসে অনেকগুলো মদের বোতল। মদ আর মাংস খেয়ে লোকগুলো সারারাত হৈ চৈ করে। তবেই—হরেকেষ্টর নালিশ শুনছে কে? নালিশ শোনার লোক কেউ নেই। হরেকেষ্টর নালিশ শুনে, দশজনে রায় দিল, হরেকেষ্টই দোষী। অ্যাদ্দিন এমন সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহিলার টাকাটা কেন সে লুকিয়ে রেখেছে। বোধ হয়, টাকাটা মারার তালে ছিল। গলায় ঝোলান মস্ত বড় হরিনামের ঝোলার ভেতর মালা ঘোরাতে-ঘোরাতে—গোকুল এই কথাটা বলল। গোকুল দাস ব্যবসা করে। দোকান খুলে তেল ঝাল, নুন বিক্রী নয়। গোকুল দাস চাষীমহলে টাকা ধার দেয়। গহনা, বাসনকোশন, জমি পুকুর, বাগান বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াই ব্যবসা। মুখের ভাষা বড় মিষ্টি—আর মুখে সদাই হাসি। সব সময়, সবই গোবিন্দের ইচ্ছে বলে, দুই চোখ নিমীলিত করে যেন ধ্যান করে। দেনদার, খাতক, ওরা গোকুলদাসের অতি বিনীত ভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। নিজেরা বলাবলি করে

।াসমশায় একজন ভালো লোক বটে। কিন্তু দাস শায়ের জীবনের খাতার পাতায় যেসব ঘটনার কথা , তা কে দেখেছে। কত চাষী জমি হারিয়েছে—ঘরবাড়ী হারিয়েছে—! কত বিধবা স্ত্রীলোক চির-দিনের মতন, তার সামান্য পুঁজি একগাছা সোনার হার বা গাছকয় চুড়ি, সেই যে দাসমহাশয়ের লোহার সিন্দুকে ঢুকেছিল, তা আর ফেরেনি। দাসমশায়ের লম্বা খাতার পাতায়, হিসেবের যে জটিল অঙ্ক, পাতার পর পাতা লেখা হয়েছিল, শেষে সুদে আসলে নাকি সবই ডুবে গেল। এমনি কত গহনা—কত থালা, গেলাস, ঘটিবাটি, ঘড়া, গাড়ু দাসমশায়ের ঘরে মজুত আছে, তার কোন হিসেব নেই। বহুজনের চোখের জল তপ্ত দীর্ঘশ্বাস পড়েছে কিন্তু সব বাতাসে মিলিয়ে গেছে। যাদের এক কালে সবই ছিল আজ তারা গৃহহারা ভিক্ষুক।

তারা সব ফেরার। একদিন বউ ছেলের হাত ধরে গাঁ থেকে উঠে, কোথায় যে গিয়েছে কেউ জানে না। কিন্তু গোকুলদাস ঠিক তেমনি আছে। গলায় সেই হরিনামের ঝোলা মুখে হাসি কপালে নাকে চন্দনের রেখা আর মুখে সেই কথা—গোবিন্দ হে। তোমারি ইচ্ছা প্রভু। এ গাঁয়ের রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে বহু ইতিহাস লেখা আছে। বহু অভাগা জনের অনেক চোখের জল এখানকার মাটিতে শুষে গেছে। বহু নারীর আর্ত্ত চীৎকার, বহু ভদ্রকুলবধূর মানসম্ভ্রমের গোপন ইতিহাস—তাদের নীরব কান্না এ গাঁয়ের বাতাসে একদিন বেজে উঠেছিল। কিন্তু সমস্তই বৃথা। লোকে ফিস্‌ফাস্ করে বলেছে—কেউ মুখফুটে প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি। সমাজে এমনি ঘটনা তো আকছার ঘটে থাকে—আজও ঘটছে। বড়লোক ধনী প্রতিপত্তি-শালীর বিরুদ্ধে কে কথা বলবে। তবুও সব শেষে এর একদিন বিচার হয়—সেদিন কেউ রক্ষা করতে পারে না। অমন যে প্রতাপশালী সিধু পাঠক ছিল, সে আজ কোথায়? মস্ত বাড়ী—কত সম্পত্তি,—বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব—বার মাসে তের পার্ব্বণ—কত হাঁকডাক—কত বন্ধুবান্ধব—লেঠেল নগদী কিন্তু কোথায় গেল সিধু পাঠক। তাসের ঘরের মত, একদিন সব ভেঙ্গে গেল।

শেষে একদিন যতীন পিওনের ডাক শোনা গেল। বর্ষা শেষ হয়েছে—আশ্বিনের সাদা সাদা তুলোর মত মেঘ সারা আকাশে আনাগোনা করছে। শরৎ-কালের রোদ্দুর সোনার বরণ। অবশ্য মাঝে মাঝে মেঘ হয়ে আসছে—হুড়মুড় করে বৃষ্টি আসছে—আবার বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। নদীর পাড়ে কাশফুল ফুটে উঠেছে, রাস্তার ওপর শিউলি ফুল পড়ে, সারা রাস্তা ফুলময় হয়ে উঠেছে। শিউলি ফুলের মধুর মিষ্টি গন্ধে মা দুর্গাকে মনে পড়ে যায়। মনে হয় আর দেরী নেই মায়ের আসতে, পুজো আসছে। এ এক কথা ভাবতেই আনন্দ লাগে—। এই আশ্বিন মাসটা কি আশ্চর্য্য। হিন্দুদের কাছে এ এক বিশেষ অনুভূতির ব্যাপার। বিশেষ এক ভাব—চিন্তা ও মধুর রসের মাধুর্য্যে একটা অভুতপূর্ব্ব বস্তু মানসিক মধুর রস, মনের মধ্যেই তৈরী হয়ে যায়। এর তুলনা কোথায়? যে স্নেহ মায়া মমতাভরা গান আগমনীর মধ্যে প্রকাশ পায়, তা অন্য কোন কাব্য-সাহিত্যে বিরল। এমন এক আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময় অভয়দের রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, যতীন পিওন ডেকে উঠল। গোপেশ্বরদা বাড়ী আছে নাকি? কিন্তু গোপেশ্বর তখন বাড়ীতে ছিলেন না। মাঠে গিয়েছেন। অভয়ও বাড়ী নেই।

যতীন বলল চিঠি আছে। অগত্যা সরোজিনীকেই দরজা খুলতে হ'ল। যতীন অবশ্য গাঁয়েরই লোক। তবুও সরোজিনী এই গাঁয়ের বউ মানুষ। একেবারে সরাসরি কথা বলতে লজ্জা অনুভব করেন। তাই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, চিঠি আছে নাকি?

যতীন বলল, হাঁ, একখানা চিঠি আছে অভয়ের নামে। আর একখানা গোপেশ্বর দাদার নামে। কোথায় গেল অভয়? এই চিঠির জন্যে একেবারে পাগল হয়েছিল। জ্যষ্টি মাসের রোদের মধ্যে পাক্কা দু কোশ ভেঙ্গে রোজ যেত ডাকঘরে। আমি বলতাম, তুই কি জন্যে এই রোদে আসিস। এই রোদের মধ্যে মারা পড়বি যে। চিঠি থাকলে আমিই দিয়ে আসব। খুব

তেষ্টা পেয়েছে বৌঠান, একঘটি জল দেন। সরোজিনী কাঁচের ডিশে করে একটুখানি আখের গুড় আর একঘটি জল এনে দিলেন। যতীন পিওন মুখটা ধুয়ে ঢক্ ঢক্ করে জলটা খেয়ে একটা শব্দ করল আঃ প্রাণটা বাঁচল। এখন যাই আমি। যতীন একটা বিড়ি ধরিয়ে কলদে রংয়ের ব্যাগটা ঘাড়ে ফেলে গনগন্ করে ভিন্ গাঁয়ের উদ্দেশে ছুটল।

মন্মথর খোঁজে এসেছিল অভয়। দেখে দোকান বন্ধ। কিন্তু এরকম তো হয় না, দুপুরবেলায় মন্মথ দোকানেই থাকে, তখন লোকজন থাকে না। চারদিক জনশূন্য। প্রখর রোদে মাঠ ঘাট পুড়ে যাচ্ছে। উপরের আকাশটা নীলবর্ণ, ঠিক যেন একটা তপ্ত নীল পাথর। আর তার মধ্যে প্রকাণ্ড নক্ষত্র সূর্য্য দপ দপ করে জ্বলছে। নিজে জ্বলে সবকে জ্বলাচ্ছেন। এমনি দুপুর রোদের মধ্যে কাক চিল পর্যন্ত গাছের নিবিড় ছায়ার মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঠ ঘাট পথ সবই জনশূন্য আর নিস্তব্ধ। অথচ অন্যদিন এমন সময়, মন্মথ তার দোকানঘরে আম কাঠের সস্তা তক্তাপোষে শুয়ে দিবানিদ্রা দেয়। মন্মথ সহর থেকে নগদ চার-টাকা খরচ করে, সৌখিন গড়গড়া কিনে এনেছে। নকল জরীর কাজ করা লম্বা নলটা মুখ দিয়ে, সুগন্ধি কাশীর তামাক টানতে টানতে মন্মথ বলে, এখন আমিই বা কে আর বাদশা নবাবই বা কে? বুঝলি অভয়, এই গড়গড়ায় তামাক খাওয়া যে কি মজা, তা কি বলব। এতে ভারী আরাম—ভারী আরাম—। তাই অভয় ভাবে এমন আরাম ছেড়ে, অন্য কোথাও যাবার পাত্র মন্মথ নয়। কিন্তু আজ কোথায় গেল? একথা একথা করে, মন্মথদের বাড়ীর দরজার কাছে এসে ভীরু গলায় ডাকল—মোনাদা ও মোনাদা। দরজার পাশেই এক গাদা ছাই। ছাইয়ের ওপর মহা সুখে একটা শীর্ণকায় নেড়ী কুকুর ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ সেটা চমকে উঠে, ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। হড়াম করে দরজা খুলে গেল। একটা ছোট গামছা পরনে মাত্র—যুগলবাবু এসে দাঁড়ালেন—কি চাই, অ্যাঃ—। এই ভরদুপুরে ব্যাপার কি? যুগলবাবুর দুটো চোখ লাল—সারা মুখে গোঁপ দাড়ির জঙ্গল।

অভয় বলে—মোনাদা কোথায়?

—মরেছে সে। তার খবর আমি কি জানি। তার খবর জানার কথা তো তোদের। কেন তুই জানিসনে। রোজ দুজনে গুজগাজ করিস, মিনি পয়সায় মুড়ি চিঁড়ে, মুড়কী, বাতাসা খাস। পরের পয়সায় বায়স্কোপ দেখিস, চা, সন্দেশ, বিস্কুট খাস আর সে কোথায় তা জানিসনে। দুপুরবেলায় গেরস্থের বাড়ীতে এসে হাঁকাহাঁকি চেল্লাচেল্লি কেন রে? বেরো বেরো উল্লুক গাধা, নিকালো আভি—। যুগলবাবুর লাল চোখ, আরও লাল হয়ে উঠল। ডান হাতের একগাদা মাদুলি কবচ-গুলো একসঙ্গে শব্দ করে বেজে উঠল। যুগলবাবু তর্জনী তুলে, সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। অভয়ের মুখের ওপর দড়াম করে দরজার দুটো পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

সুবিমল সিংহ

(৪)

"বাজারে হট্টগোল কিসের?"

"সবাই যে যা'র কথা বলছে।"

সাধারণ পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণে চাহিদা এবং যোগানের ভূমিকা এবং কোন দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারণে চাহিদা এবং যোগানের ভূমিকা, এই দুই-এর মধ্যে আমরা একটা পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছি (ফাল্গুন, ১৩৭৭)। এই পার্থক্যের ফলে আমরা দেখিয়াছি যে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে যেমন কোন একটা ধর্ত্তব্য, আলোচ্য, অথবা চলিত সময়ে একটীমাত্র চাহিদা-যোগান-সমন্বয়-সাধক মূল্য (Equilibrium Price) থাকা সম্ভব, দুইটী বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে তেমন নয়। অর্থাৎ দুইটী বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা স্বর্ণভিত্তিক (gold standard) না হইলে এবং বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে কোনরূপ বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে ইহাদের মধ্যে একই সময়ে একাধিক চাহিদা-যোগান-সমন্বয়-সাধক বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Exchange) থাকা সম্ভব।

এই ব্যাপারটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ অর্থশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তকে আমরা দেখিতে পাই যে স্বর্ণমানের অবর্ত্তমানে এবং অবাধ মুদ্রা-বিনিময়-এর বাজারে যে কোন একটা চলিত সময়ে সেই বিনিময় হারটীই নির্দ্দিষ্ট হইবে যাহাতে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার (অথবা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার) চাহিদা এবং যোগান সমান থাকিবে। ইহাকেই অর্থশাস্ত্রে বলা হয় Equilibrium Rate of Exchange এবং বাংলায় তর্জ্জমা করা হয় "ভারসাম্য বিনিময় হার"। কিন্তু যদি দেখা যায় যে একই সময়ে একাধিক ভারসাম্য বিনিময় হার থাকা সম্ভব, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম, নতুবা হয়ত নিয়মটীর মধ্যেই কোন গলতি থাকিবে।

"স্বর্ণমানের অবর্ত্তমানে" এবং "অবাধ মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে" এই কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Free Competition) এর একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য যে অর্থশাস্ত্রে "বাজার" (Market) শব্দটীর ব্যবহার হয় সাধারণতঃ কোন একটী বিশেষ পণ্যদ্রব্যের মূল্য কিরূপে চাহিদা এবং যোগানের সংঘাতে স্থিরীকৃত হয় তাহার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে। তবে আমরা জানি যে চাহিদা আসে ক্রেতার তরফ হইতে এবং যোগান আসে বিক্রেতার তরফ হইতে। অতএব অর্থশাস্ত্রে বাজার শব্দটির সহিত তিনটী ধারণা জড়িত, যথা (১) কোন একটী বিশেষ পণ্যদ্রব্য, (২) ইহার ক্রেতা, এবং (৩) ইহার বিক্রেতা। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রে "বাজার" (Market) বলিতে কোন একটী বিশেষ স্থানে রকমারি পণ্যসম্ভারের সমাবেশ বুঝায় না; কোন একটী বিশেষ পণ্যদ্রব্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতার যোগাযোগ বুঝায়। ফলে অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের জন্য বিভিন্ন "বাজার" এর কল্পনা করিতে হয়, যেমন "চিনির বাজার", "কয়লার বাজার" ইত্যাদি। আবার কোন একটী বিশেষ পণ্যের বাজারের অবস্থান, আয়তন, ব্যাপ্তি অথবা বিস্তৃতি নির্ভর করে দ্রব্যটীর স্থায়িত্ব অথবা সংরক্ষণ-যোগ্যতা, চাহিদার ব্যাপকতা, পরিবহনের এবং ক্রেতা-বিক্রেতার অবাধ মিলন অথবা যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপ্তি অথবা বিস্তৃতির উপর। যথাযথ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা রহিত অথচ ক্ষণস্থায়ী অথবা ক্ষয়িষ্ণু

হইলে, চাহিদা সীমিত হইলে, পরিবহন-এর অথবা ক্রেতা এবং বিক্রেতার অবাধ যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা সীমাবদ্ধ হইলে একই পণ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ অসংখ্য স্বতন্ত্র বাজার থাকিতে পারে। যেমন নগর হইতে বহুদূরে অবস্থিত পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এক-একটী পল্লীগ্রামের মাছের অথবা দুধের বাজার। অপরপক্ষে দ্রব্যটী ক্ষণধ্বংসী না হইলে, ইহার চাহিদা সুদূরপ্রসারী হইলে, পরিবহনের এবং ক্রেতা-বিক্রেতার অবাধ যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা প্রসারিত থাকিলে, ইহার বাজার সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হইতে পারে। যেমন গম, তূলা, চা, কফি ইত্যাদির আন্তর্জাতিক বাজার। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতার প্রত্যক্ষ মোকাবেলাই ঘটে না। কারণ আধুনিককালে ডাক, তার, অথবা বেতার মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বের ক্রেতা এবং বিক্রেতার অবাধ যোগাযোগ সম্ভব। অতএব অর্থশাস্ত্রীয় "বাজার"-এ ক্রেতা এবং বিক্রেতার একত্র সম্মেলন অথবা প্রত্যক্ষ মোলাকাৎ অপরিহার্য্য নহে। তাঁহাদের পারস্পরিক যোগাযোগ-এর প্রশ্নটাই মুখ্য, তাহা প্রত্যক্ষই হোক, আর পরোক্ষই হোক (যেমন "এজেন্ট" অর্থাৎ প্রতিভূর মাধ্যমে)। এমনও হইতে পারে যে পণ্যদ্রব্যটী রহিল ভারতে, ইহার মালিক তথা বিক্রেতা রহিলেন ইংল্যাণ্ডে, ক্রেতা রহিলেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, এবং মাল চালান হইবে ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়ায়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের কালে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা মালের আকৃতিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন না। নমুনা (sample) অথবা শ্রেণী অথবা পর্য্যায় (grade) সূচক সংজ্ঞা হইতেই ক্রয়-বিক্রয় সাধিত হয়। তা ছাড়া আধুনিককালে শুধু ভূত, জাত অথবা উৎপন্ন দ্রব্যেরই ক্রয়-বিক্রয় হয় না; ভবিষ্য, অজাত অথবা অনুৎপন্ন দ্রব্যেরও একটা বাজার আছে, যাহাকে বলা হয় Futures Market। তবে গম, তূলা ইত্যাদি যে-সকল দ্রব্যের চাহিদা অতিশয় ব্যাপক অথবা আন্তর্জাতিক তাহাদের পাইকারী (wholesale) ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন অথবা ব্যবহার স্থলের সন্নিহিত পৃথিবীর বিশিষ্ট শিল্প অথবা বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ক্রেতা এবং বিক্রেতার কিংবা তাঁহাদের প্রতিভূদের (Broker) জন্য সুসংগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত মিলনকেন্দ্র আছে যাহাকে বলা হয় "এক্সচেঞ্জ" (Exchange)। এই সব "এক্সচেঞ্জ" অথবা সুনিয়ন্ত্রিত ক্রয়-বিক্রয়-কেন্দ্রগুলি নগরীর বুকে সুসজ্জিত প্রাসাদে অবস্থিত থাকে। সেখানে প্রকৃত পণ্যদ্রব্যের আবির্ভাব ঘটে না। নমুনা (sample) অথবা পর্য্যায়-সূচক অভিষ্টা (grade) হইতেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। সেখানে উপস্থিত ("spot") অথবা "ভবিষ্যৎ" (Futures) উভয়বিধ পণ্যেরই বেচা-কেনা চলে। যেমন, কোন কার্পাস তন্তুশিল্প সংস্থা (spinner) যদি পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত মূল্যে ভবিষ্যতে কোন বস্ত্রশিল্প সংস্থাকে (weaver) সূতা সরবরাহের সর্ত্তে আবদ্ধ থাকেন, তবে তাঁহারাও এই বাজারে আসিয়া পূর্ব্বনির্দ্ধারিত মূল্যে "ভবিষ্যৎ" তূলা (Futures in Cotton) ক্রয় করিয়া থাকেন। আবার পণ্যদ্রব্যের বাস্তব অস্তিত্ব নিরপেক্ষ "ভবিষ্যৎ" ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ হইতে ভবিষ্যতে মূল্যের উঠানামার অনুমানভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় অথবা speculation-এরও উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কোন পক্ষেরই পণ্যের প্রকৃত হস্তান্তরের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। অবশ্য যেসব ব্যবসায়ী কোন পণ্যদ্রব্য পুনরায় বিক্রয়ার্থে ক্রয় করেন তাঁহাদেরও সব সময়ই ভবিষ্যতে ইহার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুমান অর্থাৎ speculate করিতে হয়। তাঁহাদের অনুমান নির্ভুল হইলে লাভ হয়, ভুল হইলে ক্ষতি হয়। কিন্তু "ভবিষ্যৎ" বেচা-কেনায় প্রকৃত পণ্যদ্রব্যের ভূমিকা না থাকায় ইচ্ছামত যতখুশী ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা কৃত্রিম চাহিদা অথবা যোগানের সৃষ্টি করিয়া মূল্যকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে প্রভাবিত করা যায়। কারণ হিসাবনিকাশের সময় প্রকৃত পণ্যের লেনদেনের বদলে লাভক্ষতির লেনদেন করিলেই চুকিয়া যায়। এইরূপ জুয়াখেলা জাতীয় ফক্কা ক্রয়-বিক্রয়কে আমাদের দেশে "ফটকা" বাজার আখ্যা দেওয়া হয়।

অতএব দেখা যায় যে পণ্যের বাজারে ক্রেতা এবং

বিক্রেতার যোগাযোগই আসল কথা। এমন কি আসল পণ্যদ্রব্যটীর কোন উপস্থিতি অথবা অস্তিত্ব না থাকিলেও বাজার অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় চলিতে পারে এবং ভালই চলে। অর্থাৎ রাম ছাড়াও রামায়ণের অভিনয় বেশ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইতে পারে। তবে যে পণ্যদ্রব্যের বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতার যোগাযোগ যত থাকিবে সেই বাজারটীও তত নিখুঁত হইবে এবং বাজারে সর্ব্বত্র পণ্যটীর একই সময়ে একটী মাত্র মূল্য চলিত থাকিবে। তবে আমরা জানি যে বিভিন্ন শ্রেণীর অথবা পর্য্যায়ের (grade) গম, চাল, তুলা, পাট, চা ইত্যাদির মূল্যও অবশ্যই বিভিন্ন হইবে। কারণ এ-ক্ষেত্রে পণ্যগুলিই বিভিন্ন। আবার একই পণ্যের বিভিন্ন নাম অথবা মার্কা লাগাইয়া যদি ক্রেতার মনে একটা কাল্পনিক পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় তাহা হইলেও ইহা বিভিন্ন পণ্যে পরিণত হয়। যেমন ধরা যাক, কোন সিগারেট প্রস্তুত-কারক সংস্থা বিভিন্ন শ্রেণীর খরিদ্দারের চাহিদা মিটাইবার জন্য একই সিগারেটে বিভিন্ন নাম দিয়া বিভিন্ন দাম লাগাইয়া দিলেন। এরূপক্ষেত্রে এক-একটী নামীয় সিগারেটের জন্য এক-একটী স্বতন্ত্র বাজারের সৃষ্টি হইল।

আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার। অর্থশাস্ত্রে বাজার শব্দটি শুধু আক্ষরিক অর্থে পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। যাহা কিছু অর্থমূল্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহারই একটা বাজার আছে। যেমন শ্রমের বাজার (Labour Market), শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার (Share Market), বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয়ের বাজার (Foreign Exchange Market), ইত্যাদি। তেমনি স্বল্প-মেয়াদী ঋণস্বরূপ টাকার লেনদেনের বাজারকে আখ্যা দেওয়া হয় Money Market। আবার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের সুনিয়ন্ত্রিত এবং কেন্দ্রীভূত বাজার থাকে বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হয় "ষ্টক এক্সচেঞ্জ" (Stock Exchange)। তেমনি শ্রমের বাজার-এ (Labour Market) সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র থাকিলে তাহাকে আখ্যা দেওয়া হয় "এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ" (Employment Exchange)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার-এ (Foreign Exchange Market) "ভবিষ্য ক্রয়-বিক্রয়" (Futures Transactions) খুব চালু। কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যে ভবিষ্যতে মূল্য পরিশোধের সর্ত্তে ক্রয়-বিক্রয় হইলে ভবিষ্যতে বিনিময়হারের উঠানামাজনিত লাভ-ক্ষতি এড়াইবার জন্য আগে হইতেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হারে মুদ্রাবিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ ভবিষ্য মুদ্রার বিনিময়কে Forward Exchangeও আখ্যা দেওয়া হয়। স্বভাবতঃই ভবিষ্য মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে "ফাটকা"র খেলাও খুব জমে। এবং ফাটকাবাজ অথবা Speculatorদের ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে অনেক দেশের মুদ্রা-কর্তৃপক্ষকে সময় সময় বেশ সংকটেও পড়িতে হয়।

যাহাই হউক, মোদ্দা কথা হইল এই যে অর্থশাস্ত্রে "বাজার" (market) শব্দটি কোন একটি বিশেষ পণ্য-দ্রব্য অথবা উপকৃতি (service) এর প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা কোন একটি বিশেষ স্থান অথবা রকমারি পণ্য সম্ভারের সমাবেশ বুঝায় না; কোন একটি বিশেষ পণ্যদ্রব্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতার যোগাযোগ বুঝায়। অথবা আমরা বলিতে পারি অর্থশাস্ত্রে "বাজার" শব্দ দ্বারা কোন একটি বিশেষ পণ্যদ্রব্য অথবা বিশেষ ধরণের উপকৃতির "চাহিদা" এবং "যোগানের" যোগা-যোগ বুঝায়। কারণ অর্থশাস্ত্রে 'বাজার' শব্দটির অবতারণা হয় কোন একটি বিশেষ পণ্য দ্রব্য অথবা উপকৃতির মূল্য কিরূপে চাহিদা এবং যোগানের সংঘাতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আলোচনা প্রসঙ্গে।

আমরা জানি যে কোন পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রয় বলিতে বুঝায় অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ অথবা স্বত্বলাভ, বিক্রয় বলিতে বুঝায় অর্থের বিনিময়ে বর্জ্জন অথবা স্বত্বত্যাগ। অর্থাৎ ক্রেতা অর্থের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার বিনিময়ে ক্রীত পণ্যদ্রব্যের উপর স্বত্বলাভ করেন এবং বিক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার বিনিময়ে অর্থের উপর স্বত্বলাভ করেন। আমরা ইহাও জানি যে ক্রেতা কোন দ্রব্য ক্রয় করেন হয় ব্যবহারের

উদ্দেশ্যে, না হয় পুনরায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে কোন দ্রব্যের বিক্রেতার একটিমাত্র আসন্ন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। তাহা হইল পণ্যদ্রব্যটির বিনিময়ে অর্থলাভ। কিন্তু আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে অর্থের কোন প্রত্যক্ষ ব্যবহারমূল্য নাই। পণ্যের বিক্রেতা বিক্রয়লব্ধ অর্থ খাইতেও পারেন না, পরিতেও পারেন না। তবে এই অর্থ তিনি পরোক্ষভাবে ব্যবহার করিতে পারেন, ইহার বিনিময়ে অপর পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া। অতএব অর্থ এক্ষেত্রে শুধু বিনিময়ের মাধ্যম-এর(Medium of Exchange) কাজ করে। পণ্যের বিক্রেতা প্রথমে বিক্রীত পণ্যের বিনিময়ে অর্থলাভ করেন এবং পুনরায় ক্রেতার ভূমিকা অবলম্বন করিয়া সেই অর্থের বিনিময়ে অপর পণ্যদ্রব্য ক্রয় করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে বিক্রীত পণ্যটির বিনিময়ে ক্রীত পণ্যটি আসিল, অর্থ শুধু মধ্যস্থস্বরূপ এই পণ্য-বিনিময়ের কাজে সহায়তা করিল। এবং একই ব্যক্তি প্রথমে বিক্রেতার ভূমিকায় পণ্যের বিনিময়ে অর্থলাভ করিলেন, তারপর আবার ক্রেতার ভূমিকায় সেই অর্থের বিনিময়ে অপর পণ্য লাভ করিলেন।

আর্থিক সমাজের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই একাধারে বিভিন্ন সময়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতা এই উভয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সকলেই জীবন ধারণের প্রয়োজনে কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু কেহই তাঁহার জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু স্বয়ং উৎপাদন করেন না। তবে প্রত্যেকেই তাঁহার শ্রম বা উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ লাভ করেন এবং সেই অর্থের বিনিময়ে নিজের প্রয়োজনীয় অথচ অপরের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তবে নিজের প্রয়োজন মিটান। অতএব আর্থিক সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির বৈষয়িক অবস্থা নির্ভর করে একদিকে যেমন নিজের শ্রম অথবা উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্যের উপর, অপরদিকে তেমনই অপরের শ্রম অথবা উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্যেরও উপর। ফলে বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্য অথবা বিভিন্ন প্রকারের শ্রম অথবা উপকৃতির মূল্য কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার আলোচনা অর্থশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমরা অনেক সময়ই দেখি যে সরকার কোন কোন পণ্যদ্রব্যের অথবা শ্রমের মূল্য বাঁধিয়া দেন। এই মূল্য নিয়ন্ত্রণের রেওয়াজ বলিতে গেলে মানুষের বৈষয়িক সমাজ-বিবর্ত্তনের প্রায় আদি হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। তবে অতি প্রাথমিক পর্য্যায়ে মানুষের এক-একটি গোটা সমাজ এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃহৎ পরিবারের মত গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করিতেন। এইসব বৃহৎ পরিবার-তুল্য স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের অভ্যন্তরে শ্রমবিভাগ ছিল, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকিতেন বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় নিজেদের মধ্যে কোনরূপ পণ্য বিনিময়ের প্রশ্ন ছিল না। তবে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজগুলির একে অন্যের মধ্যে কোন কোন উদ্বৃত্ত দ্রব্যের বিনিময় হইত। এমন কি পাঁচ ছয় হাজার বছর আগেই ভারতের সিন্ধু তীরে, মধ্যপ্রাচ্যের মেসোপটেমিয়ায় এবং আফ্রিকায় মিশরে যে প্রাচীনতম সভ্যসমাজগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বেশ ফলাও রকমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও চলিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বেচাকেনার স্থান বিশেষ ছিল না। অতএব মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও উঠে না। তবে চারিহাজার বছর আগে ব্যাবিলন-এর প্রখ্যাত সম্রাট হামুরাবি (Hammurabi) তৎকালীন অন্যান্য সামাজিক রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানুন-এর সহিত পণ্যদ্রব্যাদি এবং শ্রমের মূল্যও বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তফাৎ এই যে আজকাল পণ্যদ্রব্যাদির সর্ব্বোচ্চ মূল্য এবং শ্রমের নিম্নতম মূল্যই (অর্থাৎ নিম্নতম মজুরী) ধার্য্য করা হয়। কিন্তু হামুরাবির সময়ে শ্রমেরও সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য করিয়া দেওয়ার সামাজিক প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল।

আমাদের দেশেও সম্ভবতঃ তিন চার হাজার বছর যাবৎ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ চলিয়া আসিয়াছে। একই পরিবারের লোক কৃষিকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্ম্মাণ, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকেন। একই

গ্রামে কৃষিজীবী, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, ক্ষৌরকার, ধীবর, তীবর, রজক, সদ্গোপ, মালাকার ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তিধারীরা পরস্পরের প্রয়োজন মিটাইয়া একত্র বাস করেন। অতএব ক্রয়-বিক্রয়ের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। তবে কোন পরিবারের অথবা গ্রামের প্রয়োজন মিটাইয়া যদি উদ্বৃত্ত দ্রব্য কিছু থাকে, তবে তাহা পণ্যস্বরূপ হাটে বা বাজারে যায়। গত কুড়ি বৎসরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ কতদূর আধুনিক নাগরিক-সমাজে পরিণত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে একশতাব্দী আগে কার্ল মার্কস বেশ সশ্রদ্ধভাবেই ভারতীয় প্রাচীন গ্রামীণ সমাজের যে আবহমান কাঠামোর চিত্র আঁকিয়া গিয়াছিলেন, তাহা প্রাক্-স্বাধীন যুগ পর্যন্ত বর্ত্তমান ছিল বলা যায়।

অতএব আমরা যখন কোন একটি পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির মূল্য চাহিদা এবং যোগানের সংঘাতে নির্দ্ধারিত হওয়ার অর্থশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের কথা বলি, তখন ইহাকে একটি বিশেষ বৈষয়িক সমাজের পট-ভূমিকায় বিচার করিতে হইবে। সাধারণতঃ এই বিশেষ ধরণের বৈষয়িক সমাজকে "ধনতান্ত্রিক" আখ্যা দেওয়া হয়। তবে "ধনতন্ত্র" অথবা "পুঁজিতন্ত্র" অর্থাৎ মূলধনের "শাসন" কিংবা প্রাধান্য এই বিশেষ ধরণের বৈষয়িক-সমাজ ব্যবস্থার "নিদান" অর্থাৎ মূল কারণ নহে, ইহা একটা "লক্ষণ" (symptom) মাত্র। বরং ইহার প্রকৃত সংজ্ঞা দেওয়া যায় "বৈষয়িক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য" (Economic Individualism)। এইরূপ বৈষয়িক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক সমাজে পণ্য-দ্রব্যাদির উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, মূল্য নির্দ্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রের কোনরূপ হস্তক্ষেপ থাকিবে না। আভ্যন্তর অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনরূপ বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না। কোনরূপ "পারমিট" (Permit) "লাইসেন্স"-এর (Licence) কোন স্থান থাকিবে না। যে কোন ব্যক্তি তাঁহার খুশীমত যে কোন দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হইতে পারিবেন। নিজ নিজ বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবর্দ্ধনে প্রয়াসী প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিগত রুচি, যোগ্যতা অথবা প্রবণতানুরূপ যে কোন জীবিকা গ্রহণ করিবেন। নিজের শ্রম অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য যে কোন মূল্য দাবী করিতে পারিবেন, তবে কি মূল্যে তাহা বিকাইবে তাহা নির্ভর করিবে অপরের চাহিদার উপর। তেমনি অপরের শ্রম অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য তাঁহার খুশীমত যে কোন মূল্য দিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন, কিন্তু তাহা কি মূল্যে পাইবেন তাহা নির্ভর করিবে অপরের যোগানের উপর। প্রত্যেক ব্যক্তির স্ব স্ব উপার্জিত ধনসম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত থাকিবে। শ্রম অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অথবা হস্তান্তর ব্যাপারে পরস্পরের ইচ্ছা প্রণোদিত স্বাধীনভাবে সম্পাদিত বৈধ চুক্তিভঙ্গজনিত ক্ষতি হইতে নাগরিকদের রক্ষা করা ব্যতীত সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণ-বিধানের কোনরূপ প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রাষ্ট্রের থাকিবে না। অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা বিধানের ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে যতটুকু রাজস্বের প্রয়োজন তদতিরিক্ত কোনও কর অথবা শুল্কাদি আরোপে রাষ্ট্র বিরত থাকিবেন।

আমরা যে অর্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা করি তাহা মূলতঃ এইরূপ একটা আদর্শ বৈষয়িক-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজের পটভূমিকায়। বাস্তবে এইরূপ বৈষয়িক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মানুষের ইতিহাসে দুইশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোথাও ছিল না। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ড এবং ফরাসী দেশের ধনবিজ্ঞানীরা এইরূপ একটী বৈষয়িক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক সমাজের আদর্শ সামনে রাখিয়া আধুনিক অর্থশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে বৈষয়িক কার্য্যাবলীতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ জনকল্যাণের পরিপন্থী। মানুষের বৈষয়িক কার্য্যাবলীতে তাঁহাদের প্রস্তাবিত কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অথবা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপবর্জিত অবাধ স্বাধীনতামূলক এই নীতিকে "অবাধ উদ্যম" অথবা

Free Enterprise বলা হয়। ফরাসী ভাষায় এই নীতিকে Laissez Faire ("ল্যাসে ফ্যার") এই কথাগুলির দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সম্ভবতঃ ইহার বাংলা অনুবাদ হইবে "যা খুসী করিতে দাও"। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রপ্রমুখ পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলি মোটামুটিভাবে এই নীতি মানিয়া চলিয়াছিলেন এবং গত দুইশত বৎসর-এর যান্ত্রিক শিল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি এবং পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের বিস্ময়কর অর্থ নৈতিক উন্নতির সহিত এই বৈষয়িক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জড়িত আছে বলা যায়। তবে "অবাধ উদ্যম" (Freedom of Enterprise) ভিত্তিক বৈষয়িক অগ্রগতির সহিত এই নীতি হইতেই উপজাত একটা দানবরূপী কুফলেরও উদ্ভব হয়। তাহা তাহা হইল বৈষয়িক-সমাজ সংগঠনের উপর ব্যক্তিগত মূলধনের ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্য। ইহাকেই ধনতন্ত্রবাদ অথবা পুঁজিবাদ (Capitalism) আখ্যা দেওয়া হয়। এবং ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া হইতেই সমাজবাদ অথবা Socialismএরও আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক সমাজবাদী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মূলধনের স্থান নাই, সমস্ত মূলধন রাষ্ট্রায়ত্ত। সেখানে সুপরিকল্পিতভাবে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদনের উপাদনগুলিকে নিয়োজিত করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্যাবলী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীন। অর্থাৎ সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যমকে অপসারিত করিয়া সমষ্টিগত অথবা রাষ্ট্রীয় উদ্যমএর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আবার যেসকল দেশ এতদিন বৈষয়িক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অথবা অবাধ উদ্যম নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাও বর্ত্তমানে অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পথ অবলম্বন করিতেছেন। এইরূপ বৈষয়িক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সমাজতন্ত্র অথবা রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ এই দুই-এর সংমিশ্রণে উদ্ভূত অর্থনীতিকে বলা হয় "সঙ্কর অর্থনীতি" অথবা "মিশ্র অর্থনীতি" (Mixed Economy)। অমাদের দেশেও এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব আমাদের অর্থশাস্ত্রীয় আলোচনায় "অবাধ উদ্যম" অথবা "বৈষয়িক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য"-এর পটভূমিকাটাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

"অবাধ উদ্যম" অথবা বৈষয়িক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ভিত্তিক সমাজে কোন পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির মূল্য নির্দ্ধারিত হয় "বাজারে", অর্থাৎ ক্রেতা এবং বিক্রেতার যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সম্মতিতে। এইরূপ বাজারের একটি আদর্শ অবস্থাকে "অবাধ প্রতিযোগিতা" অথবা "পূর্ণ প্রতিযোগিতা" (Free Competition অথবা Perfect Competition) আখ্যা দেওয়া হয়। কোন পণ্যদ্রব্যের বাজার অবাধ প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান থাকিলে ঐ দ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতার অবাধ যোগাযোগে ক্রেতাদের তরফ হইতে চাহিদা এবং বিক্রেতাদের তরফ হইতে যোগান এই দুই অদৃশ্য অথচ বিপরীতমুখী শক্তির মিলনে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠীর অথবা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই দ্রব্যটির মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়।

যে অবস্থায় কোন পণ্যদ্রব্যের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান আছে বলা যায় তাহা মোটামুটি এই। প্রথমতঃ পণ্যদ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকিবে। ইহার অর্থ এই যে, কোন বিশেষ ক্রেতার চাহিদা অথবা বিশেষ বিক্রেতার যোগান বাজারের মোট চাহিদা অথবা যোগানের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। ফলে কোন বিশেষ ক্রেতা অথবা বিক্রেতা তাঁহার ক্রয় অথবা বিক্রয়ের পরিমাণ যতই বাড়ান বা কমান না কেন, তাহাতে বাজারের সামগ্রিক চাহিদা অথবা যোগানের বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। দ্বিতীয়তঃ ক্রেতা অথবা বিক্রেতাদের মধ্যে কোনরূপ জোট থাকিবে না। কারণ ক্রেতা অথবা বিক্রেতারা বহুসংখ্যক হইলেও যদি নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধেন তবে ইচ্ছামত চাহিদা অথবা যোগান নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে

অবাধ যোগাযোগ থাকিবে অথচ কোন পক্ষপাতিত্ব থাকিবে না। অর্থাৎ যে কোন ক্রেতার নিকট যে কোন বিক্রেতা (অথবা কোন বিক্রেতার নিকট যে কোন ক্রেতা) সমানই অধিগম্য হইবেন এবং প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতা বাজারের অন্যান্য ক্রেতা-বিক্রেতা কি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছেন সে বিষয়ে সম্যক্ অবহিত থাকিবেন। চতুর্থতঃ বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রেয় পণ্য সম্পূর্ণ অভিন্ন (identical) হইবে অর্থাৎ কোন ক্রেতার দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রেয় দ্রব্যের মধ্যে বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক কোন পার্থক্য থাকিবে না। ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে পক্ষপাতশূন্যতা এবং পণ্যদ্রব্যের অভিন্নতার অর্থ এই যে নৈকট্য, আচরণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কোন ক্রেতা কোন বিশেষ বিক্রেতা অথবা তাঁহার পণ্যের প্রতি আসক্ত হইবেন না। মনে করা যাক্, দুইটি বস্ত্র-নির্মলক সাবানের উৎপাদক একই সাবান তৈরী করিতেছেন, কিন্তু একজন তাঁহার সাবানের নাম দিলেন "রবিরশ্মি", আরেকজন নাম দিলেন "শশিপ্রভা"। ইহাতে ক্রেতাদের মনে একটা পার্থক্যের সৃষ্টি হইল। অতএব অবাধ প্রতিযোগিতা ব্যাহত হইল (অথবা, আমরা দেখিয়াছি (সিগারেট-এর দৃষ্টান্তে) যে এক্ষেত্রে একই পণ্য দুইটি স্বতন্ত্র পণ্যে পরিণত হইল।

সুবর্ণভিত্তিবর্জিত মুদ্রাব্যবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে কোনরূপ বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে তাহাও সাধারণ পণ্যদ্রব্যের অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মতই হইয়া দাঁড়ায়। তবে এই প্রসঙ্গে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যত্যয় ঘটিলে কি হয় তাহাও জ্ঞাতব্য। কোন পণ্য-দ্রব্যের বাজারে অবাধ অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যতিক্রম ঘটে, যদি (১) ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ হয়, (২) ক্রেতা অথবা বিক্রেতাদের মধ্যে জোট থাকে, (৩) ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ না থাকে অথবা পক্ষপাতিত্ব থাকে অথবা (৪) বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রেয় দ্রব্য সম্পূর্ণ অভিন্ন না হয়। ইহার একটি চরম অবস্থা অর্থাৎ অবাধ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী অবস্থা হইল একায়ত্ত বাজার (Monopoly) যেখানে একজনমাত্র বিক্রেতা অথবা উৎপাদক অথবা একটিমাত্র সংস্থা এমন একটি দ্রব্য বিক্রয় অথবা উৎপাদন করেন যাহার আর কোন জুড়ি নাই। অর্থবিজ্ঞানীরা অনেক সময় এক-বিক্রেতায়ত্ত বাজার (Monopoly) এবং এক-ক্রেতায়ত্ত বাজার (Monopsony) এই দুইএর পৃথক নামকরণ করেন। অবাধ প্রতিযোগিতা-মূলক বাজার এবং একায়ত্ত বাজার এই দুইয়ের মাঝামাঝি আরও দু'একটি বাজারের কল্পনা করা হয়, যেমন দ্বি-আয়ত্ত বাজার (Duopoly) এবং কতিপয়ায়ত্ত বাজার (Oligopoly)। ইহাদিগকেও আবার দুই ক্রেতায়ত্ত বাজার (Duopsony) অথবা কতিপয় ক্রেতায়ত্ত বাজার (Oligopsony) এইরূপে ভাগ করিয়া স্বতন্ত্র নামকরণ করা যায়।

বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে যদি অবাধ ক্রয়-বিক্রয় চলে এবং অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকেন, তাহা হইলে যে কোন সাধারণ পণ্যদ্রব্যের বাজারের চেয়েও ইহা নিখুঁতভাবে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার কথা। কারণ বিভিন্ন বিক্রেতার (অর্থাৎ বিনিময় ব্যাঙ্কের) বিক্রেয় বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক কোনরূপ পার্থক্যই থাকিতে পারে না। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ডলার অথবা যুক্তরাজ্যের ষ্টার্লিং আমরা যে ব্যাঙ্ক হইতেই ক্রয় করি না কেন তাহা একই ডলার অথবা ষ্টার্লিং হইবে। অতএব বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার মধ্যে যদি অবাধ বিনিময় ব্যবস্থা চলিত থাকে তাহা হইলে একই সময়ে শুধু দুইটী বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার মধ্যেই একটীমাত্র বিনিময়-হার থাকিবে তাহাই নহে, সবগুলি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়-হারের মধ্যেও একটা অমোঘ সামঞ্জস্য থাকিবে। অর্থাৎ টাকার সহিত ডলারের বিনিময়হার যদি হয় ১ ডলার = ৫ টাকা, এবং ডলারের সহিত ষ্টার্লিংএর বিনিময়হার যদি হয় ১ ষ্টার্লিং = ৩ ডলার, তবে টাকার সহিত ষ্টার্লিংএর বিনিময়হারও অবশ্যই হইবে ১ ষ্টার্লি = ১৫ টাকা। যদি টাকা এবং ষ্টার্লিএর পারস্পরিক চাহিদা যোগানের পরিবর্তনের ফলে কোন সময়ে টাকার বিনিময়হারের

একটু পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে একদিকে টাকা এবং ডলারের এবং অপরদিকে ডলার এবং ষ্টার্লিং-এর বিনিময়হারেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া এই তিনের মধ্যে একটা নতুন বিনিময়হার প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করা যাক টাকার বিনিময়ে ষ্টার্লিং এর মূল্য বাড়িয়া হইল ১ ষ্টার্লিং = ১৬ টাকা অথচ টাকা এবং ডলারের (১ ডলার =৫ টাকা), আর ডলার এবং ষ্টার্লিং এর (১ ষ্টার্লিং=৩ ডলার) বিনিময়হার পূর্ব্ববৎই রহিল। ইহার অর্থ হইল এই যে ষ্টার্লিং এর বিনিময়ে টাকা সস্তা হইল কিন্তু ডলারের দাম পূর্ব্ববৎই রহিল। অর্থাৎ এক ষ্টার্লিংকে সোজাসুজি ডলারে রূপান্তরিত করিলে পাওয়া যাইবে ৩ ডলার, কিন্তু প্রথমে টাকায় (১৬ টাকা) রূপান্তরিত করিয়া তারপর ঐ টাকাকে ডলারে পরিণত করিলে পাওয়া যাইবে কিছু বেশী। তেমনি টাকাকে সোজা-সুজি ষ্টার্লিংএ পরিণত করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, আগে ডলারে পরিণত করিয়া তার পর সেই ডলারকে ষ্টার্লিংএ পরিণত করিলে তার চেয়ে বেশী মিলিবে। এবং ডলারের বিনিময়ে সোজাসুজি টাকা না কিনিয়া প্রথমে ষ্টার্লিং কিনিয়া তারপর সেই ষ্টার্লিং দিয়া টাকা ক্রয় করিলে পাওয়া যাইবে কিছু বেশী। অর্থাৎ ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে টাকার চাহিদা বাড়িবে, টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা বাড়িবে এবং ডলারের বিনিময়ে ষ্টার্লিং-এর চাহিদা বাড়িবে। এবং ফলে ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে টাকার মূল্য কিছু বাড়িয়া (১ ষ্টার্লিং = ১৫ টাকা এবং ১৬ টাকার মাঝামাঝি হইয়া) এবং টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্য কিছু বাড়িয়া (১৬ ডলার=৫ টাকার কিছু বেশী হইয়া) এবং ডলারের বিনিময়ে ষ্টার্লিং এর মূল্য কিছু বাড়িয়া (১ ষ্টার্লিং=৩ ডলারের কিছু বেশী হইয়া) একটা নূতন বিনিময়হার স্থির হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে এইরূপ সামান্য উঠানামা হইলেই সাধারণ পণ্যদ্রব্যের মতই সস্তার বাজারে কিনিয়া চড়া বাজারে বিক্রয় করিয়া মুদ্রাব্যবসায়ীরা কিছু লাভ করেন এবং বিনিময়হারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনিয়া দেন। এইরূপ বেচা-কেনার নাম Arbitrage। আধুনিককালে তার অথবা বেতার যোগে প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীময় এইরূপ বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় চলিতে পারে।

অতএব দেখা যায় যে, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে দুইটি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার, এমন কি অসংখ্য বিভিন্নদেশীয় মুদ্রার, পারস্পরিক বিনিময়হার স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থির হইয়া যাইবে, তাহা অবধারিত। এবং যে বিনিময়হারটী স্থির হইবে তাহাকে Equlibrium Rate of Exchange অথবা ভারসাম্য বিনিময়হার আখ্যাও দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে একই সময়ে একাধিক ভারসাম্য বিনিময়হার থাকা সম্ভব (ফাল্গুন, ১৩৭৭)। সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে একই সময়ে একাধিক Equilibrum Price অথবা ভারসাম্য মূল্য থাকা সম্ভব নয়। ইহা নিয়মের ব্যতিক্রম কি না তাহা আমরা ক্রমে বুঝিবার চেষ্টা করিব

নরেন দেব

নীলকণ্ঠ মৈত্র

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নরেন দেবের মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের এক বিপুল ক্ষতি। তিনি ছিলেন কল্লোল-যুগের লেখক এবং ভারতী পত্রিকার গোষ্ঠীর সংগে বিশেষভাবে জড়িত। এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাছাড়া, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ছিলেন তাঁর নিকটতম বন্ধু। শরৎচন্দ্রের সংগে তাঁর বিশেষ আলাপ ছিল, বিশেষতঃ শরৎচন্দ্র তাঁর নিকট-প্রতিবেশী হবার জন্যে শেষজীবনে নিজের বাড়ী করেছিলেন অশ্বিনী দত্ত রোডে। যৌবনকাল থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি বাণীর বন্দনা করে গেছেন। কবি হিসেবেই তিনি হয়ত বিশেষ পরিচিত, কিন্তু লেখক বা সমালোচক হিসেবেও তাঁর দান কম নয়। ছোটদের জন্যে লিখেছেন—'গৌতমের গত জন্ম'—এতে বুদ্ধ-অবতার শ্রীগৌতমের কাহিনী রচনা করেছেন তাঁর সুনিপুণ হস্তে। কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত——তাঁর এক অসামান্য রচনা হ'ল 'ওমর খৈয়াম' এবং 'মেঘদূত।' বিদেশেও তিনি নানা গুণীর সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গ, রাশভারী পুরুষ। দূর থেকে দেখলেই সম্ভ্রমের উদয় হত,—মনে হত, তিনি বোধহয় গুরুগম্ভীর প্রকৃতির—কোনো প্রকার চটুল আলাপ পছন্দ করেন না। কিন্তু যখন তাঁর কাছে গিয়েছি, তিনি গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন ঠিকই, তবে ছিলেন সদালাপী, প্রিয়ভাষী এবং তাঁর সংগে আলাপ করে তাঁকে নিজের হিতাকাঙ্খী বলে মনে হত—সেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। নিজের সহজাত গাম্ভীর্য বজায় রেখেও উপহাস প্রকাশে কোনো কার্পণ্য করতেন না।

তিনি ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু এবং প্রতিবেশী। আমার সংগে তাঁর আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে বলা চলে না—তবে তাঁকে আমি যতটুকু দেখেছি এবং জেনেছি তারই একটা আভাস দেব।

আমরা হিন্দুস্থান পার্কে উঠে আসি ১৯৩৬ সালে, আর উনি আসেন তার কয়েকবছর আগে। আমার পিতার সঙ্গে common যোগসূত্র ছিল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল কম্পানী। ঐকম্পানীর সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরসঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। ক্যালকাটা কেমিক্যাল কম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, ৺অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রনাথ সেন, ৺খগেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র হ'লেন আমার পিতৃবন্ধু।

ওঁর সংগে আমার পরিচয় হয় প্রথমে ১৯৬৭ সালে। তার কারণ, আমার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে পুণা, দিল্লী, দেরাদুন প্রভৃতি সহরে।

আমার প্রথম সাক্ষাতের যোগাযোগ হ'ল, যখন পরম পূজনীয় শ্রীদিলীপকুমার রায় একখানা চিঠি পাঠান, তাঁর হাতে দেবার জন্যে। প্রথম আলাপে সম্বোধন করেন 'আপনি', তারপরে পিতৃপরিচয় পেয়ে 'তুমি'র পর্যায়ে নেমে আসে, যাতে সংকোচের ভাবটা কেটে যায়। এই প্রসঙ্গে, তিনি পূজনীয় দিলীপদার অনেক অনেক খোঁজ-খবর নিলেন, বিশেষতঃ কী ক'রে আমি তাঁর স্নেহের ছায়ায় আসি। আমি উত্তরে বলি, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমি পুণাতে ছিলুম, এবং সেইসময়ে এক প্রভাতের পরম শুভমুহূর্তে দিলীপদার পদধূলি গ্রহণ ক'রে ধন্য হই।' উনি দিলীপদা'র খুবই অনুরাগী ছিলেন এবং দিলীপদাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। দিলীপদার শিষ্যা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীও ওঁর স্নেহাস্পদা এবং আমার কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য গুণের প্রশংসা করতেন। দিলীপদা'র অমূল্য পুস্তক 'স্মৃতিচারণের সমালোচনা ভারতবর্ষে উনিই করেন এবং বইটির বহুল প্রশংসা করেছিলেন। দিলীপদা ওঁকে 'নরেনদা' ব'লে আহ্বান করতেন। উনি এবং ওঁর শ্যালক শ্রীবিভূতি

কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন পুণা থেকে ফিরে এসে ভারতবর্ষ পত্রিকায়। তাছাড়া দিলীপদা' যখন কোলকাতায় এলগিন রোডে শ্রীমিলন সেনের অতিথি হতেন, তখন নরেনবাবু তাঁর ভজনসভায় নিয়মিতভাবে যেতেন এবং দিলীপদাও হিন্দুস্থান পার্কে তাঁর বাড়ীতে যেতেন। গতবার যখন দিলীপদা' আর ইন্দিরাদিদি তাঁর পদধূলি নিতে যান, তখন উনি বলেন,—"আমারই উচিত তোমাদের পদধূলি গ্রহণ করা।" এতে ক'রে আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয়ের একটা যোগসূত্র বাড়ল। তারপর আমি আরও অনেকবার গিয়েছি ওঁর কাছে দিলীপদার পত্রবাহক হয়ে—এবং প্রতিবারই ওঁর সহৃদয়তায় এবং অমায়িকতায় মুগ্ধ হ'য়েছি।

১৯৭০ সালে উনি বিশেষ অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, দিন চারেক কোনো জ্ঞান ছিল না, তারপর সুস্থ হ'য়ে উঠলেন এবং আস্তে আস্তে সব কাজই আরম্ভ করলেন। সেই সময়ে এপ্রিলমাস নাগাদ বন্ধুবর ডাক্তার রামচন্দ্র-অধিকারীকে নিয়ে ওঁর বাড়ীতে যাই—ওঁরা পুরোনো দিনের অনেক আলোচনা করেন,রবীন্দ্রনাথ,দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সাহিত্যের মহারথীদের সংগে তাঁদের কী রকম সময় কেটেছিল। ১৯৭০ সালে পুজোর সময় দু'একটা পুজো মণ্ডপে গিয়ে উনি ভাষণও দিয়েছেন। বিকেলের দিকে উনি বাড়ির সামনে পায়চারী করতেন, কখনও বাড়ীর রকে বসে থাকতেন। সান্ধ্যভ্রমণের সময় আমি মাঝে মধ্যে ওঁর সংগে আলাপ করতুম—সেই সময়ে উনি আধ্যাত্মিকতা নিয়ে অনেক আলোচনা করতেন। আধ্যাত্মিকতায় আগে উনি খুব বিশ্বাস করতেন না, একথা আমাকে বল্লেন—তবে এখন যেন সেই বিশ্বাসটা দৃঢ় হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সংগে উনি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন—বিশেষতঃ জনৈক সাধুর সম্বন্ধে। এঁরা দুজনে ছিলেন সমবয়সী এবং অকৃত্রিম বন্ধু।

কয়েকমাস পিতৃদেবের অসুস্থতার জন্যে ওঁর সংগে সাক্ষাৎ করতে পারি নি। ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১ সাল সকালে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। উনি বল্লেন—"কেন জানি না, অনেকদিন ধরে তোমার কথা মনে হচ্ছিল, দেখ আজ তুমি এসে গেলে। জানো, এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে, যাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে, সে দেখা দেয়। মনে হয় ভগবানকে সেইরকমভাবে দেখতে ইচ্ছে করলে তিনিও দেখা দেবেন। ওঁকে mentally alert দেখলুম এবং যদিও বিছানায় আধ-শোওয়া অবস্থায় ছিলেন, টেবিলের চারপাশে অনেক ম্যাগাজিন ও বই ছিল, যেগুলি তিনি পড়ছিলেন। পরে বল্লেন—"জানো পায়ে বিশেষ বল পাই না, সেজন্যে নীচে নামি না, আর নানারকম ওষুধ খেয়েও বিশেষ effective হচ্ছে বলে মনে হয় না। তুমি মাঝে মাঝে এসো, তোমাকে দেখলে ভালো লাগে।" তার পরের রবিবার 11th April দিলীপদা'র রচিত উষাঞ্জলি দিয়ে আসলুম। উনি খুব খুসী হলেন—দিলীপদা'র নানা খবর জিজ্ঞাসা করলেন। ভাবলুম—নববর্ষের পরে ওঁর সংগে আবার সাক্ষাৎকরব, নববর্ষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। ইতিমধ্যে দিলীপদা' Saint Gurudayal বইটি আমাকে পাঠালেন, ওঁকে দিয়ে আসবার জন্যে—এবং সেটাও দিলীপদার নববর্ষের প্রীতি-উপহার ছিল। ১লা বৈশাখ বেশ মেঘালো ছিল, ভাবলুম, আকাশ পরিষ্কার হলেই ওঁর বাড়ীতে যাবো নববর্ষের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না—আর না দিতে পারলুম তাঁর হাতে তুলে দিতে দিলীপদার নববর্ষের প্রীতি-সম্ভাষণ। এ আক্ষেপ আমার চিরদিনই থাকবে।

তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ অল্প কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু যেটুকু সময় তাঁর সংগে কাটিয়েছি, আনন্দে মন ভরে গেছে। তিনি ছিলেন সহৃদয় ও অমায়িক এবং স্নেহভাজন। পিতৃবন্ধু হ'লেও আমাকে যথেষ্ট সমাদর করতেন।

তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে যখন যাই, তখন মনে বেদনা পাই। একজন প্রকৃত শুভাকাঙ্খীর অভাব অনুভব করি।

তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মিঃ ষ্টিলিকে আশ্বাস দিয়ে জর্জ ব'ললো, আপনার উপদেশ আমি মেনে চ'লবো।"

"আর দেখ, দরজার পাল্লা বন্ধ করে নিয়ে ঘরের ভিতরেই থেকো, ব'লেছি তো এখানকার তুষার-ঝড় বড় পাজি জিনিস আর মারাত্মক। কোন রকমে একবার তার কবলে প'ড়লে আর তোমার বাঁচতে হবে না।"

জর্জ বাহাদুরী দেখাবার জন্য সাহস দেখিয়ে বললো, "আমি ভয় পাই না। তুষার-ঝড় আমি আগেও দেখেছি।"

জর্জের কথা শুনে মিঃ ষ্টিলি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর গম্ভীর হয়ে ব'ললেন "এ জিনিস কখনো তুমি আগে দেখোনি। যাই হোক আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়ে গেলাম। পরে যেন আমাকে দোষ দিয়ো না, ব'লো না যেন, আমি তোমাকে আগে থাকতে সাবধান ক'রে দিইনি।"

মিঃ ষ্টিলি চ'লে যাবার কয়েকদিন পরে ফায়ার প্লেসের জন্য জ্বালানী কাঠ মাঠ থেকে সংগ্রহ করে আনার উদ্দেশ্যে জর্জ একদিন দলবল নিয়ে বের হ'ল। এই জ্বালানীর মধ্যে কিছু পরিমাণ শুকনো সূর্যমুখী ফুলের কাঁটাও মিলানো ছিল, আগুনে দিলে তা থেকে রক্তিম আভা বিচ্ছুরিত হ'ত। কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম ক'রে মাটি খুঁড়ে জর্জ যতোটা পারল জ্বালানী সংগ্রহ করলো, তারপর সে তার গাড়ীতে বোঝাই করে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

থাকায় এতক্ষণ সে খেয়াল করেনি বেলা গড়িয়ে এসেছে, চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো একখণ্ড ছোট মেঘ। কিন্তু তাতে যে কোন বিপদের ইঙ্গিত আছে তা তার মনেই হল না। নীল আকাশের এক কোণে জমে থাকা সেই ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড থেকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। এ আর এমন কি? জর্জ বিশেষ গ্রাহ্য করলো না।

সামনে তার আর একটা মাঠ প'ড়লো জ্বালানী কাঠে ভরা। সেই মাঠে নেমে জর্জ আবার জ্বালানী সংগ্রহের কাজে মন দিল। ক্ষুদ্র সেই মেঘখণ্ডের কথা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তারপর প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে কড়কড় আওয়াজ ক'রে হঠাৎ ভীষণ শব্দে একটা বাজ পড়লো আর সেই সঙ্গে তীব্র বিদ্যুতের ঝলকানি যেন আকাশটাকে এফোঁড়—ওফোঁড় করে ছিঁড়ে দিয়ে গেল। জর্জ চেয়ে দেখলো, ঘন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমস্ত আকাশ একেবারে ঢেকে ফেলেছে, কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। সে বুঝলো, এখনই একটা ভীষণ ঝড় উঠবে।

জর্জ মনে মনে ব'ললো, অনেক আগেই আমার বাড়ী যাওয়া উচিত ছিল। সে দ্রুতবেগে গাড়ী চালিয়ে সন্ধ্যার আগে বাড়ী পৌঁছলো। গাড়ী থেকে নামিয়ে জ্বালানী কাঠগুলো ঘরের মধ্যে জমা ক'রলো জর্জ এবং মোটা মোটা কাটের গুঁড়িগুলি নিয়ে গোলাবাড়ীর মাচানে রেখে দিল। ইতিমধ্যে আকাশের মেঘ আরো ঘন থমথমে হয়েছে।

আরম্ভ ক'রেছে। নরম পাখীর পালকের মতো রাশি রাশি পাতলা তুষার তীরের তীক্ষ্ণ ফলার মতো ছুটে এসে গায়ে বিঁধছে। জর্জ কয়েক মুহূর্ত স্থির নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ধেয়ে আসা তুষার-ঝড়ের সেই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তি অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। ভয়ঙ্কর, তথাপি সুন্দর। মন কেড়ে নেয়। বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে হুঙ্কার দিয়ে ফিরছে, আর তার সঙ্গে এসে জুটেছে তার খেলার দোসর তুষার-ঝঞ্ঝা। এই দু'য়ের নির্মম কশাঘাতে পৃথিবী যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে, এমনই মনে হ'তে লাগলো জর্জ কার্ভারের।

গোলাবাড়ী থেকে ছুট দিয়ে জর্জ বাড়ীর দিকে ইতিমধ্যে প্রায় অর্ধেক পথ চ'লে এসেছে, সেখান থেকে বাড়ীর দূরত্ব তখন পঞ্চাশ গজও বাকী নেই। কিন্তু শেষ বোঝাটা তুলে নেবে কিনা ভাবতে ভাবতে যেই সেটার দিকে তাকালো অমনি তার চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার নেমে সবকিছু যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, সে না দেখতে পেলো সেই বোঝা, না তার নিজের ঘর, না সেই পিছে ফেলে আসা গোলাবাড়ী। পায়ে চলার পথের নিশানাও বিলুপ্ত হ'ল তার চোখের সামনে থেকে। শাদা ফেনায়িত তুষারের মহাসমুদ্রে জর্জ কার্ভার তলিয়ে গেল। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজে সে পথ চ'লতে লাগলো। ঠিক পথে যাচ্ছে কিনা সে জানে না। যে পথ সামনে পাচ্ছে সেই পথ ধ'রেই সে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছে তার সেইটেই বাড়ী যাবার ঠিক পথ। হাত দিয়ে চোখের সামনেটা আড়াল ক'রে সে পথের নিশানা নজরে আনবার চেষ্টা করলো। সৌভাগ্যক্রমে জর্জ কার্ভারের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যথেষ্ট প্রবল ছিল, সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হচ্ছে তার অনুভব-শক্তি। চোখে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও তার তীক্ষ্ণ অনুভব-শক্তির বলে বাতাসের গতি ও শব্দ লক্ষ্য করে এবং প্রবহমান তুষার ঝঞ্ঝায় তীব্রতা অনুভব করে সে মোটামুটি বুঝতে পারে কোথায় কোন্ স্থানে সে দাঁড়িয়ে র'য়েছে।

কিন্তু তা সত্বেও জর্জ কার্ভার বাড়ী যাবার কয়েক গজ মাত্র পথ অতিক্রম ক'রতে এক ঘণ্টারও বেশী সময় নিল। অর্ধমৃত অবস্থায় সে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে কোন রকমে যখন তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো তখন আর তার দাঁড়াবার শক্তি নেই। তার মনে হচ্ছিল, তার জীবনীশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে একেবারে ফুরিয়ে গেছে।

কয়েক সপ্তাহ পরে মিঃ ষ্টিলি লার্নেড থেকে ফিরে এলেন। জর্জ তাঁর কাছে সেদিনকার সেই ভয়ঙ্কর তুষার-ঝঞ্ঝার বর্ণনা দিয়ে বললো, "আপনি সত্য কথাই ব'লেছিলেন, তুষার-ঝড় যে কত ভীষণ হ'তে পারে তা আমার কল্পনায় ছিল না, এবার তা নিজের চোখে দেখলাম। আমার জীবনে তুষারঝঞ্ঝার ভীষণতা সম্বন্ধে এই প্রথম সত্যিকারের অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল।'

জর্জ কার্ভার বসন্তকালে তার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাস্তুভূমিতে ফিরে এলো। দুরন্ত শীতকাল কেটে যাবার পর তার মনে হ'ল, সে যেন সাঙ্ঘাতিক একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেছে। মরুভূমির বুকে ফোটা রক্তগোলাপের মতো লাল পুষ্পমুকুল দেখবার জন্য জেগে উঠেছে।

জীবনে দুঃখকষ্ট যতই অসহনীয় হোক একদিন নিশ্চয় তার শেষ আছে। জর্জ কার্ভার আবারও একবার ভাগ্যের পায়ে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করে আত্মাবমাননা থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রলো। এখন নিজের বাস্তুভূমিতে নানা কাজে সারাক্ষণ সে ব্যস্ত থাকে। কাজের মধ্যে ব্যাপৃত থেকে সেই কাজের মধ্যেই জর্জ কার্ভার তার সমস্ত দুঃখকষ্ট, সব হতাশা ও গ্লানি থেকে মুক্তি লাভের চমৎকার একটা পন্থা আবিষ্কার করলো। সে নিজের জমি লাঙ্গল দিয়ে নিজেই চাষ করে, ফসল বোনে। বাড়ীর দক্ষিণ প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র গবেষণাগার নির্মাণ করে জর্জ সেখানে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সমতলভূমিতে ফোটা নানাজাতীয় বসন্তকালের ফুল ও গাছ সংগ্রহ করে আনে। এনে সেসব নিজের উদ্যানে

রোপণ করে। প্রায় সারাক্ষণই এমনি সব কাজ নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে। তারপর সন্ধ্যা হলে পরে বাইরের কাজ যখন আর থাকে না, সেই অবসর সময়ে গভীর রাত পর্য্যন্ত জেগে থেকে প্রদীপ জালিয়ে নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়ে অথবা ছবি আঁকে। ছবি আঁকা তার একটা খেয়াল মাত্র নয়। চিত্রাঙ্কন দস্তুরমতো তার একটা সাধনা। তার আঁকা ছবি যারা দেখেছে তারাই বিস্মিত হ'য়েছে, উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে প্রশংসা করে বলেছে—কোনটা আসল আর কোন্‌টা নকল ফুল তা ধরার উপায় নেই। বাগানের গাছ থেকে সদ্য পেড়ে আনা একটা গোলাপ ফুলের সঙ্গে জর্জ কার্ভারের আঁকা গোলাপ ফুল মিলিয়ে দেখে কেউ কোন তফাৎ দেখতে পায় না।

এত বিভিন্ন কাজের মধ্যে মগ্ন থেকেও জর্জ কার্ভার মনে শান্তি পায় না। তার অস্থিরতা কমে না। তার আবেগ ও ব্যথা তাকে এখনো আগের মতোই অস্থির করে রাখে। অন্তরে অন্তরে সে অনুভব করে সে যেন অকূল সমুদ্রে ভাসমান এক জাহাজের খালাসী। এখনো সে শুধুই এক বাঁও মেলে না দুই বাঁও মেলে না ক'রে জল মেপে চ'লেছে নিজের জীবন-তরণীকে সম্মুখে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, কখন ডুবন্ত পাহাড়ে ধাক্কা লেগে বানচাল হয় এই তার ভয়।

কলেজে ভর্তি হবার আশা জর্জ ত্যাগ করেনি। এখনো তার জন্য সে সমানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার জীবনের চরম লক্ষ্য হ'ল কলেজের শিক্ষা লাভ করে অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং জীবনের অগ্রগতির পথে পিছিয়ে থাকা তার নিগ্রো ভাইবোনের বাঁচাতে সাহায্য করা।

"এমন এক দিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন নিগ্রো সন্তানরাও শিক্ষালাভ করার, মানুষ হবার সুযোগ পাবে, আর সে সুযোগ এনে দেবো আমি। আমি নিজে আমার কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো ভাইদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করবো। আজ তারা শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে ভর্তি হ'য়ে এক-সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, কিন্তু চিরদিনই কি তারা এমনি বঞ্চিত ও অবহেলিত থাকবে? নিজের মনে এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে জর্জ কার্ভার, আবার নিজেই তার উত্তর দেয়, "তাদের সে মানবিক অধিকার তাদের জন্য আমি আদায় করবো। তার জন্য যদি আজীবন সংগ্রাম করতে হয়, তাও ক'রবো। আজ, না হয় কাল, কিংবা দশ বছর পরে হ'লেও নিগ্রোরা তাদের মানবিক অধিকারলাভে সমর্থ হবেই একদিন।"

জর্জ কার্ভার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা জিনিসও স্পষ্ট উপলব্ধি করলো। সে জিনিসটা হ'ল, তার কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো ভাইদের ভাগ্য ফেরাতে হলে তার জন্য সর্বাগ্রে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হ'ল তার নিজেকে একজন সৎ, কর্মঠ এবং দক্ষ কৃষকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। নিজে যোগ্য হলেই তবেই তার পক্ষে নিগ্রোদের কল্যাণের কাজে ব্রতী হওয়া সম্ভব।

জীবনের এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য এখান-কার সবকিছু ত্যাগ ক'রে চ'লে যেতে হবে অন্য কোথাও, কান্সাসের এই বিশাল প্রান্তর ফেলে রেখে চাষের উপযুক্ত উর্বর কোন ভূমিতে, এখানকার এই বেনাঘাসের জঙ্গলে ঢাকা সুবিশাল প্রান্তরে কৃষিকাজের উপযুক্ত এক ফোঁটাও জমি নেই! এখানে গোচারণের মাঠ আছে, কিন্তু এই কঙ্করময় পাথুরে জমিতে কোন উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

জর্জ কার্ভার কৃষিপণ্য উৎপন্ন করার উপযুক্ত সরস জমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। এখানকার জমির ওপর মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ ক'রে সে যখন তার স্বপ্নের রাজ্য খুঁজতে বের হ'ল তখন মরুভূমির কতগুলি ফুলের নমুনাই শুধু সে তার সঙ্গে নিল। তার এবারকার লক্ষ্যস্থল হ'ল আইওয়ার উইন্টারসেট শহর।

কিন্তু যে জমিকে অন্তরের সমস্ত আগ্রহ এবং যত্ন দিয়ে আর রক্ত জল করা পরিশ্রম দিয়ে দুই বছরের অক্লান্ত সাধনার ফলে চাষের উপযুক্ত ক'রে তৈরি ক'রেছে তাকে কি এতই সহজে ছেড়ে যাওয়া যায়? দুবছর ধ'রে জর্জ কার্ভার এখানকার প্রতিকূল আবহাও-য়ার সঙ্গে লড়াই ক'রেছে, তুষারঝঞ্ঝা তার মাথার ওপর

দিয়ে কতো বার ব'য়ে গিয়েছে, ঝলসানো রোদে তার মুখের আর পিঠের চামড়া পুড়েছে, সে গ্রাহ্য করেনি। পাথরের মতো কঠিন মাটি আর জলশূন্য আতপ্ত পাণ্ডুর মরুভূমির সঙ্গে সে উদয়াস্ত নিরলস সংগ্রাম ক'রেছে এবং সে সংগ্রামে সে জয়ী হ'য়েছে।

জর্জ কার্ভার তার ঘরের সঙ্গে লাগানো যে জমিটুকু ছিল সেই জমিতে সুন্দর বাগান তৈরী ক'রেছিল। ঘাসের চাপড়া আর বুনো ফুলের চারাগাছ এনে তাতে সেখানে লাগিয়েছিল। শৈত্যপ্রবাহ থেকে সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য শীতকালে যে একটা সংগ্রহশালা তৈরি করে তার মধ্যে সে সেগুলিকে সযত্নে ও সাবধানে রেখে দেবার ব্যবস্থা ক'রেছিল। পাশাপাশি সব গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসতো জর্জ কার্ভারের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রহশালা দেখতে, অনেকে একসঙ্গে ভিড় ক'রে ঢুকে যেতো সংগ্রহশালা-গৃহে, শীতে আড়ষ্ট আধ-বোজা চোখ খুলে অতি কষ্টে কোনরকমে তাকিয়ে দেখতো। কিন্তু ফুল দিয়ে সাজানো জামালাগুলি আর প্রকাণ্ড টেবিলটা দেখে তাদের আর বিস্ময়ের পালা শুধু এখানেই শেষ হ'ত না, তারা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে যতই পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে জর্জের সংগ্রহশালার সবগুলি দেখতে থাকতো ততই তাদের বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতো। জর্জ কার্ভার ভ্রমণে বের হ'য়ে যেখানে যত আশ্চর্য্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্য পেয়েছে, যেসব জিনিস তার কাছে মহার্ঘ এবং সংরক্ষিত ক'রে রাখার উপযুক্ত বিবেচিত হ'য়েছে সে সবই সে সযত্নে সংগ্রহ ক'রে এনে তার সংগ্রহশালায় স্থান দিয়েছে। বিভিন্ন বর্ণের সুদৃশ্য প্রস্তরখণ্ড ও আদিমজাতির প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শনও জর্জ কার্ভার তার সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ করে এনেছে। উদয়াস্ত সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পর সন্ধ্যার পরেই তার অন্য কাজ করার অবসর মিলতো, তখন সে এইসব জিনিস নিয়ে ব'সতো এবং একান্ত মনোযোগী ছাত্রের মতো গভীর অভিনিবেশ সহকারে বাছাই করতো এসব জিনিষ, পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে দেখতো। কখনো কখনো সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের কাজ নিয়েও সে তন্ময় হ'য়ে থাকতো।

এমনিভাবে এখানে জর্জ কার্ভারের জীবনের উপর দিয়ে শীত গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষা অনেকগুলি ঋতু পার হ'ল। যত দিন যায় জর্জের মনের অস্থিরতা তত বাড়ে, ক্রমশঃ সে অধৈর্য হ'য়ে পড়ে। এই মানসিক অস্থিরতা নিয়ে নিয়েই সে কয়েকটা বছর এখানে কাটিয়ে দিল। নিত্য নিত্য নব নব অভিজ্ঞতার প্রস্তরঘর্ষণে তার জীবনবোধ শক্ত সবল এবং সুদৃঢ় হ'ল, তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনা শান-দেওয়া তরোয়ালের মতো ধারালো, ঝকঝকে এবং উজ্জ্বল হ'ল। নতুন ক'রে আবার সে মন দিয়ে পড়াশুনা ও ছবি আঁকা আরম্ভ ক'রলো। সে মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো এই বিশাল বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আর বৃক্ষলতাপাতাহীন দিগন্তজোড়া শুষ্ক রুক্ষ তৃষাদীর্ণ প্রান্তর একান্তভাবে তার নিজস্ব গোপন আশ্রয়স্থল। কিন্তু এই গণ্ডীর ভিতরে এভাবে আর সে আত্মগোপন করে থাকতে চায় না। এই নির্জন নিরালা প্রান্তরের পরি-বেষ্টনীর মধ্যে সে আর অবরুদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারছে না। বিশাল বিশ্বের চারিদিক থেকে সে ডাক শুনতে পাচ্ছে, বহির্বিশ্বের অব্যক্ত আহ্বানবাণী তার কানে এসে পৌছোচ্ছে—উন্মুক্ত অবাধ অসীম জগতে বেরিয়ে প'ড়বার প্রাণ আকুল করা আহ্বান।

১৮৮৮ সালের গ্রীষ্মকাল শুরু হবার মুখেই জর্জ কার্ভার যেদিন নিজের হাতে সাজানো বাগান, অতি-প্রিয় সংগ্রহশালা ও গবেষণাগার, বাড়ীঘর, মায় জমিজমা পর্য্যন্ত চিরদিনের মতো ত্যাগ ক'রে অনির্দিষ্ট পথে এক নতুন দিগন্তের সন্ধানে যাত্রা ক'রলো; যাবার আগে বার বার সেদিন জর্জ ঘুরে ঘুরে চোখ ফিরিয়ে সবকিছু দেখলো। কোন কিছুই সে তার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। যেখানে জিনিসটি যেমন আছে তেমনিই থাকবে। থাকবে না শুধু সেই মানুষটি যার সাগ্রহ প্রচেষ্টায় ও যত্নে এবং পরিশ্রমে এই নন্দন-কানন সৃষ্টি হয়েছিল।

জর্জ কার্ভারের দুই চোখ কখন যে জলে ভ'রে এসেছে তা সে জানতেও পারেনি।

আর পিছন ফিরে তাকানো নয়।

জর্জ কার্ভার মন দৃঢ় ক'রে সামনের দিকে পা বাড়ালো। পূর্বদিক অভিমুখে তার পথ চলা শুরু হ'ল।

পথ চ'লতে চ'লতে দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। যখন জর্জ কার্ভার গিয়ে উইন্টার শহরে পৌঁছলো তখন রাস্তার আলো জ্ব'লেছে।

জর্জ কার্ভারের জীবনের আকাঙ্খা বিরাট, বিপুল, প্রায় আকাশছোঁয়া। সে বড় হবার স্বপ্ন দেখে জীবনে। কিন্তু ভগবান তাকে অপাংক্তেয় এবং নিঃস্ব করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ দেশের যে সমাজে সে জন্মেছে সেই গোটা নিগ্রো-সমাজই অপাংক্তেয়, ক্রীতদাসত্বের লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধা প'ড়ে অসহায়ের মতো কাঁদছে। এই দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করে নিলেও তাকেই সে তার জীবনের একমাত্র ভাগ্যলিপি ব'লে মেনে নিতে রাজি নয়। দুরন্ত পাহাড়ী-ঝর্ণা দুর্বার গতিবেগে যেভাবে শিলাস্তর ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে, তারপর কলগান কণ্ঠে নিয়ে সমুদ্র-অভিযানে যাত্রা করে জর্জ কার্ভারও অবিকল দুরন্ত পাহাড়ী নদীর মতো আপন গতিবেগে নিজের পথ তৈরী করে নিয়েছে, বাধা তার কাছে যত দুর্লঙ্ঘ মনে হ'য়েছে ততই তার মনের মধ্যে কোথা থেকে দুর্জয় সঙ্কল্প এসে সেই বাধাকে অতিক্রম করার শক্তি জুগিয়েছে তা সে নিজেও ভালো করে জানে না। এমনিভাবে বাধার পর বাধা অতিক্রম করে সে কেবলই সামনের দিকে এগিয়েছে সে শুধু জানে চলা মানেই বেঁচে থাকা। থেমে থাকা মানে মৃত্যু। মৃত্যুকে সে এড়িয়ে যায়নি, মৃত্যুকে বারে বারে সে জয় ক'রেছে। তার বুকের মধ্যে যে অভী মন্ত্র আছে সে কেবলই তাকে বলে, ভয় পেয়ো না! মা ভৈঃ।

মানুষ যা পেতে চায়, যা আকাঙ্খা করে তা সে কদাচিৎ পায়। আকাঙ্খিত বস্তু অনেকেরই ভাগ্যে মেলে না। জর্জ কার্ভারও সেই দলের, তার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা, বড় রকমের কিছু ধরে না তার মধ্যে। আকাঙ্খিত বস্তু কোনদিনই তার কপালে জোটে না, কোন জিনিষের ওপরই তার বিশেষ কোন লোভ নেই। যা পায় তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকে। ভাগ্য তার যে জিনিষ যখন তাকে জুটিয়ে দেয় সেই জিনিষকে ভালো লাগার রঙ মাখিয়ে খুসি মনে জর্জ কার্ভার গ্রহণ করে এবং এইটেই তার স্বভাবে পরিণত হ'য়েছে যে জিনিষ সে পায় সেই জিনিষকেই পছন্দ করায় একটা আশ্চর্য্য মানসিকতা তার মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে। তা'ছাড়া, তার ভাগ্যের পরিবর্তন একদিন নিশ্চয়ই হবে এ বিষয়ে তার স্থির বিশ্বাস আছে, কিন্তু ভাগ্যের সেই পরিবর্তন যে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা সে জানে না। এই বিশ্বাস তার আছে ব'লেই জর্জ কর্ভার দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে না, বিপদে দিশেহারা হয় না। সুদিনের জন্য ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকার সাহস তার আছে।

উইন্টারসেট শহরে পৌঁছে জর্জ কার্ভার প্রথমটায় খুবই অসুবিধায় প'ড়লো। নানান জায়গায় ঘোরা-ঘুরি ক'রে ব্যর্থ হ'য়ে অবশেষে স্কালজ্ হোটেলের রন্ধনশালায় পাচকের চাকরি পেলো। চাকরি হ'ল কিন্তু ঘুমোবার জন্যও তো একটা জায়গা চাই। জর্জ কার্ভারের রাত্রে ঘুমোবার জায়গা হ'ল যে ঘরটাতে রান্না করার জ্বালানী কাঠ রাখার ব্যবস্থা সেই ঘরের এক কোনায়, সেখানেই কোন রকমে খাটিয়া পেতে তার উপরে পুরু ক'রে খড় বিছিয়ে শোবার চমৎকার বন্দোবস্ত ক'রলো জর্জ কার্ভার। খাবার ভাবনা তার আর রইলো না। হোটেল থেকেই সে বিনা পয়সায় দুবেলা খেতে পায়। কাজেই নিজের জন্য জর্জ কার্ভারের পয়সা কড়ি ব্যয় করার ঝামেলা নেই। বেতনের টাকা সবই তার জমে।

অল্পদিনের মধ্যেই জর্জ কার্ভার দেখতে দেখতে মাথায় এতটা লম্বা হ'ল যে লোকের দৃষ্টি সহজেই তার দিকে আকৃষ্ট হ'তে লাগলো। কৃশকায় দীর্ঘদেহী জর্জ কার্ভারকে অনায়াসে বাতাসে নুয়ে পড়া দীর্ঘ বেতসলতার সঙ্গে তুলনা করা চলে। [illegible]

কঠোর পরিশ্রম ক'রে তার যে শরীর গঠিত হ'য়েছে এখন প্রায় সারাদিন জ্বলন্ত উনুনের পাশে থাকার ফলে তার চেহারা মাংসল হ'য়েছে। চেহারার এই ত্রুটি সংশোধন ক'রে নেবার উদ্দেশ্যে জর্জ প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে অনেকটা পথ বেড়িয়ে আসতে শুরু ক'রলো।

বাঁকানো কাঁধ এবং বেখাপ্পা চেহারা হওয়া সত্বেও জর্জ কার্ভারের সৌম্য শান্ত সুন্দর শ্রী ফুটে উঠতে আরম্ভ ক'রলো, আভিজাত্য গরিমা ও সম্ভ্রমের ছাপ তার চেহারায় স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিল। বিশেষভাবে জর্জ কার্ভারের গোঁফ জোড়া হ'য়েছে সত্যই দেখার মতো। সজারুর কাঁটার মতো খাড়া আর সোজা। দস্তুর মতো এক জোড়া জমকালো গোঁফ। উইন্টারসেট শহরের অভিজাত শ্রেণীর বহুলোক এখন জর্জ কার্ভারের সঙ্গে সমীহ ক'রে কথা বলে।

হোটেলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও জর্জ কার্ভার তার সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারে নিয়মিতভাবে গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। সেই ব্যাপ্টিষ্ট গির্জায় প্রার্থনা মন্ত্র ও সঙ্গীত-পরিচালনার ভার একটি মহিলার উপর। নাম তাঁর মিসেস জন মিলহোল্যাণ্ড। জর্জ, কার্ভার যখন উদাত্তকণ্ঠে ও স্পষ্টাক্ষরে উচ্চগ্রামে সুর তুলে ধর্মসঙ্গীত গায়, সকলের সমবেত কণ্ঠ ছাপিয়ে তার গলার স্বর স্পষ্ট বোঝা যায়, মিসেস মিলহোল্যাণ্ড স্তব্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। মহিলাটি জর্জ কার্ভারকে এক বিশেষ দৃষ্টি কোণ দিয়ে লক্ষ্য ক'রলেন। তার দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার গান শোনেন। তাকে তাঁর খুব ভালো লাগে। কয়েকদিন ধ'রে এমনিভাবে তিনি জর্জকে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেন, কিন্তু জর্জ তার বিন্দুবিসর্গ টের পেল না। জর্জ কার্ভার জাতিতে নিগ্রো ব'লে তার প্রতি মহিলাটির ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই, বরং জর্জকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করলেন। বর্ণবিদ্বেষের শুচিবাই থেকে মিসেস মিলহোল্যাণ্ড সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি বাড়ী ফিরে গিয়েও জর্জকে ভোলেননি, স্বামীর কাছে তিনি জর্জের কথা ব'ললেন এবং এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে বহু আলোচনাও হ'ল।

সেদিন ছিল এক সোমবার। রোজকার মতো সেদিনও জর্জ কার্ভার সন্ধ্যার আগেই হেঁসেলে ঢুকেছে। সন্ধ্যা শুরু হ'তে না হ'তেই হোটেলে খদ্দেরদের ভীষণ ভিড় জ'মতে আরম্ভ করে, ঠিক সময়ে খানা হাতের কাছে না পেলে তারা হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয়। রান্নাঘরে রান্নার কাজে জর্জ খুবই ব্যস্ত তখন হোটেলের চাকর এসে তার হাতে একখানা কার্ড দিল, ব'ললো, বাইরে এক ভদ্রলোক তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

জর্জ কার্ভার বাইরের ঘরে এসে দেখলো একজন শেতাঙ্গ ভদ্রলোক তার জন্য অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন। জর্জকে দেখে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দন করার অভিপ্রায়ে, ব'ললেন, আমার নাম মিস্টার মিলহোল্যাণ্ড। আপনার কাছে লেখা মিসেস মিলহোল্যাণ্ডের একখানা চিঠি আছে। ব'লে ভদ্রলোক জর্জ কার্ভারের হাতে চিঠিখানা দিলেন। সৌম্য শান্ত সুন্দর চেহারা ভদ্রলোকের, ঘন বাদামী রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গায়ে কালো কোট। সহাস্য মুখে জর্জ কার্ভারকে ব'ললেন, আমার স্ত্রী মিসেস মিলহোল্যাণ্ডকে আপনি অবশ্যই গির্জায় দেখে থাকবেন, তিনি গির্জার প্রার্থনা মন্ত্র ও সঙ্গীত পরিচালিকা। সমবেত সঙ্গীত অনুষ্ঠানে আপনার উদাত্ত কণ্ঠের গান তাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ক'রেছে। বোধ হ'চ্ছে আপনি উইন্টারসেট শহরে নবাগত, তাই অল্প কিছুদিন থেকে আপনাকে তিনি গির্জায় উপস্থিত হ'তে দেখেছেন। তিনিই আমাকে আজ এই চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। আমি আপনাকে আজ আমাদের সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

উত্তরে জর্জ কার্ভার বেশী কিছু ব'লতে পারলো না, কোন রকমে শুধু চিঠিখানা হাতে নিল। চিঠি পড়া শেষ ক'রে ব'ললো, "বিশেষ ধন্যবাদ, দয়া ক'রে আপনার মিসেসকে ব'লবেন, আনন্দের সঙ্গে আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রেছি।"

ক্রমশঃ—

অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ

মানসী মুখোপাধ্যায়

সূচনা

[ঢাকা শহর। হিন্দু ও মুসলিম রাজত্বের রাজধানী ঢাকা, বহু হিন্দু ও মুসলমান সাধক, পীর, মহাপুরুষদের মহান স্মৃতিবিজড়িত ঢাকা, ইংরাজ রাজত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে তরুণ-বীরত্বের গৌরবমণ্ডিত ঢাকা। আবার মরমী গীতিকার ও সুললিত সুরকার অতুলপ্রসাদ সেনের পুণ্য জন্মভূমিও ঢাকা।]

অতুলপ্রসাদ যে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে শতাব্দীকে চেতনার নবজাগরণের যুগ বলা যায়। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শ শিক্ষিত তরুণদের দৃষ্টিকে আধুনিকতা দান করেছিল এবং জীবনের ধাপে ধাপে আলোড়নের ঝড় তুলেছিল বিশেষ করে ধর্মে সাহিত্যে ও রাজনীতিক্ষেত্রে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮৫ অব্দ, এই সময়ে আলোড়ন অত্যন্ত তীব্র রূপ ধারণ করে এবং বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিবর্তনবাদের পথ অনুসরণ করে নতুন নতুন ভাবাদর্শের উন্মেষের দ্বারা শতাব্দীটিকে স্মরণীয় করে তোলে।

একদিকে করুণা ও মৈত্রীর মূর্তিমান অবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা ও ভক্তিবাদে ধনী-দরিদ্র সকলকে সহজ সরল ভাষায় অনুপ্রাণিত করছেন। অন্যদিকে যৌবন ও নবীনতার প্রতীক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শে ও ওজস্বিনী ভাষণে বাংলার শিক্ষিত যুবকদের উতপ্ত করে তুলেছেন। প্রাচীন ব্রাহ্ম নেতাদের সামনে নিত্য নতুন দাবি রাখছেন—ব্রাহ্মণত্বের চিহ্ন সরিয়ে দিয়ে সবাইকে এক শ্রেণীভুক্ত হতে হবে; অন্যায়কে সব শক্তি

অতুলপ্রসাদ

স্ত্রীজাতিকে এগিয়ে নিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি স্থান দিতে হবে। নিজের কিশোরী পত্নীকে পরিবারের বাইরে, সভায় নিয়ে গিয়ে তিনি নিজের বক্তব্যের সততা দেখালেন। বাংলা তথা সারা ভারতকে বক্তৃতায় মুগ্ধ করে বাগ্মী কেশব গেলেন ইংলণ্ডকে

সাহিত্যে চিরাচরিত গণ্ডী অতিক্রম করে বিদ্রোহী মধুসূদন শ্রীরামচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রাবনিকে নিয়ে রচনা করলেন নতুন ছন্দে নতুন কাব্যে "মেঘনাদ বধ"! রামচন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগের চেয়ে লঙ্কা রাজ্যভূমি—নিজের দেশের জন্য ইন্দ্রজিতের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় আদর্শ।

বিদ্রোহ ও দেশাত্মবোধক সুর যা প্রথম কবি রঙ্গলালের কাব্যে অনুরণিত হয়েছিল এবং পরে নবীনচন্দ্র এবং হেমচন্দ্র অনুসরণ করেছিলেন মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ" কাব্যে তা-ই নতুন নিটোলরূপে দেখা গেল। নবীন লেখকরা নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন, তরুণ পাঠকরা বিস্মিত ও উদ্বেলিত।

এরপর সাহিত্যের দিগন্ত উদ্ভাসিত করে উপস্থিত হলেন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। রঙ্গলালের দ্বারা যার সূত্রপাত হয়েছিল, মধুসূদনের লেখনীতে যা নিটোল রূপ পেয়েছিল তাকে পরিপূর্ণতার সার্থক রূপ দিলেন সাহিত্য-সম্রাট।

আর রূপক নয়, পুরাণ নয়, কাহিনীর বিষয়বস্তু হল বাস্তব ঘটনা, চরিত্রের স্থান নিল সাধারণ মানুষ। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের পর সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত হল তাঁর "আনন্দমঠ" পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের 'বেদ'। আনন্দ মঠ-এ দেশের মাটি হলেন মা—আরাধ্যদেবী, আর তাঁরই বন্দনা গান হল 'বন্দেমাতরম্'।

তরুণ প্রাণ দেশাত্মবোধক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল। এবার প্রয়োজন ভগীরথের যিনি বা যাঁরা সেই চেতনা-গঙ্গাকে বহন করে সারা দেশকে সিক্ত, প্লাবিত, প্রাণবন্ত করে তুলবেন।

দেখা দিলেন দেশগুরু, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মানন্দের ধর্মপ্রচার বা পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার সংগ্রাম প্রধানতঃ বাংলা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ শুধু বাংলা নয় সারা ভারতকে নতুন চেতনার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন, বিরামহীন পরিভ্রমন। তারফলে একদিন প্রতিষ্ঠা হল জাতীয় কংগ্রেস, কালে যা রাষ্ট্রীয়বোধ ও জাতীয় সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হল।

এ যুগের শিশুরা সাধারণত তাই ধর্ম, জাত সম্বন্ধে উদার, সাহিত্যে নতুন পথের দিশারী, পরিবর্তনের পূজক ও দেশাত্মবোধ, দেশানুগত্যের প্রতি তাঁদের অপলক দৃষ্টি এবং তদ্গত চিত্ত।

অতুল প্রসাদ তাঁর যুগের যথার্থ প্রতিচ্ছবি।

॥ এক ॥

শরৎ কাল। শরতের ঝকঝকে আকাশে মেঘের আল্পনা, প্রকৃতির গায়ে উজ্জল সবুজ রঙের পোষাক, নদী, খাল, বিল, পুকুর জলে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দে যেন টল টল করছে।

ঢাকায় ভাটপাড়া নিবাসী ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্তের লক্ষ্মীবাজারের বাড়ী সেদিন উত্তেজনা ও আনন্দে চঞ্চল, উচ্ছল। তবে সে টল টলে আনন্দের মাঝেও বাড়ীর মানুষগুলির মুখে-চোখে থেকে থেকে দেখা দিচ্ছে উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া।

কালী নারায়ণ এবং তাঁর পত্নী অন্নদা দেবী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত; আবার উৎকর্ণও—কখন শোনা যাবে একটি শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি। তারই অপেক্ষায় প্রতি পল প্রতি মুহূর্তের হিসেব করে চলেছেন, কিন্তু আর কত দেরি—

ক্রমে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হল, ভাবনা তলিয়ে গেল আনন্দের তরঙ্গাঘাতে। ভূমিষ্ঠ হল ফুলের মত অনুপম একটি শিশু। সে দিনটি ছিল ২০শে অক্টোবর, ১৮৭১ অব্দ। বাংলা মতে কার্ত্তিক মাস ১২৭৮ সন।১

মাতামহ কালী নারায়ণের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত, বিগলিত। সহর্ষে তিনি নবজাতককে ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদরূপে বুকে তুলে নিলেন। "এইটি তাঁর সর্ব্ব প্রথম দৌহিত্র। ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ পাইয়া তার নাম দিয়াছিলেন 'অতুলপ্রসাদ'"।২

অতুলপ্রসাদ ডাক্তার রাম প্রসাদ সেনের এবং হেমন্তশশী দেবীর প্রথম সন্তান।

রামপ্রসাদ ৺রাজবল্লভ সেনের পৌত্র ও ৺কৃষ্ণচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন।৩ পাঁওৎসায় উমাতারার নিকট থেকে বাংলা, পারসী ইত্যাদি শিক্ষালাভ শেষ করে রামপ্রসাদ প্রথম জীবনে জপ্‌সা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন।

উচ্চাকাঙ্খী রামপ্রসাদের চঞ্চল মনকে ছোট্ট জপ্‌সা গ্রামে বেশিদিন কঠিন হাতে ধরে রাখতে পারে নি। দু চোখে আশার উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে রামপ্রসাদ একদিন গ্রাম ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বহু কষ্ট স্বীকার করে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় নিঃশঙ্ক রামপ্রসাদ শেষে কোলকাতায় পৌঁছুলেন।

তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মের দিক্‌পালরা সব জীবিত ছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে রামপ্রসাদ মহর্ষির সহিত সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলেন। সহায়হীন পূর্ববঙ্গবাসী যুবকের দুঃসাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও উদ্যম দেখে মহর্ষি মুগ্ধ হন। তাঁর দয়া ও সাহায্যে রামপ্রসাদ মেডিকেল কলেজে বাংলা ক্লাশে ভর্তি হবার অনুমতি লাভ করেন। তখন বাংলায় ডাক্তারি পড়ান হত।

ডাক্তারি পাশ করার পর রামপ্রসাদ প্রথমে সরকারি চাকরি গ্রহণ করে ঢাকায় পাগলা গারদের চার্জে কিছু কাল ছিলেন।

ব্রাহ্ম নেতাদের সাহচর্যে এসে বিশেষ করে মহর্ষির সংস্পর্শে এসে রামপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন; তাঁদের বিশ্বাস ত্যাগ-স্বীকার, ঈশ্বর নির্ভরতা দেখে বিমোহিত ও মুগ্ধ হন। শেষে মহর্ষির প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

চাকরিতে নিযুক্ত থাকাকালে রামপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।৪

"বলাবাহুল্য ব্রাহ্মধর্মে ধর্মান্তরিত অন্যান্য ব্রাহ্ম সন্তানদের মত তিনিও গৃহ ও সমাজচ্যুত হয়ে একাকী জীবন যাপন করেন।"৫

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে রামপ্রসাদ ঋষি কালীনারায়ণ এবং অন্নদা দেবীর কন্যা হেমন্তশশী দেবীকে বিবাহ করেন।৬

হেমন্তশশী দেবী সুন্দরী, গুণবতী এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা ছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি তিনি যেমন গভীর বিশ্বাসে নির্ভরশীলা ছিলেন তেমনি সাহসিনীও ছিলেন। তিনি স্নেহময়ী, সেবাপরায়ণা এবং স্বভাবে সহিষ্ণু ছিলেন। "কবিতা ও গান রচনায় তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতা ছিল। অবসর সময়ে ছোট ছোট কবিতায় তাঁর খাতা ভরে উঠত।"৭

স্বাধীনচেতা রামপ্রসাদ পরের গোলামি করে সুখী হতে পারেন নি। বিবাহের পর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেন। এরপর তিনি ঢাকাতেই হাসনা বাজারে মিরাতারের ভাড়া বাড়িতে 'মিট্‌ফোর্ড' হাঁসপাতালের বিপরীত দিকে 'নিউ মেডিকেল হল' নামে ডিস্‌পেন্সারি স্থাপনা করেন। ঐ ডিস্‌পেন্সারি তখন ঢাকায় সব চেয়ে বড় ওষুধের দোকান ছিল এবং রামপ্রসাদ ওখানে ডাক্তার হিসাবে প্রভূত যশ ও অর্থ অর্জন করেন।

রামপ্রসাদ স্বভাবে অত্যন্ত উদার ছিলেন। তিনি বিধবাবিবাহ তো সমর্থন করতেনই এমন কি সেই যুগে স্ত্রী হেমন্তশশীকে একদিন বলেছিলেন, "আমার অবর্ত-মানে তুমি পুনরায় বিবাহ করো।"৮

তিনি সুবক্তা ছিলেন, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সভায় যোগ দিয়ে বক্তৃতা করতেন। তাঁর গান রচনায় দুর্লভ গুণ ছিল। হোলি ইত্যাদি পর্বোপলক্ষে নিজে গান রচনা করে সকলের সঙ্গে গাইতেন। তাঁর বাড়িতে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল। ফুল, ফল খুব ভালবাসতেন বাড়িতে ফুল ও ফলের বাগান ছিল যা তিনি নিজে অবসর সময়ে তদারক করতেন।

চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন হলে রাম-প্রসাদ নিজেদের গ্রামে "একটি স্কুল স্থাপন করে ছিলেন।"৯

রামপ্রসাদ যখন মিরাতারের বাড়িতে আসেন তেখন

অতুলপ্রসাদের জন্ম হয়। ওখানেই তাঁর চঞ্চল বাল্যের আনন্দ ও বিস্ময়ভরা দিনগুলি অতিবাহিত হয়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে মা-বাবার সব সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হতে থাকে।

আর একজনেরও দুর্লভ সদ্‌গুণ তাঁর স্বভাবে একাকার হয়ে তাঁকে এক অসাধারণ, অসামান্য চরিত্র দান করেছিল। কিন্তু সে পরের কথা।

শৈশবকালে অতুলপ্রসাদের জীবনে দুটি মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু করুণাময়ের অপার করুণাঘন আশীর্বাদে তিনি মৃত্যুর থাবা থেকে আবার জীবনের আলোয় ফিরে আসতে পারেন।

১২৮৩ সন, পূব বাঙলার ভয়াবহ সময়। রামপ্রসাদের জীবনেও একটি মৃত্যু-ভয়-ভরা দিন।

রামপ্রসাদ সেবার শৈশবের লীলাভূমি নিজের গ্রামে স্ত্রী-পুত্রসহ বেড়াতে গিয়েছিলেন। প্রতি বছরই যেতেন। তখন ফেরার পালা। বজরায় করে প্রকৃতির থমথমে রূপ দেখতে দেখতে চলেছেন।

হঠাৎ যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে প্রচণ্ড বেগে শুরু হয়ে গেল ঝড়-তুফান। তাই দেখে ভয়ঙ্করী নদী—পদ্মা অট্টহাস্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। ঝড়-তুফানের দাপটে ও পদ্মার তরঙ্গাঘাতে বজরা চরের কাছাকাছি এসে খেলাঘরের নৌকোর মত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে সস্ত্রীক রামপ্রসাদ চরের উপর আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সর্বগ্রাসী বন্যার জল তখন হু হু করে স্ফীত হয়ে উঠছে। রামপ্রসাদ শিশু অতুলপ্রসাদকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন; পাশে সন্তানবতী স্ত্রী। জল তখন ভীমগর্জনে ওঁদের গলা অব্দি পৌঁছে গেছে।

শেষে মৃত্যুরূপী বন্যা সংযত হয়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। ভগবানের অশেষ করুণায় মৃত্যুর দ্বার থেকে ওঁরা সবাই প্রাণ নিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঢাকাতেই ঘটেছিল। হেমন্তশশী পুত্র অতুলকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে লক্ষ্মীবাজারে যাচ্ছিলেন। বিদ্যুৎগতিতে ঘোড়া দুটি খালের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে; খুরে খুরে তাদের যেন চকমকির আলো। সভয়ে হেমন্তশশী দু হাতের বন্ধনে শিশু অতুলকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

হঠাৎ-ই যা ঘটবার ঘটে গেল। ঘোড়া দুটি তাল সামলাতে না পেরে খালের জলে গাড়ি সমেত পড়ে গেল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় অতুলসহ হেমন্তশশী খালের ধারে নরম মাটির ওপর ছিটকে পড়ায় মৃত্যুর সীমানা থেকে আবার প্রাণের জগতে উঠে এলেন।

কবি, গায়ক ভক্ত রামপ্রসাদ প্রতিদিন খুব প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতেন। তখনই শুরু হত তাঁর উষা-বন্দনা ও সংস্কৃত শ্লোক পাঠ। উষাকে উদ্দেশ করে প্রতিদিন তিনি গাইতেন:—

অয়ি সুখময় উষে কে তোমারে নিরমিল
বালার্ক সিঁদুর কৌটা কে তোমার
ভালে দিল।

গানের কলি শিশু অতুলপ্রসাদকে প্রভাত হবার সংবাদ দিত। তিনি চেতনা জগতে ফিরে আসতেন; সুরের লহরী তাঁর মনে যেন ইন্দ্রজাল রচনা করত।

অতুলপ্রসাদ যখন প্রায় সাত বছরের তখন গুরু-প্রসাদ সেনের পুত্র সত্যপ্রসাদ ঢাকায় পড়াশোনা করবেন বলে মিরাতারের বাড়িতে আসেন। রামপ্রসাদই ব্যবস্থা করে তাঁকে আনিয়েছিলেন। তিনি অতুলপ্রসাদের চেয়ে কয়েক মাসের বড় ছিলেন।

রামপ্রসাদের গান শেষ হতেই দুই বালককে উঠতে হত। তিনি তখন গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন; বালক দুইটিকে মুখস্থ করাতেন।

রামপ্রসাদের কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক অতুলপ্রসাদকে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করত। তিনি সেসব শ্লোকের মানে বুঝতেন না, বুঝবার বয়সও তখন নয়। কিন্তু সেসব সুরেলা শ্লোক তাঁর মনে যেন ঢেউ তুলত, মানে না বুঝলেও তার অনেকগুলি তিনি শুনে শুনে মনে ও কণ্ঠে ধরে রেখে নিতেন।

এই সংস্কৃত শ্লোকের প্রভাব তাঁর মনে কী গভীর রেখাপাত করেছিল এবং মনের গহনে কেমন সুরবোধ

জাগিয়ে তুলেছিল তার কথা অতুলপ্রসাদ তাঁর পরবর্তী জীবনে বন্ধুবান্ধবের কাছে নিজেই উল্লেখ করে গেছেন।

প্রাতঃরাশের পর রামপ্রসাদ তার ডিস্পেন্সারীতে গিয়ে বসতেন। প্রতিদিন কত লোক তাঁর কাছে আসত —রুগী, অভ্যাগত, বন্ধুবান্ধব। ডাক্তার বন্ধুরা এখানে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত মিলিত হতেন—ডাক্তার সূর্যনারায়ণ সিংহ, ডাক্তার দুর্গাদাস রায়, ডাক্তার-প্রিয়নাথ বসু, কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত এবং আরো অনেকে। তাঁরা এসে চা খেতেন, ধর্মালোচনা করতেন গল্পও চলত। এখানে তাঁদের যেন ক্লাব ছিল।

রামপ্রসাদ এবার অতুলপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদকে স্কুলে দেবার কথা চিন্তা করলেন।

ডাক্তার দুর্গাদাস রায় সে সময়ে ঢাকায় 'মডেল স্কুল' নামে একটি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। সাধারণ স্কুলে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা হয় না বলে তাঁর অনুযোগ ছিল। তাঁর স্কুলে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষালাভ হবে এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

রামপ্রসাদ অতুলপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদকে দুর্গাবাবুর স্কুলে ভর্তি করলেন।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দুর্গাদাসবাবুর তিন পুত্র জ্ঞানেশ, পরেশ ও দীনেশ পড়তেন। বঙ্গচন্দ্র রায়ের পুত্র যোগেশ ও আরো কয়েকজন ব্রাহ্ম ছাত্ররা ঐ স্কুলে ছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন আবার মিশুকও ছিলেন তাই সহপাঠিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে তাঁর দেরি হত না।

ঐ স্কুলের শিক্ষকরা সবাই নববিধান সমাজের লোক ছিলেন। প্রায় সকলেই একই বাড়ীতে থাকতেন। প্রাতে উপাসনা শুরু হতে হতে বারোটা বেজে যেত। স্নান আহার সেরে স্কুলে আসতেন বেলা একটায়। এরপর পড়াশোনা বিশেষ হত না, কারণ ছাত্রদের স্কুলে এসেই পড়ার অভ্যাস গড়ে না ওঠায় তাঁরা সারা সময় কেবল গোলমাল করে কাটিয়ে দিতেন।

দুর্গাদাসবাবুর স্কুলে এই ভাবে দু'বছর কেটে গেল। পড়াশুনার অগ্রগতি দেখে রামপ্রসাদ চিন্তিত হলেন। তারপর অতুলপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। অতুলপ্রসাদ নবম শ্রেণীতে ও সত্যপ্রসাদ দশম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলেন।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন সাহেব জনসন পোপ। তিনি অত্যন্ত সদাশয় ও দয়ালু ছিলেন। কৈলাশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন অ্যাসিসটেণ্ট হেডমাস্টার। অন্যান্য শিক্ষক যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন অন্নদাচরণ সেন, গুরুপ্রসাদ ভৌমিক, দীননাথ সেন, সূর্যকুমার অবস্থি, প্রসন্ন বিদ্যারত্ন, সারদাচরণ রায় সারদা পণ্ডিত এবং শশীভূষণ দত্ত—অতুলপ্রসাদের মেসোমশাই।

এই স্কুলে অতুলের কয়েকজন প্রিয় সতীর্থ ছিলেন যেমন—প্রাণকৃষ্ণ বসু, নলিনি নাগ, নগেন্দ্র সোম। শেষোক্ত জন পরবর্তী কালে মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লিখেছিলেন।

পোপ সাহেবের পর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসেন বুথ-সাহেব। ইনি প্রকৃতিতে পোপ সাহেবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। গম্ভীর, রাশভারী মানুষ অঙ্গভঙ্গি করে ক্লাশে পড়াতেন।

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর সতীর্থরা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন। তারপর বুথসাহেবসহ অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়ে একটি পদ্য লিখলেন :—

বুথের প্রধান কাজ অঙ্গভঙ্গি করা।
গোলমালে অবস্থির ঘণ্টা হল সারা।
বিদ্যানিধি ডাক্তার রায় বলিতে অক্ষম।
প্রসন্ন তাহাকে ভাবে সদা অনুপম।
সাহেবী ফ্যাসানে দক্ষ সারদারঞ্জন।
বুক ফুলিয়ে হাঁটেন বাবু সূর্যনারায়ণ।

স্কুলের সহপাঠী ছাড়াও আনন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র সুধীর এবং গোবিন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র সুবোধের সঙ্গেও অতুল প্রসাদের বন্ধুত্ব ছিল। সুবোধ খুব ভাল গান' গাইতে পারতেন। তাঁর বাবার গান—'কত কাল পরে ও

'নির্মল সলিলে' বার বার গাইতেন। আগ্রায় থাকার দরুণ উনি হিন্দী গানও ভাল গাইতেন। ওঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুকণ্ঠ অতুলপ্রসাদ গান করতেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ নিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজে আদর্শগত এবং নীতিগত ভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল যার জন্য ভারতীয় ব্রাহ্ম-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ১০

এ বিভেদের ঢেউ ঢাকাতেও গিয়ে আঘাত করল যার জন্য সেখানেও ব্রাহ্ম সভ্যরা দু ভাগে বিভক্ত হলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করলেন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্ত, রজনীকান্ত ঘোষ, প্রসন্নকুমার মজুমদার, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, পি কে রায় প্রভৃতি।

কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সমাজকে প্রথম সমর্থন জানালেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আরো যাঁরা কেশবচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন তাঁরা হলেন বঙ্গচন্দ্র রায়, কৈলাশচন্দ্র নন্দী, গোপীকৃষ্ণ সেন, বৈকুণ্ঠ ঘোষ, দুর্গানাথ রায়, ডাক্তার দুর্গাদাস রায় প্রভৃতি।

ঢাকায় তখন নববিধান সমাজের নিজস্ব উপাসনাগৃহ ছিল না। রাম প্রসাদের মিরাতারের বাড়ির দরজা সদা উন্মুক্ত, অবারিত। প্রতি রবিবার সেখানেই উপাসনা-সভা বসত এবং গান বাজনা হত। ঋষি কালীনারায়ণ যদিও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য ছিলেন তবু ঐ উপাসনা-সভায় নিয়মিত যোগদান করতেন।

বালক অতুলপ্রসাদ ঐ উপাসনা সভায় উপস্থিত থাকতেন; গান বাজনা শুনতেন এবং নিজেও শোনাতেন। রামপ্রসাদ যখন ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন তখন বালক অতুলপ্রসাদ পিতার খোল নিয়ে তাঁর গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন। তাঁর প্রয়াস দেখে মুগ্ধ রামপ্রসাদ তাঁকে একটি ছোট খোল কিনে দিয়েছিলেন।

কিন্তু একটি বাজনাতেই অতুলপ্রসাদের সুরেলা মন তৃপ্ত ছিলনা। ঐ বয়সেই তিনি হারমোনিয়াম,

কিন্তু বেশি দিন মিরাতারের বাড়ীতে উপাসনা সভার আয়োজন করা যায় নি। বাড়ীওলার তাগাদায় রামপ্রসাদের ইচ্ছা ও আগ্রহে ছেদ পড়েছিল।

মিরাতারের কালীপ্রসন্ন বসুর বাড়ীতে রামপ্রসাদ ভাড়া ছিলেন। ঐ বাড়ীতে তাঁর এগারো বছর বসবাস করা হয়ে গিয়েছিল। বারো বছর বসবাস করলে বাড়ীর ওপর তাঁর স্বত্ব জন্মে যেত তাই তাঁকে বাড়ীওলার অনুরোধে বাড়ী ছেড়ে দিতে হয়।

নীড় ভেঙে গেল, ভেঙে গেল জীবন-ও। হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদ, সত্যপ্রসাদ, হিরণ, কিরণ, প্রভাকে ১১ নিয়ে কালীনারায়ণের নিকট চলে যান। রামপ্রসাদ ডিস্‌পেন্সারির পাশে একটি ঘর নিয়ে দিনের বেলায় থাকতেন রাত্রি বেলায় লক্ষ্মী বাজারে চলে যেতেন।

উপাসনার স্থান নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। স্থির হল যে, সমাজের নিজস্ব একটি উপাসনা-গৃহ তৈরী করা হবে। টাকা চাই। রামপ্রসাদ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। ঘরে ঘরে ও দোকানে দোকানে চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁর সম্মানীয় আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে কত বিদ্রূপ ও কত নিন্দে করেছেন। কিন্তু আদর্শবাদী রামপ্রসাদ তাঁদের ব্যবহারে কখনো বিচলিত হন নি বা নিজের কর্তব্যকর্মে বিরত হন নি।

এরপর রাম প্রসাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি ব্রণ থেকে তাঁর ফোড়া হয়। দুঃসাহসী রামপ্রসাদ "আয়নার সাহায্যে নিজের ফোড়া নিজেই অপারেশান করেছিলেন।১২ তাঁর বহুমূত্র রোগ ছিল। ফোড়া শেষে কার্বাঙ্কলে দাঁড়ায়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্মীবাজারে স্থানান্তরিত করা হয়।

সেদিন ১৬ই কার্তিক, ১২৯১ সন। মৃত্যুর নিকষ কালো ছায়া ধীর অথচ দৃঢ় পায়ে রামপ্রসাদের শয্যা-পার্শ্বে এগিয়ে এলো। তিনি আর ঊষার রাঙা আলো দেখার সুযোগ পেলেন না। পত্নী, প্রিয় পুত্র ও কন্যা-

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর শোকাতুরা হেমন্তশশী পুত্র কন্যাদের নিয়ে লক্ষ্মীবাজারে থেকে যান।

সত্যপ্রসাদ ও কালীনারায়ণের স্নেহের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হন নি।

---

(১) অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর বিলাতযাত্রা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে ৺গুরুপ্রসাদ সেনের পুত্র ৺সত্যপ্রসাদের ডায়েরীতে পাওয়া গেছে। তাঁর ডায়েরীর ওপর ভিত্তি করেই সে পর্যন্ত লেখা হয়েছে। ডায়েরী থেকে যেখানে যেখানে তাঁর কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে সেখানে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া অতুলপ্রসাদের পরবর্তী জীবনের যে সব খণ্ড খণ্ড সংবাদ পাওয়া গেছে ও ব্যবহার করেছি সে সব তাঁরই ডায়েরী থেকে নেওয়া হয়েছে।

২। ৺সুবালা দেবী—"অতুলপ্রসাদ"। সুবালা দেবী ৺কালীনারায়ণ গুপ্তের কনিষ্ঠ কন্যা এবং ৺প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী।

৩। পূর্বপাকিস্থানে ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের 'মগর' গ্রামে ৺রামলোচন সেন ও কৃষ্ণচন্দ্র সেন বসবাস করতেন। পরে ঐ গ্রাম 'পঞ্চপল্লী' ডাকঘরের অন্তর্গত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্রর পেশা ছিল কবিরাজী। ইনি দরিদ্র গৃহস্থ ছিলেন। এঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যা ছিল যথা—দুর্গাপ্রসাদ (এঁর অকালে মৃত্যু হয়), উমাতারা, গুরুপ্রসাদ, ভবসুন্দরী, রামপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদ ভবসুন্দরীর ও রামপ্রসাদ উমাতারার স্বামীগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ শিক্ষা শেষে নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন।

৪। ৺সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "আমার জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বে খুড়ামহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করেন।" সত্যপ্রসাদের জন্ম ২৩শে আষাঢ় ১২৭৮ সন (ডায়েরী)। কেশবচন্দ্র সেনকে রামপ্রসাদ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। মনে হয় কেশবচন্দ্র ১৮৬৯ অব্দে ৭ই ডিসেম্বর যখন তৃতীয়বার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন তখন রামপ্রসাদ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।

৫। শ্রীমতী বেলা সেন—অতুলপ্রসাদ সেনের একমাত্র পুত্রবধূ।

৬। ৺সত্যপ্রসাদ সেন ডায়েরীতে লিখেছেন, "খুড়ামহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করায় দেশে ধোপা-নাপিত বন্ধ হইয়া যায়।"

৭। কুমুদিনী দত্ত—সাক্ষাৎ।

কুমুদিনী দত্ত অতুলপ্রসাদ সেনের ভ্রাতৃজায়া ও ৺শিশিরকুমার দত্তের পত্নী।

৮। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

৯। ৺সত্য প্রসাদ সেন—ডায়েরী।

১০। ৺সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, 'আমাদের ছোট সময়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ নিয়া মতভেদ হওয়ায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভাঙ্গিয়া নববিধান সমাজ আরম্ভ হইল।'

আসলে কেশব কন্যার বিবাহ নিয়ে মতভেদ হওয়ার ফলে "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ' পরিত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র তখন ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের নাম রাখেন 'নববিধান সমাজ' (১৮৭৮)।".

"Brahmananda
Keshub Chandra Sen
Testimonies in Mamorium"
G. C. Banerjec.

১১। শ্রীযুক্তা হিরণবালা, কিরণবালা ও প্রভাবতী—ডাক্তার রামপ্রসাদ ও হেমন্তশশীর তিন কন্যা। অতুলপ্রসাদের কনিষ্ঠা এঁরা।

১২। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

মাসতুতো ও বৈমাত্র

জ্যোতির্ময়ী দেবী

দিতি ও অদিতিসুত যতসব দনুজ-মনুজ
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সবতারা মাসতুতো আর বৈমাত্র অনুজ
দক্ষসুতা ও কশ্যপ সন্তান।
একদা করিল লাঠালাঠি কাটাকাটি
সমুদ্রমন্থনে চেয়ে অমৃতের বাঁটাবাঁটি।
পায়নিকো। তাতে কিবা। তারা রক্তবীজ। তারা রয়েছে অমর।
রক্তে রক্তে বাঁচে মরে যুগ যুগান্তর।
যুগে যুগে আসে। তিন যুগ পরে পুন এসেছে সবাই।
কালনেমি বিভীষণ দানব মানব দৈত্য আর সুরাসুরে
ধরা আছে পুরে।
তারা বলে ভাই ভাই। করে কোলাকুলি।
করে চুলোচুলি।
করে হিংসিত-অহিংসার—আহা। গদীর লড়াই।
আর নব নব রূপে জাগে দ্রৌপদীর বসন হরণ।
আর হের হের নব নামে হেথা হোথা জাগে কুরুক্ষেত্র।
পাণিপথ পলাশীর মাঠ
শব্দহীন বাজে রণবাদ্য। বলে মার মার আর কাট কাট।

জয় বাংলার জয়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠে কণ্ঠে মুক্তির বাণী, নব জীবনের গান,
ভাঙে শৃঙ্খল, দুর্গম পথে দুর্বার অভিযান।
বাধা যত সব ধূলায় লুটায়, লক্ষ পায়ের দাপে
টলমল করি' ওঠে ধরাতল, শত্রু-শিবির কাঁপে।
শান্তির নীড় ভেঙেছে সহসা আকাশ ছেয়েছে মেঘে,
দিক্‌দিগন্ত একাকার আজ প্রাণের বন্যা-বেগে।
যারা এতকাল পেতেছিল ফাঁদ ধর্মের ছলনায়
মুখোস তাদের খুলে গেছে আজ, টিকলোনা যাদু হায়।
ফাঁকির বেসাতি ধরা পড়ে গেছে, মানুষের অপমান
সহেনা বিধাতা, বিদ্রোহে তাই এলো তাঁর আহ্বান।

বাংলা মায়ের বীর সন্তান দেখেছে মায়ের মুখ,
ধন্য জীবন, গৌরবে তার ভরিয়া উঠেছে বুক।
না জানি কেমনে এই মুখখানি ভুলে ছিল এতদিন।
রাত্রি-প্রভাতে তার পানে চেয়ে নয়ন পলকহীন।
নদীকূলে কূলে কাশ ফুলে ফুলে কি রূপ উছলি' যায়,
পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরীতে মা'র রূপ উথলায়।
শুধু রূপ নয়, অফুরান স্নেহ ব'হে যায় শতধারে,
সবুজে সোনায় ভরে দেয় মাটি, ভরে দেয় ভাণ্ডারে।
যে দস্যুদল এই জননীরে পরায়েছে শৃঙ্খল,
দহিতে তাঁহারে, দিকে দিকে আজ জ্বেলেছে বজ্রানল,
তাদেরি দহিবে তাদের আগুন, হবে এ পাপের ক্ষয়।
পুণ্যের জয় ঘোষিবে জগৎ, জয় বাংলার জয়।

আদিম

সন্তোষকুমার অধিকারী

খড়ের কাঠামো মাত্র—বিশ শতকের মন
তাল তাল মাটির প্রলেপ দেওয়া
রঙের জৌলুস।
শান্তি শুধু দিগন্ত ছলনা।
মানবতা এবং সাম্যের নামে যতবার
সাজাই প্রতিমা,
রঙ মুছে সে মূর্তির আদিম নগ্নতা
হিংস্রতার বর্বর প্রকাশে ভেসে ওঠে।
বিশ শতকের মন মানবিক অনুভব ছেড়ে
মাঝে মাঝে হয় আরণ্যক,
ক্রুশবিদ্ধ যিশাসের রক্তমূল্যে তারা
পৃথিবীর ইতিহাস লেখে
রক্তাক্ত জীবনে জমে অন্তহীন ঘৃণার বিদ্বেষ।

শবের পাহাড় পার হ'য়ে
মাঝে মাঝে চেঙ্গিসের হ্রেষাধ্বনি জাগে।
পৃথিবী ভোলেনা কোনদিন
প্রস্তরযুগের সেই উন্মত্ত বন্যতা
প্যাম্থারের দাঁতে দাঁতে ক্রুদ্ধ এক বীভৎস হিংসায়
জেগে উঠে ইয়াহিয়া
বর্বর তাণ্ডবে জ্বালে দাবানল মানুষের বুকে।
শতাব্দীর অক্লান্ত সাধনা
মুছে যায়, সভ্যতার রঙচটা খড়ের কাঠামো
নগ্নিকা ঘৃণার মূর্তি হয়;
মাঝে মাঝে প্রাণের আশ্বাস মুছে দিয়ে

ইতিহাস মুছে যাবে

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কতোগুলি প্রাণ দিতে হবে আর
কতোখানি রক্ত দান,
ইতিহাসে কিছু লেখা নেই তার
নেই তার পরিমাণ।
ইতিহাসে লেখা নেই কিছু
নেই নিকৃতির মাপ,
তাই পথে ঘাটে উল্লাসে কাঁপে
হৃদয়ের উত্তাপ।
পথঘাট একদিন নির্জন হবে
প্রাণেরা নীরব,
ইতিহাস সেদিন মুছে যাবে ঠিক
পড়ে বে তার শব।

নক্ষত্রে স্বরূপ

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

এই পথে মানুষের ভীড় থেমে গেলে
শুধু নক্ষত্রের ক্ষীণাঙ্গ আলোকে—
আমি চিনে নিতে পারি
তোমার সোনা-রঙ সুপ্রভাত-মুখ,
সমুদ্রের মত স্তব্ধ চুল;
আর ধানশীষ রঙের বুকের মালাটি পর্যন্ত।
মানুষ হারিয়ে যায় অফুরন্ত অকাজের কাজে।
জৈবিক ক্ষুধার রাজ্যে একচ্ছত্র সুদজীবী দিন
তারপর রাত্রি নামে মায়ার শরীর।
দিনের পরুষ ত্রাণ মুছে ফেলে
মনগুলি নীড়মুখী পাখী হ'লে পর
জানালাটা খুলে দিলে
চেনা যায় সহৃদয় নক্ষত্রে স্বরূপ।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা বসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 'অতি ক্রিয়াশীল'—সি পি এম নেতৃত্বে গঠিত গণতান্ত্রিক বাম-ফ্রন্ট (ছয় দলীয়)—বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের "অবিশ্বাসের" প্রস্তাব পেশ করিয়াছে—এবং এই 'বিশ্বাস নাই' প্রস্তাবের একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য অজয়-বিজয় মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো, কারণ পশ্চিমবঙ্গের জনগণ নাকি ইহাই প্রার্থনা করে॥

একথা বহুবার বলা হইয়াছে যে আমাদের এ-রাজ্যে যাহারা এবং যেসব দল সি পি এম বিরোধী, তাহারাই হইবে প্রতিক্রিয়াশীল, অগণতান্ত্রিক এবং জন মঙ্গল কথনো করিতে অক্ষম। কিন্তু একটা কথা আমাদের মত মূর্খ লোকদের পক্ষে বুঝা অসম্ভব, নূতন সরকার কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, কি জন্য এবং কি ব্যাপারে জন মঙ্গলের মনোপলির বাহক ও ধারক সি পি এমের, তথা সদা ক্রুদ্ধবদন, জ্যোতি বসুর নিকট কোন বিশেষ অপরাধের বা কাজের জন্য অবিশ্বাসের অপরাধে অপরাধি হইল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। ব্যাপার দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের আরো কয়েকটি রাজ্যে বিধান সভার সদস্যদের প্রধান এবং একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়াছে (গত ২।৩ বৎসর যাবৎ) এক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো এবং অন্য দলীয় সরকারের অর্থাৎ মন্ত্রিসভার প্রতিষ্ঠা করা। যদিও অন্য দল একথা ভাল করিয়াই জানে যে—যে কোন মন্ত্রিসভা আজ সরকার গঠন করিলে হলে, বলে কৌশলে, সেই মন্ত্রিসভার পতন ঘটিতে সময় লাগিবে মাত্র কয়েক মাস! অর্থাৎ প্রাক্ নির্ব্বাচনী গালভরা বড় বড় প্রতিশ্রুতি এমন কি নির্ব্বাচিত হইলে জনগণের জন্য জীবন দানও নির্ব্বাচনপ্রার্থী করিতে প্রস্তুত থাকিবেন, একবার কোন প্রকারে নির্ব্বাচিত হইলে, সেই সব প্রতিশ্রুতি এবং জন মঙ্গল কামনা অবিলম্বে নির্ব্বাচিত প্রার্থীদের বিস্মৃতির রেকর্ডরূপে কাঁচা খাতায় লিপিবদ্ধ হইয়া—অচিরে 'কালগ্রাসে' পতিত হয়।

ভাবিতে কষ্ট হয়, আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় কর্ত্রী ঠাকুরাণীও এই একই খেলায় নিজেকে প্রায়ই ব্যস্ত রাখেন, এই সব প্রাদেশিক ব্যাপারে তাঁহাকে এতই মত্ত দেখা যায় প্রায়ই, যাহার কারণে তাঁহার বহু ঘোষিত এবং কর্ণপটাহভেদকারী ঢক্কা নিনাদিত 'ইন্‌স্ট্যাণ্ট সোস্যালিজম্' পিয়ালায় ঠাণ্ডা হইতে হইতে ক্রমে অখাদ্যে পরিণত হইতেছে। এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু লাভ কি? যাহাদের কানে তুলো এবং পিঠে কুলো, তাহাদের শুভ চেতনা কিছুতেই করা যাইবে না।

রাজ্য-বিধানসভা যদি কেবলমাত্র বিধানসভার দলীয় সদস্যদের নক্-আউট্ টুর্ণামেন্টের ময়দানে পরিণত হয় এবং দলীয় শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে গদি-রূপী ট্রফী জয় করাটাই হয় একমাত্র কাজ তাহা হইলে বিধান সভার সার্থকতা কি বুঝি না। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ভাবী-সদস্যদের ভোটার্জ্জনের জন্য স্তোকবাক্য দ্বারা ভোট-দাতাদের প্রতারণা করা আর যাহাই হউক, ভদ্র এবং বিন্দুমাত্র নীতিজ্ঞান যাহাদের আছে, তাহাদের শোভা পায় না। কিন্তু আমরা এ-সব নীতি কথা এবং হিতোপদেশ যাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, তাহারা এ-সবের অতি উর্দ্ধে কিংবা নিম্নে। [illegible]

হইলে সহজ চিরন্তন মানবীয় ধর্মের নীতি-কাঠিতে হইবে না, ইহাদের বিচারের জন্য যে-প্রকার বিশেষ মাপ-কাঠির প্রয়োজন, তাহা হয়ত কম্যু—এবং সহ-ধর্মী দলীয় অস্ত্র ভাণ্ডারে সার্চ করিলে পাওয়া যাইবে।

রাজ্যের বিধান সভার স্পীকার এবং উপস্পীকার নির্ব্বাচনে সিপি এম প্রথম রাউণ্ডেই বিষম পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে এই ধাক্কাটা বেচারাদের বিষম ব্যথার কারণ হইতেছে।

এই নিবন্ধ লেখার তারিখ ১৪ ৫-৭১ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই অনাস্থা প্রস্তাবের ফলাফল ঘোষিত হইবে এবং সেই সঙ্গে বর্ত্তমান সরকারের ভবিষ্যতও। যতদূর দেখিতেছি শুনিতেছি এবং যতটুকু বুঝিতেছি, তাহাতে অজয় বিজয় মন্ত্রীসভার সংখ্যা গরিষ্ঠতা মাত্র ৭।৮ টিতে নিবদ্ধ। গত কয়েকদিন ধরিয়া দল ভাঙ্গাভাঙ্গি এবং ভোট-কাড়াকাড়ির জোর প্রয়াস প্রচেষ্টা দুই পক্ষে চলিতেছে। বলাবাহুল্য এক একটি ভোটের মূল্য (কেবল) অর্থ বিনিময়েই আবদ্ধ নহে বিবিধ প্রকারে চলিতেছে। যে পক্ষ দর বেশী হাঁকিবে, তাহাদের ভোট কাড়িবার কেরামতী বেশী। তারপর মূল্য দেওয়া বা আদায় করার কোন অবকাশ হয়ত থাকিবে না, কারণ এই মন্ত্রীসভার পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এইরাজ্যে আবার সেই কচ্ছ পরীক্ষিত এবং সর্ব্বভাবে ব্যর্থ রাষ্ট্রপতি তথা ইন্দিরার সরকার পশ্চিমবঙ্গের ফুটা নৌকার হাল ধরিবে এবং সেই সঙ্গে জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী পার্টি এরাজ্য হইতে সি আর পি, মিলিটারি প্রত্যাহার এবং পুলিসের দমন দাবি করিতে থাকিবে। সেই সঙ্গে আবার দিনসাতেকের মধ্যে হয়ত নব নির্ব্বাচনের জোর দাবিও উঠিবে। ইহাতে যে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইবে, তাহা ত রাষ্ট্রীয় পার্টিদের জমিদারী হইতেই আদায় হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাবস্থা রমনীয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রখ্যাত দৈনিকে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়।

একে একে সেই পুরানো কথাটাই আবার মনে পড়িয়া যাইতেছে।—একে একে নিভিছে দেউটি। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে কারখানাগুলি একের পর এক দেখিতেছি দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছে। বিশেষ করিয়া যেগুলি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান তাহাদের কবে কী হয় কে বলিতে পারে! কোনও একটা বিশেষ শিল্পের উপর যে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ ধারণা ভুল। কারখানা বন্ধ হইবার কারণও সব ক্ষেত্রে এক নয়। কোথাও অক্ষম পরিচালনা বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। কোথাও-বা কাঁচা মালের অভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিপন্ন হইয়াছেকোথাও-বা প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। আবার আধুনিক শিল্পপ্রণালীর সঙ্গে পরিচয় না থাকাতে অনেক কারখানা বিপদে পড়িয়াছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যত নষ্টের মূল হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিণামদর্শিতা। বৈষয়িক নীতির নামে তাঁহারা যে তত্ত্বের জাল বুনিয়া চলিয়াছেন তাহাতে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে নানা শিল্পের। সে আঘাত আবার পড়িয়াছে প্রচণ্ডভাবে পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলির উপর।

অন্য রাজ্যের শিল্পগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে নির্মম ও নির্দয় নন। কিঞ্চিৎ মমতা তাঁহাদের সেগুলির সম্বন্ধে আছে। সে মমতা বাচনিক নয়,সঙ্কট কাটাইয়া ওঠার জন্য তাহাদের যথেষ্ট সহায়তা কেন্দ্রীয় সরকার করিয়া থাকেন। তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টার অন্ত তাঁহাদের নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিপরীত রীতি। এ রাজ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতি যেমন অসঙ্গত তেমনই পক্ষপাতদুষ্ট। অন্যত্র নূতন শিল্প-স্থাপনে তাঁহারা বিশেষ আগ্রহী। যেখানে পরিবেশ শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকূল নয়, সেখানেও নূতন প্রকল্পের ছাড়পত্র দিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যে শিল্প এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে তাহাকেও মঞ্জুর করতে তাঁহারা নারাজ। ভিন্ন রাজ্যে পুরাতন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অবস্থা মন্দ

হইলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কেন্দ্র দরাজ হাতে সাহায্য দিতে প্রস্তুত। আর পশ্চিমবঙ্গে তেমন ঘটিলে মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া অন্য কিছু কদাচিৎ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রবিশেষে তাহাও জোটে না। ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং বন্ধ হইতে না হইতেই ব্রেথওয়েটও তাহার পথ অনুসরণ করিয়াছে। এখন শুনিতেছি ফিলিপসও যাই যাই করিতেছে। জেসপের অবস্থা নাকি টলমল। এতগুলি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত সে কি আকস্মিক, হঠাৎ হইয়া গিয়াছে ব্রেথওয়েট যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে সে ব্যাপারটার তদন্ত করিবার জন্য সরকার একটা কমিটী বসাইয়াছেন। কিন্তু আসল কাজ তাহাতে কতটা হইবে? মরণাপন্ন রোগীর শ্বাস থাকিতে থাকিতে সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিলেও হয়তো কিছু কাজ হয়। একবার প্রাণপাখি খাঁচা ছাড়া হইলে তাহাকে তো আর ফিরাইয়া আনা যায় না। যেসব প্রতিষ্ঠান দরজা বন্ধ করিয়াছে বা করিতে উদ্যত আগে তাহাদের আর্থিক দাবি বা কাঁচামালের চাহিদা মিটাইয়া দেওয়া হউক। অন্তত সাময়িকভাবে তাহাদের বাঁচিয়া থাকার ব্যবস্থা আগে হউক, তাহার পর না হয় সমীক্ষার কাজ সাড়ম্বরে হইবে। রোগ নির্ণয় কিংবা চিকিৎসাপদ্ধতি লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে করিতে রোগী যদি মারাই যায় তাহা হইলে তাহার শবব্যবচ্ছেদ করিয়া কাহার লাভ হইবে। ফিলিপসের সমস্যা তাহার উৎপাদনশক্তির অপচয়—যতটা সে উৎপাদন করিতে পারে ততটা দিতে সরকার চান না। কারণটা আর যাহাই হউক, অর্থনৈতিক নয়। আর ফিলিপস যদি তাহার উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে না পারে তাহা হইলে সেটা শুধু প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি নয়, জাতীয় ক্ষতি এই কথাটা কেন্দ্রীয়সরকার বুঝিতে চাহিতেছেন না বলিয়াই সঙ্কট দেখা দিয়াছে। একটা প্রতিষ্ঠানের আয়তনের সঙ্গে তাহার উৎপাদনক্ষমতারও যে একটা সম্পর্ক আছে সে বোধ নয়াদিল্লীতে কি কাহারও নাই? বেশী উৎপাদন করিলে খরচও কমে, দামও। তা না করিতে দিলে খরচের সঙ্গে সঙ্গে দামও বাড়ে। ফিলিপসের তাহাই হইতেছে জোর করিয়া উৎপাদন সীমিত করিয়া দেওয়ার দরুন। ইহার পর লোকসান সামলাইতে না পারিয়া ফিলিপস যদি কারখানা গুটাইয়া লয় তাহা হইলে এ রাজ্যের দুর্দশা আরও বাড়িবে। ফলিত অর্থনৈতিক পরিষদের জাতীয় পর্ষদ যে তাঁহাদের সমীক্ষায় মন্তব্য করিয়াছেন যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সম্পদের অভাব নাই তাহার সম্প্রসারণের ছাড়পত্র অবাধে মঞ্জুর না করা অসঙ্গত, সেটা তাঁহারা করিয়াছেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সে কথা কানে না তোলেন তাহা হইলে অনেক দুর্ভোগ আমাদের কপালে লেখা আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ব্রেথওয়েট কারখানার পরিচালনা-ভার নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহাতে খুশী হইবার কোন কারণ নাই, কারণ কেন্দ্র-সরকারের নিয়োজিত পরিচালক প্রশাসকদের এমনই একটা বিশেষ গুণ আছে যাহার ফলে 'সোনা মাটি হইয়া যায় এবং তাহার ফলভোগ করিতে হয় সাধারণ করদাতাকে—দৃষ্টান্ত হিন্দুস্থান ষ্টিল হরিদ্বারের অ্যান্টি-বায়োটিক ঔষধ কারখানা, এল, আই, সি, প্রভৃতি।

এ বিষয়ে রাজ্যসরকারের (পশ্চিমবঙ্গ) প্রশংসা ও কম প্রাপ্য নয়। কলিকাতা ট্রাম গাড়ীর সংখ্যা ক্রমশ যে হারে কমিতেছে, ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসগুলির যা অবস্থা তাহাতে যে কোন এক শুভ দিনে দুয়েরই চাকা রাস্তায় স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

ট্রাম এবং বাস নামেই ষ্টেটের। সত্যই কিন্তু আসলে এই দুটি সংস্থার মালিক শ্রমিক ইউনিয়নের মালিকগণ। তাঁহাদের ইচ্ছামত যখন যেখানে খুসী ট্রাম বাস বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। হাজার হাজার যাত্রীর অভিযোগ সুবিধার কথা কাহারো চিন্তার কারণ নহে।

তাহারা দরকার মত পয়সা দেবে এবং মনের আনন্দে পথ চলার সুখভোগ করিবে।

সুতী কাপড়ের কলের সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে

এদেশে সুতী কাপড়ের কল বেশীর ভাগই পশ্চিম ভারতে—বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ে ও আমেদাবাদে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও কাপড়ের কল একেবারে নাই এমন তো নয়। এক আধটি নয়, একচল্লিশটি কাপড়ের কল এ রাজ্যে কোনরকমে আছে, তবে চালু রহিয়াছে মাত্র চব্বিশটি। বাকী সতেরোটির চাকা এখন বন্ধ। ওই সতেরোটি কলের কর্মীরা এখন বেকার। দুইটি কারখানা খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। অর্থমন্ত্রী হিসাবে যে বাজেট তিনি বিধানসভায় পেশ করিয়াছিলেন তাহাতে সে দুইটির জন্য টাকা বরাদ্দ করাও ছিল। কিন্তু বৎসর ঘুরিতে চলিল সে টাকা আজও খরচ হয় নাই—আর হইবে বলিয়া মনে হয় না। দুইটি অচল কলের চাকা সচল হইতে হইতেও হইল না। তাহাদের রথচক্র গ্রাস করিয়াছে মেদিনী নয়—আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি আর লাল ফিতায় বাঁধা ফাইলের স্তূপ।

অথচ চেষ্টা করিলে দুইটি কেন, সতেরোটি বন্ধ কলের চাকাই আবার চালু করা যায়। তবে তাহার জন্য একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা দরকার। সে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে গেলে টাকাও চাই, সুপরিচালনাও চাই, সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত মালমসলা তো চাই-ই। বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ আছে তাহাতে গোটা দুই কল চালু করা হয়তো যাইত, কিন্তু তাহার পর ম্যাও ধরিত কে? পশ্চিমবঙ্গের যেসব কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের একটা প্রধান সমস্যা আধুনিকীকরণ। তাহার জন্য প্রচুর টাকা দরকার। সে টাকা যোগাইবার ব্যবস্থা না হইলে কলগুলি খুলিতে না-খুলিতে আবার বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভবনা। সে ঝুঁকি না লওয়াই সঙ্গত। সেগুলি কোনও মতে খুলিয়া দিনকতক চালু রাখার পর আবার যদি টাকার কিংবা তুলার অভাবে অথবা বেবন্দোবস্তের দরুণ তাহাদের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হয় তাহা হইলে হিতে-বিপরীত হইবে, অশান্তি বাড়িবে, কলগুলিও চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়িবে।

ওই সমস্ত মুমূর্ষু কাপড়ের কলকে বাঁচাইতে হইলে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার। সে প্রতিষ্ঠানের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হইবে, আর কারিগরী সমস্যা মিটাবার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ তাহারা যাহাতে দিতে পারে সেটাও দেখিতে হইবে। অনেকদিন হইতেই শোনা যাইতেছে রুগ্ন কাপড়ের কলগুলির সুচিকিৎসার জন্য একটা টেক্সটাইল কর্পোরেশন গড়িয়া তোলার অভিপ্রায় সরকারের আছে। এতদিন মনে হইতেছিল সে কর্পোরেশনের মূল কেন্দ্র ও তাবৎ কেন্দ্রীয় বৈষয়িক প্রতিষ্ঠানের মতো মহারাষ্ট্রেই স্থাপিত হইবে। কিন্তু নূতন কথা শুনিয়াছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি-গভর্ণর ডঃ হাজারি। তিনি জানাইয়াছেন একটা আর্থিক পুনর্গঠন সংস্থা খাড়া করিবার সব ব্যবস্থাই হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই সেটি চালু হইবার কথা। প্রথম পর্বে পূর্ব ভারত বিপন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা করাই সংস্থার লক্ষ্য হইবে। তাই মূল কর্মকেন্দ্র তাহার প্রতিষ্ঠিত হইবে পূর্ব-ভারতে শিল্পের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায়।

গোড়াপত্তনটা কাপড়ের কলগুলি লইয়াই হওয়া সমীচীন। কেন না সে শিল্পের এ রাজ্যে নাভিশ্বাস উঠিয়াছে বলিলেই চলে। তা ছাড়া তাহাদের সমস্যা লইয়া দীর্ঘকাল রাজ্য সরকার মাথাও ঘামাইয়াছেন। তবে শুধু কাপড়ের কলগুলিকেই পশ্চিমবঙ্গে রোগে ধরে নাই। বিস্তর ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানও এ' রাজ্যে ব্যাধিগ্রস্ত। ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং বেশ কিছুদিন বন্ধ আছে। ব্রেথওয়েটও অল্পদিন হইল বন্ধ হইয়াছে। অশান্তি ও অসন্তোষ ছাড়া কাঁচামাল ও মূলধনের অভাব ওই

সঙ্কটের মূলে রহিয়াছে। কয়েকটি পাটের কলেরও টলমল অবস্থা। সুপরামর্শ এবং আর্থিক সহায়তা পাইলে তাহাদের অনেকেই সঙ্কট কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। সে কাজ কিঞ্চিৎ হিতবাণী শোনাইয়া কিংবা সাময়িক আর্থিক আনুকূল্য করিয়া সম্পন্ন করা যাইবে না তাহার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। সে প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের সিদ্ধান্ত যখন হইয়া গিয়াছে তখন আর অহেতুক বিলম্ব কেন? শুভস্য শীঘ্রম—এ প্রাজ্ঞ বচন একবার অন্তত সরকার মানিয়া লউন না কেন।"—

উপরি উক্ত মন্তব্যের সহিত আমরা একমত হইলেও, দায়িত্বভার যাহাদের সাজে তাহাদের হাতে না দিলে সবই হইবে বেকার বৃথা। আমাদের এ-রাজ্যে সব কিছুতেই রাজনৈতিক দলগুলির হস্তক্ষেপ তথা কর্ম্ম নষ্টামির খেলা চলে। বিশেষ করিয়া যে ক্ষেত্রে টাকার খেলার অবকাশ বেশী সেই সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক চেলা-চামুণ্ডার দল আসিয়া জমায়েত হয়, ভাগাড়ে চিল ও শকুনীর মতই। বলা বাহুল্য পার্টির নেতারাও লুটের ভাগ হইতে বঞ্চিত হয়েন না।

কলকারখানা এবং শিল্প সংস্থা চালাইতে হইলে বিশেষ জ্ঞান এবং যথেষ্ট টেক্‌নিক্যাল বিদ্যার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে ভোটের জোরে যে কেহ মন্ত্রীর পদ লাভ করিবেন, তিনি একদিনেই সর্ব্ব বিদ্যা এবং সবরকম টেক্‌নিক্যাল তত্ত্বের অধিষ্ঠান হইয়া যান। লোয়ার প্রাইমারী স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত যদি ভোটের জোরে মন্ত্রী হইতে পারেন, তিনি ষ্টিল প্লান্টের চেয়ারম্যান অর্থাৎ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়েন।

আমাদের মুখ্য মন্ত্রীর ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে জ্ঞান কতটা জানা নাই, কিন্তু তিনি এখন সব বিষয়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতেছেন। যাহার প্রকৃত মূল্য বলিতে কিছুই নাই। অথচ দেশে শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে নাই তাহাও নয়।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৫)

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল ২-১৫ মিনিটের সময়। প্রথমের দিনের মত অধিবেশনের বহু পূর্বেই সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

যথারীতি সভাপতিমশায় অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়াসে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

"বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন হল। তারপর রাষ্ট্রীয় স্ত্রী মহামণ্ডল দুইটি হিন্দী সঙ্গীত এবং কুমারী রাইহানা তায়েবজী একটি উর্দ্দু সঙ্গীত গেয়ে শোনালেন।

প্রথমে ডাঃ আনসারী আরও কতকগুলি অভিনন্দন-সূচক টেলিগ্রাম ও চিঠি পড়ে শোনালেন।

তারপর সভাপতিমশায় মহাত্মা গান্ধীকে এই কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব উত্থাপন করতে আহ্বান করে বললেন যে প্রস্তাবটি উত্থাপন ও আলোচনার জন্য তিনি মাত্র দু ঘন্টা সময় দেবেন। মহাত্মাকে অনুরোধ করলেন যে তিনি আধ ঘন্টার বেশী সময় না নেন। মহাত্মার পর যে সকল বক্তা প্রস্তাবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলতে উঠবেন তাঁরা প্রত্যেকে ৫ থেকে ১০ মিনিটের বেশী সময় পাবেন না।

কটিবাস পরিহিত মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সমস্ত সভাস্থল "মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়" ধ্বনিতে ও আনন্দকলরবে মুখরিত হয়ে উঠল।

মহাত্মা মঞ্চে উঠে তাঁর জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত একটি চেয়ারে বসে বললেন যে সভাপতিমশায় তাঁকে মাত্র ৩০ মিনিট সময় দিয়েছেন। তিনি আশা করেন যে তার বেশী সময় তিনি নেবেন না, কিন্তু সভাপতি-মশায় একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন। প্রস্তাব ইংরাজীতে এবং হিন্দীতে পড়ার সময় বাদ যাবে এ কথা তিনি বলেননি। এই উক্তিতে সভায় হাস্যরোল উঠল।

মহাত্মা তারপর একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব পেশ করলেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে :—

যেহেতু জাতীয় কংগ্রেসের গত অধিবেশনের পর ভারতের জনগণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পেরেছে যে অহিংস অসহযোগ অবলম্বনে দেশকে নির্ভীকতা আত্মোৎসর্গ ও আত্মসম্মান উপলব্ধির দিকে প্রভূত পরিমাণে এগিয়ে দিয়েছে এবং যেহেতু এই আন্দোলন গভর্ণমেন্টের মান মর্য্যাদা বহুল পরিমাণে খর্ব করেছে এবং যেহেতু মোটের উপর দেশ সমগ্রভাবে স্বরাজের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে অতএব এই কংগ্রেস কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত এবং নাগপুর অধিবেশনে স্বীকৃত প্রস্তাবকে আরও স্বীকৃতি জানাচ্ছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত পাঞ্জাব ও খিলাফতের অবিচারের প্রতিকার না হয় এবং স্বরাজপ্রতিষ্ঠিত না হয় এবং যত-দিন ভারত গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা দায়িত্বহীন প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে ভারতের জনগণের নিকট হস্তান্তরিত না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশ যেভাবে নির্দেশ দেবে সেইভাবে অহিংস অসহযোগের কর্মসূচী অধিকতর উদ্যমের সঙ্গে চালিয়ে যেতে দৃঢ় সংকল্প জানাচ্ছে।

এবং যেহেতু ভাইসরয়ের সাম্প্রতিক কালের বক্তৃতায় ভীতি প্রদর্শন এবং তার ফলে স্বেচ্ছাবাহিনী ছত্রভঙ্গ এবং প্রকাশ্য জনসভা ও এমন কি কমিটীর সভা পর্য্যন্ত বে-আইনী ও সেচ্ছাচারভাবে বলপূর্বক নিষিদ্ধ করে এবং বিভিন্ন প্রদেশে বহু সংখ্যক কংগ্রেস কর্মিকে

গ্রেপ্তার দ্বারা ভারত গভর্ণমেণ্ট দমন আরম্ভ করেছে এবং যেহেতু এই দমন কংগ্রেস ও খিলাফতের সমুদয় কর্মতৎপরতা খতম করা এবং তাদের সাহায্য থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হয়েছে অতএব এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে কংগ্রেসের সমুদয় কর্মতৎপরতা যতদুর প্রয়োজন স্থগিত রেখে এবং গত ২৩শে নভেম্বর বোম্বাইয়ের ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবানুসারে দেশের সর্বত্র যে সকল স্বেচ্ছাবাহিনী সংস্থা গঠিত হবে তাতে যোগ দিয়ে বিনা আড়ম্বরে নিঃশব্দে গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য সকলকে আবেদন জানাচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর না করলে কাউকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে গ্রহণ করা হবে না :—

ঈশ্বরকে স্বাক্ষী রেখে আমি ধর্মতঃ ঘোষণা করছিঃ—

(১) আমি জাতীয় স্বেচ্ছাবাহিনীর সদস্য হতে ইচ্ছুক।

(২) যতদিন পর্য্যন্ত আমি বাহিনীর সদস্য থাকব ততদিন আমি বাক্যে ওকার্য্যে অহিংস থাকব এবং চিন্তায় অহিংস থাকার জন্য আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব যেহেতু আমি বিশ্বাস করি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র অহিংসাই খিলাফৎ ও পাঞ্জাবকে সাহায্য করতে পারে এবং স্বরাজ অর্জন করতে পারে এবং ভারতের বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ, কি খৃষ্টান, কি ইহুদি সকলের মধ্যে ঐক্য দৃঢ়ীভূত করতে পারে।

(৩) আমি এই ঐক্যে বিশ্বাস করি এবং সর্বদা এই ঐক্য বর্ধনের চেষ্টা করব।

(৪) আমি ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক মুক্তির জন্য স্বদেশী একান্ত প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করি এবং অন্য সকলরকম কাপড় বাদ দিয়ে হাতে কাটা সুতোয় হাতে বোনা খদ্দর ব্যবহার করব।

(৫) হিন্দু হিসাবে আমি অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক অপসারণের ন্যায্যতা ও আবশ্যকতায় বিশ্বাস করি এবং সকল সম্ভাব্য উপলক্ষে নির্যাতিত শ্রেণীর সাহচর্য্য খুঁজে বার করব এবং তাদের সেবার চেষ্টা করব।

(৬) স্বেচ্ছাসেবক বোর্ড অথবা ওয়ার্কিং কমিটী অথবা অন্য কোন প্রতিনিধি সংস্থা—প্রতিজ্ঞাপত্রের অপরিপন্থী যে সকল নিয়মকানুন তৈরী করবেন তাহা এবং আমার উর্দ্ধতন কর্মচারীদের নির্দেশ আমি পালন করব।

(৭) বিনা বিরক্তিতে আমি আমার ধর্ম ও দেশের জন্য কারাবরণ; দৈহিক নির্য্যাতন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করতে প্রস্তুত আছি।

(৮) কারারুদ্ধ হ'লে আমার পরিবার বা আশ্রিতগণের জন্য আমি কংগ্রেসের নিকট থেকে সাহায্য দাবি করব না।

এই কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে ১৮ বা তদূর্দ্ধ বয়সের প্রত্যেকে অবিলম্বে স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিবে।

জনসভা নিষেধের ঘোষণা স্বত্বেও যেহেতু কমিটীর সভাগুলিকেও জনসভারূপে গণ্য করার চেষ্টা হচ্ছে অতএব এই কংগ্রেস কমিটী সভা এবং জনসভা আহ্বান করার জন্য উপদেশ দিচ্ছে। শেষোক্ত সভাগুলি পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘেরা জায়গায় টিকিটের ব্যবস্থা করে করতে হবে। সেখানে যতদূর সম্ভব পূর্বে প্রচারিত বক্তারাই কেবল লিখিত ভাষণ দিতে পারবেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে উত্তেজনা এবং সম্ভাব্য হিংসার ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এই কংগ্রেস আরও মনে করে যে যখন স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী এবং মনুষ্যত্বহীনকারী ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা দেওয়ার ব্যক্তিগত অথবা সংঘগত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তখন সমগ্র বিপ্লবের বিকল্পস্বরূপ আইন-অমান্যই একমাত্র সভ্যোচিত ও কার্য্যকরী পন্থা; অতএব সকল কংগ্রেসকর্মী শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে এবং যারা হৃদয়ঙ্গম করেছে যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার না করে ভারতের জনগণের প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন ক্ষমতা থেকে বর্তমান গভর্ণমেণ্টকে হটানোর অন্য কোন

উপায় নেই তাদের ব্যক্তিগত আইন অমান্য এবং যখন ভারতের জনগণ অহিংস পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে এবং অন্যথায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর গত দিল্লীর অধিবেশনের প্রস্তাবের সর্তানুসারে জনসাধারণের আইন অমান্য গড়ে তুলতে উপদেশ দিচ্ছে।

এই কংগ্রেস মনে করে যে উপযুক্ত সেফগার্ড রেখে ওয়ার্কিং কমিটী বা সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সময়ে সময়ে যে সব উপদেশ দেবেন তদনুসারে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আইন-অমান্যের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য যেখানে, যখন ও যে পরিমাণে প্রয়োজন হবে কংগ্রেসের অন্য সকল কাজ স্থগিত রাখতে হবে।

এই কংগ্রেস ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ছাত্রদের, বিশেষ করে যারা জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে তাদের এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের অবিলম্বে উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান করছে।

আসন্ন বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্ম্মীর গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ পরিচালনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বজায় রেখে এবং যথাসম্ভব তা সাধারণভাবে কাজে লাগিয়ে এই কংগ্রেস অন্য নির্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের একমাত্র কর্মকর্তা নিযুক্ত করছে এবং তাঁকে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অথবা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী বা ওয়ার্কিং কমিটী অধিবেশন আহ্বান করার ক্ষমতাসহ অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করছে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করা যাবে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর দুইটি অধিবেশনের মধ্যবর্ত্তীকালে এবং তাঁকে সঙ্কটকালে উত্তরাধিকারী নিয়োগের ক্ষমতা দিচ্ছে।

এই কংগ্রেস এতদ্বারা উক্ত উত্তরাধিকারীকে এবং সমস্ত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীদের যারা পর্য্যায়ক্রমে তাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা নিযুক্ত হবে তাদেরও উপরোক্ত ক্ষমতা অর্পণ করছে।

প্রকাশ থাকে যে এই প্রস্তাবের কিছুই অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর প্রারম্ভিক অনুমোদন ব্যতীত ভারত গভর্ণমেন্ট অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কোন ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীকে বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে না এবং তা এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কংগ্রেস অধিবেশনে অনুমোদন করাতে হবে এবং আরও প্রকাশ থাকে যে কংগ্রেসের মূলনীতি (ক্রীড) মহাত্ম্য গান্ধী বা তাঁর উত্তরাধিগণ কোন মতেই বদলাতে পারবেন না।

এই কংগ্রেস যে সকল দেশপ্রেমিক তাঁদের বিবেক অথবা দেশের জন্য বর্ত্তমানে কারাবাস করছেন তাদের অভিনন্দন করছেন এবং উপলব্ধি করছে যে তাঁদের আত্মত্যাগ স্বরাজের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করেছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে মহাত্মাজী অন্যান্য কথার পর বললেন যে এই প্রস্তাব নিজেই নিজের ব্যাখ্যা করছে। যদি ১৫ মাসের অবিশ্রাম কর্মতৎপরতার পরেও এখানে সমবেত প্রতিনিধিগণ তাদের মন বুঝতে না পেরে থাকেন তা হলে দু বৎসরব্যাপী বক্তৃতা দিয়েও তিনি তাঁদের বোঝাতে পারবেন না।

তিনি বললেন যে এই প্রস্তাবে নূতন কিছুই নেই। যাঁরা মাসের পর মাস ওয়ার্কিং কমিটীর এবং প্রত্যেক তিন মাস অন্তর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যবিবরণী পড়েছেন তাঁরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন যে প্রস্তাব গত ১৫ মাসের জাতীয় কর্মতৎপরতার স্বাভাবিক ফল।

এই প্রস্তাবের অর্থ হইল যে জাতি পৃথিবীর অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীতই একমাত্র ভগবানের সাহায্যে তার নিজের পথ করে নেবে।

যদি গভর্ণমেন্ট আন্তরিকভাবে মুক্ত দরজা চান তা হলে এই প্রস্তাবই সেই দরজা খুলে রেখেছে।

তারপর তিনি বললেন যে লর্ড রেডিংয়ের একটি গোল-টেবিল বৈঠক আহ্বানের সম্ভাবনা আছে কিন্তু বৈঠকটি সত্যকারের বৈঠক হতে হবে। যদি তিনি এমন বৈঠক চান যে সেখানে যাঁরা বসবেন তাঁরা

সকলেই সমান এবং সেখানে একজনও ভিখারী নেই তা হলে কংগ্রেসের দরজা খোলা আছে।

মহাত্মাজী তার পর বললেন যে যদি এই দেশে কোন কর্তৃপক্ষ বাক্যের বা মিলনের স্বাধীনতা খর্ব করতে চান তা হলে তিনি প্রতিনিধিদের নামে এই প্ল্যাটফরম থেকে বলছেন সেই কর্তৃপক্ষ ধ্বংশ হবে।

উপসংহারে তিনি বললেন যে তিনি শান্তির মানুষ। তিনি শান্তিতে বিশ্বাস করেন কিন্তু তিনি যে কোন মূল্যে শান্তি চান না। কবরখানার শান্তি তাঁর কাম্য নয়। বক্তৃতা শেষ করে তিনি তাঁর আসনে ফিরে গেলেন।

বিঠলভাই প্যাটেল গুজরাতিতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর যুক্তপ্রদেশের মৌলানা মজিদ ও সৈয়দ মহম্মদ ফকির উর্দুতে, শ্রীমতী মঙ্গলা দেবী হিন্দীতে, সারদাপীঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইংরাজিতে এবং করাচীর রোস্তমজী : কে, সিদ্ধ গুজরাতিতে, খাজা আবদুল মজিদ উর্দুতে, দিল্লীর সরদার গুররকন সিং হিন্দীতে এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ইংরাজিতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

প্রস্তাব সমর্থিত হওয়ায় সভাপতি মশায় মঞ্চে উঠে প্রস্তাবটি ভোটে দিলেন। বিপুল সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হল। বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন মাত্র ১০ জন প্রতিনিধি।

এই প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসে মহাত্মার এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

তারপর সভাপতির পক্ষ থেকে ডাঃ আনসারী নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করলেন :—

এই কংগ্রেস যারা পূর্ণ অসহযোগে বিশ্বাস করেন না অথচ যাঁরা জাতীয় আত্মমর্য্যাদার জন্য খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অবিচারের প্রতিকার দাবি করা এবং তার উপর জোর দেওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন এবং জাতীয় পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য অবিলম্বে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন তাঁদের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বর্ধন করে, আর্থিক অবস্থার দিক থেকে এবং কুটীর-শিল্প হিসাবে লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী যারা প্রায় অনাহারে জীবনধারণ করছে তাদের আর্থি[ক] অবস্থার পরিপূরকস্বরূপ—তুলো বোনা, হাতে সুতো কাটা, হাতে কাপড় বোনা—জনপ্রিয় করে এবং সে[ই] উদ্দেশ্যে হাতে কাটা সুতোয় হাতে তৈরি পরিচ্ছদে[র] প্রচার ও ব্যবহার করে, সমস্ত মাদকদ্রব্য নিবারণে[র] কাজে সহায়তা করে এবং হিন্দু হলে অস্পৃশ্যতা নিবার[ণ] করে এবং নিমজ্জিতশ্রেণীর উন্নতিসাধনে সাহায্য ক[রে] জাতিকে পূর্ণ সহায়তা করার জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

এই কংগ্রেস প্রতীতি প্রকাশ করছে যে মোপলা বিদ্রোহ অসহযোগ বা খিলাফৎ আন্দোলনের জন্য হয় নি, বিশেষতঃ যখন পূর্বে ছয় মাস উপদ্রুত অঞ্চলে—অসহযোগীদের ও খিলাফৎ প্রচারকদের অহিংসার প্রচার চালানোর সুযোগ জেলা কর্তৃপক্ষগণ দেন নি। এই সকল ঘটনা উপরোক্ত দুই আন্দোলনের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কবিরহিত অন্য কারণে ঘটেছিল এবং এই হাঙ্গামা ঘটত না যদি অহিংসার বাণী তাদের নিকটে পৌঁছে দেওয়া হত। তথাপি কংগ্রেস কতিপয় মোপলা দ্বারা জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ করা এবং প্রাণ ও সম্পত্তি ধ্বংশ করা তীব্রভাবে নিন্দা করছে এবং অভিমত প্রকাশ করছে যে ইয়াকুব হোসেন ও অন্যান্য অসহযোগীদের প্রস্তাব গ্রহণ করলে মহাত্মা গান্ধীকে মালাবারে যেতে অনুমতি দিলে মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট মালাবারের হাঙ্গামা প্রসারে বাধা দিতে পারত। কংগ্রেস আরও অভিমত প্রকাশ করে যে মোপলাদের প্রতি ব্যবহার যা শ্বাসরোধজনক ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তা আধুনিক যুগে অশ্রুতপূর্ব ও অমানুষিক এবং যে গভর্ণমেন্ট নিজেকে সভ্য বলে মনে করে তার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

এই কংগ্রেস গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা এবং তুর্কীদের তাদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং তুর্কী জাতিকে তাদের পদমর্য্যাদা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রামের প্রতি ভারতের সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এই কংগ্রেস ১৭ই নভেম্বর বা তার পরে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ঘটনার তীব্রভাবে নিন্দা করছে এবং সকল দল ও সম্প্রদায়কে আশ্বাস দিচ্ছে যে পূর্ণমাত্রায় তাদের অধিকার রাখার ইচ্ছা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কংগ্রেসের বরাবর ছিল এবং এখনও আছে।

এই কংগ্রেস এতদ্বারা শ্রীগুরু নানক ষ্টীমারের—মহান গঠনকর্তা যিনি সাত বৎসর গভর্ণমেন্টের ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর জাতির বলিদানস্বরূপ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছেন সেই শ্রীমান বাবা গুরুদত্ত সিংজীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং অন্যান্য শিখ-নেতারা যাঁরা তাঁদের ধর্মাচরণের অধিকার ও স্বাধীনতার উপর বাধা আরোপের চেয়ে কারাবরণ শ্রেয় মনে করেছেন তাঁদেরকেও অভিনন্দন জানাচ্ছে। এবং বাবাজীর গ্রেপ্তারের সময় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পুলিশ ও সৈন্য দ্বারা প্ররোচিত হওয়া সত্বেও তাদের অহিংস মনোভাবের জন্য শিখসম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

উপরোক্ত প্রস্তাব ছয়টির উপর ভোট গৃহীত হয়ে সর্ব সম্মতিক্রমে পাশ হল।

এর পর বিঠল ভাই প্যাটেল সভাপতির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সংবিধানের কয়েকটি ধারার সামান্য পরিবর্তনের জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর বিঠল ভাই প্যাটেল নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় উপস্থিত করলেন :—

এই কংগ্রেস পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডাঃ এম্ এ আনসারী এবং শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীকে ১৯২২ সালের জন্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নিয়োগ করছে এবং যেহেতু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং শ্রীযুত সি রাজাগোপালাচারি বর্তমানে জেলে আছেন তাদের স্থলে কাজ চালনার জন্য শ্রীযুত বিঠল ভাই জে প্যাটেল এবং ডাঃ রাজনকে নিযুক্ত করছে, প্রথম জন কার্য্যকরী সম্পাদক হবেন।

এই কংগ্রেস শেঠ যমনালাল বাজাজ এবং শেঠ ছোটানীকে পুনর্বার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করছে—প্রথমোক্ত কার্য্যকরী কোষাধ্যক্ষ হবেন।

প্রস্তাবগুলি উর্দ্দুতে ব্যাখ্যা করার পর গৃহীত হল।

তারপর সভাপতির নির্দেশে বিঠল ভাই প্যাটেল সভা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সকলকে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতে বললেন এবং জানালেন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করা হবে। ঐ প্রস্তাব আলোচনান্তে ভোটে দেওয়া হবে। প্যাটেল মশায় আরও জানালেন যে এই প্রস্তাবের পর ধন্যবাদজ্ঞাপক মামুলি প্রস্তাবগুলি সভায় পেশ করা হবে।

তারপর সভাপতি মশায় মৌলানা হসরত মোহানীকে কংগ্রেসের ক্রীড পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থিত করতে আহ্বান করে জানালেন যে এই প্রস্তাবটি বিষয়-নির্বাচনী সভায় উঠেছিল কিন্তু সেখানে ভোটাধিক্যে তা অগ্রাহ্য হয়েছে। তখন মৌলানা সাহেব প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাব উত্থাপন করার নোটীশ দিয়েছিলেন এবং সে নোটীশ তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

মৌলানা তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করতে—মঞ্চোপরি দাঁড়ালেন, "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি দ্বারা সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা করল।

তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন :—

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের লোকের দ্বারা সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমুদয় বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বরাজ অথবা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন।

প্রস্তাব উত্থাপন করে অন্যান্য কথার পর মৌলানা সাহেব বললেন যে কংগ্রেসের ক্রীড অনুসারে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বরাজ অর্জন, কিন্তু স্বরাজ কি তার কোন ব্যাখ্যা করা হয় নি, তিনি যে প্রস্তাব পেশ করেছেন তাতে স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা বলা হয়েছে। যখন নাগপুর কংগ্রেসে ক্রীড পরিবর্তনের প্রস্তাবে স্বরাজ শব্দ জুড়ে দেওয়া হয় তখন বলা হয়েছিল স্বরাজ শব্দটি ব্যাখ্যা না করেই রাখা হল যাতে যাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করবেন তাঁরা এর যে কোন অর্থ করে নিতে পারবেন।

যাঁরা এর অর্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তরভুক্ত স্বরাজ

মনে করেন এবং যারা অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত স্বরাজ মনে করেন তাঁদের সকলেরই স্থান কংগ্রেসে হবে।

তিনি জানালেন যে মহাত্মা বলেছিলেন যে যদি খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের মনমত হয় তা হলে আমরা সাম্রাজ্যের বাইরে যেতে চেষ্টা করব না কিন্তু তা না হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে স্বরাজ অর্জনের চেষ্টা করা হবে'। যখন আমাদের ইচ্ছানুসারে নিষ্পত্তি হলনা তখন মৌলানা সাহেব জিজ্ঞাসা করছেন আজ এক বৎসর পরে কেন আমরা বলতে পারব না যে স্বরাজ শব্দের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে এখনও স্বরাজ ও খিলাফতের সমস্যা সন্তোষজনকভাবে মিটতে পারে কিন্তু গভর্ণমেন্টকে যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা উত্তীর্ণ হয়েছে অথচ এপর্যন্ত কিছুই হয় নি। মৌলানা সাহেব বললেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কোন প্রশ্নেরই সমাধান হবে না। তারপর এ সম্পর্কে অনেক যুক্তি দেখালেন।

কর্ণাটকের ভেঙ্কটরমন ইংরাজিতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তার পর আজমীঢ় মাড়ওয়ারার স্বামী করুণানন্দ হিন্দিতে, ইয়াকুব আলি খাঁ উর্দুতে এবং অন্ধ্রের টি পি আসোয়ার ইংরাজিতে সমর্থন করলেন।

এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, তিনি "বন্দে মাতরম" ও "আল্লা হো আকবর" ধ্বনির মধ্যে মঞ্চের উপর উঠে একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন।

তিন হসরত মোহানীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রথমে হিন্দীতে কিছুক্ষণ বললেন। তারপর ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে রকম চাপল্যের সঙ্গে কেউ কেউ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তা দেখে তিনি দুঃখ পেয়েছেন। দায়িত্বশীল পুরুষ ও মহিলা হিসাবে সকলকে নাগপুর ও কলকাতার দিনগুলিতে ফিরে যেতে হবে। মাত্র এক ঘন্টা পূর্বে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কতকগুলি উপায় দ্বারা খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা এবং শাসন সম্প্রদায়ের হাত থেকে ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা আছে। তিনি আশা করেন যাঁরা পূর্বোক্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছেন তাঁরা এই প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার সময় ৫০ বার চিন্তা করবেন। তাঁদের সীমিত ক্ষমতা মনে রাখতে হবে। হিন্দু মুসলমানের সম্পূর্ণ অচ্ছেদ্য ঐক্য স্থাপন করতে হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে এখানে এমন কে আছেন যিনি আজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারেন যে ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের অচ্ছেদ্য মিলন সংগঠিত হয়েছে; এখানে এমন কে আছেন যিনি তাঁকে বলতে পারেন যে পার্শী, শিখ, ক্রিশ্চান, ইহুদী এবং অস্পৃশ্যগণ এই কল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না।

তিনি আরও বললেন যে সকলের আগে তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং নিজেদের গভীরতা জানতে হবে। যার গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নেই সেরূপ জলাশয়ে আমরা যেন না নামি। মিষ্টার হসরত মোহানীর এই প্রস্তাব সকলকে অতল গভীরে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর তিনি বললেন যে ক্রীড কি কাপড়-চোপড়ের মত এতই সাধারণ জিনিস যে যখন ইচ্ছা তার পরিবর্তন করা যায়? ক্রীডের জন্য লোক মৃত্যুবরণ করেছে এবং এই ক্রীডের জন্য লোকে যুগ যুগান্তর প্রাণ-ধারণ করেছে, যখন নাগপুর কংগ্রেসে এই ক্রীড গ্রহণ করা হয়েছিল তখন এক বৎসরের জন্য কোন সীমা নির্দেশ করে দেওয়া হয়নি। এই ক্রীড ব্যাপক। এই ক্রীডের বলে কংগ্রেসে দুর্বল সবল সকলেরই স্থান আছে।

তিনি তারপর প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে বললেন যদি তাঁরা মৌলানা হসরত মোহানীর সীমাবদ্ধ ক্রীড় গ্রহণ করেন তা হলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা দুর্বলচিত্ত তাঁদের শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে।

উপসংহারে তিনি জানালেন যে তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে সকলকে বলছেন।

মহাত্মা আসন গ্রহণ করলে মৌলানা হসরত মোহানী প্রত্যুত্তর দিতে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেখালেন এবং প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করলেন যেন তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দেন। "আল্লা হো আকবর" ধ্বনির মধ্যে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর সভাপতিমশায় উর্দ্দুতে সংক্ষিপ্ত কথায় প্রস্তাবটি বুঝিয়ে দিলেন। তিন বললেন—মহাত্মা গান্ধীর ব্যাখ্যা অনুসারে স্বরাজ শব্দের দুই অর্থই হতে পারে। মৌলানা সাহেবের প্রস্তাবে 'স্বরাজের' একটি মাত্র অর্থ, অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা রাখা হয়েছে।

সভাপতিমশায়ের বক্তব্য সোয়েব কোরেশী ইংরেজী অনুবাদ করে শোনালেন।

তারপর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হল। বিপুল সংখ্যাধিক্যে মৌলানা সাহেবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

এই প্রস্তাবই বর্তমান কংগ্রেসের শেষ প্রস্তাব।

এরপর সভাপতিমশায় তাঁর বিদায়ী অভিভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে উর্দ্দুতে বললেন।

সভাপতিমশায় বললেন যে ধৈর্য্যের সহিত গভীর মনোযোগ সহকারে সভার কার্য্যে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রতিনিধিগণকে তিনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

তিনি বললেন যে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করে প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে গুরু দায়িত্ব নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন, সেই দায়িত্ব পালন করতে তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকবেন।

তারপর তিনি বললেন তাঁর রুলিংয়ের জন্য এবং বক্তৃতার অনুমতি না দেওয়ার জন্য যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরা যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি জনালেন যে অন্যান্য বক্তাগণকে বক্তৃতার জন্য বেশী সময় দেন নি সুতরাং তিনি নিজে বক্তৃতার জন্য দীর্ঘ সময় নিতে চান না।

তারপর তিনি আমেদাবাদের অধিবাসীদের অপূর্ব আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বিশেষ করে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ কস্তুরীভাই মনিভাই ও শেঠ বিমলভাই মায়াভাইয়ের নাম উল্লেখ করলেন। তিনি স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আসন গ্রহণ করলেন।

সভাপতি মশায়ের আসন গ্রহণ করার পর তাঁকে ধন্যবাদ দিতে উঠলেন গত নাগপুর কংগ্রেসের প্রবীণ সভাপতি সি বিজয় রাঘবাচারী। অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে তাঁরা নিজদের অভিনন্দন করতে পারেন এই ভেবে যে তাঁরা শ্রীদাশের জেল হওয়া রূপ দুর্ভাগ্য থেকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হাকিম আজমল খাঁর সভাপতিত্বরূপ সৌভাগ্যলাভ করেছেন। তারপর তিনি সভাপতিকে ধন্যবাদসূচক এক প্রস্তাব সভায় পেশ করলেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বল্লভভাই প্যাটেল প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করলেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর শেঠ যমনালাল বাজাজ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেলকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীমতী সত্যবালা দেবী কর্তৃক হিন্দীতে সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

উত্তর দিতে উঠে বল্লভভাই প্যাটেল—অভ্যর্থনা সমিতিতে যে সকল সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়েছিল তার বর্ণনা দিলেন।

এর পর রাষ্ট্রীয় স্ত্রী মহামণ্ডল কর্তৃক "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভাপতি মশায় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

'বন্দে মাতরম্' এবং "মহাত্মা গান্ধী কী জয়" ধ্বনির মধ্যে অধিবেশন শেষ হল। ক্রমশঃ

জাতীয় বাজেটের সমালোচনা

"যুগবাণী" সাপ্তাহিকে জাতীয় আয়-ব্যয়ের আগামী বৎসরের জন্য অর্থমন্ত্রীর রচিত হিসাবের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূল কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত রাও চ্যবন লোকসভায় বাজেট পেশ করার পর কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েকটি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর "গরীবী হঠাও" শ্লোগানের বেলুন ফাঁসিয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছেন নিম্ন মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে। সিগারেট, সাবান, মোটা, মাঝারি ও সরু কাপড়, রেডিমেড বস্ত্র, ট্রেণ ও বাসভাড়া, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেজিস্ট্রী চিঠি পাঠানো, রুটি, পাখা, ইলেকট্রিক ইস্ত্রী, চুলের তেল, চিনামাটির বাসন, কাঁচের বাসন প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর নতুন করের বোঝা চাপানো হইয়াছে। টেরিলিন, টেরিকট জাতীয় বস্ত্রের উপর কর বসে নাই, বসিয়াছে সুতী বস্ত্রের উপর। বিড়ির উপর কর বসানো হয় নাই, মদের উপরও নয়, হইয়াছে শুধু সিগারেটের উপর। অর্থাৎ সোজা ভাষায়, ধনী ও শ্রমিক এই দুইটি শ্রেণীকে নতুন কর হইতে যতটা সম্ভব রেহাই দিয়া মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তকে খতম করাই আমাদের নবা সমাজতন্ত্রীদের লক্ষ্য হইয়াছে। প্রত্যক্ষ কর বাড়িয়াছে—সেটা দিবে বাঁধা মাহিনার চাকুরিজীবীরা। অলিখিত আয়ের পথ যাদের খোলা সেই ফাটকাবাজ-কালোবাজারী—অসৎ পুঁজিপতিদের চাপিয়া ধরার চেষ্টা বর্তমান বাজেটে হয় নাই। সরকার দুই শ্রেণীর মানুষকে পছন্দ করেন—ধনী ও শ্রমিক; মধ্যবিত্ত শ্রেণীটাকে ঢিট করিতে চান কারণ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ একমাত্র তারাই দিতে পারে।

বাজেটে ডেফিসিট ফিনান্সিংয়ের প্রস্তাব নাই। সেটা মন্দের ভালো। কিন্তু এখনো যে ২২০ কোটি টাকা ঘাটতি থাকিয়া গেল উহা পূরণ হইবে কিভাবে? অর্থমন্ত্রী সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেন নাই। যে সকল নতুন কর ধার্য করা হইয়াছে তাহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আসিবে বাড়তি ২২০ কোটি টাকা। উহা হইতে ৫৩ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকিবে ১৭৭ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৭১-৭২ সালে বাজেটে মোট ঘাটতি ধরা হইয়াছে ৩৯৭ কোটি টাকা। উহার মধ্যে ১৭৭ কোটি টাকা পূরণ হইলেও আরও নীট ঘাটতি থাকিবে ২২০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ আরও অনেক বেশী ছাড়াইয়া যাইবে। কারণ নতুন উদ্বাস্তুদের জন্য বাজেটে মাত্র ৬০ কোটি টাকা খরচ ধরা হইয়াছে। যদি এক হইতে দেড় কোটি নতুন উদ্বাস্তু আসিয়া যায় তবে ভারত সরকার ৫০০ কোটি টাকা খরচ করিয়াও কূলকিনারা পাইবেন না। এ পর্যন্ত উদ্বাস্তু ত্রাণের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য অতি সামান্যই আসিয়াছে, প্রয়োজন মাফিক সাহায্য আসার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারত সরকার এই উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব লইতে বাধ্য হওয়ায় বাজেটের কোন হিসাবই আর চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধিয়া যায়—সে সম্ভাবনাও প্রবল—তবে যুদ্ধের খরচ কত হইবে? যুদ্ধ যদি আন্তর্জাতিক রূপ লয়, চীন, রাশিয়া ও আমেরিকা জড়াইয়া পড়ে—তবে? যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহা

হইলে ? এই সব সম্ভাবনাগুলিকে বাজেটে স্বীকার করা হয় নাই। সে জন্যই মনে হইতেছে বর্ত্তমান বাজেট একেবারেই চোরাবালির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার সব হিসাব ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।

প্রতিরক্ষা খাতে খরচ ধরা হইয়াছে এ বছর ১২৪১·৬৬ কোটি টাকা। গত বছর এই খাতে খরচ হইয়াছিল ১১৮২.৮৩ কোটি টাকা। গত বারের তুলনায় এবার ৬৮·৮৩ কোটি টাকা বেশী প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ধরা হইয়াছে। এক বছরে এই প্রায় ৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বাড়ানো হইল কেন ? পাকিস্তানের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের খরচটাকি ঐভাবে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের পক্ষে ঐরূপ অনুমান করিলে কি অসঙ্গত হইবে ? ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে ভারতের খরচ হইয়াছিল ৫০ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন এবারও যুদ্ধ হইলে ঐ পরিমাণ টাকাই খরচ হইবে। উদ্বাস্তুর যে স্রোত আসিতেছে তাহা চিরতরে বন্ধ করিতে লাগিবে মাত্র ৫০-৬০ কোটি টাকা, আর উদ্বাস্তু আগমন বন্ধের ব্যবস্থা না করিয়া উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন করিতে গেলে এক হাজার কোটি টাকায়ও কুলাইবে না। সেজন্যই বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যুদ্ধ না করিয়া লাভ কি ? যুদ্ধ করিলেই খরচ কমিবে।

যাই হোক, চ্যবন যে বাজেট পেশ করিলেন তাতে ডেফিসিট ফিনান্সিং আবার বাড়তি নোট ছাপানোর দিকে সরকার ঝুঁকিবেন। নতুন করের সঙ্গে নতুন আকারে মূল্য স্ফীতি ঘটিলে জনসাধারণ দুঃখের সাগরে পড়িবে।

তবে একটা কারণে আমরা অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁর বাজেট প্রস্তাবগুলিতে কোন জটিলতা নাই। তিনি কথার মারপ্যাঁচ বেশী দেখান নাই। টিটি কৃষ্ণমাচারির মতো জটিল বাজেট তিনি পেশ করেন নাই এবং মোরারজী দেশাইয়ের মতো নির্মম প্রস্তাবও তিনি রাখেন নাই। এই বাজেটে এমন কোন প্রস্তাব নাই যাহার ফলে কোন বিশেষ পেশা বা ব্যবসা ধ্বংস হইবে। নতুন বোঝা সবার ঘাড়েই কম বেশী চাপিল—মধ্যবিত্তের কষ্টই সবচেয়ে বেশী বাড়িবে—তবে পুঁজি বিনিয়োগে নিরুৎসাহ ঘটাইবার মতো কোন প্রস্তাব না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ বাড়িবে ও নতুন কর্ম্মসংস্থানের কিছু সুযোগ সৃষ্টি হইবে। মধ্যবিত্তের পক্ষেও সেটাই একমাত্র সান্ত্বনা।

ছাত্রদিগের চরিত্র জাতীয় চরিত্রেরই অংশ মাত্র

ছাত্রদিগের ব্যবহার লইয়া অনেক নিন্দাবাদ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। কিন্তু ছাত্রদিগের অভিভাবকদিগের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোনও কথা কেহ বিশেষ বলেন না। "যুগজ্যোতি" পত্রিকার এই বিষয়ে লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত সম্পাদকীয় উক্তি সকলের পাঠযোগ্য :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন সম্প্রতি ছাত্রদের উদ্দেশে একটি বেতার ভাষণে বলিয়াছেন যে বর্ত্তমানে পরীক্ষায় নকল করা কলিকাতায় যে ভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাতে পরীক্ষা গ্রহণ করিবার কোনই অর্থ হয় না। তিনি ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন যে ইহার ফলে সারা ভারতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এমন দুর্ণাম রটিয়াছে যে অন্য কোন রাজ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-উত্তীর্ণ ছাত্রদের যোগ্যতা স্বীকৃতি লাভ করিতেছে না। তাঁহার এই উক্তি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রশ্ন উঠিতেছে যে ছাত্ররা যে আজ এমন ভাবে দুর্নীতির আশ্রয় লইতেছে তাহার কারণ কি ? মানুষ বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায় পারিপার্শ্বিকের উপরে উঠিতে পারে না এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারাই তাহাদের চরিত্র গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে আজ যে ভাবে সমাজের প্রতিস্তরে দুর্নীতি প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাতে ছাত্ররাও যে তাহার শিকারে পরিণত হইবে তাহাতেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। আজ মূল মন্ত্র হইয়াছে "Nothing succeeds like success" (সফলতার মত অন্য কোন কিছুই সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে না)। যে কোন উপায়ে জীবন যুদ্ধে মোটামুটি সার্থকতা লাভ করিতে পারে যে সেই আজ "বাহাদুর"

বলিয়া সমাজে কীর্ত্তিত হয়। যে ব্যর্থতা অর্জ্জন করে তাহার চরিত্র, শিক্ষা দীক্ষা নীতিজ্ঞান যত উচ্চ স্তরেরই হোক না কেন সমাজে অবহেলিত হয়। ছাত্ররাও তাই জ্ঞানার্জ্জন অথবা চরিত্র গঠনের জন্য বৃথা প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সহজ উপায়ে পরীক্ষার সাফল্য অর্জ্জন করিয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিবে তাহাতেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ?

ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয় গৃহে পিতামাতা ও বয়জ্যেষ্ঠদের প্রভাবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আদর্শে। তাহা ছাড়া প্রথিতযশা ব্যক্তি অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা প্রভৃতি "মহাজনদের পন্থা" ও তাহারা অনুসরণ করে। গৃহে তাহারা দেখে পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকরা অর্থের নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। নীতির বালাই সেখানে নাই ; কি ভাবে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা অপরকে ঠকাইয়া সুযোগ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায় সেই চেষ্টায়ই তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি তাঁহারা সর্ব্বদা নিয়োগ করিয়া রাখিতেছেন। কাহারও পিতা ঘুষ লইতেছেন কাহারও পিতা ঘুষ দিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতেছেন আবার কাহারও পিতা ইহার কোনটি না করিতে পারার জন্য "অপদার্থ' 'অকর্ম্মণ্য' বলিয়া গৃহিনী ও আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতেছেন। তরুণরাও বাল্যকাল হইতে শিখিতেছে সাফল্যই কাম্য, কোন পথে কি ভাবে তাহা আসিবে তাহা বিচার্য্য নয়। অধিকাংশ পিতামাতা বা অভিভাবকরা সন্তানের জ্ঞান কতখানি হইল তাহা জানিতে চাহেন না—পরীক্ষায় সে পাশ করিল কিনা, বড় জোর কত নম্বর পাইয়াছে তাহা জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এই পরিস্থিতিতে যে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠিত হইতেছে, তাহাদের কাছে কি আশা করা যায় ?

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের চরিত্রও ছাত্রদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আজ শিক্ষকরাও শুধু অর্থের উপাসনায় মগ্ন—ছাত্রদের সত্যকার শিক্ষা দিবার কোন চেষ্টাই তাঁহাদের নাই। ট্রেড ইউনিয়ান গঠন করিয়া বা ধর্ম্মঘট কার্য্য বিরাট প্রভৃতির সাহায্য কিভাবে বেতন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে তাহাই তাঁহাদে লক্ষ্য। অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য অধ্যাপনায় তাঁহার মনসংযোগ করিতে পারেন না এবং গৃহ শিক্ষার কার্য করিয়া সংসারে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অধ্যাপনায় মন সংযোগ করিতেও পারেন না। তাই ছাত্রদের পরীক্ষা সাগর পার করাইবার জন্য প্রশ্ন পত্র কি হইবে সে সম্পর্কে তাহাদের বাধ্য হইয়াই নির্দেশ দিতে হয়। এইভাবে যে সকল ছাত্র ফাঁকি দিয়া পরীক্ষায় পাশ করিবার শিক্ষা শিক্ষকের নিকট পায়—তাহারা আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া নকল করিয়া বাজি মাত করিতে চাহিবে তাহাও স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রথিতযশা ব্যক্তি বা নেতাদের চরিত্র সম্পর্কে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র ! স্বার্থ ও গদির লোভে তাঁহারা এমন উন্মত্ত যে ন্যায় অন্যায় কিছুই তাঁহাদের বিচার্য্য নয়। নিজ স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলা, অন্যায় পন্থার সাহায্য লওয়া, স্বেচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা রটনার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীর চরিত্র হনন করা এমন কি সময় সময় তাঁহাকে হত্যা করা প্রভৃতিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। তরুণ ছাত্ররা দেখিতেছে জীবন সংগ্রামে এই ভাবে অন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়া কত মানুষ সাফল্য লাভ করিতেছে। হীন জঘন্য কাজের সাহায্যে গদি লাভ করিয়া কত নেতা জাতীর শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন। এই অবস্থায় যদি তাহারাও "যন তেন প্রকারেণ" পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন করে তাহাতে শিহরিয়া উঠিবার কোন কারণই নাই। ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করিবার উপদেশ দিবার আগে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহাদের পিতা অভিভাবক বা শিক্ষক অথবা সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতাদের কয়জনের নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন অসাধু উপায়ে সাফল্য অর্জ্জনের সুযোগ পাইয়া সেই লোভ সম্বরণ করিতে পারেন ?

সমগ্র জাতি আজ অধঃপতিত কেন হইয়াছে তাহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ইহার মূলে

রহিয়াছে শোচনীয় অর্থনৈতিক দুর্গতি। ভারত স্বাধীন হইবার পর হইতে যে অবিশ্রান্ত ক্ষমতার লড়াই রাজনীতি ক্ষেত্রে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে জয়লাভের জন্য নেতৃবর্গ পরস্পরবিরোধী কতকগুলি "ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন" এর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দানবের সংঘাতে ও সংঘর্ষে দেশ হইতে নীতি, চরিত্র ও মহান আদর্শ বিদায় লইয়াছে। ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই নীতিজ্ঞানহীন রাজনৈতিক নেতারা তোষণ অথবা বঞ্চনার দ্বারা ভোট লাভের শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপনাই গণতন্ত্রের চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। ইহার ফলে ভারতে প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং রাজনীতি ক্ষেত্র ভাগ্যা-ন্বেষীদের শিকারক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁহার ভাষণে প্রাচীন শিক্ষাবিদ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করিয়াছিলেন "আমাদের জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রে সংস্কার অথবা পুনরুজ্জীবন আনিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। উপাস বৃক্ষের নীচে থাকিলে কোন কিছুই সমৃদ্ধ হইতে পারে না। বর্ত্তমান প্রশাসন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিলে শিক্ষা বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর নয়"।

ত্রিপুরার শরণার্থী ত্রাণ ব্যবস্থা

"ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে প্রকাশ :

ত্রিপুরা বিধানসভার ৪ (চার) জন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গত ৩১শে মে লেঃ গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সর্বশ্রী যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, ক্ষিতীশ দাস, রাধিকারঞ্জন গুপ্ত, কমলজিৎ সিং এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিভ্রান্তিকর।

প্রতিনিধি দল লেঃ গভর্ণরের নিকট কোন স্মারকলিপিই দাখিল করেন নাই। বস্তুত পক্ষে লেঃ গভর্ণরের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর তাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন অতি ক্ষুদ্র এবং ইহার সম্পদ সীমিত তথাপি অপ্রত্যাশিত ভাবে বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য ত্রিপুরা সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তবে সমস্যাটি এত বিরাট যে ত্রাণ কার্য্যে কোন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক হইতে পারে না। লেঃ গভর্ণর তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে সকল শরণার্থী তাহাদের বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আছেন তাহাদিগকে রেশন দানের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। ভারত সরকারের সঙ্গে লেঃ গভর্ণর নিজেও এ বিষয়ে পত্রালাপ করিতেছেন।

ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া ত্রিপুরা সরকার সাহায্য সম্প্রসারণ করিতে পারে না। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে আসাম সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বসবাসকারী শরণার্থীদের রেশন দিতেছেন না।

শরণার্থীদের কাপড় চোপড় এবং বাসন পত্র সরবরা-হের সম্বন্ধেও ভারত সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ চলিতেছে। বর্ত্তমান নির্দেশ অনুযায়ী পুনর্বাসন বিভাগের বাজেট হইতে কাপড় চোপড় ও বাসনপত্র সরবরাহের জন্য ব্যয় নির্বাহ করা চলে না। স্বেচ্ছাসেবী অথবা দানশীল প্রতিষ্ঠানগুলিই এই সমস্ত জিনিস দিতে পারেন। ত্রিপুরা বাংলা দেশ নারী শরণার্থী শিবিরে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাপড় চোপড় বন্টন করিতেছেন। এই সমস্ত কাপড় তাহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন অথবা নিজেদের সংগৃহীত অর্থ ভাণ্ডার হইতে ক্রয় করিয়াছেন।

শরণার্থী শিবিরগুলিতে ড্রাই রেশন দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিনিধি দলকে জানানো হইয়াছে যে ড্রাই রেশন বন্টনের ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অনেক শিবিরে ড্রাই রেশন দেওয়া হইতেছে। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ডোল হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান করা চলে না।

ভারতীয় রেড ক্রশ, রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শিশু

ভাণ্ডার (ইউনিসেফ) পুনর্বাসন মন্ত্রনালয় এবং বাংলা দেশ সহায়ক সমিতির নিকট হইতে কিছু গুড়া দুধ এবং ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি শরণার্থী শিবিরে ব্যবহৃত হইতেছে।

পাকিস্থানী আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

"যুগশক্তি" (করিমগঞ্জ) পত্রিকায় প্রকাশ :

গত ১৪শে মে দুপুরে পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী করিমগঞ্জ সহরের অদূরবর্ত্তী সুতারকান্দি-জারাপাতা সীমান্ত এলাকায় প্রচণ্ডভাবে গুলী বর্ষণ করিতে করিতে ভারতীয় এলাকায় এক মাইল ভিতরে অনুপ্রবেশ করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দুইজন এবং পাঁচজন গ্রামবাসী পাক সৈন্যের এক আকস্মিক হামলায় নিহত হন। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চারজন এবং ছয়জন গ্রামবাসী আহত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া পাক সৈন্য কর্তৃক দুইজন গ্রামবাসীকে অপহরণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রথমে কোন সক্ষম প্রতিরোধ তৈরী করিতে ব্যর্থ হন। ফলে কয়েক ঘণ্টার জন্য সুতারকান্দি চেক-পোষ্টসহ ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় কিছু অংশ পাকিস্তানীদের হাতে আসে এই সময় তাহারা জারাপাতা ও সুতারকান্দির কয়েকটি ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দেয়। পরে আসাম পুলিশ ব্যাটেলিয়নের একটি দল আক্রমণ করিয়া ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া যাইতে পাক সৈন্যদের বাধ্য করে।

করিমগঞ্জ বাংলাদেশ ত্রাণ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীভুপেন্দ্রকুমার সিংহ, প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও আসামের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার বার্তাযোগে এই ঘটনার বিবরণ জানাইয়া অবিলম্বে করিমগঞ্জের সহর বাজার ও গ্রাম এলাকার নিরাপত্তা বিধানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানাইয়াছেন। তার বার্তায় বলা হয় যে, কুশিয়ারার অপর তীরে জকিগঞ্জে পাক বাহিনীর আক্রমণাত্মক প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের নিরা-পত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে। সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে এবং সীমান্তবর্ত্তী গ্রাম ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অনেকেই অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন।

ভারতীয় সামরিক আয়োজন উপযুক্ত রকম নাই বলিয়া ঐ পত্রিকা যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে :

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম করিমগঞ্জ সীমান্ত ভ্রমণ করিয়া যাওয়ার ঠিক পরেই সুতারকান্দি সীমান্তে পাক বাহিনীর বর্বর হামলায় মোকাবিলায় আমাদের সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থার যে শোচনীয়তা প্রকট হইয়াছে, তাহা যে কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পক্ষেই লজ্জাকর। পাকিস্তানী হামলাকারীরা যে অকস্মাৎ এই হামলা করিয়াছে, তাহা নয়, কারণ গোটা সীমান্ত জুড়িয়া বেশ কিছুদিন ধরিয়াই প্রকাশ্যেই তাহারা যুদ্ধ প্রস্তুতি চালাইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্বয়ং তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও আক্রমণের মুখে আমাদের প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এতটা বিপর্য্যয় হইল কেন সেই কৈফিয়ৎ উপদ্রুত এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার অধিবাসীরা নিশ্চয়ই সরকারের নিকট দাবী করিতে পারেন।

আমাদের রাষ্ট্রনীতির নিয়ামকগণ পাকিস্তানীদের শুভবুদ্ধির উপর এক ধরণের নির্ব্বোধ আস্থা স্থাপন করিয়া থাকেন এবং বহুবার ঠেকিয়াও তাহারা কোনরূপ বাস্তব শিক্ষা গ্রহণে অপারগ হন। বস্তুতঃ এই ধরণের বজ্জাতি প্রতিরোধের জন্য শুধুমাত্র প্রতিবাদ পত্রের উপর নির্ভর না করিয়া দ্রুত সক্রিয় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা হইলে তবেই পাকিস্থানী জঙ্গী কর্তাদের বিষদাঁত ভাঙ্গিবে এবং পৌনঃপুনিক এই ধরণের ঘটনার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য ভারত সরকারকে সেই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে।

এই হামলায় যাঁহারা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের আত্মীয় পরিজনের এবং আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে পর্য্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

দেশ-বিদেশের কথা

কারখানা বন্ধ ও কর্ম্মীদিগের প্রাপ্য সম্বন্ধে আইন

একটা রাষ্ট্রপতির হুকুমনামা জারি করিয়া নিয়ম করা হইয়াছে যে, অতঃপর কোন কারখানা বন্ধ করিতে হইলে মালিকদিগকে সরকারকে ষাট দিন পূর্ব্বে জানাইতে হইবে যে তাঁহারা কারখানা বন্ধ করিবেন। এই নিয়ম চালিত হইলে সরকারী কর্ম্মচারীগণ যথেষ্ট সময় পাইবেন যাহাতে তাঁহারা মালিক ও শ্রমিক বিবাদ থাকিলে তাহার সমাধান করিতে সক্ষম হইতে পারেন। অথবা যে স্থলে ঐরূপ বিবাদ নাই, অন্য কারণে কারখানা বন্ধ হইতেছে সেখানেও সরকারী কর্ম্মচারীগণ কারখানা চালু রাখার ব্যবস্থা করিতে যথেষ্ট সময় পাইবেন। অর্থাৎ কারখানা বন্ধ করা যদি মালিকদিগেরই এক তরফা বিচারের উপর নির্ভর করে; তাহা হইলে ষাট দিন সময় থাকিলে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণ চেষ্টা করিয়া কারখানা চালাইয়া রাখিতে সক্ষম হইতে পারেন। এই নিয়মের মূলে যে ধারণা রহিয়াছে তাহা হইল যে মালিকগণই অধিক স্থলে কারখানা বন্ধ করিবার জন্য দায়ী এবং তাঁহাদিগের উপর সরকারী প্রভাব বিস্তার করিলে কারখানা চালু রাখা সম্ভব হইবে। বাংলা দেশে বর্ত্তমান কালে যে ৪০০ শত কারখানা বন্ধ হইয়াছে, প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে সেই কারখানাগুলি কি কারণে ও কেমন করিয়া বন্ধ হইল। যদি দেখা যায় যে ঐ কারখানাগুলির মধ্যে অধিকাংশং মালিকগণ ইচ্ছা করিলেই চালু রাখিতে পারিতেন তাহা হইলে এই নুতন হুকুম জারি করার একটা অর্থ হয়। এবং যদি দেখা যায় যে মালিকগণ ইচ্ছা থাকিলেও অপর কারণে বাধ্য হইয়া কারখানা বন্ধ করিয়াছেন তাহা হইলে সেই অপর কারণগুলি যাহাতে আর থাকিতে না পারে সেই চেষ্টাই করা বিশেষভাবে আবশ্যক। ইহা ব্যতীত দেখিতে হইবে যে সরকারী কর্ম্মচারীগণ সকল সময়ে কারখানায় গোলযোগ সৃষ্টি বিষয়ে নির্দ্দোষ কি না। কারণ তাঁহারাও অনেক সময় উল্টা পথে চলিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত দেখিতে হইবে যে সরকারী প্রভাব নিরপেক্ষ ভাবে নিযুক্ত করা হয় কি না। সরকার অর্থে আজকাল বুঝিতে হয় রাষ্ট্রীয় দল ও গোষ্ঠীগুলিকে। এই সকল দল ও গোষ্ঠী অনেক সময় ব্যবসা বাণিজ্য ও কারখানার নিয়ন্ত্রণ ও চালনা ক্ষেত্রে সমাজ বিরোধীতা করেন ও ফলে সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহাতে সুনীতি ও ন্যায়সঙ্গতভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কারখানার কর্ম্মীদিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্ব নিম্ন বেতনে কাজ করে, তাহারা সর্ব্বদা "ইউনিয়ন" গড়িয়া ও আন্দোলন করিয়া নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করাইতে সক্ষম হয় না। অধিক বেতনের কর্ম্মী, যাহারা চাঁদা দিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রের নেতাদিগকে দলে টানিতে সক্ষম হয় তাহারাই রাষ্ট্রীয় দলগুলির সমর্থন লাভ করিয়া থাকে। এবং ফলে দেখা যায় যে কর্ম্মীদিগের মধ্যে যাহারা ঘোর অভাবের মধ্যে নিমজ্জিত নয় এবং তুলনা মূলক ভাবে কর্ম্মী জগতে উপার্জ্জনে অধিক পারগ তাহারাই প্রাপ্তিবৃদ্ধির জন্য প্রবল আন্দোলন চালায় এবং রাষ্ট্রীয় দলগুলির সাহায্য লাভ করে। ইহার মূলে আছে ঐ টাকা দিবার ক্ষমতা যাহা না থাকিলে আজ-কাল কোন ক্ষেত্রেই কোনও কিছু করা সম্ভব হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ভারতের কারখানা জগতে যে সকল গোলযোগ হইয়া থাকে তাহার মূলে সাম্য বা সমাজবাদের আবেগ বা আদর্শ নাই; আছে যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা অপেক্ষা অধিক পাইবার চেষ্টা। এবং যাহারা এই সকল আন্দোলনে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁহারা হইতেছেন রাষ্ট্রীয় দলের সহিত সংযুক্ত।

তাঁহাদের মধ্যে অধিক পাওয়ারাই হইলেন সেই সকল গণ্ডির মানুষ যাঁহাদের অভাব ও অধিক পরিশ্রমের সহিত কখনও সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই।

ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান চেষ্টা না করিয়া শুধু লোক দেখান অপপ্রচার ও জনগণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টাই সর্ব্বক্ষেত্রে করা হইয়া থাকে। ফলে সর্ব্বব্যাপী যে বেকার সমস্যা ও পাঁচলক্ষ গ্রামে যে নিদারুন দারিদ্র ও অভাব তাহা দূর করিবার কোনও কার্য্যকরী ব্যবস্থা কেহ করিতেছে না। শুধু কথার বাহার ও সেই কথাকে রূপায়িত করিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ ং বহুল কাল্পনিক বুদ্বুদের সৃজন করাই ভারতের সমাজবাদকে একটা মহা মিথ্যায় পরিণত করিতেছে।

যাহারা কর্ম্মজীবনের শেষে অবসর গ্রহণ করে তাহারা যাহাতে "প্রভিডেন্ট ফাণ্ড" ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পায়; সে ব্যবস্থাও অল্প সংখ্যক কর্ম্মীর জন্য করা হইতেছে। এই যে দুই লক্ষ কর্ম্মী "গ্র্যাচুইটি" পাইবে; ইহারা ভারতের কর্ম্মীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র নহে। এই ব্যবস্থাও অত্যাবশ্যক ছিল বলিয়া মনে হয় না। জাতির কর্ত্তব্য অভাব যেখানে প্রবলতম সাহায্যের হস্ত সেইদিকে প্রসারিত করা। কিন্তু নাম কিনিবার আগ্রহে রাষ্ট্রনেতাদিগের সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ যথাযথভাবে জাগ্রত না হইয়া যাহা বলিলে বা করিলে সহজে আত্ম-শ্লাঘা অনুভব করা যায় ও জগতের নিকট আত্মগুণ কীর্ত্তণ সহজ হয়, সেইরূপই ঘটাইবার আয়োজন করা হইয়া থাকে।

আমেরিকা পাকিস্থানকে সামরিক সরঞ্জাম দিয়া চলিয়াছে

২৫শে মার্চ্চের পরে আমেরিকা পাকিস্থানকে আর কোনও সামরিক সাহায্য দিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও আমেরিকা এখনও জাহাজ বোঝাই করিয়া অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্থানে পাঠাইয়া চলিয়াছে। এই প্রতিশ্রুতি দিবার কারণ ছিল বাঙলাদেশের পাকিস্থানী গণহত্যা যাহাতে অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহের ঘাটতির ফলে কিছুটা হ্রাস হইয়া যায় সেই চেষ্টা। আমেরিকা বলিতেছে যে এখন যে সকল জাহাজ অস্ত্র লইয়া পাকিস্থানে যাইতেছে সেই অস্ত্রগুলির সরবরাহ-আজ্ঞা ২৫শে মার্চ্চের পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলেও যদি সরবরাহ-আজ্ঞা তিন মাস ব্যবহার না করা হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে উহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখিলেই উচিত হইত। যেখানে সামরিক সাহায্য বন্ধ করার উদ্দেশ্য গণ-হত্যা দমন; সেখানে কোন একটা হাল্কা অজুহাত দিয়া সেই সাহায্য দেওয়া কতটা অন্যায় তাহা আমেরিকাকে বুঝাইবার প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে। কিন্তু আমেরিকা একটা প্রতিশ্রুতি দিয়া যদি তাহা কার্য্যতঃ নাকচ করিবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহা নিবারণ করা কঠিন কার্য্য। বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এমনই জিনিস যে তাহা নানা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নিজ নীচ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। তবে আমেরিকার মত উচ্চ-স্তরের রাষ্ট্র যদি কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা হইলে সে প্রতিশ্রুতি যে সত্য মনোভাব প্রণোদিত নহে এরূপ চিন্তা করিবার কারণ থাকা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে আমেরিকার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কথার অর্থ বক্র করিয়া বুঝাইয়া জগৎবাসীকে প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টার আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নহে। পাকিস্থান যখন কম্যুনিষ্টদিগের সহিত দ্বন্দ্বে ব্যবহারের জন্য বিশেষ করিয়া পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র ১৯৬৫ খৃঃ অব্দে ভারতের বিরুদ্ধে চালাইয়াছিল, তখনও আমেরিকা সে অন্যায় অনায়াসে হজম করিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ আমেরিকার সত্য মিথ্যা জ্ঞান অনেকটা নিজেদের সুবিধা অসুবিধা বোধের উপর নির্ভরশীল। অনেক জাতির সম্বন্ধেই কথাটা খাটে; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, যেখানে নিরস্ত্র জনগণকে সশস্ত্র পাক বাহিনী নির্দ্দয়-ভাবে হত্যা করিয়া চলিয়াছে, সে ক্ষেত্রে ঐ পাক সৈন্য-দিগকে অস্ত্র সরবরাহ করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া তৎপরে নানা ফিকিরে সেই প্রতিশ্রুতিকে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করা আমেরিকার মত রাষ্ট্রের পক্ষে

একটা অতি বড় গর্হিত কার্য্য। সেইজন্য এইরূপ ঘটিলে বিশ্ববাসীর উচিত আমেরিকাকে এই কথা লইয়া খোলাখুলিভাবে তাহাদের মানবীয় আদর্শ বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে দোষারোপ করা।

সামরিক অস্ত্রাদি পাকিস্থানকে ততদিন দেওয়া হইবে না যতদিন পাকিস্থান পূর্ব্ববাঙলার জনসাধারণের সহিত একটা ন্যায্য রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন না করে—এই কথার অর্থ এই যে পূর্ব্ব বাঙলায় ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে কোন সাধারণতন্ত্র অনুগত শাসন রীতির প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত পাক বাহিনী গণহত্যা চালাইতে থাকিবে এবং সেইজন্য নূতন শাসন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা না হওয়া অবধি ঐ সেনাদলকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা গণহত্যার সহায়তার কার্য্য বিবেচনা করিতে হইবে। আমেরিকার পক্ষে পাকিস্থানকে এই সময়ে পাঁচ জাহাজ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা একটা অতি বড় অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। ইহার জন্য আমেরিকাকে বিশ্বমানবের দরবারে জবাবদিহি করিতে হইবে।

পাকিস্থান সহায়ক জাতিসংঘ কর্তৃক পাকিস্থানকে সাহায্য বন্ধ

ভারতকে নানা ভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য করার উদ্দেশ্য যেরূপ একটা ভারত সহায়ক জাতি সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে (Aid India Club) সেইরূপ একটা পাকিস্থান সহায়ক সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বাংলাদেশের গণহত্যা ও জন উৎপীড়ন লইয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রবল আন্দোলন হওয়ার ফলে এই পাকিস্থান সহায়ক জাতি-গুলি মিলিত ভাবে স্থির করিয়াছেন যে বাংলাদেশের জনসাধারণের সহিত পাকিস্থান সরকার যতদিন না একটা রাষ্ট্রীয় সুনীতি সঙ্গত বোঝাপড়া করিয়া কোন ন্যায্য শাসন পদ্ধতি স্থাপন করে ততদিন পাকিস্থানকে সাহায্য করা স্থগিত রাখিতে হইবে। যে সকল জাতি পাকিস্থানের অর্থ-নৈতিক সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে গ্রেট বৃটেনের নাম; সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য; কারণ পাকিস্থানের আরম্ভ হইতেই বৃটেন ঐ রাষ্ট্রকে যথাসাধ্য নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। সত্যকথা বলিতে বৃটেনই পাকিস্থানের জন্মদাতা বলিলে কোন অসত্যের অবতারণা করা হয় না। বৃটেন ভারত স্বাধীন হইলেও যাহাতে এই দেশে বৃটিশের দাঁড়াইবার একটা জায়গা থাকে সেই জন্য ভারত বিভাগ করিয়া দুইটি রাষ্ট্রগঠন ব্যবস্থা করে। ভারত ও পাকিস্থান এই দুই রাষ্ট্রই পূর্ব্বে মিলিতভাবে ভারত ছিল। বৃটিশের পাকিস্থান সম্বন্ধে প্রীতি থাকা স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশের গণহত্যা ব্যাপারে আমেরিকা অপেক্ষা বৃটেনই পাক সেনাবাহিনীর অধিক নিন্দাবাদ করিয়াছে। এখন যে বৃটেন পাকিস্থানকে সকল সাহায্য দান বন্ধ করিয়াছে তাহাতেও প্রমাণ হয় যে বৃটেন কূট নীতির খাতিরে সকল সুনীতি বর্জ্জন করিয়া সুবিধাবাদ অবলম্বন করিয়া চলিতে প্রস্তুত নহে। নীতিবোধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলে চীনদেশ। তৎপরে স্থান হয় আরও দুই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের। বৃটেন এখন অবধি নিজের সুনাম রক্ষা করিয়া চলিতেছে।

পূর্ব্ব বাংলার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য

পশ্চিম পাকিস্থান কর্তৃক পূর্ব্ব পাকিস্থান শোষণ ও পূর্ব্ব পাকিস্থানের বাঙ্গালী অধিবাসীদিগকে নিম্নশ্রেণীর নাগরিকের স্থানে বসাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এখন অনেক কথা নানা স্থান হইতে প্রচারিত ও আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্ব বাংলায় কিছুকাল পূর্ব্বে প্রবল ঘূর্ণবায়ু ও বন্যার প্রকোপে যখন লক্ষ লক্ষ লোক বিধ্বস্ত হইয়া অসহায় অবস্থায় জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয় ও যখন পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক শাসন কর্ত্তাদিগের সে সম্বন্ধে ঘুম ভাঙ্গিয়া সজাগ হইতে সপ্তাহাধিক সময় লাগিয়া যায়; এমন কি তৎপরেও যখন ঐ পশ্চিম পাকিস্থানীগণ সাহায্যের জন্য বিদেশ হইতে পাওয়া টাকাও নিজেদের ব্যবহারে লাগাইতে থাকে; তখন প্রথম ভারতের মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করে যে পাকিস্থানের তথাকথিত মুসলমান জাতির এক জাতিত্বের প্রকৃত অর্থ কি। পাকিস্থান যে

পশ্চিম অংশের পাঞ্জাবী প্রভৃতি জাতির সুবিধা ও প্রভুত্বের জন্যই গঠিত হইয়াছিল এবং বাংলাদেশের মুসলমানদিগকে যে পশ্চিমা মুসলমানগণ কিছুমাত্র আপন জন বা নিজেদের সহিত সমান স্তরের মানুষ বলিয়াও মনে করে না তাহা এই সময় প্রকটভাবে ভারতবাসীদের নিকট প্রকাশিত হইল। দেখা গেল যে পাকিস্থানের স্থাপন কাল হইতে ঐ পশ্চিমাগণ পূর্ব্ব পাকিস্থানের অধিবাসীদের শোষণ করিয়া সহস্র সহস্র কোটি টাকা নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করিয়াছে এবং বাঙালী-দিগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান ঐ বিষয় লইয়া প্রবল আন্দোলন করিয়া সকল বাঙালীদিগকে পশ্চিম পাকিস্থা-নের শোষনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিখাইতেছিলেন। এই আন্দোলনের ফলে পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণ শেষ অবধি একটা নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন এবং সকলকে এইরূপ বুঝিতে দেন যে নির্ব্বাচন হইয়া যাইলে পর সামরিক শাসন শেষ হইয়া সাধারণতন্ত্র চালিত হইবে। কিন্তু নির্ব্বাচন হইলে পর তাহা হইল না। শেখ মুজিবর রহমানকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং সারা পূর্ব্ব বাংলায় এক নির্ম্মম গণহত্যার পাশবিক তাণ্ডব আরম্ভ হইল যাহার ফলে ৫ লক্ষ বাঙালী নরনারী শিশু নিহত হইল, সহস্র সহস্র নারীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইল, শত শত ছাত্রীদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং ষাট লক্ষ পূর্ব্ব বাংলাবাসী পশ্চিম পাকিস্থানের বর্ব্বর সৈন্যদিগের অত্যাচার হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হইল।

এই অবস্থায় অনেকের মতে ভারতের উচিত ছিল পাকিস্থানের সামরিক শাসকদিগকে যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া গণহত্যা ও জন উৎপীড়ন হইতে বিরত হইতে বলা এবং তাহারা সে কথা না শুনিলে পূর্ব্ব বাংলায় সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে দমন করা। ভারত সরকার সেরূপ কোন সামরিক শক্তি ব্যবহার করিবার ইচ্ছা কোন সময় প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা জগৎজাতি সভার নিকট পাকিস্থা-নের বর্ব্বরতার কথা প্রকাশ করিয়া জগৎজনমতের চাপে পাকিস্থানকে সভ্যতার পথে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টাই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্তুরূপে ভারতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল ও ফলে ভারতের দেড় দুই কোটি টাকা দৈনিক ব্যয় হইতে লাগিল তখনও ভারত সরকার তাহা লইয়া অভিযোগ ও আপত্তি এবং সর্বদেশে প্রচার ব্যতীত আর কিছু করিলেন না। অনেকে বলিলেন পাকিস্থানের অন্ততঃ কিছুটা ভূখণ্ড দখল করিয়া ঐ উদ্বাস্ত দিগকে সেইখানে বসাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হইত। কিন্তু সেরূপ কিছু করা হইল না।

বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজ পশ্চিম পাকিস্থানীদিগের সহিত যে যুদ্ধ চালাইয়া চলিলেন; সকলে বলিল ভারত সরকার তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়া জয়যুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাই বা কতদূর করা হইল? সরকারীভাবে মুক্তিফৌজ কোন সাহায্য পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্যভাবে হয়ত কিছু কিছু সাহায্য পাইয়া থাকিবে। আন্তর্জাতিক আইনের দিক দিয়া ভারত সরকারের কার্য্যকলাপ নির্ভুল কিন্তু স্বার্থ রক্ষার দিক দিয়া কি তাহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক?

সাময়িকী

বাংলাদেশ ও পাকিস্থান

বাংলাদেশে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে সে সম্বন্ধে নানা প্রকার মতামত আছে। সেখানে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে মতামতের তাহা লইয়া বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সকলেই প্রায় একমত যে পাকিস্থানী সামরিক শাসকদল যে ভাবে বাংলাদেশে নরনারী শিশু নির্ব্বিশেষে গণহত্যা চালাইয়াছে ও এখনও চালাইয়া চলিতেছে মানব বর্ব্বরতার ইতিহাসে তাহার তুলনা কোথাও দেখা যায় না। পাঁচলক্ষ নরনারী শিশুকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে এই কারণে যে তাহারা বাঙালী এবং সুতরাং পশ্চিম পাকিস্থানীদিগের শাসন অধিকার সমর্থন করে না। পঞ্চাশ হাজার নারীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাহাদের অধিকাংশকে হত্যা করা হইয়াছে। বাছাই করিয়া অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত বাঙালীকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হইয়াছে। ছাত্রছাত্রী বালক বালিকা ও শিশু; কাহাকেও ছাড়া হয় নাই। বস্তি বাজার গ্রাম প্রভৃতি পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং তাহার বাসিন্দাদিগকে হয় প্রাণে মারা হইয়াছে নয়ত দেশত্যাগ করিয়া অন্য দেশে পলাইতে বাধ্য করা হইয়াছে। এখন যে সকল বাঙালী কোনও উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে তাহারা পাকিস্থানী শাসকদিগের সেনাবাহিনীর সহিত যথাশক্তি সংগ্রাম চালাইতেছে। কোন কোন স্থানে পাকিস্থানী সেনাদিগকে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ বিশেষভাবে ঘায়েল করিয়াছে। অনেক স্থলে পাকিস্থানীগণ নিজেদের দখল শক্তভাবেই রাখিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বহুস্থলে যোগাযোগ রক্ষাও করিয়া চলিয়াছে।

আমাদের দেশে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন পরিস্কার ধারণা সর্ব্বজনের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। একই সংবাদপত্রে নানা প্রকার মত প্রকাশিত হইতেছে। ইহার কারণ যথাযথ সংবাদ পাওয়া সকল সময় সম্ভব হইতেছে না। মিথ্যা অপপ্রচারের বাহুল্য আছে এই জন্য যে পাকিস্থানীগণ সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় দলগুলিও নিরপেক্ষভাবে কোন কিছু দেখিতেছে না। নিজেদের যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই সত্য বলিয়া তাহারা প্রচার করিতেছে। সংবাদপত্রে যাহারা লিখিতেছে তাহাদেরও নানা প্রকার মতলব অনুযায়ী রটনা করিতে দেখা যাইতেছে। যথা একই সংবাদপত্রে ১৫।২০ দিনের মধ্যে যাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে পরিস্কার প্রমাণ হইতেছে যে সংবাদ প্রচার শুধু সংবাদের উপরই নির্ভর করিতেছে না; ভিতরে অন্য কথাও কিছু কিছু আছে বলিয়া মনে হয়।

এক পত্রিকায় ২৯শে মে ১৯৭১ বলা হইতেছে:

"পূর্ববাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম জনিত পরিস্থিতি ক্রমেই বিভ্রান্তিকর পর্য্যায়ে পৌছিতেছে......পূর্ববঙ্গের জনসাধারণও অবর্ণনীয় অত্যাচার ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়া মনোবল হারাইয়া ফেলিয়াছে ও বাঙালী মুসলমানরাও হিন্দুদের উপর অত্যাচার সুরু করিয়াছে এ খবর আমরা প্রতিদিন পাইতেছি।......বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি ভারতের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে সংশয় মাথা তুলিতেছে। কটু মন্তব্য শোনা যাইতেছে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যাদের বেসাতির পণ্য তারা সক্রিয় হইতে সুরু করিয়াছে। এইবার ভারতের পক্ষে চরম সঙ্কট ও পরীক্ষার সময় আসিতেছে........."

পড়িয়া মনে হয় যে লেথকের মনে বাংলাদেশে যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতেছে তাহাদের উপর

পূর্ণ বিশ্বাস নাই এবং তাহারা যে শেষাবধি সংগ্রামে জয়লাভ করিবে সে আস্থাও নাই। ইহার কয়েকদিন পরে একই ঐ সংবাদপত্রে বলা হইতেছে (১২ইজুন ১৯৭১)

"প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে আলো-আঁধারি ভাষায় কথা বলা সুরু করিয়াছেন। তিনি কি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিবেন? পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? কোন প্রশ্নেরই সরা-সরি উত্তর প্রধানমন্ত্রী দিতেছেন না। ২৫শে মার্চ্চের পর দশ বারো দিনের মধ্যে ভারত সরকার মুক্তিফৌজকে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিলে বাংলাদেশ তখনই পাক সৈন্য মুক্ত ও স্বাধীন হইতে পারিত। ......শ্রীমতী গান্ধী তখন পার্লামেন্টে ও উহার বাহিরে বহু গরম কথা বলিয়াছিলেন দ্ব্যর্থবোধক ও ব্যাঞ্জনাময় ভাষায় নানা প্রকার মুখরোচক ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। আমাদের আশা হইয়াছিল যে তিনি শীঘ্রই একটি চূড়ান্ত কিছু করিবেন। তারপর দুইমাস অতীত হইয়া গিয়াছে পাক সৈন্যবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট ও বড় বড় শহরগুলি ছাড়াও পূর্ববাংলার গ্রামগুলি পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইয়াছে, মুক্তিফৌজ কার্য্যত সীমান্তে সরিয়া আসিয়াছে। মুসলিম লীগ পূর্ব-বাংলায় গড়িয়া বসিয়াছে। আওয়ামী লীগ পলাইয়াছে লুঠ, অত্যাচার ও উৎপীড়নের ধাক্কায় আবার হিন্দুরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে, ভারতে পঞ্চাশ লক্ষ শরণার্থী আসিয়াছে ও আরও আসিবে—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্থানের বন্ধুরা সাফল্যের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা লইয়াছে। চীন দিতেছে পাকিস্থানকে অস্ত্র ও টাকা;—এখন ভারত সরকার ইচ্ছা করিলেও সহজে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না।"

পড়িলে এখনও মনে হয় বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধা দিগের জয়ের আশা সুদূর পরাহত, এমন কি কিছুমাত্র নাই বলিলেও চলে। শত্রু পক্ষ সর্ব্বত্র সাফল্য গৌরবে মণ্ডিত এবং বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সাতদিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই কোন অজানা কারণে লেখকের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ১৯শে জুন তারিখে তিনি লিখিতেছেন:

"পূর্ব্ববঙ্গের মুক্তি যুদ্ধের গতি আবার পালটাইতেছে এবং আগামী তিন চার মাসের মধ্যে স্বাধীন সার্ব্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বিজয় পতাকা আবার উড্ডীন হইবে বলিয়া আশা করা অসঙ্গত নয়। মুক্তিফৌজ সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং বিশেষত গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল তারা আয়ত্ত করিয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গের সুদূর নিভৃত অঞ্চল পর্য্যন্ত তারা অনুপ্রবেশ করিতেছে এবং পাক সৈন্যদের তারা প্রচুর সংখ্যায় হত ও আহত করিতেছে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামারুজ্জামান নিহত ও আহত পাক সৈন্যের যে সংখ্যা দিয়াছেন—১৩ হাজার ২৩ হাজার সে সংখ্যা খুব বেশি অতিরঞ্জিত নয়। পূর্ব্ববঙ্গে পাঁচ ডিভিশন পাক সেনা পাঠানো হইয়াছিল। তার মধ্যে প্রায় দুই ডিভিশন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আরও দুই ডিভিশন সৈন্য খতম করিতে পারিলে সামরিক পরিস্থিতি একেবারেই পালটাইয়া যাইবে।"

ইহার পরে লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলার জয় হইলে বিশেষ আনন্দিত হইবেন না। ইহার কারণ ভারত সরকারের বাঙালী প্রীতির অভাব। কিন্তু এই অভাবের সহিত তুলনায় ভারত সরকারের পাকিস্থান বিদ্বেষ ওজনে বেশী কি কম তাহার আলোচনা করা হয় নাই। কারণ পাকিস্থান যদি ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে বাঙালীদিগের পূর্ব্ব-বাংলায় অর্জ্জিত বিজয় গর্ব্ব গড়িয়া উঠিলেও কার্য্যত সেই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারই পূর্ণতররূপে নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ভারতের (পশ্চিম) বাংলাদেশ ও পূর্ব্ব বাংলার বাংলাদেশ মিলিত হইয়া এক রাষ্ট্রে নবকলেবর ধারণ করিবে এরূপ কথা কেহ বলে নাই। এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই; কারণ সেই নবগঠিত রাষ্ট্র ভারতের অন্তর্গত হইতে পারিবে না এবং পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রও হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। তাহা ব্যতীত ভারতের হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গ কোন মুসলমান প্রধান

অখণ্ড ও বৃহত্তর বাংলার অঙ্গ হিসাবে থাকিতে প্রস্তুত হইবে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস হয় না।

এই সকল আলোচনা হইতে কয়েকটা কথা পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। প্রথমত বাংলাদেশের স্বাধীন মুক্তিফৌজের আকার, শক্তি-সামর্থ্য, কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের অজ্ঞানতা গভীর ও সর্ব্বব্যাপী। এই যে যুদ্ধ চলিতেছে যাহাতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে ও হারাইতেছে; ইহার যথাযথ সংবাদ পাইবার এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই। স্বাধীন বাঙলার অথবা পাকিস্থানের প্রচার যতই উত্তম হউক না কেন তাহা এক তরফা এবং তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা চলে না। যথা উদ্বাস্তু-দিগের সংখ্যা পাকিস্থান বেতার বলে ৪০০০০ হাজার। আমরা জানি যে তাহা উহার শতগুণেরও অধিক। পাকিস্থানের শাসকগণ বলেন বাংলাদেশে সর্ব্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা জানি ঐ দেশের বহু সহরেই সন্ধ্যার পরে কেহ রাস্তায় বাহির হইতে পারে না এবং সর্ব্বত্রই গণহত্যা, জনবিতাড়ন, নারীহরণ ও সাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠন অবাধে চলিতেছে। ইহা অবশ্যই বলা যায় না যে পাকিস্থানী সামরিক শক্তি বিশেষ ক্ষমতার সহিত ঐ দেশের মানুষের উপর নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে। তাহাদের অবস্থা সর্ব্বত্রই টলায়মান। মুক্তিফৌজ যদি সংখ্যায় অস্ত্রে ও প্রাণ-বানতায় ক্রমন্নোতিশীল হয় তাহা হইলে তাহাদের বিজয় সম্ভাবনাও দ্রুত বর্দ্ধিত হইতে সক্ষম হইবে।

ভারত ও ইসরায়েল

পৃথিবীতে ইহুদিদিগের নিজস্ব কোন বাসভূমি বা স্বদেশ নাই এবং সকল দেশেই তাহাদিগকে পরদেশী বলিয়া অবজ্ঞার চোখে দেখা হইত বলিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বৃটেন প্রভৃতি ক্ষমতাশালী জাতিগুলি ইহুদিদিগের নিজের একটা দেশ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ করে। যেহেতু ইহুদিগণ আরম্ভে প্যালেস্টাইন অঞ্চলেরই জাতি ছিল ও সেই হিসাবে তাহারা আরব দেশের মানুষ বলিয়া ইহাই স্থির করা হয় যে তাহাদিগের দেশও ঐ অঞ্চলেই গড়িয়া তোলা হইবে। বর্তমানের ইসরায়েল রাষ্ট্র স্বাধীন রিপাবলিক বলিয়া ঘোষণা করিয়া ১৪ই মে ১৯৪৮ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইহার পূর্ব্বে ঐ অঞ্চল বৃটেনের অধিকারে ছিল (ম্যান-ডেট)। বৃটেন ম্যানডেট তুলিয়া দেওয়াতে উপরোক্ত ঘোষণা করিয়া ইহুদিদিগের নিজ বাসভূমির প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই দেশ ইহুদি-দিগের নিজদেশ ছিল। পরে উহা প্রথমতঃ রোমান-দিগের দ্বারা বিজিত ও অধিকৃত হয় এবং আরও পরে সপ্তম শতাব্দীতে আরবগণ ঐ দেশ জয় করিয়া লয়। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কীর সুলতান ঐ দেশ দখল করেন। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৭) বৃটেন তুর্কীদিগকে পরাজিত করিয়া দেশটি অধিকার করে ও ঐ সময় হইতেই নানান প্রকল্পের আশ্রয়ে ইহুদিগণ ঐ অঞ্চলে নিজ বাসভূমি গঠনের চেষ্টা আরম্ভ করে। কুড়ি বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ ইহুদি প্যালেস্টাইন অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসিদিগের ইহুদি গণহত্যার ফলে ইহুদিদিগের নিজ দেশ স্থাপনের কথা আরও বাস্তবরূপ ধারণ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪৮ খৃঃ অব্দে ইসরায়েল স্থাপন করা হয়। এই সকল কার্য্য বিশেষ শান্তিপূর্ণভাবে সাধিত হয় নাই। আরম্ভ হইতেই ইহুদিগণকে বারম্বার নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রক্ত বহাইয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। বুদ্ধি, যুদ্ধকৌশল, অস্ত্রশস্ত্র আহরণ ও উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে শিখা ইত্যাদি সকল দিক দিয়াই ইহুদিগণ সর্ব্বদাই নিজেদের বৈশিষ্ট প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে। ৫ই—১১ই জুন ১৯৬৭-র যুদ্ধে ইহুদিগণ নিজেদের অধিকৃত এলাকা ৭,৯৯৩ বর্গমাইল হইতে বাড়াইয়া ৩৪,৪৯৩ বর্গমাইলে বিস্তৃত করে। এই বিস্তৃতির ফলে ইসরায়েলের জনসংখ্যাও ২৮,৪১,১০০ হইতে বাড়িয়া ৩৮,৩১,১০০ হইয়া যায়। বিস্তৃতির পূর্বে ইসরায়েল রাষ্ট্রে ৩০০০০০ মুসলমান ও ৭২০০০ খৃষ্টান ছিল। পরে মুসলমানের সংখ্যা ৯৫২০০০ ও খৃষ্টানের সংখ্যা ৩২০০০ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইসরায়েল রাষ্ট্রে যাহারা ইহুদি নহে

তাহাদিগের সম্বন্ধে কোনও অন্যায় ব্যবস্থা নাই। শোনা যায় যে ইহুদিগণ আরবদিগকে সকলভাবেই উন্নতি করিতে সাহায্য করিয়া থাকে।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রগতিশীল ও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্রে মানব অধিকার নিরপেক্ষভাবে সকলের জন্যই সংরক্ষিত হইয়া থাকে। শিক্ষা, সামাজিক-ভাবে মানবের অভাব নিবারণ ব্যবস্থা, উপার্জ্জন করিয়া খাইবার সুবিধাজনক আয়োজন প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই ইসরায়েল ন্যায় ও সুনীতির পথে চলিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ একটি রাষ্ট্রের সহিত ভারতের আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ কোনও দিন স্থাপিত করা হয় নাই। ইহার কারণ মিশর প্রভৃতি দেশগুলির ইসরায়েল বিরুদ্ধতা। ভারত কেন যে গায়ে পড়িয়া আরব রাষ্ট্রগুলির ঝগড়া নিজের ঘরে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে সক্ষম নহি। কারণ যদি এই হয় যে ভারতের মতে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন করা উচিত হয় নাই যেহেতু উহা আরবদিগের দেশ ছিল; তাহা হইলে বলিতে হয় যে ঐ দেশ ক্রমান্বয়ে রোমান, ক্রুসেডার, তুর্কী, ইংরেজ প্রভৃতি নানা জাতির অধীনেই ছিল। এবং বর্ত্তমানে ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ বাসীন্দাই ইহুদি। নূতন রাষ্ট্র গঠন যদি অন্যায় হয় তাহা হইলে পাকিস্থান গঠন অপেক্ষা ইসরায়েল গঠন অধিক অন্যায় হইয়াছে বলা যায় না। কাহারও দেশ অন্য কোন জাতির দ্বারা অধিকৃত হওয়া যদি অন্যায় হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে ইহুদিগণ ঐ দেশ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া দখল করে নাই তাহারা প্রত্যেক ছটাক জমি যথাযথভাবে ক্রয় করিয়া লইয়াছে। চীন, তিব্বত রাষ্ট্র গায়ের জোরে দখল করিয়া বসিয়াছে এবং ভারতেরও ২০০০০ বর্গমাইল ভূমি চীন জোর করিয়া দখল করিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার চীনের সহিত আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে আপত্তি করেন বলিয়া দেখা যায় না। পাকিস্থানের সম্বন্ধেও ঐ একই মনোভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব্বকাল হইতেই

সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও নেপালের কতকটা অনুরূপ আছে। ইসরায়েলের সহিত ঐ তিনটি দেশই সদ্ভাব রক্ষা করিয়া এবং রাষ্ট্রীয় কুটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত রাখিয়া চলিয়া থাকে। ভারত কিন্তু ইসরায়েল বিরোধী-ভাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপস্থিত আছে। ইহার কারণ হয়ত কোন সময় মিশর নেতা পরলোকগত নাসের সাহেবের আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গতঃ জবাহরলাল নেহেরুর কোন আলাপ আলোচনার মধ্যে নিহিত আছে। সে কথার জবাব যথাযথভাবে কে দিতে পারে?

ইসরায়েলের সহিত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির অসদ্ভাব অনেক অধিক। ইহার কারণ আরব জাতিগুলি কম্যুনিষ্ট প্রীতিতে পূর্ণ নিমজ্জিত ও তাহাদের সাহায্য ভাণ্ডার আরব জাতিগুলির জন্য সদা উন্মুক্ত। রুশিয়া বা কিউবা কিন্তু ইসরায়েলের সহিত আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াই চলে।

বর্ত্তমানে পাকিস্থানের সহিত বাংলাদেশের গণহত্যা লইয়া ভারতের যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ভারতের নানাদেশ ঘুরিয়া সকল জাতিকে বুঝাইতে হইতেছে যে তাহাদের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় পাকিস্থানকে কোনও ভাবে সাহায্য করা গণহত্যা সহায়ক কার্য্য হইবে। এই প্রচারের ফলে বহু জাতি পাকিস্থানকে সাহায্য করা বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু আরব দেশগুলি যথাসাধ্য পাকিস্থানকে সাহায্য করিয়া চলিয়াছে এবং সকল কথা জানিয়া বুঝিয়াই তাহারা এইভাবে পাকিস্থানের ঘাতকদিগকে সাহায্য করিতেছে। ইসরায়েলের সহিত ভারত শত্রু চীন অথবা পাকিস্থানের কোনও সৌহার্দ্য নাই। শুধু সেই কারণেই ভারতের উচিত ছিল ইসরায়েলের সহিত বন্ধুত্ব চেষ্টা করা। কিন্তু ভারতের কূটনৈতিক বুদ্ধি সর্ব্বদাই উল্টা পথে চলিয়া থাকে। কাহার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক; একথা ভারত কোনদিন ঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে ভারত চিরকালই ভুল পথের পথিক। তাই কোনও দেশেই ভারতের কোন সুবিধা হয় না। দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে চটাইয়া উত্তর ভিয়েৎনামকে খুসী করিবার চেষ্টা অতি নিকটের কথা। সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতীয় বিতাড়ন ও আমাদের ঐ দুই দেশের সকল অন্যায় মানিয়া লওয়াও এই কূটনীতিজ্ঞানহীনতার আর একটা উদাহরণ।

(২৪৮ পাতার পর)

যায় না। বৃটেনের যে বিশ্বব্যাপী একটা প্রতিষ্ঠা, ইয়োরোপীয় জাতিগুলির সহিত একজোট হইয়া বিশ্বের বাজারে অপর সকল জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে সেই প্রতিষ্ঠা আর থাকিবে না। ইহাতে দূরদৃষ্টি ব্যক্তিদিগের মতে বৃটেনের অবস্থা ক্রমশঃ পৃথিবী চক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় জোরালো দেখাইবে না। অর্থাৎ যাহাকে বলে খ্যাতি বা নামডাক তাহা আর থাকিবে না। ইহা একটা বৃহৎ লোকসানের কথা। ঠিক ওজন করিয়া বলা সহজ হইবে না যে এই লোকসান কতটা; কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা যাইবে যে বৃটেনকে লইয়া কেহ আর বড় একটা মাথা ঘামাইতেছে না। বৃটেন কোন সময় একটা মহাশক্তিশালী, অতি সমৃদ্ধ, পৃথিবীর অর্থনৈতিক কেন্দ্রস্থলীয় ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের পরম উপদেষ্টা জাতি ছিল। সেই অবস্থা হইতে হটিয়া গিয়া বৃটেন ক্রমে ক্রমে একটা ব্যবসায়ী ও ঐশ্বর্য্যশালী সাধারণ জাতি হইয়া দাঁড়াইতেছে। এখনও দুনীয়ায় বৃটেনের একটা অপর জাতির তুলনায় উচ্চতর স্থান আছে; কিন্তু বৃটেন যদি বিশ্বের সকল জাতির সহিত সম্বন্ধ তাচ্ছিল্য করিয়া নিজের ইয়োরোপীয়ত্বের উপরেই অধিক নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে বৃটেন অতিশীঘ্রই বিশ্বজাতি সভায় নিজের বিশেষ স্থান হারাইয়া একটা সমুদ্র মধ্যস্থিত বেলজিয়ামে (ডিসরেইলির ভাষায়) পরিণত হইবে। ইহা ব্যবসায়ে লাভজনক হইলেও কোন উচ্চ আকাঙ্খার কথা নহে।

বিপ্লব

মানব সভ্যতার গঠন, প্রকাশ ও বিকাশ মানুষের সম্মিলিত ও সংগঠিত একত্রবাসের ফলেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব তখনই মিলিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারে যখন সে সমাজবদ্ধ হইতে শেখে। এই সমাজ বদ্ধতার স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় তাহার মধ্যে ক্রমে ক্রমে বহু রীতি নীতি ও জীবন যাত্রা পদ্ধতি গঠিত হইয়া দেখা দেয়, যে সকল রীতি নীতি পদ্ধতির কোনটি ধর্ম্ম সংক্রান্ত এবং কোন কোনটি মানুষের অপরাপর পারস্পরিক ব্যবহার ও সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করে। শিল্পকলা, শিক্ষা, দর্শন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শাসন, অধিকার, অনধিকার, প্রভৃতি সকল কথাই নানাদিক দিয়া সমাজের রীতি নীতি পদ্ধতির সহিত জড়িতভাবে নিজ নিজ মানবীয় মূল্য ব্যক্ত করে এবং সেই সকল মানব সভ্যতার অঙ্গের ক্রমবিকাশ ও উন্নতির ভিতর দিয়াই মানুষ সমাজবদ্ধভাবে অগ্রগমনে সক্ষম হয়। আজকাল যে সকল ব্যক্তি বিপ্লববাদ প্রচার করে তাহারা মানব সমাজের একটা সর্ব্বাঙ্গীন আমূল পরিবর্ত্তনের কথাই মনে মনে ভাবিয়া লয়। ভাঙ্গা হইবে সবই; কিন্তু গড়া হইবে কি তাহা অনির্দ্দিষ্ট, অনিশ্চয় ও অজ্ঞাত। এই কারণে এই বিপ্লববাদ মানব সভ্যতার সকল অঙ্গের উপরেই হাতুড়ি চালাইতে চায় কিন্তু পরিবর্ত্তে কি যে দিবে তাহা বলিতে চায় না। এই কালাপাহাড়ী আবেগ যে একটা নিস্ফল আক্রোশমাত্র এবং তাহার মধ্যে যে কোনও সৃজন ও গঠনশীল প্রচেষ্টার চিহ্নমাত্র নাই তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ইহার প্রতিবিধান কি হইবে তাহা অবশ্য কেহ বলিতে পারেন না। মানব সভ্যতার সকল চিন্তার ধারা, সৃজন পরিকল্পনা ও বাস্তব অভিব্যক্তিই বহুকাল ধরিয়া ক্রমবিকশিত হইয়াছে। বহু পরিবর্ত্তনও তাহাদের মধ্যে হইয়াছে কিন্তু সে পরিবর্ত্তন মানুষের চিন্তা ও সৃজনী শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। হাতুড়ি ব্যবহার কখনও কখনও হইয়া থাকিলেও তাহা কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং তাহার লক্ষ্যও কখনও এতটা বহু প্রতিষ্ঠান, আদর্শ ও সভ্যতার নানা অঙ্গের মধ্যে থাকিতে দেখা যায় নাই। এখন যাহারা বিপ্লব আশ্রয় করিয়া একটি নূতন সভ্যতা গঠন করিবেন বলিতেছেন, তাঁহারা দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সামাজিক রীতি নীতি, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান; সকল কিছুই প্রথমে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইবেন বলিয়া নিজেদের পরিকল্পিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেরাসিন পেট্রোল বন্দুক ও বিস্ফোরক

ব্যবহারে কিছুকিছু ধ্বংস কার্য্য সাধনও করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাদের বাধা দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হতাহতও হইয়াছেন। কিন্তু এমন কোন গঠন কার্য্যের লক্ষন দেখা যাইতেছে না যাহার দিকে চাহিয়া মানুষ বলিতে পারে যে সভ্যতার একটা নূতন সূর্য্যোদয়ের আলোক দেখা যাইতেছে।

মানব সমাজে অধিকাংশ লোকেই অল্পাধিক রক্ষণশীল ভাবে জীবনপথে চলিতে চাহে। তাহারা যেরূপ ভাষা শিখে, যেভাবে গণিত, বিজ্ঞান দর্শন ও শিল্পকলা সঙ্গীত নাটক প্রভৃতি ব্যবহার ও উপভোগ করিতে শিখে; তাহাই আশ্রয় করিয়া চলাই তাহাদের পক্ষে সহজ ও সরল পন্থা বলিয়া তাহারা মনে করে। হঠাৎ সর্ব্বক্ষেত্রে তাহাদের মতে অপকৃষ্ট নতুনত্বের আবির্ভাব তাহারা খুসীমনে দেখিতে পারে না। অবশ্য যদি সেই "নূতন" জ্ঞান অথবা রস অভিব্যক্তির দিক দিয়া অধিক গ্রহনীয় বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হয় তাহা হইলে বিপ্লব কতকটা মানুষের উপভোগ্য হইতে পারে। যাহা দেখা যায় তাহাতে কিন্তু পরিবর্ত্তনকে উন্নততর কিছু বলিয়া মানা চলে না। যাহা ছিল তাহার সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াই উন্নতির পথে চলা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে হয়। কেরাসিন পেট্রোল বন্দুক ও বিস্ফোরক ব্যবহার না করিয়া প্রগতিশীল হইলে উন্নতির পথে বাধা পড়িবে বলিয়াও গুণীজনে চিন্তা করেন না। বিপ্লব স্থগিত থাকিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না।

মুক্তি ফৌজের যুদ্ধে সফলতা

পাকিস্থানী প্রচার প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই সাজানো মিথ্যা কথার স্তূপ এবং সেই সকল মিথ্যা বহু স্থলেই পরস্পর বিরোধী হইতে দেখা যায়। পাকিস্থান বলিতেছে যে পূর্ব্ববাংলায় এখন শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ও উদ্বাস্তুগণ ফিরিয়া যাইলে তাহাদের কোন অসুবিধা হইবে না। ইউএনওর উদ্বাস্তু সাহায্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক প্রিনস সদরুদ্দিন আগা খান পাকিস্থান সমর্থক। তিনি বলেন উদ্বাস্তুদিগকে বাংলাদেশে ফিরিয়া যাইতে তিনি বলিতে নারাজ। ইউএনও কোনভাবেই তাহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দিতে পারেন না। অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে বলিয়াছেন যে উদ্বাস্তুদিগকে তিনি কসাইখানায় জবাই হইবার জন্য পূর্ব্ববাংলায় ফেরত পাঠাইতে পারেন না; সেই কথাটাই সত্য। আর একটা কথা হইতেছে মুক্তিফৌজের পাকিস্থানীদিগের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালনার কথা। পাকিস্থানীগণ স্বীকার করে যে পূর্ব্ববাংলায় মুক্তিফৌজের আক্রমণে প্রত্যহ পঞ্চাশজন আহত অবস্থার হাসপাতালে যাইতেছে। অনেক সময়ই পাকিস্থানী সৈন্যগণ মুক্তিফৌজের আক্রমণে নিহত হইতেছে এবং সৈন্যবাহিনী যথাসাধ্য নিজ নিজ ছাউনিতেই থাকে এবং গ্রামাঞ্চলে বিশেষ প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে না। মুক্তিফৌজ বহুস্থলেই পথ-ঘাট দখল করিয়া রহিয়াছে, রেল লাইন, সেতু প্রভৃতি ধ্বংস করিতেছে, পাকিস্থান সহায়ক ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতেছে এবং পাক সৈন্যগণ ছাউনি হইতে বাহির হইলেই তাহাদিগকে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিতেছে। বর্ত্তমানকালে বহু স্থলেই পাক সৈন্যদিগের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। কোথাও কোথাও মুক্তিফৌজ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে এবং পাক সৈন্যগণ তাহাদের আক্রমণ করিয়া হটাইবার কোন চেষ্টা করিতেছে না। যতটা মনে হয় মুক্তি-ফৌজ ক্রমবর্দ্ধনশীলভাবে তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে এবং শেষ অবধি পাকিস্থানকে বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। ইহার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ পাকিস্থানের সামরিকভাবে ঐ দেশ দখল করিয়া শাসন চালাইবার শক্তি নাই এবং দ্বিতীয়তঃ পাকিস্থানের ঘোরতর অর্থাভাবের চাপে পাকিস্থান যুদ্ধ দীর্ঘকাল চালাইতে সক্ষম হইবে না।

প্রৌঢ় অবনীন্দ্রনাথ

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৭৮

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবার কথা

বাংলাদেশের জনসাধারণ জগতের সম্মুখে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা অতঃপর আর পাকিস্থানের অঙ্গ হইয়া থাকিবেন না। ইহার কারণ পাকিস্থানের বাংলাদেশের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা হইল একটা অন্যায় ও সকল সুনীতি বর্জ্জিত প্রভুত্বের সম্বন্ধ! পাকিস্থান গঠনের সময় মহম্মদ আলি জিন্না বলিয়াছিলেন তিনি ভারতের মুসলমানদিগের একটা ভিন্ন জাতীয়তা আছে বলিয়াই তাহাদের সেই জাতীয়তা রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পাকিস্থান নামে একটা পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করা আবশ্যক মনে করেন। এই রাষ্ট্রের সকল মুসলমানই এক (মুসলমান) জাতীয় এবং এক ভাষা (উর্দ্দু) ভাষী। তাহাদের সভ্যতা হিন্দুদিগের সভ্যতা হইতে পৃথক এবং তাহারা এই সকল কারণে নিজস্ব এক ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারী। এই মুসলমান রাষ্ট্র গঠিত হইবার পরে অবশ্য দেখা যাইল যে ঐ মুসলমান জাতি নানা ভাষাভাষী ও জাতীয়তা বা কৃষ্টি বিচারেও সকলে এক প্রকার নহে। পশ্চিম পাকিস্থানের পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মধ্যে অনেকে উর্দ্দু শিক্ষা করিয়া নিজ মাতৃভাষার সহিত ঐ ভাষাও বলিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপাকিস্থানের বাঙালীগণ উর্দ্দু শিক্ষা করেন নাই এবং শিখিবার জন্য কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। এই কারণে এবং পাকিস্থানের সেনাবাহিনীতে অধিক সংখ্যক মানুষ অবাঙালী হওয়াতে পশ্চিম পাকিস্থানীগণ সরকারী সকল চাকুরীতেই নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন ব্যবস্থা করিয়া লয়। এই চেষ্টা সফল হয় এবং পাকিস্থানে ক্রমে ক্রমে সেনাবাহিনীতে শতকরা ৯৫ জন মানুষ পশ্চিম পাকিস্থানের অধিবাসী হইতে দেখা যায়। সরকারী অন্য সকল কার্য্যেও শতকরা ৯০ জন ব্যক্তি পশ্চিম পাকিস্থান হইতে নিযুক্ত হইতে থাকে। এই ভাবে শাসন কার্য্যে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম পাকিস্থানের একটা ব্যাপক প্রভুত্ব পূর্ব্ব পাকিস্থানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহার ফলে পশ্চিম পাকিস্থান পূর্ব্ব পাকিস্থানকে শোষন করিয়া নিজ অঞ্চলের রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, কারখানা, গৃহ অট্টালিকাদি উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়া লয়। পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনসংখ্যা ও বিদেশী অর্থ উপার্জ্জন ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্থান অপেক্ষা অনেক

পাকিস্থানের সুবিধাই দেখিতেন। বিদেশ হইতে সংগৃহীত অর্থের বেশীর ভাগ পশ্চিম পাকিস্থানে ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্ব অঞ্চলের জনগণের জীবনমরণের প্রশ্ন উঠিলেও প্রাণ বাঁচানর ব্যবস্থা করিবার খরচের টাকা পশ্চিম পাকিস্থানী প্রভুদিগের হাত হইতে বাহির হইত না। কিছুকাল পূর্ব্বে যে ঝড় তুফানের ফলে পূর্ব্ব পাকিস্থানে বহুলোক প্রাণ হারায়, তাহা কদাপি ঘটিত না যদি কিছু খরচা করিয়া ঐ অঞ্চলে কোন কোন স্থলে ডাইক ও ব্রেকওয়াটার নির্ম্মাণ করা হইত। ইহা হইবার কথা ছিল কিন্তু করা হয় নাই। যে টাকা এই কার্য্যে খরচ হইত তাহা দিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের ইসলামাবাদ রাজধানীতে অনেকগুলি সরকারী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এইরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনসাধারণ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন করিতে থাকেন যাহাতে পশ্চিমাদিগের সামরিক শাসন ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া অতি শীঘ্র পাকিস্থানে সাধারণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। এই আন্দোলনের চাপে অবশেষে সামরিক শাসন পরিচালক ইয়াহিয়া খান পাকিস্থানে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হইবে বলিয়া স্বীকার করেন ও সেই অঙ্গীকার অনুসারে নির্ব্বাচন ব্যবস্থাও করেন। কিন্তু যখন নির্ব্বাচনে দেখা যাইল যে শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় অধিকাংশ আসনই জিতিয়া লইয়াছেন, তখন ইয়াহিয়া খান নিজের শুভ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আবার সামরিক স্বৈরাচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেষ্টাতে আত্মনিয়োগ করিলেন। বাঙালীরা ইতিপূর্ব্বে একবার বাংলা ভাষার প্রচলন লইয়া পশ্চিম পাকিস্থানী প্রভুদের সহিত লড়িয়া জিতিয়াছিলেন। তাঁহারা এইবার অসামরিক সাধারণতন্ত্র অনুগত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবল আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান এইবারে গোপনে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য পূর্ব্ব পাকিস্থানে আনাইয়া লইয়া শেখ মুজিবুর রহমানের ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ

মুজিবুর রহমানকে সরকারী আলোচনা কক্ষ হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদিগের উপর আদেশ বাহির হইল বাঙালীদিগকে হত্যা করিতে। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকায় ৫০,০০০ এর অধিক বাঙালী প্রাণ হারাইল। সহস্র সহস্র নারীর চরম অপমান হইল। বালক বালিকা, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, কেহই বাদ রহিল না। বাংলার মাটি নির্দ্দোষ, নিরস্ত্র, অসহায় নরনারী ও শিশুর রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ বিদ্রোহ করিল ও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল বলিলে সত্য ঘটনাটির যথাযথ বর্ণনা করা হয় না। কারণ, কোন শাসকগোষ্ঠী যদি দেশের মানুষকে অকারণে যথেচ্ছা হত্যা করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে রাষ্ট্রকে বিনাশ করার কার্য্য শাসকগণই করিতেছে বলিতে হয়। তখন যদি আক্রান্ত জনগণ আত্মরক্ষার জন্য শাসকদিগের উপর প্রত্যাক্রমণ করে তাহা হইলে তাহাকে বিদ্রোহ বলা ন্যায্য হয় না।

আন্তর্জাতিক আইনে যদিও বলে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে যতদিন পর্য্যন্ত সেই স্বাধীনতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না দেখা যায় ততদিন সেই স্বাধীনতা ঘোষণাকারীদিগকে ভিন্ন ও স্বাধীন রাষ্ট্রগত বলিয়া স্বীকার করা চলে না; তাহা হইলেও যেখানে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে জনগণকে আক্রমণ করিয়া নিজ রাষ্ট্রের বিনাশের কারণ ঘটায়, সেখানে যাহারা পৃথকভাবে রাষ্ট্রের একাংশকে স্বাধীন ঘোষণা করে তাহাদিগকে বিদ্রোহী বিচার করা ন্যায় সঙ্গত হয় না। পাকিস্থান সরকার পূর্ব্বাপর যে ভাবে অবিচার, অত্যাচার ও অন্যায় চালাইয়া আসিয়াছে ও শেষে যে ভাবে সহস্র সহস্র মানুষকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্রকে চিরতরে বিনষ্ট করিয়াছে; তাহাতে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি তাহারাই করিয়াছে বলা যায়। বিদ্রোহী যাহাদিগকে বলা হইতেছে তাহারা সরকারী সেনবাহিনীর আক্রমণে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পৃথক হইতে চাহিয়াছে।

দেখাইয়া প্রমাণ করা যায় না যে পূর্ব্ব বাংলার ঘটনা-বলীর সত্য ও যথার্থ রূপ কি। এই জন্য যায় না যে যদিও সকল দেশেই বিদ্রোহ হইবার একটা উৎপীড়ন, অত্যাচার বা শোষণ ভিত্তিক কারণ ছিল তাহা হইলেও বাংলাদেশের মত ব্যাপকভাবে অন্যত্র হঠাৎ কয়েক দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা এবং প্রায় এক কোটি লোককে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করার উদাহরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং যদিও আন্তর্জাতিক আইনে বলে যে কোন দেশ যদি বিদ্রোহ করিয়া নিজের পৃথক রাষ্ট্র গঠন চেষ্টা করে তাহা হইলে সেই পৃথক রাষ্ট্রকে পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রগুলি ততদিন পর্য্যন্ত মানিয়া লইবে না যতদিন না ঐ নুতন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্থিরনিশ্চয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যাইবে; তাহা হইলেও বাংলাদেশ যে ক্ষেত্রে মূল রাষ্ট্র পাকিস্থান কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হইয়া পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে সে ক্ষেত্রে বিদ্রোহ করিয়া কেহ পৃথক হইবার চেষ্টা করিলে অপর জাতিরা সেই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি সম্বন্ধে কি করিবে সে কথা বিচার করিবার কোনও আবশ্যক বা সার্থকতা নাই। কিন্তু এই কথাটা শুধু ভারতবর্ষ একেলা বসিয়া স্থির করিয়া লইলে আন্তর্জাতিক আসরে বিষয়টার যথার্থ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বলা চলিবে না। এমন কি কথাটা অনেক রাষ্ট্র একত্র হইয়া বিচার করিয়া না লইলে পাকিস্থানের বন্ধু ও সমর্থক রাষ্ট্রগুলি ঐ স্বীকৃতির কথাটাকে মিথ্যার কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে যে বাংলাদেশবাসী কোন কোন ব্যক্তি বিদ্রোহ করিয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠন চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ভারত যদি ঐ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করিয়া জগত রাষ্ট্র সভায় স্থান দান করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সেই চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ভারতের উচিত হইবে আরও কোন কোন রাষ্ট্রকে লইয়া বিষয়টার পূর্ণ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া লওয়া যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পাকিস্থানের বর্ব্বর আক্রমণ ও গণহত্যার ফলে করা হইয়াছিল; বিদ্রোহের কথা সেখানে উঠেনাই। পাকিস্থান গঠনের সময় যে সকল মিথ্যার সৃষ্টি করা হইয়াছিল—যথা মুসলমান এক জাতি, এক ভাষাভাষী ও এক সভ্যতা ও কৃষ্টি অনুগামী ইত্যাদি, ইত্যাদি; সেই সকল মিথ্যা ইয়াহিয়া খানের বর্ব্বরতা চিরতরে হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে পাকিস্থানের মুসলমান জাতির কোন অস্তিত্ব নাই। পাকিস্থান তাহা হইলে গঠিত না হইলেই চলিত এবং বর্ত্তমানে পাকিস্থানের রাষ্ট্র জগতে অবস্থিতির কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নাই। স্বাধীন বাংলাদেশ এই সকল কারণে পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। ভারতের পক্ষে উচিত হইবে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের সহিত এই কথার আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া লওয়া যে কোন কোন রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশ পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া লইলে পাকিস্থানের সমর্থকদিগের নিজের মিথ্যা প্রচার ও অপকার্য্য পরিচালনা অপেক্ষাকৃতভাবে কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

সমাজবাদ, ভিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য কথা

সমাজবাদ বলে যে ব্যক্তি সমাজের অন্তর্ভুক্তও সমাজের অঙ্গমাত্র এবং সেই হিসাবে ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির দায়িত্ব ও ব্যক্তির জীবনের রীতিনীতি চালচলনের পদ্ধতি সকল কিছুই সমাজের গঠন উন্নয়ন আদর্শ ও পরিচালনার সুবিধার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল্য তখনই গ্রাহ্য হইতে পারে যখন তাহা সমাজবাদের কোন লক্ষ্য, মতলব বা অভিসন্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া প্রকট আকার ধারণ করিয়া সমাজ-বাদীদিগের শিরপীড়ার কারণ হইয়া দেখা না দেয়। অর্থাৎ সমাজবাদের অভিপ্রায়ই হইল সমাজকে রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে ও অর্থনীতির আসরে মানব জীবনের ও জীবন-যাত্রা পদ্ধতির প্রধান কথা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা। ব্যক্তির অধিকার ও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গৌণ কথা। ভারতীয় সমাজবাদ এখন পর্য্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজের অধিকার অনধিকার ভেদ লইয়া অত গভীরে যায় নাই। সমাজবাদ অর্থে এখন পর্য্যন্ত ভারতের শাসক

মণ্ডলী বুঝেন শুধু তাঁহাদের নিজেদের ও তাঁহাদের আমলাদিগের অধিকার বৃদ্ধি। জীবনবীমা জাতীয়করণ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। কোন কোন কারবার ও কারখানাজাত ব্যবসায় শাসকদিগের একচেটিয়া অধিকারের বিষয় করিয়া নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও শাসকগোষ্ঠির আমলাদিগকে জাতির সকল ব্যক্তির স্কন্ধে স্থাপন করিলে তদ্দ্বারা যে মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইবার সম্ভাবনা খুব জোরাল হইয়া উঠে, একথা আমলাতন্ত্র সমর্থকদিগের দ্বারা এখনও প্রমাণ করা হয় নাই। বরঞ্চ এই কথাই সমাজবাদী জাতিগুলির সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং সর্ব্বঘটে আমলাদিগের প্রতিপত্তি সৃজন রাষ্ট্র সমাজ ব্যক্তি, কাহারও পক্ষে মঙ্গলের কথা নহে। সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও সকল উৎপাদন বন্টন ও সংযোগ কেন্দ্রীয় নির্দ্দেশ পরিচালনা ব্যবস্থা রুশিয়াতে করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হওয়াতে সে সকল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ দেশে ব্যক্তিকে পুনরায় তাহার অধিকার বহুক্ষেত্রে দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে। সমাজবাদের যে চেষ্টা এখন ভারতে চলিতেছে তাহাকে সমাজবাদ নাম না দিয়া মূলধন জাতীয়করণ চেষ্টা বলিলে বিষয়টার যথার্থ বর্ণনা করা হয়। কারণ সমাজবাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য যাহা বর্ত্তমান ভারতে সেই সকল কার্য্য করিবার কোন চেষ্টাই এখন করা হইতেছে না; শুধু রাষ্ট্রীয় দলের, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গের ও সরকারী কর্ম্মচারী (আমলা) দিগের অর্থ নৈতিকক্ষেত্রে শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টাই উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধিতভাবে করা হইতেছে। এই কথাটা বলিবার কারণ সহজেই দেখান যায়। সমাজবাদের একটা বড় কথা হইল সমাজের সকল ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমাজের আদেশ নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ সকল ব্যক্তির কাজকর্ম্ম উপার্জ্জন শিক্ষাদীক্ষা চলাফেরার ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে শাসকগোষ্ঠীর হুকুমে হইবে এই নিয়মের প্রবর্ত্তন করা হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে কাজকর্ম্ম উপার্জ্জন প্রকটভাবে ব্যক্তির নিজ চেষ্টা, পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র এই ক্ষেত্রে কোন ভার গ্রহণ করিতে এখনও অগ্রসর হয়েন নাই ও ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুক বিচরণ করিয়া জাতির কলঙ্কের কারণ হইয়া দেখা যায়। এই সকল ভিক্ষুকদিগের মধ্যে অধিকাংশই পেশাদার ভিক্ষুক। অনেকের অর্থসম্পদও যথেষ্ট আছে। অনেকে বৃহৎ বৃহৎ ভিক্ষুক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিযুক্ত বেতনভোগী ভিক্ষাকার্য্যে শিক্ষিত ও সুদক্ষ "কর্ম্মী"। রাজকর্ম্মচারীগণ (পুলিশ) বহুস্থলে এই ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা কার্য্য চালাইয়া জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি করিলেও তাহাতে কোনও বাধা দিবার চেষ্টা করেন না। ভিক্ষুক প্রতিষ্ঠানগুলি পুলিশকে কি ভাবে নিজেদের সহায়তা করাইতে সক্ষম হয়েন তাহা আমরা সঠিক জানি না কিন্তু অনুমানে বুঝিতে পারি। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ রাজপথগুলি ভিক্ষুক সঙ্কুল। ইহারা বিশেষ করিয়া বিদেশীদিগের নিকট ভিক্ষা চাহিয়া দেশের দুর্নামের কারণ হয়। রাষ্ট্র ইহাদিগকে কেন এই ভাবে ভিক্ষা করিতে দেন? ইহা কি "সোসিয়ালিজ্‌মের নকসার" (pattern of socialism) একটা অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ?

আমাদের সমাজবাদী রাষ্ট্রনেতাগণ ভিক্ষুকদিগের কোনও ব্যবস্থাত করেনই না, তাঁহারা সাধারণ বেকার মানুষের কোন উপার্জ্জনের আয়োজনও করেন না। অর্থাৎ যদিও সমাজবাদের প্রাণ ব্যক্তিকে সর্ব্বভাবে সমাজের আজ্ঞাবহ করিয়া জীবনযাপন করিতে বাধ্য করার মধ্যেই নিহিত আছে, তাহা হইলেও আমাদের সমাজবাদীগণ ব্যক্তির খাওয়া পরা থাকার কোনও দায়ীত্ব লইতে প্রস্তুত নহেন। তাহাদের শিক্ষার ভারও এখন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজবাদের নকসার অন্তর্গত হয় নাই। কারণ যে সকল সভ্যদেশে ব্যক্তিত্ব অধিকার পূর্ণ বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত সেই সকল দেশেও শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুকার্য্য রাষ্ট্রের দ্বারা কৃত হয়। রাষ্ট্র রুগ্ন, অঙ্গহীন, বৃদ্ধ, বিধবা,

অনাথ শিশু ও বালক বালিকা প্রভৃতির সাহায্যের জন্যও বিভিন্ন দেশে নানান ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আমাদের সমাজবাদে কিছু কিছু সাহায্য কোন কোন বিশেষ জাতীয় শ্রমিকদিগের জন্য করা হইয়া থাকে, যাহার বিশেষ কারণ হইল শ্রমিক সংঘগুলির সহিত রাষ্ট্রীয় দলগুলির সংযোগ থাকা। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাগণ শুধু নিজেদের ও দলের লোকদের শক্তি বৃদ্ধির কথাই চিন্তা করেন ও সেই বর্দ্ধনশীল ভাবে শক্তিলাভ ঘটিলে যাহাতে কাজকর্ম মোটামুটি এক প্রকারে চলে সেই জন্য রাষ্ট্রের কর্ম্মচারী (আমলা) দিগের হুকুমত (আদেশ নির্দ্দেশ দান ক্ষমতা) জোরাল হইতে আরও জোরাল না করিয়া অন্য পন্থা অনুসরণ সম্ভব হয় না। কারণ রাষ্ট্রনেতা ও তাঁহাদিগের অনুচরগণের শিক্ষাদীক্ষা কর্ম্মকৌশল ও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদিগের কাহারও কোন ভুল ধারণা নাই। নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবার নানান বুদ্ধি ও কৌশল তাঁহাদের আয়ত্তে আছে নিঃসন্দেহ কিন্তু মানব সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখাপ্রশাখার ভার গ্রহণ ও পরিচালনা অথবা প্রগতির ব্যবস্থা করা তাঁহাদের দ্বারা কখন সুসাধিত হইতে পারে না।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রকলা জগতে অমরত্ব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে যুগে ভারতের চিত্রকরগণ চিত্রাঙ্কন কৌশলে এবং চিত্র-কল্পনার প্রেরণা ও প্রতিভায় একটা অতি উন্নত স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন সেই মোগল-রাজপুত যুগকে আবার নব কলেবর দান করিয়া জাগ্রত জীবন্তরূপে কৃষ্টির আসরে পুনরাধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই নবজীবন প্রাপ্তির পূর্ব্বে ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেরূপ পাশ্চাত্য ভাষা ও শিক্ষার বিষয় ব্যবহারে জাতীয় মস্তিষ্ককে বিদেশী ছাঁচে ঢালিয়া একটা বিকৃতরূপ দেওয়া হইতেছিল, চিত্রকলাতেও সেই একই পন্থা অনুসরণ করিয়া এমন একটা ধরণ গড়িয়া উঠিতেছিল যাহা ভারতীয় কৃষ্টির ঐতিহ্যকে বর্জ্জন করিয়া রেখা ও বর্ণে রসঅভিব্যক্তিকে অনুভূতিহীন নির্জ্জীব অনুকরণের আড়ষ্টতায় শৃঙ্খলিত করিয়া জাতীয় প্রেরণার বিনাশ সাধন করিতেছিল। বৃটিশের রাজত্বকালের মধ্যযুগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় চিত্রকলার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা অত্যন্তই শোচনীয় এবং সেই সময়ের বিদেশী আদর্শে অঙ্কিত চিত্রাদি দেখিলে মনে হয় যেন এই দেশের মানুষের কোনদিন কোন কলা-কৌশল বা অঙ্কন প্রতিভা ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ মোগল-রাজপুত চিত্রকলার রসের ভাণ্ডার হইতে যে প্রেরণা আহরণ ও রূপায়িত করিয়া জগতের রসজ্ঞ সমাজের নিকট উপস্থিত করেন তাহার সঞ্জীবনী শক্তি ছিল অতুলনীয়। যাহা মৃত বলিয়া মনে হইতেছিল তাহাতে প্রাণ সঞ্চারণের এরূপ উদাহরণ সহজলভ্য নহে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে দেশে অজন্তা, ইলোরা ও বাঘের চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য পূর্ব্বকালে হইয়াছিল ও তৎপরে যে দেশে শত শত চিত্রকর লক্ষ লক্ষ চিত্র অঙ্কন করিয়া-ছিলেন, সে দেশে যদি শুধু সহজ অনুকরণজাত বিদেশী ঢংএর ছবি আঁকিয়া বলা হইত যে ঐ সকল চিত্র ভারতীয় চিত্রকলার আধুনিক নিদর্শন; তাহা হইলে উহা অপেক্ষা শোকাবহ কোনও কিছু কল্পনা করা বড়ই কঠিন মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথ বৃটিশ আদর্শের ভারতীয় চিত্র দেখিয়া কখনও কোন তৃপ্তিলাভ করেন নাই। ইউরোপীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠই ছিল। কিন্তু ইউরোপের চিত্রকলার ঐতিহ্য, আদর্শ ও প্রেরণা ভারতের বৃটিশ চিত্রাঙ্কন শিক্ষকদিগের শিক্ষার ভিতর প্রতিফলিত হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথ ভারতের শিল্পীদিগকে বৃটিশ কলাকৌশলের শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া এবং তাঁহাদিগকে চিত্রশিল্পে নিজেদের ঐতিহ্য ও প্রেরণা গৌরব বজায় রাখিয়া চলিতে শিখাইয়া ভারতীয় সভ্যতার নিজত্ব রক্ষার কার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে অনেক চিত্রশিল্পী অশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ও সেই খ্যাতির মূলে ছিল তাঁহা-দিগের গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও শিষ্যদিগের অন্তরের সুপ্ত প্রতিভা জাগাইয়া তুলিবার ক্ষমতা।

অবনীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন না। তাঁহার বিচিত্র রসবোধ নানাভাবে ব্যক্ত হইত। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি একজন মহাক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। অভিনয়ে তাঁহার শক্তি ছিল অসাধারণ। রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট, অভিনেতা-অভিনেত্রীদিগের সজ্জা, রঙ্গমঞ্চের শোভাবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি ছিলেন মহা পারদর্শী। আসবাবের নক্‌সা ও অন্যান্য শিল্প পরিকল্পনার জন্য তাঁহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল সর্ব্বজন স্বীকৃত। এই সকলের মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি হইয়াছিল সাহিত্যিক হিসাবে। তাঁহার লিখিত "রাজকাহিনী" পুস্তকের প্রকাশক পুস্তকের পরিচিতিতে বলেন "যাঁর হাতে তুলি হচ্ছে লেখনী আর লেখনী হচ্ছে তুলি, শিল্প ও কথার যিনি সার্ব্বভৌম সম্রাট, সেই অবনীন্দ্রনাথের রচনা —"। বিজ্ঞাপনের কথা হইলেও কথাগুলি অতি সত্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

অবনীন্দ্রনাথ একশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লিখিত "আপন কথা" পুস্তক হইতে কিছু কিছু পুনঃর্মুদ্রিত করিয়া দেখান হইতেছে তাঁহার লেখার অপরূপ সরসতা ও সৌন্দর্য্য। আরও দেখা যাইবে তাঁহার মানসচক্ষে দৃষ্ট তাঁহার বাল্যকালের জীবনকাহিনীর চিত্রাবলী।

"১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিনে বেলা ১২টা ১১ মিনিট থেকে আরম্ভ করে খানিকটা বয়স পর্য্যন্ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের পুঁজি—এক দাসী, একখানি ঘর, একটি খাট, একটি দুধের বাটি, এমনি গোটাকতক সামান্য জিনিসের মধ্যেই বদ্ধ রয়েছে। শোওয়া আর খাওয়া এ-ছাড়া আর কোনো ঘটনার সঙ্গে যোগ নেই আমার! অকস্মাৎ একদিন এক ঘটনার সামনে পড়ে গেলাম একলা। ঘটনার প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা সেটা। তখন বেলা দেড় প্রহর হবে,......আমার কালো দাসী আর 'রসো' বলে একটা মোটাসোটা ফরশা চাকরানী কথা কইছে শুনছি। ......স্বরের ঝোঁক আর হাতপা নাড়া দেখে জানছি দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বেঁধেছে।...হঠাৎ দেখলেম আমার দাসী একটা ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়লো দেওয়ালের উপর। আবার তখনি সে ফিরে দাঁড়িয়ে আঁচলটা কোমরে জড়াতে থাকলো। তখন তার কালো কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে...সিঁদুর পরা যেন কালো পাথরের ভৈরবী মূর্তি সে একটি।...আমার মনে জেগে রইলো সিঁড়ির ধারে সকালের দেখা রক্তমাখা কালো রূপটাই দাসীর! সেই আমার শেষ দেখা দাসীর সঙ্গে। ......রোজই ভাবি দাসী আসবে! কোন গাঁয়ের কোন ঘর ছেড়ে এসেছিলো অন্ধকারের মত কালো আমার পদ্মদাসী।...পৃথিবীর কোনোখানে হয়ত আর কোনো মনে ধরা নেই তার কিছুই এক আমার কাছে ছাড়া। হয়তো বা তাই আপনার কথা বলতে গিয়ে সেই নিতান্ত পর এবং একান্ত দূর যে তাকেই দেখতে পাচ্ছি—পঞ্চান্ন বছরের ওপারে বসে সে দুধ ঢালছে আর তুলছে আমার জন্যে।..." অবনীন্দ্রনাথ বয়েসে বাড়ছেন। অনেক কিছু দেখে আর ঠেখে শিখছেন। "কিন্তু কি নাম আমার সেটা বলার বেলায় হাঁ করে থাকি বোকার মতো —অথচ থাম বলি থামকেই, ছাতকে ছাতা বলে ভুল করিনে; পুকুরকে জানি পুকুর, আর তার জলে পড়লে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হয় তাও জানি......কেবল একটা কথা থেকে থেকে ভুলতে পারিনে—আমি ছোটো ছেলে। অনেকদিন লাগছে বড়ো হতে, গোঁপদাড়ি উঠতে, ইচ্ছামতো নির্ভয়ে পুকুরের এপার ওপার করতে, চৌতলার ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াতে এবং তামাক খেতে বৃষ্টিতে ভিজতে।"

"আপন কথা"তে অবনীন্দ্রনাথ বাল্যকালের কাহিনী অতি সুখপাঠ্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। শিশুকালের কথা কিছু কিছু উপরে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। বালক অবস্থাতে অনেক পরিবর্ত্তন হইল। "ঠিক কতো বয়েস মনে নেই কিন্তু এবারে একটা চাকর পেলেম আমি।... ..রামলাল যখন আমাকে তার বাবু বলে স্বীকার করে নিলে তখন ভারী একটা আশ্বাস পেলেম। মনে আহ্লাদও হলো—এতোদিনে নিজস্ব কিছু পেলেম আমি! রামলাল আসার পর থেকেই বাড়ির আদব

কায়দাতে দোরস্ত হয়ে ওঠার পালা শুরু হলো আমার।” তখন অবনীন্দ্রনাথ শিশু অবস্থা কাটিয়ে তিন তলার অন্য একটা ঘরে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ বাড়িটি একজন সাহেব “গৃহ নির্ম্মাণ কর্ত্তা” “নেপোলিয়ানের আমলের অনেক আগে” নির্ম্মাণ করিবার ভার লইয়া করাইয়াছিলেন। “এই সাহেবকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—পরচুল পরা, বেণী বাঁধা, কাঁসির মতো গোল টুপিটা মাথায়, গায়ে খয়েরী রঙের সাটিনের কোট, পায়ে বার্ণিশের জুতো বকলস দেওয়া, শর্ট প্যান্ট, হাঁটুর উপর পর্যন্ত মোজায় ঢাকা, গলায় একটা সিল্কের রুমাল, ফুলের মতো ফাঁপিয়ে বাঁধা! সাহেব এসে উপস্থিত আমাদের কর্তার কাছে পাল্কি চড়ে।...কর্তা বসে সাহেব দাঁড়িয়ে......তখন এইটেই ছিলো চাল এবং চল।...কর্তা ছিলেন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী সওদাগর এবং ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মান-মর্যাদার ইয়ত্তা ছিলো না কর্ত্তার।” “সে যুগ ছিল অবনীন্দ্রনাথের আগমনের পূর্ব্বের কথা।...আমি যখন এসেছি—তখন স্বপ্নের আমল, অবশ্য উপন্যাসের যুগ বাঙলা দেশ থেকেই কেটে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তখন আরম্ভ...এই সময় রামলাল চাকরের সঙ্গে বসে দেখি, দুই দেয়ালে দুই সেইকালের ছবির দিকে! ...রামলাল এসে গেছে এবং আমাকে পিঠিয়ে গড়বার ভার নিয়ে বসেছে! বুঝিয়ে সুজিয়ে মেরে ধরে, এ বাড়ির আদবকায়দা দোরস্ত করে তুলবেই আমাকে, এই ছিলো রামলালের পণ!” রামলাল অবনীন্দ্রনাথকে তাহার নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী ইংরেজী ভাষা, আদব-কায়দা, সওদাগরি ব্যবসা ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষা দিতো। “তিনতলার ঘরটায়—সেখানে বড়ো একটা কেউ আসতো না কাছে, থাকতো রামলাল তার শিক্ষা-তন্ত্র নিয়ে, আর আমি তারই কাছে কখনো বসে, কখনো শুয়ে, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে, সেকালের ঝাড়ঝোলানোর মস্ত হুকগুলো সারি সারি হেঁটমুণ্ড বিস্ময়চিহ্ন—¡¡¡¡—চেয়ে দেখতো রামলালকে আমাকে মেঝের উপর সেই ঘরে। সেখান থেকে ঝাড় লণ্ঠন কার্পেট কেদারার আবরু অনেককাল কালো সারে পোক।”

অবনীন্দ্রনাথ বড়ো হইতেছেন, নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেছেন, ঠাকুরবাড়ীর শীর্ষস্থানীয়দিগের সম্বন্ধে জানিতে পারিতেছেন। কালোয়াতী গানের ওস্তাদ, পাঠান কুস্তিগীর, রুটি গড়ায় নিযুক্ত দারোয়ান, মাঘোৎসবের ভোজ ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণা হইতেছে তাঁহার সুলিখিত পুস্তকে। তাহার পরে কিছু সময় অতিক্রান্ত হইলে পর বাড়ির বাহির মহলে যাওয়া-আসা হওয়া সম্ভব হইল। “সেকালের নিয়ম অনুসারে একটা বয়স পর্যন্ত ছেলেরা থাকতেম অন্দরে ধরা, তারপর একদিন চাকর এসে দাসীর হাত থেকে আমাদের চার্জ্জ বুঝে নিতো। কাপড়, জুতো, জামা বাসন-কোসনের মতো করে আমাদের তোষাখানায় নামিয়ে নিয়ে ধরতো; সেখান থেকে ক্রমে দপ্তরখানা হয়ে হাতেখড়ির দিনে ঠাকুরঘর, শেষে বৈঠকখানার দিকে আস্তে আস্তে প্রমোশন পাওয়া নিয়ম ছিলো।” অবনীন্দ্রনাথ ‘আপন কথা’তে শেষের দিকে বলেছেন, “আমি বেঁচে আছি পুরণোর সঙ্গে নতুন হতে হতে; তেমনি বেঁচে আছে এই তিনতলা বাড়ীটাও, আজ যার মধ্যে বাসা নিয়ে বসে আছি আমি। আজ যদি কোনো মাড়োয়ারী দোকানদার পয়সার জোরে দখল করে এ বাড়িটা, তবে এ বাড়ির সেকাল-একাল দুই-ই লোপ পেয়ে যাবে নিশ্চয়। যে আসবে, তার সেকাল নয় শুধু একালটাই নিয়ে সে বসবে এখানে। দক্ষিণের বাগান ফুঁয়ে উড়িয়ে ওখানে বসাবে বাজার, জুতোর দোকান, ঘি-ময়দার আড়ং ও নানা—যাকে বলে প্রফিটেবল্-কারখানা, তাই বসিয়ে দেবে এখানে। সেকাল তখন স্মৃতিতেও থাকবে না।” নিজেদের বাড়ী সম্বন্ধে পুরাতনের স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখিবার যেমন তিনি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; তাঁর তুলিও তেমনিই পুরাতনের প্রেরণা আর প্রতিভা নূতন কল্পনায় প্রাণবান করিয়া তুলিয়াছিল। পুরাতনকে বুঝিতে হইলে সভ্যতা ও কৃষ্টির অতি গভীরে যাইতে হয়, সে ক্ষমতা সকলের থাকে না, বা থাকিলেও অনেকে আধুনিকের জলসে

গা ভাসাইয়া যত্রতত্র আকর্ষিত, হওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করেন।

অবনীন্দ্রনাথ ভারতের নবজাগরণের যুগে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজেদের পূর্ব্বকালের সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে জাগ্রত করিবার যে মহান চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা বিশ্বের জ্ঞানের দরবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতের ইতিহাসেরও তাহা একটা অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সম্বন্ধে সজাগ হইতে আরম্ভ করেন। কোন কোন বিদেশী-ভক্ত সেই পুরাতনের পুণর্জ্জন্ম পছন্দ করেন নাই ও রবীন্দ্র সাহিত্যের ন্যায় তাঁহারা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পেরও নিন্দাবাদ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু যখন বিদেশী জ্ঞানী ও গুণীগণই ঐ রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে অত্যুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিলেন তখন নিন্দার সুর ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গিয়া সেই স্থলে জয় গানের সুচনা হইল। অল্প পরিসর আলোচনায় এক বিরাট প্রতিভার পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব হয় না। সেই কারণে আমরা এই সম্বন্ধে পূর্ণতরভাবে অন্যান্য বর্ণনা-আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখিলাম। একটা বড়ই দুঃখের কথা যে ভারত সরকার ও ভারতের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদিগের অবহেলায় অবনীন্দ্রনাথের বহু মহা মূল্যবান চিত্র সম্পদ বর্ত্তমানে বিদেশের চিত্র সংগ্রহে চলিয়া গিয়াছে। এখনও যাহা আছে তাহা আশা করি ভারত সরকার সচেষ্ট হইয়া যাহাতে দেশের বাহিরে চলিয়া না যায় সে ব্যবস্থা করিবেন। এই বিষয়ে কোন অবহেলা করিলে ভবিষ্যত ভারত সে দোষ কখনও ক্ষমা করিবে না। কারন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার চিত্রকলা ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার একটি মূল্যবান ও গৌরবময় অঙ্গ। যতদূর সম্ভব তাঁহার অঙ্কিত চিত্র সম্পদ ভারতেই রক্ষা করিবার আয়োজন

রাষ্ট্রপতি শাসন ও রাষ্ট্রীয় দলের সহযোগীতা

পশ্চিম বাঙলায় বর্ত্তমানে যে অরাজকতা চলিতেছে তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় দলগুলির সংযোগ আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণেরই বিশ্বাস। কথাটা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহাশয়ের অজানা নাই; কারণ তিনি কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নানান দলের লোকেদের সঙ্গেই ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা করিয়া থাকেন। এখন সমস্যা হইল দেশে অরাজকতা বন্ধ কি করিয়া করা যায়। কেহ বলিলেন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মিলিত প্রচেষ্টায় শীঘ্রই খুন-খারাবি, ডাকাইতি প্রভৃতি আর হইবে না। পুলিশ ও সেনাবাহিনী একত্রে সকল অপরাধকারীদিগকে ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু দেখা যাইল যে পুলিশকে সঙ্গে লইয়া তল্লাস করিতে যাওয়াতে বিশেষ কোন ফল হইতেছে না। সেনাবাহিনী পুলিশ বর্জ্জিতভাবেও খবরাখবর সংগ্রহ করিতে অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। অন্য কেহ কেহ বলিলেন রাষ্ট্রীয় দলের নেতাগণ সাহায্য করিলে খুনাখুনি নিবারণ করা যাইবে। রাষ্ট্রীয় দলের নেতাগণ যদি অপরাধীদিগের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েন তাহা হইলে অপরাধীগণকে তাঁহাদিগের চেলাচামুণ্ডা বলিয়া ধরিতে হইবে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে ঐ নেতাগণও অপরাধীদিগের সহিত অপরাধে সহযোগী এবং দণ্ডনীয়। বাংলাদেশে সহস্রাধিক খুন জখমের ঘটনা হইয়াছে বলিলে কোন অত্যুক্তি করা হয় না, এবং সকল রাষ্ট্রীয়দলের কাহার না কাহারও সহিত এই সকল ঘটনা সম্ভবত জড়িত আছে বলিয়া উচ্চস্তরের ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া চেষ্টা হইতেছে ঐ অপরাধকার্য্যের সহযোগী রাষ্ট্রীয় দলের নেতাদিগের সহিতই আলোচনা করিয়া এই অপরাধের বন্যায় কিছুটা বাধা দিবার। এই চেষ্টা যে সফল হইবে না তাহা পূর্ব্ব হইতেই বুঝা যাইতেছে। কারণ অপরাধীগণ ধর্মকথা শুনিয়া অধর্মের পথ ছাড়িয়া ন্যায়ের পথে ফিরিয়া আসিবে ইহা যাহারা বলে তাহারা সরলতার মিথ্যা অভিনয় করিয়াই তাহা বলে। রাষ্ট্র-

দ্বিশততম বর্ষের আলোকে

সন্তোষকুমার অধিকারী

রামমোহন সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে রামমোহনকে হিন্দুসমাজ ও বাঙ্গালী জাতি কোনদিনই খুশিমনে গ্রহণ করতে উৎসুক হয়নি। রামমোহনের কীর্তি সম্বন্ধে যতটুকু শ্রদ্ধা আমাদের মনে আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আছে বিরোধিতার মনোভাব। সেই মহৎ ব্যক্তিত্বকে স্বজাতীয় বলে গৌরব অনুভব করার চেয়ে তাঁকে ভিন্নধর্মী বলে বর্ণণা করার মধ্যে অনেক বেশী আনন্দ পাই।

বাঙলাদেশের পটভূমিতে তিনি মোটামুটি ১৮১৫ খৃঃ থেকে ১৮৩০খৃঃ পর্য্যন্ত সক্রিয় থেকে কাজ করেছেন, একথা মনে রাখলে, তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড়শো বছর পরে আমাদের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল। সম্প্রতি তাঁর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকীর সূচনায় রামমোহন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমার ধারণা হ'য়েছে যে, দেশে একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র—তাঁর অনুগামী কিছু ব্যক্তিই—আজ রামমোহন সম্বন্ধে আগ্রহী। অন্যদিকে আজও তাকে ধর্মদ্বেষী, মুসলমানের দূত, নাশকতাবাদী ইত্যাদি বিশেষনে ভূষিত করবার একটা গোপন চেষ্টা রয়েছে। অর্থাৎ রামমোহনকে আমরা কোন দিনই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার ধারণা হ'য়েছে যে—

প্রথমতঃ রামমোহন অতিরিক্ত যুক্তি বাদী ছিলেন; তাঁর সংস্কারের চেষ্টার মধ্যে এমন প্রবল একটি আঘাত ছিল যা হিন্দুধর্মের মানসিকতাকেই বিপর্য্যস্ত করে দিয়েছিল;

দ্বিতীয়তঃ তাঁর অনুগামী ভক্তেরা স্বতন্ত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করে সমাজ ও জাতির হৃদয় থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ তাঁর অব্যাহিত পরেই বিদ্যাসাগরের মত মানবিক হৃদয় সম্পন্ন সংস্কারকের আবির্ভাব এবং বিবেকানন্দের মত প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্মনেতার আবির্ভাবে রামমোহনের ব্যক্তিত্বের রূপ কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েছে।

চতুর্থতঃ তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটা ব্যাপকতা ছিল, যে তার মধ্যে আমরা নিজেদের বিশেষ করে খুঁজে পাইনি।

রামমোহন সম্বন্ধে আমাদের এই ভ্রান্তির কারণ, আমরা ভাবি তিনি বিপ্লবী ছিলেন এবং তাঁর বিপ্লব হিন্দুধর্ম ও সংস্কারকে ভাঙ্গতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে তিনি ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু যুক্তি ও উপযোগবাদের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে প্রচলিত চিন্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর এই বিদ্রোহ যে সার্থক হ'য়েছিল তার প্রমাণ—আধুনিক ভারতবর্ষের স্রষ্টা তিনজন শ্রেষ্ঠ নায়কের জীবন।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিবেদিতা তাঁর "Notes on some wandering" নিবন্ধে লিখেছেন—

"It was here, too that we heard a long talk on Rammohan Roy, in which he * pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love of country...... In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohan had mapped out."

(*Swamiji)

অর্থাৎ স্বামীজি অন্ততঃ তিনটি বিষয়ে নিজেকে রামমোহনের অনুগামী বলে স্বীকার করেছেন সেই তিনটি বিষয় হ'ল—(১) বেদান্তদর্শনকে জীবনে গ্রহণ করা (২) স্বাদেশিকতার বাণী ও (৩) দেশ প্রেম।

বিদ্যাসাগর রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। মাত্র ন'বছর বয়সে বিদ্যাসাগর যখন কলকাতায় এসে পৌঁচেছেন তখন রামমোহন তাঁর চোখে আদর্শ পুরুষ। কুৎসিৎ ও বর্বর সতীদাহ প্রথার নিবারণ সেই বছরই সম্ভব হল। রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ বিদ্যাসাগরের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। একবার বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদের ভীরুতায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর রামমোহনের ফটোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিলেন—ওই ফটোটা তবে ফেলে দাও। "বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থে বিদ্যাসাগর রামমোহন প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

রামমোহন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তিনি চিরকালের মতই আধুনিক।...তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। ...আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারিনি।"

রামমোহনের ধর্মচেতনাকে ধর্মসংস্কার নাম দিয়ে আমরা আরও ভুল করেছি। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা রামমোহনকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃ সহজাত ধর্মচেতনা নিয়ে তার জন্ম। যে চেতনা চিরকালের ভারতবর্ষের মনকে একদিন বিশ্বাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করেছিল। আর্য ঋষির সেই স্বচ্ছদৃষ্টি নিয়ে তিনি এসেছিলেন বলেই অতি সহজেই অন্ধ তামসিক অনুষ্ঠানকে অবহেলা করতে পেরেছিলেন। সেই দিনের ভারতবর্ষে বিজয়ী ইংরাজ মিশনারীরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করবার সুযোগ পেয়েছিল। কারণ অনুষ্ঠান সর্বস্ব ও সংস্কার জর্জর সমাজ মানুষকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। অন্ত্যজ ও নীচ বর্ণের মানুষগুলি সেদিন খৃষ্টান ধর্মের আইন পেয়ে সাগ্রহে ছুটে চলেছিল। মিশনারীদের হাত থেকে সমাজ ও ধর্মকে বাঁচানোর জন্য ধর্মচিন্তার মধ্যে গতির প্রবাহ আনার প্রয়োজন ছিল। রামমোহন নদীর মুখ থেকে চরা কেটে তাকে স্রোতস্বতী করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সেই চেষ্টাই তাঁকে শত্রু করে তুললো সকলের কাছে। একদিকে হিন্দুসমাজ তাদের বিশ্বাস ও অধিকারের উপর এই আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। রামমোহন সমস্ত প্রচলিত প্রথাকে অবান্তর ও কুসংস্কার বলে বর্ণনা করায় ব্রাহ্মণসমাজের ভিত ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। তাই তাদের কাছে রামমোহন ধর্মদ্রোহী কালাপাহাড়। অপরদিকে মিশনারী সম্প্রদায়। তারা এতদিন হিন্দুধর্মকে যথেচ্ছা গালাগাল করে এসেছে। কিন্তু রামমোহন শুধু হিন্দুধর্মের সমর্থনে দাঁড়িয়ে যে প্রত্যুত্তর দিলেন তাই নয়; তিনি খৃষ্টান ধর্মের মূলমর্মকে উপস্থাপিত করে যারা ত্রিত্ববাদী (Trinitarian) তাদের তীব্র নিন্দা করলেন। বাংলাদেশের খৃষ্টান সমাজের রক্ষণশীল দলের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ চলেছিল। রামমোহনের "An Appeal to the Christian Public" এর বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখ্য অংশগ্রহণ করেছিল শ্রীরামপুর মিশন ও তাঁদের মুখপত্র 'সমাচার দর্পণ'।

এই সময়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে হিন্দু সমাজ ও খৃষ্টান মিশনারীরা দল বেঁধে অগ্রসর হন। তাঁকে ব্যঙ্গ করে কবির দল গান বাঁধে—

সুরাই মেলের কুল
বেটার বাড়ী খানাকুল
বেটা সর্বনাশের মূল
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল।
ও সে জেতের দফা করলে রফা
মজালে তিনকুল।

ব্যক্তিগত চরিত্রের বিরুদ্ধে রটনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা হল যে রামমোহন দুশ্চরিত্র এবং বিধর্মী ছিলেন।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভাতে গোহত্যা করা হয়ে থাকে এমন কথাও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে শোনা যেতে লাগলো। খৃষ্টান সমাজও এই রটনার সুযোগ নিয়ে লিখলেন—

He is said to be very moral, but is pronounced to be a most wicked man by the strict Hindus."

[Periodical Accounts of the Baptist Missionary Society]

আশ্চর্য্যের বিষয় সে যুগে রামমোহন সম্পর্কে আমাদের যে বিতৃষ্ণা ছিল, আজও তা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। আজও আমরা প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত থাকি যে রামমোহন হিন্দুদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁর কাজ ধ্বংসমূলক ছিল। বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষা তথা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টার মূলে রামমোহনের প্রেরণাকে আমরা বিস্মৃত হই। এমন কি সেই দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার স্পৃহা যা তাঁকে বিশ্বমানবতার সম্মুখীন করেছিল, তাও ভুলে যাই।

তাই এই দ্বিশততম জন্মবর্ষের সূচনার মুহূর্তে ভারতের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ যে রামমোহন, তাঁর চরিত্র ও কার্য্যাবলীর সঠিক মূল্যায়ন করা হবে, এইটুকু প্রত্যাশা আমি আমার শিক্ষিত বন্ধুদের কাছে করবো।
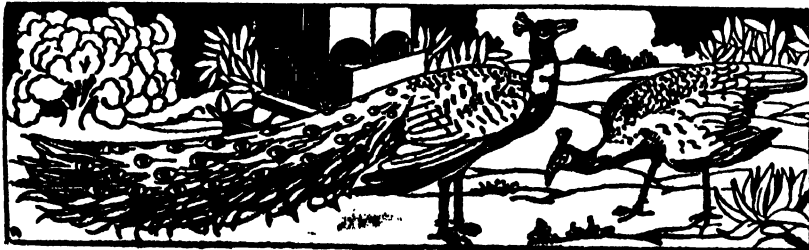
স্মৃতির জোয়ারে উজান বেয়ে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(সাত)

বিধাতা যখন আঁতুড় ঘরে আমার ললাটে অদৃশ্য আখরে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাস লিখেছিলেন তখন তাঁর বোধহয় মনে একটু দয়া হয়েছিল লেখার পর যে,এ ছেলে সংসারী হবে না, যোগী হবে। কিন্তু একদিকে যেমন যোগী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, অন্যদিকে তেমনি সংসারী বুদ্ধি না থাকলে সংসারে পদে পদে ভুগতে হয়। বিধাতা তাই লিখেছিলেন : "একে বাঁচাবে নানা সময়ে নানা বন্ধু।" বার্লিনে আমার কতিপয় বন্ধু-বান্ধবী আমাকে বাঁচিয়েছিলেন নানা সংকটে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ওলগা বিরুকফ।

ওলগার পিতৃদেব পল বিরুকফ ছিলেন টলস্টয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর সঙ্গে আমার ১৯২২ সালে দেখা হয়েছিল সুইজর্লণ্ডে। যেমন সুশ্রী তেমনি উদার। সর্বোপরি আদর্শবাদী। টলস্টয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা অহিংস যুদ্ধবিরোধী ও নিরামিষাশী হন তাঁদের বলে টলস্টয়ান। পঞ্চাশ বৎসর আগে রুষদেশে ও অন্যত্র টলস্টয়ানদের দেখা মিলত। টলস্টয়ানরা সত্যিই বিশ্বাস করেন খৃষ্টধর্মকে। সাধনা করেন সরল নিরীহ জীবনযাপন করতে। বলেন বাইরের সব শাসনই ভুল কেবল অন্তরের শাসনই আমাদের ঠিক পথে চালায়। ওলগা বার্লিনে এসেছিল চিত্রবিদ্যা শিখতে। পরত homespun সুতোর ফ্রক—খদ্দরের মতন। রোজ যেত এক সস্তা নিরামিষ ভোজনালয়ে। ভুলেও কখনো কোনো থিয়েটারে বা নাচঘরে যেত না —তবে গান ভালোবাসত বলে আমার সঙ্গে যেত নানা সিমফনি কন্সার্টে ফিলহার্মনিক হলে। বলত আমাকে : রুষজাতির মতন গানপাগল জাত আর দুটি নেই- যদিও স্বীকার করত—সত্যবাদিনী তো—জর্মনিই সঙ্গীতরাজ্যে শিখরচারী। তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত সেই নিরামিষাশী রেস্তরাঁতে, আর শুনতাম সাগ্রহে রুষ-জাতির নানা বিচিত্র মতিগতির কথা। সে বলশেভিকদের আদৌ পছন্দ করত না, কিন্তু স্বীকার করত, সত্যের খাতিরে, যে বলশেভিকরা অরাজকতা ও বিদেশী ইম্পীরিয়ালিস্‌ম্ থেকে রুষদেশকে বাঁচিয়েছে। লেনিন মহদাশয়, কিন্তু ট্রটস্কি, স্ট্যালিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সে চুপ করে থাকত। একদিন বলেছিল : "দিলীপ, দেয়ালেরও কান আছে। তাছাড়া আমি নির্বিবাদী, বাবার মতন, চাই নিজের পথে চলতে। এর ওর তার পথের গুণাগুণ সম্বন্ধে নাই বা রায় দিলাম।" কেবল "বলশেভিকরা ধর্মের মূলোচ্ছেদ করেছে শুনি" আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে হেসে বলেছিল : "ভাই দিলীপ, সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলা যেদিন সম্ভব হবে সেদিনই কেবল ধর্মকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে। খৃষ্টদেব অকারণ বলেন নি : স্বর্গ-মর্ত্য লুপ্ত হলেও আমার বাণী লুপ্ত হবে না।"

বড় ভালো লাগত তার সরল বিশ্বাস, ঐকান্তিকতা, ধর্মনিষ্ঠা, পবিত্রতা, আদর্শবাদ, মিষ্টি হাসি ও সহজ স্নেহশীলতা। ছেনালির ধারপাশ দিয়েও সে যেত না কখনো। সরল একরোখা ধর্মভীরু এ সুকুমারীকে আমার মনে হত অনন্যা। সে বলত চিরকুমারী থাকবে চিরদিন। রবীন্দ্রনাথের বলাকার লাইন মনে পড়ত : "ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নাই তোর তরে......ক্ষতি এনে দিবে পদে অদৃশ্য অমূল্য উপহার।" পরে তার পিতৃদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে(ভাগ্যক্রমে পিতাপুত্রী উভয়েই চমৎকার ফরাসী বলতে পারতেন)। আমি ওলগার মনের আরো যেন নাগাল পেয়েছিলাম। মনে

পড়ত ইংরাজী উপমা: "A chip of the old block."

বহুদিন বাদে আমার এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম ওলগা টলষ্টয় ম্যুসিয়মে কাজ করে ও তার টেবিলে আমার ছবি। মস্কো থেকে সে আমাকে চিঠি লিখত মাঝে মাঝে। তার কথা যখনই মনে হয় অন্তরে জ্বলে ওঠে তার মুখের প্রসন্ন নির্মলতার আভা। টলষ্টয় যে ম'রেও মরেনি—ওলগা ছিল তার অন্যতম তথা জীবন্ত প্রমাণ।

মানব রায়ের নিমন্ত্রণের কথা শুনে সে দুহাত তুলে বলল: "না না না—যেও না মস্কোয়। আমাকে যেতেই হবে, কিন্তু তোমার মতন ধর্ম পন্থীর পক্ষে মস্কোর আবহাওয়া হবে দুঃসহ।" এই ধরণের জোরালো নিষেধ।

আমার কাছে সে সাগ্রহে শুনত আমাদের দেশের মুনি ঋষি অবতারদের কথা। সবই তার অন্তর সাদরে বরণ করে নিত। বলত প্রায়ই একটি কথা: "তোমাদের দেশ সম্বন্ধে টলষ্টয়ের ধারণা ছিল খুব উঁচু।" কিন্তু টলষ্টয়ের কোনো লেখায় তাঁর এ ধরণের রায় তখনো আমার চোখে পড়েনি। ওলগা বলত: একথা ওর পিতৃদেব পল বিরুকফের কাছে শুনেছিল।

মস্কো যাবার ইচ্ছায় ওলগাই প্রথম বাদ সাধে।

(আট)

মস্কো সম্পর্কে আরো সোচ্চার হয়েছিল শহীদ সুরবর্দি—পই পই ক'রে মানা করেছিল মস্কো যেতে। রীডার্স ডাইজেষ্টে নানা লোকে লেখে The most unforgettable character I have seen. আমি বলতে চাই একটি Unforgettable character এর কথা: অর্থাৎ শহীদ সুরবর্দি। তার সম্বন্ধে আমি অন্যত্র লিখেছি একাধিকবার। তবু তার কথা আমার "স্মৃতির শেষপাতায়" না থাকলে আমার স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পুনরুক্তি সর্বত্র এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, তবে যেমন "এক নদীতে-মানুষ দুবার স্নান করে না" তেমনি একই বন্ধুর দুটি চিত্রায়ন একই রূপে রসে ফুটে উঠতে পারে না। কারণ স্পষ্ট: শহীদকে আমি নানা সময়ে নানা রূপে দেখতাম। ইতিপূর্বে তার চিত্রায়নে যে রূপকে ফুটিয়েছি সে একটি বিশেষ "মূড"-এর স্ফুরণ। আজ লিখছি অন্য মূড-এ—মনে রেখে যে তার সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হয়নি সেই সব কথাই বলব যথাসাধ্য। এইটুকু উপক্রমণিকা করেই শুরু করি "সুরবর্দির কথা অমৃত সমান।"

অমৃত সমান—বটেই তো! ভগবানকে বলা হয়েছে রসময়—রসো বৈ সঃ। সুতরাং যে মানুষ তার হাবভাবে চিঠি পত্রে, হাসি ঠাট্টায়, স্মৃতিচারণে অনায়াসে রসের ঝর্ণা বইয়ে দিতে পারে তার কথা "অমৃত সমান" বললে অত্যুক্তি হবে কেন? সংসারে আমরা চলি দিনগত পাপক্ষয় ক'রে দিনের পর দিন ধূসর নীরস মরুপথের পথিক হ'য়ে। শ্রীঅরবিন্দ কোথায় বলেছেন যে, মানুষের মনের মাত্র দুটি অবস্থা আছে—সুখী ও দুঃখী—একথা ঠিক নয়: আরো একটি (তৃতীয়) অবস্থা আছে এবং সেইটিই আমাদের জীবনকে বেশি ছেয়ে ধরে থাকে বলা চলে-না-সুখের না-দুঃখের অবস্থা ওরফে নিউট্রাল। সবই আছে অথচ কিছুতেই যেন সাধ মিটছে না, রস মিটছে না। স্বাস্থ্য অটুট, যশে সুপ্রতিষ্ঠিত, ধন অঢেল, বন্ধুরা সদয়, বণিতা অবিজ্ঞা নয়—তবু মন খাঁ খাঁ করে—না, বর্ণনায় ভুল হল—শূন্যতাও নয়, বিরসতা। মনে পড়ে একবার আমার প্রকাশক বন্ধু ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের ওখানে গিয়েছিলাম। দেখি রেডিও কাছে কিন্তু তিনি খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন অন্যমনস্কভাবে। শুধালাম: রেডিওতে কী বাজছে?, তিনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন: কে জানে? আমি খুলে রেখে দিই—ঐ ঘ্যান ঘ্যান করে করুক না।" আমাদের জীবনের অধিকাংশ দিন-ক্ষণ প্রহরই ঠিক এমনি বন্ধ্যা—ঘ্যান ঘ্যান করে আমরা খবর নিই না কে কী বলছে, সংকল্প করি না—"আমি এবার বলার মত কিছু বলবই বলব—শোনার মত কিছু শুনবই শুনব।" হা অদৃষ্ট! বলার মত কিছু বলতে পারে ক'জন? শুনবই বা ছাই কী? অমুক অমুককে গাল দিল বা মেরে বসল, তমুক পথ চলতে গিয়ে বাস-এর নীচে পড়ে

মারা গেল, যদু মধু বিধু সিধু একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলছে মঞ্চে বা রেডিওতে। রসিক হলেই কেবল পারে মানুষ মনকে উচ্চকিত করতে উল্লসিত করতে—দৈনন্দিন একঘেয়েমিকে পাশ কাটিয়ে সোজা রসের ঝর্নার নাগাল পেয়ে আনন্দের বান ডাকিয়ে দিতে।

শহীদ সুরবর্দি ছিল এই জাতের বিরল মনীষী—খাঁটি রসিক। যেখানেই যেত শুধু তার উপস্থিতিতেই লুপ্ত হত সব দৈনন্দিন ধূসরতা—এক আশ্চর্য শ্যামলতা, নবীনতা ফুটে উঠত তার ব্যক্তিরূপের সরসতায়, হাসিতে প্রীতিস্পর্শে।

তার সঙ্গে আমার আলাপ হয় দৈবাৎ নয়। সে আমার সাঙ্গীতিক নামডাক শুনে অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। নিজের পরিচয় দিল—Moscow Kuenstler theatre এর regisseur অর্থাৎ প্রযোজক।

আমি তো শুনে থ! ভারতীয়—তার উপর ভেতো বাঙালী বিখ্যাত রুষ মঞ্চের প্রযোজক!! বার্লিনে তখন মস্কো মঞ্চের জয়জয়কার। এর-ওর-তার মুখে শুনতাম ডষ্টয়েভাস্কির ব্রাদার্স কারামাজভ, চেকভের চেরি অরচার্ড আরো নানা রুষ নাটক দেখতে বিষম ভীড় জমে। দুদিনেই টিকিট সব নিঃশেষ। কিন্তু রুষ-ভাষায় অভিনয়! কী বুঝব—ভেবেই যাই নি। শহীদ হেসে বলল: "কেন মূক ছায়াছবি কি দেখতেন না কখনো? রুষদের অভিনয়ই যথেষ্ট, ভাষাজ্ঞান নাই থাকল।" বললাম: "আচ্ছা তাহলে যাব একদিন দেখতে ডষ্টয়েভাস্কির ব্রাদার্স কারামাজভ—যা পড়ে আইনষ্টাইন বলেছিলেন 'উপন্যাসের গৌরীশঙ্কর'।

'স্বাগতম' বলল শহীদ মিষ্টি হেসে, "কিন্তু তবু আপনাকে থিয়েটার দেখাতে আমি আনি নি। রবীন্দ্রনাথের King of the Dark Chamber আমরা অভিনয় করব রুষ ভাষায়—আপনাকে তার সঙ্গীতসঙ্গত রচনা করতে হবে।"

আমার গায়ে কাঁটা দিল! এ-জগদ্বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে আমি সঙ্গীততরঙ্গ বহাব!—একি ভাবা যায়! শহীদ খুশী হয়ে আমাকে দিল শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র সেনের অনুবাদ। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমার সস্তায় কিস্তি মেরে যশস্বী হওয়া হল না। রবীন্দ্রনাথের নাটকটি অভিনীত হল না।

কিন্তু ক্ষতিপূরণ হল এই সূত্রে শহীদকে বন্ধু পেয়ে। দুদিনেই আমরা ভালোবেসে ফেললাম পরস্পরকে। ওর সাহচর্য রসিকতায় জীবনস্মৃতির বর্ণনায় কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্যে বিশেষ করে রুষদেশের সংস্কৃতির গুণগানে ও মাতিয়ে তুলল আমাকে। ওর সঙ্গে প্রায়ই একসঙ্গে লাঞ্চ খেতাম, বা ডিনার। ও নানা পুরুষ ও ললনাকে দেখিয়ে আমাকে বলত যে কোন জাতের মানব মানবী। দশ বারো বৎসর ইউরোপে ও রাশিয়ায় কাটিয়ে ও হয়ে উঠেছিল মানব চরিত্রের এক অন্তর্ভেদী ক্রিটিক। সব-চেয়ে ও অপছন্দ করত ভড়ংকে। তাই প্রায়ই তীরন্দাজি করত আমাদের দেশের নানা সুসন্তানের মেকি প্রতিষ্ঠাকে। ওর কাছে সত্যি শুনে চমকে যেতাম সময়ে সময়ে: এ কী ব্যাপার!—অমুক দেশের দশের এক-জনের স্বর্ণদীপ্ত আসনে নিছক গিল্টি! অমুক দেশ নায়কের দেশভক্তি স্রেফ মুখের কথা। অমুক নামজাদা সাহিত্যিকের ধুমধড়াক্কা সবই অসার—সস্তা প্যাচ!

কিন্তু খাঁটি মানুষকে ও মান দিত সাগ্রহেই। কেবল বলত: "দিলীপ ভাই, খাঁটি মানুষ জগতে বেশি মেলে না জেনো।"

ওর কাছ থেকে ওর জীবনস্মৃতি শুনতে শুনতে সময় সময় মনে হত যেন ফিরে গেছি অতীত যুগে—যে-যুগে রোমান্স ঘটত পদে পদে। কতরকম অভিজ্ঞতাই যে ওর হয়েছিল—বলত ও ফলিয়ে। একটির কথা শুধু বলি এখানে।

(নয়)

ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চার পাঁচ বৎসর ছিল রুষদেশেই আটক। সময়ে সময়ে অনশনে কাটত। সে-সময় ওর এক বান্ধবী মাদাম জার্মানোভা (খ্যাতনামা অভিনেত্রী) ওর অন্নদাত্রী হ'য়ে ওকে বাঁচান। তাঁর কাছে ও কৃতজ্ঞ ছিল বরাবর—পরে যখন ১৯২৭ সালে

পারিসে আসে তখন তাঁকে তথা তাঁর স্বামী-পুত্রকে ওই বাঁচিয়ে রেখেছিল। ঋণশোধ। "না দিলীপ," বলত ও, "সে ঋণ শোধ হবার নয়।" কিন্তু ফিরে যাই বার্লিন পর্বে।

বার্লিনে আমার যে কয়টি বন্ধু বান্ধবী লাভ হয়েছিল তাদের মধ্যে শহীদের সঙ্গেই আমার বেশী সময় কাটত—আর কাটত হু হু ক'রে কারণ শহীদ ছিল শুধু বন্ধু নয়, তার উপর কথক, সর্বোপরি রসিক। ওর রসিকতার দু একটি নমুনা দিই।

বার্লিনে তিনটি রুষ সুকুমারীর ওখানে আমার ছিল অবাধ গতিবিধি। তাদের সঙ্গে ওলগার সঙ্গে ও নাপিরোর সঙ্গে আমার কথালাপ হ'ত মূলতঃ ফরাসীতেই—যদিও কখনো কখনো জার্মানেও হ'ত। তবে জার্মানে নানা প্রতিশব্দ হাতড়ে না পেলে আমাকে ফরাসী ধরতে হ'ত ব'লে ফরাসীতেই আমি বেশি আলাপ করতাম। এদের সঙ্গে শহীদের আলাপ করিয়ে দিয়ে সে এক মহা বিপদ—শহীদ ওদের সঙ্গে রুষ ভাষায় আলাপ করতে উজিয়ে উঠত, আমি থেকে যেতাম ক্ষুণ্ণ বিহ্বল শ্রোতা-মাত্র। তবে শহীদ দরদী তো—একটু বাদে ফিরে আসত জার্মান ভাষায় বা ফরাসী ভাষায় আলাপ করতে। রুষ ভগ্নীত্রয় আমাকে বলত সোচ্ছ্বাসেই যে শহীদ খাস সাহিত্যিক ভাষায় কথা কয়। হবে না? সব দেশেই রঙ্গমঞ্চের ভাষাই হ'ল খাতিয়ে শিখরচারী। শহীদ রুষ ভাষায় তালিম নিয়েছিল নট নটীর কাছেই তো।

একদা ওরা শহীদকে ও আমাকে চা-য়ে নিমন্ত্রণ করে। সচরাচর আমাদের চা-পার্টির জোগানদার হ'ত রুষ "সামোভার"। শহীদের অভ্যুদয় হয় একটু 'লেট'-এ। ওর হাজারো বন্ধু বান্ধবী তো, প্রায়ই ওর আবির্ভাব হ'ত দেরিতে। বড় বোন সুকুমারী মিনা অভিমানে অনুযোগ করল "Vous etes en retard, mon cher! Ici, en Europe il faut etre ponctuel." (আপনি দেরিতে এসেছেন বন্ধু! এদেশে য়ুরোপে পাংচুয়াল হওয়া চাই।) শহীদ অম্লান বদনে c'est le commencement de materialism, voyons!" (বস্তু-তান্ত্রিকতার সুরু যে পাংচুয়ালিটি থেকে।) ওরা শহীদের এ উত্তরে একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলল এমন রসিকের সাত খুন মাপ।

অতঃপর শহীদ আত্মস্ফালনার্থে বলল (ফ্রেঞ্চেই) "মাদমোয়াসেল! আপনি নিজামের হায়দ্রাবাদে যান নি তো। যাবেন, আমার নিমন্ত্রণ রইল! কারণ সেখানে গেলে তবে বুঝবেন আমি ঠিক কি বলতে চাইছি—তারা কেউ পাংচুয়ালিটির ধারও ধারে না। বলি শুনুন সেখানে মানুষ কিভাবে কাল কর্তন করে চিরন্তনের এলাকায়।

"সে সময়ে আমাকে বাহাল করা হয়েছিল এক মস্ত ইংরাজ ওমরাওয়ের দেখাশোনা করতে। তিনি যাবেন এলোরা দেখতে। ট্রেন ছাড়বে সকাল নটায়। আমি তাঁকে বললাম: 'ব্যস্ত হবেন না—লাঞ্চ সেরে গেলেই চলবে।'

'সে কি?'

'হায়দ্রাবাদের ট্রেন কদাচ সময়ে রওনা হয় না—লেট থাকেই থাকে।'

'তা কখনো হয়? যদি আজ ঠিক সময়ে ছাড়ে?'

'অসম্ভব।'

'না না। আমি ঠিক সময়েই যাব।'

"আমার কথায় কান না দিয়ে গেলেন তিনি ষ্টেশনে। যেই নটা বেজেছে—গার্ড শিষ দিল। ট্রেন চলল। ইংরাজ মহোদয় তার কামরা থেকে গলা বাড়িয়ে আমাকে শাসিয়ে বললেন:

"কেমন? বলিনি! ট্রেন ছাড়ল তো ঠিক ন-টায়ই—কাঁটায় কাঁটায়।'

"আমি হেসে বললাম: 'না স্যার—এ কালকের ট্রেন"

ভগ্নীত্রয়ী তো হেসে গড়িয়ে পড়ে।

* * * * *

একদা শহীদ ও আমি ড্রেসডেনে পাহাড়ে উঠছি।

আমি বললাম: "কোথাও রেস্তর**াঁ** আছে কি শহীদ? কাউকে জিজ্ঞাসা করো না ভাই।"

ও বলল: "এদেশের লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করা বৃথা।"

"সে কি?"

"শোনো বলি। একবার আমি পরিব্রাজক হয়ে পদব্রজে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। জঠরে অগ্নি জ্বলছে। কোনো রেস্তরাঁ না পেলে ধড়ে প্রাণ থাকবে না। এক পথিককে শুধালাম: "মাইন হের! এখানে কি কোনো রেস্তরাঁ আছে বলতে পারেন?"

সে থেমে আমায় বলল: "আপনি কি রেস্তরাঁ চান না হোটেল?"

আমি বললাম: "আমি ক্ষুধার্ত—হোটেল হলেও হয়, রেস্তরাঁ হলেও হয়।"

সে বলল: "জানি না, মাইন হের!"

এমনি সরস ছিল ওর কথা। আর গল্পের পুঁজি অফুরন্ত। আমি একদিন ওকে বলেছিলাম: "ভাই তুমি ভাগ্যবান্—যেখানেই কেন যাও না সবাই আদর করবে এমন বহুভাষী কথকের।"

ও মুচকি হেসে বলেছিল: "Es ist nicht alles Gold was glaenzt, mein Optimist!" (যা চকচক করে তা-ই সোনা নয়, হে উচ্ছ্বাসী!) জানো না তো কথকের কী দুরবস্থা হয় সময়ে সময়ে। একবার আমাকে টেবিলে বসিয়ে দিল—ডানদিকে মেক্সিকোর চর্মবণিক, বাঁদিকে আরবী মোল্লা। আমাকে কথা চালাতে হচ্ছে এর সঙ্গে স্পানিসে, ওর সঙ্গে ফরাসীতে।

কিন্তু এ-ধরণের কথা বলত ও আদর কাড়তেই বলব। কারা কোথাও ওকে অবজ্ঞাত কি অনাদৃত হতে দেখি নি। ওর কথাবার্তা প্রাণশক্তি সমালোচনা পরচর্চা সব কিছুর মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠত এক আশ্চর্য রূপদক্ষতা। যা-ই বলবে তার মধ্যে দিয়েই ঝিকিয়ে উঠতে আনন্দের আলো। এককথায় আনন্দময় পুরুষ

অথচ জীবনে সে দুঃখ পেয়েছে কম নয়। আর যেমন তেমন দুঃখ নয়, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

অক্সফোর্ডে গিয়ে সে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়; ফার্স্ট ক্লাস বোধহয় পায় নি। কী তার বিষয় ছিল তাও মনে নেই। তবে মনে আছে সে বলত—কবিতাই ছিল তার প্রথমা প্রিয়া, first love. কিন্তু এ-প্রেমকে সে বরণ করেও ধারণ করতে পারে নি। উত্তরযৌবনে সে আর কবিতা লিখত না। তার একটি চিঠিতে আমাকে ইংরাজীতে লিখেছিল (অনুবাদ আমার):

"শ্রীঅরবিন্দ আমার কবিতা সম্বন্ধে [শ্রীঅরবিন্দকে আমি শহীদের মাত্র দুটি ইংরাজী কবিতা পাঠিয়েছিলাম আমার বাংলা অনুবাদ সহ] যা বলেছেন আমি সাগ্রহেই পড়েছি। কিন্তু তিনি কী জানবেন—আমার প্রেয়সীকি রকম তন্বী ছিল, আমার কলাকারু কি রকম সস্তা। আমি ইচ্ছে করলে এ-রকম কবিতা আরো অনেক লিখতে পারি মিলে ছন্দে নিখুঁৎ—যেমন আর সকলে লেখে। কিন্তু সে সব কবিতার উৎস কী শুনবে?—আমার সাহিত্যিক সংস্কৃতি—literary culture—কোনো গভীর আন্তর উপলব্ধি নয়। হয়ত কখনো অনুভব করেছি একটা আবছা তৃষ্ণা, আধফোটা আশা ঈষৎ দর্শনের মোহ—তার বেশি কিছু নয়। অথচ তবু থেকে থেকে আমি দেখি আমি হঠাৎ বসে গেছি কবিতা লিখতে—জানি না কেন। কী জন্যে আমি লিখি? আমার মধ্যে এমন কোনো তাগিদই তো নেই যাকে ছন্দে রূপ না দিলেই নয়।...তবেই দেখ ভাই, আমি এক অদ্ভুত চিন্তা বাসনা ও অনুভূতির হ-য-ব-র-ল! (You see what a brute matiere of sensations, experiences, longings and thoughts I am!)

ক্রমশঃ

পুরো চিঠিটি আমার একটি ইংরাজী স্মৃতিচারণে ছাপা হয়েছে।

চুঁচুড়ায় ডাচ আমল

১৬১৫ (?)—১৮২৫

জুলফিকার

পূর্ব্বাভাস

॥পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওলন্দাজ বণিকদের আগমন ও পর্তুগীজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা॥

ওলন্দাজ বা ডাচেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এসেছিল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম দিকে—পর্তুগীজদের প্রায় শ'দেড়েক বছর পর।

সে যুগে ইউরোপে ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনীত সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র (মসলীন), সোরা, মোম, চিনি, পিপ্পুল, আদা, দারুচিনি, এলাচ, জায়ফল প্রভৃতি রকমারী মসলা; কর্পূর, চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল, জটামাংসী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য,—এসবেরই একচেটে কারবার ছিল পর্তুগীজদের। প্রাচ্যভূখণ্ডের এসব মাল কেনবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে বণিকদের ভিড় জমতো লিজবোয়া বা লিসবনের বাজারে। এসব জিনিষের সব চাইতে বড় খদ্দের ছিল ডাচেরা, ডাচদের দেশ হল্যাণ্ড ছিল স্পেনের অধীন। পরে যখন হল্যাণ্ডে হিস্পানী প্রভুত্বের অবসান ঘটল, আর ১৫৮০ খৃঃ স্পেন ও পর্তুগাল একটা সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করল, তখন লিসবন বন্দরে ডাচ জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

ডাচেরা ছিল জাত ব্যবসায়ী। ভারত ও পূর্বভারতীয় অঞ্চলের মাল পাবার অসুবিধার কথা চিন্তা করে, ওরা বহুদিন ধরেই বাণিজ্য পোত পাঠাবার জল্পনা করছিল। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতায় ওদের সংকল্প কার্যকরী হতে পারেনি।

শুধু জাহাজ হলেই ত চলবে না। প্রতিটি জাহাজের পেছনে অসম্ভব খরচ। গোটা আফ্রিকামহাদেশ প্রদক্ষিণ করে যেতে হবে,—অন্ততঃ পাঁচ ছ'মাসের রসদ মজুত রাখা চাই। সুদীর্ঘ পথ। পথে ঝড় তুফান আছে,—আছে জলদস্যুর উপদ্রব। তাছাড়া যে সব জায়গায় জাহাজ ভিড়বে, সেখানকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্যে উপঢৌকন হিসেবে কিছু মূল্যবান জিনিষও ত সঙ্গে নেওয়া দরকার। বোম্বেটেদের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাই কামান, গোলাবারুদ আর দক্ষ গোলন্দাজ। কাজেই বেশ মোটা রকমের মূলধন প্রয়োজন।......যা'হোক শেষটায় বণিকদের যৌথ অর্থে প্রাচ্য অঞ্চলে বাণিজ্য চালাবার জন্যে কয়েকটা ব্যবসায়ী সংস্থা গড়ে উঠলো।

সেটা ১৫৫৯ খৃঃ থেকে ১৬০১ খৃঃ যুগের কথা। আমষ্টারডমে স্থাপিত হলো Compagnie Van Verre, Oude Compagnie, Nieuwe Brabentsche Compagnie, Varrenighde Hollandsche Compagnie ইত্যাদি রটারডমে J Van der Vicken & Compagnie.

ডাচদের প্রথম বাণিজ্যপোত ছাড়লো ১৫৫৯ খৃঃ Captain Heutman-এর নেতৃত্বে। ১৫৫৯ সাল থেকে ১৬০৯ সাল অবধি পঞ্চাশ বছরে হল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিল বিভিন্ন কম্পানীর কমসেকম ৬৫ খানা জাহাজ। লাভও মন্দ হয়নি।...

কিন্তু এককালীন খুব বেশী অর্থব্যয় করা অনেক কম্পানীর পক্ষে কঠিন ছিল। ফলে বছরে একখানার বেশী জাহাজ পাঠানো কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। তাছাড়া, পালের জাহাজে বেশি মাল বোঝাই করা ছিল বিপজ্জনক। এ-সব অসুবিধের কথা বিবেচনা করে ১৬০২ খৃঃ-এ সব কম্পানীগুলো এক জোটে এক সমবায় গড়ে তুলল, আর নতুন প্রতিষ্ঠানটার নাম দে'য়া হ'ল ঃ

Vereenighde Oost Indische Compagnie [United East India Company] কিম্বা Oost Indische Vereenighde Compagnie সংক্ষেপে O. V. C.(১)

ডাচদের আসবার একশ' বছর আগ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের ছিল একাধিপত্য। Da Barres তাঁর Asia Portuguesa গ্রন্থে এ-বিষয় বিস্তারিত লিখে গেছেন।

পশ্চিমে লোহিত সাগর আর পারস্য উপসাগরের অর্মুজ থেকে পূর্বে ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মোলুক্কাস, নিউগিনি ও ফিলিপিনের ধার পর্যন্ত, এবং সমগ্র পূর্ব-আফ্রিকার বিস্তীর্ণ উপকূল জুড়ে এক বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চল নিয়ে পর্তুগীজদের ছিল সর্বময় বাণিজ্যিক আধিপত্য।......

কিন্তু ডাচদের আসবার পর থেকেই পর্তুগীজদের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। ১৬০২ সালে বাটনামে পর্তুগীজদের পরাজিত করে ওলন্দাজরা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাবার পথ সুগম করে তুলল। তারপর ১৬০৭ সালে বিখ্যাত মশলাদ্বীপ মোলুক্কাস পর্তুগীজদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। জাপানেও তারা পর্তুগীজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। মালয় ও মোলুক্কাসের মধ্যবর্তী যাভা বা যবদ্বীপে ডাচেরা তাঁদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করল। ক্রমেই বান্দা, পুলাওয়ে, আম্বোয়ানা রেসেনজীন প্রভৃতি দ্বীপ থেকে সংগৃহীত মশলা ইউরোপে চালান দেবার একচেটে কারবারটা ডাচদের হাতে চলে এল। ১৬১৯ খ্রীঃ ডাচেরা ব্যাটাভিয়ায় তাদের পূর্বএশিয় বাণিজ্যের সদর দপ্তর খুলল। গড়ে উঠল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালগুদাম, জেটী, সৈন্যদের ব্যারাক আর কর্মচারীদের বাসা। ক্রমেই ডাচদের শক্তিও বেড়ে যেতে লাগল।

১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ওরা সিংহল থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করলো। আর তিন চার বছরের মধ্যেই ভারত মহাসাগর পর্তুগীজ আধিপত্যের অবসান হল। ১৬১৪ সালে মালাক্কা ওলন্দাজদের অধিকারে এলো। ফলে পূর্বভারতীয় দ্বীপাঞ্চলের সামুদ্রিক পথে পূর্ণ কর্তৃত্ব ওদের আয়ত্বে এসে গেল। সন্ধির সর্তানুসারে পর্তুগীজরা তাদের মশলার কারবারটা ডাচদের হাতে তুলে দিল। ডাচদের এই সহজ জয় এর কারণও ছিল।

ব্যবসায়ী সুলভ মনোবৃত্তি পর্তুগীজদের ছিল না। তাদের রক্তে ছিল উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বভাব ছিল বেপরোয়া, নিষ্ঠুর। তাদের দুঃসাহসের যেমন অবধি ছিল না, তেমনি ছিল মুর (মুসলমান) দের প্রতি সীমাহীন বিজাতীয় ঘৃণা, আক্রোশ। সে আমলে সারা ভারত মহাসাগরের বুক জুড়ে তারা লুটতরাজ আর বোম্বেটেগিরি করে ফিরতো। আরব বা মুরদের জাহাজ দেখলেই আক্রমণ করত। মালপত্তর লুট করে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিত। নিরীহ হজ যাত্রীদের উপর চালাত অমানুষিক অত্যাচার। বলপূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করতো, ক্রীতদাস হিসেবে পাঠিয়ে দিত দূর উপনিবেশগুলোতে, ক্ষেত খামার কুলীর কাজে নির্বিচারে মেয়েদের ওপর বলাৎকার করেছে, শিশুদের মায়ের বুক থেকে টেনে হত্যা করেছে, মুর বণিকদের নাক, কান কেটে দিয়েছে, চোখ ফেলেছে উপড়ে, যথেচ্ছ চাবুক চালিয়েছে।...ধর্মান্ধতা আর ধনলিপ্সা মানুষকে কতদূর নৃশংস বিবেকবর্জিত করে তুলতে পারে, তার চরম দৃষ্টান্ত হচ্ছে সে যুগের পর্তুগীজরা, আলকান্সো ডিসুজা দুঃখ করে বলেছেন:

'—পর্তুগীজরা এশিয়াখণ্ডে এসেছিল, এক হাতে তরবারী, অন্য হাতে ক্রুশ নিয়ে। এদের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য তাদের প্রলুব্ধ করে তুলল। ক্রুশ রেখে তারা মুঠো ভর্তি সোনা কুড়তে লেগে গেল। তারপর তলোয়ারও ফেলে রেখে, দু'হাতে পকেট বোঝাই করতে শুরু করল। সে অবস্থায় ওদের পরাভূত করতে পরবর্তীদের আদৌ বেগ পেতে হয়নি।

॥ বাংলায় ডাচ বণিক ॥

বঙ্গোপসাগরে সর্বপ্রথম ওলন্দাজদের জাহাজ এসেছিল ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ওরা প্রথম কখন বাংলায় ওদের বাণিজ্য কুঠী বা ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছিল, সে বিষয়ে

সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিক Orme বলেন ১৬২৫খৃঃ ডাচেরা বাংলাদেশে প্রথম কুঠী নির্মাণ করে। আবার Thomas Bowrey এর মতে আম্বোয়ানা দ্বীপের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সময় (১৬২৩) খৃঃ ডাচদের হুগলীতে কুঠী ছিল। এই ফ্যাক্টরীটা ছিল ইংরেজদের কুঠিয়ের কাছেই,......অবিশ্যি সমসাময়িক কাগজপত্রে এর কোন প্রমাণ মেলে না।

Yule বলেছেন, ১৬৫১ খ্রীঃ-এর আগে হুগলীতে ইংরেজরা কোন কুঠি তৈরী করেন নি। ডাচদের হয়ত হুগলীতে ছোট একটা কুঠি ছিল, সম্ভবতঃ সে বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়, আর তারপর নতুন কুঠির পত্তন হয়। এই কুঠির নির্মাণকাল বোধ হয় ১৬৫৬ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর পুরনো নথিপত্রে জানা যায় যে, ওলন্দাজেরা প্রথম যখন বাংলায় আসে, সেটা ১৬৩০ সালেরও আগের কথা, কম্পানীর ১৬৩৪ সালের ২৫শে অক্টোবরের রিপোর্টে বাংলায় ডাচদের বাণিজ্যের প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তখন বাংলায় ওদের কুঠিরের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

১৬৫০ খ্রীঃ ১৪ ডিসেম্বর তারিখে বালেশ্বর ও হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবদের প্রতি কম্পানী কর্তৃপক্ষ যে নির্দেশ পাঠিয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, তাঁরা যেন রাজমহলের ডাক্তার বাউটনের২ সহায়তায় মোগল সরকারের কাছ থেকে এমন একখানা ফরমান বার করে আনেন, যাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানী ব্যবসায়িক সুবিধা ও স্বাধীনতায় ডাচের ওপর টেক্কা দিতে পারে (...as may outstrip the Dutch in point of privilege and freedom.)......

কম্পানীর এই নির্দেশ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৬৫০ খৃঃ ডিসেম্বরের আগেই ওলন্দাজরা সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে বঙ্গদেশে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করবার অনুমতি পেয়েছিল। যা হোক এ সম্বন্ধে দ্বিমত নেই, যে, সম্রাট শাহজাহানের সনদের বলেই ডাচেরা বাংলায় তাদের ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছিল; এবং সম্ভবতঃ সেটা ১৬৫০ সালের কাছাকাছি।

মেজর বামনদাস বসু তাঁর Rise of the Christian Power in India গ্রন্থে বলেছেন যে, ডাচেরা ১৬৭৫ খ্রীঃ এ চুঁচুড়ায় কুঠি নির্মাণ করেছিল। কিন্তু এর ঐতিহাসিক ভিত্তি কি তার কোন উল্লেখ করেন নি। প্রাচীন সরকারী কাগজপত্রে চুঁচুড়ার কুঠির সর্বাধ্যক্ষ বা ডিরেকটরদের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, প্রথম ওলন্দাজ ডিরেকটর ম্যথুস ভানডারব্রুকের (Vander Broucke) কার্যকাল ১৬৫৮খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কাজেই মেজর বসুর উক্তির যাথার্থে বেশ সন্দেহের অবকাশ আছে।

বাংলার ওলন্দাজদের ব্যবসায়ের গতি প্রকৃতি

বাঙলাদেশে ডাচ্‌দের প্রধান ঘাঁটি ছিল চুঁচুড়া বা চিনসুরায়। এদেশে ওদের আরও কয়েকটি কুঠি ছিল —বরানগর, কালিকাপুর (কাশিমবাজার) ফলতা আর ঢাকায়। এছাড়া উড়িষ্যায়ও ওদের কুঠি ছিল বালেশ্বরে। বিহারের পাটনায় এবং সুরাট আহমেদাবাদ ও আগ্রাতেও ওদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ডাচদের কারবার ছিল প্রধানতঃ সোরা, চিনি, রেশম, মোম ও কাপড়ের। ফলতায় ছিল নোনা শূকর মাংস তৈরীর কারখানা। Stenynsham Master তার ডাইরীতে লিখেছেন—

Wednesday
23rd Sept. 1676.

—about seven o'clock in the morning we got to Baranaggurr where the Dutch have a place called Hogg Ffactory and I was informed that they kill 3000 hogs in a yeare and salt them for their shipping.........

ডাচ-এরা এদেশ থেকে চালান দিত চাল, তেল, মাখন, শন, কাঁচা রেশম, দড়াদড়ি (cordage), পালের কাপড়, রেশমী বস্ত্র, মসলীন, সোরা, চিনি, পিপুল, মোম (bee wax) আর ব্যাটাভিয়া থেকে রপ্তানী করত হরেকরকমের মশলা, তামার ছড় (bars of Japan Copper)। ভারতবর্ষ থেকে জাভায় পাঠাত আফিম ও সোরা (Salt peter)। হল্যাণ্ড থেকে আমদানী

করত ছুরি কাঁটা (cutleries), চামচ, পশমী বস্ত্র, আয়না, কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন, নানাবিধ টুকিটাকি সৌখিন জিনিস আর রূপো।

ডাচ-এরা ছিল প্রোটেস্টান্ট, ইংরেজদের একই সম্প্রদায়ের। তাই ওদের ভেতর কোন রেশারেশি ছিল না। ওলন্দাজ আর ইংরাজ কুঠিওয়ালাদের সামাজিক সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পরস্পরের মধ্যে দেখাশোনা, খানাপিনা হামেশাই চলত। পর্তুগীজেরা ছিল ক্যাথলিক। তাই ডাচ বা ইংরেজ কেউই ওদের ভাল চোখে দেখত না। ওরা যখন এদেশে এসেছিল পর্তুগীজদের তখন পড়ন্ত অবস্থা। ইংরেজ ও ডাচ উভয়েরই বিরোধিতা পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক অবনতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু তা বলে ডাচ আর ইংরেজদের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব ছিল না এবং মোগল বাদশাদের শুল্ক আদায়কারী কর্মচারীদের হাত করে একে অপরকে হয়রানি করবার সুযোগ খুঁজত। চিনি, সোরা বা কাপড়ের বোট আটকের ব্যাপার নিয়ে মোগলদের টোল কালেকটারের সঙ্গে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদের মন কষাকষি বিরোধ প্রায়ই লেগে থাকত।

১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বোট আটকের ব্যাপারে চুঁচুড়ার ডিরেক্টর উর্দ্ধতন ব্যাটাভিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। সেখানকার ওলন্দাজ সরকার আগষ্ট মাসে চারখানা রণতরী বরানগরে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাচ জাহাজগুলো এসে পৌঁছুবার কিছুদিন পরেই (নভেম্বর মাসে) মোগল ফৌজদার শঙ্কিত হয়ে আটক নৌকাগুলির পথ মুক্ত করে দিলেন। অল্পদিন বাদেই পুনরায় মোগল প্রতিনিধির সঙ্গে ডাচদের গণ্ডগোল আবার পেকে উঠল আর নিরুপায় হয়ে ওরা বরানগর ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দিল।

১৬৮৬ সালে যখন ইংরেজদের সঙ্গে মোগল ফৌজদারের খণ্ডযুদ্ধ বাধল, তখন তিনি ডাচদের বরানগরের কুঠি ফের চালু করবার অনুমতি দিলেন। ডাচেরা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিং তার বিদ্রোহী সৈন্য নিয়ে হুগলী অবরোধ করলে, ডাচেরা তাদের জাহাজ থেকে কামানের গুলি বর্ষণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ ও বিতাড়িত করে। ওলন্দাজদের এই সাহায্যের জন্য মোগল সম্রাট প্রীত হয়ে আরও বেশী সুযোগ সুবিধে দিতে কার্পণ্য করেন নি।

১৭১১ সালে বাদশা শা' আলমের মৃত্যুর পর দিল্লীতে অরাজকতা দেখা দিল। মসনদ নিয়ে লড়াই বাধল। আর এই ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসন কর্তারা হয়ে উঠলেন স্বেচ্ছাচারী। ডাচেরা এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রস্ত হয়ে কাশিমবাজার থেকে তাদের ধনরত্ন ও সেনাবাহিনী চুঁচুড়ায় গাষ্টেভাস দুর্গে স্থানান্তরিত করল। আর নদীতে একখানা জাহাজ পাহারায় নিযুক্ত রাখল।

যা হোক নতুন বাদশাকে হাত করে তার কাছে থেকে ১৭১২ সালে ডাচেরা নতুন একখানা সনদ সংগ্রহ করল। নতুন ফরমান অনুযায়ী হল্যাণ্ড থেকে আমদানীকৃত মালের শুল্কের হার কমিয়ে শতকরা ২ ১/২% করা হল আর বাদশা হুগলীর ফৌজদারকে ফতোয়া দিয়ে জানিয়ে দিলেন: অতঃপর চুঁচুড়ার ওলন্দাজ ডিরেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি পত্র (pass) পাওয়া কোন জাহাজ বা কর্মচারীদের যেন আটক বা অযথা হায়রানি করা না হয়।

॥ নবাব : ইংরেজ : ওলন্দাজ : ।

নবাব সিরাজদ্দৌল্লার আমলে ইউরোপীয়দের মধ্যে ডাচদেরই সবচেয়ে বেশী সমাদর ছিল। তার আগেও প্রায় বছর কুড়ি একাদিক্রমে নবাব দরবারে কাশিমবাজার কুঠির ডাচ অধ্যক্ষেরই স্থান ছিল বিদেশীদের মধ্যে সর্বোচ্চে। হুগলী নদীতে বাণিজ্যের ব্যাপারে ওলন্দাজদেরই অগ্রাধিকার ছিল। হুগলী নদীর গভীরতা মাপবার ও বয়া (buoy) ভাসাবার অধিকারও একমাত্র তাদেরই ছিল। চুঁচুড়া কুঠির প্রথম ডিরেকটর ভ্যাণ্ডারব্রুক নদী ও সামুদ্রিক জরীপের কাজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তারই তত্ত্বাবধানে হুগলী নদী

ও তার মোহনা সন্নিহিত বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের জরীপের কাজ ও চার্ট তৈরী করা হয়েছিল।

১৭৫৬ সালে সিরাজ যখন কলকাতা আক্রমণ করেন। ডাচেরা তখন নিরপেক্ষ ছিল। অবিশ্যি এদেশে তখন তাদের অবস্থাও শোচনীয়। এ বিষয়ে ১৭৫৭ সালের ডাচ কাউন্সিলের রিপোর্টে লেখা হয়েছে—

"......Not able to offer any resistance worth mentioning for our palisides that have to serve as a kind of rampart are as little proof against a cannonade as the canvas of a tent and our entire military force consists of 78 men, almost one-third of whom are in hospital......" (Bengal in 1756-1757—Hill)

কিন্তু ডাচেরা কলিকাতা থেকে পলাতক ইংরেজদের তাদের ফলতা ও চুঁচুড়া কুঠিতে আশ্রয় দিয়েছিল। ১৭৫৭ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে ওলন্দাজ সরকারের সরকারী নথিপত্রে (Consultations) দেখা যায় যে, চুঁচুড়ার সার্জনকে কলকাতা অবরোধের সময় পলাতক ও আহত ইংরেজ সৈন্যদের চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের জন্যে ৬৫০ আর্কট টাকা দে'য়া হয়েছিল। ইংরেজেরা ডঃ উইলিয়াম ফোর্ট নামক একজন চিকিৎসককে চুঁচুড়ায় পাঠিয়েছিলেন আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্যে এই ডাক্তারের টুকিটাকি খরচার বিল বাবদও টাকা দেবার কথা ডাচদের সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য না করলেও ইংরেজদের আশ্রয় দেবার অপরাধে নবাব ডাচদের বিশ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য্য করলেন। ওঁর এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ডাচেরা নবাবকে ভয় দেখালো; যদি তিনি তাঁর অর্থদণ্ডের হুকুম প্রত্যাহার না করেন তবে বাধ্য হয়ে ওরা কারবার গুটিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যাবে।.........যাক্ শেষটায় নবাবকে চারলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা গুণে দিয়ে ডাচেরা অব্যাহতি পেল। অনুরূপ অপরাধে ফরাসীদেরও জরিমানা হয়েছিল তবে তার পরিমাণ কম; সাড়ে তিন লাখ টাকা। তারা নবাবকে দু'শ পঞ্চাশ পেটী বারুদ ধার দিয়েছিল। জরিমানার অঙ্কটা তাই কম হয়েছিল।

॥ চুঁচুড়া কুঠির আমলাবর্গ ॥

বাংলার ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীগুলির ব্যবসায়িক ও ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় ওলন্দাজদের কয়েকটি কুঠি বা ব্যবসা কেন্দ্র ছিল—কালিকাপুর (কাশিমবাজার) ফলতা, বরানগর, ঢাকা, মালদহ, পাটনা আর বালেশ্বরে। মালদহ ও ঢাকা কুঠি কিছুদিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়। এই সব ফ্যাক্টরীগুলির সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল চুঁচুড়ার মহামান্য ডিরেকটর বাহাদুরের ওপর। ইংরেজদের নথিপত্র ও চিঠিতে তাকে উল্লেখ করা হয়। —The Hon'ble Director of the (o. v) Companys, important trade in the kingdom of Bengal, Bihar and Orissa' বলে। ডিরেকটর নিয়োগ করতেন যবদ্বীপের ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ। চুঁচুড়া বা বঙ্গদেশের অন্য কোন কুঠির কোন পদ খালি হলে তার জন্য ব্যাটাভিয়ার হেড কোয়ার্টারসের অনুমোদন সাপেক্ষ লোক নিয়োগ করা হত। কাজের কোন ভুল ত্রুটির জন্যে চুঁচুড়ার ডিরেক্টরকে জবাবদিহি করতে হত যাভার ডাচ কর্তৃপক্ষের কাছে। বাংলা বিহার উড়িষ্যার কুঠিগুলির বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাজ চালানোর জন্যে সাতজন সদস্য দিয়ে একটা উপদেষ্টা পর্ষৎ বা, এ্যাডভাইসরী কাউন্সিল ছিল, এই কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচ জনের ভোটাধিকার ছিল। চুঁচুড়ার ডিরেক্টরের পর সভ্য হিসেবে যার দ্বিতীয় স্থান ছিল, তিনি ছিলেন কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ। কাউনসিলের তিন নম্বর সদস্য ছিলেন চুঁচুড়া কুঠির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, চতুর্থ জন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব ক্লথ হাউস (সে আমলে এ পদটি ছিল খুব লাভের। এঁর হাত দিয়েই সব কাপড় কেনা হত। তাঁতিদের দাদন দিয়ে, তাদের কাছ থেকে কাপড় বুনিয়ে এনে গুদাম

জাত করা আর সেই কাপড় জাহাজ বোঝাই করে ঠিকমত চালান দেওয়া—এই ছিল তার কাজ)

পঞ্চম সদস্য ছিলেন চুঁচুড়ার ফিস্‌ক্যাল বা মেয়র—সবরকম বিচার কাজের ভার ছিল এর ওপর। ছ'নম্বরের সভ্য ছিলেন মাল গুদামরক্ষক (ware house keeper) আর সাত নম্বর ব্যক্তি স্থানীয় পল্টনের অধিনায়ক। শেষ দুজন কাউনসিলর ভোটে অংশ নিতে পারতেন না। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ সরকারের অধীনে আরও একটা লাভজনক পদ ছিল—Controller of Equipments। তাঁর সাজ সরঞ্জাম, সরকারী আসবাবপত্র সব এঁরই চার্জে ছিল। এঁর কাজটা ছিল অনেকটা কালেক্টারীর নাজিরের মত।

ডিরেক্টর সাহেবের রাজোচিত জাঁক জমক ছিল। মোগল আমলের হাব ভাব, কায়দা-কানুন সেকালের ইংরেজ ও ডাচেরা মেনে চলতেন। ডিরেক্টর সাহেব পথে বেরুলে রূপোর আশা সোঁটাধারী চোপদারের দল তাঁর আগে আগে চলত। আর তার যাত্রা ঘোষিত হত রসুনচৌকি, তুরী ও ভেরী বাজিয়ে। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরাও আপন আপন মর্যাদা অনুযায়ী চোপদার নিয়ে পথে বেরুতেন। তবে তাদের হাতের আশা সোঁটা গুলো গোটাটা রূপোর না হয়ে অর্দ্ধেকটা রূপোয় বাঁধান থাকতো। রাস্তায় চলবার সময় ডিরেক্টর সাহেবের মাথায় ধরা হত প্রকাণ্ড এক রেশমী ছাতা, তাতে মুক্তোর ঝালর লাগানো। তার পাল্কী বা তাঞ্জাম বেশ সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত ছিল। ঝকমকে জরির পোষাক পরা বাহকেরা তা বহন করত। পাশে দু'জন বিরাট বিরাট তাল পাতার হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে করতে চলত (ওলন্দাজরাই এদেশে প্রথম টানা পাখার প্রচলন করে ছিল)। ডিরেক্টর ছাড়া অপর অন্য কারও পাল্কী বা তাঞ্জামে চেপে যাবার অধিকার ছিল না। গঙ্গার ঘাটে ডিরেক্টরের যে বজরা বাঁধা থাকত তার মাঝের কামরায় বসে একসঙ্গে ছত্রিশ জন লোক খানা খেতে পারত। ডিরেক্টর বাহাদুরের চুঁচুড়া ছেড়ে অন্য কোথাও বজরা চেপে সফরে বার হবার সময় দুর্গ থেকে তোপধ্বনি করা হত। বেতন ছাড়া ডিরেক্টর মোটা কমিশনও পেতেন, বিক্রীত মালের লভ্যাংশের ওপর। ওঁর ব্যবসায়িক ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩৬০০০ টাকা।

চুঁচুড়ার কুঠির ফিস্‌ক্যালের পদটা ছিল খুবই মর্যাদার। এঁর কাজটা ছিল অনেকটা সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের মত। তাছাড়া পুলিশের কর্ত্তাও ছিলেন তিনি চুঁচুড়া সহর এলাকায় এঁর ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ,ইনি স্থানীয় ধনী বেনেদের ধরে এনে খুটীর সঙ্গে বেঁধে মাঝে মাঝে চাবুক লাগাবার হুকুম দিতেন, যদি তাদের কেউ ব্যবসার ব্যাপারে কখনও ডাচ কর্তৃপক্ষের অবাধ্যতা বা বেইমানি করত। মোটা জরিমানাও করতেন—বিশ, ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত। ফিস্‌ক্যাল সাহেবের ভয়ে স্থানীয় লোকেরা সবসময় সন্ত্রস্ত থাকত। ব্যাটাভিয়ার কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

ব্যক্তিগত ব্যবসার মুনাফার ওপর শতকরা ৫% প্রাপ্য ছিল ফিস্‌ক্যালের। শুল্ক ফাঁকি ধরা পড়লে বা বেআইনী মাল বাজেয়াপ্ত হলে সরকারের মোট প্রাপ্যের অর্ধাংশ পেতেন ফিস্‌ক্যাল। দিশি লোকেরা এঁকে বলত জমাদার সাহেব। ফলতাতেও ফিস্‌ক্যালের একটা অফিস ছিল। তার লোকজন, পেয়াদারা লক্ষ্য রাখত যাতে অবৈধ ভাবে কোন মাল বিনা শুল্কে পাচার না হয়, বরানগরের বার বণিতাদের কাছ থেকেও ফিস্‌ক্যাল সাহেবের বেশ কিছু আয় হত।

ডিরেক্টর আর ফিস্‌ক্যাল—দু'জনেরই বেশ ভাল উপার্জন হত এদেশ থেকে যবদ্বীপে আফিং চালান করে। মালয়, শ্যাম ও চীন দেশে এই আফিং বিক্রি হত। দেড়মণ এক পেটী (১২৫ পাউণ্ড) আফিং পাটনা থেকে কিনে ইনস্যুরেন্স ও রপ্তানি খরচা দিয়ে মোট ৭০০।৮০০ টাকার মাল ব্যাটভিয়ায় ছাড়া হত ১২০০ টাকা—ফেলে ছেড়ে ৫০% মুনাফা।

লাভের মোটা অংশ ঢুকত ডিরেক্টর, ফিস্‌ক্যাল আর তাদের অনুগ্রহপুষ্ট দু'এক জনের পকেটে। বছরে কম সে কম এই আফিং চালানী কারবারে চার লক্ষ টাকার মত লাভ হত তাদের।

॥ চুঁচুড়ায় কুঠি সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণ ॥

১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ পর্যটক Gautier Schouten বাংলায় এসেছিলেন। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কুঠি সম্পর্কে ইনি লিখেছেন :

...there is nothing in it more magnificient than Dutch factory. It is built on a great space, at a great distance from the musket shot from the Ganges.... It has indeed more appearance of a large Castle than a factory of merchants...... there are many rooms to accomodate the Director and the other officers, who compose the Council and all the people of the company ....

...there are large shops, built of stone, when goods bought in the country and those that our vessels bring there are placed...

ইংরেজ এজেন্ট Streynsham Master ডাচদের কুঠির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন...'very large and well-built with two quardrangles...' Delcster বলেছেন কুঠি। সত্যিই নয়নাভিরাম এবং চুঁচুড়ার জাহাজ ঘাটায় বহু টাকার পণ্যদ্রব্যের ওঠা নামা হয়ে থাকে। Thomas Bowrey-র মতে—এশিয়া খণ্ডে চুঁচুড়ার ফ্যাক্টরীর মত এত বৃহৎ ও পরিপাটী ফ্যাক্টরী আর দুটো নেই (the largest and completest factories in ASIA).

বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক Tavernier ১৬৬৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে চুঁচুড়ায় আসেন। দিন দশেক ওলন্দাজদের অতিথি ছিলেন (২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত) ডাচ কর্তৃপক্ষ ওঁকে খুব আপ্যায়ন করেন, সব ঘুরিয়ে দেখান, প্রমোদ তরীতে চাপিয়ে গঙ্গায় নৌ-বিহার করান, নানাবিধ ইউরোপীয় সব্জী বা এদেশে দুষ্প্রাপ্য (হল্যাণ্ড থেকে হরেক রকম শাক সব্জীর বীজ এনে ওঁরা বাগান করেছিলেন;—কপি, বীন, লেটুস, এ্যাসপ্যারাগাস, বীট, শালগম প্রভৃতি সেখানে জন্মাত) তাদেরই ব্যঞ্জন আর স্যালাড খাইয়েছিলেন। তাভার্নিয়ে বলেছেন—

"—the Hollanders are vrey curious to have all sorts of pulses and herbs in their gardens but they could never grow artichokes in this country."

আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ১৭১০ সালে চঁচুড়া পরিভ্রমণে আসেন। তাঁর বিবরণে দেখা যায় চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কুঠিটা 'অতুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিরাট অট্টালিকা' (massive building with high walls of brick (?) Schouten কিন্তু বলেছেন, ফ্যাক্টরী পাঁচিল পাথরে তৈরী)—ফ্যাক্টরদের বাসগৃহগুলি সারি সারি গঙ্গার তীরে। প্রত্যেকটা বাড়ীর কাছে সুন্দর সাজানো বাগান......

সে আমলে চুঁচুড়া শহরে অনেক আর্মেনীর বাস ছিল (চুঁচুড়ার প্রাচীন আর্মেনিয়ান চার্চ এখনও রয়েছে)।

Laurent Garcin ছিলেন ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কম্পানীর চিকিৎসক। তিনি ব্যাটাভিয়া থেকে (১৭২৪ সাল ও ১৭৪২ সালের মধ্যে) তিনবার চুঁচুড়ায় এসেছিলেন। ভদ্রলোক জাতে সুইস, বেশ কৃতবিদ্য ব্যক্তি। বিলেতের রয়াল সোসাইটির ফরেন মেম্বর। ফরাসী এ্যাকাডেমীর সদস্য (associati) তাঁর জার্নাল বা ডাইরীতে (ফরাসী ভাষায় লেখা) চুঁচুড়া সম্পর্কে যা লিখে গেছেন তার কিছু অংশের মর্মানুবাদ নীচে দেওয়া হল :

.........চুঁচুড়া (চিনসুরা) বেশ বড় গ্রাম। গঙ্গার তীরে এক লীগ স্থান ব্যেপে আছে। স্থানীয় দিশী বাসিন্দাদের ঘরবাড়ীগুলো এলোমেলোভাবে সাজান, মাঝে মাঝে অপরিসর রাস্তা—এত সঙ্কীর্ণ যে পাশাপাশি দুজন লোকের চলতে কষ্ট হয়।.........

বাড়ীগুলোর বেশীর ভাগই মাটি, টালি বা বাঁশ দিয়ে তৈরী। সুরাটে দিশি লোকদের বাড়ী যেমন দেখেছি তার সঙ্গে এগুলোর বিশেষ পার্থক্য নেই। ডাচদের বাড়ীগুলো বেশ বড়, ইঁটের তৈরী। দেখে মনে হয় বেশ মজবুত।......বাইরে চুনকাম করা এত

সুন্দর বাড়ী সচরাচর ভারতবর্ষে চোখে পড়ে না।...... ডিরেক্টরের মস্ত প্রাসাদ ছাড়া কুঠির প্রশস্ত হাতায় আরও কতগুলি বাড়ী আছে। ছাদওয়ালা কয়েকটা বেশ বড় বড় গুদাম ঘরও আছে, যেখানে আমদানীকৃত বা বাইরে পাঠানোর জন্য মাল মজুত রাখা যেতে পারে। মাঝে আছে দুটো চত্বর। সেখানে কুড়িটা কামান বসানো। একটা অবজার্ভিং পোষ্টও আছে রেজিডেন্সির এক কোনায়। সেখানেও একটা কামান আছে আর তার ধারে পঁচিশ জন সৈন্য ও একজন সার্জেন্টের ঘাঁটি। কুঠির ধারে বেশ বড় একটা উদ্যান, তার মাঝ দিয়ে মনোরম একটা পথ (avenue) চলে গেছে। এই বাগানের শেষ প্রান্তে একটা পুরোনো বাড়ী, ঠিক নদীর ওপরেই।

সামনে চমৎকার থামওয়ালা প্রশস্ত বারান্দা, তারই একপাশে প্যাভিলিয়ন, যেখান থেকে সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় (un beau Pavillon......qui fait un bel Aspect)। ডিরেক্টর Vuist চুঁচুড়া কুঠির প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন বছর দু'য়েকের জন্যে। ইনি ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। তাঁরই আমলে দুটো সুন্দর চওড়া রাস্তা (অর্ধ লীগ লম্বা) তৈরী হয়েছিল কুঠির লোকজনদের সান্ধ্য ভ্রমণের জন্যে।

* * *

॥ ইংরেজদের সঙ্গে ডাচদের বিবাদ ও সংঘর্ষ ॥

পলাশীর যুদ্ধে জয়ী ইংরেজদের ভাগ্য পরিবর্তনে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওলন্দাজেরা তাদের শান্তিপ্রিয় মনোভাব ত্যাগ করল। তারাও এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে লাগল। তাই ওরা নতুন নবাব জাফর আলী খাঁর (মীরজাফর) সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে ইংরেজ প্রভুত্বের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করল।

ব্যাটাভিয়া থেকে ১৭৫৭ সালের আগষ্ট মাসে হঠাৎ একটা জাহাজ ডাচ ও কিছু অন্য দিশি ইউরোপীয় সৈন্য নিয়ে হাজির হল হুগলীতে। নবাবের কাছে এ খবর পৌছুলে তিনি একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন। ওলন্দাজদের প্রকাশ্যে কোন সাহায্য দিতে তিনি সাহস পেলেন না।

ক্লাইভের লোকেরা জাহাজটা আর তার সঙ্গের লোকগুলো আটক করে খানা-তল্লাসী করল। এ ব্যাপার নিয়ে চিনসুরার (চুঁচুড়ার) ডাচ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছুদিন ধরে ইংরেজদের বাগবিতণ্ডা ও চিঠি লেখালেখি চলল। ডাচেরা বলল জাহাজটা ওদের কুঠির দিকে যাচ্ছিল, ঝড়ের মুখে দিকভ্রান্ত হয়ে ঢুকে পড়েছে হুগলী নদীতে। পানীয় জল সংগ্রহ করে আর অনুকূল বাতাস পেলেই সে ফের রওনা দেবে তার গন্তব্যস্থানে ।.........যাহোক শেষটায় জাহাজটা ব্যাটাভিয়ায় ফিরে গেল।

এরপর ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসে সাতসাতখানা জাহাজ গোলাবারুদ বোঝাই হয়ে এবং বেশ কিছু ইউরোপীয় ও মালয়ী ফৌজ নিয়ে হুগলীর মোহনায় উপস্থিত হল। ক্লাইভ নবাবকে এ-খবর জানাতে তিনি ডাচদের নদীতে ঢুকতে বারণ করবার অছিলায় ওদের সঙ্গে দেখা করলেন। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ওদের সাহায্যে ইংরেজদের আক্রমণ করবার। যাক্, ফিরে এসে তিনি ক্লাইভকে জানালেন যে, ওলন্দাজদের বাণিজ্য ব্যাপারে তিনি কিছু সুযোগ সুবিধে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন, ওরাও রাজী হয়েছে জাহাজগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তবে দূরের চলে যেতে হয়ত কিছুটা দেরী হতে পারে। ওরা উপযোগী আবহাওয়ার প্রতীক্ষা করছে। ক্লাইভ বুঝলেন: গতিক সুবিধের নয়।

ডাচদের জাহাজগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছে আদৌ ছিল না। তারা চুঁচুড়া ওবধি জাহাজগুলো নিয়ে যাবার নবাবের অনুমতি পেয়েছে। ক্লাইভ স্থির করলেন কিছুতেই ওদের জাহাজগুলোকে এগিয়ে যেতে দে'য়া হবে না।......পরিস্থিতিটা বাস্তবিকই বিশেষ সুবিধের নয়। সে সময় ইউরোপে ইংরেজ আর ডাচদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। ওদের যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল সেখানে। ক্লাইভ যদি নিজের দায়িত্বে

অগ্রগামী ওলন্দাজ জাহাজগুলির ওপর গোলা নিক্ষেপ করেন, তবে ইংরেজদের মিত্র পক্ষীয় (ally) রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন—যেটা বিলেতের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আদৌ অভিপ্রেত নয়।.........আর যদি জাহাজগুলোর গতিরোধ না করেন তবে চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের শক্তি হবে আরও ভয়াবহ। দরকারমত ওরা যদি নবাব সৈন্যদের সঙ্গে হাত মেলায় তবে ইংরেজদের সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। ক্লাইভ গুপ্তচর মারফত খবর পেলেন যে, নবাব কাশেম আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় চুঁচুড়া, পাটনা ও কাশিমবাজার কুঠিতে ডাচদের সৈন্য সংগ্রহের কাজটা ভালভাবেই চলছে।

ওদের জাহাজগুলোতে আছে সাতশো সুসজ্জিত ইউরোপীয় সৈন্য আর আটশো মালয়ী সিপাই। তারা সবাই যুদ্ধের অপেক্ষায় রয়েছে। চিনসুরা কুঠিতে তখন দেড়শ জন ডাচ আর বেশ কিছু দিশি সৈন্য (ওদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে) রয়েছে, তাছাড়া পরোক্ষে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব রয়েছেন তার বিপুল বাহিনী নিয়ে ওদের পেছনে; লোকবল, অর্থবল কোনটাই তার কম নয়। আর এদিকে কলকাতায় তখন ছিল মাত্র ৩৩০ জন গোরা আর ১২০০ জন দিশি সৈন্য।

ক্লাইভ হলওয়েল সাহেবকে তাঁর মিলিশিয়া (সখের সৈন্যদল—কলকাতার ইউরোপীয় বাসীন্দাদের দ্বারা গঠিত) নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বললেন। হলওয়েল ছিলেন মিলিশিয়ার কর্ণেল! এই সৈন্যদলের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ' (বেশীর ভাগই ইংরেজ, কয়েকজন পর্তুগীজ ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানও ছিল) নতুন ষাট জন ভলেণ্টিয়ার জোগাড় হল (এদের অর্ধেক অশ্বারোহী)।

গঙ্গার তীরে ইংরেজদের তখন দুটো দুর্গ—একটা থানা দুর্গ (বর্তমানে যেখানে বোটানিক্যাল গার্ডেনস) অপরটা হচ্ছে চারণকের দুর্গ, ঠিক প্রথমটার উল্টো দিকে গঙ্গার পুব তীরে।

সেই সময়ে মসলীপত্তন থেকে বদলী হয়ে বাংলায় এলেন কর্নেল ফোর্ড আর ক্যাপ্টেন নক্স (Knox)। ক্লাইভ নক্স-এর ওপর দুর্গ দুটোর ভার দিলেন এবং সমস্ত সৈন্যবাহিনী ও দুর্গের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন ফোর্ডকে। ইংরেজরা মাঝ পথে ডাচ জাহাজগুলো আটকে তল্লাসী করতে চাইলেন, চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ক্লাইভ একটা চাল চাললেন। তিনি প্রতিবাদের উত্তরে লিখলেন...... "all that had been done, done by express authority of the Naobab.

কথাটা আদৌ সত্য নয়, কিন্তু ক্লাইভ বিলক্ষণ জানতেন দুর্বল নবাব জাফর আলীর তার এই উক্তির প্রতিবাদ করবার সাহস নেই।

ডাচেরা মনে করল, নবাব যদি সত্যিই এমন কোন হুকুম দিয়ে থাকেন তবে তা নেহাত চাপে পড়েই দিয়েছেন। কারণ ইংরেজের ওপর তার বিতৃষ্ণা ওদের অজানা ছিল না, যা হোক, ওরা ফলতার সামনে সাত সাতখানা ছোট ইংরেজ জাহাজ আক্রমণ করে দখল করে বসল। তারপর ফলতা ও রায়পুরে ইংরেজদের কুঠির সমস্ত মালপত্র লুঠ করে ফ্যাক্টরী দুটোয় আগুন লাগিয়ে দিল।

ওলন্দাজদের এই দুষ্কৃতির কথা ক্লাইভ নবাবের গোচরে আনলেন আর কর্ণেল ফোর্ডকে ওদের বরানগরের কুঠি অধিকার করবার আদেশ দিলেন। আরও নির্দেশ দিলেন: সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে ফোর্ড যেন শ্রীরামপুরের কাছে নদী পার হয়ে পায়ে হেঁটে চন্দননগরের দিকে রওনা দেন এবং ডাচেরা নদী পেরিয়ে চুঁচুড়ার দিকে এগোতে গেলেই যেন ওদের গতিরোধ করেন।

২১শে নভেম্বর ওলন্দাজ জাহাজগুলো সাঁকরাইলের কাছে নোঙর ফেলল, ইংরেজদের গোলাবর্ষণের পাল্লার বাইরে। ২২শে সকালে মনিখালির (melancholy) কাছে ডাচেরা তাদের সৈন্য নামিয়ে দিল। এবং তারা এগিয়ে চল্ল চুঁচুড়ার দিকে। হুগলী নদীতে সে সময় ইংরেজদের তিনখানা যুদ্ধ জাহাজ ছিল—৭৭১ টনের

Calcutta যার কাপ্তেন উইলসন, ৫৭০ টনের Hardwick যার কাপ্তেন সিম্পসন, আর ৫৪৪ টনের Duke of Dorset যার অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ফরেষ্টার। ডাচ নৌ-বাহিনীতে ছিল মোট সাতটা রণতরী—৪ খানা জাহাজ (Vlissingen, Welgeleegen, Bleiswyk ও Princess of Orange) যার প্রত্যেকটাতে ৩৬টি করে কামান; দুখানা জাহাজ (Elizabeth Dorothea আর Walreld) যার প্রত্যেকটাতে ২৬টা করে কামান এবং বাকী একখানায় (Mossel) ছিল ১৬টা কামান।

ইংরেজ জাহাজের ক্যাপ্টেনরা তাদের জাহাজগুলো নিয়ে ক্রমেই ওলন্দাজ জাহাজগুলোর সামনে আসতে লাগলো কিন্তু বেশ কাছাকাছি হবার পরও এক পক্ষ অন্য পক্ষকে আক্রমণের উদ্যোগ নিল না। শেষটায় ২৩শে নভেম্বর ক্যাপ্টেন উইলসন ডাচ বাহিনীর কমোডর James Zuydland-এর সঙ্গে দেখা করে বল্লেন: তারা যেন আর অগ্রসর না হন; অন্যথায় বাধ্য হয়ে তাদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু হবে। নৌযুদ্ধের কোন আদেশ না আসায় উইলসন নোঙর ফেলে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, গভর্ণর ক্লাইভের কাছে যথারীতি রিপোর্ট পাঠিয়ে।

ক্লাইভের নির্দেশ এলো—উইলসন যেন অবিলম্বে ওলন্দাজ কমোডরের কাছে ইংরেজদের আটক জাহাজ, বন্দী লোকজন এবং লুণ্ঠিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণের দাবী পেশ করেন এবং ওদের কৃত কর্মের জন্যে ইংরেজদের কাছে মাপ চাইতে বলেন; আর হুগলী নদী ত্যাগ করে জাহাজগুলোকে নিয়ে সোজা যাভার দিকে তারা যেন পাড়ি দেয়। ডাচেরা যদি তার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজে অস্বীকৃত হয়, তবে উইলসন যেন ওদের আক্রমণ করতে দ্বিধা না করেন—হোক না কেন ওদের নৌবহর ইংরেজ নৌবহরের দ্বিগুণ শক্তিশালী।

উইলসনের প্রস্তাব ডাচেরা অগ্রাহ্য করল তখন তিনি কামান ছুড়তে হুকুম দিলেন। কাছেই ছিলেন ক্যাপ্টেন ফরেষ্টার; তিনজন কাপ্তেনের মধ্যে তিনিই ছিলেন দক্ষ নাবিক। তিনি তার জাহাজ (Duke of Dorset) নিয়ে ওলন্দাজদের ফ্লাগশিপ Vlissingen-এর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। অন্য দুখানি জাহাজ প্রায় আধঘণ্টা বাদ ঘটনা স্থলে পৌঁছুল। দু'ঘণ্টা ধরে চলল দুপক্ষের গোলা বিনিময়। আশ্চর্যের বিষয়: সাতখানা ডাচ জাহাজের মধ্যে ছয়খানাই ঘায়েল হয়ে আটকে পড়ল ইংরেজের হাতে, বাকী জাহাজ Bleiswyk ইংরেজ নৌবাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে কাল্পী পৌঁছুবার আগেই, দু'খানা জাহাজ তাকে তাড়া করে ঘেরাও করে ফেলল।

এই নৌযুদ্ধে জয় হল ইংরেজদের। ডাচদের প্রায় একশ' জনের ওপর লোক মারা পড়ল। ইংরেজদের ক্ষতি খুব সামান্য হয়েছিল (Duke of Dorset-এর কোন লোকই মারা যায়নি, কিছু সংখ্যক আহত হয়েছিল মাত্র)

॥ বেদাড়ার যুদ্ধ: ডাচদের সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন-সমাধি ॥

এদিকে কর্ণেল ফোর্ড ১০০ জন ইউরোপীয় সেনা আর ৪০০ জন ভারতীয় সেপাই এবং ৪টা কামান নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ১৯শে নভেম্বর ওলন্দাজদের বরানগর ফ্যাক্টরী দখল করে নিলেন। ২০শে নভেম্বর হুগলী নদী পার হয়ে ফোর্ড শ্রীরামপুর এসে পৌঁছুলেন এবং সসৈন্যে মার্চ করে ২০শে রাত্রি চন্দননগরে ফরাসী কেল্লার দক্ষিণে যে বাগান ছিল সেখানে এসে ছাউনি ফেললেন। সেদিনই সন্ধ্যেয় ডাচেরা চিনসুরা থেকে তাদের পল্টন চন্দননগরের দিকে পাঠিয়ে দিল ফোর্ডের সৈন্যদের মোকাবেলা করবার জন্যে। ওদের ছিল ১২০ জন সেনানী, ৩০০ জন দিশি সেপাই আর ৪টা কামান। চন্দননগর পৌঁছে ওরাও রাত্রের মত আস্তানা গাড়ল।

২৪শে নভেম্বর সকালে দু'দলে সংঘর্ষ বাধল। ফোর্ড শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজদের চারটি কামানই দখল করে ফেললেন। পরাজিত ডাচ সৈন্যরা চুঁচড়ার দিকে পালিয়ে গেল। সেই দিনই সন্ধ্যেয় ক্যাপ্টেন নক্স তার দলবল নিয়ে কর্ণেল ফোর্ডের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। তার সঙ্গে ছিল ৩২০ জন গোরা, ৮০০ জন ভারতীয়

সৈন্য আর ৫০ জন অশ্বারোহী ইউরোপীয়ান ভলেনটিয়ার। নবাবও একশ' জন ঘোড়সওয়ার পাঠিয়েছিলেন (যুদ্ধের গতি বুঝে ব্যবস্থা নেবার গোপন নির্দেশ ছিল তাদের ওপর)।

ফোর্ড অনুমান করেছিলেন যে সাঁকরাইল থেকে ডাচবাহিনী এগিয়ে আসছে তারা পরদিনই চন্দননগরের কাছাকাছি এসে পৌঁছুবে। কিন্তু নিজের দায়িত্বে যুদ্ধে লিপ্ত হবার আগে তিনি ক্লাইভের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। তখন পর্যন্ত ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নি। ফোর্ডের চিঠি যখন ক্লাইভের হাতে এল, তখন তিনি তাস খেলছেন। খেলা ছেড়ে না উঠে ফোর্ডের চিঠিরই পেছনে এক ছত্র উত্তর পাঠালেন :

Dear Ford/Fight them immediately I will send you order of Council tomorrow.

আদেশ পেয়ে ফোর্ড তাঁর সৈন্য নিয়ে চন্দননগরের মাইল তিনেক পশ্চিমে বেদাড়ার (Bedarah) কাছে সাঁকরাইল থেকে আসা শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি হলেন।

ইংরেজদের সামনে ছিল একটা চওড়া ও গভীর নালা (সম্ভবতঃ সরস্বতী নদী) খালের একধারে বেদাড়া গ্রাম, অন্য ধারে মস্ত একটা আমবাগান। ডাচ বাহিনী খাল পেরুবার সময় অনেকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে ইংরেজ গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো। ঘণ্টাখানেকের মত যুদ্ধ চলল। ইংরেজদের প্রবল বোমা বর্ষণের মুখে ডাচ সৈন্যেরা বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। ওদের অনেকেই বন্দী হল, বাকী সব পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। ইংরেজদের হাতে ডাচদের এই শোচনীয় পরাজয় ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। Malleson এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Fifteen Decisive Battles-এ স্থান পেয়েছে।

এই যুদ্ধে ডাচ পক্ষের হতাহতের খতিয়ান নীচে দেওয়া হল :

	ইউরোপীয়	মালয়ী
মৃত	১২০	২০০
আহত	১৫০	১৫০
বন্দী	৩৫০	২০০

(এর মধ্যে ১৫ জন অফিসার)

ডাচ অধিনায়ক কর্ণেল রুসেল (Rousel) বন্দীদের একজন (জাতে ফরাসী, ওলন্দাজ নন)। ডাচদের মাত্র ১৪ জন লোক চুঁচুড়ায় ফিরে যেতে পেরেছিল। অথচ এ-যুদ্ধে ইংরেজদের ক্ষতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

[Brooms History of Royal Army]

ওলন্দাজেরা তাদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে বলেছে :

"Fatigue of a big match, want of artillery and the disorders caused in passing a nallah in front of British position."

বেদাড়ার বর্তমান নাম কি?

ক্রফোর্ড সাহেব (Lt. Col. Crowford হুগলী Surgeon ছিলেন) তার হুগলীর ইতিহাসে লিখেছেন :

"the name Bidera or Bedderah does not appear in Post Office Directory of the district and I have been unable to get any information locally from any of the inhabitants none of whom appear even to have heard the name.........I have not been able to find the place marked by name in any map."

Malleson বলেছেন : বেদাড়া চুঁচুড়া আর চন্দননগরের থেকে সমান দূরে। রেনেলের ম্যাপে চন্দননগরের খানিকটা দক্ষিণ পশ্চিমে সরস্বতী নদীর ধারে এক জায়গায় একখানি তলোয়ার আঁকা আছে। তারই পাশে সাল লেখা আছে ১৭৫৯। খুব সম্ভবতঃ এটাই বেদাড়ার স্থান নির্দেশ করছে। এই ম্যাপের রচনাকাল ১৭৮১, বেদাড়ার যুদ্ধের ২২ বছর পর।

চন্দননগরের পশ্চিমে রেল লাইন পেরিয়ে ভদ্রেশ্বর থানায় বেজড়া গ্রাম। এর এক পাশ দিয়ে সরস্বতী নদীর খাত। মনে হয় এই গ্রামের ধারেই যুদ্ধটা হয়েছিল। এই গ্রামের JL No. 41.

নবাব জাফর আলী ডাচদের অপদার্থতার জন্যে ভয়াণক চটেছিলেন। ইংরেজদের মন-তুষ্টির জন্যে তিনি ওদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করবার সংকল্প করলেন। তিনি এটাই বোঝাতে চাইলেন: ডাচদের ওপর তার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। যাক্‌ ক্লাইভের মধ্যস্থতায় শেষটায় ওরা অব্যাহতি পেল।

ইংরেজ ওলন্দাজদের মধ্যে একটা সন্ধি হল। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল গেরেটীতে (গৌরহাটী)। ডাচরা ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন লক্ষ দিতে রাজী হল। ইংরেজরাও ওদের জাহাজগুলো, আটকানো মালপত্র ও বন্দীদের ফেরৎ দিতে স্বীকার করে নিল। (অবিশ্যি বন্দীদের কেউ কেউ ইংরেজ সৈন্যের তালিকায় নাম লিখিয়ে বন্দী তালিকার নাম কেটে ছিল)।

ডাচেরা প্রতিশ্রুতি দিল তারা ১২৫ জনের বেশী ইউরোপীয় সৈন্য চুঁচুড়ার দুর্গে রাখবে না। বেশী সৈন্য যা এখন আছে তাদের ব্যাটাভিয়ায় ফেরৎ পাঠাবে। নবাবের অনুমতি ছাড়া কাল্‌পী, ফলতা ও মায়াপুর (?) ছাড়িয়ে চুঁচুড়ার দিকে একখানার বেশী জাহাজ আনবে না। এ ছাড়া ভবিষ্যতে ওরা কখনও ইংরেজদের ওপর কোন বৈরী ভাব দেখাবে না আর বাংলার সীমানার মধ্যে কোন নতুন দুর্গও তৈরী করবে না।

সন্ধির সর্তগুলি বিবেচনা করার জন্যে ইউরোপে ইংরেজ ও ওলন্দাজ সরকার দু'পক্ষের দু'জন স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত করলেন। বলাবাহুল্য, চুক্তিপত্রটা দু' কমিশনারেরই অনুমোদন লাভ করেছিল।

এরপর বাংলা তথা ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে ডাচদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটল। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টররা কলকাতায় যে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে ডাচদের সঙ্গে ইংরেজরা যেন কোনরূপ বিবাদ না বাধায়। কারণ বর্তমানে এরূপ বিসম্বাদের কোন প্রয়োজন নেই।

এরপর ওলন্দাজরা অনেকটা ইংরেজদের অনুকম্পার ওপর নির্ভর করে দিন কাটাতে লাগল। তারা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের সৌভাগ্যের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তবু তাদের ব্যবসা নেহাৎ মন্দ চলছিল না।

॥ ডাচ আমলের শেষ দিক ॥ (১৭৬৯-১৮২৪)

এ্যাডমিরাল ষ্টোভোরিনাম (ডাচ পর্যটক) ১৭৬৯ সালে যখন চুঁচুড়ায় আসেন তখন সেখানকার পড়ন্ত অবস্থা। ব্যবসাবাণিজ্যে ভাঁটা পড়েছে। শহরের শ্রী একেবারেই নেই। পাবলিক গারডেন্‌স্‌-এর বেশীর ভাগ গাছই মরে গেছে, ফোর্ট গাষ্টেভাস দুর্গের অবস্থা শোচনীয়—ভগ্নপ্রায় দেয়ালের গায়ে কামানের গোলা লাগলে যেন সেই মুহূর্তে ধ্বসে পড়বে, এমনি আশঙ্কা জাগে। ডিরেক্টর হুগলীর মুসলমান ফৌজদারের শুল্কের বকেয়া পাওনা শোধ না করায়, ফৌজদার টাকা আদায়ের জন্যে তার কাছে লোক পাঠালেন। ডিরেক্টর সাহেব এতে দারুণ অপমান বোধ করলেন। আজ অবধি লোক পাঠিয়ে তাগাদা হয়নি কোন দিন। তিনি মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেন। ফৌজদারের প্রতিনিধিকে ধরে আচ্ছাকরে চাবকে দিলেন। ফৌজদার মুহম্মদ রেজা খাঁর কানে খবরটা পৌঁছুতে তিনি ত অগ্নিশর্মা। ডাচদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি দশ হাজার ফৌজ পাঠালেন। ওরা এসে চুঁচুড়ার দুর্গ ঘেরাও করল। তেরদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় (৩রা-১৫ই সেপ্টেম্বর ১৭৬৯) অনাহারে অনেকের মৃত্যু ঘটল......শেষটায় ইংরেজদের মধ্যস্থতাে সৈন্য সরিয়ে নে'য়া হল। ডাচ কাউনসিল বকেয়া টাকা শোধ করবার অঙ্গীকার জানালেন।

এ-সময়ে চুঁচুড়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগেও ছেয়ে যায়। তৎকালীন ওলন্দাজ ডিরেক্টরও এ-রোগেই মারা যা'ন।

১৭৭০ থেকে ১৭৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলায় ডাচদের

ব্যবসা ভালই চলেছিল ; কিন্তু লাভের বেশীর ভাগ টাকাই ফ্যাক্টরীর আমলাদের পকেটে ঢুকতো। ডাচ কর্তৃপক্ষের বিশেষ লাভ হয় নি।

সে যুগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা যেমন অসদ উপায়ে বহুটাকা আয় করেছে, ডাচেরাও ঠিক তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলত। সেকালে বাংলাদেশে দুর্নীতিগ্রস্ত ডাচ ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে ইউরোপে ওলন্দাজ সরকারের কাছে একপত্রে অভিযোগে জানান হয় :

For a series of years, a succession of Directors in Bengal have been guilty of greatest enormities and the foulest dishonesty ; they have looked upon the companys effects, confided to them as a booty thrown open to their depradation they have most shamefully and arbitarily falsified the invoice prices ; they have violated in the most disgraceful manner, all our orders and regulations with regard to the purchase of goods, without paying the least heed to their oaths and duties.

[Toyanbee's Sketches—page 8]

১৭৮১ সালে ইউরোপে ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধলে ইংরেজরা চিনসুরা দখল করল। সেই সময় ওখানকার ডিরেক্টর ছিলেন রস সাহেব (Johannes Mathias Ross) হেষ্টিংসের সঙ্গে ছিল তার গলায় গলায় দোস্তী। হেষ্টিংস চিনসুরায় বেড়াতে এসে ফ্যাক্টরীতে বহুবার রস সাহেবের আতিথেয়তায় আপ্যায়িত হয়েছেন। স্থির হল : একজন পদস্থ সেনানী বেশ কিছু সৈন্য ও লোকজন নিয়ে ডিরেক্টর সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে আত্মসমর্পনের অনুরোধ জানাবেন। আর তাকে সসম্মানে কলকাতায় আনবেন। কিন্তু কার্যকালে একজন Subaltern (দ্বিতীয় লেফ্‌টনান্ট—সর্বনিম্ন কমিশণ্ড অফিসার) মাত্র ১৪ জন অনুচর নিয়ে ডিরেক্টরের কাছে এলেন।

এই অসৌজন্যে মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর বিশেষ ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হলেন এবং আত্মসমর্পনে অস্বীকৃতি জানালেন।......কিছু পত্র বিনিময় হল আর শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মসমর্পন করলেন।

বাংলার সবগুলি ওলন্দাজ কুঠিই ইংরেজদের অধিকারে এল।

প্রায় দু' বছর বাদে ১৭৮৩ সালে আবার ডাচদের হাতে তাদের কুঠিগুলো প্রত্যার্পন করা হল। চুঁচুড়ায় পুনরায় ডাচ শাসন প্রবর্ত্তিত হল।

বার বছর পর ১৭৯৫ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে ফের চুঁচুড়া ইংরেজদের শাসনে এল। শুধু চুঁচুড়ার জন্য একজন স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত করা হল। মিঃ আর বার্চ হলেন প্রথম কমিশনার। পরবর্তী কমিশনার হলেন হুগলীর জজ ও কালেক্টর।

বি, জি, ফোরবস্‌, আই, সি, এস, এরই আমলে চুঁচুড়াকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হল ডাচদের হাতে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই হস্তান্তর উপলক্ষে যে পতাকা উত্তোলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল—

On the occasion of rehoisting the Dutch flag at Chinsurah on Monday last, the Hon'ble J. A. Van Braam gave a grand dinner and in the evening a Ball and a supper to Mr. Forbes the English Commissioner and principal families in Chirsurah Chandannagore and Serampore. We are informed that the entertainment was arranged in the most gratifying manner and the greatest harmony and cordiality prevailed.

১৭৮১ থেকে ১৮২৪ সাল—এই তেতাল্লিশ বছরের মধ্যে চারবার চুঁচুড়া হাত বদল হয়েছে। এ-সময়ে এ-দেশে ওলন্দাজদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য যাভা প্রভৃতি পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ওদের ব্যবসা ও প্রতিপত্তি অব্যাহত ছিল।

হল্যাণ্ডের ডাচ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের কাজ কারবার সম্বন্ধে আদৌ উদ্বিগ্ন ছিলেন না। কারণ তারা জানতেনঃ

আজ হোক বা কাল হোক বাংলা ছেড়ে তাদের চলে আসতে হবে।

চুঁচুড়ার ডাচ ডিরেক্টর তাই ইংরেজদের মন যুগিয়ে চলতেন;—যতদিন পারা যায় যে করেই হোক এদেশ থেকে কিছু অর্থ উপায় করবেন সেই আশায়। তবুও মাঝে মাঝে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তারা ক্ষোভ দেখাতে কসুর করেন নি।......১৮২৪ সালে ইংরেজদের পুলিশ দুজন পলাতক আসামীকে ধাওয়া করে চুঁচুড়া সহরের সীমার মধ্যে ঢুকে গ্রেফতার করে। চুঁচুড়ার ডাচ ডিরেক্টর এতে বিশেষ অপমানিত বোধ করেন। কম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পুলিশের অনধিকার প্রবেশের জন্যে অভিযোগ জানালেন। ফলে হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডিরেক্টরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিল।

১৮২৪ সালের সন্ধি (৪) অনুযায়ী চিনসুরা ও বাংলার অন্যান্য ডাচ কুঠিগুলো পাকাপাকিভাবে ইংরেজদের কর্তৃত্বে এল। ১৮২৫ সালের মে মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর কর্তৃপক্ষ চিনসুরা সহরের দখল নেন আর শেষ ডাচ ডিরেক্টর Overbeck ও আরও আটজন ডাচ কর্মচারীর পেনসন দেবার ব্যবস্থা করেন। ১৮২৭ সালে ডাচদের ধ্বংসোন্মুখ গাষ্টেভাস দুর্গটি ভেঙ্গে ফেলা হল এবং তারই ইট, পাথর, রাবিশ দিয়ে রাস্তা মেরামত করা হয়েছিল। এই দুর্গের কড়ি, বরগা, দরজা, জানলা দিয়ে ১৮২৯ সালে কম্পানীর সৈন্যদের জন্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যারাক তৈরী হয়েছিল। সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে এটাই ছিল তখন সব চাইতে দীর্ঘতম অট্টালিকা। বর্তমানে এই বাড়ীটা হুগলী জেলার কালেক্টর, জজ, ও বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে (একপাশে জেলাজজের কোয়ার্টার্স) বারাণ্ডা ঘিরে এখন অনেক নতুন নতুন অফিসের জায়গা করা হয়েছে।......

মিসেস ফেনটন ১৮১৮ সালে চুঁচুড়ায় এসেছিলেন। তার লেখা থেকে সে আমলের ডাচ কলোনীর দুর্দশার একটা ছবি পাই আমরা। তিনি একে বলেছেন City of Silence and Deacay. ইংরেজ ও ডাচ মহল্লার তুলনা করতে গিয়ে মিসেস ফেনটন বলেছেন :

> "......the English quarters were extremely cheerful and neat but the part, that may be called Dutch, exhibits pictures of ruin and melancholy beyond anything you can imagine, you are inclined to think that very many years must have passed since these dreary habitations were cheerful abode of men. The character of everything is gloomy, gloomy without the imposing effect produced by mighty relics of art or sublime changes of nature. We frequently pass the dwellings of rich natives large ruinous looking houses, the window frames half decayed the flock walls black with damp, no pretty gardens or clump of trees nothing to excite imagination.

॥ চুঁচুড়ার ডাচ আমলের বাড়ীঘর : উপসংহার ॥

তখন ডিরেক্টর ভার্নেট সাহেবের আমল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। চুঁচুড়া থেকে মাইলটাক দূরে চন্দননগরের দিকে একটা সুরম্য প্রাসাদ তৈরী হচ্ছিল। এটা ছিল ফ্রিম্যাসনদের লজ। এর দ্বার উৎঘাটনের সময় যে উৎসব হয় তাতে পর্যটক ষ্টাভোরিনাস (এর কথা আগেই বলা হয়েছে) উপস্থিত ছিলেন এতে অনেক টাকার বাজী পোড়ান হয়; ভোজ বল নাচের আয়োজনও হয়েছিল। এই ভোজে বিশিষ্ট ইংরেজ ও ফরাসী পরিবারের লোকেরা অনেকেই নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

ডাচ আমলের শেষদিকে চুঁচুড়াকে কলকাতারই শহরতলী ধরা হত। অনেক ইংরেজ পরিবার তখন অবসর যাপনের জন্য গঙ্গার ধারে চুঁচুড়ায় আসতেন। এখানে তখন ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের জন্য ভাল স্কুল ছিল। বহু ইংরেজ ছেলে চুঁচুড়ায় থেকে স্কুলে পড়ত।

সে আমলে কলকাতার অনেক সাহেবেরই চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে বাগান-বাড়ী ছিল। উইলিয়াম লাসিংটন (পরে ইনি M. P. হন) কাউন্সিলের সদস্য বোগার্ডদের অন্যতম। মস্ত জায়গা নিয়ে এদের বাড়ী, মনোরম উদ্যান, মৃগ-কানন (deer park) দিয়ে সেগুলি সাজানো ছিল। ফুল ও ফলের বাগানে সাজানো বাড়ীগুলির ভাড়াও ছিল বেশ চড়া। (১৭৮৪ সালে ১৫ই এপ্রিল ক্যালকাটা গেজেটে এদের একটা বাড়ীর ভাড়া দেবার বিজ্ঞাপন বার হয়। তার মাসিক অঙ্কটা ছিল ২৫০টাকা, তুলনায় এখন তা প্রায় দু হাজার টাকা।

ডাচ আমলের অনেক বাড়ীই এখন নিশ্চিহ্ন, হয় নদী গর্ভে না হয় ভেঙ্গে চুরে শেষ হয়ে গেছে, তার জায়গায় নতুন বাড়ী উঠেছে। কোন কোন বাড়ী স্থানীয় বাঙ্গালী ধনী ব্যক্তিরা কিনে নিয়েছেন।...... ডাচভিলা বলে বাড়ীটা মণ্ডলদের।

কয়েকটা বাড়ী অবিশ্যি এখনও অটুট রয়েছে। যেমন কলেজিয়েট স্কুলের বাড়ী, কমিশনার সাহেবের কুঠি, মহসীন কলেজের মেইন বিল্ডিং, সার্কিট হাউস ও কলেজের মধ্যবর্তী চ্যাপেল, যা আজকাল কলেজের বায়োলজিক্যাল ল্যাবোরেটারি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে: ওলন্দাজদের আমলে বহু আর্মানির বাস ছিল। ১৬৯৫ সালে ওরা এখানে একটা গির্জা স্থাপন করেন। মোগল টুলির গির্জাটা জন দ্য ব্যাপটিস্টের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এই ভোজনালয়ের নির্মাণ কার্য শুরু করেছিলেন আর্মাণী বণিক মার্কার জোহানেজ এবং তার মৃত্যুর পর তস্য ভ্রাতা জোসেফ কাজটা শেষ করেন। গির্জাটা এখনও অটুট রয়েছে।

মহসীন কলেজের বাড়ীটা ১৮১০ সালে তৈরী হয়েছিল। এর মালিক ছিলেন জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক মশিয়ে পেঁ।

স্থানীয় জমিদার বাড়ীটা কিনে নিয়ে কলেজকে দান করেন। নদীর ধারে বর্তমান কলেজের কাছে ছিল ডাচদের প্রাচীন গির্জা আর ঘণ্টাঘর (Chime Clock) এটা স্থাপন করেন মিসটারম্যান সাহেব। এরই নীচে যে ঘাট ছিল আজও স্থানীয় লোকেরা তাকে ঘণ্টাঘাট বলে থাকেন। চুঁচুড়ায় ডাচ আমলের কবরখানা সহরের পশ্চিমপ্রান্তে অনেকখানি স্থান জুড়ে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে সে আমলের অনেক ডাচ ভদ্রলোকের সমাধি দেখতে পাওয়া যাবে।

যদিও প্রায় দশ' বছর ধরে ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় শাসন আর বসবাস করে গেছে, আশ্চর্যের বিষয় এ সহরে এখন তাদের কোন বংশধর বা ইন্দো-ডাচ পরিবারের কোন অস্তিত্ব আছে বলে জানা যায় না।

---

(১) ডাচেরা চুঁচুড়ায় যে দুর্গ নির্মাণ করেছিল, সেই ফোর্ট গাষ্টেভাস (Fort Gastavus) দুর্গের প্রবেশ দ্বারে একখানা প্রস্তর ফলকে এই সম্মিলিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতীক চিহ্নটা উৎকীর্ণ ছিল: ফলকের দু'পাশের সংখ্যা দুটি যে বছর দুর্গটি তৈরী হয়েছিল (অর্থাৎ ১৬৮৭ খৃ:;) সেটা নির্দেশ করছে। দুর্গটা ভেঙ্গে গেলে পাথরখানা বহুদিন ধরে সাহেবদের টেনিস খেলার মাঠে পড়েছিল। পরে ওটাকে তুলে এনে কমিশনার সাহেবের কুঠিরের পূব ধারের বৈঠকখানা ঘরে ফায়ারপ্লেসের উপর লাগান হয়েছে। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের এই বাড়ীটা ডাচ আমলের।

(২) নিঃস্বার্থপর ইংরেজ চিকিৎসক যিনি অগ্নিদগ্ধা বাদশাহজাদীকে সুস্থ করে, সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে পুরস্কারের বিনিময়ে কম্পানীকে ব্যবসায়িক সুবিধা পাইয়ে দেন।

(৩) বরানগরের কুঠি ছিল চুঁচুড়ার ডিরেক্টরের অধীন। বরানগরে ডাচদের বেশ জোর কাজ কারবার চলত। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামিলটন বাংলা ভ্রমণে এসে লিখেছেন, —'the Dutch shipping anchors there (বরানগর) sometimes take their cargoes for Batavia.'

সে আমলে বরানগরে অনেক যুবতী স্বৈরিণীর বাস ছিল। হ্যামিলটনের লেখায় পাই—

—'Baranagaul' (বরানগরকে তিনি বরানগল বলেছেন) is the next village on the river side above Calcutta, where the Dutch have a House and Garden and the town is famously infamous for a seminary of female Lewdness, when number of girls are trained up for Destruction of unwary youths.'—এইসব মেয়েরা প্রায়ই ডাচ ও মালয়ী বা ইন্দোনেশিয়ানদের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এদের অনেকেই খুব রূপবতী ও বুদ্ধিমতী। তখনকার দিন চুঁচুড়ায় এই সঙ্কর জাতের কিছু লোক বাস করত। Grand Pre তাঁর VOYAGE IN THE INDIAN OCEAN AND TO BENGAL (1789-90) নামক বইয়ে লিখেছেন—

'Here (চুঁচুড়ায়)as in all the Dutch establishment, some Malay families have settled and given birth to a description of women called *Mosses who are in high estimation for their* beauty and talents. The race is almost extinct, or is scattered through different parts of the country,'

(৪) এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল লণ্ডনে ১৮২৪ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে। সন্ধির সর্তানুযায়ী ইংরেজরা ডাচদের কাছ থেকে চুঁচুড়া, কালিকাপুর, পাটনা, ফলতা ও বালেশ্বরের কুঠি ও অন্যান্য ভূসম্পত্তির দখল পেলেন। বিনিময়ে ইংরেজরা ফোর্ট মার্লবরো ও সুমাত্রা দ্বীপটি ওলন্দাজ সরকারের হাতে তুলে দিলেন। ওলন্দাজরা এবং ইংরেজদের সিংগাপুরের সার্বভৌম আধিপত্য নিয়ে একের বিরুদ্ধে অন্যের যে আপত্তি ছিল, দু'পক্ষই তা প্রত্যাহার করে নিল।

(৫) এই গির্জাটা নির্মিত হয় ১৭৪৪ সালে, ডিরেক্টর ভার্ণেটের আমলে। এর দেওয়ালে একটা প্রস্তর ফলকে লেখা থেকে এর নির্মাণকাল জানা যায়।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

অভয় তো অবাক। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে, তার যুগলকাকার ব্যবহারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। মোনাদার বাবা, যে এমন লোক হ'তে পারে, এ ধারণা অভয়ের আগে ছিল না। অবশ্য ভারী বদ্ মেজাজী খিট্‌খিটে স্বভাবের লোক। কিন্তু অভয় তো, এ গাঁয়ের ছেলে সে তো অপরিচিত নয়। কিন্তু হঠাৎ এমন তেড়িয়া মেজাজ দেখিয়ে, মুখের ওপর দড়াম করে, দরজা বন্ধ করে দেবে। এ তো ভাবা যায় না। অভয় মনে মনে বলে, যুগলকাকা পাগল হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। এর আগে রাস্তা ঘাটে, দু একটা পাগলা লোক দেখেছে অভয়। এমনি লালচোখ—বড় বড় চুল—গোটা মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। তারাও যেমন অসভ্য অশ্লীল কথা বলে। যুগলকাকাও তো সেই রকমই।

কিন্তু মোনাদা কোথায় গেল, ভর দুপুরে। অভয়ের মনে হ'ল, বাপের সঙ্গে হয়তো জোর রাগারাগি করে, দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে। অবশ্য মন্মথর মনের ইচ্ছা তাই। কিন্তু অভয়কে না বলেই কি মন্মথ নিরুদ্দেশ হ'বে ভাবতে ভাবতে অভয় বাড়ীর দিকেই হাঁটতে থাকে। একমনেই হাঁটছিল অভয়। পল্লীর পথ এখন নিস্তব্ধ। রাস্তা জনশূন্য। দূরে দূরে দু' একটা গরু, সবুজ ঘাসের সন্ধানে ফিরছে। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠল অভয়। শব্দটা তার পাশের রাস্তায়। তাকিয়ে দেখে অবাক। কার একখানা অতি পুরাতন সাইকেল চেপে, আসছে মন্মথ। তাকে দেখেই, মন্মথ সাইকেল থেকে পা বাড়িয়ে নেমে পড়ল। সারা শরীর ঘামে ভিজে। জামাটা ঘামে সপ্‌সপ্ করছে। মুখচোখ টক্‌টকে লাল। মাথায় একটা মোটা চাদর পাগড়ীর মত।

—তুমি? কিন্তু একি, এই রোদে কোথায় গিয়েছিলে মোনাদা? মন্মথ সাইকেল খানা রাস্তার পাশে, কাৎ করে রেখে, মাথার রুমাল খুলে ঘাম মুছে বলল, বস্‌রে এখানটায়—বেশ ঝিরঝিরে বাতাস দিচ্ছে—তোফা হাওয়া। মন্মথ অশ্বত্থ গাছটার ছায়ায়, বেশ আরাম করে, হাত পা, ছড়িয়ে বসল। মন্মথ একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, খুব রোদ নয়রে?

অভয় বলল, রোদ তো বটেই। কিন্তু এত রোদের মধ্যে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে—

—আসছি সহর থেকে। মস্ত মিটিং হচ্ছে, ওখানকার বল খেলার মাঠে। কে আসছে জানিস? কি যেন নামটা? সামধ্যায়ী—হ্যাঁ, মোক্ষদা চরণ সামধ্যায়ী। খুব বড় স্বদেশী—গান্ধিজীর চেলা। গান্ধিজীর নাম শুনিসনি? ওঃ হরি—শুনিস্‌নি। গান্ধিজীর নাম—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। লোকে বলে, মহাত্মাজী। সেই মহাত্মাজীর বড় চেলা। আজ বিকেলে মস্ত সভা হচ্ছে। বিড়িতে টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, মন্মথ সেই দুপুর রোদে গুণগুণ করে গান গেয়ে ওঠে—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখ তুলে আজি চাহরে—

অভয় তো অবাক্। কে গান্ধিজী—আর কেই বা মোক্ষদা চরণ? এসব নাম নূতন শুনছে। অভয় আজ ভারী আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য নূতন কথা শুনছে। এই কি স্বদেশী করা নাকি? স্বদেশী কথাটা এখানে ওখানে শুনছে বটে। কিন্তু ওটা যে কি, তাও কেউ পরিষ্কার বলতে পারেনি। মোনাদা কি স্বদেশী করবে নাকি? মোনাদার পরণে খুব মোটা সুতোর কাপড়—মাথায় মোটা চাদরখানা পাগড়ীর মত রয়েছে। ওই কি খদ্দর —অভয় অবাক হয়ে গেল। উড়ো উড়ো কিছু কিছু কথা কানে আসছে। দোকানে, হাটে, রাস্তায় লোকে চুপি চুপি কি সব যেন বলছে। লোকে চুপি চুপি বলছে, আর এদিক ওদিক তাকায়। মায়ের কাছে একদিন বাবা স্বদেশীর গল্প বলছিলেন। অভয় শুনেছিল বাবা বলছেন, গান্ধিজী মস্ত সাধু—তিনি সাহেবদের এদেশ থেকে তাড়াবেন। অভয় শুয়ে শুয়ে শুনছিল সে সব কথা

মা বললেন—বলকি? ওই সাদা সাহেবদের তাড়িয়ে দেবে। তবে বল, তাঁর খুব ক্ষেমতা কিন্তু ওদের কত পুলিশ বন্দুক। যুদ্ধ হলেই যে সব্যনাশ গো। প্রথম যুদ্ধের কথা, সরোজিনীর মনে আছে। চালের দাম সে দিন বেড়ে ছ'টাকা মণ হয়েছিল। কাপড়ের দাম চড়ে গিয়েছিল। সে দিন গাঁয়ে গাঁয়ে—সহরে সহরে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। অনেক লোক উপবাস করেছিল, অনেকে কাপড় পরতে পায়নি। তখন কাপড়, নুন, ছুঁচ সব আসত বিলেত থেকে। আমরা ভারতবাসী সেই নুন, ছুঁচ, কাপড় সব ব্যবহার করতাম। আমরা বিলেতের জিনিষে নিজেদের নগ্নতা ঢাকতাম, অন্নে, ব্যঞ্জনে বিলিতি নুন ব্যবহার করতাম। প্রথম যুদ্ধের সময় গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক বাজে গুজব রটে গেল। যুদ্ধের জন্যে নাকি সরকার জোয়ান জোয়ান ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারা নাকি সৈন্য হবে। সরোজিনীর সেই পুরানো দিনের কথা, বেশ ভাল মনে আছে। রাত তখন আটটা হবে। বাড়ীর লোকেরা তখনও তাদের পাশার আড্ডা শেষ করে বাড়ী ফেরেনি। সরোজিনীর বয়স তখন অল্প। শ্বশুরমশাই দক্ষিণদিকের ঘরে শুয়ে আছেন। হঠাৎ পাড়ায় একটা হৈ-চৈ শব্দ উঠল। ভয় পেয়ে, রান্নাঘর থেকে, হেঁসেল ফেলে সরোজিনী ছুটে গেল শ্বশুরমশায়ের ঘরে।

—কি হ'ল—কি হ'ল বৌমা—। কিন্তু কে কথা বলবে। সরোজিনী তখন কাঁপছে—হাত, পা ঠক্‌ঠক্ করছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছেনা। সরোজিনীকে পাশে বসিয়ে, রামপতি দত্ত হাঁকলেন—গোপেশ, গোপেশ—। কিন্তু গোপেশ্বর তখনও ফেরেনি। একটু পরে, ব্যাপারখানা জানা গেল। গাঁয়ের ভেতর গুজব রটেছে, যুদ্ধের জন্য জোর করে লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারের লোক ঢুকেছে গাঁয়ে। এই খবরটা যে কে দিল, তা কেউ বলতে পারে না। এই গুজব ছড়িয়ে পড়তেই, গাঁয়ে হৈ চৈ বেধে যায়—কান্নাকাটি সুরু হয়। জোয়ান জোয়ান ছেলে ছোকরারা ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল—কেউ বনে জঙ্গলে পালাল, কেউ পুকুর ডোবায় গলা ডুবিয়ে লুকিয়ে থাকল। সে এক দর্শনীয় বস্তু।

কোন মা, ছেলেকে ধানের গোলার মধ্যে ঢুকিয়ে, খড় চাপা দিয়েছে, কোন সতী লক্ষ্মী নারী স্বামীকে, গোয়াল ঘরের মাচার ওপর উঠিয়ে, ঘাস, ঘুঁটে চাপা দিয়ে বন্ধ রান্নাঘরে বসে দুর্গানাম জপ সুরু করে দিল। বেচারা বীর পুরুষ স্বামী, মশা, পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু সর্ব্বশরীর জ্বালা করলেও একটুও টুঁ শব্দ করতে পারেনা। নিরাপদ অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত এই ভাবেই থাকতে হবে। গাঁয়ের নিবারণ রায় আর একটা অদ্ভুত বুদ্ধির কেরামতী দেখাল। সকাল বেলায় দেখা গেল, নিবারণের গলায়, দুই হাতে কোমরে লাল, কালো মোটা সুতোর সঙ্গে অন্ততঃ কয়েক গণ্ডা, ঢোলকের মত বড় বড় মাদুলি ঝুলছে।

লোকে অবাক।—আরে নিবারণ, ব্যাপার কি? রাতারাতি হাতে, গলায় এত মাদুলি কেন হে? নিবারণ শৈশব থেকেই একটু খোঁনা। নিবারণ গলার স্বর আরও খোঁনা খোঁনা করে উত্তর দিল এ-সব বুঝবেনা ভায়া। যুদ্ধে যদি ধরে নিয়ে যায়, তখন সাহেবদের বলব,

সাহেব, এই যে দেখছ মাদুলি, এগুলো নানান্ অসুখের জন্যে।

এটা হাঁপি কাশির জন্যে, এটা অম্বল, এটা অম্লশূল, এটা বাতের জন্য মাদুলি, এটা ফিক্ ব্যথার জন্যে মাদুলি। তখন? এতগুলো ব্যামো শুনে কি যুদ্ধের জন্যে আমায় ধরে নিয়ে যাবে? উহুঃ তা নেবে না। বুঝলেনা সেই জন্যে এত মাদুলি ধারণ করেছি। এটাকে মাদুলী চালাকি বলতে পার।

এইসব নানান গল্প—প্রথম যুদ্ধের কথা—চালের কাপড়ের দাম সম্বন্ধে অভয় মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছে।

মন্মথ তার সঙ্কল্পের কথা বলে যেতে লাগল অভয়ের কাছে। মন্মথ বলল, সে মহাত্মাজীর শিষ্য হবে, দেশের কাজ করবে—দেশের জন্যে প্রাণ দিতেও সে পিছপাও হবে না। মন্মথ বলে যেতে লাগল, পাঞ্জাবের জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নৃশংস অত্যাচারের কথা। সেখানকার অধিবাসীদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের কথা। অভয় এসব কথা, এর আগে শোনেনি। ইংরেজেরা দেশের রাজা এই কথাই জানে। এর বেশী কিছু জানে না। কি করে ইংরেজ এ দেশ, এ রাজ্য পেল, কিভাবে রাজ্য শাসন করছে এ সব কথা, এর আগে কেউ আলোচনা করেনি। গরীব নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সে। কোনদিন একবেলা জোটে, কোনদিন জোটে না। ভাল খাওয়া, পরা, এসব তার স্বপ্নেরও অগোচর। তার এসব কথায় কি লাভ? যে হয় হোক রাজা, যে হয় শাসন করুক দেশ, ওতে তাদের কি যায় আসে। আমরা দুটো খাওয়া-পরা চাই। পেট ভরে চাই খেতে—

এতক্ষণে বুঝল, কেন যুগলকাকা ছেলের ওপর রেগে গেছেন। যুগলকাকা ভেবেছেন, মন্মথর হালের চিন্তা, কার্য্য সবই বুঝি অভয় জানে। কিন্তু সে কি করে জানবে অপরের মনের খবর। সে আসে পড়তে—মোনাদা, তাকে ভালবাসে ছোট ভাইয়ের মত দেখে, এই পর্য্যন্ত। তাকে নবদ্বীপে নিয়ে যাওয়া, সিনেমা দেখান, এসব বোধকরি, যুগলকাকা কার কাছে শুনেছেন। অনেক লোকই তো নবদ্বীপে যায়, বোধ হয় গাঁয়ের কেউ কেউ দেখে থাকবে। অভয় ভাবল, জানুগগে, তাতে আর ভয় কি? যা জানার তাতো জানাই হয়ে গেছে। কিন্তু অভয়ের চিন্তা অন্য। যাওবা একটু আধটু লেখা-পড়া হচ্ছিল, এখন তাও বুঝি হয় না। মোনাদার যা মনের গতি, তাতে যুগলকাকার রাগ হবারই কথা। মুদীখানার দোকানও বন্ধ হয়ে যাবে। মোনাদা যদি স্বদেশী কাজে লাগে, তবে কি আর দোকান দেখবে?

অভয় বলল, আজ তবে দোকান খুলবে না—

—না। আর কিছু পরেই বের হ'ব। মিটিং-এ যাবো। দোকান তো অনেকদিন চালালাম। এখন, দেখিনা দিন কতক অন্য কিছু করে। দুর্লভ মানব জন্ম যখন পেয়েছি, তখন শেয়াল-কুকুরের মত বেঁচে না থেকে, মানুষের মত বাঁচার চেষ্টা করি। বুঝলি অভয়, তুই নিজের চেষ্টায় লেখা-পড়া কর। তোর জ্যাঠাবাবুকে আবার পত্র দে। যদি পারিস শহরে যা, সেখানে লেখা-পড়া শেখ। লেখা-পড়া না জানলে কিছুই হ'বে না। এটা কিন্তু সব সময় মনে রাখিস।

অভয় হঠাৎ প্রশ্ন করল, তুমি কি দেশ ছেড়ে চলে যাবে মোনাদা। মন্মথ দূরে তাকিয়ে রইল। এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কি যে করব, কোথায় যে যাব কিছুই ঠিক নেই। তবে, দোকানদারী আর করছি নে। দোকানের ঝাঁপ চিরকালের মত বন্ধ করে দিলাম। এখন উপস্থিত শহরে যাচ্ছি—চলি—। মন্মথ সেই জীর্ণ সাইকেলখানা চেপে, শব্দ করতে করতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হ'ল। অভয় অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল। তারপর এক সময়ে বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগল। অভয়ের মনে হ'ল, মোনাদা আর ফিরবে না। মোনাদা হয়ত চিরকালের মত দেশ ছাড়ল। সেই জনহীন স্তব্ধ পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল অভয়। জনমানবহীন পথ —ধুলায় ধূসরিত একখানি পথ স্তব্ধভাবে যেন শুয়ে আছে। এ যেন কোন প্রাণহীন শব। সেই পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল অভয়। একটা অব্যক্ত ব্যথায় ওর

সারা বুক ভরে গেল। দুই চোখে এল জল। টপ টপ করে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তার দৃষ্টি হ'ল ঝাপসা। প্রায় সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে পা দিতেই সরোজিনী বললেন, এ কিরে খোকা। তোর মুখ-চোখ এত শুকনো কেন? সারা দুপুর রোদে রোদে কোথায় ঘুরিস। এই দারুণ রোদে কেউ কি ঘর থেকে বেরোয়। নে, মুখ হাত ধুয়ে ফেল—

অভয় কোন কথা বলল না। ছোট ভাইটী রান্নাঘরে বসে একমনে খেলা করছিল। মা, সংসারের কাজে ব্যস্ত। এখন অনেক কাজ। সন্ধ্যা দেখানো—আলো-বাতি করা—গরু-বাছুর বাঁধা—গোয়ালে ধুপ-ধূনা দেখানো এমনি সব অনেক কাজ। সম্ভবতঃ গীতা আর খোকন দাদার সাড়া পায়নি। জানতে পেলে, এখনি ছুটে আসত।

মন্মথর চলে যাবার পর থেকে অভয়ের যেন সব শূন্য মনে হয়। সেদিন একা একা চড়কতলার মাঠে বসেছিল। বার বার মন্মথর কথাই মনে হচ্ছিল। কত স্নেহ, দয়া-মায়া, কত ভালবাসা সে পেয়েছিল, সে তো ভুলবার নয়। মোনাদা যে ফিরবে না—তাই বার বার মনে হচ্ছিল। নিজের কত কষ্ট, দুঃখের কথা, তাদের অবস্থার কথা একমাত্র মন্মথকেই বলত। সহৃদয়, সমব্যথীর নিকট, নিজ দুঃখ-কষ্টের কথা বলেও শান্তি। মনে হয় বুকটা খালি হ'ল। কিন্তু এখন কার কাছে মনের দুঃখ জানাবে। এক দুঃখী বালকের মনের কথা শুনবার লোক কোথায়? ধনবান ধনবানের সঙ্গেই মেশে, তাদের আলাপ-আলোচনা হয় টাকা-কড়ি আর বিষয়-সম্পত্তির। কিন্তু দরিদ্রের সকরুণ কাহিনী কে শুনতে চায়? জগতে ভালবাসার মাপ তো শুধু টাকা-কড়ি দিয়ে হয় না। যেখানে শুধুমাত্র ধন-ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধ নিয়ে ভালবাসা গড়ে ওঠে, তা হয় ক্ষণ-ভঙ্গুর। সামান্য স্বার্থের আঘাতে, সেই ভালবাসার সেতু ধ্বসে পড়ে যায়। কিন্তু যেখানে শুধুমাত্র হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের স্পর্শ হয়, সেখানেই গড়ে ওঠে প্রকৃত ভালবাসা। ব্যক্তি-তখন সমগ্র জনগণকে আমরা ভালবাসতে পারি। সমগ্র মানবগণের জন্যই আমরা চিন্তা করি। তাহাদের সুখে-দুঃখে অংশীদার হই। মনে হয়, সমগ্র বিশ্ববাসী আমার আপনজন। মনে হয় সমগ্র বিশ্বসংসারই আমার ঘর। সেই ভালবাসা আরও—আরও—গভীর—আরও বিস্তৃত হলে,—তখনই আসে পরিপূর্ণ বিকাশ জ্ঞানের। বোধ করি তদ্দারাই অনুভব করা যায় ভগবানকে। তখনই হয় সর্বজ্ঞানের পরিপূর্ণতা—তখনই হয় প্রকৃত ভালবাসার পূর্ণতালাভ।

মন্মথর সঙ্গে অভয়ের কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই। অর্থ, ঐশ্বর্য্য বা টাকাকড়িরও লেন-দেন নেই। গ্রামে তো আরও লোক ছিল,—অভয়ের সমবয়সী আরও বহু বালক ছিল। কিন্তু কই তাদের সঙ্গে তো অভয়ের বন্ধুত্ব হয়নি। বন্ধুত্ব বা মনের মিল হওয়া সত্যই স্বাভাবিক নয়। একই চিন্তাধারা সর্ব্বত্র মেলে না। যেখানে মতের মিল থাকে, তার সঙ্গে যোগ থাকে স্নেহ, ভালবাসা, দয়া-মায়া শুধু সেখানেই গড়ে ওঠে প্রকৃত ভালবাসা আর বন্ধুত্ব। স্বার্থের বন্ধুত্ব তো ক্ষণিকের। অর্থ ফুরালেই বন্ধুত্বও ফুরিয়ে যায়।

তাই অভয় কেঁদেছিল তার মোনাদার জন্যে। মায়ের ডাকে সচকিত হয়ে অভয় সাড়া দিল। ততক্ষণ গীতা, খোকন এসে গেছে। দুইজনে দুইদিক থেকে অভয়ের হাত ধরে, সমস্তদিনের ছোট-বড় নানান্ ঘটনা বলে যেতে লাগল।

অভয় বলল, বাবা এখনও আসেন নি? কোথায় গেছেন?

সরোজিনী বললেন, এই তো ছিলেন। কতবার জানতে চাইলে, অভয় এসেছে কিনা। বলছিলেন, রোদে রোদে যে কোথায় যায়? হঠাৎ সচকিত হয়ে সরোজিনী বললেন, এইরে—আসল কথাই যে ভুলে গেছি—তোর জেঠাবাবু যে চিঠি দিয়েছেন—

অভয় উৎসাহে লাফিয়ে উঠল—কই? কোথায় চিঠি? কি লিখেছেন—

—আমি কি ছাই সব পড়তে পারি? যে জড়ান

লেখা—। কিছুই বুঝতে পারলাম না। দাঁড়া চিঠি নিয়ে আসি। রান্নাঘরের কেরোসিন ল্যাম্পের কাছে বসে অভয় চিঠি পড়তে লাগল। যাক্, এতদিনে তবে জেঠাবাবুর মনে পড়েছে। অভয়কে যেতে বলেছেন—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অভয় বলল—মা, জেঠাবাবু আমাকে যেতে বলেছেন।

সরোজিনী বললেন, পত্তর ভাল করে রেখে দাও বাবা। উনি আসুন। যাওয়ার দিনক্ষণ দেখাতে হবে—টাকা-পয়সা, বাক্স, বিছানা, জামা-কাপড় এ-সব তো চাই—। পরের বাড়ীতে যাবে। তাঁরা হলেন বড়লোক মানুষ। যখন যা বলবেন, মন দিয়ে শুনবে। ভাল হয়ে থাকবে। নিজের লেখাপড়া নিয়ে থাকবে। হ্যাঁরে ওঁরা আর কি লিখেছেন? স্কুলের মাইনে, বই-এসবের কথা কিছু লিখেছেন নাকি?

অভয় বলল, না। সেসব তো কোন কথাই লেখেন নি। মনে হয়, মাইনে-টাইনে সব জেঠাবাবুই চালাবেন। তা না হলে সব লিখতেন নিশ্চয়ই।

—কি জানি বাপু। আগে উনি আসুন, তারপর সমস্ত ব্যবস্থা হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তুলসীতলায় প্রদীপ দেখান হয়েছে। মঙ্গল-শঙ্খের সু-গম্ভীর শব্দ বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ধূপ-ধূনার সুগন্ধ, তুলসীতলার মাটীর প্রদীপের স্নিগ্ধ ভীরু আলোটুকু, শঙ্খের সুপবিত্র সুগম্ভীর শব্দ, ঈশ্বরের নাম স্মরণ এইসব এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এই অতি মধুর শান্ত রসের তুলনা কোথায়? রাত ধীর পায়ে এসেছে। দিকে দিকে আবছায়া মাখা মৃদু জ্যোৎস্নার আলো, আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। দূরে ঠাকুরবাড়ী হ'তে নাম গান ভেসে আসছে। আরতির ঘণ্টা, কাঁসর শব্দে, মাঝে মাঝে হরিধ্বনি ও ঈশ্বরের নাম গান মৃদু মন্দ বাতাসে ভেসে আসছে। অশান্ত মন স্নিগ্ধ ও শান্ত করছে।

রান্নাঘরের মৃদু প্রদীপের আলোয় ও গীতা খোকা খেলা করতে থাকে। অর্থহীন ভাষায় তারা গল্প করে। একসময় খোকার চোখে ঘুম দেখা দেয়।

সরোজিনী বললেন, এই দেখেছ। এক্ষুনি দু'জনে খেলছিল, কথা বলছিল, এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। এর পর উঠিয়ে খাওয়ান মুস্কিল। তুই চলে গেলে যে কি হবে, আমি তাই ভাবছি। সবচেয়ে মুস্কিল হবে ছেলেটাকে নিয়ে। দিন রাত দাদা দাদা বলে ডাকবে—আর খুঁজবে। অভয় সস্নেহে খোকনকে কোলে তুলে নেয়। সরোজিনী বললেন, আমি মেয়েটাকে খাইয়ে দিই। এর পরে ওঠানো খাওয়ানো খুব মুস্কিল হবে। অভয়কে সরোজিনী বললেন, বাবা, ঐ পাটীটা পেতে খোকনকে শুইয়ে দে বাবা। গীতার খাওয়া হলে ও ঘরে দুজনকে শুইয়ে দেব। রাতে আর ছেলেটাকে ভাত দেব না। দুধ দেব—যদি খেতে চায় গুড় আর মুড়ি খাবে।

অভয় অনেক কিছু ভাবতে থাকে। অপরিচিত সেই মালদা শহরে, না জানি কেমন করে কাটবে। জেঠাবাবু, জেঠীমা, জ্যাঠতুতো দাদা, বোনেরা তাকে কি ভাবে নেবে, তাই ভাবতে থাকে অভয়। কিন্তু শুধু ভাবতে গেলে চলবে না। তাকে যেতেই হবে। তাকে যেমন করেই হোক জীবন যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। তাকে এগিয়ে যেতে হবে—

মন্মথর কথা মনে পড়ে অভয়ের। সত্যি কি মোনাদা মহাত্মাজীর শিষ্য হয়ে গেল। মোনাদা বলেছিল, ইংরেজ সৈন্য নাকি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে শত শত নিরীহ লোককে গুলি করে মেরেছে। ওরা তো তাই করবে। সহজে কি কেউ রাজ্যি ছাড়ে। লোকে একহাত জায়গা নিয়ে কত কাণ্ডই না করে। এই তো সেদিন বেচারাম কুণ্ডুর সঙ্গে লালবিহারী সার কি কাণ্ড-কারখানাই না হল। এ ওকে মারতে আসে—আর ও যায় তেড়ে। শেষে গালাগালি হতে হতে লালবিহারীর মাথায় ওরা লাঠি বসিয়ে দিল। উঃ কী না রক্ত—। এখনও সেই মামলা শেষ হয়নি। একহাত জায়গা নিয়ে যেখানে এই কাণ্ড হয়, আর ইংরেজ কি সহজে গোটা ভারতকে গান্ধীজীর হাতে তুলে দিয়ে যাবে। কিন্তু মোনাদা যে বলল, গান্ধীজী দেবতা—দেবতার অসাধ্য কিছু নেই। হবেও বা—

গাঁয়ের মধ্যে মাত্র একখানা সাপ্তাহিক হিতবাদী কাগজ সে তাও মুটু ডাক্তারের বাড়ী। মুটু ডাক্তার এমন লোক যে কাউকে কাগজ পড়তে বা ছুঁতে দেয় না। বলেন—কাগজের ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে। আশ্চর্য এই মুটু ডাক্তার। মুটু ডাক্তারকে দেখেছে অভয়। একবার সরোজিনীর অসুখ হ'ল—খুব বাড়াবাড়ি অসুখ হয়। সেই সময় সরোজিনীকে দেখতে আসত মুটু ডাক্তার। লাল রঙের ঘোড়ায় চড়ে মুটু ডাক্তার বাড়ী বাড়ী রুগী দেখতে যায়। মুটু ডাক্তারের ভারী পশার। মুটু ডাক্তার যে কি পাশ তা কেউ জানে না। বামুনপাড়া ছাড়িয়ে, সতু গোয়ালিনীর ভিটের পাশ দিয়ে যে সরু গলিটা মোড় নিয়েছে ঠিক সেইখানে, একেবারে হাটের কাছে মুটু ডাক্তারের বাড়ী। বাড়ীর সামনে আর পেছনে বাগান। বাগানে আম, কাঁঠাল, বাতাবি লেবু নারকেল গাছ। বাড়ীর সামনে ফুল বাগান। ছোট্ট একটা গেট। গেটের ওপর লতানে হলদে আর লাল গোলাপের গাছ। বারমাস দু'রকম গোলাপ অজস্র ফোটে—যদিও গন্ধ নেই, কিন্তু দেখতেই চমৎকার। তা বলে, ঐ ফুল ছিঁড়বার সাহস নেই কারুর।' গেট ঠেলতেই একটা শব্দ হবে ক্যাঁচ করে। সামনেই বাঁধান উঁচু রোয়াক। রোয়াকের পরই মুটু ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারী আর বসবার ঘর। বসবার ঘরের সামনে জানালার মোটা মোটা লোহার শিকের সঙ্গে শেকলে বাঁধা আছে মস্ত বড় কুকুর। পরিচিত,অপরিচিত কাউকে দেখলেই কুকুরটা ঝাঁ ঝাঁ করে লাফিয়ে উঠবে আর গম্ভীরভাবে ডাকতে শুরু করবে—ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ। কার সাধ্যি যে সেই কুকুরকে অবহেলা করে। ভাগ্যি শেকল দিয়ে কুকুর বাঁধা থাকে। নতুবা খোলা থাকলে, বোধ হয় কারুর আর রক্ষা থাকত না। অভয় ওষুধ আনতে যেত ভয়ে ভয়ে। মুটু ডাক্তারের ঘরবাড়ী বড়ই ছিমছাম্। কোথাও একবিন্দু ময়লা নেই—আবর্জনা নেই। বাহির ও ঘর দুই-ই অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। চেয়ার, টেবিল, আলমারী, ঔষধের শিশি সমস্তই ঝক্‌মক্ করছে। দেওয়ালের ছবি, ঘড়ি, হাতে বোনা পশমের ফুল সব যেন নূতনের মত ঝক্‌মক্ করছে। একপাশে টেবিলের উপর ডিজ লণ্ঠনটি পর্য্যন্ত চক্ চক্ করছে। লণ্ঠনটির গায়ে বা কোথাও কোন ময়লা দাগ নেই। একখণ্ড সাদা ন্যাকড়া দিয়ে লণ্ঠনটি ঢাকা—পাছে ধুলো-বালি লেগে যায়, তাই এই সতর্কতা। অভয় লণ্ঠনটির এত যত্ন দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

ডাক্তারের চেহারাও দেখবার মত। জুতো, জামা, ধুতি গায়ে কোঁচান চাদর, সমস্তই সাদা ধপ্‌ধপে। ভগবান মুটু ডাক্তারের শরীরটাও তৈরী করেছেন বেশ সুন্দরভাবে। বয়স যদিও ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু শরীরের বাঁধন এত দৃঢ় মজবুত যে, মনে হয় বয়স আরও দশ বার বৎসরের কম। ফরসা চেহারা—মাথায় সামান্য টাক—মাথায় চুল এখনও কালো। সেই চুলগুলির পরিপাট্য কম নয়। চোখে সোনার চশমা। সোনার গার্ড-চেনের সঙ্গে আবদ্ধ দামী ঘড়িটা বুকের বামদিকে ঘড়ির পকেটে থাকে। সোনার চেনের সঙ্গে বাইরে ঝুলতে থাকে; চেনে আবদ্ধ একটি গিনি। এই মুটু ডাক্তারের জিনিষপত্রে হাত দেওয়া ভারী কঠিন। খবরের কাগজগুলো প্রত্যেকটি অসীম যত্নে অতি সুন্দরভাবে ভাঁজ করে, একটি সুন্দর কাঠের তাকে পর পর সাজান। মুটু ডাক্তার আজ পর্য্যন্ত একখানা কাগজও নষ্ট করেন নি। মোনাদার খবরের জন্য অভয় ব্যগ্র হয়? সে শুনেছে, ইংরেজ সরকার স্বদেশীদের ধরলে, তাদের নাম নাকি কাগজে ওঠে। তাই ওর ভারী ইচ্ছে নিজের চোখে কাগজখানা দেখা।

অনেক পরামর্শের পর ঠিক হয়, অভয় মাঘ মাসেই মালদহ যাবে। মাঘ মাসের পাঁচুই তারিখ ভাল দিন। ও পাড়ার ঠাকুরমশাই পাঁজী দেখে তাকে বলে দিয়েছেন। সকাল আটটায় শুভ সময়। তাই সকাল আটটার সময়ই যাত্রা করে অভয়কে বাড়ী থেকে বেরুতে হ'বে। রেল ষ্টেশনও বাড়ী থেকে, পাকা এক ক্রোশের পথ। তাকে হেঁটে যেতে হ'বে। রত্না বাগদী বাক্স বিছানা নিয়ে ষ্টেশনে যাবে। সঙ্গে

মাল পত্তর সামান্য। একটা টিনের ছোট মত তোরঙ্গ, আর সতরঞ্চিতে বাঁধা একটামাত্র বালিশ, একটা মশারী আর একটা কাঁথা। এই কাঁথাটা অভয় নিতে চায়নি। কিন্তু সরোজিনী বল্লেন, নিয়ে যা বাবা। এতে লজ্জার কি আছে। আমরা গরীব দুঃখী মানুষ। কাঁথা আর মাদুরই তো আমাদের সম্বল। আর এ কাঁথা তো তোরই। তোর জন্যে কত যত্নে, খেজুরছড়ি কাঁথা করেছি। বিদেশে এই কাঁথাখানা দেখে, মায়ের কথা মনে পড়বে। অভয় আর অমত করে নি।

যাবার অবশ্য এখনও দেরী আছে। এখন সবে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি। বলতে গেলে মাঝে একমাসের ওপর সময়। মনে হয় শীতটা এবার বেশ জেঁকেই পড়বে। অভয় নবান্ন করে, পৌষলাা আর পৌষ পার্ব্বণের পিঠে খেয়ে তবে যাবে। এটা সরোজিনীর বিশেষ ইচ্ছা। সরোজিনী বললেন, ছেলে আমার বিদেশে থাকবে। আমি কোন প্রাণে নবান্নর চাল, আর ভাল মন্দ মুখে দেব। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে পৌষল্যা করবে, বাড়ী বাড়ী ঢেঁকীতে চাল কোটা হ'বে, পৌষ পার্ব্বণ হ'বে, আর আমার খোকা বিদেশে থাকবে—আমি কোন প্রাণে ওসব করব। সরোজিনী হাত উলটিয়ে চোখ মোছেন।

সরোজিনী বলেন—সারা বছর পর, মা লক্ষ্মী ঘরে আসছেন। যা দু'মুঠো হ'বে, তাই দিয়ে স্বামী, পুত্র, দেবতাদের সামনে ধরে দেব। মেয়ে মানুষের অমন আনন্দের দিনে, ছেলে যদি বিদেশে থাকে, সে যে কত দুঃখ তা আর কি বলব। গীতা, খোকন, দিনরাত দাদার পায়ে পায়ে ঘোরে—ওদের কি আর কোন আনন্দ হ'বে। শুধু মুখ শুকিয়ে লুকিয়ে থাকবে—আর রাস্তার পানে তাকাবে। সরোজিনীর কথাতেই গোপেশ্বর তাই মত করে, দাদাকে চিঠি দিলেন। ইতিমধ্যে আরও কিছু খরচা আছে। অভয়ের এক-জোড়া জুতো, দুটো জামা, দুখানা কাপড় কিনতে হ'বে। এক কাপড়ে তো বিদেশে পাঠান চলে না। তাই আশা—অভয় যদি মানুষ হয়, তবে পরিণামে গীতা খোকনের জন্যে ভয় নেই। মানুষের শরীরের কথা কে কি বলতে পারে? অভয়ই এখন সব আশা ভরসার স্থল। সংসারের সব দায়—সব ঝক্কি তার ঘাড়েই তো এসে পড়বে। শূন্য নয়নে গোপেশ্বর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু নিঃশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন। কিন্তু মানুষের ভাবনার কি শেষ আছে। চিন্তায় কি কোন কিছু সমাধান করা যায়? না—কোন সমাধানই হয় না—শুধু উদ্বেগই বাড়ে। তার চেয়ে কোন চিন্তা না করাই ভাল। এই কথা, একদিন সরোজিনীই বলেছিলেন।

সরোজিনী বলেছিলেন, ভাবনা চিন্তা করে তুমি কি করবে গা। সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দাও ঈশ্বরের কাছে। তিনি যদি বাঁচান তবেই বাঁচব। আমাদের মত দুরবস্থার লোকে, শুধু ভাবনাই সার হয়। হাজার ভাবনা চিন্তা করেও, কোন কিছুর কূল কিনারা হয় না। ওতে শুধু দুঃখ বাড়ে—কষ্ট বাড়ে। তার চেয়ে সব ভাবনার দায়, ভগবানের ওপর ফেলে দাও। যদি তিনি রাখেন উত্তম—যদি মারেন-তো তিনিই মারবেন। যে কষ্ট পাচ্ছি—তা মনে কর, এসব তাঁর দেওয়া নয়। নিজেদের কাজের ফল এখন ভুগছি। গোপেশ্বর চুপ করে থাকেন।

সরোজিনী বলেন—বল, এখন কার ওপর রাগ করব। বোধ হয়, আরও কত জন্মে, কত অন্যায় কাজ করেছিলাম, সেই সাজা এখন পাচ্ছি। এ দোষ তো তার নয়—সবই তো আমাদের। এমন ভাগ্য—এমন কপাল যে, নিজের ভাই বোন থেকেও এখন নেই। জানি বাপ মা চিরকাল বেঁচে থাকে না। দুই বোন তো রয়েছে, অথচ কেউ একটা পোষ্টকার্ড লিখে খোঁজ নেয় না। অথচ তারা পয়সাওয়ালা লোক। বোনেরা কি গরীব দিদিকে কি সাহায্য করতে পারে না। খুব পারে। কিন্তু ওই তো বললাম, সবই আমার কপাল। ছোট ভাইটাকে কত

বাবা মা মরে যাবার পর, সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'ল, তার কোন খোঁজ হ'ল না। কি জানি ভগবান তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কিনা তাই ভাবি। ভগবানকে ডেকে বলি, ভগবান নণ্টুকে ফিরিয়ে দাও। আমাদের যদি একবেলা জোটে, তবে মায়ের পেটের ভাই, তারও চলে যাবে। সরোজিনী চোখের জল মোছেন।

গোপেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বলেন। আহাঃ—শুধু শুধু ওসব কথায় কাজ কি? তোমার বোনেরা বড়লোক—তারা এমন গরীব দিদি, জামাইবাবুর কথা কেন মনে রাখবে? চিঠিপত্র না দেওয়াই তো স্বাভাবিক। এখন ওরা বড়লোক পয়সা হয়েছে! পাছে হুট্ করে আমরা যাই, এই ভয়ে চিঠি দেওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বড়লোক যারা তারা কি গরীব আত্মীয়কে নিজ আপনজন বলে নাকি?

সরোজিনী বলেন—কিন্তু আমি যে ভুলতে পারিনে গো। ছোটবেলায় তিনবোনের কত ভাব ছিল। বর্ষাকালে যখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তো—ঘর অন্ধকার হয়ে যেতো—বাইরে ঝড়-বাতাস-বৃষ্টি দাপাদাপি করতো—মেঘ ডাকতো—বিদ্যুৎ চমকাতো—তখন তিন বোনে ঘরের কোণে কাঁথা গায়ে দিয়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতাম। তিনজনে একসঙ্গে বড় হয়েছি—তারপর বিয়ের পর ছাড়াছাড়ি। ছাড়াছাড়ি হল—আপন আপন সংসার স্বামীপুত্র নিয়ে রয়েছে—সুখে থাক—পাকা চুলে সিঁদুর পড়ুক সব—। কিন্তু মন আলাদা হ'ল কেন—কেন ছাড়াছাড়ি হল তাই ভাবি। ভাবি দিদি গরীব বলে…? কিন্তু গরীব দিদি কি তাদের দিদি নয়? এখনও যে ছেলেবেলার কথা ভাবলে মন হু হু করে ওঠে। তারা যে দিনরাত দিদি দিদি বলে কত আবদার করত। আর আজ সব ভুলে গেল—সরোজিনী হু হু করে কেঁদে ওঠে।

ক্রমশঃ

বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী

কমলা দাশগুপ্ত

রাঁচীতে বসে একদিন সকালে রেডিওতে শুনি খবর দিচ্ছে, আগের দিন গভীর রাতে লীলা রায় পরলোক গমন করেছেন। জেলের ছবি একটার পর একটা ভেসে আসতে লাগলো। ১৯৩২ সনে প্রেসিডেন্সি জেলের সংকীর্ণ পরিধি থেকে আমাকে তখন নিয়ে গেছে হিজলী জেলে। হিজলী জেলের মধ্যে আছে খোলামেলা প্রাঙ্গন। সেখানে একটু বেড়াচ্ছিলাম, লীলাদি হঠাৎ এসে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করতে লাগলেন। কথায় বার্তায় চোখের দীপ্তিতে ঝলমল করছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্সি জেলের আইন অমান্য বন্দীদের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছিলেন। তাছাড়া তিনি কাদের চেনেন এবং আমিই বা আগে থেকে কাদের চিনতাম এইসব গল্প। কতটুকু বা সময় বেড়ালেন, কিন্তু তারই মধ্যে একটা আকর্ষণীয় স্পর্শের অনুভূতি রেখে গেলেন।

হিজলী জেলে একে একে বিনা বিচারে বন্দী ডেটিনিউ মেয়েরা অনেকে এসে পড়েছেন। জেলের দিনগুলি ক্রমেই শুকিয়ে আসে। একঘেয়েমি এড়াতে চান বন্দীরা। তাঁরা নিজেরা পড়াশুনা করেন এবং একে অন্যকে পড়ান ম্যাট্রিক, আই. এ, বি. এ, এম. এ। চট্টগ্রামের ইন্দুমতী সিংহ রয়েছেন আমাদের মধ্যে। তিনি ইংরেজী বিশেষ জানতেন না। কিন্তু বাংলা এবং হিন্দী দিয়েই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিচারাধীন বন্দীদের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে এমনকি ভারতবর্ষের নানাস্থানেও। ইংরেজী না জানা ইন্দুদিকে ম্যাট্রিক পাশ করাবেন এই ছিল লীলাদির মনে। বড়দের পড়াবার সুকৌশল রীতি লীলাদির এমনই জানা ছিল যে জেলের মধ্যে করিয়েছিলেন। ইংরেজী অনার্সের বইগুলি পড়াতেন তিনি বনলতা দাশগুপ্তকে। ডায়োসেসান কলেজে অনার্স নিয়ে পড়তে পড়তে বনলতা গ্রেপ্তার হন। সুহাসিনী গাঙ্গুলীকেও পড়াতেন I.A. পরীক্ষার জন্য। তাছাড়া নিজের দলের মেয়েদের তো তিনি ছাড়বার পাত্রই নন, পড়তে তাদের হবেই। এমনি করে হিজলী জেলে পড়াশুনার একটা সুন্দর আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। শুধু লীলাদি নন, অন্যরাও পড়াতেন।

এই ছাত্রীদলের মধ্যে আগে ভাগেই কে কে ওপারে গিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন তাই আজ বসে ভাবছি। সেখান থেকেও কি তারা আমাদের নতুন জগতের পাঠ শিখতে ডাকছেন? চলে গেছেন প্রফুল্ল ব্রহ্ম—জেলখানা ফাটিয়ে গাইতেন তিনি, "শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল'। তারপরে গেছেন বনলতা—প্রাণ-চাঞ্চল্যে উচ্ছল, জীবন্ত। গেলেন রেণু সেন, লীলাদির ডান হাত। চলে গেছেন সুহাসিনী, হাসি দিয়েই তিনি জেলখানা মাতিয়ে দিতে পারতেন। তারপর গেছেন ইন্দুমতী সিংহ লীলাদির বয়স্কা ছাত্রী এবং অন্যতম বন্ধু। আজ তাঁর ছাত্রীদলে গিয়ে সেখানে কি মিলেছেন লীলাদি?

হিজলীতে ছিল সেই সময়ে ম্যালেরিয়ার এক মস্ত আড্ডা। প্রথমে পড়লেন কমলা চ্যাটার্জি (মুখার্জি) বেশীদিন না ভুগলেও কুপোকাৎ ছিলেন তিনি বেশ কয়েকদিন। সেবা করতে সুহাসিনী একাই একশত। সেরে উঠলেন কমলা চ্যাটার্জি। এবার আমার পালা। দশদিন যাবৎ জ্বরই ছাড়ে না। মাথার বরফ এবং পাখা এক মিনিট থামলে যন্ত্রণায় ছটফট করছি। প্রচণ্ড জ্বরের যে এমন প্রকোপ জীবনে জানি নি।

লাগলেন। লীলাদি বরাভয় হস্ত তুলে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জানি নি। সেবার এবং পরিচর্যার কি নিখুঁত পদ্ধতি। জ্বর রাখবার আলাদা চার্ট, খাদ্য কখন ও কী হবে তার আলাদা চার্ট, কে কখন বরফ ও পাখা করবে—স্পঞ্জ করবে, মাথা ধোওয়াবে তার আলাদা চার্ট। কোথাও সেবার বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই, কারো কাজে চ্যুতি নেই, কারো সঙ্গে কারো সংঘর্ষ নেই। আমি অবাক হয়ে যেতাম।

দশদিন পরে বেশী জ্বরটা ছেড়ে গেল কিন্তু অল্প জ্বর জ্বালিয়েছে অনেকদিন। হয়তো জেলের ওয়ার্ডের বারান্দায় একা বসে আছি, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, অল্প জ্বরে মনটা বিষণ্ণ, কোথা থেকে এসে লীলাদি পাশে একটু বসলেন, মনের ভারটা গল্পের মধ্য দিয়ে হাল্কা করে দিয়ে উঠে গেলেন। কি ধরণের গল্প কখন করতে হবে তা তিনি জানতেন। চলে গেলে ভাবতাম রোজই কেন আসেন না?

১৯৩৩ সালে হিজলী জেলে আমাদের মধ্যে নিয়ে এল বীণা দাস এবং শান্তি ঘোষকে। কিছুদিন পরে এসেছিলেন চট্টগ্রামের কল্পনা দত্তও। শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, কুমিল্লাতে ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলী করে নিহত করেন এবং দণ্ডিত হন। বীণা দাস বাংলার গভর্ণর জ্যাকসনকে গুলী করে দণ্ডিত হন এবং কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিত হন। এই সব দীর্ঘমেয়াদী বন্দী মেয়েরা ভারী ভারী সাজা মাথায় নিয়ে আমাদের মধ্যে যখন এলেন আমরা একটা মস্ত নতুনত্বের আনন্দ পেলাম। এদের একটু মন ভাল রাখার জন্য, হাল্কা রাখার জন্য সকলেরই চেষ্টা। লেখাপড়া, খেলাধুলা, গান, নাটক, অভিনয় এবং খাওয়া দাওয়ার মধ্য দিয়ে তারা যেন একটু নতুনত্ব পান এটাই ছিল ডেটিনিউ বন্দীদের আকাঙ্খা।

ইন্দুসুধা ঘোষ শেখাতেন গান, নাটক, অভিনয়, স্টেজ সাজানো আরো কত কি। কল্যানী দাস এবং বীণা প্রধান উদ্যোক্তা। বীণা, শান্তি, কল্পনা, রেণু, বনলতা, হেলেন প্রভৃতি মেয়েদের নিয়ে ইন্দুসুধা আসর জমিয়েছিলেন 'মালিনী', 'তপতী' এবং 'বর্ষামঙ্গল' নাটককে ঘিরে।

হিজলী জেলে আমাদের বোধহয় জনা কুড়ি মহিলা ডেটিনিউ এবং তিনজন দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীকে রেখেছিল। রান্নার ভার মেয়েদের নিজেদেরই। কয়েদীরা মোটামুটি রান্না করলেও ডেটিনিউ বন্দীদের মধ্যেই দু' একজন করে কিচেনের ভার নিতেন এক একবার। এক সময় লীলাদির উপর ভার পড়ল রান্নাঘরের।

একদিন সকালে আমরা লীলাদিকে অনুরোধ করে পাঠালাম বীণা শান্তিদের নিয়ে আমাদের ৫।৬ জনের মতো ভাতে সিদ্ধ ভাত পাঠাতে। ঘণ্টাখানেকও লাগলো না। দেখি লীলাদি কয়েদীদের হাতে মস্ত থালায় অনেকখানি ভাত, ডাল, মাখন, আলুভাতে, নানারকম ভাজা তেল, নুন, লঙ্কা সব পাঠিয়ে দিয়েছেন। লীলাদির বোধহয় অল্প জিনিস দিয়ে তৃপ্তি হয় না, যথেষ্ট খাওয়ানো চাই। দণ্ডিত বন্দীদের তো কথাই নেই তারাই তো আসল, আমরা তো ফাউ।

আর একদিন ওদেরি জন্য একটা স্টোভ চাওয়া হল। লীলাদি একটুখানি সময়ের মধ্যে পুরানো স্টোভ সাজিয়ে ঘসিয়ে ঝকঝকে করে তুললেন। তারপর তেল ভর্তি করে দেশালাই সহ পাঠিয়ে দিলেন: যেন বলছেন—এখুনি জ্বালিয়ে ফেল।

প্রায়ই লীলাদি কেক তৈরী করতেন, ঠিক যেন নিউ মার্কেটের ওস্তাদের করা কেক। ইন্দুসুধা ঘোষের হাতের পাতা দৈ যেন জলযোগের দৈ। বিমলপ্রতিভা দেবীর সুক্তো ভোলা যায় না, আজও মুখে লেগে আছে।

এমনি ক'রে ভালয় মন্দয় হিজলীর শুকনো দিনগুলি আমাদের বছরের পর বছর কেটে চলেছিল। ১৯৩৮ সালের মধ্যে গান্ধীজীর চেষ্টায় সব ডেটিনিউ মুক্তি পান।

১৯৪২ সালে আবার 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে গত বারের অধিকাংশ বন্দী এবং নতুন কিছু মুখ আবার মিলেছিলাম প্রেসিডেন্সি জেলে। লীলাদি ছিলেন প্রথমে দিনাজপুর জেলে পরে নিয়ে এল তাকে আমাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলের বড় খাঁকের মধ্যে।

মানুষের মধ্যে আছে একটা এ্যাবনর্মাল মন। জেলের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সেটা তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে। বাইরের খোলা মুক্ত জীবনে ওটা অনেকেরই সুপ্ত থেকে যেতে পারে। বিচিত্র মানব চরিত্রের এই দিকটাও পড়ে দেখবার মতো। পাগল না হয়েও পাগলামী কি বন্দীরা তা বড় ভাল করে জানেন। সেই পাগলামী ধীরে ধীরে অনেক সময় একটা অহেতুক পঙ্কিল আবর্তের সৃষ্টি করে। এমনিতর একটা আবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে। কিছুদিন পরে এলেন সেখানে লীলাদি দিনাজপুর জেল থেকে। অবস্থাটা এক মুহূর্তে বুঝে নিলেন তিনি। কোথায় পড়ে রইল এ্যাবনর্মালিটি। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টির নির্মল স্পর্শে একদিনেই সব ধুলোকাদা ভেসে গেল। মা যেন সব বাচ্চাদের আপন পক্ষপুটে নিশ্চিন্ত আরামে রেখে দিলেন।

আবার ১৯৪৫।৪৬ সালে মুক্তি। বাইরে এসে সবাই যে যার কর্তব্যে এগিয়ে চলেছিলেন।

১৯৪৭ সালে এল স্বাধীনতা। তার ১১।১২ বছর পরে একসময় বসে গেলাম পরাধীন ভারতের বন্দী নারীদের ছোট ছোট রাজনৈতিক জীবনকাহিনী লিখতে। একদিন গেছি লীলাদির কাছে। তাঁর জীবনীও তো লিখতে হবে। লীলাদি ডাক্তারের মতো যেন নাড়ী ধরে বসলেন। বললেন—পশ্চাৎপট লিখছ তো? উত্তর দিলাম—বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পটভূমিকা লিখছি। লীলাদির মন উঠল না। বললেন—বাঃ উনবিংশ শতাব্দীর কঠিন পরিবেশ থেকে নারীর অগ্রগতির পটভূমিকা না লিখলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যে! বেথুন সেন্টিনারী বই থেকে আরম্ভ করে কি কি বই সেজন্য পড়তে হবে সব ধরিয়ে দিলেন। এই "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী" বইটা যখন প্রকাশিত হল লীলাদি একখানি সুন্দর চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন আমাকে। একদিন এ নিয়ে আরো কথা বলার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ১৯৬৪ সালের আগে থেকেই একটার পর একটা স্ট্রোক হবার ফলে শরীর তাঁর মোটেই ভাল থাকছিল না। আমি তাই কিছুতেই আর সুযোগ করে উঠতে পারলাম না। আবার ১৯৬৮ সালে যে স্ট্রোক হয় তাতে তাঁকে পি জি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।

লীলাদির বাকহীন দেহ নিথর হয়ে শুয়ে ছিল হাসপাতালে প্রায় আড়াই বছর। তিনি আমাকে হিজলী জেলে কত সেবা করেছেন সে কথা বার বার মনে পড়ে। আমি মাঝে মাঝে তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গেছি। আমার নাম বলেছি, আর বলেছি আমাকে যে আপনি কি বলবেন বলেছিলেন সে কথা বলে যান। শুধু একটা অব্যক্ত আওয়াজ আসতো তাঁর অবচেতন সত্ত্বা থেকে, তার অন্তশীল সত্ত্বা যেন কোথায় একটু সাড়া দিয়ে উঠতো। আবার নিস্তব্ধতা। আমাকে তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন সে কথা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়ে গেল। একটি মানবদরদী প্রাণ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল ১৯৭০ সালের ১১ই জুন।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৮৮৬ সনের ৪ঠা মে তারিখে ব্রিটিশ কলোনি সমূহের ও ভারতের প্রদর্শনীয় দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেদিন সকালবেলাটি ছিল ভারী চমৎকার—'রানীর আবহাওয়া' বলে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা। সেইদিন আমাদের প্রিয় সম্রাজ্ঞীকে দর্শন করিলাম। ব্রিটিশ প্রজামাত্রেই সম্রাজ্ঞী দর্শনকে মহা গৌরবজনক মনে করিয়া থাকে। সম্রাজ্ঞী-মাতার আমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত সন্তানই ত' বটে। উপস্থিত নানাদেশের সবাই তাঁহার সহিত একে একে পরিচিত হইয়া সরিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মুখে সন্তোষের চিহ্ন, আমাদের প্রতি বিশেষভাবে তাঁহার সন্তোষপূর্ণ দৃষ্টি। আমাদের কারুশিল্পীগণ তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার সময় যে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সবারই অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। আমাদের দেশের নানা প্রদেশের কারু-শিল্পীরা ছিলেন—পেশাওয়ারের, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার, তুষারাবৃত ভুটানের এবং কুমারিকা অন্তরীপের।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় যুবরাজ (তিনি প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌-ও), প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর অভ ওয়েল্‌স্‌ (ভিক্টোরিয়ার স্বামী) এবং রাজকুমারী লুইস, ভিক্টোরিয়া এবং মড সহ লাইফ গার্ডের রক্ষণাধীন প্রদর্শনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজপরিবারের অন্য যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যথাক্রমে—ক্রাউন প্রিন্সেস অফ জার্ম্মানী, ডাচেস অভ এডিনবরো, ডিউক ও ডাচেস অভ কনট, শ্লেজ্‌বিগ হোলস্টাইনের প্রিন্স ও প্রিন্সেস ক্রিস্টিয়ান, লরনের প্রিন্সেস লুইস ও মার্শোনেস, লরনের মারকুইস, বাটেনবের্গের প্রিন্সেস বিয়াট্রিস ও প্রিন্স হেনরি, ডিউক অভ ক্যামব্রিজ, প্রিন্সেস মেরি অ্যাডেলেড, ডিউক অভ টেক, প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া টেক, হানোভারের প্রিন্সেস ফ্রেডেরিকা, ব্যারন ফন পাবেল রামিংগেন, ওল্ডেনবুর্গের লাইনিংগেনের প্রিন্স ও প্রিন্সেস, সাক্স-ভাইমারের প্রিন্সেস এডওয়ার্ড, হোহেন-লোহে-লাংগেনবুর্গের প্রিন্স ও প্রিন্স ভিক্টর এবং কাউন্টেস থেয়োডোরে গ্লাইখেন। প্রায় ১২টার সময় রাজকীয় ট্রাম্পেটবাদকেরা ট্রাম্পেট ধ্বনি করিয়া রাজ্ঞীর আগমনবার্তা ঘোষণা করিল। সম্রাজ্ঞী সাধারণ কালো রঙের পোষাক পরিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও রাজ-চিহ্নাদি ছিল না। তাঁর চলনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে জানিবার উপায় ছিল না যে সম্মুখে বিরাট ভারত সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী উপস্থিত। তিনি প্রথমে উপস্থিত সবার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, পরে আত্মীয়দের চুম্বন করিলেন। অতঃপর প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌ কর্তৃক ভারতের ও উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিদিগের সহিত একবারে পরিচিত হইলেন।

এই অনুষ্ঠানের পর আমাদিগকে প্রদর্শনীর অন্য একটা অংশে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে ভারতীয়গণ সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে একটি ভাষণ উপহার দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বিরাট একটি রাজকীয় প্রোসেশন গঠিত হইল।

এই প্রোসেশন প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশ-পথ হইতে ঢাকা বারান্দা পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই পথে ভারতীয় নানা জাতীয় সৈন্যদের মৃন্ময় মডেল মূর্তি সারিবদ্ধ অবস্থায় সাজান ছিল। খোদাই করা দারুশিল্প-গঠিত ছাতের নিম্নপথে যাইবার সময় দেখা গেল সেখানে 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' ইংরেজীতে খোদাই করা রহিয়াছে—"Where Virtue is, there is Victory"। ইহার পর ভারতীয় অঙ্গনে প্রবেশ করা গেল। ওস্তাদ কারু-শিল্পীদের দ্বারা চমৎকার সাজান অঙ্গনটি। অবশেষে প্রোসেশন "ভারতীয় প্রাসাদে" গিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইখানে প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ আমাদিগকে একে একে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। যে সব ভারতীয় শিল্পী আমাদের বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদিগকে "রাম-রাম" বলিয়া অভিবাদন করিতে শেখান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান ছিল, তাহারা "রাম-রাম" বলিল বটে, কিন্তু অভ্যাস না থাকাতে "রাম-রাম" এর সঙ্গে "আল-আহমদ-উল-ইল্লা" জুড়িয়া উচ্চারণ করিল। তাহারা ক্রমাগত বলিতে লাগিল "রাম-রাম আল-আহমদ-উল-ইল্লা—রাম-রাম, আল-আহমদ-উল ইল্লা।" এই পর্ব শেষ হইলে অভিভাষণ পাঠ করা হইল, তাহার পর প্রোসেশন চলিতে লাগিল। ইহার পর আমাদের কর্তব্য কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। আমরা অতঃপর অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার অঙ্গন পার হইয়া গেলাম, এবং অ্যালবার্ট হলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা ঠেলিয়া ঠুলিয়া অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় সার কান্‌লিফ-ওয়েন উদ্বেগের সঙ্গে আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনারা এ কি করিতেছেন?" তখন আমাদের খেয়াল হইল আমরা ভুল করিয়াছি। এখানে অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে আমরা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে রাজপরিবারকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহাকে বিভ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কি করিয়া যাইব?" তিনি বলিলেন "না, যেখানে আছেন, সেই-খানেই থাকুন।" আমরা আমাদের ভুলের জন্য খুবই দুঃখ প্রকাশ করিলাম, কিন্তু তখন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এবং ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও তখন তাহা আর পারিতাম না, কারণ পিছনের ভিড় তখন দুর্ভেদ্য। অতএব যেখানে ছিলাম, সেখানেই রহিয়া গেলাম। প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান যেখানে সম্পন্ন হইল সেই রয়্যাল অ্যালবার্ট হলটি বিরাট আকারের এবং চক্রাকার। উপরে কাঁচের গম্বুজ, এবং হলে ১০০০০ লোক ধরে। ১৮৬৮-৭১ সনে এই হলটি এক কম্পানি কর্তৃক নির্মিত হয়, নির্মাণে ৩০ লক্ষ টাকা (২০০,০০০ পাউণ্ড) ব্যয় হইয়াছিল। হলের প্রত্যেকটি ইঞ্চি দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং আমি সাধারণ দর্শকের স্থানে যেখানে দাঁড়াইবার জায়গা পাইয়াছিলাম, সে জায়গাটি অনুষ্ঠানের বিপরীত দিক। সেখান হইতে সম্মুখে অর্ধ-চক্রাকার শুধু দর্শকদের মাথা দেখিতে পাইতেছিলাম। রাজাসন ছিল উচ্চ ভূমিতে ডাইসের উপরে, তাহার সম্মুখে সম্রাজ্ঞী বসিলেন, তাঁহার দক্ষিণ দিকে রহিলেন প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্, এবং পরিবারের অন্যান্যরা দুই দিকেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর যাহারা তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও (প্রোসেশন অ্যালবার্ট হলে পৌঁছিলে ইংরেজীতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হইল। গাহিলেন রয়্যাল অ্যালবার্ট হল কোর‍্যাল সোসাইটি। সম্রাজ্ঞী ডাইসে পৌঁছিলে দ্বিতীয় গানটি সংস্কৃতে গাওয়া হইল। সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন অধ্যাপক ম্যাকসম্যুলার। অনুবাদটি এইরূপ—

রাজ্ঞীং প্রসাদিনীং লোক-প্রণাদিনীং পাহীশ্বর!
The Queen, the gracious, world renowned,
Save, O Lord!
লক্ষ্মী-প্রভাসিনীং শত্রুপহাসিনীং,
তাং দীর্ঘশাসিনীম্; পাহীশ্বর!

In victory brilliant, at enemies
smiling, her long ruling
Save, O Lord !

এহি অস্মদীশ্বর, শত্রূন্ প্রতিশ্চর,
উচ্ছিন্ধি তান্।

Approach, O our Lord, enemies
scatter annihilating them !

তচ্ছদ্ম নাশ্য মায়াশ্চ পাশয়
পাহ্যস্মদাশ্রয় সর্বান্ গণান্।

Their fraud confound,
tricks restrain. Protect,
O, thou our Refuge, all people !

তদ্রত্ন-ভূষিতাং, রাজ্যে চিরোশিতাং পাহীশ্বর!

With thy choice gifts adorned,
in the kingdom long-dwelling, Save,
O Lord !

রাজ্য-প্রপালিনীং সদ্ধর্মশালিনীং
তাং স্তোত্রমালিনীং পাহীশ্বর!

Her, the realm-protecting, by good laws
abiding, her with praise wreathed,
Save, O Lord !

এই দ্বিতীয় সঙ্গীত আমরা সংস্কৃতে গাহিবার পর তৃতীয় সঙ্গীত ইংরেজীতে গাওয়া হইল। রাজকবি টেনিসন এ মাডাম আলবানি ও কোরাস দল। প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ ইহার পর সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে একটি ভাষণ পাঠ করিলেন এবং প্রদর্শনীর একটি ক্যাটালগ তাঁহাকে উপহার দিলেন। সম্রাজ্ঞী ভাষণের উত্তরে কিছু বলিলেন এবং লর্ড চেম্বারলেনকে 'প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল' এই ঘোষণা করিতে আদেশ দিলেন। তাহা শেষ হইলে সর্বসাধারণের কাছে তাহা সম্রাজ্ঞীর ট্রাম্পেট বাদকগণ বাজনার সাহায্যে জানাইয়া দিল। এই সঙ্গে হাইড পার্কে তোপধ্বনির দ্বারা সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদন জানান হইল।

এই প্রদর্শনীর মধ্যে ভারতীয় বিভাগটিই অন্য সব অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ঢাকা বারান্দার পথে প্রধান প্রবেশমুখে দর্শকেরা এবারে ভারতীয় সামরিক জাতিগুলির মডেল দেখিবেন। প্রাচ্যদেশে ইহারাই ইংল্যাণ্ডের শক্তি অক্ষত রাখিয়াছে। অতঃপর যেখানে বহুমূল্য হীরে জহরত ও সোনা ও রূপোর প্লেটের এবং কারুকার্যখচিত দস্তা ও তামার পাত্রগুলির সেই বিভাগ দেখিবেন। আরও দেখিবেন সূক্ষ্ম কাজের দারুশিল্প, ধাতুর উপর মিনার কাজ, পাথর ও কাঠের মধ্যে নক্সাযুক্ত কাজ, চুনি পান্না ও সোনার রং যুক্ত ল্যাকার বার্নিশের কাজ, নিপুণ হাতের বোনা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য বহুপ্রকার শিল্পদ্রব্য, স্মরণাতীতকাল হইতে যাহা পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় শিল্প-ঐশ্বর্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা তাঁহাদের দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখিবেন বিরাট ভিড় জমিয়াছে ভারতের অরণ্য জীবনের একটুখানি বেশি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা ছবির দিকে। অল্প পরিসরের মধ্যেই একটি খাড়া উঁচুনিচু পাহাড়ের অংশ আঁকা হইয়াছে, তাহা উঁচু গাছ ও ঝোপঝাড়ে চারিদিক বেষ্টিত। বাঁশ ও খেজুর গাছও চারিদিকে কাটাডালের গোড়া সমেত তাহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এবং হিমালয়ের পাদদেশে যে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে তাহা এবং অন্যান্য স্থানীয় বহু জিনিস তাহাতে আঁকা আছে। ভারতের সুখকর এই শিকার-ক্ষেত্রটিতে শিকারযোগ্য প্রাণীর ছবিতে ভরা। যাঁহারা ভারতে থাকিয়া এককালে তরাই-এর জঙ্গলীজ্বর ও অন্যান্য বহু বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া এই সব স্থানে শিকার করিয়াছেন তাঁহাদের মনে সেদিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠাতে তাঁহারা এ ছবি দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ছবির একদিকে বিরাট-দেহ হাতী শুঁড় উচ্চে তুলিয়া, মুখ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন যে রয়্যাল টাইগারটি তাহার মাথায় থাবা বিঁধাইয়া দিয়াছে তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে না পারিয়া বেদনায় কাঁদিতেছে। বাঘের থাবার স্থান হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়া নিচের

হলুদ ঘাসকে ছোপ ছোপ রাঙাইয়া তুলিয়াছে। হাতীর ভয়ার্ত চিৎকার এবং বাঘের ক্রুদ্ধ চাপা গর্জনে ভীত হইয়া একদল হরিণ নিশ্চিন্ত তৃণভোজন ফেলিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। উহাদের ভিতরের একটি সাহসী অ্যান্টলার মাথা হরিণ দূরে গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া কৌতূহলবশতঃ চাহিয়া দেখিতেছে ব্যাপারটা কি। একটি গাছের মাথায় একদল ভীত বানর পাতার আড়ালে লুকাইয়াছে, তাহাদের বাচ্চারা গর্জন শুনিয়া মায়েদের বুকে সংলগ্ন হইয়া আছে। ময়ূরের দল সবুজ ঘাসের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু অভিজ্ঞ শকুন ভবিষ্যৎ ভোজের আশায় খুশি হইয়া আকাশে উড়িতেছে। দৃশ্যের আর এক ভাগে বেঙ্গল টাইগার ঘাসের আড়ালে নিশ্চিন্তে চরা পশুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে। জঙ্গলের দৃশ্যে কিছু বাড়াবাড়ি থাকিলেও মোটের উপর উহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। চিত্রকরকে অল্প জায়গায় সব দেখাইতে হইয়াছে, সেজন্য কিছু আতিশয্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

দর্শকদের বাম দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বিভাগের অঙ্গন। এইখানে নানা আদিবাসীদের মডেল ভারতীয় উৎপন্ন শিল্পাদির মাঝে মাঝে স্থাপন করা হইয়াছে। বেঁটেখাটো আন্দামানবাসী স্ত্রীলোককে দেখা যাইতেছে, কড়ি ও গাছের পাতায় দেহ সজ্জিত, তাহার ঘন কৃষ্ণ বক্ষে একটি নরকপাল দুলিতেছে। এটি কোনও নিকট আত্মীয়ের হইবে। তাহার স্বামী তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাতে বর্শা, তাহার চুল আধুনিক ফ্যাশানে কোঁকড়ান। যাহার চেহারা হইতে এই মডেলটি প্রস্তুত সে অবশ্যই তাহাদের সমাজের একজন বিলাসী লোক। আন্দামানীরা নেগ্রিটো বংশোদ্ভূত, ইহারা নিকটস্থ নিকোবর দ্বীপের লোকদের মত নহে, তাহাদের মধ্যে মালয় উপাদানের আধিক্য বেশি। বেশ কিছু মঙ্গোল শোণিতও তাহাদের মধ্যে মিশিয়াছে। দর্শকেরা এখান হইতে অগ্রসর হইয়া গেলে দেখিতে পাইবেন ক্রমেই মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রকট। যখন দর্শকগণ আরও একটু সরিয়া যাইবেন, সেখানে ইরাবতী ব-দ্বীপের বর্মী এবং পাহাড় অঞ্চলের কারেনদের দেখিতে পাইবেন। নৃতাত্ত্বিক মডেলগুলি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের লোকদের দেখিবেন, তাহারা সবাই মঙ্গোলীয় জাতির মানুষ। সেখানে কটা-রঙের সিনফো দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় ভাঁজে ভাঁজে পাকান বেতের টুপি, হাতে তাহার চিরসঙ্গী 'দাও'। এরই সাহায্যে সে লড়াই করে, পরাজিত শত্রুর মুণ্ডটি কাটিয়া ফেলে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, পাহাড়ে শস্যক্ষেতে ব্যবহার করে, এবং ঘরের যাবতীয় কাজ করে। তাহার পরে গর্বিতভঙ্গিতে দণ্ডায়মান নাগা, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, রং করা মানুষের চুল ও ছাগলোম তাহার বুকে ঝুলিতেছে, এক হাতে কারুকার্য করা দীর্ঘ বর্শা, অন্য হাতে বাঘের চামড়ার ঢাল, যৌবনকালের প্রথম শিকারের পারিতোষিক। মানুষের চুল ও ছাগলোমের মালা হইতে জানা যাইতেছে এই পুরস্কার সে তাহার জাতির নিকট হইতে তাহাদের শত্রুদের মুণ্ডশিকারের বীরত্বের জন্য লাভ করিয়াছে। এটি বিশেষ সম্মানের চিহ্ন, বীর ভিন্ন ইহা অন্য কেহ লাভ করিতে পারে না। মোটের উপর নাগারা বর্বর। এই জন্যই তাহাদের সম্মানচিহ্ন এমন স্থূল ও আদিযুগের উপযোগী। সভ্যতা প্রাপ্ত হইলে রিবন এবং তারকা শোভা পাইত। তাহার এই খ্যাতি তাহার মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ। যে 'বীর' নির্মমভাবে নরনারীশিশুদের হত্যা করিয়াছে, দুর্বল প্রতিবেশীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং তাহার চলার পথে শুধু মৃত্যু এবং ধ্বংস অনুসরণ করিয়াছে তাহার গাথা কোনও কবি গাহিবে না। নিজের লোক-দের পাইকেরি হিসাবে জবাই করার কথাও কোনও নাগা ঐতিহাসিক সপ্রসংশ ভাষায় লিখিবে না। কোনও নীতিবাদীও বংশধরদের কাছে তাহার কথা স্থায়ী গৌরবের কাজ বলিয়া উল্লেখ করিবে না। কাজেই তাহার এ গৌরব তাহাতেই শেষ। অবশ্য সে স্থায়ী গৌরবের আশায় হত্যা করে না, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতির মতই সে শুধু হত্যার আনন্দে নরহত্যা করে। [illegible] অবশ্য এই রীতি [illegible]। [illegible]

সব দেশেরই আদিবাসীদের সর্বাপেক্ষা বড় আনন্দ, নদীর অথবা পাহাড়ের অপর পারের লোকদের হত্যা করা। ইউরোপের সভ্য মানুষেরা প্রতিবেশীদের গলা কাটার ইচ্ছা দমন করিয়া রাখে বলিয়া তাহারা নিরপরাধ শেয়াল বা হরিণ হত্যা করে, শিকারের জন্য বিশেষভাবে পালিত পায়রাও হত্যা করে। এ সবই "নির্মল" আনন্দ। ধনীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যায় হত্যা করিবার জন্য। নরওয়ের পাইন অরণ্যে তাহাদিগকে হরিণ হত্যা করিতে দেখা যাইবে, সুইস অ্যালপস পর্বতে শ্যাময় হরিণদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখা যাইবে, মৃগনাভি হরিণ হত্যার কাজে লিপ্ত দেখা যাইবে তুষার-মৌলি হিমালয়ে, সুন্দরবনে বেঙ্গল টাইগার হত্যায় দেখা যাইবে, সিংহলের ঘন অরণ্যে হাতী শিকার করিতে দেখা যাইবে। তাহারা অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যে যায় লাফাইয়া-চলা ক্যাঙারু হত্যার জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় যায় জিরাফ হত্যার জন্য, সেখানকার পাহাড়ে যায় বন্য ছাগ শিকারের জন্য। খ্রীস্টান ধর্ম তাহাকে এই শিক্ষা দেয় যে, প্রাণীর প্রাণরক্ষার জন্মগত ঐকান্তিক ইচ্ছার দিকে কান দিও না, অতএব সে সুযোগ পাইলেই প্রাণী হত্যা করে, কাজে লাগুক বা না লাগুক। সমস্ত জাতির মধ্যে হিন্দুদিগকে তাহার ধর্ম 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' শিক্ষা দেয়। ইউরোপীয়দিগের মতই নাগা জাতি হত্যাকে উপভোগ করিবার অভ্যাসটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে চতুর্দশ বর্ষীয় এক নাগা বালক এই গৌরব-চিহ্ন বুকে ধারণ করিয়াছিল। প্রতিবেশী গ্রামের লোকদের সহিত ইহাদের বিবাদ ছিল। একদিন বালকটি গোপনে শত্রুদের পল্লীতে গিয়া দাও হাতে জঙ্গলে লুকাইয়া রহিল। সেখানে একটা পাহাড়ী ঝরণা ছিল। একটি স্ত্রীলোক সেইখানে জল লইতে আসিবামাত্র সে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া উল্লাসের সহিত সেটিকে তাহাদের গ্রামে লইয়া গেল। গ্রামের সবাই তাহার এই বীরত্বের জন্য তাহার গলায় গৌরবচিহ্ন পরাইয়া দিল।

নাগার পাশে আসামের মিরি পাহাড়ের দল। এই উপজাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি অনেক বিষয়ে নিচু বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে মেলে। ব্রাহ্মণদের মত তাহারা ব্যাপকভাবে বহুবিবাহ করে। স্ত্রীকে কিনিয়া আনিতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত টাকা দিয়া নহে, জিনিসের বিনিময়ে। একটি মেয়ের গড় মূল্য তিনটি মহিষ, ত্রিশটি শূকর ও অনেকগুলি মুরগী। পুরুষ সমাজ-জীবনে যতগুলি সুবিধা ভোগ করে, মেয়েদিগকে ততগুলি সুবিধা দেওয়া হয় না। ঠিক হিন্দু বিধবাদের মত। এই অত্যাচার খাদ্য বিষয়েও চলে। নারীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ব্যাখ্যা একটা দেওয়া হয়। হিন্দুরা যেমন দিয়া থাকে। একটা উচ্চাঙ্গের নীতির কথা বলা হয়। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে চলিতে ভয় হয়, তাই তাহাদের ভীরুতাকে সমর্থন করিয়া বলা হয়, প্রথা মানিয়া চলাই সুবিধাজনক। উহারা বাঘের মাংস খায়। মেয়েদিগকে তাহা দেয় না। পুরুষেরা বাঘের মাংসে শক্তিলাভ করে, উহাতে মনের জোর বাড়ে। কিন্তু বাংলার মেয়েদের অপেক্ষা তাহাদের মেয়েরা অনেক বিষয়ে বেশি ভাগ্যবতী। তাহারা রুচিসঙ্গতভাবে পোষাক পরিতে পারে, ধর্মীয় অনুশাসনের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে অর্ধ উলঙ্গ থাকিতে বাধ্য করা হয় না।

আসামের আবর জাতি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মত পোষাক পরে, গাছের বাকলের একখানি মাত্র কৌপীন সম্বল তাহাদের। তাহারই উপরে বসে এবং রাত্রে তাহাই গায়ে দেয়। খাম্পটি মঙ্গোল শান জাতির প্রতিনিধি। আসামের আর যাহাদের মঙ্গোল আছে তাহারা—মিকির, ডাফলা, খাসিয়া, জয়ন্তীয়া। হিমালয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যে সব উপজাতির বাস, তাহারাও আছে, যথা গায়ো, মেচ, লিম্বো, লেপচা, গোর্খা এবং গাড়োয়ালী। ইহারা পূর্ব-বর্ণিত-দের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক দিক হইতে সম্বন্ধ-যুক্ত, ইহাদের নাক চ্যাপটা, গালের হাড় উঁচু, এবং মুখে দাড়ি অত্যন্ত কম। ইহারা যে তাতার বংশ হইতে আগত ইহাতে তাহা প্রমাণ হয়। [illegible]

বংশসম্ভূত, তাহারা উত্তরের মঙ্গোলীয় ও দক্ষিণের দ্রাবিড়দের মধ্যবর্তী স্থানে বাস করিয়া দুই দিককে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সাঁওতাল, পাহাড়ী, ওরাওঁ, কোল এবং গণ্ড, কোলারিয় উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। অন্যদিকে তেলুগু, তামিল, ইরুলা, বাদগার এবং সম্ভবত টোডা এবং কুর্গ দ্রাবিড় জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। পশ্চিম ভারতের তুরানিয়ান বংশোদ্ভূত ঠাকুর কাটকারি এবং শনকলিদের মডেল রহিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়াছে ভীল এবং মীনার মডেল, ইহারা তথাকার আদিবাসীদের প্রতিনিধি। পাঠান, জাঠ এবং রাজপুতদের মডেল বিশুদ্ধ আর্যদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে।

অগণিত দর্শক আসিতেছেন প্রতিদিন। ইহা হইতে একটি জিনিস স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় উন্নতির মূলে যে রহস্যময় কারণটি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল। সে তাহাদের অতৃপ্তি। ক্রমাগত নূতন নূতন জ্ঞানলাভের জন্য অনুসন্ধিৎসা এবং যাহা কিছু আরও ভাল, তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি। যখনই তাহা তাহারা আবিষ্কার করিবে এবং বুঝিবে, তখনই তাহা তাহারা গ্রহণ করিবে। কোনও জাতির শক্তি ও সম্পদ নির্ভর করে তাহার আচরিত পন্থা পরিবর্তনের ক্ষমতার উপরে। আবার যখন কোনও জাতির অবনতি ঘটিতে থাকে, তখন তাহার কারণ স্বরূপ ইহা বুঝিতে পারা যায় যে সে তাহার উন্নতির চরমে পৌঁছিয়া তাহার পরে নূতন অন্য কিছু গ্রহণ করিতে ভয় পাইতেছে, পাছে তাহা তাহার উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। উন্নতির সেই উচ্চ শিখর হইতে তখন তাহার ধর্মীয়, নৈতিক এবং সামাজিক রীতিপ্রকৃতি শিলীভূত হইয়া যায়, গতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, এবং জীবনীশক্তি এমন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে যে তখন আর সে নূতন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। সমাজের এরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে তখন মৃত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তখন অন্ধ দেশপ্রেমিকরা এবং যাহারা সমাজের প্রাচীন মৃতদেহটাকে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিবশতঃ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা প্রগতির ঘড়ির কাঁটাটাকে কয়েক বছর পিছাইয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করে। বরং পিরামিডের স্রষ্টারা যাহারা কবরস্থ আছে তাহারা বাহির হইয়া রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচলন করিবে কিন্তু আমাদের দেশে লোকেরা বৈদিক যুগে ফিরিয়া গিয়া শুধু ভারতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত হইবে। যাহা অতীত তা মরিয়া গিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, এবং অতীত হওয়া মানে মৃত হওয়া। অতীত বর্তমানকে গড়িয়াছে, এবং বর্তমান ভবিষ্যৎকে গড়িবে। বিশ্বব্যাপী প্রাণের ইহাই ধর্ম যে সে প্রতি মুহূর্তে ভবিষ্যতের সৌধ গড়িবার জন্য একখণ্ড করিয়া প্রস্তর স্থাপন করিতেছে। প্রতি মানুষের জীবন এবং সমস্ত সৃষ্টি, জীবন্ত অথবা জড়, তাহাদের নিজ নিজ সীমার মধ্যে এই সৃষ্টির কাজে প্রকৃতিকে সাহায্য করিতেছে। যে অতীতকে আঁকড়াইয়া প্রকৃতির অগ্রগতিকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে ধিক্। তাহার ধ্বংস অনিবার্য। এই অমোঘবিধানজাত অগ্রসর হইয়া চলার পথে যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে ভাগ্যের হাত তাহারা এড়াইতে পারিবে না, এবং সেই ভাগ্য —ধ্বংস। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতিরই এই দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, শুধু উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তির জন্য হিন্দু এখনও টিকিয়া আছে, নহিলে তাহারও ঐ একই অবস্থা হইত। জীবনের বাস্তব দিক ও বুদ্ধিকে কার্যক্ষেত্রে চালাইবার কাজে ইউরোপের বর্তমানই হইবে আমাদের ভবিষ্যৎ, সম্ভবত কয়েক শতাব্দীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই চলমান জগতে আমাদের বিলম্বিত যাত্রায় আমরা যতটা পথ পিছাইয়া পড়িয়াছি, তাহা যদি দ্রুত পদক্ষেপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করিয়া আরও পিছাইয়া যাইতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের জীবনপথের যাত্রা একেবারে থামিয়া যাইবে, কারণ ভবিষ্যৎ কালটা অতীত কাল হইতে বর্তমানের অনেক বেশি কাছে। কিন্তু হায়! বর্তমানে আমাদের জাতির ইহাই ইচ্ছা। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঔদার্যবশতঃ যাহা কিছু হিন্দুর তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ হইয়াছে। অতি স্পর্শচেতন এবং গর্বিত জাতি

—যে জাতি বহু শতাব্দীর বিদেশী শাসনে দৈহিক এবং মানসিক দুর্বলতা এবং দুর্নীতিগ্রস্ততায় ভুগিতেছে, সে জাতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া দিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা কার্যকর উপায় আর হইতে পারে না। সেজন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের পার্থক্য এত বেশি চোখে পড়ে। প্রথমোক্ত জাতি সর্বদা নূতনত্বের সন্ধানে নিযুক্ত এবং প্রতিনিয়ত তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহার উন্নতি যাহাতে ক্রমে আরও বেশি হয়, তাহার জন্য নূতন নূতন উপায় চিন্তা করিতেছে। ভারতীয়গণ তাহা করে না। জলশক্তি-চালিত হাতুড়ির সাহায্যে কোনও নূতন জ্ঞান তাহার কণ্ঠনালিতে ঘা মারিয়া ঢুকাইয়া দিলেও তাহা সে গ্রহণ করিবে না। ভারতীয়েরা সব সময় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো যাহাতে চোখে না লাগে সে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তবু অপ্রতিরোধ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি যদি তাহার দৃঢ় মনোভাবকে কিছু শিথিল করিয়া থাকে, চরিত্রকে আরও কিছু পরিমাণ স্থিতিস্থাপক করিয়া থাকে অথবা পৃথিবী বিষয়ে তাহার ধারণাকে কিছু বিস্তৃত করিয়া দিয়া থাকে তবে ভারতীয়দের দোষ দেওয়া যায় না। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক এক্কা-চালক তাহার গাড়ীর চাকায় স্প্রিং লাগাইতে ভয় পায়, এই অঞ্চলের কৃষকও আলুর চাষ করিবে না। কারণ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে সমাজে সে জাতিচ্যুত হইবে। প্রকৃতই কিছুকাল আগে আমি এক্কা-চালক ও কৃষককে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহারা কেহই নূতনত্বে রাজি নহে। এ রকম 'উৎসাহজনক' অবস্থায় সর্বত্র ভারতীয় স্টিফেনসন ও এডিসনেরা দলে দলে জন্মগ্রহণ করিবে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য!

অতএব আমাদের জাতীয় অথর্ব অবস্থা হইতে দৃষ্টি ইউরোপীয়দের অগ্রগতির গভীর উৎসাহের দিকে ফিরাইলে মনে একটা আনন্দ জাগে। আমরা তাই প্রতিদিনের হাজার হাজার দর্শকের ভারতীয় কাচা মাল, উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রতি কৌতূহল এবং এ সম্পর্কে নানা তথ্য জানিবার অদম্য আগ্রহ আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। বণিক, উৎপাদনশিল্পী, এবং বিজ্ঞানীরা আমাদের প্রদর্শনীতে আসিয়া ভিড় করিয়াছেন। তাঁহারা সাম্রাজ্যের সুদূর ডমিনিয়ন হইতে, তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা, নূতন নূতন ঐশ্বর্যের এবং মানুষের নূতন সুখসুবিধার আকর দেখিতে আসিতেন। এমন কি সুদূর পল্লী হইতে আগত লোকেরা গাছের পাতা, গাছের বাকল প্রভৃতি প্রদর্শিত ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের কি ব্যবহার তাহা শিখিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনীত দ্রব্যগুলি সম্পর্কে বড়রাও তাঁহাদের সন্তানদের আগ্রহ জাগাইয়া ঐ সবের ব্যবহারিক মূল্য বিষয়ে বুঝাইয়া দিতেন। যুবকেরা তাহাদের প্রণয়িনীদিগেরও এই সব প্রদর্শিত দ্রব্যে কৌতূহল জাগাইতেন। তাঁহারা যে সব মন্তব্য করিতেন তাহা আমাদের বন্ধু রেভারেণ্ড মিস্টার লং ও আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া শুনিতাম।

ভারতবন্ধু মিস্টার লং নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আমার কাছে আসিতেন, এবং তাঁহার ভারত ত্যাগের পর হইতে ভারত কতখানি উন্নতি করিয়াছে তাহা কৌতূহলের সহিত শুনিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার কোনও ক্লান্তি ছিল না, এবং প্রতিদিন তাঁহার নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ছিল। সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া নূতন যাহা ভাবিতেন, তাহা আমার সঙ্গে আলোচনা করিতেন। "বাংলা খবরের কাগজগুলি আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমন কি এখনও পরস্পরের কুৎসা গায়, না প্রকৃতই রাজনীতি লইয়া আলোচনা করে?" আমার দেওয়া "সঞ্জীবনী" কাগজখানি পড়িয়া তিনি এই প্রশ্নটি করিলেন। যখন বলিলাম রাজনীতি লইয়া আলোচনা হয়, তখন তিনি খুব খুশি হইয়া উঠিলেন। আমি তখন অন্য একখানি বাংলা কাগজ তাঁহার হাতে দিলাম। পরের সপ্তাহে যখন দেখা হইল তখন তাঁহাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাইল। বোঝা গেল তিনি ঐ বাংলা কাগজখানি পড়িয়াছেন, এবং সে কাগজে হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রায় বিপক্ষে মন্তব্য লিখিত ছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বিদেশ ভ্রমণে যে উপকার হয় সে বিষয়ে কেহ লেশমাত্রও সন্দেহ প্রকাশ করে কি করিয়া। তিনি

প্রশ্ন করিলেন, "ভারতের রেলপথ কি তাহা প্রমাণ করিতেছে না?" অন্য সময়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ব্রিটিশকে জাতি হিসেবে উহারা নিন্দা করে কেন? তাহাদের জানা উচিত যে, আমাদের মধ্যে তাহাদের যথার্থ বন্ধু রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের মঙ্গল কামনা করে এবং যাহারা অভিভাবকের দরদ লইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। লর্ড নর্থব্রুক, জন ব্রাইট, সার জর্জ বার্ডউড, মিস ম্যানিং, মিস ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এবং আরও অনেককে আপনি জানেন। তাঁহারা কি আপনাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন? আপনারা বৃহৎ জাতিতে পরিণত হউন এ ইচ্ছা যে আমার কত আন্তরিক, তাহা কি করিয়া বুঝাইব?" আমি বলিলাম, ভালমন্দ দুই-ই মোটামুটিভাবে আমাদের কাগজগুলি, ভারতে ইংরেজদের চালিত কাগজ হইতে শিখিয়াছে। তিনি আমার নিকট হইতে বাংলা কাগজগুলি, গ্রামের স্কুলগুলি, জাতিভেদ প্রথা, নীলের চাষ, এবং আরও অনেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানিতে চাহিলেন। তিনি বাংলা বই সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তিনি সংবাদপত্রও পান না। তাই আমি যখন ঐ কাগজগুলি দিলাম, তখন তিনি অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন। প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগে ইংল্যাণ্ডের নেটিভদের মধ্যে যে কৌতূহল জাগাইয়াছে, যে প্রশংসা তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিতেছে তাহার জন্য লং সাহেবকে এক এক সময়ে শিশুসুলভ আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। এই সব সময়ে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং যেন বলিতে চাহিতেছেন, "আমার প্রিয় ভারতবর্ষ এই সব প্রস্তুত করিয়াছে!" এক সময়ে আমি ইউজিন রিমেলকে ভারতবর্ষের সুগন্ধ দ্রব্যের নানা আকরের কথা ব্যাখ্যা করিতেছিলাম তাহা শুনিয়া লং সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতে বহু লোক এখন সেখানকার নানা কাঁচামাল যাহাতে আরও উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে মনযোগ দিয়াছে কি না। আমি বলিলাম, এ দিকটিতে যে কিছু লাভের প্রত্যাশা আছে, সে বিষয়ে কিছু কিছু লোকের মনে আশা জাগিতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে আগামী কিছুকাল জাতীয় উন্নতি ইহারই উপর নির্ভরশীল থাকিবে। তিনি আরও শুনিয়া খুশি হইলেন যে, ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতেছেন। "আপনি বলিতেছেন ইহার প্রতিষ্ঠা ও চালাইবার জন্য লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা দিতেছে?"—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, ইহা সত্য। অবশ্য লর্ড লিটনের সময়ে পেট্রিয়টিক ফাণ্ডের জন্য যত সহজে এবং যে পরিমাণ অর্থদান করিয়াছিল, এ ব্যাপারে তাহা করে নাই।

আমাকে হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ জানিয়া, রেভারেণ্ড লং আমার সঙ্গে যত বিষয়ে আলাপ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কখনও ধর্মের তর্ক তোলেন নাই। তিনি স্বয়ং মিশনারি হইয়াও ["পাদরি লং"] তিনি যে তাহা করেন নাই এজন্য তাঁহাকে আমি প্রশংসা করি। এখন যখন এই বিবরণ লিখিতেছি, তিনি আর জীবিত নাই। তাঁহার উদার সহানুভূতিপূর্ণ মুখখানা আমার সর্বদা মনে পড়িতেছে। দক্ষিণ কেনসিংটন স্টেশনে তাঁহার সহিত শেষ বিদায়ের ক্ষণটিও বেদনার সঙ্গে মনে জাগরূক রহিয়াছে। এ পৃথিবীতে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না। তাঁহার আত্মাটাই ছিল যেন স্বর্গ, যাহা কিছু সুন্দর এবং গৌরবময় তাহারই আবাস ছিল সেইখানে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তাঁহাকে সকলের প্রতি প্রেমময় করিয়া তুলিয়াছিল, এবং আমার বিশ্বাস যে মহানন্দময় অবস্থা সকল দেশের সকল ধর্মের সৎলোক মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার আত্মাও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন মানুষ যে জাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন, সেই জাতিকে ভাল না বাসিয়া উপায় নাই। তাঁহার জীবনের মহৎ কাজগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতার ইহাই আমাদের সবিনয় দান।

ভারতের উৎপন্ন যে সব সামগ্রী তাহারা ক্রয় করিতে পারে তাহাতে তাহাদের যথোপযুক্ত মনযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। যাহারা আঠার ব্যবসা করে তাহারা

ভারতীয় আঠা খুব করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল; কারণ সুদানের যুদ্ধের দরুন আফ্রিকা হইতে আঠা আমদানি বন্ধ ছিল। কিন্তু আরবদেশ অথবা আফ্রিকার মত শুষ্ক দেশের আঠার মত আমাদের আঠা তত উৎকৃষ্ট নহে। আমাদের গাম অ্যাকাসিয়া, Acacia arabia. Willd, (বাবলা) হইতে প্রস্তুত Acacia vera-র মত শাদা ও পরিষ্কার নহে। অ্যাকসিয়া ভেরা এডেন হইতে ভারতে আসে, উহা খুব প্রচুরও নহে। কিন্তু ভারতের নিকৃষ্ট আঠাও শত শত মন জঙ্গলে অথবা পল্লীপ্রদেশে অযথা নষ্ট হয়। কেহ কষ্ট করিয়া উহা সংগ্রহ করিলে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করা সম্ভব হইত। বোম্বাই হইতে প্রেরিত Acacia leucophloea Willd,-এর আঠা অথবা উত্তর ভারতের Acacia catechu -র আঠা গাম অ্যাকাসিয়ার বিকল্প রূপে ব্যবহার্য বলিয়া ইংল্যাণ্ডে মনে করা হইতেছে। Odina Wodier Linn (জিওল) গাছ নিম্নবঙ্গে বেড়া দিবার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার আঠাও যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে পারিলে একই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। আমাদের দেশের নিপুণ হাতে স্মরণাতীত কাল হইতে যে উদ্ভিজ্জ নীল রঞ্জক তৈরী হইয়া আসিতেছে তাহা ইউরোপে অজ্ঞাত। তাই তাহাদের অতি কড়া রকমের উজ্জ্বল নীল রঞ্জক-জাত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাহারা আমাদের দেশের অতি চমৎকার কোমল নীল রঞ্জক পদার্থের দিকে বেশি আকৃষ্ট হইল। Morinda citrifolia, Linn. Oldenlaudia umbrellata, Linn. এবং Rubia-র বিভিন্ন প্রজাতিগুলি প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। রঞ্জন কাজের জন্য এবং ট্যানিং-এর জন্য ইংল্যাণ্ড বৎসরে গাছের বাকল ও নির্যাস কয়েক কোটি টাকার আমদানি করিয়া থাকে। এই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ে ভারতের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতের এমন অরণ্যসম্পদ এবং এমন বিশাল হিমালয় যাহা একই সঙ্গে মেরুর শীতলতা ও গ্রীষ্মমণ্ডলের তাপ ধারণ করিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কি সে কষায় গুণসম্বলিত বাকল ও পাতাহীন হইতে পারে? কখনও নহে। কিন্তু ভারতে কে এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিবে, অনুসন্ধান চালাইবে, তথ্য সংগ্রহ করিবে, পরীক্ষা চালাইবে এবং ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগকে অভ্যস্ত পথ হইতে সরাইবে আনিবে? বহু শতাব্দী পূর্বে আদেশ জারি হইয়াছিল, হিন্দু যেখানে জন্মিবে সেইখানেই তাহাকে অনড় হইয়া থাকিতে হইবে। কাজেই তাহাকে সর্ববিষয়ে বিদেশীদের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। বিদেশীরা ব্যবসায়ের নূতন পথ প্রস্তুত করিবে, দেশের নুতন সম্পদের আকর আবিষ্কার করিবে, জমিতে অধিক লাভজনক ফসল ফলাইবে, পুরাতন পদ্ধতির বদলে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিবে, জাহাজ তৈয়ার করিবে, রেলওয়ে স্থাপন করিবে, এবং অন্যান্য অনেক কিছু করিবে, যাহা জাতীয়তার অহঙ্কার একটু কম থাকিলে আমাদের নিজেদেরই আগে করা উচিত ছিল। আফিসে ভারতীয় কেরানি অথবা ইংরেজ পরিচালিত রেলবিভাগে ভারতীয় গার্ড কেন বেশি নেওয়া হয় নাই বলিয়া চিৎকার করিলেই হিন্দুরা মনে করে তাহাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করা হইল। আমি অনেকবার অতি কড়া ভাষায় এ বিষয়ে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাহা স্বদেশবাসীর প্রতি সহানুভূতির অভাববশতঃ নহে। ইহার কারণ, আমাদের অগ্রগতির পথে আমরা যে নিজেরাই কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছি, সেই লজ্জায়। আমি কঠোর কথা উচ্চারণ করিয়াছি আমাদের ভীরুতার লজ্জায়, আমাদের অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তির স্বেচ্ছাকৃত অপব্যবহারের লজ্জায়। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিসীম, ইহার যথার্থ ব্যবহার হইলে হাজার হাজার লোকের অন্নসংস্থান হইবে, জীবনের মান উন্নত করা সম্ভব হইবে, এবং সম্পদ্ যদি শক্তির পরিচয় হয়, তাহা হইলে এদেশের লোক পৃথিবীর লোকের কাছে সম্মানপ্রাপ্ত হইবে। ইংল্যাণ্ডের বহু টাকা বিদেশে খাটিতেছে। সেই টাকা ভারতের উন্নতির কাজে নিয়োগ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নহে। ভারতের প্রতি ইংল্যাণ্ডের বিশেষ একটা টান আছে, বিদেশের প্রতি সেরূপ টান তাহার নাই, এবং আমার মনে হয় চেষ্ট

করিলে তাহাদের দ্বারা আমাদের দেশের উন্নতিসাধন সম্ভব। তাহার আরও কারণ তাহাতে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে। এদেশে তাহাদের যে টাকা খাটিবে তাহা ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের শিল্পকাজের সহায়ক হইবে। ভারতের অর্ধেক মানুষ প্রায় বিবস্ত্র থাকে, কারণ তাহাদের কাপড় কিনিবার সাধ্য নাই। অর্থলাভের উপায় বৃদ্ধি হইলেই সে অর্থের অনেকখানি ল্যাঙ্কাশিয়র, বার্মিংহাম শেফিল্ড এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে বস্ত্র এবং অন্যান্য দরকারী বস্তু উৎপাদনে ব্যয়িত হইবে। লণ্ডনের বাজারে ঘুরিয়া দেখিয়াছি সেখানে পৃথিবীর বহু স্থানের প্রস্তুত দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের জন্য সাজান আছে। ইহাতে আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, ভারতে বর্তমানে যেটুকু বৈদেশিক বাণিজ্য আছে, তাহা অপেক্ষা অনেকগুণে সে তাহা বাড়াইতে পারে, সে সুযোগ তাহার আছে। কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় করিয়া মাঝে মাঝে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার যেটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহার অভিজ্ঞতা আমার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সেজন্য আমি বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই, অতএব আমি ঠিক কোন্ জিনিসটির বাজার এখানে হইলে লাভজনক হইবে তাহা বলিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আরও অনুসন্ধান আরও পরীক্ষা দরকার। তাহা ভিন্ন কাজে প্রবৃত্ত না হইয়া সত্য নির্ণয় করা দুরূহ। এখন অবিরাম অনুসন্ধান চালান উচিত এবং পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কিছু জিনিস পাঠাইয়া বাজার যাচাই করা উচিত। তাহা হইলে সত্য নির্ণয় এবং প্রাথমিক অনেক বাধা দূর হইতে পারে। এই উপায়েই অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা ইংল্যাণ্ডে লাভজনক মাংসের বাজার পাইয়াছে, এবং নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাটকা ফল উৎপাদন করিয়া রপ্তানি করিতেছে। উদ্বৃত্ত মাংস তাহারা আগে নষ্ট করিয়া ফেলিত। গভর্ণমেণ্ট এ-কাজে উৎসাহ দেখান নাই, সে জন্য আমি গভর্ণমেণ্টের দোষ দিই না, আমি বরং আমার দেশবাসীকে বলি, তাঁহারা কেহ যদি এ-পথে পরীক্ষা চালাইতে চান, তাহা হইলে আমি যতদূর সম্ভব তথ্য সরবরাহ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে।

[ক্রমশঃ]

শিক্ষা সংকট

অক্ষয়কুমার বসু মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে যে একটি সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা এই রাজ্যের কাহারও না জানার কথা নহে। সমস্যাটি পুরাতন হইলেও অতি দ্রুতগতিতে ইহার গুরুত্ব বাড়িয়াছে এবং বর্তমান সময়ে ইহা একটি মহাসঙ্কটএ পরিণত হইয়াছে। সমস্যাটির যে দিকগুলি মোটামুটি সকলের চোখে পড়ে সেগুলি হইল, ছাত্রদের মধ্যে নানাবিধ উচ্ছৃঙ্খলা, অশ্রদ্ধা, ধ্বংসপ্রবণতা এবং পরিক্ষার হলে অবাধে ও ব্যাপকহারে টোকাটুকি। এগুলি কিন্তু একটি বিরাট বরফ-শিলার জলের উপরকার সামান্য অংশ মাত্র। সমস্যাটি সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে অনেক গভীরে প্রবেশ করিতে হইবে।

সাময়িকভাবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে অনেক প্রস্তাব করিয়াছেন যেমন, কেহ কেহ মনে করেন পরীক্ষায় প্রহরীর কাজ করা শিক্ষকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা কর্তব্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসিবে যেখানে টোকাটুকিতে বাধা দিতে গেলে শুধু লাঞ্ছনা ও অপমান নহে অপঘাত মৃত্যুটিও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত নয়, সেখানে শিক্ষকের নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিয়া প্রহরীর কাজ বাধ্যতামূলক করা সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে নীতিসঙ্গত হইবে কি? কাজেই কথা উঠিয়াছে প্রহরীর কাজ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করিতে হইলে কর্তব্যসাধনে কেহ আহত বা নিহত হইলে সরকারী কর্মচারীদের মত সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকার এবং তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ও অন্যান্য ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা না করিলে প্রহরীর কাজ বাধ্যতামূলক করিলেও তাহা কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ এই কাজে অবহেলা করিলে তাহা শোধরাইবার ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। পরীক্ষা সংস্কারের কথাও অনেকে ভাবিতেছেন। তাঁহাদের মতে স্কুলে ও কলেজে সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে এবং সেই পরীক্ষাগুলির নম্বরের একটি অংশ শেষ পরীক্ষার নম্বরের সহিত যুক্ত হইলে ছাত্রছাত্রীরা রীতিমত পড়াশুনা না করিলে cumulative record অর্থাৎ সব সমেত যে ফল তাহা ভাল হইবে না। আর একটি প্রস্তাব হইল—Internal Assessment System অর্থাৎ কোন স্কুল কলেজের শিক্ষকদের হাতে সেই স্কুল কলেজের পরীক্ষা করার ও নম্বর দেওয়ার পুরাপুরি ব্যবস্থা করা। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় কথা বিভিন্ন স্কুল কলেজের মানের সমতা রক্ষা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া সৎ, সুষ্ঠু ও পক্ষপাতিত্বহীন ব্যবস্থা করা বর্তমান নৈতিক অবনতির যুগে কতটা সম্ভবপর হইবে বলা শক্ত।

অন্য প্রস্তাব এই যে মৌখিক পরীক্ষার (Viva Voce) একটা ব্যবস্থা থাকিবে এবং কিছু নম্বর বিদ্যার্থী অধীত-বিদ্যা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছে তাহা বুঝিয়া তবে দেওয়া হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই পরীক্ষা গ্রহণ করিলে তাহার একটা মূল্য অবশ্যই বর্তমানে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন (Internal Assessment) এবং মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে (Viva Voce Test) একজন Internal Examiner অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রী যে শিক্ষালয়ের সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং অন্য একজন অন্য শিক্ষালয়ের শিক্ষক অর্থাৎ External Examiner এইভাবে ভিতরের ও বাহিরের পরীক্ষকদ্বয় দায়িত্ব ও সততার সঙ্গে কাজ করিলে কিছু সুফল হইতে পারে। এবিষয় বক্তব্য এই যে স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা-দের উপর আমাদের আস্থা রাখিতেই হইবে। কোথাও কোন ত্রুটি না হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে

হইবে এবং ইচ্ছাকৃত গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়িলে এমন গুরুতর শাস্তি দিতে হইবে যে ভবিষ্যতে ঐরূপ নিন্দাজনক কাজে সহসা কেহ প্রবৃত্ত হইবেন না।

কিন্তু উপরোক্ত ব্যবসাগুলি সাময়িক। ইহাতে মূল সমস্যার সামান্য সুরাহা হইলেও সত্যিকারের সমাধান হইবে না। সেজন্য চাই দীর্ঘকালীন কর্মসূচী যাহা সুচিন্তিতভাবে প্রাথমিক স্তর হইতে এখনই প্রয়োগ সুরু করিলে আগামী ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে সুনিশ্চিত সুফল পাওয়া যাইবে এবং আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা যথার্থ শিক্ষিত হইয়া আমাদের দেশের সব থেকে মূল্যবান সম্পদ হইবে; কারণ যথার্থ মানুষের তুলনায় উচ্চতর সম্পদ তার কিছুই নাই।

দীর্ঘকালীন কর্মসূচী লইতে সমস্যাটির গভীর প্রবেশ প্রয়োজন। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম', কথাটি অতি পুরাতন বটে, কিন্তু ইহা একটি চিরন্তন সত্য। শিক্ষক, গুরুজন, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি সব কিছুর উপরই বর্তমান যুগ শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। নিজেদের উপরও ছাত্রছাত্রীগণ শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। কারণ নিজেকে যে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে সে যথোপযুক্ত পাত্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেও শিখিয়াছে। যে বিদ্যা অর্জন করা হইবে তাহার উপর যদি শ্রদ্ধা না থাকে, যিনি বিদ্যা দান করেন তাঁহার উপর যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে শ্রম ও সাধনা আসিবে কোথা হইতে আর যথার্থ বিদ্যার্জ্জনই বা হইবে কিরূপে। এই শ্রদ্ধা বিনষ্টির কারণ আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং তাহার প্রতিকার করিতে পারিলেই আবার শিক্ষার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে। নতুবা সাময়িক কোন ব্যবস্থা দ্বারা দীর্ঘকালীন কোন ফল পাইবার আশা কম। এই শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদের বর্তমান শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। বিশদ আলোচনা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয় কাজেই মূল বস্তুগুলি মোটামুটি বিশ্লেষণ করিলে কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে তাহার একটি পথ-রেখা নির্দেশ করা সম্ভব।

একথা অনেকেই জানেন যে ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ম্যাট্রিক পাশ করিতে যতগুলি বিষয় পড়িতে হইত এবং এক একটা বিষয় যে পরিমাণ জিনিস জানিতে হইত তার তুলনায় এখন বিষয় সংখ্যাও বাড়িয়াছে এবং প্রতিটি বিষয়ে এখন তথ্যের পরিমাণও অনেক বেশী বাড়িয়াছে। বর্তমান স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাতে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা বা রসায়নে এখন পড়িতে হয় অনেক বেশী। আর উচ্চ মাধ্যমিক ধরিলে তো ম্যাট্রিকের সঙ্গে তুলনাই চলে না। আই-এর পাঠ্যবস্তুর সমান অথচ সেই পড়াটা এখন সুরু করিতে হয় ১৩।১৪ বৎসর বয়সে নবমশ্রেণী থেকে। যাহা আই-এ, আই এস সির যুগে পড়া হইত ১৬ বৎসরের পর। তাছাড়া এর পরিমাণ আজকাল এত বেশী যে ১৩-১৪ থেকে ১৬-১৭ বৎসরের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের তিন বৎসরের এই পর্ব্বত-প্রমাণ পাঠ্যবস্তু একসঙ্গে আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দেওয়া খুব কম ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব। তাই সমগ্র বিষয়বস্তু ভালভাবে পাঠ ও অনুধাবনের পরিবর্তে বাছাই প্রশ্নের দিকে ঝোঁক আসা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তাই টিউটোরিয়াল হোম, সাজেসনের বই প্রভৃতির এত ছড়াছড়ি। কিছু শিক্ষক বা পুস্তক-ব্যবসায়ীর লোভেই এইরকম নোটবই, গাইড, সাজেসন প্রভৃতিতে বাজার ছাইয়া গিয়াছে, এ কথা মূলতঃ সত্য নহে। আমাদের অতিরিক্ত ভারী সিলেবাস ও বিশদ বিস্তৃতভাবে লেখা বই, তার শিক্ষাপদ্ধতি আর অবৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপদ্ধতি এই সকলই বর্তমান অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মেটাইবার জন্য কিছু ব্যবসাদার হয়ত বিদ্যাকে পণ্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছে এবং কোথাও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও কালোবাজারিও দেখা দিয়াছে। মূল কারণ শিক্ষাজগতে নৈরাজ্যও অব্যবস্থা। শুধু ইংরেজীর কথাটাই আলোচনা করিতেছি।

Class V এ ইংরেজীর পাঠ্যপুস্তক সরকারী 'Peacock Reader' কিন্তু অধিকাংশ স্কুলে Class V এর পাঠ্য পুস্তকের তালিকা খুলিলে দেখা যাইবে একখানা Grammer, একখানা Translation একখানা Word

Book এবং Desk-Work ও Rapid Readerও কেহ কেহ পাঠ্য করিয়াছেন অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাষা ইংরাজীতেই ১০।১১ বৎসরের একটি ছাত্রের ৫।৬ খানা ইংরেজী বই পড়িতে হইবে। যেহেতু প্রথম ভাষা বাংলা এবং অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট সময় দিতে হবে, সেইজন্য সপ্তাহে ৬।৭ পিরিয়ডের বেশী ইংরেজীর ক্লাস দেওয়া সম্ভব নয়। ফল এই দাঁড়ায় যে একখানা ইংরেজী পাঠ্যবইও ভাল করিয়া পড়ান হয় না। কি পরিবেশে এই পড়ানোর কাজ চলে তাহাও দেখা দরকার। একটি ক্লাসে ৪০।৫০টি ছাত্র থাকে, পিরিয়ডের সময় ৩০।৩৫ মিনিট এবং শিক্ষকগণও সর্ব্বক্ষেত্রেই খুব উপযুক্ত এবং বিশেষ যত্নবান এ কথাও বলা চলে না। তাছাড়া সবাই এত বিশদভাবে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বইয়ের আকারও বেশ বড় হইয়াছে, শিক্ষক মহাশয় নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরের দিনের পড়াটুকু একবার কোনক্রমে পড়িতে পড়িতেই হয়ত অর্দ্ধেক সময় চলিয়া যাইবে। পড়া জিজ্ঞাসা করা, লিখিতে দিয়া সেই খাতা দেখা এবং ভুল-ত্রুটিগুলি ছাত্রদের বুঝাইয়া দেওয়া, অধিকাংশ স্কুলেই বিগত যুগের বস্তু হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক শান্ত পরিবেশেই এই অবস্থা, বর্ত্তমান উত্তাল পরিস্থিতিতে অবস্থা আরও জটিল হইয়াছে।

সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে বইয়ের আকার আরও বড় হয়। 'Parijat Reader তো পড়িতেই হইবে, এর পরে Rapid Reader, Grammer, Translation এবং Essay, Letter প্রভৃতি নিয়া শব্দচেক পাতার অভিধানের আকারের এক বৃহৎ বই। সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি এবং বাংলার দুই পেপার নিয়া বইগুলির বোঝা যাহা হয় তাহাতে একদিনের পড়ার সবকটি বই স্কুলে নিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কাজেই ইংরেজী এবং অন্যান্য বিষয়ের এই বৃহৎ বইগুলি কোনটাই ভালভাবে পড়ান সম্ভব হয় না এবং ইংরেজীর অবস্থা এতই শোচনীয় হয় যে Grammer and Translation এর একেবারে সাধারণ জিনিসগুলিও স্কুলে ভালভাবে শেখান হয় না, যার ফলে বি এ, এম এ, ক্লাশেও অধিকাংশ ছাত্রের ক্ষেত্রে তাই ভুলগুলি থাকিয়া যায়। ফলে ছাত্ররা প্রাণপণ মুখস্থ করিয়া যাহা লিখিল তাহাতে বানান ও ব্যাকরণগত ভুলের জন্য পাশের নম্বর পাওয়াই দায় হইয়া উঠে। বেশ ভাল এম, এ, এম, এস, সি পাশেরাও আজকাল সাধারণ ইংরেজী শব্দগুলিতেও অনেকসময় হাস্যকর ও দুঃখজনক ভুল করেন। এজন্য ছাত্রের তুলনায় শিক্ষার ব্যবস্থাপনা অনেক বেশী দায়ী।

কাজেই বইয়ের সংখ্যা ও আকার কমাইতে হইবে এবং শিক্ষককে তাহা ভালভাবে পড়াইতে হইবে এবং ছাত্রকে ভালভাবে পড়িতে বাধ্য করিতে হইবে। গান্ধীজী বলেন, "ক্ষমতা থাকিলে আমি প্রধানতঃ শিক্ষকদের সহায়ক হিসাবেই পাঠ্য পুস্তক রাখতাম, ছাত্রদের জন্য নয় আর ছাত্রদের জন্য যে কয়টি পাঠ্যপুস্তক একান্ত অপরিহার্য্য বিবেচিত হয় সেইগুলি অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য চালু রাখতে হইবে" শিক্ষক ও ছাত্রের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং উভয়ের কাছ থেকে ভালভাবে কাজ আদায় করিবার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ ছাত্রকে পড়া দিতে হইবে, ভাল করিয়া পড়া বুঝাইতে হইবে এবং ছাত্রদের কাছ থেকে রীতিমত পড়া আদায় করিতে হইবে। তজ্জন্য যথোপযুক্ত তদারকির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং কোন স্কুলের পড়াশুনা ভাল না হইলে বা পরীক্ষার ফল বার বার খারাপ হইলে শিক্ষকদেরও জবাবদিহি করিতে হইবে। কোন শিক্ষক ক্রমাগত কাজে অবহেলা করিলে তাঁহার বাৎসরিক মাহিনা বৃদ্ধি বন্ধ করা যাইতে পারে এবং কিছুতেই না শোধরাইলে কর্মচ্যুতির ব্যবস্থা রাখাও প্রয়োজন।

'এই বাহ্য'। উপরে যাহা বলা হইল তাহা কতকটা বাইরের কথা। ইহাতেও সমস্যার মূল উৎপাটিত হইবে না। মূল-সমস্যা এই যে আমাদের দেশে বর্ত্তমান চালু শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের জীবনের, সমাজের এবং ব্যক্তিগত জীবিকার সম্পর্কসূত্র নিতান্তই ক্ষীণ। যে দেশের জীবিকার শতকরা ৮০ভাগ কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল সেখানে কৃষির কিছুই আমাদের শিক্ষার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে যুক্ত হয় নাই। ইংরেজ-আমলে প্রচলিত ও শ্রমবিমুখ পুঁথিগত ও বাবুগিরি শিক্ষাই আমাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে প্রাথমিক স্তর থেকে সমস্ত শিক্ষাকেই ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। কেন কৃষকের সন্তানও বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কৃষিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে, কেন অন্য শ্রেণীর লোক কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে না তাহার মূল আমাদের এই শিক্ষার মধ্যেই নিহিত এবং এই শিক্ষাসঞ্জাত জীবনধারাই উহার প্রধান কারণ। গান্ধীজী অন্যান্য বিষয়ের মত শিক্ষা সম্বন্ধেও অত্যন্ত মৌলিক চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে বৈদেশিক শাসন নিশ্চিতরূপে অথচ অলক্ষ্যে শিশুদের শিক্ষার ভিতর দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিও একটা তামাশা বিশেষ। কিন্তু গ্রামের প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখা হউক, আর শহরের প্রয়োজনের দিক থেকেই দেখা হউক, গ্রামের ছেলে আর শহরের ছেলেই হউক, বনিয়াদি শিক্ষা এই বালক-বালিকাদিগকে ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী তাহার সহিত যুক্ত করে। ইহার দ্বারা শরীর ও মন উভয়েরই বিকাশ হয় এবং শিশুকে তাহার জন্মস্থানের সঙ্গে গভীরসম্বন্ধযুক্ত করে। ইহাতে একটি ভবিষ্যতের গৌরবময় কল্পনা লক্ষ্য করিয়া পঠ-দ্দশাতেই বালক-বালিকা নিজের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়।

একটি সর্ব্বগ্রাসী বেকার-সমস্যা এবং জীবনের সমস্যা সমাধানের শিক্ষাগত ও চরিত্রগত উৎকর্ষের অভাব আমাদের যুবকদিগকে অসন্তুষ্ট ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, যাহার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় অচল হইতে বসিয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থা সুচিন্তিত, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রয়োজন-পূর্তির সহায়ক হইলে আজ-কালকার এই সর্ব্বনাশা পরিস্থিতির উদ্ভব হইত না। আমরাই ছাত্র-দিগকে আদর্শভ্রষ্ট, স্বাজাত্য ভাববিহীন,উন্মনা ও ভ্রষ্টচারী করিয়া তুলিয়াছি।

মানুষের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র ও বাস-স্থানের। গান্ধীজীর ভাষাতেই বলি, 'আমাদের অধিকাংশ স্বদেশবাসী কৃষিজীবি। সুতরাং গোড়া থেকেই যদি আমাদের ছেলেদের কৃষি এবং তাঁত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হত এবং শুরু থেকেই তারা যদি এই দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সচেতন হত ও তার কারণ এরা নিজ নিজ পেশা সম্বন্ধে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হত, আজ তাহলে আমাদের কৃষকসমাজ সুখী ও সমৃদ্ধ হত। আর শুধু কৃষিকাজ এবং তাঁত-বোনা কেন কামার, কুমার, মৎস্যজীবি প্রভৃতি বিভিন্ন যেসমস্ত শ্রেণী বাস করে তাদের প্রত্যেকটি পেশাগত বিষয়ই কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নূতন আলোকে নবীকরণ সম্ভব নয়? তাহা হইলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক স্তর হইতেই পুস্তক-মুখীন না করিয়া কর্মমুখীন, চিন্তাপ্রবণ এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে ও জীবিকার সংস্থানে শিক্ষাকে সর্ব্বতোভাবে সহায়ক করিতে হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সহর এবং গ্রামের পার্থক্য কি এইরূপ শিক্ষা দ্বারা আরও বাড়াইয়া তোলা হইবে না এবং জাতিগত পেশা যাহা বর্ত্তমান যুগে প্রগতির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাই কি আরও পাকা-পাকি করা হইবে না। সুচিন্তিতভাবে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সংগঠন পরিচালনা করিতে পারিলে সেইরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ কৃষক বা কর্মকারের ছেলে আরও ভাল এবং আধুনিকজ্ঞানে ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত আরও ভাল কৃষক বা কর্মকার হইবে এবং কোন কৃষক বা তাঁতীর ছেলে উচ্চতর শিক্ষা লইয়া রুচি ও মেধানুসারে ডাক্তার, উকিল, প্রশাসক বা বিচারক হইতেও কোন বাধা থাকিবে না। ঠিক তেমনই কোন ডাক্তার, উকিল বা অধ্যাপকের ছেলেকে ও ইচ্ছানুসারে কৃষক বা তাঁতির বৃত্তি গ্রহণে কোন বাধা থাকিবে না। সবসময়ই মনে রাখিতে হইবে, কৃষি ও আনুষঙ্গিক বৃত্তিগুলিতে এবং বিভিন্ন কুটির ও বৃহৎ

হইবে। কাজেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতিভেদ পুনরুজ্জীবনের কোন আশংকা নাই।

সহরের ছেলেদের যেমন কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত শিল্প এবং কৃষি বা অন্য কোন গ্রামীণ শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে তেমন গ্রামের ছেলেদেরও কৃষি বা গ্রামীণ শিল্প ব্যতীত কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত শিল্পের সঙ্গে পরিচিত করিতে হইবে। অর্থাৎ ছেলেরা সহরেই থাকুক বা গ্রামেই থাকুক কোন না কোন বৃত্তিমূলক শিল্পশিক্ষণ সাধারণ পড়াশুনার সঙ্গে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। এটা অষ্টম শ্রেণী অবধিই বাধ্যতামূলক হইবে। তারপর যে যার রুচি ও যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিবে। মনে রাখিতে হইবে কোন শহর থেকেই গ্রাম খুব দূর নহে। প্রয়োজনমত আজকালকার উন্নত যাতায়াত-ব্যবস্থার যুগে গ্রামের ছেলেদের শহরে এবং শহরের ছেলেদের গ্রামে যাইবার প্রয়োজন হইলে সেই ব্যবস্থা দুঃসাধ্য নহে। গ্রামের ছেলেরা শহরকে জানুক আর শহরের ছেলেরা গ্রামকে জানুক এ ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। নতুবা শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও অর্থহীন হইবে এবং জাতীয় সংহতি ব্যাহত হইবে।

অন্ততঃ একটি বৃত্তিগত শিল্প শিক্ষা শুধু জীবিকার জন্য নহে, বুদ্ধি বিকাশের জন্য প্রয়োজন। গান্ধীজী বলেন, তাছাড়া আমরা শরীর চর্চ্চা এবং শিল্পশিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দিচ্ছি। আমাদের মস্তিষ্ককে কতগুলি ঘটনাকে আটকে রাখার গুদাম বানাবার জন্য বোধশক্তির উন্মেষ হয় না। সময় সময় বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য অধ্যয়ণ করার চেয়ে বুদ্ধি সহকারে শিল্প শিক্ষা করলে মস্তিষ্ক বিকাশের পক্ষে তাঅধিকতর সহায়ক হয়!

পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজির মত এইরূপ আজকাল সহরের স্কুল কলেজগুলিতে শিক্ষার নামে যা চলে প্রকৃতপক্ষে তা বৌদ্ধিক লাম্পট্য ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিক শিক্ষায়তন সমূহে বৌদ্ধিক শিক্ষণকে শরীর-শ্রম থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক বস্তু মনে করা হয় এব্যাপার যেমন কিম্ভূতকিমাকার এর পরিণামও তেমনি শোকাবহ। এই প্রথায় জারিত যুবক শারীরিক সহনশীলতার দিক থেকে কোন ক্রমেই একজন সাধারণ শ্রমিকের কাছে দাঁড়াতে পারেনা। সামান্য খাটুনিতেই তার মাথা ধরে। এক লহমা রৌদ্রে থাকিলে তার শরীর ঘুলাতে থাকে। আর আশ্চর্য্য কথা হচ্ছে এই যে এসবকে অতীব স্বাভাবিক আখ্যা দেওয়া হয়, অন্য দিকে প্রথমাবস্থা থেকে সে শিশুটির হৃদয়ের ভিতর শিক্ষার বীজ বপন করা হয়েছে তার উদাহরণ নিন। ধরে নেওয়া যাক যে শিক্ষার জন্য তাকে সুতাকাটা, ছুতারের কাজ বা কৃষি ইত্যাদি কোন প্রয়োজনীয় কাজে লাগান হল এবং সেই সুবাদে তাকে যেসব ক্রিয়া করতে হবে তার পূর্ণমাত্রায় ও বিশদ তথ্যমূলক শিক্ষা তাকে দেওয়া হল যে-সব যন্ত্রপাতি নিয়ে তাকে কাজ করতে হবে তার উৎপাদন ও ব্যবহার পদ্ধতিও যেন তাকে শেখানো হল। এতে শুধু সে সুন্দর ও সুগঠিত দেহী হয়েই গড়ে উঠবে না উপরন্তু এ প্রক্রিয়ায় সে গভীর জ্ঞান ও প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের আকর হবে। এই জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য কেবল পুঁথিগত হবেনা। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার আলোকে এ জ্ঞান হবে জীবনের সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ। তার বৌদ্ধিক শিক্ষার ভিতর গণিত থাকবে এবং নিজের জীবিকা সমুচিত ও সুসঙ্গতভাবে চালাবার জন্য বিজ্ঞানের যেসব বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করা প্রয়োজন তাও তার পাঠ্যক্রমের ভিতর সান্নিবিষ্ট করা হবে।

মনোরঞ্জনের জন্য এর সঙ্গে সাহিত্য যুক্ত হলে তার সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে বলা যাবে। এ পদ্ধতিতে বুদ্ধি, শরীর ও আত্মার বিকাশের পূর্ণ অবকাশ থাকবে এবং এ সবের সমবায়ে সে স্বাভাবিক এ একাবয়ব পরিপূর্ণ সত্তায় (integrated personality) পরিণত হবে। মানুষ শুধু বুদ্ধি বা কেবল স্থুল জৈবিক দেহ নয়। অথবা তাকে স্রেফ হৃদয় বা আত্মা আখ্যা দেওয়া চলে না। পরিপূর্ণ মানবের রূপায়নের জন্য এই ত্রিবিধের সমুচিত ও সুসঙ্গত সমন্বয় প্রয়োজন।"

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের অষ্টম শ্রেণী

অবধি প্রাথমিক শিক্ষার উপর বর্ত্তমানে সর্ব্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবমুখীন ও সার্থক হইলে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস ও সার্থক রূপায়ন সহজতর হইবে। এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অষ্টাদশ বৎসর বা দ্বাদশ শ্রেণী অবধি। সার্থক হইলে জাতির বৃহত্তম প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে এবং এবং স্নাতক ও স্নানকোত্তর বিভাগের শিক্ষায় তখন আমরা প্রকৃত সক্ষম এবং মেধাবী মেধাবী ছাত্রদিগকেই পাইব এবং জ্ঞানের উচ্চতম উচ্চতর পর্য্যায়ে তখন পঠন পাঠন ও গবেষণার ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য হইবে।

প্রাথমিক স্তরে আমাদিগকে অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

১। বইয়ের সংখ্যা কমাইতে হইবে, ছাত্রদের জন্য যে বই লেখা হইবে তাহাতে উপযুক্ত তথ্য সুন্দর ও সহজভাবে পরিবেশন করা হইলেও বইয়ের আকার যেন অযথা বৃহৎ না হয়। শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত তথ্যপূর্ণ বই লিখিতে হইবে এবং শিক্ষক-শিক্ষণে বা অন্যভাবে শিক্ষকদের জন্য সেই বইগুলি পড়া এবং বোঝা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে কারণ উপযুক্ত শিক্ষক না হইলে শুধু বই দ্বারা ভাল শিক্ষা কদাচিৎ সম্ভব হয়। শিক্ষকের বেতন ও সামাজিক মর্য্যাদাও বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুবা উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া অসম্ভব হইবে।

২। প্রতিটি ছাত্রকে শ্রমশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, আত্মনির্ভর ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে ও বিশ্বমানব-কল্যাণে আস্থাবান করিয়া গড়িতে হইবে। ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে শুধু হিন্দু-সংস্কৃতি নয় হিন্দু, বৌদ্ধ জৈন, মুসলমান, খৃষ্টানদের সম্মিলিত সংস্কৃতিসক বুঝিতে হইবে। সমাজে নূতন যে যুগ আসিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা সকল মানুষেরই স্বচ্ছন্দ-জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিতে পারি কিন্তু তজ্জন্য প্রয়োজন সমবায়মূলক ও সামগ্রিক প্রচেষ্টা। বর্ত্তমান আত্মসর্বস্ব এবং হিংস্র প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতেই সেই ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কাজেই শিক্ষকের শুধু বিদ্যা থাকিলেই চলিবে না, তাহাকেও নূতন সমাজ-চিন্তার ও কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

৩। বইয়ের পড়া থেকেও বাস্তব কাজের মধ্য থেকে আরও বেশী শিক্ষা লইতে হইবে এবং সেজন্য যে কোন বৃত্তিমূলক একটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে। শুধু কৃষক, কর্মকার, সূত্রধর বা অন্য গ্রামীণ শিল্প নহে, অন্যান্য সহস্রবিধ নূতন শিল্প যাহা কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত তাহার যে কোন একটি অবশ্য শিক্ষণীয় হইবে। তজ্জন্য শিক্ষা-বিভাগ থেকেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে একটি ওয়ার্ক-শপ এবং গ্রামে একখণ্ড চাষের জমি অবশ্যই ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত মডেল ফার্ম ও ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্প আছে সেখানেও কাছাকাছি স্কুলের শিক্ষক-দের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাছাড়া শহরের ছেলেদিগকেও গ্রামের কৃষি কর্মের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে এবং রোদ বৃষ্টি সহ্য করিতে শিখিতে হইবে।

৪। জীবনের প্রথম স্তর হইতেই সমবায়মূলক এবং শ্রেণী-বিভেদহীন শ্রমমূলক উৎপাদন কাজে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

৫। জীবনের প্রথম হইতেই মুখস্থ বিদ্যায় রপ্ত না হইয়া হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়া উদ্‌ভাবনী শক্তির উন্মেষ করাইতে হইবে।

উপরোক্তভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠিত হইলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সার্থকরূপায়ণও সহজসাধ্য হইবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার রূপান্তর ও পুনর্গঠন সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিমন্ত্রন রক্ষা করতে গিয়ে জর্জ কার্ভার মিলহোল্যাণ্ড পরিবারের সঙ্গে এক নতুন আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়লো। তার সামনে আর একটি নতুন জগতের দ্বার খুলে গেল। মিসেস মিলহোল্যাণ্ড সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী। ইউরোপের বহু দেশ থেকে তিনি সঙ্গীত বিদ্যার ডিগ্রী লাভ করে ফিরে এসেছেন। কৃষ্টিসম্পন্না মার্জিত রুচি বিশিষ্টা এই মহিলা জর্জ কার্ভারকে যে কী চোখে দেখলেন, বিশেষত জর্জের কণ্ঠের গান শোনার পরে, তা একমাত্র তিনি জানেন। তবে সঙ্গীত শেখার একটা তীব্র আকুলতা ও ব্যগ্র আকাঙ্খা তিনি জর্জের চোখে মুখে ফুটে উঠতে দেখছেন। লক্ষ্য করেছেন মন দিয়ে কী গভীর জর্জের সঙ্গীতের সমুদ্রের যাবার ব্যগ্রতা। জর্জ কার্ভারের মধ্যে তিনি সঙ্গীতের এক অতি বিস্ময়কর প্রতিভার সন্ধান পেলেন। জর্জ নিজে কিন্তু স্বীয় প্রতিভা সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিল না।

সেদিনকার সেই সান্ধ্যভোজের আসরে মিসেস মিলহোল্যাণ্ড পিয়ানো বাজালেন। আর জর্জ কার্ভার পিয়ানোর সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইল। আগে কখনো সে পিয়ানো দেখেইনি।

জর্জ কার্ভারের গান গাওয়া শেষ হবার পরে মিসেস মিলহোল্যাণ্ড পিয়ানোতে আরো কয়েকটি বিদেশী গানের সুর বাজিয়ে শোনালেন। এ ছাড়া তাঁর নিজের আবিষ্কৃত কয়েকটা সুরও তিনি বাজালেন। পিয়ানো বাজাবার সময়ে, জর্জ লক্ষ্য ক'রলো, মহিলার সমস্ত চোখে মুখে এক অপূর্ব ভাবের দ্যোতনা আর সঙ্গীত মূর্চ্ছনার অপূর্ব অভিব্যক্তি। মহিলা ও সমান কৌতূহল নিয়ে জর্জের মুখের দিকে তাকালেন, তাঁর মনে হ'ল আনন্দের আতিশয্যে জর্জ কার্ভারের দুই চোখের নীলোৎপল দুটো যেন হীরকখণ্ডের মতো বৈদ্যুতিক আভায় জ্ব'লছে।

মিসেস মিলহোল্যাণ্ড এমন মুগ্ধ বিমোহিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন যেন এ জিনিষ আর কখনো আর কারুর মধ্যে তিনি দেখেননি, এমন অভিজ্ঞতা তাঁর যেন এই প্রথম। এমন আশ্চর্য প্রতিভার আলো কদাচিৎ কারুর মধ্যে স্ফুরিত হ'তে দেখা যায়। যাদের মধ্যে এ প্রতিভা আছে তারা পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম। জর্জ কার্ভারের মধ্যে মিসেস মিলহোল্যাণ্ড সেই ব্যতিক্রম লক্ষ্য ক'রলেন।

স্নেহবিজড়িত কণ্ঠে মিসেস মিলহোল্যাণ্ড ব'ললেন, "মিষ্টার কার্ভার।" শব্দ দুটো হঠাৎ গিয়ে জর্জ কার্ভারের কানে কেমন যেন শোনালো। তাকে "মিষ্টার কার্ভার"

বলে এর আগে আর কেউ কখনো সম্বোধন করেনি, চিরকাল সে লোকের কাছে কেবল অবজ্ঞাই পেয়ে এসেছে। শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসা কেউ তাকে দেয়নি। মিসেস মিলহোল্যাণ্ডই আজ সর্বপ্রথম মিষ্টার কার্ভার ব'লে ডাকলেন। জর্জ কার্ভার যেন কিছুতেই নিজের কানকে বিশ্বাস ক'রতে পারছিল না।

মিসেস মিলহোল্যাণ্ড ব'ললেন, "মিষ্টার কার্ভার" আমি আপনার মধ্যে এক দুর্লভ সঙ্গীত প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি, এক মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডার আপনার মধ্যে লুক্কায়িত আছে এবং সেই রত্নভাণ্ডার আমিই আজ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলাম। আপনার সেই প্রতিভাকে আমি জাগরিত ও মূর্ত ক'রে তুলতে চাই, মেঘে ঢাকা সূর্যকে যেমন প্রকাশ করে প্রকৃতির যাদুদণ্ড তেমনিভাবে আপনার প্রতিভাকে জগতে প্রকাশ ও প্রচার ক'রতে চাই। আসুন আমরা দুজনে মিলিত হই। আপনি দেবেন কথা, আর আমি দেবো সুর—সেই কথা এবং সুর মিলে গান হ'য়ে উঠবে। আমাদের দুজনের মিলিত সাধনায় যে অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হবে তেমন সঙ্গীত পৃথিবীতে কখনো সৃষ্টি হয়নি। সারা পৃথিবীর নরনারী অবাক বিস্ময়ে কান পেতে সে সঙ্গীত শুনবে। ভাববে, এ কোন অপার্থিব সঙ্গীতের সুর মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসছে!

জর্জ কার্ভারের জীবনে এ সৌভাগ্য দুর্লভ এবং অপ্রত্যাশিত। এমন সৌভাগ্য সে কল্পনাও করেনি। এ যে তার স্বপ্নেরও অতীত। আনন্দে সুখে জর্জ কার্ভারের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'ল। শুধু কেবল মাথা নেড়ে সে মিসেস মিলহোল্যাণ্ডের প্রস্তাবে সম্মতি জানালো: কিন্তু পরক্ষণেই নিজের দারিদ্র্যের কথা মনে হ'তেই তার সব আনন্দ মুছে গেল। দ্বিধাকম্পিত কণ্ঠে সে ব'ললো, "কিন্তু আমি তো সঙ্গীত শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারবো না। আপনি জানেন না আমি কত গরীব, কত নিঃস্ব। এক মুষ্টি অন্ন, এক টুকরো রুটির জন্য দিবারাত্র আমাকে কত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

"আমি সব জানি মিষ্টার কার্ভার, আপনার সম্বন্ধে আমি ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে সব কথা আমি জানতে পেরেছি, ব'ললেন মিসেস মিলহোল্যাণ্ড।" কিন্তু এর জন্য তো আমাকে কিছু দিতে হবে না আপনার। আমরা দুজনেই গান শিখবো সমানভাবে; আমরা দুজনে মিলে হবো একটা প্রতিষ্ঠান, কাজেই আমাকে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য আপনার দাক্ষিণা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি শুধু একটি মাত্র জিনিষ আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি, সে জিনিষটা হল আপনার মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত ক'রে তোলার প্রথম সুযোগ। আপনি আমাকে শুধু সেই সৌভাগ্যটুকু দান করুন। আপনি আমাকে কি সে সুযোগ দিতে চান না মিষ্টার জর্জ কার্ভার?" মেসেস মিলহোল্যাণ্ড যেন তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহরাশি উজাড় করে ঢেলে দিলেন, এমনভাবে ব'ললেন কথাগুলি।

"না, সে সুযোগ থেকে আপনাকে আমি বঞ্চিত ক'রতে পারি না। আমাদের জানাশোনা বেশীক্ষণের নয়, অথচ এই স্বল্পকালের মধ্যে আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তার মূল্য সামান্য নয়। আপনার মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি," জর্জ কার্ভারের কণ্ঠে একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হ'ল। তার কথায় কৃতজ্ঞতারও অভাব ছিল না। তথাপি তার কথাগুলি আবশ্যকের চেয়ে একটু বেশী কঠোর মনে হ'ল। যেখানে তার আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকে সেখানেই তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের চাইতে বেশী জোরে হয়। এখানেও একই কারণ। সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধ'রে কেউ তাকে অনুগ্রহ ক'রবে, দয়া দেখাবে শুধু তার দারিদ্র্যকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এর চাইতে বড় অপমান আর কি হ'তে পারে? প্রতিদানে সে কিছুই দিতে পারবে না, এই যেখানে অবস্থা অপমানটা সেখানে আরো বেশী করে গায়ে লাগে। সে শুধুই নেবে, দিতে কিছুই পারবে না—এ তার আত্মাবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। জর্জ কার্ভার নীতিগতভাবে এই পরিস্থিতি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

সহসা কার্ভারের মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে

উঠলো একটা কথা চিন্তা ক'রে, ব'ললো, আপনার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো ওই তৈলচিত্রগুলি দেখে আমার মাথায় পরিকল্পনা এসেছে। পরিকল্পনাটা আপনাকে খুলেই বলি, ওই তৈলচিত্রগুলি কে এঁকেছেন আমি জানি না, কিন্তু যিনিই আঁকুন ছবিগুলিতে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। আমি তা সংশোধন করে দিতে পারি।"

মিসেস মিলহোল্যাণ্ড স্বীকার করলেন যে, তৈলচিত্র কয়খানি সব তাঁরই আঁকা। জর্জ কার্ভার ব'ললো, "তা হ'লে তো কথাই নেই। আমিও ছবি আঁকতে জানি কিনা, তবে খুব ভাল নয়। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না আপনি আমাকে গান শেখাবেন আর আমি তার বিনিময়ে আপনাকে ছবি আঁকা শেখাবো! এ ব্যবস্থা হ'লে কেমন হয় বলুন তো!"

"বেশ হয়, খুব ভালো হয়। আমি আপনার এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করছি।" মিসেস মিলহোল্যাণ্ড খুশি হ'য়ে সহাস্যে ব'ললেন।

"কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি প্রথমেই ব'লে নিতে চাই, ছবি আঁকার বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়মকানুন কিছুই আমি জানি না। ছবি আঁকতে কেউ আমাকে শেখায়নি, নিজে নিজে সখ করে যেটুকু যা শিখেছি সেই আমার চিত্রাঙ্কন বিদ্যার পুঁজি। আমার কাছ থেকে বড় রকমের কিছু যদি আশা করেন আমি দিতে পারবো না। কাজেই আপনার সঙ্গে আমার এই দেনা পাওনার ব্যাপারটা হবে একেবারেই একতরফা।"

"বাঃ, তা কেন?" মিসেস মিলহোল্যাণ্ড হেসে ব'ললেন, "আমি নিজে কী? গানের আমি কতটুকু জানি? আমিও তো অ্যামেচার সঙ্গীতশিল্পী ছাড়া আর কিছু নয়।

জর্জ কার্ভারের হাত দুখানা সস্নেহে নিজের হাতে নিয়ে মিসেস মিলহোল্যাণ্ড তাতে মৃদু চাপ দিলেন।

জর্জ কার্ভার পুনরায় লজ্জিতভাবে ব'ললো, "আমি ভাবছি, আমি আপনার আরো একটা কাজেও তো অনায়াসে লাগতে পারি। এক সময়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিসেবে আমার সামান্য একটুখানি খ্যাতি বা যশ যা-ই বলুন ছিল এবং লোকে আমাকে "গাছের ডাক্তার" আখ্যা দিয়েছিল। বিশেষত গাঁয়ের অজ্ঞ লোকেরা। কথাটাকে নেহাৎ অতিশয়োক্তি বলা চলে না, কারণ গাছপালার পরিচর্যা করার সখ ছিল আমার এবং তাই থেকে গাছপালা ও লতাগুল্ম সম্বন্ধে হাতেকলমে কাজ ক'রে অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। আপনি যদি দয়া ক'রে অনুমতি দেন তা হ'লে আমি রোজ এসে আপনার উদ্যান পরিচর্যা করার কাজে সাহায্য ক'রতে পারি।"

মিসেস মিলহোল্যাণ্ড আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'ললেন, "আপনার সে সাহায্য যদি পাই তো খুবই সুখের কথা। এই উপকার যদি আপনি আমার করেন দয়া ক'রে আমি যারপরনাই খুসি হবো।"

সেদিন থেকে মিলহোল্যাণ্ড ভবনের দরজা জর্জ কার্ভারের কাছে অবারিত হ'ল, সে যখন খুশি আসে যখন খুশি চ'লে যায়। মিলহোল্যাণ্ড পরিবারের ঘরের ছেলের মতো হ'য়ে উঠেছে সে। এ বাড়ীর কোন উৎসব-আনন্দই জর্জকে বাদ দিয়ে হয় না। হ'তে পারে না। পার্টি এবং ভোজসভা ইত্যাদিতে সে উপস্থিত না থাকলে তা কেমন যেন বিস্বাদ ও প্রাণহীন শুষ্ক মনে হয়।

জর্জ কার্ভার লাজুক প্রকৃতির, কিন্তু তার কথাবার্তায় মার্জ্জিত রুচি ও তীক্ষ্ণ রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। নানান কৌতুককর ও মজার কথা ব'লে সে লোককে হাসায়, আনন্দ দেয়। তার শ্লেষ ও বিদ্রুপের মধ্যে বিদ্বেষের কাঁটা লুকিয়ে থেকে মানুষকে জ্বালা দেয় না।

বড়দিন উৎসবের রাতে জর্জ কার্ভার সান্টা ক্লজ সেজে এলো একটা কালো পোশাক প'রে, তারপর অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে নানান রকমের উপহার বিতরণ ক'রলো।

দু-তিন সপ্তাহ যেতে না যেতেই মিলহোল্যাণ্ড পরিবারের সঙ্গে জর্জ কার্ভারের হৃদ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছালো যে, বাইরে থেকে বোঝার

যো ছিল না জর্জ কার্ভার নিতান্তই একজন পর। মিলহোল্যাণ্ডদের সঙ্গে তার সত্যিকারের কোনই রক্তের সম্পর্ক নেই। জর্জ কার্ভারেরও নিজেকে অনাত্মীয় বা অপরিচিত ব'লে বোধ হয় না।

এই একান্ত অপ্রত্যাশিত ও সম্পূর্ণ নতুন এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এসে জর্জ কার্ভার তার বিরাট সন্ত্রাতময় জীবনে যে নিবিড় আন্তরিকতার উষ্ণ স্পর্শ পেলো তা তার মন থেকে পুঞ্জীভূত সব ভয়, সব দ্বিধা ও সংশয় মুছে ফেলে দিয়ে তাকে নতুন একটি মানুষে রূপান্তরিত করলো। জীবনসত্ত্বা ও মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তুললো তার মধ্যে,—জন্ম হ'ল নতুন এক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের।

জর্জ কার্ভার যে ভীষণ বিভীষিকা ও ত্রাস বুকের মধ্যে বহন ক'রে ফোর্টস্কট শহর ছেড়ে এসেছিল আজ তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই তার মধ্যে। তার নতুন জন্ম হ'য়েছে। সে আজ তার নবজন্মের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি ক'রছে এতকাল যে জিনিসটাকে সে ভয় ব'লে স্থিরবিশ্বাসে জেনে এসেছে আসলে তা মোটেই ভয় নয়। সে তার আপনার দীন পাণ্ডুর ছায়া দেখে চ'মকে উঠেছে সেই চমক লাগাটাই ভয়ের রূপ ধ'রে তাকে ত্রস্ত ক'রেছে। নিজের দীনতাকেই এতকাল সে ভয়ের সিংহাসনে বসিয়ে পূজা ক'রেছে। সেই দীনতা যেই মরে গেল তার কালো ছায়াটা স'রে গিয়ে আত্মবিশ্বাসের উজ্জ্বল আলো সেখানে ফুটে উঠতেই ভয় কোথায় মিলিয়ে গেল। আত্মবিশ্বাসের যেখানে অভাব, ভয় সেখানেই বাসা বাঁধে। দুর্বলতার অপর নাম মৃত্যু। আজ সে স্পষ্ট অনুভব ক'রছে অন্তরের দৈন্যই তার সবচেয়ে বড় শত্রু, সর্বশক্তি দিয়ে সেই শত্রুকে জয় করতে হবে। শুধু জয় নয়, এই ভয়কে সম্পূর্ণ নির্মূল এবং নিঃশেষ ক'রতে হবে।

জর্জ কার্ভারের দৃঢ়সম্বদ্ধ রুদ্ধ ওষ্ঠাধরে কঠিন প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটে উঠলো। অন্তর থেকে সমস্ত ভয় দূর ক'রে দিল।

ভয়?
কাকে ভয়?
কিসের ভয়?

ভয় মানেই তো মৃত্যু, আর আত্মার অপমান।

মিলহোল্যাণ্ড দম্পতির মতো মানুষের অস্তিত্ব যত কাল পৃথিবীতে থাকবে ততকাল দুর্বল ও অত্যাচারিত মানুষেরা ভয়কে জয় করার শক্তি পাবে। সমগ্র নিগ্রো-জাতি আজো ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে কাঁদছে, আজো তারা লাঞ্ছিত ও নিগৃহিত বটে, কিন্তু তাদের মুক্তির দিন আর বেশী দূরে নেই। অন্ধকারের ওপারে আলো, রাত্রির অবসানে দিন। এই আত্মাবসানকে, এই দীনতা ও কাপুরুষতাকে জয় ক'রতে পারলেই মুক্তির লগ্ন ত্বরায় এগিয়ে আসবে।

জর্জ কার্ভার তার অন্তরের এই নবজাগ্রত চেতনার আলোকে উপলব্ধি করলো, জগতে সে আজ আর একা বা নিঃসহায় নয়। এক বিরাট সুমহৎ মানবগোষ্ঠির সে অন্তর্ভুক্ত। তারা তার পিছনে দাঁড়াবে তাকে সাহস দেবে। শক্তি জোগাবে, সমর্থন করবে। এই মানব-গোষ্ঠির কোন আলাদা জাত নেই। উঁচু-নীচু বড়-ছোট ভেদাভেদ নেই। তারা শ্বেতাঙ্গ নয়, কৃষ্ণাঙ্গ নয়, তারা সর্বকালের সর্বদেশের, সর্বজাতির সর্বমানবের প্রতিভূ। মিষ্টার ও মিসেস মিলহোল্যাণ্ডের মধ্যে সেই নিখিল মানবসত্ত্বারই ছায়া প্রতিফলিত।

এই মিলহোল্যাণ্ড দম্পতির আন্তরিক আগ্রহ এবং উদ্যোগের ফলেই জর্জ কার্ভার আবার কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পেলো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে অধ্যয়ণ চালিয়ে যেতে সক্ষম হ'ল। তাঁরাই জর্জ কার্ভারের পড়াশুনার সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যে আইওয়ার ইণ্ডিয়ানানোলা শহরের সিম্পসন কলেজের সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। তারা সিম্পসন কলেজে ভর্তির জন্য জর্জ কার্ভারকে দরখাস্ত পাঠাতে বললেন, কিন্তু জর্জ তেমন উৎসাহ বোধ করলো বলে মনে হ'ল না। প্রথমে তাকে একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল।

সিম্পসন কলেজ শুধু মাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্যই, সেখানে শুধু শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদেরই ভর্তি হবার ও পড়াশুনা করার অধিকার আছে। কলেজের শিক্ষকরাও সকলেই শ্বেতাঙ্গ। এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে জর্জ কার্ভারের ভরসা করার মতো কিছুই ছিল না। তথাপি মিলহোল্যাণ্ড দম্পতির একান্ত আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত দরখাস্ত পাঠাতেই হ'ল জর্জ কার্ভারকে, মিসেস মিলহোল্যাণ্ড বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, এই কলেজ শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্যই নির্দিষ্ট করা নয়। এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতা বিশপ ম্যাথ্, সিম্পসন ছিলেন আমেরিকার প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ এবং নিগ্রোজাতির মুক্তিদূত আব্রাহাম লিঙ্কনের আজীবন সুহৃদ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তিনি তাঁর জীবনের সমুদয় সঞ্চিত অর্থ এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অকৃপণ হস্তে ব্যয় করেছিলেন, তিনি জাতিভেদ মানতেন না। বর্ণবৈষম্যের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। সব মানুষ তাঁর কাছে সমান। জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে তিনি সমান শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। সব মানুষের সমান অধিকারে তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, এবং এই বিশ্বাসই তাঁকে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

মিসেস মিলহোল্যাণ্ডের একজন ভ্রাতুষ্পুত্র সিম্পসন কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র এবং কলেজের হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। মিসেস তার কাছে জর্জ কার্ভার সম্বন্ধে সব কথা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। সে সেই চিঠির উত্তরে জানিয়েছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ কার্ভারকে কলেজে ভর্তি করতে আপত্তি তো করবেই না বরং তাকে ছাত্ররূপে লাভ করতে পারলে তারা খুসি হবে। জর্জ কার্ভার কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। তার গায়ের চামড়ার রঙ কালো, এ-সব তাদের কাছে আপত্তি করার কারণ হয়ে উঠবে না। কারণ সিম্পসন কলেজে বর্ণ-বৈষম্যের স্থান নেই।

জর্জ কার্ভার চিঠির বিবরণ শুনে উল্লাসে চীৎকার করে বলে উঠলো, "এ যে রীতিমত একটা আশ্চর্য খবর! আনন্দের আতিশয্যে সে সারা ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগলো। তার নাচনের বেগ একটু কমলে মিসেস মিলহোল্যাণ্ড বললেন, "আমার ভাইপো আরো একটা কথা লিখেছে। সিম্পসন কলেজে শিল্প এবং সঙ্গীত শিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে। শিল্পশাখা বা সঙ্গীতশাখা —এর যে কোন একটাতে ভর্তি হয়ে তুমি দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? ভবিষ্যতে আমাদের জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার হয়তো একজন বিরাট লোক হবে। শিল্পকলা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতি লাভ করবে, তখন কি আর তুমি আমাদের চিনতে পারবে? হয়তো বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী অথবা গায়ক হবে তুমি। আমরা তখন দূর থেকে তোমার নাম শুনবো। তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হয়তো আমাদের হবে না।"

মিসেস মিলহোল্যাণ্ড যত কথা বললেন তার সব জর্জ কার্ভারের কানে গেল না। সে তখন তার আপনার ভবিষ্যৎ খ্যাতির কল্পনায় মশগুল।

"ওঃ চমৎকার!" কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কি একটা কথা তার মনে পড়লো। সে জিজ্ঞাসা করলো মিসেস মিলহোল্যাণ্ডকে, "আচ্ছা, সিম্পসন কলেজে কোন কৃষিবিভাগ নেই কৃষিবিদ্যা শেখাবার জন্য?"

"আমি তা জানি না।" মিসেস মিলহোল্যাণ্ড বললেন, "আমার ভাইপোকে তা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি।"

মিসেস মিলহোল্যাণ্ডের কাছ থেকে এমনি একটা উত্তর পেয়ে জর্জ কার্ভার খানিকটা দমে গেল, তার সব উৎসাহ উদ্দীপনা যেন এক নিমেষে জল হয়ে গেল।

গাছপালা তরুলতা জর্জ কার্ভারের চিরকালের প্রিয় সামগ্রী, তাদের নিয়ে তার জীবনের শুরু থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবার একটা প্রবল ঝোঁক লক্ষ্য করা গিয়েছে। গাছপালা ও তরুলতার মধ্যে জীবিত প্রাণীদের মতো প্রাণের স্পন্দন অনুসন্ধান করার জন্য তার সে তীব্র আকুলতা যে লক্ষ্য করেছে সেই মুগ্ধ না

হয়ে পারেনি। সমগ্র উদ্ভিদজগতের প্রতি অতি শৈশব-কাল থেকে তার প্রবল হৃদয়াবেগ সাধারণ বালকদের থেকে তাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে। জীবনের তার সেই প্রথম অনুরাগই তাকে আজ প্ররোচিত করেছে সিম্পসন কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করার কোন সুযোগ আছে কিনা জানবার জন্য। এই খবরটা ঠিকমতো না জানা পর্যন্ত সে স্থির হতে পারছে না।

"সিম্পসন কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে কি হবে? জর্জ কথাটা অনেকবার নিজের মনে মনে চিন্তা করলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কী একটা কথা মনে পড়তেই তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কৃষিবিদ্যা শিক্ষালাভের সুযোগ যদি সে পায় তো খুব ভালো কথা, আর যদি সে তা না পায় তবে কি সিম্পসন কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ সে ত্যাগ করবে? না, তা কখনোই হ'তে পারে না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয়। জর্জ কার্ভারও তা করবে না। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা তার আছে। তাই জর্জ কার্ভার সিম্পসন কলেজে ভর্তি হওয়াই স্থির করলো। সে কলেজে যে সব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে সেই সব বিষয়ের মধ্য থেকে সে নিজের পড়ার উপযুক্ত ও পছন্দসই বিষয়গুলি বেছে নেবে। আপাতত এই ভাবেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তার ভবিতব্য তাকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সে শিল্পী হবে না গায়ক হবে, সে জানে না। সেটা যে সে নিজে স্থির করবে সে ভার সে পেলো কোথা থেকে? কে দিল তাকে সে ভার? সে কে? ভগবান তার উপরে তো তেমন কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করে পৃথিবীতে পাঠাননি। তা স্থির করবেন বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান—যিনি এই বিশ্বচরাচর অনন্তকাল ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন, "আমি জানি তিনিই আমাকে তাঁর অভিপ্রেত পথে পরিচালিত করবেন। অতীতে তিনি যেমন আমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন, এবারেও তার অন্যথা হবে না।"

ক্রমশঃ

কোন পথে যাইব ?

অশোক চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আজকাল বহু স্থলে এমন একটা অস্থির মনোভাব ও যথেচ্ছাচারের ব্যাপক চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে; যাহা সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, রীতিনীতি, শিক্ষা পদ্ধতি, কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা, আইন কানুন প্রভৃতি প্রথমতঃ আগ্রাহ্য করিতে ও দ্বিতীয়ত সেসকলকিছুই সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিয়া তৎস্থলে কোন অজানা অপ্রকাশিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়বিধি ব্যবস্থার সংস্থাপন করিবার আয়োজনে নিযুক্ত হইতে জনসাধারণকে, বিশেষ করিয়া অপরিণত বয়স্কদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এই কার্যে যাহারা লিপ্ত আছে তাহারা দলবদ্ধভাবে চলে এবং সেই সকল দল ও গণ্ডি দেখা যায় কলেজে, স্কুলে, ছাত্র নিবাসে, পাড়ায় পাড়ায়, অফিসে, কারখানায় বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে এবং রাষ্ট্রীয়দলের আখড়াগুলিতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের কাছে অর্থ আছে এবং ইহারা চাঁদা আদায় করিয়া (স্বেচ্ছাদত্ত ও জোর করিয়া লওয়া), অপহরণ করিয়া ও অপর সূত্রে নানা গোপন উপায়ে অর্থ পাইয়া থাকে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই সকল দল ও গণ্ডি এক মতাবলম্বি বা এক পথের পথিক নহে। ইহারা বহু ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী ও পারস্পরিক কলহে ও হিংসাত্মক বিবাদে নিযুক্ত থাকে। কে কাহার শত্রু অথবা মিত্র; কে কাহাকে কখন আক্রমণ করিতে পারে, কাহার সমর্থনে কে আসিতে পারে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর সহজে কেহ দিতে পরে না। যাহা শুনা যয় তাহা বড়ই জটিল ও পরিবর্তনশীল। আজ যাহারা এই দলের সৈন্য কাল তাহারাই অপর দলের যোদ্ধারূপে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়। নানান দলের ও গণ্ডির পরিচালকদিগের অবস্থা বিশেষ সুখের বা স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক বলিয়াও দেখা যায় না কারণ এই সকল দলগুলির মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে ও ইহাদের বহু সৈন্য ও সেনাপতি ক্রমাগতই হতাহত হইতে থাকে। মনে হয় যেন দেশে বহু পেশাদার লড়িয়ের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহারা প্রায়ই এদল হইতে ঐ দলে গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নতুনের আস্বাদ লাভের চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে নিজনিজ প্রচারিত আদর্শবাদ প্রায় কাহারও মনে অতি গভীরে দৃঢ়রূপে স্থিতিবান হয় নাই। হয়তবা ইহার মধ্যে "বেতনের" তারতম্যের কথাও আছে। পিছনে থাকিয়া যাহারা এই সকল দলের খরচ জোগাইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে দল ভাঙ্গাইবার চেষ্টায় অধিক অর্থের প্রলোভন দেখান একটা সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যবসাদারী প্রতিদ্বন্দ্বি-তাজাত প্রচেষ্টা হইতেই পারে। নয়ত কেহ কেহ হঠাৎ মার্কাসবাদ বা অপর কোন বাদ ভুলিয়া বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করেই বা কি কারণে ?

এরূপ ঘটিলেও দল ও গণ্ডিগুলির মধ্যে অনেক লোক আছে যাহারা কোনও অবস্থাতেই মত বদলায় না এবং তাহাদের সকলেরই আশা ও সক্রিয় আকাঙ্খা যে ভারতের ভবিষ্যত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তাহাদেরই আদর্শ অনুগত হইবে। অর্থাৎ কেহ মনে করে আমাদের রাষ্ট্র রুশিয় ছাঁচে গড়া হইলে কাহারও আর কোন দুঃখকষ্ট থাকিবে না। অপর কেহ কেহ মনে করে যে চৈনিক আদর্শই উন্নততর। আমাদের স্বদেশজাত যে সকল নিজস্ব আদর্শ আছে তাহাও জাতীয়তায় বিশ্বাসী দলগুলির দ্বারা স্বীকৃত হয়। কিছুলোক মোরারজি অথবা ইন্দিরা গান্ধীর অনুসরণ করিতে প্রস্তুত; এবং তাহাদের সাহায্য করিতেও অনেক দেশবাসী উৎসুক ও টাকার হাতও উপুড় করিতে রাজী। এই সকল দলগুলি ব্যতীতও সাম্প্রদায়ীক

চংএর দল আছে। আর আছে নিছক ভেজাল বিহীন সমাজবাদী, মুসলীম লীগ, অখণ্ড ভারত গঠন প্রয়াসী এবং এই সকলের মিশ্রণে গঠিত বিভিন্ন বিচিত্র মতবাদ সজ্জিত গোষ্ঠীর মানুষজন। কোন্ আদর্শে রাষ্ট্রগঠন করিলে কি ফল হইবে তাহা যথাযথভাবে চিন্তা করিয়া কেহ বিশেষ দেখেন বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা বর্ত্তমান রাষ্ট্র পরিবর্ত্তিতভাবে গঠন করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের মানবীয় অধিকারের প্রকৃষ্ট বিকাশের ও ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণতম উপলব্ধির ব্যবস্থা করিতে চাহেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবের সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে ইচ্ছুক। অপর দলের ব্যক্তিগণ সংবিধানিক পন্থা অনুসরণ করিতেও প্রস্তুত আছেন এবং কেহ কেহ জাতীয় মতবাদের স্বাভাবিক ক্রমবিবর্ত্তনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে যাহারা সশস্ত্র বিদ্রোহ বা বিপ্লব করিতে ইচ্ছুক ও যাহারা গান্ধীবাদ, সংবিধান বা অপরাপরপথে প্রগতি আসিবে বলিয়া বিশ্বাস করেন; সকলেই নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার ও অপরের মতবাদ দমন করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে রাজী। প্রায়ই দেখা যায় যে চীনপন্থী, রুশিয়ানপন্থী ও গান্ধীবাদীদিগের মধ্যে বোমা নিক্ষেপ ছুরিকা ও বন্দুক ব্যবহার চলিতেছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রের বৃহত্তর আদর্শ অহিংস হইলেও প্রতিদ্বন্দিতা বিনষ্ট করিবার জন্যে ও সম্মুখের দ্বন্দের সাক্ষাৎভাবে মিমাংসা করিতে পাইপ-বন্দুক ও রিভলভার চালনা আদর্শবিরুদ্ধ মনে করা হইতেছে না। চীনের অনুচরের গুলিতে যেরূপ গান্ধীভক্তের প্রাণহানী হইতেছে, অহিংসাবাদীর গুলিও তেমনিই অবাধে মাও বিশ্বাসীর বক্ষে বিদ্ধ হইতেছে। এই নরহত্যার আবহাওয়া এমনই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে মানুষের প্রাণহরণ আর এখন একটা জঘন্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। বিরুদ্ধ রায় দিবার "দোষে" বিচারক খুন হইতেছেন; প্রশ্ন কঠিন করার অপরাধে পরীক্ষকের মাথায় বোমা বর্ষিত হইতেছে; ভাড়া আদায় চেষ্টার কারণে বাড়ীওয়ালা নিহত হইতেছেন, এবং যুদ্ধ থামাইবার জন্য পুলিশ আনাড়ী হস্তে গুলি চালাইয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বালক-বালিকা ও পথের পথিকের প্রাণহানী করিতেছে। এই যে নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড ইহার আড়ালে গা ঢাকা দিয়া বহু গুণ্ডা, ডাকাইত, চোর, ওয়াগণতোড় প্রভৃতি অপরাধীগণ নিজ নিজ দুষ্কার্য্য সাধনে তৎপর রহিয়াছে। যে সকল এলাকায় তথাকথিত রাষ্ট্রীয় দলগুলির যুদ্ধ সদা সর্ব্বদা চলিয়া থাকে সেই সকল এলাকায়ই দেখা যায় রেলের মাল গাড়ীর সাময়িক দাঁড়াইবার সাইডিং বা প্রতিক্ষাপথ বহু বিস্তৃতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। মালগাড়ীর দরজার গালার মোহর ভাঙ্গিয়া যাহারা মাল চুরী করে তাহাদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের "জোয়াল" ছেলেদের সদ্ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সকল জোয়াল ছেলে ও মালগাড়ীর "সিলতোড়" একই মানুষ। রাষ্ট্রীয় দলের সহিত সংযোগ থাকিলে পুলিশের হাত হইতে পার পাওয়া সহজ হয়। চোরাই মাল যাহারা কেনা বেচা করে সেই সকল ধনী ব্যবসায়ীগণও রাষ্ট্রীয় দলের নেতাদিগের সহিত অনেক সময়ে মিলিত থাকে। সুতরাং চোর, ডাকাত সিলতোড়, চোরাই মালের কারবারী এবং রাষ্ট্রীয় দলের মারপিটের ব্যবস্থাকারী-দিগের মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে বলিয়া দেখা যায়। এই অপরাধ প্রবণতা, অরাজকতা ও রাষ্ট্রনীতির মিশ্রণ সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য রাষ্ট্রে এইরূপ অবস্থা আর কোথাও নাই। রুশিয়া, আমেরিকা, চীন, অথবা বৃটেন ও ফ্রান্সে চোরাই মালের ব্যবসায়ীদিগের সহিত রাষ্ট্রকর্ম্মীদিগের সৌহার্দ্য কোথাও লক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষে ইহা যে ঘটিয়াছে তাহা আমাদের মহা দুর্ভাগ্যের কথা এবং আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া এই মিলন ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। নতুবা রাষ্ট্রকর্ম্মীগণ ক্রমশঃ চোর, পকেটমার, ছিনতাই কৌশলী, ডাকাত, ওয়াগণ বা মালগাড়ী লুণ্ঠক ও অন্যান্য সমাজ-বিরোধী অপরাধীজনের সংখ্যা গুরুত্ববশতঃ তাহাদের ভীড়ে তলাইয়া যাইবেন, ও ন্যায়ধর্ম্ম অবলম্বনকারী

সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ ভারতে আর কেহ থাকিবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে কতকটা এইরূপ অবস্থা একবার আমেরিকার মদ্যপান নিবারণ চেষ্টার ফলে হইয়াছিল। তখন বেআইনীভাবে মদ্য চোলাই ও বিক্রয় করা একটা মহালাভের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ও বহু গুণ্ডা ও খুনীরদল গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহাদের কার্য্য ছিল আইন বিরুদ্ধভাবে মদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। আমেরিকায় বেআইনি-ভাবে মদ্য চোলাই ও লুকাইয়া চালান ও বিক্রয় করার ইতিহাস দীর্ঘ ও বিচিত্র। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে "লাল" ইণ্ডিয়ানদিগকে মদ্য বিক্রয় করা আইন বিরুদ্ধ করা হয়। তখন গোপনে মদ্য লইয়া যাইবার চেষ্টা হইত হাঁটু অবধি লম্বা বুট জুতার ভিতর বোতল ভরিয়া রাখিয়া এবং এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয় "বুট লেগিং"। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে আইন করিয়া মদ্য বিক্রয় বন্ধ করা হয় কিন্তু সে আইন জোর করিয়া না চালাইবার ফলে অচল হইয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে পুনরায় আইন করিয়া মদ্যপান, প্রস্তুত, চালান ও বিক্রয় নিবারণ চেষ্টা করা হয়। তের বৎসর ধরিয়া অসংখ্য মানুষ এই মহালাভজনক বেআইনী ব্যবসায় চালাইয়া চলে ও ঐসকল আইনভঙ্গ বেআইনী মদ্য ব্যবসায়ীদিগের দলগুলি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে না করিত এমন দুষ্কর্ম্ম কিছু ছিল না। এই দলগুলিকে "গ্যাং" ও দলের মানুষগুলিকে "গ্যাংস্টার" নামে অভিহিত করা হইত; গ্যাংস্টার দলের স্ত্রীলোকদিগের নাম ছিল "গ্যাংস্টারস্‌মল"। গ্যাংস্টার নেতাদিগের ঐশ্বর্য্য ছিল অগাধ ও তাহারা রাজকর্ম্মচারীদিগকে কিনিয়া লইত। সেই জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই টিঁকিত না। আমেরিকাতে মদ্যের ব্যবসায়ত বন্ধ হইলই না, উপরন্তু নরহত্যা, জনবহুল রাজপথে গুলি বর্ষণ, লুঠ ও দুঃসাহসী নরনারীর নানা প্রকার সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্যের সংঘাতে শান্তিপ্রিয় সাধারণ জীবন ও পথের পথিকদিগের অবস্থা দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় আমেরিকার রাষ্ট্রনেতাগণ ক্রমশঃ মানিতে বাধ্য হইলেন যে মদ্যপান নিবারণ একটা সামাজিক আদর্শ হইলেও তজ্জন্য পথেঘাটে যখন তখন খণ্ডযুদ্ধের আরম্ভ হইলে আদর্শউপলব্ধির লাভ অপেক্ষা লোকসানের পরিণাম অধিক হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে ১৯৩৩ খৃঃ অব্দে ঐ মদ্যপান নিবারণ আইন বাতিল করিয়া আমেরিকা সাধারণ মানব জীবনের নিরাপত্তার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা অন্তত কিছুটা সফল হয়; কারণ "বুট লেগিং" না থাকায় "গ্যাংস্টার"দিগের ঐশ্বর্য্য প্রবাহ, চোরাই কারবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরস্পরের নিপাত চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়।

আমাদের দেশে যে সকল গুণ্ডার দল গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলির মূল প্রেরণা প্রথমতঃ ছিল রাষ্ট্রীয়। হিংস্র আক্রমণ, বিপ্লব ও বিদ্রোহ চেষ্টা কম্যুনিষ্টদিগের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রেরণার প্রাপ্তি বিদেশ হইতে হইয়াছিল। মস্কো ও তৎপরে পিকিং টাকা দিয়াও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আয়োজন করিত। সশস্ত্র আক্রমণে পৃথিবীর সকল দেশের শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া নুতন নুতন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গঠন করা হইবে, ইহা রুশিয়ায় এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল। সেই সকল নব গঠিত রাষ্ট্রের পরিকল্পনার অন্তর্গত পূর্ব্ব ভারতীয় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের কে রাষ্ট্রপতি হইতে এবং কে কে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবে সে সকল পরিকল্পনা পরে পিকিংএ স্থির নিশ্চয়ভাবেই প্রণয়ন করা হইয়াছিল। অর্থ ও অস্ত্র বিদেশ হইতে আসিতে থাকে ও সেই কার্য্যে বিপ্লববাদীগণ পাকিস্থান, বিদ্রোহী নাগা প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভারত শত্রু ও দেশদ্রোহীদিগের সাহায্য লাভ করে। ভারত সরকার উত্তমরূপে এই সকল কথা জানিয়াও ইহার কোন দমন ব্যবস্থা করেন নাই অথবা দমন চেষ্টা কিছুটা ঢিলাভাবেই করা হয়। তাহার কারণ ভারত সরকার তথা প্রদেশ শাসকদিগের মধ্যে বহু কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বন্ধুর প্রতিপত্তি ও উপস্থিতি। বিপ্লব-বাদী, বিদ্রোহ চেষ্টায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত দেশ শত্রুদিগকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগের সহিত মিতালি করিতে

ভারতের তথাকথিত কংগ্রেসী রাষ্ট্রনেতাদিগকেও দেখা যায়। সেজন্য সর্ব্বত্রই, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে দেখা যায় যাহারা রাষ্ট্র বিপ্লব করিয়া শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিতে চায় তাহাদেরই রাষ্ট্র দরবারে হাঁক-ডাক। তাহাদিগকে সময় সময় শাসক গণ্ডির অতি অভ্যন্তরে প্রবেশ অধিকার পাইতেও কোনই অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ফলে বিপ্লববাদীদিগের অনুচরগণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নানাভাবে রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত থাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিপ্লব ও বিদ্রোহ যে সমাজ ও রাষ্ট্রসংস্কার এবং পুনর্গঠন কার্য্যের একটা উত্তম উপায়; এ বিষয়ে সকল মানুষ একমত নহেন। বিপ্লব ও বিদ্রোহ প্রথমতঃ কষ্ট, ক্ষতি ও অজানা বিপদের সম্ভাবনার পথ। বহু লোকের মৃত্যু, অঙ্গহানী, গৃহসম্পদাদি ধ্বংস বিপ্লবের স্বাভাবিক ফল ত বটেই; তদ্ব্যতীত বিপ্লবের মধ্যেও দলাদলি, বিদেশী শত্রুর অনুপ্রবেশ, গুপ্তশক্তির অর্থপুষ্ট দলের আবির্ভাব ইত্যাদি অনায়াসেই ঘটিতে পারে। শেষ অবধি বিপ্লব ও বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া ফল কি দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং যদিও সমাজ ও রাষ্ট্রে বহু অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ ও নিষ্পেষণ প্রভৃতি থাকে ও সে সকল নির্ম্মূল করিতে হইলে অস্ত্রাঘাতই সহজ উপায় মনে হইতে পারে; তাহা হইলেও সেই পন্থা অনুসরণের বিপদ ও আশঙ্কার কথাও স্থির ধীরভাবে বিচার করিয়া লওয়া আবশ্যক ও উচিত। মানুষের যদি নিজের চরিত্র ও অভিরুচি পাপমুক্ত ও সুসংযত না হয় তাহা হইলে শুধু উচ্চ আদর্শ আবৃত্তি করিয়াই মানুষ কর্ম্মে জনমঙ্গল সাধনসক্ষম হইতে পারে না। বিপ্লববাদীগণ যাহার ঐশ্বর্য্য আছে তাহার ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে, যাহার শক্তি আছে তাহাকে শক্তিহীন করিতে, যেখানে অন্যায় আছে সেখান হইতে অন্যায় দূর করিতে পারেন বলিয়া মানিয়া লইলেও এই বিশ্বাস মনে জাগ্রত হয় না যে ঐ বিপ্লবীগণ ক্ষমতা হস্তে পাইলে নূতন পথে সামাজিক সম্পদের পুঁজি অন্যত্র অন্যায়ভাবে জমা হওয়ার উপায় সৃষ্টি করিবেন না। সাধারণ মানুষ তাহার ভাগে কি পাইবে তাহা কে বলিবে? এখন যাহারা জনসাধারণকে পেটে মারিতেছে তখন তাহারা না থাকিয়া অন্যলোকে যে সকলকে পেটে এবং পিঠে উভয় অঙ্গেই আঘাত করিবে না তাহার স্থিরতা কি থাকিবে? পুরাতন অন্যায় দূর হইয়া নুতন ঘোরতর অন্যায় যে আসিবে না তাহার নিশ্চয়তাই বা কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে? এই সকল প্রশ্ন ও সন্দেহ মনে জাগিত না যদি আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতাম যে যাহারা বিপ্লব ও বিদ্রোহ করিতে ইচ্ছুক তাহারা ততটা ছয় রিপুর দাস নহেন, যতটা আছেন বর্ত্তমানের রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিষ্ঠাবান শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ। কোন গোষ্ঠির মানুষ যে অপর সকল দলের মানুষের তুলনায় কম স্বার্থপর, লোভী, ষড়যন্ত্র প্রিয়, পক্ষপাত দোষদুষ্ট, ছল প্রতারক ও মতলব সিদ্ধির জন্য ন্যায় অন্যায় বোধহীন তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ কার্য্য নহে। কারণ আমরা সকল গণ্ডি ও দলের নেতাদিগকেই দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে কাহারও নিকট সুনীতি, ন্যায়সুবিচার ও সত্যনিষ্ঠা নিঃসন্দেহে আশা করা যায় না। ব্যক্তিগত লাভের কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখা যায় যে সকল নেতাগণই দলের সুবিধার জন্য জাতীয় বা মানবীয় আদর্শ ভুলিয়া অন্যায়ের পথে চলিত সহজেই প্রস্তুত হইয়া থাকেন।

ব্যক্তিগত লাভ যদি না হয় এবং বৃহত্তর লাভের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে সে লাভ জাতির অথবা বিশ্বমানবের নহে; শুধু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয়দলের গণ্ডিগত লাভ মাত্র, তাহা হইলে সীমিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিপ্লব বা সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়া ধ্বংসলীলার অবতারণা করার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? রাজবংশের শাখাপ্রশাখা নিজেদের উত্থান পতন লইয়া যে ভাবে রক্তপাতে নিযুক্ত হয় আজকাল বহুসংখ্যক রাষ্ট্রীয়দলের কলহবিবাদের সহিত সেই প্রাসাদ অভ্যন্তরের যুদ্ধের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র স্বার্থই ঐ জাতীয় দ্বন্দ্বের মূল কথা

ও সেই কারণে আমরা তাহার ভিতর কোনও মাহাত্ম্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আজকালকার রাষ্ট্রীয় মতবাদের ভিতরে মানব সভ্যতার উন্নততম নীতি, ধর্ম্ম বা আদর্শের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীর বিশ্বমানবীয় আদর্শের স্থান রাষ্ট্রীয়দলের মতবাদের ভিতরে থাকা সম্ভব হয় নাই। সেই কারণে কম্যুনিষ্ট মতবাদ যদিও বিশ্ব-মানবীয় বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা হইলেও তাহা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হয় নাই। জবাহরলাল নেহেরু দল গড়িয়া যাহা করিলেন তাহাতে গান্ধীত থাকিলেনই না, ভারতের অঙ্গেও নানা স্থলে ফাট ধরিয়া তাহা আমাদের জাতীয়তাকে আহত করিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে ও সান্নিধ্যে থাকিয়া যাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা জোরাল করিয়া লইয়াছিল তাহারাও নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই থাকিয়া গেল; কেহ এমন কিছু করিতে সক্ষম হইল না যাহার ভিতরে তাহাদের বিশ্বকবির সহিত ঘনিষ্টতার কোন স্থায়ী পরিচিতির স্বাক্ষর উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। মহামানবদিগের মাহাত্ম্য ক্ষুদ্রচেতা মানুষের চিন্তায়, ভাবে বা কর্ম্মে কখনও প্রস্ফুটিত গৌরবে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা ও উচ্চস্তরের নীতিবোধ রাষ্ট্র ক্ষেত্রে আজ-কার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত এক ছন্দে গ্রথিত হইতে পারে না; রাষ্ট্রীয় দল গঠন করিয়া যাহারা আত্মশ্লাঘা অনুভব করে এবং সত্যমিথ্যা ন্যায়-অন্যায় হেয়শ্রেয় নির্ব্বিচারে দলের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টাতে নিমগ্ন থাকে, তাহাদিগের অন্তরে কথায় কার্য্যে মহামানব ও ঋষিদিগের অমরবাণী জীবন্ত জাগ্রত রূপ ধারণ করিবে এ-রূপ আশা করা যায় না। বিরাট যাহা তাহা ক্ষুদ্র আধারে রক্ষিত হইতে পারে না। সমুদ্রের বিশালতা কূপোদকে প্রতিফলিত হইতে পারে না। আড়ষ্ট জিহ্বা, জড়কণ্ঠ ব্যক্তির মুখ হইতে উচ্চারিত বেদমন্ত্রে কোন মহিমা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। মানুষের মনুষ্যত্বের স্পর্শ ও মানব সভ্যতার পূর্ণ পরিচয় রাষ্ট্রীয় দলের কার্য্যকলাপের মধ্যে কাহারও পক্ষে পাওয়া সম্ভব হইতে পারে না। কারণ বর্ত্তমানকালের রাষ্ট্রক্ষেত্রে মানব চরিত্রের উন্নততর দিকগুলি ব্যক্ত হইতে সক্ষম হয় না। ষড়যন্ত্র, প্রবঞ্চনা, জন মনে ত্রাস সঞ্চার, প্রলোভন প্রদর্শন প্রভৃতি যে সকল উপায় রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহরহ অবলম্বন করা হয় তাহা ঠিক উন্নত নীতি অনুগত নহে। পুরাকালে রাজশক্তি অনেক সময়েই যথেচ্ছাচার প্রজা উৎপীড়ন, ইহার মাথা কাটিয়া বা উহার ধন সম্পত্তি কন্যা ভগ্নী হরণ করিয়া প্রকাশিত হইত। এখন যদি রাষ্ট্রক্ষেত্রের দলবদ্ধ শক্তিমানগণ ঐ একই ভাবে হত্যা, লুণ্ঠন ও মানব অধিকারের বিনাশ চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করে, তাহা হইলে মানব সমাজের শত শত বৎসরের স্বাধীন প্রগতিশীলতার সংগ্রাম বিফলে গিয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু এই যে নিদারুণ অবনতি ইহা রুশিয়া বা চীনদেশে না হইয়া শুধু আমাদের দেশে হইল কেন? রুশিয়ার মানুষ রুশসম্রাটকে অপসৃত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া অরাজকতার সৃষ্টি করে নাই। তাহাদের স্বাধীনতা উন্নতির সোপান হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। চীন দেশেও ভারতের মত বিভেদ বিভাগ বাহুল্য লক্ষিত হয় নাই। মতদ্বৈধ অথবা বিবাদ থাকিলে তাহা বৃহত্তর আকার গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি অন্বেষণ করিয়াছে; এ-দেশের মত খুচরা গুণ্ডাবাজী লুঠতরাজ, ছুরি চালান ও পটকা ফাটানর হীনতায় কখনও পতিত হয় নাই।

এই অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় জাতীয় চরিত্রে বহুমত, বহুজাতি, বহুভাষা প্রভৃতির ভাঙ্গন ধরান শক্তিমত্তার প্রভাব। বহুগণ্ডি, গোষ্ঠী, দল, সভা, সংঘ প্রভৃতি ভারতবর্ষে যেন আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। স্বাধীন ভারতের জন্মই হইল ভারতবিভাগ করিয়া। তৎপরে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীকে পুরস্কৃত ও ভূষিত করিতে গিয়া একের পর একটি প্রদেশ ও তাহার বিধানসভা মন্ত্রীসভা প্রভৃতির সৃষ্টি করিতে থাকিলেন। ভাগের ও দলের শেষ রহিল না। প্রথমে প্রদেশ ও পরে তন্মধ্যস্থিত অপরাপর ভাগ আকার গ্রহণ করিয়া প্রকট হইয়া

উঠিল। কায়স্থদল, ভূমিহারদল, রাজপুতদল, হিন্দু, শিখ, মুসলমান, হিন্দীভাষী, তামিলভাষী, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ—ভাগের বৈচিত্র ও তাহার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ভারতবাসীদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। হিন্দী চালাও, ইংরেজী তাড়াও, অখণ্ডভারত, শতখণ্ডভারত, মহারাষ্ট্র বাড়াও, গুজরাট পৃথক কর। পাঞ্জাবী ভাষা ও হিন্দী ভাষা একই ভাষা, হিন্দী ভাষা বলিয়া কোন ভাষাই নাই, সকল জাতি ও উপজাতির পৃথক প্রদেশ গঠন করা হউক ইত্যাদি ইত্যাদি আন্দোলন, আলোড়ন ও নিত্য নূতন ভাগিদের সংঘাতে যে ভারত মন্থন আরম্ভ হইল তাহা হইতে ক্রমাগতই হলাহল নির্গত হইতে থাকিল, অমৃত ভাণ্ডের সাক্ষাৎ কখনও পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল না। স্বদেশী প্রেরণা ও ভাবাবেগের শেষ নাই, তাহার উপর জুটিল বিদেশী আদর্শ ও মতবাদের প্রবাহ। মার্কস, লেনিন, ট্রট্স্কি, স্টালিন, হোচিমিন, মাওৎসেটুঙ্গ ক্ষুদ্র বৃহৎ দলের পয়গম্বর হইয়া দেখা দিলেন ও আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই হইল যে এই সকল নূতন ও বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক আদর্শের আমদানীর ব্যবস্থা করিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। উদ্দেশ্যটা যে ভারতীয় মানবের আত্মার উন্নতি ছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজ ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহাতে যোদ্ধাগণ নানান পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া যায় সে চেষ্টা বরাবরই করিয়া আসিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ভাড়াটিয়া লোক লাগাইয়া করাইতে ইংরেজ কোনও লজ্জা অনুভব করে নাই। এখন রুশিয় বিপ্লবান্তে কিছু কিছু ইংরেজ প্ররোচক ভারতে কম্যুনিজম্ প্রচার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। লাটসাহেবের হুকুমে রাজনৈতিক কয়েদীদের কম্যুনিষ্ট সাহিত্য পাঠ করিতে দেওয়া আরম্ভ হইল এবং ইহাকে প্রগতিশীল সমাজবাদ বলিয়া শিক্ষিত যুবজনের মধ্যে প্রচার করা হইল। এবং অসাম্প্রদায়িক বিপ্লববাদে ইহা সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলিয়া গ্রাহ্য করাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই সময়ে রুশ দেশীয় কম্যুনিষ্ট নেতাগণও ইংরেজের শিক্ষিত ভারতীয় আন্দোলনকারীদিগকে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও ভারতীয়গণের বিপ্লববাদ ও কম্যুনিজম্-এ শিক্ষা-দীক্ষা ব্যাপক আয়োজনের সহিত আরম্ভ হইল। লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্রে যাহারা ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া প্রচার ও শিক্ষাদান কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাদিগের মধ্যে কে কম্যুনিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট-সহচর আর কে যে নিছক জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাকামী, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল। বিপ্লববাদ, কম্যুনিজম্ ও অন্যরং-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম সে সময় সহজে পৃথক করিয়া দেখান সম্ভব ছিল না। রুশিয়ার কম্যুনিজম্, তুর্কীর জাতীয়তা-বাদ, আয়রলণ্ডে রিপাবলিকান সেনাদলের বৃটেনের সহিত যুদ্ধ, অ্যানামের বিদ্রোহ চেষ্টা ও চীনে মানব অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা ; সকল কিছুই পরস্পরের সহিত সহানুভূতির বন্ধনে বাঁধা ছিল বলা যায়। আদর্শবাদের পার্থক্য, বৈচিত্র ও বিভেদ লইয়া ন্যায় শাস্ত্রগত তর্কবিতর্ক পরে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। কম্যুনিজম্ প্রচারের পিছনে অর্থবল ছিল, আর ছিল রুশরাষ্ট্রের মতবাদ ব্যাখ্যা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট। সুতরাং ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ও বিদ্রোহপন্থী দলগুলির সহিত প্রতি-যোগিতায় কম্যুনিষ্ট দলের লোকদের প্রচার শক্তি অধিক অর্থপুষ্ট ও দার্শনিক মতবাদ-সম্পদে-ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া তাহারা যুবজন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভে অধিক সক্ষম হইল। রুশিয়ায় যখন রুশ সম্রাটকে নিহত করিয়া জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইল তখন (১৯১৭ খৃঃ অব্দে) ভারতে সহস্র সহস্র যুবক অস্ত্র চালনা শিক্ষা করিয়া ইংরেজকে সশস্ত্র আক্রমণে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থাও হইয়াছিল ; কিন্তু নানা ঘটনাচক্রে সে সকল অস্ত্র আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া তখনকার মত বিপ্লব চেষ্টা বিফল হয়। বিপ্লববাদ ও সশস্ত্র বিদ্রোহ চেষ্টা কিন্তু চলিতে থাকে। এই

যদিও কম্যুনিষ্ট মতবাদ তখন বহুস্থলে প্রচারিত হইতে-ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যাহারা করিয়াছিল তাহারাও ছিল প্রবল জাতীয়তাবাদী (১৯২৯)। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আত্মদানের সেই অমর কাহিনীর আবৃত্তি করিবার এই স্থলে কোন প্রয়োজন নাই। এই সময় কম্যুনিষ্ট দল ভারতে অনেকটা সুগঠিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার কার্য্য সে সময়ে ছিল বৃটিশ রাজশক্তির সহায়তা করা। বাংলাদেশে ১৯৪৩ খৃঃ অব্দের প্রলয়ংকর দুর্ভিক্ষে যখন লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে প্রাণ হারায় তখনও কম্যুনিষ্ট দলের নেতাগণ বৃটিশের যুদ্ধ চেষ্টায় যাহাতে কোন বাধা না পড়ে তজ্জন্য জনসাধারণকে লুঠপাট করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না করিয়া শান্তভাবে (অনাহারে) থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট-দিগের বিশ্বমানবীয় মুক্তি সংগ্রাম তখন ভারতে মুলতবী রাখা হয়। কারণ ইংরেজ রুশের শত্রু হিটলারের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ভারতীয় কম্যুনিষ্টদিগের নিকট তখন মাতৃভূমি ভারতের মুক্তি অপেক্ষা বড় কথা ছিল রুশিয়ার প্রাণ বাঁচান। সুভাষচন্দ্র রুশ শত্রু জাপানের সাহায্য লইয়া ভারত হইতে বৃটিশ রাজত্বের উচ্ছেদ চেষ্টা করিয়া-ছিলেন বলিয়া তিনি কম্যুনিষ্টদিগের নজরে নিম্নস্তরে নামিয়া গেলেন।

এখন অবশ্য সেই সকল পুরান কথার কোন মূল্য নাই। নেতাজী সুভাষের নাম ভাঙ্গাইয়া স্বার্থ সিদ্ধি চেষ্টা করিতে কম্যুনিষ্টদিগের আর বাধে না। সে যুগের বিপ্লবীদিগের বহুলোক কালক্রমে অহিংস নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন; অনেকে মার্কস-দর্শন চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন এবং বহুলোকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতি দেখিয়া বীতকাম হইয়া অপর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। দেশপ্রেম, দেশভক্তি জাতীয় উন্নতির আবশ্যকতা, দেশবাসীর মঙ্গল, ন্যায়, সুবিচার, মানবীয় অধিকারের মূল্য বোধ প্রভৃতি স্বজাতি প্রীতির অন্তরের কথা বহুলোকেই আজিও মনে প্রাণে মানিয়া চলেন; কিন্তু ঐ সকল কথা আধুনিক ঢংএ উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিবার কথা নহে; অনুভূতির বিষয় মাত্র। সেইজন্য 'অলীকের অনুসন্ধিৎ-সাই এখন রাষ্ট্রক্ষেত্রের সক্রিয়তার কথা। তাহার আলোচনা না করিয়া দেখা যাউক পারিপার্শ্বিকের সংঘাতের ভিতরে মাথা তুলিয়া কেমন করিয়া দেশবাসীর পক্ষে প্রাণ বাঁচাইয়া জীবন যাপন সম্ভব হইতে পারে।

অন্য প্রদেশেও অপরাধ ও অরাজকতা বর্দ্ধনশীলভাবে বর্ত্তমান আছে। লুঠ ও ডাকাইতি এবং তৎসঙ্গে নরহত্যা প্রভৃতিসকল প্রদেশেই সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশে দলবদ্ধভাবে তথাকথিত "আদর্শবাদী"গণ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাকেও হত্যা করিতেছে, কাহারও ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে, কোন কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ না দিলে হত্যা করা হইবে বলিয়া জানাইতেছে এবং সর্ব্বত্রই লোকের আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া লইয়া এবং বলপূর্ব্বক চাঁদা আদায় করিয়া জন-সাধারণের জীবন অসহ্য ও অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। পুলিশও এই প্রকারের হত্যা, জোর জুলুম ও বন্দুক পিস্তল ছিনাইয়া লওয়া হইতে মুক্তি পায় না। এই যে ব্যাপক অপরাধ ও অরাজকতার বন্যা, ইহার পশ্চাতে অর্থবল ও উচ্চস্তরের মানুষের সহায়তা রহিয়াছে। যাহারা বিদেশীর প্ররোচনায় এই দেশে বিপ্লব আনয়ন চেষ্টা করিতেছে তাহারাই এই সকল কার্যের সহায়ক ও নির্দেশ দিবার জন্য দায়ী। ইহাদের সহিত আছে ধনবান চোরাই মালের কারবারী, গুণ্ডা ও ডাকাইত দলের নেতা এবং কিছু পুলিশের লোক যাহারা গোপনে অপরাধের সহায়তা করিয়া উপার্জ্জন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। সমাজ-বিরোধী অপরাধপ্রবণ লোকদের সহিত রাষ্ট্রীয় দলের সংযোগ সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখা যায় এবং একথা বলিতেই হয় যে যদিও সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মের সহিত আরম্ভে বামপন্থি-দিগের সাহায্য প্রকট ভাবে দেখা যাইত, বর্ত্তমানে দক্ষিণ বা মধ্যপথের পথিকগণও এই সকল অপরাধের ক্ষেত্রে নির্দ্দোষ নহেন। সুতরাং যদি বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির

শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া শাসকগণ মনে করেন যে কংগ্রেস (আর) দলের সেচ্ছাসেবক হইলেই মানুষ কোনও অপরাধের সহিত জড়িত হইবে না তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির শাসকদিগকে বলিতে হইবে যে ঐ ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নহে। যাহারা পূর্ব্বে নিজেদের বামপন্থী বলিয়া লুঠ, গুণ্ডাবাজী ও বলপূর্ব্বক অথবা ভয় দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিত, এখন তাহারাই অন্য দলে যুক্ত হইয়া ওয়াগন ভাঙ্গা, ছিনতাই ও বোমা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিঠি লিখিয়া ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়, মাসিক চাঁদা না দিলে দোকান লুটের ভয় দেখান, সাধারণ গৃহস্থের ঘরে জোর করিয়া ভোজন ব্যবস্থা করিয়া লওয়া ইত্যাদি নিত্য নূতন জুলুম-বাদের অভিব্যক্তি বাড়িয়াই চলিয়াছে। পুরাতন ডাকাইতি, স্ত্রীলোকদিগের গায়ের গহনা ছিনাইয়া লওয়া ওয়াগন লুঠ প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেই আছে ও তাহার কোনও বিরামের সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না। মিটিং করিয়া রাজনৈতিক দলের নেতাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশের অবস্থার উন্নতি সাধন অসম্ভব, কারণ যাহাদের সহিত পরামর্শ করা হইতেছে তাহাদের সহিতই অপরাধীদিগের গুরুদিগের গভীর সংযোগ ও ঘনিষ্ঠতা। রাষ্ট্রীয় দলগুলি যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকে, সে অর্থ কোথা হইতে আইসে তাহার অনুসন্ধান কে করিয়া দেখে ? চাঁদা যাহারা দেয় তাহা-দের মধ্যে কতজন চোরাই কারবারের সহিত সংযুক্ত আছে তাহার খবর কে লইতেছে ?

রাষ্ট্রীয় দলগুলির সাহায্যে দেশের কোন উন্নতি হই-তেছে কি ? যদি না হইতেছে তাহা হইলে ঐ দলগুলি স্বেচ্ছায় পাট উঠাইয়া দিয়া দেশের স্কন্ধের বোঝা হালকা করিবার ব্যবস্থা করে না কেন ? দেশবাসী এই সকল রাষ্ট্রীয়দলের মাতব্বরদিগের উপদেশ ও প্রেরণা না পাইলেও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করিতে সক্ষম হইবেন। গ্রামের পঞ্চায়েৎ, তৎপরে জেলা পরিষদ ও শেষে প্রদেশের বিধানসভা গঠন রাষ্ট্রীয় দলের সাহায্য না পাইলেও সম্পাদিত ও চালিত হইতে পারিবে এবং মন্ত্রীসভা প্রভৃতি দল না থাকিলেও নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে। সকল রাষ্ট্রীয় দলেরই মূল উদ্দেশ্য দেশবাসীর জীবনযাত্রা উন্নত ও আনন্দময় করা, সুতরাং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি দলগুলির অবসান হওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া দেখা যায় তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাই জন মঙ্গলের জন্য করা আবশ্যক হইবে। দেশবাসীর এই কথা সুস্থির ভাবে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অপরাধ প্রবণতার বর্ত্তমানে যে ব্যাপক বিকাশ তাহা শুধু চির প্রচলিত ব্যক্তিগত দুষ্টতাজাত নহে। পূর্ব্বে তাহার উৎপত্তি হইত সমাজের কিছু কিছু মানুষের চরিত্রের বিকৃত অবস্থা হইতে এবং সেই অপরাধের ধারা আজকার মত প্রবল বন্যায় প্রবাহিত হইত না। এখন যাহা হইতেছে তাহা কখনও হইতে পারিত না যদি না তাহার পশ্চাতে বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় দল ও বৃহৎ ব্যবসা ও ধনীক মহলের সহায়তার প্রাদুর্ভাব হইত। ঐরূপ সংযোগ থাকাতে পুলিশ ও কখন কখন কোন কোন শক্তিমান মন্ত্রীস্থানীয় ব্যক্তিদেরও অপরাধীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতায় জড়িত থাকিতেদেখা যায়। এই কারণে যেহেতু পুলিশ দেশে শান্তিরক্ষা করিতে এবং দেশ-বাসীকে অরাজকতা হইতে বাঁচাইতে পারিতেছে না, সেইজন্য পুলিশের বহু ব্যক্তির কর্ম হইতে অপসরণ আবশ্যক। শুনা যাইতেছে যে কিছু কিছু লোক বরখাস্ত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টা অনেক ভিতর অবধি শিকড় গজাইয়াছে; বিশেষ করিয়া বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের শাসন-কাল হইতে; এবং এখন চিকিৎসা ব্যবস্থাও সেই বিষ বহিষ্করণ প্রয়োজনের বিস্তার বিচার করিয়া করিতে হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দল ও রাজকর্মচারীদিগের সমবেত সমর্থন এবং আইন প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা কার্য্যে অবহেলা নিবারণ ব্যবস্থা করিলেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে একথাও নিশ্চয়তার সহিত বলা চলে না ; কারণ বর্ত্তমানকালে আরও দুইটি আইন ভঙ্গ ও বিশৃঙ্খলা সৃজনকারী শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার সহিত অপরাধ ও অরাজকতার সম্বন্ধ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। একটি হইল ছাত্রদিগের সংঘবদ্ধভাবে

শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদিগের উপর আক্রমণ চালাইবার আয়োজন ও সেই কার্য্যের জন্য ন্যায়-অন্যায়বোধ বর্জ্জিতভাবে রসদ সংগ্রহ চেষ্টা। এই খানেই ছাত্রদিগের সহিত অপরাধী গোষ্ঠীর সংযোগের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ছাত্রগণ স্বভাবতই নির্ভিক, দুঃসাহসী এবং কঠিনকার্য্যে আত্মনিয়োগে সদা অগ্রগামী। তাহারা যদি কোন কারণে ন্যায় ও সামাজিক শৃঙ্খলার পথ ছাড়িয়া নিজেদের দেহমনের শক্তি অন্যায়ের পথে চালনা করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে দেশের একটা মহা ক্ষতির কারণ সৃষ্টি হয়। ছাত্রদিগকে এইরূপ পরিণতি হইতে রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রয়োজন শিক্ষকদিগের ব্যক্তিত্ব বিশেষ উচ্চস্তরের যাহাতে হয় সেইরূপভাবে তাঁহাদের নির্বাচনওবেতনাদির ব্যবস্থা করা। শিক্ষক যাঁহারা হইবেন তাঁহাদের নিয়োগ বিশেষ সাবধানতার সহিত করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণ যদি আকৃষ্ট না হয় ও শিক্ষককে যদি তাহারা ভক্তি শ্রদ্ধা না করে তাহা হইলে শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া ক্রমশঃ বিষাক্ত হইয়া উঠে। শিক্ষকের জ্ঞান, বুদ্ধি চালচলনের আভিজাত্য ও শরীর মনের বৈশিষ্ট যদি উত্তম ও প্রশংসনীয় না হয় তাহাহইলে ছাত্রদিগের উপর শিক্ষকের প্রভাব থাকা সম্ভব হইতে পারে না। বর্ত্তমানে শিক্ষালয়ে যে প্রকার শিক্ষকদিগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় তাহাতে মনে হয় তাঁহাদিগের নির্বাচন আরও উৎকৃষ্ট না হইলে ছাত্র মহলে শিক্ষকের প্রতিপত্তি বাড়া সম্ভব হইবে না। ছাত্রশক্তি ও যুবজনের প্রতিভা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইয়া ধ্বংসাত্মকভাবে অপব্যয় হইলে জাতির উন্নতি ও মঙ্গলের পক্ষে তাহা অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কি হইতে পারে তাহা বলা কঠিন। এই জন্য আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব শীঘ্র শিক্ষাক্ষেত্রের সকল অঙ্গের সংস্কার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। যেখানে দেশের ভবিষ্যৎ আশা যুবজনের সর্ব্বনাশ হইতেছে সেখানে কৃপণ হস্তে শিক্ষকদিগের বেতনের, পাঠের জন্য বৃত্তির ও খেলাধূলার আয়োজনের ব্যবস্থা করা দেশনেতাদিগের বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। আরও দেখা যায় ছেলেমেয়েদের পাঠ ব্যতীত অপর আগ্রহের পূর্ণতা আহরণ ব্যবস্থা উপর হইতে বিশেষ করা হয় না। যাহার প্রতিভা যে দিকে প্রকাশ পাইতে চায় তাহাকে সেইদিকে যাইতে দেওয়া হয় না। কৃষ্টির ও ভিতরের সুপ্ত সৃজন ক্ষমতার জাগরণের দিক দিয়া ইহা একটা মহা লোকসানের বিষয়। যুদ্ধবিদ্যা, বিমান পরিচালনা কৌশল, পর্ব্বত আরোহণ, নানাপ্রকার যন্ত্র চালনা; কাব্য-সাহিত্য-নাটক-সঙ্গীত-বাদ্য-চিত্রকলা-ভাস্কর্য্য প্রভৃতির অনুশীলন নিজ হইতে নিজের খরচে অল্প কেহ কেহ করে; কিন্তু সেইসকল কার্য্যের প্রেরণার ঐশ্বর্য্য কত সহস্র অন্তরে অজানাভাবে নিহিত থাকিয়া বিলুপ্ত হয় তাহার খবর দেশনেতাগণ রাখেন না। ছাত্রদিগকে শুধু নির্দ্দেশ, শাসন ও সুনীতির বাণী শুনাইয়া সমাজ সহায়তার পথে অগ্রগমনে লইয়া যাওয়া যায় না। এ দেশে শিক্ষার খাতে মাথাপিছু বাৎসরিক যে অর্থব্যয় করা হয় তাহা শুনিলে সভ্যজগতের অপর জাতির লোকেরা হাসিয়া মরিবে। সম্ভবতঃ হিসাবে তাহা এক এক ব্যক্তির জন্য বৎসরে ছয় টাকা করিয়া হয় বলিয়া দেখা যাইবে। অপরাপর দেশে ঐ ব্যয় মাথা পিছু বাৎসরিক ছয় হাজার টাকাও হইয়া থাকে। দেখা দরকার সকল শিক্ষকের বেতন দ্বিগুণ করিলে কত খরচ হয়। খেলার মাঠ, ক্রীড়া ও ব্যায়াম ব্যবস্থা, বৃত্তি প্রভৃতি সকল কিছু দ্বিগুণ করিতেই বা কত টাকা লাগে? কিছু কিছু ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে দেশভ্রমণে পাঠাইলে কি প্রকার অর্থের প্রয়োজন হয়? এই জাতীয় কথা লইয়া কোনও আলোচনা কি দেশনেতারা করিতে প্রস্তুত আছেন? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ, শিক্ষক গোষ্ঠী ও শিক্ষা পদ্ধতি, সকল কিছুই যদি এত উত্তম আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় যে তন্মধ্যে পরিবর্ত্তনের কোনও স্থানই নাই তাহা হইলে আমাদের ছাত্রদিগকে ঐ সকলের বিরোধিতা করার জন্য উন্মাদ ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ বলিয়া ধরিতে হয়। ঐরূপ ধরিয়া লওয়া একটা অসম্ভব কথাকে চরম সত্যের আসনে বসাইবার

চেষ্টা বলিয়া ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়া যাইবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে যেসকল সংস্কার, নূতন ব্যবস্থার আয়োজন প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক তাহা করিতে বিলম্ব বা অবহেলা করা উচিত হইবে না। দেশশাসক ও ব্যবস্থাপকদিগের কর্মে কোন ত্রুটি যখন থাকিবে না তখন বিচার করা যাইবে যে ছাত্রদিগের মধ্যে বিপ্লবী বা নকশাল পন্থী কেহ আছে কি নাই। দেশশাসক ও ব্যবস্থাপকগণ যেখানে যে কার্যেই হাত লাগাইয়া থাকেন সেখানেই গলদ আগাছা-কুগাছার মত অবাধভাবে গজাইয়া উঠিতে দেখা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাহা না হইয়া যাইতে পারে না। এবং ঐ ক্ষেত্রে যে বহু পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা সর্বজন স্বীকৃত।

অফিস, দফতর, কারখানাতে যাহারা কাজ করে তাহারাও নানাপ্রকার গোলযোগ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অরাজক কার্য্যকলাপে নিযুক্ত হয় বলিয়া দেখা যায়। কর্মীদিগের অভিযোগ যে তাহারা যাহা পায় তাহাতে সর্বত্র মূল্য বৃদ্ধির ফলে জীবন নির্ব্বাহ সম্ভব হয় না। তাহাদের কার্য্য হইতে যে লাভ করা হয় তাহার একটা ন্যায্য অংশ তাহাদের প্রাপ্য কিন্তু সেই অংশের সবটুকু তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। এই সকল কারণে তাহারা ক্রমাগত আন্দোলন করিয়া ও কখনও কখনও মালিক ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদিগের উপর ঘেরাও ও হিংসাত্মক আক্রমণ চালাইয়া নিজেদের দাবী পেশ করিবার চেষ্টা করে। ফলে বহু কারখানায় গোলমাল বৃদ্ধি হইয়া হরতাল ও তালাবন্ধ হইয়া থাকে। এইভাবে কয়েকশত কারখানা শুধু পশ্চিম বাঙলাতেই বন্ধ হইয়াছে ও কয়েক লক্ষ কর্ম্মী বেকার অবস্থায় বসিয়া আছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অফিস, দফতর ও কারখানা পরিচালনায় এ দেশে এখনও অতি পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলা হয়। ইয়োরোপ আমেরিকায় যেখানে একজন শ্রমিক যতটা কাজ চালাইয়া লয়, এদেশে সেইখানে ততটা কাজ করিবার জন্য তিন চারজন কর্মে বহাল হইয়া থাকে। না দিবার সুবিধার সৃষ্টি হয়। ইয়োরোপ, আমেরিকায় একজন কর্ম্মী যতটা উৎপাদন কার্য্য করে এদেশে অনেক সময় চারজন লোক তাহা হইতে অল্প উৎপাদন করে। মালিকগণ ঐভাবে কাজ হয় বলিয়া বেতন দিবার বেলায় ইয়োরোপ, আমেরিকার তুলনায় এক দশমাংশও না দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। কর্ম্মীদিগকে যদি কেহ বলে যে তাহাদের কর্ত্তব্য ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্যের রীতি অনুসরণ করিয়া অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা কার্য্য উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা; তাহা হইলে কর্ম্মী ও তাহাদের কর্ম্মী-ইউনিয়নের নেতাদিগের ঘোরতর আপত্তি হইতে শুরু হয়। এই অবস্থায় কোন্ কর্ম্মীর দ্রব্য উৎপাদনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে ও কোন্ কোন্ কর্ম্মী শুধু অপরের সহিত লটকাইয়া থাকিয়া একটা কিছু বেতন পাইয়া থাকে ; এ কথার কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। বিগত ১৫।২০ বৎসরে বহু নূতন নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে অনেক কারখানা জাতীয় কারবারের অন্তর্গত। কিন্তু এই সকল নবপ্রতিষ্ঠিত কারখানাতেও সেই পুরানো কর্মী নিয়োগ রীতিই প্রচলিত থাকিয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্মী নিয়োগ ও অত্যল্প পরিমাণে বেতন নির্দ্ধারণ একই অর্থ নৈতিক ব্যাধির বিভিন্ন লক্ষণ। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় যখন দেখা গিয়েছিল যে যুদ্ধজয় একটা বন্দুক চালনা অপেক্ষা বন্দুক তৈয়ার করারই সমস্যা এবং কারখানা হইতে যুদ্ধের মাল মশলা উৎপাদন ও সরবরাহই যুদ্ধের আসল কথা, তখন কারখানার কর্ম্মীদিগের সহিত সহযোগিতায় যে উৎপাদনের ও বেতনের সমন্বয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয় তাহাতেই পাশ্চাত্যের একটা অতি পুরাতন অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান সাধিত হইয়া যায়। আজও সেই ব্যবস্থাই অল্পবিস্তর অদল বদল করিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য বিলিব্যবস্থার নানাপ্রকার অর্থহীন অনুকরণ করা হয় কিন্তু তাহা হইতে কোন লাভ হইতে দেখা যায় না। নিয়োগকর্ত্তা অথবা

কারখানা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বহু কথা শুনা যায় কিন্তু কার্য্যতঃ কিছু হইতে দেখা যায় না। অর্থাৎ শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধজাত যত হাল্লা হাঙ্গামা তাহার কোনও দিন নিবৃত্তি হইবে বলিয়া আশার উদ্রেক হয় না। এই ক্ষেত্রেও কোন কোন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ শাসক ও ব্যবস্থাপকদিগের অদূরদর্শিতা, অজ্ঞানতা ও অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা। ব্যবসা বাণিজ্য কারখানা পরিচালনা জাতীয় করিয়া লইলেই শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্বের অবসান হয় না; বরঞ্চ মালিক হইয়া দাঁড়ায় শাসকগোষ্ঠী এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় একটা অতি বিরাট কর্ম্মীবাহিনী। এ অবস্থায় মালিক শ্রমিক ও তাহাদের কলহ সকল কিছুই এক একটা বিরাট জাতীয় আকার ধারণ করে। সমস্যাটা বিকটাকৃতি হইয়া ওঠে মাত্র—তাহার সমাধান হয় না। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কাজ-কারবার থাকিলে ও সেই স্থলে শাসকদিগের তত্ত্বাবধান সক্রিয় হইলে মালিক-শ্রমিক সমস্যার সমাধান সহজ হয়। শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব একটা সর্ব্বব্যাপী আকার গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৃহযুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়ায় না।

এখনকার পরিস্থিতি যাহা তাহার মধ্যে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন সমস্যার সহিত রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের নানান ব্যাধি ও অমীমাংসীত প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে। দেশের মানুষের যদি সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভাব দূরীভূত করাইয়া জাতীয় উন্নতির সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে সেই কার্য্য আইন প্রনয়ণ বা রাজকর্ম্মচারী অদল বদল করিয়াই সাধিত হইবে না। সেজন্য আবশক হইবে প্রথমতঃ সর্ব্বক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও বিচার এবং তৎপরে কাম্য ও আকাঙ্ক্ষিত যাহা তাহার বিবৃতি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ইহা সুসম্পন্ন হইলে বুঝা যাইবে কোথায় কি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ব্যক্তির জীবনে যেমন অভাবের কথা বলিলেই আর্থিক অভাবের আকৃতি সর্বাগ্রে প্রকট হইয়া দেখা দেয়, জাতির বিভিন্ন অভাবের মধ্যেও অর্থাভাব তেমনিই প্রবলতম বলিয়া ধার্য্য হয়। এই অর্থাভাব অন্য নানা প্রকার অভাবের মূলে আছে বলিয়া ইহা দূর না হইলে অন্য বহু অভাবকে সহজে নাড়া দিতেও কেহ সক্ষম হয় না। অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি যে সকল উপায়ে হয় তাহার মধ্যে মূলধন সংগ্রহ ও সেই মূলধন ব্যবহারে ঐশ্বর্য্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জাতির মানুষদিগের উপার্জ্জন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য উপায় কিন্তু ভারতের শাসকগোষ্ঠী রাজস্ব আহরণ চেষ্টায় ভারতীয় মানবের উপার্জ্জনের এত অধিক-অংশ রাষ্ট্র করায়ত্ত করিয়া লইয়া থাকে যে তাহাদের পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করিয়া মূলধন বৃদ্ধি একটা অসম্ভব কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্র যদি লাভ জনক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা কারখানা চালাইতে পারিত তাহাহইলে রাষ্ট্রীয়ভাবে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য দিয়াই জাতীয় মূলধন বৃদ্ধি হইতে পারিত। কিন্তু রাষ্ট্র কোনও কার্য্যে হস্তাক্ষপ করিলেই তাহাতে অর্থের অপচয় ও লোকসান হয়। সুতরাং শাসকগোষ্ঠী যদি বর্ত্তমান রীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন তাহা হইলে দেশের আর্থিক উন্নতির কোন আশা থাকিবে না। অন্য দেশে যথা অমেরিকায় কোন মানুষের বাৎসরিক আয় অন্তত ২২৫০০ টাকা হইলে তবেই তাহাকে আয়কর দিতে হয়। আমাদের দেশে বাসৎরিক ৫০০০ টাকা আয় থাকিলেই মানুষকে আয়কর দিতে হয়। অধিক আয় থাকিলে ভারতের মানুষকে শতকরা ৯৭৷৷০ পর্য্যন্ত আয়কর দিতে হয়। অর্থাৎ সেই অবস্থায় অতিরিক্ত ১০০০ টাকা উপার্জ্জন করিলে করদাতার পকেটে মাত্র ২৫ টাকা নিজস্ব বলিয়া থাকে, এবং ১০০০ টাকার মধ্যে ৯৭৫ টাকা সরকারী তহবিলে চলিয়া যায়। এই অবস্থায় যদি কেহ ৩০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া রাজস্ব ফাঁকি দিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার ১০০০ টাকা রোজগার করা (রাজস্ব দিয়া) অপেক্ষা ঐ ৩০ টাকাই অধিক লাভ জনক মনে হইবে। কালোবাজারী

কেনা বেচা, চোরাই মালের কারবার লুঠ ও অপরাপর অন্যায়ভাবে পাওয়া টাকা কেন যে এত বাঞ্ছনীয় জিনিস তাহা আয়করের উপরোক্ত বর্ণনা হইতে উত্তমরূপে বোধগম্য হয়। ইহার উপর আছে মোট ঐশ্বর্য্যের উপর রাজকর এবং ক্রয় করা দ্রব্যের উপর আবকারী খাজনা। ভারতের মানুষ অনেক সময়ই সকল রাজস্ব মিলাইয়া দেখিলে আয় অপেক্ষা রাজস্ব অধিক দিতে বাধ্য হয়। যে দেশে সকল ব্যক্তির ক্ষতি করিয়া শোষন পদ্ধতিতে কাড়িয়া লওয়ার মত রাজস্ব আদায়ের রীতি কায়েমী হইয়া দাঁড়াইতেছে, সে দেশে যে রাজস্ব ফাঁকি দিবার জন্য সকল সততা বর্জ্জন করিয়া শঠতা চুরী ডাকাইতি ও অপরাধ প্রবনতায় দেশবাসী ক্রমে ক্রমে পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া যাইবে তাহতে আশ্চয্য হইবার কিছুই নাই।

বলা যাইতে পারে রাজস্ব আদায় না করিয়া রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার ব্যয় কি করিয়া মিটান সম্ভব হইতে পারে? কথাটা কিন্তু অবিবেচনার কথা নহে। তবে যে অর্থনৈতিক পথে চলিয়া ভারতের শাসকদিগের এই অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে সে পথ পরিবর্ত্তন করিলে অবস্থার উন্নতি হইবে কিনা, সে কথার বিচার করিয়া দেখা হইতেছে না কেন? হাজার হাজার কেটি টাকা কর্জ্জা করিয়া সেই অর্থ ভুলভাবে ব্যয় করিয়া কোন লাভ হইতেছে না দেখিয়াও না দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। ভারত সরকার কর্জ্জার টাকায় খরচ চালাইয়া লইয়া রাজস্বের হার কমাইয়া ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও সেই সঞ্চিত মূলধনে ব্যক্তিগত স্বত্বের ব্যবসা, বাণিজ্য ও কারখানা বৰ্দ্ধিত হইতে দিলে, আমাদের মনে হয় ভারতের বেকার সমস্যা, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির বাধা ও মন্দগতি, রাজস্ব ফাঁকি দিবার আকাঙ্খা প্রভৃতি অনেক অবাঞ্ছিত অবস্থা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইবে। সকল মূলধন রাষ্ট্রের হইবে, সকল কর্ম্মী রাষ্ট্রের চাকুরি করিবে, ব্যক্তির অধিকার খর্ব্ব করিয়া রাষ্ট্রের অধিকার সর্ব্বব্যাপী হইবে ইত্যাদি সমাজবাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হইলে জাতীয় চরিত্রের অনেক পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন হয়। এখন জাতির মানসিক কাঠামো ও চরিত্র যেরূপ আছে তাহাতে যে পথে চলিলে এই পরিস্থিতিতে জাতির উন্নতি হইতে পারে সেই কথাই চিন্তা করা আবশ্যক এবং আমাদের আলোচনাও সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই করা হইল। জাতি, সমাজ, ও ব্যক্তি জীবনের উন্নততম আদর্শ বিচার করিবার আগ্রহে যদি ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে ভুলিয়া যাওয়া হয়; শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য পথে চলিবার সময় যদি "আমরা সকলে অমৃতের সন্তান" চিন্তা করিয়া অসাবধান হইয়া হিংস্র পশুর কবলে পতিত হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিয়া পরোক্ষকে অবলম্বন চেষ্টার ভ্রান্তির উদয় হয়। বিভ্রান্ত বিমূঢ় মানবের স্বাচ্ছন্দ্যহীনতা দূর করা অতি কঠিন কার্য্য।

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযুদ্ধ

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব আজ অনিবার্য্যতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। সকল জল্পনা কল্পনা আজ কঠিন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রেজিয়ার আজ অবিসম্বাদিত বিশ্বজয়ীর স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

পরাজয়ের পর ক্লে নিজেও স্বীকার করেছেন—ফ্রেজিয়ারই জগতের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা। নেহাতই বরাত-জোরে তিনি নক আউটে পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভ করেছেন।

শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে আজ ক্লেকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

জগতের দুই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী জো ফ্রেজিয়ার এবং ক্যাসিয়াস ক্লে (বর্ত্তমানে মহম্মদ আলি ক্লে)।

দু'জনেই প্রাক্তন অলিম্পিক মুষ্টিযোদ্ধা। দু'জনেই অলিম্পিক বিজয়ীর স্বর্ণপদকের অধিকারী। ক্লে ছিলেন ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের লাইট-হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ন। আর ফ্রেজিয়ার হলেন ১৯৬৪ সালের জাপান অলিম্পিকের হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন।

দু'জনেই বিশাল বলশালী আমেরিকাবাসী নিগ্রো। ইতিপূর্ব্বে ক্লে ৩১টি পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের সব কয়টিতেই জয়লাভ করেছেন। এখনও পর্য্যন্ত তিনি অপরাজিত। মোট ৩১টি পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের মধ্যে ২৫টিতে তিনি নক আউটে জয়লাভ করেছেন।

ফ্রেজিয়ার ২৯টি পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের ২৩টিতে নক আউটে জয়লাভ করেছেন আর বাকী ছয়টিতে বিজয়ী হয়েছেন পয়েন্টে। এখনও পর্য্যন্ত বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় অপ্রতিহত তার গতি।

বিশ্ব হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার দুই অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভের জন্য শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন। সমস্ত জগৎ আজ উদ্‌গ্রীব চিত্তে ফলাফলের বিষয় চিন্তা করছে। সকলেরই মনে রয়েছে একটি দ্বিধাশঙ্কিত সংশয়ান্বিত মনোভাব—কে হবে জয়ী ? ক্লে, না ফ্রেজিয়ার।

মুষ্টিযুদ্ধের দিন স্থির হয়েছে ৮ই মার্চ, ১৯৭১। সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে আজ নিউইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ওপর। বিশ্বের দুই অপরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী আজ সেখানে মিলিত হচ্ছেন তাঁদের মুষ্টিযুদ্ধের দ্বন্দ্বে।

আজকের এই মুষ্টিযুদ্ধ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযুদ্ধ নামে পরিগণিত হয়েছে।

অমিত বলশালী, অপরিসীম বুদ্ধিসম্পন্ন মুষ্টিযোদ্ধা ক্লে উচ্চতায় প্রায় ৬ফিট ৩ইঞ্চি। অসাধারণ ক্ষিপ্র তার গতি। তড়িৎগতিসম্পন্ন ক্লের সহিত আজ পর্যন্ত তৎপরতায় কেউ এঁটে উঠতে পারেনি।

দেশের পক্ষ হয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য শাস্তিস্বরূপ ৩বৎসরের কারাবাস যদিও তাঁর ক্ষিপ্রতাকে কিছু মন্দীভূত করে দিয়েছে, তবুও কিন্তু কারাবাস থেকে ফিরে এসে জেরী কোয়েরী ও অসকার বেনাভেলাকে পরাজিত করে তিনি প্রমাণ করেছেন মুষ্টিযুদ্ধ-জগতে হয়ত এখনও পর্যন্ত তিনিই বিশ্ব শ্রেষ্ঠ।

ক্লের কারাবাসকালীন অনুপস্থিতিতে বিশ্বজয়ীর আসন শূন্য হওয়ায় ফ্রেজীয়ার স্বীয় বাহুবলেই সেই সম্মান অর্জ্জন করেছেন। সেইজন্য অনেকের নিকট ফ্রেজিয়ারই এখন বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ক্লে এবং তাঁর অনুগামীদের নিকট ফ্রেজিয়ারের এ শ্রেষ্ঠত্বের কোন স্বীকৃতি নেই। তাঁদের মতে ক্লের অনুপস্থিতির সুযোগেই ফ্রেজিয়ারের বিশ্ব-মুকুট জয়লাভ সম্ভবপর হয়েছে। তাঁরা বলেন জয়মুকুট কেড়ে নিয়ে ক্লেকে জোর করে কারাবন্দী করে তাঁকে বিশ্বজয়ীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং ফ্রেজিয়ারের এই সম্মান তারা নতমস্তকে মেনে নিতে পারেন না।

জো ফ্রেজিয়ার ১৯৭০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী জিমি এলিসকে পরাজিত করে বিশ্ব বক্সিং এ্যাসোশিয়েশন কর্তৃক বিশ্বজয়ীর সম্মানে ভূষিত হন।

অপেক্ষাকৃত ধীর এবং দৃঢ়মনোবলসম্পন্ন ফ্রেজিয়ার। স্থির লক্ষ্যে এবং প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করে দিতে কোন ভুলই করেন না তিনি।

অপর দিকে, ক্ষিপ্রগতি মহাবলী, সুচতুর ক্লে। প্রতিপক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরে ঘুরে ঘুঁসির ঝড় বইয়ে দেন তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর। মুষ্ট্যাঘাতে বিমূঢ় করে দিয়ে প্রহারে জর্জ্জরিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্লে অতি সহজেই ধরাশায়ী করে দেন।

ক্লের একটি মাত্র দোষ এই যে তিনি একটু বেশী কথা বলেন। এই জন্যই অনেকের নিকট তিনি বাক্যে-বাগীশ ক্লে নামে পরিচিত।

অতঃপর এসেছে আজ সেইদিন—৮ই মার্চ, ১৯৭১ সাল।

অগনিত দর্শকসমাগমে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ষ্টেডিয়ামটি আজ মুখরিত হয়ে উঠেছে।

মুষ্টিযুদ্ধে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১২,৫০০০০০ ডলার। মতান্তরে কেউ কেউ বলেছেন ২০,০০০০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৫ কোটী টাকা। এক অচিন্তণীয় ও অবিস্মরণীয় ঘটনা ক্রীড়া-জগতের এক অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যায়।

মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হবে এইবার। অগণিত দর্শকসমাগমে মুখরিত স্টেডিয়ামে হঠাৎ যেন কোন্ মন্ত্রবলে নেমে এল এক বিপুল অস্বস্তিকর নৈঃশব্দের পরিব্যাপ্তি। নির্ব্বাক নিস্তব্ধ দর্শকদের উৎসুক দৃষ্টি কেবলমাত্র দুইটি রণোন্মত্ত মানুষের ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে তখন।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তখন পরস্পর করমর্দন করে রেফারীর নির্দেশান্তে রিংএর স্ব স্ব নির্দিষ্ট কোণে গিয়ে শুরু হওয়ার ঘণ্টাধ্বনির প্রতীক্ষায় রইলেন।

অতঃপর ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হয়।

খেলার প্রাথমিক পর্ব্বগুলিতে ক্লে তার স্বভাবসুলভ সুন্দর ভঙ্গিমায় ফ্রেজিয়ারের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে মুষ্ট্যাঘাত করতে আরম্ভ করলেন। এই সময় ক্লের দুটি অব্যর্থ মুষ্ট্যাঘাত ফ্রেজিয়ারকে প্রথমে একটু বিচলিত করে দিল। কিন্তু সঙ্কল্পে অটুট ফ্রেজিয়ার দৃঢ়চিত্তে মুষ্টিযুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। তিনি ক্লের মাথায় প্রচণ্ড একটি আঘাত হেনে তাঁকে বেশ কাহিল করে দিলেন।

যথারীতি কয়েক পর্ব্ব মুষ্টিযুদ্ধ চলার পর একসময় দেখা গেল ধস্তাধস্তিতে ক্লের মুখমণ্ডল নাকের রক্তে রক্তাপ্লুত হয়ে উঠেছে। ঠিক এই সময় ফ্রেজিয়ার ক্লেকে দড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে তার চোখের ওপর একটি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন।

চতুর্থ পর্ব্বে দেখা গেল ক্লে যেন আবার নতুন শক্তি ফিরে পেয়েছেন। তিনি ফ্রেজিয়ারকে রিংএর চতুর্দিকে তাড়া করে নিয়ে মারতে লাগলেন আর ফ্রেজিয়ারও বেশ চাতুর্য্যের সঙ্গে এই প্রহার এড়িয়ে গেলেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়েও ফ্রেজিয়ার অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত ক্লের কয়েকটি অব্যর্থ মুষ্ট্যাঘাত বিফল প্রতিপন্ন করে দিলেন।

এরপর থেকেই দেখা গেল ফ্রেজিয়ার ক্লের ওপর বেশ আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছেন। এই সময় তিনি প্রহারে প্রহারে ক্লেকে জর্জরিত করে দিলেন। দর্শকগণও তখন প্রবল উত্তেজনায় কেবল চীৎকার করে

প্রহারে বিকৃতমুখ ক্লেকে তখনও কিন্তু অসীম মনোবলের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে দেখা যায়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীরই গা দিয়ে তখন অঝোরে ঘাম ঝরছে।

অতঃপর অষ্টম পর্ব্বের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত চলল তীব্র ঘুসির আদান-প্রদান ও দর্শকদের উত্তেজনাপূর্ণ প্রবল চীৎকারধ্বনি ও গর্জন।

লড়াই চলছে এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল ক্লে বিদ্যুৎ-গতিতে ফেজিয়ারের মুখে পর পর তিনটি আঘাত হানলেন। তারপর থেকে দেখা গেল ফ্রেজিয়ারেরও নাক দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে।

দশম পর্ব্বের সারাক্ষণ ধরে চলল কেবল প্রচণ্ড ঘুসিবৃষ্টি। এই সময়েই ফ্রেজিয়ারের হঠাৎ বাঁ হাতের হুক ক্লের চোয়ালে সন্নিবিষ্ট হলে ক্লে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে কোনরকমে সামলে নিলেন।

একাদশ রাউণ্ডেও ফ্রেজিয়ারের অনুরূপ একটি হুক ক্লেকে পুনরায় ধরাশায়ী করে দিল। দৃঢ় মনোবল-সম্পন্ন ক্লে কিন্তু তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে পুনরায় মুষ্টিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

পরবর্ত্তী তিন পর্ব্বে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন ক্লেকে কোন-রকমে মুষ্টিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে দেখা গেল। মুষ্টি-যুদ্ধ চলতে থাকল গতানুগতিকভাবে। ইতিমধ্যে দ্বাদশ পর্ব্বে একবার ক্লেকে ডাক্তারের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুষ্টিযুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প প্রকাশ করতে দেখা গেল।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যে এবার পঞ্চদশ পর্ব্বের লড়াই শুরু হল। মুষ্টিযুদ্ধ শেষ হওয়ার আর মাত্র অল্পক্ষণ বাকী। এই সময় পুনরায় ফ্রেজিয়ারের বাঁ হাতের হুকে ক্লে ধরাশায়ী হলেন। ভূলুণ্ঠিত ক্লে কিছুক্ষণ নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বাকী সময়টুকুর জন্য ফ্রেজিয়ারকে জড়িয়ে রইলেন তিনি, এবং মুষ্টিযুদ্ধ পরিসমাপ্তির ঘণ্টা-ধ্বনিও শোনা গেল সেই সঙ্গে সঙ্গে।

মুষ্টিযুদ্ধ শেষে রেফারী সেদিন বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে এগিয়ে এসে বিজয়ী ফ্রেজিয়ারের হাতটি সর্ব্ব সমক্ষে তুলে ধরে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিলেন। ক্লে সত্যই তবে আজ প্রথম পরাজয় বরণ করলেন।

পরদিন সকালে বিবেকবর্জ্জিত মানুষের পৈশাচিক ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত হতমান পরাজিত ক্লে নিউ ইয়র্কের একটি হোটেল-ঘরে শুয়ে শুয়ে হয়ত বা চিন্তা করছিলেন—"চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুখানি চ সুখানি চ।"

চাকা হয়ত আবার ঘুরে যাবে। হয়ত পুনরায় তিনি বিজয়মুকুট ফিরে পাবেন।

ইতিহাসে এ ঘটনার নজিরও তো রেখে গেছেন তাঁরই মানসলোকের আদর্শপুরুষ—সুগার-রে রবিনসন। তিনিও তো একাধিকবার বিজয়মুকুট হারিয়ে আবার তাহা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছেন। এ ঘটনা তবে তো তার ভাগ্যেও সম্ভব হলে হতে পারে।

হ্যাঁ, ক্লে আবার ফ্রেজিয়ারের সহিত ফিরতি লড়াইয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ

মানসী মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুই

অতুলপ্রসাদের জীবনে তাঁর মাতামহের প্রভাব অসামান্য এবং অম্লান।

অতুলপ্রসাদ তাঁর মাতামহকে 'ঠাকুরদাদা' বলে ডাকতেন। শৈশব থেকেই তিনি ঠাকুরদাদার সদগুণ ও মামারবাড়ীর শিল্পী পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

কালীনারায়ণ প্রথম জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক হিন্দু ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর সেই ধর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে মান্য করে চলতেন।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন শুনে মা ভাগীরথীদেবী[১] রেগে অস্থির। "কালীনারায়ণ মার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করতে গেলেন। ক্রুদ্ধ ভাগীরথী দেবী দ্রুত পা সরিয়ে নিতে গেলে কালীনারায়ণের মাথায় তাঁর পা লেগে যায়। তিনি তখন শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'মা আমার কী সৌভাগ্য। আমি তোমার পায়ের ধূলো নেবার আগেই তুমি তা আমার মাথায় দিয়ে দিলে'।"[২]

পরব্রহ্মের প্রতি কালীনারায়ণের একান্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অকাল মৃত্যু হলে তিনি মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথমে ওঁ ব্রহ্ম উচ্চারণ করে প্রার্থনা জানালেন, 'হে প্রাণারাম, তুমি যে আজ দয়া করিয়া আমার স্নেহের ধনকে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিলে এজন্য কৃতজ্ঞতাভরে তোমায় প্রণাম করিতেছি।'

তাঁর মধ্যে জাতের অহঙ্কার ছিল না। হিন্দু মুসলমান —তাঁর প্রজাদের তিনি একই দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর নিজের একটি কালো পাথরের ভাত খাবার থালা ছিল। প্রতিদিন তিনি খাবার পরে তাঁর বাড়ির কুড়ি বছরের পুরনো মেথরকে ঐ একই কালো পাথরের থালায় খেতে দেওয়া হত। পরে সে থালাটি ধুয়ে তুলে রাখা হত পরের দিনের ব্যবহারের জন্য। প্রতিদিনই ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলত।

একবার গ্রামের এক নফর প্রথমে পাগল হয় ও পরে মারা যায়। কালীনারায়ণ ঐ পাগলকে সপরিবারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পাগল মারা গেলে তার মৃতদেহ দাহ করতে সবাই অস্বীকার করে। কালীনারায়ণ নিজেই তখন কীর্তন করতে করতে মৃতদেহ বহন করে দাহ করে আসেন।

তিনি মানুষের সঙ্গ বড় ভালবাসতেন এবং মানুষকে খাইয়ে বড় আনন্দ পেতেন। মাঘোৎসবের সময় তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রজাদের খাওয়াতেন। অন্ধ-আতুর-দীন-দুঃখী সবাইকে দু হাতে দান করতেন।

তাঁর গান রচনা করবার সহজাত শক্তি ছিল এবং 'ভাব সঙ্গীত' নামে তাঁর একটি গানের বই আছে।

আবার অপূর্ব গায়কও ছিলেন। যখন কোন পর্বোপলক্ষে মৃদঙ্গ গলায় ঝুলিয়ে কীর্তন করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলতেন তখন শত শত লোক মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গ নিতেন আর আনন্দে মত্ত হয়ে নৃত্য করতেন। "তখন হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান কাহারো ধর্মভেদ জ্ঞান থাকিত না।"৩

কালীনারায়ণের চিত্রাঙ্কন এবং মূর্তি গঠনের স্বাভাবিক গুণ ছিল। প্রজারা তাঁর সহস্তে নির্মিত পুতুল দিয়ে সাজান কাছারি বাড়ীর নাম দিয়েছিল—রংমহল।

হাস্যরসিক, মজলিসী ও সদানন্দ পুরুষ বলেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।৪

অতুলপ্রসাদ ঠাকুরদাদার প্রিয়তম নাতি বলে তাঁর সঙ্গ নিবিড়ভাবে পেয়েছিলেন। ঠাকুরদা ও দিদিমা তাঁকে আদরে সোহাগে ঘিরে রেখেছিলেন। কিন্তু অত্যধিক আদর পেয়েও অতুলপ্রসাদের স্বভাবে বিকৃতি ঘটে নি। তিনি সর্বদা সব বিষয়ে তাঁর ঠাকুরদাদার অনুকরণ করতেন এবং এইভাবে ঠাকুরদাদার সব সদ্‌গুণগুলি তাঁর মধ্যে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে।

সঙ্গীত ছিল অতুলপ্রসাদের রক্তে হৃদয়ে ও কণ্ঠে। ঠাকুরদাদা প্রায়ই নগর-কীর্তনে বেরিয়ে পড়তেন। বালক অতুলপ্রসাদ তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন, ঠাকুরদাদার কীর্তনে সকলের সঙ্গে তিনিও দোহার দিতেন। পরে দেখা যেত বালক অতুল মাতোয়ারা হয়ে সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্তন করছেন আর ঠাকুরদাদাসহ অন্যান্য সকলে তাঁর সঙ্গে দোহারা দিচ্ছেন।

দানশীল ঠাকুরদাদা যাকে যা দিতে চাইতেন তা শিশু অতুলের কচি হাতের মারফৎ দেওয়াতেন। অতুলপ্রসাদও শৈশবকাল থেকে উদারমনা ছিলেন; কাউকে অল্প জিনিস দিয়ে তাঁর মন তৃপ্ত হত না, আনন্দ পেতেন না। এজন্য হেমন্তশশী মাঝে মাঝে বলতেন হাসিমুখে, "অতুলের জন্য আমায় ভিক্ষার চাউল সর্বদা ভাণ্ড ভরিয়া রাখিতে হয়। অল্প দিয়া তার প্রাণ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।৫

অতুলপ্রসাদের খাওয়া শোওয়া বেড়ান সবই ঠাকুরদাদার সঙ্গে হত। খুব কাছাকাছি থাকার দরুণ ঠাকুরদাদার সঙ্গীতে, কাব্যে, চিত্রে অনুরাগ তাঁর শিশুমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করত; খেলার ছলে চলত অনুকরণের কাজ। তাঁর ঠাকুরদাদাকে অনুকরণ করা নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে।

"কালীনারায়ণ গুপ্ত রোজ একটি চেয়ারে বসতেন। তাঁর পাশের চেয়ারে অতুলপ্রসাদ বসতেন। একদিন অতুলপ্রসাদ লক্ষ্য করলেন যে চেয়ারে বসা সত্বেও তাঁর ঠাকুরদাদার পা দুটি মাটি ছুঁয়ে আছে কিন্তু চেয়ারে বসলে তাঁর পা মাটি ছুঁয়ে থাকছে না। শিশু বুদ্ধিতে তার কারণ বুঝতে না পেরে তিনি কেবলি চেয়ার থেকে ওঠানামা করছেন। জিজ্ঞাসা করলে বললেন যে, তিনি চেষ্টা করছেন চেয়ারে বসেও কি করে ঠাকুরদাদার মত পা মাটিতে রাখা যায়।"৬

পিতৃবিয়োগের পর মামারবাড়িতে ঠাকুরদাদার সঙ্গ আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠল। সত্যপ্রসাদ তাঁর প্রাণাধিক সঙ্গীতো ছিলেনই এখন সুবালা মামী, পানীমামা ও বিনয় মামা৭ তাঁর সঙ্গী হলেন।

পানিমামা ও বিনয়মামা গান-বাজনা ও চিত্রাঙ্কনে পটু ছিলেন আবার হাস্যরসিকও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদও ঐসব সুকুমার বৃত্তির চর্চা করতেন। কখনো তাঁর সুধা-কণ্ঠের গান শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। আবার অন্যকে নকল করার বিশেষ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তাই দেখিয়ে সকলকে হাসিয়ে অস্থির করতেন, আনন্দ দিতেন।

মামারবাড়ির শিল্প-সঙ্গীতের আবহাওয়া ছাড়াও ঢাকা শহরে তখন এমন মহল্লা ছিল না যা সঙ্গীতচর্চা মুক্ত। গানের আসর তো বসতই আবার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে ঢাকা শহর গান-বাজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত—যেমন হোলির সময়।

যখনি কোথাও গান-বাজনা হত সঙ্গীত-পাগল অতুলপ্রসাদের উত্তেজনা উৎসাহের সীমা থাকত না;

সুরের স্রোতে তিনি যেন আনন্দে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেন। গান-বাজনা শোনা বা নাটক দেখার সুযোগ হলেই তিনি ঠাকুরদাদা বা মামাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন, সময় নষ্ট করতেন না।

হোলির সময় ঢাকায় গান নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। এক বছর লক্ষ্মী বাজারের রাজাবাবুর ময়দানেও অন্য বছর উর্দ্দালা বাবুদের বাড়িতে পালা করে হোলির গান হত। সুর-তান-লয় নিয়ে সে-সব গানের আবার বিচারও হোত। গানের মধ্যে এমন ভাষায় ব্যবহার করা হোত যে গায়ক গানের ছলে প্রশংসা করছেন যে কটূক্তি করছেন বোঝা মুশকিল হত। 'ভানু' নামে এক ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন। তিনি একবার গাইলেন: 'ভানু কী জ্যোতি সে ভর দেগা তেরা চাঁদবদন।'

শুনে অতুলপ্রসাদের রসিক মন উছলে উঠল। চুপি চুপি বিনয়মামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভানু ওস্তাদ 'ভানু কী জ্যোতি সে' বললেন, না, 'ভানু কী জুতি সে,' বললেন?

মামাও রসিক। জবাব দিলেন, ও দুটো কথাই বলে ভানু ওস্তাদ।

ঢাকায় আর একটি দর্শনীয় উৎসব ছিল জন্মাষ্টমীর মিছিল। উৎসবের প্রারম্ভেই জনজীবনে উত্তেজনা ও উৎসাহ দেখা দিত। অতুলপ্রসাদের উৎসুক উদগ্রীব মনে যেন সাড়া পড়ে যেত। মামাদের সঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে পরামর্শ হোত, সদলবলে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াতেন, নিঃশব্দ পায়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে খালের ধারে পৌঁছে যেতেন।

নয়া সরকারের খালের ধারের দক্ষিণে তাঁতিবাজার ও উত্তরে নবাবপুকুর। এ স্থান হতে জন্মাষ্টমীর মিছিলের যাত্রা শুরু হোত। ঢাকাবাসীরা কাতারে কাতারে এখানে এসে জমা হতেন মিছিল দেখতে, মেলা দেখতে। ঐ সময় জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মেলাও বসত।

জন্মাষ্টমীর মিছিল এক এলাহি ব্যাপার ছিল এবং খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হোত। মিছিলের প্রথমে থাকত শতাধিক ঘোড়া ও পঞ্চাশ-ষাটটি হাতি। বহু মূল্যবান পোষাক পরিয়ে তাদের সাজান হত। বড়-বড় চৌকি সঙ্গে যেত যার ওপর পৌরানিক বা ঐতিহাসিক ঘটনার অপূর্ব চিত্র আঁকা থাকত।

শীতকালে আর এক উৎসব হত—বনবিহার। বালক শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহারের নানা দৃশ্য মাটির পুতুলের সাহায্যে দেখান হত, অদ্ভুত সুন্দর সে-সব মাটির পুতুল।

কালীনারায়ণ গুপ্ত অতুলপ্রসাদসহ অন্যান্য নাতিদের এই উৎসব দেখাতে বহুবার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে শিল্পী ছিলেন। শিল্পীর চোখ দিয়ে মূর্তিগুলি দেখতেন এবং তাদের গুণাগুণ বিচার করে নাতিদের বোঝাতেন। কখনো আবার হাসি গল্পের মধ্য দিয়ে তাদের সরল ব্যাখ্যা করেও শোনাতেন বোঝাতেন।

শৈশবকালে অতুলপ্রসাদ ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা প্রথম যে নাটক দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তা হল নবাবপুকুরের "শকুন্তলা"। করুণরসাসিক্ত কাব্যপূর্ণ জীবন-নাটক, শকুন্তলা কি রোমাঞ্চ ও বিস্ময় নিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে অতুলপ্রসাদ দেখেছিলেন। তারপর একে একে দেখলেন "সীতার বনবাস", "নীলদর্পণ" ইত্যাদি।

এই সব নাটকের প্রাণ ছিলেন অতুলপ্রসাদের সেজমামা (পানি)। তিনি যেমন নাটক সম্বন্ধে মহা-উৎসাহী ছিলেন, তার জন্য পরিশ্রম করতেন, আবার অভিনয়ও করতেন।

শকুন্তলা নাটকের কোন কোন গানের সুর অতুলপ্রসাদের কোন কোন গানে পাওয়া যায় যেমন:—

"বধূ ধর ধর মালা পর গলে"।

তাঁতিবাজারেও নাটক হত। "মালতী-মাধব" নামে একটি নাটক হয়েছিল যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন চন্দ্রনাথ রায়। ইনি একটি বাউলের দল করেছিলেন। বাউল সেজে সকলে রাত্রিবেলায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাউল গান গেয়ে শোনাতেন। এই বাউল গানের রেশ অতুল-প্রসাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল; তার উদাসী

সুরের ঝর্ণা তাঁর মনে বুঝি প্লাবন এনে দিয়েছিল। তাই দীর্ঘ সময়ের সীমানা পেরিয়েও তাকে ভুলতে পারেন নি। পরবর্তীকালে তাঁর অনেক গান তাই বাউল সুরে রচিত হয়েছে।

নাটক ব্যতীত ঢাকাতে সে সময় যাত্রাগান হত। গোবিন্দ কীর্তনীয়া অপূর্ব কীর্তন গাইতেন। এ ছাড়া কবিগান এবং খেমটা নাচও হত।

অতুলপ্রসাদের মুসলমান-প্রীতি ছিল আশৈশবের। তার প্রথম কারণ ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব। তখনকার দিনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনকার দিনের মত বিদ্বেষ এমন তীব্রভাবে দেখা দেয়নি। "তখন হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়াই এই সকল আমোদে যোগ দিত। কি মহরমের তাজিয়া, কি জন্মাষ্টমীর মিছিল, কি হোলির গান হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পরস্পরের উৎসবের আনন্দে গলাগলি হইয়াই উপভোগ করিত।"৮ এমনি সব উৎসবে অতুলপ্রসাদ ঠাকুর-দাদার সঙ্গে অংশ নিয়ে আনন্দ পেয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্য উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা অতুলপ্রসাদের পরিবার পরিত্যক্ত হন। নীচজাতীয় হিন্দু এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা যেন আত্মীয়তায় পরিণত হয়।৯ এই প্রকার আত্মীয়ের ন্যায় মেলামেশা করার দরুন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিশ্বস্ত ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অতুলপ্রসাদের জীবনে সায়ংকালেও তার পরিবর্তন ঘটেনি বা তা বিচ্ছিন্ন হয় নি।

অতুলপ্রসাদ নানাগুণে কীর্তিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান কীর্তি এবং শ্রেষ্ঠতম অবদান হল তাঁর গীতি-কবিতা যার প্রথম স্ফুরণ সাধারণের চোখে পড়ে, যখন তিনি মাত্র চোদ্দ বছরের কিশোর।

পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও অনুকূল পরিবেশ অতুল-প্রসাদের মনে যেন সোনার কাঠির স্পর্শ দিল। তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে চোখ মেলে তাকালেন; হৃদয়ের অতলে সুপ্ত কাব্যপ্রতিভা ও কল্পনাশক্তি এবার একটি একটি করে পাপড়ি খুলতে লাগল।

"ছেলেবেলা হইতেই তাহার কবিতা লিখিবার অভ্যাস ছিল......।"১০ এবং এ বিষয়ে অতুলপ্রসাদ যে তাঁর কাব্যিক ঠাকুরদাদা ও শিল্প-সঙ্গীত প্রিয় পানিমামা, বিনয়মামার কাছ থেকে সমর্থন, উৎসাহ পেতেন তা স্বাভাবিক। একদিন একটি অপূর্ব গীতি-কবিতা লিখে তিনি বাড়ির সবাইকে বিস্মিত ও বিমোহিত করেছিলেন।

সেদিন সকালে পড়ার ঘরে কারুরই পড়াশোনায় মন বসছে না। বাড়ীতে আজ উৎসব; ছোট্ট বোন তপ্‌সির১১ আজ অন্নপ্রাসন। সবাই হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেলেন। চুপচাপ বসে রইলেন শুধু অতুলপ্রসাদ; মৌনমুখে তিনি যেন কোন ভাবনায় নিমগ্ন।

পরে আস্তে কাগজ-কলম টেনে নিলেন। মনের মধ্যে তখন বুঝি শত তরঙ্গের জলোচ্ছ্বাস, প্রকাশের জন্য কল্পনার অসহ্য আকুলতা, আনন্দ ও উত্তেজনায় কবি-চিত্ত অস্থির। ক্রমে কিশোর-কবি শান্ত হলেন। তারপর তিনি লিখলেন:—

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি
তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ
সব বন্ধন টুটিয়া।
আজি মন চায় অঞ্জলি লয়ে
ধাই তব পানে ছুটিয়া।
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে
স্নেহের সাগর মথিয়া।
সে নামের সাথে তব পুত নাম
থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়ে এরে কর গো পালিত
তব স্নেহ-কোলে রাখিয়া;
নয়নেতে দিও, মাগো স্নেহময়ী,

প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে
যায় না কুসুম ঝরিয়া।
রক্ষিও নাথ, তোমার বক্ষে
সকল দুঃখ হরিয়া
দেখ প্রভু দেখ চালাইয়ো এরে
তুমি নিজ হাতে ধরিয়া;
মঙ্গল-পানীয় দিও তুমি দিও
পরাণ পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু
সকলের প্রেমে বাড়িয়া;
সে জীবন প্রভু, যেন কোথা কভু
না যায় তোমারে ছাড়িয়া।

গীতিকাব্যটি পড়ে মনে হয় তপ্‌সির 'ইলা' নামটি অতুলপ্রসাদই দিয়েছিলেন।

অতুলরা যখন লক্ষীবাজারে তখন পানিমামার বিবাহ হয়।

পানিমামা যেমন গানবাজনা ও চিত্রশিল্পে কৃতবিদ্য ছিলেন তেমনি হাস্যরসিকও ছিলেন। যেখানেই যেতেন তাঁহার ব্যঙ্গকৌতুক শোনবার জন্য লোকে অস্থির হয়ে উঠত। তিনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; হৃদয় প্রেম-ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। রাজকার্যে যখন যেখানে যেতেন সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতেন তাই সব দলেই তাঁর স্থান ছিল। তিনি দু হাতে দান ধ্যান করতেন; দুস্থ, রুগ্‌নো সর্বদা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছে। সত্যপ্রসাদের যখন খরচের অভাবে মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল ইনিই তখন যথাসাধ্য সাহায্য করায় সত্যপ্রসাদের পড়া সম্ভব হয়েছিল। অতুলরা লক্ষীবাজারে থাকাকালীন পানীমামার বিবাহ হয়। বিবাহের পাত্রী ছিলেন ডাক্তার দুর্গাদাস রায়ের একমাত্র কন্যা বিনোদিনী, অতুলপ্রসাদের বাল্যসঙ্গিনী। কী বিস্ময় কী আনন্দ! মেজমামী যেন শুধু মামী নন, আরো কিছু বেশি।

বাংলার মাটিতে স্বদেশপ্রেম লুকিয়ে আছে, আকাশে বাতাসে তারই আহ্বানবাণী, মানুষের রক্তের প্রবাহে রয়েছে উন্মাদনা! বাংলার কিশোর, তরুণদের তাই আখড়া হাতছানি দিয়ে ডাকে, সাহিত্য তাদের মনে আগুন জ্বালায় উত্তেজনা যোগায়। অতুলপ্রসাদের কিশোর বয়সে বাংলাদেশের আবহাওয়া এমনিই ছিল।

সেই আবহাওয়াকে উতপ্ত করে তুললেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতায়। তাঁর বক্তৃতা শুনে বাংলার কিশোর, তরুণ তখন মুগ্ধ, উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ।

ঐ সব কিশোরদের মধ্যে অতুলপ্রসাদও একজন ছিলেন।

অতুলপ্রসাদের মধ্যে অল্প বয়স থেকেই বক্তৃতা করবার আকাঙ্খা ছিল। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সুমধুর বক্তৃতা অনেকবার শুনেছেন। মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, টি পালিত প্রভৃতি যিনি যখন ঢাকায় এসেছেন অতুলপ্রসাদ তাঁদের দেখতে ও বক্তৃতা শুনতে কাছারিতে যেতেন।

আবার রাজনৈতিক নেতারাও আসতেন যেমন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ ইত্যাদি। অতুলপ্রসাদ আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের বক্তৃতা শুনতেন। শুনে তাঁদের বক্তৃতার নকল করার চেষ্টা করতেন।

শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব মাষ্টারমশাই দুর্গাবাবুর পুত্র সত্যেন, জ্ঞান রায়, সত্যপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ রূপবাবু বা আনন্দ মাষ্টারমশায়ের বাগান বাড়িতে গিয়ে সেখানকার নিভৃত পরিবেশে নিশ্চিন্তে আলোচনা করতেন।

আলোচনার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা, কেদারবাবুর বক্তৃতা এবং কংগ্রেসের কার্যাবলী। অতুলপ্রসাদের চোখে সুরেন্দ্রনাথ তখন আদর্শ পুরুষ। আলোচনাকালে অতুলপ্রসাদ সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করে শোনাতেন।

একবার সুরেন্দ্রনাথ ঢাকায় আসবেন, তখনো এসে পৌছান নি। কিন্তু তাঁর আসা অবধি অতুলপ্রসাদ ধৈর্য ধরে থাকতে পারেন নি। তিনি রওনা হয়ে

আগেই নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং সাক্ষাৎ সেরে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে করতে ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের মনে দেশসেবার আকাঙ্খা জাগিয়ে তাঁকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে তাই অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি করতেন। যেবার সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দিলেন না অতুলপ্রসাদ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—

—"The National Congress without Surendra Nath Banerjee is a mere farce."

বিধবা হবার পর হেমন্তশশী প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বেশী শরীর খারাপ হলে বড় ভাই স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁকে কোলকাতায় এনে নিজের কাছে রেখে চিকিৎসা করাতেন।

কখনো কখনো হেমন্তশশী একা একটি ঘর নিয়ে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিন কাটাতেন, ভগবানের নাম করতেন, কবিতা লিখতেন। আবার কখনো চিন্তা করতেন তাঁর চারটি সন্তান সন্ততি—অতুলপ্রসাদ, হিরণ, কিরণ, প্রভার ভবিষ্যৎ।১২

সেবার তখন তিনি কোলকাতায়। অতুলপ্রসাদ ঢাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর হাতে দীর্ঘ, অফুরন্ত সময়। রবিবার দিন তাই ঠাকুরদাদা ও মামাদের সঙ্গে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যেতেন।

১৮৯০ জুন মাসের এক রবিবার অতুলপ্রসাদ ঠাকুরদাদা, সত্যদাদা ও মামাদের সঙ্গে ব্রহ্মসমাজে গিয়েছিলেন।

সবাই ফিরে এসে দেখলেন বাড়ীর চেহারা যেন কার অভিশাপে হঠাৎ বদলে গেছে; সবাই যেন শোকে, দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। অতুলপ্রসাদ দেখলেন তার বোনেরা কাঁদছে, মাসীরা কাঁদছেন, সবচেয়ে শোকাতুরা হয়ে কাঁদছেন তাঁর দিদিমা। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন, কী ব্যাপার! তবে কি কোলকাতায় মার কিছু হয়েছে। দিদিমাকে ভয়ার্তকণ্ঠে মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে কোন উত্তর পেলেন না। তাঁর হাতে একটি চিঠি ধরা ছিল।

দিদিমার হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে পড়ে জানা গেল সেটি লিখেছেন স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ, বড়মামা। তিনি চিঠিতে জানিয়েছেন যে, হেমন্তশশী দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। যাঁকে বিবাহ করেছেন তিনি হলেন দুর্গামোহন দাস।১৩

হঠাৎ কি আকাশটা বিকট শব্দে মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ল! বিরাট এক ভূমিকম্পে পৃথিবী কি অন্ধকারের আড়ালে তলিয়ে গেল! বিস্মিত অতুলপ্রসাদ যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তারপর দ্রুত পায়ে পড়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

পিতৃ বিয়োগের পর মা-ই ছিলেন একাধারে সব। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অতুলপ্রসাদের কতও নির্ভরতা, কল্পনা, স্বপ্ন আর...........চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদকে চিঠি দিলেন। লিখলেন, অতুল যেন বোনেদের নিয়ে কোলকাতায় চলে আসেন।

অতুলপ্রসাদের মন তখনো প্রচণ্ড অভিমানে আচ্ছন্ন। মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে বোনেদের মার কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজে অন্যত্র চলে যাবেন।

একদিন সত্যদাদা, বিনয়মামা, সুবালামাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হিরণ-কিরণ-প্রভাসহ কোলকাতায় রওনা হলেন। লক্ষ্মীবাজারের মামারবাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হল, ছিন্ন হল ঢাকার সঙ্গেও; কতও সুখ দুঃখের স্মৃতিঘেরা এই শহর। এবার সবই স্বপ্ন হতে চলেছে।...

১। কালীনারায়ণ গুপ্ত কাওরাইদের নিঃসন্তান জমিদারের বিধবা পত্নী ভাগীরথীদেবীর দত্তক পুত্র ছিলেন। পালিতা মা হলেও কালীনারায়ণ ভাগীরথী দেবীকে নিজের মার মতই সর্বদা ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন।

২। শ্রীযুক্তা উষা হালদার—সাক্ষাৎ

৩। সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী

৪। শ্রীযুক্তা বিমলা দাস—শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিমলা দাস কালীনারায়ণ গুপ্তের এক কন্যা। কালীনারায়ণ সম্বন্ধে ওপরে যা লেখা হল তা সবই তাঁর প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

৫। ৺সুবালা দেবী—"অতুলপ্রসাদ"

৬। শ্রীযুক্তা উষা হালদার—সাক্ষাৎ।

শ্রীযুক্তা উষা হালদার ৺সুবালা দেবী ও ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কন্যা।

৭। কালীনারায়ণ গুপ্তের দুই পুত্র, তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ (পাণি), বিনয়চন্দ্র।

৮। ৺সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরী থেকে।

৯। ৺সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "খুড়ামহাশয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ করেন। সেই জন্য দেশে ব্রাহ্মণ সমাজ নাকি আমাদের বাড়ির লোকদিগকে একঘরিয়া করেন।......অন্য দিকে আমাদের নীচ হিন্দু ও মসলমানদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ছিল, আমরা কাউকে দাদা, কাকা, খুড়ী, জ্যেঠী ইত্যাদি সম্বোধন করিতাম।

১০। ৺সুবালা দেবী—"অতুলপ্রসাদ"

১১। তপ্সী (ইলা সেন)—কালীনারায়ণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কনিষ্ঠ কন্যা।

১২। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দত্ত—সাক্ষাৎ

১৩। দুর্গামোহন দাস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাকা। তাঁর তিন পুত্র। তার মধ্যে একজন হলেন এস আর দাস। কন্যা, লেডী অবলা বসু। দুর্গামোহন যথেষ্ট ধনী ছিলেন। এঁরই এক পুত্রের সঙ্গে কালীনারায়ণ গুপ্তের এক কন্যার (বিমলা) বিবাহ হয়েছিল সেই সূত্রে দুই পরিবারের মধ্যে পরিচয় এবং যাতায়াত ছিল। হেমন্তশশী কোলকাতায় থাকলে দুর্গামোহন দাস তাঁর খবরাখবর করতেন।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দত্ত—সাক্ষাৎ।

ক্রমশঃ

বিপত্তি

(গল্প)

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

দিন পনেরো আগে থাকতে বাড়ীতে একেবারে হুলুস্থুলু কাণ্ড করে তুললেন শশাংকবাবু।

এবার অনেকদিন পর মস্ত সুযোগ পাওয়া গিয়েছে।

অনেকগুলো বাড়তি টাকা পাওয়া গেল ট্যুসানির। হিসেব করে দেখেছেন শশাংকবাবু,—যাতায়াত ও পথের খাইখরচা বাবদ প্রায় দেড়শ থেকে দু'শোর মধ্যেই খরচ। পূজোর বেশী দেরী নেই আর। ছুটিও প্রায় একমাসের উপর।

স্থির হ'য়েছে, এ ছুটিটা এবার বাইরে কোথাও গিয়ে কাটাতে হবে। অনেক গবেষণার পর স্থানও নির্দিষ্ট হ'য়েছে। উড়িষ্যার 'বালেশ্বর।'

শশাংকবাবু নিজে ভূগোলের শিক্ষক। সুতরাং বালেশ্বর ভ্রমণের ইচ্ছাপ্রকাশের ব্যাপারে তার যুক্তি অনেকগুলো।

প্রথমতঃ থাকা ও খাইখরচার সুবিধা। এ'খানেই প্রায় একযুগের ওপর আছেন তারই আপন ভায়রা ভাই শ্রীসত্যেশ্বর রায়। ওখানকার একজন প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার এবং বাড়ীটা নিজের।

দ্বিতীয়তঃ শ্যালিকা শ্রীমতী ফুল্লরার চিঠিতে জেনেছেন (এবং ভূগোল শিক্ষক হিসেবে নিজেও জানেন) চাল, ডাল, তরিতরকারি এবং তার উপর বুলিবালাম নদীর (বাঙালীর বিপ্লবী বাঘা যতীনের জন্যে নদীটি এমন ঐতিহাসিক) টাটকা মাছ যেমন সস্তা, তেমনি স্বাদের তুলনা নেই।

স্থানটি বাংলাদেশের মতই শস্যশ্যামল...আবহাওয়াও ভাল। বঙ্গোপসাগরও খুব নিকটবর্তী, সমুদ্রের ধারে ইংরেজের পুরানো 'কিল্লা' আছে একটি...।

শশাংকবাবুর যুক্তি কাটাতে পারেননি সুনীলা দেবী।

যদিও ওর বরাবরের ইচ্ছা, বাংলাদেশের মধ্যেই কোথাও যাওয়া। সুনীলা দেবীর আপন দেবর আছেন 'ধুলিয়ানে।' গঙ্গার ধারে সুন্দর জায়গা। খাওয়া দাওয়ারও কোন অসুবিধা নাই, সবই পাওয়া যায়।

দেবর ও জা দুজনেই অনেক অনুনয় বিনয় করে চিঠি দিয়েছেন তাদের আসার জন্যে, শুধু সঙ্গতির অভাবেই যাওয়া ঘটেনি। এবারও সুনীলা দেবীর ইচ্ছাই ছিল ওখানে যাওয়া—কিন্তু শশাংকবাবু বাংলাদেশের কোথাও যেতেই চান না। ভ্রমণে যদি প্রকৃত আনন্দ পেতে হয় তবে বাংলার বাইরে যাওয়াই ভাল—ওর অভিমত।

আরো বলেন বাংলাদেশে ত তার আত্মীয় আর অগুনতি ছাত্রছাত্রীর অভাব নেই, ইচ্ছা করলেই তিনি সর্বত্র যেতে পারেন...কিন্তু অভিপ্রায় তা নয়। এক দার্জিলিঙ বাদে গোটা বাংলাদেশের আকৃতি-প্রকৃতি এক। শুধু 'সবুজ' আর 'জল'।...মজা কোথাও নেই। প্রকৃতির বিচিত্রতা আছে বাংলার বাইরে। মাটিতে, গাছের পাতার রঙে, আর আকাশের নীলে। আবহাওয়াও বড় মজার। যেমন ঠাণ্ডা, তেমন গরম। একেক স্থানে

জলের একেক স্বাদ ও ক্রিয়াগুণ। সাহসা স্বাস্থ্যহানি ঘটবার কোন কারণ হয়না...

সুনীলা দেবী নিজেও একদিন স্কুলে পড়েছেন। আজ বারো চোদ্দ বছর না হয় সংসারের পাকেচক্রে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তবু ভূগোলের কিছুকিছু অংশ ছায়া ছবির মত মনে পড়ে বৈকি।

দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ বা জব্বলপুর বাদে তার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে কাশী বা বেনারাসের কথা। তিনি নিজে গিয়েছেন সেখানে, যখন ওর বয়েস মাত্র ছ' সাত। বুড়ো দিদিমার সঙ্গেই তিনি গিয়েছিলেন কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে। এতটা বয়েস হলো, আশ্চর্য, সে স্মৃতি ভোলেননি তিনি এখনো। সেই বিশ্বেশ্বর মন্দিরের গলি, গোধুলিয়ার চৌমাথা, দশাশ্বমেধের ঘাটের কথা, বাঙালী টোলা প্রভৃতি সহজে মন হ'তে কি ভুলে যাবার?...

সদ্য বিয়ের পর একটি যায়গায় গিয়েছিলেন তিনি।... বহরমপুরে। তখন গঙ্গায় ভরা-বর্ষণ। অনেকের সঙ্গে মজা করে অবগাহন স্নান করেছিলেন তিনি সেবার। কী ভয় ছিল তখন। তারপর কতদিন গিয়াছে...সে-কথা আজো ভোলেন নাই।

বিয়ের দু'বছর পর যখন মিনু জন্মায় তখন আসানসোলের কাছে সীতারামপুরে গিয়েছিলেন তিনি মাত্র দু'দিনের জন্যে। তার এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে। যাওয়া-আসার খরচ তারাই দিয়েছিলেন। শশাংকবাবু কিন্তু যেতে পারেননি এখানকার কি জরুরী কাজে।

তারপর দশবছরে চারটি সন্তানের জননী হয়েছেন তিনি...এ সময়ে কোথাও যাবেন কি, সংসারের ঝামেলা দিনেদিনই বেড়ে চলেছে। আর যা উপায়, মাস গেলে একটা কানা কড়িও বাঁচে না।

শশাংকবাবুকে দোষও দিতে পারেন না সুনীলাদেবী। চোখেই তিনি দেখতে পারছেন, লোকটা একদণ্ড বিশ্রামের সুযোগ পান না। সকালে বিকালে চার-পাঁচটা ট্যুসানি, হাটবাজার, দশটা পাঁচটা পর্যন্ত স্কুল করে লোকটা সময় কোথায় পায়?

তবু মজার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন বড়বড় ছুটি-ছাটা আরম্ভ হবার আগে ভূগোলের শিক্ষক শশাংকবাবু প্লান করতে বসতেন বাংলার বাইরে কোথাও যাবার। ছাত্রদের ষান্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষা হবার আগে ট্যুসানীর সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়ে যেত, ফলতঃ অতিরিক্ত কিছু হাতে এসে জমতো, আর অমনি শশাংকবাবুর দেশভ্রমণের ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠতে বিলম্ব ঘটতো না।...

সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিক্রমশীল পৃথিবীর আহ্নিক গতিবিধি, ঋতু, আবহাওয়াতত্ব, পর্বত-নদী, মহাদেশ এবং উপমহাদেশের যাবতীয় খ্যাত ও অখ্যাত স্থান যদিও ভূগোলবিদ্ শশাংকবাবুর নখদর্পণে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বাংলার বাইরে ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ স্থান পরিদর্শনের সুযোগ হয়নি তার।

কেন হয়নি, তার ইতিহাস নিতান্তই পারিবারিক।

ভাই-বোনেদের মধ্যে শশাংকবাবুই বড়। তিন ভাই এক বোন। ছোট ভাইকে বছর দু'য়েকের মত রেখে মা-বাবা প্রায় একসঙ্গেই গত হন। শশাংকবাবুর বয়স তখন চৌদ্দ পনেরো। অনেক কষ্ট করে ভাই বোনেদের মানুষ করতে হ'য়েছে।

ফার্ষ্ট ডিভিসনে জলপানি পেয়ে পাশ করার ফলে কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তার ভাই দুটিও মেধাবী। ম্যাট্রিক তারা ভাল মতই পাশ করেছে, কিন্তু কলেজে পড়াশুনা তাদের বিশেষ হয়নি। দ্বিতীয় ভাই একজনের সুপারিশে ব্লক ডেভোলপ্‌মেণ্ট অফিসে আর তৃতীয় জন, পি, ডাব্‌লিউ, ডি-তে ঢুকেছে,—অবশ্য নিজের চেষ্টায়।

মাত্র কয়েক বছর আগে একমাত্র বোনের বিয়ে দিতে পেরেছেন শশাংবাবু। তিন ভাইয়ের সম্মিলিত উপার্জ্জনের টাকায় বিয়েটি হ'য়েছে।

মেজভাই বিয়ে করে বর্তমানে ধূলিয়ানে আছে,—যারা প্রায় সময়ই শশাংকবাবুদের যেতে লেখে। ছোট

ভাই এখনো অবিবাহিত; সে থাকে কাঁচড়াপাড়ার কোন মেস-হোটেলে। সপ্তাহের ছুটিতে একবার করে দাদাবৌদিকে এসে দেখে যায়।

বোনের বিয়ের পর শশাংকবাবু অনেকটা ভারমুক্ত হ'য়েছেন। এবং বিশেষ করে এর পর হ'তেই তিনি দেশ ভ্রমণের কথা বেশী করে ভাবেন ও কোথায় যাবেন, তার প্লান করতে বসেন। কিন্তু কোথায় হঠাৎ ত্রুটি ঘটে যায়, আর যাওয়া ঘটনা।

কিন্তু এবার......এবার আর সেটি হ'চ্ছে না। যাওয়া এবার অনিবার্য।

সুনীলা দেবী বেনারাসের কথা তুলেছিলেন অবশ্য একবার, কিন্তু শশাংকবাবু রেলওয়ের টাইম-টেবিল ধরে হিসেব কষে দেখলেন যে এতে আশাতিরিক্ত খরচ বাড়বে। উপরন্তু যতদিন সেখানে থাকবেন, ধর্মশালা নয়তো ঘরভাড়া করেই থাকতে হবে তাদের। এতে খরচের চূড়ান্ত হবে। কাজেই, যা সাম্ভাব্য সামর্থের মধ্যে, তাই করা উচিত। আর সেই ঔচিত্যের পরিণাম স্বরূপ যাওয়া স্থির হোলো উড়িষ্যার বালেশ্বরে।

শুধু যাওয়া-আসার হিসেব পত্রই নয়, রওনা হবার দিনক্ষণ পর্যন্ত তিনি পঞ্জিকা দেখে স্থির করলেন।

শশাংকবাবু ধর্মভীরু লোক। মঘা-অশ্লেষা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা না মেনে পারেন না। ছা-পোষা মানুষ......কোথা থেকে কি ঘটে যায়, বলা যায় না।

১০ই অক্টোবর, শনিবার যাত্রার দিন স্থিরকৃত।

যাবেন হাওড়া-মাদ্রাজ একস্‌প্রেসে। এ ট্রেনেই সুবিধা। দিন দুপুরে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ বালেশ্বরে পৌঁছে যাবেন। ভায়রা-ভাই সত্যেশ্বর রায়কে সেভাবেই চিঠি লিখে পূর্বেই জানানো হয়েছে। আবার, যাবার আগে 'টেলি' করবেন বলেও লিখে দিয়েছেন শশাংকবাবু। যাতে ত্রুটি কোনদিকেই না ঘটে।

চিঠি ডাকে দেবার পর হ'তেই শশাংকবাবু আরো ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

মানুষ তারা সাতজন। ছোটভাই মৃগাংককে যাওয়ার জন্যে বলেছিলেন সঙ্গে, কিন্তু অফিসের জরুরী কাজে যেতে পারবে না সে। না যাক সে, "কিন্তু এই সাতজনের একসঙ্গে যাবার ঝক্কি কম হ'বে না।

কম করেও তারা বালেশ্বরে একমাস থাকবেন। এই একমাস থাকার সকলের ভাল ও উপযুক্ত জামা-কাপড় চাই। আর সেগুলো টেনে নিয়ে যেতে কম করেও দুটি ষ্টীল ট্রাংক ও ছোট বড় গোটা কয়েক সুটকেশও দরকার। সেখানে হয়তো বিছানাপত্রের অভাব হবে না, তবু সঙ্গে কিছু কিছু নিতে হবে বৈকি। বাসন-কোষণ নিতে হবে প্রয়োজন মত। ট্রেনে যেতেও কিছু লাগবে। তা বাদে নতুন আত্মীয়ের বাড়ী প্রথম যাওয়া, কুটুম্বিতা রক্ষার্থে শ্যালিকা পুত্র-কন্যাদের জন্যে এটা-ওটা নেয়া দরকার। এদিকে ছোট ছেলে নান্টু, ও মেয়ে পুলুর ভাল জুতো নেই; গিন্নী সুনীলার একজোড়া ভাল সাণ্ডেল চাই: শশাংকবাবুর নিজের চাই একজোড়া মোজা; ভন্টু ও সন্টুরও জন্যে দু'জোড়া গেঞ্জি ও একটা করে হাফসার্ট; মিনুর পরার শাড়ী চাই একখানা: ইত্যাদি নানা কেনাকেটা—বাজার নেহাৎ কম নেই একেবারে।

সুতরাং আগে থাকতে হুলুস্থূলু কাণ্ড বাঁধবার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি।

কিন্তু সুনীলা দেবী সবই বাড়াবাড়ি মনে করেন।

বলেন: তোমার সবই আদিখ্যেতা বাপু। যাব ত ছ'ঘন্টার পথ, তার আবার এত কি?......হিল্লী দিল্লী হ'লে বুঝতুম।

শশাংকবাবু শুনে গম্ভীরভাবে বলেন: তার মানে দূরে যেতে সব জিনিষের দরকার হয়—কাছে যেতে কিছু দরকার পড়ে না।...কিন্তু হাওড়া-বালেশ্বর কত-খানি রাস্তা জানো? দু'শো বত্রিশ কিলোমিটার। একেবারে চাট্টিখানি কথা নয়। প্যাসেঞ্জারে গেলে দশ বারো ঘন্টার পথ। নেহাৎ এক্সপ্রেসে যাচ্ছ বলেই ছ'সাত ঘন্টা। একেবারে কম ভেবো না ছ'সাত ঘন্টার জানি। দুবারের খাওয়া আর ঘুম বিশ্রাম দুটো

মোটামুটি ভালই হবে।—বলে সন্তকেনা টাইম টেবিলের পাতা এদিকে ওদিকে উল্টাতে লাগলেন শশাংকবাবু।

বইখানা কেনার পর হ'তে এমন দিন নেই যে শশাংকবাবু দু'বার করে তার পাতা উল্টান। প্রতিটি স্টেশন খুঁটে খুঁটে দেখেন ও পড়েন। একেবারে মুখস্ত হয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে মনটাও কেমন ট্রেনের গতির মত চলতে থাকে স্টেশনের পর স্টেশন। গাড়ীর দুপাশে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো চলচ্চিত্রের মত পট বদলাতে থাকে। কত নদী, নালা, প্রান্তর, ছায়াভরা পল্লী ধান ও রবিশস্যের হরিৎক্ষেত, পল্লীবধূ ও রাখাল ছেলের সুমধুর বাঁশীর সুর শশাংকবাবু ঘরের ভেতর দু'চক্ষু মুদে সমান উপভোগ করতে থাকেন।...এমনি করেই তিনি উলুবেড়ে বাগনান্, কোলাঘাটের রূপনারায়ন নদী পার হয়ে দেখতে দেখতে চলে আসেন খড়্গপুরে। ভৌগলিক মতে খড়্গপুর ভারতের অন্যতম বড় ষ্টেশন।...খড়্গপুরের পর দাঁতন...জনশ্রুতি, পুরি যাবার পথে মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্য নিমডালে এখানে দাঁতন করেছিলেন নাকি, তারপর লক্ষননাথ স্টেশন ছাড়ালে নদী সুবর্ণরেখা—ছোট হলে কি হয়, বর্ষাকালে যার প্রতাপ কম নয়। তা বাদে খুঁজে দেখলে আজো এর বুকে 'সুবর্ণকনা' মেলে বৈকি এদিক ওদিক।...তারপর আরো কয়েকটি স্টেশন ছাড়লে নিজেদের গন্তব্য স্থল—বালেশ্বর।...

শুধু এ পর্যন্ত নয়, শশাংকবাবুর উৎসুক ভৌগলিক মন আরো-আরো দূরে স্টেশনের পর স্টেশন ছুটতে থাকে। কটক ভুবনেশ্বর, পুরী, চিল্কা, গঞ্জাম ভিজিয়ানাগ্রাম ছাড়িয়া ওয়ালটেয়ার, তারপর রাজমুন্দ্রি পার হয়ে বিজয়ওয়ারা। সব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক স্থান।

কোন স্থানেই শশাংকবাবু যান নাই বটে, কিন্তু সবই যেন তার মানসনেত্রে মুহূর্তে প্রত্যক্ষভূত হয়ে ওঠে। শুধু কি তাই এই সুদূর দক্ষিনা পথের প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত স্থান গুলোতে ও যেমন ইতস্ততঃ পরিক্রমন করতে থাকেন তিনি। মছলীপট্টম, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, মাদুরা, রামেশ্বর, বাঙালোর আরো কত কি!

এসব স্থানের কথা চিন্তা করতে করতে মাঝে-মাঝে তিনি যেমন অস্থির, তেমনি উত্তেজিত হ'য়ে পড়তেন! কিন্তু তিনি নিরুপায়, সত্যই নিরুপায়! সংসারের বোঝা বিরাট হ'য়ে যখন তার মাথায় পড়েছে, তখন থেকেই তিনি নিরুপায়!

শুধু নিজের দেশ-ভারতবর্ষ কেন, যখন উচ্চশ্রেণীতে তিনি ভূগোলের ক্লাস গ্রহণ করেন, তখন অন্যান্য মহাদেশের কত না মহানগর শহর, জনপদের ইতিকথা তাকে সত্য মিথ্যা পড়াতে হয়। পড়াবার কালে তার মন কথিত সেইসব দেশ ও জনপথের পথে পথে তৃষ্ণার্ত চাতকের মত এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে।...আফ্রিকার আদিম অরণ্যের ঘনছায়া তলে, সাহারার দিগন্তবিসারি উষর মরুভূপ্রান্তরে, মহা-অজগরের মত বিস্তৃত দেশ রাশিয়ার ভল্গানদীর কূলে-কূলে, পাহাড়-উপত্যকাসঙ্কুল মেক্সিকোর উচ্ছ্বলিত কলরোডো নদীর প্রাণপ্রবাহে, দাক্ষিণ আমেরিকার বরফাচ্ছন্ন আণ্ডিসের সুউচ্চ শিখরে-শিখরে, অরণ্যসংস্কুল ব্রাজিলের উপকুলধৌত আমেজানের গেঁরুয়া জলে, সদা-তুহিনাচ্ছন্ন উত্তর মেরুর এক্স্কিমোদের রোমাঞ্চকর শিকার জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ভৌগলিক শশাংকবাবুর ভ্রমণ নেশাগ্রস্থ মন বিপথে হাওয়ার মত দোলায়িত হ'তে থাকে। পড়াতে পড়াতে তখন তিনি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান। কিন্তু পড়ান ভাল। ছাত্রেরাও সুবোধ ছেলের মত মুগ্ধ হয়ে শুনে যায়। কিন্তু মাস্টারমশাই যখন পড়াতে পড়াতে চুপ...ছেলেরা তখন বিস্মিত। কিন্তু প্রশ্ন তারা করে না কোনদিন।

সেই ভূগোলসিদ্ধ শশাংকবাবু প্রকৃতই যখন ভ্রমণে বের হতে বদ্ধপরিকর, তখন সেই যাওয়া নিয়ে বাড়ীতে কিছু যে হুলুস্থুল বাঁধবে, তাতে আর বিচিত্র কি?...

অবশেষে বাঞ্ছিত দিন এসে পড়ে।

বিদ্যালয়ের গণ্ডী ও পাড়া ছাড়িয়ে অর্থাৎ ভিন্-পাড়াতে যারা অল্পবিস্তর শশাংকবাবুকে চেনেশুনে, তারা আজ ভাল করেই জানে যে শশাংকবাবু সপরিবারে দেশভ্রমণে চলেছেন মাসখানেকের জন্যে। কোথায়

চলেছেন, তাও অজ্ঞাত নয়। কিছু কিছু প্রচার শশাংকবাবু নিজে করেছেন, কিছু শিক্ষক বন্ধু ও ছাত্রের দল করেছে।

জেনে অনেকেই খুসী।

কারণ তারা জানেন, জীবনে এপর্যন্ত বাইরে মুখ দেখার সুযোগ ও সুবিধা হয়নি শশাংকবাবুর। এ'বার যদি সেই সুযোগ এসে থাকে, তবে যথার্থই আনন্দের কথা বৈ কি।

কিন্তু কিছু সন্দেহ প্রকাশ করলেন স্কুলেরই এক সতীর্থ সুকুমার কাব্যতীর্থ—উপরের ক্লাসে সংস্কৃত ও বাংলা পড়ান।

যাবার দুইদিন আগে বাজারের পথে দুজনের দেখা।...

মামুলি কথা বিনিময়ের পর সুকুমারবাবু বললেন : তাহলে যাওয়া এবার ঠিকব—কি বলেন মশায়?

: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এবার আর কোন ভুল নেই। অগ্রিম টিকিট পর্যন্ত হ'য়ে গেছে। বললেন শশাংকবাবু।

: খুব ভাল। কিন্তু কি জানেন...আমতা আমতা করলেন সুকুমারবাবু।

: কিছু বলছেন কি?—শশাংকবাবুর উৎসুক প্রশ্ন।

: না, এমন কিছু নয়, তবে...আচ্ছা, আপনি বলছিলেন না এ' শনিবারেই রওনা হবেন?

শশাংকবাবু মাথা নাড়লেন।

: হুঁ, তাহলে মুস্কিল হোলো দেখছি...চিন্তিত সুকুমারবাবু বললেন পঞ্জিকা ও' দিনটিকে একেবারেই ভাল বলে না কিনা। যাত্রা প্রায় একেবারে নাস্তি...

শুনে বিব্রতবোধ করেন শশাংকবাবু, বলেন : বলেন কি? কিন্তু আমিওত নিজ চোখে দেখে দিন স্থির করেছি সুকুমারবাবু!

: দেখেছেন? কিন্তু কি ভেবে দেখেছেন, জানিনে। আমারও হঠাৎ নজর পড়লো বলতে পারেন; বলেন সুকুমারবাবু : ধীরেনবাবু নারানসুদ্ধো শনিপূজো করেন কিনা ফি শনিবার, তাই পঞ্জিকাটা দেখতে বললেন আমাকে। আর তাই দেখতে গিয়ে, যাত্রা নির্ঘণ্টটাও নজরে পড়ে গেল। অমনি আপনার কথাও মনে পড়ে গেল।

: 'তবে আপনারই ঠিক। আমার ত ওসব দেখায় অভ্যাস নেই।—শশাংকবাবু এবার বেশ ভাবিত হয়েই বলেন : তবে কি মশাই টিকিট ফেরৎ দিব?

: না, ফেরৎ দেবার দরকার নেই, সুকুমারবাবু এবার সুচিন্তিত অভিমত করেন : সকালের দিকে মানে ৭টা ৪০ মিনিটের মধ্যে সময়টা কিছু ভাল আছে, বারবেলাও পড়ছে না—ঐ সময় যাত্রাটা একেবারে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন, ব্যস্,আর গোল থাক্‌বে না—একটিপ নস্য নাকে গুঁজে দিতে দিতে ফট্ ফট্ চটি পায়ে বাজারের পথে প্রস্থান করেন সুকুমার কাব্যতীর্থ।

ঘরে ফেরেন শশাঙ্কবাবু। কপালের বলীরেখা ঘন হ'য়ে ফুটে ওঠে।

ঘরে ফিরে কিন্তু কালবিলম্ব করেন না দ্বিধাগ্রস্থ শশাঙ্কবাবু। পাশের জ্ঞানদাবাবুর পঞ্জিকাটি আবার চেয়ে নিয়ে এসে দেখতে বসেন।

না: ভুল তার কোথায়? ঠিকই দেখেছেন তিনি। বরঞ্চ সকালের দিকেই 'যাত্রানাস্তি' দেখছেন! ১১টা ৩৭ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড গতে শুভযাত্রার পক্ষে যোগটা ভালই দেখা যায়। হ্যাঁ, তারই ঠিক, সুকুমারবাবুরই ভুল। সুতরাং যাত্রাক্ষেত্রে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে মত চলবেন।

জ্ঞানদাবাবুর পঞ্জিকা ফেরৎ দিয়ে এলেন তিনি।

আরেকটা কাজ বাকি। সেথাও যথারীতি সেরে এলেন তিনি। বালেশ্বরে সত্যেশ্বর রায়কে 'টেলি' করা।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে এবার শশাঙ্কবাবু গৃহিনী সুনীলাদেবীর সঙ্গে বাকী জিনিষগুলো হাতে-হাতে এটা-ওটা গুছিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। অবশ্য সুনীলাদেবী সুপটু হাতে গ্রহণীয় বস্তুগুলো নিতে ভোলেন নি। এখন একমাত্র বেডিঙ্ বাঁধা ও টিফিন ক্যারিয়ারে পথের খাদ্য হিসেবে কিছু নেয়া।

ট্রেন যখন বেলা দুটোয়, তখন শশাংকবাবু স্থির করেছেন, বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘর হ'তে বের হবেন। মালপত্র যাবে ঘোড়ার গাড়ীতে এবং নিজেরাও। গাড়ী একটা নয়, দুটি। থাকেন ট্যাংরার দিকে, সুতরাং হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছতে সময় কিছু চাই বৈকি।

যাবার দিন শশাংকবাবু যাকে বলে ঘরে 'তাণ্ডবনৃত্য' সুরু করে দিলেন।

গোটাদশেক মালপত্র হয়েছে ছোটবড় মিলিয়ে। বড় দুটি স্টীল ট্রাংক, গোটা তিনেক চামড়ার পুরানো স্যুটকেসই প্রধান। দুটি ছালায় কিছু বাসনপত্র ও নানা টুকিটাকি। বেডিং দুটি। আর খাবারদাবারের একটি টিফিন ক্যারিয়ার ও বড় একটি বেতের ঝুড়ি। এতগুলো জিনিষ বেলা নটা বাজিতেই শশাংকবাবু একেবারে বাইরের দরজার মুখে ঠেলে রেখে দিলেন। গাড়ীর গাড়োয়ান দুজনকে বেলা এগারোটার মধ্যে বাসায় আসতে বলেছেন—যাতে তারা সঠিক সময়ে পৌঁছে, এ'কারণ কিছু আগাম দিয়ে রেখেছেন।

ছেলেমেয়েরা কি পরে যাবে, সে ভার সুনীলা দেবীর, শশাঙ্কবাবুর নয়।

কথা আছে, সকাল সকাল একে একে স্নান সেরে আপন আপন ড্রেস পরে নিবে। এখন প্রায় দশটা বাজতে চললো, অথচ এর অর্দ্ধেকও কিছু হোলো না দেখে শশাঙ্কবাবু ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগলেন।

সুনীলাদেবী হেঁসেল নিয়ে ব্যস্ত—সকলে একমুঠো খেয়ে যাবে বলে। তিনি বড় মেয়ে মিণ্টুকে বলে রেখেছেন, সব দেখাশুনার। সে-ও অবশ্য বসে নেই—ছোট ভাই বোন নান্টু পুটুকে স্নান করিয়ে ভাল জামা পরিয়ে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও তৈরী হ'য়ে নিয়েছে।

ছেলেদের মধ্যে 'ভন্টু' একটু ঢিলে, তারই বিশেষ কিছুই হয়নি। অথচ যা করবে, নিজে। কারো সাহায্য পছন্দ ক'রে না সে। সন্টুর প্রায় হয়ে এলো। কিন্তু প্রায় কিছুই হয়নি সুনীলাদেবীর। শশাংকবাবু নিজে দু'ঘন্টা আগে থাকতে প্রস্তুত হ'য়ে বসে আছেন। কাজেই অযথা মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠে 'যাত্রার টাইম' স্মরণ করে দিচ্ছেন।

এক সময় সুনীলা দেবী বিরক্ত হয়ে বলেন: আমরা কি সবাই চুপ করে বসে আছি নাকি—যাই বল, তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি। বারোটা বাজতে এখনো দু'ঘন্টা বাকী।

দু'ঘন্টা আর নেই—শশাঙ্কবাবু ঘড়ি দেখে চেঁচিয়ে বলেন: এখন দশটা বেজে পঁচিশ। একঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকী। এর মধ্যে আবার যাত্রা সারতে হ'বে, মনে রেখো।

সুনীলাদেবী আর জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করতে থাকেন: বাপরে, দু'হপ্তা ধরে অস্থির হ'য়ে মরলুম,... কোথাও যাওয়া না, জ্যান্ত মরা—

সঠিক সময় গাড়োয়ান দু'জন এসে দরজার কাছে হাঁক মারলো।

সুনীলাদেবী তখন একমুঠো খেতে বসেছেন। আর সকলের একরূপ খাওয়া হয়েছে এবং প্রস্তুত। শশাঙ্কবাবু মালগুলো তুলতে হুকুম দিলেন কালবিলম্ব না করে।

প্রায় আধঘন্টার মধ্যে যাত্রার পাঠ শেষ করে 'দুর্গা দুর্গা' করে বাইরের দরজায় বড় তালা ঝুলিয়ে দিলেন শশাঙ্কবাবু।...

ঘোড়ার গাড়ীর এক কোণে আরাম করে বসে শশাঙ্কবাবু এক দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। ...তাহলে সত্যই তারা এতদিন পর বের হ'তে পারলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাকী রাস্তায় তিনি চিন্তায় ডুবে রইলেন।...হ্যাঁ, ঠিক সময়েই ঘর থেকে ওরা বেরিয়েছেন। হাওড়া স্টেশনে নেমে কোন গোলমাল নেই, থ্রি টায়ারে তাদের রিজার্ভেশান ঠিক আছে। গাড়ীতে বসে দুপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর স্টেশনগুলো তিনি ভালভাবে দেখবেন আর উপভোগ করবেন। কোলাঘাটের রূপনারায়ন নদী—যে নদীর কথা তিনি বহুদিন ছাত্রদের স্কুলপাঠ্য পুস্তকের মধ্য দিয়ে জানেন, আজ তাকেই প্রত্যক্ষ করবেন শশাঙ্কবাবু। তারপর দীর্ঘ প্লাটফর্ম, ভারতের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ স্টেশন খড়্গপুর...

হুড়্ হুড়্ করে ঘোড়াগাড়ী চলেছে, দুপাশে মহা-নগরীর রৌদ্রদগ্ধ জনতা ও যানবাহনের চলমান দৃশ্য, ধীরে ধীরে পিছনে অদৃশ্য হয়ে চলেছে, ক্রমে শেয়ালদা স্টেশন ডানে রেখে হ্যারিসন রোডে গাড়ী ঢুকলো—

শশাঙ্কবাবু অনাগত স্থান ও দৃশ্যচিন্তায় মগ্ন হ'য়ে রইলেন।

খড়্গপুরের পর দাঁতন, সুবর্ণরেখা নদী, তারপর বালেশ্বর। বালেশ্বর গিয়ে তিনি একদিনও বসে থাকবেন না, বুড়ীবালামের তীরে, অদূরবর্তী বঙ্গোপ-সাগরের নির্জন সৈকতে, আশেপাশের ছায়ানিবীড় গ্রামগুলো তিনি খুঁটে খুঁটে দেখবেন, তার অনেকদিনের দেখার বাসনা এমনিভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণ করবেন।... তারপর বালেশ্বরে কয়েকদিন কাটিয়ে ভুবনেশ্বর, কোনারক, পুরী দেখার বাসনাও তার আছে। যাবেন তিনি একাই। যেসব স্থানের নিরুক্ত ইতিহাস তিনি বহুদিন যাবৎ শুনে আস্‌ছেন...

সহসা তার চিন্তাজাল ছিন্ন হোলো আশেপাশের প্রচণ্ড গোলমাল।

শশাংকবাবু সচকিত হয়ে দেখলেন তাদের গাড়ী হাওড়া ব্রিজের মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগে পিছে নানাজাতীয় যানবাহন, ট্রাম, প্রাইভেটকার, বাস, হাতরিকসা, ট্যাক্সি, হাতে ঠেলা গাড়ির—ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থা।

তিনি বুঝলেন যে, তারা ট্রাফিক জামের মধ্যে পড়েছেন।

এ 'ট্রাফিক জাম' যে কি বস্তু, তিনি ভাল করেই জানেন। কয়েকবছর আগে টালাতে এরূপ ট্রাফিক জামের হাতে তিনি পড়েছিলেন। তাদের ট্যাক্সির সে জামের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে প্রায় দেড়টি ঘন্টা লেগেছিল।

আচম্বিতে শশাঙ্কবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল।

এখানেও যে এরূপ দেরী হবেনা, কে বলতে পারে?

সামনের গদিতে ভণ্টু, নান্টু, আশ্চর্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো দেখছে, পৃথিবীর এক আশ্চর্য হাওয়ার পুল, কলনাদিনী গঙ্গার বিশালতা, দু'পাশের জনতার মিছিল আর এই ট্রাফিক জাম।

তাদের আরেকটা গাড়ী সামনে—যেখানে আছেন সুনীলাদেবী, সণ্টু আর মিনু।

গাড়ী থেকে আচম্‌কা নেমে পড়লেন তিনি। 'কিংকর্তব্য' জিজ্ঞেস করলেন গাড়োয়ানদের। কিছু জবাব দিতে পারলো না তারা। শুধু অর্দ্ধমৃত 'পক্ষীরাজ' ঘোড়া দুটোকে তাড়না করতে থাকলো মুখের অদ্ভুত শব্দ সহযোগে।...

'জাম' হতে মুক্তি পেয়ে শশাঙ্কবাবুর দু'ঘোড়ার গাড়ী হাওড়া স্টেশনের হাতলে যখন প্রবেশ করলো, তখন সাড়ে তিনটা বেজে গিয়েছে।

উদ্‌ভ্রান্ত ও বিরক্ত শশাংকবাবু স্টেশনে ছুটে গিয়ে খবর নিয়ে জানলেন, সঠিক সময়েই অর্থাৎ ঘণ্টাখানেক আগে হাওড়া-মাদ্রাজ এক্সপ্রেস প্লাটফর্ম ত্যাগ করে গিয়েছে।

এখন কি করবেন?...ফিরে যাবেন? তাদের এত দিনের আশা ও ব্যবস্থা এমনি পণ্ডশ্রম হবে। গাড়ী ফেল করার দোষ তাদের কোথায়? দৈব ছাড়া আর কি বলা চলে?

জিনিষপত্র নামিয়ে রেখে ঘোড়াগাড়ী বিদায় করলেন শশাঙ্কবাবু। তারপর 'টাইম-টেবিল' খুলে বস্‌লেন।

বালেশ্বর যাবার ট্রেন ত তিনি অনেক দেখছেন, কিন্তু এ'সব ট্রেনে কোথাও স্থান পাবেন কি? তবু চেষ্টা করতে বাধা কি?

উঠে পড়লেন আবার শশাঙ্কবাবু। অবশেষে অনেক ঘোরাঘুরি ধরাধরি করার পর যাবার ট্রেন মিললো 'পুরী প্যাসেঞ্জার।' যেটা রাত প্রায় পোনে এগারোটায় ছাড়ে।

সুতরাং নিরুপায় বসে থাকা ছ'সাত ঘন্টা হাওড়া স্টেশনে।...এ'কয়ঘন্টা শশাঙ্কবাবু শুধু দোষারোপ করতে লাগলেন নিজের ভাগ্যকে।

পুরী প্যাসেঞ্জার প্রায় একঘন্টা লেট করলো বালেশ্বর

স্টেষনে পৌছতে। আশ্বিন মাসের রৌদ্র অনেকটা তেতে উঠেছে।

স্টেশনে রিসিভ করতে কেউ ছিল না। শশাঙ্কবাবু আশাও করেন না। যে ট্রেনে তাদের এখানে পৌছানোর কথা, অর্থাৎ রাত্রি সাড়ে আটটায়, তা নেহাৎ দৈব দুর্ঘটনাতেই হোলো না। এলেন পরের ট্রেনে। কাজেই আশা করে লাভ নেই। তবে আসতে যে পারলেন, তাই যথেষ্ট। গোটা কয়েক সাইকেল রিকসা ও কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে গোপাল গাঁও রোডে যখন ডাঃ সত্যেশ্বর রায়ের বাড়ী ট্রেন-ভ্রমণ-ক্লান্ত শশাংকবাবু সপরিবারে পৌছলেন, তখন সত্যেশ্বর রায়ের বহির্দরজায় বড় একটি তালা ঝুলছে।

শব্দ সাড়ায় পাশের বাড়ী হতে একটি লোক বেরিয়ে এলো।

জানালো যে, সে এই বাড়ীর চাকর। ডাক্তারবাবুর বাবা গঞ্জামে থাকতেন। হঠাৎ তার মৃত্যুসংবাদে বিভ্রান্ত ডাক্তার বাবু হুড়াতাড়া করে গতকাল সকালেই সপরিবারে চলে গেছেন সেখানে। বলে গেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরবেন।

তারপর পকেট থেকে একগোছা চাবি শশাংকবাবুর হাতে দিয়ে বললেন যে, চাবিগুলো ডাক্তারবাবু দিয়ে গিয়েছেন। তারা যে সন্ধ্যারাতে এখানে আসবেন, সকলেই জানে। স্তব্ধ হতভম্বপ্রায় শশাংকবাবু যন্ত্রচালিতের মত চাবির গোছাটি হাতে গ্রহণ করলেন।

দু'সপ্তাহের মধ্যে শশাংকবাবু কলকাতার ট্যাংরা রোডে ফিরে এলেন।

যাতায়াতে যে অভিজ্ঞতা হোলো, সহজে জীবনে ভুলবেন না শশাংকবাবু।

ক্লাসে বসে ছাত্রদের কাছে ভুগোল পাঠের চেয়ে বাস্তবক্ষেত্রে ভুগোলপাঠের গুরুত্ব যে কতখানি এবার হাতে-নাতে বুঝতে পারলেন।

না, ভায়রাভাই ডাঃ সত্যেশ্বর রায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। তার বালেশ্বর আসার আগেই তিনি কলকাতা রওনা হ'য়ে আসেন। তার অনেককিছু দেখার বাসনা নষ্ট হয়ে যায়। পরের বাড়ী এমনভাবে থাকতে শশাংকবাবুর মোটেই ভাল লাগেনি—সুনীলাদেবীরও না। তবু তিনি মালিকহীন বাড়ীতে দশদিন কাটিয়েছেন। অবশ্য কষ্ট কিছু হয়নি। সত্যেশ্বরের চাকরটি ভাল। না চাহিবামাত্র হাতে হাতে সে সবকিছু করে দিয়েছে।

গঞ্জাম থেকে সত্যেশ্বরের চিঠি পেয়েছিলেন শশাংকবাবু।

তাতে অনেক কিছু ছিল। সহসা পারিবারিক বিপদে বালেশ্বরে কি করে থাকতে পারেন সত্যেশ্বর রায়—এই না থাকার জন্যে অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছে সে। কিন্তু শ্রাদ্ধের শেষ কাজ সম্পন্ন করে যেতে তার আরো কিছু বিলম্ব ঘটবে, কাজেই ততদিন সে যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে—

না, অপেক্ষা করতে পারেনি শশাংকবাবু। কারণ ওভাবে থাকা সত্যিই তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সত্যেশ্বর রায়ের চিঠির জবাব দিয়েছেন শশাংকবাবু। তাতে সত্যের অপলাপই করেছেন তিনি। বিশেষ কোন জরুরী কাজে তাদের কলকাতায় ফিরতে হ'য়েছে, একথাই জানিয়েছেন।

কিন্তু...ফিরে এসে শশাংকবাবু বুঝেছেন যে, সুকুমার পণ্ডিতের কথাই যথার্থ, তারই ভুল, তিনি লক্ষ্য করেননি জ্ঞানবাবুর পঞ্জিকাটি ছিল একবছরের পুরানো। তার এখন প্রবল সন্দেহ তার ভাগ্যে শনিবারের বারবেলার বিপত্তিটি সত্যিই এ'কারণে ঘটে গিয়েছে কিনা ?...

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

৬

এবারকার কংগ্রেসে কয়েকটি বৈশিষ্ট বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল, এবার প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় প্রতিনিধিদের বসবার ব্যবস্থা প্রভৃতির আমূল পরিবর্তন করা হয়েছিল।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ছিল অধিবেশনের ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিচালনা। ফলে অধিবেশনের সময় খুব সংক্ষিপ্ত হয়েছিল, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মূল সভাপতি এবং অন্যান্য বক্তারা, বক্তৃতার জন্য খুব কম সময় নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র দুদিনে কংগ্রেসের অন্য কোন অধিবেশনের শেষ হয় নি।

এবার কংগ্রেসে আর একটি যুগান্তকারী ঘটনা দেখা গেল। এই প্রথম কংগ্রেস একজন ডিক্টেটর নিযুক্ত করল। মহাত্মা গান্ধীকে এক নায়কত্ব বা ডিক্টেটারের পদে নিযুক্ত করা হল।

৭

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের পর আমার কথামত ৺ডাক্তার চারুচন্দ্র সান্যাল।' ৺নলিনী মোহন-রায়চৌধুরী প্রভৃতি ৬।৭ জন বাংলার প্রতিনিধি মেহেতা মশায়ের গৃহে নৈশভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হলেন। এঁরা গুজরাটিপরিবারের আথিতেয়তা দেখতে চেয়েছিলেন।

সন্ধ্যার পর যখন তাঁরা মেহেতাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন তখন গৃহস্বামী ও তাঁর পরিবারবর্গ অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বৈঠকখানায় নিজে নিয়ে বসালেন। কিছুক্ষণ বাদে আহারের আহ্বান এল। খাবার ঘরে গিয়ে দেখা গেল প্রত্যেকের বসবার জন্য পিঁড়ি রাখা হয়েছে বা সেই পিঁড়িগুলির সম্মুখে একটি করে অপেক্ষাকৃত উঁচু পিঁড়ি রাখা হয়েছে। অতিথিদের সঙ্গে গৃহকর্তা ও তাঁর বাড়ীর পরিজনের মধ্যে ২।৩ জন। শৈলেশ্বর ও আমি খেতে বসলাম। সম্মুখের উপর একটি করে থালা রাখা হল এবং পাশে জলের-গেলাস দেওয়া হল। তার পর বাড়ীর মেয়েরা পরিবেশন সুরু করলেন। প্রথমেই কয়েকটি মিষ্টি ও দুধপাক (পায়েস) পরিবেশন করা হল। পশ্চিম ভারতের নিয়ম প্রথমে মিষ্টি খাওয়া। যাই হোক আমরা জানালাম যে আমরা প্রথমে মিষ্টদ্রব্য খাই না পরে খাই। আমাদের কথা শুনে মেয়েরা হেঁসে লুটিয়ে পড়ল। আমাদের ইছানুসারে মিষ্টদ্রব্যগুলি শেষের জন্য রেখে প্রথমে ভাত ডাল তরকারি তার পর ফুলকা (খুব পাতলা রুটি) ডাল, তরকারি পুনরায় ভাত ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে পরিবেশন করা হল। পরে আমারা মিষ্টদ্রব্য ও দুধপাক খেয়ে আহার শেষ করলাম। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে মহারাষ্ট্রে এবং গুজরাতে বাড়ীর মেয়েরা কেউ পরিবেশন না করলে অতিথিদের অবমাননা করা হয়।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অতিথিরা তাঁদের ক্যাম্পে ফিরে গেলেন। স্থির হল যে পরদিন প্রাতঃ-কালে আমরা বরোদা সহর দেখতে যাব।

পরদিন আমাদের ছোট একটি দল ট্রেনে বরোদা অভিমুখে রওনা হলাম। বরোদা ষ্টেশনে পৌঁছে জানলাম যে তথাকার কলাভবনের ছাত্রাবাসে কয়েকজন বাঙালী ছাত্র বাস করে, আমরা সেখানে খাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। বাঙালী ছাত্ররা অতি আগ্রহসহকারে তাদের বোর্ডিংয়ে থাকার জন্য আমাদের আহ্বান করলেন।

আমরা সেখানে উঠলাম এবং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানাহার সেরে ঐ ছাত্রদের সাহায্যে টাঙ্গা করে শহর দেখতে গেলাম। মহারাজার সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারিনি। সেখানে প্রবেশের জন্য পাশের দরকার। আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত কাজেই সে রাজপ্রাসাদ আর দেখা হল না। অপর একটি রাজপ্রাসাদ দেখলাম। সেটিও অতি সুন্দর। সেখানকার গাইড প্রাসাদের অন্যান্য স্থান-দেখানোর পর মহারাজার জন্য বিশেষ ভাবে নির্মিত শৌচাগার ও স্নানাগার দেখাতে নিয়ে গেল। বিলাসিতার চরম নিদর্শন দেখতে বিস্মিত হলাম। উভয় ঘরের দেওয়াল ও মেঝে মার্বেল মণ্ডিত, স্নানাগারে যে টাবটি রক্ষিত আছে তাঁর সঙ্গে অসংখ্য নানা প্রকারের নল যুক্ত রয়েছে, কোনটা দিয়ে গরম জল কোনটা দিয়ে ঠাণ্ডা জল। কোনটা দিয়ে গন্ধদ্রব্য আসবে তার ব্যবস্থা আছে। শুনলাম যে এই টাবটির জন্য খরচ হয়েছিল দশ হাজার টাকা।

শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বরোদার বিখ্যাত গ্রন্থাগার ও চিত্রশালা দেখলাম। খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক নিউটন দত্ত অতি যত্নের সহিত আমাদের লাইব্রেরী ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সব দেখালেন। তারপর আমরা চিত্রশালা দেখলাম। নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর ছবিতে গৃহটি পরি-পূর্ণ ছিল। বিশেষতঃ অতি সুন্দর ক্ষুদ্রাকৃতি ছবিগুলি দেখে নয়ন সার্থক করলাম। মাত্র একদিন সময়ে বরোদার মত সহর ভাল করে দেখা সম্ভব নয়, কাজেই আমাদের ভ্রমণ বুড়িছোঁয়া গোছের হল।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর আমরা চিতোর-গড় দেখতে রওনা হলাম। বরোদা স্টেশনে আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে বাঙালী ছাত্ররা সকলেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল। ট্রেন যখন স্টেশনে পৌঁছল তখন দেখলাম কামরাগুলি লোকের ভীড়ে পরিপূর্ণ। কামরার দরজা খোলা অসম্ভব। তখন ঐ ছাত্রবন্ধুরা—আমাদের প্রত্যেককে চ্যাংদোলা করে গবাক্ষ পথে ট্রেনের ভিতর ছুঁড়ে দিতে লাগল। আমাকে যখন ঐভাবে নিক্ষেপ করা হল তখন দেখলাম আমার একপা পাটাতনে, অন্য পা রাখার জায়গা হল না। আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে আমাদের মালপত্রগুলি অনুরূপ ভাবে ভিতরে ফেলে দেওয়া হল। ট্রেন চলার অনেকক্ষণ পর আমরা খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে কেউ মেঝেতে বিছানা বা সুটকেশের উপর বসলেন। কাউকে বা অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তখনকার দিনে ট্রেনে এত প্রচণ্ড ভীড় হত না। আমেদাবাদ কংগ্রেস শেষ হওয়ায় প্রতিনিধি ও দর্শকদের জন্য এই ভীড় হয়েছিল।

কয়েক ঘণ্টা পর রাত্রির প্রথমভাগেই আমরা চিতোর-গড় স্টেশনে উপনীত হলাম। স্টেশনে দেখলাম কয়েক-জন বাঙালী তীর্থযাত্রী ও যাত্রিনী সেই ট্রেনে ওঠার জন্য পরস্পরকে ডাকছে। সুদূর রাজপুতনায় (বর্তমানে রাজস্থান) বাঙলা ভাষা ও বাঙালীর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে যেন মধুবর্ষণ করল, আমরা স্টেশনের অনতিদূরে চিতোর দুর্গের পাদদেশে একটি ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করলাম। চিতোরে কি দারুণ শীত, আমেদাবাদের গরমের পর এখানকার এই হাড় কাঁপানো শীতে বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ট্রেন যাত্রার ধকলে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রাতঃপ্রালে দেখা গেল যে তাঁর রীতিমত জ্বর হয়েছে। তিনি চিতোর গড় দর্শনের আশা ত্যাগ করে একজন সঙ্গীসহ কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন।

প্রাতঃকালে আমরা প্রাতকৃত্যাদি সেরে জলযোগ সহ চা পান করে কয়েকটি ভাড়াটে টাঙায় চড়ে চিতোর দুর্গের দিকে রওনা হলাম। দুর্গটি প্রায় ৫০০ ফুট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর নির্মিত। টাঙাগুলি পাহাড়ের বিসর্পিত পথে উঠে কয়েকটি তোরণ অতিক্রম করে দুর্গ-প্রাকারের নিকটে আমাদের নামিয়ে দিল। সেখান থেকে একজন গাইডের সাহায্যে দুর্গের অভ্যন্তরে বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য স্থানগুলি যথা, পদ্মিনী মহল, মীরা বাইয়ের মন্দির, রাণা কুম্ভের শ্যামের মন্দির, রাজপুত মহিলাদের জহরব্রত পালনের স্থান ও আরো কয়েকটি মন্দির দেখে আমরা রাণাকুম্ভের বিজয় স্তম্ভের উপর উঠলাম, স্তম্ভের

জীর্ণ দশা দেখে আমরা সকলেই দুঃখ অনুভব করলাম। চিতোর গড়ে মহারাণার জন্য একটি সুরম্য প্রমোদভবন—বহু অর্থ ব্যয় করে সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে দেখলাম অথচ তাঁর পূর্ব পুরুষের কীর্তি রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই নেই।

দুর্গ দেখে ফিরে ধর্মশালায় স্নানাহার সেরে আমরা ট্রেনে মেবারের রাজধানী উদয়পুর দেখতে গেলাম। সেখানেও একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলাম। জিনিসপত্র রেখে আমরা শহর দেখতে বেরুলাম। তখন উদয়পুরে মেবারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে রাণাকুম্ভের বিজয় স্তম্ভের সংস্কারের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে বললাম। তিনি জানালেন যে এখানকার লোকেরা উদাসীন। মাঝে মাঝে বাঙালী পর্যটকেরা এ সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। এ পর্য্যন্ত তাতে কোন ফল হয়নি।

উদয়পুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। চারিদিকে সমুন্নত পর্বতশ্রেণী ও সুবৃহৎ হ্রদ দর্শকের নয়ন-মন-মুগ্ধ করে।

প্রথমে আমরা পিচোলী হ্রদের তীরে শ্বেতপাথরে নির্মিত অতি সুন্দর কারুকার্যশোভিত বহু বিস্তৃত রাজ-প্রাসাদ দেখতে গেলাম। একজন গাইড আমাদের প্রাসাদের নানা কক্ষে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকটি কক্ষের সৌন্দর্য্য দেখালেন।

রাজপ্রাসাদ দেখার পর একটি নৌকা ভাড়া করে পিচোলী হ্রদে বেড়ালাম। হ্রদের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপে জগমন্দির নামে একটি প্রাসাদ আছে। আমরা নৌকা ভিড়িয়ে সেই সুন্দর প্রাসাদ দেখলাম। সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র যুবরাজ খুররমকে পিতার রোষবহ্নি থেকে রক্ষা করায় মেবারের মহারাজ আশ্রয় দিয়ে এই প্রাসাদে রেখেছিলেন। যুবরাজ খুররমই পরবর্তী সম্রাট সাজাহান।

আমরা যখন পিচোলী হ্রদ থেকে ফিরে আসছিলাম তখন তীরবর্তী রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য আমাদের মন মুগ্ধ করেছিল।

নৌকা থেকে নেমে আমরা টাঙ্গা করে শহরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ধর্মশালায় ফিরলাম। সন্ধ্যার পর শীতের তীব্রতা অসহ্য হয়ে উঠল। কোন প্রকারে আহারাদি সেরে সোয়েটার আণ্ডারওয়েয়ারের প্রভৃতি পরিহিত অবস্থায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

প্রাতঃকালে হাত মুখ ধুয়ে চা পানান্তে কলকাতার ট্রেন ধরার জন্য চিতোরগড় স্টেশনে উপস্থিত হলাম। তারপর সোজা কলকাতা ফিরে এলাম। পথে আর কোথাও নামলাম না।

ক্রমশঃ

ঝুলন-পূর্ণিমা

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ঝুলন পূর্ণিমা তিথি। বরষার অশ্রুজল ঝরা রবি-তিরোধানে
মধুর বিধুর হলো। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। কাব্যে, নাট্যে, নৃত্যে, গানে,
রূপে, গুণে, স্নেহে, মাধুর্যের মহিমায়, সৌন্দর্যের বিচিত্র প্রকাশে
মুগ্ধ যিনি করেছেন বিশ্ববাসিজনে। উচ্চ, নীচ, সবারি সকাশে
মৈত্রীর অভয়বাণী, তথাগতসম, করেছেন জগতে প্রচার!
দিয়েছেন অশান্তরে শান্তির আলয়। জয় করি হৃদি সবাকার
এনেছেন রম্য তপোবনে!

তপস্বীর তপোলব্ধ শান্তিনিকেতন।

যেথা নানা, বর্ণ, ধর্ম, নানা ভাষাভাষী পৃথিবীর অধিবাসীগণ
বন্ধুত্বের প্রেমডোরে বাঁধা পড়িয়াছে। উজাড়ি সবার স্নেহসার
অসীম বৈচিত্র মাঝে গড়িয়াছে বিশ্বে এক নীড়—এক পরিবার।
সে-মহাকবির লভিয়াছে স্পর্শ যারা, ধন্য তারা! স্পর্শমণি সম,
সেই স্পর্শ লোহারে করেছে সোনা। লভেছে নিস্তেজ, তেজ—অনুপম!
নালন্দা, বিক্রমশিলা, তক্ষশিলা আদি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্বভারতীর মাঝে লভিয়াছে নূতন জনম—নূতন আশ্রয়।
সেই শান্তিনিকেতনে এলে তুমি বহুদূর হতে, আমাদের গেহে,
আমাদের রাজা! রাজারি মতন করেছিলে জয়, রূপে, গুণে, স্নেহে,
আমাদের সবারি হৃদয়! জীবনের যত পূজা হলো না তা সারা।
ফুল আর ফুটিল না—ঝরিল ধুলায়! মরুপথে, ক্ষুদ্র নদীধারা
মুছে গেল। ঘুচে গেল দেহের বন্ধন! সীমা আজ হারাইল সীমা।
রবি যবে গেলা অস্তাচলে—সেই তিথি। আজও সেই ঝুলন-পূর্ণিমা।

সর্বহারা

পুষ্পদেবী

নারীর মহিমা হায় ভুলেছে যে না জানি কি করে
মায়ের গৌরব তার নাহি আর সর্ব্ব চিত্তহরে।
কবির কল্পনা সে যে জননীর মানস প্রতিমা
শিল্পীর তুলি কাহারে দিতে যার এতটুকু সীমা,।
করুণায় দ্রবময়ী মহিমায় অধরা যে জন
হায় রে লুণ্ঠিত তাই রমণীর অতুলন মন।
কোন দুরাচার হায় নিঃশেষ করিল নিজ বলে
মায়া কোমলতা স্নেহ বিসর্জন দুচরণে দলে।
জননী রাক্ষসী আজ সত্য আজ মিথ্যা রূপ ধরে
হারাইয়া মার স্নেহ ভীত হয়ে কাঁপে থরে থরে।
স্মিত মুখে স্নেহ সুধা বিলাবার কথা যার ছিল
না জানি কিসের আশে কার পায়ে নিজে বিকাইয়া
কি মোহ লালসা হায় কল্পনার বদ্ধ কারাগার
মায়ের প্রতিমা শত বিবর্ণ বিকৃত হয়ে মরে।
আর কি পাব না ফিরে আত্মহারা জননীর স্নেহ
আর কি ভগিনী প্রীতি করিবে না স্নিগ্ধ ভ্রাতৃদেহ।
সহধর্মিনীর নাম সার্থক হবে না কভু তার,
দাঁড়াবে না কন্যা আসি মাতৃরূপে সম্মুখে আবার।
সব কি ফুরায়ে গেল রূঢ় এই বাস্তব চেতনা—
কে জোগাল কেবা দিলো মৃত্যু ওরে কিসের প্রেরণা
শান্তিরূপে ভ্রান্তি এল ত্যাজি এই মোহ কারাগার
মায়েরা জাগিয়া ওঠ সন্তানের শক্তির আধার।
মদালসা বিদুলাও গান্ধারীর বাণী মনে করো
সত্য ও ধর্মের জয় হইবেই এই কথা স্মরো।
সত্যেরে স্মরিয়া সবে অসত্যেরে চরণেতে দলে
জননী আসিবে পুনঃ দৃপ্ত পশু তার পদতলে।
পুরাণের শত নারী তপস্যায় উমারূপে সেই
আবার আসিবে ফিরে নাই দেরী আর দেরী নাই।

দুর্লভ দিন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জাগরণে কোন্ কাজ!—নিয়ে অর্ধনিমীলিত আঁখি
আজি এ অলস প্রাতে মনে হয় শুধু পড়ে থাকি
সুকোমল তন্দ্রালীন! মাঝে মাঝে শুনি পেতে কান
ভোরের ভজন-গাওয়া বৈরাগীর খঞ্জনীর তান
নিরজন পল্লীপথে। কী মধুর পুষ্পিত প্রলাপ
সদ্য-জাগা বনানীর! কোথা ধায় ভ্রমর-কলাপ
উল্লসিত পাখা মেলি'! এত গীতিগন্ধ সমারোহ
জাগাইয়া তোলে প্রাণে কাজ ভোলা এ কোন্ সম্মোহ!
করবীর রাগরঙ্গ, রঙ্গনের অপাঙ্গের হাসি,
গৃহের প্রাঙ্গণ ভরি' দধিশুভ্র মল্লিকার রাশি
কোন্ পূর্বজনমের ভুলে-যাওয়া সুখস্বপ্নসম
সহসা আকুলি' তোলে শান্তস্নিগ্ধ প্রাণমন মম
নিশিভোরে!

কাজকর্ম?—ছিল, আছে, রবে চিরদিন!
জানি—শুধিতেই হবে ক্লান্তিকর অস্তিত্বের ঋণ
হৃদয়-শোণিতে;—এই গন্ধশোভা, সুরের আবেশ
মুহূর্তেই যাবে টুটে—এতটুকু না রহিবে লেশ!
সেই উঞ্ছ আহরণ—বাঁচিবার দুর্মর প্রয়াস
সুখস্বপ্নাতুর চিত্তে করিবে নির্মম পরিহাস
ক্ষণপরে! এ জীবনে নাহি যদি তিলেক বিশ্রাম,—
যযাতি-যৌবনা ধরা কেন তবে নয়নাভিরাম?
উথলে সমুখে মোর সৌন্দর্যের সপ্ত পারাবার,—
ক্ষুব্ধ প্রাণ তারি তীরে বসি' সদা করে হাহাকার
তৃষাতুর! অর্ধতন্দ্রাঘোরে তাই আজ শুধু ভাবি,—
এ সংসারে সব মিথ্যা,—সত্য শুধু এ দেহের দাবী
দয়াহীন! রাত্রিদিন একটানা কাজ আর কাজ!
হায় কবি, আত্মতৃপ্ত অকিঞ্চন নির্বোধ নিলাজ,
তোর স্বপ্নকল্পনায় অবিরাম হানিছে ধিক্কার
উদগ্র জঠর জ্বালা,—স্বর্গশায়ী বিশ্ববিধাতার
সে আদিম অভিশাপ! অফুরন্ত গন্ধ শোভা গান
কর্মকোলাহলমত্ত হৃদয়েরে করিছে আহ্বান
বৃথা শুধু! এ প্রভাতে তাই মনে হয় বারবার

ক্ষণিক আলসে মোর অচল হবে কি এ সংসার
চিরতরে? জন্ম-মৃত্যু দুই প্রান্তে সান্দ্র অন্ধকার ;—
তারি মাঝে এ জীবন—ক্ষণিকের আলোক-উৎসার।
আসিব না হয় তো বা কোনোদিন আর কভু ফিরে
এ উদার-রমনীয় চিরপ্রিয় শ্যাম উর্বীতীরে
পুনর্বার! পাখি-ডাকা আর কোনো পেলব প্রভাতে
নিদ্রাজড়িমার মাঝে দেখিব না চাহি জানালাতে
লতাপুষ্পমহোৎসব!—কেন তবে এত ছোটাছুটি?
পল্লবশয়ান শুভ্র গন্ধরাজ করে ফুটি ফুটি
আধো আঁখি মেলি'; দূরে নারিকেল তরুশাখা 'পরে
শিশু সবিতার আলো ঝিমায় মধুর তন্দ্রাভরে;—
তাহার নাহিক ত্বরা! অমনি স্বর্ণাভ তন্দ্রালীন,
মসৃণ শান্তির মাঝে কাটে যদি এ দুর্লভ দিন,—
ক্ষতি কার! বহুদিন ভুলে-যাওয়া নিজেরে আবার
এ নিভৃতে খুঁজে যদি পাই তবে কোন্ হানি কার!

রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

তুমি আকাশের মত?
আদি অন্তহীন
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলিয়াছ দিগন্তবিলীন
সব মন-চক্রবাল, উধাও প্রান্তর।
ধরণীর শেষ প্রান্ত উত্তাল সাগর।
তুমি সাগরের মত? উদ্দাম আকুল
তরঙ্গে তরঙ্গে লেখ ভাসাইয়া কূল—
বীথির বিচূর্ণ বাণী - কাব্য হয়ে ফোটে
বেলাতটে কথা তার ভাঙে জাগে ওঠে।
তুমি পৃথিবীর মত?
রূপে রসে সুরে
সাজায়ে সাজায়ে গেলে সমস্ত ঋতুরে
ধরার প্রঙ্গণতলে।
হে কবি জানি না।
শুধু শুনি বীণাপাণি দিয়েছিল বীণা
একদা তোমার হাতে। তাহারি ঝঙ্কার!
"যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিল ইহার তার।"

বাংলা ও বাঙালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'জেট'-বাজেট

ছেলে ঘুমলো—পাড়া জুড়ালো—বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।

পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলিতেছি, বর্তমান বৎসরে বর্গীবীর রচিত বাজেটের চোটে, এ-রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা অনাহার ক্লিষ্ট দেহ মন, এমন কি ক্ষুধায় ক্রন্দন করিবার শক্তিও যাহাদের নাই—তাহারা, সেই শিশু এবং কিশোর কিশোরীর দল, অবসন্ন দেহ মন লইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে নেতাইয়া পড়িয়াছে! কাজেই দেশে "অন্ন দাও অন্ন দাও" কলরব নাই, থাকিলেও তাহা কয়-জনের কর্ণে প্রবেশ করিবে জানি না।

ভারতবর্ষে এই প্রথম এমন একজন অর্থমন্ত্রীর উদয় হইল, অর্থাৎ বর্গীবীর শ্রীচৌহান—যাঁহার উদার অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেশের এবং সাধারণজনের নিত্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যই টেক্স হইতে রেহাই পায় নাই। আর যে দুচারটি সামগ্রী ছাড়া পাইয়াছে, তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি হইবেই। পেট্রল এবং রেল মাল পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু লোকে যাহাই বলুক, আমরা মনে করি মহামান্য মহারাষ্ট্র নেতা তথা বর্গীবীর রচিত এবারের বাজেট অতি মনোরম হইয়াছে। হাতে দুই চারিটা বেশী পয়সা আমদানীর কল্যানে আমাদের খাবার চাউল-এ টান পড়িলেও, অন্য ভাবে এবং দিকে নানা প্রকার চালমারা একটা বদ্ অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যায়। বর্গীবীর বীর এবার সেই অনাবশ্যক অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর 'চালমারা' রোগ হইতে আমাদের বাঁচাইলেন। যেমন ধরুন—

দেশে সাজীমাটি যথেষ্ট আছে, সেই সাজীমাটি গায়ে মাখিয়া সাবানের খরচা বাচানো যাইবে। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় না হউক বোম্বাই মিলের দেওয়া মোটা কাপড় দিয়া সকলের কাজ চলিতে পারে।' মন্ত্রীগটি এবং সংসদ সদস্যরা অবশ্যই finest of the fine খদ্দরের ধুতী পাঞ্জাবী পরিবেন, তাঁহাদের বিশেষ অধিকার বলে এবং তাঁহারা বিশেষ privilege প্রাপ্ত শ্রেণী বলিয়া। সুগন্ধ মাথার তেলের কিবা প্রয়োজন? সাধারণ নারিকেল বা ক্যাষ্টর অয়েলে চাঁপা বা অন্য-বিধ সুগন্ধ ফুল কয়েকদিন ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে সুগন্ধ তেলের সব কিছুই পাওয়া যাইবে—এই প্রকার ঘরের প্রস্তুত মাথায় মাখিবার তেলের কাছে বসন্তবাহার, বেগম-তোষ প্রভৃতি মূল্যবান তেলও হার মানিবে। আসল কথা—ইচ্ছা থাকা চাই।

কলে তৈরী বিস্কিট খাইবার দরকার কি? বাড়ীতে ময়দা আটা দিয়া বেশ কড়া মুচমুচে এবং সুস্বাদু নানা প্রকার প্রায়—বিস্কিটের মত দ্রব্য তৈরী করা যায়। আসল কথা ইচ্ছা থাকা চাই চাই।

নাম করা বড় দোকানের ছাপ মারা তৈয়ারী পোষাক না হইলে কি চলে না? বাড়ীর মেয়েরাই ত একটু চেষ্টা করিলে বাড়ীতেই নানা রকম পোষাক ছেলে মেয়েদের জন্য তৈয়ার করেন, এবার আরও করিবেন এখন হইতে বড়দের জন্যও সহজ, সুন্দর আরামদায়ক আলা খাল্লা জাতীয় জামার একটা নূতন সংস্করণ করাতে দোষ কি। আর কিছু না পারা যাক—মাপ সই বড় বালিসের খোল তৈয়ার করিয়া, তাহার দুই দিকে দুইটা হাত সেলাই করিয়া দিলেই চলিবে। বাহার না হউক কাজের জিনিষ অবশ্যই হইবে। বর্গী অর্থমন্ত্রী আমাদের কত সুযোগ দিতেছেন। আসলে ইচ্ছা থাকা চাই—

টুথ-ব্রাশ না হইলে কি চলে না? এ-দেশে শত শত বৎসর যাবত পেয়ারা, নিম, জাম, গাব, ভ্যারেণ্ডা ডালের দাঁতন লোকে ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত—একটা দাঁতন দশ-পনেরো দিন চলে। দাঁতনে একটু সরিষার তেল এবং নুন লাগাইয়া দিলে—কোথায় লাগে বিলাতী বা দেশী বিচিত্র এবং মূল্যবান টুথ-ব্রাশ—আর টুথ-পেষ্টের স্থলে লবন এবং দু'চার ফোঁটা সরিষার তৈল। এই সব একবার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলে, আর কিছুতে মন উঠিবে না, দাঁত ও মাড়িও খুসী হইবে। এই সব দ্রব্যের উপর অর্থদপ্তরের চাঁইদের নজর এখনও পড়ে নাই, কাজেই যতদিন পারা যায়, খরচ সাশ্রয় করিতে দোষ কি? দোষ কিছুই নাই—আসলে ইচ্ছা থাকা চাই।—

ময়দার উপর শুল্ক বসিয়াছিল, সংসদে এবং সমগ্র দেশে প্রতিবাদ হওয়াতে—বর্গী অর্থমন্ত্রী ক্রমাগত ৯॥ দিন ছদ্মবেশে দেশে নানা স্থানে,নানা স্তরের লোকের মধ্যে ভ্রমণ করিলেন, অবশ্য আকাশযানে করিয়া, কারণ চৌহান সাহেব এরোপ্লেন চড়িতে ভালবাসেননা, কিন্তু যেখানে দেশের এবং দশের সেবার প্রশ্ন জড়িত, তাঁহাতে একান্ত বাধ্য হইয়া, দুঃখিতচিত্তে এরোপ্লেন ভ্রমণ করিতেই হয়। অর্থমন্ত্রী সমগ্র দেশ ঘুরিয়া এক বিচিত্র জ্ঞান অর্জ্জন করিলেন যে দেশে কুলী মজুর এবং সামান্য শ্রমিকও পাউরুটি আর চা খায় দিনে অন্তত দু'তিন বার। চৌহান সাহেব দেখিলেন যে পাউরুটি কেবলমাত্র উপরতলা বাসীন্দারাই খায় না, অন্যরাও খায়। কিন্তু মনে করিবেন না শুল্ক প্রত্যাহার করা হইলেও এই সকল সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। রেল-মাশুল এবং ট্রাক্ প্রভৃতির ভাড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কেহই এই অতিরিক্ত ভাড়া নিজের ট্যাঁক্ হইতে দিবে না। অতএব শেষ পর্য্যন্ত যাহা ত্যাগ করিতেই হইবে, তাহা আজই কেন করিব না। আটা-ময়দার বদলে ভুট্টা প্রভৃতির চলন বাড়াইতে দোষ কি? এ-রাজ্যে এই সবের চাষ এবং ফলন প্রচুর হওয়াতে সহজ-লভ্য এবং সহজ মূল্যে বিক্রয় হয়। আসলে ইচ্ছা থাকা চাই।

কত আর বলিব?—

ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রেল—সব কিছুর ভাড়াই বৃদ্ধি পাইয়াছে, বহুক্ষেত্রে যাহা সোজা পথে হয় নাই, তাহার মার বাঁকা পথে আদায় করিবার প্রশস্ত ব্যবস্থা বর্গীবীর চৌহান অর্থমন্ত্রী কেমন অবলীলাক্রমে সমাধা করিলেন! আজ পর্য্যন্ত ভারতে প্রায় দেড় গণ্ডা অর্থমন্ত্রী গদীতে বসেছেন কিন্তু এমন চৌকস এবং সুদক্ষবুদ্ধিদীপ্ত অর্থনীতি বিষয়ে পরম অজ্ঞ অথচ প্রাজ্ঞ আর কাহাকেও ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। এমন কি মহারাষ্ট্রবাসী অর্থনীতিবিদ্ শ্রীদেশমুখ আজ বর্গীবীর চৌহানের কেরামতি দেখিয়া নিজেকে এতই নির্ব্বোধ মনে করিতেছেন যে তিনি লজ্জায় বিন্ধপর্ব্বতে অগস্ত মুনির পথে যাত্রা করিয়াছেন। আর কৃষ্ণমাচারী? তিনি ত এখন ত্রিসন্ধ্যা কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। আর দেশ বিখ্যাত শ্রী 'মোরারজী' দেশাই—এখন দেখা যাইতেছে তাঁহার ইস্পাত কঠিন অন্তরেও দয়া মায়া বলিয়া কিছু পদার্থ ছিল! বর্গীবীর চৌহান তাঁহার বাজেটের গাট্টাতে পূর্ব্বতন সকল অর্থমন্ত্রীদের একেবারে বোকা বানাইয়া দিয়াছেন! জয় শ্রীচৌহান! জয় বর্গীবীর অর্থমন্ত্রীর!

বাস-ট্রামের ভাড়া বাড়িয়াছে কিংবা বাড়িবার পথে। "এখন হয়েছে সময়" বাস, ট্রাম, ট্যাক্সী বর্জ্জন করিয়া শ্রীশ্রীচরণ যুগলের আশ্রয় গ্রহণ করা। আমরা হাটিতে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম—এইবার আপিস, কলেজ, স্কুল যাইবার সময়, সময় থাকিতে আবার হাটা পথ ধরি। যে পয়সা বাঁচিবে, তাহাতে চিনা বাদাম, ভুট্টা অথবা ছোলাভাজা দু-চার পয়সার কিনিয়া দল বাঁধিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করি! যাহারা বিনা ভাড়ায় ট্রাম বাস রেল চড়ায় অভ্যস্ত তাহাদের বলিবার কিছু নাই, ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহাদের দলের সভ্যসংখ্যা বাড়াইতে পারেন বাধা কেহই দিবে না। এই রকম আরো বহু কিছু আছে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে—ইচ্ছা থাকা চাই

ট্যাক্স প্রতিরোধ এবং খরচ বাঁচাইতে গণতন্ত্রে (ভারতীয় মডেল) গত কিছুকাল হইতে একদল মানুষ

সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার—বিশেষ করিয়া বেআইনী এবং 'বে-সংবিধানী' প্রয়োগ প্রয়াস করিলেই প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, তাহাদের বিচিত্র এবং কিম্ভুত দাবী সরকার শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া লইতেছে। আমরা যদি এই সময় একটা 'বিনা-ভাড়ায় ইচ্ছা-ভ্রমণ' সংঘ গঠন করিয়া রেল এবং অন্যান্য পাব্লিক এবং প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি—কে বা কাহারা আমাদের এই ভারতীয় প্যাটার্ণ নব গণতন্ত্রের দাবিকে বাধা দিবে? গত কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে—সব কিছু অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা প্রতিকার-কল্পে প্রশাসক মহলের উচ্চতম ব্যক্তি (অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি) হইতে অন্যান্য মন্ত্রী এবং ক্ষমতার গদিতে আসীন মহত ব্যক্তিরা—সকলকে কেবলমাত্র কাতর কণ্ঠে করুণ 'আহ্বান' মাত্র করিতে শিখিয়াছেন—যেমন ধরুন যে রোগে দরকার স্ট্রেপ্টোমাইসীন্—সেই রোগ প্রতিকার কল্পে ব্যবস্থা বিধান হইল অ্যানাসিন বা অ্যাস্প্রো জাতীয় বটিকার! সে যাহাই হউক, আমরা যদি দল এবং সংঘবদ্ধ ভাবে নিজের রক্ষার জন্য নিত্য নব গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করি, বিশেষ করিয়া বিনা টিকিটে রেল-ভ্রমণ, মাতার কোন ভ্রাতা ঠেকাইবে? বাধা দিতে গেলে রেল কর্ম্মচারীদের কি অবস্থা প্রায় প্রতিদিন হইতেছে তাহা বেশী দূরে না গিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেলেই দেখিতে পাইবেন। তবে একটু তফাতে থাকিবেন!

ভয়ের কোন কারণ নাই, চিন্তাও নাই। দলে ভারী হইলে, শত নহে সাত'শ খুন মাপ হইবেই। অতএব মন স্থির করিয়া শুভকার্য্য আরম্ভ করুন—কিন্তু আসলে মনে প্রবল ইচ্ছার প্রবাহ থাকা চাই!

কোন্ বিষয়ে গণতন্ত্র অনুসরণ করিব?

'শতদল কন্টকিত' পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের বিশেষ কয়েকটি রূপ দেখা দিয়াছে—আরো দিবে। যে দলের সদস্য সংখ্যা ৯।। জন, সেই প্রকার দলও দ্বিধা ত্রিধা বিভক্ত হইতেছে—দলের "আদর্শগত প্রাণ" সংঘাতের কারণে এবং এই বিভক্ত দলগুলিও নিজেদের পছন্দ—সুবিধামত—একটি বিশেষ 'গণতন্ত্রের' পথে যাত্রা আরম্ভ করিতেছে। বলা বাহুল্য এই সকল নিত্য নব প্রস্ফুটিত 'গণতন্ত্রের' সহিত সাধারণ 'গণে'র কোন সম্পর্ক নাই। গণ বলিতে যাহাদের অঙ্গকার রাজনৈতিক (?) দল বা দলের মোড়লগণ মনে করেন তাহারা দলপতিদের নির্দ্দেশমত পথ চলিবে এবং যখন যেখানে দরকার এক দলের গণবাহিনী বিরোধী দলের সহিত সংঘর্ষ অর্থাৎ সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। যেমন ধরুন—

পরম গণতান্ত্রিক দল সি পি আই এম সদা সর্ব্বদা আর দুইটি বা তারও বেশী দলের (সবাই কিন্তু গণতন্ত্রে পরম বিশ্বাসী এবং সাধারণ জন+গণের কল্যানে নিবেদিত প্রাণমন) কারণে অকারণে, পথে-ঘাটে, মাঠে-খামারে, হাটে-বাজারে—যখন যেখানে ইচ্ছা তাহাদের পেটেন্ট গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাইতেছে হাতে বোমা, পাইপগান, রাইফেল, শাবল এবং এ-সব না থাকিলে ইট, পাথর প্রভৃতি লইয়া প্রতিপক্ষদের জন+গণ বাহিনীদের এবং সেই সঙ্গে সাধারণ বহু মানুষকে হতাহত করিতেছে। গত কিছুকাল হইতে এইভাবে নিহতদের সংখ্যা কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমূহে প্রত্যহ গড়ে ১০।১৫ দাঁড়াইয়াছে—অজ্ঞাত সংখ্যা অবশ্যই ইহার দুই তিনগুণ বেশী হইবে।

আশা এবং ভরসার কথা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অজয়—বিজয় সরকার অনতিবিলম্বে সব ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন। এখন প্রানই পাঁচ না দশ সপ্তা হইবে, তাহাই ঠিক করা হইতেছে এবং ইহা ঠিক হইয়া গেলেই—রাজজ্যোতিষীকে দিয়া একই শুভক্ষণ এবং দিন ঠিক করাইয়া লইয়া, মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজাইয়া ঠাণ্ডাই-ধোলাই পর্ব শুরু হইবে। অতএব আর কয়েকটা মাস বা বছর কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকুন—তাহা হইলে হয়ত এ-পোড়া রাজ্যের কিছু ভাল দেখিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু একদিকে বাজেটের চোট, অন্যদিকে গণতন্ত্রের মার, সামলাইতে পারিবেন কি? কিন্তু হায়! তাহারাই অস্ত গেলেন!

সি পি এম নেতারা, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিয়া মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত

করিতে চেষ্টায় সরকার বা অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সহিত কোন প্রকার বুঝা পড়ায় আসিতে এমন কি এ-বিষয়ে কোন আলোচনা করিতেও রাজী নহেন। সোজা কথায় ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে—সি পি এম যে সর্ত দিবে—অন্য সবাইকে এমন কি সরকারকেও তাহা মানিয়া লইতে হইবে এবং সি পি এম কর্ম্মী কিংবা সমর্থক পালটা। কোন্দলে নিহত হইলে রাজ্যের প্রকৃত খাঁটি গণতান্ত্রিক (সি পি এম মার্কা) সি পি এমের একজনের হত্যার বদলে অন্য পার্টির অন্তত দুইজনকে হত্যা করিবার পূর্ণ অধিকার এই দলের থাকিবে—লিখিত বা অলিখিত যেমন ভাবেই হউক।

এমত অবস্থায় এ-রাজ্যে সরকার তথা মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনকারি বিভিন্ন দলগুলিকে—সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইবে। ইহা কতদিন সম্ভব থাকিবে বলা শক্ত, কারণ সি পি আই, মুসলীম লীগ প্রভৃতি দলগুলি কখন কোন দিকে গাড়ী ঘুরাইবে কেহ জানে না।

"মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিব না—বাহির হইতেই আমরা রাজ্যে বর্ত্তমান সরকারকে সমর্থন করিতে থাকিব"—ইহাকে রাজনৈতিক ন্যাকামো ছাড়া আর কি বলা যায়? সে যাহাই হউক, অবস্থা এবং পার্টিগুলির ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইতেছে এ-রাজ্যে শান্তির আশা সুদূর পরাহত। আগামী দশ বছরেও রাজ্যবাসীর কপালে ইহা জুটিবে কি না সন্দেহ।

রাজ্যে "ল অ্যাণ্ড অর্ডার" থাকিবে কেতাবে এবং কাগজপত্রে—ইহাদের বাস্তবে প্রয়োগ করিবার কোন ক্ষমতা কিংবা ইচ্ছাও কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। আসল কথা—আবার কবে নির্ব্বাচন হইবে হঠাৎ কেহই জানে না, কাজেই আজ যাঁহারা ভোটের এবং ভোটদাতাদের অনুগ্রহে—মন্ত্রী হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা কোন ভোটারের বিরাগভাজন হইতে চাহেন না, সে ভোটার খুনী, গুণ্ডা, চোর বদমাইস যাহাই হউক না কেন।

অতএব আপনার আমার কর্ত্তব্য কি—কোন গণতন্ত্রীদলে ভিড়িব? ভিড়িব সেই গণতন্ত্রীদলে যাহাদের নিজস্ব পেটেন্ট গণতন্ত্র রক্ষা করিবার মত গান্ (gun) অপর্য্যাপ্ত আছে, হাতে এবং অস্ত্র ভাণ্ডারে।

সি পি এম সোজা বলিয়াদিয়াছে—তাহারা অন্য কোন দলের সহিত বুঝাপড়ায় আসিতে রাজী নয়, তাহাদের পথ এবং মত যে দল এবং যাহারা সমর্থন এবং গ্রহণ করিবে শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং অবনত মস্তকে—তাহাদেরই তাহারা আপন-জন এবং রাজনৈতিক সহোদর বলিয়া গ্রহণ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে একমাত্র, সি পি এম-ই পশ্চিমবঙ্গের জন এবং গনের হইয়া কথা বলিতে পারে, তাহারাই যথার্থ জন-সরকার গঠন করিবার অধিকারী। এই ঘোষণায় অস্পষ্ট কিংবা ঝাপ্‌সা কিছুই নাই—বুঝিতেও কষ্ট হয় না।

নক্‌শালবাদীরা এ—বিষয়ে আরো পরিষ্কার। তাহারা ভারতীয় সংবিধানে বিশ্বাস করে না। —এই সংবিধান নাকি নিপীড়িত জনগণকে প্রতারণা করিবার, তাহাদের চিরকাল মালিক, জোতদার এবং তথাকথিত উচ্চে-অবস্থিত শ্রেণীর পায়ের তলায় রাখিবার, পেষণ করিবার একটা যন্ত্র মাত্র। নক্‌শালবাদীরা—বিশ্বাস করে একমাত্র Gun—তন্ত্রে। সাধারণ মানুষের শক্তি ও মুক্তির উৎস এবং উপায় আছে একমাত্র বন্দুকের ব্যারেলে। ইহাতে তাহাদের এমনি বিশ্বাস হইয়াছে যে আজ ইহারা তাহাদের বিদেশী গুরু শ্রী মাওকেই হয়ত অনতিবিলম্বে অস্বীকার করিয়া, তাঁহাকেই "প্রতিক্রিয়াশীল" বলিয়া ঘোষণা করিবে। মাও-এবং বর্ত্তমান নীতি নাক্সালাইটরা মানিতেছে না। এখনও তাহারা স্কুল-কলেজ ল্যাবরেটারী বিনষ্ট করার মহান ব্রত পালনে ব্রতী রহিয়াছে। —শেষ কোথায়—কি সে কে জানে?

যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল ম—ঘটিল তাহাই।

অদ্য (২৬-৬-৭১) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। দুইজন ঝাড়খণ্ডী সদস্যের মন্ত্রীত্ব প্রাপ্তিও হইল না। ঝাড়খণ্ড পার্টি'র সদস্য তিনজন—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তিনজনই মন্ত্রী—হইতেন। প্রায় মাসখানেক

ধরিয়া দরকষাকষি চলিতেছিল—এমন কি সরকারী গঠনকারী এবং সমর্থক দলগুলিও গোপনে বিরোধী পক্ষের সহিত বিশেষ মূল্য পাইলে—সরকারকে সমর্থন করিবে না, এমন কথাও শুনা গিয়াছে।

বিধানসভা নাই—কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী এখনো বিদ্যমান—অবস্থাটা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। এমন বিচিত্র অবস্থা ইতিপূর্ব্বে ঘটে নাই। তবে অজয়-বিজয় নাকি বলিয়াছেন যে মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করিবেন কি না, দু-তিন দিনের মধ্যেই স্থির হইবে। (অন্ততঃ ৩০-এ জুন পর্য্যন্ত থাকুক দয়া করিয়া, তাহা হইল পুরা বেতনটা এক মাসের পাওয়া যাইবে।)

অন্যদিকে জ্যোতিবসু তৎপর এবং অতি সজাগ। কিন্তু বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া অনেকের অনেক হিসাবে গোলমাল হইয়া গেল।

এ—বিষয় বিশদভাবে এখন আর বেশী কিছু বলা যায় না। এখন কি আবার নির্ব্বাচন, আবার রাষ্ট্রপতির শাসন, সেনবর্ম্মার নিত্য নব গবেষণা। এ—পোড়া রাজ্যের আগুন নিভিবে না!

এবার প্রধানমন্ত্রী আরও 'কৃতসংকল্প'

কয়েকদিন পূর্ব্বে ইনষ্ট্যান্ট সোস্যালিজ্‌ম উদ্ভাবক এবং প্রবর্ত্তক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে—আর সহ্য করিব না, দেশে বিশেষ করিয়া পোড়া এবং অভিশপ্ত রাজ্যে-পশ্চিমবঙ্গে বেআইনী কার্য্যকলাপ যেমন নরহত্যা, লুঠপাট, রেল চলাচল বাধার সৃষ্টি এবং অন্যান্য হাজার রকম শৃঙ্খলাহীনতা এবার তিনি বন্ধ করিবেনই অতি কঠোর হস্তে—তবে কঠোর হস্তে কুঠার লইয়া রণক্ষেত্রে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে—তাঁহার সন্তান সমান প্রজাদের অতি কোমল এবং বিনম্র কণ্ঠে আবেদন জানাইবেন 'বাছারা! এবার সংযত হও—সুবোধ সুশীল বালকদের মত নিজ নিজ কাজে করহ মনোনিবেশ—আর তাহা যদি না কর তোমাদের দিন অচিরে শেষ হইবে। আশা করি আর দ্বিতীয়বার তোমাদের ধমক দিবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের, হে হামলাকারীগণ! এই শেষ সুবর্ণ সুযোগ, আশা করি ইহা হেলায় হারাইবে না!'

ইতিপূর্ব্বে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে বহুবার তাঁহার এবং কেন্দ্র সরকারের 'কৃত-সঙ্কল্পের' কথা উচ্চারণ করেন কিন্তু সঙ্কল্প সঙ্কল্পেই থাকিয়া যায়, কাজে তাহা বহিয়া গেল অকৃত।

ইহার অবশ্য কারণও আছে। প্রধানমন্ত্রী দেশের সোস্যালিজ্‌ম কায়েম করিবার কাজে অতি ব্যস্ত—যথা জেনারেল ইন্‌সিওরেন্স রাষ্ট্রায়ত্ব করা, কারণ ইহা না করার জন্য সাধারণজনের দিন কাটিতেছিল বড়ই কষ্টে (এই জেনারেল ইন্‌সিওরেন্সে মোট যে পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় হয়, বছরে তাহার পরিমাণ কোন ক্রমেই ৬।৭ কোটি টাকার বেশী নহে। তারপর রাজন্যভাতা-সংবিধানের চুক্তিমত রাজন্যবর্গ বছরে মোট ৪।৪॥ কোটি টাকা পাইয়া থাকেন। এত ভীষণ অঙ্কের টাকা সরকার কোন্ প্রাণে একদল বেকার লোককে দিতে পারেন—তবে যতই মহত কাজ হউক, তাহা করিবার একটা রীতি আছে। রাজন্যবর্গকে তাঁহাদের সংবিধানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে গিয়া সরকার এতই উৎসাহী হইয়া তালজ্ঞান মাত্রা হারাইয়া ফেলিলেন, যে শেষ পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের রায়ে তাহাদের চাল বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। সে কথা যাক—এবার সরকার আটঘাট বাঁধিয়া কাজ করিতেছেন—দেখা যাক কি হয়।

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় এ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা আজ আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। এ-রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন যে বিফল, তাহা প্রমাণিত, এখন বাকি আছে সামরিক শাসন। gun-তন্ত্রী দমন করিতে হইলে পাল্টা গান্-এর ব্যবহার অত্যাবশ্যক। কেবল বন্দুকে গুলী চালাইলেই হইবে না। "পুলিশ ১৫ রাউণ্ড গুলী চালাইয়াছিল—কেহ হতাহত হয় নাই"—ইহা চলিবে না। [১৯৪৫।৪৬ সালে বাঙলার গভরনর সার ফ্রেড্‌রিক বারোজ রেডিওতে ঘোষণা করেন: I have ordered the military, which is in control of Calcutta now to shoot if necessary—and not only to shoot—but shoot to kill. I hope the public will

make a note of this and avoid being shot." সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এই ঘটনা ঘটে। সমপ্রকার নির্দ্দেশ আমাদের করুণাময়ী দেশমাতা দিতে ভরসা করিবেন কি?

হাঙ্গামাকারী এবং শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের নিকট ইতিপূর্ব্বে আহ্বান করা এবং আবেদন জানানো হাজারোবার হইয়াছে কিন্তু তাহাতে ফললাভ হইয়াছে কাঁচা অষ্টরম্ভা। সন্ত্রাসকারীরা আজ এক সন্ত্রাসের রাজত্ব রাজ্যময় সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে শতকরা নব্বুই জন সাধারণ মানুষ পথে ঘাটে হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী হইয়াও—হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে ভয় পায়—নিজের প্রাণের গরজে। জনমানসকে সরকার কোন প্রকার বিশ্বাস (তাঁহাদের) প্রতিশ্রুতিতে বিন্দুমাত্র আস্থা বা বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। এ-অবস্থায় এবং লোকের মনে আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করিতে না পারিলে—সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস বৃথা—প্রয়াস হইবে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বহু পুরাতন গান—

আমরা সাতদিন সাতরাত জেগে এক ব্যাংগ মারিতে পারি

যদি ব্যাংগ ঝাঁপ না দেয় জলে।

এখানে ব্যাংগের অর্থ ধরিতে হইতে রক্তখেকো ক্রিমিন্যাল আর জলের অর্থ হইবে—জন-সমুদ্রের জল। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই যে হাঙ্গামাকারী হত্যাকারীরা যদি ভীরুর মত পলায়ন না করে, কিন্তু তাঁহারা যদি জনারণ্যে অথবা জনসমুদ্রে আত্মগোপন করে—তাহা হইলে আমাদের সরকারী শান্তি রক্ষকদের সাতরাত্রি সাতদিন জাগরণ হইবে বৃথা!—

পাঠক এই গানের অর্থ নিজের পছন্দমত করিয়া লইবেন।

অজয়-বিদায়ের পার্টিং কিক্—

বিদায় লইবার পূর্ব্বে মুখ্যমন্ত্রী আইন করিয়া গিয়াছেন যে—কলকারখানা বন্ধ করিতে হইলে, তাহা ৬০ দিনের নোটিশ দিয়া করিতে হইবে, ফলে হইবে এই যে শ্রমিক বেপোরায়াভাবে তাহাদের মারমুখী অভিযান এবং কলকারখানার যন্ত্রপাতি নষ্ট করিবে। ইহা প্রমাণিত সত্য।

চোট্‌টা কি কেবল কলকারখানার মালিকদের উপরেই' যাহারা ঘটিবাটি বিক্রয় করিয়া বহু কষ্টে সংগৃহীত মূলধনে—(ভুল করিয়া) পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সংস্থা স্থাপন করিয়াছে—কেবলমাত্র মার খাইবার জন্য দুই তরফ হইতে—শ্রমিক এবং সদাশয় সরকার।

মালিক পক্ষ না হয় সরকারী আদেশ পালনে বাধ্য হইবে—কিন্তু শ্রমিকদের অনাচার এবং ওয়াইল্ডক্যাট ধর্ম্মঘট নিরোধক কোন ব্যবস্থা করার কথা সরকারের মানসপটে একবারও উদিত হইল না কেন? সরকার বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত, আর এইসব বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পরিচালক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী—অতএব যাহা হইবার তাহাই হইতেছে! প্রভুদের 'গুণের কথা অকথ্যকথন' সোজা অর্থে—ধরিতে হইবে।

(৩৬৮ পাতার পর)

নেতাগণ যদি চোর, ডাকাইত, খুনী, লুঠেরা প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত না হ'ন তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত অপরাধ থামাইবার কথায় কোন আলোচনা করিয়া লাভ হইতে পারে না। তাঁহারা যদি অপরাধের সহিত জড়িত থাকেন অথবা অপরাধীদিগের সহায়তা বা তাহাদিগের সহিত সহযোগিতা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের সহিত আলোচনা না করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া তাঁহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিগণ যদি পশ্চিম বাংলাতে পদার্পন করিয়া অপরাধীদিগের প্ররোচকদিগের সহিত মিতালি করেন তাহা একাধারে আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য হইবে।

অরাজকতা নিবারণে জনসাধারণের কর্ত্তব্য

বর্ত্তমানের আইন শৃঙ্খলা বর্জ্জিত অরাজক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। পুলিশ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম; কিন্তু তাঁহারা মোটা হারে রাজস্ব দিয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহারা অপর পাহারার ব্যবস্থা করিতেও পারিতেছেন না। পুলিশ নিজেদের প্রাণ ও হাতিয়ার রক্ষা করিতেও সক্ষম নহে কিন্তু তাহারা কোথাও কোথাও জনসাধারণকে আদেশ দিতেছে যে সকলে যেন নিজ নিজ বন্দুক, রিভলভার প্রভৃতি পুলিশেরই নিকট জমা দিয়া দেয়। এই অপরূপ অল্পবুদ্ধিতা শুধু ভারতের সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্যজাত আমলাতন্ত্রের সেচ্ছাচারিতারই প্রকট উদাহরণ। কোথায় জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে স্থির মস্তিষ্ক, সমাজ মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তিগণ সশস্ত্রভাবে অরাজকতা দমন কার্য্যে অবতীর্ন হইবেন, সেই চেষ্টা করা হইবে; না জনসাধারণকে নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় নামাইয়া দিয়া তাহাদের চোর ডাকাইতের সহজ শিকার হিসাবে বিদ্ধস্ত হইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে! জনসাধারণ হইল শুধু রাজস্ব দিয়া শোষিত হইবার জন্য বলির পশুর মত। শাসকমণ্ডলী হইল স্বৈরাচারে পূর্ণ অধিকারী একাধিপত্যের আসনে অধিষ্ঠিত শাহেনশা—অন্ততঃ যতদিন সে অধিকার বিপক্ষ দল ভাঙ্গিয়া দিতে না পারে। শাসকগণ অন্যান্য রাষ্ট্রীয়দলের মানুষগুলিকে কিছুটা খাতির করিয়া চলেন; কেন না তাহারা ঐ একই ব্যবসায়ে লিপ্ত সংযুক্ত এবং শাসন কৌশল, রাষ্ট্রীয় ক্রুরবুদ্ধি, মিথ্যাপ্রচার ও প্ররোচনা প্রভৃতি তাহারাও রপ্ত করিয়াছেন। শুধু জনসাধারণকেই উপরওয়ালাগণ করুণার চক্ষে দেখিয়াও দেখেন না; কারণ যাহারা করুণার উদ্রেক করে তাহারা দুর্ব্বল ও অসহায় বলিয়া প্রবল ব্যক্তিরা তাহাদিগকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলা প্রয়োজন মনে করেন না।

জনসাধারণকে তাহা হইলে নিজেদের তরফ হইতে আত্মরক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা কি ভাবে করা যাইবে তাহার আলোচনা জনসাধারণই নানান এলাকায় নিজেরাই করিতে আরম্ভ করিবেন আশা করা যায়। সকলস্থলে একই ভাবে একই ব্যবস্থা হইবে বলা যায় না। স্থানকাল বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কোথায় কি আয়োজন সম্যক ও পর্য্যাপ্ত হইবে। তবে একথা স্থির নিশ্চয় যে সর্ব্বত্রই কিছু কিছু মানুষকে প্রহরীর কার্য্যে অস্ত্র হস্তে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ভারতীয় সামরিক বিভাগের সেনাবাহিনী অপেক্ষা জনসাধারণের দ্বারা নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সকলেই বন্ধু বলিয়া জানিবে ও সহায়তা করিবে। এই সহায়তাই একটা অতি আবশ্যকীয় ও দুস্প্রাপ্য জিনিস। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিদিগের এই সকল কথা সত্বর বিচার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ইয়াহিয়া খান চূড়ান্ত অপরাধে অপরাধী

কোন কোন বিদেশী সাংবাদিক বলিতেছেন যে ইয়াহিয়া খান গণহত্যা, নারীদিগের উপর অত্যাচার পূর্ব্ববাংলা হইতে বাঙ্গালী বিতাড়ন প্রভৃতি অপরাধের জন্য দায়ী নহেন, তাহার সেনাপতিগণই সকল অত্যাচার অনাচার ও অপরাধের মূল কারণ। ইয়াহিয়া সম্ভবত জানেনও না যে পূর্ব্ববাংলায় কি হইতেছে। এই সকল সাজান কথা বলা আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতেই যখন জার্ম্মান ও জাপানী সমালোচকগণ এই সূত্রে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ অবসানে যুদ্ধের অপরাধ লইয়া যে সকল বিচার ও প্রাণদণ্ড ইত্যাদি হইয়াছিল সেই সকল কথার অবতারণা করে। ইয়াহিয়া খান যে বহুকাল হইতেই গণহত্য ও জনদমন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতেছিলেন সেকথা ২৫শে মার্চ্চ হইতে যে তাণ্ডব আরম্ভ হয় তাহার ধাক্কায় জনসাধারণ কিছুটা বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু পুরাতন সংবাদ পত্রাদি দেখিলে দেখা যায় যে ইয়াহিয়া খান কতকাল হইতে সামরিক দমননীতি অবলম্বনেই চলিয়া আসিতেছিলেন। যথা আমরা ১৩ই মার্চ্চ ১৯৭১এর "যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "জয় বাংলা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে ২৫শে মার্চ্চের পূর্ব্বে কি ঘটিয়াছিল।

পূর্ব্বপাকিস্তান বিপ্লবের তরঙ্গে প্লাবিত হইয়াছে। হাজার হাজার মানুষ সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে-বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য পথে নামিয়া তাঁহার ভাড়াটে সৈন্যদলের বন্দুকের সম্মুখে উচ্চশিরে বুক পাতিয়া দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহের শুক্রবার পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ঢাকার অন্ততঃ তিনশত ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীর গুলিবর্ষণের ফলে প্রাণ দিয়াছে। সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়া সেখ মুজিবর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জীবন পণ করিয়াছে। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার হাওয়া, বাংলা বিভাগের পরও যে আজ অবিকৃত আছে, পূর্ব্ববঙ্গের গণবিপ্লব তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করিয়া আনিয়াছে। বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, বাঙ্গালীর বিপ্লবী ভাবধারা বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদ, বাঙ্গালীর আদর্শনিষ্ঠা ও বাঙ্গালীর আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি যে মহাকালকে উপেক্ষা করিয়া উন্নতশিরে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে তাহার উজ্জ্বলতম নিদর্শন মিলিয়াছে পূর্ব্ববাংলায়।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ হইতে পূর্ব্বপাকিস্তানের দরিদ্র অসহায় জনগণকেমুক্তি দিবার জন্য মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ যখন ছয়দফা কর্ম্মসূচী লইয়া নির্ব্বাচনে অবতরণ করিয়া গণপরিষদে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল তখনই অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল পশ্চিমী পাকিস্তানের সৈরাচারী সামরিক শাসনকর্ত্তারা তাহাদের শোষণভূমি এই উপনিবেশকে হস্তচ্যুত হইতে দিবে কিনা? গত ১৯শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় "পাকিস্তান" শীর্ষক প্রবন্ধে আমারা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলাম—"মুজিবরের নীতি জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতেছে দেখিলে ইয়াহিয়া খাঁর পক্ষে জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বিস্ময়জনক নয়।" আমাদের

সে আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। গত ৩রা মার্চ্চ ঢাকা সহরে গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবার কথা ছিল। পশ্চিম পাকিস্থানী নেতা জুলফিকর আলি ভুট্টো এই অধিবেশন বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানের অন্যান্য দলের নেতারা তাঁহাকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত না হওয়ায় তাঁহার এই অধিবেশন বানচাল করিবার প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। অবশেষে মনে হয় ভুট্টোরই পরামর্শে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ এই অধিবেশন স্থগিত করিয়া ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্য যে দুরভিসন্ধিমূলক তাহা বুঝিতে কষ্ট নাই, কারণ এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পূর্ব্বপাকিস্থানে অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন এবং মুজিবর রহমানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন পূর্ব্বপাকিস্থানের গভর্ণরকে বরখাস্ত করিয়া সৈন্যবাহিনীর একজন অধিনায়কের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্য যে পূর্ব্বপাকিস্থানের জনমনকে কণ্ঠরুদ্ধ করিবার ও জনগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা তাহা পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনগণের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাই পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রতিটি মানুষ এই স্বেচ্ছাচারকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মুজিবর রহমনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বিদ্রোহের প্রবল তরঙ্গে পূর্ব্ববাংলা আজ প্লাবিত হইতেছে।

ইহার পরিণাম কি হইবে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। স্বেচ্ছাচারী সামরিক শাসন শেষ পর্য্যন্ত জনমতের নিকট নতি স্বীকার করিবে, না সৈন্য-বাহিনীর বন্দুকের সম্মুখে নিরস্ত্র জনগণ সাময়িকভাবে মনোবল হারাইয়া ফেলিবে অথবা এই বিপ্লব অবিলম্বেই পূর্ব্বপাকিস্থানে সার্ব্বভৌমিক জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে জনমতকে যে দীর্ঘকাল কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে না এবং অবশেষে যে তাহা অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা করিবে তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। এ সম্পর্কে আয়ুব খাঁর পদত্যাগের অব্যবহিত পরেই ১৯৬৯ সালের ৫ই এপ্রিলের সংখ্যায় "পূর্ব্ব বিপ্লবের পাকিস্থানে পদধ্বনি" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি :—

"সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে নিরস্ত্র জনগণের আন্দোলন সাময়িক ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে তবে এই নিস্তব্ধতা প্রবল ঝড়ের পূর্বের নিস্তব্ধতার সহিত তুলনীয়। ঝড় আসিবে তবে কতদিনে তাহা সঠিক বলা চলেনা। আয়ুবের জঙ্গী শাসনের পূর্ব্ববঙ্গে জনমনে স্বায়ত্ব শাসনের দাবী জাগিয়াছিল। ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায় সেখানে হয়তো সার্ব্বভৌম স্বাধীন পূর্ব্বপাকিস্থানের দাবী সৃষ্টি হইবে। যুগে যুগে অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠিই বিপ্লবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। অত্যাচারি ও অবিচার বিপ্লবের বীজ বপণ করে, অত্যাচারিত অসহায় সর্ব্বহারার অশ্রু তাহাতে জল-সিঞ্চন করে মাত্র। তাই পূর্ব্বপাকিস্থানে যে বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাইতেছিল তাহা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং একদিন জনরোষ হুতাশনের রূপ ধরিয়া অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠিকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে। ফ্রান্সের লুই, রুশিয়ার জার, চীনের মাঞ্চু সম্রাট অথবা ভারতের পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের বন্দুকের অভাব ছিল না। কিন্তু জনগণের সহিত সংঘর্ষে ঝড়ের মুখে তৃণের মতই তাহারা উড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের বন্দুক কামান কোন কাজে লাগে নাই। ইয়াহিয়া খাঁর বন্দুকও তেমনি ব্যর্থ হইয়া লৌহপিণ্ডে পরিণত হইবে।"

১৯২০।২১ সালে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের সময় ভারতীয় মুসলমানরা ঘোষণা করিয়াছিল যে তাহারা "প্রথমে মুসলমান তাহারপর ভারতীয়।" ধর্ম্মীয় উন্মত্ততার যুপকাষ্ঠে তাহারা বিচারবুদ্ধিকে বলি দিয়াছিল—ধর্ম্মান্ধতায় অন্ধ হইয়া জাতীয়তাবাদকে বিস্মৃত হইয়াছিল।

আজ আবার পূর্ব্ববাংলার মুসলমানরা সেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বুঝিয়াছে যে জাতীয় ঐক্যই প্রকৃত

ঐক্য ধর্মীয় ঐক্য তাহা নয়। তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে যে তাহারা "প্রথমে বাঙ্গালী তারপর মুসলমান।" তাই আজ সেখানে সপ্তকোটি কণ্ঠে নিনাদিত হইয়াছে—"জয় বাংলা।"

২৫শে মার্চের ঘটনাবলী ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন কার্য্যের প্রাত্যহিক কথা-বিপ্লব তখনও হয় নাই। শেখ মুজিবর রহমানকে তখনও ইয়াহিয়া খান বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায় নাই। এখন যে ছয়জন সেনাপতির স্কন্ধে দোষারোপ করিয়া ইয়াহিয়া খানের সাফাই প্রচেষ্টা করা আরম্ভ হইয়াছে তাহারা ২৫শে মার্চের পূর্ব্বে হুকুম চালাইতে সুরু করে নাই। উত্তমরূপে সকল কথা বিচার করিলে দেখা যাইবে ইয়াহিয়া কতবড় মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য অপরাধী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

বাংলাদেশের নুতন প্রতিষ্ঠিত যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে তাহার স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র "জয়বাংলা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

'যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ইজানুয়ারী পর্যন্ত বাংলা দেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল।

এবং

"যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন।

এবং

"যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন।

এবং

"যেহেতু আহুত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বে-আইনীভাবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের জন-প্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনাকালে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ন্যায়নীতি বহির্ভুত এবং বিশ্বাসঘাত-কতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

এবং

"যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাঙলাদেশের বেসাম-রিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে এবং যেহেতু পাকিস্থান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাঙলাদেশের গণ-প্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

এবং

"যেহেতু বাঙলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাঙলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাঙলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যাণ্ডেন্ট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাঙলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য—সেইহেতু আমরা

বাঙলাদেশকে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহা দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমনের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি।

"এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা দ্বারা বাঙলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন।

বাঙলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাঁহার কর্তব্য ও প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসঙ্ঘের সনদ মোতাবেক আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৩শে মার্চ হইতে কার্য্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমরা অধ্যাপক এম, ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করিলাম।"

স্বাক্ষর :—

এম, ইউসুফ আলী,

বাংলাদেশ গণপরিষদের পক্ষ থেকে
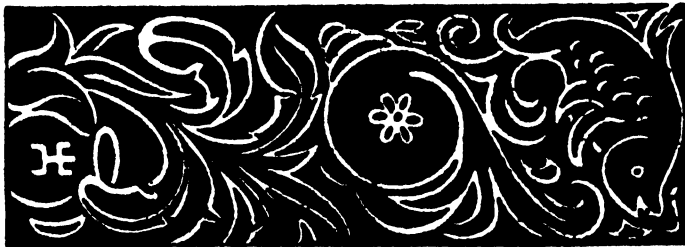
সাময়িকী

ত্রিপুরায় শরণার্থীর প্রবেশ

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঐ প্রদেশের বিধান সভায় শরনার্থী প্রবেশ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন তাহা "ত্রিপুরা" সাপ্তাহিক হইতে উদ্ধৃত করা হইল :

যে পরিস্থিতিতে বাংলা দেশের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি সভার এই অধিবেশনে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছি। সেই থেকে পশ্চিমী পাকিস্তানী সেনা বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ মানুষের উপর যে বর্বর ও নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে তা আজ সারা বিশ্বে দিনের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের হাজার হজার মানুষ যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয়েছেন ও হচ্ছেন তাঁদের জন্য আমাদের হৃদয় আজ সমবেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণের দীপ্তি কখনো পাশবিক শক্তির কাছে পরাস্ত হতে পারে না। বাংলাদেশে যারা আছেন তাঁদের দুঃখ দুর্দশা ছাড়াও পাক বাহিনীর সন্ত্রাসের রাজত্বে গত ১০ সপ্তাহ ধরে নারী ও শিশু সহ যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে আমরা তাদের দুঃখ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছি।

২। শরণার্থী স্রোত এখনও অব্যাহত আছেন। এমন কি গত সপ্তাহে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একমাত্র সিধাই, মোহনপুর এলাকাতে ২০০০০ হাজার শরণার্থী প্রবেশ করেছেন। এদের অধিকাংশই মুসলমান। ত্রিপুরায় মোট শরণার্থী সংখ্যা এখন আনুমানিক দশ লক্ষ। তাদের মধ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত শরণার্থী সংখ্যা হল ৮.০৩ লক্ষ। যারা রেজিষ্ট্রিকৃত নয় তাদের সংখ্যা আনুমানিক দুই লক্ষ। ত্রিপুরার আশ্রয় শিবিরগুলিতে শরণার্থী সংখ্যা ৫.৮৮ লক্ষ। বর্ত্তমানে প্রতিদিন ১৫,০০০ হাজার থেকে ২০,০০০ হাজার শরণার্থী এখানে আসছেন।

৩। এমন বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও পানীয় জলের সীমীত সংস্থান স্বভাবতই এক বিরাট সমস্যা। তদুপরি সম্পদ ও যোগাযোগ অসুবিধার হেতু অনগ্রসর রাজ্য ত্রিপুরার পক্ষে এই সমস্যা আরও জটিল। ১৫ লক্ষ মানুষের ভারে বিব্রত একটি রাজ্যের পক্ষে প্রয়ে ১০ লক্ষ শরণার্থীর অতিরিক্ত চাপ যে কি নিদারুন সমস্যার সৃষ্টি করে তা সহজেই অনুমেয়। অন্য কোন রাজ্যকেই তার জনসংখ্যার অনুপাতে এত অধিক পরিমান শরণার্থীর ভার বহন করতে হয়নি। উপরন্তু এইভাবে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আগমন অব্যাহত থাকলে কি পরিমান শরণার্থীর চাপ এ রাজ্যকে বহন করতে হতে পারে তা কল্পনাতীত।

৪। সীমিত সম্পদ নিয়ে এই বিপুল ও সমস্যার মোকাবেলার সম্মুখীন হতে গিয়ে সর্বস্তরের মানুষের ও প্রশাসনের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। এমন একটি দুঃসাধ্য সমস্যার মোকাবেলায় এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির কাজ দেখে দেশ বিদেশ থেকে আগত পরিদর্শকগণ বিমুগ্ধ হয়েছেন। এ কথাও স্বীকার্য আমরা সকল শরণার্থীর জন্য, বিশেষতঃ রাজ্যের দক্ষিণ প্রত্যন্তবর্তী সাব্রুম ও বিলোনীয়া মহকুমায় পরিমিত আশ্রয়ের সংস্থান করতে সক্ষম হইনি। এতদ্ব্যতীত শরণার্থীদেরকে আরও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উদ্বাস্তু আগমণ অভাবনীয়

আকস্মিক ও অস্বাভাবিক হারে হওয়ায় ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক, তবুও এগুলি অপসারণ করে ত্রাণ সংস্থার কাজকর্মের সর্ব্ববিধ প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

৫। সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য সেগুলির কয়েকটী আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের ও জনসাধারণের সহায়তায় এ পর্যন্ত ২.২৫ লক্ষ শরণার্থীর জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবিরবাসীদের পানীয় জলের সংস্থানের জন্য ২৫০টি নলকূপ ও ৫০০ কাঁচা কূপ খনন করা হয়েছে। আশ্রয় শিবির নির্মানের কাজ চলছে। ছাউনীর সরঞ্জামের অভাব থাকাতে কাজের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। ছন দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। অষ্ট্রেলিয়া থেকে ছাউনীর কিছু সরঞ্জাম সবেমাত্র এসে পৌছেছে। আমরা ৩০,০০০ হাজার তাঁবু ও বহু সংখ্যক ত্রিপল চেয়ে পাঠিয়েছি। এ পর্যন্ত মাত্র হাজারখানেক তাঁবু পাওয়া গিয়েছে এবং বাকিগুলি শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। প্রায় হাজার তাঁবুর রেলওয়ে রসিদ এসে পৌছেছে এবং আরো তাঁবুর জন্য সরবরাহকারীদেরকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের পরিবহণ সড়ক দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় আমরা সাজসরঞ্জাম আশানুরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমদানী করতে পারছি না। ছাউনীর কাজে পলিথিনও ব্যবহার করা হচ্ছে।

কয়লা তুলিয়া দ্বিগুণ লোকসান

কয়লা ভগবানদত্ত ঐশ্বর্য্য। তাহা পৃথিবীর মাটির তলায় জমিয়া আছে এবং বহু পরিশ্রম করিয়া কয়লা বাহিরে তুলিয়া আনিয়া মানুষ তাহা ব্যবহার করে। এই ভাবে যে ঐশ্বর্য্য ধরা অভ্যন্তরে লুপ্ত আছে তাহাকে সুপ্তি হইতে উঠাইয়া মানব ব্যবহার্য্য করা হয়; কিন্তু যদি কয়লা উঠাইয়া তাহা স্তুপাকৃতি করিয়া ফেলিয়া রাখা হয় তাহা হইলে তাহা ঐশ্বর্য্য না হইয়া একটা বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। আশানশোল হইতে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকা "কোল ফিল্ড ট্রিবিউন"-এ প্রকাশিত হইয়াছে যে বহু কয়লা উঠাইয়া পাহাড় করিয়া রাখা থাকা সত্বেও রেলওয়ের ওয়াগন সরবরাহ যথাযথ ভাবে না হওয়ার ফলে সে কয়লা তুলিয়া শুধু বৃথা পরিশ্রম করা হইতেছে ও আর্থিক লোকসান বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত কয়লাতে কোথাও কোথাও আগুণ লাগিয়া সেই মূল্যবান উৎপাদিত বস্তু পুড়িয়া ছাই হইতেছে। এইভাবে দরিদ্র্য দেশের দারিদ্র্য হ্রাস না হইয়া পরিশ্রম করিয়া বাড়ান হইতেছে। ইহা ব্যবস্থার অভাব। এবং সেই অব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে সরকারী অক্ষমতা ও গাফিলি। সকল ব্যবসা ক্রমশঃ সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইলে কি হইবে ইহা তাহার একটা উদাহরণ।

বাংলা দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলা দেশের রাজনৈতিক সমাধানের প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভাবে ঐ দেশের নেতাদের উপর নির্ভর করে। আমরা এ ব্যাপারে কতটুকু কি করতে পারি, তাতে অন্য কোন রাষ্ট্রের ভূমিকাই বা কি এবং আমরা কোন পথে চলেছি তা এ প্রসঙ্গে আসে না।

শিলচরে শ্রীমতী গান্ধী

শ্রীমতী গান্ধী ১২ই জুন শিলচরের সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদিগের সহিত একটা আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাহার বর্ণনার কিয়দংশ করিমগঞ্জের (আসাম) "যুগশক্তি" সাপ্তাহিক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:

বাংলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর চিন্তাধারায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে কি না—জনৈক সাংবাদিকের এ প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্পূর্ণ চিত্র এখনও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। তিনি বলেন, বাংলা দেশে যে ভাবে গণহত্যা চলছে, তার নজীর ইতিহাসের পাতায়ও নেই। জনৈক সাংবাদিক বাংলা দেশের স্বীকৃতি দান সম্পর্কে লক্ষ্ণৌতে জি. জি. সোয়েলের একটি বিবৃতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সম্প্রতি শ্রীসোয়েল বলেছেন যে সর্দার স্বরণ সিং বিদেশ

থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই ভারত সরকার চূড়ান্ত ভাবে বাংলা দেশের স্বীকৃতি দেবেন। এটা কতটুকু সত্য? প্রশ্নটির জবাব দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সর্দার স্বরণ সিং ফিরে এলে পর আমরা শুধু এটাই বুঝতে পারব যে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের চিন্তাশীল নায়কদের দৃষ্টি বাংলা দেশের ব্যাপারে কতটুকু আকৃষ্ট করতে পেরেছি। স্বীকৃতির প্রশ্ন আলাদা—এই বলে তিনি জবাব এড়িয়ে যান।

জনৈক সাংবাদিক মেঘালয়ে সম্প্রতি বাংলা দেশের শরণার্থীদের আগমনে সেখানকার উপজাতি সম্প্রদায় যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সেখানে কোন শরণার্থীকেই স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শরণার্থীদের প্রত্যেককেই তাদের দেশে ফিরে যেতে হবে, তাই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করে সাংবাদকরা বলেন, আসাম সরকার অত্যন্ত কঠোর হস্তে তা দমন করেছেন এবং এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয়। আসামের শরণার্থীদের জন্য রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করলে তিনি তাতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ২৫ মিনিট কাল আলোচনা করেন।

দুইটি অন্ধ চক্ষু জুড়িয়া একটি দর্শনক্ষম চক্ষু সৃজন

মস্কো হইতে বার্ত্তায় প্রকাশ যে একজন রুশিয়ান অস্ত্র চিকিৎসক একব্যক্তির দুইটি অন্ধ চক্ষু হইতে সুস্থ অংশগুলি কাটিয়া লইয়া ও জুড়িয়া একটি দর্শনক্ষম চক্ষু তৈয়ার করিয়া সেই ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ব্যক্তির কোন দুর্ঘটনায় দুই চক্ষুই অন্ধ হইয়া যায়। রুশিয়ার সংবাদপত্র "প্রাভদা" হইতে এই খবর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। যে দুর্ঘটনায় ঐ ব্যক্তির চক্ষু নষ্ট হয় তাহাতে কোন রাসায়নিক দ্রব্য উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাহার চক্ষুতে লাগে বলিয়া শুনা যায়। এই ঘটনা তিন বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং ইহাতে উভয় চক্ষুর সম্মুখভাগ আঘাত পাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ডাঃ মিখায়েল দুই চক্ষুর পিছনের দিক হইতে সুস্থ অংশগুলি কাটিয়া লইয়া সংযুক্ত করেন ও পরে সম্মুখভাগে একটি আলোক যাইবার পথ খুলিয়া দিয়া দৃষ্টিলাভের উপায় করেন। অস্ত্রোপচারের পাঁচদিন পরে ঐ ব্যক্তি দেখিতে আরম্ভ করেন বলিয়া "প্রাভদায়" প্রকাশ।

দেশ-বিদেশের কথা

শ্বেতহস্তী যুথ

ইংরেজীতে যে সকল প্রতিষ্ঠান চালাইয়া কোনও লাভ হয় না, শুধু লোকসানের বোঝাই উত্তরোত্তর ভারী হইতে আরও ভারী হইতে থাকে, সেগুলিকে শ্বেতহস্তী নামে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থ এই যে শ্বেতহস্তীগুলি ভোজনে সাধারণ হস্তীর সহিত সমান হইলেও কার্য্যের বেলা বিশেষভাবে অকর্ম্মণ্য বলিয়া লক্ষিত হয়। অথচ শ্বেতহস্তী যাহারা রাখে তাহাদের নিকট ঐ হস্তীর দ্বারা কোনও কাজ না হইলেও সেগুলি পূজনীয় ও সাদরে পালনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারত সরকারের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসাবে বহু কারখানা ও কারবার গঠিত ও চালিত হইয়াছে যেগুলি ক্রমাগত লোকসানের উপর লোকসান বৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল কারখানা ও কারবারগুলিকে কোন কোন সমালোচক ভারত সরকারের পোষা শ্বেতহস্তী বলিয়া থাকেন ও সে কথাটা কোন অন্যায় কথা বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি ভারত সরকার একটা বাৎসরিক লাভ লোকসানের বিবৃতি বাহির করিয়াছেন যাহাতে ৯১টি জাতীয়ভাবে চালিত কারখানা ও কারবারের আয় ব্যয় ও কার্য্যের বিষয় যথাযথভাবে দেখান হইয়াছে। যে সকল কারবার সরকারী বিভাগীয় ভাবে চালিত হইয়া থাকে, যথা রেলওয়ে, ডাক ও তার, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, অস্ত্রসস্ত্র কারখানা, রিসার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। সেগুলির কথা এই বিবৃতিতে নাই। ৯১টি কাজকারবারের মধ্যে ৮টি এখনও পূর্ণ গঠিত ও চালিত হয় নাই, ১১টিতে শুধু উন্নয়ন ও সম্প্রসারন ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে এবং ৩টি (জীবনবীমা, ফিল্ম ফাইন্যান্স ও রপ্তানীর জন্য অর্থ সাহায্য প্রতিষ্ঠান) শুধু টাকাকড়ি লেনদেনের কার্য্যে নিযুক্ত। ৬৯টি কারখানা ও কারবারকে পূর্ণরূপে চালিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। সকল কারখানা ও কারবারে ভারত সরকার অদ্যাবধি ২১০০ কোটি টাকা মূলধন হিসাবে ঢালিয়াছেন এবং দীর্ঘমেয়াদী ধার কর্জ্জ হিসাবে দিয়াছেন ২২০১ কোটি টাকা। প্রকাশিত বিবৃতি হইতে ঐ সকল কাজকারবারের সকল কথা পরিষ্কার বোধগম্য হয় না। এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে কত টাকা আয় হইতে পারে ও তাহার মধ্যে কতটুকু হইতেছে এবং কতটা হওয়া সম্ভব হইলেও হইতেছে না, এই সকল কথা উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয় নাই। এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে এই সকল কাজ কারবার হইতে ১৯৬৯-৭০ সালে মোট বিক্রয়ের আয় ৩০০০ কোটি পরিমাণ হইয়াছিল এবং যদি ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ উৎপাদনশক্তির অন্তত শতকরা ৮০-৯০ ভাগও উৎপাদনে লাগান সম্ভব হইত তাহা হইলে আরও ১০০০কোটি টাকা বিক্রয় হইতে পাওয়া যাইত। অর্থাৎ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইত। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে যাহা উৎপাদন করা হয় তাহা উৎপাদন শক্তির মাত্র ৫০-৫৫ ভাগ। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ কারখানা যে সকল দেশে অবস্থিত সেই সকল দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপকগণ বিশেষ চেষ্টা করেন যাহাতে সকল কারখানার কর্ম্মীগণ উৎপাদনশক্তির অন্তত ৭০।৮০ ভাগ কার্য্যে লাগাইতে সক্ষম হয়। তাহারা ইহা সাধন করেন উৎপাদন-বোনাস (বেতনের অতিরিক্ত উপার্জ্জন ব্যবস্থা) দিয়া। মনে হয় ভারত সরকার তাঁহাদের কর্ম্মীদিগকে যথাযথ উৎপাদন না করিলেও অতিরিক্ত উপার্জ্জন করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। শুনা যায় যে ভারত সরকারের চাকুরীতে কেহ একবার বহাল হইলে তাহার চাকুরী কোন মতেই আর যায় না—সে কার্য্য করুক অথবা না করুক। এইরূপ সুবিধা অন্য কোনও দেশে নাই। অন্ততঃ চীন বা রুশিয়াতে ত নিশ্চয়ই নাই। ইহা ব্যতীত সরকারী কার্য্যে অযথা অসংখ্য লোক নিযুক্ত হয় ও তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই কোন কিছু

উৎপাদনের কাজ করে না। উপরুল্লিখিত বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে যদি বিক্রয় লব্ধ অর্থ আরও ১০০০ কোটি টাকা অধিক হইত তাহা হইলে তাহা হইতে ২০০।৩০০ কোটি অন্তত লাভ হইত এবং তাহা হইলে চ্যবন সাহেবকে আর টাকার অভাবে হা হুতাশ করিতে হইত না অথবা ভারতের সর্ব্বাধিক উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিদিগকে উপার্জ্জনের টাকার শতকরা ৯৭৷৷৹ টাকা আয়কর দিয়া মরিতে হইত না।

উপরোক্ত ৬৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৃহত্তম হইল দশটি। যথা হিন্দুস্থান স্টীল, বোকারো স্টীল, ফুড-কর্পোরেশন, হেভি এঞ্জিনিয়ারিং, হিন্দুস্থান এরোণটিকস্, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন, অয়েল এণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন, ন্যাশনাল কোল ডিভেলাপমেণ্ট, ভারত হেভি ইলেক্ট্রীকালস্ এবং নেভেলি লিগনাইট কর্পোরেশন। প্রথমটিতে সরকার বাহাদুর ১০৬১ কোটি টাকা ঢালিয়াছেন এবং সকলগুলিতে মোট দিয়াছেন ৩১০৭ কোটি টাকা মূলধন ও কর্জ্জা মিলাইয়া। বোকারো স্টীল ১৯৬৫ খৃঃ তে আরম্ভ হইয়া এখনও শেষ হয় নাই। ইহা রুশিয়ার সাহায্যে (আর্থিক, যান্ত্রিক ও নির্ম্মাণগত) হইতেছে। মূলধন স্থির হইয়াছিল ৬৭১ কোটি। তাহা বাড়াইয়া হইয়াছে ৭৫৮ কোটি। কাজ যে হয় নাই তাহার কারণ—সরকারী কারখানা হেভি এঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের অর্ডারী মালপত্র সরবরাহ করিবার অক্ষমতা। আর একটা মাল, অগ্নি প্রতিরোধক ইষ্টক মাত্র ৪৩১১ টন রুশিয়া হইতে আনিবার কথা ছিল। সরকারী নির্দ্দেশে যাহাদিগকে সরবরাহ করিতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল তাহারা মাল না দেওয়াতে রুশিয়া হইতে ঐ মাল আসিল ৪৬,৫৯৫ টন! এইভাবে ঐ কারখানা যে কবে শেষ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। যখন হইবে তখন মোট খরচ ১০০০ হাজার কোটির অধিক হইয়া দাঁড়াইবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে? হিন্দুস্থান স্টীল ১০৬৩ কোটি টাকা খরচ হইয়া তিনটি কারখানা হইতে ৫৯ লক্ষ টন স্টীল উৎপাদন করিবে ঠিক ছিল। ১৯৬০-৭০ খৃঃতে উৎপাদন হইয়াছে ৩৮ লক্ষ টন। ঐ বৎসরে মোট লোকসান হইয়াছে দশ কোটি নব্বই লক্ষ টাকা। তাহার পূর্ব্ব বৎসরে হইয়াছিল ৩৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। এই লোকসানের কমতি হইয়াছিল স্টীলের মূল্য টন পিছু ৭৫ টাকা বৃদ্ধি করিয়া। আজ অবধি হিন্দুস্থান স্টীলের মোট লোকসান হইয়াছে ১৭৩ কোটি টাকা।

ফুড কর্পোরেশন-এ মূলধন আছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। ইহার বাৎসরিক কেনাবেচা হয় ৭০০।৮০০ কোটি টাকার। উৎপাদনের কথা নাই বলিয়া লোকসান না হইয়া এই কারবারে লাভ হইয়াছে ৬৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মূলধনের উপর শতকরা এক টাকার একটা ভগ্নাংশ মাত্র। হেভি এনজিনিয়ারিং এর মূলধন প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। উৎপাদন হয় যাহা তাহার মূল্য ঐ বৎসর ছিল ১৪ কোটি টাকা। মোট লোকসান হইয়াছিল ১৮ কোটি টাকা। অপরাপর শ্বেত হস্তীগুলির কোন কোনটিতে কিছু কিছু লাভ হয় বটে কিন্তু লোকসানের ধাকাটা এতই প্রবল যে তাহার ফলে দেশের অর্থনীতি ক্ষত বিক্ষত ও জনসাধারণের অবস্থাও শোচনীয়। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হইবার আরম্ভেই অবস্থা যাহা হইয়াছে, প্রতিষ্ঠা ভারত সরকারের আদর্শ অনুযায়ী ভাবে সম্পূর্ণ হইলে যে সে অবস্থা কি হইবে তাহা আমরা শুধু ভীত শঙ্কিত মনে কল্পনাই করিতে পারি।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির চীন গমন

ডাঃ কিসিংগ্যের নামধেয় একজন ভূতপূর্ব্ব নাৎসি দলের কর্ম্মী এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইয়াছেন। ইনি শুনা যায় রাষ্ট্রক্ষেত্রের নানা প্রকার কঠিন যোগ স্থাপন কার্য্যে সুদক্ষ এবং সেই কারণে রাষ্ট্রপতি নিক্সন ইহাকে দেশে দেশে পাঠাইয়া নিজেদের দেশের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উন্নতির ব্যবস্থা করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ডাঃ কিসিংগ্যের অল্পকাল হইল এই দেশে আগমণ করিয়া পাকিস্থান ও পূর্ব্ব বাংলার যুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের অনুশীলন করেন। এই সকল বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত প্রায় সত্তর লক্ষ উদ্বাস্তুদিগের ভারতে

পাইয়া আসার সমস্যা। তাহারা কি আর নিজ দেশে কোনদিন ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হইবে? যদি হয় তাহা কি পাকিস্থানের সহায়তায় হইবে, না পাকিস্থানকে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী পরাজিত করিয়া পূর্ব্ববাংলা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিলে তবেই সম্ভব হইবে? পাকিস্থানের সহিত এই যুদ্ধে জয় পরাজয় ব্যতীত অন্য কোন নিষ্পত্তি হওয়া কি সম্ভব? যদি হয় তাহা হইলে তাহা কি প্রকার হইতে পারে? পাকিস্থান কি শেষ পর্য্যন্ত বাংলাদেশ দখলে রাখিতে পারিবে না মুক্তিবাহিনী ক্রমশঃ পাক সেনাদলকে ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম পাকিস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিবে?

ডাঃ কিসিংগ্যের ভারত ও পাকিস্থান পর্য্যটন করিয়া এবং বহুস্তরের বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে সত্যকার পরিস্থিতিটা ঠিক কি প্রকার। তিনি ভারতবর্ষে ঘোরাফেরা শেষ হইলে পর পূর্ব্ব পাকিস্থানে ও তৎপরে পশ্চিম পাকিস্থানে গমন করেন। ইসলামাবাদ যাইবার পর তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ও বেশ কিছুকাল লোকে চিন্তা করিতে লাগিল যে ডাঃ কিসিংগ্যেরের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি পশ্চিম পাকিস্থানেরই অপর কোনও স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। কিন্তু হঠাৎ পৃথিবীর সকল মানুষকে তাক লাগাইয়া দিয়া খবর বাহির হইল যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিক্সন পিকিং যাইবার জন্য চীন দেশের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছেন ও এই আমন্ত্রণের মূলে আছেন ডাঃ কিসিংগ্যের। তিনি নাকি পশ্চিম পাকিস্থান হইতে গোপনে পাকিস্থানী হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া পিকিং চলিয়া গিয়াছিলেন ও সেখানে চু এন লাইএর সহিত সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া রাষ্ট্রপতি নিক্সনের চীন গমন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সংবাদটি বিশ্ববাসীকে চূড়ান্তভাবে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দিল; কেননা চীন ও আমেরিকার ভিতরে যে কোন সদ্ভাবের পুনরায় সৃজন কখনও হইতে পারে সে কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। ডাঃ কিসিংগ্যের যে এই অসম্ভব সম্ভবকারী কার্য্য করিতে পারিয়াছেন তাহা নিশ্চয় তাহার খ্যাতিবৃদ্ধির একটা বড় কারণ হইয়া দেখা দিবে।

এখন কথা হইল চু এন লাই কেন নিক্সনের সহিত আলাপ করিতে রাজী হইলেন? ডাঃ কিসিংগ্যের কি লোভ দেখাইয়া চীনকে তাহাদের প্রবল আমেরিকা বিদ্বেষ অন্তত বেশ কিছুটা হাল্কা করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন? তাঁহাকে কি নিক্সন টাইওয়ান (ফরমোজা) এর ন্যাশনালিষ্ট চীন উঠাইয়া দিয়া পৃথিবীতে শুধু একমাত্র পিপলস রিপাবলিক চীনই থাকিবে এইরূপ কোন আশা দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন? তাহা যদি হয় তাহা হইলে চ্যাংকাই শেকের ভতঃপর কি হইবে ব্যবস্থা হইল? অপর দিকে ভিয়েটনাম হইতে আমেরিকা পাট উঠাইবে তাহাত ঠিকই আছে। কিন্তু আমেরিকা সমর্থিত দক্ষিণ ভিয়েটনাম সেনা বাহিনীও কি উত্তর ভিয়েটনামের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে স্থির হইয়াছে? ইহা হইলে এতবড় একটা গাছে উঠাইয়া মই সরাইয়া লওয়ার উদাহরণ বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে অন্যত্র পাওয়া সহজ হইবে না। ডাঃ কিসিংগ্যের যে পাকিস্থানে আসিলেন এবং গোপনে পাকিস্থানের বিমান লইয়া পিকিং গমন করিলেন এই সকল ঘটনা হইতে মনে হয় আমেরিকার পাকিস্থান প্রীতিও কোনও ভাবে নিক্সনের পিকিং গমনের সহিত জড়িত আছে। চীনত পূর্ব্ব হইতেই পাকিস্থানের সহায়তায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছে। এখন যদি আমেরিকা তাহাকে আরও অধিক করিয়া সেই সাহায্যে অবতীর্ণ হইতে বলে তাহা হইলে চীন হয়ত আমেরিকার নিকট অন্যভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়া ঐ কার্য করিতে থাকিবে, ইহাতে আমেরিকাকে খোলাখুলি ভাবে ভারত বিরুদ্ধতা এবং পূর্ব্ববাংলার হত্যালীলার সমর্থন করিতে হইবে না ও তাহাতে আমেরিকা জগতবাসীর নিকট মুখ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে। চীন যদি আমেরিকার নিকট হইতে অর্থ ও যন্ত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে তাহা হইলে চীনের কৃশ

বরোধিতা আরও সক্রিয়রূপ গ্রহণ করিতে পারে। চীনকে অর্থ ও যন্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিলে আমেরিকার বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে দেখা যাইতেছে। প্রথমত আড়াল হইতে পাকিস্থানকে সাহায্য করিয়া ভারতের সহিত পাকিস্থানের যুদ্ধ হইলেও আমেরিকাকে ভারত বিরুদ্ধতা উন্মুক্তভাবে করিতে হইবে না এবং দ্বিতীয়তঃ রুশকেও জব্দ করিয়া রাখিবার একটা পথ খুলিয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত দক্ষিন-পূর্ব্ব এশিয়াতে আমেরিকা আর যুদ্ধে জড়িত হইয়া থাকিতে বাধ্য না হইলে আমেরিকার লক্ষলক্ষ সন্তানকে অযথা গভীর কষ্টে নিমজ্জিত থাকিতে হইবে না। ইহাতে রাষ্ট্রপতি নিক্সন স্বদেশে যে জনপ্রিয়তা হারাইতেছেন তাহা অনেকটা বন্ধ হইবে। পরে যখন নির্ব্বাচনের সময় হইবে তখন ইহাদ্বারা অনেক সুবিধা হইতে পারে। নিক্সনের পিকিং গমন তাহা হইলে সুচিন্তিত মতলব হাসিল করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবস্থিত হইতেছে।

পুস্তক পরিচয়

চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, প্রকাশক জয়শ্রী প্রকাশন, ২৫১৩।৩২ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস রোড কলিকাতা-৪৭। মূল্য ২০৲ টাকা। ৫৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

দেশবন্ধুর বিচিত্র ও বিশাল জীবনকে অবলম্বন করে লেখক এই বিরাট জীবনী গ্রন্থখানিতে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন যা আজকের দিনে অনেকের কাছেই অজানা।

আমাদের আজিকার চরম সংকট ও দুর্গতির দিনে দেশবন্ধুর অমৃতময় জীবনকাহিনীকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন কত বেশী তা বলে শেষ করা যায় না।

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ নিজের অপরিসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে বহু তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে যে সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রচনা করেছেন তা বাংলা ভাষায় জীবনী-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই জীবনী গ্রন্থখানি শুধু তথ্য বা তত্ত্ব-ভিত্তিক নহে। একালের ঐতিহাসিক ও গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইহা রচিত।

'চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জনে'র মূল উপাদান—তাঁর আইন-জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন—বিশাল কার্যময়, আদর্শময় এবং চমকপ্রদও বটে। মানুষ চিত্তরঞ্জন, দাতা চিত্তরঞ্জন, রসরাজ চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন, মানবীয় সত্তার এক একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। একটানা বিরাট জীবনকে ঘিরে সেদিনের সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের যে বিপুলতা, তার সবিশদ পর্যালোচনা করে লেখক এই জীবনীগ্রন্থখানিকে একটি বিশেষ রূপ দিয়েছেন। তার ফলে গ্রন্থখানি হয়েছে অতুলনীয়।

বহু বিভিন্নমুখী প্রতিভার সমন্বয়ে সমুজ্জ্বল চিত্তরঞ্জনের জীবন। গ্রন্থকার ডাঃ ঘোষ প্রতিটি বিষয়খণ্ড বিশ্লেষণ করে এই অনবদ্য জীবনীগ্রন্থকে অমূল্য এবং অতি আকর্ষণীয় করেছেন।

এই মহামূল্যবান সময়োপযোগী ও অতি প্রয়োজনীয় জীবনীগ্রন্থখানি রচনা করে ডাঃ ঘোষ দেশের যে কল্যান সাধন করলেন তার জন্য তিনি দেশবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন ও বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। গ

শিল্পী শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

প্রথম যৌবনে অঙ্কিত চিত্র

কালি কলমে আঁকা ছবি

"রাধা-কৃষ্ণ" (উপরে বামদিকে) ও অন্যান্য দু-একটি ছবি ১৮৯৪-৯৫ সালে আঁকা।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত :

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৭৮

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতার দুই যুগ

স্বাধীনতার পরশ পাথরের স্পর্শে ভারতীয় মানুষের সকল দুঃখ, দৈন্য, অভাব ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা দূর হইয়া জীবন একটা নবলব্ধ সব পেয়েছির আনন্দস্রোতে ভাসিয়া অনন্ত সফলতার বন্দরে পৌঁছিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে কালাতিপাত করিতে পারিবে; এই কামনা যদিও ভারতবাসীদিগের সিদ্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলেও সকল ভারতবাসীই যে বিগত চব্বিশ বৎসর ধরিয়া পরাধীনতার লজ্জা, ক্ষুদ্রতা ও ভীতি কাটাইয়া উঠিয়া স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়ায় আত্মপ্রসাদ ও গৌরব অনুভব করিয়া স্ফিতবক্ষে ও উন্নত মস্তকে বিচরণ সক্ষম হইয়াছেন সে কথা কেহ ভুলিতে পারে না। দাসত্বের আবহাওয়াতে মানুষ যতই উত্তম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি পাউক না কেন দাসত্ববোধ তাহার জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবেই, একথা স্থির নিশ্চয়ভাবে বলা যাইতে পারে। স্বাধীন যে সে অল্পাহারেও সুখে থাকে, ছিন্ন বসন তাহার প্রাণে কোন পরনির্ভরতার অসুখ জাগাইতে পারে না, ভগ্ন বাসস্থান তাহাকে সহায়হীনতাবোধে অভিভূত করিতে পারে না, ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও সে মুক্তির আস্বাদ লাভকেই সম্পদ লাভ অপেক্ষা শ্রেয় মনে করিতে শিখে। আমরা যাহারা বৃটিশের অধীনতার দৈন্য নানাভাবে অনুভব করিতে বাধ্য হইয়া জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়াছি এবং বৃটিশ শাসকদিগের অহংকারমত্ততাজাত বর্ব্বর ব্যবহার সহ্য করিয়া অন্তরে অপমানের আগুনে দগ্ধ হইয়া কেমন করিয়া বৃটিশকে ভারত হইতে তাড়ান যাইবে সেই চিন্তা ও চেষ্টাতে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছি; আমরাই জানি যে বৃটিশ যখন ভারত সাম্রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল তখন আমাদের মনে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উন্মেষ হইয়াছিল। যাহারা পরাধীনতার লজ্জা কখনও অনুভব করে নাই তাহাদের পক্ষে স্বাধীনতার গৌরব উপলব্ধিও তেমন গভীর ও আবেগ উদ্দীপ্ত হওয়া সম্ভব হয় নাই। যাঁহারা বিনা কষ্টে,

বিনা পরিশ্রমে, সংগ্রাম না করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সৌভাগ্যবান; কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘ-কাল পরাজয়ে জর্জ্জরিত হইয়া থাকিবার পরে বিজয়ের যে অপরূপ আনন্দ সে অনুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। স্বাধীনতার মূল্যায়নও সেই কারণে অনেকের অন্তরে যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

যে সকল দোষের জন্য আমরা দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে পর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, আজ আবার সেই সকল দোষই আমাদিগের মধ্যে জাগ্রত হইতেছে। ফলে আমরা যে আবার সেই পুরাতন পথেই চলিয়া সেই পুরাতন ব্যাধিতেই আক্রান্ত হইয়া পড়িব না এ কথার কে নিশ্চিত জবাব দিতে পারে? কিন্তু যাহারা সেইসকল পুরাতন পাপের শাস্তি কি তাহা সাক্ষাৎ ভাবে জানে না তাহাদের অন্তরে পাপভয় জাগ্রত করা সহজ নহে। কিন্তু অনেকে আছেন যাঁহারা জানিয়া বুঝিয়া লোভে পড়িয়া পুরাতন পাপে পুনরায় জড়াইয়া পড়িতেছেন। আজ এই দুই যুগ স্বাধীন থাকিবার পরে তাঁহাদেরই বিশেষ করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে হইতেছে যাহাতে তাঁহারা সেই অতীতের আত্মঘাতের পথে আবার অগ্রসর না হ'ন। সর্ব্বাপেক্ষা মাহাত্ম্য গরিমা উজ্জ্বল মনোভাব হইল দেশভক্তি ও দেশের জন্য স্বার্থ ত্যাগের আগ্রহ। এই দেশভক্তি ও নিজের সুবিধা ও স্বার্থ ভুলিয়া দেশবাসীর মঙ্গল প্রচেষ্টা আজ বহু অন্তরের কোথাও ক্ষীণভাবেও লক্ষিত হইতেছে না। যাঁহাদের বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে তাহাদের এই সকল কথা শিখাইতে হয় না। বহু বিখ্যাত আত্মবলিদানকারী ভারত সন্তানকে তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে দেখিয়াছেন ও চিনিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তত আমরা বলিতে পারি যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুনীতি ও দেশের মঙ্গলের পথ ছাড়িয়া বিচিত্র মতবাদের অন্ধকারে পড়িয়া দিশাহারাভাবে যত্রতত্র বিসম্বাদ বিপর্য্যস্ত হইবার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না; সুতরাং দেশভক্তি ও দেশবাসী জনসাধারণের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতির পুরাতন পথই সুগম ও শ্রেয়। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যে সকল মহাপুরুষ ঐ পথ অনুসরণ করিয়া জাতিকে উন্নতির সোপান বাহিয়া উর্দ্ধে আরোহন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রদর্শিত দিকে না গিয়া অজানার তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া হাবুডুবু খাইবার কোন কারণ দেখা যায় না। দেশের সকল মানুষের উপার্জ্জনের ব্যবস্থা; খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার আয়োজন, ইহাই সুসাধিত হইতে সকল কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষমতা পূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া যাইবে। যাঁহারা বলেন, জাতির উন্নতি অদ্যাবধি তেমন কিছু হয় নাই তাঁহারা ভুলিয়া যান যে পূর্বকালে দেশের অবস্থা,জনসংখ্যা, মোট জাতীয় আয়, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির অবস্থা-ব্যবস্থা কি ছিল এবং প্রথমতঃ ১৯৪৭খৃঃ অব্দ অবধি উন্নয়ন কি হইয়াছিল ও পরে ১৯৪৭—হইতে উন্নতি কি হইয়াছে। ইহার হিসাব করিলে দেখা যাইবে বহু ক্ষেত্রেই জাতীয় উন্নতি অন্যান্য অপ্রগতিশীল জাতির তুলনায় বিলক্ষণ হইয়াছে। জাতিভেদ, ছোঁয়াছুঁয়ি, অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহে বাধা সতীদাহ ইত্যাদি নানান সামাজিক দুর্নীতি পরিচায়ক রীতির অবসান স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে স্ত্রীজাতির পুরুষের সহিত সাম্য অর্জ্জন সম্পূর্ণ হয় এবং জাতিভেদ ও ছুতমার্গ অনুসরণ ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতে আরম্ভ করে। স্বাধীনতার পরে ভারতের কারখানাগুলির সকল দিক হইতেই প্রসার ও বিস্তৃতি হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ভারত ঔষধ, অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, অস্ত্রশস্ত্র, বিমান, যন্ত্রযান, জাহাজ প্রভৃতি প্রস্তুত ও নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থা অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সেইদিকে ভারত আরও অগ্রসর হইতেছে।

এই অবস্থায় সকলের নৈরাশ্যের অতলে চলিয়া যাইবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। জাতীয় উন্নতি সহস্র বৎসরের পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসার কথা এবং তাহা সহজসাধ্য নহে। কত শীঘ্র ৫৫ কোটি মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যময় করা

যাইতে পারে এ প্রশ্নেরও উত্তর সহজে দেওয়া সম্ভব হয় না। এই কথাই বলা চলে যে অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে ভারত উন্নতির দিকেই চলিতেছে —অবনতির দিকে নহে।

আন্তর্জাতিক সংযোগে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি

একাধিক রাষ্ট্র মিলিতভাবে অর্থনৈতিক সামরিক বা অপর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি চেষ্টা করিতেছে; এইরূপ ঘটনা মানব ইতিহাসে বহুবার বিভিন্ন যুগে ঘটিতে দেখা গিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত করিয়া নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির আয়োজন করিতে বহু জাতিকে মিলিত-ভাবে সচেষ্ট হইতেও যুগে যুগে দেশে দেশে দেখা গিয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদিতে মিলিত আয়োজন বহুদিন হইতেই আন্তর্জাতিকভাবে হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ যে প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহযোগিতা অনেকক্ষেত্রে অধিক লাভজনক হয় বলিয়া দেখা যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন কোন কার্য্যে কোন কোন জাতির বিশেষ অবস্থা আনুকুল্য ও সুবিধা থাকিতে দেখা যায় এবং সেইজন্য কোন কোন জাতি মিলিতভাবে যে কার্য্যে যাহার অধিক সুবিধা তাহাতেই বিশেষ করিয়া সেই সেই জাতিকে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া উৎপাদন কার্য্যে ঐ সকল জাতির উচ্চতম লাভের ব্যবস্থা করার রীতি পুরাকাল হইতেই চালাইয়া আসি-তেছে তাহা দেখা চাই। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কারণ হইল যুদ্ধকালে সামরিক সহায়তা প্রাপ্তির প্রচেষ্টা। যুদ্ধ লাগিলে সকল জাতিকেই নানাভাবে যুদ্ধের মাল মশলা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। অনেক সময় সহযোগী ও সমর্থক বন্ধু জাতির নিকট হইতে সৈন্য সংগ্রহও করিতে হইতে পারে। যথা বিগত দুইটি বিশ্ব মহাযুদ্ধেই দেখা গিয়াছিল (১৯১৪-১৮ ও ১৯৩৯-৪৫) ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্ম্মাণী, রুশিয়া, ইতালি, জাপান, তুর্কী, অস্ট্রীয়া প্রভৃতি জাতি মিলিতভাবে দুইটি বহুরাষ্ট্রীয় দল গঠন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। বৃটিশের সহিত কমনওয়েলথ যুদ্ধে সংযুক্ত হইয়া যায় বলিয়া আরও অনেক রাষ্ট্র (যথা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ক্যানাডা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ) ঐ দুই মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সম্মিলিত জাতিদিগের পক্ষে একত্র হইয়া যুদ্ধ করা নুতন কথা নহে। পূর্ব্বকালেও, যথা নেপোলিয়নের সময় কিম্বা তাহারও পূর্ব্বে যুদ্ধে আন্তর্জাতিক মিতালি একটা অতি প্রচলিত রীতি বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বর্ত্তমানকালে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয় ক্ষেত্রে অনেক কিছুই কতকটা গা ঢাকা দিয়া অথবা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া করা হইয়া থাকে। যথা কোরিয়া ও ভিয়েৎনামে চীন ও রুশিয়ার সহায়তা ততটা খোলা-খুলিভাবে করা হয় নাই। অপর পক্ষেও যত সাহায্য আসিয়াছিল তাহার মধ্যে কিছু কিছু গোপনেই আসিয়াছিল। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বহুক্ষেত্রেই আবশ্যক হয় এবং নানা জাতির মধ্যে সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক অথবা সামরিক সহায়তার ব্যবস্থাও করা হইয়া থাকে। অনেক সময় পুরাতন শত্রু মিত্ররূপে সাহায্য করিতে উপস্থিত হয় এবং কখন কখন পুরাতন বন্ধু শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। নেপোলিয়নের সময় জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের সহিত মিলিত-ভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে দেখা যায় জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের শত্রু ও ফ্রান্স হইল ইংলণ্ডের স্বপক্ষে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধে ইতালি ও জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার স্বপক্ষে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে জাপান ও ইতালি জার্ম্মাণীর সহায়ক হইয়া দাঁড়ায় এবং চীনদেশ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার দলে সংযুক্ত হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে কে কখন শত্রু হইতে মিত্র হয় অথবা মিত্রতা খারিজ করিয়া শত্রুদলে নাম লিখায় তাহার কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। ইহার কারণ এই যে সকল জাতিই নিজ নিজ সুবিধা বুঝিয়া শত্রুতা মিত্রতার সম্বন্ধ সৃজন করে এবং অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটিলে যে এখন মিত্র হয়, সেই পরে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যথা আমেরিকা, কিছুকাল পূর্ব্বে চীনদেশের সহিত বিরুদ্ধতাতেই নিবিষ্ট ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে চীনের

সহিত সখ্য স্থাপন করিতে আগ্রহ দেখাইতেছে। ভারত এই অবস্থায় মনে করিতেছে যে যদি পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ লাগিয়া যায় তাহা হইলে চীন নিশ্চয়ই পাকিস্থানকে সাহায্য করিবে। সে ক্ষেত্রে যদি আমেরিকা চীনের বন্ধু হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে ভারতের আমেরিকার সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকিবে না। সে ক্ষেত্রে ভারতের এমন কোন শক্তির সহিত সখ্য স্থাপন আবশ্যক যে শক্তি চীনের ও আমেরিকার সহিত বন্ধুত্বের বন্ধনে নিবদ্ধ নহে। সেইরূপ বৃহৎ শক্তি শুধু রুশিয়াকেই ধরা যায়। এই কারণে ভারত যে রুশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব ও প্রয়োজন হইলে সামরিক সাহায্য প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিমূলক সন্ধি করিয়াছে তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষভাবে কার্য্যকর, প্রয়োজনীয় এবং উচিত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহেরুর আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সংক্রান্ত ভ্রান্ত নীতি নির্দ্ধারণের ফলে আমাদের বিশ্বের জাতি সভায় কোনও শক্তিশালী বন্ধু ছিল না। ইহার ফলে ভারত অথর্ব্ব সিংহের ন্যায় পাকিস্থানী গর্দ্দভের পদাঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছিল। কারণ ঐ গর্দ্দভের পিছনে মহাসর্প চীনের উপস্থিতি। এখন যদি অতিকায় রুশ ভল্লুক অথর্ব্ব সিংহকে উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করে তাহা হইলে আমেরিকান সাহায্যপুষ্ট চীনকে আর ভয় করিয়া চলিতে হইবে না। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ভারত যে নিজের তথাকথিত নির্দ্দলীয় ভাব ছাড়িয়া আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করিতেছে ইহা একটা বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক আইনে বিচার

শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসাবে পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনসাধারণ কর্ত্তৃক তদ্দেশীয় প্রধান নেতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। আওয়ামী লীগ পাকিস্থানের বিগত রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে শতকরা ৯৮টি আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়া নিজেদের পূর্ব্ব পাকিস্থানের প্রতিনিধিত্বে একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ করেন। সমগ্র পাকিস্থানের নির্ব্বাচনেও তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করেন। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি (সামরিক) ইয়াহিয়া খান একটা আলোচনা বৈঠক আহ্বান করেন ও সেই আলোচনা বৈঠকের কার্য্য চলিতে থাকার অবস্থায় তিনি ২৫ মার্চ্চ ১৯৭১ সন্ধ্যাকালে শেখ মুজিবুর রহমানকে অকস্মাৎ গ্রেফতার করিয়া, রাওলপিণ্ডিতে লইয়া চলিয়া যান। ঐ রাত্রেই পাকিস্থানী সৈন্যগণ পূর্ব্ব পাকিস্থানে ব্যাপকভাবে গণহত্যা, নারীধর্ষণ ও বাঙালীদিগের গৃহে ও দোকানে অগ্নিসংযোগ আরম্ভ করে সুতরাং যখন আলোচনা বৈঠক চলিতেছিল এবং যখন সেই আলোচনা বৈঠকে স্বয়ং ইয়াহিয়া খান সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সেই সভায় মুজিবুর রহমান শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে উপস্থিত থাকিয়া এবং কোন বাধা দিতে সক্ষম না হইয়া অনায়াসে ধৃত হইয়া রাওলপিণ্ডিতে চালান হইয়া যান; তখন সেই আলোচনা বৈঠকে শেখ মুজিবুর কোনও প্রকার বিদ্রোহ বা বিপ্লবাত্মক কার্য্য করিতেছিলেন না বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ আলোচনা বৈঠক ডাকিবার সময় ইয়াহিয়া খান এমন কোন কথা বলেন নাই যাহাতে মনে হইতে পারে যে ঐ সময় কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লব চলিতেছিল। এবং যদি সেইরূপ অবস্থা থাকিত তাহা হইলে শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠকে নিজে নিরস্ত্র ও অস্ত্রধারী সঙ্গীবর্জ্জিতভাবে উপস্থিত হইয়া অত সহজে ইয়াহিয়া খানের কবলে পড়িয়া গ্রেফতার হইতেন না। ঐ ঘটনা হইতেই প্রমাণ হয় যে শেখ মুজিবুর রহমান যে সময় ধৃত হইয়া ইয়াহিয়ার সহিত রাওলপিণ্ডি যাইতে বাধ্য হন, তখন অবধি পূর্ব্ব বাংলায় কোন ব্যাপক বিদ্রোহ, বিপ্লব বা যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয় নাই। ২৫শে মার্চ্চ রাত্রে যখন পাকিস্থান বাহিনী নরনারী শিশু নির্ব্বিচারে বাঙালী-দিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে তখন বাঙালীরাও আত্মরক্ষার্থে প্রত্যাক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। ঐ রাত্রে ৩০০০০।৫০০০০ বাঙালী নিহত হয় ও পাকিস্থানী সৈন্য যদি কেহ মারা গিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের

সংখ্যা অতি অল্পই হইয়া থাকিবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং পাকিস্থানী সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক যে অকথ্য বর্ব্বরতা ও জঘন্য নৃশংসতার বন্যা ঐ রাত্রি হইতে প্রবলভাবে পূর্ব্ব বাংলার জনগণের উপর বহাইতে আরম্ভ করা হয় তাহার পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে কোন ব্যাপক যুদ্ধ হয় নাই এবং শেখ মুজিবুরও যখন যুদ্ধের হাওয়া ছড়াইতে আরম্ভ করে তখন রাওলপিণ্ডিতে বন্দী অবস্থায় কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। সেই জন্য শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্থান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় বা নীতি-বৈপরীত্যজাত কার্য্য করিয়াছেন বলা ঠিক হয় না। কারণ আওয়ামী লীগের কার্য্যকলাপ রাষ্ট্রীয় দলের কার্য্য এবং তাহাতে সামরিক শাসন পদ্ধতির যদি কোন দোষ দেখান হইয়া থাকে, তাহা রাষ্ট্রক্ষেত্রে রীতিবিরুদ্ধ নহে। স্বয়ং ইয়াহিয়া খানও সামরিক শাসন পদ্ধতি রদ করিয়া সাধারণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত করাইয়া সামরিক শাসকদিগের সমালোচকদিগের সহিত নিজেও যোগদান করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ তাহা হইলে দেখা যায় সকল দিক হইতেই কষ্টকল্পিত ও মিথ্যা। যদি কেহ রাষ্ট্রবিরুদ্ধতা করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার বা তাহাদের নাম আয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খান। এই দুই ব্যক্তি পাকিস্থানে সামরিক শাসন পদ্ধতি একটানা দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া "ইসলামিক রিপাবলিক" নামটাকে অর্থহীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং সাধারণতন্ত্রের বা মুসলমান জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার পদদলিত করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির স্বৈরাচারী একাধিপত্যই অধিকতরভাবে ন্যায্য ও রাষ্ট্রনীতি সঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সুতরাং কাহারও যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইয়াছে আয়ুব ও ইয়াহিয়ার। কারণ তাহারাই অন্যায় ও অধর্ম্মের পথে চলিয়া এবং নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি ও আর্থিক লাভের জন্য পাকিস্থান রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। পূর্ব্ব বাংলার জনসাধারণকে দলিত ও শোষিত অবস্থায় চরম দুর্দ্দশায় নিপতিত রাখার মূলেও আছে ঐ সামরিক শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্থানের বিনাশের হেতু অনুসন্ধান করলেও দেখা যায় ঐ পশ্চিম পাকিস্থানবাসী সামরিক লুণ্ঠনকারীদিগকে এবং সম্প্রতিকার যে সকল চরম বর্ব্বরতা, অমানুষিক অত্যাচার ও গণহত্যার কার্য্যাবলী তাহারও মূলে রহিয়াছে পশ্চিম পাকিস্থানী সেনাবাহিনী ও তাহাদের সেনাপতিগণ। প্রধান সেনাপতি হইল রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান। সুতরাং রাষ্ট্র ও মানবতা বিরুদ্ধ সকল অপরাধের জন্যই অভিযোগ উঠান যায় ঐ সকল চরিত্রহীন, বর্ব্বর, অমানুষ ও স্বার্থান্বেষী পশ্চিম পাকিস্থানী মনুষ্য দেহধারী পশুদিগের বিরুদ্ধেই। শেখ মুজিবুর রহমান নির্লোভ, নির্ভিক আদর্শবাদী মানবধর্ম্ম অনুসরণকারী মহাপ্রাণ সর্ব্বজনপূজ্য দেশনেতা! তাঁহাকে যদি বিচারের নাম করিয়া ইয়াহিয়া খান হত্যা করে তাহা হইলে তিনি জগত ইতিহাসের অপরাপর মহান আত্ম বলিদানকারীদিগের সহিত একত্রে অমরলোকে অবস্থান করিবেন। নরাধম ইয়াহিয়ার স্থান কোন নরকে হইবে তাহা কে বলিতে পারিবে?

শেখ মুজিযুর রহমান পাকিস্থান সেনাবাহিনীর সৈনিক নহেন। তিনি যদি অপরাধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বিচার গোপনে সামরিক বিচারক দিগের নিকট হইতে পারে না; তাহা হওয়া উচিত উন্মুক্ত বিচারালয়ে। আইনত বিচারকদিগের নিকট এবং যথাযথভাবে সাক্ষীসবুদ ও উকিল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করিয়া। অপরাধ হইল পূর্ব্ববাংলায়, বিচার হইতেছে গোপনে একহাজার মাইল দূরে। ব্যাপারটা যে একটা মহা চক্রান্তের অঙ্গমাত্র তাহা বিচার ব্যবস্থা হইতেই দেখা যায়। যাহারা শেখ মুজিবুরের তরফের সাক্ষী তাহারা কে? যাহারা বিরুদ্ধপক্ষের সাক্ষী তাহারাই বা কে এবং তাহাদের এজাহারের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের জেরাই বা কে করিবে?

যদি জেরা না করিয়া অথবা জেরার অভিনয় করিয়া পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতির অনুচরগণই তথাকথিত বিচারের কার্য্য শেষ করে তাহা হইলে ঐ প্রহসনের প্রয়োজন কি ছিল? শেখ মুজিবুর রহমান যে কোন কাল্পনিক কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিলেই হয়। ইয়াহিয়া খানের মিথ্যার জবাব কাহারও দিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুকে হত্যা করিয়া বলে যে সেরূপ কোন হত্যাকাণ্ড হয় নাই; সহস্র সহস্র নারীকে চরম অপমান করিয়া বলে যে সে সকল কথা মিথ্যা এবং পঁচাত্তর লক্ষ মানুষকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া বলে যে সেই সকল লোক পূর্ব্ববাংলার বাসীন্দাই নহে; সেইরূপ একটা মহানিপুণ মিথ্যাবাদীর পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানকে ইহলোক হইতে অনন্ত শূন্যে মিলাইয়া দেওয়া অতি সহজ কার্য্য। কোনও একটা কল্পিত ঘরের চার দেওয়ালের অন্তরালে কোন কল্পিত বিচারকের নিকটে একটা কাল্পনিক বিচার কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া একটা মহা মিথ্যার জাল বুনিয়া নিজের উদ্ভাবনাশক্তির অপচয় করিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য যাহাদের জীবনের গতি মিথ্যার স্রোতে গা ভাসাইয়াই চলার উপরেই নির্ভরশীল তাহারা মিথ্যা না বলিয়া জীবন কাটাইতে পারে না। মিথ্যাহীন জীবন তাহাদের নিকট শুষ্ক নির্জ্জলা নদীবক্ষের মতই সকল গতির প্রবল অন্তরায়।

বন্যা

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু বলিয়াছিলেন—"ইয়ে হটাও, উয়ো হটাও" এবং তখন তাঁহার পরামর্শদাতা দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ যুথের মাতব্বরগণ ঋণের টাকায় ঐ সকল "হটাও" প্রচেষ্টার আত্মনিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যে সকল কষ্টকর ও বিপদজনক অবস্থা দূর করিবার জন্য সহস্র সহস্র কোটি টাকা ঋণ করা হইল সে সকল কষ্টের ও বিপদের অবসান হইল না; যদিও খরচটা বেশী বই কম হইল না। অনেক কিছু কষ্টকর ও জীবনহানিকর অসুখ-বিসুখ হ্রাস হইল নূতন নূতন চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে। যথা ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড়, নিউমোনিয়া, কুষ্ঠ ও অন্যান্য বহু রোগের নূতন ঔষধের সহায্যে চিকিৎসা হওয়া সম্ভব হইল ও ফলে ভারতের জন্মের হার না কমিলেও মৃত্যুর হার কমিয়া গিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা নূতন পথ খুলিয়া যাইল। কিন্তু ইহার জন্য ভারত সরকারের কোন খ্যাতি প্রাপ্তি হওয়ার কথা নয়; খ্যাতিটা একান্ত-ভাবেই বৈজ্ঞানিকদিগের পাওনা।

বন্যা নিরোধ লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিকল্পনার বোঝা বৃদ্ধি হইয়াছিল। নানা স্থলে বাঁধ বাঁধা হইল, বহু খাল কাটা হইল; কিন্তু বন্যা নিরোধ হইল না। যখন বন্যা হয় না তখন জল জমা করিয়া অনেকগুলি সুবৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি হইল। নূতন খালগুলি সেই সময় শুষ্ক জলহীন অবস্থায় বিরাজ করিত। এবং যখন বর্ষার জল প্রবল ধারায় বহমান হয় তখন হ্রদগুলির জল অতিরিক্ত হওয়াতে সেই জল পূর্ব্বপথে ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত অপর উপায় থাকে না। ফলে হ্রদের জল ছাড়াতে নানা স্থানে প্লাবন আরম্ভ হয়। খালগুলিতে কি হয় তাহা বলা কঠিন। তবে মনে হয় যে খাল-গুলি দিয়া বন্যার জল কোথাও পাঠান চলে না; কারণ তাহা সম্ভব হইলে পুরান পথে জল ছাড়া হয় কেন?

শুনা যায় এই অবস্থা ঘটিয়াছে এই জন্য যে যথেষ্ট সংখ্যক বাঁধ বাঁধা হয় নাই। সুতরাং যে কয়েকটি হইয়াছে সেগুলি সমগ্র প্লাবনের জল ধারণ করিতে পারে না। প্রশ্ন হইল আরও বাঁধ বাঁধা হইল না কেন? ঐ দোষে কাহাকে কোথায় বরখাস্ত করা হইল?

অথবা কেহই যদি দোষী গণ্য হইল না তাহা হইলে কেন হইল না? ভারত সরকারের চাকুরী অথবা মন্ত্রীত্ব চিরস্থায়ী বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। এক, স্বাভাবিক কারণে, যদি কেহ ইহলোক ত্যাগ করিয়া অপরলোকে যান তাহা হইলে চাকুরী বা মন্ত্রীত্ব আর রাখা সম্ভব হয় না। তবে কর্ত্তব্যে অবহেলা, কর্ম্মে নির্বুদ্ধিতা এবং ইচ্ছাকৃত অন্যায় ব্যবহার অথবা ভুলপথে চলার

জন্য কাহাকেও বরখাস্ত করা হয় বলিয়া আমরা কখন শুনি না। ছোট খাট চাকুরেদিগের হয়ত উপরওয়ালা-দিগের অনুগ্রহ না থাকিলে কখন কখন সাজা হইয়া থাকে কিন্তু ঐ জাতীয় অতি সাধারণ খবর কোথাও বিশেষ প্রচারিত হয় না। যে কথাটা ভারতবাসীদিগের একটা মহা ক্ষতিকর ও লোকসানের কথা ; অর্থাৎ যাহার জন্য বহু ভারতবাসীর আর্থিক সর্ব্বনাশ হইতে পারে এমন কি প্রাণহানীর সম্ভাবনাও যাহার ভিতর আছে, সেই বিষয়টা লইয়া ভারত শাসকগন কখনও কোন উচ্চবাচ্য করেন না কেন? সে জন্য কাহারও কোন সাস্না ত হয় নাই, এমন কি কোন মন্ত্রীকেও অক্ষমতার স্বীকৃতির জন্য পদত্যাগ করিতে দেখা যায় নাই। কথাটা হইল প্লাবন নিরোধ করিতে না পারার কথা। সহস্র কোটি মুদ্রা ঋণ করিয়া ব্যয় করিবার পরেও যে বন্যার জলে বহু অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি ডুবিয়া গিয়া ফসল নষ্ট ও গৃহপালিত পশুর প্রাণহানী ঘটিতেছে, এমন কি বহু গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও কখন কখন মানুষেরও অপঘাত মৃত্যু হইতেছে, ইহার জন্য কাহাকে দায়ী করা যাইবে? এবং সেই দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করিবার পর কাহার কি শাস্তি হইবে? ভারতবাসী জনসাধারণ ঋণের টাকা সুদ সমেত শোধ করিতে বহু যুগ ধরিয়া রাজস্বের বোঝা বহিতে থাকিবেন। কিন্তু যাহারা এই জন্য দায়ী তাহারা অনায়াসলব্ধ সম্পদ উপভোগ করিয়া দিন কাটাইতে থাকিবে। এ ব্যবস্থাটা ঠিক ন্যায় বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহারা গায়ে পড়িয়া, নিজ অক্ষমতা স্বীকার না করিয়া, দেশের শাসন, গঠন ও উন্নতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সকল কিছুকে বিফলতার গভীরে ডুবাইয়া দিয়া থাকেন সেই সকল রাজনীতির ক্ষেত্রের খেলোয়াড়দিগের অতঃপর নিজ নিজ কার্য্যের দায়িত্ব স্বীকার করিতে শিখাইতে হইবে। দায়িত্বহীনভাবে দেশ-বিদেশঅতি আবশ্যকীয় বিভিন্ন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সকল কিছু যাহারা অসফল করিয়া "যার যাবে তার যাবে" নীতি অনুসরণে নিজেদের গা বাঁচাইয়া চলিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে বুঝান আবশ্যক যে দেশবাসীর লোকসান হইলে তাঁহাদেরও লোকসান পূর্ণ মাত্রায় হইবে।

পশ্চিমবাংলায় মতবাদের যুদ্ধ

পশ্চিমবাংলায় আজকাল মাঝে মাঝে মতবাদ অথবা রাষ্ট্রীয় দলের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ হইয়া যায়। এই সকল যুদ্ধে অনেক সময় শত শত মানুষ অংশ গ্রহণ করে এবং বোমা, পিস্তল, পাইপ বন্দুক, ছুরি, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক এক বার এই সকল যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা পঞ্চাশ হইতে একশতও হইতে দেখা যায়। যখন যুদ্ধ হয় তখন লোকের গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া লুটপাট এবং কখনও কখনও গৃহে বা শত্রুপক্ষের সমর্থক বিবেচিত দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হইয়া থাকে। যেখানে যুদ্ধ হয় সেখানের মানুষের আত্মরক্ষার উপায় থাকিলে ভাল, না থাকিলে তাহারা অসহায়ভাবে সশস্ত্র যোদ্ধাদিগের কৃপার উপরে নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। জনসাধারণের অস্ত্রের প্রয়োজন এখন পশ্চিমবাংলায় যত অধিক হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে সেরূপ কখনও হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু পুলিশ সম্প্রতি জনসাধারণের নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। কারণ জনসাধারণ নিজের অস্ত্র অনেক সময় গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেদের হস্তে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু ইহার মূলে আছে পুলিশের অক্ষমতা ও গুণ্ডা দমনে অনিচ্ছা। পুলিশ পশ্চিমবাংলায় এখন নানান রাষ্ট্রীয়দলের সমর্থক ও পুলিশের সাহায্যেই গুণ্ডাগণ খবর পাইয়া আগ্নেয়াস্ত্র ছিনাইয়া লইতে ইহার উহার গৃহে গমন করে। ইহা ব্যতীত পুলিশের অস্ত্রও পুলিশের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাসত্বে গুণ্ডাদিগের হস্তে যাইতে দেখা যায়। সুতরাং জনসাধারণের উচিত আরো বেশী সংখ্যায় অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া (লাইসেন্স লইয়া) পাড়ায় পাড়ায় সশস্ত্র রক্ষী-বাহিনী গঠন করিয়া গুণ্ডাদিগের দমন ব্যবস্থা করা। পুলিশের হস্তে অস্ত্র রাখিতে দিলে জনসাধারণ একান্ত অসহায় হইয়া পড়িবেন। সুতরাং পশ্চিমবাংলার শাসক-

দিগের এইদিকে বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এই প্রদেশের পুলিশ জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য অবহেলার প্রায়শ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিলে রাষ্ট্রপতির শাসনে তাহা গ্রাহ্য হওয়া কখনও উচিত হইবে না।

রাষ্ট্রপতির শাসনে রাষ্ট্রীয় দলের প্রভাব

পশ্চিম বাংলায় এখন রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের ফলে এই প্রদেশে আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। ইহার কারণ আইনভঙ্গকারীদিগের দমনের জন্য যে বিশেষ আইন করা হইয়াছে তাহার যথাযথ ব্যবহার না হওয়া। অর্থাৎ আইন যাহারা ভাঙ্গায় তাহাদের ছাড়িয়া রাখিয়া শুধু চুনাপুঁটিদিগকে ধরিলে কোনও সুফল হইবে না; এই কথা ভুলিয়া চলিতে থাকার ফলে অল্পকিছু স্থানীয় গুণ্ডা এখানে ওখানে ধরিলেও অপরাধের স্কুল কলেজ যাহারা চালায় তাহারা নূতন নূতন অপরাধকারী সৃষ্টি করিয়াই চলিতেছে ও তাহাতে অপরাধীর সংখ্যা ধরপাকড়ে হ্রাস ত হইতেছে না বরঞ্চ মোটের উপর বাড়িয়াই চলিতেছে। প্রায় ৪০০০ লোক ধরা পড়িয়াছে। ইহা মোট অপরাধকারীদের সংখ্যার শতকরা একাংশ হইবে সম্ভবত। নুতন রংরুট আসিতেছে মাসিক ৪০০০ জন। এই জন্য খুন জখম লুট দাঙ্গা গৃহ-বাস-ট্রাম দাহন বাড়িয়াই চলিতেছে। প্রয়োজন পালের গোদাদিগকে ধরিয়া দূর দেশে প্রেরণ করা। আর প্রয়োজন চোরাই ও লুঠের মাল বিক্রেতা কিছু ব্যবসায়ীকে প্রদেশ হইতে বহিস্কার। কিন্তু এই সকল লোকের কেন্দ্রের দরবারে মুরুব্বি থাকায় কাজটা সহজ হয় না। কিন্তু সেইরূপ ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত অপরাধ প্রবণতার দমন সম্ভব হইতে পারে না।

পশ্চিম বাংলার যে দরবার এখন রাষ্ট্রপতির শক্তিতে শক্তিমান সেখানেও যাহারা ঘোরাফেরা করিতে পারে তাহাদের মধ্যে অনেক আইন ভঙ্গকারীর গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা যদি অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সহানুভুতি ও সমর্থনের উপর নির্ভর করে তাহা হইলে সেই শাসন ব্যবস্থার দৃঢ়তা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে আদর্শবাদের দোহাই দিয়া নরহত্যা, পরস্বঅপহরণ, গৃহদাহ ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের উৎপীড়ন ইত্যাদি করা হয়, সেখানে সুনীতিবর্জ্জিত আদর্শের ভেক দেখিলেই ছদ্মবেশী পাপের উপস্থিতি সন্দেহ করা সমীচীন। অন্তত ডাকিয়া আনিয়া কোন ধর্ম্ম বিরুদ্ধতার ব্যাপারীর সহিত মিতালি করিয়া রাষ্ট্রশাসন কার্য্য সহজ সরল হয় না। পুনর্ব্বার বলি যে অপরাধ নিবারণ করিতে হইলে যাহারা অপরাধের দীক্ষাদাতা তাহাদিগকে সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আসর হইতে অপসৃত করিয়া জাতির কর্ম্মক্ষেত্র ক্লেদহীন করা আবশ্যক। পাপের সহিত অতি দূরের ও পরোক্ষ সাহচর্য্য থাকিলেও তাহার ফল কখনও শুভ হইতে পারে না। সেই সাহচর্য্য সদা বর্জ্জনীয়।

আমেরিকা ও চীনের বন্ধুত্বের বাধা

আমেরিকা ও চীনের মধ্যে একটা নবজাত বন্ধুত্বের* কথা সম্প্রতি আলোচিত হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ যাহা দেখা যায় তাহা হইল আমেরিকার দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়া হইতে সকল সৈনিক সরাইয়া লইবার প্রতিশ্রুতি এবং তাহা করা হইলে চীনের প্রসার ও এশিয়ার উপর প্রভুত্বের পথ পূর্ণরূপে খুলিয়া যাইবার আশা। ইহা ব্যতীত যাহা আছে বলিয়া মনে হয় তাহা চীন ও আমেরিকার উভয়েরই রুশিয়ার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব। দুই দেশই মনে মনে চাহেন যাহাতে রুশিয়ার শক্তি লাঘব হয়। রুশিয়াও আমেরিকার বিরোধী এবং চীনের সহিত মিত্রতাবোধের অভাব পোষণ করে। কিন্তু এই সকল অবস্থা থাকিলেই আমেরিকার পক্ষে পুরান শত্রু চীনের বন্ধুত্ব সহজসাধ্য হইয়া যায় না। কারণ মাওবাদী চীন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক আদর্শে কখনও আমেরিকার সহিত শত্রুতা ত্যাগ করিয়া একত্র বাস করিতে পারে না। আমেরিকার পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত চীনের মার্কসবাদ কখনও মিলিত হইতে পারে না। চীনের অন্তরে একান্ত গভীরে সুরক্ষিত মনোভাব

(এরপর ৫৭৬ পাতায়)

বরপণ

সীতা দেবী

সদাশিবের ছেলেবেলাটা বড়ই কষ্টের মধ্যে কেটেছিল। বাপ সামান্য চাকরি করতেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা কোনোদিনই প্রায় পেট ভরে খেতে পেত না। বেশভূষা করা, ভাল ঘরে থাকা, ভাল স্কুলে পড়া বা রোগ হলে চিকিৎসা বা ওষুধ পাওয়া এ সবের কথা তারা ভাবতেই পারত না। স্ত্রী সুরধুনী ভোরবেলা থেকে রাত দশটা অবধি অবিরাম খেটে, ছেলেদুটোকে আর স্বামীকে কোনোমতে একবেলা ভাত আর একবেলা রুটি দিতে পারতেন। নিজে একবেলা ভাতটা খেতেন, উপকরণ হিসেবে থাকত কোনোদিন খানিকটা শাকভাজা, কোনোদিন শুধু নুন আর কাঁচা লঙ্কা। বাকি সময়ে হয় শুকনো মুড়ি নয় কুঁয়োর জল। দুখানি শাড়ীর বেশী তিনখানা কোনো দিন তাঁর জোটেনি, তাও কাচবার সময় বেশী পেতেন না বলে কাপড়গুলো বেশীর ভাগ সময় অত্যন্ত ময়লা হয়ে থাকত। এ হেন সংসারে মানুষ যে ছেলে তার বাল্যকালটা কিছু সুখে কাটেনি, বলাই বাহুল্য। খুব ছোটবেলায়, চিন্তা করার মত সাধ্য হতেই সে স্থির করে রেখেছিল যে কোনোরকমে হোক বড়লোক তাকে হতেই হবে। পাপপুণ্য, ওসব কিছু নয়। যাতে নিজের সুবিধা হয় তাই পুণ্য। যাতে নিজেকে দুর্দ্দশায় পড়তে হয় তাই পাপ। এই নিয়ম মতেই সে জীবনের পথে চলবে ঠিক করল।

খুব ছোটবেলায় ত নিজের মতে কিছু করা সম্ভব নয়? বাবা মা যেভাবে চালালেন তাই তাকে মেনে নিতে হল। তবে জ্ঞানবুদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সব বিষয়ে নিজের মতামত খাটাতে শুরু করল। বাপ তার বেশী লেখাপড়া শেখেন নি, অথচ বেশ ধর্ম্মভীরু মানুষ ছিলেন। এটাকে সদাশিব নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। ভদ্রলোক যদি আবার সততা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাহলে কোনোদিনই তার কিছু হবে না এতো জানা কথা। শহরের যে এতগুলি বড়লোক, তার ভিতর ক'জন সৎপথে থেকে বড়লোক হয়েছে? এক বাপ দাদার সম্পত্তি পায়, সে আলাদা কথা।

ভাইবোনের পাতে ভাল জিনিষ কিছু যদি দৈবাৎ কখনও পড়ত ত সদাশিব তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে নিয়ে খেয়ে নিত। এর জন্য চড়-চাপড় তাকে কম খেতে হত না। ভাই-বোনরাও বেশ করে আঁচড়ে কামড়ে দিত। কিন্তু এতে সদাশিবের স্বভাবের কোনো পরিবর্ত্তন দেখা যেত না। কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়।

কোনোমতে কষ্ট করে তাকে একটা অবৈতনিক স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। সেখানে সদাশিব খুব অল্পদিনেই বেশ নামজাদা ছেলে হয়ে উঠল। পড়াশুনায় যে খুব ভাল হল তা নয়, তবে সর্দ্দারি করতে বেশ পাকা হল। ক্লাসের ছেলেদের বই খাতা পেনসিল চুরি করা, টিফিনের খাবার চুরি করে খেয়ে নেওয়া, অল্প বা বিনা কারণে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করা, সব বিষয়েই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাবা এতে বড়ই

বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। ছেলেকে শাসন করেও কোনো লাভ হয় না। বকুনি সে কানেই তোলে না। মারতে গেলে এক দৌড়ে সে তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে যায়, হয়ত দশ বারো ঘণ্টা আর বাড়ীই আসে না। একমাত্র খাওয়া বন্ধ করলে তাকে একটু কাতর দেখায় তা সে শাস্তিটা মা প্রাণধরে খুব বেশী দিতে পারেন না। একেই ত তাদের আহারের যা দুর্দ্দশা, তাও কি আবার বন্ধ করা চলে? কাজেই সদাশিব নিজের ইচ্ছামতই বাড়তে লাগল। পড়াশুনো একেবারেই যে করত না তা নয়, ভাল করে পাস করতে না পারলেও ক্লাসে সে ঠিকই উঠত। এই রকম করে ক্রমে বছর ষোল সতেরো বয়সে সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে পড়ল।

এর পরেও তার পড়াশুনো হয়ত চলত, কিন্তু ঠিক এই সময় তার বাবা মারা গেলেন। চিরদিনই তাঁরা দরিদ্র ছিলেন, সঞ্চয় কোথাও আধ কানাকড়ি ছিল না, বিধবা সুরধুনী এবার তিন-চারটি সন্তান নিয়ে অকূলে ভাসলেন। ভাঙাচোরা বসতবাড়ীটা ছাড়া তাঁদের আর কিছুই ছিল না। সুরধুনীর বাপের বাড়ীর লোকেরাও বিশেষ অবস্থাপন্ন ছিলেন না। ভাই তবু অনেক পরামর্শ করে ছোট ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে পড়াশুনো করাতে চাইলেন।

কোলের ছেলেটাকে ছেড়ে দিতে সুরধুনী বড়ই কাতর বোধ করতে লাগলেন। তিনি ইতস্ততঃ করছেন দেখে সদাশিব ব্যস্ত হয়ে বলল, "দিয়ে দাও মা, দিয়ে দাও, একটা ছেলে অন্তত মানুষ হোক। আমার ত লেখাপড়া কিছুই হল না, মুটেগিরি করে খেতে হবে। আর তোমার মেয়ে-দুটোরও ত বিয়ে থা কিছুই দিতে পারবে না, ওরাও পরের বাড়ী ঝি-গিরি করে খাবে।"

বোনেরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "তুমি পরের বাড়ীর চাকর হও গিয়ে, আমরা কেন ঝি হব?"

সদাশিব বলল, "দেখা যাক কে কি হয়। এখন খ্যাদাটাকে দাও ত মামার বাড়ী পাঠিয়ে, দুটো খেয়ে বাঁচুক। আমাদের ত এখন একবেলা পান্তা ভাতও জুটবে কি না সন্দেহ।" অতএব খ্যাদা বেচারা কাঁদতে কাঁদতে মামাবাড়ী যাত্রা করল। সুরধুনী উপায় না পেয়ে কাছের এক বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ নিলেন। সারাদিন প্রায় তাঁকে বাইরেই কাটাতে হয়। পনেরো বছরের বিভা এবং তের বছরের শোভা যেমন করে পারে সংসারের কাজ ঠেলতে লাগল। একবেলাই রান্না করত, দুপুরে খেয়ে যা উদ্বৃত্ত থাকত, তাইতেই আধপেটা খেয়ে সকলে শুয়ে পড়ত।

কিন্তু এরও ত খরচ আছে? চাল, ডাল, আটা, তেল, নুনটাও ত কিনতে হয়? কাপড়ও দু-একখানা কিনতে হয়, কারণ সভ্য সমাজে থাকতে হলে কাপড় ছাড়া চলে না। কারো একখানার বেশী আস্ত ধুতি বা শাড়ী নেই। বাইরে বেরোতে হলে তাই পরে, ঘরের ভিতর শতভালি দেওয়া ছেঁড়া কাপড় পরে বা গামছা পরে।

সদাশিব পাগলের মত কাজ খুঁজতে লাগল। যোগ্যতা ত তার বেশী নয়, প্রথম প্রথম কোনো কাজেরই সন্ধান পেল না। ঠিক করল আর কয়েকটা দিন দেখবে, তারপর সোজাপথে রোজগারের পথ না পেলে বাঁকা পথেই যাবে। তাতে তার আপত্তি নেই। ভগবানের বোধহয় ইচ্ছা নয় যে সে সৎপথে থাকে, তা না হলে কোথাও কোনো উপায় করে দিচ্ছেন না কেন? আশে পাশে যে সব লোক নানারকম সন্দেহজনক কাজকর্ম্ম করে, সে তলে তলে তাদের খোঁজ খবর নিতে লাগল।

সদাশিবদের পাড়ায় সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি নীলাম্বর দাস। তাকে ঠিক ভদ্রলোক বলা যায় না। লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি, জাতেও ছোট। কিন্তু টাকার মহিমায় তার পসার প্রতিপত্তি খুব। সে ঠিকাদারের কাজ করে, এতেই নাকি ফুলে ফেঁপে উঠেছে। লোকে অবশ্য বলে, ঠিকাদারের কাজটা নিতান্তই লোক দেখান, তলে তলে তার অন্য অনেকরকম ব্যবসা আছে।

নীলাম্বরের হঠাৎ নজর পড়ল সদাশিবের উপর। তাকে একদিন রাস্তায় দেখতে পেয়ে নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ হে ছোকরা, তুমি নাকি কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছ?"

সদাশিব বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজ আছে নাকি কিছু?"

নীলাম্বর বলল, "আছে ত, তবে করতে পারবে কি না সেটাই দেখতে হবে।"

সদাশিব বলল, "তা, আমার সাধ্যে যদি কুলোয় তবে অবশ্য পারব। লেখাপড়া ত বেশী শিখিনি, ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছি। লেখাপড়ার কাজ নাকি কিছু?"

"না হে না, ওসব নয়। লেখাপড়া নিয়ে আমি কি করব, ঠিকাদার মানুষ। আমার একটা কুলীর সর্দ্দার দরকার। যেটা আছে সেটা বুড়ো হয়ে গেছে, লোক-জনকে শাসনে রাখতে পারে না। আমার একটা শক্ত অল্পবয়সী লোক দরকার। বকাঝকা করতে হবে, মাঝে মাঝে ঘুঁসি চড় চাপড়ও চালাতে হবে, পারবে?"

"আজ্ঞে তা খুব পারব। আধপেটা খেয়ে থাকি তাও আমার সঙ্গে পাড়ার কোনো ছেলে পেরে ওঠে না, পুরো পেট খেতে পেলে আমি যে কোনো বেটাকে তুলে আছাড় দিতে পারি।"

নীলাম্বর দাস বলল, "তোমার বাবা ত এক মহা সাধুব্যক্তি ছিলেন, এটা ভদ্রলোক করে না, ওটা ছোট লোকের কাজ, এ সব বাতিক নেই ত?"

"আজ্ঞে না না, ও সব শুচিবায়ুর আমি ধার ধারি না। বাবা ত রেখে যাবার মধ্যে ঐ সাধুতাই রেখে গেছেন, তা ধুয়ে ত আমি জল খাব না? এমনিতেই আমার বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে না, পয়সা রোজগার আমায় করতেই হবে, যেমন করে হোক।"

নীলাম্বর দাস বলল, "বেশ, বেশ, ঐরকম ছেলেই আমি চাইছিলাম। তা কাল থেকেই তুমি কাজে লাগতে পার। তবে দেখ বাপু, এইরকম কাপড় চোপড়ে ত চলবে না। আমার সব ছোটলোক নিয়ে কারবার। তারা বেশ ফিটফাট কেতাদুরস্ত না হলে ভদ্রলোক বলে মনেই করে না, মানতেই চায় না। আমি আগাম কিছু টাকা দিচ্ছি, কাপড় চোপড় কিছু কিনে নাও, এক জোড়া জুতোও কেন। চুলটা ভাল করে কাটিয়ে নাও।"

সদাশিবের কোনো কিছুতে আপত্তি দেখা গেল না। টাকা নিয়ে সে সোজা দোকানে গিয়ে কাপড় জামা, জুতো কিনল। চুল কাটাল। তারপর বাড়ী গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তনে মন দিল।

শোভা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ সব কোথা থেকে পেলি রে দাদা? কারো পকেট মেরেছিস নাকি?"

সদাশিব বলল, "যা যা, বথামি করতে হবে না। পকেট মারতে যাব কেন? আমি চাকরি পেয়েছি। তারা আগাম টাকা দিয়েছে। এই নে দুটো টাকা রাখ্, ও বেলার জন্যে একটু ভাল তরকারি কি মাছ নিয়ে আসিস্। কুমড়ো সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে ত মুখ পচে গেল।"

সেদিন ঐ অবধিই হল। সুরধুনী রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে মাছের গন্ধ পেয়ে বিধিমত অবাক্ হলেন, তবে ছেলেকে কিছু বললেন না। তারপর দিন থেকে সদাশিব নিয়মমত কাজে বেরোতে আরম্ভ করল।

খাটত প্রায় সারাদিনই। কাজে তার ক্লান্তি ছিল না। মাঝে দুপুরে একবার এসে শুধু খেয়ে যেত। শরীর তার ক্রমেই সবল এবং শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। খেতে এখন ভালই পায়। বোনরা ভাল রান্না করতে পারে না বলে সে জোর করে মাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে আনল। কি দরকার তাঁর চাকরি করবার? সংসার দেখুন তিনি। সদাশিব ত এখন ভালই রোজগার করছে। আর বোন-দুটোকে একটু ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ের চালচলন শেখান। সে-দুটো সারাদিন ছোটলোকের মেয়ের মত পাড়াময় হৈ হৈ করে বেড়ায়, এমন দেখলে কেউ তাদের ঘরে নেবে? ধিঙ্গী হয়ে উঠছে একেবারে। বিয়ে ত দিতে হবে, না চিরকাল পুবড়ী হয়ে বসে থাকবে? সদাশিবকে আজকাল কত লোক চেনে। তাকে ভদ্রসমাজের রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে ত?

কতরকম লোকজনের সঙ্গে তার এখন আলাপ পরিচয়। কেউ ভদ্র, কেউ অভদ্র, কেউ সৎলোক, কেউ তার উল্টো। মনের টানটা সদাশিবের শেষোক্ত দলের প্রতিই, তবু সে সকল জাতের লোকের সঙ্গেই

সদ্ভাব রেখে চলতে চেষ্টা করে। কে কখন কাজে লেগে যায় বলা যায় না ত?

প্রথম বছরটা পেটের ক্ষিদে মেটাতেই তাদের গেল। ভাল খাওয়া যে কাকে বলে জন্মাবধি তারা তা জানতই না। কাজেই বহুদিনের ক্ষিদে তাদের জমা হয়েছিল। ছেলেপিলের চেহারা ফিরে যাচ্ছে দেখে সুরধুনীর আনন্দ হত। নিজে বিধবা মানুষ, মাছ মাংস ত খেতে পারেন না? এ বিষয়ে দুঃখটা তিনি দুধ, ঘি, ফল পাকুড় বেশী করে খেয়ে মেটাতেন। খ্যাদাটার জন্যে নূতন করে তাঁর মন কেমন করত। আহা, সে না-জানি মামার বাড়ী কি খাচ্ছে। তাদেরও ত অবস্থা তেমন ভাল নয়? দু-একবার ক্ষীণ কণ্ঠে তাকে ফিরিয়ে আনার কথা তুলেছিলেন; তা সদাশিব তেমন আমল দেয় নি। বলেছিল, "রোসো, খানিকটা গুছিয়ে নিই আগে, তারপর ওসব খরচ বাড়ান ব্যবস্থা হবে।"

বছর খানিক ভালমন্দ খেয়ে খেয়ে সদাশিবের নিজের চেহারাটা গুণ্ডার মত হয়ে উঠল। উনিশ বছরের ছেলেকে যেন দেখাত পঁচিশ বছরের জোয়ান। কুলী-কামীনদের মহলেও তার বেশ প্রতিপত্তি হয়েছিল। সকলেই তাকে সমীহ করে চলত।

যা হোক খাওয়ার তীব্র ইচ্ছাটা বছর খানিক পরে খানিকটা কমে গেল। তখন সদাশিবের মনে হল, এরপর, অন্য সব দিকে একটু মন দেওয়া দরকার। অন্য দশজনের মত চলতে গেলে প্রথম বসত-বাটীটার ভাল করে সংস্কার প্রয়োজন। মা, বোনদের পোষাক-পরিচ্ছদের বড়ই দুর্গতি। বোনগুলো দেখতে এখন তেমন জরাজীর্ণ নেই বটে, তবে কাপড়-চোপড় বড় গরীবের মত, হাতেও কাঁচের চুড়ি ছাড়া কিছু নেই। বাড়ীতে একখানা চেয়ার শুদ্ধ নেই যে ভদ্রলোক কেউ এলে বসতে দেওয়া যায়। সে কোমর বেঁধে লেগে গেল বাড়ী সারাতে। মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল, "বড়বুড়ী, ছোটবুড়ীকে কিছু ভাল কাপড় জামা কিনে দাও, সামনে পুজো আসছে এখন যেন ওরকম সং সেজে না বেড়ায়। হাজার হোক আমার এখন ভদ্রলোক বলে একটা নামডাক হয়েছে। বাড়ীটা সারান হয়ে যাক, তখন আরো কিছু টাকা তোমায় দিতে পারব, ওদের দুজোড়া রুলী করিয়ে দিও।"

শোভা আর বিভা আড়ালে দাঁড়িয়ে দাদার কথা শুনছিল, সে চলে যেতেই ছুটে এসে ছোঁ মেরে মায়ের হাত থেকে টাকাগুলো কেড়ে নিল। বলল, "কাপড়জামা আমাদের আমরাই পছন্দ করে কিনব। তুমি ত হাল ফ্যাশান কিছু জান না, ঢ্যাবা ঢ্যাবা কস্তা পেড়ে শাড়ী কিনে আনবে। ওরকম শাড়ী নাপতিনী ছাড়া আজকাল কেউ পরে না।"

মা বললেন, "তা, সবগুলো টাকা নিয়ে নিচ্ছিস কেন? আমারও ত সেমিজ শাড়ী দরকার?"

বিভা বলল, "সেও আমরা কিনে দেব। তোমাকে ত সবাই ঠকিয়ে দেবে।"

তারা সত্যিই দেখেশুনে ভাল ভাল কাপড়-জামা কিনে আনল। মায়ের জন্যও সেমিজ শাড়ী কিনে দিল। সদাশিব ঠিকাদারের কাজ করে, কাজেই বাড়ী সারাবার মালমশলা ভালরকমই জোগাড় করল, ভাল মিস্ত্রিও জুটল। বাড়ী দেখতে দেখতে প্রায় নূতন হয়ে গেল। তখন সকলের শোবার তক্তপোশ এল, কাপড়ের আলনা এল। সদাশিবের নিজের ঘরের জন্য একটা ছোট টেবিল আর খান-দুই চেয়ার এল। কিছুদিনের মধ্যে সে নিজের জন্য একটা সাইকেলও কিনে ফেলল।

বিভা শোভা রুলী নিতে রাজী হল না। ও বড় সেকেলে। স্যাকরাকে বলে খুব ভাল পালিশ করে তিনগাছি করে ব্রোঞ্জের চুড়ি করান হল। তাকে খুব করে তালিম দিয়ে দেওয়া হল যেন সে এ কথা আর কাউকে না বলে। কেউ জানতে চাইলে বলবে সোনার চুড়ি। বিভা শোভাও বড় মুখ করে তাই বলে বেড়াতে লাগল। সদাশিব বেশ দুহাতে পয়সা উপার্জ্জন করছে, কাজেই কেউ অবিশ্বাসও করল না।

এরপর সদাশিবের ভাবনা হল যে বোনগুলো বেশ বড় হয়ে গেছে, এখন ওদের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হয়। ওদের বিয়ে না দিয়ে ত আর নিজে বিয়ে করা চলে না?

অথচ সুন্দরী একটি বউ ঘরে আনার সখ তার ষোলআনা। বউ হয় খুব সুন্দরী হবে, নয় বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে হবে। যেমন তেমন বিয়ে সে করবে না। দেখেছে ত মায়ের দশা? ঐ রকম অবস্থা কখনও তার স্ত্রীর হবে, এমন সম্ভাবনাই সে রাখবে না।

খেতে বসে একদিন এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখল যে বোনেরা কেউ ধারে কাছে নেই। বলল, "মা ত বেশ খাচ্ছ, দাচ্ছ, ঘুমোচ্ছ। এদিকে মেয়েদুটোর দিকে ত আর তাকান যায় না। একেবারে ধুমসো হয়ে গেছে। ওদের বিয়ে দিতে হবে না? বি-এ, এম-এ ত পাস করেনি যে মাষ্টারনীগিরি করে খাবে?"

মা বললেন, "তা যা বলেছ বাছা। যতই বলি বারো তের বছর বয়স, লোকে বিশ্বাস করবে কেন? গায়ে গতরে বেড়েও উঠেছে বেশ। বিয়ে দিতে কি আর অসাধ আমার? কিন্তু টাকা কোথায়? মেয়ের বিয়ে কি এমনি এমনি হয়? তায় আবার কালো মেয়ে, লেখা-পড়াও তেমন কিছু শেখেনি। তোকে বলব বলব করি, আবার ভাবি খেতে পরতে দিচ্ছিস এইত ঢের, আবার বোনদের বিয়ের ভারও তোর উপর চাপাব? বাপত কানাকড়িও রেখে যায়নি।"

সদাশিব বলল, "তা ভাবলে আর চলছে কই? সব ভার যখন আমিই বইছি, তখন এই ভারও আমাকে বইতে হবে। আমি পাত্তর দেখি। তাই বলে ভেবো না যেন যে রাজপুত্তুর বর এসে তোমার মেয়ে নিয়ে যাবে। যেমন অবস্থা, সেই মত ব্যবস্থা হবে। তখন যেন আবার নাকে কাঁদতে বোসো না।"

মা বললেন, "আহা, আমি কি চালের ভাত খাই না? ঘটে কোনো বুদ্ধিই নেই? আমার যেমন মেয়ে তেমন ত বর আসবে? নেহাৎ মাতাল দাঁতাল না হয়, দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতে পারে, তাহলেই বর্তে যাব।"

সদাশিব বলল, "বেশ, আমি বলছি সবাইকে। এত চেনাশোনা লোক আছে, একটা বর কি আর জুটবে না।"

পাত্র খোঁজা চলতে লাগল। সদাশিবদের বংশটা ভাল, তবে মেয়েগুলি ত কাল। তার উপর ভাই অল্প দিন হল রোজগার আরম্ভ করেছে, খুব একটা সময় পায়নি টাকা জমাবার। কতই আর সে খরচ করতে পারবে বা চাইবে? সুতরাং বর খোঁজার ব্যাপারটা একটু ঢিমে তেতালায়ই এগোতে লাগল।

দু-একটা সম্বন্ধ আসতে লাগল, তবে তা এমনই, যে, সদাশিব সেগুলি গ্রহণযোগ্য মনে করল না, মায়ের কাছে কিছু বললও না। এদিকে বিভা শোভা খুব প্রসাধনের ঘটা লাগিয়ে দিল, বর খোঁজা হচ্ছে শুনেই।

অনেকদিন কাটল। হঠাৎ একটা সম্বন্ধ সদাশিবের মনে ধরে গেল। এটা হলেও হতে পারে। খুঁৎ অবশ্য অনেক আছে, কিন্তু তাদের দিকেও খুঁতের অভাব নেই।

মাকে গিয়ে বলল, "মা, একটা পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের বিশেষ খাঁই নেই। খুব যে আহা মরি গোছের কিছু তা নয়। মানুষটার বয়স বেশী, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে। তবে স্বাস্থ্য ভাল, শক্ত সমর্থ চেহারা। ব্যবসাদার লোক, খাওয়া-পরার সংস্থান আছে। আগে একবার বিয়ে করেছিল, সে বউ একটা ছেলে রেখে মারা গেছে। সে অনেককালের কথা। এখন আবার বিয়ে করতে চায়, বড়সড় মেয়ে দেখে। বড় বুড়ী ত দেখতে মস্ত, কুড়ি বছর বললেও কেউ অবিশ্বাস করবে না। দেখ ভেবে দেবে কি না।"

সুরধুনী ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "বিভার ত মোটে আঠার বছর বয়স, ঐ মাঝবয়সী বরে দিবি? প্রায় যে বাপ-মেয়ের মত বয়সের তফাৎ? মেয়েটা মনে দুঃখ পাবে না?"

সদাশিব হাত নেড়ে বলল, "তা দুঃখ পেলে আর কি করছি বল? কচি বর কি বিনা পয়সায় পাওয়া যায়? এ লোকটা ত কিছুই চাইছে না, টাকাও না, গহনাও না। বরং বলছে, বউ পছন্দ হলে সে-ই গা সাজিয়ে গহনা দেবে, আলমারি ভর্ত্তি শাড়ী জামা দেবে। মেয়ে তোমার ভালই থাকবে। একটা মোটে ছেলে আছে, সেও বড় হয়ে গেছে, তার পিছনেও কিছু খাটতে হবে না।"

সুরধুনী তবু দোমনা হয়ে রইলেন, দিন-দুইয়ের সময় চাইলেন। কিন্তু দেখা গেল, যার জন্যে মায়ের অত ভাবনা সে একরকম মন স্থির করেই ফেলেছে। দাদার আমলে খাওয়া-পরার দুঃখটা ঘুচেই গিয়েছিল, তবে ইচ্ছামত খরচের উপায় ছিল না। খাটতেও হত খুব, কারণ, দাদা ঝি-চাকর কিছু রেখে দেয়নি। টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে সে আরামে থাকবে, ইচ্ছামত সাজসজ্জা করতে পারবে। মাকে নিজেই মুখ ফুটে বলবে ভাবছে এমন সময় ছোট বোন শোভাই তার হয়ে ওকালতি আরম্ভ করে দিল। বলল, "মা কেন খুঁৎ খুঁৎ করছ বল ত? দিদির বিয়ে ঐখানে দিয়ে দাও। হলোই বা বয়েস বেশী? ছোকরা বর নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? তারা ত জানে শুধু রাতদিন হাড় জ্বালাতে। এখানে বিয়ে হলে দিদি বেশ পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে। কিছু করতে হবে না। দোজবরে স্বামীরা স্ত্রীদের বেশ তোয়াজ করে। দিদির টাকাওয়ালা বরে বিয়ে হলে আমারও ভাল বরে বিয়ে হবে, তোমারও বিপদে আপদে সাহায্য করবার একজন লোক থাকবে।"

মেয়ের বাগ্মিতায় মা একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। কাজেই ঐখানেই বিভার বিয়ে হয়ে গেল। খুব যে ঘটা করে বিয়ে হল তা নয়, তবে একেবারে অশোভন রকম ন্যাড়া-বোঁচা ভাবেও হল না। বিভার জন্যে অল্পদামের হলেও বেনারসী শাড়ী জামা করান হল, অন্য কাপড় চোপড়ও কিছু কিছু হল। এক ছড়া সরু হার আর কানের ফুলও হল। তবে গায়ে হলুদের তত্ত্বেই বর তিন-চারখানা ভারি গহনা পাঠানতে, বিভার গহনার অভাব সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। আত্মীয়স্বজন সবাইকে ডাকা হল, ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও বাদ পড়ল না। মোটামুটি ভাল ভাবেই বিয়ে হয়ে গেল বিভার।

বোনের বিয়ের পর্ব চুকিয়ে সবে সদাশিব নিজের বিয়ের ভাবনা ভাবতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সুরধুনীর শরীরটা কিছুদিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না, মেয়ের বিয়েতে খাটুনিটাও অতিরিক্ত রকম হয়ে থাকবে। হঠাৎ রক্তের চাপ ভয়ানক রকম বেড়ে গিয়ে তিনি একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়লেন। শরীরের বাঁ দিকে খানিকটা পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা গেল।

সদাশিব ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তার সংসার দেখে কে, এবং পীড়িতা মায়ের সেবা শুশ্রূষাই বা করে কে? সে ত বাড়ীতে থাকার সময়ই পায় না। শোভা একলা কতটুকু কাজই বা করতে পারে? সে বিভার মত অত খাটিয়ে স্বভাবেরও নয়, একটু আয়েসী প্রকৃতির। নিতান্ত বিব্রত হয়ে সদাশিব মামার বাড়ীর শরণ নিল, তারা যদি কোনো উপায় করতে পারেন। তাকে যদি বাড়ী বসে মায়ের সেবা করতে হয়, তাহলে ত বাড়ীশুদ্ধ না খেয়ে মরবে।

মামা মামী অনেক ভেবে চিন্তে তার চিঠির উত্তর দিলেন। তাঁদের কারো পক্ষেত ওখানে গিয়ে বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়, নিজেদের ঘর-সংসার, ছেলে-পিলে রয়েছে। খ্যাঁদা যদি মেয়েছেলে হত তাহলে না হয় তাকে পাঠিয়ে দিতেন শোভার সাহায্যের জন্যে। কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছরের বেটা-ছেলে ঘরের কোন্ কাজটাই বা করতে পারবে? বরং ঝঞ্ঝাট বাড়াবে। তাই তাঁরা প্রস্তাব করছেন যে, মামীর দূর সম্পর্কের পিসতুতো বোন মোহিনী আর তার মেয়ে পঙ্কজিনীকে সদাশিবদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এরা অতি দুঃস্থ, প্রায় ভিক্ষে করে দিন চলে। দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল এবং খাটবার ক্ষমতা অসীম। ওদের গ্রাসাচ্ছাদন দিলেই চলবে, মাইনে টাইনে কিছু দিতে হবে না। তারা যেতে রাজীই আছে, সদাশিবের চিঠি পেলেই রওনা হবে।

আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা যখন পাওয়া গেল না, তখন সদাশিবকে রাজী হতেই হল। এখন সম্প্রতি ত একটা সুরাহা হবে, পরে সুবিধে না হয় ত বিদায় করে দিলেই হবে। কিছু ত আর কন্ট্র্যাক্ট লিখে দেওয়া হচ্ছে না?

মোহিনী আর পঙ্কজিনী দুতিন দিনের মধ্যেই এসে উপস্থিত হল। মোহিনীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি

হবে, মোটাসোটা নয়, তবে শক্ত সমর্থ চেহারা, গায়ের রং কাল, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে ময়লা থান ধুতি, তার উপরে একটা ছেঁড়া চাদর জড়ান। পঙ্কজিনীর বয়সও উনিশ কুড়ির কম হবে না। সে মায়ের চেয়েও কাল, মোটাসোটা মজবুৎ চেহারা, সেও আধ-ময়লা শাড়ী পরেছে তবে গায়ে জামা আছে। জিনিষ-পত্রের মধ্যে একটা বড় বিছানার বাণ্ডিল, আর একটা কাঁসার থালা আর ঘটি।

আগন্তুকদের দেখে সদাশিবের মনটা একটু অপ্রসন্ন হয়ে গেল। এ যে দেখি নিতান্তই দুঃস্থ। এদের জন্যে ত কাপড়চোপড় এখনি কিনতে হবে কিছু, নাহলে লোকের সামনে বার করা যাবে না। কত কমে সারতে পারে সদাশিব মনে মনে তার হিসাব করতে লাগল।

শোভা কিন্তু ওদের দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এ ক'দিনের কঠিন পরিশ্রমে সে একেবারে পাগল হয়ে যেতে বসেছিল। সদাশিবকে ডেকে আড়ালে বলল, "এই বেশ হল দাদা। একজন রান্নাবান্না দেখবে আর একজন মাকে দেখবে। আমিও দুটো কথা কয়ে বাঁচব, তুমি বেরিয়ে যেতে আর আমার মুখেও চাবি পড়ত। কি ভয়ে ভয়ে যে দিন কাটত, কি বলব?"

সদাশিব বলল, "তা ত হল, কিন্তু কাপড় চোপড়ের ছিরি দেখেছিস? একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হলে ত এদের হাতে খেতেও রুচবে না।"

শোভা বলল, "মায়ের বাক্সে ত পাঁচ ছ-খানা ধুতি আছে, সেগুলো এখন ব্যবহার হচ্ছে না ত? মা ত চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। এখন তার থেকে খান-দুই বার করে দিই, মা সেরে উঠলে পর তুমি আবার তাঁকে কিনে দিও। আর দিদিও শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় পুরানো কাপড়জামা কয়েকখানা ফেলে গেছে, তার থেকে কিছু দিয়ে দিই পঙ্কজিনী দিদিকে। ব্যস, হয়ে গেল।"

সদাশিব খুশী হয়ে বলল, "তোর কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি আছে বেশ। তাই কর্ তাহলে। স্নান করে ওরা একটু জলটল খাক। তারপর কাজকর্ম দেখিয়ে দে। আমি তাহলে এখন একটু বেরুই, দুপুরে এসে খাব। সময় মত যেতে পারি না বলে লোকগুলো খুব কাজে ফাঁকি দিচ্ছে।"

সদাশিব ত বেরিয়ে গেল। শোভা মনের সুখে গিন্নীপনা করে সব ব্যবস্থা করতে লাগল। নিজে খাটতে তার ভাল লাগে না বটে, তবে পরকে খাটানর কাজটা ভালই করে। কাজেই সদাশিব ফিরে এসে দেখল, মায়ের ঘরটা আর আগের মত এলোমেলো নেই। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সব পাল্টান হয়েছে, অন্য ঘর-দোরগুলোও বেশ ঝাঁটপাট দেওয়া মনে হচ্ছে। মোহিনী পঙ্কজিনী দুজনেই স্নান করে ফরশা কাপড়-জামা পরেছে। রূপসী তারা কেউ নয়, তবে ভদ্রঘরেরই মেয়ে তা এখন বোঝাই যাচ্ছে। খেতে বসে দেখল, রান্নাবান্নাও বেশ ভালই করেছে। সদাশিব একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দিন এরপর একরকম ভাল ভাবেই কাটতে লাগল। সুরধুনী অবশ্য সারলেন না, সারবেন যে এমন কোনো আশ্বাস ডাক্তারেও দিল না। তবে বলল যে, এই-ভাবেই দশ-বিশ বছর বেঁচে যেতে পারেন। সদাশিব বুঝল যে, অতঃপর বাড়ীর কর্তা ও গিন্নী দুইই তাকে হতে হবে। শোভাটা বড়ই ছোট, তাকে দিয়ে গিন্নী-পনা করান যাবে না, তাকে মানবেই বা কে? তার নিজেরই এখন বড়সড় দেখে একটি বিয়ে করা দরকার। কিন্তু যেমন তেমন বউ হলে ত তার চলবে না? তার যেমন আদর্শ তেমনটি চাই। হয় পরমাসুন্দরী মেয়ে, না-হয় ত একেবারে কুবেরনন্দিনী। তলে তলে খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু অমন সাতরাজার ধন এক মানিক কি আর হুট্ করতেই পাওয়া যায়? এর জন্যে সাধনা চাই, সময় চাই। বর হিসাবে সে যে বেশ যোগ্য ব্যক্তি সেটা প্রমাণ না হলে অত ভাল পাত্রী তাকে দিতে যাবে কে? তার লেখাপড়ার যে অভাবটা আছে, সেটা অর্থ আর খ্যাতি দিয়ে পূরণ করতে হবে ত? সে প্রাণপণে খেটে আরো তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার চেষ্টা করতে লাগল।

শোভার দিন ভালই কাটছিল। একটু আধটু কাজকর্ম্ম করে, মায়ের কাছে দুদণ্ড বসে, বাকি সময় পঙ্কজিনীর সঙ্গে গল্প করে বা দিদির বাড়ী বেড়াতে যায়। দিদিও মধ্যে মধ্যে বেড়াতে আসে। বিয়ে করে বিভা মোটামুটি ভালই আছে। কাজকর্ম্ম বেশী কিছু করতে হয় না, ঝি-চাকর আছে। স্বামী বেশীর ভাগ সময়ই ব্যবসার ধান্ধায় ঘোরে, কাজেই তার পরিচর্য্যাতেও বেশী সময় দিতে হয় না। সে খায় দায় ঘুমোয়, পাড়া বেড়ায় বা বাপের বাড়ী যায়। গহনা কাপড় প্রচুর হয়েছে, কাজেই তার মনে কোনো অভাব-বোধ নেই।

মোহিনী আর পঙ্কজিনীর দিন ততটা ভাল কাটে না। এখানে এসে তাদের খাওয়া-পরার কষ্টটা গেছে, কিন্তু তাদের ভবিষ্যতের জন্যে দুশ্চিন্তা ত যায়নি? পঙ্কজিনী লেখাপড়া কিছু শেখেনি। সামান্য বাংলা পড়তে লিখতে জানে। দেখতে একেবারে ভাল নয়, এক কপর্দকেরও সংস্থান নেই। তার কি আর বিয়ে থা কিছু হবে? এরা যখন বিদায় দেবে, তখন তারা যাবেই বা কোথায়?

শোভার জন্যে মাঝে মাঝে নানারকম সম্বন্ধ আসে। পঙ্কজিনী সে সব শোনে, আর তার চোখদুটো থেকে থেকে চক্‌চক্‌ করে ওঠে। মোহিনী শোনেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

একদিন হঠাৎ শোভাকে ধরে বললেন, "তোমাদের বাড়ী এত ঘটক ঘটকী যায় আসে বাছা, আমার মেয়েটার জন্যে একটা সম্বন্ধ জোগাড় করে দিতে পার না? যেমন হোক, একেবারে পথের ভিখিরী না হলেই হল। এখনও গতর খাটিয়ে খাচ্ছে, স্বামীর ঘরেও গতর খাটিয়ে খাবে।"

শোভা বলল, "দাদাকে বলব আমি নিশ্চয়।"

দাদা শুনে হেসে বলল, "আরে দূর্। ওর বিয়ে হওয়া কি সহজ কথা? এক ছালা টাকা দিলে তবে যদি কেউ ফিরে তাকায়। তার চেয়ে ও নার্সিং-টার্সিং শিখুক বরং। সেবা-শুশ্রূষার কাজ ত ভালই পারে। আচ্ছা, তবু আমি বলব একবার ঘটক ঠাকুরকে।"

কথাটা কেমন করে জানি না, পঙ্কজিনীর কানে গেল সে খানিকক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ করে রইল। তারপর এক সময় শোভাকে একলা পেয়ে বলল, "তোমার দাদা কাল কুচ্ছিৎ মানুষদের খুব ঘেন্না করেন, না?"

শোভা বলল, "যাঃ, তা কেন? দাদা নিজেই বা এমন কি ফরশা? মানুষ ত মানুষই, তার আবার শাদা কাল কি?"

পঙ্কজিনী এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

সদাশিব ক'দিন বেশ ভাল মেজাজে ছিল। কয়েকটা কাজে তার আশাতীত লাভ হয়েছে। ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কটা যখনই ভাবে,মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। সে যে এখন নামকরা বড়লোক বলে গণ্য হতে পারে, সেটা লোককে জানান যায় কি করে? বাড়ী ত এখন একটা চলনসই মত রয়েছে, আর একটা এখনই ফেঁদে বসার কোনো মানে হয় না। বিয়ে করে সংসারী হবার পর না-হয় সে-কথা ভাবা যেতে পারে। সম্প্রতি একটা গাড়ী কিনবে বলে ঠিক করেছে। এখন আর সাইকেল চড়ে বেড়ানটা মানায় না। যে কোনো লোকই ত এখন সাইকেল চড়ে। রাধু ধোপার ছেলেও সেদিন একটা সাইকেল চড়ে বেরিয়েছিল। গাড়ী খোঁজ করছে সে। একটি মনের মত সুন্দরী মেয়েরও সন্ধান পেয়েছে সে। কিছুদিন তাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় নূতন গাড়ী চড়ে বেড়াতে হবে, তা না হলে তাকে তারা সম্ভাব্য পাত্র বলে ভাবতে পারবে কেন?

তবে দিন যে নিরবচ্ছিন্ন সুখেই কাটছিল তা নয়। বিভা শ্বশুরবাড়ীর কোন্ এক গ্রামে বেড়াতে গিয়ে শক্ত রকম ম্যালেরিয়া বাধিয়ে এল। বেশ ভুগতে লাগল সে। এদিকে বাড়ীতেও সুরধুনীর অবস্থার কিছু অবনতি ঘটল। তিনি অবশ্য একেবারে সেরে যাবেন

এমন আশা ছেলেমেয়েরা করেনি, তবে এখনও অনেক দিন বাঁচবেন এবং নাতি-নাতনী দেখে যাবেন এ ভরসা তাদের ছিল।

কিন্তু আরো দুর্বিপাক ঘটল। দুপুরবেলা একদিন সদাশিবদের বাড়ীতে হৈ চৈ কান্নাকাটি বেধে গেল। কুলীদের সঙ্গে ঝগড়া বেধে সে একজনকে লাথি মারে। এতে একদল রেগে তাকে আক্রমণ করে। তার মাথা ভয়ানক ফেটে গিয়েছে এবং হাড়গোড়ও ভেঙেছে। অন্য কুলীরা তাকে উদ্ধার করে বাড়ী নিয়ে এসেছে। সদাশিবের জ্ঞান আছে, কিন্তু কাতোরোক্তি করা ছাড়া সে আর কিছু কথা বলছে না।

বিভাদের বাড়ী লোক ছুটল, অন্য একজনকে পাঠান হল ডাক্তার ডাকতে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে শীঘ্রই পাওয়া গেল। বিভা আর তার স্বামীও এসে পৌঁছল অনতিবিলম্বে। সদাশিবের ভগ্নীপতি ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগল, বিভা শোভার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিৎকার কান্না জুড়ে দিল। মোহিনী আর পঙ্কজিনী মাকে আর মেয়েদের নিয়ে হিমশিম খেতে লাগল, কাকে তারা সামলাবে?

ডাক্তার বিভার স্বামীকে বললেন, "দেখুন, এঁর ত ভীষণ loss of blood হয়েছে। খানিকটা রক্ত যদি এখন দেওয়া যায়, তাহলে সেরে ওঠার সম্ভাবনা বেশী, না হলে ব্যাপারটা একটু seriousই হয়ে দাঁড়াবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "তা কাছের কোনও হাসপাতাল থেকে যোগাড় হয় না? পয়সার জন্যে ভাবনা নেই, ইনি বেশ পয়সাওয়ালা লোক।"

ডাক্তার বললেন, "এদিক্‌কার কোনো হাসপাতালে কিছু পাবেন না মশায়। সব জায়গায়ই মহা টানাটানি যাচ্ছে। কত জরুরী operation আটকে যাচ্ছে। বাড়ীর মধ্যে থেকে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে থেকে পেলে খুব ভাল। ভাইবোন কে আছে এঁর?"

"বোন ত দুজন, ভাই একটা আছে বটে, তবে সে বহু দূর দেশে থাকে। বোনদের মধ্যে বড় যে সে ত দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে, তার রক্ত দেওয়া যায় না। ছোটজনকে বলে দেখছি।"

বোনরা পাশের ঘরেই ছিল। বিভার স্বামী গিয়ে কথাটা তোলামাত্র শোভা এক চিৎকার দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল, "বাবা রে! মরে যাব যে!"

সুরধুনী আকারে ইঙ্গিতে অস্পষ্ট ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তাঁর রক্ত দেওয়া হোক।

জামাই বলল, "সে হয়না মা, আপনার রক্তে কোনো কাজ হবে না।"

পঙ্কজিনী এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে একবার নিজের মায়ের দিকে তাকাল,মা কিছুই বললেন না। তখন মাঝের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলল, "আমি রক্ত দিতে পারি। আমার রক্তে কাজ হবে? আমার শরীর বেশ ভাল, কোন অসুখ নেই।"

ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খুব ভালই হবে মনে হচ্ছে, গ্রুপ যদি মেলে আপনি তাহলে তৈরী হোন। কাছেই আমার এক বন্ধুর নার্সিং হোম আছে। আমি সেখান থেকে তোড়জোড় সব আনিয়ে নিচ্ছি।"

বাড়ীর সবাই ত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। মোহিনী ছুটে এসে মেয়েকে নাড়া দিয়ে বললেন, "করছিস কি হতভাগী? আমরা দাসীবৃত্তি করে খাই বলে কি গায়ের রক্তটুকুও দিয়ে দিতে হবে?"

পঙ্কজিনী মাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। বলল, "এমনি এমনি ত দিচ্ছি না, সদাশিববাবুকে কথা দিতে হবে যে সেরে উঠে তিনি আমায় বিয়ে করবেন।"

বিভার স্বামী সদাশিবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলেন দাদা?"

সদাশিবের বুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, কিন্তু জ্ঞান তখনও যায়নি। সে আস্তে আস্তে বলল, "আমার টাকার অভাব নেই; যত টাকা লাগুক তোমরা খুঁজে দেখ আর কাউকে পাও কি না।"

ডাক্তার বললেন, "তা দেখুন মশায়, তাড়াতাড়ি দেখুন। সময় খুব বেশী হাতে নেই কিন্তু। লোক খুঁজে বার করতে হবে, তারপর তাদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে ঠিক গ্রুপের কিনা, তবে ত? আমি একটু ঘুরে আসছি।"

লোক ছুটল চারিদিকে। বাড়ীতে সমানে গোলমাল আর কান্নাকাটি চলতে লাগল। পঙ্কজিনী গোঁজ হয়ে ঘরের এক কোণে বসে রইল, কারো সঙ্গে আর কথাবার্ত্তা বলল না।

ঘণ্টাখানিক পরে যখন ডাক্তারবাবু ফিরে এলেন তখন দেখা গেল, যে, দুজন ছোকরাকে জোগাড় করে আনা হয়েছে। পাড়ারই ছেলে, নিষ্কর্ম্মা আড্ডাবাজ দলের, টাকার অঙ্কটা শুনে চলে এসেছে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকেই বললেন, "এরা নাকি? খুব সুস্থ সবল ত মনে হচ্ছে না? যা হোক, রক্ত পরীক্ষা করে দেখছি।"

সদাশিবের রক্ত পরীক্ষা করা হল। ছেলে দুজনের রক্তও পরীক্ষা করা হল। একেবারে মিলল না। ডাক্তার বললেন, "এঁদের দিয়ে ত হবে না। তাছাড়া যা দেখছি, এঁর গ্রুপের রক্ত পাওয়া খুব শক্ত হবে। সময়ও কিন্তু আর বেশী হাতে নেই। রোগী ক্রমে ভয়ানক দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন।"

সদাশিবের ভগ্নীপতি হতাশ হয়ে বললেন, "অনেক খুঁজেও আর কাউকে এখন পাওয়া গেল না। বাড়ীর ঐ মেয়েটির রক্তই দেখুন।"

পঙ্কজিনী গম্ভীরভাবে এগিয়ে এল। তার রক্ত নেওয়া হল. পরীক্ষা করা হল। ঠিক মিলে গেল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলেন সদাশিববাবু, দেব এঁর রক্ত?"

একটি সুন্দরী কিশোরী মূর্ত্তি যেন সদাশিবের মানস লোক থেকে হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আর তার দেখা পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রাণের দায় যে বড় দায়। সে অস্ফুট স্বরে বলল, "তাই দিন। ওঁর রক্তে শরীর নিয়েই বাঁচব যখন, তখন বিয়ে করতে আর কি আপত্তি?"
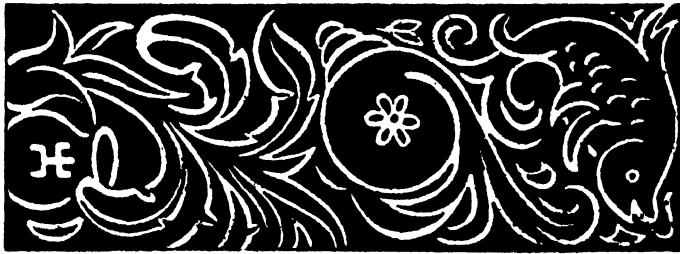
প্রকল্প রূপায়নে বিভক্ত বাংলার বর্ত্তমান চিত্র

চিত্তরঞ্জন দাস

পাক-শাসিত পূর্ব্ব বাংলার সুবিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী, বিগত ২৫শে মার্চ '৭১ থেকে শুরু হয়েছে পশ্চিম পাকিস্থানী বর্ব্বর চমুদের সশস্ত্র আক্রমণ ও কল্পনাতীত নৃশংস অত্যাচার। ইতিমধ্যে বহু লক্ষ গণ-হত্যা, গণ-বিতাড়ন সুপরিকল্পিতভাবেই সংঘটিত হয়েছে এবং প্রতিদিন উহা অপ্রতিহতভাবে চলছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত, এ নারকীয় বীভৎস অনুষ্ঠান অবাধে চলবে।

অত্যাধুনিক বিপুল সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত কুশলী পাক্‌সামরিক বাহিনীর প্রবল ও ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে, পূর্ব্ব-বাংলার বেসামরিক নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার গণপ্রতিরোধ, ফলতঃ বাঙ্গালী হতাহতের সংখ্যাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি করছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যহ সহস্র সহস্র, লক্ষাধিক বললেও হয়ত এখন আর অত্যুক্তি হবে না; নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, অসহায় আতঙ্কগ্রস্থ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ তাদের চির আবাসস্থল পিতৃপুরুষের ভিটেমাটী পরিত্যাগ করে এক বস্ত্রে পূর্ব্ব-বাংলা থেকে দলে দলে অনিশ্চিত আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশায়, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে। বলাবাহুল্য পশ্চিমবঙ্গে সমাগত শরনার্থীর মোট সংখ্যা অদ্যাবধি অর্দ্ধকোটির উর্দ্ধে এবং কোটি পূর্ণ হতে আর অধিক বিলম্ব নেই।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্থানের বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলশ্রুতি পূর্ব্ব-বাংলার শেখ মুজিবুর রহমান পরিচালিত আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতাই উক্ত নৃশংস অত্যাচার ও ব্যাপক হত্যালীলার প্রধান কারণ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্থান সৃষ্ট হওয়ার পর থেকে এযাবৎকাল সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্থানী শাসক-বর্গই পূর্ব্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে অবাধে শাসন ও শোষণ করে আসছে। কিন্তু বিগত নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্থানী কায়েমীচক্র সম্পূর্ণরূপে ঘুরে যাবার ফলে, পূর্ব্ব-বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ আওয়ামীলীগই আইনসঙ্গত ও নীতিগত ভাবে সমগ্র পাকিস্থানের বর্ত্তমান প্রশাসন ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু সেই ন্যায্য অধিকার থেকে যে কোন উপায়ে তাদের বঞ্চিত করতে না পারলে, কিম্বা আওয়ামীলীগ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে, পশ্চিম পাকিস্থানী শাসকবর্গের আর কোন কর্তৃত্বই থাকবে না এবং স্বভাবতই তাদের কায়েমী স্বার্থ সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট হবে। এমতাবস্থায় পাকিস্থানের জঙ্গীলাট ইয়াহিয়াকে হ'তে হ'ল এক গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।" একদিকে যেমন সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনগণের রায়, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্থানীদের কায়েমী স্বার্থ। একদিকে গণতন্ত্র, অন্যদিকে স্বৈরতন্ত্র। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত স্বৈরাচারী শাসক ইয়াহিয়া নিজ তন্ত্র গ্রহণ করেই, পূর্ব্ব-বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ বাঙ্গালী ধ্বংসের প্রকল্প রূপায়ণে ব্রতী হয়েছে। কারণ একমাত্র বাঙ্গালী নিধন ভিন্ন পশ্চিম পাকিস্থানীদের পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে কায়েমী শাসন ক্ষমতা দখলে রাখবার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। তাই পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানী বর্ব্বর জঙ্গীশাহীদের বর্ত্তমান সশস্ত্র অভিযান, ব্যাপক আক্রমণ ও নৃশংস গণ-হত্যা এবং গণ-বিতাড়ন সুপরিকল্পিতভাবেই চলছে। সুতরাং যতদিন না প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণ সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন এ নারকীয় বীভৎস চিত্র সেখানে প্রদর্শিত হবে।

বলাবাহুল্য গণতান্ত্রিক সংবিধানে পাকিস্থান কোন দিনই বিশ্বাসী নয় অথবা ন্যায় অন্যায়, আইনকানুনের ধার তারা ধারে না। নইলে পাকিস্থান সৃষ্ট হবার মাত্র

ন'বছরের মধ্যে এগারজন প্রধান মন্ত্রীর উত্থান পতনের বিচিত্র ইতিহাস কখনও সৃষ্ট হত না। স্বৈরাচারই তাদের একমাত্র গ্রহণযোগ্য তন্ত্র এবং সে তন্ত্র প্রয়োগের ফলে ১৯৬৫ সাল থেকে এযাবৎকাল পাকিস্থানের বে-আইনী স্বৈরাচারী সামরিক শাসনই চলে আসছে। সুতরাং তাদের নিকট ন্যায়-নীতি, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য বলে কিছুই নেই। ক্ষমতার লোভে তারা এত উন্মত্ত যে আত্মীয় অনাত্মীয় স্বধর্মী বিধর্মী প্রয়োজনবোধে সকলেই হয় তাদের হিংসার বলি। নৃশংস নরহত্যায় তারা যে কত সিদ্ধহস্ত, ভারতে মুসলমান শাসনের ইতিহাস দৃষ্টেই তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য বিগত ২৫শে মার্চ থেকে অদ্যাবধি পশ্চিম পাকিস্থানী বর্ব্বরদের অভূতপূর্ব্ব নৃশংস হত্যালীলা ও পোড়ামাটী নীতির বাস্তব রূপায়ণে, পূর্ব্ব-বাংলার জনবহুল সুদৃশ্য সহর; বন্দর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ বহু পল্লীঅঞ্চল সম্পূর্ণ-রূপে বিধ্বস্ত। জনমানবহীন শকুনী গৃধিনী শৃগালের বিলাস প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথের সোনার বাংলা প্রকৃতপক্ষে আজ শ্মশানে।

প্রকল্পের মূল-সূত্র

প্রসঙ্গক্রমে বিগত যুগের একখানি মঞ্চ সফল ঐতিহাসিক নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য সংলাপ এখানে লিপিবদ্ধ করছি:—"আজও বাংলাকে শকুনী, গৃধিনী, শৃগালের বিলাস কাননে পরিণত করতে পার নি? এখনও রক্তের নদী কঙ্কালের পাহাড় তৈরী হয় নি? আজও এই অভিশপ্ত দেশটাকে ভেঙ্গে চুরে সাগরে বিলীন করতে পার নি? কি করেছ সব অপদার্থ মূর্খের দল?" ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দীর শাসনকালে বঙ্গদেশ কুখ্যাত বর্গীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। ইতিহাস তার সাক্ষী। তদ্ভিন্ন তৎকালীন রচিত বহু ছড়া এখনও বাংলাদেশের সহর ও পল্লী অঞ্চলের অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোকের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। যথা:—

"কি হবে গো, কোথা যাবে গো, বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে।"
ইত্যাদি—

সুতরাং বর্গীরা তখন বাংলা ও বাঙ্গালীর উপর কী প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, যার স্মৃতি এই সুদীর্ঘ দু'শ আড়াই'শ বছরেও বাঙ্গালীর মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি, সহজেই তা অনুমেয়। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত অত্যাচারী অভিযাত্রী বর্গী বাহিনী বিদেশী নয়, খাঁটি স্বদেশী, মহারাষ্ট্র নিবাসী ভারতবাসী। বাংলা ধ্বংসের মহান পরিকল্পনা করেই বর্গীনেতা ভাস্কর পণ্ডিত সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে বঙ্গদেশে নিষ্ঠুর অভিযান চালিয়ে, বাংলার অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সংলাপটি ছিল মারাঠা সৈনিকদের প্রতি পণ্ডিতজীর খেদোক্তি। সুতরাং বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রতি অবাঙ্গালীর কত গভীর প্রেম, মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিতের বঙ্গাভিযান ও বঙ্গধ্বংসের রূপায়নই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলা কঠিন। তবে বাংলা ধ্বংসের গৌরব নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা আর পণ্ডিতজীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ বর্গীর নৃশংস অত্যাচারে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবার পূর্ব্বে তিনি নিজেই ধ্বংস হলেন। সুতরাং তার সুমহান প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ তখনকার মত অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

বৃটিশ শাসন

অতঃপর প্রায় দু'শ বছর ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েম ছিল। উক্ত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এত অধিক সংখ্যক মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসেও তার দৃষ্টান্ত বিরল। বলাবাহুল্য বাংলার উক্ত মনীষীদের অসাধারণ প্রতিভা এবং সার্থক প্রচেষ্টা দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল তখন বাংলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে ক্রমশঃ সমগ্র দেশের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া। মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি সর্ব্ব বিষয়ে বাংলা ও বাঙ্গালী ছিল অগ্রণী। বহির্বঙ্গের

মনীষীরাও অনেকে উহা স্বীকার করেছেন। যেমন স্বর্গত গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে একদা বলেছিলেন :—"what Bengal thinks to-day, the rest of India will think to-morrow." প্রখ্যাত নেতার এ হেন সত্য ও স্বাভাবিক উক্তি তৎকালীন বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ! কিন্তু পরবর্তীকালে উহাই অর্থাৎ উক্ত গৌরব এবং শ্রেষ্ঠত্বই হ'ল বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির অভাবনীয় পতনের মূল কারণ বা মহাকাল।

বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী

একে অপরের, এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের কিম্বা এক জাতি অপর জাতির উন্নতি বা শ্রেষ্ঠত্ব কায়মনোবাক্যে কখনও কামনা অথবা স্বীকার করে না, করতে পারে না। ইহা মানুষের সহজাত প্রকৃতি। অতি অল্পক্ষেত্রেই উহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সুতরাং সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙ্গালীর অনস্বীকার্য্য গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমশঃ হয়ে উঠল অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের নিকট অত্যন্ত অসহনীয় ও ইর্ষার কারণ। এবং একমাত্র উক্ত কারণেই কালক্রমে সৃষ্ট হ'ল বাঙ্গালীর প্রতি অবাঙ্গালীর একটা প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাব। ফলে বাঙ্গালী হ'ল প্রায় সর্ব্বত্রই অবাঞ্ছিত। অবশ্য ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার অবিসম্বাদী সুমহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যতদিন সক্রিয় ছিলেন এবং লোকান্তরিত হন নি, ততদিন অবাঙ্গীর উক্ত বিরুদ্ধ মনোভাব অথবা কার্য্যকলাপ যতই প্রতিক্রিয়াশীল হোক না কেন, একমাত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ভিন্ন, অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারে নি। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে, উহা সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বাঙ্গালীকে করল সম্পূর্ণরূপে কোন ঠাঁসা। যার ফলে বাংলার নেতৃবৃন্দ এমন কি দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ. অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। সুতরাং নিখিল ভারত কংগ্রেস থেকে বাংলার সুযোগ্য নেতৃবৃন্দের প্রকারান্তরে অপসারণ এবং বাঙ্গালাদেশের যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের অভাবেই সম্ভব হয়েছিল অবাঙ্গালী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পক্ষে বাংলা ধ্বংসের মহাকাল সদৃশ বঙ্গবিভাগ করে কুচক্রী বৃটিশ প্রদত্ত স্বাধীনতা গ্রহণ করা। বাংলাদেশের বর্ত্তমান চিত্রই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রতি অবাঙ্গালীর প্রকৃত মনোভাবের ইহাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বাংলার হিন্দু মুসলীম ঐক্য

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে খুব যে একটা ঐক্য বা প্রীতির সম্পর্ক ছিল, এরূপ ধারণা করবার বিশেষ কোন হেতু নেই। আবার সর্ব্বত্রই যে একটা কায়েমী বিবাদ বিদ্যমান ছিল, সেরূপ ধারণা করাও ভুল। সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হ'য়েছে সত্য, কিন্তু উহা ছিল সম্পূর্ণ অস্থায়ী। উভয় সম্প্রদায়ের গণ-শক্তি সমান থাকায় উক্ত হাঙ্গামার ক্ষয়ক্ষতি প্রায় উভয়েরই সমান হো'ত। আবার যথাসময়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসত। কিন্তু যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ স্বার্থ নিহিত ছিল, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐক্য এবং সম্প্রীতির ভাব দৃষ্ট হ'য়েছে। যেমন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা কায়েমী বিভেদ তথা বিবাদ সৃষ্টি করবার জন্য ১৯০৫ সালে করেছিল বঙ্গভঙ্গ। উক্ত বিভাগ যে গোটা বাঙ্গালী জাতির স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এ অতি সত্য এবং সহজ বিষয়টি তৎকালীন বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মনেপ্রাণে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং গণসংগ্রামের ফলে একক বাঙ্গালীর পক্ষেই সম্ভব হ'য়েছিল তখন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সরকার পরিকল্পিত উক্ত ভেদনীতির অতীব ঘৃণ্য চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করা। বলাবাহুল্য যথাসময়ে বৃটিশকে করতে হয়েছিল উক্ত বাঙ্গালীজাতি বিধ্বংসী বঙ্গবিভাগ রদ্।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রকৃতপক্ষে উক্ত বঙ্গভঙ্গের সূত্রপাত থেকেই শুরু

হয়েছিল বাংলাদেশে বৃটিশ বিরোধী গণ-বিক্ষোভ, গণআন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ক্রমশঃ উহা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের কঠোর দমন-নীতির ফলে তখনও বাংলার বহু অমূল্য জীবন বিনষ্ট হ'য়েছে। কিন্তু তৎসত্বেও বাঙ্গালীর মনোবল ছিল অটুট এবং অদম্য ঐক্যবদ্ধ বাঙ্গালীর নিকট শেষ পর্য্যন্ত নতি স্বীকার করেই বৃটিশকে করতে হ'য়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদ্। সুতরাং বাংলার তৎকালীন হিন্দু মুসলীম ঐক্যবদ্ধ প্রবল শক্তির নিকট বৃটিশের পরাজয়ের গ্লানি বৃটিশ কখনও ভোলেনি বা ভুলতে পারে না। তাই সে শক্তি খর্ব কিম্বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করবার জন্য তারা ছিল সদা সচেষ্ট এবং ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সেই সুযোগ গ্রহণ করল, ভারতের তৎকালীন প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের নিকট স্বাধীনতা প্রদানের মূল সর্ত্ত স্বরূপ মহাকাল দেশ বিভাগের কথা উত্থাপন করে। যদিও তৎপূর্ব্বে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে দেশ বিভাগের কোন উল্লেখ ছিল না এবং উহা কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা, মহাত্মা গান্ধী এমন কি মিঃ জিন্নাও মানতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কতিপয় নেতার আপত্তি থাকায়, উক্ত প্রস্তাব তখন গৃহীত হয়নি। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক স্বাধীনতার পরবর্ত্তী প্রস্তাবে দেশ বিভাগের সর্ত্ত প্রযুক্ত হয়েছিল। বলাবাহুল্য দেশ বিভাগের প্রস্তাবে অধিকাংশ স্থলেই বিরুদ্ধ মত ও গণবিক্ষোভ দৃষ্ট হ'য়েছে। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও ছিলেন উক্ত প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়েই দেশ বিভাগ একমাত্র সম্ভব। তদ্ভিন্ন বাংলার জননেতা স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু এবং শহীদ সুরাবর্দ্দীও উহার প্রবল বিরোধীতা করেছিলেন। অবশ্য মহাত্মা গান্ধী শেষ পর্য্যন্ত নেতৃবৃন্দের চাপে বাধ্য হয়েছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাবও সমর্থন করতে। সুতরাং তখন আর কংগ্রেসের পক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধার কারণ ছিল না মহাকাল দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যাহার ফলে হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ তদবধি হয়ে গেল ঘনকৃষ্ণ মেঘাবৃত।

দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি

দেশ বিভাগের ফলে মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব ও বাংলাদেশেরই যে সর্ব্বাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল থাকা সত্বেও একমাত্র দেশের প্রশাসন ক্ষমতা দখলের লোভে নেতৃবৃন্দ উক্ত ধ্বংসাত্মক সর্ত্ত বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়ে সানন্দে গ্রহণ করলেন বৃটিশ প্রদত্ত স্বাধীনতা, যা ভারতবাসীকে নিঃসর্ত্ত অর্পণ করা ভিন্ন বৃটিশের আর তখন গত্যন্তর ছিল না। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুরারোগ্য ক্ষত বৃটিশকে করেছিল তখন বিশেষভাবে জর্জ্জরিত। তদ্ভিন্ন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাংশের উপর বাংলার গৌরব সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন অবিসম্বাদি নেতৃত্ব ও অসীম প্রভাব এবং তৎসঙ্গে বোম্বাইয়ে প্রবল নৌ-বিদ্রোহ বৃটিশকে করেছিল তখন সম্পূর্ণরূপে সন্ত্রস্ত। তাই যত শীঘ্র সম্ভব ভারতের প্রশাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের নিমিত্ত তারা ছিল তখন অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। সুতরাং দেশ বিভাগের প্রস্তাব তখন নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হ'লেও হয়ত তৎকালীন দেউলিয়া বৃটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব হ'ত না আর দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ শাসন করা। কিন্তু অদূরদর্শী নেতৃবৃন্দ তখন এত অধিক ক্ষমতা লোলুপ হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁরা আর কোন মতেই সে অপূর্ব্ব সুযোগ হারাতে চাইলেন না এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরই ভুলে সম্ভব হয়েছিল তখন সুচতুর ইংরেজের পক্ষে ভারত বিভাগ করে দুটি পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র গঠন করা। যথা:—ভারত ও পাকিস্থান। বলাবাহুল্য দেশ বিভাগ করে যে বিষবৃক্ষ বৃটিশ এদেশে রোপণ করেছিল, তার বিষাক্ত ফল ভারত ও পাকিস্থানের অধিবাসী এই সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর যাবৎ একাদিক্রমে ভোগ করে আসছে। সুতরাং উক্ত বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত না হলে, একমাত্র ধ্বংসই হবে দেশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

স্বাধীনোত্তর ভারতের পরিস্থিতি

মহাকাল দেশ বিভাগের ফলে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ যখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমানের তাজা রক্তে প্লাবিত, দিল্লীর মস্‌নদ তখন স্বাধীনতার বিজয়োৎসবের আলোক মালায় সুসজ্জিত। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে যখন সর্ব্বহারার কাতর ক্রন্দনের রোল আকাশে বাতাসে সমুত্থিত, অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ তখন আনন্দোৎসবে মত্ত।

দু'টি প্রদেশের কোটি কোটি অধিবাসী হ'য়ে গেল ছিন্নমূল, বাস্তুহারার, সর্ব্বহারার; অন্য প্রদেশে প্রবাহিত হচ্ছে তখন আনন্দের ফল্গুধারা। উদ্বাস্তু পাঞ্জাবীদের জীবন মরণ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তখন নবগঠিত ভারত সরকারের উপর প্রচণ্ড চাপের ফলে। কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতির কোন সমস্যারই সমাধান হ'ল না এই সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরে। ফলে বাঙ্গালী অদ্যাবধি পারল না বৃটিশ প্রদত্ত স্বাধীনতার সুখ কিম্বা প্রকৃত মর্ম্ম বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের পথে যে অন্তরায় জনসাধারণ কথনও কল্পনাও করেনি, আজ স্বাধীন ভারতে সে সমস্ত অন্তরায়ের অন্ত নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বাধীন কিনা, এ প্রশ্ন অন্য প্রদেশের অধিবাসীগণের নিকট অবাস্তব অথবা মূল্যহীন হলেও, বাংলাদেশের মানুষের উহা অন্তরের কথা। এ যেন রূপকথার রাজা বদলের উপাখ্যানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ব্ব-বাংলার বর্ত্তমান চিত্রই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রাদেশিকতা

প্রাদেশিকতা দোষে বাঙালী দুষ্ট, এ খ্যাতি বা অখ্যাতি তার চিরদিনই আছে। সুতরাং বাংলার কথা, বাঙ্গালীর সমস্যা কোনদিনই অবাঙ্গালীর নিকট বিশেষ গুরুত্ব লাভে সমর্থ হয় না। এমন কি রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়েও আমাদের বর্ত্তমান দণ্ডমুণ্ডের মালিক রাজ্যের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের নিকট পশ্চিম বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব ও আচরণের কথা বহুবার বহুক্ষেত্রে শুনেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী যদি বাস্তবিকই প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হ'ত তাহলে বর্ত্তমান কোটি কোটি অবাঙ্গালীর পক্ষে কথনও সম্ভব হত না পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীর সঙ্গে এরূপ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা। তদ্ভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য কিম্বা চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অন্যান্য প্রদেশে উল্লেখযোগ্য কোন সুযোগ পায় না, অথচ পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার বাঙ্গালী থাকা সত্ত্বেও, এখানে অবাঙ্গালীর সে সুযোগের কোন অভাব হয় না। পশ্চিম বাংলার কলকারখানা, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে লোকসংখ্যার অনুপাতে বাঙ্গালীর চেয়ে অবাঙ্গীর সংখ্যা কোন অংশে কম নয় সুতরাং উহা বাঙ্গালীর প্রাদেশিকতা নয়, প্রকৃতপক্ষে উদারতারই পরিচায়ক। বরং ইতিপূর্ব্বে "বাঙ্গালী খেদা" আন্দোলন অনেক প্রদেশেই হয়েছে এবং পাইকারী হারে বাঙ্গালী বিতাড়িতও হয়েছে। কিন্তু স্মরণকালের মধ্যে পশ্চিম বাংলার অনুরূপ কোন দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি দৃষ্ট হয়নি। তবে বাংলাদেশ বাঙ্গালীর জন্মভূমি—স্বর্গাদপী গরীয়সী। সুতরাং সেই জন্মভূমির স্বার্থ এবং গৌরব রক্ষা করা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অবশ্য কর্ত্তব্য.........এবং সে কর্ত্তব্য পালনে যদি অপরের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, সে ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর উপর প্রাদেশিকতার দোষারোপ করা অবাঙ্গালীর পক্ষে অতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেয়।

দেশ এবং স্বাধীনতা

দেশ কিম্বা স্বাধীনতা কারোর পৈত্রিক অথবা ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, সকলেরই সমান অধিকার। সুতরাং সব মানুষের জন্যই সমবণ্টন ও সমব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যেখানেই ঘটে তার বৈষম্য, সেখানেই সৃষ্টি হয় নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও অসন্তোষ। স্বাধীনতার সর্ব্বসুখ একজন করবেন ভোগ এবং অপরকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত রেখে তার উপর করবেন প্রভুত্ব অথবা উপর সত্ত্বভোগী এক প্রদেশ শাসনের নামে অন্যপ্রদেশকে করবে সর্ব্বতোভাবে শোষণ, এ দুর্নীতি

যা চক্রান্ত দীর্ঘকাল চলতে পারে না। শোষিত মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ জেগে ওঠে বিদ্রোহের প্রবল মনোভাব এবং শুরু হয় তখন সর্ব্বাত্মক বৈপ্লবিক কর্মধারা যার ফল হয় অত্যন্ত বিষময়। পূর্ব্ব বাংলার বর্ত্তমান চিত্রই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

স্বাধীনতার পরবর্তী চিত্র

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণার পর নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা যথাক্রমে দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দল অর্থাৎ কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের হস্তে অর্পিত হ'ল। উভয় রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ সর্ববিধ রাজকীয় সুখ ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে, প্রকৃতপক্ষে ভুলে গেলেন দেশ এবং জাতির প্রতি তাঁদের সুমহান কর্ত্তব্য। এমনকি যারা একসময়ে বলতেন—"আরাম হারাম হ্যায়", পরবর্তী কালে দেখা গেল একমাত্র আরামই তাঁদের কায়েমী ব্যায়ারাম। ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থ-কায়েমের নিমিত্ত নির্দ্ধারণ করলেন বহুবিধ নীতি। তন্মধ্যে কন্ট্রোল, লাইসেন্স, পারমিট, কন্ট্রাক্ট প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যার ফলে সৃষ্ট হয়েছে দেশব্যাপী কুখ্যাত কালোবাজার, ভেজাল, ঘুষ, চুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি যাবতীয় সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ। উন্নয়নের নামে পরপর কয়েকটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপচয় করেছেন বিভিন্ন দেশ থেকে ঋণার্জিত সহস্র সহস্র কোটি টাকা। সরকারী নীতির ফলেই দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিদের বিত্তসম্পদ হয়েছে শত সহস্রগুণে বর্দ্ধিত। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ক্রমশঃ হয়েছে হাঁড়ির হাল। বিদেশী মুদ্রার্জনের নিমিত্ত অসংখ্য দেশবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় স্বদেশজাত খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে যাবতীয় পণ্যসামগ্রী এমনকি মাথার চুল পর্য্যন্ত বিদেশে রপ্তানীর ফলে ক্রমশঃ সৃষ্টি হয়েছে দেশে প্রায় সর্ব্বাধিক জিনিষেরই দারুণ অভাব। সুতরাং চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ক্ষেত্রে যেখানে বিরাট ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা কখনও সম্ভব নয়। এতদ্ভিন্ন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের চাবিকাটী প্রকৃতপক্ষে যাদের হাতে, সেই উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ীগণই যদি হয় অসৎ এবং দুর্নীতিপরায়ণ, তা'হলে তারা যে অধিক লাভের আশায়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, ক্রমবর্দ্ধমান উচ্চমূল্যে সরবরাহ দ্বারা সাধারণ মানুষকে সর্ব্বোতভাবে শোষণ করবেন, ইহা অতি সত্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন সরকারী দুর্বল নীতির ফলে কর্মীদের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী মেটাতে যে পরিমাণ অর্থেরই প্রয়োজন হোক না কেন, সরকার উহা নানাভাবে করের বোঝা চাপিয়ে দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকেই আদায় করে থাকেন। কিন্তু উহার ফলে ধনীদের বিশেষ অসুবিধা না হলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণকে ভোগ করতে হয় অশেষ দুর্গতি। সুতরাং ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অস্বাভাবিক সরকারী কর বৃদ্ধির চাপে সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা, সর্ব্বহারা, দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষণে সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত; প্রাক্ নির্বাচনী ভাষণদানকালে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে যে একটি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন অর্থাৎ শ্রীমতীর "গরীবী হঠাও" ঘোষণাই দেশের চরম দারিদ্রের শ্রেষ্ঠ নজীর। অবশ্য গরীব হঠান যত সহজ, গরীবী হঠান তত কঠিন। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধী প্রকৃতপক্ষে কোনটা যে হটাবেন, তা একমাত্র তিনি কিম্বা তাঁর সহকর্মীরাই জানেন। তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেট দৃষ্টে মনে হয়, তিনি সহজ পন্থাটিই অবলম্বন করবেন, তার কারণ উক্ত বাজেটে বর্দ্ধিত করের আওতা থেকে গরীবরাও নিস্কৃতি পায় নি।

সরকারী শিল্প প্রকল্প

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং স্বাধীনোত্তর ভারতে সর্ব্বাগ্রে কৃষি উন্নয়ন-প্রকল্প রূপায়নই ছিল বাঞ্ছনীয়। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভারতের পক্ষে কৃষি উন্নয়নই ছিল অতীব সহজ। প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও বন্টন কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হওয়ার পর উচিৎ

ছিল শিল্প কিম্বা অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে অগ্রসর হওয়া। তাহ'লে দেশের এই বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি কখনও সৃষ্ট হত না। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতের কর্ণধার হলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, যাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার সব কিছুই ছিল পাশ্চাত্য জগতের। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্তু জ্ঞানাবধি পাশ্চাত্য দেশে বাস করবার ফলে সেখানকার সভ্যতা ও ভাবধারা ছিল পণ্ডিত নেহেরুর মজ্জাগত। সুতরাং স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষকে রাতারাতি পাশ্চাত্যদেশের সমতুল্য করে তোলবার জন্য, তিনি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করলেন শিল্প প্রকল্প। কিন্তু তিনি সম্ভবত তখন একথা একবারও চিন্তা করেননি যে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে, পাশ্চাত্য দেশগুলি শিল্প ক্ষেত্রে তখন যথেষ্ট উন্নত। সুতরাং ভারতের পক্ষে কখনও সম্ভব নয় শিল্প প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য দেশের সমতুল্য কিম্বা কাছাকাছিও অগ্রসর হওয়া। ভারতীয় শিল্পোৎপাদিত পণ্য দ্রব্যের চাহিদা বিদেশের বাজারে সৃষ্টি করা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। কারণ উন্নত দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও অনুন্নত দেশের তুলনায় অধিকতর উন্নত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ভারত যতদিনে উক্ত সর্ব্বোন্নত দ্রব্যোৎপাদনে সমর্থ হবে, ততদিনে উক্ত দেশগুলির দ্রব্য-সম্ভার সে তুলনায় সর্ব্বাধিক উন্নততর হবে। অতএব শিল্প প্রকল্প রূপায়নে অগ্রাধিকার প্রদান ভারতের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের আশা পরিত্যাগ করে যদি ভারত উক্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হতে পারে, উহা দেশের পক্ষে কল্যানকর, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি ভারতীয় দ্রব্যের মুল্যাধিক্য বিবেচিত হয়, তা হ'লে শিল্পক্ষেত্রেও স্বয়ম্ভর হওয়া কখনও সম্ভব নয়।

শিল্প প্রকল্প রূপায়নে এযাবৎকাল ভারতের অগ্রগতি সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক। অদ্যাবধি যে পরিমাণ ঋণার্জ্জিত অর্থের অপচয় হয়েছে, সে তুলনায় শিল্পোন্নতি কোন দিক থেকেই সন্তোষজনক হয় নি। সরকারী প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'য়েছে। ফলে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী সম্পূর্ণরূপে করেছে বিক্ষুব্ধ দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবকদের। সুতরাং অধিকাংশ যুবকই হ'য়ে পড়েছে আজ সর্ব্বতোভাবে সমাজ বিরোধী।

সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মুষ্টিমেয় শিল্প সংস্থার কার্য্যক্রম সম্বন্ধে বিশেষ কোন সমালোচনা না করেও একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে দীর্ঘকাল প্রচলিত দেশের উল্লেখযোগ্য লাভজনক বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যথা জীবনবীমা, সাধারণ বীমা, ব্যাঙ্ক, পরিবহন প্রভৃতি ক্রমশঃ রাষ্ট্রায়াত্ব করে অযোগী পরিচালনার ফলে, সরকার শুধু লোকসানের মাত্রাই বৃদ্ধি করছেন। পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন সংস্থাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেসরকারী পরিবহন প্রতিষ্ঠান যেখানে জনবহুল সহর ও সহরতলীতে উক্ত ব্যবসার দ্বারা প্রচুর পরিমানে লভ্যাংশ অর্জন করে, সেখানে সরকার পরিচালিত পরিবহন সংস্থা অর্থাৎ বাস, ট্রাম প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসানের মাত্রা বৃদ্ধি করে। সুতরাং উহা কি সরকারের অযোগ্য পরিচালনার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

সরকার ও কর্মী বিক্ষোভ

সরকারী সংস্থার কর্মী বিক্ষোভ এবং বিবিধ দাবী দাওয়ার দৈনন্দিন কর্মসূচী তো লেগেই আছে। তাতে যে শুধু সরকারই বিব্রত বোধ করছেন, এমন নয়, সাধারণ মানুষের নিকটও উহা অত্যন্ত বিরক্তিকর। কারণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও গগনস্পর্শী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চাপে মানুষ একেবারেই দিশেহারা। দৈনন্দিন রোজি-রোজগারের নিমিত্ত অত্যন্ত উদ্বেগ সহকারেই কাটাতে হয় অধিকাংশ সময় গৃহের বাইরে। সেখানে যদি প্রতিনিয়ত কর্মীবিক্ষোভ, প্রতিরোধ, বন্ধ, নরহত্যা প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহ'লে মানুষকে বাধ্য হয়ে সময় কাটাতে হয় সগৃহে আবদ্ধ থেকে, অত্যন্ত অসহনীয় অবস্থায়ে কেবলমাত্র হরিমটরের উপর নির্ভর করে। রোজি-রোজগারের পথও হয়ে যায় সম্পূর্ণ বন্ধ।

একদিকে যেমন সরকারী ঠাট কিম্বা কাঠামোর অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য সরকার ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক বাধ্য হচ্ছেন কর্মীদের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী মেটাতে, অন্যদিকে তেমন কর্মীবৃন্দও সরকারের দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাঁকি দিচ্ছেন এমন কি তাদের আংশিক কর্ত্তব্য পালনে। সুতরাং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের যন্ত্রী অর্থাৎ কর্মীবৃন্দই যেখানে কর্ত্তব্যবিমুখ ও প্রতিক্রিয়াশীল, সেখানে সে যন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই সরকারী দুর্বল নীতি ও ক্রমবর্দ্ধমান প্রশাসনিক ব্যর্থতাই সৃষ্টিকরেছে আজকের এই ব্যাপক গণবিক্ষোভ, গণ উন্মাদনা, হিংস্রতা, উশৃঙ্খলতা, অরাজকতা প্রভৃতি যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ। সুতরাং যতদিন না বিকলাঙ্গ প্রশাসন যন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে, ততদিন আয়ারাম গয়ারাম কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব হবে না যোগ্য প্রশাসন পরিচালনা করা।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

অবশ্য উপরোক্ত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সব কিছুর মূলেই যে রয়েছে বর্তমান পরস্পর বিরোধী স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলির অতি ঘৃণ্য চক্রান্ত ও বিপুল প্রভাব ইহা একেবারেই অনস্বীকার্য্য। সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত প্রভৃতি এমনকি মানুষের হেঁসেলখানা পর্য্যন্ত আজ নোংরা রাজনীতির নাগপাশে আবদ্ধ। দেশে বর্ত্তমানে রাজা নেই, কিন্তু রাজনীতি আছে এবং ইহা পুরাদমেই চলছে। রাজনীতির দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যের জনজীবন সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ। সুতরাং রাজ্য পরিস্থিতি যতই গুরুতর হোক না কেন, এ সমস্তই একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য গদী দখল করা। অতএব সেই সুমহান উদ্দেশ্য সাধনে যে কোন ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন এমনকি নরহত্যা করতেও কেহ আর দ্বিধাবোধ করেন না। বলাবাহুল্য পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও নরনিধনযজ্ঞ শুরু হয় এ রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে, এবং অদ্যাবধি উহা প্রতিনিয়ত চলছে। প্রতিরোধের নাকি কোন উপায় নেই অথচ এ রাজ্যে পাহাড় প্রমাণ বেতনভুক্ত রাজ্যসরকার, রাজ্যপাল, রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ, পুলিশ, মিলিটারি সবই আছে। কিন্তু অদ্যাবধি সহস্র সহস্র খুনের একটি ঘটনারও কোন কিনারা হয়নি, কিম্বা হ'লেও কোন খুনী আসামীর প্রাণদণ্ডাদেশের খবর শোনা যায় নি। সুতরাং ইহা কি বিচিত্র নয়? কিম্বা এর মধ্যে কি গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নেই? অথবা উহাই কি বর্ত্তমান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়? সুতরাং হয় সরকার অপদার্থ, রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অযোগ্য অসমর্থ, নয় উক্ত নরনিধনযজ্ঞ সরকারী প্রকল্পেরই অন্তর্ভুক্ত।

গদীর লড়াই

আজকের এই দেশব্যাপী গদীর লড়াই-এর জন্য মূলতঃ দায়ী স্বাধীনোত্তর ভারতে ইংরেজ পরিত্যক্ত দিল্লীর মসনদে যাঁরা সর্ব্বপ্রথম অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সেই কতিপয় কংগ্রেস কংগ্রেস নেতা। শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে মনে করলেন "হামলোক ক্যা কমতি হ্যায়? বিলকুল গণতান্ত্রিক রাজ।" উঠলেন ইংরেজের চেয়েও অনেক ধাপ উপরে, সেখান থেকে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ সংরক্ষণ সম্ভব নয়, কিম্বা তার কোন প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেন নি। বিশেষ আইনের বলে, দেশের জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে দখল করলেন বহু সংখ্যক রাজন্যবর্গের বিপুল ধন সম্পত্তি। গদীতে বসলেন এক একজন বিরাট গদীয়ান হ'য়ে। বিলাস ব্যাসনে দিলেন মোঘল বাদশাহেদেরও হার মানিয়ে। গৌরী সেনের অর্থভাণ্ডার তো সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, সুতরাং অর্থের আর ভাবনা কি? কিন্তু সম্ভবত তখন তাঁরা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁরা গণ-প্রতিনিধি এবং নিম্নোক্ত কবিতার ছত্রটিও হয়ত একবারও মনে পড়ে নি যথা:—"তোমরা কি ছিলে, উঠেছ কোথায়, আবার পতনে লাগে কতক্ষণ?"

সুতরাং যে কংগ্রেস ছিল এক সময়ে দেশের

স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ক্রমশঃ উহা ব্যক্তিগত স্বার্থের নিমিত্ত হয়ে গেল খণ্ড বিখণ্ড। সৃষ্টি হল বহু পরস্পর বিরোধী দল। সকলেরই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হ'ল সরকারী গদী। বলাবাহুল্য উক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল একমাত্র সরকারী গদীর উপরই। তাই তাঁরা কায়েমী স্বার্থের নিমিত্ত অতি সুনিপুণভাবে তাঁদের দখলীকৃত গদীকে করেছিলেন কামধেনুতে রূপায়িত, যেখানে কারোর কোন কামনাই আর অপূর্ণ থাকার কথা নয়। সুতরাং তাদেরই সৃষ্ট সুধা সমুদ্রের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার ফলে, সেই সুধা পানের নিমিত্তই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে পরস্পর বিরোধী প্রতিযোগিতা বা গদীর লড়াই।

গদীর লড়াই-এর পরিণতি

ভারতের সর্ব্বত্রই এখন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে গদীর লড়াই চলছে। এবং ক্রমশঃ উহা পরিণত হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামে, বিশেষতঃ এই হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গে, প্রায় বিশ বছরকাল শাসন ও শোষণ করবার পর ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে হ'ল কংগ্রেসের অভাবনীয় পতন। কয়েকটি রাজ্যে গঠিত হ'ল যুক্তফ্রণ্ট অথবা খিচুড়ী সরকার। কিন্তু পরস্পর বিরোধী শরীকদলের ক্রমবর্দ্ধমান মতানৈক্যের এবং বিরোধের ফলে, অধিকাংশ স্থানেই উহা হ'ল ক্ষণস্থায়ী। অতঃপর সেখানে প্রবর্ত্তন হ'ল রাষ্ট্রপতির শাসন। আবার কোটি কোটি অর্থ ব্যয়ে—হ'ল অন্তবর্ত্তী নির্বাচন। পুনরায় হ'ল খিচুড়ী সরকার গঠন। সুতরাং এই ভাবেই চলছে বর্ত্তমান প্রশাসন। নির্বাচন তো হয়েছে এক অত্যাশ্চর্য্য প্রহসন। সকল প্রার্থীরই উদ্দেশ্য জয়লাভ করা। সুতরাং ন্যায়, নীতি, আদর্শের আর কোন বালাই নাই। যে কোন ঘৃণ্য নীতি অবলম্বন করা ভিন্নও প্রয়োজনবোধে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে হত্যা করেও নির্বাচনে জয়লাভ করা চাই। এবম্বিধ নির্বাচন কিম্বা অন্তবর্ত্তী নির্বাচনের অন্ত হবে কবে জানি না। কিন্তু যত শীঘ্র অন্ত হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

গদীর জন্য সশস্ত্র লড়াই-এ পশ্চিমবঙ্গ সব রাজ্যকে হারিয়েছে। এ-রাজ্যের জনদরদী নেতৃবৃন্দের জনসাধারণের জন্য এত অধিক দরদ যে পূর্ব্ববঙ্গের মুক্তি যোদ্ধারা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে মরছেন, আর পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ বিনা যুদ্ধে দুর্গত মানুষের চির মুক্তির ব্যবস্থা করছেন। প্রতিবাদের উপায় নেই। কারণ যিনি প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করবেন, অবিলম্বে হবে তারও অবশ্যম্ভাবী মুক্তি। কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকার তো নীরব দর্শক। মুখে অবশ্য আস্ফালন করেন বটে, যে দু'চার দিনের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা করব, এমন কি সরকারী কর্মসূচীর প্রথম দফাই রাজ্য পরিস্থিতির প্রতিকার। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় সরকারের বন্দুকের গুলিও হয়ে পড়ে অকেজো। দুষ্কৃতকারীগণ তাদের দৈনন্দিন নরহত্যার কর্মসূচী অবাধে রূপায়িত করছে। অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সর্ববিধ আয়োজন সরকারের থাকা সত্ত্বেও কেন যে সরকার রাজ্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছেন, ইহাও খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। পশ্চিম বাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের দৃষ্টান্তই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং রাজ্য পরিস্থিতির যথোপযুক্ত প্রতিকার না হলে, পশ্চিম বাংলার মানুষের ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্রের সামিল হওয়াও কোনরূপ অসম্ভব নয়।

অখণ্ড কংগ্রেস দ্বিখণ্ডের পরবর্ত্তী চিত্র

গদীর লড়াই-এ অখণ্ড কংগ্রেস হ'ল দ্বিখণ্ড। আদি ও নব কংগ্রেস। আদিকে অন্ত করে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই হলেন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিজয়ী। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কথা শুনেছিলাম তাঁর স্বর্গত পিতা প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মুখে কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বিলকুল সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেন জনগণকে। ফলে কংগ্রেসের চির শত্রু তথাকথিত বামপন্থী দলের কিছুটা সমর্থনও পেলেন শ্রীমতী গান্ধী। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে প্রকৃত মানব সমাজের যে কিছু অবশিষ্ট আছে বলে

মনে করি না। সমাজবিরোধী শক্তি যেখানে প্রবল, সেখানে মানব সমাজের অস্তিত্ব থাকা কখনও সম্ভব নয়। যেখানে ভাই ভাই-এর বুকে ছুরি বসাচ্ছে, পিতা পুত্রকে অথবা পুত্র পিতাকে হত্যা করছে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক কারণে তো আর খুনের অন্তই নেই। সে সমাজ কি কখনও সুসভ্য মানুষের সমাজ বলে গণ্য হতে পারে? তদ্ভিন্ন সরকারী নানাবিধ নীতি প্রয়োগের ফলে সর্ব্বত্র ভেজাল, ঘুষ, চুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজকে করেছে ভেঙ্গে চুরমার। সমাজ কল্যাণমূলক পরিবার পরিকল্পনার মহৌষধি সুলভ ও স্বল্পমূল্যে গর্ভনিরোধ বটিকা প্রবর্ত্তন, এমনকি গর্ভপাত কিম্বা ভ্রূণহত্যাও আইনত বৈধ করবার ফলে, তরুণ ও যুব সমাজে অতি ঘৃণ্য ব্যাভিচার ব্যাপক ও সংক্রামকরূপে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং এবম্বিধ সমাজ পরিকল্পনা বা পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী কে বা কারা জনগণ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছেন। মুখ্য প্রগতিশীলা শ্রীমতী গান্ধী সম্ভবত উক্ত পরিবর্ত্তিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাসই জনগণকে দিয়েছেন। তদ্ভিন্ন সমগ্র দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণের সমর্থনের নিমিত্ত তিনি ঝোঁপ বুঝে কোপ মারলেন। অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:—"গরীবী হটাও।" দেশের অগণিত দরিদ্র জনতা ভাবলেন এবার একটা হিল্লে হবেই। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস কখনও নিষ্ফল হবার নয়। তাই রাতারাতি অধিকাংশ মানুষই হয়ে পড়লেন ইন্দিরা পন্থী, বললেন ইন্দিরাজী কি জয়।

সুযোগ বুঝে ইন্দিরাজী দিলেন অন্তবর্তী নির্বাচনের ডাক। বিপুল অর্থব্যয়ে হল মহানুষ্ঠান সম্পন্ন। প্রায় সর্ব্বত্রই হ'ল শ্রীমতী ইন্দিরার জয়। বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করে কেন্দ্রে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন অর্দ্ধমৃত কংগ্রেসকে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এবারকার নির্বাচনে মৃতপ্রায় কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত সাফল্যের মূলে রয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর অশেষ কৃতিত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এবং তৎসঙ্গে রয়েছে জনগণের তাঁর উপর গভীর শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও দৃঢ় বিশ্বাস। ভবিষ্যতে তিনি যে তাঁর প্রাক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করবেন, জনসাধারণ সেই আশাই করেন।

এপার বাংলা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বর্ত্তমান আংশিক চিত্র উপরে প্রদর্শিত হ'ল। সম্পূর্ণ চিত্র এত দীর্ঘ যে উহার প্রদর্শনী দ্বারা একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস সৃষ্টিরই সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং আপাততঃ উহা বন্ধ রেখে ওপার বাংলার বর্ত্তমান ভয়াবহ চিত্রেরই অবশিষ্টাংশ প্রদর্শন করছি আগামী সংখ্যায়।

স্মৃতির জোয়ারে উজান বেয়ে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(দশ)

কিন্তু শহীদ অত্যুক্তিপ্রিয় ছিল স্বভাবে, তাই নিজের কাব্যকৃতিকে প্রায়ই এ-ভাবে অপদস্থ করত। শ্রীঅরবিন্দকে আমি যে দুটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম তার একটি এখানে উদ্ধৃত করি—এটিও আর একটির অনুবাদ (মূল সহ) আমার অনামিকা সূর্যমুখীতে ছাপা হয়েছে।

You will not rue me
 When I am dead,
Like a careless flower,
 Dropped from your head.
But on some stormy day,
 By some firelight hour,
I will stir in your soul
 Like an opening flower.
You will smile and think
 And let fall your book,
And bend over the fire
 With a far-off look.

ব্যথা তুমি আজ পাবে না—যখন
 মরণান্তে যাব আমি ঝ'রে
কুন্তল হ'তে তোমার অনাদৃত
 ক্ষণ ফুলের মতই ধুলার 'পরে।
কিন্তু পরে, আমি কোনোদিন
 প্রদীপজ্বালা ঝড়ের গোধূলিতে
চিত্তে তোমার লাজুক কলির ম'তই
 মেলব আমার দলগুলি নিভৃতে।
মৃদু হেসে বইটি রেখে দেবে,
 আমার কথা পড়বে তোমার মনে,
হয়ত দীপের দিকে চেয়ে রবে
 সে দিন সুদূর আনমনা প্রেক্ষণে।

এ-কবিতাটি, আর একটির সঙ্গে, শহীদ আমাকে দিয়েছিল বার্লিনে, আমার কাছে কথা আদায় করে যে, কাউকে দেখাব না। ওকে আমি প্রায়ই টুকতাম ওর এই অত্যধিক স্পর্শকাতরতা নিয়ে। বলতাম: "এ তো চমৎকার কবিতা। দেখাতে বারণ করছ কেন শুনি।" ও কী উত্তর দিত ভালো মনে নেই, তবে নিজের কাব্য-কৃতিকে ছোট করতে যেন ও একটা নিষ্ঠুর (sadistic) আনন্দ পেত। আমার এ দরদী অনুযোগে ও কর্ণপাত করত না। বলত এ-সবই কথা নিয়ে খেলা। বলত শ্রেষ্ঠ কবিতা সে-ই যার প্রতি চরণটি একটি আন্তর অনুভবের রূপায়ণ। বীজ যেমন ফুল হ'য়ে ফোটবার আবেগকে বহন না করে পারে না, তেমনি আবেগ অন্তরে আবির্ভূত হলে তবেই সে সার্থক কবিতার প্রসূতি হয়। যে কবিতায় মাত্র সুন্দর সুন্দর কথার শোভাযাত্রা দেখতে পাই সে-কবিতার শিল্পকার নিখুঁৎ হলেও কবিতার পদবী তাকে দেওয়া চলে না। পিতৃদেবের একটি কবিতা ওর কাছে উদ্ধৃত করে পূর্ণ সাড়া পেয়েছিলাম:

কাব্য নয়ক ছন্দোবন্ধ, মিষ্ট শব্দের কথার হার,
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার সে তো শুদ্ধই শব্দসার।

কিন্তু এখানে ওর সঙ্গে আমার মতৈক্য হলেও ও যখন বলত প্রেরণা ষোলো আনা নিখুঁৎ না হলে কবিতা লেখা বৃথা—তখন আপত্তি করতেই হ'ত। অনেক চমৎকার কবিতারই প্রকাশ অনবদ্য নিটোল নয়। হয়ত একটি স্তবক অপূর্ব, তার পরের স্তবকে প্রেরণা তেমন দুর্নিবার নয় কিন্তু তবু সব জড়িয়ে কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হতে পারে। বারো আনা রসসৃষ্টি হলে ষোলো আনাই না মঞ্জুর হতে পারে না।

কিন্তু শহীদ এখানে ছিল অনমনীয়—তাই ওকে আমি প্রায়ই hipercritical নাম দিয়ে বলতাম: "না

ভাই, সমস্তটা না পেলে সমস্তটাই ছাড়ব তোমার এ-ধনুর্ভঙ্গ পণে আমার মনের সায় নেই। যেমন ধরা যাক আমি ছিলাম হারীণের কবিতার ভক্ত। ও বলত: "ও কবিতাই হয় নি—শুধু pose, ত্রিভঙ্গঠাম। ছন্দে সিদ্ধি লাভ করলে ওরকম কবিতা কে না লিখতে পারে?" আমি বলতাম রাগ করে "তোমার এ বাড়াবাড়ি। হারীণের বারো আনা কবিতা রসোত্তীর্ণ হয় নি বলে ওর যে চার আনা রসাল ফুল ফুটিয়েছে তার মূল্য কমে না।" কিন্তু ওকে বাগ মানাবে কে? তবে ওকে সাধুবাদ না দিয়ে পারতাম না যখন দেখতাম ও যে কঠোর নিরিখে অপরের কবিতাকে বাতিল করত নিজের কবিতার সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি নিষ্ঠুর ক্রিটিক ছিল। কিন্তু এ-গোঁ-কে আমল দেওয়ার ফলে ও কবিতা লেখা ছেড়ে দিল এ-জন্যে আমি খেদ করলে ও বলত হেসে: "ভাই স্নেহ করো আমাকে এ-জন্যে আমার আনন্দ হয় সত্য, কিন্তু সে-স্নেহের ফলে আমার নিকৃষ্ট কবিতাকে 'উৎকৃষ্ট' বলতে চাইলে আমি আপত্তি করবই করব।"

কিন্তু ওর একটি কবিতা ও আমাকে দিয়েছিল যেটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। শ্রীঅরবিন্দকে যখন এ কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম বহু বৎসর পরে তখন তিনি এর প্রশংসা করেছিলেন মুক্ত কণ্ঠেই। কবিতাটি ও লিখেছিল কালি দিয়ে নয়—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। তাই এর উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এর মূল ইংরাজীটি আমার "অনামিকা-সূর্যমুখী"তে ছাপা হয়েছে তাই উদ্ধৃত করলাম না। আমার বাংলা অনুবাদটি আমার নিজের বিশেষ ভালো লেগেছিল, তাই আশা করি পাঠকদেরও লাগবে—কবিতাটির নাম: কৃপার্হ:

যে- তৃষ্ণার্ত পান্থ মরুভূর খরদাহে
একবিন্দু জল তরে চারিদিকে ধায়;
যে ক্ষুধিতে নিয়তির অলংঘ্য বিধান
করে প্রসারিত কর দুটি অসহায়;
ছুটে এসে যে তোমার চরণ চুমিতে
দেখে হায়—সব শেষ, উত্তীর্ণ লগন,
শ্রীচরণে রক্তশূল, শোনে যে তুফানে
"রক্ষা নাই আর"—গায় প্রমত্ত পবন;
বিনিঃসঙ্গ নিশীথে যে আচ্ছন্ন তন্দ্রায়
স্বপ্ন দেখে নিরাশায় গহন হিয়ায়
শ্যামল ক্ষেত্রের, কুসুমিত নন্দনের,
জাগিয়া পারে না তবু কাঁদিতেও হায়;
আঁধারের নিগড় যে পারে না কাটিতে
তোমার অসিরও চেয়ে তীক্ষ্ণ বেদনায়;
অন্যায় রণে যে মানে হার—কৃপাতব
ঝরায়ো সবার 'পরে অঝোর ধারায়।
সকলেই তারা হতভাগ্য—মানি, তবু
এ-মিনতি শ্রীচরণে—ভুলিও না তারে
বহে যে নিস্ফল প্রেমভার, আমরণ
প্রাণবেদিকায় দয়িতার প্রতিমারে
পূজি, অবশেষে দেখে—প্রিয়তমা তার
প্রগল্‌ভা চপলা, তার অধর মধুর
নয় ঐকান্তিকা, হে দয়াল, বরষিও
কৃপা তব সে-দুর্ভাগাশিরে—যে বিধুর
সেই স্বৈরিণীরই স্মৃতি জপে যন্ত্রণায়,
সে-বিশ্বাসহন্ত্রীর—যে আদরে আদরে
ভুলায়ে দয়িতে শেষে উন্মুখ হৃদয়
অর্ঘ তার দলি' পদে যায় হেলাভরে।
অভাজন হ'তে সেই অভাজনে দিও
পরশ কোমলতম তোমার হে প্রিয়।

শ্রেষ্ঠ কবিতায় আত্মজীবনীর বীজই ফুল ফোটায় এ-কথা কবি মাত্রেই জানে। এমার্সন অকারণ লেখেন নি:

"The poet writes from a real experience: the amateur feigns one. Talent amuses, but if your verse has not a necessary auto-biographical basis, though under whatever gay poetic veils, it shall not waste time."

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে এমার্সনের এ-নিশ্চয়োক্তিটি প'ড়ে আমার হৃদয় সাড়া দিয়েছিল, বলেছিল—যথার্থ কবিতার সংজ্ঞা এই-ই বটে। মন আমার এমনই দুলে উঠেছিল যে, আমি এর ভাবানুবাদ করেছিলাম গদ্যে নয়, কবিতায়:

প্রাণ রক্তবিন্দু দিয়া লভিয়াছে যারে হিয়া—আঁকে
তারে কবি :
কবি চিত্রী নহে যারা—আবেগের ভালে তারা রবে
কাব্য, ছবি।
চঞ্চল মনীরা হায়, ক্ষণিক প্রমোদ চায়! কোথা
বলো তার
প্রাণের সাধনাদীপ্ত অচঞ্চল সত্যভিত্তি—গৌরবী
দুর্বার?
তব সৃষ্টিতলে যদি তোমার জীবননদী না বহে
উচ্ছল,
তবে শুধু রঙ্গগানে মঞ্জরিবে কার প্রাণে পল্লব পুষ্পল?

"কৃপাহ" কবিতাটি শহীদ কেন কোথাও প্রকাশ করে নি কল্পনা করা কঠিন নয়। এর প্রতি চরণ সে লিখেছিল তার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। এটি কবিতা তথা আত্মজীবনী। গভীর ঘা খেয়ে লেখা। প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ বিশেষণ দিয়েছিলেন poignant—যার বাংলা প্রতিশব্দ নেই। ও একটি মেয়েকে গভীর ভাবে ভালোবেসেছিল। সে ওকে খেলিয়ে কাছে টেনে দূরে ঠেলে। প্রথম যৌবনের প্রেমে বিশ্বাস করে ওর স্বপ্নভঙ্গ হয়। তখন ও পণ নেয়—কাপুরুষের মতন হাহাকার না ক'রে নিজের প্রতিভাকে রূপসৃষ্টির কাজে নিয়োগ করবে। রুষদেশে গিয়েছিল রুষ বিপ্লবের সময়। চার পাঁচ বৎসর ছিল সেখানে। রুষ ভাষা এত ভালো শিখেছিল যে, অনর্গল ভাষণ দিতে পারত। সেখানে প্রতিভাধর যুবক মোড় নিল রঙ্গমঞ্চের দিকেও প্রতিভাবলে মস্কো আর্ট থিয়েটারে পেল মানী শিল্পীর পদ—regisseur—প্রযোজক।

কিন্তু ওর ললাটলিপিতে বিধাতাপুরুষ সুখশান্তি লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।

বাধল বলশেভিক বিপ্লব। ওর ভালো লাগে নি বলশেভিকদের নিষ্ঠুরতা। অসাবধানে বলে ফেলত এ-কথা একে ওকে তাকে। তার উপর হ'ল আর এক সাংঘাতিক যোগাযোগ : যে মহিলা লেনিনকে নিশানা করে গুলি ছুড়েছিলেন তার সঙ্গে ওর আলাপ ছিল। ফল যা হবার—ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি—চেকা পুলিশ ওর পিছু নিল। ছদ্মবেশে কোনো মতে পালিয়ে এলো ইস্তাম্বুলে। কিন্তু পাসপোর্ট নেই দেখে তারা ওকে হাজতে রেখে দিল। এ-সব কথা আমার ওরই মুখে শোনা, তবে পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা তো, কিছুটা ভুল হয়ে থাকতে পারে। তবে ওর একটা কথা মনে পড়ে যা অবিস্মরণীয়। ও বলেছিল আমাকে :

"জানো দিলীপ, আমার মনে হয় প্রত্যেক মানুষকে কিছুদিনের জন্যে একা হাজতে বন্দী করে রাখা ভালো। কেন জানো? সভ্য মানুষের এক মহা যন্ত্রণা তার দায়িত্বজ্ঞান। যা করছি আমার যোগ্য তো—না তামসিক আলস্য? একমাত্র জেলেই আমরা রেহাই পাই বিবেকের তিরস্কার থেকে—কেন না সেখানে আমার কোনো স্বাধীনতাই নেই, আমি একেবারে ষোল আনা জেলরক্ষীদের তাঁবে। প্রতি পদে তাদের ইচ্ছায়ই চলতে হবে আমাকে। তোমাদের গীতায় একবার পড়েছিলাম ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে লুকিয়ে থেকে অদৃশ্য তারের টানে তাকে নাচান—যদিও সে নিজে ভাবে—সে নাচছে স্বেচ্ছায়ই। জেল রক্ষীরা কতকটা এই ভগবানের মতন, কেবল অদৃশ্য নন এই যা। কী খাব কতবার বাইরে টহল দেব, কী পড়ব, সপ্তাহে কটা চিঠি লিখতে পারব —সবই ধরা বাঁধা—তাঁদের মর্জি'র আমি হুকুম বরদার। ফলে মন হাল ছেড়ে দেয় বলে : আঃ, বাঁচলাম—আমার আর কিছু করবার নেই। তাই ঘোরা যাক ঘানি গাছের চারদিকে চোখ বাঁধা বলদের ম'ত।......" ইত্যাদি

আমি একটু ফলিয়ে বললাম, তবে ওর মোদ্দা কথাটা ছিল এই-ই বটে : যে, দায়িত্বজ্ঞান আমাদের অন্তরে জাঁদরেল বিবেক নাম নিয়ে আমাদের ঘুরিয়ে মারে।

একটি উর্দি [illegible]

বৈঠনে দেতা নহী দমভর কিসীকো চৈনসে
দরবদর হমকো ফিরুতা হৈ, য়হ আখির কৌন হৈ ?
অর্থাৎ
দু দণ্ডও থাকতে যে না দেয় আমাকে শান্তিতে
ঘুরিয়ে মারে চারিদিকে হায়—কে সে, কেমন, কে জানে ?

কবি অমজদ এ-সূত্রে ইঙ্গিত করেছিলেন যে এঁরই নাম আল্লা—ভগবান্। কিন্তু ভগবানের বিকল্প রূপ বিবেককেও এ-অদৃশ্য নিয়ন্তার পদে বরণ করা চলে।

ভালই হ'ল ভগবানকে ডাক দিয়ে। শহীদকে আমি বলেছিলাম ভগবানকে দর্শন করা যায় একথায় আমি বিশ্বাস করি। ও আমাকে গভীর স্নেহ করত তাই ওর সদাসংশয়ী মনের বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ক্ষেপে আমাকে নাজেহাল করে নি। ভগবান সম্বন্ধে ওর মনোভাব যে ঠিক কী ছিল আমাকে কোনোদিনই খোলাখুলি কিছু বলে নি। তবে একটি কথা বলত যা ভুলবার নয়: যে, ভগবানের কাছ থেকে যা মেলে তা ইন্দ্রিয়জগতের অভিজ্ঞতার চেয়ে যদি কম বাস্তব হয় তবে ও চায় না, চায় না, চায় না। কংক্রীট শব্দটি ছিল ওর অতি প্রিয়। তাই বলত: "ভগবানের কাছ থেকে ছোটখাটো প্রসাদে তুষ্ট হয়ে নিজেকে ঠকিও না। যিনি মনের প্রাণের নিয়ন্তা তাঁর কাছ থেকে মনের প্রাণের প্রত্যক্ষ—কংক্রীট—খোরাক না পেলে সব ছায়াবাজি।"

বহু বৎসর পরে যখন আমি সব ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিই তখন ও সর্বপ্রথম আমাকে দুটি পত্রে লিখেছিল ওর অন্তরের কথাটি যা (ও লিখেছিল) ও আর কাউকেই কখনো বলে নি। ওর গভীর স্নেহের এই পরম পুরস্কার আমি সাদরে গ্রহণ করেছিলাম, কেন আরো এই জন্যে যে তা থেকে আমি লাভ করেছিলাম কম নয়।

ও আশ্চর্য ভালো ইংরাজী লিখিত। কিন্তু ওর এ-দুটি চিঠির অনুবাদ করা সহজ নয়। অথচ এত বড় ইংরাজী চিঠির উদ্ধৃতি বাংলা লেখায় অশোভন। তাই চেষ্টা করি ভাবানুবাদ দিতে—পরিশিষ্টে মূল পত্র দুটি পেশ করা যাবে।

ও হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্র) থেকে আমাকে লিখেছিল ১৯৩২ সালে জানুয়ারি মাসে:

প্রিয় দিলীপ,

আমাদের বন্ধু নীরেন তোমার চিঠিটি আমাকে দিয়েছিল যথাকালে। যদি প্যারিস রওনা হবার আগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ত তাহ'লে বড় ভালো হ'ত। কারণ তাহ'লে আমি তোমাকে খুলে বলতাম আমার কাব্য সম্বন্ধে নানা ধারণা কি ভাবে বদ্‌লে গেছে ও কতখানি। যতই দিন যাচ্ছে ততই আমার মনে হচ্ছে যে, কাব্যের বাক্‌সম্পদ আমাদের অন্তরের এক গভীর সংযমকে স্ফুট করলে তবেই কৃতকৃত্য হয়। তুমি শ্রীঅরবিন্দকে আমার যে কবিতাগুলি পাঠিয়েছিলে তাদের সম্বন্ধে তিনি কী বলেছিলেন তুমি আমাকে জানাতে কুণ্ঠিত হ'লে কেন? তুমি কি আমাকে এত কম জানো? তোমার কি মনে নেই—আমি সর্বদা আত্মবিশ্লেষণ করতে চাইতাম কী নিষ্করুণ ভাবে? কেউ যদি আমার কবিতার ত্রুটি দেখিয়ে দেয় আমি কৃতজ্ঞ হব না একি সম্ভব—বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাজনের সমালোচনা? তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যাদের মিল নেই তারাও কি স্বীকার করে না যে এ-দেশের তিনি একজন মহাপুরুষ?

এবার তোমার চিঠির উত্তরে আমার যা বলবার আছে বলি। ভেবো না আমি তোমাকে উপদেশ দেবার অধিকারী—যে আমি এক হিসেবে নিরঙ্কুশই রুলব। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে পারি বন্ধুভাবে (যে-আমি জীবনে অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে গেছি) যে, যে-সব কিছুর তেমন মূল্য নেই আমাদের কাছে সে-সব ত্যাগ করা তত কঠিন নয় যেমন কঠিন সেই সব পাপ ত্যাগ করা যাতে আমরা আসক্ত।.........আমাকে ভুল বুঝো না: আমি নিজেকে কোনো দিনই একজন আদর্শ পুরুষ ভাবি নি—আমি নিজেকে জানি তো। তাই তোমার মতন স্নেহময় বন্ধুর চোখের আয়নায় আমি নিজের রূপের খবর নিই না, কেন না আমি জানি যে, তোমরা আমাকে ভুল ভেবেই এত বড় মনে করেছ। কিন্তু তবু আমার

ভাঙা জীবনেও আমি ধীরে ধীরে কোনো কোনো ইষ্টার্থে (values) পৌঁছচ্ছি—যেমন করেই হোক। আমি শুধু সেই কথাই আজ কিছু বলতে চাই, যদিও আমি সত্যিই চাই না তুমি আমার নানা মূল্যায়ণকে বেশি বড় করে দেখ। আমার বক্তব্য হোক শুধু বন্ধুর কাছে বন্ধুর নিজেকে একটু খুলে ধরা।

সব আগে বলি—আমি তোমার চিঠির জন্যে তোমার কাছে কত কৃতজ্ঞ। তোমার অন্তর আনন্দের জন্যে তোমাকে আমার সত্যিই হিংসা হয়—যে আনন্দ তোমার নাগালের মধ্যে এল শ্রীঅরবিন্দের মতন মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসে।

তারপর আমার বক্তব্য এই যে, তোমার নবজীবনা-দর্শকে আমি এতটুকুও খাটো করতে চাই নি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম সেই প্রচ্ছন্ন আত্মবঞ্চনার কথা যে আবহমানকাল আমাদের সিদ্ধিকে সুলভ করতে চায়। কিন্তু তোমার এ-কথা খুবই ঠিক যে আমাদের স্বভাবের ছন্দ এক নয়। তাই তোমার নানা আত্মিক উপলব্ধির জটিল জগত সম্পর্কে আমার কিছুই বলবার নেই—কী করে থাকবে যে আমার মন নিজের পরিচয় পেতেই দিশাহারা হয়ে পড়েছে? আমার নিরাবেগ মন্থর ও ক্ষুব্ধ চেতনার কাছে সাধনার পথ এতই দুরারোহ মনে হয় যে আমি সন্দেহের চোখে দেখি শিল্পে বা জীবনে সেই সব উপলব্ধিকে যাদের সহজেই নাগাল পাওয়া যায়। আর বিশাল জীবনের সাম্রাজ্য রূপবাণের সীমিত সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক অনেক অনেক বড়। তাই আমি কোন্ মুখে অবিশ্বাস করব যাকে শ্রীঅরবিন্দ বর্ণনা করেছেন আত্মিক জীবনের প্রাণশক্তি বলে? আমি তো ঠিক এই জন্যেই শিল্প থেকে দূরে সরে এসেছি —শুধু শিল্প কেন তার চেয়ে মহত্তর অনেক কিছুর প্রতিও আমি বিমুখ হয়েছি ঐ একই কারণে। যাইহোক, আমি আজ শুধু তোমাকে বলতে চাই, বিশ্বাস কোরো যে আমি তোমাকে ইতিপূর্বে যা কিছু লিখেছি, লিখেছি কেবলমাত্র একটি নিগূঢ় কামনায়—শুধু তোমাকে বলতে (যা আমার স্বভাব আমাকে বলতে দেয় না) যে, আমি গভীর স্নেহে তোমার প্রগতির দিকে চেয়ে থাকব—যে প্রগতি আমার কাছে চিরদিনই থাকবে (হায়) শুধু পদযাত্রা মাত্র, লক্ষ্যসিদ্ধি নয়।

কিন্তু কেমন করে তুমি আমাকে ভুল বুঝলে বলো তো? আমি তেমন মূর্খ গর্বী নই যে সর্ব্বদাই ভাবে সবাই তাকে ভুল বুঝছে। হা হতোঽস্মি, ভগবানকে অনুভূতির মধ্যে ধরা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, তাঁকে ছোঁওয়া যায় তোমার এ ঘোষণা আমার কাছে কেমন করে অগ্রাহ্য হবে—যে আমি চিরদিনই এ সম্বন্ধে সচেতন? আর তোমার দৃপ্ত বিনয়—যে আমার মতন উচ্চশিক্ষিত এ তত্ত্বকে স্বীকার করতেই পারে না, এ জিনিষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যে কবে! তোমার সরল উচ্ছ্বাসী মন যে সত্যের পরিধির মধ্যে এসেছে সে সত্য আমাদের মতন উদ্‌ভ্রান্ত বুদ্ধিমন্তদের নাগালের বাইরে। দিলীপ, তুমি এ পথের তীর্থযাত্রী হয়েছ অল্পবয়সেই বলব—ভগবানকে ধন্যবাদ। কিন্তু যারা প্রাজ্ঞ দিশারিকে সহায় না পেয়ে পথ চলে শুধু তিক্ত চিন্তার বোঝা বয়ে—তাদের কথাও একটু ভেবো। কেন তুমি ভাবলে যে, যাঁকে তুমি পরম ভাগবত বলে চিনো তাঁকে গুরুবরণ করে তুমি ধন্য হয়েছ—তোমার এ অমূল্য অভিজ্ঞতা আমার কাছে না-মঞ্জুর? আমার নিজের চোখে আমি অতি ছোট আমার এ উপলব্ধিকে তুমি কেমন করে সংশয়বাদ মনে করে বসলে? কিন্তু ভুল বোঝাকে আমি দুষি না। বরং আমি মনে করি—ভুল বোঝার মধ্যে দিয়েই আমরা পরস্পরের মনের পটে ছাপ ফেলি। তোমাকে যেসব কথা আজ বলছি—যা আর কাউকেই বলতে পারতাম না—তার মূলে কি এই ভুল বোঝাই লুকিয়ে নেই? কে জানে?... আমি শুনে খুশী হয়েছি যে শ্রীঅরবিন্দ বছরে কয়েকবার সবাইকে দর্শন দেন। জীবনের অনেক কিছুই ঘটে সমুদ্রে পাথর পড়ার মতন—যে ফেলে সে পাথর যে জানতে পারে না পাথরের ঘায় যেসব বৃত্ত জেগে ওঠে তারা কোন তটে গিয়ে লাগবে।

শ্রীঅরবিন্দের "ভগবান" কবিতাটি অতি সুন্দর। পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি সত্যিই :

নিম্নে অগণন বিশ্বে পরিব্যপ্ত হ'য়ে তুমি তবু
ব্রহ্মাণ্ডের সমূর্ধ্বে আসীন।
কর্ম্মী জ্ঞানী সম্রাটের নিয়ন্তা হয়েও তুমি, প্রভু,
ভক্তাধীণ প্রেমে চিরদিন।
করো না তো ঘৃণা জন্ম লভিতে কীটেরও মাঝে নিতি,
তুচ্ছ কঙ্করেরও তুমি প্রাণ ;
এ অচিন্ত্য দীনতায় পাই তাই তব পরিচিতি
মহীয়ান—তুমি ভগবান।

কখনো কখনো ছোট মনের মধ্যে মহৎ মনের চিন্তা জেগে ওঠে : তাই আমিও তোমাকে এই দীনতার কথাই বলতে চেয়েছিলাম—এই humility-র যার চমৎকার ছবি ফুটিয়েছেন তোমার গুরুদেব। তুমি এমন গুরুর আশ্রয় পেয়েছ ভাবতে মন আমার আনন্দিত। নির্ব্বিচারে তাঁর নির্দ্দেশ মেনে চলবার চেষ্টা কোরো

GOD

Thou who pervadest all the worlds below,
Yet sitst above !
Master of all who work and rule and know,
Servant of love !
Thou who disdainest not the worm to be
Nor even the clod,
Therefore we know in that humility
That thou art God.

ভাই। শুধু সনাতন বেদ নয় হাফেজও লিখেছেন তাঁর Divan-এর প্রথমেই :

Colour the prayer-mat with wine
If the old man of the tavern tells you this ;
Because the Teacher is not unaware
Of the Way and the ways of the Goal.

—ইতি
তোমার স্নেহাধীন শহীদ।

অতঃপর আমি ওকে কয়েকটি পত্র পাঠিয়ে দিই। তার মধ্যে একটি চিঠি ছিল কৃষ্ণপ্রেমের বাকী সব চিঠি শ্রীঅরবিন্দের। কৃষ্ণপ্রেম লিখেছিলেন (অনুবাদ আমার) :

"তোমার 'শ্রীরাধা' কবিতাটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার কেবল একটি মন্তব্য আছে। আমার মনে হয় তুমি বড় বেশী ঝুঁকেছ—বিশ্বজনীনতার দিকে। তুমি বলেছ আমাদের অন্তরাত্মা যে চায় পরমাত্মাকে তারই প্রতীক কৃষ্ণ-রাধার প্রেম। আমার মনে হয় এর উল্টোটাই সত্য : আমরা ভগবানকে ভালোবাসি। এইজন্যেই যে রাধা কৃষ্ণকে ভালোবাসেন, অর্থাৎ মানবিক ভগবৎপ্রেম আসলে কৃষ্ণ-রাধার পারস্পরিক প্রেমের প্রতীক বা প্রতিচ্ছবি।"

শহীদ এ চিঠিগুলি পড়ে আমাকে লিখেছিল :

ভাই দিলীপ,

আমি শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব্ব চিঠিগুলি বারবার পড়লাম। তোমার গুরুদেব কী চমৎকার দিয়েছেন আধুনিক মনের অকৃতার্থতার নিদান! এ মন হল মার্কস্ ফ্রয়েড য়ুঙ্গ ও স্বপ্নবাদী বিশ্বমানবের জগা-খিচুড়ী—উচ্ছ্বাসে অগাধ কিন্তু চিন্তায় বামন। ইউরোপে যাঁদের আত্মিক উপলব্ধি হয়েছে তাঁরা এ সব অর্দ্ধসত্যকে বুদ্ধির কসরৎ ছাড়া আর কিছু মনে করেন না—কিম্বা বলা যেতে পারে বাজিকরের ভেল্কি যে এ জগতের ছায়াবাজির মধ্যে এক গভীরতর ছায়াবাজির খেলা দেখায়।...

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেমের মন্তব্যে আমি সত্যিই চমকে উঠেছি—যখন সে বলছে কৃষ্ণ-রাধার দিব্য প্রেমই মর্ত্ত্য প্রেমের উৎস—এই এই এই—যাকে আমি তোমার কাছে বারবার বলতাম 'কংক্রীট' অন্তরে বাইরে। তোমার মনে থাকতে পারে আমি তোমার কাছে নানা ভাবেই বলতে চেয়েছি এই কংক্রীটের আধ্যাত্মিকতার কথা। কৃষ্ণপ্রেমের মতন আমিও বীতশ্রদ্ধ। আমাদের সেই সব স্বদেশবাসীদের 'পরে যাঁরা প্রতিমাকে প্রতীক (symbol) বলে তার ওকালতি করেন। ইউরোপকে এইভাবে তাঁরা অজান্তে প্রণাম করেন বলেই আমাদের হিন্দু মহাকাব্যে পুষ্পক রথের উল্লেখ করে বলেন আমাদেরও ছিল উড়োজাহাজ। এই লজ্জাকর আত্ম-সম্ভ্রম জ্ঞানের পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের Behauptungen

(statement of a position) কী দীপ্ত, স্থির শান্ত প্রভায় উদ্ভাসিত, নয় কি?......অপিচ শিল্প সম্বন্ধেও আমি শ্রীঅরবিন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমের মতে সায় দিই: যে, শিল্প হ'ল অধ্যাত্ম অনুভূতির একটি আনুসঙ্গিক (by-product); শিল্পের ভর গতি ও ধ্বনির 'পরে কাজেই সে নাগাল পেতে পারে না সেই নৈঃশব্দ ও স্থৈর্য্যের যে সমস্ত ধ্বনি ও কাঁপনের উৎস।

শ্রীঅরবিন্দকে শহীদের এই চমৎকার চিঠিটি পাঠিয়ে দিতে তিনি আমাকে উত্তর দেন (১৭-৫-৩২ তারিখে):

দিলীপ,

সুরবর্দি ঠিকই বলেছে আর বলেছে চমৎকার করেই......ভারতীয় apologist-রা পাশ্চাত্য বুদ্ধিমন্তদের দরবারে আমাদের আত্মিক উপলব্ধিদের 'প্রতীক' নাম দিয়ে যে ভাষ্য করেছেন সে ভাষ্য অতি দুর্ব্বল। এতে করে তাঁরা আমাদের তরফের কথার সাড়ে পনের আনা বিসর্জ্জন দিয়েছেন, বাকী আধ আনাকে বাঁচাতে। এক হিসেবে, দেবদেবীদেরও প্রতীক বলা যেতে পারে। কিন্তু সে হিসেবে দাঁড়াল না কী যে, সব কিছুই প্রতীক যাদের মধ্যে পড়েন এই উকিলগুলিও, যদিও, দুঃখের বিষয়, তাঁরা প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব বলে নিজেদেরকে জানান দিতে পারেন।"

বার্লিনে শহীদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিই যখন লুগালো-কন্‌ফারেন্সে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আহুত হয়ে সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করি। (সে ট্রেনে আমার এক রুষ বন্ধুরও আমার সহযাত্রী হবার কথা ছিল কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত আসতে পারেন নি। তাঁর কথা পরে বলছি) শহীদ স্টেশনে এসেছিল আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে। ট্রেনে উঠে ধারের বার্থে বসে গলা বাড়িয়ে দেখি সে ঠায় দাঁড়িয়ে। আমি বসে। কিন্তু ট্রেন ছাড়তে পাঁচ-সাত মিনিট দেরী করেছিল সেদিন। শহীদ হেসে বলল: "Dilip, do you know what is the most awkward moment of a man's life? আমি বললাম: "শুনি।" সে বলল: "যখন কোনো বন্ধু এক বন্ধুকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে—যখন এর ওকে তথা ওর একে যা বলার সবই বলা হয়ে গেছে, কিন্তু ট্রেন ছাড়ছে না।"

ক্রমশ:

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ

রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশে মানে পূর্বপাকিস্থানে যুদ্ধ চলিতেছে, রক্তক্ষয়কারী এক অসম যুদ্ধ। একদিকে অস্ত্রবলে বলী পশ্চিম পাকিস্থান অপরপক্ষে সংখ্যা ও মনোবলে বলী বাংলাদেশ। এ যুদ্ধের পরিণাম কোথায়? সবাই চিন্তিত, বিচলিত বাংলাদেশ ও পাকিস্থানের পরিণাম ভাবিয়া। বিশ্বের সমগ্র মুসলমান রাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্থানের দিকে। কেবলমাত্র হিন্দু ভারতবর্ষ বাংলাদেশের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষে কি মুসলমান নাই? আছে এবং তাদের সংখ্যা নাকি প্রায় পাঁচ কোটি। কিন্তু তাহাদের অনেকের মুখে কথা নাই কেন? বাংলাদেশের সাহায্য ভাণ্ডারে তাদের উদার হস্তের দান আসিতেছে না কেন? যে নরমেধ যজ্ঞ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে তার বিরুদ্ধে তাহারা মিলিতভাবে দাঁড়াইতেছে না কেন? ইহার কারন হইল পাকিস্থানী ও তাদের বন্ধুদের কাছে পূর্ববাংলার মুসলমান হিন্দু বলিয়াই গণ্য। কথাটা মুখে কেহ বলিতেছে না বটে তবে আচারে ব্যবহারে তাহা প্রকট হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এই হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত পূর্ববাংলার মুসলমান খাঁটি মুসলমান হিসাবে গণ্য হইয়াছিল যখন পূর্ববাংলা থেকে হিন্দু বিতাড়নে তারা সক্রিয় হইয়াছিল। হিন্দুর জমি ঘর দখল করিয়া পাকিস্থানের হিন্দু বিতাড়নে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছিল।

পূর্বে ৬০ লক্ষ বাঙালী হিন্দু পূর্ববাংলা থেকে ভারতে আসিয়াছিল এবার আসিল বাদবাকী। যারা আসে নাই তারা মরিয়াছে কিংবা মরিবার অপেক্ষা করিতেছে।

পাকিস্থানের নিশ্চিন্ত হইবার কথা কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে কি?

নেহাৎ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে পাকিস্থানের বিরুদ্ধতা করিতে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল পূর্ববাংলার সাড়ে সাত কোটি মুসলমান। তারা স্থানীয় হিন্দুর উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে নাই, কারণ পূর্ব-বাংলার পরিত্যক্ত হিন্দুরা অর্থে, বুদ্ধিতে ও শক্তিতে ছিল দুর্বল। তবে তারা বুঝিল হিন্দু বিতাড়ন তাদের পক্ষে এক মারাত্মক ভুল হইয়াছে। সকল হিন্দু বিতাড়নে পূর্ববাংলার মুসলমান দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাদের সায়েস্তা করিতে সবল পাকিস্থানের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। তাই টিক্কা খানের সদম্ভ উক্তি বা আদেশ পাকিস্থানী সেনাপতির উপর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সব ঠাণ্ডা করিয়া ফেল। ঢাকার জন্য দিলাম ৩০ মিনিট। আমার মনে হয় ইয়াহিয়া মনে মনে পূর্ববাংলার উপর একটা সাহানশায়ী অত্যাচার করিবার ইচ্ছা গোপনে পোষন করিতেছিল। তিনি নাকি নাদির সার বংশ তিলক। তাই আকবর যাহা কল্পনা করেন নাই, ঔরংজীব যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই সেইরূপ একটা ব্যাপার তিনি করিবেন। অনুমান কাল্পনিক নয়। পাকিস্থানী সেনাপতিরা ইয়াহিয়াকে ইলেকশন করিতে নাকি নিষেধ করিয়াছিল, কারণ তারা বুঝিয়াছিল

ইলেক্‌শনে আওয়ামী লীগের অবশ্যম্ভাবী জয় হইবে। ইয়াহিয়া কি আওয়ামী লীগের জয়ের সম্ভাবনার কথা ভাবেন নাই? ভাবিয়াছিলেন বৈ কি। তবে আশা করিয়াছিলেন জয় যদি marginal হয় তবে জোড়াতালি দিয়া শাসনভার সামলাইয়া নিবেন।—তাকে আর বাধ্য হইয়া এই নৃশংসতা করিতে হইবে না। ইলেক্‌শনের পরও প্রায় দুই মাস চিন্তা করিয়াছিলেন। দুই পাকিস্থানের জন্য দুই প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। কিন্তু মুজিবর যখন তাহাতে কিছুতেই রাজী হইল না তখন তার সংকল্প স্থির হইয়া গিয়াছে। মুজিবরের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইয়াছিল শুধু সৈন্য ও সমরোপকরণ আনিবার সুযোগ হিসাবে।

ইয়াহিয়ার চালে কতকগুলি ত্রুটির সন্ধান পাই। প্রথমতঃ ফক্কার প্লেন ধ্বংস করা। এই ব্যাপারে ইয়াহিয়ার চেয়ে ভুট্টোর হাত বেশী ছিল অনুমান করি। ভুট্টো ভারতকে একটা রাষ্ট্র বলিয়াই মনে করে না। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে জঘন্য ভাষায় গালি দিয়াছে। ফক্কার প্লেন-এর বনফায়ার করিয়া ভারত জয়ের একটা কাল্পনিক তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ভারত বিদ্বেষ তার মজ্জাগত।

ভারতের উপর দিয়া over flight বন্ধ হইয়া যাইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা ভুট্টো বা ইয়াহিয়ার মাথায় আসে নাই। আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে আবেদন নিবেদনে কোন ফল নাই, ভারতকে ক্ষতিপূরণ দিয়া সব মিটমাট করিতে তারা বলিয়াছে। তা ভুট্টো বা ইয়াহিয়ার মনঃপূত হয় নাই। কারণ তাতে ভারতের কাছে তাদের মাথা হেঁট হইয়া যাইবে। সে সম্ভাবনা অসহ্য।

দ্বিতীয় হইল বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ রিফিউজী বিতাড়ন। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া মনে করিয়াছিল এই রিফিউজী আগমনের ফলে ভারত অর্থনীতিক কারণে ভাঙিয়া পড়িবে এবং বাংলাদেশের স্বপক্ষতার পথ ত্যাগ করিবে। কিন্তু কে যেন পাকিস্থানী কূটনৈতিক চাল গুলি বানচাল করিয়া দিল। লক্ষ লক্ষ রিফিউজী ভারতে আসিল ভারত অতি সহৃদয় ভাবে তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করিল। আওয়ামী নেতাদের আশ্রয় দিল ভারতের রেডিও, ভারতের নেতা বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারের জন্য দিকে দিকে প্রেরিত হইল। বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্বের দরবারে যে একটা অনুকূল মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে তা যে ভারতেরই দান তা অনস্বীকার্য্য।

পূর্ব্ব-বাংলাদেশের চিত্ত জয় ভারত করিল কি করিয়া? যে সৌহার্দ্য প্রীতি শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল —তাহা মঞ্জুরিত হইল সহানুভূতির বারি সিঞ্চনে। নর বহে হল নারি ঢালে জল তবেই না শস্যক্ষেত্র শস্যসম্ভারে হাসিয়া ভাসিয়া উঠে।

এমন যে মৌলানা ভাসানি সে আজ ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে ভারতের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে।

মুজিবুরও মনে হয় বহুদিন হইতেই চিন্তা করিয়া আসিতেছিল। পাকিস্থানের সঙ্গে যে একটা সংঘর্ষ আগতপ্রায় তা সে বুঝিয়াছিল। তাই সে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধ করার বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়াছিল। ফক্কার প্লেন সম্বন্ধেও তার উক্তি স্মরণীয়। সে সুনিশ্চিত বুঝিয়াছিল পাকিস্থানীদের সহিত আগামী সংঘর্ষে ভারতের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। ভারত প্রতিবেশী সুবৃহৎ রাষ্ট্র তার সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশ দাঁড়াইতে পারিবে না। এ বিষয়েও মুজিবুরের চিন্তা ঐশ্লামিক চিন্তা হইতে স্বতন্ত্র। মুসলমানী রাষ্ট্র অমুসলমানের রাষ্ট্র সহ্য করিতে পারে না। এ বিষয়ে মুজিবুর মুসলমানদের চির শত্রু ইহুদি জাতির নেতার উপদেশ মনে প্রাণে গ্রহণ করিল—Love thy neighbour as thyself।

রিফিউজী সমস্যায় ভারত ভাঙ্গিয়া পড়িল না। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র আজ ভারতের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। টাকা আসিতেছে, ঔষধ আসিতেছে,

খাদ্য আসিতেছে; সব চেয়ে বড় লাভ বিশ্বের সহানুভূতি।

এ যাবৎ বাংলাদেশের যুদ্ধের পশ্চাৎপট সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এখন আলোচনা করিব বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন। স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন উঠিলেই সরকারী মহল বলে এখনও উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই, আরও একটু ভাবিয়া দেখি ইত্যাদি জ.তীয় কথা বলিয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া যাইতেছে। তবে কি সরকার পক্ষ এ-বিষয়ে কোন চিন্তা করেন নাই, কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই? সরকার পক্ষ গভীর ভাবেব বিষয়টা চিন্তা করিয়াছেন এবং স্থির সিদ্ধান্তেই আসিয়াছেন। সরকার পক্ষের সিদ্ধান্ত হইল আমেরিকা বা রাশিয়া স্বীকৃতি দিলেই ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে, আগে নয়। কিন্তু এ-কথাটা উন্মুক্ত ভাবে লোক সভায় বলা যায় না, বিশেষ করিয়া যখন বিরোধী পক্ষ একবাক্যে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতি দান করিতে শুধু সোচ্চার নয় রীতিমত চাপ দান করিতে উন্মুখ। মনে রাখিতে হইবে সরকার পক্ষও বিরোধী পক্ষের উদ্দেশ্য কিন্তু এক নয়। সরকার পক্ষ সদা ব্যস্ত বিপদ এড়াইতে। বিরোধী দল চায় সরকারকে বিপদে জড়াইয়া ফেলিতে। এ প্রসঙ্গে Gladstone-এর উক্তি স্মরণীয়—"Times পত্রিকা যখন আমার বিরোধিতা করে তখন আমি নিশ্চিন্ত যে ঠিক কাজ করিয়াছি; কিন্তু Times যখন আমার কার্য্যের সমর্থন করে তখন মনে সন্দেহ হয় কাজটা বোধ হয় ভাল হয় নাই।"

বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে ভারত সরকার একটু বেকায়দায় পড়িবে। ভারত বাঙলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সর্বাগ্রে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে বাঙলাদেশের শত্রুগোষ্ঠী ভারতের আচরণের কদর্থ করিবে এবং ভারত স্বার্থপরবশ হইয়াই স্বীকৃতি দিয়াছে এইরূপ উদ্দেশ্য রঙচঙ ফলাইয়া ফলাও করিয়া প্রচার করিবে। আর প্রকৃতপক্ষে এ যাবৎ ভারত নিরপেক্ষ থাকিয়া যাহা করিতেছে তার অধিক কিছু করার পথ বা সম্ভাবনা নাই। তাই স্বীকৃতির ফলে বাঙলাদেশের সমূহ লাভের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিপদে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া একান্ত নিস্পৃহ ও উদার ভাবে সীমাতীত ক্ষতি বরণ করিয়া লইয়াছে সেই মহত্বের ঔজ্জ্বল্য বিশ্বরাষ্ট্রের চোখে কিছুটা ফিকে হইয়া যাইবার আশঙ্কা অমূলক কি? তাই মনে করি ভারত সরকার যে স্বীকৃতি দান বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত তাহা অযৌক্তিক নয়।

এখন আলোচনা করিব শেষ প্রশ্নের—বাঙলাদেশের যুদ্ধে ভারতের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে পুরাপুরিভাবে যোগদান করার প্রশ্ন। ভারত বাঙলা দেশের যুদ্ধে লিপ্ত হইলে মনে হয় একদিনেই যুদ্ধ মিটিয়া যায়। কিন্তু আশঙ্কা যুদ্ধ মিটিয়াও মিটিবেনা। কূটনীতিক জটাজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে মাত্র। ফয়সালা হইতে বহুদিন লাগিবে। যেমন কোন ফয়সালা হয় নাই অদ্যাবধি আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের। পক্ষান্তরে ভারত পাকিস্থানী যুদ্ধের ফয়সালা যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া গিয়াছে—তা হইয়াছে ভারতের উদারতা ও সবলতার জন্য। ভারতের status quo ante মানিয়া নেওয়ায়। ভারত বাঙলা দেশের যুদ্ধে লিপ্ত হইলে কি হইবে বলা কঠিন নয়। কর্ম্মব্যস্ত উ-থান্ট সব কাজ ফেলিয়া একহাতে বাঁশের বাঁশরী ও অন্য হাতে রণতূর্য্য লইয়া নয়—তিনি আসিবেন এক হাতে শ্বেত পতাকা আর একহাতে এক জোড়া শ্বেত পারাবত লইয়া—আর অতি সুন্দর সুললিত ভাষায় ইন্দিরা গান্ধীকে বলিবেন—আপনার বাণ অতি তীক্ষ্ণ, আপনার লক্ষ অব্যর্থ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষীণজীবী হরিণ শিশুকে বধ করিবেন না, করিবেন না —All disputes should be settled by negotiation and not by war. এরূপ কথা কি মহাত্মা গান্ধী ও আপনার স্বনামধন্য পিতা বলেন নাই। ভারত যে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই বা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে নাই তাহা ভারতের পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হইয়াছে। ভারত বেচাল হইলে সমস্ত ব্যাপারটা উ-থান্টের হাতে গিয়া পড়িবে, তার মানে গোলমালের আশু নিষ্পত্তি

হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। দিনের পর দিন শুধু আলোচনা চলিবে, লক্ষ লক্ষ ডলারের পেট্রোল পুড়িবে, যাতায়াতে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়িত হইবে। কাজের ফয়সালা কিছুই হইবে না। বরং যে অবস্থা চলিতেছে তাহাই সুব্যবস্থা; অনেক সময় নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও অনেক কাজ করা যায়। They also serve God who stand wait. সেই নিষ্ক্রিয়তার কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অস্ত্রের খেলা শেষ হইয়াছে। বোমা বর্ষণ বা গোলা বর্ষণ প্রায় নাই। গরিলারা খুচখাচ প্রতিদিন অল্পসংখ্যক হইলেও পাকিস্থানী সৈন্য মারিতেছে। পাকিস্থানী সৈন্যরা মনে হয় ব্যাংকের লুণ্ঠিত টাকা লইয়া ফ্ল্যাস খেলিতেছে, আর অপহৃত বাঙালী জেনানা লইয়া ফুর্তিফার্ত্তা করিতেছে।

বাঙলাদেশ ত্যাগ করিবার কিছু কিছু লক্ষ্যণও প্রকাশিত হইতেছে, মিলগুলি তুলিয়া পশ্চিম পাকিস্থানে লইয়া যাইবার সংবাদ বাহির হইতেছে। স্কুল-কলেজ-অফিস লোকের অভাবে সব বন্ধ। মুসলীম লীগের স্বপক্ষতাও শিথিল—একটা ধামাধরা সরকারও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। সর্বোপরি অর্থনীতিক চাপে খাস পাকিস্থান খণ্ড খণ্ড হইবার সমূহ আশঙ্কা। নোট বাতিল, Stock Exchange বন্ধ। সোনাদানাও বাজেয়াপ্ত হইবার গুজবে রটিত। পাকিস্থানী প্রতিনিধিরা ভিক্ষাপাত্র হাতে পশ্চিমী রাষ্ট্রের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। এখনও কি প্রশ্ন করিবেন, বাঙলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিবেন? বাঙলাদেশের পনের আনা স্বাধীনতা লব্ধ হইয়া গিয়াছে। বাকী এক আনা লাভ করিতে আরও কিছু লোকক্ষয়, স্বীকার করিতে হইবে। যদি ইতিমধ্যে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ লাগিয়া যায় তবে মনে হয় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে ছয় মাসের বেশি সময় লাগিবে না।

হে উৎপীড়িত লাঞ্ছিত ভাই বোন, আর একটু ধৈর্য্য ধর, আরও একটু সহ্য কর। দিন আগত ঐ॥

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অগ্রহায়ণের মধ্যামাঝি। শীত এখন বেশ চেপে পড়েছে। দিন যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। বেলা তিনটের পরই মনে হয়, যেন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। হবে না কেন? পলাশপুরের চারদিকেই তো বড় বড় আম বাগান—কাঁঠাল বাগান—বাঁশ বন, বাবলা বন সব জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রাম্য পথের দুপাশে, বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, কুল ও বেলগাছ। আশে-পাশে ডোবা। ডোবার দুই পাশে ঘন বন। বাঁশঝাড় কোথাও নুয়ে পড়েছে, ঠিক ধারাল বর্শার ফলার মত, ঘন বাঁশপাতাগুলো। সমস্ত জায়গাটা অন্ধকার হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। তলার জমিতে বৈটি, শেওড়া, কাঠরঙ্গা আর কাঁটা শেয়াকুলের গাছ। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাল খেজুরগাছের সারি। যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু বন আর বন।

এখন এখানে ওখানে খেজুর-গুড়ের বান হয়েছে। কোথাও দুচোখো আর কোথাও চারচোখো আঁকা। মস্ত বড় মাটির হাঁড়িতে খেজুর রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। সকালবেলায়, বানের কাছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ গায়ে কাঁথা জড়িয়ে, কেউ বা পুরানো র‍্যাপার জড়িয়ে, এসেছে। কেউ বা [illegible] [illegible] গামছা দিয়ে, উনুনের পাশে বসে কিঃ হিঃ করে শীতে কাঁপছে। ওরা একটু রস চায়। রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে, কালি বাউড়ি খেজুরগাছে উঠে হাঁড়া পাড়তে সুরু করেছে। ওর আট কুড়ি গাছ। রোজ অবশ্য আট কুড়ি গাছে, হাঁড়া ঠাঙ্গায় না। গাছের মাঝে মাঝে জীরেন যায়। যে গাছগুলো জীরেন যায়, তারপর তার রস হয় অতি মিষ্টি—যেন অমৃতের মত। দোকাট, বা তেকাটের রস ভাল হয় না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা রোজই আসে। বানে বসে রস খায়—আর ঘটি ভরে রস নিয়ে যায়। দুপুরে ওরা আবার আসে। কালি যখন পাটালি গুড় করে, তখন এসে ওরা দাঁড়ায়। গুড়ের মিষ্টি গন্ধে, সমস্ত বনভূমি মিষ্টি সুবাসে ভরে যায়। পাটালি হয়ে যাবার পর, হাঁড়ি চেঁচে যে চাঁচি বেরোয় তার লোভে পাড়ার ছেলেমেয়েরা ভীড় করে। কালি লোকটা ভাল। সব ছেলের হাতে একটু একটু করে চাঁচি দেয়। কেউ বারণ করলে ও বলে, আহাঃ—। গুড় তো বাপু ছের-কাল হচ্ছে না—খাক্ খাক্ ওরা। ওরা নারাণের তুল্য। ওদের সেবা করাই তো আসল কাজ গো। গাঁয়ে গাঁয়ে এখন গুড়ের বান সুরু হয়েছে। ছেলেরা বানে বসে রস খায়—রস বাড়ী নিয়ে যায়। গুড়ের চাঁচি—গুড় নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ী যায়।

লোকে এখন ব্যস্ত—চাষীরাও ব্যস্ত। নবান্নের ধান পেকে উঠেছে। এই মাসেই তো নবান্ন। বাইশ আর তেইশ তারিখে দিন। তারপর আর দিন নেই। তাই চাষীরা ব্যস্ত। নবান্নের ধান কাটা সারা। ধান পেটান হবে, তারপর সেই ধান সেদ্ধ হবে—রোদে দেওয়া হ'বে। ইতিমধ্যে ঘরে ঘরে ঢেঁকির শব্দ উঠছে। দীর্ঘ এক বছর পর মা লক্ষ্মী ঘরে আসছেন। নবান্ন হ'বে—জ্ঞাতি কুটুম্ব—বন্ধু বান্ধব তারা আসবে—খাবে দাবে—আমোদ আহ্লাদ করবে। এটা যে কত সাধের দিন—কত মঙ্গল—আর আনন্দের দিন। ছেলেরা সব নবান্নের দিন গুণছে। ঘর দোর নিকানো আছে জামা কাপড় ফরসা করতে হ'বে—বাসন-কোষণ হাঁড়ি-কলসি সব মাজা ঘষা আছে। এ-নবান্ন শুধুমাত্র মানুষের একা অমোদ-আহ্লাদ নয়। এর সঙ্গে পশু-পাখী কীট পতঙ্গ, সমস্ত জীব, ঠাকুরের প্রসাদ পাবে। এক কথায়, সর্বজীব নব অন্নের প্রসাদ পাবে। তবেই তৃপ্তি তবেই মঙ্গল আর আনন্দ। সারা পৃথিবী সারা বিশ্ব জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্ততেই তো ভগবানের আসন। তিনি ছাড়া তো বিশ্ব নেই—জীব নেই। কেবা জীব আর কেবা জড়। সবই জীব—সবই সজীব। এ বিশ্ব তো তিনিই—আর তিনিই তো বিশ্ব। তিনি ছাড়া আর কে? তাই হিন্দুর সমস্ত কাজ কর্ম্ম সমস্ত জীবকে নিয়েই। সর্ব্বজীব প্রীত হলেই, তিনিই প্রীত। সর্ব্ব জীবের মঙ্গল করাই তো ধর্ম্ম। সর্ব্ব জীবের সেবাই তো তাঁকে সেবা করা।

অগ্রহায়ণ মাসের ছোট দিনের বেলা, কমে আসতে থাকে। পলাশপুরের সরু পায়ে চলা পথের উপর, আর আম, জাম, কাঁঠাল, বনের ভেতর সূর্য্যের শেষ আলো, আরও স্তিমিত হয়ে আসে। মাঠের ভেতর থেকে, ঘরে ফেরার জন্যে, গরুর পালের হাম্বা রব ভেসে আসে। ভেসে আসে, রাখালদের হাঁক্ ডাক্—পাখীর কিচির মিচির। সহর থেকে ফিরে আসছে সব। যারা গিয়েছিল সহরের বাজারে দুধ, মাছ, তরিতরকারী বিক্রি করতে তারা এখন ফিরছে। ভীন্ গাঁ থেকে হাটুরেরা এক পা ধূলো মেখে, শূন্য ঝাঁকা নিয়ে, গল্প করতে করতে ফিরছে। পাঠশালার অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে—ছেলেরা দল বেঁধে কলরব করতে করতে ধূলো উড়োতে উড়োতে বাড়ী ফিরছে।

মাঠের ওপর সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে। পলাশপুরের ঘরে ঘরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নেমে আসে। ছায়া নেমে আসে-মাঠে-ঘাটে-বনে-প্রস্তরে, ও পাড়ার বড় চৌধুরী পুকুরে। বাঁশবনের মাথায়—ভাঙ্গা শিব মন্দিরের চূড়ায়। শিব মন্দিরের চূড়ায় এক ঝাঁক টিয়েপাখী। সবুজ ডানা মেলে, ওরা উড়ছে—বসছে। ওধারে মাঠের মাঝে শালিক, চড়ই, ময়না, ঝুঁটি বাঁধা লাল ঠোঁট বুলবুলি-বুঝি পাকা ফলের লোভে এসেছে। ওদের দেখলে, চোখ জুড়িয়ে যায়। এক ঝাঁক লাল সবুজ টিয়া-এর লাল ঝুটি বাঁধা, লাল ঠোঁট বুলবুলি, ওরা পাকা পাকা তেলাকুচোর ফল খাচ্ছে—শীষ দিচ্ছে—ডালে বসে লেজ দোলাচ্ছে। ততক্ষণ পায়ে পায়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—পলাশপুরের বনে-রাস্তায়-পুকুরে-ডোবাতে। একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডানার শব্দ উঠছে —ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ—

তখনও বেশ অন্ধকার। উঠানের আমগাছটা অন্ধকারের মাঝে এক গাদা ধোঁয়ায় মত মনে হচ্ছে। আকাশে ভোরের তারাটা ঝক্‌ঝক্ করছে। বেশ শীত, অভয় দিব্বি কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। ও ঘরে গীতা আর খোকন ঘুমুচ্ছে। সরোজিনী বিছানা ছাড়তেই গোপেশ্বর জানালা খুলে বললেন—করছ কি? এখনও বেশ রাত। কি ঠাণ্ডা পড়ছে—এখন উঠো না—ঠাণ্ডা লেগে অসুখ বিসুখ করবে। সরোজিনী বললেন, আর সকাল হতে বাকি কি? আজ বচ্ছরকার দিন। ঘর দোর সব নিকোতে হ'বে। আগে গরু বাছুরকে খেতে দিই। গীতা, খোকন ঘুমুচ্ছে ওরা ঘুমুক। এখন উঠলে, পেছন পেছন খালি ঘুরবে। সরোজিনী ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলেন। গোপেশ্বর তামাকের জায়গা টেনে নিয়ে, কলকেতে তামাক সাজতে বসলেন।

আজ নবান্ন। সকলের বাড়ীতেই আজ নবান্নের উৎসব। যার যেমন সাধ্য, তেমনিভাবে উৎসব করবে। গ্রাম্য দেবতার স্থানে পুজো দেবে। প্রসাদ এনে বেলা নটার মধ্যে, নবান্ন সেরে ফেলতে হ'বে। নটার পর আর ভাল সময় নেই। তাই সকলে ব্যস্ত। ঠাকুর বাড়ীতে নৈবদ্য পাঠাতে হ'বে, গরু বাছুরের কপালে হলুদ আর সিঁদুরের ফোঁটা দিতে হ'বে। আত্মীয় স্বজন দু একজন খাওয়া দাওয়া করবে। নূতন তরকারী, আলু, কপি, নূতন খেজুর গুড়, আর নূতন চাল চাই। দুধ দিয়ে পায়েস রান্না হ'বে। নানান্ শাক, দু চার রকম তরকারী, যার যেমন সাধ্য তাই করবে। তাই আজ আর অবসর কোথায়? ঠাকুর বাড়ীতে, শাঁক, ঘণ্টা বাজছে—ভোরের আরতি সারা হ'ল। সরোজিনী ডাকলেন—ও অভয় ওঠ্ ওঠ্। আজ যে অনেক কাজ আছে বাবা। অভয় ঘুম চোখে, বিছানায় উঠে বসে। গায়ে কাঁথা জড়িয়ে বসে বসে ঢুলতে থাকে। মায়ের ডাকে, ঘুম চোখেই সাড়া দেয় —হাঁ যাচ্ছি—

—যাচ্ছি বলে, আবার যেন শুয়ে পড়িসনে বাবা। ভাবছি, বিদেশে পরের বাড়ি গিয়ে কি করবি তুই। সেখানে তো মা থাকবেনা—। ওঠ বাবা। মুখে চোখে জল দে। ওরা যেন এখন এই ঠাণ্ডায় না ওঠে। আমি গরুটাকে সরিয়ে বাঁধি—। ততক্ষণে মানুষের সাড়া পেয়ে, বাছুরটা ডাকতে সুরু করেছে।

হুঁকো হাতে করে, খড়ম পায়ে দিয়ে, গোপেশ্বর ভগবানের নাম করতে করতে উঠোনে নেমে এলেন। তখনও ভালভাবে ফরসা হয়নি। আম, কাঁঠাল গাছের পাতায় পাতায় রাতের ঘুম আর অন্ধকার জড়ান। শুকতারাকে আর দেখা যায় না—এক ফালি চাঁদ ঝিক্‌মিক্ করছে। পেঁপে গাছের পাতা দিয়ে, টুপ্ টাপ করে শিশির পড়ছে। দেখে মনে হয়, রাতে যেন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

পূবের আকাশ দেখতে দেখতে ফরসা হয়ে এল। অভয়দের বাড়ীর উঠানে মানদা বোষ্টমী নাম গান গাইছে। কোমর পাড়া থেকে হাঁড়ী, কলসী গড়ার ঢুক্‌ঢাক্ শব্দ ভেসে আসছে। চিড়ে কোটার শব্দ হচ্ছে—। চিড়ে কুটছে নন্দ গয়লানী—। অভয় নিমের দাঁতন করতে করতে কুয়ো তলায় এল। এখন শীত করছে বেশ। ততক্ষণে গীতা খোকন উঠে পড়েছে। সরোজিনী রান্নাঘর থেকেই বললেন, তোরা গায়ে জামা কাপড় দে। ঠাণ্ডা লাগাস্‌নে—। খোকন কাঁদতে সুরু করতেই গীতা ছোট ভাইকে ভোলাতে লাগল—ছিঃ আজ যে নবান্ন। আজ কাঁদতে নেই। কত রান্না বান্না হ'বে পায়েস হ'বে। আমরা সকাল সকাল চান সেরে ঠাকুর বাড়ীতে পুজো দিতে যাব। পেসাদ এনে তবে তো নবান্ন হ'বে। গীতা ভাইয়ের চোখ মুছিয়ে কুয়ো তলার দিকে গেল।

অভয় ডাকল—গীতা মাজন দিয়ে ভাল করে দাঁত মাজ। নইলে দেখবি শেষে মজা। দাঁতে পোকা হ'বে তখন কান্নার ঠেলায়, কেউ বাড়ীতে টিকতে পারবে না। খোকন বলে, দাদা—ওদের নাড়ুর দাঁতে এই এত বড় বড় পোকা। হারাণের মা মন্তর দিয়ে, পোকা বের করে দিল। পোকাগুলো কালো কালো—মস্ত বড় বড় পোকা—গীতা থুঃ-থুঃ করে থুতু ফেলল। ছিঃ পোকা দেখে ঘেন্না লাগে। মানুষের মুখের ভেতর অত বড় পোকা—অভয় বলল—হ'বে না। ভাল করে দাঁত না মাজলেই, ঐসব হয়। তোরা তো দিন রাত মুখ চালাস্—কিন্তু ভালকরে মুখ ধোয়ার পাট নেই। দেখিস্ ঐ নাড়ুর মত দাঁতে পোকা হ'বে— দাঁত ফুটো হয়ে যাবে—গাল ফুলে যাবে। তখন মজা টের পাবি—

দাদার কথায়, গীতা খোকন দাঁত মাজতে থাকে। খোকন অভয়কে বলে—দাদা দাঁত ফক্‌সা হয়েছে—

ছিঃ ছিঃ করে হেসে গীতা বলে—খোকন ফরসা বলতে পারে না। ফরসাকে বলে ফকসা—।

রান্নাঘরে নিকানো শেষ হয়েছিল। ওদিকে যেতে যেতে সরোজিনী বলেন—এই দেখ, মেয়ের হাসি। সকালবেলায় এত হাসি কেন রে? নে মা, তাড়াতাড়ি

মুখ ধুয়ে নে। আজ, রাজ্যের কাজ পড়ে আছে। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে—কখন কি হ'বে সব। বেলা নটার মধ্যেই ভাল সময়—তারপর বারবেলা পড়বে। তোর বাবা তো মুখ হাত ধুতে গেছেন। বাইরের উনোনটায় চায়ের জল চাপিয়ে দে—সরোজিনী এক বালতি জল তুলে বললেন, খোকন আজ সকালে কিছু খেতে নেই। বেশ ঠাণ্ডা—একটু চা খাও। নবান্নের পর আজ খেতে হয়। ঠাকুরের পেসাদ আসবে—তারপর চান করে, ভাল জামা প্যান্ট পরবে।

গীতা বলল—গরু-ছাগল-কুকুর-পাখী সকলকে নবান্ন দিতে হয়—। না—মা ?

—হাঁ। সব জীবকেই নোতুন জিনিষ দিতে হয়। সব জীবের সাধ মিটলেই ভগবানের সেবা হয়। জীবে দয়াই আসল কাজ মা। ততক্ষণ বাইরের উনুন জ্বলে উঠেছে। অভয় কেটলি করে, জল চাপিয়ে দিয়েছে। রাস্তার ওধারে ছেলেরা কলরব করছে। চানটান করে, এর মধ্যেই অনেকেই ঠাকুর বাড়ী পুজো নিতে যাচ্ছে। ও পাড়ার নিরদ সে অভয়ের সমবয়সী। নিরদ রাস্তা থেকে হাঁকে অভয় ও অভয়। অভয় সাড়া দেয়। নিরদ এখন পড়াশুনা করে না। নিরদ সুরেশ ছুতোরের ছেলে। বাবার সঙ্গে ভীন্ গাঁয়ে কাঠের কাজ করে। নিজেরাই একটা ছোটমত কাঠের কারখানা খুলেছে। চেয়ার, টেবিল, জলচৌকি, আলমারী, দরজা জানালা এইসব তৈরী করে। বাপ বেটাতে এখন বেশ অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। দিন কতক ওদের কি কষ্টই না গিয়েছিল। অনেকদিন পর নিরদকে দেখে অভয়ের খুব আনন্দ হ'ল। অভয় বলল, আমি ভাই, এখানে আর থাকছিনে। মালদায় জেঠাবাবুর কাছে পড়তে যাব। এখান থেকে তো পড়ার কোন সুবিধে নেই। যাক্, অনেকদিন পর, তোর সঙ্গে দেখা কেমন আছিস্ বল্। কাজ কারবার ভাল চলছে তো। তোর বাবা এখানে এসেছেন নাকি ?

নিরদ বলল— হাঁ, আজ নবান্ন সেরেই চলে যাব। আমাদের তো কাজ কামাই করলে চলে না। সামনে একটা মেলা আসছে। মেলার জন্যে হরেক রকম জিনিষ তৈরী করতে হয়। এখন তো দিনরাত কাজ। নিরদ আরও কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যায়। অভয় তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। ওরা একসঙ্গে পড়ত-লেখাপড়ায় যে খুব ভাল ছিল তা নয়। কিন্তু অঙ্কটা বুঝত ভাল। কঠিন কঠিন অঙ্ক টক্ করে, কষে দিতে পারত। যাক্ ও এখন ভালই আছে। ম্যাট্রিক পাশ করে, ও বড় জোর একটা কেরাণীর কাজ পেত। তার চেয়ে, নিজেদের জাত ব্যবসা করছে এই ভাল। স্বাধীনভাবেই আছে। কারুর কাছে, এক আধ মিনিট দেরীর জন্যে, বা দু একদিন কামাইয়ের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে না। চোখ রাঙানী দেখতে হ'বে না। ওরা বেশ আছে। নিরদ বার বার বলে গেছে, যদি সময় পায়, সে যেন, এক ফাঁকে তাদের বাড়ী যায়। সে যাবে। অনেককাল পর পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। নিশ্চয়ই যাবে সে। সুরেশ কাকাও খুব খুসী হ'বে।

পথের বাঁকে নিরদ হাত নেড়ে বলে, যাস্ কেমন ? অভয়ের মন নাড়া দিয়ে ওঠে। এই এক বিচিত্র অনুভূতি।

গ্রামের পথ। শীতের সকাল। গত রাতের শিশিরের দাগ। রাস্তার ধারে ধারে গাছের ঝরে পড়া পাতাগুলো তখনও ভিজে ভিজে। সকালবেলার সোণার রোদে, ঘাসগুলো ঝিক্‌মিক্ করছে। রাস্তার পাশে পাশে আম কাঁঠাল বাঁশবন। সহসা রোদ ঢোকে না—। দিনরাত ছায়া ছায়া। একটা সোঁদা গন্ধ, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

আজ নবান্ন। একটা আনন্দের দিন—পবিত্র দিন। ছেলেমেয়েরা স্নান সেরে, কাচা কাপড় পরে, পেতলের রেকাবিতে করে, পুজোর নৈবিদ্য নিয়ে যাচ্ছে। ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে বোঝাই গরুর গাড়ী চলছে। নতুন ধানের গন্ধ সে এক অদ্ভুত মনোরম। বিচিত্র ভাষায়, গরুর লেজ মলতে মলতে গাড়োয়ান গাড়ী চালাচ্ছে। ধুলো উড়োতে উড়োতে, গ্রাম থেকে

গাড়ী ভীন্ গাঁয়ে চলে যাচ্ছে। বাঁশবনের বাঁশের পাতায় পাতায় বাতাসে কাঁপন উড়ছে। একসময় ঝির্ ঝির্ করে, ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। অভয় আশ্চর্য্য হয়ে যায়। রাস্তা জোড়া এক মস্ত মাকড়সার জাল। এতক্ষণ সে দেখেনি। রাস্তার এ পাশের পিটুলি গাছের মাথা থেকে ও পাশের ফলসা গাছটার মাথা পর্য্যন্ত বিরাট মাকড়সার জাল। সেই জালের মধ্যে বসে রয়েছে মস্ত বড় মাকড়সা। অভয় তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ মাকড়সাটি, জালের ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়োতে থাকে। জালে ধরা পড়েছে মস্ত এক সবুজ রংয়ের মাছি। ম্যাছিটা পালাতে পারছে না। অভয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ কানে আসে, বাবা ডাকছেন—অভয়—অভয়—কোথায় রে তুই। যুগবৎ গীতা আর খোকনের ডাক শোনা গেল—দাদা আয়। চা জুইরে গেল জুইরে গেল—। এ ডাক খোকনের।

অভয় হাসতে থাকে।

গোপেশ্বর স্নান সেরে, গরদের ধুতি আর গরদের চাদর গায়ে দিয়েছেন। এ দুটা জিনিষ অনেক দিনের। সেই বিয়ের সময়কার। চাদর আর ধুতি বহু জায়গায় পোকার অত্যাচারে ফুটো হয়ে গেছে। ধুতি আর চাদর দিয়ে নেপ্থিলনের মৃদু গন্ধটা ভেসে আসছে। নূতন চাল, দুধ, নূতন গুড় আখ, লেবু, কিস্মিস্, কলা—এই সব দিয়ে নবান্ন মাখা হয়েছে। ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ, সেই নবান্নের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, গোপেশ্বর চোখ বন্ধ করে, ভগবানের নাম জপ করছেন। সমস্তই ভগবানের প্রসাদ। তিনি প্রীত হয়ে সব গ্রহণ করুন। তিনি প্রীত হলেই, সকলের মঙ্গল—জগতের মঙ্গল—সর্ব জীবের মঙ্গল। পূর্ব্ব-পুরুষদের উদ্দেশ্যে—নবান্ন নিবেদনের পর, গোপেশ্বর বললেন, পাতায় করে নবান্ন দিচ্ছি। বাইরে গোয়ালঘরে, গরু, ছাগল, কুকুর, পাখী, পিঁপড়ে—সবকে আগে দাও। সর্বজীবে প্রসাদ দাও। সর্বজীব তৃপ্ত হলেই সকলের তৃপ্তি আর মঙ্গল। ওতেই ভগবান প্রীত হন। নারায়ণ—নারায়ণ—

বাইরের উঠোনে ছেলেরা আসন পেতে নবান্ন খেতে লাগল। সরোজিনী বললেন, গীতা খোকন বেশী খেও না। এর পর ভাত খাবে।

গোপেশ্বর কিছু মাছ যোগাড় করেছিলেন। কিছু ভাজাভুজি, ডাল, মাছের তরকারী, টক্ আর পায়েস। সরোজিনী অতি যত্নে রেঁধে যাচ্ছেন। দুলে বউকে, কেদারের মা, এদের দুজনকে খেতে বলেছেন। সরোজিনীর সই চাঁপা বৌকে পই পই করে বলে এসেছেন। ছেলেদের আর গোপেশ্বরের আর দু এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে। কিন্তু এবেলা আর কেউ যাবে না। গোপেশ্বর বলে পাঠিয়েছেন রাত্রে যাবেন। ছেলেদের মধ্যে শুধু অভয় যাবে। নবান্ন খাওয়ার পর অভয় বলল, বাবা, আমি নিরদদের বাড়ী যাচ্ছি। সে এসে বার বার বলে গিয়েছে। না গেলে ভারী দুঃখ পাবে। তা-ছাড়া ওরা আজই বিকেলে চলে যাবে। গোপেশ্বর বললেন—যাও। তবে বেশী দেরী না হয়—

সরোজিনী বললেন—আহাঃ যাক্। সেদিন আমার সঙ্গে দেখা হল। প্রণাম করে বলল, পড়ার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হ'ল না। বাবা এই কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। আহাঃ ছেলেটার কথাবার্তা খুব ভাল। তাছাড়া খোকা আমার বিদেশে যাবে। পুরাণো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবে বৈকী।

বাংলার পল্লী অঞ্চলে আজ একটা স্মরণীয় দিন। পল্লী বাংলার অখ্যাত অবজ্ঞাত চাষী, জেলে, কামার, কুমার,—দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আজ সকলের কাছে এটা শুভদিন।

তিনশো পঁয়শট্টি দিনের যতেক দুঃখ-বেদনা-অভাব অনটন, কত রকমের গ্লানি থেকে মানুষ আজ মুক্ত হবে। প্রাণ খুলে আজ ওরা আনন্দ করবে। কাল কি হ'বে, সে কথা আজ নবান্নর দিন আর ভাবে না। যার যা সাধ্য, তাই দিয়ে, নবান্নর উৎসব পালন করে। ঘরে ঘরে আজ তাই উৎসব। সারা বৎসর চাষ করার পর, সেই পুরস্কারের ফল আজ এতদিন পর ঘরে উঠেছে।

সোনার ধান স্বয়ং মা লক্ষ্মী ঘরে এসেছেন। এসেছেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ঈশ্বরের পবিত্র আশীর্বাদ নিয়ে। গোলার চালে নূতন খড়—সারা বাড়ী ঘর দুয়ার উঠান সব আজ ঝকমক্ করছে। ঢেঁকিশালে ঢেঁকির শব্দ হচ্ছে। আজ চারিদিকে শুধু আনন্দ—মা লক্ষ্মী ঘরে এসেছেন। এই তো আমাদের দেশ। এই তো সত্যিকার দেশের ছবি—এই তো আমার স্বদেশ জননী।

অনেক বেলায় অভয় ফিরে এসে বলল—মা আজ খুব খেয়েছি। পেটে একটুও জায়গা নেই। সুরেশকাকা ছাড়ল না—নিরদও ছাড়ল না।

সরোজিনী বললেন, তবে আর খাসনে। রাতে আবার তোদের পাঁচুকাকায় বাড়ী নেমতন্ন। এখন ওঘরে পাটি বিছিয়ে দিচ্ছি—চুপ করে শুয়ে থাক্‌গে—

অভয় বলল, তোমার হ'ল নাকি?

হ্যাঁ হয়েছে। শুধু সইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। এলেই আমরা বসে যাব। ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে। শীতের বেলা তো দেখতে দেখতে চলে যাবে। হ্যাঁরে, মন্মথর কোন খবর পেলি?

—না মা। কোন খবর নেই। যুগলকাকার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। খবর জিজ্ঞাসা করব কি? আমাকে দেখেই কট্‌মট্ করে তাকাতে লাগলেন। যেন মোনাদার চলে যাওয়ার জন্যে, আমিই দোষী। কোথায় যে আছে তা কেউ জানে না। সরোজিনী বললেন, লোকে বলছে তাকে নাকি পুলিশে ধরেছে। গান্ধীজির চেলা হয়েছে—চরকা কাটে। কোথায় যেন বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে দিয়েছিল, এই সব কথাই তো ঘাটে শুনতে পেলাম।

—হ্যাঁ, তাও হতে পারে। এখন তো চারদিকেই এই সব ব্যাপার। হাজার হাজার লোকজন সারা ভারতে এই সব কাজ করছে। মদের দোকানে গিয়ে বলছে,—ভাই সব ওই মদ খেয়ো না। গাঁজা খেও না।

সরোজিনী বললেন, এসব তো ভাল কথা। তা এর জন্যে ইংরেজ ধরছে কেন? সরোজিনী অবাক হয়ে যান। বেলা পড়ে আসে। নির্জ্জন পলাশপুর গাঁয়ের চারধারে শুধু বাঁশবন, ডোবা, আর আম কাঁঠালের বন। কোথাও বা কাঁটানটে, শেয়াকুল, সাঁইবাবলা, আর আলাকুশি জড়াজড়ি করে রয়েছে। বড় বড় প্রাচীন বট অশ্বত্থ গাছ। এরা যে কতদিনের তা এদের বয়সের হিসেব কেউ দিতে পারে না। এই গাঁয়ের—আর পার্শ্ববর্ত্তী গাঁয়ের কত ঘটনা কত লোকজন কত সুখ-দুঃখের নীরব সাক্ষী এই এরা। কত উত্থান-পতন হয়েছে। কত শিশু জন্মেছে—তারা বড় হয়েছে—বৃদ্ধ হয়েছে—আবার তারাও একদিন দুই চোখ বন্ধ করেছে। আবার তাদের মৃত হিম-শীতল দেহ নিয়ে ঐ বৃদ্ধ বটগাছের তলা দিয়ে বাঁশবন, আমবন, কাঁঠাল বাগানের—পাশ দিয়ে, শব যাত্রীরা হরিধ্বনি দিয়ে তাকে নিয়ে গেছে। সে আর ফেরেনি। এসব কিছুর সাক্ষী—ঐ বৃদ্ধ বট আর অশ্বত্থের গাছগুলো। বনের পর মাঠ—। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সার সার তাল গাছ। মাঠের এখানে ওখানে খেজুর গাছ। কোনটা বুড়ো হয়ে গেছে, কোন রকমে শুকনো পাতার বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত মাঠ জুড়ে বুনো কুল, কয়েৎবেল গাছ। মাঝে মাঝে নোনা আতার বন। গাছে নোনা আতা পেকে পেকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। গাঁয়ের লোক বড় একটা এদিকে আসে না। রাখাল ছেলেরা দল বেঁধে এখানে গরু চরাতে আসে, মাঝে মাঝে। নতুবা সমস্ত দিন রাত, এই সব বন বাদাড়—মাঠ-ঘাট একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় লোক চলাচলহীন ভাবে পড়ে থাকে।

পৌষ মাস এসে গেছে। বেশ শীত। সকালবেলায় এত কুয়াশা যে, একহাতের মধ্যে কাছের লোক দেখা যায় না। খুব গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশা পড়তে থাকে। চারদিক শুধু অন্ধকার। সূর্য্য উঠতে অনেক দেরী হয়। পৌষ মাসটা শেষ হলেই অভয়কে দেশ ছাড়তে হবে। যতদিন যায় ততই অভয়ের মন খারাপ হতে থাকে। এই পরিচিত গ্রাম ছায়া ঘেরা গ্রাম্য পথ ঐ ষষ্ঠীতলা গোপীনাথের মন্দির, দিঘী, বসাকদের পুকুর—এ সব ছেড়ে তাকে যেতে হবে। মা, বাবা, গীতা—খোকন, এদের যে, সে কতদিন দেখতে পাবে না, তা ভগবানই জানেন। গীতা

আর খোকনের জন্য বড়ই মন কেমন করবে। না জানি ওরা কত কাঁদবে। দিন রাতই তো, ওরা দাদা, দাদা বলে পেছন পেছন ফেরে।

অভয় হাঁটতে হাঁটতে কখন যে মন্মথর দোকানের সামনে এসেছে তা জানে না। মন্মথর মুদীখানা বন্ধ। যুগলকাকার বাড়ীর দিকে তাকাল অভয়। না—যুগল কাকার খিড়কী দরজা বন্ধ। দরজার পাশে একরাশ ছাই—তার পাশে সেই কালো হাড়জিরজিরে কুকুরটা। চারদিক নিঝুম—নিস্তব্ধ।

মোনাদার জন্যে অভয়ের বুকটা টন টন করে উঠল। মোনাদা যে কোথায়, কেউ তা সঠিক খবর দিতে পারবে না। সারা দেশে চলছে গণ্ডগোল। কত গুজব, কত, সত্য মিথ্যা কথা, মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ বলছে কলকাতায় ছাত্রদের ওপর গুলি চলেছে, কেউ বলছে—ভলাণ্টিয়ারদের ওপর গুলি চলেছে। লোকে কত যে আজগুবী অসম্ভব কথা বলছে, তার আর লেখাযোখা নেই।

সেদিন কামারবাড়ীর হীরু কামার জাঁকিয়ে গল্প করছে। সুন্দরবনে নাকি দু'জাহাজ বোঝাই বন্দুক কামান নেমেছে। স্বদেশী ছেলেরা—যারা বোমাগুলি মারে, তারা সেই সব বন্দুক, বোমা নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। পাঞ্জাবীরা এসে লড়াই করবে। এমনি সব কত কথা।

অভয় ভাবে. ঈশ্বর জানেন কোনটা সত্যি। অভয় একটা বুঝল দেশে একটা বিরাট কিছু হতে চলেছে। সেটা যাই হোক না কেন।

অভয় আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। লোকজনের সঙ্গ তার ভাল লাগে না। সে একাই হাঁটতে থাকে। গ্রাম ছেড়ে এসে পড়ল মাঠের মাঝে। ধু ধু করছে খোলা মাঠ—। যে দিকে তাকাও সেইদিক ফাঁকা মাঝে মাঝে খেজুর আর বাবলা গাছ। এখানে ওখানে রাশি রাশি কেয়াফুল আর বঁইচির গাছ।

মাঠের ভিতর দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ। কেয়াফুল আর কাঁটা আর বৈঁচির ঝোপ ঝাড়। এসবের ভেতর দিয়ে আরও দূরে চলে গেছে এ পথ। মনে হয়, রাখাল বালকেরা তাদের গরু বাছুর নিয়ে এই পথে যাওয়া আসা করে। অভয় অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে থাকে। নিস্তব্ধ মাঠের ওপর সূর্য্যাস্তের আবির রং এসে পড়েছে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দু একটি শেয়াল বা খরগোস দ্রুতবেগে এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে ছুটে চলে যায়। মাঠের একপাশে কলমিলতা ঘেরা ছোট্ট একটা ডোবা। ডোবায় জল আছে কিনা, তা দেখা যায় না। কলমিলতা আর টোপা পানায় জল আর দেখা যায় না। সাদা সাদা বকগুলি অতি সন্তর্পণে এক পা এক পা করে শিকারের আশায় অগ্রসর হচ্ছে। ডোবার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে যায়। অভয় হাঁটতে হাঁটতে একসময় মাঠের এক প্রান্তে একটা গাছের নীচে বসে পড়ে। মাঠে এখন ফসল নেই। ধান কাটা শেষ। ঝাঁকে ঝাঁকে নানা পাখী এসে রিক্ত শস্য শূন্য মাঠে বসছে। মাঠে মাঠে ঝরো ধান পড়ে রয়েছে। ওরা তাই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। কত রকমের যে পাখী তা বলা যায় না। এমন খোলা মেলা মাঠ তাই পালে পালে ছাগল গরু চরে বেড়াচ্ছে। মেঠো ইঁদুরেরা মাঠের ভেতর বহুদূর পর্য্যন্ত লম্বা সুড়ঙ্গ করে, ধান সঞ্চয় করেছিল। আশে পাশের গাঁয়ের হাড়ী বাউড়ী, বাগদীরা ঐসব ইঁদুরের গর্ত্ত খুঁজে খুঁজে কোদাল চালাচ্ছে। তা মন্দ নয়। বহু পরিশ্রমে মাটি খুঁড়ে মাটির গর্ত্ত থেকে ওরা ধান বের করছে। ওদের ছোট ছোট ঝুড়িগুলি মাটি কাঁকর আর ধানে ভর্ত্তি হচ্ছে। ওরা এগুলো নিয়ে যাবে—মাটি কাঁকর বেছে বেছে বের করবে ধান। অভয়ের এসব দেখতে ভারী ভাল লাগে। ওর সারা মন একটা অব্যক্ত বেদনায় ভারী হয়ে ওঠে। এই সব ছেড়ে পরিচিত দেশ আপনজন ছেড়ে তাকে যেতে হবে। সহরে বাস করার অভ্যাস, তার কোনদিন নেই। সে শুনেছে সহরে মাঠ নেই বনজঙ্গল নেই। রাস্তা-ঘাট সব বাঁধানো—কোথাও মাটি নেই। সেখানে পয়সা দিয়ে ফুল ঘাস মাটি কিনতে হয়। এমনি অপরূপ সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত—সে আর দেখতে পাবে না। রাতের আকাশে

অজস্র নক্ষত্ররাজি, সহরের বিজলী বাতির আলোয় ঢাকা পড়ে যায়। ঋতুর পরিবর্ত্তনও ভালরূপে বোঝা যায় না। তারিখের ক্যালেণ্ডার দেখে, এটা কোন মাস তাই বোঝা যায়। বর্ষার এমন সমারোহ—বসন্তে প্রকৃতির অপরূপ সাজসজ্জা সেখানে যেন পথ ভুল করে। কিছুই চোখে পড়ে না। কখন যে সূর্য্য পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েছে—এতক্ষনে খেয়াল হল অভয়ের। মাঠ নির্জ্জন সমস্ত মাঠের ওপর সন্ধ্যার ছাই ছাই আধো অন্ধকার ছায়া। পাখীগুলো সব উড়ে গেছে—রাখালেরা গরুর পাল নিয়ে কখন বাড়ী ফিরে গেছে।

নির্জ্জন মাঠ—শূন্য উদাস। চারদিকে কোন শব্দ নেই অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এই অখণ্ড নিস্তব্ধতার মাঝে, মনে হয় প্রাণধারার কোনও স্পন্দন নেই। গাছগুলি পর্য্যন্ত শান্ত নিস্তব্ধ। আকাশে ফুটে উঠেছে অসংখ্য নক্ষত্র। অভয় উঠে দাঁড়ায়। আধো অন্ধকার আবছায়ার মধ্যে পায়ে চলা রাস্তার অতি সামান্য সাদা দাগ মাত্র চোখে পড়ে। হঠাৎ অভয় সচকিত হয়ে ওঠে। কি যেন একটা ছুটে চলে যায়। সম্ভবতঃ খরগোসের বাচ্চা। কিন্তু এ ছাড়াও, এ সব জায়গায় আরও ভয় আছে। বাঘ নয়। বাঘের চেয়েও সাংঘাতিক—সে সাপ। এমনি অন্ধকারের সন্ধ্যার সময় গ্রামের রাস্তাঘাটে চন্দ্রবোড়া গোখুরা সাপ রাস্তার উপর শুয়ে থাকে। অভয় তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। সম্মুখে অন্ধকার আরও যেন ঘন। কুয়াশায় সমস্ত গ্রাম ঢেকে গেছে। একে অন্ধকার তার ওপর ঘন কুয়াশা। অভয়ের বড় ভয় করতে লাগল। দুধারে শুধু ঘন বন—মাঝে পায়ে চলার সরু রাস্তা। কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই শব্দ নেই। কোথাও বিন্দুতম আলোর নিশানা নেই। অভয় আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। যদিও শীতকাল তবুও সাপকে বিশ্বাস নেই। ওরা মাঝে মাঝে শীতকালেও বেরিয়ে আসে। অভয়ের এতক্ষণে শীত বোধ হয়। মুখ, নাক, কান, সব যেন ঠাণ্ডায় জমে গেছে।

ক্রমশঃ

ত্রিমূর্তির রামকীর্তি

সন্তোষকুমার ঘোষ

পুরাণের কথা শোনাচ্ছি। সুতরাং ব্যাপারটা নিতান্ত আজগুবী বলে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

পিতামহ ব্রহ্মা দিন দুপুরে দুজোড়া নাক ডাকিয়ে বে-ঘোরে ঢুলছিলেন। ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ বিকটভাবে চীৎকার করে উঠলেন। অন্দর থেকে দুই কন্যা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বেতো শরীর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দুই গিন্নীও মেয়েদের পিছু পিছু এসে হাজির হলেন।

বড় মেয়ে দেবসেনা বললেন—বাবা, হঠাৎ অমন করে চেঁচিয়ে উঠলেন কেন?

ছোট মেয়ে দৈত্যসেনা বললেন—কোনরকম খারাপ স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি বাবা?

বড়গিন্নী সাবিত্রী ঠাকরুণ বললেন—ভর দুপুরে অমন করে চিল্লে মরছো কেন? ভীমরতি ধরেছে নাকি?

ছোটগিন্নী সরস্বতী ঠাকরুণ বললেন—মরণ আর কি! অমন করে গো-ডাক ডেকে উঠলে কেন বলতো?

ঘাড় নেড়ে বা রা কেড়ে কোন রকম উত্তর দিতে পারলেন না পিতামহ। ওঁর তখন প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার মত অবস্থা। বুকের ভিতরটা বেধড়ক রকম ধড়ফড় করছে। শুধু চার মুখ দিয়ে সমস্বরে একটিমাত্র শব্দ ছিটকে বেরুল—'জল'।

ছুটে জল নিয়ে এলেন মেয়ে দুটি। চার মুখ দিয়ে চোঁ চোঁ করে পুরো চার ভৃঙ্গার জল গিলে পিতামহ অল্প একটু ধাতস্থ হলেন।

ছোট মেয়ের কথাই ঠিক। দুঃস্বপ্নই দেখছিলেন পিতামহ।—প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণ! সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাহি চীৎকার! পিতামহের চারজোড়া কানেই তালা লেগে গেল। ব্রহ্মতালুতেও ফাট ধরবার উপক্রম হল। ব্রহ্মলোক থর থর করে কেঁপে উঠল। আবার বিস্ফোরণ! আবার চীৎকার! এবার আগের চেয়ে হাজারগুণ জোরে। পিতামহের কানের পর্দাগুলো ফেটে ফর্দাফাই হয়ে গেল। ব্রহ্মতালুও চৌচির হল। ব্রহ্মলোক ঘন ঘন কাঁপতে লাগল। চার জোড়া চোখই বিস্ফারিত করে চতুরানন চারদিকে নজর ছোটালেন। পর্দাফাটা কানগুলো আরও উৎকর্ণ হয়ে উঠল। যতদূর ঠাওর পেলেন—তাতে মনে হল—ব্যাপারটা স্বর্গের নয়। পাতালেরও নয়। মর্ত্যের দিক থেকেই ঘন ঘন শব্দ তরঙ্গ ছুটে আসছে। 'ভগবান বাঁচাও', 'ভগবান রক্ষা করো'—শূন্যলোক ছাপিয়ে আত্মার আর্তনাদ উঠছে। আর্তনাদের ঢেউ এসে ব্রহ্মলোকের বুকে নাগাড়ে আছড়ে পড়ছে। পিতামহ আন্দাজ করলেন—মর্তে মহাপ্রলয় গোছের কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আবার বিস্ফোরণ! এবার ধ্বনির প্রচণ্ড ধাক্কায় পিতামহের মর্মদ্বার চুরমার হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডেরও পিণ্ডি পাকিয়ে গেল। পিতামহ আঁতকে উঠে বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন। স্বপ্নও ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এই চীৎকার শুনেই মেয়েরা আর গিন্নীরা ওঁর কাছে দৌড়ে এসেছিলেন।

পিতামহের হতভম্ব ভাবটুকু কাটতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। উনি ধাতস্থ হয়েছেন দেখে গিন্নীরা আর মেয়েরা একে একে অন্দরে ফিরে গেলেন। ঘর নিরালা হতেই পিতামহ মাথায় হাত দিয়ে মহা চিন্তায় নিমগ্ন হোলেন। হোক দিবা স্বপ্ন। ব্যাপারটা সত্যি হতেই বা কতক্ষণ। এতকাল ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন—সবই হয়ত শেষটায় রসাতলে যাবে। না, কালবিলম্ব করা আদৌ ঠিক হবে না। সৃষ্টির সব কিছু বজায় আছে কি না—এখনই খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। কিন্তু খোঁজখবর নেওয়া ওঁর একার সাধ্য নয়। পালনকর্তা আর সংহারকর্তাকেও

তলব করতে হয় তা হলে। এই মুহূর্তেই ত্রিমূর্তির একটা জরুরী বৈঠক বসা দরকার। উনি আর ইতস্তত করলেন না। চট করে পদ্মাসন করে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবান বিষ্ণু আর মহেশ্বরকে স্মরণ করলেন। ব্রহ্মলোক থেকে বিদ্যুৎবেগে বেতার-তরঙ্গ ছুটল। একটা বৈকুণ্ঠের দিকে, আর একটা শিবলোকের উদ্দেশ্যে।

ব্রহ্মলোকের জরুরী ডাক। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুরও দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় হঠাৎ বাগড়া পড়ল। আরামশয্যা ছেড়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়লেন উনি। ধড়াচুড়ো এঁটে তদ্দণ্ডেই গরুড়ে চড়লেন এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্রহ্মালয়ে এসে হাজির হলেন। শিবলোকের কাণ্ডই আলাদা। মহেশ্বর ভাঙের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিলেন। নন্দী বেচারী ঠেলা দিয়ে দিয়ে কোন রকমে সংবিৎ ফিরিয়ে ব্রহ্মলোকের বার্তা শোনালেন। নেশা শিকেয় উঠে গেল। তাড়াতাড়ি গজাজিন এঁটে মহেশ্বর ষাঁড়ে চড়লেন। ঢিকুতে ঢিকুতে এসে ব্রহ্মনিবাসে পদার্পণ করলেন—ঝাড়া একপ্রহর পরে। জরুরী ব্যাপার। পিতামহ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মহেশ্বর আসামাত্রই আপন অভিপ্রায় পেশ করলেন। ত্রিমূর্তি তাড়াতাড়ি মুখোমুখি আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

কোনরকম ভূমিকা না পেড়েই পিতামহ বললেন—বলি, হ্যাঁ মহেশ্বর, খানিক আগে মর্ত্যে মহাপ্রলয়-গোছের কিছু ঘটিয়েছ না কি ?

মহেশ্বরের নেশা ছুটে গেছে বটে—ত্রিনয়নে কিন্তু মৌতাতজনিত ঢুলুঢুলু ভাব রয়েছে। উনি পুরোপুরি মুখব্যাদন করে কষে হাই তুললেন কিছুক্ষণ ধরে। তারপর বিস্মিতকণ্ঠে শুধু বললেন—কই, না তো।

পিতামহ এবার বিষ্ণুর শ্রীমুখের উপর নজর পাতলেন। উৎকণ্ঠামিশ্রিত স্বরে বললেন—হ্যাঁ হে বিষ্ণু, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমি মর্ত্যে যে সব জীব সৃষ্টি করেছিলুম—তারা সব বহাল তবিয়তে আছে তো হে ?

অসময়ে ঘুম ভাঙার দরুণ বিষ্ণুর মেজাজও গোড়া থেকেই বিগড়ে ছিল। উনি বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে শুধু বললেন—থাকা তো উচিত।

দায়সারাগোছ একছিটে উত্তর শুনে পিতামহ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উষ্মামিশ্রিতস্বরে বললেন—তুমি দায়িত্ব এড়ানোগোছের কথা কইছ বিষ্ণু। ত্রিভুবনে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে, সে সব খবর রাখো আর—না আড্ডা দিয়ে আর ঘুম দিয়ে দিয়ে কাল কাটাচ্ছ ?

কথার ছিরি দেখে বিষ্ণুর মেজাজে আগুন ধরবার উপক্রম হল। কিন্তু পিতামহ একে সৃষ্টিকর্তা, তায় বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং বেয়াদবি করাটা নিতান্ত অশোভন হবে ভেবে উনি মনোভাব দেবে রেখে শুধু বললেন—আপনি আর মহেশ্বর উভয়েই উপস্থিত রয়েছেন। আর সব দিকপতিদেরও স্মরণ করছি আমি। এখনি এসে হাজির হবেন তাঁরা। তাঁদের মুখ থেকেই সব খবর পাবেন।

পিতামহ বললেন—সেই ভালো। সৃষ্টির কাজে যে সব প্রজাপতি আমার ডানহাতগোছের ছিলেন—তাঁদেরও ডাক দিচ্ছি আমি। তাঁরাও আসুন। কয়েকটা কল্প তো কেটে গেল। এখন সৃষ্টির কোথায় কি টিকে রইলো না রইলো তার একটা হিসেব-নিকেশ করা দরকার।

ব্রহ্মা প্রজাপতিদের স্মরণ করলেন। বিষ্ণু স্মরণ করলেন দিকপতিদের। দিকে দিকে বেতার তরঙ্গ ছুটল। দেখতে দেখতে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, পবন প্রভৃতি দিকপতিরা এসে হাজির হলেন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ প্রভৃতি প্রজাপতিরাও একে একে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আহ্বানে আবার উপ-দিকপতি আর উপপ্রজাপতিরাও যে যাঁর আজ্ঞাধীন সেরেস্তাদারদের সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে বেঁধে আসতে লাগলেন। কাঁড়ি কাঁড়ি নথিপত্র আর পরিসংখ্যান-বিষয়ক ঝুড়ি ঝুড়ি তথ্যও এসে জড় হতে লাগল। আসর গম্‌গম্ করে উঠল। ঘটা করে বৈঠক শুরু হল।

পিতামহ প্রথমেই প্রজাপতিদের উদ্দেশ্যে বললেন—পর্যায়ক্রমে আমরা যে সব জীব সৃষ্টি করেছি—চটপট তার একটা হিসেব দাখিল করুন তো আপনারা।

প্রজাপতিরা সঙ্গে সঙ্গে উপপ্রজাপতিদের দিকে চোখ ফেরালেন। উপপ্রজাপতিরা যে যার সেরেস্তাদার-

দের দিকে দৃষ্টি পাতলেন। সেরেস্তাদাররা মুহুর্তের মধ্যেই কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেলেন। সৃষ্টির বিরাট বিরাট দপ্তর। ঝুড়ি ঝুড়ি নথিপত্র। হাঁটকাতে হাঁটকাতে আর হাতড়াতে হাতড়াতে হিমসিম খেতে লাগলেন বেচারীরা। বিলম্ব হচ্ছে দেখে পিতামহের মেজাজ ক্রমশ চড়তে লাগল। খানিক পরে তাঁর চারমুখ দিয়েই হঠাৎ বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দ ছিটকে বেরুল—যত সব অপদার্থের দল।

বিষ্ণু মাঝ থেকে উপর পড়া হয়ে বললেন—আপনার সৃষ্টির যুগ কি ছাই একটা। আর্কিজোয়িক যুগ, প্রোটারোজোয়িক যুগ, প্যালিয়োজোয়িক যুগ, মেসোজোয়িক যুগ, কাইনোজোয়িক যুগ—এসব যুগেরও আবার বিভাগ আছে। তা, কোন যুগের জীবদের হিসেব চাইছেন আপনি? স্পষ্ট করে বলুন। না হ'লে বাজে খেটে মরবেন ওঁরা। সময়ও নষ্ট হবে।

পিতামহ রীতিমত উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—সৃষ্টির ব্যাপারে তুমি অযথা নাক গলাতে এসো না বিষ্ণু। তুমি পালন বিভাগের কর্তা। নিজের দপ্তরের কথা ভাবো। —ব'লে প্রজাপতিদের দিকে চোখ ফিরিয়ে আবার বললেন—ওসব জোয়িক ফোয়িক বুঝি না আমি। এখন জ্যাঠামো করবার সময় নয়। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত রকম জীব বানিয়েছি—তারই একটা ফিরিস্তি চাইছি আমি।

সেরেস্তাদাররা গলদঘর্ম হয়ে কোনরকমে যে যার বিভাগের ফিরিস্তি বানিয়ে উপ প্রজাপতিদের হাতে পেশ করলেন। উপপ্রজাপতিরা সে সব আবার প্রজাপতিদের হাতে এগিয়ে দিলেন। ফর্দমারফৎ ওয়াকিবহাল হয়ে প্রজাপতিরা একে একে পিতামহকে সৃষ্টজীবদের হিসেব দাখিল করতে লাগলেন। আণুবীক্ষণিক প্রাণী ভাইরাস—এমিবাদের আদিপুরুষ পূর্বপুরুষ থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডী অমেরুদণ্ডী, স্থলচর-জলচর খেচর-উভয়চর ইত্যাদি সবরকম প্রাণীরই হিসেব শুনলেন পিতামহ। সৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছে বড় কম দিন হল না। কত রকমের জীবসৃষ্টি করেছেন যে খেয়ালই ছিল না পিতামহের। সব ফিরিস্তি শুনে উনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন। এরপর উনি বিষ্ণুর শ্রীমুখের উপর চার জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—আমার দপ্তরের ফিরিস্তি শুনলে তো বিষ্ণু? তুমি পালন কর্তা। কি কি টিকে আছে এখনো—তার একটা হিসেব দাও দেখি। আমি যা যা গড়েছিলুম—সব কিছু হুবহু বজায় আছে তো হে?

বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে দিকপতিদের মুখাপেক্ষী হলেন। দিকপতিরা উপদিকপতিদের দিকে মুখ ফেরালেন। উপদিকপতিরা সেরেস্তাদারদের দিকে। পালনবিভাগেরও বিরাট বিরাট দপ্তর। ঝুড়ি ঝুড়ি নথিপত্র। হাঁটকা হাঁটকি শুরু হল সঙ্গে সঙ্গে। হাঁটকে হাতড়ে কয়েকটা ফিরিস্তিও তৈরী হল কোনরকমে। যথাবিহিত সড়ক ধরে অর্থাৎ সেরেস্তাদারদের হাত থেকে উপ-দিকপতিদের হাতে। উপ-দিকপতিদের হাত থেকে দিকপতিদের হাতে। শেষে দিকপতিদের হাত থেকে ভগবান বিষ্ণু ফিরিস্তিগুলো হাতে পেলেন। পাওয়া মাত্রই বিষ্ণু তাড়াতাড় সেগুলোর উপর নজর বুলিয়ে নিলেন। পিতামহের দিকে চেয়ে গভীরকণ্ঠে বললেন—যাদের তারপর যেমনভাবে গড়েছিলেন আপনি, তারা আর কিন্তু ঠিক তেমনটি নেই। বিবর্তন ধর্মের ফলে অনেকের আকার কিছু কিছু পাল্টে গেছে। অনেকের পুরোপুরি রূপান্তর হয়েছে। অনেকে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপও পেয়েছে।

পিতামহ চমকে উঠলেন। বিস্ময়ের সুরে বললেন—লোপ পেয়েছে! বলো কি হে! বিরাট বিরাট আকারের মাছ—অতিকায়সরীসৃপ—শুঁড়-দাঁত-লেজওলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেরুদণ্ডী জীব—কত মেহনত করে বানাতে হয়েছিল আমাকে—তা জানো? হাঁ-করে দেখবার মত চেহারা ছিল সব তাদের। তা সেগুলোকে টিকিয়ে রেখেছ—না গোল্লায় দিয়েছ ইতিমধ্যে?

বিষ্ণু বললে—ডাইনোসর জাতের বিরাট বিরাট আকারের জীবরা সব কবেলোপাট হয়ে গেছে পিতামহ। মাঝারি আকারের জীবরাও একে একে লুপ্ত হয়ে

আসছে। ছোটখাটোদেরও অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অনেকে মহাপারি নির্বাণের দিন গুনছে।

পিতামহ মহাখ্যাপ্পাই হয়ে বললেন—তুমি তবে কি করতে আছো হে? রূপ দেখাতে? তোমার গাফিলতির জন্যেই এসব ঘটেছে। ছাই পাঁশ—কি টিকে আছে তা হলে শুনি?

বিষ্ণু তৎপর হয়ে বললেন—গুগলি, গেঁড়ি, শাঁখ, কড়ি, শামুক ঝিনুক, কাঁকড়া-চিংড়ি—এরা কিছু কিছু টিকে আছে। মাছেদের বংশধররা কিছু কিছু আছে। সরীসৃপদের বংশধর—সাপ-গোসাপ, টিকটিকি-গিরগিটি, কচ্ছপ-কুমিরও কিছু কিছু আছে। মাঝারি আকারের জীবদের মধ্যে গুটিকয়েক হাতি, উট, গণ্ডার, জিরাফ ইত্যাদি আছে বটে—কিন্তু নিতান্ত নমুনা থাকার মত। আঙুলের গাঁটে গোনা যায় তাদের। তা ছাড়া—

'খেলে কচু' বলে পিতামহ বিরক্তিভরে চীৎকার করে উঠলেন। বললেন—ওসব চুলোয় যাক। আমার সেরা সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। সেইমানুষগুলো বাহালতবিয়তে আছে কি বলতে পারো? না—তাদেরও পাইকিরি হারে উচ্ছেদ করে বসে আছ? আমার এমন সাধের সৃষ্টি সব ছারেখারে গেছে দেখছি। এজন্যে তুমি দায়ী বিষ্ণু। তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

বিষ্ণুও বেশ কড়া মেজাজে বললেন—মোটেই দায়ী নই আমি। পরস্পরকে খাওয়া-খাওয়ি করেই প্রায় তিন চতুর্থাংশ জীব লোপাট হয়ে গেছে। বাকি যা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার জন্যে মহেশ্বর দায়ী—আমি নই। উনি নেশার ঝোঁকে মাঝে মাঝে তাণ্ডবে নেচেছেন। ফলে তালগোল পাকিয়ে মর্ত্যের চেহারা বার বার পাল্টে গেছে। সেই সঙ্গে কত যুগের কত জীবও চিরকালের মত রসাতলে চলে গেছে।

পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে মহেশ্বরের দিকে কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—তোমার দপ্তরের হিসেব দাখিল করো মহেশ্বর। জীবসৃষ্টি হওয়া ইস্তক ক'বার তাণ্ডবে নেচেছ? কী ভাবেই বা সৃষ্টিকে রসাতলে পাঠিয়েছ?

একে নেশা ছুটে যাওয়ার দরুণ মহেশ্বরের মেজাজ বিগড়ে ছিল। তার উপর দোষারোপ আর কৈফিয়ৎ তলব। উনি মুহূর্তের মধ্যেই রীতিমত উগ্র হয়ে উঠলেন। বললেন—আমার দপ্তর ফপ্তরের বালাই নেই। কাকেও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই আমি।—বলে হঠাৎ বিষ্ণুর দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—আমি তোমার কথার তীব্র প্রতিবাদ করছি বিষ্ণু। বাজে দোষ দিও না আমাকে। আমি কারও কথার ধার ধারি নে। নেশাখোর হতে পারি কিন্তু তাণ্ডবের ঝোঁকে আমি যা-তা করি নি কোন কালেই। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের বিধেন মেনে চলে আসছি আমি বরাবর। এক এক কল্পের শেষে নিয়মমাফিক একবার করে মহাপ্রলয় ঘটিয়েছি। তাতে কে বাঁচলো—কে লোপাট হলো—সে দেখার ভার আমার নয়—তোমার।

পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে মহেশ্বরের কথায় সায় দিয়ে বললেন—ঠিক তাই। পালন করা বা টিকিয়ে রাখার দায়িত্বটা তোমারই বিষ্ণু। মহেশ্বরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায় এড়াতে চাইছো—এ রীতিমত আপত্তিকর।

বেচারী বিষ্ণু যেন কোনঠেসা হয়ে একটু কাঁপরে পড়লেন। উনি তাড়াতাড়ি দিক্‌পতিদের দিকে মুখ ফেরালেন। দিক্‌পতিরা একে একে বিষ্ণুর কাছে সরে এলেন। কানে কানে ফিসফিস করে যে যার মন্ত্রণা দিতে শুরু করলেন। মন্ত্রণা শুনতে শুনতে বিষ্ণু যেন বেশ খানিকটা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মার দিকে চেয়ে বিনীতকণ্ঠে বললেন—পিতামহ, অপরাধ নেবেন না কোনরকম। সব বিপত্তির মূলে কিন্তু আপনি। ওই মানুষ সৃষ্টি করেই আপনি কাল করেছেন। মানুষই আপনার গড়া শতকরা সাড়ে নিরেনব্বই ভাগ জীবকে কোপ্তাকাবাব ইত্যাদি বানিয়ে পেটে পুরে দিয়েছে। মানুষই আপনার সমস্ত সৃষ্টিকে বরবাদ করে রসাতলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—তাতে মনে হয়—দিনকয়েকের মধ্যেই নিজেরাও

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আমাদেরও আর কোন রকম অস্তিত্ব থাকবে না।

পিতামহ মহাবিরক্তিভরে বললেন—আজেবাজে বোকো না বিষ্ণু। মানুষকে আমি বড় বড় দাঁত, নখ, লেজ, শুঁড়, শিং ইত্যাদি কিছুই দিতে পারি নে বলে প্রথমটায় বড় আপসোস হয়েছিল। ভেবেছিলুম—হায়, নিতান্ত নিরীহ, নিরস্ত্র, সাত্ত্বিক মেজাজের জীব এরা—টিকে থাকবে কী উপায়ে। শেষে রক্ষাকবচ হিসেবে এদের মনে আর মগজে খানিকটা করে বিবেক আর বুদ্ধি দিয়ে—তবে নিশ্চিন্ত হই।

বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে বললেন—মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছিলেন সত্যি। কিন্তু বিবেকের চেয়ে বুদ্ধির ভাগটা পরিমাণে অনেক বেশী হয়ে গিয়েছিল। ভাবের ঘোরে মাত্রা ঠিক রাখতে পারেন নি। আপনার গলতির ফলেই সৃষ্টিতে যতসব অনাসৃষ্টি ঘটছে।

পিতামহ মহাখেপ্পাই হয়ে বললেন—অনাসৃষ্টি ঘটছেই যদি—তা, তুমি কী করতে আছ হে? তোমার ঠেকানো উচিত ছিল না কি কোন উপায়ে?

বিষ্ণু নিতান্ত বশংবদের মত বিনীতকণ্ঠে বললেন—ঠেকাবার জন্যে কম কাণ্ড করি নি পিতামহ। কিন্তু কোন উপায়ই ধোপে টেঁকে নি। বিশ্বাস করুন, বার বার অবতারের রূপ ধরে মর্ত্যে নেমেছি। খোদ ভগবান হয়ে মর্ত্যের পাঁকদঁক ইত্যাদি ঘেঁটেছি, গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করেছি, নানান হুজ্জোত ঝঞ্ঝাটও পুইয়েছি। এক এক জন্মে হাজারো হাল হয়েছে আমার।

পিতামহ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—জানতে আর কিছু বাকি নেই আমার। হাওয়া খেতে যাওয়ার মত দিনকতকের জন্যে মর্ত্যলোকে ঘুরে আসো—আর বৈকুণ্ঠে ফিরে কল্পকাল ধরে লম্বা ঘুম দাও। ও-রকম দায়সারা-গোছ কাজ করলে ফলও তেমনি হয়। নাঃ, তুমি দপ্তর ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কাজের চেষ্টা দেখো বিষ্ণু।

বিষ্ণুও মহাউত্তেজনাভরে বললেন—আপনি আপনার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করছেন পিতামহ। দপ্তর ছাড়া না-ছাড়া আপনার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বিধান অনুসারে চলতে আপনিও বাধ্য। আমাদের ত্রিমূর্তির কেউই কারও কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়।

মহেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর কথায় সায় দিয়ে বললেন—ঠিক তাই। আপনি সৃষ্টিকর্তা হলেও আমাদের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন না। সংবিধান মেনে চলতে আপনিও বাধ্য।

আইনের প্রশ্ন তুলতেই পিতামহ যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। চিন্তিতও হলেন বেশ খানিকটা। খানিকপরে বেশ শান্তকণ্ঠে বললেন—এক কাজ করো হে বিষ্ণু। তুমি না হয় অবতার হয়ে একনাগাড়ে দু'চার কল্পকাল ধরে মর্ত্যে থেকে যাও। মানুষের মস্তিষ্ক আর হৃদয়মনগুলোকে ধোলাই করে সাফ করে—বিবেক-বুদ্ধিকে পুরোপুরি চান্‌কে তুলে তারপর না হয় বৈকুণ্ঠে ফিরো।

বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে বিনীতকণ্ঠে বললেন—মাফ করতে হবে পিতামহ। দু'চার কল্প চুলোয় যাক—দু-চার দণ্ডের জন্যেও এখন মর্ত্যে গিয়ে থাকা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। শুধু দুরূহ নয়—অসম্ভবও।

পিতামহ বিস্মিতকণ্ঠে বললেন—বলো কি হে!

বিষ্ণু বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। মর্ত্যে বিশুদ্ধ জিনিস বলতে আর কিস্‌সু নেই। আপনার তৈরী পঞ্চভূত—অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ব্যোম—সব কিছুই বিলকুল বিষিয়ে গেছে। কার্বন মনক্সাইড, সালফিউরিক অক্সাইড, নাইট্রো অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন—কত ছাই নাম করবো। এই সব বিষাক্ত গ্যাসে গ্যাসে আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরে গেছে। জ্ব'লে জ্ব'লে অক্সিজেনও ক্রমশ ফতুর হয়ে আসছে। অক্সিজেনের জন্যে যে অটোমেটিক ব্যবস্থা করেছিলেন—তাও বিগড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। সূর্যের আলোরও ঘাটতি পড়েছে ক্রমশ। মানুষের অপকীর্তির ফলেই এসব ঘটেছে। আমি খোদ পরমাত্মা হলেও মর্ত্যে নামলে দুদিনেই আমারও নাভিশ্বাস উঠবে তৃতীয় দিনেই মহাপরিনির্বাণ লাভ করতে হবে আমাকে।

পিতামহ তেমনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—তাই নাকি!

বিষ্ণু পরম উৎসাহভরে বলতে লাগলেন—তাছাড়া, মানুষ, ধ্বংস করার ব্যাপারে মহেশ্বরকেও টেক্কা দিতে চায়। গুচ্ছের আণবিক বোমা বানিয়েছে শুনছি। স্থলে-জলে-ভূগর্ভে-অন্তরীক্ষে বেপরোয়াভাবে বোমা ফাটিয়ে ফাটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছে। বিস্ফোরণের আওয়াজই বা কি! সে আওয়াজ লক্ষ-লক্ষ যোজন দূর থেকে শুনলেও—আপনার কানের পর্দাগুলো ফেটে ফর্দাফাই হয়ে যাবে—পিলে চমকে উঠবে—আর যে ধরণের হৃৎকম্প শুরু হবে—তা আর কস্মিণকালেও থামবে ভেবেছেন? কাছাকাছি কোথাও বিস্ফোরণ হলে তো কথাই নেই। বিধাতাই হ'ন আর যেই-ই হ'ন—আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই চাটপোঁছ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তিলমাত্রও আর অস্তিত্ব থাকবে না আপনার।

পিতামহ আতকে উঠলেন। ভাবলেন—স্বপ্নের মধ্যে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের আওয়াজই তা হলে শুনেছিলেন তিনি! আর্তকণ্ঠে বললেন—তা হলে কি সৃষ্টির কোথাও কিছু আর থাকবে না বিষ্ণু?

বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আগে নিজের কী দশা হবে তাই ভাবুন। সৃষ্টির কথা পরে ভাববেন। মানুষের মতিগতির কথা কিছুই বলা যায় না। ওরা যে কোন মুহূর্তে ক্ষেপে বিগড়ে ওইসব বোমা নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দিতে পারে। ফলে কী কাণ্ড যে ঘটবে—তা আমাদের ত্রিমূর্তির কেউ ধারণাই করতে পারব না। সৃষ্টির সবকিছু তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই—উপরন্তু বিস্ফোরণের ফলে যে পরিমাণ রেডিও-এ্যাকটিভ ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে—তাতে স্বর্গ-বৈকুণ্ঠ, শিবলোক-ব্রহ্মলোক সব জায়গাই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে। সেই সঙ্গে দেবগুষ্টির যে যেখানে আছে সবাই ধূমাচ্ছন্ন হয়ে অনন্তকাল ধরে খাবি খেতে থাকবে।

পিতামহ আর্তকণ্ঠে শুধু বললেন—বলো কি হে!

বিষ্ণু উত্তেজনাভরে বলতে লাগলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাবের ঝোঁকে মানুষ বানিয়ে ভেবেছিলেন—কী মহাকীর্তিই না করেছেন! উল্লাসে আটখানা হয়ে গৌরাঙ্গ-নৃত্যও করেছিলেন তখন। এখন ঠেলা সামলান।

মহেশ্বর সুযোগ খুঁজছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উনি মাথা নেড়ে বিষ্ণুর কথায় সায় দিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—ঠিক তাই। সৃষ্টি গোল্লায় যাওয়ার জন্যে আপনি নিজেই দায়ী পিতামহ।

মহেশ্বরের মুখ থেকে নিজের উক্তির সমর্থন পাওয়া মাত্রই বিষ্ণুও পরম উৎসাহভরে বললেন—দুশোবার দায়ী উনি।

দুই বিধাতার তীব্র অভিযোগ শুনে পিতামহ আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। ব্রহ্মরন্ধ্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চারজোড়া চোখই রোষকষায়িত হয়ে চরকির মত ঘুরতে শুরু করল। চারচারটে নাক আর মুখ দিয়েই মুহুর্মুহুঃ আগ্নেয় শ্বাস নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। দেহের অগ্নিবর্ণ দেখতে দেখতে পাকালঙ্কার মত রগরগে হয়ে উঠল। মগজের ঘিলু তেতে টগবগ করে ফুটতে শুরু করল। শিরায় শিরায় রক্তস্রোতও লাভাস্রোতের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে পিতামহ হঠাৎ কমণ্ডলু উঁচিয়ে ক্ষ্যাপার মত চেঁচিয়ে উঠে বললেন—বেইমান-বেয়াদব সব, অর্বাচীন-অপদার্থ সব, ভাঙখোর—আরামখোর সব। আমার সৃষ্টি বরবাদ হওয়ার জন্যে তোমরা দুই মূর্তিই দায়ী। দুজনকেই অভিযুক্ত করছি আমি।

পিতামহের মুখথেকে দুর্বিনীত কটূক্তি শুনে মহেশ্বরের মেজাজেও চাকিতের মধ্যে আগুন ধরে গেল। রাগে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মত তেতে উঠলেন উনি। তৃতীয় নয়ন থেকে ধক্‌ধক্ করে প্রলয়াগ্নি ছিটকে বেরুল। কোমরের গজাজিন খসে পড়বার উপক্রম হল। প্রলয়-বিষাণও বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। শূলী-শম্ভু ত্রিশূল উঁচিয়ে বললেন—মুখ সামলে কথা বলবেন পিতামহ। দ্বিতীয়বার কটূক্তি করলেই আপনার চার চারটে মুণ্ডকেই ভস্মসার করে ছেড়ে দেবো। সব

অঘটনের জন্যে দায়ী আপনি আর বিষ্ণু। আপনারা দুজনেই আসল আসামী।

রাগ সংক্রামক ব্যাধির মত। বিষ্ণুও মুহূর্তের মধ্যেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন উনি। সারা শরীর বেয়ে দরদর ধারায় স্বেদবিন্দু ঝরতে শুরু করল। গায়ের ঘনসবুজ রঙও দেখতে দেখতে পুরোপুরি বেগনী মেরে গেল। সুদর্শনচক্র উঁচিয়ে উনি মহেশ্বরের দিকে চেয়ে তীব্র কণ্ঠে বললেন—আমারও সহ্যের সীমা আছে জানবেন। আমিও সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিতে জানি। সৃষ্টি গোল্লায় যাওয়ার জন্যে দায়ী আপনারা। আপনাদের দুজনেরই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো উচিত।

কে কাকে সামলায়! কেই বা কাকে সংযত করে! তিন বিধাতাই মহাক্ষিপ্ত হয়ে নিজের নিজের মহাশক্তির আস্ফালন করতে লাগলেন। তিন বিধাতাই রাগের প্রকোপে পুরোপুরি কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। ক্রোধানলে ত্রিভুবন ভরে গেল। ত্রিমূর্তির তিন দিক থেকেই প্রতিবাদের প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠল। ত্রিমূর্তির মুখ দিয়েই অগ্ন্যুৎপাতের মত নানা ধরণের কটূক্তি আর গালিগালাজ প্রচণ্ড বেগে ছিটকে বেরুতে লাগল। পরস্পরকে সাবাড় করে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার মতলবে তিন বিধাতাই ছটফট করতে লাগলেন। স্থাবর-জঙ্গম মহাঅঘটনের আশঙ্কায় নিতান্ত উদ্বেগব্যাকুল মনে শুধু দণ্ড, পল আর মুহূর্ত গুণতে লাগল।

পরিত্রাতা বিধাতাদের কীর্তিকলাপ দেখে প্রজাপতিরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। দিকপতিরাও নিতান্ত অসহায়ের মত 'হায় হায়' করতে লাগলেন। শেষে উপায়ন্তর না দেখে—তাঁরা করজোড়ে কোরাসে প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। আকাশে বাতাসে—দিকে দিগন্তরে প্রার্থনার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল।—হে বিধাতৃগণ, আপন আপন ক্রোধ সংবরণ করুন। হে পরিত্রাতাগণ রোষবাহ্নি সংহরণ করুন। হে করুণাময়গণ, সৃষ্টিকে রক্ষা করুন।

কিন্তু কোথায় কি। বুড়োবয়েসের প্রচণ্ড রাগ সামলাতে না পেরে পিতামহ প্রথমেই বিপর্যয় কাণ্ড করে বসলেন। বিষ্ণু আর মহেশ্বরের মাথা লক্ষ্য করে প্রচণ্ডবেগে কমণ্ডলু আর স্রুব নিক্ষেপ করলেন। মোক্ষম আঘাত। মহেশ্বর তৈরী হয়েই ছিলেন। পটোল তোলবার ঠিক পূর্বমুহূর্তেই উনিও ত্রিশূল চালিয়ে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু দুই মূর্তিকেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে হৃৎপিণ্ডহীন করে দিলেন। বিষ্ণুও অক্কা পাবার আগে সুদর্শন চক্র ছুঁড়ে ব্রহ্মা আর মহেশ্বরকে পুরাপুরি নির্মুণ্ড করে ছেড়ে দিলেন। আস্ত রইলেন না কেউই। তিন বিধাতাই হয় মুণ্ডহীন না হয় হৃৎপিণ্ডহীন অবস্থায় পড়ে রইলেন।

এরপর কী যে ঘটলো—তা অনুমান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পুরাণকাররাও এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব।

—

অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ

মানসী মুখোপাধ্যায়

॥ তিন ॥

পদ্মানদীর দেশ থেকে পদ্মার মতই অশান্ত মন নিয়ে অতুলপ্রসাদ কোলকাতা মহানগরীতে এসে পৌঁছলেন। বোনেদের দুর্গামোহনবাবুর বাড়ি মার কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেন। নিজে মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। মার প্রতি অভিমানে তাঁর মন তখন ক্ষতবিক্ষত। তিনি সোজা পানিমামার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন।১ পানিমামা তখন ইন্‌কাম্ ট্যাক্স্ এসেসর্। তাঁকে পেয়ে বিনোদিনী মামী মহা খুশী।

অতুলপ্রসাদ এরপর বড়মামার বাড়ি গেলেন। স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ তখন রেভেনিউ বোর্ডের মেম্বার। সেখানেও সবাই তাঁকে আদর করে কাছে টেনে নিলেন। মামাতো বোনেরা সহর্ষে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল, 'ভাইদাদা এসেছে!'

মামার বাড়ির সহৃদয় স্নেহমমতাপূর্ণ ব্যবহার অতুলপ্রসাদের আহত, বিক্ষুব্ধ মনের ওপর যেন পরম সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিল। তিনি শান্তি পেলেন, সাহস পেলেন। না, এ বিশাল জগতে তিনি একা নন। তিনি সহজ হলেন, প্রফুল্ল হলেন।

এবার পড়াশোনা করা দরকার। অতুলপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। মামারা তাঁদের বড় আদরের ভাগ্নেটিকে যত্ন করে পড়াতে লাগলেন।

অতুলপ্রসাদও পড়াশোনায় যেন তলিয়ে গেলেন। তাঁকে ভালভাবে পাশ করতে হবে; দু'চোখে তাঁর উজ্জ্বল স্বপ্ন—তিনি ব্যারিস্টার হবেন। বিলেত দেশটা কেমন দেখবেন।

এই কলেজে তাঁর সমসাময়িক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বিহারীলাল মিত্র, স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।২

'দুর্গামোহনবাবু অতুলপ্রসাদের মনের ভাব বুঝে প্রথমদিকে তাঁকে বিব্রত করতে চান নি। তবে কিছু দিন পর তিনি একাধিকবার অতুলপ্রসাদের মেজমামার বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করে দেন; অতুলপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর বাড়ি যেতে এবং হেমন্তশশীর সঙ্গে দেখা করতে বার-বার অনুরোধ জানান। ছেলের জন্য মা যে কত উতলা তা নানাভাবে ব্যক্ত করেন।

'মার জন্য অতুলপ্রসাদের মনও উতলা হত, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল তাঁর অভিমান। ফলে দুর্গামোহনবাবুর অনুরোধ-উপরোধ অতুলপ্রসাদের নিঃশব্দ প্রতিবাদের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হত, নিস্ফল হত।

পরে অবশ্য মা-ছেলের সাক্ষাৎ ঘটে, দু'জনের অশ্রু-জলে দু'জনে সিক্ত হন। তবে সে সাক্ষাৎ দুর্গামোহন বাবুর বাড়িতে নয়। অতুলপ্রাদ আরো অনেক পরে দুর্গামোহনবাবুর বাড়ীতে যান। মার সঙ্গে অবশ্য এর পর থেকে তিনি মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন।৩

"বিলাত গিয়ে ব্যারিস্টার হওয়ার প্রবল বাসনা অতুলের প্রাণে কিশোর বয়স হইতেই ছিল।"(৪)

এ জন্য অতুলপ্রসাদ শুধু মনে মনে বাসনা নিয়ে বা স্বপ্ন দেখেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তার জন্য তাঁর চেষ্টা এবং প্রস্তুতিও ছিল। তাই জানা যায় "পাঠ্যাবস্থাতেই তার খুব বক্তা হইবার সাধ ছিল। যখন কলেজে পড়িত অনেক সময় দেখিয়াছি ছাদে পায়চারী করিতে করিতে বিড় বিড় করিয়া কি বলিত। পিছন হইতে 'কি করছ' বলিলে চমকিয়া জানাইত, "কিছু না, এক জায়গায় কিছু বলার জন্য বন্ধুবান্ধবরা ধরেছে, তাই যা বলব তা অভ্যাস করছি।"৫

অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে আশার জাল বুনে চলেছিলেন। সে আশার কথা একদিন ছোটমাসীর কাছে ব্যক্ত করে ফেলেন, "আমার বিলেত যেতে এত ইচ্ছে করে কি ব ব। যদি কেউ চাকর করেও আমায় সঙ্গে নিয়ে যায় আমি যেতে রাজী আছি।"৬

তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতা এবার সার্থকতার রূপ নিল; শেষ হল আশা-নিরাশার মাঝে দোলায়মান থাকা। তিনি বিলেত যাবেন। পাঠাবেন তাঁর মামারা।... "যৌবনে সাংসারিক ঘটনায় অতুলের প্রাণে এত আঘাত লাগিতেছিল। ফলে মাতুলদের কাহারো কাহারো প্রাণে এত সমবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে অতুলকে দূরদেশে পাঠাইয়া তাহার প্রাণের জ্বালা প্রশমিত করিতে চেষ্টা করা সমীচিন মনে করিলেন। যাহা প্রায় অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভব হইতে চলিল।"৭

অতুলপ্রসাদ তাঁহার সত্যদাদাকে (৺সত্যপ্রসাদ সেন) পত্রে বলেছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁর মেজমামা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। "এ জন্য অতুল আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মাতুলকন্যা সাহানাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শুনিয়াছি সাহানাকে বলিতেন সে যেন তার আবশ্যকীয় টাকাকড়ি অতুলের বাক্স হইতে নেয় এবং কাহাকেও যেন তাহা না বলে।"৮

অতুলপ্রসাদ বিলেত যাচ্ছেন এ খবর সবাই জানলেন। হেমন্তশশীর নিকটও সে খবর পৌছল। অতুলপ্রসাদ মার সঙ্গে দেখা করলেন। জানালেন, মা, আমি বিলেত যাচ্ছি এবার, ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসব।

শুনে মার উজ্জ্বল দু'চোখ আনন্দাশ্রুতে টল টল করতে লাগল। আহা, অতুলের এত আশৈশবের স্বপ্ন। কত-ও রাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে গল্প শোনার সময় যখনি প্রশ্ন করেছেন, অতুল, বড় হয়ে তুমি কি হবে বাবা? দ্বিধাহীন কণ্ঠে অতুল জবাব দিয়েছে, আমি বড় হয়ে ব্যারিস্টার হব। তার সে স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।'

হেমন্তশশী তখুনি এ খবর দুর্গামোহনবাবুকে দিলেন। বললেন, অতুলকে এমনভাবে পাঠাতে হবে যাতে বিলেত গিয়ে সে কোন কষ্টে না পড়ে।

'নিশ্চয়ই, সমর্থন করেন দুর্গামোহনবাবু, তাকে বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার হতে আমরাও সাহায্য করব।

অতুলপ্রসাদ দুর্গামোহনবাবুর উদারতার কথা শুনলেন, বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। হেমন্তশশী নিজে সেতু হয়ে দুজনের মিলন ঘটালেন।'৯ তাঁর দুই পরম প্রিয়জন এবার মিলিত হল। কী শান্তি!

মামাদের এবং দুর্গামোহনবাবুর মিলিত আর্থিক সাহায্যে অতুলপ্রসাদ বিদেশ যাবার জন্য দ্রুত তৈরী হতে লাগলেন।১০

এর পূর্ব্বে অতুলপ্রসাদ ঢাকা ও কোলকাতার বাইরে কোনদিন যান নি। এখন চলেছেন সুদূর বিলেতে—তাঁর স্বপ্নের দেশে। কিন্তু আত্মীয়-বিচ্ছেদের কথা ভেবে অতুলপ্রসাদের কোমল মন বেদনায় কাতর হল।

বেদনা-কাতর হৃদয়ে অতুলপ্রসাদ ১৮৯০ অব্দে জাহাজে করে বিলাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। জাহাজ তাঁকে নিয়ে দেশের কূল থেকে যত দূরে সরে যায় ততই এক অব্যক্ত বেদনায় বুক যেন ভরে ওঠে। দেশের মাটি আর মাটি নয়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর চোখে দেশপ্রেমের পরশ-পাথর ছুঁইয়ে তাঁর দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। মাটি তাই এখন জন্মভূমি মা, বন্দিনী, দুঃখিনী মা।

আবার গর্ভধারিণী মার জন্যও তাঁর বেদনা, ভাবনা। তাই পুত্র-বিচ্ছেদ ব্যথায় মা যেমন কাতর তেমনি তাঁর অতুল।. তবে উজ্জ্বল-কল্যাণকর ভবিষ্যতের কল্পনা করে দুজনের কাছেই দুজনের ব্যথা সহনীয় হয়ে উঠল।

॥ চার ॥

অতুলপ্রসাদ আবার যেন শিশু হয়ে গিয়েছেন। সমুদ্রের বুকে জাহাজের দোলায় দোল খেতে খেতে কূল থেকে অকূলে ভেসে চললেন। সুবিশাল ভারতবর্ষ যেন সুনীল সাগরের পর্দার পেছনে নিঃসীম অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সহসা অতুলপ্রসাদ নিজেকে বড় একা বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। এই জাহাজেই দেখা হয়ে গেল বাল্যবন্ধু জ্ঞান রায়ের সঙ্গে। একক শূন্যময় সময় পূর্ণ হয়ে উঠল বন্ধুর পুনর্মিলনে, নির্মল আনন্দে।

এই জ্ঞান রায়ের সঙ্গে বাল্যে একই স্কুলে পড়েছেন। কৈশোরে রূপবাবুদের বা আনন্দ-মাস্টারমশায়ের বাগান বাড়ির নিভৃত বৈঠকে সবাই মিলিত হতেন। "জ্ঞান স্কুলে থাকা কালেই একটি কবিতাপুস্তক ছাপাইয়া ছিল।"১১ কতদিন তিনি রবিবাবুর কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। ভগ্নহৃদয় কবিতা নিয়ে খুবই আলোচনা হত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা অত্যন্ত ভাবের সহিত পাঠ করতেন যা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন। "রবিবাবু কখন কোন কবিতাটি লিখিয়াছেন এবং কেন কাহাকে কোন বইটি উপহার দিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার জানা ছিল।"১২

জ্ঞান বিলেত চলেছেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। অতুলপ্রসাদ জানালেন তিনি ব্যারিষ্টারি পড়তে চলেছেন, তাঁর সুপ্ত বাসনাকে সফল রূপ দিতে চলেছেন। আরো কত কথা হল—নিজেদের কথা, পুরনো সঙ্গী সাথীদের কথা। সমুদ্র যাত্রায় জ্ঞানের মত সঙ্গী পেয়ে অতুলপ্রসাদ মহাখুশি।

তবে সে খুশিতে মাঝে মাঝে ভাটা পড়ত। জাহাজে ভারতীয়দের প্রতি শাসক জাতীয়দের অপমানকর ব্যবহার প্রত্যেক আত্মসম্মান-সচেতন ভারতীয়র মত স্পর্শ কাতর অতুলপ্রসাদও অপমানবোধ করতেন এবং ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হতেন।

জাহাজ সুনীল সাগরের জলের ওপর বিচিত্র রেখায় নক্সা কেটে এগিয়ে চলেছে। আকাশের ঢাকনার নিচে শুধু কালচে নীল জল আর জল। সে জলের তরঙ্গের মাথায় যেন হীরার চালচিত্তির আর রাতের আঁধারে তাদের অঙ্গে অঙ্গে তারার আল্পনা। সে দৃশ্য অতুলপ্রসাদের সমুদ্র যাত্রার কষ্টকে অতিক্রম করে তাঁর কবি-হৃদয়কে অসীম, অনাবিল আনন্দে ভরে তুলত।

ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে তাই ইতালির ভেনিস নগরে গণ্ডোলা (এক প্রকার নৌকা) চালকদের গানের সুমধুর সুর তাঁর মনকে সহজেই আলোড়িত ও আপ্লুত করে। পরে ঐ সুরে যিনি তাঁর বিখ্যাত গান "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী" রচনা করেন (১৮৯১-৯২ অব্দ)।১৩

জ্ঞান রায়ের মারফৎ জাহাজে জ্যোতিষ দাস এবং নলিনী গুপ্তের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের আলাপ হয়।

চারজনের হাসি গল্পের মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ যাত্রার একদিন অবসান হল। লণ্ডনে কিংস ডকে জাহাজ এসে ভিড়লে তার একটানা যান্ত্রিক কান্না শেষ হল।

অতুলপ্রসাদ এবার সত্যিই তাঁর স্বপ্নের দেশে এসে পৌঁছলেন!

অতুলপ্রসাদের স্বপ্নের দেশে স্বপ্ন-জগতের মতই সর্বদা আলো-আঁধারির খেলা চলে। আকাশের মুখ কুয়াশার চন্দ্রাতপের আড়ালে মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। আর যখন তখন জলতরঙ্গ বাজিয়ে বৃষ্টি নেমে আসা তো আছেই। আর কি শীত! নতুন দেশে নতুন পরিবেশে চোখে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় জাগে কিন্তু মন পড়ে থাকে তার পুরানো আবাসে—ভারতবর্ষে। বিষণ্ণ আবহাওয়া বিষণ্ণ মনকে আরো যেন উদাস, উতলা করে তোলে।

ক'দিনের ভেতরই মন শান্ত করে অতুলপ্রসাদ লণ্ডনে মিড্‌ল্ টেম্পলে ব্যারিষ্টারি পড়া শুরু করে দিলেন বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে পড়তে গিয়ে অসংখ্য বইয়ের মাঝে হারিয়ে যান, কি সব অমূল্য সংগ্রহ! তার মধ্যে আবার বাংলা বইও আছে।

বিলেতে অতুলপ্রসাদ আবার চিত্তরঞ্জনের সান্নিধ্যে এলেন। আলাপ হল শ্রীঅরবিন্দ, মনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু ইত্যাদির সঙ্গে।

অতুলপ্রসাদ দেখলেন চিত্তরঞ্জন এখানে এসে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠেছেন। "তিনি যে প্রথমবার আই, সি, এস পাশ করতে পারলেন না তার কারণ রাজনীতি"।১৪ বিদেশে গিয়ে বৃটিশদের অভদ্র ব্যবহার দেখে তিনি পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই আপনার শক্তি দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর সে প্রচেষ্টায় ভারতীয় ছাত্রবন্ধু সকলের সমর্থন ছিল। অতুলপ্রসাদ ছিলেন তাঁর সমর্থক এবং গুণমুগ্ধ।

বিলেতে থাকতে চিত্তরঞ্জন যে দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন তা হল জেমস্ ম্যাকলীনের উক্তির প্রতিবাদ ও নৌরজীর নির্বাচনী প্রচার।

জেমস ম্যাকলীন নামে বৃটিশ পার্লামেণ্টের এক সদস্য ভারতীয় মুসলমানদের দাস ও হিন্দুদের 'চুক্তিবদ্ধ দাস' বলে অবিহিত করেন।

চিত্তরঞ্জন লণ্ডনস্থ ভারতীয় ছাত্রদের এবং তাঁর বন্ধুদের নিয়ে এক প্রতিবাদসভা করেন। সভায় স্থির হয় যে ম্যাকলীন তাঁর অভদ্র উক্তির জন্য ভারতীয়দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং পার্লামেণ্টের সদস্যপদ তাঁকে ত্যাগ করতে হবে।

চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় ম্যাকলীন দু'টি কাজ করিতেই বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সে সফলতায় অন্যান্যদের সহিত অতুলপ্রসাদও উৎসাহিত আনন্দিত হন।

দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টের সদস্যপদ প্রার্থী হয়ে স্যালিসবেরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হন। তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য করতে চিত্তরঞ্জন এগিয়ে এলেন। শুরু হল প্রচার কার্য। ভারতীয় ছাত্র-বন্ধুরা আবার চিত্তরঞ্জনকে ঘিরে দাঁড়ালেন। সবার সঙ্গে অতুলপ্রসাদও উত্তেজনা উপভোগ করলেন। দাদাভাই নৌরজী পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হলেন। সকলের সঙ্গে তিনিও অভিনন্দন জানালেন।

অতুলপ্রসাদ এবার ভালভাবে পড়াশোনায় মন দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ তখন আই, সি, এস পরীক্ষায় বসবেন। ক্রমে তাঁর পরীক্ষার দিন নিকটতর হল কিন্তু তিনি নির্বিকার। পরীক্ষার দিন তিনি কিছুতেই পরীক্ষা হল-এ যাবেন না। এদিকে চিত্তরঞ্জন, মনমোহন ঘোষ, অতুলপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু নাছোড়বান্দা, তিনি 'ভীতু' এ অপবাদ শুনতে তাঁরা রাজী নন, পরীক্ষা তাঁকে দিতেই হবে। চারজনে মিলে শ্রীঅরবিন্দকে ধরে পরীক্ষা হল-এ নিয়ে গেলেন এবং এক রকম ঠেলে তাঁকে হল-এর ভেতর পৌঁছে দিলেন।১৫

বৃটিশ সরকারের প্রচারের দৌলতে সবাই জানেন যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোড়ায় চড়তে অপারগ হওয়ায় আই,সি, এস পরীক্ষায় সফল হতে পারেন নি। আসলে শ্রীঅরবিন্দ পরের গোলামী করতে প্রস্তুত ছিলেনই না।

দেশের জন্য সবারই মন উদাস হয়ে ওঠে। কত দূরে পড়ে আছে সুজলা সুফলা বাংলা-মা, কিন্তু বাংলা সাহিত্য তো নাগালের মধ্যেই আছে। কেমন হয় মাঝে মাঝে ঘরোয়া বৈঠক করে সাহিত্য চর্চা করলে। এ বিষয়ে চিত্তরঞ্জন, মনমোহন, শ্রীঅরবিন্দ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সরোজিনী নাইডু সকলেরই সমান উৎসাহ।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ, তৈরী হল ষ্টাডি সার্কেল। সাহিত্যিক এডমণ্ড গসের আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হল বাংলা সাহিত্য শিল্প ও সঙ্গীত চর্চা।১৬ সেদিনের বৈঠকে সরোজিনী নাইডু এবং মনমোহন ঘোষ স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদ স্বরচিত গান শুনিয়ে বৈঠকের আনন্দ বর্দ্ধন করলেন। চিত্তরঞ্জন এবং শ্রীঅরবিন্দও সাহিত্য-রস পরিবেশনে বাদ গেলেন না।

বিলেতে অতুলপ্রসাদের তখনকার দিনের বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম প্যাটের কণ্ঠ-সঙ্গীত শোনার সুযোগ হয়। তাঁর মধুর কণ্ঠে "হোম সুইট হোম" গানটি শুনে অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হন। পরবর্তীকালে ঐ সুরে তাঁর 'প্রবাসী চলরে দেশে চল' গানটি রচনা করেন।

চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারি-পাস করে দেশে ফিরে

যাবেন। তাঁকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য গানের আসরের ব্যবস্থা হল। দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ গান করলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল একাই এক শো।

১। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী। সত্যপ্রসাদ সেন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, "অতুল ভগ্নিদের নিয়া কিছুদিন পরেই কোলকাতায় চলিয়া গেল। ভগ্নিরা গেল মায়ের কাছে। অতুল রহিল মাতুল পানীবাবুর কাছে।
২। শ্রীমতী বেলা সেন—"স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন।"
৩। সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।
৪। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।
৫। ৺সুবালাদেবী—"অতুলপ্রসাদ"।
৬। ৺সুবালাদেবী—"অতুলপ্রসাদ"।
৭। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।
৮। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।
৯। সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।
১০। শ্রীযুক্তা বেলা সেন—সাক্ষাৎ। বেলা সেন বলেছেন যে দুর্গামোহন দাস আমাদের পরিবারকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আমার শ্বশুর মশাইকে বিলেতের খরচ দেওয়া, তাঁর তিন বোনের বিবাহ দেওয়া সবই তিনি করেছেন। তাঁর খরচের একটি খাতা ছিল দেখেছি। এখন আর নেই।
শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দত্ত—সাক্ষাৎ—অতুল-ভগ্নীদের বিবাহে দুর্গামোহন দাসই খরচ-পত্তর করে দিয়েছেন।
১১। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।
১২। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।
১৩। হেমন্তকুমার ঘোষ, বার্-এ্যাট্-ল—সাক্ষাৎ। এই ঘটনা তিনি অতুলপ্রসাদের নিকট শুনেছেন। হেমন্তকুমার ঘোষ ১৯১৫ অব্দ থেকে লক্ষ্ণৌবাসী এবং ১৯১৭ অব্দ থেকে অতুলপ্রসাদ সেনের জুনিয়র হয়ে ১৯৩৪ অব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
১৪। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—মণি বাগচী।
১৫। শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ—সাক্ষাৎ। হেমন্তবাবু জানান যে অতুলপ্রসাদের নিকট তিনি এ ঘটনার কথা শুনেছেন।
১৬। হেমন্তকুমার ঘোষ—সাক্ষাৎ। বিলেতে স্টাডি সার্কেল সম্বন্ধে উনি অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে শুনেছেন।
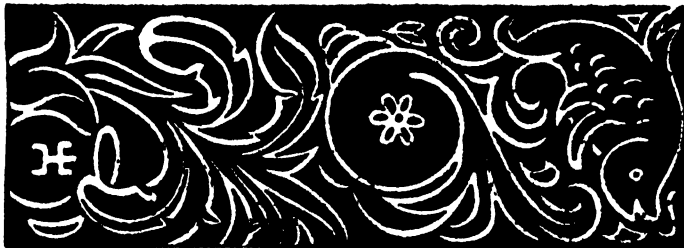
নেতৃত্বের বিড়ম্বনা

সুশীতল দত্ত

শুধু বাংলাদেশে নয় সমস্ত ভারতবর্ষে আজ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার দরুণ জনমনে যে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে, তার মূল কারণ নেতৃত্বের বিড়ম্বনা অর্থাৎ সঠিক নেতৃত্বের অভাব।

কথাটা শুনতে যেন কেমন লাগে, কারণ দেশের মধ্যে দল ও দলনেতার কোন অভাব নাই। নূতন নূতন দল সৃষ্টি আর নেতার আবির্ভাব একটা নিত্য নৈমিত্তিক কাজ, যার ফলে জনসাধারণ দিশেহারা দিকভ্রান্ত ও অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে উঠেছে।

অথচ সেইদিনও দেশের মধ্যে এতদল ও নেতা ছিল না, নেতৃত্বের দৈন্যও ছিল না, দেশের মধ্যে অরাজকতা এমন প্রবল ছিল না। অনেকে বলেন যে যুগ পরিবর্ত্তনের প্রভাবে আজকের মানুষের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব জাগরণ এসেছে, যার ফলে মানুষের মধ্যে এসেছে নবতর চিন্তা আর প্রাচীনকে পরিত্যাগের মোহ। এর ফলে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে রীতিনীতি ও প্রাচীন মূল্য বোধের নবরূপায়ণের কাজ চলছে! একথা সত্য তবে আমাদের ধারণা এই নবজাগরণকে সঠিক পথের দিকে চালনা ক'রে নিয়ে যাবার জন্য যে সৃজনশীল ও কল্যাণকামী নেতৃত্বের প্রয়োজন সে নেতৃত্ব দেবার লোক বর্ত্তমান ভারতে নাই।

এর ফলে দেশে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ নিয়ে বা কোন মতবাদ বা আদর্শবাদের দিকে লক্ষ্য না রেখেও নেতা ও দলের সৃষ্টি হচ্ছে। ওঁরা গণতন্ত্রের নামে দেশের লোককে ধোঁকা দিয়ে বিপথগামী করার যজ্ঞ সুরু করেছেন। যার ফলে দেশে বেড়েছে অরাজকতা ও উশৃঙ্খলতা আর বিঘ্নিত হচ্ছে দেশের শান্তি ও প্রগতি। জন কল্যাণের নামে একদল লোক রাষ্ট্রের অর্থের করছেন যথেচ্ছ অপচয় আরেকদল গণতন্ত্র রক্ষার নামে ও জনসাধারণের নামে করছেন সমাজের ও রাষ্ট্রের সম্পদ ও সম্পত্তি ধ্বংস। এরই নাম হচ্ছে দেশ সেবা।

যুব সম্প্রদায় নৈরাশ্যের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে বয়োজ্যেষ্ঠেরা হয়ে পড়ছেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নিজেদের মাতব্বরী আর প্রাধান্য রক্ষা করার জন্য নীতি বা আদর্শ বিসর্জন দিয়েছেন,—কারোর চোখে মন্ত্রীত্বের গদি কা'রোর চোখে অর্থলুণ্ঠন, কারোর হলো বিদেশীর প্রভাব বর্দ্ধন ও জনগণকে জনকল্যাণের নামে জন সম্পদ ধ্বংস ও সামাজিক উশৃঙ্খলতার প্ররোচনা দান। স্বাধীনতা লাভের আগে আমাদের দেশে একটা যুগ অতীত হ'য়েছে যাকে বলা হয় আমাদের স্বর্ণযুগ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষীরা সমাজকে দিয়েছেন নেতৃত্ব যে নেতৃত্বের ছত্র-ছায়ায় সমাজজীবনে এসেছিল কর্মের প্রেরণা আর সংগঠনের প্রস্তুতি। মানুষের আচরণে ছিল সততা কর্মে মনুষ্যত্ব আর প্রেরণায় দেশাত্মবোধ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব এসেছিল জাতীয় কংগ্রেস থেকে; এর পতাকা তলে দেশের সমস্ত স্বাধীনতা কামী ব্যক্তিরা ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়রা সমবেত হয়েছিলেন এক আদর্শের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। লালা লাজপত রায়, গঙ্গাধর তিলক, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এর

বাইরে আর একদল লোক যথা—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির শক্তিমান নেতৃত্বের উপস্থিতি সমাজগণকে করতো উদ্বেলিত ও সঞ্চালিত। এঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্তের মধ্যে না গিয়েও সমাজ জীবনকে সকল সংগ্রামে করেছেন উৎসাহিত। তখন আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছিল সঠিক নেতৃত্ব যাঁদের ছত্রছায়ার নীচে গড়ে উঠেছিল সুস্থ সুন্দর জীবনবোধ ও সমাজপ্রীতি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি সে সব মনীষীদের নেতৃত্ব থেকে, যাদের স্পর্শ সমাজকে করেছিল উন্নত শৃঙ্খলাপরায়ণ ও স্বাধীনতাকামী।

পরাধীন ভারতবর্ষে যেখানে ছিল নেতৃত্বের গৌরব, স্বাধীন ভারতে তার পরিপূর্ণ পরাভব। এই হল নিয়তির ক্রুর পরিহাস।

এর কারণ গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন এসেছে। আমরা কেন আজ আমাদের সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করে পশু শক্তিকে প্রাধান্য দিতেছি। আমাদের সৃজনশীল মানবিকতা আজ কেন ধ্বংসাত্মক কাজের নামে উৎসাহ পায়।

জহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ সর্বভারতীয় সর্বজনগ্রাহ্য উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়াছে। এর ফলে চতুর্থ নির্বাচনের পর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার জন্য যে কোন শুভবুদ্ধির লোকই ভারতের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হবেন। দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে—প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা হয়েছে অবলুপ্ত। মনিপুর, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ বিহার ও পশ্চিম বাঙলায় গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়েছে। এর কোন ক্ষেত্রেই নিছক নীতি বা আদর্শের লড়াই নয়, ব্যক্তিগত লোভ ও প্রাধান্যলাভের বাসনা প্রতিহিংসাই কাজ করছে, আর জনকল্যাণের কথা উঠেছে শিকের আগায়। এই কথার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না বুদ্ধিজীবি মাত্রেই এই কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন। ভারতবর্ষের সর্বত্রই আজ এক চিত্র শুধু ভাঙ্গা আর গড়ার। পুরাতন সহযোগিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের সংগ্রামে পরাজিত ব্যক্তিরা নির্বাচনের পর দলত্যাগ করে অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রধান মন্ত্রীত্বে গদিতে গিয়ে আসীন হয়েছেন। যেমন উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। খুব নিরপেক্ষভাবে দেশের সামগ্রিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করে এ সমস্ত ব্যক্তিদের কথা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বিহার ও বাংলার ঘটনা অন্য রাজ্যের থেকে দৃশ্যত আলাদা হলেও এবং দলত্যাগ নির্বাচনের আগে হলেও নির্বাচনের পর প্রধান মন্ত্রীত্বের জন্য যে মিলন তাহা নীতির দিক থেকে অবাঞ্ছিত আদর্শের দিক থেকে অন-অভিপ্রেত। এরা সকলেই যদি আদর্শের কথা চিন্তা করে বা তা রূপায়ণের পথে বাধা পেয়ে দলত্যাগ করতেন তাহলে আমাদের বলার বিশেষ কিছু থাকতো না। এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে দেশে বা সমাজে যাঁরা নেতৃত্বের অভিলাষী তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে সীমাবদ্ধ। এ সমস্ত নেতারা সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসে থেকে দেশের সেবা করেছেন, নির্য্যাতন ভোগ করেছেন, একথা সত্য কিন্তু এত দিনের সংগ্রামের সহযোগীদের পরিত্যাগ করে এঁরা নূতন রাজনৈতিক সহযোগীদের সঙ্গে মিশেছেন কোন মহত্তর আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁদের সঙ্গে মতের বা পথের মিল নেই, দেশের শাসনতন্ত্রে যাঁদের আস্থা নেই গণতন্ত্রে যাঁদের বিশ্বাস নেই এঁদের সঙ্গে মিশে নূতন কি আদর্শ এঁরা স্থাপন করবেন দেশের ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে?

গত আঠার বৎসর স্বাধীনতা লাভের পর জনসাধারণের মনের মধ্যে প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য একটা নৈরাশ্য জমে উঠেছে আর ঐ নৈরাশ্যের মধ্যে অর্ধসত্য ও মিথ্যা প্রচারের ফলে এসেছে মানুষের মনে আস্থাহীনতা আর বিতৃষ্ণা, যে বিতৃষ্ণাকে একদল লোক একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে হিংসার পথে। অথচ বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক নেতারাও কোনও

সৃজনশীল কর্মসূচী জন মানসের সামনে উপস্থিত করতে পারেন নি। কংগ্রেস বিরোধী আদর্শ ও অর্থ নৈতিক সংস্কারের স্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়ে মানুষের মনোভাবকে সংযত করে একটা সুষ্ঠু রাজনীতি চালনা করতে পারলে দেশের মধ্যে যে একটা সুস্থ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দল দাঁড়াতে পারতো তা আজ বিভিন্ন মতলব বাজ রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের জন্য প্রয়োগ হচ্ছে দেশের সংহতি নষ্ট করার কাজে ও শাসনতান্ত্রিক অনিশ্চয়তার পথে দেশকে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায়।

একথা মনে হওয়ার সঙ্গত কারণ আছে যে আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্মীরা বা নেতারা এ বিষয়ে সঠিক চিন্তা করেন না বা প্রতিকারের কথা ভাবছেন না। আর রাজনীতির বাইরে যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যাক্তিরা আছেন তাঁরাও আজ সমাজের কথা খুব একটা ভাবেন না। মানুষের মন থেকে ধর্মের প্রভাব কমে যাওয়ার ফলে ধর্ম প্রচারকেরাও আগের মত জনসমাজের মধ্যে কাজে অগ্রসর হতে চান না।

গত বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীতেই নেতৃত্বের দৈন্য-দশা এসেছে একথা ঠিক। যেমন ইংলণ্ড, আমেরিকা বা রাশিয়ায় মহান ব্যাক্তিত্ব ও রাজনৈতিক বুদ্ধিমান নেতার অভাব দেখা যায়। এর ফলে ঐ সমস্ত দেশের মর্য্যাদা কিছু কমেছে একথা ঠিক কিন্তু আমাদের দেশে যে রাজ-নৈতিক অনিশ্চয়তা ও সমাজ জীবনে উশৃঙ্খলতা দেখা যায় এমন আর কোথাও দেখা যায় না। বিদেশের কথা নিয়ে আলোচনা করা আমাদের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য নয় কিন্তু বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের ফলে প্রত্যেক দেশই আজ একে অপরের অতি কাছে এসে গেছে এবং পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান চলছে। গত বিশ্ব-যুদ্ধের পর মানুষের চিন্তাধারায় এক বিরাট বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এই মানসিক বিপ্লবের গতিবেগ এত প্রবল ছিল যারজন্য মানুষ তার বিগত ঐতিহ্যের কথা পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে চিন্তার সংকটজালে আটকে পড়ছে—পুরাতন মূল্যবোধের হয়েছে অবলুপ্তি।

আমাদের দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ যে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা আমাদের মতে সমাজ ব্যবস্থা এর একটা কারণ হলেও সর্বভারতীয় নেতারাই এর জন্য বিশেষ দায়ী। গান্ধীজী যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবিসংবাদিত নেতা তখন তাঁকে ঘিরে কয়জন বিশিষ্ট প্রতিভাবান লোক ছিলেন যথা জহরলাল, সুভাষ বসু, আচার্য্য জেবি কৃপালানী, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি এবং এঁদের মধ্যে সকলেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর স্থান দখল করার যোগ্য অধিকারী। তিনি সঙ্গত কারণেই জহরলাল নেহেরুকে তাঁর উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করেছি-লেন কিন্তু আদর্শরূপায়ণের মতপার্থক্য হেতু সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যে বিরোধ ও বিরুপতা, সেই বিরুপতা ব্যক্তি স্বার্থ সংঘাতের ফলে জহরলালের প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব নষ্ট করার জন্য শক্তি ক্ষয় হয়েছে।

অথচ দেশের প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্রকে দেওয়া উচিত ছিল দ্বৈত নেতৃত্বের অধিকার। গান্ধীজীর তিরোধানের পর জহরলাল নেহেরু তাঁর ব্যাক্তিগত প্রাধান্য ও নেতৃত্বকে বজায় রাখার জন্য নূতন নেতৃত্বের দিকে তাঁর চোখ খোলেননি। পরন্তু কিছু চাটুকার লোককে তিনি দিয়েছেন প্রাধান্য যার পরিণামে আদর্শবাদী প্রতিভাবান ব্যাক্তিগণ একে একে কংগ্রেস ছেড়ে চলে এসেছেন অথচ শাসনের ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে থাকায় এঁরা সমাজ জীবনে এঁদের যোগ্য স্থান করে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন, যেমন আচার্য্য কৃপালানী; ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নেতারা। অথচ দেশের সামগ্রিক মঙ্গল ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য এঁদের সকলের মিলিত নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। এঁদের বাহিরে চলে আসার কারণ শুধু আদর্শগত পার্থক্য নয় ব্যাক্তিগত ঈর্ষা, ভয় ও ভীতিই তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যার ফলে নেহেরুর মৃত্যুর পর সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অধিকারী হওয়ার মত ব্যাক্তিত্বের অধিকারী আর কেহই রইলেন না। এর পরিণামে ঐতিহ্যময় একটা প্রতিষ্ঠানের আজ মৃতপ্রায় অবস্থা আর ধ্বংসের দিকে গতি এবং এই ধ্বংসের সুযোগে নূতন নূতন দলের উৎপত্তি। নূতন দলগুলির মধ্যে জনসংঘ বা কম্যুনিষ্ট দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কিছুটা বুঝা যায়।

একটা নির্দিষ্ট নীতির উপর এদের ভিত্তি প্রস্তুত, কিন্তু এর বাইরে যে সমস্ত দল সংখ্যায় যাঁরা সংখ্যাতীত তাঁদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এমন কোন ব্যবধান নেই যাকে অতিক্রম করে এঁরা সকলে একদলে না আসতে পারেন। অথচ এঁরা সকলে একত্রিত হতে প্রস্তুত নহেন, কেন?

নির্বাচনের সময় কংগ্রেস বিরোধিতা এঁদের এক করে বটে কিন্তু বিভিন্ন দলনেতার অস্তিত্বে সংঘটিত যৌথ দায়িত্বে আয়োজিত কাজকে পণ্ড করে। এর ফলে দেশের সামগ্রিক কল্যান কামনা ব্যাহত হয়। এরই ফলে বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী লোকেরা একত্রিত হয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অধিকার লাভের প্রত্যাশায় এবং দলীয় প্রয়োজনে হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কাজ করতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হননা।

নেতৃত্বের দৈনদশায় ও কংগ্রেসের ভগ্নস্তূপের উপর একদল পুরা দক্ষিনপন্থী—একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ অধিকারের প্রত্যাশী আরেকদল আধুনিক যুগে প্রগতির নামে পুরান একটা রাজনৈতিক সূত্র ধরে আধুনিক যুগের সমস্যা সমাধানের অন্ধ বিশ্বাসে আস্থাশীল হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে উৎসাহী অথচ একথা এঁরা মানতে চান না যে আজকের দিনের সমাজ চিন্তায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থান নেই। সমাজ আজ বৃহত্তর সমাজ কল্যানে ব্রতী সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী সমাজ এমন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার কামনা করে যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে সমষ্টির কল্যানের পথে তার যাত্রা শুরু হবে এবং শান্তির মধ্যে অর্জিত হবে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা আর এটাই বর্ত্তমান যুগের দাবী। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দেশের কথা ভাবতে হবে এবং জনমতকে সৃষ্টির পথে ধাবিত করতে হবে।

দেশের তরুণদের আজ ভাববার দিন এসেছে দেশের ঐতিহ্যে আস্থাশীল, দেশ কল্যাণে উদ্বুদ্ধ ও কল্যানকর চিন্তায় যাঁরা অধিকারী, মা আর মাটীকে যাঁরা জেনেছেন ভাল ক'রে তাঁরাই হবেন যোগ্য নেতা দেশের এই সঙ্কট মূহুর্ত্তে।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

১৮৯০ সাল। সেপ্টেম্বর মাস। নব সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত নতুন পৃথিবী, স্নিগ্ধ সুন্দর শান্ত প্রভাত।

জর্জ কার্ভারের নতুন করে আবার যাত্রা শুরু হ'ল।

সিম্পসন কলেজ অভিমুখে এবার তার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা, পায়ে চলার পথ ধরে সে এগিয়ে চললো। অনেকটা পথ তাকে যেতে হবে, প্রায় পঁচিশ মাইল।

একা পথ চলা অবশ্যই খুব কষ্টসাধ্য, কিন্তু জর্জ কার্ভার কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে করে না বা কোন কাজ করতে আরম্ভ করে তা মধ্যপথে বা অসমাপ্তভাবে ত্যাগ করে না, এইটেই তার চিরকালের স্বভাব। ক্লান্তিতে তার পা যতই অবশ এবং ভারী হোক সে পথের মাঝখানে থেমে না দাঁড়িয়ে আরো জোরে জোরে পা চালিয়ে পথ চলে, আরো জোরে গলা খুলে চেঁচিয়ে গান গায়। তার পা যতই ব্যথায় টনটন করে ততই তার গানের গলা উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে। তার পথ চলাতেই আনন্দ।

জর্জ কার্ভার শারীরিক সবরকম দুঃখকষ্ট সহ্য করে তার হোটেলের চাকরি-জীবনে যে সামান্য পরিমাণ পুঁজি সঞ্চয় করতে পেরেছিল সিম্পসন কলেজে ভর্তি হবার সময়ে তা সবই খরচ হয়ে গেল। তার হাতে আর এক পয়সাও থাকলো না।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ১৮৯০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর সিম্পসন কলেজে ভর্তি হলেন, ছাত্ররূপে সসম্মানে গৃহীত হলেন। বর্ণবৈষম্যের প্রাচীর এখানে তাঁর অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। বরং [illegible] তাঁর ভর্তি হবার আনুষঙ্গিক কাজ-গুলি বেশ সুশৃঙ্খলরূপেই সমাধা হল। কোনরকম অসুবিধাই জর্জ কার্ভারকে ভোগ করতে হল না।

সিম্পসন কলেজের কর্তৃপক্ষ পরম সমাদরে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারকে গ্রহণ করলেন।

কলেজে তো নির্বিঘ্নে ভর্তি হওয়া গেল, কিন্তু তার পর যে দুটো মস্তবড় সমস্যা সামনে রয়েছে তা সমাধানের উপায় কি হবে ভেবে জর্জ কার্ভার চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং আহার ও বাসস্থানের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি অন্যদিকে মন দিতে পারছিলেন না। জর্জ কার্ভারের এখন মাত্র বারো সেন্ট পকেটে রয়েছে। এক বাটি গরুর চর্বি আর ঝোলের সঙ্গে খানিকটা গমের দানায় তৈরি রুটির মতো শক্ত এক রকমের খাদ্য উদরসাৎ করে জর্জ কার্ভারের একবেলার মতো ক্ষুন্নিবৃত্তি হল, ওবেলা কী খাওয়া হবে সে কথা এখন ভাববার তাঁর সময় নেই। সবচেয়ে আগে দরকার হল একটা আস্তানার। অবশেষে কোনরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁইও তাঁর একটা জুটলো। কলেজ প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে কিছুদূরে গেলে একটা বহুদিনের পুরণো ছাড়াবাড়ী চোখে পড়ে, লোকজন কেউ থাকে না সে বাড়ীতে। বাড়ী না বলে সেটাকে অনায়াসে ঝুপাড় আখ্যা দেওয়া চলে। কোনোকালে যে সে বাড়ীতে কেউ থাকতো বাড়ীটার চেহারা দেখলে সেকথা বিশ্বাস করা কঠিন। সেই বাড়ীটাই কার্ভার পছন্দ করলেন। তিনি ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করে সেই বাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা করলেন। এক ঘরে একখানা শোবার খাট পাতলেন প্যাকিং বাক্সে তৈরী করা এবং অন্যঘরে আরো কয়েকটা

আস্ত প্যাকিং বাক্স সাজিয়ে একটা লিখবার টেবিল ও বসবার আসন তৈরী করে নিলেন। এর পরে পকেটে আর তাঁর বিশেষ কিছু রইলো না, রোজ সেই একই খাদ্য—গরুর চর্বির ঝোল আর শুকনো আটার রুটি। এই যৎসামান্য খাবার খেয়েই জর্জ কার্ভার কোনমতে প্রাণটা টিকিয়ে রাখলেন।

কিন্তু এভাবে তো দীর্ঘকাল চলতে পারে না। অর্থ উপার্জনের একটা উপায় অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। জর্জ কার্ভার কলেজের পড়াশুনা করার পরে যে সময়টা হাতে থাকে সেই সময়ে কোন একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবতে লাগলেন।

শব্দতত্ত্ব, গণিত, রচনা এবং যে বিষয়টা তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করার দিকে তিনি বেশী জোর দিলেন। জর্জ কার্ভার গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা আরম্ভ করে দিলেন।

জর্জ কার্ভার একদিন তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা বড় ড্রাম সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তার উপরের দিকের ঢাকনা খুলে ফেলে কাপড় ধোলাই করার একটা যন্ত্র তৈরি ক'রলেন এবং বড় রাস্তার ধারে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে একটা লণ্ড্রী খুলে ব'সলেন। সেই লণ্ড্রী থেকে তাঁর যে অর্থ উপার্জন হ'তে লাগলো তাতে তাঁর অর্থের টানাটানি আর বিশেষ রইলো না। কলেজের বহু ছাত্র তাদের ময়লা পোষাক-পরিচ্ছদ কাচাবার জন্য জর্জের লণ্ড্রীতে আসতে আরম্ভ ক'রলো এবং তারা সবাই যে এসেই তৎক্ষণাৎ চ'লে যেতো, তা নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দীর্ঘসময় ধ'রে তারা সেই লণ্ড্রীতে ব'সে সেই রোগা কৃশতনু ছাত্রবন্ধুটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রতো, ইতিহাস, দর্শন, সমাজ-নীতি, রাজনীতি এবং বিজ্ঞানের বহু জটিল সমস্যা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চ'লতো তাদের মধ্যে, গরম গরম কথার ফোয়ারা ছুটতো।

আবার জর্জ কার্ভার যখন তাঁর নিজের বিষাদময় জীবনের রূপকথার মতো রোমাঞ্চকর কাহিনী ব'লে যেতেন তারা তন্ময় হ'য়ে একাগ্রচিত্তে ব'সে শুনতো, কিন্তু তাদের অনেকের কাছেই জর্জ কার্ভারের অনেক কথা অদ্ভুত এবং অবিশাস্য মনে হ'ত। তারা নিজেদের জীবনের পরিচিত কাহিনীর সঙ্গে জর্জ কার্ভারের জীবনের মর্মন্তুদ দুঃখ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার কোন মিল খুঁজে পায় না। জর্জ কার্ভারের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন আগাগোড়াই কেমন যেন বিসদৃশ, জগতের অন্যান্য সব মানুষের জীবন থেকে আলাদা, চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম।

জলন্ত উনুনের উপরে মস্তবড় একটা কড়াই চাপানো, তাতে কাপড় সিদ্ধ হ'চ্ছে, টগবগ ক'রে সেগুলি ফুটছে আর শাদা ফেনা থেকে বাষ্পের কুণ্ডলী উঠছে। উনুনের পাশে একখানা চেয়ারে ব'সে জর্জ কার্ভার একখানা বই প'ড়ছে আর তাঁর ছাত্রবন্ধুরা তাঁর চারদিকে ঘিরে গোলাকার হ'য়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর পড়া শুনছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জর্জ কার্ভারের তাকে সাজানো বৈয়মগুলি থেকে বিস্কুট, মধু অথবা জেলি চামচে ক'রে তুলে নিয়ে নিয়ে খাচ্ছে। অনেকে কার্ভারকে তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী অথবা তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রছে। জর্জ কার্ভার সবার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছেন না, ইচ্ছা করে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

লণ্ড্রী থেকে জর্জ কার্ভারের এখন বেশ ভালো আয় হ'তে লাগলো, আর তিনি অভাবের মধ্যে নেই। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এখন তাঁর পেট ভরে আহার জোটে। কিন্তু কোন বিলাসের উপকরণ কেনার মতো যথেষ্ট অর্থ তিনি এখনো আয় করতে পারছেন না, তাঁর সঞ্চয়ের ভাণ্ডারেও তেমন কিছু জমা পড়েনি। আর, বিলাসিতাই বা বলি কেন? টেবিল, চেয়ার, আয়না; একখানা শোবার খাট কিংবা একখানা ওয়াড্রোব-নিত্য প্রয়োজনীয় এইসব আসবাবপত্রকে কিছুতেই বিলাসের উপকরণ বলা চলে না, কিন্তু তার একটাও তিনি এখন পর্যন্ত কিনতে পারেননি। তাঁর সেই প্যাকিং বাক্সের টেবিল-চেয়ারই এখনো র'য়েছে। চেয়ারে বসার মতো একটা বড় প্যাকিং বাক্সের ওপরে ব'সে আর একটা প্যাকিং বাক্স সামনে টেবিলের মতো ক'রে সাজিয়ে

নিয়ে তার ওপরে খাবার প্লেট রেখে তিনি খান এবং এখনো রাত্রে মেঝেতে বিছানা পেতে ঘুমোন।

একদিন সন্ধ্যায় কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে জর্জ কার্ভার যারপরনাই অবাক হ'লেন। নিজের ঘর ব'লে ঘরখানাকে তিনি চিনতেই পারলেন না, সে ঘরের সব যেন কেমন উল্টে পাল্টে গিয়েছে। তাঁর সেই প্যাকিং বাক্সের চেয়ার টেবিল অদৃশ্য হ'য়ে গিয়ে তার জায়গায় সুন্দর ক'রে সাজানো র'য়েছে দামী মেহেগনি কাঠের ঝক্‌মকে পালিশ করা দেরাজওয়ালা টেবিল, তেমনি দামী আর চমৎকার আলমারী চেয়ার এবং আরো নানান আসবাবপত্র। জর্জ কার্ভার এখন আসবাবপত্র তাঁর জীবনেও দেখেননি। তিনি ভাবতে লাগলেন, তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন, না এ সব সত্যি! নিজের গায়ে চিমটি কেটে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলেন। তিনি জেগে আছেন, না ঘুমোচ্ছেন।

কিছুদিন পরে একবার মিসেস মিলহোল্যাণ্ডের কাছে একখানা চিঠিতে এ দিনটির বর্ণনা দিয়ে জর্জ কার্ভার লিখলেন, "আমার সহপাঠী ছাত্রবন্ধুরা আমাকে অতি আশ্চর্যরকম ভালোবাসে। তাদের আমার জন্য যে প্রাণের দরদ ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার নিদর্শন আমার ঘরে রেখে গিয়েছে তা দেখে আমি গভীরভাবে অভিভূত না হ'য়ে পারিনি। তাদের অকৃত্রিম ও সুগভীর প্রেম আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করি।

"সারা দিনরাত আমি যতোখানি কঠোর পরিশ্রম করি তার তুলনায় বিশ্রাম আমার ভাগ্যে খুব কম জোটে, সেটা নিশ্চয় তারা অনেকদিন ধ'রে লক্ষ্য ক'রেছে। তাই তারা সকলে মিলে সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্র কিনে এনে আমার ঘর সাজিয়ে রেখে গেছে। এ জিনিষ আমি একেবারেই আশা করিনি, তাই আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছে।"

জর্জ কার্ভারকে শুধু কেবল তাঁর সহপাঠী ছাত্রবন্ধুরাই ভালোবাসে তাই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেও তিনি যথেষ্ট স্নেহ ও সহানুভূতি পান। ছাত্ররা যেমন দল বেঁধে সবাই মিলে তাঁর ঘরে এসে গল্প-গুজবে মেতে ওঠে আড্ডা জমিয়ে বসে, শিক্ষকরাও তেমনি তাঁকে সস্নেহে কাছে ডাকেন, অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁকে নিকটে বসিয়ে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। একজন শিক্ষিকা ডাঃ মিলহোল্যাণ্ডের কাছে জর্জ কার্ভার সম্বন্ধে একখানা চিঠিতে লিখলেন—জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার একজন সত্যিকারের গুণী, অধ্যাবসায়ী, অসাধারণ ধৈর্যশীল ও সুক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ছাত্র।

"বড় হয়ে ভবিষ্যতে তুমি কী হতে চাও, জর্জ কার্ভার? তোমার জীবনের লক্ষ্য কী?" জর্জ কার্ভারের পরিচিত এবং বন্ধুস্থানীয় এক ভদ্রলোক এক দিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেদিনও জর্জ কার্ভার সে প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন নি।

শিল্পী জর্জ কার্ভারের শিল্পরীতির বিশেষত্বঃই হল এই যে, কোনো মডেল সামনে না রেখে মন থেকে তিনি ছবি আঁকেন। এমনিভাবেই কোনো মডেলের সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজের মন থেকে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে একটা ক্যাকটাস গাছের ছবি আঁকলেন। সিম্পসন কলেজের চিত্রশিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী মিস্ এট্টা বাড জর্জ কার্ভারের আঁকা ক্যাকটাস গাছের ছবিখানা দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন, জর্জ কার্ভার যে এমন একজন গুণী শিল্পী তা তিনি আগে ধারণাও করতে পারেন নি। জর্জ কার্ভারের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। ছবিখানা নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন। একদিন জর্জ কার্ভার ছবিখানা মিস্ বাডের কাছে ফেরৎ চাইতে গেলেন। মিস্ বাড তাঁকে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মধ্যে মহিলাটির আন্তরিকতার উষ্ণ স্পর্শ মাখানো ছিল তা জর্জ কার্ভারের অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিল এবং তাঁর জীবনের গতিই দিল সম্পূর্ণ বদলে। মিস্ বাড সেদিন জর্জ কার্ভারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "বড় হয়ে তুমি কী হতে

চাও? তোমার জীবনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কী? ভবিষ্যতে তুমি কোন পথে যাবে, কী করবে, সে সম্বন্ধে কিছু কি ঠিক করে রেখেছ?"

এ জর্জ কার্ভারের জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এর আগে তিনি কখনো কিছু চিন্তাই করেন নি। এখন হঠাৎ এই চিন্তাটা তাঁর মাথায় ঢুকলো। তিনি নিজেও এ কথা উপলব্ধি করলেন, আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো তাঁর জীবন উদ্দেশ্যবিহীন হ'তে পারে না। একটা লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্যের দিকে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কী সে লক্ষ্য? কে তাঁকে পথ বলে দেবে? বলে দিতে পারেন একমাত্র এই মিস্ বাড। জর্জ কার্ভার সসম্ভ্রমে মহিলাটির প্রশ্নের উত্তর দিলেন, বললেন, "আপনি যদি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে আমার অন্তরের সঙ্গে শিল্পীসত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমি আপনার আদর্শ অনুযায়ী শিল্পী হবার সাধনা করি।"

"হ্যাঁ, সেই আসল কথাটাই আমি তোমাকে বলতে চাই জর্জ, সত্যই আমি বিশ্বাস করি যে, তোমার মধ্যে অনন্যসাধারণ শিল্পপ্রতিভা রয়েছে, যথার্থ একজন শিল্পী হবার জন্য একজন মানুষের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক তোমার সে সব গুণই আছে।" মিস্ বাড শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি আরো বললেন, আমি তোমার মধ্যে এক বিরাট শিল্পপ্রতিভার অঙ্কুরোদ্গম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুমি যদি সাধনা কর তবে নিশ্চয় একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হতে পারবে, পৃথিবীতে তোমার নাম অমর হয়ে থাকবে। তোমার অঙ্কিত ক্যাকটাস গাছের ছবিখানি আমি আমার পিতাকে দেখিয়েছি। তিনি তোমার আঁকা ছবিখানি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এম্‌স শহরে অবস্থিত আইওয়া কৃষি কলেজের তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। গাছপালা সম্বন্ধে তোমার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তত্ত্বজ্ঞানের যে সামান্য পরিচয় আমি পেয়েছি তা আমি সবিস্তারে আমার পিতাকে বলেছি। সবকথা শুনে তিনি তোমার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, ভবিষ্যতে কৃষি-বিজ্ঞান নিয়েই তোমার পড়াশুনা করা কর্তব্য।"

মিস্ এট্টা বাড যদি সেদিন জর্জ কার্ভারকে কথাগুলি না বলতেন তবে হয়তো তার সমগ্র জীবন সিম্পসন কলেজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে গতানুগতিকভাবে অতিবাহিত হত।

এমনিতে জর্জ কার্ভারের জীবন সুখেরই ছিল সিম্পসন কলেজে, দারিদ্র্যের কশাঘাত ছিল না, অভাব-অনটনের বেদনা ছিল না, তার উপরে তিনি সিম্পসন কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক সবার প্রিয়জন ছিলেন। সব-চেয়ে বড় কথা সেখানে বর্ণ বৈষম্যের তীক্ষ্ণ কাঁটা পদে পদে তাঁর পায়ে বিঁধতো না, অপমান সইতে হ'ত না। শিক্ষক ও ছাত্রদের স্নেহ ও প্রীতি তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ এক নতুন স্বাদ এবং অভাবনীয় বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিল। তাই সিম্পসন কলেজের স্মৃতি জর্জ কার্ভার আমৃত্যু শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে গিয়েছেন।

পরিণত জীবনে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সিম্পসন কলেজ সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই বলতেন, মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা কি আমি জানি না। কিন্তু মানুষ বলতে সত্যি কি বুঝায়, মনুষ্যত্বের ব্যাখ্যা কী, তা আমি সিম্পসন কলেজে ভর্তি হবার পরই শিখেছি। তার আগে মানবতার পরিচয় আর কোথাও আমি এমনভাবে পাই নি। সিম্পসন কলেজই প্রথম আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমার হাত ধ'রে নিয়ে আমাকে উদার উন্মুক্ত বিশ্বের মাঝখানে দাঁড় করিয়েছে। সিম্পসন কলেজই সর্বপ্রথম আমাকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে—আমি মানুষ, এই পরম সত্য আমি লাভ ক'রেছি মনুষ্যত্বে আমারও পূর্ণ অধিকার আছে। পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ স্বাদ অন্য সকলের মতো ভোগ করার পূর্ণ অধিকার নিয়েই আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রেছি।

মিস এট্টা বাডের কথাগুলি শুনে এবং তাঁর সাহচর্য লাভ ক'রে জর্জ কার্ভারের তথাকথিত শান্তিপূর্ণ জীবনে অশান্তি অস্থিরতার ঝড় উঠলো, মনে তাঁর একটা বিপ্লব ঘনিয়ে এলো। আগামী দিনের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের

চিন্তা অশরীরি প্রেতাত্মার মতো তাঁকে অনুক্ষণ তাড়া করে ফিরতে লাগলো।

এ হ'ল ১৮৯১ সালের কথা, জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বয়স তখন মাত্র ত্রিশ বছর। তিনি ভাবতে ব'সলেন আমি তবে কী ক'রবো? আমি কি সারা জীবন সিম্পসন কলেজের ছাত্ররূপেই কাটিয়ে দেবো? এই কি আমার ভবিষ্যৎ? তার বেশী কি আর কিছুই নেই আমার সামনে?

একদিন বসন্তকালের এক নির্জন সন্ধ্যায় জর্জ কার্ভার একাকী ব'সে আপন মনে এইসব কথা ভাবছিলেন, তাঁর শান্ত স্থির অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে, সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ঝলমল ক'রছে। কোথায় শুকতারা আর কোথায় ধ্রুবনক্ষত্র ওই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে র'য়েছে কার্ভার যেন কিছুতেই তা খুঁজে পাচ্ছেন না। নিজেকে তাঁর মনে হ'চ্ছে, ওই অসীম মহাকাশের বুকে একজন নি:সঙ্গ দিগভ্রান্ত লক্ষ্যহারা পথিক। তাঁর দৃষ্টি উদাসীন, উদ্‌ভ্রান্ত, কেমন যেন স্বপ্নবিহ্বল।

সহসা জর্জ কার্ভারের চোখের সামনে ছায়ামূর্তির মতো আবির্ভূত হ'ল আন্টি মারিয়া ওয়াটকিন্সের মূর্তি, তিনি যেন তাঁকে কি ব'লছেন। মাথা তুলে জর্জ কার্ভার সেই মূর্তির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু সে ছায়ামূর্তিকে আর দেখা গেল না। শুধু একটা কণ্ঠস্বর এসে তাঁর কানে বাজলো—অবিকল আন্ট মারিয়ার কণ্ঠস্বর। জর্জ কার্ভার স্পষ্ট শুনতে পেলেন আন্টি মারিয়া তাঁকে সম্বোধন ক'রে ব'লছেন, : এতটুকু এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য তোমার জীবন সৃষ্টি হয়নি, বিশ্ববিধাতা তোমাকে দিয়ে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তোমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তোমার অনেক কাজ করার রয়েছে পৃথিবীতে, সেই কাজ করার জন্য মহাবিশ্বে বেরিয়ে প'ড়ে নিজেকে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে তোমার। এক বৃহৎ মানব গোষ্ঠী বন্ধন মুক্তির আশায় তোমার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তুমিই তাদের একমাত্র আশা-ভরসা, একমাত্র বন্ধু। তোমার জ্ঞান, প্রতিভা ও প্রজ্ঞা, তোমার কর্ম সাধনা ও অধ্যাত্ম-শক্তি শুধু তোমার একেলার জন্য নয়, তোমার যে সমস্ত ভাইবোন আজো ক্রীতদাসত্বের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা প'ড়ে পশুর মতো জীবনধারণ ক'রতে বাধ্য হ'চ্ছে তাদের বন্ধনমুক্তি তোমার উপরে বহুলাংশে নির্ভর ক'রছে। ওঠো, জাগো, অভিশপ্ত নিগ্রোজাতিকে জাগাও, তাদের স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা করো।

ক্রমশ:

হকির ধ্যান ধ্যানচাঁদ

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

১৯২৮ সাল, আমষ্টারডাম অলিম্পিক। প্রথম ভারতীয় হকিদল—হকিদল বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে যাচ্ছে তার শক্তি যাচাই করতে।

ভারত তখন পরাধীন। সমস্ত বিষয়েই তখন তার পরাজিতের মনোভাব। অসাধারণ কোন কিছু যে করতে পারে তারা তা' তাদের তখন কল্পনারও অতীত।

এই রকম অবস্থায় ভারতীয় অলিম্পিক দল ১৯২৮ সালের ১০ মার্চ্চ আমষ্টারডাম অভিমুখে রওনা হবে। অফুরন্ত শক্তি, চাতুর্য্য ও অসীম মনোবল সম্পন্ন ভারতীয় যুবকেরা যাচ্ছে আজ তাদের বিশ্ব অভিযানে। তাদের ঐ উচ্চাশায় ভারতবাসী তখন কিন্তু বিশেষ আস্থা রাখতে পারে নি। আর সেই জন্যই বোধহয় দেশবাসী তাদের যাত্রার প্রারম্ভে কোন বিদায় অভিনন্দন জানানোর প্রয়োজনবোধ করেনি।

ধ্যানচাঁদ সে দিনের সেই নিরুত্তাপ বিদায় অভিনন্দনের কথা লিখে রেখেছিলেন। তা' না হলে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানতে পারতাম না।

বিদায়ের ক্ষণটিতে ভারতীয় দলকে বিদায় জানাতে সে দিন মাত্র তিনজন মানুষ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে দুজন ছিলেন বিদেশী আর একজন বাঙালী। তারা হলেন মেজর বার্ণ মার্ডক, মিঃ নিউহাম এবং শ্রী এস ভট্টাচার্য্য। বহু অলিম্পিক জয়ী ভারতবর্ষের খুব কম লোকই বোধহয় ভারতীয় হকির প্রাণপুরুষ ঐ তিনজন মানুষের নাম জানে। প্রধানতঃ তাদেরই প্রচেষ্টায় ভারতীয় হকিদল সর্ব্বপ্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় যোগদান করতে সমর্থ হয়।

যাইহোক তৎকালীন ভারতবর্ষের ৩৩কোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ তিনজনও তাদের যথাযথ কর্ত্তব্য পালন করে আমাদের এক পরম অনুশোচনার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

অতঃপর জয় পরাজয় সম্বন্ধে বহু বিতর্কিত ভারতীয় হকিদল ১৯২৮ সালের ১৭ই মে আমষ্টারডামে অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় তাদের বিজয় অভিযান আরম্ভ করলেন।

এই প্রতিযোগীতায় তারা একের পর এক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দলগুলিকে সন্দেহাতীত গোলের ব্যবধানে পরাস্ত করে সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণ পদক জয়লাভ করে বিশ্বজয়ীর সম্মানে ভূষিত হলেন। অনেকের মতে ভারতের এই কৃতিত্বের মূলে ধ্যানচাঁদের দান ছিল অপরিসীম।

এই প্রতিযোগীতায় কোন দলই ভারতের বিরুদ্ধে কোন গোল করতে পারেনি।

অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় ভারত অষ্ট্রিয়াকে ৬—০, বেলজিয়ামকে ৯-০, ডেনমার্ককে ৫-০, সুইজারল্যাণ্ডকে ৬-০ এবং হল্যাণ্ডকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে।

এই সময় ধ্যানচাঁদ অবিসম্বাদিতভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় রূপে পরিগণিত হন।

অলিম্পিক শেষে এবার বিশ্বজয়ী ভারতের প্রত্যাবর্তনের পালা। মাত্র তিনজনের শুভেচ্ছা বহনকারী ভারতীয় দল আজ বোম্বাই অবতরণ করবে। তাদের কৃতিত্বের কথা আজ আর ভারতবাসীর অজানা নয়। আজ সকলেই তাদের প্রত্যাগমনের জন্য উল্লসিত। সকলেই আজ তাদের দর্শন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত।

দেশবাসীর সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দনের কথাও ধ্যানচাঁদ লিখে রেখেছিলেন সেদিন।

তাদের অভ্যর্থনা জানাতে অগণিত লোকের এক বিশাল জন-সমুদ্রকে ষ্টেশনে দেখা গিয়েছিল সেদিন। সমাগত জনগণের মধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও দেখা গিয়েছিল।

জনগণের মধ্যে সেদিন উপস্থিত ছিলেন শ্রীযমুনা দাস মেটা, বোম্বাই গভর্ণরের প্রেরিত একজন প্রতিনিধি এবং বোম্বাই মিউনিসিপ্যালটির মেয়র ডাঃ জি ভি দেশমুখ।

সকল সন্দেহ নিরসন করে ভারতীয় হকিদল সেদিন বিশ্বজয় করে ফিরে এসেছিল। বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় তখন ধ্যানচাঁদ। জগৎবাসীর নিকট "হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ।"

"হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদ"—এই কথাটি কোথায় এবং কি ভাবে উৎপত্তি হল সে বিষয়ে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন।

সে দিন পাঞ্জাবের ঝিলামে মিলিটারী টুর্ণামেন্টের খেলা চলছিল তখন। খেলা শেষ হতে আর মাত্র চার মিনিট বাকী। মেজর জেনরেলের দল তখনও পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষের নিকট ২-০ গোলে হারছে। সমর্থকদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এক বিশাল নৈরাশ্যের তমিস্রা। বিপক্ষ দলের দিকে শোনা যাচ্ছে তখন প্রবল আনন্দধ্বনি ও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রতি কঠোর ব্যঙ্গোক্তি। দর্শকদের অনেকেই তখন আসন পরিত্যাগ করে একে একে চলে যেতে আরম্ভ করেছে। খেলার ফলাফল সম্বন্ধে এখন সকলেই সুনিশ্চিত।

সেই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও বিজিত দলের অফিসার কমাণ্ডিং একটি খেলোয়াড়কে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন—"ধ্যান আমরা দু'গোলে হারছি, যা হোক একটা কিছু করো।"

পর মুহূর্ত্তেই দেখা যায় যুবকটি যেন নবীন উদ্যম ফিরে পেয়েছে। বল তার কাছে উপস্থিত হলে কেউ আর তাকে ধরে রাখতে পারছে না। খেলার সেই সময়টুকুতে মনে হচ্ছিল ধ্যানচাঁদ ভিন্ন মাঠে আর কোন খেলোয়াড়ই বোধহয় নেই। ধ্যানচাঁদের আক্রমণে বিপক্ষদলের রক্ষণভাগ তখন পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। মাত্র চার মিনিটের মধ্যেই ধ্যানচাঁদ বিপক্ষের দুটি গোল পরিশোধ করে দিয়ে বলটিকে তৃতীয় বারের জন্য বিপক্ষ গোলে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে স্বীয় দলের জয়লাভের পথ সুগম করে দিলেন।

খেলা শেষ হওয়ার হুইশেল ধ্বনি শোনা গেল। উচ্ছ্বসিত দর্শকদল তখন ভাষাহারা—নির্বাক। ধ্যানচাঁদের খেলা দেখে দর্শকরা সত্যই সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সকলেই তখন চিন্তা করছেন—লোকটা তবে কি? বোধ হয় যাদুকর। যাদুকর ভিন্ন এ ব্যাপার কখনই সম্ভবপর নয়।

নিতান্ত অতর্কিতভাবে শুরু হয় ধ্যানচাঁদের ক্রীড়া জীবন। অতি অল্প বয়সেই সৈনিক জীবনকেই তিনি জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। বালেতেওয়ারী নামে ভারতীয় ফৌজের একজন সুবেদার মেজরের প্রেরণাতেই তিনি ক্রীড়া জীবন শুরু করেন। ক্রীড়া জীবনের প্রারম্ভেই স্বীয় প্রতিভায় ক্রীড়াঙ্গনের সকলের মনেই তিনি একটা রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই বিশ্ব বিখ্যাত হকিবীর নিজেই স্বীকার করেছেন যে এ বিষয়ে তার শিক্ষাগুরু ছিলেন সৈনিক-দলের এক অখ্যাতনামা সুবেদার মেজর; নাম বালেতেওয়ারী।

এরপর মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষ ধ্যানচাঁদের ক্রীড়া প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে ১৯২৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড সফরকামী ভারতীয় সৈনিকদলের একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন। নিউজিল্যাণ্ডে ধ্যানচাঁদ তার ক্রীড়া চাতুর্যে সকলকেই অভিভূত করে দেন এবং ক্রীড়া জগতে নিজের আসনটি বরাবরের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন।

এই প্রসঙ্গে ধ্যানচাঁদের জীবনের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিউজিল্যাণ্ড পরিভ্রমণরত ভারতীয় সৈনিকদল সেবার অকল্যাণ্ড থেকে প্লিমাউথ যাচ্ছে হকি খেলতে। সে সময় নিউজিল্যাণ্ডবাসী দু'জন ভদ্রমহিলাকে তাদের অনুগমণ করতে দেখা গেল। এই সুদীর্ঘ পথের প্রায় সবটাই তারা ভারতীয় দলের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন।

পরে তাদের এর কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেছিলেন "আপনাদের ঐ ধ্যানচাঁদের ক্রীড়া আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছি

না। ওর হকিতে কি যাদু আছে তাই দেখতে আমরা এই সুদীর্ঘ পথ আপনাদের অনুসরণ করে এসেছি। ও বোধ হয় ভোজবাজী জানে।"

নিউজিল্যাণ্ডে ভারতীয় সৈনিকদল তাদের মোট ২১টি খেলায় ১৮টিতে জয়লাভ, দুটিতে ড্র এবং একটিতে পরাজয় বরণ করেন। খেলায় ভারতীয় দল গোল করেছিলেন ১৯২টি এবং বিপক্ষেরা দিয়েছিলেন ২৪টি গোল।

এরপর দেশে ফিরে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তঃ-প্রাদেশিক খেলায় যোগদান করে নিজস্ব ক্রীড়া প্রতিভায় তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন এবং পূর্ব্ববর্ণিত ১৯২৮ সালের আমষ্টারডাম অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এরপর সুদীর্ঘ চার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ধ্যানচাঁদের ক্রীড়া চাতুর্যে কিন্তু এতটুকু মালিন্য দেখা যায় নি। স্বদেশের প্রতিটি হকি প্রতিযোগীতায় ধ্যানচাঁদের নাম এখনও সবার উপরে থাকে।

অতঃপর আসে ১৯৩২ সালের Los Angeles অলিম্পিক। বিনা বিতর্কে ধ্যানচাঁদ ভারতীয় অলিম্পিক দলের একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন। এই দলে তার সহোদর রূপসিংও প্রথম সারির এক খেলোয়াড়রূপে নির্ব্বাচিত হন।

Los Angeles-এ ভারতীয় দল পুনরায় তাদের 'বিশ্বজয়ী সম্মান অক্ষুন্ন রাখেন। এই প্রতিযোগীতায় ভারত জাপানকে ১১-১ গোলে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে ২৪-১ গোলে পরাজিত করলেন।

Los Angeles থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ভারতীয় দল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খেলায় আমন্ত্রণ পান। ভারতীয় দলও সানন্দে এই সকল আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই সকল খেলায় ভারতীয় দল মোট ৪৮টি খেলায় যোগদান করে প্রত্যেকটিতে জয়লাভ করে। খেলায় মোট গোলের সংখ্যা ছিল ৫৮৪টি। এর মধ্যে ধ্যানচাঁদ গোল করেছিলেন ২০১টি।

আমষ্টারডাম অলিম্পিকের পর দীর্ঘ একযুগ পার হয়ে গেছে। তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু ধ্যানচাঁদের খেলা একটুও নিষ্প্রভ হয়নি। এখনও পর্য্যন্ত বল পেলে দুর্ব্বার গতিতে ছুটে গিয়ে বিপক্ষ গোলে বল প্রবেশ করিয়ে দিতে কোন ত্রুটিই হয় না তার।

অতঃপর এল ১৯৩৬ সাল। এবারকার অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে বার্লিনে। ভারতীয় অলিম্পিক দল গঠনের জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এবারও ধ্যানচাঁদ এবং রূপসিং দলে স্থান পেলেন। এবার ধ্যানচাঁদকে দলের নেতৃত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করা হল।

ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বাধীনে ভারতীয় অলিম্পিক দল বার্লিন অলিম্পিকেও আবার বিশ্বজয়ী প্রমাণিত হল।

এই প্রতিযোগীতায় ভারত হাঙ্গেরীকে ৪-০, যুক্তরাষ্ট্রকে ৭-০, জাপানকে ১০-০, ফ্রান্সকে ১২-০ এবং জার্ম্মাণীকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে।

এরপরও ধ্যানচাঁদকে বহুদিন বহু প্রতিযোগীতায় যোগদান করতে দেখা গেছে। কিন্তু কোনদিন কোন প্রতিযোগীতায় তার ক্রীড়ামানের কোন অবনতি দেখা যায় নি।

এই হল অপ্রতিহত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের ক্রীড়া জীবনের ইতিহাস।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমার বন্ধু মিস্টার টমাস ক্রিস্টি (নিবাস, ২৫ লাইম স্ট্রীট, লণ্ডন) পৃথিবীকে এক গভীর ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। সিডেনহ্যামে তাঁহার বড়ই শান্তিপূর্ণ একটি ভেষজ উদ্যান আছে। তাঁহার এই ভেষজ উদ্যান দেখিয়া মনে জাগিল আমাদের দেশের এক অতীত যুগের কথা। সেই যুগে, আমাদের মহা পূর্বপুরুষ ভরদ্বাজ জীবিত ছিলেন। মহাবিজ্ঞ সেণ্টর কাইরন ঈস্‌ক্যুলাপিয়াসকে যেমন শিক্ষা দান করিতেন, তাহার বহু পূর্বে, ভরদ্বাজ তৎশিষ্য চরককে তেমনি মনুষ্য-দেহে ঔষধরূপে ব্যবহার্য উদ্ভিদের সূক্ষ্ম গুণের ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার তত্ত্ব বুঝাইতেন। ইতিহাসপূর্ব কালে চরক সুশ্রুত, এবং পরবর্তী কালের ডিওসকোরিডিস উদ্ভিজ্জ-জাত ঔষধের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, মিস্টার ক্রিস্টিও তাঁহার সহকর্মীগণসহ বর্তমানে তাহাই করি-তেছেন। উদ্ভিদ জগৎকে এখন যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহু শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে, এবং বর্তমান কালের রসায়নশাস্ত্র বিশ্লেষণের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাহার সাহায্যে এখন পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে অনুসন্ধান চালাইয়া ব্যাধি নিরাময়, বেদনার উপশম এবং আয়ুবৃদ্ধির উপযোগী ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হইতেছে। যে উদ্যম ও মনোভাব আরব-চিকিৎসক অহরম দেখাইয়াছিলেন, যাহার ফলে রুবার্ব, কাসিয়া, সেন্না, ক্যাম্ফর এবং অন্যান্য প্রাচ্য ঔষধ ইউরোপে গৃহীত হইয়াছিল, এবং যাহার ফলে পরে কুইনিন, মরফিয়া এবং স্ট্রিকনিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মিস্টার ক্রিস্টিও ঠিক তেমনি উদ্যম ও মনোভাব লইয়া গবেষণা করিতেছেন এবং ইহার ফলে অনেক শক্তিশালী ঔষধ নূতন করিয়া ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার তালিকাভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইতিপূর্বে কয়েকটি কঠিন অসুখের কোনও ঔষধ ছিল না, মিস্টার ক্রিস্টির গবেষণায় সেই সব ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিস্টার ক্রিস্টি কোনও একটি ভারতীয় ফলের গাছের active principle বা সক্রিয় সত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা ডায়াবিটিসের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই গাছের ফল গাদা গাদা মাটিতে পড়িয়া থাকে, এবং বর্ষার জল পাইয়া স্থানটি অঙ্কুরে ছাইয়া যায়, দুর্গন্ধ বিস্তার করে, অবশেষে সেগুলি ছাগের মুখে গিয়া স্থানটি পরিষ্কার হয়। আরও একটি ভারতীয় আগাছা হইতে কঠিন এক অসুখের ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। আরও ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে যদি এই জাতীয় প্রয়াস শত শত বৎসরের ভারতীয় অভি-জ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া একত্র কাজ করিতে পারে। ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান ও প্রাচ্য দেশের প্রাচীন জ্ঞান এই ক্ষেত্রে একত্র মিলিলে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নূতন শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তার কানাইলাল দে, ডাক্তার নবীনচন্দ্র পাল, ডাক্তার মুদিন শরিফ, ডাক্তার (অধুনা মৃত) সখারাম দত্ত ও ডাক্তার উদয়-চাঁদ দত্তের সহযোগিতা অনেক কাজে লাগিতে পারিত। মিস্টার ক্রিস্টির কাজে ভারতের বিশেষ স্বার্থ আছে।

কারণ এখন যে ভেষজ সম্পদ ভারতের কোনও কাজে লাগিতেছে না, নষ্ট হইতেছে, এমন কি জঞ্জালরূপে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, সেই জঞ্জাল মিস্টার ক্রিস্টির সহযোগিতায় সোনায় রূপান্তরিত হইতে পারে।

মিস্টার ক্রিস্টিকে আমি ইংরেজ চরিত্রের একটি প্রধান প্রতীকরূপে আবিষ্কার করিয়াছি। আমার মতে তিনি একজন আদর্শ ইংরেজ। দেহে শক্তিশালী, মনে উদার, উন্মুক্ত এবং দৃঢ়। ভণ্ডামি এবং নির্বুদ্ধিতা-জাত কোনও কাজের প্রতি তাঁহার ঘোর বিতৃষ্ণা। তাঁহার সমস্ত সত্তাটাই যেন কর্মোদ্যমে গড়া, হিন্দু-চরিত্রের বিপরীত।—হিন্দুর সত্তাটি কর্মহীনতায় গঠিত। মিস্টার ক্রিস্টির মানসিক ও দৈহিক শক্তি পূর্ণ বিকশিত, আবহাওয়া ও উৎসাহ-দমনকারী ঋতুর প্রভাবে সব বিষয়ে ক্ষমতা ও দৈহিক শক্তির বিনষ্টি ঘটিবার ঠিক পূর্বে আর্যদের যেমন ছিল। বর্তমান যুগের মানুষদের মধ্যে জন বুলকে বলিষ্ঠ মানবীয় গুণসমূহের প্রতিনিধিরূপে ধরা যাইতে পারে। বর্তমানের মানবজাতির এক ভাগ, শৈশবের উদ্দাম প্রকৃতি আজিও ত্যাগ করে নাই, অন্য ভাগে অথর্ব মুমূর্ষু হিন্দু জাতি। অতএব জন বুল তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া বাহিরের শক্তিকে দমন করিতে পারে। আর হিন্দু আদর্শবাদের ধাপ পার হইয়া আসিয়া, এবং নব্যপ্লেটোনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার গুরু সাজিয়া অবশেষে বহিঃপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিল, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির চর্চা দ্বারা কল্পনা সুখের আনন্দ-সমাহিত অবস্থা লাভকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইল। কিন্তু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই তত্ত্বে যত কবিত্ব অথবা শ্রেষ্ঠতাই থাকুক, বাস্তব জগতের কঠিনতার সঙ্গে ইহাকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া সহজ নহে, যে জীবনে তুচ্ছ জিনিস লইয়াই বেশি ব্যস্ত থাকিতে হয়, বিশ্বের সেই স্থূল কর্মজীবনের পক্ষে এই তত্ত্ব গ্রহণ করা কঠিন।

আমার হাতে যে অল্প সময়টুকু ছিল, তাহারই মধ্যে আমি লণ্ডনের ঔষধের বাজার খুব মনোযোগের সঙ্গে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। বিদেশ হইতে কোন্ কোন্ ঔষধ তাহারা আমদানি করে ইহাই ছিল আমার জানিবার বিষয়। বর্তমানে ঐখানে পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, অ্যামেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে যাহা আসে, দেখিলাম তাহা ভারতবর্ষ হইতেও আনা যাইতে পারে। Cassia fistula (সোঁদাল)-এর খোসাসমেত বীজ তাহার মধ্যে একটি। এই বীজ সমস্ত ভারতে গাছে গাছে শুকাইয়া নষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন Mallotus Phillippinensis (কামিলা) হইতে প্রাপ্ত হলুদ বর্ণের চূর্ণ, এবং Hemidesmus Indicus (অনন্তমূল) দেখিয়াছি। প্রদর্শনীতে ওখানকার এক বণিক্‌দের সভায় এই জাতীয় ভারতীয় নমুনাগুলি তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করা হইল। তাঁরা এগুলি লইয়া যত্নপূর্বক পরীক্ষা চালাইয়া দেখিবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লণ্ডনের বাজারে এ সবের দাম যাচাই করিয়া বোঝা গেল প্রাথমিক অসুবিধাগুলি দূর করিতে পারিলে ইহা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে। এইভাবে অন্যান্য আরও অনেক জিনিসেরও কারবার চালাইয়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে। প্রথমেই ধরা যাউক ফাইবার বা তন্তুজাতীয় দ্রব্যের এবং কাগজ প্রস্তুতের উপকরণের কথা। রাজশাহীর বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় এক জাতীয় তন্তু পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে সবার মনোযোগ হইতে বুঝিতে পারা গেল, ভারতীয় উদ্যমে উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। আসল কথা ইংল্যাণ্ডে, বা ইউরোপে বা অ্যামেরিকায় এমন কেহ নাই যিনি ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। সমস্ত সভ্য দেশেরই প্রতিনিধি পৃথিবীর সর্বত্র সকল দেশে রহিয়াছেন যাঁহারা সেই সেই দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করেন, কিন্তু ভারতের মত এত বড় দেশ এমন সভ্য শাসনে থাকিয়াও সর্বত্র প্রতিনিধিহীন।

ভারতীয় কাঁচামাল উৎপাদন প্রশ্ন লইয়া আমি অধুনা মৃত ইউজিন রিমমেল-এর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ভারতবন্ধুদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ভারতের সুগন্ধ দ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত জিনিস ও উদ্বায়ী তেল

লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভার লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ আমি আপনার অফিসে আমার সুগন্ধ বিষয়ক গ্রন্থখানি (বুক্ অভ পারফিউম্‌স্) রাখিয়া আসিয়াছি। ভারতীয় সুগন্ধি উপকরণ ও উদ্বায়ী তেলের একটি তালিকা আপনি আমাকে দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমি তাহা আনিতে চাহিয়াছিলাম। এই তালিকা বিষয়ে আমার খুবই কৌতূহল ছিল। আপনি যদি এরূপ একখানি তালিকা প্রস্তুতের সময় করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে উহা আমাকে পাঠাইয়া দিলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।" তালিকাটি পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি ব্যবসার ভিত্তিতে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্ মিস্টার ক্রস্ তন্তু লইয়া পরীক্ষার ভার লইলেন। একবার একটি তন্তু তিনি আমার হাতে দিয়া ইহার নাম বলিতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম ইহার নাম তসর। কারণ স্পর্শে খুব কোমল ঠেকিল এবং দেখিতেও চকচকে ছিল। কিন্তু আমারই ভুল, কারণ তন্তুটি ছিল পাটের। মিস্টার ক্রস্ তাঁহার আবিষ্কৃত বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাটকে ঐভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। আর এক পদ্ধতিতে অন্য একজাতীয় স্থূল তন্তু (Bauhinia Vahlu)-কে এমন বদল করিয়াছিলেন যাহাতে উহা উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ শাদা উল হইতে পৃথক করিয়া চিনবার উপায় ছিল না। ইহার সাহায্যে বেশ একটি ব্যবসাও ইতিমধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা কলিকাতা হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে আমার এক ইংরেজ বন্ধুর চিঠির নিম্নলিখিত অংশ হইতে বুঝা যাইবে।—"মেসার্স '—' আমার নিকট Bauhinia Vahlu-এর নমুনা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে ঐ বস্তু তাঁহাদিগকে পাঠাইতে থাকিব, প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।...ঐ বস্তু এখানকার পাহাড়ে বিস্তর জন্মে, এবং আগুন প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সামান্য খরচ পড়িবে তাহাতে খুব কম দামেই ইহার যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে। মেসার্স '—' লিখিয়াছেন আপনি তাঁহাদিগকে আমার সঙ্গে পত্রালাপ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমি সেইজন্য আপনাকে লিখিলাম, এবং সমস্ত বিষয় জানাইয়া দিলাম।" এসব নীরস বিষয়ে আমি বিস্তারিত লিখিতেছি শুধু এজন্য যে আমার দেশবাসী জানিয়া রাখুন, যদি তাঁহারা চোখ খুলিয়া রাখিয়া সভ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন স্বাধীন জীবিকা, সম্পদ ও সমৃদ্ধি তাঁহাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে, কিন্তু এজন্য তাঁহাদিগকে এতদিনের সংস্কারবদ্ধ বাঁধা পথ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে হইবে, কারণ এই সংস্কারই জাতীয় উন্নতির কণ্ঠ রোধ করিয়া তাঁহাদের অগ্রসর হইবার পথও রোধ করিয়া রাখিয়াছে। আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমার মনে হয় এই, জাতীয় গবেষণায় বা পরীক্ষায় ইংল্যাণ্ডের বণিকেরা নিজেদের দেশের লোকের চেয়েও "পাগড়িপরা" ভদ্রলোকদের প্রতিই বেশী মনোযোগ দিবেন, কারণ তাঁহারা ছোট ছোট চালানের উপর আদৌ ভরসা করিতে চাহেন না, আর ওদিকে ব্যবসায়ীরাও অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে চাহেন না।

সাধারণ দর্শকদের কাছে ভারতের কারুশিল্পের অঙ্গনটিই সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ করিয়া যেদিকে প্রাচীন রীতিতে গড়া মণিমুক্তাখচিত মূল্যবান অলঙ্কারের উজ্জ্বল আধারগুলি রাখা হইয়াছিল সেই দিকে তাহারা খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সব অলঙ্কারের কারুকার্য অতি উচ্চশ্রেণীর, এবং দুর্লভদর্শন, ইহা দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। আর আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম ইহাদের দেখিয়া। মুখে স্বর্গীয় সৌন্দর্য মাখা শিশুরা পিতামাতার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের হলুদ বর্ণের চুলগুলি পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুশ্রী তরুণীরা সদ্য ইস্কুল হইতে আসিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিতে কিছু সঙ্কোচ, মুখে কিছু লজ্জার আভা। কি সুন্দর যে দেখাইতেছে। যুবতীরা আসিয়াছে তাহাদের প্রণয়ীদের সঙ্গে, সমস্ত জীবন তাহাদের নিকট

হইতে যে পূজা পাইবে আশা করিতেছে। আর আশা করিতেছে—তাহারই প্রথম কিস্তি এই প্রদর্শনীতে পাইবে। (কিন্তু হায়! প্রেমের প্রথম স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তাহা যে অধিকাংশ স্থলেই দাবীর চাপে পরিণত হয়। এবং তাহা এমন যে তাহার বিরুদ্ধে যে-কোনও সক্রেটিসও বিদ্রোহ করিবেন।) ইহা ভিন্ন গৃহিণীরা আসিয়াছেন, তাঁহাদের চালচলনে ভাবে ভঙ্গীতে বেশ একটা দায়িত্বের ভাব এবং আভিজাত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা খুব আগ্রহের সঙ্গে বালা, ব্রেসলেট, চেন, নেকলেস, লকেট ইত্যাদি দেখিতেছেন। এই সব উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার আসিয়াছে ত্রিচিনপল্লী, কটক, ঢাকা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং জয়পুর হইতে। হায়—সুদূর দক্ষিণভারতের স্বামী-সম্প্রদায়ের কারিগর! সে যখন তাহার দীন গৃহে বসিয়া তাহার আদিযুগের পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত নেহাই-এর উপর ঝুঁকিয়া রৌপ্যখণ্ডের উপরে ঠুক ঠুক করিয়া তাহার ছোট্ট হাতুড়িটি ঠুকিতেছিল, তখন কি সে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, তাহার হাতের কাজ একদিন দূর পশ্চিমের দেবকন্যাদের মত সুন্দরী নারী ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সংযমের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রণয়ী পুরুষদের এমন করিয়া মন ভুলাইবে? ভারতীয় এই কারিগর ইহাদের মনে যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার ফলে অনেকেরই হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, এবং তাহা অনেক পরিবারেরই মনে এমন এক অশান্তির ঝড় বহাইয়া দিয়াছে যাহা দেখিলে অগ্নি ও ধাতুশিল্পের দেবতা ভালক্যানও বিস্ময়ে হতবাক্ হইতেন। তাহা যাহাদের মনে বিষাদের ছায়া ফেলিয়াছে, সেই ছায়া সরাইয়া তাহাদের অভ্যন্ত মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে সেই অলঙ্কার-শিল্পী তাহার সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারিত না কি? ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যে গড়া রৌপ্য ও স্বর্ণ অলঙ্কারের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যপূর্ণ পদ্মফুলের চিত্র, গভীর লাল রুবি রঙের মিনের কাজ, যাহা বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় হাতের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন, ল্যাপিস-ল্যাজুলি পাথরের উজ্জ্বল নীল বর্ণ, টরকইসের হাল্কা সবুজ, কিম্বা পুরাকালের সত্রাজিতের স্যমন্তক মণি কি সত্যই প্রকৃতির নিজের অকৃপণ হাতে বর্ধিত ইংরেজ নারীর মাধুর্য্যকে বাড়াইয়া দিতে পারিত? বৃষ্টিস্নাত রৌদ্রোজ্জ্বল বসন্ত-সৌন্দর্য্যও ইহার কাছে ম্লান। উত্তর মেরুর নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তুষার ইহার কোমল মসৃণ ত্বক হইতে কিছু স্বচ্ছতা ভিক্ষা করিতে পারে। ইহার গণ্ড হইতে রক্তরাঙা গোলাপ কিছু রক্তাভা যাচ্ঞা করিবে। কঠোর সাধনারত সন্ন্যাসী ইহার রাঙা ওষ্ঠাধর হইতে চুম্বন-চোর যুবকদের ক্ষমা করিবে। ইংরেজ রমণীর এই রাঙা ওষ্ঠাধর দেখিয়া উজ্জ্বল লাল প্রবালসমূহ সমুদ্রের গভীরে লুকাইবে। প্রাচ্য দেশের সৌন্দর্য্যের আদর্শ অবশ্য পৃথক। দৃষ্টি তাহার খুব প্রখর না হইলে সে ইংরেজ রমণীর বর্ণ ছাড়া আর কোনও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে না। কারণ সে পছন্দ করে চাঁচাছোলা জ্যামিতিক মাপের সৌন্দর্য্য। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এ রকম পাথরে খোদাই মূর্ত্তি শুধু চোখকেই ভুলাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইংরেজ রমণীর ভাবপ্রকাশক্ষম মুখ মর্ম্ম স্পর্শ করে। তাহার ত্রুটি চোখের রঙে, মনে হয় তাহা আরও একটু কালো হইলে ভাল হইত। তাহার কেশ যেখানে সোনার রঙের নহে, তাহা একটু কালো, একটু লম্বা এবং আরও ঘন হইলে ভাল হইত। তাহার দেহ আরও একটু পাতলা, কোমল এবং কিঞ্চিৎ কৃশ হইলে ভাল হইত। এবং মুখের ভাবে আরও কিছু পেলবতা, এবং বিদ্রোহীভাবের স্বল্পতা থাকিলে ভাল হইত। এই বিদ্রোহভাবটি যেন তাহার মনের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এসব ত্রুটি অতি তুচ্ছ, বরং ইহা তাহার সৌন্দর্য্যের মহিমা আরও যেন বাড়াইয়া দিয়াছে। ইংরেজ পুরুষ ইহার জন্য যে গৌরব বোধ করে তাহা অকারণ নহে। মূর্ত্তি পূজারীরা তাহাদের দেবীমূর্তিসমূহের জন্য ইংরেজ রমণীর মুখকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারে। আমার মনে হয় সকল ম্যাডোনা মূর্তিরই, বিশেষ করিয়া বিখ্যাত 'ম্যাডোনা অব দি চেয়ার'-এর আদর্শ ছিল ইউরোপের উত্তর দেশের কোনও মুখের আদর্শে অঙ্কিত, কারণ রাফায়েলের এই ম্যাডোনার সঙ্গে লা ফরনারিনা অথবা জুইশ মুখাবয়বের

কোনও সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে ইহার মধ্যে এমন একটা অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য আছে যাহা রমণীকে রমণীয়ত্ব দান করে, এবং যাহা ইউরোপখণ্ডের নারীর মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। এবং আমি যদিও শুধু এই কারণে ইউরোপীয় রমণীর সৌন্দর্য্যের উপরে ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্যের স্থান নির্দ্দেশ করি, তবু অ্যামেরিকান রমণী প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইলে আমার বিচারে কিছু সঙ্কোচ দেখা দিবে। ইংরেজ রমণীর সমস্ত মাধুর্য্য সত্বেও সে চাকচিক্যময় সাধারণ অলঙ্কারের জন্য আকুল হইবে, ঠিক যেমন বোর্নিওর আদিবাসী ডায়াক রমণী বেতের ব্রেসলেট, দক্ষিণ ভারতের তামিল রমণী তাহার কানের প্রকাণ্ড গর্ত্তে ব্যবহারের জন্য বার্নিশ করা তালপাতার গহনা, এবং উত্তর-পশ্চিম দেশের কৃষক রমণী পাঁচ সের ওজনের পিতলের বেড়ি পায়ে পরিবার জন্য আকুল হয়। এই যন্ত্রণাদায়ক বেড়ি সে সমস্ত জীবন পায়ে পরিয়া বেড়ায় এবং মৃত্যুকালে তাহার উত্তরাধিকারিণীদের বংশ বংশ ধরিয়া ব্যবহারের জন্য দান করিয়া যায়।

প্রদর্শনী খুলিবার কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতীয় যাবতীয় অলঙ্কার এবং অন্যান্য কারুশিল্পের অধিকাংশই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। অলঙ্কার ব্যতীত অন্যান্য যেসব দ্রব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা হইতেছে পটারি, ধাতু-দ্রব্য এবং ল্যাকারের কাজ করা দ্রব্য। বোম্বাই, হাল্লা, মুলতান, জয়পুর এবং খুর্জার পালিশ করা পাত্রসমূহ সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। বোম্বাইয়ের পটারিতে দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেকার ভারতীয় জীবনালেখ্য অজন্তা গুহার অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে পাত্রগুলি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উহারা ইহার নাম দিয়াছিল Wonderland Pottery Works। এই সব চিত্রের বাস্তবানুগ ভঙ্গী এবং শিল্পমূল্য সম্পর্কে মিস্টার গ্রিফিথ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ-যোগ্য। তিনি "মুমূর্ষু রাজকন্যা" নামক ইহার একটি চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন "ইহাতে যে বেদনার প্রকাশ হইয়াছে, যে সেন্টিমেন্টের প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আমার মতে শিল্পের ইতিহাসে অনতিক্রম্য।" খুর্জার সবুজ অলঙ্কৃত পোড়ামাটির পটারি সকলেরই খুব ভাল লাগিয়াছিল। বারাণসীর পিতলের বাসনপত্র সোনার মত উজ্জ্বল, প্রদর্শনীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল, এবং তাহার দাম সস্তা হওয়াতে অল্পবিত্ত দর্শকেরাও প্রদর্শনী দর্শনের চিহ্নস্বরূপ সঙ্গে লইতে পারিয়াছিল। মোরাদাবাদের জিনিসেরও চাহিদা কম ছিল না। ল্যাকারের কাজ করা পাকপত্তন, ডেরা ইসমাইল খাঁ এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের কাঠের দ্রব্যাদিও সহজেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি, বুননের কাজ, শাল অথবা বস্ত্রদ্রব্যাদি দর্শকের খুব ভাল লাগে নাই। রুদ্রাক্ষের ব্রেসলেট এবং নেকলেস মহিলাদের মধ্যে প্রচুর বিক্রয় হইয়াছিল। বিলম্বে আসা দর্শকেরা ভাল ভাল জিনিস সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, বড়ই হতাশ হইয়াছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, ইঁহাদের মধ্যে ম্যাক্স ম্যুলারও ছিলেন।

আমি ভারতের এই সবজনপ্রিয় বিশ্বখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতকে অক্সফোর্ডে, আমার বিলাত প্রবাসের শেষ দিকে দেখিয়াছিলাম। সম্প্রতি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুতে শোক পাইয়াছেন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন নির্জন বাস করিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন দূর ভারত হইতে একজন হিন্দু আসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আনন্দের সঙ্গে দুইখানি হাত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে সহৃদয় অভ্যর্থনা করিলেন। পার্থিব সকল প্রিয় জিনিস হইতে ভারত তাঁহার প্রিয়তর। নভেম্বর মাসের এক কুয়াসা ঢাকা সন্ধ্যায় আমি অক্সফোর্ড শহরতলীবাসী তাঁহার ঘরের দরজার দর্শকদের নির্দি ঘণ্টা বাজাইয়া আগমন ঘোষণা করিলাম। মিসে ম্যাক্স ম্যুলার নিজে দরজা খুলিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রোফেসর মহাশয় কি বাড়িতে আছেন?" তিনি বলিলেন বাড়িতেই আছেন, এবং আমাকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। বৃদ্ধ অধ্যাপক

আমাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, মাঝপথে আমাদের দেখা হইল। তাঁহার শ্রদ্ধেয় মূর্তি দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। বুঝিলাম, আমি এমন এক ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি যিনি গভীর বেদজ্ঞানে সায়ন ও যাস্কের সঙ্গে, এবং বিশ্লেষণী অনুসন্ধিৎসা ও বিচারসহ তথ্য সংগ্রহে পাণিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। আমি তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি প্রোফেসর ম্যাক্স ম্যুলারের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার গৌরব লাভ করিতেছি?" তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি।" আমরা অতঃপর তাঁহার সুন্দর বৈঠকখানা ঘরটিতে গিয়া বসিলাম। একপাশে অগ্ন্যাধারে আরামদায়ক আগুন জ্বলিতেছিল, কিন্তু সমস্ত বাড়িখানাতেই যেন একটা বিষাদের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় সব সময়েই শুধু ভারতবর্ষ ও হিন্দুদের বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, এই দুইয়েরই প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও সহানুভূতি অতি গভীর। তিনি বলিলেন, তাঁহার দেহটি ইংল্যাণ্ডে থাকিলেও তাঁহার মন ও আত্মা ভারতে রহিয়াছে। তাই তিনি ভারতীয় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা দ্বারাই পরিবৃত থাকিতে চাহেন। এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রদর্শনীতে কিছু কিছু ভারতীয় দ্রব্য কিনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সবই বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে তিনি কিছু আনিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে তিনি যে সব ভারতীয় জিনিস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা দেখাইলেন, এইগুলিকে তিনি অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পিতলের ঘড়া। এই ঘড়াটি কলিকাতার এক ভদ্রলোক তাঁহার মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সংস্কৃত পণ্ডিত হিসাবে তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। প্রোফেসর এই উপহারটিকে বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করেন, এবং ইহাকে একটি বিশেষ স্থানে রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইউরোপে যে বিবাহ-প্রথা চলিত আছে তিনি তাহার বিশেষ নিন্দা করিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি পিতামাতা-নির্দিষ্ট প্রথম বয়সের বিবাহ পছন্দ করেন, তবে ভারতে যত অল্প বয়সে বিবাহ চলে, তাহা তাঁহার পছন্দ নহে। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইংল্যাণ্ড প্রবাসের একটি সুমধুর সন্ধ্যা আমার কাটিয়া গেল। তিনি পুনরায় আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাজের চাপে ইহা সম্ভব হয় নাই।

প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশে সিল্কের পৃথক একটি বিভাগ ছিল। স্ট্যাফোর্ডশিয়রের লীক নামক স্থানের অধিবাসী মিস্টার টমাস ওয়র্ডল এই বিভাগের কর্তৃত্বভার লইয়াছিলেন। তাঁহার মত অন্য কেহ ভারতীয় সিল্ক্ বিষয়ে অনুশীলন করেন নাই। গত পূর্ব বৎসরে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিজ চোখে দেখিয়া যান। সিল্ক্ শিল্পের বাজার মন্দা হওয়াতে বীরভুম, মুর্শিদাবাদ, ও অন্যান্য সিল্ক্ উৎপাদন স্থানে ইহাতে নিযুক্ত লোকদের সর্বনাশ হইয়াছে। মিস্টার ওয়র্ডল অবশ্য এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন এ বিষয়ে সুনিশ্চিত আশা পোষণ করেন। এমন কি ইতিমধ্যেই তাঁহার চেষ্টা সাফল্যলাভ করিয়াছে কারণ তিনি সিল্কের কারবারের অনেকখানি অংশ চীনাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, বাংলাদেশ ইংল্যাণ্ডের বাজার যেটুকু হারাইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। আমার ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে বাংলাদেশের সিল্ক্ ও গুটি বা কোকুনের চাহিদা হঠাৎ খুব বাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি, ঐ সঙ্গে দামও বাড়িল এবং প্রত্যেকটি আউন্স বিক্রয় হইয়া গেল, ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যোগান কুলান গেল না। অবশ্য পরবর্তী মরশুমের জন্য বড় বড় অগ্রিম অর্ডার গ্রহণ করা হইল। মিস্টার ওয়র্ডল সিল্কের সুতা রীলে জড়াইবার একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ইহাতে ভারতীয় সিল্কের চাহিদা আরও বাড়িয়াছিল। তাঁহার উদ্ভাবিত এই যন্ত্র প্রদর্শনীতে লিয়ঁবাসিনী এক ফরাসী স্ত্রীলোক চালাইয়া দেখাইতেন। এই উপায়ে রীল করা সিল্ক্ আরও বেশি দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইল। যন্ত্রটি

সহজে বহনযোগ্য, গঠন সরল, দামেও শস্তা—মাত্র ১২ পাউণ্ড। ইতিমধ্যে মিস্টার ওয়র্ডলের অক্লান্ত প্রয়াসে গভর্ণমেন্টও এদিকে দৃষ্টি দিলেন, এবং বাংলার সিল্ক্ ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিল কেন তাহার পূর্ণ অনুসন্ধানের আদেশ জারি করিলেন। এই কাজে গভর্ণমেন্ট মিস্টার উডমেসন নামক এক ভদ্রলোকের সাহায্য লাভ করিলেন, এবং মিস্টার নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভারতীয়কে তিনি সক্রিয় সহযোগীরূপে পাইয়াছেন বলিয়া আমি খুশি হইয়াছি।

সমস্ত বিষয়টাই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। বমবিসাই ডিস ও স্যাটারনিয়াই ডিস দিগকে (রেশমের পোকা) পুষিবার আয়োজন করা হইতেছে। নির্দোষ বেচারীরা জানেও না, তাহাদের কি বিপদ আসিতেছে, তাই তাহাদের জঙ্গল আবাসের দুর্গে তাহারা আনন্দে গাছের ডালে ডালে বুকে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। নিষ্ঠুর মানুষ তাহাদের এই দুর্গের উপর আক্রমণ চালাইবে। সেহ দুর্গ সুতায় গড়া। তাহারই মধ্যে নিজেদের বন্দী করিয়া ধ্যানাবস্থায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে, তাহার পর একদিন সেই গুটি ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ নড়িবার ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের লইয়াই বিজ্ঞানী মানুষ এখন গবেষণায় মাতিয়াছে, মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখিতেছে কি কি উপায়ে তাহাদের কাছ হইতে আরও বেশি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ইহাদের 'বর্মাবিক্স মোরি' প্রজাতিভুক্ত গুটিপোকা, মধ্য বাংলার সযত্নে রোপিত তুঁতগাছের পাতা খাইয়া বাঁচে। ছোটনাগপুরের উচ্চ জমিতে 'অ্যানাথিরিয়া মাইলেট্টা' (তসর) নামক প্রজাতিভুক্ত গুটিপোকা কোলেরা পালন করে। ফিলোসামিয়া রি সি নি (এড়িয়া) নামক গুটিপোকা নিম্ন ভূমির ভেরেণ্ডার পাতা খায়। এটি পূর্ব হিমালয়ের দাক্ষিণের রাজ্য। অ্যানথিরিওপ্সিস আসামা (মুগা) মাকিলাস ওডোরাটিসিমা, নীস-এর তন্ত খাইয়া থাকে। এবং আরও নানা জাতীয় গৃহ-পালিত লেপিডপটেরাস (প্রজাপতি, মথ ইত্যাদির জাতির নাম) যাহাদিগকে ভারতে পালন করা হয়, ইহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র তরুণ কর্মতৎপর অফিসারটির তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি ভীত জমিদারের সম্মুখে তাঁহার জমির উপযোগিতা পরীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্ত কূপ হইতে জমিতে জল দিবার পথের অর্ধলুপ্ত চিহ্ন দেখা যাইতেছে, এই কূপের উদ্দেশ্য এই যে, ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তী মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে গ্রামের খাজনা বৃদ্ধি করা চলিবে।

প্রদর্শনীর একটি আলোচনী সভায়, মিস্টার ওয়র্ডল চাষ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বলা শেষ হইলে আমি বলিলাম, বাংলাদেশের সিল্কের উন্নতি যেমন প্রার্থনীয়, তেমনি ইহার মূল্য হ্রাসও প্রার্থনীয়, কারণ তাহা হইলে তাহা চীনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশী সফল হইবে। এবং ইহা একমাত্র উৎপাদন ব্যয় কমাইলেই সম্ভব হইতে পারে। জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে কাহারও লাভের অঙ্ক কমাইতেই হইবে। উৎপাদনকারী, মধ্যবর্তী দালাল এবং বণিক—ইহাদের প্রত্যেকেরই পশম কাটিতে কাটিতে চামড়া পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং মনে হয় চামড়ার পরের স্তরেও অস্ত্র পৌঁছিয়াছে। একা জমিদার (ইঁহার ভূমিরাজস্বের স্থায়ী কৃষক) এতদিন কাঁচি এড়াইয়া গিয়াছেন, এখনও তিনি প্রচুর পশমের বোঝা ঘাড়ে লইয়া ফিরিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারই লোভ সিল্ক্-ব্যবসাকে ধ্বংস করিয়াছে। অন্যান্য শস্যের বেলায় ভূমিকর যেমন কম, তুঁতগাছের জমিতে তেমনি বেশি। এইখানে উহা কমাইবার সুযোগ আছে। সিল্ক্-ব্যবসায় যখন প্রচুর লাভ হইত, সে সময়ে যে খাজনা সম্ভব হইয়াছিল এখন তাহা সম্ভব নহে। বর্তমানের হিসাবে উহা মাত্রাতিরিক্ত। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাজনাও কমাইয়া আনিতে হইবে। যদি চাহিদা ও যোগানের রীতির উপর খাজনা সংশোধনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যবসাটি সমূলে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাহা সম্ভব হইবে না। কারণ আমাদের দেশের লোকেরা বাহিরের জগতের কোনও সংবাদ রাখে না। তাঁহাদের দৃষ্টি বৃহৎ পৃথিবীর বিস্তার মাপিবার শিক্ষা পায় নাই। তাহাদের পূর্বপুরুষ পায়ে হাঁটিয়া

অথবা গোরুর গাড়িতে চাপিয়া শত শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর যেটুকু দেখিয়াছেন ইহাদের দৃষ্টি তাহার বাহিরে যায় না। তাই তাহারা বুঝিতে পারে না, যে সব কারণে দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে তাহার প্রতিকার সম্ভব। সর্বশেষ, তাহারা সমবিপদে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সেজন্য অবশ্যম্ভাবীকে স্বীকার করাইয়া লইতে জমিদারের উপর বাধ্যতা-মূলক চাপ দরকার। এই সভায় মিস্টার কেস্উইক নামক একজন উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি সুন্দর একটি ছোট্ট বক্তৃতার সাহায্যে তাঁহার নিজস্ব মত ব্যক্ত করিলেন। ভারতীয় সিল্কের নানা বস্ত্র মিস্টার ওয়র্ড্‌ল সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞীও এইরূপ সুন্দরভাবে সাজান দেখিয়া খুশি হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীতে 'ভারতীয় বাজার' ইংরেজ সাধারণের কাছে বড়ই মনোহর বোধ হইয়াছিল। এইখানে হিন্দু ও মুসলমান কারুশিল্পীগণ তাহাদের নিজ নিজ কাজ করিতেছিল, এবং তাহা দেখিবার জন্য ব্রিটেনের সকল দিক্ হইতে নরনারীর ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নিরেট জনতায় সম্মুখে এই সব শিল্পী কেহ বা বস্ত্রে জরির বুটি বুনিতেছিল, কেহ বা গুনগুন্ স্বরে গান করিতে করিতে কার্পেটের প্যাটার্ন বুনিতেছিল, কেহ বা হাতে ক্যালকো-প্রিন্টিং-এর কাজ করিতেছিল। যেসব স্থূল যন্ত্রাদি ইংরেজরা বহুদিন ত্যাগ করিয়াছে, তাহারই সাহায্যে ভারতীয়দের শিল্পকাজ করিতে দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। ঠিক যেমন একজন হিন্দু অবাক্ হইত একটি সিম্পাঞ্জিকে পুরোহিত সাজিয়া তালপাতার লেখা হইতে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে দেখিলে। আমরা তাহাদের চোখে দেখিবার মত প্রাণীই বটে, যেমন জুলুরা কিংবা সিয়ু মোড়ল এখন (১৮৮৭) আমাদের চোখে। সর্বত্রই মানুষের স্বভাব অভিনবত্বের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, এবং যে জিনিস যত অভিনব হয়, তাহাও ততই বেশি দর্শনীয় হইয়া উঠে। মহিলাদের নিকট হইতেই আমরা খুব বেশি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের সর্বাবস্থায়, হাঁটায়, বসায়, খাওয়ায়, কাগজ পড়ায়, সকল প্রকার চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমাদের বিদ্ধ অনুবিদ্ধ করিতেছিল। সবুজ চোখ, ধূসর চোখ, নীল চোখ, কালো চোখ একত্র মিলিয়াছিল, এবং সব সময় তাঁহারা বলাবলি করিতেছিলেন "O, I, never!" আমরা প্রত্যেকে কতজন করিয়া স্ত্রী বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি ইহা লইয়াও তাঁহাদের মধ্যে আলোচনার অন্ত ছিল না। কেহ অনুমান করিতেছিলেন ২৫০ নিশ্চয় হইবে। অনেকেরই এই অনুমান। ইঁহাদের কাছে এ বিষয়ে যত অসম্ভব কথাই বানাইয়া বলা যাউক, ইহারা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবে না। আমাদের মধ্যকার একজন এক সুন্দরী পরিচারিকাকে বলিয়াছিলেন, তোমার ব্যবহারে আমি ভীষণ খুশি হইয়াছি, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই। তুমি কি আমার গৃহে আমার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর পদ পূরণ করিতে রাজি আছ? এই পদটি সম্প্রতি আমার দেশত্যাগের পূর্বে আমার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর মৃত্যুতে খালি হইয়াছে। পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কতগুলি স্ত্রী আছে?" "যেমন হয়ে থাকে—২৫০টি"—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আমার বন্ধু। "আপনার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর কি হইয়াছিল?" "আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি—কারণ সে আমার রান্না খারাপ করিয়াছিল।" বেচারি পরিচারিকা ইহা শুনিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। বলিল, "হতভাগা। দানব!" পরে তাহার নিকট হইতে তাহার এক বান্ধবীর দুর্ভাগ্যের কথা শোনা গেল। সুন্দরী সরলা বালিকা, সে এডিনবরোয় পাঠরত এক আফ্রিকার ছাত্রের প্রেমে পড়িল। ছেলেটি তাহার কাছে আসিয়া প্রণয় নিবেদন করিত। অবশেষে ইংল্যাণ্ডে তাহাদের বিবাহ হয়। দিন বেশ ভালই কাটিতেছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে ছেলেটি তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার লাইবেরিয়ার মরুদেশের বাড়িতে লইয়া গেল। সেখানে একটিও শ্বেতাঙ্গ নাই, তাহার সেখানে বড়ই একা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার উপর একদিন তাহার শাশুড়ি পাখীর পালক ও পশুর

চামড়া পরিয়া অর্ধমাতাল অবস্থায় নাচিতে নাচিতে বাড়ী ফিরিল, সেই দিন তাহার সহ্যসীমা পার হইয়া গেল। দুঃখে বেদনায় হতাশায় শুকাইয়া শুকাইয়া মেয়েটি মরিয়া গেল।

অবশ্য পৃথিবীর সকল দেশের লোকই অন্য দেশের লোকদের অসভ্য মনে করিয়া থাকে, অন্ততপক্ষে তাহারা যে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ থাকে না। বহুকাল হইতে মানুষের এই মনোভাব চলিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও বহুকাল থাকিবে। অতএব ইংরেজদের জনসাধারণ যে আমাদের বর্বর মনে করিবে ইহাতে আশ্চর্য হই নাই। কারণ তাহাদের চোখে আমরা সর্বদিক্ হইতেই অসভ্য বিবেচিত হইয়াছিলাম। পোষাক, আচরণ এবং মানুষের সাধারণ চালচলন হাবভাব বিষয়ে তাহাদের মনে একটি নির্দিষ্ট ধারণা আছে, ইহা হইতে এক চুল এদিক-ওদিক হইলে তাহা তাহাদের চোখে ধরা পড়িয়া যায়। ইহা তাহারা ক্ষমার অযোগ্য ভাবে। আমাদের অবশ্য তাহারা সর্বত্রই যথাসম্ভব প্রশ্রয় দিয়াছিল! সম্রাজ্ঞী নিজে তাঁহাদের সধারণ রীতি আমাদের ক্ষেত্রে শিথিল করিয়াছিলেন, এবং সর্বত্রই আমাদের প্রতি লোকে এই অনুগ্রহ দেখাইয়াছে। একটি প্রাচীন জাতির প্রতিনিধিরূপে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলা-গণ আমাদিগকে সম্মান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায়শঃই আমাদিগকে তাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন, প্রাইভেট পার্টির আয়োজন করিতেন এবং নানা উপভোগ্য আমোদের ব্যবস্থা করিতেন। কতকগুলি গৃহে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম, এবং প্রায় পরিবারের অন্তর্ভু'ক্ত লোক হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইঁহাদের কাছে আমরা সর্বদা 'সুস্বাগতম্' ছিলাম, এবং তাঁহাদের গৃহে গমন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমন আমাদের খুশিমত করিতাম। তাঁহাদের মধ্যে আমরা কয়েকজন বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম, এই ভদ্রলোকেরা আমাদের কয়েকদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই নিজেরা আসিয়া আমাদের বাড়ি লইয়া যাইতেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যে আনন্দময় দিনগুলি কাটাইয়াছিলাম তাহা আজও অনুরাগের সহিত স্মরণ করি, এবং আমাদের প্রবাসকালে তাঁহারা আমাদের প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সরকারী বিষয়ক কাজে বেসরকারী ভদ্রলোকেরাও আমাদের দিকে তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক সময়েই "আমরা পাগড়িপরা ভদ্রলোকদের কথা শুনতে চাই" এরূপ দাবি শুনা যাইত। কিন্তু আমরা যে ভয়ঙ্কর রকমের এক আশ্চর্য জীব এ ধারণা অপরিচিতদের মধ্য হইতে দূর হয় নাই। আমরা যে তাহাদের ভাষা বুঝি, ইহা জানিলে কি তাহারা এমন মন খুলিয়া আমাদের সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিত? আমাদের বিষয়ে তাহারা যাহা বলিত তাহা খুবই মজার। কাজের চাপে যখন আমাদের মন ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন এক গ্লাস পোর্ট ওয়াইন অপেক্ষা ইহাদের মন্তব্য বেশি ভাল লাগিত। আমাদের বিষয়ে ঐ সব পুরুষ ও মহিলাগণ যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিবার যে নিপুণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা হুবহু বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। তাহা থাকিলে সেইসব আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে তাহা একখানি সেরা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থরূপে গণ্য হইতে পারিত। অথবা যদি জানিতাম আমাকে পরে আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহা হইলে পল্লীবাসীদের মুখের সরল মন্তব্যগুলির কিছু অন্তত টুকিয়া রাখিতাম। তাহারা অজ্ঞাতসারে অনেক সত্য কথাই বলিয়াছে আমাদের সম্পর্কে। এই জাতীয় মনোভাব সকল দেশেই আছে এবং তাহাদের মন্তব্যে আমাদের নিজেদের বিষয়ে আমাদের যে ধারণা, এবং তাহাদের যে ধারণা, তাহার ভিতরের বস্তুগত পার্থক্য লইয়া দার্শনিকতার অবতারণা করা যাইতে পারে।

যে সব লণ্ডনবাসী তাহাদের পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যের লোকদের দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহাদেরই চোখে যদি আমরা এমন দেখিবার মত জীব হইয়া

থাকি, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের যে সব হাজার হাজার পল্লীবাসী প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল; তাহাদের চোখে যে আমরা কি বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাই ভাবি। তাহারা অবশ্য আমাদের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা আমাদের সঙ্গে আলাপ করা পছন্দ করিত, এবং আমরাও সুযোগ পাইলে তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যাঁহাদের আত্মীয়েরা ভারতে সৈন্যরূপে অথবা অন্য কাজ উপলক্ষে ভারতে আছে, তাহারা ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে আমাদের কাছে আসিয়া আমাদের করমর্দন করিতেন, এবং ভারতস্থিত আত্মীয়বর্গের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। এইভাবে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিত। "মহাশয়, জিমকে চেনেন? ঐ যে, জেমস রবিনসন— অমুক রেজিমেন্টের?"—এক প্রৌঢ়া মহিলা ভিড় ঠেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন একদিন। আমার ঘাড়ে যেন তিনি ঝড়ের মত ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কোনও ভূমিকা নাই, অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে কথা কহিবার রীতি মান্য করার বালাই নাই, সোজা প্রশ্ন। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাইলাম, তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তিনি তখন নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন তিনি জিমের আণ্ট অর্থাৎ পিসি। তাহার পর তিনি তাঁহার ভাইপো কেমন করিয়া সেনাদলে যোগ দিল তাহার দীর্ঘ ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনাদের মারফৎ তাহার খবর পাঠাইবার এমন চমৎকার সুযোগ সে নষ্ট করিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাহাকে তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তিনি তাঁহাকে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই মহিলার কিছু কিছু দুর্বোধ্য বৈশিষ্ট্য যাহা লক্ষ্য করিলাম, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— আমরা সাধারণত যে ধরণের ইংরেজী শুনি, ইঁহার ইংরেজী সেরকম নহে, তাঁহার ভাষাও মাঝে মাঝে এলোমেলো হইয়া যাইতেছিল। তিনি আমাকে অনুরোধ করিলেন, আমি ফিরিয়া যাইবার পর যেন জিমকে এই মূল্যবান্ খবরটা দিই যে মিসেস জোন্স্-এর পরিপুষ্ট শূকরটি স্মিথফিল্ড্ কৃষি প্রদর্শনীতে একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলাম, আমি ফিরিয়া গিয়াই উত্তর বর্মার অরণ্য-পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া এ সংবাদ জিমকে দিয়া আসিব। মিসেস্ জোন্স্ তাঁহার বন্ধুদের বলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ক্রমশঃ

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

সুবিমল সিংহ

(৫)

"ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?"

সাধারণ পণ্যদ্রব্যের অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Free competition) এবং বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার অবাধ বিনিময়ের বাজার (Frec Foreign Exchange Market) যে মূলতঃ একই প্রকৃতির, তাহা আমরা দেখিয়াছি (আষাঢ়, ১৩৭৮)। আরও দেখিয়াছি যে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে একটী বিশেষ ধরণের অর্থ-নৈতিক সমাজ কাঠামোর পটভূমিকায় অথবা পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনা করিতে হইবে। এই বিশেষ ধরনের সমাজ সংগঠনকে সাধারণতঃ পুঁজি অথবা মূলধন নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা (Capitalistic system) আখ্যা দেওয়া হয়। তবে আমরা দেখিয়াছি যে ইহার প্রকৃত স্বরূপ হইল বৈষয়িক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য (Eeonomic Individuailty) অথবা অবাধ উদ্যম (Free Enterprice অথবা ভাষান্তরে Laissez Faire "ল্যাসে ফ্যার")। ইহাতে যে কোন নাগরিক এর পক্ষে তাহার ব্যক্তিগত রুচি, প্রবণতা, অথবা যোগ্যতা অনুসারে যে কোন পেশা গ্রহণে কোনরূপ সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক প্রতিবন্ধ থাকিবে না। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনও পারমিট (permit) লাইসেন্স (Licence) ইত্যাদির প্রশ্ন থাকিবে না।

তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশের আভ্যন্তরীণ বৈষয়িক কার্য্যাবলীতে অবাধ উদ্যম অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র মোটামুটি স্বীকৃত হইলেও বহির্জগতের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যে সমূহ বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ থাকে। এরূপ অবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির service বাজারে যথাসম্ভব অবাধ প্রতিযোগীতা বর্ত্তমান থাকিলেও দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার 'অবাধ' বিনিময় ব্যাহত হয়। কারণ আমরা দেখিয়াছি (ফাল্গুন ১৩৭৭) যে দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের প্রয়োজন হয় প্রধানতঃ পণ্যদ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানী হইতে (অন্যবিধ মুদ্রাবিনিময় সাপেক্ষ হরেক রকমের আন্তর্জাতিক লেন-দেনের বিষয় আপাততঃ মুলতুবী রাখিয়া)। অতএব মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে কোনও প্রত্যক্ষ বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও যদি বৈদেশিক বাণিজ্যে কোনরূপ বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ থাকে তবে তাহাতে পরোক্ষভাবে অবাধ মুদ্রা-বিনিময়ের ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলারের মূল্য যত হ্রাস পাইবে ভারতীয় ক্রেতার নিকট যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যের মূল্যও তত হ্রাস পাইবে। ফলে ভারতে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় পণ্যের আমদানীর পরিমাণও তত বেশী হইবে। এই বিষয়টিকেই অপর দিক হইতে দেখিতে গেলে, ভারতীয় টাকার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলারের মূল্য হ্রাস পাওয়ার অর্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলারের বিনিময়ে ভারতীয় টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্রেতার নিকট ভারতীয় পণ্যের মূল্য চড়া; এবং ফলে চাহিদা কমা। কিন্তু ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যের আমদানী অথবা যুক্ত-রাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী যদি এদেশে অথবা সে দেশে পারমিট, লাইসেন্স, 'কোটা' (quota, অর্থাৎ প্রার্থীদের মধ্যে সীমিত বন্টন ব্যবস্থা) ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে তবে ডলার এবং টাকার পারস্পরিক চাহিদা এবং যোগানের সহজ গতিবিধিতে প্রতিবন্ধক এর সৃষ্টি হইল। এরূপ ক্ষেত্রে মুদ্রা-বিনিময়ের বাজারে দৃশ্যতঃ অথবা ঘোষিত কোনও বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও মুদ্রাবিনিময়ের বাজারকে "অবাধ" বলা যায়

না। অতএব আমাদিগকে ধরিয়া লইতে হইবে যে আভ্যন্তর অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোথাও কোনরূপ বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ নাই। অর্থাৎ আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে কোনও "অনুমতি" (permit), 'অনুজ্ঞা' (Licence), প্রার্থীদের মধ্যে সীমিত বন্টন ব্যবস্থা (quota) ইত্যাদিত থাকিবেই না, এমন কি আমদানী অথবা রপ্তানী শুল্কাদিরও কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। আমরা কল্পনা করিব যে, যে কোন দেশের যে কোন নাগরিক অবাধে স্বদেশে অথবা বিদেশে যে কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অথবা আমদানি রপ্তানি করিতে পারিবেন। ফলে আভ্যন্তর এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একমাত্র পার্থক্য হইবে এই যে একটীতে মুদ্রা বিনিময়ের কোনও প্রশ্ন নাই, অপরটীতে তাহা আছে।

আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক এই উভয়ক্ষেত্রে উপরিকল্পিত অবাধ উদ্যম বর্তমান থাকিলে দেখা যাইবে যে অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবস্থাগুলি সাধারণ পণ্যদ্রব্যের বাজার অপেক্ষা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজারে অধিকতর সহজসম্ভাবিত। এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিত আলোচনা হইয়াছে, তবে একটু নিরুক্তি বাঞ্ছনীয়।

আমরা দেখিয়াছি যে কোন পণ্যদ্রব্যের বাজারে অবাধ অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে যদি (১) পণ্যদ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকেন; (২) ক্রেতা অথবা বিক্রেতাদের মধ্যে কোন জোট না থাকে; (৩) ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ থাকে অথচ কোন পক্ষপাতিত্ব না থাকে; এবং (৪) বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রেয় দ্রব্য সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়।

অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকার, অথবা ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে কোনরূপ জোট না থাকার, অর্থ হইল এই যে কোন বিশেষ ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা অথবা বিক্রেতাসম্প্রদায় নিজেদের চাহিদা অথবা যোগান খুসীমত বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া বাজারের মোট চাহিদা অথবা যোগানকে প্রভাবিত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যটির মূল্যের উপর ক্রেতা অথবা বিক্রেতাদের কোনও প্রভাব থাকিবে না। এই মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে বাজারের সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগানের ভিত্তিতে। ক্রেতা এবং বিক্রেতারা সেই বাজার দরই মানিয়া লইয়া শুধু নিজেদের ক্রয় বিক্রয় (অর্থাৎ চাহিদা এবং যোগান) কমাইতে বাড়াইতে পারেন। অর্থাৎ তাহারা মূল্য নির্দ্ধারক (price maker) নহেন, মূল্যানুসারক (price taker) মাত্র।

ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ থাকিলে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতা অন্যান্য ক্রেতা-বিক্রেতারা কি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছেন তাহা সম্যক অবগত থাকিবেন। ফলে বাজারের সর্ব্বত্রই দ্রব্যটীর একই সময়ে একটীমাত্র মূল্য চালু থাকিবে। একই বাজারে একাধিক মূল্য থাকিলে ক্রেতারা ক্রয়েচ্ছু হইবেন নিম্নতম মূল্যে—এবং বিক্রেতারা বিক্রয়েচ্ছু হইবেন সর্ব্বোচ্চ মূল্যে। অতএব যতক্ষণ না সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন মূল্য একই মূল্য হয় ততক্ষণ কোন ক্রয়-বিক্রয় চলিতে পারে না। বাজার যদি ব্যাপক অথবা আন্তর্জাতিক হয় এবং সাময়িক ভাবে ইহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মূল্য চলিতে থাকে তাহা হইলে ক্রেতারা ভীড় করিবেন নিম্নতম মূল্যের এলাকায় এবং বিক্রেতারা ভীড় করিবেন সর্ব্বোচ্চে মূল্যের এলাকায়। ফলে নিম্নতম মূল্যের এলাকায় চাহিদা বাড়িয়া মূল্য চড়িতে থাকিবে এবং সর্ব্বোচ্চ মূল্যের এলাকায় যোগান বাড়িয়া মূল্য নামিতে থাকিবে, যতক্ষণ না বাজারের সর্ব্বত্রই একই মূল্য বিরাজ করে। এবং বাজারের বিভিন্ন অংশে মূল্যের যদি বা কোন পার্থক্য থাকে তাহা হইবে শুধু পরিবহনের এবং আনুসঙ্গিক ব্যয়জনিত পার্থক্য।

এইত গেল ক্রেতা এবং বিক্রেতার সংখ্যা এবং পারস্পরিক যোগাযোগের কথা। তারপর আসে ক্রেতাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিক্রেতার অথবা তাঁহাদের বিক্রয় দ্রব্যের অভিন্নতা অথবা বিভিন্নতার, সাদৃশ্য অথবা বৈসাদৃশ্যের প্রশ্ন। এবং কোন বিশেষ বিক্রেতা অথবা

তাঁহার পণ্যের প্রতি কোন বিশেষ ক্রেতার, অথবা কোন বিশেষ ক্রেতার প্রতি কোন বিশেষ বিক্রেতার, অনুরাগ অথবা বিরাগ, আসক্তি অথবা অনাশক্তি, পক্ষপাতিত্ব অথবা নিরপেক্ষতার প্রশ্ন।

এই প্রসঙ্গে অবাধ অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতার সর্ত্ত এই যে বিক্রেতাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন ক্রেতার প্রদেয় অর্থের মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না, ক্রেতাদের দৃষ্টিতেই তেমনই বিভিন্ন বিক্রেতাদের বিক্রেয় দ্রব্যের মধ্যে কোন বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক পার্থক্য থাকিবে না। অধিকন্তু নৈকট্য, আচরণ অথবা বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হইয়া কোন বিশেষ ক্রেতা কোন বিশেষ বিক্রেতা অথবা তাঁহার পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট অথবা আসক্ত হইবেন না। এককথায় ক্রেতারা বিভিন্ন বিক্রেতা অথবা তাঁহাদের পণ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন। অর্থশাস্ত্রীয় ভাষণে এই সর্ত্তটা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয় যে ক্রেতাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রেয় পণ্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত সামগ্রী (perfect substitute) হইবে। অর্থাৎ দ্রব্যটা যে কোন বিক্রেতার নিকট হইতেই ক্রয় করুন না কেন ক্রেতাদের পক্ষে তাহা সমান কথাই। এরূপ অবস্থায় যদি তাহারা কোন বিক্রেতার নিকট দ্রব্যটা সামান্যমাত্র কম মূল্যে পাইয়া যান তবে তাহারা অপর কোথাও যাইবেন না। ফলে সকল বিক্রেতাকেই একই মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে।

অপরপক্ষে বিক্রেতারাও বিভিন্ন ক্রেতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং অনাসক্ত হইবেন। যেকোন ক্রেতার প্রতি যে কোন বিক্রেতার মনোভাব হইবে অনেকটা 'ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?" এই জাতীয়। তবে কত কড়ি ফেলিলে কি পরিমাণ তেল মাখা যাইবে তাহা যদি সকল বিক্রেতার জন্যই এক এবং সুনির্দিষ্ট থাকে তবেই তাঁহারা এই মনোভাব দেখাইতে পারেন। অর্থাৎ প্রত্যেক বিক্রেতাই যদি জানেন যে তিনি যে মূল্য দাবী করিতেছেন অন্যেরাও তাহাই করিবেন তবেই তিনি সকল ক্রেতার প্রতি সমান নিরপেক্ষ এবং অনাসক্ত হইতে পারেন। ইহা হইতে পারে দুই অবস্থায়। এক যদি সকল বিক্রেতার মধ্যে মূল্য সম্পর্কে একটা বুঝাপড়া থাকে। আর যদি সকল বিক্রেতাই চলতি বাজার দর অনুসরণ করেন। বিক্রেতাদের মধ্যে মূল্য সম্পর্কে বোঝাপড়া থাকিলে অবাধ প্রতিযোগিতার বৈপরীত্য ঘটে। তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতারই চলতি বাজার দর অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কারণ অসংখ্য বিক্রেতা যদি একই দ্রব্য বিক্রয় করেন তবে কোন বিক্রেতাই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী বিক্রেতা অপেক্ষা সামান্য মাত্রও বেশী দাম দাবী করিতে পারেন না; করিলে তাঁহার বিক্রয় একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অসংখ্য বিক্রেতা থাকেন বলিয়া কোন একজন বিশেষ বিক্রেতা বাজারের মোট চাহিদার অথবা মোট যোগানের অতি সামান্যমাত্র অংশ সরবরাহ করিতে পারেন। ফলে তিনি মূল্য সামান্য একটু কমাইয়া দিলেই মুহূর্ত্তে তাঁহার সব মাল বিক্রয় হইয়া যাইবে বটে কিন্তু চলতি বাজার দর বিশেষ নামিবে না। বরং চলতি বাজার দরেই তিনি যতখুসী বিক্রয় করিতে পারেন। আমরা দেখিয়াছি (শ্রাবণ, ১৩৭৭) যে অর্থশাস্ত্রে এই বিষয়ে বলা হয় যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন বিশেষ বিক্রেতার দৃষ্টিতে তাঁহার নিজের পণ্যের চাহিদা "অসীম সঙ্কোচপ্রসারশীল" (perfectly elastic ; $E=\infty$.)। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই প্রত্যেক বিক্রেতাই চলতি বাজার দরই অনুসরণ করিবেন।

সকল বিক্রেতাকেই যদি চলতি বাজার দরে বিক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদের লাভ-ক্ষতি নির্ভর করিবে দ্রব্যটীর ক্রয়মূল্য তথা উৎপাদন ব্যয়ের উপর। অসংখ্য উৎপাদকের মধ্যে যাঁহাদের উৎপাদন ব্যয় বাজার দরের যত নীচে থাকিবে তাঁহাদের তত বেশী মুনাফা হইবে। অতএব প্রত্যেক উৎপাদককেই চলতি বাজার দরটীকে স্বীকার করিয়া লইয়া চেষ্টা করিতে হইবে উৎপাদনে দক্ষতা বাড়াইয়া উৎপাদন ব্যয় যথাসম্ভব কমাইবার। যদি কোন বিশেষ পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী

মুনাফার সম্ভাবনা থাকে তবে নবাগত উৎপাদকেরা অন্যান্য শিল্প বর্জ্জন করিয়া ইহাতেই আত্মনিয়োগ করিবেন। ফলে উক্ত পণ্যদ্রব্যটীর উৎপাদন শিল্প প্রসারিত হইয়া বাজারে দ্রব্যটীর মোট যোগান বাড়িবে এবং ইহার বাজার দর নামিবে। বাজার দর নামিলে উৎপাদকদের মুনাফাও কমিতে থাকিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত অন্যান্য শিল্পের তুলনায় অতিরিক্ত মুনাফা অন্তর্হিত হইবে। পক্ষান্তরে কোন পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় যদি মুনাফা অপেক্ষাকৃত কম হয় তবে উৎপাদকেরা উক্ত শিল্প বর্জ্জন করিয়া অন্যান্য শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন। ফলে উক্ত শিল্প সঙ্কোচিত হইয়া বাজারে পণ্যদ্রব্যটীর যোগান কমিবে এবং ইহার বাজার দর চড়িবে। বাজার দর চড়িলে উৎপাদকেরা শেষ পর্য্যন্ত অন্ততঃ সেটুকু মুনাফা পাইবেন যেটুকু না পাইলে ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকা যায় না। যদি কোন উৎপাদকের উৎপাদন ব্যয় চলতি বাজার দর অপেক্ষা বেশীও হয় তবুও তাঁহার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চলতি বাজার দরেই বিক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ভবিষ্যতে উৎপাদনে দক্ষতা বাড়াইয়া যদি উৎপাদন ব্যয় কমাইতে পারেন, অথবা যদি বাজার দর চড়ে, তবে ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন। নতুবা ব্যবসা গুটাইয়া ফেলিতে হইবে। এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত বিক্রেতার সংখ্যা যত বেশী হইবে ততই বাজারে দ্রব্যটীর মোট যোগান কমিতে থাকিবে এবং ফলে দ্রব্যটির বাজার দর চড়িতে থাকিবে। বাজার দর চড়িলে ক্ষতিগ্রস্ত উৎপাদকেরা, যে ন্যূনতম মুনাফা পাইলে ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকা যায়, অন্ততঃ সেটুকু পাইবেন এবং ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন। মোটকথা চাহিদার অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া কোন পণ্যদ্রব্যের বাজারে ইহার মোট যোগান বাড়িলে মূল্য কমিবে, মোট যোগান কমিলে মূল্য বাড়িবে। কিন্তু এককভাবে কোন বিশেষ উৎপাদকের পক্ষে এই মোট যোগান বাড়ানো কমানো অথবা দ্রব্যটীর মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। প্রত্যেক উৎপাদককেই চলতি বাজার দরটিকে স্বীকার করিয়া লইয়া উৎপাদন ব্যয় যথাসম্ভব কমাইয়া মুনাফা লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। এবং উৎপাদন ব্যয় কমাইতে হইলে উৎপাদনে দক্ষতা বাড়াইতে হইবে।

অতএব দেখা যায় যে অর্থশাস্ত্রে কোন পণ্যদ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলিতে দ্রব্যটীর মূল্য হ্রাসের, এমন কি উৎকর্ষ বৃদ্ধিরও, প্রতিযোগিতা বুঝায় না; উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের প্রতিযোগিতা বুঝায়। অসংখ্য উৎপাদকের মধ্যে যাঁহারা যত বেশী দক্ষ তাঁহারা উৎপাদন ব্যয় তত কমাইয়া দ্রব্যটীর যোগান দিতে পারিবেন এবং ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন। যাঁহাদের দক্ষতা কম তাঁহাদের উৎপাদন ব্যয় বেশী হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসায় গুটাইয়া ফেলিতে হইবে। দ্রব্যটীর বাজার দরও প্রতিযোগিতার ফলে এমন হইবে যে সম্ভাব্য ন্যূনতম উৎপাদন ব্যয়ের উপর যে ন্যূনতম মুনাফা না থাকিলে দ্রব্যটীর মূল্যানুরূপ চাহিদা অনুসারে যোগান আসা সম্ভব নয় উৎপাদকেরাও মোটের উপর সেই মুনাফাটাই লাভ করিবেন। এই মুনাফাকে বলা হয় "স্বাভাবিক মুনাফা" (normal profit) এবং অর্থশাস্ত্রে ইহাকেও উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের ভাষণে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের মূল্য শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে এবং উৎপাদকদের কোন মুনাফা থাকিবে না। এই তত্ত্বটী কতদূর সত্য অথবা বাস্তবানুগামী, কিম্বা ইহা নেহাতই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার "মুনাফা" অথবা কার্লমার্কসের ভাষায় "উদ্বৃত্ত মূল্য" অথবা "ফাজিল দাম" (surplus value) এর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সমাজ-বাদী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষামূলক যুক্তি, সেই দুরূহ আলোচনায় না গিয়া এক কথায় বলা যায় যে অর্থশাস্ত্রীয় "আদর্শ" অবাধ প্রতিযোগিতায় একদিকে যেমন যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (survival of the fittest) এবং অযোগ্যের অপনোদন সাধিত হইবে, অপর দিকে তেমনই পণ্যদ্রব্যাদিও সম্ভাব্য নিম্নতম মূল্যে বাজারে আসিবে।

উপরি আলোচিত পূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষ্যণীয় যে সাধারণতঃ আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে "প্রতিযোগিতা" বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি অর্থশাস্ত্রের আদর্শ প্রতিযোগিতার ধারণা ইহার প্রায় বিপরীত। আমরা বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বলিতে বুঝি পণ্যদ্রব্যাদির উৎকর্ষ অথবা বিশেষত্ব বিধান, বিজ্ঞাপণ, আচরণ, কৌশলী বিপণিকতা, ইত্যাদি দ্বারা ক্রেতাকে প্রভাবিত করা। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের আদর্শ প্রতিযোগিতায় পণ্যদ্রব্যের স্বাতন্ত্র্যবিধান, বিজ্ঞাপণ (advertisement), বিপন দক্ষতা (salesmanship) ইত্যাদির কোন স্থান নাই। তবু তাহাই নহে ; বরং এই সবই পূর্ণ প্রতিযোগিতার ব্যতিক্রম এবং বাজারকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণ একায়ত্বকরণ (monopoly) এর কৌশল মাত্র। বস্তুতঃ বাস্তব জগতে অর্থশাস্ত্রের আদর্শ পূর্ণ প্রতিযোগিতা বড় একটা দেখা যায় না ; বরং ইহার ব্যতিক্রমই বেশী। তবে তাত্ত্বিক প্রয়োজনে বাস্তবের কতকগুলি মৌল-চারিত্রিক বিশেষত্বকে বাস্তব হইতে বিচ্ছিন্ন অথবা বিমূর্ত্ত (abstract) করিয়া একটা কাল্পনিক আদর্শ অথবা "মডেল" (model) তৈরী করিতে হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অর্থশাস্ত্রীয় "মডেলটী" জানা থাকিলে বাস্তবে কোথায় এবং কেন ইহার ব্যতিক্রম ঘটে এবং ইহার ফল কি দাঁড়ায় তাহা অনুধাবন করা সহজ।

কোন পণ্যদ্রব্যের অথবা উপকৃতির (service) বাজারে অবাধ অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপরি বর্ণিত সর্ত্তগুলির যে কোন একটির ব্যতিক্রম ঘটিলেই "অপূর্ণ" অথবা "অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার" (Imperfect Competition) উদ্ভব হয়। আমরা ইহাকে "ব্যাহত প্রতিযোগিতা"ও আখ্যা দিতে পারি। যেমন ধরা যাক ক্রেতা এবং বিক্রেতা অসংখ্য আছেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ যোগাযোগও আছে, অথচ কোথাও কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রেয় দ্রব্যও অভিন্ন অথবা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তসামগ্রী (perfect substitute)। এ অবস্থায়ও যদি ক্রেতারা অথবা বিক্রেতারা অথবা উভয় পক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ হ'ন তবে অবাধ প্রতিযোগিতা অন্তর্হিত হইয়া একায়ত্ব বাজারের (monopoly) উদ্ভব হইল। কোন একটী বিশেষ অঞ্চলের অথবা বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের "একমেবা-দ্বিতীয়" নিয়োগকর্ত্তা যেমন নিজের অধিকারেই "এক ক্রেতায়ত্ব বাজারের" (monopsony) মালিক, তেমনি কোন একটী বিশেষ শিল্পের অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সঙ্ঘও "এক বিক্রেতায়ত্ব বাজারের" (monopoly) অধিপতি। কারণ শ্রমিকের নিয়োগ কর্ত্তা হইলেন শ্রমের "ক্রেতা" এবং শ্রমিকেরা হইলেন শ্রমের "বিক্রেতা"। বর্ত্তমান জগতে একদিকে ক্রেতা এবং অপরদিকে বিক্রেতা এই "উভয়মুখী" অথবা "উভয় পাক্ষিক একায়ত্বকরণ" (bilateral monopoly) কলকারখানা, শিল্পসংস্থা, রাষ্ট্রীয় শিল্প অথবা বাণিজ্যোদ্যোগ, এমন কি রাষ্ট্রায়ত্ব শিক্ষাব্যবস্থা অথবা প্রশাসন-বিভাগেও হামেসাই চোখে পড়ে। একদিকে সরকার ব্যাঙ্কিং অথবা বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা ব্যাঙ্কিং অথবা বীমা সংক্রান্ত উপকৃতি (service) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একমাত্র বিক্রেতা (monopolist) হইয়া দাঁড়ান। আবার ব্যাঙ্ক অথবা বীমা কর্ম্মচারীদের শ্রমের বাজারে একদিকে সরকার একমাত্র ক্রেতা (monopsonist) এবং অপরদিকে কর্ম্মচারী-সঙ্ঘ একমাত্র বিক্রেতা (monopolist), এবং এই উভয় পক্ষের মিলনে বাজারটী "উভয় পাক্ষিক আয়ত্বের" (bilateral monopoly) কুক্ষিগত। তেমনি রাষ্ট্রায়ত্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের "শ্রমের" বাজার সরকার এবং শিক্ষক-সমিতি এই উভয়পাক্ষিক আয়ত্বে থাকে। তবে বে-সরকারী অর্থাৎ পুঁজিপতিদের শিল্প-সংস্থায় শ্রমের বাজারে এইরূপ কর্ম্মীসঙ্ঘ এবং মালিকের উভয় পাক্ষিক আধিপত্য এবং রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগে অথবাসরকারী বিভাগে শ্রমের বাজারে দ্বি-পাক্ষিক আধিপত্যের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমটী হইল শ্রমের একমাত্র ক্রেতা (monopsonist) স্বরূপে একাধিপত্যের জোরে শ্রমিককে শোষণ (exploit) করিবার যে শক্তি শিল্পপতি প্রয়োগ করিতে সমর্থ তাহার বিপক্ষে শ্রমিকদের অর্থাৎ

শ্রমের বিক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার্থে এবং আত্মরক্ষার্থে একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি "(countervailing power")। কিন্তু সরকারী প্রশাসনিক বিভাগ, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প অথবা বাণিজ্য সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিক্ষাবিভাগ, এমন কি জলসরবরাহ ব্যাঙ্কিং, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জন-পরিবহন, ইত্যাদি সরকারী, আধা-সরকারী অথবা বে-সরকারী যে কোনরূপ জনকল্যাণ-মূলক উদ্যোগে অনেক সময় শ্রমের বিক্রেতারা তাঁহাদের শোষক ত দূরের কথা, তাঁহাদের শ্রমের আসল ক্রেতা কেই খুঁজিয়া পাইবেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে যে অবাধ প্রতিযোগিতার বাজারে তাঁহারা তাঁহাদের শ্রমের যে মূল্য পাইতেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী পাইতেছেন এবং তাহা জনসাধারণকে শোষণ করিয়া। এবং এই শোষণ করিবার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি এত বেশী যে, যে কোন সময় শ্রমের যোগান বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহারা সমাজে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া শ্রমের দাম অনেকখানি বাড়াইয়া দিতে পারেন। কারণ ইহাতে কোন পুঁজিপতির এক পয়সাও মুনাফা কমে না; গরীব জনসাধারণের একটু দণ্ড হয় এই মাত্র। এবং যাঁহাদের এই দণ্ড হয় তাঁহারা ইহার খবরই রাখেন না। শুধু তাহাই নয়। এই জনসাধারণরূপ মালিকেরা, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কর্মীদের শ্রমের শুধু ক্রেতাই নহেন বরং তাঁহাদের পোষক, তাঁহারা এতই অজ্ঞ যে অনেক ক্ষেত্রে হয়ত দেখা যাইবে যে "জনসাধারণের স্বার্থে অধিকতর প্রশাসনিক দক্ষতার দাবীতে প্রশাসনিক কর্মীদের কর্ম্ম-বিরতি"রূপ শ্রমের যোগান বন্ধেও তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে সমর্থন জানান।

এই উদ্ভট একায়ত্ব অথবা দ্বি-আয়ত্ব (?) বাজারের উদ্ভব হয় প্রধানতঃ আধা-সমাজতান্ত্রিক অথবা ভুয়া-সমাজতান্ত্রিক (pseudo-socialistic) এবং "সঙ্কর" জাতীয় অর্থনীতির (mixed economy) ক্ষেত্রে। কারণ প্রকৃত, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্প-বাণিজ্যাদি সমস্তই রাষ্ট্রীয় উদ্যমে পরিচালিত। সেখানে সর্ব্বত্রই মালিক অথবা শ্রমের নিযোক্তা হইলেন রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ, অথবা কর্ম্মী সম্প্রদায় নিজেরাই। অতএব সেখানে কর্ম্ম-বিরতিও (Strike) নাই, কর্ম্মনিরোধও (Lock-out) নাই। প্রত্যেকেই তাঁহার সাধ্যানুরূপ শ্রম দিবেন, এবং প্রত্যেকেই তাঁহার প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি পাইবেন ("From each according to his ability to each according to his need")। কিন্তু এখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক রাষ্ট্রের "সম্প্রদায় গঠনের স্বাধীনতা" (Freedom of association) আছে, পুঁজিপতিদের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকসঙ্ঘ (Trade Union) আছে, কর্ম্মবিরতি আছে, এবং এই সঙ্ঘশক্তি রাষ্ট্র তথা জাতির বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যায়।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পঞ্চত্রিংশ অধিবেশন—নাগপুর—১৯২০)

কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে—অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দেশব্যাপী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হল।

বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে বিধানসভার পদপ্রার্থী হয়েছিলেন যাঁরা একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে তাঁরা তাঁদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করলেন।

নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানালেন যে যদিও তাঁরা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর—অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন এবং যদিও তাঁরা উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন তথাপি কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যের জন্য অধিকাংশ প্রতিনিধির ভোট দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবানুসারে তারা নূতন বিধানসভার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন :—

মিষ্টার	বি, চক্রবর্তী	(ব্যোমকেশ চক্রবর্তী)	খুলনা কেন্দ্র
”	সি আর দাশ	(চিত্তরঞ্জন দাশ)	ঢাকা ”
”	অখিল চন্দ্র দত্ত	... ...	কুমিল্লা ”
”	এ সি ব্যানার্জি	... ...	কলকাতা ”
”	প্রমথ চৌধুরী	(বীরবল)	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ”
”	সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী	... ...	রংপুর ”
”	মনমোহন নিয়োগী	... ...	ময়মনসিংহ ”
”	নিশীথ সেন	... ...	বরিশাল ”
”	জে এম সেনগুপ্ত	(যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত)	চট্টগ্রাম ”
”	বিজয়কৃষ্ণ বসু	... ...	ডায়মণ্ড হারবার ”
”	শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ”
”	রজনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	... ...	২৪ পরগনা ”
”	সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	... ...	নোয়াখালী ”
কুমার	এস সি ঘোষাল	... ...	বরিশাল ”
মিষ্টার	ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ...	বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স ”
”	বিপিনচন্দ্র ঘোষ	... ...	মালদহ ”
”	বি কে লাহিড়ী	(বসন্তকুমার লাহিড়ী)	নদীয়া ”
”	বি এন শাসমল	... ...	মেদিনীপুর ”

নিম্নলিখিত পাঁচজন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন সুতরাং তাঁরাও নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালেন।

মিষ্টার	নির্মলচন্দ্র চন্দ্র	...	...	কলকাতা কেন্দ্র
”	মন্মথনাথ রায়	...	...	হাওড়া ”
”	বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	...	...	বাঁকুড়া ”
”	সাতকড়ি পতি রায়	...	...	মেদিনীপুর ”
”	জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	বীরভূম ”

রাজসাহীর শ্রীসুদর্শন চক্রবর্তী এবং কলকাতার ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রও তাঁদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করলেন।

বিঠলভাই প্যাটেল ভারতীয় বিধানসভার সদস্য পদ ত্যাগ করে বললেন যে তিনি আশা করেন যে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব সংশোধিত হবে।

পরলোকগত লোকমান্য তিলক কর্তৃক কংগ্রেস ডেমোক্রেটিকপার্টির সভাপতিজোসেফ ব্যাপ্টিষ্টা অভিমত প্রকাশ করলেন যে গান্ধী কংগ্রেসের প্রতি আঘাত হেনেছেন এবং একটি কবর খুঁড়েছেন তাতে হয় গান্ধী নয় কংগ্রেস সমাধিপ্রাপ্ত হবে। গান্ধী সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকে অপমান করে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি চান স্বরাজ অর্জন না হওয়া পর্য্যন্ত গান্ধী কংগ্রেসে কর্তৃত্ব করুন অথবা তিনি যে গর্ত খুঁড়েছেন তার ভিতর বিশ্রাম লাভ করুন।

অসহযোগ প্রস্তাবের প্রতিবাদে গোকরণনাথ মিশ্র ১৪ই আগষ্ট কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।

এন সি কেলকার (নরসিংহ চিন্তামন কেলকার—লোকমান্য তিলকের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন) এবং করন্দিকর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও কাউন্সিলের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন।

মিরাটের ব্যারিষ্টারদ্বয় সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ও ইশমাইল খাঁ এবং মুঙ্গেরের ব্যারিষ্টার মহম্মদ জাহির আইন ব্যবসা স্থগিত রাখলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আইন ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করে যুক্তপ্রদেশে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত করলেন।

পাটনার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মজহর-উল-হক কাউন-সিলের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সরে দাঁড়ালেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবলভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সমালোচনা করতে লাগলেন।

মতানৈক্যের জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর দৈনিক পত্রিকা “ইনডিপেনডেন্টের” সম্পাদকের পদ—বিপিন চন্দ্র পাল ত্যাগ করলেন এবং তাঁর স্থলে সম্পাদক নিযুক্ত হলেন মহাত্মা গান্ধীর সমর্থক সি এস রঙ্গ আইয়ার।

গত বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কংগ্রেস একটি সব কমিটী গঠন করে তার উপর এ সম্বন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার দেওয়া হয়। কমিটীর অন্যতম সদস্য বিঠলভাই প্যাটেল কমিটীর অধিকাংশ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন নি। তাঁর মতে কংগ্রেসের ক্রীড (মূলনীতি) পরিবর্তন না করে অসহযোগের সম্পূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা কংগ্রেস সংবিধানের পরিপন্থী হবে।

বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপত রায় উক্ত রিপোর্টে উল্লিখিত অসহযোগের সম্পূর্ণ কর্মসূচী কংগ্রেস অনুমোদন করেছে এই উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন।

এইরকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচ-নের কাজ চলতে লাগল। ৪ঠা অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সভাপতি পদের জন্য—শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নাম সুপারিশ করল।

ঐ তারিখেই পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী শ্রী সি বিজয় রাঘবাচারিয়ার নাম সুপারিশ করে।

আজমীড় মাড়োয়ারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এবং মাদ্রাজ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীও শ্রীবিজয় রাঘবাচারিয়ার নাম সুপারিশ করে।

১০ই অক্টোবর অভ্যর্থনা সমিতির সভায় ওয়ার্দ্ধার শিল্পপতি শেঠ যমুনালাল বাজাজ (তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারে 'রাও বাহাদুর' উপাধি ত্যাগ করেন।) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং নাগপুরের প্রসিদ্ধ নেতা ডাঃ মুঞ্জে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সুপারিশ থেকে দেখা গেল যে বিজয় রাঘবাচারিয়া ৬ ভোট, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মৌলানা মহম্মদ আলী এবং অরবিন্দ ঘোষ প্রত্যেকে ১ ভোট পেয়েছেন।

সভাপতির চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভা ১১ই অক্টোবর আহুত হয়। ডাঃ মুঞ্জে ঐ পদের জন্য শ্রীরাঘবাচারিয়ার নাম প্রস্তাব করেন। ডাঃ হেডগেওয়ার এই প্রস্তাবে আপত্তি করে বললেন যে সম্প্রতি রাঘবাচারিয়া মশায় মাদ্রাজ গভর্ণরের পার্টীতে যোগ দিয়েছিলেন সুতরাং তিনি সভাপতি পদের যোগ্য নন। আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিপুল ভোটাধিক্যে—শ্রী সি বিজয় রাঘবাচারিয়া সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৬ই অক্টোবর তিনি তাঁর সম্মতি জানালেন।

যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাব কংগ্রেসের ক্রীড (মূলনীতি) পরিবর্তন করে ভারতীয় নাগরিকের মনমত স্বরাজ অর্জন করাই কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য এবং তদনুসারে জাতীয় কংগ্রেসকে সংবিধানের প্রথম ধারা (ক্রীড সম্বন্ধে) পরিবর্তন করার সুপারিশ ছিল। প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মৌলানা সৌকত আলী, মৌলানা মহম্মদ আলী, আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা, স্বামী সত্যদেব এবং মহাত্মা গান্ধী।

কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য কর্ণেল ওয়েজউড ভারতে আগমন করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি শেঠ যমুনালাল বাজাজ এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মুঞ্জে বোম্বাই উপস্থিত হন।

মহাত্মা গান্ধী গভর্ণমেন্ট পরিচালিত বা সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল কলেজের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে দিলেন। তিনি আলীগড় কলেজ, খালসা কলেজ এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিস্তালয়ের ধ্বংস কার্য্যে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ঘোষনা করলেন যে গভর্ণমেন্টের সাহায্য প্রাপ্ত এবং গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত বিস্তালয়ে পাঠ গ্রহণ করা পাপ। তাঁর সহকর্মী মৌলনা মহম্মদ আলী আলীগড় বিশ্ববিস্তালয় ভবন দখল করে বসলেন, এই নিয়ে তাঁর এবং ভাইস চ্যান্সেলার (উপাচার্য্য) ডঃ জিয়াউদ্দিনের মধ্যে পত্রালাপ চলতে লাগল। মহম্মদ আলীর প্রভাবে ছাত্ররা বোর্ডিং হাউস থেকে বেরিয়ে এল। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য...ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়ের কমিশনে সদস্যরূপে ডাঃ জিয়াউদ্দিন এবং ইউরোপীয় পরিষদে শোভিত পাকা সাহেব মিষ্টার মহম্মদ আলী উভয়েই কাজ করেছেন।

কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররাও মাদ্রাসা ত্যাগ করে, দিল্লীর রামযশ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগিডোয়ানী চাকুরি ছেড়ে দেন এবং সেখানে ছাত্রদের একটি সভা আহ্বান করা হয়। তার সভাপতি ছিলেন ডাঃ আনসারী।

অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী শ্রীজিন্নাকে যে পত্র লিখেছিলেন তার উত্তর জিন্না সাহেব যা দিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য।

জিন্না সাহেব জানালেন যে ব্রিটিশ সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি কোন 'ফেটীশ' করেন না কিন্তু তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে রাজনৈতিক জ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে বলা যায় যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর থেকেই সদস্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা ভারতের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তিনি গভর্ণমেন্টের নীতির দোষারোপ করেন। অসহযোগ প্রস্তাবের সমুদয় কর্মসূচী সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত একথা তিনি বলেছেন

বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে তা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং জানান যে জাতীয়তাবাদীদের একমাত্র উপায় হল অনতিবিলম্বে—সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট অর্জনের জন্য সর্ববাদী সম্মত কর্মসূচী সমবেত হয়ে সফল করা। এ রকম কর্মসূচী কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতাদের সম্মতি ও সাহায্য পাওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি এবং স্বরাজ্য সভায় তাঁর সহকর্মীরা কাজ করে যাবেন।

শ্রীমতী বেশান্ত বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে এক সভায় ছাত্রদের বিদ্যালয় ত্যাগে গান্ধীজির ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন।

কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি অগ্রাহ্য করে—সংশোধিত আইন সভাগুলির পদপ্রার্থীরা সকল প্রদেশে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে লাগল।

এ সকল স্বত্বেও অসহযোগের কাজ চলতে লাগল। কলকাতার বিখ্যাত নাখোদা মসজিদে একটি জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপিত হল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ৩১।১০।২০ তারিখে বোম্বাই সহরে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে সর্বপ্রথম নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ঐ সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন যোশেফ ব্যাপ্টিষ্টা। সপত্নী কর্ণেল ওয়েজউড শ্রীমতী বেশান্ত, সপত্নী মহম্মদ আলী জিন্না, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালুভাই শ্যামলদাস (প্রসিদ্ধ শিল্পপতি) এবং আমেরিকার স্বাধীন ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত গগনবেহারীলাল মেহেতার পিতা)। বিঠলভাই প্যাটেল যমনাদাস দ্বারকা দাস, মার্মাডিউক পিকথল এবং প্রসিদ্ধ শ্রমিক নেতা এন্ এম্ যোশী।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে জিন্না সাহেব মহাত্মাকে আর একখানি চিঠি লেখেন তাতে তিনি লিখলেন—আপনি এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রতিষ্ঠানে গমন করেছেন তার প্রায় প্রতিষ্ঠানে আপনার পদ্ধতি বিবাদ ও বিভেদ এনেছে এবং এই বিবাদ ও বিভেদ কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু হিন্দু এবং হিন্দুর মধ্যে, মুসলমান এবং মুসলমানের মধ্যে এবং এমন কি পিতা ও পুত্রের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। সাধারণত দেশের সর্বত্র জনগণ মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং আপনার চরম কর্মসূচী সাময়িকভাবে বেশীর ভাগ অনভিজ্ঞ ও অশিক্ষিত যুবকদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। এ সকলের অর্থ সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। এ সকলের ফল কি হবে তা ভেবে আমার হৃদকম্প হচ্ছে।

এতে বিচলিত না হয়ে মহাত্মা, পণ্ডিত মতিলাল ও চোটানীকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় অসহযোগ প্রচার করতে থাকলেন।

গভর্ণমেণ্টও নীরব দর্শক ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে তাদের নীতি গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন। ৬।১১।২০ তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হল। বলা হল যে যদিও গভর্ণমেণ্টের মতে অসহযোগ আন্দোলন বেআইনী কারণ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে পঙ্গু ও উচ্ছেদ করা তথাপি গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত এর উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা সোপর্দ করা বা কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত আছে কারণ আন্দোলনের পরিচালকগণ সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে হিংসাত্মক কার্য্য থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় গভর্ণমেণ্টগুলির উপর উপদেশ দিয়েছে যে এই আন্দোলন চালাতে যদি কেউ নেতাদের নির্দেশের সীমা অতিক্রম করে বক্তৃতা ও লেখা দ্বারা প্রকাশ্যে জনগণকে হিংসাত্মক কার্য্যে উত্তেজিত করে এবং সামরিক বাহিনী অথবা পুলিশের আনুগত্য নষ্ট করার চেষ্টা করে তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

দেশের সর্বত্র অসহযোগ ও খিলাফৎ সভা হতে লাগল।

দেশের জনমতকে কিছুটা শান্ত করার জন্য—প্রথম একজন ভারতীয়কে গভর্ণর নিযুক্ত করা হল। লর্ড

সিংহ (সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ—ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি) বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর নিযুক্ত হলেন।

আন্দামান হতে সদ্যমুক্ত প্রসিদ্ধ বিপ্লবী সভারকর ভ্রাতৃদ্বয় কাউনসিল বয়কটের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গান্ধীর স্বরাজের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মত প্রচার করলেন।

এতে কোন ফল হল না। দলে দলে ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছাড়তে লাগল।

এদিকে নাগপুর কংগ্রেসের আয়োজন চলতে লাগল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিঠলভাই প্যাটেল ২১।১১।২০ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানালেন যে ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হবে।

অন্যদিকে মডারেট নেতারা। ভাইসরয় এবং গভর্ণনররা তাঁদের সফর কালীন বক্তৃতায় অসহযোগ —আন্দোলনের নিন্দা করতে লাগলেন।

গান্ধীজী আলী ভ্রাতৃদ্বয় সহকারে ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে পাটনা, কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে অসহযোগের স্বপক্ষে প্রচার কার্য্য চালাতে লাগলেন। ১৪ই ডিসেম্বর কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ার (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) একটি বৃহৎ জনসভায় মহাত্মা ও আলী ভ্রাতারা বক্তৃতা দেন। তারপর গান্ধীজী চিত্তরঞ্জন দাসকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় গেলেন। সঙ্গে মৌলানা সৌকত আলী ও মৌলানা মহম্মদ আলীও ছিলেন। সেখানেও তাঁরা সকলে জনসভায় বক্তৃতা দেন।

২০শে ডিসেম্বর পুনায় ফার্গুসন কলেজে একটি ছাত্রসভা সুপ্রসিদ্ধ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক ডঃ পরাঞ্জপের সভাপতিত্বে আহুত হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন—মহম্মদ আলী জিন্না। জিন্না সাহেব ঐ সভায় জানালেন যে যদিও তিনি অসহযোগের কর্মসূচীতে বিশ্বাসী তথাপি তিনি মনে করেন যে গভর্ণমেণ্টকে পঙ্গু ও অকর্মণ্য করতে গান্ধীর অসহযোগের কর্মসূচী কার্য্যকরী হবে না। আন্দোলনটি অসময়োচিত (premature) তাঁর মতে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমগ্র কর্মসূচী ক্ষতিকর ও অকার্য্যকর হবে। তিনি আরও মনে করেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।

এই পটভূমিকায় নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

ক্রমশঃ

বাঙ্‌লা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'চোর ধরতে চোরকে লাগাও'—

ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে—set a thief to catch a thief—বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবশ্য প্রকৃত এবং ধার্ম্মিক চোরদের মনে করিয়া কোন মন্তব্য করিতেছি না, কারণ আমাদের এ-রাজ্যের সি পি এম, সি পি আই, এস-ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলিকে আমরা আর যাহাই হউক এখনও কাহাকেও চোর বলিয়া মনে করি না। তবে তথাকথিত রাজনৈতিক হত্যা, হামলা এবং পরস্পর বিরোধী সদা-সংগ্রামী এইসব দলগুলি 'নীতি' (?) এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের (?) জন্যই একদল অন্যদলের সহিত সদা যুদ্ধে লিপ্ত আছে। এখানে বিশেষ করিয়া সি পি এমের কথা উল্লেখযোগ্য। এই দল অন্য দল কিংবা দলগুলির সহিত পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বপ্রকার হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ করিয়া কাজ করিতে রাজী—কিন্তু একটা সর্ত্তে—অন্য সব দলগুলি সি পি এমকে বড়দাদা বলিয়া মানিয়া লইবে এবং বড়দাদার নির্দেশমত কাজ করিবে। কিন্তু অন্যদলগুলি বিশেষ করিয়া সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি কাহারো বড়দাদাগিরি স্বীকার করিতে রাজী নয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে সিদ্ধার্থবাবুর প্ল্যান রাজনৈতিক দলগুলির সহিত এ-রাজ্যে হিংসাত্মক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কাজে কতখানি ফলপ্রসূ হইবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ইতিমধ্যে বারকয়েক এই আলোচনা বৈঠক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় নাই এবং অন্যদিকে এ-রাজ্যে হত্যালীলার তাণ্ডব ক্রমশ বৃদ্ধিমুখে। গত কয়েক মাসে কলিকাতা এবং অন্যত্র হত্যার যে সংখ্যা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে প্রায় ৬০০ শত ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে নিহত হইয়াছে। কিন্তু এ-হিসাব সরকার কোন সূত্র হইতে পাইলেন জানি না। মাঠে, পথে-ঘাটে, নালা-নদীতে যে সব নিহত ব্যক্তির শবদেহ পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যহ তাহা যে রাজনৈতিক হত্যা নহে, তাহা কেমন করিয়া বলা যায়?

আমাদের মতে এ-রাজ্যে এক একটি রাজনৈতিক দলকে এক একটি জেলার সর্ব্বপ্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করিবার ভার দেওয়া উচিত। জেলার ভারপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল এবং দলপতির—ঐ জেলার শান্তি রক্ষায় ব্যর্থ হইলে সরকারীভাবে শান্তি বিধানের ব্যবস্থা থাকিবে—এমন কি এই কার্য চালাইবার জন্য, দলপতি এবং কর্ম্মীদের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দও করা যাইতে পারে। এক পার্টির নেতা বা কর্ম্মী অন্য পার্টির এলাকাতে গোপনে প্রবেশ করিয়া শান্তি ভঙ্গকারী অন্য-দলের কর্ম্মীদের সংবাদাদি যথাস্থানে দিতে পারিলে—বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সি পি এমের সর্ত্ত-সাপেক্ষ সহযোগিতা—

সি পি এম পলিটব্যুরোর গত মিটিং-এ স্থির হইয়াছে যে তাহাদের কয়েকটি সর্ত্ত যদি সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়, একমাত্র তাহা হইলেই এই দল এ-রাজ্যে সরকারের শান্তি পুনপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সহযোগীতা দিতে প্রস্তত। অন্যথায় এ-রাজ্যে যে ভাবে হত্যালীলা চলিতেছে, তাহা অব্যাহত থাকুক, কারণ মাথাব্যথাটা যখন সরকারের, তাহারা যা পারে করুক। এ-বিষয় দায়িত্বহীন পলিটিক্যাল পার্টি এবং নেতাদের কোন প্রকার মাথা ঘামাইবার দরকার কি? তাহারা পার্টি পলিটিকস্ (যাহা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়) লইয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র এবং স্বার্থ সংঘাত লইয়া মত্ত থাকুন।

সি পি আই (এম) প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে শান্তি এবং অযথা রক্তপ্রবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন দলগুলির কাছে যে আবেদন জানাইয়াছেন, সি পি এম তাহাতে সাড়া দিতে রাজী যদি কেন্দ্র সরকার—

১। আগামী নভেম্বর মাসে এ-রাজ্যে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

২। এ-রাজ্য হইতে সি আর পি এবং মিলিটারি প্রত্যাহার করা হয়।

৩। পি ডি অ্যাক্‌ট বাতিল করিতে হইবে।

সহজ কথায় সি পি আই এম-এর ইচ্ছা এই যে, রাজ্য হইতে সি আর পি, মিলিটারি সরানো হইলে, আর সেই সঙ্গে পি ডি অ্যাক্ট বাতিল হইলে, সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক দলগুলির রাজত্ব আবার কায়েম হইবে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা এবং সেই সঙ্গে "রাজনৈতিক হত্যা" অবাধে চলিতে থাকিবে। গত কিছুকাল হইতেই ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে একদলের মতের সহিত অন্য দলের মতের মিল না হইলেই বিরুদ্ধ দলীয়দের সমর্থকদের যত জনকে পারা যায় খতম করা। বলাবাহুল্য সন্ত্রাসবাদী পার্টি নেতারা একাজ নিজেদের হস্তে করেন না, তাঁহাদের মন্ত্রমুগ্ধ স্বাধীন চিন্তাহীন ভক্ত এবং সমর্থকের দলই হত্যার কাজটা কর্ত্তা কিংবা কর্ত্তাদের নির্দ্দেশ মত করিতে বাধ্য থাকে।

নভেম্বর মাসে নির্ব্বাচন হইলেই এ-রাজ্যে শান্তির বাতাস বহিবে—সি পি এমের চুক্তি এবং দাবি যেমন অসার, তেমনি সব কিছু বুঝিয়াও ন্যাকা সাজা। সি পি এম এখন প্রায় একঘরে হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে এই পার্টির নেতাদেরও বুদ্ধি বিবেচনাও প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। (২৯-৭-৭১।)

দারিদ্র্য দূরীকরণ—গরিবী হঠাও;—

পশ্চিম বঙ্গের দরিদ্রজনদের কথাই বলিতেছি। বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে মাতা ইন্দিরা দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করিবেন ঘোষণা করেন এবং নির্ব্বাচনের পর এই উদ্দেশ্য সাধনে সংসদে তিনি জেনারেল ইন্সিওরেন্স রাষ্ট্রীয়করণ এবং রাজন্যবর্গের ভাতা যাহা সংবিধান সম্মত, বাতিল করিবার জন্য একটি বিল হয়ত শীঘ্রই পেশ করিবেন। ইহাতে দেশের দারিদ্র্য বেশ কিছুটা দূর হইবে আশা করা যায়। তাহার পর হয়ত দারিদ্র্য বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইবে যথাযথ আইন পাশ করিয়া। যেমন দূর হইয়াছে অস্পৃশ্যতা, বিবাহে পণপ্রথা প্রভৃতি। ব্যাস—তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

এ দেশে পশ্চিম বাঙ্গলার জনগণ সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র এবং অভাব অনটন নিপীড়িত, অন্য রাজ্যগুলির সাধারণ জন আছে অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল অবস্থায়। এ-রাজ্যে শতকরা বোধহয় আশীজন মানুষ এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—আর সেই জন্যই বিবাহাদি উৎসব বাড়ীতে যেখানে অতিথিদের ভোজনের পর কলা বা শালপাতা রাস্তায় ফেলা হয় সেইখানে শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ এবং রাস্তার কুকুর নিক্ষিপ্ত খাবার লইয়া কামড়াকামড়ী করে। এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য ভারতের অন্য কোন রাজ্যে দেখা যাইবে না, দেখিও নাই।

প্রাণঘাতী দারিদ্র্য কি এবং তাহা যে অসীম আসলে মাতা ইন্দিরা তাহা ঠিক জানেন না এবং আজন্ম সুখে

লালিত কোন ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্যক জানিবার কথাও নহে, জানিবার অবকাশ হয় না তাঁহাদের। সংবাদপত্রের রিপোর্টে বহুপ্রকার সংবাদ প্রকাশিতও হয়, এবং তাহাতে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে—অমুক ব্যক্তি অভাবের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া ৫।৬টি সন্তানকে হত্যা করিয়া তাহার পর স্বামী-স্ত্রীও আত্মহত্যা করিয়াছে। এমন প্রকার সংবাদ পাঠে অনেকেই দুঃখ বোধ করি—ব্যাস্ এই পর্য্যন্তই। অভাব অনটন অনাহারের জ্বালা পশ্চিমবঙ্গে যে কত শত বা হাজার মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ এবং অসহ্য কষ্টে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার সঠিক হিসাব কেহ দিতে পারিবে না, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এ-সংবাদ কখনও যে প্রকাশিত হইবে এমন আশাও কেহ করে না। দারিদ্র্যের পাতালের স্তরে যাহারা এখনো পৌঁছায় নাই, তাহারাও আর বেশী দিন চরম পতন হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারিবে —সমাজের নিচের তলায় সব একাকার হইয়া যাইবে—গরিবী গণতন্ত্র সার্থক হইবে।

পৃথিবীর কোন দেশের কোন প্রশাসক আজ পর্য্যন্ত সমাজের গরিবী হঠাইবার ঘোষণা করেন নাই, কারণ ইহা তাঁহারা জানেন যে আইনের বলে কিংবা স্লোগান ঝাড়িয়া এই দুঃসাধ্য কাজকে সুসাধ্য করা যায় না, তবে সব দেশেই মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করিবার প্রচেষ্টা নানা ভাবে চালানো হইতেছে।

একদিকে গরিবী হঠাও ধ্বনি আর অন্যদিকে ট্যাক্স এবং একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর আকাশ-ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধির কারণে—আজ পশ্চিমবঙ্গে যাহা ঘটিতেছে তাহাকে অবশ্যই বলা চলে—"নয়া গরিবী বানাও"। এবারের বাজেটে যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে নয়া গরিবী বানাইবার প্রচেষ্টার জন্য বর্ষীবীর শ্রীচোহানকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ছাড়া পথ নাই। সুখের কথা পশ্চিম বঙ্গের জনগণ মরিলেও ভারতের অন্য রাজ্যের লোকেরা বাজেটের আঘাতে বিশেষ ক্লিষ্ট হইবে না, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতের মানুষ এখনো মোটামুটি সুখে আছে, থাকিবেও।

সব কিছু সত্বেও আমরা শ্রীমতী গান্ধীর দারিদ্র্য দূরীকরণরূপ মনোবাসনার সাফল্য কামনা করি। দারিদ্র্য কাহাকে বলেন, মহাত্মা গান্ধী কিছুটা জানিতেন, কারণ তিনি দরিদ্রদের সঙ্গেই বস্তিতে বসবাস করিতেন অনেকসময়। ইন্দিরা গান্ধী তাহা করিতে পারিবেন কি?

বিবিধ প্রসঙ্গ

(৪৮৮ পাতার পর)

হইল পুঁজিবাদের বিনাশ ও বিশ্বমানবকে কম্যুনিষ্ট সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা। এরূপ অবস্থায় চীন কখনও ব্যক্তিগত লাভের কেন্দ্রস্থল আমেরিকার সহিত সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। বলা যাইতে পারে চীন রুশিয়ার ভয়ে আমেরিকার সহিত হাত মিলাইতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং আমেরিকাও নিজের প্রধান শত্রু রুশিয়ার দমনের জন্য চীনকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু চীন মনে করে তাহার মিলিশিয়ার কুড়ি কোটি সেনাগণ অতি সহজেই পৃথিবী জয় করিতে পারে। রুশিয়া ও আমেরিকার মিলিত শক্তিও ঐ বিরাট সেনা বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে না। ইহা ব্যতীত চীন ১৯৬৪ খৃঃ অব্দ হইতে আনবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে এবং তাহার কিছু কিছু আনবিক অস্ত্র হাতেও রহিয়াছে। চীন মনে করে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার যথেষ্ট পরমাণবিক যুদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে ও তখন চীন এতটা প্রবল হইয়া উঠিবে যে তাহাকে যুদ্ধে হারাইবার শক্তি আর কাহারও থাকিবে না। এইরূপ মনোভাব যেখানে সেখানে চীন আমেরিকার সহিত পিং পং ক্রীড়াতে যোগদান করিলেও যে রাষ্ট্রীয় সাহচর্য্য গঠনে প্রস্তুত হইবে এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না।

ইহা ব্যতীত আছে সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বিতীয় "চীন" দেশ টাইওয়ান অথবা ফরমোজার কথা। চীনদেশ হইতে পলাইয়া চ্যাংকাই শেখ যখন ফরমোজার আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন আমেরিকা তাঁহাকে ঐ স্থলে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে নানা ভাবে সাহায্য করে। ১৯৫৫ খৃঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বরের সন্ধি অনুসারে আমেরিকা টাইওয়ানের (ফরমোজা) রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ফরমোজা আকারে ১৩,৮৮৫ বর্গমাইল এবং তাহার জনসংখ্যা ১,৩৬,৫০,০০০। ঐ রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা ৪ লক্ষের অধিক এবং উহার নৌ ও আকাশ বাহিনীও মিলাইয়া ২০০ শতের অধিক এবং নৌ সেনার সংখ্যা ৬২০০০। আকাশ বাহিনীতে আছে প্রায় ৫০০ যুদ্ধ বিমান ও ৮৫০০০ আকাশ সেনা অথবা তাহাদের স্থল সহায়ক। অর্থাৎ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও টাইওয়ান (ফরমোজা) সুগঠিত রাজ্য এবং তাহাকে হঠাৎ উঠাইয়া দেওয়া সহজ হইবে না। উপরন্তু চীনদেশের পিপল্‌স রিপাবলিক (মাওবাদী মহাচীন) আমেরিকার দ্বারা সমর্থিত ও রক্ষিত এই ক্ষুদ্রাকার সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বিতীয় "চীন" দেশকে কিছুতেই পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবে না। ইহার কারণ চীনদেশ কোনও সময়ে (শিমনোসেকির সন্ধি ১৮৯৫, ৮ই মে অনুযায়ী) ফরমোজাকে জাপানের হাতে তুলিয়া দেয় ও পরে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের অবসানে ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৫এ ফরমোজা চীনের হস্তে (চ্যাংকাই শেখের হস্তে) প্রত্যার্পিত হয়। সুতরাং চীনদেশের প্রভু মাওৎসেতুঙ্গ বলিতে পারেন যে তিনিই একমাত্র চীনের রাষ্ট্রপতি এবং যে কোন ভূখণ্ড চীনের অংশ সে সকল দেশই ঐ একমাত্র চীনের অংশ বলিয়া শাসিত হওয়া আবশ্যক। সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বিতীয় "চীনের" কোনও পৃথক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ন্যায়ত থাকিতে পারে না। অতএব সকল দিক বিচার করিয়া বলা যায় যে আমেরিকা যতদিন পুঁজিবাদের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং চীনের বিরুদ্ধতার ক্ষেত্রে ফরমোজার সংরক্ষণ করিতে আত্মনিয়োগ করিবে, ততদিন চীন ও আমেরিকার বন্ধুত্ব কখনত সহজ সাধ্য হইবে না।

রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রবিরোধী দল

পশ্চিমবঙ্গে শুনা যায় প্রায় ত্রিশটি রাষ্ট্রীয় দল আছে। এই সকল দলের কোনও না কোন প্রকারের রাষ্ট্রীয় আদর্শ মতলব অথবা অভিসন্ধি আছে। অর্থাৎ এই সকল দলের সংগঠকদিগের রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে কোন বিশেষ মতামত আছে। সে সকল মতামতের মধ্যে শুধু একটা কথাই সর্ব্বদল সমর্থিত এবং তাহা হইল শাসন ও পরিচালনার অধিকার প্রাপ্তির কথা। সকলেই

অধিকার লাভ করিবে। পাইলে পরে এক এক দল নিজ নিজ আদর্শ মতলব কিম্বা অভিসন্ধি অনুসারে রাষ্ট্রকে নুতনভাবে গঠন করিবে এবং রাষ্ট্রশাসন কার্য্য পরিচালনা করিবে। সকল রাষ্ট্রীয় দলই যে বর্ত্তমান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অথবা স্বরূপ মূলতঃ রক্ষা করিয়া চলিবে এমন কোনও কথাও সকলে বলিতে সম্মত নহে। কোন কোন দলের লোকেরা ভারতকে উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে অন্য কোনও বৃহত্তর সংগঠনের সহিত সংযোগে অপর কোনও একটা রাষ্ট্রজাতীয় মহা প্রতিষ্ঠান গঠনের কথাও ভাবিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে ইহারা ঠিক ভারতের রাষ্ট্রীয় দল নহে। অপর কোন প্রকারের দল। ইহাদিগের ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্থান হওয়া উচিত নহে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুখাদ্য ফলবান বৃক্ষ ও বিষবৃক্ষ একত্র বর্দ্ধিত হয় এবং ভারতের মানুষ উভয়ের মূল্যায়নেই কিছু না বুঝিয়া অগ্রসর হওয়া অভ্যাস করিয়াছে বলিয়া বিষবৃক্ষগুলি যথাকালে উৎপাটিত হইয়া আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় না। অন্য কোন কোন দল আছে যেগুলির আদর্শ বা অভিসন্ধি এতই অতি পুরাতন ও অকেজো যে তাহাদের সভ্য সংখ্যা প্রায় নাই বলিলেই চলে। এই সকল সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের হিতোপদেশপূর্ণ মতবাদ বর্ত্তমান কালে অচল বলিয়া এই দলগুলির সাহায্যে কাহারও কোন উপকার হওয়া সম্ভব হয় না। যে দলগুলি চলিতে পারে সেগুলি পরিচালকদিগের গুণে শীঘ্রই ষড়যন্ত্রের আখড়াতে পরিণত হইয়া দাঁড়ায়। অতি উত্তম যাহা তাহাও এই সকল স্বার্থসিদ্ধিতৎপর পেশাদার রাজনীতিক্ষেত্রের পাণ্ডাদিগের হস্তে পড়িয়া নিম্নস্তরের কারসাজিতে পরিণত হয়। মানুষের নীচতা এমনি জিনিস যে তাহার স্পর্শে স্বর্গের পারিজাতও বিছুটির পাতায় পর্য্যবসিত হয়। মোটামুটি রাষ্ট্রীয় দলগুলি জাতি বা সমাজের কোনও কাজেই লাগে না। দলের লোকেদের কিছু কিছু লাভের ব্যবস্থা, জাতিবন্ধু ভাই বেরাদারির পোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি চলিতেই থাকে এবং এই কুরীতি প্রচলনের ফলে শাসন যন্ত্র ক্রমশঃ বিকল হইতে বিকলতর হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় দলগুলির ত এই অবস্থা। দলের বাহিরে যে সকল গণ্ডিও গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়া শাসন যন্ত্রকে আরও অচল করিয়া তুলিতে থাকে সেই সকল চোর, ডাকাত, গুণ্ডা লুঠেড়া, মাল গাড়ীর সিলতোড়, কালোবাজারের পাইকার প্রভৃতিদিগের আবির্ভাবে রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ আরই দুর্নীতির চাপে নিষ্পেষিত হইতে আরম্ভ করে। ইহাদিগের উপস্থিতির আড়ালে অনেক তথাকথিত চরম পন্থী রাষ্ট্রীয় দলের সু-কু বিচারে অক্ষম যোদ্ধারা মেয়েদের গলার হার, পেট্রোল দোকানের নগদ বিক্রয়ের টাকা প্রভৃতি ছিনাইয়া নিজেদের আদর্শবাদী জীবন যাত্রার পাথের সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। চোরাই মাল, লুঠের আমদানী, বেয়াইনীভাবে উৎপন্ন ও সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী আজকালকার বাজারের লাভের ব্যবসার ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু নিচয়। এই জাতীয় ব্যবসায়ে বড় বড় কারবারীগণ জড়িত থাকে ও তাহাদের অর্থসম্পদ অগাধ; কেননা ঐ জাতীয় ব্যবসায়ে রাজস্ব দিবার প্রয়োজন থাকে না বলিলেই চলে। সুতরাং বেয়াইনী কার্য্য-কলাপে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাদারগণের পিছনে দলবদ্ধভাবে থাকে অপরাধীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার লুণ্ঠন কার্য্যে বিশেষজ্ঞ যাহারা। এই সকল দল, রাষ্ট্রীয় দল ও সাধারণ অপরাধীদিগের দল; মিলিতভাবে সংখ্যায় একটা বিরাট সৈন্য-বাহিনীর সমতুল্য। দুষ্কর্ম্মে ইহারা অতুল্য।

কলিকাতার মহাক্রীড়াঙ্গন পরিকল্পনা

কলিকাতার দর্শকদিগের সুখ-সুবিধার জন্য একটা বিরাট ক্রীড়াঙ্গন নির্ম্মাণ করা হইবে যেখানে ৮৫০ৰ০ হাজার দর্শক আরামে বসিয়া খেলা দেখিতে পারিবেন। এই ক্রীড়াকেন্দ্র বা "স্টেডিয়ামে" একাধারে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি খেলার ব্যবস্থা থাকিবে। তদুপরি থাকিবে সন্তরণ, বাস্কেটবল, ভলিবল, জিমন্যাষ্টিক, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি ও অপরাপর ক্রীড়ার ব্যবস্থা। গভর্ণমেন্ট মনস্থ করিয়াছেন তাঁহারা তিন কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ঐ মহাক্রীড়াঙ্গন নির্ম্মাণ ব্যবস্থা করিবেন। এখন যেখানে ক্রিকেট খেলা হয়, ইডেন গার্ডেনের সেই স্থলে বড় করিয়া স্টেডিয়াম নির্ম্মাণ করা হইবে। সেই স্টেডিয়ামে

জুলাই মাসের পরে আর ফুটবল খেলা হইবে না; কারণ ক্রিকেটের ব্যবস্থা একবার করিলে সেই জমিতে ফুটবল খেলা চলিতে পারে না ইত্যাদি। এই হাম ক্রীড়াঙ্গনের পরিকল্পনা সরকারী দিক দিয়া এই কারণে উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে যে ইহাতে সকল ক্রীড়া ব্যবস্থা এককালীন হইয়া যাইবে ও সরকারী কর্ম্মচারী-গণ সকল ক্রীড়ার উপর তাঁহাদিগের নিয়ন্ত্রণরীতি প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু জুলাই মাসের পর ফুটবল খেলা অনেক সময়ই হইয়া থাকে এবং বৃহৎ বৃহৎ ফুটবল অনুষ্ঠানও আগষ্ট—সেপ্টেম্বর—অক্টোবরে হইতে পারে। তখন যদি তাহার জন্ত অপর ক্রীড়াঙ্গন ব্যবস্থিত করা হয় তাহা হইলে সেই ক্রীড়াঙ্গনই সকল সময়ে শুধু ফুটবলের জন্তই রক্ষিত হইতে পারে এবং তাহাতে ক্রিকেট খেলার সহিত ফুট-বলের দ্বন্দ্ব ঘটিত হয় না। তাহা ছাড়া একটি সুবৃহৎ ৮৫০০০ দর্শকের উপযুক্ত স্টেডিয়ামে বাস্কেটবল,ভলিবল, সন্তরণ, কুস্তি বা মুষ্টিযুদ্ধ করাইবার কোনও আবশুক হয় না। এই সকল ব্যবস্থা যে সকল পুষ্করিণী আছে সেখানেই হইতে পারে এবং একটি ক্ষুদ্র স্টেডিয়াম যদি নির্ম্মাণ করা হয় যাহাতে কুড়ি-পঁচিশ হাজার লোক বসিতে পারে তাহাতে ভলিবল, বাস্কেটবল, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি প্রভৃতি হইতে পারে। ইহাতে কপাটি খেলার ব্যবস্থাও হইতে পারে। এই স্টেডিয়াম চৌরঙ্গীর উপরেও হইতে পারে। ফুটবলের স্টেডিয়াম হইতে পারে বর্ত্তমান মোহনবাগানের খেলার মাঠে অথবা ক্রিকেট মাঠের দক্ষিণে পিঠোপিঠিভাবে এবং রাস্তাটিকে মোহনবাগান—ক্যালকাটা ক্লাব ক্রীড়াক্ষেত্রের দিক দিয়া ঘুরাইয়া দিয়া। এইরূপ করিলে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলকে কোন খেসারত দিতে হয় না ও কিছু টাকা ঋণ দিলেই তাহা গঠিত হইয়া যাইতে পারে। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকেও কিছু টাকা ঋণ দিলে তাহারাও নিজের স্টেডিয়াম নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারে। গভর্ণমেন্ট তিন কোটি টাকা ব্যয় করিলে তাহাতে বাৎসরিক সুদ ও নিয়ন্ত্রন ব্যয় (ওভার হেড) হইবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। অত টাকা ব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ গভর্ণমেন্ট যতটা নিয়ন্ত্রন করিবার অধিকার পাইতে চাহেন তাহা পাওয়া সহজ হইবে না। "পলিটিক্সের" ধাক্কায় সরকারের জনপ্রিয়তার হানী হইবে। হয়ত বা ফুটবলে সি, পি, এম, ইলেভ্ন্ গঠিত হইয়া অপরাপর রাষ্ট্রীয় ফুটবল ইলেভেনের সহিত ক্রীড়াঙ্গনের বাহিরে ঘড়ির কাঁটা না দেখিয়া প্রতিযোগিতায় লাগিয়া যাইবে। ফলে খুনাখুন বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং গভর্ণমেন্টের খেলার মাঠে না নামিলেই সকলের মঙ্গল। আমরা যতটা জানি ক্রিকেট ও ফুটবলের বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকগণ অনায়াসেই নিজ নিজ স্টেডিয়াম নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারেন। এবং তাহাই হওয়া উচিত। খেলাধুলায় সরকারী সাহায্য সর্ব্বদাই প্রার্থনীয় কিন্তু আমলাতন্ত্র কদাপি বাঞ্ছনীয় হইবে না। এই কথা মনে রাখিয়া চলা আবশুক। সরকারী প্রচেষ্টা বাংলার অপরাপর স্থলে হইলে প্রদেশে ক্রীড়ার উন্নতি অধিক হইবে।
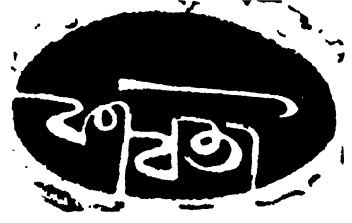
অহল্যা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

শুনিয়াছি পুরাণে ও ইতিহাসে লেখা আছে অনেক রূপকথা !
কার রূপ ? কার কথা ? নাম কেন রূপকথা
অর্থাৎ বুঝি রমণীরই রূপের কাহিনী ?

সতীসীতা শকুন্তলা সংযুক্তা পদ্মিনী
হেলেন ও ক্লিয়োপেট্রা মেহের উন্নিসা
সকলেই রূপবতী রাজরাণী রাজার নন্দিনী
ঘটিল বিগ্রহ যুদ্ধ মৃত্যু হত্যা পরাজয়
ইতিহাসে আছে বিবরণী।

অহল্যা তুমিও ছিলে অসামান্য রূপবতী
শকুন্তলারই মত। (যদিও রাজকন্যা নয়)
রূপে যার দুষ্মন্ত রাজাও ভোলে (ইন্দ্রের মতই)
(আর তোমারি মতন) তাকেও ভোলায়।
অনেক কাহিনী। কিন্তু কে ছিল কুমারী মেয়ে,—
তুমি তা নও তো!

তোমার যে পিতা আর মাতা কারা ছিল সেই বনে
গোত্র কুল বংশ দেশ কিছু লেখা নেই রামায়ণে।
মোরা মনে ভাবি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে তুমি রুক্ষচুল বল্কল বসনে
ঘুরিয়া বেড়াতে তপোবনে—
সঙ্গী তব গোবৎস হরিণশিশু পশুপাখী ফুল গাছপালা।
রৌদ্রের মতন রং গলা-সোনা-ঢালা,
পুড়ে যায় নিক সূর্য তাপে।
বয়স থমকি' থেমেছিল বাল্য কৈশোরের মাঝ ধাপে।

অকস্মাৎ দীর্ঘ শ্মশ্রু জটাজুটধারী আসেন গৌতম মুনি বনে।
কেউ জানে না বয়স।
মুগ্ধ চোখে দেখিয়া তোমায় গুরুজনে ডাকে,

বলে, সম্প্রদান কর এই কন্যারে আমাকে।
এলো না শিবিকা-রথ কিংবা অধিবাস সজ্জা অলঙ্কার,
উত্তরী-দুকুলবস্ত্র-অলক্ত-চন্দন-রমণীয় রমণীর দ্রব্য প্রসাধন।
রক্ত কমলের মত দুটি পায়ে মাড়াইয়া কাঁটাভরা বন,
এক তপোবন থেকে আর এক তপোবনে আসিলে এবার।

মুনির কুটির হয় নিকাতে সাজাতে। বল্কল গুছাতে।
রাঁধিতে নীবার।
কতদিনে কোলে আসে শিশুপুত্র নিয়ে তারে
বনে বনে ফিরে সংগ্রহ করিতে যজ্ঞ সমিধ্ সম্ভার।

সহসা একদা সাঁঝে ডাকেন গৌতম মুনি প্রিয়ে
রাজপুত্র অতিথি এসেছে এক কুটীরে আজিকে করিও সৎকার
যথারীতি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে।
আমি যাই কর্ম শেষে ফিরিব আবার।

কমণ্ডলুভরা জল আসন আনিলে। সন্ধ্যা নামিতেছে বনে-বনে।
অতিথি তোমায় দেখে বিমুগ্ধ নয়নে।
কূলে জমে আছে রাত্রি।
সপ্তমীর চন্দ্রকণা ঘিরে যেন তনুখানি রহিয়াছে থেমে।
অধরে কপোলে রক্তিম প্রত্যূষ আসিয়াছে নেমে।
পরিধানে জীর্ণ খাটো বল্কলের বাস।
নয়ন ফিরে না অতিথির।
বলিল সে এতরূপ এ অরণ্যে ধূলিম্লান কুটিরে মুনির।

নির্বোধ হরিণনেত্র মেলে অতিথির মুখপানে চাহি,
কপোলে নয়নে জেগে উঠিল সরম।
রূপ ? একথা তো কোনদিন কেহ বলে নাই।
পতিও তো বলেন নি—মহর্ষি গৌতম।
রূপ কারে বলে ? আপনারে দেখেছে সে শুধু মুকুরে নদীর।
রূপ কারে বলে ? মূঢ় নারী হেরে বাকল জড়ানো তনু আপন
শরীর।
অতিথি কহিল দেবী—আমি দেবরাজ।
ও দেহে কি শোভা পায় বল্কলের সাজ।
স্বর্ণসূত্রে গাঁথা মোর উত্তরীয়খানি
নিয়ে ঢাকো তনুখানি, তাহারি গুণ্ঠন শিরে অঙ্গে দাও টানি।
সাধ হয় রাজার ভাণ্ডার

তোমার ও অঙ্গে দিই করিয়া উজাড়।
এ রূপ স্বর্গেও নাই। নন্দনের রূপরাশি তপস্বীর হোমানলে, হায়!
দিনে দিনে ভস্ম হয়ে যায়।
আপনার কণ্ঠ হতে রত্ন হার নিয়ে রাখে নারী পায়।
* * * *

রাত্রি হয়ে এলো শেষ। বনভূমে মর্ মর্ জাগে পদধ্বনি।
'করেছ সৎকার প্রিয়ে রাজ-অতিথির'-শুধালেন মুনি।
নীরব কুটীর মাঝে মাটিতে মিশায় লাজে নারী আতঙ্কে পাথর।
কোথা রাজা কোথা রাজবেশ।
অভিশপ্ত দেবেন্দ্রের পলাতক ক্লেদময় প্রেতছায়া
মিলাইল কুটীরের পিছে বনভূমি পর।

রাত্রি শেষ অন্ধকারে তপোবনে কুটীরের তলে
দাঁড়ায়ে রহিল এক মূর্ত্তিমতী গ্লানি।
ভস্মীভূত রূপতনু!
অহল্যা হয়েছে পাষাণী!
স্তব্ধ-বনভূমি শিশুপুত্র লয়ে মুনি যান তীর্থপথে।
* * * *

অহল্যা দাঁড়ায় প্রাতে প্রত্যুষের কুয়াশার সম,
ভাবে যদি ফিরে আসেন গৌতম।
আবার সরমে ভয়ে কুটীরে লুকায়।
অহল্যা দাঁড়ায় রাতে রাত্রি শেষ জ্যোৎস্নার প্রায়।
যদি পুত্র আসে মা বলিয়া দুবাহু বাড়ায়।
অহল্যা দাঁড়ায় দুপহরে পাদ্য অর্ঘ্য হাতে। রৌদ্রময় নির্মম বনভূমি।
যদি ফিরে তপঃক্লান্ত মুনি।
অহল্যা লুকায়ে রয় সাঁঝে, জ্বালে না প্রদীপ ত্রাসে,
যদি আসে সেই ধূর্ত্ত শঠ। দেবেন্দ্র কপট।
আসে যায় বসন্ত শরৎ শীত বরষা নিদাঘ,
কখনো পাষাণ ফাটে কভু গায়ে জাগে শৈবালের দাগ।
গেছে গেছে ত্রেতা ও দ্বাপর
উড়াইয়া শতাব্দীর পাতা যুগ যুগান্তর।
* * * *

অহল্যা দাঁড়ায়ে আছে চিরকাল পৃথিবীর পথে জানি।
অহল্যা পাষাণী।
শুনিবারে শ্রীরামের বাণী।
যে বলিবে তুমি কন্যা। তুমি সতী। তুমি মাতা ধাত্রী ও ধারিণী।
তুমি নারী বুকে তব পৃথিবীর প্রাণ-মন্দাকিনী।

কখনো কি আসিবেন রাম।
পাষান ভাঙিয়া হবে কুটি কুটি।
বাহিরি আসিবে নারী। পাষাণে জাগিবে প্রাণ।
শ্রদ্ধা প্রেম করুণার স্পর্শে তার মুক্ত শুদ্ধ শুচি।

সমাজবাদের পথ কি এই ?

অশোক চট্টোপাধ্যায়

সমাজবাদের মূল অনুপ্রেরণা হইল সর্ব্বজনের মঙ্গল ও হিতসাধন। অর্থাৎ সমাজের সকল ব্যক্তি যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন নির্বাহ করিতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতে পারিলে সমাজবাদের উদ্দেশ্য সুসাধিত হইতে পারে। এই বিষয়টার যথাযথ নিষ্পত্তি করিতে যাইলে বহু প্রকারের অন্তরায়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সকল অন্তরায়ের মধ্যে সাধারণের মধ্যে যেগুলি লইয়া আন্দোলন ও বিক্ষোভ জাগাইবার চেষ্টা সদাসর্ব্বদা করা হইয়া থাকে সেগুলি হইল উপার্জ্জন ও ধনসম্পত্তি আহরণের ক্ষেত্রে কাহারও বেশী কাহারও কম এই অবস্থা, পদমর্য্যাদার ইতর বিশেষ, অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিভাগ, নানাপ্রকার সুবিধা প্রাপ্তিতে কাহারো অধিক ও কাহারো অল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটামুটি বলিতে হয় যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্যের অভাব ও তজ্জাত অধিকার অনধিকারের প্রাদুর্ভাব লইয়াই সমাজের অধিক মানুষ মাথা ঘামাইয়া থাকেন এবং কথায়, লেখায়, সঙ্গীতে, নাট্যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের দাবী প্রবলভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই সকল প্রচার কার্য্য বৃহৎ বৃহৎ মিছিল বাহির করিয়া যখন করা হয় তখন অনেক সময় যানবাহন ও লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়া অনেক রুগীর চিকিৎসক পৌছায় না; আসন্ন প্রসবা নারীদের কেহ কেহ যথাকালে হাসপাতালে পৌছাইতে সক্ষম হ'ন না, মাল কেনা বেচাতে বাধা পড়ে, ছাত্রদিগের পাঠের ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ সাধারণভাবে সমাজের মঙ্গল ও জনহিতের পথে ঐ মিছিল একটা মহাঅন্তরায় রূপেই প্রকট হইয়া দেখা দেয়। অনেক সময় অধিক বেতন বা বোনাস আদায়ের জন্য হরতাল করিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে বহু লোকের তাহার ফলে খাওয়া বন্ধ হয় ও অন্যান্য নানাভাবে জীবন যাত্রায় বাধার সৃষ্টি হয়। জলবন্ধ, গ্যাস বিদ্যুৎ বন্ধ, বাজার বন্ধ, গাড়ী চলাচল বন্ধ, স্কুল-কলেজ বন্ধ; শুধু পদব্রজে যাহারা চলেন অথবা যে সকল বালকগণ রাস্তায় ক্রিকেট-ফুটবল খেলে তাহারাই স্বাধীনভাবে বিচরণক্ষম থাকেন। এই যে অবস্থা যাহার নাম আজকাল "বন্ধ" ইহা দ্বারা কোনো মানুষের কোনো মঙ্গল বা হিত হইতে পারে প্রমাণ করা অতি সুকঠিন। বরঞ্চ এই কথাই প্রকটভাবে প্রমাণ হয় যে "বন্ধ"গুলি সর্ব্বভাবেই জনহিত বিপরীত ও সাধারণের মঙ্গলনাশের কারণ। শুধু যাঁহারা "বন্ধ" করিবার আদেশ দিয়া সর্ব্বজনকে নিঃশব্দে সকল কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করিতে বাধ্য করাইয়া থাকেন শুধু, তাঁহাদেরই প্রাণে "বন্ধের সফলতা হইতে আত্মপ্রসাদ বোধ জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের অহংকারকে পুষ্ট ও প্রবল করিয়া তোলে। কাহারও প্রাণে অহংকার সতেজ হইয়া উঠা কোন জনহিত বা মঙ্গলের কথা নহে। কারণ অহংকার জিনিসটা ভাল জিনিস নহে। এক ব্যক্তির অথবা এক দলের বহু ব্যক্তির অন্তরের অহংবোধ যতটা দমন করিয়া রাখা যায় তাহাদের নিজেদের পক্ষে অথবা অপরাপর লোকের পক্ষে ততই উহা মঙ্গলকর হইয়া থাকে। এই অহংবোধ ও তাহা হইতে উদ্ভূত যেন তেন প্রকারে অপর লোকের উপর প্রভুত্ব বিস্তার চেষ্টা

করিবার অদম্য আগ্রহ পৃথিবীর বহু অমঙ্গলের মূল কারণ। ইহা হইতে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনখারাপি প্রভৃতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ঘটিয়া আসিতেছে। অহংকারের মূলে যদি ব্যক্তিগত প্রাধান্য অথবা ধর্ম্ম ও আদর্শগত শক্তি প্রতিষ্ঠার কথা থাকে তাহা হইলে ব্যক্তি যতই গুণী ও প্রতিভাবান হউন না কেন অথবা ধর্ম্ম ও আদর্শ যতই মহান হউক না কেন, তাহা হইতে উদ্ভূত অহংকার কথনই কোনও ভাবে মানব উন্নতির কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং যত রাষ্ট্রীয় দল আছে তাহার নেতাগণ দলের প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে অনেকগুলিই মানবতা, সভ্যতা, জনমঙ্গল ও সমাজহিত বিরুদ্ধ।

উপরোক্ত কথাগুলি যে বিষয় লইয়া বলা হইল সে বিষয়টি বড় কথার অন্তর্গত বলা যায়, কারণ রাষ্ট্রীয় দলের বৃহৎ নেতা ও তাঁহাদের ক্ষুদ্র অনুচরদিগের কার্য্য-কলাপ এমনই জিনিস যে তাহা হইতে রাষ্ট্রগঠন, রাষ্ট্র-খতম, মন্ত্রীত্ব লাভ বা মন্ত্রীত্ব হারান, এই জাতীয় কথাই ক্রমাগত উঠিতে থাকে। কিন্তু অপরাপর বহু ছোট ছোট কার্য্য, ব্যবহার, বদঅভ্যাস, নোংরামী, প্রবঞ্চনা। পরস্বঅপহরণ, অসভ্যতা, বর্ব্বরতা প্রভৃতি আছে যেগুলি উচ্চাঙ্গের কথা নয় কিন্তু সক্রিয়ভাবে সর্ব্বজনের অমঙ্গ-লের, অসুবিধার ও কষ্টের কারণ বলিয়া দেখা দেয়। এই জাতীয় কার্য্য যাঁহারা করেন তাঁহারা অনেকেই অতি সবলভাবে সমাজবাদী। ব্যক্তির অধিকার প্রায় তাঁহারা মানেনইনা এবং সকল কথাতেই তাঁহারা সমষ্টিগত অধিকার, সমাজের প্রাপ্য, জাতির দাবী প্রভৃতি আওড়াইয়া মানুষের ব্যক্তিগত পাওনার কথাটার এমন একটা সহজ সরল হিসাবের ব্যবস্থা করেন; যে হিসাবে যাহাদের কার্য্যের মূল্য সাধারণ মানুষের কার্য্যমূল্যের তুলনায় অনেক অধিক তাহাদের পাওনা কম করিয়া দেখান হয় ও যাহাদের কার্য্য মূল্য কিছুই হইতে পারেনা তাহাদের নানান অজুহাতে বেশী পাওয়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। যাহাদের কিছু নাই বা অতি অল্পই আছে তাহাদের যে জনহিতের আদর্শ অনুসরণে আরও পাওয়াইয়া দেওয়া আবশ্যক ও জাতির উন্নতির জন্য শুধু পাওনা গুণিয়া জীবনধারণের হিসাব করা যে অনুচিত ইত্যাদি আলোচনার অবতারণা করা ন্যায্য স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ কথাগুলি ভুল নহে; তবে মানুষ যেরূপ একদিকে নিক্তির ওজনে নিজের উৎপাদিত যাহা সেই হিসাবেই পাওনা পাইলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়; অপরদিকে তেমনি তাহার একটা যথাসাধ্য অধিক উৎপাদন করিবার বাধ্যতা স্বীকার করিয়া চলা আবশ্যক। এবং জাতির মঙ্গলের জন্য অর্থনীতিবিদ্ যাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য সকল মানুষকে অধিক উৎপাদন করিতে শিখান। এবং প্রয়োজনে সকল মানুষের অধিক উৎপাদন করিবার চেষ্টায় ও যথাসম্ভব জাতি ও সমাজের ক্ষতিকর কার্য্যকলাপ হইতে নিজেদের মুক্ত রাখার। অর্থাৎ সকল ব্যক্তিই যদি যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া জাতীয় উপার্জ্জন বৃদ্ধির জন্য শক্তিনিয়োগ করেন এবং তৎসঙ্গে সেই সকল কার্য্য হইতে বিরত হ'ন যাহাতে জনসাধারণের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে; তাহা হইলে সমাজের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যাহা দেখা যায় তাহাতে সকল কর্ম্মী প্রাণপাণ চেষ্টা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেছেন তাহা কোথাওই দেখা যায় না এবং যে সকল সমাজের ক্ষতিকর কার্য্য হইতে সকলের বিরত থাকা উচিত অধিকাংশ মানুষই সেই সকল কার্য্য করিয়াই চলিতে থাকেন। ফলে উন্নতির আশা ক্রমে সুদূরে চলিয়া যায় এবং মঙ্গল ও হিতের কথা শুধু বাক্যেই থাকিয়া যায়।

অতি সাধারণ যে সকল কথা সেগুলিও কাহাকেও বুঝান যায় না। যত্রতত্র নিষ্টিবন ত্যাগ করিলে নানা প্রকার ব্যাধি সমাজে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটে এবং আর্থিক ক্ষতিও হয় প্রচুর। কিন্তু ঐ বদভ্যাস ত্যাগ করাইতে কি পারিবে বলিয়া মনে হয়? সমাজবাদ ও সমষ্টিগত বহু অধি-কারের কথা যাঁহারা ক্রমাগতই বলিয়া চলেন থুৎকারের প্রতিযোগিতায় তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান স্থানগুলি অধিকার

করিয়া থাকেন। পানপাত্র পেয়ালা প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া না ধুইয়া অপরকে ব্যবহার করিতে দেওয়া আর একটি মানুষ মারার কল। এইভাবে অপরিষ্কার পাত্রাদি ব্যবহার শুধু কলিকাতাতেই দুই হাজার চা, শরবত খাবারের দোকানে করা হইয়া থাকে। ফলে কত লোক মরে, শয্যাশায়ী হয়, চিকিৎসা করাইতে গিয়া ঋণগ্রস্থ হয় এবং কার্য্যে অক্ষম হইয়া উৎপাদন বন্ধ করিতে বাধ্য হয়; এই সকলের হিসাব কে রাখে? যদি বলা যায় যে এক কোটি মানুষের বদ্‌অভ্যাসের ফলে একশত লোকের প্রাণ যায়, এক সহস্র লোক কষ্ট ভোগ করিয়া সর্ব্বহারা হইয়া যায়, দশ সহস্র মানুষ অল্প বিস্তর বেকার হয় ও মোট জাতীয় লোকসান দশ কোটি টাকা হয়; যাহা একটা বিশ্ববিদ্যালয় চালাইবার খরচের সমতুল্য তাহা হইলে সেই হিসাবটা মোটামুটি একপ্রকার ঠিকই হয়। পঞ্চাশ কোটি মানুষের নিষ্টিবন ত্যাগ ও অপরিষ্কার পাত্রে খাদ্য পানীয় গ্রহণের বাৎসরিক ব্যয় তাহা পাঁচশত কোটি—ধার্য্য হয়।

ভারতের এক একটি বৃহৎ সহরে প্রত্যহ কয়লার উনুন ধরান হয় কয়েক সহস্র, যন্ত্রপাতি পরিষ্কার না রাখিয়া যন্ত্রযান চালাইয়া রাজপথে ধোঁয়া ছাড়া হয় আরও বহু সহস্র চুল্লির সমান। সিগারেট ও বিড়ির ধোঁয়াও শত চিমনি বরাবর। এই সকল কিছু মিলিত ভাবে যে ধূম্রলোক সৃষ্টি করে তাহাতে কতশত মানুষের যক্ষাকাশ, ক্যানসার, হাঁফানি প্রভৃতি রোগ হয় ও ফলে সমাজের কি লোকসান ঘটে তাহার হিসাব কেহ করে কি? যদি করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে নিবারণ করা যায় অথচ করা হয় না এইরূপভাবে ধোঁয়ার সৃষ্টি ভারতে যাহা হয় তাহা হইতেও বাৎসরিক লোকসান প্রায় ঐ পাঁচশত কোটি টাকাই হইতে পারে।

ইহার পর আছে সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা ও পচনশীল দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করার অভ্যাস। ইহা দ্বারা মাছি ও পোকা জড় হয় ও তাহার ফলে ব্যাধি সংক্রমণ অবাধে বিস্তার পাইয়া থাকে। টিনের ভিতর ময়লা ফেলা ও [illegible] লইয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয় না বলিয়া বহুলোক যোগভোগ করে। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যহ কাজে যাইতে অক্ষম হয় এবং স্কুল কলেজে যাওয়াও অনেকের বন্ধ হয়। আর্থিক হিসাব করিলে মাছি মশা কীটের প্রাদুর্ভাবে জাতির যত লোকসান হয় তাহা অল্প টাকা হইবে না। বাৎসরিক সহস্র কোটি টাকা ক্ষতি হয় বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। আমাদের জাতীয় বাৎসরিক আয় যদি ২০।২৫ হাজার কোটি টাকা হয়; তাহা হইলে জনসাধারণের নানা প্রকার সহজ নিবার্য্য বদঅভ্যাস হইতে ঐ মোট উপার্জ্জন শতকরা দশ টাকা, অর্থাৎ মোট ২৷২৷৷০ হাজার কোটি টাকা কম হয় বলা যাইতে পারে। এই টাকাটা যদি মজুরদিগের বেতনে যোগ করা যায় তাহা হইলে সেই বেতন বৃদ্ধি হিসাবে শতকরা ২০।২৫ টাকা দাঁড়ায়। ইহা করিতে একটা জাতীয় আন্দোলন প্রয়োজন হয়; কিন্তু সে কার্য্য কেহ করিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ; আমরা দেখিতে পাই যে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া নিজ অভ্যাস ভাল করা বড়ই কষ্টকর বিষয়। তাহা করিতে কেহ চাহে না। চাহে অপরের দোষ দেখিতে ও অপরে অত্যাচার করিতেছে ইহাই প্রমাণ করিতে। নতুবা এই দেশে যে অর্থ মদ্যপান, জুয়াখেলা ও চরিত্রহীনতায় ব্যয় করা হয় এবং যে অর্থ চুরী, ইচ্ছাকৃত অন্যায় ও লুঠপাটে নষ্ট হয় তাহার মোট পরিমাণও মানুষের রোজগারের একটি বড় অংশই হইবে বলিয়া মনে হয়। নিজেদের অভ্যাস ও স্বভাব সংস্কৃতির দ্বারা বহুলাংশে আর্থিক উন্নতি সম্ভব কিন্তু তাহার চেষ্টা কেহ করে না। দাবী করা ও তাহা লইয়া হাল্লা হাঙ্গামা করাই সকলে অধিক বাঞ্ছনীয় ও সুখদায়ক মনে করেন।

আর্থিক হিসাব ছাড়িয়া দিয়া অপর জাতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আলোচনা করিলে কি দেখা যায়? প্রথমে দেখা যায় সবলের দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার। জোরাল যাহারা, ব্যক্তিগত ভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে তাহারা সর্ব্বদাই অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের উপর জুলুম করিবার চেষ্টা করে। ইহার সহিত আর্থিক প্রাচুর্য্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না; যদিও [illegible] করিয়া

টাকা আদায় চেষ্টা করা হয় অনেক সময়েই। এই যে জুলুম সহ্য করা ইহা একটা চরম কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করে। মানুষে টাকা দিয়া অনেক সময় জুলুম হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করে। এই সকলের অত্যাচার শুধু গায়ের জোরের সবলতার ভিতরেই থাকে এমন নহে। যাহাদের যেখানে যে প্রকার শক্তি আছে সেই শক্তি ব্যবহার করিয়া অপরের উপর চাপের সৃষ্টি করা নানা প্রকারেই হইয়া থাকে। রেলের টিকিট কিনিতে যাইলে টিকিট বিক্রেতার জুলুম কোনও দফতরে গমন করিয়া কোন কিছু করাইবার চেষ্টা করিলেই কষ্টভোগ। পাসপোর্ট- ইনকামট্যাক্স, ট্রেজারীতে টাকা জমা আদালতে কোনকিছু লইয়া যাইলে সেখানের কর্ম্মচারী-দের হস্তে নাজেহাল হওয়া, মানিঅর্ডার পাঠান, বাসে ওঠা, ট্যাক্সি পাওয়া, ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট কিনিতে পারা—যেখানে যাহাই করিতে কেহ যায় সেখানেই প্রতিপত্তি, অবস্থাগত আভিজাত্য, গায়ের জোর কিম্বা দলভারি থাকার আবশ্যকতা। সাধারণ মানুষের পক্ষে সসম্মানে ও স্বচ্ছন্দ্যে দিন কাটান প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে।

যদি কৃষ্টির ক্ষেত্রে যাওয়া যায় তাহা হইলে সেখানেও মানুষ সুস্থ শান্তমনে পরিচিত পথে চলিতে সক্ষম হয় না। রসঅনুভূতির স্বাভাবিক সুস্বাদ রক্ষা করা আর সে ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। আধুনিক, অতি আধুনিক, চুড়ান্ত নূতন ও কষ্ট কল্পনার চরম অভিব্যক্তি যে সৃজন কার্য্যে প্রতিফলিত তাহাউপভোগ করা এক মহা দুর্ভোগ। সে সুর, সে ভাষা, সে ছন্দ ও সেই কাব্য শুধু সেই বর্ণ ও রেখার সহিত তুলনীয়। যাঁহারা অল্পমূল্যে সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত, নৃত্য বা চিত্রকলা সম্ভোগ চেষ্টা করেন তাঁহারা আজ কষ্ট উপভোগ্য দুষ্পাচ্য, দুর্ব্বোধ্য রসের তিক্ত কষায় প্রবাহে পড়িয়া কোনমতে প্রাণরক্ষা করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিলে নিজেকের পরম সৌভাগ্য মনে করেন। চিন্তার ক্ষেত্রে যে সকল তথাকথিত তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, তাহার ব্যাখ্যা ও তজ্জাত সমস্যা সংকট সাধারণ মানুষের আজকাল মাথা খারাপ করিয়া তোলে তাহা যারা বাস্তব জীবনের কোনও সমস্যার সম্যক সমাধান হয় বলিয়া মনে হয় না। যেখানে দার্শনিক বিচার হয় নাই বা হইতে পারে না সেখানে কথার জাল বুনিয়া গভীর অনুসন্ধানের বাহ্যিক লক্ষণ সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনে ভুল ধারণা গঠন করিয়া তোলার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? অন্যায় ও পাপের সাফাই গাহিবার জন্য যেরূপ মিথ্যা তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয় এও প্রায় সেই ভাবেই বড় বড় কথা বলিয়া ছোট ছোট কাজ করিবার ব্যবস্থা। সুসংযত চিন্তার বিনাশ সাধন করিয়া এই ভাবে মানব মনের স্বাভাবিক গতিরুদ্ধ করিয়া মানুষকে মানসিক ক্ষেত্রে বিপন্ন ও অসহায় করা হয়। যাঁহারা মনের উচ্চস্তরে বিচরণে অভ্যস্ত এবং পরিণত চিন্তার ভিতরেই মনের খোরাক আহরণ করিয়া লইতে অভ্যস্ত তাঁহারা এই ছদ্মবেশী কূট মতলব সিদ্ধির চক্রান্তে জড়িত হইয়া পড়িলে গভীর অশান্তিতে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মানসিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সুচিন্তার সরল পথে চলিলেই সাধিত হইতে পারে। সমাজের অধিকাংশ মানুষ এইজাতীয় কূট অভিপ্রায়ভিত্তিক দর্শন আলোচনায় জর্জ্জরিত হইয়া মানসিক ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই কষ্ট দুর্ব্বিসহ এবং ইহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা সকলের কর্ত্তব্য। অন্তত চেষ্টা করিয়া যাহারা জনগণের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে ভ্রান্ত ধারণায় নিমগ্ন করিতে চাহেন; তাহারা জনহিতবিরুদ্ধতার অপরাধে অপরাধী এবং আমরা তাহাদের শাস্তি দিবার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করি। অবশ্য আইনত অর্থহীন মতলববাজি সিদ্ধি চেষ্টার বিতণ্ডা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যদিও মানুষকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিভ্রান্তির পথে চালাইবার চেষ্টা অতিবড় অন্যায় ও তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মানবীয় বহুগুণই খর্ব্ব হইয়া তাহাকে হীনতায় নিমজ্জিত করে। আর্থিক ভাবে মানুষকে নীচে নামাইয়া দেওয়া যদি অন্যায় ও সমাজবাদ বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে যাহারা মানুষকে পুতুল নাচানর পুত্তলিকায় পরিণত করিবার চেষ্টা করে তাহারা অপরাধী বিবেচিত হইবে না কেন?

তাহা হইলে সকল কথা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে সমাজবাদ ও জাতির সমষ্টিগত অধিকার লইয়া যাহারা অধিক বাকবিতণ্ডা, হট্টগোল ও বজ্রগর্জ্জন করিয়া থাকেন তাঁহারাই আবার নিজেদের ব্যবহারে ও কার্য্যকলাপে জনমঙ্গল ও গণহিতের আদর্শ বিনাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপে লক্ষ লক্ষ মানুষ হৃত স্বাস্থ্য ও মানসিক বিভ্রান্তিগ্রস্থ হইয়া শুধু যে উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহা নহে, তাহারা নিজেদের মানবীয় গুণাবলী যথাযথভাবে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে না পারিয়া, ভুল শিক্ষা ও মিথ্যা অপপ্রচারের ধাক্কায় অবনতির নিম্নতম স্তরে গিয়া পড়িয়া থাকে এবং ফলে মানুষের মনুষ্যত্বের গঠন ও পূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয়। শেকস্‌পীয়র বলিয়াছিলেন যে মানুষের টাকার থলিতে হস্তক্ষেপ করা তাহার ততটা ক্ষতি করা নহে, যতটা ক্ষতি করা হয় তাহার সুনাম ও যশের উপর আক্রমণ করিলে। সুতরাং মানুষকে যদি কেহ অমানুষ বা অল্পবুদ্ধি করিয়া তুলিবার কারণ সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সে মানুষের অতিবড় শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। সত্য ও সুচিন্তার উপর মানুষের মন যদি গড়িয়া উঠিতে পারে তাহাই হইবে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের উপায়। অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়াইয়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকিতে বাধ্য করিলে নরদেহ যেরূপ বিকৃতরূপ ধারণ করে ; চিন্তার ক্ষেত্রেও সেইরূপ ভুল শিক্ষা ও ভ্রান্তপ্রচার মানুষকে নীচে নামাইয়া দেয়। দেহমনের উপর আক্রমণ সহ্য করিয়া মানুষ আর ধর্ম্মেতে ধীর, কর্ম্মেতে বীর ও উন্নত শির থাকিতে পারে না।

বলা যাইতে পারে যে শোষিত মানুষকে শোষণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে প্রবল আন্দোলন ও প্রচারের আস্ফালন ব্যতীত তাহা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বহু দেশে শোষণ দমন সুসাধিত হইয়াছে দেখা যায় ; যদিও সেই সকল দেশে কোনও বিপ্লব, বিক্ষোভ বা বিদ্রোহজনক কার্য্য করা হয় নাই। যথা সুইডেন, নরওয়ে, ক্যানাডা, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইৎজারল্যাণ্ড, বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়া। এই সকল দেশের আর্থিক উপার্জ্জনে নিম্নতম স্তরের মানুষ সমাজবাদী দেশের উচ্চতম বেতনের মানুষ অপেক্ষা অধিক আরামে বসবাস শিক্ষালাভ, চিকিৎসিত ও সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইতে সক্ষম। ইহাদের অর্থনীতির অনুসরণ করিলে আমাদের অধিক লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমরা সে পথে না চলিয়া সংযমহীনতাই অবলম্বন করিতে সদা অগ্রসর কেন হই তাহার মূলে আছে আমাদের নেতৃত্বের অপরিণত ভাব। নেতারা যদি কোনও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন চেষ্টা না করিয়া পরের মুখে ঝাল খাইয়া চলা ও চালান অভ্যাস করেন তাহা হইলে ফল কখন লাভের হইতে পারে না। আমাদের প্রয়োজন উপযুক্ত মানুষ খুঁজিয়া বাহির করা যাঁহারা জাতিকে ঠিক পথে চালাইতে পারিবেন।

বিদ্যাসাগর বনাম তর্কবাচস্পতি

মাধব পাল

অসিযুদ্ধের ন্যায় মসিযুদ্ধ রক্তক্ষয়ী লড়াই না হলেও এই যুদ্ধেও প্রতিপক্ষকে আঘাতে জর্জরিত হতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির মধ্যে যে মসীযুদ্ধ হয়েছিল তারও প্রচণ্ডতা কম ছিল না। এ লড়াই দৈহিক শক্তির না হলেও পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানীর শাণিত যুক্তিতে ছিল তীব্র।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা—এতদ বিষয়ক প্রস্তাব' ও 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা—এতদ বিষয়ক বিচার' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছ থেকে তীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হয়। ঐ সমস্ত প্রতিবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ শাস্ত্রসমূহ মন্থন করেছেন তাতে তাঁর "বিদ্যাসাগর" উপাধির সার্থকতাই প্রমাণিত হয়।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছিলেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি সাহিত্য, দর্শন, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা—এতদ বিষয়ক বিচার' পুস্তকের প্রতিবাদ করেন। সেই প্রতিবাদ খণ্ডনে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বনামে ও বেনামে প্রচুর যুক্তি ও শাস্ত্রের অবতারণা করেন। তিনি—'উপযুক্ত ভাইপোস্য' এই ছদ্মনামে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে 'খুড়ো' সম্বোধনে মসি চালনা করেন।

পণ্ডিতবর্গের লড়াই ইতিপূর্ব্বেও হয়েছে। বাদ প্রতিবাদ পরস্পরের প্রতি ভালমন্দ ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এর আগেও পণ্ডিতবর্গের লড়াইতে বর্ষিত হয়েছে। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের শ্রেষ্ঠ নেতা রাজা রামমোহন রায়কেও পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সহিত শাস্ত্র নিয়ে বাদ প্রতিবাদে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। সম্বাদ প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের মধ্যেও মসীযুদ্ধ চলেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত নবজাগরণের প্রথম ও বিখ্যাত কবি, এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য একজন জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাদের পরস্পরের প্রতি আক্রমণ নিজ নিজ সংযমের মাত্রা অতিক্রম করেছিল। কবি ঈশ্বর গুপ্ত—"পাষণ্ডপীড়ন" ও পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর—"রসরাজ" নামে দুইটি পত্রিকায় পরস্পরকে কুৎসাপূর্ণ—কবিতায় আক্রমণে মত্ত হয়েছিলেন। তাদের ভাষার অশালীনতার জন্যই সে সময়ে পাঠক সমাজে চাঞ্চল্য জেগেছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তারানাথ তর্কবাচস্পতির লড়াইয়ে বর্ষিত বিদ্রূপবাণ নিম্নস্তরের ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্রূপের রসিকতায় সেকালের পাঠক মজা পেতো। এবং হেসে অস্থির হতো। কলের জলের পবিত্রতা নিয়ে এই দুই পণ্ডিতের যে বিবাদ ঘটে তার পরিণতি লাভ করে বহু বিবাহের বাদ প্রতিবাদে। জলের কলে চামড়া লাগানো থাকে বলে তর্কবাচস্পতি মশাই কলের জলকে অপবিত্র ঘোষণা করেন। আর বিদ্যাসাগর মহাশয় যুক্তির শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করে কলের জলের পবিত্রতা ঘোষণা করেন।

বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহের বাদ প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উপযুক্ত ভাইপোস্য', কস্যচিৎ

তত্বান্বেষিনঃ, 'উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য' প্রভৃতি ছদ্মনামে —'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি যে সমস্ত পুস্তক রচনা করেন, তাতে যেমন তাঁর জ্ঞানের গভীরতা পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শাণিত আঘাতে তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জর্জরিত করেন। 'ব্রজবিলাস' ও 'রত্নপরীক্ষায়' নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় ও 'যশোহর হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভাও' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছাড়েন নাই। তাঁর রচিত 'লাঠি থাকিলে পড়ে না' এবং পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন লিখিত— 'প্রেরিত তেঁতুল' বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁর বক্তব্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করতেন। তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত প্রত্যুত্তর গুলো ছিল বাংলা ভাষায় রচিত। অতএব তা সহজেই সকলের নিকট বোধগম্য হতো ও হাসির খোরাক জোগাতো। উক্ত রচনাগুলি থেকে বোঝা যায় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর—হাস্যার্ণবও ছিলেন। 'অতি অল্প হইল' রচনায় তিনি ব্যাকরণের অধ্যাপক তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ব্যাকরণে বহু ভুল প্রয়োগ দেখাইয়া তাঁকে বিদ্রুপ করেছেন—

'এতকাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুর।
হতদর্প হৈলে বাচস্পতি বাহাদুর ॥,

নবদ্বীপের পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় যশোহর হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভায়' বক্তৃতাদ্বারা বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রজবিলাস লিখে তার বক্তব্য খণ্ডন করেন। সেই সঙ্গে বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বিদ্রুপে জর্জরিত করেন—

'ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদমস্তক গুণ রতনে মণ্ডিত॥"

*

"সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণপ্রায়।
যেই যে বিধান চায় সেই তাহা পায়॥'

শেষে লিখেছেন—

'খুড়োর গুণের কথা অতি চমৎকার।
এমন গুণের খুড়ো না হেরিব আর॥'

এই সমস্ত ব্যঙ্গ বিদ্রুপে সেকালের পাঠক খুবই মজা পেতো। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রাহী মণীষী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই সমস্ত রসিকতাপূর্ণ বিদ্রুপের প্রশংসা করেছেন।—"এইরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাংলা ভাষায় অল্পই আছে।"

আসামে শরণার্থী শিবির

আসামে পাক সেনাবাহিনীর বর্ব্বরতা হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বহুলোক পলাইয়া আসিয়াছে। ইহার বিষয়ে করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" সাপ্তাহিকে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :

করিমগঞ্জ মহকুমার ৩৫ সহস্রাধিক শরণার্থীকে তিনটি বৃহৎ আধাস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। মহকুমার বিভিন্ন স্কুলগৃহে যে সমস্ত শরণার্থী আশ্রয় নিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশকেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, বাকীদেরও অনতিবিলম্বেই করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থী অধ্যুষিত তিনটি শিবির পরিচালনা করার যথাযথ ব্যবস্থা করা একটি গুরুতর দায়িত্ব সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সঞ্জাত এই গুরুভার মানবিকতার কারণে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভারতের আপামর জনসাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবকে সমর্থন করিয়াছেন, সুকঠিন হইলেও যোগ্যতার সহিত এই দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনকে পালন করিতে হইবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আধাস্থায়ী শিবিরগুলি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অব্যবস্থা ও দুর্নীতির কিছু কিছু অভিযোগ আমাদের কাছে পৌঁছিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শরণার্থীদের জন্য যে দৈনিক বরাদ্দ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা হয়তো পর্য্যাপ্ত নয়, কিন্তু আমরা অভিযোগ পাইয়াছি যে এই নির্দিষ্ট বরাদ্দটুকুও সমস্ত শিবিরে যথাযথভাবে বণ্টিত হইতেছে না। রেশনে যে দ্রব্যাদি পরিবেশিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা অত্যন্ত নীচু মানের এবং মুগ ডালের পরিবর্ত্তে সর্বত্রই নাকি সম্পূর্ণ অন্য একটি বস্তু পরিবেশিত হইতেছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরবরাহকারীদের নিকট হইতে টেণ্ডার গ্রহণ করার সময়ে কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু সামগ্রী পরিবেশন করার নির্দেশই দেওয়া হইয়াছিল। শিবিরবাসীদের সহিত সরকারী কর্মচারীদের মনোমালিন্যের ঘটনা প্রায়ই ঘটিতেছে এবং অশোভন এবং অমানবিক ব্যবহারের অভিযোগও পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি কালীগঞ্জের অস্থায়ী শিবিরে শান্তিভঙ্গের যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার নানান ধরনের ভাষ্য শোনা যাইতেছে, এবং শিবিরবাসীরা এক ধরণের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। এই ঘটনাকে ধামাচাপা না দিয়া প্রকৃত তথ্য নিরূপণের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। অন্য কোন একটি আধাস্থায়ী শিবির সম্পর্কেও অসামাজিক ক্রিয়া কলাপের অভিযোগ উঠিয়াছে এবং জনৈক পদস্থ সরকারী কর্মচারীর নামও এই প্রসঙ্গে শোনা যাইতেছে। এই সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে যে কোন দিন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারে বলিয়া অনেকেই আশংকা করিতেছেন।

মানবতার নামে যাহাদের দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত্রাণ কার্য্যের ব্যাপারে আরো সহৃদয় এবং আন্তরিকতার নীতি গ্রহণের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীদের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছি। শরণার্থীরা বহু দুর্বিপাক মাথায় বহিয়া একান্ত নিরুপায় হইয়া এই বিদেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি আমরা যে দায়িত্ব পালন করিতেছি তাহার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব রহিয়াছে।

ইহা পালনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে মানবতার দরবারে আমরা অপরাধী হইব, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের মর্যাদাহানি ঘটিবে, এই সত্যটি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

শ্রীমতী ইন্দিরার নিন্দাবাদ

"যুগবাণী" সাপ্তাহিক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রখর সমালোচনা করিয়াছেন। পাঠ করিলে মনে হইবে যে ইন্দিরা এখন একজন ডিক্টেটর ছাড়া আর কিছু নহেন। তাহার কথাতেই সকলে উঠে বসে, মন্ত্রী বদল করে, এবং লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতি লইয়াও তিনি ছিনিমিনি খেলিতে মহা তৎপর। আমরা ঐ কঠোর সমালোচনার কথাগুলি তুলিয়া দিতেছি।

শাসক কংগ্রেস দল নানা আভ্যন্তরীণ কলহে আবার ভাঙনের মুখে আসিতেছে। আদি কংগ্রেসের নেতাদের তাড়াইয়া দিয়া শ্রীমতী গান্ধী প্রগতিশীলা সাজিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর আসল রূপটি এখন প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। তাঁর দলের ভিতর তাই প্রতিবাদ জাগিয়াছে, এমনকি প্রতিরোধও গড়িয়া উঠিতেছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স বিভাগ নিজের হাতে রাখিয়া তিনি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের গোপন অর্থ সঞ্চয়ের হিসাব টানিয়া বাহির করিতেছেন, কিন্তু ঐ নেতারা তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিলেই তিনি শাস্তি না দিয়া তাঁদের ছাড়িয়া দিতেছেন। দ্বিতীয় দফায় শ্রীমতী গান্ধী রাজ্যে রাজ্যে নিজের অনুগত ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাইতেছেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী মোহনলাল সুখাড়িয়াকে তাড়াইয়া তিনি বরকতুল্লা খানকে মুখ্যমন্ত্রী করিয়া দিয়াছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে সাদিককে তাড়াইয়া ডি পি ধরকে মুখ্যমন্ত্রী করার আয়োজন পাকা হইয়া গিয়াছে। ডি পি ধর ছিলেন রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত—সেখানে রাশিয়ার প্রতি বশম্বদতার পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কাশ্মীরের মতো সীমান্ত রাজ্যে একজন রুশভক্ত ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী করা হইতেছে ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মহারাষ্ট্রের ডি পি নায়েককে তাড়ানো হইতেছে। সেখানেও একজন ইন্দিরাসেবককে মুখ্যমন্ত্রী করা হইবে। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকে সরাইয়া দিয়া চেন্না রেড্ডিকে মুখ্যমন্ত্রী করা হইতেছে এবং মধ্যপ্রদেশে ভি সি শুক্লাকে সরাইয়া ডি পি মিশ্রের লোককে মুখ্যমন্ত্রী করার চেষ্টা চলিয়াছে। যখন বাংলাদেশের প্রশ্নে গোটা পাক-ভারত উপমহাদেশে আগুন জ্বলার মতো অবস্থা তখন প্রধানমন্ত্রী চক্রান্তের সাহায্যে রাজ্যে রাজ্যে নিজের লোককে গদিতে বসানোর চেষ্টায় মত্ত হইয়া আছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর অসততার দৃষ্টান্তও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁর পুত্রকে মোটর গাড়ী নির্মাণের লাইসেন্স দান, পুত্রের হিতার্থে মদ্য উৎপাদক মোহন ব্রুয়ারিজকে অতিরিক্ত লাইসেন্স দানের জন্য চাপ সৃষ্টি, স্টেট ব্যাঙ্ক হইতে অবৈধ উপায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লওয়া, যাহা নাগরওয়ালার মামলায় উদ্ঘাটিত হইতেছে, পুত্রবধুর নামে বিদেশ হইতে চোরাই মাল আনা—কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই এইগুলি সৎ আচরণের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। বাংলাদেশের প্রশ্নে তিনি যে জাতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর আচরণ করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই।

শাসক কংগ্রেস দলের দীনেশ সিং প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর ইস্পাত মন্ত্রী মোহন কুমারমঙ্গলমের ইস্পাত নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি যেসব তথ্য দিয়াছেন রাজ্যসভায় কুমারমঙ্গলমকে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং এমনকি একদিন তাঁকে ক্ষমাও চাহিতে হইয়াছে। অথচ এখন প্রধানমন্ত্রী দীনেশ সিং ও চন্দ্রশেখরকে পার্টি হইতে বহিষ্কার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এ কেমন নীতিবোধ? নিজলিঙ্গাপ্পা যখন অবিভক্ত কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তখন প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিতে শ্রীমতী গান্ধী দ্বিধা করেন নাই, আজ তাঁর দল ও সরকারের নীতি কেহ সমালোচনা করিলে তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কার করার কথা উঠিতেছে কেন? রাজ-

রাতিক সুবিধাবাদকেই যে ইন্দিরা গান্ধী এতদিন প্রগতিশীলতা বলিয়া চালাইতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে তাঁর দলের মধ্যেই তিনি এখন বহু জনের আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছেন। আসন্ন ঝড়ের কবল হইতে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন কি?

আইন ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠার অভিনয়

"যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিক সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা চেষ্টা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কর্তৃক আহুত রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকের চতুর্থ অধিবেশন চারটি সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। খুন ও হিংসাত্মক কার্য্যাবলী বন্ধ করিবার জন্য নেতারা আপাততঃ এই চার দফা প্রস্তাবে একমত হইয়াছেন। প্রস্তাবগুলিতে বলা হইয়াছে—

(১) যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন খুন এবং সন্ত্রাসবাদকে একবাক্যে নিন্দা করিতে হইবে।

(২) সমস্ত রাজনৈতিক দল মিলিতভাবে সকল প্রকার খুন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবে ও রুখিয়া দাঁড়াইবে।

(৩) খুন সন্ত্রাস দমনে অবিলম্বে প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে সকল রকমের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। দোষীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

(৪) পুলিশসহ প্রশাসনের যে সমস্ত কর্মী খুন সন্ত্রাস এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য করে বা প্রশ্রয় দেয় তাহাদের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে খুন ও সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না, তবে ইহা যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা জনগণের চক্ষে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। প্রথম দফায় রাজনৈতিক দলনেতারা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে এতদিন তাঁহারা খুন ও সন্ত্রাসবাদকে "একবাক্যে নিন্দা" করেন নাই। কোন একটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিলে কোন কোন রাজনৈতিক দল তাহার নিন্দা করিলেও অপর দলগুলি অন্ততঃ মৌন থাকিয়া ইহাকে সমর্থন জানাইয়াছে। কোন বিশেষ দল সম্পর্কে এই মন্তব্য না করায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনার কখনও নিন্দাকারী আবার কখনও সমর্থনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে ধরিয়া লইতে হইবে যে খুন বা হিংসাত্মক কার্য্যকে নেতারা প্রয়োজনীয় অথবা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করিয়াছেন। এবং নিজের দলের উপর আঘাত আসিলেই শুধু তাহার নিন্দা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় দফা সম্পর্কে বলা যায় যে প্রতিবাদ জানাইবার ত্রুটি তো কোন দিনই দেখা যায় নাই। হত্যাকাণ্ড ঘটিলেই কোন না কোন দল "পাড়া বন্ধ" "সহর বন্ধ" এবং নিহত ব্যক্তি উচ্চ পর্য্যায়ের নেতা হইলে "বাংলা বন্ধ" পর্য্যন্ত ডাকিয়াছে। এখন প্রতিবাদের আর নতুন রূপ কি হইবে? সকল দলের মিলিতভাবে "বন্ধ" এর ডাক দেওয়া না শোভাযাত্রা বাহির করা? নাগরিকদিগের বা রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানাইবার আর কোন পদ্ধতি তো জানা নাই। "রুখিয়া দাঁড়ান" এর অর্থও ঠিক বোধগম্য হইল না। কোন হত্যা বা হিংসাত্মক কার্য্য সংঘটিত হইবার সময় অবশ্যই রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীরা উপস্থিত থাকেন না, তাই তাঁহাদের ইহাতে বাধা দিবার প্রশ্নও ওঠে না। তবে কি "রুখিয়া দাঁড়াইবার" অর্থ কোন একটি ঘটনা ঘটিলে যে দল বা গোষ্ঠী তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছে সকলে মিলিয়া তাহাদের আক্রমণ করা এবং তাহাদের নেতা ও কর্মীদের হত্যা করা? কারণ বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে হত্যা ও সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা, প্রতিবাদ করাও তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া উঠিবার কথা বলা হইলেও কোন ক্ষেত্রেই কোন রাজনৈতিক দল তাঁহারা ভবিষ্যতে কোন কারণেই কোন ক্ষেত্রে হত্যা বা হিংসাত্মক কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিবেন না—এই সোজা কথাটি বলিতে চাহেন নাই। অতীতে বিভিন্ন দলের নেতারা "আক্রমণ করিলে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিআক্রমণ করিতে হইবে,"—"আঘাত আসিলে প্রত্যাঘাত করিতেই হইবে," "আমাদের দিকে বোমা ছুড়িলে আমরা অবশ্যই তাহার উত্তরে রসগোল্লা ছুড়িব না" প্রভৃতি ভাষণ দিয়া যে বদলা লইবার নীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন এমন কোন কথাও সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তৃতীয় ও চতুর্থ দফার যাহা বলা হয়েছে, তাহা অতি মারাত্মক ব্যাপার। কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত নবকংগ্রেস দলের প্রতিনিধি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং পশ্চিমবঙ্গের গত ৪ বৎসরে কোন না কোন সময়ের মন্ত্রীরা সকলেই একবাক্যে মানিয়া লইয়াছেন যে "খুন ও সন্ত্রাস দমনে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে না" এবং "পুলিসসহ প্রশাসনের কর্ম্মীদের মধ্যে খুন, সন্ত্রাস ও অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য করে বা প্রশ্রয় দেয় এমন ব্যক্তিদের অস্তিত্ব আছে।" এই প্রকাশ্য স্বীকৃতির ফলে জনগণের অন্তরে পুলিশ ও প্রশাসন কর্ম্মীদের উপরে যে অনাস্থা ও বৈরিভাব ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে দৃঢ় হইতেছে, তাহা দৃঢ়তর করা ব্যতীত আর কোন কাজ হইবে কিনা তাহা জানি না। প্রতিবার প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পুলিশও প্রশাসনের উচ্চ পর্য্যায়ে বহু কর্ম্মীকে বদল করা এবং নিম্ন বিভাগের ব্যক্তিদের বরখাস্ত করা ও পূর্বে বরখাস্ত ব্যক্তিদের পুনর্নিয়োগ করা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও পরিস্থিতির উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতিই ঘটিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের সকল ক্ষমতার অধিকারী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পক্ষে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতির কি প্রয়োজন ছিল এবং ইহাতে তাঁহার কি সুবিধা হইবে তাহাও বুঝিয়া ওঠা কঠিন। তাহা ছাড়া বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতা ও ভূতপূর্ব মন্ত্রী সকলের মধ্যে কয়জন বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহারা কোনদিন কোন অপরাধমূলক কার্য্যের অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ করেন নাই। পুলিশ বা প্রশাসন কর্ম্মীদের অনর্থক দোষ দিয়া লাভ নাই। তাহারা উদরান্ন ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য চাকরি করে, কোন মন্ত্রী বা প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে বিবেকানুযায়ী কার্য্য করিয়া নিজ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই এবং কোন দিনই কোন অবস্থায়ই তাহা হইবে না। মন্ত্রীরা যদি নিজেদের সংযত করিয়া অন্যায়ভাবে নিজ নিজ দলের প্রসার ঘটাবার অপচেষ্টা হইতে নিজেদের বিরত রাখিতে পারেন, তাহা হইলে পুলিশ বা প্রশাসন বিভাগ হইতে জঞ্জাল দূরীভূত হইতে বিলম্ব হইবে না।

দেশ-বিদেশের কথা

বৃটেনের সংবাদপত্র গৌরব

বৃটেনের জনসংখ্যা ভারতের এক দশমাংশ হইলেও সংবাদ প্রকাশ ক্ষেত্রে বৃটেন বিখ্যাত। "দি বৃটিশ প্রেস" হইতে নিম্নলিখিত খবরগুলি পাওয়া গিয়াছে।

বৃটেনের সংবাদপত্রের সংখ্যা ৪২৬০ এবং এই সকল সংবাদপত্র বর্ণনায় সাধারণ, বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত এবং ব্যবসা বাণিজ্য বা কর্ম্মকৌশল সম্বন্ধীয় বলিয়া দেখান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও ৬০০ শত পত্রিকা আছে যেগুলি বিশেষ বিশেষ কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন কোনটির বিশেষ কোন কারবার বা দফতরের সহিত সংযোগ আছে। অধিকাংশ সংবাদপত্র ও পত্রিকা লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় কিন্তু সেইগুলির প্রচার হয় বৃটেনের সর্ব্বত্র এমন কি নানান দূর দেশেও। বাহিরে যে সকল পত্র ও পত্রিকা যায় সেগুলির সহিত বাণিজ্যের সম্বন্ধ অধিক স্থলেই দেখা যায়। এইগুলির প্রচারের দ্বারা বৃটেনের রপ্তানী কারবার বৃদ্ধি পায়। সাধারণ পত্র-পত্রিকা সকল জনসাধারণের বিশেষ স্ত্রীলোকদিগের ও বালকবালিকাদিগের জন্য। ধর্ম্ম, উদ্যানের কার্য্য, খেলা-ধুলা, হাসি-তামাসা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, চাষবাস, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বিশেষ বিশেষ পত্রিকা আছে। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ, কৃষ্টি ও উচ্চস্তরের বিদ্যাচর্চ্চা, কর্ম্মীসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেরও পত্রিকা বাহির হয়।

যে সকল সাপ্তাহিকের বিক্রয় সর্ব্বাধিক তাহার মধ্যে দেখা যায় উইমেন (১২,৪৬,৪৩১), উইমেনসওন (১৮,৫৪,৬৪৫), উয়োম্যানস উইকলি (২৭,৪১,২৫৪), উয়োম্যানস রিয়েলমস্ (১১,১৫,৬৫৩), উইকেণ্ড (১৩,৩০,৬০৭) রেডিয়ো টাইমস (৩৬,৯০,৪৩৯) এবং টি ভি টাইমস (৩২,১২,৬৯৭) এই সকল সাধারণের পাঠ্য পত্রিকাগুলির বিক্রয় খুবই অধিক। অন্য স্বনামধন্য মতামত প্রচারের পত্রিকার মধ্যে নাম করা যায় দি ইকনমিষ্ট (১০৪৫৫১) ও দি নিউস্টেটস্‌ম্যানের (৭৭৫৩৯) স্পেকটেটর ট্রিবিউন, নিউ সোসাইটি স্বনামধন্য পত্রিকা। পাঞ্চ হাস্যরস ও কৌতুকের পত্রিকা (১,২৪,০৭৭) কিন্তু কৌতুকের আবরণে বহু বৃহৎ বৃহৎ সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক বিষয়ের সমালোচনা করিয়া থাকে।

ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদপত্র পত্রিকাদি প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বৃটেনে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানে ঐ জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ একটা বৃহৎ ব্যবসায়। প্রায় ৫০০ শত বিষয়ের আলোচনা এই সকল পত্রিকায় করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকা হইল ১৫০টি, ৬৪টি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, ২৮টি হিসাবের যন্ত্র লইয়া ও ১১টি আনবিক বিষয়ের। এই পত্রিকার মধ্যে অনেকগুলি অতি গভীরভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য বিচারে নিযুক্ত থাকে; কিছু কিছু সাধারণ পাঠক-দিগের জন্য সহজভাবে লিখিত থাকে এবং বাকিগুলি, কারবারের সুবিধার জন্য উৎপাদিত বস্তু বিক্রয় বৃদ্ধির বিজ্ঞাপণ প্রকাশ করিতেই বিশেষ করিয়া নানা প্রকার প্রবন্ধ ও চিত্র প্রচার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ভারত বন্ধু রুশিয়া

চীন বহুদিন হইতেই ভারতের সহিত শত্রুতা করিয়া আসিতেছে এবং সেই শত্রুতার অতি প্রকট অভিব্যক্তি হইল চীনের পাকিস্থান প্রীতির আধিক্যে। পাকিস্থানের জন্মই ভারত শত্রুতার কারণে: বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও হিন্দু বিরোধী মুসলীম লীগের মিলিত প্রচেষ্টায় পাকিস্থানের সৃষ্টি হয়। তৎপরে চীন যখন ভারতের অংশের কোন কোন স্থান দখল করিয়া বসে তাহার ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অতি আবশ্যকীয় স্থানগুলি ছিল কাশ্মীরের উত্তর অঞ্চলে, সেখান দিয়া চীন নিজের মধ্য এশিয়ার

সাম্রাজ্যগত প্রদেশ গুলির সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিল। সম্প্রতি চীন রুশিয়ার সহিত কলহে নিযুক্ত হইয়া রুশ শত্রু আমেরিকার সহিত সদ্ভাব স্থাপন চেষ্টা করিতেছে। আমেরিকাও চীনকে সাহায্য করিয়া রুশের প্রতি শত্রুতা সাধন চেষ্টা করিতেছে। রুশ চাহে না যে চীন ও পাকিস্থান মিলিত ভাবে চেষ্টা করিয়া ভারতকে কোনভাবে ক্ষীণবল ও হৃতশক্তি অবস্থায় ফেলিতে পারে সেইজন্য আমেরিকা যখন চীনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস করিল রুশিয়া তখন ভারতের সহিত সখ্যতা প্রগাঢ়তর করিবার চেষ্টা করিল। এই বিষয়ে সম্প্রতি যে ভারত-রুশ বন্ধুতা-সহায়তার সন্ধি হইয়াছে সেই সম্বন্ধে "যুগবাণী" সাপ্তাহিক বলিয়াছে:

ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় দিল্লীতে পারস্পরিক বন্ধুত্বের যে চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়াছেন তাহা সময়োচিত ও যথাযথ হইয়াছে। পাকিস্তান, চীন ও আমেরিকা ভারতের সর্বনাশ সাধনের যে পরিকল্পনা করিয়াছিল এই চুক্তির ফলে তাহা নিবারিত হইবে। যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। কিন্তু তবু পাকিস্তান যদি ভারতকে আক্রমণ করে ও যুদ্ধ বাধে তবে ঐ যুদ্ধ যে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে। রাশিয়া ঐ যুদ্ধে ভারতের পক্ষে অংশ গ্রহণের প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতিই শুধু দেয় নাই, চুক্তির সর্তেই ঐ গ্যারান্টি অন্তর্নিহিত আছে। চীন এযাবত পাকিস্থানকে সাহায্য দিবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, যুদ্ধে পাকিস্থানের পক্ষে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কোনো চুক্তি করে নাই, এমনকি লিখিত প্রতিশ্রুতিও দেয় নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকলেই জানে যে চীনের মৌখিক প্রতিশ্রুতির বিশেষ কোনো মূল্য নাই। আফ্রিকার বহু দেশকে চীন যে সব লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়া এমন কি সাহায্য দানের চুক্তি পর্যন্ত করিয়াছিল শেষ পর্যন্ত সে চুক্তির মর্যাদা চীন রাখে নাই, প্রতিশ্রুত সাহায্য দেয় নাই। কিউবার প্রতি চীন একই ব্যবহার করিয়াছে। চীনের শঠতার অন্যতম দৃষ্টান্ত ভিয়েৎনাম—সেখানে সৈন্য পাঠানো দূরের কথা, প্রতিশ্রুত অস্ত্র পর্যন্ত দেয় নাই, এবং শেষ পর্যন্ত ভিয়েৎনামের শত্রুদিগের সঙ্গে চীন মিতালি পর্যন্ত করিয়া বসিয়াছে। এই রকম বন্ধুর উপর নির্ভর করিয়া পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলে পাকিস্তান চুরমার হইয়া যাইবে।

সুদানে বিপ্লব চেষ্টা দমন

রুশিয়া আরবদিগের বন্ধু। আরব দেশের কোন রাষ্ট্রই কম্যুনিষ্ট নহে; কিন্তু রুশিয়ার তাহাতে যায় আসে না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনীতির সমর্থন করিতে রুশিয়ার বাধে না। যেমন পুঁজিবাদী স্বৈরাচারী একাধিপত্যে বিশ্বাসী পাকিস্থানকে নানাভাবে সাহায্য করে কঠোর কম্যুনিষ্ট মতবাদে নিগুঢ়ভাবে বিশ্বাসী চীন দেশ। কিন্তু সম্প্রতি সুদানে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে রুশিয়ার অনেক অসুবিধা হইয়াছে। ঐ দেশের রুশিয়া সমর্থিত কম্যুনিষ্ট দলের লোকেরা জুলাই মাসের শেষের দিকে একট বিপ্লব করিয়া সুদানের রাষ্ট্রপতি নিউমেইরিকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঐ চেষ্টা সফল হয় নাই। কয়েক ঘণ্টা রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দখল করিয়া রাখিবার পর বিপ্লবী নেতা ও তাহার অনুচরগণকে রাষ্ট্রপতি নিউমেইরির সমর্থকগণ প্রত্যাক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। পরে কম্যুনিষ্ট দলের নেতা আবদুল খালিক মাহজুবকে গুলি করিয়া মারা হয়। বিপ্লবীদিগের দলপতি বুবাকর এল-নূরকেও গুলি করিয়া মারা হয়। আরও কয়েকজন বিপ্লবের নেতাকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যথা মেজর ফারুক হামদুল্লা, কর্ণেল আলউর ও অপরাপর ব্যক্তিগণ। রাষ্ট্রপতি নিউমেইরির বহু সমর্থক ছিল এবং তাহারা প্রত্যাক্রমণের পর ৯০ মিনিটের মধ্যে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ পুনঃঅধিকার করিয়া লয়। রুশিয়া অবশ্য তাঁহার জয়ে আনন্দ জ্ঞাপন করে। রাষ্ট্রপতি নিউমেইরি রুশিয়াকে আর প্রীতির চক্ষে দেখিতে সক্ষম হইতেছেন না। কারণ রুশিয়া তাহার সৈন্যদিগের বিজয়ে আনন্দ

প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে বিদ্রোহীদিগকেও তাহাদের বিজয় লাভের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিল। অর্থাৎ রুশিয়ানরা যে কেহ সিংহাসনে বসে তাহাকেই অভিনন্দন জানাইতে তৎপরতা দেখাইয়া থাকে। রাষ্ট্রপতি নিউমেইরি কিন্তু এখন জনসাধারণের সমর্থন আরও ব্যাপকভাবে পাইয়াছেন এবং তিনি এখন আদেশ দিয়াছেন যে সুদান হইতে কম্যুনিষ্ট দলের ব্যক্তিদিগের ধুইয়া মুছিয়া সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে সুদানের সহিত রুশিয়ার আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ কি আরও ঢিলা হইয়া যাইবে? তাহা হইবে কিনা কে বলিতে পারে? কারণ আরব দেশগুলি মার্কিন বিরুদ্ধ কিন্তু পুঁজিবাদী এবং তাহারা রুশিয়ার বন্ধু হইলেও কম্যুনিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে সাপে-নেউলে ভাবাক্রান্ত। রুশিয়াও মতবাদ ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে না।

সাময়িকী

এডওয়ার্ড কেনেডির বাংলাদেশ দর্শন

পূর্ব্ব পাকিস্থানের অবস্থা পাকিস্থানী হুকুমদাতাদিগের মতে একেবারেই স্বাভাবিক এবং যে ৭৫ লক্ষ নরনারী শিশু পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে পলাইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা সকলেই ভারতের অধিবাসী—পূর্ব্ব বাংলার নহে—এবং তাহারা উদ্বাস্তু সাজিয়া জগতের সম্মুখে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারতীয় অপপ্রচারে সাহায্য করিতে নিযুক্ত। এই জাতীয় কথা "মুর্খের রসিকতা" বলিয়া অগ্রাহ্য করাই উচিত কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে মূর্খদিগেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত সুতরাং ৭৫ লক্ষ লোক সাজাইয়া ভারত পাকিস্থানের বদনাম করিতেছে কথাটার জবাবে বলিতে হয় যে পাকিস্থানও কোন সময় দশ কোটি লোক সাজাইয়া ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনের দাবি বৃটিশ দরবারে শেষ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থান গঠনে সক্ষম হইয়াছিল। যাহারা পলাইয়া আসিতেছে তাহারা ভারতবাসী কথার উত্তরে বলা যায় যে তাহারা যখন পুনরায় পূর্ব্ব বাংলায় ফিরিয়া যাইবে তখন তাহারা আবার পূর্ব্ববাংলাবাসী হইয়া যাইবে। পাকিস্থানী না হইতেও পারে, কারণ পাকিস্থানে অস্তিত্ব কতদিন থাকিবে কে বলিতে পারে?

এডওয়ার্ড কেনেডি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর অর্থাৎ তিনি ঠিক একটা ফেলনা লোক নহেন। কিন্তু তিনি যখন পাকিস্থানী সরকারের নিকট পূর্ব্ববাংলা ঘুরিয়া দেখিবার অনুমতি চাহিলেন তখন পাক সম্রাট ইয়াহিয়া তাঁহাকে সে অনুমতি দিলেন না। ইহার কি কারণ? পূর্ব্ববাংলার অবস্থা যখন শান্তিপূর্ণ এবং স্বাভাবিক তখন একজন উচ্চপদস্থ আমেরিকানকে সে দেশে ঢুকিতে দেওয়া হইল না কেন? ইহার কারণ এই যে এডওয়ার্ড কেনেডি প্রথমে ভারতে আসিয়া পূর্ব্ববাংলার উদ্বাস্তু শিবিরে ও হাসপাতালে গমন করিয়া অসংখ্য উদ্বাস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়াছিলেন। হাসপাতালগুলিতে ঘুরিয়া তিনি বেয়নেট ও গুলির আঘাতে জর্জ্জরিত বহু সংখ্যক নরনারী শিশুকে দেখিয়াছিলেন। ভারত—পূর্ব্ববাংলা সীমান্তে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র পলাতক নরনারী শিশুর ভারতে পলাইয়া আসার দৃশ্য নিঃসন্দেহে অতি বাস্তবভাবে দেখিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে পূর্ব্ববাংলায় যাইতে দিলে পাকিস্থানী মিথ্যার বন্যার অবাধ প্রবাহে বাধা পড়িবার সম্ভাবনা হইতে পারিত। এই কারণেই তাঁহাকে পূর্ব্ববাংলায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এখন তিনি আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়া যাহাই বলিবেন তাহার উত্তরে পাক রাষ্ট্র নেতাগণ বলিবে যে সেই সকল খবর ভারতের দ্বারা সাজান অবস্থা দর্শনের উপর নির্ভরশীল; সুতরাং তাহা সত্য নহে। এডওয়ার্ড কেনেডি পূর্ব্ববাংলায় গমন করিয়া কিছু নিজ চক্ষে দেখেন নাই। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বলিয়া তাঁহার কথা গ্রহণ করা এই কারণে চলিতে পারে না।

রুশিয়ায় ইহুদিদিগের নিজত্ব রক্ষা

রুশিয়াতে পূর্ব্বকালে ইহুদিদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। তাহারা একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর নাগরিক বলিয়া সমাজে স্থান পাইত, যে অবস্থায় তাহারা সহরের বিশেষ ইহুদি অঞ্চলে থাকিতে বাধ্য হইত; বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইত অর্থাৎ যথেচ্ছা যে কোন কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিবার অধিকার তাহাদের ছিল না এবং কখন কখন তাহাদের উপর ব্যাপক গণহত্যা জাতীয় উৎপীড়ন ও বর্ব্বর অত্যাচারও করা হইত। এই আক্রমণের নাম রুশিয়ানরা দিয়াছিল "পগ্রম" এবং উহার ফলে বহু ইহুদির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও প্রাণহানী হইত। যখন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল তখন ইহুদিদিগের উপর সকল অত্যাচার, উৎপীড়ন

প্রভৃতি বেয়াইনী করা হইল এবং হিব্রু ও ইড্ডিশ ভাষার পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি প্রকাশ আরম্ভ হইল। অর্থাৎ ইহুদিদিগকে জাতে উঠান হইল। ট্রট্স্কি, রাডেক, স্ভের্ডলভ, লিটভিনভ, কাগানোভিচ, কামেনেভ প্রভৃতি বহু রাষ্ট্রনেতাগণ ইহুদি ছিলেন। কম্যুনিষ্টগণ ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না এবং সেই কারণে তাঁহারা ইহুদি-দিগের কোনও পৃথক অস্তিত্বও স্বীকার করিতেন না। তাহারা অপরাপর রুশিয়ানদিগেরই মত রুশিয়ান বলিয়া ধার্য্য হইত। স্টালিন একটা ইহুদি দফতর খুলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা ইহুদিদিগের ধর্ম্ম প্রবণতার ক্রমঃঅপসারণ ব্যবস্থার জন্যই খোলা হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরেও ইহুদিগণ রুশিয়ান হইল না। সেই কারণে এখন আবার রুশিয়ায় ইহুদি বিরুদ্ধতা মাথা তুলিতেছে। তাহাদিগকে রুশিয়ানগণ অবজ্ঞা-সূচকভাবে "নোংরা ঝিদ্" বলিয়া আখ্যায়িত করে। কিন্তু ইহুদিরা কর্ম্মী এবং কৌশলের কার্য্যে বিচক্ষণ। তাহারা বলে "আমরা ঝিদ্ হই বা যাহাই হই আমরা উপরে আছি এবং রুশিয়ানরা আছে নীচে।" ইহুদি-দিগের উপার্জ্জন অধিক, জীবনযাত্রা পদ্ধতি উন্নততর এবং তাহারা ঐ সকল কারণে রুশিয়ানদিগের চক্ষুশূল। রুশিয়াতে ইহুদিগকে বর্ত্তমানে যে ভাবে রুশিয়ান করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে তাহাতে ঐ জাতির লোকেদের কোন প্রকার বৈশিষ্ট রাখিতে দেওয়া হইতেছে না। অন্তত সেই চেষ্টা হইতেছে। যদিও ইহুদিগণ নিজেদের জাতীয়তা রক্ষা করিয়া চলিতে বিশেষভাবেই উৎসাহী। এখন সেইজন্য রুশিয়ার ইহুদিদিগের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে যাহাতে তাহারা নিজ পৃথক জাতীয়তা কোনভাবেই গঠিত রাখিবার চেষ্টা না করে। শুনা যাইতেছে নানাভাবে ইহুদি দমন চেষ্টাও করা হইতেছে। তাহারা ইসরাইলে চলিয়া যাইতে চাহিলে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। ইসরাইল যেহেতু আমেরিকার বন্ধু সেইজন্য রুশিয়া ইসরাইল সম্বন্ধে প্রীতির ভাব পোষণ করে না। রুশিয়া বরাবরই বলিয়া থাকে যে ঐ বিরাট রাষ্ট্রে বহু জাতির বাস। তাহারা নানা ভাষাভাষী ও কৃষ্টির দিক দিয়া নানা পথের পথিক। রুশিয়ায় ইহুদি দমনের কথা শুনিয়া অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে ঐ বৈচিত্রের ভিতরে মিলনের কাহিনীটি ততটা সত্য নহে।

স্বাধীনতার মূল উচ্ছেদ

কোন দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন তাহার স্বাধীনতার পরিচায়ক মূল ক্ষমতা, অবস্থা, অধিকার, দায়িত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া কতকগুলি সংবিধানিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল-ভাবে করা হয় যেগুলি না থাকিলে সেইদেশের মানুষের স্বাধীনতা থাকে না বলিয়া ধরিতে হয়। কোনও দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাইয়া ঐ সকল মূল অধিকার, দায়িত্ব, ক্ষমতা প্রভৃতি খারিজ করিয়া স্বাধীনতার স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া দিতে পারেন কি না তাহা সকল ব্যক্তির ভাবিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশের সংবিধান ছিল এইরূপ যে সকল মূল অধিকার বর্ণিত আছে তাহা উঠাইয়া দিবার অধিকার কাহারও আছে কি না তাহাও চিন্তার বিষয়। শ্রীমতী গান্ধীর দ্বারা সম্পত্তির অধিকার খারিজ করা হইতেছে। এই বিষয়ে যুগজ্যোতি সাপ্তাহিক বলেন:

সম্পত্তির অধিকারটাই একমাত্র মৌলিক অধিকার নয়। সংবিধানে ইহা ব্যতীত বাক্যের ও চিন্তাধারা প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে সমা-বেশে নিরস্ত্র অবস্থায় যোগ দিবার স্বাধীনতা, কোন সংস্থা অথবা ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা, ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে ইচ্ছামত চলাফেরা করিবার স্বাধীনতা, ভারতের যে কোন অংশে বসবাস করিবার স্বাধীনতা, যে কোন পেশা বা ব্যবসায় চালাইবার স্বাধীনতা—এই পাঁচটির অধি-কারকেও মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল। তড়িঘড়ি শুধুমাত্র সম্পত্তির অধিকারকে সঙ্কোচন করিবার পন্থা স্থির করিতে না পারিয়া অধৈর্য্য ইন্দিরা গান্ধী এই সকল স্বাধীনতা হরণের অধিকারটা সংসদের হস্তে সমর্পণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা যে সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ

সম্পত্তির উপর চোট পড়িয়াছে, কাল যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনভাবে সমাবেশে যোগ দিবার ও সংস্থাগঠনের উপর আক্রমণ আসিবে না তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? প্রগতির অছিলায় মৌলিক অধিকার হরণকে কোনমতেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। "প্রগতি" অপেক্ষা "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা" অনেক অধিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়। অথচ অল্প দিন পূর্ব্বেই "নিউইর্ক টাইম্‌স্‌...ও...ওয়াশিংটন পোষ্ট" সংবাদপত্রের মামলায় আমেরিকার সুপ্রীমকোর্টে সংখ্যা গরিষ্ঠের রায় দিবার সময় বিচারপতি হুগোব্ল্যাক মন্তব্য করিয়াছিলেন—'সংবিধানের কোন মূল আইন রহিত করিবার জন্য 'নিরাপত্তা'র অছিলা তোলা উচিত নয়।" নিকসন সরকার এই রায়ের ফলে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হওয়া এবং বিশেষ অসুবিধায় পড়া সত্বেও এই মৌলিক অধিকার হরণের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের কথা চিন্তা করিতেছেন বলিয়াও অদ্যাবধি কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁহার সমর্থক নব কংগ্রেস দলের দাবী যে সংসদ সদস্যরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়ায় তাঁহাদের সকল কার্য্যকেই জনগণের ইচ্ছার পরিপূরণ বলিয়া ধরিতে হইবে এবং গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছাকেই সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া হওয়ায় সংসদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবার অধিকার রহিয়াছে। অতীতে আইন ব্যবসায়ী ও বর্তমানে পেশাদার রাজনীতিক সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় লোকসভায় সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের অভদ্র্য ভাষায় আক্রমণ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে সুপ্রীমকোর্টের শুধুমাত্র আইনের ব্যাখ্যা করিবারই অধিকার রহিয়াছে, সংসদে গৃহীত কোন আইনকে বাতিল করিবার অধিকার নাই।

ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিরাট আইনজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের খ্যাতি আছে। তাই আইন সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারে তাঁহাকে প্রশ্ন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অশোভন হইতে পারে। কিন্তু জনস্বার্থের খাতিরে একটি প্রশ্ন তাঁহাকে না করিয়া পারিতেছি না। সুপ্রীমকোর্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি সংসদে গৃহীত কোন প্রস্তাব বা আইন দেশের মূল আইন সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে ঐ প্রস্তাব বা আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া বাতিল করিয়া দেওয়া ছাড়া সুপ্রীমকোর্টের আর কি পথ আছে? ক্ষমতার মোহে আত্মহারা হইয়া ও ইন্দিরা গান্ধীর অনুগ্রহ লাভে ব্যাকুল হইয়া তিনি আজ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ইতিহাসে তাহা একটি কলঙ্কময় অধ্যায় হইয়া থাকিবে।

নির্বাচনে ভোটদাতাদের ৬০ শতাংশের মত লোক ভোট দিয়াছেন এবং নব কংগ্রেস এককভাবে প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের কম পাইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে মোট ভোটদাতাদের ৩০ শতাংশেরও কম লোকের সমর্থন পাইয়া নব কংগ্রেস লোকসভার সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতার অধিকারী-দুইতৃতীয়াংশ আসন লাভ করিয়াছে। তাই তাহাদের কোন সিদ্ধান্তে ভোটদাতাদের ত্রিশ শতাংশের মত প্রতিফলিত হইয়াছে ধরিয়া লইলেও তাহাদের পক্ষে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার হরণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল না। অন্যান্য দলেরাও অনেকেই তাহাদের এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাহারা সমর্থন না করিলেও এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পথে কোনই বাধা জন্মিত না এবং ভবিষ্যতে যে সকল সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব আসিবে তাহা গৃহীত হইবার পথে বাধা জন্মিবে না। দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনে ভোটদাতাদের নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ দলগুলির মধ্য হইতে যে কোন এক দলকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাছিয়া লইতে হয়। পরিস্থিতির বিচার করিয়া তাহারা যে দলকে ভোট দেয় সেই দলের কর্মসূচী সার্বিকভাবে তাহারা সমর্থন না করিতেও পারে। তাই বর্তমানের প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত সদস্যরা সকল বিষয়েই জনমতের প্রতিনিধিত্ব করেন, একথা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং কোন মূল আইন বা জনগণের মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করিতে হইলে সেই নির্দিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে গণভোট (Referendum) লওয়া উচিত। তাহা না করিলে সাময়িকভাবে গণতন্ত্র সম্মত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়।

ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ: শ্রীদিলীপকুমার রায়, বাক্‌ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। বার টাকা।

নামেই গ্রন্থের পরিচয়। যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক তাঁর যুক্তির বাইরে কিছুই মানতে চান না। অবশ্য একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই—বিজ্ঞান আজ অনেক অসাধ্য সাধন করেছে। যা কল্পনার বাইরে ছিল তাও আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। হয়তো আরো অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে। কিন্তু তারপর? এই তার পরের কথা বিজ্ঞানীরা আর বলতে পারেন নি। সৃষ্টির রহস্য এইখানেই অনুদ্‌ঘাটিত। ভগবান কি বস্তু আমরাও জানি না, কিন্তু একটা অলৌকিক শক্তি যে এর পিছনে কাজ করছে তা আমরা দেখতে পাই। এইখানেই আর এক জগতের কথা না মেনে উপায় নাই—যার নাম দেওয়া হয়েছে আধ্যাত্মিক জগৎ। বিজ্ঞান এই জগৎকেই অস্বীকার করে চলেছে। অবশ্য অনেকে পরে স্বীকার ক'রেছেন। তাঁদের মতামত লেখক এই গ্রন্থে অনেক উদ্ধৃত করেছেন। উদ্ধৃত অংশগুলি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ই হ'লো ধর্ম ও বিজ্ঞান।

ভগবৎ-প্রেম না থাকলে ভগবানের কথা এমন করে বলা যায় না। এ তাঁর উপলব্ধি। এই উপলব্ধিই তাকে বলিয়েছে: "পদার্থবিজ্ঞানের বাইরেও নানা জগৎ আছে। সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে নানা ভাবোদয়, শিল্পের মধুর ব্যঞ্জনা, ভগবানের জন্যে ব্যাকুলতা—এ সব কিছুর মধ্যে দিয়েই আমাদের অন্তরাত্মা এমন কোনো গভীর প্রাপ্তির আভাস পায় যার আকাঙ্খার বীজও আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান। এই যে বিকাশ—এর অনুমোদনও আমাদের অন্তরেই নিহিত, যে আমাদের চেতনার সহজাত, কিংবা বলা যেতে পারে—এর উৎস এমন কোনো আলো যার জনয়িতা আমাদের মানবিক শক্তির চেয়ে কোনো মহত্তর শক্তি......"

বইখানি পড়তে প্রত্যেককেই অনুরোধ করি।

—গৌতম সেন

উন-পাৰ

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৭৮

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বৈপরীত্য-সমন্বয় সৃজন

আপাতদৃষ্টিতে কোন কিছু দেখিলে যাহা মনে হয়, গভীর তত্ত্বানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিলে তাহার স্বরূপ বিপরীত প্রতীয়মান হইতে পারে। এই কথা ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রযোজ্য। যথা যাহারা নিরামিষাশী তাহারা জীবহত্যা করা অন্যায় মনে করেন, কিন্তু যাহারা মাংসাহার করেন তাঁহারা জীবহনন অন্যায় তো মনে করেনই না, বরঞ্চ বহুক্ষেত্রে তাহা ধর্মের নির্দেশ বলিয়াও বর্ণনা করিয়া থাকেন। নরহত্যা মহাপাপ বলিয়া যাঁহারা নরঘাতক-দিগকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করেন অথবা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে যুদ্ধ করিয়া হত্যা করেন তাঁহা-দিগের পাপ-পুণ্যবোধ নিজেদের অভিলাষ, অভিপ্রায় ও সুবিধা অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে মনে করা যাইতে পারে। প্রাচীনকালে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল ও তাহা ধর্মের অঙ্গ ছিল। ঠগী সম্প্রদায় ফাঁস দিয়া নরহত্যা করা তাহাদিগের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিত। অনেক ধর্মবিশ্বাস অবস্থাবিশেষে এমন ছিল দেখা যায় যাহাতে মানুষের প্রাণনাশ করা অন্যায় বলিয়া বিচার করা হইত না। খৃষ্টানদিগের মধ্যে কোন কোন সময় অবিশ্বাসীদিগকে বা যাহাদের অবিশ্বাসী মনে হইত তাহাদিগকে পুড়াইয়া মারার রীতি ছিল। মুসলমান-দিগের মধ্যেও অবিশ্বাসীদিগকে হত্যা করা পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। হিন্দুদিগের সতীদাহপ্রথা অথবা শিশুদিগকে গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া মারার সংস্কার ছিল বলিয়া দেখা যায়। দেখা যায় ন্যায় অন্যায় যে পরস্পর বিরোধী তাহা বহুস্থলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সকলে স্বীকার করিয়া চলেন নাই। তাঁহাদের কল্পিত মূল্যায়ণ নানাক্ষেত্রে বিপরীতকে মিলিত করিতে সক্ষম হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এমন কি অন্যায় যাহা তাহা অতিবড় ন্যায়ধর্মের কথা বলিয়া অনেকে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক "সত্য" যুগে যুগে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। যথা পৃথিবী গোলাকার স্বীকৃত হইবার পূর্বে তাহা

সমতল বলিয়া মানুষের বিশ্বাস ছিল এবং অনেকে চিন্তা করিতেন যে সমতল পৃথিবীর শেষ সীমা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অনন্ত শূন্যে গিয়া পড়া যায়। আমরা এখন জানি যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি ঘুরিতেছে; কিন্তু পূর্বকালে মানুষের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীই সকল গ্রহ-তারকার কেন্দ্র ও সকল কিছুই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতেছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মনে করিতেন যে কোন এক সময় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় জল-স্থল-আকাশ-আলোক-অন্ধকার, জীবজন্তু মৎস্য-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ চতুষ্পদ সরিসৃপ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু এখন ক্রমবিকাশের কথা সকলেই জানেন। কেমন করিয়া প্রথমে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হইল, কেমন করিয়া অতি প্রাচীন প্রাণীসকল ক্রমে ক্রমে আকার ও স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া শেষে এখনকার জীবজন্তুর আকৃতি প্রাপ্ত হইল; এইসকল কথা এখন প্রায় সবজন জ্ঞাত। সুতরাং পূর্ব্বে যাহা নাই বলিয়া জানা ছিল পরে তাহা আছে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পূর্বে যাহা মহাপাপ ছিল এখন তাহা অতি সাধারণ সর্বজন গ্রাহ্য ব্যবহার বলিয়া প্রচলিত। পূর্বের ন্যায় এখনকার অন্যায় হইয়াছে—যথা ক্রীতদাসত্ব প্রথা, বহু-বিবাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি। পূর্বের অন্যায় এখন ন্যায় বলিয়া বহুস্থলে চলিতেছে, যেমন নাস্তিকতা, ধনবানের ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লওয়া, স্ত্রীলোকের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা অথবা অব্রাহ্মণের শাস্ত্রপাঠ। ধর্ম্ম এখন অধর্ম বলিয়া বিবেচিত হয় যেমন, কম্যুনিষ্টদিগের মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস অহিফেন সেবনের সমতুল্য, কেননা বিশ্বাস প্রবল হইলে বিচার বুদ্ধি লোপ পায়। অপরপক্ষে যাহারা কম্যুনিষ্ট নহে তাহারা মনে করে যে কম্যুনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসও গঞ্জিকাপানের মতই সুচিন্তার পথে প্রবল বিঘ্নের সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে মূল্যায়ণ ও বিচারক্ষেত্রে স্থান-কালের পার্থক্য বহু বৈপরীত্যের পরস্পর বিরোধ নাশ করিয়া যাহা যেরূপ ছিল না তাহাকে সেইরূপভাবে লোকসম্মুখে উপস্থিত করে এবং পুরাতন আকার প্রকার স্বভাবেরও নূতন পরিস্থিতিতে পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন নূতন আকৃতি-প্রকৃতির সৃজন করে। যেখানে স্থানকালের বিভিন্নতা নাই সেখানেও বহু সময়ে দেখা যায় যাহা এক ব্যক্তির নিকট বিপরীত তাহাই অপর কাহারও নিকট সমন্বিত বলিয়া বিচারিত হয়। যথা ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে যত প্রকারের "আমার-তোমার" দেখা যায় তাহার প্রায় সকলগুলিকেই দেনা-পাওনার বিচারে দেনাকে পাওনা ও পাওনাকে দেনা বলিয়া বিচার করার একটা রেওয়াজ বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে বহু ধারণাই উল্টারূপ ধারণ করিয়াছে। মত প্রকাশের, নিবাসের, পেশা বাছিয়া লওয়ার যে সকল অধিকার এখনও স্বীকৃত হইতেছে, আগামীকল্য যে সেই সকল স্বীকৃতি বজায় থাকিবে একথা কেহ বলিতে পারে না। বাধ্যবাধকতা যেখানে ছিল না সেখানে আসিয়া পড়িতেছে। রীতি, নীতি, আদর্শ, মান প্রভৃতি লইয়া নিত্য নূতন ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, উল্টা-সোজা, সুর-বেসুর, ছন্দবদ্ধ-ছন্দভঙ্গ, অনুকুল-প্রতিকুল প্রভৃতি গুণাগুণের কথা উত্থিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালের নির্দিষ্ট ভাব আর এ যুগে দেখা যাইতেছে না। কুটবুদ্ধি ও উদ্ভট কল্পনা সকল অর্থকেই সম্ভব অসম্ভবের সীমানার বাহিরে অনির্দ্দিষ্টের অজানা শূন্যপথে ঝুলাইয়া রাখিয়া সকল কথাতে যথেচ্ছা বিকৃত অর্থ আরোপ করিয়া সকল কিছুকেই যাহা খুশী সাজাইয়া জনগণের মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছে। শুধু কথার অর্থের মধ্যেই এই সকল অদলবদল চেষ্টা করা হয় এমন নহে। নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, আদর্শ, পরিচালনার রীতি ও পদ্ধতি প্রভৃতি লইয়াও এই যথেচ্ছাচারের খেলা হইয়া থাকে। স্কুল-কলেজ কিভাবে চলিবে; পাঠের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি, কর্মী কর্ম্মক্ষেত্রে কিভাবে কতটা কাজ করিবে অথবা করিবে না, নিজেদের মতামতের প্রচারের জন্য অপর নাগরিকদিগের কতটা অসুবিধা সৃষ্টি করা যাইতে পারে; প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের নীতি রীতি ও পদ্ধতি নির্ণয় হেতু অর্থহীন বাক্যাড়ম্বরে অর্থহীনতা ঢাকা দিবার চেষ্টা

সর্বত্রই হইতেছে দেখা যায়। বিপরীত যাহা তাহা আর বিপরীত থাকিতে পারে না যদি সে বৈপরীত্য না থাকিলে কাহারও কোন লাভের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু কায়িক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিচার ক্ষেত্রে কোন বৈপরীত্য নাই একথা বলা চলে না; কারণ শরীরে দীর্ঘকায় অথবা হ্রস্ব আকৃতি, স্থূলবপু কিম্বা কৃশদেহ, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নতা এবং দৃষ্টিহীনতা এই সকল কিছুই একই শারীরিক অবস্থার পরিচায়ক এরূপ বলা চলিতে পারে না একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। মানসিকভাবেও তেমনি ধীর স্থির সুযুক্তিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বাতুলতা পরস্পর বিরোধী নহে অথবা যে কোন বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা থাকা না থাকাও সমান এরূপ কেহ বলিবে না। সত্য মিথ্যা, সঙ্গতি অসামঞ্জস্য, শত্রুতা ভালবাসা, প্রভৃতিও এক মনোভাব বলা যায় না। নরঘাতকের হিংস্রতা এবং জনসেবার আগ্রহ, ভগবৎপ্রেম ও নাস্তিকতা, দেশভক্তি ও বিদেশের আনুগত্য, সংযম ও স্বৈরাচার সকল কিছুর একত্ব প্রমাণ চেষ্টা দার্শনিক কূটতর্ক ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। জীবন মৃত্যু, আলোক অন্ধকার, পরিবর্তনশীলতা ও অচল অটল চিরস্থায়ী অপরিবর্তিত একাবস্থা, এ সকলের বিভেদ স্বীকার না করা সহজ সরল সুবিচার বহির্ভূত হইয়া দাঁড়ায়।

বন্যা নিরোধ

জনসংখ্যা নিরোধ, গরিবী নিরোধ, ইংরেজী নিরোধ বা বন্যা নিরোধ, যে প্রকার নিরোধের ব্যবস্থাই ভারত সরকার করিবার চেষ্টা করেন, তাহার প্রকল্প রূপায়ণ করিতে শত শত বা সহস্র সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করা একটা অতি সাধারণ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টাকাটা কোনও সময়েই ভারত সরকারের তহবিলে থাকে না; সুতরাং ঋণের ব্যবস্থা না করিলে টাকাটা ব্যয় করা সম্ভব হয় না। ঋণ পাইতে হইলে বিদেশের লোকেদের ইচ্ছামত ব্যয় না করিলে তাহারা টাকা দিতে চাহে না। বিদেশীদিগের কথা শুনিলে তাহাদিগের যন্ত্রপাতি, তাহাদিগের জ্ঞান ও কৌশল ও তাহাদিগের লোকজন ক্রয় ও বেতন দিয়া ভাড়া না করিলে কাজ হয় না। সুতরাং বিদেশীদিগের কথাতেই ভারত সরকার চলেন ও সেই কারণে প্রথমতঃ ব্যয় অধিক হয় ও পরে যথা নির্দ্দেশ যন্ত্রের পরিচালনা ও অংশ পরিবর্তন প্রভৃতি না করায় সকল কিছুই অচল হইয়া যায়। কখন কখন প্রকল্প অনুযায়ী কার্য্য করা হয় না বলিয়া বিদেশী কর্মকর্তাগণ অভিযোগ করেন। আমরা বর্তমানে অন্যান্য নিরোধ সম্বন্ধে ততটা বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত নহি যতটা আমরা বন্যা নিরোধ ব্যবস্থার অসফলতা লইয়া ভারত সরকারের সমালোচনা করিয়া থাকি। কয়েক সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করিয়া বন্যা নিরোধ যে হয় নাই তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শুধু পশ্চিম বঙ্গেই প্রায় এক কোটি নরনারী শিশু বন্যাবিদ্ধস্তভাবে গৃহত্যাগ করিয়া অপর স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। বন্যার প্রকোপ দেখিয়া মনে হয় যে নিরোধ ব্যবস্থা কার্য্যকরী তো হয়ই নাই উপরন্তু যে বাঁধ বাঁধিয়া বিরাট বিরাট হ্রদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহা হইতে বাধ্য হইয়া জল নিষ্কাশন করাতে বৃষ্টির জলের সহিত সেই জমান জল মিশ্রিত হইয়া নদীগুলির আশপাশের গ্রাম ও ক্ষেত্র সকল ডুবিয়া যাওয়া আরও অধিক করিয়া হইয়া থাকে। হ্রদগুলির জল যদি নদী হইতে দূরস্থিত এলাকায় অপরাপর সেচন ব্যবস্থা অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর জলাশয়ে রক্ষিত হইত তাহা হইলে হ্রদের জল বৃদ্ধি হইয়া তাহা নদীপথে চালাইবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু বিদেশী বাঁধ নির্ম্মাণ কৌশলীগণ সেরূপ আয়োজন করেন নাই; কারণ আমেরিকায় ঐ জাতীয় ব্যবস্থা সম্ভবত প্রয়োজন হয় নাই। সে দেশে বৃষ্টিপাত কোথায় কতটা হয় ও এককালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কি তাহা যাহাই হউক আমাদিগের দেশের তুলনায় অল্পই হয় বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন মনে হইতেছে যে সত্য সত্যই বন্যা নিরোধ করিতে হইতে হইলে সমস্ত ব্যাপারটাকে পুনরায় ঢালিয়া সাজিতে হইবে। ইহার জন্য অতঃপর রুশিয়া হইতে বিশেষজ্ঞ আনা হইবে কি না কে বলিতে পারে?

আমরা বলি যে বিশেষজ্ঞদিগের বিশেষ করিয়া স্বদেশী হওয়া আবশ্যক। নতুবা বন্যা নিরোধ কখনও সফল হইবে না। শুনা যায় যে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বন্যা নিরোধ করিবার জন্য আট জায়গায় বাঁধ বাঁধিয়া জল ধরার ব্যবস্থা করিবার কথা ছিল, কিন্তু মাত্র চারটি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ফলে জলস্ফীতি ঘটিলেই এই চারটি বাঁধের সহিত সংযুক্ত হ্রদগুলি হইতে জল ছাড়া হয়। এবং এই জল ছাড়া হয় সেই সময়েই যখন নদীর জল বর্ষার ফলে বিশেষ অধিক থাকে। ছাড়া জল ও বর্ষার জল মিলিত হইয়া নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া অথবা উপচিয়া অতিক্রম করিয়া আশপাশের এলাকায় বন্যারূপে দেখা দেয়। যদি হ্রদের সংখ্যা দ্বিগুণ হইত এবং যদি সেই হ্রদের জল প্রয়োজন হইলে নদীতে না ছাড়িয়া খাল দিয়া দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রতর পরস্পর সংযুক্ত বৃহৎ জলাশয়ে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ প্লাবন হইতেও রক্ষা পাইত এবং পরে জলের অভাব হইলে সেচনের জলও ঐ সকল জলাশয় হইতে সংগ্রহ করিতে পারিত। পূর্ব্বকালে এই জাতীয় ব্যবস্থা ছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু পরে বৃটিশ সেচন ব্যবস্থাকারীদিগের হস্তে সেই সকল পুরাতন জলাশয় ইত্যাদি ক্রমশঃ অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। কোথাও কোথাও রেললাইন নির্ম্মাণ করিতে গিয়া স্বাভাবিক জল নিষ্কাশন পথ বন্ধ হইয়া যায় ও তাহাতে বন্যার জল বাহির না হইয়া ক্ষেতগ্রাম জলমগ্ন করিবার কারণ হয়। এবং কোথাও পুরাতন বৃহৎ জলাশয়ের পাড় কাটিয়া রেল লাইন বসানর ফলে এই সকল জলাশয়ের জল বহির্গত হইয়া নিকটস্থ নদীগর্ভে গিয়া পড়ে ও জলাশয় শুষ্ক হইয়া যায়। বৃটিশ আমলের পরে নুতন ব্যবস্থাও সুবিধার হয় নাই। সুতরাং বন্যা নিরোধ কার্য্যের এখনও যথাযথ ব্যবস্থা করা হয় নাই।

সুলতান মহম্মদ খানের পাকিস্থানে প্রত্যাগমণ

পাকিস্থানের পররাষ্ট্র বিভাগের সচিব সুলতান মহম্মদ খান ইয়াহিয়া খাঁনের বিশেষ প্রতিনিধিভাবে রুশিয়াতে গিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রুশিয়াকে বুঝান যে ভারত পূর্ব্ব পাকিস্থানের (বাংলাদেশের) সকল গোলযোগের মূলে আছে এবং পাকিস্থান গণহত্যা নারীনিগ্রহ ও বাঙ্গালী বিতাড়ন প্রভৃতি দোষ করে নাই। তিনি কয়েকদিন ধরিয়া ইয়াহিয়া খাঁনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল মিথ্যাই সাজাইয়া গুছাইয়া বলেন; কিন্তু রুশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো ও তাঁহার সহকারী ফিরিউবিন ঐ সকল মিথ্যা শুনিয়া বিশেষ প্রভাবিত হয়েন নাই। তাঁহারা সুলতান মহম্মদ খাঁনকে সম্ভবত বুঝাইয়া দিয়াছেন যে পাকিস্থানের অপকর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর কোন সন্দেহই নাই। তাহারা যে ৮০ লক্ষ বাঙ্গালীকে দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য করিয়াছে সে কথা অতি সত্য এবং তাহাদের গণহত্যা প্রভৃতি বর্ব্বরতার কথাও বিশ্বাস করিতেই হইবে। এই অবস্থায় ভারতের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিবার একমাত্র অভিপ্রায় হইল ভারতের সহিত যুদ্ধ লাগাইবার চেষ্টা। রুশিয়া এই যুদ্ধচেষ্টা হইতে পাকিস্থানকে বিরত হইতে বলিতে চাহেন এবং তাঁহাদিগের মতে সুলতান মহম্মদ খাঁনের উচিত হইবে ইসলামাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজের উপরওয়ালাদিগকে সমঝাইয়া দেওয়া যে রুশিয়া পাকিস্থানের ভারত বিরুদ্ধতা ও ভারতের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা সুনজরে দেখিতেছেন না। পাকিস্থানী মিথ্যা কথাগুলিও রুশিয়ার সংবাদপত্রে আলোচিত হয় নাই। ইহার কারণ ঐ সকল মিথ্যার অসম্ভবতা ও অবিশ্বাস্যতা। পাকিস্থানের বিশেষ প্রতিনিধি অতঃপর ইসলামাবাদে ফিরিয়া যাওয়া স্থির করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই প্রত্যাগমন করার কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বলা যায়না যে পাকিস্থানকে রুশিয়া ঠিক কি কথা বলিয়াছে। যদি অতঃপর পাকিস্থান আস্ফালন কম করে ও বাংলাদেশের অধিবাসীদিগের সহিত রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার কোনও যুক্তি সাপেক্ষ চেষ্টা করে তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে রুশিয়ার ধমকানির ফল হইয়াছে। পাকিস্থান যদি বুঝিতে পারে

য ভারতের সহিত লড়াই বাধাইলে চীনের সাহায্য পাওয়া যাইলেও রুশিয়ার সাহায্য ভারতের দিকে পুরাপুরি আসিবে; তাহা হইলে পাকিস্থানের যুদ্ধের আগ্রহ ততটা প্রবল হইবে না। ইহা ব্যতীত পূর্ব্ব বঙ্গের যুদ্ধের কথাটাও পাকিস্থানকে চিন্তা করিতে হইবে। বর্ষার পরে যুদ্ধটা পাকিস্থান সেনাবাহিনীর পক্ষে অধিক সুবিধার হইলেও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী হঠাৎ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া যাইবে মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহারাও যুদ্ধ চালাইবে এবং পাকিস্থানের বহু সৈন্য হতাহত হইবে। তারপর আছে অর্থের কথা। পাকিস্থানের অর্থের অভাবও ক্রমশঃ আরো বাড়িয়া চলিবে।

কলিকাতায় সুড়ঙ্গ রেলপথ

কলিকাতায় যত মানুষ একস্থল হইতে আর একস্থলে যাতায়াত করিতে চাহেন ততজন যাত্রীর গমনাগমনের উপযুক্ত যথেষ্ট যানবাহন এই সহরে নাই। অর্থাৎ ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিক্সা যাহা আছে তাহাতে অর্দ্ধেক যাত্রী হয়ত যাতায়াত করিতে পারেন। মানুষ অতি কষ্টকর রকম ভীড় করিয়া যাতায়াত করে বলিয়া হয়ত যাত্রীদিগের শতকরা ৭৫ ভাগের গমনাগমন কোন রকমে হইয়া যায়। কিন্তু অবশিষ্ট শতকরা ২৫জন যাত্রী হয় পদব্রজে গমন করিতে বাধ্য হয়েন নতুবা তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া বহু সময় নষ্ট করিয়া তবে যাইতে সক্ষম হ'ন।

এই অবস্থায় বহু আলোচনা করা হইয়াছে যে কি করিয়া কলিকাতার মানুষ সকলে ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে সক্ষম হইতে পারে। অনেকে বলিয়াছেন বাস ও ট্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি করাইতে। তাহা করিয়াও অবশ্য সমস্যার সমাধান হয় নাই। তৎপরে কথা হইল কলিকাতার সারকুলার রোড ও স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া একটি গোলাকার রেলরাস্তা নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা। এই গোলাকৃতি রেলপথ রাস্তার উপর দিয়া চলিবে অথবা উহা লৌহ নির্ম্মিত উচ্চ মাচা পথে চলিবে সে কথাও আলোচিত হইল। পরিকল্পনাটি উত্তমই ছিল; কিন্তু কেহ কিছু সেজন্য করিল না। কারণ সম্ভবত ঐ জাতীয় রেলপথ নির্ম্মাণ সহজ ও অল্প ব্যয়ে গঠিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের মানুষের কোন সুখ সুবিধার ব্যবস্থাই যদি অল্প ব্যয়ে হইয়া যায় তাহা হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদিগের নেতা মুরুব্বি ও উচ্চপদস্থ আমলা-দিগের মনঃপুত হয় না। অধিক ব্যয় না করিলে কোন কাজ কখনও উত্তম হইতে পারে না এই নীতি অনুসরণে আমরা সহজ সাধ্য কোনও কিছুই করিতে দিতে চাহিনা। অতএব আমরা গোলাকৃতি সমতলে অথবা উর্দ্ধে স্থাপিত রেলপথ পছন্দ করিলাম না। অন্য দেশে অন্য কি বহু ব্যয় সাধ্য যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম।

বিদেশে সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ী চালাইয়া যাত্রীদিগকে নানা স্থলে লইয়া যাওয়া হয়। আমাদিগের প্রকল্প-বিদগণ দেখিতে আরম্ভ করিলেন কলিকাতায় সুড়ঙ্গ রেলপথ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে কি না। ফরাসী, ইংরেজ, রুশিয়ান ও অপরাপর দেশের যন্ত্রকৌশলী বিশেষজ্ঞদিগের আগমণ আরম্ভ হইল। কলিকাতার ভূগর্ভে কতটা মাটি ও কতটা জল তাহার মাপ আরম্ভ হইল। কেহ বলিল সুড়ঙ্গ জলে ডুবিয়া যাইবে; কেহ বলিল জলময় মাটির ভিতর দিয়া বিরাট বিরাট কনক্রীট নির্ম্মিত নল বসান থাকিবে ও রেলপথ থাকিবে সেই দানবীয় নলের ভিতরে; সুতরাং নলের বাহিরে জল থাকিলে কোনও অসুবিধা ঘটিবে না। রুশিয়ান যন্ত্র-বিদগণ সসুড়ঙ্গ রেলপথ নির্ম্মাণের ভার লইতে প্রস্তুত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমাদের দেশে সহজ যাহা তাহা কঠিন হইয়া দাঁড়ায় এবং কঠিন যাহা তাহা ত অসম্ভব হইয়া দেখা দেয়। আমাদের কর্ম্মপরিচালকগণ বহু পুরাতন অতি সাধারণ রেলগাড়ী, বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্যাস তৈয়ারী ও বন্টন, টেলিফোন প্রভৃতি চালাইয়া রাখিতেই নাজেহাল হইয়া যান। তাঁহারা যে জলমগ্ন দেশের জলসিক্ত মাটির অভ্যন্তরে রক্ষিত কনক্রিট নলগুলিকে জলময় করিয়া

ডুবাইয়া দিবেন না এইরূপ আশা করা উচিত কি না বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তদুপরি যে দেশে অর্থাভাব সে দেশে দশগুণ অর্থব্যয় করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনা বুদ্ধির কার্য্য কি না তাহাও বিচার করা উচিত। আমরা সারা দেশটাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে অক্ষমতা প্রযুক্ত গভীর জলে ডুবাইয়া বসিয়া থাকি। সেইরূপ অবস্থায় ভূগর্ভ-স্থিত নলের ভিতরে বসান বৈদ্যুতিক রেলপথ নিরাপদে চালিত রাখা আমাদের কর্ম্মী দলের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং অল্প খরচে খোলা হাওয়ায় বসান রেলপথই উত্তম হইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি?

রাষ্ট্রকর্ম্মে স্বৈরাচার ও একাধিপত্য

আদেশ নির্দ্দেশ দিবার অধিকার প্রভুত্বের পরিচায়ক। অর্থাৎ যাঁহারা অপর সকল ব্যক্তির জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থার, শাসনকার্য্য পরিচালনার ও সকল বিষয়ে হুকুম দিবার জন্য জনগণের দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হ'ন; তাঁহারা যাহা করেন তাহার নাম প্রভুত্ব করা। এই প্রভুত্ব কখন যে অবাধ শর্ত্তহীন স্বৈরাচার ও একাধিপত্য অনুসরণে ব্যক্ত হয় এবং কখন বা সংবিধান নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের সংযম মানিয়া চলে, তাহার কোন চিরস্থির ও সুনির্দিষ্ট পন্থা অদ্যাবধি কেহ নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় নাই। আজ যাহা একান্ত-ভাবে অপর সকল নাগরিকের সকল রাষ্ট্রাধিকার রক্ষা করিয়া চলিতেছে, কল্য তাহাই অবস্থান্তরে পূর্ণরূপে এক বা অল্প সংখ্যক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার দোষদুষ্ট হইয়া সকলের সকল স্বাধীনতা গ্রাস করিয়া জনগণকে রাষ্ট্রীয় দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে। রাষ্ট্রগঠনের নিয়ম রীতিনীতির পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রই মানবীয় অধিকার অস্বীকার করিয়া গঠিত হয় না। লিখিত ও কথিতভাবে সকলেই সর্ব্বজনের সকল অধিকার সংরক্ষণ করিয়া চলেন; কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় যে প্রভু এবং প্রভুর সাক্ষাৎ প্রতিভূদিগকে খুশী করিতে না পারিলে কোনও কিছুই হইতে পারে না। দরবারের যাহারা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাহাদিগের এক কথায় যাহা হয়; সংবিধানের সকল নিয়ম সকল আদালতে আবৃত্তি করিয়াও তাহা হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং যে দেশেই শাসক ও আদেশ নির্দ্দেশদাতাগণ প্রভুত্ব করেন সে দেশেই ক্রমশঃ এক ব্যক্তির বা একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির অল্প সংখ্যক ব্যক্তির ক্ষমতা ক্রমবিকশিত হইয়া স্বৈরাচারী একাধিপত্যে পরিণত হয়। সেই জন্য যে স্থলে জনসাধারণের অধিকার মোটামুটি সুরক্ষিত আছে সে স্থলেই সকল ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত যাহাতে রাজশক্তির অপব্যবহার প্রথম হইতেই নিবারণ করা হয়। কারণ প্রভুত্ব একবার যদি রীতিনীতি পদ্ধতি ও বিধানের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া উদ্দাম স্বৈরাচারের পথে চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে তাহাকে আবার সংযমনের বাঁধনে আবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা একটা অতি অসম্ভব কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই প্রতিনিধি-দিগের উপর ও তাঁহাদের সমর্থিত মন্ত্রীদিগের উপর কড়া নজর রাখা আবশ্যক; যাহাতে তাঁহারা এই কথা মনে না করেন যে শাসন ক্ষমতা ব্যবহারের অর্থ হইল যথেচ্ছাচার।

রুশিয়া কিম্বা চীন দেশেও তর্কের খাতিরে শাসকগণ বলিবেন যে তাঁহারা জনসাধারণের ইচ্ছা অনুসারেই জনগণের প্রতিনিধি হিসাবেই শাসন কার্য্য চালাইয়া থাকেন। তাঁহাদের দেশে যদি রাষ্ট্রীয়দল একাধিক না থাকে এবং শাসকদিগের বিরুদ্ধদল নাই বলিয়া সকল কার্য্যই সকলের মতে চলিতে পারে, তজ্জন্য সেই রাষ্ট্রীয় অবস্থাকে অল্প সংখ্যক লোকের একাধিপত্য বলা ন্যায় সঙ্গত হইবে না। সকলে একমত হইলে তাহার অর্থ এই হয় না যে সকলের মতের কোনও অস্তিত্ব অথবা মূল্য নাই। এই জাতীয় তর্কের উত্তর দিবার প্রয়োজন হয় না কারণ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস হইতে সহজেই দেখা যায় যে যখনই বিরুদ্ধ মত জাগ্রত হইয়াছে তখনই সেই মত অতি শীঘ্র নীরব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সহস্র সহস্র মানুষ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে প্রাণ হারাইয়াছেন

শুধু একটা কারণেই এবং তাহা হইল কম্যুনিষ্ট পার্টি নামধেয় রাষ্ট্রীয় দলের সহিত একমত না হইয়া বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে শাসকদিগের একাধিপত্য ও যথেচ্ছাচার একটা শাসন রীতি-নীতির অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে অন্য ব্যবস্থা চলিতেই পারে না। সাধারণতন্ত্রে তাহা নহে। কিন্তু যেসকল দেশে সাধারণতন্ত্র নবপ্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রীয় দলের প্রাধান্য অনেক সময় প্রবলভাবে দৃষ্ট হয় সেই সকল দেশে দলের নেতাদিগের প্রভুত্বের প্রেরণাও অনেক সময় প্রকটভাবে জোরাল হইয়া উঠে। জনসাধারণ গা ঢিলা দিয়া শাসকদিগকে যথেচ্ছাচার করিতে দিলে ঐ সকল দেশ হইতে সাধারণের অধিকার বিলুপ্ত হইয়া একাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। এইসকল দেশে সাধারণের অধিকার যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় ও একটা জনস্বাধীনতার ঐতিহ্য গড়িয়া না উঠে, ততদিন সকলকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যাহাতে রাষ্ট্র-নেতাগণ স্বৈরাচার ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া দেশবাসীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করেন।

এই স্বেচ্ছাচার ও একাধিপত্যের বাসনা কেমন করিয়া ধরা পড়ে? রাষ্ট্রনেতাগণ নির্ব্বাচনকালে যে সকল অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি করিয়া থাকেন, শাসন ক্ষমতা হস্তগত হইলে পরে তাঁহারা প্রথমত প্রতিজ্ঞা রক্ষার কোনও চেষ্টা করেন না ও দ্বিতীয়ত নিত্য নূতন "আদর্শ" খাড়া করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। অনেক সময় এই নূতন আদর্শগুলি পুরাতন প্রতিজ্ঞার বিপরীত হইয়া থাকে; অনেক সময় পুরাতন পথ ছাড়িয়া নূতন পথে চলিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টাই সকল প্রতিজ্ঞা ও আদর্শের উপরে স্থান লাভ করে। এই সকল লক্ষণ হইতেই জনসাধারণ বুঝিতে সক্ষম হ'ন যে নেতাগণ অতঃপর পথ ও মত উভয়ই বদলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলে তাঁহারা হয় চরম বামপন্থা অবলম্বন করিবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন; নয়ত অতিরিক্ত দক্ষিণ দিকে চলিয়া যান। যাহাই করুন তাহাতে সাধারণের অধিকার খর্ব হয় এবং রাষ্ট্র হয় কম্যুনিষ্ট নয় ফ্যাশিষ্ট আকার ধারণ করে।

পূর্ব্ববাংলায় অবস্থা পরিবর্ত্তন

টিক্কা খানকে পূর্ব্ববাংলার সামরিক "মনসবদারের" পদ হইতে অপসৃত করিয়া তৎস্থলে ডাঃ আবদুল মোতালেব মালিকের নিয়োগ একটা রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। অর্থাৎ যদিও পুর্ব্ববাংলায় একজন সামরিক শাসকও থাকিবেন ও সেই কার্য্যে লেঃ জেনারেল আমির আবদুল্লা খানকে বসান হইয়াছে তথাপি যাঁহারা অবস্থার উন্নতি আশা করেন তাঁহারা মনে করিতেছেন যে অতঃপর ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববাংলায় অসামরিক শাসন পদ্ধতি অধিকতর ব্যাপকরূপ গ্রহণ করিবে এবং সামরিক শাসনের অবসান হইবে। এই সকল উন্নতির সম্ভাবনার আশা যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা মনে করেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও চীনদেশ হইতে পাকিস্থানের উপর চাপ দিয়া এইরূপ করান হইতেছে; কারণ এই দুই মহাদেশ চাহেন না যে বাংলা দেশের উপর সামরিক অত্যাচার ও নিপীড়ন আরও অধিককাল চালিত থাকে। কারণ তাহা হইলে ঐ দুই দেশের পাকিস্থানকে সাহায্য দান করা লইয়া পৃথিবীর দরবারে ক্রমশঃ অখ্যাতি সৃষ্টি হইবে —এখনই যথেষ্ট হইয়াছে। ইহার উপরে পাকিস্থানের উপর রুশিয়াও চাপ দিতেছেন যাহাতে রুশিয়াকে ভারতের সহিত পাকিস্থানের যুদ্ধ লাগিয়া যাইলে কোনওভাবে সেই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে না হয়। অর্থাৎ পাকিস্থানকে যাঁহারা রক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা ভাবিতেছেন যুদ্ধ বিরতিই সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়। তাহাদের মতে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে পাকিস্থান নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। যুদ্ধ চালাইয়া পাকিস্থান মুক্তিবাহিনীকে পূর্ণরূপে পরাস্ত করিবে; এমন কি ভারতের সহিতও যুদ্ধ হইলে ভারতকেও পরাজিত করিবে; এই জাতীয় কল্পনা শুধু বাতুলতার লক্ষণ। যুদ্ধ চলিলে তাহাতে ক্রমে ক্রমে ভারত, চীন, রুশিয়া ও হয়ত আমেরিকা ও অন্যান্য কোন কোন দেশও জড়াইয়া পড়িবে। সুতরাং পাকিস্থানের উন্মাদ নররক্ত পিপাসু সেনাপতিদিগের মতলবের পক্ষে অন্যান্য জাতিরাও ডুবিতে রাজী হইবেন এরূপ মনে করা

সুবিচারের কথা নহে। সকলেই চাহেন যাহাতে যথাশীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ থামিয়া যায় এবং কেহ কেহ চাহেন যাহাতে যুদ্ধ থামিয়া যাইলে বাংলা দেশবাসীর সহিত পশ্চিম পাকিস্থানের একটা কার্য্যকরী সম্বন্ধ স্থির করিয়া শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। ইহা কিভাবে সম্ভব হইবে তাহা স্থির নিশ্চয় ভাবে কেহ বলিতে পারে না। নানান অবস্থার উপর কি হইবে তাহা নির্ভর করে। প্রথম কথা হইল সেখ মুজিবুর রেহমানের তথাকথিত বিচারের কথা। ঐ বিচার চলিতে থাকিলে কোনও কিছুই হইবে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় কথা হইল পূর্ব্ব পাকিস্থান বা বাংলা দেশে দুই লক্ষ পাঞ্জাবী পাঠান বালুচ সৈন্যের উপস্থিতির কথা। এইসকল সৈন্য হটাইয়া না লইলে শান্তির আলোচনা প্রায় অসম্ভব হইবে। কেননা পাক সৈন্য বাংলাদেশে যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ মুক্তিবাহিনী তাহাদিগের উপর আক্রমণ চালাইবে এবং তাহারাও অসামরিক বাংলাদেশবাসীর উপর অত্যাচার করিতে থাকিবে। এই অবস্থায় ঠিক কি ভাবে শান্তি ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ নির্ণয়ের কথা চলিবে তাহা বলা সহজ নহে।

মনে হয় যে সেখ মুজিবুর রেহমানকে ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্ববাংলায় পাঠাইয়া দিলে এবং তাঁহার হস্তে বাংলা দেশের শাসন ভার ছাড়িয়া দিলে কথা আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায় পাকসৈন্যগণ কোথায় যাইবে? তাহারা যদি পশ্চিম পাকিস্থানে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে পাকিস্থান থাকা না থাকা কিভাবে স্থির হইবে? সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ কি সেই ভার গ্রহণ করিতে পারেন? অর্থাৎ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্থানের সম্বন্ধ কি হইবে তাহা কি ইউ, এন, স্থির করার ভার লইতে পারে? সে ব্যবস্থা কি সেখ মুজিবুর রেহমান মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন?

তামিল নাদে মদ্যের পুনরাবির্ভাব

তামিল নাদে (মান্দ্রাজ) বহুকাল মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। ইহাতে ঐ প্রদেশের জনসাধারণের কোন বিশেষ অভাববোধ হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনি নাই। বরঞ্চ গরীব পরিবারের জীবনযাত্রা মদ্যপানে অর্থ অপব্যয় না করার ফলে অনেকটা উন্নত হইয়াছিল বলিয়াই সকলে মনে করেন। কিন্তু সরকারী রাজস্বে কিছু ঘাটতি হইতেছিল। মদ্যের বিক্রয় হইলে যে আবকারী শুল্ক আদায় হয় তাহা বহু টাকার কথা। তামিল নাদ সরকার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন যে উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি অপেক্ষা রাজস্ববৃদ্ধি অধিক কাম্য এবং সেইজন্য বিগত ৩০শে আগষ্ট তাঁহারা নিজ প্রদেশে মদ্যপান বিষয়ে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করিলেন। ঐদিন মাদ্রাজ সহরের পুলিশকে বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে অধিক মাতলামি না করিলে কাহাকেও যেন গ্রেফতার করা না হয়। এই নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও ঐদিন প্রায় ছয়শত লোক মাতলামি, হাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ করার অপরাধে ধৃত হয়। ঐ নির্দ্দেশ না থাকিলে পুলিশ অন্তত ছয় হাজার মাতালকে ধরিত বলিয়া অনুমান করা হয়। যাহাই হউক "শুষ্ক" তামিল নাদের সরস বা সুসিক্ত অবস্থাপ্রাপ্তি নীরবে হয় নাই। মদ্যপের কণ্ঠস্বর মুখর এই দিবস তদ্দেশে বহুকাল জনস্মৃতিতে জাগ্রত থাকিবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার প্রাতে ৬টা ২৪ মিনিটে বর্ত্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অমরলোকে গমন করিয়াছেন। ভাষা ভাব ও কাহিনীর সরস সমন্বয়ে তিনি মহা-কৌশলী ছিলেন। দেশের মাটি, দেশের মানুষ ও দেশের অন্তরের গতিবিধির সহিত তাঁহার যে প্রাণের সম্পর্ক ছিল তাহার উপরেই তাঁহার প্রেরণা ও প্রতিভা জাগ্রত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বহু সম্মান আহরণ করিয়া গিয়াছেন। মানুষ হিসাবে তাঁহার স্থান বহু হৃদয়ে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা তাঁহার পত্নী ও সন্তানদিগের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অহল্যা দ্রৌপদী তারা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

ভূমিকা

তা যাই বলা হোক এটাকে। হতে পারে ইতিহাস। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই এই ধরণের মানুষের কাহিনী ছড়ানো আছে। সাল, তারিখ, বংশ পরিচয় লিখনে তাকে ইতিহাস বলে চালানো যায়। বিশেষ করে বড়লোক রাজা-মহারাজা হলে তো নিশ্চয় সেটা ইতিহাসেই দাঁড়াবে। আর ওসব না থাকলে, সাধারণ মানুষের হলে তাকে গল্প কাহিনী বলেই মনে হবে লোকের। সে যাই হোক ধরে নেওয়া যেতে পারে চিরকালের নারীর একটি সুখ (? মেয়েদের আবার সুখ কোথায়?) দুঃখের পতন উত্থানের সংগোপন আতুর কাহিনী। জীবন যাত্রা নয়, জীবনের আঘাত সংঘাতের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস। আর আমিও জানিনে তার সব ইতিহাস। কাজেই এটাকে গল্প মনে করে নেওয়াই ভাল হবে।

আমি যখন, তাকে দেখেছি তখন তার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। চুলগুলো কাঁচাপাকা। রংটা ম্লান গৌর। মাথার ঘোমটা কপাল অবধি। কর্ম্মিষ্ঠ দেহ। চেহারা দেখলে মনে হয় অভিজাত ঘরের মেয়ে। হোক সে রাঁধুনী ব্রাহ্মণী। লোকে বলে বামুনদিদি। লোকের বাড়ী রাঁধে। আপদে দরকারে কাজকর্ম করে। ডাল বাটে। বড়ি দেয়। চাল ঝাড়ে। ঠাকুর দেবতার পূজায় বাসন মেজে দেয়। পালপার্বণে পূজায় যোগাড়ও দেয়।

আমাদের গাঁয়ে ঘরে যাঁরা খুব নিষ্ঠাশীলা তাঁরা তার হাতে খেতেন না। এবং......। 'ওঃ বামুনদিদি...... না; না ওকে নিরামিষ রান্নাঘরে ঢুকতে দেওয়া কেন গা...।' 'না বাপু ও ওদের আঁশঘরে রাঁধুক না...।' আমাদের রান্না আমরা করে নেব বাছা।'......

বামুনদিদি শুনতে পেত। মুখটা একটু ম্লান হয়ে যেতো। কিন্তু শুনতে না পাওয়ার মত ভান করে আমিষ ঘরের বিরাট কর্মশালায় ঢুকে পড়ত। রান্না চমৎকার। পরিবেশন নিরপেক্ষ ও সুন্দর। পুরুষরা এবং কমবয়সী মেয়েরা আর বালক বালিকারা তার রান্নাঘরের অতিথি। গিন্নীবান্নি যাঁরা ভদ্র-নিষ্ঠুর মুখরা নয়, তাঁরা ঐধরণের 'ঐতিহাসিক' চরিত্রকে 'উপেক্ষা' 'করুণা' ('ক্ষমাঘেন্না') করে মেনে নিতেন। হাতে নাই খেলেন, মুখে ভালকথা বলতে তো আর খরচ নেই......। স্বপাকের ছল করে হাতে খেতেন না—মিষ্ট বাক্যে।

'ইতিহাস' কিন্তু একটা তার ছিল 'কালো' কিম্বা 'মলিন' অথবা 'পঙ্কিল' তা কেউ জানে না। কিন্তু 'জন জিহ্বা' ও 'নারী জিহ্বা' তাকে যখন খুসী পুষ্পিত পল্লবিত করে দিত। যখনি কোনো নতুন জায়গায় কাজ করতে যেত বা গ্রামে নতুন মানুষের সমাগম হ'ত, ওর হাতে খাবার ঔচিত্য দিয়ে জনান্তিকে উচ্চশ্রাব্য স্বগত ভাষণে প্রকাশ্যেই আলোচনা হ'ত।

আর এমনি করেই একদিন আমি একটি রূপবতী কিশোরী পতিপুত্র পিতৃহীনা অনাথ ব্রাহ্মণ কন্যাকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম।

মাও তার বিধবা। একমাত্র মেয়ে ছিল সে। নাম নিশ্চয়ই একটা ছিল হয়ত ভুবনেশ্বরী নয়ত অন্নপূর্ণা কিংবা দুর্গা। কিন্তু আমার কানে সে নামটি পৌঁছায়নি। শবরীর মতই সে শুধু বামুনদিদি, বামুনমা বামুনমেয়ে নামে অভিহিত হ'ত। রাঁধতে আসত সে লোকের বাড়ীতে। গুরুজন গৃহিণীরা কেউ বললেন 'ওমা সেই বামুনদিদি', কতদিন সে কাশীবাস করেছিল......কে জানে কি সে ব্যাপার......।'

আর একজন বললেন 'কেন ঠাকুরঝি আমিতো

জানি এতো আমার মামার বাড়ীর দেশ খলিজপুরের মেয়ে......। ওর মাও তো বিধবা দুঃখী মানুষ। বড় লোকের মেয়ে হলে কী হয়, ভাইদের বাড়ী রেঁধে ঠাকুর সেবা করে, কাঁথা সেলাই করে,পৈতে কেটে দুটো পয়সার সংস্থান করত।'......আর আমি দেখতে পেলাম অনাথা কিশোরী রূপবতী দুর্গাকে। ভাসাভাসা দুটী নির্বোধ হরিণ চোখ। যে দৃষ্টির বুদ্ধিহীনতা সরলতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। পিঠভরা কালো চুল। ঝকঝকে সমান দন্ত-শ্রেণী। সহজ সরল হাসিভরা ঠোঁট। রূপ ছিল বই কি? রূপ না থাকলে তাকে দেখে পুরুষরাও ভুল্‌ত না ভোলাতোও না তাকে। আর অহল্যা পিঙ্গলাদের মত রূপকথার সৃষ্টিই বা হ'ত কি করে?

২

গল্পটা যেন 'বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এলো আমার মনের মত আকার নিল একটা আমার মনে।...এই বামুন দিদির মা ছিলেন, পিতা ভাই-বোন ছিলেন না। মাও ঐ মেয়েটিকে 'পেটে পো' এ অর্থাৎ জন্মের আগেই বিধবা হয়। তারও বয়স ১৫।১৬। এবং রূপ : তা তারও ছিল বৈকি। এবং কখন যে রূপ হয় রূপ, আর কখন হয় কাল, তা আমাদের সীতার, পদ্মিনীর আমল থেকেই সকলেরই জানা আছে। পদ্মিনী, সীতা যদি কালো কুৎসিৎ খাঁদা বোঁচা হতেন তাহলে রাবণ বা আলাউদ্দিন তাঁদের হরণ করতে লুঠতে আসতো না।

কিন্তু বামুনদিদির মার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাপ মা ছিলেন। এই দুর্গার মা ছাড়া কেউ ছিল না।

পথ

প্রয়াগ। কুম্ভমেলা। বেলা দুপুর। চারিদিকে জনস্রোত। আসা আর যাওয়া। তাড়াহুড়ো। ভলণ্টীয়ার। পুলিশ। স্নানার্থী। দর্শক। দুর্বৃত্ত। সাধুসন্ত। দলে বিদলে মানুষে পথ মুখর। পথিক বিভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত।

দুর্গা ফ্যালফেলে উদ্‌ভ্রান্ত চোখেমুখে চুপকরে একটা গাছের ছায়ায় ভিখারীদের পাশে দাঁড়াল।

পরিধানে একটী মোটা খেলো রঙীন তাঁতের শাড়ী। গায়ে সেমিজ আর জামা। হাতে কাঁচের চুড়ী। আইবুড়ো লোহা। গলা খালি। মাথায় একপিঠ চুল ভিজে তখনও। বোঝা যাচ্ছে স্নানটী হয়েছে।

রং বেশ পরিষ্কার। চেহারা সুশ্রী। সুন্দরী বলা যায়। সেই একরকমের সুন্দর যাকে দেখলে অবাক হয়ে মনেহয় ভারি যেন নির্বোধ। অথচ বোকা নয়। সে জানেই না কে ভালো বা মন্দ দেখতে।

সেই রকমের চেহারা।

যার চোখমুখ, ভ্রূ, ঠোঁট সে সব দেখার আগেই মনে হয় বাঃ বেশ দেখতে তো। তারপরেই মনে হয় যেন ভারি ছেলে মানুষ। না ভালো মানুষ! অর্থাৎ নির্বোধ। ভালো লোকেরা যাকে সরল বলেন ভাষায়। কটুভাষীরা বোকা বলেন। আর লোকেরা চেয়ে চেয়ে আবার দু একবার দেখে আর চলে যায়। যাহোক কেউ দাঁড়ায় না। জিজ্ঞাসাও করে না "তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন একলাটী?

কুম্ভমেলায় ভীড়। সাধুসন্ত দর্শন করা। তারপর ভীড় ঠেলে এগুতে হবে সাধু সন্দর্শনে, দেশ দর্শনে। তারপর বাসা অথবা আশ্রয়ে পৌঁছে খাওয়া রান্না বিশ্রাম করতে হবে। তারপরে আবার সহর দর্শন। ওপারে ঝুঁসিতে সাধুদের আশ্রম দর্শন। কল্পবাস। কল্পবাসিনী ও বাসীদের দর্শন। সেই পুণ্যকাজ।

এককথায় কারুর সময় নেই। আর দুর্গা দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রমে দুর্গা ভিখারীদের আশ্রয় স্থানটা ছেড়ে একটু এগোয়।

কি যে হয়েছে আর কি করবে সেও জানে না। শুধু বেশ বুঝতে পারছে সে হারিয়ে গেছে।

কি রকম করে হারালো!

সেই তো! যেমন করে মেয়েরা চিরকাল হারায়। ঘরে হারায়। পথে হারায়।—অভিভাবক বা রক্ষক না থাকলে জগতের পথে চিরকালই হারায়। আবার

থাকলেও হারায়। সেটা যে কি ব্যাপার আমরাও জানিনা।

॥ ২ ॥

সহসা কাকে কে যেন বললে "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!" ঘটনাটাই তাই বটে। তবে যে বললে ওই মেয়েটি বা কপালকুণ্ডলা নয় :—

বললে তিনটি ছেলের দল যাদের কাঁধে পিনে আটকানো কি একটি ফুল রেশমের। গায়ে ব্যাপার ধুতি গরম সার্ট বা কোট ৪০।৪৫ বছর আগের পোষাক।

এবং ভাষাটাও 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' নয়। একজন বললে, 'দাঁড়িয়ে কেন? রাস্তা চেনা নেই?' সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন বললে "রাস্তা তো সোজা। সঙ্গের লোকেরা কই? লোক নেই?"

রূঢ়ভাবে তৃতীয়জন বললে 'একলাই নাকি'—

অর্থাৎ যেন ওকে আপনি বলবে কি তুমি বলবে ঠিক করতে পারছিল না তারা। প্রায় সমবয়সী কিংবা মেয়েটাই বয়সে ছোট। ১৮।১৯শের বেশী বয়স নয় মনে হচ্ছে।

আর অরক্ষিত একলা ঐ বয়সের মেয়ে তাকে সম্ভ্রম করে সম্মান করে আপনি বলা যায় কি? অথচ দেখতে যেন ভদ্র ঘরের মেয়ে।......

আবার নিজেরাও ভদ্রঘরের ভলণ্টীয়ার ছেলে।

॥ ৩ ॥

মেয়েটি তিনজনের তিনরকমের একই ধরণের প্রশ্নের উত্তর কি দেবে বুঝতে পারল না। একটু তাকিয়ে রইল বোকার মতই।

তারাও কাছে দাঁড়িয়ে। চারিদিকে আসা যাওয়া যাত্রীর দল একটু দেখছে, দাঁড়াচ্ছে কেউ কেউ। আবার চলেও যাচ্ছে।

একটা লাল পাগড়ী ধরাও কাছাকাছি পথের দড়ির বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে।

যতক্ষণ মেয়েটি একলা ছিল ততক্ষণ জনতার কৌতূহল থাকলেও তত বেশী ছিল না।

এখন ঐ তিনটি কিশোর ও যুবককে মেয়েটির কাছে দাঁড়াতে দেখে স্নানার্থী, পুলিশ, দোকানী, পথিক সকলেরই কৌতূহল প্রকাশ হয়ে উঠল।

এবারে একটি যুবক বললে 'আমরা পৌঁছে দিতে পারি ঠিকানা পেলে।' সঙ্গে কে আছে? আমরা ভলণ্টীয়ার। স্বেচ্ছাসেবক অর্থাৎ এখনো 'আপনি' বলার ইচ্ছে হচ্ছে না যেন তাদের।

এবার মেয়েটা বললে—'আমার মা আর মামীরা আর মামীর ভাই আছেন সঙ্গে। ঠিকানা তো কিছু নেই এখানে। আমরা কাশী থেকে বাসে এসেছি। সন্ধ্যের আগেই আবার সেখানে ফিরে যাবার কথা ছিল বাসে করেই।'

'কাশী থেকে? কখন উঠেছেন?' (এবারে আপনি) এখানে কখন এলেন?'

"কাল সন্ধ্যায়। রাত দুটো থেকে হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গমে পৌঁছেছিলাম ভোরে। নৌকায় সঙ্গমে নেয়ে ঘাটে এসে ভিড়ে হঠাৎ সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল......। মার আঁচলটা আমার আঁচলে বাঁধা ছিল, কিছু আলগা ছিল বোধ হয় গেরোটা"—। তার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। গলা ধরে গেল। আর মাদের কারুকে দেখতে পেলাম না। তখন নাগারা স্নান করতে আসছিলেন—পুলিশ আমাদের সরিয়ে দিচ্ছিল—। মার হাতটা ধরেছিলাম হঠাৎ লোকের ধাক্কায় হাতটা ছেড়ে গেল...। ছেলেদের একজন প্রশ্ন করল, 'কতজন ছিলেন আপনাদের দলে—কারুকেই পাওয়া গেল না? সবাই মেয়ে—পুরুষ ছিল না কেউ?'

মেয়েটি চোখ মুছল। বললে 'আমরা ছজন মেয়ে মানুষ—দুজন মামী, এক মাসী, মা, আমি আর একজন পাড়ার মেয়ে—আর পুরুষ মামীর ভাই ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে চলছিলাম তো পথ করে করে।'—

'কোন জায়গা থেকে এসেছেন?'

'হাওড়া রামরাজাতলা থেকে।'

পথে ভিড় ঘন হয়ে উঠতে লাগল। টুকরো টুকরো উপদেশ মন্তব্যও শোনা যেতে লাগল।

তবে সকলেই যাত্রী স্নানার্থী। হয় স্নান করতে যাবার তাড়া, নয় ফিরে যাবার তাড়া। পথে চলতি অবস্থাতেই তাদের উপদেশ আর মন্তব্য ছিটকে ছিটকে আসে।

"আরে পুলিশের হাতে দিয়ে দাও না হে।"

"রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের কাছেও দিতে পার।"

'হারিয়ে গেছে না হাতি পালিয়ে এসেছে।'

"হ্যাঁ কচি খুকী তো নয়। ছ ছটা মাসী আর একটা পুরুষ সঙ্গী রয়েছে, আর এই ১৬।১৭ বছরের ছুঁড়ী মেয়েকে তারা আগলে ধরে রাখেনি?"

'আর বলে মা, মাসী, মামীরা। সব আপনার লোক। পাড়ার লোক নয়, পড়শী নয়। ছুঁড়ী বজ্জাত।'

'বয়সটা দেখছ না? কোনো ছোঁড়া সঙ্গে আছে নিশ্চয়ই।'

'দিয়ে দাও ঐ লালপাগড়ীর হাতে। ঝঞ্চাট মিটুক। একজন কে বললে, আহা, না। পুলিশের হাতে দিও না। তাহলে কি আর মান-সম্ভ্রম রক্ষে হবে। বয়সটাও তো ভালো নয়? ঐ কোনো আশ্রমেই দিয়ে দাও হে। ঝামেলা?'

মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়ে। কথা বেরোয় না গলায়। কাকে কি বলবে বুঝতেও পারে না।

ছেলেগুলোর মায়া হয়। দয়া হয়।

বড় ছেলেটি বল্লে। 'তোমার কাশীর ঠিকানা জানো তো?'

সে চোখ মুছে বল্লে 'বাড়ীর ঠিকানা?'

'হ্যাঁ বাড়ী কোনখানে, কাদের বাড়ী?'

বাড়ীটা আমাদের দেশের একজন লোকের—জানা লোকের বাড়ী। অগস্তকুণ্ডে। ঠিকানা জানি না। কর্তার নাম রামচন্দ্র চৌধুরী।

ছেলেদের দল মুখ তাকাতাকি করে নিজেদের মধ্যে বললে 'তা পৌঁছে দেওয়া যায়। হয়ত মা, মাসী ওদেরও সেখানে পাওয়া যাবে। কি বল?' তোমাদের সঙ্গীরা কি ফিরে ওখানেই যাবেন? জানো। 'তুমি' বলে ফেললে। মেয়েটি ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'ঠিক জানি না। কেউ বলছিল কাশীতে দু তিনদিন থাকবেন। কেউ বলছিলেন আর দেরী করলে বাড়ীতে অসুবিধা হবে। হয়ত ফিরে গেছেন সেখানে।' 'তুমি বাড়ী চিনতে পারবে?' সবচেয়ে বড় ছেলেটি বললে। একটু ফ্যালফ্যাল চোখে সে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে 'পারব বোধহয়'।

ওরা তিনজন আবার চুপ করে ভাবতে লাগল। একজন বললে 'কিন্তু আমাদের তো সন্ধ্যে অবধি ভলণ্টীয়ারের ডিউটী—সরিৎ তোদের কার কখন অবধি? সে যদি নিয়ে যায়? সরিতই বড়। সে বলল, গেলে তিনজনকেই বা দুজন যেতে হয়। একলা মেয়ে নিয়ে গেলে দেখতে ভালো হবে না। তারা বিদেয় করে দেবে।'

'গোপাল তোমার ডিউটী কতক্ষণ?'

গোপাল বললে 'ঠিক বলেছ। আমার ডিউটী সন্ধ্যে ছটা অবধি।'

'অসীমদা তোমার কখন অবধি?'

অসীম হাসল, বল্লে, 'যোগ শেষ ৪টে ২৫মিনিটে-তারপর যাত্রী পথে ভাঙবে, ঘাটে থেকে বেরুবে দলে দলে, সকলেরই সেই হতে-করতে ৬টা অবধি ডিউটী করতে হবে। তবে কারুর ওপর ভার দিয়ে হয়ত বেরিয়ে আসা যায়। ক্যাম্প বা আপিসেও তো এখন কারুকে পাওয়া শক্ত। মোটে ১টা এখন।'

তিনজনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

বাড়ী তিনজনের তিন জায়গায়। এখানে এসে চেনা হয়েছে মাত্র, একজন হাওড়া, একজন খিদিরপুর, আর একজন বারাসাত স্বেচ্ছাসেবক সমিতির।

সরিৎ বলল 'তাহলে সঙ্গে তো নিয়ে ঘোরা যাবে না। কোনো একটা সেবাশ্রমে কিম্বা থানায় বসিয়ে রেখে সন্ধ্যেবেলা তিনজনেই নিয়ে যেতে হয় কাশীতে। এরমধ্যে কিন্তু যদি ওর সঙ্গীরা ওকে খুঁজতে আসে? তাহলে? মেয়েটার দিকে তিনজনেই চাইল। এখানে

দাঁড়িয়ে থাকলে হারিয়ে যাবে। মেয়েটা চুপ করেই চেয়ে রইল।

সরিৎ। 'আচ্ছা চল ঘাটের দিকেই নিয়ে যাওয়া যাক্ কি বল? কারুকে চেনা দেখতে পেতেও পারি —না হলে সন্ধ্যের গাড়ীতে, বাসে কাশীতে নিয়ে যাওয়া যাবে। এখন সঙ্গেই থাক্।'

'তোমার নামটা কি জানিনে তো। আপিসে আবার নাম লেখাতে হবে।'

'সন্ধ্যাবেলা বাড়ী চিনতে পারবে তো কাশীতে।' মেয়েটার নাম 'দুর্গা' বলল। বাপের নাম উমাচরণ চক্রবর্তি। মার নাম ভুবনেশ্বরী। মামাদের নামও বললে, কিন্তু বাড়ী ঠিক চিনতে পারবে কিনা বলতে পারল না। অসীম বললে তাহলে এককাজ করা যাক্, ও আমাদের সঙ্গে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাক্ আমরা তিন-জনেই রাত্রের ট্রেনে যাব। সকালে বাড়ী খুঁজে নেওয়াই সুবিধে হবে। রাত্রে চিনতে পারব না কেউ।'

পাশের ভিড় কমে এসেছে। বেলা হয়েছে তো। সকলেরই বাড়ী ফেরার তাড়া।

॥ ৪ ॥

অগস্ত্যকুম্ভের গলি তো আর একটুখানি নয়। কোন বাড়ীটা? কোন জায়গায়? পথে যাত্রীর স্রোত। কাশীর প্রসিদ্ধ গলি। সে গলি-ঘুঁজিতে এক রাত্রি-দিনে অজানা একটি বাড়ী খুঁজে বের করা বিষম 'গোলক ধাঁধাঁ' খোঁজা।

"এই বাড়ী?" ছেলেরা জিজ্ঞাসা করে।

দুর্গা বলে, "দেখি।"

একটা দরজার সামনে দাঁড়ায়। রকের মানুষ কি বাড়ীর প্রাঙ্গণের কেউ জিজ্ঞাসা করেন, 'কে? কাকে চাই?'

কুম্ভমেলার ভিড় আর যাত্রী অতিথি তো কাশীতেও ভরে আছে তখনো। 'কল্পবাস' ফেরৎ পরবর্ত্তী যোগের অতিথি যাত্রীর যাওয়া আসাও যত,থেকে যাওয়া আত্মীয় বন্ধু স্বজনও'তত ঘরে ঘরেই।

এরা দাঁড়ায় তিনজন পুরুষ একজন মেয়ে। বিচিত্র সমাবেশ। ছেলে মেয়েদের আবার বয়সও বেশী নয়। বাড়ীর লোকেরা অবাক কুটীল সংশয়ভরা চোখে চায়। কুম্ভমেলার যাত্রীর মত তো এরা নয়।

"কাকে খুঁজছ?"

ওরা বেরিয়ে আসে দরজার কাছ থেকে।

দুর্গা বলে, "এ বাড়ী নয়। সে বাড়ীতে রক ছিল না।" আবার অন্য বাড়ী। এ বাড়ীতে রক আছে। রকে কয়েকটী বালক-বালিকা, একটী বৃদ্ধ বসে। দুতিন জন বর্ষীয়সী গঙ্গাজলের ঘটী হ'তে কাঁধে পট্টবস্ত্র ফুলের সাজি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সন্দিগ্ধ কৌতুহলে ওদের দিকে চাইলেন, "কোত্থেকে আসছ? কাকে খুঁজছ?"

সেইটাই তো কারুর জানা নেই। এক মা দুজন মামী সেটাতো কোনো পরিচয় কারুর নয়।

'পুরুষ কে ছিল সঙ্গে? নাম? জানো না? অবাক। সবাই গালে হাতে দিলেন।

"এ বাড়ী নয় দুর্গা বললে মৃদুস্বরে। তাঁরা দাঁড়িয়েই ছিলেন বললেন ব্যঙ্গের সুরে সে অন্য পাড়ায় যাও গো, এ পাড়া ভদ্রলোকের পাড়া।'

তিনজনের মুখ লাল হোয়ে উঠল। দুর্গা মাটী হয়ে গেল যেন। ও ব্যঙ্গ বোঝবার বয়স হয়েছে তার।

সরিৎ বলে, 'চল এ গলি শেষ করি।'

তাদের তো জানা নেই, যে কাশীর গলি শেষ হয় না। যে মুখে গেছে সেই মুখেই ফিরতে হয়।

রকে বসে ছিলেন জন দুএক বৃদ্ধ, বললেন, 'কোথায় যাবে? কার বাড়ী খুঁজছ?'

"রাম চৌধুরীদের বাড়ী।"

"রাম চৌধুরী?" ওদের দিকে তির্য্যকদৃষ্টিতে চাইলেন "ওদের বাড়ীর যাত্রীদের একটী মেয়ে "কুম্ভ'তে হারিয়ে গিয়েছে শুনছিলাম। তোমরা নাকি? তারা? তা ওদের তো একজন ফিরে গেছে। একজন দুজন আবার সেই মেয়ের খোঁজে পেরাগেই রয়ে গেছে মা, মামীও সেখানে শুনলাম। তা পেরাগ থেকে কাশী নিয়ে

এসেছ ছুঁড়ীকে। এই মেয়েটাই তো? কোথায় পেলে ওকে? ছিল কোথায়?"

জেরার চোটে ছেলেরা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারপর বললে, "আমরা কুম্ভমেলার ভলণ্টিয়ার তিনজন ওকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর দলের খোঁজ খবর করছিলাম। সেখানে কারুর ঠিকানা না পেয়ে এখানে এসেছি রাম চৌধুরীর ঠিকানায় যদি তাদের পাই।"

সন্দিগ্ধভাবে বৃদ্ধ বললেন দুর্গার দিকে চেয়ে 'অত-লোকের সঙ্গে থেকে হারিয়ে গেলে? কারুকে খুজে পেলে না?' অপর বৃদ্ধটি মৃদু হেসে বললেন, 'খুঁজে ছিলো যাদের তাদের পেয়েছে তো?

ছেলেরা আরক্ত হয়ে উঠল। গোপাল বলল, 'তাহলে একটু রাম চৌধুরীর বাড়ীর ঠীকানাটা বলে দেবেন কি?'

প্রথম বৃদ্ধ বললেন, "অগস্ত্যকুণ্ড তো আর একটুখানি গলি নয়। তিনচার মোড় এগিয়ে যাও। কারুকে পথে জিজ্ঞেস করে নিয়ো। বাড়ীর নম্বর আমরা জানিনা বাড়ীখানা চিনি বটে। ঘুরতে হবে গলি কটা।"

অসীম বললে, যদি একটু কেউ দেখিয়ে দিত। কোনো ছোটছেলে কি ঝি-চাকর?'

'সকালবেলা ছেলে ঝি, চাকর কার জন্য বসে আছে।' একটু খুঁজলেই পাবে। এগিয়ে সোজা যাও, তারপর বাঁদিকে, তারপর ডানদিকে গিয়ে কারুকে জিজ্ঞেস করে নিয়ো।' রকের বাইরে কাছে কাছে লোক জমেছে একটা দুটী করে অনেক।

শোনা গেল 'মেয়েটী হারিয়ে গেছে আহা!' 'আহা না কচু। মেয়েটী পালিয়ে এসেছে ওদের সঙ্গে। 'তাহলে বাড়ী খুঁজছে কেন? হারিয়েই গেছে।

॥ ৫ ॥

ডাইনে বাঁয়ে, বামে দক্ষিণে সামনে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করতে করতে একজন বললে, ওই যে রামবাবু-দের বাড়ী, রামবাবু ভোরে গঙ্গাস্নানে যান বেলা দশটার আগে ফেরেন না।'

'কে আছে বাড়ীতে?' ওরা কড়া নাড়ে।

মেয়েটি এক পা দুপা করে ভেতরে ঢোকে। বাড়ী ভরা নারী। 'কে বাছা? কোত্থেকে আসছ?' একজন নারী জিজ্ঞাসা করলেন।

মৃদুস্বরে মেয়েটী কি জবাব দিলে।

একজন গৃহিণী বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে নীচে উঠানের ঘরের একবাড়ী লোকের জলন্ত দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হ'ল।

গৃহিণী বললেন, 'ও তুই! দুর্গা! মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলি না?'

আর একজন বললেন, 'হ্যাঁ গো। অবাক কাণ্ড। হারিয়ে ছিল তো! সকাল বেলা তিনটে ছোঁড়া জুটিয়ে আজ এখানে এসেছ। আর মা, মামী পেরাগে 'হন্তে' হয়ে খুজে বেড়াচ্ছে। আজ কি কাল ভোরে তাদের দেশে যাবার কথা। কি ব্যাপার তোর!'

ইনি একজন সহযাত্রিনী।

দুর্গা কেঁদে ফেললে। বল্লে, "তোমাদের দলছাড়া হয়ে গিয়ে কত খুঁজলাম তখন ঠাকুমা!"

বাধা দিয়ে বাড়ীর গৃহিনী বললেন "তা ওরা কারা?"

এবারে ছেলেরা নিজেদের পরিচয় দিলে।

ভ্রু কুঞ্চিত করে এক গৃহিণী বললেন, 'ভলণ্টিয়ার! একেবারে সেপাই জুটিয়ে এনেছ?

আর একজন বললেন, 'তা' বেশ করেছ, এখন তোমার মা সেখানে! আর তুমি এখানে। যোগাযোগ করবে কে বাছা, ঠিকানা তো কেউ কারুর জানে না। ওরা পেরাগে ধরমশালায়, আশ্রমে কোথায় থাকবে তাও তো জানা নেই। তোমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছি তা জানবে কি করে!

বাড়ীর গৃহিণী কিছুক্ষণ নীরবে থেকে বললেন, 'তোমরা বাবা ওকে পেরাগেই মাকে খুঁজে দাও গে। আমি কোথায় রাখব। কার না কার সোমত্ত মেয়ে। তোমার মাঁতো আবার চেনা নয়। যাত্রীর যাত্রী। 'মাসীমার কুটুম।' তার দেশ ঘরই আমাদের জানা নেই।

আমার বোনের জায়ের সঙ্গে এসেছিল, এই মাত্র জানি। তোমরা আজই, ফিরে খুঁজে নাও ওর মাকে। না হয় দেশে ফিরে যাক্।' সব গৃহিণী ও নারীরা একমত হলেন।

॥ ৬ ॥

বিব্রত ছেলের দল বিষণ্ন বিপন্ন দুর্গাকে নিয়ে পথে নাবেন। অচেনা দেশ। ধর্মশালা বা যাত্রীনিবাসে বলে কোথায় কী আছে কাশীর মত জায়গায়—কাশীর স্থায়ী অধিবাসী ভদ্র ও সাধারণ নিত্য যাওয়া-আসা যাত্রী সমাকুল—নানা স্তরের নানা জীবিকাজীবি মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়াই সঙ্কট।

তার ওপর সবচেয়ে বড় সমস্যা ভলণ্টীয়ারদের যাওয়া-আসার পথ খরচ যা তাতো সেবা সমিতিরা দিয়েছে, কাজ শেষ হলে ফেরৎ টিকিট দেবে ফিরে যাবে। থাকতে বা বেড়াতে তো আসেনি। এই সুযোগে দেশ দেখার জন্যই ওরা নাম দিয়েছিল। আবার যে এলাহাবাদ ফিরে যাবে ট্রেণ বা বাস ভাড়া দিয়ে এবং থাকবে কোথায়—খাই খরচ করবে—সেটাই বা কোথায় পাবে। আর ফিরে যে যাবে দুর্গাকে নিয়ে—তার দেশে সে ভাড়াই বা কোথায় পাবে তারা।

বিপন্নভাবে তারা নিজদের পকেট ও ছোট ছোট মনিব্যাগগুলি খুলল। হাতড়াল।

নাঃ, যা আছে তাতে দুর্গার যাবার ভাড়া হয় না।

কাশীতে থাকতে যে খরচ হবে তাও তো ভাববার কথা। চারজনে খুঁজে পেতে একটা ধর্মশালায় উঠল। এলাহাবাদে ফিরে গেলেই কি ওই কুম্ভযাত্রীর জনারণ্যে দুর্গার মা-দের খুঁজে পাবে। যদি ওই রাম চৌধুরীরা থাকতে দিতেন তাহলে হয়তো দুর্গার মাই তাকে খুঁজে নিতো।

দুর্গা চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে চোখ মোছে। ওরা চা খায় সবাই। গোপালই সবচেয়ে ছোট। সবাই নীরব।

গোপাল বললে, 'অসীমদা আমার তো কলেজ খুলে যাবে। শ্রীপঞ্চমীর ছুটীতো মাত্র দুদিন, আমাকে ফিরতেই হবে। আমি বাড়ী ফিরে যাই, তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা দাও, সেখানে সব কথা বলে কিছু টাকার যোগাড় করে পাঠাব। তুমি আর সরিৎদা দুর্গাদিদিকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো।

সরিৎ বললে, 'কথাটা ভালো, কিন্তু আমারো তো কলেজ খুলে যাবে। আমারো আজকালই যাওয়া দরকার তোমার সঙ্গেই। দুর্গা তোমার ঠিকানাটা কি দেশের? সেখানে খবর দিলে টাকা পাঠাবে তারা? আর মার খবর পাবে?

এবার দুর্গা শুকনো মুখে তাদের দিকে চাইল। বললে, 'সেখানে যদি মা পৌঁছে থাকেন তাহলে মা টাকা দিতে পারবেন। ধার ধোর যা করে হোক। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা কি টাকা দেবেন? সব রাগ করবেন মার ওপরে।

অসীম বললে, 'আমার আপিস। ছুটীও পাওনা আছে। কিন্তু কাশীর মত জায়গায় দুর্গাকে নিয়ে একলা কোথায় থাকব? তোমরা গিয়ে টাকা পাঠাবে ততদিনই তো থাকতে হবে। সেও তো কি পরিচয়ে কি ভাবে থাকা হতে পারে?

সকলেই চুপ করে থাকে। যদি বা তিনজন ছেলে একজন মেয়ে একঘরে একত্রে থাকা চলে কোথাও, একজন অনাত্মীয় মেয়ে আর অচেনা পুরুষ; সে তো অসম্ভব সাধ্য সমস্যা। সবাই তারা জানে সে সমস্যা কেমন। এবং গোপাল ও সরিৎকে যেতে হবেই। গোপালই সবারির চেয়ে ছোট। গোপাল বললে, 'দিদি একটা ব্যবস্থা করতে পারবই নিশ্চয়। ভেবো না।

শুধু জানা নেই কারুর সে ব্যবস্থাটা কি।

॥ ৭ ॥

শপথ

দুজনে সারাদিন ধর্মশালা আর গৃহস্থবাড়ী এবং বাসাবাড়ী খুঁজে বেড়ায়। দুর্গাকে কোনো মন্দিরের চাতালে বসিয়ে একজন কাছাকাছি থাকে।

ঘর পায়। ধর্মশালাও পায়। কিন্তু একটাই ঘর। মালিক প্রশ্ন করে, 'কে কে থাকবেন। স্বামী স্ত্রী? ভাই বোন? এক কথায় মেয়েটী কে। সম্পর্কীয়া? নিঃসম্পর্কীয়া?……পলাতকা? সম্পর্কের সত্যকথা বলেত দ্বিধা দেখেই তাদের মুখে কুটীল কুৎসিৎ ইঙ্গিতময় হাসি জেগে ওঠে। কেউ তৎক্ষণাৎ বলে দেয়, 'না আমার জায়গা নেই।'

আবার স্পষ্ট করে কেউ বলে, 'আমরা ওরকম লোক নই। আপনি অন্যপাড়া দেখুন।'

বেলা পড়ে আসে। হঠাৎ দশাশ্বমেধের কাছে কালীমন্দিরের গলিতে মেয়েদের ভিড় দেখে অসীম চকিত হয়ে কি যেন ভাবলে।

মন্দিরে গিয়ে কিছু প্রণামী দিয়ে মা কালীর খাড়া থেকে সিঁদুর চেয়ে নিল একটী বিল্বপত্র করে। মন্দিরের পূজারী ও তার সেবিকা নারীকে জিজ্ঞাসা করল, জানা শোনা কোথাও একখানা ঘর পাওয়া যাবে। আমরা থাকব।

পূজারী বললে, কে কে? কজন?

অসীম। "আমরা স্বামী স্ত্রী। এরা দুটি ভাই আমার সম্পর্কীয়।"

'হ্যাঁ ঘর আছে।'……এক নিমেষে সব সমস্তাই সমাধান হয়ে গেল।

ওরা ঘর দেখে এলো। পূজারীরই বাড়ী। বাড়ীতে নারীই অধিবাসিনী বেশী।

॥ ৮ ॥

পথে এসে গোপাল বললে, 'অসীমদা কি করে বিয়ে করা বৌ বলে দুর্গাদিদিকে নেওয়া যাবে ভাবলে না? সিঁদুর শাঁখা নোয়া না থাকলে ঘোমটা না দিলে, কি রকম হবে? সরিৎ বললে, 'আর অসীম তুমি কি ওর স্বজাত? ওরা কি জাত তাও তো জানো না? কি রকম ব্যাপারটা হবে? বিয়ে হতে পারবে তো?'

অসীম বললে, "তোমরা কাল চলে যাবে। আমি একলা ওকে নিয়ে কি করে থাকব? যতদিন না ওর টাকা আসে বা ওর মা আসে। অন্ত আর কি পরিচয়ই বা কি হতে পারে। আপাততঃ আর কোনো সমাধান নেই দেখেই ওই মা কালীর খাঁড়ার সিঁদুর পরিয়ে ওকে বৌ বলে পরিচয় দিতে হবে।"

বললে—"জাতটা অবশ্য জানা দরকার হবে বিয়ে করতে হলে। সকলেই চুপ করে রইল। জাত? দুর্গা, বিয়ে? সত্যি বিয়ে হতে পারবে?"

সন্ধ্যাবেলা একটা অপেক্ষাকৃত কম নির্জন গঙ্গার ঘাটে চারজন এসে দাঁড়াল।

দুর্গার জাত? হ্যাঁ ব্রাহ্মণ। অসীমও ব্রাহ্মণ।

সকলেই যেন আশ্বস্ত হ'ল। তবে বিয়েটা হতে পারবে। তাহলে সিঁদুর পরাক। লোহা তো হাতে আছেই। আইবুড়ো লোহা।

দুর্গা সভয়ে সজলচোখে বললে, 'এতো মিথ্যে মিথ্যে বিয়ে।' কেঁদে ফেলল, 'আমি দেশে গেলে লোকে আমায় কি বলবে সিঁদুর পরা দেখলে?'

সান্ত্বনা দিয়ে গোপাল বললে, "মা কালীর সিঁদুর। অসীমদা দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে দিদি, ঠিকমত করেই।"

অসীম বললে, 'আর উপায়ই বা কি? সিঁদুর লোহা না পরলে মাথায় সিঁদুর না থাকলে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

বিয়ে করবে? বিয়ে? বিয়ের প্রতিজ্ঞাবাক্য কিন্তু চট্ করে উচ্চারণ করতে পারে না যে।

দেখাই যাক না। টাকা পাঠাক ওরা। ওর মা আসুক না? কিন্তু নিজের বাপ মা কি মতামত দেন সেটাও মন চুপি চুপি এখন ভাবছিল। কথাটা বলে ফেলার পর সিঁদুর নেওয়ার পর।

সরিৎ নীরব। গোপালও চুপ করে রইল।

দুর্গা সভয় সজল চোখে শীতের সন্ধ্যায় শান্ত কাশীর গঙ্গার কূলে একটা চাতালে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার আকাশ নক্ষত্র তারার সামনে কোন্ অজানা তিথির অজানা লগ্নে অসীমের হাতে মাথায় সিঁদুর পরল। শাঁক নয়, উলুধ্বনি

নয়, মালা মন্ত্র শালগ্রাম শিলা ফুল চন্দন নয়। শুভদৃষ্টি শুভবিবাহ নয়। কেউ হাসল না। কেউ কথাও বলল না। অজানা সত্য অজানা মিথ্যায় মেশা দ্বন্দ্ব ভাবনায় চারজনেই স্তব্ধ বিমূঢ় যেন।

এ কি সত্য? এ কি মিথ্যা? এ কি ছলনা? আত্মপ্রবঞ্চনা?

এ কি দুর্গাকে রক্ষা? এ কি সব মিশানো একটা গোলক ধাঁধা। মনে কিন্তু সবাই ভাবে—কিন্তু আর কি বা উপায় ছিল।

॥ ৯ ॥

টাকা সংগ্রহ হলেই পাঠাবে এবং দুর্গাদের বাড়ীতে ও অসীমদের বাড়ীতে খবর দেবে, সব কথার আশ্বাস দিয়ে গোপাল ও সরিৎ ফিরে গেছে। ভাড়া করা সেই ঘরখানাতে দুটি মাদুর সুজুনি কম্বল যোগাড় করে পেতে এখন বিছানা হ'ল ঘরের এধারে ওধারে।

শঙ্কিত বুক আঠারো উনিশ বছরের দুর্গা চুপ করে বিছানার ওপর বসে থাকে।

দোকান থেকে কি খাবার কিনে এনে অসীম খাওয়ার ব্যবস্থাও করে। রান্না করার জন্যও দালানের একটা কোণ নাকি পাওয়া গেছে—তাও দুর্গাকে বলে।

॥ ১০ ॥

বিপথ

একটা রাত। প্রথম রাত্রি। দ্বিতীয় রাত্রি, তাও কাটল।

একটু নির্ভয় দুর্গা।

নিস্তব্ধ কাশীধাম। রাত্রি নিশুতি।

অসীমের ঘুম আসে না আর। তার মধ্যে মানুষের আদিম সেই জন্তুজীব মানুষটা জেগে উঠেছে। চিরকালের মানুষের মনের সেই দেবরাজ ইন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেছে।

দুর্গার ঘুম ভেঙে গেল। দেখল সেই ইন্দ্রটা পাশে বসে। সে আর্তস্বরে উঠে বসে কি বলতে গেল। সেটা বললে, 'চুপ করে থাক। আমাদের তো বিয়ে হয়ে গেছে। পাশের ঘরে শুনতে পাবে। চুপ করো।

দুর্গা পাথর হয়ে গেল। অহল্যা হয়ে গেল।

॥ ১১ ॥

একদিন দুদিন করে দশদিন কেটে গেল।

নাঃ—দুর্গার মার চিঠি এলো না। খবরও এলো না। শুধু অসীমের জন্য টাকা এলো। তার বাবা পাঠিয়েছেন এবং খুব দরকার আপিসের কাজে ফিরে যেতে হবে পত্রপাঠ। জানিয়েছেন।

আর এলো গোপালের সঙ্গোপন চিঠি। দুর্গাদের বাড়ীর খবর। দুর্গার মা'রা ফিরেছেন। কিন্তু দুর্গা? গ্রাম জানে দুর্গা মারা গেছে।...এবং মা ও মামীও বললেন, 'হতভাগী মরেই যাক্।...সেই ভালো হবে।' পুরুষরা বললেন, 'ওর কথা আর আলোচনায় দরকার নেই। যা হবার তা' হয়ে গেছে চিরকালের মত।'

এতদিন পরে ওঁকে আর ফিরিয়ে আনার কথা ওঠে না।—ফিরবে কোথায়—কোন পৃথিবীতে?

জায়গা নেই। কোথাও আর জায়গা নেই দুর্গার। তারপর দুঃখিত মনে লিখেছে, 'অসীমদা তুমি ওকে কাঁলীর সিঁদুর পরিয়েছ। তুমিই ওকে রক্ষে করো বিয়ে করে। বেচারী দুর্গাদিদি। আর বাধাও তো কিছু নেই। একজাত ও ভালাঘরের মেয়েও। ওদের বংশ ভালো, বিয়ে হয়ে গেলে সবাই নিয়ে নেবে ওকে।

পিতার চিঠিতে কড়া আদেশের সুর।

'আশ্চর্য্য'। তার ভালোই লাগল সেটা। নিজের অপরাধী মনের কাছে যেন সেটা বেশ ভালো 'কারণ' কৈফিয়ৎ'। যতো হবে শীগগীর। বাবা রাগ করবেন।' উপায় নেই আর থাকার।—কি আর করা যেতে পারে অবশ্য হ্যাঁ বাবার মত হলে এসে দুর্গাকে নিয়ে যাবে। বিয়ে করবে।'

কিন্তু সেই অপরাধী অসংযমী মনেরই ক্রমে দুর্গাকেই অপরাধী মনে হচ্ছে এখন। আর সহ্য হচ্ছে না যেন দুর্গার কান্না, দুর্গার ভয়, তাকে আঁকড়ে রাখার ব্যাকুল চেষ্টা। মন বিমুখ হয়ে থাসে। বিয়ে তো করবে বলছে (ওঁদের মত হলেই)। তবে কান্নাকাটি কিসের? বিয়ের আগে......? তাতে হয়েছেটা কি? রাস্তায় রাস্তায় পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়ালেও তো এই সব হ'ত তার কপালে......। পথ থেকে তবু এতো একটা আশ্রয়। ওরা ছিল তাই তো আশ্রয় পেয়েছে। হারালো কেন ছুঁড়ী?

কিন্তু অধর্ম করল না। কয়েকটা টাকা দুর্গাকে দিয়ে ঘরটার ভাড়া চুকিয়ে সে ফিরে গেল। আবার টাকা মাঝে মাঝে পাঠাবে তাও বললো। ঠিকানা দিল না কিন্তু। বাড়ীতে চিঠিপত্র দেওয়া ঠিক হবে না। হয়ত সেইজন্যই বাবা বিয়েতে মত দেবেন না। কিন্তু পিতারও মতের আড়ালের অতল থেকে তার মনটাই দুর্গাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে...। কিছু নেই মেয়েটার। অসামান্য রূপ নেই। শিক্ষা নেই। সম্পন্ন স্বজন আত্মীয় নেই কুটুম্বিতা করার মত। পিতা ওর কি দেখে মত দেবেন। হ'লই বা স্বজাতি।

গোপন মনে জেগে থাকে সেই নিজের তার অন্যায় অসংযমের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দুর্গা।

সাক্ষী। সঙ্গী। প্রমাণ।

ওকে বিয়ে করা যাবে না। যাবে না। পারবে না বিয়ে করতে। হোক স্বজাতি। সে যেন একটা ক্লেদ মূর্ত্তি ধরে সামনে ওর সামনে রয়েছে।

সে পালাতে পারলে বাঁচে। সহ্য করতে পারছে না। তৃতীয় রাত্রির মোহ আর নেই। নেই। নেই। বাড়ীর লোকেদের বললে, 'যেতে হবে আপিসে কাজ পড়েছে, আমি পরে আসব। ওকে দেখবেন আপনারা।'

॥ ১২ ॥

কালীপূজার অপরাহ্ন দশাশ্বমেধ ঘাট। ঘাটের সিঁড়িতে একপাশে বসে একটী শীর্ণকায়, শীর্ণমুখ মেয়ে রাশিকৃত বাসন মাজছিল।

দেওয়ালীর আলো চারদিকে ঝলমল করছে। ভীড়েরও সীমা নেই। গঙ্গা আরতি দেখবার ভিড়। দেওয়ালীর প্রদীপ ভাসানোর ভিড়। ফুলের নৌকা সাজানো প্রদীপ, শুধু ঘিয়ের প্রদীপ; শুধু পাতার ঘৃতসিক্ত সলতের প্রদীপ কত রকমের সম্ভব সজ্জিত প্রদীপ বেচা কেনা আর ভাসানোর শেষ নেই। অনেকে ভাসাচ্ছে জরে চলে যাচ্ছে। অনেকে ভাসানোর পরও দেখছে প্রদীপটা ভাসছে কি না; জলে রয়েছে বা নিবে গেল। নিবে গেলে দুঃখিত হচ্ছে। আবার ভাসাচ্ছে কেউ বা। সুখের প্রদীপ, ভাগ্যের প্রদীপ। জীবনের ইঙ্গিতসূচক দীপাবলী তারা। আবার জ্বালে লোকে।

মেয়েটী বাসন গোছা করে তোলার জন্য উঠে দাঁড়াল সহসা তার পাশে এসে দাঁড়াল দু একজন কে। একটু চুপ করে থাকে তারা। কত বছর কেটে গেছে—কেউ যেন কারুকে চিনতে পারছে না। দুর্গাও তাকায় নি। চেনেও নি। শুধু ছাই মাটি ফুল পাতার কুচি ধুয়ে বাসনগুলো সরিয়ে সরিয়ে রাখছিল। পরিষ্কার জায়গা দেখে।

একটী ছেলে...ছেলে নয় এখন বেশ বয়স্ক। একটু তাকিয়ে দেখে বলল, 'আপনি কি দুর্গাদিদি?'

দুর্গা নিজের নাম শুনে চকিত হয়ে তাকাল তাদের দিকে।

হাতের বাসন নামিয়ে রেখে সিঁড়ির জলে ছাই মাখা হাত ধুয়ে মাথায় আর গায়ের কাপড় গুছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। রংটী ম্লান। ফরসা হয়তো কখনো ছিল কোনো সময়ে। চোখ বসা গালের হাড় উঁচু। সাধারণ চেহারা। শুধু ভদ্র লজ্জাময় নারী মুখ। আর কিছু বিশেষত্ব দেখা গেল না।

যে লোকটী দুর্গাদিদি বলেছিল সে বললে, 'তুমি দুর্গা

দিদি তো ?' দুর্গা অচেনা ভদ্রলোক দেখে একটু জড়সড় হয়ে গিয়েছিল। একবার তাদের দিকে তাকাল তারপর মাথার ও গায়ের কাপড় টেনে নিল। মলিন জীর্ণ কাপড়। তারপরে বললে, 'হ্যাঁ আমার নাম দুর্গা।'

লোকটি আন্দাজীভাবে তাকে চিনতে পেরেছিল। একটু যেন দুঃখিত মুখে বললে, আমার নাম গোপাল। গোপাল মিত্র। মনে আছে ? সেই কুম্ভমেলার সময়ের দেখা। আর এই সরিৎ দা।'

দুর্গা দেওয়ালীর সন্ধ্যায় দীপের আলো অস্ত যাওয়া দিন সন্ধ্যায় আলো অন্ধকারের ছায়ায় একটি মলিন মাটীর পুতুলের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

দুজনের কেউ জানে না কি কথা বলবার আছে। কি জিজ্ঞাসা করবার আছে।

সে বাসনগুলির দিকে তাকাল তারপর আস্তে আস্তে বলল এগুলো দিয়ে আসি এখনি রাত্রের পূজায় লাগবে।'

গোপাল বললে, 'দিয়ে আবার আসবে ?'

সে মাথা নাড়ল, না, আর আসবে না।

গোপাল বললে, কোথায় থাক ?

সে বললে, 'ঐ পূজারী মার বাড়ীতে।'

গোপাল বললে, 'আমরা কাশীতে এসেছি ৫।৬ দিন। বাড়ী নিয়েছি একটা। মাস কতক থাকব। একদিন নিয়ে যাব। যাবে ?

'তোমার ঘরের ঠিকানা ? থেমে গেল বলে। ঘরের ঠিকানা ? হঠাৎ মনে হল এতকাল কাশীবাসিনী অনাথ মেয়ের ঠিকানা ? সে ঠিকানা কেমন......? কি রকম ঠিকানা ?

আর দুর্গার মনে আকাশের শূন্যতা সমুদ্রের ঢেউ জাগছে মিলোচ্ছে, 'আমরা' ? এই 'আমরা কারা ?' আমরা কজন ? তার বুক মুখ শুকিয়ে গেছে। কথা হারিয়েছে। কি জিজ্ঞাসা করবে ? কার কথা কোন কথা তার জিজ্ঞাসার আছে।

তার মনের আকাশে কেউ নেই। কেউ নেই। কারুর নাম নেই। তার মনের সমুদ্রে ঢেউ আসছে আর ভেঙে যাচ্ছে। কিসের ঢেউ ? লজ্জা ? দুঃখ। নারীদের অবমাননার ? তার দেহে চিরকালকার এক অসংযত পুরুষের অসংযমের প্রথম স্পর্শের মহা ইতিহাস। প্রথম লজ্জার মহা ইতিহাস। ঘৃণার ভয়ের আতঙ্কের ইতিহাস। ক্লেদাক্ত মহা ইতিহাস। যার ভাষা নেই। যা কথাতে ব্যক্ত করা যায় না।

আকাশের মত সীমাহীন চরম অপমানের মৌন মূঢ় ইতিহাস।

॥ ১৩ ॥

সে নিচু হয়ে বাসনের বোঝা পুষ্পপত্র কোশাকুশী তামার টাট্, পঞ্চপ্রদীপ পিলসুজ পিতলের ছোটবড় থালা গামলা গোছা করতে লাগল।

শিরাময় শীর্ণহাতে সবগুলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার বললে, 'আমি যাই। এগুলি দিয়ে আসি।

গোপাল বললে, আমাদের হাতে কিছু দাও না অত ভারি সব একলা নেবে ?

তার ফ্যাকাসে ঠোঁটে একটা হাসির মত কি ফুটে উঠল।

সে সব নিয়ে উঠে দাঁড়াল শুধু।

'রোজ আস ?' গোপাল বললে। 'দেখা হবে এলে ?' সে চারদিক চাইল। তারপর বললে 'আসি প্রায়।' কিন্তু কি দরকার তোমাদের ? তোমার ?

'তোমাদের' মানে কি তা সে জানে না। 'তোমার' মানে কি তাও তো জানে না। কেন যে তোমাদের বললে তাও জানে না।

গোপালের মনেও পাথরের চাপ। সত্যিই তো কি দরকার তাদের ? সত্যিই সে তো সব জানে। জানে, অসীম ওকে এখানে রেখে গিয়ে বিয়ে করেছে। খোঁজ করেনি কখনো আর। ওদের কারুর সঙ্গে দেখাও আর করেনি। এবং দুর্গার কোনো খোঁজ করেনি ওরাও তো। কিন্তু কি খোঁজ করত।

গোপাল যখন কতদিন পরে দেখতে পেয়ে ওর কথা

তাকে জিজ্ঞাসা করেছে। অসীম প্রথমে বলেছে আমি কোনো খবর তার আর রাখতে পারিনি। বাড়ীতে মহাঝঞ্ঝাট মার কান্নাকাটি বাবার রাগ। বাড়ীতে তারা বল্লেন 'ওসব মেয়ের আবার কাশীতে অসুবিধা কি। ওদের দেখাশোনার মত লোক সংসার করার লোক সেখানে ঢের......?' সবাই বললে, 'কাশী হেন জায়গা...। লোকে এই কথা বাবাকে বলেছিল। আর 'ওর জন্য ভাবনা করো না' বললে সবাই।

গোপাল কথা বলতে পারেনি। শুধু বলেছিল, তুমি ওকে তবে মিথ্যে করে মা কালীর সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলে?...

বিরক্ত হয়ে অসীম বললে, আর কি করতাম তাই বল? তোমরাই আগলে নিয়ে থাকলে না কেন? ধার করে দেশে আনলে না কেন?

গোপাল জবাব খুঁজে পায়নি।

কিন্তু অসীমের সেই কদিনের দুর্গাকে নিয়ে থাকা বিয়ে করব বলে সিঁদুর পরানোর ইতিহাস সে কাহিনী আরও কতদূর এগিয়েছিল। কেউ তারা জানে না। শীর্ণকায় দুর্গা সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে ভারি বাসনের গোছা নিয়ে উঠে যাচ্ছে। অনেক সিঁড়ি দশাশ্বমেধের ঘাটের।

সরিৎ একটিও কথা বলেনি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দুজনেরই, গোপালেরও সরিতেরও মনে হয় দুর্গা কি ভালো ছিল? ভালো আছে? সে কি ভালো জীবন যাপন করছে? সে কি কাশীবাসিনী মেয়ের মত ছিল না। কি করে ভালো ছিল? এই ষোলো বছর ধরে? ভালো জীবন...? অসীম কি ওর মর্য্যাদা রাখতে পেরেছিল? অসীমের কথাবার্ত্তা ওদের ভালো লাগেনি তখন। আর এই মহা অন্ধকার বছর কটার ইতিহাসও কেউ জানে না। কেউ জানে না। এবং সই সাতদিনের কাহিনীও অসীম বলেনি।

তারপরের ষোলো সতের বছরের কথা শুধু 'কালের ইতিহাসকার মহাকালই জানেন। আর দুর্গা নিজে জানে।

গোপালের সাধারণ পুরুষের সন্দেহাকুল মনে সংশয় জাগে সতী অসতী? আবার কিন্তু কবেকার কিশোরী হারানো দুর্গার ভীত ত্রস্ত মুখে সিঁদুর পরার দিনটী ছবির মত এই সন্ধ্যার মতই ফুটে উঠে। সেদিন সে কিসের ভয় পেয়েছিল? আজ আর তার ভয় নেই কি? এক অসীম ক্লান্তিভরা শীর্ণ ক্ষীণ দেহ নারী সিঁড়ির ওপরে উঠে চলে যাচ্ছে।

গোপাল দেখতে থাকে। তার পুরুষের করুণাময় হৃদয় মন সকরুণ হয়ে ওঠে।

সে মন বলে, ভালো? মন্দ? বোলো না, বোলো না। চুপ কর। চুপ কর। মর্য্যাদা? দুর্বল অসহায় অনাথ নারীর মর্য্যাদা সম্ভ্রম কে রাখবে? পুরুষ, না, মেয়ে নিজে?

পৃথিবীর ইতিহাস পড়েছ? বলবানের ইতিহাস দুরাশয় অনাচারীর ইতিহাস। আবার মহৎ মানুষের মহামানবের ইতিহাস। যাতে আছে এক জায়গায় একটী আশ্চর্য্য কথা। আর কোনো ধর্ম পুস্তক গ্রন্থে ধর্মের বাণীতে যা নেই—"যে কখনো পাপ করেনি—পাপীকে তার পাপের শাস্তি প্রথমে দাও সেই লোকই।"

গোপালের অভিভূত মন বলে, কে তোমরা সমাজে নিষ্পাপ আছ দুর্গাকে বিচার করার! আছ কি কেউ? যে কোনো অন্যায় মিথ্যাচার করেনি?

দুর্গা অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

॥ ১৪ ॥

গোপালের দুর্গার বাড়ীর ঠিকানা মনে থাকার কথা নয় এত বছর পরে। আর জিজ্ঞাসা করতেও পারেনি। সেদিনের তরুন গোপাল আজ বয়স্ক পুরুষ। সংসারী হয়েছে। অনেক কিছু দেখেছে। গভীর সহৃদয় সদয় পুরুষ চরিত্র ভীত দুর্বল নারী মনের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। কপট বর্ব্বর পুরুষ চরিত্রও এবং দলিত পিষ্ট সমাজ পরিত্যক্ত অসহায় অন্ধকার জগতবাসিনী নারী লোকও সমাজের প্রত্যন্ত লোকে দেখেছে। কি করে দুর্গাকে কি জিজ্ঞাসা করবে? কোথায় আছ? কি

জীবিকা ? যা হয়ত ঐ জীবনের একমাত্র সহজ জীবিকা। দেহজীবিকা। মনে মনে ভাবে তার থাকার জায়গাটা কোন পাড়ায় কোন নারী সমাবেশে। কাশী সে কেমন সর্বাশ্রয় স্থল, তার সব জানা না থাকলেও একেবারে অজানা নেই। মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে অসহায় দুর্গাত অনাথ বৃদ্ধা নারীদের কি করতে হবে, কি করতে হয় তাও দেখেছে। দেখেছে ভিখারিনী। দেখেছে সেকালের ধনীদের স্থাপিত অন্নসত্রে সত্রে তাদের সকলের দিনের তৃতীয় প্রহরে এক মুঠো অন্ন সংগ্রহের জন্য কি প্রাণপণ প্রয়াস।

শুনেছে প্রতারিত প্রলুব্ধ কমবয়সী পতিত মেয়েদের দিন ও রাত্রির ছলনাময় আড়ালের জীবন ও জীবিকা। শুনেছে 'সতী' হয়ে থাকার কি আপ্রাণ সাধনা। সেই তাদের কত তরুণ বয়সী দীন দুঃখী অনাথ নারীর। আর তারপর অতর্কিতেই কলুষ জীবনের অতল পাঁকে ডুবে যাওয়া চিরকালের মত।

ঐ পরম তীর্থে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের মহাতীর্থে ধুলোয় ধুলোয় বিশ্বামিত্র, হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার পুরাণ কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। আছে শিবের বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি। আছে মা দুর্গার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি। দুর্গতি নাশিনীর নানা কাহিনী। কিংবদন্তি। মানুষের সাধারণ জীবনের সঙ্গে মিশানো সে পুরাণ ইতিহাস। চিরকাল পাশাপাশি বহমান গঙ্গা যমুনার মত মানুষের ও দেবতার মহা ইতিহাস। দুঃখ বেদনা সংযমময় প্রেম বিরহের আবার দুর্বলতার অসংযমের কলুষ ইতিহাসও।

যেন একটা ক্ষুদ্র পৃথিবী। সাধু সন্ত ফকীর জ্ঞানী মুনি তপস্বী যোগী সাধকের সাধনা এবং সাধারণ মানুষের দুর্বলতা ক্ষুদ্রতার পতনের ও উত্থানেরও কাহিনী কাশীর সর্ব্বাঙ্গে আঁকা। যেন মানব হৃদয় সমুদ্র মন্থন হচ্ছে পাপী পুণ্যবান মহৎ ক্ষুদ্র মানুষ সুরাসুরের মন্থন দণ্ড ও পাশ রজ্জু দড়িতে।

দড়ি ছিঁড়ছে। দড়ি জুড়ছে। বাসনা বাসুকীর নিঃশ্বাসের হলাহলে মানুষ কলুষিত হচ্ছে। জর্জ্জরিত হচ্ছে। জ্বলে যাচ্ছে। আবার শান্তমনের ত্যাগের প্রশান্তের অমৃত ও জীবন মরণের সেই জ্বালাও জুড়িয়ে দিচ্ছে। সাধু কথামৃত, পুরাণ কথামৃত তারা।

জীবন অল্প দিনের সমষ্টি। সুখ দুঃখ ও সত্য মিথ্যার মরীচিকাই হয়ত। ঐ পরম তীর্থ বারানসীর গায়ে যেন সেই কথাই ঐ চিরকালের কাহিনীই জাগছে। মিলিয়ে যাচ্ছে।

গোপাল চুপকরে বসে ভাবে ঘাটে বসে।

॥ ১৫ ॥

সাহসা কে দাঁড়াল এসে পাশে। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেছে।

ডাকল, 'গোপালদাদা'।

গোপাল চকিত হয়ে চাইল। পাশে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে। দুর্গা।

বললে, দুর্গাদিদি এসো। কদিন আসনি বুঝি ?

দুর্গা বসল একটা অন্য ধাপের সিঁড়িতে। একটু চুপ করে থেকে তারপর বললে, 'গোপালদাদা আমার মার খবর কিছু জানো ?' চোখে জল এসেছিল বোধহয় চোখটা মুছে ফেলল।

গোপাল বললে, না দুর্গাদি আমি তো তোমাদের দেশে, আর যাইনি। সেই সময়ে একবার গিয়েছিলাম মাত্র।'

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল দুর্গা। তারপর বললে, মাকে দেখতে ইচ্ছে করে একবার। হয়তো এখনো বেঁচে আছেন। একবার আমাকে নিয়ে যাবে দেশে ?

গোপাল একটু থমকে গেল। দেশে ? কোথায় নিয়ে যাবে ? কার কাছে ? কেমন করে ? কি পরিচয়ে ?......

দুর্গা নিজের দিকটাই ভাবছিল। মাকে দেখতে পাওয়া। মা আছেন হয়ত। মার কাছে নিজের এই অদ্ভুতভাবে বিপর্য্যয় ঘটা জীবনের আদ্যন্ত কাহিনী বলার ইচ্ছা। সে কথা আর কারুকেই কখনো বলতে পারবে না।

সে কাহিনী তার অতর্কিত পতন কাহিনী নয়। তার নিজের সতী অসতীত্বের কাহিনীও নয়। পুরাণের শোনা পৃথিবীর দেখা সতী নারীলোকের কথাও নয়।

শুধু আশ্চর্য্য একটি বিপন্ন নারীর জগতের কাহিনী। হয়তো অনিচ্ছুক প্রবঞ্চনার কাহিনী এবং অনিচ্ছুক পতনের কাহিনী।

যার পাপ পুণ্য বিষাদের হিসাব নিকাশ শুধু ভগবান; দুর্গা ভাবে যদি কেউ থাকেন তিনি করছেন।

দুর্গা শুধু মাকে বলবে তার জীবনের সেই একদিনের মহাদুঃখের অতর্কিত মহাঅবমাননার ইতিহাস। বলবে কি করে পৃথিবীর সহজ পথে সে পথ হারিয়েছিল। আর পথ পায়নি। তারপর থেকে সব জগতটাই তার বিপথ।

আর বলবে সে খারাপ হয়ে যায়নি......। চোখে জল আসে। চোখ মোছে আবার। হ্যাঁ সতী? অসতী? গণিকা? গণিকা নয়? কিন্তু সব বলার চেষ্টাও মিথ্যে মনে হয়। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। করবেও না।

সামনে গোপাল নীরবে বসে ঘাটের সিঁড়িতে। দুর্গার কথার সে কোনো উত্তর দিতে পারেনি তখনো।

দুর্গা আবার বললে, 'আমার যেতে কত ভাড়া লাগবে গোপালদা। টাকা আমার কিছু জমানো আছে। ভাড়ার জন্য ভেবো না।

গোপাল চকিত হয়ে উঠল ভাবনা সমুদ্র থেকে। রেল ভাড়ার কথা সে ভাবেনি। একটু অপ্রস্তুত হলো। বললে, 'না, ভাড়ার কথা আমি ভাবছিনা। ভাবছিলাম তোমার মা যদি বেঁচে না থাকেন। মিথ্যে হবে যাওয়া।

দুর্গা আকুল হয়ে উঠল। হয়ত আছেন। আমি এতদিন রোজই ভেবেছি মার কথা। একটি একটি করে টাকা পয়সা জমিয়েছি লোকের বাড়ী কাজ করে। ভেবেছি হয়ত মাই কখনো আমার খোঁজে কাশী আসবেন। হয়ত চেনা কারুর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে কাশীতেই। তা হয়নি। একবারটি নিয়ে চল তুমি আমাকে তিনি বেঁচে না থাকেন ফিরে আসব।...

আবার চোখ মুছল। আর থাকেন যদি। কিছু বলতে পারলে না। সে 'যদি' অনেক কত মর্মান্তিক দুঃখের কথা বিভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত কিশোর মনের দেহের আতঙ্কময় কাহিনীর ইতিহাস—মাকে কি বলা যাবে?

হ্যাঁ বলবে। একদিন সে বলবে জগতকে অর্থাৎ মাকে। আর তো কারুর জানার দরকার নেই তার জীবনের কথা।

॥ ১৩ ॥

বৈশাখ মাসে। হাওড়ার কাছাকাছি গঙ্গাতীরে ভাঙ্গা চোরা বাঁধানো একটা ঘাট সহরতলীর কাছাকাছি জায়গায় লোকেরা সেখানে স্নান আহ্নিক পূজা করে। বেশীর ভাগই বর্ষীয়সী বিধবার দল। যাঁরা অনেকবেলায় সংসারের কাজ শেষ করে স্নানে আসেন।

ঘাট থেকে অনেক দূরে একটি ভাঙা চাতালে দুর্গা চুপ করে বসেছিল।

কতবছর আগে সে সেখানে আসত মার সঙ্গে সেটা মনে নেই তবে এসে মনে পড়ছে সব সেই ভাঙা শেওলা ধরা ঘাট। জোয়ারের জল এসে কখন নেবে ভাঁটা এসেছে। ঘাটের ভাঙা সিঁড়িগুলো ভাঙাচোরা ধোয়া ভরা মুখে কাদা মাখা গায়ে যেন চুপ করে শুয়ে আছে। গঙ্গার অনেক দূর অবধি শুধু কাদা রেখে জল সরে গেছে। ঘোলা জল স্থির হয়ে গেছে।

দুর্গা দেখতে পেল একজন বৃদ্ধা আসছেন। জলের ঘটি ছালটির কাপড় গামছা ফুলের সাজি পঞ্চপাত্র হাতে। মা। মাই তো।

গোপাল একটু দূরে একটা দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসে। চা খাচ্ছে হয়ত।

দুর্গার বুকটা ভয়ে লজ্জায় থমকে গেল। ঢিপঢিপ করতে লাগল। মা কি চিনতে পারবে? সে কি মার কাছে এগিয়ে যাবে?

মা যদি রাগ করেন?

মা স্নান করতে নাবলেন। ঘাটে উঠে বসে পূজা আহ্নিক জপ করলেন একটু। যেমন করেন গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা।

ভিড় কমে আসছে।

মা একবার ভিজে কাপড় গামছা সব শুকিয়ে নিচ্ছেন।

দুর্গা এগিয়ে গেলো।

তাঁর পায়ের কাছে নিচের একটা সিঁড়িতে বসে পড়ল ভীত শুষ্ক মুখে।

বৃদ্ধা থমকে দাঁড়ালেন, কে গা তুমি? কাকে খুঁজছ? দুর্গা কি বলবে, ছোঁবে কি মাকে প্রণাম করবে কি? মার শুদ্ধবস্ত্র। কিন্তু ছোঁবে কি? সে জানে মার খুব শুচিবাই।

বৃদ্ধা চিনতে পারেন নি ষোলো বছরের দুর্গা এখন শীর্ণকায়, মুখের হাড় উচু চোখ বসা। দুঃখে কষ্টে ম্লান ময়লা রং প্রায় বিগত যৌবন নারী। সেই দুর্গাকে আর কখনো বা আজ তিনি দেখবেন তাও ভাবেনওনি। চিনতেও পারেন নি। কোমলকণ্ঠে আবার বললেন, কাকে খুঁজছ মা?

দুর্গার মুখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে লজ্জায়। কথা গলায় জমে গেছে। হাত পাও যেন অসাড় হয়ে গেছে।

সে বিবর্ণ মুখে কোন ক্রমে তাঁর পায়ের কাছের মাটিতে একটা প্রণাম করল।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কে তুমি বাছা চিনতে পারছিনা তো?

কিন্তু সহসা যেন মনে হয় চেনা চেনা মুখ।

দুর্গার গলা শুকনো কাঠ হয়ে আছে। অস্পষ্ট স্বরে সে বললে, আমি মা।

'আমি?' আমি কে? মা অবাক হয়ে তার দিকে চাইলেন। কণ্ঠার গালের হাড় উঁচু মাথায় সিঁদুর পরা এ কে? এই শীর্ণদেহ মেয়েটি কি তাঁর চেনা কেউ। কার মত?

জননীর বিভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে চোখ নিচু হয়ে গেলো। কি নাম তোমার? জিজ্ঞাসা করলেন মা।

মা আমি দুর্গা। সে দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এবারে জননী স্তম্ভিত হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বৃদ্ধার হাত পা থর থর করে কাঁপতে লাগল। আস্তে আস্তে ফুলের সাজি কাপড় গামছা সিঁড়িতে নামিয়ে রাখলেন আর চুপ করে সেইখানেই বসে পড়লেন।

কথা আসেনি মুখে। দুর্গা অন্য সিঁড়িতে বসে কাঁদছে।

নাঃ—মায়া হচ্ছে না। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ঘাটের চারদিকে চাইলেন। চেনা লোক কেউ আছে? তারা ওদের দেখছে কি? দেখতে পাচ্ছে? কথা শুনতে পাবে?

দুর্গা মুখ তোলেনি কাঁদছে অঘোর ঝরে। তার এই ১৮।১৯ বছরের সব কান্না সব দুঃখ, দুঃখ বললে কম বলা হয়। দুঃখের চেয়ে বড় নাম তার কি হতে পারে আমি জানি না।

ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া আত্মা মন নারী সত্তা-রূপিনী একটি পতিতা অথবা পতিতা নয় সেও জানে না তা একটি মেয়ে শুধু তার সব কান্না এই দীর্ঘদিনের জমা কান্নায় ভেঙে পড়ছে।

না। ঘাটে কেউ নেই দু একটি দাসী গৃহস্থ শ্রেণীর নারী ছাড়া।

জননী কঠিন মুখে তার ক্রন্দন কম্পিত দারিদ্র্য—কুশ্রী শীর্ণ শ্রীহীন দেহের দিকে চেয়েছিলেন।

তাঁর মাঙ্গলিক জিনিষগুলি ভিজে কাপড়গুলি নিয়ে আর একটু দূরে সরে বসলেন।

যেন অমেধ্য কিছু ছুঁয়ে ফেলবার ভয়ে।

দুর্গা মুখ তুলতে সাহস করেনি। কান্না সমিত হয়ে এলো।

নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর মুখে জননী তারদেহের দিকে চেয়ে ছিলেন। যেমন পথের মাঝে কোনো ঘৃণিত আসন্ন মৃত্যু নোংরা প্রাণীর দিকে লোকে চেয়ে থাকে, ডিঙিয়ে বা ফেলে চলে যেতে পারে না। সেই রকম বিতৃষ্ণা ভরে চেয়ে রইলেন।

কথা তিনি বলতে পারছেন না। বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

ভীত দুর্গা এতক্ষণে ভাবতে পারছে মা বুঝি এবার তার পিঠে হাত রাখবেন। জিজ্ঞাসা করবেন কিছু। বলতে ইচ্ছে হচ্ছে মা, মা মাগো। বলতে ইচ্ছে হচ্ছে সেই হারানোর পর থেকে বিভ্রান্ত দিন তারপর নোংরা অতি অপরিচ্ছন্ন অমেধ্য অপবিত্র কটা দিনের ও জীবনের ইতিহাস। সে যে কি গ্লানি তা মা ছাড়া আর কাকে বলবে। আর কেবা বুঝবে আর কেই বা বিশ্বাস করবে।

॥ ১৭ ॥

দুর্গার কান্না থেকেছে। দেহ স্থির।

মা কঠিন মুখে তার দিকে চেয়েছিলেন। যেন সেই পথের মাঝে থাকা অপবিত্র প্রাণীটা মরে গেছে। অথবা সরিয়ে নিয়েছে কেউ।

কিন্তু না মরেওনি। সরেও যায়নি।

জননী উঠে দাঁড়ালেন। বাড়ী যাবেন এবারে। ফুলের সাজি ও ঘটির শব্দ হল।

দুর্গা বুঝতে পারল জননী উঠে দাঁড়িয়েছেন। সে মুখ তুলে দেখল মার কঠিন মুখ। চোখ নামিয়ে নিল।

মা বললেন, বেলা হচ্ছে এবারে যাই।

সে মার পায়ের কাছে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

ছোঁয়া যাবার ভয়ে জননী সরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বাড়ী যা এবারে। কেউ দেখতে পাবে।' তারপর একটু থেমে কঠিন বিতৃষ্ণায় বললেন, কেন এসেছিস? টাকা চাই? ওই রকম মেয়েরা তো টাকার অভাব হলেই আপনার লোকের কাছে আসে।

দুর্গা পাথর হয়ে গেলো।

তারপর আস্তে আস্তে বললে, তোমাকে একবার দেখতে এসেছিলাম মা। টাকা নয়।

মার মুখ আরো কঠিন নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। কঠিন কণ্ঠে বললেন, ও টাকা নয়? দেখতে এসেছিস? টাকা হয়েছে বুঝি?

দুর্গা হতবুদ্ধি চুপ করে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল মার পানে। টাকার কথা মানে বুঝতে পেরেছে এবার।

মা তার অপাদমস্তক দেখছিলেন নির্মম দৃষ্টিতে, তিক্ত সুরে বললেন, সিঁদুর পরেছিস কেন? বিয়ে হয়েছে? কার সঙ্গে? সেই ছেলেটার সঙ্গে?

দুর্গার গলা ভয়ে লজ্জায় বুজে গিয়েছিল। অস্ফুট স্বরে বললে, বিয়ে হয়নি।

'তবে সিঁদুর কিসের জন্যে পরে আছিস?'

মার তিক্ত কঠিন প্রশ্নের সামনে সে মূঢ় মূক হয়ে গেছে যেন।

মৃদুস্বরে বললে, 'সেই ভলান্টিয়াররা সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল। একজন বলেছিল পরে বিয়ে করবে নইলে লোকে ঘর ভাড়া করতে দিচ্ছিল না।'

জননী বললেন. 'তারপর? বিয়ে করেছে?'

দুর্গা মাথা নিচু করে বললে, 'না করেনি। দেশে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।'

জননী তার আপাদমস্তক আবার দেখলেন?

'ভালো ছিলি? এত দিনেও মরে যেতে পারিসনি? মরে গেলিনে কেন? কাশীর গঙ্গায় জল ছিল না?'

দুর্গার ভীত চোখ থেকে জল পড়তে লাগল।

মাথা নাড়ল। ভালো ছিল না। ভালো থাকতে পারনি। পারেনি ভালো থাকতে।

কঠিন ভাবে বৃদ্ধা বললেন, 'ছেলেপিলে হয়েছিল?'

দুর্গা কাঁদতে কাঁদতে বললে, একটি মেয়ে হয়েছিল। সে বলেছিল মা কালীর সিঁদুর দিয়েছি যখন সিঁথের তখন বিয়ে হয়েছে ওতেই। দেশে ফিরে গিয়ে আর এলো না তারপর।

জননী। মেয়েটা কোন চুলোয় আছে?

দুর্গা চোখ মুছতে মুছতে বললে 'মেয়েটা পাঁচ বছর বেঁচে ছিল। বাড়ীওয়ালারা আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। ইস্কুলে দিতে গেলাম বাপের নাম ঠিকানা চাইল। দিতে পারলাম না। ফিরে এলাম। সেইবারই তারপরই হঠাৎ খুব বসন্ত হয়ে মরে গেল।'

বৃদ্ধা নিষ্ঠুর মুখে বললেন 'আপদ গেছে। বেঁচে থাকলে কি করতিস ও মেয়ে নিয়ে। তা তোর বসন্ত হয়ে মরণ হলো না।'

দুর্গার কিন্তু চোখে জল পড়তে লাগল। সে

(এরপর ৭০৩ পাতায়)

সেবিকা

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

রজতের সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। বাড়ী গিয়ে বড়দির কাছে কি কৈফিয়ৎ দিলে বকুনি এড়ান যাবে ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে সিঁড়িতে একটা জোর ঠোক্কর খেল। চীৎকার করে উঠল, "উঃ!"

তিনতলার সিঁড়ির মুখ থেকে বড়দি প্রতিমা মুখ বাড়িয়ে বলল, "কি হল আবার? এলে ত সন্ধ্যে করে, এখন চেঁচাচ্ছ কি জন্যে?"

"বাবাঃ, কি রকম লেগেছে দেখছ না? বুড়ো আঙ্গুলটা বোধহয় ভেঙ্গেই গেল।"

প্রতিমা তরতর করে নেমে এল। রজত তখন শেষ সিঁড়িটায় বসে পড়ে পায়ে হাত বুলোচ্ছে। হেঁট হয়ে বুড়ো আঙ্গুলটা পরীক্ষা করে বড়দি বলল, "ভেঙেছে বলে ত মনে হচ্ছে না। চল উপরে, আর্ণিকার পটি দিয়ে দিচ্ছি একটা। মা এত ব্যস্ত হয়েছেন, তুই এত দেরি করলি কেন?"

রজত খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি উঠছিল, বলল, "এক বন্ধুর জন্মদিনে তার বাড়ী গিয়েছিলাম।"

"খেয়ে এসেছিস্?"

রজত একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "মা, ওদের লুচি ভাজতে খুব দেরী হচ্ছিল দেখে চলে এসেছি।"

প্রতিমা বলল, "সব বাজে কথা বানিয়ে বলছিস, তুই আবার নেমন্তন্ন-বাড়ী গিয়ে না খেয়ে আসবি! সত্যি করে বল্ দেখি কোথায় গিয়েছিলি?"

রজত গোঁ গোঁ করতে করতে অস্পষ্ট ভাবে বলল, "সিনেমায়।"

"কার সঙ্গে গেলি? পয়সা কোথায় পেলি?"

"ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। একটা টাকা ধার করেছি।"

"সেটা শোধ করার ভার ত আমার উপর, বাঁদর ছেলে? তোর আক্কেল বুদ্ধি কবে হবে রে, বোকা ছেলে? আমাদের এখন কি অবস্থা তা বুঝছিস না? সিনেমা দেখবারই দিন পেয়েছ, না?"

কথা বলতে বলতে তারা তিনতলায় এসে পৌঁছেছিল। মা দাঁড়িয়েছিলেন দরজা ধরে। ছেলে-মেয়েকে দেখে বললেন, "কি হয়েছে, ওকে অত বকছিস্ কেন?"

"দেখনা ছেলে এতক্ষণে বাড়ী ফিরলেন, টাকা ধার করে সিনেমা দেখে এলেন, তারপর সিঁড়িতে ঠোক্কর খেয়ে বুড়ো আঙ্গুলটা জখম করে এনেছেন।"

মা ছেলের দিকে তাকাতেই সে অভিমানে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠল, "বেশ করেছি, ধার করেছি। আমাকে তোমরা কিছু দাও না কেন? খালি রজত নাম দিয়ে বাধিত করেছ, তার চেয়ে কানাকড়ি নাম রাখলেই পারতে? ছেলেরা আমাকে কি রকম ঠাট্টা করে।"

মা একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন, "যা, ওকে কিছু খেতে দিগে যা। কোন্ সকাল দশটায় খেয়ে গেছে।"

তিনজনে ভিতরে ঢুকে সদর দরজা বন্ধ করে দিল। দরিদ্রের সংসার, ঝি-চাকরের বালাই বেশি নাই। ঠিকা ঝি কাজকর্ম্ম সেরে দিয়ে একঘণ্টার মধ্যেই চলে যায়। মা সকাল বেলা রান্না করেন, বিকেলের দিকের সব কাজ প্রতিমাই করে।

তিনতলার এই ফ্ল্যাটটা খুবই ছোট। অবস্থা যতদিন ভাল ছিল ততদিন প্রতিমারা দোতলার বড় ফ্ল্যাটটাতে থাকত। কিন্তু বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর আর্থিক দুর্গতিতে পড়তে হয়েছে। কাজেই এই ছোট ফ্ল্যাটে উঠে আসতে হয়েছে। মোটে দুখানি ঘর, একটা মাঝারি, একটা ছোট। রান্নাঘর আর বাথরুম আছে। এক ঘরে মা আর মেয়ে থাকেন, সংসারের দামী জিনিষপত্র কিছু কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে, সেগুলিও থাকে। ছোটঘরে রজত শোয়, খাবার টেবিল আর খান-চার চেয়ার আছে সে ঘরে। বইয়ের তাকে অনেক বই সাজান।

রজত ঘরে এসে বসতেই প্রতিমা প্রথমে তার পায়ে ওষুধ মেশান জলে ভিজিয়ে একটা পটি বেঁধে দিল। তারপর গেল রান্নাঘরে তার জন্য জলখাবার আনতে। জলখাবারও বেশী কিছু নয়। পাঁউরুটি টোস্ট, মাখন মাখান, আর একটা বড় পাকা পেয়ারা। এক পেয়ালা চাও আছে। রজত ব্যাজার মুখ করে খেতে লাগল।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "নীচের ডাক বাক্সটা দেখে এসেছিস?"

রজত বলল, "দেখেছি, কিছু নেই।"

মাও এই সময় ঘরে ঢুকে বললেন, "দাদা, বৌদির কোনো চিঠি ত আটদশ দিন ধরে কিছু পাচ্ছি না, কারো অসুখ-বিসুখ করল কি না কে জানে?"

রজত পেয়ারা খেতে খেতে বলল, "অসুখ না হাতী! গরীব মানুষকে কেউ চিঠি লেখে না, পাছে টাকা চেয়ে বসে।"

প্রতিমা তাড়া দিয়ে বলল, "থাম, থাম, পাকামি করতে হবে না। চা খাওয়া শেষ করে পড়তে বোস, আবার যেন কোথাও নাচতে বেরিও না। মা, তুমি দরজাটা দিয়ে নাও, আমি নীচের কাজটা সেরে আসি।"

প্রতিমার বাবা অসময়েই মারা যান। বেশী কিছু সঞ্চয় রেখে যেতে পারেননি। কয়েক হাজার টাকার মাত্র লাইফ ইনস্যুওরেন্স ছিল, ভেঙ্গে খেতে খেতে তাও নিঃশেষিত-প্রায়। প্রতিমা পাগলের মত চাকরি খুঁজছে, এখন পর্য্যন্ত কিছু পায়নি। এদিক্ ওদিক্ ছেলেমেয়ে পড়িয়ে কিছু কিছু আনে। নীচের তলায় বাচ্চা দুটি মেয়েকে পড়ায়। ছেলেবেলা থেকে তার একটু বিশেষত্ব ছিল। সে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। সংসারে অভাব কিছু ছিল না, তবে সম্পদের চাকচিক্যও বিশেষ ছিল না। মা বাবা সাদাসিধা ভাবেই থাকতেন, ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করতেন না। প্রতিমা দেখতে শুনতে বেশ ভাল ছিল। এইরকম ঘরের মেয়েরা খানিক পড়াশুনার পর বিবাহের আর সুখী পরিবার গঠনের স্বপ্নই দেখে। অন্য কোন রকম ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাদের মনে সাধারণতঃ আসে না। প্রতিমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। তার বাবার এক মামা বিখ্যাত এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছিলেন যৌবন কালেই। প্রায় প্রৌঢ় বয়সে এঁকে প্রতিমা ছেলেবেলায় দেখেছিল। তাঁর সম্বন্ধে তার একটা গভীর ভালবাসা আর ভক্তি ছিল। এই পরহিতব্রতী মানুষটির জীবনই তার কাছে আদর্শ জীবন বলে মনে হত। সে শৈশব কাটতে না কাটতেই খেলুড়ীদের সঙ্গে সন্ন্যাসী হওয়ার আর ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে বেড়ানর খেলা খেলত। মাকে মধ্যে মধ্যে বলত, "দেখো, বড় হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাব।"

মা হেসে বলতেন, "মেয়েছেলেরা সন্ন্যাসী হয় না। দেখিস না, সব সন্ন্যাসীরাই পুরুষ মানুষ?"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করত, "মেয়েরা তবে কি হয়?"

মা বলতেন, "তারা বউ হয়, মা হয়, বাচ্চাদের মানুষ করে। মেয়েরা সন্ন্যাসী হয়ে গেলে বাচ্চাদের মানুষ করবে কে?"

প্রতিমা এতে মোটেই খুশী হত না। বলত, "তাহলে আমি বড় হয়ে হয় ডাক্তার হব, না-হয় নার্স হব। আমি কত মেয়ে-ডাক্তার দেখেছি, তারা ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কই ঘরে বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে থাকে না ত?"

মা বলতেন, "তাই হবি এখন। মেয়ে-ডাক্তাররাও কিন্তু বউ হয় মাঝে মাঝে, বাচ্চা নিয়ে বসেও থাকে।"

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার মত পরিবর্তন হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আই. এ. পাস করে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার সংকল্পে সে স্থির হয়ে রইল, এবং পড়াশুনাও সেই ভাবেই করতে লাগল। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, দেখতে ভাল, পড়াশুনায় ভাল। কাজেই ষোল বছর বয়স পার হতেই তার জন্য সম্বন্ধ আসতে লাগল। মায়ের ইচ্ছা ছিল, মেয়ে বিয়ে করে ঘর-সংসার করে। আই, এ, পাস করে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হতে তিনি বাধা দিলেন না, ভাবলেন, "বেশ ভাল সম্বন্ধ পেলেই বিয়ে দিয়ে দেব। ততদিন পড়ুক না।"

কিন্তু খুব ভাল সম্বন্ধ চট করে এল না। এদিকে মেডিক্যাল কলেজে তার তিন বছর পার হয়ে গেল। সঙ্গিনীদের অনেকের বিয়েও হয়ে গেল। প্রতিমার মন তখনও কিন্তু ঘর-সংসারের দিকে গেল না। বড় হয়ে যখন সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচয় হল তখন বরং আর্ত্ত মানুষের সেবা করার সংকল্পটা তার আরো দৃঢ় হল। ভারতবর্ষের মানুষ বড় দুঃখী, তাদের সাহায্য করতে ক'টা মানুষ বা চায়? সবাই ত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, বিশেষ করে মেয়েরা। তারা ত নিজেদের স্বামী সন্তান নিয়ে ব্যস্ত, বাইরের জগতের দিকে কতটুকু তাকায়? কিন্তু কেন? তারা কি কেউ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জীবনী পড়েনি? তারা কি আধুনিক কালের লোকজননী নিবেদিতা বা মাদার টেরেসার কথা শোনে নি? তার সন্ন্যাসী ঠাকুরদাদার মূর্ত্তিটা বারে বারে তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। মানস চক্ষে সে দেখত, যেন তিনি তাকে ডাক দিচ্ছেন, মানুষের সেবার পথে চলবার জন্যে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন।

এমন সময় হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। তার বাবা stroke হয়ে মারা গেলেন। কোন চিকিৎসা করবারও সময় হল না। স্ত্রী দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রায় অকূল পাথারে ভাসলেন।

প্রথম শোকের ধাক্কাটা কেটে গেলে দেখা গেল সামান্য কয়েক হাজার টাকা ছাড়া কিছুই নেই। বাড়ীটাও নিজের নয়। বড় ফ্ল্যাট ছেড়ে উঠে যেতে হল তিনতলার ছোট ফ্ল্যাটে।

সংসার ছোট হলেও খরচ ত বেশ। ছেলে মেয়ে দুজনেই পড়ছে। বিশেষ মেয়ের ডাক্তারী পড়ার ত অনেক খরচ। প্রতিমা বলল, "মা, আমি ত পড়া শেষ করতে পারব না। আমি পাস করে ডাক্তারী করতে গেলে এখন তিন বছর সময় লাগবে। ততদিন আমরা খাব কি? এই ক'টা টাকা ভেঙে খেতে হলে দেড় বছরেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমাকে এখন কাজের চেষ্টা দেখতে হবে।"

মা বললেন, "কি কাজ তুই পাবি, তোর পড়াশুনোই শেষ হয়নি।"

প্রতিমা বলল, "যে রকম যা পাই, তাই করব। স্কুলের ছেলেমেয়েদের অঙ্ক সায়েন্স এসব পড়াতে পারব। সুবিধা হলে নার্সিংটাও করতে পারি। সেবা করার কাজ আমার ভালও লাগবে আর কিছু অভিজ্ঞতাও ত আছে এ লাইনে।"

মা বললেন, "নার্সিংকে আমাদের সমাজে এখনও ছোট কাজ মনে করে।"

প্রতিমা বলল, "আমি মোটেই ছোট কাজ মনে করি না মা। আর্ত্ত মানুষের সেবার চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে? এই পথই ত আমি বেছে নিয়েছিলাম। ডাক্তার হয়ে যে কাজ করতাম, নার্স হয়েও সেই কাজই করব।"

মা বললেন, "তোমার সৌদামিনী মাসীর সঙ্গে পরামর্শ কর, তিনি তোমায় অনেক সাহায্য করতে পারবেন, নিজে অনেকদিনের অভিজ্ঞ ডাক্তার।"

প্রতিমা বলল, "কালই যাব তাঁর কাছে।"

প্রতিমা সময় নষ্ট করল না। নিকটে দূরে সব জায়গায় সন্ধান করে ছোটখাট কয়েকটা ট্যুশনের কাজ জোগাড় করল। মহিলা ডাক্তার সৌদামিনীর সঙ্গে পরামর্শ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল। নিজে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী, অনেকদিন পড়াশুনা করছে। সে যে-কোনোরকম রোগীর সেবা করতে রাজী আছে বলে

জানাল। সৌদামিনী অবশ্য খুব আশা করতে তাকে বারণ করলেন। বললেন, "নার্সদের এখনও এদেশে লোকে সম্মানের চোখে দেখে না তত। ঝিদের চেয়ে সামান্য উচ্চশ্রেণীর মনে করে। তোমার হয়ত ভাল লাগবে না, অপমান বোধ হবে।"

প্রতিমা বলল: "ভাল না লাগলেও আমাকে করতে হবে। সংসার ত আমাকে চালাতেই হবে, বাবা যখন বিশেষ কিছু রেখে যাননি, আর রজত ও আমার চেয়ে ছ বছরের ছোট। সে মানুষ হয়ে সংসারের ভার নিলে তবে না আমার ছুটি?"

সৌদামিনী বললেন, "তোমার বয়স কম, তুমি দেখতেও ভাল, এই দুটোই না প্রতিবন্ধক হয়। যাহোক, আমি দেখে শুনে তোমায় কেস্ দিতে চেষ্টা করব।"

প্রতিমা হেসে বলল, "তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। যা পাবেন দেবেন আমাকে, আমি আশা করি নিজের মান সম্মান বাঁচিয়ে কাজ করতে পারব।"

তার বিজ্ঞাপনের উত্তরে দু-একখানা মাত্র চিঠি এই ক'মাসে সে পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবই কলকাতার বাইরে। মা ও ভাইকে ফেলে ত সে যেতে পারে না? তাকে কলকাতায় থেকেই কাজ করতে হবে। ছেলে মেয়ে পড়িয়ে সে যা পায়, তা কতই বা? বেশী করেই তাদের সঞ্চিত টাকায় টান পড়ে। এ জন্য মা আর মেয়ের উদ্বেগের সীমা নেই।

পড়ান শেষ করে সে উপরে উঠবার আগে ডাক বাক্সটা একবার খুলে দেখল। একখানা চিঠি এসেছে তার নামে। উপরে গিয়ে খুলবে এখন। সিঁড়িটা অন্ধকার, ক্রমাগত বাল্ব চুরি যায় বলে এখন আর কেউই সিঁড়িতে আলো দেয় না। খানিক আগে ত রজত এখানে জোর ঠোক্কর খেল। প্রতিমা সাবধানে উঠতে লাগল। চিঠিখানা খুলে দেখল, তার বিজ্ঞাপনের উত্তরে লেখা চিঠি। একজন রোগিণীর জন্য নার্সের প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে কলকাতারই ঠিকানা। মাকে ডেকে বলল, "মা, এবার হয়ত একটু সুবিধা হবে। এরা কলকাতার মানুষ আর যাঁর সেবা করতে হবে তিনি মহিলা। প্রথমেই পুরুষ রোগী নিতে হলে আমার একটু অসুবিধা লাগত।"

মা বললেন, "কাল একবার তোমার সৌদামিনী মাসীমার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোলো। এ পাড়ার কাছাকাছি কোন জায়গাই হবে, ঠিকানা দেখে যা মনে হচ্ছে।"

প্রতিমা বলল, "সকালের ট্যুশনিটা সেরে তাঁর কাছে দেখা করতে যাব।"

সকালে সে একটি বাচ্চা ছেলেকে পড়ায়। সেটা শেষ করে সে দেখা করতে গেল ডাক্তার মাসীর সঙ্গে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে বাড়ীতেই পেল। চিঠিখানা পড়ে সৌদামিনী বললেন, "প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগী। বেশ খাটতে হবে। তবে মেয়ে রুগী, সেটা ভাল। ঐ পাড়ায় আমার একজন রুগী আছে। ১১টার মধ্যে যদি খেয়ে দেয়ে আমার এখানে আসতে পার ত প্রথম বার আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি।"

প্রতিমা বলল, "তাই আসব। আমি এখন আসি তবে, নাইতে খেতে কিছু সময় ত লাগবে?"

সৌদামিনী বললেন, "সাদা জামা আর প্লেন্ পাড়ের শাড়ী পরে এস।"

প্রতিমা বলল, "আমার কাপড় জামা সবই প্রায় সাদা, কলেজে আমি রঙীন কাপড় পরতাম না বিশেষ।"

বাড়ী গিয়ে সে তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সারতে লাগল। রজত তখন স্কুলে চলে গিয়েছে। মা এবং প্রতিমা খাওয়া শেষ করলেন। প্রতিমা বলল, "কাজ পেলে ভাল লাগবে বটে, তবে তোমার বড় একলা একলা লাগবে।"

মা বললেন, "কি আর করা যাবে বাছা? ভগবান্ ত একলা করেই দিলেন, সহ্য করা ছাড়া উপায় কি?"

প্রতিমা তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দুপুরে রাস্তা ঘাটে একটু ভিড় কম, ট্রামে বাসে উঠতে গুঁতো-গুঁতি করতে হয় না। ছাত্রী জীবনে ট্রামে বাসেই গিয়েছে সে, হাজার মানুষের মেলায় সে খানিকটা

অভ্যস্ত, কিন্তু অসোয়াস্তিটা একেবারে কেটে যায়নি। চিরদিনই সে বাড়ীতে ঢুকেই আগে স্নান করে ফেলে, তারপর অন্য কাজ।

সৌদামিনী তৈরি হয়েই ছিলেন। তাঁর নিজের গাড়ী, কাজেই প্রতিমা বেশ আরামে বসে চলল। খুব বেশী দূর তাদের যেতে হল না, বেশী খোঁজাখুঁজিও করতে হল না। বড় রাস্তার উপরেই বাড়ী। মাঝারি গোছের দোতলা বাড়ী। কড়া নাড়তেই একজন ঝি এসে দরজা খুলে দিল। একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রতিমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোথা থেকে আসছ আপনারা?"

সৌদামিনী বললেন, "একজন নার্স নিয়ে এসেছি, এ বাড়ীর থেকে নার্সের জন্য লেখা হয়েছিল।"

"তাহলে দাঁড়ান একটু, আমি উপরে বাবুকে শুধিয়ে আসি," বলে তাঁদের দরজার গোড়াতেই দাঁড় করিয়ে ঝি দ্রুতপদে উপরে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সিঁড়িতে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল। সর্ব্বাগ্রে একটি বছর চারের খোকা, তারপরে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে এবং সর্ব্বশেষে একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক নেমে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক দুই মহিলাকে নমস্কার করে বললেন, "হ্যাঁ, আমি বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি দিয়েছিলাম। আপনাদের ভিতর কে কাজ করবেন? চলুন উপরে. আমার স্ত্রীই অসুস্থ। তাঁর জন্যেই লোক দরকার।"

সকলে উপরে চললেন। ছোট ছেলেটি অযাচিত ভাবে এসে প্রতিমার হাত ধরল, প্রতিমা তার গাল টিপে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কি খোকা?"

খোকা বলল, "আমার নাম টিনু আর দিদির নাম মিনু, দিদি ইস্কুলে পড়ে।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি পড় না?"

খোকা বলল, "আমি যে ছোট, আমার যে স্যুসকেট নেই।"

দোতলার একটা বেশ বড় ঘরে এসে তারা ঢুকল। শোবার ঘর, ভাল আসবাবপত্রে সাজান। মাঝারি একটা পালঙ্কে একজন মহিলা শুয়ে আছেন। মোটা-সোটা চেহারা, গায়ের রং ফরশা, বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়স হবে। এতগুলি লোক দেখে বিরক্ত ভাবে তাঁদের দিকে তাকালেন।

ভদ্রলোক বললেন, "এই যে একজন নার্স এসেছেন, সেই যিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।"

মহিলা অস্ফুট স্বরে বললেন, "কে?"

সৌদামিনী এগিয়ে বললেন, "এই যে আমার বোনঝি প্রতিমা, এই কাজ করবে। ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। আর বছর দুই আড়াইয়ের মধ্যেই পরীক্ষা দিত, কিন্তু পারিবারিক কারণে ওকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন নার্সের কাজ করবে কিছুদিন। ওর সেবা করার অভিজ্ঞতা খানিকটা আছে, আর আমি যখনই দরকার হবে ওকে সাহায্য করব।"

ঝিটি এসে আবার ঘরে ঢুকেছিল। সে বলল, "এই ডাক্তার মাকে ত আমি জানি, উনি আমাদের পাড়াতেই ত থাকে, গাড়ী করে কত যেতে দেখেছি।"

সৌদামিনী বললেন "হ্যাঁ, আমি কাছেই থাকি। তা প্রতিমাকে কবে থেকে আপনার দরকার? কি কি কাজ করতে হবে, রাত্রে থাকতে হবে কি না, মাইনে কত, এগুলি জেনে নেওয়া দরকার।"

ভদ্রলোকের নাম সতীন্দ্রনাথ রায়। তিনি বললেন, "আমাদের দরকার ত এখন থেকেই। লোকের অভাবে এঁর সেবা-যত্ন ভাল করে হচ্ছে না, আমারও কাজ কামাই করে ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। সব কাজই করতে হবে, ওঁর ত হাঁটা-চলার ক্ষমতা নেই। রাত্রে থাকতে হবে কি না সেটা দুচারদিন না গেলে বলতে পারছি না, রাত্রে বেশী কিছু করতে হয় না, ঘুমিয়েই থাকেন।"

রোগিণী অস্পষ্ট ভাবে আবার জানালেন, "রাত্তিরে চাই না।"

কর্ত্তা বললেন, "দরকার হলে অবশ্য থাকতে হবে। আমি নিজেও খুব সুস্থ মানুষ নয়। রাতদিনের কাজ বলেই ধরে রাখুন। মাইনে ৩০০ টাকা দেব। আজ থেকে

থাকলেই ভাল ছিল। তা উনি ত প্রস্তুত হয়ে আসেন নি, কাল সকালেই চলে আসবেন তাহলে।"

সৌদামিনী নমস্কার করে বললেন, "আচ্ছা, আমরা তাহলে এখন চলি। ও কাল সকালেই তাহলে আসবে।"

দুজনে নেমে এলেন। গৃহকর্ত্তা তাঁদের দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

ফুটপাথে পদার্পণ করে প্রতিমা বলল, "ভদ্রলোককে মন্দ লাগল না, কথাবার্ত্তায় ভাল। বাচ্চা দুটোই ভাল। তবে তাদের মাটিকে একটু বদ্‌মেজাজী মনে হচ্ছে। কি রকম মুখ করে তাকিয়ে ছিল, যেন পারলে কামড়ে দেয়।"

সৌদামিনী বললেন, "বেশী অসুস্থ হলে মানুষ প্রায়ই খুব ভাল মেজাজে থাকে না। সব সুস্থ মানুষ সম্বন্ধেই তাদের একটা আক্রোশ জন্মে যায়। এঁর রাগের অন্য কারণও থাকতে পারে হয়ত।"

প্রতিমা বলল, "কি কারণ?"

সৌদামিনী হেসে বললেন, "আগে থেকে তোমার মাথায় আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়ে লাভ নেই। দু-চারদিন থাকলেই বুঝতে পারবে আমার ধারণাটা ঠিক না ভুল। আচ্ছা তুমি, এখন বাড়ীর পথ ধর, আমি চলি।"

প্রতিমা বাড়ী ফিরে গেল। একটু বিশ্রাম করে একটা স্যুটকেস টেনে নিয়ে কাপড় জামা গোছাতে বসল। বাইরের কাপড় চোপড় তার বেশী ছিল না। মা মাঝে মাঝে তাকে পূজোর সময় বা জন্মদিনে রঙীন বাহারে শাড়ী কিনে দিতেন বটে, তবে সেগুলি তোলাই থাকত, পরা হত কদাচিৎ। সেগুলি সে সযত্নে আলাদা করে মায়ের আলমারিতে তুলে রেখে দিল। সাদা শাড়ী, শাদা জামার মধ্যেও সব চেয়ে সাদাসিধেগুলিই বেছে নিয়ে সুটকেসে ভরল। হাতের সোনার চুড়িগুলি খুলে ফেলে মাকে বলল, "এগুলো তুলে রাখ মা। রোগীর সেবা যারা করে তারা হাতে গহনা পরে না।"

মা বললেন, "একেবারে খালি হাত করবি? দুগাছা করে রাখ না?"

প্রতিমা বলল, "না মা, ওতে অসুবিধে হয়। শুধু হাতঘড়িটা নেব, ওটা কাজে লাগে।"

মা বললেন, "রাত্রে এখানেই খাবি ত?"

প্রতিমা বলল, "যদি ফিরে আসি, তবে এখানেই খাব। তবে আসব কি না ঠিক করে বলতে পারব না। যদি আসি তখন দুধ পাঁউরুটি খেয়ে নেব, তুমি যেন এক গাদা রান্না করে রেখ না আমার জন্যে।"

গোছান অল্পক্ষণেই হয়ে গেল। মা আর মেয়ে কিছুক্ষণের জন্য একটু গড়িয়ে নিলেন। তারপর প্রতিমা উঠে নিজের ছাত্রীদের বাড়ী চলল; সে যে আর পড়াতে আসবে না সেটা তাঁদের জানাতে ত হবে? এ সম্ভাবনার কথা তাঁদের জানাই ছিল, কাজেই তাঁরা বেশী অবাক্ হলেন না।

রাত্রে খেতে বসে রজত বলল, "তুমি ত দিব্য মজা করে চললে। আমি বসে বসে বাড়ী আগলাই এখন।"

প্রতিমা বলল, "আহা, যতসব রোগীর সেবা করতে কত মজা! তুমি করে দেখনা একবার।"

"আহা, সারা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই কি সেবা করবে? দোকানে বাজারে যাবে, বেড়াতেও যাবে কথনও কথনও। কত রকম লোকের সঙ্গে দেখা হবে।"

প্রতিমা বলল, "ঠিক একটা দীর্ঘ পিক্‌নিকের মত মনে হচ্ছে তোমার, না? দোকান-বাজার কোথাও আমি যাব না, বড়জোর ওষুধের দোকানে যেতে পারি। লোকজনের মধ্যে এক ডাক্তার দু-চারজনের সঙ্গে দেখা হতে পারে।" রজত আর কথা বলল না।

সকালে উঠে চা খেয়েই প্রতিমা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাল। স্যুটকেস আর বিছানা নিতে হবে, কারণ নিজের বিছানা ছাড়া সে শুতে পারে না। একটা জলের কুঁজো আর একটা গেলাশও নিল।

অল্পক্ষণেই সে পৌঁছে গেল। আজও সেই ঝি এসেই দরজা খুলল। জিনিষপত্র দেখে বলল "দাঁড়াও, গোপালটাকে ডেকে দিই। বাক্স-বিছানা মাথায় করে আমি উপরে উঠতে পারব না বাপু।"

গোপাল এসে বাক্স-বিছানা উপরে নিয়ে চলল। সিঁড়ির মুখেই সতীন্দ্রবাবু এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "এই যে আপনি এসে গেছেন, আমি তাহলে আজ অফিসে যেতে পারি?"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, তা পারবেন না কেন? কাজ বুঝিয়ে দিয়েই যেতে পারবেন। ডাক্তার কি রোজ আসেন? রিপোর্ট রাখব ত?"

"রোজই আসেন বিকালের দিকে। রিপোর্ট রাখলে ত ভালই হয়! আমি অবশ্য এ ক'দিন ওসব করে উঠতে পারিনি, মুখেই বলতাম। আমার স্ত্রী শুনতে সবই পান, তবে কথাটা একটু জড়িয়ে গেছে, সব সময় পরিষ্কার বোঝা যায় না। ঐ নারাণী ঝি বেশ বুঝতে পারে, বুঝতে না পারলে ওকেই জিজ্ঞাসা করবেন। এই গোপাল, তুই এখানে হাঁ করে বাক্স-বিছানা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? গিন্নীমার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখ্।"

সকলেই চলল গোপালের সঙ্গে। ঘরের ভিতর টিনু আর মিনু খেলা করছিল। তারা ছুটে এসে প্রতিমার দুই হাত ধরে ঝুলে পড়ল। মিনু জিজ্ঞাসা করল, "তোমার চুড়ি কি হল? হাত কেন খালি করেছ? হাত ত খালি করতে নেই?"

টিনু বলল, "তুমি বিচ্ছিরি শাড়ী কেন পরেছ?"

সতীন্দ্রনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "এগুলোর কোনো ভদ্রতা জ্ঞান এখনও হয়নি।"

প্রতিমা বলল, "এইটুকু ছেলেমেয়ে আবার কি ভদ্রতা করবে? ওরা ঘরের লোক বাইরের লোকের তফাৎ ত বোঝে না?"

টিনুকে বলল, "আমার কাপড়গুলো সবই এই রকম বিচ্ছিরি। তোমার মত লাল জামা আমার একটাও নেই। দেবে একটা আমাকে?"

টিনু বলল, "তুমি যে বড়।"

মিনুকে প্রতিমা বলল, "আমাকে ত সারাক্ষণ কাজ করতে হবে, তাই খালি হাত করেছি। অনেক গহনা পরলে, কাজ করা যায় না।"

মিনু বলল, "মোটেই না, মা কত কাজ করত অসুখ হবার আগে। সব সময় বালা চুড়ি পরে থাকত।"

সতীন্দ্রবাবু বললেন, "ঢের পাকামি হয়েছে, এখন যাও ত স্নান করগে। নারাণী এদের নিয়ে যাও, খুকীকে খাইয়ে দাইয়ে তৈরী রেখ, স্কুলের গাড়ী এলে ওকে পাঠিয়ে দিও। বামুন ঠাকরুণকে বল গিয়ে যে একজন লোক বেশী খাবেন, তাঁর জন্যে যেন ব্যবস্থা করে। আমি ত আজ অফিস যাব, কাজেই সময়মত ভাত চাই।"

নারাণী খোকা-খুকীদের নিয়ে প্রস্থান করল। সতীন্দ্রবাবু তখন প্রতিমাকে কাজ বোঝাতে আরম্ভ করলেন। বিশেষ জটিল কিছু নয়, সাধারণ পরিচর্য্যাই মোটামুটি করতে হবে, বোঝা গেল। তবে গৃহিণীর মেজাজ একটু খিট্‌খিটে হয়ে গেছে, পথ্যাদি নিয়ে প্রায়ই গোলমাল করেন, ডাক্তার যা পথ্য বলেন তা খেতে চান না। অনেক বুঝিয়ে পড়িয়ে তাঁকে খাওয়াতে হয়।

ইতিমধ্যে ভদ্রমহিলা কি যেন একটা বলে উঠলেন, প্রতিমা ঠিক ধরতে পারল না। সতীন্দ্র তাঁর স্ত্রীর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "কি বলছ?"

তিনি আবার কথা বললেন। এবার তাঁর স্বামী মুখ তুলে বললেন, "উনি জানতে চাইছেন, আপনি কেন বিছানা নিয়ে এসেছেন।"

প্রতিমা বলল, "নিজের বিছানা ছাড়া আমার শুতে অসুবিধা হয়, তাই।"

ভদ্রলোক কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। বললেন, "আচ্ছা, তা কয়েকদিন দেখুন, রাত্রে থাকা দরকার হয় কি না দেখা যাক। আপনি চা টা খেয়ে এসেছেন ত?"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, চা খেয়ে এসেছি। এঁকে ক'টার সময় স্নান করাব?"

"এখন ক'দিন ত গা মুছছেন খালি। আমার রোগীর সেবা বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই ত? শয্যাগত মানুষকে কি করে স্নান করাতে হয় তা ডাক্তার বলেছিলেন, কিন্তু আমি সেটা করতে পারিনি। আপনি আজ তাঁর কাছে জেনে নেবেন।"

প্রতিমা বলল, "আচ্ছা। আজ তাহলে গা মুছিয়েই দেব। ওঁর খাবার কি বামুন ঠাকরুণই করে দেয়, না আমাকে কিছু করে নিতে হবে?"

"ওরাই ত করছে, তবে এঁর বড় অরুচি, কিছু খেতে চান না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাওয়াতে হয়। প্রথমদিন আপনাকে খুব হয়রান হতে হবে, রাত্রে অবশ্য আমি এসে যাব। আচ্ছা আপনি তবে গোছগাছ করুন, আমি স্নান করতে যাচ্ছি" বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

ঘরটা বেশ অগোছালই, যদিও ঝাঁটপাট দেওয়া হয়েছে বোঝা গেল। প্রতিমা ঘুরে ঘুরে আলনা, টেবিল প্রভৃতি গোছাতে লাগল। রোগিণী খাটে শুয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলেন।

নারাণী ছেলে-মেয়েদুটিকে স্নান করিয়ে নিয়ে এল। আলনা থেকে শুকনো কাপড় জামা পেড়ে নিয়ে তাদের পরাতে পরাতে বলল, "আর বল কেন দিদিমণি। ও সব দিকে তাকাবার কি আর সময় পেয়েছি এ ক'দিন? মাকে নিয়ে সে যা কাণ্ড। টিনু মিনু ত কেঁদে হাট বসিয়ে দিল। কর্তা বাবুও ত প্রায় কেঁদে ফেলেন। গিন্নির বাপের বাড়ী থেকে সব ছুটে আসে, ডাক্তারবাবু আসেন তবে ত সব থামে।"

রোগিণী একটা ধমক দিয়ে উঠলেন, যদিও প্রতিমা তাঁর কথা ঠিক বুঝতে পারল না। নারাণী হেসে বলল, "মা বলছে, আমি নাকি বাজে বকছি। কিচ্ছু বাজে নয়, তুমি শুধিও কেননা বামুন ঠাকরুণকে।"

মিনু নাক সিঁটকে বলল, "ও ফ্রকটা আমি পরব না, ওটা ধামসে গেছে। ইস্ত্রি করে দাও।"

নারাণী মুখ নাড়া দিয়ে বলল, "আমি কি জানি নাকি ইস্ত্রি করতে? সাত জন্মে ওসব হাতে করিনি, মা ত নিজে করত এসব। এখন ত ধোপার বাড়ী নে যাবারও সময় নেই।"

টিনু প্রতিমার হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলল, "তুমি করে দাও, সব মারা ত ইস্ত্রি করতে জানে।"

নারাণী বলল, "শোন কথা একবার। তা দিদিমণি দেবে নাকি একটু ইস্ত্রি চালিয়ে?"

মিনু দৌড়ে গিয়ে ইস্ত্রিটা নিয়ে এল। টেবিলের উপর ফ্রকটা রেখে প্রতিমা ইস্ত্রি করতে লাগল। টিনু তার জামাটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমারটাও।"

সতীন্দ্রবাবু স্নান সেরে ঘরে ঢুকে বললেন, "এই, কি হচ্ছে ওসব? ওঁকে দিয়ে যত বাজে কাজ করাচ্ছ কেন?"

নারাণী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমি যে ওসব পারি না বাবু। মা ত আমাকে খুকীর জামা ধরতেই দিত না।"

প্রতিমা বলল, "কি আর হয়েছে তাতে। সহজ কাজ, বাড়ীতে সর্ব্বদাই করি।"

সতীন্দ্র বললেন, "এখানে তাই বলে সবরকম কাজ আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে চলবে কেন? এমনিতেই আপনাকে যথেষ্ট খাটতে হবে। আচ্ছা, চল এখন সব, ভাত খেতে চল। নারাণী, বামুন ঠাকরুণকে বল খাবার নিয়ে আসতে।"

খোকা-খুকী আর তাদের বাবা বেরিয়ে গেলেন। ইস্ত্রি রেখে দিয়ে প্রতিমা ঘর গোছানটা শেষ করল, তার পর রোগিণীর গা মোছাবার ব্যবস্থা সব ঠিক করে রাখল। খোকা-খুকীর খাওয়া খুবই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল, তারা আবার মায়ের শোবার ঘরে এসে জুটল। তাদের বাবাও অফিসের পোশাক পরে একটু পরে এসে ঢুকলেন। স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা, তবে অফিসটা ঘুরে আসি একবার।" প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছু দরকার হলে অফিসে টেলিফোন করে বলবেন আমাকে। নম্বরটা আমি টেলিফোনের পাশে লিখে রেখে যাচ্ছি। নিজের জন্যে কিছু দরকার হলে নারাণীকে বলবেন। আমি সন্ধ্যের মধ্যেই এসে পড়ব।" মিনুর স্কুলের গাড়ী এসে পড়াতে সেও চলে গেল এই সময়।

প্রতিমা রোগিণীর গা মুছিয়ে কাপড়চোপড় ছাড়িয়ে দিল। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়গুলিও বদলে দিল, কারণ সেগুলি খানিকটা ময়লা হয়ে গিয়েছিল খাওয়ান নিয়ে খানিক হাঙ্গাম হল। গৃহিণীর জড়ান জড়ান কথায় প্রতিমা বুঝল যে তিনি ঐ নুন-মশলাহীন গরুর জাবনার মত খাবার খেতে পারেন না। ডাক্তার এত অবুঝ যে তাঁকে অখাদ্য জিনিষ ছাড়া আ

কিছু খেতে দিতে চান না। তাঁর খাওয়া অর্দ্ধেক হয়ে গেছে একেবারে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রতিমা তাঁকে কিছুটা খাওয়াতে পারল।

এরপর তার নিজের নাওয়া খাওয়া। সম্পন্ন লোকের বাড়ী, স্নানের ঘরটর ভালই। তবে গৃহিণী শুয়ে পড়াতে সবই মলিন, শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। চাকর ঝি জমাদার সকলেই যথাসাধ্য কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। যতটা পারল প্রতিমা নিজেই পরিষ্কার করে রাখল।

নার্সকে কোথায় খেতে দিতে হবে সে বিষয়ে অনেক গবেষণা করে নারাণী তাকে শেষ পর্যন্ত খাবার টেবিলেই নিয়ে গেল। বামুন ঠাকুরুণের রান্না তার কিছুই ভাল লাগল না। তবে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করা তার কোনোদিনও অভ্যাস নয় বলে সে কোনমতে খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। এখন খানিকক্ষণ তার আর কিছু করবার নেই। গল্প করবারও কেউ নেই। রোগিণী মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। প্রতিমার নিজের দিনে ঘুমোনোর অভ্যাস একেবারে নেই। সে ঘুরে ঘুরে সারা বাড়ীটা দেখল। নারাণী তার পথ-প্রদর্শিকা হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "বাড়ী কি এঁদের নিজের?"

"হ্যাঁ গো দিদিমণি, নিজেদেরই। বাবু নিজে ভাল কাজ করে, তার বাবাও বড়লোক ছিল। গিন্নিও খুব বড় লোকের মেয়ে, তায় একমাত্র সন্তান। বাপের সব সম্পত্তি সে-ই পাবে।"

এত তথ্য জানবার কোনো দরকার ছিল না প্রতিমার, তবে নারাণী বলছে যখন তখন সে শুনেই গেল।

এরপর নারাণীও খেতে গেল। প্রতিমা টিনু-মিনুর পড়ার টেবিল থেকে তাদেরই গোটা কতক বই নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল।

এমনি করে বিকেল এসে পড়ল। মিনু স্কুল থেকে ফিরে এল, টিনু ঘুম থেকে উঠে অতি অপ্রসন্ন চিত্তে নারাণীকে ক্রমাগত চিমটি কাটতে লাগল। সকলের চা খাবার সময়। প্রতিমাও একটু হাত লাগাল পরিচারিকাদের সঙ্গে, নইলে তারা তাড়াতাড়ি কিছু করে উঠতে পারে না। গৃহিণী চাটা নির্বিবাদেই খেলেন। প্রতিমাও চা খেল। গৃহকর্তা ফিরে এসে চা খেয়ে স্ত্রীর কাছে একটু বসলেন দেখে প্রতিমা টিনু-মিনুকে নিয়ে ছাদে বেড়াতে গেল।

নারাণী খানিক পরে এসে ডাকল, "দিদিমণি, ডাক্তার বাবু এসেছেন।"

প্রতিমা নেমে গেল। ডাক্তারবাবুটি বুড়ো মানুষ, বহুদিন এঁদের পারিবারিক চিকিৎসকের কাজ করছেন। প্রতিমাকে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনি ত দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ। এ লাইনে কি অভিজ্ঞতা কিছু আছে?"

প্রতিমা কিছু বলবার আগেই গৃহকর্তা প্রতিমার বিষয় যা জানতেন তা গড়গড় করে বলে গেলেন। ডাক্তার বললেন, "তাহলে আপনার বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না। ঘরটার ত দেখি অনেক উন্নতি হয়েছে, এরপর পেশেন্টেরও উন্নতি হবে।"

ডাক্তার খুব বেশীক্ষণ বসলেন না। তারই মধ্যে প্রতিমার যা কিছু জানার সে তা জেনে নিল। ডাক্তার চলে যেতেই টিনু, মিনু আবার প্রতিমাকে টানতে টানতে ছাদে নিয়ে গেল। মিনু তাকে ভাল করে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, "তুমি টিপ পরনি কেন, সিঁদুর পরনি কেন?"

টিনু বলল, "তুমি ফুলও পরনি।"

প্রতিমা বলল, "আমার ত বিয়ে হয়নি তা সিঁদুর কি করে পরব? আর ফুল পরলে কি চলে? কত রকম কাজ করতে হয় আমায়?"

মিনু বলল, "বড় মেয়েরা ত সবাই বিয়ে করে, তুমি কেন করনি? মা বলেছে আমার ষোলো বছর বয়স হলেই বিয়ে দিয়ে দেবে, আমি খুব দুষ্টু কিনা?"

টিনু বলল, "আমিও খুব দুষ্টু কিন্তু আমার বিয়ে হবে না।"

প্রতিমা বলল, "কেন বল ত? হবে না কেন?"

টিনু বলল, "দুষ্টু ছেলেদের বিয়ে দিলে তারা আরো দুষ্টু হয়ে যায়।"

এ বিষয়ে গবেষণা আর কতক্ষণ চলত তা বলা যায় না, তবে নারাণী এ সময় প্রতিমাকে ডাকতে আসাতে তাকে নেমে যেতে হল। গৃহিণীর মাথা কামড়াচ্ছে বলে কর্ত্তাবাবু তাকে ডাকছেন। অনেকক্ষণ ধরে শুশ্রূষা করে সে ভদ্র মহিলাকে সুস্থ করে তুলল খানিকটা। তারপর সন্ধ্যা হল, আলো জ্বলল। টিনু আর মিনুকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে পড়াতে বসান হল। তাদের বাবা তাদের আগলে বসে রইলেন। প্রতিমা গৃহিণীর খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় করতে লাগল। খুব অল্প একটু নুন দেবার অনুমতি সে ডাক্তারের কাছে নিয়েছিল, কাজেই রাত্রের খাওয়াটা নিয়ে আর বেশী হাঙ্গামা করতে হল না। খাওয়া শেষ হতেই গৃহিণী বললেন, 'তুমি এইবার নিজে খেয়ে দেয়ে বাড়ী চলে যাও। রাত হয়েছে ত?"

প্রতিমা বলল, "আচ্ছা, যদি দরকার না হয় ত চলেই যাব। আপনাকে ঘুমের ওষুধটা আগে খাইয়ে দিই।"

"সে খুকীর বাবা দেবে এখন, সে ত বাড়ীতেই আছে।"

প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাচ্চাদের সামনে তাদের বাবাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি তাহলে চলেই যাব? উনি ত ক্রমাগত বলছেন চলে যেতে।"

সতীন্দ্র বললেন' 'ওঁর মেজাজটা বড় খারাপ হয়ে গেছে অসুখে পড়বার পর। ওঁর কথার বিরুদ্ধে কথা বললে বড় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, সেটা ওঁর পক্ষে একেবারেই ভাল নয়। যান তাহলে। আমি ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখি যদি মাঝে মাঝে আপনাকে রাত্রে থাকতে অনুমতি দেন। আমি ত হলে কয়েকদিন একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি। কিছুদিন ধরে বড় স্ট্রেণ যাচ্ছে।"

প্রতিমা বলল, "যখনই বলবেন তখনই থাকব, আমার ত থাকবারই কথা। আজ তাহলে আমি যাই, ওষুধ ত তিনি আপনার হাতেই খাবেন বলছেন।"

ভদ্রলোক একটু কাতর ভাবে হেসে বললেন, "এঁকে নিয়ে হয়েছে এক মুশকিল। আগে স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল, কারো কাছে সেবা নিতে কখনও হয়নি, কাজেই ও অভ্যাসটা আর হয়নি। নার্স রাখতে কি সহজে রাজী হয়েছেন? ডাক্তারবাবু কত করে বোঝাবার পর তবে রাজী। তা আপনি খেয়ে দেয়ে যান, আপনার জন্যে ত আমি রান্না করতে বলেছি।"

প্রতিমা বলল, "বাড়ী গিয়ে খাব এখন। সেখানেও মা জোগাড় রেখেছেন।" সে ঘরে পরার চটিটা খুলে রাস্তায় হাঁটবার জুতোটা পরে বেরিয়ে পড়ল। ট্রামে বাসে এখনও প্রচণ্ড ভীড়। এই ঠেলাঠেলির মধ্যে উঠতে তার একেবারে ভাল লাগল না। তার বাড়ী বিশেষ দূরে নয়, সে আস্তে আস্তে হেঁটেই চলল।

মা তখন সবে রান্নাঘরে কাজ শেষ করেছেন। রজত নিজের ঘরে বসে পড়ছে। দিদিকে দেখে সে লাফিয়ে উঠল, "দিল বুঝি তাড়িয়ে? ভালই হল।"

প্রতিমা বলল, "তাড়াতে যাবে কেন? আমি কি তোমার মত কাজে ফাঁকি দিই যে তাড়িয়ে দেবে? রাত্রে কোনো দরকার নেই বলে চলে এলাম।"

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, "খেয়ে আসিস্ নি ত? আমি খাবার রেখেছি তোর জন্যে।"

প্রতিমা খাবার টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "এখানেই খাব। ওদের বাড়ীর বামুন-ঠাকরুণের রান্নার এক বেলায় যা পরিচয় পেলাম তাতে আর এক বেলা খাবার আর উৎসাহ হল না।"

মা বললেন, "তাহলে রজতও বসে যা। দুজনে খেয়ে নে গরম গরম।"

খাওয়া-দাওয়া তাদের অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ে গেল। তারপর মা খেতে বসলেন, প্রতিমা তাঁকে পরিবেশন করতে লাগল।

মা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকম বাড়ী রে? মানুষগুলিই বা কেমন?"

প্রতিমা বলল, "বাড়ী ত ভালই, পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ী। কর্ত্তা ছেলেমেয়ে এরাও ভালই। তবে রোগিণী যিনি তিনি হচ্ছেন বাড়ীর গিন্নী। তাঁকে

তেমন স্থবিধের মনে হল না। কেমন যেন খামখেয়ালী মত, মেজাজটাও খিটখিটে।"

মা বললেন, "তাহলে ত মুশকিল। অবিশ্যি ভাল মানুষও খিটখিটে হয়ে যায় রোগে পড়লে। খুব বুঝি খুঁৎ ধরে?"

প্রতিমা বলল, "তা ঠিক নয়। কাজের খুঁৎ কিছু ধরে না। মনে হয় আমাকে যেন চায় না, ধারে কাছে বেশীক্ষণ থাকলে যেন বিরক্ত হয়।"

মা বললেন, "এটা ত অদ্ভুত। সাধারণতঃ মানুষ যার কাছে সেবা-শুশ্রূষা পায়, তাকে পছন্দই করে।"

প্রতিমা বলল, "দেখি আরো কয়েকদিন। মাইনেটা ভাল আছে, খাটুনিও খুব বেশী নয়। চালিয়ে নিতে পারলে থেকেই যাব। ছেলেমেয়ে দুটো বেশ মজার, পুট পুট করে বেশ কথা বলে। তবে গিন্নী ঠাকরুণ বেশী ক্যাট ক্যাট করলে হয়ত না টিকতেও পারি।"

মা বললেন, "অনেক মানুষ আছে যারা পেশাদার নার্সের সেবা পছন্দ করে না। বাড়ীর লোকের সেবাই চায়। ইনি হয়ত সেই দলের।"

প্রতিমা বলল, "হতে পারে, জানি না। তবে বাড়ীতে সেবা করার লোক ত বিশেষ নেই। ছেলেমেয়ে দুটোই একেবারে ছোট এবং বেশ দুষ্টু। বাড়ীর কর্ত্তা আছেন অবশ্য, তা তাঁকে ত সন্ধ্যে অবধি আফিসে বসে থাকতে হয়। স্ত্রীর সেবা করবেন কখন? তাঁর ত ইচ্ছে আমি থেকে রাত্রেও রোগীর দেখাশোনা করি, তাহলে তিনি একটু ঘুমোতে পারেন, কিন্তু গিন্নীর ইচ্ছা একেবারেই সেরকম নয়।"

মা বললেন, "দখলদারীর নেশা বেশী থাকলে ও রকম হয়। বাবুটির বড় মুশকিল ত!"

মায়ের খাওয়া হয়ে গেল। টেবিল মুছে, এঁঠো বাসন-কোশন সরিয়ে রেখে প্রতিমা আর তার মা শুতে চলে গেলেন। রজত আবার গিয়ে পড়ার বই খুলে বসল। দশটার আগে তাকে শুতে যেতে মা বারণ করেন, কিন্তু অতক্ষণ তার পড়তে ভাল লাগে না। পড়েই অবশ্য সে, কিন্তু সবগুলো পড়ার বই নয়। প্রতিমা মাঝে মাঝে তার এই ফাঁকিটুকু ধরে ফেলত, তবে কিছু বলত না। ওদের বাবা বেঁচে থাকতে রাত জেগে পড়া ভালবাসতেন না। ন'টার পরই শুয়ে পড়তে বলতেন, আরো বলতেন "বেশী পড়ার দরকার হয়ত বেশী ভোরে উঠে পড়া কোরো, তাতে শরীর খারাপ হবে না।"

প্রতিমা আর তার মা খুব ভোরেই ওঠেন। ওদের চা খাওয়াও বেশ সকাল সকাল হয়ে যায়। রজত অত সকালে উঠতে চায় না, তার চা থার্মোফ্ল্যাস্কে ঢেলে রাখা হয়।

মনে একটু চিন্তা নিয়ে শুয়েছিল বলে আজ প্রতিমার ঘুম আরো আগে ভেঙে গেল। রান্নাঘরে ঢুকে একটু খুট্‌খাট্ করে কাজ আরম্ভ করতে না করতে তার মাও উঠে পড়লেন, বললেন, "এরই মধ্যে উঠেছিস কেন রে?"

প্রতিমা বলল, "তাড়াতাড়ি যেতে হবে ত, তাই আগে উঠলাম, তবে চা-টা খেয়েই যাই। ওদের বাড়ী যে চা হয়, তা আমার ভাল লাগে না।"

মা বললেন, "এই ত এসব কাজের মুশকিল। এক এক বাড়ীতে এক এক রকম রান্না খাওয়া। যে বাড়ীর গিন্নী শুয়ে আছে, সে বাড়ীর ঝি-চাকরের ত পোওয়া বারো। যা-খুশি করে, নোংরামিরও অভাব হয় না।"

চা কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে গেল। প্রতিমা চুল বেঁধে, শাড়ী-জামা বদ্‌লে বেরিয়ে পড়ল। মাকে বলে গেল, "আজও সম্ভবতঃ আমি রাত্রে ফিরে আসব।"

সতীন্দ্রবাবুর বাড়ী পৌঁছে দেখল, ঝি-চাকররা সবে নড়তে চড়তে আরম্ভ করেছে। নারাণী একটা ঘরে তখনও তার মেঝের বিছানায় চোখ তাকিয়ে শুয়ে আছে। টিনু মিনু তখনও ঘুমোচ্ছে পালঙ্কের বিছানায়। প্রতিমাকে দেখে নারাণী বলল, "বোস দিদিমণি, এ ঘরেই বোস। গিন্নীমার ঘরের এখনও দরজা বন্ধ, বাবুর বোধ হয় এখনও ঘুমই ভাঙেনি। ঘুমকাতুরে মানুষ একে, তাতে রোগীর ঘরে শোওয়া, রাত্রে অনেকবার উঠতে হয় বোধহয়।" সে নিজে উঠে বসে বিছানাটা গুটিয়ে রাখতে লাগল।

প্রতিমা বলল, "তোমাদের চা খাওয়া হয় কখন?"

"তা একটু দেরী হয়। বামুন-ঠাকুরুণ উঠে উনুন ধরাবে তবে ত? বাবুও উঠতে একটু দেরী করে। টিমু মিমুর ত কথাই নেই, তাদের টেনে বিছানা থেকে নামিয়ে না দিলে তারা জাগেই না। তা তোমার বুঝি খুব সকালে চা খাওয়া অভ্যেস? তা হলে ত তোমার কষ্ট হবে এখানে।"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, আমরা খুব সকালেই চা খাই। আজ আমি খেয়েই এসেছি, এরপর যদি রাত্রে থাকি ত একটা থার্মোফ্ল্যাস্ক্ নিয়ে আসব; রাত্রে চা করে তাতে রেখে দেব।"

নিজের গোটান বিছানাটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে নারাণী উঠে দাঁড়াল। বলল, "রাত্তিরে কি আর মা তোমাকে রাখবে? বাবুর এত কষ্ট হয় রাত জাগতে, তা ত বুঝবেনি কিছুতে! বাবুকে ওর ঘরে শুতেই হবে। আচ্ছা যাই, মুখ-হাতটা ধুয়ে আসি।" বলে নারাণী নীচে চলে গেল।

প্রতিমা একটু অবাক্ হল। গৃহিণী এত অবুঝ কেন? উপায় যখন রয়েছে তখন কেন স্বামী বেচারাকে জাগিয়ে রাখা? এমন ত কচি বউ কিছু না? ছেলে পিলের মা, মধ্যবয়স্কা মহিলা।

বাড়ীর লোকজন সব জেগে উঠতে লাগল। সতীন্দ্রনাথ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। নারাণী এসে খোকা খুকীকে ঠেলে তুলল। নীচে রান্নাঘরে আঁচ পড়েছে বোঝা গেল, বেশ খানিকটা ধোঁয়া ঘরে এসে ঢোকাতে। প্রতিমা রোগিণীর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তিনি তখন আর ঘুমিয়ে নেই, চোখ খুলে এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছেন। প্রতিমাকে বললেন, "সকাল সকাল এসেছ ত।"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ সকাল সকালই এলাম, তা নাহলে আপনার অসুবিধে হতে পারে।"

টিমু মিমু এসে জুটল। কলকল করে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়ে গেল। সতীন্দ্রবাবুও এসে ঢুকলেন, বললেন, "আজ ওকে একবার স্নান করিয়ে দেবেন, অসুখে পড়ে অবধি ওঁর স্নান করা হয়নি। আমি ত ওসব পারি না।"

গৃহিণী নিজের একখানা হাত তুলে বললেন, "দেখেছ কত ময়লা পড়েছে। কেউ বলবে যে আমি মানুষটা আসলে ফরশা?"

তাঁর স্বামী হেসে বললেন, "আজ আবার পুরোপুরি ফরশা হয়ে যাবে।"

হঠাৎ মিমু বলল, "আচ্ছা, বল ত আমার মা বেশী ফরশা না বাবা বেশী ফরশা?"

প্রতিমা একটু মুশকিলে পড়ল। সত্যি কথা বললে মিমুর মা যদি চটে যান? বলল, "তোমার কাকে বেশী ফরশা লাগে?"

মিমু বলল, "বাবাকে। তবে মা বলে সে বিয়ের সময় খুব ফরশা ছিল, বাবার চেয়ে বেশী।"

মিমুর মা বললেন, "নারাণী, নিয়ে যা ত এ মেয়েটাকে এখান থেকে। উঠেই বাঁদরামি করতে লেগেছে। তুমি বাছা আমার মুখটুখগুলো ধুইয়ে দাও ত, বাসি মুখে কথা বলতে ভাল লাগে না।"

প্রতিমা নিজের কাজকর্ম্ম আরম্ভ করল। টিমু মিমুকে নারাণী মুখ ধোওয়াতে, দুধ খাওয়াতে নিয়ে গেল। কর্ত্তাও চা খেতে চলে গেলেন।

সকাল বেলাটা অনেক কাজ থাকে, কাজেই প্রতিমার সময় তাড়াতাড়ি কাটতে লাগল। মিমু স্কুলে গেল, কর্ত্তাও বেরিয়ে গেলেন। তখন নারাণীকে সাহায্যকারিণীরূপে নিয়ে প্রতিমা রোগিণীকে ভাল করে স্নান করিয়ে দিল। সত্যিই ভদ্রমহিলার গায়ে প্রায় ছাতা পড়ে গিয়েছিল। স্নান শেষ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "বাঁচলাম বাবা। এ ক'দিন আর নিজেকে মানুষ বলে মনে হয়নি"

নারাণী বলল, "যা বলেছ মা। এই গরমের দিনে কেউ পারে চান না করে? আমারা ত দু-তিন বার করে চান করি।"

প্রতিমা নারাণীকে বলল, "তুমি এইবার এই ঘরটা মুছে ফেল, আমি ততক্ষণ নিজে স্নান করে আসি।"

স্নান করে ফিরে এসে সে যখন চুল আঁচড়াচ্ছে তখন মিনুর মা বললেন, "বাঃ, তোমার ত বেশ চুল আছে দেখছি। সবাই বলে, বেশী পড়াশুনা করলে নাকি চুল উঠে যায়।"

প্রতিমা বলল, "সবাইকার কি আর যায়? কারো কারো যায় হয়ত।"

গৃহিণী বোধহয় একটু গল্প করার মেজাজে ছিলেন, বললেন, "তোমার রংও ত বেশ ফরশা, নাক মুখ চোখও ভাল। কর্ত্তা বলছিলেন, তুমি নাকি বড় ঘরের মেয়ে, এখন অভাবে পড়েছ। তা তোমার বাবা-মা এতদিন তোমার বিয়ে দেননি কেন? তোমার বয়স ত কম হবে না? তোমরা হিন্দু ত, না ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান?"

প্রতিমা বলল, "আমরা হিন্দুই, তবে আমার বাবা ছোট বেলায় বিয়ে দেওয়া পছন্দ করতেন না।"

গৃহিণী বললেন, "ছোট বেলাই বিয়ে দেওয়া ভাল, মেয়েদের বেশী বড় করতে নেই, মতিগতি খারাপ হয়ে যায়।"

প্রতিমা মনে মনে বিরক্ত হল। বলল, "দেখুন, অত বেশী কথা বলবেন না, ওতে আপনার অনিষ্ট হতে পারে। শুনলেন না, কাল ডাক্তারবাবু বললেন কথা যত কম বলেন ততই ভাল?"

গৃহিণী ব্যাজার মুখ করে বললেন, "ওদের যত সব কথা। সারা দিনরাত কেউ মুখ শেলাই করে বসে থাকতে পারে নাকি? যেমন ডাক্তার, তেমন ঘরের মানুষ। রাত্তিরটার ত বেশীর ভাগ সময়ই জেগে থাকি, যদি একবার মুখ খুললাম ও অমনি ক্যাঁট ক্যাঁট আরম্ভ করল, আমি নাকি তার শরীর খারাপ করে দিচ্ছি ঘুমোতে না দিয়ে। ওসবের মানে কি আর আমি বুঝি না?"

যাই হোক, কিছুক্ষণ তিনি আর কথাবার্ত্তা বললেন না। প্রতিমা তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। তাঁর কাজ সেরে তারপর নিজে খেতে গেল। নারাণী জিজ্ঞাসা করল, "আজ মা আছে কেমন?"

প্রতিমা বলল, "আছেন ত একরকম ভালই। তবে ডাক্তারের নিষেধ ত মানেন না, বড় বেশী কথা বলছেন আজকে। এতে আবার না বাড়াবাড়ি হয়।"

বামুন ঠাকুরুণ বলল, "কোনোদিন কি কারো কথা শুনেছে যে আজ ডাক্তারের কথা শুনবে? এ বাড়ীর কারো ত মুখ খুলবারই জো নেই. তিনিই শুধু কথা বলবে। বাবু নেহাৎ ভালমানুষ তাই, অন্য সোয়ামী হলে পাঁচ কথার উপর দশ কথা শুনিয়ে দিত না? হলই না হয় গিন্নী বড়লোকের মেয়ে, বাবুও ত হা-ঘরের ছেলে নয়? বাড়ী, গাড়ী, কিসের তার অভাব?"

নারাণী বলল, "ছাড়ান দাও বাপু ওসব কথা। কেউ আবার কোথা থেকে শুনে ফেলবে আর টুক্ করে গিয়ে লাগিয়ে দেবে। তখন আবার বকুনি খেতে খেতে প্রাণ বেরোবে।"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "টিনু খেয়েছে? সে কোথায়?"

নারাণী বলল, "ওমা, সে কি এতক্ষণ বসে আছে? যেই তার বাবা আর মিনু খেতে বসবে অমনি সেও বসে যাবে। বাপের পাতের সব আলু তুলে নিয়ে খেয়ে নেবে। পেটে ভাত পড়ল কি ছেলের চোখ ঘুমে ঢুলে এল। ওরা বেরিয়ে যেতে না যেতে সে গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে। ও কি দিদিমণি, এরই মধ্যে তোমার খাওয়া হয়ে গেল?"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, তোমরা খাও, আমি উঠি। একসঙ্গে বেশী খেতে পারি না আমি। খেয়েই ত কলেজে যেতাম আগে, পেট বেশী ভার থাকলে ঘুম পেত, কাজ করতে অসুবিধা লাগত।"

নারাণী বলল, "তা বাপু দুপুরে একটু ঢুলুনি আসবেই ত? আমরা সারাদিন খাটি খুটি, দুপুরে একটু না গড়ালে বাঁচি না। রাত্তিরে ত শুতে সেই বারোটা বাজে।"

প্রতিমা আবার গৃহিণীর ঘরে ফিরে এল। দেখে একটু নিশ্চিন্ত হল যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। দিবানিদ্রা প্রতিমার একেবারেই অভ্যাস ছিল না। সে

সারাবাড়ী ঘুরে গোটাকয়েক ইংরেজী ও বাংলা মাসিক পত্র জোগাড় করে নিয়ে এল। একটা গদী আঁটা চেয়ারে আরাম করে বসে সেইগুলিই উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল।

মিনু বেশ সকাল সকাল ফেরে স্কুল থেকে। এসেই খাওয়ার জন্যে বায়না ধরে ; কাজেই নারাণী আর বামুন ঠাকরুণকে জল খাবারের জোগাড় করতে উঠে পড়তে হয়। অত সাধের দিবানিদ্রাটা তারা বেশীক্ষণ উপভোগ করতে পারে না। মিনুকে আবার যা তা খাবার দিলে চলবে না, নিত্য নূতন রকম খাবার চাই, নইলে সে চেঁচিয়ে মেচিয়ে হাট বসিয়ে দেয়। টিনুর একঘেয়ে খাবার হলে কিছু এসে যায় না, কিন্তু দিদি যখন চেঁচায় তখন সেও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচায়। তাদের মায়ের যখন অসুখ করেনি, তখন তিনিও ঝি-রাঁধুনীর সঙ্গে হাত লাগাতেন, এখন তারা নিজেরাই যা পারে করে।

খানিক বই পড়ে প্রতিমার আর ভাল লাগল না। সে ঘরের সামনের বারান্দায় গিয়ে বেড়াতে লাগল। মিনু একটু পরেই এসে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে টিনুও উঠে পড়বে। তখন আর কাজের অভাব থাকবে না, তাদের অসংখ্য রকমের প্রশ্নের উত্তর দিতেই অনেক সময় কেটে যাবে। গৃহিণীও ততক্ষণে জেগে যাবেন।

মিনুর স্কুলের গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। বিরাট্ গাড়ী, তার হর্ণের শব্দও বিপুল। হুড়মুড় করে মিনু ছুটে এল উপরে, চীৎকার করতে করতে, "নারাণী, শিগ্‌গির আমার খাবার দাও।"

টিনু উঠল, টিনুর মাও জেগে উঠলেন। নারাণী ডেকে বলল, "দিদিমণি, তুমিও চা খেয়ে নাওনা এখন? আর একবার চা হতে ত সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

প্রতিমা বলল, "এখনি থাক না, আগে তোমাদের মায়ের চা খাওয়া হোক।"

গৃহিণী বললেন, "না, না, তুমি খেয়ে নাও বাপু, আমার এখনি খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি চা খেয়ে এসে আমার চুলটা ভাল করে বেঁধে দাও ত। কি যে হিঁচড়ে টেনে বিনুনি বেঁধে দিয়েছে, মাঠ কপাল বেরিয়ে পড়েছে। যা দেখাচ্ছে!"

প্রতিমা হাসি চেপে চা খেতে চলে গেল। মহিলা আচ্ছা ভাবুনে যাহোক। এত অসুখের মধ্যেও নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে সে ভাবনা ভাবছেন। এমন ত কিছু সুন্দরী নন?

চা খেয়ে ফিরে এসে সে রোগিনীর চুল নিয়ে পড়ল। তাঁর পছন্দ মত খোঁপা করে দিল, তারপর তাঁর আদেশ মত পাউডার আর সুগন্ধিও মাখিয়ে দিল। গৃহিণী বললেন, "আমার শাড়ীখানা বদ্‌লে দিতে পারবে?"

প্রতিমা বলল, "তা পারব না কেন? কোন্ শাড়ীটা দেব?"

"বাইরে ত আমার ভাল কিছু নেই। আচ্ছা, আমার বালিশের তলা থেকে চাবির গোছাটা বার কর ত। ঐ যে সব চেয়ে লম্বা চাবিটা, ঐটাই আমার আলমারির চাবি। আলমারি খুলে, মাঝের তাকটায় দেখ, অনেকগুলি রঙীন শাড়ী সাজান আছে। সবার উপরে একটা হালকা সবুজ রং এর চওড়া জরি পেড়ে শাড়ী আছে, সেইটা দাও, ওর সঙ্গে ঐ রংএর জামা আছে সেটাও দাও। ঝিয়ের মত খালি ঢোলা সেমিজ আর শাদা শাড়ী পরে থাকতে ভাল লাগে না।"

প্রতিমা শাড়ী-জামা বার করে আস্তে আস্তে তাঁর পোশাক বদ্‌লাতে লাগল। হঠাৎ এত সাজগোজের কি প্রয়োজন পড়ল, ঠিক বুঝতে পারল না। পাছে কোথাও লেগে যায় সে ভয়ও করতে লাগল। যা হোক, কোনোমতে ত কাজ শেষ করল।

টিনুর মা বললেন, "গহনা টহনা ত বার করা চলবে না। ও সব আমি নিজে ছাড়া আর কাউকে ছুঁতে দিই না।"

প্রতিমা বলল, "ভালই করেন। যা দিন কাল। সবচেয়ে ভাল, বাড়ীতে ও সব না রাখা।"

গৃহিণী বললেন, "সে বাপু আমার চলে না। আমি গহনা পরতে ভালবাসি, এ বেলা ও বেলা বদ্‌লে

বদলে পারি কতবার আর ব্যাঙ্কে দৌড়ব? আছে ত পরব না কেন? সধবা মানুষ, কিছু এমন বুড়ো হাবড়া হয়েও যাইনি।"

প্রতিমা বলল, "তা ত বটেই। সেরে উঠুন, আবার পরবেন।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে আন্দাজ সারব বলতে পার?"

প্রতিমা বলল, "তা ত আমার পক্ষে বলা শক্ত। আমার অভিজ্ঞতা ত খুব বেশী নয়? ডাক্তারবাবু বরং বলতে পারেন।"

"উনি ত খালি মস্করা করেন বলেন, কেন বলুন ত তাড়াতাড়ি উঠতে চান? দিব্যি ত আরামে শুয়ে আছেন, কোনো কাজই করতে হচ্ছে না।"

টিনু মিনু ধাক্কাধাক্কি করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল। মিনু মাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "তুমি এ শাড়ী কেন পরেছ?"

মা একটু রাগতভাবে বললেন, "বেশ করেছি, তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?"

নারাণী এই সময় ঘরে ঢুকে বলল, "ওমা, মায়ের আজ জন্মতিথি নাকি?"

গৃহিণী বললেন, "না গো না, কি এমন বেনারসী আনারসী পরেছি যে সবাই মিলে অত চোখ দিচ্ছ? জন্মদিন আবার আমি কবে করি! সে যা হবার তা বাপের বাড়ী থাকতে হয়ে গেছে। এখানে আবার কে আমার জন্মতিথির ধার ধারতে যাচ্ছে? আমি একটা মানুষ আছি না আছি।"

পাড়ার একটি ছোট মেয়ে এই সময় বেড়াতে আসাতে মিনু টিনু তার সঙ্গে খেলতে ছাদে চলে গেল। তাদের মা প্রতিমাকে বললেন, "আলমারিটা বন্ধ করে চাবিটা আমার বালিশের তলায় রেখে দাও। ঝি রাঁধুনীগুলো লোক ভাল নয়, ওদের সামনে আমি আলমারি খুলি না। খোলা আলমারি দেখলেই ওদের চোখগুলো বেরালের মত চকচক্ করে।"

প্রতিমা মনে মনে ভাবল, 'ইনি নিজের যত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে সারাক্ষণই খুব সচেতন দেখছি।' কিছু না বলে আলমারি বন্ধ করে চাবি তাঁর বালিশের তলায় রেখে দিল। জিজ্ঞাসা করল, "এবার আপনার চা নিয়ে আসি?"

গৃহিণী বললেন "তাই আন, একলাই খাই, ওর ত ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে। অতক্ষণ বসে থাকতে পারব না বাপু। ভাল থাকতে অবিশ্যি এদিনে আলাদা চা খেতাম না, এক সঙ্গেই খেতাম। তা রোগে পড়ে কোন নিয়মই ত রাখতে পারছি না।"

প্রতিমা বলল, "আজ বিশেষ কোনো দিন বুঝি?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, নইলে আর এত বকবক করছি কেন? আজ আমার বিয়ের দিন। কত বন্ধুবান্ধবকে ডাকতাম এদিনে, আমার বাপের বাড়ীর লোকদেরও ডাকতাম। আর আজ দশা দেখ, কেউ উঁকি মেরেও দেখছে না। ওর ত ফিরবারই কথা মনে হল না এখনও।"

প্রতিমা এবার চা জলখাবার এনে তাঁকে খাইয়ে দিল। কাছে বসলেই ত তিনি অনর্গল কথা বলে যাবেন, তাই বলল, "এখনি আসছি ছাদ থেকে ঘুরে একটু। মিনু কেন ডাকছে দেখে আসি।"

"কেন আবার ডাকবে? স্কুল থেকে সব পাকামি শিখে আসে, সেই সব বলবে আর কি? যাও, দেখে এস।"

মিনুর ডাকাডাকির বিশেষ কোনো কারণ ছিল না। সঙ্গিনী শিখার সঙ্গে সে প্রতিমার আলাপ করিয়ে দিতে চায়। "এই দেখ আমার বন্ধু শিখা, ও আমার স্কুলেই পড়ে।"

প্রতিমা বলল, "বেশ, কোথায় থাক তুমি?"

শিখা বলল, "এই ত তিনটে বাড়ী পরে। আমি কিন্তু রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসি না, আমার বাবার মোটর গাড়ী আছে, তাইতে চেপে আসি।"

প্রতিমা হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার হেঁটে বেড়াতে ভাল লাগে না? বেশ চারিদিক্ দেখতে দেখতে হাঁটতে?"

শিখা প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল, "না, কেন হাঁটব।"

বেশীক্ষণ উপরে থাকা যায় না, রোগিণীর দরকার হতে পারে মনে করে প্রতিমা ছাদ থেকে নেমে গেল। ঘরে ঢুকে মনে হল গৃহিণী হয়ত ঘুমিয়ে আছেন, চোখের উপর হাত চাপা দেওয়া। কোনো কথা না বলে সে সামনের বারান্দায় নীরবে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নীচে গাড়ীর শব্দ হল, বোঝা গেল গৃহস্বামী ঘরে ফিরলেন। এখনই হয়ত স্ত্রীর ঘরে আসবেন, মনে করে প্রতিমা আর ঘরে ঢুকল না, বারান্দায় বেড়াতেই লাগল।

সতীন্দ্রনাথ উপরে উঠলেন। ঘরে ঢুকতেই তাঁর স্ত্রীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এলে এতক্ষণে? সব ভুলে বসে আছ ত? আমার যেমন পোড়া কপাল!"

কর্তা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "কি হল আবার?" তারপর স্ত্রীর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বললেন, "ওঃ, তাই ত, বড় ভুল হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, কিছু মনে কোরো না, আমি কাপড় বদলে, চা খেয়েই আবার বেরুচ্ছি, বেশী দেরি করব না।" বলে প্রায় দৌড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রতিমা ঘরের ভিতর এসে দেখল, গৃহিণী ততক্ষণে ফোঁস্ ফোঁস্ করে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। অনেক কষ্টে ত তাঁকে শান্ত করল। টিনু, মিনু, শিখা প্রভৃতি নীচে ছুটে আসাতে তাদের মা বাধ্য হয়ে চুপ করে গেলেন। বাবা এখনই দোকান যাবেন শুনে ছেলে মেয়েরাও বায়না জুড়ে দিল তারাও যাবে। তাদেরও জামা কাপড় বদলানর ধুম লেগে গেল। নারাণী তাড়াতাড়ি খোকা খুকীদের পছন্দমত কিছু করে উঠতে পারে না। টিনু মিনু রেগে যায়, তাদের মাও কম রাগেন না। প্রতিমা তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। মারামারি ধাক্কা-ধাক্কি করতে করতে কোনমতে ত সাজ-পোশাক শেষ হল। কর্তা ছেলেমেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরটাতে যেন মস্ত প্রলয় হয়ে গেছে। প্রতিমা ঘরটা গুছিয়ে রাখতে লাগল, নারাণী টিনু মিনুর সব জামা কাপড় তুলে নিয়ে গেল। গৃহিণী সেই দিকে তাকিয়ে বললেন, "গেছে আপদগুলো? হাড় জ্বালিয়ে মারে। কেন যে লোক ছেলেপিলে চায় জানি না বাপু।"

নারাণী কি একটা কাজে ঘরের ভিতর এসেছিল। গৃহিণীর এহেন মন্তব্য শুনে সে পরম বিস্ময়ের ভান করে গালে হাত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিমা ভাবল, "আমি বিনা পয়সায় বেশ সিনেমা দেখছি যাহোক।"

ঘণ্টা দেড়েক পরে সবাই আবার ফিরে এল। খোকা খুকী আবার উর্ধ্বশ্বাসে মায়ের ঘরে ছুটে এল। নাকী সুরে নালিশ করে বলল, "মা, দেখনা, বাবা কি রকম দুষ্টুমি করছে। আমায় একটা বাজে পুতুল কিনে দিয়েছে আর টিনুকে একটা বল। আর তোমার জন্যে শাড়ী এনেছে, মিষ্টি এনেছে, ফুল এনেছে কত।"

মা বললেন, "বেশ করেছে, যা দেখি এখান থেকে। সারাক্ষণ ভ্যান্‌ভ্যান্ করে আমার মাথা ধরিয়ে না দিলে চলে না? তোরাও পুজোর সময় কত কি পাস, তখন আমি কিছু বলি?"

প্রতিমা এসে টিনুকে এক হাতে আর মিনুকে এক হাতে ধরে বলল, "চল ত টিনু মিনু তোমাদের ঘরে যাই। খুব ভাল একটা গল্প বলব এখন তোমাদের। মাকে বিরক্ত করতে হয় না, ওতে মায়ের অসুখ বেড়ে যায় জান না!"

ছেলেমেয়েদের শোবার ঘরে নারাণী তখন বিছানা করছে। প্রতিমাকে দেখে বলল, "গিন্নীমা যেন কি? এখনও কি কচি বউটি আছেন নাকি? এখনও তাঁর রোজ সোহাগ চাই। ছেলেমেয়ে কাছে গেলেই হাড় জ্বলে যায়, এমন মাও ত কোথাও দেখিনি বাপু।"

টিনু ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, "এই, আমার মার নামে খারাপ কথা বলছ কেন? দেব তোমার মাথা ভেঙে?"

নারাণী বলল, "দেখ একবার ছেলের রকম দেখ, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।"

প্রতিমা বলল, "যার জন্যেই চুরি কর, ছেলেপিলের সামনে তাদের মায়ের নামে অমন করে বলা উচিত নয়।"

নারাণী বলল, "তুমি ক'দিন বা এসেছ দিদিমণি, মানুষটিকে ত চিনতে পারনি, আরো দিন কয়েক দেখ তারপর তুমিও বলবে।"

প্রতিমা এর আর কোনো উত্তর না দিয়ে টিনু মিনুকে গল্প বলতে বসে গেল।

খানিক পরেই অবশ্য তার ডাক পড়ল গৃহিণীর ঘরে। তাঁর খাওয়া-দাওয়া ওষুধ সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। সতীন্দ্রনাথ তখনও স্ত্রীর ঘরে বসে। মহিলার উত্তেজনাটা সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়নি দেখা গেল। গলার স্বরটা তখনও তীব্র, তবে আগের মত উচ্চকণ্ঠে আর কথা বলছেন না।

প্রতিমা নীরবে তাঁর কাজ করতে আরম্ভ করল।

গৃহিণীকে খাওয়ান হল, মুখ ধোওয়ান হল। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "এখন আপনার কাপড় ছাড়িয়ে দেব নাকি?"

গৃহিণী বললেন, "শাড়ী সেমিজ এনে আমার মাথার কাছে রাখ, আমি খানিক পরে ছাড়ব এখন।" তারপরেই বললেন, "তাই বলে ভেবো না যে তোমাকে আমি মাঝরাত অবধি বসিয়ে রাখব, তুমি যখন যাবার চলে যাবে।"

প্রতিমা আবার বারান্দায় ঘুরতে লাগল। খানিক পরে ঘড়ি দেখে বলল, "এইবার আপনার ওষুধটা খাইয়ে দিই?"

গৃহিণী যেন একটু বিরক্ত ভাবে বললেন, "দাও, আর কি করব? এত আগে আমার ঘুমোতে ভাল লাগে না। আচ্ছা, এ ওষুধ ত আমি গোড়ার থেকেই খাচ্ছি, তা আগে ত এত বেশী ঘুমোতাম না, এখন এত বেশী ঘুমোই কেন? তুমি ওষুধ বেশী দিয়ে দাও না ত?"

প্রতিমা কিছু বলবার আগেই টিনুর বাবা ধমক দিয়ে উঠলেন, "কাকে যে কি বল তার ঠিক নেই। উনি কি ওষুধ কতখানি দিতে হয় তা জানেন না? নিজেও ত প্রায় ডাক্তার?"

গৃহিণী বললেন, "হয়েছে, হয়েছে, আর বকতে হবে না। একটা কথার কথা বলেছি বই ত নয়?"

প্রতিমা একটু বিরক্তই হয়েছিল, কাজ সেরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ী যাবার আগে আর গৃহিণীর ঘরে ঢুকল না।

বাড়ীতে তার মা তাদের খেতে বসিয়ে দিলেন প্রায় যেতে না যেতেই। বললেন, "আজকে তোর ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে, না? কাল এর চেয়ে আগে এসেছিলি।"

প্রতিমা খেতে খেতে বলল, "আজ পেশেন্টটির মেজাজ বেশ বিগড়ে ছিল, তাই কাজ কর্ম্ম সারতে একটু দেরি হল।"

মা বললেন, "কেন, মেজাজ বিগড়ল কেন? মানুষটা এমনিতেই রাগী নাকি?"

"রাগী হয়ত নয়, কিন্তু বেজায় খামখেয়ালী আর জেদী। অসুখের মধ্যেও সে নিজেকে এবং অন্যদেরও নিজের মতে চালাতে চায়। নিজের অমনোমত কিছু হলেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার করে।"

মা বললেন, "এই সব লোক নিয়ে চলা চড় শক্ত বাপু।"

পরদিন সকালে কর্ম্মস্থানে গিয়ে পৌছতেই দেখল, বাড়ীর আবহাওয়া বেশ থমথমে। নারাণী বলল, "বাবুর ত জ্বর এসেছে, তিনি অফিস কামরায় শুয়ে আছেন। মা ত রেগে খুন, বলে ওসব ন্যাক্রা, জ্বর হয়েছে না হাতী।"

প্রতিমা একটু অবাক্ হয়ে গিয়ে গৃহিণীর ঘরে ঢুকল। তিনি বললেন, "দাও, আমার মুখটুখগুলো ধুইয়ে দাও। আবার অন্য কোথাও চলে যেও না যেন।"

প্রতিমা বলল, "অন্য আবার কোথায় যাব?"

গৃহিণী মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "কে জানে বাপু।"

তাঁর মুখ ধোওয়ান, চা খাওয়ান সব শেষ হলে টিনু মিনু এসে ঘরে ঢুকল। আজকে শনিবার, মিনুর স্কুল নেই। তারা ঘরে আসতেই তাদের মা মিনুকে

বললেন, "যা ত, দেখে আয়, তোর বাবা অফিস ঘরে কি করছে?"

দুই ভাই বোনে বেরিয়ে গেল। আবার তখনি ফিরে এসে বলল, "ঘুমোচ্ছে।"

গৃহিণী বললেন, "নারাণীকে বলে দে, একটু পরে বাবু উঠলে তাঁর চা জলখাবার যেন উপরে আনে। সব ঠাণ্ডা আনে না যেন, গরম করে আনে।"

প্রতিমা আপন মনে কাজ করতে লাগল। একবার ভাবল, গিয়ে সতীন্দ্রনাথকে দেখে আসে, যদি তাঁর কিছু সাহায্যের দরকার থাকে। তারপর ভাবল, কাজ নেই, গৃহিণী আবার কি ভাবে এটা নেবেন তা ত জানা নেই?

বেশ খানিক পরে পায়ের শব্দ শুনে সে পিছন ফিরে দেখল যে সতীন্দ্রনাথ এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছেন। প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ ত রাত্রে আপনাকে এখানে থাকতে হবে, আমার ত জ্বর হয়েছে।"

প্রতিমা কিছু বলবার আগেই বিছানার থেকে একটা গর্জ্জন শোনা গেল, "তা আর নয়? নইলে জমবে কেন? মোটেই থাকবে না রাত্রে, আমি থাকতে দেব না। বামুন ঠাকরুণ শোবে আমার ঘরে।"

রাগে প্রতিমার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলে উঠল। সে হাতের কাজ নামিয়ে রেখে বলল, "আমি তাহলে যাই দেখুন, এখানে কাজ করা আমার সুবিধা হবে না।"

সতীন্দ্রনাথ এতক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, "আমি আর কি করে আপনাকে থাকতে বলতে পারি বলুন? ঐ পাগলের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। ওর যা হয় হবে। চলুন, আপনার এক মাসের মাইনে আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

প্রতিমা বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিল। কারো কাছে বিদায় নেবার কোনো চেষ্টা না করে ট্যাক্সি ডাকিয়ে বাড়ী চলে গেল।

[২]

বাড়ী ফিরে এসে প্রতিমা সেদিন আর কিছু কাজকর্ম্ম করতে পারল না। এ রকম কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। পৃথিবীতে কত রকম মানুষ যে আছে তার বেশীর ভাগের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল না। নিজের বাড়ী আর নিজের কলেজ, এই ছিল তার জগৎ।

মা ত তাকে দেখে অবাক্। "এ সময় চলে এলে যে!"

প্রতিমা বলল, "আমি আর যাব না মা ওখানে। দুটো আলুভাতে ভাত চড়িয়ে দাও।"

মা বললেন, "তার দরকার নেই, ও বেলার অনেক রান্নাই ত সকালে করে রাখি, খাওয়ার কিছু অসুবিধা হবে না। কিন্তু হয়েছেটা কি?"

প্রতিমা একতলার চাকরকে ডেকে নিজের স্যুটকেস আর বিছানা নিয়ে আসতে বলল, তারপর তাকে আট আনা বখসিস দিয়ে বিদায় করে দিল। জিনিষগুলো ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে বলল, "ওখানে কাজ করা চলবে না মা। আমি ভদ্রলোকের মেয়ে ত? ও রকম ছোটলোকের মত কথাবার্ত্তা আমি কেন সহ্য করতে যাব? আমার চাকরির কিছু অভাব হবে না। পারলে আজই সন্ধ্যা বেলা সৌদামিনী মাসীর বাড়ী যাব।"

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে বলল ছোটলোকের মত কথা? বাড়ীর কর্ত্তা, না গিন্নী?"

প্রতিমা বলল, "বাড়ীর কর্ত্তাটি বড় বেশী ভালমানুষ মা, গিন্নীটিই খাণ্ডার, জগতে কোনো কিছুকেই সে গ্রাহ্য করে না। আর পাগলের মত jealous। স্বামীটি দেখতে সুপুরুষ, কাজেই ঠাকরুণের ধারণা যে বিশ্বের সব স্ত্রীলোক তাঁর জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে আর তার স্বামীরও অন্য স্ত্রীলোক দেখলেই জিভে জল এসে যাচ্ছে। আমাকে দেখা অবধি সে ক্ষেপে গেছে। কতক্ষণে বিদায় করতে পারবে, তার জন্যে ব্যস্ত। আজ তার স্বামীর জ্বর হয়েছে, তাই আমাকে রাত্রে রাখতে

চেয়েছিলেন। এই আর আছে কোথায়? যত সব অশ্রাব্য কথা বলে চেঁচাতে শুরু করল। আমি তখনি উঠে চলে এসেছি।"

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু দিয়েছে?"

প্রতিমা বলল, "সেদিক্ দিয়ে ভদ্রলোক খুব ভাল মা। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়েছেন, আমি নিতে চাইনি, তবু জোর করে পুরো মাসের মাইনেই দিয়ে দিয়েছেন।"

মা বললেন, "আজ খুব আথান্তরের পড়বেন, বেচারা ভদ্রলোক, একে নিজের অসুখ তার উপর স্ত্রীকে দেখবার লোকের অভাব।"

প্রতিমা বলল, "স্ত্রীলোক আরো গোটা দুই আছে বাড়ীতে, তবে সেগুলো একেবারে মূর্খ অজ্ঞ গোছের। গিন্নীকে ভাল চোখে দেখেও না, কাজেই তার কাজ-কম্ম তাদের হাতে কতটা উৎরবে তা বলতে পারি না। তবে কলকাতার বাজার ত? চেষ্টা করলে একদিনে নার্স জুটে যেতেও পারে।"

মা বললেন, "তা যেতে পারে হয়ত। লেডী ডাক্তার-দের কাছে সন্ধান করলে খানিকটা কাজ-জানা দাই ত পাওয়াই যায়। যা, তুই স্নান টান করে ফেল্, আমি রান্নাটা সেরে নিই।"

প্রতিমা চুল খুলতে খুলতে বলল, "দুপুর বেলা সৌদামিনী মাসী ত নাইতে খেতে একবার বাড়ী আসেন, ভাবছি সেই সময় একবার তাঁর ওখানে যাব। ওঁদের কাছে সব সময়ই নানারকম রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এবার একটু বেছে টেছে নিতে হবে। খুব কচি বা খুব বুড়ো হলে মন্দ হয় না, তাদের এসব complex থাকে না।"

মা বললেন, "তা কি আর বলা যায়? সব বয়সেই complex থাকতে পারে, বিশেষ করে অসুস্থ মানুষের।"

তাদের নাওয়া খাওয়া আজ ধীরে সুস্থেই হল, কারো কোনো তাড়া ছিল না। মা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নেন, প্রতিমার সে সব বালাইও নেই। সে বলল, "মা, তুমি একটু দরজা বন্ধ করে ঘুমোও, আমি একটু সৌদামিনী মাসীর বাড়ী হয়ে আসি। ভাল কাজ একটা পেয়ে যেতেও পারি।"

মা বললেন, "তা যা, যদিও তাড়া নেই কিছু, দেখে শুনে ভেবে চিন্তে কাজ নিস্ এবার।"

প্রতিমা বেরিয়ে পড়ল। রোদটা বড় চড়া, একটা রিক্শা ডেকে নিল। দূর থেকেই দেখতে পেল সৌদামিনীর গাড়ী এসে তাঁর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছে। তিনি এসেই গেছেন তাহলে।

প্রতিমা বাড়ীর ভিতর ঢুকে দেখল সৌদামিনী শোবার ঘরে বসে তাল পাখা দিয়ে হাওয়া খাচ্ছেন, জিজ্ঞাসা করল, "আপনার fan-এর কি হল?"

সৌদামিনী বললেন, "বিগড়েছে। মিস্ত্রি ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। তা তুমি এখন হঠাৎ? ছুটি পেলে কি করে?"

প্রতিমা বলল, "একদম ছুটি হয়ে গেছে, আর ওখানে যাব না।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, কি হল?"

প্রতিমা বলল, "সতীন্দ্রবাবুর স্ত্রীর ধারণা হয়েছে যে তাঁর স্বামী আমাকে দেখে ভয়ানক লুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং আমিও তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছি।"

সৌদামিনী বললেন, "আচ্ছা গাড়োল ত? টাকা-কড়ি দিয়েছে ত?"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, সেদিকে কোনো ত্রুটি করেন নি। তা আপনার কাছে কোনো case আছে নাকি? আমি শুধু শুধু বসে থাকতে চাই না।"

সৌদামিনী বললেন, "রোসো বাপু, তোমাকে হট্ করে একটা কাজ দিলে ত চলবে না? ভেবে চিন্তে দিতে হবে ত? স্যাওড়া গাছের পেত্নীর মত দেখতে হলে ত চট্ করে একটা ধরিয়ে দিতাম। তোমার মত সুন্দরী তরুণীকে দেখে কোন্ রোগী বা রোগিণীর মনে কি ভাবের উদ্রেক হবে তা ভেবে দেখতে হবে ত?"

প্রতিমা বলল, "আপনার যে কথা! সব বাড়ীতেই ঐ রকম পাগল থাকে নাকি?"

"পৃথিবীতে একেবারে sane মানুষ ক'টাই বা আছে? কেউ একদিকে পাগল, কেউ আর এক দিকে। অনেক বেশী লোকের সঙ্গে মিশলে এটা

বোঝা যায়। মেয়েদের জগৎটা ছোট ত? নিজেদের ঘর-সংসার আর বড়জোর নিজেদের স্কুল-কলেজ। এতে প্রায় একরকম মানুষই দেখা যায়। নেহাৎ আমার মত যারা অসুস্থ মানুষ চরিয়ে খায়, তারা নানা জাতের জীব দেখে।"

"ছোট ছেলে মেয়ে বা বুড়ো মানুষ হলে ভাল হয়।"

"ছোট ছেলে মেয়ে এখন কেউ হাতে নেই। বুড়ো একজন আছে বটে, তবে তার সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে তবে জানাব। খুব বেশী পীড়িত, কতদিন আর টিকবে তা জানি না।"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "কি অসুখ তাঁর?"

সৌদামিনী বললেন, "বোধ হয় ক্যানসার, এখনও সব রকম পরীক্ষা শেষ হয়নি। তাঁর ছেলের বউকে দেখতে আমি মাঝে মাঝে যাই। বৃদ্ধের স্ত্রী নেই, মেয়েও নেই। বউ একটু অকর্ম্মা ধরণের, অত সাঙ্ঘাতিক রোগীর কাছে যেতেই ভয় পায়। তার উপর ছেলেপিলে হবে, একেবারে জড়ভরত হয়ে পড়েছে। কাজেই এখন লোক খুঁজতে হচ্ছে। দেখি, আমি আজ যাব, সব রকম খবরাখবর নিয়ে আসব। যদি মনে হয় তোমাকে দিয়ে চলবে তা হলে কালই নিয়ে যাব। বাড়ীটা এমনিতে ভাল, লোকজন বিশেষ নাই, ঐ বুড়ো আর তার ছেলে বউ। আর একজন ছেলে আছে, সে এখন আমেরিকায়।"

এই সময় সৌদামিনীর চাকর ইলেকৃট্রিক মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে এল। প্রতিমাও উঠে পড়ল। বাড়ী ফিরে দেখল, মা ইতিমধ্যেই উঠে পড়ে রজতের জন্য সিঙাড়া তৈরী করছেন। সেও বসে বসে মায়ের সাহায্য করতে লাগল।

রজত ত বাড়ীতে ফিরে দিদিকে দেখে অবাক্। বলল, "যখন তখন ধূমকেতুর মত উদয় হও যে এসে?"

প্রতিমা বলল, "তাতে তোমার এত আপত্তি কেন বাপু? তোমারটা ত কেড়ে খাচ্ছি না?"

রজত বলল, "কেড়ে খাবার কিছু থাকলে ত খাবে। তুমি না থাকলে আমার ভাগ্যে খালি রুটি মাখন আর ডিমভাজা।"

মা বললেন, "তোমায় বাঁদরামি করতে হবে না, থাম ত। দিদি গেছেই বা ক'দিন বাড়ীর থেকে?"

প্রতিমা বিকাল বেলাটা একটু ঘুরতে বেরোল বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে। হয়ত কালই আবার কাজ নিয়ে রোগীর বাড়ী চলে যেতে হবে। একবার ভাবল, টেলিফোনে সতীন্দ্রবাবুদের একটু খবর নেওয়া যাক, তারা লোক পেলেন কি না; তারপর ভাবল, দরকার নেই, তাতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হতে পারে। যে ছাত্রীগুলিকে সে এতদিন পড়াত, তাদের বাড়ীও দেখা করে এল।

রাত্রিবেলা সৌদামিনীর ড্রাইভার একটা চিঠি নিয়ে এল। তিনি লিখেছেন, সেই বৃদ্ধ রোগীর বাড়ী তিনি গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রতিমাকে রাখতে বেশ ব্যগ্রই মনে হয়। বিশেষতঃ বউ। সে প্রায় প্রতিমার বয়সীই হবে। রোগীর ক্যান্সারই হয়েছে, খুবই পীড়িত। প্রতিমা যেন সকালে সৌদামিনীর কাছে একবার আসে, তখন সব কথা হবে। মাইনে টাইনে ভালই পাবে।

প্রতিমা বলল, "যাক তাহলে বসে আর থাকতে হবে না। বুড়ো মানুষ বেশীদিন টিকবেন না খুব সম্ভব। রাত্রে থাকতে হবে কিনা তাও কিছু লিখলেন না। যাক, কাল শুনলেই হবে।"

মা বললেন, "হ্যাঁরে, ক্যান্সার কি খুব ছোঁয়াচে অসুখ নাকি?"

প্রতিমা বলল, "না। তাছাড়া নিজে বেশ সাবধান থাকলে কোন রোগেরই ছোঁয়াচ লাগবে কেন? ও সব ভাবতে গেলে কি আর নার্সের কাজ করা চলে?"

সকাল বেলা সে একেবারে স্নান করে, ভাল করে চা-টা খেয়ে বেরোল। সৌদামিনী সকালে নিতান্ত প্রয়োজন নাহলে বেরোন না। বাড়ীতে দু-একটা রোগী দেখেন। একেবারে খেয়ে দেয়ে সারা দিনের জন্যে বেরোন।

সৌদামিনী বসে কাগজ পড়ছিলেন। প্রতিমাকে

দেখে বললেন, "একবার ত তারুণ্যের তাড়সে পালালে, এবার দেখ বার্দ্ধক্যের ধাক্কা সামলাতে পার কি না।"

প্রতিমা বলল, "কি রকম বয়স হবে ভদ্রলোকের ?"

সৌদামিনী বললেন, "তা চুয়াত্তর পঁচাত্তর ত হবেই মনে হয়। তবে senile হয়ে যাননি, কথাবার্ত্তা ভালই বলেন। একেবারে শয্যাগত, তোমায় খাটতে হবে বেশ। এখন রাত্রে একটা চাকর থাকে, তবে নার্স রাখলে হয়ত তাকেই থাকতে বলবে। তার ঘরের পাশে খালি ঘর আছে, সেখানে শোবে, দরকার হলে চাকর ডেকে দেবে। দেখ, খুব বেশী কাজ মনে হচ্ছে নাকি ?"

প্রতিমা বলল, "বেশী মনে হলে চলবে কেন ? যা কাজ তা ত করতে হবে।"

সৌদামিনী বললেন, "তাহলে জিনিষপত্র গুছিয়ে ঠিক হয়ে থেক, কাল বেরোবার সময় তোমায় নিয়ে যাব। বউটিই বাড়ীর গিন্নী তবে গিন্নীগিরি করার বেশী যোগ্যতা তার নেই, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তার স্বামীটি বেশীক্ষণ বাড়ী থাকেন না। স্ত্রীর কাছে গেলে তিনি শ্বশুরের নামে অভিযোগ করেন, বাপের কাছে গেলে তিনি বউমার নামে অভিযোগ করেন, কাজেই এই যুগ্ম অভিযোগ এড়াবার জন্যে তিনি আর রাত্রে ছাড়া বাড়ীই আসেন না।"

প্রতিমা বলল, "মানুষ মানুষকে কমই দেখতে পারে। এক খুব কচি ছেলের সঙ্গে কারো বিবাদ নেই, নইলে মানুষ অন্য মানুষকে দেখতে পারে না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই।"

সৌদামিনী বললেন, "এত যে ভালবাসার জয়গান কাব্যে সাহিত্যে, সে ভালবাসাও ত দৌঁখ উড়ে যায় দেখতে দেখতে।"

প্রতিমা বলল, "সত্যি ভালবাসা হলে কি আর উড়ত ?"

সৌদামিনী বললেন, "সত্যি, মিথ্যে বোঝাও শক্ত। যাক, ওসব ভাবনা ভাবার দিন আমার কেটে গেছে, আর তোমার এখনও যৌবন আসেনি, কাজেই আমরা দুজনেই এখন আদার ব্যাপারি, জাহাজের খোঁজে দরকার নেই। আমি এরপর উঠি, একলা মানুষের সংসার হলেও একটু আধটু কাজ ত থাকে ? তুমিও রোদ বাড়ার আগে বাড়ী ফিরে যাও।"

প্রতিমা বাড়ী ফিরে এল। জিনিষপত্র গোছানই ছিল, বিছানাটায় আরো দু চারখানা জিনিষ নিল। বই, মাসিকপত্র, প্রভৃতি খানিক নিল। ও বাড়ীতে ত ছেলে-পিলে বলে কিছু নেই, কাজেই বই পড়া ছাড়া সময় কাটাবার আর কোনো রকম উপায় পাওয়া যাবে না।

দিনটা দেখতে দেখতে কেটে গেল। পরদিন সকালে সে স্নান করে খেয়ে দেয়ে সৌদামিনীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। তিনি তখনও তৈরি হননি, সবে খেতে বসেছেন। প্রতিমা বসে বসে মাসিকপত্র পড়তে লাগল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে সৌদামিনী বাইরে বেরোবার উপযুক্ত কাপড়-চোপড় পরে নিলেন। তারপর প্রতিমার জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এ রোগীটির বাড়ী দক্ষিণ কলকাতায় নয়, বেশ খানিকটা দূরে। প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট গাড়ী চলার পর তারা একটা বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হল। বাড়ীটা বেশী বড় নয়, বেশ সাদাসিধে সাবেককালের বাড়ীর মত। দরজায় বেল্‌টেল্‌ কিছু লাগান নেই। কড়া ধরে নাড়া দিতেই একজন চাকর এসে দরজা খুলে দিল। সৌদামিনীকে সে চেনে দেখা গেল। বলল, "বউদি উপরেই আছেন।"

সৌদামিনী বললেন, "আচ্ছা, তুমি এই বাক্স বিছানা আর অন্য জিনিষপত্র নিয়ে কর্তাবাবুর ঘরের পাশের ঘরে রাখ। আমরা উপরেই যাচ্ছি।" বলে তিনি প্রতিমাকে নিয়ে উপরে চললেন।

উপরের সামনের ঘরটি মাঝারি, তবে খুব সুসজ্জিত নয়। বড় খাট একখানা আছে, কাপড়ের আলমারিও একটা আছে। ভারি আসবাব আর কিছু নেই, একটা আলনা আছে, আর চার পাঁচটি মোড়া এদিক্ ওদিক্ ছড়ানো। খাটের উপর রঙীন শাড়ী পরা একটি মেয়ে

শুয়ে রয়েছে, ঘরে লোক ঢুকতে দেখে সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। প্রতিমা দেখল, মেয়েটি বেশ মোটাসোটা, বয়সের পক্ষে একটু বেশীই। বয়স প্রতিমার মতই হবে। সৌদামিনী বললেন, "এই নাও গো তোমার শ্বশুরের জন্য নার্স নিয়ে এলাম। তুমি নিজে আছ কেমন?"

তরুণী বলল, "আমি আর কেমন থাকব, যেমন ছিলাম তাই আছি। ইনিই নাকি নার্স? বড় ছেলে-মানুষ মনে হচ্ছে যেন? কবে পাশ করেছেন?"

সৌদামিনী বললেন, "তোমায় বলেছিলাম না যে ইনি নার্সিং পাশ নয়? মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ছিলেন। হঠাৎ বাবা মারা যাওয়াতে পড়া ছেড়ে এখন নার্সিং ধরেছেন।"

বউ ঠাকুরাণী বললেন, "ওমা, তাই বুঝি? তবে ত ডাক্তারদের মতই প্রায়। আপনার নামটি কি ভাই? জানতে চাইছি বলে কিছু মনে করবেন না, আপনি বোধহয় আমারই বয়সী? আমার নিজের নাম সুনলিনী।"

প্রতিমা নিজের নাম বলে বলল, "বয়সে হয়ত আমিই বড় হব, চেহারাতে ত সব সময় বোঝা যায় না?"

সুনলিনী বলল, "তা কিছুটা ত বোঝা যায়? আমি যদি এখন বলি আমার বয়স ত্রিশ বছর হয়েছে, তা কেউ কি আর অবিশ্বাস করবে? যা দেহখানা হয়েছে। আড়াই তিন মণ ত হবেই।"

সৌদামিনী বললেন, "ছেলেপিলে হবার আগে অনেকের শরীর এরকম ফুলে যায়। বাচ্চা হয়ে গেলে ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ-বিষুধগুলো খাচ্ছ ত নিয়ম মত?"

"খাই ত মোটামুটি, আবার ভুলেও যাই থেকে থেকে। তা আমি ভুললে ত কেউ আর মনে করাতে আসবে না? একবার ভেবেছিলাম একটা ঝি রাখি শুধু আমার কাজের জন্যে, তারপর ভাবলাম কাজ ত এমন বেশী কিছু নয়, নার্স ত একজন আসবেনই, তিনি ঐটুকুও করে দেবেন।"

প্রতিমা বলল, "তা দিতে নিশ্চয়ই পারব। কি কাজ আপনার বলুন ত?"

সুনলিনী বলল, "এই ওষুধ-বিষুধগুলো কখন কোন্‌টা খেতে হবে তা যদি একটু মনে করিয়ে দেন, আর বিকেলে যদি আমার চুলটা বেঁধে দেন। একরাশ চুল, সারাদিন বিছানায় গড়াই, বালিশে ঘষা যায়। এত জট পড়ে যে হাত টন্‌টন্ করে তবু ছাড়াতে পারি না, অনেকদিন জট সুদ্ধ বেঁধে রাখি। ওতে আরও জট পড়ে যায়।"

প্রতিমা বলল- "ও, এই কাজ? ও আমি খুব পারব। সত্যি, বড় সুন্দর চুল আপনার। আজকাল এত লম্বা চুল প্রায় দেখা যায় না।"

সুনলিনী বলল, "যা দেহখানি হয়েছে, তা সুন্দর চুল থেকে আর কি হবে? কেউ কি আর এখন আমার দিকে তাকায়? অথচ এই আমারই এককালে কত আদর ছিল।"

সৌদামিনী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তুমি ভাবছ কেন? বাচ্চাটি ভালয় ভালয় হয়ে যাক, তারপর দেখো এখন কত আদর বেড়ে যায়। শুধু বউয়ের আদর ত বরের কাছে, ছেলের মায়ের আদর পরিবার সুদ্ধ সকলের কাছে। আচ্ছা, তুমি এখন প্রতিমাকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দাও, আমি চলি।"

সৌদামিনী প্রস্থান করলেন। সুনলিনী খাট থেকে নেমে পড়ে বলল, "চলুন ভাই, নীচে যাই, আমার শ্বশুরের ঘর নীচে। খুব বুড়ো হয়েছেন, অসুস্থও খুব। ডাক্তার ত বলছে সারবার কোনো আশা নেই, মাথারও কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি কে জানে? খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন। আমাকে বিশেষ দেখতে পারেন না, তাই আমি খুব বেশী যাই না ওঁর ঘরে।"

নীচের তলার ঘরটি সুনলিনীর ঘরের মতই হবে। তবে আসবাব-পত্র বিশেষ কিছু নেই। একটা তক্তাপোশের উপর খুব মোটা বিছানা পাতা। চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি খুব পরিষ্কার নয়। একটা মোটা খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে একজন কঙ্কালসার

বৃদ্ধ বিছানায় শুয়ে রয়েছেন। চোখ বোজা, তবে মাঝে মাঝে হাত-পা নাড়ছেন বলে বোঝা যাচ্ছে যে ঘুমিয়ে নেই।

সুনলিনী সোজা তাঁর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "শুনছেন বাবা, এই যে ইনি এসেছেন আপনার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে। ওঁর নাম প্রতিমা। অনেক দূর ডাক্তারি পড়েছেন, এখন নার্সের কাজ করছেন, আজ থেকেই থাকবেন।"

বৃদ্ধ চোখ খুলে চাইলেন। সুনলিনীর দিকে চোখ পড়তেই তাঁর মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। অবশ্য তার পর প্রতিমার দিকে চোখ পড়তেই মুখের ভ্রুকুটিটা খানিক কেটে গেল, বললেন, "বড্ড ত ছেলেমানুষ দেখছি, রুগীর সেবা কখনও করেছ?"

প্রতিমা বলল, "তা কিছু কিছু করেছি। ডাক্তার যা কিছু নির্দ্দেশ দেবেন সবই আমি করতে পারব।"

বৃদ্ধ বললেন, "তা ত পারবে, ডাক্তারি পড়েছ যখন। আচ্ছা, রান্নাবান্না জান কিছু তুমি?"

প্রতিমা বলল, "সাধারণ মত জানি, পাকা রাঁধুনী কিছু না।" সুনলিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "রান্নারও দরকার হবে নাকি?"

সুনলিনী ঠোঁট উল্টে বলল, "কিসের? আমার বামুনঠাকুর রয়েছে না? এখানে বলে কত বছর কাজ করছে। সব রান্না জানে সে। বাবা শুধু শুধু ঐরকম বলেন একে তাকে।"

বৃদ্ধ রেগে উঠলেন, বললেন, "সাধে কি বলি? নিজের গরজেই বলি। আমার ভালমন্দ আমি না দেখলে কে বা দেখবার জন্যে বসে আছে?"

সুনলিনী বলল, "আচ্ছা ভাই, এখন আমি উপরে যাই। আপনার জিনিষপত্র এই পাশের ঘরে রেখেছে। ওখানে নেয়ারের খাট আছে, আলনাও আছে একটা। সব গুছিয়ে নেবেন। আর কিছু দরকার হলে বলবেন। এখুনি কিছু কাজ নেই। কখন ওষুধ দিতে হবে, কখন খাওয়াতে হবে, সব ঐ কাগজটায় লেখা আছে।" এই বলে একখানা পাট করা কাগজ তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে, সে দুমদাম করে উপরে উঠে গেল।

ঘরে ছোট একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর গোটা দুই মোড়া। প্রতিমা একটা মোড়া টেনে বসে কাগজখানা দেখতে লাগল। ওষুধ ত অনেক, খাওয়াতেও হবে অনেকবার। তার উপর খাওয়ান নাওয়ান ইত্যাদি নিত্যকৃত্যও ঢের। বসে থাকার কাজ নয়। এর উপর সুনলিনীর ওষুধ খাওয়ার তাগিদ দেওয়া ও তার চুল বাঁধার কাজ আছে। তা দিনের বেলা কাজ করতে তার আপত্তি নেই। বসে থাকতে তার বিশেষ কিছু ভাল লাগে না। তবে রাতে ঘুমোতে পারলে ভাল হয়। বৃদ্ধটির কথাবার্ত্তায় তাঁকে খুব সহজ লোক বলে মনে হল না প্রতিমার।

বৃদ্ধ হঠাৎ সশব্দে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "ডাক্তারি পড়তে পড়তে ছেড়ে দিলে কেন? কোন্ ইয়ারে পড়ছিলে?"

প্রতিমা বলল, "সংসারের অবস্থা হঠাৎ বদ্‌লে গেল বাবা মারা যাবার পর, কাজেই রোজগারের চেষ্টা করতে হল।"

"তোমরা ভাই বোন ক'জন?"

প্রতিমা বলল, "এক ভাই, এক বোন। তা ভাইটিও আমার চেয়ে অনেক ছোট, এখনও স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। তাই আমাকেই বেরোতে হল।"

বৃদ্ধ বললেন, "হুঁ। অসময়ে গেলে সংসারে আথান্তর হয়ই। আমার গিন্নী যখন গেলেন, তখন ছেলে দুটো ত ছোট ছোট, ইস্কুলে পড়ছে। কি কষ্টে ওদের মানুষ করেছি, তা আমিই শুধু জানি। মা বলতেও আমি, বাবা বলতেও আমি। আর কি ভুগত দুটো মিলে. আজ এটার পেটের অসুখ ত কাল ওটার জ্বর। ঘর দেখব না ব্যবসা দেখব। সবাই বলত, বিয়ে কর আবার, অমন করে কি সংসার চলে? তা করিনি, ভাবতাম সৎমা এসে ছেলেদের যন্ত্রণা দেবে। তবে এখন দেখছি বিয়ে করলেই ভাল করতাম, শেষ দিনগুলোয় একটু সেবাযত্ন পেতাম।"

প্রতিমা কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, "আপনার ছোট ছেলে কতদিন হল আমেরিকা গেছেন?"

বৃদ্ধ বললেন, "তা হল ঢের দিন। আমার ত তখনও রোগ ধরা পড়েনি, না হলে আমি তাকে যেতে দিতাম না। সে থাকলে তবু আমার ভরসা একটু থাকত। বড়টা ত বিয়ে করে হাতছাড়া হয়ে গেছে। নিজেদের নিয়ে আছে, দিনান্তে একবার উঁকি মেরেও দেখে না। বউটা ভাল না, বেশ কুচক্রী আছে। আমি নিজে আগে মেয়ে দেখিনি, এক শালাকে পাঠিয়েছিলাম, তার বোকামিতেই এটা হল।"

একজন ঝি এই সময়ে ঘরে ঢুকে বলল, "দিদিমণি ত খেয়েই এসেছেন? বেলা ত ঢের হয়ে গেছে, আমরা এখন খেতে বসতে যাচ্ছি।"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, খেয়েই এসেছি। আচ্ছা, আমার ঐ ঘরটা ঝাঁট দেওয়া আছে ত? একটু গুছিয়ে নিতে হবে।"

ঝি বলল, "হ্যাঁ, সকালে ঝাঁট দেওয়া হয়েছে, মোছা হয়েছে। বউদি সকালেই বলেছে এ ঘরে লোক আসবে, তাই সব পরিষ্কার করে রেখেছি। আপনি দেখবে চল।"

প্রতিমা বৃদ্ধের দিকে চেয়ে বলল, "আমি ও-ঘরটা একটু দেখে আসি।"

বৃদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ, যাও। এখন আমার কিছু কাজ নেই, চারটার সময় এলেই হবে।"

প্রতিমা ঝিয়ের সঙ্গে পাশের ঘরে ঢুকে দেখল, ঘরটা মন্দ নয়। বড় বড় জানালা আছে। আয়তনেও খুব ছোট নয়, একজন লোকের খুব চলে যাবে। একখানা নেয়ারের খাট রয়েছে আর একটা আলনা, আর কোনো আসবাব নেই। ঘরটা ঝাঁট দেওয়া ও মোছা হয়েছে, যদিও খুব পরিষ্কার করে নয়।

প্রতিমা ঝিকে বলল, "একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার দিলে ভাল হয়। আমার খাওয়া-দাওয়া, লেখাপড়ার জন্য একটা টেবিল দরকার। আর খাট ছাড়া বসবার জায়গাও ত কিছু নেই।"

ঝি বলল, "বউদিকে বলে উপর থেকে নিয়ে আসব। এখন ত যে যার ঘরে বসেই খেয়ে নেয়, একসঙ্গে কেউ আর বসে না। কর্তাবাবু নিজের ঘরে খান, দাদাবাবু তাঁর আপিস ঘরে খান, বউদি তার শোবার ঘরে খায়। আপনাকেও এই ঘরে খাবার দিয়ে দেব। আমার খাওয়াটা হয়ে যাক, তারপর সব নিয়ে আসব।" বলে সে খেতে চলে গেল।

প্রতিমা বিছানাটা খুলে খাটিয়ায় পেতে রাখল। শাড়ী জামা যা দরকার তা বার করে আলনায় রাখল। জানলা দরজায় পরদা নেই। এদের বাড়ীর কোথাও সে পরদা দেখেনি। বাড়ীতে মায়ের আলমারীতে অনেক পরদা তোলা আছে, তাদের ছোট ঘরদুটোয় কটাই বা পরদা লাগে? দরজা জানলাগুলোর মাপ নিয়ে গোটা-কয়েক নিয়ে আসতে হবে। ঘড়িতে দেখল তখনও চারটে বাজতে অনেক দেরি। তবে সুনলিনীর একটা ওষুধ খাবার সময় হয়েছে বটে। একলা বসে বসে হাই তুলে আর কি হবে ভেবে সে উপরে উঠে গেল।

সুনলিনীর ঘরে ঢুকে সে দেখল, গৃহস্বামিনী শুয়ে আছে বটে, তবে ঘুমিয়ে নেই। প্রতিমা বলল, "ওষুধটা এবার খেয়ে নিতে পারেন, ভাত খাওয়া ত অনেককাল আগে হয়ে গেছে।"

সুনলিনী উঠে ওষুধ খেল, তারপর খাটে বসে বলল, "বসুন ভাই। সারাক্ষণ শুয়ে থেকে থেকে ত গায়ে ছাতা ধরে গেল। অথচ কি যে আর করব তাও ত ভেবে পাই না। ঘরের কাজ করবার লোকজন ত সবই রয়েছে, কোন্ কাজটা বা তার মধ্যে আমি করব? ওরা ত আমার চেয়ে কাজ ভালই পারে।"

প্রতিমা বলল, "বইটই পড়েন না কেন? বাড়ীতে বই নেই?"

"তা আছে, তবে বেশীর ভাগই ইংরিজি বই। ওটা আবার আমি তত ভাল জানি না। বাংলা বই-গুলো সবই আমার পড়া হয়ে গেছে। বাড়ীতে ত দ্বিতীয় মানুষ নেই যে দু-একখানা বই এনে টেনে দেবে।"

প্রতিমা বলল, "আপনার কর্ত্তাই ত রয়েছেন?"

সুনলিনী ঠোঁট উল্টে বলল, "ওর থাকা না থাকা আমার কাছে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। ও আছে নিজেকে নিয়ে, আমি আছি নিজেকে নিয়ে। কবে যে এ জ্বালার থেকে নিষ্কৃতি পাব তাও জানি না। এ যেন এক মহা শাস্তি হয়েছে।"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন আর দেরি আছে আপনার?"

সুনলিনী বলল, "ডাক্তার ত বলে মাস দুইয়ের মধ্যে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সাধ ত কবে খাওয়া হয়ে গেছে।"

প্রতিমা বলল, "নার্সিং হোমে যাবেন, না বাড়ীতে হবে?"

সুনলিনী বলল, "বাড়ীতে দেখাশোনা করবে কে? শাশুড়ী ত নেই? পুরুষ মানুষরা এসব ধাকা সামলাতে পারে না। মায়ের কাছে যাবারও উপায় নেই। তাদের ত অবস্থা ভাল নয়, পোয়াতী মেয়েকে প্রথমবার নিয়ে গেলে খরচ-খরচা তাদেরই করতে হবে। তাদের ঘাড়ে আমি আর এ বোঝা চাপাই কেন? এদের গুষ্ঠির বাচ্চা এরাই করুক, কর্ম্মাক। নার্সিং হোম ত একটা ঠিক করাই আছে, সেখানেই যাব।"

প্রতিমা বলল, "সেই ভাল, প্রথমবার হস্‌পিটাল্ বা নার্সিং হোমে যাওয়াই ভাল। ওখানে সব কিছু সব সময় তৈরী থাকে, হাতে হাতে পাওয়া যায়।" সুনলিনী বলল, "তা বটে। এ বাড়ীতে ত ঐ এক মর্নিাঙ্গ, তাও এমন ঘুম-কাতুরে যে রাত্তির বেলা যদি দরকার হয় ত তাকে হয়ত তুলতেই পারব না।"

প্রতিমা হেসে বলল, "তাই কি আর হয়? দরকার হলে ঠিকই উঠবেন। তবু রাত্তিরে বাড়ীতে একটু অসহায় লাগেই। দেখি, আপনার চুলটা শুকিয়েছে নাকি, তাহলে একেবারে বেঁধে দিয়ে যাই। এরপর ত গিয়ে কর্ত্তাকে আবার ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

সুনলিনী উঠে খাটের রেলিংএ ঠেশ দিয়ে বসল। প্রতিমা চিরুণী, ফিতে কাঁটা এনে তার চুলের জট ছাড়াতে লাগল। সুনলিনী বলল, "আস্তে আস্তে দেবেন ভাই, বড় জট পড়ে গেছে।"

একরাশ চুল, জটও পড়েছে মন্দ নয়। প্রতিমা খুব আস্তে আস্তে চিরুণী চালাতে লাগল। বলল, "কাল থেকে যেই চুল শুকোবে তখনই চুল বেঁধে দেব, যাতে ঘষা না যায়। কখন স্নান করেন আপনি?" সুনলিনী বলল, "তার কি আর ঠিক আছে কিছু? যখন মন চায় করি। তবে দশটার মধ্যে করি, তা না হলে কলে জল থাকে না। এ বাড়ীতে জলের কষ্ট বড়। আপনিও একটু সকাল সকাল স্নান করে নেবেন।"

খোঁপা বাঁধা ত কোনমতে শেষ হল। এমন সময় ঝি এসে বলল "অ বউদি, এই নার্স দিদিমণির জন্যে একটা ছোট টেবিল আর একটা চেয়ার দিতে হবে, না হলে ওঁকে খেতে দেব কি করে?"

সুনলিনী বলল, "নিয়ে যা না আপিস কামরা থেকে। ওখানে ত দু-তিনটে টেবিল আছে।"

ঝি বলল, "চানের জন্যে বালতি লাগবে নি? একটা ত বালতি আছে, তাতে কর্ত্তাবাবুর কাপড় কাচা হয়, সেটাতে ত দিদিমণির চলবে না?"

সুনলিনী কিছু বলার আগে প্রতিমা বলল, "আমার জন্যে এখনই অত ঘটি বালতি কিনতে হবে না। বাড়ীর থেকে আমি আমার বালতিটা নিয়ে আসব এখন। বালতি, মগ দুইই আমার সেখানে আলাদা আছে। কাল সকালে কর্ত্তাবাবুর কাজ হয়ে গেলে আমি বাড়ী হয়ে আসব এখন।"

সুনলিনী বলল, "তাই অসেবেন ভাই। আগে-ভাগে অত খরচা করে কি করব? আগে কতদিন থাকতে পারেন তাই দেখুন। যা অদ্ভুত মানুষ, আর যা তাঁর কথাবার্ত্তার ছিরি।"

প্রতিমা বলল, "আপনার বিয়ে হয়েছে কবে?"

"তা বছর তিন চার ত হল। আমি ত বড় লোকের মেয়ে নই, কাজেই খুব চট করে হয়নি। খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছে। লেখাপড়াও বেশী কিছু শিখিনি, পাসটাস দিইনি। তবে দেখতে ভাল ছিলাম, বললে

হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন না। চুল ত দেখছেন, রংও এর চেয়ে ফরশা ছিল, রোগা ছিলাম। কাজেই এদের বাড়ী থেকে যখন দেখতে গেল, তখন তাদের পছন্দই হল। শ্বশুর নিজে যাননি, এক মামাশ্বশুর গিয়েছিলেন। পাত্র নিজেও গিয়ে একদিন দেখে এলেন। তখন কেউ অপছন্দর কথা বলেন নি। পরে অবশ্য কর্ত্তা মশায় অনেক কথা শোনা'লেন, বাবা ঠিকমত জিনিষপত্র দিতে পারলেন না বলে। তা তখন নূতন এসেছি, দেবর, বর দুজনেই আমার পক্ষ নিলেন, কাজেই তখনকার মত ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ল।"

ঝি আবার এসে ঘরে ঢুকল। বলল, "কর্ত্তাবাবু আপনাকে ডাকছে গো দিদিমণি।"

প্রতিমা উঠে পড়ল, "এখন তবে চলি। কাজকর্ম্মের মধ্যে যদি ফাক পাই ত আবার আসব।"

রোগীর ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন "কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

প্রতিমা বলল, "উপরে আপনার বউমার কাছে ছিলাম।"

বৃদ্ধ বললেন, "ওর সঙ্গে বেশী মিশো না, ও মানুষ ভাল নয়। আমার যত দুর্গতির মূলেই ঐ মেয়ে, আমি সেটা এখন বুঝতে পারছি।"

প্রতিমা ত অবাক্ হয়ে গেল। সাধে কি সুনন্দিনী এত দুঃখ করে? সে ছেলেমানুষ, এমন কি করে থাকতে পারে যে বৃদ্ধ তার নামে এমন অভিযোগ করছেন? কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, "আপনাকে ওষুধটা এখন খাইয়ে দিই?"

বৃদ্ধ বললেন, "তা দাও, আর দেখ, আধঘণ্টার মধ্যে আমার চা আনবে। ঝি-চাকরগুলো রান্না ভাল জানেই না। চাটাও ঠিকমত করতে জানে না। তুমি গরম জল, চা, চিনি সব নিয়ে এসে এই ঘরে চা করে দিতে পার না?"

প্রতিমা বলল, "তা পারব না কেন? ওষুধটা খেয়ে নিন, আমি রান্নাঘরে গিয়ে বলে আসছি সব এখনে দিয়ে যেতে।"

"তাই বল গিয়ে। চায়ের জন্যে যেন ওদের কড়া থেকে দুধ না দেয়, আমার কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্কের টিন আছে, সেটাই যেন দেয়।"

প্রতিমা তাঁকে ওষুধ খাইয়ে রান্নাঘরে চলল। ঝি-চাকরের হাতে সম্পূর্ণ ভাবে থাকলে রান্নাঘর যেমন হয়, এঘরও তেমনি। বেশ খানিকটা এলোমেলো, অপরিচ্ছন্ন। ঝি এক কোণে বসে তরকারি কুটছে, বামুন ঠাকুর পরোটা ভাজছে প্রতিমাকে দেখে ঝি বলল, "এই ত আমি সব গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম, পরোটাগুলো হয়ে গেলেই হয়। কর্ত্তাবাবু ত আবার এ সব খাবেনি, তার বিস্কুট খৈ টই ত ও ঘরেই আছে।"

প্রতিমা বলল, "চা-ও ও-ঘরে করতে বলছেন, তাই চা চিনি দুধ সব নিতে এসেছি।"

ঝি বঁটি ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, "তা বেশ, দিচ্ছি গুছিয়ে। বাবা, ঢের বাড়ীতে কাজ করেছি, এ বাড়ীর কর্ত্তাবাবুর মত একটা মানুষ আর দেখিনি। এত সন্দেহ মানুষকে? হ্যাঁ, আমরা পেট ভরে খাই বটে, তা বলে কি আর কারো গলায় ছুরি দিতে বসে আছি? তা আপনার চাও কি ঐ ঘরে করে নেবেন, না আমি এখানে করব?"

প্রতিমা বলল, "সব এক জায়গায় দিয়েই দাও, আবার কতবার করে করবে?"

"তাই দিই", বলে মস্ত বড় একটা কলাই-করা থালায় সব জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে ঝি প্রতিমার সঙ্গে কর্ত্তাবাবুর ঘরে এসে হাজির হল। প্রতিমাকে বলল, "জলখাবার হয়ে গেলে, আমি আপনারটা আপনার ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব।"

প্রতিমা বলল "তাই রেখে দিও।"

ঝি বলল, "তা আর সব ত রেখে গেলাম। জলটা ফুটে যাক, তখন কেটলি সুদ্ধ রেখে যাব," বলে সে চলে গেল। মিনিট দশ-পনেরো পরে সে একটা ধোঁয়ায় কাল কেট্‌লিতে করে জল এনে টেবিলে বসিয়ে দিল। বলল, "এই রইল জল, তিন পেয়ালার মত নিয়ে এসেছি।"

প্রতিমা বলল, "ওতেই হবে।" সে উঠে চা ভিজিয়ে দিল।

বৃদ্ধ বললেন, "খুব কড়া কোরো না যেন। এদের তৈরী চা হয় যেন চিরেতা, মুখে দেওয়া যায় না। বোধহয় কড়ায় করে সেদ্ধ করে। কোনো কাজ দেখিয়ে দেবার মত কোনো লোক ত নেই? বউ ত এমন হা-ঘরের বেটি, যে চা কোনোদিন বাপের বাড়ীতে খায়নি বোধহয়।"

প্রতিমার মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল। বৃদ্ধের বউ সম্বন্ধে মনটা একান্তই বিরূপ, এবং সেটা কারো কাছে প্রকাশ করতেও একটুও দ্বিধা করেন না। সে ভদ্রলোকের খাবার গুছিয়ে একটা প্লেটে রাখল, তারপর এক পেয়ালা চা ঢেলে টেবিলসুদ্ধ তাঁর খাটের পাশে নিয়ে এসে বলল, "দেখুন ত ঠিক হয়েছে কি না।"

বৃদ্ধ উঠে একবার পেয়ালায় চুমুক দিলেন, বললেন, "ভালই হয়েছে। সব খাবারগুলো যদি তুমি করতে পারতে ত ভাল হত। নাও, এখন নিজের চাটাও করে নাও। আমার ত যা খাওয়া তা দুমিনিটেই হয়ে যাবে, তারপর তুমি গিয়ে নিজে চা খেয়ো এখন। যা দরকার তা চেয়ে চিন্তে নিও, নইলে কেউ খোঁজ নিতেও আসবে না। আমারই বাড়ীঘর, আমারই সব, আমার ঘাড়েই বসে খাচ্ছে সবাই, কিন্তু কেউ কি একবার উঁকি মেরেও দেখে? পরের মেয়েকে বলব কি, নিজের ছেলে, সেই কি দেখে? আর এক বেটা যে সাতসমুদ্র তের নদীর পারে বসে আমার টাকা ধ্বংস করছে, সেও কি মাসে দু লাইন লিখে আমার খবর নেয়?"

প্রতিমা যে এঁর কথার উত্তরে কি বলবে তা ভেবেই পেল না। একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, "আর চা দেব আপনাকে?"

"নাঃ, আর চায়ে দরকার নেই। খাওয়া-দাওয়ার দিন আমার ঘুচে গেছে। যাও, এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও। ঐ বোধহয় তোমার ঘরে খাবার রেখে গেল। তুমি খাও গিয়ে। রোজ একসের ময়দা খরচ করে বোধহয়, তার তিন পোয়া বোধহয় ঐ ঝি মাগী আর বামুনঠাকুর খায়; অন্যদের দুটো দুটো দেয়। উপরের ঠাকুর ঠাকরুণরা তাকিয়েও দেখেন না। কেনই বা দেখবেন? পরের পয়সা নষ্ট হচ্ছে, হোক না। নিজেদের উপার্জনগুলি ত ঠিক মত ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে?"

প্রতিমা চায়ের সরঞ্জাম সরিয়ে রাখল। তারপর বাথরুমে গিয়ে ভাল করে হাত পা ধুয়ে নিজের ঘরে গেল। একটা ছোট টেবিল আর একটা চেয়ার নিয়ে এসে রেখেছে। বড় প্লেটে করে একগোছা পরোটা আর মাঝারি গোছের বাটিতে এক বাটি আলুর দম রেখে গেছে। দুটোই রেকাবি দিয়ে ঢাকা।

খাবারের পরিমাণ দেখে প্রতিমার হাসি পেল। ভাবল, 'সাধে কি আর ঝি বলেছে যে তারা পেট ভরে খায়? আমাকেও নিজের আন্দাজে দিয়েছে আর কি? এতগুলি এঁটো করে কি করব? ফেরৎ দিয়ে দিই। ঝিটার ত নামও জানি না। এ বাড়ীর কারই বা নাম জানি সুনলিনীর ছাড়া? সেও নিজে বলেছিল বলে।'

সে রান্নাঘরে গিয়ে আবার ঝিকে ডেকে নিয়ে এল, বলল, "তোমার নাম কি গা? বারবার ত দরকার হলেই রান্নাঘরে দৌড়ান যায় না?"

"আমার নাম কুসুম গো দিদিমণি। একটা মেয়ে আছে ফেলি, ফেলির মাও বলতে পার। তা কেন ডাকছ?"

প্রতিমা বলল, "এতগুলো খাবার রেখে গেলে কেন? আমি ত দুদিনেও অত খেতে পারব না। দুটো পরোটা রাখ, আর গোটা চার আলু। বাকি নিয়ে যাও।"

কুসুম গালে হাত দিয়ে বলল, "ও মা, ঐ পক্ষীর আহারেই চলে যাবে? ভাত খাবে ত সেই রাত আটটা ন'টায়। ক্ষিদে পাবেনি? আপনি ত বউদির মত সারাদিন শুয়ে থাকবে না, কাজকর্ম করতে হবে ত?"

প্রতিমা বলল, "আমি চিরদিন এমনিই খাই, তাতে আমার কাজের কিছু অসুবিধা হয় না।"

"তবে নিয়েই যাই, আপনার খাওয়া দেখলে বাবু খুব খুশী হবে। সে মানুষের বেশী খাওয়া দেখতে পারে না। আমাদের বলে আমরা নাকি রাক্ষসের মত

খাই। তা দিদিমণি, পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমরা, আমরা ভাতটা একটু বেশী খাই। কলকাতার মত ওখানে ত পাঁচরকম পাওয়া যায় না? ঐ ভাত মুড়িই সম্বল। তার উপর খাটি খুটি ত সারাদিন?"

প্রতিমা কথা পালটাবার জন্য জিজ্ঞাসা করল, "কর্ত্তাবাবুর নাম কি? আর দাদাবাবুর?"

কুসুম বলল, "দাদাবাবুকে ত নিধু বলে ডাকে শুনি তার বাবা। ভাল নাম কি তা ঠিক জানি না। কর্ত্তাবাবুর নাম রেবতীমোহন সোম আর এক দাদাবাবু আছে আমেরিকায়, তার নাম সিধু। সে পাছে ওখানে মেম বিয়ে করে বলে কর্ত্তাবাবু ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে।" এমন সময় রান্নাঘর থেকে বামুন ঠাকুর ডাকাডাকি করায় কুসুমের আর গল্প করা হল না। বাড়তি খাবার তুলে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

প্রতিমা ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করল। ঠাকুর রান্না কিছু মন্দ করে না। রেবতীবাবুর বিশ্বসংসারের সব কিছু সম্বন্ধেই এখন অসন্তোষ, রান্নাটারও প্রতি বোধহয় সেই জন্যেই বিরাগ। খেতে পারেনও না বেশী কিছু। কাল রোগে ধরেছে, তাতে অমৃত নিয়ে এলেও খেতে পারতেন কি না সন্দেহ।

চায়ের বাসন কোসন সরিয়ে রাখতে না রাখতে দরজার কড়া খট্‌খট্ করে নড়ে উঠল। কুসুম ছুটে এসে বলল, "ডাক্তারবাবু এসে গেছেন গো দিদিমণি। এই ঘরে নিয়ে আসব?"

প্রতিমা বলল, "তা আন। আমি যে নার্স সেটা বলে দিও।"

কুসুম দরজা খুলে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল। বেশ লম্বা চওড়া, বিশালকায় পুরুষ। ঘরে ঢুকতেই কুসুম বলল; "এই নার্স দিদিমণি, আজ সকালে এসেছেন।"

ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও। তা আপনি কতদিন এ কাজ করছেন?"

প্রতিমা বলল, "খুবই অল্পদিন। মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তে কাজে নেমেছি, ফোর্থ ইয়ারে পড়ছিলাম।"

ডাক্তার বললেন, "তা হলে কাজ করার অভ্যাস আছে। রেবতীবাবু বেশী খিটিমিটি করছেন না ত?"

প্রতিমা বলল, "আমার সঙ্গে এখনও ত কিছু করেন নি, তবে অন্যদের সম্বন্ধে খুব বিরক্ত।"

"যা দশা হয়েছে তাঁর, বিরক্ত হতেই পারেন। উপায় কি? মানুষ ত অমর নয়, এ রোগ সারেও না। চলুন দেখে যাই। খেতে টেতে পারছেন?"

"বেশী কিছু ত খেলেন না, চায়ের সময়।"

দুজনে গিয়ে রোগীর ঘরে ঢুকলেন। রেবতীবাবু চোখ খুলে তাকিয়ে বললেন, "ডাক্তার এসেছ? কি করতে আর এস? কিছু ত করতেও পার না।"

ডাক্তার বললেন, "মানুষের সাধ্য আর কতটুকু বলুন? তা খাওয়া-দাওয়া কি রকম হচ্ছে? ঘুম টুম হয়?"

"খাব আর কি? ও গরুর জাবনা কি মানুষ খেতে পারে? ঘুম মাঝে মাঝে হয়, মাঝে মাঝে জেগে থাকি। আমার মনে হয়, আমাকে কেউ মৃত্যুবাণ মারছে, তান্ত্রিক টান্ত্রিক ভাড়া করেছে হয়ত।"

ডাক্তার হা হা করে হেসে উঠলেন। "ও সব আবার মানেন নাকি আপনি? ও সবের কি আর চলন আছে? আর আপনার অনিষ্ট করতে চাইবেই বা কে? আপনি ত অজাতশত্রু মানুষ।"

"যা বলেছ ডাক্তার। কি বুদ্ধি তোমার! আমি অজাতশত্রু? ঘরে বাইরে সব জায়গায় আমার শত্রু ওৎ পেতে রয়েছে। এ অসুখ হল কেন আমার? সুস্থ মানুষটা একেবারে হট্ করে ক্যানসারের রোগী হয়ে গেলাম?"

ডাক্তার উঠে পড়ে বললেন, "আরে কি মুশকিল! এ সব বাজে ধারণা আপনার এল কি করে? ওসব কিছু না, কিছু না। আচ্ছা চলি, ওষুধগুলো ঠিক ঠিক খাওয়াবেন।" বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রেবতীবাবু আপন মনে খানিক গজ গজ করলেন। তারপর প্রতিমাকে বললেন, "তোমরা ত এ সব নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না। সব modern science পড়া মানুষ।

আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। তার প্রমাণও কিছু কিছু পেয়েছি।"

প্রতিমা কিছুই বলল না। বাড়ীতে ত আছে কেবল নিজের ছেলে আর বউ। অথচ ঘরে বাইরে ইনি এত শত্রু দেখছেন কোথায়? মস্তিষ্কের বেশ খানিকটা অবনতি হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠতে লাগল। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার ঘরের আলোটা জ্বেলে দেব?"

"দাও জ্বেলে, তবে ঐ বড় আলোটা জ্বেলো না। ঐ কোণের দিকে একটা নীল রং-এর বাল্ব্ আছে সেইটা জ্বাল, ওটার তেজ কম।"

প্রতিমা আলো জ্বেলে চুপচাপ বসে রইল। কথা বলবার ত কেউ নেই? উপরে গেলে হয়ত রেবতীবাবু বিরক্ত হবেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা না করাই ভাল, তখনই আবার বিশ্বসুদ্ধকে গালাগালি আরম্ভ করবেন।

সে নিজের ঘরে গিয়ে একটা ইংরেজী মাসিক পত্র নিয়ে এল, সেটাই উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল।

রেবতীবাবু পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "ও খানা কি কাগজ?"

প্রতিমা বলল, "একটা মেয়েদের ইংরেজী কাগজ। আপনি দেখবেন?"

কর্তা বললেন "নাঃ, এখন আর ও সব ভাল লাগে না। যখন চোখের তেজ ছিল, তখন ঢের পড়েছি। খুব ভালবাসতাম ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস পড়তে। ইংরেজী বাংলা সব গোগ্রাসে গিলেছি। Agatha Christi-র বইই কি কম পড়েছি নাকি?"

প্রতিমা বলল, "আমার কাছে অনেক বই আর ম্যাগাজিন আছে ঐ রকমের, আপনার জন্যে কিছু কি নিয়ে আসব?"

বৃদ্ধ বললেন, "চোখই নেই, তার বই পড়া? এই ত সন্ধ্যেও হয়নি ভাল করে, এর মধ্যে চোখে ঝাপসা দেখছি।"

প্রতিমা বলল, "পড়েও শোনাতে পারি।"

রেবতীবাবু বললেন, "দেখি, যদি ইচ্ছে করে ত বলব। কানেও যে আজকাল খুব ভাল শুনি তা নয়।"

প্রতিমা আর কিছু না বলে বসে বসে পত্রিকা পড়তে লাগল। এ হেন রোগীকে কি করে যে স্বস্তি বা আরাম দেওয়া যায় তা ত ভেবে পাওয়া শক্ত। দুনিয়াটাকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন করেই যেন তিনি বেঁচে থাকা স্থির করেছেন।

রাত আটটা আন্দাজ বৃদ্ধ রাত্রের শেষ আহার গ্রহণ করেন। খাদ্য যৎসামান্য। প্রতিমা উঠে কুসুমকে বলল, "কর্ত্তাবাবুর দুধটা গরম করে দিয়ে যাও।"

কুসুম একটু পরে দুধ নিয়ে এল। রেবতীবাবু প্রতিমার দিকে ফিরে বললেন, "এ দিক্ দিয়ে একটা বেরাল ক্রমাগত যায় আসে দেখেছ?"

প্রতিমা একটু অবাক্ হয়ে বলল "দেখেছি ত। ঐ ত চৌকাটের ওধারে বসে রয়েছে।"

রেবতীবাবু বললেন, "দুধ এক চামচ ওর সামনে মাটিতে ঢেলে দাও ত।"

প্রতিমা ভাবল, 'সর্ব্বনাশ। এ যে দেখি বদ্ধ পাগল। অথচ কথা না শুনলে এখনি হয়ত চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। ধারণা হবে যে আমিও ওর শত্রুপক্ষে চলে গেছি।'

সে চামচে করে এক চামচ দুধ নিয়ে বেরালটার সামনে মেঝেতে ঢেলে দিল। বেরালটা মহা উৎসাহে সেটা চেটে খেয়ে নিয়ে, খুব উৎফুল্লভাবে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন আর-একবার দুধ পাবার জন্যে আবেদন জানাচ্ছে! প্রতিমা দুধের বাটিটা নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে এল।

রেবতীবাবু বললেন, "জানোয়ারটার কিছু হল না দেখছি। আচ্ছা, দুধটা দাও আমাকে।"

প্রতিমা তাঁর খাবার জিনিষপত্র এগিয়ে দিল।। বৃদ্ধ কিছু খেলেন, কিছু ফেলে দিলেন। বেরাল বাবাজীর মনস্কামনা খানিকটা পূর্ণই হল। প্রতিমা এরপর ঘরের আর সব কাজকর্ম্ম সারল। রেবতীবাবু বললেন, "এবার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দাও, দেখি

একটু ঘুম আসে কি না। তোমার যদি অন্ধকার ঘরে বসতে ভাল না লাগে, নিজের ঘরে গিয়ে বস। আমার দরকার হলে ডাকব।"

প্রতিমা নিজের ঘরে চলে গেল। বসে বসে কাগজ পত্রই নাড়া চাড়া করতে লাগল। খানিক পরে কুসুম এসে বলল, "আপনার খাবার নিয়ে আসি দিদিমণি ?"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "আর সকলের খাওয়া হয়ে গেছে ?"

কুসুম বলল, "বৌদির ত সকাল সকাল খাওয়ার কথা, তিনি আগেই খেয়েছেন। দাদাবাবু এখন খাচ্ছেন।"

প্রতিমা বলল, "তবে আমাকে দিয়েই দাও। দেখ, একসের চালের ভাত এনে দিও না যেন।"

কুসুম বলল, "না গো দিদিমণি। বাটি করে সব তরকারি ডাল নিয়ে আসি আর থালাখানা নিয়ে আসি। তারপর ঠাকুর এসে ভাত দিয়ে যাক। আপনি যতটা বলবে ততটাই দেবে।"

সেইভাবেই খাবার দেওয়া হল। কুসুম বলল, "আপনারা সব লক্ষ্মীর দেশের মানুষ দিদিমণি। এই আজ খেলে তারপর কাল খাবে, তাতেই চলে যাবে আপনাদের। আর আমারা আলক্ষ্মীর দেশের পেরাণী, আমাদের সারাদিন খালি কি খাই কি খাই।"

প্রতিমা মনে মনে ভাবল, 'ঠিকই বলেছে। এত খাবার দরকার মানুষের যে কেন হয় তা বুঝি না।'

এরপর বাড়ী ক্রমে স্তব্ধ হয়ে এল। চাকর-বাকররা সব রান্নাঘরে চলে গেল খাওয়ার জন্যে। মিধুবাবুর আফিসের একটা চাকর রেবতীমোহনের ঘরে শুত। সেই শোবে ঠিক হল, দরকার হলে প্রতিমাকে তার ঘর থেকে ডেকে আনবে। রোগীর আর কোনো প্রয়োজন আছে কি না জানবার জন্য প্রতিমা তার ঘরে একবার ঘুরে এল। তারপর গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

নিজের বাড়ীর বাইরে শুয়ে ঘুমোন প্রতিমার বেশী অভ্যাস ছিল না। অবশ্য night dutyতে সে বাইরে রাত কাটিয়েছে, তবে তখন কাজেকর্মে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত তা যেন বোঝাই যেত না। এখানে একলা অন্ধকার ঘরে অনেকক্ষণ তার ঘুমই এল না। কলকাতার রাস্তা-ঘাটও ক্রমে নীরব হয়ে এল। শেষে শ্রান্ত হয়েই প্রায় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরে ওঠাই তার অভ্যাস। ভোর বেলাই তার ঘুম ভেঙে গেল। তখনও বাড়ীতে কোনো সাড়া জাগে নি, চাকর-বাকররাও ঘুমোচ্ছে। প্রতিমা স্নানের ঘরে গিয়ে ভাল করে, হাতমুখ ধুয়ে এল। ঘরে ফিরে এসে পাশের ঘরে কথাবার্ত্তার শব্দ শুনতে পেল। রেবতীবাবু জেগে উঠে চাকরটাকে বকছেন। প্রতিমা তাঁর ঘরে ঢুকে বলল, "আপনার মুখ হাত ধোবার জল আনব ?"

রেবতীবাবু বললেন, "এই সব লোক দিয়ে আজকাল কাজ কি করে চালায় বাবুরা ? এদেরই জন্যে এক-একজন চাকর দরকার। নবাবপুত্রদের ঘুমই ভাঙে না।"

চাকরটা উঠে মুখ হাঁড়ি করে বেরিয়ে গেল। প্রতিমা নিজের কাজকর্ম্ম করতে লাগল, রেবতীবাবু সমানে চাকর-বাকর ছেলে বউ সবার উদ্দেশে অভিযোগ করে যেতে লাগলেন। খানিক পরে বললেন, "এখন একটু চা পেলে ত হত। কিন্তু সে ত এখনও বিশ বাঁও জলের তলায়। বামুন ঠাকুর ত নামেও ঠাকুর কাজেও ঠাকুর। কখন তাঁর যোগনিদ্রা ভাঙবে, তিনি চুলো ধরাবেন, তবে ত চায়ের জল হবে ?"

প্রতিমা বলল, "একটা হীটার কি ষ্টোভ পেলে আমি নিজেই করে নিতে পারতাম।"

রেবতীবাবু বললেন, "নিধেটা বাড়ী আসুক ত আজ ডেকে পাঠাব। একবার উঁকি দিয়ে দেখে না। গুষ্ঠি সুদ্ধ গিলছে আমার পয়সায়। আমি নাকি তাঁর মান রেখে কথা বলি না, চাকর-বাকরের সামনে গালমন্দ করি। আরে, তুই আবার এত মানী ব্যক্তি কবে থেকে হলি ? আমি বাপ, বলিই যদি কড়া কথা ত অমনি তোর অপমান হয়ে গেল ?"

প্রতিমা বলল, "আমি দেখে আসছি রান্নাঘরে ওরা উনুন ধরিয়েছে কি না।"

বার হয়েই দেখল, কুসুম বাঁধান উঠোনের কল-তলায় মহা সোরগোল করে মুখ ধুচ্ছে। প্রতিমা বলল, "উনুনে আঁচ দিয়েছ? কর্ত্তাবাবু ত চা চাইছেন।"

কুসুম বলল, "এরই মধ্যে? এত আগে ত খায় না? আজ বুঝি রাতে ঘুম হয়নি? আঁচ ত দিয়েছে ঠাকুর, ধরেছে কি না দেখি গিয়ে।"

প্রতিমা আর কুসুম রান্নাঘরে ঢুকল। ঘর ধোঁয়ায় ভর্ত্তি। কুসুম তালপাখা নিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল। "এখনি হয়ে যাবে, দু পেয়ালা চায়ের জল ত?"

প্রতিমা রেবতীবাবুর ঘরে গিয়ে জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রাখতে লাগল। কুসুম জলটা তাড়াতাড়িই নিয়ে এল। যখন চেয়েছেন, প্রায় তখনই পেয়েছেন এমন ব্যাপার বোধহয় রেবতীমোহনের আজকালকার দিনে খুব বেশী হয় না। তাই খানিকটা খুশী হয়ে বললেন, "ভাগ্যে তুমি এসেছ, না হলে না খেয়ে মরলেও কেউ চেয়ে দেখবে না। নামে মানুষ ত ঢের আছে, তবে মানুষের চামড়া ত সকলের গায়ে নেই?"

প্রতিমার আজ সকালের দিকে ঢের কাজ। এখানে রোগীর সকালের পর্ব্ব সেরে, সুনলিনীকে ওষুধ খাইয়ে তাকে বাড়ী গিয়ে অনেক জিনিষপত্র আনতে হবে। সে তাড়াতাড়ি নিজে স্নান করে নিল। উপরে গিয়ে সুনলিনী ওষুধটা দিয়ে এল। নিধুবাবুকে এই প্রথম দেখল। তিনিও তখন কাজে বেরোবার জন্যে যোগাড়যন্ত্র করছেন।

সুনলিনী জিজ্ঞাসা করল "ঘুমোতে পেরেছিলেন ভাই?"

প্রতিমা বলল, "মোটামুটি, খুব ভাল ঘুম হয়নি।"

"শ্বশুরমশায় কিছু গোলমাল করেছিলেন নাকি? উনি ত নূতন হোক, পুরনো হোক, মানুষ দেখলে বকতে আরম্ভ করেন।"

"বকাবকি কাল দিনের বেলা খানিকটা করেছেন, তবে আমাকে নয়। রাত্তিরে কিছু গোলমাল করেন নি।"

"আপনি বুঝি বাড়ী যাচ্ছেন এখন?"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, একবার ঘুরে আসি, কয়েকটা জিনিষ নিয়ে আসব। এঁর ত যা অবস্থা দেখছি, রোজই যে বেরোতে পারব তা মনে হয় না।"

সুনলিনী জিজ্ঞাসা করল, "খুবই কি খারাপ দেখছেন? আমি ত বেশী যাই না ওঘরে, গেলেই বড় বকাবকি করেন।"

প্রতিমা বলল, "ডাক্তারবাবু ত বিশেষ ভরসা দিচ্ছেন না, আমারও তেমন কিছু ভাল বোধ হচ্ছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আবোল তাবোল বকছেন।"

নিধুবাবু পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, "ওটা ওঁর অসুখ নয়, ওটা ওঁর স্বভাব। যখন অসুখ ছিল না, তখন ও ঐ রকম সব কথা বলতেন।"

প্রতিমা এইবার নিজের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল। কুসুমকে বলে গেল, "আমি ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই ফিরে আসব। তুমি কর্ত্তাবাবুর ঘরের দিকে একটু নজর রেখো, যদি ডাকাডাকি করেন।"

কুসুম বলল "তা রাখব গো দিদিমণি, এই পাশের ঘরেই ত আছি। তবে আপনি তাড়াতাড়ি এস, কর্ত্তা-বাবু আমাদের দেখলেই বড় মুখ করে বাপু।"

প্রতিমা ভাবল, 'এ বুড়ো মানুষটি একেবারে দুর্ব্বাসা মুনি হয়ে উঠছেন। কবে আবার আমার সঙ্গেও খিটি-মিটি লাগান, কে জানে?'

বাড়ীতে গিয়ে দেখল, মা তখনও রান্নাঘরে। রজত খেয়ে উঠে বই গোছাচ্ছে। দিদিকে দেখে বলল, "কি রকম কাজ রে বাবা, সকালেই বেড়াতে বেরিয়েছ?"

প্রতিমা বলল, "বেড়াতে আসিনি, কিছু জিনিষপত্র সংগ্রহ করতে এসেছি। ও বাড়ীর লোকেরা খায় খুব প্রাণপণে, আর কোনো প্রয়োজনকে বিশেষ স্বীকার করে না।"

সে মায়ের চাবি নিয়ে কয়েকটা পরদা বার করে নিল। তারপর একটা বালতি, একটা মগ, একটা ছোট ফ্ল্যাস্ক্ আর একটা ফুলদানি জোগাড় করল। মাকে বলল, "মা একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দাও, কাউকে

দিয়ে। এত লটবহর নিয়ে ট্রামে বাসে যেতে পারব না, আবার তাড়াতাড়ি পৌঁছতেও হবে, রুগীটির ত অবস্থা খুব সুবিধের নয় ?"

রজত বলল, "আমি দিচ্ছি ডেকে ট্যাক্সি। তুমি ওগুলো নিয়ে নাম ত।"

প্রতিমা আর তার মা জিনিষপত্র নিয়ে নীচে নামলেন। রজত চলে গেল ট্যাক্সির খোঁজে।

ফিরে এসে প্রতিমা দেখল, রেবতীবাবুর দরজার কাছে ঝি, ঠাকুর সবাই দাঁড়িয়ে, ঘর থেকে বৃদ্ধের গলা শোনা যাচ্ছে। জিনিষপত্রগুলো নিজের ঘরে রেখে এসে সে রেবতীবাবুর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে ?"

রেবতীবাবু জবাব দেবার আগেই কুসুম বলল, "দেখুন ত দিদিমণি, জ্যান্ত মাছ এসেছে, এখনও ধড়ফড় করছে, আর কর্ত্তাবাবু বলছেন তিনি পচা মাছের গন্ধ পাচ্ছেন। নিয়ে আসব এখানে ?"

রেবতীবাবু বললেন, "তুমি যাও ত প্রতিমা, দেখে এস কেমন তাজা মাছ। পষ্ট পচা গন্ধ পাচ্ছি।"

প্রতিমা কুসুমের সঙ্গে রান্নাঘরে এসে দেখল, কয়েকটা মাছ তখনও খাবি খাচ্ছে। অল্প দূরে খানিকটা কুচো চিংড়ি ঢালা রয়েছে, তার থেকে খানিকটা অপ্রিয় গন্ধ উঠছে বটে। বলল, "এইগুলোর গন্ধই বোধহয় নাকে গেছে।"

বামুনঠাকুর বলল, "কিছু না থাকলেও ওঁর নাকে গন্ধ লাগে। কি আর বলব, রুগী মানুষ, অথর্ব্ব বুড়ো, তাই সব সয়ে যেতে হয়।"

প্রতিমা ফিরে গিয়ে বলল, "না, মাছ ভালই আছে। খানিকটা কুচো চিংড়ি এনেছে, তারই গন্ধ পেয়েছেন আর কি ?"

রেবতী বললেন, "কত কি আসছে না-আসছে কেবা তার খবর রাখে ? গিন্নী না থাকলে যা হয়। আবার দুরকম মাছ কেন ? বউটা একেবারে অপদার্থ, কোনো কিছু তাকিয়ে দেখে না। ছেলে যেন আর কারো হয় না ? শুধু খাবে আর শুয়ে থাকবে।"

প্রতিমার সকালের দিকে অনেক কাজ। একটা একটা করে সারতে লাগল। পরদা-টরদা লাগিয়ে নিজের ঘরটা ঠিক করে নিল। বইপত্র আরো কিছু এনেছিল, সেগুলি গুছিয়ে রাখল। তারপর রেবতীবাবুর বিছানার চাদর, গায়ে দেবার চাদর, বালিশের ওয়াড় সব বদলে দিল। যতক্ষণ ট্রাঙ্ক থেকে প্রতিমা কাপড়-চোপড় বার করল ততক্ষণ সতর্ক দৃষ্টিতে বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর তাঁর গা মোছাল, কাপড়-জামা সব বদ্লাল। কুসুমকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "কর্ত্তার কাপড়-চোপড় কি ধোবার বাড়ী যায়, না ঘরেই কাচা হয় ?"

"ধোবাতেই যায় দিদিমণি। মাঝে মাঝে ঘরেও কাচি, তা ওনার পছন্দ হয় না, বলে ময়লা কাটে না। আজকেই বিকেলে ধোবা আসবে, ওগুলো সব জড়ো করে আপনি রেখে দাও, সে এলেই দিয়ে দেওয়া যাবে।'

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "উনি রোজ কাপড় ছাড়তেন না ? বড় বেশী ময়লা কাপড় পরে ছিলেন।"

কুসুম বলল, "কে ছাড়াবে ? দাদাবাবু ত রাগ করে ঘরে যায় না। চাকরদের ত বকে ভূতছাড়া করে, কেউ গায়ে হাত দিতে সাহসই পায় না। এক আপনাকেই সুনজরে দেখেছে।"

খাওয়ার সময়ও যথারীতি গোলমাল হল। দু-এক গ্রাস ভাত খেয়েই সব রেবতীবাবু ঠেলে সরিয়ে দিলেন, বললেন, "নিজেদের জন্যে রেঁধেছে নিজেরাই খাক।"

প্রতিমা বলল, "রোগীর পথ্য রাঁধতে সবাই জানে না। আপনি কি আপনার ছেলেকে বলেছিলেন ঠোঙের কথা ? তাহলে আমি আপনার মাছের ঝোলটা রান্না করে দিতে পারি।"

রেবতীবাবু বললেন, "বলেছি ত, তা বেটা এখন কখন কি আনে, কে জানে ?"

রোগীর ঘরের কাজ সেরে প্রতিমা নিজের ঘরে গেল। আগে স্নান করে যাওয়াটা ভুল হয়েছে বুঝতে পারল। তারপর এত বেশী নোংরা ঘাঁটতে হয়েছে

যে আর-একবার স্নান না করলে চলবে না। কোনমতে কাকস্নান করে কাপড়চোপড় সব কেচে ফেলল। তারপর খাওয়া-দাওয়া সারল। এরা ঝাল দেয় বেশী সেইজন্য রুগ্ন মানুষের মুখে বেশী ভাল লাগে না বোধহয়।

রেবতীবাবু দুপুরে বিশেষ কিছুই খাননি, তবে দিবা-নিদ্রায় অভ্যাস ছিল বোধহয়, দেখা গেল বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। প্রতিমা নিজের ঘরে গিয়ে খানিকটা গড়িয়ে নিল, ঘুমের অভ্যাস নেই, ঘুম এল না। একটু বই, মাসিক পত্র নাড়া চাড়া করল। একবার উপরে গিয়ে সুনলিনীকে ওষুধ খেতে বলে এল। রেবতীবাবুর সাড়া পেল খানিক পরে, তখন তাঁর ঘরে গিয়ে বসল। বলল. "অনেক বই আর পত্রিকা নিয়ে এসেছি, একটা কিছু পড়ে শোনাব ?"

"নাঃ, শরীরটায় কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগছে, কিছু ভাল লাগছে না। সব বই কাগজগুলো আমায় দেখিও, যদি কোনটা শুনতে ইচ্ছে হয় ত বলব।"

আবার খানিকটা সময় গেল। ওষুধপত্র উপরে নীচে সে দরকার মত খাইয়ে আসতে লাগল।

সুনলিনী বলল, "আপনার আর একটু কাজ বাড়বে ভাই; কর্তা খোট ধরেছেন, তিনি আর বামুন ঠাকুরের রান্না খাবেন না, ছেলেকে হুকুম হয়েছে ষ্টোভ এনে দিতে, আপনাকে ঘরে বসে মাছের ঝোল বেঁধে দিতে হবে। রান্না জানেন ত ?"

প্রতিমা বলল, "মাছের ঝোল রাঁধতে পারব। রোগে ভুগে ভুগে জিভটা ওঁর একটু অসাড় হয়ে গেছে বোধহয়, কিছুই ভাল লাগে না। আমার রান্নাও ভাল লাগবে কি না জানি না।"

সুনলিনী বলল, "ভাল মন্দর ত কথা নয় ? ওঁর সবাইকে সন্দেহ। আপনাকে চোখের সামনে বসে রাঁধতে দেখবেন, কাজেই নিশ্চিন্তে থাকবেন।"

নীচে নামতেই কুসুম গরম জলের কেটলি নিয়ে হাজির হল। "চা করে নিন্ গো দিদিমণি, আমাদের খাবার করা হয়ে গেছে।"

প্রতিমা বাসন-পত্র এনে চা করতে বসে গেল। রেবতীবাবু বললেন, "নিখেকে বলেছি একটা ষ্টোভ কি কিছু এনে দিতে, তাহলে আমাকে এখানেই একটু পিশ্‌প্যাশ্ মত করে দিও, ওদের রান্নাঘরের রান্না আমি খাব না।"

সত্যিই ষ্টোভ এসে গেল সন্ধ্যাবেলা। বাসন-পত্র, গুঁড়ো মশলা, একটা বিরাট্ জলচৌকি, সবই এসে জুটল প্রতিমার আর রেবতীবাবুর নির্দেশ মত। প্রতিমা কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্নায় মন দিল।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। আজ আবার সঙ্গে নিখুবাবু। ডাক্তার বললেন, "এ সব আবার কি ব্যাপার ? এঁর অসুবিধা হবে না ?"

নিখুবাবু বললেন, "ওঁর সুবিধার জন্যেই ত করা হল। সামনে বসে রান্না না করে দিলে উনি খাবেন না।"

রেবতীবাবু বললেন, "যার তার হাতে আর খেতে রুচি নেই ডাক্তার।"

ডাক্তার বললেন, "বেশ, ওঁর হাতেই খান তাহলে।" গোটা কয়েক প্রশ্ন করে রোগীকে একটু নেড়ে চেড়ে দেখে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন খাওয়াটা রেবতীবাবুর নিরুপদ্রবে হল, যদিও খেতে যে বেশী কিছু পারলেন তা নয়। মুখে বললেন, "ভালই ত রাঁধ, তা খাবার দিন আর আমার নেই। দেখ, মানুষ কতরকম। তুমিও বাঙালী ভদ্র-ঘরের মেয়ে, উপরের ঐ বউটাও তাই, অথচ কত তফাৎ দেখ। আমার কপালেই কি যত ঝড়তি পড়তি পড়ল। আমি কার পাকা ধানে মই দিয়েছিলাম বাপু ?"

বেচারী সুনলিনী কোনোদিন শ্বশুরের ঘরের ধারে কাছেও আসে না, অথচ তাঁর সব চেয়ে সন্দেহ আর রাগ, তার উপরেই। তার অপরাধের মধ্যে তার বাবা যত ভরি সোনার গহনা দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, তা তিনি বিয়ের সময় দিতে পারেননি। পরে দিয়েছিলেন কি না অবশ্য প্রতিমা জানে না। যাহোক, এ ঘরের কাজকর্ম সেরে সে নিজের ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারল। এখন আর রোগীর ঘরে যাবার কোনো দরকার নেই, যদি না ডাক পড়ে। শুয়ে শুয়েই শুনল চাকরটা এসে দরজার কাছে বিছানা করে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে একবার যখন স্বর্ণলিনীকে ওষুধ খেতে বলতে গেল, তখন দেখল, তার মুখটা একটু বেশী রকম গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাই, শরীর ভাল নেই নাকি?"

স্বর্ণলিনী বলল, "কাল থেকেই কেমন যেন ভার ভার লাগছে। কে জানে হিসাবে ভুল করলাম কি না। গোড়ায় তেমন ভাল করে বুঝতে পারিনি ত? ওকে বলেছি আজ লেডী ডাক্তারকে খবর দিতে। ভয় করে যদিও, তাহলেও এ আপদ্ চুকে গেলেই বাঁচি।"

প্রতিমা বলল, "ও, সৌদামিনী মাসী আজ আসবেন বুঝি? আমাকে ডাকবেন ত তিনি এলে।"

স্বর্ণলিনী বলল, "আপনি হয়ত নিজেই এসে পড়বেন তখন আমার চুল বাঁধতে, না এলে আমি ডেকে পাঠাব। শ্বশুরমশায় আপনার রান্না খেয়ে কি বললেন?"

প্রতিমা বলল, "বললেন ত ভাল হয়েছে, তবে খেতে যে কিছু পারলেন তা নয়।"

স্বর্ণলিনী বলল, "ডাক্তারবাবু ত ওঁর ছেলেকে সতর্ক করে দিচ্ছেন, বলছেন আর বেশী দিন নেই।"

প্রতিমা বলল, "মানুষকে ত একদিন যেতে হবেই, ওঁর বয়স হল কত?"

"তা পঁচাত্তর ছিয়াত্তর ত হবেই। কিন্তু আমার বিয়ের সময় অবধি স্বাস্থ্যটা ভালই ছিল। একেবারে হঠ্ করে শক্ত অসুখে পড়ে গেলেন।"

প্রতিমা বলল, "এ সব অসুখ অনেক সময় শরীরে লুকিয়ে থাকে, প্রথমেই ধরা পড়ে না। সবাই ত সমান সাবধান থাকে না? যাই, দেখি গিয়ে মাছ এল কি না, আমার ত আবার রান্নার তোড়জোড় করতে হবে।"

খাওয়া-দাওয়ার পর রেবতীবাবু বললেন, "আচ্ছা প্রতিমা, তোমার মা তোমার বিয়ে দিতে চাননি?"

প্রতিমা বলল, "আমি এখন বিয়ে করলে চলবে কেন? আমার মাকে, আমার ভাইকে কে দেখবে?"

রেবতীবাবু বললেন, "আহা, সেইরকম দেখে শুনে ত দিতে হবে? তুমি সুন্দরী মেয়ে, বেশ লেখাপড়া জানা, ভাল ঘরের মেয়ে। এমন বরও থাকতে পারে যে তোমার মা-ভাইয়ের ভার নিতেও রাজী। এমন ত সংসারে কতই হচ্ছে।"

প্রতিমা বলল, "সে রকম বরও কেউ জোটেনি, তাই অত ভাবনাও কেউ ভাবেনি। তাছাড়া বিয়ে করার ইচ্ছে আমার কোনোদিনই বিশেষ নেই। মানুষের সেবার কাজেই আমি জীবন কাটাব, এই আমি ছোট বয়স থেকেই ঠিক করে রেখেছি।"

রেবতীবাবু বললেন, "আরে, সে আবার একটা কথা হল নাকি? তুমি কি মেমসাহেব যে Little Sister of the Poor হয়ে রুগীর সেবা করে বেড়াবে? ওসব আমাদের দেশে চলে না। কখন কোন্ বদ্মায়েসের খপ্পরে পড়ে যাবে তার ঠিক নেই। বিয়ে করাটাই উচিত হবে।"

প্রতিমা ভাবল, 'এ ত মহা জ্বালা। ভাল এক ঘটক ঠাকুরের খপ্পরে পড়লাম।' মুখে বলল, "আমার ত এখন ওসব দিকে মন দেবার সময় নেই। ভাইটাকে ভাল করে মানুষ করা দরকার।"

"তোমার কি বা বয়স, আর কি বা বুদ্ধি? এরপর যেদিন বাড়ী যাবে, মায়ের সঙ্গে ভাল করে পরামর্শ করবে, তাঁর মতে চলবে। সংসার যারা করেন তারা ত বুঝতে পারে না কত ধানে কত চাল।"

প্রতিমা চুপ করে রইল। রেবতীবাবুও আর কথা বললেন না। বোধহয় ঘুম আসছিল। তাঁর চোখ বুজে আসছে দেখে সে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে চলে গেল। দু চারটা চিঠিপত্র লেখার ছিল, বসে বসে সেইগুলো লিখে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। বিকালে যখন স্বর্ণলিনীর চুল বাঁধতে উপরে উঠছে, তখন সৌদামিনীর গাড়ী এসে দাঁড়াল সদর দরজার কাছে, তিনি নেমে এলেন। প্রতিমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার, হঠাৎ ডাক পড়ল যে?"

প্রতিমা বলল, "ওঁর শরীরটা ত বিশেষ ভাল যাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছেন।"

"ভয় পাবার আর কি আছে? হয়ত হিসাবে কিছু

ভুল ছিল, চেহারা দেখে সেইরকমই মনে হয়। তোমার রুগীর কি খবর ?”

প্রতিমা বলল, “ভাল ত কিছু দেখি না। খাওয়া-দাওয়া ক্রমেই কমে আসছে। ডাক্তারবাবুও কিছু ভরসা দিচ্ছেন না। ওঁর মনটাও ত শান্ত নয়। সারা দিনরাত হাজার ভাবনা ভেবে নিজেও ব্যস্ত হচ্ছেন, অন্যকেও ব্যস্ত করছেন।”

সৌদামিনী বললেন, “ঘোরতর সংসারী মানুষ ছিলেন ত? চিরজন্ম ঐ করেছেন, এখনও ওসবের মায়া ছাড়তে পারছেন না। চল, দেখি গিয়ে সুনলিনীর কি হাল।”

সুনলিনী সৌদামিনীকে দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সবিস্তারে নিজের শারীরিক অবস্থার বর্ণনা করতে লেগে গেল। সৌদামিনী তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, এবং পরীক্ষা করেও দেখলেন। তারপর বললেন, “ঠিক বলতে পারি না বাপু তবে মনে হচ্ছে, সময় এগিয়ে এসেছে। তুমি নার্সিং হোমে যাবার জন্যে জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখ। রাত্তিরে গাড়ীর ড্রাইভারকে বাড়ীতেই রেখো। নিধুবাবু যেন অফিস ফেরত বাড়ীতেই থাকেন। বেশী অসুস্থ বোধ করলেই আমাকে ফোন ক’রো, আর নার্সিং হোমে যাবার জন্যে তৈরী হয়ো। সাবধানে চলাফেরা কোরো। কোথাও আছাড় টাছড় খেয়ো না।”

সৌদামিনীর তাড়া ছিল, তিনি বেশীক্ষণ বসলেন না।

প্রতিমা সুনলিনীর চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, “ভয় পাবেন না। ছেলে-পিলে ত সকলেরই হচ্ছে, আর কলকাতার শহরে দরকার মত সব সাহায্যই ত পাওয়া যায়।”

সুনলিনী বলল, “তবু ভয় করে বাপু। মায়ের কাছে থাকলে তবু খানিকটা ভরসা পেতাম। মা এসব কাজে খুব ওস্তাদ। নিজের সাত-আটটা ছেলেমেয়ে হয়েছে ত ?”

প্রতিমা বলল, “তাঁকে দিন-কয়েকের জন্য আনিয়ে নিন না এখানে ?”

সুনলিনী বলল, “সে ত হয় না ভাই। মা আসবে না। এঁরা ত তাদের সঙ্গে কিছু ভাল ব্যবহার করেন না ? আর তা ছাড়া নাতি নাতনী না হলে নাকি জামাইয়ের বাড়ী খেতে নেই।”

দিন দুই-চার একই ভাবে চলল। নিধুবাবু এখন কাজ থেকে এসে আর আড্ডা দিতে বেরিয়ে যান না। বাড়ীতেই থাকেন। বন্ধুবান্ধব এক-আধজন এলে ঘরে বসে তাশ খেলেন। সুনলিনীর সঙ্গেও মধ্যে মধ্যে গল্প করেন। সে জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রেখেছে। মা ও দিদি দু-একবার এসে তাকে দেখে গিয়েছেন। কিছু ভাল সে বোধ করে না, তবে বেশী বাড়াবাড়িও কিছু হয়নি।

রেবতীবাবুর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। খেতে টেতে তিনি আর এখন একেবারেই পারেন না। গলা বসে গিয়েছে, অতি ক্ষীণ স্বরে কথা বলেন। তবে বকাবকিটা সারাক্ষণই করেন। স্ত্রী বেঁচে থাকতে কত ভাল ভাল রান্না খেয়েছেন, তা প্রায়ই বলেন। আজকালকার মেয়েরা কেউ তেমন রাঁধতে পারে না, শেখে না ওসব মন দিয়ে। ওসব ঝি-চাকরের কাজ মনে করে। প্রতিমা যে অত ভাল মেয়ে, সেও ত বেশী কিছু রাঁধতে জানে না, বই মুখে করেই দিন কাটিয়েছে। ডাক্তারবাবু নিয়ম মত আসেন, তবে নিধুবাবুকে আড়ালে বলেই দিয়েছেন, যে তাঁর আর কিছু করবার নেই। আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিয়ে রাখা ভাল। বাড়ীর আবহাওয়াটা ক্রমেই যেন থমথমে হয়ে আসতে লাগল। এ বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত তত আসত না, এখন ক্রমে দুচারজন করে আসতে আরম্ভ করল। রেবতীবাবু কাউকে দেখে বেশী খুশী হতেন না, কথাবার্তা যা বলতেন খানিকটা রূঢ় ভাবেই বলতেন।

সপ্তাহ খানিক কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ভোর রাত্রে দরজায় ধাক্কা পড়ল প্রতিমার। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলল উঠে। ঝি কুসুম দাঁড়িয়ে বলল, “বৌদির শরীর খারাপ করছে, সে আপনাকে ডাকছে।”

প্রতিমা জামা-কাপড় পরে নিয়ে উপরে উঠে গেল।

সুনলিনী শুয়ে শুয়ে কাঁদছে, মাথার কাছে বিব্রত মুখে নিধুবাবু দাঁড়িয়ে। প্রতিমা গিয়ে সুনলিনীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "কাঁদছেন কেন? ভয় কিসের? খুব কি কষ্ট হচ্ছে?"

নিধুবাবু বললেন, "দেখুন ত একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমাদের কারোই ত কোনো অভিজ্ঞতা নেই এসব বিষয়ে, কিছু বুঝতে পারছি না। লেডী ডাক্তারকে খবর দেব কি?"

প্রতিমার নিজেরও অভিজ্ঞতা খুব বেশী নয়, তবে বই পড়া বিদ্যা ত আছেই। সুনলিনীকে প্রশ্ন করে তার মনে হল, এখন সৌদামিনী মাসীকে খবর দেওয়া উচিত। নার্সিং হোমে যাবার জন্যে তৈরি হওয়াও উচিত। নিধুবাবু সেই মত টেলিফোন করতে গেলেন যাকে যাকে দরকার। প্রতিমা সুনলিনীর সঙ্গে যা কিছু যাবে তা সব তাড়াতাড়ি স্যুটকেসে ভরে দিতে লাগল।

সৌদামিনী চট্ করেই এসে গেলেন। বললেন, এই ত সব গোছান হয়েই গেছে। বেরিয়ে পড়াই যাক তাহলে? নাকি চা টা খেয়ে যেতে চাও?"

সুনলিনী নাক মুখ মুছতে মুছতে বলল, "মা আসবেন বলে পাঠিয়েছেন, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব, নইলে আমার ভয়ানক ভয় করবে।"

নিধুবাবু প্রতিমাকে বললেন, "আপনি বামুন ঠাকুরকে আর কুসুমকে বলুন ত চা টা যদি একটু তাড়াতাড়ি করে দিতে পারে, তাহলে একটু খেয়েই যাই।"

প্রতিমা বলল, "দেখছি, ওরা উঠেছে বোধহয়। না হলে আমিই ষ্টোভে জল চড়িয়ে দিচ্ছি, হয়ে যাবে এখন।"

নীচে নেমে এল। ঝি, ঠাকুর সবাই গোলমালে উঠে পড়েছে, কাজে হাতও লাগিয়েছে, তবে কত তাড়াতাড়ি হবে তা বলা যায় না। প্রতিমা ষ্টোভ জ্বেলে জল বসিয়ে দিল। রেবতীবাবু বললেন, "হল কি আবার? কারো অসুখ-বিসুখ নাকি?"

প্রতিমা বলল "অসুখ নয়, আপনার বউমাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।"

রেবতীবাবু বললেন, "সে কি? এখন ত হবার ছিল না?"

প্রতিমা বলল, "অমন একটু ভুলচুক অনেক সময়ই হয়। দেখি, ওদের চা টা করে দিই, রান্নাঘরের উনুন এখনও ত ধরেনি।"

কুসুম অনেকগুলি পেয়ালা পিরিচ নিয়ে এল। প্রতিমা চা ভিজিয়ে পেয়ালায় পেয়ালায় ছেঁকে দিতে লাগল। ঠাকুর আর কুসুম সেগুলি তুলে নিয়ে গেল।

প্রতিমা এবার নিজেদের চায়ের জন্য জল চড়িয়ে সকালের অন্যান্য কাজ সারতে লাগল। ইতিমধ্যে নার্সিং হোমের দল রওনা হয়ে গেলেন। সুনলিনীর সঙ্গে চলল অনেক লোক। সৌদামিনী, নিধুবাবু, সুনলিনীর মা, তার দিদি, পাড়ার একজন মাতব্বর গিন্নী। সবাই সমানে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, কিন্তু তার কান্না কিছুতেই থামছে না।

সকালের সাধারণ কাজ খানিকটা ব্যাহত হয়েছিল এই সব ব্যাপারে। এখন আবার সব সোজা পথে চলতে আরম্ভ করল। প্রতিমাদের চা খাওয়া হয়ে গেল। কাজ করতে করতে সুনলিনীর কান্না ভরা মুখটাই তার ক্রমাগত মনে হতে লাগল।

ঘণ্টা দুই পরে নিধুবাবু ফিরে এলেন নার্সিং হোম থেকে। বললেন, "ভালই আছে এখন। ওর মা রইলেন ওর কাছে। আজকের মধ্যেই হয়ে যাবে ত ডাক্তাররা বলছেন।"

তিনি স্নানাহার করে কাজে চলে গেলেন। প্রতিমা নিজের কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিতে যাবে ভাবছে, এমন সময় রেবতীবাবু তাকে ডেকে বললেন, "প্রতিমা, শোন।"

প্রতিমা কাছে এসে বলল, "কি বলছেন?"

"বলছি, তুমি আর এই ক'দিন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওনি না?"

প্রতিমা বলল, "না, যাওয়া হয়নি। কাজ একটু বেশী পড়ে যাচ্ছে ত, এইসব রান্নাবান্না নিয়ে?"

"আমি তাঁর সঙ্গে যে পরামর্শ করতে বলেছিলাম তা

ত কিছু করা হচ্ছে না। এ দিকে আমার ত তাড়া আছে। আমার পরমায়ু ত আর অনন্তকাল পড়ে নেই? আমি শেষ জীবনটায় একটু শান্তি পেতে চাই।"

প্রতিমা একটু অবাক্ হয়ে বলল, "কিন্তু আমার বিয়ের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে কেন? ওটা ত আপনার কোন দায়িত্ব নয়? সে আমি ভাবব, আমার আত্মীয়েরা ভাববেন। আপনার মনের শান্তি কেন নষ্ট হবে?"

রেবতীবাবু বললেন, "বলছি। দেখ, বিষয়-সম্পত্তি আমার প্রচুর আছে। কলকাতায় দুখানা বাড়ী আছে, দেশে বাড়ী আছে, জমি-জমা আছে। এখানে লাখ খানিক টাকা invest করা আছে। দুই ছেলে আর বউ ওৎ পেতে বসে আছে কবে আমি মরব আর তারা সব দখল করবে। কিন্তু তাঁদের পাকা ঘুঁটি আমি কাঁচিয়ে দিতে চাই। এখানের বাড়ী-দুটো আমি দুই বেটাকে দিয়ে যাব, একেবারে বঞ্চিত করব না। তবে টাকা আর দেশের বিষয় আমি অন্যত্র দিয়ে যাব। এই নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা। আমি এগুলি সব তোমাকে লিখে দিয়ে যাচ্ছি, যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী থাক।"

প্রতিমা ত আকাশ থেকে পড়ল। বৃদ্ধ একেবারে পাগল হয়ে গেছেন। বলল, "এসব কি বলছেন আপনি? শুনলে যে লোকে আপনাকে বদ্ধ পাগল ভাববে? আপনি আমার ঠাকুরদাদার বয়সী, তাতে এমন পীড়িত, এখন কি এইসব ভাববার সময়? এ সব কথা শোনাও যে পাপ।"

রেবতীবাবু বললেন, "পাপ পুণ্য নিয়ে বক্তৃতা করো না বাপু ওসব আমার ঢের শোনা আছে। তোমাকে আইনতঃ আমার করে নিতে চাই, যাতে তুমি শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার কাছে থাক। নইলে কখন কে কি লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে? তোমার ভয় নেই, কোনো রকম দাবী-দাওয়া আমি তোমার উপর করব না, যেমন নার্সের কাজ করছ, তাই শুধু করবে। আর ছেলে-বউদের খোঁতা মুখ আমি সেই সঙ্গে ভোঁতা করে দিতে চাই। ছেলে হতে যাচ্ছে, এখন ত লোভ আরো বাড়বে। নাও, এখন কি বল তুমি?"

প্রতিমা বলল, "দেখুন, আপনি বুদ্ধিমান্ লোক, নিজেই একটু ভেবে দেখুন। এরকম অস্বাভাবিক প্রস্তাবে কেউ কখনও রাজি হতে পারে? যে শুনবে সেই হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। এ সব ভুলে যান আপনি।"

"তোমার যতটা বুদ্ধি আছে ভেবেছিলাম, তা নেই দেখছি। তোমার লাভ বই ক্ষতি হত না। মায়ের সঙ্গে একটু পরামর্শ করবে না?"

"না, এরকম অদ্ভুত কথা আমি কারো সামনে উচ্চারণ করতে পারব না।"

"তবে যাও তুমি, সরে যাও আমার সামনে থেকে। দেখি ডাক্তারকে বলে আমি অন্য লোক আনাতে পারি কি না।"

প্রতিমা নিজের ঘরে চলে এল। দুনিয়াটা দেখা যাচ্ছে পাগলেরই কারখানা। ভেবেছিল এখানে হয়ত নিরুপদ্রবে কিছুদিন কাজ করা যাবে, কিন্তু বৃদ্ধ এরকম অসম্ভব অবুঝ হলে,তাঁর কাজ সে কি করে করবে? আর তিনি হয়ত তাকে কাজ করতেই দেবেন না। সুনন্দনী এখানে থাকলে সুবিধা হত, নিধুবাবুর কাছে এসব কথা বলাও ত মুশকিল। সৌদামিনী মাসীকে দিয়ে বলাতে হবে।

দুপুরটা চুপচাপেই কাটল। রেবতীবাবু জেগে রইলেন কি ঘুমিয়ে রইলেন, তা প্রতিমা জানল না, তবে তাকে আর ডাকলেন না। বিকালের চা টা নীরবে আধ পেয়ালা খেয়ে ঠেলে সরিয়ে রাখলেন।

নিধুবাবু অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরলেন, এবং তাড়াতাড়িই আবার চা খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঝি-চাকররা সব তাঁর ফেরার জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আত্মীয়-স্বজনও দুচারজন এসে সুনন্দনীর খবর নিয়ে গেল। রেবতীবাবুর অতক্ষণব্যাপী নীরবতাটা প্রতিমার বিশেষ ভাল লাগছিল না, কিন্তু পাছে ডাকলে চেঁচামেচি করেন বা উত্তেজিত হন, সেই জন্যে সে ডাকতেও পারছিল না, নীরবে কাজ করছিল।

রাত সাড়ে সাতটা আটটার-সময় নিধুবাবু নার্সিং হোম থেকে ফিরে এলেন। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকলেন, "কুসুম, ও কুসুম।"

কুসুম ছুটে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, "কি দাদাবাবু? বউদি কেমন আছেন?"

"ভাল। খোকা হয়েছে এই ঘণ্টাখানিক আগে। কর্তাবাবুকে বল, নার্স দিদিমণিকে বল।"

প্রতিমা শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, জিজ্ঞাসা করল, "সুনলিনী ভাল আছেন ত, বেশী কষ্ট পাননি ত?"

"না, ডাক্তাররা বললেন স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে, বেশী কষ্ট পায়নি। দেখে এলাম ভালই আছে। বাচ্চাটিও বেশ সুস্থ সবল মনে হল।"

রেবতীবাবুর ঘর থেকে কুসুম চিৎকার করে উঠল, "ওগো দিদিমণি, শিগগির এস গো! র্তাবাবু খাট ছেড়ে উঠে চলে যাচ্ছেন।"

প্রতিমা আর নিধুবাবু দৌড়ে রেবতীবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তিনি ততক্ষণ গোঁ গোঁ করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। নিধুবাবু তাঁকে ধরতে না ধরতে তিনি সশব্দে মাটিতে পড়ে গেলেন। চাকরবাকররা দৌড়ে এল, সকলে মিলে তাঁকে ধরাধরি করে খাটে তুললে। কিন্তু জ্ঞান আছে মনে হল না। নিধুবাবু গেলেন ডাক্তারকে ফোন করতে। প্রতিমা বৃদ্ধের নাড়ী দেখল, সুবিধাজনক নয়। মুখে চোখে জল দিল, তাতেও লাভ হল না কিছু। ভাবল, "আজই এই ঝগড়াটা না বাধালে ভাল ছিল।"

ডাক্তার এলেন, বিশেষ কিছু ভরসা দিলেন না। বললেন, "Watch করুন সারাক্ষণ, আর আত্মীয়দের খবর দিন। করবার কিছু নেই।"

নিধুবাবু বললেন, "এখন আমি কোন্ দিক্ সামলাই? একজন এলেন ত আর একজন যেতে বসলেন। সিধেটাও এখানে নেই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ত এঁর যা ভাব ছিল, কেউ উঁকি মেরে দেখলে হয়। আমাকে ত এখন বাইরে বাইরে অনেকটা ঘুরতে হবে, আপনি একলা এদিক্ সামলাতে পারবেন?"

প্রতিমা বলল, "পারব। আপনার যেখানে যাবার যান।"

[৩]

প্রতিমা দিন দশ পরে বাড়ী ফিরে এল। রেবতীবাবু সেই রাত্রেই মারা গেলেন। কিন্তু নিধুবাবুর অনুরোধে সে আরো ন-দশটা দিন তাঁদের বাড়ীতে রইল। সুনলিনী ছেলে নিয়ে নার্সিং হোম থেকে ফিরল। সে এমনিতেই কাজকর্মে অপটু, ছেলে নিয়ে আরো যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। কার্য্যতঃ বাচ্চার সব কাজই প্রায় প্রতিমাকে করতে হতে লাগল। সৌদামিনীর সাহায্যে অবশেষে একজন ভাল আয়া পাওয়া গেল, তখন প্রতিমা ছাড়া পেয়ে বাড়ী চলে এল। রেবতীবাবুর শ্রাদ্ধের দিন শুধু গিয়ে একবার দেখা করে এল।

এখন বাড়ীতেই বসে আছে। রোজ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে, সৌদামিনী মাসীর কাছে প্রায়ই যায়। নিধুবাবুদের বাড়ীর ডাক্তারবাবুও তাকে আশ্বাস দিয়ে রেখেছিলেন যে কোনো কাজের সন্ধান পেলেই তাকে জানাবেন। তিনি নিজেও একটা নার্সিং হোমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেখানেও একটা কাজ দিতে পারতেন, তবে মাইনে বড় কম। তবে একেবারে কিছু না করে বসে থাকার চেয়ে কিছুদিন কম মাইনেতে কাজ করাও ভাল কি না প্রতিমা ভাবছিল।

তাদের বাড়ীতে সকালে একটাই কাগজ আসে। একটু বেলা হলে সে একতলা দুতলার থেকে সব কাগজগুলি আনিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো তন্ন তন্ন করে পড়ে। কলকাতার বাইরে দু-একটা কাজের কথা দেখা যায়। শেষ অবধি কি কলকাতা ছেড়ে চলেই যেতে হবে নাকি? তাহলে কিন্তু মায়ের বড় অসুবিধা হবে। রজতটাও একেবারে ছেলেমানুষ।

একতলার ছোকরা চাকরটা হঠাৎ একখানা খবরের কাগজ হাতে করে উপরে উঠে এল। প্রতিমার দিকে

কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "মা এইটা দেখতে বললেন, এই যে এখানে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিয়েছেন।"

প্রতিমা কাগজটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একজন সেবিকার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। একেবারে পাশ করা না হলেও হবে, কিন্তু নার্সিং-এর সব কিছু জানা চাই। ডাক্তারের সব নির্দ্দেশ ভালভাবে বুঝতে ও পালন করতে হবে। একাধিক রোগীর পরিচর্য্যা করতে হতে পারে, তবে সাহায্য করার জন্য আরো লোক থাকবে। কেউ কর্ম্মপ্রার্থী থাকলে একটা বিশেষ ঠিকানায়, সকাল বারোটার মধ্যে দেখা করতে বলা হয়েছে। মাইনে বেশ ভাল।

প্রতিমা মাকে ডেকে বলল, "মা, ভাখ এই বিজ্ঞাপনটা। দেখা করে আসব নাকি? কলকাতার মধ্যেই ত, যদিও আমাদের বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূর হবে।"

মা বিজ্ঞাপন পড়ে বললেন, "বাবাঃ, এ যে বিরাট ব্যাপার দেখছি। প্রায় হাসপাতালের কাজের মত। একাধিক রোগীর পরিচর্য্যা করতে হবে। তবে দেখে আসতে ক্ষতি কি? কেউ ত কাজ নিতে বাধ্য করবে না? কিন্তু একেবারে একলা যাস্ না। অন্ততঃপক্ষে খোকাকে নিয়ে যাস্।"

প্রতিমা বলল, "কাল রবিবার আছে, কালই যাব ওকে নিয়ে। যদিও অভিভাবক হিসাবে ও কতখানি কাজে লাগবে আমার তা জানি না। তবুও একলা যাওয়ার চেয়ে দুজনে যাওয়া ভাল।"

পরদিন সকালেই চা-টা খেয়ে বেরোল দুজনে। দূর আছে বেশ, সময় লাগল অনেকটা।

রজত বলল, "এখানে কাজ নিলে আর তোমায় বাড়ীতে বেড়াতে আসতে হবে না, দিন কেটে যাবে একবার আসতে যেতে।"

অবশেষে দীর্ঘ পথ শেষ হল। বাড়ী খুঁজতে হল না, রাস্তার উপরেই বাড়ী। বড়লোকের বড় বাড়ী, এককালে খুবই জাঁকজমক ছিল বোঝা যায়, এখন মনোযোগের অভাবে খানিকটা হতশ্রী হয়ে পড়েছে। দারোয়ান তাদের নিয়ে গিয়ে একটা লাইব্রেরী গোছের ঘরে বসাল। চারদিকে বইয়ের আলমারি, বসবার জন্যে বড় বড় গদি আঁটা চেয়ার। রজত ফিশ্‌ফিশ্ করে বলল, "বাবাঃ, এ যে দেখি এলাহি কারখানা।

একজন শীর্ণকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, আর একজন বিধবা ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। প্রতিমারা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই নার্সের কাজ করবেন? বড় ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। এ কাজের অভিজ্ঞতা আছে কিছু?"

প্রতিমা বলল, "তা আছে কিছু। দু-চার জায়গায় কাজ করেছি, তা ছাড়া মেডিক্যাল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ছিলাম, নার্সিং এর সবই জানি। ডাক্তারের সব নির্দ্দেশ পালন করতে পারব।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আমার দুটি ছেলে মেয়েই বড় রুগ্ন, তাদেরই দেখাশোনা করতে হবে। আমারও শরীর কিছু ভাল নয়। বাড়ীতে মানুষও আর কেউ নেই তেমন। আমার এই ভাই অনেক সময় থাকেন অনেক সময় থাকেনও না। যিনি কাজ নেবেন, তাঁকে অনেকখানি দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হবে। আরো বয়স্কা মানুষ হলে ভাল হত, কিন্তু সুবিধা মত পাচ্ছি না। তা আপনি দেখুন আমার ছেলেমেয়েকে। যদি মনে করেন যে পারবেন, তাহলে কাল চলে আসুন। ঝি-চাকর দুজন আছে আপনাকে সাহায্য করবার। চলুন।"

তাঁদের সঙ্গে প্রতিমা দোতলায় উঠল। একটি ঘরের পরদা তুলে ভদ্রমহিলা ভিতরে ঢুকে বললেন, "আসুন, এই আমার মেয়ে রুণু। ইনি তোমার দেখা-শোনা করবেন রুণু।"

রুণু ফিরে তাকাল প্রতিমার দিকে। রংটা বেশ ফরশা, মুখটা তত সুন্দর নয়। প্রতিমাকে দেখে বলল, "ওমা, এইটুকু মেয়ে, এত আমারই বয়সী?"

তার মা বললেন, "থাক, তোমার আর পাকামি করতে হবে না, তোমার চেয়ে ঢের বড়।"

রুণু বিজ্ঞের মত বলল, "তবে একেবারে বুড়োধ

চেয়ে ছোটও ভাল, তাদের সঙ্গে তবু হাসি-ঠাট্টা করা যায়।"

রুণুর মা প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখুন, একে নিয়ে চালাতে পারবেন? অবাধ্য ধরণের মেয়ে কিন্তু।"

প্রতিমা বলল, "আমি খুব পারব, কোনো অসুবিধা হবে না। এঁর কি অসুখ?"

"ছেলে মেয়ে দুজনেরই পলিও। আমার কপালের কথা আর বলেন কেন? দুজনের একজনও যদি ভাল থাকত।"

"কি আর তাতে তোমার লাভ হত? আমি হয়ত কলেজ যাবার নাম করে যেখানে সেখানে প্রেম করে বেড়াতাম, আর তুমি মাথা চাপড়ে মরতে। দাদা হয়ত terrorist হয়ে যেত। এই ত বেশ নিশ্চিন্ত আছ, আমাদের দুটোরই পায়ে বেড়ি পড়েছে।"

রুণুর মা বললেন, "বয়সই হয়েছে বাছা তোমার, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই হয় নি। চলুন আমার ছেলের ঘরে। মেয়েটা যেমন বেয়াড়া, ছেলেটা তেমনিই ভাল। কত আশা ছিল আমার ওর সম্বন্ধে। ভগবান্ ওকে কেন অমন শাস্তি দিলেন, জানি না।"

এ ঘরটি রুণুর ঘরের চেয়ে আরো বড়। খুব পরিষ্কার আর গোছাল। রুণুর ঘরের মত রং এর ছড়াছড়ি কোথাও নেই, অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ। ঘরে দুটি বড় বইয়ের আলমারি, একটা কাপড়ের আলমারি, টেবিল এবং কয়েকখানি চেয়ার। বড় খাটে, ঠেশান দিয়ে বসে একজন যুবক বই পড়ছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের আধখানাই দেখা গেল। প্রতিমা প্রথম দৃষ্টিতেই চমৎকৃত হয়ে গেল। এত সুন্দর মুখ সে যেন আর আগে কখনও দেখেনি। হয়ত বা ছবিতে বা মূর্ত্তিতে দেখেছে। এ যেন লিওনার্ডোর ছবির খ্রীষ্ট নেমে এসেছেন।

গৃহকর্ত্রী বললেন "আশিস, এই একজন নার্স এসেছেন। ইনি কাল থেকে তোমাদের কাজ করবেন সম্ভবতঃ। ইনি মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়েছেন, কাজেই তোমার লেখাপড়ার কাজেও সাহায্য করতে পারবেন।"

যুবক ফিরে তাকাল। বইটা নামিয়ে রেখে প্রতিমাকে নমস্কার করে বলল, "এরকম কাজ বেছে নিলেন যে? ডাক্তারি ত এর চেয়ে ভাল হত।"

প্রতিমা বলল, "হঠাৎ পারিবারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায়, রোজগারের চেষ্টায় নামতে হল।"

যুবক বলল, "আমার কাজ খুব ভারি নয়, অনেকটাই সাধনদা করে। তবে সময় অবশ্য অনেকটা দিতে হবে। রুণু কিন্তু আপনাকে খুব জ্বালাতন করবে। মোটেই সুশীল ও সুবোধ বালিকা নয়।"

প্রতিমা বলল, "সে কি আমাদের দেশে কোথাও আর আছে? তাদের দিন গেছে। আমার নিজেরও একটি অত্যন্ত দুষ্টু ভাই আছে, দুষ্টুমি নিয়ে চলতে আমি অভ্যস্তই আছি।"

এ ঘরে তারা আর বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। অন্য এক ঘরে এসে বসে গৃহিণী বললেন, "দেখুন বিবেচনা করে কাজ করতে পারবেন কি না। রাতদিন থাকতে হবে, কাজকর্ম্মে সাহায্য করবার লোক পাবেন, তবে দায়িত্ব সব আপনার। আমি নামেই বাড়ীর গিন্নী, অর্দ্ধেক দিন শুয়েই থাকি, উঠতে পারি না, এমন মাথার যন্ত্রণা হয়। ঝি-চাকর সব পুরোন, একরকম করে কাজ চালিয়ে যায়। বাঁধা মাইনে করা ডাক্তার আছেন, তিনিও একদিন ছাড়া এসে দেখে যান। বাড়ীতে টেলিফোন আছে দরকার মত তাঁকে খবর দেওয়া যায়।"

প্রতিমা বলল, "আমার দিক্ থেকে ত কিছু অসুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি কাল থেকে আসতে পারি।"

"তবে তাই আসবেন। একবারে সকালেই চলে আসবেন, এখানে এসে খাওয়া-দাওয়া করবেন।"

"আচ্ছা, এখন আসি তবে," বলে প্রতিমা সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল। গৃহিণী আর নীচে নামলেন না, তাঁর ভাই একতলা অবধি নেমে প্রতিমা আর রজতকে বিদায় দিলেন।

রজত গেটের বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "এরা বেজায় বড়লোক, না ?"

প্রতিমা বলল, "এককালে খুবই বড়লোক ছিল বোঝা যাচ্ছে, এখন অবস্থা পড়ে গিয়েছে মনে হয়। তবে গৃহিণীটি এবং তাঁর ছেলেটি খুবই ভাল মনে হয়।"

"ছেলেটিই কি রুগী নাকি ? কতবড় ছেলে ?"

প্রতিমা বলল, "আমাদের বয়সীই হবে। রুগী ত একটি নয়, দুটি। মেয়েও আছে একজন, তোদের বয়সী হবে। দেখতে ভাল, তবে শুনলাম বেজায় দুষ্টু।"

রজত বলল, "শুয়ে শুয়ে আর কি দুষ্টুমি করবে ?"

"সেইটাই খুব পাকামি করে তার মাকে বলছিল। ওর অসুখ করে ওর মায়ের কত অসুবিধা হয়েছে সেইটাই প্রমাণ করতে চায়।"

ট্রাম এসে পড়ল, তারা উঠে পড়ল, আর গল্প করা হল না। বাড়ী ফিরে স্নানাহার সেরে জিনিষপত্র গুছোতে বসল। মাকে বলল, "মা, বড়লোকের বাড়ী কাজ করতে যাচ্ছি, কাপড়-চোপড় একটু বেশী নেব। নইলে আমাকে নিতান্তই ঝি ভাববে। মেয়েটি আবার যা মুখফোঁড়! তোমার বড় স্যুটকেসটা নিচ্ছি।"

মা বললেন, "তা নিয়ে যা। ভাল কাপড়চোপড়ও কিছু নে না ? সারা দিনরাতই ত নার্সিং করবি না।"

প্রতিমা বলল, "সাজ-সজ্জার কি কিছু দরকার হবে ? বাড়ীর সব ক'টা মানুষই ত অসুস্থ ? উৎসবাদি কিছু হবে বলে ত মনে হয় না। যাই হোক, বলছ যখন, তখন নিই দুচারটে।"

পরদিন সকাল-সকালই সে বেরিয়ে পড়ল। অনেক জিনিষপত্র নিতে হল বলে ট্যাক্সি করেই গেল। আজ সোমবার, সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, কাউকে আর সঙ্গে নিতে পারল না।

ওখানে পৌঁছে দরোয়ানেদের সাহায্যে জিনিষপত্র নিয়ে সে উপরে উঠল। একজন চাকর তাকে ঘর দেখিয়ে দিল, "এই আপনার ঘর। মা ঠাকরুণ এখন স্নান করছেন, স্নান হয়ে গেলে আপনার ঘরে আসবেন। আপনি বলুন কোথায় কি রাখতে হবে, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" যেখানে যা রাখতে চায়, প্রতিমা দেখিয়ে দিল, চাকরটি সব ঠিকঠাক করে দিয়ে চলে গেল। ঘরটিতে আসবাব-পত্র সবই আছে, এক আলমারি বই পর্য্যন্ত। তার আর বাড়ী থেকে কোনো কিছু আনতে হবে না। দু-একখানা বই বার করে সে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল।

গৃহিণী ইন্দুমতী এসে ঘরে ঢুকলেন। ইনিও বয়স-কালে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝাই যায়, এখন অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছেন এবং গায়ের উজ্জ্বল রং ম্লান হয়ে গেছে। একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, "আমি সকাল-সকালই স্নান করি, নইলেই মাথা ধরে ওঠে। তা জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিয়েছ ত ? দ্যাখ, 'তুমি' বলছি বলে কিছু মনে করছ না ত ? তুমি আমার ছেলে মেয়ের চেয়ে বিশেষ বড় ত হবে না ?"

প্রতিমা বলল, "কি আশ্চর্য্য! মনে আবার কি করব ? 'তুমি' বলাই ত উচিত, আমি নিজেই আপনাকে অনুরোধ করব ভাবছিলাম। হ্যাঁ, জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিয়েছি।"

"তবে চল, আগে রুণুর ঘরে যাই। ও আমার মতই সকাল-সকাল স্নান করতে চায়, চুলও ওর প্রায়ই শ্যাম্পু করতে হয়। খুব সুন্দর চুল ছিল মেয়ের, এই রকম ঘষাঘষি ছেঁড়াছেঁড়ি করে অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে।"

কথা বলতে বলতে তাঁরা রুণুর ঘরে এসে ঢুকলেন। রেশমের রাত-কাপড় পরা রুণু তখন ইংরেজী সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখছে, এবং একজন প্রৌঢ়া ঝিকে বকে চলেছে। প্রতিমাকে দেখে বলল, "আপনার চুল দেখে মনে হচ্ছে, আপনি চুল পরিষ্কার করতে জানেন। আমার এই মানদা ঠাকুরাণীটির ধারণা যে রোজ মাথায় এক বোতল নারকেল তেল ঢেলে দিলেই চুলের পরিচর্য্যা ভালভাবে হয়। আপনি নিশ্চয়ই তা ভাবেন না ?"

প্রৌঢ়া দাসীটি বলল, "দিদিমণির যে কথা। চুলে তেল ছোঁয়াবারই জো নেই। সাবান দিয়ে দিয়ে চুলগুলো সব লাল হয়ে গেল।"

প্রতিমা বলল, "আপনি যেমন করতে বলবেন, তাই করব। আপনার ডাক্তার এ বিষয়ে কি কিছু বলেছেন ?"

"সে বুড়ো আবার কি বলবে? কোনোদিন কি ও-সব দিকে তাকিয়ে দেখে? যত বাজে কথা বলতেই ব্যস্ত। নাও মানদা, আমার জলটল ঠিক কর ত? একটু ভাল করে স্নান করে বাঁচি, যা গরম আজকে!"

প্রতিমা কাজে লেগে গেল। মানদা তাকে সাহায্য করতে লাগল, ইন্দুমতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মানদা অনেক দিন কাজ করছে, কাজকর্ম্ম মোটামুটি জানে, তবে তার বিরুদ্ধে রুণুর প্রধান আপত্তি হচ্ছে সে কথা শোনে না, নিজের মতে চলতে চায়। বোধহয় জন্মাবধি রুণুকে দেখছে বলে তাকে ছেলেমানুষ ভাবা মানদার অভ্যাস হয়ে গেছে। আজ মাঝে প্রতিমা থাকায় কাজটা মোটামুটি নিরুপদ্রবে এবং তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। রুণু বলল, "ত্মাখ, আজ কতটুকু সময় লাগল। অন্য দিন ত এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা লেগে যায়। আমি বিংশ শতাব্দীর মেয়ে আর মানদা মহাভারতের যুগের, এই নিয়ে ত যত গোলমাল।"

এই সময় ইন্দুমতী ঘরে ঢুকে বললেন, "প্রতিমা, তুমি এবার ছেলের ঘরে যাও। এ ঘরের বাকি কাজ মানদা সেরে ফেলবে। ও ঘরেও সাধন তোমার সাহায্য করবে। সব কাজ সে মোটামুটি পারছিল, তা ইদানীং চোখে একটু কম দেখছে বলে একটু একটু অসুবিধা হচ্ছে। তা ছাড়া লেখাপড়া ত জানে না? সেদিক্ দিয়ে সব কাজ তোমাকেই করতে হবে।"

প্রতিমা বলল, "সব কাজ ত আমারই করবার কথা, যা দরকার হবে সবই করব।"

এ ঘরেও স্নানের তোড়জোড় চলছে দেখা গেল। সাধন সব ঠিক করে রাখছে। ইন্দুমতী বললেন, "তুমি সকালে ওঠ ত প্রতিমা? এর আবার সব সকাল-সকাল করার স্বভাব। রুণু বরং বিছানায় শুয়ে কুঁড়েমি করতে ভালবাসে।"

প্রতিমা বলল, "আমি খুব ভোরে উঠি। যত সকালেই দরকার হোক, আমার কিছু অসুবিধা হবে না।"

এ বাড়ী সকলেরই সকালে স্নান করা পছন্দ। বাসি মুখে, বাসি কাপড়ে থাকা কেউ পছন্দ করে না। কখন কি করতে হবে সেটা প্রতিমা মোটামুটি জেনে নিয়ে কাজ আরম্ভ করল। এর আগে যে দুজনের পরিচর্য্যা করেছে তার একজন নারী একজন বৃদ্ধ। সমবয়স্ক তরুণ যুবকের কাজ করা তার এই প্রথম। কিন্তু জোর করে সে মন থেকে সব সঙ্কোচ দূর করে দিল। আর্ত্তসেবার সময় এ সব কথা মনে আসবে কেন? যার সেবা করছে সে পীড়িত মানুষ, এইটুকুই মনে রাখলে চলবে। আশিসের মুখ দেখেও কিছু মনে হল না যে তরুণী নারীর সেবা নিতে সে কিছু বিব্রত বোধ করছে। বৃদ্ধ সাধন সারাক্ষণ উপস্থিত থাকায় খানিকটা সুবিধা হল। স্নান শেষ হবার পর আশিস্ বলল, "বড় কষ্টের কাজ বেছে নিয়েছেন আপনি। আর যে কোনো লাইনে এর চেয়ে আপনাকে কম খাটতে হত। রাত্রেও ত সব সময় নিষ্কৃতি পাবেন না। মাথা ধরা এ বাড়ীর একটা প্রিয় ব্যাধি, হয় মায়ের, নয় আমার, যখন তখন মাথা ধরছে। রুণুরও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রকম অসুখ দেখা দেয় থেকে থেকে।"

প্রতিমা বলল, "তা জেনেশুনেই ত এ লাইন বেছে নিয়েছিলাম। নার্স হব গোড়ায় ভাবিনি, কিন্তু ডাক্তার হলেও নিজের সুখ-সুবিধা বড় করে দেখা চলত না। মানুষের সেবার কাজেই জীবন কাটাব, এই ত ঠিক করেছিলাম।"

আশিস্ বলল, "এটা কিন্তু আমাদের বাঙালীর ঘরে একটু নূতন ব্যাপার। মেয়েরা ঘর-সংসার করবে, এ ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোনো পথ আছে এ ত কেউ মনে করে না। আপনার মা, বাবা এতে মত দিয়েছিলেন?"

"মা মত দিয়েছিলেন ঠিক বলা চলে না, তবে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হতে বাধা দেন নি। হয়ত ভেবেছিলেন যে সময়ে মত বদলে যাবে। বাবার কোনো অমত ছিল বলে মনে হয় না, অন্ততঃ মুখে কিছু বলেন নি কখনও।"

"এদিকে মনটা গেল কি জন্যে? বেশী কৌতূহল দেখাচ্ছি যদি মনে করেন, তাহলে উত্তর দেবেন না।"

অন্য কেউ হলে হয়ত প্রতিমা আপত্তি অনুভব করত, কিন্তু আশিসের প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনো বাধা অনুভব করল না মনে। বলল, "এমন কিছু গোপন কথা নয়, স্বচ্ছন্দেই বলতে পারি। আমার একজন ঠাকুরদাদা ছিলেন, বাবার মামা, তিনি খুব অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে যান। তবে আমাদের সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন, প্রায়ই আসতেন যেতেন। ছোট থেকে আমি তাঁর ভক্ত ছিলাম। তাঁর মত হব, দুর্গত মানুষের সেবা করব, এই ছিল আমার একান্ত ইচ্ছা। বড় হয়ে অনেক মহীয়সী মেয়ের ইতিহাস পড়লাম, যাঁরা এই কাজেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। চোখেও দেখেছি কিছু কিছু, কলকাতায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। মেয়েরাই চালান, তাঁদের পারিবারিক আলাদা কোনো জীবন আছে কি না জানি না, কিন্তু এইটিই তাঁদের জীবনের ব্রত। আমারও এই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য আমার আছে। তার জন্য কিছুকাল আমায় উপার্জ্জন করতে হবে। ভাই যখন তৈরি হয়ে সংসারের ভার নিতে পারবে, তখন হয়ত আমি আমার অভীষ্ট পথে যেতে পারব।"

আশিস্ বলল, "আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এমন মনোভাবের একেবারেই অভাব। ঘর-সংসার করা ছাড়া কিছু তারা ভাবতেই পারে না।"

প্রতিমা বলল, "ছোটবেলায় যে পুতুল খেলে তারও মধ্যে এই। বউ-বর সাজতে হবে, এটাই সবচেয়ে প্রিয় খেলা। অন্যদিকে তাদের মন ফেরাতে কেউ চেষ্টাও করে না। এই একদিকেই পাখী পড়ান হয়।"

এমন সময় মানদা এসে বলল, "দিদিমণি, আপনার এ ঘরের কাজ হয়ে গেছে কি? তাহলে রুণুর ঘরে একটু আসতে হবে। সে ভাত নিয়ে বসে আছে, আপনি গেলে তবে খাবে।"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "তাকে বুঝি খাইয়ে দিতে হয়?"

মানদা বলল, "না, নিজেই কাঁটা চামচ দিয়ে খায়, হাতের ত কোন দোষ নেই। তবে কাঁটা চামচ দিয়ে ত মাছের কাঁটা ছাড়াতে পারে না ভাল করে? আমিই ছাড়িয়ে দিই, নয় ওর মা ছাড়িয়ে দেন। আজ মায়ের শরীরটা তত ভাল নেই, আর আমার কাজ ওর ভাল লাগে না। আমি কিনা নোংরা ঘাঁটি, তাই আমার ছোঁওয়া খেতে তার ঘেন্না করে।"

আশিস্ বলল, "যান তবে আপনি। না হলে এখনি বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি, চেঁচামেচি আরম্ভ করবে। চিরকালের spoilt baby একটি। আমি যদিও এ বাড়ীর প্রথম সন্তান এবং পুরুষ ছেলে, তবু আহ্লাদটা রুণুই পেয়েছে দশগুণ বেশী। এর জন্য দায়ী অবশ্য আমার পরলোকগত পিতৃদেব। তিনি ত বহুকাল দেহ রক্ষা করেছেন, তাঁর কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করছি আমরা।"

প্রতিমা রুণুর ঘরে চলল। তার খাবার এনে তার বিছানার পাশে ছোট টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে হাত তুলে বসে আছে, এখনও কিছু ছোঁয়নি। প্রতিমাকে দেখে বলল, "দিন ত মাছটা বেছে। একটু 'ডেটল' দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিন। দাদার ঘরে কিছু নোংরা ঘাঁটেননি ত? ঐ জন্যে ত মানদার ছোঁওয়া কিছু খেতে পারি না।"

প্রতিমা বলল, "না, হাত ভালই আছে, তবু আর একবার ধুয়েই নিচ্ছি।" হাত বেশ ভাল করে ধুয়ে সে এসে রুণুর মাছ ছাড়াতে বসল। অনেক রকম রান্না, রুণুর খাওয়া শেষ করতে সময়ও লাগল কিছু। শুধু খাওয়া ত নয়, তার সঙ্গে গল্পও চলল অনেক রকম।

খাওয়া শেষ হলে মানদা বাসনপত্র তুলতে তুলতে বলল, "আপনি এইবার নিজে স্নান করে নিন দিদিমণি, আর সকলের হয়ে গেছে। আপনি মায়ের ঘরে যান, সেখানে সব পাবেন।"

"আমার সঙ্গেই সব আছে," বলে প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গৃহিণীর ঘর ও তার ঘরের মাঝখানেই এ স্নানের ঘরটি, তার বেশ সুবিধাই হল। স্নান করে কাপড়-চোপড় বদলে সে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল. "দাদাবাবুর খাওয়ার সময় আমার যাওয়ার কি দরকার আছে?"

মানদা বলল, "এমনিতে ত দরকার কিছু হয় না, সাধনদা সব ঠিক করে দেয়, উনি নিজের হাতে খান। তবে ডাকেন যদি ত যাবেন।"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "মায়ের শরীর ভাল নেই বলছিলে, এখন কেমন আছেন?"

মানদা বলল, "এখন ত ঘুমিয়ে আছেন মনে হচ্ছে। খাবার জন্য ডাকাডাকি করতে বারণ করে দিয়েছেন। আপনাকে ক'টার সময় খাবার দেব?"

প্রতিমা বলল, "আমাকে এগারোটার মধ্যে দিলেই হবে, বাড়ী থাকলে ঐরকম সময়েই খাই। মায়ের মাঝে মাঝে মাথা ধরে, তিনি বলছিলেন; গিয়ে দেখব নাকি, তাঁর জন্যে কিছু করতে পারি কি না?'

মানদা বলল, "দেখি গিয়ে তিনি জেগে আছেন কি না। ঘুমিয়ে থাকলে তোলা চলবে না, ঘুমই ত তাঁর একমাত্র ওষুধ।"

মানদা গৃহিণীর ঘরে গিয়ে একবার ঘুরে এল। ফিরে এসে বলল, "না, এখনও ঘুমিয়েই আছেন, এখন তুলে কাজ নেই। এগারোটার সময় আপনাকে ডাকব তাহলে খাবার জন্যে। দাদাবাবু বলে রেখেছেন, আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে তাঁর ঘরে একবার যেতে। রুণুও চায় একবার গল্প করতে, এখানে ত তার কথা বলবার মত কেউ নেই? ঘর থেকে ত নড়তে পারে না, দাদাবাবুও নিজের ঘর থেকে বেরোয় না। রুণুর বন্ধু-বান্ধব দুচারজন মধ্যে মধ্যে আসে। মায়ের সঙ্গে ওর মতে মেলে না। কাজেই গল্প চলে না। আর আমাদের ত কথাই নেই। ওর সামনে কথা বলতে ত সাহসই পাই না। এমন সব কথা বলে যে, এ বাড়ীর ইঁটকাঠও চমকে ওঠে। এতবড় বনিয়াদি ঘরের মেয়ে, যেমন মা, তেমন বাবা, মেয়ে যে কি করে এমন হল তা জানি না। দাদাবাবু হয়েছে যেমন হতে হয়।"

প্রতিমা বলল, "যাব নাকি একবার রুণুর ঘরে? এগারোটা বাজতে এখনও কিছু দেরি আছে।"

"ও ত ভাত খেয়েই ঢুলে পড়ে। এখন ঘণ্টা-দুই ও ঘুমোবে। তারপরে যাবেন এখন। আপনাকে যদি পছন্দ হয়ে যায় ত মুশকিল, সারাদিন ডেকে ডেকে জ্বালাতন করবে, একটু বিশ্রাম করতে দেবে না।"

প্রতিমা বলল, "কাজ করতেই ত আসা, বিশ্রাম না-হয় নাই করলাম।" সে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বই নাড়াচাড়া করতে লাগল। মানদা গেল নিজের কাজে, এবং কিছুক্ষণ পরে প্রতিমার খাবার বহন করে নিয়ে এল। বলল, "মাও এতক্ষণে উঠে খেতে বসেছেন।"

পুরান জমিদারবাড়ী, খাওয়ার আয়োজন একটু রকমারি আছে। খেতে খেতে প্রতিমা ভাবল, 'বেশীদিন এ বাড়ীতে থাকলে সুনলিনীর মত মোটা হয়ে যাব। কিন্তু সে হলে ত আমার চলবে না, আমায় খেটে খেতে হবে।'

তার খাওয়া শেষ হতেই মানদা বাসন তুলতে এল, বলল, "আপনি বড় কম খান দিদিমণি।"

প্রতিমা হেসে বলল, "বেশী খেলে ত কাজকর্ম করতে পারব না। আচ্ছা, তোমার দাদাবাবু কি জেগে আছেন এখন? যাব তাঁর ঘরে?"

"হ্যাঁ, যান। দাদাবাবু দিনের বেলা কখনও ঘুমোন না," বলে বাসন-কোসন নিয়ে মানদা চলে গেল।

প্রতিমা চলল আশিসের ঘরে। তারও খাওয়া হয়ে গেছে, সাধন টেবিল সরিয়ে রাখছে, পিঠের বালিশ-গুলো ঠিক করে দিচ্ছে। প্রতিমাকে দেখে আশিস্ জিজ্ঞাসা করল, "খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, মানদা ঘড়ি ধরে খাইয়ে দিয়েছে।"

আশিস্ বলল, "মানদা মানুষটা বড় ভাল। ও না থাকলে আমাদের সংসারই চলত না। আমাদের তিন রুগীর সংসার, বাবা চলে যাবার পর মাও এমন নেতিয়ে পড়লেন যে সংসার দেখবারই আর কেউ রইল না। মানদা ছিল বলে আমরা কোনো মতে দুবেলা দুমুঠো খেতে পেয়েছি। বেশ ভালভাবেই সে সংসার চালিয়েছে। এখন এই যে হাসপাতালের মত বাড়ী, এও চালিয়ে ত যাচ্ছে, তার উপর রুণুর যত উৎপাত সহ্য করছে। রুণু সারাক্ষণ তাকে গাল দিচ্ছে, অথচ এক

মিনিটও ত তার চলে না মানদাকে ছাড়া। মাকে বরং সে বাদ দিতে রাজী, কিন্তু মানদাকে নয়।"

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "কতদিন ও আছে আপনাদের বাড়ীতে?"

"তা বহুকাল। মায়ের বাপের বাড়ী থেকে এসেছিল, মায়ের বিয়ের সময়। সেই থেকে ত এখানেই থেকে গেছে। আমরা সকলে ওর হাতেই ত মানুষ।"

"ওর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?"

"বিশেষ কাউকে ত দেখি না। এক-আধজন মাঝে মঝে আসে দেশ থেকে, ও কখনও দেশে যায় না। বাবা ওর জন্যে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। ও যতদিন বাঁচবে এখানেই থাকবে, ও টাকা পাবে। ওকে ছাড়ান যাবে না। অবশ্য ওকে ছাড়াবার কথা আর কেউ এখন স্বপ্নেও চিন্তা করে না।"

প্রতিমা বইয়ের আলমারিগুলির দিকে চেয়ে বলল, "খুব পড়াশুনো করেন বুঝি সারাদিন?"

আশিস্ বলল, "কি আর করব? আর ত কিছু করবার নেই? মাঝে মাঝে লিখবার চেষ্টা করি তা শেষ প্রায়ই করে উঠতে পারি না। হাতটা বড় তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যায়। চোখটা তত তাড়াতাড়ি হয় না, তবুও পড়াও একটানা খুব বেশীক্ষণ করতে পারি না। বন্ধুবান্ধব এক সময়ে প্রচুর ছিল, কিন্তু সুসময়ের বন্ধুরা অসময়ে বিশেষ আসে না। আর তাদের সব ফুর্ত্তি যে-ধরণের তাতে আমি যোগও দিতে পারি না এখন। মাঝে মাঝে মনে হয় 'আশিস্' নামটা বদল করে এখন নাম রাখি 'অভিশাপ'।"

প্রতিমা বলল, "ও কি একটা কথা হল নাকি? অত অধৈর্য্য হলে চলে? অসুখ করেছে সেরে যাবে, কত লোকেরই ত সারে। আর একটা কিছু শারীরিক খুঁৎ হলেই কি জীবনটা একেবারে বিফল হয়ে যায়? কাগজে পত্রিকায় কত এ রকম জীবনের ইতিহাস বেরোয়, মারাত্মক সব অক্ষমতা নিয়েও, কেমন করে অধ্যবসায়ের জোরে মানুষ তাকে জয় করেছে, জীবনকে সার্থক করেছে। বাবা ছোট বেলার থেকে এই সব বই পত্রিকা কিনতেন, আমি ছোটবেলা থেকে তাঁর কাছে গল্প শুনতাম। বড় হয়ে সেগুলি সব আমি যত্ন করে বাঁধিয়ে টাঁধিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। আপনাকে কয়েকটা এনে দেখাব।"

আশিস্ বলল, "সত্যিই আপনাদের পরিবারটা খুবই নূতন ধরণের। আমাদের দেশে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যেই রোগী বা দুঃখী মানুষের কাছে আসুক, খানিকটা হা-হুতাশ করে তাকে আরো upset করে দিয়ে যায়। এটাই হল, তাদের সহানুভূতি জানান। এতে চিরকাল ভালর বদলে মন্দই হয়।"

প্রতিমা বলল, "কতদিন হয়েছে আপনার এ অসুখ? ভাইবোন দুজনেরই কি এক সঙ্গে হয়েছিল?"

আশিস্ বলল, "একসঙ্গেই হয়েছিল। মায়ের কি অবস্থা ভেবে দেখুন একবার। আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে এসেছিলেন অনেকজন, কিন্তু কেউ বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারেননি। তাঁদেরই নিয়ে মাকে বরং ব্যতিব্যস্ত হতে হত। সত্যি সাহায্য করেছিলেন আমাদের বুড়ো ডাক্তারবাবু আর পুরান চাকর-ঝিরা। ডাক্তারবাবু ত অনেকদিন এ বাড়ী ছেড়ে নড়েনইনি, তিনি আবার বাবার বন্ধুও ছিলেন বটে। ঝি-চাকররা অবিরাম অবিশ্রাম কাজ করেছে, নাওয়া-খাওয়ার ছুটিও নেয়নি।"

প্রতিমা বলল, "আমরা ওদের মূর্খ অজ্ঞ বলে উপেক্ষা করি, কিন্তু পরীক্ষার সময় এলে এদের মধ্যে থেকেই যথার্থ মনুষ্যত্ব বেরিয়ে পড়ে।"

আশিস্ বলল, "তা বলতে পারেন। এই দু'বছর ত রোগে ভুগছি, এই পুরনো ঝি আর চাকরই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আর ত কত এল, গেল। বিশেষ সুবিধা কাউকে দিয়ে হয়নি, তেমন ভাল লোক পাওয়া যায়নি। অবশ্য আপনাকে বাদ দিয়ে কথা বলছি। আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা ত বেশ শুভই মনে হচ্ছে।"

প্রতিমা হেসে বলল, "ফাঁকি দেবার চেষ্টা করব না, এইটুকু বলতে পারি। তবে রুণুর আমাকে পছন্দ হবে কি না কে জানে? একটু খামখেয়ালি ধরণের ত?"

আশিস্ বলল, "একটু না, বেশ বিশেষ রকম।

এমনিতেই তার বিধাতার উপর আর সমাজ-সংসারের উপর রাগের সীমা ছিল না, এখন অসুখ হয়ে সেটা শতগুণ বেড়ে গেছে। কার উপর রাগ ঝাড়বে তা ভেবেই পায় না। মা ত এখন কার্য্যতঃ invalid, মানদার উপরেই সব চোটটা পড়ে। তবে ওর বন্ধু-বান্ধবের দল আমার বন্ধুগুলোর মত অত অপদার্থ নয়, মাঝে মাঝে এসে খুব অনেকক্ষণ ধরে হুল্লোড় করে যায়। মা অবশ্য তারা যাবার পর প্রায়ই মাথা ধরিয়ে শুয়ে পড়েন, এবং মানদা কানে গঙ্গাজল ঢালার চেষ্টা করে, তবে রুণুর খানিকটা মনের জ্বালা বার করে দিতে পারায় উপকারই হয়।"

প্রতিমা বলল, "ঘরে ত একটা এস্‌রাজ দেখছি, গান বাজনা করেন নাকি?"

"ঝোঁক ত ছিল বেশ, শিখতে আরম্ভও করেছিলাম, ওস্তাদও রেখেছিলাম. কিন্তু অন্য সব কিছুর মত অসুখ এসে বাধা দিল। গলা মন্দ ছিল না, বন্ধুদের নিয়ে জলসা-টলসা করেছি। তাদের মধ্যে দুচারজন ভাল গাইয়েও ছিল। এখন ত কতদিন যে গান বন্ধ আছে, তা মনেই নেই, ইচ্ছাই করে না।"

প্রতিমা বলল, "ভাল গানের গলা ভগবানের একটা মস্ত আশীর্বাদ, ওটাকে কখনও অবহেলা করতে নেই। ওর মত শোকে সান্ত্বনা দিতে, সুখের দিনে আনন্দ দিতে আর কিছু কি পারে?"

আশিস্ বলল, "আপনি নিজে কি গান করেন?"

"শিখতাম ত; স্কুল-কলেজের functionএ গেয়েওছি অনেকবার, তবে বেশ কিছুদিন ছেড়ে দিয়েছি।"

আশিস্ বলল, "আপনার গান একদিন শুনতে হবে ত। আজকে এখনই খেয়ে উঠেছেন, এখন বলব না। কাল সকালে শুনব। গাইবেন ত?"

প্রতিমা বলল, "তা গাইব এখন। আপনার গানও শুনব, বাজনাও বোধহয় ভালই বাজান, এত জলসা-টলসা যখন করতেন। ওদিকে মনটা গেলে ভাল। সময়ও কাটবে, মনের depression-টাও ঢের কমে যাবে। এ লাইনে ত প্রচুর উন্নতি করা যায়। চোখ নেই, কান নেই এমন অসংখ্য সংগীতজ্ঞ দুনিয়ার কত দেশে কত কাজ করেছেন। ইচ্ছা করলে আপনিই বা পারবেন না কেন? অন্য কোনোদিকে বাধা ত আপনার নেই?"

"তা নেই বোধ হয়। এই এক বাধাতেই এমন ধাক্কা খেয়েছি, যে ভাল করে আর কিছু ভেবেই দেখিনি। কি হারালাম তাই আমার সারা মন সারাক্ষণ জুড়ে থাকে, কি আছে তার আর হিসাব করিনি। এতবড় একটা shock কাটাতে সময় লাগা স্বাভাবিক বোধহয়। যা হোক, এখন এর থেকে বেরোবার চেষ্টা করতে হবে। বাঁচতে ত হবে এখনও বোধহয় অনেকদিন, এখন ত সবে চব্বিশ বছর বয়স। চিরটাকাল ত আর হা-হুতাশ করে কাটিয়ে দেওয়া যায় না? আপনি যদি সৌভাগ্যক্রমে টিঁকে যান, তাহলে অনেক সাহায্য আপনার কাছ থেকে পাব।"

প্রতিমা বলল, "টিঁকে থাকার ইচ্ছাটাই ত আমার ষোলো আনা। তবে এদিকে আমার কপালটা খুব ভাল না, তাই ভরসা করে বলতে পারি না। প্রথম কাজে নেমেই যে দুটো কেস্ পেলাম, তার ত একটাতেও বেশীদিন টিঁকতে পারলাম না। আমার নিজের ত কোনো দোষ ছিল বলে মনে হয় না।"

আশিস্ বলল, "দেখুন, তিনবারের বার হয়ত অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হবে। এখানে যদি রুণুর উৎপাতে না পালান ত আর কেউ তেমন উৎপাত করবার নেই। মা অতি ভালমানুষ, তা ছাড়া আপনাকে পেয়ে বর্ত্তে গেছেন মনে হয়। আর আমি ত আপনাকে রাখবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

এমন সময় রুণুর ঘরের দিক্ থেকে একটা খুব কলরোল শোনা গেল। খিলখিল করে হাসি, ইংরেজী আর বাংলায় তীব্রকণ্ঠে চীৎকার আর অনেকগুলি লঘু পদক্ষেপের শব্দ। আশিস্ চমকে উঠে বলল, "এই রে, রুণুর দল এসে গেছেন। আজ মানদা আর আপনি নিষ্কৃতি পাবেন, কিন্তু মায়ের হবে বিপদ্। একেই তাঁর শরীর আজ ভাল নেই। আচ্ছা, মানদাকে একটু ডাকুন ত।"

প্রতিমা গিয়ে মানদাকে ডেকে নিয়ে এল। যাবার

পথে দেখল, রুণুর ঘরে গোটা পাঁচ-ছয় মেয়ে খুব হৈ হুল্লোড় করছে।

মানদা এসে ঘরে ঢুকতেই আশিস্ বলল, "মানদা দিদি, তুমি তেতলার ঘর খুলে সেখানে বিছানা করে মাকে নিয়ে যাও। রুণুর বন্ধুরা না বিদায় হলে তাঁকে নীচে এনোই না। আজ এমনিতেই তাঁর শরীরটা ভাল নেই, এদের গোলমালে আরো বেড়ে যাবে।"

"তাই যাই, তাড়াতাড়ি করে, না হলে নাইবার খাবার সময় পাব না। একটু পরেই রুণু শুরু করবে, চা নিয়ে এস, কোকাকোলা নিয়ে এস।"

আশিস্ বলল, "সাধনদাকে দলে নাও, ওকে আমার দুপুরে দরকার হবে না। এই ত দিদিমণি রয়েছেন, উনিই আমাকে দুপুরে দেখবেন। যাও তুমি, চট করে যাও।"

মানদা চলে গেল। প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "দুপুর বেলাটা কি করেন আপনি সাধারণতঃ?"

"পড়াশুনো, লেখার চেষ্টা, এই সবই করি। দিনে ঘুমনো অভ্যাস করিনি, ওটা আসে না। ঐ বাঁ পাশের আলমারি খুলে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীগুলো বার করুন না। পড়ে শোনানর অভ্যাস আছে, না ওসবের ভিতর যাননি কখনও?"

প্রতিমা বলল, "সবেরই অভ্যাস কিছু কিছু হয়েছে। অভিনয়-টভিনয়, আবৃত্তি সবই করেছি কিছু কিছু স্কুল কলেজে। ও সবে একটু নামও হয়েছিল। আজকে রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস থেকেই পড়ি খানিকটা, কাব্য গ্রন্থাবলী কাল খোলা যাবে। কি পড়ব বলুন।"

আশিস্ বলল, "আমার রুচিটা একটু অসাধারণ। 'নৌকাডুবি'টা আমার বেজায় ভাল লাগে। যদিও সমালোচকরা ওটা নিয়ে বেশী সময় খরচ করেন না। ঐটাই পড়ুন।"

প্রতিমা বই বার করে পড়তে আরম্ভ করল। গলাটা তার চেহারার মতই মিষ্টি, আশিস্ একমনে শুনতে লাগল। সাধন ঘরের ভিতর ঢুকে একবার বলল, "তুমি ত এখন পড়া শুনবে দাদাবাবু, আমি তাহলে কেক আর কোকাকোলা কিনতে যেতে পারি? তোমার কোনো অসুবিধা হবে না ত?"

প্রতিমা বলল, "অসুবিধা কেন হবে, আমি রয়েছি তবে কি করতে? তুমি যাওনা কোথায় যাবে।"

আশিস্ বলল, "তোকে টাকাকড়ি দিয়েছে ত? না আবার মাকে গিয়ে খোঁচাতে হবে?"

"না, দিয়েছে। বন্ধুরা আসবে বোধহয়, আগের থেকে জানা ছিল। মায়ের কাছে থেকে আগেই জোগাড় করে রেখেছে", বলে সাধন চলে গেল।

প্রতিমা আবার পড়া শুরু করল। আশিস অনেকক্ষণ ঠেশ দিয়ে বসে শুনল, তারপর বলল, "একটু ধরে শুইয়ে দিন ত, একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকলে এখনও অসুবিধা লাগে।"

প্রতিমা তাকে শুইয়ে দিল, জিজ্ঞাসা করল, "যখন অসুখ প্রথম হয়, তার চেয়ে এখন অনেকটা ভাল আছেন না?"

"এক-এক দিকে কিছু কিছু ভাল আছি, আবার এক-এক দিকে কোনো উন্নতিই হয়নি।"

প্রতিমা বলল, "সময় নেবে আর কি সারতে। এই সব রোগ হয় চট করে কিন্তু বিদায় নিতে খুবই দেরি করে।"

আশিস্ বলল, "বিদায় at all হলে যে হয়। এক-এক সময় মনে হয়, আমিই আগে বিদায় হব হয়ত।"

প্রতিমা বলল, "আহা, অত pessimist হয়ে কি লাভ? আস্তে আস্তে সারছে ত? মনটা একটু অন্য দিকে দিন না?"

আশিস্ বলল, 'কোন্ দিকে দেব? একলা একলা কিছু কি ভাল লাগে? এখন তবু মা আছেন, মামা আছেন, যখন এঁরাও থাকবেন না, তখন কি অবস্থা হবে? সংসারই বা কে দেখবে, আমাদের বা কে দেখবে?"

প্রতিমা বলল, "সে ত ঢের পরের কথা। ততদিনে সেরে যাবেন। রুণু সেরে গেলে তার বিয়েও হয়ে যেতে পারে।"

"সেরে গেলে ত আমারও বিয়ে হতে পারে, বলুন, পারে না কি?" বলে আশিস্ হা হা করে হাসতে লাগল।

প্রতিমা একটু অবাক্ হল, এত হাসির কি হল? আশিস্ নিজেই বলল, "আমার এই অসুখটা হবার আগেই ঠিক একটা সম্বন্ধ এসেছিল, তাই মনে করে হাসছিলাম। মস্ত জমিদারের একমাত্র মেয়ে। দেখতে শুনতে তেমন কিছু ভাল না, এবং একটা পা খোঁড়া। কনের বর্ণনা শুনে আমার ত চক্ষুস্থির। আমি আর মা ত তাঁদের পত্রপাঠ হাঁকিয়ে দিচ্ছিলাম, কিন্তু তাঁরা নাছোড়বান্দা। আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় আমি পড়লাম অসুখে। যখন জানা গেল যে আমার দু পা খোঁড়া, তখন এক পা খোঁড়া পাত্রীর দল সোজা পথ দেখলেন।"

প্রতিমা বলল, "মানুষে নাটক লেখে, ভাগ্য দেবীও থেকে থেকে নাটক লেখেন। যাক গে, এখন ওসব ভেবে কি হবে? এখন সব মনটা ভাল করে সেরে ওঠার দিকে দিন। ডাক্তারের নির্দেশ সব ভাল করে পালন করা হয় ত?"

আশিস্ বলল, "সব কি আর হয়? সাধনদা, মা, কেউই ত trained নয়, যা পারে করে, যা পারে না তা হয় না।"

প্রতিমা বলল, "সে বললে ত হয় না? সব খুঁটিয়ে করতে হবে। আজ জেনে নেব সব ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে।"

আশিস্ বলল, "দেখুন পারেন যদি।"

প্রতিমা বলল, "পারব না কেন, নিশ্চয় পারব। আপনি মনটা ঠিক রাখবেন। সেরে যাবার সংকল্পটা একটা মস্ত জিনিষ, এর সাহায্যে অনেক বাধাই কাটান যায়। এরপর যেদিন বাড়ী যাব, আমি বেছে বেছে কতগুলো পত্রিকা নিয়ে আসব। দেখবেন, মানুষ ইচ্ছার জোরে কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।"

আশিস্ বলল, "Readers' Digest ত? ও magazineটা আমি এক-আধটা দেখেছি। আমার শরীরের রোগ সারুক বা না সারুক, মনের রোগটা সেরেই যাবে মনে হচ্ছে।"

প্রতিমা বলল, "শরীরটাও সারবে তা হলে। ও দুটোকে আলাদা করা যায় না, একটা সারলেই আর একটা সারে।"

রুণুর ঘরে সমানেই কলরব চলছিল। গান হচ্ছে, গল্প হচ্ছে, দু-তিনটে ভাষায়, নাচের ধ্বনিও থেকে থেকে ভেসে আসছে। সাধন এবং মানদা ক্রমাগতই ঘরে ঢুকছে আর বেরোচ্ছে।"

আশিস্ বলল, "একবার আরম্ভ করলে আর এ মেয়ে থামতে জানে না। যতদিন একলা থেকেছে একদিনেই তার শোধ তুলে নেবে মনে হচ্ছে। তবে দিনটা ভাল বাছে নি, মায়ের শরীরটা খারাপ রয়েছে।"

তবে খুব বেশীক্ষণ আর আড্ডা চলল না। বন্ধুর দল সব দেশী ও বিদেশী ভাষায় চীৎকার করে বিদায় নিয়ে, জুতোর শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে নেমে চলে গেল। খানিক পরে মানদা এসে বলল, "নাও, এখন ঠেলা সামলাও। সবাই ত আনন্দ করে চলে গেলেন, এখন রুণু ত দুই হাতে মাথা চেপে ধরে শুয়ে পড়েছে, তার ভয়ানক খারাপ লাগছে, বমি আসছে। এখন আমি কি করি?"

আশিস্ প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কি করা যায় এখন?"

প্রতিমা বই রেখে উঠে পড়ল, বলল, "দেখছি গিয়ে। আপনার মাকে disturb করে কাজ নেই, বরং ডাক্তারবাবুকে ফোন করি, দুপুরে বাড়ী থাকাই সম্ভব। রুণুর কি এরকম হয় মাঝে মাঝে?"

মানদা বলল, "বেশী হুড়োহুড়ি করলেই হয়, তা কে বলবে মেয়েকে সে কথা? বন্ধুদের দেখলে আর তার জ্ঞান-গম্যি থাকে না। চলুন দিদিমণি, আপনাকে টেলিফোন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

(এরপর ৭৪৫ পৃষ্ঠায়)

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় সেকাল

মাধব পাল

বাংলার নবজাগরণের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অষ্টাদশ শতকে নবজাগরনের সূচনা হলেও উনবিংশ শতকেই পরিণত ফলরূপে উহা সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করতে থাকে। সে সময়ে ইংরেজ শাসন ও ইংরেজী শিক্ষায় বাঙ্গালী সমাজের যে পরিবর্তন হইতে থাকে তন্মধ্যে ইংরেজী ১৮১২ হইতে ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত এই যুগসন্ধিক্ষণের একজন সাক্ষী ছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত।

যেমন ছিলেন তিনি এই পরিবর্তনশীল কালের দ্রষ্টা, তেমনি ছিলেন সেই কালের পরিচয় দাতা। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না, সম্বাদ প্রভাকরের সম্পাদক হিসাবে সে সময়ের সমাজ ও ধর্ম্মাচরণের তিনি ছিলেন বিচিত্র সমালোচক। এই সব সমালোচনা ছিল স্বভাব মধুর ব্যঙ্গরসাত্মক। তাঁর কবিতায় সে সময়ের সমাজ ও বাস্তব জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা প্রায় সবই ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক।

সেই নবজাগরণের কালে বাংলার সমাজ ব্যবস্থা যেভাবে দ্রুত বিপর্য্যস্ত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, কবি তা সহজ শ্লেষাত্মক বর্ণনায় চিত্রিত করেছেন।—

পূর্ব্বেকার দেশাচার কিছুমাত্র নাহি আর
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব্ব রীতি নীতি অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি
শ্রুতি হয় শ্রুতি পথে হত॥

ইংরেজী ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী হইতে কবি ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত পত্রিকা 'সম্বাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হইতে থাকে। নিজের সম্পাদিত এই পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সেকালের কলকাতায় যা কিছু তিনি দুচোখ ভরে দেখেছেন, তাকেই তিনি রসিয়ে খবরের কাগজের পাতায় ধরে রেখেছেন। তার স্বাভাবিক ব্যঙ্গ রসিকতায় লোকে হেসেছে। কিন্তু তার সেই সমস্ত ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতায় তৎকালীন বাস্তব চিত্র এত স্পষ্টরূপে চিত্রিত যে তা ব্যঙ্গবিদ্রুপ হলেও মর্ম্মান্তিক সত্য।

সমাজে তখন একটা খুবই উচ্ছৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থা চলেছে। ইংরেজী শিক্ষিত ছেলেরা সব বিগড়ে যেতে থাকে। তারা হিন্দুর আচার-আচরণ বাদ দিয়ে ইংরেজদের অনুকরণে খৃষ্টানী আচরণে মেতে উঠে। এরাই সেকালের ইয়ং বেঙ্গল।—

যত কালের যুবো যেন সুবো
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।

অথবা———

হয়ে হিঁদুর ছেলে ট্যাসে চেলে
টেবিল পেতে খানা খাবে।

শুধু ইয়ং বেঙ্গলই নয়। যাঁরা এতদিন পর্দানশীন ছিল সেই মেয়েরাও বেথুন সাহেবের স্কুলে পড়তে যাচ্ছে। হিন্দুর বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেছে। এইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ডকারখানা দেখে সেকালের রক্ষণশীল সমাজের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেছে। কবির ভাষায় তাদের হাহাকার ফুটে উঠেছে———

হ'ল কর্ম্মকাণ্ড লণ্ডভণ্ড
হিঁদুয়ানী কিসে রবে।

যত দুধের শিশু ভজে ইশু
ডুবে ম'ল ডবের টবে ॥

মেয়েরাও বেথুন সাহেবের স্কুলে ইংরেজী পড়তে যাওয়ায় নারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হতে আরম্ভ করে। কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্ত নারী প্রগতিকে হয়তো সুনজরে দেখেন নি। তাই ভবিষ্যৎবাণীরূপে তার বিদ্রূপ ঝলসে উঠে।——

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল
ব্রত ধর্ম্ম কোর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে ॥

নবজাগরণের সেই চরম মুহূর্তে দেশের সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। সমাজে নূতন রীতি নূতন আচার প্রবর্তনের ফলেই এই পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল। এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্ধন জোগাচ্ছিল সেকালের ইংরেজ শাসকবর্গ, আর খৃষ্টান মিশনারীগণ। মিশনারীরা ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে জোর ধর্ম্মপ্রচার চালাতো। তারই সঙ্গে প্রলোভন দেখিয়ে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করতো।

তারা ঈশুমন্ত্র কানে ফুঁকে
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা।
তার ফলশ্রুতিতে একই সংসারে দেখা যায়—
'বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোড়া বলে ইশু ॥'

মিশনারীদের এই রকম ধর্ম্মপ্রচার ও ব্যাপকভাবে ধর্ম্মান্তকরণের বিরুদ্ধে কবি ঈশ্বর গুপ্তের শাণিত বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়েছে। বাঘের চেয়েও হিংস্র অনিষ্টকারী বলে তিনি মিশনারীদের বর্ণনা করেছেন।—

হেদো বনে কেঁদো বাঘ রাঙা মুখ যার।
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে নাম শুনে তার ॥

সে সময়ে মিশনারী ডফ্ সাহেব এক ইংরেজী স্কুল খুলিয়াছিলেন। এই স্কুলে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের নীতি শিক্ষা দিতেন। গুপ্ত কবির কবিতায় জানা যায় মিশনারী ডফ্ ধর্ম্মান্তকরণে ছল চাতুরির আশ্রয় পর্য্যন্ত নিতেন।—

বিদ্যাদান ছল করি মিশনরী ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টব ॥

* * *

যেখানেতে বালকের বিপরীত মতি।
সেখানেতে মিশনরী বলবান অতি ॥

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাতে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তার প্রতি তীব্র বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করেন—

হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে।
উদরে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে ॥

কবির এইরকম তীব্র বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকারীদের। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করেন। এই বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে বাংলা দেশে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই ভীষণ বাদ প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই বিধবা-বিবাহকে সুনজরে দেখেননি। তাই তিনি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন—

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥

মনে হয় কবি বিধবা-বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্যার জে, ডব্লু, কোলভিল সাহেব বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করলে কবি তার তীব্র সমালোচনা করেন।—

না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল কার করিলেন আইন আদেশ ॥

বিধবা-বিবাহের আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন—

গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কিনা পারে ॥

সমাজের দ্রুত পরিবর্তন ও নানারকম সংস্কারমূলক আন্দোলনের সাথে সাথে চলছিল নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের প্রতি ইংরেজশাসক ও নীলকরদের অত্যাচার। এর কিছুদিন আগেই সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে গেছে।

ইংরেজশাসক সে কারণেও এদেশীয়দের প্রতি খুবই নিষ্করুণ ছিল।

সে সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছিল। চাষীদের দিয়ে জোর করে নীলের চাষ করাতো কুঠিয়ালরা। না করলেই নীলকর সাহেবরা অত্যাচারে জর্জ্জরিত করতো রায়তদের। ইংরেজ শাসকগণও কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে যেত না। তারা ছিল নীলকুঠির সাহেবদের বন্ধু ও ও স্বজাত। আবার অনেক নীলকর সাহেব ছিল অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। সুতরাং—

কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী।

অতএব—

না বুনলে নীল মেরে কিল
'কিল' করে নীল করে।

চাষীদের ভিটে মাটী গরু বাছুর শেষ সম্বলটি পর্য্যন্ত নীলকরদের অত্যাচারে নিঃশেষ হয়ে যেতো। ধানের জমিতে নীল বুনতে হতো। যা ধান চাল হতো—সে চালও বিদেশে রপ্তানী করতো ইংরেজ সরকার। বাংলা দেশে তাই ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছিল।—

ভাত বিনে বাঁচিনে আমরা ভেতো বাঙ্গালী।
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে
চেলের জাহাজ চেলো নাক॥

বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে, তখন পুরোপুরি দুর্ভিক্ষ। ভিক্ষে চাইলেও কেউ ভিক্ষে পায় না। ভিক্ষা দেবেই বা কে? গৃহস্থের অবস্থাও—'তার তেল জোটে তো নুন জোটে না।' এবং—

ঘরে হাঁড়ি ঠন্‌ঠনাস্তি,
মশা মাছি ভন্‌ভনাস্তি,
শীতে শরীর কন্‌কনাস্তি,
একটু কাপড় নাইক পিটে।
দারা পুত্র হন্‌হনাস্তি,
অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি,
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি,
আমি ব্যাটা খেটে মরি॥

দেশে এতসব সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অভাব অনটনের হাহাকার থাকা সত্বেও ইংরেজদের কোনও অসুবিধা হতো বলে মনে হয় না। তাদের উৎসবে ব্যসনে জাঁক-জমকের কোন কমতি ছিল না। সেকালে বড় দিনের উৎসবে সমস্ত কলকাতা আনন্দমুখর হয়ে উঠতো। বিশেষ করে সাহেব পাড়ায় সেদিন ঈশ্বর ভক্তির সাথে আনন্দোৎসব মিশে যেতো।—

টেবিল সাজায়ে সব ভাবে গদগদ।
মাংস বলে রুটি খান রক্ত বলে মদ॥
* * *
বেষ্টিত সাহেব সব বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন আহারের কালে॥

চুনা গলির অধিবাসী এ দেশীয় খৃষ্টানগণও সেদিন যেন নিজেদের ইউরোপীয় মনে করতো। তাদের খোলার ঘরেও সেদিন প্রচুর আয়োজন হতো। তারাও সেদিন উপরওয়ালা সাহেবদের মত অখৃষ্টান বাঙ্গালীদের সাথে ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহার করতো। নীলু, গুলু, হারু, ছিরু প্রভৃতি ধর্ম্মান্তরিতগণও সেদিন—

ভাঙ্গা এক টেবিলেতে ডিম সাজাইয়া।
ঈশু ভাবে খানা খান বাহু বাজাইয়া॥

উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করার জন্য অধস্তন ও অনুগতজনেরা পাঠাতো নানারকম উপহার ও ভোজ্যদ্রব্য।

কেরানী দেয়ান আদি বড় বড় মেট্।
সাহেবের ঘরে ঘরে পাঠাতেছে ভেট্

ইংরেজদের অনুকরণপ্রিয় কোন কোন বাঙ্গালীবাবু বড়দিনে সাহেবী পোষাক পরে সাহেবদের আচরণের অনুকরণ করতো। সেদিন ইয়ারবন্ধুগণসহ তাদের বাগান বিহার চলতো। দেশী বিলাতী মদ্যপানে সকলে প্রীত হতো।

বড়দিন উপলক্ষে গঙ্গায় নৌকা বাচ্ হতো। নৌকা গুলোও নানারকম সুসজ্জিত থাকতো। সাহেব পাড়ায় বাড়ী গাড়ী ও হোটেলগুলো নানারকম ফুল পাতা ও রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হতো। দেখে শুনে গুপ্ত কবির নিজেরই ইচ্ছা হতো সাহেব হতে।—

জেতে আর কাজ নেই যীশু গুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে বিবি যদি পাই॥

বড়দিনের মতই সেকালে কলকাতায় ইংরেজী নব বর্ষের উৎসবও ছিল আড়ম্বরপূর্ণ।

নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজ টোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয়॥

নববর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় সাহেব পাড়া গুপ্ত কবির ভাষায় শিবের কৈলাস ধাম বা অমরাবতী স্বর্গের ন্যায় মনে হতো। সাহেবদের ঘরে ঘরে সেদিন নানারকম খানা ও পানীয় মজুত থাকতো। খানাপিনার পর হতো নাচগান। মেমসাহেবদের সাজ পোষাকের বাহার সেদিন দর্শনীয় হতো। কবি ঈশ্বরচন্দ্র দেখেছেন—

মান মদে বিবি সব হইলেন ক্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস ফুটিফাটা ড্রেস॥
শ্বেদ পদে শিলিপর শোভা তায় মাখা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা॥
চিক্ চিরুনী চারু চিকুরের জালে।
ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িতেছে গালে॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥

শুধু ইংরেজদের বড়দিন বা নববর্ষ উৎসবই নয়। হিন্দুদের দুর্গা পূজায়ও কলকাতার রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য লোকের বাড়ীতে মহাসমারোহে উৎসবিত হতো। পূজা উপলক্ষে সাহেবরা নিমন্ত্রিত হতো। তাদের নানারকম খাদ্য ও মদ্য দিয়ে তুষ্ট করতেন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা। নামকরা বাঈজির নাচগানে তৃপ্ত দিতেন সাহেবদের। কবি ঈশ্বর গুপ্ত মেকি ও নেকামি সহ্য করতে পারতেন না তাই শোভাবাজার রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার বাহার দেখে তিনি বিরক্তই হয়েছিলেন। তার ব্যঙ্গোক্তি সম্বাদ প্রভাকরের পাতায় ফুটে উঠে।

রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে।
দেবী পূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে॥

* * *

পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে।
সাহেবে খাইলে মন মুক্তিপদ পাবে॥

দুর্গাপূজা ছাড়াও সেকালে স্নান যাত্রার উৎসবের বর্ণনায় গুপ্ত কবি মুখর ছিলেন। মাহেশের স্নানযাত্রার মেলার সেকালে খুব নাম ডাক ছিল। কলকাতা থেকে বাবুরা দলে দলে এই মেলা দেখতে যেতো। ছোট বড় পানসী পঞ্চমকারসহ সাজিয়ে তাতে বাবুরা মেলার নামে নৌকাবিহার করতে যেতো।

বৃষ পূর্ণিমার দিবা অপার আনন্দ কিবা
মাহেশে সুখের মহামেলা।
স্নানযাত্রা প্রতিবর্ষে এইদিনে মহাহর্ষে
মেলা পেয়ে করে সব খেলা॥

শুধু কলকাতার বাবুরা নয়। মেলা দেখতে আরও যেতো—

হাড়ি, মুচি, যুগী, জোলা কত বা সেখের পোলা
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।

আষাঢ় মাসে স্নান যাত্রার মেলার চেয়েও সেকালে হিন্দুদের আর একটি বড় আনন্দময় পরব ছিল—পৌষ পার্ব্বণ। প্রবাসী পুরুষরা এই উপলক্ষে ছুটি নিয়ে বাড়ী আসতো। পার্ব্বণের আয়োজনে শহর থেকে কিনে আনতো বহু দ্রব্য-সামগ্রী। লোকে মকর সংক্রান্তির ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করতো। তারপর লেগে যেতো পিঠে খাওয়ার ধুম।

ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা॥
খোলায় পিটুলী দেন হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি॥
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা॥

সেকালের লোকে খেতেও পারতো—

ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য তোর লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা কবি ঈশ্বরচন্দ্র। সমাজের সবকিছু তিনি দুচোখ ভরে দেখতেন। তাই তার কবিতায় সেকালের বাস্তব চিত্র এত পরিস্ফুট। নেহাৎ শিশু বয়সে তার মৌখিক এক ছড়ায় কলকাতার এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে—

রেতে মশা দিনে মাছি
এই তাড়য়ে কলকেতার আছি।

তিনি ছিলেন ব্যঙ্গরসের স্বভাব কবি। তাই যা কিছু তার কাছে ভণ্ডামি মনে হতো তাই তার বিদ্রুপ বর্ষিত হতো। সেকালে কৌলীন্য প্রথা প্রবল ছিল। অতিবৃদ্ধ কুলীন ও কৌলীন্যের গুণে একাধিক নাবালিকা বিয়ে করতো। যার জন্য কবির শাণিত বিদ্রুপ থেকে কুলীনেরাও রেহাই পায় নাই।

বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥

সহজ সুরের স্বভাব কবি হলেও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—সেকালের মনীষীদের চেয়ে দেশপ্রীতিতে কম ছিলেন না। তিনি লক্ষ্য করেছেন—সেকালে ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বদেশীয় সব কিছু উপেক্ষা করে বিদেশী ইংরেজদের সব কিছুকেই উত্তম মনে করতো। কবি তাদের প্রতি উপদেশ দিয়েছেন—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

কবির ঐ উপদেশ আজও অনুধাবন যোগ্য।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জোড়া তাল গাছটার কাছে আসতেই অভয়ের বুকটা কেঁপে ওঠে। ও শুনেছিল, এই খানটায় নাকি ভয় আছে। কত লোক নাকি কত কি অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার এই জায়গাটায় দেখেছে। জোড়া তালগাছ দুটোর পাশেই সেই বুড়ো ন্যাড়া বেলগাছ। অনেকদিন আগে এই বেলগাছের একটা ডালে, কবে কে যেন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল লোকের মুখে মুখে সেই সব অদ্ভুত গল্প ছড়িয়ে পড়ে। আশে পাশের গাঁয়ের লোকেরা সেই গল্প জানে। অভয় চোখ বন্ধ করে। দুইহাত বুকের কাছে জড় করে, একরকম ছুটতে থাকে। শীতে ভয়ে ওর দাঁতে দাঁতে লেগে ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়। মনে মনে বিড় বিড় করে—রাম—রাম উচ্চারণ করতে থাকে।

দূরে দ্বারিক গড়াইয়ের ঘানি ঘর দেখা যায়। ঘানি ঘরের আলো এই অন্ধকারে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। এই আলো দেখেই অভয় যেন সজীব হয়ে ওঠে। আর কী মনোরম ঐ সামান্য আলোর ছটা। ও যেন আশ্বাস দিচ্ছে অভয় দিচ্ছে। কেঁপে কেঁপে সেই জলন্ত প্রদীপ শিখা যেন বলছে ভয় নেই। ভয় কি? এই তো আমি। আমিই তো জীবন—আমিই তো প্রাণ। আমিই তো সব ভয়, সব অন্ধকার, সব অজানা, অচেনাকে তাড়িয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করছি সত্য-জ্ঞানকে। ভয় নেই—ভয় নেই।

—আঃ—। সেই প্রদীপ শিখার দিকে তাকিয়ে অভয় শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এসে পড়েছে সে। দ্বারিক কলু চোখে বাঁধা বলদের পিঠে হাত দিয়ে বলছে—হাঁট—হাঁট—। ঘানি গাছ ঘুরছে—পায়ে পায়ে চোখ বাঁধা গরু ঘানি গাছে পাক দিচ্ছে।

পায়ের শব্দে দ্বারিক বলে—কে যায় গো—। কে—

—আমি অভয় দ্বারিক জেঠা—

—অভয়। ও মাজের পাড়ার গোপেশের ছেলে তুমি। তা বাবা এই শীতের রাতে, অন্ধকারে কোথায় ছিলে গো—শীত হলে কি হয়। রাস্তা ঘাট তো ভাল নয়। লতার ভয় যে সব সময়। ওনারা শীত গ্রীষ্ম মানে না। এই নাও চাড্ডি পাট কাঠি—। পাট কাঠি জ্বালিয়ে যাও—

অভয় অনেকগুলো পাটকাঠি একসঙ্গে করে জ্বালিয়ে নিল। দাউ দাউ করে জলছে। সারা পথ আলোয় আলোময়।

অভয় ভাবছে, মা নিশ্চয়ই বকবেন। বাড়ী ঢুকতেই নিশ্চয়ই মা বলবেন, ধন্যি ছেলে যা হোক। আমি কত ভাবছি। দেখ্—দেখি, কতখানি রাত হল। রাস্তাঘাট ভাল না। কোথায় গিয়েছিলি বাবা। মায়ের কথা যেন অভয় শুনতে পায়। মায়ের মুখ দেখতে পায় অভয়। অভয় দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটতে থাকে। সেই অন্ধকার ঘন কুয়াশা ভেদ করে, অভয় চলতে থাকে। এই কুয়াশা দেখে, অভয় ভাবে, সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা কবরখানা সমস্ত পৃথিবী যেন মৃতদের স্থান হয়েছে। একবার সে কোন এক হাঁসপাতাল দেখেছিল।

সাদা রংয়ের বড় বাড়ী—ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সব ঘর। সারা ঘরে লোহার সাদা রংয়ের খাট তার ওপর মড়ার মত পড়ে রয়েছে, সাদা বিছানায় সাদা চাদরে ঢেকে সারি সারি রুগীরা। হঠাৎ তার মনে হ'ল, এ যেন সেই হাঁসপাতাল —সব যেন ঠাণ্ডা—আর সাদা কাপড় জড়িয়ে মৃতদেহ গুলো পড়ে রয়েছে। কুয়াশার সাদা সাদা রং দেখে অভয়ের কেন যেন এইসব কথা মনে হ'ল—তা বলতে পারে না। কবে সে তাদের গাঁয়ের পাঁচুকাকাকে দেখতে, তার বাবার সঙ্গে একটা হাঁসপাতালে কয়েক মিনিটের জন্য গিয়েছিল। সেদিন হাঁসপাতালের কিছু কিছু দৃশ্য দেখে, ভয় পেয়েছিল। সেই ভয়, আজ হঠাৎ মনের মধ্যে জেগে উঠল। এই গাঁ যেন সেই হাঁসপাতাল —সেই ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা সাদা বাড়ী ঘর—সাদা কাপড় জড়ান রুগীগুলো যেন চারধারে সার সার পড়ে রয়েছে। ওরা যেন কেউ জীবিত নয়—সব যেন মৃত। অভয় আরও জোরে হাঁটতে থাকে। এইবার বাড়ী। ওই তো পরিচিত তাদের বাড়ী সেই পথ—সেই ছোট ছোট বন জঙ্গল—শিউলি আর কুলগাছ—আর কলাবাগান—। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা আলোর স্তিমিত ক্ষীণ রেখা। অন্ধকারের মধ্যে সেই আলোর রেখা কী সুন্দর আর মধুর। যেন সেই আলোর রেখা হাত তুলে বলছে —ভয় কী। কিসের ভয়। স্তিমিত প্রদীপ শিখা আলো দেখাচ্ছে—ভয় নাশ করছে ও যেন বরাভয়রূপিনী স্বয়ং দশভূজা দুর্গা। ও ক্ষুদ্র প্রদীপ শিখা নয়। ও যেন জীবনের জীবন। কী সুন্দর—পবিত্র—আর কী স্নিগ্ধ।

অভয় ডাকে—মা—মা—। সব চিন্তা ভয় কোথায় যেন চলে যায়—এই ডাকে।

পৌষ মাসের দিন মনে হয় খুব ছোট। বেলা তিনটের সময় হলেই যেন সন্ধ্যার ছায়া, গুটি গুটি পায়ে নেমে আসে পলাশপুরের গাঁয়ে? মাঠের ওধার দিয়ে ভেসে আসছে উত্তরে হাওয়া কনকনে বাতাস—হাড়ের ভেতর কাঁপন ধরে যায়। এরই মধ্যে মনে হয়, সন্ধ্যার ধূসর স্তিমিত ছাই ছাই ছায়া নেমে এসেছে মাঠে ঘাটে পথে। নেমে এসেছে, ছোট ছোট মাটির দেওয়াল ঘেরা, কুটীরে, গোয়ালে, সরু গলিঘুঁজির আনাচে কানাচেতে। গাছ পালার ভেতর দিয়ে সূর্য্যের অতি কোমল লাল রংয়ের কিছু আলো, ছড়িয়ে যাচ্ছে পথে প্রান্তরে খানাডোবায়। গরুর পাল নিয়ে, রাস্তার ধূলো উড়িয়ে সকাল সকাল ফিরছে রাখাল ছেলেরা। খেজুর গাছে ভাঁড় টাঙ্গানো প্রায় শেষ। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি হাঁটুর ওপর কাপড় আঁট সাঁট করে পরা কোমরে একটা টিনের বাক্স মতন—তার ভেতর গাছ কাটা দা, ওর কাঁধে ঝুলছে গাছে ওঠা দড়া। কাঁপতে কাঁপতে চলছে তুষ্টু বাগদি। মান্দাবুড়ি কাঁখে করে মাটির কলসীতে জল নিয়ে, যেতে যেতে বলল—কেরে তুষ্টু নাকি? তা হাঁ বাবা, একটুখানি জীরেণ রস কাল দিবি? নাতিটা কদিন থেকে রস খাবে বলে, বায়না ধরেছে—হাঁটতে হাঁটতে তুষ্টু বলল, তা যেয়োগো। সকাল সকাল একটা ঘটি নিয়ে যাবেন—তুষ্টু রাস্তার ধারে গাছে উঠে পড়ল। ততক্ষণ আরও অন্ধকার হয়ে উঠেছে—। ঘন ধোঁয়ার মত, ঝাপসা কুয়াশায় সমস্ত গ্রাম ঢেকে গেছে। নাকে এসে লাগছে, সোঁদা সোঁদা গন্ধ। এ যে কিসের গন্ধ, তা ঠিক করা যায় না। এ কুয়াশার গন্ধ না ভিজে খড়ের আগুন, যা গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় সাঁজালের আগুনের গন্ধ ঠিক এইরকম। এই অদ্ভুত গন্ধের সঙ্গে মিশেছে, খেজুর রসের মিষ্টি গন্ধ। বনের মাঝে, একটা ফুল ফুটেছে। ওর গন্ধও হতে পারে। এমনি সময় বনের মধ্যে ঐ ফুলগুলো ফোটে। কি মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ সাঁজালের ধোঁয়ায় সমস্ত গ্রাম অন্ধকার। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঘন কুয়াশা। গৃহস্থের দরজা জানালা বন্ধ। শীতের প্রবল দাপট। কাঁথা কম্বল মুড়ে ছেলেরা উনুনের ধারে আগুন পোয়ায়। গাঁয়ের পথ নির্জন। দেখে বোঝা যায় না, এখানে জীবন আছে কি না আছে। মৃত্যুপুরী যে কি বস্তু স্বচক্ষে বোধ করি কেউ দেখেনি। কিন্তু সে যাইহোক, বোধকরি জনহীন পথ ঠাণ্ডা কুয়াশা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন গ্রাম—শীতার্ত্ত মানুষ আর সজীব প্রাণীর জড়াজড়ি বসবাস, এ সব দেখে স্বভাবতঃই মৃত্যুপুরীর কথাই মনে পড়ে। ক্ষুধার কাতর—

উৎসাহহীন জীবনহীন মুখে, শুধু ক্লান্তি শুধু হতাশা—শুধু কোন গতিকে দেহপিঞ্জরে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা এইতো সমগ্র গ্রাম্য জীবনের চিত্র। হাসি, উৎসাহ, সাহস নির্ভিকতা যে কোন্ বস্তু এসব এখানে অজ্ঞাত। একটা গতানুগতিক জীবন ধারার মাঝে, স্রোতে ভেসে যাওয়া লক্ষ্যহীন শেওলার মত, এইসব জীবন ভেসে যাচ্ছে। কোথায় যে যাবে আর কোথায় যে থামবে, এ কারুর জানা নেই। স্রোত যে দিকে নিয়ে যায়, সেখানেই তার স্থান। আশাহীন ভরসাহীন জীবন, একান্ত ভার বোঝার মতন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। মনে হয়, যে কোনও সময় এই ভারবাহী পশু মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়বে। আর সেদিনই এর মুক্তি।

শুধু মাত্র সামান্য জীবনের চিহ্ন দেখা যায়, বাজারের মাঝে। রাধু কামারের ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ—আসে, কামার শালা থেকে। মতি গড়াইয়ের মুদিখানা দোকান, তাদের তাস খেলার চিৎকারে। বাইরে সামান্যতম কোন শব্দ হলেই, মতি হাঁক দেয়—কে যায় অ্যাঃ—কে যায় গো—। বলি সাড়া দিচ্ছনা কেন অ্যাঃ—মতি গড়াই কান পেতে শোনে—অচেনা লোকটির পায়ের শব্দ বুঝতে চেষ্টা করে। কেনেস্তারা টিনের ঝাঁপটা একটু ফাঁক করে, আলো তুলে বুঝতে চেষ্টা করে—লোকটা কে? ধড়াম্ করে, ঝাঁপ বন্ধ করে, মতি বলে,—এঃ শালার গরু—আমি ভাবলাম কোন উটকো লোক। আবার তাস খেলা চলতে থাকে, এখানে শুধু এইটুকু জীবনের স্পন্দন। সমস্ত গ্রামের নাড়ীর স্পন্দন এখানে। খুব ঢিলে তালে ছিয়ানব্বুই ডিগ্রীতে নাড়ির গতি চলছে—ধুক্ ধুক্ করে।

সেই পাঁচুই মাঘ আসার আর দেরী নেই। ইতি-মধ্যে গোপেশ্বর মালদায় দাদার কাছে, পত্র দিয়ে জানিয়েছে ঐ তারিখে শ্রীমান্ অভয় যাত্রা করবে। অভয় ইতিপূর্বে আর কখনও মালদহে যায় নি, তাই গোপেশ্বরকেও সঙ্গে যেতে হ'বে। মালদা থেকে যোগেশ্বর রেল রাস্তার বিবরণ জানিয়েছেন। আজিম-গঞ্জ ষ্টেশনে নেমে গঙ্গা পার হয়ে, ঘোড়ার গাড়ী করে জিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে যেতে হ'বে। জিয়াগঞ্জ থেকে লালগোলা ষ্টেসন—তারপর ষ্টীমারে পদ্মাপার—তারপর গোদা গাড়ীতে রেলগাড়ী। আর কোথাও নামা নয় সোজা মালদহ ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকে সামান্য হেঁটে নৌকায় মহানন্দা নদী পার হয়ে, মালদহ শহর। ওখানে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে, মকদুমপুরের রাস্তা বলে দেবে। অথবা ইংরেজবাজারে দত্ত ফার্মেসীর নাম করলে লোকে দোকান দেখিয়ে দেবে।

অভয়ের জন্য ছোট্ট একটি টিনের ট্রাঙ্ক ও যৎসামান্য বিছানার ব্যবস্থা কোনমতে হয়েছে। অভয়ের একদিকে যেমন আনন্দ হচ্ছে অন্যদিকে একটা অসীম বেদনা সমগ্র মনকে পূর্ণ করে ফেলেছে। এই বাড়ী, এই গ্রাম, তার মা, বাবা, ছোট ভাই-বোন ছেড়ে তাকে যেতে হ'বে। আবার কতদিন পর, সে এদের দেখতে পাবে, তা ঈশ্বরই জানেন তাই আজ এখানকার যাবতীয় জিনিষকে ভাল লাগছে। বাড়ীর উঠোনের ওপর, শিউলী গাছটা—ঐ পিটুলিগাছ—লাউ কুমড়োর চালা, মংগলা গাই, কচি বাছুর, গোয়ালের ওপাশে ছাই গাদা, গোবরের গাদা—এ-সব যেন আজ আর তুচ্ছ বা অতি অকিঞ্চিৎকর নয়। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে সমস্ত কিছু দেখতে থাকে। রাস্তা দিয়ে পঞ্চু ঘোষ দুধের বাঁক নিয়ে ছুটছে, হরি ক্ষ্যাপা গান করতে করতে একপাল গরু নিয়ে চরাতে যাচ্ছে, আজ যেন এগুলো ভারী ভালো লাগছে। আজ আর অভয়, বাড়ীর বাইরে গেল না। মায়ের পাশে পাশে ঘুরতে লাগল। গীতা, খোকনও বুঝেছে, কাল তাদের দাদা অনেক দূরের শহরে পড়তে যাবে। মা আজ নিঃশব্দে আঁচলে চোখ মুছছেন, আর নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছেন। আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায়, তাঁর সমস্ত অন্তর ভরে গেছে। তবুও চোখের জল ফেলতে পারছেন না। পাছে ছেলের অকল্যান হয়। অভয় মাকে বার বার বলছে, মা মন খারাপ করবে না। আমি সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি দেব। তুমি গীতা, খোকনকে দেখবে। যেন ওরা পুকুরে না যায়, দুপুরে যাতে লেখা পড়া করে দেখবে।

আমি কোন রকমে পাশটা করে নি, তারপর অন্ত ব্যবস্থা হ'বে। একটা পাশ দিলে, যা হোক একটা চাকরী জুটিয়ে নিতে পারব। তখন আর বাবার কষ্ট থাকবে না। এ তুমি দেখে নিও—। সরোজিনী অবাক হয়ে, ছেলের উৎসাহ দীপ্ত মুখের দিকে তাকাল।

রাত পোয়াতে না পোয়াতেই সরোজিনী উঠে পড়েন। তখনও বেশ অন্ধকার। শীতও বেশ। চারধার কন্ কন্ করছে। সাদা কুয়াশায় চারধার ঘিরে গেছে। গাছপালা দিয়ে টুপ্‌টাপ্ করে শিশির পড়ছে। ঘাসগুলো এত ভিজে যে, দেখে মনে হয়, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গীতা, খোকন, হাত পা গুটিয়ে কাঁথা মুড়ে ঘুমুচ্ছে।

দুর্গা শ্রীহরী—দুর্গা শ্রীহরি বলে, সরোজিনী উঠে, দেওয়ালের কালী, লক্ষ্মী, দুর্গার ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে, প্রণাম করে, ছেলেদের গায়ে কাঁথা ভাল করে দিয়ে উঠে পড়েন। মুখে জল দিয়ে, দরজার ঝন কাটে জল দিয়ে লক্ষ্মীর ঘরে প্রণাম সেরে গোয়ালে গেলেন।

আজ আর কাজে মন নেই। বাড়ী ঘর ফাঁকা হয়ে যাবে। বেলা আটটার মধ্যেই যাত্রা করতে হ'বে অভয়কে। প্রায় দেড় ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে তবে রেল ষ্টেশন্ এর মধ্যে যাহোক কিছু রান্না সেরে ফেলতে হ'বে।

রান্নঘর রাত্রেই নিকানো হয়েছে। বাসনপত্র সমস্তই গত রাত্রেই ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। উনুন ধরিয়ে, আগে চায়ের জল চাপালেন সরোজিনী। গোপেশ্বর উঠে পড়েছেন। অভয় তখনও ঘুমুচ্ছে। তামাক খেয়ে গোপেশ্বর উঠে পড়লেন। গরু বাছুরকে খেতে দিয়ে, আর একবার রত্নাকে বলে আসবেন। রত্না বাগদী—সেই ট্রাঙ্ক বিছানা নিয়ে ষ্টেশন্ যাবে। অভয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে পড়ল আজ তার যাবার দিন। তাড়াতাড়ি উঠে, ডাকল—মা—

রান্নাঘর থেকে সরোজিনী সাড়া দিলেন, কি বাবা উঠেছিস্? মুখ হাত ধুয়ে নে বাবা। আমি চায়ের জল চাপিয়েছি। জল ফুটে উঠলেই, ভাত চাপাবো—

অভয় তাড়াতাড়ি উঠে, মুখ হাত ধুতে গেল। নিমের দাঁতন করতে করতে বাইরে চলে এল। অভয়ের মন ভারাক্রান্ত। আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায়, মনে সুখ-শান্তি নেই। তবুও একটা উত্তেজনা অনুভব করছে। নূতন দেশ নূতন পরিবেশ। জ্যেঠা, জ্যেঠী, জ্যেঠতুতো ভাই-বোনেরা, তাকে কি ভাবে গ্রহণ করবে তাও ভাবছে অভয়। সে শুনেছে, তার জ্যেঠা-মশাই বড়লোক। দু-একজন বড়লোককে অভয় দেখেছে। কিন্তু ভাল লাগেনি। কি জানি কেন, অভয়ের মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গে আর ঐ বড়লোকদের শুধু একটুখানি নয়, অনেকটা ব্যবধান রয়েছে। আচারে ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায়, তাদের মুখে চোখে, কথাতে একটা যেন তাচ্ছিল্যভাব—একটা অহমিকার ভাব যেন দেখতে পাওয়া যায়। এরা যে গরীব, এ কথাটা যেন ওঁদের মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে যেন ফুটে ওঠে। মনে হয়, ওঁরা যেন বলেন, হাঁ—কথা বল শুনছি। কিন্তু যা বলবে, তা বেশ সমীহ করে বলবে। দাঁড়াবে কিন্তু কাছে এসোনা—দূরে থাক। বসতে চাও বস—আপত্তি নেই। কিন্তু দূরত্ব রেখে বস। গায়ে গা ঠেকিও না। তোমাদের যা দিচ্ছি, দুহাত পেতে নাও। কিন্তু মনে রেখো, এটা দয়ার দান, অর্থাৎ ভিক্ষা দিচ্ছি। অভয় এই-রকম ব্যবহার দু-একবার পেয়েছে বৈকি। কলকাতা হ'তে যখন চৌধুরী বাবুরা দেশে আসেন, তখন সে দেখেছে বৈকি। তারই—সমবয়সী—বাবুদের ছেলেদের দেখেছে। তারা সব সময় যেন একটু দূরত্ব রেখে চলা-ফেরা করে, বেশ মেপে যুকে কথা বলে। প্রাণ খুলে হাসে না—মন খুলে কথা বলে না। সবটা যেন যান্ত্রিক। হাসি যেন কৃত্রিম। অথচ বাবুদের ছেলেরা, সবই তারই সমবয়সী এবং একই গ্রামের ছেলে। তফাৎ এই ওঁরা জমীদার বড়লোক—আর বাস করেন শহরে। অভয়রা গরীব—অত্যন্ত গরীব। অনশন—অর্দ্ধাশন, নিত্যসঙ্গী। শৈশব থেকে অভাব-অনটন, দারিদ্র্য, ক্ষুধা এদেরকে সে চেনে। এরাই তাদের জীবনের যেন নিত্যসঙ্গী আর বন্ধু। এরাই যেন অভয়ের হাত ধরাধরি করে একত্রে

চলছে—একত্রে এক পা এক পা ফেলছে এক সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে কথা বলছে, হাসছে। এই পার্থক্য-এই বৈষম্য কেন হয়, অভয় চিন্তা করে। কিন্তু এর কোন সদুত্তর পায়নি। শুধু অর্থের বৈষম্য ছাড়া আর কি। ওদের পয়সা আছে, বাগান-পুকুর সম্পত্তি আছে—তাদের নেই। এই তফাৎ আর পার্থক্য নিয়েই সে জন্মেছে—। আর তার মন হাজার হাজার ছেলে, এই পার্থক্য নিয়েই জন্মাচ্ছে। কিন্তু এতে দোষটা কার বা কাদের? তাদের জন্মটাই কি তবে দোষের? না—এর পেছনে কোন কিছু আছে। ঈশ্বর না কপাল বা অদৃষ্ট। অনেক সময় খুব গভীর ভাবে চিন্তা করেছে অভয়।

মায়ের পরণে যখন ছেঁড়া কাপড় দেখেছে—পাওনাদার-দের তাগাদায়, বাবার মুখ যখন বিষণ্ণ ক্ষুধার জ্বালায়, ছোট ভাই বোনেরা চীৎকার করে, নূতন কোন খেলনা, জামা-কাপড় বা সামান্য একটা পুতুলের জন্য ওরা বায়না ধরে, অথবা অসুখে যখন ডাক্তার আসেনা, ঔষধ বা পথ্য পায়না, তখন অভয় এসবগুলো সম্বন্ধে গভীর ভাবে সব চিন্তা করেছে। তার মনে হয়েছে, টাকা-পয়সা, বা বিষয়-সম্পত্তি না থাকাটাই একমাত্র পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। মান সম্মানের মাপকাটি ঐ অর্থ ও সম্পত্তি। গাঁয়ের নামকরা বদ মানুষ শ্রীমন্তকেই দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু লোকে শ্রীমন্তকে খুব খাতির করে। কেন? অথচ পরমেশবাবু মাষ্টার, শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর খাতিরের অভাব হয় কেন? এই বৈষম্য এই তফাতের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝেছে অভয়। একজনের অনেক টাকা আছে কিন্তু অন্যজনের নেই। শ্রদ্ধা আর খাতির তবে প্রকাশ পাচ্ছে শুধু অর্থের জন্য। টাকার অংকটা যার যত বেশী ভারী, তিনি তত সম্মানী, তত মহাশয় ব্যক্তি। অথচ ব্যক্তিগত চরিত্রে যত দোষই থাকুকনা, তাতে কিছু আসে যায় না। এই অদ্ভুত যুক্তি, অদ্ভুত আচরণে, মনে মনে হাসে, মনে মনে অন্যদের বলে, মূর্খ—মহামূর্খ—। অভয়ের নিজের অজ্ঞান্তেই, সেই শৈশবকাল থেকে, এইসব বৈষম্য, দুঃখ, দারিদ্র্য দেখে একটা উদ্ধত কাঠিন্য মানসিক ভাব গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে একটা বিদ্রোহের রক্ত শিখা যেন সারা দেহে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

—দাদা—। কে ডাকে? অভয় সচকিত হয়ে ওঠে। স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়। সে ফিরে আসে বাস্তব জগতে। না, আর তো সময় নেই। তাকে আজ যাত্রা করতে হবে। অভয় চারদিকে তাকায়। দেখে নেয়, তার চিরসাথী নিজগ্রামকে। তার গাঁয়ের বন বাদাড় ধুলো ভরা পথ, সবকে। রাস্তার মোড়ের মাথায় ষষ্ঠীতলা—সেই বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছটি। এরা যেন বড় পরিচিত, ঠিক ঘনিষ্ট আত্মীয়ের মত, অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধুর মত, ওরা যেন মনের সবটুকু জুড়ে রয়েছে। ওদের কি ভোলা যায়। আবার কবে, কতদিন পর যে ফিরে আসবে এ গাঁয়ে তা কি জানে। আবার কতদিন পর সে এদের দেখা পাবে।

খাওয়া দাওয়া শেষ। যাত্রার সময় সন্নিকট। সরোজিনী এক হাতে চোখ মোছেন। সরোজিনীর সই বলে, ওকি ভাই। শুভদিনে ছেলে বাড়ী থেকে আসছে এখন কি চোখের জল ফেলে। বল, যেন সে মানুষ হতে পারে।

গীতা আর খোকন অবাক হয়ে তাকায়। লক্ষ্মী পুজোর ঘরে অভয় ঠাকুর প্রণাম করে। সরোজিনী ছেলের মাথায় কপালে ঠাকুর পূজার ফুল ছুঁইয়ে দেয়, কোঁচার খুঁটে বেঁধে দেন সেই প্রসাদী ফুল। কপালে দেন দইয়ের ফোটা। ওদিকে রত্না তাগাদা দিচ্ছে—ও ছোটদা ঠাকুর, যেতে হ'বে অনেকখানি।

—এই হয়েছে—। তুই এগিয়ে যা আমি ধরছি—রত্না বাগদি ছোট একটা ট্রাঙ্ক আর বিছানা নিয়ে ষ্টেশনের পথে হাঁটে। অভয় মাকে, সইমাকে, প্রণাম করে। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন সরোজিনী। অভয়, গীতা আর খোকনকে আদর করে বলে, মায়ের কথা শুনবি সব। রোজ ভাল করে লেখা পড়া করতে হ'বে। ছোট ভাইটিকে কোলে করে, অভয় সদরের দিকে যায়। পেছনে পেছনে সরোজিনী

সইমা, গীতা, আরও পাড়ার দু একজন এসে রাস্তায় দাঁড়ায়। খোকনকে মায়ের কোলে দিতেই খোকন হাত পা ছুড়তে থাকে। আমি যাব—আমি যাব—। খোকন কাঁদতে থাকে। গোপেশ্বর বলেন, ওকে ধর গো। খুব সাবধানে থাকবে কিন্তু এ কদিন। আমি দু একদিনের মধ্যেই চলে আসব। গোপেশ্বর এগিয়ে যান।

অভয় ডাকে—মা—

সরোজিনীর কান্না আর বাধা মানে না। হু হু করে কেঁদে ওঠেন।—বাবা—মাণিক আমার—

অভয় চোখ মুছে বলে, মা কেঁদোনা। তুমি যদি অধৈর্য্য হও তবে ওরা কি থামবে। আমি চিঠি দেব। অভয় হাঁটতে থাকে। বার বার পেছন ফিরে তাকায়। খোকন কাঁদছে—হাত পা ছুড়ছে। মা, গীতা সইমা কাঁদছেন। অভয়ের দুই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। কোন দিন এদের ছেড়ে থাকেনি। এই গ্রাম এই পথ-ঘাট বন-জঙ্গল, কত পরিচিত মুখ—আজ যেন সব অতি পরমাত্মীয়ের মত দু হাত দিয়ে, তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে—না—যেওনা—যেওনা—।

অভয় ভাবে, উঃ কি কঠিন এই মায়া, এই স্নেহ ভালবাসা। কি কঠিন এই বাঁধন। শক্ত লোহার শেকল ছিঁড়ে ফেলা বোধহয় সহজ। কিন্তু স্নেহ ভালবাসার এই বাঁধন ছেঁড়া বোধ করি অসম্ভব।

অভয় আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, রাস্তার ওধার থেকে সেই ষষ্টীতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার মা। খোকন, গীতা কাঁদছে। খোকন তখনও বলছে আমি যাব—আমি যাব। দাদার সঙ্গে যাব—। টপ্ টপ্ করে লোনা গরম জল চোখের দুপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। অশ্বত্থ গাছের আড়ালে—ওদিকে পথ বেঁকে গেছে আর দেখা যায় না। কানে ভেসে আসছে —খোকনের আর্ত্ত চীৎকার—দাদা আমি যাব—আমি যাব। না—আর দেখা যায় না। কিন্তু চোখে না দেখা গেলেও অভয়ের দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠছে—মায়ের বিষাদময় মূর্ত্তি, গীতা আর খোকনের কান্না মাখানো মুখ। আঃ—কী কঠিন আর কঠোর কাজ, এই বড় হওয়ার সাধনা।

রত্না বাগদী বিছানা ট্রাঙ্ক নিয়ে চলছে। গোপেশ্বর তার জীর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়ে, আস্তে আস্তে হাঁটছেন। —অভয় একটু পা চালিয়ে আয় বাবা—। অনেকটা পথ যেতে হ'বে।

সম্মুখে রুক্ষ রিক্ত প্রান্তর। এখন আর মাঠে ফসল নেই। দূরে দূরে কিছু রবিশস্য পড়ে রয়েছে। এই সকাল বেলার রৌদ্রজ্জ্বল দিনটি, আজ আর কোন আনন্দ বয়ে নিয়ে আসছে না। একটা বিষাদময় অবসন্নতা—জগৎব্যাপী শূন্যতায়, তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আসক্তিহীন মনে ঠিক যন্ত্রের মত, অভয় পা ফেলতে থাকে। মঝে মাঝে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস, শূন্য প্রান্তরের ওপার দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সুউচ্চ তাল গাছের পাতায় পাতায়, বাতাসের স্পর্শে, একটা শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন খোকনের কান্নাই ভেসে আসছে। সেই বুকফাটা কান্না—দাদা-দাদা—আমি যাব। আমি যাব—কোথাও আর কিছু নেই, সমস্ত চরাচরব্যাপী এক ক্ষুদ্র বালকের আর্ত্তকণ্ঠের কান্না যেন সমস্ত বিশ্বভুবনকে, এই মাঠ ঘাট বনপ্রান্তরকে ভরিয়ে দিয়েছে। একটা ব্যথা বেদনা—একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর বেদনাভরা অশ্রুতে এই পৃথিবী যেন ভেসে গেছে, ডুবে গেছে। অভয় শোনে সেই কান্না। চোখের ওপর ভেসে ওঠে খোকনের মুখ—মায়ের মুখ—অভয় জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। কিন্তু কানে যেন ভেসে আসছে—একটা কান্নার সুর—আমি যাব—যাব—আমি যাব। কানে আসছে সেই একটানা কান্না, সেই সুদীর্ঘ চীৎকার যাব—যাব—আমি দাদার সঙ্গে যাব—। বিষাদময় কান্নার তরঙ্গে অভয় ডুবে যায়।

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ইতিপূর্বে এত দীর্ঘ পথে অভয় কখনও ট্রেনে বেড়ায়নি। সারারাত গাড়ীর জানালার ধারে বসে রইল। এক একটা স্টেশন পার হয় গাড়ী যায়—কিন্তু ওর চোখে ঘুম নেই। মায়ের করুণ মুখ গীতা, খোকনের কথা, তার পলাশপুর গাঁয়ের কথা, বার বার মনে উঠছে। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস

বেরিয়ে এল। বাবার বিষণ্ন মুখ, আর জরাগ্রস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে মনটা আরও দমে গেল। নিদারুণ দারিদ্র্য, যাতনায় মানুষকে কী অসুন্দর না করে দেয়।

গোপেশ্বর বললেন, অভয়, এখন শুয়ে পড় বাবা।

—না ঘুম আসছে না। গাড়ীতে কত লোক উঠছে। আবার মাঝ পথে একে একে নেমে যাচ্ছে। অভয়দের কামরায় ভীড় নেই একেবারে। পরে সন্ধ্যার সময়, গাড়ী এসে থামল আজিমগঞ্জ স্টেশনে। আরও প্রায় একঘন্টা আগে আসতে পারত গাড়ীটা। কিন্তু মাঝপথে কি কারণে যেন অনেকখানি দেরী হয়ে গেল। প্রত্যেক স্টেশনেই গাড়ী দেরী হতে লাগল। নানান রকম কাঁচামাল ওঠানামা করছে— সম্ভবতঃ তার জন্যেই প্রত্যেক স্টেশনেই গাড়ী ছাড়তে দেরী হচ্ছে। গোপেশ্বর বললেন, এখানেই আমাদের নামতে হবে। গঙ্গাপার হয়ে যাব জিয়াগঞ্জ স্টেশনে। রাত দশটায় ট্রেন যাবে লালগোলা ঘাট। তারপর ষ্টীমারে পদ্মা পার হয়ে গোদাগাড়ী ঘাট। তারপর ট্রেনে মালদা—। বাক্স বিছানা নিয়ে অভয় নেমে পড়ল। কুলির মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে অভয় চারদিক তাকাতে লাগল। কাছেই গঙ্গা। গঙ্গার বিস্তার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ঢেউ নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে গঙ্গার মাঝে চড়া পড়ে গেছে। অভয় ভাবল, গঙ্গার একি বিশ্রী অবস্থা। শোনা গেল চোত, বোশেখ মাসে লোকে নাকি হেঁটে গঙ্গা পার হয়। অভয় অবাক হয়ে গেল। তার দেশে গঙ্গার যে চেহারা দেখেছে, তার সঙ্গে এ গঙ্গার চেহারার কোন মিল নেই। ওপারে দেখা যাচ্ছে কালী বাড়ী, তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়ার গাড়ী। নৌকা ঘাটে ভিড়তেই গাড়ীর গাড়োয়ানরা দলবদ্ধভাবে ছুটে এল। কুলির মাথা থেকে হেঁচকা টানে মাল নিয়ে নিজ নিজ গাড়ীর মাথায় তুলতে লাগল। একটা হৈ চৈ বকাবকির মধ্যে গাড়ী চলতে সুরু করল। প্রতিদিনই এই অবস্থা—

অভয় অবাক হয়ে সব দেখতে লাগল। পুরাণো শহর—কোথাও জঙ্গল ভাঙ্গাবাড়ী। শহরের রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ী চলতে লাগল। খোয়া ওঠা ভগ্নপ্রায় রাস্তায় গাড়ী দুলতে দুলতে চলছে। ভয় হয় গাড়ী না কাৎ হয়ে পড়ে যায়। অভয় আশ্চর্য্য হয়। এটা কি শহর। শহরের এই অবস্থা।

সেই রাত সাড়ে দশটায় ট্রেণ। এখনও অনেক সময়। স্টেশনে গাড়ী থামতেই যাত্রীরা গাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে নেমে এল। আর তাড়া নেই। ভীড় ঠেলাঠেলি নেই। স্টেশনের একপাশে বেশ ফাঁকা জায়গায় গোপেশ্বর সতরঞ্চি পেতে নিজের ব্যাগ, অভয়ের ছোট ট্রাঙ্কটি সাজিয়ে রাখলেন। সামান্য জিনিষপত্র। নিজের ব্যাগ থেকে ছোট একটা ঘটি আর গামছা বের করে বললেন, ওই জল রয়েছে, বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে এস।

গোপেশ্বরের তামাক খাওয়া অভ্যাস। নিজের ব্যাগের ভেতরে টিনের লম্বা কৌটাতেই সব আছে। ছোট্ট একটি হুঁকো, তামাক টিকে দেশলাই সব বের করে, হুঁকোয় জল ফিরিয়ে, তামাক, সাজলেন, গোপেশ্বর। অভয় তখন ঘুরে ফিরে চারদিক দেখছে। শহরের একেবারে একপ্রান্তে রেলস্টেশন। টিম টিম করে গোটাকয় কেরোসিনের আলো জ্বলছে। ষ্টেশন ঘরের ভেতর বড়বাবু টেবিলের ওপর মস্তবড় গোটাকতক খাতা মেলে হিসেবপত্র করছেন। কুলিরা দু একজন এদিক ওদিক ঘোরাফিরি করছে। যাত্রীরা কেউ শুয়ে, কেউ বসে গল্প করছে—তামাক খাচ্ছে। ওধারটায় ঘন জঙ্গল—গাছের মাথায় টিপ টিপ করে জোনাকীপোকা জ্বলছে। ষ্টেশনের চারদিক তার দিয়ে ঘেরা, কামিনী ফুলের ঝাড় সমস্তটা ঘিরে রয়েছে। ডালপালাগুলো সমান করে কাটা—ঠিক যেন গাছের একটা পাঁচীর। গোপেশ্বর ডাকলেন—খোকা এখানটায় এসে বস্। দোকানে চা বিক্রি হচ্ছে। চাট্টি চিড়ে, মুড়ি, বাতাসা আর জল নিয়ে আসি। গোপেশ্বর উঠে গেলেন। অভয় সতরঞ্চির ওপর এসে বসল। বেশ অল্প অল্প ঠাণ্ডা আর শীত করছে। গায়ের চাদরটা মাথায় গায়ে দিয়ে অভয় বসে রইল। বার বার মনে পড়ছে বাড়ীর কথা। এখন মা কি করছেন। নিশ্চয়ই খোকন, গীতা, রাতের খাওয়া শেষ করে ওরা ঘুমুচ্ছে। সমস্তদিন ওরা খেলা করে, হুটোপুটি

করে—সন্ধ্যে হলেই আর বলতে পারে না। এখন মায়ের কাজকর্ম আর কি? সকাল সকাল গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে, গরু বাছুরকে খড় ফ্যান দিয়ে দিয়েছেন। মায়েরও খাওয়া দাওয়া শেষ। কিন্তু আজ কি মায়ের চোখে ঘুম আসবে। গীতা, খোকনের গায়ে হাত দিয়ে, হয়ত মা চুপ করে বিছানায় বসে আছেন। বসে বসে ভাবছেন, খোকা আমার কতদূর গেল। অভয় আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কাল ছিল সে বাড়ীতে, আর আজ এই অপরিচিত জায়গায় অন্ধকারে বসে রয়েছে খোলা একটা জায়গায়। এখানে কোন চেনা লোক নেই—। অপরিচিত জগৎ, অপরিচিত স্থান, অচেনা লোকজন। আবার আর কিছুক্ষণ পর ছেড়ে যাবে এই জায়গা। পড়ে থাকবে এই স্বল্পক্ষণের পরিচিত জায়গা—এই ষ্টেশন, এই সব। অভয় অবাক হয়—অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়। মানুষের জীবনটা কী অদ্ভুত আর কী আশ্চর্য্য—

—খোকা ও খোকা—। কে ডাকছে? মা—মা—না গোপেশ্বর এসেছেন। হাতে মাটির গেলাস।

—ধর বাবা ধর। চা খেয়ে এলাম—আগে তোর চা ধর, সাবধান খুব গরম। যে ঠাণ্ডা পড়েছে আগে গরম গরম চা-টা খা। মুড়ি, মুড়কী, বাতাসা নিয়ে এলাম। ষ্টেশন কিনা তাই খুব আক্রা। দু আনার মুড়ি-মুড়কী দিয়েছে কত কটা। গাঁয়ে হলে এক ধামা পাওয়া যেত। আর এই চার পয়সার বাতাসা মাত্র চব্বিশ খানা দিয়েছে—

অভয় সবিস্ময়ে বলল, মাত্র চব্বিশ খানা। আর এই ছোট ছোট। দেশের শ্রীবাস কাকার দোকানে বড় বড় বাতাসাই দেড় পয়সায় আটখানা। এই বাতাসার অন্ততঃ আটগুণ বড়। শহরে জিনিষপত্র কি আক্রা। মুড়ি চিবোতে চিবোতে গোপেশ্বর বললেন, গরম দুধ বিক্রী হচ্ছে। বলল, কিনা জাল দেওয়া দুধ একসের চার আনা। কি অসম্ভব দাম সব—। আরে বাপু দিয়েছিস্ তো সেরে একপোয়া জল—। তাই চার আনা সের। আর আমাদের তিন পয়সা সের দুধ—। আর দুধ কি যেন বটের আটা—

অভয় বলল, বাবা, তুমি আধসের গরম দুধ খাও। দুধ খাওয়া তোমার অভ্যেস। তার ওপর এই ঠাণ্ডা রাত জাগা—। না—না—দুধ খেয়ে এস। গোটা রাত জাগা—গাড়ীর ধকল সহ্য করতে হ'বে—

—তা বটে বাবা। কিন্তু দু গণ্ডা পয়সা—কম কথা নয়।

—তা হোক। কি আর করবে—

গোপেশ্বর বললেন, মাটির ভাঁড়ে দেবে। দুজনে খাব—যাই নিয়ে আসি।

দুধ খাওয়ার পর, অভয়ের একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। বিছনার বাণ্ডিলটার ওপর মাথা হেলান দিয়ে একটু কাৎ হয়েছিল। সেই সময় এসেছিল ঘুম—কখন যে ঘুম এসেছিল তা জানতেও পারেনি। পা বুকের কাছে জড় সড় করে, মাথা-কান চাদর দিয়ে ঢেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একসময় গোপেশ্বরের ডাকে সচকিত হয়ে উঠল অভয়। ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল সে কোথায়? টিকিট ঘরের কাছে বিস্তর ঠেলাঠেলি। কে আগে টিকিট নেবে, তারই প্রতিযোগিতা চলছে। বকাবকি ও তর্কাতর্কি চলছে।

গোপেশ্বর বললেন, উঠে বস্ বাবা। গাড়ীর সময় হয়ে গিয়েছে।

—টিকিট—

—টিকিট আগেই কিনেছি। সেই অন্ধকার ষ্টেশন যেন সজাগ হয়ে উঠেছে। ষ্টেশনের নেভান সব আলো গুলি এখন জ্বলছে। ষ্টেশন ঘরের সেই নিরবতা আর নেই। টেবিলের ওপর মস্তবড় টেবিল ল্যাম্প দপ্ দপ্ করে জ্বলছে—। চোখে চশমা—টেকো মাথার ওপর কালো টুপি, গায়ে কোট দিয়ে ষ্টেশন্ মাষ্টার খট্ খট্ করে টিকিট দিচ্ছেন।

একজন বলছে—কি হে কি বুলছ—টিকিট লিলছ—। অভয় হাঁ করে ওদের এই কথা শুনতে থাকে। গোপেশ্বর বলেন, এরা সব ধুলিয়ানের লোক। ধুলিয়ানের এরা সব চাষীভুষি মুসলমান। ওদের কথাই ওই রকম।

কেন এদের কথা শোনেনি? দেশে যখন রথের মেলা হয়, ওরা আমের কলম বিক্রি করতে আসে। ফজলী আম নিয়ে আসে বিক্রী করতে।

হাঁ—হাঁ—। এবার অভয় মনে করতে পারছে। লুঙ্গি পরা বড় বড় দাড়ি—মাথায় কারুর কারুর সাদা ফুল পাতা আঁকা টুপি। কারুর মাথা নেড়া। ঠিকইতো—প্রতি বছর রথের মেলা—শ্রাবণ সংক্রান্তির মেলাতে এরাই তো আসে।

গোদাগাড়ীতে ট্রেণ থামতেই অভয় অবাক্ হয়ে যায়। এ কোথায় এসে ট্রেন থামল। সামনেই পদ্মা নদী ষ্টীমার থেকে গম্ভীরভাবে ভোঃ ভোঃ করে ষ্টীমারের বাঁশী বেজে উঠছে। রাতের অন্ধকারে পদ্মার বাতাসে ভেসে যাচ্ছে সেই সুগম্ভীর শব্দ। সার্চ্চলাইটের তীব্র আলোয় খান্ খান্ করে দিচ্ছে পদ্মার ওপারের অন্ধকারকে। সার্চ্চলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে পদ্মার গেরুয়া রংয়ের ঢেউ। ঢেউ উঠছে আর পড়ছে। যেন প্রকাণ্ড লোহার কড়াইয়ে দুধ উথলচ্ছে আর উথ্লুচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কত অজস্র পোকা কত রাত-চরা পাখী। সার্চ্চলাইটের আলো ঘুরে ঘুরে এদিক ওদিক পড়ছে।

কালো কালো গুড়ো পাথর চারদিকে স্তূপীকৃত। দাউ—দাউ—করে কাঁচা কয়লা জ্বলছে। কুলিরা শীত তাড়াবার জন্যে আগুন পোয়াচ্ছে—কয়লার সেই আলোয় চারদিক ভরে গেছে। পদ্মার ধারে, ষ্টীমার ঘাটের কাছে, সার সার খাবারের দোকান আর ভাতের হোটেল। ডাকাডাকি করছে দোকানীরা। আসুন বাবু আসুন—গরম লুচি—খাঁটি ঘিয়ের লুচি আট আনা সের। ওদিকে হোটেল ওয়ালারা হাঁকছে—হিন্দু হোটেল। মাত্র চার আনা করে। ভাত, দু রকম ডাল, আলু ভাজা, মাছ ভাজা, ইলসে মাছের ঝোল, মাছের ঝাল, ডিম ভাজা, মাছের টক্—কুমড়োর তরকারী—মাত্র চার আনা—। চার গণ্ডা পয়সায় পেটভরে খেয়ে যান।

গোদাগাড়ী ষ্টীমার ঘাটে দোকান পাট, খাবার আর ভাতের হোটেল।

গোপেশ্বর বললেন, অভয় ভাত খাবি না লুচি। আমি বলি লুচিই খা। হোটেলের ভাত তো। সত্যি ক জাতের সঙ্গে, পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে হ'বে। ও বেলার—ডাল তরকারী—এ বেলার সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। ওদের কি এঁটো কাঁটার বাছ বিচার আছে। আধসের লুচি নিই। তরকারী তো ফাউ দেবে। রসগোল্লা আধসের নেবে ছআনা এতেই হয়ে যাবে।

টিনের চেয়ারে বসলেন গোপেশ্বর—পাশে অভয় মস্ত বড় বড় লুচি। ছাঁচি কুমড়োর তরকারী শুধু হলুদ আর লংকা দিয়ে রান্না। কিন্তু খিদের মুখে তাই অমৃত। পদ্মার বাতাসে খিদে যেন চম্ চম্ করে লাগছে। অভয়ের ঠোঙ্গায় আরও লুচি দিয়ে দিলেন গোপেশ্বর। অভয় বলল—আর না। তুমি কি খাবে—

—এত কি খেতে পারি। এত মিষ্টি খাবনা বাবা। রাত জাগতে হ'বে। এ থেকে চারটে তুলে নে। জল না খেয়ে বরং চা খা—কি বলিস? অভয় খেতে খেতে চারদিকে তাকায়। ষ্টীমারে সে ইতিপূর্বে চড়ে নি। দূর থেকে গঙ্গায় ষ্টীমার যাচ্ছে—তাই দেখেছে। কিন্তু এত কাছ থেকে দেখেনি।

—চা দাও হে দুটো। গোপেশ্বর হাত ধুয়ে বিড়ি ধরালেন।

ষ্টীমার ছাড়তে তখনও দেরী। বাবার পেছন পেছন ওপরের ডেকে উঠে—একেবারে রেলিংয়ের ধারে, সতরঞ্চি বিছিয়ে বসলেন গোপেশ্বর। বেশ ঠাণ্ডা, বেশ শীতও করছে। কিন্তু অন্যত্র আর জায়গা নেই। চার দিকে লোকে লোকারণ্য। গোপেশ্বর বিলিতি কম্বল, বেশ করে সারা দেহে মুড়ে তামাক সাজতে বসলেন। বিড়ি খেয়ে ঠিক্ তামাকের নেশা হয়না। যাদের হুঁকোয় তামাক খাওয়া অভ্যেস, বিড়ি সিগারেট তাদের ভাল লাগে না। তামাক টানার মৌতাত—ও সুখ সে আলাদা বস্তু। তামাক খাওয়ার ভেতরও রকম ফের

আছে। উবু হয়ে বসে, দুহাতের মধ্যে কলকে রেখে বড়্ বড়্ করে কলকে টানার আরাম বোঝে একদল। হুঁকো আর—গড়গড়ায় তামাক খাওয়ার ভেতর তফাৎ আকাশ পাতাল। ও দুটীর আস্বাদ ও মৌতাত ও আনন্দের অনেক পার্থক্য আছে। পাঠক কখনও শীত কালের রাতে, সুকোমল শয্যায়, লেপ গায়ে টেনে গড়গড়া টেনেছেন কি? এর মত আনন্দ কি সিগারেট টেনে পাওয়া যায়? না তা যায় না। কিন্তু রাস্তা ঘাটে গড়গড়ায় তামাক খাওয়ার অসুবিধা বিস্তর। তাই বাধ্য হয়ে, লোকে বিড়ি সিগারেট টানে।

অভয় ইতিপূর্বে ষ্টীমারে চড়েনি। সে অবাক হয়ে যায়। চারদিকে ঘুরে ফিরে সে দেখতে থাকে। রেলিংএ ভর দিয়ে, ইঞ্জিন ঘর দেখে অবাক হয়ে যায়। খুব নীচে কত রকমের—যন্ত্রপাতি বন্ বন্ করে বড় বড় চাকা ঘুরছে। কেউ সেই চাকায় তেল দিচ্ছে—কেউ বা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে এক ঝুড়ি কয়লা নিয়ে, সেই পাতালপুরী থেকে অতি সরু সরু লোহার মইয়ের সরু সরু ডাণ্ডা বেয়ে ওপরে উঠে পদ্মার জলে পোড়া কয়লা ঢালছে। কেউ বা বয়লারে কয়লা দিচ্ছে। ভেতরের আগুন লাল বর্ণ কি আগুন কী তার উত্তাপ—অভয় অবাক হয়ে যায়। সব আশ্চর্য্য সবই বিস্ময়কর জিনিষ।

উপরের ডেকে চায়ের দোকান, পান, বিড়ি, খাবার, মুড়ি, মুড়কী, কলা, ডাব—সব পাওয়া যায়। এই সব দোকানীরা ষ্টীমারেই থাকে। অভয় ঘুরে ঘুরে সব দেখতে থাকে।

গোপেশ্বর বলেন, বাবা, খবর্দার রেলিংএর ধারে যেওনা—যেন ঝুঁকবে না।

ষ্টীমার চলছে সার্চলাইটের আলো পড়ছে কখন ডাঙ্গায় কখনও সামনে বাঁয়ে। পেছনের চাকার আঘাতে, পদ্মার জল কেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ হয়ে, অনন্ত জলরাশির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। একটা তরঙ্গায়িত রেখা টেনে টেনে ষ্টীমার ছুটে চলছে উজিয়ে। এখনও উজিয়ে চলছে—আরও উজিয়ে তখন মাঝামাঝি পাড়ি দেবে। মাঝে-মাঝে জল কত কোথাও লম্বাচর—। কোথাও নানা বাঁক—। এই বাঁক চর পাশ কেটে এঁকে বেঁকে ষ্টীমার চলছে—। দূর হতে অন্য ষ্টীমারের বাঁশীর শব্দ আলো দেখা যাচ্ছে। গম্ভীর শব্দ হচ্ছে—ভোঁ—ও—। একটানা শব্দ—একটা।

গোপেশ্বর তামাক সাজতেই একটি অতি শীর্ণকায় ব্যক্তি নিকটে এসে বসল। গোপেশ্বর জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই লোকটি বলল, আজ্ঞে মহাশয় আমি ব্রাহ্মণ—কুলিন ব্রাহ্মণ। মহাশয়ের তামাক সেবা দেখে, —হেঃ—হেঃ—

—ও তামাক খাবেন। কিন্তু হুঁকো আছে কি?

—হুঁকো কি দরকার—এই এতেই হ'বে। লোকটি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে, ঠিক একটা পাইপের মত করে, তাতে কলকে বসিয়ে, তামাক টানতে লাগল। নিঃশব্দে হুস্ হুস্ করে, অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হ'বে।

—মালদা যাচ্ছি—আমার দাদার কাছে।

—বেশ বেশ। আমিও প্রায় আপনার সঙ্গেই যাব। যাব মুচিয়া। ওখানেই ঘর বাড়ী করে, ছোট খাট একটা দোকান দিয়েছি। আগে বাড়া ছিল কাঁটোয়ার কাছে বোস পাড়া। বোস পাড়ার চক্রবর্ত্তীদের নাম শোনেন নি? আমার ঠাকুর্দ্দা ছিলেন তারিণী চক্রবর্ত্তী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়। মস্ত পণ্ডিত বহু শিষ্য জজমান ছিল। আমার পিতা স্বর্গীয় কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তিনিও মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। তবে ঐ যে বলে কপাল অদৃষ্ট। অমন বংশে অমন পণ্ডিত বংশে জন্ম হয়েও আমার কোন বিদ্যে হ'ল না। বুঝলেন সবই কপাল। আজ তাই মুদীখানা খুলে বসেছি।

—ন্যাকামী রাস্তাঘাটেও বড় বড় কথা—। গোপেশ্বর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, একটু দূরে একখানা ভাল-সতরঞ্চির উপর বসে আছেন একটি স্থূলাঙ্গী মহিলা। মহিলার মুখখানি গোল সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর চিহ্ন। মহিলাটির সামনে বেশ বড় সড় পানের ডাবর। মুখের ভিতর সম্ভবতঃ চার পাঁচটি পান ইতিপূর্বে চলে গিয়েছে। বাঁ হাতে

খানিকটা জর্দা ঢেলে মুখের ভেতর চালান দিয়ে ভদ্রমহিলা কি রকম কট্‌মট্‌ চোখে চক্রবর্ত্তীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চক্রবর্ত্তী নীচু গলায় বললেন, উনি আমার পরিবার। বুঝলেন কিনা, উনি ভারী সৌখীন—কিন্তু ভারী রগচটা বদমেজাজী। চক্রবর্ত্তী অস্ফুকণ্ঠে স্ত্রীর গুণবর্ণনা করতে করতে তামাক টানেন আর আড়চোখে পরিবারকে দেখেন। গোপেশ্বরকে হাতে কলকে দিয়ে চক্রবর্ত্তী বললেন—নাঃ বেশ যুৎ হল না। কেমন যেন পানসে—এতে বেশ নেশা হয় না। হেঁঃ—হেঁঃ, দারুণ শীতের রাত। ঈয়ে, মানে বড় তামাক চলে নাকি? চক্রবর্ত্তী পকেট থেকে গাঁজা আর গাঁজার কলকি বের করলেন।—না—ওসব খাইনে—

হেঃ হেঃ—তা বেশ—তা বেশ। কিন্তু এটাতে শরীরটা চাঙ্গা রাখে। তা যখন মহাশয়ের অভ্যেস নেই তখন আর কি কথা। তা মহাশয়ের কি করা হয়।

—এই যৎসামান্ত চাষবাস আছে—তাতেই—

—ভাল। খুব ভাল। আমারও—মহাশয় কিছু জমি জমা ছিল। কিন্তু সব গেল। কি আর বলব—সব এই ললাটের লেখন। ওই যে বলে, মারে কেষ্ট রাখে কে, আর রাখে কেষ্ট মারে কে? কিন্তু আমাকে মশাই কেষ্টও মেরেছে—আর মানুষেও মেরেছে। নইলে, শেষে কিনা ঐ মুটিয়াতে দোকান খুলে বসি। দেশে জমিজমা ছিল, খাসা সংসার ধর্ম করছিলাম। প্রথম পক্ষের পরিবার খাসা লক্ষ্মী ছিলেন, হঠাৎ কি এক রোগে, ডাক্তার ডাকতে তর সইল না। বউটা গেল টেঁসে। করলাম ফের দ্বিতীয় পক্ষ, তখন মশাই হাতে দু-পয়সা ছিল, আর চেহারাটাও ছিল ভারী সুন্দর। এখন আমার এই চেহারা দেখে মনে করবেন না চিরকাল আমি এমনি খয়া জরা ছিলাম। তা নয় দিব্বী নধর গড়ন ছিল দেহে ঐ যে কী বলে লাবণ্য ছিল মহাশয়। বোসপাড়ার প্রাতঃস্মরণীয় বংশের ছেলে আমি। আজ এই নটবর চক্রবর্ত্তীকে, সেদিনের সেই যৌবনকালের নটবর চক্রবর্ত্তীকে এক ভাববেন না।

ক্রমশঃ

প্রকল্প রূপায়নে ওপার বাংলার বর্ত্তমান চিত্রের অবশিষ্টাংশ

চিত্তরঞ্জন দাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর

নাটকের সংলাপ নিছক নাটকীয় ও অবাস্তব সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন উহার হুবহু মিল বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন উহাকে প্রকৃত বাস্তবধর্মী বলেই গণ্য করা উচিৎ। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত নাটকের সংলাপটি যে শুধু নাটকীয়ই নয়, সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে পূর্ব্ব বাংলার বর্ত্তমান নারকীয় চিত্র দর্শন করে। অতএব ইহা একেবারেই অবাস্তব অথবা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতের বাংলা ধ্বংসের প্রকল্প রূপায়নেরই কঠোর দায়িত্ব গ্রহণ করছে পাক্ বা পাঞ্জাবী সর্দার ইয়াহিয়া খান। এবং পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান গণ-হত্যা, গণ-বিতাড়ন উক্ত প্রকল্পেরই সার্থক রূপায়ণ। বলাবাহুল্য অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতজী অর্থাৎ ভাস্কর পণ্ডিতের সুমহান প্রকল্প ও নৃশংস অত্যাচারের ফলে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছিল তৎকালীন বাংলা ও বাঙ্গালী। অতঃপর বিংশশতাব্দীর পণ্ডিতজী অর্থাৎ জহর পণ্ডিতের আমলেও মহাকাল দেশ বিভাগের ফলে সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ এবং ধ্বংস হয়েছিল বাংলা ও বাঙ্গালী এবং ধ্বংসের অবশিষ্টাংশের পূর্ণাঙ্গ রূপদানে সর্ব্বতোভাবে সক্রিয় হয়েছে বর্ত্তমান পাক-পণ্ডিত অর্থাৎ বর্ব্বর অধিনায়ক কুখ্যাত ইয়াহিয়া খাঁ।

বাংলা ধ্বংসের প্রকল্প রূপায়ণে পূর্ব্ববঙ্গে অভূতপূর্ব্ব নৃশংস অত্যাচারের বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছে বর্ব্বর পাক সেনাবাহিনী। সে বিষয়ে বিশ্ববাসীও সম্ভবতঃ এখন সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী। প্রাচীন ভারতে বহুসংখ্যক সশস্ত্র মুসলিম অভিযান ও অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম পাকচমূদের বর্তমান সশস্ত্র অভিযান ও নৃশংস অত্যাচার সে তুলনায় বহুগুণে ধ্বংসাত্মক। যে কোন বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিংবা হতাহতের অগণিত সংখ্যাকেও ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে ইয়াহিয়ার বর্ব্বরতা ও পাশবিক অত্যাচার। বলাবাহুল্য উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত অপর একটি সুমহান উদ্দেশ্যও ইয়াহিয়ার থাকা বর্তমান ক্ষেত্রে একেবারে অস্বাভাবিক কিংবা অবিশ্বাস্য নয়। এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই পূর্ব্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী নিধন, বিতাড়ন ও পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছে ইয়াহিয়া। কারণ, বর্ব্বর এখন বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে যে পূর্ব্ববাংলার সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীকে আর কোনমতেই দাবিয়ে রেখে শাসন বা শোষণ করা পশ্চিম পাকিস্থানী শাসকদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে নৃশংস হত্যা ও গণবিতাড়নের মাধ্যমে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাংলার চিরস্থায়ী অধিবাসীদের যথাসম্ভব

নিশ্চিহ্ন এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী ঘর বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে সেখানে বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী আপাততঃ সুবৃহৎ সড়ক মাঠময়দান, শস্যক্ষেত্রের রূপদানে সক্রিয় হয়েছে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনী, যাতে করে ভবিষ্যতে আর কখনও উহার কোন দাবীদার কিংবা সাক্ষ্য প্রমাণের চিহ্নও না থাকে। অতঃপর উক্ত দখলীকৃত বিস্তৃত অঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তানী মরু ও পার্ব্বত্যাঞ্চলবাসী খান সাহেবদের যথাসময়ে আমদানী করে তাদের স্থায়ী বসবাসের একটা সুবন্দোবস্ত করে দেবার প্রকল্প বা চক্রান্তও নিশ্চয়ই পাক বর্ব্বরের মগজে আছে। কারণ পূর্ব্ববঙ্গে পাকপ্রশাসন কায়েম রাখতে হলে শূন্য ময়দানে উহা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং নিহত ও বিতাড়িত হতভাগ্য বাঙ্গালীর শূন্যস্থান পূর্ণ করতে সর্ব্বাগ্রে তাদের প্রয়োজন হবে বিপুল সংখ্যক নূতন নাগরিকের পুনর্বাসনের প্রকল্প রূপায়ণ। তাই সে ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই তাদের পশ্চিম পাকিস্থানী জ্ঞাতি ভাইদের অগ্রাধিকার প্রদান করবে, যার ফলে তাদের পক্ষে অধিকতর সহজ হবে পূর্ব্বঙ্গে জঙ্গী শাসন পুনঃপ্রবর্তন ও কায়েম করা এবং স্বভাবতঃই ক্রমশঃ সেখানে গড়ে উঠবে দ্বিতীয় ইস্‌লামাবাদ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ইসলাম্

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সহস্র বছর পূর্ব্বেও ভারত ছিল একমাত্র হিন্দুদেরই বাসস্থান এবং উক্ত কারণেই ভারতের অপরনাম হিন্দুস্থান। ইস্‌লামের নামগন্ধও তখন এদেশে ছিল না কিংবা থাকলেও উহা একেবারে উল্লেখযোগ্য নয়। স্বাধীন সার্ব্বভৌম হিন্দুর দেশ, সুতরাং হিন্দুস্থানে তখন একমাত্র হিন্দুর ধর্ম, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি প্রচলিত থাকাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং প্রকৃতপক্ষে ছিলও তাই। অবশ্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও যে ব্যক্তিগত, দলগত কিংবা প্রদেশ-ভিত্তিক প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, এরূপ ধারণা করবারও কোন হেতু নেই। দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার এখনও যেমন চলছে, তখনও অনুরূপভাবেই চলতো। জাতীয় সংহতির কোন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই। ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্য ছিল প্রচুর এবং কেবলমাত্র পরাক্রমশীল ব্যক্তিরাই রাজ্য দখল ও প্রশাসকের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ক্ষমতার লোভে সৃষ্ট হ'ত পরস্পর বিরোধী মনোভাব, প্রবল শত্রুতা, সশস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতি যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ, যেমন বর্ত্তমান ভারতেও প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হচ্ছে অনুরূপ চিত্র। সুতরাং কালক্রমে ভারতে হিন্দুরাজ্যের পতনের মূল কারণও হয়েছিল হিন্দুদের আত্মঘাতী সংগ্রাম। বলাবাহুল্য হিন্দুর আত্মকলহ ও দুবলতার সুযোগ গ্রহণ করেই পরবর্তীকালে সম্ভব হয়েছিল ভারতে তৎকালীন অনুপ্রবেশ বা আক্রমনকারী বিদেশী মুসলমানের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল অথবা রাজ্য দখল করে ক্রমশঃ ইস্‌লামিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং উহার সম্প্রসারণ করা।

ভারতে মুসলিম অভিযান

বর্ত্তমান বাংলাদেশ আক্রমনকারী ইয়াহিয়ার পূর্ব্বসূরী অর্থাৎ যাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমন ও অত্যাচারের ফলে ভারতবর্ষ হয়েছিল বিজিত এবং সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশূন্য, তাদের কতিপয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এস্থলে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ একান্ত প্রয়োজন বোধ করছি।

মহম্মদ ইব্‌ন্ কাশিম

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতের সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চল সর্ব্বপ্রথম আক্রান্ত হয়েছিল, আরবের মুসলমানগণ কর্তৃক। উক্ত অঞ্চলের তৎকালীন হিন্দুরাজা ছিলেন দাহির। অতি সামান্য ঘটনার সূত্রে আরবের শাসনকর্তা হজ্জাজ দাহিরের বিরুদ্ধে দুবার নিস্ফল অভিযানের পর, তৃতীয় অভিযানের নেতা হিসাবে পাঠালেন মহম্মদ-ইবন্-কাশিমকে। কাশিম দাহিরকে পরাজিত ক'রে দেবল বন্দর অধিকার করেন এবং

পুনরায় রাওর নামক স্থানে যুদ্ধে দ্বিতীয়বার দাহিরকে পরাস্ত করে, সমগ্র সিন্ধুদেশ আরব অধিকার ভুক্ত করেন। কিন্তু আরবদের মধ্যে শিয়া-সুন্নী ধর্ম-দ্বন্দ্বে ক্রমশঃ সিন্ধু উপত্যকার আরবশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ায়, তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোহম্মদ ঘুরীর হস্তে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকায় আরব শক্তি বা শাসনের শেষ চিহ্ন ও বিলুপ্ত হয়েছিল।

সুলতান সবুক্তিগীন ও মামুদ

খ্রীঃ দশম শতকে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন হিন্দু রাজা জয়পাল। তাঁর রাজ্যের সীমান্তদেশে অবস্থিত গজনীর সুলতান সবুক্তিগীন কর্ত্তৃক পাঞ্জাব দুবার আক্রান্ত হয়। কিন্তু জয়পালের রাজ্য থেকে প্রভুত অর্থ ও বহু লোককে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া ভিন্ন, সবুক্তিগীন রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করতে সমর্থ হন নি। অবশ্য তাঁর দ্বিতীয়বার আক্রমণকালে তিনি কাবুল ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ অধিকার করেছিলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলতান মামুদ সিংহাসন আরোহন করিবার অব্যবহিত পরেই, পিতৃশত্রু জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত আক্রমণই ভারতে সুলতান মামুদের প্রথম অভিযান এবং তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর রাজত্বকালে মোট সপ্তদশ বার (মতান্তরে ত্রয়োদশ বার) ভারত আক্রমণ করে ভারতের তৎকালীন প্রভুত ধনসম্পদ, মণি-মুক্তা, হীরা জহরৎ লুণ্ঠন করে গজনীর রাজকোষ ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের অতুলনীয় ধনসম্পত্তি ও হিন্দু নারী লুণ্ঠন করা, হিন্দু নিধন, দেব মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করা, যদ্বারা তিনি ভারতের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছিলেন। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের বিশেষ লোভ বা প্রচেষ্টা তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। তবে তাঁর উক্ত মহান উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বহু যুদ্ধ তাঁকে করতে হয়েছিল, তৎকালীন ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে। বিজিত রাজ্যগুলির শাসনভার সুলতান মামুদ স্বভাবতই তখন তাঁর বিশ্বস্ত মুসলমান কর্মচারীদের উপর অর্পণ করেছিলেন। সুলতান মামুদের বহুবার ভারত আক্রমনই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সর্ব্বশেষ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০২৭ খ্রীঃ অব্দে।

মোহম্মদ ঘুরী

অতঃপর ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ ঘুরী মামুদ অধিকৃত মুলতান এবং ক্রমশঃ পেশোয়ার, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলগুলি দখল করেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে সম্মিলিত হিন্দু রাজাদের পরাজিত করে তাঁদের রাজ্যগুলিও জয় করেন। উক্ত যুদ্ধেই পৃথিরাজ ধৃত ও নিহত হয়েছিলেন। মোহম্মদ ঘুরী তখন নব বিজিত রাজ্যগুলির শাসনভার কুতুবউদ্দিন নামে তাঁরই জনৈক ক্রীতদাসের উপর ন্যস্ত করে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন। দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল কুতুবের রাজধানী এবং প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই শুরু হ'ল ভারতে ইস্‌লামিক রাষ্ট্র। সুতরাং মোহম্মদ ঘুরীই ছিলেন ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি নির্মাতা।

তৈমুরলঙ্গ

অতঃপর ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে "লঙ্গ" বা "খোড়া" তৈমুর লঙ্গ তুঘলক বংশের সুলতান মামুদ শাহ এর রাজত্বকালে ভারত আক্রমণ করেন। মামুদকে পরাস্ত করে মাত্র তিনমাস তাঁর দিল্লী অবস্থানকালে অসংখ্য অধিবাসীকে হত্যা এবং তাদের প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন। তৈমুরলঙ্গ ভারতে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করে গিয়েছিলেন খিজির খাঁকে।

বাবর

১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের শাসনকর্ত্তা বাবর সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করে লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু প্রবল বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে, তিনি কাবুলে ফিরে যেতে বাধ্য হন। পরের বছর অর্থাৎ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে

াবুল থেকে কামান, বন্দুক ও বার হাজার সৈন্য নিয়ে ল্লী দখলের নিমিত্ত অগ্রসর হ'ন এবং পানিপথের থম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ও নিহত করে দল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। সুতরাং ভারতে মুঘল াজত্বের সূচনা করলেন তখন বাবর। কিন্তু তিনি াত্র ৪৭ বৎসর বয়সে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত য়েছিলেন।

নাদির শাহ

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যাধিপতি নাদির শাহ কাবুল, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চল জয় ও লুণ্ঠন করে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার শর্ত্তে নাদির শাহের সঙ্গে সন্ধি করেন। উক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের নিমিত্ত নাদির শাহের দিল্লীতে অবস্থানকালে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব রটানর ফলে, নাদিরের নয়শত সৈন্য সেখানে নিহত হয়। উহাতে নাদির ক্ষিপ্ত হয়ে দিল্লীবাসীদের নির্বিচারে হত্যার আদেশ দেন। ফলে দীর্ঘকাল ধরে নরহত্যা, অবাধ লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি নারকীয় ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর দিল্লীর বাদশাহের বহু মিনতির ফলে লুণ্ঠিত ধন দৌলত নিয়ে নাদীর শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎকালীন তাঁর লুণ্ঠিত অর্থের পরিমাণ ছিল পনের কোটি টাকা, অসংখ্য মণি মানিক্য, ময়ুর সিংহাসন ও কোহিনুর মণি প্রভৃতি এবং তৎসঙ্গে তিনি সহস্র সহস্র ঘোড়া, উটও নিয়ে গিয়েছিলেন। তদুপরি সিন্ধুনদের পশ্চিম অঞ্চলটি তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। সুতরাং নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীর বাদশাহ তখন সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশূন্য হওয়ার ফলে ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি হ'য়েছিল।

ইয়াহিয়া খাঁ

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে মার্চ বাংলাদেশ আক্রমন করলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁ এবং অদ্যাবধি সেই চিত্রই নিয়মিত চলছে। ইয়াহিয়া নাকি উক্ত নাদির শাহের বংশধর, অতএব বাংলাদেশে তার পাশবিক অত্যাচার নাদির শাহী অত্যাচারের তুলনায় কোন অংশে কম হওয়ার কথা নয়, বরং অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ নাদির শাহের আমলের অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় ইয়াহিয়ার অস্ত্রসম্ভার প্রচুর ও যথেষ্ট উন্নত ধরণের। সুতরাং বাংলাদেশ ধ্বংসের প্রকল্প রূপায়ণে ইয়াহিয়া যে তার পূর্ব্ব সূরীদের এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নায়ক হিটলারকেও অতিক্রম করে, বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করবে, তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই। অবশ্য উক্ত প্রকল্প রূপায়নে যথাসময়ে বিশ্ববাসীর নিকট থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে, ইয়াহিয়ার পক্ষে কখনও সম্ভব হ'ত না বাংলাদেশে এবম্বিধ নারকীয় চিত্র প্রদর্শন করা।

ভারতীয় মুসলীম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি যে সহস্র বছর পূর্ব্বেও ভারতে ইসলামের উৎপত্তি বা অবস্থিতির কোন সঠিক প্রমাণ ইতিহাসে নেই। পরবর্ত্তীকালে উক্ত বৈদেশিক মুসলমান অভিযাত্রী অথবা অনুপ্রবেশকারীদের বিশেষতঃ গজনীর সুলতান মামুদ ও মোহম্মদ ঘুরীর পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণের ফলে ভারতের ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু রাজ্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। সুতরাং সেই সমস্ত বিজিত রাজ্যগুলির কায়েমী দখলের নিমিত্ত প্রয়োজন হয়েছিল তাদের সর্ব্বত্র স্বজাতি, স্বধর্মীদের স্থায়ী বসবাসের সুবন্দোবস্ত করা। কিন্তু উক্ত বিদেশাগত মুসলিম অভিযাত্রীদের সঙ্গে কোন নারী অভিযাত্রী ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল বলে ইতিহাসে কোন নজীর নেই বা থাকাও সম্ভব নয়। তাহ'লে কি করে সম্ভব হয়েছিল উক্ত মুষ্টিমেয় পররাজ্য লোভী বিদেশী মুসলমানের পক্ষে ভারতে মুসলিম সম্প্রদায় সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করা? সুতরাং ইহা একেবারেই অত্যুক্তি বা অযৌক্তিক নয় যে মুসলিম আক্রমণের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য যখন হিন্দুনারী লুণ্ঠন করা এবং অদ্যাবধি ও যা বিশেষভাবে প্রচলিত, তখন উক্ত

আক্রমণকালে সহস্র সহস্র হিন্দুনারী লুণ্ঠন করে তাদের সেই শূন্য স্থান তারা পূরণ করেছে এবং সেই লুণ্ঠিত হতভাগ্য হিন্দুনারীদের সঙ্গে ইচ্ছা কিম্বা অনিচ্ছাকৃত সহবাস বা সহ মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট জাতকের দ্বারা ক্রমশঃ এদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও সম্প্রসারণ হয়েছে। তদ্ভিন্ন অনুগত হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশকে তারা জোরপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছে। সুতরাং এইভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল ভারতে মুস্লিম সম্প্রদায় এবং কালক্রমে যারা সমগ্র হিন্দুস্থান অধিকার করে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছিলেন।

অতএব উপরোক্ত কারণে ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা রক্তের সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে সম্পর্ক যতই আত্মিক কিম্বা ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, ভারতের সংখ্যালঘু মুস্লিম সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি চিরকালই একটা সহজাত বিদ্বেষ অথবা বিরোধের মনোভাব পোষণ করে আসছে। তাদের আজন্ম ধারণা বা বিশ্বাস হিন্দুজাতি বিধর্মী কাফের ইসলামের চিরশত্রু। অবশ্য উক্ত ধারণা বা বিশ্বাস মুস্লিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছে কাঠমোল্লা এবং মৌলবীগণ। একমাত্র তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামীর নিমিত্তই সৃষ্ট হয়েছে ভারতে চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও বিবাদ। বলাবাহুল্য উক্ত বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করেই পরবর্ত্তীকালে সম্ভব হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের পক্ষে প্রায় দু'শ বছর ভারতবর্ষ শাসন করা। এমনকি উক্ত বিবাদ কায়েম রাখবার জন্য, ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ড করে দুটি পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে গেছে প্রতিশোধপরায়ণ বিদায়ী শাসক ইংরেজ, যার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে আজ উভয় রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষকে।

স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া ও বাংলার মুক্তিফৌজ

রাজ্যলিপ্সা মানুষকে করে অমানুষ, উন্মাদ। তখন তাদের নিকট আর ধর্মাধর্ম ন্যায় অন্যায়ের কোন প্রশ্ন থাকে না। প্রয়োজনবোধে হিংস্র পশুর ন্যায় মানুষকে করে বিনাশ, সমাজ রাষ্ট্রকে করে ধ্বংস। একমাত্র রাজনৈতিক কারণেই দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব্ববাংলার অগণিত হিন্দু ইতিপূর্ব্বে হয়েছিল হতাহত, বিতাড়িত। পশ্চিম বাংলা এবং ভারতের অন্য প্রদেশে আশ্রয় পেয়েও অদ্যাবধি বহু হতভাগ্যের পক্ষেই সম্ভব হয়নি স্থায়ী পুনর্বাসন লাভ করা। তদুপরি ইয়াহিয়ার বর্তমান নৃশংস অত্যাচারের ফলে পূর্ব্ব বাংলার সংখ্যালঘু বাঙ্গালী হিন্দুদের কোন অস্তিত্বই যে আর সেখানে থাকবে না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। অবশ্য ক্ষমতার লোভে নরপশু ইয়াহিয়ার নিকট এখন আর স্বধর্মী বিধর্মীর কোন প্রশ্ন নেই। এখন উহা সম্পূর্ণ প্রদেশ ও ভাষা ভিত্তিক। সুতরাং পূর্ব্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী যারা ইয়াহিয়ার স্বৈরশাসন ও শোষণ মুক্ত হ'তে চান, সেই মুক্তি সংগ্রামীদের সঙ্গেই পাক চমুদের বর্তমান সংগ্রাম। বেসামরিক নিরস্ত্র মানুষের উপর সশস্ত্র সেনা বাহিনীর নিষ্ঠুর অত্যাচার। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার গণহত্যা ও গণবিতাড়ণের অমর কীর্ত্তি বিশ্ব ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসঙ্গে নিরস্ত্র বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধার সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও প্রচণ্ড সংগ্রাম, বাঙ্গালীর অসীম সাহস ও অসাধারণ বীরত্বের শ্রেষ্ঠনিদর্শন স্বরূপ উক্ত ইতিহাসে যথাস্থান লাভ করাও একেবারে অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। বিশ্ব ইতিহাসে অদ্যাবধি এবম্বিধ বীরত্ব ও সাহসের কোন নজীর সৃষ্ট বা দৃষ্ট হয়নি

বাংলাদেশের বর্ত্তমান চিত্রে ভারতের ভূমিকা

পূর্ব্ববাংলায় বর্ত্তমান ভয়াবহ চিত্র শুরু হতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন "পূর্ব্ব বাংলার ব্যাপারে ভারত নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। সর্ব্বাধিক সম্ভাব্য সাহায্য ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদান করবে।" বলা বাহুল্য প্রধানমন্ত্রীর উক্ত আশ্বাসবাণী পূর্ব্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে এক নব চেতনা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, অসীম সাহস ও অভূতপূর্ব্ব আশার সঞ্চার করেছিল। তাই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পূর্ব্ব বাংলার সহস্র সহস্র মুক্তি সংগ্রামী বিনা দ্বিধায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করে

যুক্ত হলেন আক্রমনকারী পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে। ফলে হ'ল লক্ষ লক্ষ হতাহত, লক্ষ লক্ষ বিতাড়িত, যার মোট সংখ্যা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। তবু মুক্তিফৌজের মনোবল অটুট, হয় জয়, নয় মৃত্যু।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আশ্বাস-বাণীর অব্যবহিত পরেই মুক্তিসংগ্রামীগণ গঠন ও ঘোষণা করলেন স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম বাংলাদেশ সরকার। উক্ত সরকারের আশু স্বীকৃতি লাভের আশায় সুরু করলেন তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট আবেদন নিবেদন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন রাষ্ট্রই এমনকি ভারতও দিল না উক্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি। যার ফলে উক্ত নবগঠিত সরকার অদ্যাবধি সমর্থ হ'ল না বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র ক্রয় কিম্বা সংগ্রহ করে পাক্ চমূদের ব্যাপক গণহত্যা ও গণবিতাড়ন বন্ধ করতে। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত বহুলক্ষ শরণার্থীর চাপে বাংলা দেশের এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের কতিপয় রাজ্য অর্থ নৈতিক এবং বিভিন্ন কারণে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত। উক্ত বিপুল শরণার্থী পূর্ব্ববঙ্গে কোন দিন ফিরে যাবে, এখনও এ আশা যারা করেন, তারা মুর্খের স্বর্গেই বাস করছেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট পূর্ব্ব বাংলার অগণিত উদ্বাস্তুদের কারোর পক্ষেই সম্ভব হয়নি পূর্ব্ববঙ্গে ফিরে যাওয়া। সুতরাং বর্ত্তমান উদ্বাস্তুদেরও যে ঠিক ঐ একই হাল হবে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।

বিশ্ববিবেক ও মানবিকতা

পূর্ব্ব বাংলার ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব-বিবেক ও মানবিকতার জন্য বিভিন্ন দেশে যোগ্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে বহু আবেদন নিবেদন করা সত্বেও অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক ফল লাভে সমর্থ হন নি। বিশ্ববাসীর কোন বিবেক বা মানবিকতা থাকলে বিশ্ব ধ্বংসের নিমিত্ত কখনও এটম বোমা তৈরী হত না। কিম্বা পূর্ব্ব বাংলার বর্ত্তমান বীভৎস চিত্র অবাধে প্রদর্শিত হতে পারত না। সকলেই নীরব দর্শক। তদ্ভিন্ন পাকিস্থান সৃষ্টির মূলে রয়েছে বিদেশীর স্বার্থ বিজড়িত। সুতরাং বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্থান বিনষ্ট করবার উদারতা কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রেরই সম্ভবত নেই। তাই তারা পূর্ব্ব বাংলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়। বরং পাকিস্থানের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে উক্ত রাষ্ট্রগুলি থাকবে সদা সচেষ্ট এবং সর্ব্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতা তাদের নিকট থেকে পাবে, অত্যাচারী পাকিস্থান সরকার।

একলা চলো রে

এমতাবস্থায়ে ভারত সরকারের উচিৎ একলা চলার নীতি গ্রহণ করা। কারণ এ দায় ভারত সরকারের, অন্য কোন রাষ্ট্রের নয়। অন্য রাষ্ট্র শুধু মৌখিক সহানুভূতিই প্রদর্শন করবে, বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি, সমর্থন বা সাহায্যের জন্য কেহই এগিয়ে আসবে না। সুতরাং ভারত সরকারের উচিৎ অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশ্ব রাষ্ট্রগুলির সমক্ষে গণতন্ত্র ও মানবিকতার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করা। নচেৎ উক্ত স্বীকৃতি ও সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদানে ভারত যত অধিক বিলম্ব করবে, পাক সরকারের পক্ষে তত বেশি সুবিধা হবে পূর্ব্ববাংলাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা, যার অবশ্যম্ভাবী কুফল পশ্চিম বাংলা তথা ভারতকেই বিশেষভাবে ভুগতে হবে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ববাংলা ধ্বংস হলে, পশ্চিমবাংলা তথা ভারতও যে ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, এরূপ ধারণা করাও অনুচিৎ। কারণ প্রথমতঃ পূর্ব্ববাংলার বিরাট সংখ্যক শরণার্থীর ভারতে অনুপ্রবেশ ও অবস্থানহেতু ভারতের অর্থ-নৈতিক কাঠামো ক্রমশঃ ভেঙে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ পাক্ আক্রমণ পূর্ব্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পূর্ব্ব বাংলা ধ্বংসের প্রকল্প রূপায়ণ সম্পূর্ণ হলে, স্বভাবতই পাকিস্থানী আক্রমণ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে পশ্চিমবঙ্গে, ভারতের সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলে, যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইতিপূর্ব্বে বহুবার বহুক্ষেত্রে ভারত সরকারের নিষেধ ও প্রতিবাদ সত্বেও পরিলক্ষিত হয়েছে, পাক চমূদের পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ও সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে। সুতরাং এবম্বিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিবাদ না করে

একমাত্র প্রতিবাদ লিপি যারা ভারত সরকার যদি তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে উহা নিশ্চয়ই গৌরবের বিষয় নয়, বিশেষ কলঙ্ক ও দুর্ব্বলতারই পরিচয়। ভারত সরকারের একান্ত উচিত চৈতন্য নীতি বর্জন করা অর্থাৎ "মেরেছো কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না?" পাকিস্থান ভারতকে অনেক জ্বালিয়েছে, অথচ ভারব ক্রমাগতই উহা সহ্য করে আসছে। কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা থাকা উচিৎ!

যুদ্ধের আতঙ্ক বা আশংকা

অনেকেরই এমনকি ভারত সরকারেরও সম্ভবত ধারণা যে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিলেই পাক ভারত লড়াই হবে। কিন্তু উক্ত লড়াই যে ভারত সরকার স্বীকৃতি না দিলে হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? পাকিস্থানী আক্রমণাত্মক নীতি কখনও বন্ধ হবে না এবং আজ হোক কিম্বা দুদিন বাদে হোক তারা যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে ভারত আক্রমণ করবে, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং ভারত সরকারের দীর্ঘসূত্রিতার সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্থান সরকারের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হবে ভারতের বিরুদ্ধে বৈদেশিক রাষ্ট্র থেকে লড়াইয়ের উপযুক্ত সমরাস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করা। ইতিমধ্যে সে দিক থেকে পাকিস্থান সরকার ক্রমশঃ সাফল্যের পথেই অগ্রসর হচ্ছে। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর প্রবল চাপ থেকে ভারতকে নিস্কৃতি পেতে হলে একমাত্র পাকিস্থানের সঙ্গে লড়াই ভিন্ন ভারত সরকারের গত্যন্তর নেই। কারণ ভারত সরকারের অনুরোধে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি পূর্ব্ব বাংলার ব্যাপারে বাহ্যিক সমবেদনাসূচক যতই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুক না কেন, কিম্বা তাদের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির আশায় পাকিস্থানী জঙ্গীশাসকের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের একটা অবাস্তর মিলনের নিস্ফল প্রচেষ্টা যতই করুন না কেন, উহা কখনও সফল বা কার্য্যকরী হতে পারে না। সুতরাং ভারত সরকারের উচিত অনর্থক কালবিলম্ব না করে যত শীঘ্র সম্ভব বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি ও সর্ব্ববিধ সামরিক সাহায্য দিয়ে পূর্ব্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্থানী হানাদারদের বিতাড়িত করা। উক্ত কার্য্যের ফলে বিশ্বযুদ্ধের আশংকা নিতান্ত অমূলক। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শোচনীয় পরিণামের যে অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি অর্জন করেছে, তাতে সহজে আর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র, ভিন্ন দেশের যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হয়ে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করবে বলে মনে হয় না। তবে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার সদিচ্ছা হয়ত অধিকাংশ রাষ্ট্রেরই আছে এবং সেজন্য তারা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব উস্কানী প্রদান ও সর্ব্ববিধ সমরাস্ত্র এবং অর্থ সাহায্য করেন কিম্বা আশ্বাস দেন। কারণ উহাদ্বারা তাদের লাভ এই যে যুদ্ধ বাধলে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রশক্তির ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর হয়, অন্যদিকে তেমন উক্ত উস্কানী এবং সাহায্য প্রদানকারী রাষ্ট্রগুলির মজুত অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয়েরও একটা সুযোগ হয়। কিন্তু এবম্বিধ যুদ্ধে তারা যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে না, তার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে একাধিক যুদ্ধে পাওয়া গেছে। অবশ্য ভারতরাষ্ট্রও যে যুদ্ধ চায় না, ইহা আত সত্য কথা। কিন্তু যদি অন্য রাষ্ট্র তার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, সে ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে নীরব কিম্বা নিষ্ক্রিয় থাকা কখনও সম্ভব নয় বা থাকা উচিতও নয়।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় একই সমস্যা

রাজনৈতিক কারণে পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানী বর্ব্বরদের অমানুষিক তাণ্ডব চলেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং সমস্যা একই, রাজনৈতিক সমস্যা। তবে পূর্ব্ববাংলার ব্যাপার— অত্যাচারী ভিন্দেশীয় শাসকের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মুক্তি-সংগ্রাম, আর পশ্চিমবাংলার ব্যাপার পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির একমাত্র গদীর লোভে বাঙ্গালীর আত্মঘাতী সংগ্রাম। উভয় সংগ্রামই ধ্বংসাত্মক। সমগ্র বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী জাতি বিধ্বংসী সংগ্রাম। সুতরাং উভয় বাংলার সংগ্রামই আজ বাঙ্গালীর পক্ষে এক বিরাট জাতীয় সমস্যা। বাঙ্গালী জাতির জীবন মরণের সমস্যা। তাই আজ পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, রাজ্যের প্রচলিত আত্মঘাতী সংগ্রাম থেকে বিরত হোন, বাংলা ও বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করুন। পূর্ব্ববাংলার সমস্যা একক পূর্ব্ববাংলাবাসী বাঙ্গালীরই নয়, উহা সমগ্র বাঙালী জাতির। সুতরাং পূর্ব্ববাংলা ধ্বংস হলে পশ্চিম বাংলা ও বাঙালীর ধ্বংসও অনিবার্য্য। অতএব পূর্ব্ব-বাংলাকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং উহা জাতীয় কর্ত্তব্য। উক্ত কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই আজ বিশেষ ভাবে সচেতন ও সক্রিয় হওয়া উচিত। নইলে ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে সৃষ্ট হবে বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কেরই এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

জর্জ কার্ভারের কিছুদিন থেকে অনবরত একটা কথা মনে হচ্ছিল। তিনি বোধহয় ঠিক পথে যাচ্ছেন না, কোনখানে কিছু ভুল ক'রছেন তিনি, তাঁর জীবনের গতি আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে। কিন্তু কেমন ক'রে কি ভাবে সেই পরিবর্তন সম্ভব হ'তে পারে। তেবে জর্জ কার্ভার স্থির ক'রতে পারেন না।

একদিন জর্জ কার্ভার তাঁর মনের এই দারুণ অস্থিরতা নিয়ে মিস বাডের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। মিস এট্টা বাড শুধু তাঁর অধ্যাপিকাই নন, তিনি একাধারে জর্জ কার্ভারের গুরু, বন্ধু এবং পথ প্রদর্শক। কার্ভার তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে নিজের মনের অস্থিরতার কথা সব খুলে ব'ললেন। জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "বলুন তো এখন আমি কী করি? আপনি কি বাস্তবিকই মনে করেন আমি একজন ভালো শিল্পী হ'তে পারবো?"

"শুধু ভালো শিল্পী কি ব'লছো জর্জ, আমি বলছি, তুমি একজন সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হ'তে পারবে। তোমার মধ্যে যেবিস্ময়কর শিল্পপ্রতিভা র'য়েছে তার যদি যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারো তা হ'লে, আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে ব'লতে পারি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পাশে তোমারও একদিন অবলীলাক্রমে স্থান হবে। আমার যদি শক্তি থাকতো শিল্প শিখবার জন্য আমি তোমাকে ইউরোপের শিল্প শিক্ষানিকেতন রোমে কিংবা প্যারিসে পাঠিয়ে দিতুম, যতো টাকা লাগতো অকাতরে ব্যয় করতুম, কিন্তু আমার যখন অর্থ বা শক্তি কোনটাই নেই তখন আমি তোমাকে শুধু পরামর্শ'ই দিতে পারি জর্জ কার্ভার। তুমি নিজে যদি কোন রকমে পারো, চ'লে যাও ইউরোপে, দেখে এসো ঘুরে ঘুরে সেখানকার শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিগুলি, গ্রীস, রোম ও প্যারিসের শিল্প গ্যালারিগুলিতে সাজানো বিশ্ববন্দিত শিল্পীদের আঁকা শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শনগুলি নিশ্চয় তোমাকে মুগ্ধ ক'রবে, শুধু মুগ্ধই ক'রবে না তোমাকে নব নব শিল্প চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত ক'রবে। সেখানকার শিল্পীদের সঙ্গেপরিচিত হবার সুযোগ ক'রে নাও, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো। তারপর সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে ফিরে এসো আমাদের এই দেশ—আমেরিকায়। তা যদি ক'রতে পারো, দেখবে, যোগ্য স্থান তুমি লাভ ক'রেছ," আবেগকম্পিত কণ্ঠে কথাগুলি ব'ললেন মিস এট্টা বাড।

"কিন্তু আমার যারা রক্ত মাংস, আমার যারা আপনার জন আমার সেই নিগ্রো ভাইবোনদের অন্ধকারের মধ্যে অসহায়ের মতো ফেলে রেখে আমি কোথায় যাবো? কেমন ক'রে যাবো? যুগযুগান্ত কাল ধ'রে তারা যে ক্রীতদাসের জীবন বহন ক'রছে, পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা প'ড়ে আর্তনাদ ক'রছে তাদের আমি কোন প্রাণে ছেড়ে যাবো? আমার শিল্প প্রতিভা তাদের কী উপকারে লাগবে ব'লতে পারেন?

জর্জ কার্ভার তাঁর বলিষ্ঠ দুখানি বাহু ঈষৎ উর্ধ্বে তুলে আন্দোলিত ক'রে একবার চোখের সামনে ধ'রে দেখলেন। সেই বলিষ্ঠ বাহু দুখানির মধ্যে তিনি নিজেরও প্রবল ইচ্ছাশক্তির যেন স্ফুরণ লক্ষ্য ক'রলেন। তারপর প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভরা আবেগমিশ্রিতকণ্ঠে ব'ললেন, "আমি যে কথাটা আপনাকে স্পষ্ট করে বোঝাতে চাই তা হ'ল এই যে, আমি আমার দুঃখী, পরাধীন ও পদদলিত নিগ্রো ভাইদের ছবি আঁকা

শেখাতে পারিনি বটে, কিন্তু একটা জিনিষ আমি তাদের ভালো ভাবেই শিখিয়েছি এবং সে শিক্ষা ষোল আনা তাদের কাজে লাগবে! আমি তাদের শিখিয়েছি লাঙ্গল ধ'রে কিভাবে জমি চাষ করতে হয় এবং ফসল ফলাতে হয়। ফসল উৎপাদনের কৌশল তারা সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত ক'রেছে।"

জর্জ কার্ভারের উত্থিত বলিষ্ঠ বাহু দুখানির দিকে কিছুক্ষণ বিস্ময়াভিভূতের মতো তাকিয়ে রইলেন মিস বাড, তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ব'ললেন, "তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি মিঃ জর্জ, তুমি যখন নিবিষ্ট মনে উদ্যানের পরিচর্যা কর আমি দূর থেকে তা লক্ষ্য করি। প্রায়ই দেখি তৃণগুল্ম গাছগাছালির সেবায় তুমি বিভোর হ'য়ে থাকো। দেখি আর মুগ্ধ হই। সেখানেও তুমি একজন জাত শিল্পী। নানাবর্ণের ফুলের বিচিত্র সমাবেশে উদ্যানে তুমি যে আশ্চর্য ছবি অঙ্কিত করো তার মধ্যেও শিল্প প্রতিভার সাক্ষর মেলে।"

"তা হ'লে বলুন, এবার আপনার পরামর্শ কী? আপনি কী ক'রতে বলেন আমাকে?" জর্জ কার্ভার, জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

মিস বাড আপনমনে কী যেন কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তারপর সস্নেহে জর্জ কার্ভারের কাঁধে ডান হাতখানি রেখে ব'ললেন, এই সিম্পসন কলেজ তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। তুমি আর কোথাও চ'লে যাও, অন্য কোন একটা ভালো কলেজে গিয়ে ভর্তি হও। এমন কলেজ যেখানে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করার সুবন্দোবস্ত আছে। তুমি সে কলেজে পড়াশুনা ক'রে একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ হ'তে পারবে।"

"আমিও কিছুদিন ধ'রে সেই কথাই ভাবছি।" জর্জ কার্ভার উত্তর দিলেন।

"সেই বেশ ভালো হবে জর্জ, অন্ততঃপক্ষে আমার তাই বিশ্বাস," মিস বাড ধীরে ধীরে কথা কয়টি উচ্চারণ ক'রলেন। অপরের কিসে ভালো হবে সে সম্বন্ধে তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া বড় শক্ত, মিস বাড মনে মনে তা উপলব্ধি ক'রলেন। পরে বললেন, "কিন্তু একথাটাও সঙ্গে সঙ্গে আমি না ব'লে পারছি না মিঃ জর্জ, আজ এইযে একটা সুনিশ্চিত ও মহান ভবিষ্যৎ ত্যাগ ক'রে তুমি অজানার এক অন্ধকার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছো যার অপর তীরে কি আছে না আছে তুমি কিছুই জানো না, তোমার এই ত্যাগ হবে এক বিরাট ত্যাগ। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য নিজের জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ত্যাগ ক'রে আজ যে মহত্ত্বের পরিচয় তুমি দিতে যাচ্ছো, যাদের জন্য তোমার এই ত্যাগ তারাই হয়তো ভুল বুঝবে, তোমার শত্রুতা ক'রবে, তোমাকে নিন্দা ও গালাগালি ক'রবে। সংসারে সমাজে এই জিনিষটাই সচরাচর ঘটে, এইটাই সাধারণ নিয়ম। আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করতে চাই না জর্জ! আমার অন্তরের সমস্ত শুভ কামনা তোমার জন্য রইলো। তুমি একজন মহান শিল্পী হ'তে পারতে, কিন্তু তা না হ'য়ে তুমি হ'তে চ'লেছ একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ, তোমার উদ্দেশ্য সফল হোক এই কামনা করি।"

"না মিস বাড, আমি কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা মনে করি না। বরং আমার মনে হয়, একজন বড় শিল্প-হওয়ার চাইতে একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ হতে পারা কোন অংশে কম গৌরবের নয়। যেমন ধরুন, একটা গাছে ফোটা ফুল—সেটা প্রকৃতির দান—আর একটা একজন শিল্পীর আঁকা ফুল, তা যতই সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর হোক তাতে প্রাণ থাকে না। প্রকৃতির দান গাছে ফোটা ফুল প্রাণরসে ভরপুর। শিল্পীরা রূপ সৃষ্টি করতে পারে, সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তাদের সৃষ্ট জিনিষে তারা প্রাণ দিতে পারে না। ভগবানের স্থান তারা নিতে পারে না।"

"কিন্তু মিঃ জর্জ, আমি আবার বলছি, তুমি নিশ্চয় একজন মস্তবড় শিল্পী হতে পারতে, তা না হ'য়ে তুমি হ'তে যাচ্ছো একজন কৃষিবিদ্। শিল্পী হতে তুমি রূপান্তরিত হবে একজন কৃষকে। সেটা আমার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক", হাসলেন মিস বাড। কিন্তু সে হাসি বড় ম্লান, কেমন যেন প্রাণহীন। "একবার কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেষ্টা কর জর্জ, মহৎ শিল্পীরূপে তোমার

কির্তী, তোমার যশ ও খ্যাতি সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে প'ড়লে পরে তোমার শিল্পশিক্ষার গুরু হিসাবে আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হ'তে পারতাম। তোমার নামের সঙ্গে আমার নামটাও জড়িয়ে থাকতো। সেই খ্যাতির স্বর্গ থেকে তুমি আমাকেও বিচ্যুত ক'রলে জর্জ কার্ভার! মিস এট্টা বাডের দুই চোখে অশ্রু আর বাধা মানলো না।

জর্জ কার্ভার অপলক দৃষ্টিতে মিস বাডের অশ্রু ভেজা সেই ম্লান মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, আস্তে আস্তে বেদনাহত কণ্ঠে ব'ললেন, "মিস বাড, আপনার অকৃত্রিম স্নেহ এবং দয়ার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না। যত শীঘ্র পারি আমি অন্য আর একটা কলেজে গিয়ে ভর্তি হবো।"

"আমি হয়তো অন্য কলেজে ভর্তি হবার ব্যাপারে তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারি জর্জ। এমস শহরে অবস্থিত একটা ভালো কৃষি কলেজের কথা আমি জানি। সেই কলেজটার নাম হচ্ছে আইওয়া কৃষি কলেজ। তোমার হয়তো স্মরণ আছে, তুমি আর আমি একদিন সেই কলেজ নিয়ে আলোচনা ক'রেছিলাম। আমার বাবা সেখানকার একজন অধ্যাপক। তোমার সম্মতি পেলে আমি আমার বাবার কাছে চিঠি লিখতে পারি। তিনি হয়তো তোমাকে সেই কলেজে ভর্তী হবার ব্যাপারে সাহায্য ক'রতে পারবেন", মি বাড বললেন।

"কী ব'লে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো মিস বাড", আবেগে উত্তেজনায় জর্জ কার্ভারের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো।

"তুমি যখন একজন প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক হবে জর্জ, কৃষিবিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা যখন তুমি সারা জগতে চমক লাগাবে, একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি ক'রবে তোমার বিশ্ব-জোড়া নাম হবে সেদিন তোমার সেই বিপুল বিরাট খ্যাতির কণামাত্র অংশও আমি পাবো না। তোমার নামের পাশে কোনোখানে আমার নামের চিহ্নমাত্র থাকবে না—কিন্তু আমার পিতা অধ্যাপক জে এল বাড নিশ্চয় তা হবেন না। তোমার নামের সঙ্গে কখনো না কখনো তাঁর নামও অবশ্যই উচ্চারিত হবে।" ক্রমশ

যুগোপযোগী

(গল্প)

সুবোধ বসু

কংসারিবাবুর মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ চলতে লাগল।

শাঁসালো ব্যবসায়ী কংসারিকৃষ্ণ রায়। এত বড় গোলদারি ব্যবসা বড়বাজার অঞ্চলেও বেশি নেই। সামান্য দোকানের ছোকরা হয়ে কর্মজীবন শুরু করে নিজ বুদ্ধি আর অধ্যবসায়েই তিনি ফেঁপে উঠেছেন। ইচ্ছে করলেই এখন তিনি রাজনীতি করতে পারতেন, মন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু ওসব দিকে তার মন নেই। মাল কেনা আর মাল বেচা আর এই দুইয়ের মধ্য থেকে মুনাফা লোটাতেই তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ।

তাঁর একমাত্র মেয়ে নূপুর সতেরো বছরে পা দিয়েছে। এবার হাইয়ার সেকেণ্ডারি দেবে। আশ্চর্য্য সুন্দরী। সভায় গান গেয়ে মেডেল পেয়েছে। এমন মেয়ের উপযুক্ত বর পেতে সময় লাগে। গিন্নী নিত্যকালী যতই বলছেন, 'এমন ধিঙ্গী মেয়ে ঘরে রেখে গলা দিয়ে যে আমার জল সরছে না।' ততই কংসারি গম্ভীর গলায় বলছেন, 'হবে, হবে। উপযুক্ত পাত্র চাই তো। মামুলি জামাই হলে আমার চলবে না......।

প্রকৃতপক্ষে কংসারিবাবু নিজেও বসে নেই। তিন তিনটে ঘটক লাগিয়েছেন। নিয়মিত রিপোর্ট পাচ্ছেন। ওরা যেমন তিলকে তাল বানিয়ে তাঁর কাছে সম্ভাব্য বরের বর্ণনা পেশ করছে, তিনিও তেমনি চতুরতার সঙ্গে তাদের তালকে তিলে পরিণত করে ছাড়ছেন। বলছেন, 'মামুলি বরে চলবে না। আজকাল ওসব অচল। বর্ত্তমানের উপযোগী পাত্র চাই......।'

দুপুরে গদিতে বসে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে একটু ঝিমুচ্ছেন, এমন সময় হরি ঘটক এসে হাজির হলো এবং 'বাবু জেগে আছেন নাকি' বলে তাঁর তন্দ্রাটি শেষ করলে।

'চমৎকার একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি।' হরি উচ্ছ্বসিত গলায় জানালো 'একেবারে হীরের টুকরো ছেলে। খবর পেয়ে আর দেরী করিনি। ট্রামের পয়সা খরচা করে গদিতেই ছুটে এসেছি...।'

'ট্রামের পয়সা পাবে।' কংসারি প্রথমেই আশ্বাস দিলেন। 'কিন্তু শুনি হীরেটি কি রকম। কতবারই তো কত হীরের টুকরো নিয়ে এসেছ...।'

'বলেন কি বাবু। এর সঙ্গে তাদের তুলনা! এমন পাত্র লাখে একটি মেলা ভার। হাইকোর্টের নামকরা অ্যাডভোকেটের ছেলে। এম, এ-তে ফার্স্ট কেলাস ফার্স্ট! দেখতে যেন......'

'ফার্স্ট কেলাস ফো বটে। কংসারি মামুলি গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কাজকর্ম কি করে?'

'চাকরি! চাকরি পেয়েছিল হাজার টাকা মাইনের। নেয় নি। বলছে রিসার্চ করবে...'

'রিসার্চ করবে।' চাকরি নেয় নি। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কংসারি বললেন। 'সব বেকারই তাই বলে। ভালো চাকরি কি রাস্তায় গড়াগড়ি করছে যে, ইচ্ছে করলে তুলে নেব, মর্জি হলে ছুঁড়ে ফেলব...'

'আজ্ঞে এ যে ফার্স্ট কেলাস ফার্স্ট......' হরি ফার্স্ট ক্লাসের উপযোগী বিস্ময়ের সঙ্গে উক্তি করলে।

'বেকার ফার্স্ট কেলাস ফার্স্ট তো নাকৃশাল হবে। টাকা লুটবে না, পয়সা লুটবে না। বিপ্লব আনার জন্য আখেরে প্রাণ দেবে। জেনে শুনে এমন ছেলেকে কেউ জামাই করে! আচ্ছা ঘটক তো তুমি!...শুনছ সরকার হরিবাবুর হাতে দুটো টাকা দিয়ে দাও।'

কংসারি হিসাবের খেরো বাঁধা লম্বা খাতা খুলে নিলেন। অর্থাৎ সরে পড়ো এবার।

এরকম বহু পাত্রই কংসারির অপছন্দ হয়। এঞ্জিনীয়ার? এত বেকার আর কাদের মধ্যে? চাকরি গেলে আর একটা যোগাড় করা অসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া মজুরের ঠ্যাঙ্গানি আর ঘেরাও তো লেগেই আছে। ডাক্তার? সারাক্ষণ রোগী ঘাটছে। ঘরকন্না করার তার সময় কোথায়? সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার? রোগীদের তাচ্ছিল্য আর রোগীর আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে যে কোনও সময়ে মার খাবে। প্রফেসার, উকিল-ব্যারিস্টার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যাকেই পাত্র হিসেবে উপস্থিত করা হয়, তারই গুচ্ছের খুঁত বের করে ফেলেন কংসারি। তাই আর চট করে পাত্র জোগাড় হচ্ছে না।

সেদিন যথারীতি রাত দশটার পর গদি থেকে ফিরেছেন। গাড়ী থেকে নেমে সরাসরি উঠে এসেছেন দোতলায় নিজের শোবার ঘরে। এমন সময় গিন্নী প্রায় হাউ-মাউ করতে করতে উপস্থিত হলেন।

'আরে হলো কি ছাই। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বলো না। এক বর্ণও যে বুঝতে পারছি না।' কংসারি ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বললেন।

'বুঝতে পারলে আর এমন বিপদে পড়তে হতো?' গিন্নী ক্রুদ্ধস্বরে বললেন। 'দিন-রাত্তির পই পই করে বলেছি, তাড়াতাড়ি পার করো। এত বড় মেয়ে দিনকাল ভালো নয়......'

'ব্যাপার কি?' এবার শঙ্কিত হলেন কংসারি। 'মেয়ের কি হলো? এখনও বাড়ী ফেরেনি?'

'তার চেয়ে ঢের ঢের বড়ো বিপদ।'

'চিঠি লিখে পালিয়ে গেছে?'

'চিঠি নিয়ে বাড়ী ফিরেছে।'

'চিঠি? কার?'

গৃহিণী প্রথমে আরও কিছুটা হাউ-মাউ করলেন তারপর ব্যাপারটা সবিস্তারে স্বামীর গোচর করলেন। গত ক'দিন ধরেই নাকি ছোকরা নূপুরের পিছু নিয়েছে। এ পাড়ার ছেলে নয়, তবে পাড়ার নামকরা বখা পালেদের বড় ছেলে দাসুর বন্ধু। তার কাছে প্রায়ই দেখা যায়। গালের তলা পর্য্যন্ত জুলপী, চোস্ত পাজামার মত অঁাটো পাৎলুন, বিচিত্রবর্ণের ফুলের হাওয়াই সার্ট। তাগড়া জোয়ান, চেহারা ভালোই, তবে ভাবভঙ্গিতে পরিচয় প্রকাশ হতে দেরি থাকে না। বগলে বোতল নিয়েও তাকে দাসুর কাছে আসতে দেখা গেছে। রাত দশটা এগারোটায় স্কুটারের পেছনে চাপিয়ে দাসুকে নিয়ে যাচ্ছে, এ তো হামেশাই দেখা যায়। সেই শ্রীমান আজ নূপুরের হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে বলেছেন, 'কাল এর জবাব চাই।' মেয়েকে নিত্যকালী জেরা করেছেন, ধমকেছেন। সে দিব্যি মেনেছে, কস্মিন কালেও সে এর সঙ্গে কথা বলেনি। তবে ইতিপূর্বেও ছেলেটা তাকে প্রায়ই আড় চোখে চেয়ে দেখেছে। এটা আজকের দিনে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তাই মেয়েও এসব মায়ের কাছে রিপোর্ট করেনি। আজ বিবর্ণমুখে চিঠি হাতে নিয়ে বাড়ী পৌঁছে মাকে সব বৃত্তান্ত জানিয়েছে।

'কি লিখেছে? দেখি চিঠি?' কংসারি বললেন

'বাবুর বিয়ের বাসনা হয়েছে, এই আর কি। পরে দেখাচ্ছি।' নিত্যকালী বললেন।

'নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলেছেন?'

'না। তবে এরই মধ্যে আমি কিছু খোঁজ নিয়েছি। নিয়ে, হাত-পা পেটের ভেতর সিঁধিয়ে যাচ্ছে। চিঠিটা পড়ে দেখে এবার পুলিশে খবর দাও......' বলে নিত্যকালী বালিশের তলা থেকে একটা রঙিন খাম বের করে কংসারির হাতে দিলেন।

খাটের উপর বসে পড়ে ভুরু কুচকে আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন কংসারি বেশ একটু সময় নিয়ে। তারপর প্রায় আধ মিনিট কাল চুপ করে বসে রইলেন। অবশেষে স্ত্রীর দিকে চেয়ে সংক্ষেপে প্রশ্ন করলেন, 'খোঁজ করে কি জানা গেল?'

'কি আর বলব, সর্বনাশের কথা।' নিত্যকালী গলা খাটো করে বললেন। 'ছেলেটা শহরের একটা নাম করা গুণ্ডা! কত খুন জখম করেছে তার ঠিক নেই। একটা বড়ো অঞ্চলের যত ছেনতাই, পকেট কাটা, রাহাজানি, সব কিছুর ওপর এর বখরা আছে। এ ছাড়া আছে আরও বড় ব্যবসা। রেলগাড়ীর ওয়াগন ভেঙে মাল সরানো, ব্যাঙ্ক চড়াও, মাইনের দিনে কোম্পানীর ব্যাগ আর বড় বড় গদির ক্যাশ লুট...টাকায় টাকায় লাল। নবাবের মতো টাকা ওড়ায়। মদ আর তার উপসর্গের যজ্ঞি হয়।...আবার টাকা দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করে। দরকার হলে একশো গিনির ব্যারিষ্টার দিয়ে মামলা নড়ে। পকেটে দুটো পিস্তল নিয়ে ঘুরছে। কারুও টু-কথাটি বলবার উপায় নেই। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাফ করবার জন্য বড় বড় মহল থেকে ডাক পড়ে। ওর অসাধ্য কাজ কিছুই নেই ...'

'ছেলেটাকে একবার দেখতে হবে' কংসারি সংক্ষেপে বললেন।

'তার আগে পুলিশকে তো খবর দাও।' স্বামীর উত্তেজনার অভাব লক্ষ্য করে হতাশ হয়ে বললেন নিত্যকালী। 'কাল ছোরা হাতে নিজেই এসে দেখা দেবে।'

মুখে একটু হাসির ভাব ফুটে উঠল কংসারিবাবুর। গায়ের জামাটা খুলে তিনি নিত্যনৈমিত্তিক গদি থেকে ফেরার পরে স্নান সারবার জন্য তোয়ালা কাঁধে তুলে নিলেন।

পরদিন খুব সকালে উঠেই বের হয়ে পড়েছেন কংসারি। টেলিফোনে পুলিশ ডাকার চেয়ে নিজে থানায় গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে ফল আরও ভালো হওয়ার কথা। সেই সকাল থেকেই নিত্যকালী অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু কংসারি ফিরছেনই না। চা-টুকু মুখে না দিয়েই নীরবে বেরিয়ে গেছেন কংসারি। বেলা দশটা বেজে গেছে, তবু ফেরবার নাম নেই। পুলিশের সঙ্গে কি নিজেও ছোকরার ডেরাতে হানা দিয়েছেন? তবে তো সর্বনাশের কথা। পুলিশ তো দলবল বন্দুক-সঙ্গীন নিয়ে থানায় ফিরবে কজে সেরে। অন্যদের তো ফিরতে হবে বাড়ীতে। সেখানে গুণ্ডার প্রতিহিংসা থেকে কে তাদের রক্ষা করবে? জেদী স্বামীর উপর নিত্যকালীর অসম্ভব রাগ হলো। বিপদের উপর আবার সে বিপদ সৃষ্টি করেছে। সব খানেই কি গোয়ার্তুমি করা সাজে?

কংসারি ফিরলেন বেলা দুটোরও পরে। ততক্ষণে নিত্যকালী বহুবার চোখ মুছেছেন, ঠাকুর-দেবতার কাছে মানত করেছেন, বার বার গদিতে কর্তাবাবু ফিরেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করবার জন্য টেলিফোন করেছেন।

'থানায় এত দেরি হলো কেন?' নিজেকে সংযত করে প্রশ্ন করলেন নিত্যকালী।

'থানা! কে বললে থানায় গিয়েছি।' কংসারি জবাব দিলেন।

'তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলে? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই...' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন নিত্যকালী।

'সমীরের ওখানেই অনেক খেয়ে নিয়েছি।' জামা খুলতে খুলতে বললেন কংসারি।

'সমীর! সে কে?

'কেন, তুমি তো চেন বললে।' কংসারি স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে বললেন। 'পালেদের বড় ছেলের কাছে সব সময় আসে বল। জুলপী, জামা-কাপড় সব কিছুর বর্ণনা দিলে...'

'বলো কি!' স্তম্ভিত উক্তি করলেন নিত্যকালী। 'সেই গুণ্ডার ডেরায় তুমি নিজে গেলে? একটু ভয় ডর নেই? আস্ত ফিরে এসেছ এই আমার পরম ভাগ্য, শাঁখা-সিদুঁরের জোর। কি বললে তাকে?...'

'সব জিজ্ঞেস করলাম।' কংসারি শান্তভাবে

বললেন। 'সেও অকপটে সব জানালে। ব্যাঙ্কের পাস্ বই এনে পর্য্যন্ত দেখালে। কত আদর-আপ্তি করলে। আমিও কথা দিয়ে এসেছি...'

'কি কথা ?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন নিত্যকালী।

'মানে খুকির সঙ্গে 'বিয়ে দিতে রাজি হয়ে এলুম আর কি।' কংসারী তৃপ্তির সঙ্গে জবাব দিলেন।

'টাকা পয়সার অভাব নেই, গাড়ী-বাড়ী। ট্রাক, ঠেলা, স্কুটার। লোকজন। সুন্দর চেহারা। ভাল স্বাস্থ্য। জোর জুলুম, ছেনতাই করে টাকা জমিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকাল তো তারই যুগ। বোমা, পিস্তল ছোরা এ সবই চালু করে তুলেছে আজকালকার ছেলেরা। আর টাকাঅলাদের টাকা কমানো তো একটা বিশেষ সম্ভ্রান্ত মতবাদ। তবে আর আপত্তির রইল কি ? মদ, মদের উপসর্গ এসব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। চিরকালই ধনীদের মধ্যে এসব প্রচলিত আছে। আর আজকালকার সব গল্প উপন্যাসে দেখছো না, সুযোগ পেলেই কি ছেলে কি মেয়ে সবাইকেই লেখকেরা মদ খাইয়ে ছাড়বে আর একের সঙ্গে অন্যের বেলেল্লা গিরি ফলাও করে দেখাবে। এসবই আজকাল জাতে উঠেছে। তবে এমন সুপাত্র হাতে পেয়ে ছাড়ি কেন ? নিজে চিঠি দিয়েছে, এটা আজকালকার প্রেম করে বিয়ে করার যুগে একটা অপরাধই নয়। নাও, এবার সব জোগাড়-যন্তর শুরু করো। নিজেই তো মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে অস্থির হয়ে উঠেছিলে...'

'তা বলে একটা গুণ্ডার সঙ্গে মেয়ের...' রাগে অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গেল নিত্যকালীর কণ্ঠস্বর।

'নামটাই খারাপ লাগছে তো ?' শান্তভাবেই বলে গেলেন কংসারি। 'এটা কিছু নয়। আজকালকার ছেলেরা একে বলে, বুর্জোয়া মনোভাব। অথচ এক চালে সব সমস্যার কি রকম সমাধান করে দিলাম। মেয়ের বিয়ের আর গুণ্ডার উপদ্রবের দুশ্চিন্তা একই সঙ্গে মিটে গেল। দেখছ তো সব ? গুণ্ডার হাত থেকে পুলিশ কাকে আর রক্ষা করতে পারছে ? গুণ্ডার সঙ্গে দোস্তি করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। লাভ—লোকসান সব খতিয়ে তবেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি...'

পরিতৃপ্ত মুখে কংসারি খাটে এলিয়ে পড়লেন। বললেন, 'একটু গড়িয়ে নিই। চারটের পর গদিতে যাব...'

(৬২৪ পাতার পর)

ভেবেছিল অসীম একদিন আসবে নিশ্চয়ই। মেয়ে দেখলে মায়া হবে। তখন বিয়ে করবে। দুর্গার জানা ছিল না, অসীমের বিয়ে হয়েছে। এবং স্ত্রী পুত্র কন্যার অভাব হয়নি। সুন্দরী সতী স্ত্রী, সুন্দর পুত্র কন্যা যা সব পুরুষই চায় এবং পায়। দুর্গাদের মত কারুর দুর্গতি করলেও তা পায় তারা। সেও পেয়েছে।

জননী উঠে দাঁড়ালেন। দুর্গাও পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল।

সরে গিয়ে মা বললে, 'ছুঁসনি'।

দুর্গা বললে, আমাকে নিয়ে যাবে মা। তোমার সেবা যত্ন করতে পারব। আমি আর তো খারাপ হইনি। সেই তারপর—কেঁদে ফেলল।

জননী আতঙ্কিত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তোকে? কোথায় নিয়ে যাব। গাঁয়ে কি আর তোর কথা কারুর অজানা ছিল, না আছে। আমার মরণ কালের গঙ্গাজল মুখের আগুনটুকুও ঘুচে যাবে। কেউ দেবে না। তোকে নিয়ে গেলে থাকবি কোন চুলোয়?

'যদি পরিচয় না দিয়ে যদি গাঁয়ের এক পাশে কোথাও পড়ে থাকি? চিনতে পারবে না লোকে।'

'খাবি কি? চিনবেই লোকে। তুই যেখানকার জঞ্জাল সেইখানেই যা। আমার কপালে ঢের হয়েছে। তোমাকে আমার আর চাইনে।'

'মা আমি কাশীতেও তো বাসন মাজার কাজ করেছি। এখানেও তাই করব মা। ভাল ছিলাম মা।'

জননী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বললেন, আর ভাল থাকায় কাজ নেই।

তারপর মাথার সিঁথের দিকে তাকিয়ে বললেন, সিঁদুর পরে আছিস কেন? সেই হতভাগার জন্যে? মেয়ে হল। মেয়ে মোলো। বিয়ে হলো না। আবার এয়োতির সিঁদুর। লক্ষণ করে।

'যা মুছে ফেলে মাথা মুড়িয়ে নিগে। চুল ফেলে দিয়ে 'ঠেঁটী' পর। লজ্জা 'হায়া' নেই? আবার গাঁয়ে ঘরে ঢুকতে চাস।

কুয়োর দড়ি ছিল না গলায় দিতে।

দুর্গা পাথরের মত হয়ে গেল ঐ ধিক্কারে। মুখ তুলতে পারল না। সত্যই তো সিঁদুর শাড়ী পরে আছে।

জননী নিষ্ঠুর মুখে বললেন, 'ইহকাল ঘুচে গেছে, পরকালের কথা ভাব। ব্রাহ্মনের মেয়ে। বিয়েই হলো না কার জন্যে সিঁদুর পরে লক্ষণ্ করছিস্?'

নতমুখী দুর্গার চোখের জল ও বিভ্রান্ত মুখে নীরবে বসে থাকায় শেষ অবধি বৃদ্ধার বোধ হয় একটু দয়া হল।

'না' কাশী ফিরে যা। ধর্ম কর্ম যা জানিস্ পারিস কর। আর আসিসনি। আমাকে শান্তিতে মরতে দে। বিশ্বনাথের চরণে পড়ে থাক্‌গে। তোর মত মেয়ে সেখানে অনেক আছে। জননীর কণ্ঠ একটু নরম একটু আর্দ্র হয়ে উঠল। আবার বললেন 'ফিরে যা।' আসা যাওয়া করলে আমার আশ্রয় মান সম্ভ্রম সব শেষ হয়ে যাবে। তোমারও উপকার হবে না।

দেখলেন শীর্ণকায় যুবতী নারী যেন প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছে গেছে। শরীরের ক'খানা হাড়। হাত দু'খানা সত্যই বাসন মাজা ঝিয়ের মতই হাত। চোখ দুটো আর সেরকম নেই। কোটরে বসে গেছে। চেনা সত্যই আর যায় না। তাহলে হয়ত সে সত্যই গণিকা জীবিকায় নাবেনি। কিন্তু ভাবতেই তাঁর শরীর শিউরে উঠল। এতদিন এতদিন কাশীতে একলা থেকেছে ষোলো সতেরো বছর বয়সের মেয়ে……।

দুর্গা মুখ নামিয়ে বসেছিল। ধিক্‌কৃত অহল্যার মত। পাথরের মূর্ত্তির মত।—

এবার যেন মার আবার দয়া হল। বললেন, 'সকাল থেকে বসে আছিস খাওয়া দাওয়া করবি কোথায়? খেয়েছিস্ কিছু? কার সঙ্গে এসেছিস? একলা এসেছিস?

দুর্গা শুধু ভাবছিল মার ধিক্কার। সিঁদুর পরে আছিস্ কেন? মাথা মুড়িয়ে নেয়নি কেন? কেন? সত্যিই তা তো ও জানে না! বলেছেন গঙ্গায় জল ছিল না—কুয়োর দড়ি ছিল না, গলায় দড়ি দিতে। ডুবে মরতে।

ভাবছিল কি করে ভাল থাকে লোকে? কি করে খারাপ হয়। কেন আর উঠতে পারে না কেউ পাঁকের গহ্বর থেকে।......কি করে এমন হয়।

দুর্গা এই চৌত্রিশ বছর বয়সেও জানে না। শুধু ভালো থাকার অদম্য ইচ্ছা মনে জমে আছে। মার কথায় চকিত হয়ে বললে, 'সেই ভলন্টীয়ারদের একটি ছেলে ঐ যে চায়ের দোকানে বসে আছে সেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।'

জননী আবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন।

'ও! তবে এখনো ছোঁড়াগুলো পেছনে ঘুরছে। বললেন কোন ছোঁড়াটা? সেইটে? সেই ছোঁড়াটা?'

দুর্গা বিবর্ণ মুখে বললে, 'না, সে নয়। এ অন্য একজন। ওখানে বসে আছে ওই সে।'

জননী বিতৃষ্ণায় ঘৃণায় আর সেদিকে বা কোনো দিকেই তাকালেন না।

শুধু বললেন, 'তুমি ফিরে যাও। আর কখনো এখানে এসো না। থাক্ থাক্ আর প্রণামে কাজ নেই।

দুর্গা মাথা নিচু করে মাটিতে মাথাটি ঠেকিয়ে প্রণাম করতে গিয়েছিল।

॥ ১৮ ॥

লোকের দৃষ্টি ভীত কন্যা এবং নিজের দুঃখে চোখের জলে অন্ধ চোখে বৃদ্ধা চলে গেলেন। আর ফিরে চাইলেন না। ঘাট প্রায় জন শূন্য। সূর্য্য আকাশের প্রায় মাঝখানে।

দুর্গা শুধু ভাবছিল, সত্যি গঙ্গায় তো অনেক জল ছিল......। অনেক জল। কত জনহীন কত ভাঙা ঘাট। কত সন্ধ্যায় কত রাত্রে ঠাকুরের বাসন মাজতে এসেছে।—

জল তো অনেক ছিল। মাতো ঠিকই বলেছেন, মেয়ে মরে গেল। তারপরও সে নিজের মরার কথা ভাবেনি কেন?

চুপকরে ভাবে, এখানেও তো গঙ্গায় অনেক জল আছে। ডুব দেবে? একেবারে ডুব দেয় যদি? চারদিকে তাকায়।

আর কাশী ফিরে যেতে হবে না। আর গোপালকে ব্যস্ত করবে না।

সে উঠে দাঁড়াল যন্ত্রের মত। যেন জীবনও তার দেহে নেই। মৃত্যুর কথাও সে দেহ আর ভাবছে না ভাবছে শুধু একটি ডুব দিক্। খুব ঠাণ্ডা জল। শান্ত জল। গ্রীষ্মের শান্ত গঙ্গা। এবারে আস্তে আস্তে ভাঙা মুখ সিঁড়ি দিয়ে নেবে যাবে। অনেক দূর অবধি সিঁড়ি আছে সেখানে। তারপর যেখানে সিঁড়ি নেই...... সেইখানে পৌছে যাবে।

॥ ১৯ ॥

দুর্গা ভাঁটার কাদাতে পা রেখে নামছে। অনেক দূর অবধি কাদা। তারপর জল।

পিছনে ডাকল গোপাল, 'দুর্গাদিদি।'

চমকে ফিরে তাকাল।

ওই তো তোমার মা? চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন যিনি। দেখা তো হলো। চল এবারে। গঙ্গায় নামছ কেন আর? কাপড় ভিজে যাবে। আর কাপড় তো আনো নি। কি বললেন মা?

দুর্গা শুনলে, চোখ মুছতে মুছতে গেলেন মা! সে বিভ্রান্ত মুখে চাইল।

হ্যাঁ মা। ভাবছি একটা ডুব দিয়ে নিই। তুমি এখনো বসে আছো গোপালদা?

অস্পষ্ট ভাবে বললে, তুমি চলে যাওনা। আমার তো চেনা জায়গা।

মার চোখে জল! সেতো দেখতে পায় নি, সে ভাবে।

গোপাল তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, কার কাছে

থাকবে? মা নিয়ে যাবেন? বাড়ীতে জিজ্ঞেস করতে গেলেন বুঝি?

দুর্গা এবারে কেঁদে ফেললে, 'না। মা নিয়ে যাবেন না। এইখানেই পড়ে থাকব। ভিক্ষে-শিক্ষে করে খাব। আর কোথাও যাব না।'

গোপাল তার জলের ধারে যাওয়া দেখেই কিছু যেন বুঝেছিল। কিছু ভেবে নিয়েছিল।

বললে, তুমি পাগল? —দুর্গাদি। এখন চল ফিরে চল। বাড়ী গিয়ে ব্যবস্থা কিছু করব।

মুখে মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে নাও। তেষ্টা পেয়েছে? চা খাবে?

দুর্গা আবার বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাইল। বললে, চা। তুমি খেয়েছ? কোথায়? একটি ডুব দিয়ে নেব গোপালদা?

গোপাল।—'ডুব দেবে? কাপড় কই।'

'এইটেই নিংড়ে পরে নোব। শুকিয়ে যাবে। যা রৌদ্দুর।'

তার শুকনো শ্রীহীন উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে গোপাল ভাবলে তা ডুব দিয়ে নিক।

আচ্ছা আমি দাঁড়াচ্ছি ওই গাছতলায়।

দুর্গা জলে নামল। মাথায় জলের ছিটে দিল।

এবারে এবারে কি করবে। জল তো গঙ্গায় ঢের। কিন্তু গোপাল তো সামনে দাঁড়িয়ে।

মার কথা মনে আছে সিঁদুর কার জন্যে? অসাড় পায়ে বিহ্বল মনে সে ডুব দিল। কিন্তু মা যে বলেছেন মাথা মুড়িয়ে নিতে। নাপিত? পিঠ ভরা চুল এখনো দুর্গার। নাপিত কোথায় পাবে? কাঁচি কোথায় পাবে? ঘাটের ওপারে যদি থাকে কোনো নাপিত।

কিন্তু গোপালদা রাগ করবে। দেরী করলে। ডুবে ডুবে সমস্ত চুল রগড়ে রগড়ে ধুয়ে ঘোমটায় মাথা ঢেকে কাপড় নিংড়ে পরে দুর্গা ওপরে উঠে এলো।

সতীলোক

তারপর বারো চোদ্দ বছর কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন সকালে গোপাল এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ী।

বললে, দু একটা টাকা সাহায্য করবে বীণাদিদি দুর্গাদিদি পরশু হাসপাতালে মারা গেল। মরবার আগে আমার হাত ধরে বলে গেল, আমার মুখে আগুন তোমরা কেউ দিও। নয়ত কোনো ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিও। আর আমার জন্যে একটু অন্ন জল বস্ত্র দান করিয়ে বামুন খাইয়ে দিও। আর দেখো আমাকে যেন ওই সব মেয়েরা পোড়াতে না যায় গোপালদা—সব শুনেছিল কবে কার কাছে নাম ঠিকানাহীন মেয়েদের ওরা সমকর্মী সমধর্মী হিসেবে নিজেরাই সব শবকৃত্য করে। যদিও ও সে পাড়ায় ছিল না।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। দুর্গা কিছুদিন মাঝে মাঝে আমার কাছেও কাজ করেছিল। গোপালই দিয়েছিল কাজ করার জন্য। দুর্গার ইতিহাস গোপালের কাছে শুনি। যা শুনেছি তা কম নয়। যা শুনিনি কেউ জানে না তাও কম নয় নিশ্চয়ই।

সে আর কাশী ফিরে যায়নি। গোপালের বাড়ীরই একটা এঁদো ঘরে পড়ে থাকত। তার বাড়ী কাজ করত। পাড়াতেও গোপাল কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। গোপালের মা একটু দয়ামায়া করে রেখেছিলেন। বাইরের যা হোক কাজে সে মাটির মত মিশে থাকত মাটিতেই যেন। তবে তবু দয়া মমতা পেত। ঝিয়ের কাজ তো জাত কুল বিচার করে না কেউ।

রান্নার কাজে সে দু এক জায়গায় ঢুকেছে। তারা কেউ কাজ নিয়েছে, অনেকেই নেয়নি। যারা নিত তার আচরণে দয়ামায়া করত।

আমি দেখেছি যখন তখন তার আর চুল নেই। কবে হয়ত কেটে ফেলেছিল। চেহারা? কে জানে কেমন চেহারা ছিল।

গোপাল বলল। তার মনেও একটি কেমন কষ্ট হয়েছে যেন। আস্তে আস্তে প্রথম দিনের পথ হারানো থেকে চেনা প্রথম বিপথে পড়ার কাহিনী থেকে শেষ অবধি মাতৃ সাক্ষাৎ অবধি সবই সে কিছু জানা কিছু শোনা কিছু কল্পনা করে বলে গেল।

৫৲ টাকা দিলাম। চোখের সামনে প্রায় বৃদ্ধা শীর্ণ মুখ নারী মূর্ত্তি একটা দেখতে পাচ্ছিলাম যেন।

* * *

কি অসীম ভয় ও লজ্জা তার মুখে। কি দুঃখ ও সেই মুখ চোখে। সতী বা অসতী গণিকা বা গৃহস্থ কন্যা কিছুই ভাববার বলবার অধিকার কারুর আছে কিনা গোপাল বা আমি ভাবছিলাম না। শুধু তার ভালো থাকার এবং নিজেকে ভালো বিশ্বাস করানোর কি চেষ্টা।

মনে হচ্ছিল কি তার আপ্রাণ আকুলতা লোকে তাকে অসতী না ভাবুক অসতী পতিতা না বলুক। সে তো ইচ্ছে করে অসতী হয় নি। সে তো গণিকা বৃত্তি নেয় নি। কিন্তু কেউ তার কথা বিশ্বাস করেনি। এমন কি তার মাও যেন বিশ্বাস করলেন না।

মৃত্যুর পর সতী বা অসতী কোন লোকে তার স্থান হয়েছে। আমরা জানি না। শুধু জানি সবাই তাকে কাশীবাসিনী পতিতাই ভাবত।

* * *

ভাবি, অহল্যা কোন্ সতীলোকে গিয়েছিলেন? তাঁকেও কি তপোবনের সব নরনারী আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দেখিয়ে দিত? 'পাষাণী' মানুষ হয়েছিল কি? সমাজের সতী সমাবেশে আর কখনো দাঁড়াতে পেয়েছিল কি?

দ্রৌপদী কুন্তীর একাধিক পতি ছিলেন এবং তাঁদের সন্তানরা বিবাহিত পতির সন্তানও ছিলেন না। পতির অনুমোদনে তাঁরা বহুভর্ত্তৃকা আর সেই সব পুরুষের সন্তানের মাতা হয়েছিলেন।

তাহলে কি ঐ 'অনুমতি শুদ্ধতাই তাঁদের সতী স্ত্রী অকলঙ্ক করে রাখল।

অহল্যা যদি তা হতেন? আর দুর্গারা? দুর্গা কি অহল্যার স্বর্গে গেল? যায়? না, পাষানী বা পাথরের টুকরো হয়ে আমাদের পৃথিবীর পথে ওরই মত আরো অনেকের মত পড়ে রইল।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ২ ॥

১৯২০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বাংলার প্রতিনিধি গণের একাংশ বি এ-আর বোম্বে মেলে নাগপুর রওনা হন। প্রায় ২৭০ জন যাত্রীর মধ্যে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রও ছিল। তারা নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র সভায় যোগদান করতে যাচ্ছিল। প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন। প্রতিনিধিদের মধ্যে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, সপরিবার চিত্তরঞ্জন দাশ, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি নেতারা ছিলেন।

পরদিনের বোম্বে মেলে বাংলার আরও প্রায় ২০০ প্রতিনিধি নাগপুর রওনা হন, এই দলে আমিও ছিলাম। প্রতিনিধিদের জন্য দুটি প্রথম শ্রেণী, পাঁচটি দ্বিতীয় শ্রেণী, একটি মধ্যম শ্রেণীর (ইন্টার মিডিয়েট ক্লাস) কামরা এবং দুটি তৃতীয় শ্রেণীর বগী রিজার্ভ করা হয়েছিল।

প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন—ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, নিশীথনাথ সেন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর), জে,এন, রায়, বি সি চ্যাটার্জি (বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) জে চৌধুরী (যোগেশচন্দ্র চৌধুরী), বসন্তকুমার বসু প্রভৃতি। এঁরা উচ্চশ্রেণীতে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করলেন।

কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে আমি একটি তৃতীয় শ্রেণীর বগীতে উঠলাম। কামরায় বসবার মত সকলের জায়গা ছিল কিন্তু রাত্রে শোওয়ার মত কোন জায়গা ছিল না। তবে আমরা সকলে প্রতিনিধি থাকায় শয়নের ব্যবস্থা করা কঠিন হল না। বাঙ্কের উপর বেঞ্চের উপর এবং বেঞ্চগুলির মধ্যবর্তীস্থানে পাঠাতনে বিছানা পেতে আমরা শয়নের ব্যবস্থা করলাম। পূর্ব্বের মত এবারও আমাদের নেতৃত্ব করলেন ঢাকার নেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সহযাত্রীদের মধ্যে শ্রীশবাবু ছাড়া, কৃষ্ণনগরের হেমন্ত কুমার সরকার—সদ্য আন্দামান প্রত্যাগত প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, আমার সহপাঠী বন্ধু সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বগুড়ার সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন। এই ট্রেনেই প্রথমে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি আন্দামান থেকে মুক্ত হয়ে কংগ্রেসে যোগদান দিতে চলেছেন, তাঁর মধ্যে অনির্বান অগ্নিশিখা লক্ষ্য করি। দীর্ঘকাল আণ্ডামানে বন্দীজীবন কাটানর পরেও তাঁর তেজ বীর্য্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।

নাগপুরে পৌঁছে নেতাগণ তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে চলে গেলেন। আমাদের জন্য ক্র্যাডক টাউনে (ধানতৌলি) অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল, স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের সেখানে নিয়ে গেল।

দাশ মশায় গান্ধীর মূল অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধা-

চরণ করার জন্য প্রভৃত অর্থব্যয়ে পরবর্তী ট্রেনেও বহু সংখ্যক প্রতিনিধি নাগপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বিশেষ কোন বিধি ছিল না। যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারত।

দাশ মশায় গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণে দৃঢ় সংকল্প হন। এই সময় অসহযোগ সম্বন্ধে তাঁর তৎকালীন মনোভাব কি ছিল তা ডিব্রুগড়ে ১৩২০ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং ৩রা ডিসেম্বর একজন সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে যে মত ব্যক্ত হয়েছে তা থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন যে অসহযোগই একমাত্র উপায় যা কার্য্যে পরিণত করতে পারলে দু বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেন্টকে অচল করা যায় কিন্তু কংগ্রেস যে কার্য্যসূচী প্রস্তুত করেছে তা মোটেই কার্য্যকরী নয়। প্রত্যেক প্রদেশের অবস্থা বিবেচনা করে কর্মসূচী পরিবর্তন করতে হবে। তিনি আশা করেন যে—আগামী কংগ্রেসে অভিপ্সিত পরিবর্তনগুলি গৃহীত হবে। প্রস্তাবিত ব্রিটিশ দ্রব্যের বয়কট সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এতে দেশের ক্ষতি হবে কারণ এতে দেশ ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে। তৎপরিবর্তে তিনি ব্রিটিশ এজেন্সিগুলি বয়কট করতে বলেন। কাউনসিল বর্জন সম্বন্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে জাতীয়বাদী-গণের কাউনসিলে প্রবেশ আবশ্যক—গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করতে নয়—মন্ত্রী গঠন অসম্ভব করে তুলে গভর্ণমেন্টকে সঙ্কটে ফেলতে। তিনি স্কুল ও কলেজ বয়কটের বিরুদ্ধেও বলেন। আইন—আদালত বর্জন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ২১ বৎসর আইন ব্যবসায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বিশেষভাবেই জানেন বর্তমান বিচার পদ্ধতি কি পরিমাণে দেশের নৈতিক ও আর্থিক ক্ষতি করেছে কিন্তু তথাপি তিনি মনে করেন অসহ-যোগের সমুদয় কর্মসূচী গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আইন ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ত্যাগ করতে বলা চলে না।

আমাদের বাসস্থান অ্যাংলো-বেঙ্গলী স্কুলের পার্শ্ব-বর্তী প্রাঙ্গনে পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের জন্য শিবির স্থাপিত হয়েছিল। দেখলাম যে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় ঐ শিবিরে উপস্থিত হয়ে প্রতিনিধি-দের সঙ্গে মাটিতে পাতা সতরঞ্চির উপর বসে তাঁদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছেন এবং রাজ-নৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করছেন।

আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বাংলার নেতারা তাঁদের বিশিষ্ট বাসভবন থেকে বেরিয়ে সাধারণ প্রতিনিধিদের কোন খোঁজ খবর নেওয়া দরকার মনে করে নি।

(৩)

নির্বাচিত সভাপতি শ্রী'সি বিজয়রাঘবাচারিয়া ২৪শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে একটি স্পেশাল ট্রেনে নাগপুর ষ্টেশনে পৌছে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মুসলীম লীগের নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ আনসারীর আগমনের প্রতীক্ষায় কেলনার কোম্পানীর বিশ্রাম কক্ষে অবস্থান করছিলেন। ব্যবস্থা ছিল উভয় সভাপতিকে এক সঙ্গে অভ্যর্থনা করা। ডাঃ আনসারী হাকিম আজমল খাঁ এবং উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নেতাদের সমভিব্যাহারে বেলা ১০টা নাগাদ বোম্বে মেলে নাগপুর পৌছলেন। প্ল্যাটফরমে প্রবেশ জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্লাটফরম টিকিট বিক্রয় করা হয়েছিল। ট্রেণ ষ্টেসনে প্রবেশ করতেই জনতা 'বন্দে মাতরম্' মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়" ধ্বনি দিতে লাগল। ষ্টেশনের বাইরে বিপুল জনতা সমবেত হয়েছিল। ডাঃ আনসারীকে শেঠ যমনালাল বাজাজ, ডাঃ মুঞ্জে ও কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির ও মুসলীম লীগের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ—অভ্যর্থনা করে প্ল্যাটফরমের উপর নির্মিত সামিয়ানায় নিয়ে গেলেন। সেখানে শ্রী সি বিজয় রাঘবাচারিয়া, মহাত্মা গান্ধী, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, এস, আর, বোমানজী, লালা লাজপত রায় এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ জননায়কগণ অপেক্ষা করছিলেন। এই সকল নেতাকেই পুষ্পমাল্যে

ভূষিত করে ষ্টেশনের গেটে নিয়ে যাওয়া হল। হোমরুল পতাকা শোভিত মোটর গাড়ীতে নেতাগণকে নিয়ে শোভাযাত্রা করা হল। প্রথম মোটর গাড়ীতে নির্বাচিত সভাপতি দুজনকে দুধারে রেখে মধ্যস্থলে গান্ধীজী বসলেন ঐ গাড়ীর সম্মুখের সিটে বসলেন শেঠ যমনালাল বাজাজ ও ডাঃ মুঞ্জে। অন্যান্য নেতারা পশ্চাৎবর্তী মোটর গাড়ীগুলিতে উঠলেন। পুষ্পমাল্য পতাকা শোভিত প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত ধূলি ধুসরিত সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়ে নিবাচিত সভাপতিদ্বয়কে শোভাযাত্রা করে ক্র্যাড়ক-টাউনে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলের নিকট নিয়ে যাওয়া হল। এখানেই অধিকাংশ নেতাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। শোভাযাত্রার সময় রাস্তার উভয় পার্শবর্তী জনতা আনন্দে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। শোভাযাত্রা ক্রাডক টাউনে পৌছলে সভাপতিদিগকে তাঁদের নির্দিষ্ট বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হল।

(৪)

কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল ২৬শে ডিসেম্বর বেলা ১টা, নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব থেকেই প্যাণ্ডেল, প্রতিনিধি ও দর্শক দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। আমরাও একটু সকাল সকাল প্যাণ্ডেলে পৌছে বাংলার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট ব্লকে চেয়ারে আসন গ্রহণ করি।

এবারকার প্যাণ্ডেল আগেকার প্যাণ্ডেলগুলির তুলনায় অনেক বড় ছিল। ডায়াসের সম্মুখে একটি বক্তৃতা মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের চূড়ায় একটি বৃহৎ হোমরুল পতাকা শোভা পাচ্ছিল। সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলের আভ্যন্তরিক দৃশ্য নয়নানন্দকর হয়েছিল। ডায়াসের সম্মুখে জঙ্গী আইনের আমলে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত জনগণের উপর নৃশংস অত্যাচারের বৃহৎ বৃহৎ তৈল চিত্র দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট ব্লকগুলির পশ্চাতে তিন দিকে দর্শকদের বসবার স্থান হয়েছিল গ্যালারিতে। প্যাণ্ডেলের ভিতর এত লোক সমবেত হয়েছিল যে সেখানে তিলধারণের স্থান ছিল না। বহুলোক প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতে না পেরে বাইরে থেকে গেল। এত ভীড় স্বত্বেও স্বেচ্ছাসেবকগণ অতি দক্ষতার সহিত প্যাণ্ডেলে প্রতিনিধি ও দর্শকদের প্রবেশ সুকৌশলে ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে।

মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের জন্য এবারকার কংগ্রেসে প্রায় ২২ হাজার প্রতিনিধি যোগ দিযেছিলেন। প্রেস গ্যালারীর সন্নিকটে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্লকে বহু সহস্র মহিলা আসন গ্রহণ করেছিলেন, কংগ্রেসে এত জনসমাবেশ ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। সমবেত জনতা মুহুর্মুহু "মহাত্মা গান্ধীকী জয়" "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দ্বারা তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল।"

ডায়াসের উপর যারা আসন গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী সর্ব্বশ্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, বসন্তকুমার লাহিড়ী ইন্দুভূষণ সেন, পদ্মরাজ জৈন, বিপিন চন্দ্র পাল, স্বপত্নী মহম্মদ আলি জিন্না, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, সর্ব্বশ্রী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জে, এন্, রায়, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, নিশীথচন্দ্র সেন, জি, ব্যানার্জ্জি, স্যার বিপিন কৃষ্ণ বসু (নাগপুরের বিশিষ্ট উকিল এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য্য) সর্ব্বশ্রী মুজিবর রহমন্, এস্, কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার, এ, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, এস্, সত্যমূর্ত্তি, সি, রাজাগোপালাচারী, এন্, বি রঙ্গস্বামী, আয়েঙ্গার, ভি, পি, নরসিংহ আইয়ার, ডঃ জে, এন্, রাজন্, সর্ব্বশ্রী জে, কে, গোপালস্বামী, মুদালেয়ার, টি, ভি, ভেঙ্কটরমন আয়ার, জি, এস্, খর্পদে, স্যার গঙ্গাধর চিত নবীস্, সর্ব্বশ্রী এন্, বি, দাদাভাই, দীক্ষিত, দ্বারকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য, ডাঃ সত্যপাল, ডঃ কিচলু, লালা হরকিষণলাল, পণ্ডিত শ্যামলাল নেহেরু, কুঙার লক্ষণ রাও ভোঁসলে, সর্ব্বশ্রী জহুর আমেদ, কামিনীকুমার চন্দ, ওমর শোভানী, পণ্ডিত বিষন দত্ত সুকুল, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, লালা সুন্দরলাল,

হাকিম আজমল খাঁ, শ্রীআসরফ আলী, মৌলানা সৌকত আলী, মৌলানা মহম্মদ আলী প্রভৃতি নেতাগণ। ডায়াসের পুরোভাগে বামদিকের প্রথম সারিতে, শাড়ী পরিহিতা শ্রীমতী জিন্না (প্রসিদ্ধ শিল্পপতি স্যার দীনশা পেটিটের কন্যা) বাহু যুগল অনাবৃত করে বসেছিলেন। তখনকার দিনে মহিলাদের মধ্যে এ ভাবে পোষাক পরা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নি। অনেকের নিকট এই পোষাক দৃষ্টিকটু লাগছিল। বিশেষতঃ মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা গেল কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলল না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পরে বেলা সাড়ে এগারটার সময় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ যমুনালাল বাজাজ, সম্পাদক ডঃ মুঞ্জে, শ্রীদীক্ষিত ও অন্যান্য সদস্যগণ প্যাণ্ডেলের তোরণদ্বারে নির্বাচিত সভাপতি শ্রীবিজয় রাঘবাচারিয়াকে—অভ্যর্থনার পর শোভাযাত্রা করে ডায়াসে নিয়ে এলেন। সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ছিলেন। সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকগণ বিপুল জয়ধ্বনি করে সভাপতি মশায়কে অভ্যর্থনা জানাল; কিন্তু বেশী অভ্যর্থনা পেলেন মহাত্মা গান্ধী, "মহাত্মা গান্ধী কী জয়" ধ্বনিতে প্যাণ্ডেল মুখরিত হয়ে উঠল।

আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত—সভাপতির আসন গ্রহণ না করে শ্রীবিজয় রাঘবাচারিয়া অপর একটি চেয়ারে বসলেন। সন্নিকটে লোকমান্য তিলকের একটি আবক্ষ প্রস্তর মূর্ত্তি রক্ষিত ছিল। ঐ মূর্ত্তির নিকটে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিঠল ভাই প্যাটেল আসন গ্রহণ করলেন। তাঁদের নিকটে ব্রিটিশ, শ্রমিক দল ও কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত কর্ণেল ওয়েজউড, মিঃ বেন, মিঃ সি স্পুর, কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির প্রতিনিধি স্বরূপ মিঃ হলফোর্ড নাইট এবং মিঃ দুবে (ব্যারিষ্টার পণ্ডিত ভগবান দীন দুবে) আসন গ্রহণ করেন, এ ছাড়া শ্রীমতী ওয়েজ উডও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরও "ব্রিটিশ লেবার পার্টি কী জয়" ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়।

ক্রমশ

পরমসত্য

(গল্প)

আরতি বসু

লিখতে লিখতে একবার আমাকে চোখ তুলে তাকাতে হ'ল। একটা খস্‌খস্‌ অস্পষ্ট শব্দ। তাকিয়ে দেখি জানলার কাছে হুমড়ি খেয়ে দুহাত দিয়ে আমার দিদা কি যেন হাতড়াচ্ছে। একটু থমকে থামতে হ'ল আমায়। জিজ্ঞেস করলাম—কি খুঁজছ দিদা? উত্তর পেলাম—'আমার জলখাবারটা হাতের কাছে এনে দেতো ভাই। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ঘরের সমস্তটা জুড়েই একটা আলো আধারির লুকোচুরি খেলা চলছে। প্রথম দৃষ্টিতে কিছুই আমার চোখে পড়ল না। আমি আমার লেখবার টেবিল ছেড়ে উঠে এলাম। দিদার খুব কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম অনতিদূর একটা বাটিতে কিছু মুড়ি আর দুটো বেগুনী রেখে যাওয়া হয়েছে। কে রেখেছে, কখন রেখেছে তার কিছুরই খবর আমি রাখিনি। হয়, অনাদর আর অবহেলায় রেখে যাওয়া খাবারটার সম্বন্ধে দিদাকে সচেতন করা হয়নি। আর না হয় আমার লেখায় আমি ডুবে ছিলাম বলে কোন কথা আমার কাণেই যায়নি। যাইহোক বাটিটা আমি দিদার হাতে তুলে দিলাম। বললাম—'নাও দিদা' খাও। আমাকে বললেই তো হত। শুধু শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছ কেন?' দিদা একটু হেসে বলল—'তুই লিখছিলি দাদুভাই তাই তোকে বিরক্ত করিনি। আজকাল চোখদুটোতে আর কিছুই ঠাওর করতে পারিনা রে। যা ভাই যা, তুই লিখগে যা।'

আমি আবার আমার চেয়ারে এসে বসলাম। কিন্তু লিখতে নয়। দিদা জানেনা যে আজ আমার আর লেখাই হবে না। খাতা বন্ধ করতে হবে, কলম গোটাতে হবে, তারপর আমার দিদার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আজকের সন্ধ্যের অনেকটাই আমায় নষ্ট করে ফেলতে হবে।

দিদা তখন হাতে বাটিটা তুলে নিয়ে খাবার ভান করছে। কারণ, আশি বছরের বৃদ্ধার পক্ষে ঐরকম মিইয়ে যাওয়া মুড়ি আর রবারের মত বেগুনীকে গলাধঃকরণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অথচ আমি জানি, দিদা তারজন্য কোনদিন আমার মা, কাকীমা অথবা বৌদিদির কাছে কোনরকম অভিযোগ করেনি। আমি ঘরের আলোটা জেলে দিলাম। কারণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝলাম সেটা বোধহয় ভাল করিনি। আলো জ্বালার শব্দ পেতেই দিদা খাবার বাটিটা পাশে সরিয়ে রাখল। আমাকে বললে—'দরজা-গোড়ায় একটা ঘটি আছে, সেখান থেকে একটু জল এনে আমার হাতে দেতো ভাই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আগে আহ্নিকটা সেরে নিই, তারপর খাব'খন। আমি নিঃশব্দে দিদার কথামত কাজ করলাম। ভাবলাম সত্যিই তো অত শক্ত খাবার দিদার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি খাওয়া সম্ভবই নয়। আহ্নিক সারতে সারতে দিদার ক্ষিদেই হয়ত চলে যাবে। তার মানে আজকের জলখাবারটা দিদার পেটে আর পড়বেই না।

এই আমার দিদার ছবি। এই ছবিটাকেই আমি প্রতিদিন লিখতে লিখতে তাকিয়ে দেখি। আশি বছর বয়স্কা এই দিদার জীবনের প্রত্যেকটি সম্বল প্রায় একে একে হারাতে বসেছে। কাউকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেও কেউ আর দিদাকে আঁকড়ে থাকতে চায়না। কারণ এ সংসারে দিদা নামক মানুষটি একেবারে অচল হয়ে গিয়েছে। পুরোন ভাঙ্গা ঘটি বাটির মত আর কি। যার প্রয়োজন সংসারে ফুরিয়েছে অথচ তাকে চট্ করে ফেলে দেওয়াও যায় না। হয়ত কোনদিন কোন অসময়ে ওটা কাজে লাগতেও পারে। তাই চিলে-কোঠায় ছাদের যতরকম আবর্জনার স্তূপে ওটাকে জড়ো করে রাখা হয়। আমার তো মনে হয় দিদার ঐ ভাঙ্গা ঘটি-বাটির মতো অসময়ের কিছু কাজ দিতে হয়। কারণ মাঝে মাঝে যখন সারা বাড়ীর সমস্ত লোকের কোন ফূর্ত্তি করবার দরকার পড়ে তখন ঐ অবহেলিত বুড়ি-টাকেই দারোয়ান সাজতে হয়। পাহারা দেবার এই কাজটুকু না থাকলে অনেকদিন আগেই ওরা হয়ত দিদাকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠিয়ে দিত।

এই দিদার জীবনের তাই একটিমাত্র সম্বল। একছড়া জপের মালা। দিদা সারাদিন তাকে অঙ্গুলে জড়িয়ে বুকে ঠেকায় আর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে ইহ-জীবনের কাজ সারে।

এই দিদার কাছে আমি কিন্তু অনেকরকম আবদার জানাই। প্রায়ই বলি---দিদা কদিন ধরে একটা প্লটও আমার মাথায় আসছে না। আচ্ছা দিদা তোমার কথা কিছু বলনা গো। তোমাকে নিয়ে তাহলে একটা গল্প লিখতে পারি।' দিদা হাসে—'দূর পাগল! আমাকে নিয়ে কি লিখবি। আমি কি আর তেমন কেউ?' আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। 'আহা বলই না। তোমারও তো একটা জীবন আছে। এই এতবড় সংসারটা এতাদন ধরে চালালে কত কিই তো দেখেছ। সেগুলো কিছু কিছু বলনা।'

দিদা একটু থেমে থাকে। বোধহয় আশি বছরের বিরাট জীবনটার তলায় তলায় তলিয়ে যেতে চায়। হয়ত সেখানে কোন মণিমুক্তোর সন্ধান করে। দিদার ধারণা যা কিছু ভাল সাহিত্য শুধু তার কথাই বলে। কিন্তু আমি যতদূর জানি আমার দিদার জীবনের কোথাও শত চেষ্টা করলেও হীরের সন্ধান পাওয়া যাবে না। শুধু পাথর, পাথর আর পাথর। শোকে, দুঃখে, যন্ত্রণায় এই মানুষটার বুকটা সাহারার মরুভূমি হয়ে গেছে। কেবল আজকেই নয়, কোনদিন কখনও সেখানে কোন ফুল ফোটেনি, কোন ফল ধরেনি। তবুও দিদাকে বিরক্ত করি—'দিদা তোমার বিয়ে হয়েছিল কবে? তখন তোমার কত বয়স গো?' উত্তর পাই—'সে কি আর মনে আছে ভাই, সে কবেকার কথা, সব কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে রে!'

আমি অবশ্য জানি কিছু কিছু। দিদার বিয়ের সময় বয়স ছিল আট কি নয়। দিদা বাসিবিয়ের দিনে এ বাড়ীতে আসবার সময় সারা রস্তাটা নাকি চিৎকার করে কেঁদেছিল। যখন গাড়ী এসে থামল সে এক বিশ্রী অবস্থা। কাজলে চন্দনে মাখামাখি হয়ে একাকার। বড়মা, মানে দিদার শাশুড়ী দিদাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। চোদ্দো বছরের দাদুর তখন হিংসে হয়েছিল। বলেছিলো 'ইস্ আদর কত! ছিঁচকাঁদুনি মেয়ে কোথাকার। দিদা তখনও বড়মার কোলে, তবু দাদুকে ভেংচি কেটে জিব দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন তুই ছিঁচকাঁদুনি।' সবাই হেসে উঠেছিল হো হো করে। বলেছিল----'যেমন কাণ্ড তোমাদের। এতটুকু মেয়ে বিয়ের কি বোঝে?' সত্যি, বিয়ে কি ওরা বোঝেনি। তাই সমস্তক্ষণই ওদের চুলোচুলি লেগে থাকত। দাদু ছড়া কাটতেন—'ছিঁচকাঁদুনী নাকে ঘা, রক্ত পড়ে চেটে খা।' দিদা প্রত্যুত্তর দিতেন—'বাঁদরের মতন দেখতে আর গাধার মতন বুদ্ধি। চিড়িয়াখানা তাই তো তোর আসল চৌহদ্দি। বড়মা দুজনের সঙ্গে কিছুতেই পেরে না উঠে মাঝে মাঝে দিদাকে ঘরে বন্ধ করে রাখতেন। শেষে ঘড়িতে যখন এগারোটা বাজত দিদা গলা ছেড়ে চেঁচাতেন—'অ মা দরজাটা খুলে দাওনা, গাধাটা যে ইস্কুল চলে যাবে, তখন সারাদিনে আর

দেখাই হবে না।' রান্না করতে করতে বড়মা হেসে খুন হতেন, ছুটে এসে দরজা খুলে দিতেন। বলতেন—'আর করবি কখনও দুষ্টুমি? যা এক্ষুনি গিয়ে খোকাকে প্রণাম করগে যা। বলগে যা আর কখনও ওসব বলবো না।' ছাড়া পেয়ে দাদুর কাছে ছুটে যেতেন দিদা। দাদু তখন ইস্কুলের বইপত্তর গোছাতেন। দিদা বলতেন —'এই বাঁদর কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?' বড়মা বলতেন—'বৌমা আবার?' দাদু ততক্ষণে সজোরে দিদার কানদুটো মলে দিয়ে রাস্তায় পা দিতেন। আর যায় কোথায়! দিদা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হেঁচে কেশে দাদুর যাওয়ার পথে বাধা দিতেন। বড়মা নাস্তানাবুদ হতেন আর বলতেন—'ওরে পোড়ারমুখী সর্বনাশ করবি নাকি, ছেলেটা যে গাড়ীর তলায় চাপা পড়বে।' দিদা তখন পরম আনন্দে হাসছেন। ভাবটা এই, তাই তো চাই তোমার ছেলের একটা বিপদ হোক। তারপর বিকেলে দুজনের একেবারে অন্য মূর্ত্তি। ইস্কুল থেকে ফিরেই দাদু ছুটে আসতেন। দিদার কানে হাত দিয়ে বারবার দেখতেন জায়গাটা লাল হয়ে আছে কিনা। জিজ্ঞেস করতেন—'কমল বড্ড লেগেছে কি?' দিদা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলতেন—'কাল ইস্কুলের ফেরৎ সেই মাথায় টুপি দেওয়া সাহেব পুতুলটা কিনে এনো। শুধু মেম নিয়ে আমি কি করব?' দিদার এসব কথা শুনতে শুনতে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। কবিগুরুর লাইনটা কানে বাজত, 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে।' তাহলে একটা আট বছরের মেয়ের কাছে এ সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেইদিনই বড়মার কাছ থেকে খাতা পেন্সিলের নাম করে কিছু বেশী পয়সা চাইতে হতো দাদুকে। তারপরদিনই সাহেব পুতুল পেয়ে যেত দিদা।

আমার দিদার নাম ছিল কমলিনী। দাদু কখনও ডাকতেন কমল, কখনও বা কমলহীরে। অথচ অবাক লাগে ভাবতে, এই হীরেই একদিন দাদুর জীবনে কাচে পর্য্যবসিত হয়েছিল। দাদু তখন মদ ধরেছেন, উচ্ছৃঙ্খল হয়েছেন, দিদার ওপর অত্যাচার অবিচার তখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিরাতে প্রহারই তখন দিদার জীবনে একমাত্র পাওনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর যা বলছিলাম...। দুজনের খুনসুটি যখন কিছুতেই থামানো গেলনা তখন গরমের ছুটিতে বড়মা ওদের পুরী পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে কেউ গেলনা। জানাশোনা এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ওঠবার ঠিক হলো। একমাস পরে স্কুল খুললে ওরা ফিরে আসবে এই বলে দুজনকে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হলো। ষ্টেশনে লোক থাকবে ওদের নিয়ে যাবার জন্য।

তারপর কি ওষুধ দিয়ে দাদু দিদাকে ঠিক করলে বড়মা জানেন তবে ওরা যখন ফিরে এল সবাই লক্ষ্য করল দুজনের একেবারে অন্য মূর্ত্তি।

দিদা ভীষণ শান্ত, নম্র আর লাজুক হয়েছে। দাদুকে দেখলে মাথায় ঘোমটা টানে। সন্ধ্যাবেলায় শাঁখ বাজায়, তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালে। সকাল হলে বড়দের প্রণাম করে আর রাত্তিরে সবার শেষে শুতে যায়।

যে দিদা আট বছরে এ সংসারে ঢুকেছিল, সেই দিদার আশি বছর প্রায় পার হতে চলল। কত ঝড় কত ঝাপটা, কত ক্ষতি, কত বিচ্যুতি তবু দিদা অচল অটল।

শুধুই কি দাদুর অত্যাচার? জীবনে শোকও বড় কম পায়নি দিদা। স্বামী, একমেয়ে, একছেলে, ছোটবৌ এমনকি এক নাতনীর চলে যাওয়া দিদা চোখের সামনেই দেখেছে। এছাড়া দিদার নিজের দাদা-বৌদি আর বাবা-মা'র শোকতো আছেই। আমার বাবারা অনেক ভাই-বোন ছিলেন। তার মধ্যে জ্যেঠামশাই অর্থাৎ দিদার বড় ছেলে তিনদিনের জ্বরে মারা গিয়েছিলেন। সকলকে অবাক করা এই মৃত্যু দিদার জীবনে যে চরম বিপর্যয় এনেছিল তা বলাইবাহুল্য। প্রায় বছর খানেক দিদা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। সবাই ভেবেছিল দিদা বোধহয় পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু ভগবান দিদাকে অত সহজে পাগল করতে চায়নি, কারণ দিদার জীবনে অনেক শোক তোলা ছিল। এবং তা জানা

গেল আরও বছর দুই পরেই। সেজপিসি যে ঐ ভাবে গাড়ীর তলায় চাপা পড়বে এ কথা কি কেউ আগে জানতো? দিদা স্থির হয়ে সেই দুঃসংবাদ শুনেছিলেন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন—'ভাগ্যিস ওর বাবা আজ বেঁচে নেই। থাকলে এ শোক সে সহ্য করতে পারত না। ও বড় ভালবাসত মিন্টুকে।' তারপর অনেক বছর ঈশ্বর দিদাকে দয়া করেছিলেন। আমাদের সংসারে আর নতুন কোন মৃত্যু ঘটেনি। শেষে অভাবনীয় সেই দুঃসংবাদ নিয়ে ছোটকাকীমার একভাই এসে দাঁড়াল। কদিনের জন্য ছোটকাকীমা বাপের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেন। তারই ভিতরে কেমন করে যে তাঁকে কলেরায় ধরল তা কেউ কল্পনাতেও আনতে পারলনা। যখন প্রায় সব শেষ হয়ে এল তখন এ বাড়ীর কাছে সেই খবর এসে পৌঁছল। ছোট কাকার দুঃখটাই তখন সবার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল কিন্তু কেউ জানলা না আর একটা মনের খবর। সেখানটা যে কেমন করে আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার তখন আর কারোরই সময় ছিল না।

এমনি করে মৃত্যু দেখতে দেখতে দিদা মাঝে মাঝে সত্যি পাগল হয়ে যেতেন। চীৎকার করে বলতেন, 'ওরে বড্ড জ্বালা, বড় যন্ত্রণা বুকে। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা রে।'

অথচ আশ্চর্য্য কেউ কখনও দিদাকে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলতে দেখেনি। শোক করতে করতে পাগল হয়ে গিয়েছিল মানুষটা। মাঝে মাঝে পাগলামী করত, তারপর স্থির হয়ে যেত কিছুদিন পরে, কিন্তু কাঁদত না কখনও একবিন্দু।

দিদা বলেছিল, দিদাকে নিয়ে নাকি গল্প লেখা যায় না। শুনলে আমার হাসি পায়। হাসি নয় আসলে দুঃখটাকে ভোলবার জন্যেই হাসতে চেষ্টা করি। আমার আটাত্তর বছরের বৃদ্ধা দিদাও একদিন এই একই কারণে হাসতে চেষ্টা করেছিলেন। আমার নিজের ছোট বোনটা যখন বাচ্চা হতে গিয়ে হাঁসপাতালে মারা গেল তখন দিদাকে খবরটা জানানো হয়নি। কারণ শোক সহ্য করারও তো একটা সীমা আছে। সকলে ভয় পেয়েছিল, দিদা হয়ত হার্টফেল করবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দিদা জানতে পেরেছিল। বেড়ালটা যখন একটানা কাঁদতে লাগল তখন দিদা বললে—'ওরে তোরা আমাকে আর লুকোবার চেষ্টা করিসনি। আমি জানি বেলা আর বেঁচে নেই। তোদের দুটি পায়ে পড়ি ওকে তোরা হাঁসপাতাল থেকে শ্মশানে নিয়ে যাসনি। একবার আমার কাছে নিয়ে আয়। ওর অনেকদিনের চাওয়া সেই বেলফুলের মালাটা আজ ওরই গলায় পরিয়ে দোব। হতভাগীকে দেখিয়ে দোব ওকে শেষ সাজে সাজাবে বলে বুড়িটা এখনও বেঁচে আছে।'

কবে নাকি ছোটবেলায় বেলা দিদার কাছে চার আনা পয়সা চেয়েছিল একটা বেলফুলের মালা কিনবে বলে। দোব দোব করে পয়সাটা আর দেওয়া হয়নি। সেই মালাটা এতদিন পরে দিদা সত্যি সত্যিই বেলার গলায় পরিয়ে দিলে। সবাই আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, দিদার হাত এতটুকু কাঁপল না। গলা একটুও ধরল না। দিদা পরিষ্কার চাঁচা গলায় বললে—'নে দিদিভাই নে, মালাখানা পর, আর অভিমান করে থাকিসনে ভাই, লক্ষ্মীটি।'

বেলা চলে গেল। আমাদের বহুদিনের পুরোন চাকর নিধিরামের হাত ধরে দিদা ওপরে উঠে এল। বললে 'শরীরটা কেমন করছে রে তোরা একটু আমার কাছে থাক্।'

এই আমার চির চেনা দিদা। আমার ঠাকুমা, এ বাড়ীর আসল গিন্নী।

তারপর আস্তে আস্তে আরও ক'বছর কাটল। দিদা আরও অথর্ব হ'ল, আরও অক্ষম। সংসারের কাছে একেবারে অপ্রয়োজনীয় হতে আর কিছুই বাকী নেই। দিদা চোখের দৃষ্টিটা এখন প্রায় সম্পূর্ণ ই হারিয়ে ফেলেছে। সমস্ত দাঁত পড়ে গেছে। কুঁজো হয়ে গেছে। লাঠি কিংবা কাউকে না ধরলে চলতে পারেনা। বাথরুম ছাড়া বড় একটা কোথাও যায় না। একজায়গাতেই

বসে থাকে সারাদিন। শুধু বিকেল হলে নিধিরামের হাত ধরে এই জানলাটায় এসে বসে। কেন যে বসে, এই জানলা দিয়ে কোন্ আশার আলো যে দেখতে পায়, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। শুধু লিখতে লিখতে মুখ তুলে দেখি নিধিরাম জানলার কাছে দিদাকে বসিয়ে দিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে আমাদের বামুনদিদি দিদার জলখাবারটাকে পরম অবহেলায় দিদার সামনে রেখে চলে গেল। দিদার হাতে তুলে দেবার সময়টুকু পর্য্যন্ত ওর নেই। ও স্পটই বলে দিয়েছে যতসব বুড়িদের তদারক করতে পারবেনা। আসলে বামুনদিদি জানে ওর মাইনেটা দিদা দেয় না, তাই যারা দেয় তাদের রান্নাটাই বামুনদিদি যত্ন ক'রে করে।

দিদা থাকে বারন্দার কোনের ঐ অন্ধকার ঘরে, সে ঘরে আলো-হাওয়ার প্রবেশ নিষেধ, তবু সেইখানেই দিদাকে থাকতে হবে কারণ স্বাস্থ্যকর ঘরে দিদার আর কি কোন দরকার আছে? জীবনে বেঁচে থাকার আর তো কোন মানেই হয় না। আশি বছরের একটা বুড়ির জন্য শুধু শুধু একটা ঘর জোড়া হয়ে রয়েছে। এই ক্ষতিটা যে কবে পূরণ হবে সেই চিন্তা এখন সকলেই করছে। বিকাল হলেই দিদা চেঁচায়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যখন গলা চিরে যায় তখনই নিধিরাম গজগজ করতে করতে দিদাকে এঘরে দিয়ে যায়। এসেই দিদা বলে—'দাদু ভাই আজ তোমার লেখার কতদূর?' আমি বলি 'এগোবে কি দিদা তুমি তো তোমার কথা কিছুই বলতে চাও না। আমি যে চাই তোমায় নিয়ে লিখতে।' আসলে আমি অন্য কিছু চাই। আমি জানি এই অদরকারী মানুষটা যেদিন সংসার থেকে চলে যাবে সেদিন একেবারেই যাবে। তার কোন স্মৃতিকেই এরা ধরে রাখবার চেষ্টা করবে না। এমনকি জপের মালাটাকেও এরা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। তবু দিদা থাকবে আমার উপন্যাসে, আমার গল্পে, আমার কবিতায়। আমার চেতনায়, আমার ভাবনায় আমি কেবলই দিদার ছবি দেখব।

অথচ আমার ইচ্ছে কিছুতেই বাস্তবরূপ নিচ্ছিল না। ইতিমধ্যে আমি একটা ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় গল্প দেওয়া নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। দিদাকে নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতে পারিনি। গল্প লিখছি আর কাটছি। একটা নিটোল প্লট কিছুতেই খাড়া করতে পারছি না। সমস্তটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এ দিকে সময়ও আর বেশী নেই, তারপর হঠাৎ, হঠাৎ-ই একদিন একটা প্লট পেয়ে গেলাম। আর সেই প্লট আমার দিদাকে নিয়েই গড়ে উঠলো।

অমনি করে লিখছি আর কাটছি, এমন সময় দেখি দিদা আপনমনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ভীষণ ভাবে কাঁদছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। দিদার এমন অযাচিত কান্নার কোন কারণ অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলাম না। একদৃষ্টে দিদার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম শরীরে কি কোন কষ্ট হচ্ছে? দিদা বুড়ো হয়েছে। দেহে নানারকম ব্যাধির যন্ত্রণা হওয়া তো আশ্চর্য্য কিছু নয়। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম—'কাঁদছ কেন দিদা, শরীরটা কি খারাপ লাগছে? আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা। আমি তো জানি শত কষ্ট হলেও ওরা কেউ দিদার খোঁজখবর করবেনা। কারণ অসুখটা একবার ধরা পড়ে গেলেই সবাইকে লোকদেখানো সেবাটাও করতে হবে। তার চেয়ে এটাই সম্পূর্ণ নিরাপদ উপায় অর্থাৎ দিদা সম্পর্কে উদাসীন থাকা। দিদা আমার কথার উত্তরে শুধু আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লে। মানে শরীরে কোন কষ্ট হয়নি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তবুও দিদা কাঁদছে। তবে আর ফুঁপিয়ে নয়, দুচোখ দিয়ে জল ঝরছে অবিরল।

পরিস্থিতিটা তখনও আর ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। কেউ কি তবে দিদার মনে কষ্ট দিয়েছে? কিন্তু এ কথাটাও খুব নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ দিদার এই বয়সে কি মনের আর কিছু অবশিষ্ট আছে, যে সেই মন কষ্ট পাবে? তাহলে কি হতে পারে! কিন্তু দিদাকে আমি আর বিরক্ত করলাম না। আমি যে জানি মানুষের জীবনে কোন কোন সময় কান্নার খুব বেশী প্রয়োজন

আছে। দুঃখের সান্ত্বনা তো আমরা কান্না দিয়েই পেয়ে থাকি। শত শোকেও যে দিদা একফোটা চোখের জল ফেলেননি সেই দিদার জীবনে এমন কি কারণ ঘটতে পারে যার জন্য দিদা কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দিচ্ছেন? সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত আমি বাড়ীতেই ছিলাম না। তাই সারাদিন কি কি ঘটতে পারে আমার জানা নেই। কিন্তু সন্ধ্যে থেকে......হঠাৎ মনে পড়ে গেল কিছুক্ষণ আগেকার একটা ঘটনার কথা। ঘটনা কিছু নয়, রেডিও-তে একটা দুঃসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছিল। জগদ্বিখ্যাত বরেণ্য এক বিজ্ঞানীর পরলোক গমনের সংবাদ দিয়ে ঘোষক বলছিলেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। শুধু এইটুকুই আমি শুনেছি। আর কোন কথা শোনবার আগেই আমার মন যত্রতত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তাতে কি? এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মৃত্যুর সঙ্গে দিদার কান্নার কি সম্পর্ক? তাঁকে কি দিদা চিনতেন নাকি, তাই তাঁর শোক সহ্য করতে পারছেন না?

ভারি আশ্চর্য্য হলাম ভেবে। সংসারে নিজের এত নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু দিদার সহ্য হোল আর এ মৃত্যুটাই দিদার জীবনে এতবড় করে দেখা দিল? আমি আবার জানতে চাইলাম 'দিদা তুমি কাঁদছ কেন গো?' দিদা কিন্তু এবারে আর চুপ করে রইলনা। চোখ দিয়ে তেমনই জল গড়াতে লাগল। মুখে শুধু বললে 'রেডিও-র ঐ কথাটা শুনে কেমন যেন কান্না পেয়ে গেল দাদুভাই।' বললাম 'তুমি কি ওকে চিনতে দিদা?' দিদা বললে—'না ভাই না, অতবড় মানিষ্যির দেখা আমি পাব কি করে, আমি কি আর বাড়ী থেকে বেরিয়েছি কখনও?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—তবে? দিদা বললে—ও কিছু নয় রে, তুই তোর কাজ কর ভাই।

আমার কিন্তু কেমন যেন বিচিত্র লাগছিল ব্যাপারটা। আবার ব্যস্ত হলাম। 'বলনা দিদা তুমি অমন করছ কেন?'

আমার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে দিদা ব্যাকুল হল। উত্তর দিলে—'ঐ যে বললে শুনলিনা মরণের সময় তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর?' আমার তখন আরও বিস্ময়ের পালা। বললাম—'তাতে তোমার কি?' উত্তর পেলাম—'আমার মরণও যে ৮১ বছরে হবে ভাই। আর তাতো আর বেশী দেরী নেই। এটা তো ফাগুন মাস চলছে, বোশেখ মাস আমার জন্ম মাস। তাহলে ৮১ বছর পড়তে আমার আর দু'মাস বাকী।' আমি জানতে চাইলাম—'তুমি কি করে জানলে দিদা তোমার৮১ বছরে ফাঁড়া আছে?' দিদা একটু ম্লান হাসলে, বললে—'ফাঁড়া কিরে, এ একেবারে মৃত্যুযোগ। দু'জন নামকরা জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল ৮১ বছরে আমার মরণ হবেই। এ মরণ কেউ রুখতে পারবে না। তারা তো মিথ্যে বলেনি ভাই, তারা মস্তবড় গণৎকার। তাই......তাই মনটা কেমন হয়ে গেল দাদুভাই। এক বছরের মধ্যেই এ জগতটাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতেই আমার কান্না পাচ্ছে রে। এ জীবনটাকে আমি বড় ভালবেসেছিলুম।'

আমি সস্নেহে দিদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম—'তুমি কেন এত ভাবছ দিদা? গণনা তো ভুলও হতে পারে!' এই সান্ত্বনা যেন আমাকেই ব্যঙ্গ করতে লাগল। একটা আশি বছরের জঞ্জাল চলে যাবে বলে পৃথিবীর কোথাও কি কোন দুঃখ আছে, যে তাকে ঢাকতে সান্ত্বনা দিতে হবে? দিদা মাথা নাড়তে লাগল। 'না রে না। এ আর নড়চড় হবে না। আমি মরে গেলে তুই আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখিস ভাই।

ভাবছিলুম মরে গেলে নয়, আজই আমাকে একটা গল্প লিখতে হবে, আশি বছরের একটা মৃতপ্রায় জীবনও তবে বেঁচে থাকার একটা মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়। কি আশ্চর্য্য এই মানুষের মন, কি বিচিত্র তার অনুভূতি।

আমার এই দিদা, জগৎ সংসারে যার কানাকড়িও মূল্যও আর নেই, যার মৃত্যুতে কেউ একফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না, বরং আপদ বিদেয় হয়েছে ভেবে খুশীই হবে, সেই দিদা আরও বাঁচতে চাইছে? আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় সেই দিদার চোখে জল? মানুষ

তাহলে প্রতিপদে নিজের সঙ্গে নিজেই ছলনা করে চলেছে। নিজেকেই নিজে মিথ্যে কথা বলছে। মুখে বলছে এত দুঃখ আমি আর সইতে পারছি না অথচ ওগুলো তার বানানো কথা। অন্যের সামনে নিজেকে নানাভাবে অসুখী প্রামাণিত ক'রে মানুষ এক ধরণের মজা পায়, কিন্তু মনে মনে জানে জীবনের কোথায় যেন একটা সুখ, একটা বাঁচার তাগিদ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। নইলে...একটা যে দিদার জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেছে। যেখানে ফুল ফোটার আর কোন সম্ভাবনাই নাই, সংসারের কাছে সেই অবহেলিত অবাঞ্ছিত অযাচিত মানুষটাও কিছুতেই যেতে চাইছে না? জীবনের এত শোক সবই কি এ শোকের কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল? সবাই চলে গেলেও হয়ত ক্ষতি নেই কিন্তু আমি চলে যাব ভাবাও যায় না। আমার শেষ হয়ে যাওয়া, উঃ সে এক অসহ্য অনুভূতি।

আমি লিখতে শুরু করলাম। দিদা হয়ত এখনও অনেকক্ষণ কাঁদবে, কাঁদুক। বাধা দেব না। ওরা সবাই এসে সান্ত্বনা দেবে। কেউ ভাববে দিদা জ্যেঠার জন্য কাঁদছে। কেউ ভাববে পিসিই তার কারণ আবার কেউ বা বলবে আহা ছোট বউটাকে বড্ড ভালবাসত যে! মা হয়ত একবার এসে দাঁড়াবে, বলবে—'কাঁদবেন না মা, এতো ভালই হ'ল, বেলা শেষকালটায় যে বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল।

আমি কিছুই বলব না. কিচ্ছু না। আমি তো জানি কারো জন্যেই দিদা কাঁদছে না। দিদা কাঁদছে নিজের জন্যে। আমি থাকব না অথচ ফুল ফুটবে, পাখী গাইবে, চাঁদ উঠবে সত্যি এ কি সহ্য হয়।

শত শোকেও যে অটল ছিল, কাউকে বিব্রত করেনি এতটুকু, সে যদি এই শোকটাকে সইতে না পেরে একটু বেসামালই হয়ে পড়ে তবে আমাদের অবুঝ হওয়া সাজে কি?

কর্ম্মপ্রার্থী মন

ভাগবতদাস বরাট

হিমাদ্রি নিজের কথাই ভাবে। হাজার রকম চিন্তা-ভাবনার বেড়াজালে সে আপনআপনি জড়িয়ে পড়েছে। খুবই অসহায় মনে হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে সে সম্পূর্ণ অকেজো। হাত—কর্ম্মপ্রার্থী হলেও কাজ নেই। নানা চেষ্টা-চরিত্র করেও একটা কাজ জুটাতে পারে নি। অক্ষমতাই ওর পরিচয়। নিজেকে ধিক্‌কার দেয়। ভাগ্যকে উপহাস করে।

অনেক কথাই মনে পড়ে। স্মৃতির রোমন্থনে জল বুদ্‌বুদের মত একে একে অনেক কথাই ভেসে উঠে। যা এদ্দিন চাপা ছিল তা আজ স্মৃতির দরজায় চাপ সৃষ্টি করে বেরিয়ে আসছে। বিস্মৃত ঘটনাপুঞ্জ সঞ্জীবিত হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মনে হচ্ছে—এই তো সেদিনের ঘটনা, গত কাল কিম্বা পরশু। কিন্তু তা নয়।

তখন সে পাঠশালায় পড়ত। শ্লেট পেনসিলে লিখত। সামান্য কয়েকটা যোগ-বিয়োগের অঙ্ক সে ঠিক ঠিক ভাবে কষতে পারত না। পাঠশালায় সুরেন পণ্ডিত সেই সময় ওর কান টেনে দাঁত কিচে বলেছিলেন—তোর মাথায় গোবর ভরা। কথা শুনে আশপাশের ছেলেরা হেসেছে—। যাদের ওরই মত বিদ্যায় দৌড় তারাও টিপ্পনী কেটেছে—মাথায় গোবর ভরা থাকলে তো বুদ্ধি বাড়বে ওর। গোবর, গাছের গোড়ায় দিলে গাছ যখন বেড়ে উঠে তখন বুদ্ধিই বা বাড়বে না কেন?

অকাল পক্ক ছোঁড়ার কথায় পণ্ডিত মশায় রেগে গিয়ে দু'থাপ্পড়ে ওকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। হিমাদ্রির মনে হচ্ছে এই সবই যেন আজকালের কথা। অথচ কয়েক বছরের ব্যবধান। আজ সে পাঠশালায় পড়ুয়া নয়, একটা হাই ইস্কুলের শিক্ষকের পদপ্রার্থী। শুধু এটুকুই তার সান্ত্বনা। এখনো সে কোন পদই কায়েম করতে পারে নি। হাত বাড়িয়েছে কিন্তু নাগাল পায় নি। শূন্য হাত শূন্যেই আন্দোলিত হয়েছে। ওর কাছে মনে হয়েছে চাকরিটা আলেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। উষর মরুতে মরীচিকা যেন। অথচ এ যেন চাকরির মোহে কত ছুটোছুটি। হায়রাণির একশেষ। পেলেই হামবড়া, আর না পেলেই হায় হায়।

চাকরির আশায় নানা স্থানে ইনটারভিউ দিয়েছে হিমাদ্রি। দরখাস্তের পর দরখাস্ত। তদবিরের পর তদবির-তদারক। কিন্তু ওর তকদির খারাপ। তা নাহলে ওর সামনে কতজনের চাকরি হল, কিন্তু ওরই হল না। একে বলে ভাগ্য। হিমাদ্রিকে হিমের মতই স্তব্ধ মনে হয়। যেন রণক্ষেত্রের পরাজিত সৈনিক। শান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন। স্থিরভাবে বসে ভেবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ওর চালে বোধহয় ভুল হয়েছে সর্ব্বত্রই। তাই পরাজয়।

ওর বাবা ওকে প্রায়ই বলতেন—তোর বুদ্ধিটা খুব মোটা হিমু। কখনও বা বলতেন,—ভোঁতা বুদ্ধি। হয়ত তাই হবে। তা না হলে সেবার ওরা মাত্র আটজন পরীক্ষা দিয়েছিল, তার মধ্যে ফার্ষ্ট কিম্বা সেকেণ্ড প্লেস এ্যাকোয়ের করতে পারলেই তো মাসে চারশ' টাকা আর্ণ করত। একটা স্কুল মাষ্টারের স্থায়ী পোষ্ট পেয়ে যেত। সখেদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—ওসব ভাগ্য। কিন্তু পরক্ষণে সে আবার ভাগ্যকেও স্বীকার করে না। বলে চিত্তবিকার। দুর্ব্বলতার লক্ষণ। যারা দুর্ব্বল তারা আপনি দুর্ব্বলতাকে চাপাচুপি দিতে ভাগ্যের দোহাই দেয়। নাগালের বাইরে যখন আঙুর ফল, তখন আঙুর পাওয়ার অন্য কোন উপায়ের কথা চিন্তা করে না।

হিমাদ্রি তাও করেছে। যখন নানা চেষ্টাতেও

চাকরি হয় নি, তখন একটা সামান্য কেরানীর চাকরির আশায় পঞ্চাশ টাকা গুনে দিয়েছিল অপিসের কোন এক বড় বাবুকে।

বহু কষ্টের টাকা। ওর হাত খরচা থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করে পঞ্চাশ টাকা সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু কষ্টেও কেষ্ট মেলে নি, সুফল ফলে নি। চাকরি তো পেলই না, টাকাও গেল।

—কৈ মশাই টাকা যে নিলেন, চাকরি হল কৈ? হিমাদ্রি ক্ষুব্ধ ভাবে প্রশ্ন করেছিল।

উত্তর শুনেছিল—কি করব মশায় আপনার বরাত যে খারাপ।

—বরাত কেন খারাপ হবে? আপনি টাকা নিলেন অথচ চাকরি দিতে তো পারলেন না। হিমাদ্রি রাগতঃ-ভাবে ভদ্রলোককে আক্রমণ করেছিল।

উত্তরে আমতা আমতা করে তিনি বলেছিলেন, —টাকা নিয়ে কাজওতো করেছি। আপনাকে ইন্‌টারভিউ দিতে কল দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষাও দিতে দিয়েছি। টাকা না দিলে ওসব কিছুই হত না।

এই সামান্য কটি কথায় হিমাদ্রির কথা ও আসফালন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। প্রতিবাদে সে কিছুই বলতে পারে নি। একটি সবল দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পড়ার অর্থ যে কি তা যারা শুনেছিল তারাই বলতে পারবে। তবে ওর মনে হয়েছিল ওর সখের আমগাছ মুকুল সমেত শুকিয়ে গেছে।

এই সবই অতীতের কথা। ওর মনেই লুকানো ছিল। এখন চিন্তাস্রোতে ভেসে উঠছে। পাতের থিতানো জল চোখে দিয়ে পরখ করলে যেমন জলের নীচের বালিকণা ধরা পড়ে তেমনি।স্থতাবস্থায় আপন চিন্তায় বিশ্লেষণে অতীতের ঘটনাবলি স্পষ্টভাবে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেখতে পাচ্ছে ওদের সংসারটা তিলে তিলে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে যেন। ঘরের পূর্ব্বশ্রী বিলুপ্ত। ওদের বাড়ীটা যেন বাসি গোলাপ। শুকিয়েছে, কিন্তু বৃন্তচ্যুত হয় নি।

জীর্ণ কড়ি বরগা বহুদিন ধরেই সে উইএর খাদ্য, ওরা সবাই তা জানে। ছাদের কার্নিসে আপনা আপনি গজিয়ে ওঠা বটগাছটা যে দেওয়াল গাত্রে শিকড় মেলেছে, তাও ওরা লক্ষ্য করেছে। ছাদে যে ফাট ধরেছে তাও ওদের অজানা নয়। এ সবের মেরামত ও সংস্কার যে আশু প্রয়োজন তা ওরা সবাই বুঝেছে। কিন্তু উপায় নেই। হিমাদ্রি ভাবে ওর উপায়ে এই সবেরই সংস্কার হত। বাড়ীর পূর্ব্বশ্রী ফিরে না এলেও হতশ্রী হত না। ধীরে ধীরে সব কিছুরই ধ্বংশ হচ্ছে। ওরা সবাই ভূমিকম্পে পিষ্ট মানুষের মত ছাদ কাঁধ ঝাঁকা অবস্থায় নিমেষে নিঃশেষ হবে। ওরা যে কালের শিকার তা হিমাদ্রি স্বীকার করে। তা না হলে এত হীনবস্থাই বা হবে কেন ওদের? হাত পা থাকতে ভাগ্যের পরাজয়কে মেনে নেবেই বা কেন?

অভিমানে সখেদে বলে—বেশ তাই হোক। এইক্ষণে তা যেন ঘটে। আগুনের স্বল্প তাপে ধীরে ধীরে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝলছে পুড়ে পাঁস হওয়া ঢের ভাল। দুঃস্থের কাছে মৃত্যুই মূল্যবান।

অথচ সে একটা জোয়ান ছেলে, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব তো এখন ওদেরই। কিন্তু তা অতি দূরের কথা। নিজেদের ছোট খাটো সংসারটাকে সে ধ্বংশের হাত থেকে টিকিয়ে রাখতে পারছে না। শক্তি থাকলেও সাহস নেই। লোক ভয় পায়ের বেড়ী। চুরি ডাকাতি বা গুণ্ডামী করতেও প্রবৃত্তি নেই। বিবেকের বাধা। ওরা যে ভদ্র। ভদ্রভাবে বাঁচতে চায়। কিন্তু সে পথেও কাঁটা পড়েছে।

পিতা রোগে শয্যাশায়ী। মায়ের মুখ বিষণ্ণ। এবং ওরা সবাই বিষণ্ণ।

মধ্যবিত্তের সংসারে বাবা ছিলেন একা রোজগারী। একটা আটপৌরে কেরাণীর চাকরিতে তিনি যা আয় করতেন তাতেই সংসারটা এদ্দিন টিকে ছিল। অভাব থাকলেও তার আঁচ লাগেনি কারো গায়ে। দুপুরের পথিকের মত ওরা গাছের তলায় বসেছিল। কিন্তু ঝড়ে পড়ে গেল গাছ। একদিন পড়ে গিয়ে দীনেশ

বাবুর বাঁ ধারটা পেরালাইজড্ হয়ে গেল। সেইদিনই দীন দারিদ্রের নামের তালিকায় ওদের নাম উঠল। কিন্তু ওরা যে মধ্যবিত্ত। ঠাট বজায় রেখে চলতে অভ্যস্ত। স্বভাবের ধর্ম্ম। বাইরের চাকচিক্যে অন্দরের জৌলুসকেও জৌলুস দেখায়। রোগীর খরচ পত্রে টাকার অনটন। খায় এক বেলা। কিন্তু সাজ পোশাকে কেতা দুরস্ত। ওরা জোর করে দারিদ্র্যতাকে স্বীকার করে না। দৈন্যকে উপেক্ষা করে। তাই সরকারের প্রদত্ত রিলিফ নিতে হাত বাড়াল না।

যাক্ তা হলেও বাড়ীটা দীনেশ বাবুর পৈত্রিক। তাই রক্ষে। ভাড়ার টাকা গুনতে হয় না। আর বড় সড় বাড়ী বলেই খানিকটা ভাড়া দিয়ে দু'পয়সার মুখ দেখছে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স যে প্রতি কোয়াটারে কুড়ি টাকা। আর সেই টাকা কয়েক বছরেরই বাকী। সেদিন ট্যাক্স আদায়কারী শাসিয়ে গেছে, ট্যাক্সের টাকা না মিটালে সার্টিফিকেট কেস করে ওদের বাড়ী নিলাম করাবে।

হিমাদ্রি দেখছে অকূল পাথারে যেন অপ্রশস্ত একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপে ওরা বাস করছে। ঢেউ আর জোয়ারের ধাক্কায় বিপর্য্যস্ত হচ্ছে অহরহ। তার চেয়ে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাওয়াই ভাল। নিহতের কষ্ট নেই, আহতেরই যন্ত্রণা।

দীনেশবাবু অনিতাকে বলতেন—ছেলে বড় হোক, আয় করুক। আমার চেয়েও বেশী রোজগার করবে। তখন দেখবে আমাদের বাবা বেটার রোজগারে তোমার ছোট সংসার ভেসে যাবে। বার বার এসব কথা বলতেন। ছেলেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন। আর কেন বলতেন তাও হিমাদ্রি বুঝত। আর বুঝতো বলেই এমন মর্ম্মব্যথা।

আরো বলতেন—আর দুটো বছর সহ্য কর, হিমাদ্রি পাশ করে বেরিয়ে এলেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে। আর ধার দেনা করতেই হবে না। তখন তোমার চুড়ি হার আবার গড়িয়ে দেব। হারটা খুলে দাও, বন্ধক দিয়ে টাকা আনি।

সেই সময় দু'বছর অপেক্ষা করার কথা হিমাদ্রিও শুনিয়েছিল দীপালিকে। দু'বছর সবুর কর তাহলে একটা চাকরি জুটিয়ে তোমাকে নিয়ে সরে পড়ব।

দীপালি বলেছিল—কিন্তু বাড়ীর সবাই যা পীড়াপীড়ি করছে তাতে আর দেরি চলে না। হয় তুমি দু'এক দিনেই আমাকে নিয়ে সরে পড়, তা না হলে উলুবেড়িয়ায় ঐ উলু খাগড়াকেই বিয়ে করতে হবে। বাপ মায়ের অবাধ্য হতে পারব না।

কথাটা শুনে হিমাদ্রির মনে হয়েছিল ওর সাত টাকা দামের নূতন পেনটা পকেট থেকে কোথায় যেন পড়ে গেছে। এই মাত্র তা জানতে পারল। মুখ দিয়ে কোন কথাই সরল না। স্থিরভাবে চিন্তা করে সে দেখেছিল বাপ-মায়ের অবাধ্য হওয়ায় সাহস তারও নেই। স্বাবলম্বী হলে পারত।

একটু থেমে দীপালি আবার বলেছিল—তুমি পাশ করেই বা কি ছাই পাঁশ কুড়াবে শুনি? তোমার যখন সাহস নেই তখন তোমার দ্বারা কোন কাজই হবে না। সোজা পথ ধরে তুমি শুধু চলতেই পারলে। কিন্তু সে পথে যদি কাঁটা পড়ে তা হলে তো তুমি অচল।
একটু থেমে আবার বলেছে, আরতি ঠিক কথাই বলে, তোমার হাত ধরে পথে বেরুলে আমাকে পথের ধারেই বসতে হবে।

দীপালির কথা মনে জাগায় হিমাদ্রির মনে পুলক সঞ্চার হলেও ব্যথা জাগে। তাড়াতাড়ি মনটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। অনিতা শুধু দীনেশবাবুর কথাই শুনেছে। নানা তোয়াজ ও তোষামদেও মন গলে নি। গায়ের গয়না একটিও খুলে দেয় নি। উত্তরে বলেছে—তুমি অন্য কোথাও টাকা ধার কর গে, দু'বছর বাদে সুদ সমেত শোধ করবে।

কিন্তু একদিন সব গয়নাই খুলতে হল অনিতাকে। বিপদ হতে ত্রাণ পেতে ত্বরায় অনেক কিছুরই মোহ কাটাতে হয়। তাই দীনেশবাবুর হাতে তুলে দিল হার ও চুড়ি। ক্রোধে ঘৃণায় ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় দীনেশবাবু তখন দিশেহারা। অথচ জোর গলায় তা প্রকাশ করতেও

পারবেন না। অন্তরে মর্মদাহ। অস্ফুটে শুধু এই কথাই বলেছিলেন—তোমার আস্কারা পেয়েই তো মেয়েটা বিপদ বাধালে। ওর উপর নজর রাখলে কি এই বিপদ হত?

অনিতা নিশ্চুপ। মেনে নেয় স্বামীর কথাই। কথা বাড়ালেই বাড়বে। ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। গোপনতা চাপা-চুপি থাকবে না। মান-মর্য্যাদা সেই সঙ্গে এক পলকে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। পাঁচ কানে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশেরও নজর পড়বে। তাই কাতর কণ্ঠে স্বামীকেই বলেছিল'—চুপ কর।

কিন্তু দীনেশবাবু চুপ করার মানুষ নন। কথা যখন ওঁর মুখ থেকে খসতে সুরু হয়েছে, তখন তো সরবেই। সরবে তিনি সব কথাই প্রকাশ করবেন। বলেন—আমি পই পই করে বলেছি—প্রশান্তর সঙ্গে ওকে মিশতে দিও না। কিন্তু তা কি শুনেছিলে?

অনিতাও বিপদগ্রস্থা। তারও অন্তরে জ্বালা কম নয়' তার উপর স্বামীর ভৎসর্না। চোখ ফেটে জল আসে।

মেয়ে কচি খুকি নয়। বিবাহযোগ্যা মেয়ে। যার বোধশক্তি টনটনে। খানিকটা শিক্ষা-দীক্ষাও যে পেয়েছে, সে যে এমনভাবে আগুনে হতে দিয়ে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে একথা অনিতা কস্মিনকালেও ভাবে নি। অস্ফুটে বলে—আমি কি শুনব? ও আপদ কে জুটিয়েছিল? মেয়ের প্রাইভেট টিউটার করে ঐ হতভাগাকে তুমিই তো ঘরে আনলে।

—বেশ তো সে এসে পড়িয়ে চলে যাক। যে কাজে তাকে রাখা হয়েছে সে কাজ করবে। তা বলে ওর সঙ্গে হেথাহোথা ঘোরাঘুরি করতে ছাড়লে কেন? কথার শেষে ক্ষোভে-দুঃখে দীনেশবাবু কেঁদে ফেললেন। অনিতারও চোখে জল। আর ওদের মেয়ে কণিকা ঘরের এক কোণে উবু হয়ে যে, সকাল থেকে পড়ে আছে তো আছেই।

আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে। দৈনন্দিন কাজ কর্ম যেমন চলে তেমনি চলছে। বাবা মা দু'জনেই বিষন্ন ও বিমর্ষ। ওদের চেয়েও মুহ্যমান কণিকা। পাকা আমের মিষ্টতার স্বাদ নিতে গিয়ে ওর গলায় আঁঠি অটেকেছে। কি যে ঘটেছিল, তা যতই ধামা চাপার মধ্যে আবদ্ধ থাক হিমাদ্রি তা জানত। মনে হয়েছিল ছুটে গিয়ে কণিকার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে ওর বুকে দুটো লাথি মারি। কিন্তু তা পারেনি। তির্য্যক দৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে তখুনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এই চাওনির যে কি অর্থ তা অন্য কেউ না বুঝলেও কণিকার বুঝতে কষ্ট হয় নি।

এদের এই সর্বনাশে হেরম্ব ডাক্তারের পৌষ মাস। কাজের মত একটা কাজ পেয়ে পাঁচশ' টাকা ছিনিয়ে নিল।

এক ঠাঁই এ বসে এই সব নানা আবোল তাবোল চিন্তায় হিমাদ্রি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিল। ঢং ঢং শব্দে আটটা বাজতেই সম্বিৎ ফিরে পেল। মনে হল যেন হাতের ছাতাটা কোথায় ফেলে রেখে চলে এসেছে। এতক্ষণ মনে ছিল না। এইমাত্র জানতে পারল। আপনা আপনি বলে—আরে এখুনি যে ডাক্তার খানায় যেতে হবে। বাবার প্রেসার টেষ্টের একান্ত দরকার। হিমাদ্রি উঠে পড়ল। বেকারেরও কাজের তাগিদ। কিন্তু ঝেড়ে ঝুঁড়ে উঠেও মন থেকে চিন্তাকে ছুঁড়ে ফেলতে পারল না। এখন যে অবস্থার সম্মুখীন, যে দুরবস্থায় আড়ষ্ট, তার থেকে কি করে যে রক্ষা পাবে তাই ওর চিন্তার বিষয়। একটা চাকার পেলেই বেঁচে যায়।

বাবা পঁয়ত্রিশ বৎসর চাকরি করেও কিছু জমিয়ে রাখতে পারেনি। চার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দীনেশবাবু ফকির না হলেও ফতুর হয়েছেন। অভাবী জীবনে অনটনের আস্তানা। হিমাদ্রি বাংলায় অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেও এম এ পড়তে পারল না। দীনেশবাবু শয্যাশায়ী হতেই চাকরির খোঁজে শশব্যস্ত হতে হল। ওর বাবার বন্ধু রমেনবাবু বলেছিলেন, চাকরির চেষ্টা না করে ল' পাশ কর গে। চালাতে পারলে পয়সা আসবে। কিন্তু সে কথা শুনেও শুনে নি। চাকরির খোঁজে ছুটোছুটি করে হয়রাণ হয়েছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জেও নাম

রেজিষ্ট্রি করে কার্ডের পর কার্ড রিণিউ করেও যখন কোন ফল হয়নি, তখন সরকারের ঐ প্রতিষ্ঠানকে প্রহসন বলে ভেবে নিয়েছে। চাকরি জুটাতে না পেরে নিজেকে সে ভেবে নিয়েছে কুলাঙ্গার! কণিকার চেয়েও হেয়।

কণিকার বিয়ে হয়েছে। ছেলে মেয়ের মা। এখানে থাকে না। কচিৎ আসে। যখন আসে, বাবা মায়ের আদর পায়। আর কেন যে পায়, তা হিমাদ্রি বুঝে। সঙ্গে টাকা থাকে বলেই ওর সম্ভ্রম। বাবা-মায়ের অভাবের সংসারে কিছু দেয়ও। বিয়ের আগে সে যে কতখানি অন্যায় করেছে, তার হিসাব এখন কারো মনে নেই। দিন কয়েক থেকে যখন ফিরে যায়, তখন মা বলে—আবার আসবি। বাবাও বলেন তাই। কণিকার চোখে জল। বাবা মাও চোখ মুছেন।

হিমাদ্রি বুঝেছে, যে বেকার হলেই সে যে কায়দায় পড়ে গেছে। রোজগার করতে পারছে না বলেই ওর ওর উপর সবাই রাগচটা। কিন্তু ওর দোষ কি? রুজি রোজগারের পথ সে খুঁজছে, না পেলে কি করবে। রৌদ্র তাপে ঝিমিয়ে পড়া চারার মত সে সেচন প্রার্থী। চাতকের মত উদ্ধমুখী। বলে—জল চাই।—এইক্ষণে এই মুহূর্ত্তে সে একটা চাকরি পেলে বর্ত্তে যাবে। চাঙ্গা হবে। জীবনের স্বাদ পাবে। হাতে পকেটে টাকা আসবে।

দীপালিকে মনে পড়ে। সেদিন সে যা বলেছিল সে কথাই ঠিক। সোজা পথেই সে শুধু চলতে জানে। কিন্তু সে পথে যদি কাঁটা পড়ে তাহলে হিমাদ্রি অচল। তাই হিমাদ্রি অনড় হয়ে বসে আছে। ওর খুবই যেন তৃষ্ণা পেয়েছে অথচ কাছে পিঠে কোথাও জল নেই। ঊষর মরুতে সে কেবল জলের খোঁজে ছুটোছুটি করছে। আর তাতেই সে ক্লান্ত।

কিন্তু কাজ ওকে তো নিরাশ করেনি। নানা কাজে কর্ম্মে সে পাড়িত। ভেবে দেখে চাকরির খোঁজ তল্লাসে লিপ্ত থাকাও একটা কাজ। বিনা বেতনের চাকরি। পরিশ্রমের দাম নেই। অর্থ না থাকায় ওর চারদিকে অনর্থেরই মূল বিস্তার; যদিও অর্থই অনর্থের মূল।

এই সময় হিমাদ্রির ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে। ঠাকুর বলতেন—মাটি টাকা, টাকা মাটি। অর্থাৎ টাকা মাটির মতই মূল্যহীন। কিন্তু সে দেখে তা নয়। টাকা যেন মা-টি। মায়ের মতই প্রিয় টাকা। মাটিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে টাকাই সর্ব্বস্ব।

স্মৃতি জোয়ারে উজান বেয়ে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(এগারো)

শহীদের কাছে আমি প্রায়ই (বিশেষ ফাঁপরে পড়লে) ধর্ণা দিতাম নানা প্রশ্ন নিয়ে। চাইতাম ওর উপদেশ বা নির্দেশ। য়ুরোপীয় জীবনের সম্বন্ধে ওর গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমার অল্পজ্ঞ মনকে সময়ে সময়ে সত্যিই অভিভূত করত। ও কলিয়েই বলেছিল আমাকে কীভাবে ও ছদ্মবেশে রিক্ত হস্তে মস্কো থেকে পালায় চেকা পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পেতে। কিন্তু সেসব বর্ণনা আমার কলমে সজীব হ'য়ে উঠবে না তাই শুধু বলি—ও ওলগার কথায় ষোলো আনা সায় দিয়ে আমাকে বারণ করছিল মস্কো যেতে মানব রায়ের সঙ্গে। বলেছিল হেসে: "দিলীপ, তুমি সরল মানুষ। ওখানে গিয়ে কি বলতে কি ব'লে ফেলবে আর তার কি রিপোর্ট পৌঁছবে কর্তৃপক্ষের কাছে কে জানে? কেন সাধ ক'রে চুলকে ঘা করবে? তুমি গান শিখবে জার্মাণীতে এসেছ—খুব বুদ্ধির কাজ করেছ—কারণ যদিও রাশিয়ানরাও সঙ্গীতে মহীয়ান্ কিন্তু রুষভাষা কঠিন ভাষা—তাই বেশি লাভ করতে পারবে না রুষ সঙ্গীত থেকে......ইত্যাদি। আরো অনেক কিছু বলেছিল—তার চুম্বকটি এই যে মস্কোমুখী হ'লে আমাকে বিপন্ন হ'তে হবে। সে সময়ে পুলিশের প্রশাসন ছিল খুব কড়া—ফ্রাউ জার্মানোভার মুখেও শুনেছিলাম। শহীদ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ডস্টয়েভস্কির "ব্রাদার্স কারামাজভ" অভিনয় দেখতে—যাতে ফ্রাউ জার্মানোভা পার্ট নিয়েছিলেন স্বৈরিণী গ্রুশেনকা-র। হের কাচালভ—ইভানের। শহীদই আমাকে ফিস ফিস ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যার ফলে অভিনয় আরো উপভোগ করেছিলাম।

কিন্তু হা অদৃষ্ট, ওদের রবীন্দ্রনাথের নাটকটির অভিনয় করা হ'ল না, আমারও বার্লিনে কম্পোজার নাম কেনা হ'ল না।

*   *   *   *

এরপরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় ১৯২৭ সালে প্যারিসে—যখন আমি চেক ভাইস কনসাল ভ্লাদিমির ভাসেক ও তজ্জায়া মার্থার অতিথি। সেখানে আমি একদিন মার্থার উপরোধে প'ড়ে পণ্ডিত জহরলালকে নিয়ে গিয়েছিলাম। মার্থা ছিল জহরলালের মহাভক্ত। শহীদের সঙ্গেও পণ্ডিতজির প্যারিসে দেখা হয়েছিল।

সে সময়ে মস্কো আর্ট থিয়েটার জিরুচ্ছে। ফ্রাউ জার্মানোভা তাঁর স্বামী পুত্র নিয়ে ছিলেন শহীদের ফ্ল্যাটে। তাঁদের রসদদার ছিল শহীদ একা। শুধু তাঁদের নয় তাঁদের দুটি কুকুরেরও। শহীদ কী যে ভালবাসত বান্ধবীর কুকুর দুটিকে। আমি ওকে হেসে বলতাম: "ঠিকই হয়েছে। সাহেব পুরাণে আছে—love me, love my dog!" শহীদ হেসে উত্তর দিত ভলটেয়ারের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে: "না দিলীপ, ওদের আমি ভালোবাসি ওরা মানুষ নয় ব'লেই। ভলটেয়ার ছিলেন একজন সত্যিকার জ্ঞানী, জানো তো—তিনি উঠতে বসতে বলতেন: "The morc I see dogs the less I like men' হা হা হা!"

ফ্রাউ জার্মাণোভা একদিন আমাকে খাইয়েছিলেন নানা রুষ রান্না—শুধু borsch আর pilav এই দুটি নাম মনে আছে। তবে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর সরলতায়। শহীদ যেন উদয়াস্ত খেটে অতিথি-পরিবারের অন্ন সংস্থান করত বুঝতে বেগ পেতে হয় নি। যে-স্বৈরিণী ওকে বঞ্চনা ক'রে ওর মন ভেঙ্গে দিয়েছিল তার কথা ওর মুখে শুনিনি কখনো, তবে ওর স্নেহময়ী বরেণ্যা অতিথি যে ওর ভাঙ্গা মন জুড়ে দিয়েছিলেন তার গভীর

স্নেহে—ওদের অনবদ্য menage a trois দেখলে এ বিষয়ে সংশয় থাকত না।

বিচিত্র মানুষ বৈকি। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে নানা ভূমিকম্পের পরেও যার পা টলেনি সে কেন আমাকে লিখল তার "ভাঙ্গা জীবনের" কথা—আমি মাঝে মাঝে ভাবি। এর উত্তর কী তাও জানি অথচ ঠিক জানি না তাই মুখে চাবি দিয়ে তার কাছে আমার ঋণ স্বীকার ক'রেই এ-অধ্যায়ের সমাপ্তি টানি।

না। যখন এতটাই বললাম তখন বলি বাকিটুকু—বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে।

* * * *

প্যারিসের পরে শহীদের সঙ্গে দেখা হয়নি দশ বারো বৎসর। হঠাৎ একবার পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে ওর সঙ্গে পুনর্মিলন হয়—তখন ও থাকত থিয়েটার রোডে—আমার মাতুলালয়ের ঠিক সামনের বাড়ীতে। মহানন্দ! ওকে নিয়ে পেশ করলাম সুভাষের দরবারে। সুভাষ ওর কথা শুনে মুগ্ধ। ও-ও সুভাষের চরিত্র নিষ্ঠা ও দীপ্তি-মুগ্ধ। গুণী গুণং বেত্তি। বন্ধুবর তুলসীও হয়ে উঠেছিল শহীদের মহাভক্ত। তার ওখানেও শহীদ আসর জমাত বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে।

তারপর আমি ও ইন্দিরা ১৯৫৩ সালে বেরোই বিশ্ব ভ্রমণে—যে-কাহিনী আমার "দেশে দেশে চলি উড়ে"-তে বলেছি ফলিয়েই। এ-সফরে, কী আশ্চর্য্য যোগাযোগ, এক ভারতীয় রাজপুরুষের বাড়ীতে গান করতে গিয়ে হঠাৎ শহীদের সঙ্গে দেখা—নিউয়র্কে! আনন্দে ত বান ডেকে গেল আরো এই জন্যে যে ইন্দিরার সমাধির কথা শুনে ও তাকে অকুণ্ঠেই শ্রদ্ধার অর্ঘ দিল। বলল: "আমার জন্যে প্রার্থনা করবেন, লক্ষ্মী দিদি!" ইন্দিরাও উচ্ছ্বসিত ওর সরস আলাপে, হাসিতে, ব্যক্তিরূপে।

অতঃপর দেশে ফিরে আমরা পুনায় সাধনার আসন পাতলাম ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৬ সালে শুনলাম ও পাঠালাম আমার "Beggar Princess Mirabai" নাটক।

উত্তরে ও লিখল সান সেবাস্টিয়াল থেকে (৪।৮।১৯৫৬—অনুবাদ আমার)

ভাই দিলীপ,

ভ্লাদিয়া ইতালি থেকে তোমার চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছে। কী আনন্দ! তুমি আমাকে 'যাযাবর' তথমা দিয়েছ। কিন্তু আমি অন্তত এই পৃথিবীর বাসিন্দা, তোমার মতন আকাশে বসবাস করি না। আমার মন বলে বরাবরই যে তুমি এখনো বেঁচে বর্তে আছ, কিন্তু তুমি যে পুনায় থিতু হয়েছ এতে আমি খুশী—তোমার pervasive personality কোনো একটা বিশেষ স্থানে কায়েমী হ'লে আমাদের মতন লোকের একটু সুবিধে হয়।......স্পেন ধর্মে গোঁড়া ক্যাথলিক—অন্য কোনো দেশের ধর্মে তার ঔৎসুক্য নেই।......তাই আমার মনে হয় না এর পরে তুমি সফরে বেরুলে এ-অঞ্চলে ঢুঁ মারবে। তবে যদি আমাকে তোমার খবর দাও ও তারিখ জানাও তবে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে লণ্ডন প্যারিস বা রোমে যেতে পারি।

আমি উল্লসিত হয়েছি ইন্দিরা দেবীর সংবাদ পেয়ে। আশা করি আমাকে তিনি বেবাক ভুলে যান নি? এ-জীবনে ভগবৎ উপলব্ধির ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদের মতন ভাগ্য কার?

তোমার মীরাবাই সম্বন্ধে নাটকটি প'ড়ে আমি পুলকিত। মীরাবাই বিশ্ববরেণ্যা, কে না তাঁকে ভালোবাসে? তুমি যে তাঁর সম্বন্ধে লিখছ এতে আমি সত্যিই ভারি খুশী। এ-যুগে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই কত শত মধুর ও সুন্দর অঘটনের কথা।......যে-সব চমৎকার কথায় চমৎকার চমৎকার চিন্তা মূর্ত হয়ে ওঠে তুমি তাদের বেসাতি করছ খুব ভালো কথা। তোমাদের কথা আমি ভাবব সস্নেহে।

ইতি। তোমাদের স্নেহাধীন শহীদ

এরপরে সাত বৎসর ওর খবর আমরা পাইনি হঠাৎ কে বললে যে, শহীদ স্পেন থেকে ফিরে এসেছে করাচিতে—অসুস্থ। আমি ওকে লিখলাম সোজা পুনায় চ'লে আসতে—যদি সম্ভব হয়—পুনায় খুব ভালো ডাক্তার আছে—আমি সব ব্যবস্থা করব কয়াজি নার্সিং হোম-এ। উত্তরে ও লিখল আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে যে ওর হার্ট দুর্বল, চোখে ছানি পড়েছে, নড়াচড়া একদম বন্ধ। যদি একটু সেরে ওঠে তো চেষ্টা করবে।

আমি তখন পণ্ডিত জহরলালজির কাছে দরবার করলাম ওর সঙ্গিন অবস্থার কথা জানিয়ে: তিনি ওকে কোনো মতে দিল্লীতে টেনে আনতে পারেন না? দিল্লীর সেরা নার্সিং হোমে ওর চিকিৎসা হওয়া দরকার ......ইত্যাদি।

উত্তরে পণ্ডিতজি লিখলেন (২৯।৫।৬৩):

প্রিয় দিলীপকুমার,

দুঃখিত হলাম শহীদ-এর খবর শুনে। আমি জানতাম সে পাকিস্থানের রাজদূত হ'য়ে স্পেনে গেছে। তারপরে তার আর কোনো খবর পাইনি।

আমি তার জন্যে যদি কিছু করতে পারি সানন্দেই করব। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না কী করা যেতে পারে। সে যদি দিল্লী আসতে পারে তবে আমি যা পারি করব। কিন্তু আমি তাকে সোজাসুজি লিখতে চাই না। তাতে ক'রে ভুল বোঝার সৃষ্টি হ'তে পারে।

তাই আমি বলি কি, তুমিই তাকে ফের লেখো জানিয়ে যে, তার সম্বন্ধে অনেক সুন্দর স্মৃতি আমার মনে আজো উজ্জ্বল আছে। লিখো—যদি সে দিল্লী আসতে পারে তবে আমি তাকে সাদরে বরণ করব।

ইতি জহরলাল নেহরু।

আমি এ-চিঠির একটি কপি শহীদকে পাঠিয়ে অনুরোধ করলাম সোজা দিল্লী যেতে। উত্তরে সে করাচি থেকে আমাকে ১৮।৬।৬৩ তারিখে লিখল তার শেষ পত্র (অনুবাদ আমার):

ভাই দিলীপ

তোমার স্নেহের জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ—ইন্দিরাদেবীর কাছেও তাঁর শুভৈষনার জন্যে।

তুমি পণ্ডিতজির যে-চিঠিটি আমাকে পাঠিয়েছ, প'ড়ে আমার হৃদয় দুলে উঠল। আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি যে, বিশ্ব জগতের অগুন্তি সমস্যা নিয়ে যাঁকে ভাবতে হয় তাঁর আমার মতন এক নিঃসহায়ের কথা মনে থাকতে পারে। আমার কোনো বিশেষ সানিটেরিয়মে যাবার দরকার নেই। তাই আমি পণ্ডিতজিকে এখন কিছু লিখতে চাই না। আমার হার্ট যদি হঠাৎ দৈবী করুণায় একটু সেরে ওঠে তো আমি নিজেই দিল্লী যাব। ইতিমধ্যে যদি তোমার তাঁর সঙ্গে কোথাও দেখা হয় তো তাঁকে আমার কথা বোলো, বোলো—তাঁর চিঠি প'ড়ে আমি চোখের জল ফেলেছি সকৃতজ্ঞে। তিনি আমার সমবয়সী। আমি জানি তোমার মতন বন্ধু আমার লাভ হয়েছে বহু ভাগ্য—আমাদের মধ্যে ব্যবধান সত্বেও। তোমারও ইন্দিরাদেবীর জন্যে আমি প্রায়ই প্রার্থনা করি। তোমরাও কোরো আমার জন্যে।

তোমার স্নেহাধীন শহীদ

আমি এর পরেও চেষ্টা করেছিলাম শহীদকে পুনায় আনতে। লিখেছিলাম—দরকার হ'লে আমি লোক পাঠিয়ে তাকে উড়িয়ে আনতে পারি। কিন্তু সে লিখল—উপস্থিত তার বিছানা থেকে নড়বার পর্যন্ত জো নেই ডাক্তারের নিষেধ। শেষে খবর পেলাম কলকাতায় মার্চ মাসে (১৯৬৫) যে শহীদ আমাদের মায়া কাটিয়ে প্রয়াণ করেছে—

"to that undiscovered country from whose bourn no traveller returns." ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

॥ বারো ॥

শহীদ আমাকে মস্কো যেতে নিষেধ করেছিল খুবই জোরালো সুরে। তার সঙ্গে আমার যে তর্কাতর্কি হয়েছিল তার কিছুটা আমি মানব রায়কে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন: "সুরবর্দির বান্ধবী লেনিনকে গুলি করতে চেয়েছিল এইজন্যেই চেক পুলিশ সুরবর্দির পিছনে

লেগেছিল। আপনি যাচ্ছেন ওদেশের গান শিখতে আর আমাদের গান গাইতে ওদের কাছে। আপনার ভয়টা কি ?"

এইসঙ্গে আমার আর এক বন্ধু শাপিরো (রাশিয়ান বলশেভিক) আমাকে বলেছিল মানব রায় ভুল বলেন নি—রাশিয়ায় শিল্পীর, গুণীর কবির যেমন আদর আর কোনো দেশে তেমন নয়। তাই—বলেছিল শাপিরো—আমি মস্কো গেলে কেবল জয়ধ্বনিই পাব—বিশেষ যদি মানব রায় আমার পেট্রন থাকেন। শাপিরো আমাকে আরো কি কি বলেছিল মনে নেই—থাকার কথা নয়, পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা তো।—কিন্তু এটুকু মনে আছে যে সে চেয়েছিল আমার আশ্চর্য কণ্ঠ (voix merveilleuse) রাশিয়ানরা শোনে এবং তাদের আশ্চর্য কণ্ঠও আমি শুনি

স্বভাবে আমি দোমনা—vacillating—তাই মন স্থির করতে না পেরে লণ্ডনের হাই কমিশনর এন সি সেনকে লিখলাম। তাঁর ওখানে লণ্ডনে আমি মাঝে মাঝে আসর জমাতাম, তারা বিশেষ ভাল বাসতেন আমার মুখে ৺পিতৃদেবের নানা গান শুনতে। তিনি লণ্ডন থেকে আমাকে দ্বিতীয়বার লিখলেন: খবর্দার! মস্কো মুখো হলে বিপদে পড়বে—তবে সে বিপদ আসবে মস্কো থেকে নয়, বৃটিশ রাজের কাছ থেকে। লিখলেন: হয়ত তোমার পাসপোর্ট আর কাজে আসবে না—ফলে তুমি আর স্বদেশে ফিরতে পারবে না।

ও বাবা! —আতঙ্কে আমার রাত্রেও প্রায় "নিদ নাহি আঁখি পাতে" অবস্থা। মস্কো আমার মাথায় থাক আমি মানব রায়কে বললাম: "হুম্, আচ্ছা, ভেবে দেখি পরে জানাবো।" তিনি তীক্ষ্ণধী, বললেন: "বৃটিশ পুলিশের ভয়—এই তো?" সলজ্জে না না করে চম্পট দেওয়া ছাড়া আর গতি রইল না এভাবে হাতেনাতে ধরা পড়ে। ফিরে ওলগার কাছে এসে সব বলতে সে খুশী হয়ে বলল: "আমার সত্যি ভয় হয়েছিল পাছে তুমি মস্কো যাও—তবে তোমার ভয় যে জন্যে আমার ভয় ঠিক সেজন্যে নয়। আমি মনে করি—জীবনে সবচেয়ে বড় সম্পদ ধর্ম। তুমি স্বভাবে ধার্মিক, আমিও তাই। তাই আমি চাই নি তুমি তাদের সঙ্গে দহরম মহরম করো যারা ধর্মকে বলে মনের আফিং।"

শহীদ বলল: "আমার ভয় সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি ওখানে গিয়ে মুখ বুজে থাকতে পারবে না। সরল মানুষ তো, বলে ফেলবে কত কী বেফাঁস কথা—আর বলার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁসে যাবে।......ইত্যাদি।" কিন্তু এ বিস্বাদ প্রসঙ্গের এখানেই সমাপ্তি টানি, বলি শাপিরোর কথা।

তাকেও আমি ভালো বেসেছিলাম জেনেশুনে যে, সে বলশেভিক। না, ভুল বলেছি। আমি প্রথম দিকে জানতাম না। আমাকে ওলগাই প্রথম সাবধান করে দেয়। কিন্তু তখন "টু লেট"—আমি শাপিরোকে ভালবেসে ফেলেছি। আমার স্বভাব আমাকে রেহাই দিত না—যাকে একবার সত্যি ভালোবাসতাম তাকে আঁকড়ে না ধরে পারতাম না। বেশ মনে আছে—যৌবনে যখন থেকে থেকে বিবাহ করার ইচ্ছা হত আমার বিবেক আমাকে শাসাত যে বিবাহ করলেই আমি ডুবব স্ত্রীপুত্র-কন্যার মোহপাকে। আমার মনে হত বিবাহপ্রীতিকে আমল না দিলে আমি পরমহংসদেবের ভাষায় 'বদ্ধজীব' ব'নে যাব দেখতে দেখতে। আসক্তি আমার প্রকৃতির রক্তমজ্জায় গাঁথা। যাই ভালো লাগে দারুণ ভালো লাগে তারপর শুধু যে আর মুক্তি পাই না তাই নয়, মুক্তি পাইতে হবে ভাবলেও কষ্ট: রবীন্দ্রনাথের "জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে"—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে।

এহেন আমি শাপিরোকে ভালোবেসে ফেলার পর তাকে এড়িয়ে চলব কেমন করে? তার সুকুমার দীপ্ত মুখশ্রী আজও মনে জাগে। কানে বাজে—তার 'মঁশের' (mon chere) সম্বোধন। সর্বোপরি, আমার গানে তার মুখে আলো জ্বলে ওঠা। তাকে নিয়ে আমি কখনো কখনো যেতাম বিপ্লবীদের আড্ডায়। শাপিরোকে খুব বেজেছিল যখন আমি ভেবেচিন্তে রুষ দেশে যাব না বলে দিলাম মানব রায়কে। সে সদুঃখে বলেছিল—

তোমার এমন কণ্ঠ আমার কয়েকটি বন্ধুবান্ধবী যদি শুনতেন দিলীপ। তুমি খুব ভুল করলে মানব রায়ের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। মস্কো গেলে শুধু তোমার লাভ হত না আমার অনেক বন্ধু বান্ধবীরও লাভ হত। তারা হ'ত তোমারও বন্ধুবান্ধবী।"......ইত্যাদি

কিন্তু এবার শাপিয়োর কথা একটু বলি সংক্ষেপে।

সে কাজ করত রুষ দূতাগারে (embassy)। উদয়াস্ত আফিসে থেকে ফিরত এক ছোট বোর্ডিং এ (pension) ক্লান্ত দেহে। তবে আমার সঙ্গে লাঞ্চের ছুটিতে যেত এখানে ওখানে নানা রেস্তর াঁতে। কথাবার্তা হত সেখানেই। কী চমৎকার যে সে ফ্রেঞ্চ বলত। শুধু ফ্রেঞ্চ নয়—জর্মন ভাষায়ও তার দখল ছিল অসামান্য। বড় ঘরের ছেলে শৈশবেই শিখেছিল গভর্নেস রেখে এ-দুটি ভাষা। আমার সঙ্গে কথা হত বেশি ফরাসী ভাষায়ই। রুষ ভগ্নী ত্রয়ী, ওলগা ও শাপিয়ো এই পাঁচ জনের সঙ্গে নিরন্তর ফ্রেঞ্চে আলাপ করেই আমি সে ভাষায় পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলাম—যদিও শাপিয়োর মতন নিখুঁত ফ্রেঞ্চ বলা ছিল আমার সাধ্যাতীত। যেমন বাঁধুনি তেমনি চেহারা! ওলগাও স্বচ্ছন্দে ফ্রেঞ্চ বলত কিন্তু এত চমৎকার শৈলীতে নয়। তার মুখে শুনলে মনে হ'ত ফরাসী তার শেখা ভাষা। শাপিয়োর—যেন মাতৃভাষা, এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয়।

শাপিয়ো প্রথম দিকে আমাকে আত্মকথা কিছুই বলে নি। মনে হ'ত—চাপা যুবক আত্মগুপ্ত। ওলগা প্রথমদিকে তাকে নেক নজরে দেখে নি—যখন আমি তাকে সেই নিরামিষ রেস্তর াঁতে টেনে আনতাম। কিন্তু তার ঐকান্তিকতা সৌকুমার্য ও ফরাসী ভাষায় অসামান্য অধিকার দেখে সে প্রশংসা না করে থাকতে পারত না। শনৈঃ শনৈঃ সে শাপিয়োকে ঈষৎ প্রীতির চোখে দেখতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে দেখে যে সে আমাকে সত্যি ভালোবাসে। ওদের মধ্যে সময়ে সময়ে রুষ ভাষায় কথা হত—ওলগা পরে তর্জমা করে আমাকে বলত সে আলাপের চুম্বক।

এমনি করে আমাদের ত্রয়ীর মধ্যে একটি প্রীতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে—কতকটা সঙ্গীতের আবহে, কতকটা সাহিত্যের। ওদের আমি গান শোনাতাম, ওরা আমাকে আমাকে বলত রুষ সাহিত্যের কথা। আর একটি কেন্দ্র ছিল—যাদের কথা বলেছি—ত্রয়ী রুষ ভগ্নীর কেন্দ্র, যেখানে শহীদ প্রায়ই আসত। শহীদ শাপিয়োকে তেমন আমল দিত না.যদিও শহীদের রুষ ভাষায় অধিকারের কথা বলতে শাপিয়ো উজিয়ে উঠত। কালাতিপাতে শহীদও শাপিয়োর প্রতি কিছুটা সদয় হয়ে উঠেছিল। বলত: "ভাই, যতই বলি না কেন অহমিকা মরিয়া-না-মরে রাম। আমাকে যে admire করে তাকে ডিশমিশ করার মতন কঠিন কাজ সংসারে কমই আছে।" কিন্তু দেখো শাপিয়োর কাছে বলশেভিকের রীতিনীতি সম্পর্কে পাঠ নিও না। ওকে ভালোবাসো বেশ কথা—তুমি সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারো—তোমার এ আশ্চর্য প্রতিভার কথা শাপিয়োও বলছিল সেদিন রুষ ভাষায়। কিন্তু ভালোবাসার পথ কুসুমাস্তৃত নয়, বন্ধু! যাকে ভালোবাসো তার নানা রুচি পক্ষপাত আদর্শ স্বপ্নের ছোঁয়াত একটু না একটু লাগবেই! এই দেখ না শাপিয়ো চায়—তুমি মস্কো ঘুরে আসো। ভাগ্যে ওল্‌গা ছিল। সে আমার সঙ্গে যোগ না দিলে টাগ অফ ওয়ার ও যে জিতত কে বলতে পার? হয়ত তুমি একদিন 'দুত্তোর' বলে মস্কো পাড়ি দিতে মানব রায়ের ডাকে......"

আমি আমাদের কথাবার্তার যেসব রিপোর্ট পেশ করছি তার মধ্যে কিছুটা কল্পনার মিশাল থাকবেই। তবে ওদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও একতাই আমার বর্ণনার বিষয়বস্তু, কথালাপ নয় এটুকু মনে রাখলে আমার নানা মনগড়া বিবৃতির কতকটা শোধণ হবে। আমি বলতে চাইছি এ-সূত্রে বিশেষ করে একটি কথা: যে, বার্লিনে আমার জীবন ছিল বৈচিত্র্যে অতি সমৃদ্ধ—আর সে সমৃদ্ধির মূলে ছিল নানা জগতের বন্ধুবান্ধবীর প্রীতি। এদের মধ্যে শাপিয়োর স্থান কারুর চেয়েই কম নয়।

সাপিয়োর মনের ছোঁয়াতে যেমন আমি হয়ে উঠে-ছিলাম সমৃদ্ধ আমার মনের ছোঁয়াতে সে-ও হয়ে উঠেছিল তেমনি উৎফুল্ল। আমি শিখেছিলাম ওর কাছে মন্ত্রগুপ্তির

বিদ্যা। ও শিখেছিল আমার কাছে আত্মকথনের রীতি। তাই কয়েকমাসের মধ্যেই আমার আত্মকথনের জোয়ারে ওর মনেও জেগে উঠল এ-জোয়ার—ও বলল আমাকে ওর অবিশ্বাস্য জীবনকাহিনী—যার কথা আমি লিখেছি ফলিয়েই আমার "ভাবি এক হয় আর" উপন্যাসে।

আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ওর আদর্শনিষ্ঠা। ওর বাবা ছিলেন লণ্ডনের এক ধনী ডাক্তার। শাপিয়ো তাঁর একটিমাত্র ছেলে তথা উত্তরাধিকারী। তিনি ছিলেন White Russianদের দলে—বলশেভিজমকে যারা বিষচক্ষে দেখে। কিন্তু শাপিয়ো নানা ওঠাপড়ার পরে হয়ে দাঁড়ালো একনিষ্ঠ বলশেভিক—ঠাকুরের লীলার কি পার পায় কেউ? ধনী পিতার পুত্র—যে আশৈশব বিলাসে মানুষ—সে কিনা ঝুঁকল এ-দুরন্ত আদর্শের দিকে যার ফলে বাপ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। বললেন: "হয় বলশেভিজম্ ছাড়ো নয়—আমার—আর সেই সঙ্গে তোমার জন্মস্বত্ব—আমার সম্পত্তি।" ও জবাব দিল: "সম্পত্তি আমি চাই না, চাই নিজের চোখে বড় হ'তে—নিরন্নদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থায় আমার সব শক্তি নিয়োগ করতে।"

বাপ ওকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু ও কানে তুলল না। তাঁর যুক্তি মিনতি চোখের জল। চ'লে এল লণ্ডন থেকে মস্কো—যোগ দিল লেনিনের সৈন্যদলে। একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল—কিন্তু সে রুষদেশ ছেড়ে চ'লে এল বলল বলশেভিককে সে বিবাহ করতে পারে না!

তারপর? যা হবার। ও প্রণয়িনীকে ছাড়ল, সম্পত্তি ছাড়ল, গৃহ সুখ ছাড়ল—শুধু ওর আদর্শকে বরণ করতে মনেপ্রাণে। বার্লিনে খুব কম মাইনে পেত। কিন্তু তাতে কী? টাকা কে চায়। বুর্জোয়া প্রণয়িনীর সঙ্গে ঘর করাও তো সম্ভব নয়। ও চায় লেনিনের ধ্বজাবাহী হ'তে—নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে রাষ্ট্রের সেবক হ'তে। কেবল এই পথেই মনের শান্তি মিলতে পারে। যদি ভবিষ্যতে বলশেভিকরা হেরেও থাকবে বিজিতদের দলেই। কারণ ও জানে অন্তিমে বলশেভিস্‌মের জয় অবশ্যম্ভাবী। তবে সে-দিগ্বিজয়ের পথ কাঁটাবনের মধ্য দিয়ে। ওকে আমি অনুবাদ ক'রে শোনাতাম রবীন্দ্রনাথের বলাকার শেষে কবিতা থেকে আর ওর চোখে আলো জ্ব'লে উঠত, বলত:

"এই এই এই দিলীপ, বলশেভিকদের মনও করত এই অঙ্গীকার নির্ভয়ে:

> পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
> পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফণা
> নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ,
> এই তোর রুদ্রের প্রসাদ,
> মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
> দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
> ভয় নাই ভয় নাই, যাত্রী—
> ঘরছাড়া দিকহারা অলক্ষ্মী তোমায় বরদাত্রী

এ-কবিতাটিরও চমৎকার ফরাসী অনুবাদ করেছিল আমার মুখে এর ভাবার্থ শুনে।

এবার দিলীপ শাপিয়ো সংবাদের শেষ অধ্যায়ে আসি।

ও বিবাহ করেছিল। লেনিনের তরফে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল—বুঝি কলচাকের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হয়। হাঁসপাতালে এক শ্রীমতিনী নার্সের প্রেমে প'ড়ে তাকে বিবাহ করে। বিবাহ করতে চায় নি, কিন্তু সে ওকে সত্যই ভালোবেসেছিল—তাই রাজী হয়েছিল ওর আদর্শ বরণ করতে। এরপরে ও সানন্দেই তাকে বিবাহ করে। কিন্তু ওকে চলে আসতে হয় বার্লিন, কর্তৃপক্ষের আদেশে। ওর কাজ ছিল গোপনে রিক্রুট সংগ্রহ করা ও বলশেভিক প্রপাগাণ্ডা করা। জর্মণরা বলশেভিসম্‌কে বিষচক্ষে দেখত, তাই এ কাজ খুব সাবধানেই করতে হ'ত। যে কোনো মুহূর্তে ওকে জর্মন নায়কেরা হুকুম করতে পারেন—প্রস্থান কর্মো। তখন? কী হবে? কিন্তু ও হেসে বলেছিল আমাকে: "পরিণাম চিন্তা যে করে সে খাঁটি বলশেভিক নয় দিলীপ। হয়ত আমাকে

এখানে জেলে যেতেও হতে পারে। কিন্তু আমি বেপরোয়া—চাই শুধু আমার আদর্শকে জীবনে ফলিয়ে তুলতে লেনিনের সেবক হ'য়ে। আমার কেবল এক দুঃখ আছে: আমার জন্যে আমার স্ত্রীকে জেনেভায় কাজ নিতে হ'ল।"

"তুমি তাকে দেখতে যাও না কেন মাঝে মাঝে?"

"টাকা কোথায় দিলীপ? আমি যে নিঃস্ব। যা মাইনে পাই তাতে টায়ে টায়ে চ'লে যায়।"

আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল: "সে হবে না শাপিয়ো। চলো আমার সঙ্গে জেনেভা। আমি লুগানো যাচ্ছি—জেনেভা হ'য়ে। আমি তোমার ট্রেণভাড়া ও হোটেল খরচ দেব। না—কোনো কথা নয়। আমাকে যদি সত্যিই বন্ধু মনে করো তবে কেন আমার এ-সাহায্য নেবে না—বিশেষ যখন আমার হাতে যথেষ্ট টাকা আছে? চলো তুমি। যেতেই হবে তোমাকে।"

ওর চোখে জল চিক চিক ক'রে উঠল। বলল: "ভাই, তুমি আমাকে বলশেভিক জেনেও ভালোবেসেছ—তাই তোমার উদারতার মানহানি করব না। যাব তোমার সঙ্গে জেনেভা।"

কিন্তু হা দুর্দৈব—কি একটা জরুরি কাজের জন্যে ও ছুটি পেল না আমাকে একলাই জেনেভা ছুটতে হ'ল। সেখানে দুদিন কাটিয়ে লুগানো।

লুগানোতে ও আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখল। কি সুন্দর চিঠি! লিখল ওর জীবনের অনেক আশা আকাঙ্খার কথা। যেমন শেষে লিখল: "বন্ধু, আমি নাস্তিক, সমাজ মানি না, ভগবান মানি না, চলতি নীতিবাদও মানি না। কিন্তু তুমি যে ভালোবাসার চুম্বকে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছ তাকে মানতে আমার বাধে নি। হয়ত আমাদের কোনোদিনই আর দেখা হবে না। কিন্তু আমার প্রণয়বাগানে তুমি যে প্রেমের ফুল ফুটিয়ে গেছ সে অমর ফুল।"

সে চিঠিটি হারিয়ে গেছে কিন্তু ও এই ধরণের কথা যে লিখেছিল সরল কাব্যোচ্ছ্বাসে একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

ফেল

(গল্প)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গত বৎসরও বি, এ'টা পাশ করতে পারে নি প্রভা। দু'বারই সাধ্যমতো খেটেছিল। প্রথম বৎসরটা কেন যে হোল না বলতে পারে না, তবে গতবার খোকা ঠিক পরীক্ষার মুখেই এসে প'ড়ে বাগড়া দিল। হয়ে যেত, তবে পরীক্ষাই যে নানা গণ্ডগোলের জন্য মাস দু'য়েক পেছিয়ে গেল। এ-বছরটাও খোকাই গিলেছে, প্রস্তুতই হতে দিল না। প্রথমটা নিজের অসহায়তা দিয়ে, প্রভা ভিন্ন কোন উপায়ই ছিল না বেচারির, প্রতি মুহূর্তেই প্রয়োজন, তারপর ক্রমেই এত দুষ্টু হয়ে উঠেছে, বিশেষ ক'রে প্রভার বই-খাতা-কালি কলমের সঙ্গে এমন বৈরীর ভাব যে, কখন যে তারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে কোথায় যে লুকিয়েছে, আর খোঁজও রাখে না প্রভা।

তাছাড়া আগেকার মতো সে ঝোঁকও নেই পড়ার দিকে আর পরীক্ষার দিকে, যার জন্যে একনাগাড়ে এতটা এগিয়ে এসেছিল। ছাত্রী হিসাবে ভালো মেয়েই ছিল সে।

বিয়ের পর একটা বড়-রকম বিরতি গেল পড়া আর পরীক্ষা দেওয়ার। বড় সংসারের প্রথম বধূ, একেবারে অনেকগুলি দায়িত্বের মধ্যে এসে পড়তে হোল। এ ছাড়া শ্বশুরবাড়ি একটা মাঝারি গোছের মহকুমা সহরে,সেখানে মেয়েদের পড়া পাস করার সেরকম রেওয়াজ নেই, বিবাহিতা মেয়ে মহলে একেবারেই নেই। নূতন বিবাহের হৈচৈ, আত্মীয়কুটুম, দেখাশোনা শেষ হোল, এইবার সংসারে ঢোক; মাঝে মাঝে না হয় বাপেরবাড়িটা হয়ে এসো, একটু দম নিয়ে এসো—এই ছিল সাধারণ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মধ্যে কটা বছর কাটাতে হয়েছে প্রভাকে। এর মধ্যে সুজন আর শিখা হোল বছর তিনেকের ব্যবধানে। তারপর প্রায় পাঁচ-ছয় বছর বাদ দিয়ে সম্প্রতি খোকা হয়েছে। সুজনের বয়স এখন বছর দশেক হোল।

প্রভার যখন বিবাহ হোল তখন ওর স্বামী মহিম বছর তিন ধরে একটা ইন্‌জিনিয়ারিং ফার্মে কাজ করছে। বছর তিন পর কেন্দ্রীয় সরকারের একটা আধা সরকারি ইনজিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে ভালো কাজ পেয়ে গেল। বছর চারেক বদলি হয়ে হয়ে ক'জায়গায় ঘুরে ঘুরে পাঁচ বছর হোল এই সহরে স্থায়ী ভাবে এসে বসেছে। এর মধ্যে প্রভা এসেছে তিন বছর হোল; কোয়াটার্স পাচ্ছিল না মহিম।

একটা খুব বড় পরিবর্তন হয়ে গেল প্রভার জীবনে। খুব বড় আধুনিক সহর। প্রভার শ্বশুরবাড়ির মহকুমা সহর এখানকার একটা পাড়া। প্রত্যেক পাড়াই প্রগতি অর্থে যা বোঝায় সেদিক দিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। পুরুষদের ক্লাব, মেয়েদের সমিতি; নিত্যই কোথাও না কোথাও, কোন না কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য, সঙ্গীত, নাটক; এ-পাড়ায় নয়তো অন্য পাড়ায়, দূরে বা কাছে। অফিসার মানুষ স্বামী, নিমন্ত্রণ থাকে, যায় প্রভা। মফঃস্বলের মেয়ে প্রথমটা বেশ যেন দিশেহারাই হয়ে পড়েছিলেন,তারপর অভ্যস্ত হয়ে গেল। মহিলাদের মধ্যে বয়স এবং অনুভূতি-অভিজ্ঞতার জন্য প্রথম পরিচয়ে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে গিয়ে পড়ল প্রভা, তারপর তাদেরই বলা-কওয়ায় একদিন সমিতির সভ্যাও হয়ে গেল। এখানকার মেয়েদের সমিতির নাম মহিলা মহল।

এতদিন বাইরে-বাইরে যাওয়া আসা ক'রে, মেলা-মেশা করে বেশ ছিল, সভ্যা হওয়ার পর একটা অস্বস্তির মধ্যে যেন পড়ে গেল প্রভা। সমিতির অনেকেই উচ্চ শিক্ষিতা। এম, এ, এম্-এসসি অনেকগুলি, জন তিনেক ডক্টরও রয়েছেন, এরপর বি-এ, বি,এসসির সংখ্যাও প্রচুর। এর নীচেও রয়েছে, তবে, প্রশ্ন করে তো খোঁজ নেওয়া যায় না, প্রভার যতটা পরিচয় তাতে মনে হয় ওর

বয়সের অথচ গ্র্যাজুয়েট নয়, এখন সভ্যা নিতান্ত অল্পই আছে। চিকিৎসক—ডাক্তারও দু'জন আছেন।

কিছুটা বিদূষী সমাগম হলেও, তার জন্যেই একটা সঙ্কোচের ভাব থাকলেও চলে যাচ্ছিল প্রভার। সময় নেই, ক্লাব জীবনে অভ্যস্ত নয়, যায় খুবই কম, সুতরাং প্রভেদটুকু গায়ে লাগছিল না,তারপর একদিন টের পেল সমিতির কে কি বিশেষ করে কার বিদ্যার দৌড় কতটা এ নিয়ে একটা চাপা জিজ্ঞাসা আছে নেপথ্যে।

মেয়েটির নাম তপতী, ডাকনাম তপুতেই পরিচিত। সমিতির মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে ছোট। না হয়, সব ছোটদের অন্যতম। বছর চব্বিশ হবে। ঠিক ঠিক জানতে দেয় না, কাউকে বলে আঠারো, কাউকে বলে আঠাশ। অত্যন্ত লঘু, চপল প্রকৃতির মেয়ে। হাসিখুসি রঙ্গরসে ভরা। একটা কিছু হলেই তাই নিয়ে লেগে পড়বে। যখন গম্ভীর তখনও এর পেছনে একটা ধারাল হাসি লুকিয়ে রাখে এর জন্যেই যেমন অনেকে তাকে কাছে টানে, ভালোবাসে, তেমনি আবার অনেকে ভয় করে বা এড়িয়ে চলতে চায়,বিশেষ ক'রে যাদের ভেতরে কিছু গলদ আছে।

সমিতি বসে রোজই। একটা লাইব্রেরী আছে, তার সঙ্গে দৈনিক-মাসিক পড়বার ব্যবস্থা, গান বাজনারও সরঞ্জাম আছে। তবে জমে শনিবার সন্ধ্যায়। মেলা-মেশা, গল্প-গুজব, কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকে ঐদিন। একটা ছোট ক্যান্টিন আছে, হাল্কা মিষ্টি-নোস্তার ব্যবস্থা থাকে।

প্রভা আসতে পারলে ঐদিনই আসে। এবার এল দুটো শনিবার বাদ দিয়ে। বি-এর ফলাফল বেরিয়েছে, মনটা খারাপ ছিল, অন্তত ঠিক সমিতি-মেজাজে ছিল না, তাছাড়া খোকা বেশিক্ষণ কাছ-ছাড়া থাকতে চায় না। তাকে নিয়েও আসতে হয়েছে একটা চাকরকে দিয়ে পেরাম্বুলেটর চালিয়ে। লনে আরও সঙ্গী পায় খেলবার, ফ্যাসাদ করে না।

ওকে চাকরের হেফাজতে রেখে হলে প্রবেশ করতেই তপতী দেখতে পেয়ে হলের মাঝখান থেকে দুটো বেণীর একটা দু'হাতের আঙুলে নাড়াচাড়া করতে করতে কাছে এসে ছেড়ে দিয়ে প্রভার ডান হাতটা ধরে বলল—"বাবাঃ বাবা! কদ্দিন থেকে যে খুঁজেছি তোমায় প্রভাদি, ফেল করে যেন ডুমুরের ফুলটি হয়েছ। চলো, ডক্টর বাগচী তোমায় ডাকছেন।"

ওর বলার ভঙ্গীতে কয়েকজন ঘুরে হাসল। একজন সমবয়সী গোছের প্রশ্ন করল—"সত্যিই তোমায় অনেক দিন দেখিনি প্রভা, অসুখ-বিসুখ করেনি তো?" "যদি দু'বছর ধরে ফেল করাটাকে একটা ক্রনিক ব্যাধি বলে না ধর।"—হেসেই উত্তর করল প্রভা।

হেসেই প্রত্যুত্তর হোল—"নাও, আজকালকার আবার পাস-ফেল!"

"কেন, ওকথা বললেন যে রত্নদি?"—এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল তপতী, প্রশ্ন করল—"বলতে চান, আজকালকার পাসের কোন মূল্য নেই, জলুস নেই?"

একটি ওর বয়সীই একেবারে আধুনিক ভঙ্গীতে সুসাজ্জিতা মেয়ে একটু যেন পা চালিয়েই এদিকে আসছিল, হঠাৎ পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে—"কেউ ডাকলে আমায়?"—ব'লে, যেন মনে হোল একটা অনির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করেই আবার ঘুরে চলে গেল।

এর কোথায় যেন কী একটা অর্থ ছিল, কয়েকজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, একটু টেপা হাসিও খেলে গেল কয়েকটি ঠোঁটের কোণে।

তপতী প্রভার ডান হাতটা আদ্রাভাবে জড়িয়ে বলল "চলো প্রভাদি, ডক্টর বাগচী দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

প্রভা যেতে যেতে চোখ নামিয়ে খুব নীচু গলায় প্রশ্ন করল—"কী যেন একটা হয়ে গেল রে তপু, ব্যাপার কি বলত?"

"শুনবেখন।"—বলে এগিয়ে নিয়ে চলল তপতী।

ডক্টর নীলিমা বাগচি এখানকার মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল। এদিকে সমিতির উনিই প্রেসিডেন্ট। বয়স পঞ্চাশের কিছু ওপরে। প্রভার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তবে সমিতিতে আসবার সময় কম পান, প্রভাও

আসে কম, দেখাশোনা বেশি হয় না। তবে, কতকগুলো গুণ থাকার জন্য প্রভা যেমন অনেকের প্রিয়পাত্রী তেমনি এঁরও। বয়সের অনেক তফাৎ থাকা সত্ত্বেও এঁর স্নেহের সঙ্গে যেন একটা শ্রদ্ধার ভাব লেগে থাকে। এমনিতে রাসভারি স্ত্রীলোক, তবে আজকাল যেন একটা ক্লান্তির ভাব লেগে থাকে চোখেমুখে।

সমিতির কিছু কাগজপত্র দেখছিলেন লাইব্রেরিয়ান কেরানির কাছে, সে চলে গেলে দাঁড়িয়েই ছিলেন এদের প্রতীক্ষায়, প্রভা গিয়ে পায়ের ধূলি নিল।

বললেন—"তোমায় এত দেখবার ইচ্ছে হচ্ছিল প্রভা। ...তুমি নাকি এবারেও ফেল করেছ?"

প্রভা হেসে ফেলল, বলল—"দুবার উপরোউপরি ফেল করে—এমন মেয়ে একটা দ্রষ্টব্য বৈকি মাসিমা।"

"না না, সেকথা নয়"—উনিও একটু হেসে ফেললেন, বললেন—"আমার কথাটাই একটু বেখাপ্পা হয়েছে। দাঁড়াও, একটু গুছিয়ে বলে দেখি। তোমরা আজ-কালকার মেয়ে, একটু ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয় বাপু। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম......"

বাধা পড়ল। তপতী বলল—"কিছু মনে করবেন না মাসিমা, এখানে আর একটি আজকালকার মেয়ে রয়েছে। ...বলছিলাম আপনি প্রভাদিকে দেখে এত খুশী হয়েছেন যে, তাঁকে বসতে বলতে ভুলে গেছেন।"

একটু যেন উৎকণ্ঠিতভাবে শুনতে শুনতেই ডক্টর বাগচী এবার একটু সশব্দেই হেসে উঠলেন, ওর পিঠে লঘু করাঘাত করে বললেন—"দেখেছ, দুষ্টু মেয়ের মনে করিয়ে দেওয়ার ছিরি! ...বোস প্রভা।"

প্রভা লজ্জিতভাবে বলল—"দাঁড়িয়েই থাকি না মাসিমা। আপনার সামনে......"

"বোস, বোস। এটা কলেজও নয়, তুমি ছাত্রীও নয়।"

"সেরকম ভাগ্য নিয়ে জন্মাব, তবে তো আপনার ছাত্রী হব।"

—বসতে বসতেই বলল প্রভা।

হঠাৎ একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল ছোট করে। তারপর যেন স্তম্ভিত হয়ে তপতীর দিকে চেয়ে বললেন—'তুমি কৈ বসলে না তো তপু?"

"দুষ্টু মেয়ের সাজা নিচ্ছি মাসিমা, আপনি তো দিতে পারবেন না...

"কেন—সাজা?—একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্নটা ক'রে তখনই আবার হেসে বললেন—"ও বুঝেছি। তা ক্লাসের শেষ পর্যন্তই যে হ'তে হবে তার মানে কি? নাও, ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বোস।"

আবার যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বললেন—"তোমাদের মতন ক'জন প্রাণখোলা হাসিখুসী মেয়ে দেখলে যে কী আনন্দ হয়!"

একটু স্বগতভাবেই। তারপর প্রভার দিকে চেয়ে কতকটা আতুর কণ্ঠেই বললেন—"পৃথিবীটা যে দিনদিন কী নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে প্রভা!"

একটু চুপচাপ গেল। তারপর উনিই বললেন—"হ্যাঁ, তোমাকে যা জিজ্ঞেস করছিলাম, তুমি ফেল করলে কেন দু'দুবার? শুনি, ব্রিলিয়েন্ট মেয়েই ছিলে।"

"স্কুল ফাইন্যালে দু'টো লেটার পেয়েছিলো।—তপতী বলল।

"তাই নাকি? অতটা জানতাম না। তাহলে?"

লজ্জায় দৃষ্টি একটু নেমে গিয়েছিল প্রভার, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দিতে পারল না। তারপর মুখটা তুলে একটু ম্লান হাসির সঙ্গে বলল—"সে ছিল স্কুলে থেকে পড়া মাসিমা। ভালো স্কুলও, আমার চেয়ে দিদিমণিদেরই যশ বেশি ক'রে প্রাপ্য। আর এবা হচ্ছে তা প্রাইভেটে সংসারের সব ঝামেলার মধ্যে কোন রকমে একটু সময় করে। মাঝ খানে পড়ার অভ্যেসে বড় রকম একটা ছেদও তো পড়ে গেল।"

"এই রকমই নিশ্চয় কিছু হবে। এবার আমি তোমায় কেন এত ক'রে দেখতে চাইছিলাম বলি। যদিও কি ভাববে জানি না।"

নীচে চা আর কাগজের রঙিন ডিসে করে খাবার

বিলি হচ্ছিল, কম বয়সী মেয়েরাই দিচ্ছে, একটি মেয়ে ট্রেতে ক'রে ওপরে নিয়ে এল। ডক্টর বাগচীর আহার খুব নিয়ন্ত্রিত, খাননা, এরা দুজনেও নিলনা। উনি প্রশ্ন করতে তপতী বলল, তার একটু অম্বলের মতো হয়েছে। প্রভা জানাল, আজ বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয় দেখা করতে আসেন, তাদের সঙ্গে হয়ে গেছে চায়ের পাট, আসতে তাই দেরিও হয়ে যায় ওর।

মেয়েটি নেমে গেলে ডক্টর বাগচী পূর্ব্বের কথার জের ধ'রে বললেন—"তোমায় দেখতে চাইছিলাম প্রভা, একে তো অনেকদিন দেখিনিই, তার ওপর শুনলাম এবারেও ফেল করেছ। দু'বছর ধরে ফেল করাটা যতই দুঃখের হোক, তার মধ্যে একটা মস্তবড় সত্য এই রয়েছে যে, পরীক্ষাটা পরীক্ষাই ছিল, আর তুমি তার অমর্যাদা করনি। এই অমর্যাদাটি এত হচ্ছে আজ, করাটা এত সস্তা, আর সেইজন্যে লোভনীয় হয়ে উঠেছে যে, যে মানুষটা দু'দুবার ফেল করবার সম্ভাবনা দেখেও সেই লোভের ফাঁদে পা দিলনা—আমার মনে হয়েছে, সে যেন এ-পরীক্ষায় বিফল হয়ে একটা অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এল। তুমি যখন আসছিলে এত পাস করাদের মধ্যে দিয়ে নতুন পুরণো সব রকম—দেখা যায় তোমার সেই হাসিখুশিভাবে এতটুকু কোথাও যেন কালির আঁচড় পড়েনি।"

ছেড়ে দিয়ে ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন—"থাক্, লজ্জা পাচ্ছ। এসো তোমরা, আমিও এবার উঠি।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রশ্ন করলেন—"হ্যাঁ আর একবার দেখবে চেষ্টা করে?"

ওরা দুজনেও উঠে পড়েছে, তপতী বলল—"আপনি প্রভাদি'কে রবার্ট ব্রস্ করে ছাড়তে চান মাসিমা?"

এতজোরে হেসে উঠলেন ডক্টর বাগচী যে নীচের অনেকের দৃষ্টি এদিকে এসে পড়ল।

ওঁকে মোটরে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে আসতে তপতী বলল—"এবার চলো বাইরের দিকে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে বসিগে। খাওয়াতে হবে।"

"আমায়? আমার দায়টা?—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল প্রভা: বলল—"তখন তো খেলিও না।"

"অত বোকা মেয়ে নয় যে দুটো সিঙ্গাড়া আর দুটো সন্দেশ খেয়ে ক্ষিদে নষ্ট করব"—যেতে যেতে বলে চলল তপতী—"সাধনের দোকান থেকে রীতিমতো বাছাই করা খাবার এনে খেতে হবে পেট ভরে। চলো, হলের দিকে সুবিধে হবে না।"

বেয়ারাকে ডেকে লনের একদিকে দুটো লোহার চেয়ার আর একটা টেবিল পাতিয়ে বসল দুজনে। তাকেই একটা পাঁচটাকার নোট দিয়ে প্রভা তপতীকে বলল—"নে, কি খাবি বলে দে।"

একটা কচুরি, একটা ডিম-সন্দেশ।

বেয়ারার মুখের দিকে চেয়ে ফরমাসটা দিয়ে বলল—একটু তাড়াতাড়ি আসবে।

"সে কিরে! এই তোর পেটভরে খাওয়া!"—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল প্রভা।"

"একটু ভদ্রতাও করতে দেবেন না প্রভাদি! বেয়ারাটা ওদিকে চলেও যায়।"—একটু—অনুযোগের ভঙ্গিতে কথাটা বলে নিজেই একটা হাঁক দিয়ে তাকে ফিরিয়ে প্রভাকে বলল—"বাকিটা তুমি বলবে ব'লে ছেড়ে দিলাম আমি। তা বলে যেন একরাস ফরমাস দিয়ে রাক্ষস বানিও না ঘুরিয়ে। তাহলে বুঝব ভেতরে ভেতরে চটেছ।"

প্রভা বলল—"এতরঙ্গও জানিস!"

ফরমাস নিয়ে বেয়ারা চলে গেলে বলল—"ঘাড় ভেঙে তো খাচ্ছিস, তা কৈ আমার গরজের কথাটা তো বললিনি।"

"ফেল করেছ, তার দণ্ড যা খুশি—যে দিক দিয়েই নাও।"

"কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে"—প্রভা মন্তব্য করল।

তপতী হঠাৎ একেবারে গম্ভীর হয়ে গেছে, ওর এ টিপ্পনীটুকু যেন কানেই গেল না। একটু চুপ করে রইল, তারপর আবার হঠাৎ মুখটা তুলে প্রশ্ন করল—"প্রভাদি, তুমি ডক্টর বাগচীর কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলে কি?"

"একটু যেন বেশি ক্লান্ত। নয় কি? কেন বল্ দিকিনি?"

"যার জন্যে তোমার ফেল করার অত জয়গান গাইলেন।"

"সেটাও যেন কেমন লাগছিল, নিজে অতবড় ক্লাসে। যদিও খুব সান্ত্বনা পেয়েছি তবু।"

"তুমি কলেজের বাইরের মেয়ে, অত খোঁজ রাখনা, বছরের শেষে একবার ক'রে পরীক্ষা দিয়ে এসে খালাস। ছেলেদের কলেজের বিষাক্ত হাওয়া মেয়েদের কলেজেও ঢুকেছে। তাদের নেশা যে কোন উপায়েই পাশ করতে হবে। গত বার অন্য কলেজে সীট পড়েছিল মেয়েদের —যেমন প'ড়ে আসছে, তাতে কতকগুলোমেয়ে ঐ কলেজের ছেলেদের সাহায্য নিয়েকলেজের বদনাম করায় উনি চেষ্টা করে নিজের কলেজে ব্যবস্থা করান এবার। ফল আরও খারাপ হয়েছে। কতকগুলো মাকালফলের সৃষ্টি। ঐ ইলা মাইতি, দেখলেই তো—'ঐ ধরণের মেয়েই, তার ওপর এবার বি,এ রেজাল্ট বেরণো পর্যন্ত ও যে কী করে বেড়াচ্ছে—ধরাকে সরা মনে ক'রে। তবে ধাক্কাও খাচ্ছে না কি? খাচ্ছে। ঐ তো দেখলে পাস ফেলের কথা হচ্ছে দেখে ছুটে আসছিল, আমায় দেখে আর আমার বক্তৃনি শুনে তাড়াতাড়ি ঘুরে পালাল। ও ঠিক আসছিল তোমার ফেল করা নিয়ে কিছু বলতে, আর নিজেকে জাহির করতে, অন্তত 'এবারেও তোমার হোল না প্রভাদি?' ওর যে কি করে হল সবাই জানে কিন্তু খোলাখুলি বলে না তো। কিন্তু ও জানে তপী বড় ঠোঁটকাটা। দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি পালাল।"

সাহেনের দোকান গেটের বাইরেই। বেয়ারা খাবার কিনে, প্লেটে ক'রে সাজিয়ে নিয়ে এসেছে একটা ট্রেতে, সঙ্গে চা। চায়ের সঙ্গে দুটো ডিম সন্দেশ তুলে নিয়ে তাপতী প্লেটটা ঠেলে দিয়ে বলল—"নিয়ে যা।"

"বাঃ। তোর হয়ে গেল পেট ভরে খাওয়া?"—প্রভা টুকল। তপতী বলল—"নিয়ে যাক, বাড়িতে ছেলেমেয়েদের দেবে। আনন্দের খাওয়া—। যতদূর পর্যন্ত পৌছয়।"

মুখটা থমথম করছে। প্রভাও যেন সম্মোহিত হয়েই চুপ করে রইল।

"ও আমায় এড়িয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমি ওকে ছাড়ব ভেবেছ? এখানে সীট হতে, ওর ভাই আর তার সঙ্গীরা —তার মধ্যে ক'জন ওর এ্যাডমায়ারারও আছে, ডক্টর বাগচীকে শাসিয়ে চিঠি দেয়, অবশ্য বেনামিতে—ঘেরা-ওয়েরও ভয় দেখায়। এতটা আশঙ্কা করেন নি। তোমায় আজ সংক্ষেপেই বলছি, একদিন সব সময় ক'রে বলব, তপী গতরখাকির কিছু জানতে তো বাকি নেই। রিজাইন দিতেই যাচ্ছিলেন—কমিটির ক'জন মাতব্বর তো আবার ভেতরে ভেতরে ওদিকে—গলদ তো একরকম নয়। রিজাইন দিতেই যাচ্ছিলেন, এদিকে স্বামী একরকম ইনভ্যালিড—যার জন্যে ওঁর এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে চাকরি করা—যারা ওঁর ভালো চায়—তাঁদের পরামর্শে পরীক্ষার সময়টা ছুটি নিয়ে বসে রইলেন। তারপর এবারে মেয়েদের কলেজে যে কী তাণ্ডব গেছে তুমি কল্পনা করতে পারবে না প্রভাদি।

ডক্টর বাগচীর "পরীক্ষার অমর্যাদা" বলাটা তো কিছুই নয় তার সামনে।

সবচেয়ে ঘা দিয়েছে ইলা। অন্য কেউ হলে অন্তত দিন কতকের জন্যে বাইরে গিয়ে বসে থাকত। ও ময়ূরের মতন প্যাখম ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তপী পোড়ারমুখীকে ভয় তো……"

"তুই ওটুকু খা। চা-টাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। প্রভা বাধা দিল।"

"খাব না? খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে ওকে খুঁজে বের করব। যেখানে আছে, জটলা করেই আছে তো, বলব—"এই ফেলের খুশির খাওয়া খেয়ে আসছি প্রভাদির কাছ থেকে ইলা……"

সম্মোহিত হয়েই শুনছিল প্রভা, শঙ্কিত হয়েই বলে উঠল—"না ভাই অমন কাজ করবিনি, ভাববে আমিই হিংসে ক'রে এগিয়ে দিয়েছি তোকে। ভেবে দ্যাখনা, তাই ভাববে না? দু'দুবার চেষ্টা ক'রে বিফল হলে, হয়ই মনটা একটু খারাপ, কিন্তু তোকে সত্যি বলছি আমার আর কোন দুঃখ নেই, এতটুকুও নয়। আমি অমন মানুষের কাছে ফেলের মর্যাদা পেয়েছি, আর পাসের দিকে কি যাই?"

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এক সময় আমি প্রদর্শনীর একটি উচ্চশ্রেণীর রেস্টোরান্টে বসিয়া খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইতেছিলাম। সকালে কাগজ পড়িবার সময় পাই নাই। পাশের এক টেবিলে ভদ্র চেহারার এক পরিবারের লোকেরা বসিয়াছেন। বোধ হইল তাঁহারা পল্লী অঞ্চলের লোক। ঐ টেবিল হইতে মাঝে মাঝে আড় চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আমি ভাবলাম কিছু মজা করা যাউক। আমার দিকে সবাই চাহিতেছে এ বিষয়ে সজাগ হইলাম, তাঁহারাও দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইলেন। আমি পাঁচ মিনিট ধরিয়া কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম যাহাতে উহাদের দৃষ্টি সম্মুখস্থ প্লেট হইতে আমার দিকে ফেরে। এবং আমি যতই কাগজে মনোযোগ দিতেছি, ততই উহাদের চপল দৃষ্টিও আমার দিকে নিবদ্ধ হইল। মনে হইল, আমাকে ভাল করিয়া দেখিবার পর আমার সম্পর্কে উহাদের ধারণা আগে যতটা খারাপ হইয়াছিল, সে রকম এখন আর নাই। সম্ভবত আমার নরমাংসভোজনের যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা বাহিরের কোনও লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যায় না, কিংবা হয়ত ঐ প্রবৃত্তি সম্প্রতি আমি দমন করিয়া রাখিয়াছি, অথবা স্থান ও পরিবেশ এমন নহে যাহাতে আমি উহাদের ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, তাহারা কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া উঠিল এবং চাপা গলায় এমন আলাপ জুড়িয়া দিল যাহাতে আমার দৃষ্টি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষ কর্তব্যটি অবশেষে ঐ দলের প্রায় সতের বৎসর বয়স্কা সুন্দরী মেয়েটির উপর ন্যস্ত হইল, অবশ্য আমাকে শুনাইবার জন্য নহে, কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, "এই লোকটির সঙ্গে কথা বলিবার আমার ভীষণ ইচ্ছা হইতেছে।" এমন কথা শুনিয়া আমি কি করিয়া চুপ করিয়া থাকি? আমি উঠিয়া তাহাদের কাছে গেলাম, এবং মেয়েটিকে বলিলাম, "তুমি কি আমার উদ্দেশে কিছু বলিতেছিলে?" সে ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইল এবং মাথা নিচু করিয়া রহিল। তাহার পিতা তাহার হইয়া বলিলেন, "আমার এই মেয়েটি প্রদর্শনীতে ভারত হইতে আনা দ্রব্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে। কয়েকটি প্লেটে ও ঢালের উপর আপনাদের ভাষায় কি সব লেখা রহিয়াছে, সে উহার অর্থ জানিতে চায়। কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া পাই নাই, তাহার পর আপনাকে এখানে দেখিয়া আপনার কাছাকাছি স্থানে বসিয়াছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে বসিয়া কিছু পানীয় গ্রহণ করিবেন? আপনি কি পছন্দ করেন? এখানে দেখিতেছি মোজেল সুরাটি উৎকৃষ্ট। অথবা আপনি শ্যামপেন কিংবা আরও কড়া কিছু পছন্দ করেন?" আমি ধন্যবাদের সহিত পানীয় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম, এবং একটি চেয়ারে তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া কফটগারি পাত্রে যে সব উৎকীর্ণ কবিতা সোনায় অলঙ্কৃত করা আছে, তাহার কয়েকটি অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। তরুণী ততক্ষণে তাহার লজ্জা ত্যাগ করিয়া এমন উৎসাহের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যাহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া আমি মনে করি নাই। যাহা বলিতেছি তাহাতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, এবং আমার ইংরেজী শুনিয়া

বিস্মিত হইতেছে, এবং "আমার" দেশ হইতে আনা ব্যাণ্ড বাজনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেছে। আসলে ওটা ইণ্ডিয়ান নহে, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাণ্ড, নিগ্রো এবং ম্যুলাটো (শ্বেত ও কৃষ্ণকায়ের সঙ্কর)-রা বাজাইতেছিল। মেয়েটির প্রশংসা যে যথাস্থানে বর্ষিত হইল না, সেজন্য একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও আমি প্রায় পনেরো মিনিট-কাল আলাপ চালাইয়া গেলাম। এবং তাহার বন্ধু মিনি, জেন, বা লিজি, যেই হউক তাহাকে নস্যাৎ করিয়া তাহার যে সব আত্মীয় তাহার মত সৌভাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদিগকে অন্তত বলিতে পারিবে যে, সে একজন আসল র‍্যাকির সঙ্গে আলাপ করিয়াছে—এই সব গল্প করিবার পর আমি ওই সময়ের মধ্যে তাহাকে যথেষ্ট উপকরণ যোগাইয়া দিয়াছি।

অন্য আর এক সময় গ্রিল রুম নামক এক শস্তা খাদ্যালয়ে—সেখানে অল্প কয়েকটীমাত্র পদের খাদ্য বিক্রয় হয়, সেইখানে এক নাবিক আমার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল, আমি যেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কিছু আলাপ করি। সে বলিল গত পূর্বদিন সে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছে, এবং একদিনের ছুটি লইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রদর্শনী দেখাইতে আনিয়াছে। সে তাহাকে যতটা সম্ভব খুশি করিতে চাহে। তাহার স্ত্রীর মাথায় এক ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে আমি তাহার সঙ্গে আলাপ না করিলে সে খুশি হইবে না, প্রদর্শনী উপভোগও করিতে পারিবে না। এই অদ্ভুত আবদারে বিরক্ত হইয়া আমি বলিলাম, "ইহার কোনো মানে হয় না, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিব না।" কিন্তু লোকটি নাছোড়, সে ভীষণভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, এবং বারবার দূরের এক টেবিলে বসা গোমরামুখী স্ত্রীর দিকে তাকাইতে লাগিল। যাহা হউক তাহার দৌত্য অবশেষে সফল হইল, আমি গিয়া তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিলাম। তাহার মুখচোখ তৎক্ষণাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার স্বামীকে পুরস্কারস্বরূপ আরও একপাত্র হুইস্কি পানে অনুমতি দিল। উহাদের বিবাদও মিটিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীর সহায়তায় তাহাকে ধরাধরি করিয়া ক্যাবে তুলিয়া দিলাম, তাহা না হইলে সে বিপন্ন হইত।

আমাদের প্রতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহার কিরূপ? আমার বিশ্বাস আমার দেশবাসী তাহা জানিতে চাহেন। ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্রলোকের যেরূপ ব্যবহার তাঁহারাও আমাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সার জর্জ বার্ডউডের অপেক্ষা সদয় এবং সহৃদয় বন্ধু আর কাহাকে আশা করা যাইতে পারে? তাঁহারা এবং আমরা যেন এক দেশেরই মানুষ এই রকম একটা সহানুভূতির ভাব আমাদের মধ্যে ছিল। ভারতে চাকরির পদমর্যাদা আমাদিগকে পৃথক রাখিয়াছিল, ইংল্যাণ্ডে আমরা সবাই অতিথি। সম্মানিত অতিথির মর্যাদা তাঁহারা যদি না বুঝিতেন, তবে তাঁহাদের প্রবাস বাস বৃথা হইত। মাঝে মাঝে অবশ্য আমরা অদ্ভুত চরিত্রের দুই-একজনের দেখা পাইতাম, যাহারা, বিশেষ করিয়া যদি সঙ্গিনীসহ থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে হিন্দি ভাষায় পণ্ডিত তাহা জাহির করিতে ব্যস্ত হইতেন, সে ভাষায় জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক। এবং ইহার দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহারা আমাদের চেয়ে কত বড়। অর্থাৎ সঙ্গিনীদের দেখাইতেন "দেখ, আমরা কত বড়।" এ পর্যন্ত ভালই। আমরাও তাঁহাদের ভারতীয় ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানের কাছে নত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গিনীর চোখে তাঁহারা যাহাতে খুব মহৎ প্রতিভাত হইতে পারেন, সে বিষয়ে সাহায্য করিতাম। মহিলারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, এতই তাঁহাদের আনন্দ এবং গর্ব বোধ হইত। একেবারে যেন খাঁটি নাগরিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিমন্ত্রণ পাইতাম। হায় হায়! আমরা নিজেদের কি নরাধমই না ভাবিয়াছি! কিন্তু এ সবই উদারতার পরিচয়। যাহাই হউক ভারতীয় কয়েকজন প্রতারকের সঙ্গেও লণ্ডনে আমাদের মোলাকাত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবসা বড়ই মন্দা যাইতেছিল। একবার আমি এবং একবারই মাত্র, এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নিকট হইতে রূঢ় ব্যবহার পাইয়াছিলাম। সে কি বলিয়াছিল,

ঠিক সেই ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নহে, তবে আমি তাহার নিহিতার্থ এবং ভঙ্গিটি কথায় প্রকাশ করিতেছি। সে রাজকীয় ভঙ্গিতে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "স্লেভ, আমাকে অমুক অফিসটি কোথায় দেখাইয়া দিবি?" আমি তাহার উত্তরে বলিলাম, "আমি দুঃখিত, আমি অন্য কাজে ব্যাপৃত আছি, আপনার আদেশ আমি এই মুহূর্তে পালন করিতে অক্ষম। তবে যদি আপান সোজা গিয়া ডান দিকে ঘোরেন, এবং তাহার পরে বাম দিকে, তাহা হইলে আপনি সেই অফিসটি দেখিতে পাইবেন। সে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেই হইবে, তুমি কাহার কাজে নিযুক্ত আছ? কে তোমার প্রভু?" "আমি, মহাশয়, বর্তমানে ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত আছি, তিনিই আমার প্রভু। আর আমার সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছেন, তিনি অমুকের রিপোর্টার।" কিন্তু যাঁহার নাম করিলাম সেই নাম শুনিয়া লোকটি যেমন কেঁচোর মত হইয়া গেল, তাহা তাহার রূঢ় ব্যবহার অপেক্ষাও আমাকে বেশি পীড়িত করিয়াছিল।

প্রদর্শনীর বাহিরে আমরা কখনও কাহারও নিকট হইতে কোনও অসদ্ব্যবহার পাই নাই। ঈস্ট এণ্ড, ওয়েস্ট এণ্ড, এবং অন্যান্য স্থানে ঘুরিয়াছি, এবং অনেকবার পথ হারাইয়াছি। ছেলেমেয়েরা আমাদের চারিদিকে ভিড় করিয়াছে। কিন্তু আমাদের উপর কোনও অত্যাচার করে নাই। ভিখারী এবং অসৎ চরিত্রের স্ত্রীলোকেরা আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে একটু বেশি সাহস দেখাইয়াছে এই সাহস তাহারা ইংল্যাণ্ডবাসীদের সঙ্গে ব্যবহারে দেখাইতে পারে না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করে নাই। কোনও বাউণ্ডুলে স্ত্রীপুরুষ বা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক আমাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রতারিত করে নাই। বরং যাহারা দরিদ্র পল্লীর সাধারণ পানালয়ে অলসভাবে বসিয়া বসিয়া সময় কাটায়, তাহারা সব সময়ে আমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, পথ হারাইলে পথ বলিয়া দিয়াছে। যে সব স্থানে লণ্ডনের শহরের লোকেরাও দিনের বেলা যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে, আমরা সেখানে কোনও অঘটনের সন্ধানে গিয়াছি কিন্তু প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে পারিলে অঘটন ঘটিবে কেন? একবার এক দুরাত্মার মত চেহারার জন্য আমার উপরে হাতে-কলমে রসিকতা ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোজন লোক ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিল। অথচ ইহারা বেপরোয়া ধরনের লোক এবং সবাই আমার অপরিচিত। অন্য আর এক সময় কোনও একজন লোক চিৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ যে বিদেশী!" সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বলিয়া উঠিল, "না উনি বিদেশী নহেন, আপনার আমার মতই ব্রিটিশ প্রজা।"

ইংরেজদের অনুগ্রহের প্রসঙ্গে আমি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। ঘটনাটি আমার মিস্টার গুপ্তের সম্পর্কে। তিনি এবং সার এডওয়ার্ড বাক্ একদিন সকালে কভেন্ট গার্ডন মার্কেটে গিয়াছিলেন। এখানে পৃথিবীর সকল দেশের টাটকা ফল প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এই স্থানে সকল ঋতুতে উৎকৃষ্ট ফুল ও উত্তম সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। সকাল ছয়টার সময় সর্বাপেক্ষা বেশী ভিড় হয় এই বাজারে, বিশেষ করিয়া মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবারগুলিতে। সার এডওয়ার্ড আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কখনও র‍্যাস্পবেরি আস্বাদন করিয়াছেন কিনা। বন্ধু তাহার উত্তরে "না" বলাতে, সার এডওয়ার্ড কিছু র‍্যাস্পবেরি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন দেরি হইয়া গিয়াছে. সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এক খুচরা বিক্রেতা কয়েক ঝুড়ি র‍্যাস্পবেরি সকালে কিনিয়া সেগুলিসহ রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সার এডওয়ার্ড একঝুড়ি কিনিতে চাহিলেন, কিন্তু সে বলিল, সে বিক্রয় করিবে না। তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল এই ভারতীয় বন্ধুর জন্য দরকার ছিল, তাহা শুনিয়া লোকটি তৎক্ষণাৎ একঝুড়ি ফল তাঁহাকে দিল। কিন্তু দাম কিছুতেই লইল না। সে বলিল, "মহাশয়, ইনি আমাদের অতিথি, আমি এই ঝুড়িটি তাঁহাকে উপহার দিলাম।"

আমার আগে ধারণা ছিল গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিই ফলের দেশ এবং আমই সবার সেরা ফল। এখন দেখিলাম আমার ধারণার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। হট হাউসে যে সব ফল হয় তাহার একটি চমৎকার গন্ধ আছে, তাহা খোলা জায়গার ফলে পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট আম অবশ্যই ভাল, কিন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ ফলগুলির অন্যতম, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ফল নহে বিনা সঙ্কোচে আমি ইহার সঙ্গে পীচ, নেকটারিন, আনারস এবং স্ট্রবেরিকে একাসনে বসাইতে পারি। ভারতে যাহা জন্মে তাহা নিকৃষ্ট। প্রথম শ্রেণীর দোকানগুলিতে যে আঙুর বিক্রয় হয় তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, হট হাউস ফলের কিরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারে ইউরোপ হইতে যে সব আঙুর আমদানি করা হয়, তাহা আমরা যে কাবুলি আঙুর আনাই তাহার সামান। কিন্তু ঐ গরম ঘরের আঙুর তাহা অপেক্ষা পাচগুণ বড় এবং দশগুণ বেশি রসাল এবং মধুর। ইংল্যাণ্ডের আপেল আমার খুব ভাল মনে হয় নাই, কিন্তু পিয়ার, এবং আমরা যাহাকে পেয়ারা বলি তাহা আমাদের দেশের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। চেরি, গুজবেরি, এবং গ্রীনগ্রেজ এবং অন্যান্য প্লাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আমদানি করা ফলের অপেক্ষা হট হাউসের ফলের দাম অনেক বেশি স্বভাবতঃই। পীচ ও নেকটারিন প্রথম শ্রেণীর হইলে প্রতিটির দাম তিন হইতে আট পেনি, হট হাউসের আনারস প্রতিটি এক গিনি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হইতে আনা প্রতিটি ৪ শিলিং, বাহির হইতে আনা আঙুর এক পাউণ্ড ৫ পেনি, সর্বোৎকৃষ্ট হট হাউসের আঙুর এক পাবণ্ড ৫ শিলিং। ইংল্যাণ্ডে আম জন্মে না। কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে বম্বাই হইতে আম আমদানির চেষ্টা করিয়া বার বার ব্যর্থ হইয়াছেন। ভাল কলা পাওয়া যায় না, কিন্তু কয়েক জাতীয় সবুজ কলা (বম্বাই মাদ্রাজ বর্মা প্রভৃতি দেশে যেমন হয়) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে আনা হইয়াছিল। বরফঘরে যেমন মাংস ঠাণ্ডা করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত টাটকা রাখা যায়, তেমনি যদি কেহ টাটকা ফল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তিনি প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন। কমলালেবু, ট্যাঞ্জারিন, মলটা এবং স্পেন হইতে ইংল্যাণ্ডে আমদানি করা হয়। হট হাউস অর্থাৎ উপরে ঢাকা, এবং চারিদিকে অল্পবিস্তর ঘেরা—সবই কাঁচের। ইহার মধ্যে গাছের বা ফুলের বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাহা সৃষ্টি করা হয় গরম জলপূর্ণ পাইপ অথবা কিছুদূরে অবস্থিত বয়লার হইতে আনীত গরম বাষ্প দ্বারা। এইভাবে প্রয়োজনীয় আলো এবং উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করা চলে। পৃথিবীর যে অঞ্চলের গাছ, সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা ইহাতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা চলে, এবং দেশী বা বিদেশী সব রকম ফুল বা ফলের গাছেরই বৃদ্ধি বা বৃদ্ধিরোধ দুই-ই ইচ্ছামত করা যায়। তাই মরশুমের বাহির হউক বা মরশুমে হউক সকল সময়েই সব রকম ফুল ও ফল উৎপাদন করা চলে। ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক বড় বাড়ির সঙ্গেই একটি করিয়া হট হাউস যুক্ত আছে। আমার মতে ভারতেও এইভাবে ফলমূল বা সবজী এই রূপ লাভজনকভাবে উৎপাদন করা যাইতে পারে। কাঁচের ঘর থাকিলে আবহাওয়ার কঠোরতা হইতে তাহাদের রক্ষা করা সহজ হইবে।

প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া আসিয়াছি, আরও কিছুদূর চলিতে চাহি, কারণ ইহা অকারণ নহে। আমার স্বদেশবাসীরা অবশ্যই জানিতে উৎসুক হইয়াছেন ইংল্যাণ্ডে কি কি সবজী পাওয়া যায়। প্রথমেই নাম করিতে হয় আলুর। তাহার সঙ্গে মাংস ও রুটি যুক্ত হইয়া ইংরেজদের প্রধান খাদ্য হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীরই ইহাই প্রধান খাদ্য। প্রাচীন জগৎ নূতন জগতের কাছে অর্থাৎ অ্যামেরিকার কাছে, দুটি খাদ্য বিষয়ে কৃতজ্ঞ—আলু ও মকাই। অ্যামেরিকা আমাদের দিয়াছে আনারস। এবং তামাককেও আমি অগ্রাহ্য করছি না। প্রথম প্রথম আমরা যেমন করিয়াছি ইংরেজরাও তেমনি প্রথমে আলু খাইতে রাজি হয় নাই। উহারা বলিত, আলুর কথা বাইবেলে নাই। এরপরেই নাম করিতে হয় বাঁধাকপির। ইংল্যাণ্ডের এটি একটি মূল্যবান সবজী। ফুলকপিও দেখা যায়, কিন্তু এমন

অপর্যাপ্ত নহে। গরমকালে সবুজ কড়াইশুঁটির মরশুম। কিন্তু উহারা কড়াইশুঁটি টিনে সংরক্ষিত করিয়া সকল ঋতুতেই ব্যবহার করে। ফ্রান্স হইতেও আসে, ভারতবর্ষেও ইহা ফ্রান্স হইতে আমদানি করা হয়। ভারতবর্ষেই কড়াইশুঁটি সংরক্ষিত করা যায় কি না আমি জানি না, যথাকালে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। শুনিলাম ইউরোপের উৎপন্ন কড়াইশুঁটির স্বাদ ভারতের অপেক্ষা মিষ্টতর। আমি কিন্তু তুলনা করিয়া কোনও পার্থক্য বুঝিতে পারি নাই। লাউজাতীয় একরকম ফল আছে, ইহাকে 'ভেজিটেবল ম্যারো' (cucurbita ovijera) বলা হইয়া থাকে, ইংরেজদের একটি প্রিয় খাদ্য, ইহার একজাতীয় মৃদু সুগন্ধ আছে। শশাও একটি প্রিয় খাদ্য, পাতলা করিয়া কাটিয়া কাঁচাই খায়। খোসা বাদ দিয়া অথবা খোসাসুদ্ধ খাওয়া হইয়া থাকে। খাইবার সময় ইহার সহিত প্রচুর ভিনিগার ও ঝাল মিশাইয়া লয়। বড় আকারের কুমড়ো (cucurbita pepo) ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয়, ইহা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হইতেও আসে। উহাদের মূলা আমাদের দেশের মত বড় আকারের নহে, কিন্তু ইহাদের ওলকপি ও গাজর খুব উৎকৃষ্ট। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের বড় বড় শহরের আশেপাশে একমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য যে ইউরোপীয় গাজর বর্ত্তমানে উৎপন্ন হয়, তাহার স্বাদ আমাদের দেশের অনেকেই পান নাই। আমি তাঁহাদিগকে উহা একবার খাইয়া দেখিতে বলি। কাঁচা অবস্থায় বেশ মিষ্ট এবং কচকচ করিয়া চিবাইয়া খাওয়া যায়, ঠিক আধা-পাকা পেঁপের মত। আমাদের দেশী গাজর জলীয় অংশ বেশী, ইহার পরিবর্তে বিলাতি গাজরের চাষ করিলে হয়। কিন্তু ভয় হয় ফলন খুব বেশি না হইতে পারে, এবং ফলন না হইলে চাষীরা ইহার দিকে ঝুঁকিবে না। স্পেনদেশীয় পেঁয়াজ আকারে প্রকাণ্ড, তাহা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। ছোটগুলি চাকাচাকা করিয়া কাটিয়া ভাজা হয়। মাশ্‌রুম বা ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) ইহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। বাহিরে যেখানে জন্মে সেখান হইতে অথবা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রচুর সার দিয়া খুব যত্নের সঙ্গে উৎপন্ন করা হয়। কয়েক জাতীয় ছত্রাক বিষাক্ত, কিন্তু এইগুলিকে পৃথক করিয়া চেনা কঠিন। ইংরেজরা 'ট্রাফল' জাতীয় ছত্রাকও খায়। একজাতীয় ট্রাফল কালো রঙের (Tuber cibarium) মাটির এক ফুট নিচে জন্মে, বাহিরে তাহার কোনও চিহ্ন থাকে না, অতএব কোথায় খুঁড়িলে ইহা পাওয়া যাইবে তাহা বুঝা যায় না। শোনা গেল ইহার সন্ধানের জন্য কুকুরকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। জেরুসালেম-আর্টিচোক এবং পার্স্নিপ (মূলা জাতীয়) কিছু কিছু চলে। স্পিনিজ পাতা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। টমাটো ইহারা প্রচুর খায়, ইহাদের মতে ইহা যকৃতের পক্ষে উপকারী। গ্রীন স্যালাড ইহাদের বড়ই প্রিয় খাদ্য। কাঁচা পাতা (সাধারণত লেটুস), খণ্ড খণ্ড সিদ্ধ ডিম, বীট-শিকড়, লবণ, ভিনিগার, তেল ও অন্যান্য মশলা সহযোগে খায়। সিদ্ধ গলদা চিংড়ি কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ইহার সঙ্গে মিশাইয়া দিলে তখন ইহার নাম হয় লবস্টার স্যালাড। ওয়াটার-ক্রেস্ একজাতীয় জলজ উদ্ভিদ, সেটিও কাঁচা খাওয়া হয়। আরও একটি নরম রসালো ডাঁটা জাতীয় এক রকম খাদ্য সিদ্ধ অবস্থায় খাইতে দেখিয়াছি। ইহার উপরের দিকটি শুধু দাঁতে কাটিয়া লয়, নিচের দিকটি শক্ত। নাম ভুলিয়া গিয়াছি। হয় তো অ্যাসপারাগাস্। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কোনও কোনও অংশে আমি রুবার্বের চাষ দেখিয়াছি। ইহার পাতা খাদ্যে সুগন্ধ যোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। এইগুলিই ইংল্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য।

নিরামিষ খাদ্যের প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের দুধের কথাও বলা উচিত। ইংল্যাণ্ডে এবং হল্যাণ্ডের কয়েকটি ডেয়ারি পরিদর্শন করিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে ইউরোপীয়ানদের যদি কিছুমাত্র রুচিজ্ঞান থাকে তবে তাহারা অবশ্যই ভারতীয় দুধকে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু বলিয়া মনে করিবে। গোরুর প্রতি হিন্দুরা যে ব্যবহার করে, তাহার মত এতখানি লজ্জাজনক অধঃপতন সম্ভবতঃ তাহার অন্য কোনও বিষয়ে হয় নাই।

অনাহারক্লিষ্ট, কঙ্কালসার পশুগুলি এমনই দুর্বল যে ল্যাজ দিয়া মাছি তাড়াইবার ক্ষমতাও কমই অবশিষ্ট আছে, এ দৃশ্য নবাগত ইউরোপীয়ের চোখে সুখের নহে, এবং গোজাতি যে হিন্দুর বিশ্বাসমতে অতি পবিত্র এ-কথাও তাহারা বুঝিবে না। তাহার কাছে এটি বড়ই লজ্জাকর বোধ হইবে যে, যে মানুষেরা বিসমার্কের রাজনীতির ত্রুটি বাহির করে, হারবার্ট স্পেন্সারের সমালোচনা করে, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ভ্রম সংশোধন করে, এবং হাক্সলি, টিন্‌ডাল এবং ফ্যারাডের গবেষণা বিষয়ে বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে, তাহারা স্থির মস্তিষ্কে, এবং অতি উৎসাহের সঙ্গে এই সব দুর্দশাগ্রস্ত পশুদের যন্ত্রণা যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহার জন্য আন্দোলন করিতে পারে। সে স্বভাবতই প্রশ্ন করিবে "এই জীবন হইতে তাহাদের মুক্তি দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে আরামদায়ক নহে?" তাহার বন্ধু বলিবে "চুপ! তুমি পাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছ।" ভারতের বহু দুর্দশা আছে। ভারতের বহু সন্তান বহুবিধ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, এবং সমস্ত দেশে হিন্দুরা জাতি হিসাবে গোরুর উপর যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা সেই সব দুষ্কার্যের অন্যতম। যে পশু আমাদের এত উপকার করে, তাহার প্রতি এই অমানুষিক বর্বরোচিত ব্যবহার কোনো দয়ামায়াবোধসম্পন্ন সরকারের অধীনে চলিতে দেওয়া উচিত নহে। আমার মতে অবিলম্বে খুব কঠোর আইনের সাহায্যে হিন্দুদিগকে এই দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্ত করা উচিত। ইউরোপের বহু গোশালা আমি দেখিয়াছি। সেগুলি বেশ প্রশস্ত এবং তাহাতে হাওয়া খেলিবার সুবন্দোবস্ত আছে, বারান্দা আছে, এবং সে সব এমন পরিচ্ছন্ন যে তাহা মনুষ্যাবাস হইতে পৃথক নহে। মেঝে ইট দিয়া ঢাকা, তাহার উপর প্রচুর শুষ্ক ঘাস ও খড় ছড়ানো আছে। ইহার উপর গোরুগুলি ইচ্ছামত দাঁড়াইয়া অথবা শুইয়া থাকিতে পারে। এই খড়ের বিছানা প্রতিদিন বদল করা হয়, এবং মেঝের যাবতীয় জিনিস দূরে অবস্থিত ধাপায় নিক্ষিপ্ত হয়। জঞ্জাল সরাইবার পরে প্রতিদিন মেঝে ঝাঁটার সাহায্যে পরিষ্কার করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে জলে ধোয়া হয়। গোরুদের পশ্চাৎ দিকে দেয়াল বরাবর প্রণালী কাটা আছে, ধোয়া জল সেই পথে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। সেই প্রণালীটিও দিনে দুইবার ধোয়া হয়। দুগ্ধবতীদের আহার্যের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ অ্যালবুমেন ও ফসফেট দেওয়া হয়, ইহাতে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভারতবর্ষের দুগ্ধ বিক্রেতারা সাধারণতঃ যেভাবে গোরুর মাংস, চর্বি এবং রক্তকে দুধে পরিণত করে, ইহারা তাহা করে না। আমি দেখিয়াছি ইংল্যাণ্ডে একরের পর একর জমিতে নানা জাতীয় শালগম উৎপাদন করে শুধু গোরুর খাদ্য-রূপে ব্যবহারের জন্য। খাশ বাংলাদেশে এই উদ্দেশ্যে এক একর জমিও ছাড়া হয় বলিয়া আমার জানা নাই। উত্তর ভারতে Sorghum Vulgare বা জোয়ারের কিছু চাষ হয় এই উদ্দেশ্যে। ইউরোপে পানের জন্য গোরুকে বিশুদ্ধ জল দিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। ছোটদের টাইফয়েড ফিভার অনেক সময় অপরিষ্কার জল খাওয়া গোরুর দুগ্ধ হইতে হইয়া থাকে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে গোরুর দুগ্ধের সঙ্গে সব রকম নোংরা জলই মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এরূপ দুধ খাইয়া কত শিশুর মৃত্যু ঘটে তাহার হিসাব কেহ রাখে না। তাহার পর ইউরোপের ডেয়ারির কথা। এইখানে, যেখানে দুধের ভাণ্ডার থাকে এবং ক্রীম প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিবার মত। এই স্থানের ঘর যথেষ্ট উচ্চ, আলো হাওয়া প্রচুর, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থানটি পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, ইহার মধ্যে কোথাও ফাঁকি নাই। নিকটে কোনও দুর্গন্ধ বিস্তারকারী পয়ঃপ্রণালী, অথবা শূকরদের থাকিবার স্থান থাকিলে চলিবে না। এমন অযোগ্য স্থান হইতে দূরে ডেয়ারী নির্মাণ করা হইয়া থাকে। টাটকা দুধ ব্যতিরেকে অন্য কোনও প্রকার খাদ্য—যথা মাংস, চীজ, কিংবা অন্য কোনও জান্তব খাদ্য এই ডেয়ারি-ঘরের ভিতরে খাওয়া চলবে না। এমন কি এক ফোঁটা দুধ মেঝেতে পড়িলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। তাক ও মেঝে প্রতিদিন অতি

যন্ত্রের সঙ্গে ঘষিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করা হয়। ডেয়ারির কাজের জন্য যে সব মেয়ে নিযুক্ত আছে, তাহাদেরও সব সময় সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতে হয়। ডেয়ারির ভিতরের হাওয়া যাহাতে কোনও মতেই দূষিত হইতে না পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হয়। ডেয়ারির কাজে নিযুক্ত মেয়েরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও সেখানে কাটাইতে পারে না। ধনীরাও ডেয়ারি রাখিয়া থাকেন। ইঁহাদের ডেয়ারিতে পরিচালনা বন্দোবস্ত আরও ব্যাপক। প্রয়োজনের জন্য প্রচুর ব্যয় করিবার পরেও ডেয়ারিটি যাহাতে দেখিতে খুব মনোহর হয় তাহার জন্যও যত ইচ্ছা টাকা খরচ করা হয়। জানিতে পারিলাম একটি গোরুর দাম ৭৫০০০ টাকা (৫০০০ পাউণ্ড), এবং এই দাম খুব বেশি মনে করা হয় না। এত দাম দুধ বেশী দিবার জন্য নহে, ইউরোপীয় আদর্শে যে গোরু দেখিতে সুন্দর তাহার জন্য এই দাম। একটি দণ্ডের মত পিঠটি সরল, মাথাটি ধীরে ধীরে সরু হইয়াছে, বড় বড় দু'টি চোখ উজ্জ্বল দেখাইতেছে, ঘাড় হ্রস্ব, বাঁটগুলি উত্তম আকারের, এবং দেহটি মসৃণ রেশমের মত লোমে ঢাকা —দুগ্ধবতী গাভীর অন্যান্য গুণের মধ্যে এগুলি অন্যতম। আয়ারশিয়র ও অলডারান (চ্যানেল দ্বীপ) গোরু, ব্রিটেনের কয়েকটি বিখ্যাত পালিত গোরুর জাত। যে সব যত্নের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা বিবেচনা করিলে ইংল্যাণ্ডের দুধ যে ভারতীয় দুধ হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গোয়ালা নিজেই গোরুর মালিক হইলে লণ্ডনেও ভাল দুধ পাওয়া যায়। এমন কি সাধারণ দুধের দোকানের দুধ আমি খাইয়া দেখিয়াছি (এক গ্লাস, দাম এক পেনি) সে দুধ খুব সুস্বাদু, অন্ততপক্ষে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট দুধের অপেক্ষা ভাল। লণ্ডনের কয়েকটি ডেয়ারিও আমি দেখিয়াছি। লণ্ডনে সাধারণতঃ গো-হত্যা করা হয় না, কিন্তু আমি এই সব শহরের ডেয়ারিতে নিজে যাহা দেখিয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, যখন দুধ দিবার ক্ষমতা থাকে না তখনই সেই গরুকে কসাইয়ের কাছে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। কলিকাতার হিন্দু গোয়ালারাও ইহাই করিয়া থাকে। আইন অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডে দুগ্ধবতী গাভী মাংসের জন্য হত্যা করা নিষেধ, তবু যতটা খাদ্য দরকার তাহা শুকনা গোরুরা পাইতে পারে না। কাজেই বাছুর অবস্থায় যতটা খাদ্য পাওয়া যায় তাহা যোগান দিয়া তাহাদিগকে বড় হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। যাহারা বাকি থাকে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া 'ভীল' (বাছুরের মাংস) রূপে ব্যবহার করা হয়। আমি ইংল্যাণ্ডে একটি অতি নিষ্ঠুর প্রথা দেখিয়াছি। অসহায় বাছুরগুলিকে তাহারা রক্ত মোক্ষণের দ্বারা বধ করে, ইহাতে তাহার মাংস শাদা রঙের হয়।

দেখা যাইতেছে কোনও কোনও হিন্দু ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া, ইচ্ছা করিলে জাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে। চাল ময়দা পাওয়া যায়, জার্মানি ও ঈজিপ্ট হইতে ডাল আমদানি হয় (মশুর জাতীয়)। সবজী অপর্যাপ্ত, ফলমূলও তাই, ভাল দুধ মাখন এবং চিনি যত ইচ্ছা পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ

হঠাৎ অরণ্য মাঝে মাঝে

সন্তোষকুমার অধিকারী

মাঝে মাঝে নরমাংসভোজী—
জন্তুগুলি শহরে নগরে নেমে আসে।
হঠাৎ হাসিতে জাগে হায়েনার নিষ্ঠুর হিংস্রতা ;
প্রসারিত হাতে তীক্ষ্ণ নখ, দাঁতে দাঁতে
রক্ত লোভ প্যান্থারের
মাঝে মাঝে বীভৎস ক্ষুধায় তারা অরণ্য নির্দয়।

অথচ মানুষ চায় আরণ্যক হিংস্রতার থেকে—
দূরে এক সজল মাটির নীল নীড়।
সে মাটিতে মার কোলে শিশুর কাকলি ভাসে,
বন্ধুর সহাস্য মুখ, মমতায় নিবিড় রমণী ;
জান্তব প্রবৃত্তিগুলি হৃদয়ের বোধের আবেগে
মানবিক হ'য়ে থাকে।
জীবন প্রেরণা
আনে ভালবাসা, প্রেম, বুক ভ'রে শান্তির প্রত্যাশা।

তবুও জান্তব মন মাথা নাড়ে, মাঝে মাঝে সমাজ-হৃদয়
হঠাৎ প্যান্থার হ'য়ে ওঠে।
হিংস্র পাশবিক এক প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর প্রেরণা
অস্থি মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে রক্তের আস্বাদ মেখে বুঁদ হ'তে চায়
কঠিন রিরংসা তীক্ষ্ণ বাঘনখ হ'য়ে বেঁধে সময়ের বুকে।

তখন অরণ্য ফিরে আসে।
তখন চেতনাশূন্য ক্যানিব্যাল ছাড়া পায় শহরের পথে,
আদিম মৃত্যুর স্তূপে পুঞ্জিভূত হয় শুধু ঘৃণার আঁধার॥

ইন্দ্রপ্রস্থ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

সচল যুগের সজাগ সাক্ষী অমর নগর ইন্দ্রপ্রস্থ,
তোমার মহিমা-সূর্য কখনো কাল-পারাবারে যায়নি অস্ত।
তোমারে ঘিরিয়া ধরিয়াছে রূপ দ্বৈপায়নের ধ্যানের দৃষ্টি,—
যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন-মাখানো 'ময়'-দানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।
সমর-সাগর-প্লাবন-পীড়নে তাড়িত হ'য়েছে এ কুরু-ক্ষেত্র;
হিংসা-পাপের—লোভের মূরতি হেরিলে নগর, উদাস-নেত্র।
তোমার উদার আকাশ-পাথার সতত দীপ্ত সূর্যে-চন্দ্রে;
সত্র-সরণী ধর্ম-ক্ষেত্র, ধ্বনিত নিয়ত মানব-মন্ত্রে।
ধ্বংস করিয়া হাজার রাজার—দুর্যোধনের দারুণ দম্ভ,
বাঁচায়ে রেখেছ মহা-মানবতা—স্বর্গ-স্বপন—অশোক-স্তম্ভ।
কত মোহ-ভার—কত অবিচার, ভীতি-ব্যভিচার—কত না ভ্রান্তি
তোমার মাটিতে গিয়াছে মিশিয়া, তোমার ধূলায় লভিছে শান্তি।
কত রণ-নীতি—কূট রাজ-নীতি কালের চক্রে করিয়া পিষ্ট
চেয়েছ নগর, যাহা দুর্মর,—নিখিল নরের অমেয় ইষ্ট।
লক্ষ চিতার বহ্নি জ্বলিছে, নিভিছে আবার ত্যাগের পুণ্যে;
অসীম নীলিমা বিরাজে কেবল তোমার বিপুল বিরাট শূন্যে।

'দেবগিরি' আর 'সিক্রী' শোভার বিজলী-আভার লভিয়া দীপ্তি,
হে মহাকেন্দ্র, তোমার বক্ষে পেয়েছে পরম চরম তৃপ্তি।
কর্ম-বিজয়ী, ধর্ম-বিজয়ী, হে কাল-বিজয়ী মহান্ সৃষ্টি,
তোমার মাঝারে বাঁচায়ে রেখেছ শতেক যুগের প্রাণের কৃষ্টি।
মহাভারতের মিলন-বাসর—হে মহানগর, পুণ্যবন্ত,
বসুন্ধরার প্রাণের কেন্দ্র, সূর্য-সমান দীপ্তিমন্ত।
চিরযুগ ধরি' এ ধরণী ভরি' বিনিময় করি' প্রাণের পণ্য
ধর্ম-ক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থ, মানব-জাতিরে করিছ ধন্য।

এসেছে দ্রাবিড়, এসেছে যবন, পারসিক, শক, পাঠান-সৈন্য,
মগ ও মোগল, বৃটিশ এসেছে; কাহারও দম্ভ করোনি গণ্য।
ধূলায় তোমার করি' একাকার বিজয়ী-বিজিত-অস্থি-চর্ম,
যুগ যুগ ধরি' হে মহাপ্রহরি, বাঁচায়ে চ'লেছ মানব-ধর্ম।
হিংসা-পাপেরে দিতেছ কবর; কবরে কবরে ডাকিছে ঝিল্লী;
মহাপ্রাণ তারে দিতেছ জীবন,—ধন্য হে দিলদরিয়া দিল্লী!

বুঝেছি ধরায় সবই ডুবে যায় কাল-পারাবার ঘূর্ণাবর্তে ;
ধন্য—ধন্য ইন্দ্রপ্রস্থ, অমৃত-বারতা দিতেছ মর্ত্যে।

ভবিষ্যতের বিশাল ভারতে—বিপুল জগতে তোমার তত্ত্ব
জানি প্রাণে-মনে পাবে রূপায়ণ—প্রচারিত হবে পরম সত্
দানি' বরাভয় জানি দিবে আনি' বিশ্ববাসীরে চতুর্বর্গ ;
ধূলার ধরায় চির-সুন্দর মঙ্গলে-ভরা গড়িবে স্বর্গ।
মাটির মানুষ তোমারই প্রসাদে লভিবে ললিত ধ্যানের দৃষ্টি
যুধিষ্ঠিরের স্বপ্নে সেদিন ভরিবে দিল্লী, বিশ্ব-সৃষ্টি।
সাম্য-মৈত্রী-অমৃত-সাধনা ইন্দ্রপ্রস্থ, বহিছ নিত্য :—
কালের প্রবাহে সাধনা-সিদ্ধি লভিবেই জানি মানব-চিত্ত

শ্যামল অরণ্য তুমি

শংকর চক্রবর্তী

অরণ্য শ্যামল হোলো তুমি দিলে প্রসন্ন নীলিমা
নক্ষত্রেরা নদী জলে দেখে নিল নিজেদের মুখ
সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ক্লান্ত যত প্রবাল ঝিনুক—
তোমার আলোর তীরে খুঁজে পেল হৃদয়ের সীমা।

আবার কখনো তুমি প্রশান্ত ঝড়ের মাধুরিমা
দুঃসহ ব্যথায় দীর্ণ ভূকম্পনে সত্তার স্বরূপ
বাঁধ ভাঙা বন্যা তুমি গ্রাম ভাঙো ললাট চিবুক—
ঢেকেছে উড়ন্ত কেশে বাম মুখে মৃত্যুর মহিমা।

বিশীর্ণ নদীর বুকে বালুচর অনুর্বর ক্ষেত
বারুদের গন্ধে জলে উদাসী বৈরাগী মেঠো হাওয়া
দুই চোখে মুছে যাওয়া আরক্তিম অশ্রুর কাজল
হৃদয় গভীরে কোনো হতাশায় নিগূঢ় সংকেত।
দু'পাশে কালের ঢেউ অবিরাম শুধু পথ-চাওয়া—
সময়ের সরোবরে স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যের জল॥

(৬৭২ পৃষ্ঠার পর)

ডাক্তারবাবুকে সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীতেই পাওয়া গেল। তিনি সব শুনে ব্যবস্থা দিলেন রুণুর জন্তে, রাতে ঘুমিয়ে পড়ে তার জন্তে ওষুধও দিলেন। গৃহিণীরও শরীর ভাল নেই শুনে বললেন, ' আজ আমার যাবার কথা ছিল না, তা সবাই যখন অসুস্থ, আজই গিয়ে দেখে আসব।"

আধঘণ্টার কিছু বেশী রুণুর পরিচর্য্যা করে প্রতিমা তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলল। মানদা তখন ঘর অন্ধকার করে দিয়ে প্রতিমাকে বলল, "আপনি এবার যান দিদিমণি, দাদাবাবুর যদি কিছু কাজ থাকে। এ এখন অনেকক্ষণ ঘুমোবে। চা খাবার সময় হয়ত উঠবে। আমি এখানেই শুয়ে থাকব এখন।"

প্রতিমা ফিরে গেল আশিসের ঘরে। সে তখনও বই নাড়ছে চাড়ছে। জিজ্ঞাসা করল, "রুনু খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছে ?"

প্রতিমা বলল, "হ্যাঁ, ডাক্তারবাবুর কথামত তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। আপনি এখন কি করবেন? বই শুনবেন আর ?"

আশিস্ বলল, "থাক গিয়ে। Moodটা চলে গেছে। সত্যি আপনি না এসে পড়লে আজ বড় মুশকিল হত। তিনটে মানুষ থাকি এ বাড়ীতে, সব ক'জনই অসুস্থ। ঝি-চাকরে ত অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারে না ?"

প্রতিমা বলল, "যাক, এখনকার মত ত সামলে গেছে। মাও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তারবাবু এসে গেলে সকলের জন্তে ঢালাও ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে হবে।"

"তা ত রাখবেন, তবে ব্যবস্থাগুলো কাজে খাটানর লোক চাই ত? আপনাকে দিয়ে একটা দলিল সই করিয়ে রাখতে হবে দেখছি, যে বরাবর থাকবেন এখানে।"

প্রতিমা হেসে বলল, "একদিনের ত পরিচয়, এর মধ্যেই কি আর মানুষ চেনা যায় ? ভাল করে চিনলে তবে ত বরাবরের কথা উঠবে ?"

আশিস্ বলল, "আমাদেরও যে nuisance value কতখানি তাও ত আপনাকে ভাল করে জানতে হবে। অতঃপর টিঁকে থাকতে পারবেন কি না, সেইটাই হবে চিন্তার বিষয়।"

প্রতিমা বলল, "আমি এসেছি নার্সের কাজ করতে, আমার ত ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখবার কথা নয়? আমি সেবা করব যথাসাধ্য, এই আমার কাজ। আমি ত আর পিক্‌নিক্ করতে আসিনি যে অপরা আমার আনন্দ বর্দ্ধন করছেন কি না সেটা বিবেচনা করতে বসব ?"

এমন সময় মানদা এসে বলল, "মায়ের ঘুম ভেঙেছে, আপনাকে একবার ডাকছেন।"

প্রতিমা উঠে গেল। গৃহিণী তখন তিনতলার ঘর থেকে আবার দোতলায় নিজের ঘরে চলে এসেছেন। মানদা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার চুলটা এবার বেঁধে দেব ? রুনু জেগে গেলে আর হয়ত সময় পাব না।"

গৃহিণী বললেন, "তাই দাও। ও কেমন আছে এখন ?"

মানদা বলল, "এখনও ত ঘুমিয়ে রয়েছে। কারো ত কথা শোনে না, অত হল্লা করলে কি আর রোগা মানুষের শরীর ভাল থাকে ?"

গৃহিণী বললেন, "আজ তুমি এসে না পড়লে বড় বিপদ্ হত। সবাই এক সঙ্গে শুয়ে পড়লাম।"

প্রতিমা বলল, "আপনার পুরানো লোকরা রয়েছে, চলে যেত এক রকম করে। আপনি নিজে কেমন আছেন ?"

গৃহিণী বললেন, "মাথাটা ছেড়েছে, তবে বড় অবসন্ন লাগছে। যা দুশ্চিন্তার বোঝা আমার ঘাড়ে, ভাবতে গেলেই যেন আমার জ্ঞান হারিয়ে যায়। কাদের হাতে এ বিষম ভার আমি দিয়ে যাব ?"

প্রতিমা বলল, "ছেলেমেয়েরা সেরে ত উঠছে, আস্তে আস্তে।"

"বড় আস্তে, দু-বছরে কতটাই বা সেরেছে ? একজনও যদি আবার মানুষের মত হয়ে উঠত তাহলে তার উপর ভরসা করতাম।"

এমন সময় রুণুর ঘর থেকে ডাক শোনা গেল। প্রতিমা বলল, "আমি ওঁর চুলটা বেঁধে দিচ্ছি। তুমি দেখ ও কি চায়।"

মানদা চিরুণী রেখে চলে গেল। প্রতিমা গৃহিণীর চুল বাঁধা শেষ করল। মানদা ফিরে এসে বলল, "কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে বোধহয়, মেজাজ খুব খারাপ, এখন সারাদিন জ্বালাবে। দিদিমণিকে ডাকছে।"

প্রতিমা উঠেই বলল, "দেখেই আসি কি বলে।"

রুণু শুয়েই ছিল, প্রতিমাকে দেখে বলল, "আচ্ছা, আমার মত অসুখ আর আপনি দেখেছেন?"

প্রতিমা বলল, "দেখেওছি, শুনেওছি, বইয়েও ঢের পড়েছি।"

"আচ্ছা, তারা কখনও সারে?"

"তা অল্প বিস্তর সারে বই কি? কিছু খুঁৎ হয়ত থেকে যায়, তা সেরকম ত অন্য অনেক রোগেও হয়। এই দেখুন না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাঁর ত এইরকম অসুখ ছিল। তৎসত্ত্বেও ত কত বৎসর তিনি প্রেসিডেন্টের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন।"

"ওরকম কালে-ভদ্রে এক-আধটা হয় বোধহয়। সাধারণতঃ এই রোগ হলে ত সব দিক্ দিয়ে খতম্। মরে যাওয়ার চেয়েও খারাপ। চারিদিকে সব আগের মত আছে, খালি আমি কিছুর মধ্যে নেই। এক টুকরো কাঠের মত পড়ে আছি। অসুখের আগে আমার কত বন্ধু ছিল, এমন কি একজন boy friendও ছিল। যখন যা খুশি করেছি, যেখানে খুশি গিয়েছি। মায়ের কথা শুনি নি, দাদার কথা ত তুড়ি দিয়ে উড়িয়েছি। আর এখন?"

তার দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। প্রতিমা দেখল বিপদ্, এ ত ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। আবার না অসুখ করে।

এমন সময় খট্‌খট্ জুতোর শব্দ করে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। পিছনে মানদা। প্রতিমাকে দেখিয়ে বলল, "ইনি নার্স দিদিমণি, আজ সকালে এসেছেন।"

ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও, আপনিই তখন ফোন করেছিলেন? তা রুণু আবার কান্না জুড়েছে কেন? মাথা ছাড়েনি এখনও? ওষুধ যা দিতে বলেছিলাম, দিয়েছিলেন? ঘুম হয়নি নাকি একটুও?",

রুণু বলল, "ওষুধ খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, আবার এখন জেগেছি। আমি কি চিরকাল এমনি হাত-পা খোঁড়া হয়ে পড়ে থাকব না কি?"

ডাক্তার বললেন, "চিরকাল থাকবে না, তবে কিছুকাল আরো থাকতে হতে পারে। সব রোগ ত দুদিনে সারে না? চা-টা খেয়ে বই-টই পড়, রাগ করে কান্নাকাটি করে কি হবে? ওতে নিজেরই কষ্ট বাড়ে, যদি ঘুম না হয় ওষুটা আরো একবার খেতে পার। আচ্ছা, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। নার্স, আপনি চলুন আমার সঙ্গে।"

গৃহিণীর ঘরে বসে ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে রোগীদের বিষয় আলোচনা করলেন। বললেন, "একজন উপযুক্ত লোক যখন পেয়েছেন, তখন ছেলেমেয়ের কাজ সম্পূর্ণ ওঁর উপর ছেড়ে দিন। উনি আপনার চেয়ে ভাল পারবেন, আপনিও বিশ্রাম পাবেন। আপনি বড় ষ্ট্রেন্ করছেন। এর ফলে যদি রোগী আর একজন বেড়ে যায়, তাহলে কি সেটা কারো পক্ষে ভাল হবে?"

গৃহিণী বললেন, "তা ত হবেই না। একটাও অন্ততঃ যদি ভাল হত ত তার বিয়ে-টিয়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতাম।"

"কাজ চলা গোছের সেরে যাবে বলে ত মনে হয়, তবে সময় খানিকটা লাগবে ত? মেয়ে সেরে যেতে পারত আগে, ওর attack টা তত শক্ত হয়নি, তবে ও ত কথা শুনবে না কারো, যা খুশি তাই করবে। আপনার ছেলের শুশ্রূষাটা এবার আশা করি নিখুঁতভাবে হবে, ভাল লোক যখন পেয়েছেন। আমি সব লিখে দিয়েছিলাম, কাগজখানা ওঁকে দেবেন। কিছু বুঝতে

না পারলে আমাকে জানাবেন। আশিস্‌কেও দেখে যাই, আমার আজ অনেক জায়গায় যেতে হবে। মোট কথা, আপনি কোনো কারণেই আজ ছুটোছুটি করবেন না, বেশী অসুখ করতে পারে।”

আশিস্ মোটামুটি ভালই ছিল। তার সঙ্গে দুচারটে কথা বলে ডাক্তারবাবু বিদায় নিয়ে গেলেন। এরপরই এল চা খাওয়ার সময়। প্রতিমাকে অনেকক্ষণ রুণুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হল। সে খেল অল্পই, তবে বাজে বকল বিস্তর। তার ভিতর boy friend এবং বন্ধুদের কথাই বেশী। একবার জিজ্ঞাসা করল, “আপনার এ সব শুনতে ভাল লাগে না, না? আপনি old school-এর ভাল মেয়ে। মানদার মত এ সব পাপ মনে হয়?”

প্রতিমা বলল, “পাপ মনে হয় না, তবে ওদিক্ থেকে মনটা ফিরিয়ে নিয়ে এখন অন্যদিকে দিলে বুদ্ধিমতীর কাজ হয়।”

“অন্য কোন্ দিকে দেব শুনি? সাধন-ভজন করব? ওসব আমার ভয়ানক হাস্যকর লাগে, কেনোদিনও ওদিকে আমার মন যাবে না।”

প্রতিমা বলল, “সাধন-ভজন নাই করলেন, পড়া-শুনো, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, শেলাই করা, এ সব ত করতে পাবেন? অসুখে পড়ার আগে সবই ত করতেন?”

“তা করতাম। একলা একলা ওসব করতে ভাল লাগে না। আমাকে গীটার শেখাত একটা ফিরিঙ্গী বুড়ো, দেখব তাকে আর পাওয়া যায় কি না। আপনি গান-বাজনা করেন?”

“গান ত করতাম। বাজনা তত শিখিনি। এস্‌রাজ আর হার্মোনিয়াম কাজ-চলা গোছের বাজাতে পারি।”

প্রতিমার আবার ডাক এল অন্য ঘর থেকে। আশিস্ এখন চা খেতে চায় না, কফি খেতে চায়। মানদা বা সাধন কেউই কফি ভাল করে করতে জানে না, তাই প্রতিমার ডাক পড়েছে।

প্রতিমা কফি করে এক পেয়ালা আশিসের দিকে এগিয়ে দিল, জিজ্ঞাসা করল, “আপনি চায়ের চেয়ে কফি বেশী ভালবাসেন?”

আশিস্ বলল, “তা বাসি বটে, মা পারতপক্ষে খেতে দেন না। ওঁর ধারণা ওতে ঘুম কম হয় এবং ঘুম কম হলে যে-কোনো অসুখ বেড়ে যায়।”

প্রতিমা বলল, “শেষের কথাটা ঠিক, তবে কফি খেলেই ঘুম কম হয় কি না জানি না। আমি ত কলেজে পড়ার সময় প্রায়ই বারেবারে কফি খেতাম, তাতে ঘুম কমত কি বাড়ত, তা লক্ষ্য করিনি।”

আশিস্ বলল, “তবে বাকি কফিটা আপনি নিয়ে খেয়ে নিন্, ফেলা যাবে কেন? সাধনদা, ট্রে সুদ্ধ দিদিমণির ঘরে রেখে এস ত।”

সাধন ট্রে নিয়ে চলল। প্রতিমাও উঠে গেল নিজের ঘরে।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই প্রতিমা বুঝতে পারল বাড়ীর লোকজন উঠে পড়েছে। সেও মুখ হাত ধুয়ে ঘর ছেড়ে বেরোল। আর সব ঘরেরই দরজা খোলা, শুধু রুণুর ঘরের দরজা ভেজান, ঘর অন্ধকার। মানদা বাইরে ঘুরছে, তাকে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, “এখনও ওঠেনি বুঝি রুণু?”

মানদা বলল, “এখন উঠবে? সেই যায় নাম আটটা। কাল রাত বারোটার আগে ঘরের আলো নেভাতে দেয়নি। আমার হয়েছে মরণ, এ মেয়ের ঘরে থেকে। আমাদের শরীরও যে রক্ত-মাংসের তা ত মনে করে না?”

সাধন এসে বলল, “দাদাবাবু ডাকছেন দিদিমণি।”

প্রতিমা বলল, “চা হয়েছে নাকি?”

“এই মিনিট দশ বারো বাকি আছে,” বলে সাধন চলে গেল।

প্রতিমা আশিসের ঘরে ঢুকে বলল, “রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল ত?”

আশিস্ বলল, “খুব ভাল যে হয়েছে তা বলতে

পারি না। আমার অতি একঘেয়ে জীবনে কালকের দিনটা ঘটনাবহুল ছিল ত? ভাল কথা, আজ গান শোনাবার কথা আপনি নিশ্চয় ভুলে যান নি?"

প্রতিমা বলল, "বাবাঃ, এমন কি দরকারী কথা যে অত করে মনে রেখেছেন? বেশ ত, এখন করব, না চা খাওয়ার পরে করব?"

"চায়ের ত আজ একটু দেরি আছে শুনলাম। এখনই করুন না? বই চাই? ঐ আলমারীতে অনেক গানের বই আছে, রবীন্দ্রনাথের, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তের। Classical গানটান আসে নাকি?"

প্রতিমা বই বার করতে করতে বলল, "ওসব কোনোদিন শিখিনি। বাবা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসতেন, তাই শিখেছিলাম। কি গাইব বলুন। আপনার বিশেষ কোনো গান শুনতে ইচ্ছা আছে?"

"এখনি ত মনে পড়ছে না, পরে মনে হলে ফরমাশ করব। এখন আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন, রত্নাকরে সবই ত রত্ন, ভালমন্দ বাছবার প্রয়োজন হয় না।"

প্রথমে গুণগুণ করে, পরে গলা ছেড়ে প্রতিমা গান ধরল—"তোমারি মধুররূপে ভরেছ ভুবন,

মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন।"

গান শেষ হতে আশিস্ বলল, "আপনি ত রীতিমত ভাল গান করেন, তবে অত বিনয় কেন করছিলেন? পৃথিবীটা সত্যিই সুন্দর জায়গা, যদি অবশ্য কবি যে দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়।"

প্রতিমা বলল, "সাধারণ লোকও যদি একটু intelligently জগৎটাকে দেখে তা হলে অসংখ্য ভাল জিনিষ দেখতে পায়।"

"সত্যিই পায়, তবে কতজন বা সেভাবে দেখে? আমরা নিজেদের কামনা বাসনার রংএর ভিতর দিয়ে দেখি ত? তাই রুণুর মত অনেকের কাছে জগৎটা horrible আর disgusting এবং আমার কাছে দারুণ boring ত বটেই, আর কিছু না হোক্।"

প্রতিমা বলল, "ডাক্তারবাবু বলছিলেন, রুণু যদি কথা শোনেন এবং মন প্রফুল্ল রাখেন ত তাঁর সারবার বেশ chance আছে।"

"সেইটাই ত করবেন না তিনি। বিশ্বসংসারের উপর তার রাগ, তারাই যেন ওর অসুখ করে দিয়েছে। আর আমার কথা কি বললেন ডাক্তারবাবু?"

"বললেন, সব নির্দ্দেশ পালন করে চললে অনেকটাই সেরে উঠবেন। আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন উনি আর আপনার মা।"

আশিস্ বলল, "দেখুন তবে, আপনার কৃপায় যদি সেরে উঠতে পারি। তাহলে সত্যিই আমার পুনর্জ্জন্ম হবে। নাঃ, আর একটা গান শুনব ভাবছিলাম, কিন্তু চায়ের ঠেলাগাড়ী এসে পড়েছে। এখন কানের বদলে জিভের তৃপ্তিসাধনে মন দিতে হবে।"

ঘরে ঘরেই চা খাওয়ার ডাক পড়ল। প্রতিমা রোগী আর রোগিণীদের রুটিন খুঁটিয়ে দেখল, সারাদিন প্রায় তাকে একটা না একটা কাজ করতে হবে। দুপুরে খাওয়ার পর মাত্র ঘণ্টা দুই ছুটি আছে। কিন্তু কাজ করতে যখন এসেছে, তখন কাজ দেখে পিছোলে চলবে কেন?

সকাল থেকে একটার পর একটা কাজ করতে লাগল। গৃহিণীকেও দু একবার দেখে এল।

তিনি আজও তেমন ভাল নেই। রুণু খানিক কথা কাটাকাটি করল। দুপুরে যখন প্রতিমা একটু বিশ্রামের সময় পেল, তখন আশিসের ঘরে গিয়ে বলল, "আমি এলাম আপনার গান শুনতে। আমি ত কথা রেখেছি, এখন আপনাকেও রাখতে হবে।"

আশিস্ বলল, "তা রাখছি, না হলে আপনি ত বেঁকে বসবেন, আর গান শোনাবেন না। এই সাধনদা, আমার এস্রাজটা আন ত।"

সাধন এস্রাজ এনে দিল। তার ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ সময় গেল ঠিক করে বেঁধে নিতে। তারপর আশিস্ বলল, "আপনি যেমন রবীন্দ্র সঙ্গীতই গেয়েছেন, আমি তেমনি প্রধানতঃ classical গেয়েছি, তবে বাংলা গান বাদ দিইনি একেবারে ও মা

হলে ত মন ভরে না আমাদের ? Classical-এর ক্রিমৃত্যাস-টিকে বুদ্ধিটাকে অবশ্য তৃপ্ত করে বেশ।"

পরপর সে দুটো হিন্দি গাইল। চমৎকার দরাজ গলা বেশ শিক্ষিত। প্রতিমা বলল, "এত ভাল গান করেন, আর দিব্যি সব ছেড়ে বসে আছেন ? এ রীতিমত অন্যায়, ভগবানের দানের অপমান। শীগ্‌গির আপনার ওস্তাদদের ডেকে আনুন, এনে আবার সব আরম্ভ করুন।"

আশিস্ বলল, "আচ্ছা, আপনার কথা মেনে নিলাম। দেখি, আমার উদ্ধারের কোনো উপায় হয় কি না।"

অবসর সময়টুকু বড় চট করে কেটে গেল। এরপরেই ছিল রুণুর ঘরের কাজ। সেখানে যেতেই রুণু বলল, "বেশ ত আপনারা দুজনে জমিয়ে নিয়েছেন। গান শুনছেন, গান শোনাচ্ছেন। আমি বেচারী ভ্যাবা মুখ করে একলা ঘরে বসে আছি।"

প্রতিমা হেসে বলল, "আপনিও গান শোনান না, আমি ত শুনতে খুবই রাজী। যদি আমার গান শুনতে চান ত শোনাতেও পারি।"

রুণু বলল, "নাঃ, ওসব যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ কি আর হয় ? আমি বড় ঝগড়ুটে, আমার সঙ্গে আপনার বেশীক্ষণ ভাল লাগবে না। দাদা খুব ভদ্র ছেলে, ওকে like করা সহজ।"

প্রতিমা রুণুর কাজ সেরে চলে এল। মেয়েটা ঝগড়ুটে বটে তবে কথাগুলো ঠিকই বলেছে। বাড়ীর সকলের স্বাস্থ্যের উপর একটু যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। গৃহিণী আর রুণু যদিবা আজ খানিক ভাল রইলেন, ত রাত্রে খাওয়ার পর সাধন এসে খবর দিল, "দাদাবাবুর ঘুম হচ্ছে না, শরীর খারাপ করেছে একটু।"

গৃহিণী ব্যস্ত হয়ে বললেন, "দ্যাখ ত প্রতিমা। ও মাথা ধরলে বড় কষ্ট পায়। মাথাটা টিপে দিতে হয়, অনেকক্ষণ ধরে। আমিই দিই, তা আজ ত আমি পারব না। ডাক্তারবাবু ত আমার হাত পা নাড়াও প্রায় বারণ করে গেছেন।"

প্রতিমা উঠে আশিসের ঘরে গেল। সে শুয়ে পড়ে মাথাটা বালিশে ঘষছে, মুখ দিয়ে এক-আধবার কাতরোক্তি বেরোচ্ছে।

প্রতিমা বলল, "বাতিটা নিভিয়ে দিই ? চোখে আলো না লাগাই ভাল।"

"তাই দিন, মাথাটায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"দেখি কি করতে পারি," বলে প্রতিমা খাটের উপর উঠে বসে আশিসের মাথা আস্তে আস্তে টিপে দিতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার কাতোরোক্তি থেমে গেল। কয়েক মিনিট পরে বলল, "আশ্চর্য আপনার হাত। যন্ত্রণাটা যেন সব টেনে বার করে নিচ্ছেন। সাধনদার কাস্তে ধরা হাতে গায়ের ছাল চামড়া ওঠে বটে, তবে ব্যথা যায় না। মা মাঝে মাঝে চেষ্টা করেন বটে, তবে তাঁর হতে এমন যাদু নেই।"

বুকের ভিতর একটা শিহরণ অনুভব করল প্রতিমা। কিন্তু তখনই কঠিনভাবে দমন করতে লাগল। সে সেবিকা, পীড়িতের সেবা করতে এসেছে। ভাববিহ্বল হওয়া তার চলে না।

একটু পরে অস্ফুট স্বরে আশিস্ বলল, "আমার ঘুম আসছে। যাবার সময় passageএর ঐ আলোটা জেলে দিয়ে যাবেন, নইলে বড় বেশী অন্ধকার হয়।"

প্রতিমা খাট থেকে নেমে পড়ে বলল, 'রাত্রে আবার দরকার হলে ডাকবেন।"

আশিস্ বলল, 'সারারাত জ্বালাব আপনাকে ?"

প্রতিমা বলল, "এ আবার জ্বালান কি ? সেবা করবার জন্যেই ত আমার আসা ?"

আশিস্ বলল, "তাই ডাকব। মা ত সব কিছু থেকে আস্তে আস্তে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এখন আপনাকে অবলম্বন করেই আমাকে বাঁচতে হবে।"

অন্ধকারে. আরক্ত মুখে প্রতিমা নিজের ঘরে গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। যে প্রতিমা এখানে এসেছিল, অল্পদিন আগে, এরই মধ্যে কি করে সে এমন বদলে গেল ? এ কি বাঁধনে নিজেকে সে বাঁধছে ?

সে রাত্রে আশিসের ঘরে আর তার ডাক পড়ল না। সকালে সে ভালই আছে দেখা গেল। বলল, "আপনার নিশ্চয় কাল ঘুম হয়নি, শুক্‌নো দেখাচ্ছে। বড় বেশী খাটুনি হচ্ছে কি?"

প্রতিমা বলল, "আমার এমন কিছু খাটুনি নয়। তবে আপনার মায়ের জন্য আর একজন লোক হলে ভাল হয়। রুণুকে attend করে মানদা ওঁকে দেখবার খুব বেশী সময় পায় না।" আর একজন লোকের যে দরকার তা দিন তিন-চারের মধ্যেই বোঝা গেল। মাঝ-রাত্রে গৃহিণী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রতিমা ছুটে এল, অবস্থা দেখে ডাক্তারকে ফোন করা হল। গৃহিণীর ভাইকেও আসতে বলা হল। রুণু তার ঘরে চীৎকার করে কাঁদছে শোনা গেল। প্রতিমা রোগীর শুশ্রূষা করতে করতে দেখল, সাধন আর একজন চাকর ধরাধরি করে আশিস্‌কে এ ঘরে নিয়ে আসছে।

মায়ের বিছানার পাশে বসে আশিস্ বলল, "মা, ভয় পেয়ো না, আমি ভাল হচ্ছি, আরো ভাল হব, সব ভার আমি নেব, তুমি শুধু সেরে ওঠ।"

গৃহিণী কেঁদে ফেলে বললেন, "তোমাকে কে দেখবে বাবা আমার? কার হাতে তোমাকে আমি দিয়ে যাব?"

আশিস্ একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর প্রতিমার দিকে চেয়ে বলল, "চিরজীবন আর্ত্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, তাই আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমার ভার নিন আপনি। মা দেখে নিশ্চিন্ত হোন।"

প্রতিমা তার দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর এসে আশিসের একটা হাত ধরে বলল, "আমি ভার নিলাম।"

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অপূর্ব দৃশ্য—

ওপারের বাঙ্গলার দিকে দেখুন। বাঙ্গলাদেশের লোকেরা সমবেতভাবে হিন্দু মুসলমান, নিজেদের পাক্-পাশ মুক্ত করিয়া নিজেদের জন সত্যকার এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন সর্বস্ব পণ করিয়া সংগ্রাম চালাইতেছে। আর এপারের বাঙ্গলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষ কি করিতেছে? জাতির এবং দেশের স্বার্থ জলে ভাসাইয়া দিয়া দলীয় এবং দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম চালাইয়া প্রত্যহ কত নিরীহ এবং অন্যান্য মানুষের হত্যা অনুষ্ঠানে প্রমত্ত রহিয়াছে। দেখিয়া অবাক হই যে সব কয়টি দলই বলে যে প্রত্যেকেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই আত্মঘাতী জন—সংহার ব্রত লইয়াছে। ওপারের বাঙ্গলার লোকেদের আদর্শ এবং যুদ্ধ ইহাদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে না।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দলপতিদের সহিত বৈঠক চালাইতেছেন—পশ্চিমবঙ্গে হত্যা স্রোত বন্ধ করিতে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেবল বৈঠকই হইল কাজে কিছুই না। বিশেষ করিয়া সি পি এম-এর বিরোধীতার কারণে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি—যাহাদের নিজেদের মধ্যে আদর্শগত (যদি থাকে) কোন মিল নাই, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার শুভ আদর্শের মিল কখনও হইতে পারে না।

সিদ্ধার্থশঙ্কর এবার আর সময় নষ্ট না করিয়া সিদ্ধার্থের ভূমিকা ত্যাগ করিয়া শঙ্করের ভূমিকা গ্রহণ করুন এবং দলীয় ভূতপ্রেতদের তাণ্ডব নৃত্য বন্ধ করিতে তাঁহার প্রশাসনিক মহা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করুন। ভাল কথার মানুষ যাহারা নয়, তাহাদের সায়েস্তা করিতে যাহা প্রয়োজন এবার সেই ঔষধ 'সর্ব্ব-অনাচার গজ-সিংহ' প্রয়োগ করুন। দেশ ও দশ তাহার জয়গান করিবে। তাঁহার সকল কল্যাণ প্রচেষ্টার পশ্চাতে থাকিবে। দেশবন্ধুর দৌহিত্রের নিকট আমরা এই আশা করি।

একই দেশের; একই জাতির দ্বিরূপ!

তথা বর্ণিত ভারতের পরম বন্ধু লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সুপরামর্শে তৎকালীন আমাদের ভাগ্য বিধাতা—জবাহরলাল, রাজাগোপালচারী, বিঠঠলভাই প্যাটেল—মাউন্টব্যাটেনের ভারত তথা বাঙ্গলা বিভাগ মানিয়া লয়েন—গদিতে বসিবার অতি আগ্রহের জন্য। একমাত্র মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদ করেন—কিন্তু তাহা হয় অরণ্যে রোদন। বাঙ্গলা দুইভাগ হইয়া গেল, কিছুকালের জন্য ওপারের বাঙ্গালী মুসলমান ভাইরাও নিজের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ভুলিয়া নিজেদের পশ্চিমী পাকিস্থানীদের সমগোত্র বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু বেকুব আয়ুব খাঁ যখন ওপারের বাঙ্গালীদের ঘাড়ে জোর করিয়া উর্দ্দু চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন

বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা বাঙ্গলার বদলে, সেই সময় হইতে সুরু হইল সংঘাত, যে সংঘাতে প্রায় ৫০।৬০ জন বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্র পাক্ পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিলেন। ফলে বেক্কুব আয়ুব বাঙ্গলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি এবং মর্য্যাদা দিতে বাধ্য হইল।

আজ এপারের বাঙ্গলার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তথাকথিত দলীয় নেতারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে গণতন্ত্রকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার কল্যাণ প্রচেষ্টায় ব্যস্ত অন্য দলের নেতা এবং সমর্থকদের বিলোপ সাধন করিয়া। ওপারে বাঙ্গলায় যখন 'কমন-ম্যান' সমবেতভাবে এক কমন-নেতার আদর্শ, আদেশ এবং নির্দ্দেশমত কাজ করিতেছে, এ-পারের বাঙ্গলার নেতারা নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রাখিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং বুদ্ধিহীন চেলাদের—অন্য দলের শত্রু বধ কর্ম্মে উস্কানী দিতেছে। ওপারের বাঙ্গলার ছোট বড় সকল নেতাই আজ মুজিবরকে সর্ব্বাধীনায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কাহারো দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নহে। আর এপারের বাঙ্গলার দশগণ্ডা নেতা ঠেঙ্গার জোরে সুপ্রীম কমাণ্ডার হইবার বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত এবং লোভে প্রমত্ত!

ওপারের বাঙ্গলা পাক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিজেদের দেশের নামকরণ করিল—বাঙ্গলাদেশ, ইহা একটি শুভ সূচনা দুই বাঙ্গলার পক্ষেই।

আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে দেশ গিয়েছে ছেয়ে!

অতীত দিনের স্মৃতি মাত্র। আজ দেখিতেছি এ-রাজ্যে বিষাদময়ীর আগমনে-বিষাদে গিয়াছে দেশ ছেয়ে। ধনীর দুয়ার আছে—কিন্তু রুদ্ধ। কাঙালিনী মেয়ে সে দুয়ারের কাছেপিঠে যায় না, কারণ একদা—ধনীদের সাম্যবাদের রোলারের চাপে এবার প্রায় নিধন করার প্রক্রিয়া চলিতেছে! দরিদ্র জনদের টানিয়া উপরে উঠাইবার কার্য্য যখন দেখা গেল সম্ভব নহে—এমন অবস্থায় উপরের স্তরকে পঙ্কে ঠেলিয়া নামান সহজ সম্ভব। সাম্যবাদও প্রচার হইবে আর সেই শ্রেণী হীন সমাজও চালু হইবে।

অতএব আমাদের চিন্তার আর কিছু নাই। অন্যদেশে সাম্যবাদ লইয়া বিচার বিবেচনা চলিতে থাকুক, আমরা সেই অবসরে এ-রাজ্যে পূর্ণ এবং নিখাদ সাম্যবাদ চালু করিয়া বড় বড় দেশগুলিকে হতভম্ব করিয়া দিব, দিব নহে দিতেছি এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমী সভ্য দেশগুলির প্রশংসাপত্র প্রকাশ করিতে থাকিব। পশ্চিমবঙ্গ কত ফরোয়ার্ড—সবাই অবাক হইয়া পরম পুলকে অবলোকন করিতে থাকিবে।
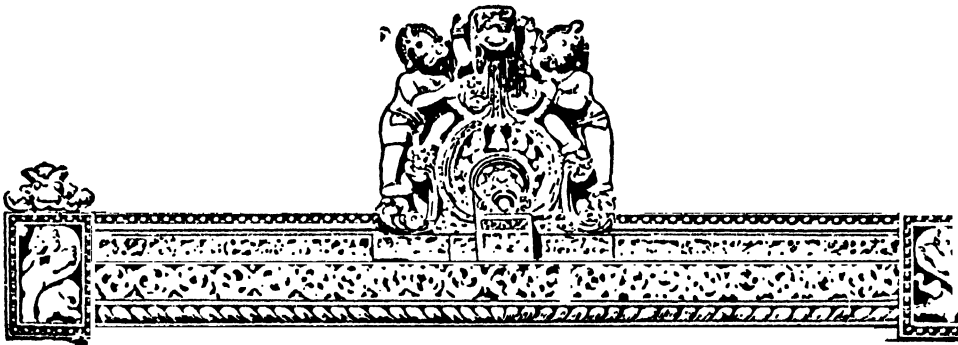
অসমীয়া ও বাঙ্গালীর সংঘর্ষ

বিগত মে মাসে লামডিং-এ যে বাঙ্গালী অসমীয়া সাম্প্রদায়িক সংঘাত হয় সেই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ অসমীয়া সাপ্তাহিক "নীলাচলে" একটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" সাপ্তাহিকে ঐ প্রবন্ধের একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। আমরা ঐ বঙ্গানুবাদটি এইখানে পুণর্মুদ্রিত করিতেছি।

লামডিং-এর ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে গৌহাটি ও আসামের অন্যত্র অশান্তি এবং উত্তেজনা থেকে সবার একটা শিক্ষা হলো। অসমীয়া, বাঙ্গালী এবং আসামের অন্য সব সম্প্রদায়ের লোকের এখন বুঝতে হবে যে কুৎসিৎ ও সকলের পক্ষে অহিতকর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্ভাবনা আমাদের সমাজে এখনও রয়েছে। এই ঘটনার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে তার প্রতিবিধানে যত্নবান হতে হবে। উত্তেজনা প্রশমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রিয় সত্যটাকে অস্বীকার করে পুনরায় গতানুগতিক জীবনে ফিরলে চলবে না!

অসমীয়া ও বাঙ্গালীদের মনোমালিন্য যদিও একশো বছরের পুরাতন, তবু এইবারের ঘটনায় কিছু আশার লক্ষণ পাওয়া গেছে। সত্যি মিথ্যা যাই হোক বাঙ্গালীরা অসমীয়া সংস্কৃতির অপকার করছে, এ রকম সংস্কার অসমীয়ারা মাতৃস্তন্য থেকে হজম করে থাকে। আসাম ও অসমীয়া সংস্কৃতির উন্নতিতে বাঙ্গালীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান তারা ভুলে যায়। অন্য দিকে বাঙ্গালী-দের অনেকেই এখনও তাদের ইমিগ্রান্ট (বহিরাগত) মনোভাব ছাড়তে পারেন নি। ফলে অসমীয়াদের সঙ্গে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ উৎসাহজনক বলা যায় না। অসমীয়া সংস্কৃতির প্রতি তাদের কৌতুহল ও পঠন পাঠন খুবই সীমিত। তবু বহু ও অন্যান্য অসমীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে। এদের সংখ্যা কম। তাই আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতির বিকাশে সংখ্যা ও শক্তির অনুপাতে বাঙ্গালীরা বিশিষ্ট কোন ভূমিকা নিতে পারেন নি। আশার কথা, সমাজের বড় অংশ এইবারের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে সক্রিয় বা নিরপেক্ষ ভূমিকা নেন নি। বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ কর্মিরা সন্দেহাতিতভাবে অন্ধ জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করছেন। এই প্রগতি শীল মনোভাব শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে, আশা করা যায়।

আশঙ্কার কারণ

আশঙ্কার কারণ নেই এমন নয়। ছাত্র যুবকদের একাংশের ভবিষ্যৎ ভূমিকা খুব সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হবে। নানা ধরণের ব্যর্থতা ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে হয়ে পরে অন্ধ ও উন্মাদ প্রকাশের চেহারা আমাদের জানা আছে। এই ক্ষোভ ও হিংসাত্মক মনোভাব কোন ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠির করায়ত্ত হলে আসামের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ১৯৬০র ভাষা আন্দোলনে অন্তত একটা পরিষ্কার লক্ষ্য ছিল অসমীয়া ভাষার রাজ্যভাষা মর্যাদা। আন্দোলন হত্যালীলায় পরিণত হয় কিছু অযৌক্তিক আবেগের উন্মাদনায়। এবারে উত্তেজনায় তেমন কোন লক্ষ্যও ছিল না। অসমীয়া মান অপমান বিষয়ে কিছু লোকের অসংযত ও অত্যধিক উষ্মাতে এর জন্ম ও বিকাশ—যেন এরা ছাড়া আর কোন অসমীয়া আসামকে ভালবাসে না আর রাস্তায় বাঙ্গালীদের মার পিট করাটাই দেশপ্রেমের মস্ত প্রমাণ॥

কিন্তু শুধু কিছু যুবকের উগ্র মনোবৃত্তিতে এমনটি হয় নি, বয়স্কদের একাংশের প্ররোচনাও এতে আছে। পত্রিকায় প্রকাশিত একেকটা উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য কেবল মানুষের মেজাজ গরম করেই শেষ না হয়ে মারপিট সম্পত্তি নাশের রূপও যে নিতে পারে, সেই কথাটা ভাবা হয় নি, সমাজের প্রধান দুই একজন ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহারের বিপদ সম্বন্ধে আদৌ সচেতন ছিলেন না।

লামডিং-এ বাঙালী গুণ্ডা কয়টা 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়েছিল। অসমীয়া বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদেরই মেজাজ বড় ইন্টারেষ্টিং। গৌহাটিতে মারপিট করার সময় একদল ভাবে A. S K র জায়গায় 'এ, এছ, কে' লিখলেই অসমীয়া ভাষা রক্ষা পাবে। লামডিং-এও 'জয় বাংলা' শ্লোগানই কাল হলো। বয়স্ক থেকে দশ বছর বয়স্ক বালক পর্য্যন্ত তেতে উঠল।

কেন? বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রাম কিছু তত্ত্বিদের মতে মার্কীন সাম্রাজ্যবাদী দালালের কীর্ত্তি, কিছু অসমীয়া দেশপ্রেমিকের মত 'বৃহত্তর বাংলা' গড়ার ষড়যন্ত্র এই 'ষড়যন্ত্রে' হাজার হাজার লোক যে প্রাণ দিল, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহত্যাগী হল, কত লোক যে এখনও বীরত্ব পূর্ণ সংগ্রামে রত সেই কথা কি এরা একবার ভেবে দেখেছিল?

দলে দলে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু দলকে কোথায় নেওয়া হবে, আগে কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। এখানে ওখানে ভ্রাম্যমান থাকলেও এই উদ্বাস্তুস্রোত কিছুতেই 'বৃহত্তর বাংলা' গঠন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এদের সুশৃঙ্খলভাবে আশ্রয় দান ভারত সরকারের দায়িত্ব। পকেটে হাত দিয়ে বসে না থেকে এই বৃহৎ দায়িত্ব পালনের সাহায্যে এগিয়ে আসা এইসব দেশপ্রেমিক-দের উচিত ছিল। অবশ্য রাস্তায় দু'জন নিরস্ত্র বাঙালীকে মারপিটের চেয়ে এই সব গঠনমূলক কাজ কষ্টসাধ্য।

দোষ কি শুধু বহিরাগতের

বেকার যুবকদের ক্ষোভ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অন্যতম কারণ। আসামে অর্দ্ধ শিক্ষিত, শিক্ষিত বেকার সংখ্যা ১৩ লাখ। যদি আসামে প্রতিটি অফিসে কারখানায় বাঙালী বা বহিরাগতদের তাড়ান হয়, তা হলেও এই বিপুল সংখ্যার ক্ষুদ্র অংশের মাত্র কর্ম সংস্থান হবে। অর্থাৎ বহিরাগত চক্রান্তে অসমীয়া যুবক বেকার —কথাটা খুবই অন্তঃসারশূন্য কথা। ইতিমধ্যে কিছু কিছু জাতীয়বাদী সাংবাদিকও বলেছেন যে, কষ্টকর জীবিকা যেমন শিল্প ব্যবসায়ে অসমীয়া যুবকের অনিচ্ছা ও বিতৃষ্ণা, কেরানীগিরির প্রতি উৎসাহের অভাবেও অনেক অসমীয়া ছেলে বাড়ীতে বসা। দোষ আমাদের সরকারের। শিল্পায়ন করে জীবিকার সুযোগ না বাড়ালে এই বিপুল সংখ্যক বেকারের কি উপায় হবে?

একটি বীভৎস সত্য

এই উত্তেজনা অশান্তিতে একটি বীভৎস সত্য প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্র সমাজের অধিকাংশের অপরিপক্কতা। বিশেষত কলেজের ছাত্রের যে প্রকার উদ্দেশ্য ধর্মী ও যুক্তিবাদী মনোভাব থাকা উচিত, তার অভাব খুব পীড়াদায়ক। যেমন লামডিং-এর ঘটনার 'প্রতিশোধ' নেওয়ার পদ্ধতি! গুণ্ডা কয়টাকে বের করে তাদের উপর প্রতিশোধ নিলে তবু কথা ছিল। কিন্তু ঘটনার সংগে সম্বন্ধহীন যেখানে সেখানে বাঙালী ধরে উৎপাত করে প্রতিশোধ নেওয়া সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত মনের প্রমাণ নয়। সব বাঙালী কি অসমীয়া সংস্কৃতিকে হেয় করে? সাহিত্য সভার মাকুম অধিবেশনে বাঙালী যারা দেহ মনে প্রাণপাত করলেন, তাদের খবর কে রাখে? নবীন বরদলৈ হলে ছাত্র সভায় যে ক'জন বক্তা মত দিলেন যে লামডিং-এ অপমানে প্রতিশোধ হিসেবে বাঙালীদের আসাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, মাকুমের বাঙালী ভদ্রলোক কজন এই মনোভাব দেখে কি হতাশ হবেন না? আর আসামে এ রকম বাঙালী আরও কত আছে। এইভাবে বাঙালীদের মেরে তাড়ালে আসাম উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করবে বলে যারা ভাবে এবং সেই মত উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলন করে, তারা আসামের চির শত্রু।

সাময়িকী

ইয়াহিয়া খানের প্রলাপ

ইয়াহিয়া খানের কথাবার্ত্তা ঠিক সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির কথা বলিয়া মনে হয় না। বিদেশে গমন করিয়া তদ্দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে নানা প্রকার অর্থহীন কথা বলিয়া ইয়াহিয়া খান কি রাষ্ট্রীর কর্ত্তব্য করিতেছেন মনে করেন তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না; কিন্তু বিদেশের সংবাদপত্রে ঐ সকল প্রলাপবাক্য বেশ সাজাইয়া প্রকাশ করা হয় বলিয়া আমাদেরও সেই কথা সম্বন্ধে কখন কখন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়। ইয়াহিয়া খান প্যারিস গমন করিয়া বলিয়াছিলেন "ঢাকার হত্যাকাণ্ড ঠিক ফুটবল খেলা হইয়াছিল বলা চলে না। কারণ আমার সৈন্যগণ যখন মানুষ মারে তখন তাহারা খুব পরিষ্কার ভাবেই সেই হত্যাকার্য্য করিয়া থাকে।" ফুটবল খেলায় তাহা হইলে নরহত্যা করা হয় না। অথবা করা হইলেও তাহা ঘৃণা জঘণ্যভাবেই করা হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। ইয়াহিয়া এই গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া নিজের মানসিক অসম্বদ্ধতাই শুধু ব্যক্ত করিয়াছেন; অপর কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধি তাহা দ্বারা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি তৎপরে বলেন, "আমার সৈন্যগণ সামরিক কার্য্যে সুশিক্ষিত সুতরাং তাহারা যখন সামরিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহারা তাহাদের সামরিক শক্তি ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করে না।" সুতরাং তাহারা যে লক্ষ লক্ষ অসামরিক নাগরিকদিগকে প্রাণে মারিবে, পাশবিকভাবে আক্রমণ করিবে এবং তাহাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিবে ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইয়াহিয়া খান জেনারেল বলিয়া বাজারে চলিয়া থাকেন। "প্রফেসর" নামটি যেরূপ যাদুকর, সার্কাসের বলবান খোলোয়াড় প্রভৃতি নানান লোকের নামেই সংযুক্ত করা হইয়া থাকে, পাকিস্থানে "জেনারেল" নামটাও সম্ভবতঃ সেইভাবে যেমন তেমন করিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নয়ত কোন জেনারেল সৈন্যদিগের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগের বর্ব্বরতার সমর্থন করিতে সাহস পাইতেন না।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান শুধু যে ভারতের সম্বন্ধে যথেচ্ছা অপপ্রচার করিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেন তাহাই নহে; তিনি এখন বৃটেনের বিরুদ্ধেও নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৃটেন তাঁহার সৈন্যদিগের বর্ব্বরতার কথা লইয়া তাঁহাকে মানবতার দায়িত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়া না চলিতে বলায় তিনি যদি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাহাহইলে বৃটেন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে বলিয়া আশা কর। বাতুলতার পরিচায়ক। বহু জাতির নেতাগণই ইয়াহিয়া খানকে বর্ব্বরতা বর্জ্জন করিয়া চলিতে বলিয়াছেন। শুধু চীনের কেহ বলে নাই। পরম বন্ধু আমেরিকার শাসকগণ কিছু না বলিলেও মনে রাখা আবশ্যক যে এডওয়ার্ড কেনেডি একজন উচ্চপদস্থ আমেরিকান ও তিনি সাক্ষাৎভাবে দেশত্যাগী বাংলাবাসীদিগের সহিত কথা বলিয়া ও সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন কার্য্যকে মানব সভ্যতা বিরুদ্ধ চরম দুর্নীতি দোষদুষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহিয়া খান নিজের পাপ সম্বন্ধে নির্লজ্জভাবে সকল অপরাধবোধশূন্য। চলিত ভাষায় যাহাকে দুই কান কাটা বলা হয়। ইয়াহিয়া খানের উদ্ধত কথার ধরণ ধারণ দেখিয়া মনে হয় ইয়াহিয়া খানের শতকর্ণ থাকিলেও সে সকল কর্ণই কর্ত্তিত অবস্থায় থাকিতে দেখা যাইত। যে ব্যক্তি আশি লক্ষ মানুষকে দেশ ছাড়িয়া ভারতে পলাইতে বাধ্য করিয়াছে সে যদি বলে যে উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতের হইতে পারে না; তাহা পাকিস্থানের নিজস্ব সমস্যা, তাহা হইলে বলিতে হয় যে মানুষটা শুধু উন্মাদ নহে; সে একটি সকল কাণ্ডজ্ঞানহীন

মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। উপরন্তু সে বিশ্ববাসী সকলকেই এত অল্পবুদ্ধি মনে করে যে নানা প্রকার অসম্ভব মিথ্যার অবতারণা করিতে তাহার কিছুমাত্র সংকোচবোধ হয় না। হিংস্র পশু হিংস্রতাতেই নিমগ্ন থাকে; সে নিজ পাশবিকতার কষ্টচেষ্টিত সমর্থনের জন্য নানা বিচিত্র মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণ করে না; কিন্তু বর্ব্বর নরঘাতক মানুষ সর্ব্বদাই নিজের পাপের সাফাই গাহিবার চেষ্টায় অভাবনীয় কষ্ট কল্পিত প্রসঙ্গের উত্থাপনা করিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে নিজ চরিত্রের স্বাভাবিকতা প্রমাণ চেষ্টা করে। ইয়াহিয়া খান ও তাহার ছয়জন মহাসৈনাধ্যক্ষের কার্যের প্রকৃষ্ট আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ঐ সকল হিংস্র বর্ব্বর নরদেহধারী অনার্য্যদিগের প্রত্যেকটিই পাপ ও অপরাধের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন দেশের বুদ্ধিমান নেতাগণ এই কথাটা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন এই কারণে এখনও চলিতেছে।

সংবিধান অন্তর্গত মূল অধিকার অপসারণ

ভারতীয় রাজাদিগকে বাৎসরিক যে টাকা দেওয়ার রীতি স্বাধীনতা লাভের পরে স্থির করা হয় তাহার কারণ ছিল তাহারা নিজ নিজ রাজ্যের শাসন ও রাজস্ব আদায় ভার ভারত সরকারের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ও সেই কারণে তাঁহাদের যাহা আয় হইত তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই টাকা যে ভারত সরকার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহার কারণ ভারত সরকারের ভারতীয় রাজাদিগের রাজ্যের উপর রাজ অধিকার প্রাপ্তি। যখন ভারত সরকার ঐ বার্ষিক টাকা দিবার ব্যবস্থা রদ করিতে চাহিলেন তখন তাহা উচিত কার্য্য হইতেছে কিনা ইহা লইয়া নানা প্রকার মতামতের সৃষ্টি হইল। কেহ বলিলেন টাকা না দেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গের সমতুল্য হইবে; কেহ বলিলেন ভারতীয় রাজ মহারাজাদিগের রাজ অধিকার থাকিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই সুতরাং তাহা যদি উঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা নীতিসঙ্গত বলিয়া ধার্য্য হওয়া উচিত। টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি যখন করা হয় তখন ঐ ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতির কথা চিন্তা করিলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার দুর্নামটা হইত না। ভারতের "উচ্চতম আদালতে" টাকা দেওয়া রদ করার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল "সুপ্রিমকোর্ট" অভিযোগ শুনিয়া রাজাদিগের তরফে রায় দিয়াছিলেন ও সেই রায় কাটাইবার জন্যই পার্লামেন্ট সংবিধান সংস্কার করিয়া মূল অধিকার হইতে সম্পত্তির অধিকার দূরীকরণ ব্যবস্থা করা হয়। এই যে সংবিধান সংস্কার করা ইহা বিষয়টার গুরুত্ব বিচার করিলে মনে হয় অতি সহজেই করা যায়। ভারতের সংবিধানে তাহার স্বরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন কঠিন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া করা হয় নাই। যথা, দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান রীতি অনুসারে সংবিধান পরিবর্ত্তন যে কোন সংখ্যাগুরু দল যথা ইচ্ছা করিতে পারেন। শ্রীমতী ইন্দিরার দল যে নির্ব্বাচনে বিজয় লাভ করিয়া রাষ্ট্রীয় শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই নির্ব্বাচনে ভারতের সকল ভোট দাতাদিগের মাত্র শতকরা ৫৪ জন মাত্র ভোট দিয়াছিলেন। এই ৫৪ জনের মধ্যে ৩০।৩৫ জন শুধু ইন্দিরার দলের প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মোট ভোটদাতাদিগের এক তৃতীয়াংশ মানুষের প্রতিনিধিগণই পার্লামেণ্টে সংবিধান সংস্কার করিতে সমর্থ। সংবিধানের মূল নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা এত সহজে পরিবর্ত্তন করিতে পারা রাষ্ট্রের স্থিতি ও স্বরূপকে কমজোর করিয়া দেয়। সুতরাং এরূপ রীতি প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক যাহাতে সংবিধান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অন্তত প্রাপ্ত বয়স্ক সকল দেশবাসীর অধিকাংশের মত হইলে তবেই তাহা করা সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ না করিলে যে কোন সংখ্যাগুরু দলের খামখেয়ালের উপর রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।

পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় দর্শন অনুশীলন

ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্টি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি বহুকাল হইতে আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ, বেদ বেদান্ত পুরাণ কাব্য প্রভৃতির চর্চ্চাতে বহু পাশ্চাত্যের মনীষী জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। ভারতের পণ্ডিত সমাজ এই সকল ইউরোপ

আমেরিকার জ্ঞানীদিগের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ইতিহাসের চিন্তাধারার সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন ও সেই কারণে পাশ্চাত্যের নিকট আমাদের একটা বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধিগত ঋণ আছে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। ম্যাক্স মূলার, ইয়াকোবি, ইয়োলি, রীস ডেভিডস্, সিলভ্যাঁ, লেভি, এমিল ফুশে, থিবো, ভিন্টারনিৎস্, ফরমিকি, তুচ্চি প্রভৃতি বহু প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদের নাম আমাদের সর্ব্বদাই মনে আসে এবং আমরা জানি যে বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই যে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি একটা সম্মানের ভাব প্রদর্শিত হয়, তাহার মূলে আছে অতীত ও বর্ত্তমানের এই সকল মহাপণ্ডিতদিগের জ্ঞান-চর্চ্চা ও অনুশীলন। যুক্তি তর্ক ও বিচার দিয়াই পূর্ব্বকালের ভারতীয় পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের মানসিক প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সকল ভারতীয়দিগের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সর্ব্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন, জগদীশচন্দ্র বোস প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচারকদিগের নাম উল্লেখযোগ্য? বিষয়টির আলোচনা করিলে একটি কথা সহজেই বোধগম্য হয় যে ভারতীয় সভ্যতা কৃষ্টি-দর্শন সাহিত্য, ভাষা ব্যাকরণ, বেদবেদান্ত পুরাণ প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন অধ্যয়ন ও অনুশীলনের। উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত নিনাদ কিম্বা একত্র সমাবেশিতভাবে গঞ্জিকাপান করিলে ভারতীয় কৃষ্টির সহিত একটা গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়, এইরূপ যাঁহারা মনে করেন সেই সকল ইয়োরোপ ও আমেরিকা নিবাসী প্রেরণাতত্ত্ব ও অন্তর্দর্শন রহস্যসন্ধানী দিগ্‌ভ্রান্ত মনোজগতের পর্য্যটকদিগকে বলিতে হয় যে সহজ পথের পথিকের গন্তব্যস্থান কখনও জ্ঞানের দুরারোহ উচ্চশিখরে স্থিত হয় না। উন্মাদনা ও জ্ঞান এক মানসিক অবস্থা উদ্ভূত নহে। সুতরাং আজকাল যে দলে দলে ইয়োরোপ আমেরিকা হইতে আগত যোগতপস্থা অনুরক্ত মুক্তি ও মোক্ষ আকাঙ্ক্ষী নরনারীগণ নানান গুরুর আশ্রমে ও আখেড়ায় গিয়া সরল ও সহজ উপায়ে দিব্যদৃষ্টি আহরণ চেষ্টা করিতেছে তাহার একটা ফল হইবে যে জ্ঞান আহরণের যে বিরাট ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার গতি ও ধারা ক্ষতিকরভাবে ব্যাহত হইবে। এতগুলি সহজে বিশ্বাস করিতে আগ্রহী শিষ্য পাইলে হবু গুরুদিগের যে সর্ব্বত্র একটা ভিড় জমিয়া উঠিবে তাহা স্বাভাবিক। এবং হইয়াছেও তাহাই। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত সম-শ্রেণীর ভারতীয়দের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আমাদের দেশের গ্রাম্য ভক্তগণ যেরূপ নকলগুরু ও সাধুদিগের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়; শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যেও সেইরূপ বহুমানুষকে যাহাকে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ভুল পথে চলিতে দেখা যায়। এই কারণে ইয়োরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদিগের উচিত হইবে যাহাতে তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেশের মানুষ এদেশে আসিয়া অযথা ধর্ম্ম, দর্শন বা অপর বিদ্যাচর্চ্চার অভিনয়ে জড়িত হইয়া পড়িয়া আর্থিক ও চরিত্রগতভাবে প্রবঞ্চিত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে কিছু আমেরিকান মস্তকমুণ্ডণ করিয়া শুধু একগুচ্ছ কেশ শিখা হিসাবে রাখিয়া, নগ্নদেহে এক বস্ত্রে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পালনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কোন এক ব্যক্তি ইঁহাদিগের গুরু ও তিনি ইহাদিগকে কীর্ত্তণ করিয়া কৃষ্ণের পূজা করিয়া নিজেদের অন্তরে কৃষ্ণবোধ জাগ্রত করিতে শিখাইতেছেন। এই গুরুর না কি বহু শিষ্য আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিতেছেন। কলিকাতায় এই দলের বিদেশী কৃষ্ণ-ভক্তগণ গৃহে রাজপথে ও মণ্ডপ সাজাইয়া কীর্ত্তণ করিয়া থাকেন ও খোল করতাল কাঁসর ঘন্টা শাঁখ বাজাইয়া ইঁহাদিগের কীর্ত্তণ রাত্রি ৩।৹ টা হইতে আরম্ভ হয় ও তৎপরে কিছু কিছু অবসর রাখিয়া সন্ধ্যা ৭।৹ টা অবধি চলিয়া থাকে। ভক্তের নিকট সময় কিছুই নহে; কিন্তু যাহারা অপর পথের পথিক তাহাদের পক্ষে রাত্রি ৩।৹ টার সময় কীর্ত্তণ শুনতে আরম্ভ করা কষ্টকর মনে হইতে পারে। কারণ যাহারা বৈষ্ণব নহেন তাঁহাদের প্রাণে গভীর রাত্রের সংকীর্ত্তণ আরম্ভ হইলে কোন ধর্ম্মবোধ জাগ্রত হয় না। এই সকল ব্যক্তির উচিত অরণ্যে আশ্রম বাঁধিয়া বাস করা কিন্তু ইঁহারা তাহা না করিয়া কলিকাতার ফ্ল্যাটের বাড়ীতে থাকিয়া নৃত্য সংকারে কীর্ত্তণ করিয়া থাকেন।

দেশ-বিদেশের কথা

স্বাধীন বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে না

আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

বাংলা দেশের ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী গ্রোপ) যুবনেত্রী শ্রীমতী মতিয়া চৌধুরী গত ২২শে জুন করিমগঞ্জ সরকারী হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল মাঠে এক বিরাট জনসভায় বলেন যে স্বাধীন বাংলা দেশের মানুষ হিন্দু-মুসলীম সাম্প্রদায়িকতাকে পদ্মা, মেঘনার গর্ভে চিরতরে বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পট ভূমিকা বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন যে, যখনই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পাক জঙ্গীশাহীর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখনই তারা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাঁধিয়ে নিজেদের গদী কায়েম রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। ভারতের এক ধরণের নাগরিক যে বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকিস্থানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাদের উল্লেখ করে শ্রীমতী চৌধুরী বলেন যে, এদের ধারণা পাকিস্তান বুঝি ইসলামী রাষ্ট্র। কিন্তু পাক কর্তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে ইসলামের বা কোনও ধর্মেরই সম্পর্ক নেই, সেখানে সম্পূর্ণ বর্বর রাষ্ট্র কায়েম আছে। নিজেদের যাবতীয় দুষ্কৃতি চাপা দেওয়ার জন্য সেখানে ইসলাম ধর্মের জিগির তোলা হয় মাত্র। বাংলাদেশের যে সমস্ত শরণার্থী ভারতে আছেন, তাদের মধ্যেকার প্রত্যেক সুস্থ সবল ব্যক্তিকে মুক্তি ফৌজে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে ভারতের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, এখানে আমরা আশ্রয় পেয়েছি, কিন্তু এই আতিথেয়তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে, যদি আমরা এখানে থেকে মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে সাহায্য না করতে পারি।

যুব কংগ্রেস এবং যুব ফেডারেশন কর্তৃক আহূত এই জনসভায় সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী অনিমা কর। সভায় সময়োপযোগী কতকগুলি সংগীত পরিবেশিত হয়।

ইংরেজীর সহিত ফরাসীর সংগ্রাম

"দেশ" সাপ্তাহিকে ইংরেজীর সহিত ফরাসী ভাষার সংঘাতের কথা আলোচিত হইয়াছে। ফরাসী কে ইয়োরোপের "লিন্‌গুয়া ফ্রান্‌কা" বা সর্বজন কথিত ও সর্বত্র প্রচলিত ভাষা বলা হইত, কিন্তু সেই প্রতিপত্তি রক্ষা করা ফরাসীর পক্ষে ক্রমে ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজকে দমান যায় কিন্তু আমেরিকানকে দাবাইয়া রাখা প্রায় অসম্ভব। আলোচনাতে যাহা আছে তাহা হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

ভাষা নিয়ে ইংরেজদের যত গর্ব ফরাসীদেরও তত। ইংরেজদের ধারণা তাদের ভাষার জুড়ি দুনিয়াতে নেই, ফরাসীদেরও। তাই ইংরেজরা মনে করে তামাম দুনিয়ার ভাষা বলতে যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে ইংরিজী, আখেরে দুনিয়ার সব জাত তাই মেনে নেবে এই তাদের আশা। ফরাসীরা মনে করে বিশ্বভাষা হবার যোগ্যতা কোনও ভাষার যদি থাকে তা হচ্ছে ফরাসী; ইংরিজী যে একটা উঁচুদরের ভাষা তা তারা স্বীকারই করে না—শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও। তারা বলে ওটা তো বেনের জাতের ভাষা; হাটে বাজারে ওটা চলতে পারে, কিন্তু সভ্য সমাজে ওটা অচল। অমনি ধারণা ইংরিজী সম্পর্কে কেবল ফরাসীদেরই ছিল না—গোটা কন্টিনেন্টই অর্থাৎ ব্রিটেন ছাড়া ইউরোপের লোকে ওই রকমই ভাবত। ইংলিশ চ্যানেল পেরুলেই ইংরিজী হয়ে উঠতো অচল, শুরু হতো ফরাসীর রাজ্য। ইংরিজী কেউ বললে ও এলাকায় লোকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো।

হাটে বাজারে না হলেও সভ্য সমাজে যে ভাষাটির

এই সেদিন পর্যন্ত কদর ছিল সেটি ইংরিজী নয়, ফরাসী। ডিপলোম্যাসি অর্থাৎ কূটনীতির ভাষা ছিল পশ্চিমী জগতে অনেককাল পর্যন্ত ফরাসী। অমন মোলায়েম ভাষা তো দুনিয়াতে কমই আছে। ভদ্রতায় যেমন ফরাসীদের জুড়ি নেই, তেমনই নেই রান্নায়। ভোজনরসিক বলে তাদের যেমন খ্যাতি তেমনই পাকা রাঁধুনী বলেও। ও ব্যাপারে ইংরেজদের নামযশ আদৌ নেই। কেবল খাদ্য কেন, পানীয়তেও ফরাসীদের সুনাম ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী। পশ্চিমী খাবারের ফর্দ তাই তৈরী হয় ফরাসীতে আজও। খোদ বিলেতের নামীদামী অভিজাত হোটেলেও খাবারের নাম লেখা হয় ফরাসীতে, তার আদরের ইংরিজীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ বললেই হয়, ও-রেওয়াজ খালি ইউরোপে নয় দুনিয়ার যেখানে ইউরোপীয় ধাঁচে খানা চালু আছে সেখানেই ওই নিয়ম।

ফরাসী ভাষাকে কোণঠাসা করেছিল গোড়ায় ইংরেজদের বিশাল সাম্রাজ্য, তারপর দুনিয়া জুড়ে আমেরিকানদের বাড়বাড়ন্ত। ইংরেজ যেখানেই ঘাঁটি বানিয়েছে সেখানেই চালু করেছে ইংরিজী। কোন জায়গায় ফরাসী যদি পাশে থেকে চালু থেকেও থাকে তাকে প্রায়ই মাঝে মাঝে সরে পড়তে হয়েছে। তবে কোনও কোনও এলাকা থেকে ফরাসী ভাষা ইংরিজীর আওতায় থেকেও একেবারে মরে যায়নি, জোরালো প্রতিপত্তি না থাকলেও বেঁচে সে আজও আছে। অমনই ঘটেছে কানাডার কুইবেকে। কিন্তু ইংরেজরা যা পারেনি সে কাজ করেছে আমেরিকানরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঝাঁকে ঝাঁকে আমেরিকান সেনা এসেছে ইউরোপের দেশে দেশে, এসিয়ার অঞ্চলে অঞ্চলে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, পূব ইউরোপ, রুশিয়া কোথায় না মার্কিন সেনা কখনও ছাউনি ফেলেছে? পূব এশিয়ায়, পশ্চিম এশিয়ায়—কোথায় না গেছে? দেশে ফিরলেও তারা ইংরিজী ভাষার চল করে গেছে এমন অনেক এলাকায় যেখানে কস্মিনকালেও ইংরেজরা পাত্তা পায়নি।

দ্য গল যে আমেরিকার ওপর অমন খাপ্পা ছিলেন তার একটা কারণ তারা দেশে দেশে ইংরিজীর কাঁটা ছড়িয়ে ফরাসীকে উৎখাত করেছিল বলে। স্বদেশী ভাষা ছাড়িয়ে বিদেশী ইংরিজী ভাষা ধরাতে ইউরোপ-এশিয়ার মার্কিনীরা হয়তো পারেনি। কিন্তু বিস্তর দেশে পয়লা নম্বর বিদেশী ভাষা হিসেবে তারা ধরিয়েছে ইংরিজী। জার্মান-জাপানে ইংরিজী-চর্চা বাড়িয়েছে ইংরেজরা নয় আমেরিকানরা। ভিয়েতনামে কাম্বোডিয়াতে ফরাসীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে ইংরিজী আমেরিকানদের দৌলতে। এমনি ঘটেছে দুনিয়ায় আরও অনেক দেশে, ঘা খেয়েছে ইংরিজীর কাছে ফরাসী।

ইংরিজীর এই সংস্কৃতিক জয়যাত্রা ফরাসীরা আর সইতে নারাজ। আমেরিকানদের ঠেকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ইংরেজকে তারা তো বাগে পেয়েছে। ইউরোপে সাধারণ বাজারে ঢোকার বাড়তি মাশুল হিসেবে তারা চাইছে ইংরেজদের ওপর ফরাসী ভাষা চালিয়ে দিতে। দ্য গলের মতো তাঁর শিষ্য পঁপিদুও ফরাসী সভ্যতা ভাষা আর সংস্কৃতির গোঁড়া ভক্ত। তিনি চান ইউরোপের প্রধান ভাষা হবে ফরাসী, তা হবে বারোয়ারী বাজারের একমাত্র সরকারী ভাষা। পঁপিদুর এ দাবি যদি মঞ্জুর হয় তা হলে ইউরোপে জাতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদেরও শিখতে হবে ফরাসী। তখন যা পারেননি নেপোলিয়ন, তাই করবেন পঁপিদু—ব্রিটেনকে তিনি জয় করতে পারবেন। হোক না সে বিজয় ভাষার। তার মূল্য কী কিছু কম? দেশ দখল করার খেসারত তো বিস্তর। সাংস্কৃতিক বিজয়ের তো আর ঝুট ঝামেলা নেই। সেনা-সামন্ত পাঠাতে হবে না, কিছু বই, ছায়াছবি আর ফরাসী মাস্টার পাঠালেই কেল্লা ফতে।

শুধু বিলেতে নয়, গোটা ইউরোপেই ফরাসী ভাষার প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্যে পঁপিদু উঠে পড়ে লেগেছেন। যখনই বৈদেশিক মন্ত্রী ইউরোপের কোনও দেশে পাড়ি দিচ্ছেন তখনই তাঁকে বলে দেওয়া হচ্ছে ইংরিজী হটিয়ে

ফরাসী শেখানের ব্যবস্থা সেখানকার সরকারকে দিয়ে করাতে। পশ্চিম জার্মানিতে যে ইংরিজী আর ফরাসীকে তুল্যমূল্য করা হয়েছে এতে ফরাসী সরকার ভারী খুশী। অমন চেষ্টা সুইডেনেও চলছে। ক্যানাডাতেও স্বাধীন কুইবেকের জন্যে তাঁদের তত বেশী মাথা ব্যথা নেই যত আছে সেখানে ফরাসী ভাষা বজায় রাখার জন্যে। এই ইংরিজী হটাও আন্দোলনে ইংরেজরা অবশ্য ভয় পায়নি—তারা এতে মজাই পাচ্ছে। তারা বলছে, ফরাসীরা আগে নিজের ঘর সামলাক তবে তো পরের ঘর ভাঙবে—যেভাবে ফ্রান্সের ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা আদর করে ইংরিজী শিখছে তাতে কোনদিন না ফরাসী মুল্লুক থেকেই ফরাসী ভাষা লোপাট হয়ে যায়।

খুচরা ধাতু-মুদ্রা অদৃশ্য

কিছুদিন হইতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খুচরা ধাতু-মুদ্রা আর দেখা যাইতেছে না। কেহ যদি ৭৫ পয়সার কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া একটা টাকা দিয়া ২৫ পয়সা ফেরত পাইবার অপেক্ষা করেন তাহা হইলে অনেক সময় তাঁহাকে আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কাহারো যদি বিক্রেতাকে এক টাকা দশ পয়সা দিতে হয় তাহা হইলে বিক্রেতা একটা টাকা লইয়াই বলে "দশ পয়সা থাকেত দিন; না থাকলে আর একটা টাকা দিলে ৯০ পয়সা ফেরত দিতে পারব না। এক টাকাতেই এক টাকা দশ পয়সার কাজ হইয়া যায়। কথা হইতেছে খুচরা ধাতু মুদ্রা সব কি হইয়াছে? শুনা যায় প্রত্যহ ট্যাকশালে কয়েক কোটি খুচরা মুদ্রা তৈয়ার হয়। সেগুলি যায় কোথায়? অনেকে বলেন যে মুদ্রাগুলি গালাইয়া পিতল ভরন ইত্যাদির বাসন, ফুলদানি, ছাইদান, জগ, বদনা প্রভৃতির ধাতুর সহিত মিলাইয়া দেওয়া হয় ও তাহাতে না কি লাভ হয়। একসের খুচরা মুদ্রাতে কয় টাকা হয় এবং একসের ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের মূল্য কয় টাকা হয় ইহার তুলনা করিলে বুঝা যাইতে পারে যে মুদ্রা গালাইয়া অন্য কার্য্যে লাগাইলে লাভ হইতে পারে কি না। একবার শুনা গিয়াছিল যে মুদ্রা গলান দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। অবশ্য তাহা করিলেও লাভ থাকিলে মানুষ খুচরা মুদ্রা গালাইতেই থাকিবে বলিয়া মনে হয়। শাস্তির ভয় ও লাভের আশা এই দুই এর মধ্যে লাভের আশাই অধিক শক্তিশালি হইবে বলিয়া মনে হয়। ধাতু মুদ্রাগুলি যদি আরও ক্ষুদ্রাকৃতি করা হয় তাহা হইলে কি হয় তাহাও বিচার করা যাইতে পারে। ইহাতে কিছুনা হইলে ৫০ পয়সা ও ২৫ পয়সার নোট ছাপাইতে হইতে পারে। ৫ পয়সার মুদ্রা উঠাইয়া দিয়া শুধু ১, ২, ৩ ও ১০ পয়সার মুদ্রা রাখা যাইতে পারে।

সহর অন্ধকার করিবার ব্যবস্থা

পৃথিবীর সকল বৃহৎ বৃহৎ নগরগুলিকে কি করিয়া আরোও উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করা যায় এ চিন্তাই জগতের কর্ম্মীদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। কলিকাতার কর্ম্মীগণ না কি সারাক্ষণই উল্টা চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন কেমন করিয়া সহরটিকে আরও অন্ধকারাবৃত করা যায়। ইহাতে না কি তাঁহাদের বেতন বা বোনাস বৃদ্ধির সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। আমরা সহজ বুদ্ধিতে মনে করি যে উৎপাদন বাড়িলেই রোজগার বাড়ার সম্ভাবনা বাড়ে; সুতরাং বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়িলেই বিদ্যুৎ উৎপাদক কর্ম্মীদিগের উপার্জ্জন বৃদ্ধি অধিক সম্ভব হইবে। কিন্তু আমাদের সহজবুদ্ধি আমাদের ভুল বুঝায় কারণ সকল ক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগেরই বিশ্বাস যে, যত কম উৎপাদন করা হইবে ততই অধিক উপার্জ্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইবে। কি ভাবে হইবে তাহা আমরা না বুঝিতে পারিলে যায় আসে না; কারণ কর্ম্মীরা কি না বুঝিয়া কথা বলে? কলিকাতা যত অন্ধকার থাকিতেছে কলিকাতার বিদ্যুৎ উৎপাদক কর্ম্মীদিগের ভবিষ্যত ততই আলোকময় হইয়া উঠিতেছে। যে দিন কলিকাতায় কোন আলো জ্বলিবে না সেইদিন কর্ম্মীদিগের উপার্জ্জনের চূড়ান্ত হইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অপর বহু ক্ষেত্রে কর্ম্মীগণ কাজ কম করিয়া উপার্জ্জন বাড়াইয়া আকাঙ্খার শেষ সীমান্ত পার হইয়া উপার্জ্জনের পরপারে পৌছিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে বিদ্যুৎ সরবরাহ না করিয়াও ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৮৯২—৯৫ সালে আঁকা কালি-কলমের ছবি।

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৭৮

৭ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

চীনদেশে কী হইয়াছে ?

প্রতি বৎসর ১লা অক্টোবর পিকিং সহরে চীন দেশের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গঠনের জন্মদিন উপলক্ষে মহা সমারোহ করিয়া জাতীয় ঐক্য, সামরিক শক্তি, কৃষ্টি ও সমাজ সংগঠন ইত্যাদির প্রদর্শন ব্যবস্থা করা হয়। তোরণ, পতাকা, সৈন্যবাহিনীর দলবদ্ধ গতিবিধি আকাশ বাহিনীর সমবেত উড়িয়া যাওয়া, তোপ রকেট ট্যাঙ্কের জলুস প্রভৃতি নানা কিছু বাদ্য বক্তৃতা সঙ্গীত সহকারে পিকিংবাসীদিগকে ঐ দিন মাতাইয়া রাখে। পৃথিবীকে ঐ ভাবে মনে রাখান হয় যে ১লা অক্টোবর চীনদেশের জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল।

এই বৎসরও সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে পিকিং-এর টিয়েন আন মেন, স্বর্গীয় শান্তি (তোরণ) নূতন লাল রং-এ নিজের শোভা বৃদ্ধি করিয়া সম্মুখস্থ বিরাট চত্বরের চতুর্দ্দিকে সভাপতি মাও ৎসে তুঙের চিন্তাজাত অমরবাণী সকল লিখিত কাষ্ঠ ফলক সাজাইয়া মহা দিবসের জন্য জগতবাসীকে জাগ্রত করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। প্রত্যহই শত শত যুবকদিগের পদধ্বনিতে ঐ এলাকা প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ করে। ইহারা ১লা অক্টোবরের বিরাট শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে নিযুক্ত ছিল। পাঁচলক্ষ লোকের উপর ভার ছিল ঐ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার। কিন্তু যখন ঐ দিনের আর মাত্র দশ দিন বাকি ছিল তখন হঠাৎ একটা ঘোষণা প্রকাশ করা হইল যে ১লা অক্টোবরের বিরাট জলুস ও আতশবাজির খেলা এই বৎসর আর করা হইবে না। একুশ বৎসর ধরিয়া যে দিবসের সমারোহ একটা জাতীয় অনুষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা হইবে না বলায় সকলের মনে একটা মহা অভাব বোধের সৃষ্টি হইল। চীনে কি অঘটন ঘটিয়াছে যাহার জন্য জাতীয় দিবস পালন করা স্থগিত করা হইল। সকলের মনে নানা প্রকার সন্দেহ জাগ্রত হইতে লাগিল; কি হইয়াছে? রাষ্ট্রীয় দফতরের প্রকাশিত কারণ দেখান হইল যে আর্থিক ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য জলুস প্রভৃতি বন্ধ করা হইয়াছে। এই কারণটি লোকের মনে বিশ্বাস জাগাইতে পারিল না। ইহা ব্যতীত শুনা যাইতে

লাগিল যে বহু সহরের বহুস্থল হইতে সভাপতি মাও এর মূর্ত্তি সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং সামরিক পলিট বুরোর মাতব্বরদিগকে কিছুকাল হইতে কোথাও দেখা যাইতেছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। গুজব উঠিতে লাগিল সভাপতি মাও হঠাৎ দেহরক্ষা করিয়াছেন। অথবা তিনি অত্যন্ত অসুস্থ এবং দেশের সকল নেতাগণ তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত; ১লা অক্টোবর জাতীয় দিবস অনুষ্ঠান করিতে আসা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

কেহ বলিলেন মাও ৎসে তুঙ্গ মৃত অথবা অসুস্থ নহেন। কিন্তু লিন পিয়াও মৃতপ্রায় ও তাঁহার স্থলে কে মাও ৎসে তুঙ্গের পরে জাতীয় নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবেন সেই কথা স্থির করিবার জন্যই এখন চীন দেশের সকল প্রধানগণ মহা বিপর্য্যস্ত ও পারস্পরিক মতদ্বৈধাক্রান্ত। লিন পিয়াও ১৯৬৬-৬৯ যুগের লাল দেশরক্ষকদিগের বিপ্লব আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন ও সেই কারণে তাঁহার শত্রুর অভাব নাই। চু এন লাই ৭৩ বৎসর বয়স্ক ও তিনি যাহাদের উপর আস্থা রাখিয়া চলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন সেনাপতিদিগের প্রধান হুয়াঙ্গ ইউঙ্গ-শেঙ্গ। ইনি ৬৬ বৎসর বয়স্ক এবং সর্ব্ব কর্ম্মে চু এন লাইয়ের সমর্থক বলিয়া পরিচিত। চু এন লাই যদি রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রবল হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাহা হইলে হুয়াঙ্গ ইউঙ্গ-শেঙ্গ লিন পিয়াও অধিকৃত প্রতিরক্ষা মন্ত্রীত্বপদ পাইতে সক্ষম হইবেন মনে করা যাইতে পারে। কি হইয়াছে যখন স্থির নিশ্চয় ভাবে জানা যাইতেছে না, তখন সকলে অনুমানের উপরেই চলিতেছেন। কেহ কেহ মনে করিতেছেন লাল সৈন্য বাহিনীর কোন কোন শাখায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেই কারণে বহু সেনাপতিই সৈন্যসহ পিকিং হইতে অন্যত্র গমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলে পিকিংএর ১লা অক্টোবরের জলুস করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে এবং অনুষ্ঠান বন্ধ করার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু যদি বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার শিখা অথবা ধূম্র কেহ দেখিতেছে না কেন? যদি মাও ৎসে তুঙ্গের জীবনাবসান ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে যদি সেই অবস্থায় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা হইলেই বা সে কলহ একেবারে গোপন রাখা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? যদি জাতীয় দিবস পালন সত্য সত্যই আর্থিক কারণে না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে কি কারণে সেরূপ অর্থকষ্ট হইয়াছে তাহাও কেহ কেন জানিল না? চীনদেশের সকল অবস্থা ব্যবস্থা লইয়াই একটা লুকাচুরির খেলা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। কারণ চীনা নেতাদিগের সকল কথাই গোপন রাখিয়া চলিবার অভ্যাস। এই স্বভাবের মূলে কি আছে তাহা বলা বড়ই কঠিন। সম্ভবত চীনা নেতাগণ সর্ব্বদাই নিজেরা চোরাবালির উপর চলিতেছেন বলিয়া মনে করেন এবং কোন কার্য্য করিলেই তাহাতে সক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে সে বিষয়ে কোনও কথা প্রকাশ করিতে চাহেন না। যদি অসফল হ'ন তাহা হইলে কথাটা চাপিয়া যান। সুতরাং সকল কার্য্যই গোপন রাখা হয়, যতক্ষণ না কর্ম্মের সফলতা ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নেতাগন স্থির নিশ্চয় হইতে পারেন।

বর্ত্তমানে চীনদেশে কিছু ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি ঘটিয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না।

জাপান সম্রাটের বিদেশ পর্য্যটন

জাপানের সম্রাটদিগের আচার ব্যবহারের রীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা হইল যে সম্রাট বৎসরে দুই দিন মাত্র নিজের প্রাসাদের একটি বারান্দা হইতে প্রজাদিগকে দর্শন দিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার কার্য্য কলাপ সম্পূর্ণরূপে দেশের ও অপর দেশের জনসাধারণের সহিত সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্জ্জিতভাবেই চলিয়া থাকে। জাপানের সম্রাট নিজের রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যহই কয়েকঘন্টাকাল প্রাসাদে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী-দিগের সহিত নিযুক্ত থাকেন। বৎসরে তাঁহাকে প্রায় ২৫০০ দলিলে সাক্ষর বা সিলমোহর সংযুক্ত করিতে হয় এবং তিনি এই কার্য্যের জন্য যে সিলমোহর ব্যবহার করেন তাহা স্বর্ণনির্ম্মিত ও তাহার ওজন আনুমানিক ৩০০ শত ভরি। জাপান সম্রাট নানা কার্য্য নিজের আনন্দের অথবা জ্ঞানলাভের জন্য করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ধানের চাষ করা এবং সামুদ্রিক জীবদিগের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন। তিনি সহস্তে ধানের চাষ করেন এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্য এতই উত্তম যে সেইজন্য ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি তাঁহাকে নিজেদের সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সুইডেনের রাজা ব্যতীত অপর কোন দেশের রাজা এই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। জাপানের কোনও সম্রাট কখনও বিদেশ গমন করেন নাই। বর্ত্তমান মিকাডো হিরোহিতো বংশানুক্রমিকভাবে ১২৪তম মিকাডো ও তিনিই প্রথম বিদেশ যাত্রী মিকাডো। তিনি যেখানে যেখানে যাইবেন সেখানেই ৮০০ শত জাপানী পতাকা হস্তে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে উপস্থিত থাকিবেন। এই ৮০০ শত নিপপনবাসী তাঁহার আগমন প্রতিক্ষায় সর্ব্বত্র পূর্ব্ব হইতে গিয়া পৌছাইবেন; এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে, যখন হিরোশিমা ও নাগাশাকি সহর দুইটি আণবিক বিস্ফোরণের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিদ্ধস্ত, তখন সম্রাট অল্প কয়েকটি কথায় জাপানের আত্মসমর্পণ প্রচার করেন। সে পরাজয়ের অপমান তাঁহার কথার ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল ও তিনি সে কথা এখনও ভুলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। জেনারেল ম্যাক আর্থার যখন জাপানের বড় বড় সামরিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদিগকে গ্রেফতার করিয়া সামরিক অপরাধের জন্য বিচারার্থে উপস্থিত করিতেছিলেন; পরে যে জন্য কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হয়, তখন সম্রাট হিরোহিতো ম্যাক আর্থারের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন যে জাপানের সামরিক সকল কার্য্যের জন্য তিনি নিজেই দায়ী এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণ শুধু তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলেন মাত্র। ম্যাক আর্থার সম্রাটকে সামরিক অপরাধের অভিযোগ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন ও তাঁহাকে বিচারার্থে উপস্থিত করেন নাই। কেন করেন নাই সে কথার জবাবদিহি ম্যাক আর্থারকে করিতে হয় নাই। ম্যাক আর্থার ঐ ঘটনার বিষয় বলিয়াছিলেন যে সম্রাট হিরোহিতো শুধু সম্রাট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি নিজ স্কন্ধে সকল অপরাধের বোঝা তুলিয়া লইয়া এই কথাও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে মানবীয়তার মাহাত্ম্যও তাঁহাকে এমন একটা শ্রেষ্ঠতা ভূষিত করিয়াছিল যাহা বংশগৌরব হইতে লাভ করা যায় না।

সম্রাটের সাত সন্তানের মধ্যে তিন কন্যা ও দুই পুত্র জীবিত আছেন। ইঁহারা সময়ে সময়ে নিয়মানুযায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কন্যা তিনজন রাজবংশে বিবাহ না করার জন্য তাঁহাদের সন্তানাদিসহ রাজপরিবারের আভিজাত্য হারাইয়াছেন। দুই পুত্রসন্তান সন্ততিসহ রাজবংশের শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তিন সম্রাট কন্যার সাতটি সন্তান সাধারণ মানুষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। ইহারা পৃথক পৃথক সময়ে সম্রাটের নিকট আসিতে পারেন। একত্র আসা চলে না; প্রাসাদের রীতিতে বাধে। সম্রাটের হাঁটা চলা, সময় অতিবাহনের জন্য যাহা করেন সকল কিছুই প্রাসাদ অভ্যন্তরে করিতে হয়। প্রাসাদের জমির পরিমাণ ৯০০ শত বিঘা। সুতরাং ক্ষেত বাগান, সরোবর, বৃহৎ বৃক্ষের সখের অরণ্য প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই প্রাসাদের জমির ভিতরে স্থান পাইয়াছে। হিরোহিতো এখন বিদেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। এই আনন্দ তিনি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে একবার পাইয়াছিলেন তৎপরে আর কখনও দেশভ্রমণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আদালতের কবলে জনসাধারণের প্রাপ্য অর্থ

একথা সর্ব্বজন জ্ঞাত ও স্বীকৃত যে ভাড়াটিয়াগণ যে ভাড়ার টাকা "রেণ্ট কোর্ট" নামক আদালতে জমা করেন সেই টাকা রেণ্ট কোর্ট হইতে উদ্ধার করিতে ঐ টাকার মালিকদিগের অন্তহীন সময় ব্যয়, পরিশ্রম ও তাদ্বির করিতে হয়। প্রথমতঃ টাকা জমা করা হইয়াছে বলিয়া যে খবর দেওয়ার রীতি আছে সেই খবর পাইতে মালিকের অনেক সময় ২।৩ বৎসর কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়ত যখন উকিল নিয়োগ করিয়া সেই টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করা হয় তখন নানা অজুহাতে ও অছিলায় উকিলকে ঘোরান হয় ও টাকা দেওয়া হয় না।

একটা অতি অদ্ভুত নিয়ম হইল যে এখনকার টাকা দিয়া পূর্ব্বকার প্রাপ্য টাকা আটকাইয়া রাখার চেষ্টা। ইহাতে পরে কোন সময় পূর্ব্বকার টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার সুবিধা হইতে পারে বলিয়া বাড়ীর মালিকদিগের সন্দেহ হয়। বর্ত্তমানে একটা সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তিতে দেখান হইয়াছে যে প্রায় চারকোটি টাকা এইভাবে রেণ্ট কোর্টে পড়িয়া আছে এবং সেই টাকা জনসাধারণ তুলিয়া লইতেছেন না। কথাটা কতটা সত্য এবং কাহার দোষে টাকা আটকাইয়া পড়িয়া থাকে এ কথার বিচার সকল মালিকই করিতে সক্ষম। এখন সকল মালিকের উচিত হইবে টাকা আদায়ের চেষ্টা দ্বিগুণ উদ্যমে করিবার উদ্যোগ করা এবং প্রয়োজনবোধে হাইকোর্টের সাহায্য গ্রহণ চেষ্টা করা।

এই সূত্রে বলা যাইতে পারে যে গভর্ণমেণ্টের যে সকল দফতর পরের অর্থ তাহাদিগকে দিবার জন্য রাখিয়া থাকেন, সেই সকল দফতরের নিকট হইতেই টাকা পাইতে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। একটা দফতরের নাম করা যাইতে পারে। তাহা হইল কার্য্যসূত্রে শ্রমজীবীদিগের অঙ্গহানী অথবা মৃত্যু হইলে যে টাকা মালিকদিগের নিকট তাহারা পায় সেই টাকা যখন সরকারী দফতরে জমা হয় সেই দফতর। অঙ্গহানী হইলে ক্ষতি পূরণের টাকা মালিকদিগকে সাক্ষাৎভাবে শ্রমজীবিকে দিতে হয়। সেই টাকা শ্রমজীবিগণ সহজেই পাইয়া যায়। মৃত্যু হইলে টাকা মালিকদিগকে সরকারী দফতরে জমা দিতে হয় ও সেই টাকা তৎপরে শ্রমজীবিদের উত্তরাধিকারীদিগকে সরকারী দফতর দিয়া থাকেন। খোঁজ করিলে দেখা যাইবে কত টাকা শ্রমজীবিদের উত্তরাধিকারীগণ কোন দিনই পায় না। কত টাকা বহু বিলম্বে অল্প অল্প করিয়া পায় এবং এই টাকা পাইতে তাহাদিগকে কত খরচ করিতে হয়, কি ভাবে ও কি কারণে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার খবর লইয়া জানা গিয়াছিল যে বহু টাকা অপ্রাপ্তভাবে ঐ দপ্তরে পড়িয়া আছে। শুনা যায় যে সরকারী হস্তে যাইবার পরে জীবনবীমার টাকা পাইতেও বীমা ক্রেতাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এই অভিযোগও বহুক্ষেত্রে সত্য বলিয়া মনে হয়। কোন কোন স্থলে যাহাদের প্রভাব আছে তাহারা টাকা পাইয়া যাইতেছেন। বর্ত্তমানে সাধারণের গচ্ছিত টাকা জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি রাজনৈতিক কারণে যত্রতত্র কর্জ্জা দিবার জন্য ব্যবহার করিতেছেন। ঐ অর্থ ফিরাইয়া পাওয়াও অনেক স্থলে সম্ভব হইবে না। তখন গচ্ছিত টাকা সাধারণকেই রাজস্ব হিসাবে দিতে বাধ্য করা হইবে। তাহা হইলে কাহার টাকা কে কিভাবে পাইবে ?

যুদ্ধ লাগিবার সম্ভাবনা আছে কি না

পূর্ব্ব বাংলা (পাকিস্থান) হইতে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা নিরন্ন, উদ্বাস্তু, পলাতক, উৎপীড়িত, পাকিস্থানী সৈন্যদিগের দ্বারা আহত, ধর্ষিত, বিতাড়িত—যাহাই হউক, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাহারা নিঃসন্দেহ পাকিস্থানবাসী ও পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রজা। তাহাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার কোন আইনগ্রাহ্য অধিকার নাই। হইতে পারে যে ভারতবর্ষের মানুষ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতিপরবশ হইয়া তাহাদিগকে খাদ্য বস্ত্র ঔষধ ও বাসস্থান দিয়া সাহায্য করিতেছে; কিন্তু সেই কারণে পাকিস্থান রাষ্ট্রের তাহাদের সম্বন্ধে দায়িত্ব উঠিয়া যাইতেছে না। তাহারা পাকিস্থানবাসী ও পাকিস্থানের সামরিক প্রভুদিগের দ্বারা আক্রান্ত উৎপীড়িত লাঞ্ছিত ও তৎকারণে ভীতি জর্জ্জরিত হইয়া ভারতে আশ্রয়লাভ হেতু আগত। পাকিস্থানের সামরিক প্রভুদিগের প্রথমতঃ এইভাবে নিজ দেশবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে দেশছাড়া করাইবার এবং তাহাদিগের ভরণ পোষণ প্রভৃতির ভার অপর কোন জাতির বা রাষ্ট্রের স্কন্ধে চাপাইবার কোন অধিকার নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের দরবারে এই বিষয়ে বহু অসম্ভব ও কষ্টকল্পিত মিথ্যা প্রচার চেষ্টা করিয়া পাকিস্থানী সেনাপতিগণ নিজেদের পাপের বোঝা ও নিজ রাষ্ট্রের মানুষের অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া এরূপ একটা পরিস্থিতি আনয়ন করিয়াছে

যাহাতে যুদ্ধ করিয়া পূর্ব্ববাংলা দখল করিয়া লইয়া উদ্বাস্তুদিগকে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ব্যতীত সমস্যার সমাধানের আর কোন পথ অন্ততঃ ভারতবর্ষের থাকিতেছে না। বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ শক্তিশালী জাতিগুলি পাকিস্থানের উপর কোনও চাপ দিয়া এই অবস্থার কোন উন্নতি করিবার চেষ্টা ত করিতেছেনই না, পরন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও চীন অস্ত্র ও অর্থ দিয়া পাকিস্থানী হত্যাকারীদিগের সহায়তাই করিতেছে। অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্র পাকিস্থানকে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করিয়া পরোক্ষভাবে তাহার অমানুষিক কার্য্যকলাপের সমর্থন করিতেছে।

কথা হইতেছে যে ভারত নিরুপায় হইয়া শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেই বাধ্য হইবে কি না। ভারত কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিবে যে বিশ্বশক্তিমানদিগের অথবা পাকিস্থানের সামরিক শাসকদিগের কোন সুবুদ্ধি হইবে? প্রত্যহ দুইকোটি টাকা খরচ হইতেছে; পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগের সাহায্যের জন্য। প্রত্যহ আশ্রয় প্রার্থীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণও শান্তিপূর্ণভাবে ঐ সমস্যার সমাধানচেষ্টা না করিয়া সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া ভারতের সহিত যুদ্ধ লাগাইবার চেষ্টাই করিতেছে। সৈন্য সংখ্যাবৃদ্ধি, অস্ত্র সংগ্রহ, আক্রমণ নিরোধ করিবার জন্য অতি উচ্চ ও চওড়া দেওয়াল পরিখা ও লৌহ সিমেন্টের পিলবক্স্ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে পাকিস্থান বিশেষ তৎপরতা দেখাইতেছে। ইহা ব্যতীত ভারতের সিমান্তে ক্রমাগত সুচীবিদ্ধ করার মত অনুপ্রবেশ, গোলাগুলি চালাইয়া বহু ভারতবাসীকে নিহত ও আহত করা এবং ঘরবাড়ীর ক্ষতি করা, বিমান চালাইয়া ভারতের আকাশ সীমান্ত লঙ্ঘন প্রভৃতি নানান প্রকার আক্রমণ কার্য্য পাকিস্থান ক্রমবর্দ্ধনশীলভাবে চালাইতেছে। এমত অবস্থায় শান্তি রক্ষা করিয়া চলা কোনও রাষ্ট্রের পক্ষেই অধিককাল সম্ভব হয় না। যুদ্ধ লাগিয়া যাওয়া এই জন্য খুবই সহজে হইতে পারে?

যুদ্ধ না লাগিবার দিকের প্রধান কারণগুলি হইল বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ও পাকিস্থানীদিগের উপর আক্রমণ করিয়া পূর্ব্ববাংলার নানা স্থান দখল করায় সক্ষমতা প্রদর্শন। ভারত সরকারের পক্ষে এই কথা ভাবা স্বাভাবিক যে মুক্তি বাহিনী যদি পাকিস্থানী সামরিক শক্তিকে পূর্ব্ববাংলা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে তাহা হইলে ভারতকে আর যুদ্ধ করিতে হয় না এবং সেইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ভারত একদিকে যেমন দেখিতেছে যে বিশ্বজাতিসংঘ পাকিস্থান সেনাবাহিনীকে পূর্ব্ববাংলা ত্যাগ করিয়া পশ্চিম পাকিস্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারে কি না; অপরদিকে এই সম্ভাবনার কথাও বিচার করিতেছে যে বাংলা দেশের মুক্তি বাহিনী পাকিস্থানীদিগকে পরাজয় স্বীকার করিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করাইতে পারে কি না। ভারত যদি পাকিস্থানকে আক্রমণ করে তাহাতে ভারতের চির অনুসৃত যুদ্ধ বিরুদ্ধতার আদর্শ রক্ষা করিয়া চলা আর রক্ষিত থাকিবে না। ইহা ব্যতীত একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহার পরিণতি কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? আন্তর্জাতিক যুদ্ধ হইলে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়া মহাযুদ্ধে পরিণত হইতে সময় লাগে না। ইহা ব্যতীত পাকিস্থান ক্রমাগত যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি করিয়া চলিতেছে এবং ভারত ভাবিতেছে যে পাকিস্থানই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবে। সেইরূপ হইলে ভারতবর্ষের যুদ্ধের জন্য কোনও নৈতিক দায়িত্ব থাকে না। বিশ্বজাতিসংঘের কোন কোন মহাজাতি এখন পূর্ব্বের ন্যায় আর নিস্পৃহ নাই। পাকিস্থানের উপর কিছুটা চাপ এখন পড়িতেছে। ইহার জন্য দায়ী ভারত-রুশ বন্ধুত্ব ও সহায়তার সন্ধি। রুশিয়া ভারতকে যুদ্ধ লাগিলে সাহায্য করিবে এবং সেইরূপ অবস্থাতে অন্যান্য জাতির যুদ্ধে জড়িত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবলতর হইবে বলিয়া পাকিস্থানের সমর্থক জাতিগুলি এখন দৃষ্টিভঙ্গীর সংস্কার সাধন করিয়া যুদ্ধ সম্ভাবনাকে আর ততটা সহজ সরল মনে করিতেছে না ভারতকে বিপন্ন করা সহজ ও সুখময় কিন্তু রুশিয়া সহিত আণবিক সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া যাওয়া অত্যন্ত আশঙ্কার কথা। সুতরাং কয়েক জাহাজ ঝড়তি পড়তি

অস্ত্র-শস্ত্র, দুই চারিটি ক্ষুদ্রকায় যুদ্ধ জাহাজ (গান বোট) ও কিছু টাকা দিয়া পাকিস্থানকে গরম করা এককথা এবং একটা বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ করা সম্পূর্ণরূপে অন্য কথা। ইহা ব্যতীত আমেরিকা চীনের সহিত পিংপং খেলিতে উৎসুক হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে চীনের সহিত সহযোগিতা করিতে ততটা ব্যগ্র নহে। কারণ সেইরূপ পরিস্থিতিতে ইয়োরোপের জাতিসকল আমেরিকার বিরুদ্ধে যাইতে পারে। এই সকল জটিলতা হেতুই যুদ্ধ লাগিতেছে না।

মন্ত্রী ও রেলদফতরের প্রধানের লড়াই

কিছুদিন পূর্ব্বে একটা অতিশয় অশোভন ব্যাপারের জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি ভারতবর্ষের রেলওয়ের পরিচালকদিগের দিকে আকর্ষিত হয়। রেলওয়ে বোর্ড'এর চেয়ারম্যান বি সি গাঙ্গুলী নিজ সেলুনে চড়িয়া কোন কার্য্যে কোথাও যাইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার সেলুন গাড়ীটি যে ট্রেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইতেছিল তাহা হইতে কাটিয়া সাইডিংএ অচল অবস্থায় সংস্থাপিত করা হইল ও রেল দফতরের প্রধান শ্রী বি সি গাঙ্গুলী জ্ঞাত হইলেন যে রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রী হনুমনতাইয়ার আদেশেই তাঁহার সেলুন তাঁহাকে লইয়া গন্তব্যস্থানে যাইবে না। ইহার উপর তিনি জানিলেন যে তাঁহাকে সেই সময় হইতেই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে; যদিও তাঁহার চাকুরীর আরও প্রায় চার মাস বাকি ছিল। তাঁহাকে মন্ত্রীর তরফ হইতে বোধহয় চিঠি দিবার চেষ্টা করা হইল কিন্তু তিনি সে চিঠি গ্রহণ না করাতে তাঁহার সেলুনের গায়ে একটা পরোয়ানা সাঁটিয়া দেওয়া হইল ও সেই পরোয়ানাতে তাঁহাকে অবসর গ্রহণ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। বলাবাহুল্য এইরূপ অপমানকর ব্যবহার দেখিয়া শ্রীগাঙ্গুলী সেলুন ছাড়িয়া যাইতে অথবা কোন নির্দ্দেশ মানিতে রাজী হইলেন না; এবং সেলুনেই থাকিলেন। মন্ত্রী হনুমনতাইয়াও গোলমাল দেখিয়া বিশেষ কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। মন্ত্রীর কার্য্যকলাপ ঠিক মন্ত্রীর উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করেন না; কারণ নিজ দফতরের প্রধান কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে মন্ত্রীর যাহাই অভিযোগ থাকুক না কেন; তাহা জ্ঞাপনার্থে সভ্যতা ও সরকারী কর্ম্ম পদ্ধতির সকল চলিত প্রথা ও সুরীতি লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচার করা কোন মন্ত্রীর পক্ষেই উচিত কার্য্য নহে। তিনি তাঁহার অদ্ভুত অসভ্য ব্যবহারের দ্বারা শ্রীগাঙ্গুলীকে এমনভাবে প্রত্যুত্তরব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়াতে নিক্ষেপ করেন যাহাতে শ্রীগাঙ্গুলীও নিজের আজীবনের কর্ম্মরীতি ও আচরণ পদ্ধতি কিছুটা ভুলিয়া যান। মূল দোষটা অবশ্যই শ্রীহনুমনতাইয়ার এবং তাহার জন্য তাঁহাকে শ্রীমতী ইন্দিরার জবাবদিহি করিতে বাধ্য করা উচিত। শ্রীগাঙ্গুলীর কোন দোষ ছিল কি না সে কথা যখন বিচার করা হইবে তখন দেখা দরকার হইবে রেলওয়ের পরিচালনা গোলকধাঁধার মধ্যে কোথায় কোন বা শ্বাপদ সরিসৃপ লুকাইয়া লুকাইয়া জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া সামাজিক অপরাধীদিগের উদরপূর্ত্তির আয়োজন করিতেছে।

পাকিস্থানের কাশ্মীর দখল চেষ্টা

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে কাশ্মীর একটি ভারতীয় রাজ্য ছিল। যেমন ছিল নিজামের হাইদ্রাবাদ, জুনাগড় ও অন্যান্য রাজ্যগুলি। ভারত বিভাগের সময় বৃটেন নিয়ম করে যে রাজ্যগুলির অধিকার থাকিবে হয় ভারত নয় পাকিস্থানে যোগ দিবার। কিন্তু বিভাগ হইবার অল্পদিন গত হইতে না হইতে পাকিস্থান নিজ সেনাদিগকে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পার্ব্বত্য পাঠানজাতির মানুষ সাজিয়া কাশ্মীর দখল করিবার চেষ্টা করে। ঐ সকল ছদ্মবেশী পাকিস্থানী সৈন্যগণ নিজেদের স্বভাব অনুযায়ীভাবে কাশ্মীরের নরনারীর উপর নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করে এবং মহা বিপদ দেখিয়া কাশ্মীরের রাজা ভারতের নিকট আবেদন জানান যে কাশ্মীর ভারতে যোগ দিতে ইচ্ছুক ও ভারত যদি অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া কাশ্মীর রক্ষা না করে তাহা হইলে কাশ্মীরের মানুষের সর্ব্বনাশ হইবে। ভারত বিমান ও সৈন্য পাঠাইয়া পাকিস্থানী লুঠেরাদিগকে হটাইয়া কাশ্মীর রক্ষা করে ও পরে পাকিস্থানও স্বীকার করে যে তাহার

সৈন্যগণই কাশ্মীর দখল চেষ্টা করিয়াছে। এই সুযোগে ইয়োরোপ আমেরিকার বৃহৎ বৃহৎ জাতগুলি স্বয়ং নির্বাচিত ভাবে মধ্যস্থতার অভিনয় করিয়া কাশ্মীরের কিয়দংশ পাকিস্থানের হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু সে অন্যায় ব্যবস্থা মানিয়া ল'ন। এইভাবে কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্থান অধিকৃত হয় তাহার নাম দেওয়া হইল আজাদ কাশ্মীর। প্রথম আক্রমণ অথবা দ্বিতীয়বার যখন পাকিস্থান ব্যাপক ভাবে যুদ্ধ করিয়া ভারতকে দমন করিবার চেষ্টা করে তখন নানাভাবে আমেরিকা বৃটেন রুশিয়া ও চীন পাকিস্থানকে সাহায্য করে, কিন্তু পাকিস্থান পরাজিত হয়। বিশ্ব মহাশক্তিমানগণ পাকিস্থান হারিয়া যাইলেও ভারতের উপর চাপ দিয়া কাশ্মীরের অন্যায় ভাবে দখল করা অংশ পাকিস্থানের হস্তেই রাখিবার ব্যবস্থা করে। এখন কাশ্মীরের যে অংশ ভারতের সহিত সংযুক্ত সেই অংশের জনসাধারণ ভারতের অপর সকল লোকের মতই রাষ্ট্রাধিকার সম্ভোগ করে। পাকিস্থানের দখলে যে অংশ সেখানের কিছু মানুষ চীনের অধীনে চলিয়া গিয়াছে ও বাকিরা পাকিস্থানের সামরিক শাসকদিগের গোলাম। সুতরাং মুসলমান স্বাধীনতা যেরূপ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের হইয়াছে। কাশ্মীরের মুসলমান গণ তাহা অপেক্ষা উপভোগ্য কোন ব্যবস্থা আশা করিতে পারে না।

কাশ্মীর যদি ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে আক্রান্ত না হইত তাহা হইলে পরে সেই রাজ্য স্বেচ্ছায় পাকিস্থানে সংযুক্ত হইত না; কারণ কাশ্মীরের রাজার নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিলে তিনি নেপাল ভুটান বা সিকিমের মতই স্বাধীন থাকিতেন। ভারত যে ভারতঅন্তর্গত রাজ্যগুলিকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিল সে ব্যবস্থা কাশ্মীরকে বাদ রাখিয়াই হইত; কারণ কাশ্মীর ভারতের সহিত সংযোগ আকাঙ্খা প্রকাশ না করিলে ভারত বলপূর্ব্বক, পাকিস্থানী আদর্শ অনুসরণ করিয়া, কাশ্মীর দখল করিত বলিয়া মনে করার কোনও কারণ নাই।

বর্ত্তমানে পাকিস্থান যেভাবে ক্রমাগত কাশ্মীরকে "মুক্তি" দান করার কথা তুলিয়া থাকে নির্লজ্জতার উদাহরণ হিসাবে তাহার কোনও তুলনা পাওয়া কঠিন। যে জাতি (?) নিজদেশের সামরিক একাধিপত্য চালাইয়া সবল হস্তে জনসাধারণের নিজস্ব যাহা কিছু সবই কাড়িয়া লইয়া একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির ভোগের জন্য ব্যবহার করে; সেই শাসকগণ কাহাকেও সত্যকার স্বাধীনতা দান করিবে একথা কেহ বিশ্বাস করে না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ

জানিয়া শুনিয়া সহস্র সহস্র অসহায় নরনারী শিশু হত্যা ও বর্ব্বরভাবে নারী নিগ্রহের সমর্থন করা অতি বড় পাপ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নানান অজুহাতে যে পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের মালমশলা সরবরাহ করিয়া চলিয়াছে তাহাতে আমেরিকার দুর্নামের ও পাপের চূড়ান্ত হইতেছে। কিন্তু তাহাতে সে দুষ্কার্য্য বন্ধ হইতেছে না। কারণ আমেরিকা একহাতে বাংলা দেশের নরনারী শিশুর বুকে ছুরি বসাইবার সাহায্য ব্যবস্থা করিতেছে ও অপর হস্তে কিছু কিছু খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি দুস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য আগাইয়া দিতেছে। যাহাকে বলে গরু মারিয়া জুতা দান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালকগণ মনে করিতেছে যে জগৎবাসী এই পাপ-পূণ্য,সু ও কুএর একত্র স্থাপন দেখিয়া ভুলিয়া যাইবে যে পাপের ওজন ও গভীরতা পূণ্যের হাল্কা ও ভাসাভাসা স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করিয়া দেয়। সহস্র লোককে ঠকাইয়া ও খাদ্যাভাবে মরণ যন্ত্রনা ভোগ করাইয়া যদি কোন ব্যবসায়ী কিছু লোকের কর্ণে শাস্ত্রপাঠের সুধা ঢালিবার আয়োজন করিয়া নিজ পাপ ক্ষালন করিবার চেষ্টা করে, তাহার যেরূপ কোনও মূল্য থাকে না; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বাস্তুদিগকে খাদ্য বস্ত্র ঔষধ দানও তেমনি মানবসমাজের চোখে ধুলা দিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

চোখে ধুলা দিবার চেষ্টার আরও অপর প্রমাণ যে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না এমন নহে। যথা, সম্প্রতি একটি বিশ্বাসযোগ্য সংবাদে দেখা গিয়াছে যে আমেরিকার কোনও কোনও ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে

চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুশিয়ায় তৈয়ারী বন্দুকের গুলি ক্রয় করিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে ঐ সকল গুলি পাকিস্থানে পাঠান হইয়াছে। অর্থাৎ চেষ্টা হইতেছে যাহাতে লোকে মনে করে যে রুশিয়া ও তাঁহার সহযোগী কম্যুনিষ্ট জাতিসকল পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য করিতেছে। এইরূপ মতলব যে অতিশয় ও দ্বিগুণভাবে ঘৃণ্য ও জঘন্য সে কথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। প্রথমতঃ হত্যা ও নির্ম্মম অত্যাচারের মাল-মশলা সরবরাহ করা, তদুপরি সেই পাপের বোঝা প্রবঞ্চনা করিয়া অপরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা! সৌভাগ্যের বিষয় ঐ সকল গুলি প্রভৃতি যে আমেরিকান ব্যবসায়ীগণ ক্রয় করিয়াছে তাহার প্রমাণ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রদিগের নিকট আছে।

অতুলপ্রসাদ সেন জন্মশতবার্ষিকী

অতুলপ্রসাদ সেন বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত রচনাকারী ছিলেন। তিনি সুর-সংযোগে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উত্তর ভারতের সঙ্গীত ও সুর সম্বন্ধে ব্যাপক জ্ঞান অর্জ্জন করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন উচ্চশিক্ষিত ও বিশ্বসভ্যতা ও কৃষ্টি বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার পরিবারের বহু গুনী ও জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেদের কর্ম্মশক্তিদ্বারা সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে কীর্ত্তিমান ছিলেন। অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যাহাদের কথা মনে পড়ে তাঁহারা হইলেন স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, সাহানা দেবী, সত্যজিৎ রায়, শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত প্রভৃতি। স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ রাষ্ট্র কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী ছিলেন। সত্যজিৎ বহুগুণাধার ও অন্যরা সঙ্গীতের জন্য প্রখ্যাতা। অতুলপ্রসাদের বহু সঙ্গীত সবিশেষ লোকপ্রিয় ও সেই সকল সঙ্গীত বাংলার জনসাধারণ বহু যুগ গত হইলেও ভুলিবে না। তাঁহার রচিত অনেক ধর্ম্মসঙ্গীত ভক্তদিগের প্রাণে ভক্তিরস জাগ্রত করিয়া লোকপ্রিয় হইয়াছে। জাতীয় সঙ্গীত রচনাতেও অতুলপ্রসাদ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কয়েকটি সঙ্গীতের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে
২। হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
৩। সবারে বাস রে ভালো নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে
৪। মিছে তুই ভাবিস মন। তুই গান গেয়ে যা আজীবন
৫। দাও হে ওহে প্রেমসিন্ধু দাও হে নবীন যুগলে
৬। কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়
৭। ওহে জগত কারণ এ কি নিয়ম তব
৮। এ মধুর রাতে বল কে বীণা বাজায়
৯। ওগো আমার নবীন সাথী ছিলে কোন বিমানে
১০। বল বল সবে শত বেনু বীণা রবে

অতুলপ্রসাদকে বঙ্গবাসী সাধারণ গানের ভিতর দিয়াই চিনিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য অল্প সংখ্যক বাঙ্গালীরই হইয়াছিল। তিনি পশ্চিম ভারতে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান লক্ষ্ণৌ সহরে সমারোহের সহিত করা হইতেছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। তিনি বাংলা মায়ের সুসন্তান ছিলেন এবং দেশের সঙ্গীত ঐশ্বর্য্য তিনি বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিগত ২৮শে আশ্বিন, ইং ১৫ অক্টোবর চাইবাসায় নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের গৃহে হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর। চাইবাসায় তাঁহার নিকট তাঁহার পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন হইতেই হেমন্তকুমারের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছিল। তিনি এই কারণে কলিকাতা হইতে চাইবাসায় গমন করেন ও সেইখানে প্রথমে তাঁহার শরীর কিছুটা উন্নতির পথে যাইলেও সে উন্নতি স্থায়ী হয় নাই। চিকিৎসকদিগের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও শরীরের অসুস্থতা দূর করা সম্ভব হয় নাই; হেমন্তকুমার মাসাধিক কাল হইতে সম্পূর্ণরূপে শয্যাশায়ী হইয়া গিয়াছিলেন।

প্রবাসীর সহিত হেমন্তকুমারের সংযোগ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে। তিনি প্রথমে প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারীর কার্য্য করিতেন ও পরে সেই কার্য্য ত্যাগ করিলেও প্রবাসীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি অসুস্থতা থাকিলেও প্রতি মাসের "বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা" লিখিয়া পাঠাইতেছিলেন। আশ্বিন মাসের প্রবাসীতেও তাঁহার ঐ লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে হাস্যরসাত্মক লেখার জন্য

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হেমন্তকুমার তাঁহার "শনিবারের চিঠি"তে প্রকাশিত কবিতাগুলির জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি "শনিবারের চিঠি"র উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন ও তৎকালীন লেখক সমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। হেমন্তকুমার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপন লেখন ও তাহার নক্সা প্রভৃতি রচনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বহু বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও কারবারের জন্য তিনি বিজ্ঞাপনের কার্য্য ব্যবস্থা করিতেন এবং ইহাই তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে বরাবরই নিজস্থান রক্ষা করিয়া চলিতেন ও আজ তাঁহার মৃত্যুতে বহু সাহিত্যিকই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া শোকসন্তপ্ত হইবেন।

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারাণসী চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান। হেমন্তকুমারের পিতা-মাতা তাঁহার বাল্যকালেই ইহলোক ত্যাগ করেন। হেমন্তকুমার কিছুকাল দার্জ্জিলিংএ জ্যেষ্ঠতাত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট থাকিবার পরে কলিকাতা চলিয়া আসেন ও তৎপরে তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বেই পাঠাদি সম্পূর্ণ করেন। হেমন্তকুমারের কলিকাতা আগমন তাঁহার অসামান্য সহনশীলতা ও দুঃসাহসের পরিচায়ক। ১৯১০ খৃঃ অব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে দার্জ্জিলিং গমন করেন ও সেইস্থলে হেমন্তকুমার ঐ পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তোলেন। তিনি বাল্যকালে স্বভাবে দুর্দ্দান্ত ছিলেন ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়ের সহিত তিনি সর্ব্বদাই ঘোরাফেরা ও অশান্ত কার্য্যকলাপে সহযোগী হইতেন। ১৯১১ খৃঃ অব্দে হেমন্তকুমার হঠাৎ মনস্থ করেন যে তিনি আর দার্জ্জিলিংএ থাকিবেন না। তখন ঘোর বর্ষাকাল। হেমন্তকুমার কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায় রেলওয়ের এগাড়ী সেগাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া কয়েকদিন পরে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। সে দিন সহরের সকল রাজপথ জলমগ্ন ছিল; বিশেষ করিয়া ঠনঠনিয়া কালীতলা অঞ্চল। প্রবাসী অফিস ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাসস্থান ছিল ঐ অঞ্চলেই। হেমন্তকুমার যখন আবক্ষ জল ঠেলিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন তখন ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক বালকের সেই অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিকতা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

হেমন্তকুমার কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া পরে শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হ'ন ও সেইখান হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসেন। পরে তিনি কটকের রেভেনশ কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষা দিয়া উপাধিলাভ করেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ লাগিয়া যায় ও হেমন্ত কুমার কিছুকাল বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোরএ যোগ দিয়া কোয়েটা ডেরা ইসমাইলখান ও মেসোপটেমিয়া ঘুরিয়া আসেন।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রজীবনে হেমন্তকুমার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শান্তিনিকেতন হইতে চলিয়া যাইবার পরেও কবি হেমন্তকুমারকে দেখিলেই তাঁহাকে সাদর সম্ভাষন করিতেন। হেমন্ত কুমার কিন্তু কখনও এই ঘনিষ্টতা দ্বারা নিজের কোনও সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই আত্মনির্ভরতাতে বিশ্বাস করিতেন। বহু বিখ্যাত ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহিত পরিচয় থাকিলেও তিনি সেই পরিচয়কে কখনও নিজের লাভের জন্য ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। শেষ অবধি তিনি এই স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার গৌরবের কথা।

হেমন্তকুমারের পিতা অসাধারণ শক্তিমান ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। রনপা চড়িয়া দ্রুতগতিতে দূরপথ অতিক্রম করা, দীর্ঘ বংশখণ্ড ঘুরাইয়া বহুলোককে হটাইয়া দেওয়া এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করিয়া বন্য ভল্লুক, চিতাবাঘ প্রভৃতি শিকার করার জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। হেমন্তকুমার পিতার দৈহিক শক্তি ও

সাহস অনেকটা পাইয়াছিলেন। তিনি খেলাধূলা, সন্তরণ প্রভৃতিতে বিশেষ পারগ ছিলেন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে কয়েকজন বন্ধুর সহিত হেমন্তকুমার পুরীধামে গমন করেন। সেখানে প্রায় প্রত্যহই স্বর্গদ্বারের নিকটে সমুদ্রে অবতীর্ণ হইয়া হেমন্তকুমার ও তাঁহার ঐ চার পাঁচজন বন্ধু ঢেউয়ের প্রাকার অতিক্রম করিয়া বাহির সমুদ্র পথে সন্তরণ করিয়া চক্রতীর্থে আসিয়া সন্তরণ শেষ করিতেন। প্রসিদ্ধ সাঁতারু স্বর্গীয় হিমাংশু গুপ্ত এই দলের সহিত সাঁতারে নামিতেন। উচ্ছল উর্মিমালার ভিতর দিয়া বাহির সমুদ্রে যাওয়া ও আবার সেই তোড়ের ভিতর দিয়া সমুদ্র সৈকতে প্রত্যাবর্ত্তন করা সন্তরণের দিক দিয়া সহজ কার্য্য নহে। ইহা ব্যতীত প্রায় এক মাইল সমুদ্রে সন্তরনের কথাও ছিল। সাহসের কার্য্যে তিনি সদা অগ্রগামী ছিলেন এবং জীবনে নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির সম্মুখীন হইতে তাঁহাকে কখনও পিছনে হটিতে দেখা যায় নাই। সুযোগ সুবিধার অভাব তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল। তাহা হইলেও তিনি জীবনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই পার্থিব জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক স্বাস্থ্যহানী ও মৃত্যু না হইলে তিনি আরও বহু বৎসর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে আনন্দ দান করিতে পারিতেন; কারণ তাঁহার রসবোধ ও আসর জমাইয়া রাখিবার ক্ষমতা ছিল অনন্যসাধারণ। বন্ধুর সংখ্যাও ছিল তাঁহার অগণ্য। শান্তিনিকেতনে থাকিতেই হেমন্তকুমার সঙ্গীত ও অভিনয়ে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অভিনয়ে বহুবার রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে বিভিন্ন নাটকে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় "শারদোৎসবে" ও পরে "বিসর্জ্জন' ও "বাল্মীকী প্রতিভায়" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকায় হেমন্তকুমারকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। তিনি রসজ্ঞ ছিলেন ও সেই কারণে তিনি কৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই রসবেত্তাদিগের নিকট সমাদৃত হইতেন।

জীবন সফলতা বিফলতার ক্রীড়াঙ্গন। সেই কারণে যাহার জীবন পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য অপূর্ণতার সহিত সংগ্রামে অবিরাম আবেগে নিযুক্ত থাকিয়া আজ অজানার ক্রোড়ে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কবির ভাষায় বলা যায়:—

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল।
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে সে হয়ত আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।।
সে হয়ত দেখিয়াছে পড়ে যাহা ছিল পাছে
আজ তাহা আগে,
ছোট যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন,
বড় হয়ে জাগে।

———

দ্বিজেন্দ্রলাল

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতের প্রথম লর্ড, বঙ্গদেশের সুসন্তান সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ বলিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ন্যায় অমন একজন অপূর্ব্ব প্রতিভান্বিত ব্যক্তি জীবিতকালে তাঁহার দেশবাসীদের নিকট হইতে যেটুকু সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন তদপেক্ষা বহুল পরিমাণের সমধিক মর্য্যাদা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ছিল।" তাঁহার দেহাবসানের পরও উপযুক্ত সম্মান তিনি পান নাই। ইহাই আমাদের জাতির দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতা দূর করার একমাত্র উপায় ঈদৃশ ব্যক্তিদিগের জীবনালেখ্য শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করা; তাঁহাদিগের অনন্য সাধারণ গুণাবলীর সম্যক আলোচনা করা। ইতিপূর্ব্বে প্রবাসী পত্রিকায় সে কার্য্য কিছু করিয়াছি। আজও সেই কাজই কিছু করিব। দ্বিজেন্দ্রলালের বিচিত্র জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ জানাইব।

১২৭০ সালে ৪ঠা শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর মহারাজগণের দেওয়ান ছিলেন। তিনি যেরূপ সরল ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, সেইরূপ আবার নির্ভিক ও তেজস্বী। পরোপকার ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তাঁহার ন্যায় আচারবান, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অথচ উদার চরিত্রের লোক খুব অল্পই ছিল। এই সকল কারণে প্রাতঃ স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুসাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্ত, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যগুরু দীনবন্ধু মিত্র, মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন, মহাকবি মধুসূদন দত্ত, বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বাঙলা দেশের অনেক গুণী ও জ্ঞানী কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের গুণমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। তিনি বাংলা, পার্শী ও ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচনা শক্তিও অনুপম ছিল। তৎপ্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত, ও আত্মজীবন চরিত" ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি সুকণ্ঠ, সুভাষী ও সুরসিকও ছিলেন। তিনি সুগায়কও ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা প্রসন্নময়ী দেবী শান্তিপুরের শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের বংশোদ্ভূতা। তিনি সরলা, স্নেহশীলা ও অতি কোমলহৃদয়া ছিলেন। আশ্রিত, অনুগত, অতিথি সজ্জনের প্রতি তাঁহাকে সততই সেবাপরায়ণা, ও মমতাময়ী দেখা যাইত। কটুবাক্য প্রয়োগ বা পরনিন্দা করিতে কেহই তাঁহাকে দেখে নাই। তিনি নিরভিমানিনী ও অহঙ্কার লেশশূন্যা ছিলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও আত্মসম্মান জ্ঞান তাঁহার সহজাত ছিল।

কৃষ্ণনগরের দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও বাল্যকালে অতিবাহিত হয়। পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানা দুর্ঘটনা ও দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বরে তিনি মৃত্যুমুখে কয়েকবার পতিত হইতে হইতে দৈবানুগ্রহে বিপদমুক্ত হন।

প্রকৃতির কোলে দ্বিজেন্দ্রলাল মানুষ হইয়া ছিলেন। গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে ফুল তুলিয়া, পাখীর পিছনে ছুটিয়া,

নীল আকাশে উজ্জ্বল তারকারাশির দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া তাঁহার কাটিত। বাড়ীতে গানের আসর বসিত। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হইত। এই পরিবেশে শৈশবকালেই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ হইতে দেখা যায়। সুরলয়ের কানও তৈয়ারী হয়। শিশু কবি শশধরকে সম্বোধন করিয়া কখনও বলেন—

"গগনভূষণ তুমি জনগণ মনোহারী,
কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভোচারী।"

কখনও বা নক্ষত্রপুঞ্জের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়া উঠেন—

"কে বল সৃজিল তোমারে,
কেবল সৃজিয়া দিল রে রাখিয়া সুদূর অম্বরে।"

শিশুকাল হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিলেন। সমবয়স্ক বালকদিগের ন্যায় বিবধ ক্রীড়ায় মত্ত হইতেন না। হয় নয়ন মেলিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন, না হয় একাগ্রচিত্তে আত্মহারা হইয়া কবিতা লিখিতেন। স্বভাব বৈরাগী ছিলেন তিনি। বেশভূষায়, দেহের পারিপাট্যে তাঁহার মন ছিল না। মায়া ছিল না নিজের ব্যবহৃত জিনিসপত্রে। কেমন একটা ঔদাসীন্য তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের য়্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ। সংসারের সকল বিষয়ে তিনি আনমনা ও উদাসীন থাকিলেও পাঠ্য বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অসামান্য ছিল তাঁহার মেধা ও স্মরণশক্তি। সাধারণ বালক বালিকার যে পাঠ অভ্যাস করিয়া আবৃত্তি করিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিত, তিনি তাহা পনের কুড়ি মিনিটেই করিতে পারিতেন। ছয়-সাত বৎসর বয়সে তাঁহার পিতাকে হারমোনিয়াম সংযোগে গান গাহিতে দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুক্ষণ পরেই সেই গানখানি হারমোনিয়াম বাজাইয়া গাহিয়া শুনাইয়া দিলেন এতই অসাধারণ ছিল তাঁহার মনঃ-সংযোগ।

বাল্যকাল হইতেই সত্যনিষ্ঠ ও আত্মমর্য্যাদা শীল ছিলেন। অতি শৈশবে গুরুজনদিগের আদেশে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে না পারায় তাঁহাকে নীরবে ক্রন্দন করিতে দেখা গিয়াছে। পথ ভুলিয়া পথে পথে বেড়াইয়াছেন তবু ছোট হইয়া যাইবার আশঙ্কায় কাহাকেও পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে উদ্ভাবনী ও কল্পনা শক্তির উন্মেষ দেখা যায়। বক্তৃতা দেওয়ারও তাঁহার খুব ঝোঁক দেখা যাইত। অনুশীলনের অভাবে তাঁহার এই শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। জীবনে যে কয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতেই সুবক্তা বলিয়া তিনি সম্মান পাইয়াছিলেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পান। তখন তাঁহার স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়া জ্বরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, এবং শরীরও অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। সেই কারণে তাঁহার আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ-এ, পাশ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাশ করেন হুগলী মহসীন কলেজ হইতে। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই।

তাহার পর এম-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বরে অবিশ্রান্ত ভুগিয়া জীবনে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা, কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী প্রসন্নময়ীদেবীর সহিত দেওঘরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠাইয়া দেন। সেখানে কয়েক মাস থাকিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হইল। এই স্থানেই প্রসন্নময়ীর মাধ্যমে ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের সুন্দর মুখ, মধুর গান, তদপেক্ষা মধুর স্বভাব

রাজনারায়ণবাবুর স্নেহ আকর্ষণ করে। তিনি প্রসন্নময়ীদের বাড়ীতে আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত গানে, গল্পে, নানাবিধ সদালোচনায় প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতেন। অনেক সময় স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তজ্জন্য রাজনারায়ণবাবুকে গৃহিণীর নিকট অনুযোগ শুনিতে হইত।

পরীক্ষার মাস দুই পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দুই মাসের মধ্যে এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তিনি হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেজদাদা সুপণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রলাল তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষা দেওয়াইলেন। ফল বাহির হইলে দেখা গেল দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া অনার্সের সনদ (Certificate of honour) পাইয়াছেন।

ইংরাজী সাহিত্য তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি প্রয়োজন হইলে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারিতেন।

অসামান্য প্রতিভা ও অনন্য সাধারণ স্মৃতিশক্তি থাকা সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকাল হইতেই গম্ভীর প্রকৃতি ও লাজুক (shy) ছিলেন। কর্ম্ম জীবনে অবসরের অভাবে এবং স্বভাবসুলভ লাজুকতার (shyness) জন্য তাঁহার বক্তৃতাও দিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি ক্রমে লোপ পাইতে থাকে। তাঁহার বাড়ীর বৈঠকী মজলিসে এক এক দিন কোন কল্পিত বিষয়ে সেচ্ছায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া দুই এক ছত্র বলিয়াই বসিয়া পড়িতেন। তখন সকলে হাসিয়া উঠিলে, নিজেও হাসিতে হাসিতে গান ধরিতেন—

"দেখ হতে পার্ত্তাম আমি নিশ্চয় বক্তা ও অদ্ভুত
কিন্তু, দাঁড়ালেই হয় স্মরণ-শক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত।
আর মুখস্ত বুলি এ, এমন বেড়ায় যায় সব ঘুলিয়ে,
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী-ভাবগুলি হে।
তা হাজার কাশি, আদর করি দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈঠকখানা বক্তা চটে মোটেই তো।
তা নইলে এক ভারি.........ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ লাজুক ছিলেন বটে, কিন্তু যাহা অবান্তর ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে কখনও পশ্চাদ্-পদ হইতেন না। যখন তিনি কৃষ্ণনগর স্কুলের ওপরের শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার কয়েকজন সতীর্থে ও ছাত্রবন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া একটি "চাদর নিবারণী সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। এই দরিদ্র দেশে জামার উপর চাদর অনাবশ্যক, এবং তাহাতে বৃথা অর্থব্যয় হয় মনে করিয়া, কেহ যাহাতে চাদর ব্যবহার না করেন তাহার জন্য আন্দোলন করিতে থাকেন। বালকবৃন্দের সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই বিষয়ে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়ার ফলে বালক সম্প্রদায়ের মধ্যে অচিরে চাদর ব্যবহার উঠিয়া যায়।

বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে ইহাতে বিশেষ কৌতুক অনুভব করিলেন বটে, কেহ কেহ আবার বিরক্তও হইলেন। ইহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া অনেকে আবার চাদর পরিত্যাগ করিলেন। পরে একদিন দ্বিজেন্দ্রলালই তাঁহার "নূতন কিছু কর" প্রসিদ্ধ হাসির গানে—

'ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শাগ্‌গীর ধুতি চাদর নিবারণী সভা"।

বলিয়া যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টি করেন। তাহা হইলেও চাদর ছাড়া হিসাবে তিনিই প্রথম অগ্রণী ছিলেন।

যেখানে আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ, এবং মনুষ্যত্ব বিপন্ন সেখানেও লাজুক দ্বিজেন্দ্রলাল বীর-বিক্রমে রুখিয়া দাঁড়াইতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন এম-এ ক্লাসের ছাত্র। গড়ের মাঠে 'কলিকাতা সর্ব্বজাতীয় প্রদর্শনী' (Calcutta International Exhibition) এর প্রথম অনুষ্ঠান। কলেজের ছুটির পর এক শনিবারে কয়েকজন সহাধ্যায়ীর সহিত তিনি প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই

দিনই পুরুষ সঙ্গীহীনা কতিপয় ভদ্রমহিলাও কেবল দাসী সঙ্গে লইয়া প্রদর্শনী দেখিতে আসেন। কতক-গুলি অভদ্র ফিরিঙ্গী যুবক তাঁহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া জঘন্য ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিল। ভদ্রমহিলাগণ এইরূপ অসভ্য আচরণে উত্যক্ত ও লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও ভয়, লজ্জা ও সঙ্কোচে কিছু বলিতে বা করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ক্রোধে, ঘৃণায় ও অপমানে উদ্দীপ্ত হইয়া একাকীই সেই বর্ব্বর যুবকদিগকে উচিত-মত শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন।

ফিরিঙ্গী যুবকেরা এই "ভেতো" বাঙ্গালীর ঔদ্ধত্য ও আস্পর্দ্ধা দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে অতি কদর্য ভাষায় গালি দিল, তাহাতে দ্বিজেন্দ্রলালকে পশ্চাৎপদ হইতে না দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। প্রদর্শনী ক্ষেত্রের মধ্যেই মারামারি দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিলে পাছে তিনি বিপদে পড়েন, এই আশঙ্কায় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে এবং সেই ভদ্রমহিলা-গণকে কোন প্রকারে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিপন্ন মহিলাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রদর্শনীর সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া দেখিলেন ফিরিঙ্গী যুবকেরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। বেগতিক বুঝিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীরা নিজ নিজ পথ দেখিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন একাকী আটদশ জন ফিরিঙ্গী নন্দনের ওপর মুষ্ঠাঘাত আরম্ভ করিলেন। দলপতিকে নাক ভাঙ্গিয়া রক্তাপ্লুত মুখে প্রথমেই ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া সকলে মিলিয়া একযোগে দ্বিজেন্দ্রলালকে আক্রমণ করিল। দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। অঝোরে রক্ত ঝরিতে লাগিল তথাপি তিনি বীর-বিক্রমে মুষ্টাঘাত করিয়া যাইতে বিরত হইলেন না। এই অসম যুদ্ধ দেখিয়া বহুসংখ্যক বাঙালী যুবক প্রথমে নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহারাও একযোগে ফিরিঙ্গী যুবকদিগকে আক্রমণ করিলেন। তখন তাহারা যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল।

ধূলিম্লান, শোনিতসিক্ত, ক্ষতবিক্ষত দেহে দ্বিজেন্দ্রলাল ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন সেই ফিরিঙ্গী দলপতি এক স্থান হইতে তাঁহাকে ইঙ্গিতে ডাকিতেছেন। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে সেই অবস্থাতেই যুদ্ধাভিলাষী হইয়াই তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে ফিরিঙ্গী দলপতি তখন অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে হস্ত প্রসারণ করিয়া বিনীত অভিবাদনে দ্বিজেন্দ্রলালের করমর্দ্দন করিলেন, এবং নিজেদের ঘৃণিত আচরণের জন্য ক্ষমা ভিক্ষাও করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাহার পর দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ তেজস্বিতা, সৎসাহস ও আদর্শ নৈতিক বলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সসম্মানে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

আর একদিনের ঘটনা। দ্বিজেন্দ্রলাল একজন সমবয়স্ক সুহৃদের সহিত ট্রামে করিয়া কলিকাতার "ইডেন উদ্যানে" বেড়াইতে যাইতেছিলেন। তখন ট্রাম গাড়ী ঘোড়ায় টানিত। তাঁহারা দুজনে পাশাপাশি যে বেঞ্চিতে বসিয়াছিলেন ঠিক তাহার সম্মুখের বেঞ্চিত বসিয়াছিলেন একজন সাহেব। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সাহেবটি তাঁহার বুটমণ্ডিত দক্ষিণ পদটি উভয় বন্ধুর মধ্যস্থলে অল্প পরিসর যে স্থানটুকু ছিল তাহাতে তুলিয়া দিয়াছেন। সাহেবের এইরূপ অভদ্র আচরণ দেখিয়া পাখানি নামাইয়া লইতে দ্বিজেন্দ্রলাল বার দুই অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সাহেব সে অনুরোধ রক্ষা না করিয়া 'নিগার' বলিয়া তাঁহাকে গালি দিল। তেজস্বী দ্বিজেন্দ্র লাল আর কিছু মুখে না বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং এক পদাঘাতে সাহেবের চরণখানি বেঞ্চি হইতে নামাইয়া দিলেন এবং সদর্পে তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সাহেব ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝিয়া ট্রাম হইতে সত্বর নামিয়া গেলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল সসম্মানে এম এ পাশ করিলেন বটে, কিন্তু মারাত্মক ম্যালেরিয়া জ্বর তাঁহাকে

তখনও ছাড়িল না। এই সময় তাঁহার অগ্রজ নরেন্দ্রলাল রায় মধ্যপ্রদেশে ছাপরা জেলায় ব্যাভেলগঞ্জ নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। লেখাপড়া শিখিয়া ঘরে বসিয়া থাকা মনঃপুত না হওয়ায় এবং স্থান পরিবর্ত্তণে দুর্দান্ত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে যদি অব্যাহতি পান এই আশায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার দাদার স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া ব্যাভেলগঞ্জে চলিয়া যান।

দুই মাস পরেই তিনি সরকারী চিঠি পাইলেন—এম-এ পরীক্ষায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তিনি সরকারী বৃত্তি লইয়া কৃষি বিদ্যা শিক্ষার্থে বিলাতে যাইতে অনিচ্ছুক, দ্বিজেন্দ্রলাল যদি এই বিষয়ে স্বীকৃতি দেন, তাহা হইলে সরকার বাহাদুর তাঁহাকেই সেই বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইবেন।

এই পত্র পাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে গমনের সংকল্প করিলেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে পিতামাতার সম্মতি পাইবেন কিনা সে বিষয়ে তাহার মনে বিশেষ সন্দেহ জাগিল। উদারমতি কার্ত্তিকেয়চন্দ্র তাঁহাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন—বিলাত যাইলে তাঁহাকে কিরূপ সামাজিক পীড়ন সহ্য করিতে হইবে এবং অন্যান্য নানা অসুবিধার মধ্যেও পড়িবেন। আবার ইহাও বলিলেন জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সমুদ্র যাত্রায় তিনি নিজে কোন প্রকার বাধা দিতে চাহেন না। স্নেহময়ী জননীর অনুমতি পাওয়া কিন্তু কঠিন হইল। তবে যখন তিনি শুনিলেন বিলাতে গিয়া কিছুদিন থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলাল ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া সত্বর সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিবেন, তখন তিনি অনুমতি দিলেও তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল—"দ্বিজুর সহিত তাঁহার আর দেখা হইবে না।" কাজেও তাহাই ঘটিল। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে যাইবার পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার মাতা স্বর্গারোহন করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মনেও এ আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। যাত্রার মুহূর্ত্তে তিনি ভাবিয়াছিলেন কোন প্রকারে বিলাত যাত্রায় বাধা পড়িলে ভাল হয়। তবুও তাঁহাকে যাইতে হইল; এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তাহার পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। এই ঘটনা তাঁহার মনে এরূপ আঘাত দিয়াছিল যে তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন—মানুষের মনের ওপর সময়ে সময়ে এবং অবস্থা বিশেষে ভাবী বিপদের ছায়া পড়ে।

১২৯২ সালের ২রা কার্ত্তিক, ইংরাজী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর জাহাজ ছাড়িল। দ্বিজেন্দ্রলালই সে জাহাজে একমাত্র বাঙ্গালী যাত্রী। পথে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া অবশেষে লণ্ডনে গিয়া পৌঁছিলেন। শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য লণ্ডনেই অবস্থান করিতেছিলেন। উত্তর জীবনে তিনি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বনামধন্য অধ্যক্ষ হন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দাদা জ্ঞানেন্দ্রলালের সহিত গিরিশ চন্দ্রের পরিচয় ছিল। তাঁহার পত্র পাইয়া গিরিশবাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে জাহাজ ঘাট হইতে নিজ আবাসে আনিলেন। সেখানে উপযুক্ত স্থানের অভাবে অন্য বাড়ীতে দ্বিজেন্দ্রলালের থাকার ব্যবস্থা হইল। তখন তিনি "সিরেন সেষ্টার" (Cirencester) কলেজে নিয়মিত পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন—নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ রায়, ভূপালচন্দ্র বসু, এবং গিরিশচন্দ্র বসু। আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, এবং লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত লণ্ডনেই দ্বিজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ঘটে। আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার বাল্যবন্ধু ছিলেন। ইঁহারা সকলেই চিরজীবন দ্বিজেন্দ্র লালের অকৃত্রিম সুহৃৎ ছিলেন এবং উত্তর জীবনে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় তিন বৎসর মিসেস হারমার (Mrs Harmar) নামে এক ভদ্র মহিলার সংসারে খরচ দিয়া (as paying guest) বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি পুত্রসন্তান ছিল। ভদ্র মহিলা দ্বিজেন্দ্রলালকে নিজ সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন ও আদর-যত্ন করিতেন।

বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট বলিতেন—"বিধাতা আমাকে দুইটি পুত্র দিয়াছিলেন, আর একটি আমি ভাগ্যবলে অর্জ্জন করিয়াছি। এটি আমার তৃতীয় পুত্র। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহাকে নিজ মাতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং আজীবন তাঁহার অসীম স্নেহের কথা স্মরণে রাখিয়াছিলেন। যখনই মিসেস গারমারের কথা উঠিত, দ্বিজেন্দ্রলাল সসম্ভ্রমে দুই হাত তুলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন।

নিজের সকল বিষয়ে উদাসীন হইলেও তাঁহার তেজস্বীতার অভাব ছিল না। স্বদেশের বা স্বজাতির নিন্দা তিনি কোনও দিনই সহ্য করিতে পারেন নাই। একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের "রিজেন্ট পার্কের" মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় একজন পাদরী মহা চীৎকার করিয়া বক্তৃতা দিতেছেন, এবং তাঁহার চারদিকে বহুলোক জড় হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বক্তৃতা শুনিবার জন্য সেখানে দাঁড়াইলে পাদরী সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"And you, the Devil is staring you in the face"—শয়তান তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিই এই কটুবাক্য প্রযুক্ত হইল বুঝিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—"yes you are"—"হ্যাঁ তুমিই তাকাইয়া আছ বটে।" মুখের মত জবাব পাইয়া তিনি নিরস্ত হইলেন, এবং সমবেত সকল লোকই হাসিয়া উঠিল।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষি বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া এফ,আর,এ,এস (F.R.A S.) উপাধি লাভ করেন। সেই সঙ্গে রাজকীয় কৃষি কলেজ ও কৃষি সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া এম্-আর-এ সি, এবং এম্-আর এস-এ-ই (M. R. A. C. and M. R. S. A. E) উপাধিও প্রাপ্ত হন। তিন বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারাক্রান্ত মনে, অবসন্ন হৃদয়ে ও শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

যে আশায় দ্বিজেন্দ্রলালকে বিলাতে পাঠান হইয়াছিল সে আশা পূর্ণ হইল না। ছোট লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎকার কালে তিনি যেরূপ স্বাধীনভাবে ও সরল চিত্তে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন তাহার ফলে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর দ্বিজেন্দ্রলাল সামান্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম পাইলেন। অথচ তাঁরই ন্যায় কৃষি বিদ্যা লাভ করিয়া বিলাত প্রত্যাগত আর একজন বাঙালী "সিভিলিয়ান" (Statutary Civilian) হইলেন।

ভাগ্যের পরিহাস এই স্থানেই শেষ হয় নাই। সামাজিক পীড়নও আরম্ভ হইল। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সামাজিক অনুষ্ঠানে এবং নানাবিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার সহিত একটু বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিল। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং তাঁহাকে 'একঘরে' হইতে হইল। ইহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেও সমাজের নিকট নতি স্বীকার করিলেন না। নিজেই দূরে সরিয়া গেলেন।

আত্মীয় স্বজনের এইরূপ ব্যবহারে তিনি মনে যে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহার ফলে 'একঘরে' নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। এই পুস্তিকায় হিন্দুসমাজের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা বেশ শ্লেষপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হইল। উত্তর জীবনে তাঁহার রচিত "রানা প্রতাপ" "মেবার পতন", প্রভৃতি নাটক গুলিতে বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—সামাজিক দুর্ব্বলতাই জাতিকে ক্রমশঃ বলহীন করিয়া পরাধীনতায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পর কয়েকমাস রায়পুরে থাকিয়া তাঁহাকে জরিপ ও জমাবন্দির কাজ (survey and settlement) শিখিতে হইয়াছিল। তাহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময় একদিন স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ীর গৃহে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুন্দরী ত্রয়োদশীকে দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল মুগ্ধ হন। ঠিক সেই সময় তাঁহারই কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। তাঁহার অগ্রজেরাও দ্বিজেন্দ্রলালের সম্মতি আছে জানিয়া এ শুভকার্যে অগ্রসর হন। তখন তিনি এ বিবাহে একটি সর্ত্ত করিলেন। তিনি বলিলেন—"এক কপর্দ্দকও পণ গ্রহণ করিলে তিনি এ

বিবাহ করিবেন না এবং বিবাহ কার্য্য হিন্দুমতে হইবে।

এ সকল বিষয়ে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইল না বটে কিন্তু সামাজিক কিছু বাধা থাকায় আত্মীয় স্বজনের ঠিক সহানুভূতি ও সহযোগীতা পাওয়া গেল না। তাহা হইলেও ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (ইংরাজী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) শুভলগ্নে এই শুভকার্য নিষ্পন্ন হইল। নববধূকে কৃষ্ণনগরে আনা হইলে, এ বিবাহে সমাজের কেহ স্পষ্ট বিরুদ্ধবাদী না হইলেও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত প্রকাশ্যভাবে কেহ কোন সামাজিক আচার ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজদিগের সহযোগে তাঁহার দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখ ও শান্তির হইয়াছিল। সুরবালা ক্রমে সুগৃহিনী এবং সুমধুরা সহচরী হইয়া উঠিলেন। এমন শৃঙ্খলতার সহিত সংসার চালাইতে শিখিলেন যে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ হইতে এমন কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন যাহার দ্বারা কলিকাতায় "সুরধাম" নির্মিত হইল। তাঁহাদের সম্মিলিত জীবন মনে হইত—

"যেন একটা লাগাও ছুটি,
যেন একটা অবিশ্রান্ত গীতি,
যেন একটা মলয় হাওয়া,
যেন শুদ্ধ ভেসে যাওয়া,
যেন একটা স্বপ্নরাজ্যেস্থিতি।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তাঁহাদের প্রথম সন্তান দিলীপকুমার জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সন্তান—কন্যা "মায়া" ভূমিষ্টা হন।

বিবাহের পর দ্বিজেন্দ্রলাল সহকারী সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার হইয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী "শ্রীনগর ও বেনেলী ষ্টেট" জরিপ করিতে যান। তখন তিনি মুঙ্গের ফোর্টের ৫নং বাংলায় বাস করেন।

উত্তর কালে বাঙ্গালী সাহেবদের তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করিলেও বিলাত হইতে ফিরিয়া কয়েক বৎসর উগ্র সাহেবী ভাবাপন্ন ছিলেন। এমন কি তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া দাঁড়াইল—Mr. Dwijen Lala Ray (মিষ্টার দ্বিজেনলালা রে)। মনেহয় এই সাহেবিয়ানার ফলেই তিনি জনসাধারণের নিকট মিষ্টার ডি-এল-রায় নামে পরিচিত হন।

মুঙ্গেরে থাকিতে ভাগলপুরে তাঁহার "রাঙ্গা দাদা" হরেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ী গিয়া সস্ত্রীক কিছুদিন থাকিয়া আসেন। সেই সময় সুরসিক পাঁচকড় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই পরিচয় তন্মুহূর্ত্তেই গাঢ় বন্ধুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরস্পরের সম্বোধন "আপনি" হইতে তুমিতে আসিয়া দাঁড়ায়।

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া ওঠেন। নিজগৃহ ও সমাজে স্বাধীনা ও শিক্ষিতা মহিলা দেখিতে চান ববং পরিচিত সকলকেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে বলেন। তাহার জন্য সংসারে মাঝে মাঝে অম্লমধুর কথাও তাঁহাকে শুনিতে হয়।

কর্ম্ম জীবনের প্রথমাবস্থা হইতেই তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যানুরাগ, সত্যানুরক্তি, এবং অসহায় দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোন অন্যায় উৎপীড়ন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অন্যায় অত্যাচার দেখিলেই তাহার প্রতিকারে বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এরূপ প্রবল ছিল যে কোন কিছু করা একবার উচিত মনে করিলে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। ইহাতে অনেক সময় তাঁহার ঐহিক উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিত। তাহার স্পষ্টবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বারই তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

সেই সময় বাঙ্গলার ছোটলাট ছিলেন স্যার চার্লস্ এলিয়ট্। প্রজাদিগের উদ্বৃত্ত জমির উপর খাজনা নির্দ্ধারণের অব্যবস্থা লইয়া তাঁহার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের মতান্তর ঘটে। এই লইয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিমত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইলে তিনি এ যাত্রা অব্যাহতি পান। তাঁহার স্বাধীন-চিন্ততা, সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য উর্দ্ধতন

কর্ম্মচারীদিগের সহিত সকল সময় তিনি একমত হইতে পারিতেন না বলিয়া তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপেই কর্ম্মজীবন শেষ করিত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদের যোগ্যতা থাকিলেও তাঁহাকে সে পদ হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। তাহাতে তিনি কোনও দিনই দুঃখপ্রকাশ করেন নাই। বরং সৎপথে ও স্বধর্ম্মে থাকিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন।

এই সময় হইতে তিনি আবার কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। আর্যগাথা ২য় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার হাসির গান বাঙ্গলা সাহিত্যে অভিনব। বিলাতী humour বা ব্যঙ্গ এ দেশে আমদানি করিয়া এ দেশের শ্লেষের মাদকতা উহার সহিত মিশাইয়া বিলাতী সুরে হাসির গান রচিত হইত। উহা নিজেই গাহিয়া সকলকে শুনাইতেন। দেশের লোক উহা শুনিয়া মুগ্ধ হইত।

মুঙ্গেরে থাকিতে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সুসাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মুঙ্গেরে বদলি হইয়া আসিলে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত চর্চ্চার বিশেষ সুযোগ ঘটে। সুরেন্দ্রবাবুও সুগায়ক ও ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল জরীপ বিভাগ হইতে আবগারী বিভাগের প্রথম পরিদর্শক পদে নিযুক্ত হন। এই পদে সাত আট বৎসর থাকিয়া কার্য্যোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। নব নব নৈসর্গিক শোভা দর্শনে তাঁহার সহজে কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে থাকে এবং বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়া মানব চরিত্র পর্যবেক্ষণেরও সুযোগ ঘটে। সাহিত্যজীবনে এই দুইটি অভিজ্ঞতাই তাঁহার বিশেষ কাজে লাগে।

এই সময় কলিকাতার কোন কাজে আসিয়া হ্যাট কোট পরিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবাসী অফিসে পাঁচকড়ি বাবুর সহিত দেখা করিতে আসেন। নত হইয়া প্রণাম করিবার কালে তাঁহার প্যান্টের একটি বোতাম ছিঁড়িয়া যায়। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ঘরে বসিয়াই তিনি পাঁচকড়িবাবুকে বলিলেন—"তুমি বঙ্গবাসীর 'এডিটর' (editor) গোঁড়াদের সর্দ্দার, তোমার এখানে আসিতে ভয় করে।" দৈবক্রমে সে দিন সে স্থানে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন মাথা নাড়িয়া বলেন—"হুঁঃ পাতিদের সর্দ্দার। কমলা শ্রীহট্টে জন্মায়, সে কমলার চাষ বাঙ্গলার মাটিতে করিলে গোঁড়ায় পরিণত হয়। পাঁচু এ দেশেরই ; পাতি, বড় জোর যদি শ্রদ্ধা করিয়া বলত, কাগজী বলিলেও বলিতে পার। ইন্দ্রনাথবাবু 'হিতবাদী' পত্রিকায় 'বুদ্ধের বচন' লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সকল লেখাই বেশ সরস অথচ শ্লেষপূর্ণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল অমনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—আপনার নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কেমন ? কারণ এখন উপহাস রসিকতা এক ইন্দ্রনাথ ব্যতীত আরতো কাহারও নাই।" ইন্দ্রনাথও তৎক্ষণাৎ বলিলেন—তোমাকেও চিনিয়াছি। তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল।" এইভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত ইন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। লেখার মাধ্যমে দুইজনই দুইজনকে চিনিতেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বেশ কিছুদিন সাহেবিয়ানা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহজ উদারতা, অমায়িকতা ও স্বাজাত্যমান তাঁহাকে বেশী-দিন সাহেব সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাষায় বলা যায়—"বিলাত থেকে তিনি যে ক্লোক (cloak)টি নিয়ে এসেছিলেন সেটি যেন কোথায় খুলে পড়ে গেল।" সরল, উদার, নির্ভীক, সদানন্দ পুরুষ—যাকে বলে খোলাপ্রাণ সকলের সঙ্গেই সমভাবে মিশতেন। গ্রামে পল্লীতে বা শহরে যেখানেই দ্বিজেন্দ্রলাল কর্ম্মোপলক্ষে যাইতেন সেইখানেই তিনি হর্ষ, কৌতুক, কবিত্ব ও রসিকতায় সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন।

অভিনয়ের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। বিলাতী থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া দেশী থিয়েটারও দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কুরুচিদর্শনে অন্তরে ব্যথা

পাইলেন। সেই মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পাইল তাঁহার রচিত "কল্কী অবতার" নাটিকায়। ইহাতে নাট্যকারের অসামান্য লিপি চাতুর্য্য ও ব্যঙ্গ দক্ষতা সুচারুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম বয়সে দ্বিজেন্দ্রলাল বেশ লাজুক (shy) ছিলেন। তজ্জন্য লোক সমাজে বড় একটা মিশিতে পারিতেন না। কর্ম্মজীবনে সে লাজুকতা ক্রমে দূর হইয়া যায়। বাঙ্গলাদেশের বহুস্থান তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হর্ষমুখর হইয়া উঠে। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও সাহিত্যালোচনা ও হাস্যকৌতুকে একটা সুস্পষ্ট সাড়া পড়িয়া যায়। কিছুকালের মধ্যে 'ভারত সভার' সদস্য হইয়া নানা শ্রেণীর লোকের ভিতর সুপ্রতিষ্ঠ হন। এই সময়ই কতকগুলি ইংরাজী হাসির গানের বাঙ্গলা অনুবাদ করেন এবং তাহাতে বিলাতী সুর বসান।

এই সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধের দোকানে (Imperial Druggists Hall) দিন দুপুরে ডাকাতি হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁহার বন্ধুরা "ডাকাত ক্লাব" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার সদস্যদিগকে "লক্ষ্মীছাড়ার দল" আখ্যা দেন। এই ক্লাবের প্রথম সভাপতি হন—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্যামাচরণ মিত্র। প্রতি রবিবার সকালেই এই ক্লাবের সকল সদস্য একস্থানে সমবেত হইতেন। সারাদিনটাই এইখানেই কাটিত। অনেক সময় রাত্রের আহারেরও আয়োজন হইত এবং গান, গল্প, পাঠ, আবৃত্তি, তর্ক-বিতর্কে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিতেন। লক্ষ্মীছাড়ার দল পর্য্যায়ক্রমে ডাকাতের দলকে নিজ নিজ গৃহে আমন্ত্রণ করিতেন, কখনও বা বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে এক এক জনকে হঠাৎ নোটিশ দেওয়া হইত—"অমুক দিন তোমার বাড়ীতে ডাকাত পড়িবে।" ঠিক সেই সময়ই ডাকাত পড়িত এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ও হাস্যকৌতুকে বন্ধুগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথও এইক্লাবে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বরচিত সঙ্গীতে মাঝে মাঝে সকলকে মুগ্ধ করিতেন। বলাবাহুল্য এই সকল অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রলালই কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এবং সঙ্গীত, আবৃত্তি বা সাহিত্যালোচনায় সর্ব্বাগ্রে উদ্যোগী হইতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মজলিসি লোক হইলেও অধিক মাত্রায় নীতিনিষ্ঠ ও রুচিবাগীশ (Puritan) ছিলেন। রঙ্গালয়ে নারীদিগকে লইয়া অভিনয়ের বিরোধী থাকা সত্ত্বেও ১৩০৮ সালে যখন তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি 'ক্লাসিক থিয়েটারে' অভিনীত হয়, তখন শিক্ষাকালীন কোন এক অভিনেত্রীর 'গান বেসুরা হওয়ায় অনিচ্ছাতেও 'রিহার্সাল, গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি সুরটি ঠিক করিয়া দিয়া আসেন। এইভাবে ক্রমে তিনি রঙ্গালয়ে যোগ দেন।

"পিওরিট্যান" হইলেও তাঁহার জীবন হাসিখুসিতে ভরা ছিল। চিঠি পত্রের মধ্যেও তাঁহার মধুর হাস্যকৌতুক ফুটিয়া উঠিত। একদা তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে এইভাবে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন—"এই দীন অকিঞ্চিৎকর অধীনের গৃহে শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আসিয়া যদি শ্রীচরণের ধূলা ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়।

আর একবার কর্ম্মান্বেষী কোন আত্মীয়কে রবীন্দ্রনাথের নিকট একখানি সুপারিশ পত্র লিখিয়া পাঠান। পত্রখানির মুখবন্ধ এইরূপ ছিল—

"শুনছি নাকি মশায়ের কাছে
অনেক চাকরি খালি আছে,
দশ বিশ টাকা মাত্র মাইনে।
দুই একটা কি আমরা পাইনে?

তারপর কর্ম্মপ্রার্থীর পরিচয়—

পাবনা কোর্টের প্লীডার
গন্যমান্য বারের লীডার—
প্রতাপ রায় হল ইঁহার শ্বশুর,
এতেই মাপ এঁর হাজার কসুর" ইত্যাদি

বন্ধুপত্নী ও নিজ স্ত্রীকেও জ্বালাতন করিতে গান বাঁধার আলস্য ছিল না তাঁহার। গানটির আরম্ভ এইরূপ—

"প্রথম যখন বিয়ে হল
ভাবলাম 'বাহা বাহারে'।
কি রকম যে হয়ে গেলাম
বলব তাহা কাহারে?"

এইভাবে আনন্দে উদ্বেলিত জীবনস্রোত তাঁহার অবাধে চলিতেছিল। সেই স্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িল। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতার বাহিরে! জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ী ফিরিলেন বটে, কিন্তু স্ত্রীর সহিত আর দেখা হইল না। তখন তিনি পরলোকে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সুরবালা নশ্বরদেহ-ত্যাগ করিয়া সুরধামে চলিয়া যান।

এই প্রচণ্ড আকস্মিক আঘাতে দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষণকাল বিভ্রান্ত ও বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার মনে হইতে থাকে—"যতখানি দেখা যায় ধূ ধূ করে শুধু অসীম বারিনিধি।" তথাপি পুত্র-কন্যার মুখ চাহিয়া কঠিন হস্তে গলিত অশ্রু মুছিয়া ফেলেন। ইহার পর তাঁহাকে আর কেহ কাঁদিতে দেখে নাই। মর্ম্মদাহী শোকাগ্নির উত্তাপে উদ্গত অশ্রু শুকাইয়া গেল। তাঁহার সহজাত প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটিল।

এইরূপ অপ্রকৃতিস্থ ও অবসন্ন মন লইয়া পরের দাসত্ব করা আর সম্ভব নয় মনে করিয়া তিনি চাকুরি হইতে কিছু কালের ছুটি চাহিলেন। তৎকালীন তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী দ্বিজেন্দ্রনাথের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও কর্ম্মে নিষ্ঠার নিমিত্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, বিশেষ ভালও বাসিতেন। সেই কারণে যখন তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে বলিলেন—"এখন আপনার পক্ষে বরং কাজে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত থাকাই প্রয়োজন। ছুটি লইয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে আপনার মনের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িবে।" এ যুক্তিপূর্ণ কথায় তিনি আর ছুটি লইলেন না, কাজে নিযুক্তই থাকিলেন। তবে পুত্র-কন্যাকে কলিকাতায় রাখিয়া আবগারী বিভাগের পরিদর্শক হিসাবে দেশ-দেশান্তরে আর ঘুরিয়া বেড়ান সম্ভব হইল না। তিনি আবার ডেপুটিগিরি করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বভাবকবি দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন মাতৃভাষায় একনিষ্ঠ ও সাধক ছিলেন। হাজার সঙ্কটে পড়িলেও সাহিত্যসেবায় কোনরূপ বাধা ঘটে নাই। তাঁহার উদাস মন সাহিত্যসেবাতেই বিশেষভাবে নিবিষ্ট রহিল। ১৩০২ সালে "কল্কী অবতার," ১৩০৪ সালে "বিরহ" ১৩০৫ সালে "আষাঢ়ে," ১৩০৭ সালে "ত্র্যহস্পর্শ" ও "পাষাণী,"—১৩০৯ সালে "সীতা," ১৩১০ সালে "মন্দ্র" কাব্য ও "তারাবাঈ" নাটক প্রকাশিত হইল। তাহার পরই "রাণা প্রতাপ" বা "প্রতাপ সিংহ" প্রকাশিত হয়।

"প্রতাপ সিংহ" প্রণীত ও প্রকাশিত হইবার পরই বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। রাজা রামমোহন রায় যে বীজ একদিন রোপণ করিয়াছিলেন, সে বীজের ওপর জল সেচন করিলেন রাজনারায়ণ বসু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ, নব গোপাল মিত্র ও তাঁহার সহকর্মী দিগের যত্নে সে বীজের অঙ্কুর উদ্গত হইল। বঙ্গভঙ্গরূপ "শক্" (shock) পাইয়া উহা সত্বর বাড়িয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয় সাধনা ও স্বামী বিবেকানন্দের আকুল আহ্বানে যুবশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল। সমগ্র দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। এই আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল যোগ দিতে না পারিলেও দেশমাতৃকার প্রতি তাঁহার ভক্তিভালবাসা প্রকটিত হইয়া পড়িল তৎরচিত কয়েক খানি অপূর্ব্ব গানে। উদাত্তকণ্ঠে দেশবাসীকে ডাকিয়া কহিলেন—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ"। আবার আশ্বাস দিলেন—আসিবে সেদিন আসিবে।"

দেশের অধিকাংশ নেতার প্রতি কিন্তু তিনি বিমুখ ছিলেন। তিনি বলিতেন—"কাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই কেবল বক্তৃতা, বক্তৃতা আর বক্তৃতা। এই সকল নেতা ও বক্তাদিগের উপর এখন তো আমার ঘৃণাই জন্মিয়া গিয়াছে। এখন কি উপায়ে এইসব আত্মসর্ব্বস্ব, 'নামকা ওয়াস্তে, নেতাদের হাত হইতে দেশবাসীকে বিশেষতঃ আমার ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল, আশাকল্পতরু সোনার চাঁদ ঐ যুবকদিগকে রক্ষা করা যায় তাই আমি অনেক সময় ভাবি।" তিনি আরও বলিতেন—"আমাদের জাতটাকে আবার জীয়িয়ে—জাগিয়ে তুলতে হলে দেশের আবার উন্নতি ও উদ্ধারসাধন করতে হলে একদল সচ্চরিত্র ও উৎসাহী যুবকের আজীবন অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করতে হবে।...অবারিত উদ্যম, অদম্য ইচ্ছা-

শক্তি, উন্মুক্ত নির্ম্মল ও উদার মন, প্রাণময়ী চিন্তা, ও জোতির্ম্ময়ী কল্পনা—এ সবের উপায় যদি কিছু থাকে ত আমার বিশ্বাস সে হচ্ছে একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য। এই এক ব্রহ্মচর্যের বলেই একদিন আমাদের এই স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমি অত সহজে অমন অনায়াসে স্বাভাবিক শক্তিবলে এ বিশ্বসংসারে জগৎগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল।"

এইরূপ ছিল তাঁহার দেশাত্মবোধ, দেশোদ্ধারের ধারণা। বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দেরও অনুরূপ ধারণা ছিল। তাই বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজ বিদ্বেষী ছিলেন না। ইংরাজ জাতির গুণাবলী তিনি যেরূপ অকুণ্ঠভাবে কীর্ত্তন করিতেন শাসক ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের দোষ দেখাইয়া দিতেও কণামাত্র ভয় পাইতেন না। যুগযৎ রাজভক্ত ও দেশপ্রেমিক লোক পরাধীন দেশে অতি বিরল।

দ্বিজেন্দ্রলাল যে অসামান্য প্রতিভাবলে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে শুধু মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদিগকে প্রগাঢ় প্রীতিরবন্ধনেও বাঁধিয়া ছিলেন। সেই বন্ধন সুদৃঢ় করিবার মানসে স্বগৃহে—"পূর্ণিমা মিলন" প্রবর্ত্তন করেন। ১৩১১ সালের দোল পূর্ণিমার সায়াহ্নে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ, মঙ্গলবার ইহার প্রথম বৈঠক বসে। এই অধিবেশনে কলিকাতার প্রায় সকল বিখ্যাত সাহিত্যিকই উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েন নাই। সরল প্রাণে আলাপ-পরিচয়ে, গল্প-গুজবে, রঙ্গে ব্যাঙ্গে, সঙ্গীতালাপে, ও কবিতাপাঠে সকলেই বিশেষ উৎফুল্লচিত্তে "পূর্ণিমা মিলন" সার্থক করেন। "মিষ্টান্ন মিতরে জনা" তো ছিলই, ফাগ মাখামাখিও বেশ চলিয়াছিল। রবীন্দ্র নাথের শুভ্র সুন্দর পরিচ্ছদও 'লালে লাল' হইয়া উঠিল-তখন স্বভাবকোমল মৃদুকণ্ঠে মিষ্টি হাসিয়া অনুরাগস্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—"আজ দ্বিজুবাবু শুধু যে আমাদের মনোরঞ্জনই করেছেন তা নয়, তিনি আজ আমাদের সর্বাঙ্গরঞ্জন করলেন।"

এইরূপ মধুরমিলন বেশ কিছুদিন চলিতে থাকে। বন্ধুবর্গও তাঁহাদের নিজ নিজ বাটীতে 'পূর্ণিমা মিলনের' অধিবেশন বেশ সমারোহের সহিত পর্য্যায়ক্রমে করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে একান্ত উৎসাহের অভাবে উহা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যায়।

বৃটিশ সরকার এ হেন লোকের প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন না। একস্থান হইতে আর এক স্থানে শীঘ্র শীঘ্র বদলি করিয়া তাঁহাকে অযথা ঘুরাইয়া মারিতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল একবার চাকুরি ছাড়িয়া দিতেই মনস্থ করেন। কিন্তু নানা দিক ভাবিয়া উহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে গয়ায় বদলি করা হয়। সেখানে তিনি তিন বৎসর কাজ করিয়া দেড় বৎসর ছুটি পান। তখন তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

তাঁহার সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চ্চা গয়ায় বিশেষ রূপধারণ করে। পূর্ব্ব পরিচিত লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত সেখানে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদগ্ধ পুরুষ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত সাহিত্যালাপ আরম্ভ হইত, অনেক দিন মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত চলিত। লোকেন্দ্রনাথের ইংরাজ পত্নী ইহার জন্য অনেক সময় দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট অনুযোগ করিতেন। শুধু বাংলাসাহিত্য নয়, ইংরাজী কাব্য, নাটক, দর্শন বিজ্ঞান, সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও দর্শন, এমনকি যোগশাস্ত্রেরও বিশদ আলোচনা চলিত। দুই বন্ধু সেই সময় জ্ঞান সমুদ্রে ডুবিয়া থাকিতেন।

গয়ায় গানের মজলিসও বসিত। স্থানীয় বিখ্যাত গায়ক ও বাদকেরা সেই সকল বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া সঙ্গীত পরিবেশনে সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালও স্বরচিত গান গাহিয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। রাগ-রাগিনীর ইতিবৃত্ত আলোচনাতেও অনেক সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও পাওয়া যাইত।

দীর্ঘ অবসর পাইয়া কলিকাতায় আসিলে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রচেষ্টায় "পূর্ণিমা মিলনের" পুনরাবির্ভাব ঘটে, তাঁহারই নবনির্মিত গৃহ 'সুরধামে' উহার তিনটি অধিবেশনের সুযোগ হয়। এই তিনটি অধিবেশনের

মত এত আন্তরিকতা ও উৎসাহপূর্ণ সম্মিলন ইতঃপূর্ব্বে আর একটিও হয় নাই।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা 'মেট্রোপলিটন" কলেজের (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) কয়েকজন ছাত্র সুকিয়া স্ট্রীটের (বর্ত্তমান কৈলাস বসু ষ্ট্রীট) এক বাড়ীতে 'ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব" (Friends Dramatic club) নামে একটি "ক্লাব" প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন। বাঙ্গালীর জাতিগত দৌর্ব্বল্যের ফলে সদস্যদিগের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় হরিদাসবাবু ও প্রমথবাবু "ইভ্নিং ক্লাব" (Evening club) নামে স্বতন্ত্র একটি নূতন 'ক্লাব' স্থাপন করেন। ইহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং আন্তরিক যত্নে বহু সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রগৃহের সন্তানেরা আসিয়া ক্রমশঃ ইহাতে যোগ দেন।

"ইভ্নিং ক্লাবের উক্ত পরমোৎসাহী পরিচালকদ্বয় এবং আরও কয়েকজন সভ্যের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। ইঁহারা সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে এবং নিজের সরল স্বভাব বশে অল্পকালের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল নিজ গৃহে ক্লাবটি তুলিয়া আনেন। তখন তিনি উক্ত ক্লাবের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নিজ গৃহে ক্লাবটি তুলিয়া আনা হলে আত্মীয়বন্ধুর ভাল লাগিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু সে কথা কানে তুলিলেন না। তাঁহার ছুটি ফুরাইলে তাঁহাকে বাঁকুড়ায় বদলি করা হইল। কিন্তু দুইচারি দিনের মধ্যেই অসুস্থ হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় থাকিতেও হইল। তখন ব্যক্তিগত অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি ক্লাবটিকে অন্যত্র উঠিয়া যাইতে দিলেন না। তাঁহার জীবনাবসানের পর যখন সমগ্র বাড়ীটি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল তখন ক্লাবটি ঐ স্থান হইতে উঠিয়া গেল।

অসুস্থ অবস্থায় দ্বিজেন্দ্রলাল যখন কলিকাতায় চিকিৎসাধীন ছিলেন, সেই সময় তাঁহার মনে একখানি আদর্শ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার বাসনা জাগে। উহা তাঁহার আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশও করেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুর মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ইভ্নিং ক্লাবের সদস্যরাও এই কার্য্যে উৎসাহী হইয়া উঠেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে ভয় পান। ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ দুঃখিত হইলে হরিদাসবাবু পত্রিকা প্রকাশের সকল ভার গ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন বলেন—"বেশ, এ কাগজ এখনই বাহির করা হোক, আমি শীঘ্রই 'পেনশন্' লইয়া নিজেকে উহার সম্পাদক পদে ব্রতী করিব।"

অনেক বাক্‌বিতণ্ডারপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রস্তাবানুসারে মাসিক পত্রিকাটির নাম হইবে "ভারতবর্ষ" ইহাই স্থির হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল অবিলম্বে পত্রিকার "সূচনা", উহাতে প্রথম প্রকাশের জন্য দুইটি অনুপম সঙ্গীত, 'ছত্র মহিমা' ও 'হরিনাথের গ্রুপদ শিক্ষা' শীর্ষক দুইটি অনবদ্য কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন। বহু খ্যাতনামা কবি ও লেখকের রচনা বহু ব্যয়ে সমাদৃত হইল। এই ভাবে প্রস্তুতপর্ব্ব শেষ হইলে বৈশাখ মাস হইতেই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইবে স্থির হইল বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'পেন্সনের' আবেদন মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হওয়ায় উহা আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু উহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। একটি প্রতিভাদীপ্ত প্রদীপ অকালে নিবিয়া গেল।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষ। এতদিন নিয়মিত ভাবে বাহির হইয়া ১৩৭৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যার পর উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি কীর্ত্তি লুপ্ত হইল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার এই রোগের সূত্রপাত হয়। চিকিৎসকদিগের উপদেশে কিছুকাল আহার ও পরিশ্রম বিষয়ে সংযত ছিলেন। কিন্তু নিজের অভ্যাস-মত অধ্যয়ন, গান, রচনা ও তর্ক বিতর্কে মাতিয়া উঠিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। তাঁহার শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। তদুপরি স্ত্রী বিয়োগের পর হইতেই জীবনে তিনি নিস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শরীরের প্রতি ঔদাসীন্য তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আনিল। তাঁহার সকল জ্বালা জুড়াইল।

করুনাময়ী কালীবাড়ী

কানাইলাল দত্ত

বারাসাতের কলোনি মোড়ে করুণাময়ী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার অনেকেই দেখে থাকবেন। অদূরে আমডাঙ্গার একটি সুপ্রাচীন কালিবাড়ী করুণাময়ী মন্দির নামে খ্যাত। মাতৃনাম স্মরণ করে বারাসাতের ময়রা তাঁর দোকানের নাম দিয়েছেন 'করুণাময়ী'। এতদঞ্চলের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই করুণাময়ী নামটি যুক্ত রয়েছে। বারাসাত থেকে আমডাঙ্গা হয়ে জাগুলি পর্যন্ত যে বাসগুলি চলাচল করে তার একখানা বাসের নাম করুণাময়ী। আমডাঙ্গার নিকট আওয়ালসিদ্ধি গ্রামে একটি সিনেমা হলের নাম হয়েছে করুণাময়ী টকীজ। এমন কি আমডাঙ্গার পেট্রল পাম্পটির নাম হলো করুণাময়ী সার্বিসস্টেশন। এ সব থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এতদঞ্চলের মানুষ করুণাময়ীকে বিশেষ ভক্তি করে থাকেন।

করুণাময়ী মন্দিরকে কেন্দ্র করে নানা জনশ্রুতি এবং প্রাচীন ইতিহাসের অলিখিত কাহিনী এখনো এতদঞ্চলের লোকমুখে ফেরে। আমডাঙ্গা বারাসাত মহকুমার একটি থানা। এখন বারাসাত একটি অতি সাধারণ মহকুমা শহর মাত্র। অতীতে বারাসাত যে খুবই সমৃদ্ধ ছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়। বেড়াচাপার চন্দ্রকেতুর গড় খুঁড়ে বিস্মৃত অতীতের সমৃদ্ধির চিহ্ন বের করা হয়েছে। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তার প্রধান মন্ত্রী শঙ্কর বারাসাতে বসবাস করতে থাকেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকালে বারাসাত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। সে সব কথা আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নয় বারাসাতের সেই সমৃদ্ধ অতীতের একটি পর্বের সহিত করুণাময়ী কালীবাড়ীর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে বলে দু একটি কথা উল্লেখ মাত্র করলাম।

বারাসাত থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়ক কল্যানী রোড ধরে সোজা গেলে বার কিলোমিটারের মাথায় আমডাঙ্গা। শ্যামবাজার-বিরাটি, এসপ্লানেড-কল্যানী এবং বারাসাত জাগুলি, বারাসাত-নৈহাটী এবং বারাসাত কাচড়াপাড়া রুটের বাসগুলি এই পথে চলাচল করে। আমডাঙ্গায় ছোট্ট একটি বাজার আছে। পাশেই থানা, জেলা পরিষদের ডাক বাংলা, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্লক আফিস, সাবরেজেষ্ট্রি অফিস ও ডাকঘর। ইদানীং একটি ঔষধঘর ও পেট্রল পাম্প ও হোটেল হয়েছে। হোটেলটি জনৈক পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু ভদ্রলোকের। খদ্দের সবই বহিরাগত। এই পথে শত শত লরী নিত্য চলাচল করে। তারই চালক ও শ্রমিকেরা কেউ কেউ এখানে বিশ্রাম নেন এবং পানাহারাদি সারেন। বিজলি আলো আছে, থানায় একটি টেলিফোনও আছে; তথাপি জায়গাটি অজ পাড়াগাঁ। পাকা সড়কের দু দিকেই বহুদূর প্রসারিত শ্যামল শস্য ও ক্ষেত্র ফলের বাগান। এখানকার ভূমিতে সোনা ফলে। গভীর নলকূপের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে বারমাসই মাঠে ফসলের উৎসব কৃষিকার্যই এখানকার জনসাধারণের একমাত্র জীবিকা। কলকাতার সন্নিহিত সব এলাকার মত এখানেও কৃষি

অনুষঙ্গ কোন কুটীর শিল্প বা ব্যবসায় তেমন গড়ে উঠতে পারে নি।

জনসংখ্যার সত্তর ভাগই মুসলমান। সমগ্র থানা এলাকার হিসাব নিলে হিন্দু মুসলমানের অনুপাতের কিঞ্চিৎ হেরফের হতে পারে—কিন্তু মুসলীম গরিষ্ঠতা অক্ষুন্ন থাকবে। চারিপাশের সব থানায়—হাবড়া, নৈহাটি, হরিণঘাটা-জগদ্দল প্রভৃতি এলাকায় কোন না কোন সময়ে ছোট বড় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হলেও আমডাঙ্গাকে সে কলঙ্ক কখন স্পর্শ করে নি। অথচ এখানে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা প্রসার লাভ করেনি। হালে দু চারজন যুবক লেখাপড়া শিখেছেন—তারা অধিকাংশই গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছল ও সহজ জীবিকার আকর্ষণে। আমডাঙ্গা ব্লক আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের বাড়ি বারাসাত থানা এলাকায়। আমডাঙ্গা থানা এলাকায় তার জমিজমা ও কিছু ঘরদোর আছে সেই হিসাবে তিনি এখানকার কর ও ভোটদাতা বরং তারই জোরে আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি হতে আইনের বাধা ঠেকিয়ে রেখেছেন। করুণাময়ী কালী মন্দির কমিটিরও তিনি অন্যতম সদস্য। ওঁর মুখে এই মন্দিরের অনেক ইতিহাস শুনেছি। তারই কিছু এখানে নিবেদন করব।

করুণাময়ী কালীবাড়ী যেতে আমডাঙ্গা বাজার স্টপেজে আমাদের নামতে হবে। বাজার বলতে আমরা যা বুঝি আমডাঙ্গা তা নয়। রাস্তার উপরে কয়েকখানা স্থায়ী দোকান ঘর আছে। সপ্তাহে দু দিন (মঙ্গল ও শুক্রবার) বিকেলে সামান্য সময়ের জন্য হাট বসে। হাটখোলার পশ্চিম দিকে করুণাময়ী এস্টেটের (লোকে বলেন আমডাঙ্গা মঠ) একটি দীঘি আছে। নাম তার অচল দীঘি। আমডাঙ্গা মঠের মোহান্ত অচলানন্দ গিরি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই দীঘিটি তিনি খনন করান। তাঁর নামানুসারে এর নাম হয়েছে অচল দীঘি। চৈত্র বৈশাখের খরতাপে যখন দীঘির জল কমে আসে তখন দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বুদ্বুদ উঠতে দেখা যায়। কিম্বদন্তি থেকে জানা যায় পাতাল থেকে অচল দীঘির জল ওঠে। অচলানন্দ গিরি মহারাজ দেড়শত বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তার ছবি মঠে রক্ষিত হয়েছে।

পঞ্চাশ বছর আগে আমডাঙ্গা থানায় চাকরি করতে এসেছিলেন খুলনা জেলার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি উদ্যোগী হয়ে অচল দীঘি সংস্কার করেন এবং সান বাঁধানো ঘাট করে দেন। মঠ কর্তৃপক্ষ মন্দির প্রাঙ্গণে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে মুখোপাধ্যায় মশায়ের নাম উৎকীর্ণ করে রেখেছেন। এই স্মৃতি স্তম্ভের চারদিকে চারটি ফলকে চারজন ভক্ত দাতার নাম খোদিত রয়েছে। এর থেকে জানা যায় রায়পুর গ্রামের জনৈক জীবনকৃষ্ণ ঘোষ বারাসাত থেকে আমডাঙ্গা সম্পূর্ণ পথটি নিজ ব্যয়ে পাকা করে দেন। রায়পুর গ্রামটি মন্দির থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ফনিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পঞ্চান্ন বৎসর পূর্বে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন। তিনিও মায়ের মন্দিরাদি সংস্কার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন বলে উক্ত স্তম্ভে লেখা আছে।

আমডাঙ্গা হাট থেকে পূর্ব দিকে একটি গ্রাম্য পথ চলে গেছে। এই পথ ধরে মিনিট দুই গেলেই করুণাময়ী মায়ের মন্দির। পঞ্চান্ন বিঘা জমির উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মায়ের দ্বিতল মন্দির নির্মাণ করে দেন। নিত্যপূজা ও ভোগরাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৩৬৫ বিঘার ভূসম্পত্তিও তিনি দেবোত্তর করেন।

এ সম্পর্কে অন্য একটি জনশ্রুতি শোনা যায়। একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পারিবারিক বিপদের সময় করুণাময়ী মায়ের তদানীন্তন মোহান্ত রামানন্দ গিরি যাগযজ্ঞাদি করে মহারাজাকে বিপদমুক্ত করেন।

এর ফলে করুণাময়ীর প্রতি মহারাজার ভক্তি বৃদ্ধি

পায় এবং তিনি মায়ের মন্দির নির্মাণ এবং ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করার ব্যবস্থা করেন। তৎকালে এ রকম ঘটনা বিরল ছিল না।

কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে ঢুকতেই সামনে পাবেন একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। গাছটির গোড়া ইট দিয়ে গোলাকৃতি করে বাঁধানো। এটা পঞ্চানন তলা। বাঁ হাতে নির্মল জলের একটি পরিচ্ছন্ন বড় পুকুর। খুব প্রশস্ত বাধানো ঘাট। দক্ষিণে মাতৃমন্দির। উঠানের চারিদিকে শিবমন্দির। মোট বারটি মন্দিরের মধ্যে একটি হলো প্রকৃত শিব মন্দির। অন্যগুলি সেবাইত মোহান্তদের সমাধি মন্দির। মূলমন্দির ও সমাধি মন্দির প্রতিটিতেই শিবলিঙ্গ আছে। কিন্তু মূল মন্দির ভিন্ন অন্য কোনটিতে নিত্যপূজার ব্যবস্থা নেই। মন্দিরগুলি একটার পর একটা এমন করে সাজানো যে পৃথক পাচিলের আর প্রয়োজন হয় না। সবগুলির আকার প্রকার প্রায় একই রকম। এর থেকে অনুমিত হয় এগুলি পরে কোন একসময় একত্রে নির্মিত হয়েছে। একটি সমাধি শিবমন্দিরের গায়ে ১৬৭২ শকাব্দ উৎকীর্ণ রয়েছে। এটি প্রথম মোহান্ত রামায়েৎ গিরি মহারাজের সমাধি মন্দির। পুরাতন দলিলে এঁকে পরমহংস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসল শিবমন্দিরের অদূরে একটি পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। ইটের দেওয়াল দিয়ে জায়গাটিকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এই আসনে বসে সাধনা করা সহজ কথা নয়। মাঠের অন্যতম অছি শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন তিনি দুবার দুজন লোককে এই আসনে বসে সাধনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে দেখেছেন। মন্দির কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রত্যেককেই এই অসম্ভব প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হতে উপদেশ দেন। প্রথম ব্যক্তি সে উপদেশ উপেক্ষা করে ঐ আসনে গিয়ে বসে পড়েন। কিন্তু মধ্য রাত্রের পূর্বেই তিনি গোঙাতে থাকেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ তখনই সরিয়ে আনা হয়েছিল, এর পর সাধক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেই রাত্রের অনুভূত অভিজ্ঞতার কথা তিনি অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও প্রকাশ করতে স্বীকৃত হন নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ আসনের সমীপবর্তী হতে দেখেন একটি গোখরো সাপ, ফণা তুলে মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঐ ভদ্রলোক যতক্ষণ মন্দিরের মধ্যে ছিলেন ততক্ষণ সাপটি একই ভাবে উদ্যত-ফণা হয়েছিল।

করুণাময়ী কালীবাড়ির আলোচনা প্রসঙ্গে বারাসাতের অন্যতম পুরনো বাসিন্দা ডাক্তার মুরারী মোহন ভট্টাচার্য এই কথাটা শুনে স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা বলেছিলেন। ১৯১৮ সনে একবার মন্দির সংস্কার হয়। মুরারীবাবু তখন সংস্কার কমিটির কর্মী ছিলেন। ঐ সময় পঞ্চমুণ্ডির আসনটি সংস্কারের জন্য হাত লাগাতেই দুটো গোখরো সাপ বেরিয়ে পড়ে। মিস্ত্রিরা ভয়ে ওখানে কাজ করতে অস্বীকার করেন। পরে আর কখন এই আসনটি সংস্কারের চেষ্টা হয় নি।

আসল মন্দিরটি দক্ষিণ দুয়ারী। একটি অতি সাধারণ দ্বিতল পাকা বাড়ী। দোতলায় মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ঢুকতেই দোতলার সিঁড়ির সামনে বারান্দায় ছয় বর্গফুট পরিমিত স্থান কাঠের জাফরি দিয়ে ঘেরা। এটাকে বলা হয় রত্ন বেদী। এশত আটটি (১০৮) শালগ্রাম শিলা এখানে প্রোথিত বলে দাবী করা হয়। কেন এই রত্ন বেদী রচনা তা কেউ বলতে পারেন না। বিধর্মীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই ব্যবস্থা কি না তাই বা কে বলতে পারে। এরই পাশে নতুন সংযোজন হলো একটি ভগ্ন সূর্য মূর্তি। একখানা পাথরের উপর বেদী ও চাল সমেত সূর্য মূর্তি খোদাই করা। মুখটা ভেঙ্গে গেছে। বছর ত্রিশেক আগে তিন মাইল দূরবর্তী বীরহাটি গ্রামে পুকুর কাটার সময় এটি পাওয়া যায়। এই বিগ্রহ ভক্তের অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে প্রোথিত হয়েছিলেন না কোন কালাপাহাড়ের কলুষিত হস্ত তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল তা আজ আর জানবার কোন উপায় নেই বোধ হয়। সূর্যমূর্তি নাকি খুবই বিরল, শুনেছি সারা ভারতে তিনটি মাত্র সূর্য মন্দির আছে।

যজ্ঞবেদীর সামনে থেকে একটি অপ্রশস্ত সিঁড়ি দোতলায় উঠেছে। এইখানে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ঘরগুলি প্রশস্ত। কিন্তু দরজা খুব ছোট। যে ঘরে মা থাকেন তার দরজাটি চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরি। বিগ্রহটিও ক্ষুদ্রাকৃতি। একখানি কষ্টিপাথর থেকে কালী ও মহাদেব খোদাই করা হয়েছে। বাংলায় সচরাচর যেমন বিগ্রহ আমরা দেখি এটি তার চেয়ে শিল্পরীতি ও অন্য কোন কোন প্রকরণে পৃথক। বাংলার কালী সাধারণতঃ দিগবসনা। এখানে মাতৃমূর্তি বসনাবৃতা। বাঙালী কন্যারা যেমন করে সাড়ী পরেন তেমনি ঢঙে মায়ের কোমরে আচল জড়ানো। প্রাচীনেরা বলেন ত্রিশ চল্লিশ বছর হলো মাকে কাপড় পরানো হচ্ছে, আগে তাঁর পরণে ছিল উত্তর ভারতের পোষাক— ঘাঘরা।

কথিত আছে করুণাময়ী মূর্তিটি মহারাজা মানসিংহের। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি বাংলায় আসেন। প্রথমবার তিনি সন্ধি করে ফিরে যান। যাবার সময় শ্রীপুর থেকে শিলাদেবী বিগ্রহটি নিয়ে যান। জনশ্রুতি মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ সে কথা স্বীকার করেন না। মানসিংহ শিলাদেবীকে জয়পুরের অম্বর দুর্গে প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর পূজা অর্চনার জন্য একজন বাঙালী ব্রাহ্মণও তিনি সঙ্গে নেন। প্রতিষ্ঠার পর দেবী পূর্বমুখী হন। মানসিংহ এই অলৌকিক ব্যাপারে বিস্মিত ও বিচলিত হলেন। দেবীর রোষ থেকে রক্ষা পাবার উপায় হিসাবে তিনি করুণাময়ী মায়ের মূর্তি গড়ান এবং পরের বার বাঙলা দেশে আসবার সময় ঐ বিগ্রহটিকে সঙ্গে করে এনে বর্তমান মন্দিরের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে কোন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। ভূপ্রকৃতির বদল ও অন্যান্য কারণে গঙ্গানদী অনেক পশ্চিমে চলে গিয়েছে। আমডাঙ্গা সংলগ্ন এলাকার প্রাচীন নদীপথ ও তার তীরবর্তী ভূ-ভাগ বরুতীবিল। এই বরুতী বিলের কোন স্থানে করুণাময়ী প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। সেই ভূ-ভাগ জলমগ্ন হয়ে গেলে মায়ের তৎকালীন সেবাইত সিদ্ধপুরুষ রামায়েৎ গিরি মাকে নিয়ে পূর্ব্ব দিকে ডাঙ্গা বা উচু জমিতে চলে আসেন। তাঁর নাম থেকেই স্থানটি প্রথমে 'রামায়েৎ গিরির ডাঙ্গা' বলে পরিচিত হয়। এই রামায়েৎ গিরির ডাঙ্গা এখন আমডাঙ্গা হয়েছে। আমাদের দেশে বহুস্থানে শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও উচ্চারণের বিকৃতি আছে। যেমন কলকাতার মানুষ লেবুকে নেবু, শ্যামবাজারকে, ছামবাজার ইত্যাদি বলেন। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলে 'র' কে 'ড়' বলা হয়। জায়গার নামও নানা কারণে পাল্টায়। যেমন পাণিহাটি হয়েছে পেনেটি, কাঁথী হয়েছে কনটাই। সুতরাং অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের কণ্ঠে রামায়েৎ গিরির ডাঙ্গা ক্রমে রামডাঙ্গা এবং পরে আমডাঙ্গা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

অনেকে অনুমান করেন বর্তমান মন্দিরের নিকটেও ছোট কোন নদী ছিল। ভূপ্রকৃতি এই অনুমানের সপক্ষে। এই অঞ্চলের ছোট বড় নদীর ধারে প্রতাপাদিত্যের কয়েকটি ঘাটি ছিল। আমডাঙ্গার দশএগার কিলোমিটার উত্তরে যমুনা নদী দিয়ে সরাসরি নৌকাপথে ধুমঘাটের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বর্তমান বিরাটীতে কোন যুদ্ধের বিরতি ঘটেছিল তাই জায়গাটির নাম বিরতি। কালক্রমে বিরতি বিরাটী হয়ে গেছে। প্রতাপাদিত্যের পর্টুগীজ সেনাধ্যক্ষ রডার তত্ত্বাবধানে যেখানে ঘাটি ছিল সেটা সেই রডার নাম থেকে রহড়া হয়েছে। রহড়া আমডাঙ্গা থেকে পাখীওড়া দূরত্বে দশ বারো কিলোমিটার মাত্র হবে। সুতরাং দক্ষিণে বিরতি (বিরাটী), উত্তরে যমুনা (হরিণঘাটা) পশ্চিমে রডা (রহড়া)'র মধ্যবর্তী হল আমডাঙ্গা তখন শান্ত ও নিরাপদ ছিল বলা চলে। আবার অদূরে গঙ্গা এবং ভাটপাড়া। আশপাশের বহু জনপদ বিদ্যা ও বিত্তে তখন বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ভাটপাড়া, নৈহাটী, শ্যামনগর, জাগুলি, রাজীবপুর, নিবাধুই, শিবালয় প্রভৃতি সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত পল্লীগুলি আমডাঙ্গার দর্শ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। অতএব এইরকম একটি স্থানে করুণাময়ী মাকে প্রতিষ্ঠা করার তাৎপর্য অনুমান করা যায়।

ইতিহাস ও কিম্বদন্তি মিলে করুণাময়ী কালীমাতা আজও একটি প্রচণ্ড রহস্য। বর্তমানেও এ নিয়ে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সম্বৎসরে দু দিন মাকে দোতালার সংরক্ষিত ঘর থেকে নীচের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের প্রশস্ত মণ্ডপে আনা হয়। দুর্গোৎসবের পর কালীপূজার দিন মহাসমারোহে তিনি অবতরণ করেন। এই দিনটির জন্য দীর্ঘদিন ধরে নানা আয়োজন করা হয়ে থাকে। নানা ভক্ত এই দিনের পূজার বিবিধ উপকরণ পাঠিয়ে থাকেন। আমডাঙ্গায় মুসলমান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা এখন বেশি। তাঁরাও অনেকে চাল, গুড়, গাছের প্রথম ফল, তরিতরকারী, সাধ্যমত অন্যান্য বিবিধ প্রকার জিনিসপত্র শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে পাঠিয়ে থাকেন। কালে আসলে মুসলমান দাতার সংখ্যা হ্রাস পেলেও একেবারে নগণ্য হয়ে যায় নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে তথাকথিত নিম্নবর্ণের ও দরিদ্র হিন্দুরাই এখানে গত দেড় দুই শ' বছরের মধ্যে মুসলমান হয়ে গেছেন। অধিকাংশই অবস্থার চাপে পড়ে মুসলমান হন। তাই বাইরের আচার ব্যবহারে মুসলমান সাজলেও হিন্দু মনটাকে মানিয়ে নিতে সমর্থ হন নি। তাই মুসলমান হয়েও মায়ের পূজায় অর্ঘ্য পাঠানো বন্ধ করা যায় না। রোগে শোকে বিপদে-আপদেও এরা এখানে মানৎ করে থাকেন। অপুত্রক মুসলমান নারীও এখানকার একটি গাছে একখণ্ড ঢিল ঝুলিয়ে দিয়ে যান। তিনিও ভগবানের আশীর্বাদে মা হবেন এই আশায়।

বিবিধ আচার অনুষ্ঠান বাদ্য ও মন্ত্রপাঠের মধ্যে প্রধান পুরোহিত মাকে নিয়ে নীচেয় আসেন। বিগ্রহ সিংহাসন থেকে তুলে ঘরের বাইরে আনার সঙ্গে সঙ্গে একটি পাঠা বলি দেওয়া হয়। এটিকে বলা হয় নজর বলি। তারপর একটি সিঁড়ির ধাপ তিনি অতিক্রম করবেন আর একটি পাঠা বলি দেওয়া হবে। এমনি কার দোতালা থেকে ১৯টি সিঁড়ি নামতে আরও ১৯টি বলি পড়ত। এতে সময় লাগত দু ঘণ্টারও বেশি। এখন অবশ্য বলির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দুটিতে ঠেকেছে।

এখানে আরও একটি অভিনব জিনিস প্রচলিত আছে। মৎস্য বলি। অম্বুবাচির পারণের পরদিন এবং চৈত্র মাসে নীলের পরদিন মৎস্য বলি দিয়ে মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। বলির যেখানে এত ছড়াছড়ি সেখানেও বলি বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল কিছু কাল আগে। আর সেই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন এই মঠেরই মোহান্ত শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর আশ্রম। তাঁকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। ধর্মজগতে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। ব্যাপারটার মীমাংসার জন্য পণ্ডিতসভা ডাকা হয়েছিল। সেই সভা বলি বহাল রাখার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে মোহান্তজী ঐক্যমত হতে পারেন নি। তিনি মঠ ছেড়ে চলে গেলেন। এতে এক অচল অবস্থার ও দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। সে কথা পরে বলব। এখন একজন সাধারণ পুরোহিত পূজা অর্চনার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন।

মন্দির সীমানার মধ্যে কোন বিবাহিত দম্পতির বসবাসের অধিকার নেই তাই পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়ের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে মন্দির এলাকার বাইরে।

বিবাহিত দম্পতির মন্দির প্রাঙ্গণে বসবাসের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মঠ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মন্দিরে উপনয়ন ও বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অসমর্থ অভিভাবকদের সাহায্য করার জন্যই এটি করা হয়। এমনতর বিয়ের আয়োজন এখন আর বড় একটা হয় না কিন্তু আশপাশের প্রায় প্রতিটি নববিবাহিত দম্পতি বিয়ের পরে যুগলে এসে মাকে প্রণাম করে যান। উপনয়ন এখনও হয়। ব্রাহ্মণ মাতা পিতার পক্ষে পুত্রের উপনয়ন দেওয়া একটা অবশ্য করণীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অর্থাভাবে যারা সেটা করতে অসমর্থ মঠ কর্তৃপক্ষ তাদের সাহায্য করে থাকেন। মঠের তত্ত্বাবধানে এবং অর্থে উপনয়নের সমগ্র অনুষ্ঠানকার্য নির্বাহ হয়। এমনকি, প্রয়োজনমত যাতায়াতের ভাড়াও দেওয়া হয়ে থাকে। অন্য কোন মন্দির বা মঠকর্তৃপক্ষ এমন করেন বলে শুনিনি।

প্রসঙ্গতঃ এখানে অনুরূপ আর একটি সার্বজনীন

উৎসবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটির অনুষ্ঠান স্থান হলো আমডাঙ্গার কয়েক কিলোমিটার উত্তরে বিরহীর মদনমোহন তলা। ভাইফোঁটা একটি পবিত্র ও বরণীয় উৎসব হলেও এটি এখন কিছু কিছু ধর্মীয় আচারের মর্যাদা পেয়েছে। যে সব বোনদের ভাই নেই তারা ভাইফোঁটার দিন এই মদনমোহন বিগ্রহের কপালে ফোঁটা দেন আর প্রার্থনা জানান একটি ভাইয়ের জন্য। এই উপলক্ষে এখানে তিন দিন ধরে মেলা হয়। যতদূর জানি বাংলাদেশের আর কোথায়ও ভাই ফোঁটার মেলা নেই।

আমাদের করুণাময়ী মন্দির প্রাঙ্গণেও মেলা বসে। সাতদিন হচ্ছে নির্ধারিত সময়। কিন্তু যেবার ধান ভাল হয়, লোকের হাতে দু চারটে বাড়তি পয়সা থাকে সেবার মেলাও চলে অনেক দিন ধরে। কোন কোন বছর একমাসকালও মেলার স্থিতি হয়। ২৫শে ডিসেম্বর এর সুরু। এ দিনও মাকে দোতালা থেকে নামিয়ে নীচের মণ্ডপে রাখা হয় সবর্জনীন দর্শনের জন্য। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই মেলায় যোগদান করেন। বহু মুসলমানের দোকানপাট এমন কি চা ও মিষ্টির দোকান আমি এই মেলায় দেখেছি। বাংলার অন্যান্য পল্লীমেলার সঙ্গে এর কোন বিশেষ পার্থক্য নেই। বয়স্ক পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোক ও শিশুর ভিড় বেশি। ঘর-গেরস্থালির নিত্য প্রয়োজনীয় সুলভ জিনিসপত্রেরই ভিড় হয় বেশি। আমোদ প্রমোদের দিকে থাকে প্রধানতঃ যাত্রাগান ও জানোয়ারপূর্ণ সার্কাস। শনি ও মঙ্গলবার এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়ে; অধিকাংশই নারী শিশু। খুব সামান্য ব্যয়ে পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা মঠ কর্তৃপক্ষ করে রেখেছেন। সুতরাং ধনী দরিদ্র সকলেই সাধ্যমত মায়ের পূজার আয়োজন করতে সমর্থ হন।

করুণাময়ী মন্দিরের অতীত সমৃদ্ধি এখন ম্লান। প্রাঙ্গণটিতে প্রবেশ করলেই অযত্ন ও অবহেলার হাজারো নিদর্শণ চোখে পড়ে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নির্মিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির। তারই বা কি হাল! ধুলিমলিন ঝরাপাতার জঙ্গলে ভরা প্রাঙ্গণ। এ মূল মন্দির থেকে পৃথক। মন্দির প্রাঙ্গণের হরীতক গাছটির খুব কদর। কথিত আছে ঐ গাছটির হরীতক বিধিমতে শোধন করে অঙ্গে রাখলে সর্বকার্যে সিদ্ধিলা হয়। অপেক্ষাকৃত নবীন একটি গাছ এমন বিরল মহিমা অধিকারী হলো কেমন করে এই প্রশ্নের উত্তরে পুরোহি শ্রীবিরিশ্বতীকুমার ভট্টাচার্য জানালেন—এই জায়গাটিতে একটি অতি পুরাতন হরীতকী গাছ ছিল। সেটি শুকি মরে যাবার পর বর্ত্তমান গাছটি আপনাআপনি হয়েছে কেউ এনে ওটিকে যত্ন করে লাগায় নি।

বিশ্বাস করলে সত্য, না বিশ্বাস করলে সবই মিথ্যা আমরা অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস অবিশ্বাসের সীমারেখা বাস করি। ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন বিশ্বা বিশ্বাসই, অন্ধবিশ্বাস বলে কিছু নেই। আমা জ্ঞান বুদ্ধির সীমার মধ্যে নেই এমন অনে জিনিস এই বিশ্ব জগতে রয়েছে—সুতরাং কোনটা সত আর কোনটা মিথ্যা এ সব তর্ক করার ধৃষ্টতা আমা নেই।

করুণাময়ী মন্দির এখন একটি পাবলিক রিলিজিয়া ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত। ১২৫ বৎসর পূর্বে ভোটবাগা মঠের মোহান্ত ওমরাও গিরি মহারাজ আমডাঙ্গা মঠের মুখ্য মোহান্ত নির্বাচিত হন। নেপালের সঙ্গে সম্প ভাল করার অভিপ্রায়ে ওয়ারেন হেস্টিংস হাওড়া জেলা গঙ্গাতীরবর্তী একটি ভূখণ্ড নেপালকে দান করেন সেখানে মহাকালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাঙ্গণ "ভুটিয়া মঠ" নামে পরিচিত হয়। বর্ত্তমানে একে বল হয় ভোটবাগান মঠ। এই ভোটবাগানের সঙ্গে করুণাময়ী মন্দির যুক্ত হবার পর থেকেই কালীবাড়ি অবনতি সুরু হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমডাঙ্গ থানার জনৈক কর্মী পরেশচন্দ্র দত্ত, বোদাই গ্রামে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবালয়ের নৃপেন্দ্রন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি "আমডাঙ্গা মঠ সংরক্ষণ সমিতি প্রতিষ্ঠা ও রেজিষ্ট্রি করেন। ঐ সময় ত্রিলোকগি ভোটবাগান ও আমডাঙ্গা উভয় মঠের মোহান্ত ছিলে

নবগঠিত কমিটি আমডাঙ্গা মঠকে তার পূর্ব গৌরবে ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্য এটিকে ভোটবাগান মঠ নিরপেক্ষ একটি সংস্থায় পরিণত করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু মোহান্তগণ এতে বাধা দেন। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালতের রোয়েদাদ অনুসারে এখন আমডাঙ্গা মঠ একটি পরিচালক সমিতির দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু এটার কর্তৃত্বভার ন্যস্ত হয়েছে হাওড়ার জেলা জজের উপর। পরিচালক কমিটি তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। অবিলম্বে বর্তমান মন্দিরের সংস্কার করা প্রয়োজন। বর্তমান পরিচালক সমিতি এজন্য যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে অন্যূন পঁচিশ হাজার টাকা দরকার।

এসটেট অ্যাকুইজিশন আইনের ফলে মঠের ভূসম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তেছে। সেজন্য সরকার মঠ কর্তৃপক্ষকে কোন ক্ষতিপূরণ দেন নি। তবে মন্দির পরিচালনার জন্য বার্ষিক ১২০০ টাকা অনুদান করে থাকেন। এ ছাড়া মঠের এখনও ৬০ বিঘা জমি ও একটি পুকুর আছে।

ঝোপঝাড় গাছ পালায় ঘেরা মঠের চত্তরটিই প্রায় ৫৫ বিঘা হবে। এর একটা বিশেষ আকর্ষণ এখানে এলেই অনুভব করা যায়। সমাজের নানা স্তরের ভক্ত মানুষের এখানে নিত্য সমাগম হয়। আপনিও একদিন গিয়ে দেখে আসতে পারেন। ছুটির দিন মন্দির কর্তৃপক্ষ অন্নপ্রসাদ বিতরণ করে থাকেন। সেজন্য অবশ্য পূর্বাহ্ণে এক টাকা দক্ষিণা দিয়ে নামটা লিখিয়ে দিতে হয়। প্রসাদের আকর্ষণ যারা বোধ করেন না, তারাও ঠকবেন না কারণ যে খাবার তারা দেন তার বাজার দাম এক টাকার অনেক বেশি।

একা ব্রজমোহন

(গল্প)

উমা মুখোপাধ্যায়

ক্লান্ত মাথাটা যে তন্দ্রার ঘোরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, স্বপ্নের সেই মধুর আমেজটাও যেন সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল; ছেলে মেয়ে মাধুরী সকলে এসে মিলেছিল, হঠাৎ ভেঙ্গে গেল তন্দ্রাটা।

মাইক্রোশকোপটা একপাশে সরিয়ে, মাথাটা টেবিলে রেখে স্বপ্নটা আবার দেখবার চেষ্টা করলেন ব্রজমোহন; এখনই এই মুহূর্তে ওদের সকলকে কাছে পাওয়ার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

চিকিৎসা বৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে আর্ত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেও পারিবারিক জীবনের অভাববোধ ওঁকে কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় যেন। অস্বাস্থ্যকর গ্রাম্য পরিবেশে কোন রকমে নিজের কাজকর্ম নিয়ে নিজে থাকা যায়, কিন্তু যাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রয়োজন, তাদের এখানে রাখা যায় না। ছেলেমেয়ে নিয়ে মাধুরী তাই কলকাতায় থাকে। সে চায় না স্বামীকে ছেড়ে এমনভাবে একলা থাকতে কিন্তু নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য ওদের দুজনকে দুধারে ঠেলে দেয়।

নাঃ আজ আর কাজে মন লাগছে না, বলে শ্লাইড-গুলোকে ড্রয়ারে রেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ওপাশে শেল্ফের ওপর রাখা ফটোগুলোকে নামিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে আবার সযত্নে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখে; জানলার ধারে এসে অবাক বিস্ময়ে বাইরে চেয়ে থাকেন। বিরাট ঝাঁকড়া ওই আমগাছটায় এমন কচি

তারই মৃদুমন্দ সুবাস ওঁর কর্তব্যরত মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল বোধ হয়। প্রকৃতির অপূর্ব শোভায় মুগ্ধ চোখে অন্যমনস্কে তাকিয়ে থাকেন হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজে চমকে ওঠেন।

ড্রাইভার ইদ্রিস; ও স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছে আজ অনেকদূর সেই বিলাসপুরের দিকে যেতে হবে। বেরুতে আর দেরি হলে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে স্যার।

ইদ্রিসের কথা বলা শেষ হতেই সেবাব্রতী ব্রজমোহন তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলেন। ষ্টেথো, ব্যাগ, সিরিঞ্জ, ওষুধ খুচরো আরো দু'চারটে জিনিস; কাজের ব্যস্ততায় দূরে সরে গেল মাধুরী ছেলেমেয়ে, সংসার। মনের মধ্যে ভেসে উঠলো অসহায় সেই মানুষগুলোর কথা, যাঁরা তাঁর পথ চেয়ে বসে থাকে, অপেক্ষা করে গাছতলায়। সভ্য সমাজে তারা ঘৃণিত, অবহেলিত তারা সাধারণের কাছে; নিজেদের তারা মনে করে অভিশাপগ্রস্থ, জন্মান্তরের শাস্তি বলে ভাবে নিজেদের কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত শরীরটাকে। ডাক্তার ব্রজমোহনকে তারা দেবদূত বলেই মনে ভাবে হয়তো! মনে মনে হাসি আসে তাঁর; দেবদূত না হলেও রাজদূত তো বটে রুগীদের কথায় কাজে কর্মে মনের সেই বিষণ্ণতার বোধটা কখন কেটে গেল। লাল ধুলোর রাশি উড়িয়ে সরকারী জীপ ছুটে চললো বিলাসপুরের দিকে। ধবধবে সাদা এ্যাপ্রোনটা লাল ধুলোয় রঙীন হয়ে উঠলো।

এ অঞ্চলের মধ্যে বিলাসপুরের এই হাটটাই বেশ বড়।

কেনা-বেচা, লেন-দেন ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও, ডাক্তারবাবুকে সম্ভাষণ জানায় ব্যস্তমানুষজন। চলতে চলতে তাঁর কানে আসে নমস্কার ডাক্তারবাবু, পেনাম হই বাবু। একটু হেসে মাথা নেড়ে এগিয়ে যান তিনি; তাঁর সন্ধানী সজাগ দৃষ্ট আটকে পড়ে ওই শাক নিয়ে বসে থাকা আদিবাসী বউটির দিকে। ডাক্তারবাবুকে দেখে সে তাড়াতাড়ি সারা গায়ে মাথায় কাপড় টেনে বসে।

ওকে আর কোন কথা বললেন না তিনি। অনেকটা শাক আছে ওর ঝুড়িতে, কিছুটা কেনা-বেচা হয়ে যাক। মনে মনে কথাটা ভেবে নিয়ে সেদিক থেকে সরে গেলেন। ওধারে কটা মুরগী নিয়ে বসে আছে বেশ জোয়ান মত কটা লোক, একজন কে যেন পরিচিত বলে মনে হতে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাঝের সেই লোকটি প্রণাম হই আজ্ঞে বলে কাছে এগিয়ে এলো। ব্রজমোহন গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

নিয়মিত ওষুধটা খেয়ে যাচ্ছিস তো?

লোকটি বিনীত হয়ে উত্তর দেয়—অনেক আরাম বুঝছি বাবু। ওষুধ কী আরো খেতে হবে আজ্ঞে? ব্রজমোহন চাপা গলায় উত্তর দেন খাবি বই কি, অনেক দিন ধরে খেতে হবে—কিন্তু তোকে নিষেধ করেছি না মানুষের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করবি না। সঙ্গে বসে আছে ওরা কে? লোকটি উত্তর দেয় কেউ নয় আজ্ঞে, বন্ধু স্যাঙাত আর কি; উরা আপনের অপিক্ষেয় বসে আছে, আমি উদের সঙ্গে আনছি এই মুরগী কটা বেচে আপনের কাছকে যাবে।

আপাদমস্তক তাদের দিকে চেয়ে দেখলেন তিনি, হ্যাঁ নাক ঠোঁট আঙুলের মাথা সিম্‌টম্‌গুলো বেশ প্রমিনেন্ট হয়ে উঠেছে। ওদের একটু পরে আসতে বলে...মনে মনে একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি ওপাশের সেই শাক নিয়ে বউটিকে আর দেখা যাচ্ছে নাতো! পনেরো দিনের ওষুধ ওকে দেওয়া ছিল আজই তার শেষ দিন। ওরই জন্যে বিশেষ করে আজ হাটের ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে আসা। আশ্চর্য উপকার হয়েছে মেয়েটির। মনে ভেবেছিলেন আজ ওকে আরেকবার পরীক্ষা করে দেখে শুনে আরো কিছু ওষুধপত্তর দেবেন। কিন্তু সে পালালো কোথায়? পাশে আলু পিঁয়াজ নিয়ে যে লোকটি বসেছিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটির কথা, সে বললে পাইকারদের কাছে শাকের বস্তা ধরে দিয়ে তাড়াতাড়ী আছে বলে সে চলে গেছে—কেন বাবু আপনি কিছু পয়সা পেতেন নাকি ওর কাছে? চলে যেতে যেতে উত্তর দেন ব্রজমোহন হ্যাঁ গো, চার আনার শাক নিয়ে ওকে একটা নোট দিয়েছিলাম। বললে বিক্রি হলে বাকী পয়সা ফেরৎ দেবে, কেমন আক্কেল দেখলে! ভুলে গেছে হয়ত, দেখি আবার কতদূর গেল। হাটের বাইরে এসে কোথাও চোখে পড়ল না মেয়েটিকে।

হঠাৎ স্যানিটারী বাবুকে দেখে মাথায় বুদ্ধি খুলে গেল। ভ্যাকসিন দেবার সরঞ্জাম নিয়ে সহকারীর সঙ্গে এদিকেই আসছিলেন তিনি। ব্রজমোহন তাঁর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এসে একেবারে জীপে বসিয়ে বললেন—একবার ধবনী চলুন দেখি! স্যানিটারীবাবু আশ্চয্য হয়ে বলেন—ওখানে তো দিন কয়েক আগে কাজ আরম্ভ করে কালকে সব শেষ করেছি স্যার। প্রতিটি ঘরে আমি নিজে গেছি। মৃদু হেসে ব্রজমোহন বল্লেন একটা ঘরে দেওয়া হয়নি। স্যানিটারীবাবু জিজ্ঞাসু হয়ে চেয়ে থাকেন; কার বাড়ী বলুন দেখি। ব্রজমোহন বলেন সেইটাই তো খুঁজে বার করতে হবে। তাই আপনাকে সঙ্গে নিলাম, চলো ইদ্রিস। বেশী দূর যেতে হল না গাড়ীর শব্দে পথের পাশে সরে দাঁড়িয়ে সেই বৌটি, জীপ থেকে নেমে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটির অপরাধীর মত কুণ্ঠায় ভরা মুখ দেখে করুনায় মন ভরে উঠলো।

কাছে সরে এসে বললেন আমায় দেখে পালিয়ে এলি কেন? রাস্তায় না পেলে আজ তোর বাড়ী পর্যন্ত যেতুম, কী করতিস-তুই তা হলে। কালো শির বার করা শুকনো মুখে করুন দুটি চোখ জলে চিক্ চিক্ করে উঠলো।

উকথা বোলো নাই বাপ্ আমার, তা হলে ঘরে আর ঠাঁই দিবে নাই গো বাবা, ঘরে আর ঠাঁই দিবে নাই। রাগে জ্বলে উঠলেন ব্রজমোহন। ধমকের সুরে বললেন। তবে শাকগুলো পাইকেরদের ধরে দিয়ে পালিয়ে এলি কেনো আজ তোর ওষুধ নেবার দিন ছিল না? দেখ দিকি কপালের দাগ কটা সব মিলিয়ে গেছে, হাতেরগুলোও তো বেশ মিলিয়ে এসেছে। আর নতুন দাগ কোথাও বেরোয়নি তো। দেখি পিঠের কাপড়টা একটু সরা দেখি? পথের লোকজন একটু ফাঁকা হতে ভয়ে ভয়ে মেয়েটি পিঠের কাপড় সরালো। নাঃ কোথাও দাগ নেই আশ্বস্ত হ'লেন তিনি যাক এটাও বেশ সাক্সেস্‌ফুল মনে হচ্ছে। খুশী হয়ে বললেন কত ভাল হয়ে গেছিস বল দেখি এই দু মাসে। ধৈর্য ধরে আর কটা মাস তুই ওষুধ খেয়ে যা, দেখি কেমন তুই সেরে না উঠিস, লক্ষ্মী মা আমার আমি সঙ্গে করেই তোর ওষুধ এনেছি, ধর। পরম কৃতজ্ঞতায় জলভরা চোখে মেয়েটি তার রোগা কালো হাতটা বাড়িয়ে হলুদ রঙয়ের ডি, ডি, এস বড়িগুলি নিয়ে নেয়।

ইনজিন বন্ধ করে ইদ্রিস গাড়ীতেই বসেছিল। স্যানিটারীবাবু কতক্ষণ বসে নেমে এলেন গাড়ী থেকে। মেয়েটির দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বললেন,স্যার এতো আমাদের মধু সোরেনের বউ। চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে ওর; সবাইকে তো ভ্যাকসিন দিয়েছি। ওদের ওই কি কমপ্লেন করেছে নাকি আপনার কাছে। হেসে ওঠেন ব্রজমোহন, ও কি কমপ্লেন কোরবে, আমার গরজটা আপনি বুঝলেন না। আপনাকে ছাড়া আমাকে ওদের গাঁয়ে ঢুকতে দেখলেই তো লোক সন্দেহ করবে। এ রোগের চিকিৎসার এই যে একটা মহা অসুবিধে।

মেয়েটির চোখে মুখে করুণ মিনতি ফুটে উঠলো। সে হাতজোড় করে স্যানিটারীবাবুর দিকে চেয়ে বলে— টিকেবাবু তুমি আমার গাঁয়েঘরে আমার রোগের কথা বুল নাই বাবু। এই দাকতার বাবার কথায় আমার কোলের ছানাকে উর মাসীর কাছে রাখছি। আজ কতকদিন হয়ে গেল হাটে আজ আমার ঘরের পাশের লোক ছিল, উরা তো এই বাবাকে কুঠে দাকতর বলে জানে। আমি ভয়ে তাই পেলিয়ে আসলম্। তা বাপ আমার নিজের বাপের থিকা বড় গো, নিজের বাপও এমন করে দেখে নাই গো দেখে নাই। কান্নার আবেগে মুখটা ওর আরো বিকৃত হয়ে ওঠে।

ব্রজমোহনের আর দেখার সময় নেই। অশথতলায় রুগীর ভীড় জমে গেছে হয়তো খেটে খাওয়া জনমজুর কাঙালি ভিখিরি আরো কত অনাথ আতুর। দূর দুরান্ত গ্রাম থেকে আসে ওরা আবার ফিরে যায়। ড্রাইভারকে বললেন। গাড়ীর স্পীডটা একটু বাড়াও ইদ্রিস।
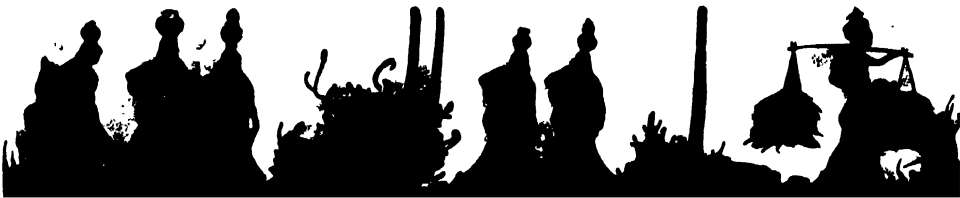
অতুলনীয় অতুলপ্রসাদ

মানসী মুখোপাধ্যায়

সুদূরের এক আকর্ষণী মোহিনী শক্তি আছে। সে শক্তির টান প্রবল। কিন্তু একবার তা করায়ও হয়ে গেলে তখন নিকটতমর জন্য প্রাণ উতলা হয়।

অতুলপ্রসাদ বিলেতের প্রতি এমনিই আকর্ষণ বোধ করেছিলেন যে একদিন চাকর হয়েও বিলেত যেতে প্রস্তুত ছিলেন। বিলেতে গিয়ে তার আবহাওয়া আর পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল মাটির মায়ের অদৃশ্য আকর্ষণ বুঝতে শুরু করলেন, তার অভাব অনুভব করতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়ে তাঁর বড় মামা কৃষ্ণগোবিন্দ কার্যোপলক্ষে সপরিবারে বিলেতে এলেন। বিদেশে বড়মামা মামীমাকে কাছে পেলেন। কাছে পেলেন মামাতো বোন হেমকুসুমকে—যে তাঁরই মত সঙ্গীত-পাগল। সুধাকণ্ঠী হেমকুসুম গান ছাড়াও এস্রাজ, বেহালা ও পিয়ানো বাজাতে জানেন; ছবি আঁকতেও তাঁর সমান আগ্রহ।

বড়মামা, মামীমার সঙ্গে কতো কথা হল, মনের রুদ্ধ বাতায়ণ যেন উন্মুক্ত হয়ে গেল; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার খবর নিলেন। নিজের খবরও দিলেন।

অতুলপ্রসাদ সময় পেলেই মামীমার কাছে চলে আসেন। বাংলায় কথা বলে আনন্দে, তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। দেশের মাটি ও মাতৃভাষা যে কতো প্রিয় সে বোঝা যায় যখন তার ধরাছোঁয়ার বাইরে, দূরে থাকা যায়। 'আমার বাংলা ভাষা' যে কত আহামরি ভাষা তা অতুলপ্রসাদ তাঁর প্রবাস জীবনে মনে হয় অত্যন্ত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন।

অবসর সময়ে মামীমা এবং মামাতো বোনদের নিয়ে বেড়াতে যান, লণ্ডন শহর ঘুরিয়ে দেখান। সন্ধ্যেবেলায় হেমকুসুমের বেহালা বাজানো শোনেন। হেমকুসুম যত্ন করে বেহালা শিখছেন। বেহালার হাত ওর বড় মিষ্টি। সঙ্গীত সভায় নাচের আসরে বেহালা বাজিয়ে হেমকুসুম ইতিমধ্যে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

অতুলপ্রসাদ এলে হেমকুসুম বেহালা রেখে গল্প করতে চান। বলেন, সারাক্ষণ বেহালা বাজিয়ে ক্লান্ত লাগছে। এসো এবার গল্প করা যাক। বিলেৎ দেখা তোমার স্বপ্ন ছিল। এখন বিলেৎ কেমন লাগছে বল।

অতুলপ্রসাদ তাঁর হাতে বেহালা তুলে দেন। বলেন এখন বেহালা শুনি, গল্প পরে হবে।

হেমকুসুমকে আবার বেহালা বাজাতে হয়। তাঁর মুখে মৃদু হাসির রেখা।

অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হয়ে বেহালা শোনেন। হেমকুসুমকে দেখেন।

হেমকুসুমকে দেখতে সত্যিই সুন্দর, একহারা চেহারা উজ্জ্বল বর্ণ, মুখশ্রীও ভাল। তার ওপর তাঁর সপ্রতিভা ও দুঃসাহসীকতা তাঁকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে তুলেছে। একটিই দোষ, স্বভাবে বড়ই জেদী।

এরপর এলো বিদায়ের পালা। বড়মামার লণ্ডনের কাজ তখনকার মত শেষ। তিনি সপরিবারে দেশে ফিরে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ আবার যেন নতুন করে একা হয়ে পড়লেন। বিদেশে একাকীত্ব বড় বেদনাদায়ক, বড়ই অসহনীয়। লণ্ডনের ধূসর আবহাওয়া শূন্য মনকে যেন আরো বিষন্ন, রিক্ত করে তোলে।

মনকে সান্ত্বনা দিয়ে অতুলপ্রসাদ পড়াশোনায় ডুব দিলেন। দেশ যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দিনরাত পরিশ্রম করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি চলল। এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা।

অবশেষে পরীক্ষা দিলেন। কৃতকার্য হলেন

অতুলপ্রসাদ। পার্টি দেওয়ার পর তাঁর নাম ব্যারিস্টারিতে এনরোল্ড্ হল। তিনি সফল, তাঁর স্বপ্ন এবার সার্থক, পূর্ণ হল তাঁর সুদীর্ঘ দিনের একান্ত গোপন আশা।

এবার দেশে ফেরার পালা। দেশের স্মৃতি বুঝি তাঁর মনে গুনগুনিয়ে ওঠে,—'প্রবাসী চলরে ফিরে চল।'

॥ পাঁচ ॥

১৮৯৫ অব্দে অতুলপ্রসাদ স্বদেশে ফিরে এলেন; ফিরে পেলেন আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের মধুর সান্নিধ্য। ছেলেকে কাছে পেয়ে হেমন্তশশীর চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দেয়, তারপর আশীর্বাদ হয়ে অতুলপ্রসাদের মাথার ওপর ঝরে পড়ে।

ফিরে আসা ও ফিরে পাওয়ার প্রবল আনন্দ ক'দিন পরে থিতিয়ে গেল, শান্ত হল। এবার ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হবার পালা। তার আগে অতুলপ্রসাদ একবার নিজেদের গ্রামে, পঞ্চপল্লীর অন্তর্গত মগরে ঘুরে এলেন। পদ্মানদীকে দেখে উচ্ছ্বসিত হলেন; গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করে মন অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল।

কোলকাতায়, সার্কুলার রোডে বাড়ী ভাড়া নেওয়া হল।১ সেখানে অতুলপ্রসাদ তাঁর অফিস সাজালেন। দুর্গামোহনবাবু তাঁকে সব রকমে সাহায্য করলেন। কোলকাতা হাইকোর্টে অতুলপ্রসাদের নাম এন্‌রোল্ড হল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের (পরে লর্ড) জুনিয়র হয়ে অতুলপ্রসাদের কর্মজীবন শুরু হল।২ পরিচিত হলেন তখনকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজে; তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন, মাথায় দীর্ঘ, গড়ন সুগঠিত, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ ক'বছর বিলেৎ-বাসের পর আরো উজ্জ্বল, সব চেয়ে সুন্দর তাঁর গভীর চোখ দুটি। তাঁর ব্যবহারও বড় অমায়িক, বড় চমৎকার।

সকালে নিজের অফিসে সময় কাটে, সারাদিন কোর্ট-কাছারিতে সময় চলে যায়। তার পরের সময় তাঁর একান্ত একার। সেই সময় তিনি পরিচ্ছন্ন হয়ে চলে যান ক্লাবে, সাহিত্য ও সঙ্গীতের আড্ডায়- খামখেয়ালীর আসরে।

"বিলাত হইতে আসার পর অতুলের রবিবাবুর সহিত আলাপ হয় এবং তাহা ক্রমে গভীর স্নেহের বন্ধনে পরিণত হইয়াছিল"।৩

রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম আলাপ হয় খামখেয়ালীর আসরে। অতুলপ্রসাদের ভাষায়, "তখন আমায় বয়ঃক্রম প্রায় একুশ-বাইশ। শ্রীমতী সরলা দেবী আমাকে লইয়া গিয়া তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম।' ৪

সে আসরে রবীন্দ্র গান করেছিলেন। অতুলপ্রসাদের সে গান বড় ভাল লেগেছিল।

এরপর অতুলপ্রসাদের এক বন্ধু জানান যে, অতুলপ্রসাদ গান করেন আবার গান রচনাও করেন।

তখন কবির অনুরোধে অতুলপ্রসাদ স্বরচিত একটি গান করে শোনান।

এরপর দুই কবি আরো সন্নিকট, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৮৯৬ অব্দে "খামখেয়ালী" নামে একটি সাহিত্য এবং সঙ্গীত-সভা স্থাপিত হয়। অতুলপ্রসাদ এই সভার সর্ব কনিষ্ঠ সভ্য। অন্যান্য সভ্যরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, লোকেন পালিত, রাধিকামোহন গোস্বামী ইত্যাদি।

এই সভার বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না। সাহিত্য, সঙ্গীত, হাস্যরস ইত্যাদির দ্বারা আনন্দ পরিবেশন করে সভ্যদের আকৃষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

খামখেয়ালী আসরকে আমোদে মশগুল করে রাখতেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর অফুরন্ত হাসির গান দিয়ে। তিনি গান গাইতেন আর অন্যান্য সভ্যরা তাঁর সঙ্গে কোরাস গাইতেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। সকলের মুখে হাসি কণ্ঠে গান, হাসির উচ্চরোলে সভাস্থল কম্পান্বিত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল গাইতেন, 'হাত পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন, 'তা

বটেই ত, তা বটেই ত'। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন, 'নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ' রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন, 'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'।৫

বিখ্যাত গায়ক রাধিকামোহন গোস্বামী তাঁর উচ্চাঙ্গের তান লয়মণ্ডিত সঙ্গীতে সভ্য সকলের মনোরঞ্জন করতেন।

নাটোরের মহারাজা বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে বাঁয়া তবলা বাজাতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'রাজন' বলে সম্বোধন করতেন।

শিল্পের রাজা অবনীন্দ্রনাথ মিষ্টি হাতে এস্রাজ বাজাতেন।

সভা সভ্যদের বাড়ি বাড়ী ঘুরে বসত। যখন যে সভ্যের বাড়ী বসত তিনি অন্যান্যদের সভা অন্তে ভোজনে তৃপ্ত করতেন।

অতুলপ্রসাদের বাড়ীতেও একবার খামখেয়ালী সভাকে আমন্ত্রণ করে সাহিত্য সঙ্গীত-রসের আস্বাদনের পর সভ্যদের ভূরি ভোজন করান হল। সেদিন রবীন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরলেন রাত বারোটার পরে; নাটোরের মহারাজা রাত একটার পরে এবং দ্বিজেন্দ্রলালকে অতুলপ্রসাদ নিজে পরের দিন বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলেন।

রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ হবার পর অতুলপ্রসাদ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত করতেন। কবির নির্দেশে তিনি প্রতিদিন বিকেলবেলা যেতেন আর দীর্ঘ সময় রবীন্দ্রকাব্যের রসাস্বাদন করে চা-পান অন্তে সন্ধ্যের সময় নিজের বাড়ী ফিরে আসতেন। তখনো যেন কাব্যের গুঞ্জরণ কানে বাজত, মন আনন্দে, তৃপ্তিতে ভরে থাকত।

প্রতিদিনের কল্পনা আনে সার্থকতার স্বপ্ন। অতুলপ্রসাদ ঠিক সময়ের মধ্যে তৈরী হয়ে হাইকোর্টে পৌঁছে যান।

কিন্তু বিকেলবেলার বিষণ্ণ আলোর মত বিষণ্ণ মন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। কোলকাতায় পসার জমিয়ে উঠতে পারছেন না। যেখানে বড় বড় রথী-মহারথীদের হালে পানি পেতে দীর্ঘ সময় লাগে, সেখানে নতুন ব্যারিষ্টার অতুলপ্রসাদের দ্রুত পসার জমিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

চিন্তিত হন অতুলপ্রসাদ। চিন্তিত হন হেমকুসুমও। কিন্তু পরক্ষণেই উৎসাহ দেন, চেষ্টা করতে করতে তুমি একদিন সফল হবেই, দেখ।

কিন্তু অতুলপ্রসাদ উৎসাহবোধ করলেন না। আত্মীয়-বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন কোন ছোট শহরে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে। রংপুর বেশ ভাল জায়গা।

সত্যি, ভাল মত প্র্যাকটিস হওয়া দরকার। কিন্তু কোলকাতার পরিবেশ ছেড়ে অতুলপ্রসাদের অন্য কোথাও যেতেই ইচ্ছে করে না। খাম-খেয়ালীর আড্ডা ছেড়ে, রবীন্দ্র—বলেন্দ্র—দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গ ছেড়ে তিনি থাকবেন কি করে; মনের সব জানালা বন্ধ রেখে তিনি বাঁচবেন কেমন করে।

এই সময়ে, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৯৭ অব্দে, দুর্গামোহন দাস হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর শরীর খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল; দ্বিতীয়বার বিবাহ করার দরুন হেমন্তশশীদেবীর মত তিনিও আত্মীয়-স্বজন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় মানসিক শান্তিও ছিল না।৬

তাঁর মৃত্যু সংসারের ওপর যেন কালবোশেখী ঝড়ের মত এসে পড়ল। অতুপ্রসাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি হল। তিনি চিন্তিত হলেন।

কিছুদিন পরে অতুলপ্রসাদ রংপুরে যাত্রা করলেন। নতুন করে প্র্যাকটিস শুরু হল। রংপুর ছোট শহর, কৃতকার্য হতে পারেন। কিন্তু ওখানে তাঁর মন স্থির হয়ে বসতে চায় না। প্রায়ই কোলকাতা চলে আসেন।

ইতিমধ্যে একটি অপ্রিয় ঘটনা বিরাট আকার নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম একে অপরকে বিবাহ করবেন বলে স্থির করলেন।

শুনে মা, হেমন্তশশীদেবী এবং বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ এবং তার পরিবারের সকলেই প্রবল প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। মামাতো—পিসতুত ভাইবোনে বিয়ে—অসম্ভব!

মা ছেলেকে বোঝাতে লাগলেন, এ অসম্ভব প্রস্তাব ছাড়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ কিছুই বুঝতে চাইলেন না।

বড়মামা ও মামীমা হেমকুসুমকে শাসন-বারণের দ্বারা নিরস্ত করতে চাইলেন। কিন্তু হেমকুসুম তাঁর সঙ্কল্পে অটল। সোজা রাস্তায় মা-বাবাকে রাজী করাতে অসমর্থ হয়ে তিনি শেষে কৌশলের পথ ধরলেন। 'একদিন গলায় ফাঁস লাগাবার অভিনয় করলেন তিনি। একটি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝোলান শাড়ি নিজের গলায় বেঁধে মাকে ডাকিয়ে পাঠালেন। মা এলে বললেন, হয় অতুলকে বিয়ে করার অনুমতি দাও নয় তো আমি এই ঝুলে পড়লুম।

এই জেদী, অবুঝ সন্তানটি মা-বাবার বড় আদরের ছিলেন। সন্তানকে মৃত্যুমুখী দেখে ভীতা মা আশ্বাস দেন, আর বাধা পাবে না, নেমে এসো'।[৭]

হিন্দু আইনে মামাত পিসতুত ভাইবোনের বিবাহ সম্ভব নয়, বৃটিশ আইনেও যে ব্যবস্থা নেই। ধর্মান্তর গ্রহণ বিবাহ করে করতে অতুলপ্রসাদ রাজী নন; ধর্মমতকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। আবার অতুল—হেমকুসুম একে অপরকে বিবাহ করতে স্থির সঙ্কল্প। অতুলপ্রসাদ খুবই চিন্তায় পড়লেন।

তখন লর্ড সিংহ অতুলপ্রসাদকে বিলেত গিয়ে বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন। স্কটল্যাণ্ডে গ্রেটনাগ্রীন গ্রামে ভাইবোনের (কাজিন) বিবাহের নিয়ম-নীতি আছে।[৮]

অতুলপ্রসাদ তার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। তারপর ১৯০১ অব্দে একদিন হেমকুসুমসহ আবার সীমাহীন নীল সাগরের বুকে নতুন আর এক আশার অঞ্জন চোখে নিয়ে অকুলে পাড়ি দিলেন।

॥ ছয় ॥

আবার বিলেৎ।

এখন শীতের শেষ। এরপর আসবে গ্রীষ্ম। বিলেতে 'সামার' হল বসন্তকাল। আর কিছুদিন পরে ফুলের মেলা দেখা যাবে।

অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের বিবাহ নির্বিঘ্নে শেষ হল। আনন্দের মাঝেও নিরানন্দ, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে দূর বিদেশে নিঃশব্দে দুজনে বিবাহ করলেন। আলোর চমকানি নেই, কোন আড়ম্বর নেই, আনন্দের কলরব নেই, ধান-দূর্বা-চন্দন-প্রদীপের পূত পরিবেশ নেই। বড় শূন্য মনে হল অতুলপ্রসাদের, হেমকুসুমের।

দুজনেই বড় অভিমানী। অতুলপ্রসাদ ঠিক করলেন আর দেশে ফিরে যাবেন না। আত্মীয়রা যখন তাঁদের সমর্থন করেন নি, আর দেশ ছেড়ে যখন চলে আসতেই হল তখন বিলেতে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। এই সমুদ্র-ঘেরা মেঘে ঢাকা-দেশ, তাঁর স্বপ্নের দেশ এখন থেকে হবে তাঁর কর্মভূমি, কাব্যের লীলাক্ষেত্র।

শুনে হেমকুসুম তাঁকে সমর্থন জানালেন। শুরু হল নতুন জীবন।

অতুলপ্রসাদ মহাউৎসাহে লণ্ডনে প্র্যাকটিস আরম্ভ করলেন। তাঁর সফলতার জন্য পরিশ্রমের অন্ত ছিল না, দেহে মনে শ্রান্তি ক্লান্তিও ছিল না। কিন্তু কোলকাতার মত এখানেও তাঁর ভাগ্যলক্ষী উদার হস্ত প্রসারিত করে তাঁকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিলেন না। উদ্বেগ আর অনটনের মধ্যে দিয়ে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল দিনগুলি শেষ হয়ে শীত তার সাদা মাথা নিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে এলো। কুয়াশা বৃষ্টি বরফে লণ্ডন যেন বড় বিষণ্ণ দেখায়।

বিমর্ষ অতুলপ্রসাদও। পরিশ্রমে আনন্দ নেই, মনে শান্তি নেই। এতদিনেও দেশ থেকে একটিও চিঠি এলো না; মার কাছ থেকেও একটি চিঠি পাওয়া গেল না।

সেই বিমর্ষ নিরানন্দের দিনে আনন্দ দিতে, একটি নয় এক জোড়া শিশু এলেন হেমকুসুমের কোলে। ১৯০১ অব্দে হেমকুসুম জননী হলেন।

স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে শিশু দুটির নাম রাখলেন দিলীপকুমার ও নিলীপকুমার। ওঁদের ফোটো তোলা হল।

অতুলপ্রসাদ আবার নতুন উৎসাহে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তাঁকে এবার সফল হতেই হবে, স্ত্রী-পুত্রদের সুখে রাখতে হবে।

কিন্তু চেষ্টা করেও প্র্যাকটিস তাঁর জমলো না। বিলেতের দারুণ শীতে শিশুপুত্র নিয়ে বড় কষ্টে দিন কাটতে লাগল।

আত্মীয়দের নীরবতা, স্বামীর হতাশা ও সন্তানদের কষ্টে হেমকুসুমও বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তবু তিনি সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন। এরপর এমন দিন এলো যে হেমকুসুমের সঙ্গে যা সোনার গহনা, হীরের আংটি ইত্যাদি ছিল তিনি তা একে একে নিঃশব্দে বিক্রী করে দিলেন।৯

ভগবানের পরীক্ষার তখনো বুঝি শেষ হয় নি। দিলীপের যখন সাত মাস মাত্র বয়েস কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর তিনি মারা গেলেন।

স্বামী-স্ত্রীর আর কোনো আশা-আনন্দ রইল না। হেমকুসুম বুঝি পাথর হয়ে যাবেন। অতুলপ্রসাদ হারিয়ে ফেললেন তাঁর সব উদ্যম উৎসাহ।

মানসিক এবং আর্থিক অবস্থা যখন ছিন্নভিন্ন তখন অতুলপ্রসাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর একজন মুসলমান বন্ধু। "সেখানে একজন মুসলমান বন্ধুর সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনিই অতুলকে লক্ষ্ণৌএ বসিতে উপদেশ দেন"।১০

বন্ধুর উপদেশ অতুলপ্রসাদ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন। এভাবে অনিশ্চিত ও অভাবের মধ্যে আর পড়ে থাকা যায় না। বাংলাদেশের কথা, কোলকাতার কথা তাঁর মনে উঁকি দিল। আবার আত্মীয়-স্বজনের কথাও মনে পড়ল। তিনি শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুর উপদেশে লক্ষ্ণৌ যাওয়াই স্থির করলেন।১১

লক্ষ্ণৌ যাবার আগে বিলেৎ থেকে অতুলপ্রসাদ স্ত্রী-পুত্রসহ প্রথমে কোলকাতায় এলেন, অবশ্য দিন কয়েকের জন্য। আত্মীয়-স্বজন কেউই এসে অতুলপ্রসাদকে স্বাগতম্ জানালেন না, একমাত্র ব্যতিক্রম শিশিরকুমার দত্ত। এ জন্য অতুলপ্রসাদ শিশিরকুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।১২

তারপর অতুলপ্রসাদ সপরিবারে অপরিচিত দেশ সংযুক্ত প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সে বছর ছিল ১৯০২।

১। সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।

২। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

৩। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী

৪। অতুলপ্রসাদ—আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি।

৫। অতুলপ্রসাদ—আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি।

৬। সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।

৭। সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।

৮। শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ—সাক্ষাৎ, তিনি এ কথা অতুলপ্রসাদের নিকটেই শুনেছেন।

৯। সেন পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়া—সাক্ষাৎ।

১০। ৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী। ৺সুবালাদেবীও তাঁর প্রবন্ধ "অতুলপ্রসাদ'—এ লিখেছেন, "সেখানে (বিলেতে) তাঁর একটি মুসলমান বন্ধু লক্ষ্ণৌ যাইয়া প্র্যাকটিস করিবার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করেন এবং বলেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। নিশ্চয়ই তোমার সেখানে ব্যবসায়ে উন্নতি হইবে"।

১১। "বিবাহের পর আত্মীয়রা তাহাদের উপর বিমুখ হইয়া পড়িল। তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য এবং অভাবের তাড়নায় লক্ষ্ণৌ গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করাই স্থির করলেন। আত্মীয়দের নিকট কোনও সাহায্যের প্রত্যাশা নাই অথচ কাছে থাকিয়া তাহাদের উপহাসের পাত্র হইতে হইবে এ সকল চিন্তা করিয়াই তিনি দূরে গিয়াছিলেন"।—৺সত্যপ্রসাদ সেন—ডায়েরী।

১২। কুমুদিনী দত্ত—সাক্ষাৎ। ৺শিশিরকুমার দত্তের পত্নী।

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি

রমেশচন্দ্র পাল

বাংলা দেশে বিজ্ঞান-লক্ষ্মী জগদীশ চন্দ্রের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিস্ময়কর আবির্ভাব সাহিত্যের সরস্বতী রবীন্দ্রনাথের। উভয়েই ইতিহাসের পাতায় স্বাতন্ত্র্যের স্বর্ণ সিংহাসনে স্থানলাভ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে বিশ্বদরবারে জায়গা করে দিয়ে গিয়েছেন। একজনের বড় পরিচয় বিজ্ঞানী, অপরজনের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। আশ্চর্য! বাংলাদেশের এই দুই মহাপুরুষের মিলনমধুর আবির্ভাব। প্রায় একই সময়ে বঙ্গমাতার কোলে অবতীর্ণ হন এঁরা। অথচ ভিন্ন চিন্তায় উভয়েরই চিন্তাধারা সীমা পেরিয়ে সীমার উর্দ্ধে দিক থেকে দিগন্তে সর্ববিষয়ে প্রসারিত হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক হলেও "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" প্রভৃতি লেখনির মধ্যে তার বিরাট সাহিত্য প্রতিভার অমর সাক্ষ্য বহন করছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় তাঁর "ছিন্নপত্রে, সৌন্দর্য বোধ, পঞ্চভূত ও বিশ্বপরিচয়"-এ। তাই তিনি বলেছিলেন—"বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনি তেমনি পাত্র।" বৈজ্ঞানিক চিন্তা না আসিলে, বা তার মাধ্যমে কর্মের ক্রমবিকাশ না ঘটলে, কোন দেশ বা জাতির উন্নতি হতে পারে কি? বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্রমবিকাশ বিশেষ উন্নতস্তরে না উঠার জন্যই বুঝি ভারতের অগ্রগতিতে প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ইলেকটিশিয়ান পত্রিকা ও বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি কম্ব তখন লিখে পাঠিয়েছিলেন "আপনার আবিষ্কার বিজ্ঞানকে বহুদুর এগিয়ে দিয়েছে।...বহু হাজার হাজার বছর আগে আপনার পূর্ব পুরুষ মানব সভ্যতায় অগ্রনী ছিলেন। এবং কলাবিদ্যায় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক জগৎ সমক্ষে প্রজ্বলিত করে এগিয়েছেন। আপনি আপনার পূর্ব পুরুদের গৌরব কীর্তি। বিশ্বকবি নিজেও জানতেন জগদীশচন্দ্র একদিন সুনাম অর্জন করবেন। তাই তো ১৩০৪ সনে পশ্চিমে জগদীশ চন্দ্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে —তিনি গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে লিখেছিলেন—

> বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
> দূর সিন্ধুতীরে
> হে বন্ধু গিয়েছ তুমি জয়মাল্য খানি
> সেথা হ'তে আনি
> দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
> পরায়েছ ধীরে
> বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা মণ্ডিত
> পণ্ডিত সভায়
> বহু সাধুবাদ ধ্বনি নানা কণ্ঠ রবে
> শুনেছ গৌরবে।
> সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
> হয়ে সিন্ধুপার
> আজি মাতা পাঠিয়েছে অশ্রুশিক্তবাণী
> আশীর্ব্বাদ খানি
> জগৎ সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
> কবি কণ্ঠে প্রাত:
> সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
> ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

বাংলা সাহিত্যাকাশে কবি রবিকে যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিকাশের ধারক বলা হয়, তবে বোধ করি সে নাম সার্থক হবে। কারণস্বরূপ বলা যায় তিনি লিখেছিলেন "একটি বালুকণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখিতে পাই তাহা কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি।......অতএব নিতান্ত জড়ভাবে না দেখিলে মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকণার

আকার-আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। জানা যায় যে তাহা অসীম।”

আরও বলেছিলেন “...আমাদের চক্ষু যদি অনুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে সূক্ষ্ম দেখিতেছি তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অনুবীক্ষণতাশক্তি কল্পনায় যতই বড় বাড়াইতে ইচ্ছা করি ততই বাড়িতে পারে।...পরমাণুর বিভাজ্যতায় তার কোথাও শেষ নেই। অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে; একটি পর্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে, ছোটবড় আর কোথায় রহিল? একটি পর্বত ও যা পর্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই। কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান।...হয়ত ছোট যেমন অসীম হতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হ'তে পারে। হয় তো অসীমকে ছোট বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না। কবির কবিতার মধ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়:

যাহা কিছু, শুধু ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি
বালুকার কণা সেও অসীম—অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশে
কে আছে, কে পারে তার আয়ত্ত করিতে
ছোট বড় কিছু নাই, সকলি মহৎ।'

কবির চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এক জায়গায় তিনি লিখেছেন '-ঈথর কাঁপিতেছে আমি দেখিতেছি আলো। বতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে আমি শুনিতেছি শব্দ, ব্যবচ্ছেদ বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে।......আমাদের মনে যাহার ভাব নেই—মুখে বলি তাহা অসংখ্য শক্তির খেলা কিন্তু শক্তি বলিতে আমরা কিছুই বুঝি না। অতএব আমরা যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি তাহার ওপরে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। সাহিত্যিকের চোখে তিনি যে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া বর্ণনা করেছিলেন তা তাঁর প্রবন্ধে কাব্যে নানাস্থানে প্রকাশ পেয়েছে।

“জীবনস্মৃতি'তে তিনি অনেক তত্ত্ব পরিবেশন করে গিয়েছেন। তাছাড়া “পঞ্চভূতে” এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন গতির মধ্যে খুব একটা পরিমাণ করা নিয়ম আছে। পেণ্ডুলাম নিয়মিত তালে দুলিয়া থাকে। চলিবার সময় মানুষের পা মাত্রা রক্ষা করিয়া উঠে পড়ে ...গতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে থাকে। সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লয় আছে। এবং পৃথিবী এক মহাছন্দে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে...একটা গতির সঙ্গে আর একটা গতির বড় সম্বন্ধ। অনন্ত আকাশ জুড়িয়া চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারা তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে।

'ছিন্নপত্রে' তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—“...পৃথিবীর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে এই ডাঙ্গায় জলে লড়াই চলছে।” সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রতিভা বিচার করাও বড় শক্ত।

পুরাণে বলে—সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যদেব। অর্থাৎ অরুণ সারথি চালিত সপ্তাশ্বরথে সূর্য দেবতা বিশ্বপর্যটন করেন। বিজ্ঞানে “স্পেক ট্রাম কাঁচ খণ্ডের সাহায্যে প্রতীয়মান হয় সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে সূর্য্যের শ্বেতবর্ণ সমুদ্ভূত। সূর্য কিরণ বিশ্লেষণ করলেও সেই বিভিন্ন রঙের সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনি রবি-কবিকে বাংলা গদ্য, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা সঙ্গীত ও প্রবন্ধে সপ্ত কেন প্রায় সর্ব বিভাগেই কবির অপূর্ব সৃজনশক্তি ও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়ের সন্ধান মেলে। কবির প্রভাব যে একমাত্র কাব্যেই জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে তা নয়, রবিকিরণের সর্বব্যাপ্ত প্রতিভা সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলেই প্রতিফলিত হয়েছে। কারো কারো কাছে, কোনটি বাহ্যত দূরবর্তী ও ভিন্নপথের যাত্রিক হলেও সমস্ত গ্রহ—উপগ্রহই এ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে। সূর্যের মতই কবি-প্রতিভা-প্রকৃতির রস ভাণ্ডার হতে যা সংগ্রহ করে সহস্র গুণেই সহস্র করেই তা ফিরিয়ে দেন। তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহিরিন্দ্রীয়গত সৌন্দর্য ভোগের কম বেশী মিলে মিশে প্রকৃতির ও সৃষ্টিবৈচিত্রের উপকরণ জুগিয়েছেন এবং বিজ্ঞান-সম্মত বুদ্ধি বা যুক্তিবাদের দিক অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় বরং কবির উচ্চতর

বুদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে। অন্য দু একজনের মত কবি কল্পনার মধ্যেও আজ আমরা আমাদের চাঁদে যাওয়ার বা অবতরণের যে প্রশ্ন পেয়েছি—তাতে বিশ্বকবির সেদিনের চিন্তাও অমূলক নয়; তা তাঁর কবিতায় প্রকাশ পায়—তিনি লিখেছিলেন—

ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠি ঝলি
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়
অতিদূর তীর্থের যাত্রী
ভাষাহীন রাত্রি
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ।"

বিশ্বকবির কবিতায় আছে এক জায়গায়—

বুড়ো চন্দ্রটা নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।

—যদিও কবি চন্দ্রকে মৃত্যুদূত বলেছেন, আসলে চাঁদ যখন পৃথিবীর কাছে চলে আসবে তখন চাঁদকেই মরতে হবে, এছাড়া কবির কবিতাতে চাঁদে যে বায়ুমণ্ডল নেই, দিনের বেলাতেও যে চাঁদের দেশে কুচকুচে কালো আর সেই কালো আকাশে দিনের বেলাতেও তারা ফুটে, তা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছিলেন—

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে ছিল হাওয়ার
আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র
ছিল সে নিত্য নবীন,
দিনে দিনে আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হল সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে,
আজ শুধু তার মধ্যে আছে—
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দণ্ড—
ফোটে না ফুল বহে না কলি মুখরা নির্ঝরিণী

কবিতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় কবিগুরু সাহিত্যিক হলেও বিজ্ঞানকে অন্তরের শেষ ভালবাসা ঢেলে আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বড় পরিচয় জগদীশচন্দ্র যখন বিদেশে একের পর এক সুনাম অর্জন করছিলেন তখন তিনি জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে যে কবিতা লিখেছিলেন—

"ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি,
হে আশ্চর্য জগদীশ! কী অদৃশ্য তপোভূমি—
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।—

এই কবিতার মধ্যে দিয়ে কবির বিজ্ঞান-মনের জিজ্ঞাসা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, এছাড়া বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকে বিজ্ঞান চর্চায় ও ভাবসাধনায় বাঙালী জাতি কোন দিনই সে কোন জাতি অপেক্ষা খুব একটা পিছনে ছিল না বা বাঙালীর মণীষা ও ক্ষুরধার প্রতিভাময় বুদ্ধি বাঙালীকে যে বিশ্বের প্রশংসা অর্জনে অনগ্রসর করে রাখতে পারে নি বরং বাংলার সুসন্তানগণ সময়ে সময়ে শাণিত বুদ্ধির আর বিপুল সৃজনী-প্রতিভার যে পরিচয় মেলে তাতে তাঁরা যেমন ধন্যবাদ পেয়েছেন তেমনি নিজেদের দেশকে গৌরবান্বিত করেছে; আজ সভ্যতার বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানের নতুনত্ব আবিষ্কারে নিজেরা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে অরণ্যচারী ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করে সন্ধানী মানুষের চোখে দিক-বিদিকে আলোর শিখা জ্বালাইবার কৌশলটি আয়ত্ব করেছিলেন তার নিদর্শনস্বরূপ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে যে মুখ্য আসনে বসাতে চেয়েছিলেন তাতে তিনি একটি ইংরাজী প্রবন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বিজ্ঞান চর্চা যে তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছিল জীবনস্মৃতি থেকে শুরু করে শেষ বয়সের "বিশ্ববিজ্ঞান" তার উদাহরণ।

শান্তিনিকেতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন তিনি করেছিলেন। তার কারণ বোধ হয় এই—শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের

আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারে, তাহলেই বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটবে। তিনি 'শিক্ষা প্রসঙ্গ' কথায় এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন "বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার গোড়া পত্তন করিয়া দিতে হয়।.........যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞান চর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক তাহা হইলেই বিজ্ঞান সভা সার্থক হইবে। কবিগুরু ১৮৯৫ সালে (বঙ্গ দর্শন, শ্রাবণ সংখ্যা) জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় বাংলায় একটি প্রবন্ধ লিখেন "জড় কি সজীব?" তাতে এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেন যাহাকে আমরা ...জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে। নইলে কখনই নির্জীবের প্রতি জীবের জড়ত্বের প্রতি মনের বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই। সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি।

বিদেশে জগদীশচন্দ্রের এক চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে অশোক বন হইতে সীতা উদ্ধার তুমিই করিবে। আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বন্ধন করিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়ে স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করব।" এবার রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের উপর রস-কাব্যের উদাহরণ দেওয়া যাক। ১২৮৭ খৃঃ ভাদ্র সংখ্যায় ভারতী পত্রিকায় তিনি লেখেন—একজন লোক আছে তাহারা যতক্ষণ একলা থাকে ততক্ষণ কিছুই নহে—একটা শূন্য '০' মাত্র। কিন্তু একের সহিত যখনি যুক্ত হয় তখনি (১০) দশ হইয়া পড়ে। একা আশ্রয় পাইলে তাহারা কি না করিতে পারে। সংসারে শত সহস্র শূন্য আছে। বেচারীদের সকলেই উপেক্ষা করে থাকে তাহার একমাত্র কারণ সংসারে আসায় তাহারা উপযুক্ত 'এক' পাইল না।...এই সকল শূন্যদের এক মহাদোষ এই যে পরে বসিলে ইহারা ১কে ১০করে বটে কিন্তু আগে বসিলে দশমিকের নিয়মানুসারে ১কে তাহারা শতাংশে পরিণত করে। (·০১ অর্থাৎ ইহারা অন্যের দ্বারা চালিত হইলেও চমৎকার কাজ করে বটে কিন্তু অন্যকে চালনা করলে সমস্তই মাটি করে।...স্ত্রী মর্যাদা অনভিজ্ঞ গোঁয়ারগণ বলেন যে স্ত্রীলোকেরা এই শূন্য। ১-এর সহিত যতক্ষণ না তাহারা মিশিতেছে ততক্ষণ তাহারা শূন্য। কিন্তু ১এর সহিত বিধিমতে যুক্ত হইলে সে ১কে এমন বলীয়ান করে তুলে যে সে দেশের কাজ করতে পারে। কিন্তু এই শূন্যগণ যদি ১এর পূর্বে চড়িয়া বসেন তবে এই ১ বেচারীকে তাহার শতাংশে পরিণত করেন। স্ত্রৈনপুরুষের আর এক নাম ·০১।"

সামান্য আলোচনার মাধ্যমে কবির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা সত্যিই কষ্টসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন মহাপুরুষ, যাকে সেকালের সমযুগের মানুষ তার বিজ্ঞান, দর্শন কর্ম, ধর্ম, জ্ঞান, শৌর্য, ত্যাগ, সাহিত্য, কাব্যে ও দেশপ্রেমের আদর্শে তাকে বীর-পূজার আসনে বসিয়ে তার সাধনার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করে তাকে পূজা করলে শেষ হবে না। তাঁর অনন্ত অসীম জ্ঞানভাণ্ডার এক মনুষ্য জীবনে উপলব্ধি করা কঠিন।

আমাদের অজ্ঞতা কবিগুরুর বিজ্ঞান-চিন্তাকে অস্তিত্ব স্বীকার করুক আর নাই করুক, তিনি তার সাহিত্যের মধ্যে কাব্যের ছটায়, প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারার যে আলোকপাত করে গিয়েছেন, গভীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খুঁজলে দেখা যাবে বিশ্বকবি একজন বড় বৈজ্ঞানিক।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোপেশ্বর তামাক টানতে টানতে ভাবলেন ইস্—আচ্ছা পাল্লায় পড়া গিয়েছে। তাঁর মনটা উস্‌-খুস্ করতে লাগল। ছেলেটা আবার কোথায় গেল। একদণ্ড যে স্থির হয়ে বসবে তা নয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, দূরে অভয় দাঁড়িয়ে। ষ্টীমারের এটা সেটা দেখছে। নটবর চক্রবর্তী গাঁজার কলকেয়, বড় তামাক সাজতে সাজতে বলতে সুরু করেন, আবার দ্বিতীয় পক্ষ করলাম। ছেলে পুলে আজও হ'ল না। আর দ্বিতীয় পক্ষটি, কি বলব মশাই, ভারী দজ্জাল আর জাঁহাবাজ ছিল। ভারী জাঁহাবাজ—। শুনে অবাক হ'বেন মশাই—আমার ধর্মপত্নী মশাই, একদিন আমার গায়ে হাত তুলল। বুঝলেন কিনা—কলিকাল আর কাকে বলে মশাই—ঘোরকলি এখন। ভাবতে পারেন মশাই, পরিবার কিনা স্বামীর গায়ে হাত তুললো। তুই যে ভুলে গেলি পতি পরম গুরু। ওর কি নরকেও জায়গা হ'বে। উহুঃ—তা হ'বে না। তারপর মশাই—ঘেন্নার কথা কি আর বলব। সেই মেয়ে মানুষ মশাই আমার টাকা-কড়ি গয়না-গাটি সব নিয়ে, পাড়ার এক ফক্কড় ছোঁড়ার সঙ্গে উধাও। দেখুন ঠ্যালাখানা একবার। সেই দজ্জাল মেয়ে মানুষ যে আমায় খুন করে যায় নি এই আমার পরম ভাগ্য।

গোপেশ্বর কৌতুক অনুভব করছিলেন। হুঁকোটি নামিয়ে হেঁসে বললেন, তবে উনি বুঝি তৃতীয়—

নটবর চক্রবর্তী এতক্ষণে চড়াৎ করে গাঁজার কলকেতে শেষ টান দিয়ে সমস্ত ধোঁয়াটা বোধ করি পেটে চালান দিলেন। যাতে সামান্য ধোঁয়াও যেন বাইরে হাওয়ায় না মেশে, সেজন্য দমবন্ধ করে থেকে, আরও চোখ শিব নেত্র করে, যৎ সামান্য ধোঁয়া শূন্যে ছেড়ে—একবারে খেঁকিয়ে উঠলেন, বলেন কি? আমি হ'লাম বোদ পাড়ার পণ্ডিত ঘরের ছেলে। তাতে কুলিন ব্রাহ্মণ, স্বনামধন্য আমার পিতা পিতামহ। আর আমি বিয়ে করব ঐ সাহা জাতীর মেয়ে লোকটাকে। মানে উনি আমার মানে—ঐ—ইয়ে আর কি। পানের ছোপধরা কাল কাল দাঁত বের করে আড় চোখে তাকিয়ে হেঁ হেঁ করে, নটবর চক্রবর্তী হেঁসে উঠলেন।

—বুঝলাম—। গাঁজার গন্ধে গোপেশ্বরবাবু অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করছিলেন। এ আপদ কখন বিদেয় হবে তাই ভাবছিলেন।

—হেঁ হেঁ আপনি বুঝবেন বৈকী—। যাই বলুন—ওঁর মনটা কিন্তু সাদা গঙ্গাজল। বুঝলেন কি না—। উনি আমায় যত্ন আত্তি করেন, তবে মাঝে মাঝে ঐ যে একবার ফোঁস করে ওঠেন। শুধু ওটাই দোষ বুঝলেন কিনা—অভয় আসতেই চক্রবর্তীর গল্পের স্রোত বন্ধ হয়ে গেল। ওদিকে গোদাগাড়ী ঘাটের আলো দেখা যাচ্ছে। লোকজন নিজ নিজ বাক্স বিছানা, পোঁটলা পুটুলী গোছাতে ব্যস্ত। নটবর চক্রবর্তী উঠে পড়লেন।

—হেঁ হেঁ—মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে খুব খুসী হ'লাম। এখন তবে আসি বাবুমশাই—

মহানন্দা নদী পার হয়ে কুলির মাথায় বাক্স বিছানা তুলে দিয়ে, লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে গোপেশ্বরবাবু যখন দাদার বাড়ী পৌঁছালেন, তখন বেলা নটা। নদীর ধারের কাছেই বাড়ী। সামনে মস্ত লম্বা এক মাটির বাঁধ। মহানন্দা নদীর জলস্রোতকে বাধা দেবার জন্য ও সহর রক্ষার জন্যই এই বাঁধ। বাঁধটি বেস চওড়া, গাড়ী ঘোড়া চলে না—তবে লোকজন এই বাঁধের ওপর দিয়া চলাফেরা করে। দুধার বেশ ফাঁকা —বাঁধের পাশে দুধারে কৃষ্ণচুড়া ফুলের গাছ। গাছের তলায় বসার জন্য খানকয় লোহার বেঞ্চি। ছায়াভরা রাস্তা—বেড়াবার পক্ষে ভারী মনোরম। অভয় চারদিক দেখতে দেখতে এগোয়।

সম্মুখে মস্ত বাগান। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, নানা ফুল ফুটে আলো হয়ে আছে। বাগানের মধ্য দিয়া সরু লাল রাস্তা। অভয় অবাক হয়ে যায়। এক জন লোক বাগান পরিষ্কার করছে, সে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল। মালির পাশ দিয়ে গোপেশ্বর এসে উঠলেন সামনের বাইরের ঘরে। অতি সাজান গোছান ঘর। বড় বড় আলমারীতে বই ঠাসা। মস্ত টেবিল, চারপাশে অনেকগুলো গদি আঁটা চেয়ার। সামনের দেওয়ালে সেথ টমাস্ কোম্পানীর মস্ত বড় লম্বা দেওয়াল ঘড়ি। একটা বড় অয়েল পেণ্টিং সামনের দেওয়ালে ঝুলছে। এক সুবেশ ভদ্রলোক সাহেবী পোষাক পরা হাতে বন্দুক একপাশে মৃত একটি বাঘ। অভয় ভাবল, সম্ভবতঃ তার জ্যাঠাবাবুর চেহারা এটি।

দুটি অল্প বয়সী ছেলে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া করছিল।

তারা অবাক হয়ে তাকাল।

গোপেশ্বর বললেন, কি নাম—

বড়টি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমার নাম শ্রীবিশ্বেশ্বর দত্ত—।

—ওঃ বেশ। আমি তোমার কাকা হই। দাদা বাড়ী আছেন। ছেলেটি একটা প্রণাম করে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। গোপেশ্বর বহুদিন দাদাকে দেখেন নি। সে আজ কতদিনের কথা। ঠিক ভালমত কিছুই মনে পড়ে না। এখন তো চেনাই যাবে না। সেই যে যোগেশ্বর পনের ষোল বৎসর বয়সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, তারপর বহু বৎসর পর খবর পাওয়া গেল। তারপর আবার কয়েক বছর পার হয়ে গেল। এখন নিজেকেই চেনা যায় না। দশ বৎসর পূর্ব্বের চেহারার সঙ্গে, আজকের চেহারার কি কোন মূল্য আছে। দেওয়ালে টাঙ্গান ছবিখানা দেখে, গোপেশ্বর বহু কিছু ভাবতে লাগলেন। সম্ভবতঃ ওটি দাদারই চেহারা। কিন্তু ঠিক মনে হচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে সেই বহুদিন আগেকার, একটি পনর ষোল বৎসরের ছেলের কথা ভাবেন গোপেশ্বর। নাঃ এই অয়েলপেণ্টিং এর চেহারার সঙ্গে কোন মিল হচ্ছে না। সেই যোগেশ্বর দত্ত অনেক অনেকদিন অগেই হারিয়ে গেছে। এ যোগেশ্বর আলাদা—সব বিষয়ে ভিন্ন। মায়ের মুখখানা মনে পড়ে যায়। পুত্রশোকে মায়ের সেই শোককাতর বিষন্ন মুখচ্ছবি আজও মনের ভেতর অম্লান হয়ে রয়েছে। অনন্ত মহাকালের জমাট অন্ধকার, সীমাহীন কাল স্রোতের মাঝে সেই চির দুঃখিনী মা চিরকালের মতই হারিয়ে গেছেন। কত দুঃখ কত বেদনা কত গভীর শোকের মধ্যে—কত অবর্ণনীয় দারিদ্র্য যাতনা আর লাঞ্ছনার মধ্যে তাঁর জীবন শেষ হয়েছে। তবুও মার সেই শেষ জীবনের ব্যথাকাতর শীর্ণ মুখখানি আজও যেন জীবন্ত।

—ভেতরে আসুন। বীরু ডাকছে। গোপেশ্বর বাবু অভয়কে নিয়ে ভেতর বাড়ীতে ঢুকলেন। সামনে আর একটি ঘর, সেই ঘর পার হয়ে মস্ত লম্বা দালান। ওদিকে প্রশস্ত উঠান—পর পর সারি সারি সুসজ্জিত ঘর, দোতলায় ওঠার চওড়া সুদৃশ্য সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

সম্মুখের দালানে দাঁড়িয়ে, অতি সুন্দরী স্থুলকায় এক মহিলা। সারা গায়ে দামী গহনা, পরণের সাড়ী জামা সবই অতি সুদৃশ্য ও মূল্যবান। দুটী বড় মেয়ে তাদের মায়ের দুই পাশে দণ্ডায়মান। হেঁসে মহিলা বললেন, আসুন। উনি তো এখন বাইরে গেছেন।

বাড়ী ফিরতে সেই বেলা দেড়টার কম নয়। উনি বলেছিলেন বটে, আজ কাল আপনাদের এখানে আসার কথা। এটি বুঝি অভয়।

গোপেশ্বরবাবু বুঝলেন, ইনিই বৌদী। নীচু হয়ে প্রণাম সেরে অভয়কে বললেন, প্রণাম কর বাবা। ইনি তোমার জ্যাঠাইমা। দিদিদের প্রণাম কর।

অভয়ের কেমন বাধ বাধ ঠেকতে লাগল। বয়সে যে কে বড় তা ঠিক করতে পারল না। বোধকরি সেই বয়সে বড়।

—না—না। ওদের আবার প্রণাম কেন। মিনতি বোধ করি ছ'মাসের বড় হবে। আর প্রণতি তো অনেক ছোট। প্রণতি এঁদের ঘরে নিয়ে বসা। আমি আসছি। পাশের ঘরটি বেশ সাজান গোছান। চেয়ার, টেবিল রয়েছে একপাশে। জানালার কাছেই মস্ত সুদৃশ্য খাট। খাটের উপর বিছানা পাতা। অভয় একপাশে বসল। ছেলেমেয়েরা উঁকীঝুঁকী দিচ্ছে। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলেন, আশালতা।

—মিনু মা। এই ঘরে চা জলখাবার ঠাকুরকে দিতে বল। তার আগে হাত মুখ ধোবেন। বাথ্রুমটা দেখিয়ে দিতে বল মিঠুয়াকে। নটাতো বেজে গেছে। তোমাদের স্কুলের বেলা হচ্ছে। স্নানটান করে নাওগে—। ওবেলা আলাপ পরিচয় করবে। ওরা দুই বোনে চলে গেল।

চা খাবার পর, গোপেশ্বরবাবু বৌঠানের সঙ্গে একটু আধটু গল্প করতে লাগলেন। পুরানো দিনের কাহিনী। দাদার নিরুদ্দেশের কাহিনী—মায়ের শোকাবহ মৃত্যু। বৌঠান নিস্তব্ধ হয়ে শোনেন। মাঝে মাঝে হাতের সোনার চুড়িগুলি ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন—হুঁ—

একসময় গোপেশ্বরবাবু সজাগ হয়ে ওঠেন। কি বলবেন আর। যৎসামান্য মিনিট কয়েকের পূর্ব্বের পরিচয়—আর হারানো দাদার আত্মীয়তার ক্ষীণ সেতু। শুধুমাত্র এইটুকু সম্বন্ধ। কিন্তু মনে হয়, তাঁর নিজের সঙ্গে, দাদার ভেতর ফাঁক যেন অনেকটা। কিন্তু এই ব্যবধান কি, একদা যৎসামান্য—রক্তের সম্বন্ধে ভরাট হয়ে যাবে নাকি?

নিস্তব্ধতা নেমে আসে। শীতল ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা। কিন্তু মরীয়া হয়ে গোপেশ্বরবাবু বলেন, অভয়কে নিয়ে এলাম বৌঠান। ওই ওর জেঠাকে পত্র দিয়েছিল। আমার নিজের সামর্থ বিন্দুমাত্র নেই। দাদাও সম্মতি জানিয়ে পত্র দিলেন। ওখানে থাকলে, ছেলেটা মানুষ হবে না বৌঠান। ওখানে স্কুলও নেই—এমন একটা মানুষ নেই যে পড়াটা বলে দেয়। এখন আপনার ভরসাতেই রেখে যাব। যদি মানুষ হয়—ঈশ্বর কৃপা করেন—যদি লেখাপড়া শিখতে পারে তবে তবে—। আশালতা দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অভয়কে।

—কোন ক্লাসে পড়ছ?

অভয় বলল, ওখানে তো কোন স্কুল নেই। তবে ক্লাস এইটের বই পড়ছি।

—ক্লাস এইটের। তা বেশ—। আশাদেবী উঠলেন। রান্নাঘর থেকে ঠাকুর ডাকছে। ছেলেমেয়েরা এখন স্কুলে যাবে। স্কুল যাবার সময় হয়েছে।

আচ্ছা, এখন বিশ্রাম করুন। গোটা রাত তো ঘুমুন নি। সকাল সকাল স্নান করে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করুন। ওঁর সঙ্গে রাত নইলে, আর কোন কথাবার্ত্তা হচ্ছে না। আশালতা ঘর থেকে চলে গেলেন।

অভয় বলল, জ্যাঠাবাবুর ফিরতে সেই বেলা দুপুর। চানটান করে, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে নাও বাবা। রাতে কথা বলবে। তুমি কোন ভাবনা করবে না। আমি ঠিক মানিয়ে চলতে পারব।

আমার জন্যে কোন ভাবনা চিন্তে করতে হবে না। আমি বলি, কালকের দিনটা থেকে পরশু তুমি চলে যাও। সেখানে সব কি করছে—কি হচ্ছে, তার ঠিক কি।

গোপেশ্বরবাবু একটু চিন্তিত মনে, একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, জ্যেঠাইমাকে দেখে কি মনে হ'লরে। খুব চাপা নয়? মুখ দেখে, মনের কথা বোঝা কঠিন। খুব যেন গম্ভীর আর চাপা মেজাজ—

—তা হোকগে। দায় দরকার আমাদের। আমার কাজ লেখাপড়া করা। জেঠাবাবুতো তাড়িয়ে দিতে পারবেন না।

কিন্তু আমি ভাবছি। দাদাকে—

অভয় তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে, বাবার মনের কথা বুঝল। ধার দেনা—অভাব-অনটন, এ সবতো তার জানা। কিন্তু বাবার প্রার্থনা কি জ্যেঠাবাবু মঞ্জুর করবেন। কিন্তু সেই আশা—সেই বড় আশা করেই তো এসেছেন গোপেশ্বরবাবু। এখানে আসার জন্যে কি ভাবে টাকা যোগাড় হয়েছে, সে ইতিহাস সে জানে। জমির খাজনা অনেক বছরের বাকী। দোকানে ধার দেনা—ঘর বাড়ীর অতি দুরবস্থা। এই সব মিলিয়ে বাবার অনেক আশা,—দাদা যদি সাহায্য করেন, তবে সকল সমস্যার সমাধান হয়। পাওনাদারদের তিনি বিশেষ ভরসা দিয়ে এসেছেন। এখন শূন্য হাতে ফিরলে —কি দিয়ে মেটান হবে, সেই অভাব রাক্ষুসীর বিস্তৃত ক্ষুধা।

গোপেশ্বরবাবু চিন্তিত হয়ে ওঠেন। মনে মনে বার বার বলেন—নারায়ণ—নারায়ণ—। অভয় একসময় উঠে দাঁড়ায়। অসহ্য কৌতুহলবশে, সে বসে থাকতে পারে না। এঁদের সঙ্গে তাকে ভাব করতে হবে। এদের আচার ব্যবহার চালচলন সমস্ত লক্ষ্য রাখতে হবে। অভয় পায়ে পায়ে এদিক ওদিক বেড়াতে থাকে।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিল মনে নেই। অভয়ের যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা শেষ হয়ে গেছে। গোপেশ্বরবাবু চায়ের কাপ নিয়ে ডাকাডাকি করছেন, অভয় ওঠ্‌, ওঠ্‌। বেলা চলে গেল। মুখে চোখে জল দিয়ে চা খেয়ে নে। অভয় ফ্যাল ফ্যাল করে বাবার দিকে তাকায়।

এতক্ষণে বুঝল সে এখন কোথায়? ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিল গীতা খোকনকে। খোকন যেন কিসের বায়না ধরেছিল। কিসের যে বায়না ধরেছিল, তা আর মনে করতে পারল না। এতক্ষণ কিন্তু বেশ মনে ছিল। অভয়ের মনে হতে লাগল, খোকন যা বলেছিল, তা বেশ মনে ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেই স্বপ্নটা যেন আস্তে আস্তে মনের কোন এক অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে—তা আর মনের ওপর ভাসছে না। অভয় চোখে মুখে জল দিয়ে চা খেতে লাগল। বাঃ সুন্দর চা তো—। কি সুন্দর সুগন্ধ। চা যে এমন সুন্দর হয় এমন স্বাদ এমন সুগন্ধ হয় তা অভয় কখনও ভাবতে পারেনি। বাড়ীতেও চা খেয়েছে, কিন্তু চায়ে না আছে স্বাদ, না সুগন্ধ। অভয় দেখল, তার বাবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চা খেয়ে খুব তৃপ্তি পাচ্ছেন। আজ অভয়ের খুব আনন্দ হ'ল। তার দুঃখী বাবা ভালমন্দ কোন জিনিষের মুখ কখনও দেখেন নি। ছেঁড়া কাপড় খালি পা—মাথায় তেল নেই—ক্ষুধার সময় চাট্টি ভাত জলের মত কলাইয়ের ডাল, আর শুকনো মুলো, বেগুন এই সবের তরকারী। বাবার মুখে কোনদিন বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠেনি। কিন্তু অভয় বুঝত, এই সব খাদ্য বাবা বহু কষ্টে খাচ্ছেন। অভয় বলল, বাবা আর এক কাপ চা খাবে?

—চা? তা হ'লে ভালই হ'ত। কিন্তু—। অভয় চায়ের কাপ হাতে করে তাকাতে লাগল। ওপরের ঘরে, সবাই কথা বলছে। নীচেতে, অন্য কোন লোকের সাড়া শব্দ নেই। এ ঘর ওঘরে উঁকী দিয়ে দেখতে দেখতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চলল অভয়। রাঁধুনী ঠাকুরের সঙ্গে ওবেলাই সামান্য একটু পরিচয় হয়েছে। অভয় বলল—ঠাকুর মশাই আর এক কাপ চা হ'বে?

খাবেন? কেটলীর ঢাকনা খুলে দেখল, এখনও অনেকটা চা আছে।

—বাবা খাবেন। দেন তো এক কাপ। রাত জেগে এসেছেন কি না—। অন্য এক কাপে চা নিয়ে, বাবার হাতে তুলে দিল। গোপেশ্বর বললেন, ভারী সুন্দর চা না রে? কি মিষ্টি গন্ধ—আঃ—। আস্তে আস্তে গোপেশ্বরবাবু চা খেতে লাগলেন। অভয় বড় আনন্দের সঙ্গে, তৃপ্তির সঙ্গে, বাবার খাওয়া দেখতে লাগল।

নাঃ—আজ বহুকাল পর, বাবাকে সে সামান্যতম সুখী করতে পেরেছে। অভয়ের মনটা বড় খুসীতে ভরে গেল।

—চল বাবা, একটু ঘুরে ফিরে আসি। সহরটা একটু দেখে আসি। দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল না। ঘুমুচ্ছিলাম বলে দাদা আর ডাকেন নি। রাতে কথাবার্ত্তা হ'বে। চল্ বাবা—একটু ঘুরে ফিরে আসি—এক তাড়া বিড়ি কিনতে হ'বে।

রাস্তায় চলতে চলতে গোপেশ্বরবাবু, অভয়কে বহু উপদেশ দিতে লাগলেন। সহর জায়গা কত রকমের লোকজন সবাই তোমার অপরিচিত। রাগ গোসা কিছু করবে না বাবা। দুঃখী বাপ মায়ের কথা মনে রেখো। ধর্ম্মপথে থাকবে—ভগবানের ওপর নির্ভর করবে—বিশ্বাস রাখবে। সব সময় পড়াশোনা—আর নিজ শরীরের ওপর যত্ন করবে। সাবধানে চলা ফেরা করবে। এখানে এসেছ লেখা পড়া করতে। লেখা পড়াই যেন, তোমার ধ্যান জ্ঞান হয়। যে জিনিষ বুঝতে পারবেনা, তা মাষ্টার মশাইদের কাছে জেনে নেবে। ভাল ছেলের কাছে জানবে। মনে রাখবে বড় হ'তে হ'লে নিজের চেষ্টাতেই হ'তে হ'বে। অপরে তোমায় বড় করে দিতে পারবে না। তীর্থপতি মাষ্টারের মুখ খানা ভেসে উঠল, অভয়ের মনে।

—এগিয়ে যেতে হ'বে—এগিয়ে যেতে হ'বে। রাস্তার মাঝে দেখা মিঠুয়ার সঙ্গে। যোগেশ্বরবাবুর বাড়ীর চাকর মিঠুয়া। বেশী বয়স নয়। উনিশ কুড়ি বৎসর হ'বে। দ্বারভাঙ্গা জেলার কোন গ্রামে বাড়ী। ওদের দেশের বহু লোকই এই সহরে চাকরী করে। বাংলা শিখেছে—হিন্দী বাংলায় মিশিয়ে কথা বলে।

মিঠুয়া বলে, কাঁহা চলেছেন বাবু—

হেঁসে গোপেশ্বরবাবু উত্তর করেন, এই একটু খানি বেড়িয়ে আসি। তা, তুমি বুঝি বাজারে গিয়েছিলে—

—নাঃ। হামার দেশের—একটা আদমী দেশ যাবে কাল। তাই দেখা সাক্ষাৎ করে এলাম। যান বেড়িয়ে আসুন বাবুজী। ঐ যে বাঁধ—সিধে এই রাস্তা বহ বাবুলোক-ওখানে বেড়ান ঐ নদী, নদীর ঘাট—। বল খেলার মাঠ—সাহেব লোকদের কুটী—আচ্ছা চলি বাবুজী। মিঠুয়া হন্ হন্ করে চলে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় লাম্প পোষ্ট। কেরোসিনের আলো জ্বলছে। তখনও ইলেকট্রিক এ সহরে আমদানী হয়নি। দু একটা মানুষটানা রিক্সা-গাড়ী—পালকী, এক্কা—আর ঘোড়ার গাড়ী চলে। মোটর—বা মোটর বাসের কোনও বালাই নেই। ছোট খাট সহর-তবুও বেশ—গাঁ গাঁ ভাব। পাড়ার মধ্যে ঢেঁকিতে চাল কুটছে—ঘরের দাওয়ায় বসে, মুড়ি ওয়ালী চাল চিড়ে ভাজছে। সাউজী পাড়ায় অনেক-গুলো তেলের ঘানি। চোখবাঁধা বলদ, ঘানি গাছের চার পাশে—ধীরে ধীরে ঘোরে। সাউজী পাড়া ছাড়িয়ে—কামার পটী—। নেহাইয়ের উপর দমাদম্ গরম লোহা পেটাচ্ছে হিন্দুস্থানী কামার। দ্রুম্-দ্রাম শব্দ হচ্ছে—চারপাশে আগুনের লাল ফুলঝুরি ছিটকে পড়ছে। অভয় দেখতে থাকে। সারসার কামারের দোকান। সবাই প্রায় হিন্দুস্থানী।

বাঙ্গালী কর্ম্মকার দু একজন মাত্র। কুমোরপাড়াও তাই। বাঙ্গালী কুমোর নজরে পড়ল না। চারদিকে মাটির থালা, গামলা, হাড়ী, কলসী আর গেলাস। বন্ বন্ করে চাক্ ঘুরছে—অভয় অবাক হয়ে যায়।

বাঁধের রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা। অনতিদূরে মহানন্দা নদী। নদীর ধারে ধারে অগনিত নৌকা। কোনটা বড়-প্রায় আর সব ছোট। টিপ্ টিপ্ করে আলো জ্বলছে নৌকার ওপর। বাঁধের রাস্তা এঁকে বেঁকে একেবারে—চলে গেছে নদীর ধারে।

রাত্রে—খাওয়া দাওয়ার তখনও দেরী আছে।

রাত—বোধ করি মাত্র নটা। গোপেশ্বর নীচের ঘরে শুয়েছিলেন। চিন্তা অনেক। অভয় কাৎ হয়ে, বাবার কাছেই শুয়েছিল। মিঠুয়াই খবর দিল—বাবু এসেছেন। বড়বাবু ডাকছেন।

মিঠুয়ার-পেছন পেছন আলোকিত সিঁড়ি ভেঙ্গে, উপর তলায় এলেন গোপেশ্বর। হাঁ—একখানা দেখবার মত বাড়ী বটে। উপরের ঘরগুলি দেখলে দুই চোখ জুড়িয়ে যায়। বাবার পিছন পিছন অভয়ও উপরে এসেছিল। জেঠামশাইকে দেখবে, প্রণাম করবে।

যোগেশ্বরবাবু প্রকাণ্ড একটা খাটের ওপর বসে বসে, কি যেন অনেকগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন। দিব্বী গোলগাল চেহারা—ফরসা রং—মুখে একজোড়া কাঁচা পাকা গোঁপ। মাথার উপরের চুল পাতলা—বেশ বড়—একটা টাক—।

গোপেশ্বরবাবু প্রণাম করতেই—চশমার ফাঁক দিয়ে দেখে বললেন—এস ভাই বস। তারপর কেমন?—তা—এটি?

—আমি অভয়।

অভয়কে ভালভাবে দেখে, যোগেশ্বরবাবু—বললেন, আমাকে চেনা কঠিন। না গোপেশ? অনেকদিন তো সাক্ষাৎ নেই। তারপর আমিও—যাব—যাব ভাবি, কিন্তু নানান্ কাজকর্মের ভেতর জড়িয়ে পড়ি, আর হয়ে ওঠে না। অভয় থাকুক—স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। শুনলাম, ক্লাস এইটে পড়ছে। তা ভাল—দু একদিনের মধ্যেই জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। মন দিয়ে লেখা পড়া করবে। যখন যা দরকার হ'বে, তোমার জেঠাইমার কাছে বলবে। কারণ আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া শক্ত। কখন যাই—কখন আসি ঠিক নেই। জামা, জুতোর মাপ দেবে। বুকলিষ্ট-এসব সুরেশবাবুকে দেবে। সুরেশ আমাদের সরকার মশাই। উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপর গোপেশ, আজকাল কি করছ?

—আমি আমি আর কি করব দাদা। ঐ সামান্য দু-চার বিঘে জমি আছে তাই চসে খুঁড়ে চালাচ্ছি। গাঁয়ে তো সেরকম কিছু করবার নেই। কোন প্রকারে দিন যাচ্ছে।

চশমার ফাঁক দিয়ে যোগেশ্বরবাবু তাকিয়ে থাকেন। কাগজপত্র একদিকে সরিয়ে রাখলেন। বললেন, আর ছেলে পুলে কটি?

—এরপর একটি মেয়ে তারপর একটি ছেলে সেই ছোট।

—হুঁ। গাঁয়ে পাঠশালা আছে বোধ হয়। বাড়ীতে বসিয়ে রাখবে না। পাঠশালায় পাঠাবে। মুখ্যু করে রাখবে না। লেখাপড়া না শেখালে কোন উপায় নেই। হুঁ—কি বলছিলে খুব কষ্টে চলছে। তা গাঁয়ে ছোট-খাট দোকান টোকান দিলেও তো হয়। শুধু শুধু—বসে থাকলে কি সংসার চলে? না—চলে না। পৃথিবীটা বড্ড কঠিন জায়গা—ভারী কঠিন স্থান। এখানে বেঁচে থাকতে হলে, প্রতি মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ করে চলতে হয়। যার গায়ের জোর বেশী যার মগজের জোর বেশী সেই তোমার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবে। বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে আমি কম পরিশ্রম, বা কম দুঃখ কষ্ট করিনি। বহু খাটতে হয়েছিল—যাক সে সব পুরানো কথা। মোট কথা—যোগেশ্বরবাবু আলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ—পাশের ঘরে বোধ করি দেওয়াল ঘড়ি আছে। পেণ্ডুলামের টিক্ টিক্ শব্দ ভেসে আসছে।

অভয় জেঠাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অভয় ভাবে বাবার মনের কথা। বাবার বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে অভয় অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করে। অভয় ভাবে, বাবা কেন জোর গলায় দাবী করছেন না। ওঁরই তো দাদা। এক মায়ের পেটের সন্তান। ছোটবেলায় এক সঙ্গে বড় হয়েছেন। কত খেলাধুলা, কত হাসি গল্প করেছেন। এখন সেই দাদাকে ভয় কেন? স্নেহ ভালবাসা—এই সবের দাবীতে বাবা কেন আজ নিজের কথা বলতে ভয় করছেন কেন?

যোগেশ্বরবাবু বললেন, রাত্রে বোধকরি ঘুম হয়নি। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়গে—

গোপেশ্বর বললেন, না—এখন আর ঘুম হবে না। আমি ভাবছিলাম কালই ফিরে যাই। ওরা সব কি করছে তার ঠিক কি?

—কাল যাবে? তা যাও—। অভয়ের জন্যে কোন চিন্তা নেই। কাল ট্রেন তো সেই বিকেল চারটের সময়। বেশ—তবে যদি ইচ্ছে কর, দু-চারদিন থেকে যেতে পার। যোগেশ্বরবাবু পাশ থেকে সেই সব কাগজ পত্র টেনে নিলেন।

একটুখানি অপেক্ষা করে কাশলেন গোপেশ্বরবাবু। কাগজ থেকে মুখ তুলে যোগেশ্বর বললেন, কিছু বলবে নাকি—

—হাঁ দাদা। মানে ভারী কষ্ট যাচ্ছে। চারদিকে ধার দেনা—জমির খাজনা বাকী, তার ওপর উপরি উপরি দু বছর ধান হয়নি। ভারী কষ্ট গিয়েছে—এখনও সেই অবস্থা। আর ওখানকার যা জমি টমি আছে, তার একটা—ঈষৎ হেঁসে যোগেশ্বরবাবু বললেন, ওখানকার যা সম্পত্তি তা তোমার। আমি শীগ্রি এর ব্যবস্থা করে দেব। আপাততঃ কি যেন বলছিলে, খুব টানাটানি—ধার দেনা—না? আচ্ছা—যা হোক কিছু হবে। আচ্ছা এখন যাও—আমি এখন ব্যস্ত। এইসব কাগজপত্রগুলো ভাল করে দেখতে হবে আমায়। আচ্ছা—আচ্ছা—। যোগেশ্বরবাবু কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গোপেশ্বর।

পরের দিন বেলা আড়াইটে নাগাদ—উঠে পড়লেন গোপেশ্বর। চারটে দশে ট্রেন। বাঁধের রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাবেন। মিঠুয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাবে। যোগেশ্বরবাবু কিছু কাপড় চোপড় আর এটা সেটা জিনিষপত্র কিনে দিয়েছেন। আটা ছাতু আমসত্ব, নানান খাবার, মিষ্টি এমনি সব জিনিসপত্র। বেশ ছোটখাট একটা মোট হয়েছে। গোপেশ্বরবাবু চা জলখাবার খেয়ে, বৌদিকে প্রণাম করে রাস্তায় নেমে এলেন। যোগেশ্বরবাবু নিজের কাজে বেরিয়ে গেছেন আর ছেলে মেয়েরা স্কুলে। অভয় সঙ্গে সঙ্গে চলল। নদীর ধার দিয়ে বাঁধের রাস্তা চলে গিয়েছে—ষ্টেশনের খেয়া ঘাটের কাছে। ওখান থেকে নৌকায় নদী পার হয়ে সামান্য হাঁটলেই মালদা ষ্টেশন। লোকজন পায়ে হেঁটেই যায়। মেয়ে ছেলে থাকলে পালকীতেই যেতে হয়।

বাবার পাশে পাশে চলতে চলতে অভয় বলল, জেঠাবাবু টাকা দিলেন কিছু?

—হাঁ দুশো টাকা আর পথ খরচের জন্য দশ টাকা। বাবা অভয়, এই পাঁচটা টাকা রেখে দাও। সাবধানে থাকবে, নিজের লেখাপড়া করবে। দাদা, বৌদির যেন কদাচ অবাধ্য হবে না। ভাই বোনদের সঙ্গে বেশ মিলেমিশে থাকবে। মনে রাখবে, তুমি গরীবের ছেলে।

অভয় বলল, আপনি খুব সাবধানে যাবেন। অত গুলো টাকা সঙ্গে রয়েছে—যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না। গীতা, খোকনকে দেখবেন, যাতে ওদের লেখাপড়া হয়। মাকে কোনরকম ভাবতে বারণ করবেন। গিয়েই পত্র দেবেন। আপনার চিঠি পেলে উত্তর দেব।

গোপেশ্বর বললেন, আর যাসনে বাবা। এদিকে আমায় পা চালিয়ে যেতে হ'বে। তুই ফিরে যা বাবা—।

অভয় প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যা বললেই কি যাওয়া হয়। অভয় সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। গোপেশ্বর যাচ্ছেন আর বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন। ওঁর যে বড় স্নেহের ধন পড়ে রইল এখানে। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যাদের ছেড়ে একদণ্ড তিনি কোথাও যাননি, আজ অনেক দূর দেশে রেখে যেতে হচ্ছে তাঁকে। অভয় তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে। শীর্ণ চেহারা। বহু দুঃখ কষ্ট অনশন অর্দ্ধাশনে, আর দুশ্চিন্তায় তার বাবার জীবন কাটছে। ঐ দীর্ঘ নুয়ে পড়া দেহখানা—যেন জগতের সমস্ত দুঃখ কষ্টের একক প্রতিনিধি। অত্যন্ত সরল, ভালমানুষ উনি। ঝগড়া, বিবাদ, কথান্তরের মধ্যে থাকেন না। ঈশ্বরের উপর সমস্ত নির্ভর করে শুধু অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। এটা ভাল, কি মন্দ—এ বিচার করার শক্তি ওঁর নেই। অভয়ের দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। বুকের ভেতর থেকে বেদনার পুঞ্জীভূত রাশিগুলো যেন একসঙ্গে দানা পাকাতে থাকে। একসময় যেন বাষ্পাকারে উপরে উঠতে থাকে......ওর দুই চোখ জলে ভরে যায়। বাবা অনেকদূর চলে গেছেন—আর একবার ফিরে তাকালেন—হাত নাড়লেন। নাঃ আর দেখা যায় না। অভয় সরে এসে সম্মুখে এগিয়ে আসে,—আর—একবার বাবাকে দেখবার জন্যে। নাঃ—আর দেখা যায় না। অভয় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। চোখের উপর ভেসে

ওঠে তাদের গাঁয়ের ছবি। দেশের রেল ষ্টেশন থেকে নেমে, রেল লাইনের পাশ দিয়ে নির্জ্জন সরু পথ চলার পথ। দুপাশে আমবাগান মাঝে মাঝে দু'একটি লোক শুধু। ওপাশে মনোহর সাপুড়ের চালাঘর—তারপর বাগদিপাড়া। বাগদিপাড়া ছাড়ালেই মস্ত বাবলা বন। ওর পাশ দিয়েই সরু রাস্তা। একটু এগুলেই পাওয়া যাবে, রেল কোম্পানীর ফটক একটা আর পরিত্যক্ত গুমটি ঘর। ওর দুপাশে জোড়া তাল গাছ—আর একটা প্রাচীন বটগাছ। ওখান থেকেই সুরু হ'ল তাদের গাঁয়ের সীমানা। ওখান থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে আর একটা গুমটি ঘর আর তার লাল টালির ছাদ। অভয় যেন সব বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। গুমটি ঘরের পাশ দিয়ে নেমে গেল কাঁচা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। সমস্ত রাস্তা ধুলোয় ভর্ত্তি। পায়ের পাতা ডুবে যায়। দুপাশে আমবন আর বাঁশ বাগান। সমস্ত কিছু নির্জ্জন ঠাণ্ডা আর ছায়াময়। মাঝে মাঝে মাত্র দু-একটা ঘর। রাস্তা সোজা চলে গেল পালেদের বো পুকুর ঘেঁসে। ওখান থেকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাদের বাড়ীর দরজার ঝাঁপ। বেড়ার গায়ে হেনা ফুলের গাছ, জবা, আর টগর ফুলের গাছ। তারপরই সম্মুখের ঘরের পাশ দিয়ে ভেতরে যাবার খিড়কীর দরজা।

অভয় চমকে ওঠে। কে যেন বলল, কাকে খুঁজছেন?

অভয় দেখল, পাশের বাড়ীর একটা ছেলে অবাক হয়ে তাকে দেখছে। অভয়ের দুই চোখে, তখন জল চক্ চক্ করছে। অভয় সচকিত হয়ে চোখ মুছে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। গলির ভেতর দিয়ে রাস্তা। একটু হাঁটলেই সামনের বড় রাস্তায় পড়বে। রাস্তার পাশে মস্ত বড় ইঁদারা। সম্মুখে একটা মেয়ে স্কুল। তারপর বাজার। বাজারের পাশ দিয়ে একটু হাঁটলেই যোগেশ্বর দত্তের বৃহৎ বাড়ী।

অভয় ফিরে আসে। স্কুলের ছুটী হয়ে গিয়েছে। বীরুরা ফিরে এসেছে। মিনতি প্রণতি এখনও আসেনি। ওদের রোজই একটু দেরী হয়। স্কুলের ঘোড়ার গাড়ী আছে, তাতে করে মেয়েদের বাড়ী বাড়ী পৌছে দেয়। অভয় নিজের ঘরে এসে বসল। ওপরে বীরুদের গলা শোনা যাচ্ছে। অভয়ের মনটা বড় খারাপ। বাবা এতক্ষণ নৌকায় উঠেছেন এরপর হেঁটে রেল ষ্টেশন্। সমস্ত রাত ওঁকে জাগতে হবে। আজিমগঞ্জ থেকে ট্রেন পাওয়া যাবে সেই সকাল আটটায়। বাড়ী পৌছাতে বেলা একটা বেজে যাবে। বাবার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে অভয়। সঙ্গে মোটমাট অনেকগুলো টাকা পয়সা। তার ওপর বাবার তো রুগ্ন শরীর। সামান্যতেই ঠাণ্ডা লাগে। ঠাণ্ডা লাগলেই বুকের সেই পুরোণো ব্যথাটা টাটিয়ে ওঠে। কন্ কন্ করতে থাকে, বুক যেন খসে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়। হাঁসপাতালের ডাক্তার বুক পরীক্ষা করে বলেছিলেন, ভেতরটা বড়ই দুর্ব্বল দত্তমশাই। একটু ভাল খাওয়া দাওয়া করা দরকার। এই ঔষধটা নিয়মিত খেয়ে যাবেন। কিন্তু টাকার অভাবে ঔষধ কেনা হয়নি। আর ভাল খাওয়া দাওয়ার কথাতো স্বপ্ন। যাদের দুবেলা ভাত জোটে না। অর্দ্ধেক দিন না খেয়ে থাকতে হয়, তারা আর ভাল খাওয়া দাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। দুমুঠো চাল, একটু ডাল, লবন, তেল এসব প্রতিদিন সংগ্রহ করাই যাদের পক্ষে কষ্টকর, তারা ভাল খাওয়ার কথা আর কি ভাববে শুধু ভাল খাদ্য হলেই তো শরীরের উন্নতি হয় না। বাসস্থান পরিবেশ, মনের শান্তি এগুলো যে বিশেষ দরকার। মানসিক অশান্তি যেখানে সব চেয়ে প্রবল, সেখানে ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া করলেই কি উন্নতি হয়? মানুষ যদি দিবারাত্র আর্থিক অভাবে কাটায়, তবে কি শরীরের উন্নতি সম্ভব। আর্থিক স্বচ্ছলতাই তো সুস্থতা এনে দেয়। সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্য ব্যাধীই যে সমস্ত অনর্থের মূল। এই প্রথম ও প্রধান শত্রু যদি নির্ম্মূল না হয়, তবে মানুষের সুখশান্তি কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি আনার কোন পরিকল্পনা যদি কখনও কোথাও হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে চাই, সমাজ হ'তে দারিদ্র্যব্যাধী নির্ম্মূল করা। ব্যক্তির যদি সামগ্রিক উন্নতি না হয়, তবে জাতি বা দেশের উন্নতি হওয়া কোনকালেই সম্ভব নয়।

অভয়ের মনে এই ধরণের নানা প্রশ্ন জেগে ওঠে। ওর চোখের ওপর ভেসে ওঠে একটা অসুস্থ মানবজাতির ছবি। সেই অসুস্থ মানবগুলি যেন, এই বাংলা দেশের মানুষগুলো। বাংলা দেশের অফুরন্ত খানা ডোবা, পচা পুকুরের মাঝে, অজস্র ভাঙ্গা কুঁড়েঘর। সেই কুঁড়ে ঘরে অর্দ্ধাহারে আর অনাহারে—সামান্য কটিবাস ধারণ করে, যে সমস্ত মানুষ, শুধু অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করে আর অদৃষ্টের ভরসা করেই বেঁচে রয়েছে অভয় আজ তাদের ছবিই যেন দেখতে পাচ্ছে। সমস্ত দুঃখ ব্যথার কাহিনী, অশ্রুসজল ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী যেন তার বাবা। তার বাবা যেন সমস্ত বাংলা দেশের, নিরন্ন লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষের প্রতিভূ।

বিকেলের রোদ আরও স্তিমিত হয়ে আসে। পাড়ার ছেলেদের খেলার হুল্লোড় গোলমাল, সব যেন এই এই ঘরের দরজায় এসে স্তব্ধ হয়ে যায়।

একসময় মিঠুয়ার গলার শব্দে অভয় সচকিত হয়ে ওঠে।

—আরে অভয় দাদাবাবু খেলা দেখতে যান নি?

হামি পৌছে দিয়ে এলাম। অভয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে।

মিঠুয়া বলে, যান্ যান্ দাদাবাবু। একটু বাইরে বেড়িয়ে আসুন। খেলার মাঠে যান্—দেখুন গে জোর ফুটবল খেলা হচ্ছে।

খেলার মাঠে যায় অভয়। মস্ত বড় মাঠ। অনেকদল খেলা করছে। অনেক ছেলে, এখানে ওখানে বসে খেলা দেখছে। বায়ুসেবীর দল বাঁধের চারদিকে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। সামনে মহানন্দা নদী—। অনেক নৌকা যাওয়া আসা করছে। কোনটাতে শুধু চূণ, কোনটাতে কয়লা, কোনটাতে ধান। হিন্দুস্থানী মুটেরা মাথায় করে চুনের বস্তা বইছে, ওদের গোটা গা চুনে সাদা হয়ে গেছে। চেহারা দেখলে হাসি পায়। কিন্তু এসব দেখতে ভাল লাগেনা অভয়ের। তার মণ ছুটে চলেছে, তার বাবার পেছন পেছন। এতক্ষণে বাবা যাচ্ছেন ট্রেনের কামরার মাঝে, কত অপরিচিত লোকের সঙ্গে তার বাবাও বসে আছেন বিষন্ন মনে। তার বাবাও ভাবছেন ছেলের কথা। অভয়ের মন ছুটে যায়, সেই চলন্ত রেল গাড়ীর পেছনে পেছনে।

ক্রমশঃ

সুদূরের সংকেত

সন্তোষকুমার দে

পৃথিবীর মত অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে মানুষের অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকলেও তারা কোন ধরণের জীব, কোন ভাষায় তারা কথা কয়, এ নিয়ে সব দেশেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে পুরাণে-পুঁথিতে, গল্পে-গাথায় অনেক কল্পনা করা হয়েছে এবং বিগত দুই তিন যুগ ধরে অনেক সায়েন্স ফিক্সনও লেখা হয়েছে। আমাদের নিকটতম গ্রহ চাঁদে, আমরা কল্পনায় এক অপরূপ সুষমামণ্ডিত জগতের কল্পনা করে আসছিলাম; কিন্তু মানুষ যেদিন সেখানে প্রথম পদার্পণ করল দেখতে পেল, চাঁদের জগৎ মনোহরত নয়ই "নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ, রোগমসীঢালা কালী তনু তার"। সে ব্রণ কণ্টকিত মুখের দিকে চাইলে মানুষের সমস্ত সুন্দরের অনুভূতি নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে যায়। সে অন্ধ-তামস-নিশি জগতে জীবত দূরের কথা কোনো লতাগুল্মেরও অস্তিত্ব নেই। সমস্ত জল্পনা-কল্পনা শুব্ধ হয়ে গেল। তবু মানুষের মন মানে না মানা। বিজ্ঞান যতই বলে সেখানে বাতাস নেই, শব্দ নেই, জল নেই, গাছপালা নেই; তবু কল্পনা মানুষের মুখপানে চেয়ে বলে না, না, না। তাই দেখি উড়ন্ত পিরিচের (ফ্লায়িং সসার) গল্প ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী সেই উড়ন্ত চাকি থেকে মানুষকে নামতে দেখেন, দেখেন কখনো উড়ন্ত চাকির অগ্নিকণায় গাছপালায় আগুন ধরে যায়। চাঁদে জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। দূরতম গ্রহ মঙ্গলে যে রকেট অভিযান চালানো হয়েছিল, তাতেও প্রাণের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তা বলে মানুষের কল্পনা ত থমকে থেমে যাবে না—সে যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ।

এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা আবার নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও টেলিস্কোপে এক নতুন সংকেত ধরা পড়ে—সে যেন এক সুদূরের আহ্বান। প্রথমে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন, আবহমণ্ডলে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে এই স্পন্দনের শব্দ তরঙ্গায়িত হচ্ছে; পরে নক্ষত্র বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এ স্পন্দন প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ফলে নয়; সৌরজগতের বাইরে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে এ সংকেত আসছে। আবার ভালভাবে কান পেতে থাকলেন। তাঁদের মনে হতে লাগল অতি দূরে, সৌরজগত ছাড়িয়ে কোন কি অজানা জগত থেকে ক্রমাগত নিয়মিত বেতার তরঙ্গে এ ধ্বনি আসছে। তাঁরা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বলে উঠলেন,—

"অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধারে প্রান্তরে।"

আরও ভাল করে শুনতে লাগলেন। তাঁদের মনে হতে লাগল, কোন মরণোন্মুখ গ্রহের বেদনাহত বিলাপ ধ্বনির মত ঐ সংকেত—কখনো ধীরে কখন আবার দ্রুত লয়ে। সুদূর নীহারিকাপুঞ্জ থেকে ঐ শব্দ যেন

চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিহত হয়ে পৃথিবীতে আসছে। যেন কোন অদৃশ্য জগতের সুসভ্য মানুষ এই ধূলির ধরণীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্যে বারে বারে চেষ্টা করে, বারে বারে বিফল হয়ে যাচ্ছে।

ঐ শব্দ তরঙ্গ কিন্তু আমাদের মনে হয় নতুন নয়। অনাদিকাল থেকে এ-স্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। আমাদের কান নেই তাই শুনতে পাই নে। সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবিরা এ-গান যুগে যুগে শুনতে পেয়েছেন। আমাদের ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ তাই বোধহয় বলেছেন,—"পাতিয়া কান শুনিস না যে—দিকে দিকে গগন মাঝে—মরণ বীণায় কি সুর বাজে—তপন—তারা—চন্দ্রেরে।" একেই বোধ হয় মহামনস্বী পিথাগোরাস মিউজিক অব্ দি স্ফীয়ারস্ বা মহাকাশের সংগীত বলেছেন। সে যুগে রেডিও টেলিস্কোপ ছিল না। জানিনে কি ভাবে পিথাগোরাস মহাকাশের এই সংগীত শুনতে পেয়েছিলেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার মারটিন রাইল ঐ সংকেত ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "প্রথমে আমারও মনে হয়েছিল, যেন কোনো অজ্ঞাত বুদ্ধিদীপ্ত জগৎ এই পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।" পরে যখন দেখা গেল, ঠিক একই সময় একই রকম সংকেতধ্বনি একই তরঙ্গ-দৈর্ঘে মহাকাশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসছে; তখন বিজ্ঞানীরা বললেন না, কোন মানুষের সংকেত এ হতে পারে না, শক্তির এত মূঢ় অপচয় (সেকেণ্ডে ৪০ থেকে ২০০০ মেগা সাইকেল) কোন বুদ্ধিমান মানুষ করতে পারে না। তবে সে কি? কোনো স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণেই কি এই অনাহত তান অনাদি কাল থেকে বেজে চলেছে? কেনই বা বাজছে।

আবার অনুসন্ধান চলতে লাগল। অবশেষে ১৯৬৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটিস বৈজ্ঞানিকরা জোর গলায় বললেন, ঐ সংকেত প্রাকৃতিক কারণেই হচ্ছে—অপ্রাকৃতিক বা অতি প্রাকৃতিক এর মধ্যে কিছুই নেই। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান জগতে আবার নতুন করে সাড়া পড়ে গেল। সকলেই আবার আপন আপন দেশের বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে (রেডিও টেলিস্কোপ) দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। সকলে আবার প্রশ্নটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে বসলেন। এবার সকলে একমত হয়ে বললেন, না এ অচেনার আহ্বান নয়, দিবস রজনী যুগযুগান্তর ধরে ঐ ধ্বনি আসছে। এ প্রাকৃতিক কারণেই হচ্ছে। মহাকাশের এই চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস ধরার জন্যে এক বিশেষ ধরণের বিরাটকায় রেডিও টেলিস্কোপ নির্মিত হল। এটি হল পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও টেলিস্কোপ—পোরটোরিকোর আরিসিবো (Arecibo) শহরে এটি স্থাপিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সমস্ত ব্যবস্থাই সেখানে আছে। সেখানকার আণবিক ঘটিকাযন্ত্রে সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের একভাগ অতি নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। এই টেলিস্কোপের তিনশ' মিটার ব্যাসের বিরাট প্রতিফলকের ওপর মহাকাশে কোনো শব্দ স্পন্দিত হওয়া মাত্র তা বিশেষ কোণে প্রতিফলিত হয়। পরে এই কোণের মাপজোখ থেকে সঠিকভাবে জানা যায়, কতদূর এবং কোন বিশেষ জায়গা থেকে এই শব্দ তরঙ্গায়িত হচ্ছে। এই রেডিও টেলিস্কোপের স্পর্শ ও অনুভব শক্তি কল্পনাতীত। শীতকালে আকাশ থেকে পালকের মত হাল্কা যে তুষারপাত হয়, সেই পতন শব্দ এই রেডিও টেলিস্কোপে ধরলে মনে হবে যেন কোনো পাহাড়ের এক বৃহৎ অংশ বিকট শব্দে ভেঙ্গে ধ্বসে পড়ছে। এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এই অজানা সংকেতের হদিস পাবার চেষ্টা করেছেন। বহু গবেষণার পর ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা এখন দুটি অনুমানে উপনীত হয়েছেন।

১) এই সংকেত ধ্বনি আসছে, তাঁরা বলছেন, হয়ত "শাদা বামনের" (হোয়াইট ডোয়ার্ফ, একটা মরণোন্মুখ তারকার নাম) কাছ থেকে। এই তারকার জলজান জ্বালানি (হাইড্রোজেন ফুয়েল) নিঃশেষিত প্রায়। তাই এই মরণোন্মুখ তারকার প্রক্ষেপ ও কাতর আর্তনাদ অতিদূর হতে আমাদের কাছে বেতার তরঙ্গে অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনির মত হয়ে পৌছচ্ছে।

২) হয়ত বা এই আর্তনাদ আসছে একটি নিউট্রণ তারকা হতে। এই তারকাটি এত ভারী যে এ নিজের গুরুভারে প্রপীড়িত হয়ে মৃতপ্রায় হয়েছে। এ যেন বলছে, এত গুরু ভার সহিতে পারি না আর। অবিশ্বাস্য এর গুরুভার। এর প্রতি ঘন বা ত্রিঘাত সেন্টিমিটার, পৃথিবীর পরিমাপে ওজন হল ষাট কোটি টন। এত ভার সহ্য করা সম্ভব নয়, তাই আপন ভারে সে ভেঙ্গে পড়ছে। এই ভেঙ্গে পড়ার শব্দ এক বিষাদময় সুরে পৃথিবীতে এসে পৌছচ্ছে মৃদু বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে।

ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদের এ যুক্তি আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা আবার মেনে নিতে পারছেন না। ঐ স্পন্দন ধ্বনি মেপে জুখে দেখে তাঁরা বলছেন, এত রঙ্গ "শাদা বামন" থেকে আসতে পারে না; কারণ তার পক্ষে এত দ্রুত স্পন্দন পাঠানো সম্ভব নয়; আবার নিউট্রণ তারকা থেকেও আসা সম্ভব নয়; কারণ এ স্পন্দন অতি ধীর ও মন্থর। তা হলে? কোথা হতে ভেসে আসে এ ধ্বনি। এঁরা বলছেন, এ ধ্বনি আসছে নিঃসন্দেহে কোনো স্পন্দনমান তারকা (Pulsating star, সংক্ষেপে Pulsar থেকে। কিন্তু কোথা সেই 'পোলসার'? যার শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা। ধ্বনি তরঙ্গ মেপে জুখে যে স্থানের হদিস মিলছে, মহাকাশের মানচিত্রে সেখানে কোনো তারকার চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে তার কাছ বরাবর সার মার্টিন রীল একটা ক্ষীণ নীলাভ আলো দেখতে পেলেন, যে আলোটি এর আগে অন্য বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। কিন্তু সেখান থেকেও শব্দতরঙ্গ উত্থিত হওয়া সম্ভব নয়। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খোঁজাখুঁজি করার পর, এই নীলাভ আলোর কাছাকাছি একটি লাল রঙের তারকা দেখা গেল। পেয়েছি পেয়েছি বলে সকলে চীৎকার করে উঠলেন। বললেন, ঐখান থেকেই শব্দ আসছে। আবার মাপজোখ সুরু হল। দেখা গেল, এই তারকা থেকে শব্দ তরঙ্গ এলে যে মাপের হওয়া উচিত; বেতার তরঙ্গের মাপের সঙ্গে তা মিলছে না। তা হলে হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন স্থানে। কোথা সেই স্থান? কোথায় সেই ভুতুড়ে 'পোলসার'? তাকে দেখতে পাবার আশায় বিজ্ঞানীরা নীরবে নিস্পন্দ বিস্ময়ে দূরদিগন্তে আজও অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, আর মনে মনে বলছেন, —"শুধু কম্পিত সুরে আধোভাষা পুরে কেন এসে গান গাও?

বৈদিক ঋষিরা মহাকাশের এই ব্যাকুলকরা বাঁশির তান কি শুনতে পেয়েছিলেন, তাই কি আকাশের এক নাম দিয়েছিলেন ক্রন্দসী? রবীন্দ্রনাথ কি এই ভেবেই লিখেছিলেন,—"ওই শুন দিশে দিশে তব লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী" কম্পিত সুরে, আধো আধো স্বরে কি কথা বলতে চায় ঐ দূরের নীহারিকাপুঞ্জ, আজও আমরা তা সঠিক বুঝতে পারছিনে। চন্দ্রাভিযান সফল হয়েছে। এখন আশা হয়ত করতে পারি, ঐ চাঁদের ভূমিতে এক মহাকাশ ঘাঁটি যদি স্থাপন করা যায় এবং সেই সঙ্গে এক শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপন করা হয়, তাহলে নীহারিকাপুঞ্জের এই ক্ষীন, অস্পষ্ট ধ্বনি আরও স্পষ্ট ও জোরাল হয়ে উঠবে, কেন না চাঁদে অভিকর্ষ কম (পৃথিবীর তুলনায় ১/৬ ভাগ) এবং বাতাস ও শব্দ না থাকায়, বেতার তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গ, বিনা বাধায় এসে পৌছবে। আর তার ফলে আজ যা অস্পষ্ট ও আবছায়া তা হয়ে পড়বে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ এবং সেই সঙ্গে হবে অনেক প্রহেলিকার সমাধান। তখন নীহারিকাপুঞ্জকে বলতে পারব,—"ওগো ভাল করে বলে যাও। বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে সে কথা বুঝায়ে দাও"।

এবার আবার সেই আগেকার কথায় ফিরে আসা যাক যাঁরা বলেন, ঐ শব্দ আসছে সুদূর নীহারিকাপুঞ্জ থেকে। সেখানকার বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীরা মর্ত্তের মানুষের চেয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে বহুগুনে বলীয়ান। আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন তাঁরা; কিন্তু বিজ্ঞানে তাঁদের সমকক্ষ না হওয়ায়, আমরা তাঁদের সঙ্গে মিলন ঘটাতে পারছি নে, বুঝতে পারছি নে তাঁদের ভাষা। আর্থার ক্লার্ক—ইনি অবশ্য ঠিক বিজ্ঞানী নন, তবে সায়েন্স ফিক্‌সন লেখক হিসেবে খুব নাম করেছেন

এবং মহাকাশ যাত্রা সম্বন্ধে তাঁর অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে—বলেন দূর নীহারিকা জগতে মানুষ পৌঁছতে পারলে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীর দেখা পাবে। একথা যদি সত্য হয়, (ভাবতেও বেশ আনন্দ ও রোমাঞ্চ অনুভব করা যায়) তবু এজগতেরমানুষের পক্ষে ও জগতের মানুষের সঙ্গে বেতার তরঙ্গেও আলাপ করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। কেন? সেই কথাই বলি এবার।

পৃথিবী হতে এই সব পালসারের দূরত্বের কথা একবার কল্পনা করুন। এরা প্রত্যেকে হাজার থেকে বারশ' আলোক বর্ষ মাইল দূরে। এক আলোক বর্ষ হল, ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ × ১,৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ ৫,৮৬৫,৬৯৬০০০,০০০ মাইল।

বেতার তরঙ্গের গতি আলোক তরঙ্গেরই মত, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ২৯৯,৭৭৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। এখন কল্পনা করা যাক, কোনো পালসার থেকে কেউ আমাদের ভাষায় বেতার তরঙ্গ মার্ফত বলল, "ওগো, পৃথিবীর লোক শুনছ। এই কথা কটি আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগবে এক শত বছরের বেশী। আর তার উত্তরে যদি কোনো পৃথিবীর বিজ্ঞানী বলেন, "হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে বলছি"। সেটা পৌঁছতে লাগবে আরও একশ' বছরের বেশী সময়। ছোট একটি প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তরের সময় লাগছে তা হলে দুশ' বছরের বেশী। এই ভাবে যদি বার পাঁচেক কথা বলাবলি করি তাহলে আমাদের সময় লাগবে এগার শ' বছরের বেশী। শবরীর প্রতীক্ষাও হার মেনে যাবে। কাজেই এ সংযোগ স্থাপন করা কার্যত কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

"তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে'। যদি কোনো দিন, দুই এক আলোক বর্ষ পরে—পৃথিবীর মানুষ তখন, ধরে নেওয়া যেতে পারে, আরও বিজ্ঞান কুশলী হয়ে উঠবে—বেতার তরঙ্গকে সেকেণ্ডে আরও কয়েক শত আলোক বর্ষ মাইল দ্রুতগামী করা যায়, তাহলে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। কিন্তু এখানে 'যদি' টাই মুখ্য, বাকি সব গৌণ। সেই অনাগত দিনের অপেক্ষায় কবির সুরে সুর মিলিয়ে গাওয়া যাক,—

"বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহচন্দ্রদীপ্ত তপন তারা।"

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

॥ ১০ ॥

এম্‌স শহরে তখন রীতিমত একটা উৎসবের আমেজ। সবার মনেই আনন্দের ছোঁয়াচ। আইওয়া কলেজ কৃষি গবেষণা ও হাতেকলমে বিজ্ঞানচর্চার মর্যাদা লাভ ক'রেছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতিও আগাগোড়া পাল্টে গিয়েছে। সেকেলে গুরুমশাইদের ধরণে পড়াবার রীতি ত্যাগ ক'রে অধ্যাপকরা এখন নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নব উৎসাহে ছাত্রদের পড়াতে আরম্ভ ক'রেছেন।

জর্জ কার্ভার যখন কলেজে ভর্তি হ'তে এলেন তখন ছাত্র ভর্তি করার মরশুম শেষ হ'য়ে গিয়েছে আইওয়া কৃষি কলেজের। তিনি আর ভর্তি হবার সুযোগ পেলেন না। কলেজের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাসে, শেষ হয় নভেম্বরের শেষাশেষি। চাষবাসের কাজও এই সময়টাতেই চলে পুরোদমে, তাই এ সময়ে কোন নতুন ছাত্রের পক্ষে কলেজে ভর্তি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

কলেজ হোষ্টেলেও জর্জ কার্ভার থাকার জায়গা পেলেন না।

অধ্যাপক বাড জর্জ কার্ভারকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তিনি তাঁর নিজের পড়াশুনার জন্য ব্যবহৃত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সব কাগজপত্র সরিয়ে নিয়ে সেটাকে উপরে দোতলার ঘরে চালান ক'রে দিলেন, সেই সঙ্গে বইয়ের আলমারি ও অন্যসব জিনিষও সে ঘর থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত ক'রলেন।

জর্জ কার্ভার অবাক হ'য়ে দেখলেন, অধ্যাপক বাড তাঁর নবাগত ছাত্রের জন্য একতলার সবচেয়ে বড় ঘরখানাই ছেড়ে দিয়েছেন। দয়াময় ভগবানের অপরিসীম করুণার কথা স্মরণ ক'রে জর্জ কার্ভারের সমস্ত অন্তর অধ্যাপক বাডের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভ'রে গেল।

কিন্তু তখনও জর্জ কার্ভারের অন্য রকম একটা অভিজ্ঞতা লাভ করা বাকী ছিল। পরের ঘটনাতেই তাঁর মনে দারুণ একটা আঘাত লাগলো, অপমানে ও লজ্জায় তাঁর মুখ কালিমাখা হ'য়ে গেল, আর তাঁর সমস্ত হৃদয়, গ্লানি ও বেদনায় পরিপূর্ণ হ'ল। মুহূর্তকালের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করলেন, তিনি যে নিগ্রো সেই নিগ্রোই আছেন কোন পরিবর্তন হয়নি। হাজার লেখাপড়া শিখলেও তাঁর গায়ের কালো রঙ কখনো বদলাবে না, চামড়া কখনোই সাদা হবে না। অধ্যাপক বাডের সব সদয় ব্যবহার, তাঁর সহানুভূতি ও করুণা জর্জ কার্ভারের কাছে অন্তঃসারশূন্য এবং সম্পূর্ণ অর্থহীন বোধ হ'ল। জর্জ কার্ভারের বাড পরিবারের পারিবারিক ভোজন কক্ষে সকলের সঙ্গে একসাথে ব'সে আহার করার অধিকারও পেলেন না, কারণ তিনি একজন নিগ্রো, শ্বেতকায়দের সঙ্গে এক জায়গায় ব'সে আহার করার অনুমতি তাঁকে দেওয়া যায় না। অতএব জর্জ কার্ভারের জন্য আহারের স্থান নির্দিষ্ট হ'ল রন্ধনশালার নীচেই যে অন্ধকার একখানা ঘর আছে, যেখানে ব'লে বাড়ীর চাকর-বাকর এবং ক্ষেত-খামারের কাজে নিযুক্ত দিন মজুররা আহার করে সেই ঘরে। কিন্তু এমনি ব্যবহার শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে জর্জ কার্ভার এর আগেও পেয়েছেন, পার্থক্য এই যে, অধ্যাপক বাড নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হ'য়েও সাদা-কালোর এই বর্ণবৈষম্য সমর্থন করবেন, অন্য সকলের মতো তিনিও তা মেনে চ'লবেন এটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'ল। জর্জ কার্ভার এরকম আসা করেন

নি। এই কারণেই জর্জ কার্ভারকে অপমানের আঘাত বেশী ব্যথা দিল।

তথাপি জর্জ কার্ভার কোন কথা ব'ললেন না। নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে সেই বর্ণবৈষম্যমূলক অপমানকর ব্যবস্থাই তিনি মেনে নিলেন। অবশ্য এই ব্যবস্থা মেনে নেবার আগে তিনি তার সমর্থনে মনে মনে একটা যুক্তি খাড়া ক'রে নিলেন। যুক্তিটা যদিও খুব জোরালো নয় তবু তার মধ্যে তিনি নির্ভর করার মতো একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। যুক্তিটা হ'ল, উপর তলার বাসিন্দা শ্বেতাঙ্গরা যদি জ্ঞানে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে কোন দিক দিয়ে তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ না হয় তবে তিনিই বা নিজেকে কৃষ্ণাঙ্গ দিনমজুর ও গৃহভৃত্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচনা ক'রবেন কিসের অহঙ্কারে।

অধ্যাপক বাড যদি এই ঘটনার এখানেই ইতি ক'রে দিতেন, যদি তিনি এই ঘটনার কথা তাঁর মেয়ে এট্টা বাডের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লেখ না ক'রতেন তা হ'লে হয়তো ব্যাপারটা এখানেই চুকে যেতো। পিতার চিঠি প'ড়ে কন্যা এট্টা বাড তো রেগেই আগুন। কিন্তু বছরের এই মাঝামাঝি সময়ে কলেজের শিল্প অধ্যাপনার কাজ হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাওয়া নেহাৎ তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না, তাই তিনি তাঁর বান্ধবী মিসেস আর্থার লিষ্টনের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা ক'রলেন। জর্জ কার্ভার যখন সিম্পসন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন এই মহিলার সঙ্গে তাঁরও যৎসামান্য পরিচয় হ'য়েছিল। সেই সামান্য পরিচয়ের সূত্র অবলম্বন ক'রেই মিসেস লিষ্টন পরের ট্রেণে রওনা হ'লেন।

জর্জ কার্ভার কিন্তু এসব কিছুই জানতে পারলেন না। তাই মিসেস লিষ্টনকে দেখে খুবই বিস্মিত হ'লেন, এবং আনন্দিতও কম হ'লেন না। তিনি সারা সকালবেলা ঘুরে ঘুরে মিসেস লিষ্টনকে সঙ্গে নিয়ে কৃষি কলেজের সব বিভাগগুলি ভালো ক'রে দেখালেন, অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মধ্যাহ্নভোজের সময় হ'ল, উপরতলার ভোজকক্ষে তাঁর ডাক প'ড়লো। কিন্তু মিসেস লিষ্টন উপরতলায় শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত ভোজকক্ষে উপস্থিত না হ'য়ে অধ্যাপক বাডকে ব'লে পাঠালেন শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বসে ভোজন করার চাইতে তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু জর্জ কার্ভারের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে ভোজন করাই বেশী পছন্দ ক'রছেন। খবর পেয়ে অধ্যাপক বাড ছুটে চ'লে এলেন মিসেস লিষ্টনের কাছে। তাঁকে অনেক রকম ক'রে বোঝালেন, বহু অনুরোধ ক'রলেন, কিন্তু মিসেস লিষ্টনের ধনুকভাঙা পণের এতটুকু নড়চড় হ'ল না।

শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক এবং ছাত্ররা সবাই মিসেস লিষ্টনের উপর মনে মনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হ'ল কিন্তু মুখ ফুটে কারুর কিছু বলার সাহস হ'ল না। ভোজকক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে মিসেস লিষ্টনকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রলেন, ব'ললেন "কিন্তু ম্যাডাম, আইওয়া কৃষি কলেজের ডীনের কানে গিয়ে যখন এই কথা উঠবে তিনি নিশ্চয় খুবই রাগ করবেন। আমরা তখন তাঁর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবো?"

"মিঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জন্য যখন আহারের এই অপমানকর ব্যবস্থা ক'রেছিলেন তখন আপনাদের বিবেকবুদ্ধি কোথায় ছিল? এসব কথা তখনই আপনাদের চিন্তা করা উচিত ছিল", মিসেস লিষ্টন তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় কথাগুলি ব'ললেন। কর্মচারীটি তাঁর একটি কথারও উত্তর দিতে পারলেন না, অপরাধীর মতো ম্লান মুখে চুপ ক'রে মিসেস লিষ্টনের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু থেমে মিসেস লিষ্টন ব'ললেন, "আমি আবারও এখানে আসবো আশা করি।"

ব্যাপারটা এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে ঘ'টলো যে, তার ফলে সমস্ত ব্যবস্থাই আগাগোড়া পাল্টে গেল। পরের দিন ভোরে প্রাতরাশের সময় জর্জ কার্ভারের ডাক প'ড়লো সাধারণ ভোজকক্ষে সকলের সঙ্গে একই টেবিলে ব'সে আহার করার জন্য, তিনি শুধু যে সসম্মানের সহিত আমন্ত্রিত হ'লেন তাই নয়, সমাদরের সঙ্গে গৃহীতও হ'লেন।

ভর্তি হবার প্রথম দিন থেকেই জর্জ কার্ভার ছাত্র ও অধ্যাপক নির্বিশেষে সকলের স্নেহ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা লাভ ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন। তাঁর ভদ্র নম্র ও প্রীতি পূর্ণ ব্যবহার সকলের কাছে সহজেই তাঁকে বিশেষ প্রিয় পাত্র ক'রে তুলেছে, এক সপ্তাহ অতিবাহিত হ'তে না হ'তেই জর্জ কার্ভার ডাইনিং হলের টেবিলে টেবল টেনিস খেলার প্রবর্তন ক'রলেন, সেই সময় থেকে আজো পর্যন্ত এম্‌স শহরের আইওয়া কৃষি কলেজে টেবল টেনিস খেলা সমান উৎসাহের সঙ্গে চ'লে আসছে।

জর্জ কার্ভারের যোগদানের আগে পর্যন্ত ভোজন পর্বটা ছিল নেহাৎই মামুলি, একেবারে নীরস ও বৈচিত্র হীন ব্যাপার। যে যার আহার সমাধা ক'রে নিজের নিজের যায়গায় ফিরে যেতো। ভোজকক্ষের প্রতি কারুর কোন বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। জর্জ কার্ভারই প্রথম ভোজ কক্ষের আবহাওয়া ব'দলে দিলেন। প্রত্যেকটি আহার্য পদার্থের তিনি নতুন নামকরণ ক'রলেন এবং সবাই সেই নতুন নামেই খাবার চেয়ে নিয়ে খায়। আহার্য পদার্থ গুলির যে নতুন নাম দিলেন জর্জ কার্ভার সেগুলি অবশ্য সবই বৈজ্ঞানিক নাম। কেউ যদি ভুল ক'রে ব'লে ব'সে ট্রিটিকাম ভালগেয়ার (Triticum Valgare) তা হ'লে সে শুধু রুটি ছাড়া আর কিছুই পায় না। আবার অন্য একজন যদি তেমনি ভুল ক'রে স্যালেনাম টিউবারোসাম (Salonum Tuberosum) কথাটা মনে না আনতে পেরে চুপ ক'রে থাকতে বাধ্য হয় এবং সে সময়ে জর্জ কার্ভার তার পাশে উপস্থিত না থাকে তবে তার ভাগ্যে আলুর দম জোটার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

কলেজে ভর্তি হ'য়ে জর্জ কার্ভার বিজ্ঞানের যে সব বিষয় নিয়ে পড়াশুনা ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন সবগুলিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অতিশয় জটিল, সেই কারণে কিছুটা নীরসও বটে, কিন্তু জর্জ কার্ভার তাঁর একাগ্রতা ও অদ্ভুত মননশীলতার গুণে পাঠ্য বিষয়গুলিকে সরস এবং চিত্তাকর্ষক ক'রে তুললেন। একটা জিনিষ বিশেষভাবে তাঁকে চিন্তান্বিত ক'রে তুললো। এতগুলি বিষয় প'ড়ে শেষ ক'রতে হবে, কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট সময় যেন তিনি পাচ্ছেন না। সেই জন্যই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, জীবাণুতত্ব, রসায়ন বিদ্যা এবং জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি জটিল পাঠ্য বিষয়গুলি দ্রুত অধ্যয়ন করার দিকে মন দিলেন এবং তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে ফেলতে লাগলেন।

জীবিকার সংস্থান করার জন্য জর্জ কার্ভারকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে হ'চ্ছে, কখনো তিনি নর্থ হলের পরিচালক, কখনো বা তিনি কাঁচের আধারে রক্ষিত উদ্যান সংগ্রহশালা ও গবেষণাগারের তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু এতসব কাজ করার পরেও তিনি যেটুকু সময় পান সেই অবসর সময়েও তিনি কলেজের সীমানার মধ্যে থেকেই আরো বহুরকম পেশাবহির্ভূত কাজ করেন। এমনিভাবেই এক সময়ে জর্জ কার্ভার আইওয়া কৃষি কলেজের ছাত্রদের ব্যায়াম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হ'লেন।

জর্জ কার্ভার জন্মসূত্রে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো হওয়ার অপরাধে অধ্যাপক বাডের বাড়ীতে যে অপমানজনক ব্যবহার পেয়েছিলেন বহুদিন বাদে কিভাবে যেন সে খবর অধ্যাপক জেমস জি উইলসনের কানে গিয়ে পৌছলো। তিনি জর্জ কার্ভারকে ডেকে ব'ললেন, ইচ্ছা ক'রলে তুমি আমাদের অফিস যে বাড়ীতে করা হ'য়েছে সেই বাড়ীতেও এসে বাস ক'রতে পারো। সে বাড়ীতে অনেক গুলি বাড়তি ঘর খালি প'ড়ে আছে, সেগুলি আমাদের বিশেষ কোন কাজে লাগছে না।

জর্জ কার্ভার সানন্দে অধ্যাপক জেমস জি উইলসনের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রলেন এবং অনতিবিলম্বে অফিস বাড়ীতে নিজের বাসা বদল ক'রলেন। সেখানে বেশ বড় একখানা ঘর তিনি বাস করার জন্য পেলেন। সামনের দিক বহুদূর পর্যন্ত খোলা, রোদ এবং হাওয়ার যথেষ্ট প্রাচুর্য। ঘরখানিকে জর্জ কার্ভার তাঁর শিল্পী মন নিয়ে খুব সুন্দর ক'রে সাজালেন, কাঠের দরজাজানালাগুলিতে নিজের হাতে রঙ লাগালেন। নিজের আঁকা ভালো ভালো কয়েকখানা ছবি চারদিকের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলেন। জর্জ কার্ভারের বাসস্থান পরিবর্তনের খবর

পেয়ে কলেজ থেকে শিক্ষক এবং ছাত্ররা দল বেঁধে তাঁকে দেখতে এলেন।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে অধ্যাপক উইলসনের সঙ্গে জর্জ কার্ভারের যে পরিচয় ও বন্ধুত্বের সূত্রপাত হ'ল তাই একদিন নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হ'ল এবং তাঁদের এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক চিরদিন অমলিন ও অবিচ্ছেদ্য ছিল। ছাত্র-শিক্ষকের বয়সের ব্যবধান ছাপিয়ে সেই সম্পর্ক দুই সমবয়স্ক ব্যক্তির বন্ধুত্বের পর্যায়ে গিয়ে পৌছল। এই ঘটনার বহু বছর বাদে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ম্যাকেনলি, প্রেসিডেন্ট টাফ্‌ট এবং প্রেসিডেন্ট রুজেভেল্ট যখন রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন তখন অধ্যাপক উইলসন আমেরিকার কৃষি সচিব ছিলেন। সে সময়ে আমেরিকার কৃষক সমাজ কতকগুলি অত্যন্ত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে কৃষি সচিব অধ্যাপক উইলসনের স্মরণাপন্ন হয়। তিনি নিজে সব সমস্যার সমাধান ক'রতে না পেরে জর্জ কার্ভারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য ডেকে পাঠান। এমনিভাবে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য তিনি প্রায়ই জর্জ কার্ভারকে ডেকে পাঠাতেন। এতেই বোঝা যায় জর্জ কার্ভারকে তিনি কতখানি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও পরামর্শের কত গভীর মূল্য দিতেন।

আইওয়া কৃষি কলেজে ভর্তি হবার সময়ে জর্জ কার্ভারের বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর। কিন্তু বয়সে তরুণ হ'লেও তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের মতোই ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ছাত্র এবং শিক্ষকদের নিকট তিনি একজন বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে এবং আধ্যাত্মিক নেতারূপে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ ক'রলেন। তার ফলশ্রুতি হ'ল এই, এতদিন এমস সহরের যেসব ভোজকক্ষগুলিতে কালা আদমি ব'লে জর্জ কার্ভারের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল ক্রমান্বয়ে সেই সব ভোজকক্ষগুলির দ্বার তাঁর জন্য উন্মুক্ত হ'তে লাগলো। যে উন্নাসিক শ্বেতাঙ্গরা এতদিন তাঁকে স্থান দেয়নি নিজেদের সমাজে, যাদের কাছে জর্জ কার্ভার ছিলেন অস্পৃশ্য এবং অপাংক্তেয়, তাদের কাছ থেকেও সাদর নিমন্ত্রণ আসতে আরম্ভ ক'রলো ভোজের আসরে যোগ দেবার জন্য। নিমন্ত্রণকারীদের মধ্যে অনেকে সমাজের শীর্ষস্থানীয়, সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকও ছিলেন। শুধু তাই নয়। জর্জ কার্ভার বহু সাহিত্য সভা ও অন্যান্য সমিতির সদস্য নির্বাচিত হ'লেন। কিন্তু শুধু এই-ই সব নয়, তাঁর জন্য আরো সম্মান, আরো শ্রদ্ধা, আরো সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন বাকী ছিল। তিনি আণ্ড; কলেজ বাইবেল সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হ'লেন। জর্জ কার্ভার একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধির মর্যাদায় ভূষিত হ'য়ে বাইবেল সম্মিলনীর অধিবেশনে আসন গ্রহণ ক'রলেন।

ক্রমশঃ

আধুনিকতমদের প্রেম

(গল্প)

চিত্রিতা দেবী

রথীনের সঙ্গে ভাব করা যায়। কিন্তু তাকে ভালোবাসা যায় কি ? কে জানে ? চিত্রা আর মিত্রা দুজনেই রথীনকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করত। নামের মিলেই ওদের দুবন্ধুর মনের মিল হয়েছিল। নইলে আর সবেতেই তো ওদের গরমিল। চিত্রারা বড়ো লোক। আর মিত্রারা একেবারেই সাধারণ—তবু মিত্রার সঙ্গে সঞ্জয়ের ভাব হয়ে গেল—আশ্চর্য্য নয় কি ? চিত্রার বাবার কারখানায় অবশ্য সঞ্জয়ের মত ডজন দুয়েক ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে, তবু সঞ্জয়কে দেখে চিত্রারও একটু চমক লেগেছিল বই কি !

সঞ্জয়ের চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মত। দেখা হয়েছিল অবশ্য রেখাদের বাড়ীতে,—রেখার জন্মদিনের পার্টিতে। কলেজের বন্ধুরা প্রায় সবাই ছিল,—সুমিতা, অনীতা, কাজল, রথীন, বরুণ, দীপঙ্কর, অলকা, অপর্ণা সবাই।

রেখার পিসতুতো দাদা সঞ্জয়। সবে Glasgow থেকে ফিরেছে। বাপের যা কিছু ছিল সব খুইয়ে বেশ এক খানা ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু ডিগ্রী সত্ত্বেও চাকরী মেলেনি এখনো। ভেবেছিলো ফেরামাত্রই সবাই ওকে লুফে নেবো। তা হলো না। কি জানি বিলিতি ডিগ্রীর আর বোধহয় তেমন নাম ডাক নেই।—আজকাল সবাই States এ যাচ্ছে আসছে। বিলাতটা নেহাৎই আমেরিকার পঞ্চাশতম প্রদেশ হয়ে উঠেছে।

তবু Glasgow is Glasgow,খ্যাতিটা এখনো পুরোপুরি যায়নি।—যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি বলেন—পার্থ হেসেছিল, "ও বোমাই পড়ুক আর ছবিই ভাঙ্গুক।" যাদবপুরের ছাত্রী প্রতিমা প্রতিবেশিনী বলে এই উৎসবে যোগ দিতে এসে ছিল।—সে হেসে মাথা নেড়ে চোখ নাচিয়ে বলেছিল, —"আর বড়াই করিসনে তোরা। যাদবপুর আজকাল বোমাতেও কলকাতাকে ছাড়িয়ে গেছে।"

শুনে রথীন হেসে বলেছিল—"পকেটে আছে দু চারটে তাজা রকমের।—ছাড়ব না কি একটা?" শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিল।

রথীনের কথায় সবাই হাসে কেউ ওকে সিরিয়াসলী নেয় না। মিত্রা বলে—"রেখার জন্মদিনে রথীনটা কিছু আনেনি—সে যা ফাঁকি দিয়েছে "

রথীন অবাক হয়ে বলে—"সে কি এতখানি একটা জিনিষ নিয়ে এলাম।"

"কি কি কি?" সবাই ছেঁকে ধরল।

"বাঃ প্রীতি, শুভকামনা।"

"ওতে আর আজকাল মানায় না।"—কে যেন বললে—"রেস্ত কিছু ছাড়ো না বাবা।"

চিত্রা শুধু Capitalist এর মেয়েই নয়—Marx এর Capital বইটাও তার কিছু কিছু পড়া, তাই সে চট করে

বলে উঠল—"টাকা খরচ না করতে চাও—লেবার দাও।—ম্যাজিক দেখাও।"

এমনি লঘুভাবেই সে দিনটা শেষ হয়ে যেতে পারত, আরো অনেক দিনের মতো। কিন্তু হোল না। কেমন করে জানি সঞ্জয়ের চোখের সঙ্গে মিত্রার বড়ো বড়ো বাঁকানো পিছিচাকী কালো চোখের তারা আটকে গেল। মনে মনে কেমন যেন কাছাকাছি এসে গেল ওরা।

মিত্রার তনুদেহে বেশ একটা মাজা মাজা কোমল, শ্রী আছে। চিত্রার মতো ফর্সা সে নয় কিন্তু মাধুর্য্যময়ী তো বটেই। তাছাড়া চিত্রাকে পাবার আশা সঞ্জয়ের মত একজন সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারের হবেই বা কি করে? তাই চিত্রাকে মিত্রা কোনদিনই প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভাবে নি। মনের সুখে মনের কথা বলাবলি করেছে।

রথীন কিন্তু অনেকবার মিত্রাকে সাবধান করে দিয়েছে—বড়লোকের সঙ্গে অত বেশী মাথামাথি করিস নে মিত্রা—তার চেয়ে আমার মত গরীবদের সঙ্গে ভাব কর—আখেরে কাজ দেবে।—

মিত্রা বলত,—"দূর বোকা, তুই যে পুরুষ মানুষ,—তোকে কি মনের কথা সব বলা যায়। সঞ্জয়ের সঙ্গে আমার প্রেমের কথা চিত্রা ছাড়া আর কে বুঝবে?"

যতদিন যায় সঞ্জয় আর মিত্রা কাছাকাছি এসে যায়। কিন্তু বিয়ে করার মত সামর্থ্য নেই সঞ্জয়ের। এখনো পর্য্যন্ত একটা চাকরী জোটাতে পারল না।—শুধু বাপের টাকা ধ্বংস করে ঘরে ফিরে বসে আছে। র‍্যাশেনের মোটা চাল আর পুঁই চচ্চাড় গলা দিয়ে গলতে চায় না সঞ্জয়ের। নিজেই নিখরচায় বাপের অন্নদাস হয়ে পড়ে আছে এত পাস টাশ করেও—তার উপরে বিয়ের কথা মুখে আনা যায় কি? তবু মনে তো আসে।

সঞ্জয় বললে—"মিতালী বিশ্বাস রাখো, উপায় একটা করবই।" কিন্তু সঞ্জয়ের বদলে মিত্রাই উপায় ঠিক করলে।

মিত্রার সব সখের উপায় চিত্রাই করেছে চিরদিন। ওর লিপস্টিক পাউডার থেকে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং জুতো আর ভ্যানিটী ব্যাগ পর্য্যন্ত সমস্তরই উপায় করেছে চিত্রা। সখীর উপরে প্রভুত্ব ফলাবার এও একরকমের খেলা ছিল চিত্রার। চিত্রা যেমন রাজকন্যা—মিত্রা যেন সে যুগের সখী। সখীর সব দায়-দায়িত্বও তো রাজকন্যারই।

এ ব্যাপারেও মিত্রা গিয়ে চিত্রার শরণাপন্ন হোল—"তোর বাবাকে বলে ওর একটা চাকরী করে দে—নইলে বিয়ে করতে পারছি নে।"

শুনে চিত্রা হাসল। মিত্রা নিজের মনের রঙ্গে বিভোর ছিল—চিত্রার হাসির ভেতরকার তির্য্যকভাবটা ধরতে পারল না।

যেদিন দুজনের মধ্যে মিত্রাকে পছন্দ করে নিল সঞ্জয় সেদিন মিত্রার গর্ব্বোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে একটা সুক্ষ্ম পরাজয়ের কাঁটা চিত্রার বুকের ঠিক কোনখানটায় বিঁধে ছিল মনে নেই। তবু চিত্রা সেই কাঁটার যন্ত্রনাটা কাউকে টের পেতে দেয় নি।

চিত্রাদের টাকার খ্যাতিটা এত বেশী ফুলে ফেঁপে উঠেছে যে, চিত্রার সম্বন্ধ ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না।—"ওরে বাবা সোমেন দত্তর মেয়ে এসে আমাদের বাড়ীর বউ হবে। ভাবা যায় না," অনেকেরই এই অভিমত।—তাই চিত্রার জন্যে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে সোমেনবাবুকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।—মজা মন্দ নয়,—চিত্রা ভাবে, লোকে তো ধনীর মেয়েকেই বিয়ে করতে চায়—এ যে দেখি "গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।"

চিত্রার মনটা খারাপ হয়েছিল এমনিতেই। মিত্রা যে মান খুইয়ে হবুবরের জন্যে চাকরী খুঁজতে এল, এতে খানিকটা খুসী হয়ে উঠল।

চিত্রা বলল—বেশ, সঞ্জয়কে পাঠিয়ে দিস কাল সাড়ে আটটার মধ্যে। বাবা তো চান টান সেরে "বো"টাই বেঁধে আটটার মধ্যেই ফিটফাট রেডি।—তারপরে পনেরো বিশ মিনিটে ব্রেকফাস্ট। ব্যস। দেখিস সঞ্জয়কে বলিস যেন বেশ স্মার্টলি সেজে আসে। এই কমাসেই দেখছি বিলেত ফেরতা রঙের উপরে ওর একটা মেটে রঙের ছোপ পড়েছে।

কি করবে বল।—চাকরী নেই তাই মনমরা হয়ে থাকে—মিত্রা বন্ধুকে চটাল না। কিন্তু নিজে চটল। আর সেই চটুনির জ্বলুনিটা রথীনকে জানালো। সঞ্জয়কে বলতে ভরসা হোল না—যদি আবার রেগে গিয়ে বেফাঁস কিছু বলে বসে।

রথীনের কাছে যখন তখন মন খোলা যায়। রথীনের একটা বড় গুণ আছে। হাতে হাতে ছোঁয়া ছুঁয়ি না করলেও মনে মনে কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারে।

রথীন অনেকক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—তারপর বলল, "ভুল করলি মিত্রা—সঞ্জয় যদি নিজের চেষ্টায় চাকরী যোগাড় করত, তবেই তোর মান থাকত। —এখন আর কি কোনদিন চিত্রার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবি? তাছাড়া ওদের পাল্লায় পড়ে সঞ্জয় নিজেই হয়ত বদলে যাবে। আর ধর চিত্রাই যদি ওকে গায়েব করে বসে?"

"কি বলছিস যা তা"—মিত্রা রেগে চেঁচিয়ে ওঠে—"আমি তোকে মারব রথীন। সঞ্জয় ওরকম ছেলেই নয়, আর চিত্রা আমার বন্ধু।"

রথীন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বলল—"বেশ, তোর যখন মারধোর করার মত মনের অবস্থা তখন তোর কাছে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়—তবে এইটুকু জেনে রাখ, সব ছেলেই সমান, আর মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয় না।

রথীন চলে গেল। আর যাবার আগে মিত্রার মনে কাঁটা বিঁধিয়ে গেল। সে কাঁটা আর তুলতে পারল না মিত্রা। বরং দিন দিন তার ক্ষত গভীর হতে লাগল। সঞ্জয় একটু একটু করে বদলে যেতে লাগল—আর চিত্রাও ওদের দুজনের বন্ধুত্বের মাঝখানে ধীরে ধীরে একটা দেয়াল গেঁথে তুলতে লাগল।

সঞ্জয়কে প্রথম দেখেই চিত্রার মায়ের ভালো লেগেছিল।—কেমন সুন্দর লম্বা চেহারা। গায়ের রংটাও ফরসাই বলতে গেলে। বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে ফিরেছে। এমন ছেলে কোথায় পাবে। ওকেই ভালো একটা চাকরী দিয়ে বশ করে নাও। বাপের যখন পয়সা কড়ি তেমন নেই।—সেখানে চিত্রার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আলিপুরে একটা ফ্ল্যাট কিনে দাও, মেয়ে সুখে থাকবে—শ্বশুর শাশুড়ীর ঝামেলা তোমার মেয়ে মোটেই পোয়াতে পারবে না।

চিত্রাও ভিতরে ভিতরে ঠিক এই জিনিষটাই চাই ছিল। ছোট বেলা থেকে মিত্রাকে সে অনেক জিনিষ দিয়েছে, প্রতিদানে নাহয় এই জিনিষটা নিলই—চিত্রার মনে এ নিয়ে কোন দ্বিধা উঠল না।

অনেকদিন পরে সঞ্জয়ের ফোন পেল মিত্রা—আজ একটু হাতে সময় পেয়েছে। মিত্রাকে নিয়ে কোন একটা ভালো রেস্তোঁরায় গিয়ে গল্প গুজব করতে করতে রাতের খাওয়া সেরে আসতে চায়।

কতদিন পরে সঞ্জয়কে আপন করে পাবে মিত্রা।—সুখে ওর শরীর আনচান করে উঠল। ওর সবচেয়ে ভালো শাড়িটা পরে তৈরী হয়ে নিল মিত্রা। হঠাৎ মনে হোল শাড়িটা চিত্রাই ওকে দিয়েছিল গত জন্ম দিনে। এখন সঞ্জয়কে চাকরী দিয়ে ওর কাছে ফেরৎ পাঠাচ্ছে। পার্ক ষ্ট্রীটের রেস্তোঁরায় বসে খাওয়াবার পয়সা হয়েছে ওর। আশ্চর্য্য চিত্রাটা কেন হঠাৎ এমন চুপচাপ হয়ে গিয়ে ওকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগই দিচ্ছে না।

আকাশরঙের নতুন ঝকঝকে গাড়ী নিয়ে এল সঞ্জয়। এরই মধ্যে সে গাড়ীও কিনেছে, অথচ মিত্রাকে জানায় নি। সূক্ষ্ম একটা অভিমান চোখের কোণে চিক্‌চিক্ করে উঠতে চাইলেও তাকে আমল দিল না মিত্রা।—

সারা সন্ধ্যা খুসীতে ঝলমল করল মিত্রা।—কিন্তু সঞ্জয়ের খুসীতে যেন একটু ভেজাল ছিল। মিত্রা সেটা দেখেও দেখল না—গায়েই মাখল না।

সঞ্জয়ের মাইনেটা এখন ঠিক কত জানবার জন্যে কৌতূহল হচ্ছিল মিত্রার। ভাবছিল সঞ্জয় নিজেই হয়ত বলবে—যখন বলল না, মিত্রা জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না।

"আপাতত বাইশশ" সঞ্জয় বললে, নিতান্ত সাধারণ ভাবে।

"বাইশশ! অথচ এতদিন খবরটা মিত্রাকে জানাবার সময় হয় নি বাবুর? কে চাকরী করে দিয়েছে শুনি?"

হঠাৎ মনে মনে চমকে উঠল সঞ্জয়।—সত্যিই তো।—কে চাকরী করে দিয়েছে? মিত্রা? না চিত্রা?

সঞ্জয় একটুক্ষণ চুপ করে থাকল।—তারপরে দ্বিধাভরে বলল—সেই জন্যেই তো এতদিন তোমাকে বলে উঠতে পারছি না কিছুতেই। চাকরীর একটা শর্ত আছে—এখন বছর খানেক বিয়ে করা চলবে না। তাছাড়া আপাতত কিছুদিনের জন্যে যেতে হচ্ছে দিল্লীতে—একটা নতুন ফ্যাক্টরী খোলার কাজে।—প্রায় সব দায়িত্বই পড়বে সঞ্জয়ের উপরে। সবই তো খুব ভালো খবর।—তবু কেমন যেন মিইয়ে গেল মিত্রা। কোথায় যেন তার ছিঁড়ে গেছে। সুর মিলছে না।

ঘোরার পথে বেশী কথা বলতে পারল না ওরা কেউই। মাঝখানে একবার মিত্রা জিজ্ঞেস করেছিল—"চিত্রার সঙ্গে দেখা টেখা হয়?"

সঞ্জয় বলেছিল,—"মাঝে সাঝে।"

ব্যস তারপরে আর সঞ্জয়ের কোন খোঁজ খবর নেই। মিত্রা ভাবছিল, সঞ্জয় দিল্লী চলে গেছে।

"হঠাৎ দুর্মুখ রথীনটা এসে দেখা দিল। রথীন এসেই হাসতে লাগল—"তোর love bird উড়ে গেছে মিত্রা।"

"খবরদার রথীন।—বাজে ফাজলামী করিস না। সঞ্জয় বদ্‌লী হয়ে দিল্লী গেছে।"

"উঁহু, কত বাজী? ও এখানেই আছে।"

—"কক্ষনো না।"

—"কক্ষনো হ্যাঁ"—ফোন করে ভাখ, ওর বাড়ীতে।

সঞ্জয়ের বাড়ীতে ফোন করল মিত্রা। ওর বাবা নিজেই ফোন ধরেছিলেন। বল্লেন, "সঞ্জয় আজ দিন দশেক হোল উঠে গেছে আলিপুরে।"

—"আলিপুর"। মিত্রা বিস্ময় রুখতে পারল না গলায়।

—"হ্যাঁ, ওর শ্বশুর ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে সেইখানে। পরশু ওর বিয়ে।"

টেলীফোন ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল মিত্রা।—বুঝতেই পারল না যেন কি শুনল। অনেকক্ষণ পরে যখন মুখ তুলল,—তখন ওর শূন্য চেহারার দিকে চেয়ে রথীন আর হাসতে পারল না। মিত্রা বুঝল, সবাই খবরটা শুনেছে, শুধু সে ছাড়া। সবাই কার্ড পেয়েছে, শুধু সে ছাড়া। রথীনের পকেট থেকেও কার্ডটা উঁকি দিচ্ছিল। মিত্রা সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

রথীন বলল,—"তুই ভাবছিস কেন মিত্রা। চিত্রা আজ জিতল বটে, কিন্তু একদিন সে হারবে।—যখন তুই gold medal নিয়ে B. A, পাশ করবি।—ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট। আর কাগজে কাগজে তোর ছবি বেরুবে। তারপরে ধাপে ধাপে এম, এ, ডক্টরেট আরো কত কি। তারপরে যখন visiting lecturer হয়ে আমেরিকা যাবি, তখন "কত শত শত ভক্তবৃন্দ তোকে বন্দনা করবে।"

রথীনের বক্তৃতা শুনে মিত্রার চোখের জলে হাসির ছায়া পড়ল। রথীন বলল—"আজ পড়া ছাড়ল বলেই চিত্রা তোকে ছাড়তে পারল। ও তোকে অনেক দিয়েছে বটে—তুইও ওকে কম দিস নি, তুই যে ওর বিনা মাইনের মাষ্টারনি ছিলি, সে কি ভুলে গেলি?

সত্যিই সে কথা মনে ছিল না মিত্রার। কোনদিন ভাবেও নি। চিত্রার মাথায় পড়াশুনো সহজে ঢুকতে চাইত না। তাকে পাশ করিয়ে তোলায় মিত্রার আনন্দ ছিল।

রথীন বললে "মিত্রা আলিপুরের স্বর্গ আমাদের জন্যে নয়। তুই ভুল স্বর্গের দিকে পা বাড়িয়েছিলি। তুই যদি আর বছর কয়েক অপেক্ষা করতে পারিস, তাহলে আমি ততদিনে একটা মাঝারি গোছের চাকরী জুটিয়ে নিয়ে তোকে বড় হবার সুযোগ দিতে পারি।"

মিত্রা চেয়ারে মাথা হেলিয়ে বসেছিল, বলল—ধ্যাৎ, কিসব বাজে বকছিস। রথীন বললে—"বাজে নয়—সত্যি কথা। তুই আমার চেয়ে অনেক ভালো

চাকরি পেয়ে যাবি জানি, কিন্তু আমি তাতে হিংসে করবো না। তোতে আমাতে মিলে বালীগঞ্জ কি টালিগঞ্জ, কি বড়জোর যোধপুর পার্কে ছোট্ট একটা দুতিন কামরার স্বর্গ রচনা করব। তুই যখন রাশিয়া কি আমেরিকা জয় করে ফিরে আসবি তোর জন্যে ঠাণ্ডা সরবৎ এনে দেবো,—তখন তুই ভেবে দেখিস। রথীনের সঙ্গে শুধু ভাব করাই চলে, না ভালোবাসাও যায়।”

এতক্ষণ আচ্ছন্নের মত শুনে যাচ্ছিল মিত্রা।—হঠাৎ চমকে বলল—"কি বলছিস রথীন?”

রথীন ওর চোখে চোখ রেখে বলল—"সত্যি বলছি মিত্রা—তুই যাই বলিস, সব ভালোবাসাই ক্ষণিক। চেষ্টা করলে সঞ্জয়কে ভুলে আমাকে ভালোবাসতেও তোর দেরী হবে না।”

শুনে মিত্রার মুখে হাসি ফুটতেও দেরী হোল না।—বলল—"তখন তোকে আর তুই তোকারি করা চলবে না।—কি বলিস?”

রথীন গম্ভীরভাবে বলল,—"না, তখন তুমিতে প্রমোশন হবে।”

যীশু

স্নেহেন্দু মাইতি

আচমকা আঘাতটা পেলেন। ঘাড়ের কাছটায়। এমনি জোরে যে, জয়ন্তবাবু সামলে উঠতে পারলেন না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। এবং চকিতে বুঝতে পারলেন, একটা ধারালো অস্ত্র তাঁর পিঠে আমূল বিঁধে গেল।

জয়ন্তবাবু বাধা দিলেন। একটু সামলে নিয়েই। জোর করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইলেন। বলে উঠলেন, 'কেন, কেন তোমরা আমায় মারছ?'

'কেন'? তিনজন যুবকের মধ্যে একজন গর্জে উঠল। 'আপনার মত বুড় শেয়ালকে শেষ করলে দেশের অনেক উপকার হবে।'. ওদের প্রত্যেকের মুখে রুমাল ঢাকা। তবু নির্বোধের মত বলে উঠলেন জয়ন্তবাবু, 'তুমি স্বরূপ।' কোকিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু।—'আমি, আমি কি অন্যায় করেছি।

স্বরূপ নামে যুবক ক্ষেপে গেল। সংগীদের বললে, 'বুড়ো হারামজাদা গলার আওয়াজে চিনতে পেরেছে। দে আর একটা করে পুরিয়া। নয়ত ঝামেলা পাকাবে।'

সভয়ে মাত্র মুহূর্তখানেক দেখলেন জয়ন্তবাবু, তিন তিনটে ধারালো অস্ত্র। চীৎকার করে উঠলেন তিনি। আর সেই মুহূর্তে অস্ত্র তিনটি পিঠে ঢুকে গেল। বাধা দিতে চেষ্টা করেও পারলেন না। আর স্বরূপের দল সেই মুহূর্তে ছুটে কোথায় পালিয়ে গেল।

জয়ন্তবাবু নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটপট্ করলেন। কোকিয়ে বলে উঠলেন, 'স্বরূপ তুমি।' এবং তখনই অকল্পনীয় গতিতে কয়েকটি চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বাংলার প্রাচীণ অধ্যাপক জয়ন্তবাবু বি-এ ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়াতে এসেছেন। প্রথম দিনের ক্লাস। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, সাহিত্য কি? ঐ স্বরূপ আশ্চর্য ভাষায় সেদিন যা বলেছিল, বিভিন্ন সাহিত্যিকের উদ্ধৃতি দিয়ে তা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন জয়ন্তবাবু। অনেক

ন্যবাদ দিয়েছিলেন। আরো ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, পরীক্ষার খাতা দেখে। বলেছিলেন, 'তোমার হবে স্বরূপ। তুমি লেখ।'

তারপরে সেকেণ্ড ইয়ার। সেই স্বরূপ কেমন হয়ে গেল। মাথায় ঢুকল জঘন্য রাজনীতি। ছেলেটার প্রতি বড় মায়া এসে গিয়েছিল জয়ন্তবাবুর। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, স্বরূপ ক্রমেই রাজনীতির দলের হাতিয়ার হয়ে পড়ছে। তিনি গোপনে খোঁজ নিয়ে জানলেন, ওর ঘরে রাজনৈতিক লীডার আসে, উপদেশ দেয়। তখন থেকেই স্বরূপ রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠল। পড়াশোনা মাথায় উঠল। ও ছিল রীতিমত বুদ্ধিমান। সকলকে পরিচালনা করত। জড়িয়ে পড়ল রাজনৈতিক হানাহানিতে। জয়ন্তবাবু বেশ চিন্তিত হয়েছিলেন। কলেজে বেশ কয়েকদিন ধরে নানান দলের মধ্যে বিবাদ চলছিল। কলেজে ইলেক্‌শনের সময়ে একটা ছেলে খুন হল। খুনী ধরা পড়ল না। স্বরূপের বিপক্ষ দলের। চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন জয়ন্তবাবু। স্বরূপকে ডেকেছিলেন। বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু স্বরূপ শুনে নি, বেশ মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, 'স্বরূপ ধ্বংস সহজ। সৃষ্টি করা কঠিন। স্বীকার করি ধ্বংস না হলে নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই—'

অশান্ত হয়ে উঠেছিল স্বরূপ। তাঁর বিশ্বস্ত ছাত্র। বলেছিল, 'আপনারা নতুন কিছুকে বাধা দেন। স্বীকার করে নিতে পারেন না। আপনারা সেই, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' নিয়েই থাকলেন।'

অপমানিত বোধ করেছিলেন জয়ন্তবাবু। তবুও তিনি হেসে বুঝিয়েছিলেন, স্বরূপ, 'তোমরা ছেলে মানুষ। নিজেদের পথ ছেড়ে তোমরা ভুল পথে চলছ।'

স্বরূপ চুপচাপ উঠে গিয়েছিল।

জয়ন্তবাবু তবুও ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। ছাত্ররা চিরকাল এমনই হয়ে থাকে। ওরা রাগতে জানে। সহজে শান্ত হয় না। যদি এদের ঠিক পথে চালান যেত।

এরপরে স্বরূপের আর ক্লাসে দেখা পাওয়া যেত না। খবর পেতেন জয়ন্তবাবু, ওরা পার্টি অফিসে যায়। পার্টি অফিসে যাক্ ক্ষতি নেই। কিন্তু ওদের যে ভুল পথে চালাচ্ছে, অথচ ওরা বুঝছে না। একটা প্রবন্ধ লিখলেন জয়ন্তবাবু। 'রাজনৈতিক দল ও ছাত্র।' নামী পত্রিকা 'সদর্শনে'। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, ছাত্ররা কেমন করে অধঃপথে যাচ্ছে। এরা আজ মোহাচ্ছন্ন। শিক্ষা জাহান্নামে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের প্রভাবে এরা পড়েছে। ছাত্ররা ভাঙে, সৃষ্টি করে। ভুল পথে এরা পা দিলে মুস্কিল। হঠকারিতা কোনক্রমেই করা উচিত নয়—ইত্যাদি।

প্রবন্ধটি আলোড়ন তুলেছিল। প্রবন্ধটি এমনি প্রভাব বিস্তার করেছিল ছাত্রদের মনে যে, কয়েকজন ছাত্র স্বরূপদের দল থেকে বেরিয়ে এল। রাজনৈতিক নেতারা প্রমাদ গুনলেন, আর এখান থেকেই আরম্ভ হল জয়ন্তবাবুর সংগে স্বরূপদের দলের লড়াই।

স্বরূপ ক্রমেই দুর্বার হয়ে উঠছিল। ক্লাস তো করছিলই না। উপরন্তু ফাষ্ট ইয়ারের পরীক্ষার সময়ে প্রচার করতে লাগল, 'যে শিক্ষা করে আমরা চাকরি পাব না, সেখানে শিক্ষার মূল্য কি?'—ইত্যাদি।

একদিন জয়ন্তবাবু বলেছিলেন, 'স্বরূপ!—'

ঔদ্ধত্যপূর্ণ চোখে তাকিয়েছিল স্বরূপ।

'শিক্ষা যাই হোক না কেন! শুধু শুধু ডিগ্রী নেওয়ার চেয়ে যদি কিছু শেখে নাও, সে কি তোমাদের ভাল নয়!'

'উপদেশ অন্যকে দেন স্যর—' বলেই স্বরূপ চলে গিয়েছিল।

তবুও জয়ন্তবাবু এতটুকু রাগেন নি। আবার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ছাত্র সমাজের মঙ্গলের জন্যেই। এবারে ফল হল আরো ভীষণ। একরকম সরাসরিই স্বরূপের দল তাঁকে আক্রমণ করল। লেকচার দিতে থাকল। সব শোনেন জয়ন্তবাবু। তবু ও কিছু বলেন না। মনে মনে আক্ষেপ করেন, 'হায় এরা কি বুঝবে না! এরা চত ভুল করছে। এদের কেমন করে কে বোঝাবে!'

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে লাগল বই খুলে। প্রফেসারকে দেখেও গ্রাহ্যে আনল না। জয়ন্তবাবু সহ্য করতে পারলেন না। জনা দু'য়েককে এক্সপেলড্ করলেন। ওরা বেরিয়ে যাবার সময়ে শাসিয়ে গেল, 'দেখে নেব।'

প্রিন্সিপ্যাল ছুটে এসে বললেন, 'এ কি করলেন!'

জয়ন্তবাবু বললেন, 'শিক্ষক হিসেবে যা করা দরকার করেছি।'

মাত্র গতকাল বাংলা পরীক্ষা হয়ে গেল। স্বরূপ যে হলে পরীক্ষা দিচ্ছিল, তিনিই ছিলেন সে হলের ইনভিজিলেটর। অবাক হয়ে দেখলেন, স্বরূপ বেঞ্চের উপরে ছুরি গেঁথে পরীক্ষা দিচ্ছে। বাধা দিলেন জয়ন্তবাবু। স্বরূপের কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়ে বললেন, 'ছিঃ স্বরূপ, তোমার উপরে আমার আস্থা ছিল।'

স্বরূপ একদৃষ্টে তাকাল, জয়ন্তবাবুর দিকে। অকল্পনীয় দৃষ্টি। এ দৃষ্টি একবার মাত্র ছেলেবেলায় দেখেছিলেন জয়ন্তবাবু। তাঁদের পাড়ার একটা চোরের। তাকে যখন ধরতে এসেছিল, এমনি চোখ! কিন্তু জয়ন্তবাবু সামলে নিলেন। বললেন, 'তোমার উপরে আমার অনেক আস্থা ছিল।'

স্বরূপ বলেছিল, 'আপনি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছেন। আর সহ্য করব না।' বলেই হল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এরপরে জয়ন্তবাবু শুনলেন, তাঁর বিরুদ্ধে নাকি একটা বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছে, হয়ত জীবন নিয়ে টানাটানি। হেসেছেন জয়ন্তবাবু। এমন কি তিনি অন্যায় করেছেন!

কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, জয়ন্তবাবুর নানান ছবি চোখের সামনে ভাসছিল। লাইন ধরে তারা ভেসে গেল। মাত্র মুহূর্তেই জয়ন্তবাবু দেখলেন। তারপরে কোঁকিয়ে উঠলেন। উঠতে গেলেন, পারলেন না। নির্জন বনের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রোজই ফেরেন। কেউ কি এখান দিয়ে আসবে! চীৎকার করতে গেলেন জয়ন্তবাবু। পারলেন না। অস্ফুট কয়েকটা কি মাত্র উচ্চারণ করলেন। চোখ দুটো খুলে ঠিক মত চাইতে পারছিলেন না। চোখের সামনে হলদে বৃত্ত আপনা থেকেই রচিত হচ্ছিল। এবং মুহূর্তে স্বরূপের মুখটা ভেসে উঠল। মনে মনে বললেন, 'এদের বোধশক্তি ফিরে আসুক, তিনি মাথা সোজা করতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। আস্তে আস্তে কাৎ হয়ে গেল।

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

(প্রথম অধ্যায়)

দুটি ছেলের পর অনেকদিন বাদে শান্তার প্রথম মেয়ে হল। কন্যালাভে মন তার প্রসন্ন, অতি শান্তিতে শিশুর পাশে সে ঘুমিয়েছিল। চাদর ও বালিশের গোলাপী আভা সমস্ত ঘরখানা রাঙিয়ে তুলেছে, তবু ঘরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে শান্তার লাবণ্যপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি। সুতীক্ষ্ণ মুখমণ্ডল নব আনন্দে আজ বিহ্বল। তার গায়ের রং তামার মত উজ্জ্বল—দূর থেকে শান্তাকে একটি খোদাই করা মূর্ত্তির মত নিখুঁত দেখাচ্ছিল।

দেবাশিসের আহ্লাদের সীমা নেই, কন্যার সাধ তার এতদিনে পূর্ণ হল। মেয়েকে সে বড়ই আকুলভাবে কামনা করেছিল, তাই অন্তরের আবেগ ও উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে পারছিল না। শান্তার হাত দুটি সে ধরতেই তার ওষ্ঠাধার কেঁপে উঠল। একজোড়া হীরের কানফুল বালিশের তলা থেকে বের করল, কৌটাটা খুলে দিতেই শান্তা স্বামীর দিকে হাত বাড়াল। পরস্পরের মনের কথা বুঝতে তার আর বাকি রইল না। দেবাশিস নির্বাক হয়ে মা ও মেয়ের দিকে চেয়ে রইল। শান্তা ধীরে ধীরে চুলগুলি সরিয়ে কানফুল পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যা কিছু চেয়েছিল, দুজনে সবই আজ পেয়েছে এমন একটি ভাব নিয়ে দেবাশিসের মুখের দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হাসল। কথা কারুরই বেরুলো না, চোখে চোখে আনন্দের পূর্ণ প্রকাশ হল।

ময়মনসিংহ-এর রায়েদের কথা সকলেই শুনেছে। শান্তা যে উদার প্রকৃতির গৃহিণী—ও দেবাশিস পুরো মাত্রায় কর্ত্তব্যপরায়ণ এ বিষয় দূর বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে দ্বিমত ছিল না। জমিদারী গেছে বহুদিন কিন্তু নগদ টাকার অভাব ছিল না বলে সকলেই আরামে থাকত। কলকাতায় জমি, বাড়ী, কারখানা, ছাপাখানা ছিল, বৃহৎ পরিবারের খরচ কুলিয়ে যেতো। ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাগ্যলক্ষ্মীর আশ্রয় পেয়েছিল সন্দেহ নেই, তবু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা সুদূর অতীতের স্মৃতি ভুলতে পারতেন না। দেবাশিসের নিজের সন্তান তিনটি, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের ছেলেমেয়েরা নানাভাবে সাহায্য পেয়েছে—প্রয়োজনমত এসেছে, থেকেছে। আত্মীয় কুটুম ও দেশের বন্ধু পরিজনের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ কোনদিন ছিন্ন হয়নি। এভাবে অনেকদিন কাটিয়েছে শান্তা ও দেবাশিস, তারা যে ক্লান্ত হত না তা নয়, কিন্তু জোর করে পুরাতন আবেষ্টনকে বদলিয়ে নেবার ইচ্ছা খুব প্রবল ছিল না। কন্যার আবির্ভাবে সংসারের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে উঠল, সকলের জীবনেই যেন প্রেরণা এল। একটি নবাগতা শিশু শত আত্মীয়ের আনন্দের কারণ হল।

শিশু কন্যাকে নানা নামে ডাকা হোত কিন্তু ঘটা করে নাম দেওয়া হল "জয়তী।" আত্মীয়-বন্ধু, কর্মচারী, ঝি চাকর সকলেই তাকে ঘিরে রাখতে চায়। ঠাকুমা ও ঠাকুরদাদার তো নয়নের মণি, নাতনীর হাসিমুখ তাদের বার্ধক্যের সকল গ্লানি ঘুচিয়ে দিয়েছিল। জয়তীর সরল স্নিগ্ধ চোখ দুটি কেমন যেন মন ভোলাতো। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রং, মাথাভরা কোঁকড়ানো চুল। স্নিগ্ধ নিটোল মুখখানা বারবার চেয়ে দেখত সকলে। স্বর্গ-সুধা যেন ঝরে পড়ছে। চারিপাশের সুরক্ষিত বাগানটিতে কত রঙের ফুল ফুটে আছে। জয়তীর মন সকল সময় এই অপূর্ব বাগানের মধ্যেই ঘুর ঘুর করতে থাকে। গাছপালা ফলফুল, পাখী, রোদের খেলা মেঘের ডাক, কোন দিকেই সে উদাসীন নয়। ঘরের ভিতর গেলেই তার ছবি আঁকার নেশা চাপে। মেঝেতে,

দেয়ালে, দরজার গায়ে, সিঁড়িতে, উঠোনে কোথাও আর বাদ যেতো না। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত কত ছবি যে আঁকতো সে, শান্তা প্রায় সবই মন দিয়ে দেখতো। নানাভঙ্গীর মুখ, বিভিন্ন পাখী, বিচিত্র প্রজাপতি, আবার নিত্য নূতন নক্‌সা করা ছোট ছোট আলপনা। শৈশবের পুতুল খেলা ছেড়ে খেলনা ফেলে রেখে দিনান্তে পশ্চিম আকাশের দিকে সে কেবলই ছুটতো—"রং দেখো মা, সূর্য নেমে গেল আকাশে। কত রং দিয়ে গেল। ঐ রং আমার চাই।" ছবি আঁকার ঝোঁক নিয়েই জয়তী এদিক ওদিক ঘুরত। চতুর্দিকেই বিচিত্র দৃশ্যের আলো ও ছায়া তার সঙ্গে সঙ্গে—তাই দেখে দেখে বছর ঘুরে যায়। নেশা তার বেড়ে চলল।

কৈশোরের দিনগুলি রঙে রসে কল্পনায় কেটে গেল। পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণ মাধুরীতে সে চারিদিক আলো করে তুলল। কোনদিকে তার অভাব ছিল না কিন্তু একটি বাধা তার মনকে অধীর করেছিল—সেটি স্বাধীনতার অভাব। নিজের ক্ষুদ্র জগতটিকে গড়ে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল তার, কিন্তু চারিদিকের সুখের আবেষ্টন সবই যেন কেড়ে নিতো। জয়তী সতেরোতে পৌছোল

বড়দাদা হেমেন ও ছোটদা সোমেন বুদ্ধি ও বিবেচনায় কেহই কম নয়। দেবাশিস তাদের শিক্ষা দিয়েছিল নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। সোমেনের ছিল ব্যবসায় মন। সে অল্পদিনের মধ্যে বিদেশ থেকে ফিরে এসে একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিল। স্বাধীন ব্যবসায় তার উৎসাহের অভাব ছিল না—হেমেন বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে এলো এবং পঁচিশ বছর বয়সে মন দিয়ে প্র্যাকটিস্ শুরু করলো। বড় ছেলে হেমেনের বউ আনবার জন্য শান্তা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠল

সম্বন্ধের অভাব নেই। হেমেন উপযুক্ত পাত্র, কাজেও তার খুব মন। চৌধুরীদের বাড়ীর মেয়ে শীলা সুন্দরী ও শান্ত। দুই পরিবারের মধ্যে মনের বিশেষ যোগ ছিল না বটে তবে শীলাকে শান্তার পছন্দ। হেমেনও তাকে দু-একবার দেখেছে। অল্পদিনের মধ্যে আশীর্বাদ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে শুভ বিবাহের তারিখ পড়ল—সকলেই উল্লসিত। চৌধুরীদের একরত্তি মেয়ে একমাত্র সন্তান, সম্পত্তিও তাদের বেশ কিছু ছিল। এই বিয়েতে দেবাশিস ও শান্তার একমত।

রায় পরিবারে মেয়ে দিতে চৌধুরীরা বিশেষ উৎসুক ছিল, বিরাট আয়োজন ও আড়ম্বরের মধ্যে শীলার বিয়ে হ'ল। বউ ভাতের আনন্দোৎসবে দেবাশিস শান্তা কোনদিকেই ত্রুটি রাখলো না। কত দিনের পুরানো কথা তবু দাদার বিয়ের দিনটি জয়তীর বার বার মনে পড়ে, সেদিন তার কেমন জানি নিজেকে হঠাৎই বড় বলে মনে হয়েছিল। বেগুনি বেনারসি সাড়ী পরেছিল, সারা গায়ে তার পদ্মের কুঁড়ির মত সোনালি বুটি তোলা। বউদিকে নববধূরূপে সেদিন কি মিষ্টিই লেগেছিল তার; সকলে বউ-এর হাতে মিষ্টি খেতে চেয়েছিল। কত বছর কেটে গেছে, শীলা আজ সংসারে কর্ত্রীর স্থান নিয়েছে কিন্তু তার কম্পিত কণ্ঠস্বর সলজ্জ মুখশ্রী জয়তীর কেবলই মনে পড়ে। কিন্তু শীলা এই পরিবারের অনেক দায়িত্ব নিয়ে ক্রমশঃ অন্যরূপ ধারণ করেছে। বধূমাতা থেকে আজ সুগৃহিনীর পদে সে প্রতিষ্ঠিত।

অজস্র স্মৃতির ঢেউ জয়তীর মনকে উতলা করেছে। আসমানী পর্দাটি ঝড়ো হাওয়ার মেজাজের সঙ্গে উঠছে আর পড়ছে, জানালাটিকে একবার ঢাকছে আবার নগ্ন করে দিচ্ছে। পশ্চিমের আকাশে যেন আবির ছড়ানো, ক্লান্ত রবি মুহূর্তের মধ্যে অতল অন্ধকারে বিলীন হ'ল। গোধূলির আলো সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

জয়তী হাল্‌কা জাম রঙের একটি সুতির সাড়ী খাটের কোণে খুলে রেখেছিল। সঙ্গে সাদা ব্লাউজ পরবে বলে সেটি সাড়ীর পাশেই পড়ে আছে। শান্তা যেন আন্দাজ করেছিল জয়তী এরকমই একটা পছন্দ করবে, তাই ঘরে ঢুকতেই কতকগুলি অবান্তর কথা বলে ফেললো। "আজকাল কি রকম পছন্দ হয়েছে জয়া মা? সাজ-

পোষাকের দিকে কি একটুও নজর নেই? এই উদাসীনতাই এখন ফ্যাসান বুঝি?"

"সব সময় অতিরিক্ত সাজতে কি আর ভাল লাগে মা? তোমার পছন্দে আমি সর্বদা মত দিতে পারি না।" জয়তী মুখ নীচু রেখেই কথাগুলি বলে নিলো।

'বাড়ীর মর্যাদা বলেও তো একটা কথা আছে, এতদিন একভাবে যে ক'টা নিয়ম মেনে এসেছি সেগুলো কি ভুলতে পারি? অল্প বয়সে রঙচঙ পরতে তো ভালই লাগতো, গয়নাও পরেছি বেশ। মনে পড়ে সেই......' শান্তার কথা শেষ হতে না হতেই জয়তী বলে উঠলো—'এখন কি এ'ভাবে সাজ পোষাক করে কেউ? সিনেমা স্টার বলবে যে! বউদির মাও তোমাদের দলের লোক। যা দেখছি—যা ভীষণ ধুমধাম করে সাজেন উনি! একটু চোখে লাগে না কি মা?'

'হ্যাঁ জয়তী, আমাদের দলের লোক বলতে পার, সকলের মতে চলিনি আমরা—পরিবারের বৈশিষ্ট্য রাখতে হয়েছে।'

'মা আর কতবার এই কথা বলবে বল তো? পরিবারের রীতিনীতি, সংসারের ধারা—এ সব আর আমার বন্ধুদের কাছে বলবে না তো? যে সম্পত্তি নেই যে জীবনধারা চালাতে পারবে না সে কথা ক্রমাগত ভাবো কেন?' জয়তী সামান্য বিরক্তি প্রকাশ করল কিন্তু শান্তা উত্তর দিতে দ্বিধা করলো না—

'শীলা তো আপত্তি করে না, সে তো বেশ সেজেগুজে থাকে, চুড়িগুলো ওর হাতে ভারী মানায়, জরির পাড়খানা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে বল তো?'

'সে তো তোমার পুত্রবধূ, স্বাধীনতা তার কিই বা আছে? বেচারা বউদি। আমি কিন্তু ও সব কথা শুনতে রাজী নই, আমায় ছেড়ে দাও।'

জয়তী পারিবারিক আবেষ্টনের ওপর ক্রমাগতই বিরূপ হয়ে উঠছিল, অথচ মা বাবা ও দাদা বৌদির অন্ধস্নেহের দাবী সে অগ্রাহ্য করতেও পারছিল না। এই গভীর ভালোবাসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য সে মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠতো।

'তোমরা কেউ আমায় বুঝবে না,' এই বলে চোখের জল সামলিয়ে নিতো। কি যে সে চাইছিল আর কি যে সে চাইছিল না স্পষ্ট করে বোঝাতে সে পারে নি, অথচ কাকেই বা দুঃখ দেবে দোষী করবে? সকলেই যে অতি আপন।

'জয়া মা, কোথায় তুমি?' দেবাশিসের গলা শোনা গেল। সে দরজায় সামান্য একটু কড়া নাড়তে মা ও মেয়ে একত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু তাদের প্রকৃত মনের ভাব কিছুই বোঝা গেল না। 'শান্তা শোন, জয়া মা যেন বুড়ীদের মত পোষাক না পরে। আমার ভাল লাগে না। তোমার জরির পাড়ের শান্তিপুরী কাপড়খানা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে—বেশ বৈশিষ্ট আছে কাপড়খানায়।' মেয়ের কাঁধের ওপর হাতখানা রেখে দেবাশিস মনের কথা বললো—'জয়া মা সেই সবুজ সাড়ীখানা পরে এসো, গত জন্মদিনে তোমায় দিয়েছিলাম, মনে পড়ে? সাড়ীখানা বড় মানায় তোমায়। চল, নির্ম্মলের বাড়ী যাই।' জয়তীর নিজের পছন্দমতো সাড়ী আর পরা হ'ল না।

তার মনে ধাক্কা লাগল কিন্তু সে কিছু বললো না। সামান্য কথা যদিও তবু এই ছোট মতামত সর্বদাই যেন তাকে তিক্ত করে। কিন্তু এই নিয়ে কি মনোমালিন্য হয়? জয়তী তার ঘরে গিয়ে মা বাবার ইচ্ছানুসারেই সাজল। সে উঁচু করে খোঁপা বাঁধে, কানে একজোড়া দুল পরে। গলাটা খালি রাখলে তার আরাম লাগে। হাঁসের মতো সুদীর্ঘ চিকন গ্রীবা, বিনা অলংকারে ভালোই দেখায়। বালাজোড়া নিজেই সখ করে এঁকে দিয়েছিল। গহনায়, কারুকার্যের বাহুল্য সে বেশ পছন্দ করে, সুক্ষ কাজটি স্যাকরা নিপুণভাবে তুলেছিল, জয়তী তাই এই বালাজোড়াই পরে থাকে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে মা বললেন—'জয়তী গলাটা খালি কেন? একটা হার পরে নাও।'

বিরাট মোটর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মা বাবা গাড়ীতে উঠলেন আর গাড়ীও বেশ জোরে চলতে লাগল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই তিনজনে নির্ম্মলের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল।

'কতদিন দেখা নেই নির্মল ?' দেবাশিস নামতে নামতে নির্মলের কাঁধের ওপর হাত দিল।

'বিয়ে বাড়ীর ধুম যেন এখনও চলছে, লোকজন আসা-যাওয়ার অন্ত নেই।' কথা শেষ করে সে চটি জোড়া খুলে আরাম করে বসলো।

ঘরে ঢুকেই শান্তা পা দু'খানি গুটিয়ে নিয়ে বড় তক্তপোষের ওপর তাকিয়া ঘেঁষে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। পানদানী থেকে একটি পান নিয়ে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল—শীলা ও হেমেনকে কদিনের জন্য কলকাতার বাইরে পাঠিয়েছি—ওরা ঘুরে আসুক, বলেই শান্তা আর একটি পান মুখে পুরলো। পারিজাত ও নির্মলের বাড়ীতে তার সঙ্কোচ বোধ হয় না।

'আবার শীঘ্রই তোমার বাড়ীতে বিয়ের ধুম লাগবে, জয়তী তো বড় হয়ে উঠল'—পারিজাত বেশ মৃদু হেসে কথা বলে। চারটি ছেলের মা সে, বিয়েও বহুকাল হয়েছে কিন্তু দিন দিনই রূপ যেন তার বেড়ে চলেছে। আশ্চর্য সুন্দরী সে কিন্তু অহংকার তার কিছুই নেই।

দেবাশিস পারিজাতের দিকে মুচকি হেসে বলল—'তোমার মেয়ে যদি থাকত পারিজাত, সে না জানি কত নামজাদা সুন্দরীই হোত।'

"ভাবছো কেন হে দেবাশিস ? ছেলেদের বউ আসুক সঙ্গে পাল্লা দেবে পারিজাত।' নির্মল চোখ টিপে বন্ধুর দিকে তাকালো।

'নিয়মে কাজ করি, খাটতে তো ভয় পাই না ; পাঁচটি পুরুষ বাড়ীতে, এক দণ্ড বসতে পাই কি ? তবে তাদের জন্যই নিজেকে সুস্থ ও কর্মঠ রাখতে হয়। জয়তীকে বড় ভাল লাগে কিন্তু সে আরামে মানুষ, গরীবের বাড়ীর হাড়ভাঙা খাটুনি তার সইবে না। আদুরে মেয়ে তো ? একটি মাত্র ছেলে যে ঘরে সেখানেই মানায়।'

নির্মল ও পারিজাতের আর মেয়ে হল না। তাদের চারটি ছেলে, সব কটিই সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান। সঙ্গে থাকে মালা—নির্মলের পিস্‌তুতো ভায়ের একমাত্র সন্তান। মা বাবাকে হারিয়ে সাত বছর বয়সে সংসারে একা পড়েছিল সে। তাকে নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখে পারিজাত কাছে নিয়ে আসে। এ বাড়ীতে মেয়ের মতই সে মানুষ হয়েছে, দাদাদের অতি আদরের বোন। কিন্তু মালা বড় নিরীহ। করুণ চোখে তাকায় আর ভয়ে ভয়ে কথা বলে এ ছাড়া কিছুই যেন শেখেনি। তাকে যতই আদর-যত্ন করা হয়, সে একভাবেই ভীরু হরিণীর মত ঘুরে বেড়ায়, ডাকলে সহজে কাছে আসেনা। শ্যামবর্ণ কোমল মুখশ্রী, এক ঢাল চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে, চোখ দু'টি সদাই দ্বিধাপূর্ণ। জয়তীর সঙ্গে অতি সঙ্কোচে সে কিছুক্ষণ গল্প করলো, পাশের ঘরে বসেছিল দুজনে। দাদাদের ঘরে ঢুকতে দেখে মালা জয়তীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। গুরুজনদের মাঝখানে এসে সে একেবারেই চুপ করে যায়।

নির্মল দেবাশিসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে বলল প্রকাশ "আমার বড় ছেলে নরেন বোম্বেতে ভাল পেয়েছে কাজ—টেক্সটাইল মিলে ডিজাইনার হয়েছে—উন্নতি করেছে বেশ। যে মিলে কাজ করছে তারাই পাঠিয়েছিল বিদেশে। আমার আর টাকা কোথায় ছেলেদের দূরে পাঠাবার ? কি বল ?" দেবাশিস আনন্দ করলো। তারও অনেক গল্প বলবার ছিল– বিকেলটা ভালভাবেই কেটে গেল। চা খাওয়া শেষ করে শান্তা ও জয়তীকে তাড়া দিয়ে দেবাশিস গাড়ীতে উঠলো।

গাড়ীতে বসে জয়তী বলল—'নির্মলকাকা একরকমই রয়ে গেলেন—বড় সোজা মানুষ আর কেমন খোলামেলা।'

'খুবই সংগ্রাম করে চারটি ছেলে মানুষ করেছে সে, পারিজাতের মত স্ত্রীও কম হয়। বলল শান্তা। নির্মল ও পারিজাতকে শান্তা শ্রদ্ধা করতো, কথাগুলো সরল ভাবেই বলল সে। কিন্তু দেবাশিস মুচ্‌কে হেসে বলে—'আহা এই কথাটি যদি আমি বলতাম তাহলে তুমি খুশী হ'তে কি ? শান্তা, বল না ?' সে খেপিয়ে তুললো শান্তাকে।

'তুমি যে পারিজাতের উপাসক সে কি আমি জানি না ?' শান্তা হেসে ফেলল।

'কিন্তু তাহ'লে তোমায় বিয়ে করলাম কেন ?'

দেবাশিস আজ শান্তাকে খুব চটিয়ে দেবে মনস্থ করেছিল কিন্তু কিছুতেই পারলো না। 'এখন একটিই ধন আগলে আছ জানি, সে তোমার ঐ মেয়ে—একেবারে বাপের মতই খামখেয়ালি। তাকে ছাড়া যে আর কাউকে ভালোবাস না তা খুব ভাল করেই জানি।' শান্তা কথাগুলো বেশ গর্ব করেই বললো। স্বামীর প্রেমে সে বিভোর ও কন্যার প্রতি স্নেহান্ধ। ধীরে ধীরে মেয়ে ও স্বামীর কাছ ঘেঁসে ঘেঁষে জানালার পর্দাগুলি টেনে দিল, সতর্ক হয়ে ছিটকিনিগুলো এক এক করে বন্ধ করলো, আলমারির তাকগুলো গুছিয়ে নিয়ে চাবি দিল। সন্ধ্যার আকাশ যেন রোমাঞ্চ লাগায় কত যে বাসনা কামনা মানুষ পুষে রাখে, স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে তার আহ্লাদের জীবন, ছেলেরা বড় হয়েছে, যেন একটু দূরে সরে গেছে। কিন্তু শান্তা দুঃখ করতে জানতো না, এতদিন সবই তো ইচ্ছামত হয়ে এসেছে। অনেক রাত হয়ে গেল, শান্তা বিছানায় শুয়ে পড়লো—পাশে তার স্বামী প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। 'কাকে যে মেয়ে বিয়ে করবে তাই ভাবি', শান্তা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। দেবাশিস হঠাৎ চমকে উঠলো—

'নরেন বেশ ছেলে'—বলেই সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে অলৌকিক বন্যা জাগিয়েছে কোথাও আর একটুও অন্ধকার নেই। শান্তা জানালার এক পাট বন্ধ করে দেবাশিসের চুলগুলির মধ্যে নিজের আঙ্গুলগুলি অল্প অল্প করে চালিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে নিজেও ঘুমিয়ে পড়লো।

জয়তীর ঘরখানা হাসনাহানার গন্ধে ভরে উঠেছে—জানালার ধারে ফুলগুলি যেন হাসছে। জয়তীর চোখে ঘুম নেই। সে উঠে ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পাতা পড়ছে, হাওয়া বইছে—সবই তার কানে আসছে। রাতের শেষ ট্রেনটা বিকট একটা আওয়াজ করে বিদ্যুত বেগে ছুটছে, দৈত্যের পায়ের ছাপের মত তারই ছায়া বেশ কয়েকবার দেখা গেল।

'দিদিমণি, ও দিদিমণি!' শ্যামা ঝি ডেকে উঠলো।

'ঘুমিয়ে পড়ো, রাজপুত্রের কথা ভাবতে নেই এমনিই আসবে।'

'শ্যামা, তোর বরের জন্যই তো ভেবে মরছি, তাই তো ঘুম আসছে না আমার। ঐ যে গোয়ালা এসেছিল বিকেলে, সে তো তোকে বেশ পছন্দ করে, তুই কী বলিস?' শ্যামা সুখবরটি শুনেই খুশী। শুধু প্রেমের উল্লেখ করতেই সে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

জয়তীর ঘুম আসে না। মনের নানান্ কথা যেন চাঁদের আলোর মত ছড়িয়ে পড়তে চায় কিন্তু কোথায়? কার কাছে? এত জনতার মধ্যে তার মনের শূন্যতা যেন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, সে এই সুখের নীড়ের মধ্যে কিছুই পায় না। সে জানে সবই আছে, সবই পাবে কিন্তু সে যা চায় তা তো পায় না। মনকে ক্ষুদ্র খাঁচার মধ্যে আর রাখতে পারছে না। এত বিলাসের প্রয়োজন কি তাও সে বোঝে না, সব কিছু পুরাতন বন্ধন ভাঙতে চায় সে। অর্থহীন দম্ভ, ধনসম্পত্তির হিসাব, অতীতের গর্ব, সবই অর্থহীন তার কাছে। নরেনকে তার ভালো লেগেছিল কিন্তু সেও তো সেই এক ধরণের সঙ্কীর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ, তার মা ও বাবার ইচ্ছামত বৌ আনবে, একই ভাবে থাকবে। জয়তীর কিছু ভাল লাগে না। সবই যেন বৈচিত্র্যহীন একটানা সুর—কোথাও একটুও পার্থক্যের আভাস পেলে সকলেই তাতে ভীষণ বাধা দিতে চায়, তুমুল সমালোচনা করতে বসে।

চিন্তার স্রোতের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সংগ্রাম করতে করতে জয়তী ক্লান্ত হয়ে পড়লো, পা দুটো সোজা করে, হাই তুলে চোখ বুজে কতভাবে সে ঘুম আনতে চাইল কিন্তু নিদ্রালোকে পাড়ি দেওয়া কি কঠিন। ঘুমের তপস্যা করতে করতে অবশেষে সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লো। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে নানান আওয়াজ আসতে থাকে। দাস-দাসীর কর্কশ গলার চীৎকার, মা বাবার মান অভিমান, বৌদির কাজের তালিকা—জয়তী স্নান সেরে নিয়ে ঘরের দরজায় খিল দিল। বিরাট একখানা ছবি আঁকতে হবে ভেবে রেখেছিল, শুধু আঁচড় কেটে রেখেছে আগের দিন। শ্যামা টের পেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে। উঁকি দিয়ে দিদিমণিকে দেখে যাবে তার ইচ্ছা কিন্তু জয়তীর চোখ এড়াতে

পারল না। জয়তী বলল, 'বনমালীর খবর চাস?' শ্যামা জিভ কেটে ঘোমটা টেনে পেছন ফিরে রওনা দিল, বনমালী গোয়ালার ছবিখানা সেদিনই জয়তী শুরু করেছে, তাই একটা টাকা দিয়েছিল তাকে। সে হেসে নমস্কার করে টাকা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু কেন যে টাকা পেলো তাও সে জানতে চায় নি।

'শ্যামা শোন্ শোন্' বলে জয়তী তাকে ধরে নিয়ে এলো। 'এই দেখ তোর পরাণ-সখা।' ছবিখানা ভাল করে শ্যামাকে দেখালো।

'বেচারা বুড়ো মানুষ, কেন তুমি তাকে আমায় নিয়ে অমন করে বল দিদিমণি?'

'ও তুই বুঝি বুড়োকে তেমন পছন্দ করিস না?' ছেলে যদি পাস্ তো বলিস আমি খুব ভালো করে তার ছবি এঁকে দেবো। রাগ করিস না শ্যামা, তোকে না ক্ষ্যাপাতে পারলে আমার দিনই কাটে না। যা, তোর কাজ সেরে আয়।'

শ্যামা ও জয়তী যেন বন্ধুর মতো, হাসি ঠাট্টায় দুজনেই মশগুল। দেবাশিস ও শান্তা সংসারের নানান্ কর্তব্যের মধ্যে জড়িয়ে আছে। একটি আধভাঙা বড় বাড়ী মেরামত করাতে হ'ল, সারা বাড়ীখানা রঙ করে দিতে ভাড়াটে বড় খুশী। কোথায় জমি পড়ে রয়েছে বস্তির লোক তার ওপর বাসা বাঁধছে দেবাশিস ভাল খরিদ্দার পেয়ে জমিটা বিক্রি করে দিল। ভাগ্নীর বিয়ের খরচও কিছু দিতে হ'ল। বৃহৎ পরিবারের মাথা হয়ে নানা দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে, শান্তা মধ্যে মধ্যে রাগ করলেও তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করে।

জয়তীর ইচ্ছা কলেজের পড়া শেষ হলে সে চিত্র-কলায় মন দেয়। ছবি আঁকায় দক্ষতা সে অনেকবার দেখিয়েছে, বিদেশ যাবার বৃত্তি পরীক্ষায় সফল হ'ল। প্যারিসে যাবার তার একান্ত ইচ্ছা কিন্তু মা ও বাবার মত হ'ল না।

'ছবি এঁকে আনন্দ পাও বুঝি, সারা জীবন এই নিয়ে পড়ে থাকবে তা আমি চাই না। দেবাশিস একটু দৃঢ়ভাবেই যেন কথাগুলি বলে গেল। ভরসা পেয়ে শান্তা নিজের মতামত প্রকাশ করতে এগিয়ে এলো।

'তোমার বন্ধুদের দেখছো না জয়তী? কোথাও তো শালীনতার পরিচয় দেখি না। এমন কি তাদের পোষাকের মধ্যে, চালচলনের মধ্যে খানিক যেন অশোভনতা এসে পড়েছে, তুমি তো এদের দলে ভিড়ে যেতে পার না?'

'মা কি বলছো তুমি? ওরা যে আমারই বন্ধু। আমায় ভালোবাসে, তাদের নিয়ে তুমি কেন মাথা ঘামাও?'

'মাথা ঘামাতে কে চায়? তাদের তো মন্দ বলি না, কিন্তু তুমি যে ওদের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়বে তা আমি চাই না—সর্বদা তাদেরই সঙ্গে বেড়াবে তাও পছন্দ করি না।'

'তা বললে কি করে হবে? আমরা তো এক বিষয়েই চিন্তা করি, এক স্বপ্নই দেখি, পরস্পরের সমস্যা বুঝি। তোমরা কতটুকু বোঝ আমায়?' জয়তী মার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল।

'তর্ক কোরো না জয়তী' দেবাশিস বাধা দিয়ে উঠল। শান্তার দিকে তাকিয়ে বলল—''জয়তীর স্বধীনতার অভাব কি? তার বন্ধুরা অন্য ধরণের হোক না—ক্ষতি কি? আমরা তাদের অপছন্দ না করতে পারি কিন্তু জয়তীর বোঝা উচিৎ আমাদেরও মতামত আছে।'

শান্তা তার স্বামীর কথাগুলো শুনে গেল, তার অর্থ যেন এলোমেলো, কিন্তু সারমর্ম এই যে সে মেয়েকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে নারাজ।

'কাল নন্দিতার বাড়ী যাবো কথা দিয়েছি' জয়তী এই বলে নীরবে বই দেখতে লাগলো।

'ফিরতে যেন দেরী না হয়' শান্তা গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জয়তী তাকিয়ে দেখল তাকের ওপর বইগুলি সবই উলট পালট। কোনটি দাঁড় করানো, কোনটি শোয়ানো—বুঝতে বাকি রইল না শ্যামা বই গোছাচ্ছিল কিন্তু কাজে তার মন ছিল না মোটেই। জয়তী নিজেই বইগুলি ঝেড়ে মুছে ঠিক করে রাখলো।

ছোট দাদা হঠাৎ ঘরে ঢুকে এসেই তার লম্বা বিনুনিতে এক টান দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

'কোথা থেকে এলে তুমি?' বলে জয়তী তাকে টেনে পাশে নিয়ে বসালো।

'বোন আমার স্বনামধন্য হয়েছে যা বুঝতে পারছি। বোম্বেতে নরেনের কাছে খুব প্রশংসা শুনলাম তোর। ছেলেটা বড় ভাল।' জয়তী বলল 'নরেনকে একদিনই দেখেছি, এক বন্ধুর বাড়ীতে চা খেতে বলেছিল, সেখানেই আলাপ হ'ল ভাল করে। পড়াশোনা করতে ভালবাসে মনে হ'ল। হাক্স্‌লি, সারৎর, রবীন্দ্রনাথ সবই বেশ জানা আছে দেখলাম তাছাড়া কবিতা পড়বার নেশাও আছে। কিন্তু সামান্যই জানি তাকে—কতটুকুই বা দেখেছি?' জয়তী বিশেষ কোন উৎসাহ দেখালো না।

'তোর একটা ছবির জন্য তুই তো বিদেশ থেকে বিশেষ (award) পুরস্কার পেয়েছিস? তোর দাড়িওয়ালা বন্ধুর কাছে শুনলাম ঐ যোসেফ সব কথা বলল। বোম্বে গিয়েছিলাম গত সপ্তাহে কোথায় যেন আলাপ হল।'

'বল বল ছোটদা—সে কী বলল? তাকে তো আমি মোটেই চিনি না, দেখিও নি, তবে আমার বন্ধু মনুয়া তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু বিয়ে করতে পারছে না বাড়ীর লোকের বিশেষ অমত। বিলেতে দুজনে একত্রে পড়েছিল অনেকদিন, সেখানেই ভাব হয়েছে। আমি তাকে দেখিনি কখনও।'

সারা সকাল ভাইবোনে প্রাণখুলে গল্প হ'ল। দুপুরে আহারের জন্য সকলে একত্র হয়েছে, সোমেন ও জয়তী সেই দলে যোগ দিল। হেমেন জয়তীকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এলো—

'কী রে কোথায় ছিলি?

'ছোটদাকে ক্ষ্যাপাচ্ছিলাম।'

'শুনেছি তোর বন্ধুরা নাকি আমাদের বিশেষ পছন্দ করে না?' নিতান্তই বুড়ো ভাবে আমাদের বোধহয়?'

'দাদা, এ সব যে কী বল তোমরা সারাক্ষণ? তোমরাই কি ওদের পছন্দ কর? শিল্পীদের কোন বাড়ীতেই বিশেষ আমল দেয় না, বিশেষ করে আমাদের বাড়ীর লোকের মত যারা।' জয়তী একটু খোঁটা দিয়ে কথা বলতেই শীলা আর চুপ করে থাকতে পারল না—কল্ কল্ করে কথা বলে উঠলো।

'দেখো জয়তী—সোনিয়াকে ঐ' কাকের বাসার মত খোঁপা একেবারেই মানায় না, বড় বেঁকিয়ে কথা বলে সে। বৃন্দা দেখতে বেশ কিন্তু সে এত ছোট জামা পরে, এক গজ কাপড় কিনে দিতে ইচ্ছা হয়। রঞ্জিত যেন ফিরিঙ্গি—ভাল করে বাংলা বলতে চায় না, কেন রে? মা ওর মেম না কি?'

শীলার কথাগুলি জয়তীর বুকে কাঁটার মত বিঁধলো, সে বৌদির বাক্যবাণ আর সহ্য করতে পারল না।

'আমাদের বন্ধুদের তোমার ভালই লেগেছিল মনে হয়, নইলে তাদের বিষয় এত কথা মনে পড়ে?' জয়তী প্রশ্ন করল।

'চা ঢালছিলাম—ভাল করে দেখে নিলাম ওদের, ওরা বুঝতে পারে নি কিছুই।' শীলা উত্তর দিল।

'ওরা যে তোমার বিষয় কি ভাবে সেও তো জানা উচিত। ওদের জিজ্ঞেস করবো।' জয়তী শীলার দিকে তাকিয়ে দেখলো তার চোখ দু'টি কৌতূহলে পরিপূর্ণ, তার হাসিটি সেদিন আর স্বচ্ছ লাগলো না। বৌদিকে ভালো বেসেছে চিরকাল, আজ তাই মনটা বড়ই ভার হয়ে উঠলো। খাওয়া দাওয়ার পর যে যার ঘরে গিয়ে বসলো।

প্রচণ্ড গরম ছিল সারাদিন। মধ্যে মধ্যে শুধু পাখীদের গুমরাণি শোনা গেছে। একটি পাতা কোথাও পড়ল না—একটি শাখাও দুললো না। রোদ পড়তে আরম্ভ করতেই দু-একটি বন্ধু জয়তীর সঙ্গে দেখা করতে এল। দেবাশিস ও শান্তা কী আর করবে, সিনেমায় চলে গেল। হেমেন ও শীলা বাংলা থিয়েটারের দুখানাই টিকিট পেয়েছিল, হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে গেল। সোমেন বাড়ীতেই ছিল, সে জয়তীর কাছে কতগুলি সমস্যার কথা আজই বলবে ভেবে রেখেছে। সুযোগ

পেয়ে বেঁচে গেল। অতি কষ্ট করে দাদাকে রাজী করিয়েছিল থিয়েটায় যাবার জন্য তাই বৌদিকে নিয়ে যেতে হয় নি। নইলে এই কর্তব্য প্রায়ই তার ঘাড়ে এসে পড়ে।

'জয়তী তোকে একটা গোপন কথা বলবো বলে ভাবছিলাম, পেটে রাখতে পারবি তো?'

'ছোটদা, তুমি বলবার আগেই বলে দিচ্ছি—মালাকে ভালোবাসো এ' তো?' সোমেন খুব হেসে উঠলো, জয়তীর কাছে গিয়ে বসল। 'সকলের কাছে বলে বেড়াবি না তো?' সোমেন মালাকে সত্যিই ভালবাসতো কিন্তু মা বাবার কাছে সে কথাটা পাড়তে পারছিল না—দু'একবার আঁচ পেয়েছে তাঁদের এ বিয়েতে উৎসাহ নেই।

এই বাপ মা হারা মেয়ের জন্য সোমেনের প্রাণ কাঁদে কিন্তু রায় পরিবারের কেউ তো সে কথায় কান দেয় না। আজ তাই জয়তীর কাছে যেন সমর্থন চাইতে এসেছে—ছোট বোন, তাই বড়ই প্রিয়, একান্তই আপন।

'ছোটদা, তোমার ভয় কিসের? মালাকে যদি সত্যিই বিয়ে করতে চাও, এতদিন থেকে ভালোবেসেছ, কথাটা নির্মলবাবুকে বলতে পারছ না? আমাদের বাড়ীর সকলের যদি অপছন্দ হয়—আর তুমি তাই মন ঠিক করতে না পার তাহলে তোমার বিয়ে করাই উচিৎ নয়। তোমার নিজের মতের কোন মূল্য নেই কি? সাহস নেই তোমার?'

'তুই সত্যি বলছিস, জয়তী? আমি বলবো তাহলে নির্মলবাবুকে?

'কিসে এতো তোমার ভয় ছোটদা? সব নিয়ে তুমি দ্বিধা কর, একে তাকে সকলকেই ভয়।'

'শান্তি ভালোবাসি তাই কিছু বলি না—তোর মত যদি সোজা কথা বলতে পারতাম ভালোই হোত। ছোট বোন তুই তবু তোরই সাহস আছে।' সোমেন বেরিয়ে পড়ল নির্মলবাবুর কাছে যাবে মনস্থ করেছে। জয়তী তৈরী হতে চলে গেল—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিপুণ ভাবে সাজলো। চিরুণীটা ভালো করে মুছে রূপোর থালাটির ওপর রেখে ফ্যানেল সেন্ট একটু কানের পাশে একটু হারের ওপর ছোঁয়াল। বাতিটি নিবিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুবে বাইরে সামান্য একটু আওয়াজ হ'ল। একখানা গাড়ী প্রায় নিঃশব্দে বৈঠকখানা ঘরের দরজার কাছে এসে সবে থেমেছে। অলোক গাড়ীর দরজার কাঁচখানা তুলে দিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে এসে বৈঠকখানা ঘরের আধখোলা দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকছে; জয়তী সামনে বেরিয়ে এলো।

'একটু বেরুচ্ছিলাম, তুমি আসবে কিনা ঠিক বুঝতে পারিনি তাই তৈরি হয়ে নিলাম—বন্ধুদের বলেছিলাম তাদের সঙ্গে যাব। তুমি বসো দু মিনিট কিছু মনে করো না বেরুচ্ছি বলে।' জয়তী সোজা কথায় জানালো সে বন্ধুদের কাছে যাচ্ছে।—অলোক সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠল—

'কতবার যে বলেছ ঐ বন্ধুগুলোকে ত্যাগ করবে, কই জয়তী তাদের মায়া তো ছাড়তে পারছো না? আমার কথা তো মানলে না। কতদিন বিদেশ ঘুরে এলাম, চাকরীর কত উন্নতিও হল, তোমার তো কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না। কখনও তো কোন আগ্রহ দেখি না। আমায় ঘিরে আছে পাগলের মত কতগুলো বিলাসী আমুদে লোক যাদের ছাড়তেও পারি না, সহ্য করতেও পারি না। রোজই চায় তারা আমায় সঙ্গে নিয়ে এখানে ওখানে যাবে। পালিয়ে আসি তাই মধ্যে মধ্যে। ভেবেছিলাম তুমি হয়তো কোনদিন রাজী হবে, সেই আশা এতদিন পুষে রেখেছি। কিন্তু তুমি তো সত্যি কিছু বললে না? কোনদিন কি পাবো তোমায় তাই ভাবি।'

'কিন্তু অলোক, রাগ করো কেন এতো? ওরাই যে আমার সঙ্গী আমরা এক সঙ্গে কাজ করি, পরস্পরকে ভালো করে চিনি, ভাল মন্দ সবই জানি। ওরা যে আমারই মত। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কী কথা বলব ভেবেই পাই না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মন জুড়িয়ে কথা বেশীক্ষণ বলতে পারিনা, তাই পালাই তাদের কাছ থেকে।'

'শুধু আমার বন্ধুদের কাছ থেকে? আমার কাছ থেকেও পালাতে চাও দেখতে পাচ্ছি। আমি কি বলেছি তোমায় সবেতেই বাধা দেব? তোমার যা ভাল লাগে নিশ্চয় করবে কিন্তু আমায় তোমার ভার নিতে দাও। কবে বিয়ে করতে পারবো বলো।'

অলোক যেন মহাযুদ্ধে হেরে চলেছে তবু ধৈর্য ধরে সবই সহ্য করছে। কতদিন থেকে সে বসে আছে। আজ যেন মনে হ'ল জয়তী শুধু বাজে কথাই বলেছে।

'অলোক শোন, একটা কথা বলি আজ। আমি তোমার উপযুক্ত হতে পারবো বলে মনে হয় না। কোন নিয়ম ধরা জীবনে চলা, কোন গতানুগতিক জীবনধারা রক্ষা করা আমার স্বভাবের বিরুদ্ধে। তুমিও কষ্ট পাবে, তোমার জীবন ব্যর্থ হবে। আমি তো জান খেয়ালে চলি, তুমি কি আমায় শ্রদ্ধা করতে পারবে? আমার দুর্বলতা আমি জানি বলেই তোমায় খুলে বলছি।'

'তোমায় কি বলেছি আমি যে তোমায় সম্পূর্ণ বদলাতে হবে জয়তী? তোমায় ভালোবেসেছি বলেই তো তোমার পাগলামিকে ছাড়তে বলি, তোমায় সুখী করতে চাই। তোমার আর আমার চিন্তাধারার মধ্যে কি কোথাও সামঞ্জস্য নেই, কোথাও যোগাযোগ নেই? হয়ত তুমিই আমায় শ্রদ্ধা করতে পারছ না।'

অলোকের গলার স্বর অতি শুষ্ক, তার দুঃখ সে আর যেন বহন করতে পারছে না। অতি সন্তর্পণে তাই কতগুলো কথা বলে গেল, জয়তীকে জোর করতে পারে না সে কোন বিষয়ে। কিন্তু জয়তীই অলোকের কথায় আজ একটু বিচলিত হ'ল। তার মনের মধ্যে যদিও দ্বন্দ্ব চলেছে, সে চায় না আর নিজের মনকে দুর্বল করতে। 'না না হবে না' এই যেন সে বলতে চায় কিন্তু অলোকের মুখের সামনে নির্মম কথাগুলো কিছুতেই বলতে পারল না।

'অলোক শোন, শোন, আমায় আর বোল না, বিয়ের কথা তুলো না আর। আমার অনেক আকাঙ্খা অপূর্ণ রয়ে গেছে, সে সব পূর্ণ হতে অনেক সময় লাগবে, তুমি পারবে না অতদিন বসে থাকতে।'

'কি করে জানলে?' অলোকের কণ্ঠে পরাজয়ের সুর।

'তুমি বিয়ে না করলে আমি চিরকাল অপরাধী বোধ করবো, আমায় সত্যিই যদি এত ভালোবাস তাহলে মুক্ত করে দাও।' জয়তী এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেললো।

'হেঁয়ালি করছো জয়তী? কাউকে কোনদিনই ভালোবাসনি তাই ভালমন্দ কিছুই অনুভব কর না তুমি। দুঃখও না, আনন্দও না। মন কারুর জন্য কাঁদে নি তোমার তাই বুঝবে না কিছু। আমায়ও বুঝলে না।'

অনেক সুদীর্ঘদিন তার মনকে বশে রেখেছিল আজও তাই নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারল। জয়তীর দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বলল—'জয়তী চলো, যেখানে যেতে চাইছিলে সেখানে পৌঁছে দিয়ে যাই, তোমার স্বাধীনতায় হাত দেব না।' দরজা খুলে জয়তীকে গাড়ীতে উঠিয়ে গাড়ী চালাতে শুরু করল। সারা পথ সে একটিও কথা বলতে পারল না। আজ অলোকের মনের মধ্যে যে কি গভীর ক্ষোভ ঝড়ের মেঘের মতো জমাট হয়ে আছে, জয়তী তা বুঝতে পারলো না। জয়তী ছটফট্ করছে কিন্তু কথাও পাড়তে পারছে না, কারণ নিজের মনকে সে টলতে দিতে চায় না। অলোককে সে বিয়ে করবে না মনে মনে তাই স্থির করলো। নিকট ভবিষ্যতে তার ছবি আঁকার উন্নতির আশা আছে কিনা শুধু এই চিন্তা নিয়ে বাকি পথ নিরব হয়ে রইল।

জয়তীকে নামিয়ে দিয়ে অলোক বাড়ী ফিরল। সিঁড়ি উঠেই দরজাটা প্রচণ্ড জোরে বন্ধ করে দিয়ে ইজি চেয়ারটি দখল করে বসল। প্রশস্ত জানালার ধারেই এই চেয়ারটি থাকে, এখান থেকে আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। কালো মেঘের ঘনঘটা, চারিদিক অন্ধকার করে তুলেছিল, অলোকের মনেও আজ এই কালো মেঘের ছায়া। মনের মধ্যে চিন্তার স্রোত অধীর করে দিলে তাকে, সে ভাবতে লাগল—

'নারী, স্বামী, সংসার, সন্তান, সবই কামনা করে,

এইটাই তো স্বাভাবিক। বিয়ের কথা শুনলেই জয়তী ভীত হয়ে ওঠে। সারা জীবন সে করবে কি? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ তো হবেই, বাসনা কামনারও পার্থক্য থাকতে পারে, পরস্পরের চিন্তাধারা খানিক মেনে নিতেই হয়, নইলে সংসার চলে না। তাহলেই স্বাধীনতা গেল। প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মায়া, মমতা কত কথাই বলে মানুষ—যদিও সব কিছুই সত্য তবু দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটি তার পৃথক ভাবে রক্ষা করা কি সম্ভব? পরের ইচ্ছায় মত দেওয়াও প্রেমেরই পরিচয় কিন্তু ক্রমাগত নিজের মতামত জলাঞ্জলি দিতে দিতে সেও শুষ্ক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়—অর্থাৎ বিবেক বলে 'অন্যকে সুখী করতে হবে।' প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় কর্তব্যই সবচেয়ে বড় স্থান নেয়, প্রেমও তার অধীন—স্বাধীনতার স্থান তারও নিম্নে। জয়তী তাই ভয় পায়। চিত্রকলা হল তার সবচেয়ে বড় সম্বল। কল্পনা স্বপ্ন, সাধনা দিয়ে সে শিল্পের পূজো করে। কখনো উচ্ছ্বাস কখনো উদাসীনতা, ইচ্ছানুসারে চলবে—আমি সে সব খামখেয়ালি ব্যবহার হয়ত মেনে নিতে পারবো না। আমার প্রয়োজন অনুসারে তাকে চাইব, তাকে না পেলে অভিযোগ করবো। তাই সে ভয় পায়। খেয়াল তার কাছে বিশেষ বস্তু—আমি হয়তো তা বুঝবো না। কত কিছু তার কাছে দাবী করবো। তাই সে আমায় দুঃখ দিতে চায় নি। কিন্তু তাকে কেই বা সুখী করতে পারবে?'

অলোকের মন ক্রমশ অস্থির হতে লাগল: 'যা চাইছে তাই কি জয়তী পাবে? হয়তো নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে ফেলবে। থাক্ থাক্ আমি তাকে মুক্তি দিয়ে সুখী করবো। কিন্তু তাকে আমিই যে সবচেয়ে বেশী ভালোবেসেছি।'

এতক্ষণ অলোক নিজেকেই বোঝাচ্ছে। পৃথিবীর একদিকে সুখ, ঐশ্বর্য ধনসম্পত্তির প্রতিপত্তি, আর এক দিকে অতৃপ্ত শিল্পী তার আধখানা অপূর্ণ আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জয়তী বিশ্ববীণার তারের মত সহজেই বেজে ওঠে, সামান্য একটু ছোঁয়ায় যেন কেঁদে উঠছে—সেই ঝংকারের সুর করুণ, অসহায়, অলোক স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। 'জয়তী কি জানে না পূর্ণতা খুঁজতে গেলে ভালমন্দ সবই গ্রহণ করতে হয়? রূপ, রস, প্রেম, শক্তি ভক্তি, প্রত্যেকটি আলাদা করে কিছুই নয়, সব কিছু নিয়েই অখণ্ড পূর্ণতার সৃষ্টি। কোন্ কাজে সে এই পূর্ণতার প্রকাশ দেখতে পাবে যদি জীবনে এই মিল সে খুঁজে না পায়? সংসার থেকে পালাবে কোথায়? যেখানে যাবে সেখানেই তো পূর্ণতারই সন্ধান করবে—যার জন্য মানুষ এত আকুল হয়।'

অলোক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো স্বপ্ন দেখছিল কি?' বলে উঠলো সিগারেটের ছাই ঝেড়ে সোজা হয়ে উঠে বিড় বিড় করতে লাগল। 'কেন যে জয়তীর জন্য ভেবে মরছি? সে তো আমায় চায় না,—

এত ভাবি কেন? এও তো মিথ্যা মায়া—ভুলতেই হবে একে।' তাড়াতাড়ি সুট্ পরে বেরিয়ে পড়লো।

দেবাশিস এদিকে চুরুটে দু'চারটি টান দিতে দিতে নানান্ কথা ভাবছে। টেবিল ছেড়ে লম্বা চেয়ারখানায় বসে বিশ্রাম করছিল। বইগুলি টেবিলের ওপর এলো মেলো হয়ে আছে, উল্টোসোজা নামগুলো সবই দেখা যাচ্ছে। গীতা, উপনিষদ, আধুনিক উপন্যাস; আবার রাজনৈতিক কাহিনী। শান্তা ঘরে ঢুকেই টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। বইগুলো একদিকে পাহাড়ের মত উঁচু করে রেখে একটি একটি করে আবার সাজাতে শুরু করল। তাকে দেখে দেবাশিস সোজা হয়ে বসেছে, বই বন্ধ করে রেখে দিয়ে বলল—

'দেখো শান্তা, দুই পুরুষের মধ্যে কিছুই সামঞ্জস্য দেখি না। মা বাবার সঙ্গে সন্তানের মনের মিল কোথায়? যতটা ছাড়তে পারি ততই তারা খুশী, ধরে রাখতে গেলেই একেবারে সর্বনাশের দিকে যায়, জিদ্‌ও কম নয়।' শান্তার বলবার ইচ্ছা ছিল এই যে—

'আমার সংসারে আর মন লাগছে না. জয়তী কোন পরামর্শই শুনতে চায় না। হেমেন আর শীলা তাদের মত ভালই আছে। এখানে আমাদের আর থাকার প্রয়োজন কি বল? সোমেন তো মালাকে বিয়ে করবে মনস্থির করে ফেলেছে, আমাদের সারা বছর

এখানে থাকার কোন অর্থই হয় না। ইচ্ছা করে একটু ঘুরে বেড়াই, কয়েকটি তীর্থস্থান দেখে আসি, মনটা হয়তো একটু শান্ত হবে।' দেবাশিসকে একা পেয়ে অনেকগুলি অভিযোগ একত্রে বেরিয়ে পড়ল।

'জয়তীর ভবিষ্যৎ তার নিজের হাতেই, দেবাশিস বলল। 'তার বিয়ের কথা ভেবে কিছু লাভ নেই। অলোক তাকে সত্যিই চেয়েছিল কিন্তু জয়তীর পছন্দ অপছন্দ তো আমাদের হাতে নয়। চিত্রকার সে হবেই এবং সেই অনুসারে তার ভবিষ্যৎ জীবন গড়বে, এ আবেষ্টনে জড়িয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয় বুঝি।'

শান্তাকে দেবাশিস নরম সুরেই কথাগুলো বলল, শান্তার মনের উদ্বিগ্নভাব তার মনে বড় আঘাত দেয়। শান্তা মাথা তুলে বলল—'বাদল যে বড় আদরের নাতি তাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়, মুখখানা ঠিক হেমেনের মত।'

শান্তা সুবৃহৎ রায় পরিবারেও নানা দায়িত্ব বহুদিন বহন করেছে—আত্মীয় স্বজনের জন্যও অনেক করেছে, এ বাড়ীর সব দাবী সে ছাড়তে রাজী নয়। দেবাশিস যে সংসার সম্বন্ধে খানিকটা উদাসীন হতে শুরু করেছে শান্তা তা অনেকদিনই লক্ষ্য করেছে কিন্তু সে নিজে তার অধিকার সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নয়। ছেলেমেয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তাও সে চায় না। ঘরোয়া পরিবেশ যে হালচাল, রীতিনীতি সবেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে শান্তা তা ভালো করেই বুঝেছিল। মন তার মধ্যে মধ্যে তিক্ত হয়ে উঠত। কীর্তন, পূজা দান ধ্যানের দিকে তাই মন দিতে সে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বাইরের ভাব ধর্মে শান্তার কোনদিনই বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। গরীব দুঃখীর সেবা করে খানিক তৃপ্ত পেতো। দেবাশিসের স্বভাবের বিশেষ গুণগুলো সে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছিল সন্দেহ নেই এবং সংসার থেকে একটু আলগা হলে হয়তো শান্তি পাবে এই আশা ছিল। পাহাড়ে বা সমুদ্রতীরে যখনই গিয়েছে মনটা তার বেশ কিছুদিন শান্ত থাকতো। জয়তী নিজের ইচ্ছা হলে কখনো কখনো মা বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু সেও তার খেয়াল। মনগড়া একটি জগতের মধ্যে নিমগ্ন থাকতো সে, খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে কারুরই সঙ্গে মন খুলে কথা বলা তার অভ্যাস ছিল না। বাবা মার সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্প করবে, সে তা ভাবতেই পারত না।

রানিখেত জায়গাটি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার জেনে জয়তী মা ও বাবার সঙ্গে ক'দিন পাহাড়ে ঘুরে আসতে রাজী হ'ল। সেখানে প্রকৃতির শোভা পুরোমাত্রায় উপভোগ করতো এবং বসে বসে ছবি আঁকতো। কলকাতায় ফিরে এসে আবার বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি। একদিন ভোরে চিঠি এলো বিলাত থেকে মনুয়া লণ্ডনে তার কাছে গিয়ে থাকতে নিমন্ত্রন করেছে। চিঠি হাতে নিয়ে জয়তী মাকে উদ্দেশ্য করে বলল—

এবার আমায় বিদেশে যেতেই হবে মা, আর কতদিন ধরে রাখবে বল? ওখানে কাজ শিখতে পারবো। মনুয়ার কাছে থাকতে ভালোই লাগবে। আমার বয়সী অনেক মেয়ে একাই যায় ও থাকে।' কথা শেষ না করতেই জয়তী চিঠিখানা হাতে নিয়ে তার বাবার ঘরে ঢুকলো। শ্রীঅরবিন্দের ভারী বইখানা হাতে, দেবাশিস চোখ তুলে তাকালো। জয়তীকে বসতে অনুরোধ করল।

'বাবা মনুয়ার চিঠির বিষয় শুনেছে তো? ওর সঙ্গে গিয়ে থাকতে বলছে- লণ্ডনে আছে সে, মা বলেন নি তোমায়?

'বল, তুমি কি ঠিক করলে?' দেবাশিস শান্তভাবে প্রশ্ন করাতে জয়তী চমকে গেল। 'তোমার বুঝি এ বিষয় কোন উৎসাহ নেই?' জয়তী অভিযোগের সুরে বাবাকে উল্টে প্রশ্ন করাতে দেবাশিস গলাটা পরিষ্কার করে বইখানা বন্ধ করল—'তুমি তো হঠাৎই সব কিছু ঠিক কর, তারপর আমাদের জানাও, আমি অত তাড়াতাড়ি মতামত দেব কি করে জয়তী? এদিকে এসো, বোসো, বল কি ব্যাপার?'

মা বাবার মতামত না নিয়েও শান্তি নেই জয়তীর, অথচ মতামত চাইলেও নানা সমস্যা। ভালো মানুষের

মতো মুখ করে বসে বাবা কি বলেন তাই শুনতে লাগলো।

'তোমাদের বাধা কি কেউ দিতে পারে? দেবাশিস বলল। 'আমাদের তো মনে হয় দুটো পরামর্শ দিই, ছেলেমেয়ে তো চিরকালই শিশু আমাদের কাছে।'

'তেইশ বছর বয়স হ'ল তবু শিশু? আর কবে নিজের পায়ে দাঁড়াবো বল তো?' জয়তী আজ বড় চঞ্চল হয়ে আছে।

'তোমার মা ও আমি আমাদের বয়সটা এবার আন্দাজ করতে পারছি, এই বিরাট সংসারের বাইরে বেশ কিছুদিন থাকতে চাই, ছোটরা এবার ক্রমশঃ ভার নিক সংসারের—দেবাশিস আবেগশূন্য স্বরে কথাগুলো বলে গেল। মা ও বাবা সরে যেতে চান শুনে জয়তী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল, তাঁরা এত সহজে তার মতামত গ্রহণ করলেন দেখে জয়তী যেন কেমন আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার খুব ভালোও লাগলো না। বাবা যেন বড় সহজেই হার মানলেন। তাই মনে হ'ল সে নিজেই হেরে গেছে।

তোমার ফিরে আসার জন্য দিন গুনবো। হয়তো দু বছরের মধ্যে ফিরতে পারবে। দেবাশিস অনুরোধের সুরে কথাটা বলতে জয়তীর মনটা খানিক নরম হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল—

'তোমাদের এখানে আর কি আকর্ষণ? তোমাদের এখন সমবয়সীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয়, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো, তাই তো ভালো লাগবে। তাই ভাবছ শুনলাম।'

'হ্যাঁ, আমরা দু একটি তীর্থস্থান দেখতে যাবারই ব্যবস্থা করছি' দেবাশিস ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। সে আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে জয়তীর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে লা লো।

'জয়া মা সকল দেশেই স্বাধীনভাবে চাকরী বা অর্থোপার্জন করা মেয়েদের পক্ষে সমস্যা। আনন্দ ও সুখ কমই পায় এই স্বাধীন জীবনে। তবে মনে জোর কর, নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে তা খুবই দরকার। আমরা তোমাদের ভীরু করে গড়ে তুলি, বিশেষ করে মেয়েদের আধুনিক সমাজে ও প্রগতিশীল নূতন দলের মধ্যেও অনেক ভাল জিনিস আছে, তাদের চিন্তাধারা শ্রদ্ধা করতে চাই। মিথ্যা ভয়গুলি আমাদের দূর হওয়াই শ্রেয়।'

শান্তা সমর্থন করে বলল—'আমাদের কাজকর্ম নিয়ে থাকা উচিৎ। কোন একটা আশ্রমে গিয়ে ক'দিন থেকে এলে হয়, অনেক পরিবার আছে সেখানে, কাজও অনেক করে তারা। শুনেছি শান্তিতে থাকে।'

জয়তীর আজ মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়। মা বাবার মনের অভিমান সে বুঝতে পেরেছে কিন্তু বিদেশে সে যাবেই। নিজের মনকে সে ভোলাতে চায় না, শক্ত করে রাখতে চায়। দেবাশিস ও শান্তা জয়তীকে কোনদিন দোষী করেনি সেজন্যও জয়তী তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোমেনই কেবল তাকে ভালো করে বুঝেছিল, উৎসাহ দিয়েছিল, তাই সে এতদিন সব কথা ছোটদাকেই বলেছে। সোমেন ঘরে ঢুকতে জয়তী মনের কথাগুলো তাকেই বললো।

'ছোটদা, প্রত্যেকটি শিল্পীর এ জগতে স্থান আছে—কে ছোট কে বড় বিচার কি করে হবে? জীবনের অনুভূতি এক এক জনের এক এক রকম। অভিজ্ঞতা সকলের এক নয় আবার পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই তাও নয়। হৃদয়ের দরদ দিয়ে চরম দুঃখ সহ্য করে কত লাঞ্ছনা কত বিদ্রূপকে অগ্রাহ্য করে পথ খুঁজে বেড়ায় মানুষ, সে পথ খোঁজা কখনও বৃথা হইতে পারে না, তার মূল্য নিশ্চয় আছে। আমায় সে পথ কে দেখাবে ভাবছো? অন্তরে যে শক্তি এতদিন এই পথে চালিয়েছে প্রেরণা দিয়েছে, ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছে সেই অন্তরাত্মাই আমায় পথ দেখাবে। চিত্রকে জীবন্ত করে তোলে চিত্রকর কোন শক্তির দ্বারা? সেই শক্তিই আমার জীবনের ব্রতকে সত্য করে তুলবে, আমার চিত্রপটে প্রাণ এনে দেবে। আমার বিশ্বাসকে তুমি শ্রদ্ধা কর না কি?'

দেবাশিস দূর থেকে মেয়ের কথাগুলো শুনছিল,

জয়তীর মুখে দার্শনিকের মত তত্ত্ব শুনে মৃদু হেসে সে মেয়ের দিকে তাকালো। এত বড় সত্যকে সে বিশ্বাস না করে পারছিল না কিন্তু কেন জানি গ্রহণ করতে চাইছিল না। অজানা অচেনা কারুর মুখে এ কথাগুলো শুনলে দেবাশিস অতি সহজেই হয়তো সমর্থন করতো কিন্তু জয়তীর মুখে কথাগুলি যেন অস্বাভাবিক লাগলো। সে কি সত্যিই এত বড় হয়েছে? জয়তী তার জীবনের সমস্যাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করেছে সে বুঝল, সহানুভূতিও হ'ল কেমন যেন।

ঘর থেকে জয়তী যখন বেরিয়ে এলো তার নিজেরই মনে হ'ল ঠিক যেন একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তার মতই রইলো। পুরাতন সব কিছু ঠেলে ফেলে সে নূতনকে আলিঙ্গন করবে এই তার পণ। নূতনের আহ্বান তার বুকে সুমধুর সুরে বেজে উঠলো কিন্তু মা ও বাবা যেন বিচ্ছেদের করুণ বাঁশীর রেশ শুনতে পেলেন। শান্তা অতি মৃদুস্বরে বলতে লাগল—'সত্যিই তো ওদের মতামত শ্রদ্ধা করতে চাই—দুর্বল মন বলে গ্রহণ করতে চাই না।'

শৈশবে পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে জয়তী লতার মত জড়িয়ে ছিল। কৈশোরে সে গভীর স্নেহের আশ্বাস পেয়েছে। চারিদিকের শোভা ও সৌন্দর্য তার মনকে কোমল করেছে এবং কল্পনায় সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিল। যৌবনে সে অনুভব করতে লাগলো এমন উদ্দেশ্যহীন জীবনে সে আর কোন সুখ পাচ্ছে না—এতদিনের বিলাসের বন্ধন তাকে বিশেষ কোন প্রেরণা দিতে পারছে না। কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে সে পারছিল না। তিলে তিলে কেবল সংগ্রাম করেছে। অন্তর থেকে কে যেন বড়ই জোর করছিল—'আরও দৃঢ়তা চাই, আরও ইচ্ছাশক্তি চাই, সাহস চাই।' ক্রমাগত এক মনেই যেন শুনতে পাচ্ছে। পারিবারিক আবেষ্টনের যা কিছু সুন্দর তা ছাড়তেই তার মায়া। তবু তাকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতেই হবে। সে মনুয়ার কাছে লণ্ডনে গিয়ে থাকবে এই স্থির হ'ল। কেন যেন বহুদিনের পুরাতন গান তার মনে পড়ল।

"পুরান যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে
শ্যামলে কোমলে কনকে হীরকে ভুবনভূষিত
করিয়ে দাও॥"

গুণ গুণ করতে করতে জয়তী চিঠি লিখতে বসলো।

ক্রমশঃ

বনবানীর প্রেরণা

সুখরঞ্জন চক্রবর্তি

এইতো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া এইতো আমার মনকে
মাতায়।

প্রকৃতি সচেতন কবিমনকে শৈশবকাল থেকেই পাতায় ঘাসে চঞ্চলতা মুগ্ধ করেছে। উতলা করেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার হাতেখড়ি যে হয়েছিল নিসর্গ চেতনার অন্দরমহলে সে কথা আমরা তাঁর বনফুল, কবি কাহিনী, শৈশবসঙ্গীত ইত্যাদি রচনা থেকে জানতে পারি। বনফুল কাব্যের উদ্বোধন হয়েছে "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয় মলুনং কররুহে:" এই উদ্ধৃতি দিয়ে,আর কাব্যের নামকরণ দিয়ে। "কবিকাহিনীতে" কবি আপন নিসর্গচেতনার কথা কল্পনালোকে বলেছেন—

প্রকৃতি আছিল তব সঙ্গিনীর মতো
নিজের মনের কথা যত ছিল
কহিত প্রকৃতিদেবী তার কানে কানে।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে প্রকৃতি চেতনা এখানে স্বতোৎসারিত হয় নি। অন্ধআবেগে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সেই চেতনা যার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃতির যত না যোগ ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি যোগ ছিল একটা কাল্পনিক পুঁথিগত জ্ঞানের। এর সম্বন্ধে কবি তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে বলেছেন —"বেশ মনে পড়ে দক্ষিণের বারান্দায় এক কোণে আতার বিচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বিচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে একথা মনে করিয়া ভারী বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য জন্মিত। আতার বিজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিস্ময় অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে না।" এই বিস্ময়ের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে এই যুগের নিসর্গচেতনা এক ভাবসর্বস্ব রোমান্টিক মূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন—

"নতুন ফুটেছে মালতির কলি
ঢলি ঢলি পড়ে এ ওর পানে
মধুবাসে ভুলি প্রেমালাপ তুলি
অলি কত কি যে কহিছে কানে।"

(বনফুল)

অথবা—

"আধার মাথা উজল করি হরিত পাতা ঘোমটা পরি
অবলা মোর কুসুমবালা সহিব মিছা মনের জ্বালা
বিরাট কাল তাহার চেয়ে রহিব হেথা লুকায়ে।"

শৈশব সঙ্গীতে কল্পনাবালা কবিকে ফুলের জগতে নিয়ে গেছে এবং বলেছে—"দেখিবে কত কি অদ্ভুত ঘটনা কত কি অদ্ভুত ছবি।" ফুলবালা সেখানে পুষ্পাঙ্গনাদের সঙ্গে কবির যে লীলা তা' বিশুদ্ধ কল্পনার আশ্রয়েই প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবের ছোঁয়া লাগে নি তাতে। যেমন মধুপের প্রতি কবির উক্তি—

"গোলাপ ফুল ফুটিয়া আছে মধুপ হোথা যাসনে
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে।
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা, শেফালী হোথা ফুটিয়ে
ওদের কাছে মনে কথা বলবে 'মুখ ফুটিয়ে।'"

ছিন্ন লতিকা,ফুলের ধ্যান,কামিনীকদম, গোলাপবালা ইত্যাদি প্রকৃতি জগতকে নায়িকা প্রতিনায়িকা কল্পনা করে যেন কবিরই প্রেমস্বপ্নের গুঞ্জরণ। যে নিসর্গপ্রীতি নিয়ে কবি জন্মেছিলেন তারই যেন চলেছে অন্তরে বাহিরে, যার ফলে প্রকৃতির জগতের সঙ্গে তাঁর প্রথম রঙীন নেশা আবেগে বিভোর—

" শুন নলিনী খোলগো আঁখি
ঘুম এখনো ভাঙিলো নাকি,
দেখ তোমারি দুয়ার পরে
সখী এসেছে তোমারি রবি।"

প্রথম যুগের এই স্বপ্নময়তা কাটলো যৌবনে পদ্মাতীরে এসে যখন ঘর বাঁধলেন গ্রামবাংলার নদীপথে। বস্তুতঃ উক্ত রবীন্দ্রজীবনে একটি দিক সম্যক রূপে আত্মপ্রকাশ করত কিনা, তা গবেষণার বিষয়। কেননা, এই পর্বের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত রচিত কাব্যে যে প্রকৃতি বর্ণনা আছে তাতে সেই আদি যুগেরই স্বপ্নঘোর। যেমন ছবি ও গানে, "দোলা" কবিতাটিতে

"গাছের ছায়া চারিদিকে আঁধার করে রেখেছে
লতাগুলি আঁচল দিয়ে ঢেকেছে।
ফুল ধীরে ধীরে মাথায় পড়ে পায়ে পড়ে
গায়ে পড়ে
থেকে থেকে বাতাসেতে ঝুরু ঝুরু পাতা নড়ে।"

অথবা খেলা, আচ্ছন্ন ও মধ্যাহ্ন কবিতায় প্রকৃতির যে ছবি আমরা পাই তা যেন উদাস বিভোর তন্ময়তার সাধনায় মগ্ন অথচ সে সাধনা নিসর্গের কোন সুস্পষ্ট ছবি মনে জাগায় না। এর ভাব যেন—

"রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়
কি মূরতি তব নীলকাশশায়ী নয়নে ওঠে
গো আভাসি।"

অথবা—

"প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তেরই বাতাসটুকুর মত
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেলরে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।"

এ ভাবেরই প্রাধান্য মানসীকাব্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। মানসীতে আবার কবির নিসর্গপ্রীতির নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। কুহুধ্বনি বা বধূ কবিতায় প্রকৃতি যেন প্রাণ বন্যায় উচ্ছ্বসিত। কুহুধ্বনি কবিতাটি যদিও গাজীপুরের স্মৃতি দিয়ে লেখা তথাপি এর প্রতিটি ছত্রই প্রায় শান্তিনিকেতনের স্মরণ করায়। চৈত্রের শেষে ক্লান্ত যখন আম্র কলির কাল এবং যখন মধ্যাহ্নের প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে" তখন—

"ছায়া মেলি সারি সারি আছে তিন চারি
সিশুগাছে পাণ্ডু কিশলয়।
নিঃস্ব বৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্প ঢাকা
আম্রবন আম্র ফলময়॥
* * * *
দূরান্ত প্রান্তরে শূণ্য তপন করিছে ধূ ধূ
বাঁকাপথ শুষ্ক তপ্ত কায়া
তারি প্রান্তে উপবন মৃদুমন্দ সমীরণ
ফুলগন্ধ শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।"

বধূ কবিতাটিতে শিলাইদহের পল্লীচিত্র যেন ফটোগ্রাফীর সাহায্যে হুবহু তুলে নেওয়া হয়েছে প্রতি ছত্র। এরপরে পদ্মা তীরে কবির নিসর্গ অভিসার। কবি উপলব্ধি করেছেন—"এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠতো, শরতের আলো পড়তো, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্থিত হতে থাকতো...তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।"

এ আবেগপ্রবাহ ধরা পড়েছে কবিতাতেও—

"তৃণ পুলকিত যে মাটির ধরা লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা
কেমনে।
মনে হয় যেন ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণ জলে
সে দুয়ার খুলি কব কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

বিচিত্ররূপে বিশ্বপ্রকৃতি এসে তাঁর কাব্যে ধরা দিয়েছে। কবি সেই অপরূপা বসুধাকে নিঃশেষে পান করেছেন। হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। আর সে সব কথা তাঁর কাব্যধারা—সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকায় ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সে অনুভূতি মধুপকুঞ্জে লহরী তুলেছে, কুসুমকুঞ্জে গিয়ে পবনে-দুলেছে আবার কখনো "শ্রাবনের বাদল সিঞ্চনে" ঝরেছে। কখনো নানাবর্ণে বেদনায় আঁকা হয়ে রয়েছে। কখনো ইমনে কেদারায়; কখনো বেহাগে বাহারে।

কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর কবিদৃষ্টিতে পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁর কাব্যে ঋতু পরিবর্তন ঘটেছে বারবার। প্রায়ই তা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল নোতুন পথ নেয় সম্ভবতঃ এই তত্ত্বের পথে অভিসার প্রথম সূচিত হয় ফাল্গুনী নাটকে। এবং ফাল্গুনীতেও তত্ত্ব কিছু পরিমানে বাইরের ঘটনা থেকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞের মত—"অনেকেরই ধারণা ফাল্গুনী নাটকের গানগুলি নাটকের কথা মনে করিয়াই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। সেই ফাল্গুন মাসে ট্রেনে কোথাও গিয়াছিলেন। ট্রেনের দ্রুতগতি তাঁহার মনে একটা বিশেষ আবেগের সৃষ্টি করে,সে আবেগ হইতে পাইলাম দুইটি গান—প্রথমটি হইল "চলিগো, চলিগো, যাইগো চলে"—দ্বিতীয়টি হইল —"ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা।" এই প্রসঙ্গে সম্ভবত মনে পড়ে "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে উদ্ধৃত কবির বলাকা কাব্যের প্রেরণা বর্ণনা—এলাহাবাদের ছাদের উপরে বসে কালেরস্রোতে প্রবাহমান গতিকে উপলব্ধি করার কথা।

এই চলমানতাই কবিকে নিসর্গের সঙ্গে প্রাণের ঐক্য "প্রথম প্রীতি"তে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই কবি তাঁর ঘরের আশে পাশে আলোর প্রেমে যত প্রকৃতির আহ্বান অন্তরে শুনতে পেয়েছেন। এভাবে সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রাণের যোগস্থাপনেই যথার্থ মুক্তি। আত্মার প্রকাশই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়—"আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।" "বাসনা আজ আমার সেই যুগান্তরের তাই কবির বন লক্ষ্মীর ঘরে ভাই ফোঁটার নিমন্ত্রন; সেখানে আজ তরুণীর সঙ্গে নিতান্ত ঘরের বালকের মত মিশিতে হইবে।" এই যে জলস্থল আকাশব্যাপী প্রাণের প্রবাহ ইহার কেন্দ্রে কবি এক জ্যোতির্ময় সত্তাকে অনুভব করেছেন—যিনি তার তাণ্ডব নৃত্যছন্দে মহাকালের ভারসাম্য রক্ষা করেন। কবির কল্পনায় তিনিই মহাকালের চালক—

কালের রাখাল তুমি সন্ধ্যায় তোমার
শিঙ্গাবাজে
দিন ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধতার
গোষ্ঠগৃহ মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।

এভাবে ক্রমে কবির মূক বন্ধু বনের বাণীতে স্পর্শ লেগে একটি অপরূপ রসলোকের দুয়ার খুলেছে। নটরাজের ভূমিকায় কবি তাই বলেছেন—"অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।" কিন্তু কবি তাঁর বনের বাণীতে তত্ত্বের আরোপ করলেও তাকে কোথাও প্রাধান্য দান করেন নি। কারণ প্রাণের সহজ ভাব তাহলে বাধাপ্রাপ্ত হবে। তাই কবির অকুণ্ঠ স্বীকৃতি—

তবু জেনো অবজ্ঞা করি নি
তোমার মাটির দান।
আমি যে মাটির কাছে ঋণী
জানায়েছি বারংবার তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে
অমর্ত্যের পেয়েছি সন্ধান।"

কেননা, "সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি।"

তাই কবির শেষ কথা—

"বেসেছি ভালো এ ধরারে
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
ফুলের দিনে দিয়েছ রচি গান
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি
সে গানে মোর বাজুক স্মৃতি
আর যা আছে হউক অবসান।

রোদের বেলা ছায়ায় বেলা
করেছি সুখে দুঃখের খেলা
সে খেলা ঘর মিলাবে মায়া মন
অনেক তৃষা অনেক সুধা
তাহারই মাঝে পেয়েছি ক্ষুধা
উদয়গিরি প্রণাম লহ মম—" (বীথিকা)

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

—চতুর্থ অধ্যায়—

।। যাহা দেখিলাম ।।

আমরা ১৮৮৬ সনের সাধারণ নির্বাচন দেখিলাম। চেল্‌সী আমাদের কাছেই অবস্থিত, এবং এইখানে আমরা সার চার্লস ডিল্‌ক্ এবং মিস্টার হুইটমোরের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সে সময়ের জন্য চেলসী স্থানটি আগাগোড়া ইটান্‌স্‌উইল (পিকউইক পেপার্স দ্রঃ) হইয়া উঠিল। যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই বড় বড় প্ল্যাকার্ড, এবং তাহাতে লেখা "ভোট ফর হুইট মোর" অথবা "ভোট ফর ডিল্‌ক্।" ইহারা যেন দর্শককে বলিতেছে"Short is your friend, not Codlin"—অর্থাৎ তোমাদের বন্ধু শর্ট, কডলিন নহে [ডিকেনসের দুটি চরিত্র]। কিংস রোডে প্রকাণ্ড এক ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা সবাইকে সার চার্লস ডিল্‌কের কীর্তনের কথা ঘোষণা করিতেছে। অন্যদিকে ফালহ্যাম রোডে অবস্থিত মিস্টার হুইটমোরের অফিসের বাহিরে নানা ক্যারিকেচার চিত্র, ছড়া ও নানা তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের মত বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই। এক পক্ষ অন্য পক্ষ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছে, তাহা বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে দেখিলে দুই পক্ষেরই ক্ষমতার লোভ এবং স্বার্থপরতার পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে। রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের অঙ্গনে পুরাকালে গ্ল্যাডিয়েটরগণ যেমন লড়াই করিত, এখানে দুটি রাজনৈতিক দলের নেতারাও তেমনি মরীয়া হইয়া লড়াই করিয়াছেন। মানুষ মানুষে শত্রুতা সৃষ্টির ক্ষেত্ররূপে ধর্মের পরেই রাজনীতির স্থান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক মতবাদ পুরুষানুক্রমিক, ভারতে ব্যবসা বা অন্য কোনও বৃত্তি যেমন। উহাদের কেহ গর্বের সঙ্গে বলে 'আমরা চিরদিন রক্ষণশীল' অথবা 'আমরা চিরকাল উদারপন্থী।' তবে কার্যক্ষেত্রে দুই দলের লোকেরা যাহা ছিল বা যাহা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ দুটি পার্টির মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল নহে। দুটি দলই জনমতকে অনুসরণ করিয়া চলে, এবং তাহাদিগকে জনমত গঠন করিতে হয়, তাহাদিগকে শিখাইতে হয়, সংহত করিতে হয়, এবং ভাগ্য খারাপ তাঁহারই যিনি পিছাইয়া থাকেন, অথবা যিনি বেশিদূর অগ্রসর হইয়া যান। অতএব সম্মুখবর্তী প্রত্যেকটি পদক্ষেপের আগে পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ভারতবর্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। এখানে নেতারা নিজেরাই চলেন, ট্রেনবিহীন এঞ্জিন যেমন চলে, এবং যখন তাঁহারা পিছনে তাকান তখন দেখিতে পান বহুদূরে ঝিমন্ত অবস্থায় জনতা অতি দ্রুত তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের অধৈর্য ও ঝোঁকের মাথায় কাজ করিবার অভ্যাসকে তাঁহারা সংযত করেন না। তাঁহারা প্রথমে জনসাধারণকে গড়িয়া পিটিয়া একটা সংহত সুসংগঠিত দলে পরিণত করেন না। তাহা না হইলে তাঁহারা যাহা তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন, তাহা যে কি বস্তু সে বিষয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কোনো ধারণাই নাই।

আমাদের ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "আবশ্যিক শিক্ষা" নামক একটি

প্রস্তাব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না, পাছে বলিতে গিয়া বেশি বলিয়া ফেলি। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল পরিবার সব সময়েই রক্ষণশীল মনোনয়ন প্রার্থীকে সমর্থন করে, যেমন উদার-পন্থী পরিবার উদারপন্থী প্রার্থীকে সমর্থন করে। রক্ষণশীল হউক বা উদারপন্থী হউক, মানুষের মন জিব্রলটারের পাহাড়ের মত কঠিন, এবং তাহার উপরে প্রতিপক্ষের কোনও যুক্তিই কোনও দাগ কাটে না। তাহাদের মধ্যে বহু মতান্ধ গোঁড়া ব্যক্তি আছে, যাহারা তোমার বিপরীত মতের জন্য তোমাকে প্রকাশ্যে পুড়াইয়া মারিতে চাহিবে। ইংল্যাণ্ডে যে জাতিভেদ এবং রাজনৈতিক গোঁড়ামি আছে, তাহা কত গভীর তাহা অনভিজ্ঞ আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের কাছে সকল ব্রিটিশ মানুষই (আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের লইয়া) এক মনে হইয়াছে। উচ্চনীচ, রক্ষণশীল বা অতি উদারপন্থী, দুইই আমাদের চোখে সমান! আমরা জানিতাম না নিম্নস্তরের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব পোষণ করা পাপ, অথবা উদারপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা রক্ষণশীলদের প্রতি অপরাধ। ঘরোয়া বিবাদেও খোলাখুলি ভাবে পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। এক দলের সহিত আলাপ করিলে, অন্য দল তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেএমন আশা করিও না। মনে হয় আমাদের অজ্ঞতা এবং অহমিকা বোধের জন্য এ সব ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সতর্ক হইতে পারি নাই। এবং এই কারণেই, যেখানে নীরব থাকিলে বিজ্ঞতার কাজ হইত, সেখানে হয়ত কথা বলিয়াছি। বাঙালীর মনে সম্প্রতি কিছু নব্য পরহিতব্রতী স্বাধীন চিন্তা জাগিতেছে, কিন্তু তাহার বৈষয়িক জ্ঞানের অভাব আছে। বদ্ধ ধারণা লইয়া যে-সব দল রহিয়াছে, তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র আর একটি দল আছে, সেই দলের লোকদের মত বা ধারণা দোলায়িত হয়। তাহারা একবার এক দলকে সমর্থন করে, একবার অন্য দলকে সমর্থন করে। প্রধান দুটি দল প্রায় সমান সমান, উদ্বৃত্ত অদলীয় লোকেরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করে। ইহাদের অসম্ভব ক্ষমতা! চেল্‌সীতে সার চার্লস ডিলকের পক্ষে যে ইলেকশন প্রচার চলিতেছিল, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল এ প্রচার কিছু যেন প্রাণহীন। কিন্তু মিস্টার হুইটমোরের প্রচার ছিল খুব দুর্দান্ত। কিংস রোডের এক বাড়িতে ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হইল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে অঞ্চল ভোটার, ভোটারদের সমর্থক এবং বাজে লোকের ভিড়ে পূর্ণ ছিল। এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে রাত্রি ১০টার সময় আমি সেখানে ভোটিং-এর কাণ্ড-কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। সে সময়ে ভোট গণনা চলিতেছিল। ফলাফল জানিবার জন্য শত শত ব্যস্ত লোকে রাস্তাটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আশেপাশের পথেও বহু লোকের ভিড়। সবাই আশঙ্কা করিতেছিল একটা কিছু গণ্ডগোল বাধিবে। কারণ চেল্‌সী ও তন্নিকটস্থ স্থান-সমূহ উৎসাহী লোকে পূর্ণ, সবাই ভাবিতেছিল এ উপলক্ষে অনেকের মাথা ভাঙিবে, এবং উপলক্ষটা তাহাতে আরও একটু উপভোগ্য হইয়া উঠিবে। শেষ রাত্রি ২টার সময় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হইল। রক্ষণশীল প্রার্থী মিস্টার হুইটমোর জয়লাভ করিলেন। জনতার আনন্দ-চিৎকারে কান ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ প্রার্থীর সমর্থকদের কণ্ঠ হইতেও হতাশার ধ্বনি একই উচ্চগ্রামে উঠিল। সবাই এই ফলাফলে বিস্মিত। কারণ, চেলসীর আসনটি সার চার্লস ডিল্‌ক্ গত কুড়ি বৎসরের অধিককাল ধরিয়া দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নাম তাঁহার পার্টির নিকট শক্তির দুর্গ স্বরূপ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফল ঘোষণার অল্পক্ষণ পরেই মিস্টার হুইটমোর এবং সার চার্লস উভয়েই উপরের ব্যালকনিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিস্টার হুইটমোর তাঁহার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাইলেন। সার চার্লস তাঁহার প্রতিপক্ষের বিজয়লাভে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, বিজয়ীর জয়লাভ ন্যায্য ভাবেই হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে করমর্দন করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু জনতার মধ্যে যে উত্তেজনা জাগিয়াছিল তাহা তখনও থামে নাই। ভোরবেলা পর্যন্ত পথ জনাকীর্ণ ছিল, এবং এক দলের উল্লাস ও অন্য দলের আর্তধ্বনি পরস্পর পাল্লা দিতেছিল। গুরুতর লড়াই কিছু বাধে নাই।

কিন্তু এখানে আমি লড়াই না দেখিলেও আর একটি ইলেকশনে আমি লড়াই দেখিয়াছি। এক বন্ধু সেখানে একটা কিছু ঘটিবে অনুমান করিয়াই আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে আমি আমার মাথা হইতে পাগড়ি খুলিয়া তাহার বদলে মজুরের টুপি পরিলাম। আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল,অতএব দেখিলাম স্থানটি লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে। বসিবার স্থান আর পাইলাম না, হলের পিছন দিকে বহু লোক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে আমিও নীরবে গিয়া দাঁড়াইলাম। ইহার পরেও লোক আসিতে লাগিল এবং ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদের গায়ে গায়ে লাগাইয়া দাঁড়াইতে হইল, কোথাও ফাঁক ছিল না। এই পল্লীতে দুই দলের এক দল কর্তৃক মনোনীত এক প্রার্থী বক্তৃতা দিবেন কথা ছিল। যথাসময়ে তিনি ভাষণ দিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার সমর্থক দলের হর্ষধ্বনিতে হলের চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহা থামিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথম সারির ব্যক্তিগণ চুপ করিলেন কিন্তু অন্য অংশের লোকেরা ক্রমাগত ছড়ি ও জুতা ঠুকিতে লাগিলেন। শব্দ থামিল না। এক দিকের থামে ত অপর দিকে আরম্ভ হয়। প্রথম সারির লোকেরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পিছনে তাকাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। বক্তা দুই-একবার কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জনতার চিৎকারে তাহা আর শোনা গেল না। অনেকে 'সাইলেন্স' "সাইলেন্স" ধ্বনি তুলিলেন, কিন্তু তাহার উত্তরে শুধু "বু" "বু" ধ্বনি উঠিল। এর পরেই তুমুল কাণ্ড। প্রথম সারির লোকেরা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, মাথায় টুপি পরিলেন। কয়েকখানি চেয়ার হাওয়ায় চড়িয়া ভিড়ের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেইখানে জোর লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল, কিন্তু ভিড়ের চাপে কেহ মাটিতে পড়িতে পারিল না। মুহূর্তের মধ্যে চেয়ারগুলির পিঠ, হাত ও পাগুলি চেয়ার হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, এবং এই অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উত্তেজিত জনতা অতি উৎসাহের সঙ্গে লড়াইতে মাতিয়া উঠিল। কয়েকজন শক্তিমান্ লোক একখানি বেঞ্চি টানিয়া তুলিতে পড়িয়া গেল, তাহার নিচে কয়েকটি মাথা চাপা পড়িল, এবং খানিকটা স্থান সেজন্য শূন্য দেখাইল সেই কালো টুপির অরণ্যে। তাহার পর হুশ্—বাতাসে ছুটিয়া আসিতেছে, জলের কৌটায় মালা গাঁথিয়া—যেন বড় একটি ধূমকেতু ও তাহার ল্যাজ ছুটিতেছে। সেটি জলভরা একটি গ্লাস, বক্তার টেবিলে ছিল। সভার কাজ এইভাবে চলিতে লাগিল, খুবই আনন্দজনক সন্দেহ নাই। প্রত্যেকেই খুব উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করিয়াছে এবং উপভোগও করিয়াছে পুরোপুরি। রক্ত যখন শিরায় টগবগ করিয়া উঠিল, তখন তাহা সকল বাধা ভেদ করিয়া নাক দিয়া, মাথা দিয়া এবং দেহের অন্যান্য অংশ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। এইভাবে যাহাদের মাথা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তাহারা পশ্চাদপসরণ করিবামাত্র তপ্ত রক্তবিশিষ্ট অন্যরা সবাইকে ঠেলিয়া আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল এবং তাহাদের স্থান দখল করিল। তাহারা বাহির হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছু নিরাপদ্ দূরত্ব হইতে সব পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, কিন্তু এখন বাহির হইতে বহু নবাগত আসিয়া আমাদিগকে রবিনসন ক্রুসো গল্পের নেকড়ে বাঘদের মত সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু আমার মাথাটি ভাঙুক, নাক চ্যাপটা হইয়া যাউক এবং আমার চোখের চারিদিকের রং আরও কিছু কালো হউক, ইহা আমার বিশেষ পছন্দ না হওয়াতে, দশাসই চেহারার যে লোকগুলি আক্রমণ করিতে আসিতেছিল তাহাদের কণুইয়ের নীচ দিয়া খুব কৌশলে ঐ স্থান হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইহা করিতে আমাকে দস্তুরমত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আমার ন্যায় শান্তি-বিলাসীর পক্ষে স্থানটি আর উপযুক্ত ছিল না কারণ এইরূপ একটি অর্থহীন কাজে আমার কোনও অংশ ছিল না। আমার এখন অনুতাপ হইতে লাগিল আমার পাগড়িটি ফেলিয়া আসিলাম কেন। কারণ, এমন উত্তেজিত অবস্থায় উহারা আমার ভারতীয়ত্ব অন্যান্য সময়ের ন্যায় যদি মান্য না করিয়া আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া কিছু করিতে আসিত, তাহা হইলে এখন সেখানে যে টুপিটি রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা

পাগড়িটি অনেক ভালভাবে মাথাটিকে বাঁচাইতে পারিত। আমাদের গ্রামের একটি লোক অন্ততপক্ষে এ বিষয়ে আমার আদর্শ। সে দল ধরিয়া প্রতিবেশীর বাগান হইতে কাঠ চুরি করিতে গিয়া মার খাইবার সময় তাহার টাক মাথাটায় তাড়াতাড়ি কাপড়ের পাগড়ি বাঁধিয়া লইত। কিন্তু এখন ত আমার কোনও উপায়ই নাই। বাহির হইয়া যাইবার কোনও উপায় থাকিলেও দরজা ত বাহিরের মজা দেখা লোকের ভিড়ে বন্ধ; এবং যখন সকলেরই দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ, এবং যখন শত্রু-মিত্র ভেদে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে গুঁতান কর্ত্তব্য বোধ করিতেছে, তখন সেখান হইতে পলায়ন চরম ভীরুতা। লড়াইরত মানুষদের মধ্যে কে কোন্ দলের, কার কি রাজনৈতিক মতবাদ, তাহা কে জানে, আর কেই বা কাহাকে জিজ্ঞাসা করে? এবং গুঁতাগুঁতির জন্য তাহার প্রয়োজনই বা কি? কিছুই আসিয়া যায় না। যাহাকে মারিতে হইবে সে হাতের কাছে থাকিলেই যথেষ্ট, এবং যাহারা পাশে উপস্থিত তাহারা সে সময়ে একটু ঠেলিয়া সরিয়া দুইজনের হাতের ব্যবহারের উপযুক্ত একটু জায়গা করিয়া দিলেই হইল। খুব স্ফূর্তির সঙ্গে তাহারা লড়াই করিতে লাগিল, ঠিক যেন স্কুলের বালক সব। যাহারা দাঁড়াইয়া ইহা উপভোগ করিতেছিল, তাহারা দেখিতেছিল কোনও একটি পক্ষ যেন অধিক সুবিধা না পায়। গুঁতা খাইয়া একজন ধরাশায়ী হইবামাত্র দর্শকদিগের ভিতর হইতে একজন আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছিল। এগুলি উপযুক্ত হাতা লড়াই, প্রায় খেলা; এবং যাহারা শুধু দর্শকরূপে ক্লান্ত হইয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের জন্য। এই রকম একটি লড়াইতে একজন বলবান্ লোক একটি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান্ উৎসাহীকে উত্তেজিত করিয়া তাহার সঙ্গে লড়াইতে উদ্যত হইতেই দেখা গেল বিকাট চেহারার একটি লোক (সম্ভবত উত্তর স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী) ঠেলিয়া আসিয়া দুর্ব্বল লোকটিকে সরাইয়া দিয়া সবল লোকটিকে বলিল, I am your man, come on. অর্থাৎ একবার আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা কর ত চাঁদ! লড়াই অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। প্রথম লোকটি ঘুঁসি খাইয়া চোখ ফুলাইল, নাক দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, এবং পর পর চারবার ধরাশায়ী হইল। কিন্তু তবু হার মানে না। যতবার পড়ে ততবার তড়াক করিয়া উঠিয়া দর্শকদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আবার আক্রমণ করে। "Well done Rob Roy" বলিহারি রব রয়! [স্কটের নভেল দ্রষ্টব্য] এক দল চেঁচাইল। সম্ভবত লোকটির লাল চুলের জন্য রব রয় বলা হইল। অন্য দল পরাজিতকে উৎসাহিত করিতে লাগিল "Try again, Bill"—আবার লেগে যাও বিল। চতুর্থ বার যখন সে পড়িয়া গেল, তখন তাহাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে হইল। দাঁড়াইয়া বলিল, আর-এক দিন দেখিয়া লইব। এই উপযুদ্ধ চলিতেছিল এক দিকে, কিন্তু আসল রণাঙ্গনে চলিতেছিল মহাযুদ্ধ। হঠাৎ কি হইল, দেখি, সেই নিরেট ভিড় পশ্চাদপসরণ করিয়া সিঁড়ি ও ভিতরের পথ খালি করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। দশ গুনিতে যত সময় লাগে তাহা অপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল। তাহাদের সম্মিলিত চাপে আমিও তাহাদের সঙ্গে পথে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে দেখি জনতা এক এক চক্রে ভাগ হইয়া লড়াই চালাইতেছে। ভিতরের লড়াইয়ের সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই, ইহারা এখানে স্বাধীনভাবে লড়াই চালাইতেছে। কিন্তু হলের ভিতরের লড়াই অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ ছিল, কারণ সেখানে ভাঙা আসবাব হইতে আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণের অস্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আমার মনে হইল, ব্রিটিশরা আর যাহাই হউক, সভ্যতাপ্রাপ্ত বর্ব্বর। কিন্তু তবু তাহারা ঝড়বৃষ্টি, বন্যা, ভূকম্প, এবং আগ্নেয়গিরিপূর্ণ পৃথিবীর মতই জীবন্ত মানুষ। আর আমরা, যতদূর জানি, মৃত পর্ব্বতমালা, জলহীন মরু, উদ্ভিদহীন প্রান্তর, এবং জীবহীন নীরব চাঁদের মত নিষ্প্রাণ। মনে রাখিতে হইবে, সভ্যতায় অধিক অগ্রসর দেশে, যেমন ইংল্যাণ্ডে, সব জিনিসেরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলিবে। সবচেয়ে উদার, এবং সবচেয়ে নীচ, দানবীর এবং ব্যয়কুণ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা ধার্মিক এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধার্মিক, সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দান্ত গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক

এবং সর্বাপেক্ষা খ্রীষ্টের অনুগত, মানুষের দেখা মিলিবে। ইংরেজী অভিধানে 'কাউয়ার্ড' শব্দ অপেক্ষা অধিক অপমানকর অর্থদ্যোতক শব্দ আর নাই। প্রায় সকল ইংরেজই বরং মৃত্যু বরণ করিবে তবু অন্য ইংরেজের মুখে কাউয়ার্ড বিশেষণটি শুনিতে চাহিবে না। কাউয়ার্ডের মত কাজ তো করিবেই না। অবশ্য দৈহিক শক্তি সম্পর্কেই কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খ্রীষ্টান হওয়া এবং সে ধর্ম পালন না করা, অখ্রীষ্টান হইয়া স্ত্রীর নির্দেশে চার্চে যাওয়া, অথবা এই জাতীয় সব কাজকে কাউয়ার্ডিস বা ভীরুতা মনে করা হয় না। আমাদের দেশেও এ জাতীয় কাজ ভীরুতা নহে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি। এই-সব লড়াইয়ে কোনও দুইটি ব্যক্তি যুগ্মভাবে একটি ব্যক্তির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লড়াই করে নাই। আমাদের দেশে এ রকম ঘটে এবং 'ভদ্রলোক' বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই ঘটে। ব্রিটিশদের এই লড়াইয়ের রীতিকে আমি উচ্চ প্রশংসা করিতে পারিতাম, কিন্তু পারিলাম না। কারণ, আমাদের দেশে সম্প্রতি কয়েকজন ইংরেজ দুর্বল অসহায় ভারতীয়কে গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা যে কখনও পাল্টা মারিবে না তাহা জানা সত্ত্বেও। এবং আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহারা মার খাইয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া যাইবার পরেও তাহাদের পেটে লাথি মারা হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের কোনও কোনও কাউন্টিতেও এইরূপ পাশবিক লড়াই হইয়া থাকে শুনিয়াছি। কিন্তু এ কথা সত্য যে, সাধারণতঃ ব্রিটিশরা এরূপ আচরণকে ভীরুতা গণ্য করিয়া থাকেন। কোনও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি পড়িয়া গেলে তাহাকে আর মারা হয় না। কিংবা প্রতিপক্ষ দুর্বল হইলে তাহাকে আঘাত দেওয়া হয় না, অবশ্য যদি তাহারা প্রত্যাক্রমণ না করিতে চাহে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ব্যাপারে ইউরোপীয়দিগকে কিঞ্চিৎ মহাভারত পাঠ করিতে অনুরোধ জানাই। চার হাজার বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কি করা হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের জানা উচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে খ্যাত ব্যক্তিরা অস্ত্রহীন অথবা দুর্বল বীর প্রতিপক্ষের বুকে কি বুলেট বিঁধাইতে পারেন? অশ্বত্থামা অবশ্য দিব্যাস্ত্রাদিতে এই জাতীয় অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন, শত্রুপক্ষীয় পদাতিকদের উপর গ্রীকদের অগ্নিবর্ষণের সঙ্গে ইহা কিছু পরিমাণ তুলনীয়, তবে অশ্বত্থামা উচ্চ ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও বিশেষ ন্যায়-চরিত্রের লোক ছিলেন না। ভারতে এমন কি কোনও কোনও অসভ্য উপজাতিদের মধ্যেও এমন নিয়ম আছে যে, তাহারা মানুষের প্রতি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে না। নিক্ষেপ না করা তাহারা গৌরবের বলিয়া মনে করে। বর্তমান সভ্যতা, গৌরবের হানি করিয়াও মারণাস্ত্রের উন্নতি ঘটাইয়াছে।

ক্রমশঃ

পিছনের জানালায়

(ক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় পুরাণ পরীক্ষকদের পক্ষ থেকে লোকান্তরিত পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামীর স্মৃতি সভার আয়োজন হয়েছিল। সেই সভায় অনেক সুবক্তা সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন আমি একটি কবিতা পড়েছিলাম—ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্মৃতি সভাটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছিল সন্দেহ নাই। সভাক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসছি একজন মলিনবেশী পুরুষ আমার হাতখানা চেপে ধরে বললেন: ভাইজী, চমৎকার হয়েছে তোমার কবিতাটি, বক্তারাও চমৎকার বলেছেন, কিন্তু মনের একটা সন্দেহ কিছুতেই ঘুচছে না।

প্রশ্ন উন্মুখ চোখে ওঁর পানে চাইলাম। বললেন, মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে একজন পরম ভাগবত পাঠক দেহ ত্যাগ করলেন কেন? এই অকাল মৃত্যু কেন হয়?

আশ্চর্য প্রশ্ন—মৃত্যুর কি কোন নির্দিষ্ট বয়স আছে? সে কি পরম ভক্ত, আর চরম দুর্বৃত্তের মধ্যে কোন ভেদা-ভেদ স্বীকার করে? এই চিন্তাতরঙ্গ মনে উঠতেই বললাম, মৃত্যুর আর কালাকাল কি—যখন সময় হয়—

বাধা দিয়ে বললেন, সময় অত খেয়ালী নয়, প্রকৃতি কোন রকম অপচয় সহ্য করে না—ভোগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হলে সেখানে অনাচার জমলে ভোগভূমিতে থাকবার অধিকার ফুরিয়ে যায়। হাতে ঘড়ি বেঁধে একই সন্ধ্যায় তিন চারটি আসর ঠেকিয়ে বেড়ালে কোনটিতেই শ্রীভগবানের লীলামহিমাকে ঠিকমত ব্যক্ত করা যায় না। এতে অর্থ আসে। পরমার্থ লাভ হয় না। এটা দারুন অপচয় নয় কি ভাইজী? কামনার দাস, কাম কীট আমরা—এমনি করেই আয়ু ক্ষয় করে থাকি।

বলতে বলতে উনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলে ওঁর মুখ থেকে অনর্গল মহাজন বাক্যের উদ্ধৃতি বার হয়—ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত। চমৎকার সুরঝঙ্কৃত কণ্ঠস্বর—অদ্ভুত সুস্পষ্ট ছন্দগতি সমন্বিত নির্ভুল উচ্চারণ হৃদয়ের আবেগ ও অনুরাগে মাখা কথাগুলি শুনলে কান জুড়িয়ে যায়।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কথা বলতে বলতে আমরা চলছিলাম। উনি বললেন, ভাইজী, চলনা আমাদের ওদিকটা ঘুরে যাবে। রাত তো বেশী হয়নি।

কেমন ভাল লাগছিল আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। পাকা রাস্তা থেকে নেমে—একটা আম বাগানের মাঝখান দিয়ে আরও কয়েকটি গলি ঘুঁজি পেরিয়ে ওঁর বাড়ীতে পৌছলাম। পাকা কোঠা বাড়ী কিন্তু খুবই দুর্দশাগ্রস্থ। ঘরের মধ্যে ঢুকে দুর্দশাকে প্রত্যক্ষ করলাম। শুধু দুর্দশাই নয়—কী বিশৃঙ্খল এলোমেলো ছড়ানো সব জিনিসপত্র—এ যে মানুষের বাসপোযোগী গৃহ, মনেই হয় না। খোয়া ওঠা মেঝে—জানালার কপাটগুলো ভাঙ্গা—কোনটায় চটের পর্দা টাঙানো; ছাদের কড়িকাঠে বাঁশের ঠেকনো দেওয়া পতনোন্মুখ ছাদকে কোন মতে খাড়া রাখা হয়েছে। দেওয়ালে পলস্তরার চিহ্নমাত্র নেই, নোনা ধরা ইঁটের দেওয়াল—দগদগে ঘায়ের মত চক্ষু-পীড়া জন্মায়—সবচেয়ে অস্বস্তি লাগে—আধখানা মেঝে জুড়ে—টুটাভাঙ্গা তক্তাপোষটা দেখলে। ওর একটিও পায়া নেই—থাক থাক সাজানো ইঁটের ঠেকনা দেওয়া তক্তাপোষ আকণ্ঠ বইয়ে বোঝাই। তাই কি ভাল করে গুছিয়ে রাখা হয়েছে বইগুলি—যেন হাটের শাক-বেগুনের মত এক জায়গায় কে ঢেলে রেখেছে—পাইকারী দরে বিক্রী করবে বলে। এই বইয়ের স্তূপের মাঝখানে হাত চারেক লম্বা হাত আড়াই চওড়া যে খালি জায়গা টুকু দেখা যায় তার উপরে তেলচিটে একখানা মাদুর পাতা—বালিশ চোখে পড়ল না।

উনি হেসে বললেন, এই আমার বিদ্যামন্দির এই খানেই শুয়ে থাকি অনন্তশয্যা রয়েছে।

বললাম, এই এলোমেলো বইয়ের গাদা থেকে আপনার খুসিমত বই বেছে নেন কেমন করে? নিতে পারেন।

আমার সব ঠিক আছে—কোনটা কোথায় রয়েছে হাত দিলেই টের পাই। এ ঘরে আর কেউ আসে না—বইয়ে হাত দেয় না কেউ—আমার জিনিষটি ঠিক কোথায় আছে হাত দিলেই বুঝতে পারি। একটা কাঁচ ফাটা ময়লা চিমনী বসানো হ্যারিকেন—তারই অস্বচ্ছ আলোয় যতখানি সম্ভব---ঘর এবং ঘরের আসবাবপত্তর দেখে নিলাম। তক্তাপোষের তলায় যত রাজ্যের ডেয়ো, ঢাকনা জিনিস ইঁদুর আরশোলার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র—সাপ বাসা বাঁধলেই বা কে দেখছে।

আমাকে সেই নড়বড়ে তক্তাপোষের একধারে বসিয়ে বললেন, বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে আমার অনেক অভাব। সত্যি বলতে কি আমি কিছু বোধ করি না। যে যে বস্তু না থাকলে অভাব বোধ হয়, আমি সেই গুলিকে বর্জন করেছি। জান ভাইজী, আমি জুতো পায় দিই না ছেলেদেরও সেই অভ্যাস করিয়েছি। জামাও গায়ে দিই না—একখানা চাদরে গা ঢেকে যখন সভ্য হওয়া যায় তখন কাজ কি অত ঝঞ্ঝাটে। ছেলেরা অবশ্য কামিজ পরে। আধুনিক ইস্কুল কলেজে সভ্য পোষাক পরে যাওয়াই রীতি। মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ বাড়ীতে আসে না—ছেলেরাও অনুযোগ করে না। পান দোক্তা বিড়ি সিগারেট তামাক এসব বাড়ীর ত্রিসীমানাতে পাবে না। মেয়ের বিয়ের আগে বেয়াইকে সব কথা খুলে বলেছিলাম। জামাই এলে অসুবিধা হবে জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম পন টন দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, থাকলেও দিতাম না ওটা কুপ্রথা মনে করি। উনি হাসি মুখে সব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমার পরিবারে কারও চা খাওয়ার অভ্যাস নেই, মেয়েদের গহনা পরার অভ্যাসও নয়—অবশ্য যা অবস্থা তাতে সোনার স্বপ্ন মরীচিকা। আমার স্ত্রীর হাতে শাঁখা—পরণে লাল পাড় শাড়ী তাতেই উনি সুখী। ছেলেরা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে। ওরা ঋষি হবে—সত্যাশ্রয়ী হবে—এক একটি ঋষি বালক হবে—এই শিক্ষাই আজীবন দিয়ে এসেছি। সাতটি ছেলে দেশের সাতটি জায়গায় আশ্রম স্থাপন করবে। ভারতের প্রাচীন কালকে ফিরিয়ে আনবে—বিলাসের স্রোতে—যে জীবন ভাসছে—লোভে অহঙ্কারে কাম পীড়নে মাৎসর্য্যে মদগর্বে—যে জীবন রসাতলের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে—ওরা সত্যাশ্রয়ী ঋষি হয়ে তাকে আলোকের উদয়াচলে ফিরিয়ে আনবে। আমরা যে অমৃতের পুত্র পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের ধর্ম।

আবেগে উত্তেজনায় ওঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল—এক মুহূর্ত্ত থেমে আমার পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, কি ভাইজী পারব না?

পরিবর্তিত কালের কথা তুলে লাভ নাই—ওঁকে ভাবলোকচ্যুত করার কি অধিকার আমার আছে। উনি মূর্খ নন, বাস্তবজ্ঞান বর্জিত নন। অতি মাত্রায় আদর্শবাদী এবং ভাবপ্রবণ। সেই কারণে কল্পনার স্বর্গে বাস করেন। ভাবাতিবেগে অতিমাত্রায় বিচলিত হলে পারিপার্শ্বিক তুচ্ছ হয়ে যায়, তাতো জানা কথা। এই ভাবপ্রবণতার বশেই উনি পৃথিবীতে আদি যুগকে ফিরিয়ে আনতে চান। উনি চান মানুষ সেই যুগে বাস করুক যে যুগের জীবন বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, দেবকৃপা নির্ভর যে যুগে বিজ্ঞানের চেয়ে দেবকৃপার উপরেই নির্ভরশীল ছিল জনসমাজ। সেই যুগে বাষ্পীয় শকট ছিল না, বিদ্যুৎ আলো ছিল না, মুদ্রাযন্ত্র ছিল না—ক্ষেপনাস্ত্র রাডার, ট্যাঙ্ক, বিমান তো দূরের কথা বারুদের ব্যবহারও কেউ জানত না—সেই আদি যুগে অরণ্য আশ্রমে ভারতবর্ষ প্রত্যাবৃত্ত হোক।

সুস্থির করতে নানা যুক্তি তর্ক তুলে ওঁর ধারণাকে ভুল প্রমাণ করা মোটেই কঠিন নয়—কিন্তু ওঁরই আশ্রয়ে সাদরে অভ্যর্থিত হয়ে ওঁকে ভাবস্পর্শ লোক থেকে বিচ্যুত করার নিষ্ঠুরতা আমি দেখাতে পারলাম না। এই দণ্ডে ওঁর ঘরে বসে ওঁর নিরাবরণ দুঃখ বা তপস্যাকে (যদিও ওঁর মতে এটা দুঃখ নয়) প্রত্যক্ষ করলাম এবং আমার মনে বার বার প্রশ্ন জাগল—উনি তো উচ্চশিক্ষিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। ইচ্ছে করলে অন্ততঃ শিক্ষকতা নিয়ে নিজের আর্থিককৃচ্ছ্রতা নিবারণ করতে পারতেন—সেই পথেও তো সৎ নীতি প্রচার ও সৎশিক্ষা দেবার সুযোগ ছিল প্রচুর, তবে কেন তা করলেন না?

এক সময়ে মনের ভাব প্রকাশ করে ফেললাম যাতে উনি বেদনা না পান তেমন করেই কথাটা পাড়লাম, আপনি কি শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন?

উনি বললেন, অবসর নেবার বয়স হয়নি, তবু নিলাম। কেন জান? একটু থেমে বললেন একদিন ক্লাসে ছেলে পড়াতে পড়াতে তন্দ্রা মত এসেছিল বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হল। বাড়ী এসে ভেবে দেখলাম, এটা তো ঠিক হচ্ছে না কর্তব্যচ্যুত হচ্ছি। ছেলেরা কত আশা করে আমার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করতে এসেছে, আমি আলস্যবসে ওদের আশা পূর্ণ করতে পারছি না, কর্তব্যে ফাঁকি দিচ্ছি। আরও ভেবে দেখলাম—ওরা কেউ হয়তো পিতৃহীন—বিধবা মায়ের একমাত্র আশা ভরসা স্থল—কারও বাপ হয়তো সামান্য আয়ের দিন-মজুরী করে—ছেলে মানুষ হলে দুঃখ ঘুচবে এই ভরসা—ওরা একান্ত নির্ভর করে আমার হাতে দিয়েছে ছেলেকে—আর আমি কিনা আলস্যবসে কাজে ফাঁকি দিচ্ছি—। ওদের বিশ্বাসকে নষ্ট করছি। মনে ধিক্কার এল। মাস্টারি ছেড়ে দিলাম।

এখন তো আপনাকে সুস্থ মনে হয়। এখনও তো বাড়ীতে বসে অনায়াসে ছেলে পড়াতে পারেন। হেসে বললেন, না পারি না মনকে বিশ্বাস নাই—একটু প্রশ্রয় পেলে অনেকখানি চায়। না—আমার দ্বারা মাস্টারী করা আর সম্ভব নয়। দেহ অপটু হয়ে আসছে। সব সময়ে স্ব-বসে থাকে না।

আবার উনি বর্ত্তমান যুগের নীতিভ্রষ্টতা ও অনাচার নিয়ে অক্ষেপ প্রকাশ করলেন। বললেন, এই ভাবে চললে পৃথিবী ধ্বংস হবে, মানুষের দুঃখ কষ্ট বাড়বে—ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না কোন কালে। আর স্বাধীন হয়েই বা কি ফল। ন্যায়নীতিভ্রষ্ট জীবন আর শূন্যগর্ভ মেঘ দুইই নিষ্ফল। কোন উপকারে আসে না একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, একখানা বই লিখেছিলাম, তাতে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও বর্ত্তমান কালের অনাচার সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি—পড়ে দেখো। তক্তাপোষের একধারে বইয়ের স্তূপ থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে আমার হাতে দিলেন। বইয়ের নাম 'বর্ত্তমান যুগের বেগ ও উদ্বেগ।' বইখানা হাতে নিয়ে উঠছিলাম। উনি বললেন, আর একটা জিনিস দেখাই। বলে—লণ্ঠন হাতে করে কুলুঙ্গির কাছে গেলেন। কুলুঙ্গির ভিতর থেকে ফ্রেমে বাঁধানো একখানা ফটো বা'র করে আনলেন। হাতের লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরলেন তার উপরে। অপরিষ্কার কাচের মধ্যে ঝাপসা হয়ে আসা এক মূর্তি। চেহারা সনাক্ত করা তো দূরের কথা সেটা যে আদৌ মানুষ মূর্তি প্রমাণ করা দুষ্কর। উনি সেই ফ্রেমের উপরে মাথা ঠেকিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললেন, আমার পিতাঠাকুর আমার পরমগুরু। সকালে উঠে প্রথমেই ওঁকে দর্শন করি। তারপর সেই কুলুঙ্গির গর্ভ থেকে টেনে আনলেন শক্তমত একটি জিনিস। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে বস্তু পরিচয় হল, আকারহীন একজোড়া জুতো, সেটিও মাথার উপরে রেখে—শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, পিতৃদেবের এই পবিত্র চিহ্নটি মাথা ঠেকিয়ে আমার প্রাতিদিনের কাজ সুরু হয়। আমি ভারি নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করি। ফটো ও জুতো জোড়া যথাস্থানে রেখে লণ্ঠনটি উঠিয়ে নিলেন। বললেন, চল খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

বললাম, না থাক বাইরে দিব্য জ্যোৎস্না—পথ চিনতে কষ্ট হবে না।

পথের বাঁক ফিরবার মুখে আর একবার চাইলাম—বাড়ীটার পানে ক্ষীরোদবাবু তখনও লণ্ঠন হাতে রোয়াকে দাঁড়িয়ে আছেন—পূর্ণিমামুখী চাঁদের আলো চারিদিকে। অতিশয় উজ্জ্বল সেই জ্যোৎস্না ধোয়া রোয়াকে আলোটাকে ভারি বেমানান মনে হল।

দু'বছরও হয়নি উনি দেহ রেখেছেন। শেষের কয়েক বছর ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। পরমাণবিক যুগের নব নব মারণাস্ত্র আবিষ্কার। লুনিকের জেমিনির চন্দ্রাভিযান—মহাকর্ষ পার হয়ে মহাশূন্যলোকে মানুষের পরিভ্রমণ, বিজ্ঞান নূতন সৃষ্টি কর্তার ভূমিকা নেওয়ার সংবাদ শুনে ওঁর সে অরণ্য আদর্শের কোন রূপান্তর ঘটেছিল কিনা জানতে ভারি ইচ্ছা করে। উনি ওঁর আদর্শবাদের স্বপ্নলোকে শেষ পর্যন্ত আত্মমগ্ন থাকতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহজনক! নিরবধি কালের নিষ্ঠুর আঘাত এড়ানো বড় সহজ কথা নয়।

বিশ্বের বিস্ময় বিকিলা

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

আজকের দিনে কোন কৃতিত্বকেই যেন আর অসাধারণ বলে গণ্য করা যায় না। বিশ্বজয়ীর কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়ে প্রতিনিয়তই দেখা যায় নতুন বিশ্বশ্রেষ্ঠের আবির্ভাব। আজ যে অসাধারণ কাল সে অতি সাধারণ বলে প্রতীয়মান হয়। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই প্রগতির পথে বিশ্বমানবের এই গতি আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়।

এখনকার দিনে অসম্ভব, অপ্রতিহত অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভৃতি কথাগুলি পুরাণে কল্পিত বীরদের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। যদি কাহাকেও এই অধিকার দেওয়া হয় তা'হলে এটাকে বাস্তব বর্জিত বলেই মনে হবে। আর একদা সভ্যতা বর্জিত তিমিরাচ্ছন্ন দেশের কোন একজনকে যদি এই বিশেষণে ভূষিত করা হয় তবে সেটাকে অলৌকিক বলেই মনে হবে।

কয়েক দশক আগে পর্য্যন্তও আফ্রিকা মহাদেশ সভ্য জগতের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ বা Dark Continent নামে পরিচিত ছিল, সে দিন পর্য্যন্তও এখানকার মানুষ আদিম সভ্যতার যুগে অবস্থান করে আছে বলে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও সমগ্র জগতের নিকট আফ্রিকাবাসীরা এক অনগ্রসর জাতি নামে পরিচিত ছিল। কোন কাজ যে তারা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে করতে পারে—একথা তখন সাধারণের ধারণারও অতীত ছিল।

অতীতের সেই অন্ধকার মহাদেশ আজ সভ্যতার নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আফ্রিকাও আজ অন্যান্য দেশের সহিত কালের সঙ্গে সমান তালে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগীতায়ও তারা আজ জগতের এক অন্যতম জাতি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সভ্যতার আলোকদীপ্ত নবীন আফ্রিকায় বাস্তব জগতেরই কোন এক অলৌকিক কীর্ত্তিধারী কৃষ্ণাঙ্গকে নিয়েই আজকের এই গল্পের অবতারণা।

আফ্রিকায় ইথিয়োপীয়া একটি স্বাধীন ছোট্ট পর্বতময় দেশ। ইহার পূর্ব নাম ছিল আবিসিনীয়া। ইথিয়োপীয়া একটি রাজতন্ত্র শাসিত দেশ। এখানকার রাজা হাইলে সেলাসী। তিনি তাঁর সরল নিরাড়ম্বর প্রজাদের নিয়ে এখানে রাজত্ব করেন। বলশালী কর্মঠ আফ্রিকানরা এখানকার অধিবাসী।

এদেরই একজনকে নিয়ে আজকের এই কাহিনী। নাম আবি বিকিলা (Abbe Bikila)। এক অতি সাধারণ নিগ্রো পরিবারের ছেলে এই আবি বিকিলা।

শৈশব থেকেই বন-পর্বতের পথে পথে প্রকৃতির কোলে বড় হয়ে উঠেছে বিকিলা। প্রকৃতির গড়া এই দীর্ঘদেহী কৃষ্ণাঙ্গ যুবক কষ্ট সহিষ্ণুতায় যেন এক মূর্ত্ত প্রতীক। অসীম মনোবলের অধিকারী এই দীর্ঘদেহী কৃষ্ণাঙ্গ যুবক।

স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই তার জীবন তৈরী হয়ে উঠেছে। অসমতল পার্বত্য বনপথে নগ্ন দুটি পায়ে দৌড়ানয় তিনি অভ্যস্থ। এই জন্যই জুতাপায়ে দৌড়ানয় তিনি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না। অনাবৃত দু'টি নগ্ন পায়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে মাইলের পর মাইল ছুটে যান তিনি।

অতঃপর এই দীর্ঘদেহী কৃষ্ণাঙ্গ কর্মঠ যুবককে দেখে পছন্দ করে রাজা হাইলে সেলাসী তাকে তাঁর দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন।

আবি বিকিলা কাজ করেন আর দৌড় অভ্যাস করেন। বিখ্যাত সুইডিস কোচ Onip Niskamen ১৯৪৭ সালে ইথিয়োপীয়ায় আসেন। এই সময়

অনভিজ্ঞ বিকিলা Niskamen এর দৃষ্টিপথে পতিত হন।

Niskamen চিন্তা করেন উপযুক্ত শিক্ষাধীনে এই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হয়ত বা কোনদিন অসম্ভবকে সম্ভব করলেও করতে পারে। অতঃপর Niskamen এর তত্ত্বাবধানে দূর পাল্লার দৌড় শিক্ষা শুরু হল বিকিলার। বিদেশী শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিকিলা তার সম্ভাবনাময় জীবনের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হলেন।

ছোট্ট দেশ ইথিয়োপীয়া ইদানীং অলিম্পিকে তার প্রতিনিধি প্রেরণে অভিলাষী হয়েছেন। Niskamen এর তত্ত্বাবধানে ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণে বিকিলা আজ দেশের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর রূপে পরিগণিত হয়েছেন। তাই তিনি ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন করেছেন।

ঐতিহ্যময় অলিম্পিকের কথা এখন আর আফ্রিকাবাসীর অজানা নয়। এ কথাও জানা আছে তাদের এখানে বিজয়ীর সম্মান লাভ বড়ই কষ্টসাধ্য। কয়েকজন মাত্র বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদই এই সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হন।

এই জন্যই বোধহয় দেশের অলিম্পিক প্রতিনিধিকে বিদায় সংবর্দ্ধনা জানানোর জন্য একদল ইথিয়োপিয়াবাসী কৃষ্ণাঙ্গকে বিমান বন্দরে দেখা গিয়েছিল সেদিন।

সহজ সরল নিরাড়ম্বর হল তার দেশবাসীগণ। আর তেমনি সহজ সরল ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়েই তারা বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়েছিল সেদিন—'বিকিলা যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসে।' বিকিলার অভিলাষ কিন্তু তখন আরও উচ্চতর "একটা জয়ের মতন জয়।" সম্মিলিত একটি মাত্র কামনায় বিমান বন্দর সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল সেদিন—"জগৎসভায় বিকিলা যেন জয়ী হয়।"

অভিজ্ঞ শিক্ষক Onip। তাঁর তত্ত্বাবধানায় বিকিলা হৃদয়ঙ্গম করেছে ভাল দৌড়বীর হতে হলে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে দৌড়ান উচিত। শুধু শক্তি ও সামর্থই নয়; ভাল দৌড়বীর হওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অবলম্বন করা আবশ্যক। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমে উন্নতির চেয়ে অবনতির সম্ভাবনাই বেশী থাকে।

Onipএর প্রচেষ্টায় বিকিলা এখন দূরপাল্লার দৌড়ে একজন পারদর্শী দৌড়বীর। ১০০০০ হাজার মিটার দৌড়ে এখন তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে ম্যারাথনের প্রতি তাঁর দুর্বার আকর্ষণ।

ম্যারাথন দৌড়ের ভেতর কেমন যেন একটা মাদকতা অনুভব করেন তিনি। ম্যারাথন দৌড় তার নিকট যেন একটা নিজস্ব গৌরবে মহীয়ান। সকল প্রতিযোগীতাই ম্যারাথনের নিকট তুচ্ছ বলে মনে হয় তাঁর কাছে।

ম্যারাথন দৌড়ের নামেই তার মনে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—সৌর্য্য বীর্য সহিষ্ণুতা ও দেশপ্রেমের এক ঐতিহ্যময় ইতিহাস। ম্যারাথন নামেই স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে অলিম্পিকের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীতা। ঐ নামেই মনে এনে দেয় ম্যারাথন রণক্ষেত্রে পারস্যাধিপতি দারায়ুসের বিরুদ্ধে গ্রীকবীর লিওনিডাসের জয়লাভ বার্ত্তা বহনকারী ফিডিপিডিসের ছাব্বিশ মাইল দৌড়ের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তিকথা।

বিকিলার একমাত্র সঙ্কল্প—'একটা জয়ের মতন জয়, একটা অনিবার্য্য জয় অর্থাৎ এক অবিসম্বাদিত জয়।'

অন্তরের প্রবল বাসনা তার—'তৎপরতার সঙ্গে এক অনায়াস জয়লাভ।' কষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে জয়লাভ করাটা বিকিলার নিকট বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে। সে জয়লাভ তার কাছে সবলতাও সহিষ্ণুতার পরিচায়ক নয়, সেটি হচ্ছে দুর্বলতার নিদর্শন। ক্লান্তি জর্জরিত অবস্থায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে তিনি দৌড় শেষ করেন নি কোনদিন। জীবনে কষ্ট হয়ত তিনি পেয়েছেন কিন্তু সে কষ্টের বহিঃপ্রকাশ কেউ কোনদিন তার মধ্যে দেখেন নি।

অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে বিকিলা তাঁর দলের সঙ্গে রোমে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রোমের আবহাওয়া বিকিলার বেশ মনের মতন হয়েছে।

এখানকার আবহাওয়া অনেকটা আদিস আবেবার মতন। সেই জন্যই বিকিলা আজ বেশ পুলকিত।

প্রতিযোগীতার পূর্বের কয়েকটা দিন শিক্ষকের নির্দেশানুসারে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে তিনি অনুশীলন করেছেন। কোনদিন সমান গতিতে চারিটি পৃথক ১৫০০ মিটার দৌড়েছেন, কোনদিন দৌড়েছেন তীব্র গতিতে একটা ৫০০০ মিটার দৌড়, আবার কোনদিন হয়ত অলিম্পিক রাস্তায় চারিটি বিভিন্ন ২০ কিলোমিটার দৌড় দৌড়েছেন তিনি।

এরই মধ্যে তিনি লক্ষ্য করে রেখেছেন অলিম্পিক পথের শেষ বাঁকের মুখে Obelisk of Axum. । ম্যারাথন রেসের শেষ সীমা এখান থেকে ঠিক এক কিলো মিটার।

চাচের নিকটস্থ সমতল রাস্তাটিও তিনি নজর করে গিয়েছেন। এই স্থান থেকে কিছুদূরে 'Appian Way'র দীর্ঘ আট কিলোমিটার পথটি ঢালু হয়ে ধীরে ধীরে এসে সমতলের সঙ্গে মিশেছে। এই সমতল কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে আবার উঠে পুরান শহরের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে।

অলিম্পিক পথের ঐ সুবিস্তৃত উৎরাইয়ের পর চল্লিশ কিলোমিটারের মাথায় এই রকম একটা চড়াইয়ে আরোহন করা বাস্তবিকই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

বিকিলা চিন্তা করে রেখেছেন চরম ফলাফলের দৌড়ের জন্য শেষ পর্য্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্য এইটাই হবে তবে উপযুক্ত স্থান।

অলিম্পিকের শেষদিনে বেলা প্রায় ৫॥. ঘটিকার সময় বিশ্বের প্রথম পর্যায়ের ৭০জন দূর পাল্লার দৌড়বীর সেন্ট পিটারস্ চার্চ সংলগ্ন ময়দানটিতে এসে লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শুরু হবে দৌড় এইবার। সত্তরজন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র তিনটি প্রতিযোগীর নম্বর বিকিলাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে ২৬, ১৩ এবং ১৯। এর মধ্যে সেরা হলেন মরক্কোর প্রতিনিধি ২৬ নং প্রতিযোগী র‍্যাডী (Rhadi)।

অতঃপর শুরু হল রোম অলিম্পিকের ম্যারাথন দৌড়। দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ।

ছুটে চলেছেন প্রতিযোগীরা। চতুর্দিক থেকে কেবলমাত্র পদধ্বনি কানে আসছে। দৌড়রত বিকিলার মনে কেবলমাত্র তিনটি নম্বরই জেগে আছে—২৬, ১৩, এবং ১৯।

খুব সংযত হয়ে ছুটে চলেছেন বিকিলা। প্রতিযোগীরা পার হয়ে গেলেন শহর পরিখার সীমা। তারা এখন তিনটি দলে অলিম্পিক পথ পরিক্রমায় রত। বিকিলা এখন রয়েছেন দ্বিতীয় দলে।

পদদ্বয়ের সমতা বজায় রেখে বিকিলা এখন পুরগামীদের অনুসরণে রত। মনে হচ্ছে বিকিলার গতিবেগ যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর পদদ্বয় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কিন্তু ঠিক একই দূরত্বের ব্যবধানে।

কিছুক্ষণ পরে বিকিলাকে দ্বিতীয় দলের পুরোভাগে ছুটে চলতে দেখা গেল। রোমের পথ দিয়ে ছুটে চলেছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তরজন দূর পাল্লার দৌড়বীর।

দ্বিতীয় দলের অন্যান্য প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে বিকিলা ক্রমশই এগিয়ে চললেন। পুরোবর্তীদের থেকে বিকিলার দূরত্বের ব্যবধান ক্রমেই কমে যেতে আরম্ভ করল। অতঃপর সম্মুখের একটি পথের বাঁকের নিকট প্রথম দলকে ধরে ফেলে ছুটে চললেন তিনি।

বিভিন্ন পদক্ষেপে ধাবিত হচ্ছেন কয়েকজন দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন, কষ্টসহিষ্ণু বলশালী যুবক। বিভিন্ন গতিতে তারা পাশ্চাদিক বরাবর ছুটে যাচ্ছেন। পশ্চিমের পড়ন্ত রোদ চোখের ওপর এসে পড়ে কি রকম যেন একটা দৃষ্টিভ্রম এনে দিচ্ছে। এ সত্বেও প্রতিযোগীরা কিন্তু একই ভাবে দৌড়ে চলেছেন।

প্রতিযোগীরা ১৩ কিলোমিটার পথ পার হয়ে এলেন। এবার দেখা যায় তারা চড়াইয়ের ওপর উঠছেন। একটা বাঁকের মুখে এই সময় দু'জন প্রতিযোগীকে দৌড় থেকে অবসর গ্রহণ করতে দেখা গেল।

দুর্দাম গতিতে ছুটে চলেছেন বিকিলা। এক এক জনকে পেছন থেকে এসে ধরে ফেলে বিকিলা ক্রমেই এগিয়ে চলেছেন। অতঃপর পুরোভাগে অবশিষ্ট থেকে আর মাত্র চারজন দৌড়বীর।

অর্ধপথ অতিক্রম করার সময় একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে তিনি লক্ষ্য করেন পূর্বের চারজন প্রতিনিধি ডান দিকে মোড় নিয়ে পুনরায় ছুটতে আরম্ভ করলেন।

বিকিলা চিন্তা করতে করতে ছুটেছেন। এইবার আসবে Appian Way'র সর্বোচ্চ স্থানটি। দৌড় শেষ হতে এখনও তবে ১০ কিলোমিটার বাকী।

রাস্তার সঠিক দূরত্ব মধ্যবর্তী চড়াই উৎরাই সবই এখন বিকিলার নখ-দর্পণে। স্বীয় গতিবেগ এবং পদদ্বয়ের দূরত্বের ব্যবধান সম্বন্ধেও তিনি বেশ সচেতন।

ক্ষণেকের তরেও তিনি একবার ফিরে তাকাচ্ছেন না তার অনুগামীদের উদ্দেশ্যে। পুরোভাগের চারজনের কথাই চিন্তা করতে করতে তখন ছুটে চলেছেন আবি বিকিলা।

দর্শকদের আনন্দ ধ্বনি আর জয়োচ্ছাসের ক্ষীণ ধ্বনি মাঝে মাঝে তার কানে আসছে। এই সময় ঐ জয়োচ্ছাসের মধ্যেই 'র‍্যাডি' নামটি একবার কানে এল তাঁর। এই সঙ্গেই পূর্ব সংগৃহীত সব নম্বরগুলিই তাঁর মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

বিকিলা ছুটছেন আর চিন্তা করছেন—র‍্যাডির নম্বর তো আলাদা। র‍্যাডি হয়ত অন্য নম্বরে দৌড়চ্ছেন? কিংবা একাধিক র‍্যাডি হয়ত এই প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

চিন্তা ক্লিষ্ট বিকিলা অতঃপর র‍্যাডি বিষয়ক সমস্ত চিন্তা দূরে ফেলে রেখে দ্বিগুণ গতিতে ছুট্‌তে আরম্ভ করলেন। মনের মধ্যে তখন তার একটি মাত্র চিন্তা—'পূর্বগামীদের পরাস্ত করতেই হবে।'

ছুটে চললেন বিকিলা। পূর্ববর্তী তিনজনকে একের পর এক পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছেন বিকিলা। অতঃপর দেখা গেল পুরোভাগে রয়েছেন সম্মুখ অভিমুখে ধাবমান দুই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক র‍্যাডি এবং বিকিলা।

তারা ছুটে চলেছেন এখন 'Appian Way'র শীর্ষ স্থানটির উদ্দেশ্যে। যেখানে সমতল পাওয়া যায় র‍্যাডি সেখানে এগিয়ে যান। আর উর্দ্ধারোহনের সময় বিকিলা সেটুকু পুষিয়ে নেন দুই পায়ের দূরত্বের সমতা বজায় রেখে। মাঝে মাঝে দেখা যায় তারা ছুটে চলেছেন পাশাপাশি।

সেদিন শেষ বেলায় দৌড় শুরু হয়েছে। এই জন্যই দৌড় শেষ হবার আগেই সেদিন আঁধার ঘনিয়ে এল।

এই সময় ঐ আঁধারের মধ্যেই মোটর সাইকেল বাহিনীকে হেডলাইটের তীব্র আলোর সাহায্যে নির্দেশিত পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। আর দেখা যায় যন্ত্রযানের পেছনের লাল বাতিটির প্রতি দৃষ্টি রেখে ছুটে চলেছেন দুই বিজয় অভিলাষী দৌড়বীর।

তমসাবৃত সেই অলিম্পিক পথের কিছুদুর অন্তর অন্তর সামরিক বাহিনীর সৈনিকদের মশাল হাতে দণ্ডায়মান থাকতে দেখা যায়। মশালের আলোয় নিকটবর্তী স্থানগুলি বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছে তখন।

তাঁরা এখন পর্য্যায়ক্রমে ছুটে চলেছেন আলো এবং আলোআঁধারি মেশানো সুবিস্তৃত অলিম্পিক পথ দিয়ে। এই সময় পরিশ্রান্ত র‍্যাডিকে ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়তে দেখা গেল। দু'জনের দূরত্বের ব্যবধানও ক্রমশই দীর্ঘতর হতে আরম্ভ হল। সকলেই এখন এই দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গের জয়লাভ সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিত। সকলেই জানে ভবিষ্যতের ম্যারাথন চ্যাম্পিয়ন তবে এই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক।

দর্শকদের মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন নি -'কোন দেশের প্রতিনিধি এই যুবক?' অনেকের মনেই প্রশ্ন তখন—'অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে চলেছেন কে এই যুবক? অলিম্পিক ইতিহাসে এ রকম দৌড়ত আজ পর্য্যন্ত কেউ দৌড়ায় নি।

ছুটে চলেছেন অবিশ্রান্ত র‍্যাডি। অমানুষিক পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি যেন ভেঙে পড়েছেন। তবুও ছুটে চলেছেন। ওদিকে দুই প্রতিযোগীর দূরত্বের ব্যবধানও ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। প্রতিযোগীরা কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় স্থির লক্ষ্যে তাদের গন্তব্যস্থল অভিমুখে ধেয়ে চলেছেন। কেউই তবে প্রতিযোগীতা থেকে অবসর নিতে রাজী নয়।

অতঃপর প্রবল উত্তেজনা ও উল্লাস ধ্বনির মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ বিকিলাকে ষ্টেডিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়। অতি সহজ সরল সাবলীল ভঙ্গিমায় ষ্টেডিয়ামের চক্রপথের ওপর দিয়ে তিনি দৌড়তে আরম্ভ করলেন। অতঃপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে এসে ফিতা স্পর্শ করে তিনি মৃদু ব্যায়ামে আপনাকে নিয়োজিত করলেন। পরিশ্রান্তির কোন লক্ষনই তখন তার মধ্যে প্রকাশ পায় নি।

এর কিছুক্ষণ পর বিস্মিত সময় রক্ষক চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন—সময় ২ঘন্টা ১৫মি ২৬·২সেকেণ্ড। একটা অভুতপূর্ব ঘটনা। একটা বিশ্ব রেকর্ড।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে দর্শকদের মধ্যে তখন সম্বিত ফিরে এসেছে। তারা অধীর আগ্রহে পরবর্তী প্রতি-যোগীদের জন্য অপেক্ষামান রয়েছেন। কিন্তু তমসাবৃত ষ্টেডিয়ামের ত্রিসীমানার মধ্যেও কোন প্রতিযোগীর আগমন বার্তা জানা যায় না তখন।

এই রকম বহু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মোটর সাইকেলের উদ্ভাসিত আলোচ্ছটায় ঐ অন্ধকারের মধ্যেই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মরক্কোর র‍্যাডীর আগমন সংবাদ জানা গেল।

এরও কিছু সময় বাদে নিউজিল্যাণ্ডের বেরী ম্যাজেল (Berry Magel) ধীরে ধীরে এসে ম্যারাথন রেসের শেষ সীমায় উপস্থিত হলেন সেদিন।

এই হলো অলিম্পিক বিস্ময় আবি বিকিলার জীবন ইতিহাস। শুধু এইখানেই এ ইতিহাসের শেষ নয়। আরও কিছুটা বাকী ছিল বোধহয় পরবর্তী ১৯৬৪ সালের জাপান বিশ্ব অলিম্পিকের জন্য।

এরপর অলিম্পিকের আসর অনুষ্ঠিত হল জাপানের টোকিওতে। দিনটি ছিল ২১শে অক্টোবর ১৯৬৪ সাল।

আবি বিকিলাকে আবার দেখা গেল অলিম্পিক প্রাঙ্গনে।

এই অলিম্পিকের মাত্র একমাস পূর্বে ১৬ই সেপ্টেম্বর আপেনডিক্সের (Apendix) অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে বেশ কিছুদিন শয্যাগত থাকতে হয়।

এবারের জন্য বিশ্ববাসী ভালভাবেই অবগত ছিলেন. যে পুনরায় এক বৎসরের মধ্যে বিকিলার পক্ষে আর ম্যারাথন দৌড় সম্ভবপর নয়।

এবারও দেখা যায় আধুনিক ক্রীড়াজগতের বাঁধা ধরা সমস্ত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও যাবতীয় চিকিৎসাবিধি হেলায় তুচ্ছ করে দিয়ে পুনরায় বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে বিকিলা আবার একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। সময় ২ঘন্টা ১২মিনিট ১২·২সেকেণ্ড।

এ যেন এক রূপকথার কাহিনী। একটা অলৌকিক ঘটনা যা এই বাস্তব জগতেই সম্ভবপর হয়েছিল একদিন।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমে একদল বালিকা কর্তৃক "বন্দে মাতরম্" এবং অন্যান্য জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার পর স্বরাজ্য সম্বন্ধে তামিল ভাষায় রচিত একটি গান গাওয়া হল।

সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ যমনালাল বাজাজ তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে উঠলেন। তিনি হিন্দীতে অভিভাষণ দিলেন। সাদরে—নির্ব্বাচিত সভাপতি ও উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও জঙ্গী আইনের বলে নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শোনালেন। এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের গভর্ণর মাইকেল ওডেয়ার নামের পূবে স্যর উপাধি ব্যবহার করায় আপত্তি জানিয়ে কয়েকজন প্রতিনিধি তা পরিত্যাগ করতে বললেন।

এই সময় প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে এবং অত্যন্ত গরমে একজন প্রতিনিধি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন এবং অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় থাকেন, এতে খুব হৈ চৈ গণ্ডগোল আরম্ভ হল।

শান্তি স্থাপনের পর পুনরায় শেঠজী তাঁর অভিভাষণ পড়তে লাগলেন। পাঞ্জাবের বিবরণ শুনে সমবেত জনতা 'শেম' 'শেম' ধ্বনি দ্বারা ধিক্কার জানাল।

তারপর শেঠজী অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করে তার বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং জাতির নির্দেশ মেনে চলার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান।

শেঠজীর অভিভাষণের পর শ্রী বি, ও, সৌকত শ্রীবিজয় রাঘবাচারিয়াকে সভাপতি পদে নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করে তাঁর বিবিধ গুণাবলী ও দেশ সেবার উল্লেখ করলেন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে মহাত্মা গান্ধী বললেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর কমে এসেছে এবং তিনি পূর্বের মত বক্তৃতা করতে পারেন না, তিনি বিজয় রাঘবাচারিয়া মশায়ের অশেষ গুণের উল্লেখ করে সমবেত প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করলেন যেন তাঁরা সম্পূর্ণ শান্তি বজায় রাখেন এবং যাঁরা তাঁদের মতের বিরুদ্ধে কথা বললেন তাঁদের প্রতি যেন অসহিষ্ণু না হন। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করলেন যেন কোন ভাষণ "শেম, শেম" ধ্বনি দ্বারা বিঘ্নিত না হয়। বিতর্কমূলক প্রস্তাব সম্বন্ধে মত প্রকাশের উপযুক্ত সময় হচ্ছে ভোট দেবার সময়।

লালা লাজপত এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে শ্রীবিজয় রাঘবাচারীয়া অপেক্ষা খাঁটি নির্ভীক ও উৎসর্গীকৃত প্রাণ দেশ সেবক মিলবে না, ইনি গত ৩০ বৎসর ধরে দেশের সেবা করে আসছেন এবং জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার সময় থেকে দেশের কর্মীগণের পুরোভাগে আছেন।

মাদ্রাজের টি, ভি, ভেঙ্কটরমণ আইয়ার প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে তিনি মাদ্রাজী। এ পর্য্যন্ত মাদ্রাজ থেকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন খুব কমই হয়েছে সুতরাং এবারকার সভাপতি নির্বাচন খুব বিচক্ষণতার সহিত করা হয়েছে। এজন্য তিনি সকলের নিকট মাদ্রাজের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। অসহযোগের কর্মসূচীর কতকাংশ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা সত্বেও কংগ্রেসে তা গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের আগে কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রীবিজয় রাঘবাচারিয়া একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন।

তারপর মহম্মদ আলী ও চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর নির্বাচিত সভাপতিকে পুষ্প-মাল্যে শোভিত করে সভাপতির আসনে নিয়ে যাওয়া হল।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে দাঁড়ালেন। তিনি দাঁড়াতেই সমবেত জনতা বিপুল জয়ধ্বনি দ্বারা উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল।

সভাপতি মহাশয় তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণ পড়তে আরম্ভ করলেন কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। ভীড়ের চাপে ও প্রচণ্ড গরমে প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ পিপাসার্ত হয়ে 'জল' 'জল' বলে চিৎকার করায় এমন বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হল যে বৃদ্ধ সভাপতির পক্ষে অভিভাষণ পড়া অসম্ভব হয়ে পড়ল।

এই বিশৃঙ্খলতার সময় জনতার যে অংশ স্থানাভাবে প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রবেশ করতে পারেনি তারা গোলমাল সৃষ্টি করল। তাদের শান্ত করার জন্য মহাত্মাগান্ধী প্যাণ্ডেলের বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিলেন। বাইরেও বিপুল জনতার সমাবেশ হয়েছিল। মহাত্মার একারপক্ষে সকলকে শান্ত করা অসম্ভব হওয়ায় সৌকত আলীর বাইরে গিয়ে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। এতে বাইরের গোল-মাল শান্ত হল কিন্তু ভিতরে গোলমাল চলতেই লাগল।

গোলমাল কতকটা শান্ত হওয়ার পর সভাপতি মশায় পুনরায় অভিভাষণ পড়তে আরম্ভ করলেন কিন্তু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর প্রতিনিধিদের নিকট পৌঁছচ্ছে না দেখে তিনি অগত্যা বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র পালের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে অভিভাষণ পাঠ করতে অনুরোধ করলেন। বিপিন বাবু তার জলদগম্ভীর কণ্ঠে উচ্চস্বরে অভিভাষণ পাঠ করতে আরম্ভ করলে সকলে শান্ত হল।

সভাপতি মশায় তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে শাসন-নীতির বিস্তারিত আলোচনা করেন, পাঞ্জাবের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনার সময় স্তর মাইকেল ওডেয়ার, জেনারেল-ডায়ার এবং অন্যান্য জঙ্গী আইন প্রয়োগকর্তাদের নাম উল্লেখের সময় অনেকেই ওদের নাম উল্লেখে আপত্তি করেন।

এরপর পাল মশায় অসহযোগ সম্বন্ধে সভাপতি মশায়ের বক্তব্য পড়তে আরম্ভ করেন।

কিছুদূর পড়েই পাল মশায় জানালেন যে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পক্ষে আর অভিভাষণ পড়া সম্ভব নয়। এই বলে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

অগত্যা অতিবৃদ্ধ সভাপতি মশায় দাঁড়িয়ে লিখিত ভাষণ না পড়ে অসহযোগ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত মৌখিক ভাষণে ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন যে তিনি অসহ-যোগের মূলনীতি বিশ্বাস করেন কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করার কর্মসূচী সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

পরিশেষে তিনি বললেন পাঞ্জাবে ভারতীয়গণ সিন-ফিনের মত কাজ করে নি। ব্রিটিশেরাই সিনফিনের মত কাজ করেছে। আমরা ইংরাজদের বলব, হয় আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার কর নচেৎ দেশ থেকে চলে যাও। এই উক্তিতে সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি হল।

বক্তৃতা শেষে সমুচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায় আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর সাধারণ সম্পাদক বিঠল ভাই প্যাটেল সেই দিনই সন্ধ্যার সময় প্যাণ্ডেলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রদেশের বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচন করার জন্য প্রতিনিধিগণকে নির্দেশ দিলেন।

সে দিনের মত সভার কার্য্য শেষ হল।

(৫)

২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য প্যাণ্ডালের পূর্বদিকের গ্যালারীতে মিলিত হলাম, সেই দিনই কলকাতা থেকে ট্রেনে বোম্বাই হয়ে বাংলার আরও প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি নাগপুর পৌঁছান। এদেরও দাশ মশায় দলবৃদ্ধির জন্য টাকা খরচ করে আনিয়েছিলেন। কিন্তু সময় মত পৌঁছতে না পারায় প্রতিনিধির টিকিট সংগ্রহ করে কংগ্রেসে যোগদান করতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁরা বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন।

সুতরাং সে সন্ধ্যায় যাতে সদস্য নির্বাচন স্থগিত থাকে তার জন্য দাশ মশায়ের দল সচেষ্ট হলেন। অসহযোগ প্রস্তাবের সমর্থকগণ তখন পর্য্যন্ত সংখ্যায় গরিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তাঁরা এই সুযোগে সেই সন্ধ্যাতেই বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতিনিধিদের সভার সভাপতি নির্বাচন করে সভার কাজ আরম্ভ করলেন। বিরোধীদের পক্ষ থেকে সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র জিতেন বাবুকে অনুরোধ করলেন। সে অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বচসা সুরু হল। বচসা থেকে ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হল। উভয়ে উভয়ের দিকে শূন্যে ঘুঁসি ছুড়তে লাগলেন। সৌভাগ্যের বিষয় উভয়ের দিকে ব্যবধান একটু বেশী থাকায় ঘুঁসিগুলি কারও অঙ্গস্পর্শ করল না। এরপর বচসা দুই দলের মধ্যে সংক্রামিত হল। বচসা থেকে ক্রমে দুদলের মধ্যে হাতাহাতি হতে হতে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। বড় বাজারের বহু মাড়োয়ারী ও উত্তর ভারতের বহু লোক যাঁরা কলকাতায় নানা কার্য্যোপলক্ষে বাস করতেন তাঁরা—কলকাতা হতে বাংলার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই মহাত্মাগান্ধীর ভক্ত। সুতরাং তাঁরাও দাশ মশায়ের দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। ক্রমশঃ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে উভয় দলের লোক গ্যালারীর বেঞ্চ ভেঙ্গে তা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে লাগল।

আমি জিতেনবাবু ও সত্যেনের নিকটেই এক বেঞ্চে দাঁড়িয়েছিলাম, আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন কলকাতার প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার জে এন্ রায়। এই মারামারি দেখে তিনি মন্তব্য করলেন যে 'নেমিসিস' দেখ। চিত্ত (দাশ মশায়) এই বড় বাজারের দলের সাহায্যে ১৯১৭ সালের কংগ্রেস থেকে আমাদের (মডারেটদের) তাড়িয়েছিলেন এখন সেই অস্ত্রই তাঁর বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে। এই হট্টগোলের মধ্যে জিতেনবাবুর দল ভোটাধিক্যে তাদের দলের লোককে বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচিত করল।

এই সংবাদ পেয়ে মহাত্মা গান্ধী বাংলার প্রতিনিধি-গণকে পরদিন অর্থাৎ ২৭ শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে প্যাণ্ডেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সংবাদ পাঠালেন, আমরা সকলে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে মিলিত হলাম। মহাত্মা একটি চেয়ারে বসেছিলেন, তাঁর ঠিক বাম পার্শ্বে পদ্মরাজ জৈন গরুড় পক্ষীর মত দাঁড়িয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী বাংলার প্রতিনিধিগণকে সম্বোধন করে ইংরাজিতে বহু উপদেশ দিলেন, কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন যে তিনি জানেন যে বাংলার উৎসাহ উদ্দীপনা আছে তা আপাততঃ সংযত রাখতে হবে (I know there is spirit in Bengal but it must be bottled up for the present). তারপর তিনি সকলকে অহিংস থাকার জন্য উপদেশ দিলেন এবং ঐ উপলক্ষে তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যখন জেনারেল স্মাটসের সঙ্গে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে তথাকার প্রবাসী ভারতীয়দের উপর অত্যাচার ও করভার নিবারণের জন্য আলোচনা করছি-লেন (যার ফলে Smuts Gandhi agreement হয়) তখন অসংখ্য ভারতীয় কক্ষের বাইরে উদ্‌গ্রীব হয়ে ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করছিল। মন্ত্রণা-কক্ষ থেকে গান্ধীজী বাইরে আসামাত্র দুজন পাঠান লাঠি দ্বারা মহাত্মাকে গুরুতরভাবে আঘাত করে। ফলে তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটীতে পড়ে যান। পার্শ্ববর্তী ভবনের মিশনারী ডোক সাহেব তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন এবং তাঁর চিকিৎসার ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। পাঠান দুজন মনে করেছিল যে গান্ধী স্মাটসের সঙ্গে আলোচনায় ভারতীয়দের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছেন, এই ভুল বোঝার জন্যই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে গান্ধীজীকে আঘাত করেছিল, পরে তারা ভুল বুঝতে পেরেছিল। যে কয়দিন গান্ধীজী ডোক সাহেবের বাস-ভবনে ছিলেন সে কয়দিন প্রায় সমুদয় ভারতীয়েরা তাঁর অবস্থা জানার জন্য ডোক সাহেবের বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে জমায়েত হত।

মহাত্মার জ্ঞান ফিরতেই তিনি প্রথমে পাঠান দুজন

সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। যখন শুনলেন যে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তখন তিনি তাদের তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিতে বললেন এবং জানালেন যে তাদের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই। এর ফল হল এই যে যতদিন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন ততদিন এই দুই পাঠান তাঁর দেহরক্ষীস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে।

এর পর মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশে বাংলার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পুনরায় বিষয়-নির্বাচনী সভায় সদস্য নির্বাচন করা হল। এবার অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আমিও বিষয় নির্বাচনী সভায় সদস্য নির্বাচিত হলাম। অবশ্য এ দিনও নিরুপদ্রবে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়নি। কিছু হাতাহাতি হয়েছিল এবং ৩।৪ জন সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন।

(৬)

২৭ শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে বিষয় নির্বাচনী সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

সভাপতি মশায় আসন গ্রহণ করার পর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের ক্রীড (মূলনীতি) পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের বর্তমান ক্রীডের পরিবর্তে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বপ্রকার বিধিসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায় দ্বারা স্বরাজ অর্জন" এই ক্রীড গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। মহাত্মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধীর গম্ভীরভাবে প্রস্তাবের অনুকূলে তাঁর বক্তব্য শোনালেন। স্বরাজ অর্জনে তিনি শান্তিপূর্ণ এবং আইন-সঙ্গতভাবে দেশের গণআন্দোলন চালাতে উপদেশ দিলেন।

এই প্রস্তাব নিয়ে প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হল। লালা লাজপত রায়, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা সৌকত আলী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি মহাত্মা গান্ধীকে সমর্থন করলেন। এর বিরুদ্ধে বললেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, মহম্মদ আলী জিন্না প্রভৃতি নেতাগণ।

এই বিরোধী নেতাদের বক্তৃতার সময় তাঁদের পদে পদে বাধা দেওয়া হতে লাগল, বিগত কলকাতার বিশেষ অধিবেশনের সময় থেকেই বিরুদ্ধ মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখা দিতে আরম্ভ করে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বললেন যে কংগ্রেসের মূল নীতির পরিবর্তনের এখনও সময় হয় নি কারণ প্রস্তাবিত নূতন ক্রীডে ইংরাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করাও চলবে, দেশ এখনও তার জন্য প্রস্তুত হয়নি। এই সময় মৌলানা সৌকত আলী উঠে পণ্ডিতজীকে সম্বোধন করে বললেন "আমরা সকলেই প্রস্তুত। আপনি আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন, আমরা আপনাকে অনুসরণ করব।" এর উত্তরে মালব্যজী বললেন "যে দিন সে দিন আমাকে আন্দোলনের পুরোভাগেই দেখতে পাবেন—পশ্চাতে নয়।"

জিন্না সাহেবের বক্তৃতার সময় সৌকত আলীর সঙ্গে রীতিমত বচসা সুরু হল। ব্যাক্তিগত আক্রমণও বাদ গেল না।

সমস্ত আলোচনার পর মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হল এবং ঠিক হল যে আগামী কালের অধিবেশনে এই একটি মাত্র প্রস্তাব উপস্থিত করা হবে। প্রকাশ্য অধি-বেশনের সময় নির্দিষ্ট হল ১২-৩০ মিনিট।

ক্রমশঃ

দেশবন্ধু স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ

চিত্তরঞ্জন দাস

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

বিখ্যাত ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যক্তিগত জীবনের প্রথম অংশ স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের মাধ্যমেই অতিবাহিত হ'য়েছে। তিনি বিরাট ধনীর দুলাল অথবা দরিদ্র-নন্দনও ছিলেন না। উচ্চ শিক্ষিত এবং অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯০ সালে আই, সি, এস্ পড়তে তিনি ইংলণ্ডে যান। সেখানেই তাঁর অসাধারণ জাতীয়তাবোধের সম্যক পরিচয় বিশেষভাবে পরিব্যপ্ত হয়েছিল যখন তিনি তৎকালীন বৃটিশ পার্লামেন্ট-এ অন্যতম সদস্য লর্ড বার্কেনহেড্ প্রদত্ত একাধিক ভাষণে আপত্তিকর উক্তির বিরুদ্ধে (অর্থাৎ তরবারির দ্বারা ইংরেজ ভারত জয় করেছে এবং তরবারির সাহায্যেই উহা রক্ষিত হবে ইত্যাদি) তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। তদ্ভিন্ন দাদাভাই নৌরজীকে "ভারতীয় কালা আদমী" বলবার অপরাধে লর্ড সালীসবারিকে যথোচিত শিক্ষা প্রদানেও ভীত হন নি তখন পরাধীন ভারতের প্রবাসী ছাত্র চিত্তরঞ্জন। অতঃপর তিনি সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে নিয়মিত সভা, সমাবেশ ও আলোচনা বৈঠকের মাধ্যমে ক্রমশঃ গড়ে তুলেছিলেন বৃটিশবিরোধী উল্লেখযোগ্য আন্দোলন, যার ফলে চিত্তরঞ্জনের পক্ষে আর সম্ভব হল না সেখানে আই, সি, এস্ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়া। কারণ এ হেন একজন জাতীয়তাবাদী ভারতীয় ছাত্রকে আই, সি, এস্ হবার সুযোগ দিয়ে, ভারতের প্রশাসনিক কর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে উচ্চপদে নিয়োগ করা, তৎকালীন বৃটিশ সরকারের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর বিবেচিত হওয়ায় হয়ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই তখন চিত্তরঞ্জনের আই, সি, এস, পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় বাধার সৃষ্টি করেছিল। অথবা অন্য কারণ এ ও হতে পারে যে চিত্তরঞ্জন নিজেই আই, সি, এস্ হ'য়ে বৃটিশ সরকারের অধীনে গোলামী করবার মোহ পরিত্যাগ করে, স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত ব্যারিষ্টারী পাশ করে ১৮৯৪ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন। অবশ্য আই, সি, এস্ প্রসঙ্গে তিনি নাকি ঠাট্টাচ্ছলে বলেছেন :—"I appeared at the examination but headed the list of the unsuccessful."

কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করবার পর কিছুকাল Brief এর অভাবে অন্যান্য অনেকের মত চিত্তরঞ্জনকেও বহু ক্লেশ ও নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। বর্ত্তমানের ন্যায় কলিকাতায় তখন যান বাহনের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। তাই অধিকাংশ সময়ে বাড়ী থেকে হাইকোর্টে যাতায়াত করতে হ'য়েছে তাঁকে পায়ে হেঁটে। এ হেন দুর্দিনে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন একদিন হাত দেখালেন এক জ্যোতিষীকে। হাত দেখে উক্ত জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে চিত্তরঞ্জন একদিন হাইকোর্টের অদ্বিতীয় ব্যারিষ্টার হবেন এবং উপার্জ্জনও করবেন দৈনিক সহস্র সহস্র টাকা। বলা বাহুল্য জ্যোতিষীর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী কালক্রমে হ'য়েছিল সম্পূর্ণ সফল। সুতরাং ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের খ্যাতি যখন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তখন একদিন উক্ত জ্যোতিষী চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আত্মপরিচয় প্রদান করলেন। চিত্তরঞ্জন তখন সানন্দে তাঁকে একদিনের উপার্জ্জন অর্থাৎ সহস্রাধিক টাকা দিয়ে জ্যোতিষীকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন।

চিত্তরঞ্জনের ইংলণ্ডে যাতায়াত ও সেখানে অধ্যয়নের

নিমিত্ত বিপুল অর্থব্যয় ভার বহনের দরুণ তাঁর পিতা স্বর্গত ভুবনমোহন দাস যথেষ্ট পরিমাণে ঋণগ্রস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবিতাবস্থাতে তিনি আংশিক ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। তাই পুত্র চিত্তরঞ্জন যখন ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে কথঞ্চিত সুপ্রতিষ্ঠ হ'লেন, তখন তিনি পিতার সমুদয় ঋণ পরিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঋণ দাতাদের আহ্বান জানালেন এবং তাঁদের তরফ থেকে লিখিত কিম্বা মৌখিকভাবে যিনি যত টাকা দাবী করেছিলেন, সকলের দাবী নির্বিচারে মিটিয়ে দিয়ে স্বর্গত পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। বলাবহুল্য আজকের দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত খুব কমই দৃষ্ট হয়।

বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত থেকেই তৎসংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য মামলা-মোকর্দ্দমার বিবাদীপক্ষের মামলা পরিচালনার কঠিন দায়ীত্ব ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন গ্রহণ করতেন। পারিশ্রমিকের বিশেষ কোন বাধ্য বাধকতা থাকত না। অধিকাংশক্ষেত্রে বিনা পারিশ্রমিকে এমন কি নিজের অর্থব্যয় করেও মামলা পরিচালনা করতেন। আলিপুর ফৌজদারী আদালতে মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্রের মামলাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলাবাহুল্য উক্ত ঐতিহাসিক মামলায় জয়লাভ করবার পরেই ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের প্রসিদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। উক্ত মামলার অন্যতম আসামী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের স্বপক্ষে ইউরোপীয় বিচারকের নিকট ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন যে বক্তব্য এবং মন্তব্য পেশ করেছিলেন, নিম্নে উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করছি।

"———I appeal to you, therefore, that a man like this who is being charged with the offence with which he has been charged stands not only before the bar of this Court but before the bar of the High Court of history and my appeal to you is this, that long after this controversy, will be hushed in silence, long after this turmoil, this agitation will be ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India but accross distant seas and lands. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before the bar of this Court but before the bar of the High Court of history."

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন তখন থেকেই কত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, উপরোক্ত মন্তব্যই তার যথেষ্ট প্রমাণ। উক্ত আদালতে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তির আদেশপ্রাপ্ত হলেন, কিন্তু তাঁর ভ্রাতা বারীন ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। অতঃপর ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করে উক্ত ফাসীর হুকুম রদ এবং অপর আসামীদের দণ্ড হ্রাসের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স্ জেন্‌কিন্‌স্ উক্ত মামলার ব্যাপারে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন :—

"I desire in particular to place on record my high appreciation of the manner in which the case was presented to the Court by their leading Advocate Mr. C. R. Das."

বাল্যকালে পূর্ব্ব বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চলে বাস করতাম, সেখানে ছিল আমার জননী জন্মভূমি। সুতরাং তখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাসকে দেখবার সুযোগ, সুবিধা কিম্বা কোন প্রয়োজনও ছিলনা। তবে বয়স্কদের নিকট তাঁর সম্বন্ধে তখন অনেক তথ্য অবগত হতাম। বিশেষতঃ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানিকতলা বোমার মামলা কিভাবে তিনি পরিচালনা করেছিলেন, তার বিস্তৃত আলোচনা ও বিবরণ বার বার শুনেও যেন শুনবার আগ্রহ আর মিটলনা। অত্যন্ত মনযোগ সহকারেই উহা শুনতাম এবং শুনে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করতাম। অবশ্য আমরা তখন সবেমাত্র বিপ্লব সংস্থার সভ্যতালিকাভূক্ত হ'য়েছিলাম এবং আমাদের নিকট তখন বিপ্লবের যে কোন তথ্য এবং আলোচনা ছিল অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং বিপ্লবের মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দকে

যিনি উক্ত জটিল মামলার সুনিশ্চিত কঠোর দণ্ডের রায় থেকে সসম্মানে অব্যাহতির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তিনি যে কত বড় ব্যারিষ্টার, কত বড় বিপ্লবী, কত বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন, সে পরিচয় আমরা বাল্যকালেই পেয়েছিলাম। তাই তখন থেকেই ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে একটা অতি উচ্চ ধারণা, অসীম বিশ্বাস এবং গভীর শ্রদ্ধা অন্তর্নিহিত ছিল।

ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশকে প্রথম দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল আমার ১৯১৭ সালে। তিনি তখন মাত্র একদিনের জন্য বরিশাল শহরে গিয়েছিলেন এ্যানি বেসান্ত প্রবর্ত্তিত হোম রুলের সমর্থনে স্থানীয় একটি মহতী সভায় ভাষণ দিতে। আমরা তখন স্থানীয় একটি প্রখ্যাত বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৫-১৬। এখন যেমন স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষক প্রায় সকলেই প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক দলভুক্ত এবং স্কুল কলেজগুলি হয়েছে এক কথায় বলতে গেলে রাজনৈতিক পীঠস্থান, তখন এরূপ ছিল না। ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি করা তো দূরের কথা, কোন প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভায় যোগদান করাও ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অবশ্য আমরা কতিপয় ছাত্র সে নিষেধ অমান্য করেই উক্ত সভায় যোগদান করেছিলাম এবং বিখ্যাত ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশকে চাক্ষুষ দেখবার বহুদিনের আশা সেদিন মিটেছিল। অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বক্তৃতারত সৌম্যমূর্ত্তী ব্যারিষ্টার সি, আর দাশকে দেখে তখনই যেন মনে হয়েছিল যে তিনিই একদিন বাংলা-দেশের একমাত্র অবিসম্বাদী সুযোগ্য নেতা হবেন।

কিছুকাল পরে সম্ভবত পরের বছরই চিত্তরঞ্জনকে দ্বিতীয়বার দেখবার সুযোগ পেলাম উক্ত বরিশাল শহরেই। তিনি তখন স্থানীয় একজন জমিদার মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁনের একটি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। উক্ত মামলায় সরকার বাদী ও ইস্‌মাইল খাঁন ছিলেন বিবাদী। বাদীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন বরিশালের তৎকালীন প্রখ্যাত উকিল স্বর্গত বিপিন বিহারী সেন। বিবাদী পক্ষে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ সি আর, দাশ এবং উক্ত মামলায় বিবাদীই জয়লাভ করেছিলেন। ব্যারিষ্টারের ফি বাবদ দুদিনের জন্য মিঃ দাশ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র দু'হাজার টাকা, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত টাকা তিনি সেখানেই দান করলেন দুটি সৎকার্য্যের জন্য। এক হাজার টাকা দিলেন বরিশালের তৎকালীন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ভেগাই হালদারকে এবং অবশিষ্ট আর এক হাজার টাকা প্রদান করলেন প্রস্তাবিত "অশ্বিনী কুমার টাউন হল" কমিটিকে। সুতরাং তিনি যে নিজের কাছে কিছু অবশিষ্ট রেখে দান করতেন না, উক্ত ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রার্থীকে তিনি কখনও বিমুখ করতেন না। বিশেষতঃ দানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদা মুক্ত হস্ত। তাঁর নিকট থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে বাংলা দেশের কন্যাদায়গ্রস্ত কত দরিদ্র পিতা যে দায়মুক্ত হ'য়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে, মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বহু সদস্যের সঙ্গে মিঃ সি, আর, দাশও ছিলেন উক্ত প্রস্তাবের বিরোধী। সুতরাং ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে যাতে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'তে না পারে, তদুদ্দেশ্যে প্রবল বিরোধিতা সৃষ্টি করবার জন্য, বঙ্গদেশ থেকে সহস্রাধিক কংগ্রেস সদস্য সমভিব্যাহারে নিজ ব্যয়ে স্পেশাল ট্রেনে মিঃ সি, আর, দাশ তখন নাগপুরে উক্ত অধিবেশনে যোগদানের নিমিত্ত গমন করেন। বিপুলসংখ্যক প্রতিনিধিসহ মিঃ দাশের নাগপুর আগমনে, মহাত্মা গান্ধী স্বভাবতই কথঞ্চিৎ বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন অনন্যোপায় হ'য়ে মিঃ দাশের নাগপুরস্থ অস্থায়ী ক্যাম্পে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রায় দু'ঘন্টাকাল নিভৃতে, পরস্পর

বিরুদ্ধমতাবলম্বী দুই নেতার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা হয়। মহাত্মা গান্ধী তৎপূর্ব্বেই জানতেন যে মিঃ সি, আর, দাশ উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন এবং তিনি তখন ইহাও বেশ সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে মিঃ দাশের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগীতা ভিন্ন তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না ভারতবর্ষে অহিংস অসহযোগ প্রবর্ত্তন করে স্বীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করা। সুতরাং উক্ত আলোচনাকালে মিঃ দাশের বিরুদ্ধ মত পরিবর্ত্তন, প্রস্তাব সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগীতার জন্য মহাত্মা গান্ধী নানাভাবে চিত্তরঞ্জনকে অনুনয়-বিনয়, অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন। তিনি নাকি তখন মিঃ দাশকে এ কথাও বলেছিলেন যে তাঁকে উক্ত আন্দোলন প্রবর্ত্তনের সামান্য একটা সুযোগ দিলে, তিনি অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী মাত্র এক বছরের মধ্যেই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। বলাবাহুল্য শেষ পর্য্যন্ত চিত্তরঞ্জনের উদার হৃদয় মহাত্মাজীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিল এবং যথাসময়ে উক্ত অধিবেশনে গান্ধীজীর বিশেষ অনুরোধে প্রস্তাবটি চিত্তরঞ্জন নিজেই উত্থাপন করলেন এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে উহা গৃহীত হল।

নাগপুর অধিবেশন অন্তে যথাসময়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করবার পর, অসহযোগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ সি, আর, দাশ তৎকালীন তার মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জনের বৃত্তি অর্থাৎ ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করে, সক্রিয়ভাবে দেশসেবার কার্য্যে ব্রতী হ'লেন। অবশ্য অনেকেই তখন তাঁকে ব্যারিষ্টারী বর্জন করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তাঁর উক্ত সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অচল, অটল। তাই সর্ব্ববিধ ভোগৈশ্বর্য্য ছেড়ে তিনি হলেন তখন সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসী, পেলেন দেশবন্ধু আখ্যা। চিত্তরঞ্জনের উক্ত ত্যাগের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসেও বিরল।

ভারতবর্ষে উক্ত অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অতুলনীয় অবদান এবং বাঙ্গালীর তৎকালীন চিন্তা ও কর্মধারার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা এ স্থলে বিশেষ প্রয়োজন ও সমীচীন বিধায় নিম্নে উহা প্রদত্ত হ'ল।

বাংলার অগ্নিযুগ

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সূত্র থেকেই শুরু হয়েছিল বঙ্গদেশে প্রবল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। বয়কট, বিপ্লব, স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি তারই ফলশ্রুতি। বাংলাদেশের উক্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রচলিত ছিল ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত এবং সেই সুদীর্ঘ পনর বছর কাল ছিল বাংলার অগ্নিযুগ নামে খ্যাত। সর্ব্ব ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অবিসম্বাদী নেতৃত্বও ছিল বাঙ্গালীর। তৎকালীন বাংলা ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের ধারণাও ছিল অতি উচ্চ। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বর্গত গোপালকৃষ্ণ গোখলের উক্তিটি উল্লেখ করছি:— "What Bengal thinks today, India will think to-morrow." (বাংলাদেশ আজ যাহা চিন্তা করে, ভারতবর্ষ কাল উহাই চিন্তা করবে)। উক্ত মন্তব্য অবশ্যই বাংলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে ছিল উল্লেখযোগ্য গৌরবের বিষয়। কিন্তু আজকের বাংলা এবং বাঙ্গালীর কি সে গৌরব কিম্বা গর্ব্ব করবার মত কিছু অবশিষ্ট আছে? পরাধীন ভারতে যে বাংলা ও বাঙ্গালী ছিল সমগ্র দেশের শীর্ষস্থানীয় আজ স্বাধীন দেশে তার স্থান হয়েছে সর্ব্ব নিম্নে। আজ সে সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী, পর-নির্ভরশীল। ধ্বংসের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে বাংলা ও বাঙ্গালী। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে, বাঙ্গালীকেই আজ আবার গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে নতুন পথ। চলতে হবে সঠিক পথে।

"রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথ পুষ্পাবিকীর্ণ নহে, রুধির কর্দমিত"। অগ্নিযুগে বাংলাদেশের বহু তরুণ ও যুবক ছিল উক্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত। তারা ছিল প্রকৃত বিপ্লবী। বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ছিল ঢাকা ও কলিকাতায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিপ্লবী বীর যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বাঘা যতীন পরিচালিত 'যুগান্তর' নামে বিপ্লবী সংস্থা ছিল কলিকাতায় এবং ঢাকা শহরেও

ছিল পুলিন দাস পরিচালিত অনুরূপ সংস্থা—'অনুশীলন সমিতি'। উভয় সংস্থারই আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মধারা ছিল এক এবং সংস্থাদ্বয়ের মধ্যে ছিল একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র। বিভিন্ন জিলায় উক্ত সংস্থার শাখা এবং আঞ্চলিক সংগঠনও ছিল প্রচুর। বর্ত্তমান বাংলার তথাকথিত বিপ্লবীদের মধ্যে যেমন দলীয় সংঘর্ষ, আত্মঘাতী সংগ্রাম প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, অগ্নিযুগে এরূপ ছিল না। তৎকালীন বিপ্লবীদের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা এবং সে জন্য যত কিছু নির্য্যাতন, নিপীড়ন ও ত্যাগ স্বীকারে তারা ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই বহু বিপ্লবী তরুণ ও যুবকের তাজা রক্তে সিক্ত হয়েছিল বাংলার তৎকালীন উত্তপ্ত মাটী। ফাঁসী ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের কঠোর দণ্ডও ভোগ করতে হয়েছিল অনেক বিপ্লবীকে। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কখনও বাংলার অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক কাহিনী বিস্মৃত হতে পারে না, কিম্বা হওয়া উচিৎও নয়। যদি কখনও উক্ত কাহিনী বর্জিত স্বাধীন ভারতের ইতিহাস রচিত হয় সে ইতিহাস ইতিহাসই নয়।

১৯২১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে তিনদিনব্যাপী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল শহরে। উক্ত অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জনকে তৃতীয়বার দেখবার সুযোগ পাই। কিন্তু তখন তিনি আর ব্যারিষ্টার সি,আর, দাস নন, শুভ্র খদ্দর পরিহিত সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তিনি তখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছেন এবং উক্ত বরিশাল অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত সিদ্ধান্ত যাতে গৃহীত হয়, সেজন্য তিনি ছিলেন তখন বিশেষভাবে সচেষ্ট ও সক্রিয়। কিন্তু অন্যান্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দের অনেকেই যেমন বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, ললিতমোহন ঘোষাল প্রমুখ বাংলার তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন উক্ত অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁদের বক্তব্য ছিল—"উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙ্গে দিয়ে, একটা উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রসমাজ গঠন করবার কোন সার্থকতাই নেই। উহাদ্বারা শুধু ছাত্রদেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে" ইত্যাদী।

সভাপতির ভাষণে বিপিনচন্দ্র পাল প্রকারান্তরে এ কথাও বলেছিলেন যে "রাজনীতি ক্ষেত্রে বাংলা ও বাঙ্গালীর নেতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে, অবাঙ্গালী প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত আন্দোলনে সামিল হওয়া, বাঙ্গালীর পক্ষে অশুভ ভবিষ্যতেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এর অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল বাঙ্গালীকে চিরদিন ভোগ করতে হবে।" স্বর্গত পাল মহাশয়ের উক্ত মন্তব্য যে কত সত্য এবং কত সুচিন্তিত ছিল, পরবর্ত্তী জীবনের প্রতিটি বাস্তব ক্ষেত্রে উহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি এবং আজও করছি। কিন্তু '২১ সালে আমাদের অতি ক্ষুদ্র জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবার কোন প্রশ্নই মনে আসে নি অথবা তখন কোন প্রয়োজনও বোধ করি নি। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী একবছরের মধ্যে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন, এ প্রতিশ্রুতি মহাত্মাজী দেশবাসীকে দিয়েছিলেন। সুতরাং মহাত্মার প্রতিশ্রুতি কিম্বা ভবিষ্যদ্বাণী কখনও নিষ্ফল হবে না, হ'তে পারে না, এ দৃঢ় বিশ্বাস তৎকালে আমাদের অনেকের হৃদয়েই ছিল বদ্ধমূল। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলার মানুষ তখন উক্ত অধিবেশনে সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন সমস্বরে। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সদস্য সংখ্যা ছিল তখন অতি নগণ্য অর্থাৎ মাত্র ছাব্বিশজন। সুতরাং অতি অনায়াসেই অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসের উক্ত বরিশাল অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল এবং বাংলা দেশের তৎকালীন বহু ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি সর্ব্বস্তরের মানুষ দলে দলে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন। বাংলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামে তখন এল এক ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন। অগ্নিযুগের অবসান ও গান্ধী নীতির প্রবর্ত্তন।

অতঃপর দেশবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশঃ হয়ে উঠল ব্যাপক ও

জোরদার এবং তৎসঙ্গে বৃটিশ সরকারের দমন নীতিও শুরু হ'ল প্রবলবেগে। ফলে বন্দীশালাগুলি প্রায় সবই হ'ল রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। বাংলা তথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই তখন একই অবস্থা। সমগ্র দেশের নেতৃবৃন্দসহ অসংখ্য কর্মীবৃন্দকে কারারুদ্ধ করবার ফলে, স্বভাবতই অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশঃ হয়ে পড়ল বহুলাংশে শিথিল। বলাবাহুল্য আমরাও তখন কারাভ্যন্তরেই ছিলাম এবং কারামুক্তির পর ১৯২৩ সালে কলিকাতায় এসে দেশবন্ধুর সান্নিধ্য করে তাঁর নবগঠিত স্বরাজ্য পার্টিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করি।

স্বরাজ্য পার্টি গঠন

১৯২১-২২ সাল প্রায় দু'বছর সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সপরিবারে সচেষ্ট ও সক্রিয় হ'য়ে দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগ করতেও বাধ্য হ'য়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল যখন আশানুরূপ হ'ল না, তখন তিনি গান্ধীনীতি পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কংগ্রেসের ভিতরেই গঠন করলেন নতুন দল—নাম হ'ল তার—"স্বরাজ্য পার্টি"। অসহযোগ আন্দোলনের মূল নীতি ছিল Council বর্জন। স্বরাজ্য পার্টির নীতি হল সেখানে—Council entry. সুতরাং মহাত্মা গান্ধী তখন উক্ত নীতি গ্রহণ কিম্বা সমর্থন করলেন না। অবশ্য তাঁর পক্ষে উহা তখন গ্রহণ অথবা সমর্থন করা কোন রকমেই সম্ভবপর ছিল না। তিনি তখন No changer হ'য়েই রইলেন।

দেশবন্ধু প্রবর্ত্তিত উক্ত নীতির সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের দিল্লী এবং কোকনদের অধিবেশনে ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশের তৎকালীন প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯২০-২৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র স্বরাজ্য পার্টি অর্থাৎ দেশবন্ধু প্রবর্ত্তিত আন্দোলনই ছিল কার্যকরী। কিন্তু ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধুর তিরোধানের পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে স্বরাজ্য পার্টি ক্রমশঃ হ'য়ে গেল অবলুপ্ত এবং মহাত্মা গান্ধী পুনরায় গ্রহণ করলেন কংগ্রেসের নেতৃত্ব। অবশ্য স্বরাজ্য পার্টি প্রবর্ত্তিত নীতি অর্থাৎ Council entry প্রভৃতি বর্জন কিম্বা পরিবর্ত্তনের কোন প্রশ্ন অতঃপর আর উত্থাপিত হয় নি।

১৯২৩ সালের নির্বাচন ও স্বরাজ্য পার্টি

Council and Corporation এর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে স্বরাজ্য পার্টি আশাতীতভাবে জয়লাভ করেছিল। উক্ত নির্বাচন প্রসঙ্গে দু'একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা নিয়ে উল্লেখ করছি।

একটি নির্বাচন কেন্দ্র ছিল খোদ লালবাজার পুলিশ হেড্ কোয়ার্টার্সে। প্রার্থী ছিলেন দুজন। সরকারী তরফে ছিলেন দেশবন্ধুর জ্যাঠতুত দাদা Advocate General Mr. S. R. Das এবং স্বরাজ্য পার্টি মনোনীত প্রার্থী ছিলেন সাতকড়িপতি রায়। বলাবাহুল্য উক্ত কেন্দ্রে সাতকড়ি বাবু হ'য়েছিলেন বিজয়ী এবং মিঃ, এস, আর, দাশের হয়েছিল পরাজয়। নির্বাচন অন্তে আমরা কর্মীবৃন্দ যখন লালবাজারের একটি প্রকোষ্ঠে সন্ধ্যার পর জয় গৌরবের আনন্দসহকারে জলযোগে বিশেষ ব্যস্ত, স্বয়ং দেশবন্ধু তখন সেখানে উপস্থিত থেকে তদারকী করছিলেন। হাত দুখানি পশ্চাতে রেখে স্বাভাবিক ভাবেই পায়চারী করতে করতে আমাদের শুনিয়ে বললেন:—"নির্বাচনে জয়লাভ করেছি, এ অতি আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আনন্দ হ'য়েছে আমার সাহেব দাদাকে (অর্থাৎ এস, আর দাশকে) অধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্তীর আশায় সুটের বদলে খদ্দর পরে আসতে দেখে। তিনি যে আজ খদ্দর পরে খাঁটি স্বদেশী সেজেছেন, এই আমার পরম আনন্দ। সুতরাং নির্বাচনে হারলেও হয়ত আজ আর আমার বিশেষ কোন দুঃখ হোত না......ইত্যাদি।"

সেবারের নির্বাচনে বীরভূম জেলায় ছিল ছয়টি কেন্দ্র। প্রার্থী ছিলেন তিনজন। ১) হেমন্তপুরের রাজা, ২) রায় সাহেব অবিনাশ ব্যানার্জী, ৩) স্বরাজ্য পার্টি মনোনীত অবনীশ রায়। শেষোক্ত প্রার্থী ছিলেন একজন সাধারণ

সিরাশদার। অপর প্রার্থীদের তুলনায় তাঁর অর্থ ও লোকবল বিশেষ কিছুই ছিলনা, তাই যথাসময়ে তিনি দেশবন্ধুকে সেখানে কর্মী প্রেরণের নিমিত্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলেন। সুতরাং নির্বাচনের পূর্ব্ব দিবস কলিকাতা থেকে আমরা সেখানকার ছয়টি ভোট কেন্দ্রের জন্যে ছয়জন কর্মী প্রেরিত হই। যাত্রার প্রাক্‌কালে দেশবন্ধু আমাদের নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :—

"অবনীশের পক্ষে প্রয়োজনীয় নির্বাচনী প্রচার কার্য্য বিশেষ কিছু হয়েছে বলে আমি মনে করি না। সুতরাং তোমরা সেখানে গিয়ে একজন করে প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে এবং ভোটারগণ যখন ভোট দিতে যাবেন, তখন যথাসম্ভব ব্যাক্তিগতভাবে তাদের জানাবে যে আমিই তোমাদের সেখানে পাঠিয়েছি এবং আমার ইচ্ছা এবং অনুরোধ তারা যেন অবনীশকে ভোট দেয়...ইত্যাদি।" বলাবাহুল্য আমরা দেশবন্ধুর নির্দেশ মতই সেখানকার কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন করেছিলাম এবং একটা জিনিষ তখন বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম যেদেশবন্ধুর নামে শুনেই যেন জনগণ অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রায় সব কয়টি কেন্দ্রেই শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে স্বরাজ্য পার্টিরই জয়। সুতরাং জয়ের গৌরব নিয়েই বীরভূম থেকে যথাসময়ে আমরা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলাম। জনসাধারণের উপর তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কী বিপুল প্রভাব ছিল, উপরোক্ত নির্বাচনের ফলশ্রুতিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কলিকাতা পৌরসভার প্রশাসন ক্ষমতা স্বরাজ্য পার্টী দখল করেছিল ১৯২০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং স্বয়ং দেশবন্ধু নির্বাচিত হয়েছিলেন পৌরসভার প্রথম মেয়র। প্রারম্ভে পৌরসভার সাংগঠনিক কার্য্য সংক্রান্ত আলোচনা বৈঠকে অনেক সময় উপস্থিত থাকবার সুযোগ পেয়েছি। তাই তৎকালীন দু'একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করছি।

পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে প্রার্থী ছিলেন দুজন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু। উভয়ের মধ্যে উক্ত পদের কে যোগ্য প্রার্থী সে নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক হয়েছিল দেশবন্ধু দাশ ও দেশপ্রাণ শাসমলের মধ্যে। দেশবন্ধুর ইচ্ছা উক্তপদে সুভাষচন্দ্রকে নিয়োগ করা। কিন্তু তৎকালে বীরেনবাবু যে সুভাষের চেয়ে যোগ্যতর প্রার্থী, তার বিবিধ প্রমাণ প্রদর্শন করতে গিয়ে বহু কটুক্তিও করেছিলেন দেশপ্রাণ দেশবন্ধুকে। অবশ্য সে সব এখন আর উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে উক্ত নিয়োগের ব্যাপারে দেশবন্ধুর ব্যাক্তিগত অভিমত ও সিদ্ধান্তের কারণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করছি।

দেশবন্ধু বীরেন্দ্রবাবুকে বলেছিলেন যে দেশের স্বার্থে বীরেনবাবুর ত্যাগ ও অবদান যথেষ্ট এবং সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। সে দিক থেকে বীরেন বাবুর সঙ্গে সুভাষের কোন তুলনামূলক প্রশ্ন ওঠাই উচিৎ ছিল না। কিন্তু দেশবন্ধু চেয়েছিলেন সাংগঠনিক কার্য্যে সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং জনপ্রিয় বীরেন শাসমলকে দিয়ে মফঃস্বল অঞ্চল সংগঠন করতে এবং জনগণের তৎকালীন অপরিচিত সুভাষচন্দ্রকে পৌরসভার প্রধান কর্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করে, তাঁকে দিয়ে কলিকাতার ছাত্র সমাজকে সু-সংগঠন করতে। সুভাষচন্দ্রের উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি তখন কথঞ্চিৎ ইঙ্গিতও প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর অসাধারণ কর্মশক্তির ক্রমবিকাশের সুযোগ স্বরূপ কলিকাতাই হওয়া উচিৎ তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। এবম্বিধ মন্তব্যও দেশবন্ধু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কোন যুক্তিই বীরেনবাবুর হৃদয় স্পর্শ না করায়, বীরেনবাবু তখন দলত্যাগ করলেন। অতঃপর সুভাষচন্দ্র বসুই তখন কলিকাতা পৌরসভার প্রাধন কর্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন।

দেশ এবং জনস্বার্থে দেশবন্ধু যখন যা উচিৎ বিবেচনা করতেন, কার্য্যতঃ তিনি তাহাই করতেন। সেখানে ব্যাক্তিগত কিম্বা দলীয় স্বার্থের কোন প্রশ্ন ছিল না। স্বদলীয় স্বার্থান্বেষী অতি প্রিয়জনকেও তিনি কটুক্তি করতে কখনও দ্বিধা বা সঙ্কোচবোধ করতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি সামান্য ঘটনার উল্লেখ করছি।

একালের কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা, যিনি স্বাধীনতার পরে অনতিবিলম্বে অবস্থার বিরাট পরিবর্তন করে ফেললেন অর্থাৎ বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি অনেক কিছুরই মালিক হয়ে পড়লেন এবং যাকে আমরা সে কালেও দাদা বলেই ডাকতাম, একদিন দেশবন্ধুর নিকট এলেন একটি আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল উক্ত আত্মীয়ের জন্য পৌর বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষকের পদ সংগ্রহ করা এবং সেজন্য দেশবন্ধুকে বিশেষভাবে অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু অত্যন্ত বিরক্তি সহকারেই তাঁকে বলেছিলেন :—"দেখ, তোমাদের স্নেহ করি, ভালবাসি। সুতরাং সেই স্নেহ ভালবাসার সুযোগ নিয়ে তোমরা যদি যখন তখন এর তার চাকুরীর জন্য আমার নিকট উমেদারী করতে আস, তাহলে তো আমাকে অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র এই সমস্ত সাধারণ চাকুরীর ব্যাপার নিয়েই থাকতে হয়। তোমরা কি তাই চাও? তাহলে বল আমি শুধু এই নিয়েই থাকি।" বলাবাহুল্য দাদা তখন একেবারেই চুপ এবং সুযোগমত স্বস্থানেই করলেন প্রস্থান।

দেশবন্ধু ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, বিরাট সংগঠক, আদর্শ দেশপ্রেমিক, অদ্বিতীয় আইনজীবী, সুমহান দাতা, অবিস্মরণীয় রাষ্ট্রনায়ক, রাজ-ঐশ্বর্য্যভোগী ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর যে কত গভীর প্রেম ও অনুরাগ ছিল, তার প্রমাণ স্বরূপ এ স্থানে উল্লেখ করা সম্ভবত অত্যুক্তি কিম্বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে দেশবন্ধুর কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী তৎকালীন বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নিয়ে গঠন করেছিলেন একটি সৌখীন কীর্ত্তনের দল এবং তিনি নিজেই দলটি পরিচালনা করতেন অতি যোগ্যতার সহিত। বহু বিশিষ্ট স্থানে উক্ত দলের আমন্ত্রণ এবং সভ্যাদের দ্বারা সুমধুর কীর্ত্তন গান পরিবেশিত হত, যা শ্রবণ করে তৎকালীন ভক্ত রসিকবৃন্দ অশেষ তৃপ্তি লাভ করতেন।

বাংলার শিল্প, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা সংস্কৃতি সর্ব্বক্ষেত্রেই ছিল দেশবন্ধুর বিশেষ লক্ষ্য এবং উল্লেখযোগ্য অবদান। বিভিন্ন ক্ষেত্রোন্নয়নের জন্য তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং নির্বাচন করতেন কার্য্য অনুযায়ী সুযোগ্য ব্যক্তি। বলাবাহুল্য সেকাল এবং একালের প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের অনেকেই ছিলেন দেশবন্ধুর আবিষ্কার। এমন কি একথাও শুনেছি যে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের নিমিত্ত স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও প্রথমে দেশবন্ধু কর্তৃক উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ছিলেন দেশবন্ধুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং সেই সূত্রেই তিনি যখন এলাহাবাদ যেতেন, তখন আনন্দভবনেই অবস্থান করতেন। তাই তখন তাঁর পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ হত, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মজ্জাগত বৈদেশিক ভাব-ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে যথাসম্ভব জাতীয় ভাবধারায় প্রভাবান্বিত করা। অবশ্য উক্ত ব্যাপারে তখন তিনি পণ্ডিত মতিলালের বিশেষ কোন সমর্থন পান নি। বরং কিছু অনুযোগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অলমতি বিস্তরেণ।

বাংলার সামগ্রিক শিল্পোন্নয়নের জন্য তিনি যে কত সচেষ্ট ও সক্রিয় ছিলেন, উদাহরণ স্বরূপ তার দু'একটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করছি।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হবার দরুণ, বাংলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ঘোরতর আর্থিক বিপর্য্যয় দৃষ্ট হ'ল। উক্ত মিলের তৎকালীন পরিচালকবৃন্দ যখন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার অবাঙ্গালীর হস্তে অর্পণ করবার উদ্যোগ আয়োজন করছেন, তখন দেশবন্ধু একদিন মাদারীপুরের তৎকালীন অসহযোগী উকীল শ্রদ্ধেয় সুরেন বিশ্বাস মহাশয়কে বললেন :—"সুরেনবাবু, বাংলার সব কিছুই তো চলে গেল। শুনছি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলটিও নাকি অবাঙ্গালীর হাতে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এমন কি কোন ধনী বাঙ্গালী নেই যে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে? দেখুন না একবার চেষ্টা করে।" বলাবাহুল্য অতঃপর সুরেন বিশ্বাস মহাশয়ের প্রচেষ্টায়

অল্পকালের মধ্যেই ফরিদপুর জিলার কোটালীপাড়ার সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং ময়মনসিং এর বিখ্যাত ধনী পাটের ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী এগিয়ে এলেন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে এবং ত্রিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে, ভট্টাচার্য্য চৌধুরী কোম্পানী শুরু করলেন বাংলার শিল্পক্ষেত্রে তাঁদের ঐতিহাসিক জয়যাত্রা। ক্রমশঃ তাঁরা গড়ে তুললেন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান। যথা—মেট্রোপলিটন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস লিঃ, কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং প্রভৃতি। বিভিন্ন ব্যবসায়ে আশাতীত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল উক্ত ভট্টাচার্য্য চৌধুরী কোম্পানী এবং বর্তমানেও যা অব্যাহত এবং প্রচলিত আছে। সুতরাং উক্ত বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূলেও ছিল দেশবন্ধুর উল্লেখযোগ্য অবদান।

নাট্যশিল্পে বাংলা তথা বাঙ্গালী ছিল অগ্রণী। শতবর্ষ পূর্ব্বে উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠা হয় বঙ্গদেশে, যখন অন্যান্য প্রদেশে এ জাতীয় শিল্পের কোন সন্ধানই পাওয়া যেত না। সুতরাং বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চ ছিল গিরীশযুগে বাংলার এক অমূল্য সম্পদ। অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে কোন তুলনামূলক প্রশ্নই ছিল না তখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার নাট্য শিল্পের। কিন্তু ১৯১২ সালে রঙ্গমঞ্চের জনক নটগুরু গিরীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর, বাংলার নাট্যশিল্পে ক্রমশঃ দৃষ্ট হ'ল নানাবিধ বিপর্য্যয়। গিরীশ-পুত্র সুমহান নট দানীবাবুই ছিলেন তখন বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের অদ্বিতীয় অভিনেতা। দানীবাবু একদিন একটা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে এসেছিলেন দেশবন্ধুর বাড়ীতে। উক্ত দিবস মামলার বিষয়বস্তু ছাড়াও বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের বিবিধ সমস্যাবলী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা হ'য়েছিল দানীবাবু ও দেশবন্ধুর মধ্যে। উভয়ের আলোচনা শেষে দেশবন্ধুর বাড়ীর অন্দর মহল থেকে একটি অনুরোধ এল দানীবাবুর নিকট অভিনয় করবার জন্য। বলাবাহুল্য দানীবাবু তেমন অভিনয় করে উক্ত অনুরোধের যোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করেছিলেন।

অতঃপর একদিন দেশবন্ধুর অনুরোধে দানীবাবু প্রখ্যাতা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী সহ "দুর্গেশনন্দিনী" নাটকের একটি বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করেছিলেন ষ্টার রঙ্গমঞ্চে। দেশবন্ধুই উক্ত অনুষ্ঠানের সমগ্র ব্যয় বহন করেছিলেন।

বাংলার নাট্যশিল্প উন্নয়নকল্পে দেশবন্ধু অতঃপর খুব গভীরভাবেই চিন্তা করতেন। হঠাৎ একদিন তৎকালীন মেট্রোপলিটন কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দেশবন্ধুর মতামত অবগত হওয়া। বলাবাহুল্য তৎ পূর্ব্বেই শিশির কুমারের অসাধারণ নাট্য প্রতিভার পরিচয় তৎকালীন নাট্যরসিকগণ পেয়েছিলেন। দেশবন্ধুরও উহা অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং শিশিরকুমারের উক্ত সিদ্ধান্তে তিনি সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলেছিলেন :—"শিশির! রঙ্গমঞ্চ জাতীয় গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানে তোমাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষিত যুবকদের যোগদান করা একান্ত প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন উহার উন্নয়ন কি করে সম্ভব?......ইত্যাদি।" দেশবন্ধুর সম্মতি, শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ গ্রহণ করে, শিশিরকুমার সেদিন অতি আনন্দসহকারেই প্রত্যাবর্ত্তন করেছিলেন স্বগৃহে।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিশির কুমারের উক্ত সংকল্প বা সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী, প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেছিলেন :—"শিশির! রঙ্গমঞ্চ তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। তোমার স্থান কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। আমি মনে করছি শীঘ্রই তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করব......ইত্যাদি। উত্তরে শিশিরকুমার বলেছিলেনঃ- "Excuse me Sir, I am born for the stage and I shall serve it till the last moment of my life. রঙ্গমঞ্চই শিশির প্রতিভা বিকাশের একমাত্র যোগ্য স্থল।"

অতঃপর যথাকালে (১৯২১ সাল) শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করে বাংলার নাট্যক্ষেত্রে

নব যুগের প্রবর্ত্তন করেছিলেন, নাম ছিল যার শিশির যুগ। শিশির প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হ'য়েছিল বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে। সুতরাং সে ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল দেশবন্ধুর।

শিশিরকুমারের শেষ জীবনে তাঁর বরানগরের বাস ভবনে সময়ে সময়ে যেতাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তখন তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা হোত এবং উক্ত আলোচনার মাধ্যমেই শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদানের সঠিক ঘটনা অবগত হয়েছি। দেশবন্ধুর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অসীম ভক্তি ছিল শিশির কুমারের। দেশবন্ধু প্রসঙ্গে একদিন তিনি ব্যক্ত করলেন তাঁর (দেশবন্ধুর) শেষ জীবনের একটি উক্তি। দেশবন্ধু নাকি বলেছিলেন :—জানো শিশির! আজকাল আমার দৈনিক খোরাকী খরচ মাত্র দশ আনা।"......তৎপ্রসঙ্গে শিশিরকুমার বললেন:—"আজ যদি দেশবন্ধু জীবিত থাকতেন, আমি তাঁকে বলতাম যে বর্ত্তমানে আমার দৈনিক খোরাকী খরচ মাত্র দশ পয়সা।" জিজ্ঞাসা করলাম:—"দশ পয়সায় আপনি কি খান?" উত্তরে তিনি বললেন:—"কেন? একটা কমলা লেবু।" সুতরাং শিশিরপ্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি।

দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একদিনের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। দেশবন্ধু সেদিন কঠিন রোগাক্রান্ত, সম্পূর্ণরূপে শয্যাগত। স্যার নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকের নির্দেশে দেশবন্ধুর পক্ষে তখন ওঠা-বসা, নড়া-চড়া সব কিছুই ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু সেদিন Bengal Legislative Councilএর অধিবেশনে একটা Black Bill (কালা কানুন) প্রবর্ত্তনের সর্ব্ববিধ সরকারী ব্যবস্থা ছিল সঠিক। উক্ত Billএর উল্লেখ্য বিষয়—যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার এবং বিনা বিচারে আটক রাখবার বিশেষ ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব ছিল—গভর্ণরকে। সুতরাং দেশবন্ধুর অনুপস্থিতির সুযোগে যাতে উক্ত বিল পাশ না হ'তে পারে সেজন্য শেষ পর্য্যন্ত দেশবন্ধু গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়ও Invalid chair এ করে উক্ত অধিবেশনে নীত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য দেশবন্ধুর উপস্থিতি ও ব্যক্তিগত প্রতিবাদের জন্য উক্ত Billটি আর সেদিন গৃহীত হয় নি। সুতরাং উক্ত ঘটনাও দেশবন্ধুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বেরই পরিচয়।

বাংলার বর্ত্তমান মহাসঙ্কট মুহূর্ত্তে অধিকাংশ সময়ই দেশবন্ধু মানসপটে উদিত হন। মনে হয় বাংলা দেশের এ হেন দুর্দিনে যদি দেশবন্ধুর ন্যায় একজন সর্ব্বত্যাগী দেশপ্রেমিকের আবির্ভাব হোত, তাহলে সম্ভবত বাংলা ও বাঙ্গালী অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তিলাভ করত।

তবুও আলোর স্বপ্ন

শান্তশীল দাস

তবুও আলোর স্বপ্ন ; চারিদিকে ঘন অন্ধকার ;
এই কালো-কালো দিন, এই রাত শেষ হবে না কি ?
অসংখ্য জীবন কাঁদে, আলো চাই, কে দেখাবে পথ ?
সেই কান্না ধীরে ধীরে মিশে যায় দূরে বহুদূরে।

তবু এই স্বপ্ন আজো প্রাণপণে বুকে ধরে আছি,
না হ'লে কী নিয়ে বল বাঁচি এই অন্ধকার দিনে ?
আলো নেই, গান নেই, নেই কোনো আসক্তি কোথাও ;
এ জীবন অর্থহীন, অর্থহীন এই বেঁচে থাকা।

কত আশা, সব আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল যেন ;
দু'চোখে কত না আলো, নিভে গেল এক একটি ক'রে ;
বিধাতার অভিশাপ অথবা এ আত্মকৃত পাপ ?
এর শেষ হবে না কি ? একদিন শেষ হবে, হবে।

এই স্বপ্নটুকু আজো বাসা বেধে মনের গভীরে,
অনেক আঁধার পথে এ আমার চলার পাথেয়।

— · —

একটি দুপুর

করুণাময় বসু

শরতের পাখি ডাকা ছবি আঁকা একটি দুপুর,
টল টলে দিঘি জলে মেঘ মেঘ ছায়া উদাসীন ;
ঝরাপাতা খসে পড়ে দু চারিটা টুপুর টাপুর,
নির্জন বকুল বনে চোখ বোজে মায়াবী আশ্বিন।

এই মন ডানা মেলে, কার খোঁজে হয়ে যায় গান,
চুপি চুপি হতে চায় লতা পাতা ফুলের বাগান।
যেখানে মেয়েটি এসে বাঁধে একা সেতারের সুর :
এ হৃদয় হতে চায় শরতের আশ্চর্য দুপুর।

কাটবে না ফসল ?

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জনগণের কণ্ঠে স্বয়ং ভগবানের কথা।
ভাবলে ওটা ইতিহাসের হাল্‌কা রসিকতা।
গণহস্তী সগৌরবে স্কন্ধে নিলো যারে—
অন্ধ তুমি দম্ভে তারে রাখলে কারাগারে।
বললে আল্লা সংবিধানের শিকেয় তোলা থাক।
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ? জাহান্নমে যাক।
সত্যের জয় ? মিথ্যে কথা॥ ওটা কাল্পনিক।
বলং বলং বাহু বলং—এটাই নাকি ঠিক।

নরমুণ্ডের পিরামিডের চূড়ায় সমাসীন—
কেমন ক'রে ভাবলে মানুষ নিঃস্পন্দ মেশিন ?
অন্তরে যার দিব্যলোকের বহ্নি অনির্বাণ—
কোন্ সাহসে করলে তারে তুচ্ছ তৃণজ্ঞান ?
বাঁধন-ছেঁড়ার আকুতি যার রক্তধারায় বয়—
করবে তারে কুত্তা তোমার ? স্পর্দ্ধা তো কম নয়
ইয়াহিয়া খাঁ, খেলছো তুমি আগুন নিয়ে খেলা।
চোখ থাকলে দেখতে তোমার জঙ্গীশাহী ভেলা
ঐ ডুবে যায় ইতিহাসের ক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসে।
দেখতে ধরার বঞ্চিতেরা দৃপ্ত জয়োল্লাসে
ঐ চলেছে। কণ্ঠে ওদের শিকল-ভাঙার গান।
অত্যাচারী বর্ব্বরেরা ত্রাসে কম্পমান।
দিগ্বলয়ে যায় মিলিয়ে দিগন্তবিস্তারী
কত রাজ্য। কত রাজার দীপ্ত তরবারি।

শিশুর রক্তে লাল করেছো শ্যামপদ্মা পার ?
ইতিহাসের নাদির তুমি, দ্বিতীয় হিটলার।
শূন্য ক'রে দিলে তুমি অনেক মায়ের কোল।
গণহত্যার বীজ বুনেছো—কাটবে না ফসল ?

———

আসামের নূতন রাজধানী

আসামের নূতন রাজধানী কোথায় হইবে তাহা লইয়া আলোচনা, আন্দোলন তদ্বির চলিতেছে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" সাপ্তাহিকে প্রকাশ।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর গৌহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে যদিও সাধারণ নির্বাচনের আগেই আসামের নূতন রাজধানীর স্থান চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হবে, তবু তিন বৎসরকাল আসামের রাজধানী শিলংই থাকবে। উল্লেখযোগ্য যে প্রস্তাবিত রাজধানীর স্থান হিসেবে কামরূপের চন্দ্রপুর এবং নওগাঁর শিলঘাটে প্রাথমিক জরিপ চালানো হচ্ছে এবং উভয় পক্ষেই জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে। রাজধানী স্থাপনের দাবী নিয়ে নওগাঁ জেলায় হরতালও পালিত হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে এক সংবাদে জানা গিয়েছিল যে চন্দ্রপুরই চূড়ান্তভাবে রাজধানীর স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে, কিন্তু এ আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকারকে আবার দ্বিতীয় চিন্তা করতে হচ্ছে বলে প্রকাশ।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে শ্রীমতী ইন্দিরার উক্তি

"আশ্রম" পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি লওয়া হইয়াছে। ইহাতে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদিগের সাহায্য ও সেবার জন্য বিশ্ববাসীর নিকট আবেদন কেন করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে :

একজন মাননীয় সদস্য আমাদের ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বিভিন্ন দেশের কাছে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মহাশয়, ভিক্ষা করা আমার অভ্যাস নয় এবং আমি কখনো করিনি, এখনও করছি না এবং করার ইচ্ছাও নেই। আমাদের দেশ থেকে বিভিন্ন দেশে যদি দূত পাঠানো হয়, তাঁরা ভিক্ষে করতে যান না অথবা দুর্বলতার লক্ষণ দেখান না। তাঁদের পাঠানো হচ্ছে কারণ এটি এক আন্তর্জাতিক দায়িত্ব যা থেকে তাঁদের গা ঢাকা দিতে দেওয়া যায় না। এ দায়িত্ব তাঁদের এড়ান সমীচীন হবে না। তাঁরা সাহায্য দিতে পারেন অথবা নাও দিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বের এই অঞ্চলে যা ঘটছে তার পরিণাম থেকে তাঁদের নিষ্কৃতি নেই। সমস্যাটি যথাযথভাবে আমরা তাঁদের সামনে তুলে ধরবো। সাহায্য আমরা নিশ্চয়ই চাই এবং যত বেশী সাহায্য পাব ততই ভালভাবে আমরা উদ্বাস্তু ব্যক্তিদের পরিচর্যা করতে পারব। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ সাহায্য পাওয়া গেছে তা অতি সামান্য—আসল প্রয়োজনের এক দশমাংশ মাত্র বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে আমি আশা রাখি, এই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কয়েক লক্ষ প্রাণ বাঁচাবার জন্য, কয়েক লক্ষ শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য দেবার জন্য এবং যে সব ব্যক্তি বিসূচিকা বা অন্যান্য রোগে ভুগছেন তাঁদের চিকিৎসার জন্য আরও অনেক বেশী সাহায্যের প্রয়োজন। সেদিক থেকে সাহায্যের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু সাহায্যের পরিমাণটি কেবল বড় কথা নয়। সমস্যাটির যথাযথ উপলব্ধির জন্য আমাদের আবেদন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আশ্রয়প্রার্থীদের জীবন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য আমরা উদ্বি

সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও বেশী উদ্বিগ্ন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানবাধিকারের সমস্যা সম্পর্কে, মানব মর্য্যাদা সম্বন্ধে যা এখন তথা বিশ্ববাসীর চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের মত ভাসছে। আমাদের যে সব প্রতিনিধি বিদেশে গিয়েছেন, তা তাঁরা মন্ত্রীসভার সদস্যই হোন অথবা বে-সরকারী ব্যক্তিই হোন, তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন—বিশ্ববাসীকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করা এবং আমি মনে করি, এদিকে আমরা খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রগুলি এখন এ বিষয়ে আরও তীব্রভাবে সমালোচনা করছে এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য অনেক বেশী স্থান দিচ্ছে। আমি মনে করি, এই মানসিক পরিবর্ত্তনে আমাদের খানিকটা হাত আছে। সুতরাং আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করা সমীচীন নয়। মাননীয় সদস্যবর্গ এবং সংসদের বাইরে জনগণের আবেগ ব্যথা এবং অসহায়ের ভাব আমি সম্যক উপলব্ধি করি এবং এ কথা আমি সংসদে আগেও বলেছি। এই মনোভাব বোধগম্য এবং এর প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। তবে এর জন্য নিরাশ হবার কিছু নেই। আমরা যেন না ভাবি যে, কিছুই করা হচ্ছে না, অথবা কিছুই করা যাবে না এবং এ সমস্যা আমাদের একেবারে ডুবিয়ে দেবে। এক অসামান্য বোঝা আমাদের ঘাড়ে। আমি আগেও বলেছি এবং শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের সময় কথাপ্রসঙ্গে সেখানকার লোকদেরও বলেছি যে, এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমাদের নরকভোগ করতে হবে। আমি জানি না, কথাটা অসংসদীয় হোল কিনা। যদি হয়ে থাকে, মহাশয়, দয়া করে শব্দটি বাদ দেবেন। কিন্তু আমার লেশমাত্র সংশয় নেই যে, আমরা সফল হব। এই পরিস্থিতি নানা দিক থেকে আমাদের আঘাত করবে সন্দেহ নেই—অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য দিক থেকে। কিন্তু সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং সহিষ্ণুতা থাকলে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হব। আমি নিজে এ বিশ্বাস রাখি যে, আমাদের জনগণের এইসব গুণ আছে এবং আমরা এই পরিস্থিতির বিহিত করতে পারব। তবে সেটা সহজসাধ্য নয়—তা সে আর্থিক দিক থেকেই বলুন অথবা দৈহিক প্রচেষ্টাই বলুন। আর এই প্রচেষ্টায় সকলকে কিছু না কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। এর দরুণ আমাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্মসূচীও ব্যাহত হতে পারে। এ সত্ত্বেও এটি এমন এক পরিস্থিতি যা আমরা কখনও এড়াতে পারি না। কারণ আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি—বাংলাদেশে যা ঘটছে, ভারতের উপর তা রেখাপাত করবে। গণতন্ত্রের সাধারণ নীতি নিয়ে আমরা চিন্তিত তো বটেই। কিন্তু আরও বেশী আমরা চিন্তিত এই কারণে বাংলাদেশ আমাদের সীমানার এত কাছে যে, সেখানকার ঘটনাবলী আমাদের দেশের ওপর খুব বেশী রকম রেখাপাত করবে। বেশী দূরে হলে হয়তো এতটা রেখাপাত করতো না।

বাংলাদেশের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদিগের সাহায্যের জন্য একটি বিশেষ অর্থ সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার বর্ণনা "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকা হইতে লওয়া হইল :

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্যনির্বাহক-সমিতি বাংলাদেশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :

সীমান্তের ওপারে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্তমানের বাংলা দেশে মানবজীবন এবং ধন-সম্পত্তির অবিশ্বাস্য রকম ভয়াবহ ক্ষতির খবর আসিয়াছে। বর্তমানের তথাকথিত সভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন যুগে মানুষ যে মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা করিতে পারে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। শিশু, নারী, পুরুষ এবং বিশেষতঃ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যাহারা ধর্ম, শিক্ষা এবং সমাজের কল্যাণমূলক নানাবিধ কার্যে নেতৃত্ব দানে সক্ষম ছিলেন তাঁহাদের রাজনৈতিক ঐক্যের নামে ব্যাপক ও নির্মমভাবে হত্যা করা হইতেছে। আরও দুঃখজনক বিষয় হইতেছে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ সুপরিকল্পিতভাবে বিশ্বসংগঠনের ত্রাণকার্যের গতিরোধ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্যান্য সভ্য দেশের সরকারগণ এই ক্ষেত্রে যে উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছেন তাহা ক্রমশঃ জনগণের চক্ষু উন্মেলন করিতেছে এবং সুবিধাবাদী বিশ্ব-রাজনীতির নগ্ন পরিচয় প্রকট করিতেছে। এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে যদি ব্রাহ্মসমাজ নীরব থাকেন তবে মানবপ্রেমিক রামমোহনের নিকট হইতে তাঁহারা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের যে মহান আদর্শ ও সর্ববিধ শোষণ ও নিপীড়নের সংগ্রাম করিবার সুমহৎ প্রেরণা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন—তাহার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইবে।

আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সর্বস্তরের মানুষের নিকট পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের এই নিষ্ঠুর মানবতা-বিরোধী নিপীড়ন ও হত্যালীলার বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার আহ্বান জানাইতেছেন ও বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্থ নিঃসহায় নরনারীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবার আবেদন করিতেছেন।

তারাশঙ্কর প্রসঙ্গ

স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনের পরে "দেশ" সাপ্তাহিকে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর লিখিত অনেকগুলি লেখা প্রকাশিত হয়। ঐ লেখাগুলির মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হইল :—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন "পরিবর্তমান যে যুগ ও যে জনপদের মহাকাব্য তিনি রচনা করে গেলেন স্বাভাবিক নিয়মে তার বিলোপের সঙ্গে তারাশঙ্করের সাহিত্য সৃষ্টিও বাতিল হয়ে যাবে না। কারণ সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও যা অজর অমর,সাময়িকতার সাহিত্য দর্পণে সেই অবিনাশী মানবসত্তাই তারাশঙ্কর বিম্বিত করে গেছেন। তা না করে গেলে সময়ের স্রোত বয়ে যাওয়ার সঙ্গে তাঁর সমস্ত রচনা পুরাতাত্ত্বিকদের কদাচিৎ কৌতূহল জাগানো একটি খণ্ড অতীতের বিবর্ণ কিছু দলিল মাত্রই হয়ে থাকত।" একথা অতি সত্য যে তারাশঙ্কর একটা বিশেষ সময় ও স্থানের কথা লইয়া বহু রচনা গড়িয়া তুলিয়াছেন। সে হিসাবে তাঁহার রচনার documentary (দলিল জাতীয়) মূল্য আছে। কিন্তু তাঁহার লেখার প্রাণ রসবোধ ও রস অভিব্যক্তির ভিতর দিয়াই জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার ভিতরে দলিলের শুষ্ক প্রাণহীন তালিকাগত বিবরণের সহিত কোনও সাদৃশ্য কোথাও আবির্ভূত হয় নাই। তাঁহার প্রাণের স্পর্শে একান্ত শুষ্ক যাহা তাহাও রস আহরণ করিয়া নুতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

রেলে "ঘুঘুর বাসা"

আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংবাদাতার নিকট রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী বি সি গাঙ্গুলি বলিয়াছেন যে তাঁহাকে "সরিয়ে দেওয়া হল কারণ (তিনি) রেলওয়েকে অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি লাভ জনক সংস্থায় পরিণত করতে" চেয়েছিলেন। শ্রীগাঙ্গুলি বলেন তিনি যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাতে মোটামুটি ভাবে রেলের আরও অতিরিক্ত ১৬ কোটি টাকা লাভ হত। যদিও বাজেটে রেলের অনুমানিক ঘাটতির পরিমান ৭ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। তিনি বলেন রেলের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর এই হাল হয়েছে।

শ্রীগাঙ্গুলি বলেন যে তাঁহার নিকট এখনও কিছু কিছু গোপনীয় কাগজপত্র আছে, কিন্তু তিনি দফতরে যাইতে পারিতেছেন না তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইবে সেই ভয়ে। তিনি কার্য্যভার অপর হস্তে দিয়া এখনও কার্য্য হইতে সরিয়া যান নাই।

সাময়িকী

কলিকাতার পথঘাট ও ঘরবাড়ীর কথা

কলিকাতার পথঘাট ক্রমশঃ আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যাহা অতি সহজে করা যায় অর্থাৎ রাস্তা ঘাট হইতে আবর্জ্জনা উঠাইয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা তাহাও ক্রমশঃ এরূপ ঢিলাভাবে করা হইতেছে যে বহু রাজপথের মাত্র এক চতুর্থাংশ মানুষ ও যান বাহন চলিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তিন চতুর্থাংশ ভরিয়া থাকে পর্ব্বতপ্রমাণ আবর্জ্জনার স্তূপে। এই আবর্জ্জনা অনেক সময় দৈনিক যতটা সরান হয় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমান ২৪ ঘণ্টায় জমা হইয়া যায়। সুতরাং আবর্জ্জনা ক্রমঃবর্দ্ধনশীল ও বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে তাহা পূর্ণরূপে কখন সরান হয় না। যাহারা আবর্জ্জনার সৃষ্টি করে তাহারা গৃহস্থ, দোকানদার অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় হয় ডাব, কমলা লেবু, কলা, ভুট্টা বিক্রেতা অথবা অপর জাতীয় ফেরীওয়ালা। কলিকাতার রাজপথ হইল অসংখ্য ভিন্ন জাতীয় ফেরীওয়ালার ব্যবসাক্ষেত্র। চৌরঙ্গীর মত প্রধান রাজপথেও পদব্রজগামীর "ফুটপাথ" দিয়া মানুষ চলিতে পারে না; কারণ সেইখানে বিক্রয়বস্তুর পাহাড় ও ক্রেতা বিক্রেতার মিলন স্থান। জামা কাপড় জুতো ঔষধ প্রসাধনবস্তু ইত্যাদি সকল কিছুই ফুটপাথাস্থিত রাস্তায় ঢালিয়া রাখা দোকান হইতে সকলে ক্রয় করে। পথ চলিতে হয় পণ্যদ্রব্যের পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া এবং মহাসাবধানে। এই সকল ফেরীওয়ালাদিগের জন্য পথঘাট আরও আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। অন্যান্য রাজপথে বহুলোকে শুইয়া ঘুমায়, রন্ধন করিয়া খায়, স্নান করে, গাড়ী ধোলাই করে, কাপড় কাচে এবং বাসন মাজে। অলিতে গলিতে ট্যাক্সি, বাস প্রভৃতি সারারাত দাঁড়াইয়া থাকে, মেরামত হয় এবং চালকগণও খাটিয়া পাতিয়া সেই স্থলেই রাত কাটায়। এইরূপ অবস্থায় কলিকাতার পথঘাট লোক চলাচল বা গাড়ী চলিবার জন্য অল্পই ব্যবহৃত হয়। উহার সহিত বস্তির উঠানের সাদৃশ্যই অধিক শুধু সেই উঠানগুলিতে কিছু আব্রু আছে, পথেঘাটে তাহা নাই। চৌরঙ্গী এক সময় যখন ধর্ম্মবীর লাট ছিলেন তখন ফেরীওয়ালা শূন্য করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে আবার ঢিলা রাজ হইলে পরে ঐ ফেরীওয়ালাগণ সদলবলে ঐ স্থলে ফিরিয়া যায়।

কলিকাতার পথঘাটের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক দোষ হইল অসমতা ও বিবরবাহুল্য এবং এই দোষ সামান্য কিছু প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর সঙ্কুল দুর্গমতার আকার গ্রহণ করে। বিরাট গর্ত্তগুলি ক্রমে আকারে বাড়িয়া চলে ও পরে এমন হয় যে কোন যান বাহন সেই পথে চলা, অসম্ভব হয়। শুনা যায় দশ বিশ বা শতকোটি টাকা কলিকাতার উন্নতির জন্য শীঘ্রই ব্যয় করা হইবে কিন্তু পথঘাটের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে ঐ সকল কথা কল্পনা বিলাস-জাত। কলিকাতার বাসিন্দাগণ স্থানাভাবে কোনও প্রকারে দিন কাটাইয়া থাকেন। শুনা যায় সহর নুতন নুতন দিকে বিস্তৃত না করিলে বাসস্থান গঠন সম্ভব হইবে না। কিন্তু কলিকাতায় বহু বস্তি, একতালা বাড়ী অথবা অতি পুরাতন দুই তিন তালা বাড়ী আছে। ঐ গুলিকে ভাঙ্গিয়া সেই স্থলে উচ্চ উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিলে বহু লোকের বাসের আয়োজন হইতে পারে। বস্তিগুলিও ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং যে সকল বস্তিতে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইবে

সেইগুলি সর্ব্ব প্রথমে ভাঙ্গিবার আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য হইবে। বস্তিবাসীগণ যদি নূতন অট্টালিকায় বাসস্থান লইতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহারা যাহাতে ন্যায্য মূল্যে তাহা পায় সে ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য হইবে। নতুবা বস্তি অধিকৃত জমি খালি করিয়া দিবার জন্য ঐ জমির মালিকগণ গভর্ণমেণ্টকে জমির মূল্যের শতকরা ১০।১৫ টাকা খালি করার খরচা হিসাবে দিবেন ও ঐ টাকা দিয়াই অন্যত্র সস্তা জমি ক্রয় করিয়া সেখানে বস্তির ভাড়াটিয়াদিগকে সরাইয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে হইলেও ভাড়াটিয়াদিগকে তুলিয়া মালিকদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে বৃহত্তর গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেও কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে প্রস্তুত থাকিলে অর্থ সাহায্য দান, প্রস্তুত না থাকিলে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য করা, ভাড়াটিয়াদিগকে উঠিয়া যাইলে দিবার এবং ইচ্ছামত নূতন বাড়ী হইলে তাহাতে পুনর্ব্বার ভাড়াটিয়া হওয়া প্রভৃতির কথাও বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা বিচার ও মীমাংসার বিষয়।

কলিকাতার বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ

ইতিপূর্ব্বে যাহারা পুরীধামে ভ্রমণে যাইতেন তাঁহারা সেই সহরের বৈদ্যুতিক আলো পাখা হঠাৎ হঠাৎ থামিয়া যাওয়া লইয়া হাসাহাসি করিতেন। দিনে অন্ততঃ দুই তিনবার আলো পাখা বন্ধ হইয়া যাইত ও তাহা লইয়া প্রশ্ন করিলে তদ্দেশীয় লোকেদের অকারান্ত ভাষায় কারণ প্রদর্শন লইয়া সকলেই হাসিত। দোষ সর্ব্বদাই "হিরাকুদ (অ) গ্রিদ (অ)"র নামেই দেওয়া হইত কারণ উক্ত "গ্রিড" নাকি বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরণ সম্বন্ধে অতিশয় অপারগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কলিকাতায় আমাদের কোন গ্রিড হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রাপ্তি হয় তাহার উত্তরে কেহ কিছু সঠিক বলিতে পারেন না। শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র—পাওয়ার হাউস—ব্যাণ্ডেল স্টেশন—দামোদর ভ্যালি ইত্যাদি নানা নামেরই উল্লেখ হয়। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এর নামও ক্রমাগতই উঠিয়া থাকে কারণ প্রথম প্রতিষ্ঠানটি সকলকে শক্তি সরবরাহ করে ও তজ্জন্য মূল্য আদায় করে ও দ্বিতীয়টি বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সকল বিষয়েই সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু কিছুদিন হইতে ক্রমাগতই বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ লইয়া কলিকাতাবাসী বিশেষভাবে নাজেহাল হইতেছেন। যখন তখন থাকিয়া থাকিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ বন্ধ করা হয়; কখন এক অঞ্চলে কখন অন্যত্র। ফলে বৈদ্যুতিক আলো পাখা ত বন্ধ হইয়া যায়ই, আরও বন্ধ হয় খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু ঠাণ্ডা রাখিবার রেফ্রিজারেটর আলমারি, ঘর ঠাণ্ডা করিবার এয়ার কন্ডিশনার কল, একতলা হইতে বহুতলা উর্দ্ধে উঠিবার লিফ্‌ট্, রন্ধনের বৈদ্যুতিক চুল্লি, নানা প্রকার কলকব্জা চালাইবার মোটর ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে সকল কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। লেখাপড়া, রোগ চিকিৎসা, গমনাগমন, প্রভৃতিও বন্ধ হয়। লিফট্ অর্দ্ধপথে আটকাইয়া গিয়া যাত্রীদিগের মহা কষ্টের সৃষ্টি করে, বহু মূল্যবান দ্রব্য গরম লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়, আরও কত কিছু বাধ্য হইয়া বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করে।

এই যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহে বাধা ইহার জন্য আমরা বলিব, আমাদিগের শাসকগণই দায়ী। কারণ তাঁহারাই বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ এক হাতে রাখিয়াছেন, তাঁহারাই ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে হাত পা বাঁধিয়া অক্ষম করিয়া রাখিয়াছেন। জনসাধারণের একান্ত আবশ্যকীয় যাহা তাহার সরবরাহ লইয়া ছিনি মিনি খেলা শুধু আমাদের শাসকদিগের পক্ষেই সম্ভব। অন্য দেশ হইলে ইহার একটা ব্যবস্থা বহু পূর্ব্বেই হইয়া যাইত। কিন্তু আমাদিগের দেশে জনসাধারণকে কষ্টভোগ করান সরকারী তরফের একটা অহেতুক আগ্রহের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহারও কোন লাভ নাই শুধু শাসকদিগের অভ্যাস দোষের জন্য জনসাধারণ বৈদ্যুতিক শক্তি ঠিকমত পান না। গভর্ণমেণ্টের ইহাতে লাভ ত হয়ই না বরঞ্চ লোকসানই হয়। হিন্দীতে বলে মোছকা লড়াই অর্থাৎ কাহার গোঁফ দীর্ঘতর তাহা লইয়া

প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এখানেও কে কাহাকে দাবাইয়া রাখিবে তাহাই লইয়া দ্বন্দ্ব। মরে জনসাধারণ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের লুণ্ঠন নীতি

লুণ্ঠন কথাটার বাজারের অর্থ হইল গায়ের জোরে পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া। এই অর্থ অনুসরণ করিয়া যে কোন জোর করিয়া টাকা আদায়কে লুণ্ঠন বলা যাইতে পারে। কলিকাতা কর্পোরেশন আইনত নানা প্রকার কর্পোরেশনী কর আদায় করিয়া থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই আদায়গুলিও আইনের আশ্রয়ে জোর করিয়াই আদার করা বলা যাইতে পারে, কারণ কর্পোরেশন যে সকল জনহিতকর কার্য্য করেন বলিয়া ঐ কর আদায়ের অধিকার তাঁহাদের দেওয়া হইয়াছে সে কাজগুলি কর্পোরেশন যথাযথ ভাবে কোন সময়েই করেন না। সম্প্রতি কর্পোরেশন একটা নুতন উপায়ে টাকা আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা হইল কোন কোন রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া রাখিলে কর্পোরেশনকে পয়সা দিতে হয়। আধ ঘণ্টা দাঁড় করাইলে ২০ নয়া পয়সা ও তৎপরে আরও অধিক হারে পয়সা আদায় করা হয়। একথা সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষে একটা মোটর গাড়ীর রাস্তা দিয়া চলিবার জন্য রোড ট্যাক্স্ নামক কর পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। এই কর কখন কখন বাৎসরিক ২৫০।৩০০ টাকাও হইয়া থাকে। অর্থাৎ বৎসরে যদি কেহ ২৫০।৩০০ দিন গাড়ী চালান তাহা হইলে তিনি দৈনিক এক টাকা রোড ট্যাক্স্ দিয়া থাকেন। যে পার্কিং ফি বা গাড়ী দাঁড় করাইয়া রাখিবার করের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নিম্নতম হার হইল কুড়ি পয়সা। অর্থাৎ ২০০শত দিন যদি কেহ প্রত্যহ কুড়ি পয়সা দিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সেই করের বাৎসরিক পরিমান হয় চল্লিশ টাকা। অনেক ব্যক্তি আজকাল এই কর্পোরেশনী কর দিনে একাধিক বার দিয়া থাকেন। অর্থাৎ কেহ কেহ বাৎসরিক এক শত টাকার অধিক টাকাও কর্পোরেশনকে দিতে বাধ্য হইতেছেন! এই কর আমাদের মতে অন্যায় ভাবে লওয়া হইতেছে। কারণ রোড ট্যাকস দেওয়ার অর্থ রাস্তা ব্যবহার করিবার জন্য মূল্যদান। রাস্তা ব্যবহার অর্থে গাড়ী চালিত রাখাই শুধু নহে। রাস্তাতে গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহা রাস্তা ব্যবহার ব্যতীত আর কিছু নহে। সেই কারণে গাড়ী দাঁড় করাইলে কর দিতে হইবে এবং চালাইলে সেই কর লাগিবে না এইরূপ নিয়ম অর্থহীন, যুক্তিহীন ও অন্যায়। আমরা আশাকরি বাংলাদেশের শাসকগণ কর্পোরেশনের এই অন্যায় টাকা আদায় বন্ধ করিয়া দিবেন। হয়ত বলা হইবে যে লণ্ডনেও "পার্কিং ফি" কোথাও কোথাও দিতে হয়। কিন্তু লণ্ডনের "ফি পার্কিং" স্থানগুলি রাস্তার বাহিরে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সেখানে যাহারা "ফি" আদায় করে তাহারা লণ্ডন কাউন্টি কাউনসিলের তরফ হইতে সেই পয়সা আদায় করে না।

দেশ-বিদেশের কথা

পাকিস্থান কর্তৃক জাতীয় অঞ্চল বিদেশীকে দান

পাকিস্থান যখন অবৈধভাবে কাশ্মীরের কিয়দংশ দখল করিয়া বসিয়া যায় তখন পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিগুলি সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া পাকিস্থানের যথেচ্ছাচারের সমর্থন করে। পরে যুদ্ধ করিয়া কাশ্মীরের আরও কোন কোন অঞ্চল দখল করিতে গিয়া পাকিস্থান পরাজিত হইয়া অনেক এলাকা ভারতের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া পলাইতে বাধ্য হয়। বিশ্বজাতি সংঘের পাণ্ডাগণ ভারতকে কিন্তু ঐ সকল এলাকা পুনরায় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে। ভারত সরকার ঐ নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া পাকিস্থানের কাশ্মীর দখলও মানিয়া লইয়াছিলেন বলা যায়। পাকিস্থান কাশ্মীরের নিজ অধিকৃত অংশের কোন কোন স্থান চীনকে দান করে ও চীন এখনও সে সকল অঞ্চল নিজ দখলে রাখিয়া চলিয়াছে। শুনা যায় পাকিস্থান পূর্ব্ব বাংলার কোন কোন অংশ বিদেশী দিগকে ইজারা দিয়াছে। এই কথা কতটা সত্য তাহা সঠিকভাবে এখন বলা যায় না। তবে এই বিষয়ে ভারতের সতর্কতা প্রয়োজন। ভারত বিভাগ করিয়া যে অংশ পাকিস্থান নাম পাইয়াছে তাহা বিদেশীকে দান করিবার অধিকার পাকিস্থান শাসকদিগের নাই। কারণ পাকিস্থানের ভূমি মুসলমান শাসিত বিভিন্ন রাষ্ট্রান্তর্গত থাকিবে বলিয়াই ভারত বৃটেনের সহিত চুক্তি অনুসারে সেই সকল এলাকা পাকিস্থানকে দিয়াছে। সেই সকল জমি ভারত অথবা পাকিস্থান ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রের অধিকারে যাইতে পারে না। যদি কোন অঞ্চলে পাকিস্থানী রাজত্ব বহাল না থাকে তাহা হইলে সেই অঞ্চল ভারতে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া ন্যায়ত ধরা যাইতে পারে। চীন অথবা অপর কোন বিদেশী শক্তির কবলে যদি কোন জমি পাকিস্থান পড়িতে দেয় তাহা হইলে সেই জমি ভারতেই ফিরিয়া যাইবে। ভারত সরকারের এই দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কারণ যদি মানিয়া লওয়া হয় যে আয়ুব খাঁ অথবা ইয়াহিয়া খাঁর পাকিস্থান অঞ্চল বিক্রয় বা ইজারা দিবার অধিকার আছে তাহা হইলে সেই কার্য্য পূর্ণতরভাবে করিলে পাকিস্থান যে আমেরিকা বা চীনের রাষ্ট্রান্তর্গত হইয়া যাইবে না তাহারই কোন নিশ্চয়তা থাকিবে ?

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ডলার মূল্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা

বৃটেনের সাপ্তাহিক (ম্যানচেষ্টার) "গার্ডিয়ান" বলেন :

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পৃথিবীর বাজারে ডলারের উপর আস্থা ফিরাইয়া আনার এবং ডলারের ঘরে-বাহিরে মূল্যরক্ষার ব্যবস্থার ধাক্কায় পশ্চিমের দেশগুলিতে একটা মহা আর্থিক তোলপাড়ের সৃষ্টি হইয়াছে। নানা দেশের টাকা অদল বদলের বিনিময়-হারের কোন স্থিরতা না থাকায় এবং অর্থ বিনিময় বাজারগুলি দরজা বন্ধ করিয়া থাকায় বিশ্বের মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অচল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নিকসন একটা জাতীয় সংকটময় পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে ঘোষণা করিয়া কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমতঃ তিনি বিগত ২৭ বৎসর ধরিয়া ডলার ভাঙ্গাইয়া সোনা পাওয়ার যে নিয়ম ছিল তাহা রদ করিয়া দেন। তাহার পর আমদানি বাণিজ্যে যে সকল বস্তু আমেরিকায় আনা হয় তাহার মধ্যে অধিকাংশের উপর একটা

শতকরা দশভাগ শুল্ক বসান হইয়াছে; নব্বই দিনের জন্য সকল বেতন ও মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করা হইয়াছে এবং বাহিরের দেশগুলিকে যে সাহায্য দান করা হয় তাহাও এক দশমাংশ হারে হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার উপর করা হইয়াছে শাসন ব্যয়ের বিশেষ লাঘব ব্যবস্থা এবং আয়কর ও মোটর গাড়ীর মাশুল হ্রাস।

ইউনাইটেড ষ্টেটস-এর রাজকোষ সচিব শ্রীযুক্ত জন কোন্যালি বলেন যে ডলারের বিনিময় মূল্য কমানোর কথা বলিবার সময় এখনও হয় নাই যদিও বিদেশে অনেকেই ঐজাতীয় কথাই ভাবিয়া থাকেন। লণ্ডনে আমেরিকা আগত পর্য্যটকদিগের ডলার পাউণ্ডে ২·৮০ সেণ্ট হারে বিনিময়ের কথা শুনা যায় যদিও নির্দ্দিষ্ট হারের উচ্চতম সীমা হইল ১ পাউণ্ড = ২·৪২ ডলার।

পশ্চিমের সকল দেশের মন্ত্রীসভাগুলি এই ব্যাপার লইয়া ক্রমাগত বৈঠকের পর বৈঠক করিয়া চলিয়াছেন। ইয়োরোপের যে ছয়টি দেশ সাধারণতঃ একভাবে ক্রয় বিক্রয় করিতে চুক্তিবদ্ধ সেই "কমন মার্কেট" অন্তর্গত দেশগুলি এই বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনা করিতেছেন। হয়ত তাঁহারা নিজেদের সকল মুদ্রার বিনিময় মূল্য পরিবর্তনশীলভাবে রাখিয়া দিবেন। যে দশটি দেশ পৃথিবীতে ধনবান বলিয়া পরিচিত সেই দেশগুলিও সম্ভবতঃ শীঘ্রই একটা সুচিন্তিত কর্ম্মধারা নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়া মনে হয়। জাপানের বাণিজ্য অধিক ভাবে আমেরিকার সহিতই হইয়া থাকে। জাপান নিজের ইয়েনের বিনিময় মূল্য কি ভাবে বদল করিবে তাহা অন্য সকল দেশ দেখিতেছে। নিকসন প্রবর্ত্তিত শতকরা দশাংশ আমদানি শুল্ক জাপানের ব্যবসার ক্ষতির কারণ হইয়াছে। এই অবস্থায় জাপান নিজের মুদ্রার বিনিময় হার অদল-বদল করিতে বাধ্য হইবে।

ধারকর্জ্জার হিসাব

"স্বরাজ্য" সাপ্তাহিক (ইংরেজী) একটি ধার-কর্জ্জার হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভারতের প্রদেশ সমূহের কেন্দ্রের নিকট যে ধার আছে তাহা তৎসংক্রান্ত অপরাপর খবর দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭১ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসের শেষে যে সকল ঋণ শোধ হয় নাই তাহার মোট পরিমান ছিল ৬,৩৪২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে যে সকল প্রদেশের ঋণ অধিক ছিল সেগুলি হইল উত্তর প্রদেশ ৬৮৬.৪৫ কোটি, পশ্চিমবঙ্গ ৫৮৮.৪২ কোটি, রাজস্থান ৫৭৬.৫৫ কোটি, অন্ধ্রপ্রদেশ ৫৬৬.২৪ কোটি, মহারাষ্ট্র ৪৪৮.৬৬ কোটি, ওড়িষ্যা ৩৭৬.০৯ কোটি এবং তামিলনাড়ু ৩৫০.৯১ কোটি। অপরাপর প্রদেশগুলি সমবেত ঋণের পরিমান ২১৫৯.২৭ কোটি টাকা। এই সকল ঋণের সুদ শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা ৭৫ পয়সা।

রিসার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে সকল প্রদেশ ধার করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করেন সেই সকল ধার করিয়া অতিরিক্ত খরচের মোট পরিমান ২৫৪.৪৭ কোটি টাকা। (১৯৭১) পূর্ব্ব বৎসরে এই ধারের মোট পরিমান ছিল ১১৮.৭০ কোটি। তিনটি প্রদেশের এই প্রকার ধার ছিল না। সেগুলি হইল ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ।

এই জাতীয় ঋণের বিলিব্যবস্থা করিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতি বৎসরই অনেক টাকা খরচ করিতে হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ঐজাতীয় খরচ হইয়াছিল মাত্র ২৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঐ খরচ বাড়িয়া ১২৯ কোটি ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৫৪১ কোটি হয়। প্রথম তিন বৎসরে ব্যয় করিতে হয় ৯৮২ কোটি ও ১৯৬৯-৭১ খৃঃ অব্দে হয় ৮৬৩ কোটি টাকা। নূতন নূতন ঋণের ব্যবস্থা করিয়া যে সকল টাকা উঠান হয় তাহার শতকরা ৩০ ভাগ পুরাতন ঋণ শোধের ব্যবস্থায় লাগিয়া যায়।

জাপানে শ্রমিকের সাতখুন মাফ হয় না

বিগত মে ১৮ই হইতে মে ২০শে পর্য্যন্ত জাপানের রেলপথগুলিতে যে হরতাল করা হয় তাহার পরে ২৫১৫৮ শ্রমিকের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ইহার মধ্যে ৬৮ জনকে কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করা হয়, ৩৪৯ জনকে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ হইতে সাময়িকভাবে বসাইয়া দেওয়া হয়, ২২৮১৫ জনের আর্থিক জরিমানা

জনকে ভবিষ্যতে ঐজাতীয় হরতাল করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া শাসানো হয়। এই ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায় যে জাপানে শ্রমিকের অধিকার বলিতে জাপানীরা যথেচ্ছাচারের অধিকারকে ধার্য্য করেন না। সংযম, নিয়ন্ত্রণ ও আইন মানিয়া চলা জাতীয় উন্নতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য। একথা সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়।

আরব ও পশ্চিমা মুসলমান বাংলার মুসলমানকে কি ভাবে

শুনিয়াছি ভারতের মুসলমানগণ যখন হজ করিবার জন্য মক্কাধামে গমন করেন তখন তত্রস্থ পাণ্ডাগণ ভারতীয় তীর্থযাত্রীদিগকে কিছুটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। তাহাদের "হিন্দি" বা ভারতীয় বলিয়া বর্ণনা করা হয় এবং যথাসম্ভব অধিক মূল্যে অল্প বস্তুসম্ভার সরবরাহ করার চেষ্টা হয়। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে আরবগণ বাংলা দেশের বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যেও পার্থক্য দেখিতেছে। কারণ বহুলক্ষ মুসলমান বাংলায় পাকিস্থানী সেনাদ্বারা নিহত, আহত ও ধর্ষিত হইলেও আরবগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তাহারা পশ্চিম পাকিস্থানের কথাই পরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বোধহয় পশ্চিমা পাকিস্থানীগণ বিধর্ম্মী বলিয়া বর্ণনা করিতেছে ও নিজেদের পরম বিশ্বাসী মুসলমান বলিতেছে। কিন্তু আরবদিগের ঐ ভাবে পরের কথা শুনিয়া চলিবার কোনও কারণ নাই। তাহারা অনায়াসেই ভারতে ও বাংলাদেশে ঘুরিয়া যাইতে পারে ও দেখিতে পারে যে পাকসৈন্যগণ কি ভাবে কাহার উপর কতটা অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইবে না। অনুসন্ধান না করিয়াই তাহারা সকল কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্মান্ধতা মানুষকে নানাভাবে অন্ধ করে। আরব রাজনীতিবিদগণ বুঝিয়াছে যে পাকিস্থান থাকিলে তাহাদের সুবিধা; সুতরাং তাহারা বাংলাদেশ বিদ্বেষী। কে বুঝাইয়াছে? সম্ভবত বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ। বর্ত্তমানে বৃটিশ রাজনীতিবিদগণ খোলাখুলি এবং রাষ্ট্রীয় তরফ হইতে কিছু করে না। চীন, আমেরিকা, রুশিয়াই আজকাল দলপতির স্থান গ্রহণ করিয়া এই গোষ্ঠী, সেই গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহের আয়োজন করিয়া থাকে। কিন্তু বৃটিশ রাজনীতিক্ষেত্রে নাই বলা চলে না। আছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের কোনও সন্ধি সর্ত্ত বা ব্যবস্থার জন্য নহে; আছে উপদেশদাতা হিসাবে বন্ধুভাবে। বৃটিশ পরামর্শদাতা সর্ব্বত্রই ঘোরাফেরা করিতেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ব্যাপারে ফোড়ন দিবার কার্য্য করিতেছে।

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি

মুদ্রা হইল ক্রয় বিক্রয়ের হাতিয়ার। প্রায় সকল ক্রয়-বিক্রয়ই মুদ্রা অথবা মুদ্রা জাতীয় কিছু (চেক, ড্রাফট ইত্যাদি) দিয়া করা হয়। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি যদি ব্যবসার বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া চলে তাহা হইলে দ্রব্যমূল্যের বাজারে কোনও গোলমাল হয় না। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি (ইনফ্লেশন) হেতু মূল্য বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যদি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং ব্যবসাবৃদ্ধি সেই তুলনায় যথেষ্ট না হয় তাহা হইলে বাজারে সব কিছুর মূল্যই বাড়িয়া চলে ও তাহার জন্য মুদ্রার সংখ্যাবৃদ্ধিকেই দায়ী করা হয়। ১৯৬৫।৬৬ খৃঃ অব্দের তুলনায় ভারতে ১৯৭০।৭১-এ মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৩০ এরও অধিক। ১৯৬৫।৬৬-তে যদি মোট মুদ্রার পরিমাণ ৩২০০ কোটি টাকার মত হয়, ১৯৭০।৭১-এ তাহা বাড়িয়া হইয়াছিল ৪৩০০ কোটি। ব্যবসা বৃদ্ধি শতকরা ৩০ হারে বাড়িয়াছে বলিয়া কেহ বলে না। সুতরাং মুদ্রা স্ফীতি দোষের জন্য সাধারণ ভাবে দ্রব্যমূল্য উর্দ্ধগামী হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

ধাতুমুদ্রার স্বল্পতা

সাধারণ ভাবে মুদ্রার পরিমাণ যে ভাবে বাড়িয়াছে অল্পমূল্যের ধাতুমুদ্রা সেই হারে অধিক সংখ্যায় বাজারে না ছাড়াতে এবং তাহার কিছু অংশ গালাইয়া ফেলিয়া লোকে অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুত করায় ঐ জাতীয় ধাতু মুদ্রার বিশেষ ঘাটতি হইয়াছে। কিন্তু সেই ঘাটতির প্রধান কারণ হইল ধাতুমুদ্রা যথেষ্ট না থাকা। এই কারণে সরকার মুদ্রা গালান বন্ধ করিবার জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থাই করুন, ধাতুমুদ্রা আরও অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা অত্যন্তই আবশ্যক এবং তাহা না করিলে মুদ্রা যথেষ্ট বাজারে পাওয়া যাইবে না বলিয়াই মনে হয়। বাজারে কেনাবেচা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইত এখন তাহা অপেক্ষা শতকরা ১৫।২০ অংশ অধিক হয়। তাহার জন্য যে পরিমাণে অধিক কাগজে ছাপা মুদ্রা প্রয়োজন হয় তাহা ছাপা হইয়াছে। শুধু ধাতুমুদ্রার পরিমাণ ততটা বাড়ান হয় নাই। এই পরিস্থিতিতে মুদ্রা বিভাগকে (রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া) নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শীঘ্র শীঘ্র সজাগ করান আবশ্যক।

বন্যা বিদ্ধস্তদিগকে সাহায্য দান

পশ্চিমবাংলাতে যে বন্যা হইয়াছিল ও যাহার জল এখনও অনেক স্থল হইতে নামে নাই, তাহার জন্য পশ্চিম বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রায় ৬৭ কোটি টাকা চাহিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বন্যা বিদ্ধস্ত-দিগের সাহায্যার্থে মাত্র সাড়ে একত্রিশ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহাতে পশ্চিমবাংলা সরকার সাহায্য দান কার্য্যে কিছু হাত টানিয়া চলিতেছেন ও ফলে বন্যা নিপীড়িতদিগের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতেছে। অনেকে দোষ চাপাইতেছে উদ্বাস্তুদিগের উপর, কারণ তাহাদিগের মনে এই কথাই জাগ্রত হইতেছে যে উদ্বাস্তুদিগের জন্য দৈনিক দুই কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে বলিয়াই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতটান হইয়াছে। আসল কথা হইল পশ্চিম বাংলায় বেকার সমস্যা, কারবারে লাভ না হওয়া, কাঁচামালের অভাব প্রভৃতি ব্যাধি থাকাতে অসন্তোষ সহজেই জাগিয়া উঠে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত মূলধন হিসাবে বহু খাতে বহু টাকা খরচ না করিয়া যাহাতে মানুষ সাময়িক বিপর্য্যয়ের হাত হইতে সহজে উদ্ধার পায় তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা। কারখানা, রেললাইন, বাঁধ, সেতু ইত্যাদি এমনিতেও বহু বিলম্বে গঠিত হইতেছে, খরচ বিলম্বে করিলে না হয় গঠন কার্য্যে আরও কিছু বিলম্ব বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু লোকের মাথার উপর ছাদ, হাঁড়িতে চাউল, ঔষধ, বস্ত্র প্রভৃতি অবিলম্বে না পাইলে চলে না। ঔষধ যথাসময়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক। খাদ্য, বস্ত্র ও মাথা গুঁজিবার স্থান সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

যুদ্ধের আয়োজন

যুদ্ধের কথা হইলেই আমরা ভারত ও পাকিস্থানের ভিতর সমর সম্ভাবনার আলোচনা করিতে বসিয়া যাই। কিন্তু ভারত বা পাকিস্থানের সৈন্য সংখ্যা দিয়া যদি সেই সম্ভাবনার বিচার করা হয় তাহা হইলে মনে হইবে যে যুদ্ধ না হইবার দিকেই সকল লক্ষণ অধিক প্রকটভাবে নজরে পড়ে। ভারতের অথবা পাকিস্থানের সৈন্য সংখ্যা কোন অবস্থাতেই ৩।৪ লক্ষের অধিক হয় না। ইহার সহিত তুলনায় যদি কেহ রুশিয়া ও চীনের যত সৈন্য মুখোমুখী সঙ্গীন উঁচাইয়া খাড়া আছে তাহাদের সংখ্যা গণনা করে তাহা হইলে মনে হইবে ঐ দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগিল বলিয়া। কারণ উভয় দেশই প্রায় পাঁচ লক্ষ করিয়া সৈন্য রুশ-চীন সীমান্তে সদা প্রস্তুতভাবে স্থাপন করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অধিক সৈন্য উভয় দেশই নিজেদের অপরাপর সীমান্তে রাখিয়া থাকে। যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কথা বিচার করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে ঐ দেশের সৈন্য সংখ্যা ৮৫০০০০ কমাইবার পরে অবশিষ্ট থাকিবে ২৫০০০০০ (পঁচিশ লক্ষ) বলিয়া জানা যায়। এই সকল বৃহৎ বৃহৎ সামরিক শক্তির আধার দেশগুলিও সামরিক আয়োজনে যে অর্থ ব্যয় করে তাহার তুলনায় আমাদের মোট জাতীয় আয় ও অত্যল্প প্রতীয়মান হইবে। শুধু সৈন্য সংখ্যা নহে, সামরিক বিমানও সংখ্যাতে ইহাদের নিকট যত আছে তাহার তুলনায় আমাদের যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা শতকরা পাঁচটিও হইবে না। যুদ্ধ জাহাজ (ভাসমান ও ডুবো জাহাজ) আমাদের ত নাই বলিলেই চলে।

সুতরাং সামরিক তোড়জোড় দেখিয়া সমর সম্ভাবনা বিচার করিলে ভারত অথবা পাকিস্থানের ভিতর যুদ্ধ লাগিবার আশংকা ততটা প্রবল মনে হয় না। অথচ পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করিলে দেখা যায় একদিকে পাকিস্থান অকাতরে যত বর্ব্বরতা করিয়া চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে উৎপীড়িত জনতার প্রত্যাক্রমণ হইলেই তাহা ভারতের দোষ বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা করিতেছে। উদ্দেশ্য যদি কোনও সময় পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যোগী হয় তাহা হইলে বলিতে পারিবে যে ভারত পাকিস্থানের বিরুদ্ধে নানা প্রকার শত্রুতার কার্য্য করার ফলে ঐ যুদ্ধ ঘটিয়াছে। কিন্তু বস্তুত পাকিস্থান প্রথমত পূর্ব্ব বাংলায় পাঁচ লক্ষ নির্দোষ জনসাধারণকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়াছে ও পঞ্চাশ হাজারের অধিক অসহায় নারীদিগকে ধর্ষণ করিয়াছে ও এই পাশবিক অত্যাচারের ফলে নব্বই লক্ষ

পূর্ব্ব বাংলাবাসী জনসাধারণ পলাইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে ভারতের জনসাধারণকে একটা অতি কঠিন সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ও আর্থিক ক্ষতিও ভারতের সহস্র কোটি টাকার মত ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় পাকিস্থানের নির্লজ্জ ভারত বিরোধী অপপ্রচারের কোন কারণ আছে বলিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করিতে পারেন না। বরঞ্চ ভারত যদি পাকিস্থানকে আক্রমণ করিয়া পূর্ব্ব বাংলা দখল করিয়া লইয়া নব্বই লক্ষ পলাতক পূর্ব্ব বাংলাবাসীকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে সাহায্য করিত; তাহাই ন্যায্য কথা বলিয়া বিশ্ববাসী স্বীকার করিত। কিন্তু নানা কথা ভাবিয়া ভারত তাহা করে নাই। যুদ্ধ করিয়া পাকিস্থানকে হটাইতে পারিবে না এ কথা মনে করিবার কোনও প্রশ্ন কোন সময় ওঠে নাই; কারণ যুদ্ধ হইলে ভারতেরই বিজয় হইবে এ কথা সর্ব্বজন স্বীকৃত।

চীন পাকিস্থানের সহায়তা করিবে অথবা আমেরিকা অধিক করিয়া সাহায্য দান করিয়া পাকিস্থানকে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম করিয়া তুলিবে প্রভৃতি কথার কোনও বিশেষ মূল্য কোন সময় ছিল না, এখনও নাই। কারণ পাকিস্থান ১৯৪৭ ও ১৯৬৫, এই দুইবার ভারতের নিকট পরাস্ত হইয়াও চীন বা আমেরিকার সাহায্যে জয়লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। এখন যুদ্ধ হইলে চীন হইতে সাহায্য আসিয়া পাকিস্থানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে বলিয়া কেহ মনে করে না। চীন নিজের শিরঃপীড়া লইয়াই ব্যস্ত। এতদ্ব্যতীত পাকিস্থানকে চীন কি অবস্থায় কতটা সাহায্য করিবে তাহার বিষয় কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই বলিয়াই মনে হয়। ভারতের উপর কোন চৈনিক আক্রমণ হইলে রুশ ভারতের সাহায্যে আসিবে একথা ভারত-রুশ পারস্পরিক সাহায্য বিষয়ক সন্ধিতে প্রকৃষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করা আছে। সুতরাং ভারত যে পাকিস্থানকে আক্রমণ করিতেছে না তাহার কারণ ভারতের যুদ্ধ বিরুদ্ধ মনোভাব এই কথাই বিশ্বাস করিতে হইবে।

ভারতের প্ররোচনায় বাংলাদেশে বিপ্লব?

কোন কোন মহাজাতির অপপ্রচারের সারমর্ম্ম এই যে ভারত যদি বাংলাদেশে বিপ্লবীদিগকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত না করিত তাহা হইলে ঐ দেশের মানুষ কখনও পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক বাহিনীর জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন ও শেষে সংগ্রাম অবধি করিতে উদ্যত হইত না। এই সকল জাতিগুলি নিজের নিজের ইতিহাসের মধ্যেই বিপ্লবের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে; অথচ আন্তর্জাতিক কূটনীতির সমর্থনে ইহারা সে ইতিহাস অগ্রাহ্য করিয়া মিথ্যা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বে বৃটেনের উপনিবেশ ছিল। নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহারা বৃটেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করে ও পরে সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া বৃটেনের শাসন বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মুক্তির পথে চলিতে সক্ষম হয়। সেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজ স্বাধীনতাকামী নানান জাতিকে দমন করিবার কার্য্যে অর্থ, অস্ত্র ও জনবল দিয়া সাহায্য করে। পাকিস্থানের এক ক্ষুদ্র সামরিক গণ্ডির অল্প সংখ্যক মানুষ আজ বহু কোটি মানুষের জীবনযাত্রার ও স্বাধীন আত্ম উপলব্ধির উপর নিজেদের স্বৈরাচারের জগদ্দল প্রস্তর চাপাইয়া রাখিয়া মানবতার সকল আদর্শ ও অধিকারকে পাশবিকতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সকল কথা জানিয়া বুঝিয়া আমেরিকা নিজের কূট অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য পাকিস্থানের সহায়তায় পূর্ণ উদ্যমে আত্ম-নিয়োগ করিয়া চলিয়াছে।

চীনদেশের ইতিহাসের ভিতরেও দেখা যায় যে চীনের মানুষ কিরূপ প্রবল আগ্রহে মুক্তির জন্য স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপাত করিয়া যুঝিয়াছে। সন্ ইয়াত সেন চীনকে একটা আফিংখোর দাসজাতির ঘৃণ্য অবস্থা হইতে কেমন করিয়া আত্মোন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, সে একটি মানব ইতিহাসের মহা গৌরবের অধ্যায়। পরে

চিয়াং কাই শেককে বিতাড়িত করিয়া কেমন করিয়া চীনের গণশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় তাহাও একটা আদর্শ সংগ্রামক্ষেত্রের মহান কাহিনী। কিন্তু সেই চীন যখন কূটনীতির মানবধর্ম্ম বিরুদ্ধ পথে চলিয়া বাংলা-দেশের মানুষের স্বাধীনতা প্রয়াসের মিথ্যা ব্যাখ্যান করিয়া জগতের সকল স্বাধীনতাকামী মানুষের চক্ষে নিজেকে হেয় প্রমাণ করিতে লাগিল তখন আমাদের প্রাণে একটা মানব চরিত্র সম্বন্ধে নিদারুণ অবিশ্বাসের উদয় হইতে আরম্ভ করিল। আমরা বুঝিলাম যে পৃথিবীর অনেক জাতিই নিজেদের ঐতিহ্য বিস্মৃত হইয়া দলা-দলির ও চালাকির মোহে সত্যের উপরে অসত্যকে এবং ন্যায়ের উপরে অন্যায়কে আসন দান করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ রাষ্ট্রীয় পন্থা অতি মন্দ তাহা কাহাকেও যে বুঝাইতে হইবে তাহা পূর্ব্বকালে আমরা চিন্তাই করিতে পারিতাম না। কিন্তু যেখানে মানব স্বাধীনতার উদ্ধার ক্ষেত্র আমেরিকা ও চীনে রাষ্ট্রনেতা-গণ স্বাধীনতা প্রয়াসী জনগণের বিরুদ্ধে চলিয়া মানব অধিকার দমনকারী শোষক স্বৈরাচারীদিগের সহায়তা করিতে ব্যগ্র দেখা যাইতেছে, সে স্থলে মানব সভ্যতা ক্রমোন্নতির পথে যাইতেছে কে বলিবে?

সুবিমল চন্দ্র রায়

ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি শ্রীসুবিমল চন্দ্র রায় বিগত ১২ই নভেম্বর দিল্লীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন ও তাঁহাকে উইলিংডন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি শুক্রবার ২৫শে কার্ত্তিক প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন। তাঁহার পত্নী, তিন কন্যা ও একপুত্র বর্ত্তমান আছেন। সুবিমল চন্দ্র রায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে, স্কটিশ চার্চ্চেজ কলেজে, লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে ও লিনকনস ইন এ শিক্ষালাভ করেন ও শেষোক্ত আইন শিক্ষাকেন্দ্র হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি বিশেষ সক্ষমতার সহিত দীর্ঘকাল ব্যারিষ্টারের কার্য্য করেন। ৩৪ বৎসর এই কার্য্য করিয়া তাঁহার আইনজ্ঞ বলিয়া বিশেষ খ্যাতি হয় ও তৎপরে তাঁহাকে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত করিয়া দিল্লী লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে অল্প কয়েক মাসের ভিতরই তাহার দেহান্ত ঘটাতে সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পূর্ণতর সাহায্য লাভে সক্ষম হইল না। আইনের ক্ষেত্রে তিনি ইংলণ্ডের বিশ্ব বিদ্যালয়ের বহু পদক, পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করিয়া ছিলেন ও তত্রস্থ কাউনসিল অফ লীগাল এডুকেশন তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের একটি সার্টিফিকেটও দিয়াছিলেন। তাঁহার আইন পুস্তকের গ্রন্থাগার অতি বৃহৎ ও বহু মূল্যবান ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। লিনকন্‌স্ ইন হইতে তিনি আইন পরীক্ষায় দুইবার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'ন। তাঁহার পূর্ব্বে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সেরূপ কৃতিত্ব আর কেহ দেখাইতে সক্ষম হন নাই। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুবিমল চন্দ্র রায়ের বিদ্বান ও সুনীতিবান বলিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে একবার হাইকোর্টের বিচার-পতির কার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি তাঁহার খুল্লতাত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সেই সময়ে পশ্চিম-বঙ্গের চীফ মিনিষ্টার ছিলেন বলিয়া ঐ নিয়োগে সুবিমল চন্দ্র সম্মত হ'ন নাই। অমায়িক নিরাড়ম্বর, নির্ভীক ও বহু গুণাধার এই খ্যাতনামা আইনজ্ঞের অকাল মৃত্যুতে ভারতের মহা ক্ষতি হইল। অন্তরের ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদাতে সুবিমল চন্দ্র রায় বিশিষ্ট ছিলেন ও আজ তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ক্রমাগত সেই কথাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠিতেছে।

ফরক্কা বাঁধ ও সেতু শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইল

ভাগীরথীতে জলের তোড় বাড়িয়া কলিকাতার বন্দর আবার পূর্ণরূপে সচল হইয়া উঠিবে কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ নূতন খাল কাটিয়া শেষ না করিলে শুধু ফরক্কাসেতু ও বাঁধ সম্পূর্ণ হইলেই ভাগীরথীতে অতিরিক্ত জল আসিবে না এবং সেই কার্য্য

কতদূর হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে কোন পরিষ্কার জবাব পাওয়া যায় না। কিন্তু সে দিন রেলমন্ত্রী শ্রীহনুমন্তাইয়া মহা সমারোহে ফরক্কার রেল সেতু উন্মোচন করিয়া অপরের কৃত কার্য্যের খ্যাতি নিজে ইচ্ছামত যাহাকে ইচ্ছা বিতরণ করিয়া সত্যমেব জয়তে মন্ত্রের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছেন। শুনা যায় যে তিনজন কর্ম্মী ঐ রেলপথ গঠনের জন্য সর্ব্বাধিক কার্য্য করিয়াছেন শ্রীহনুমন্তাইয়া তাঁহাদের কাহারও নাম পর্য্যন্ত নিজভাষণে উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহাদের না কি ঐ উন্মোচন সভাতে নিমন্ত্রনও করা হয় নাই। এই তিনজন কর্ম্মচারী হইলেন শ্রী বি সি গাঙ্গুলী, শ্রীদেবেশ মুখার্জী ও শ্রী আর বি চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা সকলেই রেলওয়ের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহারা কি কারণে শ্রীহনুমন্তইয়ার নেক নজরে নাই তাহা আমরা জানি না, তবে তিনি তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের খ্যাতি হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলেও জনসাধারণ তাঁহাদের সে কারণে ভুলিয়া যাইবে না। বরঞ্চ ঐরূপ ভাবে কর্ম্মীদিগকে প্রাপ্য প্রশংসা দান না করিয়া শ্রীহনুমন্তাইয়া নিজেরই দুর্ণামের সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে তিনি নিজের পেটোয়াদিগকে কন্‌ট্র্যাক্ট ও চাকুরী দিয়া পুরাতন কর্ম্মী যাহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিতেছেন। যদি এই কথা সত্য হয় তাহা হইলে রেলমন্ত্রী দেশবাসীর নিকট হেয় প্রমাণ হইবেন। রেলমন্ত্রী অন্যান্য ক্ষেত্রেও অখ্যাতিকর কার্য্য করিয়াছেন ও সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে তিনি মন্ত্রীত্বপদে না থাকিলে দেশের কোন ক্ষতি হইবে না।

বিনয় ভূষন ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের প্রধাণ মন্ত্রণাদায়ক কর্ম্মচারী বিনয় ভূষন ঘোষ বিগত ২৭শে অক্টোবর নিজ বাসভবনে হঠাৎ হৃদরোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। সেইদিন তিনি অনেকগুলি আলোচনা সভাতে যোগদান করিয়াছিলেন ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টার নিমন্ত্রনে একটি দ্বিপ্রহর ভোজন পার্টিতেও গিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কয়েকটি ফাইল দেখবেন মনস্থ করেন; কিন্তু ৪টা আন্দাজ তিনি অসুস্থতা বোধ করেন। তাঁহার নিজের চিকিৎসককে ডাকিয়া পাঠান হয় এবং তিনি আসিবার পুর্ব্বে নিকটস্থ আর একজন চিকিৎসককে আনা হয়। তাঁহার হৃদযন্ত্রের অবস্থা যাহাতে আরও খারাপ না হয় তজ্জন্য বহু চেষ্টা করা হইলেও কোনও ফল হইল না এবং তিনি কিছুক্ষণ পরে প্রাণত্যাগ করেন। ৩০শে অক্টোবর লণ্ডনে একটি কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের অংশীদারদিগের সভায় যাইবার কথা ছিল।

শ্রীবিনয়ভূষন ঘোষের মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর। কর্ম্মই তাঁহার জীবনের প্রধান প্রেরণা ছিল। ১৯৩০ খৃঃ অব্দে তিনি ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে প্রথম কর্ম্মে নিযুক্ত হ'ন। পরে ১৯৩৯-৪৭ অবধি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। তৎপরে তিনি প্রতিরক্ষা দফতরের সহ কর্ম্মসচিব হ'ন। ইহার পরে তিনি ক্রমান্বয়ে খাদ্য ও কৃষি বিভাগের কর্ম্ম সচিব, কলিকাতার পোর্ট কমিশনারদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ কারখানা উন্নয়ন দফতরের প্রধান ও পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে পরে রাজ্যপালের প্রধান মন্ত্রণাদায়ক নিযুক্ত হ'ন। তাঁহার অর্থনীতির জ্ঞান; বিশেষ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য ও কারখানা সংক্রান্ত বিষয়ের সম্পর্কিত ক্ষেত্রের জ্ঞান ব্যাপক ও প্রগাঢ় ছিল।

বিনয় ভূষন ঘোষের পিতা শ্রীনাথ ঘোষ বরিশাল ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ড এর উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। বিনয় ভূষন ১৯২৬ খৃঃ অব্দে এম, এসসি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উপস্থিত বুদ্ধি, ন্যায় বিচার ও সততার জন্য স্বনামধন্য হইয়াছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন ও কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় অক্লান্তকর্ম্মী কোথাও দেখা যাইত না। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে নানাক্ষেত্রে বহু কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

পাকিস্থানের সামরিক দুর্ধর্ষতা

প্রাচীনকালের যে সকল ধর্ম্মযুদ্ধ নীতি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে রাত্রির অন্ধকারে, পিছন হইতে গোপনে অতর্কিতভাবে যাহারা আক্রমণ করে, অথবা যাহারা আপন অপেক্ষা তুলনায় অল্প অস্ত্রে সজ্জিত কিম্বা অপেক্ষাকৃতভাবে নিম্ন স্তরের যোদ্ধা তাহাদিগকে আক্রমণ করে সেই সকলকেই অধর্ম্মযুদ্ধকারী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার যখন রাত্রিকালে দূর হইতে নদী পার হইয়া আসিয়া পিছন হইতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন, তখন তাঁহারও প্রচুর নিন্দাবাদ হইয়াছিল। সম্মুখ সমর কিম্বা অশ্বে অশ্বে, গজে-গজে ও রথীতে-রথীতে যুদ্ধই নৈতিক ভাবে সে যুগে স্বীকৃত হইত। সপ্তরথী যখন একত্রে ঘিরিয়া আক্রমণ করিয়া বালক যোদ্ধা অভিমন্যুকে নিহত করে, তখন তাহাদের কার্য্য অতি ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত নিরস্ত্র ব্যক্তি, নারী শিশু বা পুরোহিতকে অস্ত্রাঘাতে বধ করা বর্ব্বরোচিত মহাপাপ কার্য্য বলিয়াই জনসাধারণ দেখিতেন। বর্ত্তমান কালে টোটাল ওয়ার বা সর্ব্বব্যাপ্তযুদ্ধ বলিয়া একটা নামের অজুহাতে যুদ্ধের সকল নীতি অগ্রাহ্য করিয়া যাহাকে তাহাকে যেমন তেমন করিয়া হত্যা করা একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মানদিগের "শ্রেখ্‌লিখ-কাইট" বা ভীতিজনক যুদ্ধরীতিও একটা বৃহৎ নামের আড়ালে বর্ব্বরতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু পাকিস্থান যাহা করিয়াছে ও করিতেছে তাহার তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া শান্তির পরিস্থিতিতে হঠাৎ গোপনে ও ছদ্মবেশে অন্যদেশ আক্রমণ করিয়া দখল চেষ্টা পাকিস্থান একাধিকবার করিয়াছে। কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া পাকিস্থান কয়েকমাস স্বীকারই করে নাই যে তাহাদের সৈন্য কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছিল। পরে আর একবার কোন যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া পাকিস্থান জম্মু ও রাজপুতনা আক্রমণ করে। এই সময় তাহারা শান্তির অবস্থাতেই ঐ কার্য্য করে। পাকিস্থান আরও নানান অপকর্ম্ম করিয়া তাহা অস্বীকার করিয়া নিজেদের দুর্নীতি পরায়ণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছে। যথা চীনকে ভারতের নিকট হইতে চুরী করা জমি দান করা। বিমান চুরী করিয়া ও তাহা পুড়াইয়া দিয়া সেকথা অস্বীকার করা। নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া ও অস্ত্র সরবরাহ করিয়া সেকথা না স্বীকার করা ইত্যাদি ইত্যাদি। বিগত ২৩ বৎসর এই জাতীয় কার্য্য করিয়া পাকিস্থান যে দুর্নাম কিনিয়াছে তাহাতে তাহাদিগের কোন লজ্জা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্থান পরের দেশে জনগণের অধিকারের কথা তুলিয়া আন্দোলন করিবার ও করাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু নিজের দেশে যে জনগণের কোনও স্বাধীনতা বা স্বায়ত্বশাসন অধিকার নাই সে কথা ভুলিয়া থাকিবার অভিনয় করিতে পাকিস্থানের কোনও লজ্জার লক্ষণ ধরা পড়ে না। নির্লজ্জভাবে নিজ জাতিকে সামরিক একাধিপত্যের কঠোর নিয়মাধীন করিয়া রাখিয়া বড় গলা করিয়া ধর্ম্মের ও মানবীয় রাষ্ট্রাধীকারের কথা আওড়াইতে পাকিস্থানকে সর্ব্বদাই দেখা যায়। এই আচরণ যে একাধারে মিথ্যাচরণ পরিচায়ক এবং হাস্যকরভাবে আত্ম-সম্মানবোধ বর্জ্জিত সেকথা পাকিস্থান বুঝিতে চাহে না। কিন্তু পাকিস্থান সম্প্রতি পূর্ব্ব বাংলায় যাহা করিয়াছে তাহাদের দুষ্কার্য্যের বিচিত্র ঐতিহ্য পূর্ণতাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলাইয়া দেয়। কারণ পাকিস্থান যদিও পূর্ব্বে সামরিক শক্তি ও ক্ষমতার অহমিকা মত্ততা আকুল আস্ফালন করিয়া লোক হাসাইয়াছে তাহা হইলেও তাহাদের আস্ফালন অধিকতঃ কথাতেই থাকিত। কিন্তু এইবার পূর্ব্ব বাংলাতে পাকিস্থান চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার নরনারী শিশু হত্যা করিয়া যে বর্ব্বরতার পরিচয় দিল ও তৎপর সহস্র সহস্র নারী নির্য্যাতন ও তাহাদের চরম অপমান করিয়া নিজ চরিত্রের যে অতি ঘৃণ্য পাশবিকতা ব্যক্ত করিল সে মহাপাপ পাকিস্থান পূর্ব্বে কখন করে নাই। ইহার উপরে ছিল সহস্র সহস্র গ্রাম জ্বালাইয়া তাহার লক্ষলক্ষ অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া ভারতে পলাইতে বাধ্য করা; নারীহরণ, ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবি হনন, শ্রমিক নিপাত, কারখানা ধ্বংস প্রভৃতি

পূর্ব্ব বংলার জাতিগত সর্ব্বনাশ সাধনের পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী বহু ব্যপক মানবতা বিরুদ্ধ অপরাধ। পাকিস্থান দেখাইয়াছে যে তাহার যুদ্ধের শক্তির তাল ঠোকা মূলতঃ কল্পনার উপর নির্ভরশীল হইলেও তাহার সামরিক শাসকগণ অসামরিক জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সক্রিয় ও সফলকাম। ইহা দেখিয়াও যে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি কেন পাকিস্থানকে প্রশ্রয় দিবার জন্য ব্যাগ্র তাহার অর্থ বোঝা অতি সুকঠিন। শুধু এই কথাই বোধগম্য হয় যে মানব সভ্যতার বুনিয়াদ কিছুমাত্র সুগঠিত নহে। কারণ যদি সামান্য সামান্য মতলব সিদ্ধির জন্য সভ্যজগতের জাতি সকল লক্ষ লক্ষ মানবের চরম দুর্গতি আকাতরে মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে মানব জাতির ভবিষ্যত অতি গভীর অন্ধকারে।

সংবাদপত্র বিক্রয় বন্ধ

একটা নুতন রকমের কার্য্যবন্ধের নমুনা দেখা যাইল। সরকার হইতে স্থির হইল সংবাদপত্র প্রকাশ করিলে তাহার বিক্রয়ের উপর প্রতি সংখ্যার জন্য দুই পয়সা আবগারি শুল্ক দিতে হইবে। এই ঘোষনা হইলে পরে সংবাদপত্রের মালিকগণ দেখিলেন যে তাঁহাদের সংবাদ পত্র প্রকাশের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রায় শতকরা ৩০ টাকা। তাঁহারা বলিলেন তাহারা দুই পয়সা আবগারি শুল্কের সহিত আরও ছয় পয়সা মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দৈনিক সংবাদ পত্রগুলির মূল্য করিবেন ২৮ পয়সা। এই কথা শুনিয়া সংবাদপত্র বিক্রেতাগণ ঐরূপ দাম হইলে কাগজ বিক্রয় হইবেনা বলিয়া বিক্রয় বন্ধ করিল। সুতরাং কাগজ প্রকাশও বন্ধ হইল; অর্থাৎ ছাপা কিছু কিছু হইলেও প্রকাশ না হওয়ার মতই অবস্থা হইল। কাগজ বাহির করিবার খরচ বৃদ্ধি হইয়া থাকিলেও তাহা কতটা হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে হিসাব করিয়া কেহ দেখে নাই। সম্ভবতঃ শতকরা ৩০ টাকা হারে খরচ বৃদ্ধি হয় নাই। যদি শতকরা ৫।১০ টাকা হইয়া থাকে তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি যথেচ্ছা করা অনুচিত হইবে। ইহার সম্যক আলোচনা কেহ করিতেছে কি না আমরা জানি না।

মুক্তি বাহিনীর জয়যাত্রা

পূর্ব্ববাংলার সামরিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যাইতেছে। সামরিক পরিস্থিতি কথাটা ঠিক এক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত কিনা তাহা বলা যায় না। কারণ সমর হয় দুই পরস্পর বিরোধী সৈন্য বাহিনীর মধ্যে। যেখানে সৈন্যবাহিনী বলিতে শুধু এক মাত্র সশস্ত্র দল বা গোষ্ঠীর মানুষই আছে ও যেখানে সেই দলবদ্ধ শিক্ষিত সৈন্যগণ অপর দিকের নিরস্ত্র ও যুদ্ধাবিস্থা অপারগ জনগণকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিতে নিযুক্ত; এবং লুণ্ঠন গৃহদাহ ফসল কারখানা বাজার প্রভৃতি ধ্বংস; ছাত্র শিক্ষক নারী শিশু প্রভৃতিকে পাশবিকভাবে নির্য্যাতন ধর্ষণ ও আক্রমণ ইত্যাদিই যোদ্ধাদিগের প্রধান কার্য্য; সেখানের যে পরিস্থিতি তাহা সামরিক অথবা একান্ত ঘৃণ্য ও জঘন্য পশুবৃত্তির নিম্নতম অভিব্যক্তি, একথা হইতে দীর্ঘ আলোচনার সুত্রপাত হইতে পারে না। সামরিক পরিস্থিতি বলা এখন রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যেহেতু পাক সৈন্যগণ বিশ্ব মানবকে নিজেদের অমানুষিক অপরাধ প্রবনতা সম্বন্ধে মানসিক সুষুপ্তির অন্ধকারে রাখিবার জন্য ভারতের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। সীমান্ত নিকটস্থ বহু ভারতীয় জন বহুল স্থানে পাকিস্থানী গোলাগুলি ক্রমাগতই পড়িতেছে ও তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু ভারতীয় গোলাগুলিও পাক সৈন্যদের উপর বর্ষিত হইতেছে। ইহাকে ঠিক সমর বলা চলে না। ভারতের উপর পাকিস্থানী হামলা বলা যায়; কিন্তু বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘ পাকিস্থানী-দিগের লুণ্ঠন, গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও অপর রাষ্ট্রের উপর অন্যায় আক্রমণ—সকল কিছুই স্মিতবদনে ও প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন; কারণ পাকিস্থান তাঁহাদের মধ্যের দুই তিনটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের চেষ্টাতেই গঠিত হইয়াছে। পাকিস্থানের অত্যাচারে ও

উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া পূর্ব্ববাংলার জনগণও ক্রমে ক্রমে পাক সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাহাদের মধ্যে লক্ষাধিক যুবক নানাভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পাক বাহিনীর উপর গ্যেরিলা যুদ্ধ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল মাতৃভুমির রক্ষক, মাতা ভগিনী কন্যার মান সম্ভ্রম বাঁচাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যুবকগণ নিজেদের বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। প্রথমে ইঁহারা এই যুদ্ধে কোনও সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইতেছিলেন না। কিন্তু পরে দেখা যাইল যে তাঁহারা সংগ্রাম করিয়াই নিজেদের ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত সৈন্যের সমতুল্য যোদ্ধা করিয়া তুলিয়াছেন। এখন মুক্তি বাহিনী বহু স্থলেই পাক সেনাদিগকে বিতাড়িত করিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশ দখল করিয়া লইতেছেন। মনে হইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে এই সকল স্বয়ং শিক্ষিত সৈন্যগণ নানাভাবে বিবিধ আয়ুধ সংগ্রহ করিয়া অধিক সংখ্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইবেন এবং পাক সৈন্য-দিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াই তাহাদের ধ্বংস সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। সিলেট, ময়মনসিংহ, যশোহর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, হিলি প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী বহুক্ষেত্রে পাক বাহিনীকে বিদ্ধস্ত করিয়াছেন এবং পাক সেনা দল নানাস্থল হইতে পলাইয়া এখন মাত্র অল্প কয়েকটি কেন্দ্রেই কেল্লা গঠন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে। মুক্তি বাহিনী এখন তোপ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত। ঐ সকল অস্ত্র পাইলে তাঁহারা যুদ্ধ কার্য্য প্রবলতরভাবে চালাইতে পারিবেন।

সমালোচক প্রিয়নাথ সেন

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

বর্তমান কালের অধিকাংশ পাঠকের নিকট প্রিয়নাথ সেনের নাম অপরিচিত। তবে সাহিত্যানুরাগী পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটি, প্রভাত মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী' ইত্যাদি মনযোগ সহকারে পাঠ করিবার অবসর পাইয়াছেন তাঁহাদের নিকট প্রিয়নাথ সেনের কিছুটা পরিচয় অবশ্যই অজ্ঞাত থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের উন্মেষলগ্নে যে ব্যক্তি তাঁহার নিত্যসঙ্গী, উপদেষ্টা ও শুভানুধ্যায়ীরূপে বিরাজমান ছিলেন তিনি জ্ঞানতপস্বী, সাহিত্যরসিক ও সহৃদয় হৃদয় সংবাদী প্রিয়নাথ সেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সৃষ্টিকর্ম্মের জীবনেতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা আনুপূর্ব্বিক পরিচিত তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না যে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুবসমাজে এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজে রবীন্দ্রনাথ যশস্বী হইয়া 'বাংলার শেলী' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। অথচ প্রিয়নাথ সেন এই কাব্য পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবি হইবার আশা ত্যাগ করেন। ইহার ফলে 'ভগ্নহৃদয়ের' দ্বিতীয় সংস্করণ আর বাহির হয় নাই। বলাবাহুল্য প্রিয়নাথের হতাশাব্যঞ্জক অভিমত জ্ঞাত হইয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নিরুৎসাহিত হন এবং কিছুকাল পরে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যটি তাঁহাকে পাঠ করিতে দিয়া উহার স্বপক্ষে প্রিয়নাথের প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হন। তখন হইতে উভয়ের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য [illegible] ও অবিচ্ছিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। 'জীবনস্মৃতিতে' এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

এই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার দ্বারা আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্য রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাব রাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্ণ সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ, অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা শক্ত।"

প্রিয়নাথ সে যুগের বিদ্বৎ সমাজের নিকট একজন অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন ও সত্যকার বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইতেন। ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রায়শঃই তাঁহার গৃহে আগমন করিতেন। তাঁহার গ্রন্থাগারটি ছিল সেকালের সাহিত্যসেবীগণের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় মিলনক্ষেত্র। প্রিয়নাথ নিজে ছিলেন বহু অধীত পাঠক। প্রতি সপ্তাহেই তিনি স্বীয় গ্রন্থাগারে নূতন নূতন গ্রন্থ সংযোজন

করিতেন। এবং প্রত্যেকটি গ্রন্থই অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পাঠ করিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের তাহা পাঠ করিতে দিয়া উৎসাহিত করিতেন। এই বিষয়ে প্রিয়নাথকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার গৃহে যে আলোচনা চক্রটি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে নিয়মিত উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও দেবেন্দ্রনাথ সেন। অন্যান্যদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রমথ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বাগচী ইত্যাদি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রিয়নাথের সম্পর্ক ছিল অকৃত্রিম ও দীর্ঘস্থায়ী। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ প্রিয়নাথের গৃহে শুধু গমন করিতেন না—সাহিত্য চর্চ্চায় এমন মশগুল হইয়া যাইতেন যে সমস্তাদন অতিবাহিত করিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে পত্রালাপ হইত তাহা হইতে এই কবিপ্রাণের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধটি পরিস্ফুট হইয়াছে। এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : "তোমার কাছে গেলে আমার মনে হয় এখানে জারিজুরি খাটবে না, তুমি জহর চেন—আমার নিজেকে নিজের অনুপযুক্ত বলে বোধ হয়।" অন্য এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছেন "প্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মস্ত উপকার এই হয় যে সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিষ বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একাধিক রচনার পাণ্ডুলিপি (যেমন 'চিত্রাঙ্গদা', 'গোড়ায় গলদ' ইত্যাদি) সবার আগে যে প্রিয়নাথকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহা একাধিক পত্রে উল্লিখিত আছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথও প্রিয়নাথকে যে কি পরিমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহার নমুনাস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখিত পত্রের একটি অংশ উদ্ধারযোগ্য। সেই অংশটি এই : "তুমি আমার 'স্বপ্নপ্রয়াণের' সমালোচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়।"

প্রিয়নাথ সেন ছিলেন বহু ভাষাবিদ কবি, সমালোচক ও দার্শনিক। সংস্কৃত, পার্শী, উর্দ্দু, ইংরাজী, ফরাসী ইটালিয়ান ইত্যাদি ভাষার সহিত বঙ্গ ভাষায় তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি ও অধিকার থাকায় তিনি সে যুগের রসিকসমাজে 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' রূপে সমাদৃত হইতেন। কাব্য রচনায় তাঁহার দক্ষতা অনস্বীকার্য্য। তিনি বাংলা এবং ইংরাজী উভয় ভাষায় সমান পটুতা প্রদর্শন করিয়া কাব্য রচনা করিতেন বলিয়া সুধী সমাজে তিনি 'বাংলার মিল্টন' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের প্রাঞ্জলতা' সরলতা ও অপূর্ব্বতা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। সনেট রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। বাংলা সাহিত্যে সনেটের গাঢ় বন্ধন ও ওজস্বীতা প্রদর্শনাতে মধুসূদনের পর অল্প যে কয়েকজন সক্ষম হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নিত্যকৃষ্ণ বসু, মোহিতলাল ব্যতিরেকে একমাত্র প্রিয়নাথ সেনের নামই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সনেট রচনায় যে মৌলিক রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের পর দেবেন্দ্রনাথ তাহা সার্থকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর সনেটে ফরাসী ভঙ্গী নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু প্রিয়নাথ সেনের সনেট বাংলা সনেট কাব্যের মূল্যবান সম্পদ। দুঃখের বিষয় এই যে প্রিয়নাথের এই কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে আজিও প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই। বিভিন্ন পত্রিকার অভ্যন্তরে উহা আজিও আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রিয়নাথের ইংরাজী সনেটও এক অনবদ্য কীর্ত্তি। আমাদের রসিক সমাজে ঐগুলির যে পরিমাণ সমাদর হইয়াছিল তদপেক্ষা বিদেশের পাঠক মহলে ঐগুলি অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রিয়নাথের 'AT THE YEARS END' নামক ইংরাজী ভাষায় রচিত সনেটটি পাঠ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের খ্যাতনামা সমালোচক Edmond Gosse মুগ্ধ হইয়া এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছেন :"...Your verses remind me of the English poetry of Goethe, which has similar peculiarities. I am sure you will not mind being compared with so eminent a man.

১৯১৬ সালে প্রিয়নাথ সেন পরলোক গমন করেন। ইহার প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পরে তাঁহার রচনার কতকগুলি কাব্য প্রবন্ধ ইত্যাদি সঙ্কলন করিয়া তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেন মহাশয় 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা বর্ত্তমানে অপ্রকাশিত ও দুর্লভ। অতঃপর প্রমোদনাথ ১৩৭৬ সালের ২৬শে কার্ত্তিক (স্বর্গত পিতৃদেবের পুণ্য জন্মদিনে) 'দুই কবি' নামে যে মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতেও কাব্যরসিক পাঠকগণ প্রিয়নাথের কাব্যরস সম্ভোগে সক্ষম হইবেন।

কাব্য ব্যতীত প্রবন্ধ রচনায়ও প্রিয়নাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক, আলোচনা বা সমালোচনা সে যুগের রসিক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হইত। তাঁহার কাব্য ও গদ্য রচনা তৎকালের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলিতে—যথা ভারতী, সাহিত্য, কল্পনা, প্রদীপ, প্রবাসী, মানসী, ব্রহ্মবিদ্যা ইত্যাদিতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনায় ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীর মৌলিকতা ও বিস্তারিত সাহিত্য জ্ঞানের নিদর্শন ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর রসবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ বিচার ভঙ্গী একই সঙ্গে লোক ও পাঠক সমাজে তাঁহাকে সম্মানের সশ্রদ্ধ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। রবীন্দ্রজীবনী রচয়িতা প্রভাতকুমার ইহা লক্ষ্য করিয়াই মন্তব্য করিয়াছেন: "প্রিয়নাথ সেন ছিলেন সেই শ্রেণীর সাহিত্যিক যিনি উৎসাহবাণী ও অনুকূল সমালোচনা দ্বারা সাহিত্য স্রষ্টাদের রচনাকে অভিনন্দিত করিতেন।" অন্যত্র তিনি পুনরায় বলিয়াছেন: "এই সাহিত্য সাধক রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্য প্রেরণা, সাহিত্য রচনা, ভাব গ্রাহিতায় কতখানি যে উদ্বুদ্ধ করিতেন তাহার যথাযথ হিসাব হয় নাই। তাঁহার মধ্যে যে মহতী শক্তি রহিয়াছে তাহা যেন তিনি প্রিয়নাথের কাছে গেলে সুষ্ঠভাবে বুঝিতে পারিতেন।

প্রিয়নাথ সেনের সাহিত্য সমালোচনা মূলক রচনার সংখ্যা অধিক নয় এবং সেগুলি গ্রন্থাকারে একত্রিত হইয়া প্রকাশিত না হওয়ায় পাঠকের ঐগুলির প্রতি অনুরাগ জাগ্রত হইতে পারে না। যাহা হউক আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা ঐ প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব পরিণিত হইতে চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপ্রয়ান' কাব্যটি প্রকাশিত করিবার পর যখন কাব্যামোদী পাঠকগণের নিকট আশানুরূপ মতামতের সাড়া পাইলেন না সেই সময় তিনি কিছুটা আক্ষেপ করিয়া লিখেন: "বঙ্গের সাহিত্য মধুপেরা drone এর জাতি—তাহারা রসও বোঝে না আর ভাল জিনিসের মর্য্যাদাও বোঝে না।" এমন সময় প্রিয়নাথ সেই কাব্যের সমালোচনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হন এবং তাঁহাকে জানান "আমার সাধের স্বপ্নপ্রয়াণটিকে তোমার ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া আমি নিশ্চিন্ত।" 'স্বপ্নপ্রয়াণ' দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত একটি রূপক কাব্য। ইংরাজী-সাহিত্যে Spencer-এর Fairie Queen কাব্য এবং Bunyan এর Pilgrims Progress নামক গ্রন্থ রচনা যে আঙ্গিকে রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' তাহারই অনুসারী। এই কাব্য সম্পর্কে প্রিয়নাথ লিখিয়াছেন: "স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দ পূর্ব্বেকার কোন কবি গড়ে নাই এবং পরবর্ত্তী কোন কবিই এই ছন্দে লিখিতে বা ইহার অনুসরণ করিতে সাহস করে নাই। এমন কি বাঙ্গলায় যিনি অসংখ্য বিভিন্ন নব নব সুন্দর ছন্দ রচনা করিয়াছেন—যিনি অসাধারণ নিপুণতার সহিত বাংলা শব্দে নূতন স্বর যোজনায়, ছন্দে নূতন নূতন ধ্বনি এবং ঝঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছেন সেই রবীন্দ্রনাথও করেন নাই। কিন্তু ছন্দ নূতন হইলেও উৎকট কিছুই কানে ঠেকে না—স্রোতঃপুষ্ট প্রফুল্ল প্রবাহিনীর ন্যায় মধুর কল্লোলে প্রবাহিত হইয়াছে।"

কাব্যের সংজ্ঞা বা লক্ষণ কি তাহা লইয়া যুগে যুগে রসিক ও পণ্ডিত মহলে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ ও ইউরোপের কাব্য বিচারকগণ এপর্য্যন্ত বহু অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের কোনটিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রত্যেকটি মতামত আংশিকভাবে সত্য, পরিপূর্ণভাবে

বিচার করিলে তাহাদের ভিতরে অনেক বস্তু দেখা যায় যাহা আদৌ সমর্থন যোগ্য নয়। এই সম্পর্কে প্রিয়নাথের 'কাব্য কথা' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাব্যের মূলগত প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইতে প্রিয়নাথ বলিয়াছেন: "রসোদ্ভাবেই কবির মর্য্যাদা, কাব্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। বস্তু সমাধানে কবির কৃতকার্য্যতা থাকিতে না পারে তাহাতে আসিয়া যায় না। কিন্তু রসোদ্ভাবনে অসামর্থ্য অমার্জনীয়। এমন অনেক কাব্য আছে যাহার বস্তু যৎকিঞ্চিৎ—সামান্য এবং চিত্তকে আকৃষ্ট করে না; কিন্তু রসের প্রাবল্য ও প্রাচুর্য্যে—রসোদ্ভাবের গুণে তাহারা সাহিত্য সংসারে এক একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। পদ্য কাব্যে, Byron,Shelly. Keats প্রভৃতি এবং গদ্য কাব্যে Victor Hugo, Dickens Thackeray, Ruskin, বঙ্কিম প্রভৃতি হইতে ইহার প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।" কাব্য হইতে মানুষ নীতিজ্ঞান লাভ করিবে অথবা কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়নাথ বলিয়াছেন: "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন- চিত্ত শুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা: কিন্তু নীতি নির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতি শিক্ষা দেন না তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" কাব্যের সৌন্দর্য্য কি তাহা বুঝাইতে প্রিয়নাথ বলিয়াছেন: "সৌন্দর্য্যকে সংজ্ঞার মধ্যে আনা অসম্ভব—যদিও ইহাকে অনুভব করিতে সময় লাগে না। পার্থিব হইয়াও ইহা 'অপার্থিব" কাব্যের যে সৌন্দর্য্য তাহা প্রকৃত পক্ষে আনন্দসম্ভাত। সৌন্দর্য্যসৃজন করিয়া কবিগণ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ইংরাজ কবি কলরিজের এই উক্তি poetry has been to me its own exceeding great reward' উদ্ধার করিয়া প্রিয়নাথ এই উপসংহার টানিয়াছেন: "যতক্ষণ না তাহার সৃষ্টি কবির হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিতেছে ততক্ষণ তিনি অন্ধকারে। গোড়ায় তিনি সাধারণের প্রশংসার জন্য চেষ্টিত নন—অবজ্ঞার ভয়ে ভীত নন। —তান্ প্রতিনৈষ যত্নঃ।"

প্রিয়নাথ সেন ছিলেন অনুকূল সমালোচক। যে কোনও রচনা তাঁহার নিকট সুখপাঠ্য বিবেচিত হইত তাহা তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আলোচনা করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রঙ্গনাট্য বা প্রহসন 'অলীকবাবু' প্রকাশিত হইলে তিনি ঐ রচনাটির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন পরে তিনি ঐ প্রহসনে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাহাও একটি পত্রে ব্যক্ত করেন।

প্রিয়নাথ সেনের 'অলীকবাবু' সমালোচনাটি পাঠ করিয়া সন্তোষের সুকবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মন্তব্য করেন: "আপনি সংক্ষেপে যে দু-চারিটি কথা বলিয়া গিয়াছেন—বলার মাহাত্ম্যে এবং আপনার স্বভাব সুলভ ভাষার গৌরবে এই ক্ষুদ্র লেখাটি বড়ই মনোরম হইয়াছে। মাসিক পত্রে আপনার গদ্য পড়িবার জন্য একটা নেশা হয়—কাগজ খুলিয়া আপনার লেখা পাইলে মনটা লাফাইয়া উঠে। আপনার গদ্যে কি যেন এক মোহিনী আছে।"

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রিয়নাথ সম্পর্কে অন্যত্র বলিয়াছেন: "প্রিয়নাথবাবুর কলারসগ্রাহী ভাবুকতা এবং স্থির ধীর সুনিপুণ লিপিচাতুর্য্য পাঠকের অন্তর ভেদ করে।"

প্রিয়নাথের সমালোচনা শক্তির উপর রবীন্দ্রনাথের ছিল অগাধ বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্য প্রকাশিত হইলে প্রিয়নাথ যখন সেই গ্রন্থটির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন রবীন্দ্রনাথ তখন এক পত্রে তাঁহাকে জানান: "তুমি ক্ষণিকা সমালোচনা করছ শুনে আমি খুশি হলুম, সে কথা গোপন করতে চাইনে। তার একটু বিশেষ কারণও আছে;—ওর ভাষা ছন্দ প্রভৃতি এতটা অধিক নতুন হয়েছে যে যারা স্বাধীন রসগ্রাহী লোক নয় তারা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না এটা তাদের ভাল লাগা উচিত কিনা—সুতরাং পণের আনা পাঠক ইতস্ততঃ করছে—আর যদি অধিক

কাল তাদের এই দ্বিধার মধ্যে ফেলে রাখা যায় তাহলে তারা চটে 'মটে' বইটাকে গাল দিতে আরম্ভ করবে— একটা সমালোচনা পেলে তারা আশ্রয় পেয়ে বাঁচবে।"

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্য প্রকাশিত হইলে রক্ষণশীল মহলে কিছু কিছু গুঞ্জন শোনা গেল যে তিনি কাব্যে দুর্নীতিকে প্রশয় দিতেছেন। ক্রমশঃ রবীন্দ্র বিরোধী আন্দোলন প্রকাশ্যরূপ গ্রহণ করে এবং এই রবীন্দ্র বিরোধী মতবাদের সমর্থকরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখা দিলেন তাঁহার 'কাব্যেনীতি' নামক প্রবন্ধে। তিনি লিখিলেন: "দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান ও কবিতাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন: "বৈষ্ণব কবিদের কবিতা হইতে অপহরন। স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তি-রূপে গৃহীত। তবে রবিবাবুর সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের এই প্রভেদ যে রবিবাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।......নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণী জাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়! নারী জাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার মরমে গুমরি মরিছে, কামনা কত।"

রবীন্দ্রকাব্য এই দুর্নীতির অপবাদ চরম আকার ধারণ করে যখন কবিগুরুর 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্য প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল এই অভিমত প্রকাশ করেন "রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখুন। অশ্লীলতা ঘৃণাহ বটে কিন্তু অধর্ম ভয়ানক। ...ঘরে ঘরে বিশ্যা হইলে সংসার আঁস্তাকুড়। কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়।...সুরুচি বাঞ্ছনীয় কিন্তু কুনীতি অপরিহার্য্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেইজন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।" দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনীতি শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৩১৬ সালের সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐসময় একাধিক পত্রিকা দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিমত সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় বিরূপ আলোচনা বা প্রতিকূল সমালোচনায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। এই সময় প্রিয়নাথ তাঁহার সহায়ক হন। সত্যকার বন্ধু ও শুভার্থী হিসাবে তিনি বন্ধুকৃত্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করেন এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকায়' দ্বিজেন্দ্রলালের 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদে সুদীর্ঘ একটি রচনা প্রকাশ করিয়া চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করেন। তিনি যুক্তির অবতারণা করিয়া এবং বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সহিত কবিগুরুর চিত্রাঙ্গদার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ইহা প্রমাণ করেন যে চিত্রাঙ্গদা আদৌ দুর্নীতি অথবা অশ্লীলতাযুক্ত নয়। তিনি ঐ গ্রন্থ হইতে একাধিক পংক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছুই নাই—চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের মিলন বিবাহসম্পন্ন দাম্পত্য মিলন।'

চিত্রাঙ্গদা আলোচনা করিতে গিয়া প্রিয়নাথ সেন বলিয়াছেন; "চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বতোভাবে রবিবাবুর নতুন সৃষ্টি। মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কোন সুস্পষ্ট মূর্ত্তি নাই।... রবিবাবুর চিত্রাঙ্গদাকাব্য বুঝিতে হইলে, নায়িকার চরিত্রটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এ চরিত্রে কিন্তু জটিল কিছুই নাই—ইহা অত্যন্ত সরল ও সহজে বোধগম্য। কিন্তু ইহার বিশেষত্বের দৃষ্টি থাকা চাই।... বাস্তবিক সাহিত্য জগতে রবিবাবুর চিত্রাঙ্গদা চরিত্র একটি বিস্ময়কর অথচ সঙ্গত সুন্দর সৃষ্টি, মহাভারতে পুত্রবৎ পালিতা কন্যা রবিবাবুর কাব্যে একেবারে প্রকৃত যুবরাজ; যুবরাজের ন্যায় শিক্ষা--যুবরাজেরই ন্যায় তাহার স্কন্ধে রাজ্যের কর্তব্যভার। ফলতঃ চিত্রাঙ্গদা নারী হইলেও শিক্ষা এবং ব্যবহারে পুরুষ,—কবি চিত্রাঙ্গদার মুখেই এই কথা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।"

এই কাব্যের আলোচনায় প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে অজস্র পংক্তি উদ্ধার করিয়া মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে কবির অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন এই দুই চরিত্রের নানা প্রশ্নোত্তরের

ঘাত প্রতিঘাতে উভয়ের হৃদয় ও প্রকৃতি কিরূপ অজানিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার বিশদ উল্লেখ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদার নিজের প্রকৃত পরিচয় দানই এই কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা নাটকীয় ঘটনা। এবং তাহা রবীন্দ্রনাথ কিরূপ অনির্ব্বচনী মাধুর্য্যে এবং সকরুণ সৌন্দর্য্যআপ্লুত করিয়াছেন প্রিয়নাথ তাহার নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন। প্রিয়নাথ আরও দেখাইয়াছেন যে চিত্রাঙ্গদায় প্রেমের যে উচ্চ স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সাহিত্যে দুর্লভ;"ইহার তুল্য দরের কবিতাShelleyতেই পাওয়া যায় এবং তাঁহার রচিত Epipsychidion প্রমুখ অতুলনীয় কবিতা সমুহের মধ্যেই এইরূপ আত্মবিলোপী প্রেম এবং প্রেমসর্ব্বস্ব জীবন গীত হইয়াছে।"

প্রিয়নাথ সেন দ্বিজেন্দ্রলালের অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কের ভোগ উন্মত্ততার অভিযোগ খণ্ডন করিয়া অতিশয় দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন; "আমরা ত কাব্যের কোথাও দ্বিজেন্দ্রবাবুর কথিত এই নির্লজ্জ উপভোগ বা তাহার অধিকতর নির্লজ্জ বর্ণনা দেখিলাম না। বাস্তবিক এই অভিযোগে আমরা যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের বোধহয় দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন তাঁহার এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাব্যখানি তাঁহার সম্মুখে ছিল না। তিনি বহু পূর্ব্বকালের পাঠের স্মৃতি বা বিস্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন।"

প্রিয়নাথের এই সুনিশ্চিত সমালোচনা প্রবন্ধটি প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অশ্লীলতা বা দুর্নীতির সকল অভিযোগের চিরঅবসান ঘটে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথও দুর্ভাবনামুক্ত হইয়া নিরঙ্কুশ গতিতে তাঁহার নব নব সৃজনী কর্ম্মে ব্রতী হন এবং বিশ্ববরেণ্য কবির সম্মানে ভূষিত হন। প্রিয়নাথের এই অবদান সেইকারণে চিরস্মরণীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের "কাব্যে নীতি" প্রবন্ধের সহিত প্রিয়নাথ একমত হইতে না পারিলেও এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার মতামত পক্ষপাতদুষ্ট বিবেচিত হইলেও দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য কর্মের প্রতি প্রিয়নাথের শ্রদ্ধার অভাব ছিলনা। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য, নাটক এবং রসরচনা যথেষ্ট অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়া ছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল যে একজন বলিষ্ঠ ও প্রতিভা সম্পন্ন লেখক ছিলেন তাহা তিনি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নামক রচনাটিতে অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার অপেক্ষা স্বদেশী গান ও হাসির গানের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা স্মরণ করিয়াই প্রিয়নাথ বলিয়াছেন: তিনি গীতিকবি নাট্যকার হাস্য রসিক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কায়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার রচিত নাটক সকল রঙ্গালয়ে এবং অন্যত্র বিশেষ গৌরব লাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে তাঁহার স্বদেশীগান এবং কবিতাগুলি লোকপ্রিয় হইয়াছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহার হাসির গানের জন্যই তিনি বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিচিত হইয়াছিলেন। সমজদার সকলেই। প্রকৃত হাসির গানের ধর্ম্মই এই। শুনিয়া বা পড়িবামাত্র তাহা লোককে হাসাইবে। বিশ্লেষণ বা টীকার মারফৎ যে হাসির গান উপভোগ্য তাহা হাসির গান নয়।"

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সম্পর্কে মাননীয় রাসবিহারী ঘোষ বলিয়াছিলেন' "তাঁহার রচিত হাসির গান শুনিয়া হাসিতে হয় বটে, আমরা অনেকেই অনেকবার সে গান শুনিয়া হো হো হাসিয়াছি বটে, পরন্তু সেগুলি কি সত্যই হাসির গান? সে যে জাতির চরিত্রের মুকুর। শিথিল শ্লথসমাজের প্রতিচ্ছবি। যখন হাসিয়াছি, তখন আমরা কেহ ভাবিনাই এ মুকুরে আমাদের প্রত্যেকের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে।

উপরোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধার করিয়া প্রিয়নাথ বলিয়াছেন: "তাঁহার হাসির গানের ভিতর অনেক সময়েই যে মর্ম্মবিগলিত অশ্রুনিহিত এ কথা কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। সম্প্রতি মাননীয় রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সেদিনকার শোকসভায় মৃত কবি সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে এই কথারই উল্লেখ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।' এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে রচিত প্রিয়নাথ সেনের একটি সনেটের কয়েকটি চরণ উল্লেখযোগ্য:

"..........বঙ্গ কবিকুলে
জাগাইতে হাস্য-রস তুমি একা, শুনি,

কিন্তু কান আছে যার, কাঁদে ফুলেফুলে
শুনিয়া বীণায় তব প্রচ্ছন্ন কাহিনি—
অশ্রুজলে আর্দ্রহাসি—অশ্রু হাস্যোজ্জ্বল
মেঘরৌদ্রে ধরা যথা করিতে বিহ্বল।”

প্রিয়নাথ সেন প্রবীন ও নবীন সকল লেখকদের রচনাই সমান আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। নবীনদের রচনায় উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে তিনি যেমন নিজের গ্রন্থাগার হইতে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি বাছিয়া বাছিয়া পড়িতে দিতেন তেমনি তাঁহাদের রচনা যাহাতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। বাংলাসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক প্রমথ চৌধুরী বীরবল এক সময় প্রিয়নাথের স্নেহপুষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি নিজে একটি পত্রে স্বীকার করিয়াছেন লেখক হিসেবে যাঁরা ৺প্রিয়নাথ সেনের কাছে ঋণী আমি তারমধ্যে একজন।’ প্রমথচৌধুরীর ‘চার-ইয়ার’ কথা প্রকাশিত হইলে কোনও কোনও পাঠক মহলে উহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী লইয়া তীব্র আক্রমণ হয়। কিন্তু প্রিয়নাথ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন: “আমার ধ্রুব বিশ্বাস তোমার ভাষা যেমন এ গল্পে মানাইয়াছে আর কোন ভাষা তেমন মানাইবে না।”

প্রমথনাথ চৌধুরীর সনেট গ্রন্থ সনেট পঞ্চাশৎ প্রকাশিত হইবার সময় প্রিয়নাথ লেখকের প্রতি স্নেহের বশবর্তী হইয়া উহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। বাংলা সাহিত্যে সনেট সম্পর্কে এরূপ প্রমাণ্য রচনা আজও রচিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রমথ চৌধুরীর সনেট ফরাশী রীতিকে অবলম্বন করিয়া রচিত। কিন্তু সনেট কাব্যের উৎপত্তি হয় ইতালী দেশ হইতে। ইহার গঠন, সৌষ্ঠব, পদবন্ধন, ছন্দশ্রী কবির ভাব প্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমাকে অবলম্বন করিয়াছে। তাহা বুঝাইতে প্রিয়নাথ বলিয়াছেন “সনেটের ইতিহাস পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে ইহার আয়তন, আকার ও মিলন পদ্ধতি শ্রেণী বিশেষের ভাব প্রকাশের বিশেষ উপযোগী বলিয়াই সত্যে ইহার প্রতিষ্ঠা।

ইংরাজী সাহিত্যে মিল্টন, কীটস, ব্রাউণিং ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা কবিই সনেট রচনা করিয়াছেন। কিন্তু রসেটির সনেটে ঐ সকল কবিদের তুলনায় অধিকতর উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছে। কবি রসেটি তাঁহার এক সনেটে এ কাব্যের মূলগত যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন প্রিয়নাথের ভাষায় তাহা এই, “যখন কোনও মুহূর্তে ভাবের প্রবল আবেগে সমাচ্ছন্ন কবিহৃদয় সৌন্দর্য্যের দৈব আবির্ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, সনেট ভাষায় ও ছন্দে সেই দুর্লভ মুহূর্ত্তের চিত্র।” অর্থাৎ ইহাতে গীতি-কাব্যের উন্মাদনা থাকিলেও ঝঙ্কার বাহুল্য ও আড়ম্বর থাকিবেনা। ইতালীদেশের সনেট কাব্যের জনক পেত্রার্কা মনে করিতেন যে পূর্ণ রসঅভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দশ পদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও অনুকূল। বাংলাকাব্যের সনেট প্রবর্ত্তক মধুসূদন এই কারণে পেত্রার্কাকেই অনুসরণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া চতুর্দশ পদী কবিতাবলী রচনা করিয়াছেন।

বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক ওয়াট্স-ডান্টনও সনেট রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সনেট কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা সত্যই গ্রহণযোগ্য। তাঁহার যে সনেট কবিতায় কথাটি ব্যক্ত হইয়াছে—‘A sonnet is a wave of melody তাহাকেই সম্মুখে রাখিয়া প্রিয়নাথ তাঁহার অননুকরনীয় কাব্যময়ী ভাষায় বলিয়াছেন “সমুদ্র তরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতন যেমন তাল লয় ব্যবচ্ছিন্ন, সনেটের ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনও সেইরূপ তাল লয় ব্যবচ্ছিন্ন। ফেনিলোচ্ছল সাগর তরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ স্ফীত ও বর্দ্ধিতকায় হইয়া বেলা ভূমির উপর উৎপাতিত হয় এবং নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া আবার উজান বেয়ে সাগর গর্তে অপসারিত হয় সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ ছন্দোময়ী শব্দ ধারায় অষ্টকে উচ্ছ্বলিত হইয়া বিপরীত আবর্ত্তনে ষষ্ঠকে অবসান প্রাপ্ত হয়।”

ইংরাজী সাহিত্যে ওয়ায়াট, সারে, স্পেন্সার প্রভৃতি কবিগণ ইতালীয় সনেট রচনার পদ্ধতিকে সংস্কার

করিয়া যে নূতন পথ অবলম্বন করেন যাহা সেক্সপীয়রের হস্তে অনবদ্য আকারে প্রকাশ পায়। পেত্রার্কার সনেটে যেমন অষ্টক ও ষষ্ঠকের বাঁধন অপরিহার্য্য সেক্সপীয়রের সনেটে প্রথম দ্বাদশ চরণে তিনটি চতুষ্পদী যাহাদের মিল এক ছত্রান্তর পর্য্যায়ে বিন্যস্ত এবং শেষ দুইটি চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারে রচিত। ইহাতেই সনেটের মূলভাব আবদ্ধ ও রসের চরম স্ফূর্তি ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি যাহারা মধুসূদনের পন্থা অবলম্বন করেন নাই তাঁহারা মোটামুটি এই নিয়ম পালন করিয়াছেন। তাঁহাদেরও সনেট একই কারণে সেক্সপীয়রের ন্যায় deep brained বা গভীর চিন্তাশক্তি প্রসূত হইয়াছে। প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলি ফরাসী কবিদের দৃঢ় নিবদ্ধ সনেটের রূপকে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বলে ভাব ও ভঙ্গী, বাক্য ও অর্থকে হরপার্ব্বতীর মূর্তির ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত করিয়া পাঠকদের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রিয়নাথ সেনের একজন স্নেহভাজন লেখক। ঠাকুর পরিবারের কনিষ্ঠদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন শক্তিশালী কবি ও গদ্য লেখক। বলেন্দ্রনাথের ভাষা ও রচনাভঙ্গী কাহারও দ্বারা প্রভাবিত ছিলনা বলিয়া তাহা সহজেই প্রিয়নাথকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বলেন্দ্রনাথের দেহাবসান ঘটায় তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকাশের সুযোগ পায় নাই। তথাপি তাঁহার স্বল্পায়ুতার মধ্যে রচিত সাহিত্য কর্ম্মগুলি চিরায়ুতার দাবী রাখে। ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের ন্যায় বলেন্দ্রনাথও নিয়মিত প্রিয়নাথ সেনের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাহিত্যালোচনায় যোগদান করিতেন। মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনাবসানে প্রিয়নাথও মর্ম্মাহত হন। পরে তিনি এই লেখকের সাহিত্য কৃতির একটি নাতিদীর্ঘ পরিচিতি প্রকাশ করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। বলেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গুণাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ বলিয়াছেন 'প্রথম হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তি বঙ্গীয় পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছে। কি গদ্যে কি পদ্যে তাঁহার একটি অভিনব সুন্দর মৌলিকতা দৃষ্ট হয়।...তিনি জন্মকবি—আজন্ম রচনারসিক (stylist)। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাঁহার নিজস্ব ছিল। গদ্যে এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গী নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না।"

বলেন্দ্রনাথের 'চিত্র ও কাব্য' প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রিয়নাথ বলিয়াছেন: "চিত্র ও কাব্য" সাহিত্য ও ললিতকলা বিষয়িনী সমালোচনা। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রসগ্রাহিতা শক্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—ততোধিক আশ্চর্য্য হইতে হয় ভাবোচ্ছল ভাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে। লেখার ভিতর বুদ্ধির কোন প্যাঁচ নাই—পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন প্রয়াস নাই—চকচকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেলা নাই। কেবল কাব্য ও কলা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ তন্ময়হৃদয়ের বিভোরতা আছে।"

বলেন্দ্রনাথের শব্দ সংযোজনার কৃতিত্ব বিষয়ে উল্লেখ করিতে গিয়া প্রিয়নাথ বলিয়াছেন: "শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা। এক একটি কথা এক একটি চিত্র—এমন পূর্ণ প্রাণ পূর্ণ অবয়ব কথা বাংলা গদ্যে কোথাও দেখি নাই।"

বলেন্দ্রনাথের অন্য বৈশিষ্ট্য কি তাহা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ এই কথা লিখিয়াছেন: "প্রতিভার আর একটি মনোহর এবং প্রকৃত লক্ষণ বলেন্দ্রনাথে বিদ্যমান—নির্ভীকতা। সমালোচনায় বা মৌলিক রচনায় যখন যাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, বিনা সংশয়-সঙ্কোচে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এ নির্ভীকতা ক্ষমতার পরিচায়ক এবং প্রথম শ্রেণীর কলাপ্রধানের স্বভাবগত ধর্ম্ম।"

উপসংহারে প্রিয়নাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়: "একজন ফরাসী কবি ও প্রথম শ্রেণীর গদ্য লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে পদ্যের পক্ষ ও চরণ দুই আছে—কিন্তু গদ্যের পক্ষ নাই কেবল চরণ আছে। বলেন্দ্রনাথের গদ্য পাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হই। পদ্য পাঠে

আনন্দলাভ করিলেও আরও উচ্চতর রচনার আকাঙ্খা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।”

প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনারীতি কি প্রকারের ছিল তাহা বুঝাইতে তাঁহার কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা হইতে অংশ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে হইল। বাংলাসাহিত্যে যেমন তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তেমনি ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ ছিল। একসময় ইংরাজী সাহিত্যের এমন কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই যাহার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় নাই। ইংরাজী কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন—এই তিন বিভাগের ক্লাসিক রচনাবলী তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক রচনাও তিনি সাগ্রহে পাঠ করিতেন। একদিকে রাস্কিন ও অপরদিকে মোপাসাঁ এই দুই ভিন্নধর্মী লেখককে তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। জন রাস্কিন ছিলেন ইংলণ্ডের প্রথিতযশা লেখক। তাঁহার ললিতকলা রসিকতা, সৌন্দর্য্যপ্রীতি, ধর্মজ্ঞান ও নীতিনিষ্ঠা রাস্কিনকে যে মর্য্যাদা দান করিয়াছিল তাহা অতুলনীয়। জনষ্টুয়ার্টমিল ও মেকলে একসময় ইংলণ্ডের চিন্তাশীল সমাজে সর্ব্বাধিক সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব সমন্বিত চরিত্রের পার্শ্বে রাস্কিনও দণ্ডায়মান হইয়া স্বকীয়তার গুণে ইংরাজী ভাষাভাষী সমাজে গৌরবের একটি উচ্চতর আসন লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ সেন রাস্কিনের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ‘জনরাস্কিন’ নামক প্রবন্ধে এই ব্যক্তি-পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সাহিত্যিক কৃতিত্ব প্রভৃতির যে পরিচয় তিনি প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীর অবশ্য পাঠ্য। এই প্রবন্ধ রচনায় তিনি ইংরাজী সাহিত্যের তথা ইউরোপীয় সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক—যথা কীটস, লংফেলো, এমারসন, ব্রায়ান্ট, হথর্ণ, জর্জ্জস্যাণ্ড, নিউম্যান, ডিজ্রুইলি, ডিকেন্স—প্রভৃতির ষ্টাইলের ও বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া রাস্কিনের ভাষার অনবদ্যতা ও বাণীসৌন্দর্য্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: ‘বাস্তবিক সে ভাষা—সে গদ্যের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা অসাধ্য। যেমন কোনও সুদূর সাগর সঙ্গম-বাহিনী স্রোতস্বিনী তুষারমণ্ডিত স্বীয় পর্ব্বতগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া লীলায়িত গতিতে ছায়ালোক বিচিত্র ধরণী পৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়া উদ্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়—সে নদী যেমন কখন গিরি সঙ্কট মধ্যগতা প্রখর ফেনিল আয়সবর্ণা, কখন বীচিবিক্ষোভ সংকুলা—কখন অসীম কান্তার মধ্যগতা—নিঃশব্দ বাহিনী—কখন উপল আস্তরণ মধ্যে বিস্তীর্ণদেহা—কখন ছায়াবহুল পত্রমর্ম্মর সঙ্কুল বিটপশ্রেণী পদদেশে কলনাদিনী—কখন আবার তরঙ্গভঙ্গ ভীষণা—সেইরূপ রাস্কিনের—গদ্য রচনা বিচিত্র কলাসৌষ্ঠবে প্রস্ফুটশ্রী, বিবিধরসে আপ্লুতা।”

মোপাসাঁ বিশ্ব সাহিত্যের এক জনপ্রিয় গল্পকার। মূল ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত হইয়া তাঁহার অসংখ্য ছোটগল্প ইংরাজী ভাষাজ্ঞানী রসিকদের পিপাসা নিবারণ করিয়াছে। কিন্তু প্রিয়নাথ যেহেতু মূল ফরাসী ভাষায় ঐগুলি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন সেই কারণে অনুবাদকৃত কাহিনীগুলির প্রতি বিশেষ ভাবে অনুকূল মত পোষণ করেন নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন: অনুবাদে আমাদের বিশ্বাস নাই। সত্য বটে সাহিত্য সংসারে দু-একটি সুন্দর অনুবাদ আছে কিন্তু সাধারণতঃ কাব্যসৌন্দর্য্য ভাষান্তরিত হইবার নহে—অনুবাদে তাহার মৌলিক গৌরব কোথায় চলিয়া যায়। পদ্য কাব্যের ত কথাই নাই—ভাবপ্রকাশে কবির প্রধান অবলম্বন ছন্দ, কিন্তু অনুবাদে ছন্দের মাধুরী একেবারে বিলুপ্ত হয়।” গীদে মোপাসাঁ' নামক এই প্রবন্ধে প্রিয়নাথ মোপাসাঁর গল্পেরযে মূল্যায়ণ করিয়াছেন তাহা আজিকার পাঠকের নিকট অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। তিনি মোপাসাঁর উপন্যাস অপেক্ষা গল্প রচনায় যে অধিকতর দক্ষতা ছিল তাহা অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন এবং সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এইগুলি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবদান তাহা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ছোটগল্পের আজিকার প্রাচুর্য্যের ও বৈচিত্রের দিনেও বাঙালী পাঠক মোপাসাঁর গল্প পাঠ করিবার দুর্নিবার আগ্রহ অনুভব করেন।

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী আন্দোলন ও সরকারী শিল্প ট্রাইবুনাল

সমর দত্ত

ভারতবর্ষে শিল্পে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯২৯ সালে ট্রেড ডিস্‌পিউট এ্যাক্ট নামে একটি আইন প্রণোদিত হয়। তারপর অনেকগুলি ছোট ছোট প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনের সৃষ্টি হয়। অবশেষে শ্রমিক মালিক বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ১৯৪৭ সালে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউট্‌ এ্যাক্ট নামে রচিত একটি যুগান্তকারী আইন বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। শিল্প বিরোধ মীমাংসা এবং ভবিষ্যৎ বিরোধের পথ বন্ধ করবার জন্য এই আইনটির পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি প্রণালী উদ্ভাবিত হ'য়। যেমন—(ক) ওয়ার্কস্‌ কমিটি (খ) বোর্ড অব কনসিলিয়েশন (গ) কোর্ট অব ইনকোয়ারী এবং (ঘ) ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ট্রাইবুনাল।

১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট থেকে সুরু করে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (বর্ত্তমান ষ্টেট ব্যাঙ্ক) প্রায় সাত হাজার কর্ম্মচারী নয় দফা দাবীর ভিত্তিতে দীর্ঘ ৪৬ দিন যে ধর্ম্মঘট চালায় সেই ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত শ্রমিক মালিক বিরোধের মীমাংসা হয় উল্লিখিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউট্‌ এ্যাক্ট অনুসারে গঠিত সরকারী শিল্প ট্রাইবুনালের মাধ্যমে।

তখনকার দিনে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ২৪।২৫ বছর আগে শুধুমাত্র সারাভারতীয় ভিত্তিতেই ধর্ম্মঘট করাই যে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল তা নয়, ওই সময়ে সরকারী শিল্প ট্রাইবুনালের সাহায্যে কোন শিল্পের শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসা হওয়ায় ছিল বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাধারণতঃ কোন বৃহৎ শিল্পে যখন শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দিত এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সঙ্ঘটি যদি খুব শক্তিশালী হ'ত কেবলমাত্র তখনই সরকারী আইন অনুসারে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইবুনাল গঠিত হ'ত। কোন ছোট শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দিলে ট্রাইবুনাল বড় একটা পাওয়া যেত না, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিক সঙ্ঘটি যদি খুব শক্তিশালী না হ'ত। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার কয়েক বছর পরেই এ বিষয়ে সরকারী মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। কারণ বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিক মালিক বিরোধ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। শ্রমিক আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন শিল্প পণ্যের উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সেইজন্য সরকারী বে-সরকারী ছোট বড় সকল শিল্পের শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার প্রয়োজন মত শিল্প ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা করে। অপর পক্ষে এই শিল্প ট্রাইবুনাল সম্বন্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আগ্রহ ক্রমশঃ কমতে থাকে। কারণ বিভিন্ন শি[illegible] ট্রাইবুনালে অংশ গ্রহণ ক'রে এবং ট্রাইবুনালের কার্য-কলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য ক'রে শ্রমিকগণ এ[illegible] অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে যে শিল্প ট্রাইবুনালের বিচা[illegible] শেষ পর্য্যন্ত মালিক পক্ষই লাভবান হয়। ট্রাইবুনালে[illegible] কাজ বহুদিন ধরে চলে এবং বহু অর্থ ব্যয় হয়, যে পরিমা[illegible] অর্থব্যয় করা শ্রমিকগণের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। তারপ[illegible] নানা অজুহাতে শিল্প ট্রাইবুনাল প্রদত্ত রোয়েদাদে[illegible] বিরুদ্ধে মালিকগণ উচ্চ আদালতে অর্থাৎ হাইকো[illegible] অথবা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। যদিও মালিকগণে[illegible] পক্ষে এই সব আদালতে মামলা চালান সহজ ব্যাপা[illegible] কিন্তু দরিদ্র শ্রমিকগণের পক্ষে এই সব আদালতে মাম[illegible] চালান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এমনিভাবে শি[illegible] ট্রাইবুনাল থেকে সুবিচার প্রত্যাশী দরিদ্র শ্রমিকগণে[illegible] হয়রানির সীমা থাকে না। বহুদিন অপেক্ষা করব[illegible] পর ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ অনুসারে তারা যা প[illegible]

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পর্ব্বতের মুষিক প্রসব ছাড়া আর কিছুই নয়।

যতদিন যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ শিল্প ট্রাইবুনালের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করতে থাকে। এই সময়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমোহনলাল মজুমদার ওই এসোসিয়েশনের ১৯৫০-৫১ সালের কার্য্যাবলীর বাৎসরিক রিপোর্টে ব্যাঙ্ক বিরোধ সম্বন্ধীয় একটি শিল্প ট্রাইবুনালের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা ক'রে বলেন :—

"The long awaited Award of the all India Industrial Tribunal (Bank disputes) came out in the gazette of the 12th August 1950. About 65000 bank employees throughout the country were expecting that the Tribunal consisting of three High Court Judges would certainly bring the long standing dispute to an end and would give adequate relief to the bank employees. But to our utter astonishment the employers challenged the validity of the Tribunal and legality of the Award before the Supreme Court of India. The Advocate General of India pleaded that the Constitution of the Tribunal was absolutely in accordance with the provisions of the Industrial Disputes Act 1947. Our counsels also excellently marshalled our case. But the Supreme Court held by a majority of 4 to 3 the Constitution of the Tribunal was illegal and the Award as such was not binding. The Supreme Court's order came to the bank workers as a deadly blow. The money spent by the poor employees were in vain. The energy, labour and attention engaged to vindicate the cause of the bank employees became sheer wastage. The public money spent lavishly by the government in this regard was all futile. The Tribunal that was foisted upon the bank employees proved itself a completely impotent machinery to settle the Industrial Disputes."

এই রকম অবস্থা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক শ্রেণীর সরকারী শিল্প ট্রাইবুনাল ব্যবস্থাটিকে বর্জ্জন ক'রে চলা সম্ভব ছিল না। কারণ একটি প্রণালী ব্যতিরেকে শ্রমিকগণের দাবী দাওয়ার বিচার বিশ্লেষণ কি করে হবে? দাবী দাওয়া মেনে নেবার ক্ষমতা মালিকগণের কতটা আছে এবং আদবেই আছে কি না তার পরীক্ষা কে ক'রবে? এ সম্বন্ধে শিল্প ট্রাইবুনাল একটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রণালী না হলেও এটি একটি মন্দের ভাল ব্যবস্থা। সেইজন্য শ্রমিকগণ সরকারী শিল্প ট্রাইবুনাল প্রণালীকেও সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে তাদের দাবী দাওয়া মিটিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থাটি মেনে চলে এবং আজও চলছে।

৪৬দিন ব্যাপী সংগ্রাম চালিয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণ তাদের ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার ক'রে নেয়। এর কারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের দাবী দাওয়ার কিয়দংশ মেনে নেয়। এতদ্ব্যতীত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শ্রমিক মালিক বিরোধ সম্পূর্ণরূপে মীমাংসাভূত হবার জন্য একটি সালিশী ব্যবস্থা অর্থাৎ বোর্ড অব কনসিলিয়েশন উভয় পক্ষ মেনে নেয়। কিন্তু এই সালিশীর কাজ আরম্ভ হ'তে অত্যন্ত দেরী হয়। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যায়। আসে ১৯৪৭ সাল।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে ১৯৪৭ সালে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপিউট্স এ্যাক্ট পাস হয়। এই আইনটি ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বলবৎ হয়। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউটস এ্যাক্ট বলবৎ হওয়ায় ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সমিতি সরকারের নিকট আবেদন ক'রে যে তাদের দাবী দাওয়া যেন বোর্ড অব কনসিলিয়েশনের পরিবর্ত্তে শিল্প ট্রাইবুনাল কর্তৃক বিবেচিত হয়। কারণ নব প্রবর্ত্তিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিস্‌পিউটস এ্যাক্ট অনুসারে বোর্ড অব কনসিলিয়েশন অপেক্ষা ট্রাইবুনালের ক্ষমতা অধিকতর। সরকার ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের এই আবেদন মঞ্জুর করে। ১৯৪৭

সালের মে মাসে সরকার কর্ত্তৃক গঠিত আর, গুপ্ত আই-সি-এস ট্রাইবুনালের কাজ আরম্ভ হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণের দাবী দাওয়া নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে। কর্ম্মচারীগণ সম্পূর্ণ সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে এই ট্রাইবুনালে অংশ গ্রহণ করে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বাড়ী অর্থাৎ ৩ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা—১এ প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ট্রাইবুনালের শুনানী চলে। অবশেষে ১৯৪। সালের ৪ঠা আগষ্ট আর গুপ্ত ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে গুপ্ত ট্রাইবুনালের সামনে যে দাবীপত্র পেশ করা হয় সেই দাবী পত্রটি ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের ধর্ম্মঘটকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষ রচনা করেন। এই দাবী পত্রটি রচনার মাধ্যমে তিনি এ দেশের শ্রমিক আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন।

এখন দেখা যাক্ আর, গুপ্ত ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ অনুযায়ী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণ কি পেয়েছিল এবং কতখানি লাভবান হয়েছিল। ৯২১ সাল থেকে ১৯.৬ সালের ধর্ম্মঘটের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মাসিক মাহিনার ব্যাপারে চারটি গ্রেড প্রচলিত ছিল। প্রতিটি গ্রেড অনুসারে মাহিনার হার ছিল এই রূপ :—

গ্রেড	মাসিক মাহিনা
এ	——৫৫টাকা থেকে ১২৬টাকা (২৫ বছরে) (প্রথমে ৪০টাকা, ৬ মাস পরে চাকুরী স্থায়ী হ'লে ৫৫ টাকা)
বি	———.........১৪০টাকা
সি	———.........১৫৫টাকা
ডি	———.........১৮০টাকা

প্রথমে সকল কেরানীকেই 'এ' গ্রেডে ভর্ত্তি করা হ'ত। 'এ' গ্রেড থেকে 'বি' গ্রেডে উন্নতি লাভ করতে গেলে ডিপার্টমেন্টের বড় সাহেবের সুপারিশের প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু খুব কম কেরানীর ভাগ্যেই বড় সাহেবের সুপারিশ জুটতো। সুতরাং ব্যাঙ্কে ২৫ বছর কাজ করবার পর বেশীর ভাগ কেরানীর চাকুরী জীবন শেষ হ'ত ১২৬ টাকায়। 'বি' গ্রেড থেকে সি গ্রেডে এবং 'সি' গ্রেড থেকে 'ডি' গ্রেডে উন্নতি লাভ করতে গেলে ব্যাঙ্কের যথারীতি পরীক্ষায় বসতে হ'ত। কিন্তু এই পরীক্ষা ছিল একটা বিরাট প্রহসন। আসল কথা ব্যাঙ্কের বড় সাহেবদের খুসী করবার কৌশল যারা জানত তাদেরই উন্নতিসাধন হ'ত।

এইতো গেল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ক'লকাতা হেড অফিস এবং স্থানীয় ব্রাঞ্চ অফিসগুলির কর্ম্মচারীগণের মাস মাহিনার অবস্থা এবং পদোন্নতির ব্যবস্থা। ক'লকাতার বাহিরে মফঃস্বল ব্রাঞ্চগুলির কর্ম্মচারীগণের চাকুরীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। মফঃস্বল ব্রাঞ্চে একজন কেরানীর মাহিনা আরম্ভ হ'ত ১৮টাকায়। অবশ্য একজন গ্রাজুয়েট কেরানীর মাহিনা সুরু হ'ত ৩৫ টাকায়। কিন্তু সকল কেরানীকেই তিন বছর শিক্ষানবীশ হিসাবে কাজ করতে হ'ত। তারপর তাদের চাকুরীর অবস্থা ব্রাঞ্চ অফিসের বড়কর্ত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ক'রত। যাই হোক্ গুপ্ত ট্রাইবুনালের রায় বলবৎ হবার পর এইরকম নৈরাশ্যজনক অবস্থার বেশ খানিকটা পরিবর্ত্তন ঘটে। ওই ট্রাইবুনালের রায় অনুসারে আসাম থেকে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ছোট বড় অফিসের কেরানীগণের মাহিনা হয় এইরূপ:—

গ্রেড	মাসিক মাহিনা
জুনিয়র	—৭০টাকা থেকে ১৭৫টাকা (২৫ বছরে)
সিনিয়র	—১০০টাকা থেকে ২৫০টাকা (২৫ বছরে)

আলোচ্য ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ অনুসারে কেরানীদের জুনিয়র এবং সিনিয়র—এই দু'টি গ্রেডে বিন্যস্ত করা হয়। বহু কেরানীই জুনিয়র থেকে সিনিয়র গ্রেডে উন্নতি লাভ করে। এক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের বড় সাহেবদের সুপারিশ অনুসারেই কেরানীদের জুনিয়র গ্রেড থেকে সিনিয়র গ্রেডে উন্নতিসাধন করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধর্ম্মঘটের পরবর্ত্তীকালে

সুপারিশ করার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ খুব বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখায় নি।

ট্রাইবুনালের রায় অনুসারে ব্যাঙ্কের নিম্ন পদস্থ কর্মচারীগণের মাহিনার হার হয় এইরূপঃ—

৩০টাকা থেকে ৮০টাকা (২৫ বছরে)

কিন্তু ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার গাড়ী চালক এবং হেড মেসেঞ্জারের মাহিনার হার হয় ৭০টাকা থেকে ১০০টাকা (২৫ বছরে)। এতদ্ব্যতীত কর্মচারীগণের মাগগী ভাতা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা (মাঝে ½ ঘণ্টা বিশ্রাম) পর্য্যন্ত কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট হয়। বছরে ১০দিন Casual Leave এবং ১ মাস Privilege Leaveএর ব্যবস্থা হয়। ট্রাইবুনাল Sick Leave-এরও বিধান দেয়। কর্মচারীগণের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে সঞ্চিত টাকার উপর ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত সুদের হার বর্দ্ধিত করা হয়। কোন কর্মচারীর সার্ভিস রেকর্ডে ক্ষতিকর মন্তব্য করবার আগে কর্মচারীটির ত্রুটি সম্বন্ধে তদন্ত করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। গুপ্ত ট্রাইবুনালের রোয়েদাদে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণের যে বিষয়ে বিশেষ জয় হয় সেটি ছিল মালিক কর্তৃক কতিপয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে নানা কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্বন্ধে ট্রাইবুনালের অভিমত এবং নির্দ্দেশ। ট্রাইবুনাল সকল কর্মচারীকেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব'লে ঘোষণা করে এবং তাদের চাকুরীতে পুর্ণবহাল করবার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দেয়। কর্তৃপক্ষ তাদের চাকুরীতে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

এই প্রসঙ্গে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না যে ১৯৪৬ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের ফলে নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি পুনর্জ্জন্ম লাভ করে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের এই দুটি স্বনামখ্যাত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সুযোগমত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। এখন আরও ২টি ঘটনার কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করি।

আর, গুপ্ত ট্রাইবুনাল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণকে যে পরিমাণ মাগগী ভাতা দেবার নির্দ্দেশ দেয় সেই পরিমাণ মাগ্‌গী ভাতায় ওই ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যদিও গুপ্ত ট্রাইবুনালের রোয়েদাদের অনুকূলতায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণের বেশ খানিকটা সুবিধা হয় তথাপি তারা তাদের এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট অধিক পরিমাণ মাগ্‌গী ভাতা এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি ভাতা দাবী করে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সরকার সমস্ত বিষয়টি একটি ট্রাইবুনালের নিকট বিচার বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। ওই ট্রাইবুনালের নাম এম, সি, চক্রবর্ত্তী ট্রাইবুনাল। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ঐ ট্রাইবুনালের রায় প্রকাশিত হয়। কর্মচারীগণ তাদের মূল মাহিনার উপর শতকরা ৪০ টাকা (সর্ব্বনিম্ন ৫০ টাকা) মাগ্‌গী ভাতা পায়। অন্যান্য দাবীগুলি ট্রাইবুনাল নাকচ করে দেয়।

ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওই এম, সি, চক্রবর্ত্তী ট্রাইবুনালের উপর এক সাংঘাতিক বিবাদ নিষ্পত্তির ভার পড়ে। বিবাদটি ঘটে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীগণের মধ্যে। ১৯৪৬ সালে ওই ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ যখন ধর্মঘট করে তখন ব্যাঙ্কের অফিসারগণ এবং তাদের দম্পতিগণ ব্যাঙ্কের কাজ খানিকটা তুলে দেবার চেষ্টা করে। এইসব অফিসার এবং তাদের পত্নীদের ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত এক মাসের মাহিনা পারিশ্রমিকরূপে দান করে। এইরকম দানকে Ex-gratia Payment বলা হয়। ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন এই রকম আর্থিক দানকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ ভ্রুক্ষেপ করেনি। কাল বিলম্ব না করে এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ সভ্যগণকে সংগ্রামের জন্য ডাক দেয়। ১৯৪৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর কলম ধর্মঘট হয়। ৯ই সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। ফলে Lock-out-এর সৃষ্টি হয়।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই অবস্থাটাকে Lock-out ব'লে মেনে নেয়নি। কারণ আইনতঃ তখন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে Lock-out করা যেত না। কর্মচারীগণ তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। এই সংগ্রামের ফলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত মুস্কিলে পড়ে যায়। আমানতকারীগণ কর্তৃপক্ষের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উপায়ন্তর না দেখে কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ধর্ণা দেয়। সরকারী নির্দ্দেশে গঠিত এম, সি, চক্রবর্ত্তী ট্রাইবুনালের নিকট বিবাদমান বিষয়টি বিচারের জন্য প্রেরিত হয়। চক্রবর্ত্তী ট্রাইবুনালের রায় অনুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ জয়ী হয়। ট্রাইবুনাল মন্তব্য করে :—

"The Ex-gratia payment sought to be made to the non strikers is an unfair labour practice and the Bank cannot make this discrimination in payment and should not do it."

এই রায় প্রকাশিত হবার পর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে সমস্ত অফিসারগণ এবং অফিসার দম্পতিগণ উল্লিখিত বে-আইনী পারিশ্রমিক পেয়েছিল তাদের সে টাকা ফেরৎ দিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন সভাপতি শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একটি অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় বলেন :—

'The fight on the issue of ex-gratia payment is a fight for an important principle which affects not only the employees of Imperial Bank of India but also the entire working class of India. In the victory of our comrades, every worker has the reasons to rejoice over something which has undoubtedly strengthened his cause and the ideal of his organisational activities. This fight exposed the most dirty tactics and the sinister move of the Bank Authorities. Not only that. It also exposed the most dangerous move for disrupting our solidarity and weakening our Association which has of late, gained enormous strength through the course of struggle. The uncalled for attack of the Bank on our unity through payment of Premium on black—legism was completely beaten and repulsed. Never before in the history of the Bank the Burra Sahibs received such a rebuff from their employees. This triumph will surely inspire all of us in our future struggle and will lead us from victory to victory."

এমনিভাবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিজয় রথ অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। অপরদিকে ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের অন্যান্য ইউনিয়নগুলির মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়। এই প্রসঙ্গে ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের ৭ দিনের সফল ধর্মঘট, ১৯৪৮ সালে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের ১৯ দিনের ধর্মঘট, লয়েডস ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের ২৬ দিনের ধর্মঘট এবং পুনরায় ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের ৪৯ দিনের ধর্মঘট বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

জর্জ কার্ভারের জীবনের উল্লেখযোগ্য রোমাঞ্চকর অধ্যায় হ'ল তাঁর সৈনিক-জীবন। কলেজের সৈন্যদলে ভর্তি হবার পরে তাঁর গায়ে উঠলো ঝক্‌ঝকে পিতলের বোতাম আঁটা গাঢ় আকাশী রঙের সৈনিকের পোশাক। স্বেচ্ছাকৃত সৈনিকরূপে দেশের প্রতিরক্ষা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদগ্র আকাঙ্খা বুকে নিয়ে সেচ্ছাসৈন্য বাহিনীতে যোগ দিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁর পদোন্নতি হ'ল। জর্জ কার্ভার নিজেও এই পদোন্নতিতে কম বিস্মিত হ'লেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হ'লেন একজন কৃষ্ণকায় নিগ্রো—ক্যাপ্টেন জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার, এমন ঘটনা বিরল ব'লেই অনেকের কাছে এটা বিস্ময়ের কারণ হ'ল। জর্জ কার্ভার নিজেও এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা সম্বন্ধে যতই চিন্তা করেন ততই তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। প্রথম যখন এই পদোন্নতির খবর শুনলেন তখন তাঁর বুকের মধ্যে যে প্রবল দামামা-ধ্বনি শুরু হ'য়েছিল তার রেস অনেকদিন পর্যন্ত ছিল।

কিন্তু ভাবপ্রবণতার বন্যায় আত্মসমর্পন করতে জর্জ কার্ভার রাজি হ'লেন না। মনকে দৃঢ় ও সংযত ক'রে নিয়ে সুসংহত পদক্ষেপে তিনি কর্তব্যপথে এগিয়ে চ'ললেন। এখানে তাঁর নিজের মুখের কথা উদ্ধৃত করি—"ঈশ্বরের দ্রাক্ষাকুঞ্জের আমি একজন দীন মালাকর ও সামান্য ভৃত্য মাত্র।"

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা জর্জ কার্ভারের চিরকালের অভ্যাস। আইওয়া কৃষি কলেজের অন্যান্য ছাত্ররা যখন ঘুমিয়ে থাকে রাতের আধ-অন্ধকার তখনো গাছে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু জর্জ কার্ভারের তখন আর বিছানায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না, তিনি শয্যাত্যাগ ক'রে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। কাঁচের আধারে সযত্নে সুরক্ষিত গাছের চারাগুলি তদারক করেন অথবা গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখার উদ্দেশ্যে লতাগুল্ম সংগ্রহের জন্য বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। তাঁর মতে দৈবক্রমে ভুল ক'রে একটা আগাছার ফুল আবর্জনার মধ্যে জন্মেছে ব'লেই নিতান্ত অবহেলার জিনিষ নয় বা তুচ্ছও নয়। পৃথিবীর যাবতীয় ফুলের সে সগোত্র।"

জর্জ কার্ভারের বিচারে একটা বুনো গাছের চারা এবং ধনীর উদ্যানে মালির হাতে সযত্নে রোপিত অভিজাত শ্রেণীর গাছের চারা মুলতঃ একই পদার্থ। দুটো জিনিষের মধ্যে তফাৎ সামান্যই। কিন্তু এই দুটো জিনিষেরই সৃষ্টিকর্তা এক ভগবান এবং দু'য়ের উপরে ভগবানের একটি করুণাধারা সমানভাবে উৎসারিত।

একদিন এমনি এক ভোরবেলায় জর্জ কার্ভার বনের মধ্যে জলাভূমির কিনারায় কতগুলি গাছগাছালির নমুনা সংগ্রহ করার কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন ঝোপের মধ্যে আট-দশ বছরের একটি ছোট ছেলে অতি সন্তর্পনে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছে কার্ভারের মনে হ'ল ছেলেটা বোধহয় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তিনি তাকে সাবধান ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "ওহে ছোকরা, খুব সাবধানে ভালো ক'রে দেখেশুনে পথ চলো, এখানে এই যে জলাভূমি দেখছো এরমধ্যে অনেকগুলি চোরাবালি আছে, একবার যদি অসাবধানে কোন রকমে চোরাবালির মধ্যে গিয়ে পড়ো তোমাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। শুধু তাই

নয়, তোমার চিহ্ন পর্যন্ত কেউ খুঁজে পাবে না। চিরদিনের মতো একেবারে অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।"

কিন্তু সেই ছোট্ট ছেলেটি যে জর্জ কার্ভারের কথায় কর্ণপাত ক'রলো এমন মনে হ'ল না, সে যেমন এগোচ্ছিল তেমনিই এগোতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ঝুপ্ ক'রে কিছু প'ড়ে যাবার মতো একটা শব্দ হ'ল, জর্জ কার্ভার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, ছেলেটি চোরা-বালির গর্তে প'ড়ে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। আর চীৎকার ক'রছে সাহায্যের জন্য। জর্জ কার্ভার বিদ্যুতের বেগে ছুটে গিয়ে জলাভূমির মধ্যে খানিকটা অবধি নেমে ছেলেটাকে ধ'রবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। ছেলেটাও হাত বাড়ালো কিন্তু কার্ভারের হাত ধ'রবার শক্তি তার হ'ল না। জর্জ কার্ভার দেখলেন আর এক মুহূর্ত দেরী ক'রলে ছেলেটাকে আর বাচানো যাবে না। ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে তিনি আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার হাত ধ'রে ফেললেন। তারপর বহু কষ্টে টেনে উপরে তুললেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর গহ্বর থেকে ছেলেটা ফিরে এলো।

"আমি তোমাকে আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথায় কান দাওনি" জর্জ কার্ভার ভৎর্সনার সুরে ছেলেটিকে ব'ললেন, "তুমি চোরাবালির মধ্যে প'ড়েছিলে, কোন্ অতলে তুমি তলিয়ে যেতে কেউ জানতেও পারতো না। ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন।"

"যাইহোক, আপনার দয়ায় আমি বেঁচে তো গিয়েছি" ছেলেটি বললো। "আপনি আমায় রক্ষা ক'রেছেন তার জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"আমাকে কথা দাও, আর কখনো এরকম অসাবধানে কাজ ক'রবে না" জর্জ কার্ভার ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে ব'ললেন।

"আমি শপথ করছি, এ রকম কাজ আর কখনো আমি করবো না," ছেলেটি ধীর স্থির কণ্ঠে জবাব দিল।

জর্জ কার্ভার অপলক দৃষ্টিতে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগলেন, তাঁর মনে হ'ল তাঁর এক বন্ধুর মুখের সঙ্গে এই ছেলেটির মুখের আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য আছে। মুখখানিতে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছাপ। আত্মপ্রত্যয়ে দৃপ্ত, প্রতিভায় উজ্জ্বল এবং লেশমাত্র ভয়ডরহীন সে মুখ।

ছেলেটি একটুখানি হাসলো, অত্যন্ত ম্লান ও নিষ্প্রভ সে হাসি। সে তার নিজের পরিচয় দিলো, বললো, "আমার নাম হেনরি ওয়ালেশ।"

"অধ্যাপক ওয়ালেশ কি তোমার কেউ হন?"

"হ্যাঁ, আমি তাঁর ছেলে।"

এই কথা শোনামাত্র জর্জ কার্ভার তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে হেনরিকে বাহুবেষ্টনে বেঁধে ফেললেন, ব'ললেন, "তোমার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমি খুব আনন্দিত হ'লাম, হেনরি। আমার নাম হচ্ছে জর্জ—জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার। আমি তোমার পিতার একজন গুণমুগ্ধ ছাত্র, তিনি চমৎকার পড়ান।"

তারপর একটুকাল থেমে থেকে হেনরিকে ব'ললেন, আচ্ছা, এবার শিগ্‌গীর করে বাড়ী যাও, স্নান করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হও গিয়ে।"

এমনিভাবে হঠাৎ জর্জ কার্ভার তাঁর ছাত্রজীবনে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, উত্তরকালে যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতিশয় সম্মানিত এক উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হ'য়েছিলেন। একদা যে কিশোর বালককে জর্জ চোরাবালির মৃত্যু গহ্বর থেকে টেনে তুলে জীবন রক্ষা করেছিলেন সেই বালকই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সময়ে আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্টের আসন অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সঙ্গে পরিচয়ের বহু বছর পরে আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট হেনরি ওয়ালেশ নিজের জীবন স্মৃতিতে লিখেছিলেন, "আমি তখন কিশোর বালক ছিলাম, কিন্তু সেই বলিষ্ঠ গড়ন দীর্ঘ সমুন্নত দেহের অধিকারী মানুষটিই বর্তমান যুগের প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার। সে সময়ে আমি তাঁর একজন রীতিমত গুণগ্রাহী ও বিশেষ

অনুরাগী সঙ্গী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে বহুদিন নিবিড় অরণ্যের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ ক'রেছি, দুজনে মিলে রঙীন প্রজাপতি আর কীট পতঙ্গের অনুসন্ধান ক'রেছি, গাছের মূল ও লতাপাতা সংগ্রহ করেছি। তখন তার সঙ্গে সেই নিভৃত নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ চ'লতে কী যে মজা লাগতো; মনে হ'ত বন তো নয়, কোন এক পরীর দেশে এসে প'ড়েছি, আর, আমিই যেন সেই পরীর রাজ্যের আবিষ্কর্তা।"

জর্জ কার্ভার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সৌরভ এবং বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতীক হিসাবে সর্বদাই নিজের কোটের বুক পকেটের ভাঁজে একটা সুন্দর রঙীন ফুল গুঁজে রাখতেন। কিন্তু তার বেশভূষায় অন্য কোন ভাবে তার এই সৌন্দর্য প্রিয়তার আর কোন পরিচয় পাওয়া যেতো না। বাস্তবিক পক্ষে তিনি নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। বছরের পর বছর তিনি এক প্রস্থ পোশাক পরিধান করেই বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতেন। পোশাকটা পরিবর্তন করা দরকার এ কথাটাও তাঁর কখনো মনে হ'ত না, নতুন পোশাক তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা তো দূরের কথা। কেউ যদি কৌতূহলী হ'য়ে এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন ক'রতো তিনি উত্তরে বলতেন, "আমি সোজা সরল সাদাসিধে মানুষ, আমার বেশী দামী আর ভালো পোশাকের কীই বা দরকার? সাধারণ একখানা চিঠি ডাকে পাঠাবার জন্য কি কেউ দামী খাম কেনে?"

জর্জ কার্ভারের ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, তাঁকে কিন্তু একবার একটা বিশেষ উপলক্ষে বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে ও সনির্বন্ধ অনুরোধে একটা দামী পোশাক প'রতে হ'য়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উপাধি গ্রহণ করার জন্য জর্জ কার্ভারকে আমন্ত্রণ জানানো হ'ল, তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এক অভিজাত দোকান থেকে তাঁর জন্য বহু মূল্যবান একটা পোশাক ক্রয় ক'রলো, সৌখীনতার দিক দিয়েও সেটা কম ছিল না। মাথায় টুপি প'রে ও গাউন পরিধান ক'রে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে জর্জ কার্ভার সারিবদ্ধভাবে মার্চ ক'রে উৎসব প্রাঙ্গনে প্রবেশ ক'রলেন, কিন্তু তাঁর পোশাক পরিধানের অপরূপ ধরণ এবং চলার অদ্ভুত ভঙ্গী দেখে অনেকেরই হাসি পাচ্ছিল, তাঁর সহপাঠী ছাত্ররাও কৌতুক বোধ করছিল। তাঁর টুপির টাসেল যেদিকে থাকার কথা সেদিকে না থেকে বিপরীত দিক থেকে বেমানানভাবে তার চোখের সামনে ঝুলে রয়েছে।

জর্জ কার্ভার নিজের এই বেখাপ্পা ধরণে পরা পোশাক এবং খামখেয়ালী আচরণের কথা পরে অবশ্য অন্য লোকদের মুখে শুনে খুবই হেসেছিলেন।

আর একবার ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সাহিত্যসভায় জর্জ কার্ভার তাঁর স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করে সবাইকে অবাক করে দিলেন। তাছাড়া তাঁর আঁকা কয়েকখানি ছবি নিয়ে অ্যাসেম্ব্লি হলে একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হ'ল। শিল্পী জর্জ কার্ভারের নতুন পরিচয় উদ্ঘাটিত হ'ল, তাঁর বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভার নিদর্শনগুলি তাঁর জন্য এক দিগন্ত খুলে দিল। জর্জ কার্ভারের প্রশংসায়, শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতিতে সারা দেশ ভ'রে গেল, মুগ্ধ জনসাধারণের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধার অভিসিঞ্চনে তিনি অভিষিক্ত হলেন। আইওয়া কৃষি কলেজের অধ্যাপকরা সবাই মিলে জর্জ কার্ভারের সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন ক'রলেন।

ভোজসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে জর্জ কার্ভার খুবই বিস্মিত হ'লেন, ব'ললেন, অধ্যাপকদের জন্য আয়োজিত ভোজসভায় যোগদান করার জন্য আমাকে আবার বিশেষ ক'রে কেন আহ্বান জানানো হ'ল আমি তো তার কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না।"

উত্তরে অধ্যাপক উইলসন স্মিতহাস্যে ব'ললেন, "কারণ তো অন্য কিছু নয়, আপনি কাল থেকে কলেজের অধ্যাপকগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হতে চ'লেছেন।"

অধ্যাপক উইলসন নিজেই নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে

এসেছিলেন জর্জ কার্ভারের কাছে তাঁকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাতে।

আইওয়া কৃষি কলেজের শীতকালীন ছুটি শুরু হবার পরে জর্জ কার্ভার চ'লে গেলেন মিস এট্টা বাডের শিল্প বিদ্যালয়ে ছুটির দিনগুলো অতিবাহিত করার উদ্দেশ্যে সিম্পসন শহরে।

জর্জ কার্ভার তাঁর ছবি আঁকার অনুশীলন বন্ধ রেখেছেন প্রায় এক বছর হ'ল, এই এক বছরের মধ্যে তিনি একটি দিনও তুলি হাতে নেন নি। সিম্পসনে গিয়ে ছুটির দিনগুলিতে অবসর বিনোদনের সময়ে ক্যানভাসের উপরে এমন কয়েকখানি অপূর্ব ছবি আঁকলেন যা নিত্যকালের সম্পদ হ'য়ে রইলো। আজো তাঁর অমর শিল্প প্রতিভার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর সেই ছবিগুলিতে উজ্জ্বল হ'য়ে র'য়েছে।

ছেলেবেলায় জর্জ কার্ভার কতো দিন যে একা একা আপনমনে নির্জন বনের মধ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রীর মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, কতো বিভিন্ন আর বিচিত্র ধরণের ফুল, লতাপাতা, কতো জাতের রঙীন প্রজাপতি ও পাখী দেখে মুগ্ধমনে ঘুরে বেড়িয়েছেন আজ সেই পিছে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা তাঁর মনে উদিত হ'ল। জীবনের অতি দূরে পিছনে ফেলে আসা বাল্যকালকে ধ'রে রাখবার অন্য কোন উপায় না পেয়ে জর্জ কার্ভার তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে ব'সলেন। ক্যানভাসের উপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো একটা চারা ইউকা গাছ আর তার চারপাশে ছড়ানো লাল গোলাপের অজস্র পাপড়ি।

শীতের ছুটি শেষ হ'ল. জর্জ কার্ভারও এমস শহরে ফিরে গেলেন, আবার শুরু হ'ল তাঁর অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও বিজ্ঞান গবেষণা। কঠোর পরিশ্রমও তাঁকে দমাতে পারে না, অবিশ্রান্ত ভাবে তিনি খাটেন, কিন্তু প্রকৃতি তার পাওনা আদায় করতে ছাড়বে কেন? সে তার পাওনা আদায়ের জন্য যথাসময়ে এগিয়ে এলো, তার সাড়া পাওয়া গেল। অতিরিক্ত কঠোর পরিশ্রম করার ফলে জর্জ কার্ভার রক্তশূন্যতা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে শরৎকাল আগমনের মুখোমুখি সময়ে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হ'য়ে প'ড়লেন। তাঁর চিকিৎসক তাঁকে আরোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে বড়দিনের ছুটির সময়ে অন্য কোথাও চ'লে না গিয়ে জর্জ কার্ভার যাতে কলেজেই থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

একদিন বিকেল বেলায় হঠাৎ অধ্যাপক বাডের সঙ্গে জর্জ কার্ভারের দেখা হ'ল, তিনিই তাঁকে আইওয়ার রাষ্ট্রীয় শিক্ষক সমিতির আগামী অধিবেশনের খবরটা দিলেন। কবে অধিবেশন শুরু হবে তার তারিখ অবশ্য তখনো স্থির হয়নি, তবে বড়দিন এবং জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে তা অনুষ্ঠিত হবে, এবং সেই অধিবেশন অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হবে নিখিল আইওয়া শিল্প প্রদর্শনী। সেখানে দেশের বহু দূর দূরান্তর স্থান থেকে বিখ্যাত সব শিল্পীরা আসবেন নিজেদের শিল্পসম্ভার নিয়ে, কারণ সেখানে এক বিরাট শিল্প প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হ'য়েছে। জর্জ কার্ভারকেও তাঁর নিজের আঁকা ছবি সেখানে পাঠাবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন অধ্যাপক বাড।

কিন্তু জর্জ কার্ভার ব'ললেন, "এখন আর সময় কোথায় আছে? যে দু'চার দিন বাকী আছে সেই অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতায় পাঠাবার মতো ভালো ছবি আঁকা আমার দ্বারা যে সম্ভব হবে তার আশা খুবই কম, যদিও বা আঁকতে পারি তা আর প্রতিযোগিতায় পাঠাবার সুযোগ পাবো না"

"এ তুমি ঠিক কথা বলোনি জর্জ, অধ্যাপক বাড মাথা নেড়ে স্নেহের সুরে ব'ললেন, আমার মেয়ে এট্টা আমার কাছে তোমার সম্বন্ধে কী ব'লেছে জানো? ব'লেছে, জর্জের মতো অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পী সারা আইওয়া শহর খুঁজলে আর একজন পাওয়া যাবে না।"

বড়দিন শেষ হ'য়েছে, বড়দিনের উৎসব-আনন্দ এবং সমারোহও শেষ হ'য়েছে। পরের দিন ভোরবেলায় জর্জ কার্ভার একলা ঘরে ব'সে আছেন। জানালায় একটা সুন্দর রঙীন পর্দা ঝুলছে, আর জানালার ঠিক নীচে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নায় সামনাসামনি

রাখা ফুলদানিতে সাজানো কয়েক গুচ্ছ ফুলের স্তবক, পাপড়িগুলি যার এখনো সব শুকিয়ে যায়নি। জর্জ কার্ভার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেগুলির দিকে চেয়ে আছেন, বড়দিনের উৎসব সমারোহের স্মারক চিহ্ন হিসেবে তার একটা বিশেষ মূল্য আছে তাঁর কাছে। দু-একটা ক'রে ফুলের পাপড়ি বোটা আলগা হ'য়ে খ'সে খ'সে প'ড়ছে।

এমন সময়ে ছাত্র বোঝাই একখানা শ্লেজ গাড়ী নর্থ হলের গেটের সামনে দাঁড়ালো "ওঠো, ওঠো হে জর্জ শিগ্‌গীর গাড়ীতে উঠে চ'ড়ে ব'সো!" একসঙ্গে অনেকগুলি ছাত্রের কণ্ঠ থেকে উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। গাড়ীর চালকের আসনে উপবিষ্ট ছাত্রটি সবচেয়ে বেশী চীৎকার ক'রছে, ব'লছে কার্ভারকে, "অমন হাঁদার মতো চেয়ে র'য়েছ কি, দেখছো না আমরা সবাই তোমায় নিতে এসেছি! আজ তুমি যেখানে খুসি, আর যত দূরে খুসি যেতে চাইবে, আমরা তোমায় আনন্দের সঙ্গে নিয়ে যাবো।

জর্জ কার্ভার ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলেন না। অবাক হ'য়ে বন্ধুদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু বন্ধুরা তাঁকে বেশীক্ষণ ভাববার সময় না দিয়ে সবাই মিলে ধরে পাঁজাকোলা ক'রে গাড়ীতে নিয়ে তুললেন। গাড়ীতে আরো যেসব ছাত্র ব'সেছিল তারা নিজেরা স'রে স'রে গিয়ে মাঝখানে জর্জ কার্ভারের ব'সবার জায়গা ক'রে দিল। গাড়ী পূর্ণ গতিতে ছুটে চ'ললো। কর্মীদের কোয়ার্টারগুলির পাশ দিয়ে গাড়ী শহরের দিকে এগোতে লাগলো।

জর্জ কার্ভার এবার প্রতিবাদ ক'রে বলতে লাগলেন, "আমাকে তোমরা সবাই কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? এ কিন্তু তোমাদের ভারি অন্যায়। আমাকে তোমরা এভাবে না নিয়ে গেলেই পারতে। তোমাদের এ কাজ কিন্তু মোটেই ভালো হ'ল না। তোমরা শেষে বুঝতে পারবে। তার চেয়ে এখন আমাকে ছেড়ে দাও!" কিন্তু কেউ যে তাঁর কথায় কান দিল, এমনও মনে হ'ল না। সবাই আনন্দে আত্মহারা, সবাই হাসছে, হাততালি দিচ্ছে, আর গলা ছেড়ে কোরাসে গান গাইছে। গান আর থামে না। একটার পর আর একটা গান তারা অবিশ্রান্ত গেয়েই চ'লেছে, অবিরাম অব্যাহত সঙ্গীত।

তারপর এক সময়ে শ্লেজ গাড়ীখানা দেখা গেল নামজাদা দর্জি'র দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জর্জ কার্ভার তখনো পর্য্যন্ত প্রাণপণে ছাত্রদের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। সবাই মিলে তাঁকে পাঁজাকোলা ক'রে উঁচুতে তুলে নিয়ে দোকান ঘরের মধ্যে ঢুকলো তারপর জর্জ কার্ভারকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে তারা তার গা থেকে জামা কাপড় একে একে সব খুলে নিল। চমৎকার একটা ধূসর রঙের প্যান্ট, তার সঙ্গে মানানসই কোট, সার্ট, টুপি, নেকটাই, দস্তানা এবং জুতো-মোজা পরিয়ে তাঁকে এমনভাবে ফিটফাট ক'রে সাজানো হ'ল যেন কার্ভার সম্পূর্ণ একজন নতুন মানুষে পরিবর্তিত হ'লেন। তারপর আবার তাঁকে আগের মতো তেমনিভাবে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে শ্লেজগাড়ীতে বসানো হ'ল। ছাত্ররা তাঁর চারধার ঘিরে গোল হ'য়ে ব'সে গান শুরু ক'রলো। গান, হাসি, হৈ-হল্লা সমানে চ'লতে লাগলো।

জর্জ কার্ভার ছাত্রদের কাছে যতবার যত প্রশ্ন করেন কেউই তার কোন জবাব দেয় না। তারা ইতিমধ্যে সবাই একসঙ্গে একটা নতুন কোরাস গান গাইতে শুরু ক'রেছে, গানটার নাম "জঙ্গলের ঘণ্টা"। তাদের আনন্দ উল্লাস আর গানের তাণ্ডবের মধ্যে জর্জ কার্ভারের দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠস্বর নিঃশেষে ডুবে গেল।

গাড়ী এবার গিয়ে অধ্যাপক উইলসনের বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালো। জর্জ কার্ভারকে সকলে মিলে নিয়ে গিয়ে যখন ড্রয়িং রুমের মাঝখানে দাঁড় করালো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক উইলসন এবং অধ্যাপক বাড। কলগুঞ্জনমুখরিত সেই ঘরের মধ্যে জর্জ কার্ভার সর্বপ্রথম যে মানুষটির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে

সমর্থ হ'লেন তিনি হ'চ্ছেন অধ্যাপক উইলসন। জর্জ তাঁকে ব'ললেন, "আপনি আমাকে আজ বিকেলে এখানে যে কাজ করার কথা ব'লে দিয়েছিলেন সে কাজের কি হবে?"

"কী বোকার মতো কথা ব'লছো, জর্জ? এখানে কোন কাজই নেই তোমার করার, যে কাজ তোমাকে ক'রতে ব'লেছিলুম তার চেয়ে অনেক বড়—বিরাট এক কাজের দায়িত্ব তোমাকে দেবার উদ্দেশ্যে পাকড়াও ক'রে তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হ'য়েছে। আমরা তোমাকে সেডার র‍্যাপিড্‌সে পাঠাবো ব'লে স্থির করেছি। সেখানে যে বিরাট শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'য়েছে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে তোমাকে আমাদের প্রতিনিধিরূপে সেখানে পাঠাবার প্রস্তাব গ্রহণ ক'রেছি। আইওয়া কৃষি কলেজ থেকে তুমি আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হ'য়েছ, "ধীর গম্ভীর কণ্ঠে অধ্যাপক উইলসন ব'ললেন।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জর্জ কার্ভার ব'ললেন, "কিন্তু এই গুরু দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা আমার কতখানি আছে। সেটাও তো একবার ভেবে দেখবেন।"

"ভেবে দেখেছি বৈকি জর্জ কার্ভার! তোমার চাইতে যোগ্য লোক আমাদের বিবেচনায় এখানে আর কেউ নেই।" অধ্যাপক উইলসন ব'ললেন তা ছাড়া আরও একটা কথা, যেহেতু এটা আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত সেই জন্যেও তোমাকে এটা মেনে নিতে হবে। এ সম্পর্কে তোমার কোন আপত্তিই আমরা শুনবো না জর্জ। এই নাও তোমার সেখানে যাবার ট্রেনের টিকিট, আর এই হ'চ্ছে তোমারই আঁকা সব ছবি। এই ছবিগুলি বাছাই ক'রেছেন অধ্যাপক বাড, আর তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য ক'রেছেন তাঁর শিল্পকন্যা মিস ট্রা বাড। বিশেষজ্ঞদের বিচারে এই ছবিগুলিই হ'চ্ছে তোমার শিল্পকৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আমরা নিজেরা গিয়ে তোমার কোয়ার্টার থেকে এগুলি নিয়ে এসেছি।"

অধ্যাপক উইলসনের মুখ থেকে এসব কথা শুনে জর্জ কার্ভার বিহ্বল ও হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইলেন, তাঁর মাথায় যে কিছু ঢুকেছে এমন মনে হ'ল না। তারপর কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন অধ্যাপক উইলসনের হাত থেকে জিনিষগুলি নেবার জন্য। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জর্জ কার্ভার ব'ললেন, "আজ আপনারা আমাকে যথেষ্টেরও বেশী অর্থ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু একদিন তো নিশ্চয়ই এই ঋণ আমার পরিশোধ ক'রতে হবে, তখন আমি টাকা পাবো কোথায়? কে আমাকে অত টাকা দেবে? আমি আপনাদের এ ঋণ থেকে মুক্ত হবার কোন উপায় তো দেখতে পাচ্ছি না।"

পরম স্নেহে অধ্যাপক উইলসন তাঁর নিজের ডান হাতখানা জর্জ কার্ভারের কৃশ কাঁধের উপর স্থাপন ক'রে ব'ললেন, "তুমি তোমার ঋণ ইতিমধ্যেই পরিশোধ ক'রেছ জর্জ, এখন আর তুমি ঋণী নও। তোমার গুণ-মুগ্ধ অধ্যাপক এবং ছাত্রবন্ধুরা মিলে নিজেদের সঞ্চিত তহবিল থেকে এই সামান্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ ক'রে এনেছেন। তোমাকে তাদের প্রতিনিধিরূপে শিল্প প্রদর্শনীতে পাঠাবার জন্য এই অর্থ গ্রহণে তোমার লজ্জার কোন কারণ নেই। তোমার যে অমূল্য বন্ধুত্ব লাভ করার পরম সৌভাগ্য আমাদের সকলের হ'য়েছে তার জন্য আমরা গর্বিত এবং নিজেদের আমরা ধন্য মনে করছি। তুমি আমাদের যে সুমহান গৌরবের অধিকারী ক'রেছ তার তুলনায় আমরা তোমার জন্য আজ সামান্য যা ক'রতে পেরেছি তা এতই নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর যে, সে কথা উল্লেখ ক'রে তুমি আর আমাদের লজ্জা দিয়ো না।"

ক্রমশঃ

পিছনের জানালায়

(বিশ্বেশ্বর দাস)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার পর মা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কোনদিনই......লোকসমক্ষে আত্ম-প্রকাশ করেন নি। লোকচক্ষুর অগোচরে অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান সেরে—নিজের ঘরটিতে এসে বসতেন। নাম জপ করতেন—সারাদিন ধরে। জপ সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি তণ্ডুলকণা......আলাদা করে রাখতেন পাশে। জপশেষে যে কটি তণ্ডুল জমতো—দিনান্তে তাই দিয়ে প্রস্তুত করতেন অন্ন। সেই অন্ন ভগবানকে নিবেদন করে—অতিথি অভ্যাগত কেউ থাকলে তাদের ভাগ করে দিয়ে নিজে গ্রহণ করতেন—এইভাবে একান্ত নির্জনে...সর্ব্বত্যাগিনী যোগিনীর মত মা আমার শেষ জীবনের দিনগুলি—বলতে বলতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠবিশ্বেশ্বর দাস (ওরফে বিশুবাবু) মাতৃহারা শিশুটির মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। আমরা তো অবাক। ধারা বিগলিত গণ্ডগলদশ্রু নয়ন রোদনপরায়ন সত্তর অতিক্রান্ত শিশুটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। একি আবেগ—কি অতি কি অসীম শ্রদ্ধার স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশ। পরম বৈষ্ণব ভিন্ন এই প্রেমস্ফূর্ত্তি সম্ভব নয়। জীবন সায়াহ্নের—এমন বর্ণাঢ্য......রূপলাবণ্য কোন দিন তো চোখে পড়েনি।

তখন দুপুর বেলা, বাইরের ছোট ঘরখানিতে বিশুবাবু একটি ছেলেকে সামনে বসিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্য রিপোর্ট লিখছিলেন। উনি বহুদিন থেকেই ঐ পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা—মাঝে মাঝে প্রবন্ধও লিখে থাকেন। মৃণালকান্তি ঘোষের সঙ্গে ওঁর হৃদ্যতা রয়েছে—শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রস আস্বাদনে দুজনে (তদগত চিত্ত) একই পথের পথিক গোবিন্দ দাসের কড়চা নিয়ে একদা যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল—বিশ্বেশ্বর দাস তাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। পুরাতন পত্রিকার পাতায় তার বিবরণ আছে। যাই হোক রিপোর্ট লেখা শেষ হলে আমরা প্রার্থনা জানালাম—ইচ্ছা আছে চৈতন্যচরিতামৃত পড়ব...আপনার বইখানা যদি একবার দেন—বললেন, একখানা বই নয়—অনেকগুলো চৈতন্যচরিতামৃত আমার কাছে আছে—কিন্তু পাঠক কে?

বললাম, পাঠক আমি—নিজে।

উনি বললেন না-না, সে কথা বলছি না—মানে শুধু বই পড়ে......চৈতন্যচরিতামৃত বোঝা কঠিন। একজন ব্যাখ্যাকার না থাকলে রস বা অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। পাঠক অর্থে আমি তাঁকেই বোঝাচ্ছি—যিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত মানুষ। আমি নিজে পড়েছি বহুবার, বুঝিনি। ব্যাখ্যাকাররা বুঝিয়ে দিয়েছেন—। তাও সুপণ্ডিত না হলে তত্ত্ব মীমাংসা সহজ হয় না—রস তত্ত্ব বোধ না হলে পাঠ তো পণ্ডশ্রম।

বললাম, আপনি কিছু বলুন—

আমি। না-না, আমি কি বলব—কি জানি। যাঁর কৃপায় মূকং করোতি বাচালাং-পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং—একমাত্র তাঁর দয়া না হলে অন্তরে কৃষ্ণরূপ স্ফূর্ত্তি হয় না—কৃষ্ণলীলা হৃদয়ঙ্গম হয় না। একমাত্র তিনিই রসস্বরূপ।

আমরা ধরলাম—না কিছু বলুন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব অন্তর্ধান করার পর দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কতদিন জীবিত ছিলেন—কিভাবে তাঁর দিন কাটতো—

চক্ষু বন্ধ করে চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিলেন বিশ্বেশ্বরবাবু—তার পর যা বললেন—সে বর্ণনা প্রারম্ভেই দিয়েছি।

এই পরম বৈষ্ণব মূর্ত্তি কিন্তু বাহ্য রূপ নয়, এ হল

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৭ ॥

২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টার সময় বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন হল। আমি যেখানে বসেছিলাম তার ঠিক সামনে ... ... মশায় আসন গ্রহণ করেন, প্রাতঃকালেই তিনি রীতি মত পান করে এসেছিলেন এবং চারদিকে সৌরভ বিতরণ করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী সত্যদেব এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন। বসেই মদের গন্ধে বিরক্ত হয়ে "দারু পিয়া" "দারু পিয়া" বলতে বলতে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

আমার নিকটেই কর্ণেল ওয়েজ উড বসেছিলেন। কতকগুলি প্রস্তাব আলোচনার পর লালা লাজপত রায় ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে উঠলেন। ব্রিটিশ পণ্য দ্রব্যের বয়কটের প্রস্তাব উপস্থিত হলেই কর্ণেল ওয়েজউডের মুখ রাগে রক্তিম বর্ণ হয়ে উঠল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন যে এতে ভারতবর্ষ,—ব্রিটিশ লেবার পার্টীর সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত হবে।

এদিনকার আলোচনা সভায় পণ্ডিত মদনমোহন উপস্থিত হতে পারেন নি, হঠাৎ তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই তাঁর সুপরিচিত মূর্তি আজকের অধিবেশনে দেখা গেল না।

আরও কয়েকটি প্রস্তাব আলোচনাতে কংগ্রেসে উপস্থিত করার সুপারিশ করা হল।

॥ ৮ ॥

২৮শে ডিসেম্বর নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই প্যাণ্ডেল প্রথম দিনের মত পূর্ণ হয়েছিল। এবারে প্রতিনিধির সংখ্যা—অমৃতসর কংগ্রেসের প্রতিনিধির সংখ্যার মত খুব বেশী ছিল প্রতিনিধির টিকিট বিক্রয় হয়েছিল ১৬ হাজার। এর উপর দর্শকের সংখ্যাও কম ছিল না। প্যাণ্ডেলের ভিতরে এত লোকের স্থান হওয়া অসম্ভব হয়েছিল, বহু দর্শক টিকিট না পেয়ে—প্যাণ্ডেলের বাইরে জমায়েত হয়েছিল, তখন পর্য্যন্ত প্রতিনিধির সংখ্যা তিন হাজারে সীমাবদ্ধ হয়।

নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বদিনের মত শোভাযাত্রা সহ সভাপতি মশায় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। সকলে তাঁকে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা করল।

একটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কাজ আরম্ভ হল।

প্রথমেই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের ক্রীড (মুখ্যনীতি পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায় দ্বারা স্বরাজ্য অর্জন করা।(১)

প্রস্তাব উপস্থিত করে মহাত্মা প্রথমে হিন্দীতে কংগ্রেসের মূলনীতি পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন বর্তমান ক্রীড অনুসারে আইন সঙ্গত উপায়ে অবিচারের প্রতিকার দাবি করার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সবই সাম্প্রতিক আন্দোলনে—দেখা গেল যে গভর্ণমেণ্ট খিলাফৎ বা পাঞ্জাবের অবিচারের কোন প্রতিকারই করল না। আইন সঙ্গত উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে ভারত এখন বিনা রক্তপাতে অত্যাচারের প্রতিকারের অন্য পন্থা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক। উত্থাপিত প্রস্তাবের শব্দ যোজনা এমন ভাবে করা হয়েছে যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

সঙ্গে যুক্ত থেকে অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে স্বরাজ্য অর্জন করা যেতে পারে অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংযুক্ত থেকে অথবা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে স্বরাজ অর্জন নির্ভর করছে পাঞ্জাব ও মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার প্রতিকারের ব্যবস্থার উপর। প্রস্তাবের ভাষা এমন ব্যাপক যাতে উভয় মতাবলম্বীর পক্ষেই তা গ্রহণ যোগ্য হবে।

তারপর মহাত্মাজী ইংরাজিতে অন্যান্য কথার পর বললেন যে তাঁর মতে সর্ব অবস্থাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার চিন্তা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে,—অপমান জনক। ভারতবাসীরা যে সকল অমানুষিক, অত্যাচার দ্বারা প্রপীড়িত হচ্ছে তা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতিকার করতে শুধু অস্বীকারই করে নি তারা তাদের ক্রটী বিচ্যুতি পর্য্যন্ত স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। এই মনোভাব বজায় থাকলে কংগ্রেসের পক্ষে ব্রিটিশের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করার কথা বলা অসম্ভব। ভারতীয়দের প্রতি যদি তারা সুবিচার না করে তা হলে তারা ব্রিটিশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার কথা সারা বিশ্বে ঘোষণা করবে। যদি ভারতের অগ্রগতির জন্য ব্রিটিশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক হয়তো হলে তারা তা নষ্ট করতে চায় না কিন্তু এই সংযোগ যদি ভারতের আত্ম মর্য্যাদার পরিপন্থী হয় তা হলে তাদের কর্তব্য হবে এই বন্ধন ছিন্ন করা। যাঁরা ব্রিটিশের সঙ্গে সংযোগ রাখতে চান এবং যাঁরা তা চান না প্রস্তাবিত ক্রীড গৃহীত হলে কংগ্রেসে উভয় দলেরই স্থান থাকবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি রেভারেণ্ড এনড্রুস সাহেবের নামোল্লেখ করলেন। সাহেবের মত এই যে ভারতের পক্ষে ব্রিটিশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার সমস্ত আশাই নষ্ট হয়েছে এবং ভারতকে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন হতে হবে। অপর পক্ষে তিনি তাঁর ও তাঁর ভাই সৌকত আলীর দৃষ্টান্ত দিলেন। প্রস্তাবিত ক্রীড গৃহীত হলে কংগ্রেসে উভয় মতাবলম্বীরই স্থান হবে।

এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলার বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচনের সময় মতান্তরের ফলে উভয় দলের মধ্যে মারামারির উল্লেখ করে বললেন যে তাঁর চেষ্টায় উভয় দলের মধ্যে বিরোধের মিমাংসা হয়েছে।

পরিশেষে তিনি বললেন যে বর্তমান গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ করতে হবে অস্ত্রদ্বারা নয়—আত্মার বল দ্বারা। এই বল সাধুদেরই একচেটিয়া নয়। এ বল প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে।

লালা লাজপত রায় এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে ইংরাজিতে ভাষণ দিতে আরম্ভ করা মাত্র "হিন্দী "হিন্দী" ধ্বনি শোনা গেল। লালাজী তা কর্ণপাত না করে ইংরাজিতেই তাঁর বক্তব্য শোনালেন।

তিনি বললেন যে প্রস্তাবটি কেবল দেশে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয় নি—দেশের ভবিষ্যতের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের বর্তমান ক্রীড কিভাবে রচিত হয়েছিল তার ইতিহাস তিনি বিবৃত করলেন। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যাওয়ার পর কংগ্রেসের তৎকালীন সংখ্যা গরিষ্ঠ মডারেট কংগ্রেস নেতারা ১৯০৮ সালের প্রথম ভাগে এলাহাবাদে একটি কনভেনসানে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের সংবিধান ও ক্রীড প্রস্তুত করেন। তিনিও ঐ কনভেনসনে উপস্থিত ছিলেন এবং এই ক্রীড গ্রহণের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বলেছিলেন যদি কেউ দেশপ্রেমিক পূতচরিত্র শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মত,—দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে; তাকে কংগ্রেস থেকে বের করে দেবার অধিকার কারুরই নেই। সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করে এলাহাবাদে নূতন ক্রীড গৃহীত হয়।

তিনি বললেন যে এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর মতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ প্রস্তাবের স্বাভাবিক পরিণতি হল এই ক্রীডের পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত ক্রীডের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন সাধারণকে এবং ব্রিটিশ গর্ভণমেণ্টকে নোটীশ দেওয়া। আমাদের ব্রিটিশ কমন ওয়েলথের ভিতর থাকা বা না থাকার প্রশ্ন অন্য কারও নির্দেশের উপর নির্ভর করবে না। এই সভায় ভারতের যে কয়জন বন্ধু বৃটেন থেকে এই কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছেন তাঁদের তিনি এই বার্তা

বৃটেনের জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন।

লালাজী তারপর বললেন ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরাজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিবরণে পরিপূর্ণ, ভারতবাসীরা ইংরাজের উপর সকল আস্থাই হারিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পার্লামেন্টে লর্ড মেলবোর্ণের বক্তৃতা ও লর্ড ডালহৌসির কার্য্যাবলীর উল্লেখ করলেন। লর্ড কর্জন ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাকে আলঙ্কারিক শব্দ বিন্যাস বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারপর তিনি বর্তমান প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের ভারতীয় মুসলমানদের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের উদাহরণ দিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি বললেন যে যে বৃটিশ সাম্রাজ্য তাঁকে নাগরিক অধিকার ও সুযোগ দিতে সম্মত নয় তার অংশীদার হয়ে থাকতে তিনি ইচ্ছুক নন।

তার পর তিনি প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত স্বরাজ্য শব্দের উল্লেখ করে বললেন যে এর অর্থ dubious ফলে এই শব্দের অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বরাজ্য অথবা ব্রিটিশ সম্পর্ক শূণ্য পূর্ণ স্বরাজ্য উভয়ই হয়।

পরিশেষে তিনি বললেন যে যদি কোন ইংরাজ ব্যক্তিগত ভাবে অথবা ইংলণ্ডের কোন দল আমাদের স্বরাজ অর্জনে সহায়তা করে তা হলে সেটা তাঁদেরই গৌরব। আমারা ইংরাজ ভদ্রলোকের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি কিন্তু ব্রিটিশ রাজনৈতিকের বাক্যে কোন আস্থা স্থাপন করতে পারি না।

লালা লাজপত রায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করে বসার পর শ্রীমহম্মদ আলী জিন্না এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠলেন। তিনি বললেন যে মিষ্টার গান্ধী যে প্রস্তাব পেস করেছেন তাতে দুটো অংশ আছে। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভারতের স্বরাজ অর্জন এবং এটা নিঃসন্দেহ যে এই প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই 'না' 'না' বলতে লাগল। এর উত্তরে জিন্না সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "তা হলে কি এখানে ব্রিটিশের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা হয়েছে? তাতেই অনেকে না'-না' করে উঠলেন, জিন্না সাহেব বললেন এতে ব্রিটেনের সঙ্গে যোগ সূত্র বজায় রাখা হয় নি। কিন্তু মিষ্টার গান্ধীকে মিষ্টার না বলে মহাত্মা বলার জন্য চারিদিকে অনুরোধ শোনা গেল, ও তখন তা স্বীকার করে তিনি বললেন যে মহাত্মা গান্ধী এবং লালা লজপত রায় তাঁদের বক্তৃতায় বলেছেন যে প্রস্তাবের দুই অর্থই হতে পারে—ব্রিটিশের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা অথবা ছিন্ন করা। তিনি জানালেন যে লালাজীর গভর্ণমেন্টের সমালোচনার সঙ্গে তিনি একমত। ১৯০৮ সালের ক্রীড অবলম্বন সম্বন্ধে বললেন যে সেই সময় স্বাধীনতা ঘোষণা করার ইচ্ছা বা যোগ্যতা দেশের ছিল না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে আমাদের কি এই ঘোষণা করার উপায় আছে? শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্তর এল "নিশ্চয়ই আছে"। যে উপায় মিস্টার গান্ধী (পুনরায় আপত্তি হতে তিনি সংশোধন করে বললেন) যে উপায় মহাত্মা গান্ধী নির্দেশ দিয়েছেন তা হল বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন যে ভাওলেন্স (হিংসাত্মক কার্য্য) ছাড়া কখনই স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। এই উক্তিতে সভায় একই সঙ্গে 'হিয়ার' 'হিয়ার' এবং 'নো' 'নো' শোনা যেতে লাগল। যদি কেউ মনে করেন যে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে তা হলে চরম ভুল করবেন। তিনি বললেন যে এই প্রস্তাবে ঠিক পন্থা অবলম্বন করা হয় নি। জাতীয় কংগ্রেস কেন কোন প্রতিষ্ঠানই এমন ক্রীড গ্রহণ করতে পারে না, যা নোটীশ বলে গণ্য হবে। উদ্দেশ্য যদি এই হয় তা হলে ক্রীডের পরিবর্তন না করে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। এই ক্রীড গৃহীত হওয়ার পর উভয় দলের (যারা ব্রিটিশের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা এবং যারা তা ছিন্ন করতে চায়) পক্ষে একই প্ল্যাটফরমে যোগ দেওয়া কি সম্ভব হবে? ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এবং ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের সম্বন্ধে লালা লাজপত রায়ের বর্ণনা সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে মহাত্মা গান্ধী এ পর্য্যন্ত তাঁর মন স্থির করতে পারেন নি।

জিন্না সাহেব তারপর জানালেন যে যদি—কংগ্রেস

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে নোটিশ দিতেই চায় তাতে তাঁর আপত্তি নেই। তাহলে জনসাধারণকে জানান প্রয়োজন যে, যে মুহূর্তে এই প্রস্তাব পাশ করা হবে সেই মুহূর্তে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হবে কারণ মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে ধ্বংস করতে হবে। তিনি জানতে চাইলেন—কি করে তা সম্ভব হবে। তিনি ত নিজেকে হতাশ মনে করছেন। (এতে মন্তব্য শোনা গেল "দাস মনোভাব")

জিন্না সাহেব জানতে চাইলেন এই মূলনীতি—পরিবর্তনের হেতু কি। বিষয় নির্বাচনী সভায় এর একমাত্র কারণ মিষ্টার মহম্মদ আলী (চারদিকে 'মৌলানা' বলার জন্য চিৎকার হতে লাগল।) তিনি তাতে কর্ণপাত না করে পুনরায় মিষ্টার মহম্মদ আলী বলায় প্রবলতর ভাবে "মৌলানা মহম্মদ আলী" "মৌলানা মহম্মদ আলী' ধ্বনি উঠতে লাগল। তখন জিন্না সাহেব বললেন যেভাবে উচিত মনে করেন সেইভাবে যদি কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার স্বাধীনতা না দেওয়া হয় তা হলে যে স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের উদ্যম সেই স্বাধীনতা থেকেই তাঁকে বঞ্চিত করা হবে।

তিনি অবিচলিত থেকে পুনরায় মিষ্টার মহম্মদ আলী বলাতে পুনরায় "মৌলানা মহম্মদ আলী' ধ্বনি উঠল কিন্তু তিনি নতি স্বীকার করলেন না। তিনি বললেন যে মিষ্টার মহম্মদ আলী বলেছেন যে বর্তমান ক্রীড সই করতে অনেকের আপত্তি থাকায় ক্রীডের পরিবর্তন আবশ্যক।

মহম্মদ আলী এর উত্তরে বললেন এই একমাত্র কারণ তিনি দেখান নি।

জিন্না বললেন যে এই একমাত্র কারণই তিনি বুঝে ছলেন।

জিন্না সাহেব বলতে লাগলেন যে প্রস্তাবিত ক্রীড গ্রহণের অর্থই হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা। তারপর এর উপায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে গভর্ণমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করার পক্ষে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি উৎকৃষ্ট অস্ত্র বটে কিন্তু এই অস্ত্র দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা যাবে না। আমার সাহসের অভাব, আমাকে দুর্বলচিত্ত ইত্যাদি বলা হয়েছে। এ সকল মন্তব্যের উত্তর দিতে হলে আমাকে বলতে হবে এগুলি মন্তব্যকারীদের হঠকারিতা, কিন্তু এই সকল উক্তি প্রত্যুক্তি আমাদের কোন কাজেই লাগবে না।

পরিশেষে তিনি বললেন যে সভাপতিমহাশয়ের মতে দেশের ভাগ্য দুজনের উপর নির্ভর করছে, তার একজন হলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি মহাত্মার নিকট তাঁর গতি সংযত করার আবেদন করে আসন গ্রহণ করলেন।

একজন মন্তব্য করল রাজনৈতিক ভণ্ড political imposter.

জিন্না সাহেব বক্তৃতার সময় পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত, হচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে এই কংগ্রেসেই জিন্নার শেষ যোগদান। অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর অন্যান্য অনেক নেতার সহিত তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন।

এরপর বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে অন্যান্য কথার পরে বললেন যে প্রস্তাবে স্বরাজ্য শব্দের পূর্বে গণতান্ত্রিক (democratic) শব্দ যোগ করলে ভাল হত কারণ তাহলে কি রকম স্বরাজ্য আমাদের কাম্য তার নির্দেশ থাকত। তিনি বললেন যে কংগ্রেসের বর্তমান ক্রীড কালোপযোগী নয়। ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।

এরপর কর্ণেল ওয়েজউড তীব্র ভাষায় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বললেন। তিনি জানালেন যে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের ন্যায় ভারতের বন্ধুদের পক্ষে ভারতের অনুকূলে কাজ করা কঠিন ও অসম্ভব হবে। তারপর তিনি বললেন, যে স্বরাজ অর্জন হবে তা যেন গণতান্ত্রিক হয় এবং তাতে যেন সকলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। তিনি বিভিন্ন দলের প্রতি সুবিচারের উপর জোর দিলেন। এই উপলক্ষে তিনি জানালেন যে আজকের কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে মিষ্টার জিন্নার প্রতি এবং গত কল্যকার বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশনে পণ্ডিত মালব্য এবং স্যর আশুতোষ চৌধুরীর প্রতি অভদ্র আচরণে তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছেন। বিরোধী মতাবলম্বীর প্রতি ভদ্র আচরণ করা কর্তব্য। এটাই হল গণতন্ত্রের মূলসূত্র।

ক্রমশঃ

দীপান্বিতার ইতিকথা

ভাগবতদাস বরাট

দীপান্বিতা ভারতের অন্যতম জাতীয় উৎসব। অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ দীপ দান। আলোকসজ্জায় বাড়ী ঘর সাজান হয় বলেই এর নাম দীপাবলী বা দেওয়ালি।

এই উৎসব কালীপূজায় অনুষ্ঠিত হয়। সে কারণে হয়ত অনেকের ধারণা কালীপূজা উপলক্ষে দীপান্বিতার দীপসজ্জা। কিন্তু তা নয়।

কালীপূজা আর্য্যোত্তর সমাজের পূজা। পরে আর্য্যরা তা গ্রহণ করে নবরূপ দান করেছেন। কিন্তু কখন থেকে যে এই পূজার সূত্রপাত তার কোন হদিস নেই। কারো মতে ষোড়শ শতক হতে কালীপূজা চালু হয়েছে, আবার কারো মতে একাদশ শতকে এই পূজার প্রবর্ত্তন। সে যাই হোক কালীপূজা কিন্তু সর্ব্ব ভারতীয় উৎসব নয়। অথচ দীপান্বিতা ভারতের উত্তরে নেপাল হতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-খণ্ডে প্রবর্ত্তিত।

আমাদের দেশে যে কালীপূজার প্রচলন নেই, তা নয়। তবে আসামে ইহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মিথিলাতে এর অনুষ্ঠান কথা শোনা যায়। সেখানে ঐদিনে লক্ষ্মীপূজারও প্রচলন আছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং সৌরাষ্ট্রেও শক্তিপূজা চালু আছে। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য ভারতে লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। মহীশূর, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের অধিবাসীরা কৃষ্ণভক্ত। হায়দ্রাবাদে শ্রীকৃষ্ণ পূজা এবং বলিরাজের পূজা— এই দুই পূজাই প্রচলিত। যাক, এখন আলোচনায় আসা যাক।

দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশের অধিবাসীরা দেওয়ালি দিনে দুর্গাপূজার বিজয়ার মত আত্মীয় স্বজন-ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আলিঙ্গন ও প্রীতি বিনিময় ক'রে থাকে। নব দম্পতিকে উপঢৌকন দেয়। আবার ঐদিন পুরাণ অনুযায়ী জুয়া খেলার সূচিত সময় বলে, অনেকে সারারাত না ঘুমিয়ে জুয়া খেলায় মত্ত হয় কথিত আছে হর-পার্ব্বতী এই রাতে জুয়া খেলায় মেতে ছিলেন। এবং সেই সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশও সারারাত জুয়া খেলায় কাটিয়ে ছিলেন।

দীপান্বিতার উৎসবকে বিজয়োৎসব বলা হয়। বিভিন্ন উপকথায় ও লোকগাথায় এই বিজয়োৎসবের উল্লেখ আছে। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী যখন ঘরে ফিরত তখন তার সম্মান প্রদর্শনে প্রদীপ হাতে পুরনারীরা ছুটে আসত। এবং প্রদীপের আলোয় তার মুখ উজ্জ্বল করে তুলত।

এই দেওয়ালি উৎসবকে কেন্দ্র করে পূর্ব্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে একটি পৌরানিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই যে পুরাকালে মহাবলি নামে এক প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। তিনি দৈত্যদের রাজা হলেও দাতা ছিলেন। সমস্ত দেব দেবী তাঁকে ভয় করতেন। একদিন দেবতারা তাঁর উচ্ছেদ মানসে বিষ্ণুর কাছে সমবেত হয়ে আবেদন জানালেন। বিষ্ণু তখন বামন বেশে মহারাজ বলির কাছে হাজির হলেন। বলি সেই দিন কল্পতরু। অর্থাৎ তাঁর কাছে যে যা চাইবে তাকে তিনি তাই দিবেন। বামন বেশী বিষ্ণু এসে তাঁর কাছে মাত্রতিন পা ভূমি চাইলেন। দৈত্যরাজ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মাত্র তিন পা ভূমি নিয়ে কি হবে? বামন বললেন, প্রয়োজনের অধিক আমি চাই না। পরে দরকার হলে আরো কিছু চেয়ে নেবো। বিষ্ণুর ছলনা বলি বুঝতে পারলেন না। পূর্ব্বাপর আত্মাভিমানানুযায়ী তিন পা ভূমি গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

অন্য মতে বলি নিজেকে দানী ভেবে খুবই গর্ব্ববোধ করতেন। তাই তার দর্প চূর্ণ করার অভিপ্রায়ে বিষ্ণু বামন বেশে এসে তিন পা ভূমি চেয়েছিলেন। যাক সে কথা। তিন পা ভূমি গ্রহণের অনুমতি পেয়ে বিষ্ণু নিজ মূর্ত্তি ধারণ করলেন।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই তিন রূপ একত্রে ধারণ করায় সকলে বিস্মিত হয়ে আরাধনায় রত হলেন। কিন্তু বিষ্ণু অটল, অনড়। প্রথম পা দিয়ে সমস্ত মর্ত্ত ভূমি গ্রহণ করলেন। স্বর্গরাজ্য নিলেন দ্বিতীয় পায়ে। কিন্তু তৃতীয় পা কোথায় রাখবেন? অন্য কোন উপায় না দেখে বলি সেই পা স্বীয় মস্তকে রাখার প্রস্তাব করলেন। বিষ্ণু এই সুযোগের প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি পায়ের চাপে বলিকে পাতালে প্রেরণ করলেন।

পাতালে গিয়ে বলি নারায়ণের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। তাতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে শুধু অমরত্বই প্রদান করেন নি, বৎসরান্তে একদিন স্বীয় রাজ্যে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই দিনটি হল এই দিন, যে দিন দেওয়ালির দীপ জ্বলে ওঠে।

দানবীয় বলি ছিলেন পৃথিবীর ও মর্ত্তের রাজা। মর্ত্তবাসীরা তাঁর সম্বর্দ্ধনায় তাই রাতে আলো জ্বেলে দিনটিকে স্মরণ করে।

উত্তর ভারতে যে দেওয়ালি উৎসব পালিত হয় তার প্রবর্ত্তক বলিরাজ নন, নরকাসুর। পৌরাণিক কাহিনী হতে জানা যায় যে উক্ত নরকাসুরের নিবাস ছিল ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে। অত্যাচারী নরকাসুরের অত্যাচারে স্বর্গের ও মর্ত্তের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা তার প্রতিকার কল্পে দিবারাত্রি নারায়ণের স্তব করেন। দানব দমনকারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে নরকাসুরের রাজ্যে গিয়ে হাজির হলেন।

প্রথমে অতিথি আপ্যায়ন। তারপর আলাপ আলোচনা ও যুক্তি তর্ক সুরু হল। তর্ক বিবাদে, বিবাদ গালমন্দে এবং গালিগালাজ যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করল। যুদ্ধে নরকাসুর নিহত হল। আনন্দের আতিশয্যে ঘরে ঘরে বিজয়ীর উদ্দেশ্যে ও তাঁকে বরণ করার অভিপ্রায়ে আলো জ্বলে উঠল।

নরকাসুরের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ষোলশত অসহায়া বন্দিনী মুক্তি পেল। আর সুস্থির হলেন অগনিত মুনি ও দেবতা। নরকাসুরের জননী পুত্রের মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত হলেন এবং ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর দুঃখ দূর হল যখন তিনি জানলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই হত্যাকারী। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাতর নিবেদন করলেন যে এমন একটা কিছু করা হোক যাতে তাঁর পুত্রের মৃত্যুস্মৃতি বজায় থাকে। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। নরকাচতুর্দ্দশী নামে মৃত্যুদিনটি অভিহিত হল। এবং মর্ত্তবাসীরা সেই থেকে ঐ দিনটি স্মরণ রাখার অভিপ্রায়ে আলোক উৎসব পালন করে।

রামায়ণেও দেওয়ালি উৎসবের উল্লেখ আছে। অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্র যেদিন রাবন বধ করেন সেদিন ছিল বিজয়ার দিন। তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের দিন সকল রাজ্যবাসী বিজয়ী রামচন্দ্রকে আলো জেলে বরণ করেছিলেন এবং সারা রাজ্য আলোকমালায় সাজান হয়েছিল। অন্যমতে, মহামায়া দনুজ দলনী দুর্গা যেদিন অসুর বধ করেন সেদিন ছিল কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। ঐদিন অসুরের পতনের পর মর্ত্তবাসী জনমানব আনন্দের আতিশয্যে দেবীর স্তবস্তুতি করে সমস্ত গৃহকোণ আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

এই সবই হল পুরাণাশ্রিত কাহিনী। ঐতিহাসিকরা কিন্তু অন্য মত পোষণ করেন।

কারো মতে রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে শকদের অত্যাচারে রাজা ও প্রজা উভয়েরই শান্তি বিঘ্নিত হয়েছিল। অবশেষে রাজা বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শকদের পরাজিত করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তখন প্রজারা তাঁকে শকারী উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর অভ্যর্থনায় প্রদীপ জালিয়ে সমগ্র রাজ্য আলোয় সমুজ্জল করে তুলেছিল।

পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবে যে আলোক উৎসব পালন করা হয় তার কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ এই মত পোষণ করেন যে শিখদের ষষ্টগুরু হরগোবিন্দ বাহান্নজন অনুগামী সহ মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় স্বদেশবাসী অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে গুরু সম্বর্দ্ধনা করেছিল। পাঞ্জাবে দীপান্বিতা উৎসব সেই কারণে আজো প্রতিপালিত হয়।

আজ দীপাবলী সর্ব্বস্তরের উৎসবে পরিণত হয়েছে। ধর্ম্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলেই এই উৎসব সাধ্যমত পালন করে।

এদেশের অনেকের অভিমত এই যে কালীপূজায় দিবাভাগে যে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, সেই পার্ব্বণের অঙ্গস্বরূপ পিতৃপুরুষদের স্মরণ করে ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলে ওঠে। স্বর্গতঃ জনগণের বংশধররা তাঁদের সম্বর্দ্ধনায় আলোক মালায় ঘর সাজায়। এবং তাদের পূর্ব্বপুরুষরা যে পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করছেন তা ভেবে তারা উল্লাস প্রকাশ করে থাকে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এই সব কোন কথাই মনঃপুত হবে না বলে মনে করি। বৈজ্ঞানিকদের মত কিন্তু ভিন্নতর। শুধু বৈজ্ঞানিকরা কেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চোখের সামনে যা হতে দেখবেন তাকেই তাঁরা সত্য বলে মেনে নেবেন। তাঁদের মতে আলো পোকাদের ধ্বংসের মানসে দীপান্বিতা উৎসবের উদ্‌যাপন।

এই সময় সবুজ রঙের এক প্রকার উড়ন্ত ক্ষুদ্র পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে। তারা আলো দেখলেই সেখানে ভীড় জমিয়ে গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। আলোর কাছে জড় হয় বলেই এদের নাম আলোপোকা। দেওয়ালি উৎসবে জ্বলন্ত আলোর দলবদ্ধ হয়ে এরা পুড়ে মরে। তার পর থেকেই এদের অত্যাচার কমে যায়। হয়ত এই আলোপোকাদের ধ্বংসের মানসেই দীপান্বিতা উৎসবের সূত্রপাত হয়েছিল।

যাক্ সে কথা। দেওয়ালি উৎসব যে কারণেই হোক না কেন, ইহা যে উল্লাস প্রকাশক বিজয়োৎসব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অমাবস্যার রাত্রি। ঘন ঘোর অন্ধকার। সেই আঁধার রাতে প্রতি বাড়ীর ছাদের কার্নিশ, প্রাচীরের শীর্ষদেশ, রক গেট ইত্যাদি বহির্বাড়ীর সর্ব্বত্র দীপমালায় সাজান হয়। এই প্রদীপন প্রদর্শনী অতীব মনোরম ও তাৎপর্য্যপূর্ণ।

আঁধারের প্রত্যাশী কেউই নয়। শোক দুঃখে জর্জ্জরিত, পরাজয়ের গ্লানিতে মুমূর্ষু, মানব মন ভাবে বুঝি আঁধারে ডুবে গেলাম। জীবনটা ব্যর্থ হল। বেঁচে থাকার স্বাদ নেই। সেই অবস্থায় হতাশায় ভেঙ্গে না পড়ে যদি সে তার অন্তরের মণি কোঠায় প্রেমের দীপ জ্বেলে অন্তর দেবতার খোঁজ করে তাহলে দেওয়ালি উৎসবের আলোকসজ্জিত গৃহাঙ্গনের মত মনোরম হবে তার জীবন। ব্যর্থ জীবন সার্থকতা লাভ করবে।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সমস্ত রাত ভাল ঘুম হয় না। ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাইরের ঘরের পাশে, একটা ছোট্ট ঘরে তার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এ ঘরে সে একলা। একটা তক্তাপোষ—একটি টেবিল আর একটা চেয়ার। টেবিলের ওপর তার নিজের কয়েকখানা বই। এক গেলাস জল, একটা বই দিয়ে ঢাকা। বোধহয় মিঠুয়াই রেখে গেছে। ঘরের একপাশে মেজের ওপর টিপ্ টিপ্ করে লণ্ঠন জ্বলছে। আলো অন্ধকারের মাঝে, মশারীটা লাগছে অদ্ভুত। এখানে এখনও তীব্র শীত। মাঘ মাসের আজ মাত্র আট তারিখ। কথায় বলে, মাঘের শীতে মোষের সিং কাঁপে। তা কথাটা মিথ্যে নয়। অভয় ভাবে এখানে শীতটা খুব। এটা উত্তর বাংলা। পশ্চিম বাংলার মাঘ মাসে এতটা শীত লাগে না। মাঝে মাঝে বেশ গরম বোধ হয়। তখন লেপ গায়ে রাখা যায় না। কিন্তু এখানে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত লেপ গায়ে দিতে হয়। ঘুম আর আসে না। ওদিকে ঠাকুর চাকরদের ঘর। ওপরে জ্যেঠাবাবু জ্যেঠাইমারা থাকেন।

অভয় বুঝতে পারছে, বড়লোক জ্যেঠাবাবু করুণা আর দয়া করেই তাকে স্থান দিয়েছেন। এখানে তার কোনও দাবী দাওয়া নেই। এখানকার বাড়ীতে, সে মাত্র দয়াস্বরূপ স্থান পেয়েছে। অন্য কিছু না। কোন কিছুতে তার নিজস্ব মতামত দেবার কোন অধিকারই নেই।

চোখ বুজে থাকে অভয়। রাত তখন অনেক। অভয় ভাবে এখন রাত কটা। বোধ হয় রাত দুটো। তার মন চলে যায় বাবার কাছে। সেই আজিমগঞ্জ ষ্টেসনের থার্ডক্লাস যাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট, চারদিক খোলা বিশ্রামাগার নামক স্থানে, যেখানে তার বৃদ্ধ পিতা অনেকগুলি ছোট বড় গাঁটরি আগলে বসে আছেন। হয়ত, তামাক টানতে টানতে ভাবছেন অভয়ের কথা। স্বল্প অন্ধকার ঘরে শুয়ে, সমস্তই যেন দেখতে পায় অভয়। তার বৃদ্ধ পিতার কৃশ মুখখানি তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। যাবার আগে, বাবার কথাগুলো মনে পড়ে। সৎপথে থেকে, মানুষ হবার চেষ্টা কর। লেখাপড়া শেখো—কিন্তু সব সময় মনে রাখবে, তুমি গরিবের ছেলে। তোমার মুখের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। অভয়ের চোখের ওপর ভেসে ওঠে বাবা মার মুখ, গীতা, খোকনের মুখ। উঃ কতদিন পর, আবার সে দেশে যাবে - ওদের দেখবে।

জানুয়ারী মাস আসতেই, অভয়কে ভর্ত্তি করে দেওয়া হ'ল জেলা স্কুলে। ইংরাজী আর অংকের পরীক্ষা নেওয়া হল। বেশ প্রশংসার সঙ্গেই উৎরে গেল অভয়। নবম শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হ'ল অভয়।

অভয় অবাক হয়ে যায় স্কুল দেখে। হবে না কেন? এটা যে খোদ গভর্ণমেণ্টের স্কুল। কি সুন্দর বাড়ী, মস্ত বড় পাকা বাড়ী। চারদিকে শুধু ফুলের বাগান।

অন্য ছেলেরা তার দিকে তাকায়। অভয়ও এদিক ওদিক দেখতে থাকে। ক্লাসের ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কত ছবি টাঙ্গান।

ক্লাসের পড়া সুরু হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। একঘণ্টা চলে যাবার পর একটা চাপা গুঞ্জন সুরু হয়। বাব্বাঃ এবার আসবেন আদিত্যবাবু। ইংরাজী গ্রামারের ক্লাস। না পারলে যা হবে। অভয় বেশ কৌতুহলী

হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘর নিস্তব্ধ। ক্লাসের ক্যাপটেন ব্রজরাখাল। ব্রজরাখালের বয়স হয়েছে বেশ। মাথায় ছোট করে চুল ছাঁটা। মাথায় পেছনে একটি সরু টিকি। গলায় তুলসীর মালা। দাড়ী গোঁপ কামান মুখখানি—বেশ পাকাটে। ঠোঁট দুটী অতিরিক্ত বিড়ি তামাকের ধোঁয়ায় কাল। ব্রজরাখাল বৈষ্ণব মানুষ। বয়স বোধ করি পঁচিশ ছাব্বিশ। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ যে কবে করবে তা ভগবানই জানেন। ব্রজরাখালের ভারিক্বী চাল—গম্ভীর মুখ ও বেশী বয়স বলেই ক্লাসের সে ক্যাপ্টেন। মনে হয় এই পদটি তার পাকাপোক্ত। ক্লাসের শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তার। ক্লাসে যতক্ষণ শিক্ষক অনুপস্থিত থাকবেন, ততক্ষণ সমস্ত ক্লাসের একচ্ছত্র সম্রাট ব্রজরাখাল। ব্রজরাখালের উদ্ধত উড্ পেনসিল, আর ক্ষুদ্র কুটীল দুটী চোখকে কে না ভয় করে? ছেলেদের ফিস ফিস করে কথা বলার অধিকার নেই। বাইরে যাবার দরকার হলে ব্রজরাখালের কাছে বক্তব্য পেশ করতে হবে তবে মিলবে ছুটী।

—ইউ—ইউ—। অভয় হতচকিত হয়ে এপাশ ওপাশ তাকায়।

—ইউ—ইউ—হাঁ তুমি। আদিত্যবাবুর বিরাট চেহারা, মস্তবড় মুখমণ্ডল, ভুঁড়ীও তেমনি বিপুল। কপালের একপাশে ছোট্ট একটি আব। মাথায় কাঁচা পাকা চুল—মাথার মাঝখানে একটা বৃহৎ আকারের টাক।

—কি নাম? হাঁ তুমি তুমি। অভয় উঠে দাঁড়ায়। আদিত্যবাবুর দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়। —অভয়পদ দত্ত—

—অভয়পদ। কিন্তু নামের আগে শ্রী কথাটা বলতে হয়। বেশ। আগে কোথায় পড়তে। এখানে কে আছে তোমার?

অভয় উত্তর দেয়। আদিত্যবাবু খানিকক্ষণ অভয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন—বেশ, বস। অভয় হাঁপ ছাড়ে। আদিত্যবাবু নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার-খানি টেনে নিয়ে পড়াতে থাকেন। অভয় নিস্তব্ধ ভাবে শুনতে থাকে। আদিত্যবাবু পড়াতে থাকেন। পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পান অভয়ের মুখখানা। একাগ্র মনে, নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনছে। আদিত্যবাবু তা লক্ষ্য করেন। এক নিমিষেই বুঝতে পারেন, উপযুক্ত ভাবে তালিম পেলে, ছেলেটি ভবিষ্যতে ভাল হবে। অভিজাত শিক্ষক এক মুহূর্ত্তেই যেন অভয়ের পরিচয় পেয়ে যান।

ঢং ঢং করে ঘন্টা পড়ে। টিফিন। ছেলেরা ক্লাস থেকে বাইরে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যায়। বাইরে সার সার ফুল গাছ। লাল, সাদা, টগর ফুল ফুটে রয়েছে। রাস্তার দু-পাশে বেলি, রজনীগন্ধা ফুলের গাছ। স্কুলের চারপাশে নানা ফুলের গাছ। এখানে ওখানে নানান্ আকারের টবে অনেক ফুলের গাছ। ওদিকে মস্ত মাঠ। মাঠের ওপাশে হিন্দু আর মুসলমান হোষ্টেল।

অভয় একা একা ঘুরতে থাকে। হঠাৎ তার কাঁধে কে যেন হাত দেয়। প্রায় তার সমবয়সী একটি ছেলে। তাদেরই ক্লাসের ফার্ষ্টবয় শুভময় ঘোষ। সুন্দর চেহারা, মুখখানা বুদ্ধিদীপ্ত। একমাথা কোঁকড়ান চুল। চোখ, নাক, কান সবই নিখুঁত।

শুভময় হেঁসে বলল, তোমার সঙ্গে ভাই, আলাপ করতে এলাম।

মৃদু হেঁসে অভয় বলল, বেশতো। কিন্তু আমি তো কাউকে চিনি না।

হেঁসে শুভময় বলল, দিন দুই পরে, সবই চেনা হয়ে যাবে ভাই। এস বসা যাক্। কথায় কথায় অভয় জানল, শুভময় সহরের নামকরা সরকারী উকিল গিরীজা বাবুর ছেলে।

একসময় শুভময় বলল, রবিবার দিন আমাদের বাড়ীতে এস ভাই। বেশ বসে বসে গল্প করা যাবে— একটু ইতঃস্তত: করে অভয় বলল, বেশ তা যাব। —আমাদের বাড়ী চেন তো। খেলার মাঠের কাছে যে হলদে রংয়ের বাড়ী। অভয় সেই বাড়ী দেখেছে। মস্তবড় তিনতলা বাড়ী। সামনে খুব বড় ফুলের বাগান

রাস্তা থেকে দেখতে পাওয়া যায় ফুলের বাগান। বাগানে যে কত রকমের ফুল ফুটে, বাগানকে আলো করে রেখেছে। অভয় ভাবে, অতবড় বাড়ীতে গিয়ে শুভময়ের খোঁজ পাবে কি করে? এই কথাই ভাবতে থাকে, কিন্তু কি রকম লজ্জায় সে কথা বলতে পারে না অভয়। কিন্তু শুভময়ই তার সমাধান করে দেয়।

—ভাই সকালে আমি বাইরের বাগানে থাকি। গেট দিয়ে ঢুকেই আমায় দেখতে পাবে। রবিবারে আমি ভোর ছটা থেকে নটা পর্য্যন্ত মালির সঙ্গে বাগানে কাজ করি। বাগানে অনেক রকমের ফুল দেখতে পাবে। বাবা কলকাতা থেকে নানান্ রকমের ফুলের চারা, বীজ আনিয়েছেন। আমার এখানে এসে চা খাবে কেমন?

—চা? খুব বেশী আমি চা খাইনে। সারাদিনে ২ কাপ খাই।

মৃদু হেঁসে শুভময় বলল, না হয় রবিবার দিন তিন কাপ চা খাওয়া হবে। ওতে কিছু আসে যায় না। বাবা তো সারাদিনরাতে দশ-বার কাপ চা খান। আচ্ছা ভাই তবে, ঐ কথা থাকল।

অভয়ের মন পড়ে থাকে পোষ্টাপিসের পিওনের দিকে। কিন্তু এ বাড়ীতে কখন যে পিওন আসে, অথবা কার হাতে ডাক দিয়ে যায়, তা সে জানে না। রোজই ছুটির পর ভাবে, আজ নিশ্চয়ই বাবার চিঠি আসবে। কিন্তু না কোন সংবাদই সে পায় না। মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতেও কি রকম যেন তার লজ্জা লাগে। অথচ মন মানতে চায় না। একখানি পোষ্টকার্ডের সেই চির পরিচিত লেখা জানবার জন্য, তার সমস্ত মন প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সে তার বাবাকে জানে। বাবার শরীরের কথাও জানে। বেশী ঠাণ্ডা বেশী রোদ বাতাস—শারীরিক পরিশ্রম, এ সব সহ্য হয় না। রাতজাগা—চীৎকার গোলমাল, ঝগড়া বিবাদ, তিনি বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারেন না। নিজে যেমন মিতভাষী, যেমন ঝগড়া গোলমাল বিন্দুমাত্র সহ্য করতে পারেন না তেমনি কারুর সঙ্গে ঝগড়া গোলমাল করেন না।

অভয় তার বাবার স্বভাব জানে। দারিদ্র্য তাঁর সহ্য হয়ে গিয়েছে। অতি অভাব অনটনে মুখ বুঁজে থাকেন, কারুর কাছে হাত পাতেন না। শুধুমাত্র তাঁর মুখ ও চোখের বিষণ্ণতাই দেখে বুঝতে পারে, বাবার মানসিক অবস্থার ধারা। পচা ছেঁড়া কাপড় সেলাইয়ের পর সেলাই করে, শীতে সামান্য চাদর গায়ে দিয়ে সারা রাত থেকেছেন। কিন্তু মুখে কোনও উচ্চ বাচ্য নেই। তার বাবার কথা সে জানে। শুধু মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে ওঠেন ঠাকুর—ঠাকুর—হে নারায়ণ। ব্যস এই পর্য্যন্ত। কারুর ওপর কোনও দোষরোপ নেই। না মানুষ – না ভাগ্য বা ভগবানকে। হেঁসে বলেন, মানুষ হও বাবা। ভগবান মানুষকে হাত পা চোখ নাক কান দিয়েছেন। কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়—আর খুব গৌরবের কথাও নয়। আমরা নিজেদের সব কিছু থাকতে, তাঁর দানকে ঠিক মত গ্রহণ করতে পারিনি, তখন দোষ তো আমার। এই বিশ্ব চরাচরে তিনি তো কোন কিছুর অভাব রাখেন নি। তবে বোধ করি এ জগৎ ছাড়া, আর একটা বিশেষ জগৎ আছে বলে মনে হয়। ঠিক বুঝতে পারিনে। তবে এটা বুঝি, আমরা কষ্ট পাই, নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য, আলসেমীর জন্য আর কিছুটা বুদ্ধির অভাবে। তার উদাহরণ যেমন আমি। চোখ বুজে, গোপেশ্বর চুপ করে থাকতেন। সেই দৃশ্যটি পরিষ্কার দেখতে পায় অভয়। তার বাবার ধ্যানমগ্ন ছবি সে দেখেছে। কি যেন তিনি খোঁজেন—কি যেন তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা যে কি, তা অভয় বুঝতে পারে না!

কথায় কথায় হঠাৎ তার বাবা একদিন বলেছিলেন, দেখ্ অভয়, আমার মনে হয়—

অভয় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—কি? কি বলছেন?

—না। মানে একটা কথা ভাবি—

—কি কথা।

—ভাবি মানুষ কি শুধু নিজের চেষ্টা, যত্ন, বিদ্যা, আর বুদ্ধিতেই বড় হ'তে পারে। না এর পেছনে আরও

কিছু আছে। এমন একটা শক্তি, যে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাই ভাবি। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যায়। ঠিক বুঝতে পারিনে। এই যে আমাদের এই অবস্থা, একি শুধু আমারই দোষ। আমার অক্ষমতার জন্যেই কি এ অবস্থা। বোধ করি ভাগ্য বলে কিছু আছে। কিন্তু সকলের ভাগ্যই কি এক। তাই বলি, একটু চেষ্টা করে দেখ্ বাবা। ভাগ্যের এই চাকাকে উল্টো দিকে ঘোরাতে পারিস কিনা। যদি পার তবে বুঝব বাহাদুর। তবে—তবে—। আবার গোপেশ্বর চুপ করে যান।

অনেক কারণে আমাদের লেখা পড়া হয়নি। বোধ করি, যাতে আমার লেখা পড়া না হয়, তার জন্যে পর পর সেইসব ঘটনাগুলো ঘটে গেল। তাই ভাবি, পেছনের কোনও শক্তি বুঝি, এইসব খেলা খেলে চলছে।

মানুষের ভাগ্য আর জীবন নিয়ে এ এক মস্ত রসিকতা। তবে এটা নিষ্ঠুর রসিকতা—

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙ্গে যায় অভয়ের। কে যেন ওপরে গান করছে। কোণের ঘর থেকেই হারমোনিয়মের আওয়াজ আর গান ভেসে আসছে। বেশ সুন্দর মিষ্টি গলা—অভয় কান পেতে শোনে। গানের ভাষা সব বুঝতে পারে না। গানটা হয় রবীন্দ্রনাথের অথবা রজনী সেনের। অভয় নিস্তব্ধভাবে কান পেতে শুনতে থাকে। ভোরবেলায় এই নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝে, গানের সুরখানি ভারী মিষ্টি লাগে। অভয় কাৎ হয়ে শোয়। ভোরের শান্ত ঠাণ্ডা পরিবেশের মধ্যে, এই গানের সুর যেন, একটা মিষ্টি পাখীর মিষ্টি গলার সুর। কিন্তু কে গান করছে? মিষ্টি পাখীর মিঠে গলায় কে ডাকাডাকি করছে। আকাশ থেকে উড়তে উড়তে এসে, সে যেন বসেছে শিশির ধোয়া ভেজা গাছের ডালে। শিশির ভেজা পাতার আবডালে বসে। মিঠা গলার মধুর সুর সবখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অনেকদিনের আগেকার কথা মনে হয় অভয়ের। যখন সে ছোট ছিল, তখন তার মা আপন মনে গুণ গুণ করে, গান করতেন। ভারী মিষ্টি সেই সুর। কি যে গান মনে নেই - এখনও সেই সুরটা কানে ভাসছে—। সেই ঘুম পাড়ানী গানের সুর—। গান হারিয়ে গেছে কিন্তু সেই সুর তো হারায়নি, বোধকরি কখনও হারাবে না। অভয় তখন অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তার বিস্ময় মাখা তাকানো দেখে, মা হেঁসে ফেলতেন। দু হাত বাড়িয়ে বুকে চেপে ধরে চুমো খেতেন—।—খোকা আমার—সোণা মাণিক—। ঠিক যেন গানের মতন, ঠিক যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি সুর—একটা গানের কলি। রাতে সে মায়ের বুকের কাছে ঘুমুতো, মায়ের একটি স্তন হাত দিয়ে ধরে, আর একটি স্তন মুখে দিয়ে সে ঘুমুতো। ভারী ভাল লাগত তার—। অভয় চোখ বন্ধ করে, সেই হারানো আনন্দ উপভোগ করে। সেই হারানো আনন্দ আর গানের রেশ এখনও যেন নূতন করে মনে সাড়া জাগায়। একটা স্বপ্নের মত মনে হয়—তার সমস্ত শরীর শির শির করে ওঠে। কিন্তু এখনকার আনন্দ যেন, বিভিন্ন জাতের। যেন আলাদা রকমের ভিন্ন স্বাদের। মিনতির দুরন্ত গাল, ফরসা মুখ আর পাতলা লাল ঠোঁট দুটো, চোখের ওপর ভেসে ওঠে। মিনতির সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি। সে তো ওপরে দোতলায় যায় না। ওকে দেখলে পাশ কাটিয়ে যায়। মিনতি কোন কথা বলে না – তবে কেমন যেন অবাকভাবে দু একবার নজর করে পাশ কাটিয়ে যায়। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে গানের সুরখানি যেন তাকে ঘিরে ধরে, যেন তার সমস্ত শরীরে, সুরের সুধারস মাখামাখি হয়ে যায়।

একসময় ঘুমিয়ে পড়ে অভয়।

এমনি করে দিন চলে যায়। বাবার চিঠি আসে না। মনটা উন্মনা হয়ে ওঠে। বাবার মুখখানি মনে পড়ে। জীর্ণ দুঃখকাতর হতাশভরা চেহারাখানা, চোখের ওপর ভেসে ওঠে। কি দুশ্চিন্তা আর দুঃখের বোঝা নিয়ে, মানুষটা সংসারের পথে চলেছে। একটা দিনও শান্তি পেলেন না। বাবা-মায়ের চেহারায় বিন্দুমাত্র লালিত্য নেই—অকাল বার্ধক্য, জরা এগুলো সত্যিকারের রোগ নয়। সবটাই মানসিক ব্যাধী। দুশ্চিন্তাজনিত

রোগ। পুষ্টিকর খাস্ত আজকাল কটা লোক খেতে পায়। শুধু শাক সেদ্ধ আর ভাত খেয়ে, কত লোক তো দিব্য সুস্থ সবল রয়েছে। কিন্তু তাদের মানসিক শান্তি আছে। দুশ্চিন্তা নেই তাদের। তারা খেটে খায়। থাকলে খায় নতুবা উপবাস দেয়। কিন্তু তাদের প্রাণে আনন্দ আছে—স্ফূর্তি আছে দেখেছে। গাঁয়ের হাড়ী, বাউড়ী, বাগদীদের দেখেছে অভয়। দারুণ শীতে, শুধুমাত্র একটা গামছা গায়ে দিয়ে, ওরা রয়েছে। সমস্তদিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, আট দশ আনা যা রোজগার করল, সব ঢেলে দিয়ে এল মদের দোকানে। গাঁয়ের একপাশে বলাই সার পচুই মদের দোকান। বিকেল হলেই জমতে লাগল, গাঁয়ের মেহনতী খেটে খাওয়া মানুষের দল সেই দোকানের কাছে। চারপাশে গোল হয়ে বসেছে সবাই। সেই কালো কালো মানুষগুলো—সমস্ত গায়ে কাপড়ের চিহ্ন নেই। শুধু কোমরে একটু কাপড় জড়ান আর মাথায় গামছা। প্রত্যেকেরই পাশে কোদাল কুড়ল, দা, কাস্তে। তাদের মাঝে মস্ত মদের একটা মাটির জালা। চাল ভাজা, ছোলা ভাজা চিবুচ্ছে ওরা। বসনামালীর পানের দোকানে রয়েছে পান, বিড়ি, ওদিকে কানাই গড়াই নিয়ে বসেছে তেলেভাজা জিনিষ। ঢক্ ঢক্ করে ওরা মদ গিলছে—তারপর সুরু হয়ে উদ্দাম গাল। সবাই সমস্বরে গাল সুরু করে দেয় —কখনও বা সুরু হয় ওদের সামাজিক বিচার। তখন সুরু হয় গালাগালি, কখনও হাতাহাতি। তখনই দলের সর্দ্দার ওদের ঠাণ্ডা করে দেয়। সুরু হয় গান। সে গানের কি যে ভাষা—কি যে সুর—তা বোঝা যায় না। তবুও ওরা গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে যায়। ওদের এই উন্মত্ত স্ফূর্ত্তি দেখে, কে ভাববে যে, এদের ঘরে আধ পোয়া চাল নেই—ডাল, নুন, তেল নেই। এমন কি প্রদীপ জ্বালাবার তেলটুকুও নেই। অনেক রাত পর্য্যন্ত হৈ হৈ করে, সবাই টলতে টলতে, গান গাইতে গাইতে ফিরে আসে। অন্ধকার ঘরের মাটির মেঝেতে উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়বে।

এদের সঙ্গে তফাৎ মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ উচ্চশ্রেণীর ভেতর অর্থ, বিষয় সম্পত্তি না থাকলেও, তাদের আছে সব চেয়ে বেশী সম্মান বোধ। এঁরা অসম্মানজনক কাজ করতে চান না। কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে পারেন না। দেহের, সামর্থ্যে বাধে, আর বাধে আত্মসম্মান বোধে। এঁরা—এই শ্রেণীর গরীব বটে, কিন্তু অশিক্ষিত নন। এরা শিক্ষিত বটে, কিন্তু মোটেই অর্থবান নন। কিন্তু এঁদের চাকরী জোটে না—। সামান্য দুই চার বিঘা জমি হ'তে যে সামান্য আয় হয়, এদ্বারাই সংসার চলে। বলতে গেলে এমন একটা শ্রেণী, যে শ্রেণী সব চেয়ে বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান,—আজ তারাই উপেক্ষিত আর অবহেলিত। আজ অর্থই সব। যার অর্থ আছে—তিনিই এ যুগের একজনবাবু তিনিই সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ। অভয় চিন্তা করতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় নিজের ঘরে বসে অভয় পড়ছিল। হঠাৎ ডাক এলো। মিঠুয়া বলল, অভয়দাদাবাবু উপরমে চলিয়ে।

অভয় অবাক হয়ে যায়। এর মধ্যে, সে একদিন মাত্র বাবার সঙ্গে ওপরে জ্যাঠাবাবুর ঘরে গিয়েছিল, তারপর আর কোনদিনই যায়নি।

—কেনরে?

মিঠুয়া বলল মাইজী বোলাতেছেন—। আপনাকে ডাকছেন—বুকটা কেঁপে উঠল অভয়ের। হঠাৎ জ্যেঠাইমার ডাক কেন? জ্যেঠাইমা তো কোনদিনই তাকে ডাকেন না। তবে?

মিঠুয়ার পেছন পেছন অভয় উপরে উঠে এল। ঘরের মাঝে মস্ত একটা ইজি চেয়ার—তাতে বসে আছেন আশালতা। একপাশে চেয়ারে বসে মিনতি কি যেন একটা সেলাই করছে। ঘরে আর কেউ না।

—এস অভয়। আচ্ছা—মিঠুয়া তুই এখন যা—

মিনতি একবার অভয়ের দিকে তাকিয়ে, আবার

ঘাড় নীচু করে, সেলাই করতে থাকে। আশালতা এক খানা পোষ্ট কার্ড অভয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন —দেশের চিঠি। তোমার বাবা পৌছান খবর দিয়েছেন —সব ভাল।

—বাবার চিঠি—। অভয় যেন হাতে স্বর্গ পেল। কী দারুণ দুর্ভাবনার মধ্যে সময় কাটছিল। পত্রখানা আগা গোড়া পড়বার জন্য অভয় ব্যস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু তার আগেই—আশালতা বললেন, চিঠি পরে পড়বে। আচ্ছা, ঐ চিঠিতে মন্মথর কথা রয়েছে। তুমি ওকে চেন? ও কে?

—খুব চিনি। মোনাদা আমাদের গাঁয়ের ছেলে।

—হুঁ। কিন্তু ছেলে তো ভাল নয়। স্বদেশী করে, এখন সে জেল খাটছে আলীপুরে। খদ্দর পরে—চরকা কাটে—বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে, মদের দোকানে পিকেটিং করে—তার জেল হয়েছে ছমাস। তোমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? মানে কি রকমের বন্ধুত্ব।

অভয় বলল, আমি মোনাদার কাছে পড়তে যেতাম —মোনাদা মানে ঐ মন্মথ? ও কটা পাশ করেছে— একটাই। গরীব তো—তাই আর পড়তে পারেনি। খুব গরীব তো—

—হুঁ। কিন্তু ঐ সব স্বদেশী ছেলেদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা ঠিক নয়। উনি এসব পছন্দ করেন না— আমিও করি না। এ সব স্বদেশীদলের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে—এসব যদি প্রকাশ হয়, তবে ওঁর খুবই ক্ষতি হ'বে বুঝলে। ওঁকে সব সময় সরকারী বড় বড় কর্মচারীর সঙ্গে চলা ফেরা করতে হয়। আর নূতন বছরের গোড়ার দিকে ওঁর রায় বাহাদুর হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই সব ব্যাপার প্রকাশ পেলে সব ক্ষতি হ'বে। যাক্ মোট কথা—চিঠিপত্র যা লিখবে সবই আমায় দেখিয়ে তবে পোষ্ট করবে। আমি নিজে পড়ে সে গুলো ডাকে দেব। আর—আর—। আশালতা থামলেন—

—হুঁ দেখ। এখানে এসেছ লেখাপড়া করতে। গরীব বাবা মার দুঃখ ঘোচাতে, তাই এটা মনে রাখবে। হাঁ—আর একটা কথা। এখানে এসেছ লেখাপড়া করতে—কোন স্বদেশীওয়ালা ছেলের সঙ্গে মিশবেনা বা সম্বন্ধ রাখবেনা। এখন স্বদেশী করার একটা ঢেউ এসেছে। আজ সভা—কাল শোভাযাত্রা এই সব রোজ চলছে। কিন্তু খবর্দার। আমি যেন ভবিষ্যতে তোমার সম্বন্ধে কোন কিছু শুনতে না পাই। আচ্ছা এখন যাও—। বাবার পত্রখানা হাতে নিয়ে অভয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু মনটা খিট্ খিট্ করতে লাগল। তার চিঠি লেখা মেলামেশার ব্যাপারে, এত নিষেধের বেড়াজাল, এতো অসহ্য। চিঠি লেখা বা চিঠি পাওয়ার ব্যাপারে তার কোনও স্বাধীনতা থাকবেনা। এ চিন্তায় মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাবার চিঠিখানা হাতে করে, লণ্ঠনের আলোর সামনে গুম্ হয়ে বসে পড়ে। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, চিঠিখানা বারবার পড়ে অভয়। মোনাদা তবে জেলে। অভয়ের বুক থেকে একটা উষ্ণ নিঃশ্বাস বের হয়ে আসে। তার বাবা জানিয়েছেন এখানে সবাই ভাল। গীতা, খোকন পাঠশালায় যাচ্ছে। তাদের আদরের তরী গাইয়ের নূতন বকনা-বাছুর হয়েছে। অনেক উপদেশ দিয়েছেন গোপেশ্বর। মাও দু কলম লিখেছেন। মায়ের হাতের লেখার দিকে চেয়ে চেয়ে অভয়ের দু চোখে জল আসে।

অভয় ভাবে—কী অদ্ভুত তফাৎ। এখানে তার জ্যেঠাইমা দিন রাত শুয়ে বসে কাল কাটাচ্ছেন। বিরাট প্রাসাদ তুল্য বাড়ী, দাস দাসী, ঠাকুর বাজার সরকার কত কি। গায়ে কত গহণা, কত সাড়ী, কত সুন্দর সুন্দর সাজ পোষাক। আর তার মা—একখানা ছেঁড়া সাড়ী, হাতে দু গাছি শুধু শাঁখা। শীতের দিনে একখানা ছেঁড়া কাপড় দু ভাঁজ করে গায়ে জড়ান। সকাল হ'তে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সংসারের সব রকম কাজ সারতেই দিন চলে যায়। একদণ্ড বিশ্রাম নেই—

অভয় বাবার পত্রখানা, হাতে করে চুপ চাপ বসে থাকে। আজ আর পড়াশোনা করতে ভাল লাগে না। অভয়ের মনে পড়ে যায় কাল শনিবার। তারপরের দিন

শুভময়ের সঙ্গে তাকে দেখা করতে হ'বে। শুভময়—নামটি যেমন সুন্দর—ছেলেটিও কি সুন্দর। কেমন সুন্দর কথাবার্তা, কেমন সুন্দর আচার ব্যবহার। অভয় রবিবারের দিনটির জন্য প্রতীক্ষা করে। অভয়ের আজ বেশ খিদে মনে হয়। কিন্তু এতো বাড়ী নয় যে খিদে লাগলেই, মাকে বললে তার ব্যবস্থা হ'বে। তাদের গরীবের ঘর বটে কিন্তু মুড়ি, চিড়ে, গুড় জুগিয়ে রাখতেন তার মা। মা তাদের জন্যে সেই ভোরে অন্ধকারের মধ্যে উঠে, দুখোলা মুড়ি, খই, চিড়ে ভেজে আবার রান্নার যোগাড় করেছেন। গরীবের সংসারে কাজ অনেক বেশী। কাজের কি শেষ আছে? কাঠ কাটা, ঘুঁটে দেওয়া, ডাল ভাঙ্গা, কাপড় সেদ্ধ করা, কাপড় কাচা, এমনি কত কাজ। সমস্ত দিনে বিশ্রাম কোথায়? একমাত্র সেই রাত টুকুতে যা একটু বিশ্রাম কিন্তু তাও কি নিস্তার আছে। চিন্তা আর নানান্ সমস্যায় সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। চোখে ঘুম আসতে চায় না।

এখানে খাওয়া দাওয়া হয়, সেই রাত দশটায়। জ্যেঠাইমাদের খাবার চলে যাবে ওপরে। দোতালাতেই ওঁরা সব খেতে বসেন। প্রায় রাত সাড়ে দশটায় অভয়ের ডাক আসে খাওয়ার জন্য। মিঠুয়া এসে বলবে অভয়দাদাবাবু ভাত খাইতে আসুন—

এই ডাকটুকুর জন্য অভয় প্রতীক্ষা করে। ক্ষুধায় সমস্ত শরীর ঝিন্ ঝিন্ করতে থাকে। নীচে লম্বা দালানের একপাশে একটা আসন, তার পাশে জলের গেলাস। ঠাকুর ভাত, ডাল, তরকারী এনে দেবে। চাইলে ভাত, ডাল দেবে নইলে নয়।

স্কুলের ছুটির পর খিদে পায় খুব। কিন্তু তার জন্যে, কোনও জলখাবারের ব্যবস্থা নেই। সকালে এককাপ চা, আর একখানি মাত্র বিস্কুট। আবার বেলা দশটায় ভাত—আর রাত সাড়ে দশটায় ভাত। অবশ্য, জ্যেঠাইমার ছেলেমেয়েদের জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা ওপরেই হয়। ভাগ্যি নীচেয় হয় না এই রক্ষে। নতুবা সেটা ভারী লজ্জার ব্যাপার হ'ত অভয়ের কাছে। স্কুল থেকে ফিরে খালি পেটে ঢক্ ঢক্ করে এক গেলাস জল খায় অভয়। কোন কোনদিন পানুর দোকান থেকে দুপয়সার মুড়ি আর দু পয়সার তেলেভাজা কিনে খায়। ভারী সুন্দর তেলেভাজা তৈরী করে পানু। পেঁয়াজী, ডালপুরী, পাঁপর ভাজা, এই সব দিয়ে। তেলমাখা গরম গরম মুড়ী খেতে অভয় খুব পছন্দ করে। কিন্তু রোজ এর জন্যে একআনা পয়সা খরচ করা অভয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বেশীর ভাগ দিন শুধু এক গেলাস জল খেয়েই, উপস্থিত উদ্যত তীব্র ক্ষুধার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালতে হয়।

বৈকালে তাই অভয় বাড়ীতে থাকে না। পাড়ার আর একটি ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে অভয়ের। সে উমেশ মাঝি। উমেশ জেলেদের ছেলে। উমেশ মাঝি ওর সঙ্গে পড়ে। ওর বাবার নৌকা আছে। মহানন্দা নদীতে নৌকা চালায়, মাছ ধরে, ভাড়া খাটে। উমেশের বাড়ী একেবারে নদীর ধারে। ঘরে শুয়ে মহানন্দা নদীর জল, নৌকা চলাচল, লোকজনের স্নান, সবই দেখতে পাওয়া যায়। উমেশের বাড়ীতে অভয় প্রায়ই যায়। ওরা দুজনে নৌকায় এসে বসে, কখনও কখনও নৌকা নিয়ে বেড়িয়ে আসে। এক একদিন, উমেশ তাকে গুড়, মুড়ি, ছাতু খেতে দেয়।

উমেশ নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। সে বলে তার বাবার মতন মাঝিগিরী করবেনা। ম্যাট্রিক পাশ করে, কলেজে পড়বে। তার ইচ্ছা—একবার সাহেবদের দেশটা দেখা। তাদের এক আত্মীয় জাহাজে চাকরী করে—সে বহু দেশ দেখেছে। তারও ইচ্ছা, ঐ রকম জাহাজের চাকরী নিয়ে দেশ বিদেশে জাহাজে জাহাজে ঘুড়ে বেড়ায়। কিন্তু কি করে যে তার ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে তা ভগবানই জানেন।

ক্রমশঃ

সাহিত্যের সৌন্দর্য্য

অচিন্ত্য বসু

The theory of beauty' গ্রন্থের ২৮৭ পৃঃ মন্তব্য করেছেন ক্রেরিট,

My reading of croce has concerned me that the expression of any feeling is beautiful. The joy which I took to be the presupposition of Art is realy beautiful.

অর্থাৎ যে কোন অনুভূতির প্রকাশই সুন্দর। এমন কি রবীন্দ্রনাথও অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে একবার একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বস্তুত বলতে চাই, যা আনন্দ তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কি দিয়ে এই সৌন্দর্য্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড়বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের।

এমন কি 'কাব্যলোক' প্রণেতা সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের মত অনুযায়ী ইউরোপে যা 'Beauty'র প্রকাশ, আমাদের কাছে তাই রস। তাদের রস চেতনা 'Beauty' ও 'Emotion' এর যুগ্মচেতনা।

পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন, একহিসাবে সৌন্দর্য্য মাত্রই এ্যাবসট্রাকট। সে তো বস্তু নয়। সে একটা প্রেরণা, যা আমাদের অন্তরে রসের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, যা আনন্দ দেয়, রসসঞ্চার করে, তাই হোল সুন্দর।

বস্তুর আনন্দ দেবার এবং রসসঞ্চারের শক্তিই হোল তার সৌন্দর্য্য। রামগঙ্গাধর জগন্নাথেরও বক্তব্য হোল 'রমনীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দ কাব্যম' অর্থাৎ রমনীয় অর্থবোধক শব্দ হোল কাব্য। এবং বৃত্তিতে 'রমনীয়তা' ব্যাখ্যা করেছেন জগন্নাথ—অলৌকিক আনন্দের জ্ঞানগোচরতাই রমনীয়তা অর্থাৎ রমনীয়তা চ লোকোত্তরহ্লাদ জ্ঞান গোচরতা—এবং রবীন্দ্রনাথেরও কথা যা মনকে আনন্দ দেয় তাই সুন্দর।

উপরোক্ত উক্তিগুলো সামনে রাখলেও আধুনিক সাহিত্যের শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিচারে বেশী আট করি না। মনকে কী ধরণের লেখা আনন্দ দেয়। কেন দেয়? কেন না মন তাদের থেকে রসগ্রহণ করে।

তাই যদি প্রকৃত কারণ হয়, তবে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার দাঁড়ি টেনে সাহিত্যের মধ্যে সীমারেখা আনার চেষ্টা অন্যায় ও অস্বাস্থ্যকর। কেন না কোন সাহিত্যই তার বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পরে না। যা থাকে তা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ। সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে লেখাকে কোন নিয়ম বাঁধনে বাঁধা ঠিক নয়।

স্থির মস্তিস্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় এইভাবে 'কোট' কাচারি'তে সাহিত্য কখনও গড়ে ওঠতে পারে না। দেখা গেছে, যদি কোন লেখা যুগান্তকারী হয়, তাকে হাজার 'ব্যাণ্ড' করলেও কিছু হয় না এবং প্রচণ্ড ভাবে প্রচারে প্রতিষ্ঠিত লেখাও কালের বিচারে তা না টিকে থাকতে পারে।

আধুনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বিবর' 'রাত ভোর বৃষ্টি' প্রভৃতি যে সব বইয়ের বিষয় নিয়ে নানাধরণের 'কেস' ইত্যাদি হচ্ছে বস্তুত তাদের মধ্যে যদি কোন বিষয় থাকে যাকে ইতিহাস মনে করবে গ্রহণযোগ্য নয়, তা কোন কালেই গ্রহণীয় হবে না—তা ইতিহাসের অন্ধকূপে পড়ে থাকবে।

ডাঃ জিভাগো, লেডি চ্যাটার্লী বা চিত্রাংগদা আজ আর নাকচ হোয়ে যায় নি। তারা মুছেও যায় নি। নীলদর্পণ'কে 'ব্যাণ্ড' করে দিয়েও তার ক্ষতি হয় নি। অখ্যাতি জীবনের কাহিনী 'টমকাকার কুটির' এর মত আরও একটি কাহিনী আজ আর মেলেনা—'নীলদর্পন' এবং 'টমকাকার কুটির' পৃথিবীর দু'টি ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের চিঠি লিখে রেখে গেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়ে, 'বিষের বাঁশী' কিংবা অগ্নিযুগের কাহিনী প্রভৃতি, সমাজতান্ত্রিক বিষয়াবলী নিয়ে ১৯৪৮ সালে কামউনিষ্ট কাহিনী নিয়ে রচিত কাহিনী প্রভৃতিকে। ব্রিটিশ বিরোধী বলে এককালে 'ব্যাণ্ড' হোয়ে যেতো, এককালে দেশ প্রেমের প্রচারে যা প্রধান নেতৃত্ব নিতো, কিংবা রোমান্টিক মানসিকতায় আনন্দ সৃষ্টি করতো অথবা ১৯.৮ সালে সমাজতান্ত্রিক বিষয়াবলী নিয়ে ননী ভৌমিক, গোপাল হালদার প্রভৃতির লেখা আজ আর উত্তেজনা জাগাত না। আজ আর তাদের সেভাবে কোনরূপ প্রকাশ পায় না—তারা কালজয়ী হোতে পারে নি। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের ওপর রচিত বহু কাহিনী যা নিষিদ্ধ ছিল, তা একদা পড়তে আনন্দ জোগাতো বলেই তা একেবারে কালজয়ী হোয়ে ওঠে নি। তার চিরস্থায়িত্ব বা Eternal আবেদন ছিল না।

আজও তাই 'বিবর,' 'প্রজাপতি', 'রাত ভোর বৃষ্টি' বইগুলো সেক্সরসিপের সামনের সারিতে এসে তাদের একটা সহজ ব্যবসায়িক মূল্য ভীষণ বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক বিচারে টিকুক আর নাই টিকুক। এই সব বইগুলো কাগজের আইন আদালতের পৃষ্ঠার খবর হোয়ে যাওয়াতে তাদের প্রকাশকেরা এই সব লেখা বেশ চড়া দামে ছাড়বেন।

আগেই বলা হয়েছে সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হোল সৌন্দর্য্য। নিছক 'প্যামপ্লেট' সাহিত্য হোলে তার কদর নেই। কেউ কেউ বক্তব্যর ওপর ভীষণ জোর দেন এবং সাহিত্যের যদি কোন কথা বলার না থাকে, তবে তা যে মূল্যহীন এমন কথাও তারা বলেন।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, ছোটদের সাহিত্য বলে কোন সাহিত্য নাই। যা ছোটদের ভালো লাগে, তা তারা গ্রহণ করে, সেখানে তারা কোন 'কমপ্রমাইস' বা 'সমঝোতা'র ধার দিয়েও যায় না। তাই ছেলেদের জন্যে লেখা না হোলেও ছোটরা গ্যালিভার্স ট্রাভলস বা রামায়ণ, মহাভারত পড়ে। গ্যালিভারের কাহিনী তো একটি রূপকধর্মী। তা ছোটদের গ্রহণীয় হোল কেন? কারণ তারমধ্যে ছোটরা নিজেদের খুঁজে পায়।

এর যুক্তি কি। যুক্তি হোল সৌন্দর্য্যবোধ। যে কোন লেখাই তার সৌন্দর্য্যের গুণে গ্রহণীয়। 'গ্যালিভার্স ট্রাভলস'এর বক্তব্য কি নেই? আছে। সমসাময়িক সমাজের পিঠে চাবুক মারার জন্যই এটি রচিত। কিন্তু বাচ্চাদের তাতে কোন অসুবিধা হয় না। কেননা তাদের সৌন্দর্য্যবোধ সেখানে পথ খুঁজে পায়।

সুন্দর হয় 'রস' বা 'রসবোধ' থেকে। কান্টের সৌন্দর্য্য দর্শনে একস্থানে আছে Beauty is a state of mind, a satisfaction which is purely subjective—সৌন্দর্য্য মাত্র চিত্তের একটি অবস্থা চিত্তের পরিতোষ কেবল মাত্র আত্মগত ধর্ম বিশেষ।

হিউমের বক্তব্যও তাই, Beauty is no quality in things themselves but it exists merely in the mind which contemplates them—উপরোক্ত দুটি চিন্তায় প্রকাশ পায় অনুভূতি হৃদয়াগত। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে গোর্কির 'মা' বা টলষ্টয়ের 'রেশারেকশন' লেখা বড় কথা নয়, বড় কথা তাকে গ্রহণযোগ্য ভাবে

তৈরী করা। গ্রহণ না করলে কোন বস্তুরই কোন মূল্য থাকে না।

তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিনজনের মধ্যে লোকে প্রথমে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আত্মগত ভাবে, পরবর্ত্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও পরে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রহণ করেছে। কখনো আংশিকভাবে, কখনো সম্পূর্ণভাবে—সেই কারণে আজকে শ্লীলতা, অশ্লীলতা, বাস্তবতা অবাস্তবতাই বড়কথা নয়—সবটাই আত্মগতভাবে গ্রহণ করার ব্যাপার। আদেশ বা বক্তৃতা দিয়ে তাকে গ্রহণ যোগ্য করা যাবে না, কার্য্যকরী হোল রসোত্তীর্ণতা। তার অভাবে অথবা রসোত্তীর্ণতার অভাবে তাই তা হারিয়ে যায় সৌন্দর্য্যের বোধ শূন্যতার জন্য। তাই হঠাৎ জনপ্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তার মাপকাঠি নয়। সেই কারণে সৌন্দর্যবোধই আসল। তাই অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রেরণা দেওয়া 'গীতা'ও তাই রাজ্য অধিকারের কাহিনীর জন্যই আদৃত। তার সঙ্গে রসোত্তীর্ণতার সম্পর্ক নেই। রসোত্তীর্ণতা ছিল বলেই তা চিরকাল আদৃত।

সৌন্দর্যবোধই বড় কথা। তাই সৌন্দর্য্যবোধের জন্যই কোন লেখার চিরস্থায়িত্ব; সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ, কান্ট, হিউম, কেরিট, প্রভৃতি শিল্পতাত্ত্বিকের তত্ত্ববিশ্লেষণে আমরা যা পাই তা হোল রসাস্বাদন। রসাস্বাদনের জন্যে আমরা সর্ব্বদাই অগ্রণী এবং রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে তাই রসোত্তীর্ণতাকে আমরা প্রধান মূল্য দি।

এর পরেই কোন লেখা বক্তব্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, সেটা বক্তব্যের প্রকাশের উপর বর্তায়। সমসাময়িক আদর্শ অনেক সময় চিরস্থায়িত্ব লাভ করে, কখনো সমসাময়িক থাকে। কিন্তু সমস্যা মিটলেও সমস্যার মূলবক্তব্য লোকের মনে থাকে রসোত্তীর্ণ লেখা হোলেই নচেৎ নয়। সেখানেই তার মূল্য।

সে যুগের নানা কথা

শ্রীসীতা দেবী

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনস্মৃতির আরম্ভে লিখেছেন "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি ধরিয়া বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয়, কত কি রাখে। বস্তুত: তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।"

তাই নিজের বিস্মৃতপ্রায় শৈশবের দিনগুলির দিকে ফিরে দেখলে এই কথাগুলিই মনে হয়। কত কিছুই ত ভুলে গেছি। প্রথম স্মৃতি যা তা প্রায় ঝাপসা ছবির মত, পরিষ্কার করে মনে পড়ে না। কত বড় ছিলাম তখন আন্দাজ করতে পারি সমসাময়িক অন্য সব ঘটনার কথা শুনে। শুনেছি জন্মেছিলাম কলকাতায়, তবে ছয়মাস বয়সেই বাংলাদেশ ছেড়ে তখনকার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদ শহরে চলে আসি। বাবা ওখানকার 'কায়স্থ পাঠশালা বলে এক কলেজের অধ্যক্ষের কাজ নিয়ে সপরিবারে কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। প্রথম বছর দুইয়ের কথা ত কিছু মনে থাকবার কথা নয়। প্রায় যখন তিন বছর পূর্ণ হতে চলেছে, তখনকার দু-একটা কথা অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে। ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে, বাজ পড়ছে। দুটো আঙ্গুল দুই কানে ঢুকিয়ে আমি একটা বড় ঘরের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ ভয় করছে। কে যেন আমাকে বলে দিয়েছে যে, বাজ পড়ার সময় ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতে হয়, দেওয়াল বা জানলা-দরজার পাশে দাঁড়াতে নেই। ঘরের ছাদ পাকা নয়, খাপরার চাল, ভিতরের দিকে মোটা শাদা কাপড়ের ceiling দেওয়া। মেঝে সিমেন্ট করা, অনেক দিনের পুরানো বলে জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, বাজ পড়ার জন্য সব ফেটে যাচ্ছে। কতক্ষণ ঝড় চলল মনে নেই, ঝড় থেমে যাবার পর কি হল তাও মনে নেই।

এই সময়কার আর একটা ঘটনা মনে পড়ে। বাড়ীতে নূতন একটি খোকার জন্ম হয়েছে। বেশ গোলগাল, পরিপুষ্ট, ফরশা ধবধবে রং। আমি আর আমার দিদি, আমরা দুই বোনে যে ঘরে ভাই আছে সে ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছি। দুজনের হাতে দুটো খুব বড় পাথরের ঢেলা। সশস্ত্র হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, কারণ, ভাইকে চোরে নিয়ে যাবার ভয় আছে। আমার জন্মের বছর দেড় পরেই একটি ভাই হয়ে দারুণ বিসর্প রোগে মারা যায়। তার কথা আমার কিছুই মনে নেই। অন্যদের মুখে শুনেছিলাম যে, সে আশ্চর্য্য সুন্দর ছিল, তার নাম রাখা হয়েছিল দেবব্রত। সে মারা যাবার পর ওর অন্য ভাইবোনরা জিজ্ঞাসা করেছিল ভাই কোথায় গেল। তাদের বলা হয়েছিল, ভাইকে চোরে নিয়ে গেছে। তাই এই নবজাতককে রক্ষা করার জন্য বোনদের এ রকম উদ্যম। এই ভাই অশোক। ওর জন্মের পর আমার ঠাকুরমা এক মুঠো ক্ষুদ দিয়ে ওকে যেন কার কাছে বিক্রী করে দেন, এই আশায় যে, তাহলে কোন অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গ্রহের দৃষ্টি আর এই শিশুর উপর পড়বে না।

আমার জীবনে প্রথম বাড়ীর স্মৃতি এইটিই। এর আগের কোনো বাড়ীর কথা আমার মনে নেই। বাবার কলেজ ছিল সাউথ রোড আর একটা কি রাস্তার, বোধ হয় সিটি রোডের, মোড়ে। ঐ সাউথ রোড দিয়ে খানিক এগিয়ে গিয়ে পড়ত আমাদের বাড়ী। বাড়ীটা একটু

অদ্ভুত গোছের ছিল। সদরটা তার ঠিক রাস্তার উপরে ছিল না। রাস্তা থেকে একটা পায়ে চলা পথ খানিকটা গড়িয়ে নীচে নেমে এসেছিল। সেইখানে বিরাট বড় একটা compound-এর মধ্যে তিনটা বাড়ী। বড় বাড়ীটা দোতলা, সঙ্গে বড় ফুলের বাগান ছিল। মাঝারি বাড়ীটা বাবা ভাড়া নিয়েছিলেন, এটারও সঙ্গে অনেকখানি খোলা জমি ছিল, পরিষ্কার করে ঘাসটাস ছেঁটে রাখলে সেটাকে 'লন্' বলা যেত, তা সেটাকে পরিষ্কার করার দিকে বিশেষ কেউ কোনোদিন মন দেয়নি। বড় একটা মেহেদীর বেড়া ছিল বলে মনে পড়ে, তার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আমরা প্রায়ই হাত-পা রং করতাম। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মেয়েরা আলতার বদলে মেহেদীটাকেই বেশী ব্যবহার করে। ছোট বাড়ীটার ঘরের সংখ্যা গোটা তিনের বেশী ছিল না, খালি জমি অনেকখানি একপাশে ছিল। তারপরই বিরাট পেয়ারার বাগান। অনেকদূর অবধি বিস্তৃত। পেয়ারা বাগানের পরেই ষ্টেশন রোড বলে একটা রাস্তা। তার পাশ দিয়ে রেলওয়ে লাইন। ট্রেনের ইঞ্জিনের শব্দ সর্বদাই শুনতে পেতাম, তবে পেয়ারা বাগান পার হয়ে ঐ অবধি যাওয়া আর কোনোদিন ঘটে ওঠেনি। এত চমৎকার সুস্বাদু পেয়ারাও আর কোথাও খাইনি। অবশ্য সব গুণ পেয়ারাগুলোর নাও হতে পারে। শৈশবের জিহ্বার গুণও কিছুটা নিশ্চয় ছিল। এ বাগান যে কার ছিল তা আজও জানি না। কোনো স্বত্বাধিকারীকে বা চৌকিদারকে কখনও দেখিনি। এ যেন বিশ্বজনীন বাগান ছিল, কেউ কোনোদিন এখানে যেতে বাধা পেত না।

আমাদের বাড়ীতে ঘর অনেকগুলো ছিল। সব ক'টার মেঝে জমির থেকে সমান উঁচু নয়। একটা প্রকাণ্ড লম্বা ঘর ছিল, তার মেঝেটা বেশ নীচু, সেটায় যেতে হলে অন্যঘর থেকে দু তিনটে সিঁড়ি নেমে যেতে হত। স্নানের ঘর, রান্নাঘর, চাকরদের ঘর সব নানা level-এ, নানা ছাঁদের ছিল। পাকা ছাদ একটারও না, সব খোলার চাল, ভিতরে মোটা কাপড়ের সীলিং দেওয়া। অনেকগুলো বারান্দা ছিল। বাড়ীর ভিতরের ঐ নীচু লম্বা ঘরটায় পরে প্রবাসী অফিস হয়েছিল।

প্রথম প্রথম বাড়ীতে শুধু আমরাই ছিলাম মনে পড়ে। মা, বাবা, আর আমরা ক'জন ভাই বোন। তা ছাড়া পাচক "মহারাজ" একজন, অন্য কাজকর্ম্মের জন্যে "কাহার" চাকর একজন এবং বাচ্চাদের জন্যে ঝি একজন। এ ছাড়া জমাদার, মালি, বাবার কলেজের দারোয়ান, প্রভৃতি অনেক মানুষ চারিদিক ঘিরে থাকত। খুব ছোটবেলা থেকেই বাড়ীতে সব সময় অতিথি অভ্যাগতের আগমন দেখতাম। এলাহাবাদ মহা প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ প্রয়াগ। কাজেই আমার মা ও বাবার জন্মভূমি বাঁকুড়া থেকে তীর্থকামী আত্মীয়-কুটুম্ব সব সময় আসতেন। দেশে অবশ্য বাবার কোনো আদর ছিল না, তিনি উপবীতত্যাগী বিধর্ম্মী ব্রাহ্ম বলে। তবে এলাহাবাদে এসে আমাদের বাড়ীতে উঠতে বা দিনের পর দিন তাঁর পয়সায় খেতে কোনো নিষ্ঠাবান্ বা নিষ্ঠাবতীকে আপত্তি করতে দেখিনি। এছাড়া ব্রাহ্ম-সমাজের কেউ এলে আমাদের বাড়ীতে উঠতেন। বাঙালীরা এদিকে এলে খুঁজে পেতে আমাদেরই অতিথি হতেন, কারণ, নামকরা বাঙালী তখন এলাহাবাদে দু-চারজনের বেশী ছিলেন না। মাঘ মাসে তীর্থযাত্রীর ভিড়ও খুব বেশী হত। এ সময় মাঘ মেলা হয়, বছর কয়েক বাদ দিয়ে দিয়ে অর্দ্ধকুম্ভ, পূর্ণকুম্ভের বিরাট মেলাও হয়। শিশুকালে অবশ্য এ সব মেলার দিকে কেউ কোনোদিন আমাদের যেতে দেয়নি, সে সব দেখেছি বড় হয়ে। ঐ সময় ঠাকুরমা, পিসীমা প্রভৃতি পুণ্যলোভীরা দল বেঁধে আসতেন বলেই আমাদের টনক নড়ত।

ঠাকুরমা বার দুই প্রয়াগে কল্পবাসও করেছিলেন বলে মনে পড়ে। সে দারুণ কষ্টের ব্যাপার। এলাহাবাদের ঐ প্রচণ্ড শীতে গঙ্গাগর্ভের চড়ায় চাটাইয়ের কুঁড়েঘরে থাকতে হবে। এ মহাপুণ্যের ব্যাপার, ঠাকুরমা কিছুতেই খোট ছাড়বেন না। বাবা মাতৃভক্ত পুত্র ছিলেন, বাধ্য হয়েই তাঁকে মায়ের জন্য যথাসাধ্য ভাল ব্যবস্থা করতে

হত। কল্পবাসের অনেক গল্প শুনতাম আমরা ঠাকুরমা বাড়ী এলে, তবে গঙ্গার চড়ার কুটীরে গিয়ে কোনোদিন দেখিনি। ছোটখাট, ধবধবে ফরশা মানুষ ছিলেন ঠাকুরমা, মাথার চুল ছেলেদের মত ছাঁটা। বাড়ীতে এলে ক্ষুদুকে কোলে নিয়ে উঠোনের একটা বেঞ্চিতে বসে থাকতেন, নাতি দুইহাতে তাঁর মাথায় ফটাফট চড় মারত। তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না।

পিসীমাদের দুজন দুরকম দেখতে ছিলেন, সহোদরা বোন বলে মনেই হত না।

বড় পিসীমা ত্রিপুরাসুন্দরী রোগা কালো ছোটখাট মানুষ ছিলেন, খুবই কম কথাবার্ত্তা বলতেন। কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা, সতীনের উপর বিয়ে হয়েছিল, নিজের কোনো সন্তানাদি হয়নি। সতীনের একটি ছেলেকেই নিজের ছেলের মত করে মানুষ করেছিলেন। বেশির ভাগ সময় বাপের বাড়ী থাকতেন। তাঁকে কোনোদিন কোনো উপলক্ষেই সাজগোজ করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁকে যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন তিনি সধবা ছিলেন কি বিধবা ছিলেন মনে নেই।

ছোট পিসীমা সারদাসুন্দরী ছিলেন ধবধবে ফরশা, বেশ দশাসই চেহারা। খুব চড়া মেজাজ ছিল, বড়রা সুদ্ধ তাঁকে ভয় করে চলত। তাঁরও সতীনের ঘরে বিয়ে হয়েছিল, তবে শ্বশুরবাড়ী বিশেষ যেতেন না। দুজন ছেলে ছিল তাঁর, আমরা বড়দা ছোড়দা বলতাম। আমার এই দ্বিতীয় পিসেমশাইটির প্রথমা স্ত্রী দেখতে ভাল ছিলেন না বলে তিনি আমার ছোট পিসীমাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর রূপের তৃষ্ণা সম্ভবতঃ মিটে থাকবে, তবে ছোট পিসীমা তাঁকে খুব কড়া শাসনে রাখতেন বলে শুনতে পাই। ইনি অতি তেজস্বিনী ও অতি স্বাস্থ্যবতী মহিলা ছিলেন। মাকে মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করতেন "হ্যাঁরে সেজ বউ, এই মাথা ধরাটি কেমন বল্ ত রে?" জীবনে নাকি তাঁর মাথা ধরেনি।

আমাদের কলকাতার সমাজপাড়ার বাড়ীতেও এক বার এসে কিছুদিন ছিলেন। আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির। একদিন রবিবার সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হচ্ছিল, আচার্য্য যিনি ছিলেন, তার গলা খুব চড়া ছিল। ছোট পিসীমা খানিকক্ষণ শুনে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে নন্দ, ওখানে কি ভীমের বক্তৃতা হচ্ছে?"

আমার বড় জ্যাঠামশায় একবার কঠিন রোগগ্রস্ত হয়ে আমাদের এলাহাবাদের বাড়ীতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসেন বলে মনে পড়ে। বেশ কিছুদিন তিনি, বড় জ্যাঠাইমা ও তাঁদের ছোট ছেলে আমাদের বাড়ী ছিলেন। বড় জ্যাঠামশায় বিরাট দীর্ঘাকৃতি মানুষ ছিলেন, গায়ের রংও ছিল বেশ ফরশা। তাঁর ক্ষয়রোগ হয়েছে সন্দেহ করে এলাহাবাদের ডাক্তাররা তাঁকে খুব খোলা হাওয়ার মধ্যে রাখতে বললেন, এবং ছেলে-পিলেদের তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করা নিষেধ করলেন। মনে পড়ে একটা বারান্দা চটের পুরু পর্দা দিয়ে ঘিরে তাঁর জন্যে আলাদা একটা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। ডাক্তার বারণ করেছে বলে এমন নূতন ধাঁচের ঘরে যে আমরা যেতাম না, তা মোটেই নয় অবশ্য। ডাক্তাররা তাঁকে খুব পুষ্টিকর খাবার খেতে বলেছিলেন। দেশী, বিদেশী অনেক রকম খাবার তাঁর জন্য আনা হত। তার মধ্যে অনেকগুলি আমরা আগে কখনও দেখিনি; ইতালীয় খাবার vermicelli, macaroni প্রভৃতি। ম্লেচ্ছ দেশের জিনিষ বলে আমাদের আচারনিষ্ঠ হিন্দু-স্থানী পাচক (মহারাজ) সেগুলি রান্নাঘরে নিয়ে যেতে আপত্তি জানাল। জ্যাঠাইমা তোলা উনুনে সেগুলি বারান্দায় বসে রান্না করতেন। সেগুলি জ্যাঠামশায়ের ভোগে কত লাগত তা বলতে পারি না, তবে আমরা ছেলেপিলের দল, বাটি গেলাস পিরীচ প্রভৃতি যা পেতাম তাই নিয়েই জ্যাঠাইমার চারধার ঘিরে বসে যেতাম ইতালীয় খাবার আস্বাদনের জন্যে। খেতে যে কি রকম লাগত, তা কিছুই মনে নেই। কিছুকাল এলাহাবাদে থাকার পর জ্যাঠামশাই আবার দেশে ফিরে যান। তাঁদের কথা খুব বেশী আর কিছু মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, আমাদের জ্যাঠাইমা খুব কবিতা পড়তে ভালবাসতেন। সেকালের বাংলা

দেশের গ্রামের মেয়ে সামান্য বাংলা লেখাপড়া জানতেন, তাঁর মধ্যে এমন শখ খুবই আশ্চর্য্য লাগে। মাকে প্রায়ই বলতেন, "সেজবউ, সেজঠাকুরপোর কাছে ত ঢের কবিতা আসে প্রাবাসীতে ছাপার জন্য। উনি ত তার অনেক ফেলে দেন। তুমি সেইগুলি কুড়িয়ে আমাকে দিও, আমি পড়ব।"

তিন-চার বছর বয়সের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন আর কেউ এসে থেকেছিলেন কি না মনে পড়েনা। অতিথি অভ্যাগতদের ছায়া ছায়া ছবি দু-চারটে মনে পড়ে। তার মধ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে একবার রবীন্দ্রনাথের শুভ আবির্ভাব। বাবার সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের আলাপ ছিল, তবে আমি তাঁকে এর আগে কোনোদিন দেখিনি। তিনি তাঁর ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। অভ্যাগতদের চেহারা আর সাজ-পোশাক দেখে চাকর-বাকররা একেবারে থ মেরে গিয়েছিল। তাদের ভিতর একজন তাঁদের দড়ির খাটিয়া পেতে বসতে দিয়ে ছুটে ভিতরে এসে বাবাকে খবর দিল "যে দুজন রাজা এসেছেন।" বাবা তাড়াতাড়ি দেখতে গেলেন রাজাদের, আমিও তাঁর পিছন পিছন ছুটলাম। অতিথিদের চেহারা দেখে নিজের বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবের কথা আমার এখনও মনে পড়ে। অত সুন্দর মানুষ এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। তাঁরা চলে যাবার পর বাবা আমাদের বলে দিলেন যে, যিনি কাল পোশাক পরে এসেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ধুসর পোষাক পরেছিলেন তিনি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশে পাশের পাড়া-প্রতিবেশীরা বাঙালী ছিল না কেউ। সাউথ রোডের ওপারে, অর্থাৎ আমাদের বাড়ীর ঠিক উল্টো দিকে কয়েকটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী ছিল, তাতে কয়েকঘর অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান বাস করতেন। এঁদের ভিতর একটি যুবতী মেম প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসতেন আমার মাকে ইংরেজী ও গান বাজনা শেখানর জন্য। মা ইংরেজী কতটা তাঁর কাছে শিখেছিলেন জানি না, তবে বাজনা শিখেছিলেন এবং "Home, sweet home" জাতীয় দুচারটে গানও শিখেছিলেন। বাংলা গান তিনি এত সুন্দর গাইতেন যে ওসব ইংরেজী গান গাইবার তাঁর কোনোদিন কোনো প্রয়োজন হয়নি। আমরা মজা করার ইচ্ছায় তাঁকে মধ্যে মধ্যে ইংরেজী গান গাইতে বলতাম বটে। কি জানি কেন এই মেমসাহেবদের আমার একেবারে ভাল লাগত না। চাকর-ঝিদেরও এতে খানিকটা দোষ ছিল। তারা প্রায়ই আমাকে ক্ষ্যাপাত যে মেমরা আমাকে নিয়ে যাবে, আমি তাদের মত ফর্শা কি না? আমি চটে বলতাম "মেমলোগ পাতোনি হুয়, ও লোগ কাউয়া খাতা।" আমাকে কেউ না কেউ ধরে নিয়ে যাবে,এই বলে ক্ষ্যাপান বেশ কিছুদিন চলেছিল। ওখানে পণ্ডিত সুন্দরলাল বলে এক মহাধনী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর কোনো ছেলেপিলে ছিল না। তাঁর দত্তক নেবার কথা হচ্ছিল শুনে আর-এক পালা আমাকে ক্ষ্যাপান চলল যে, তিনি নাকি বলেছেন যে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছোট মেয়েকে পুষ্যি নেবেন। আমি দারুণ ক্ষেপে যেতাম। আবার বাবার কাছ থেকে কেউ আমাকে নিয়ে যাবে, এমন অসম্ভব আস্পর্দ্ধা কারো হতে পারে বলেই মনে করতে পারতাম না। অপরাধীকে কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত ভাষার জোর আমার ছিল না, আমি ভাষা সৃষ্টি করে বলতাম "পণ্ডিত সুন্দরলালকে আমি ল্যাসাড়ে, দেব।" এ হেন ভীতি-প্রদর্শন ভদ্রলোকের কানে কখনও গিয়েছিল কি না জানি না, এবং তিনি ভয় পেয়েছিলেন কি না তাও জানি না।

আমাদের বাড়ী যেখানে ছিল, সেই বিস্তৃত compound-এর মধ্যে আরো দুটি বাড়ী ছিল আগেই বলেছি। একটি খুব বড় দোতলা বাড়ী, তার সঙ্গে বড় ফুলবাগানও ছিল। আর একটি ছোট একতলা বাড়ী, তার পরেই বিশাল পেয়ারা বাগান। আমার যখনকার কথা প্রথম মনে হয় তখন বড় বাড়ীটাতে একজন ঐ দেশীয় ব্যারিষ্টার বাস করতেন, তাঁর নাম লালা রোশনলাল। বাড়ীর স্বত্বাধিকারী তিনিই ছিলেন। তাঁর গৃহিণী বিহারের খুব এক সম্ভ্রান্ত ধনী বংশের

মেয়ে। আমরা তাঁকে রাধাবিবি বলে ডাকতাম। খুব বিপুলাকৃতি দেখতে ছিলেন, রংটা মাঝারি। ছেলে মেয়ে কিছু ছিল না, কিন্তু ছেলেমেয়ে খুব ভালবাসতেন। আমাদের দুই বোনকে ক্রমাগত ডাকাডাকি করতেন। ওদের বাড়ীতে খেলার সাথী হবার মত কেউ ছিল না বলে আমরা সহজে যেতে চাইতাম না। কখনও কখনও আয়ারা যদি নিয়ে যেত ত তিনি মহাখুশী হয়ে বলতেন "বুঢ়ীমা এসেছে।" তাঁর বাংলা বলা শুনে কেন জানি না আমরা দুই বোনেই চটে যেতাম। কিছুকাল পরে তাঁর বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে অন্য কোথায় চলে গেলেন।

এরপর এলেন তেজবাহাদুর সাপ্রুরা। তাঁদের ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, তেজবাহাদুরের বাবা, মা, তাঁরা অনেক ভাই বোন। তেজ বাহাদুর ও তাঁর ভাই বোনদেরও তখন বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেপিলেও হয়েছে। চাকর বাকরও অনেক। বাড়ীটা রোশনলালদের আমলে চুপচাপ ছিল এখন কলরবমুখর হয়ে উঠল। তেজবাহাদুরের সঙ্গে বাবার আলাপ ছিল, তবে তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা বা ছেলেপিলেরা কোনোদিন আমাদের বাড়ী আসেন নি। আমরাও আয়াদের সঙ্গে একবার কি দুবার গিয়ে থাকব। তেজ বাহাদুরের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা ঠিক হাতীর দাঁতের খোদাই করা মূর্ত্তির মত দেখতে ছিলেন। তেজ বাহাদুরের বাবা ছিলেন খুব লম্বা আর মোটা, গলাটাও ছিল ভীষণ হেঁড়ে। সারাক্ষণ চীৎকার করে ছেলেপিলে চাকর-বাকরকে বকতেন। চীৎকার না করে কথাই বলতে পারতেন না। রাগ হলে নাকি মা-বাবাকেও মারতে যেতেন। তাঁর একমাত্র ভালবাসার পাত্র ছিল বিরাট একটা শাদা গাই, সেটা অনেক সময় আমাদের ঘরের ভিতর ঢুকে আসত। দুটো খুব সুন্দর শাদা খরগোশও মধ্যে মধ্যে এসে রান্নাঘরের তরকারির ডালা থেকে আনাজ তরকারি খেয়ে যেত মনে পড়ে। তাদের কিছুদিন পরে ঐ পাড়ার কোন বাড়ীর কুকুরে মেরে ফেলে। তখন আমারা খুব কেঁদেছিলাম। খরগোশ দুটি যে কাদের পোষা ছিল তা এখন মনে পড়ে না।

ওঁদের অন্দরে বোধ হয় আমি একবার মাত্রই ঢুকেছিলাম। তেজ বাহাদুরের স্ত্রীকে দেখে খুব অবাক্ হয়েছিলাম। ভারতীয় মেয়ে এত ফরশা আর এত গহনা পরা হয়, এ আগে আর আমি দেখিনি। এঁরা সব দারুন পর্দ্দানশীন ছিলেন, কখনও বাইরে বেরোতেন না। ছেলেপিলেরা বাইরে খেলা করত। ভদ্রলোকেরা বাইরে টেনিস্ খেলতেন।

ঐ একবারই ঢুকেছিলাম। একটি তরুণী মহিলার নাম শুনলাম শ্যামা। আমাদের বাঙালী চোখে ত তাঁকে খুবই ফরশা লাগল। কাশ্মীরী চোখে হয়ত তিনি ফরশা ছিলেন না। তেজ বাহাদুরের বাবাকে সব সময়ই দেখতাম। শুনতাম আরো বেশী। তাঁর মেঘমন্দ্র গলার স্বর না শুনে উপায় ছিল না। আমার ছোট ভাই অশোক সময় সময় দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর অনুকরণ করত। ভদ্রলোক শুনতে পেতেন কি না জানি না। ভদ্রলোক দেখতে শুনতে ভীমসেনের মত ছিলেন, সাহসও ছিল খুব। একবার সাউথ রোডের পাড়ায় cantonment-এর গোরাদের সঙ্গে হিন্দুস্থানী ঠিকা গাড়ী চালকদের এক দাঙ্গা হয়। দুজন গোরা রাস্তা দিয়ে ছুটে প্রথম আমাদের বারান্দায় ওঠে, সেখানে সব দরজা বন্ধ দেখে সাপ্রুদের বাড়ী যায়। তেজ বাহাদুরের বাবা গোরা দুজনকে বাঁচাতে গিয়ে খুব আহত হন। এ নিয়ে অনেকদিন মামলা হয়।

আর-একদিন ওদের বাগানে প্রচণ্ড কোলাহল শুনে ছুটে দেখতে গিয়েছিলাম কি হয়েছে। শুনলাম যে, একজন চোর ধরা পড়েছে। ছুটে গিয়ে দেখি একটা লোককে সাপ্রু বাড়ীর চাকর দারোয়ানরা খুব কষে পিটচ্ছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ও ত মানুষ, ওকে মারছে কেন?" এটা কোনো দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের দিক্ দিয়ে জানতে চাইনি। চোর বলতে আমি নখী, শৃঙ্গী বা দন্তী কোনো একটা জানোয়ার বুঝেছিলাম। তার বদলে মানুষ দেখে অবাক্ হয়েছিলাম।

আমরা যতদিন সাউথ রোডের বাড়ীতে ছিলাম,

ভর্তদিন বোধহয় সাপ্রুরা ঐ বড় বাড়ীতে ছিলেন। তাঁরা বেশ রাজসিক ভাবে থাকতেন বলে আমরা ওদিকে বড় একটা ঘেঁষতাম না। শাদাসিধা চালচলনে অভ্যস্ত ছিলাম, সেটাই আমাদের ভাল লাগত। বাড়ীতে ঝি-চাকর কয়েকজন ছিল। তাদের ছেলেমেয়েগুলো আমাদের সঙ্গে খেলত, তাতে আমাদের মর্য্যাদার কোনো হানি হচ্ছে বলে আমরা মনে করতাম না। সব বাড়ীর সঙ্গেই তখন চাকরদের জন্য বড় বড় থাকার ঘর থাকত. সকলে সপরিবারে এসে থাকলেও কোনো অসুবিধা ছিল না। একটা ছোট মেয়ে, রজওন্তিয়া নাম্নী, সারাদিন আমাদের সঙ্গে ঘুরত এবং জলখাবারের সময় সর্ব্বদা একটা বাটি হাতে করে এসে আমাদের সঙ্গে খেতে বসে যেত। মা তাকে সমানেই খাবার দিয়ে যেতেন। এলাহাবাদে খাদ্যদ্রব্য তখন শস্তাও ছিল বেশ। দুধ ছিল টাকায় ষোল সের, ঘরে এসে দুয়ে দিয়ে যেত। সব জিনিষই স্বল্পমূল্যে প্রচুর পাওয়া যেত, এক মাছটাই ছিল দুষ্প্রাপ্য, অনেক সময় আমরা দুবেলাই নিরামিষ খেতাম। বাবাকে ত কোনোদিন মাছ মাংস কিছুই খেতে দেখিনি। মাও ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব বাড়ীর মেয়ে, মাংস ত বাড়ীতে আসতই না। কাজেই মাছ না পেলে নিরামিষ। তবে ওখানে ফল-মূল, তরিতরকারি, দুধ ঘি, এ সবের এত প্রাচুর্য্য ছিল যে মাছের অভাব বিশেষ বোঝা যেত না। নিজে ছোটবেলায় বিশেষ ভোজন-রসিক ছিলাম না। দুধ পছন্দ করতাম না, বকে ঝকে খাওয়াতে হত।

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না। এলাহাবাদ প্রচণ্ড শীতের দেশ। কাজেই ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করলে খুব গরম ফ্ল্যানেলের জামা জুতা মোজা এসব না পরে উপায় ছিল না। যখন শীত থাকত না তখন সাদা সুতি বা ছিটের জামা পরেই চলে যেত। যতদিন ফ্রক পরেছি তার মধ্যে মাত্র একটা সিল্কের ফ্রক পেয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। শীতকালে পরার জন্য খুব মোটা গরম কাপড়ের দুটো ফ্রক ছিল। দুটোরই রং লাল। খুব বাচ্চা বয়সে আমি সে দুটোর নামকরণ করেছিলাম, "একজন লালা" ও "দুজন লালা।"

ওখানের ভয়াবহ শীতে স্নান করাও ছিল এক মর্ম্মান্তিক ট্রাজিক ব্যাপার। গল্প শুনি যে বাড়ী ছেড়ে ছুটে পালাতাম ভয়ে। ঝি-চাকররা তাড়া করে ধরে আনত। তাদেরই কাছে অনুনয় জানাতাম আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে।

গহনা-গাঁটি ছোটবেলায় চোখেই দেখিনি বললেও চলে। মা হাতে কয়েক গাছা চুড়ি ও কানে দুটো ছোট ফুল ছাড়া কখনও কিছু পরতেন না। গলার একটা চওড়া হার তাঁর বাক্সে মধ্যে মধ্যে দেখতাম, তবে সেটা তাঁকে কখনও পরতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। থেকে থেকে সেটাও বহুদিনের মত অদৃশ্য হয়ে যেত, অবার হয়ত কখনও রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসত। ছেলে-পিলেদের গহনার মধ্যে দাদার একজোড়া বালা ও এক ছড়া হার ছিল। তিনি বাড়ীর প্রথম সন্তান, তায় পুত্র সন্তান, কাজেই তাঁকে নিয়ে একটু ঘটা হয়েছিল। তা তিনি বেটা ছেলে, কিছুটা বড় হয়ে যাওয়ার পর তিনি ত আর গহনা পরবেন না, কাজেই ওগুলি মায়ের বাক্সে তোলাই থাকত। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে বালা জোড়া আমাকে ও হারটা দিদিকে পরান হত মাঝে মাঝে। পরবার সময় খুব আগ্রহ করেই পরতাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই "অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড়" করতে আরম্ভ করত। যেখানেই থাকি, বালা খুলে মায়ের কাছে দিয়ে ঝাড়া ঝাপটা হতাম। এর জন্যে মায়ের কাছে বকুনি ত খেতামই, মাঝে মাঝে চড় চাপড়ও দু-একটা খেতাম।

Compound-এর ভিতর, পেয়ারা বাগানের পাশে যে ছোট বাড়ীটা ছিল, তাতে পরে পরে অনেক পরিবার এসে থেকেছিলেন বলে মনে পড়ে। প্রথম ঝাপ্সাভাবে মনে পড়ে একটি মুসলমান পরিবারের কথা। এই বাড়ী-গুলিতে যে কেউই আসুক, আমাদের গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে, এটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম, তা তাঁদের সঙ্গে আমাদের মা-বাবার আলাপ থাকুক বা নাই থাকুক। এই মুসলমান পরিবারটির চারজন লোকের কথা মনে পড়ে। একজন কর্ত্তা, তাঁকে বাড়ীতে

খুব বেশীক্ষণ দেখা যেত না, তার পর গৃহিণী, তিনি প্রৌঢ়া মহিলা, খুব সাদাসিধা পোশাক পরতেন, কোনো গহনা পরতেন না এবং সারাদিন কাজ করতেন। তারপর দুজন তরুণী মেয়ে। একজন বেশ গোলগাল, আর একজন তন্বী। রঙীন পোশাকে আর স্বর্ণালঙ্কারে অতি সুসজ্জিতা। নামগুলিও তাঁদের তখন শুনেছিলাম, এখন মনে নেই। কাজকর্ম এঁদের বেশী করতে দেখতাম না। সরু তারে পুঁথি গেঁথে অনেক রকম সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈরি করতেন দুই বোনে। আমাদের কয়েকটা দিয়েও ছিলেন। গৃহিণী ভদ্রমহিলাকে আমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম, "আপনার মেয়েরা এত সুন্দর কাপড় গহনা পরে, আপনি কেন পরেন না?" তিনি হেসে বলতেন, "মেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়ে আমার সব সুন্দর কাপড় গহনা, খরচ হয়ে গেছে, কিছুই নেই, তাই কিছু পরতে পারি না।" এটা তখন আমার কাছে বড় অবিচার বোধ হত।

আর একজনদের কথা মনে পড়ে, এঁরা দাক্ষিণী ব্রাহ্মণ। বাড়ীর কর্তার নাম ছিল C. Y. Chintamani, এঁর সঙ্গে বাবার আগেই আলাপ ছিল। ইনি সাংবাদিক ছিলেন। প্রথম একবার একলা এসে আমাদের বাড়ীতে উঠেছিলেন। দেখা গেল, তিনি ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হিন্দু। খাওয়া দাওয়ার আগে লাল চেলির কাপড় পরে, কোষাকুষি নিয়ে আহ্নিক করতে বসতেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কারো ছোঁওয়া খেতেন না। সেবার দু-চারদিনের বেশী ছিলেন না। এরপর তিনি এলাহাবাদের Leader পত্রিকার সম্পাদকের কাজ নিয়ে এলেন। ঐ ছোট বাড়ীটা ভাড়া করলেন এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে এলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী তখন মারা গিয়েছিলেন। পরিবারের মধ্যে ছিলেন তাঁর বিধবা মা, আর একজন বিধবা তরুণী, তিনি হয়ত বোন বা ভ্রাতৃজায়া, একটি বালিকা ভাইঝি ও তাঁর নিজের পুত্র লছমিরাম। লছমিরাম প্রায় আমার বয়সীই ছিল মনে হচ্ছে, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলত, "লছমিরাম শাস্ত্রী।" মেয়েটির নাম ছিল কামেশ্বরী, এমন সুন্দর পদ্মপলাশলোচন আর কোথাও দেখিনি, চুলও ছিল একরাশ। কেউ কারো ভাষা জানি না, ভাঙা হিন্দীর মাধ্যমে ভাব-বিনিময়ের চেষ্টা হত। খেলা জমতে আটকাত না। কিছুকাল পরে তাঁরা অন্য বাড়ীতে উঠে গেলেন।

মাঝে ও বাড়ীতে একবার মেসের মতও হয়েছিল। নেপালচন্দ্র রায়, গিরীশ মজুমদার, প্রভৃতি অনেকে থাকতেন। তারপর একবার নেপালবাবু পরিবার নিয়ে এসে অনেকদিন ছিলেন। ইনি প্রথম আমাদের বাড়ীতেই এসে ওঠেন। আমাদেরই বাড়ীর কাছে Anglo-Bengali School বলে একটা হাইস্কুল ছিল। বাঙালী ছেলেরা এতে খুব বেশী সংখ্যায় পড়ত। এইখানের হেডমাষ্টার হয়ে নেপালবাবু এলাহাবাদে আসেন। বাবার সঙ্গে তাঁর আগেই আলাপ ছিল বোধহয় এবং তাঁকে এ কাজে নিয়ে আসার মধ্যেও বাবার হাত খানিকটা ছিল। ইনি এসেই আমাদের অত্যন্ত বন্ধু হয়ে পড়লেন। আমরা যতদিন এলাহাবাদে ছিলাম, ততদিন ইনিও ছিলেন। বেশীর ভাগ সময় একলাই এখানে থাকতেন, পরিবারবর্গ খুলনায় দেশের বাড়ীতে থাকতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁরাও এলাহাবাদে আসতেন, তখন নেপালবাবু আলাদা বাড়ী ভাড়া করে তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা দেশে ফিরে গেলে আবার আমাদের বাড়ী এসে থাকতেন। তিনি ও আর-একজন ঐ স্কুলের শিক্ষক, গিরীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর নাম, বহুকাল আমাদের সঙ্গে এক বাড়ীতে ছিলেন। নেপালবাবু আমাকে মা বলে ডাকতেন এবং দিদিকে বলতেন মাসীমা। গিরীশবাবু আমাকে ডাকতেন ছোড়দিদি এবং দিদিকে ডাকতেন বড়দিদি। আমরা যখন এলাহাবাদ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি, তখনও ওঁরা এলাহাবাদে থেকে যান। নেপালবাবু কয়েক বৎসর পরে এলাহাবাদের কাজ ছেড়ে চলে আসেন, এবং শান্তিনিকেতনে কাজ নিয়ে সেইখানে বাস করতে আরম্ভ করেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। গিরীশবাবু বোধহয় এলাহাবাদ থেকে পরে কলকাতায় ফিরে যান। নেপালবাবু দেশ থেকে

যখন প্রথম পরিবারবর্গকে আনান, তখন তাঁরা আমাদের বাড়ীতেই উঠেছিলেন। জায়গার অভাব আমাদের বাড়ীতে ছিল না, বরং মানুষের তুলনায় ঘরদোর বেশীই ছিল। অনেকে এসেছিলেন, নেপালবাবুর স্ত্রী, তাঁর ছেলে কালিপদ, কালিপদর দিদিমা, এবং পিসীমা, নেপালবাবুর এক ভাইপো এবং এক ভাগ্নে। কালিপদ দেখতেও যেমন সুন্দর ছিল, কথাও বলত তেমন চমৎকার। তার সব বাণী যদি লিখে রাখা যেত ত একখানা বই হয়ে যেত। কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকার পর তাঁরা ঐ ছোট বাড়ীটাতে উঠে যান। নেপালবাবুর ভাই-ভাজ ছেলেপিলে আরো কয়েকজন তখন এসেছিলেন বলে মনে হয়। ওখানে আমাদের খেলা খুব জমত, কারণ, একসঙ্গে এত খেলার সাথী ইতিপূর্ব্বে আমরা আগে কখনও পাইনি। ওঁদের বাড়ীতে একজন কবিরাজ ছিলেন, কাজেই ছেলেপিলেরাও খুব 'কবিরাজী' খেলা খেলত। প্রায়ই দেখা যেত, তারা ইঁট কুড়িয়ে এনে উনুন বানিয়েছে এবং নানা লতাপাতা কুড়িয়ে এনে মাটির ভাঁড়ে পাঁচন সিদ্ধ করছে। "জ্বরের উপর সান্নিপাত" প্রভৃতি বচনও কখনও কখনও তাদের মুখে শোনা যেত। নেপালবাবুর দিদি এবং শাশুড়ী দুজনেই বিধবা ছিলেন। দেখতাম, সারাদিন তাঁরা কত রকম যে তরকারি কুটছেন এবং রান্না করছেন তার ঠিকানাই নেই। এ সব রান্নার নামও আমরা আগে কোনোদিন শুনিনি। আমাদের "মহারাজের" (পাচক ব্রাহ্মণের) কল্যাণে, ডাল ভাত, 'রোটি' ও "ভাজী" প্রভৃতির সঙ্গেই পরিচয় ছিল। নূতন তরকারি রান্না করাতে হলে মাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে যেতে হত। পাঁচ মেশালি তরকারী দিয়ে যে আবার একটা ব্যঞ্জন হয়, এ "মহারাজ"দের নিরেট মস্তিষ্কে কিছুতেই ঢুকত না। মনে পড়ে, আমার মাসীমা একদিন তাঁর পাচক ব্রাহ্মণকে একথালা তরকারি কুটে, ভাগে ভাগে সাজিয়ে তাকে রান্না বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। থালায় শুক্ত ও একটা চড়্‌চড়ির তরকারি কোটা ছিল। খাবার সময় একটা বিকট বিস্বাদ ঘ্যাঁট্‌ পাতে পড়াতে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "এটা কি হয়েছে?" মহারাজ সস্মিতভাবে উত্তর দিলেন, "সব মিলায়কে কড়্‌কড়ি বানায়া মাজী।" মাসীমা চটে মহারাজের মাথায় একটা প্রবল চাঁটি বসিয়ে দিলেন। মহারাজ চাঁটিটা হজম করে বললেন, "মাজীর আমাকে বকবার ইচ্ছা তাই, না হলে অন্যায়টা কি হয়েছে? সবই ত একই জায়গায় যাবে,—তা আলাদা করেই রাঁধি না একসঙ্গেই রাঁধি।"

আমরা যখন প্রথম এলাহাবাদে যাই তখন ওখানে ব্রাহ্ম আর কেউ ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল কিছু কিছু মানুষ ছিলেন। বিহার, পাঞ্জাব, প্রভৃতি স্থান থেকে দু-চারজন ব্রাহ্ম প্রচারক মাঝে মাঝে এলাহাবাদে এসে আমাদের বাড়ী উঠতেন, তাঁদের মধ্যে সুন্দর সিংজী, মোহিনী দেবী প্রভৃতিকে মনে পড়ে। বাবা এখানে ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজে দারুণ কর্ম্মব্যস্ত মানুষ ছিলেন, কলেজের কাজ ও সম্পাদকের কাজ করে কোনো সময়ই পেতেন না। কাজেই কোনো একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোককে এলাহাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য নিয়ে আসার প্ল্যান করেন। তিনি সাপ্তাহিক উপাসনা, আলোচনা, প্রভৃতি কাজ করবেন, অন্যরকম প্রচারের কাজও তাঁকে দিয়ে হতে পারবে।

এই সময় আমরা একবার বাঁকিপুর যাই। ট্রেণে চড়ে যাওয়াটা তখন আমাদের কাছে একটা দারুণ আনন্দের ব্যাপার ছিল। এলাহাবাদ শহর থেকে বেরোতে হলে যমুনা নদী পার হয়ে যেতে হয়। যমুনা নদীটি সুন্দর, দুই তীরের দৃশ্য সুন্দর, নদীর উপরের সেতুটিও আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এখানে আমরা অনেক সময় বেড়াতে যেতাম। ষ্টেশন থেকে ট্রেণ ছাড়লেই আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম, কখন ট্রেণটা যমুনা ব্রিজের উপর দিয়ে যায়। ট্রেনের শব্দটা তখন একটা বিশেষ ধরণ নিত, সেটা আমরা খুব উপভোগ করতাম। এবারে বাঁকিপুর যাবার পথে, আমরা একটা অনেকগুণ বড় সেতু দেখলাম, সেটা শোন নদের সেতু। এতবড় সেতু আগে

আর কখনও দেখিনি। সে যেন আর শেষই হয় না। বাঁকিপুরে পৌঁছে ছোট একটা বাড়ীতে উঠলাম। পাশে একটা মাঠ, তার পরেই একটা বড় বাড়ী দেখা যেত। এখানে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার একসঙ্গে থাকতেন। অনেক লোকজন। আমরা বেশীর ভাগ সময়ই ওখানে কাটাতে লাগলাম। এই পরিবারগুলির একটি ছিলেন শ্রীযুক্তইন্দুভূষণ রায়ের পরিবার। তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী সরোজবাসিনী ও তিন ছেলেমেয়ে,—সোহিনী, প্রতিভারঞ্জন ও জীবনময়। জীবনদা বয়সে আমাদের দলের কাছাকাছি ছিলেন। সোহিনী দিদি তখনকার মতে তরুণী, তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতেন না। প্রতিভারঞ্জন বয়সে খুব একটা বড় না হলেও, দারুণ রাশভারি ব্যক্তি ছিলেন, তাঁকে আমরা নিজেদের দলের বলে মনেই করতে পারতাম না। শুনলাম যে, এঁরা সকলে এলাহাবাদে এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ইন্দুভূষণ ও সরোজবাসিনী তখন থেকে আমাদের মেসোমশায় ও মাসীমা হয়ে গেলেন। রক্তসম্পর্কের মাসী-মেসোর চেয়ে এঁরা আরো বেশী আপন ছিলেন, যতদিন বেঁচে ছিলেন। এলাহাবাদে আমরা যতদিন ছিলাম, এঁরা প্রায় সব সময়টাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, শেষের দু বছর ছাড়া। তখন ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা বাড়ী নেওয়া হয়, এঁরা সেখানে উঠে যান।

যাহোক, সেবার বাঁকিপুরে খুব বেশীদিন ছিলাম না। নূতন যে মানুষগুলির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল তাঁদের কথা খানিক খানিক মনে পড়ে। বেশী বেড়িয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। একটা বিরাট granary দেখেছিলাম, তার নাম শুনতাম "গোলঘর"। এটার ভিতর দাঁড়িয়ে কথা বললে খুব প্রতিধ্বনি শোনা যেত।

এলাহাবাদে ফিরে এলাম। মাসীমা, মেসোমশায়েরাও অবিলম্বে এসে গেলেন। বাড়ী জমজমাট হয়ে উঠল। জীবনদা খেলার সাথী হিসাবে বেশ ভাল ছিলেন। তিনি ছবি আঁকতে পারতেন, বেশ সুন্দর গান করতে পারতেন, কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন এবং কবিতা লিখতেও পারতেন প্রয়োজন মত। জীবনদা আমার দাদার চেয়ে বছর দুইয়ের বড় ছিলেন। এতদিন আমাদের পড়াশুনা নিয়ম মত হচ্ছিল না, এবার সব গুছিয়ে নেওয়া হল। দাদা ও জীবনদা বাড়ীর কাছের Anglo-Bengali School এ ভর্তি হলেন। আমি দিদি ও অশোক, তিনজনে মেসোমশায়ের কাছে বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করলাম।

মেসোমশায় খুব ভাল শিক্ষক ছিলেন। ধমক-ধামক, মারধর কিছুই করতেন না, বরং সময় সময় ছাত্র ও ছাত্রীর চিমটি ও খামচানিও অম্লানবদনে সহ্য করে যেতেন। কিন্তু নিজে যা করবেন স্থির করতেন তা করিয়েই নিতেন, আমরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতাম না। কোনো কিছুর মানে জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন, "Dictionary দেখ।" দেখতেই হত। পুরনো পড়া ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করতেন বলে আমি পড়া হয়ে যাবা মাত্রই পড়া পাতাটা ছিঁড়ে ফেলতাম। সোহিনীদিদি ও প্রতিভারঞ্জন নিজেদের বয়োসোচিত পড়াশুনা করতেন। বেশ কিছুকাল পরে সোহিনীদিদি এলাহাবাদের মহাজনী টোলা নামক পল্লীতে মেয়েদের একটি স্কুলে কাজ নিয়েছিলেন। স্কুলটা দুচারদিন পর্য্যবেক্ষণ করতেও গিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। বাঙালী মেয়ে ঢের ছিল। ঘরগুলো বড় তবে জানলাগুলি খুব ছোট ছোট, প্রায় ceiling-এর কাছে। বলদের গাড়ীতে করে মেয়েরা আসত। খুব হনুমানের উৎপাত ছিল বাড়ীটাতে। এই জানোয়ারগুলি বড় দুর্দ্দান্ত ছিল।

ক্রমশঃ

উপযুক্ত জবাব

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

সে দিয়েছিল এক উপযুক্ত জবাব—যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পেনসিলভিনিয়ার অধিবাসী এক যুবক নাম Horace Ashenfelter.

প্রাণ-খোলা, সদা চঞ্চল ক্রীড়াবীদদের উপস্থিতিতে অলিম্পিক গ্রাম তখন মুখরিত। অন্যান্য দিনের ন্যায় সে দিনও সন্ধ্যা ভোজের আসরে প্রতিযোগীরা তখন হাস্য পরিহাসের মধ্যে নির্মল আনন্দ উপভোগ করছিলেন। এই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন Horace Ashenfelter। অতএব সকলের নজর পড়ল তাঁর দিকে। এই সময় হঠাৎ একজন প্রশ্ন করে উঠল—"কি হে অ্যাশ! কাল কি রকম দৌড় হবে।" হোরেস উত্তর "যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি।"

প্রতিযোগীদের মধ্যে একজন হেসে বললেন "দৌড় শেষে 'ক্যাজান্টসেভ' যখন তার স্নানের পাট শেষ করবে তখন হয়ত দেখা যাবে 'অ্যাশ' তার দৌড় চক্রের বেড়া টপকাচ্ছে।

আর একজন বল্লেন "না, ওকে অতটা খারাপ ভাবা উচিত হবে না। আমার মনে হয় দেখা যাবে ক্যাজান্টসেভ হয়ত যখন তার দৌড় শেষ করছে, অ্যাশ এর তখনও তিনপাক বাকী আছে।"

হোরেস একটা বোকা হাসি হেসে বলল—"এ রকম কেন ভাবছ তোমরা। আমি জানি রাশিয়ান ক্যাজান্টসেভ ৩০০০ মিটার ষ্টীপল চেজে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। আর একথাও জানি এবারে এখানে সে আরও প্রচণ্ডভাবে দৌড়বে। তবুও কিন্তু আমার কি মনে হয় জান—এ দৌড়ে আমি যদি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পারি তা'হলে আমিই জিতব।"

এই কথা শুনে টেবিলে তখন হাসির রোল উঠল। যাই হোক, হোরেস তাঁর ভোজনপর্ব সমাধা করে নিজের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

পরের দিন হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ৩০০০ মিটার ষ্টীপল্ চেজ দৌড় শুরু হবে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে ওদের দুজনকেও ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল।

এই অলিম্পিকের প্রায় এক বৎসর পূর্বে ক্যাজান্টসেভ পৃথিবীর রেকর্ডের চেয়ে দশ সেকেণ্ড কম সময়ে ৩০০০ মিটার ষ্টীপল চেজ দৌড়ে একটা বিশ্ব রেকর্ড করেছিল। অনেকেই কিন্তু তার এই কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন তখন। কিন্তু এই অলিম্পিকের কিছুদিন পূর্বে তিনি পুনরায় এই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন আর এই জন্যই সকলে এই বিভাগে তার জয় সুনিশ্চিত ধরে নিয়েছিলেন। তাই হোরেসের প্রতি বর্ষিত হয়েছিল এই বিদ্রুপবাণ।

যাইহোক, এ বিষয়ে হিটে তারা দু'জনেই নিজ নিজ বিভাগে প্রথম হয়ে উঠেছিলেন। তবে হিটে এ্যাসেন ফেল্টর ভাল সময় করেছিলেন।

অতঃপর তিন হাজার মিটার প্রতিবন্ধক দৌড় আরম্ভ হল। দেখা গেল প্রথম পাকে ক্যাজান্টসেভ পাঁচ গজ এগিয়ে আছে। এর পরের পাকে হোরেস আর পেছিয়ে থাকতে রাজী থাক্‌লেন না। দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে পূর্বগামীকে ধরে ফেলেন তিনি।

এ দৃশ্য দেখে, ষ্টেডিয়াম শুদ্ধ লোক তখন হাসিতে ফেটে পড়ল। কেউ কেউ বলে উঠল "দেখ দেখ এ্যাশ আবার ক্যাজন্টসেভের সঙ্গে সমান ভাবে দৌড়তে চাইছে।"

কেউ আবার বলে "বেচারা একটু পরেই মজা টের পাবে। যখন ক্লান্ত হয়ে বারবার জল বাধায় (Water Barrier) জলে পড়ে নাকানি চুবুনি খাবে তখনই বুঝতে পারবে আসল ব্যাপারটা তবে কি।"

কিন্তু দেখা যায় তারা দু'জনে একসঙ্গে বেড়া টপকাচ্ছে, একসঙ্গে জল বাধা অতিক্রম করছে আবার ছুটছেও একসঙ্গে।

এরপর দেখা গেল হোরেস একটু এগিয়ে গেছে। পরক্ষণেই ক্যাজাণ্টসেভ এসে তাকে ধরে ফেলে। হোরেস আবার এগিয়ে যায়, ক্যাজাণ্টসেভ আবার তাকে ধরে ফেলে। পাঁচ চক্র পর্য্যন্ত চলল দৌড় এই রকম। হোরেস কিন্তু ক্যাজাণ্টসেভকে কিছুতেই এগিয়ে যেতে দিলেন না।

ষ্টেডিয়ামের ৭০,০০০ হাজার দর্শক এখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বসে আছে। তারা দেখছে যুবকের এই অসাধারণ অমানুষিক প্রচেষ্টা। কারও মুখ দিয়ে তখন একটিও বাক্য নিঃসরণ হচ্ছে না। সমস্ত ষ্টেডিয়াম নির্বাক, নিষ্পন্দ।

পাঁচ পাকের পর তখন দুজনকেই বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছে। দুজনেই কিন্তু সমানভাবে ছুটে চলেছেন। দর্শকরা তখন চিন্তা করছেন, হোরেস বোধহয় এবার ছেড়ে দেবে।

ছেড়ে কিন্তু দেয় না 'হোরেস এ্যাসেনফেলটর।'

ছুটে চলেছেন এ্যাশ - গলা তার শুকিয়ে উঠেছে, বুক ফেটে যাচ্ছে সামান্য বাতাসের জন্য আর পা দুটিকে মনে হচ্ছে অস্বাভাবিকর ভারী।

হোরেস চিন্তা করছেন—শেষ পর্য্যন্ত কোন রকমে যদি পা দুটিকে এইভাবে ওঠাতে আর নামাতে পারি তাহলেই হয়ত জিতে যাব।'

দৌড় শেষ হতে এখন আর মাত্র আধপাক বাকী কিন্তু তখনও 'এ্যাশ' একই ভাবে দৌড় চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সময় দেখা যায় ক্লান্ত ক্যাজাণ্টসেভ ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়ছেন। 'হোরেস' কিন্তু একই ভাবে দৌড়ে চলেছেন তার লক্ষ্যস্থল অভিমুখে।

বিস্ময়াবিষ্ট দর্শকগণ অতঃপর দৃঢ়চিত্ত 'এ্যাসেন ফেলটর'কে শেষ বেড়া অতিক্রম করে যেতে দেখলেন। অতঃপর খুব দ্রুতগতিতে ছুটে এসে তিনি দৌড় শেষ করলেন।

ষ্টেডিয়ামের ভেতর তখন একটি একটানা বিস্ময় সূচক ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—ঃ......উঃ...। উঃ...।

তাই বলছিলাম 'ধী'শক্তি সম্পন্ন মানুষকে একটা উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন পেনসিলভিনিয়াবাসী, অখ্যাত, অজ্ঞাত এই ধীরোদাত্ত যুবক নাম—'হোরেস এ্যাসেফেলটর।'

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইংরেজ জনসাধারণ ঘুঁসিখেলা, বা ঐ জাতীয় নানা লড়াই খুব উপভোগ করে। ইহা তাহারা স্কুলে অভ্যাস করে, বস্তিতে অভ্যাস করে, মাঠে করে এবং যেখানেই তাহাদের কর্মস্থান নির্দিষ্ট হয়, সেখানেই করে। যতদিন শক্তি থাকে করে। অবশ্য ভদ্রসন্তানেরা স্কুল ত্যাগ করিবার পরে ঘুঁসি খেলায় মাতে না, তবু লর্ড বংশের কেহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-কোনও নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে লড়াই করাকে ঘৃণ্য মনে করে না, অথবা এমন লড়াইতে হারিয়া গেলে তাহাকে নিন্দনীয় বোধ করে না। কিন্তু অনেক সময় উহারা লড়াইয়ের জন্যই লড়াই করে, এবং ইহার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহিয়াছে মদ্য পান। লড়াইতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলে কোনও ব্যক্তি তাহার গা হইতে কোট খুলিয়া তাহা পথের উপর ফেলিয়া রাখে এবং পথিকদের প্রতি হুঙ্কার ছাড়িয়া বলে, "আমার কোটের প্রান্তটি মাড়াইয়া দিবার সাহস আছে কার, অগ্রসর হও।" পুলিসের লোক যদি কাছে না থাকে, এবং থাকিলেও কিছু প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে অনেকেই এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দেয়, এবং সে পরে উপলব্ধি করে তাহার কোটটি এবং মুখখানা বাড়িতে রাখিয়া আসিলেই ভাল করিত। মুষ্টিযুদ্ধ আইনতঃ নিষিদ্ধ, কিন্তু গোপনে বহুস্থানেই এই প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে। আমি ইংলণ্ডে থাকিতে, মুষ্টিযুদ্ধে একটি লোক মরিয়াই গেল। ইহা শুনিয়া আমি আমার এক বন্ধুকে বলিলাম, যে মরিল, তাহার যথাসময়ে বলা উচিত ছিল, আর নহে, এইবার থাম। এবং উপস্থিত সাক্ষীরাও যে যথাসময়ে এ খেলা থামাইতে বলে নাই হা লজ্জাকর ব্যাপার। ইহার উত্তরে শুনিলাম, "লোকটার তেজ দেখিলে না?" এই জাতীয় লোকেরা কাহাকেও ভয় পায় না, বয়স্ক পুরুষ, স্ত্রী, কম বয়স্ক ছেলে মেয়ে কেহই ভয় পায় না। ইহারা স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হয়, বিপদ উত্তীর্ণ হইবার আনন্দ লাভের জন্য। ইহারা জলের উপরে অথবা স্থলের উপরে আকাশ-পথে বেলুন-যাত্রা করে। ইহারা মেরুপ্রদেশে কঠিন বরফের উপর পথ কাটিয়া চলে, উদ্দেশ্য মেরুকেন্দ্রের ছোট্ট বিন্দুটি কোথায় তাহা আবিষ্কার করিবে। ইহারা পিপেয় ঢুকিয়া নায়াগারা প্রপাতে পড়িবে। কেন, না তাহারা বড়াই করিয়া বলিতে পারিবে "আমি ইহা করিয়াছি।" আলপস পর্বতমালায় বৎসরে কত লোক মারা যায়। সেও শুধু এই জন্যই, অর্থাৎ বড়াই করার জন্যই। ইহা ভিন্ন অন্ধকার মহাদেশের—আফ্রিকার জঙ্গলের ভিতর অভিযানের যে কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে! ইহারা আকাশে, জলে, গরমে অথবা ঠাণ্ডায়, জ্বর ও কলেরা তুচ্ছ করিয়া, বাঘ-সিংহকে তুচ্ছ করিয়া চলে। সকল রকম বাধা ও বিপদকে ইহারা চ্যালেঞ্জ করে।

বর্তমানে ইহারা ভূতের ভয়ও করে না। ডাইনী, দুষ্টু শিশু ভূত, অথবা পরী, কাহাকেও নহে। এমন কি যে সব ছোট ছোট দুষ্টু ছেলে খালি পায়ে অ'ক্রদের নিকটে কর্দমাক্ত স্থানে লম্ফঝম্প করিয়া বেড়ায়, তাহারাও এই সব ভূত ইত্যাদিকে ভয় করে না। কিন্তু ভারতবর্ষের পল্লীতে এই সব ভূত-প্রেত কি অনিষ্টই না করে। বিশেষ করিয়া বালকদের কাছে ইহা বিভীষিকা। ভারত সরকারের উচিত ভূত শিকারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা। সাপ অথবা বাঘ শিকারের জন্য

যেমন পুরস্কার দেওয়া হয় ঠিক তেমন। এই কাজের ভার পাইতে পারে এমন অনেক অভিজ্ঞ লোক আমাদের মধ্যে আছে। আমি আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ একটি লোকের নাম করিতে পারি, যে লোকটি কয়েক দিন আগে হাওড়াতে একটি প্রেতকে হত্যা করিয়াছে। অবশ্য ঐ প্রেত যে ছেলেটির উপর ভর করিয়াছিল, প্রেত-মারণের প্রক্রিয়ার ফলে সেও মারা গিয়াছে। কিন্তু সেটা আদৌ বড় কথা নহে। প্রক্রিয়া যাহার হাতে অতটা কঠিন হয় না, এমন লোকও আমার বাড়ির পাশেই থাকে। সমস্ত দেশে যত ভূত-ধরা ওস্তাদের বাস, তাহাদের অনেককেই আমি চিনি। দক্ষিণ দেশে, উত্তর দেশে, হিমালয়ে, মধ্যপ্রদেশে ইহাদের বাস। মধ্যপ্রদেশে গত ১৮৮২ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী ৭০ জন ডাইনী-ধরা ওস্তাদ আছে। অন্যান্য জাতীয় ওস্তাদও ঐ প্রদেশে বহু আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করি—

এখানে ৯৫৪ জন শিল প্রতিহতকারীর দেখা মিলিবে, যাহাদের আবহাওয়া ও ঋতুর উপরে অসীম প্রভাব; বৃষ্টি, রৌদ্র, বজ্র ও শিল তাহাদের কথায় চলাফেরা করে। শুধু উপযুক্ত টাকার বরাদ্দ করিতে হইবে, অন্যথা কেমন করিয়া এই সব লুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করা যাইবে? হায়! তাহারা অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমাদের নির্দয় ভারত সরকার "না দেখে আমাদের অশ্রু, না শোনে আমাদের কান্না।"—আমি কলিকাতার একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইতে শেষের কথাগুলির উদ্ধৃতি দিলাম। আমি নিজে ভূত-বিরোধী, জীবিত অথবা মৃত কোনও ভূতের উপর আমার আস্থা নাই। সে ভূত দেহধারী হউক অথবা দেহহীন, পুরুষ ভূত হউক অথবা নারীভূত, শিশুভূত হউক বা বয়স্ক ভূত, ব্রাহ্মণ ভূত হউক বা মুসলমান ভূত, স্থলভূত হউক বা জলভূত, গোভূত হউক অথবা অশ্বভূত—মোট কথা যে ভঙ্গির ভূতই হউক তাহার বিরোধী আমি। আমাদের দেশে কত রকম ভূত আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দিবার লোভ হইয়াছিল, ইচ্ছা হইয়াছিল তাহাদের সকলকে শ্রেণী, উপশ্রেণী, গুণ-বিন্যাস, জাতি এবং প্রজাতি হিসাবে পৃথক একটি অধ্যায়ে সাজাইয়া পাঠককে উপহার দিই, এবং সে অধ্যায়ের নাম দিই ভৌতিক রাজ্য, যেমন অন্যান্য বিষয়ে আছে, যথা খনিজ রাজ্য, উদ্ভিদ রাজ্য, প্রাণী রাজ্য। ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক অথবা প্রাণী বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা স্থানীয় বিবরণ দিতে যেমন অধ্যায় গুলির নামকরণ করেন তেমনি। কিন্তু আমি লোভ দমন করিলাম। এবং আমি আশা করি, তেমন একটি অধ্যায় যে আমি আমার পাঠকের ঘাড়ে চাপাই নাই, সেজন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিবেন কি দিবেন না, তাহা আমি ভাবিতেছি না, কিন্তু আমি ইহা দ্বারা যে একটি সৎকাজ করিলাম, তাহা ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছি। নিতান্ত শিশুকাল হইতেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মনে ভূতপ্রেত এবং ঐ জাতীয় যাবতীয় জীবের ভয় ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলে চীনা মেয়েদের পায়ে যেমন লোহার জুতা পরাইয়া তাহার বৃদ্ধি রোধ করা হয়, তেমনি ভূতের ভয়ের দ্বারা তাহাদের মনেরও স্বাভাবিক সাহসকে খর্ব করিয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী জীবনে ভয়ে জমাট বাঁধা রক্তধারী নরনারী সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানে গাছের একটি পাতা পড়ার শব্দেও ভয়ে কাঁপিতে থাকে। একটি পেচক উড়িলেও ভয় পায়। কারণ, তাহার চারিপাশে সর্বত্রই সে ভূতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকে। পূর্বে যাহাই থাকুক, বর্তমানের ইংরেজ ছেলে মেয়েরা এই ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে। যদি কোনও প্রতিবেশীর বাগানের চেরি গাছের ডালে উঠিতে কোনও ইংরেজ বালক ভূতের মুখোমুখি হইতেই দেখিতে পায় সেই ভূত তাহার ঘাড় মটকাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইলে বালকটি যদি অবিচলিত কণ্ঠে ভূতকে বলে 'এখানেই কিছু করিয়া বসিও না, যদি লড়াই করিতে ইচ্ছা কর তবে নিচে নামিয়া আমাকেও লড়িবার সুবিধাটুকু দাও'—তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব না।

ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে আমার মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাহাদের

চরিত্রের সবচেয়ে আমার ভাল লাগিয়াছিল তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা, সম্মানবোধ এবং তাহাদের স্বাধীনচিত্ততা। তাহাদের মধ্যে যে জিনিসটির অভাব দেখিয়াছি, সে হইতেছে তাহাদের বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ সজীবতা। যেন তাহারা বয়সের আগেই বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। বালকত্ববিহীন বালক তাহারা। তাহাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ এবং বাক্যে আমি তাহা-দিগকে বালক ভাবিতে সঙ্কোচবোধ করিয়াছি। তাই তাহাদের সম্বন্ধে এই ধারণাই আমার মনে স্থান পাইয়াছে যে, তাহারা 'ছোট ছোট পুরা-মানুষ।' তাহাদের স্কুলের বিদ্যা যাহাই হউক, অপেক্ষাকৃত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা জানে তাহারা যে পৃথিবীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছে তাহা কঠিন।

যাহারা গৃহহীন এবং পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের সুনাম নাই, কিন্তু আমি তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও কুৎসা শুনিতে প্রস্তুত নাই, কারণ ইহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে তাহাদের বন্ধুত্বের সম্মান দিয়াছে। পৃথিবীতে এই বন্ধুত্ব অপেক্ষা দুর্লভ বস্তু আর কি আছে? পৃথিবীর বিকারপ্রাপ্ত জঠরে যে রত্ন লুকাইয়া আছে তাহাকে কি সেজন্য অগ্রাহ্য করিব? একটি ছয় বৎসরের বালক বিশেষভাবে আমার অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার এই বালক বন্ধুর অনেক কৃতিত্ব ছিল। সে আকাশে দুই পা তুলিয়া হাতে হাঁটিতে পারিত—কুড়ি গজ পর্য্যন্ত সে এইভাবে হাঁটিত। তাহার দিকে কিছু টানিয়া বলার অপরাধ হইলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, তাহার মত এতদূর হস্তব্রজে চলা আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। এই ব্যাপারে সে তাহার সমবয়স্ক আর সবাইকে হারাইয়া দিতে সক্ষম। যাহার ইচ্ছা সে ইহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারে, দাবি বেশি নহে, দশ গজ হাতে হাঁটা শিখাইতে এক পেনি, অনেক সময় বিনামূল্যেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বন্ধুটির বন্ধুদের কাছেও আমি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে দেখিলেই হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিত। বলিত, Hullo, the Shar! There is the Shar coming! Hurrah for the Shar! "ওরে 'শার' আসছে।" তার মানে বোধ হয় এই যে, তাহারা আমাকে পারস্য দেশের শা মনে করিয়াছিল। শা ইংল্যাণ্ডে খুব খ্যাত হইয়া-ছিলেন, একথা ছোটরা বড়দের নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবে। রেল ষ্টেশনে ওজনের যন্ত্র আছে তাহাতে অনেক ছেলে এক পেনি ফেলিয়া নিজের ওজন দেখিয়া লয়। কোনও যন্ত্রে চকোলেট, কোনও যন্ত্রে সিগারেট, তাহাতে পেনি ফেলিয়া দিলে চকোলেট অথবা সিগারেট বাহির হইয়া আসে। ছেলেরা ইহাতে বেশ মজা অনুভব করে। ছোটখাটো আনন্দ। নিন্দার কিছু নাই।

পূর্বে রেল ষ্টেশনের বা অন্য কোনও প্রকাশ্য স্থানের ওজন-যন্ত্রের বিষয় কিছু বলিয়াছি কি না মনে পড়ে না। ওজন-যন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া একটি ছিদ্র দিয়া একটি পেনি ফেলিয়া দিলে ডায়ালের উপরে একটি কাঁটা ঘুরিয়া ঠিক ওজনের দাগে আসিয়া থামিবে। চকোলেট যন্ত্রে পেনি ফেলিলে চকোলেট বাহির হইয়া আসিবে, সিগারেট-যন্ত্রে সিগারেট আসিবে। এই জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে হাসপাতালের জন্য দান চাওয়া হয়। একটি একবার উপরে উঠিতেছে, একবার নিচে নামিতেছে, কার্ডে লেখা, "দয়া করিয়া কিছু দান করুন।" একটি পেনি তাহার ছিদ্রপথে ফেলিবামাত্র আর একটি কার্ড উঠিবে, তাহাতে লেখা, "ধন্যবাদ।" সবই এখন যন্ত্রের সাহায্যে হইতেছে। সিগারেট জড়ানো হইতে সমুদ্রের নিচে সুরঙ্গ খোঁড়া, সবই যন্ত্রে। সুখের দেশ! আমেরিকা শুনিয়াছি আরও বেশি ভাগ্যবান্।

ইংল্যাণ্ডে এখন সকল ছেলেমেয়েই স্কুলে যায়। শিক্ষা এখানে বাধ্যতামূলক। পিতামাতা সন্তানকে স্কুলে পাঠাইতে আইনতঃ বাধ্য। মধ্যবিত্তদের সন্তানদের হাতের লেখা, পড়া, ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক ইত্যাদি শিখিতে হয়। মেয়েদের উপরন্তু সেলাই এবং সাধারণ রান্না শিখিতে হয়। কোনো বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ছেলেরা রবিবারে স্কুলে যায়। দরিদ্রদের জন্য স্কুলের বেতন সপ্তাহে এক শিলিং হইতে উর্দ্ধে—

বিদ্যালয়ের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী। স্কুলের পদ-মর্যাদা নির্ণীত হয়, কোন্ শ্রেণীর লোকের পৃষ্ঠপোষকতা সেই স্কুল লাভ করিয়া থাকে, তাহার দ্বারা। কোনও ব্যক্তির আয় বৎসরে ৫০ পাউণ্ড, কাহারও ৭৫ পাউণ্ড, কাহারও ১০০ পাউণ্ড, ইত্যাদি। সবাই পৃথক জাতি। তবে প্রত্যেককেই আয় অনুযায়ী কিছু না কিছু বাহ্যাড়ম্বর দেখাইতে হয়। উচ্চ বর্ণের লোকেরা এ সব স্কুলে তাহাদের সন্তানদের পাঠায় না। তাহাদের জন্য হ্যারো, টন এবং অন্যান্য অভিজাত স্কুল রহিয়াছে। এই সব লে ছেলে রাখিবার খরচ অতিমাত্রায় বেশি।

ভাল পরিবার সামান্য আয় লইয়া ইংল্যাণ্ডে বাস রিতে পারে না। দারিদ্র্য সর্বত্রই একটি অপরাধ, ু ভারতে অপরাধ নহে। শত শত উচ্চ বর্ণের ব্যক্তি ানের দ্বারা এখানে দারিদ্র্য বরণ করিয়া থাকে, তাই ারিদ্র্যকে ভারতে হীন চোখে দেখা হয় না। আমি কণ্ঠে বলিতে পারি, ঐশ্বর্য সম্মানিত হইলেও ভারতবর্ষে ারিদ্র্যকে ঘৃণা করা হয় না। ইংল্যাণ্ডের অবস্থা ন্যরূপ। সেখানে ইহা গুরুতর অপরাধ। ধনী াত্মীয়ের পাশে নিজের দৈন্য সেখানে অসহ্য হইয়া ঠে, বিশেষ করিয়া যখন নিকটস্থ সবাই তাহাকে সব ময় তাহার দীন অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে াকে। বাহিরের একটা ভড়ং বজায় রাখিতে অবস্থার ঙ্গে কি লড়াই-ই না করিতে হয়। ভারতে শুধু একটু র্মভাব দেখাও, তাহা হইলে তোমার দারিদ্র্যকে সবাই ক্ষমা করিবে, এবং পরদিন হইতেই সমাজ তোমাকে পূজা করিতে থাকিবে। ধর্মীয় ভাবের বাজার ইংল্যাণ্ডে বড়ই মন্দা।

একজন ইংরেজ জেনটলম্যানের শিক্ষা ও একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য অনেক। ইংল্যাণ্ডে জেনটলম্যানের উপযুক্ত গুণাবলী ভারতের অপেক্ষা অনেক উচ্চাঙ্গের। ইউরোপের জেনটলম্যানদের তাহাদের সমপর্যায়ের মধ্যে স্থান পাইতে হইলে, আমাদের দেশের অ-পরনির্ভর ভদ্রলোক অপেক্ষা অনেক বেশি জানিতে হয় শিখিতে হয়। সে পণ্ডিত না হইতে পারে, কিন্তু অতীত ও বর্তমানের যাহা কিছু মানুষের কাছে মূল্যবান্ মনে হইয়াছে, সে-সব বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান তাহার থাকা চাই। বিদ্যালয়ে হয়ত তাহার কৃতিত্ব খুব বেশি প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু পরে তাহাকে যখন সম শ্রেণীর উচ্চ সংস্কৃতি-সম্পন্ন নরনারীর সঙ্গে মিশিতে হয়, তখন তাহার মনের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তাহার মানস গঠনে ভ্রমণ এবং সংবাদপত্র বিশেষ সহায়ক। কিছু ফরাসী ভাষা তাহাকে শিখিতে হয়। বিজ্ঞান-সমূহের প্রাথমিক একটা জ্ঞান তাহার থাকা চাই, অঙ্কন বিদ্যা, পেনটিং কিছু জানা দরকার, সঙ্গীত বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা চাই, এবং বিশেষভাবে সঙ্গীত যন্ত্রের কোনও একটা ভালভাবে বাজাইতে শেখা চাই। ইহা ভিন্ন অশ্বারোহণ, গাড়ি চালান, শিকার বিদ্যা এ সব আর পৃথকভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, জেনটলম্যানের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। ইংল্যাণ্ডে এখন আর ভাঁড়ামির দিন নাই। উচ্চ শ্রেণী এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গের সম্পর্কিত হইলে অবশ্য এখনও উহা সম্মানিত হইয়া থাকে।

পূর্বের কথায় ফিরিয়া যাই। বহু বালক, সভাগৃহের নিচে পথে যে মারামারি হইতেছিল, তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে হাততালি দিয়া উৎসাহ দিতেছিল। আমি তাহাদিগের একজনকে আমাকে কোনও একটা কফি হাউসে পৌছাইয়া দিতে বলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল ত আমি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছি?" সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "ইণ্ডিয়া।" "কেমন করিয়া বুঝিলে?" জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমি জানি," তাহার পর একটু থামিয়া বলিল "মুসলমানেরা কি খুব খারাপ লোক?" "কেন" জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "কারণ তাহারা সিপাহী বিদ্রোহ করিয়াছিল।" এই বিদ্রোহের কথা তোমাকে কে বলিল?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল; আমি একখানা বইতে মিউটিনি সম্পর্কে সবই পড়িয়াছি।" "ভারত সম্পর্কে অন্য কোনও বই তুমি পড়িয়াছ?" সে

বলিল, "না।" এই উত্তরটিতে অনেক কিছুর ইঙ্গিত আছে। ইংল্যাণ্ডের এমন বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি যাহারা ভারত সম্পর্কে "মিউটিনি" ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ইহার জন্য আমি বেদনাবোধ করিয়াছি। আমরা ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত, অতএব ঐ সময়ের একটি ঘটনা প্রচারের ভার ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায়। হায় রে, সেদিন! সেদিন আজি-মুল্লার ভ্রূকুটি এবং তোপে উড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াও একটি "বাবু"কে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড় করান যায় নাই, যেদিন ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সৈন্যরা "ক্যালকাটা বাবুজ" লিখিত প্ল্যাকার্ড ভিন্ন আর কিছুকেই মান্য করে নাই—কারণ ঐ প্ল্যাকার্ড তাহাদের দরজার উপরে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং "বাবু"দিগকে ব্রিটিশ পক্ষে থাকিবার সাহসের পুরস্কার স্বরূপ পেনশন ও জমি দেওয়া হইতেছিল। তখন "বাবু"দের প্রতি সম্মান দেখান হইয়াছিল। সেই রাজভক্ত বাবুদের আজ নিন্দা প্রচার করা হইতেছে, এবং তাহাদের রাজভক্তিতে সন্দেহ করা হইতেছে। বাংলা কাগজে যখন ব্রিটিশদের জাতি হিসাবে নিন্দা করা হয় তখন আমি তাহাদের অজ্ঞতাকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু যখন দেখি ইংরেজী সংবাদপত্র ও ইংরেজ রাজনীতিকেরা খাশ বাংলাদেশের চার কোটি অজ্ঞ চাষী, যাহারা মধ্য আফ্রিকার নদীবাসী জলহস্তী পৃথিবী সম্পর্কে যাহা জানে, তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই জানে না, তাহাদের নিন্দা করে, তখন তাহাদিগকে কি বলিব? তখন লজ্জায় মাথা নত হয়। বাঙালীদের নিন্দার ব্যাপারে, আমি দুঃখের সঙ্গে বলিতেছি, ইংরেজরা অনেক সময়েই "নেটিভ"দের স্তরে নামিয়া আসে।

ছেলেটি আমাকে এক কফি-হাউসে লইয়া গেল। খুবই দরিদ্রদের জন্য সেটি। শস্তাও খুব। চা, কফি অথবা চকোলেট, এক পেয়ালা এক পেনি। আইসক্রীম দুই পেনি। রুটি মাখন দুই পেনি। কেক দুই পেনি। সোডা ওয়াটার লেমনেড, জিনজার বিয়ার, প্রতি বোতল দুই পেনি। ডিম প্রতিটি এক পেনি। শূকরের মাংসের ফালি এক প্লেট তিন পেনি। আরও একটু দামী জায়গায় এই একই জিনিসের দাম দ্বিগুণ হইতে তিনগুণ। এখানে সুরা জাতীয় কিছু বিক্রয় হয় না। লণ্ডন শহরে জিনিসের ভালমন্দের উপর সব সময় দাম নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানটির কতখানি আভিজাত্য, তাহার উপর। ভাল ডিনার সাড়ে সাত শিলিঙে পাওয়া যায়, আবার স্থান-বিশেষে এক গিনি বা তাহার বেশিও লাগে। পোশাক পরিচ্ছদ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিষয়েও ঐ একই অবস্থা। অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ না পাইলে সস্তায় বাস করার কৌশল নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, এবং লণ্ডনে তাহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। আমি যেখানে খাইতে গিয়াছিলাম তাহার পরিচালিকা একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক।

ক্রমশঃ

রোগশয্যা থেকে

(গল্প)

রবীন মিত্র মজুমদার

"আসলে তুমি এখনও একেবারে ছেলেমানুষ"—সুব্রতর এলোমেলো চুলগুলোর ভেতর সযত্নে আঙুল চালাতে চালাতে কথাগুলো বলে সুচেতা। সারাদিন রাত বুঝি শুয়ে শুয়ে এইসব আবোল তাবোল চিন্তা কর তুমি। অসুখ যেন আর কারও হয় না। ডাক্তারবাবুতো বলেছেন 'ক'দিন বাদেই ছেড়ে দেবেন তোমাকে।' সুব্রতকে উৎসাহ যোগাতে কথাগুলো বলে বটে সুচেতা, কিন্তু নিজের ভেতর তেমন ভরসা পায় না ও।

ডাক্তাররা তো কতদিন থেকেই ওকথা বলে আসছে। আজ দু'মাস হয়ে গেল ওদের 'এই ক'দিন আর শেষ হয় না।' শেষের কথাগুলোর মধ্যে ওর অধৈর্য্যের লক্ষণ স্পষ্ট বুঝতে পারে সুচেতা। আজ প্রায় দু'মাস হ'ল এই হাসপাতালের রোগশয্যায় শুয়ে আছে সুব্রত। ফুটবল খেলতে গিয়ে শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড চোট লেগেছিল। সে দিনটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না সুচেতা। প্রতিপক্ষের তিন চারজন খেলোয়াড়কে অবলীলায় অতিক্রম করে সুব্রত যখন প্রায় গোলের মুখে—সুচেতা উত্তেজনায় ষ্টেডিয়ামের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে—ঠিক তক্ষুনি পেছন থেকে ঐ দৈত্যের মতো ব্যাকটা এসে......উঃ আর ভাবতে পারে না সুচেতা' মাঠের উপর পড়ে কাটা পাঁঠার মত কিছুক্ষণ ছটপট করেছিল সুব্রত। সুচেতার হৃৎপিণ্ডটা অকস্মাৎ যেন কে উপড়ে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। কয়েকজন লোক ষ্ট্রেচারে করে মরা মানুষের মতো ওকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিল। তারপর নিশ্চয়ই আবার খেলা শুরু হয়েছিলো। সুব্রতর বদলী একজন কেউ নেমেছিল ওর জায়গায়। তারপর কি করে যে পথটুকু পার হয়ে এসেছিলো সুচেতা আজ এতদিন বাদে আর সে কথা মনে করতে পারে না। সেই থেকে হাসপাতালের এই রোগশয্যায় শুয়ে আছে সুব্রত। অথচ সেদিনই প্রথম। এর আগে কতবার বলে বলেও ওকে মাঠে নিয়ে যেতে পারেনি সুব্রত। সুচেতার ভালো লাগে না। ওই একটা চামড়ার পিণ্ড নিয়ে একপাল মানুষ অমন কাড়াকাড়ি করে কি মজা পায় ভেবে পায়নি সুচেতা। সেদিন মাঠে গিয়ে কিন্তু খুব ভালো লেগেছিল ওর। আর সুব্রত খেলেছিলোও খুউব ভালো। সেই সুব্রত আহত হয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার পরও খেলা থেমে যায়নি। ভাবতে অবাক লাগে সুচেতার। অথচ সুব্রত কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসতে প্রথম কথা বলেছিলো—'আমাদের খেলার কি হোলো ?' ভীষণ রাগ হয়েছিল সুচেতার। পরদিন সুব্রতর দু'তিনজন খেলোয়াড় বন্ধু এসেছিলো ওর সঙ্গে দেখা করতে। ওদেরই বলতে শুনেছে সুচেতা সে খেলায় শেষপর্য্যন্ত সুব্রতর দলই জিতেছিল। সুব্রত খেলতে পারলো না অথচ ওর দল জিতে গেল। শুনে সুব্রতর রোগপাণ্ডুর চোখ দুটো সহসা চক্ চক্ ক'রে উঠেছিলো।

ডাক্তার প্রথমে ভেবেছিলেন সামান্য আঘাতে স্পাইনাল কর্ডে একটু চোট লেগেছে। দু'দিন শুয়ে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বলেছিলেন বটে কিন্তু কিছুই ঠিক হয়ে যায় নি। সেই থেকে রোজ একবার করে এখানে আসছে সুচেতা। একটি দিনের জন্যও বাদ পড়েনি। দু-ঘণ্টার ভিজিটিং অ্যাওয়ার এখানে কাটিয়ে সুচেতা যখন বাইরে বের হয় মহানগরীর পথে তখন

সন্ধ্যার বিষাদ নেমে এসেছে। রাস্তায় নেমে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের দিকে তাকায় সুচেতা প্রতিদিন। আধো অন্ধকারের প্রান্তরের প্রহরীর মতো এই বিশাল বাড়ীটার পানে চেয়ে সহসা গোধূলির বিষণ্ণতা নেমে আসে সুচেতার মনের প্রান্তে।

প্রথম প্রথম সিস্টাররা ওর দিকে চেয়ে তির্যক হাসি হেসে নিজেদের ভেতর কিসব বলাবলি করতো। এখন অবশ্য ওসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর সুচেতা দেখেছে এমনিতে যাই হোক ওরা সুব্রতকে খুব যত্ন করে। সুব্রত নিজেও বলেছে কতবার "জানো ওরা আমায় এমন যত্ন করে মনেই হয় না হাসপাতালে আছি।... ..কিন্তু সেরে উঠতে এত দেরী হচ্ছে কেন?"

"আবার আপনি ঐসব ডিমরালাইজিং কথাবার্তা বলতে শুরু করেবেন?"—হাসপাতালের তরুণ ডাক্তার অনুপম সেন কখন এসে ওদের বেডের পাশে দাঁড়িয়েছেন জানতেও পারেনি সুচেতা। ডাক্তার যেন হাসছেন। আসলে ডাক্তার সেনকে কখনও মুখ গোমড়া করে থাকতে দেখেনি সুচেতা। চেহারার ভেতর বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব আছে ডাক্তার সেনের। একসময় অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টের আগে পর্যন্ত সুব্রতর চোখে মুখেও ঐ রকম একটা তাজা, সতেজ ভাব দেখতে পেত সুচেতা। ডাঃ সেন সপ্তাহে দু'দিন করে দেখে যান সুব্রতকে। বেশ নিবিষ্ট মনেই দেখেন সুব্রতকে। অন্ততঃ সুচেতার তো তাই মনে হয়েছে। আগে আগে নাকি সকালের দিকে আসতেন ডাঃ সেন। ইদানীং ডিউটি চেঞ্জ করে নিয়েছেন। প্রতিবারই ডাক্তার সেন সুব্রতকে সাহস দিয়েছেন। বলেছেন—"আপনি না খেলোয়াড়। আপনার মতো স্পোর্টসম্যানও যদি এতটুকুতেই এলিয়ে পড়েন তাহলে চলবে কেন আর এত ভয়েরই বা কী আছে? আমরা তো রয়েছি।

বেশ আন্তরিক ভাবেই কথাগুলো বলেন ডাঃ সেন; কিন্তু সুব্রতর কানে তা একটু বিসদৃশই শোনায়। বিশেষ করে ঐ আমরা কথাটা। আমরাতো রয়েছি বলতে ডাঃ সেন কি বোঝাতে চাইছেন। অথচ সুব্রতর যতদূর মনে পড়ে প্রথম প্রথম ডাঃ সেন বলতেন, আমিতো রয়েছি। নাঃ এসব কি ভাবছে সুব্রত। এসব ওর অসুস্থতার লক্ষণ। ছিঃ ছিঃ নিজের মনকে শাসন করে সুব্রত। ও না খেলোয়াড়। স্পোর্টস্-ম্যান। ডাঃ সেন ঠিকই বলেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার এক আশ্চর্য বিষাদ এসে ওর সারা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ক্ষণে ক্ষণে রঙ্ বদলায় সুব্রতর মনের, বিকেলের ঐ অস্তগামী সূর্যের মতোই। আজকাল যেন ডাঃ সেন একটু বেশী ঘনিষ্টভাবে কথা বলছেন সুচেতার সঙ্গে। সুব্রতকে দেখাটা যেন কিছু নয়। আসলে সুচেতাকে দেখতেই আসেন ডাঃ সেন। ডাক্তাররাও কি অসুস্থ মানুষকে ভালোবাসেন না? শুধু কি কর্ত্তব্যের খাতিরে...নাঃ আর ভাবতে পারে না সুব্রত। ডাঃ সেনের সঙ্গে কথা বলবার সময় সুচেতাকেও খুব বেশী প্রফুল্ল দেখায়।

প্রথম যেদিন সুচেতাকে দেখেছিলেন ডাঃ সেন সেদিন খুব সরল শিশুর মতোই প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা মিস চক্রবর্ত্তি, আই মীন, সুব্রতবাবু আপনার কে হয় বলুন তো? কথাটা শুনে সহসা এক ঝলক রক্ত এসে সুচেতার সারা মুখ রাঙ্গা করে দিয়েছিল। তাই দেখে সুব্রতর খুব ভালো লেগেছিলো। আর ডাঃ সেন বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সুব্রত কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনা ওর অসুখটা আসলে কি? শিরদাঁড়ার সেই কন্‌কনে ব্যথাটা অবশ্য মাঝে মাঝে জানান দেয়, গোলমালটা ওখানেই। ডাঃ সেনকেও দু'একদিন সুচেতার সঙ্গে কথা বলবার সময় ওরকমই বলতে শুনেছে—আরও কি সব যেন বলেছিলেন চাপা স্বরে। আজকাল ওর অসুখের বিষয়ে সব রকম কথাবার্ত্তা সুচেতাকেই বলেন ডাক্তারবাবু। অবশ্য সুব্রতর বাবা সুকান্তবাবুর সঙ্গেও বেশ সিরিয়াসলি সুব্রতর অসুখ নিয়ে আলোচনা করেন ডাঃ সেন।

সুব্রতর হাসি পায়। ইচ্ছে হয় ডাঃ সেনকে বলে, 'দেখুন ঐ সব গাম্ভীর্য্য আপনাকে ঠিক মানায়না। আপনি এখনও ছেলেমানুষ। আসলে বয়সটা একটা সীমানা পার হবার আগে চেহারায় ব্যক্তিত্ব আসে না

কিছুতেই। সুব্রতর বাবার চেহারার মধ্যে কিন্তু বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। হয়ত কিছুটা দম্ভও আছে ওর। মাঝে মাঝে সুকান্তবাবু ডাঃ সেনকে বলেন, 'দেখুন টাকাপয়সার জন্য ভাববেন না। সুব্রত আমার একমাত্র সন্তান। যত টাকা লাগুক ওকে আপনি সারিয়ে তুলুন। "যত" কথাটার উপর একটু বেশী জোর দেন সুকান্তবাবু। বেশ কয়েক দিন বাদে বাদে সুকান্তবাবু এখানে আসেন। ব্যস্ত মানুষ! রোজ রোজ আসা সম্ভবও নয়। এই সময় মাঝে মাঝে মাকে মনে পড়ে সুব্রতর—মা থাকলে নিশ্চয়ই রোজ একবার করে আসতেন—সুচেতার মতোই। মা খুব ভালোবাসতেন সুব্রতকে। সুচেতাওতো ওকে ভালোবাসে, তা নইলে রোজ রোজ এখানে আসবে কেন? কখনও কখনও যদিও সুব্রতর মনে হয়েছে ব্যাপারটা যেন কেমন একটা গতানুগতিক রুটিনের মতো দাঁড়িয়েছে। প্রথম প্রথম আসবার সময় একগুচ্ছ রজনী গন্ধা নিয়ে আসতো সুচেতা। সুব্রত শয্যার পাশে ছোট্ট বেড সাইড টেবিলের উপর চিনে মাটির ফুলদানীটার ভেতর সযত্নে সাজিয়ে রাখতো ফুলগুলো। ঐ রজনীগন্ধার দিকে চেয়ে থকতে থাকতে সুব্রতর মনটা সহসা একটা সাতরঙা রামধনু হয়ে যেত। মনে হ'ত একটা শুভ্র নরম রজনীগন্ধার হালকা অরণ্যের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার মিষ্টি বাতাসের মতো অকল্পনীয় রোমাঞ্চকর দিনগুলো আজও দোলা দিয়ে যায় ওদের দু'জনকে।

প্রথম যেদিন ডাঃ সেন বিকেলে ডিউটিতে এলেন সেদিন প্রথমেই ওর দৃষ্টি পড়েছিল ওই ফুলগুলোর ওপর। 'বাঃ ভারী সুন্দর তো! কে নিয়ে এলো? আপনি নিশ্চয়ই, বলেই সুচেতার দিকে তাকিয়েছিলেন ডাঃ সেন। লাজুক চোখ দুটো নামিয়ে আলতো করে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়েছিলো সুচেতা। এরপর অনুপম সেন পরম আন্তরিকতায় স্পর্শ করেছিলেন ফুলগুলি। হালকাভাবে ওদের ঘ্রান নিয়েছিলেন। অনুপম সেনও তাহলে ফুল ভালবাসেন? অবশ্য ফুল সবাই ভালোবাসে পৃথিবীতে যা কিছু রমণীয়, তাকে সবাই ভালোবাসে। সুচেতাও সুন্দর! কী পরম রমণীয়—একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতোই। কথাটা আকস্মিক ভাবেই মনে হোল সুব্রতর। ওরা চলে যাবার পর সুব্রতর ইচ্ছে হ'ল ও-ও একটু স্পর্শ নেয় ফুলগুলোর। বালিশ থেকে মাথাটা তুলে ডানদিকে শরীরটা একটু এগোতে গেছে অমনি কোথা থেকে স্টাফ নার্স মিস্ রায় চৌধুরী হা হা! করে ছুটে এসেছে। সুব্রতকে মৃদু তিরস্কার করেছে। আপনার না নড়া-চড়া একদম মানা। ডাক্তারবাবু বার বার বলে দিয়েছেন। অথচ আপনি কিছুতেই শুনবেন না। স্বভাবতই একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছিল সুব্রত। বয়ন্ 'স্পোর্টসম্যান' সুব্রত গুপ্ত। ওর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় একটু করুণা হয় নার্সের, ফুলদানী আর টেবিলটা আরও এগিয়ে দেয় সুব্রতর বেডের একেবারে কাছে। এবারে ইচ্ছে করলেই সুব্রত হাত বাড়িয়ে ওদের স্পর্শ করতে পারে; কিন্তু তা করেনা ও। তেমনি চুপচাপ শুয়ে থাকে। নার্স বোধহয় বুঝতে পারে। খুব নরম করে বলে—রাগ করলেন? দেখুন আপনার জন্যই তো বলা। বেশী নড়াচড়া করলে আপনার শরীর সারতে দেরী হ'বে।' 'আমার ভালোর জন্যে'—সুব্রত ভাবে—আমার ভালোর জন্যে সবাই চিন্তিত। সবাই চায় আমি ভালো হ'য়ে উঠি। স্টাফ নার্স মিস রায় চৌধুরী চান। সুব্রতর বাবা সুকান্তবাবু চান। সুচেতা চায়। ডাঃ অনুপম সেন চান। তবুও ভালো হয়ে উঠতে এতো দেরী হচ্ছে কেন সুব্রতর? ভেতরে ভেতরে অধৈর্য্য হয়ে পড়ে সুব্রত। এক এক সময়ে ওর মনে হয় কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে যায় এখান থেকে। এই হাসপাতালের চত্বরের বাইরে—মুক্ত পৃথিবীতে। পরক্ষণেই খেয়াল হয় ওরতো নড়াচড়াই বারণ। পালিয়ে যাবে কি করে?

"আজ কেমন আছ?'—বিছানার পাশে ছোট্ট টুলটার ওপর বসতে বসতে প্রশ্ন করে সুচেতা। সুব্রতর মাথায় একবার হাত বুলায় আলতোভাবে। সুব্রত গতানুগতিক বিষন্ন চোখে চেয়ে ম্লান হাসে। আর কোন প্রশ্ন করেনা সুচেতা। এই একই প্রশ্ন রোজ করে সুচেতা। আজ

দু'মাস ধরে প্রতিদিন একবার করে আসছে। প্রথম প্রথম ওর চোখে মুখে দারুণ উদ্বেগের ছায়া দেখতে পেত সুব্রত। ওকে খুশী করবার জন্যই বলতো 'খুব ভালো আছি আজ।' সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো সুচেতার সারাটা মুখ। আজকাল এসেই সুচেতা যেন করিডোরের দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘনঘন। একটু পরেই ওই পথে আসেন ডাঃ সেন। দূর থেকেই সুচেতার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় ডাক্তারের। ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বেশ বুঝতে পারে সুব্রত। সুব্রতর সঙ্গে রোজই কিছু কিছু কথাবার্ত্তা হয় ডাক্তারের। সহসা এক সময় ঘড়ির দিকে চেয়ে সচকিত হ'য়ে ওঠেন ডাক্তার। 'চলি! আজ আবার অনেকগুলো নতুন পেসেন্ট এসেছে।' তারপর সুচেতাকে উদ্দেশ্য করে বলে 'ভিজিটিং আওয়ারওতো ওভার হ'য়ে এলো। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' এরপর ওরা ধীরে ধীরে করিডোর দিয়ে এগিয়ে যায়! অনেকদূর পর্যন্ত চেয়ে চেয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখে সুব্রত। ওর মনে হয় ক্রমশঃ ওরা যতদূরে যাচ্ছে ততই আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠছে। সুব্রত আহত হ'য়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওর জায়গায় একজন বদলী খেলোয়াড় নেমেছিল কথাটা আচমকাই মনে হয় সুব্রতর।

সেদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল সুব্রতর—একটা পাখীর মিষ্টি ডাক শুনে। সচকিত হয়ে দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ও। একটু আগেই নার্স এসে ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে দিয়ে গেছে। সকাল বেলাকার স্নিগ্ধ, নরম বাতাস এসে গায়ে লাগছে। সুব্রতর ভালো লাগছে। জানালা দিয়ে তাকালেই একটা পুরানো ঝাঁকড়া নিমগাছ চোখে পড়ে। সব হাসপাতালেই কি নিমগাছ থাকে নাকি? সুব্রতর তো তাই মনে হয়। আশ্চর্য্য মিষ্টি সুরে ডেকে চলেছে পাখীটা। ফুলে ফুলে ভর্ত্তি নিমগাছটা। বাতাসে ভেসে আসে মৃদু গন্ধ। সুব্রতর মনে হ'ল এটা বৈশাখের মাঝামাঝি। এখন নিমফুল ফোটার সময়। একসময় সুব্রত দেখতে পেল পাখীটাকে ঘন ডালপালার মাঝে। একটা ছোট্ট পাখী নানা বর্ণের ছটায় ওর ছোট্ট অপূর্ব ছন্দময় শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। এ-রকম সুন্দর পাখী জীবনে কোনদিন দেখেনি সুব্রত। কিন্তু ঐ মিষ্টি ডাক? এই ডাকটা যেন ওর ভীষণ চেনা। অনেকদিন আগে কোথায় যেন শুনেছিল। কিন্তু কবে কোথায় শুনেছিলো এই মুহূর্ত্তে কিছুতেই মনে করতে পারে না। সুব্রতর ভীষণ ইচ্ছে হল একটিবার জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পরক্ষণেই ওর মনে পড়ে ডাঃ সেনের কড়া নির্দেশ—ওর নড়াচড়া একদম বন্ধ। সুব্রতর মনের সেই রামধনুর রঙ্‌টা সহসা ধূসর হ'য়ে আসে। সুব্রত যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে—এই রোগশয্যা থেকে ও আর কখনোই বের হতে পারবে না। বাইরের সুস্থ সবল বর্ণবহুল সুষমাময় মুক্ত পৃথিবীর দরজা যেন ধীরে ধীরে বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে ওর সামনে থেকে। এই হাসপাতাল, এই রোগশয্যা, নানারকম ওষুধের তীব্র গন্ধ, ষ্টেথেসকোপ, ইনজেক্‌সনের সিরিঞ্জ, ডাক্তার সেনের কড়া নির্দেশ—ষ্টাফ নার্সের সতর্ক প্রহরা সবকিছু অনিবার্য ভাবেই ওকে ক্রমশঃ আঁকড়ে ধরেছে অক্টোপাসের মতো। এর থেকে ওর মুক্তি নেই।

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

কয়েকদিনের মধ্যে জয়তী প্লেনে করে ইউরোপ রওনা হ'ল। মালপত্র যা, ভাল করেই গুছিয়েছিল। বড় ট্রাঙ্কে করে জাহাজে পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল। তার ঘরখানা বড় শূন্য দেখায়। জিনিষপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে, ঘরখানা পরিষ্কার করিয়ে শান্তা পাশের ঘরে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে আর হঠাৎ দেখতে পেলো শ্যামা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। জয়তীকে জন্ম থেকে শ্যামা আদর যত্নে ঘিরে রেখেছিল, সেই তাকে বড় করে তুলেছে। জয়তীর বিদেশে রওনা দেওয়ার বিষয় তার মত নেওয়া হয়নি ব'লে সে নিতান্তই দুঃখিত।

'আজকালকার মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলে বড্ড স্বাধীন হয়ে যায়, তাই তো এভাবে......' শ্যামা চাপা গলায় কি বলতে যাচ্ছিল শান্তা বাধা দিয়ে বলল—

চুপ কর শ্যামা, তুমি এ ধরণের একটি কথাও বলবে না, ঘরের বাইরে ঘরের একটি কথাও যেন শোনা না যায়।' শান্তা বেশ শাসনের সুরে কথা বলে। শ্যামা ক্রমাগত চোখ মুছে যাচ্ছে আর বলছে—'আমায় কি চেন না তুমি মা? অন্য চাকর-ঝিদের মত ভাবো আমায়? এ বাড়ীর ভালো মন্দ কোন কথাই আমার মুখ থেকে কোথাও যাবে না, আমি অন্য ধরণের মানুষ, এতদিনেও বুঝলে না?' শান্তা ধীরে ধীরে শ্যামার পিঠে দু একবার হাত বুলিয়ে বেরিয়ে গেল। নিজেও চোখের জল সামলাতে পারছিল না।

* * * *

জয়তী লণ্ডনে পৌঁছতেই মন্নুয়া তাকে এয়ার পোর্ট থেকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল।

'কত কথা যে বলবার আছে মন্নুয়া'—জয়তী উচ্ছ্বসিত হয়ে গল্প করতে লাগলো।

'বোম্বের থেকে কী খবর এনেছো বল?' মন্নুয়া যোসেফের কথা জানবার জন্য ব্যগ্র। জয়তী বলল 'ছোটদা গত সপ্তাহে বোম্বে গিয়েছিল। যোসেফ নাকি খুব উন্নতি করেছে, তার চিত্র প্রদর্শনীতে বহু লোক এসেছিল, সংবাদপত্রেও প্রশংসাই করেছে।'

"এখানে আসবে বলেছে কি?" মন্নুয়া জিজ্ঞেস করলো।

"কে জানে? তোমার একটি ফটো তার টেবিলের ওপর রেখেছে নিত্য দেবী দর্শন হচ্ছে! ছোটদা সেই ছবি দেখে আমায় বললো—তোর বন্ধু মন্নুয়া তো বেশ সুন্দর দেখতে! আমি কিন্তু সাবধান করে দিলাম যোসেফকে কিছু যেন না বলে! হয়তো মারামারি হয়ে যেতে পারে তাহলে। কি বল?"—নূতন আবহাওয়ার মধ্যে এসেই জয়তীর মনের ও মেজাজের পরিবর্তন হ'ল, ঠিক যেন একটা বহু দিনের পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হতেই সে একটা গরম ব্লাউজ পরে বসলো। ঘন নীল রঙের শালখানা জড়িয়ে নিল, কিন্তু তাতেও যেন শীত গেলো না। চেয়ার থেকে ছোট কোটটা তুলে নিয়ে ভাল করে পরে নিল। ধীরে ধীরে পা দুটি একত্র করে আরাম করে বসল।

'ক'লকাতার খবর দাও জয়তী! দিল্লী বোম্বে—কোথায় বন্ধুরা সব—মীনার বিয়ে হ'ল নাকি?'

'হ্যাঁ নীনা সেই রিসার্চ স্কলার (Research Scholar)কেই বিয়ে করলো—বর বেচারা স্কেচ বা অয়েল পেণ্টিং-এর পার্থক্য বোঝে না। প্রেমের ব্যাপারে এ সব অতি তুচ্ছ যা দেখছি। শুনি তো বেশ আনন্দেই আছে। তবে নীনার ছবি আঁকার বিষয় আর কিছু শুনি না—হয়তো সে সব লোপ পেয়েছে।' জয়তী অনর্গল কথা বলে চলেছিল তারপর একটু ঢোক গিলে বললো—

'মনুয়া একটা কথা তো বলিনি তোমায়, অলোক এসেছিল ক'দিন আগে—আবার সেই কথা, সেই তর্ক, আর ভুল বোঝা। আর বোধ হয় দেখা হবে না মনে হয়। তাকে বিয়ে করব কথা দিতে পারলাম না—মনুয়া, আমি ভাই কিছুতেই মনস্থির করতে পারলাম না। মানুষটাকে কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে মনে হয় আমার সবটাতে বাধা দেবে। শিল্পকলায় কোন আকর্ষণ নেই তার তাও জানি।' মনুয়া উত্তর দেবার জন্য উৎসুক হয়েই ছিল—

'কিন্তু পুরুষের উদ্ধতভাব কিছু অস্বাভাবিক নয়—যোসেফও মতামত সম্বন্ধে বেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিন্তু আমি বিয়ে করতে চাই তাকেই ভালোবাসি। prsonality থাকলে পুরুষ মতামত প্রকাশ করবেই। মেয়েরাই কি করে না?'

'তোমার মা বাবার অমত কেন এ বিয়েতে?'

'যোসেফের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে অনেকদিন। অনেকেরই ধারণা যোসেফেরই দোষ কিন্তু তা নয়।' উত্তর দিল মনুয়া। 'ওর একটি বন্ধুর সঙ্গে যোসেফের স্ত্রীর সম্পর্কটায় কিছু রহস্য ছিল, গুপ্ত প্রেম বোধহয়, অশোভন অনেক কিছুই করেছে সে, অবশেষে স্ত্রীর অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে আলাদা হয়ে যায়। আর্টিস্টদের বিষয় মন্দ সব কিছুই বিশ্বাস করা সহজ—তাদের নামে বাজে কথা বলবার লোকের কোনই অভাব নেই।'

মনুয়ার চোখ ছলছল করে উঠলো—তাই দেখে জয়তী কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে এই ঘটনার বিষয় কিছুই বিশেষ জানতো না। সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'যোসেফের যে স্ত্রী ছিল এ কথা আজ প্রথম শুনলাম। কিন্তু তুমি যদি তাকে ভালোবাস তোমার তার ওপর বিশ্বাস থাকা স্বাভাবিক। এখন তো সে একা।'

যোসেফের প্রথম বিয়ের কথা জানতে পেরে জয়তী রীতিমতো আশ্চর্য হয়েছিল কিন্তু মনুয়াকে সে সব মন্তব্য সম্পূর্ণ খুলে বলতে পারলো না। মনুয়া যে যোসেফের প্রথম প্রেয়সী নয় এ কথা জেনে তার ভালো লাগলো না। আধুনিক অনেক কিছুই জয়তী সমর্থন করেছে কিন্তু এক্ষেত্রে তার আঘাত লাগলো। সে ধারণাই করতে পারলো না যোসেফের জীবনে অন্য কেউ ছিল। স্ত্রীকে যোসেফ নিশ্চয় ভালোবেসেছিল—মনুয়া কি তার বিষয় কিছুই জানতে চায় না? অতি ছোট গণ্ডির মধ্যে জয়তী মানুষ হয়েছে—কত বিভিন্ন সমস্যা ও কত প্রকারের প্রেম যে মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় সে এই প্রথম তার একটু পরিচয় পেল। মনুয়া ও যোসেফের প্রেমের মধ্যে সে রোমাঞ্চকর বিশেষ কিছু খুঁজে পেল না।

'মনুয়া, তুমি কতদিন যোসেফকে চেনো?' জয়তী অকস্মাৎ এ কথা বলে উঠতে মনুয়া যেন চমকে উঠলো। 'জয়তী আমার যোসেফকে ভাল লাগা ও বিয়ে করার ইচ্ছাটা তোমার যেন ভাল লাগছে না? বিশ্বাস কর সে আমাকেই ভালোবাসে। তুমি জানো বোধ হয় সে লণ্ডনে, প্যারিসে, জার্মানিতে সর্বত্রই থেকেছে ও কাজ করেছে, মন তার শিল্প জগতেই ঘোরে কিন্তু তার স্বভাবে একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার কিছুমাত্র অভাব নেই, আমি জানি সে আমাকে একান্তই চায়। স্বদেশের প্রতি তার প্রবল টান আছে, যদিও দেশে ফিরে এসেই সে নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। শিল্পীদের পরশ্রীকাতরতা দেখেছে, খৃষ্টান বলে কোন কোন ক্ষেত্রে একমত হতে পারেনি তারপর আবার পারিবারিক অশান্তি। সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজ সে যে প্রান্তে এসেছে তাকে সেইখানে দেখো। তাকে চিনতে পারবে এই চিঠি খানার কয়েকটি লাইন পড়লে।'

মনুয়া যোসেফের চিঠি পড়তে শুরু করলো।

'ইউরোপে থাকো আমেরিকায় কাজ কর আর যেখানেই যাও, মনে রেখো আমাদের দেশের মতো দেশ কোথাও নেই। বলতে পার স্বদেশ বলেই তাকে ভালোবাসি—শুধু ভালো বলেই নয়। আমাদের পূর্ব পুরুষের কতশত প্রাচীন তত্ব, পুঁথি ও শাস্ত্র—আছে পরশ পাথরের মতো সে সব অমূল্য। সেই তো আমাদের ঐশ্বর্য আর এই সংস্কৃতির মধ্যেই প্রবল প্রেরণার উৎস। আর কোথায় পাবে সেই আদি শক্তি? যত শীঘ্র পার কাজ শেষ হলেই চলে আসবে, এখানেই শিল্পের চর্চা আরম্ভ করবে। পশ্চিমের আলো যেন সব বিবেক না ভুলিয়ে দেয় সতর্ক থেকো বিদেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের আদর্শকে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য, শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা অতি প্রয়োজন। প্যারিসের চিত্রকরের কলাকৌশল যেন তোমাকে বোকা না বানায়—নিজের ষ্টাইল রক্ষা ক'রো।'

মনুয়া জয়তীর দিকে তাকিয়ে দেখল সে যোসেফের চিঠিখানা মনদিয়েই শুনছিল। জয়তীরও বুঝতে বাকি রইল না যে যোসেফের আদর্শবাদ মনুয়াকে মুগ্ধ করেছে। যোসেফের প্রতি মনুয়ার অপরিসীম অনুরাগের পরিচয় পেয়ে জয়তী যেন অনুমান করতে পারলো সে নিজে অলোককে অতি সামান্যই ভালোবেসেছিল।

'কি জানি ভাই, ঠিক ভালোবাসতে পারলাম না কাউকে এখনও, আমি বোধহয় নিজেকে বুঝতে পারি না, এই বলে জয়তী চুপ করে রইলো।

এদিকে আমেরিকা থেকে মনুয়ার কাছে এক নিমন্ত্রণ পত্র আসাতে দুইবন্ধুরই নূতন সমস্যা এসে পড়লো। মনুয়া জয়তীকে এসে তার কাছে থাকতে বলেছিল আর বিদেশ থেকে ঠিক এই সময়েই নিমন্ত্রণ এলো। এক শিল্পানুষ্ঠান থেকে মনুয়াকে অনুরোধ করেছে এক বছর কোন একটি বিশেষ শিল্পকলা শেখাতে হবে। চাকরীটি সামান্য হলেও অভিজ্ঞতার দিক থেকে মূল্যবান। মনুয়াকে যেতেই হবে—দ্বিধা করলে চলবে না। আমেরিকা যাবার পথে সে প্যারিসেও কয়েকমাস থেকে যাবে। যোসেফের বিষয় ভালো করে জানতে পেরে জয়তী প্রশ্ন করলো—

'মনুয়া, যোসেফের সঙ্গে তোমার বিয়ে হওয়া কখনো কি সম্ভব?' মনুয়া বিরক্ত হয়ে বলল—'কেন এ প্রশ্ন করছো তুমি জয়তী? যেদিন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো, বাড়ী থেকে একটি কড়িও চাইবো না, সেদিনই যোসেফকে বিয়ে করতে পারবো, এখনও বাড়ী থেকে টাকা আসে তাই বিয়ে করছি না।'

'কেন? তুমি এখন বেশ স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে পারো, সেটুকু শক্তি তোমার আছে আমি বিশ্বাস করি।' জয়তী মনুয়াকে উৎসাহ দিতে দ্বিধা করলো না।

'কিন্তু জয়তী এই flatএর ভার যদি তুমি নাও, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই তাহলে রওনা দিই।'

জয়তীর বুঝতে বাকী রইলো না যে মনুয়া আমেরিকা যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে, সে যদি এই ঘর আগলাতে রাজী হয় তাহলে মনুয়া খুশী হয়। সে বন্ধুকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক এবং তাই স্পষ্ট করে বলল—'একা থাকবো এখানে তা তো ভাবিনি কিন্তু তোমার এমন সুযোগ হারালে চলবে না। আমি আর একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে থাকবো বিশেষ একা লাগবে না তাহ'লে। তুমি ভেবো না—আমার কোন অসুবিধা হবে না মনুয়া।'

মনুয়া জয়তীর কথায় আশ্বাস পেলো এবং বেশ নিশ্চিন্ত হ'লো। সারা সপ্তাহ দু'টি বন্ধু এক দণ্ড বিশ্রাম করেনি, কত যে প্রাণের কথা ছিল তার অন্ত নেই। বন্ধু-বান্ধবদের খবর দেওয়া হ'ল একত্রে খেতে আসতে। নানান দেশের ছেলে মেয়ে জড়ো হয়েছে—ভোজন শেষ হলে, নাচ, গান করে তারা চারিদিকে মাতিয়ে তুললো। আমোদ-প্রমোদে হাসি-গল্পে ও প্রেমের উচ্ছ্বাসে ঘরখানা অপরূপ ধারণ করলো। প্রত্যেকেরই ভিন্ন মতামত চালচলন, ধর্মশিক্ষা ও সংস্কার, কিন্তু শিল্পীরা একত্র হলে এসব প্রভেদ ভুলে গিয়ে স্ফূর্তি করতে জানে, পরস্পরের সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারে। জয়তী এই দলটির সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারলো। বন্ধুদের আন্তরিকতা তাকে মুগ্ধ করলো।

মনুয়া জয়তীকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলতে চায়—যোসেফের চিঠিগুলো কোথায় কার ঠিকানায় পাঠাবে তা ভাল করে বুঝিয়ে দিল। মনুয়াকে প্লেনে তুলে দিয়ে জয়তী বাড়ী ফিরে আসছে, ঘরখানা অন্য রকম করে সাজিয়ে রাখবার প্রবল ইচ্ছা তার। চেয়ার, টেবিল কার্পেট প্রভৃতি যা সব জিনিসপত্র ছিল সব স্থান বদল হল। বইগুলো যেভাবে ছিল সেইভাবে আর রাখলো না। ঘরখানা এমন ভাবে গুছিয়ে নিল যেন কলকাতার ঘরখানার প্রতিচ্ছবি। সে কি তার অতি আপন গৃহ কোণের কথা আজ ভাবছিল? মনুয়া চলে যাওয়াতে হঠাৎই যেন সে উন্মনা হয়ে গেল, আজ অলোকের কথা কি জানি এমনভাবে ঘুরে ফিরে মন অস্থির করছিল কেন? কখনো তো সে এমনভাবে অলোককে চায় নি। যত কাজ ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবই তো সারা হ'ল, তবু যেন মনটা আজ বিষণ্ণ। এই নৈরাশ্য তার ভাল লাগে না। আর্ট স্কুলে অনেক ঘণ্টার রুটিন বাঁধা কাজ, আর ঘরের কাজও কম নয়, দিনটা নিমেষের মধ্যেই কেটে যেতো। একটু যেদিন সময় পেতো, অসম্পূর্ণ ছবিখানা নিয়ে বসতো, শেষ হয়নি সেই ছবি আজও। লণ্ডনের মত স্থানে বসে, শ্যামার মুখই তার নিত্য মনে পড়ছে। তার একার জীবনের সূত্রপাত এখানেই কিন্তু লণ্ডনে সহজেই একা বোধ হয়। পুরো মাত্রায় স্বাধীনতা পেয়েছে সে চারিদিক নিরিবিলি নিস্তব্ধ নির্বিঘ্ন। নূতন আবহাওয়ায় ক্রমশ সে অভ্যস্থ হয়ে গেল।

ভোর বেলা উঠে জয়তী পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে উষার আলোর প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু এ তো আর কলকাতার রৌদ্র মাখানো আকাশ নয়—চারিদিক তখনও বেশ অন্ধকার। অল্প সময়ের মধ্যে স্নান ও চা খাওয়া সেরে নিতে সে ব্যস্ত, ছবি আঁকার জন্য মন চঞ্চল হয়ে আছে। দরজাটি বন্ধ করে শান্ত হয়ে পেছন ফিরে বসলো, সামনে easel। বেশ উৎসাহে হাত চলছিল কিন্তু দরজায় কে যেন সজোরে ধাক্কা দিল। নীচের তলায় ছোট একটি ভিয়েনিজ্ মেয়ে থাকে, সর্বদাই জয়তীর ছবিগুলো সে দেখতে চায়—আজও সে প্রবেশের অনুমতি চাইছে জয়তী বুঝলো। জয়তী মুখ না ঘুরিয়েই তাকে বলল—'চলে এসো—এই সবে বসেছি।'

পুরুষের ভারী গলায় কে উত্তর দিল—'আমি যোসেফ—আসতে পারি? মনুয়ার খোঁজে এসেছি—সে কোথায়?' মনুয়ার ঘরে অন্য একজন মেয়ে বসে ছবি আঁকছে দেখে যোসেফও বেশ অবাক্ হয়ে রইলো। একত্রিশ বা বত্রিশ বছরের একটি যুবক এসে দাঁড়াল। পরিষ্কার ছাঁটাকাটা সরু লম্বা দাড়ি ও প্রশান্ত চেহারা। অপ্রস্তুতভাবে এগিয়ে এসে ক্ষমা চাইলো।

'মনুয়া আমায় জানায়নি সে এখানে নেই, আপনাকে ব্যস্ত করলাম তাই খারাপ লাগছে, তার খবর যদি কিছু দিতে পারেন তাই ভাবছিলাম। আপনি তো মনুয়ার বন্ধু যিনি কলকাতায় থাকেন?' দাড়িতে সামান্য একটু হাত বুলিয়ে যোসেফ তার সলজ্জভাব সামলিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। জয়তী তাকে বসতে অনুরোধ করলো।

'হ্যাঁ আমি জয়তী রায়, কলকাতা থেকেই এসেছি—মনুয়ার সঙ্গে থাকতেই এসেছিলাম কিন্তু সে তো (States) স্টেটস্—এ চলে গেছে, প্যারিসেও কিছুদিন থাকবে তার ইচ্ছা। সে আপনাকে এ বিষয় কিছু জানায় নি? আপনার কথা ওর কাছে সর্বদাই শুনতে পাই, আমাকে এখানে এসে থাকতে নিমন্ত্রণ করেছিল মনুয়া। কিন্তু বেচারাকে যেতে হ'ল অনেক দিনের জন্য।

'কতদিন থেকে আপনার মনুয়ার সঙ্গে পরিচয়'? বলে যোসেফ হেসে উঠল। 'ওর তো কোন কিছু ঠিক থাকে না খামখেয়ালি সে কখন যে কোথায় থাকবে কেউ জানে না, কিন্তু আমার এখন রীতিমত রাগ হচ্ছে ওর ওপর। অবিশ্যি আমি যে আসবো সে কথা তাকে আমিও জানাতে পারি নি, কারণ হঠাৎই ঠিক করে চলে এলাম। লণ্ডনে একটা প্রদর্শনীর জন্য আসতে অনুরোধ করেছিল এরা, তাই এসে পড়লাম।' জয়তী সব কিছু বিস্তৃতভাবে জানতে পারলো।

যোসেফের ব্যবহারে ও কথাবার্তায় সে বেশ মুগ্ধ হ'ল। জয়তী, ক্রমশঃ বুঝতে শিখল যে শিল্পীরা অল্পসময়ের মধ্যেই মন ঠিক করে এদিক ওদিক যায়—সে একাই খামখেয়ালি নয়।

'মহুয়াও হঠাৎই এই নেমতন্ন পেয়েছিল তাই চলে গেল মন ঠিক করে।'

'কিন্তু মহুয়ার এখন উচিৎ ছিল দেশে ফিরে যাওয়া, বোম্বেতে আমি আছি, সে তো কিছুই স্থির করতে পারে না কোন বিষয়। ভেবেছিলাম রোমানেসক্ ফ্রেসকোগুলি (Romanesque Fresco) তাকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে যাবো—এ বিষয় যে কতদিন পড়াশুনা করেছি তার হিসাব নেই। গীর্জার ভেতরের অপূর্ব চিত্রমালা আমার কৈশোরের ধ্যান ও স্বপ্ন ছিল। কত যে দেখেছি তবু যেন ক্লান্তি হয় নি এই প্রাচীন পদ্ধতির বিচিত্র ছবিগুলি আমার শৈশব স্মৃতির অঙ্গ—শিল্পীর এ যেন আরাধনা, গভীর সাধনা, সূক্ষ্ম কাজের মধ্যে দিয়ে চিত্রকর মহাশক্তির কাছে তার জীবনের অনুভূতি প্রকাশ করতে চায়, সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করতে চায়। এই অপরূপ সৃষ্টির অন্তরালে কত যে কঠোর তপস্যা ও সাধনা তা কে জানতে পারে। সেই তো পূজার মন্ত্র ও পুষ্পাঞ্জলি। আমাদের দেশের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে যে সব সূক্ষ্ম কার্যকলা দেখা যায় সেও সুদক্ষ গ্রাম্য শিল্পীর দৈবশক্তির কাছে আত্ম নিবেদন।

জয়তী যোসেফের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলি মন দিয়ে শুনতে লাগলো, ফ্রেসকোগুলি সে যেন চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। অন্তরের গভীর আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে যোসেফ কথা বলছিল, জয়তীর বড় ভাল লাগলো। জয়তী খানিক অভিভূত হয়ে ভাবছে—'যোসেফের ধর্মে বিশ্বাস আছে—সে নূতন যুগের শিল্পী হতে পারে কিন্তু আধুনিক জগতের নাস্তিকদের চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত নয়'।

চিন্তার স্রোত রুদ্ধ করে জয়তী বলে উঠলো—'ফ্রেসকোগুলি শুনেছি অতি সুন্দর' আমি নিশ্চয়ই যাব দেখতে'—চেয়ারখানা যোসেফের কাছে নিয়ে এসে তার পাশেই বসলো—মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনতে লাগলো।

'আরও একদিন শুনতে চাই এ বিষয়' জয়তী অনুরোধ করল।

'আর একদিন সব বলবো' এই বলে যোসেফ সেদিনকার মত বিদায় নিল।

পরদিন সকালে যোসেফ টেলিফোন করে জয়তীকে খবর দিল যে তারা আট দশজন বন্ধু মিলে মিউজিয়াম দেখতে যাবে, জয়তী তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে কি?'

শুক্রবার সকাল। সূর্যের আলো চারিদিকে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কমই হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, গাছের পাতাগুলি কখনও দুলছে কখনও পড়ছে যেন যৌবন মদে মত্ত। যুবক-যুবতীদের সরস হৃদয়ে নানান রহস্য এনে দিল—সারাদিন ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখা হ'ল, সকলে মিলে ফুর্তি করে খাওয়া হ'ল। দিনান্তে সকলে জয়তীর ঘরে গিয়েই জুটলো। কেউ লেখক, কেউ চেলো বাজায়, কেউ ভাল গাইয়ে। এরই মধ্যে কয়েকজন চিত্রকলায় রীতিমত পটু। বন্ধুগুলির গুণের অন্ত নেই—জয়তী এদের সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করার সুযোগ পেল। ভীরা নামে পার্শী মেয়েটি লণ্ডনে অনেকদিন রয়েছে, তার সহপাঠী ইংরেজ ছেলে স্টীফেনকে (Stephen) সে বিয়ে করবে সব ঠিক, তাই লণ্ডন ছাড়তে পারছে না। দু'জনে একত্রে আর্ট স্কুলে পড়ছে। কর্ডিয়া উয়োগোস্লাভিয়া থেকে এসেছে, শিল্পকলা শিখবে বলেই আছে। মন তার খুব উদার। স্পষ্ট কথা বলতে তার কোন সময়েই দ্বিধা নেই। অতি স্নেহপরায়ণ মন তার, অল্পদিনের মধ্যেই জয়তীকে সে আপন করে নিল। রাত তিনটে বাজতে সকলে বাড়ী ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'ল, ভীরা আর কর্ডিয়া সেই রাত্রে জয়তীর কাছেই থেকে গেল। অন্য সকলে এক এক করে বাড়ীর দিকে রওনা দিল।

এক সপ্তাহের মধ্যে যোসেফের চিত্র প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন হবে—একমাত্র তার আঁকা ছবিই দেখানো

হবে। নানান স্থানের শিল্পীরা তাকে অভ্যর্থনা করে এনেছে, নবীন শিল্পীদের মধ্যে যোসেফ বেশ নাম করেছে সন্দেহ নেই। জয়তীরও স্টিফেনের ফ্ল্যাটে যোসেফের ছবিগুলি বন্ধ ছিল, সব একত্র করে নিয়ে আসা হ'ল। প্রদর্শনী সংক্রান্ত সব কিছু কাজের ভার জয়তীই নেবে কথা দিল।

যোসেফের ছবিগুলি দেখতে দেখতে তার জীবনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ভালো করে অনুমান করা যায়। স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল সে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান কোন ধর্মেরই প্রতি উদাসীন নয়। উদারতা তার স্বভাবের বিশেষ একটি গুণ। হিন্দুদের শাস্ত্র ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ ধর্মের জাতক ও শীলের প্রতাপ, কোরাণের মূলতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য বা শিল্পকলা, বাইবেল বা স্ক্রীপচার—সবই সে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন ধর্ম তত্ত্বের বিষয় তার বেশ পড়াশোনা ছিল মনে হয়। খৃষ্টান ধর্মের ক্ষমাশীলতা, বেদ ও গীতার মহাবাণী, প্রত্যেক ধর্ম যেন শুভবার্তা ও মাঙ্গলিক গীতি বহন করে যোসেফকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সে সর্বদাই বলছে—

'প্রত্যেক ধর্মেরই উদ্দেশ্য অন্তরকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা।' দৈবশক্তির পরশ যেন তাকে অনেকক্ষণ জাগ্রত রাখতো, মনকে কখনো সে দমতে দেয় নি, ভাঙতে দেয় নি। পরাজয় তাকে বহুবার নূতন করে বিশ্বাসের পথে অগ্রসর করেছে, সে জানে অটল বিশ্বাসই গায়ককে, শিল্পীকে, লেখককে তার বিশেষ স্থান খুঁজে নেবার প্রেরণা এনে দেয়। চেষ্টার দ্বারা মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মহামানবের মহান তেজ বিন্দু বিন্দু করে বাড়িয়ে তুলতে হয়, নইলে কোন দিকই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয় না।' জয়তী এ বিষয় ভাবতে শুরু করল—আত্মবিশ্বাস কত বড় প্রেরণা তাই ভাবছিল।

ছবিগুলি সাজান শেষ হ'ল। বিদেশী দর্শকদের যোসেফ বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি সাঙ্কেতিক চিত্র দেখালো। বিশাল চিত্রপট রাধা ও কৃষ্ণের লীলা। ক্যানভাসের একটি ধারে শুধু নীল—অন্যদিকে প্রেম ও ভক্তির প্রতিচ্ছবি রাধা—উজ্জ্বল সোনালি আলো। রাধিকার কলসী যমুনার কালো জলে মৃদু মৃদু দুলছে ধীরে অতি ধীরে। সংসারের সব বন্ধন মায়া ছিন্ন করে রাধিকা যাঁর আশায় দীর্ঘ দিবস বসে আছেন তিনিই সত্য। পুণ্য প্রেমের দীপ্তি, অলৌকিক রঙের খেলায় প্রকাশিত হয়েছে। রাধা ও কৃষ্ণের বিরহ মিলন লীলা যে ঈশ্বর ও মানবের চিরন্তন প্রেমেরই কাহিনী, যোসেফ বিদেশী দর্শককে বৈষ্ণব পদাবলীর উদাহরণের দ্বারা তা বুঝিয়ে দিল।

দ্বিতীয় চিত্র—বুদ্ধদেবের ধ্যানী মূর্ত্তি, কত সহস্র যুগের সাধনার ফলে এই প্রশান্তি, কোথাও গ্লানি নেই—নিঃস্পন্দ নির্বাক নিমীলিত আঁখি। মুগ্ধ নেত্রে বিদেশী শিল্পী বুদ্ধের জরাশূন্য সৌম্যমূর্তির দিকে চেয়ে আছে—চিত্রটি ছেড়ে সে যেন আর যেতে পারছে না। জাতকের গল্পগুলিও নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যোসেফ। বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস বিশেষভাবে গবেষণা করেছে বোঝা যায়। কয়েকদিন ধরে জয়তী এই বিশাল চিত্রগুলির মধ্যেই যেন বসবাস করছিল, প্রত্যেকটি যত্ন করে যথাস্থানে সাজিয়েছে—অপরকে দেখিয়েছে। এই কাজে সে বড় তৃপ্তি পেয়েছিল বলাবাহুল্য। সে আশা করেনি, কোনদিন এমন সুযোগ তার হবে, গুণী শিল্পীর সঙ্গে কাজ করে মনের সুখ হ'ল তার। এ কয়দিনের পরিশ্রমের ভিতর সে যে বিশেষ আনন্দ পেয়েছিল। যোসেফ তা কিছুই জানতে পারেনি। জয়তী যোসেফের চিত্রগুলি গভীর শ্রদ্ধার সহিত উপভোগ করেছিল এবং তার কাজের দক্ষতা ও স্বভাবের ঔদার্য্য প্রতিমুহূর্তেই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু যোসেফ তা কণামাত্রও টের পায় নি। অন্য চিত্রগুলি নিরীক্ষণ করে এবং তার অর্থ বুঝে দর্শক আনন্দ লাভ করুক, স্বদেশের সম্মান বৃদ্ধি হোক কেবল এই কথাই যোসেফ কামনা করেছিল। প্রদর্শনী শেষ হবার পর জয়তীকে সে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেনি।

কোন্ মুহূর্তের উতল হাওয়া, কোন্ আকাশের আলো, কোন্ গাছের শ্যামলতা, কোন্ পাখীর ডাক যে যোসেফের মনে কখন উৎসাহের বন্যা এনে দেবে কেউ তা অনুমান

করতে পারতো না। কোনদিন গগনপটে কালো ঘন মেঘ দেখেই তার আনন্দের সীমা নেই। কোনদিন একটি গাছ নিয়েই সারাদিন সে পড়ে রইলো। তার চরিত্রের মধ্যে এমন একটি পূর্ণতা ছিল যে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র বস্তর মধ্যে সে সরসতা খুঁজে পেত, অথচ কোন বিশেষ একটি স্থান, মানুষ বা জিনিস নিয়ে অতিরিক্ত জড়িয়ে পড়তো না। ঈর্ষা, অহংকার, নৈরাশ্য, অতিবাসনা বা প্রলোভন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সরল বন্ধুত্বের পরশ দিয়ে পরকে সে আপন করে নিতো এবং অন্যকে সুখী করতে চাইত। জয়তী যোসেফকে যেভাবে বুঝেছিল, বন্ধুরা এত ভাল করে কেউ তাকে চেনেনি। যোসেফ স্বভাবতই বন্ধনমুক্ত—তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একমাত্র চোখে পড়েছিল জয়তীর। অথচ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যোসেফের প্রতি আকর্ষণ তার দিন দিন বেড়ে উঠেছিল। যোসেফ মন্নুয়ারই বন্ধু এবং সেই সূত্রেই যোসেফের সঙ্গে জয়তীর আলাপ ও যোগাযোগ, কিন্তু আজ সে তার এত নিকট হয়ে উঠলো কেমন করে? জয়তীর মনে এই প্রশ্নটি বহুবার খোঁচা দিল, মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, চুপ করে বসে নানা কথা ভাবতে লাগল।

'ও রকম গম্ভীর মুখ করে বসে পড়লে কেন জয়তী?' যোসেফ সেদিন লক্ষ্য করল জয়তীর মন কেমন জানি ভারাক্রান্ত।

'আমি কিন্তু ও রকম হাঁড়িমুখ পছন্দ করি না'— যোসেফ বেশ জোর গলায় জয়তীকে বকে উঠলো।

'চারিদিকে সৌন্দর্য আমাদের ঘিরে আছে, কাম্য বস্তু অফুরন্ত, কিন্তু জীবনে অনেক কিছু আশা কোরো না, তাহলেই দুঃখ পাবে।' জয়তী আর চুপ করে থাকতে পারলো না—

'কে বলেছে আমার মনে দুঃখ? সব সময় অকারণে হাসিমুখ দেখাতে হবে এই কি তুমি চাও? আমি বেশ ভালই আছি।' শিল্পীরা একটু নাম করলে মানুষের মনের চিত্র আঁকতে চায়—সে চেষ্টা করো না।

যোসেফ বিশ্বাস করলো না—'তোমার মুখখানায় প্রসন্নতার বড় অভাব, যদি সত্যিই না গুমরোতে চাও তবে ভালোই, কিন্তু মানুষকে ভালমন্দ নানান মেজাজে দেখাই ভাল। সব কিছু থেকে রস গ্রহণ করতে পারলে জীবনে অনেক কিছু রস পাওয়া যায়—হাসিমুখই বল, আর রাগী চেহারাই বল। সে হাসতে লাগল। সবই তো পরিবর্তনশীল, রাত হয় দিন, মেঘ হয় জল, ঢেউয়ের মতো সবই আসছে আর যাচ্ছে। পাগল প্রফেসারের মত বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি—রাগ করো না জয়তী—কান্না পেয়ে গেল নাকি?' যোসেফ খুব হাসতে লাগলো, কিন্তু জয়তীর মুখ ক্রমশঃ রাঙা হয়ে উঠলো। সে তো যোসেফের মত হাসতে পারছে না—কি যে বলবে ঠিক করতে পারল না। নিজেরই ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—'ভালো লাগে না যোসেফ, তোমার তত্ত্ব আমি বুঝি না।'

'একদিন তোমার ও মন্নুয়ার সঙ্গে আমার নিজস্ব তত্ত্ব খুলে আলোচনা করবো।' যোসেফ জয়তীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলো সে যেন কি রকম ভীত হয়ে বসে আছে, কোন সমস্যা তাকে হয়ত পীড়া দিচ্ছে। সে একটা দুটো সংবাদপত্র টেনে নিয়ে বলল—

'কাজ শিখে নিয়ে দেশে ফিরে যেও শীঘ্র'—যোসেফ এই বলা মাত্রই জয়তী উত্তর দিল— 'তোমার সাহায্য ছাড়া আমার কিছুই হবে না এখানে মনে হয়।'

'তোমরা স্বাধীন হতে চাও না? মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াবে না কেন? একা নিশ্চয় পারবে।' হাতে এক টিন সিগারেট ছিল, একটি টেনে নিয়ে আগুন ধরাল। গলাটা পরিষ্কার করে যোসেফ বলল—'আমি শীঘ্রই লণ্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমার কাজ সব শেষ হয়েছে এখন গেলেই ভাল। তোমার তো এখন অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

'ভেবেছিলাম তোমার ওপর নির্ভর করতে পারবো, মন্নুয়াও চলে গেল। তোমার সাহায্য পেলে ভালোই হ'ত।' কথাগুলো যোসেফের ভাল লাগল না যদিও তবু যেন মনটা ছুঁলো।

স্বাধীনতা যতটা চেয়েছিল জয়তী সে তুলনায় মনকে শক্ত করতে পারে নি। বিদেশে একা পড়তেই সে কোন

সঙ্গীর জন্য আকুল হতে লাগল, চোখ দু'টির মধ্যে তার দ্বিধা, অসহায় ভাব, নিজের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছিল না। একা এখানে থাকতে অতি বিশ্রী লাগছে, সে বলে উঠলো হঠাৎ।

'তবে তুমি লণ্ডন ছেড়ে চলে যাও। আমার তো যেতেই হবে শীঘ্র।' যোসেফের কথায় বেশ দৃঢ়তা প্রকাশ পেলো। জয়তীর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো যোসেফকে সে এত আপন করতে চাইছে কেন? যোসেফ তার মনের দুর্বলতার একটুও আভাস যদি পেয়ে থাকে এই মনে করে সে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

'আমিই এখান থেকে ফিরে যাবো।' জয়তী বলল।

'কেন জয়তী?' যোসেফ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়লো, জয়তীকে সে আঘাত দিতে চায় না কিন্তু তার দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেও সে নারাজ। কেমন একটা অপ্রতিভ অবস্থা—কষ্টও হ'ল জয়তীর জন্য। সে যে স্বাধীন ভাবে থেকে একটুও অভ্যস্থ নয়—স্পষ্টই বোঝা গেল।

'মহুয়া তোমার এত বন্ধু জয়তী, আমি এখানে আর বেশীদিন থাকলে একটা মনোমালিন্য ঘটতে পারে। আমি কালই যাবো।' যোসেফ শান্তভাবে জয়তীকে কথাগুলি বলে চলে যেতে চাইল। জয়তী বুঝতে পারলো যোসেফ তার সমস্যার কথা জানতে পেরেছে, সে যে খানিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে যোসেফ তা অনুমান করেছে সন্দেহ নেই। নিজের ওপর ঘৃণা হল, রাগ হ'ল, কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না। ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিল, খাঁচার পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। যোসেফের মন করুণায় ভরে উঠলো বটে কিন্তু জয়তীকে সে তা ঘুণাক্ষরেও জানতে দিল না। ধীরে ধীরে বলল—জয়তী আমায় বিশ্বাস কর, মহুয়াকে কিছুই বলবো না। তুমি কিসের জন্য নিজেকে এইভাবে শাস্তি দিতে চাও?' জয়তী চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না। অর্থহীন অশ্রুধারার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল, সে আকুল নয়নে খানিকক্ষণ কাঁদল। বহুদিনের ঘাত প্রতিঘাত, বসতবাড়ী ছেড়ে আসার দুঃখ, পারিবারিক মনোমালিন্য, বহুদিনের নৈরাশ্য সব মনে পড়তে লাগল। কিন্তু এই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের কালিও সব মুছে গেল। নূতন করে আশা জাগলো, সাহস ও শান্তি ফিরে এলো। তার অশান্ত মন এমনই একটা শান্ত দিন খুঁজেছিল যেদিন সে অন্তরের নিবিড় ব্যথাগুলি জয় করতে পারবে। কান্না তার অনেক দিনের, শুধু এই মুহূর্তের নয়। কারুর সমবেদনার জন্যই যেন জয়তী প্রতীক্ষা করছিল। মন তার হালকা বোধ হল অবশেষে।

যোসেফ লণ্ডন ছেড়ে চলে গেল। ক্রমশঃ

আর্ণল্ড জে. টয়েনবী ও ইতিহাসের নতুন ধারা

রণজিৎ কুমার সেন

ইতিহাসের নতুন পথে যাঁরা রচনা করেছেন অধ্যাপক আর্ণল্ড জে. টয়েনবী তাঁদের অন্যতম একজন। তাঁর ইতিহাস যেমন যুদ্ধবিগ্রহ ও খুন-খারাপির ইতিহাস মাত্র নয়, তেমনি শুধু কোনো রাজত্বের ভাঙা-গড়া ও উত্থান-পতনের কাহিনীও নয়। টয়েনবীর ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের সাধারণ ধারণার ইতিহাসের গড়মিল অনেকখানি।

ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি, তার গতানুগতিক অনুসরণের মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি; সেই ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যের এবং সত্বার সন্ধানকেই তিনি শ্রেয় বলে গ্রহণ করেছেন এবং এই সন্ধানের মধ্যেই তাঁর ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসকে টয়েনবী খণ্ডকালের বা দেশের অনুপাতে বিচার করেন নি। বরং অখণ্ডভাবে, সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের বিচার-বিবেচনা করে তার অন্তর্নিহিত একত্বের সুর উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন এবং এই উপলব্ধিকে নিজের করে নিয়ে সকলের করাবার প্রয়াস পেয়েছেন, এই জন্যে তাঁর ইতিহাসে একটা নূতনত্বের সুর আছে, একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আছে—যা সমসাময়িক ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই হিসেবে মার্কস-এর ইতিহাস বিশ্লেষণেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং এই বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট মতবাদকেও তিনি পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় গ্রহণ করতে পারেননি; বস্তুতঃ কম্যুনিষ্ট মতবাদ তাঁর কাছে খ্রীষ্টীয় মতবাদেরই অপভ্রংশ মাত্র। এইজন্যেই তিনি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতন ভাবধারায় ও নূতনতর গবেষণায় নতুন ইতিহাস গড়ে তুলেছেন তাঁর 'A Study of History' গ্রন্থে। এই গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ড ১৯৩৪ সালে, পরবর্তী তিন খণ্ড ১৯৩৮ সালে এবং শেষ চারখণ্ড ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। মোট দশ খণ্ডে 'A Study of History' সম্পূর্ণ।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত সত্যের বা তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে টয়েনবী মানুষের প্রকৃতি ও পরিণতি অনুসন্ধান করেছেন। এবং এই অনুসন্ধানে তিনি বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার উত্থান, বিবর্তন ও পতনের ধারা অনুধাবন করেছেন। এই পর্য্যালোচনায় তিনি ধর্মকে ইতিহাসের মূলকেন্দ্রে এবং সংস্কৃতিকে সভ্যতার সারমর্ম বলে উপলব্ধি করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর ইতিহাস গতানুগতিকতার পথ বর্জন করেছে। বস্তুতঃ তাঁর ইংলণ্ডের ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজাদের রাজত্বকালের ইতিহাসই নয়, সে ইতিহাস পাশ্চাত্য খ্রীষ্টবাদের ইতিহাস। তেমনি এশিয়ার ইতিহাস পাশ্চাত্য দেশ সমূহের আর্থিক শোষনের লীলাভূমির ইতিহাস মাত্র নয়, এ ইতিহাস মানবজাতির লীলার ইতিহাস। ইউরোপের ইতিহাসে বিগত দু'শতাব্দী ধরে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে বিরাট শূন্যতা চলে আসছে, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বিভিন্ন সভ্যতাকেও তিনি এক আদি উৎস থেকে উৎসারিত বলে মনে করেন না, প্রত্যেকটি সভ্যতাকেই তিনি ভিন্নরূপে বিচার করেছেন এবং এই বিশ্লেষণে কতকগুলোর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন সামঞ্জস্য, আর কতকগুলোর মধ্যে সংঘাত। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসকে তিনি উন্নীত করেছেন দার্শনিক ভিত্তিতে এবং সময় ও দূরত্বের ব্যবধানকেও বিশ্লেষণ করেছেন নতুন ব্যাখ্যায়। তাতে দেখা যায়—সকল সভ্যতাই প্রায় সমসাময়িক।

ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্তার সন্ধান করতে গিয়ে টয়েনবী দেখতে পেয়েছেন মানুষের অন্তরের এমন একটি অন্তঃসলিল প্রবাহ—যা প্রচলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সময় সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সেই বিদ্রোহে ক্রমে সভ্য মানুষও সাড়া দেয়, সমাজ ও সভ্যতার রূপান্তর ঘটে, নতুন সমাজে আবার বিদ্রোহ জাগে, আবার সাড়া মেলে। এইভাবে বিদ্রোহ ও সাড়ার ক্রমপর্যায়ে সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস গড়ে ওঠে। সৃজনক্ষম সামান্য লোকের সাড়া ও সৃজনক্ষমতাহীন জনসাধারণের তা অনুকরণের মাধ্যমেই ক্রমিক বৃদ্ধি বা পুষ্টিসাধন দেখা দেয়। এই সৃজনক্ষম মুষ্টিমেয়র প্রতি যখন সাড়া মেলে না, জনসাধারণ যখন তাদের প্রতি সহানুভূতিহীন হয় তখনই ক্ষয় দেখা দেয়। সমাজের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়, এবং জেগে ওঠে সংঘাত। এই সংঘাতে 'বিদ্রোহী মুষ্টিমেয়' প্রতিষ্ঠা করে সার্বজনীন সাম্রাজ্য। এর ভিতরকার জনসাধারণ মুক্তির সন্ধান পেতে চায়, সার্বজনীন ধর্মে, আর বাইরের জনসাধারণ অর্থাৎ যারা এ ব্যবস্থা মেনে নেয় না কোনক্রমেই, তারা অনবরত আঘাত হানতে থাকে। এই সংঘাতে সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ে। কিন্তু যদি এর মধ্যেও সর্বজনীন ধর্ম নূতন সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়, তবে আবার এই পদ্ধতির পুনরাবর্তন সূচিত হয়। টয়েনবীর নিসর্গবাদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র কোনো সভ্যতাকেই অপর সভ্যতার মধ্যে বিলীন করে না; প্রত্যেকটি সভ্যতাই স্বতন্ত্র।

তাঁর 'Civilization on Trial' একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম মানবজাতির একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার (Religion, after all, is a serious business of the human race)। তিনি মনে করেন, মানুষের উন্নতির পক্ষে (এমন কি চরম বাস্তব উন্নতির পক্ষেও) অন্যান্য জীবের উপর প্রাধান্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবন বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

এরকম একটা অনুভবের ভিতর দিয়ে ইতিহাস ও ও সভ্যতার ভাবধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি ধর্মের ধারাকেও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর 'An Historian's Approach to Religion' গ্রন্থে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ধর্মের আলোচনা স্থান পেয়েছে। টয়েনবীর মতে একমাত্র গৌতম বুদ্ধ ব্যতীত আর কোনো ক্ষেত্রে দার্শনিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক শূন্যতার পরিপূরক হয়নি। তাঁর ভাবধারায় ভারতীয় ধর্মবিবেকে খৃষ্ট বা ইসলাম ধর্মের অনুরূপ মানসিক স্বাতন্ত্রের স্থান নেই, এবং এই বিপরীত ভাবধারার আলোচনায় তিনি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের রোমদেশীয় পণ্ডিত বাগ্মী রাজনীতিবিদ কুইন্টাস অরেলিয়াস সাইমাকাসের মত সমর্থন ক'রে বলেন :একটি মাত্র পথ অনুসরণ ক'রে এত বিরাট একটা রহস্যের অন্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।' তিনি মনে করেন—'যেকোন ধর্মাবলম্বী লোকদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের পদ্ধতি এবং সেইসঙ্গে আত্মকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করবার চেষ্টায় তাদের সাফল্যের কথা বিবেচনা করে কোনো ধর্ম সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না।' তিনি বলেন: 'উচ্চস্তরের ধর্মাদর্শগুলি প্রতিযোগিতামূলক নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। একমাত্র সর্বানি মনে না ক'রেও আমরা নিজেদের ধর্মপথকে বিশ্বাস করতে পারি। মুক্তির একমাত্র উপায় ব'লে মনে না করেও নিজেদের ধর্মমতকে ভালোবাসা যায়। খৃষ্টধর্মের প্রতি আনুগত্য বর্জন না করেও সাইমাকাসের কথা গ্রহণ করতে পারি। আবার খ্রীষ্টের প্রতি কঠোর না হ'য়ে আমরা সাইমাকাসের প্রতিও কঠোর হতে পারি না। কারণ সাইমাকাস যা বলেন তা খ্রীষ্টিয় বদান্যতারই নামান্তর মাত্র।'

টয়েনবীর ইতিহাস মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক, একথা সর্বজন-স্বীকৃত। তারই ভিত্তিতে দেখা যায় ইতিপূর্বে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাইয়ের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে পর্যটনে গিয়ে তিনি সেখানকার আর্থিক দুরবস্থা, রাজনৈতিক অব্যবস্থিতচিত্ততা ও সামাজিক বিপর্যয় ইত্যাদি যেমন লক্ষ্য করেছিলেন, তেমনি ধর্মজীবনটাকে লক্ষ্য করতেও ভুল করেননি। চৌ-এন লাইয়ের ব্রহ্মদেশ সফর ও সেখানকার বক্তৃতাবলী সম্বন্ধে সামান্য কথায় তিনি যা বলেছেন তাতেই ঐতিহাসিক টয়েনবীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন : ষাট কোটি মানুষের শাসনকর্তা ব্রহ্মদেশে এসে যুদ্ধবর্জনের উপদেশ ঘোষণা করেছেন বটে কিন্তু ব্রহ্মদেশে কাচিন রাজ্যের তিনটি গ্রাম নিয়ে চীনের সঙ্গে যে বিবাদ চলে আসছে, সেগুলোর উপর থেকে চীনের দাবী প্রত্যাহার সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। অতীতে অনেকবার চীন উত্তর ব্রহ্মদেশের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং মোঙ্গল রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশ উত্তর দিক থেকে বিজিত হবার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে এমন একদিন ছিল —যখন মোঙ্গল রাজধানী কোয়ারাকোরামে দাঁড়িয়ে একজন খ্রীষ্টপন্থী সাধু দেখেছিলেন—রাজধানী পশ্চিম তোরণ দিয়ে একটি ও দক্ষিণ তোরণ দিয়ে অপর একটি সামরিক বাহিনী নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে। কোথায় এ বাহিনী যাচ্ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে বলা হয়েছিল—একটি হাঙ্গেরী ও অপরটি ব্রহ্মদেশ।'

টয়েনবীর দৃষ্টিতে চীনের প্রধানমন্ত্রীর এই কূটনীতি যেমন এড়ায়নি, তেমনি অহিংস বৌদ্ধপন্থী লোকদের সহিংস খুনখারাপিও এড়ায়নি। যে প্রশ্ন সাধারণতঃ আমাদের মনেও দেখা দেয়, তা এই যে এই অহিংসপন্থী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধধর্মে আস্থাবান থেকেও কি ক'রে হিংসাত্মক প্রাণ হানাহানিতে মত্ত হ'য়ে ওঠে ? এ প্রশ্নের জবাব টয়েনবী দিয়েছেন। তিনি শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্মের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—ব্রহ্মদেশের সাধুদের সামাজিক মর্যাদা ও মনোভাব যেকোনো ঐতিহাসিককে পঞ্চম শতাব্দীর মিশরের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। এদের সমাজের যোগী, দার্শনিক, সাধু ও অনুরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা যে কোনো দেশের যে কোন সময়কার তুলনায় নগন্য নয়। তবে আলেক-জেন্দ্রিয়ার বাইজেনটাইন গভর্ণরের পক্ষে যেমন উগ্রপন্থী সাধুগণ ভয়ের কারণস্বরূপ ছিল, তেমনি উগ্র ধর্মযাজক ব্রহ্মদেশের সমাজে বিদ্যমান। একদল সন্ন্যাসী হঠাৎ সাধুর পোষাক ফেলে দিয়ে ছুরি, তলোয়ার বা রিভলবার ও হাতবোমা নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দিতে পারে। আর ব্রহ্মদেশের এইসব সন্ন্যাসী যারা অনুরূপ কাজে কিম্বা এর চাইতে কম হিংসাত্মক কাজে নিজ দিগকে লিপ্ত করে, তাদেরকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনাও সহজ সাধ্য নয়। সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশের সাধুগণ খুবই নিয়মতান্ত্রিক ও কঠোর, কিন্তু জনসাধারণের মতই হঠাৎ ক্ষেপে যেতে পারে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণও হতে পারে, এরকম ব্যক্তিকে সাধুর পোষাক খুলে নিয়ে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া তাঁর আধ্যাত্মিক মুরুব্বিদের পক্ষেও বিপজ্জনক। ওঁরা ওকে সব কাজে এড়িয়ে চলেন এই আশায় যে কালক্রমে সে নিজে থেকেই একদিন দল ছেড়ে যাবে।

এতে করে এরকম মনে হতে পারে যে, সেখানকার বৌদ্ধরা হয়তো শ্যামের বৌদ্ধদের মতবাদের প্রভুত্বকে ঠিক মেনে চলে না। কিন্তু এরকমটা মনে করা ভুল। শ্যামে বৌদ্ধধর্ম সম্মানিত, কিন্তু ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম জীবন্ত। বাইজেনটাইন মিশরের ন্যায় বর্তমানে ব্রহ্মদেশেও ধর্ম জীবন পরম্পরবিরোধী ভাবধারায় পরিপূর্ণ। তা একদিকে যেমন কুৎসাজনক অপরদিকে তেমনি শিক্ষপ্রদ, একদিকে যেমন বিঘ্নস্বরূপ অপরদিকে তেমনি প্রেরণাময়। কোনো কোনো সন্ন্যাসী যেমন পোষাকের মর্যাদা রক্ষা করে চলে না, তেমনি আবার এমন অনেকে আছেন—যাঁরা তাঁদের Theravada Buddhismকে মর্যাদার আসেন প্রতিষ্ঠিত করতেই ব্যস্ত, (তারা তাদের কর্মের 'হীনযান' নামটা পছন্দ করে না, তবে উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধগণ অর্থাৎ 'হীনযানী বৌদ্ধরা দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধগণকে এই নামেই অভিহিত ক'রে থাকে।

ব্রহ্মদেশের এইসব ধর্মসংস্কারকেরাও মনে করেন গৌতম বুদ্ধের দর্শনই বর্তমান জগতের আধ্যাত্মিক শূন্যতার একমাত্র নিদান। তাঁরা বৌদ্ধ ত্রিপিটকের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন এবং বেয়াল্লিশ খণ্ডে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে।

অতঃপর ব্রহ্মদেশের সাধারণ জনগণের বর্তমান ধর্মানুরাগের বিষয় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে অব্যবস্থিত চিন্তা চলেছে, তার আলোচনা ক'রে

টয়েনবী বলেছেন-ব্রহ্মদেশের বাস্তব জীবনে যে ঘনান্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তার মধ্যেও তার আধ্যাত্মিক আলোর শিখা নিভে যায় নি। নিজের পথ যত বন্ধুরই হোক্ না কেন, ব্রহ্মদেশ জগৎকে নতুন সম্পদ দান করবে।' ব্রহ্মদেশের ব্যবহারিক জীবনের পরিস্ফুট ইতিহাসের অন্তরালে অধ্যাত্ম জীবনে যে নতুন ইতিহাস গড়ে উঠেছে টয়েনবী তারই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান জগতে মানুষের অধর্মজীবন এমন প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে, মানব সমাজ ধর্মকে তার গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি মনে করেন—বর্তমান জগতে শান্তি বজায় রাখা এবং তৃতীয় একটা বিশ্বযুদ্ধে আনবিক অস্ত্র ইত্যাদির ধ্বংসলীলা থেকে মানব-সমাজকে রক্ষা করাই আশু সমস্যা বটে, কিন্তু ধর্মকে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার সমস্যাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। 'ধর্ম এবং সভ্যতা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে দিল্লীতে রামকৃষ্ণ মিশনে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'প্রাচীন কাল থেকেই ধর্ম ও সভ্যতা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে আসছে। ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের দিক থেকে অপরিহার্য; একে বর্জন করে মানব সমাজ চলতে পারে না। তবে কুসংস্কারের জঞ্জাল থেকে ইতিহাস বিখ্যাত ধর্মমতগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার করে না আনতে পারি, তবে আমরা ধর্মকে যথার্থ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো বলে আমি মনে করি না। প্রত্যেকটি ধর্মের সঙ্গে এমন কতকগুলো জিনিষ চ'লে এসেছে—যাকে ধর্মের আনুষাঙ্গিক বা সংস্কারমতে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হ'য়ে থাকে; অথচ ধর্মের প্রকৃত সারমর্মের সঙ্গে এ গুলোর হয়তো সম্পর্ক নেই। এসবের জন্যেই বর্তমানের বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যায় শিক্ষিত লোক প্রকৃত ধর্মমতে ফিরে যেতে বাধা পায়।

এই অংশে টয়েনবীর 'An Historian's Approach to Religion' গ্রন্থের একটি কথার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। সেখানে তিনি বলেছেন: 'সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে যেমন ধর্মের প্রতি মানুষের একটা বিরূপ মনোভাব গ'ড়ে উঠেছিল, বিংশ শতাব্দীর শেষেও তেমনি বিজ্ঞান ও কারিগরি চর্চার প্রতি একটা বিরূপতা দেখা দিতে পারে। হয়তো বা মানব বিজ্ঞানের (human science) উপরেই মানুষের আগ্রহ ও একাগ্রতা কেন্দ্রিভূত হ'তে পারে। এইভাবে মানুষের মন যখন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানবীয় ব্যাপার বিশ্লেষণের শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে, তখন হয়তো এই বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা নতুন পথের সন্ধান দেবে, এবং ধর্মকে হয়তো এমন ভাবধারায় সঞ্জীবিত করবে—যা খুব সাধারণ হ'লেও আধ্যাত্মিক দিক থেকে অধিক সম্ভাবনাময় হবে।'

মূলতঃ এই হচ্ছে অধ্যাপক টয়েনবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তিনি যে ইতিহাস ও রাজনীতিবিজ্ঞানেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন, তা নয়, তিনি একাধারে সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, চিন্তানায়ক, স্রষ্টা এবং উদার ও শান্তিপ্রিয় মানবপ্রেমিক। তাঁর প্রবর্তিত মত ও প্রদর্শিত পথ এখনও মার্কসীয় পদ্ধতির অনুরূপ ভাবে সর্বজন গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠে নি বটে, তবে কালক্রমে হয়তো তাও মানবসমাজকে নূতন ভাবধারায় সঞ্জীবিত ও নূতন আদর্শে উন্নীত করতে পারে॥

প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্ত্তমান চিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চিত্তরঞ্জন দাস

ওপার বাংলা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবাসীর আশ্বিন সংখ্যায় ওপার বাংলার বর্ত্তমান চিত্রের অবশিষ্টাংশের উল্লেখ ছিল, কারণ আশা করেছিলাম ইতিমধ্যে উক্ত চিত্রের যবনিকাপাত হবে। কিন্তু অদ্যাবধি তা হয়নি এবং আরও কতদিন এ নারকীয় বীভৎস চিত্র চলবে: দেবাঃ ন জানন্তি। বিশ্ববাসীর সঙ্গে তাই আজও আমরা উক্ত চিত্রেরই নীরব দর্শক।

ভারত সরকারের অবিরাম প্রচার ও প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে বিশ্ব-বিবেক জাগ্রত না হ'লেও বিশ্ব-নিদ্রা যে ভঙ্গ হ'য়েছে, ইহা অনস্বীকার্য্য। পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম পাক-জঙ্গী-শাসকের নৃশংস অত্যাচারের অভূত-পূর্ব্ব কীর্ত্তি-কাহিনী বিশ্বের সর্বত্র আজ সুবিদিত। বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় উক্ত কাহিনী এখন বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববাসীর কথঞ্চিৎ সাড়াও ভারত পেয়েছে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ এবং নেহাৎ সৌজন্যমূলক। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্র প্রতিনিধিবর্গ দলে দলে ভারত ভ্রমণ, হতভাগ্য শরণার্থী-পরিদর্শন, কুম্ভিরাশ্রু-বিসর্জন, শরনার্থী—সাহায্যের প্রতিশ্রুতি-দান এবং বিরাট সমস্যা সমাধানের বিচিত্রাভিমত প্রদান প্রভৃতি সব কিছুই করেছেন. কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি যথাপূর্ব্বম। বরং অধিকতর ঘোরালো—ভারতের সঙ্গে নবোদ্যমে পাকিস্থানের সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতি। অতএব কি ফল লভিনু হায়!

এক কোটি শরণার্থীর বিরাট সমস্যা

উক্ত সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় নির্দ্ধারনের নিমিত্ত বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলি আজ সক্রিয়। অনেকেই এ বিষয়ে চিন্তা করছেন এবং প্রকৃত পক্ষে যারা পাক দরদী ও পাকিস্থানের অস্তিত্ব যাদের একান্ত কাম্য, তাদের মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাধানই নাকি ভারতের বিরাট শরণার্থী সমস্যার একমাত্র উপায়। কিন্তু উক্ত রাজনৈতিক সমাধানটি কী? পূর্ব্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি সুসভ্য মানবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানী অসভ্য দানবগোষ্ঠীর পুনর্মিলন বা গাঁটছড়া বেঁধে মানব দানবের অবাস্তব সহাবস্থানের একটা অলীক প্রকল্প নয় কি? বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বাংলাদেশ স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেলে, পাকিস্থান বিলুপ্ত হবে, এ অতি সত্য এবং সহজ বিষয়টি অতি মুর্খে'রও অবিদিত নয়। কারণ পাকিস্থান সৃষ্টি হবার পর থেকে এ যাবৎ কাল পশ্চিম পাক্-শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে সর্ব্বতোভাবে শোষণ করেই পাকিস্থানের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সুতরাং মুক্তিকামী বাংলাদেশ আজ যদি

পাক্-শাসন ও শোষন মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাহলে পশ্চিম পাকিস্থানের অবলুপ্তি অবধারিত। অতএব পাকিস্থান দরদী বৈদেশিক রাষ্ট্র সমুহের পক্ষে কি করে সম্ভব, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে, জঙ্গী শাসিত পাকিস্থানের অবলুপ্তি ঘটান ? তাই বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন রকম জোড়াতালি দিয়ে তাদের অতি প্রিয় পাকিস্থানের অস্তিত্ব বজায় রাখবার শেষ চেষ্টাই তারা করছেন।

বৈদেশিক রাষ্ট্র প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমাধান অবাস্তব

বিশ্ব সেরা রাষ্ট্র নায়কদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসুত রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ পূর্ব্ব বাংলার মুক্তিকামী সাড়ে সাত কোটি নির্য্যাতিত নিপীড়ত মানবের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থান নৃশংস দানবের অবাস্তব আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতা। কিন্তু উক্ত রাজনীতি বিজ্ঞদের অভিমত বা উপদেশ বাংলাদেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র উলুবনে মুক্তোছড়ানবৎ। পূর্ব্ব বাংলার মানুষ ছেঁড়া চটীর ন্যায় পাকিস্থান বর্জ্জন করেছে, পুনর্ব্বার উহা তারা আর গ্রহণ করবে না, করতে পারে না, সুতরাং বর্ব্বর পাক্-শাসকের সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্র-প্রস্তাবিত আলাপ আলোচনা তাদের নিকট একেবারেই মূল্যহীন এবং সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়। একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন বিকল্প কোন প্রস্তাব তাদের পক্ষে আর গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত স্বাধীনতা অর্জ্জনের নিমিত্তই পূর্ব্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মুক্তি ফৌজ জীবন পণ করে বর্ব্বর পাক্-সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে উক্ত সংগ্রামে বিজয়ই হবে তাদের পক্ষে একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান। যে জাতির মধ্যে মুজিবুর রহমানের ন্যায় সুমহান নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যাঁর পতাকাতলে রয়েছে, পূর্ব্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষ, সে জাতির স্বাধীনতা রোধ করবার শক্তি বিশ্বের কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্রেরই নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। জয়তু বাংলা।

কোটি শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন

আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়-প্রাপ্ত কোটি শরণার্থী পূর্ব্ব বঙ্গের উক্ত সাড়ে সাত কোটি মানুষেরই একটা বিরাট অংশ বিশেষ। সুতরাং তাদের পক্ষেও একমাত্র স্বাধীনতা ভিন্ন বিকল্প কোন প্রস্তাব গ্রহণ সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অবাস্তব। যে দানবের নৃশংস অত্যাচারের ফলে তারা চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি পরিত্যাগ করে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়লাভ করেছেন, পূর্ব্ব বঙ্গে সেই দানব গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হ'লে একটি শরণার্থীও আর পূর্ব্ব বাংলায় ফিরে যাবে না, যেতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য। অতএব বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রস্তাবিত উক্ত রাজনৈতিক সমাধান দ্বারা কোটি শরণার্থীর বিরাট সমস্যার যে কোন সুরাহাই হবে না, ইহা সুনিশ্চিত। তবে উক্ত অবাস্তব রাজনৈতিক সমাধানের জল্পনা কল্পনা এবং আলাপ আলোচনা দ্বারা যত অধিক সময় বিনষ্ট হবে, পাকিস্থানের পক্ষে ততই মঙ্গল। কারণ ইত্যবসরে ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের যুদ্ধ প্রস্তুতি ব্যাপক ও সুদৃঢ় হবে এবং তথাকথিত রাজনৈতিক সমাধান যথাকালে পর্য্যবসিত হবে আসন্ন পাক্-ভারত মহাসমরে। সুতরাং কোটি শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের প্রশ্ন হবে তখন সুদুর পরাহত।

শরণার্থীদের ভয়াল ভবিষ্যৎ

ভারত সরকারের পক্ষে সুদীর্ঘকাল এক কোটি শরণার্থীর সমগ্র ব্যায়-ভার বহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথচ পূর্ব্ব বঙ্গে সম্পূর্ণ সুস্থ পরিবেশ বা স্বাভাবিক অবস্থা ভিন্ন, শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই নেই কিম্বা থাকা উচিৎ ও নয়। সুতরাং উপরোক্ত রাজনৈতিক সমাধানের অছিলায় যত অধিক কালক্ষয় হবে, অর্থনীতির দিক থেকে ভারত সরকার বিরাট শরণার্থী সমস্যার চাপে ক্রমশঃ হ'য়ে পড়বে দুর্ব্বল এবং সরকারের পক্ষে তখন আর কোন রকমেই সম্ভব

হবে না, অনির্দিষ্ট কালের জন্য হতভাগ্য শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান করা। তদ্ভিন্ন আসন্ন পাক্‌-আক্রমণের মোকাবিলায় ভারত সরকারের উপর পড়বে প্রতিরক্ষার প্রবল চাপ। সুতরাং সরকার তখন কোনদিক সামলাবেন? শরণার্থীদের প্রশ্ন, অবশ্যই হবে তখন গৌণ এবং সাহায্য ব্যবস্থাও ক্রমশঃ হয়ে যাবে খর্ব অথবা সম্পূর্ণ বন্ধ। ফলে শরণার্থীদের হবে অভাবনীয় বিপর্য্যয়। বিপুল সংখ্যক শরণার্থী তো ইতি মধ্যেই অনাহার, অর্দ্ধাহার অথবা নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণের ফলে বিনা চিকিৎসায় সর্ব্বজ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছে, বাকী সব যে অদূর ভবিষ্যতে ক্রমশঃ পাইকারী হারে মহাকালের কবলে পতিত হবে, সে বিষয়েও আর কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন যারা বেঁচে থাকবে, তারাও আর পূর্ব্ব বাংলার মাটিতে ফিরে যাবে না, পশ্চিম বাংলার মাটি আঁকড়ে ধরে জীবিকার্জনের নিমিত্ত স্থানীয় দুষ্কৃতকারী সমাজ বিরোধীদের দলে নিঃসন্দেহে মিশে যেতে বাধ্য হবে। সুতরাং পূর্ব্ব বাংলার এক কোটি শরণার্থীর বিরাট সমস্যার সমাধান যে উপরোক্তরূপেই সম্পন্ন হবে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। বলা বাহুল্য উক্ত এক কোটি শরণার্থীর জীবনের মূল্যের চেয়ে বিশ্ব রাষ্ট্র নায়কদের নিকট পাকিস্থানের জীবন অধিকতর মূল্যবান এবং তদুদ্দেশ্যেই তাঁরা উপরোক্ত রাজনৈতিক সমাধানের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অতএব উক্ত অভিমতের উপর ভারত সরকারের পক্ষে বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ না করাই শ্রেয়।

প্রত্যক্ষ দর্শীর মর্মান্তিক বিবরণ

পূর্ব্ব বাংলার বর্ত্তমান চিত্রের মর্মন্তুদ কাহিনী কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা বা গণ-বিদ্রোহ দমন নয়। সম্পূর্ণ পূর্ব্ব পরিকল্পিত। স্বৈরাচারী শাসকের কায়েমী স্বার্থের নিমিত্ত গণ-তন্ত্রের উচ্ছেদ। তাই, পাক্‌ আক্রমণের সর্ব্ব প্রথম শিকার ও বলিই হ'ল পূর্ব্ব বাংলার অসংখ্য বুদ্ধিজীবি ও ছাত্রবৃন্দ অর্থাৎ যারা দেশের কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন অথবা সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। পূর্ব্ব বঙ্গে গণ-তন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করতে নর-ঘাতক ইয়াহিয়ার উদ্যত খড়্গ তাই সর্ব্বা গ্র পতিত হ'ল উক্ত মেরুদণ্ডের উপর। ফলে সহস্র সহস্র অমূল্য জীবন হ'ল সেখানে বিনষ্ট। অতঃপর শুরু হ'ল হিন্দু নিধন যজ্ঞ। হিন্দু অধ্যুষিত বিস্তৃত অঞ্চল সমূহে পাক্‌-বেতন-ভূক্ত তাঁবেদার স্থানীয় মুস্লিমদের দলে দলে প্রেরণ করে পাইকারী হারে অসহায় হিন্দু নাগরিকদের ধরে এনে পাক্‌ সেনাবাহিনী মহানন্দে তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। হিন্দুদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে করেছে সব পোড়ামাটি। বিস্তৃত অঞ্চল হ'য়েছে শ্মশান।

পাক্‌-আক্রমণের বিরাট পরিধি থেকে কোন রকমে নিষ্কৃতি পেয়ে, যারা শুধু প্রাণটা নিয়ে বহুকষ্টে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে পেরেছে, তারাই আজ নতুন আখ্যা পেয়েছে—শরণার্থী। অদ্যাবধি উক্ত শরণার্থীর সংখ্যাই প্রায় এক কোটি এবং ইহারা ক্রমশঃ হ'য়ে পড়ছে ভারত সরকারের দুর্বিসহ গলগ্রহ স্বরূপ। বলা বাহুল্য উক্ত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর অধিকাংশই হিন্দু, মুস্লিম সংখ্যা অতিনগণ্য। মহাকাল দেশ বিভাগের পর পূর্ব্ব বাংলার এক কোটি হিন্দু হ'য়েছিল হত ও বিতাড়িত। বর্ত্তমান চিত্রও প্রায় অনুরূপ। সুতরাং অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গে কোন হিন্দুর অস্তিত্ব আছে কিনা অথবা থাকা সম্ভব কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ যথেষ্ট আছে। আর থাকলেও সে সংখ্যা অতি নগন্য এবং তারা অতি দুঃস্থ নিম্ন শ্রেণীর যারা অদূর ভবিষ্যতে সহজেই বাধ্য হবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে। শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিশেষ ভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। সুতরাং ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তা তৎকালীন কতিপয় কংগ্রেস নেতা কর্ত্তৃক মহাকাল দেশবিভাগই যে বাংলা ও বাঙালী জাতি বিধ্বংসী প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

পূর্ব্ব বাংলার ধর্ষিতানারী

বর্বর পাক্‌-দানবদের দ্বারা অদ্যাবধি পূর্ব্ব বাংলার কত নারী যে ধর্ষিতা হ'য়েছে তার সঠিক সংখ্যা

নিরূপণ করা অতীব কঠিন। এমন কি স্বয়ং ব্যাস দেবেরও অসাধ্য। উক্ত দানবগণের পাশবিক অত্যাচারের ফলে অগনিত নারী হ'য়েছে আজ অন্তঃ-স্বত্বা। পশ্চিম বাংলার কিছু সংখ্যক শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করলেই তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু উক্ত হতভাগ্য রমনীদের ভবিষ্যৎ যে কোন অন্ধকার আবর্ত্তে নিহিত আছে, একমাত্র সর্ব্ব নিয়ন্তাই জানেন। এদের অধিকাংশই স্বামী-হারা, স্বজন হারা, সর্ব্ব-হারা। সমাজে হবে না এদের স্থান, প্রাণের মায়ায় বাধ্য হবে তখন অসৎ বা ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করতে। পাপ ব্যবসাই হ'বে তখন এদের জীবিকার্জ্জনের একমাত্র সহজ উপায়। সমাজ সিদ্ধান্তে এরাই হবে তখন অস্পৃশ্য পতিতা। অবশিষ্ট যারা উক্ত ঘৃণ্য বৃত্তি যে কোন কারনেই হোক গ্রহণ করবে না, তাদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহের জন্য একমাত্র গ্রহণ যোগ্য উন্মুক্ত পন্থা হবে দাসীবৃত্তি অথবা ভিক্ষাবৃত্তি। অবশ্য উক্ত বৃত্তিদ্বারা কখনও কারোর কোন অভাব মোচন হয় না বা হওয়া সম্ভবও নয়। তাই স্বভাবতই অনাহার অর্দ্ধাহারের ফলে তারা বাধ্য হবে ক্রমশঃ মৃত্যুর পথেই এগিয়ে যেতে। সুতরাং এদের দুর্গতির জন্য দায়ী সেই পশ্চিম পাকিস্থানী দানব গোষ্ঠী নয় কি?

এতদ্ভিন্ন বিপুল সংখ্যক ধর্ষিতা নারী অদ্যাবধি পূর্ববঙ্গে পাক্ দানবদের কবলে আবদ্ধ থেকে তাদের ভোগ বিলাসের সামগ্রী স্বরূপ অত্যন্ত দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে এবং সর্ববিধ অত্যাচার, নির্য্যাতন এবং পাক্ কবল মুক্ত হবার জন্য সম্ভবত তারা নিতান্ত অসহায়ভাবেই একমাত্র মৃত্যু কামনাই ভগবানের নিকট করছে। তাদের উদ্ধারের আর কোন আশাই নেই। কারণ ইতিপূর্ব্বে দেশ বিভাগের পর যে বিপুল সংখ্যক হতভাগ্য হিন্দুরমণী মুস্লিম কবলিত হয়েছিল, অদ্যাবধি ভারতের কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি তাদের এক জনেরও উদ্ধার সাধন করা। সুতরাং বর্ত্তমান পাক্-কবলিত নির্যাতিতা সহস্র সহস্র হতভাগিনীরও যে সেই একই দশা হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ

দুর্বলের উপর সবলের নৃশংস ও পাশবিক অত্যাচার বাধ্য হয়েই সহ্য করে অসহায় মানুষ, কিন্তু ভগবান উহা সহ্য করেন না। নইলে শাস্ত্র মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, অত্যাচারীর ধ্বংস অনিবার্য্য। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে উহা স্বীকার্য্য। বিশেষতঃ অবলার প্রতি অত্যাচারে একটা জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। ইতিহাস তার সাক্ষী। ত্রেতাযুগে প্রপীড়িতা সতী স্বাধ্বী সীতার অশ্রুজলে লঙ্কা ভেসে গেল। অত্যাচারী রাবণ রাজা হ'ল স্ববংশে নির্বংশ। দ্বাপরে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর ক্রোধানলে বিরাট কুরুবংশ হয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত। বর্ত্তমান কলিযুগেও পাক্ দানবদের নৃশংস ও পাশবিক অত্যাচারের মাত্রা বহুপূর্ব্বেই সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং তার যোগ্য প্রতিফলও তারা অবশ্যই পাবে। লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা রমণীর কাতর অশ্রুজলে ভেসে যাবে পশ্চিম পাকিস্থানী দানবগোষ্ঠী। বিশ্বের কোনও রাষ্ট্র শক্তি সক্ষম হবেনা অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কবল থেকে পাকিস্থানকে উদ্ধার করতে। পাকিস্থানের ধ্বংস অতি আসন্ন। তাই বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ নর-ঘাতক ইয়াহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে দিয়েছে যুদ্ধের হুমকি, করেছে সর্ব্ববিধ সমরায়োজন, প্রতিনিয়ত করছে অসহনীয় আস্ফালন। বর্বর হয়ত এখনও জানেনা যে আসন্ন পাক-ভারত সমরে হ'য়ে যাবে তার কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ, দানবগোষ্ঠী হবে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন।

পাক্-ভারত যুদ্ধ

ভারতের সঙ্গে পাকিস্থানের যুদ্ধের কোন হেতু নেই। অথচ বর্ত্তমানে পুরোদমে চলছে উভয় রাষ্ট্রেরই সমরায়োজন। সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে হচ্ছে হতাহত। যুদ্ধের পরিণাম ধ্বংস। যে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির উহা অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তৎসত্বেও যুদ্ধের দিকেই এগিয়ে চলেছে উভয় রাষ্ট্র-পাকিস্থান ও ভারতবর্ষ। অতএব উহার অবশ্যম্ভাবী কুফল সহজেই অনুমেয়।

পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম পাক্-দানবদের নৃশংস হত্যালীলা এবং ব্যাপক পাশবিক অত্যাচার পাকিস্থানের সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীন ব্যাপার। উক্ত ব্যাপারে ভারতের কোন ভূমিকাই ছিলনা, অথচ দানবীয় অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এক কোটি কিম্বা ততোধিক (বিনা তালিকাভুক্ত) শরণার্থী ভারতে আগমনের ফলে, ভারতকে হ'তে হ'য়েছে এক সমস্যার সম্মুখীন। বিগত আট নয় মাস যাবৎ একমাত্র মানবিকতার দিক থেকে ভারত উক্ত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদান ক'রে আসছে। কিন্তু ভারত, কেন বিশ্বের কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য এবম্বিধ সাহায্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখা। সুতরাং অদুর ভবিষ্যতে ভারত বাধ্য হবে উক্ত সাহায্য প্রদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে, নইলে ভারত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও বিপন্ন হবার সম্ভাবনা অধিক। ফলে উক্ত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর শোচনীয় পরিণাম সহজেই অনুমেয়। এমতাবস্থায় ভারতের পক্ষে শরণার্থী সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন এবং কল্যাণকর। কিন্তু উহা কি করে সম্ভব? একমাত্র পাক্-ভারত যুদ্ধ ভিন্ন সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। কারণ পূর্ব্ববাংলার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলে, একটি শরণার্থীও স্বদেশে ফিরে যাবেনা কিম্বা যাওয়া উচিৎও নয়। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্যই প্রয়োজন ভারত সরকারের সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা। নচেৎ যেমন চলছে, তেমনই চলবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে একক মুক্তি বাহিনীর পক্ষে সহজ সাধ্য হবেনা অনতিবিলম্বে পূর্ব্ব বাংলা থেকে পাক্চমুদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা। অতএব যুদ্ধের ফলাফল যত শোচনীয়ই হোক্ না কেন, ভারতকে বিপদমুক্ত হ'তে হ'লে অনর্থক সুদীর্ঘ সময় নষ্ট না ক'রে অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে পরবর্ত্তী চিত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করাই ভারতের পক্ষে একান্ত উচিৎ। পাক্-ভারত যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী তখন দীর্ঘ সময়ের সুযোগ দিয়ে শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি করবার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত নেই।

ইন্দিরাজীর সফর শেষ

তিন সপ্তাহ বিদেশ সফর করে গত ১৩ই নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। উক্ত সফরের উদ্দেশ্য ছিল ছয়টি বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট পাক্-ভারতের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদর্শন করা। তিনি তা করেছেন এবং প্রায় সর্ব্বত্রই আশানুরূপ বাহবাও পেয়েছেন। কিন্তু উহাদ্বারা মূল সমস্যার কোন সমাধান হয়েছে কি? কিম্বা হবার কোন আশা আছে কি? মনে হয় কিছুই হয় নি, কিম্বা হবার কোন আশাও নেই, থাকতে পারে না। লাভের মধ্যে ফল হ'য়েছে যে উক্ত ঐতিহাসিক সফরের জন্য গরীব দেশের অর্থভাণ্ডার থেকে একটা মোটা অঙ্ক ব্যয় হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের নিকট থেকে অর্জ্জন করেছেন প্রভূত প্রশংসা এবং তাঁদের প্রদত্ত ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশামৃতের সুমধুর রসপান করেই হৃষ্টচিত্তে তিনি স্বদেশে ফিরেছেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে কতিপয় বৈদেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থেই সৃষ্ট হ'য়েছিল পাকিস্থান। সুতরাং কোনও অবস্থাতেই পাকিস্থানের অবলুপ্তি বা ধ্বংস উক্ত রাষ্ট্র সমুহের কখনও কাম্য নয়। হ'তে পারে না। অথচ ভারতের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে পাকিস্থানের সর্ব্ববিধ সমরায়োজন প্রস্তুত। ভারতও নীরব দর্শক বা নিষ্ক্রিয় নয়। প্রতিরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। সুতরাং পাক্-ভারত যুদ্ধ সমাসন্ন। যুদ্ধের ফলে উভয় রাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াও পাকিস্থান ধ্বংসের সম্ভাবনাই অধিক। অতএব উক্ত পাক্-দরদী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সমূহ বিপদের আশঙ্কায় বর্ত্তমানে বিশেষভাবে বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক। এ হেন সঙ্কট মুহূর্ত্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী গেলেন পাক্-ভারত সমস্যা সমাধানের উপায় অন্বেষণে বৈদেশিক রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে। সুতরাং তাঁদের পক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে যে শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য কতটা সদুপদেশ বা সৎ পরামর্শ প্রদান

করা সম্ভব, সহজেই তা অনুমেয়। অবশ্য উক্ত সমস্যার সৃষ্টিকর্ত্তা যে পাকিস্থান, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বলেছেন এবং তৎসঙ্গে বিনাযুদ্ধে যাতে এ ব্যাপারের একটা ফয়সলা হয়, সে জন্যও পাকিস্থানের উপর একটা আশু চাপ সৃষ্টির উদ্দেশে অবশ্যই তিনি উক্ত রাষ্ট্র নায়কদের নিকট আর্জি পেশ করেছেন। কিন্তু উহাও যে কতটা ফলবতী হবে, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ পাকিস্থান স্বাধীন রাষ্ট্র এবং যুদ্ধরাজ ইয়াহিয়া তার কর্ণধার। সুতরাং তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও বৈদেশিক চাপ বা নির্দেশ কতটা কার্য্যকরী হবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে পাকিস্থানের প্রতি ভারতের অসীম দরদ ও উদার নীতির জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাজী যে উক্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ অর্জন করেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

বলাবাহুল্য পাকিস্থান সৃষ্ট হবার পর এই সুদীর্ঘ কাল ভারতের সঙ্গে উক্ত রাষ্ট্রের কী সুমধুর সম্পর্ক চলে আসছে, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের উহা অবিদিত নয়। কিন্তু পাক-ভারতের ব্যাপারে সকলেই নীরব দর্শক। তার প্রধান কারণ এ যাবৎকাল যত কিছু অন্যায় অবিচার, অত্যাচার সংঘটিত হ'য়েছে, তৎসমুদয়ই পাকিস্থানের তরফ থেকেই হ'য়েছে। ভারত শুধু প্রতিবাদলিপি দ্বারাই কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছে এবং নীরব দর্শকরূপে সব কিছু সহ্য করে উদারতারই পরিচয় প্রদান করে আসছে। প্রতিশোধমূলক কোনও নীতি অবলম্বন করে নি। সুতরাং পাক্-দরদী বিশ্বরাষ্ট্রগুলি তাতেই বিশেষ খুশী এবং নীরব দর্শক। কিন্তু তাদের উক্ত নীরবতা ভঙ্গ হয়েছে যখনই পাকিস্থানের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারত শুধু মুখ খুলেছে। সকলেই তখন এগিয়ে এসেছে ভারতের উত্তেজনা প্রশমিত করবার জন্য বিবিধ মতামত বা হিতোপদেশ নিয়ে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও হচ্ছে ঠিক তাই। আসন্ন পাক্-ভারত যুদ্ধে পাকিস্থানের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের আশঙ্কায়ই পাক্-দরদী রাষ্ট্রগুলি তুলেছে একটা অবাস্তব রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্ন, যা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং এমতাবস্থায় ভারতের আশু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হবে এখন সফর প্রত্যাগত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর। অলমতি বিস্তরেণ।

ধলেশ্বরী

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

সেবার সরকারী ট্যুরে বের হয়েছি।

মধ্যপ্রদেশের ছোট একটি সহর। নাম নরসিংপুরই হ'বে—ইটারসি জব্বলপুর লাইনে। বাংলাদেশ থেকে হাজার কিলোমিটারের উপর।

উঠেছি সরকারী ডাকবাংলোয়।

উঠতে প্রথম কিছু বিঘ্ন ঘটেছে। আগে থেকে সরকারী ডাকবাংলোয় চিঠি লিখে বুকিং না করলে যা হয়।

দু'ঘর ডাকবাংলোয় চারটে মাত্র সিট। আগে থেকেই বুকিং হ'য়ে আছে।

পদস্থ দুজন সরকারী কর্মচারী আপাততঃ সশরীরে দখলকারী, পরে আরো দু'জন শীঘ্রই আসছেন,—সংক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণের চৌকিদার সবিনয়ে কথাটা আমাকে জানিয়ে দিলে। বিপদের সম্মুখীন হ'তে হোলো অগত্যা।

কারণ, আগেই জানতে পারা গেছে, এ ছোট সহরটিতে এক অসুবিধা, ভাল কোন 'পান্থনিবাস' নেই। দু'চারটে পাঞ্জাবী হোটেল আছে,—যেখানে শুধু খাদ্যই মেলে, থাকার নেই কোন বন্দোবস্ত।

'ধর্মশালা' আছে একটি। নাম 'হরে রাম'। নামটা অদ্ভুত।...আটআনা থেকে চারটাকা পর্যন্ত থাকার বন্দোবস্ত আছে এখানে, কিন্তু ঘরগুলোর যে নমুনা ও আকৃতি দেখলাম, তাতে রীতিমত বিদেশীর পক্ষে ভয়ের কারণ।

ফিরে এলাম আবার ডাকবাংলোর চৌকিদার সমীপে।

নতুন আগন্তুকের পক্ষে এখানে কী অসুবিধা ও বিপদ, তাকে জানালাম আবার।

এবার কৃপাপরবশ হয়ে জানালো সে,—রাত আটটায় এক সরকারীবাবুর চলে যাবার কথা। তিনি চলে গেলে সে জায়গায় অধিকার মিলতে পারে...।

...সৌভাগ্যক্রমে সে অধিকার পেলাম রাত আটটার পর। কিন্তু সমস্তদিন 'হরেরাম' ধর্মশালার দু'টাকার সিটে থাকতে হোলো।

হিসেব করে দেখলুম, এখানকার কাজ সেরে উঠতে প্রায় হপ্তাখানেক লাগবে।

সমস্তদিন মাত্র পাঁচ ছ'ঘণ্টার কাজ। এই নির্বান্ধব দেশে বাকী সময় যে কি করে কাটবে, ভেবে পেলাম না।

দুদিন কাটলো।......

সময় কাটানোর অজুহাতে দু'রাতে দুটি 'স্টাণ্ট' হিন্দি ফিল্ম দেখলুম। খুশীর পরিবর্তে মন আরো বিশ্রী হ'য়ে গেল।

তৃতীয়দিন পাঞ্জাবী হোটেলে লাঞ্চ খেতে এসে একটু আলোর ছিটেফোটা লাগলো নিরানন্দ সঙ্গীহীন জীবনে।

হোটেল মালিক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি কথায় কথায় জানালেন যে এখানে 'গাঙ্গুলী' নামে একঘর বাঙালী ভদ্রলোক থাকেন। এখানকার সরকারী ইণ্ডাষ্ট্রিস ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন। পরিচয় আছে তার সঙ্গে। ভদ্রলোক খুব 'মাই ডিয়ার'। তার সঙ্গে পরিচিত হলে হয়তো আমার পক্ষে সুবিধাই হ'য়ে যাবে।

শুনে পুলকিত হ'য়ে উঠলুম।

আর যাই হোক, বেশ কয়েকঘণ্টা পরিবারটির সঙ্গে বাংলা কথা বলতে পারা যাবে, বৈচিত্রহীন জীবনে তাতেই কি কম লাভ? উঠতে-বসতে বৈমাত্র্য হিন্দি ভাষা বলতে বলতে যে মুখে চড়া পড়ে গেল?

গাঙ্গুলী ভদ্রলোকের অফিস ঠিকানা চেয়ে নিয়ে উঠে পড়লুম আমি।

ছুটি হবার আগে তাকে গিয়ে ঠিক ধরলুম।

খুশী হ'য়ে ভদ্রলোক নিয়ে চললেন তার বাড়ীতে।

পথে যেতে যেতে কথাবার্তা অনেক।

ভদ্রলোকের পুরানাম অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায়। বিবাহিত। তিনটি ছেলেমেয়ে।

দেশ এককালীন ছিল পূর্ববঙ্গে, পরে বেনারসবাসী। শুধু চাকুরী সুবাদে এমন বাঙালী বর্জিত দেশে আসা।

প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হচ্ছিল এখানে আসার পর, এখন ছ'সাত বছর একটানা কাটানোর পর তেমন বাঙালী নিঃসঙ্গতাবোধ হয় না। কেটে যাচ্ছে একরকম। ভদ্রলোক জানালেন।...তবে আরো একঘর বাঙালী আছেন শহরের আরেকপ্রান্তে,কালেভদ্রে তাদের সঙ্গে দেখা হয়।

পাকিস্থান হ'য়ে যাবার পর বাঙলার মুখ আর দেখেন নি তিনি অনেককাল।

রিফিউজির ছাড়পত্র পাবার পর ওর বাবা বাঙলার মোহ ছেড়ে সোজা বেনারাসে এসে শহরের উপান্তে এক চালাঘর বানিয়ে সপরিবারে অধিষ্ঠিত হন, তখন অনিমেষের বয়েস পনেরো-ষোলো। লেখাপড়া চাকুরি বিয়ে সমস্তই বেনারসে। সম্প্রতি কিছুকাল হোলো মা বিগতা হয়েছেন। সংসারে বাবা এখন রয়েছেন ছোট ভাইবোনদের নিয়ে জড়িয়ে।...

ছোটবড় কয়েকটি গলিপথ পেরিয়ে একটি দোতলা বাড়ীর সামনে এলুম।

বিকেলের আলো তখন পাণ্ডুর।

দমকা গরম হাওয়ার ঝট্‌কা আস্‌ছে থেকে থেকে।

বাড়ীর অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো সজনে গাছের ডাল থেকে অজস্র শাদাফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে এদিক-ওদিক।

একটা বোবা মিষ্টি গন্ধ।

বাইরের দরজায় ঠেলা দিয়ে গাঙ্গুলী ডাকতে সুরু করে দিলেন: ঈশ্বরী, ঈশ্বরী, ওগো শুনছো, দরজা খোলো দিকি, দেখ, কাকে ধরে নিয়ে এলাম,...ঈশ্বরী...

মিনিট দু'পরে দরজা খুলে দেখা দিলেন এক ভদ্রমহিলা। অবাক হলুম দেখে। একমাথা লাল চওড়াপাড় ঘোমটার তলে গৌরবর্ণ সুন্দর গোলপানা একটি মুখ দুটিভাসা টানাটানা চোখ কপালের মাঝখানে ফুট্‌ফুট্‌ করছে। গোলচাঁদের মত সিন্দুর টিপ উজ্জল। বয়স প্রায় পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে।

আমাকে দেখে মহিলার সুন্দর আরক্তিম ঠোঁট দুটো মুহূর্তের জন্যে ফাঁক হোলো,...হয়তো অবাক হ'য়েছেন... আমার চেহারায় পরিচয় পেতে বোধহয় বিলম্ব ঘটলো না—মিস্টি হেসে দু'হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললেন: আসুন ভেতরে আসুন—

প্রতি নমস্কারে একদিকে ঘাড় হেলিয়ে বল্‌লাম: কী সৌভাগ্য যে আপনাদের দেখা পেলাম। বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি একা-একা দুদিন...

বসলুম এসে বাইরের ছোট ঘরখানায়।

মোটামুটি সাজানো গোছানো। নানা দেবদেবীর ছবিতে ভরা দেয়ালপঞ্জী। একটি ছোট কাচের আলমারীতে নানাজাতীয় খেল্‌না।

গাঙ্গুলী একটি চেয়ারে বস্‌লেন;...একটু ঘোমটা তুলে দিয়ে মহিলাটিও বস্‌লেন পাশের চেয়ারে।

প্রাথমিক কথাবার্তা চলতে লাগলো।

মহিলা জিজ্ঞেস কর্‌লেন: কোথায় দেশ আপনার?

আপাতত জব্বলপুর। আগে ছিল পদ্মাপার..., জবাব দিলুম।

মহিলা হেসে বল্‌লেন: আপনার কথার টান থেকেই কিন্তু ধরেছি—

: আপনার কথাতেও সেই টান লক্ষ্য কর্‌ছি কিছু,.. বল্‌লাম আমি: গাঙ্গুলী মশাইত পূব বাংলার কোথায় নিজের দেশ বল্‌লেন, আপনারও কি—

হ্যাঁ, পূব বাংলাতেই।

কোথায়?

ধলেশ্বরী পার। বলে খুব হাস্‌তে লাগলেন মহিলা।

হাসি দেখে কিছু অপ্রতিভ হলুম। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই গাঙ্গুলী নিজেই বললেন: ওঁর হাসির অর্থ

কিছু বুঝলেন রায়মশাই?—জানি বোঝেন্নি। আমার গিন্নী আপনাকে জানাতে চায় যে, ওঁর দেশ শুধু ধলেশ্বরী পারই নয়,—নিজে ধলেশ্বরী নামেই প্রকাশ।

মানে ধলেশ্বরী? কণ্ঠে কিছু বিস্ময়।

কেন সুন্দর নাম নয়?—আমার শ্বশুরমশাইয়ের দেয়া। দেশ ছেড়েছেন বটে তিনি, কিন্তু মায়া কাটাতে পারেননি।—বলতে লাগলেন গাঙ্গুলী: নিজের তিনটি মেয়ের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি ফেলে আসা দিনের স্মৃতিকে। মেঘনা, যমুনা আর ধলেশ্বরী।

অবাক হ'য়ে তাকাতে মহিলার মুখে কুণ্ঠিত লজ্জা লক্ষ্য করলুম। শেষে বল্লেন গম্ভীর ভাবে; 'তা' সত্যি। বাবা ত ভিটের মায়া ছেড়ে আস্তেই চাননি। শুধু এলেন দশের চাপে পড়ে। তখন আমার বয়স আট্‌ন', আর বোনেদের ছ, চার।...মোগলসরাইয়ের কাছে আমাদের দূর সম্পর্কের এক কাকা থাকতেন,একদিন বিনা আমন্ত্রনে চলে এলাম আমারা সেখানে। স্থান পেলাম, স্বাস্থ মিল্‌লো,কিন্তু দেখা গেল,বাবা কিছুতেই মন বসাতে পারছেন না। মনমরা নির্জিব হ'য়ে আছেন সর্বক্ষণ। অথচ আমার মনে আছে, বাবাকে দেখেছি সজীব এক পুরুষসিংহ। সকাল-সন্ধ্যে কী পরিশ্রমই না করতেন। সরকারী আদালতের টিকিট ভেণ্ডার ছিলেন তিনি। জমি ছিল কয়েক বিঘা। পুকুর ছিল গটা দুয়েক। আদালতের কাজ সেরে বাকী সময়টা ভিটে জমি আর পুকুরের পেছনেই লেগে থাকতেন তিনি। পরার কাপড় আর নুন তেল ছাড়া বাইরে আর কোন কিছু কেনার প্রয়োজন হোতো না। তের পার্বনের ঘটা বাবা ধুম-ধামের সঙ্গেই করতেন বাড়ীতে। কাজেই তাঁর সুখ তার আনন্দ। আর আনন্দ দেখেছি, বছরে দু'বার করে যখন তিনি আমাদের নিয়ে ঢাকায় যেতেন 'গহনার নৌকায় চড়িয়ে।...ধলেশ্বরী বেয়েই যেতে হোতো আমাদের, আয়োজন চল্‌তো সাতদিন আগে থেকেই।... রাতের খাওয়া-দাওয়া নৌকায় হোতো। মাঝিরা বাবার চেনা। খুব খাতির করতো বাবাকে। আমাদের আলাদা বন্দোবস্ত থাকতো নৌকার পেছনে। মাঝি বা মাত্রীরা গান ধরতো ভাটিয়াল নয়তো দেহতত্ত্ব।

বাবার গলাও শোনা যেত সে সময়। উজানী নৌকার ঢেউ-ভাঙ্গা জলের কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে গানের সুর, একাকার হয়ে যেত তখন। ঘুম পেয়ে যেত আমার। পাটাতনের একপাশে গুটি গুটি হ'য়ে শুয়ে পড়তুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেত আমার।...রাত কত জানি না, দেখি, ঠিক আমার পায়ের কাছে ছায়ার মত নিঝুম হয়ে বসে আছেন বাবা,—দৃষ্টি প্রসারিত ধলেশ্বরীর বিশালতা ছাড়িয়ে আরো দূরের অন্ধকারে;—যেখানে চুম্‌কীর মতো কতকগুলো তারা জলের' 'আয়নায় ঝিকিমিকি জ্বল্‌ছে...,

'তখনো বুঝিনি, কিন্তু পরে বুঝেছি, শুধু নিজের ঘরবাড়ী, পুকুর জমিজমাই নয়, বাড়ীর পাশে ওই ধলেশ্বরী নদীটি ছিল বাবার আত্মার সামিল। ওর বর্ষার ধারাজলেই আমাদের ক্ষেত বাঁচে, আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়।'

মাঝে মাঝে বাবাকে বলতে শুনেছি,...বুঝলি পুটুমা, নদীই দেশের প্রাণ। আর তাইত ক্ষেতকে পূজো না করে নদীকেই পূজো করি আমি, আমার ধলেশ্বরী নদী মাকে—,

মহিলাটি চুপ করলেন একটানা এতকথা বলার পর। তারপর কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে রইলেন। এবার বুঝতে হয়না, কেন গাঙ্গুলীর শ্বশুরমশাই হিন্দুস্থানে চলে আসার পর মেয়েদের নাম এমন পাল্টে রাখলেন। মেঘনা যমুনা, ধলেশ্বরী।

পূব্‌বাঙ্‌লার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার এ' এক আশ্চর্য্য বিলাসিতা বটে!...

অনুরোধ উপরোধে সে-রাতে গাঙ্গুলীর ওখানেই খেতে হোলো।

আরো সুখ-দুঃখের কথা হোলো। ডাক বাংলায় যখন ফিরে এলাম, তখন অনেক রাত।...

মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ পরিচয় গাঙ্গুলী পরিবারের সঙ্গে, অথচ এ' টুকুর মধ্যে পুব্‌ বাঙ্‌লার ফেলে আসা দিনের ধূসর স্মৃতিকে ফিরে পেলাম যেন।

শুয়ে-শুয়ে বিগতদিনের কত কথাই না মধু গুঞ্জরণ তুলে সঞ্চারিত হ'তে লাগলো মনে।...

শস্যশ্যামল নদীমাতৃক সোনার বাঙলা। তাকে ত কোনমতেই ভুলতে পারি নে। স্নায়ু আর রক্তের সঙ্গে মাতৃভূমির জড়ানো স্নেহ-লালিত উর্বর পলিমাটি আর ষড় ঋতুর কোমল মিষ্টি স্পর্শ তখনো কেমন মাতাল করে দেয়।...

নরসিংপুরে যতদিন ছিলাম, একবার করে যেতে হ'য়েছে গাঙ্গুলী বাড়ী।

দম্পতির সনির্বন্ধ অনুরোধ ছাড়াও আরো যেন একটা কী,—পাদুটোকে যন্ত্রের মত চালিত করেছে সে, বাড়ীর দিকে।

গাঙ্গুলীগৃহিনী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছেন, স্নেহ কোমল হাতে চা-মিস্টির ডিস্ এগিয়ে দিয়েছেন। আর গাঙ্গুলী অনর্গল বলে বাঙ্গলা বলার নিঃস্ব অভাব মিটিয়ে নিয়েছেন আমাকে দিয়ে, আমিও যথারীতি তার প্রত্যুত্তর ও সদ্ভাব রেখে চলেছি।...

ঠিক এক সপ্তাহ পর গাঙ্গুলী দম্পতির পরিচয় সূত্র কাটিয়ে বিষাদিত মনে বিদায় নিয়ে চলে এলুম বটে, কিন্তু কেন জানি না, প্রথম দেখা সেই একমাথা লাল চওড়াপাড় ঘোমটার তলে গৌরবর্ণ গাঙ্গুলীগৃহিনীর ফুটফুটে মুখ আর তার স্বনামের সঙ্গে জড়ানো ধলেশ্বরী নদীর কথা অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারিনি।......

হঠাৎ ধলেশ্বরী নদীর কথাই মনে হোলো আবার।

প্রায় চার পাচ বছর পর।

না, আর দেখা হয়নি, নরসিংপুরের সেই সুন্দর গোলগাল মুখে টকটকে সিদুঁর টিপে উজ্জ্বলা ধলেশ্বরী নামের মহিলাটির সঙ্গে, আর পূর্ব বাঙ্গলায় ফিরে গিয়েও চাক্ষুস দেখলুম না জীবনস্বরূপ বিসর্পিল ধলেশ্বরীর ধারা প্রবাহে, আমি দেখলুম, আমার স্বপ্ন দেখা ধলেশ্বরীকে অন্যরূপে।

এমনি একবার দেখেছিলাম, যখন রাজনৈতিক কুচক্রান্তে পূর্বাবাঙ্গলার বাস্তুভিটা ছেড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে আসতে হয়েছিল পশ্চিমবাঙ্গলায়। দিনের সূর্য তখন অসময়ে জিঘাংসা ও পৈশাচিক হত্যালীলার অমা-অন্ধকারে ধীরে ধীরে মুখ লুকিয়ে রাখছেন॥

পবিত্র ধলেশ্বরীর জল তখন সংখ্যাতীত নিরপরাধের রক্তে ক্লেদক্ত, কলংকিত।

কিন্তু এবার দেখলাম, আশ্চর্য হ'য়েই দেখলাম, অসময়ে অন্ধকার আড়ালে ডুবে যাওয়া কম্পমান সূর্য আবার রক্তস্নান করে শুচিশুদ্ধ হ'য়ে জাগছে, জীবননদী ধলেশ্বরীর দুপাশে আদিগন্ত সবুজের ঢেউ-খেলানো কচি ধানের শীষে শীষে।...

সহসা আরো একটা কথা মনে হোলো আমার:

একদিন কথার মাঝে নরসিংপুরের গাঙ্গুলীগৃহিনী বলেছিলেন, বুঝলেন রায়মশাই আমার বাবার বড় ইচ্ছা আবার পূববাঙ্গলায় ফিরে যান। কিন্তু তা কি আর কোনদিন হবে?"

জবাব তখন দিতে পারিনি কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ঐ প্রশ্নের উত্তর দেয়া এখন তেমন হয় তো কষ্ট নয়।

পূববাঙ্গলায় মরণ পণ অযুত মুক্তি যোদ্ধাদের নির্ভিক পদধ্বনি ও তাদের শানিত অস্ত্রের আঘাতেই সেই জবাব আজ স্পষ্ট, নিঃশঙ্ক।

বঙ্কিম-সাহিত্যে রূপমোহ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যে রূপমোহ অন্যতম প্রধান উপজীব্যরূপে প্রায় সব বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে বঙ্কিম-সাহিত্যে বর্ণিত রূপমোহকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের রূপমোহ ব'লে মনে করলে ভুল হবে। রূপমোহের ঐন্দ্রজালিক শক্তির সম্বন্ধে সচেতনতা দোষাবহ নয়। রূপের জাদুশক্তির সীমা কোথায়, তা জানার অর্থ, রূপমোহকে জয় করার শক্তি অর্জন করা। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ শক্তি যে অর্জন করেছিলেন, তাঁর রচনায় তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রূপপ্রভাবের মাদকতাময়ী শক্তির বহু বিচিত্র বর্ণনায় বঙ্কিমের উপন্যাস সমৃদ্ধ ব'লে অনেকে ভুল ক'রে তাঁকে নারীর রূপলাবণ্য সম্বন্ধে ঈষৎ দুর্বল বা মোহগ্রস্ত ভাবতে পারেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রূপের অন্তর্নিহিত শক্তির আকর্ষণ সামর্থ সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞ হলেও কখনও তার বশীভূত হন নি। এ ব্যাপারে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুভূতি ও মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর উপলব্ধি ও প্রকাশভঙ্গির তুলনায় প্রকৃত বিষয়টি নিঃসংশয়ে বোঝা যায়।

রূপ, বিশেষত নারীর রূপ, কেমনভাবে মানুষকে কতটা আকর্ষণ করে, তার বর্ণনায় বঙ্কিমের কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। বঙ্কিম কেবল নারীর রূপ নয়, পুরুষের রূপের বর্ণনাতেও বিস্ময়কর সফলতা লাভ করেছিলেন যার কোন তুলনা পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম সাহিত্যেও বিরল। সাধারণত বঙ্কিমের নারীরূপ বর্ণনা সুপরিচিত ও বহুজন-আলোচিত। কিন্তু পুরুষের রূপ বর্ণনায় বিশেষত নারী-চিত্তে পুরুষের রূপ কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তার বর্ণনায় বঙ্কিম শুধু অদ্বিতীয় নন, তুলনারহিত। তাঁর নারীরূপ বর্ণন শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মোহিতলাল, দিলীপকুমার প্রভৃতি শিল্প রসিকেরা করেছেন। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের রূপবর্ণনার সামর্থ্য বিষয়ে দিলীপকুমারের মন্তব্য সুধীজনের বিচার্য :—

"বঙ্কিমের সীতারামে শ্রী ও জয়ন্তীর রূপ বর্ণনা আমি ভুলতে পারিনি কোনোদিনই। তাঁর তিলোত্তমা আমাকে কোনো দিনই স্পর্শ করে নি - তবে রোহিণী ? আশ্চর্য নয় তার রূপ বর্ণনা ? যা দেখেছি তাকে শুধু জীবন্ত নয়, জ্বলন্ত ক'রে তোলা। এ-শক্তিতে বঙ্কিমের সমকক্ষ সাহিত্যিক আমাদের দেশে এ-যাবৎ জন্মগ্রহণ করেননি পৌরুষে, পাণ্ডিত্যে, দৃষ্টিশক্তিতে, মননশক্তিতে মিলিয়ে। মোহিতলাল এ কথা নানাভাবেই বলেছেন ও দেখিয়েছেন। ধন্যবাদ তাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠাকে— তাঁর আন্তরিকতাকে।" (ত্রিবাঙ্কোর পরিব্রাজক— আবার ভ্রাম্যমাণ, ১৯৮ পৃষ্ঠা।)

বঙ্কিমচন্দ্রের নারী রূপ বর্ণনাসমূহের মধ্যে তিলোত্তমা, বিমলা, আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, মনোরমা, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, ইন্দিরা, রোহিণী, শ্রী, জয়ন্তী, এই লোকললামভূতা রমণী কুলরাজ্ঞীদের লাবণ্য-উজ্জ্বল রেখাচিত্র তার তুলিকার ইন্দ্রজালে পাঠক মাত্রের চোখে পড়ে। কিন্তু নারীর চোখে পুরুষের রূপ কেমনভাবে ধরা পড়ে, তার বর্ণনা হয়তো সব পাঠক লক্ষ্য করেন না। তেমন দু একটি রূপ-বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা যাক।

প্রথমে চোখে পড়ে বিমলা ও তিলোত্তমার চোখে জগৎ সিংহের রূপ :—

"যুবক মন্দিরাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিয়া রমণীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার শরীরোপরি দীপরশ্মিসমূহ প্রপতিত হইলে, রমণীরা দেখিলেন যে, পথিকের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে; শরীর এতাদৃশ দীর্ঘ যে, অন্যের তাদৃশ দৈর্ঘ অসৌষ্ঠবের কারণ হইত। কিন্তু

যুবকের বক্ষোবিশালতা এবং সর্বাঙ্গের প্রচুরায়ত গঠন-গুণে সে দৈর্ঘ্য অলৌকিক শ্রীসম্পাদক হইয়াছে। প্রাবট্ সম্ভূত নবদূর্বাদলতুল্য, অথবা তদাধিক মনোজ্ঞ কান্তি; বসন্তপ্রসূত নব পত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জাতির পরিচ্ছদ শোভা করিতেছিল, কটিদেশে কটিবন্ধে কোষসম্বদ্ধ অসি, দীর্ঘ করে দীর্ঘ বর্শা ছিল; মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি এক খণ্ড হীরক; কর্ণে মুক্তাসহিত কুণ্ডল, কণ্ঠে রত্নহার।

নবীনা রমণী ক্রমে ক্রমে অবগুণ্ঠনের কিয়দংশ অপসৃত করিয়া সহচরীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে অনিমেষ চক্ষুতে যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। যুবতীর চক্ষুদ্বয়ের সহিত পথিকের চক্ষু সংমিলিত হইল। যুবতী অমনি লোচনযুগল বিনত করিলেন চতুরা সহচারিণী এই দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, যে লক্ষণ দেখিতেছি, পাছে এই অপরিচিত যুবাপুরুষের তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া আমার হস্তসমর্পিতা এই বালিকা মন্মথ-শরজালে বিদ্ধ হয়।"

তারপর কুচরিত্রা নারীর মনোভাব বাঞ্ছিত লম্পট পুরুষ সম্বন্ধে, যা থেকে দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার ঈষৎ Sadist-প্রেমের পরিচয় মেলে :—

"যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্রবাবুর হাতে দিই, তা হলে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব না। কি মুখখানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্‌সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বলতে লোক পেলেন না! মারি মিন্‌সের নাকে এক কিল। আহা, তার নাকে কিল মেরেও সুখ।...প্রভু, আমি আপনার রূপগুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। আমি ধার্মিক নহি, ধর্ম বুঝি না—ধর্মে আমার মন নাই। যে দিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণ সেবা করিব।"

এর সঙ্গে তুলনীয় রমা-র প্রতি গঙ্গারামের আসক্তি :—

"গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। সে রমা। রমারই সৌন্দর্যের খ্যাতিটা বেশি ছিল। তা, সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর। কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি এমন দেখাইল? তা হ'লে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান্ রঙ্! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা, তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা, কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবী দুর্লভ! গঙ্গারাম ভাবিল, মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জান্‌তেম না। একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।"

এরই নাম প্রকৃত অর্থে, রূপ-মোহ। জগৎসিংহের প্রতি তিলোত্তমার, জগৎসিংহের প্রতি আয়েষার, আয়েষার প্রতি ওসমানের, নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দের যে আকর্ষণ তা হল রূপানুরাগ কিন্তু রূপমোহ নয়। কিন্তু দেবেন্দ্রের প্রতি হীরার, কুন্দের প্রতি নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র, দুজনের, কল্যানীর প্রতি ভবানন্দের, প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর যে আসক্তি—তার নাম রূপমোহ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এর যে চিত্র রূপায়িত, আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে তার কোন তুলনা পাওয়া যায় নি, বঙ্কিমচন্দ্র এর স্বরূপ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তা শ্রেষ্ঠ মনোবিশ্লেষক ঔপন্যাসিকের যোগ্য এবং এ-ব্যাপারে ফরাসি ও রুশ সাইকো-এ্যানালিস্ট নভেলিস্টদের চেয়েও তিনি অনেক বেশি অগ্রসর ও পূর্ববর্তী। বঙ্কিমচন্দ্র রূপমোহকে কথনও সমর্থন করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনের তুলনায় এদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য বেশি। তাঁর এ সম্পর্কে মন্তব্যগুলি অনুধাবনযোগ্য :—

"একে ভালবাসা বলে না। এ একটা সর্বাপেক্ষা

নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি - যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে তার সর্বনাশ করিয়া ছাড়ে।"

"তখন সেই পাপমণ্ডপে বসিয়া পাপান্তঃকরণ দুই জনে, পাপাভিলাষ বশীভূত হইয়া চিরপাপরূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপে উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।"

গঙ্গারাম সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্য উপভোগ্য, যখন সে ভাবছে কেবল রমার কথা ভেবেই তার আশাপূরণ হবে :—

"তা কি পারা যায় রে মূর্খ! একবার দেখিয়া অমন হইলে আর একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। দুপুর বেলা গঙ্গারাম ভাবিতেছিল, "একবার যে দেখিয়াছি, আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচি, সেই কয় বৎসর সুখে কাটাইতে পারিব।"—কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ভাবিল, "আর একবার কি দেখিতে পাই না?" গঙ্গারাম রমার কাছে আসিয়া মাথামুণ্ডু কি বলিল, তাহা গঙ্গারাম নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না। রমা ত নয়ই। আসল কথা, গঙ্গারামের মাথামুণ্ড তখন কিছুই ছিল না। সেই ধনুর্ধর ঠাকুর ফুলের বান মারিয়া তাহা উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহার চক্ষু দুইটি ছিল, প্রাণ পাত করিয়া গঙ্গারাম দেখিয়া লইল, কান ভরিয়া কথা শুনিয়া লইল, কিন্তু তৃপ্ত হইল না।"

বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমকে শ্রদ্ধা করতেন, এমন কি অ-পরিনীত প্রেমকেও; কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার ওপর সামাজিক অনুমোদনের ছাপ একান্ত প্রয়োজন বোধ না করলেও তিনি সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির পক্ষে অকল্যানকর কোন রকম রূপমোহকে আদৌ প্রশ্রয় দেন নি। রূপমোহের আগুনে মানব মনের পুঞ্জীভূত বাসনারাশি প্রজ্বলিত হলে যে বেদনাদায়ক অথচ সুন্দরশ্রী রঙিন বৈচিত্র্যের স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়, তার ফুলঝুরি লীলার আপাত রমনীয়তা পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকদের বিভ্রান্ত করলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচলিত বা সত্য পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রূপমোহ-গ্রস্ত বিপথগামী ও বিপথগামিনীদের ভয়াবহ কিন্তু স্বাভাবিক পরিণাম তিনি নির্দেশ করেছেন।

শশিশেখর ভট্টাচার্য ওরফে অভিরাম স্বামী যে কি চমৎকার সচ্চরিত্র লোক ছিলেন, তা দুর্গেশনন্দিনীর পাঠকদের মনে থাকার কথা। কিন্তু বিমলার মা যথার্থ পতিপ্রাণা ছিলেন যেমন ছিলেন বিমলাও। সেই জন্যে বিমলার এই মন্তব্য স্বাভাবিক :—

"তখন মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রপূত ব্যতীত যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি স্বর্গারোহণে অধিকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।"

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে অহেতুক গোঁড়ামির অপবাদ দেওয়া অত্যন্ত অযৌক্তিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে অর্জুন-চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা-বজ্রসেন প্রণয়-নাট্যযুগল রচনা করেছেন, রুশদের মতোই বঙ্কিমচন্দ্র তা কখনও অনুমোদন করতেন না। রুশরা শ্যামানাটকের অন্তর্নিহিত প্রণয়তত্ত্ব ও মানবতার নীতি বুঝতে ব্যর্থকাম হওয়ায় নাটকটি সোভিয়েট ইউনিয়নে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। বজ্রসেনের প্রতি যে অনুরাগে শ্যামা উত্তীয়কে বলি দিল তাকে বঙ্কিমচন্দ্র কদর্য রূপমোহ ছাড়া আর কিছু বলতে পারতেন না। তিনি দেখিয়েছেন, রূপমোহের মতো সাংঘাতিক কুপ্রবৃত্তির কবলে খালি গঙ্গারাম ও হীরার মতো অপেক্ষাকৃত নিম্নকোটির মানুষরাই নয়, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, অমরনাথ, ভবানন্দ, মবারক প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মানুষরাও গিয়ে পড়ে। কিন্তু স্বভাবত বীর যারা, তারা বীরের মতোই আত্মত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের পথে প্রায়শ্চিত্ত করে, আর কাপুরুষরা দেবেন্দ্র, গঙ্গারাম, শৈবলিনী, তকি খাঁ প্রভৃতির মতো ঘৃণিত পরিণাম লাভ করতে বাধ্য হয়।

বঙ্কিম সাহিত্যে রূপমোহের যে দৃষ্টান্ত সবচেয়ে মর্মস্পর্শী তা আনন্দমঠে ভবানন্দ-কল্যানীর কথোপকথনের মধ্যে নিহিত। কল্যানী ভবানন্দের মুখে যদি শুনতে পেত যে, তাকে পেলে ভবানন্দ মরবে না, তাহলে তার কাছে ভবানন্দের প্রেমের হয় ত কোন মূল্য থাকত; কিন্তু যখন সে বুঝল, তাকে পেলেও যে ভবানন্দের মরা উচিত এ-বোধ ভবানন্দের মনে আগে থেকেই আছে, লালসার চরিতার্থতার অপেক্ষা রাখে নি, তখন যে ঘৃণা ঐ রূপমোহের প্রাপ্য, তাই সে ভবানন্দকে দিয়েছে। কিন্তু ভবানন্দের অনুপম বীরত্ব তার মরণকে গৌরবান্বিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এটা বলতে চেয়েছেন যে, অন্যথা বহুগুণান্বিত পুরুষও রূপমোহের আকর্ষণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তাঁর মতো রমনীরূপরসিক শিল্পীও তাই ভবানন্দের মৃত্যুর পর সক্ষোভে মন্তব্য করেছেন, "হায় রমণীরূপলাবণ্য, ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্।"

বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষের রূপমোহে তীব্রতমরূপে বর্ণনা করার জন্যে পুরুষের স্বমুখে মুখ্যত জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দ কাব্যের ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এ-প্রয়োগ বাঙালী জাতির পুরুষের প্রণয়স্ফূর্তির সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে সুসমঞ্জস হয়েছে। এই প্রয়োগের যথার্থতার প্রশংসা ক'রে শেষ করা যায় না। প্রথমে বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দেবেন্দ্রের ভাষা লক্ষ্য করা যাক:—

"আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে।"

প্রায় এক রকমই ভবানন্দের মনোভাব:—

"তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। সেইদিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না যে, সংসারে এ-রূপরাশি আছে। এমন রূপরাশি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয়।"

এবার জয়দেবের সেই মাদকতাময় ছন্দ স্মরণ করা সঙ্গত:—

সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানম্
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্।
স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥

লক্ষ্য করা উচিত যে, দেবেন্দ্র-হীরা প্রণয়-প্রসঙ্গে এই পদ্যাংশটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে: পদবল্লবমুদারম্!

গোবিন্দলালের রূপমোহের অন্যতম কারণরূপে তার অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণাকে দেখিয়ে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা সীতারাম, নগেন্দ্রনাথ, মবারক, মতিবিবি, শৈবলিনী প্রভৃতির ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। অনেকে মনে করেন, স্ত্রী বা স্বামী যথেষ্ট পরিমাণে রূপের অধিকারী না হলে মানুষের অচরিতার্থ রূপতৃষ্ণা তাকে সহজে রূপমোহগ্রস্থ করতে পারে। এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অত্যন্ত কুদর্শনা নারীর স্বামী অত্যন্ত সচ্চরিত্র এবং সুন্দরী লাবণ্যময়ীর স্বামী কুরূপা দাসীর প্রতি আসক্ত, এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যাবে। বস্তুত রূপের সাগরে আকণ্ঠ ডুবে থেকেও কেউ কেউ রূপমোহগ্রস্থ হয়। বাস্তবিকই এটি একটি নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি যা মানসিক ব্যাধির মতো। সীতারামের চরিত্রে কোন সমালোচক "অতৃপ্ত রূপমোহ" লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু সীতারামের অনেক সুন্দরী স্ত্রী ও উপপত্নী ছিল, তাতে শ্রীর প্রতি মোহ কিছু কম হয় নি। নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখী পরম সুন্দরী ছিলেন। শৈবলিনীর স্বামীও অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাতে ক'রে যৌনক্ষুধা ও রূপাসক্তির বিষদাঁত ভাঙা যায় নি। আসলে উপভোগের দ্বারা রূপলালসা চরিতার্থতা বা নিবৃত্তিলাভ করে না। আগুনে ঘি দেওয়ার মতো রূপোপভোগ কেবল রূপতৃষ্ণা বাড়িয়ে

দেয়। আর ঐ বাসনা যুক্তির পথেও চলে না। পরম সুন্দরী স্ত্রীর নির্দোষিতা সত্ত্বেও তার সকরুণ প্রণয় আবেদন নির্মমভাবে উপেক্ষা ক'রে মহামনীষী পরম যুক্তিবাদি আর্ল বার্ট্রাণ্ড রাসেল বন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা ও কলহকরে যে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে ব্যভিচার করতেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর মতো সুন্দরী ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের রূপমোহগ্রস্তা নায়িকা বা অন্যধরণের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে শৈবলিনী, হীরা, রোহিণী মতিবিবি—এরা কেউই প্রকৃত অর্থে প্রেমিকা নয় কিম্বা ভবানন্দ, মবারক, অমরনাথ প্রভৃতির মতো আত্ম-বিসর্জনের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিবিধানে তৎপর নয়। শৈবলিনীকে দিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়েছে বটে, কিন্তু তা যেমন নিস্ফল, তেমনি অনিচ্ছাগৃহীত। মরণভীরু শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্তের ফলে উন্মাদিনীতে পরিণত হল। কিন্তু উন্মাদ রোগ থেকে মুক্ত হওয়ামাত্র শৈবলিনী নিজে কোন রকম স্বার্থত্যাগের পরিবর্তে প্রতাপের মৃত্যুর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে দিল। প্রতাপের সঙ্গে মরণ-চুক্তিতে আবদ্ধা সে যেমন একদিন অনায়াসে প্রতাপকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে ফিরে এসেছিল, তেমনি রোগমুক্তির পরও তার দাবি পূরণ করতে প্রতাপকে মরতে হল। স্বার্থপরতাই মতিবিবি, হীরা, শৈবলিনী ও রোহিণী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য। অথচ এদের মুখে বড় বড় কথার অভাব নেই। শৈবলিনীর রূপমোহের বর্ণনা এই রকম:—

"কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন-কালেও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত পাইলাম না কেন? পাইলাম ত না মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই। যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।"

বঙ্কিমচন্দ্র এমন কোন নারী চরিত্র সৃষ্টি করেন নি যা প্রতাপ বা অমরনাথের মতো আত্মত্যাগের পথে রূপমোহকে জয় করেছে। আয়েষা অতি সুন্দর চরিত্র; কিন্তু তাকে রূপমোহে অভিভূতা হতে দেখা যায় নি। প্রতাপ নিজে রূপমোহগ্রস্ত না হলেও সে শৈবলিনীর ডাকে সাড়া দেবার ভয়ে আত্মবলিদান করে। এ-সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটি বর্ণনা ও প্রতাপের নিজের মুখের একটি কথা লক্ষ্য করার উপযুক্ত:—

"প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।" এ জন্মে এ-অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া, এদেহ পরিত্যাগ করিলাম আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম।"

প্রতাপ ইন্দ্রিয় জয় করেছিল বটে, কিন্তু তার মন বিচলিত হবার ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছিল। সে যথার্থ বীর ব'লে দেহত্যাগ করল। এ-শক্তি বঙ্কিমের কোন নারী চরিত্রে দেখা যায় নি। অবশ্য অন্যদিক থেকে মহীয়সী নারী চরিত্রের অভাব বঙ্কিম-সাহিত্যে নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাস ও জয়দেবের সাহিত্যে বর্ণিত প্রেমকে উচ্চস্তরের ব'লে মনে করেন নি। কিন্তু বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের সাহিত্যে উল্লিখিত প্রেমকে উন্নতভাবের ব'লে বর্ণনা করেছেন। যাদের মধ্যে গভীরতা আছে তারা অবশ্যই তাঁর সঙ্গে একমত হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যের সমস্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে রূপমোহের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি কোথাও ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের, কোথাও সমাজ বা রাষ্ট্রের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে। সামাজ, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত, সেখানে ব্যক্তির পক্ষে নিস্তার লাভ প্রায়শ সুকঠিন; সমগ্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে অংশের পরিত্রাণ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সবচেয়ে ভয়ানক রূপমোহের দৃষ্টান্ত দুটি দেখা যাচ্ছে মৃণালিনী ও সীতারাম উপন্যাসে। পশুপতি-মনোরমা আর শ্রী-সীতারাম কাহিনী দুটিতে ব্যক্তিগত রূপতৃষ্ণার পরিণাম শুধু ব্যক্তি নয়, সমষ্টির পক্ষে কতটা শোকাবহ হতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পশুপতির মনোরমার প্রতি আসক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মনোরমার যে রূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তা বঙ্কিম-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বর্ণনা, সর্বোত্তম সৌন্দর্য্য বিবৃতি যদি নাও হয়। ঐ রূপ পশুপতির মনে যে তীব্র মোহের সঞ্চার করেছিল, তার জন্যেই তার স্বজাতিদ্রোহী হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। বীরপুরুষ ও সুন্দরী রমার স্বামী সীতারাম স্ত্রীর প্রতি নিছক স্বামীভাবে আকৃষ্ট না হয়ে পশুভাবে আকৃষ্ট হলেন ব'লেই তাঁর নিজের অতি ভয়ানক পতন হল যার অনিবার্য পরিণামে তাঁর রাজ্য ও দেশবাসীরা উৎসন্ন গেল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐন্দ্রজালিক লেখনীতে লালসার পঙ্কতালে সুষমার যে কমল সুর রচনা করেছেন, তার স্মৃতি জাগিয়ে তোলার জন্যে এই উদ্ধৃতি দুটি দেওয়া হল :—

"সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোণার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গ শিশু শ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলক শ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্ধচন্দ্রাকৃত নির্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীল পুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল লোচন যুগল; মুহুর্মুহু আকুঞ্চন বিস্ফারণ প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরৌষ্ঠ যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগলতুল্য; কপোল যেন চন্দ্র করোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বু-বিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা।......ঐ যে মনোরমা দেবী গৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোচন জন্য উন্নত-মুখী, নয়নতারা উর্ধ্বস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, অবদ্ধ কেশরাশির কিয়ংদশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষৎমাত্র অগ্রবর্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে, ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যোদয় সদ্যঃপ্রফুল্লদলমালার্ময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন।"

শ্রীর রূপ, সেই রূপের প্রতি সীতারামের মোহ এবং তাঁর পতনের কারণের যথাযথ ব্যাখ্যা—নীচের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাবে :—

"সকলে দেখিল, সহসা অতুলনীয়া রূপবতী বৃক্ষের ডাল ধরিয়া, শ্যামল পত্ররাশি মধ্যে বিরাজ করিতেছে। প্রতিমার ঠাটের মত, চারিদিকে বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ঘেরিয়া রহিয়াছে; চুলের উপর পাতা পড়িয়াছে, স্থূল বাহুর উপর পাতা পড়িয়াছে, বক্ষঃস্থ কেশদাম কতক কতক মাত্র ঢাকিয়া পাতা পড়িয়াছে, একটি ডাল আসিয়া পা দুখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।...মহামহীরুহের শ্যামল পল্লবরাশিমণ্ডিতা চণ্ডীমূর্তি, দুই শাখায় দুই চরণ স্থাপন করিয়া বাম হস্তে এক কোমল শাখা ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে অঞ্চল ঘুরাইতে ঘুরাইতে ডাকিতেছে, "মার! মার! শত্রু মার!" অঞ্চল ঘুরিতেছে, অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম বায়ুভরে উড়িতেছে—দৃপ্ত পদভরে যুগল শাখা দুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুরিমময় দেহ উঠিতেছে, নামিতেছে...উত্থিত বাহু, কি সুন্দর বাহু! স্ফুরিত অধর বিস্ফারিত নাসা, বিদ্যুন্ময় কটাক্ষ, স্বেদাক্ত ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের শোভা।...সীতারাম চাহিয়া দেখিলেন, সন্মুখে গৈরিক বস্ত্র রুদ্রাক্ষভূষিতা মুক্তকুন্তলা রমনীয়া মূর্তি। রাজা, "আমার শ্রী" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন, আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন যে, স্থির মূর্তি, অবিচলিত ধৈর্যসম্পন্না, অশ্রু বিন্দুমাত্র শূন্যা, উদ্ভাসিত রূপরশ্মিমণ্ডল-মধ্যবর্তিনী, মহামহিমাময়ী এযে দেবী প্রতিমা! হায়! মূঢ় সীতারাম মহিষী খুঁজিতেছিল—দেবী লইয়া কি করিবে।...কথাগুলি বড় মনোমোহিনী। যে বলে, সে আরও মনোমোহিনী। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই মনোমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল

হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। আগে আগুন ত জ্বালিয়াইছিল এখন ঘর পুড়িল। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে তাহার মোহিনী শক্তির অনেক লাঘব হইত। কিছু দিনের পর রাজার চৈতন্য হইতে পারিত। এই ইন্দ্রানীর মত সন্ন্যাসিনী বাঘছালে বসিয়া বাক্যে মধুবৃষ্টি করিতে থাকিবে, আর সীতারাম কুকুরের মত তফাতে বসিয়া মুখপানে চাহিয়া থাকিবে—অথচ সে সীতারামের স্ত্রী! শেষ সীতারাম স্থির করিলেন, শ্রীর প্রতি বলপ্রয়োগই করিবেন।... অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল। উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে সীতারাম আদেশ করিলেন, "রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।"

সীতারামের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার সময়ে আমরা যেন ভুলে না যাই যে তার দোষ শ্রীর প্রতি আকর্ষণ নয়, শ্রীর প্রতি রূপমোহ চরিতার্থ না হওয়ার আক্ষেপে নিরীহ নিষ্পাপ অগনিত কুলকন্যা কুলবধূর সর্বনাশ সাধন। আমরা যেন "ভানুমতীর কথায় রাজার কান ভরিয়াছিল", সে-কথা ভুলে না যাই। ভানুমতীর উক্তির কিছু অংশ :—

"আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্মনাশ করিয়াছ—মনে করিয়াছ কি, তার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহারও স্বামী কাঁদিতেছে, কাহারও শিশুসন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলে কি, সে-কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না?"

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন নারীহন্তা গোবিন্দলালকে ভ্রমরকে ফিরে পেতে দেন নি, তেমনি মহাপাপী সীতারামও শ্রীকে আর কখনও ফিরে পায় নি। "শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না।" এই হল শ্রী সীতারাম প্রসঙ্গে বঙ্কিমের শেষ কথা।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথের রূপমোহের অসংযমে হতভাগিনী কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়। তার মৃত্যুর জন্যে নগেন্দ্রনাথ দায়ী, তাঁর অবিমৃষ্যকারিতায় তাঁর নিজের, সূর্যমুখীর ও কুন্দনন্দিনীর জীবনে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। নগেন্দ্রনাথ সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ভদ্রলোক, একটি পরিবারের গৃহকর্তা। তাঁর ত্রুটিতে ব্যক্তিবিশেষ ও তাঁর নিজের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে সীতারাম এক বিস্তীর্ণ এলাকার শাসক, তাঁর কাজের দায়িত্ব অপরিসীম; সে-দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারেন নি। শ্রীকে যৌবনাগমের পর প্রথম দর্শনমাত্রেই তিনি অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, "তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!" শ্রীকে স্ত্রীরূপে নয়, মাত্র একটি নারীরূপে তিনি উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। তার সৌন্দর্য যেন তেন প্রকারেণ উপভোগের লালসায় কর্তব্যবোধে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি "চিত্ত-বিশ্রাম" গৃহে সর্বক্ষণ অতিবাহিত করতে লাগলেন। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী" নাটকের নায়িকা সুমিত্রার মতো একই উদ্দেশ্যে শ্রী সীতারামকে ত্যাগ করলে রাজা অতৃপ্ত কামের জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে পৈশাচিক উপায়ে সৌন্দর্য্য ভোগে প্রমত্ত হলেন। এ হল রূপমোহের বীভৎসতম পরিণতি। তাঁর কাজের দায়িত্ব যেমন গুরুতর, ফলাফলও তেমনি সুদূর প্রসারী হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের চোদ্দটি রোমান্সের মধ্যে অন্তত এগারোটিতে রূপমোহ মুখ্য বা গৌণ স্থান অধিকার করেছে। রূপ, রূপের বর্ণনা, রূপানুরাগ, রূপমোহ, রূপরসিকতা—বঙ্কিমের সব উপন্যাসেই রূপের প্রাধান্য বর্তমান রোমান্সের বিস্ময় মিশ্র সৌন্দর্যবোধ সর্বত্র প্রবল। দেবী চৌধুরানী, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারানী বই তিনটিতে রূপমোহের উল্লেখ নেই। শেষ দুটির ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে রূপমোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হবার সম্ভাবনা কম ছিল।

রূপমোহের সংঘর্ষে চরিত্র বিকাশের সুযোগ লাভে বঙ্কিম-সাহিত্যের পুরুষ চরিত্র যত সার্থক হয়ে উঠেছে, নারী চরিত্র তেমন কিছু পারে নি, একথা আগেই বলা হয়েছে। রূপমোহাতুরা একটি নারীকেও পরবর্তীকালে উর্দ্ধতিতা বা আত্মত্যাগধন্যা দেখা যায় না। বৈষ্ণব

পদাবলীর রাধা চরিত্রের মতো অসহায়ভাবে তারা প্রবৃত্তি ও আবেগের স্রোতে ভেসে গেছে। তার কারণ, অধোগতির পথে পা ফেলে দু একটি স্খলনের পরও পুরুষ সহজে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু নারী একবার পতিত হলে সহজে ফিরে আসতে পারে না বা চায় না। বঙ্কিমচন্দ্র এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যকেই বিকশিত করেছেন।

সামাজিক কারণেও পুরুষের রূপমোহ তত দোষের ব'লে মনে করা হত না। তার সাত খুন মাফ। নৈতিক চরিত্রের বিশুদ্ধির বিচারে ইন্দিরার স্বামী উপেন্দ্র কোন মতেই হীরা, শৈবলিনী বা রোহিনীর চেয়ে "ভালো লোক" নয়; কিন্তু তৎকালীন বাঙালী সমাজে উপেন্দ্র বিশিষ্ট ভদ্রলোকরূপে গণ্য হতে কোন বাধা ছিল না। এ ব্যাপারে উপেন্দ্রের নিজের উক্তি: গ্রামে কিছু সামাজিক দিলেই গোল মিটিবে। আমাদের টাকা আছে—টাকায় সবাইকে বশীভূত করা যায়।"

রূপমোহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের মনোভাব এক রকম ছিল, একথা আগে বলা হয়েছে। এই কারণে দুজনকেই সে যুগে অনেক বিরুদ্ধবাদী "নীতিবাগীশ" ও "পবিত্রতাবাদী" বলে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু কোন সত্যনিষ্ঠ শিল্পরসিক রূপমোহকে সমর্থন করতে পারেন না। রূপরসিক রূপশিল্পী হয়েও মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথও তা করেন নি। অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল ও বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কঠোরতর ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের রূপবর্ণনার কৃতিত্ব অস্বীকার কেউ করতে পারেন না। কিন্তু রমণীরূপের নিপুণ বর্ণনশিল্পী হয়েও তিনি যা বলেছেন তা-ই বঙ্কিমচন্দ্রের মনের কথা এবং জার্মান দার্শনিক শোপনহাউঅরের Metaphysics of Love গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়:—

এই প্রেম, এই ঈপ্সা শুধু কাম, শুধু লিপ্সা—
এ শুদ্ধ বিধির বিধি, ভবে
রাখিতে তাঁহার সৃষ্টি; আর এই রূপবৃষ্টি—
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।

১৭৭৪-১৯.০ সালের বাঙালি Maitre বা গুরুস্থানীয় মহামনীষীরা শুধু শিল্পে সাহিত্যে নয়, লোকচরিত্রে এবং দর্শনে ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই রূপের পুষ্পসুষমা অনায়াস লাবণ্যলীলায় বিতরণ করেও তার বালুকাবেলায় শুকিয়ে যাওয়া শিশিরের মতো মোহের মর্ম উন্মোচন করতে তাঁদের কোন দ্বিধা ছিল না।

ছেলেদের পাততাড়ি

পিনাকী ভূষণ

শান্তা দেবী

সাত সমুদ্র পারের একদেশে গোষ্ঠভূষণ নামে একটি দরিদ্র ছুতোর থাকত। ছোটখাট দেখতে মানুষটি, বুড়ো হয়েছে, নিজের বলতে কেউ নেই। একদিন তার এক বন্ধু গোষ্ঠকে একলা বসে থাকতে দেখে একটা বড় কাঠের গুঁড়ি তাকে উপহার দিয়ে গেল। এমন কাঠ দিয়ে উনান জ্বালানো যায়, আগুণ পোয়ানো যায়। কিন্তু গোষ্ঠ ঠিক করলে কাঠ দিয়ে একটা বড় পুতুল তৈরী করবে। সেই পুতুলটা ছেলের মত তার সঙ্গী হয়ে থাকবে। তার নাম রাখবে পিনাকী। এই নামে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে মনে হল।

বাইরে তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঝোড়ো হাওয়ার সাঁ সাঁ আওয়াজ দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ঘরের ভিতরটা দিব্যি শান্ত ছিম্‌ছাম্। উনানে পোড়া কাঠের মৃদু গন্ধ। একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা রান্নার বাসনের পাশ থেকে ঝিঁ ঝিঁ করে ডেকে চলেছে। পোষা বেড়ালটা কাঠের কুচিগুলো নিয়ে খেলা করছে, বৃদ্ধ গোষ্ঠ বাটালি নিয়ে পুতুল কুঁদতে ব্যস্ত। পুতুলের গোল মাথাটিতে চুল খোদাই করা হল সবার আগে, তারপর তৈরী হল কপাল। চোখ দুটি খোদাই করতেই গোষ্ঠ দেখলে পুতুলটা জীবন্ত। ওর দিকেই পুতুল তাকিয়ে দেখছে। এইবার নাক খোদাই হবে। ওটাকে নিয়েই বড় জ্বালা। কাটতে সুরু করতেই নাকটা বাঁশির মত লম্বা হয়ে চলল। যত খোদে, ততই নাক বাড়ে। মুখের ছ্যাঁদা কাটতেই পুতুল জিভ বার করে ওকে ভেঙাতে সুরু করল।

গোষ্ঠ ভাবলে, "কি দুষ্টু ছেলে রে বাবা!" মুখে কিন্তু কিছু বললে না। পুতুলের দুটো হাত তৈরী হল, দুটো পা, দুটো পায়ের পাতা। সব তৈরী হয়ে গেলে পুতুলকে গোষ্ঠ মেঝের উপর দাঁড় করিয়ে দিল। পা দুটো প্রথম প্রথম আড়ষ্ট লাগছিল। গোষ্ঠ পুতুলকে কি করে হাঁটতে হয় দেখিয়ে দিলে। পুতুল চট্ করে শিখে নিল।

গোষ্ঠ তখন বললে, "হাঃ, এইবার ঠিক হয়েছে।" পিনাকী ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। দুই এক পাক দিয়েই সে হঠাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করল। বাড়ী ছেড়ে পালাবার মতলব।

বুড়ো গোষ্ঠ পিনাকীর পিছন পিছন বেরিয়ে, "থামাও থামাও" বলে চেঁচাতে লাগল। "ওগো, কেউ ছেলেটাকে ধর।" বলে কত ডাকল।

বেচারী গোষ্ঠ! ভারী দয়ালু, মিষ্টি স্বভাব, পিনাকীকে ভালবাসে ঠিক সত্যি ছেলের মত। ওকে নিয়ে তার কত গর্ব্ব, কিন্তু পুতুলটা এই বয়সেই ভারী দুষ্টু আর স্বার্থপর হয়ে উঠছে।

একটা পাহারাওয়ালা পিনাকীর নাক ধরে তাকে পাকড়ে আনছিল। কিন্তু পিনাকী আঁচড় পাঁচড় করে তার হাত ছাড়িয়ে বাড়ীর দিকে দৌড়দিল। বাড়ীতে অবশ্য তখন কেউ ছিল না, কারণ গোষ্ঠ পিনাকীকেই খুঁজতে বেরিয়ে ছিল। কিন্তু গোষ্ঠ কোথায় গেল তা নিয়ে পিনাকী মোটেই মাথা ঘামাচ্ছিল না। সে কেবল নিজের ক্লান্তির কথাই ভাবছিল; কি করে একটু বিশ্রাম পাওয়া যায় সেই তার একমাত্র চিন্তা। হঠাৎ একটা আওয়াজ শোনা গেল সরু গলায় কে ডাকছে, "ঝিঁ, ঝিঁ, ঝিঁ।"

পিনাকী ভয় পেয়ে বললে, "কে ডাকছে?"

সরু গলা বললে, "আমি ডাকছিলাম।"

পিনাকী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলে বড় একটা ঝিঁ ঝিঁ

পোকা দেয়াল বেয়ে উঠছে। পিনাকী বললে, "কে তুমি?"

সে বললে, "আমি কইয়ে ঝিঁ ঝিঁ। এই ঘরে আমি একশ বছরের উপর বাস করছি।"

পিনাকী বললে, "এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে।"

সরু গলায় ঝিঁ ঝিঁ বললে, "বাড়ী ছেড়ে পালানে ছেলেগুলোর মরণই ভাল। আখেরে ওদের ভাল হবে না কিছুই।"

পিনাকী বললে, "চোপরাও বলছি। আমি অন্য ছেলেদের মত বই হাতে ইস্কুলে যেতে চাই না।"

ঝিঁ ঝিঁ কড়া সুরে বলল, "আচ্ছা বেশ, তাই ভাল। তুমি বড় হয়ে গাধা হবে।"

পিনাকী একটা হাতুড়ী তুলে নিয়ে ঝিঁ ঝিঁ-কে মারতে যাচ্ছিল। কিন্তু কইয়ে ঝিঁ ঝিঁ জানালা দিয়ে টুপ করে বেরিয়ে কোথায় চলে গেল।

এদিকে রাত হয়ে এল। পিনাকীর ভীষণ খিদে পাচ্ছে, সারাদিন যে কিছুই খায় নি। সে ঘরের মধ্যে চারধার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, দেরাজ তাক আলমারি সব টানাটানি করলে, ঘরের কোণগুলো খোঁচা দিলে, যদি কোথাও কিছু খাবারের সন্ধান মেলে। এক টুকরো মাংস কি মাছ, একখানা রুটি কি যা হোক কিছু পেলেও দাঁতে কেটে চিবোতে পারলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু কোথাও কিছু নেই, কিছুই নেই। ক্ষুধা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পিনাকী কান্না জুড়ে দিল। মনে মনে বললে হায়, হায়, কি ভুলই করেছি। যদি ভাল ছেলে হয়ে বাড়ী বসে থাকতাম, তাহলে বাবা এতক্ষণ আমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে থাকতেন। ক্ষিধের যন্ত্রণা যে কি ভয়ঙ্কর তা আর কি বলব?"

হঠাৎ চোখে পড়ল ধুলোর গাদার মধ্যে কি যেন একটা ছোট সাদা গোল মতন জিনিষ পড়ে রয়েছে। ডিম নাকি? পিনাকী সেটা তুলে দেখলে সত্যিই একটা ডিম। মনটা তার এমনি আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল যে ডিমটা সে হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল, আদর করে একটা চুমো দিলে। বললে, "কি করে এটা রাঁধব? মামলেট বানাব? না, গরম জলের উপর ভেঙে ছেড়ে দেব? ওতে খুব তাড়াতাড়ি হবে। আমার খাবার তাড়া বড় বেশী।" একটা ছোট রেকাবীতে জল নিয়ে উনুনের জ্বলন্ত কয়লার উপর রেকাবিটা বসিয়ে দিল। জলে ধোঁয়া উঠতেই পিনাকী ডিমের খোলাটা ভেঙে পিরিচে ডিমটা ঢালতে গেল। ওমা! সাদা আর হলদে ডিমের কুসুম কই? ছোট্ট একটা মুরগীর ছানা ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রভাবে নমস্কার করে বললে, বহুৎ সেলাম ভাই! ডিমের খোলা ভাঙবার কষ্টটা তুমি আমার বাঁচিয়ে দিলে। আজ তবে আসি।" খুসী মনে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে সে উড়ে বেরিয়ে গেল।

রাগে দুঃখে কাঠের পুতুল চেঁচিয়ে মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল। ক্ষিধেয় প্রাণ প্রায় যায়! বাড়ী ছেড়ে সে আবার গ্রামের দিকে চলল। সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়ছে, তাই পথঘাট অন্ধকার নির্জ্জন। পিনাকী সামনের বাড়ীটাতেই দরজায় কড়া নাড়তে সুরু করল। ভাবল, নিশ্চয় আওয়াজ শুনে কেউ বেরিয়ে আসবে। সত্যিই বেরিয়ে এল। মাথায় টুপি পরে ছোট্টখাট্ট একজন বুড়ো মানুষ জানালায় এসে রেগে বললে, "কি চাই তোমার?"

পিনাকী করুণ সুরে বললে, "দয়া করে আমাকে একটু খেতে দেবেন কি?"

বুড়ো বললে, "দাঁড়াও, আমি আসছি এক্ষুনি।" সে ভেবেছিল রাস্তায় যে দুষ্টু ছেলেগুলো রাত্রে মজা করবার জন্যে লোকের বাড়ীর কড়া নাড়ে এ ছেলেটা তাদেরই কেউ। একটু পরেই আবার জানালা খুলে বুড়ো চেঁচিয়ে পিনাকীকে বললে, "নীচে এসে হাত পেতে দাঁড়াও।"

পিনাকী দুই হাত পেতে দাঁড়াল। অমনি উপর থেকে এক গামলা জল বুড়ো তার মাথায় ঢেলে দিল। তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেল।

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে কাঠের পুতুল বাড়ী ফিরে গেল। উনুনের আগুনের দিকে ভিজে পা দুটো এগিয়ে দিয়ে সে একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল বেলা গোষ্ঠ

খাবার জিনিষপত্র নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। ঘরে ঢুকেই দেখলে তার সোনা মানিক জলজ্যান্ত ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার পা দুটো? রাত্রে উনুনের আঁচে তার পা দুটো পুড়ে গেছে। জেগে উঠে পোড়া পা দেখে পিনাকী ত কেঁদে খুন।

গোষ্ঠর ফেরার শব্দ পেয়ে পিনাকী ছুটে দরজা খুলতে গেল। দুতিন বার হোঁচট খেয়ে সে ধড়াম্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ছেলের পা নেই দেখে গোষ্ঠর চোখে জল এসে গেল। সে তাকে কোলে তুলে মুখে চুমো দিলে। পিনাকী বললে, "শীত করছিল বলে পা আগুনের দিকে দিয়ে শুয়েছিলাম, তাইতো পা পুড়ে গেছে।"

গোষ্ঠ বললে, "ভয় কি? আমি তোমার নূতন পা বানিয়ে দেব। কিন্তু তুমি ত তখন আবার বাড়ী ছেড়ে পালাবে।"

পিনাকী বললে, "না, আমি পালাব না। আমি ভাল ছেলে হব।"

গোষ্ঠ হেসে বললে, "ইস্কুলে যাবে?"

পিনাকী বললে, "হ্যাঁ, যাব।"

গোষ্ঠ তখন বাটালি করাত হাতুড়ি সব এনে দুটি ছোট ছোট কাঠের টুকরো নিয়ে পা তৈরী করতে বসল। এক ঘণ্টা না যেতে একজোড়া সুন্দর পা তৈরী হয়ে গেল।

গোষ্ঠ পিনাকীকে বললে, "চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমাও ত, বাছা!",

পিনাকী চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল, যেন কতই ঘুমোচ্ছে।

গোষ্ঠ একটা বাটিতে করে আঠা গলিয়ে পা দুটি ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দিলে।

পিনাকী যেই দেখলে যে তার নূতন পা হয়েছে সে মেঝের উপর লাফিয়ে পড়ে ঘরময় পাগলের মত নাচতে লাগল। বাবাকে বললে, "তোমায় শতেক প্রণাম বাবা, আমার পা করে দিয়েছ! এইবার তোমায় খুসী করতে আমি ইস্কুলে যাব।"

বলতে না বলতেই তার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি এসে গেল। সে বললে, "ইস্কুলে যাব কি করে, বাবা? আমার ত কাপড় চোপড় নেই।"

গোষ্ঠ বললে "ঠিক কথা, আমার ও কথা মনে হয় নি।"

"আমার পোষাক কবে দেবে?"

গোষ্ঠ বললে, "ইস্কুলে যদি সত্যি যাও ত পোষাক দেব বই কি।" গোষ্ঠ ছেলে পড়তে যাবে শুনে তার পোষাক করে দিলে।

পিনাকী পোষাক পরে গামলার জলে নিজের ছায়া দেখতে গেল। পোষাক পরা সুন্দর ছায়া দেখে সে মহাখুসী।

গোষ্ঠ বললে, "শোন্ বাছা, সুন্দর কাপড় পরলেই ভদ্রলোক হয় না, পরিষ্কার কাপড় হওয়া চাই।"

দুষ্টু ছেলেটা সে কথায় কান না দিয়ে বললে, "আর একটা জিনিষ দরকার; তা না হলে ত ইস্কুলে যাওয়া চলবে না।"

বাবা বললে, "সে আবার কি?"

কাঠের পুতুল বললে, "প্রথম ভাগ।"

গোষ্ঠ বললে, "ঠিক বলেছ।"

ছেলে অসভ্যের মত বললে, "বইএর দোকানে গিয়ে পয়সা দিলেই বই পাবে।"

বেচারী বৃদ্ধ সব পকেট ঝেড়ে দেখলে একটাও পয়সা নেই সে শুধু হাতেই পথে বেরিয়ে গেল।

যখন ফিরে এল তখন বরফের মত হাওয়া। শীতের দেশত। গোষ্ঠর গায়ের মোটা কোটটা নেই। সেইটা বিক্রী করেই সে ছেলের বই কিনে এনেছে।

গোষ্ঠ মিষ্টি করে হেসে বললে, "কোটটা বড্ড বেশী গরম।" কিন্তু কথা বলতে বলতেই গোষ্ঠ শীতে হি হি করে কাঁপতে লাগল।

পিনাকী গোষ্ঠর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, দুইগালে চুমো দিলে। তারপর ইস্কুলে চলে গেল। সত্যিই এবার ভাল ছেলে হবে ঠিক করেছিল।

সহরের চকের দিক থেকে গান বাজনার শব্দ

ঢাকঢোল বাঁশির শব্দ আসছিল। ইস্কুলে যেতে যেতে পিনাকী ভাবলে ওখানে হচ্ছে কি? এক মিনিটের মত দৌড়ে গিয়ে দেখে এলে হয় ব্যাপারটা কি। একটা বড় তাঁবু খাটিয়েছে, তার সামনে আবার লম্বা করে কি লিখে টাঙিয়ে দিয়েছে। তাঁবুর ভিতর থেকে হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পিনাকী তখনও পড়তে শেখেনি, কাজেই একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে কি লেখা রয়েছে?"

ছেলেটি বললে, "পুতুল নাচের খেলা। তোমার কি টিকিট কেনবার পয়সা আছে?"

পিনাকীর পয়সা ছিল না। একটা ফিরিওয়ালা পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, "তোমার নূতন বইটা আমার কাছে বিক্রী কর না কেন?

বাইরে থেকে পিনাকী পুতুলদের নাটক শুনতে পাচ্ছিল, তাদের মধ্যে গিয়ে পড়বার জন্যে তার মনটা ভারী ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল কাজেই ফিরিওয়ালা বলবামাত্র পিনাকী তার বইটা বিক্রী করে একটা টিকিট কিনল। থিয়েটারের তাঁবুতে ঢুকেই সে এক লাফে ষ্টেজের উপর গিয়ে উঠল। ওর মনে হল ও ত ওই পুতুলদেরই একজন।

পুতুল নাচের খেলা শেষ হয়ে যেতেই যাত্রার অধিকারী রান্নাঘরে চলে গেল। রান্নাঘরে রাত্রের খাবারের জন্য ভেড়ার মাংস রান্না হচ্ছিল। রান্নার কাঠ কম পড়েছে দেখে অধিকারী তার রাধুনীকে বললে, "ঐ নূতন পুতুলটাকে ধরে আন। ওত দেখছি ভারী খটখটে শুকনো কাঠের তৈরী, আগুণে ফেলে দিলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে; রান্না হতে দেরী হবে না একটুও।"

একটু পরেই রাঁধুনী পিনাকীকে পাকড়ে ধরে ফিরে এল। ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত তখন তার অবস্থা; সে সিঙি মাছের মত কিলবিল করছে আর প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

পিনাকী কেঁদেই চলেছে। তা দেখে যাত্রাওয়ালার মনে বড় দয়া হল। মানুষটা নিষ্ঠুর ছিল না। তার পিনাকীর জন্যে ভারি দুঃখ হতে লাগল। এমন কি সে নিজেও কান্না জুড়ে দিলে। পিনাকীর চেয়ে অধিকারীর কান্নাই বেশী হয়ে দাঁড়াল।

পিনাকী তাকে নিজের বাবার কথা বললে। তার বাবা এত ভাল যে তার বই কেনবার জন্যে নিজের শীতের জামাটাই বেচে দিয়েছে।

তা শুনে অধিকারীর কান্না আরও বেড়ে গেল, বুড়ো গোষ্ঠর দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল। সে বললে, "আমি যদি তোমায় আগুণে ফেলে দিতাম তাহলে তোমার বুড়ো বাবা বেচারী কি বলত? বেচারী বুড়ো!" যাত্রাওয়ালা 'ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌' করে হাঁচতে লাগল।

পিনাকী বললে, "শতঞ্জীব।"

অধিকারীর দুঃখ হলে সে হাঁচে। আবার হেঁচে সে পকেট থেকে পাঁচটা সোণার মোহর বার করলে। বললে, "এই মোহর দিয়ে গোষ্ঠদাদাকে একটা গরম জামা কিনে দিও আর তুমি একটা প্রথম পাঠের বই কিনো।" সে আরও চার পাঁচ বার হেঁচে পিনাকীকে কোলের মধ্যে টেনে নিলে। বললে, "তুমি লক্ষ্মী ছেলে, বীর ছেলে, এসত আমাকে একটা চুমো দাও দেখি।" পিনাকী অধিকারীর দাড়ি বেয়ে তরতর্‌ করে তার মুখের কাছে উঠে পড়ল, তার নাকের ডগায় একটা চুমো দিয়ে বললে, "সেলাম, সেলাম, বহুৎ সেলাম।" টাকার জন্যে আর কি করে ধন্যবাদ দেওয়া যায় ভেবে পেল না। থিয়েটারের সব পুতুলদের নমস্কার করলে। তারপর অন্য পুতুলরা আবার নাচ করতে লাগল, পিনাকী বাড়ীর পথে যাত্রা সুরু করলে। খানিক দূর যেতেই একটা খোঁড়া শেয়ালের সঙ্গে দেখা। তারপরেই এল একটা বিড়াল, সে অন্ধের মত দুই চোখ বন্ধ করে আছে। দুজনে মিলে রাস্তায় হাত পেতে ভিক্ষে করছে।

শেয়াল বললে, "নমস্কার, পিনাকী!"

পিনাকী বললে, "তুমি কি করে আমার নাম জানলে?"

শেয়াল বললে, "তোমার বাবা গোষ্ঠ যে তোমার নাম করে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেচারীর এই শীতে গায়ে একটা গরম কোটও নেই।"

পিনাকী বললে, "আমার টাকা আছে। আমি বাবাকে নূতন জামা কিনে দেব। এই বলে সে তার মোহরগুলো তুলে ধরল। শেয়ালটা তক্ষুনি তার খোঁড়া থাবাটা এগিয়ে দিল আর বেড়ালটা দুটো চোখই খুলে তাকাল। শেয়াল বললে, "তোমার নিশ্চয় ক্ষিধে পেয়েছে সরাইয়ে আমাদের সঙ্গে খাবে চল না।"

রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে সরু গলায় কে ডেকে উঠল, "ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ। কুসঙ্গীদের কথায় কখনও কান দিও না।"

পিনাকী বুঝেছিল যে বাইরে ঝিঁ ঝিঁ তাকে সাবধান করছে। কিন্তু তার তখন সেদিকে মন যাচ্ছিল না।

বাবার কথা, নূতন জামার কথা, পড়ার বই এর কথা, সুবুদ্ধির কথা সবই সে এক নিমেষে ভুলে গিয়ে শেয়াল আর বেড়ালকে বললে, "চল আমরা যাই, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাব।" বেড়াল শেয়াল আর পিনাকী তিনজনে সরাইখানায় গেল। শেয়াল খেল খরগোষের মাংস, বেড়াল খেল মাছ ভাজা, পিনাকী একথালা খিচুড়ী নিয়ে অর্দ্ধেক খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

খাওয়া হয়ে গেলে শেয়াল বললে, "আমাদের দুটো ঘর চাই, একটা পিনাকীর আর অন্যটা আমাদের দুজনের।"

পিনাকী বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমে নানা স্বপ্ন দেখা দিতে লাগল, দেখল যে তার মোহরগুলি একটা গাছে মাঠের মধ্যে ফলে রয়েছে। হাত বাড়িয়ে মোহরগুলি পাড়তে যেতেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

সরাইওয়ালা বললে, "রাত ত দুপুর হল। শেয়াল আর বেড়াল খেয়ে দেয়ে কখন চলে গেছে। তারা পয়সা দেয় নি।" কাজেই তিনজনের খাবারের জন্য সে পিনাকীর একটা মোহর নিয়ে নিল। যাই হোক, এখন-ও ত আরো চারটা মোহর আছে। সেইগুলো নিয়েই সে অন্ধকারে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। কিন্তু মনে হল পিছন পিছন কারা যেন তাড়া করে আসছে। তারার আলোয় সে দেখতে পাচ্ছিল দুটো কালো জানোয়ার লাফিয়ে লাফিয়ে ওর পিছনে ছুট্‌ছে। তাদের পরনে কালো চটের থলি, আগা গোড়া সব ঢাকা, চোখ দু জোড়া কেবল দু জোড়া ফুটোর ভিতর থেকে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। তারা এসে পিনাকীর দুটো হাত চেপে ধরল। ফিস ফিস করে বললে, "তোমার টাকাগুলো আমাদের দাও।"

পিনাকী মোহরগুলো মুখের মধ্যে রেখেছিল। কিন্তু সে ভয়ে এমন কাঁপছিল যে মোহরগুলোও মুখের মধ্যে ঠন্ ঠন্ করছিল। আওয়াজ পেয়ে একটা জানোয়ার ওর নাক চেপে ধরল, অন্যটা মুখটা তুলে ধরে হাঁ করিয়ে দিলে। তারপর একটা বেড়ালের থাবা তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে মোহর খুঁজতে লাগল। পিনাকী তার থাবায় সজোরে একটা কামড় দিয়ে ওদের হাত ছাড়িয়ে চোঁ চোঁ এক দৌড় লাগাল। মোহরগুলো হাতছাড়া হয়নি তখনও।

জানোয়ার দুটো পিনাকীর পিছনে কয়েক মাইল ধরে তাড়া করল। শেষে পিনাকী এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে সে আর দৌড়ে পেরে উঠছিল না। সে একটা গাছের মাথায় চড়ে বসল। এটা খুব বুদ্ধির কাজ হয়েছিল, কারণ থলিপরা জানোয়ার দুটো লাফ দিয়ে দিয়ে চলতে পারলেও গাছেত চড়তে পারে না। যাহোক সে দুটো কিন্তু হার মানবার পাত্র নয়। তারা কিছু শুকনো কাঠ কাঠরা জোগাড় করে গাছতলায় আগুণ ধরিয়ে দিলে। আগুণ বাড়তে বাড়তে গাছের মাথা ছোঁয় আর কি। এই বার বুঝি গায়ে আগুণ লাগবে এই ভেবে পিনাকী গাছ থেকে একলাফ দিলে। মাটিতে পড়েই আবার দে ছুট্ দে ছুট ; জানোয়ার দুটোও পিছু ছুটছে। হঠাৎ একটা ছোট্ট নদী এসে পড়ল। এবার কি হবে? সে লম্বা একটা লাফ দিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে পড়ল। জানোয়ার দুটোও লাফিয়ে ডিঙ্গোবার মতলবে ছিল, কিন্তু থলিতে পোরা অবস্থায় অতখানি লাফ কি করে দেবে? এক এক লাফ দিতেই তারা ঝুপ্ ঝুপ্ করে জলে পড়ে গেল।

পিনাকী হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু বেশীক্ষণ আর হাসতে হ'ল না। জলে পড়ে জানোয়ার দুটো ভিজে চুপচুপে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তারা নদীর ওপারে গিয়ে আবার পিনাকীকে তাড়া করতে লাগল। পিনাকী জানত না বটে, তবে জানোয়ার দুটো সেই দুষ্টু শেয়াল আর ধূর্ত্ত বেড়াল ছাড়া আর কেউ নয়।

ছুটো ছুটি করতে করতে ভোর হয়ে গেল। পিনাকী জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে একটা সাদা বাড়ীর কাছে এসে পড়ল। তার জানালায় একটি নীলপরী জ্যোৎস্নার মত ঘর আলো করে বসে। পিনাকীকে দরজা খুলে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি বিপদ হয়েছে?"

পিনাকী কালো জানোয়ারদের উৎপাতের কথা আর বাড়ী ছেড়ে পালানোর পর আর যত রকম বিপদে পড়েছিল সবই বলল।

পরী বললেন, "তোমার মোহরগুলো কই?"

পিনাকী আম্‌তা অম্‌তা করে বললে, "হারিয়ে ফেলেছি। আসলে কিন্তু সেগুলো ওর পকেটেই ছিল। এই মিথ্যাটা বলবা মাত্রই তার লম্বা নাকটা আরও লম্বা হতে লাগল।

পরী বললেন "কোথায় হারালে?"

পিনাকী আবার মিথ্যা বলল, "জঙ্গলে।"

এবার নাকটা আরও লম্বা হয়ে গেল।

পরী দয়া করে বললেন, "চল, তবে আমরা খুঁজি গিয়ে।"

পিনাকী ঢোঁক গিলে বললে, "আমি সেগুলো গিলে ফেলেছি।" তিনবার মিথ্যা কথা বলাতে নাক এতই লম্বা হয়ে গেল যে ঘরের ওপরে গিয়ে ঠেকল। অতবড় নাক নিয়ে দরজা দিয়ে সে বার হতেও পারছিল না।

পিনাকী লম্বা নাক নিয়ে এদিক ওদিক নড়তে চেষ্টা করে ঘুরছে না পরী দেখছিলেন। মিথ্যা কথা বলার শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে দেখে পরীর তার প্রতি দয়া হল। তিনি একঝাঁক কাঠ ঠোকরা পাখী ডেকে আনলেন। পাখীগুলো জানালার ভিতর দিয়ে উড়ে এসে পিনাকীর নাকের উপর বসল সারি দিয়ে। তারপর তারা সবাই মিলে ঠক্ ঠক্ ঠক্ করে ওর নাকটা ঠুকতে লাগল। ঠুকে ঠুকে নাক ক্ষয়ে ঠিক মাপ মত হয়ে উঠল।

তখন পিনাকী বলল, "আপনি কি দয়াময়ী পরী! আমি এবার আমার বাবার কাছে যেতে চাই।

পরী ওকে একটা চুমো দিয়ে বললেন, "তবে যাও লক্ষ্মী ছেলের মত।"

শিশ দিতে দিতে পিনাকী বাড়ী চলল। যখন বড় রাস্তায় এসে পড়েছে, তখন মনে হল মাথার উপর থেকে পাখীর গলা শোনা যাচ্ছে, "তুমি কি পিনাকী?"

মস্ত বড় একটা পায়রা! অত বড় পায়রা পিনাকী কখনও দেখেনি। সে বললে, "হ্যাঁ আমি পিনাকী। তুমি আমার বাবা গোষ্ঠকে দেখেছ কি?"

পায়রা বলল "হ্যাঁ, আমি ওকে সমুদ্রের ধারে ছোট নৌকায় দেখেছি। সে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।"

পিনাকী বলল, "এখান থেকে সমুদ্রের ধার কতদূর?"

"উঃ, অনেক দূর! তোমার ওজন কত হবে?"

পিনাকী বলল, "বেশী না। আমি হাল্কা কাঠের তৈরী।"

"তাহলে আমি তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি।" এই বলে সে ডানা দুটি ছড়িয়ে দিলে তার পিঠে পিনাকীকে চড়াবার জন্যে। তাকে পিঠে নিয়ে পায়রা উড়ে চলল সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রের ধারে পায়রা একটুখানি দাঁড়াতেই পিনাকী লাফিয়ে নেমে পড়ল।

তীরে অনেক লোক জমা হয়ে সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটা নৌকা দেখিয়ে চেঁচিয়ে কি সব বলছিল।

পিনাকী বললে, "কি হয়েছে?"

একটি স্ত্রীলোক বললে, "নৌকায় এক বেচারী বুড়ো বসে আছে। সে তার ছেলের খোঁজে ওপার থেকে এদিকে এসেছিল। এদিকে ঝড় এসে পড়ল বলে ছোট্ট নৌকাটা ডুবে যেতে পারে।"

পিনাকী দেখলে বড় বড় ঢেউ এর ধাক্কায় নৌকাটা

আছাড়ি পিছাড়ি করছে। নৌকার উপর ঠিক গোষ্ঠর মত দেখতে একজন লোক মাথার টুপিটা খুলে নাড়ছে। পিনাকী বললে, "বাবা! এই যে আমি।"

ঠিক সেই সময় একটা বিরাট ঢেউ এসে নৌকায় ধাক্কা দিল, নোকাটা শূন্যে উঠেই হুস্ করে তলিয়ে গেল আর দেখা গেল না।

লোকেরা 'হায়, হায়,' করে উঠল। "আহা বেচারা সাঁতার জানে না।"

পিনাকী বললে "আমি তাঁকে বাঁচাব, আমি বাঁচাব আমার বাবাকে।" এই বলে পিনাকী অতল জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। দেখল সে বেশ ভালই সাঁতার দিতে পারছে। হাত দুটো অবশ হয়ে এলে জলে গা ছেড়ে ভাসতে লাগল। এমনি করে সারাদিন এবং পরে সারারাতও সে সাঁতার দিল এবং ভেসে চলল প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে; কিন্তু নৌকাও দেখতে পেল না, গোষ্ঠর খোঁজও মিল্ল না।

সকাল বেলা দূরে একটা সবুজ ছোট দ্বীপ দেখা দিল। অতটা যেতে পারবে মনে হল না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাঁতরে সেই দ্বীপে পৌছল। বালুময় তীরে পৌছে তার সে কি আনন্দ। আশা হতে লাগল এখনও হয়ত কোথাও জলে নৌকা ভাসিয়ে গোষ্ঠ চলেছে দেখতে পাবে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু নৌকার কোন চিহ্ন নেই।

একটু পরে সূর্য্য উঠল। পিনাকীর কাপড় জামা শুকিয়ে গেল। কোথায় যে এসেছে জানতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু বলে দেবে এমন কোন মানুষ ধারে কাছে দেখা গেল না। একটা বড় মাছ দূরে ভাসছিল সেটা শুশুক। পিনাকী তাকেই ডেকে কথা বলতে লাগল। পিনাকী বললে 'এখানে কোথাও একটু খেতে পাওয়া যায় বলতে পার কী ভাই?' শুশুক খুব ভদ্র ভাবে খাবার জায়গার পথ বলে দিল পিনাকীকে। তখন সে বলল, "তুমি আমার আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? আমার বাবা নৌকায় ভেসে চলেছে কোথাও দেখেছ কি?"

শুশুক বললে, "বড়ই দুঃখের কথা যে আমি ওরকম কাউকে দেখিনি। আমি কেবল তোমাকে দেখেছি আর একটা বিরাট হাঙ্গরকে দেখেছি। সে এইখানেই বাস করে।

পিনাকী ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌ল। তারপর বললে, "আচ্ছা ধন্যবাদ, আসি তবে।"

সে যত জোরে পারে দৌড়ে চলে গেল। ভয় হচ্ছিল যদি সেই ভয়ঙ্কর হাঙ্গরটা ডাঙ্গায় উঠে আসে।

শুশুক যে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল সেই রাস্তা ধরে ও একটা গ্রামে এসে পৌঁছল। এই বার কিছু খাবার জোগাড় করতে হবে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখ্‌ল টাকা কড়ি কিছু নেই। চারটে মোহরই হারিয়ে ফেলেছে।

কি করবে? কিছু কাজ করে খাবার কেনবার মত পয়সা রোজগার করা যায়, না হলে ভিক্ষে করতে হয়। কিন্তু গোষ্ঠ তাকে বলেছিল যে যার গায়ে কাজ করবার একটুও শক্তি আছে তার কখনও ভিক্ষে করা উচিত নয়।

ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল একজন লোক একগাড়ী ফল ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। পিনাকী তাকে বললে, "তুমি আমাকে কিছু খেতে দেবে?"

লোকটি বললে, "হ্যাঁ দেব যদি তুমি এই গাড়ীটা ঠেলতে আমায় সাহায্য কর।"

পিনাকী নাক সিঁটকে বলল, "আমি গাধা নই।" লোকটি পিনাকীকে ধমক দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

একটু পরে একজন মালীকে দেখা গেল এক ঝুড়ি তরিতরকারি নিয়ে চলেছে। পিনাকী বললে, "তুমি যদি আমাকে পাঁচ আনা পয়সা দাও ত আমি কিছু কিনে খেতে পারি। দেবে কি?"

মালী বললে, "নিশ্চয়ই দেব। তুমি এই ঝুড়িটা বয়ে নিয়ে গেলে আমি তোমায় পাঁচের বদলে দশ আনা দেব।"

পিনাকী বললে, "ঝুড়িটা যে বড্ড ভারী। বইতে গেলে হাঁপিয়ে যাব।"

মালী চটে বল্‌ল, "তার মানে তোমার যথেষ্ট ক্ষিধে পায় নি।" এই বলে সে চলে গেল।

বেলা বয়ে যেতে লাগল। রাস্তা দিয়ে কত মানুষই যাচ্ছে। সবাইকার কাছেই পিনাকী পয়সা ভিক্ষা করল। সকলেই এক কথা বললে, "ভিক্ষা করতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত; তোমার গায়ে ক্ষমতা আছে, কাজ করে ত রোজগার করতে পার।" শেষে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। সে দু হাতে দুই বালতি জল নিয়ে যাচ্ছিল। পিনাকী বললে, "আমায় একটু জল খেতে দেবে?"

মেয়েটি বললে, "নিশ্চয় দেব। আমার একটা বালতি যদি বয়ে নিয়ে চল।"

পিনাকী প্রথমে ভাবলে, 'এও ত কাজ করা।' কিন্তু তেষ্টা এতই বাড়তে লাগল যে সে দৌড়ে গিয়ে মেয়েটির এক বালতি জল বয়ে দিল।

মেয়েটির বাড়ীর রান্না ঘরে টাটকা ভাজা পিঠের গন্ধ উঠ্‌ছিল। পিনাকী বল্‌লে, "আমার ক্ষিধেও পেয়েছে। মেয়েটি তখন ওকে বসিয়ে ভাল করে খাইয়ে দিলে।

মেয়েটি যেই গায়ের শালটা খুলে রাখল অমনি পিনাকী দেখল, ওমা, এত সেই নীলপরী। আনন্দে পিনাকী প্রায় কেঁদে ফেল্‌ল। পরীকে নিজের দুঃখের সব কথা বল্‌লে। তারপর বল্‌লে, "আমি কতকাল আর কাঠের পুতুল থাক্‌ব? সত্যি জীবন্ত ছেলে হতে চাই।"

পরী বললেন, "তুমি তাই হবে। মানুষ হবার যোগ্য হও, তবেই মানুষ হবে। ভাল ছেলে হতে শেখ এবং ইস্কুলে পড়তে যাও।"

পিনাকী বলল, 'তাই করব।' সত্যিই তা করবার ইচ্ছা তার হয়েছে এবার। তারপর আবার বাবার কথা মনে পড়াতে বল্‌ল, "বাবা কি আমাকে কোনো দিন খুঁজে পাবে?"

পরী বললেন, "তিনি যদি খুঁজে না পান, তুমি তাকে খুঁজে বার করবে। কিন্তু তার আগে তোমার অনেক শিক্ষা দরকার। সত্যি মানুষ হতে হলে এটা করতেই হবে। কাল তোমাকে ইস্কুলেও যেতে হবে।"

পরী তাকে যে বইটা দিলেন তা নিয়ে পরদিন গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে পিনাকী ইস্কুলে গেল। ঠিক সময় মত ত ক্লাশে গিয়েইছিল, পড়াও তৈরী করেছিল। ছেলেরা অবিশ্যি ওকে নিয়ে অনেক মজা করেছিল। তার কাঠের হাতে আর পায়ে সুতো বেঁধে তারা ওকে নাচাচ্ছিল। কিন্তু বেশীক্ষণ জ্বালাতন করবার পর সে এমন জোরে লাথি ছুঁড়তে লাগ্‌ল যে ছেলেরা ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

এই নূতন জীবনটা পিনাকীর ভালই লাগছিল। পরী যেন ঠিক ওর মা, তার উপর ইস্কুলে পড়াশুনা ভাল হচ্ছিল। তবে ওর একটা দোষ ছিল। ইস্কুলের দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে ও খুব ভাব করে নিয়েছিল, একদিন অনেকগুলো ছেলে চেঁচাতে চেঁচাতে এসে বল্‌ল, দেখেছ? চল পিনাকী আমরা হাঙর দেখে আসি। শুনলাম তীরের কাছেই এসেছে।"

সমুদ্রের ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। ঠিক সেই সময় ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ করে কে ডেকে উঠল। কুসঙ্গীর সঙ্গে মিশো না। সাবধান হও! পরীকে কি কথা দিয়েছিলে ভুলো না। কে বলছে?

পিনাকী ছেলেদের বল্‌ল, "ইস্কুলের কি হবে? তারা বললে, "উঃ একদিনের জন্যে ইস্কুল না হয় ভুলেই যাও। আর কোনোদিন নইলে দেখতে পাবে না।"

"আচ্ছা, চল তবে যাওয়া যাক্‌" বলে সবার আগে পিনাকীই সমুদ্রের তীরে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু সেখানে ত হাঙর কুমীর কিছু দেখা গেল না। ছেলেগুলো পিনাকীকে ধাপ্পা দিয়েছিল। তখন অবিলম্বে একটা ঝগড়া মারামারি বেধে গেল। একটা ছেলে ভারী একটা অঙ্কের বই তুলে নিয়ে পিনাকীর মাথা

লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। পিনাকীর না লেগে অন্য একটা ছেলের কপালে ধাঁই করে বইটা গিয়ে লাগ্‌ল।

ছেলেটা মাটিতে মড়ার মত পড়ে গেল। আর কি? তখন পুলিশ এসে হাজির।

পিনাকী ছেলেটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। তার কোনো দোষ না থাকলেও সেই প্রায় পুলিশের হাতে বাঁধা পড়ছিল। কোনো রকমে আঁকু পাঁকু করে সে যখন পালাচ্ছে তখন পুলিশ তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিলে।

পিনাকী একটা পাহাড়ের চিপির উপর থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ল। কুকুরটাও ঝাপাং করে লাফ দিয়ে ডুবে মরে আর কি! তখন সে "পিনাকী, আমাকে বাঁচাও" বলে চেঁচাতে লাগল।

পিনাকী বললে, মর না বেশ হবে, আমার ত বয়ে যাবে।"

মুখে ও রকম বললেও কাঠের পুতুলের মনে দয়া ছিল। কুকুরটা ডুবে মরে তা সে চাইত না। কিন্তু নিজের কথা ত আগে ভাবতে হবে। তাই সে বললে, "আমি যদি তোমায় বাঁচাই তুমি আবার আমায় তাড়া করবে না ত?"

হাঁপাতে হাঁপাতে আধমরা কুকুরটা বলল, "না, তাড়া করব না।"

তখন পিনাকী সেইদিকে সাঁতার দিয়ে গিয়ে দুহাতে কুকুরের ল্যাজ ধরে টান দিল। কুকুরটাকে এমনি করে ডাঙ্গায় তুলে দিয়ে সে বললে, "যাই তবে, নমস্কার।"

কুকুরও বললে "নমস্কার। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করলে তার জন্য ধন্যবাদ। হয়ত আমিও কোনোদিন তোমার কিছু উপকার করতে পারব।"

পিনাকী আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু এবার তার মনে হল সে ত জলে সাঁতার কাট্‌ছে না মাছের মধ্যে সাঁতার কাট্‌ছে। একটা বড় জালে অনেক গুলো মাছ ধরা পড়েছিল, পিনাকী তারই মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আসলে। বেরোবার জন্যে সেও মাছের মতই কিল বিল করছিল। কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই দেখলে এক জন জেলে জল থেকে জালটা টেনে তুলে নিয়ে পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে নিয়ে চল্‌ল।

অভাজন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

লক্ষ্মী আমায় গেছেন ছেড়ে, সরস্বতীর পাইনি দয়া,
না জানি কোন্ দোষে বিমুখ হলেন যুগল মহাশয়া।
প্রবেশ নিষেধ এই অভাগার কমলার ঐ কমল-বনে
সেঁউতি তাহার হয় না সোনা রাতুল চরণ-পরশনে।
দেননি মাতা বিত্ত-বিভব মুক্তামণি পান্নাহীরে,
অকিঞ্চনের পানে ভুলেও তাকান না তো বারেক ফিরে।
বুঝি এইটে অমোঘ কর্মফল ;—
আমার দুঃখ দেখে মুচকে হাসে সংসারেরি বিজ্ঞদল।
কালিদাসের মতন, আমার কণ্ঠে নাহি সরস্বতী,
জন্মাবধি কুপুত্র মা'র এ অকৃতী মন্দমতি।
বিশ্ববিদ্যাভাণ্ডারী নই, খেতাবধারী নইকো ভাই,
প্রাণের কথা ছন্দে গেঁথে কেবল আমি কাল কাটাই।
সভার মাঝে অভাজনের কেমন যেন ভির্মি লাগে,
গবেষণার গোহাল-ঘরে ঢুকলে বুকে কাঁপন জাগে।
তাই ঘাটে-বাটেই দিন কাটে,
জানি কানাকড়ি মূল্য আমার নেই দুনিয়ার এই হাটে।
অন্নহারা ছন্নছাড়ার পানে ফিরেও চাননা রমা,
তৈল ঢালেন তৈলা মাথায়।—দেবী আমায় করুন ক্ষমা।
কৃপণ ধনীর সিন্দুকে বাস দিবসরাতি করেন মাতা,
ভাগ্যবানের মাথার 'পরে ধরেন তিনি সোনার ছাতা।
ইন্দিরা আর হংসারূঢ়ার সমান দয়া আমার 'পরে,
মূঢ়তা তাই নিত্য সাথী, দারিদ্র তাই আমার ঘরে।
বলো কারেই বা দাই, আজ দুষি,—
তাই ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো দেখেই শুধু হই খুশী

প্রশ্ন

[শ্রীসুধীর নন্দী]

সত্যিই কী ফুরিয়ে গেছি ?
এ কী হল বলত ?
জলতরঙ্গের বাজনা
আজ ত আর শুনি না।
বাইরের জীবনের রুদ্র আহ্বান ?
সেদিন শুনতাম।
শালপ্রাংশু মহাভুজ ভাবতাম নিজেকে
'সব পারি'র মন্ত্র তখন আকাশ বাতাস
ধ্বনিত হ'ত নিত্যদিন।

তারপর তুমি এলে,
কখন জানি না সবটুকু প্রতিভা
ফুরিয়ে গেল।
রবি ঠাকুরের সেই গান
'আমার যে সব দিতে হবে।'
দেওয়া বোধহয় সারা হয়েছে :
একটু একটু ক'রে যেন
পুরুষকারের সেই আঁতকায় নির্ভয়া ধারা
শুকিয়ে গেল ;
তোমার দ্বাদশ সূর্যের কিরণে।
আমিও কী হারিয়ে গেছি,
ফুরিয়ে গেছি তার সঙ্গে !
বোধ হয় তাই।
তবু তোমাকে 'আমি' ব'লে
ভাবতে পারছি না কেন ?

সংক্রান্তি

জ্যোতির্ময়ী দেবী

এটা মাসের সংক্রান্তি,
অর্থাৎ একটা শেষ।
কিন্তু আবার আরম্ভের পদধ্বনিও আসে।

একদিকে নিশা অন্যপ্রান্তে উষা
সংক্রান্তি বলে তাকে।
আর দেখতে পাচ্ছি
সেই পাঁজিতে আঁকা বুড়ো সংক্রান্তি পুরুষটাকে।
যার সর্বাঙ্গ আশা দুরাশা হতাশা নিরাশায় কুঁজো বাঁকা।
সাঙ্কেতিক সংখ্যার চিহ্ন আঁকা।

সভয়ে ভাবছি ওটা কে ?
আরম্ভ না শেষ ?
ও কে ? ওকি আমি ? আমার মন ? ওকি সংক্রান্তি ব্রাহ্মণ ?
অথবা শুধু বছর মাসের শেষ দিন ? কিন্তু কাকে ডাকে ?

পুনশ্চ

শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য

বুঝি নি তো আগে—
অনিত্য এ আবর্জনা ধরণীতে এতো ভাললাগে ;
তাই তারে বহু অনুরাগে
প্রত্যহের প্রয়োজনে সঞ্চয় করিয়াছিনু প্রাণে
সযত্ন-সম্মানে।
এখন এ জীবনের সায়াহ্নের প্রান্তপারে এসে
দেখিলাম—তারে ভালবেসে
মৃত্যুর কালিমা দিয়ে রচিয়াছি গাঢ় অন্ধকার
নাই কোন তটরেখা তার।
রাত্রি আসে রবি অস্তমান,
এখন চাহিছে হিয়া গাহিতে সে প্রভাতের
আলোকের আনন্দের গান।

রাজ কর্ম্মচারী ও কারখানার কর্মী বরখাস্ত

"যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে প্রকাশ :

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডায়াস ১৬ জন সরকারী কর্মচারীকে সংবিধানের ৩১১ (২) (গ) ধারা অনুযায়ী বরখাস্ত করিয়াছেন। আবার রাষ্ট্রপতি গিরি কাশীপুর, দমদম্ ও ইছাপুর অস্ত্র কারখানার ১৯ জন কর্মীকে সংবিধানের ৩১০ (১) ধারা অনুযায়ী ছাটাই করিয়াছেন এবং আরও ১৩ জন অস্থায়ী কর্মীকেও "রুল ফাইভ্" অনুযায়ী কর্মচ্যুত করা হইয়াছে।

উপরোক্ত পত্রিকা এই কার্য্যের সমর্থন করেন না। তাঁহাদিগের মতে...

কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কোন কার্য্য আইন সঙ্গত কিনা তাহাই শুধু বিচার্য্য নয়, তাহা শোভন, সঙ্গত—এবং জনকল্যাণের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হইয়াছে কিনা তাহাও অবশ্য চিন্তনীয়। এই ভাবে ৩১০ বা ৩১১ ধারা প্রয়োগ করিয়া যদি সরকারী কর্মীদের বরখাস্ত, চাকুরী হইতে অপসারিত করা হয় অথবা তাহাদের পদাবনতি ঘটান হয়, তাহা হইলে সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। যে কোন কর্মচারীই কোন কারণে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হইলে এইভাবে দণ্ডিত হইতে পারেন। অপরাধ কি জানান হইবে না, তাহার কৈফিয়ৎ শোনা হইবে না, শাস্তি দেওয়া হইবে—ইহাকে কোন মতেই গণতান্ত্রিক প্রশাসন নীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষ করিয়া কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলভুক্ত কর্মচারী ইউনিয়ানের কর্মকর্তাদের বাছিয়া বাছিয়া বরখাস্ত করিবার প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবেই জটিল হইয়া উঠিতে বাধ্য, কারণ ইহার দ্বারা কর্মীদের ইউনিয়ান গঠন করিবার যে মৌলিক অধিকার রহিয়াছে পরোক্ষ ভাবে তাহাই বিলোপ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অনুরূপ কার্য্য করিলে সরকার তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিবে ও নিজেদের বেলায় তাহারা যথেচ্ছভাবেই এইরূপ চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ইহা কোন মতেই শোভন, সঙ্গত বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়—হইতে পারে না। সরকারী অফিস গুলিতে কোন কাজই ঠিকমত হয় না। এমনকি অনেক স্থলে আদবে কোন কাজই হয় না, এবং সরকারী কর্মচারীরা ও দুর্ণিতি পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কেন এইভাবে প্রশাসনের অধোগতি ঘটিতেছে এবং ইহার জন্য দায়ী কাহারা তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য উচ্চক্ষমতাশালী নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। কিন্তু তাহা না করিয়া এইভাবে বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের সদস্যদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিলে জনগণ ইহাকে রাজনৈতিক অপকৌশল বলিয়াই মনে করিবে এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে জনমনে বিরাট অশ্রদ্ধারই সঞ্চার হইবে।

বড়বাজারের ছোটকাজের দমন চেষ্টা

বড়বাজার চিরকালই অর্থনীতির সহিত অপরাধ প্রবণতার সমন্বয়সৃষ্টি চেষ্টার জন্য সুপরিচিত। রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারকগণ কিন্তু এই বিষয়ে সজাগ নহেন। সম্প্রতি যুব নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় বড়বাজারের ছোট ছোট কার্য্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবেন বলিয়াছেন। "যুগবাণী" পত্রিকা এই সম্বন্ধে বলেন :

আমরা সবচেয়ে খুশি হইয়াছি কালোবাজার ও

মুনাফাবাজির আসল ঘাঁটি বড়বাজারে আন্দোলনকে লইয়া যাওয়ায়। ঐখানেই সব চেয়ে বড় আঘাতটি হানিতে হইবে। গত চব্বিশ বছরে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখিয়াছি। বামপন্থীরা কোনোদিন বড়বাজারে আন্দোলন করিতে যান না। যত ক্ষোভ, যত আন্দোলন সব বাঙালী পাড়ায়—তার ঝঞ্ঝাটও পোহায় বাঙালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। নকশালপন্থীরাও বড়বাজারে হানা দেয় নাই, তাদের যত ক্রোধ সব বাঙালীদের ওপর। কলেজ ষ্ট্রীট পাড়ায় বই ব্যবসায় তো ছাত্র আন্দোলন ও নকশালী বিপ্লবের ধোঁয়ায় বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই প্রথম দেখিতেছি যুব ও ছাত্ররা তাদের আক্রমণের লক্ষ্য করিয়াছে বড়বাজারের মালিকদের। সুব্রত মুখার্জী বলিয়াছেন, আক্রমণ তীব্র হইতে তীব্রতর হইবে। এমনকি বলপ্রয়োগ ঘটিবে। আঘাত আসিলে প্রত্যাঘাত হানা হইবে। প্রকাশ্যভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিবার পর যুবনেতারা আশা করি পশ্চাদপসরণ করিবেন না। মাড়োয়ারি শোষণে লাঞ্ছিত, পীড়িত, পর্যুদস্ত বাঙালী সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁরা পাইবেন, ইহাতে কোনো সংশয় নাই।

মেঘালয়ে শরণার্থীদিগের অবস্থা

করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" পত্রিকা বলিতেছেন :

মেঘালয়ে বিশেষতঃ খাসিয়া পাহাড় জেলায় যে সমস্ত শরণার্থী আশ্রয় নিয়াছেন, তাঁহাদের দুর্গতি নিয়া বহু আলোচনা হইয়াছে, দিল্লী সংসদেও প্রসঙ্গটি উঠিয়াছে। ইদানীং কালে আরো সহস্র সহস্র শরণার্থী প্রত্যহই মেঘালয়ে আসিয়া পৌঁছিতেছেন এবং তাঁহাদের অবর্ণনীয় দুর্গতির মধ্যে দিন যাপন করিতে হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে একদল স্থানীয় অধিবাসী গোড়া হইতেই এই শরণার্থীদের সম্পর্কে জনমনে অহেতুক আশংকা সৃষ্টিতে ব্যাপৃত হন, এবং বর্ত্তমানে তাহারা মেঘালয়ের সরকারী-বেসরকারী উভয় স্তরেই পর্য্যাপ্ত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছে। ফলে নবাগত এই সমস্ত শরণার্থীদের আশ্রয় এবং খাদ্য দানের ব্যাপারে পর্য্যাপ্ত গাফিলতি দেখানো হইতেছে এবং বিনা চিকিৎসায় বহু লোক প্রত্যহ মারা যাইতেছেন।

শরণার্থীদের ব্যাপারে যাবতীয় আর্থিক এবং অন্যান্য দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই মেঘালয় সরকারের বর্ত্তমান সহানুভূতিহীন মনোভাবের কোন সংগত যুক্তি নাই। সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে শরণার্থীদের আশ্রয় দানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাইয়াছেন। কাজেই এই ব্যাপারে কোনরূপ স্বেচ্ছাকৃত গাফিলতি প্রদর্শন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইবে। আশা করি মেঘালয় সরকারকে এই ব্যাপারে যথোচিত আন্তরিকতা প্রদর্শনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে কেন্দ্রীয় সরকার আরো কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া এই বিপন্ন মানব গোষ্ঠীর প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর হইবেন।

শরণার্থী নিপীড়নের উদাহরণ

"যুগশক্তির" আর এক সংখ্যায় দেখা যায় :

গত ২২শে অক্টোবর চরগোলা শরণার্থী শিবিরে শরণার্থীদের সঙ্গে শিবির কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য থেকে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কয়েকজন শরণার্থীকে বেপরোয়া প্রহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ২৫শে অক্টোবর উক্ত ঘটনার তদন্তের জন্য কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার, করিমগঞ্জের মহকুমা শাসক ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চরগোলায় যান। ১৫ জন শরণার্থীকে অতঃপর গ্রেপ্তার করে করিমগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। থানার লক-আপে এদের ৫ দিন আটক রাখা হয়। প্রথম দিন এদের কোনও খাদ্যদ্রব্যই দেওয়া হয় নি এবং পরের চার দিন শুধু মাত্র চিঁড়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, করিমগঞ্জ থানায় লকআপে মনুষ্যবাসের জন্য নিতান্ত প্রাথমিক ব্যবস্থাদিও অনুপস্থিত। অতএব বন্দী এই সমস্ত শরণার্থী পুরো

পাঁচ দিন পর্য্যাপ্ত দুর্ভোগের মধ্যে প্রায় অনাহারে দিন কাটিয়েছেন। করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরবিন্দ চৌধুরী এবং স্থানীয় যুবক-গ্রেস উক্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেছেন।

চীন ও আমেরিকা পাক-ভারত সংগ্রামে যুক্ত হ'তে চায় না

"আনন্দ বাজার পত্রিকা"তে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়:

নয়াদিল্লী ১২ই নভেম্বর—চীন পাকিস্থানকে সংযত হয়ে কাজ করতে এবং পূর্ব্ব বাংলা সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা চালাতে পরামর্শ দিয়েছে। লণ্ডন টাইমস পত্রিকার রাওয়ালপিণ্ডির সংবাদ দাতা এ কথা বলেছেন। সংবাদদাতার খবর উদ্ধৃত করে বি বি সি বলেন: চীন বলেছে, কোন অবস্থাতেই ভারত আক্রমণ করা পাকিস্থানের উচিত নয় এবং তাদের মতে ব্যাপারটি নিরাপত্তা পরিষদে তোলার এটা উপযুক্ত সময় নয়। ডেলি টেলিগ্রাফের ঢাকার সংবাদদাতার খবরে বলা হয়েছে পূর্ব্ব বাংলার ৬ হাজার পশ্চিম পাঞ্জাবী পুলিশের মনোবল ভেঙে পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাঙালী পুলিশরা বাংলাদেশে যোগ দেওয়ায় তাদের জায়গায় এদের পূর্ব্ব বাংলায় নিয়ে আসা হয়।...তাদের সেপ্টেম্বরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পূর্ব্ব বাংলায় নিয়ে আসা হয়েছে। তারা এখন দাবি তুলেছে তাদের ফেরার ব্যাপারে একটা পাকা তারিখ দিতে হবে।...ইউ এন আই ওয়াশিংটন, ১২ই নভেম্বর—মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব শ্রীউইলিয়াম রজারস আজ এখানে বলেন: ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ হলে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বতোভাবে তার বাইরে থাকার চেষ্টা করবে। তিনি বলেন, আমাদের আর কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা নেই।...এ এফ পি

সাময়িকী

দৈনিক সংবাদপত্র বিক্রয় বন্ধ

ভারত সরকার রাজস্ব হিসাবে ভারতবাসীর নিকট আরো ৭০ কোটি টাকা অধিক আদায় করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহার মধ্যে সংবাদ পত্রের উপর একটা দুই পয়সা শুল্ক বসান লইয়া গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দৈনিক পত্রিকাগুলিই প্রধানতঃ ঐ শুল্ক দিবে। শুল্ক আদায়ের উপায় বলিয়া দৈনিক পত্রিকাগুলি সংবাদপত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিবার কথা বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে ইতিপূর্ব্বে যখন শেষ মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছিল তখন হইতে তাঁহাদিগের কিছু কিছু খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থাৎ শেষ মূল্য বৃদ্ধির ফলে দৈনিক সংবাদ পত্রগুলির মূল্য ধার্য্য করা হয় ২০ পয়সা। এখন সংবাদপত্র প্রকাশকগণ স্থির করিলেন মূল্য করা হইবে ২৬ পয়সা ও তদুপরি ২ পয়সা সরকারী শুল্ক অর্থাৎ মোট ২৮ পয়সা। কাগজ বাহির করিবার খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে ৬ পয়সা প্রমাণ অর্থাৎ শতকরা ত্রিশ

টাকা হারে। এই হিসাবটা কতটা যথার্থ ও কতটা আন্দাজ ও অনুমান তাহা লইয়া তর্কের অবতারণা হইতে পারে। খরচ সত্য সত্যই শতকরা ত্রিশটাকা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না।

সে যাহাই হউক সংবাদ পত্র বিক্রেতাগণকে বলা হইল যে তাহারা শুল্ক অর্থাৎ ঐ অতিরিক্ত দুই পয়সার উপর বিক্রয়ের দস্তুরি কমিশন পাইবে না। কোন কোন পত্রিকা পরিচালকগণ বলিলেন অতিরিক্ত মূল্যের পয়সার উপরেও বিক্রেতাগণ অধিক হারে কমিশন পাইবে না। মতভেদের আরম্ভ এই খানেই এবং বিক্রেতাগণ অতিরিক্ত কমিশন না পাইলে সংবাদ পত্র বিক্রয় করিবে না বলিয়া কাজ বন্ধ করিল। সকলে বলিলেন ঐ বিক্রয় বন্ধ একদিনের অধিক চলিবে না। কিন্তু দুই দিন পার হইয়া যাইলেও বিক্রয় বন্ধ চালিত রহিয়াছে দেখা যাইল। কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না যে বিক্রেতাগণ অতঃপর বিক্রয় কার্য্যে মনোযোগ লাগাইবে। বরঞ্চ ইহাই মনে হইতেছে যে কাগজের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে কমিশন বৃদ্ধি করা হইবে। যাহাই হউক দীর্ঘকাল সংবাদ পত্র না পাইলে সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ অসুবিধা হয়। এবং এই মতদ্বৈধ্যের অবসান যথা সম্ভব শীঘ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অপর দেশের সাহায্যে অর্থ নৈতিক সংগঠন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট বাহিরের দেশগুলিকে অতঃপর কোন অর্থনৈতিক সাহায্য দিবেন না বলিয়া ধার্য্য করায় পৃথিবীর বহু জাতিরই আর্থিক বিলি ব্যবস্থা নুতন করিয়া চালিয়া সাজিতে হইবে। অনেক জাতিকেই বিদেশী অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনাই নুতন করিয়া ভাবিয়া নবরূপে গঠন করিতে হইবে। নেহেরুযুগের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিদেশের নিকট টাকা পাওয়া যাইবে ধরিয়া লইয়া রচিত হইয়াছিল। ফলে যে সংযম ও কঠোর হস্তে দমিত কার্য্য ধারা অবলম্বনে গঠিত হইলে জাতির সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেই তেজদীপ্ত প্রাণ শক্তি সঞ্জীবিত হইতে পারে, ভারতের ঋণের টাকায় গঠিত কলকারখানা সেচন ও বন্যা নিরোধ আয়োজনের মধ্যে সেই সর্ব্বজয়ী জীবন স্পন্দন লক্ষিত হয় নাই। পারিপার্শ্বিকের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহা গড়িয়া উঠে, অপরের সাহায্য পুষ্ট স্ফীতোদর কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য হীনতার সহিত তাহার অসীম শক্তিমত্তার কোন তুলনা হয় না। এক ভাবে দেখিতে যাইলে দেখা যাইবে যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরের যুগের যে দুর্নীতি প্রবণতা তাহা অনেকাংশেই ঐ সস্তার বিদেশী টাকা প্রাপ্তি হইতে উদ্ভূত। ভারতের মোট বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৬৯৮৭ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আমেরিকা দিয়াছিল ৩৭২২ কোটি টাকা। আর দিয়াছিল বৃটেন ৬৪৭ কোটি, সোভিয়েট দেশ ৩৫৪ কোটি, পশ্চিম জার্ম্মানী ৪০৮ কোটি ও জাপান ২৫৩ কোটি টাকা। আমরা আজকাল বামপন্থিদিগের অপপ্রচারের ফলে আমেরিকা যে ভারতে অপর সকল দেশের সমবেত অর্থ সম্প্রয়োগ অপেক্ষা অধিক অর্থ ঢালিয়াছে সে কথা ভুলিয়া কথা বলিয়া থাকি। আমেরিকা ভারতকে অর্থ না দিলে সেঅর্থে যে সকল গঠনমূলক অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য হইয়াছে তাহা হইত না। এ কথা যদিও বলা যায় যে অপব্যয়ও ততটা হইত না, তাহা হইলেও আমরা যদি অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকি সে দোষ আমাদের আমেরিকার নহে। আমেরিকা সম্ভবত নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই টাকা দিয়া থাকিবে; কিন্তু টাকা লইয়া দাতাকে ঐ জাতীয় দোষারোপ করা জাতীয়ভাবে আমাদের সদ্গুনের পরিচায়ক নহে। কাহারও নিকট টাকা না লইয়া নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করিলে আমাদের পক্ষে খুবই উন্নত মনোভাব প্রমাণ হইত; কিন্তু পাঁচ জাতির নিকট টাকা লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা যে দিয়াছে তাহার অপবাদে আত্মনিয়োগ প্রশংসনীয় কার্য্য নহে।

বৃটিশ, জার্ম্মান ও রুশিয়ান যে টাকা দিয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা দুর্গাপুর, রাওরখেলা ও ভিলাইএ ইস্পাতের কারখানা নির্ম্মাণ করিয়া লাভ করিয়াছে। জাপান এ দেশ হইতে প্রচুর কাঁচা মাল,

যথা লৌহ খনিজ প্রভৃতি লইয়া নিজেদের জাতীয় কাজ কারবারের উন্নতি সাধন করে। অন্যান্য জাতি গুলিও ভারতের সহিত আমদানি রপ্তানি চালাইয়া লাভ করে বলিয়াই মনে হয়। লোকসানটা আমাদেরই, কারণ আমরা যত কারবার জাতীয় ভাবে পরিচালনা করি তাহার সবগুলিই প্রায় লোকসানে চলে। সুতরাং ঋণের টাকা যে যে ক্ষেত্রে সুদে আসলে শোধ দিতে হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে ঐ টাকা চা, পাট, অভ্র, খনিজ, কয়লা, বস্ত্র, চামড়া প্রভৃতি বিক্রয়লব্ধ বিদেশী অর্থ দিয়া শোধ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঋণ করিয়া কতকগুলি লোকসানের কারবার না চালু করিলে আমাদের ঋণের পরিমাণ আরও অল্প হইত এবং আমরা যেটুকু লাভ জনক ভাবে ব্যবহৃত ঋণের টাকা বিদেশীদিগের নিকট লইতাম তাহা আরো সহজে শোধ করিতে সক্ষম হইতাম।

আমেরিকার সেনেট যে অন্য জাতিকে অর্থ সাহায্য প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে তাহাতে অনেক জাতির অসুবিধা হইবে; কিন্তু ভারতেরই যে মহা অসুবিধা হইবে তাহা মনে হয় না। ইহার একটা লাভের দিকও আছে! আমরা যত সহজে বিদেশী কর্ম্মীদিগকে চাকরী দিয়া ভারতে আনিয়া থাকি, এখন তাহাতে কিছু বাধা পড়িবে। ফলে আমাদের নিজেদের কর্ম্মীদিগের রোজগার ও ইজ্জত বৃদ্ধি হইবে। যথা সম্প্রতি ২১৪টি কয়লা খনি জাতির করায়ত্ব হইবার পরে সরকারী পরিচালক প্রধান শ্রীযুক্ত চারি বলিয়াছেন তিনি, পোলাণ্ডে কর্মী সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার কারণ পোলাণ্ডের কয়লা খনির কাজ এত বৈজ্ঞানিক ভাবে করা হয় যাহা অন্যত্র হয় না। কথাটা কষ্টকল্পিত। কেন না আমরা যুদ্ধ বিমান, জাহাজ, মোটর গাড়ী, বহু রসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আনবিক শক্তি উৎপাদন—সকল কিছুই করিতে পারি শুধু কয়লা কাটিয়া তুলিবার বিজ্ঞান আমরা শিখিতে পারি না এবং মাল—কাটা আনিতে আমাদের পোলাণ্ডে যাইতে হয়! শ্রীযুক্ত চারিকে উচিত পোলাণ্ডে পাঠাইয়া দিয়া সেই খানে এই নুতন পদ্ধতিতে কয়লা কাটা শিক্ষা করিয়া আসিতে। তিনি তৎপরে ঐ বিদ্যা ভারতীয়দিগকে শিখাইয়া লইয়া এই কার্য্য ভারতীয় কর্ম্মীদিগের দ্বারা করাইতে পারিবেন।

অনেকে বলেন ভারতকে টাকা ঋণ দিতে না চাইলেও বিদেশী জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি সম্পূর্ণ বিদেশী অর্থ লাগাইয়া ভারতবর্ষে নুতন নুতন কারবার আরম্ভ করিতে রাজী হইতে পারেন। একমাত্র বাধা হইল যে ভারত সরকার নুতন নুতন প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থকরী হইলে সেগুলিকে সরকারী করিয়া লইতে পারেন। সুতরাং যদি ভারত সরকার ২৫।৩০ বৎসর রাষ্ট্র করায়ত্ব করা হইবে না। কড়ার করিয়া ঐ সকল বিদেশীদিগের অর্থে কারখানা খুলিবার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে কোন বিদেশী ভারতে টাকা লাগাইয়া কারবার করিবেন বলিয়া মনে হয় না ভারতের বিদেশী অর্থের প্রয়োজন আর থাকিবে না বা যাহা ব্যবসার দ্বারা উপার্জ্জিত হয় তাহাই যথেষ্ট হইবে এরূপ চিন্তা করিবার সঙ্গত কোন কারণ এখনও দেখা যাইতেছে না।

দেশ-বিদেশের কথা

শরণার্থীদিগের অবস্থা

অ্যালান লেদার কিছুকাল পূর্ব্বেও পশ্চিমবঙ্গের অক্স্ফ্যাম কর্ম্মীদিগের সহকারী প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে বিহারের দুস্থজনের ত্রাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নিউ স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় শ্রীযুক্ত লেদার বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম অংশত: উদ্ধৃত করা হইতেছে (বাংলা তর্জ্জমা)।

"এখন বাংলা দেশের উদ্বাস্তু শরণার্থীদিগের আশ্রয়ের জন্য এক হাজারের অধিক শিবির স্থাপিত হইয়াছে। এক একটি শিবিরে দুই হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার অবধি লোকের আশ্রয় ব্যবস্থা আছে। শিবিরের বাসস্থানগুলি বাঁশের কাঠামোর উপর চাটাই ত্রিপল বা পলিথিন ছাউনি দিয়া গঠিত হইয়াছে এবং ইহা অপেক্ষা আরও উত্তমরূপে নির্ম্মিত আবাস কিছু কিছু থাকিলেও অধিকাংশ শরণার্থী অস্থায়ী নিবাসগৃহগুলিতেই বাস করিতেছেন। স্থানাভাব থাকার ফলে বহুস্থলে এক একটি পরিবারের সকল ব্যক্তিই ৭।৮ ফুট চৌড়া জায়গায় বাস করিতেছেন। ফলে জল-হাওয়া রোদের আক্রমণ সহ্য করিয়া মানুষকে কোন প্রকারে থাকিতে হইতেছে এবং আব্রু বলিয়া কিছুই থাকিতেছে না।

"ভারত সরকারের খাদ্য ব্যবস্থা একটা অসাধ্য সাধনের কার্য্য; কিন্তু তাহাতে ভারত সরকারকে এমন একটা চাপের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে যাহার কোনও বর্ণনা করাও সহজ নহে। প্রত্যহ ২০০০টন খাদ্য বস্তু ১৫০০শত মাইল দীর্ঘ এলাকায় পাঠাইয়া খাওয়ার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করা হইতেছে। মাল চালান একটা বিরাট সমস্যার কথা। মূল খাদ্যবস্তু পাওয়া যাইতেছে কিন্তু তরকারি ও ডাল অনেক সময় ঠিকভাবে সংগ্রহ হইতেছে না। অল্প বয়স্কদিগের খাদ্যে প্রোটিনের কমতি হইলে স্বাস্থ্যহানীর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ওফলে ক্রমশ: অল্পবয়স্কদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিতে থাকে। অন্যান্য খাদ্য বস্তু সরবরাহের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও শিশুদিগের মধ্যে নানা প্রকার অসুখের লক্ষণ দেখা যাইতেছে যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে পুষ্টির অভাব হইতেই সেই সকল অসুখের উৎপত্তি। প্রায় ৪০০০০০ লক্ষ শিশুদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং একথা সকল চিকিৎসকগণই স্বীকার করেন যে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি না করিতে পারিলে বহু শিশুই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আমি যখন বিহারে কাজ করিতাম তখন এই জাতীয় সমস্যার কখনও আবির্ভাব হয় নাই। "জমিতে জল অধিক থাকায় শৌচাগার প্রভৃতি স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম অনুসারে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখা সম্ভব হয় নাই। পানীয় জলের সহিত রোগবীজাণুর মিশ্রণ ঘটিয়া রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঔষধ দিয়া বীজাণু দুর করাও সহজ হইতেছে না; কারণ জলে সকল সংক্রমণ প্রতিষেধক ঔষধ ধুইয়া যাইতেছে। গ্রামবাসী লোকেদের জল ফুটাইয়া খাইবার রেওয়াজ নাই; এবং তাহারা ইচ্ছা থাকিলেও জ্বালানির অভাবে জল ফুটাইয়া লইতে পারে না।

"শরণার্থীদিগের আগমন এখনও প্রত্যহ ৩০০০০।৪০০০০ রহিয়াছে। ইহা মনে হয় আরও বৃদ্ধি পাইবে; কারণ খাদ্যাভাব ও সামরিক শাসকদিগের অত্যাচার বাড়িয়াই চলিবে। মনে হয় যে অবস্থা শেষ অবধি ১৯৪৩ খৃ: অব্দের দুর্ভিক্ষের মতই দাঁড়াইবে। সে সময় ৩০০০০০০ ত্রিশ লক্ষ নরনারী অনাহারে প্রাণ হারাইয়া ছিল। এখন যদি বিশ্বজাতি সংঘের সাহায্য ব্যবস্থা উচ্চহারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে এই সংকট হইতে শরণার্থীগণ ত্রাণ পাইতে পারে। তাহা না হইলে অবস্থা ভয়াবহ হইবে। পাকিস্থান সরকার মিথ্যা প্রচার করিয়া

প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে যে বাংলা দেশের সমস্যা হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ভূত। কিন্তু বস্তুত শরণার্থীগণ ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এপারে আসিলেই বলে যে তাহারা পাকিস্থান সামরিক বাহিনীর নির্ম্মম অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্যই পলাইয়া আসিতেছে।

দুইশত চৌদ্দটি কোকিং কয়লাখনি রাষ্ট্র করায়ত্ত হইল

যে সকল উচ্চ কারবন ও অল্প ছাই উৎপাদক কয়লা লৌহ ইস্পাতের কারখানার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই জাতীয় কয়লাকে কোকিং কয়লা বলা হয়। এই জাতীয় কয়লা ভারতবর্ষে অল্পই আছে এবং সেই জন্য ঐ কয়লা খুব হিসাব করিয়া খনি হইতে আহরণ করা প্রয়োজন বলিয়া ভারত সরকার বলিয়া থাকেন। ভারত সরকার মনে করেন যে ঐ কোকিং কয়লা খনির মালিকগণ তাঁহাদিগের মহামূল্যবান খনিজের সংরক্ষণ বিষয়ে তেমন তৎপর নহেন এবং এই কারণে ভারত সরকার সম্প্রতি ঐ শ্রেণীর ২১৪টি খনি নিজ করায়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। উদ্দেশ্য সরকারী পরিচালনায় কোকিং কয়লা অপচয় হইবে না এবং তাহার ফলে দেশের এই মূল্যবান খনিজ যথাযথ ভাবে হিসাব করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

এই বিষয়ে আসানসোলের কোল ফিল্ড ট্রিবিউন নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে বলা হইয়াছে যে বর্ত্তমানে কয়লা উঠান ও তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিয়মাধীন এবং কোনও কয়লাই সরকারের অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাসত্ত্বে কেহ ক্রয় করিতে অথবা ব্যবহার করিতে পারে না। ভারতবর্ষে যে ষাট লক্ষ টন লৌহ-ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাহার জন্য বড় জোর নব্বই লক্ষ টন (বা এক কোটি টন) কোকিং কয়লা ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। কিন্তু ভারত সরকার প্রায় দুই কোটি টন কোকিং কয়লা তুলিয়া দিয়া থাকেন ও তাহার মধ্যে অনেকাংশই লৌহ-ইস্পাত উৎপাদন কার্য্যে লাগান হয় না। শ্রীযুক্ত চারির, যিনি এখন ভারত সরকারের কয়লা তুলিবার কার্যের তত্ত্বাবধায়ক ও হুকুম দিবার মালিক হইবেন, বলিয়াছেন যে তিনি কোকিং কয়লা উঠান শীঘ্রই দ্বিগুণ করিয়া ফেলিবেন। অর্থাৎ যদিও লৌহ ইস্পাত উৎপাদন তেমন বাড়িবে না, তাহা হইলেও কোকিং কয়লা তুলিবার কার্য্য অধিক করিয়াই হইবে। ইহাতে সরকারের অধিকারে গিয়া কোকিং কয়লা সংরক্ষণ কার্য্য আরও উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া যে আশা তা কি ভাবে পূর্ণ হইতেছে? আর একটা কথা হইল ঐ কয়লা কোথায় যাইতেছে? ভারতে লৌহ ইস্পাত উৎপাদন কার্য্যে যদি কোকিং কয়লা না ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অন্য কার্য্যের জন্য তাহা কাহাকে ও কি কারণে দেওয়া হইতেছে? অবশ্য ভারত সরকারের একটা দুর্ব্বলতা আছে যাহার জন্য ভারত সরকার যে কোনও দেশের স্বার্থহানীকর কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই দুর্ব্বলতা হইল বিদেশের অর্থ প্রাপ্তির চেষ্টা। অর্থাৎ যদি কোকিং কয়লা জাপান বা অন্য কোন দেশে চালান করিয়া বিদেশের অর্থ পাওয়া যায় তাহা হইলে ভারত সরকার সেই কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে পারেন। শ্রীযুক্ত চারির কোকিং কয়লা উত্তোলন দ্বিগুণ করা হইলে ভারত সরকারের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারেই হইবে এবং তাহার আবশ্যকতা সম্ভবত বিদেশে ঐ কয়লা রপ্তানি করিয়া ইয়েন ডলার বা মার্ক আহরণ করার জন্যই বিশেষ করিয়া সরকারী নজরে দেখা দিবে। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ টন লৌহ খনিজ, তাম্র খনিজ প্রভৃতি রপ্তানি করা হইয়া থাকে ঐ একই লাভের আশায়—বিদেশী অর্থ আহরণের জন্য। বিদেশী অর্থ থাকিলে সহজ ও সরল উপায়ে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যায়। এই জন্য বিদেশের অর্থের প্রতি সরকারী আমলাদিগের এত টান। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা অথবা দূরদর্শীতা আমলাদিগের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। কার্য্য সিদ্ধি হইল তাহাদিগের প্রধান আগ্রহ ও অবলম্বন। কার্য্য সিদ্ধির জন্য যাহা যে ভাবে করিলে নিকটের সমস্যার সমাধান হয় আমলাগণ তাহাই করিয়া থাকে। কোকিং কয়লার বিষয়টাও ঐ নীতি অনুসরণে চলিবে।

শুনা যাইতেছে যে চারি মহাশয় পোলাণ্ড হইতে মাহিনা করিয়া আনা কয়লা খাদের কর্ম্মীদিগের দ্বারা নুতন পন্থায় এই সকল কাড়িয়া লওয়া খাদগুলির কার্য্য ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এইরূপ হইলে প্রথমত ঐ কয়লা রপ্তানি করিয়া যে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহার অনেকাংশ বিদেশীদিগের ভোগেই লাগিয়া যাইবে। উপরন্তু বিদেশী কর্ম্মী নিয়োগ করিলে স্বদেশের কর্ম্মীদিগের বেকারত্বের সৃষ্টি হইবে এবং তাহাদিগের মানসিক অবস্থা অক্ষমতা বোধ দূষিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। ইহাও জাতীয় আত্মসম্ভ্রম ও আত্মনির্ভরশীলতা বোধের দিক দিয়া ভাল কথা নহে।

রুশিয়ায় অভিনব মানসিক ব্যাধি

রুশিয়ায় কখন কখন নানান লোককে গ্রেফতার করিয়া কারাগারে বন্ধ করা হয়, যাহাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধির আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া রুশিয়ার কারাগারের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য বিবরণের বর্ণনায় লিখিয়া থাকেন। জুলিয়াস টেলেসিন জেরুস্যালেম হিব্রু ইউনিভারসিটির রিসার্চ কার্য্যে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। রুশিয়া হইতে উপরোক্ত মানসিক ব্যাধি বর্ণনা সম্বন্ধে ভ্লাডিমির বুকভস্কি পাশ্চাত্যদেশের মানসিক ব্যাধি চিকিৎসকদিগকে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছেন তাহার কথা শ্রীযুক্ত জুলিয়াস টেলেসিন বৃটেনের "গার্ডিয়ান" পত্রিকায় সম্পাদককে লিখিত পত্র আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রে দেখা যায় যে রুশিয়ান মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে কেহ যদি মার্কসের মতবাদ বিষয়ের বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গের কথার সমালোচনা করেন তাহা হইলে তিনি উন্মাদ। কেহ যদি রুশিয়ার শাসকদিগের কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত ব্যবস্থারও সমালোচনা করেন তাহা হইলে তিনিও পাগল। রুশিয়ায় রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত অপরাধের জন্য যাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহিরের লোকেদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। যথা প্রাক্তন জেনারেল পিয়েত্র গ্রিগোরেনকে, কবি নটালিয়া গোরবানেভস্কায়া, কৃষক ইভান ইয়াখিমোভিচ প্রভৃতি। ইহারা যে মানসিক ব্যাধি আক্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা শাসকদিগের সহিত মতভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং ঐ মতভেদকে মানসিক ব্যাধি বলিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এই জন্য পারে না যে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট মতবাদের জন্মদাতাদিগের সহিত একমত নহেন এরূপ শত শত কোটি মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছেন। তাহারা সকলেই কিছু উন্মাদ নহেন। যদি বলা হয় রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ দিয়া মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিচার করা আবশ্যক, তাহা হইলে শেষ অবধি দেখা যাইবে সকল মানুষই পাগল।

ইস্পাতের সরবরাহে ঘাটতি

অধ্যাপক সি এস মহাদেবন বলেন (স্বরাজ্য) যে ভারতের ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা ও বাস্তব উৎপাদন ক্ষেত্রে ইস্পাতের সরবরাহের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ১৯৭০-৭১ খৃঃ অব্দে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৯৯ লক্ষ টন; কিন্তু উৎপাদন করা হইয়াছিল মাত্র ৬০ লক্ষ টনেরও কম। ইস্পাতের চাহিদার অনুমান দেখা যায় ১৯৭১-৭২ খৃঃ অঃ-এ হইবে ৬৭৷৷০ লক্ষ টন, ১৯৭২-৭৩ খৃঃ অঃ-এ ৭৮ লক্ষ টন, ১৯৭৩-৭৪-এ ৯৩ লক্ষ টন। ১৯৭৫-৭৬ খৃঃ অব্দেও উৎপাদন ৮৪ লক্ষ টনের অধিক হইবে না, এবং ঐ সময় চাহিদা হইবে ১ কোটি ৫ লক্ষ টন। অর্থাৎ আগামী কয়েক বৎসর ধরিয়াই ইস্পাত সরবরাহের ঘাটতি প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। ইহার কারণ উৎপাদনের সকল ব্যবস্থা থাকিলেও উৎপাদন হইতে না পারা। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সেই কারণগুলি সহজেই নিবারণ করা যায় কিন্তু করা হয় না। ইহা কেন হইতে পারে তাহা দেখিতে যাইলে বলিতে হয় যে হয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের অক্ষমতা, নয়ত শ্রমিকদিগের ইচ্ছাকৃত উৎপাদন লাঘব চেষ্টা, নয়ত কাঁচা মাল, মালগাড়ী ইত্যাদির অনটন, অথবা আর কিছু। শ্রীমহাদেবন কথাটার বিশদ আলোচনা সম্পূর্ণ করেন নাই।

পুস্তক পরিচয়

সোনা রূপা নয়। জ্যোতির্ময়ী দেবী। প্রকাশকঃ অশোকা গুপ্ত। পি ৫০৪।৫ গড়িয়াহাট রোড কলকাতা ২৯। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। দাম পনের টাকা

বাংলার গল্প-সাহিত্যে মহিলাদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে আজকের আশাপূর্ণা দেবী বা বাণী রায় পর্যন্ত যে ক্রম-বিবর্তন বা ক্রমবর্ধন হয়েছে তার দিগন্ত যেমন বহুবিস্তৃত তেমনি তার রসপরিবেশয়িত্রী লেখিকারাও আপন দীপ্তিতে আপনি উজ্জ্বলা। বাংলা গল্পসাহিত্যের ধন-ভাণ্ডার এমনি রত্নরাজিতে ঝলমলিয়ে উঠেছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পের নব নব রসসম্ভারে। কিন্তু এ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নয়, এ দীর্ঘপ্রবাহিনী ছন্দিত লীলা। এক সময় বাংলার গল্পের বাজারে অনুরূপা দেবীর বা নিরুপমা দেবীর গল্পের প্রবাহ কি বিপুল সমারোহে সমাদৃত ছিল তারপর এই সঙ্গে মনে আসে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, আশালতা সিংহ, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতাদেবী, শান্তাদেবী বা গিরিবালা দেবীর নাম। আধুনিক গল্পের বাজারে লীলা মজুমদার থেকে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্যোতির্ময়ী। কিন্তু 'সোনা রূপা নয়' গ্রন্থের বর্ষীয়সী লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী বাংলা ছোট গল্পের রাজপথে জনতার জনারণ্যে কোনোক্রমেই হারিয়ে যাবার নাম নয়। কারণ তিনি সহজপথে হাততালি পাওয়ার লোভে কোনো রচনা লেখেন নি, প্রকাশকের তাগিদে রসালো বাজার চলতি চাহিদা মেটাবার জন্য ফরমায়েসী বিপুলায়তন কাহিনীর বহুপল্লবিত রসালাপও রচনা করেন নি। একান্তই নিজের অন্তরের তাগিদে সাংসারিক সহজজীবন প্রবাহের সরল গতিছন্দে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত বোধ ও বোধির আলোকে কয়েকটি অনবদ্য রেখাচিত্র রচনা করেছেন বলা চলে। রেখাচিত্রই বলা চলে এই কারণে যে, গল্পের বাঁধুনি, এতই আঁটোসাঁটো এবং নির্ভেজাল যে অপ্রাসঙ্গিক কথার রেখাপাতও কোথাও এসে যায় নি। যার জন্যে তাঁর গল্পের পাঠক গল্পের বক্তব্যকে ঋজুপথেই আস্বাদন করতে পারেন। বাহুল্যবর্জিত ছোটগল্পের পরিশীলিত ভাষা ভঙ্গি সত্যিই জ্যোতিময়ী দেবীর গল্প রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট, যা চিরদিন অনুকরণীয় হয়েই থাকবে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই বনফুলের ছোট গল্পের ভাষাভঙ্গির কথা পাঠকের মনে আসতেও পারে এবং আসাটাও স্বাভাবিকই।

পরম শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সোনা রূপা নয়' গল্প সংকলনটির মুখবন্ধে বলেছেন—'বহুবিচিত্র শিল্পচিন্তা ও শিল্পরীতিতে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী একটি উজ্জ্বল ও সম্মানিত নাম। তাঁর নামের উজ্জ্বলতায় দীপ্তি আছে কিন্তু উত্তাপ নাই, দাহ নাই; নামের উচ্চারণে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তার মধ্যে আন্তরিক সম্ভ্রমের পরিপূর্ণ প্রকাশ থাকে। বর্তমান সাহিত্য-সংসারের এই মাতৃস্বরূপা দেবী সত্যিই তাঁর লেখনীর জ্যোতির্ময়ী প্রভাবে যেমন সকল মত ও পথের বাংলার সাহিত্যপথের পথিকদের কাছ থেকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন তেমনটি দেখা যায় আর একমাত্র আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রে। উভয়েই সর্বজনপ্রিয়া ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়া। উভয়ের এই সার্বজনীন প্রীতিলাভের মৌল ভূমিতে আছে ব্যক্তিজীবনে সহজ প্রসন্নতায় সাহিত্য-পথিকদের প্রতি আন্তরিকতা এবং সাহিত্যসৃষ্টির নৈষ্ঠিক রূপায়ণ। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্প সম্বন্ধে লিখেছেন—'তাঁর সহজ ঘরোয়া ভাষা ও বলবার ধারা নিজস্ব যেন সহজ কথা শুনে যাচ্ছি। অভিজ্ঞতার আভাস তাঁর গল্প মাত্রেই নাই, যা সখের মেলায় বিরল। পরিবার-বহুল বড় সংসারের সুখ দুঃখের মধ্যে জীবনের পরিচয় না ঘটলে লেখায় তার ছবিটি এমন সত্যের সৌন্দর্য্য নিয়ে

ফুটে উঠতে পারে না ও পাঠক পাঠিকার পাওনাটাও এত সহজ ও উপভোগ্য হয় না।...ভাষা ও বর্ণনা তাকে এমন ঘরোয়া করে তুলছে কেবল মনে হয়েছে মেয়েরাই এ চিত্র দিতে পারেন।'

ছোট গল্পের দিগন্ত আজ বাংলা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে বিস্তৃত কিন্তু বাংলার ঘরের বধূর লেখনীতে এমনি দিগন্ত বিস্তার জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখনীতেই সম্ভব হয়েছে। তিনি বাল্যজীবন রাজস্থানে অতিবাহিত করেন পিতৃমাতৃ সঙ্গে। বহির্রঙ্গের বহু জীবনচর্চার ফসল তিনি সেই সময় তুলে নিয়েছিলেন আপন মানসমঞ্জুষিকায়। যার ফলে রাজস্থানের কাহিনী এসে যায় তাঁর ছোট গল্পের কাহিনী প্রগ্রনায়। রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও 'রাজপুত জীবনপ্রভাত' ঐতিহাসিকের বৃহত্তর পরিধিতে বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের রাজপুত বীরত্ব কাহিনীর মধ্যে মাত্র ছিল উদ্বেলিত স্বদেশ ভাবনার সুর। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী দেবীর রাজপুত কাহিনীর গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে অখণ্ড মানবিক মহিমার জয় ঘোষণা।

'সোনা রূপা নয়' ছোট গল্প সংকলনটিতে মোট উনপঞ্চাশটি গল্প সংকলিত হয়েছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্য জীবনের ভূমিকায় আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি জীবনধারাকে একান্ত গৃহমুখিন রেখে মাতৃস্বরূপা বঙ্গজননী কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির বিচরণ-ভূমি করেছেন সারাভারতীয়। তাই যেমন গল্পে রাজস্থানের কাহিনী এসেছে তেমনি ভারত বিভাগের ফলে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের জীবন-ছবিও দিল্লীর পট-ভূমিকায় তিনি উপস্থাপিত করেছেন। এবং এই জীবনচিত্র এতই বাস্তব ঘনিষ্ঠ যে গল্পগুলির প্রতিটি বর্ণনা যেন রূপালী পর্দায় চোখে ভেসে ওঠে। কি করুণ ও মর্মান্তিক জীবনকাহিনীই না তিনি পাঞ্জাব উদ্বাস্তু-জীবন নিয়ে লিখেছেন। মুসলমান গুণ্ডাদলের হাতে লাঞ্ছিতা মা তার ছেলে নিয়ে ভিক্ষা করেছেন আর আপন জ্যেষ্ঠ কন্যাকে চিনতে পেরেও নিজে অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছেন। 'সেই ছেলেটা' গল্পের এমনি এক সকরুণ কাহিনী পাঠককে অভিভূত না করে পারে না। গত দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ে মার্কিনী সৈনিকদের জন্যে টিনের বাক্সের নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী আসে। এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই নিষিদ্ধ দুটি মাংসও উপস্থিত থাকতো। ভিক্ষুক হিন্দু মুসলমান দুজনের ক্ষুধার মধ্যেও জাত ধর্মের সজাগতা এসেও এক করুণ বেদনায় বলে উঠেছে—ভিখিরীর আবার জাত কি! 'টিনের মাংস' গল্পের শেষ তাই খণ্ড কালের পথ পেরিয়ে অখণ্ড কালের উৎসঙ্গে। আবার 'এস পি' বা 'রক্তের ফোটা' গল্পের রাজনৈতিক চিন্তা চৈতন্যের এক বৃহত্তর চিন্তাপ্রসূত কাহিনীগ্রন্থনা পাঠক মাত্রকেই ভাবিত করে। বাংলার মন্বন্তরের কাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বঙ্গবিভাগের সময়ের কাহিনী প্রভৃতি যেমন আছে তেমনি আছে চিরন্তন জীবনযাত্রার সুখ দুঃখের অতলস্পর্শী খণ্ড চিত্র যা মানবমহিমার অখণ্ড ঐশ্বর্য্য। সব থেকে অবাক লাগবে জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই গল্প-গুলির পাঠক পাঠিকার এই ভেবে যে কি নিখুঁতভাবেই না তিনি সংসারযাত্রায় বিভিন্ন রূপ ও রুচির, বিভিন্ন চরিত্র ও চিন্তার নরনারীর জীবনচর্য্যাকে দর্শন করেছেন এবং তারই চিত্রাবলী সরলরেখায় বাহুল্যবর্জ্জিতভাবে অঙ্কিত করেছেন। গল্পগুলোর মধ্যে কত রকমের চরিত্রই না ভিড় জমিয়েছে—যেমন রাজা আছেন তেমনি বাঁদর নাচওয়ালাও আছে, যেমন মহাত্মা গান্ধীর কথা আছে তেমনি ঠক্ চরিত্রও আছে। উচ্চ নীচ মহৎ সাধারণ সকলেরই সমাবেশ ঘটেছে। তবে জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পের সম্বন্ধে পাঠকের মনে হবে এই যে, তিনি কোনোক্রমেই জীবনের ফোটোগ্রাফ তুলে ধরেন নি সবগুলোই হয়েছে অনবদ্য ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট রেখাচিত্র। সেখানেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোট গল্প-শিল্পের সার্থকতা উত্তুঙ্গ-শিখরে। জ্যোতির্ময়ীদেবীর মাতৃদৃষ্টির কোমল আলোকে সৃষ্ট মহৎ শিল্পের সম্ভারটি বাংলার ছোট গল্পের ভাণ্ডারকে তাই সোনা রূপা নয় একেবারে জীবন-মাণিক্যের দীপ্তিতেই ঔজ্জ্বল্য দান করেছে।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
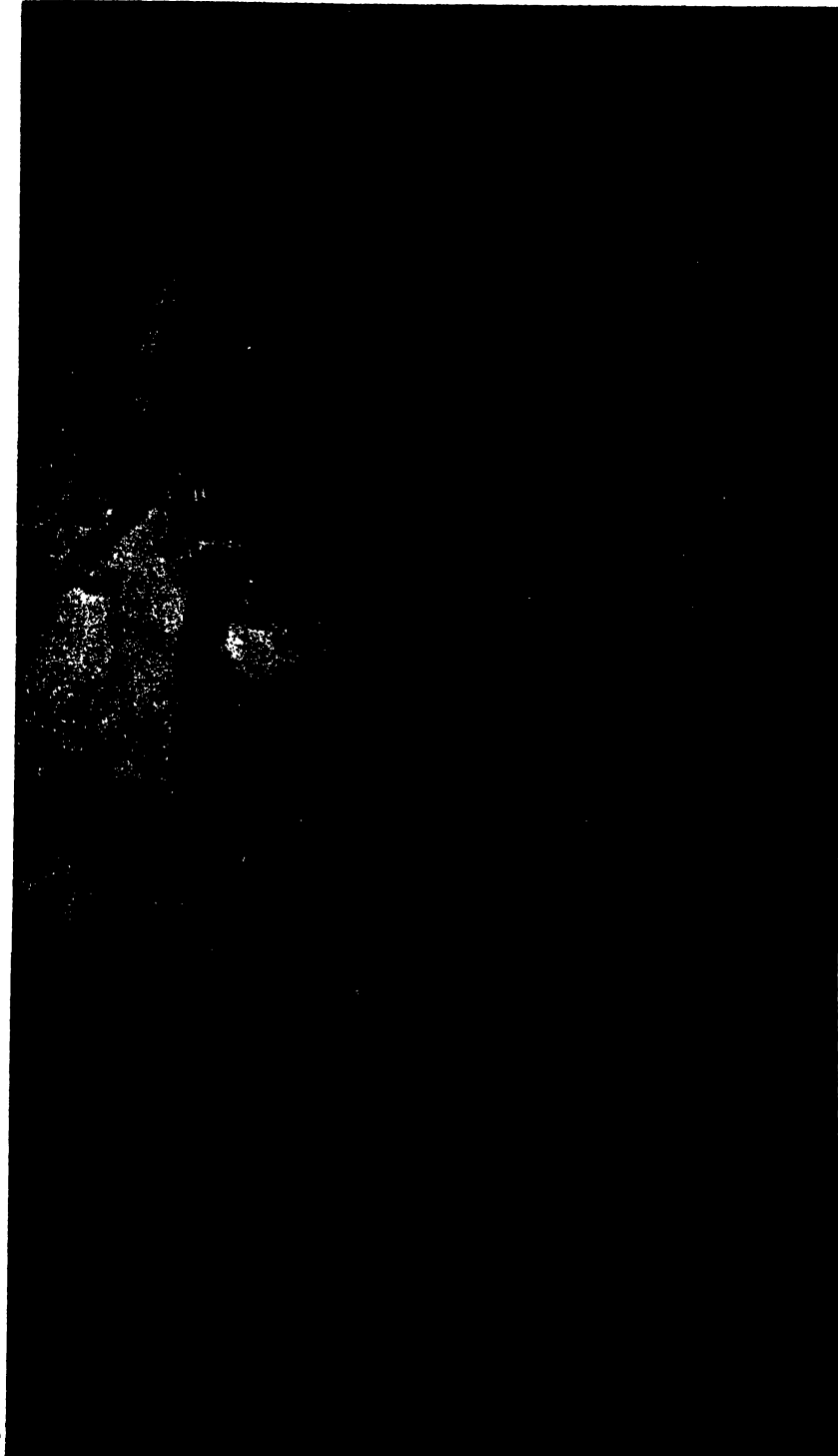
ঝড়ের পর

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৭৮

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নিকসনের ন্যায় শাস্ত্র

নিকসন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও এক প্রকার সর্বেসর্বা প্রশাসক। এই জন্য পৃথিবীর জনসাধারণ আশা করে যে নিকসন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্র বহির্ভূত মতামত প্রকাশ অথবা কার্য্যে ন্যায়ের পথ ছাড়িয়া যথেচ্ছাচারে আত্ম নিয়োগ করিবেন না। ন্যায় কথাটার অর্থ যাহা তাহাতে মানুষ ন্যায়শাস্ত্র অন্তর্গত বিষয় বলিতে তাহাই বুঝে যাহার মধ্যে একাধারে সুযুক্তি, সুনীতি, যাথার্থ্য ও মানবকল্যান উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। নিকসন যখন পাকিস্থানের সমর্থনহেতু অযথা মিথ্যা অপবাদ দিয়া ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন তখন যাঁহারা যথার্থ খবর রাখেন তাঁহারা স্বতঃই এই কথা মনে করেন যে পৃথিবীর একজন অতি উচ্চপদস্থ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে এই প্রকার সস্তার মিথ্যাকথা রাষ্ট্র করিবার চেষ্টা অত্যন্তই গর্হিত কার্য্য। অর্থাৎ নিকসন যে জানিয়া বুঝিয়া পাকিস্থানের সকল অপরাধ অস্বীকার করিয়া ভারতকে আক্রমনকারী ঘোষণা করিবার জন্য বিশেষ বাড়িবে না। পৃথিবীর মানুষ নিকসন বলিলেই সাদাকে কালো বলিয়া মানিয়া লইবে এরূপ চিন্তা করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। এমনিতেই নিকসনের কথা অল্প লোকেই বিশ্বাস করে। এই ক্ষেত্রে নিকসন পাকিস্থানের ঘৃণ্য ঘাতকগোষ্ঠীর সপক্ষে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের নিরপরাধ প্রমাণ করিতে গিয়া নিজের সুনাম চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

সকলেই জানেন যে পাকিস্থানের সামরিক শাসক-দিগের কর্ত্তা ইয়াহিয়া খান পূর্ব্ব বাংলার জনগণকে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়া একটা নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করেন ও পরে নির্ব্বাচনে নিজের বিপক্ষ দল আওয়ামী লীগের হস্তে শতকরা ৯৮টি আসন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া একটা আলোচনা সভা ডাকিয়া সেখান হইতে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পূর্ব্ব বাংলার জননেতা শেখ মুজিবুর রেহমানকে গ্রেফতার করিয়া বিমানযোগে পশ্চিম পাকিস্থানে চালান করিয়া দেন। তৎসঙ্গে ইয়াহিয়া খান নিজেও পশ্চিম পাকিস্থানে চলিয়া যান ও যাইবার সময় নিজের সৈন্যবাহিনীকে

হুকুম দিয়া যান যেন তাহারা তখন হইতেই বাঙ্গালী নিধন কার্য্য পুরাদমে আরম্ভ করে। ফলে সেই দিন (২৫শে মার্চ্চ ১৯৭১) সন্ধ্যা হইতে দুই তিন দিনের মধ্যে ঢাকা সহরে ৫০০০০ বাঙ্গালী নরনারী শিশুকে হত্যা করা হয়। এই সকল নিহত দিগের মধ্যে বাছাই করিয়া তাহাদেরই হত্যা করা হইয়াছিল যাহারা শিক্ষিত ও উচ্চস্তরের কর্ম্মী মানুষ। উকিল, শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, যন্ত্রবিদ, ছাত্র প্রভৃতি সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকেদের মধ্যে ঢাকা হইতে অল্পই বাঁচিয়া পলাইতে সক্ষম হয়। নারীহরণ ও ধর্ষণ হইয়াছিল প্রায় ৫০০০ ঐ সময়ে। ইহার পরে আরম্ভ হয় পূর্ব্ব বাংলার সর্ব্বত্র ঐ একই পন্থায় গনহত্যা, পাশবিক অত্যাচার, বাঙ্গালী নিপীড়ন ও বিতাড়ন। সেইদিন হইতে অদ্যাবধি নরনারী শিশু হত্যার সংখ্যা হইয়াছে ১০ লক্ষ, পূর্ব্ববাংলা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এক কোটি বাঙ্গালী এবং নারীহরণ ও ধর্ষণের সংখ্যা পৌঁছিয়াছে পঞ্চাশ হাজারের কোঠায়। এই এক কোটি পলাতক উদ্বাস্তু ব্যক্তিগণের অধিকাংশই ভারতে আশ্রয় সন্ধানে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্য ভারত সরকারের দৈনিক ব্যয় হইতেছে দুই কোটি টাকা। পাকিস্থানী সৈন্যগণের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক যোদ্ধাবাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে যাহারা ক্রমশঃ সংখ্যা ও শক্তিতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে ও যাহাদের আক্রমনে পাকিস্থানের বাঙ্গালী দমন কার্য্যে একটা প্রবল বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মুক্তি বাহিনী প্রথমে বাঙ্গালী সৈনিকদিগের দ্বারা গঠিত ছিল ও বাহিনীর যোদ্ধাসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০০০। কিন্তু উৎপীড়িত জনগণের ভিতর হইতে প্রত্যহই নুতন নুতন যুবকগণ সৈনিক বাহিনীতে যোগ দিবার জন্য আসিতে লাগিল। বর্ত্তমানে মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধার সংখ্যা ১৫০০০০ হইতেও অধিক ও তাহাদের অস্ত্র শস্ত্রও ক্রমবর্দ্ধনশীল। এই যোদ্ধাগণ পূর্ব্ব বাংলার সর্ব্বত্রই পাকিস্থানী সৈন্যগণের উপর আক্রমন চালাইতেছে এবং ইহারা প্রয়োজনবোধ করিলেই ভারতে প্রবেশ করিয়া দম লইতেছে। পাকিস্থানী ফৌজ প্রথমে মুক্তিফৌজের উপর আক্রমন করিবার জন্য ও পরে ভারতের সহিত যুদ্ধ লাগাইবার ইচ্ছায় ভারত পাকিস্থান সীমান্তে ক্রমাগতই গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া থাকে। ভারতরক্ষী সৈন্যগণের উপর গোলাগুলি বর্ষিত হইতে থাকিলে তাহারাও প্রত্যুত্তরে পাকিস্থানের সৈন্যদিগের উপর গোলাগুলি চালাইতে আরম্ভ করে। তখন পাকিস্থান তাহা লইয়া অভিযোগ আরম্ভ করে। কিন্তু বস্তুত ভারতীয় সৈন্যগণ অল্পক্ষেত্রেই পাকিস্থানের সৈন্যদিগের উপর গোলাগুলি চালাইয়াছে। পাকিস্থান একশতবার গোলাগুলি চালাইলে হয়ত ভারত তাহার উত্তরে দুই একবার গুলি-গোলা চালাইয়াছে। অর্থাৎ এই সীমান্তের আক্রমন ও প্রত্যাক্রমনের কার্য্য মূলতঃ পাকিস্থানের দ্বারাই চালিত হইয়াছে। ভারত ইহা লইয়াই একটা যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারিত কিন্তু ভারত তাহা করে নাই। পাক সৈন্যগণ মুক্তিবাহিনীর নিকট মার খাইলে সর্ব্বদাই তাহার জন্য ভারতীয় সৈন্যদিগকে দায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কথা হইল এই যে ভারতীয় সীমান্তের এপারে যে সকল গোলা বর্ষণ করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা অনেক অধিক ও তাহা যে পাকিস্থান সৈন্যের দ্বারা বর্ষিত হইয়াছে তাহা কোনও মতেই পাকিস্থান অস্বীকার করিতে পারে না। সীমান্ত লঙ্ঘন ও সীমান্তপারে গোলাবৃষ্টি পাকিস্থান সহস্র সহস্রবার করিয়াছে। ইহা পাকিস্থানের অপরাধ প্রবণতার অঙ্গ। পাকিস্থান ইতিপূর্ব্বে দুইবার ভারত আক্রমন করিয়াছে ও সেই সময়েও তাহার আক্রমন যুদ্ধের সকল রীতিনীতি অগ্রাহ্য করিয়া হঠাৎ গুপ্ত ঘাতকের ঘৃণ্যপন্থা অনুসরণ করিয়াই আরম্ভিত হইয়াছিল। ন্যায়ের পথে চলা পাকিস্থানের নিকট একটা মহা দুর্ব্বলতার লক্ষন। সেই জন্য পাকিস্থান সকল জঘন্য পাপের আশ্রয়ে চলিতে অভ্যস্ত ও তাহাতে পাকিস্থানের কোনও লজ্জা হইতে কেহ দেখে না।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিকসনও যে পাকিস্থানের সাহচর্য্যের ফলে পাকিস্থানী দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে গিয়া নিজেও ন্যায় ও সুনীতির সকল রীতি অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিবেন ইহা কেহ কখনও আশা করে নাই। আজ

যখন পাকিস্থান যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া ভারতীয় বিমান বন্দরগুলির উপর বোমা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল, তখন নিকসন কোন মুখে বলিলেন যুদ্ধ আরম্ভ, ভারত আক্রমণ করার ফলে হইয়াছে? ইহার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে কয়েকটি পাকিস্থানী সেবর-জেটবিমান যখন যশোহর হইতে কলিকাতার দিকে আসিতেছিল, তখন ভারতীয় ন্যাট বিমান সেই পাকিস্থানী বিমানগুলির অধিকাংশকে ভূপাতিত করে এবং দুইটি সেবর-জেট ভারত সীমান্তের পাঁচ কিলোমিটার ভারতের অভ্যন্তরে পড়িয়া ধ্বংস হয়। বিমান চালক পাকিস্থানী দুইজন বৈমানিক যোদ্ধা ভারতে প্যারাস্যুট দিয়া অবতরণ করেন ও গ্রেফতার হ'ন। ইহাও একটা যুদ্ধনীতি বৰ্জ্জিত সামরিক আক্রমনের উদাহরণ। এই সকল কথা নিকসনের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু নিকসন বলিতেছেন ভারত যুদ্ধারম্ভের জন্য দায়ী। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে ভারতের উপর বোমা বর্ষণের ফলে ও বোমা বর্ষণ করিয়াছে পাকিস্থান; কিন্তু নিকসনি, ন্যায়শাস্ত্রের হিসাবে ভারত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে প্রায় নয় মাস ধরিয়া পাকিস্থান মানুষ তাড়াইয়া ভারতে পাঠাইতেছে ও সেই লোক সংখ্যা এক কোটি। পূর্ব্ব পাকিস্থানে দশ লক্ষ বাঙ্গালী হত্যা করিয়াছে পশ্চিমা পাকিস্থানী সৈন্যগণ, নারী শিশু কেহই বাদ যায় নাই। শুধু এই কার্য্যের জন্যই সভ্য জগতের উচিত ছিল পশ্চিম পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনীর সকল হুকুম দাতার ফাঁসির ব্যবস্থা করা। কিন্তু নিকসন তাহা না করিয়া পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া চলিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ করিতে যে পাকিস্থান সাহস পাইয়াছে তাহার মূলে আছেন নিকসন। সুতরাং যুদ্ধারম্ভের জন্য নিকসন ভারত অপেক্ষা নিজেই অধিক দায়ী। পাকিস্থান মনে মনে ধরিয়া রাখিয়াছে যে ভারতের নিকট পরাজিত হইলেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিসংঘের আখড়াতে কোন খেলা খেলিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া দিবে—যেমন পূর্ব্বে দুইবার বাঁচাইয়াছে। এখনকার পরিস্থিতিতেও তাহাই দেখা যাইতেছে। আমেরিকার সাঙ্গপাঙ্গ সকলে শুধু "সিজ ফায়ার, সিজ ফায়ার" (গুলিচালান বন্ধ কর) বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যখন পাকিস্থান গণহত্যা ও নারীনিগ্রহ করিতেছিল প্রায় ৯মাস ধরিয়া তখন আমেরিকা একবারও "সিজ কিলিং, সিজ ইন্‌হিউম্যান অ্যাক্‌ট্‌স" বলে নাই (গণহত্যা ও অমানুষিক অত্যাচার বন্ধ কর)। বরঞ্চ গোলা বারুদ সরবরাহ করিয়া নিকসনের সরকার পাকিস্থানকে তাহার দুষ্কর্ম্মে সাহায্যই করিতেছিল।

আমেরিকার অর্থবল আছে আর আছে বিরাট সামরিক শক্তি। কিন্তু অন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে শুধু টাকা ও নৌবহর থাকিলেই সে পাপকার্য্য সফল হয় না। আমেরিকা কোরিয়া ও ভিয়েৎনামে গায়ের জোর দেখাইয়া সফলতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ভারতের মানুষ ভিয়েৎনামের লোকেদের সহিত তুলনায় অল্পশক্তি নহে। আমাদের জনসংখ্যা পঞ্চান্ন কোটি। আমাদের অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ ক্ষমতা কিছু কিছু আছে। আমাদের উপর আক্রমন চালাইলে আমরা যদি ত্যাগ ও আত্মবলিদানে পশ্চাৎপদ না হই তাহা হইলে আমেরিকা অথবা চীন আমাদিগকে দমন করিতে সক্ষম হইবে না। অন্যায়ের ও অধর্ম্মের নিকট আত্ম সমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ভারতকে পাপের প্রশ্রয়দাতাগণ পদদলিত করিতে কখনও সক্ষম হইবে না।

অপপ্রচারের বুদ্ধিহীনতার নিদর্শন

যাহারা মিথ্যা প্রচার করিতে নিযুক্ত হ'ন তাঁহারা প্রায়ই চোখ ঝলসান ও চমকদার বিজ্ঞপ্তি রচনা করিতে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা, বিদ্যা অথবা মানবীয় আদর্শ রক্ষার জন্য বিখ্যাত নহেন। ইহার কারণ মিথ্যার বাজারে জ্ঞান বা সত্যানুসন্ধানের কোনও চাহিদা নাই। তাহা হইলেও যদি অপপ্রচার করিবার আগ্রহে কেহ বারম্বার নিজের পূর্ব্বের প্রচারের বিরুদ্ধ প্রচার করিয়া ফেলেন তাহা হইলে তাহা একটা কৌতুকজনক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার বর্ত্তমান অপপ্রচার হইল যে ভারত-পাকিস্থান সংগ্রামের জন্য ভারতই মূলতঃ দায়ী। কি কারণে তাহা

অবশ্য বলা হইতেছে না। কারণ যথার্থ অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে পাকিস্থান সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভিনয় করিয়া ও পরে সামরিক শাসকদিগের রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করিয়া শাসনশক্তি হারাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রকে সমরক্ষেত্রে পরিণত করিল। শুধু তাহাই নহে, ন্যায় যুদ্ধের সকল নিয়ম বিসর্জ্জন করিয়া পাকবাহিনী যখন গণহত্যা,নারী নগ্রহ ইত্যাদি অমানুষিকতায় লিপ্ত হইল এবং জননেতা শেখ মুজিবুর রেহমানকে চালাকি করিয়া ধরিয়া লইয়া পশ্চিম পাকিস্থানে চালান করিল, তখন পাকিস্থানের ভবিষ্যত গভীর ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এক কোটি মানুষকে তাড়াইয়া ভারতে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিয়া নিগ্রহিত জনতার প্রতিশোধ আকাঙ্খাজাত প্রত্যাক্রমনের ফলে পূর্ব্ব পাকিস্থান একটা নির্ম্মম আন্তর্জ্জাতিক সংগ্রাম ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান একদিকে ও পশ্চিমা মুসলমান অন্যদিকে। এই জাতীয় আবহাওয়াতে পাকিস্থানী সামরিক শাসকগণ নিজেদের দোষ না দেখিয়া ভারত কেন উদ্বাস্ত পাকিস্থানীদিগকে সাহায্য করিতেছে এবং কেন মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধাদিগকে কোথাও আশ্রয় দান করিতেছে ইত্যাদি অভিযোগের অবতারণা করিয়া ভারত সীমান্তের ভারতীয় দিকে গোলাগুলি চালনা আরম্ভ করিল। কখন কখন ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়া ভারতীয় সীমান্ত রক্ষকদিগকেও আক্রমন করিতে লাগিল। বালুরঘাটে নভেম্বর মাসে ১৮টি পাকিস্থানী ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং যশোহর সীমান্তে ভারতীয় এলাকায় তিনটি পাকিস্থানী সেবার-জেটবিমান নাশ এইরূপ অন্যায় আক্রমনের উদাহরণ। কিন্তু নিকসনি অপপ্রচার বলিতেছে ভারত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

অপপ্রচারের রীতি অনুসরণ করিয়াই আবার প্রচারের ভিতর উল্টা কথাও বলা হইতেছে। ভারত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া কিছু পরেই বলা হইতেছে; "Over the past nine months, the Pakistani Government of President Mahammad Yahya Khan had indiscriminately slaughtered more than a million of its subjects in a cruel and myopic attempt to prevent autonomy for the Bengalis of East Pakistan."

অর্থাৎ "বিগত নয় মাস ধরিয়া পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ ইয়াহিয়া খানের রাজশক্তি নির্ব্বিচারে দশ লক্ষাধিক প্রজাকে হত্যা করিয়া অদূরদর্শিতার পথে বাঙ্গালীদিগের স্বায়ত্তশাসন আহরণ চেষ্টা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।" ভাষা এমন যাহা পাঠ করিলে মনে হইবে যে দশ লক্ষাধিক মানুষকে নির্ব্বিচারে হত্যা করা একটা অতি সামান্য কথা। ইহা নিক্‌সনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। কিন্তু নিকসন শুনিয়াছি "কোয়েকার" সম্প্রদায়ের মানুষ। তিনি শুধু যে অমানুষিকতাকে কোনও দোষ বলিয়া মনে করেন না তাহা নহে; তাঁহার নিজের ধর্ম্মবোধও তিনি সামরিক শক্তির যুপকাষ্ঠে বলিদান দিয়াছেন। বিশ্বের "কোয়েকার"গণ তাঁহাদের এই ভক্তটিকে নিজেদের সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কার করিলে উচিত হয়; নিকসন যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন তিনি বাল্যকালে তাঁহার মাতার নিকট গান্ধীর অহিংসাবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। মাতা যদি তাঁহাকে সবল হস্তে সত্য ও সুনীতি অনুসরণ করিতে শিখাইতেন তাহা হইলে ভালো হইত।

ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণতন্ত্র অনুসরণকারী রাষ্ট্র। পাকিস্থান ধর্ম্ম বিশেষের প্রাধান্য স্বীকৃতিকারী স্বেচ্ছাচারী সামরিক একাধিপত্য অনুগামী। আমেরিকা সাধারণতন্ত্রের পুজারী ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় স্থল। কিন্তু আমেরিকায় যেমন শ্বেতাঙ্গদিগের সাম্য ও স্বায়ত্তশাসন অধিকার পূর্ণশক্তিতে বিরাজমান, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গদিগের অবস্থা সে দেশে অত্যন্তই হীন। অর্থাৎ আমেরিকা মানব স্বাধীনতাকে শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য একচেটিয়া বলিয়া মনে করে। যেখানে কোন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্থিরভাবে অপরিবর্ত্তনীয় নহে একের জন্য এক প্রকার ও অপরের জন্য ভিন্ন প্রকার সেখানে নীতি চিরস্থির ভাবে সকলের জন্য সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে না। এই যে মনোভাব ইহার ফলে আমেরিকার উপর কেহ সকল পরিস্থিতিতে নির্ভর করিতে পারে না। আজ যে আমেরিকা পাকিস্থানের

সুবিধা অনুসরণহেতু নিজের সকল আদর্শ জলাঞ্জলি দিতেছে তাহার মূলে আছে আদর্শের ক্ষেত্রে আমেরিকার সুবিধাবাদ। যাহারা কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদিগকে বিনা বিচারে ইচ্ছামত গাছে টাঙ্গাইয়া ফাঁসি দিয়া মারে ও সেই দুষ্কার্য্য করিয়া অবাধে কোন শাস্তি না পাইয়া সমাজে বাস করিতে থাকে, সে জাতির মানুষ যে ১০ লক্ষাধিক কৃষ্ণাঙ্গের হত্যা কার্য্য সহজ দৃষ্টিতে দেখিবে ও দেখিয়া মানিয়া লইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

বৃটেনের ইচ্ছা পুরান রোগ জাগিয়ে রাখা

বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের কোন কোন চিন্তাশীল সাংবাদিকের মতে পূর্ব্ববাংলা স্বাধীন হইলে পরে তাহা চীনের আওতায় চলিয়া যাইতে পারে এবং তখন ভারতবর্ষের মধ্যে একটা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিলে ভারতের একটা শিরঃপীড়ার কারণ সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ বৃটেনের ঐ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদিগের মতে পাকিস্থানের সামরিক শাসকমণ্ডলী ঐ দেশে থাকিলেই ভারতের পক্ষে (এবং বৃটেনের) মঙ্গল হইত। কিন্তু বন্ধুজাতি যদি কম্যুনিষ্ট হয় তাহা হইলে সে অবস্থা ততটা বিপদজনক হয় না যতটা হয় একটা বৃটিশ আমেরিকার চক্রান্তের অংশীদার জাতি। এবং আমরা দেখিতেই পাইতেছি যে পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণ কতটা ভারতবন্ধু হইতে পারে। ২৪ বৎসরে তিনবার ভারতের বক্ষে তাহারা যে যুদ্ধের আগুন জ্বালাইয়াছে তাহাতে এই কথাটাই প্রমাণ হইয়াছে যে পাকিস্থান কখনও কোনও অবস্থাতেই ভারতবন্ধু হইতে পারে না। সুতরাং পাকিস্থানী শাসনের অবসানে যে শাসন পদ্ধতিই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা ভারতের পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হইবে বলিয়াই মনে হয়।

বৃটিশ রাজনীতিবিদগণ আরও মনে করেন যে পাকিস্থান হয়ত এই যুদ্ধে কাশ্মীর দখল করিয়া লইবেন এবং তাহাতে কাশ্মীর হয়ত পাকিস্থানের অন্তর্গত অথবা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হইয়া যাইবে। তাঁহাদের মতে এই সম্ভাবনার মূলে আছে মুসলমানদিগের হিন্দু বিদ্বেষ এবং হিন্দু রাজত্বে বাস করিবার প্রবল অনিচ্ছা। কিন্তু বৃটিশগণ ভুলিয়া যান যে কাশ্মীর বহু শতাব্দী হইতেই হিন্দু রাজাদিগের অধীনে থাকিয়াছে এবং কাশ্মীরের মুসলমানগণ ঠিক ১৯৪৬/৪৭ খৃঃ অব্দের মুসলীম লীগের সভ্যাদিগের মত হিন্দু বিদ্বেষী নহেন। শাসক যে জাতির বা ধর্ম্মমতের হউক না কেন তাহারা যদি সুশাসক হয় তাহা হইলে প্রজাদিগের সহিত তাহাদিগের কোনও কলহ হয় না। পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণ মুসলমান হইলেও তাহাদের সহিত পূর্ব্ববাংলার মুসলমান প্রজাদিগের সম্প্রীতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ তাহারা শোষণ পন্থা অনুসরণে চলিতেন। ভারতের বৃটিশ রাজত্বও প্রথমে জনসাধারণের বৃটিশের উপর বিশ্বাস ও আস্থা থাকাতে গড়িয়া ওঠা সম্ভব হইয়াছিল। বৃটিশ শাসকগণ আমাদিগের স্বজাতি অথবা আমাদের সহিত এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। কিন্তু তাহা হইলেও যতদিন তাঁহাদের উপর জনসাধারণের নির্ভর ছিল ততদিন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রকার আন্দোলন করে নাই। যখন ভারতীয়দিগের বিশ্বাস চলিয়া যাইল তখন হইতেই বৃটিশ বিরুদ্ধতা প্রবলরূপ গ্রহণ করিল। বৃটিশ সাংবাদিকদিগের ভারতে হিন্দু মুসলমান বিবাদ পুনঃ জাগরিত হওয়ার আশা, যতটা আমরা বুঝি সফল হইবে না। ইহার কারণ সাম্প্রদায়িক কলহ যে কোন সুফল দান করে না সে কথা বর্ত্তমানে ভারতের জনসাধারণ সম্যকরূপে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। আমরা মনে করি যে কাশ্মীরে আমরা পাকিস্থানীদিগকে পরাভূত করিয়া তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর অধিকার করিয়া লইতে সক্ষম হইব এবং কাশ্মীরে যাহাদের পাকিস্থানের প্রতি সহানুভূতি ছিল তাহারাও অতঃপর পূর্ব্ব পাকিস্থানের হত্যালীলার পরে আর সে মনোভাব রক্ষা করিতে পারিবে না।

বৃটিশ নীতিজ্ঞদিগের আরো মনেহয় যে ভারতের এই সকল পরিবর্ত্তনের ফলে পরে বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে। কারণ বাঙ্গালী জাতি মিলিত হইয়া এক রাষ্ট্র গঠন চেষ্টাও করিতে পারে। এই আশঙ্কার বিশেষ কোনও কারণ নাই, কেন না জনসংখ্যা অধিক থাকাতে পূর্ব্ববাংলা পশ্চিমের উপর প্রভুত্ব করিবে এবং

শুধু সেই কারণেই দুই বাংলা এক হইবে না। এবং যদি নিজেদের স্বাধীনতা ও পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষা করিয়া এক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয় তাহা হইলে ভারতের তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। উত্তর প্রদেশের মত বিরাট প্রদেশ যদি ভারতে থাকিতে পারে তাহা হইলে মিলিত বাংলাই বা পারিবে না কেন? বাংলা বৃহত্তর হইলেই ভারত হইতে পৃথক হইয়া যাইবে এইরূপ চিন্তা করিবার কোনও কারণ নাই।

বৃটেনের চিন্তাশীলদিগের এই সকল জল্পনা কল্পনা কিছুটা নির্ভর করে কিরূপ হইলে তাঁহাদের নিজেদের সুবিধা ও আনন্দ হয় তাহার উপর। ভারতের যাহাতে ক্ষতি বৃটেনের তাহাতেই লাভ এই ধারণার মূলে আছে পুরাকালের সাম্রাজ্যবাদী দিগের ভারত সম্বন্ধে বিদ্বেষ। কিন্তু বর্ত্তমানে এই বিদ্বেষের আর কোনও মূল্য নাই। সুতরাং এখনকার ভারত বিরুদ্ধতার কারণ পাকিস্থানের প্রতি বাৎসল্য ভাব। নিজের স্বহস্তে রচিত এই অমানুষিক দুর্নীতি ও নির্ম্মমতা পুষ্ট পরভুক্ রাক্ষস রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখা বৃটেনের একটা অতি বৃহৎ কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া কোন কোন বৃটিশ জাতীয় ব্যক্তিই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু কিছু কিছু মহৎ চরিত্র বৃটিশ জাতীয় মানুষ আরম্ভ হইতেই ভারত বিভাগ ও পাকিস্থান গঠনের তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদিগের সংখ্যা অল্প। আরও এক মানব সেবক বৃটিশ গোষ্ঠীর লোক আছেন যাঁহারা দুস্থের সাহায্যের জন্য প্রাণপাত করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। অক্স্‌ফ্যাম দল এই জাতীয় মানবহিতব্রত পালনের জন্য বিখ্যাত। কুটিলতা কপটতায় বিশেষজ্ঞ যাঁহারা সেই সকল বৃটিশ মানুষের পাপের অনেকটা এই উন্নত চেতা কর্ম্মীদিগের পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা শোধিত হইয়া যায়।

যুদ্ধ কেমন চলিতেছে

যতটা জানা যায় পূর্ব্ব পাকিস্থানের যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। লিখিবার সময় (২৮শে অগ্রহায়ণ) যে অবস্থা ছিল তাহাতে পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ময়নামতি অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে এবং ইহাছাড়া অপর সকল স্থানই ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তি বাহিনীর দখলে আসিয়া গিয়াছে। পশ্চিম অঞ্চলে কাশ্মীর, শিয়ালকোট, রাজস্থান ও সিন্ধু প্রদেশে পাকিস্থানীদিগের বহু ঘাঁটি ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর হস্তে আসিয়াছে। অন্যত্র কোথাও পাকিস্থানীদিগের ভারতে অনুপ্রবেশ চেষ্টা সফল হয় নাই। যুদ্ধ প্রবল ভাবেই চলিতেছে। জলে, স্থলে ও আকাশে ভারতীয় যোদ্ধাগণ নিজেদের বীরত্ব ও আত্ম বলিদানের চিরস্মরণীয় ও অমর ঐতিহ্য পূর্ণরূপে জাগ্রত রাখিয়া শত্রুর অন্তরে ভীতি ও হতাশা জাগ্রত করিয়া অগ্রগমন করিয়া চলিয়াছেন। আজ অবধি যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে ক্ষতির হিসাবে দেখা যায়।

বিনষ্ট হইয়াছে	পাকিস্থানের	ভারতের
বিমান	৮৩	৪১
ট্যাঙ্ক	১১৫	৬১
যুদ্ধ জাহাজ	৪	একটিও না
ডুবো জাহাজ	২	একটিও না
গান বোট	১৬	একটিও না
ফ্রিগেট	একটিও না	১

সৈন্যদিগের মধ্যে ক্ষতির হিসাবে দেখা যায় ভারতীয় স্থল যোদ্ধা দিগের মৃত্যু হইয়াছে ১৯১৮ জনের, আহত হইয়াছেন ৫০২৫ জন ও নিখোঁজ আছেন ১৬৬২ জন। বৈমানিক মারা গিয়াছেন ১৯১ জন। পাকিস্থানের হতাহতের মধ্যে ৪১০২ জন সৈন্য হতাহত এবং অপর সশস্ত্র যোদ্ধাদিগের (রাজাকার) মধ্যে হতাহত ৪০৬৬। এইক্ষতির সম্বন্ধে আমরা পুরা খবর জানিতে সক্ষম হই নাই। যতটা জানা গিয়াছে তাহাই লিখিত হইল।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে পাকিস্থানী সৈন্যগণ পশ্চিম পাকিস্থানে যুদ্ধকার্য্য অধিক সক্ষমতার সহিত চালাইতেছে। ইহার কারণ পূর্ব্ব পাকিস্থান অথবা বাংলাদেশে তাহারা পাপে নিমজ্জিত হইয়া পড়ায় তাহাদিগের মনোবল বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। নিজেদের পাপ তাহাদিগকে হীনবল করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্থানে তাহারা

জনসাধারণের উপর নির্ভর করিতে পারে এবং ভারতীয় সৈন্যগণ সাধারণের সাহায্য লাভ করে না। পূর্ব্ব বাংলায় মুক্তি বাহিনী ভারতীয়দিগের সঙ্গে থাকায় ভারতীয়দিগের অগ্রগমন সহজ হইয়াছে।

দুই বাংলা এক হইতে পারে না

ভারতের বিরুদ্ধে যে সকল দুরভিসন্ধির অভিযোগ ভারত সমালোচক জাতিগুলি করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার মধ্যে একটা হইল ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠনের মতলবের কথা। অর্থাৎ ইহাদের মতে ভারত পাকিস্থান ভাঙ্গিয়া নিজের রাষ্ট্রের আকার বৃদ্ধি চেষ্টা করিবে। ভারত বলিতেছেন যেকোন ভাবেই ভারতের নিজ রাষ্ট্রের আকার বৃদ্ধির কোন অভিপ্রায় নাই এবং পাকিস্থান যদি না থাকে তাহা হইলেও ভারত তাহার নিজের রাষ্ট্রের এলাকা ছাড়িয়া অপরের জমি দখল চেষ্টা কখনও করিবে না। অবশ্য যে সকল স্থান ন্যায়ত ভারতেরই অথচ যে গুলি অন্যায় ভাবে অপরে দখল করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল অঞ্চল ভারত ন্যায়ত ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে কোনও অন্যায় কার্য্য করা হইবে না। যথা আজাদ কাশ্মীর। ঐ স্থল পাকিস্থান অন্যায় ভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে এবং ঐ অঞ্চল ভারতের ফিরাইয়া পাইবার অধিকার আছে। কিন্তু পূর্ব্ববাংলা পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও ভারত কখন পূর্ব্ববঙ্গ নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবে না। এবং পশ্চিমবঙ্গও কখনও ভারত ছাড়িয়া বাংলাদেশের অন্তর্গত প্রদেশ হইবার কল্পনাও করিবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের অঙ্গ হইয়া থাকার একটা গৌরব ও নানা দিক দিয়া নিরাপত্তার দিক আছে। বাংলা দেশের সংখ্যালঘিষ্ট অংশীদার হইয়া একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ছোট সরিক হইয়া থাকার কোন গৌরব বা মূল্য থাকিবে না। সুতরাং সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি কেহ চেষ্টা করিয়া করিবে বলিয়া মনে হয় না। এই সকল কারণে মনে হয় না যে দুই বাংলার এক হইবার কোন সম্ভাবনা আছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে। যদি কোন সময় পূর্ব্ববাংলা, যাহার নাম এখন বাংলাদেশ, এমন অবস্থায় আসিয়া পড়ে যখন তাহার পক্ষে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র চালাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া গিয়া তাহাকে অপর রাষ্ট্রের সহিত সংযোগ সৃষ্টি করিতে হইতে পারে; সেইরূপ অবস্থায় বাংলাদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রয়োজন অনুভব করিতে পারে; কিন্তু সেইরূপ হইলে পশ্চিমবঙ্গও পূর্ব্ববাংলা এক হইবে না; সেই দুইটি অঞ্চলই ভারতের অন্তর্গত হইয়া গিয়া ভারতের দুইটি প্রদেশ হইয়া যাইবে।

আমেরিকার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে

আমেরিকা পাকিস্থানের সমর্থক। পূর্ব্বে আমেরিকা পাকিস্থান হইতে গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্ত চালকবিহীন বিমান ছাড়িয়া রুশিয়া ও চীনদেশের আলোক চিত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিত ও সেই জন্য পাকিস্থানকে বহু অর্থ সাহায্যও করিত। পরে ঐ জাতীয় কার্য্য আর ততটা মূল্যবান অথবা অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইত না; কিন্তু পাকিস্থানের উপর একটা দাবি থাকিলে তেমন অবস্থায় পাকিস্থানকে অবলম্বন করিয়া নানান কার্য্যই হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া আমেরিকা বরাবরই পাকিস্থানকে সাহায্য দিয়া কিনিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছে। কম্যুনিষ্ট জগতের সহিত যদি আমেরিকার যুদ্ধ হয় তাহা হইলে পাকিস্থান আমেরিকাকে সাহায্য করিবে এই কথা ভাবিয়া আমেরিকা পাকিস্থানকে বহু অস্ত্র শস্ত্র দিয়া সামরিকভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে পাকিস্থান সেই সামরিক শক্তি বারম্বার ভারতের উপরেই চালাইয়াছে। বর্ত্তমানে পাকিস্থান কম্যুনিষ্টদিগের বন্ধু সুতরাং আমেরিকার অস্ত্র কাহার উপর চালিত হইবে তাহা আমেরিকা হয়ত জানে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে পাকিস্থানীদিগের গণহত্যা ও অন্যান্য অমানুষিক অত্যাচারের সময় আমেরিকা নির্লজ্জভাবে ইয়াহিয়া খানের হস্তে অর্থ ও অস্ত্র পৌছাইয়া দিয়া পাকিস্থানের বর্ব্বরতার সমর্থকের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। এখন যখন পাকিস্থানীরা নিরস্ত্র নরনারী বালক বালিকা ও শিশুদিগের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাইবার পরিবর্ত্তে ভারতীয় সৈনিকদিগের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ ব্যতীত অপর কোনও পথ পাইবে না; সেই সময় আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর হইতে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়া ব্রহ্মদেশের নিকট হইতে হেলিকপ্টার যোগে বা অন্য কোন ভাবে কিছু কিছু পাকিস্থানীকে পূর্ব্ব বাংলা হইতে পলাইবার উপায় করিয়া দিতেছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আমেরিকা ঐরূপ করিলে তাহাতে ভারতের পক্ষে বাধা দেওয়া আইনত সহজ নহে। ভারত সম্ভবতঃ ঐরূপ কিছু হইলে তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিবে না। কিন্তু আমেরিকা মানব স্বাধীনতার মহান রক্ষকের স্থান হইতে নামিয়া আসিয়া যে পাশবিকতার সমর্থনের পঙ্কে নিমজ্জিত হইল ইহা একটা অতিবড় নির্ম্মম মানব সভ্যতার সকল পবিত্র আদর্শ বিনাশী কলঙ্কের কথা হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর আমেরিকা সভ্যতার উচ্চতম আসরে অপাংক্তেয় হইয়া থাকিবে।

বর্ব্বরের ঔদ্ধত্য ও দর্পের সীমা থাকে না

বন্য পশুদিগের মধ্যে নিজেদের অপরাধবোধ থাকে না। বন্য বরাহ যখন শানিত ছুরিকাবৎ দন্ত দ্বারা অপর কাহাকেও আক্রমণ করিয়া চিরিয়া ফেলিবার জন্য প্রবলবেগে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, তখন তাহার মনে কখনও নিজের পূর্ব্ব আচরণের ন্যায্যতা অথবা অপরকে আক্রমণ করিবার অধিকার সম্বন্ধে কোনও চিন্তা জাগ্রত হয় না। জুলফিকার আলি ভুট্টো যখন আন্তর্জাতিক সংঘে কাগজপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সম্মিলিত জাতিসংঘকে গালিগালাজ করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইল; তাহার মনেও তখন তাহার স্বদেশবাসী দিগের দ্বারা দশ লক্ষ নরনারীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করার অথবা পঞ্চাশ হাজার নারীর চরম নিগ্রহের কথা জাগ্রত হয় নাই। এক কোটি মানুষকে তাড়াইয়া সঙ্গীন দিয়া খোঁচা মারিয়া দেশ ত্যাগ করাইবার কথাও ভুট্টো ভাবে নাই। শুধু ভাবিয়াছিল তাহার নিজের গর্বিত ও উদ্ধত বাসনার কথা।

"এই যে সকল পশু মনোভাব চালিত মানুষ, যাহারা বর্ত্তমান জগতে সভ্য সমাজে যথেচ্ছা চলাফেরা করিতেছে ইহাদিগের মানব সমাজে বিচরণ বন্ধ করা প্রয়োজন। মানুষকে যেমন উন্মাদ অবস্থায় অথবা কোনও ছোঁয়াচে রোগাক্রান্ত হইলে শৃঙ্খলাবদ্ধ কিম্বা অপর মানুষের নিকট হইতে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়; নরঘাতক ও পাশববৃত্তি উদ্দীপিত জাতির মানুষকেও তেমনি সভ্য জগতের মানুষের সহিত অবাধ মেলামেশা করিতে না দেওয়া কর্ত্তব্য। পাকিস্থান সৈন্যবাহিনী যাহা করিয়াছে তাহাতে পশ্চিম পাকিস্থানের সকল সৈনিক এবং সকল শাসন কর্ম্মে নিযুক্ত মানুষকে বিশ্বের সভ্য দেশে কোথাও প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নহে। বহুকাল পূর্ব্বে বোম্বাই-এ তাজমহল হোটেলের দরজায় লিখা থাকিত "দক্ষিণ আফ্রিকানদিগের প্রবেশ নিষেধ।" বর্ত্তমান পরিস্থিতেতে সর্বত্র যদি লেখা থাকে "পশ্চিম পাকিস্থানীদিগের প্রবেশ নিষেধ" তাহা হইলে কিছু কিছু পাকিস্থানীগণ বুঝিতে পারিবে যে তাহাদিগের চরিত্রের মানুষের অবাধ গতিবিধি সভ্যজনসমাজে আর গ্রাহ্য হইবে না।

সাধারণ গ্রাম্য সমাজে একটা রীতির প্রচলন এখনও আছে, যাহাকে বলা হয় একঘরে করা, জাতিচ্যুত করা অথবা হুঁকাপানি বন্ধ করা। ইংলণ্ডেও কোন মানুষ কোন কোন অপরাধে জড়িত হইলে তাহাকে "সেণ্ডিং টু কভেণ্ট্রি" (কভেণ্ট্রিতে পাঠান) করা হইত। অর্থাৎ তাহার সহিত অপর লোকের আর কোনও সম্বন্ধ থাকিত না। এখন যদি বিশ্বের কোন কোন হোটেল, ক্লাব প্রভৃতিতে লেখা হয় পশ্চিম পাকিস্থানী দিগের প্রবেশ নিষেধ (West Pakistanis not admitted) এবং যদি পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনীর মানুষকে 'পাসপোর্ট' দেওয়া সম্বন্ধে কোন কোন দেশে বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে নারীদিগের উপর পাশবিক অত্যাচার, নিরস্ত্র নরনারী বালক বালিকা ও শিশু হত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীর বিবেক কিছুটা সজাগ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ঘটিবে। জুলফিকার আলি ভুট্টো যখন চিৎকার করিয়া "আমি চলিলাম, যুদ্ধ করিতে চলিলাম" বলিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের আসর ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যাইল; তখন তাহার সে রঙ্গমঞ্চ সুলভ ভঙ্গিমাতে কেহ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া যায় নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আস্ফালন হাস্যকর হয়; কিন্তু কোন পশ্চিম পাকিস্থানীর পক্ষে কি যে হাস্যকর অথবা লজ্জাকর কিম্বা ঘৃণ্য তাহা বোঝা স্বাভাবিক নহে।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা

সন্তোষকুমার অধিকারী

বিপ্লব কাকে বলে বর্ণনা করতে গিয়ে আইরিশ নেতা টেরেন্স ম্যাকস্যুইনি লিখেছিলেন—অত্যাচারী যখন রাজাসনে বসে, আর নির্য্যাতনে একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষ উঠে দাঁড়ায়। তার শক্তি ও বীর্য্যের জোরে অত্যাচারের প্রতিরোধ করে। তারপর প্রতিষ্ঠা করে অনন্যনির্ভর এক নতুন রাষ্ট্রতন্ত্রের। বিপ্লবীকে বিচার করতে হবে তার উদ্দেশ্য ও পন্থার দ্বারা। মানুষের অধিকারকে খর্ব করে তাকে নত করে রাখবার চেষ্টা করলে, সে একদিন রুখে দাঁড়াবেই। চেষ্টা করবে তার নিপীড়ককে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার।

ভারতবর্ষের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র ছিল। মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের পীড়নে সমস্ত দেশ যখন জর্জর, তখন অত্যন্ত সতর্ক চতুরতায় ইংরাজ বণিকের প্রবেশ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমান নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে সরিয়ে যখন ক্লাইভ বাংলাদেশে তার খুঁটি গাড়লো, তখন স্বাধীনতা চলে গেল বলে কেউ ত্রস্ত হয়ে ওঠে নি। ইংরাজ আস্তে আস্তে তার রাজ্য বিস্তারকে দৃঢ় ও সংগঠিত করেছে। তখন মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়েছে কোন কোন সামন্ত রাজা অথবা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষ। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অথবা ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহের চরিত্রে খুব বেশী প্রভেদ নেই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তমলুকের রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া বিদ্রোহী হয়েছিলেন তাঁর অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ায়। ১৮৫৭তে নানাসাহেব তাঁতীয়া টোপী ও রাণী লক্ষীবাই সিপাহীদের সংগঠিত করে ইংরাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিলেন; কারণ প্রায় একই। নানাসাহেবের সংগঠন শক্তির সঙ্গে মিশেছিল আজিমুল্লা খাঁর রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি। এবং সময়ও কিছুটা অনুকূল ছিল। তাই সিপাহীবিদ্রোহ সর্ব ভারতীয় রূপ নিয়েছিল। তবু সিপাহীবিদ্রোহের একটি বড় দান যে, সাধারণ ভারতবাসীর মনে এই বিদ্রোহের ফলে ইংরাজের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে এত ছোট ছোট টুকরো রাজত্বে বিভক্ত ছিল যে একটা সব ভারতীয় বোধ জেগে উঠতে পারে নি। ছলে বলে যেভাবেই হোক্ ইংরাজ সমস্ত ভারতবর্ষকে পদানত করেছিল বলেই এক অখণ্ড ভারতীয়তার সৃষ্টি। অর্থাৎ ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যে একটি বোধ মানুষের মনে জেগে উঠলো তা হল ইংরাজ-বিদ্বেষ। তবে এই বিদ্বেষ পুঞ্জিভূত হতে আরও অনেক সময় লেগেছিল।

ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষা, ও ভাষার মাধ্যমে ইউরোপের চিন্তাধারা আমাদের কাছে এসে পৌছলো। আমরা জানলাম, জাতীয়তা কথার অর্থ এবং স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্খা। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা শব্দের প্রথম উদ্‌গাতা রামমোহন রায়। কিন্তু তখনও ইংরাজ-রাজত্বের অবসান ঘটাতে কেহ চাননি। তখনও মানুষের মনে অরাজকতার দুঃস্বপ্ন। রামমোহনই প্রথম ভারতবর্ষের মানুষের মনকে তার অতীত ও ঐতিহ্যের দিকে ফেরালেন। তারপর এলেন বিদ্যাসাগর। যিনি জাতীয়তার মর্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শেখালেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা অনেকগুলি লোককে পেলাম। তার মধ্যে উল্লেখ করতে পারি নবগোপাল মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী ও রাজনারায়ণ বসুর নাম। তবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে পুরুষ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার নাম স্বামী বিবেকানন্দ।

জমিতে ফসল ফলাতে হ'লে জমিকে ফসলের উপযোগী করে নিতে হয়। ভারতবাসীর মন বিপ্লবের উপযোগী হয়ে উঠছিল একটার পর একটা ঘটনায়। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। সেই রূপ আরও নগ্ন হয়ে দেখা দিল ১৮৬০ সালে নীলকর সায়েবদের ব্যবহারে। সম্ভবতঃ নীল বিদ্রোহই প্রথম ঘটনা যা সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের চেষ্টাকে প্রতিফলিত করেছে। যে বিদ্রোহের মাধ্যমে গ্রাম্য কৃষকের সঙ্গে বুদ্ধিজীবির সমন্বয় ঘটেছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' এর মত গ্রন্থ লেখা হ'য়েছে। এবং সাধারণ মানুষের মনে ইংরাজ বিদ্বেষের রূপকে তীব্রতর করেছে। এরপর ১৮৬৩ সালের ওয়াহাবি আন্দোলন। যদিও চরিত্রে সাম্প্রদায়িক তবুও জনমানসে এর ফলে ইংরাজ বিদ্বেষের ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধের আর একটি চিত্র পাঞ্জাবের 'কুকা' আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হ'ল। অশান্তির আগুন এরপরেই সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। দেশ জুড়ে একটি সাধারণ শত্রুর চেহারা মানুষের চোখে প্রতিভাত হ'ল সে চেহারা শাসক ইংরাজের। —মানুষ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সাধারণ মানুষ—ভাবতে সুরু করলো দেশের কথা; যে দেশের অখণ্ড ও মহনীয় রূপ এতদিন তার অজানা ছিল।

এই দেশকে মানুষের চোখের সামনে; বুকের মধ্যে প্রতিভাত করে তুললেন যিনি, তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ নিয়ে লেখা তাঁর 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দর মত সর্বত্যাগী দেশহিতব্রতী নায়কের চরিত্র সৃষ্টি করলেন। বিপ্লবী সৈনিককে প্রশ্ন করলেন গুরু—তোমার পণ কি?

প্রত্যুত্তরে বলিল—পণ আমার জীবন সর্বস্ব।

প্রতিশব্দ হইল—জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

—আর কি আছে? আর কি দিব?

উত্তর হইল—ভক্তি।

প্রথমে দেশের রূপ তিনি অঙ্কিত করলেন সে রূপের বর্ণনা—সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্......তারপর দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা। তারপরে সেই মাতৃচরণে আত্মনিবেদন।

বঙ্কিমচন্দ্র মন্ত্র দিলেন আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর কানে—বন্দেমাতরম্।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ ছুটে এলো; মুখে ধ্বনি—বন্দেমাতরম্। সেই মন্ত্র মুখে নিয়ে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পুলিশের লাঠির আঘাত অগ্রাহ্য করলো। অরবিন্দ ঘোষ বিপ্লবের প্রচণ্ডতম বাণী জাগালেন তাঁর 'বন্দেমাতরম পত্রিকায়'। অত্যাচার ও নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান বজ্রের মত শব্দে বেজে উঠলো। বাংলাদেশ থেকে মহারাষ্ট্রে ছুটে গেল সে মন্ত্রের বিদ্যুৎ। ফ্রান্সে বসে মাদাম কামাও বন্দেমাতরম্ পত্রিকা বার করে ডাক্ দিলেন ভারতের মানুষকে। ডাক দিলেন ইংরাজ শাসককে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে চূর্ণ করে দেওয়ার জন্য ভারতের যুবসমাজকে।

তবু বঙ্কিমচন্দ্রকে লোকে চিনতো না যদি বিবেকানন্দ না থাকতেন, যদি বজ্র নির্ঘোষে সে নাম প্রচার না করতেন। বিবেকানন্দ সমস্ত পৃথিবী জয় করে এসে ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে বললেন—হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা,—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? ভারতবর্ষের যুবসমাজকে ডাক দিয়ে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে

বললেন—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী। হে কলিকাতার যুবকবৃন্দ, ওঠো জাগো, কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে। সাহস সংগ্রহ কর—ভীত হইও না।' ওঠ, জাগো, তোমাদের জন্মভূমি তোমাদের নিকট হইতে আজ মহান আত্মবলিদান চাহিতেছেন।

সেই বলিষ্ঠ নির্ভয়ের ডাক বাংলার যুবসমাজের রক্তে রক্তে আলোড়ন তুলেছিল। শুধু বাংলা নয় গোটা ভারতবর্ষের মানুষ এক নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের চেতনায় আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তার প্রমাণ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে।

১৮৬৭ সাল ছিল বাংলার জাতীয় জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য তারিখ। এই বছরে রাজনারায়ণ বসুর পরিচালনায় এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই হিন্দুমেলাতেই স্বাদেশিকতার প্রথম উদ্বোধন। এই বছরেই তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রথম উচ্চারণ করেন—ইংরাজ ভারত ছেড়ে যাক্। তখনই বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু স্পষ্টভাষায় স্বাধীনতার কথা যিনি ঘোষণা করেছিলেন তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ—"এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—স্বাধীনতা না দিলে কোন রূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে।" বিবেকানন্দ যখন সমস্ত ভারত ঘুরে দেশের মানুষকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করছিলেন তখন তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি আরও তীব্র ও জ্বলন্ত ভাষায় প্রকাশ করছিলেন লোকমান্য তিলক তাঁর কেশরী পত্রিকায়। হীনমন্যতার গ্লানি মহারাষ্ট্রের মানুষকে একই ভাবে অভিভূত করেছিল। তারপর ইংরাজ তার রাজশক্তির জোরে যখন অন্যায় ও নির্দয় পীড়ন চাপিয়ে দিল তখন জাতির চিত্ত বিস্ফোরক পদার্থের মত ফুটতে আরম্ভ করলো। ভারতে বিপ্লববাদের প্রথম উদ্বোধন মহারাষ্ট্রে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট নামের দুই ইংরাজ অফিসারের হত্যা দিয়ে। এই দুই অত্যাচারী ইংরাজ অফিসারকে হত্যা করে ১৮৯৮ সালের এপ্রিলে দামোদর চাপেকার এবং ১৮৯৯ সালের মে মাসে বালকৃষ্ণ চাপেকার ও মহাদেব রাণাডে ফাঁসির দড়িতে আত্মবলিদান দিয়ে চাপেকার অমরত্বের গৌরব অর্জন করলেন। আর রাজদ্রোহকর বৈপ্লবিক ভাষণের দায়ে কারাবরণ করতে হল লোকমান্য নেতা বালগঙ্গাধর তিলককে।

সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ ছিলনা বরং কোন কোন ঐতিহাসিক একে সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ দমনে রাজশক্তির পাশবিক নিপীড়ন মানুষের মনে ইংরেজবিদ্বেষের এক সাধারণ উপলব্ধি এনে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার আগে ভারত অগণিত ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এক অখণ্ড জাতীয়তার বোধ মানুষের মনে ছিলনা। কিন্তু ইংরাজ শাসনে সেই খণ্ডবিখণ্ড দেশ এক অখণ্ডতায় নিজেকে বুঝতে চাইলো। মহারাষ্ট্রের শিবাজীকে নিয়ে কলকাতায় যেমন উৎসব সুরু হ'ল, চিতোরের রাণা প্রতাপও তেমনি বাঙ্গালীর মনে বীরের আসন পেলেন।

বস্তুতঃ ইংরেজ বিরোধিতা থেকেই এই অখণ্ডতা বোধের সৃষ্টি। কিন্তু বিপ্লবের উপাদান বাঙ্গালী এবং ভারতবাসীর মনে দানা বেঁধেছে সম্পূর্ণ অন্য পথে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী বিপ্লবের আগুন শুধু ইউরোপে নয় ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের হৃদয়ে তখন এক নবমানবতাবাদ ও বিপ্লবাত্মক কর্ম পদ্ধতির নতুন আলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী যুবকের চোখের সামনে ইতালীর ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর ইতিহাস তুলে ধরলেন। তাঁরই অনুরোধে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী রচনা করলেন। ভগিনী নিবেদিতাও ম্যাটসিনির (Mazzini) অগ্নিময় বাণী ও গ্যারিবল্ডীর দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনীকে প্রচার করতে লাগলেন। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ'র প্রভাবে জাপানী শিল্পী ওকাকুরা এলেন ভারতবর্ষে। তিনি ইংরাজ তথা

ইউরোপের বিরুদ্ধে এক অখণ্ড এশিয়ার আদর্শকে তুলে ধরতে চাইলেন।

বাঙ্গালীর মনে নিজেকে জানবার ও প্রকাশ করবার উদ্যোগ দেখা গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক বা ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ করে দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম এবং বঙ্গবিজেতা ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যায় বাঙ্গালী যেন নিজেকেই নতুন করে খুঁজে পেলো। এই সময় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'বৃত্রসংহার' তার কাছে এক নতুন অর্থ বহন করে আনলো। তার মানসিকতায় শক্তি ধর্মের প্রভাবই সক্রিয় হয়ে উঠলো। 'গীতা'কেও বাঙ্গালী নতুন করে আবিষ্কার করলো।

মারাঠি যুবকদের জাতীয়জীবনে শিবাজীর প্রেরণা এবং রাজপুতজীবনে প্রতাপ সিংহের মত স্বাধীনতাকামী নির্ভীক যোদ্ধার জীবনাদর্শ যেভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছিল; শিখ জনসাধারণের চেতনায় গুরুগোবিন্দ সিং ও তাঁর অনুগামীদের বীরত্বগাথা অনুরূপ প্রেরণায় দ্যুতি ছড়িয়েছিল। বাঙ্গালী যদিও শিবাজী, প্রতাপ সিংহ ও গুরুগোবিন্দকে তার নিজের করে নিয়েছিল তবু এক জাতীয়বীরের সন্ধানে তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই ব্যাকুলতাই শেষ পর্য্যন্ত তাকে প্রতাপাদিত্যের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' ও পরবর্তী কালে প্রতাপাদিত্য নাটক সেই চেষ্টারই ফল।

গীতাকেও বাঙ্গালী নতুন করে আবিষ্কার করলো। গীতার আদর্শকে নতুন দৃষ্টিতে প্রতিভাত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর ভবানী পাঠক ও সত্যানন্দ গীতার ধর্মেই দীক্ষিত। একদিকে কর্তব্যনিষ্ঠা অন্য দিকে ধর্ম, একদিকে দেশপ্রেম অন্যদিকে ব্যক্তিস্বার্থে নিরাসক্তি এই ভাবের সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। তাই গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ ও কর্মসন্ন্যাসযোগ বাঙ্গালীর জীবনে নবচেতনার সৃষ্টি করলো। বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন'কে বাঙ্গালী পরবর্তীকালে কর্মে রূপায়িত করতে চাইলো।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিতে ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বাঙ্গালী চেতনায় এই নবপ্রেরণার প্রভাব। সে তখন দিগন্তে এক রক্ত সূর্যের আবির্ভাব দেখছে। ইংরাজ তার কাছে মহিষাসুর। এই অসুররূপী শত্রুকে বিনাশ করে এক নতুন ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কামনাই তার আদর্শ। এই আদর্শে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর 'ভবানীমন্দির' লিখলেন। এবং 'ভবানীমন্দিরে'র আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার আশ্রয় নিলেন।

এদিকে বৈদান্তিক বিবেকানন্দ তাঁর বৈদ্যুতিক ভাষণের আঘাতে হিন্দুমনের যুগান্তব্যাপী জড়তাকে প্রচণ্ড আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো করে হিন্দু যুবজনকে অগ্রসরশীল ও কর্মময় হ'তে আহ্বান দিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"শরীর গঠন ও দুঃসাহসিক কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়াই তরুণ বাঙ্গলার প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর সাধনা ভগবদ্‌গীতা পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ।"

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল এক সর্বাত্মক জাগরণের (awakening) সূচনা। এই জাগ্রত চেতনার আলোক বাংলা থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল একথা বললে ভুল বলা হ'বে না। সেদিন বাঙালীর মনে এই জাগ্রত জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে এসে মিশেছিল প্রখর আত্মমর্য্যাদার চেতনা তার; দেশ প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভক্তি, এবং স্বাদেশিকতার প্রেরণা নির্ভর করেছিল গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের ওপরে। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান এই সর্বাত্মক জাগরণের একটি বিশিষ্ট দিক হিসাবেই গণ্য হবে।

দেশের যুব চরিত্রের দেশাত্মবোধ ও মাতৃভক্তির এবং দেশকে মাতৃরূপে কল্পনার চেতনা দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতবর্ষের নব জাগরণের ধারাকে স্বীকার করে নিয়ে এবং তার অসহিষ্ণু-চিত্তচাঞ্চল্যকে সংহত করবার চেষ্টাতেই ১৮৮৫ সালে হিউম সাহেব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বের 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ নামের

এক একুশ বছর বয়সের যুবক বরোদা থেকে প্রবন্ধ লিখলেন যে এই কংগ্রেস আর যাই হোক জাতীয় নয়, এবং জনমানসের প্রতিভূও নয়। অরবিন্দ ঘোষ পরিকল্পনা করলেন ভবানী মন্দিরের। এই পরিকল্পনায় যোগসাধনা ও দেশোদ্ধারকে একত্রে সমন্বিত করার চেষ্টা করা হ'য়েছিল। বিবেকানন্দ, যিনি ভারতের বিপ্লব চেতনার স্রষ্টা, তিনিও ধর্মকে দেশের সঙ্গে যুক্ত করে বিপ্লবকে ধর্ম সাধনার অঙ্গরূপেই প্রতিভাত করেছিলেন। বিবেকানন্দর মৃত্যুর পর ভগিনী নিবেদিতা তাঁর এই কর্মভার নিজের বলিষ্ঠ হাতে তুলে নেন।

এই সময়ে বাংলাদেশের আরও কিছু লোকের মনে বিপ্লববাদের প্রেরণা জেগে উঠছিল। ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র (পি মিত্র) ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) দু জনেই ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। পি মিত্র যখন দেশের যুবশক্তিকে ক্লাব, লাইব্রেরী ইত্যাদির মাধ্যমে সংগঠিত করবার চেষ্টা করছিলেন, তখন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদায় গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে অরবিন্দর এই যোগাযোগ বাংলা-দেশের বিপ্লব আন্দোলন সৃষ্টির মূলে একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা।

অরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ দুজনেই সশস্ত্র বিপ্লবের পথে বিশ্বাসী ছিলেন। অরবিন্দর ধারণা আরও সুস্পষ্ট ও পরিণত ছিল। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য যে থাকতে পারে না এ'কথা তিনিই প্রথম বলেছিলেন। অরবিন্দর লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর এই চিন্তাধারা এতই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল যে 'ইন্দু প্রকাশে' তাঁর প্রবন্ধ বন্ধ করবার নির্দেশ আসে। এই সময়ে বোম্বেতে তিলকের কেশরীও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নি বর্ষণ করে চলেছে। পুনা থেকে প্রকাশিত পরাঞ্জপের 'কাল' পত্রিকায় প্রকাশ্যভাবেই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের কাজের প্রশস্তি রচনা করা হয়।

১৯০২ সালে অরবিন্দর নির্দেশে বারীন্দ্র কলকাতায় আসেন। ঠিক একই সময়ে যতীন্দ্রনাথও কলকাতায় আসেন গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার জন্যে। পি মিত্রর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রের যোগাযোগ ঘটে। আত্মোন্নতি সমিতি ও অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে যুবকদের লাঠি খেলা ও শরীর চর্চার শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। নিবেদিতাও তখন পুরোপুরি সক্রিয়। বিপ্লবাত্মক রচনাদি প্রচারের ভার তিনিই নিয়েছিলেন। অরবিন্দ, বারীন্দ্র ও পি মিত্র নিবেদিতার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

এই সময় আরও একজন বিপ্লববাদী কর্মীর আবির্ভাব ঘটে, তাঁর নাম ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব ব্রিটিশের সঙ্গে কোনরকম আপোষেরই পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ শাসনকে আক্রমন করেছেন। এবং ১৯০৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সে যুগের চরম পন্থার প্রবর্তক। পরবর্তীকালে বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ প্রবর্তিত বন্দেমাতরম্‌ও প্রকাশ্যে বিপ্লববাদকে প্রচার করতে থাকে। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর পরিচালনায় 'যুগান্তর' আর একটি পত্রিকা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে সুদূর প্যারিসে বসে পার্শী মহিলা মাদাম কামাও তাঁর ইংরাজী বন্দেমাতরম্ ও সোর্ড বা তলওয়ার পত্রিকায় যেভাবে ইংরাজকে হত্যা করে শাসন ক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টার কথা বলেছেন,—তাঁর তুলনাও বিরল। মাদাম কামা প্যারীতে বসে রক্তাক্ত বিপ্লবের পথকে আহ্বান জানিয়েছেন। ১৯০৭/৮ সালে বাংলাদেশে ও ১৯০৮ সালে লণ্ডনে যে বিপ্লবাত্মক ঘটনাগুলি ঘটে—তার উৎস সন্ধানে যেতে হলে 'যুগান্তর' 'বন্দেমাতরম' এবং অরবিন্দর নাম যেমন মনে করতে হয় তেমনি স্মরণ করতে হয় শ্যামাজীকৃষ্ণ বর্মা ও মাদাম কামাকে।

কাজেই শুধু বাংলাদেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরেও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও এই যে সশস্ত্র বিপ্লবের সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল এর কারণ প্রথমতঃ নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ, দ্বিতীয়তঃ

ইতিহাস চেতনা এবং ইতালী ও আয়ার্ল্যাণ্ড্‌এর উদাহরণ, তৃতীয়তঃ বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তিলক ও কামার মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব।

অভাব ছিল শুধু সংহত প্রয়াসের। সে সুযোগ এনে দিল লর্ড কর্জনের বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব। ১৯০৫ সালে এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হ'লে বাংলাদেশ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। কবি রবীন্দ্রনাথের মত লোকও রাস্তায় নেমে এসে শোভাযাত্রার পুরোভাগে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম গাইলেন সেই গান—বন্দেমাতরম। তারপর তাঁর কণ্ঠ থেকে একে একে আরও অনেকগুলি জাতীয়তার উদ্বোধক সঙ্গীত শোনা গেল। বাঙালী সেদিনই দেখবার সুযোগ পেল, যে সে একা নয়; তার পেছনে সমস্ত ভারতবর্ষের সমর্থন।

সেদিন বিপ্লবী বাংলার যুবকবৃন্দ একটি মন্ত্র খুঁজে পেল, যে মন্ত্র তাদের দেশকে ভালবাসতে এবং দেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রেরণা দিল। সে মন্ত্র হ'ল দুটি মাত্র শব্দে গঠিত—বন্দেমাতরম। ১৯০৬ সালে বিপিনচন্দ্র পালের ইংরাজী 'বন্দেমাতরম' দৈনিক পত্রিকা এবং প্যারী থেকে প্রকাশিত মাদাম কামার 'বন্দেমাতরম' সাপ্তাহিক পত্রিকা একই সুরে বিপ্লববাদের আহ্বান জানালো।

ইংরাজ দুর্বল নয়, সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদও সে শিথিল হাতে গড়েনি, এ কথা বিপ্লববাদী যুবকেরা জানতো। তারা আরও বুঝেছিল যে নরমপন্থীদের আবেদনে বিগলিত হয়ে ইংরাজ কোনদিন স্বেচ্ছায় ভারতকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে না। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রচণ্ড আঘাতে তাকে দুর্বল করে দিতে হবে। কিন্তু আঘাত যারা দেবে তাদের শক্তি সামান্য। তাদের হাতে অস্ত্র নেই, সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ নেই। ইংরাজের ও তার সাম্রাজ্য বাদী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত প্রবল সামরিক বল নেই।

আছে শুধু নৈতিক বল, আছে আদর্শবাদ ও আত্মদানের চেতনা। তারই ওপর নির্ভর করে বিপ্লবী দল অগ্রসর হ'ল। কিন্তু আত্মদানের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি করে আঘাত হানার প্রয়োজনও তারা উপলব্ধি করলো।

অস্ত্র চাই-ই—একথা উপলব্ধি করলেন যেমন অরবিন্দ ও যুগান্তর দল, তেমনই মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক সংগঠন এবং কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকর এর দল। কিন্তু কি অস্ত্র? রাইফেল পাওয়া যেমন দুঃসাধ্য, লুকিয়ে রাখাও প্রয়োজনে ব্যবহার করা তার চেয়েও বেশী শক্ত। সুবিধাজনক অস্ত্র হল পিস্তল ও রিভলভার। কিন্তু রিভলভার সংগ্রহ করাও কম শক্ত নয়, আর একটি রিভলভার এ'র জন্য যে টাকা দিতে হয়, তার পরিমাণও কম নয়।

রিভলভার রাখতেই হবে। অত্যাচারী ইংরাজ পুলিশকে হত্যার জন্ত এ'র চেয়ে সফল অস্ত্র আর নেই। কিন্তু বিপ্লববাদীরা প্রয়োজন অনুভব করলো আর একটি অস্ত্রের—সেটি হল বোমা। একটি বোমার দ্বারা অনেক লোককে ভয় দেখানো যায়। বোমা তৈরী করাও খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়।

বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত কি করে বোমা তৈরী করে দলের সকলকে দেওয়া যায় সে চিন্তায় মগ্ন হলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁর বিবৃতিতে বারীন্দ্র বলেন—"...স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বাংলায় ফিরে এলাম। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। ছেলেদের ও ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির পাঠও দেওয়া হ'ত। ....১৯০৭ সালের গোড়ার দিকে ১৪/১৫ জন যুবককে পেলাম যাদেরকে আমি একসঙ্গে ধর্মপুস্তক ও রাজনীতি পড়াতে লাগলাম। আমরা সব সময় এক বিপ্লবের কথা চিন্তা করতাম এবং প্রস্তুতি হিসেবে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলাম। এর মধ্যে আমি এগারোটি রিভলভার, চারটে রাইফেল ও একটি বন্দুক সংগ্রহ করেছি। যে সব যুবক আমাদের দলে ভর্তি হ'তে এল, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল উল্লাসকর দত্ত। উল্লাসকর জানালো,

যে আমাদের কাজে লাগবে বলে সে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীর কাজ শিখে এসেছে। তাদের বাড়ীতে তার একটি ছোট্ট গোপন ল্যাবরেটরি আছে, সেখানেই সে পরীক্ষা করে দেখেছে। এই উল্লাসকরের সাহায্যে আমরা ৩২ নম্বর মুরারী পুকুর রোডের বাগান বাড়ীতে অল্প অল্প বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করার কাজ আরম্ভ করলাম। ইতিমধ্যে আমাদের আর একজন বন্ধু— হেমচন্দ্র দাস তার কিছু সম্পত্তি বিক্রী করে বোমা তৈরী শিখতে প্যারিসে গেল। প্যারিস থেকে ফিরে সেও উল্লাসকরের সঙ্গে বোমা তৈরী শুরু করলো।"১

বিপ্লবীদের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে বোমার ব্যবহার শুধু বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও প্রাধান্য পেয়েছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দেই রাশিয়া আমেরিকা ও ইউরোপে বিপ্লবীদের হাতে বোমার ব্যবহার দেখা গেছে। ১৯০৬ সালে Wando Dobrodzika নামের এক রাশিয়ান তরুণী ওয়ারশ'র শাসনকর্তা জেনারেল স্কালনকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা ছুঁড়েছিলেন বলে জানা যায়। পরের বছরে (১৯০৭ সালে) মস্কোর এক বালিকা বিদ্যালয়ে একটি বিরাট আকৃতির বোমা পাওয়া যায়। রাশিয়ান নারী সেলিথ সিলভারষ্টিন একটি পুলিশদলের ওপরে বোমা ছুঁড়তে গিয়ে তাঁর ডান বাহুটি হারান।

১৯০৭ সালেই বাংলাদেশের তরুণ বিপ্লবীরাও বোমা তৈরীর ওপর জোর দেন। বারীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে উল্লাসকর দত্ত'র তৈরী বোমার কার্যশক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেওঘরের দিঘারিয়া পাহাড়ে তরুণ বিপ্লবী প্রফুল্ল চক্রবর্তী বোমার বিস্ফোরণে নিহত হলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম শহীদ এই প্রফুল্ল চক্রবর্তী আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী দলের নির্দেশে অত্যাচারী সরকারী কর্মচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে বোমা ফেললেন মিসেস ও মিস কেনেডির গাড়ীর ওপরে।

প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ে নিজের রিভলভারে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু ক্ষুদিরামকে ধরা দিতে হল। ষোল বছরের যুবক ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল ১১ই আগষ্ট তারিখে মজঃফরপুরে। । ব্রিটিশ সরকার ভেবেছিল চরম দণ্ড দিয়ে তারা বিপ্লবীদের মনোবল ভেঙ্গে দেবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। বিপ্লবীরা গুপ্তচর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুলি করে মারলো। সারা ভারতবর্ষের মানুষ বেদনায় ও উত্তেজনায় উত্তাল হয়ে উঠলো। ২২শে জুন তারিখের কেশরী পত্রিকায় মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক লিখলেন—

From the murder of Mr. Rand on the night of the Jubilee in 1897 till the explosion of the bomb at Muzaffarpore, no act worth naming and fixing closely the attention of the official class took place at the hands of the subjects. There is considerable difference between the murders of 1897 and the bomb outrage of Bengal. Considering the matter from the point of view of daring and skilled execution, the Chapekar brothers take a higher rank than members of the bomb party in Bengal. Considering the ends and the means the Bangalis must be given the greater commendation. Neither the Chapekars nor the Bengali bomb throwers committed murders for retaliating the oppression practised upon themselves; hatred between individuals or private quarrels or disputes were not the cause of these murders. These murders have assumed a different aspect from ordinary murders owing to the supposition on the part of the perpetrators that they were doing a sort of benificent act. Even though the causes inspiring the commission of these murders be out of the common, the causes of the Bengali bomb are particulaaly subtle.........The Bengali bombs had of course

their eyes upon a more extensive plain brought into view by the partition of Bengal."

এর পরের অনুচ্ছেদে বোমার ব্যবহারকে সমর্থন জানিয়ে তিলক লিখলেন—"পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই নতুন নতুন বন্দুক রাইফেল ও পিস্তল সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই আবিষ্কার করেছে বোমা। কোন দেশের সামরিক শক্তি কখনও বোমার দ্বারা ধ্বংস করা যায় না, বোমার এত শক্তি নেই যা দিয়ে সামরিক বাহিনীর শক্তিকে পঙ্গু করা যায়। কিন্তু সামরিক শক্তি যখন আপন দম্ভে প্রবল হয়ে ওঠে, তখন তার সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি ফেরবার জন্যে বোমার ব্যবহার অপরিহার্য।"

পুণা থেকে প্রকাশিত "কাল" পত্রিকাতে পরাঞ্জপে লিখলেন—মানুষ এখন আর ব্রিটিশ শাসনের গৌরব কীর্তনে মুগ্ধ নয়, তারা স্বরাজ অর্জনের জন্য যে কোন পথে যেতে প্রস্তুত। ব্রিটিশ শক্তির ভয়ে তারা আর ভীত নয়।......বোমা নিক্ষেপ করা সঙ্গত কি অসঙ্গত সে কথার আগে বোঝা দরকার যে ভারতের মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে এ কাজ করছে না, তারা স্বরাজ্য অর্জনের জন্যই করছে।"২

একদিকে অন্ন সংগ্রহের প্রচেষ্টা অন্যদিকে অর্থ সংগ্রহের চিন্তা একই সঙ্গে বিপ্লবীদলের নেতৃবৃন্দকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। বৈপ্লবিক সংগঠন ও পরিচালনার জন্য অনেক অনেক টাকার দরকার। দেশের স্বাধীনতা—অর্জনের জন্যে যেভাবেই হোক টাকা পেতেই হবে। প্রয়োজন হ'লে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিতেও দোষ নেই। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে এক গুপ্ত সভায় অরবিন্দ ঘোষও ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টাকে সমর্থন করলেন। সমর্থকদের মধ্যে পুলিন বিহারী দাসও ছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র।৩

১৯০৬-৮ সালে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক কর্মধারার একটি ধারাবাহিক বিবৃতি দেওয়া হ'ল।

১৯০৬ আগষ্ট—		রংপুর জেলার মহিপুর গ্রামে ডাকাতির চেষ্টা।
,,	সেপ্টেম্বর—	ঢাকার শেখরনগরে ,, ,,
১৯০৭	,,	নেতাগঞ্জে ডাকাতি করে ৮০ টাকা লুট
,,	,,	আরগুলিয়াতে ডাকাতি।
,,	এপ্রিল	ময়মনসিংএর জামালপুরে দাঙ্গা
,,	আগষ্ট	বাঁকুড়ার হাসডাঙাতে ডাকাতি
,,	অক্টোবরে	চন্দননগরে ট্রেন লাইন চ্যুত করার চেষ্টা
,,	ডিসেম্বরে	মেদিনীপুরের নারায়ন গড়ে ,, ,,
,,	,,	ফরিদপুর গোয়ালন্দতে অ্যালেন হত্যার চেষ্টা।

১৯০৮ সালেও ৯টী ডাকাতির ঘটনা, পাঁচটি বোমা ছোড়ার ঘটনা ও এগারোটি হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস সিডিসন কমিটির রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে আলিপুর জেলে এ্যাপ্রুভার নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা। এই ঘটনায় জড়িত কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসিতে সমস্ত বাংলাদেশের মানুষ উত্তাল হ'য়ে উঠেছিল। কানাই ও সত্যেন হাসিমুখে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে নিজেদের হাতেই ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে নেন।

১৯০৮ সালে পরপর কয়েকটি ঘটনার পরে সমস্ত বাংলা জুড়ে দেখা দিল পুলিশী তাণ্ডব। মাণিকতলার বাগানে—৩২ নং মুরারী পুকুর রোড—হঠাৎ তল্লাসী করে পুলিশ বোমা তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করলো। সঙ্গে

সঙ্গে ধরা পড়ে গেলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আটত্রিশজন বিপ্লবী।৪ একবছর ধরে আলিপুর কোর্টে মামলা চললো; আসামী পক্ষ সমর্থন করলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জোরে অরবিন্দ বারীন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত মুক্তি পেলেও পুলিশ তাঁদের সংগঠন ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। বাংলাদেশে অরবিন্দ বারীন্দ্রের বৈপ্লবিক সমিতি অনুশীলন পার্টি যুগান্তর উত্তরবঙ্গ পার্টি ইত্যাদি নানা অংশে বিভক্ত হয়ে গেল।

প্রথম পর্য্যায়ের এখানেই সমাপ্তি। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সুরু ১৯০৮-৯ সাল থেকে। ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত এই অধ্যায়ের বিস্তৃতি। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সংগঠনে দৃঢ়তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার যোগ ঘটলো। বিপ্লবীরা আন্দোলনকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। বিপ্লবীরা চাইলেন বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা করলেন, প্যারীতে মাদাম কামা 'বন্দেমাতরম' সাপ্তাহিক ও পরে সোর্ড (তলওয়ার) পত্রিকায় ইংরাজ বিরোধী প্রচার সুরু করলেন। উত্তর আমেরিকায় ইতিপূর্বেই হরদয়াল বিপ্লবী সংস্থা গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছেন। জার্মানীর বার্লিনে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স কমিটির সৃষ্টি করলেন ডাক্তার চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী।

জার্মানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা এই যুগের বিপ্লবীদলের অন্যতম কাজ। তাঁরা চেয়েছিলেন জার্মানী থেকে অস্ত্র এনে ভারতে ইংরাজের সঙ্গে তাঁরা লড়াই করবেন। ইতিমধ্যে গুপ্তচর ও বিশ্বাসঘাতকদের মৃত্যু দণ্ড দিতে, অত্যাচারী ইংরাজও সরকারীদের হত্যা করতেও তাঁরা দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। কিন্তু শুধু হত্যাই নয়, প্রতিবাদে নিজের জীবনকে নির্ভয়ে দেশের জন্যে ডালি দেওয়াও তাঁদের সাধনা ছিল।

এই পর্য্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল ইন্‌স্টিটিউটের এক গ্যালারিতে স্যর উলিয়াম কর্জন ওয়াইলিকে হত্যা। শ্রীসভারকরের নেতৃত্বে মদনলাল ধিংরা ওয়াইলি সায়েবকে গুলি করে মারলেন ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে। ডিসেম্বর মাসে গুলি খেলেন নাসিকের জেলা শাসক জ্যাকসন, আর ১৯১০ এর জানুয়ারীতে কলকাতা হাইকোর্টের সীমানার মধ্যে গুপ্তচর বিভাগের শ্যামসুল হুদা গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন।

এই তিনটি ঘটনাতেই হত্যাকারীরা ধরা পড়েছিলেন। বস্তুত: তাঁরা ধরা পড়বেন এবং চরম দণ্ডে দণ্ডিত হবেন জেনেই এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হ'য়ে ছিলেন। বিপ্লবী মদনলাল ইংলণ্ডের পেন্টোনভিল কারাগারে, অনন্তলক্ষণ কানহারে, কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও বি এন দেশপাণ্ডে মহারাষ্ট্রের থানা জেলে এবং বীরেন দত্তগুপ্ত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিতে ঝুললেন।

কিন্তু চরম দণ্ড দিয়ে বিপ্লবকে রোধ করার সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল। তাছাড়া এই বিপ্লবের পথে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, যাঁদেরকে ইংরাজ সন্ত্রাসবাদী (Terrorist) বলে বর্ণনা করেছিল, তাঁরা একটি পরিপূর্ণ আদর্শকে সামনে রেখেই এগিয়ে এসেছিলেন। দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁদের কামনা। তাঁরা জানতেন এর জন্য প্রয়োজন বহু রক্তপাতের, তাঁরা প্রস্তুত হয়েছিলেন দেশ মাতৃকার চরণে নিজেদের বলিদান দিতে। বরং সেদিন তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হ'য়েছিল, কে আগে প্রাণ দিতে পারবে তাই নিয়ে। কবির সেই বাণীকে তাঁরা কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন—
"মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

তাই পরবর্তী যুগে আমরা দেখি রাসবিহারি বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যালের মত দক্ষ সংগঠককে, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মত নির্ভীক নায়ককে, গোপীনাথ সাহা, আসফকউল্লা, ভগৎ সিং এর মত আত্মাহুতির অভিযাত্রীকে এবং যতীন্দ্রনাথ দাসের মত স্বেচ্ছামৃত্যুর অমর শহীদকে।

আরও অনেক ঘটনা......অনেক উদার শিক্ষিত প্রাণের নিঃশব্দ আত্ম বিসর্জন। ইংরাজ যাদের হত্যাকারী, সন্ত্রাসবাদী নাম দিয়েছে, দেশবাসীও যাদের সম্মান দিতে এগিয়ে আসেন নি। অনেক নির্ভয় জীবনের উজ্জ্বল আত্মদান, যাঁরা আজও অপরিচিত অবহেলিত ও অবজ্ঞাত।

১৯১২ সালের একটি ঘটনা। দিল্লীতে রাজকীয় শোভাযাত্রায় ছিলেন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ। অকস্মাৎ একটি বাড়ীর ছাদ থেকে একটি মহিলার হাত থেকে বোমা নেমে এল। বজ্রের মত বিস্ফোরিত হ'য়ে আহত করলো হার্ডিঞ্জকে। যিনি বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন তিনি আসলে নারী নন, নারী ছদ্মবেশে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। পরে ধরা পড়ে ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর পরের ঘটনা ১৯১৪ সালে। কলকাতায় বন্দুক ব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল ও প্রচুর পরিমাণে(৫) কার্টিজ ভর্তি কয়েকটি বাক্স বিপ্লবীরা লুট করে নিলো।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটলো যার ফলে সাম্রাজ্য লিপ্সু ব্রিটিশ-শাসনের নির্লজ্জ বর্বরতা সকলের সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেল। পাঁচশোর ওপর শিখ যাত্রী নিয়ে 'কোমাগাটামারু' নামের একটি জাহাজ বজবজে এসে পৌঁছলো ১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে। গুরুজিৎ সিং নামের এক ঠিকাদারের অধীনে ভাগ্যান্বেষণে এই শিখের দল কানাডার অভিমুখে রওনা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে স্থান না পাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে তারা কলকাতার উপকণ্ঠে বজবজে এসে পৌঁছলো। হঠাৎ পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে তাদের প্রতিরোধ করলেন। তারপর সেই পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত বাধ্‌লো। যার পরিণতিতে সেই প্রায় নিরস্ত্র শিখ যাত্রীদের ওপরে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাল। পুলিশের গুলিতে সেদিন অন্ততঃ আঠারো জন প্রাণ হারালো; আহত ও বন্দী হ'ল অজস্র লোক।

'কোমাগাটামারু'র এই ঘটনা শুধু পাঞ্জাবে নয়, সমস্ত দেশের বুকেই ক্ষোভ ও বেদনার সৃষ্টি করলো।

১৯১৪ তে মহাযুদ্ধের সূচনা দেখা দিল। ব্রিটিশ একদিকে যেমন সতর্ক হয়ে উঠলো অন্যদিকে তেমনি তৎপর হয়ে উঠলো বিপ্লবীরা। সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্যে চেষ্টা চললো। এই অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় নায়করূপে সামনে রইলেন রাসবিহারী বসু ও বিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলে। দেশীয় সৈন্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করা হ'ল। পরিকল্পনার প্রধান কেন্দ্র লাহোর থেকে রাসবিহারী বসু ও পিঙ্গলে কর্ম পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতায় রইলেন কর্তার সিং সরোবা, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ও আরও অনেকে। উদ্বিগ্নমুখে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলেন ২১শে ফেব্রুয়ারীর জন্যে।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের মুখে সমস্ত খবর পেয়ে গেল ভারতসরকার। নষ্ট হয়ে গেল সকল উদ্যোগ আয়োজন। পুলিশের হাতে রাসবিহারী বসু ছাড়া বাকি সকলে ধরা পড়া গেলেন। রাসবিহারী বসু চলে গেলেন জাপানে। কিন্তু ফাঁসি হ'য়ে গেল পিঙ্গলে, সরোবা ও অন্য পাঁচজনের।

কিন্তু তবুও দমে যায় নি বিপ্লবীরা। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আবার তারা দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। জার্মানের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্ত্র আনবার ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল। আবার বিশ্বাসঘাতকের আবির্ভাব। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলনের অগ্রগতি বারবার শুধু বিশ্বাসঘাকতার ফলেই থমকে থেকেছে। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উড়িষ্যার বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী তাঁর চারজন সঙ্গীর সঙ্গে যখন অপেক্ষা করছেন, তখন পুলিশ তাঁর খোঁজ পেয়ে গেল।

যতীন মুখার্জী তাঁর চারজন সঙ্গীকে নিয়ে সেদিন সশস্ত্র পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে

মুখোমুখী লড়াই করে নিহত হলেন। তাঁর অদ্ভুত বীরত্ব ও নৈপুণ্যে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টও মুগ্ধ হয়ে গিয়ে তাঁকে বীরের সম্মানই দিয়েছিলেন।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারতের গান্ধী ব্রিটিশকে পূর্ণ সহায়তা দিয়েছেন। বিপ্লবী ভারতের রক্তদান বিফল হ'য়ে গিয়েছে। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ধারার দ্বিতীয় পর্য্যায়েরও সমাপ্তি ঘটেছে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যে সব আশাবাদী নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের সহৃদয়তায় বিশ্বাস করে সহযোগিতা করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস ও আশাভঙ্গের বেদনা ভোগ করতে হ'য়েছে। ইংরাজ সরকার যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষে থাকার ফলস্বরূপ ভারতের মানুষকে পেতে হয়েছে প্রচণ্ড নির্যাতন। ১৯১৭ সালের রাউলাট এ্যাক্ট ও ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের সাধারণ মানুষের মোহ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে গিয়েছে। তারা দেখেছে, সাম্রাজ্যবাদের রূপ চিরদিনই ক্রূড় ও পাশব। তারা জেনেছে, স্বাধীনতা সহজলভ্য নয়। তার জন্যে আরও অনেক বড় ত্যাগের, অনেক রক্তদানের প্রয়োজন আছে।

১। সিডিসন কমিটির রিপোর্ট

২। সিডিসন কমিটির রিপোর্ট থেকে পাওয়া।

৩। বাংলায় বিপ্লববাদ : পৃ: ৯৩ (নলিনীকিশোর গুহ)

৪। সিডিসন কমিটি রিপোর্টে বলা হয়েছে ৩৪ জন।

৫। অনুমানিক ৪৬০০০
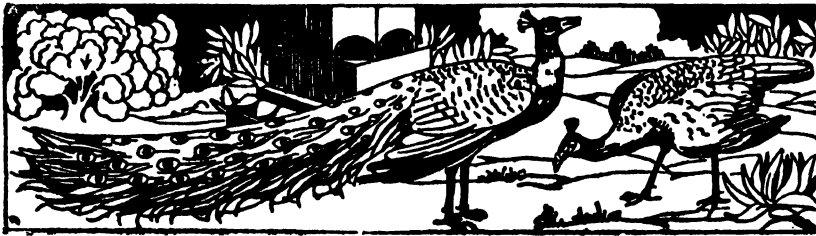
আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইংল্যাণ্ডের গৃহিনীরা ভারতবর্ষের গৃহিনীদের অপেক্ষা অনেক গুণ বেশি দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডের স্বামী টাকা উপার্জন করে এবং ভারি কাজ গুলি করে। ছোটখাটো শত রকমের কাজের ভার গ্রহণ করে স্ত্রী। স্ত্রীই গৃহের সব কিছু পরিচালনা করে, পারিবারিক সম্পত্তি দেখাশোনা করে, হিসাব রাখে, রান্না করে, ঘর পরিষ্কার করে, জামার বোতাম ঢিলা হইলে তাহা নতুন করিয়া আঁটিয়া দেয়, নিজের এবং ছেলেদের অন্তর্বাস শেলাই ও রিপু করে, ধোলাইয়ের কাজ করে, পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কেহ অসুস্থ হইলে তাহার শুশ্রূষা করে। পল্লী অঞ্চলের স্ত্রী-মাঠের কাজেও স্বামীকে সাহায্য করে। আর ভ্রমণের সময় স্ত্রী স্বামীর পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠে, ভারতীয় স্ত্রীর ন্যায় অসহ্য রকমের বোঝা হইয়া উঠে না। ট্রাঙ্কের ভিতর যত্ন করিয়া এত জিনিস গুছাইয়া রাখে যাহা তাহার স্বামীর পক্ষে সাধ্য নহে। টিকিট সহজে কিনিয়া আনিতে পারে। এবং সমস্ত ভ্রমণ কালে অল্প ব্যয়ে বেশ চালাইয়া লইতে পারে। এটি সম্ভব এই জন্য যে, ইউরোপে সভ্য মানুষের বাস, এখানে প্রত্যেকটি পুরুষের মনে এ শিক্ষা গ্রথিত আছে যে তাহাকে স্ত্রী লোকের সুখসুবিধা এবং আরাম বিধানের জন্য নিজের অনেকখানি সুখসুবিধা ও আরাম বিসর্জন দিতে হইবে। মোটকথা, স্ত্রী সেখানে আক্ষরিক অর্থে তাহার স্বামীর সহকর্মিণী। পুরুষ নিজের সম্পর্কে অনেকখানি অসতর্ক এবং জীবনের ছোটখাটো বহু বিষয়ে সে উদাসীন। স্ত্রী তাহার এই ত্রুটি পূরণ করিয়া থাকে, স্ত্রীই স্বামীর দেখাশোনার ভার লয় স্বামী স্ত্রীর নহে। অফিস হইতে ফিরিবার সময় হইলে যুবতী স্ত্রীর মুখে যে আগ্রহসূচক ভঙ্গি জাগে তাহা দেখিবার মত। অনেক সময়েই স্বামীকে অভ্যর্থনা করিতে পথে ছুটিয়া যায়।

বড় ঘরের মহিলারা অবশ্য কাজ করে না, স্বামীর কাজেও তাহারা বিশেষ লাগে না। কাজের সমস্ত ভার তাহারা ভৃত্যের উপর ছাড়িয়া দেয়, তাহারা সুদৃশ্য পোশাক পরে, বন্ধু যাহারা দেখা করিতে আসে, পাল্টা তাহাদের বাড়িতে দেখা করিতে যায়, নভেল পড়ে, পিয়ানো বাজায়, গান গায়, গীর্জায় যায়, থিয়েটারে যায়, এবং কখনও দান-ধ্যানের কাজেও লিপ্ত হয়। পোশাকে বছরে তাহারা কত টাকাই না ব্যয় করে! এবং ইউরোপের নরনারীর উপরে ফ্যাশানের প্রভাব প্রায় অত্যাচারের সীমায় পৌঁছিয়াছে।

ফ্যাশান প্রসঙ্গ আমাকে অনেক সময় ভাবাইয়া তোলে। সকল যুগে, সকল দেশের মানুষ ক্রীতদাস হইয়াই জন্মায়। আমার মনে হয় হারবার্ট স্পেনসার বা ঐ জাতীয় কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি একখানা বড় বই লিখুন, তাহাতে বর্ণনা করুন কেমন করিয়া আদি যুগ হইতে, যখন তাহার জীবন সরল ছিল, তখন আমাদের প্রধান কাজ ছিল, আমাদের নিজেদের হাতে পায়ে পরাইবার জন্য শৃঙ্খল প্রস্তুত করা। কেমন করিয়া এক এক সময়ে মানুষ এই সব শৃঙ্খলে আরও একটু উন্নত কৌশল যোগ করিয়া খ্যাত হইয়াছে এবং কেমন করিয়া মানুষ ঘন ঘন পুরাতন শৃঙ্খল ভাঙিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দের সঙ্গে নূতন ফ্যাশানের শৃঙ্খল পরিয়াছে।

এই সবের ইতিহাস তাঁহারা লিখুন। অবিরাম মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতে না হইলে মানুষের, জীবনের কি চেহারা হইত? অতএব পুরাতন ঐতিহ্য, নবতম ফ্যাশান এবং আচরিত প্রথাসমূহ ব্রিটিশ সিংহকে যেমন, ভারত হস্তীকেও তেমন অধীন করিয়া রাখে। একথা সত্য যে, পাশ্চাত্ত্য জগৎ একটি বড় রকমের সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইবে জানি না। এ জাতীয় পরিবর্তনের পরে আবার আর এক প্রস্থ সুগঠিত নূতন শৃঙ্খল দেখা দেয়, টাটকা অবস্থায় সুন্দর দেখায় এবং তাহা পরবর্তী যুগকে শৃঙ্খলিত রাখিবার পক্ষে বেশ উপযুক্তই হয়। আমি আমাদের সমাজের অদ্ভুত সব রীতিনীতির ঘোর বিরোধিতা করি বলিয়া একথা কেহ মনে করিবেন না যে, আমি আমাদের দেশের সামাজিক শৃঙ্খলের পরিবর্তে ইউরোপীয় সামাজিক শৃঙ্খল পরিবার জন্য ওকালতি করিতেছি। আমি শুধু আমার দেশবাসীকে বলি তাঁহারা হয় থামিয়া থাকুন, আর না হয়, ঠিক পথে সংস্কার সাধন আরম্ভ করুন। জমিতে শস্যও হয়, আগাছাও হয়। আগাছা উৎপাটন করা উচিৎ নহে কি? সময়টা সেইরূপ একটি ক্ষেত্রে যেখানে মানুষ কল্যাণের শস্য ফলাইয়া থাকে। আগাছাকে সেই ক্ষেত্র হইতে সমস্ত পুষ্টি টানিয়া লইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে আসল শস্যটিই শুকাইয়া মরে। ইউরোপকে যে শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে তাহাকে আমি প্রশংসা করিতে বলি নাই। আমি প্রশংসা করিতে বলিয়াছি তাহারা যে পক্ষ বিস্তার করিয়া উপরে উঠিতেছে তাহাকে।

ইংরেজরা যাহাকে ফ্যাশান বলে তাহাকে তাহারা যেভাবে অনুসরণ করে তাহা কৌতুককর। কোনও খ্যাত ব্যক্তি প্রথমে এক ধরণের কলার কিংবা কোট পরিলেন, তৎক্ষণাৎ দেখা যাইবে অন্যরাও ঠিক সেইরূপ কলার ও কোট পরিতেছে। অনেক দরজি আমাকে বলিয়াছে তাহাদের ব্যবসায় খুব নিরাপত্তা নাই। "এখানে এই যে ষ্টক দেখিতেছেন, এগুলি বর্তমান ফ্যাশান অনুযায়ী প্রস্তুত। কিন্তু পর বৎসর এই ফ্যাশান হয় ত অচল হইয়া যাইবে; তখন এগুলিকে অর্ধমূল্যে বিক্রয় ভিন্ন আমাদের আর উপায় থাকিবে না অথবা আমরা, এগুলিকে ভবিষ্যতে কোনও দিন আবার এই ফ্যাশান চলিত হইবে আশায় তুলিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু সে আশা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যাহাদের বেশি মূলধন আছে তাহাদের সঙ্গে সেইজন্য সমান তালে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। যত চাহিদা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি তাহারা প্রস্তুত করে, এবং তাহা মূল্যবানও বটে। উদ্‌বৃত্ত দিয়া তাহারা কি করিবে? দয়া করিয়া প্যারিস সেগুলিকে গ্রহণ করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিয়ত পরিবর্তনশীলতার জন্য কুখ্যাতি আছে কিন্তু পোষাকের ফ্যাশান তেমন নহে। এক একটি পোষাক ৫০ হইতে ১০০ গিনি মূল্যে কিনিয়া এক মরশুম ব্যবহার করিয়া ফ্যাশান বদল হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে যত যে পোষাকের ও টাকার মায়া ছাড়িতে হয়! চাঁদের কলা বদলের মত একমাত্র ধনী মহিলারাই দিনে দিনে ফ্যাশান বদল করিতে পারে। দরিদ্রদের বেলায় কি হইবে? হিন্দু নারী কেউঞ্ঝর পাহাড় অঞ্চলের জোয়াং নারীর মত পাতার পোষাক পরা যেমন কল্পনা করিতে পারে না, তেমনি ইংল্যাণ্ডের নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত নারীও ফ্যাশান-বহির্ভূত পোষাক পরিয়া কোনও ড্রইং রুমে যাওয়া কল্পনা করিতে পারে না। লোভী দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করা, এবং আজীবন ১০০০ পাউণ্ডকে ২ দিয়া গুণ করিয়া ২০০০ পাউণ্ডে পরিণত করার প্রয়াস, ইহাদের পারিবারিক জীবন যে সব উপকরণ দিয়া গঠিত, তাহার মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। যে সব ব্যক্তিতে ১০০০ পাউণ্ড × ২ পাউণ্ড = ২০০০ পাউণ্ড উপার্জন করিতে হয়, তাহারা কি কখনও একটি কীটের জীবন হইতে তাহাদের জীবন ভিন্ন মনে করে? আমার শেষ কথা এই যে, অতি মহার্ঘ চোখ ঝলসান পোষাক পরা লেডি অপেক্ষা মধ্যবিত্ত ঘরের শাদাসিদা, ছিমছাম এবং পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা

নারীকে অধিক পছন্দ করি। আর যখন কোনও উৎসব সন্ধ্যায় চোখ ঝলসান পোশাকে নিমন্ত্রিতদের শোভাযাত্রা অভিজাত গৃহের মোটা কারপেটের উপর দিয়া প্রায় নীরব পদক্ষেপে চলিতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে এই হতভাগ্য থাকিলে তাহাকে নলবনে প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জলজন্তুর ন্যায় বোধ হইত। ইহার অপেক্ষা কম আশ্চর্যজনক বোধ হইবে যদি দুর্গাপূজার জন্য সংগৃহীত হাজার-এক উপকরণের মধ্যে আফ্রিকা হইতে সদ্য আনা একটি গেরিলাকেও দেখা যায়। আমি যে এমন একটি বিভীষিকার সৃষ্টি করি নাই তাহার কারণ আমি তাহাদের মধ্যে চলিবার চেষ্টা করি নাই। ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের জন্য অতি সাধারণ এক প্রস্থ পোষাকের দাম প্রায় ৫ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ৭৫ টাকা)।

ইংরেজরা তাহাদের পোষাকে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করে তাহা আমাদের দেশের লোকেরা কমই জানে। প্রচলিত প্রথা নিমন্ত্রিতের জন্য, কোনও বিশেষ সময়ের জন্য যে পোষাক নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহা না পরিয়া যদি কোনও অতিথি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসে তাহা হইলে নিমন্ত্রণকারী তাহাতে অপমান বোধ করিয়া থাকে। সান্ধ্য পোষাক পরিয়া না গেলে থিয়েটারের ষ্টলেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ভদ্র পোষাক পরিহিত না থাকিলে উদ্যানে কিংবা অন্যান্য জনসাধারণের মিলন স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। রীতিটি প্রশংসাযোগ্য। ট্রাম গাড়ীতে নোংরা পোষাক পরা লোকটির পাশে বসিতে কি কাহারও ভাল লাগে? অতএব ইডেন গার্ডেনে যদি হাবা ধুতি পরিয়া যাওয়াতে, যেখানে ব্যাণ্ড ষ্টাণ্ডে মহিলারা সমবেত হইয়াছেন, সেখানে আপনার উপস্থিতি আপত্তি জনক হয় তাহা হইলে তাহা লইয়া হল্লা করিবার দরকার কি? অপরে (যাহারা পোষাকের রীতি কঠোরতার সঙ্গে মান্য করিয়া চলে) আপনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে ইহা যদি পরিহার করিতে চান, তাহা হইলে ইংরেজ কর্তৃক প্রাইভেট পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইয়া অসামাজিক পোষাকে যাইবেন না। ইংরেজী পোষাক পরিতে বা পরিচ্ছদ-রীতি গ্রহণ করিতে বলিতেছি না, এবং আমার মতে তাহা পছন্দ সই নহে, কিন্তু সভ্য জগতে ডিসেন্সি বা শালীনতা নামক একটি বস্তু স্বীকৃত এবং প্রচলিত আছে এবং আপনি তাহা জানিতে বাধ্য। যে সুন্দরী সিন্দুর-রঞ্জিত প্যাণ্ডেনাস গাছের পাতায় সাজিয়া আন্দামান দ্বীপসমূহের যুবকদের মন ভোলায়, তাহাকে সেই স্থানেই মানায়। সে যেন 'পালে রয়্যালের' নিকটস্থ ফরাসী সালোঁর সুন্দরীর কাছে নাচিতে নাচিতে না আসে। একমাত্র পোষাকের হাস্যকর ফ্যাশানই যে ইংরেজদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে। ফ্যাশানের চাকা ঘুরিতে ঘুরিতে শিল্পকৃতি, খেলনা, সাবান, পেটেন্ট ঔষধ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, অভিনেতা অভিনেত্রী, সঙ্গীত শিক্ষা, নৃত্য শিক্ষা, ঘোড়া জকি, কবি, উপন্যাস-লেখক, রেড-ইণ্ডিয়ান, কুলু, ঔপনিবেশিক, ভারতীয়—সব রকম বস্তুকেই হয় মাথায় তুলিতেছে, না হয় পদদলিত করিতেছে। এইভাবে বর্তমান বাঙালীদের নিন্দা করা ফ্যাশান দাঁড়াইয়াছে। কোনও বিখ্যাত লোক বাঙালীর বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করিল, তৎক্ষণাৎ চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল। মানবিক শব্দ কম্পন যন্ত্র হইতে যে তীক্ষ্ণ ধ্বনি উত্থিত হয়, পৃথিবীতে আর কোনও ধ্বনি তত তীক্ষ্ণ হইতে পারে না। হায় শ্রীমতী ফ্যাশান, আমাদের উপর ভ্রুকুটি হানিতেছ কেন? কেন তুমি এমন আদেশ প্রচার করিয়াছ যে, গঙ্গা নদীর কোটি কোটি নিরপরাধ মোহনা-বাসীদের নিন্দা না করাটা বড়ই অসম্মানকর? এবং তাহাদের যে সব ভ্রাতা বহু যুগের জড়ত্ব হইতে খাড়া জাগিয়া উঠিতেছে তাহাদেরই বা কি অপরাধ? ফ্যাশান-সুন্দরীকে ধিক!

যে স্ত্রীলোকটির কফি-হাউসে গিয়াছিলাম তাহার ছয়টি সন্তান। তাহাদের একজোড়া যমজ। অন্য একটি কফি-হাউসে আমি দুই জোড়া যমজ দেখিয়াছি। শেষের দুইজন শিশু। তাহাদের মা তাহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দেখাইল এবং বলিল,

এই দুটি শিশু দুইজনের মধ্যে শ্রম ভাগ করিয়া লইয়াছে—একজন কথা বলা শিখিয়াছে, অন্যজন হাঁটা শিখিয়াছে। অতঃপর আমি ইংল্যাণ্ডে বহু যমজ সন্তান দেখিয়াছি। সেখানে ইহা দেখিলাম একটি সাধারণ ঘটনা। আমার ধারণা, ব্রিটিশদের ভারতীয়দের অপেক্ষা জননহার বেশি। শিশুমৃত্যু কম। সেখানে অনেকে ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করিয়া অবিবাহিত থাকে, তবু তাহাদের দেশে জননহার বেশি। বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ অ্যাংলো-স্যাকসন শিশুর আবির্ভাব ঘটে, অথচ তাহাদের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছদনের কোনও ব্যবস্থাই থাকে না। প্রত্যেক দেশেরই (সে দেশ যতই ধনশালী হউক) লোক পালন ক্ষমতার একটা সীমা থাকে। অতএব ইংল্যাণ্ডের মত দেশে যদি বহু লোক অভাবগ্রস্থ থাকে, তবে অবাক হইবার কিছু নাই। দানের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হয় না। করবৃদ্ধি দ্বারাও স্থায়ী সমাধান হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কর বাড়াইয়া যাইতে হইবে, এবং তাহা সম্ভব নহে। উদার পন্থীরা অবশ্য বলেন, ইংল্যাণ্ডে এখন যত লোকের স্থান, তাহা অপেক্ষা অধিক লোকের স্থান হওয়া উচিত। তাঁহাদের মতে জমি মাত্র কয়েকজন জমিদারের দখলে, তাঁহারা চাষীদের নিকট হইতে তাহাদের ফসলের বেশির ভাগ অংশ আদায় করিয়া লন, এবং তাহার আয় তাঁহার ইংল্যাণ্ডে অথবা ইংল্যাণ্ডের বাহিরে যথা ইচ্ছা ব্যয় করেন। ইহার উপর বড় বড় ধনিক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা ছোটখাটো সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্রাস করিয়া প্রতিযোগিতা চূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই উপায়ে মজুরদের চাহিদা কমাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছেন। এ কথা কতদূর সত্য তাহা আমি জানি না, ইহার প্রতিকার উদ্দেশ্যে তাঁহারা কি করিতে চাহেন, তাহাও জানি না। মজুরশ্রেণী অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মজুরেরা শ্রমের জন্য একটা নিম্নতম হার ঠিক করিয়া লইয়াছে, তাহার নিচে তাহারা কাজ করিবে না; কিন্তু এই ট্রেড ইউনিয়নগুলিতেও খুব সুবিধা হয় নাই কারণ বাহির হইতে আগত শ্রমিকের সঙ্গে মজুরের হারের প্রতিযোগিতায় তাহারা পারিয়া উঠে না। মজুরি বেশি পাওয়া যায় বলিয়া বহু জার্মান ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানের শ্রমিক ইংল্যাণ্ডে চলিয়া আসে। তাহারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক নির্দিষ্ট মজুরি অপেক্ষা কমে কাজ করিতে রাজি। মজুরি বেশি দিলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে, এবং তাহার ফলে অ্যামেরিকা জার্মানি এবং অন্যান্য দেশের জিনিস, ইংল্যাণ্ডের প্রস্তুত দ্রব্যাদি শুধু ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ হইতেই হঠাইয়া দেয় তাহা নহে, খাস ইংল্যাণ্ডেও বিদেশী জিনিষেরই প্রাধান্য বেশী হয়। অতএব ধনী এবং শক্তিশালী ইংল্যাণ্ডের—পৃথিবী ব্যাপী উপনিবেশের মালিক ইংল্যাণ্ড তাহার সবার জন্য সম-আইন, তাহার অবাধ বাণিজ্য রীতি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও সে সুবিধার সঙ্গে বহু অসুবিধাও ভোগ করিতেছে—তাহার অগ্রগতি হইতে এখন যদি সে পিছু হটিয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর ক্ষতি হইবে।

ইংল্যাণ্ড সুবিবেচনা ও সৌভাগ্যবশতঃ পৃথিবীর প্রত্যেকটি অংশে তাহার যে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল সেইসব স্থান হইতে এখন অ্যামেরিকা ও ইউরোপীয় দেশসমূহ তাহাকে হঠাইয়া দিতেছে। ইউরোপে এখন সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পালা চলিতেছে। কোনও দিন হয়ত যুদ্ধ হইবে। তাহার পর আবার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় লাঙ্গল চলিবে, হাতুড়ি বাটালির কাজ তাঁতের কাজ চলিতে থাকিবে। হয়ত সেইন, রাইন ও ড্যানিউবের তীরে তীরে সৈন্য ব্যারাকগুলির কাজ ফুরাইবে। ল্যাঙ্কাশিয়র ও বারমিংহামে যে সব চিমনি গর্বের সঙ্গে আকাশে মাথা তুলিয়া দূরের সব দেশে সুলভ বস্ত্রের আনন্দ-বার্তা পাঠাইতেছে, এবং ছোটখাটো ছুরি কাঁচি ও অন্যান্য কর্তন যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদের প্রতিযোগী হয়ত লিল্, ড্রেসডেন এবং প্রাগ শহরে মাথা তুলিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহারা অল্প টাকায় জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, তাহারা অল্প মজুরিতে দ্রব্য উৎপাদনও করিতে পারে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের একান্তভাবে নিজস্ব শিল্পের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হইবে। এইভাবে তাহার অবস্থা বিশেষ অসুবিধাজনক

হইয়া উঠিলে সে হয়ত তখন আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই বিদেশী শ্রমিকের অবাধ আমদানি বন্ধ করিয়া দিবে। অষ্ট্রেলিয়া এবং অ্যামেরিকাও চীনা শ্রমিক আমদানি ঠিক এই ভাবেই বন্ধ করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড স্বাধীন বানিজ্য রীতিও পরিত্যাগ করিয়া একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে, এবং তাহা শুধু নিজের জন্য নহে, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য স্বায়ত্ব শাসনহীন অধিকার ভুক্ত দেশগুলির জন্যও। তবে এরূপ হইতে বিলম্ব হইবে, অতএব এই সুবিধা গ্রহণ করিয়া আমাদের নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে অথবা বর্তমানের শিল্পের উন্নতি সাধনেও বিলম্ব হইবে। তাহার পূর্বে ইংল্যাণ্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যেই বিলাতি দ্রব্য কিনিতে আমরা বাধ্য। আমাদের ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছে. তাই তাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমাদের ভাগ্যের উপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবে। ইংল্যাণ্ড বাঁকিয়া দাঁড়াইলে বাহিরের দেশসমূহের দুর্ভাগ্য সূচিত করিবে। স্বাধীনতার দুর্গ রূপে একমাত্র ইংল্যাণ্ডই সকলের ভরসা। যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম অথবা সুইজারল্যাণ্ড উপগ্রহস্বরূপ, ইহারা সকলেই ব্রিটিশ সূর্যের আলো গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যান্য উন্নত রাজ্যগুলি এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। চীন হইতে পেরু অবধি আমর মনকে চালনা করিয়া একথা জোরের সঙ্গে বলিতেছি যে আমি বরং নিউজীল্যাণ্ডের সীমান্ত বরাবর অঞ্চলগুলিতে আইরিশ দুর্দান্ত লোকদের সঙ্গে অথবা টেক্সাসে বাস করিব তবু ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে বাস করিয়া চাপা গলায় কথা বলিতে.নদীর ওপারের প্রতিবেশীদের প্রতি ঘৃণা জাগাইয়া তুলিতে, মানবজাতিকে বিনাশ করিবার নবতম পদ্ধতি শিখিবার জন্য ক্রীতদাসের ন্যায় জীবন কাটাইতে এবং সর্বদা জাতীয় ধ্বংসের বিভীষিকা লইয়া বাস করিতে পারিব না। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তাহা সমর্থন করিতেছে যে, আমরা ভারতবর্ষে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি, ইউরোপীয় জাতিগুলি তাহাদের গভর্মেণ্টের অধীনে ততটাও করিতেছে না অতএব ইংল্যাণ্ডের ক্ষতির অর্থ অন্য দেশের অগ্রগতিতে বাধা পাওয়া। মানবজাতি, বিশেষ করিয়া শ্বেত জাতি চরম যুক্তিবাদিতায় অনেক দুঃখ পাইয়াছে, যেমন প্রাচীন কালে সে চরম ধর্মচারিতায় দুঃখ ভোগ করিয়াছে। একটি জীবনের নীতি দেখা যায় তাহা অন্য জীব ধ্বংসের জন্য অবিরাম শক্তি প্রয়োগের নীতি, সে জন্য তাহা হইতে যুক্তিবাদিতার কুসংস্কার জন্মিয়াছে। ইহা মানুষকে আরও নিচে নামাইয়া আনিয়াছে, কারণ ঐ সব কুসংস্কার বর্তমানের উচ্চ জ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত। দার্শনিক ও নির্বোধের মধ্যকার বড় পার্থক্য এই যে, একজন তাহার অজ্ঞতা বিষয়ে চেতন, অন্যজন চেতন নহে। জ্ঞান কি আমাদের অজ্ঞতা দূর করার অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে? প্রত্যেকটি নূতন আবিষ্কার কি সীমাহীন অজ্ঞতার জগতে এক একটি অ্যামেরিকাকে প্রকাশ করিয়া দিতেছে? অজানাকে জানিবার বাসনা এক, অজানা সম্পর্কে বদ্ধ মতবাদ নির্ভুল এবং অব্যর্থরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অন্য। ইহারা এতই অধীর যে অপেক্ষা করিতে পারে না। এইভাবে আমরা যুক্তিবাদিতা পূর্ণ এক মতান্ধতা লাভ করিয়াছি, ইহা সত্যকে অগ্রাহ্য করে, ন্যায়বিচার ও করুণাকে অমান্য করে, এবং যে সব উচ্চতর বৃত্তি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে মানুষকে পৃথক করে তাহাকে অমান্য করে। তদুপরি অসম্পূর্ণ এবং অর্ধ প্রতিষ্ঠিত তথ্য হইতে, আরোহ এবং অবরোহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া নীতি বিধিকে ধ্বংস করিতে থাকে। এবং তাহার ফলে যে সব শক্তি আমাদিগের চারিদিকে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা তাহাদের কাছে আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। এবং ইহা ইউরোপের শক্তিশালী দেশ সমূহে এমন একটি ঠগী ধর্ম শেখায় যাহা আজটেকদের সাম্রাজ্য বিধ্বংসী স্প্যানিয়ার্ডদের, অথবা যে শক্তিতে টেগাস্ হইতে ইরাবতী তীর পর্যন্ত আরবেরা যাবতীয় রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা নির্মম। তবু একথা মানিতে হইবে যে, বর্তমান যুক্তিবাদিত্ব ঘেঁষা ধ্বংস প্রবৃত্তির যুগে একমাত্র ইংল্যাণ্ড রাজ্যজয়ের সঙ্গে ন্যায় বিচারের মিশ্রণ ঘটাইয়া জয়ের রূঢ়তা কিছু কোমল করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বিজিত দেশের উপর তাহার শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করিতেও পারিয়াছে।

ক্রমশঃ

ষ্টীলফ্রেম ভাঙছে

কানাইলাল দত্ত

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে কতকগুলি মৌলিক অধিকার আমরা ভোগ করে থাকি। ইংরেজ শাসনকালে নিযুক্ত সিবিলিয়ান কর্মীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা – বেতন, পেনশন ছুটি ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের এই অসামান্য সুবিধাভোগী চাকুরিয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা আজকের পরিস্থিতিতে একান্তই বেমানান হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের মধ্যে এ ব্যাপারে অসন্তোষ লক্ষ্য করে জন প্রতিনিধিগণ ঐ সব সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

সামান্য কিছু লোক অবশ্য ভিন্নমতাবলম্বী আছেন। তাদের বক্তব্যের মর্ম হলো—আই, সি, এস ক্যাডারের সামান্য কয়েকজন চাকুরিয়া মাত্র অবশিষ্ট আছেন এবং তারা সকলেই আগামী চার পাঁচ বছরের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করবেন। সুতরাং ঢাক ঢোল পিটিয়ে নিজেদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করার কোন সার্থকতা নেই। বিশাল ভারতবর্ষের পটভূমিকায় বিচার করলে এর দ্বারা যে আর্থিক সাশ্রয় হবে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পরন্তু প্রতিশ্রুতি খেলাপের অপরাধে আমরা অভিযুক্ত হব।

কিন্তু কি জনসাধারণ কি বর্তমান সরকার কেউই বিষয়টিকে ঐ দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন না। এর অর্থমূল্য যত কম হোক না কেন রাজনৈতিক মূল্য অপরিসীম। সমতার সমাজ সৃষ্টি যাদের লক্ষ্য তাদের পক্ষে শ্রেণী বিশেষের বিশেষ অধিকার মেনে নেওয়া কখনই সম্ভবপর নয়। কিন্তু সংবিধানে লিখে পড়েই আমরা আই সি এস অফিসারদের অধিকার দিয়েছি বলে সরকার ইচ্ছে করলেই তা পাল্টে দিতে পারেন না। তাই সরকারী ইচ্ছা পূরণের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন পড়েছে।

ইতিমধ্যে আর একটা মত বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। অনেকে মনে করছেন সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সঙ্কোচনের ক্ষমতা সংসদের নেই। সে জন্য দরকার আর একটা কনসটিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলী। যাঁরা এই মত স্বীকার করেন না এবং মনে করেন সর্ব বিষয়ে সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে তারাই দলে ভারি। তাই সংসদের চলতি অধিবেশনে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়ে নেওয়া হয়েছে। সিবিলিয়ান কর্মচারীদের প্রদত্ত অধিকার সঙ্কুচিত করার কাজে হাত দেওয়া সরকারের পক্ষে এখন সহজতর হলো। রাজন্য-ভাতা বিলোপ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আই. সি. এস কর্মচারিদেরও বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহৃত হতে পারে।

ইংরেজ তার সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে ভারতবর্ষে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তার দ্বারা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর যেটুকু হিত সাধিত হয়েছে তাকে বাই-প্রোডাকট বলা যেতে পারে। ইংরেজের সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে সেই প্রশাসনিক কাঠামোটিকে সিবিল সার্বিসের কর্মীরাই সদা তৎপর এবং সক্রিয় রাখেন। এই কর্মী বাহিনী সম্পর্কে পার্লামেন্টে ভাষণ দেবার সময় খ্যাতিমান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড় জর্জ 'স্টীল ফ্রেম' বা ইস্পাত কাঠামো শব্দটি ব্যবহার করেন।

১৯১৯ খৃঃঅঃর ভারত শাসন সংস্কার আইন কার্যকর হলে ইংরেজ সিবিলিয়ানরা অখুশি হন। কেউ কেউ চাকুরিতেই ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন। সে যুগের সিবিলিয়ন কর্মচারীরাও রাজকীয় সুখ সুবিধা ভোগ করতেন। সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তারা। বেতনটাও ছিল হাতে বিঘতে বেশ লম্বা

চওড়া। সুতরাং সকলের পক্ষে চাকরি ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। যারা রয়ে গেলেন তারা ঘোট পাকাতে যত্নশীল হন। অনেক সরকারী শুভ সঙ্কল্প এদের প্রতিরোধ অথবা অ াচার জন্যই বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

নতুন শাসন সংস্কারের সঙ্গে ব্রিটিশ নীতি যে সামঞ্জস্য পূর্ণ, অন্তত: কাগজে কলমে, সেটুকু বলবার প্রয়োজন হয়েছিল। সিবিল সার্বিসে বেশি সংখ্যায় ভারতীয় যাতে নিযুক্ত হতে পারেন তার জন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে সেক্রেটারি ও'ডনেল প্রাদেশিক সরকার গুলিকে চিঠি লেখেন। শাসন সংস্কার প্রবর্তনের ফলে সিবিলিয়ানরা চটে ছিলেন এ কথা আগেই বলেছি। তারপর এই সার্কুলার। সিবিলিয়ানরা (ইংরেজ) প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের দরবারে এক স্মারকলিপিতে নিজেদের স্বার্থরক্ষার আবেদন করলেন। ব্যাপারটা পার্লামেন্টে গড়ায়। এই উপলক্ষে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার লয়েড জর্জ সিবিলিয়ানদের ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ইস্পাত কাঠামো বলে বর্ণনা করেন। তিনি আশ্বাস দিলেন ভারতে তাদের প্রয়োজন চিরকাল থাকবে। এই আশ্বাসও যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি। লর্ড মলীর নেতৃত্বে একটি কমিশন বসাতে হয়েছিল; অনেকে অবশ্য মনে করেন এই কমিশন ছিল একটি সাজানো লোকদেখানো ব্যাপার। সে যাই হোক, সিবিলিয়ান কর্মচারিরা যে ভারতের পক্ষে অপরিহার্য তা আমরা স্বাধীন ভারতেও তো দেখছি।

সরকারের রঙ ও চরিত্র যাই হোক না কেন দক্ষ মেধাবী ও শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন প্রশাসক সকলেরই প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতেও প্রশাসক দলের শীর্ষে যারা আছেন তারাও সিবিলিয়ান থেকে ভিন্নতর কিছু নন। তবে নতুন ধ্যান ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতনাদি কিছু কিছু খর্ব করা হয়েছে এই মাত্র, ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি হ্রাস পায় নি। সরকার নীতি নির্ধারণ করে দিলেও তার রূপায়ণের দায়িত্ব কর্মীদের। সুতরাং সরকারী নীতির সার্থক রূপদানের জন্য যুক্তিবাদী ও উদ্ভাবনী কল্পনার অধিকারী বিশ্বস্ত কর্মীর প্রকান্ত প্রয়োজন।

প্রশাসক নিয়োগ ও তাদের শিক্ষণ ব্যাপারে ইংরেজ সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। এবং তার ফল যে ভাল হয়েছিল তা স্বীকার করতেই হবে। ইংরেজ যে সকল কর্মীদের নিযুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে বিশাল প্রতিভাধর মানুষের অভাব ছিল না। মেকলে, ভিনসেন্ট স্মীথ বা রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের মতন বিরল প্রতিভাধর মানুষও ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক কর্মী ছিলেন।

গোড়ার দিকে সিবিল সার্বিসকে কেন্দ্র করে আমাদের আশা আকাঙ্খা আবর্তিত হতো। আই. সি. এস হলে দেশ শাসনের দায়িত্ব পাওয়া যাবে—এবং এই দায়িত্ব পাওয়াটা স্বরাজ সাধনার অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেও সিবিল সার্বিস বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে প্রস্তাবে যুগপৎ ভারতে ও ব্রিটেনে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের দাবি করা হয়। পরীক্ষার্থীর বয়সের উর্ধ্ব সীমা তেইশ বছর করারও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

কংগ্রেসের আবির্ভাবের পূর্বে প্রধানত: ভারত সভার উদ্যোগে কলকাতায় সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (১৮৮৩)। এই সম্মেলন ন্যাশনাল কনফারেন্স বা ন্যাশনাল ইউনিয়ন নামে অভিহিত হয়েছিল। সম্মেলনের প্রথম দিনেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং সিবিল সার্বিস বিষয়ক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জাতীয় সম্মেলনের অনেক পূর্ব থেকেই সিবিল সার্বিস নিয়ে আবেদন নিবেদন চলছিল। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত সভা একে আন্দোলনের রূপ দেন, টাউন হলে সভা করে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। সেই সাব কমিটি সিবিল সার্বিস সম্পর্কে স্মারকলিপি রচনা করে দেন। সুরেন্দ্রনাথ ঐ স্মারকলিপি নিয়ে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করে জনমত গঠন করেন। লাহোরের

খাঁন বাহাদুর বরকত আলি খাঁন ট্রিবিউনের সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়া, আলিগড়ের সার সৈয়দ আহমদ্ খাঁ, কানপুরের মুন্সী নওলকিশোর, রাজা আমীর হোসেন খাঁ, এলাহাবাদের পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ, বারাণসীর ঐশ্বর্য নারায়ণ সিংহ বোম্বাইয়ের কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, ফিরোজ শা মেটা, ভি. এন. মাণ্ডলিক প্রভৃতি তৎকালীন নেতৃবৃন্দ সিবিল সার্বিস সম্পর্কে ন্যায় বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সহায়তা করেন। সিবিল সার্বিস তখন একটি রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়েছিল বল্লে অত্যুক্তি হবে না।

সিবিল সার্বিসের ক্ষেত্রে ইংরেজের সুস্পষ্ট প্রাধান্য বরাবর অক্ষুন্নই ছিল। তথাপি নানা ঐতিহাসিক শক্তির প্রভাবে ব্রিটিশ সরকারকে মধ্যে মধ্যে ভারতবাসীকে সামান্য সামান্য সুবিধা দেবার কথা ঘোষণা করতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিবিধ চক্রান্ত করে এ বিষয়ে নিজেদের ঘোষিত নীতি তারা কোন দিনই পুরোপুরি কার্যকর হতে দেন নি। ইংরেজদের চক্রান্তের একটি সুন্দর নজির মেলে বড়লাট লর্ড লিটনের একখানি সরকারী চিঠিতে। তিনি যা লেখেন তার সারমর্ম হলো : সিবিল সার্বিস সম্পর্কে ভারতবাসীর দাবি হয় প্রতিহত করতে হবে নতুবা তাদের প্রতারিত করতে হবে। আমরা দ্বিতীয় পন্থাটি গ্রহণ করেছি।...আমরা মুখে যাহা অঙ্গীকার করেছি কাজে তা ষোল আনাই ভঙ্গ করেছি।

ভারতবাসীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৬৪)। একজন মাত্র ভারতীয়ের সাফল্যে ইংরেজেরা বিচলিত বোধ করে। আতঙ্কিত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতের নম্বর কমিবে এবং গ্রীক ও লাটিনের নম্বর বাড়িয়ে ভারতীয়দের পক্ষে ঐ পরীক্ষায় পাস হওয়া দুরূহ করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও অতিশয় মেধাবী দু একজন ভারতীয় সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হচ্ছেন দেখে ওরা মূলে আঘাত করলে। পরীক্ষার্থীর বয়স একুশ থেকে কমিয়ে উনিশ করে দিল। এমনি অনেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিস্তর কাণ্ড ঘটেছিল সিবিল সার্বিসের স্বর্গীয় চাকুরিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কোনটাই তার খাপছাড়া বা যুক্তিহীন আবেগসর্বস্ব ব্যাপার ছিল না। সবই ছিল ভারতবাসীকে প্রতিহত ও প্রতারিত করার জন্য সুচিন্তিত কৌশলের অঙ্গ।

এমন কি চাকরি পেলেও উচ্চতর পদগুলিতে বসবার সুযোগ ভারতীয়রা পেতেন না। বরাবর তারা প্রচার করে এসেছেন ভারতবাসী বিচার বিভাগীয় কাজ চালাতেই সমর্থ, প্রশাসনিক কাজের যোগ্য তারা নন। তাই প্রশাসনিক বিভাগে ভারতীয় কেউ চাকরি পেলে নানা ছুতো নাতো কারণে তাদের অযোগ্য প্রমাণের চেষ্টা করতে ইংরেজ আদা জল খেয়ে লেগে যেত। সঙ্গে দোসর জুটেছিল ফিরিঙ্গিরা। এদেরই চক্রান্তে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মত মানুষকেও চাকরি খোয়াতে হয়েছিল।

সিবিল সার্বিসের মর্যাদা এবং ক্ষমতা যেমন আকাশ চুম্বী ছিল তেমনি বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছিল অফুরন্ত। শ্রী যোগেশ চন্দ্র বাগল বিদ্রোহী ও বৈরিতা গ্রন্থে সিবিল সার্বিস প্রসঙ্গ আলোচনা করে লিখেছেন—"চারি বৎসর একটি পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে যে কোন সিবিলিয়ান কর্মচারী পাইত বৎসরে পনের হাজার টাকা। আর দশ বৎসর পরে প্রত্যেকের বেতন হইত বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকা।" ঘর বাড়ি গাড়ী ঘোড়া লস্কর আর্দালি খানসামারও ছিল ছড়াছড়ি। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। স্বাধীনতা অর্জনের প্রায় সিকি শতাব্দী পরে ভারতবর্ষ আর একটি ক্রান্তিকালের সমীপবর্তী হয়েছে। যুগ পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সিবিলিয়ানদের নাগ-পাশ থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হতে চাইছে—। ১১৫ বৎসর পূর্বে আর একজন প্রাতঃ স্মরণীয় বঙ্গ সন্তান ঠিক একই কথা বলেছিলেন। ১৮৫৭ সনের ১৩ই মার্চ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—দি সিস্টেম মাস্ট দেয়ারফোর বি ব্রোকেন আপ।

বহু আকাঙ্খিত সেই ভাঙ্গন পূর্ণ হবার মহেন্দ্রক্ষণ বুঝি আসছে।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

আইওয়া কৃষি কলেজের শিল্প প্রতিনিধিরূপে জর্জ কার্ভার তাঁর নিজের হাতে আঁকা শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার নিয়ে সেডার র‍্যাপিড্‌সের শিল্প প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ ক'রেছিলেন যে, তাঁর উপরে যে মহান দায়িত্ব ন্যস্ত করা হ'য়েছিল তিনি তার মর্যাদা উপযুক্ত ভাবেই রক্ষা ক'রেছেন। অধ্যাপক বাড এবং অধ্যাপক উইলসনও জর্জ কার্ভারের কৃতিত্বে বিশেষভাবে সুখী হ'য়েছিলেন এই দেখে যে, তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস মোটেই অপাত্রে অর্পণ করা হয়নি। জর্জ কার্ভারের বিপুল সাফল্যে আর একটি তরুণীরও সমস্ত অন্তর গর্বে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, সে তরুণীটি হলেন মিস বাড। জনতার ভিড়ের মধ্যে তিনি জর্জ কার্ভারকে অভিনন্দন জানাতে আসেন নি। সবার পিছনে সকলের অন্তরালে থেকে তিনি যে আনন্দের অশ্রু বিসর্জন ক'রেছেন তার খবর বাইরের কোন লোক কোন দিন জানতে পারে নি। মিস বাড মনে মনে শুধু একটা কথাই বার বার উচ্চারণ ক'রেছেন—জর্জ। আমার জর্জ!

জর্জ কার্ভারের অঙ্কিত চিত্রগুলি শিল্প প্রদর্শনীতে বিশেষ উচ্চ প্রশংসা লাভ ক'রলো এবং তাঁর শিল্প প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বহু পুরস্কারও লাভ ক'রলেন। জর্জ কার্ভারের ইউকা গ্লোরিওসা নামে চিত্রখানি শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রের সম্মান অর্জন ক'রলো। তখন নিখিল আইওয়া শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হ'য়ে গিয়েছে, জর্জ কার্ভারের তৈলচিত্রখানি সেই শিল্পমেলায় প্রদর্শনের জন্য বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত ক'রে রাখা হ'ল।

এই শিল্পমেলায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পীরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। জর্জ কার্ভারের অঙ্কিত ছবিগুলিও তার মধ্যে সগৌরবে স্থান ক'রে নিয়েছিল। শুধু তাই নয় শিল্প প্রদর্শনীর বিচারকমণ্ডলী একদিকে যেমন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সেগুলির প্রশংসা ক'রেছিলেন অন্যদিকে তেমনি আইওয়ার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব পত্র পত্রিকায় জর্জ কার্ভারের অসামান্য শিল্প সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছিল।

জর্জ কার্ভার কিন্তু দেশ জোড়া খ্যাতি, প্রশংসা ও যশ লাভ ক'রেও আনন্দে আত্মহারা হ'লেন না বা সংযম ও ভারসাম্য হারালেন না। তিনি আগে যা ছিলেন অর্থাৎ শান্ত, ভদ্র এবং বিনয়ী পরেও তিনি তাই-ই র'য়ে গেলেন, তাঁর স্বভাব একটুও বদলালো না। খ্যাতির সুউচ্চ শিখরে আরোহন ক'রেও জর্জ কার্ভার সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, নির্বিকার ও অহংকারলেশহীন হ'য়ে রইলেন।

(১১)

১৮৯৪ সালে জর্জ কার্ভার "মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত গাছের রূপ" নামে একটি থিসিস রচনা করে তাঁর দীর্ঘকালের আকাঙ্খিত বি, এস, সি ডিগ্রী লাভ করলেন। উপাধি বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ানোলা থেকে মিসেস লিষ্টন এসে

উপস্থিত হলেন, তাঁর হাত দিয়ে জর্জ কার্ভারের বান্ধবী মিস বাড লাল গোলাপের একটা তোড়া পাঠিয়ে দিলেন। অনুরাগের রঙে রাঙা সেই গোলাপের তোড়া পেয়ে জর্জের মন খুসিতে ভরে উঠলো। মিসেস লিষ্টার এবং মিস বাডের প্রীতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা জর্জ কার্ভারের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করলো। তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। এই দুজন শুভানুধ্যায়িনী মহিলার সান্নিধ্যে এসে জর্জের জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। তিনি উপলব্ধি করলেন এ জগতে ভালোর সঙ্গে মন্দ, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে করুণা পাশাপাশি রয়েছে বলেই মানুষের জীবন এত সুন্দর, এত মহৎ, এত বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাই যদি না হত তা হলে মানুষের আদিম অবস্থা ঘুচতো না। মানুষ আজও বনে বাস করতো। লাল গোলাপের তোড়া থেকে একটা বড় ফুল তুলে নিয়ে জর্জ কোটের বুক পকেটে গুঁজে দিলেন এবং সেই দিনটি থেকে শুরু করে জীবনভর তিনি একটা গাঢ় লাল রঙের গোলাপ ফুল, আর তা না জোগাড় করতে পারলে যে কোন গাছের একটা কচি সবুজ পল্লব প্রত্যহ বুক পকেটে গুঁজে রাখতেন। অথবা যদি গাছের পল্লবও না জুটতো তবে বুনো লতাপাতা যা হাতের কাছে পেতেন তাই নিয়েই পকেট সাজাতেন।

জর্জ কার্ভার বি, এস, সি, ডিগ্রী লাভ করার অল্প কিছুদিন পরে আইওয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খ্যাতনামা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডাঃ লুই প্যামেলের লেখা একখানা চিঠি পেলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কলেজের গবেষণা বিভাগে সরকারী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর পদ খালি হওয়ায় সেই পদের প্রার্থী হয়ে জর্জ কার্ভার কিছুদিন আগে একখানা আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন। অধ্যাপক লুই প্যামেল চিঠি লিখে তারই জবাব দিয়েছেন। জর্জ কার্ভার যে এ চাকরি পাবেনই এরূপ নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারলেন না, না পাবার সবচেয়ে বড় কারণ, নিগ্রোদের এই কলেজে প্রবেশাধিকার নেই। কোন নিগ্রোকে কখনো এখানে চাকরিতে বহাল করা হয়নি। জর্জ নিজেও তা জানতেন। তথাপি অধ্যাপক প্যামেলের চিঠি পেয়ে তিনি না গিয়ে থাকতে পারলেন না। অধ্যাপকের অফিসে জর্জের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হল সেই প্রথম সাক্ষাতের সময়ই তিনি পরম আন্তরিকতার সঙ্গে বন্ধুভাবে জর্জ কার্ভারকে গ্রহণ করলেন, স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তবে তুমি কি করবে ঠিক করেছ? ভবিষ্যৎ কার্য প্রণালী সম্পর্কে তোমার পরিকল্পনা কী?

ডাঃ প্যামেলের এই প্রশ্ন শুনে জর্জ কার্ভার মনে মনে নিঃসংশয় হলেন, এ চাকরিতে তিনি বহাল হন নি। অধ্যাপক প্যামেল এই কথাগুলি বলে ভদ্রভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। জর্জ কার্ভার খানিকক্ষণ নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলেন কারণ অধ্যাপকের প্রশ্নের জবাবে কি বলতে হবে, কি বলা সঙ্গত, তা স্থির করতে পারছিলেন না। পরে বললেন, "এ বিষয়ে আমি এখনো কিছু চিন্তা করিনি, তবে মনে হয় কোনও ক্ষুদ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়তো আমাকে গ্রহণ করতেও পারে।"

"গ্রহণ করতে পারে কথাটা বলার মানে কি জর্জ? তোমাকে গ্রহণ করার তো কিছু বাকি নেই, আমি যেমন ঠিক তেমনি তুমি এখন এই কলেজের একজন অধ্যাপক।"

ডাঃ প্যামেল উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে প্রায় চীৎকার করে কথাগুলি বললেন। "তুমি হচ্ছ আজ থেকে আমার সহকর্মী। আমি জানতে চাচ্ছি গবেষণার কাজ চালাবার জন্য তুমি ইতিমধ্যে নতুন কোনও পরিকল্পনা স্থির করে নিয়েছ কি না। এ বিষয়ে আমার নিজের অবশ্য একটা প্রস্তাব আছে, কিন্তু প্রস্তাবটা তুমি গ্রহণ করবে, না প্রত্যাখ্যান করবে তা তো জানি না। আমার গ্রীন-হাউসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যদি তোমাকে দিই তা হলে কেমন হয়? কাজটা তোমার অপছন্দ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।"

আইওয়া রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত

হবার প্রথম দিন থেকেই জর্জ কার্ভার গ্রীন হাউসের তত্ত্বাবধায়কের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে কাজ শুরু করলেন। এখানে তিনি নিরলস পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে সমীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন, সঙ্কর জাতীয় গাছ এবং লতাপাতা সৃষ্টির জন্য। জগৎ বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞানসাধনা ও নব নব আবিষ্কারের কথা শুনে তাঁর সম্বন্ধে সব কথা জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠলো। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অনেক নতুন গাছের জন্ম সম্ভবপর হল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিজ্ঞানের চন্দ্রাতপতলে আবির্ভূত হলেন নিগ্রো মনীষার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

জর্জ কার্ভারের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ছত্রাকের জন্ম পদ্ধতি ও তার ক্রমবৃদ্ধি—উদ্ভিদ-বিজ্ঞানেরই একটি শাখা হল ছত্রাক-বিজ্ঞান। তিনি প্রাচীন ভারতীয় ঋষির মতো জ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন হলেন। গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করে বাইরের জগতের কথা প্রায় ভুলে রইলেন। বিশ হাজারেরও বেশী বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিচিত্র ধরণের ছত্রাক বন-বনান্তর থেকে সংগ্রহ করে এনে গ্রীন হাউসে সাজিয়ে রাখলেন।

তারপর শুরু হল সেইসব জিনিষ নিয়ে তাঁর তপস্যা, কঠোর নিরলস তপস্যা। তাঁর এই সুকঠোর বিজ্ঞানুশীলনের ফলে যে সঙ্কর উদ্ভিদ সৃষ্টি করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল তাতে ছত্রাকের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ করে সব রকম গাছগাছালির বেঁচে থাকার শক্তি অনেকগুণ বেশী বেড়ে গেল। বিজ্ঞানবিষয় সম্পর্কিত সব উচ্চশ্রেণীর পত্র-পত্রিকাগুলিতে বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল এবং সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশিত হয়ে তা নিয়ে জোর আলাপ-আলোচনা ও আন্দোলন শুরু হল। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলিও পত্রপত্রিকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান পেতে লাগলো।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার আজ একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক তথাপি তাঁর সেই বাল্যকালের অনেক অভ্যাস তিনি এখনো বজায় রেখেছেন। জানবার, বুঝবার এবং অধীত বিদ্যাকে আত্মস্থ করার আগ্রহ তাঁর আজো অপরিসীম। অজানা অপরিজ্ঞাত নতুন কোন জিনিষ দেখলে এখনো তিনি তাঁর সেই ছেলেবেলার মতো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—"এটা অন্যরকম না হয়ে এ রকম কেন হল?"

"কোন কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করতে হলে তার খুঁটিনাটি বিষয় আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হবে, বুঝতে হবে, নচেৎ আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি জগতের উপকারে ঠিকভাবে লাগাবো কি করে?"—এই হল বৈজ্ঞানিক কার্ভারের কথা। তিনি সব রকমের গাছ-গাছালি, মাটি, ধাতু, পাথর, কীট-পতঙ্গ ও প্রাণী নিয়ে গবেষণা করে প্রত্যেকটি জিনিষ সম্বন্ধে এমন গভীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করলেন যে এইসব জিনিষের কোন একটি সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই তিনি বলতেন, "ওরা আমার বন্ধু।" এই সমস্ত জিনিষের গোপন রহস্য আবিষ্কার করার প্রেরণায় তিনি সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। প্রকৃতিরাণীর কত রূপ, কত বৈচিত্র, কত সম্পদ, তার বৈচিত্র ও সৌন্দর্যের লীলায় আমি প্রত্যহ অবগাহন করি। প্রকৃতির সঙ্গছাড়া হয়ে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারি না।"—কথাগুলি বলেছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরূপে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের নাম সারা আমেরিকায় প্রচারিত হল, নানা জায়গা থেকে কৃষক সমিতি ও উদ্যান পরিচালকদের সভায় ভাষণ দেবার জন্য মাঝে মাঝেই তাঁর কাছে অনুরোধ আসতে লাগলো। এমনি কোন একটি সমিতির সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সভাপতি বলেছিলেন, "অধ্যাপক জর্জ কার্ভার বোধ করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় তরুলতা চেনেন এবং প্রত্যেকটির নাম জানেন, জিজ্ঞাসা করলে যে কোন গাছ বা লতার নাম বলে দিতে পারেন।"

জর্জ কার্ভারের এখন নিরুদ্বিগ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবন। তথাপি অনেক সময় বসে বসে তিনি তাঁর অতীতের দুঃখ জর্জর দিনগুলির কথা ভাবেন। ১৮৯৬ সালে তিনি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। দুবছর আগে তিনি বি এ ডিগ্রী লাভ করেছেন।

পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি তখন অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। জর্জ কার্ভার মনে মনে স্থির করেছিলেন এখান থেকে তিনি আর কোথাও যাবেন না। জীবনের বাকি দিনগুলো এখানেই নিশ্চিন্ত পরিবেশে এবং নিরুদ্বেগে কাটিয়ে দিবেন ভেবেছিলেন।

কিন্তু মানুষ যা ভেবে রাখে সব সময় তা হয় না। মানুষের সব চিন্তাভাবনা, সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করার ভার যে বিধাতার হাতে তিনি মানুষকে নিজের ইচ্ছা মতো চালান। তাঁরই ইচ্ছায় জর্জ কার্ভারকে একদিন এই নিশ্চিন্ত পরিবেশ ছেড়ে যেতে হল। আলাবামা থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আহ্বান এসে পৌঁছলো তাঁর কাছে—সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ এই জীবন থেকে বিশ্বের বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিজেকে অবাধে মেলে ধরবার। বিস্তৃত করে দেবার আহ্বান এসেছে। আর সে আহ্বান পাঠিয়েছেন নিগ্রো-জাতির কর্মবীর বুকার টি ওয়াশিংটন। টাস্কেগি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বময় কর্তা তিনি। বিদ্যালয়টি আকৃতিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তার কর্মকাণ্ড বিরাট করার উদ্দেশ্য নিয়ে বুকার টি ওয়াশিংটন এক অভিনব সংগ্রাম শুরু করেছেন। অশিক্ষার অন্ধকার জগতে শিক্ষার আলোক-বর্তিকা জ্বেলে দেবার সংগ্রাম। তাঁর এ সংগ্রামে শক্তি জোগাবার জন্য পাশে বিশেষ কেউ নেই। নিগ্রোদের পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে এনে তাদের নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠা করা, তাদের স্বাধিকার অর্জন ও কল্যান সাধনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল জর্জ কার্ভার চিঠিখানি পেলেন। আয়াস ও আরামের মধ্যে জীবনযাপন করতে আরম্ভ করে যাদের কথা তিনি প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলেন এই চিঠিখানি এসে হঠাৎ তাঁর সেই মোহনিদ্রা ভেঙে দিল। তাঁকে আয়াসের শয্যা থেকে টেনে তুললো, হতভাগ্য নিগ্রোদের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার নিজেই যে একজন নিগ্রো, সে কথা তিনি ভুলবেন কি করে? তাঁর মতো আরো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নিগ্রো আছে সে দেশে। আর সবারই ওই এক অবস্থা। সবাই জন্ম থেকে ক্রীতদাস। তারা সবাই তাঁর আত্মার আত্মীয়, রক্তমাংসে সব তাঁর আপনজন। মানুষের অধিকার থেকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত বুভুক্ষিত ও লাঞ্ছিত মানুষগুলি আজো যে পশুর মতো জীবন কাটাচ্ছে—ইচ্ছা করে নয়, বাধ্য হয়ে, কে তাদের মুক্তি দেবে- অন্ধকারের মধ্য থেকে তারা আলোয় বেরিয়ে আসতে চায়—সূর্যের আলো, মুক্তির আলো, স্বাধীনতার আলোয়।

বুকার টি ওয়াশিংটনের চিঠিখানা জর্জ কার্ভারকে ভাবিয়ে তুললো, কোন পথে যাই? দীর্ঘ দুঃখের রাত্রি পার হয়ে আজ তিনি যে সুখের সন্ধান পেয়েছেন, যে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন ভোগ করছেন তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকবেন, না আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন অন্ধকার অনিশ্চিত অমাবস্যার কালো সমুদ্রে?—তিনি যখনই একা থাকেন, নিভৃত নিরালয় বসে এইসব চিন্তা করেন। চিন্তার সহস্র নাগিনী দংশনে দংশনে অস্থির করে তোলে তাঁকে, তাঁর পথ কি? কর্তব্য কি? উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করা তো যে কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব এবং তিনি নিজেও তো এতদিন ধরে তাই করেছেন। তাতে তাঁর নিজের উন্নতির পথই শুধু প্রশস্ত হয়েছে কিন্তু নিগ্রো জাতির মুক্তির পথ তাতে কতটুকু প্রশস্ত হয়েছে? এতদিন তিনি শুধু নিজেকে নিয়ে বিব্রত রয়েছেন, শৃঙ্খলিত অত্যাচারিত অসহায় নিগ্রোজাতির বন্ধন মুক্তির জন্য কিছুই করেননি। তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা জাতির সেবার শ্রেষ্ঠ পথ নয়। তিনি নিজেও নিগ্রো, নিগ্রোজাতির সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার

তিনিও একজন শরিক এবং সেইভাবেই তাঁর বাঁচতে হবে। তাদের থেকে দূরে পৃথক হয়ে থাকার কোন অধিকার তাঁর নেই। বিধাতা তা কখনো সহ্য করবেন না। এত অপরিসীম দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বহু যত্ন, নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে যে জ্ঞান তিনি আহরণ করেছেন তার আশীর্বাদ সকলের সঙ্গে এক হয়ে ভোগ করতে হবে তাঁকে, কারুকে বঞ্চিত করে রাখা চলবে না।

জর্জ কার্ভার একান্ত নিভৃতে বসে যখন এইসব চিন্তার ঝড়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে, আটশো মাইল দূরে বসে আরও একটি মানুষ এমনিভাবে এই একই চিন্তায় তরঙ্গাভিহত তরণীর মতো উদ্বেলিত আন্দোলিত হচ্ছিলেন, কায়মানোবাক্যে নিগ্রোজাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলেন—সে মানুষটি হলেন সমগ্র নিগ্রো জাতির মুক্তিদূত কর্মবীর বুকার টি ওয়াশিংটন। সমাজে যাদের ঠাঁই নেই, সম্মান নেই, রাষ্ট্রে যাদের মর্যাদা নেই শুধু সেই কৃষ্ণকায় নিগ্রোজাতির সন্তানদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যই তিনি একটা শিক্ষা-নিকেতন গড়ে তোলার স্থির সংকল্প নিয়ে এবং সেই সংকল্পকে সাফল্য-মণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে তিনি সব বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে একাকী বীরের মতো যুদ্ধ করে চলেছেন। অস্ত্র হাতে নিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সৈনিকেরা যে যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ায় এও তেমনি যুদ্ধ, তেমনি অসমসাহসিক ও দৃঢ়নিষ্ঠ, কিন্তু এ যুদ্ধের সৈনিকদের যুদ্ধ করার জন্য তরোয়াল বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এ যুদ্ধের জন্য চাই দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল এবং পাহাড়ের মতো সহ্যশক্তি। বুকার টি ওয়াশিংটন এই তিনটি গুণেরই সমান অধিকারী ছিলেন।

বুকার টি ওয়াশিংটনের সামনে একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। সমস্যাটা হল এই, যেসব নিগ্রোদের মধ্যে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন, লাঙ্গল দিয়ে কি ভাবে জমি চাষ করতে হয়, তারা জানে না। ফসল কাটতেও জানে না। জর্জ কার্ভারের কাছে লেখা একখানি চিঠিতে এই কথাগুলি লিখে বুকার টি ওয়াশিংটন সবশেষে লিখলেন, "আমার নিজেরও কৃষিকাজ করার অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নেই। সারাটা জীবন আমি পড়াশুনা নিয়ে কাটিয়েছি, সেইটেই আমার জানা আছে। আমি তাদের লেখাপড়া করার বিদ্যা শেখাতে পারি আর সেই কাজই আমি করছি। এ ছাড়া আর যা আমি তাদের শেখাতে পারি তা হচ্ছে, কিভাবে জুতো তৈরী করতে হয়, কিভাবে মাটি আর বালি দিয়ে ইট প্রস্তুত ক'রে তার সাহায্যে দেয়াল গেঁথে গেঁথে বাড়ী তৈরি করতে হয় এসবই আমি তাদের শেখাচ্ছি। কিন্তু তথাপি আমি তাদের দুবেলা যাতে আহার জোটে তার কোন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করতে পারছি না। তাদের আমি পেট ভরে খেতে দিতে পারি না।

"আমি পারি না, কিন্তু তুমি পারবে। বহুদূর থেকেও তোমার কৃতিত্বের খবর আমি পেয়েছি। তোমার যশোগাথা আমার কানে এসে পৌঁছেছে। আমি আহ্বান তোমাকে করি আমার কর্মযজ্ঞের সমিধ আহরণের কাজে যোগদান করার জন্য।

"এখন, এই মুহূর্তে আমি তোমাকে ঐশ্বর্য, মর্যাদা কিংবা খ্যাতিলাভের কোনরকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। আইওয়া কৃষি বিদ্যালয়ে যে আরাম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছো তার কোনটাই এখানে পাবে না। এখানে পাবে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ এবং কঠোর সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত জীবন।

"আমি তোমাকে ঐশ্বর্য, মর্যাদা এবং খ্যাতির প্রতিশ্রুতি-এর কোনটাই দিতে পারবো না। সে কথা আগেই জানিয়েছি। প্রথম দুটো জিনিষ অর্থাৎ ঐশ্বর্য এবং মর্যাদা ইতিমধ্যেই তুমি লাভ করেছ। এখন যেখানে আছো সেখানে থাকলে শেষেরটা অর্থাৎ খ্যাতিও তুমি নিঃসন্দেহে লাভ করবে, হয়তো বিশ্ববিখ্যাত হবে। এখানে আসতে যদি তুমি রাজি হও তবে অর্থ, মান-প্রতিপত্তি এবং খ্যাতির প্রলোভন ত্যাগ করে শুধু নয়, সে রকম কোন কিছুর আশা না রেখেই আসতে হবে।

"এসব জিনিষের পরিবর্তে যা আমি দিতে পারবো

তোমাকে তা হল কাজ, কাজ, কাজ—শুধু কাজ। অবিশ্রান্ত অনলস নিরবচ্ছিন্ন কাজ। কঠোর ও দুরূহ শ্রমসাধ্য কাজ। রাজি যদি থাকো তবে চলে এসো।

"যারা বঞ্চনা, বুভুক্ষা ও আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ঘৃণ্য জীবন কাটাতে আজ বাধ্য হচ্ছে তাদের এই ঘৃণ্য জীবন যাপনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তোমাকেই আমি সেই কাজের ভার দিতে চাই। তাদের জীবনে মানুষের অধিকার অর্জনে সহায়তা করাই হবে তোমার কাজ। তোমার জীবনের ব্রত। তুমি কি পারবে না এ মহৎ ব্রত গ্রহণ করতে? কোন উজ্জ্বল ভবিষৎ এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করে নেই সত্য, কিন্তু মনে রেখো অর্থ যশ সম্মান প্রতিপত্তি লাভের চাইতেও ঢের বড় কাজ হচ্ছে একটা অধঃপতিত অসহায় জাতিকে মৃত্যুর পঙ্ককুণ্ড থেকে জীবনের প্রদীপ্ত আলোকের চেতনায় উদ্বোধিত জাগ্রত করা, পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাদের জীবনে স্বাধীনতার নির্মল বাতাসের স্পর্শ এনে দেওয়া—এই পুণ্য যজ্ঞের নেতারূপে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই।"

যেদিন বুকার টি ওয়াশিংটন এই চিঠিখানা লিখলে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের কাছে সে তারিখটা ছিল ১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল। চারদিন পরে সকাল বেলায় সেই তরুণ বৈজ্ঞানিক চিঠিখানা পেলেন। জর্জ কার্ভার চিঠি পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। এমন আন্তরিকতা পূর্ণ চিঠি তিনি জীবনে কদাচিৎ পেয়েছেন। এমন আবেগ, এমন আকুতি, এমন হৃদয়ভরা দরদ দিয়ে কেউ এর আগে কোনদিন তাঁকে ডাক পাঠায়নি। কর্তব্য কর্মের সমুদ্রতরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য এই উদাত্ত আহ্বান তার শিরায় শিরায়-রক্ত স্রোতের মত বয়ে যেতে আরম্ভ করলো, এক উন্মাদনা তাঁকে অস্থির করে তুললো, এক অননুভূত স্পন্দন জাগলো তাঁর বুকের মধ্যে, পরম করুণাময় ঈশ্বর জর্জ কার্ভারের সামনে এক নতুন কর্মময় জগতের মানচিত্র মেলে ধরেছেন।

এ আহ্বান ঈশ্বরের আহ্বান, বুকার টি ওয়াশিংটনের মধ্য দিয়ে তিনি আহ্বান পাঠিয়েছেন, এ আহ্বান উপেক্ষা করার শক্তি জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের নেই।

ক্রমশঃ

কেন্দুলীর জয়দেব মেলা

তুষাররঞ্জন পত্রনবীশ

অজয় যেখানে উজান বইছে, গীতগোবিন্দের রস-মাধুরী এখনও যেখানে বৈষ্ণব-বাউলকে বিভোর করে দেয়, মকর সংক্রান্তিতে জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্বে (কেন্দুলী) এবারও মেলা বসেছিল। হাজার হাজার নারী-পুরুষ ১৩ই জানুয়ারী বুধবার থেকেই ওখানে জড়ো হয়েছিলেন যাতে পরদিন প্রত্যুষে অজয় নদে মকর সংক্রান্তির স্নান করে উত্তরায়ণের পুন্যার্জ্জন এবং কবিপ্রনাম সাঙ্গ করতে পারেন।

আমরাও জড়ো হয়েছিলাম, মূলতঃ বাউল উৎসবে যোগ দিয়ে একদিনের জন্য হলেও শহুরে জ্বালা ভুলে থাকার কামনায়। অজয়ের এপারে বোলপুরের দিক থেকেই বেশী যাত্রী সমাগম হয়েছিল—সার্ভিস বাসে, রিজার্ভ বাসে, প্রাইভেট কার-এ এবং শতাবধি গরুর গাড়ীতে; অনেকে আশপাশের গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটেও এসেছিলেন। অজয়ের অপর পার দিয়ে দুর্গাপুর-বাঁকুড়ার দিক থেকেও এসেছিলেন অনেক ভক্ত ও রসিক; এঁদের কিন্তু উরু জল ভেঙে অজয় পার হতে হয়েছিল।

কেন্দুলী একটি ছোট্ট গ্রাম। উৎসবের সময় গ্রামবাসী তাঁদের ঘরেই বাইরের লোককে স্থান দেন। কিন্তু তাতে ক'জনারই বা জায়গা হয়? অগণিত শিশু-যুবা-বৃদ্ধ পৌষ-মাঘের শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের নীচে রাত কাটাতে বাধ্য হন যেখানে কেন্দুলী তার আঁচল পেতে রেখেছে উন্মুক্ত ধূলিশয্যায়। বাউল-বৈষ্ণবদের দশ-বারটি আসরে ঘুরতে ঘুরতে মন যার একবার গানের রসে মজে যায় কতটুকু রাতই বা তার বাকী থাকে সুখশয্যায় ক্লান্তদেহ বিছিয়ে দেবার তাগিদে?

সংক্রান্তির দিন দুপুরে পৌঁছে দেখি কেন্দুলীর প্রতিটি ঘর অতিথি সমাবেশে পূর্ণ। রাধাবল্লভের মন্দিরে পাণ্ডাদের কাছেও স্থান নেই; স্থান নেই বৈষ্ণবদের আড্ডায় ও রামকৃষ্ণ মঠে। শ্রান্তদেহে তাকিয়ে দেখি সঙ্গিনীর শুকনো মুখে হতাশা। এমন সময় ভানু বৈষ্ণবীর দাওয়ায় উঠে একরাতের আশ্রয় চাইলাম। রক্তাম্বর পরিহিত এক সাধু ভাগিয়ে দিচ্ছিল, বৈষ্ণবীর বোধহয় মায়া হল, বলল: "এসো মা জননী। এই মাটির ঘর, খড়ের চাল, আলগা দোর; পারবে এখানে রাত কাটাতে?" অকূলে কূল পেলাম। বৈষ্ণবীর দুখানি ঘর। একটিতে তার এক আত্মীয়া উৎসব উপলক্ষে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে উঠেছে; তাই তার নিজের ঘরেরই সামনের অংশে দরজার পাশে আমাদের জায়গা হল। বৈষ্ণবী বলল: "এখানেই আসন বিছিয়ে নাও।" মহাখুশী হয়ে সতরঞ্জি বিছিয়ে কম্বল পেতে আসীন হলাম। বললাম: "একটু চা হবে?" "জল চাপিয়ে দিয়েছি", বৈষ্ণবী অন্তর্যামীর অন্তরঙ্গতায় জবাব দিল।

চা-পানের পর কদম্বখণ্ডের ঘাটে স্নান সেরে এলাম। সঙ্গিনীর শহুরে ধাত; ওভাবে অবগাহনে রাজী হলেন না। বৈষ্ণবী যেন ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দিল; তার রসকলি অঙ্কিত মুখের মিষ্টি কথার সঙ্গে ডাল-চচ্চড়ি, মাছের টক দিয়ে গরম ভাত পরিবেশন—যাহই বটে! সামান্য বিশ্রামান্তে মেলা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

পোড়ামাটির মূর্ত্তি খোদাই করা মন্দিরগাত্র রাধা-বল্লভের দেউল অতি দীনভাবে জীর্ণদশায় জয়দেবের স্মৃতি বহন করছে। পদ্মাবতীর মন্দির অজয়ের পারে; যদিও এই ছোট্ট মন্দিরটির দৈহিক পরিচর্যার বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হয় নি, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের নীচের দিকে

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্/দেহি পদপল্লবমুদারম্" শ্লোকটি যেভাবে ভুল বানানে লেখা রয়েছে তাতে মনন-পরিশীলনের অভাব অবশ্যই দর্শককে পীড়া দেয়। নিকটেই "জয়দেব অনুসন্ধান সমিতি" হরিদাস গোস্বামীর আশ্রমে এক ভক্তমণ্ডলীর সভা আহ্বান করেছেন। উদ্দেশ্য: জয়দেবের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উৎসব উপলক্ষে সমাগত সাধু-সজ্জনের জন্য অতিথিশালা নির্ম্মাণ। সভাপতির ভাষণে শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন দুঃখ করলেন: "জয়দেবকে আমরা ভুলতে বসেছি" সত্যই তাই, নইলে জয়দেবের জন্মস্থানে গীত-গোবিন্দের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, কবির বাস্তুভিটা সংরক্ষণের কোন আয়োজন আজ অবধি করা হয় নি। অধিবাসীরা অবশ্য জায়গাটির নাম দিয়েছেন "জয়দেব কেন্দুলী" এবং সরকার স্থানীয় ডাকঘরেরও ঐ নাম স্বীকার করে নিয়েছেন।

অজয়ের ধারে ধারে বটতলা থেকে পদ্মাবতীর মন্দির পর্যন্ত, বলতে গেলে, কেন্দুলীর পরিসর; মাইলখানেকও নয় লম্বায়, আর চওড়া খুব বেশী হলে এক ফার্লং। মেলায় শত শত দোকান এসেছে আর এসেছে স্বাভাবিক-ভাবেই সার্কাস, ম্যাজিক ইত্যাদির গ্রাম্য সংস্করণ। হাজার পঁচিশ লোক জড়ো হয়েছে ওইটুকু যায়গায় এবং অতগুলি দোকানপাটের ফাঁকে ফাঁকে। আহার্য ও পানীয়ের অভাব কিছু নেই, তবে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন অবান্তর।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল মনোহর দাসের আখড়ায়ই ভাল বাউলগানের আসর বসবে। অনেকের মধ্যে নদীয়া থেকে এসেছেন কমলিনী বৈষ্ণবী আর এসেছেন দীনবন্ধু দাস, নারায়ণ দাস ও গৌরী দাসীর মত বাউল। সন্ধ্যার আগেই দুজনে ওখানে বসে গেলাম, ভালো লাগলে, সারারাত গান শোনবার সঙ্কল্প নিয়ে। জয়দেব মেলার বাউলগানের যে অনেক সুখ্যাতি শুনে এসেছি। পর পর দুখানা পদাবলী পালা হল। রাত তখন দশটা। আর একখানা পালা কীর্ত্তনের পর শুরু হবে বাউলগান। ভাল লাগছিল না বলে উঠে পড়লাম। সঙ্গিনী কিন্তু বসেই থাকলেন। বৈষ্ণবীর ঘরে গিয়ে এক ঘুম দিয়ে আবার আসব—ভেবে চলে এলাম। পথে আসতে আসতে শুনতে পেলাম এখান-ওখান থেকে ভেসে আসছে ভাটিয়ালী সুরে বাউলগানের রেশ।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন ভোর চারটে। তাড়াতাড়ি আসরে ফিরে এলাম। ওখানে তখন গান শেষ; পাঁচ-ছ'শ মেয়ে-পুরুষ চাদর-কাঁথা মুড়ি দিয়ে নৈর্ব্যক্তিকতায় সুখসুপ্ত। সন্তর্পণে অন্যের গা বাঁচিয়ে সঙ্গিনীর কাছে গিয়ে ডাকলাম। কুপিত দৃষ্টি দিয়ে খণ্ডিতা নায়িকা দয়িতকে অভ্যর্থনা করলেন। বুঝলাম এতক্ষণ ঘুমিয়ে অপরাধ করেছি। আসরের বাইরে এসে নিবেদন করলাম: "জয়দেবকে স্মরণ করে কি বলব—দেহিপদপল্লবমুদারম্?"

সে যুগের নানা কথা

শ্রীসীতা দেবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের বাড়ীতেই ব্রহ্মোপাসনা প্রতি রবিবারে হতে আরম্ভ করে। উপাসনায় আচার্য্যের কাজ বেশীর ভাগ মেসোমশায় করতেন, কথনও সথনও বাবাও করতেন। মেসোমশায় বেশ ভাল গান করতে পারতেন, গান রচনাও অনেক করেছিলেন। আমার মাও খুব ভাল গান করতেন, কাজেই উপাসনার সময় গানের কোনো অসুবিধা ছিল না। আর-একজন ভদ্রলোক, তাঁর নাম নগেন্দ্রনাথ সোম, তিনিও খুব ভাল গান করতেন। কলকাতা বা অন্য কোথাও থেকে কোনো ব্রাহ্মবন্ধু অতিথি হিসাবে এলে তাঁরাও আচার্য্যের কাজ করতেন। শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই রকম বার-দুই এসেছিলেন বলে মনে পড়ে।

সাপ্তাহিক উপাসনাই যে শুধু হত তা নয়, বৎসরে দুবার উৎসবও হত। একবার মাঘ মাসে হত, যে সময় সব জায়গায় মাঘোৎসব হয়, আর একবার হত অগ্রহায়ণ মাসে, যখন এলাহাবাদে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ উৎসবগুলিও হত আমাদের বাড়ীতেই। ব্রাহ্মসমাজের জন্য বাড়ী নেওয়া হয় অনেক পরে। উৎসব সাধারণতঃ তিন-চার দিন হত, তার একটা দিন বালক-বালিকা-সম্মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই দিনটির জন্য আমরা উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করে থাকতাম। আমাদের জীবনে অন্য উৎসবাদিত বেশী ছিল না। অবশ্য রামলীলার মিছিল দেখতে যাওয়া, অথবা দুর্গাপূজার প্রতিমা দেখতে যাওয়া এ-সব ছিল খানিক খানিক, কিন্তু তাতে যেন আমাদের মন ভরত না। এই উৎসবগুলিকে খুব আপন মনে হত। উৎসবটা হত আমাদের বাড়ীর সামনের খোলা জায়গাটায়। বেঞ্চি চেয়ার পেতে সকলের বসবার জায়গা করা হত। আমরা ছেলেমেয়ের দল নূতন কাপড়-জামায় সুসজ্জিত হয়ে সার দিয়ে বসতাম। গান হত, কবিতা আবৃত্তি হত, ছেলেমেয়েদের গল্প বলা আর উপদেশ দেওয়া হত। সব শেষ হত তাদের লুচি, আলুর দম, মিষ্টি দিয়ে ভাল করে জলযোগ করিয়ে। এলাহাবাদে ব্রাহ্ম তখন দুই-এক ঘরের বেশী ছিলেন না, তবে ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল অনেকেই ছিলেন। তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আসতেন। তা ছাড়া জলযোগের খবরটা ছড়িয়ে পড়ায় বালক-বালিকা উৎসবে উপস্থিতির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। একবার মনে আছে, আমাদের বাড়ীর এক অতিথি ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের জামায় গোলাপফুল পরিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ফুলের ঝুড়ি নিয়ে ফিরে এসে বাবাকে বললেন, "একদল গোঁফ ওয়ালা ছেলে এসে বসেছে, আমি ওদের ফুল পরাতে পারব না, আপনি ওদের হাতে হাতে দিয়ে দিন।" সত্যই দেখা গেল, পাড়ার কতগুলো বয়স্ক ছেলে এসে বাচ্চাদের সঙ্গে বেঞ্চি জুড়ে বসে আছে। তাদের যে

সবাই অত্যন্ত বিদ্রূপের চোখে দেখছে এতেও তাদের কোনো লজ্জা দেখা গেল না, তারা ভাল করে খেয়ে দেয়ে প্রস্থান করল। খেতেই যখন এসেছে তখন না খাবে কেন? গান আবৃত্তি এ সব আমরাই করতাম। সেই বয়সেই গল্প বলার অভ্যাস আমার ছিল, মাঝে মাঝে গল্পও বলতাম। মেসোমশায় একটু ছোট প্রার্থনা করতেন। খুব ছোট বাচ্চাদের এ-সব বড়ই অবান্তর মনে হত, তাদের মন পড়ে থাকত ফুল নেওয়া আর লুচি খাওয়ার দিকে। একবার আমার এক ছোট ভাই বলল, "মেসোমশায়, বেশী বড় উপাসনা করবেন না কিন্তু,—লুচি ভাজা হয়ে গেছে।"

এলাহাবাদে থাকা কালীন বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে, ছুটির সময় মধ্যে মধ্যে বাঁকুড়া গিয়ে কিছুদিন করে থেকে আসতেন। ঠাকুরমা পিসীমারা যতদিন বেঁচেছিলেন, তখন অনেক সময়ই পাঠকপাড়ার আমাদের পৈতৃক বাড়ীতে গিয়ে উঠতাম। সে বাড়ীটা এখনও আছে, বড় জ্যাঠামশায়ের কয়েকজন নাতি সেখানে বাস করেন। আমার ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা মনে পড়ে, বাড়ীটা তখন বেশীর ভাগই একতলা ছিল। দোতলায় একটা ঘর ছিল, আর মস্ত খোলা ছাদ। একতলায় একসার ঘরের সামনে একটু খোলা বারান্দা, তার সামনাসামনি খড়ের চাল দেওয়া রান্নাঘর প্রভৃতি। এই বাড়ীর চার পাশ ঘিরে নানা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী। পাড়ায় গোটা-তিন পুকুর এবং একটি দেবমন্দিরের কথা মনে হয়। সব চেয়ে বড় পুকুরটিকে "বড় পুকুর" নামেই অভিহিত করা হত। দেবমন্দিরটি ছিল তার পাশেই। আর একটি পুকুরকে সবাই বলত "অপ্রকা।" বাবা বলেছিলেন, এটির নাম আসলে ছিল "অপরূপা।" আমরা যখন দেখেছি তখন তার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, অন্ততঃ অপরূপ ত বলা চলেই না। জল একেবারে প্রায় দেখাই যেত না, শ্যাওলা আর পানার আতিশয্যে। এ ছাড়া বাড়ীর পিছন দিকে একটা ডোবা মত ছিল, সেটাকে সবাই বলত "গোড়ে"। ওখানে বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি হত।

খাবার জল কিন্তু আসত এ-সব পুকুর থেকে নয়। বাড়ীতে কুয়াও দেখিনি। অল্প দূরে "গন্ধেশ্বরী" বলে একটি অন্তঃসলিলা ছোট নদী ছিল, সেইখান থেকে সব বাড়ীর মেয়েরা পানীয় জল নিজেরাই নিয়ে আসত। নদীটির জল উপর থেকে প্রায় দেখাই যেত না, বালি খুঁড়তে আরম্ভ করলেই ঝিরঝির করে পরিষ্কার জল এসে সেই গর্তে জমা হত। জল যেমন মিষ্টি তেমনি টল্‌টলে পরিষ্কার। এই জলই সবাই নিত।

বাঁকুড়ায় যাওয়াও তখন এক adventureএর সামিল ছিল। বাঁকুড়া অবধি ট্রেন যেত না। হয় রাণীগঞ্জ, নয় আসানসোল অবধি ট্রেনে গিয়ে নেমে পড়তে হত। রাতটা কাটাতে হত রাণীগঞ্জের অতি নোংরা waiting room-এ বা আসানসোলে বাবার এক বন্ধু ভদ্রলোকের বাড়ীতে। তারপর ভোর রাত্রে আবার যাত্রা, হয় শা কোম্পানীর ঘোড়ার গাড়ীতে, না হয় উটের গাড়ীতে। সুজলা, শস্যশ্যামলা বাংলা দেশে উটের গাড়ীর যে হঠাৎ কেন চলন হয়েছিল জানি না। তবে জানোয়ারগুলি প্রচণ্ড বলশালী, দোতলা বিরাট গাড়ী অনেক যাত্রী সহ অকাতরে টেনে নিয়ে যেত। একবার কোনো কারণে দাঁড়িয়ে গেলে, প্রকাণ্ড টিনের শিঙা সজোরে না বাজালে কিছুতেই আর নড়ত না। অনেকে বলত, শিঙা বাজানটা শুধু উটকে চলাবার জন্যই নয়, জন্তু জানোয়ারের ভয়ও রাস্তায় আছে, এই বিষম তূর্য্য ধ্বনিতে তারাও চমকে পথের কাছ থেকে পালিয়ে যেত। যাবার পথটা আগাগোড়াই প্রায় বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যেত। এসব জায়গায় রেল লাইন হবার আগে অবধি ভালুক, চিতাবাঘ এমন কি বুনো হাতীও লোকালয়ের কাছাকাছি এসে পড়ত। দামোদর নদ পড়ত মাঝে, তাকে অতিক্রম করে যেতে হত। নদে যখন জল সামান্য থাকত তখন গাড়ীগুলি নদীগর্ভে নেমে পড়ে সোজা চলে যেত। বয়স্ক লোকেরা অনেক সময় নেমে পড়তেন গাড়ীর ভার কমাবার জন্যে। ছোটরা গাড়ীতেই থাকত। বর্ষাকালে

নৌকা করে পার হতে হত। মায়ের কাছে গল্প শুনতাম যে, একবার আমি নৌকা থেকে জলে পড়ে সলিল সমাধি লাভ করতে যাচ্ছিলাম, মার সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধিতে রক্ষা পাই। শা কোম্পানীর ঘোড়ার গাড়ীর কোনো বিশেষত্ব মনে পড়ে না। ঘোড়াগুলি খুব জেদী এবং ট্যাটা বলে কুখ্যাত ছিল।

শৈশব অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর পাঠকপাড়ার বাড়ীতে আর গিয়ে থাকতাম না। আমার ঠাকুরমা তখন আর বেঁচে ছিলেন না। বাঁকুড়া শহরে তখন স্কুলডাঙা বলে একটা নূতন পাড়া হয়েছিল, নূতন নূতন বাড়ীও অনেক হয়েছিল। ঐ পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করে অনেকবার থাকা হয়েছিল। এরপর স্কুলডাঙায় বাবা একটি বাড়ী কেনেন, তাঁর এক শিক্ষকের কাছ থেকে। ঐ বাড়ীতেও আমরা অনেক বার গিয়ে থেকেছি। এই বাড়ীর পাশে ব্রাহ্মসমাজের ছোট একটি মন্দির ছিল। আচার্য্যের থাকবার জন্য ছোট একটি খড়ের চালের বাড়ীও ছিল।

ভাড়াটে বাড়ীগুলোর একটার কথা খুব মনে পড়ে, সেটা একটা পুকুরের ধারে ছিল। পুকুরটাকে পাড়ার লোকরা বলত গদাই বাঁধ। এ বাড়ীটা মনে থাকার কারণ, ঐ পুকুরে প্রায়ই একজন মাহুত তার হাতীকে স্নান করাতে নিয়ে আসত। হাতীটা অনেকক্ষণ ধরে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে স্নান করত। পাড়ার সব ছেলে মেয়েরা পাড়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করত—

"হাতীমামা দোল দোল,
পান খিলিটি খোল খোল।"

মামা জল থেকে উঠে আসবার লক্ষণ দেখালেই সবাই দৌড় দিত।

আর একটা বাড়ীর কথা মনে পড়ে। এটায় রান্না-ঘরের খড়ের চাল থেকে আমার গায়ে একটা সাপ পড়ে গিয়েছিল। দুধের একটা ছোট কড়াই নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিলাম। সাপটা যখন গায়ে পড়ল, তখন ভয়ে প্রায় জমে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু হাতের কড়াইটা ফেলিনি। আর-একটা বাড়ীর কথা মনে পড়ে। তখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুজন ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তার ভিতর একজন মুসলমান। তাঁদের জলযোগ করান হল, তারপর তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু অন্দরে মহা কোলাহল বেধে গেল। ঝি-চাকর কেউ মুসলমানের এঁটো করা থালা গেলাশ ধোবে না। মা তখন সেগুলি তুলে নিয়ে এসে ধুয়ে ফেললেন। সর্ব্বনাশ ব্যাপার! আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক, বিদেশে বসে যা খুশি না হয় করি, তাই বলে দেশে এসে এমন কাণ্ড করব! আশ্চর্য্যের বিষয়, মা বা বাবার কোনো শাস্তি বিধান করতে কেউ এগোল না; বাবাকে সবাই ভয় করে চলত, তাই ভাবল "থাক্ গে বাপু, ব্রাহ্ম মানুষ, ওরা যা খুশি করুক গিয়ে।"

আমার বাবার বাড়ীও বাঁকুড়া শহরে ছিল, আবার মামার বাড়ীও ওখানে একটা ছিল। দাদামশায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে বাসিন্দা ছিলেন ওন্দা গ্রামের, তবে কাজের সুবিধার জন্য তিনি সারাবছরই প্রায় বাঁকুড়া শহরেই থাকতেন। ছুটি-ছাটায় গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে উঠতেন। গ্রামের বাড়ীটি পাকা দালান ছিল বলে মনে পড়ছে, তবে শহরে একটি মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালের বাসা-বাড়ী করেছিলেন। ছেলেরা এখানে পড়াশুনা করত। আমার মা-রা সাত বোন ছিলেন, আমরা অবশ্য সকলকে দেখিনি, চারজনকে দেখেছি। মামারা তিন ভাই ছিলেন। আমার দিদিমা খুব অল্পবয়সে মারা যান। আমরা যখন মামার বাড়ী যেতাম, তখন সেখানে গৃহিণী ছিলেন আমার বিধবা বড়মাসীমা হেমলতা। তিনি অল্পবয়সে বিধবা হয়ে দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ীতে থাকতেন। যে পাড়ায় দাদা-মশায়ের বাড়ী ছিল সেটাকে বলত লালবাজার। তাঁর বাড়ীর পাশে church ছিল একটা, একজন ধর্ম্মযাজক সেখানে সপরিবারে বাসও করতেন। আমরা মধ্যে মধ্যে গিয়ে দাদামশায়ের বাড়ীতে থাকতাম। তিনি বড়

স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন; নাতি, নাতনী, মেয়ে, সবাই গেলে তিনি বড় আনন্দিত হতেন। কি করে যে তাদের যথেষ্ট আদর জানাবেন তা যেন ভেবে পেতেন না। সাধারণ খাদ্যদ্রব্য বাড়ীতে প্রায় বাতিল হয়ে যেত। দাদামশায় কেবলি আদেশ করতেন, "লুচি ভাজ, বুটের (ছোলার) ডাল কর, রসগোল্লা নিয়ে এস।" এসব ছাড়া নাতি-নাতনীদের উপযুক্ত খাবার তিনি খুঁজেই পেতেন না। আমরা কিন্তু বড়মাসীমার রাঁধা "ডিংলার (মিঠা কুমড়োর) ঝাল" বা "ছাতুর" (mushroom) তরকারি খুব আগ্রহ করে খেতাম। এলাহাবাদে ত এসব পাওয়া যেত না? বাঁকুড়ায় তখন খুব উৎকৃষ্ট ছানার জিলিপি পাওয়া যেত, স্থানীয় লোকেরা তাকে বলত "ঝিলপি"। বড় এক হাঁড়ি সেই "ঝিলপি" সর্ব্বদা আমাদের ভোগের জন্য হাজির থাকত। দাদামশায় মা-ও বড়মাসীমাকে বলে দিতেন, তাঁরা যেন ছেলেমেয়েদের "ঝিলপি" খেতে বাধা না দেন। তাদের যখন ইচ্ছা যত ইচ্ছা খাবে। এমন না হলে আর মামার বাড়ী? পূজোর ছুটিতে গেলে শাড়ীও পাওয়া যেত। তখন চন্দ্রকোণাতে খুব সুন্দর সুন্দর শাড়ী পাওয়া যেত, ছোট বড় নানা মাপের। একবার আমাদের দুই বোনের জন্য দুটি ডুরে আর চৌখুপি কাটা শাড়ী এনেছিলেন, নাতিদের জন্য অন্য পোশাক। আমার ছোটভাই অশোক তখন বছর তিনের হবে। সে খোট ধরল যে সেও রঙীন শাড়ী নেবে, অন্য পোশাক কিছুতেই নেবে না। দাদামশায় আবার শাড়ী খুঁজতে বেরোলেন। অনেক খুঁজে একটি ছোট্ট নীলাম্বরী শাড়ী নিয়ে এলেন, সবুজ রেশমের পাড় দেওয়া। অশোক মহাখুশী, তার শাড়ী পরা মূর্ত্তি দেখে দাদামশায়ও মহা খুশী। বললেন, "কেমন শিশু বলরামটির মত দেখাচ্ছে বল দেখি?"

দাদামশায় মানুষটি সে যুগের পক্ষে কিছু উদার নৈতিক ছিলেন মনে হয়। অতগুলি মেয়ে হওয়াতে তাঁর কোন দুঃখ দেখা যত না। সকলকে তিনি বাংলা লেখা-পড়া শিখিয়েছিলেন। মা এবং তাঁর ছোট বোন গানও করতেন। আমাদের পাঠকপাড়ার বাড়ী এ সব দিকে ভয়ানক রক্ষণশীল ছিলেন। ঠাকুরমা, পিসীমা এঁরা কেউই পড়তে জানতেন বলে মনে হয় না। পিসীমারা সব সতীনের ঘর করতেন। দাদামশায় কিন্তু কোনো মেয়েকে সতীনের ঘরে দেননি। বড়মাসীমা দারুণ কুলীনের ঘরে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের সতীন ছিল না। তাঁর দুই ননদের সতীন ছিল বলে তাঁরা সর্ব্বদা বাপের বাড়ী থাকতেন। এমন কি বড় মাসীমার নিজের মেয়েরও অতি অল্প বয়সে সতীনের উপর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

বাঁকুড়ার মামার বাড়ীর পাশে একটি চার্চ ছিল। বোধহয় ওয়েস্‌লিয়ান মিশনের। পাশে ধর্ম্মযাজকের থাকার বাড়ী ছিল, তিনি সেখানে সপরিবারে থাকতেন। পাড়ার লোকে তাঁকে বলত "কাটি কেষ্ট" বাবু, বোধ হয় catechist কথাটা তাদের মুখে ঐ রূপ ধরে ছিল। এঁদের পরিবারের সঙ্গে দাদামশায়ের বাড়ীর লোকেরা সমানে কথাবার্ত্তা বলত, যাওয়া আসাও চলত। এতে কারো জাত যাওয়ার ভয় ছিল না। আমার ছোটমাসী তখনকার দিনের পক্ষে বেশ বড় বয়স অবধি অবিবাহিতা ছিলেন, তাতে দাদামশায়ের কোনো চিন্তা ছিল না। অথচ পাঠক পাড়ায় দেখতাম, আমরা ফ্রক পরা অবস্থাতেও দারুণ অরক্ষণীয়া বলে গণ্য হতাম। হাতে কেন কোন গহনা নেই, এ নিয়েও খেদোক্তি শোনা যেত।

দাদামশায় মোক্তারের কাজ করতেন। ধবলভূমের রাজার তিনি বেতন-ভোগী মোক্তার ছিলেন। বাঁকুড়া থেকে ঘাটশিলার রাজবাড়ী যাবার পথে কত বার বুনো হাতীর সামনে পড়েছেন, কতবার ভালুকের সামনে পড়েছেন তার গল্প প্রায়ই করতেন। একবার নাকি তিনি পাল্‌কি করে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক পাল বুনো হাতীর প্রায় সামনে গিয়ে পড়েন। বেহারারা পাল্‌কি সুদ্ধ একটা বড় culvert এর তলায় গিয়ে লুকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ তাদের আটকে থাকতে হয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলায় ও জেলার চারদিকে গভীর জঙ্গল ছিল অনেক। বাঘ, ভালুক আর হাতীর সঙ্গে গ্রামের মানুষদের নিত্যই কারবার করতে হত। মানুষগুলি বেশ সাহসী আর উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। দ্বৈরথ সংঘর্ষে প্রায়ই তারাই জয়লাভ করত। শীতকালে চিতাবাঘ শহরের ভিতর চলে আসার গল্পও শুনেছি। মহিলারাও অনেক সময় বাঘ-ভালুকের সঙ্গে মোকাবেলায় অগ্রসর হতেন। এরকম একটা গল্প শুনেছিলাম আমার দিদিমার মায়ের সম্বন্ধে। আমার দিদিমা অম্বিকা দেবী অল্প বয়সেই মারা যান, তবে তাঁর মা বিধুমুখী দেবী বহু কাল বেঁচে ছিলেন। আমরাও তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর বয়স ৮০ এবং ৯০এর মাঝামাঝি কিছু একটা হবে। তখনও বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা, হাঁটা চলা সতেজ, কথাবার্ত্তা পরিষ্কার বলেন, কাজকর্ম্মও করেন। ইনি নাকি একবার গোয়ালে চিতাবাঘ ঢোকায় লাঠি নিয়ে তাকে তাড়াতে যান। বাড়ীতে তখন কেউ পুরুষ মানুষ ছিল না। বাঘ তাঁর উপর লাফিয়ে পড়তেই তিনি লাঠিটা দু হাতে উঁচু করে ধরে মেঝেতে বসে পড়েন। পেটে দারুণ খোঁচা খেয়ে বাঘটা ছিট্‌কে গোয়াল ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ে। ততক্ষণে গ্রামের অন্য লোকজনরা এসে পড়ে এবং বাঘের সম্বর্দ্ধনায় অগ্রসর হয়।

আমরা যখন বিধুমুখী দেবীকে দেখি তখন আমার দাদা দশ-এগারো বছরের হবেন। নাতনীর অমন সুন্দর ছেলে দেখে ভদ্রমহিলা কোলে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দাদা তখন নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক ভদ্রলোক মনে করতেন। এ হেন প্রস্তাব অতি লজ্জাজনক মনে করে তিনি একেবারে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েই গেলেন।

বাঁকুড়ার স্কুলডাঙায় যখন বাড়ী কেনা হল, তখন সে বাড়ীতে গিয়ে আমরা অনেকবার থেকেছি। ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের ভার নিয়ে মন্দির সংলগ্ন বাড়ীতে থাকতেন তখন মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। এঁর খুব বড় লাইব্রেরী ছিল, এতে আমাদের বই পড়ার খুব সুবিধা হত। মহেশবাবু চিরকুমার ছিলেন। তবে তাঁর সঙ্গে তাঁর এক দিদি থাকতেন এবং আর এক দিদির ছেলে নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত থাকতেন। নির্ম্মলকুমারের আরো ভাই-বোন ছিলেন, তাঁরাও কখনও কখনও বাঁকুড়ায় এসে থাকতেন। সবছোট-ভাই বিমল সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার ভাই অশোকের খুব ভাব হয়েছিল। মহেশবাবু ওখান থেকে চলে যাবার পর কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ বলে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ঐবাড়ীটিতে ছিলেন। তাঁর পরিবার-পরিজনদের সঙ্গেও বেশ ভাব হয়েছিল। আর কেউ কখনও সেখানে গিয়ে থেকেছেন কি না জানি না। এখন ত সবই ধূলোয় মিশে গেছে। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরটিরই বা কি দশা হয়েছে তাও জানি না।

এ ত গেল পুরনো বাঁকুড়ার কথা, এখন আবার এলাহাবাদের কথায় ফিরে আসা যাক।

বাবা খুব অল্প বয়স থেকেই পত্রিকা সম্পাদনার কাজ আরম্ভ করেন। আমার জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর শুনতাম তিনি "প্রদীপ" নামক কাগজের সম্পাদক। কলকাতা থেকে বৈকুণ্ঠনাথ দাশ বলে এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসতেন। প্রদীপ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত, তিনি সেখানে থেকে পত্রিকাটির দেখাশুনা করতেন। এ ছাড়া আমার আর কিছু মনে নেই প্রদীপের বিষয়। কিন্তু প্রবাসী যখন বেরোল, তখন আমি খানিকটা বড় হয়ে গেছি, বছর-ছয় বয়স হয়েছে। বাড়ীর থেকে পত্রিকা বার হচ্ছে, আমাদের এটা একটা মহা আনন্দের ব্যাপার হল। আমি তখন বাংলা পড়তে শিখেছি। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার চেহারা আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। আমাদের সেই নীচু লম্বা ঘরটিতে প্রবাসীর অফিস হল। তার কাজকর্ম দেখার জন্যে আশুবাবু বলে একজন ভদ্রলোক এলেন। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ছিল।

প্রবাসী বেরোনোর পর থেকে বাড়ীতে লেখকদের

আনাগোনা বেড়ে গেল। ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ত প্রায়ই আসতেন, অন্য জায়গা থেকেও অনেকে আসতেন। এলাহাবাদের লেখকদের মধ্যে দুজনের কথা খুব মনে পড়ে, একজন ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, আর একজন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ। দেবেন্দ্রনাথ বাবাকে বড় ভালবাসতেন, প্রায় রোজই বিকেলে আসতেন আমাদের বাড়ী। তিনি উকীল ছিলেন, অনেক সময় কোর্টের পোশাকেই চলে আসতেন। তাঁর কবিতা তখন প্রবাসীতে প্রায়ই বেরোত। জ্ঞানেন্দ্রবাবু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, চেহারাটা বেশ সুন্দর ছিল। তাঁদের বাড়ীর সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়েছিল।

প্রবাসী বেরোবার বছর দেড়েকের মধ্যেই বোধ হচ্ছে আমার, দাদার এবং ক্ষুদুর টায়ফয়েড ফিভার হয়। তখন এ নিদারুণ রোগের ডাক্তারি কোনো চিকিৎসা ছিল না, তার উপর এক সঙ্গে তিন জন আক্রান্ত হয়ে বাবা-মাকে বেশ বিব্রতই করেছিলাম। তবে তখনকার দিনের বন্ধুরা শুধু নামে বন্ধু ছিল না, কাজেও বন্ধু ছিল। বাবার বন্ধু-বান্ধবরা তখন পরম আত্মীয়ের মত সাহায্য করে সব কাজ উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। এমন কি দড়িটানা পাখার দড়ি টেনে রোগীর ঘরে হাওয়ার ব্যবস্থাও তাঁরা করতেন। মাসীমা সরোজবাসিনী আমার সব রকম সেবা শুশ্রূষার ভার নিয়ে ছিলেন। তখন নার্স ওখানে সম্ভবতঃ পাওয়া যেত না, গেলেও ফিরিঙ্গি নার্স বাঙালী বাড়ীতে কেউ রাখত না। মেসোমশায় ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় দু-একজন সাহায্যকারীকে নিয়ে আমার দুই ভাইয়ের দেখাশোনা করতেন। মাও এই সময় খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিদি আট বছর ন' বছর বয়সেই বেশ ঘরকরণার কাজ শিখে গিয়েছিল, সে মাকে অনেক সাহায্য করত।

ভাইরা তবু অল্পের উপর দিয়ে উদ্ধার পেয়ে গেল, আমিই ভুগলাম সাঙ্ঘাতিক রকমের। আমার টায়ফয়েডের উপর আবার ডবল নিউমোনিয়া হল। অনেক সময় অচৈতন্য হয়েই থাকতাম। জ্ঞান হলে মাকে মাসীমাকে দেখতে পেতাম, ডাক্তারদের দেখতে পেতাম। একদিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম, একজন বিরাট লম্বা চওড়া সাহেব, একটা বড় আলো হাতে করে আমাকে দেখছেন। পরে শুনলাম তিনি ওখানের civil surgeon, নাম ছিল Col. O'Brien। ঘরের হারিকেন লণ্ঠনে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না বলে নিজের টমটম্ গাড়ীর আলোটা খুলে নিয়ে এসেছিলেন। রুগী দেখা শেষ হলে যখন বাবা তাঁকে fees দিতে গেলেন, তখন তিনি টাকা নিলেন না। বললেন, "ছোট মেয়েদের চিকিৎসার জন্য আমি টাকা নিই না, আমার ও রকম দু'টা মেয়ে আছে।"

যা হোক, কোনো রকমে ত আস্তে আস্তে আরোগ্য লাভ করলাম। কিন্তু নিদারুণ ব্যাধি দেহ ও মনের উপর অনেক ছাপ রেখে গেল। হাঁটতে চলতে ভুলে গেলাম। ইংরেজী, বাংলা লেখাপড়া শিখেছিলাম, সব মন থেকে মুছে গেল। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন এ বাড়ী ছেড়ে যেতে। বাড়ীটা একটু স্যাঁৎসেঁতে ছিল হয়ত, আর কোনো দোষ ছিল বলে মনে হয় না। যা হোক, ডাক্তাররা বলছেন যখন তখন বাড়ী খোঁজা হতে লাগল এবং অবিলম্বে জুটেও গেল। কাছেই Edmonstone Road-এ বেশ বড় ভাল বাড়ী পাওয়া গেল। আমাদের তিন ভাই বোনকে পাল্কি করে নিয়ে যাওয়া হল, আমরা তখনও ভাল করে হাঁটতে পারি না।

নূতন বাড়ীটা পুরনো বাড়ীর চেয়ে দেখতে ভাল ছিল, কিন্তু আমার অনেকদিন অবধি পুরনো বাড়ীটার জন্য মন কেমন করত।

নূতন বাড়ীর সামনাসামনি রাস্তার ওপারে মেমদের একটা বড় স্কুল ছিল। ধবধবে ফরসা, সুসজ্জিতা মেয়েগুলিকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগত, অনেক সময় নাওয়া খাওয়া ভুলে হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এই বাড়ীটার পাশের একটা বাড়ীতে সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক

ছিলেন। তিনি উকিল ছিলেন, বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল। তাঁদের বাড়ীতে অনেক ছেলেমেয়ে ছিল, কাজেই আমাদের খেলার সাথী অনেক জুটে গেল।

এঁদের বাড়ীতে নিয়মিত দুর্গাপূজা হত। সতীশবাবু বাড়ী এসে বাবাকে নিমন্ত্রণ করে যেতেন। অবশ্য বাবা এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না, তবে আমাদের যাবার বাধা ছিল না। আমরা গিয়ে প্রতিমা দেখে আসতাম, তবে যেদিন বলিদান হত সেদিন আমাদের যেতে দেওয়া হত না। এঁদের বাড়ীর "আটকৌড়ে" প্রভৃতি উৎসবেও আমরা যোগ দিতাম।

এ বাড়ীতে থাকাকালীন আমার সব-ছোট ভাই মুলুর জন্ম হয়। তার আগের ভাই অনিল তাকে আদর করে ডাকত "মুকুতা।" বোধহয় বলতে চাইত 'মুক্তা"। তা মেয়ের নাম ত ছেলেকে দেওয়া যায় না, তাই বড় হলে তার নাম হল মুক্তিদাপ্রসাদ। পরে 'মুক্তিদা'টা কেমন করে খসে গেল, "প্রসাদ" নামেই সে চলতে লাগল। ডাক নাম প্রথমে হল "মুকু" তারপর হল "মুলু"।

এই বাড়ীতে কতদিন ছিলাম মনে পড়ে না। প্রায়ই বাড়ী বদল হত, কেন যে হত সে খবর আমরা রাখতাম না। এর কিছুদিন পরে অন্য একটা বাড়ীতে অশোকের পরের ভাই অনিল ডিফথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। সজ্ঞানে এই আমার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। সে বিভীষিকার ছাপ এখনও মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। তখনকার দিনে serum দিয়ে ডিফথিরিয়ার চিকিৎসা ভারতবর্ষে চলন ছিল না, এলাহাবাদে ত ছিলইনা। অনিলের তাই সুচিকিৎসা হয়নি। বাবা সে দুঃখ মনে মনে চিরজীবন বহন করে ছিলেন। আমার একটি মেয়ের একবার ডিফথিরিয়া হয়েছিল, তাকে serum injection দেওয়া হচ্ছে দেখে বাবা জানতে চাইলেন, এ চিকিৎসা কতদিন হল ভারতবর্ষে এসেছে। চিকিৎসক যা হোক কিছু একটা উত্তর দিলেন, যাতে বাবা মনে ব্যথা না পান। বাবা কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করলেন না, বললেন "ডাক্তারবাবু বোধহয় ঠিক জানেন না।"

এরই মধ্যে এক এক বৎসর মাঘ মাসে আমরা কলকাতা চলে যেতাম, মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে। দুবারের কথা মনে পড়ে। একবার "সাধনাশ্রমের" বাড়ীতে উঠেছিলাম। তখনকার কলকাতা আর এখনকার কলকাতার আকাশ পাতাল তফাৎ। কলকাতায় তখন ঘোড়ার টানা ট্রাম চলে। আমরা এলাহাবাদে গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া কিছু দেখিনি। অতবড় লম্বা গাড়ী দুটো ঘোড়ায় টানছে দেখে বেশ কিছু অবাক্ হয়ে গেলাম। আর একবার এসে উঠেছিলাম ডাঃ প্রাণ-কৃষ্ণ আচার্য্যের বাড়ীতে। তাঁদের বাড়ীতে প্রথম electric light আর fan দেখি। এলাহাবাদে যতদিন ছিলাম, বিজলি বাতির ব্যবহার দেখিনি। তখন কলকাতার মাঘোৎসবে বালক-বালিকা উৎসবের ঘটা দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম। কলকাতায় এলে আমরা বাবার বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির বাড়ী গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করে আসতাম।

আর একটা বাড়ীতে একবার উঠে গেলাম, সেটা প্রায় উপকথার রাজবাড়ীর মত। নামে সেটা এলাহাবাদ শহরের কীটগঞ্জ নামক পাড়ায়, কিন্তু কার্য্যতঃ শহরের বাইরে। অনেক মাইল জুড়ে চারিদিকে খাঁ খাঁ করত মাঠ। দিনের বেলা রাস্তা দিয়ে লোকজন চলত, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী চলত। খানিক দূরে একটা নূতন রেললাইন তৈরি হচ্ছিল, সেটার নাম Oudh Rohilkhand Railway। সেখানে তখনও পুরোদমে মাটি কেটে embankment তৈরি হচ্ছে, লাইন তখনও পাতা হয় নি। সেইখানে মাটি কাটতে গিয়ে মেবরাজ নামক এক দেহাতী ব্যক্তি, একঘড়া মোহর নাকি কি করে পেয়ে যায়। ব্যস্, আর তাকে পায় কে? টাকা ভাঙিয়ে সে বিরাট বিষয়-সম্পত্তি কিনে ফেলল। কোন এক দেউলে নবাবের বাড়ীঘর বাগান প্রভৃতি নিলামে উঠেছিল। মেবরাজ সব কিনে ফেলল। এক অতি বিরাট compoundএর মধ্যে তিনটে বাড়ী। তিনটাই বাংলো

প্যাটার্নের, উপরে টালির ও খাপরার চাল। বাবা মাঝারি বাড়ীটা ভাড়া নিলেন। সেটা তখন মেরামত করা হচ্ছিল বলে আমরা সাময়িকভাবে বড় বাড়ীটায় গিয়ে উঠলাম। সে বাড়ীটা এতবড় যে এক-একটা ঘরে এক-একটা পরিবার স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। একতলা বাড়ী, কিন্তু ভিতটা দোতলার সমান উঁচু, অনেক সিঁড়ি বেয়ে তবে ঘরে ঢুকতে হত। বারান্দাগুলো এত বড় বড় যে একটাকে জীবনদাদা, দাদা প্রভৃতি ছেলেরা ফুটবল খেলার মাঠে পরিণত করল। ছোট বাড়ীটাতে এসব সম্পত্তির অধীশ্বর মেঘরাজ স্বয়ং বাস করতেন।

এই compoundএর মধ্যে কি যে না ছিল তার ঠিক নেই। বিস্তীর্ণ গমের ক্ষেত ছিল, ফল ও তরকারির বাগান ছিল। রঙীন ফুলও কিছু কিছু হত। একটা মজে যাওয়া আধশুকনো পুকুর ছিল, বিরাট একটা বটগাছের তলায় পুরান নবাববাড়ীর কার যেন একটা সমাধি ছিল। একজন প্রৌঢ় পাঠান রোজ সন্ধ্যাবেলা সেখানে প্রদীপ রেখে যেত। এছাড়া জন্তু-জানোয়ারও অনেক ছিল, দেখা যেত শোনা যেত। শেয়ালের ডাক ও হায়নার ডাক শোনা যেত। কেউটে সাপ থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য বিষধর সাপ যত্রতত্র দেখা যেত। যে বটগাছের তলায় সমাধি ছিল সেটিতে একটি অতিকায় অজগর বহুদিন ধরে বাস করছিল। সেই প্রৌঢ় পাঠানটির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সে আমরা থাকতে থাকতেই মারা পড়ে।

চোর ডাকাতের অভাব ছিল না। তার পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যেত। মেসোমশায়ের বড় ছেলে প্রতিভা-রঞ্জন একবার মাঝরাতে ঘরের বার হয়ে ডাকাতের হাতে লাঠির বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটিয়ে এলেন। বাবা এবং মেসোমশায় তখনই বেরিয়ে তাদের ধরতে পারলেন না। এ হেন বাড়ীতে লোকের থাকতে ভয় হবার কথা। আমাদের কিন্তু ভয় ডর কিছু ছিল না। বাড়ীতে মানুষ ছিলাম আমরা অনেকগুলি। আমরা সকলে, মাসীমারা সকলে, নেপালবাবু, গিরীশবাবু আর দু-একজন মধ্যে মধ্যে থাকতেন। পাচক, চাকর, ঝি, চৌকিদার প্রভৃতি নিয়ে আরো জন-চারেক মানুষ ছিল। স্বয়ং বাড়ীগুলির মালিক মেঘরাজ খানিক দূরেই থাকতেন, তাঁর লোকজন অনেক ছিল। সেকালের দেহাতী মানুষ, ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের মহিমা কিছু বুঝতেন না, তাঁর টাকাকড়ি বাড়ীতে লোহার সিন্দুকে থাকত, সেটার উপর একজন পালোয়ান বিছানা করে শুয়ে থাকত। চাকর, বাকর, মালী, গাড়োয়ান, সহিসে তাঁর বাড়ী ভর্ত্তি ছিল। তিনি বড়মানুষ হয়েও তাঁর চাল-চলনে নিজের দেহাতী জন্মকে অতিক্রম করে যাননি। রোজই আমাদের বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে তিনি দলবল নিয়ে বেড়াতে যেতেন। অনুচরদের সঙ্গে তাঁর পোশাকের পার্থক্য কিছু বোঝা যেত না। বড়লোক যখন তখন গাড়ী একটা তাঁর ছিল, কিন্তু সেটা জুড়িগাড়ী বা মোটরগাড়ী নয়, এক্কাগাড়ী। অবশ্য তার ঘোড়াটা বেশ তেজী আর বলবান্ ছিল, এবং এক্কাগাড়ীও মূল্যবান্ লক্ষ্ণৌএর ছিটে মণ্ডিত ছিল। লোকটি সব জড়িয়ে বেশ interesting type ছিলেন।

এহেন জায়গায় লোকের একটু ভীত সন্ত্রস্ত এবং একলা লাগার কথা, কিন্তু আমাদের সে-সব বালাই ছিল না। বাড়ীতে অনেক লোকজন ছিল এবং বাবা ও মেসোমশায় দুজনেই অসমসাহসিক ছিলেন, এবং তাঁদের উপর বিশ্বাসও ছিল আমাদের অগাধ। খেলার সাথী বাইরের কেউ না থাকলেও নিজেরাই ত বেশ কয়েকজন ছিলাম। মেয়েলী পুতুল খেলার দিকে নজর খুব বেশী ছিল না আমার ভাইদের ও তাদের বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেই আমার দিন কাটত বেশীর ভাগ। পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল তেমনি, বছর দশ-এগারো পর্য্যন্ত হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে হল এই যে, যখন শাড়ী পরতে আরম্ভ করলাম তখন আশে-পাশের লোকেরা হাঁ হয়ে গেল এবং বলাবলি করতে লাগল, "দেখেছ, ওদের বাড়ীর ছেলেটাকে কি রকম মেয়ে সাজিয়েছে!"

এই বাড়ীর এতবড় compound পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সম্ভব ত ছিল না। তবে একটা মস্তবড় গেট ছিল। দুইধারে দুই বিরাট স্তম্ভ, তার শীর্ষে দুটি সিংহের মূর্ত্তি।

এই এলাকার লোকেরা বড় বাড়ীটাকে বলত, "শেরওয়ালি কোঠী"। "শের"রা অবশ্য কাকে পাহারা দিতেন জানি না, আমরা তাঁদের পাদদেশে বসে খেলা জমাতাম। সকালে উঠে নেপালবাবুর সঙ্গে ছেলেমেয়েরা মিলে বেড়াতে বেরোতাম, স্বচ্ছন্দে মাইলের পর মাইল হেঁটে আসতাম। বয়সের অনুপাতে হাঁটতে পারতাম খুব। তারপর খাওয়া-দাওয়া পড়াশুনা ছিল। বিকেলে খেলা টেলা হত বেশীর ভাগ। সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা নিরাপদ ছিল না। তখন বড় বারান্দায় শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে নেপালবাবুর কাছে গল্প শুনতাম। খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন তিনি। বিদেশী নাম-জাদা উপন্যাস অনেকগুলিই শুনেছিলাম তাঁর কাছে, যেমন Hugoর Les Miserables, Stevenson-এর Treasure Island, George Elliotএর Romola প্রভৃতি। এই সময় থেকেই গল্পবলার বীজটা আমার মনে পোঁতা হয়ে যায়, বড় হয়ে তাই গল্প লিখতে আরম্ভ করি।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ আমের জন্য বিখ্যাত। খুব ভাল আম পাওয়া যেত এলাহাবাদেও খুব সস্তা। আমাদের বাড়ীর সামনের বড় রাস্তা দিয়ে ঝাঁকা করে আর গরুর গাড়ী করে আম বিক্রী করতে নিয়ে যেত। আমরা অনেক সময় আম কেনার জন্য গেটের স্তম্ভের পাদদেশে বসে থাকতাম। সঙ্গে বড়রা একজন কি দুজন থাকতেন। আমাদের কাজ ছিল আম চেখে দেখা মিষ্টি না টক্। সে এক বিরাট ব্যাপার। ঝাঁকা পর ঝাঁকা নামান হচ্ছে এবং আমরা ছেলেমেয়ের দল চেখেই চলেছি। এতে বাধা-নিষেধও ছিল না, ব্যাপারীরা কোনো আপত্তিও অনুভব করত না। চাখতে চাখতে ত পেট সম্পূর্ণ ভরে যেত। তারপর হয়ত এক ঝাঁকা আম কেনা হল। এরকম কেনার কথা সেকালে কেউ ভাবতে পারত না। চাকর, ঝি, জমাদার, চৌকিদার সবাইকে ভাগ দেওয়া হত। এক ঝাঁকা আম শুনতে খুব অনেকখানি শোনায় কিন্তু আমাদের বাড়ীতে ঐ এক ঝাঁকা শেষ হতে খুব বেশী সময় লাগত না।

এইরকম সময়ের কাছাকাছি একবার আমরা বাবার সঙ্গে সবাই মিলে কাশী বেড়িয়ে এলাম। বাবা প্রায় সব বৎসরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে যেতেন। এবার কংগ্রেস কাশীতে হয়েছিল। তখনকার কালে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক রকম conference হত, তার মধ্যে একটি ছিল Theistic conference। এবারেও সেটা কাশীতে হবে ঠিক হল। শোনা গেল এই সম্মিলনীর জন্য Benares Cantonmentএ একটা খুব বড় স্কুল বিল্ডিং ভাড়া নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের চেনাশোনা অনেকেই যাচ্ছেন। স্থির হল আমরাও সকলে যাব। যথাকালে কাশীতে গিয়ে অবতীর্ণ হওয়া গেল। ক'দিন যে ওখানে ছিলাম ঠিক মনে পড়ে না। যাত্রীনিবাসে চেনা লোক অনেকেই ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাবা শ্রীপ্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়কে ওখানে প্রথমে দেখি। তাঁর আশ্চর্য্য জ্যোতির্ম্ময় চেহারা দেখে খুব অবাক্ হয়েছিলাম। ওখানে সকালে সর্ব্বদা উপাসনা ও গান হত। একদিন একজন সুকণ্ঠ ছেলে গান করল, "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।" রবীন্দ্রনাথের এই গানটি তখন হয়ত সদ্য রচিত, আগে কখনও শুনিনি। মনে হল, এমন গান আমার জীবনে আর আমি কখনও শুনিনি। সেই অতি বালিকা-বয়সে শোনা গান এখনও যেন আমার কানে শুনতে পাই।

বেড়ান হত খুবই। কখনও দল বেঁধে, কখনও বাড়ীর ক'জনে। সারনাথ তখন সবে excavate করা শুরু হয়েছে। অশোক স্তম্ভের সিংহশীর্ষ columnটি আধভাঙা অবস্থায় মাটির উপর এনে রাখা হয়েছে। স্তম্ভের নাম অশোক স্তম্ভ শুনে আমার ভাই অশোক মহা খুশী। কাছে একটা বেল গাছ ছিল। তার তলা থেকে একটি ছোট বেল তুলে এনে একটা সিংহের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে সে নিজের দখলী স্বত্ব প্রমাণ করে রাখল।

কাশীর বিখ্যাত ঘাটগুলি, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির, এসব দেখেছিলাম। তাছাড়া নাগরী

প্রচারিণী সভার বাড়ী, অসম্পূর্ণ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী, এসবও দেখেছিলাম। কংগ্রেসের অধিবেশন দেখতেও দিন-দুই গিয়েছিলাম। বিরাট মণ্ডপে দেশ-বিখ্যাত অনেক নেতাকে দেখলাম, যেমন গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি। সরলা দেবীকেও বোধহয় সেই প্রথম দেখলাম। গুজরাটের মহিলা প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা বিদ্যা রমনভাই বাচ্চা কোলে করে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। দেখে অনেকে খুব কৌতুক অনুভব করে-ছিলেন। আর এক রূপবতী মহিলা উঠে দাঁড়ালে পিছন থেকে মন্তব্য শোনা গেল, "আরে, ও দেখতে সুন্দর বলে সামনে ঠেলে দিয়েছে, নইলে ও বক্তৃতার কি জানে?"

আর একদিন কাশীর গলিঘুঁজিওয়ালা এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে এক কাণ্ড ঘটে গেল। গাড়ীতে সেদিন মহিলারা এবং বাচ্চাকাচ্চারাই ছিল, বয়স্ক পুরুষ মানুষ কেউ সঙ্গে ছিল না। একটা গলির মধ্যে হঠাৎ গাড়ীটা থেমে গেল। একটা লোক লাফিয়ে গাড়ীর কোচবাক্সে উঠে গেল। তারপরেই ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ, গাড়ীর ছোকরা চালকটা চেঁচাতে লাগল, "মাইজি, দেখ, আমার চাবুক কেড়ে নিচ্ছে।" হানাদার পরুষ-কণ্ঠে বলল, "মাইজি আমার কি করবে রে?"

আমাদের সঙ্গে এক মারাঠী মহিলা যাচ্ছিলেন, তাঁর নাম মিসেস্ কেলকার। তিনি হঠাৎ গাড়ীর দরজা খুলে পাদানীতে নেমে দাঁড়ালেন, এবং হতভম্ব ছোক্‌রা গাড়োয়ানের হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে গুণ্ডা মহারাজের চোখে মুখে বেদম প্রহার করতে লাগলেন। গর্জ্জন করে বলতে লাগলেন, "উৎরো, উৎরো।" লোকটা ঝট্‌পট্ নেমে পড়ল। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তারা খুব হাততালি দিতে লাগল। আমরা অতঃপর নিজেদের গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করলাম।

ক্রমশঃ

সিরাজ মিয়া ও যাত্রা সম্রাট

অজিতকৃষ্ণ বসু

যাত্রা সম্রাট উমানাথ ঘোষাল 'দক্ষযজ্ঞ' পালাগান শুরু করেছিলেন সন্ধ্যার অনেক পরে, যেন বাড়িতে বাড়িতে মা লক্ষ্মীরা বাড়ির সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে নিজেদের খাওয়া দাওয়া সেরে এসে একটুও বঞ্চিত না হয়ে প্রথম থেকেই শুনতে পারেন, এবং পঞ্চাঙ্ক নাটকটি যেন এমন সময় শেষ হয় যখন ভোর হবার আর বেশী দেরি নেই। ঢাকা শহরের পল্লীপ্রতীম 'গেণ্ডারিয়া' ৬দীননাথ সেনের বাড়ির মাঠে সামিয়ানার তলায় ১৯২৭ সালের সেই যাত্রাভিনয় রাত্রির কথা আমার যে আজও বিশেগভাবে মনে আছে, তার প্রধান কারণ দুটি—সিরাজ মিয়া, এবং সম্রাট সাজাহান।

প্রথমে বলি সিরাজ মিয়ার কথা—আমরা গেণ্ডারিয়ার প্রতিবেশী সিরাজ মিয়া। আমি তার আগে একবার ঘোষালের দলের 'দক্ষযজ্ঞ' দেখেছিলাম, কিন্তু সিরাজ মিয়া দেখেনি তাই দেখতে যাবার আগেই নাটকের মূল কাহিনীটি আমার মুখে শুনে নিয়েছিল, আশ্চর্য কৌতূহল-রসিক অনুসন্ধিৎসু মানুষ ছিল এই লেখাপড়া না-জানা অথবা অল্প জানা সিরাজ মিয়া। তার এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত কৌতূহলরসিকতা এবং অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ আরেকবার পেয়েছিলাম সেই 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয় রাত্রির মাস দুই আগে, গেণ্ডারিয়া অঞ্চলেই, আমাদের বাড়ির দক্ষিণে গৌর পিওনের বাড়ির উঠোনে হিন্দী 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটিকাভিনয় উপলক্ষে। আমাদের পাড়ার ডাক বিলি হত পাড়ার সীমান্তবর্তী 'ফরিদাবাদ' ডাকঘর থেকে। গৌর পিওন সেই ডাকঘরের ভূতপূর্ব (অর্থাৎ পেন্‌শনপ্রাপ্ত) ডাকহরকরা, আমরা 'গৌর' নামটির পর তার পৈতৃক পদবির বদলে পেশাগত 'পিওন' পদবিটাই শুধু জানতাম এবং ব্যবহার করতাম। যে সময়কার কথা লিখছি তখন গৌর পিওন সম্পন্ন গৃহস্থ—তার সম্পন্নতার উৎস কৃষিকার্য এবং গো ও মহিষ পালন। গৌর পিওন ছিল বিহারের কোনো একটি গ্রামের মানুষ, বাল্য থেকেই ঢাকায় প্রবাসী, হিন্দী তার মাতৃভাষা হলেও বাংলা সে এবং তার ছেলেরা প্রায় আমাদেরই মতো সহজে বলতে পারত এবং ভালবাসত। এই গৌর পিওনকেই কেন্দ্র করে আমাদের পাড়ায় একটি হিন্দীভাষী (বিহারী) এলাকা গড়ে উঠেছিল। এই হিন্দীভাষী সমাজের মাতব্বর ছিল গৌর পিওন।

গৌর পিয়নের সবচেয়ে ছোট ছেলে মাত্র দশ বছর বয়স্ক বালক রাজারাম যখন মাত্র চার আনার (বর্তমান মুদ্রায় পঁচিশ পয়সা) লটারি টিকেট কিনে একশ টাকা পুরস্কার পেল, তখন গৌর পিওনের ভক্ত হিন্দীভাষী সমাজে সাড়া পড়ে গেল, কারণ এত অল্প বয়সে এমন অসাধারণ কৃতিত্ব ক'টা দেখা যায়? এই ক্ষণজন্মা বালকের অত্যাশ্চর্য বিজয়-গৌরবের সম্মানে একটি উৎসবানুষ্ঠান যে নিশ্চয়ই করা উচিত এ বিষয়ে কারও অমত রইল না। তারপর খবর পেলাম—যখন আমার কাছে আর্জি পেশ হল হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমি যেন সাহায্য করি—গৌরভক্ত হিন্দীভাষী সমাজ গৌরাত্মজ রাজারামের সম্মানে গৌর পিওনের বাড়ির মেটে উঠোনে হিন্দী 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয় করবে। এবং এই অভিনয়ানুষ্ঠানে যে টাকা লাগবে, তা দেবার গৌরীসেন হবে পুত্রগরবী গৌর পিওন। বংশের মুখোজ্জ্বলকারী পুত্রের সম্মানে মুক্তহস্তে খরচ করতে সে পিছ পা নয়।

এখানে বলে রাখি এই হিন্দীভাষী (অথচ বাংলা জানা) সমাজের প্রায় সবাই ছিল বাংলা যাত্রাগান শুনে অভ্যস্ত এবং যাত্রাসম্রাট উমানাথ ঘোষালের গুণমুগ্ধ ভক্ত। সুদূর অতীতের স্মৃতিকথা লিখতে লিখতে আমার মনে হচ্ছে উমানাথের বংলা যাত্রাভিনয়ের স্মৃতিই এদের

হিন্দী যাত্রাভিনয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় ওদের কারও হারমোনিয়াম ছিল না, ওরা কেউ হারমোনিয়াম বাজাতেও জানত না, তাই ওদের 'প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকে আমি হারমোনিয়াম বাজাবার অমূল্য এবং অবিস্মরণীয় সুযোগ পেয়েছিলাম। আরো বলি, আমি (বা অন্য কোন হারমোনিয়াম বিশারদ) হারমোনিয়াম না বাজালেও ওদের যাত্রাভিনয়ের তেমন কিছু লোকসান হত বলে আমার মনে হয় না, এবং ওদের প্রত্যেকটি গানে ওরা নিজেরাই সুর দিয়ে নিয়েছিল, সুরের ব্যাপারে আমার (বা অন্য কোনো সঙ্গীত বিশারদের) সহায়তা তাদের দরকার হয় নি। নাটকের সংলাপ, নাট্য পরিচালনা, গান এবং সুর রচনা প্রভৃতি সব কিছুই ছিল ওদের নিজেদের ভেতর সীমাবদ্ধ। কিন্তু ওদের বোধ হয় মনে হয়েছিল হারমোনিয়াম তাদের যাত্রাভিনয়ের মর্যাদা (প্রেস্‌টিজ) বাড়াবে বিশেষ করে সে যন্ত্র যদি কোন 'বাবু' দ্বারা বাদিত হয়। তাই বাবু সমাজ থেকে আমার ডাক পড়েছিল। ওরা জানত আমাদের বাড়িতে একটি হারমোনিয়াম আছে, এবং আমি তাকে বাজাতে জানি। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে কয়েক বিঘা চাষের জমি ছিল, তাতে ভাগচাষী রূপে পালাক্রমে প্রায় সারা বছরই নানারকমের ফসল ফলাত ঝগড়ু, ঝরিয়া আর মথ্‌খন (অর্থাৎ মাখন)— বিহার থেকে আগত তিন সহোদর ভাই। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটিকাটির কাঠামো সংলাপ এবং পরিচালনায় প্রধান অংশ ছিল ঝগড়ুর, এবং তার ছিল মহাদেবের ভূমিকা– 'দক্ষযজ্ঞ' যাত্রাভিনয়ে যে ভূমিকা ছিল যাত্রাসম্রাট উমানাথ ঘোষালের। মেজ ভাই ঝরিয়া হয়েছিল হিরণ্যকশিপু, দৈত্যরাজ। ছোট ভাই মথ্-খনকে দেওয়া হয়েছিল প্রায় নির্বাক জল্লাদের ভূমিকা, কারণ মৃত সৈনিকের কোনো ভূমিকা প্রহ্লাদ চরিত্র নাটিকায় ছিল না। মথ্‌খনের ছোট্ট ছেলেটা একেবারেই বাপ-কা বেটা হতে পারে নি, দৈত্যরাজ পুত্র প্রহ্লাদের ভূমিকায় সে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছিল, 'শূলী চরনেকে লিয়ে যাতে হ্যায় হম্', 'হে গোবিন্দ রায় শরণ' (এটি বিখ্যাত ভজন, ঝগড়ু কোম্পানির রচিত বা সুর সংযোজিত নয়) প্রভৃতি গানগুলিও সে ভক্তিভরে কেঁদে কেঁদে (অর্থাৎ কাঁদ কাঁদ ভঙ্গীতে) ভালই গেয়েছিল।

কিন্তু সে সব কথা থাক, এবার সিরাজ মিয়ার কথায় ফিরে আসি। সিরাজ মিয়া যেমন ছিল আমার অতি নিকট প্রতিবেশী—আমাদের বাড়ির দক্ষিণের জমির পূর্ব সীমানার ঠিক ওধারেই তার কুটির—তেমনি ছিল গৌর পিওনেরও, কারণ আমাদের দক্ষিণের জমির দক্ষিণ সীমান্তের পর একটি রাঙামাটির পথের দক্ষিণেই গৌর পিওনের বসত বাড়ি আর ক্ষেত খামারের শুরু। আমাদের পাড়ার চিঠি পত্র বিলি করা পিওন ওসমান আলির মতোই গৌর পিওনকে সিরাজ মিয়াও বলত গৌর চাচা, এবং গৌর পিওনের প্রাণও সে ডাকে সানন্দে সাড়া দিত।

ওসমান আলির কথা যখন উঠেই পড়ল, তখন তার পরিচয় ও একটু দিয়ে নিই।

গৌর পিওনকে সিরাজ মিয়া চাচা বলত পাড়া সম্পর্কে, ওসমান মিয়া চাচা বলত ডাকঘর সম্পর্কে।

আমাদের পাড়ার পূর্বদিকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে লাইন, তার পূর্বদিকে অন্যতম গ্রাম জুড়াইন। তারই বাসিন্দা ওসমান আলি। ফরিদাবাদ ডাকঘরে যুবক বয়সে ডাক-পিওন গিরিতে তার হাতেখড়ি হয়েছিল গৌর পিওনের হাতে, এ গল্প শুনেছিলাম ওসমানের মুখেই। ওসমান মিয়া ইংরাজী স্কুলে পড়ে কিছু কিছু ইংরাজী শিখেছিল তা জানি—মোটামুটি পড়বার মতো এবং অন্ততঃ নিজের নামটা সই করবার মতো—কিন্তু সে সেকালের এন্‌ট্রান্‌স্ বা স্কুল ফাইনাল বা অন্য কোনও পরীক্ষা পাশ করেছিল কিনা জানি না; সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করবার কথা তখন আমার মনেই হয় নি।

ওসমান যখন ফরিদাবাদ ডাকঘরে ডাকপিওন হয়ে ঢুকল, তখন চিঠি বেছে আর সাজিয়ে নিয়ে তারপর বাড়ি বাড়ি সেই সব চিঠি বিলি করার কাজটা তার বড় বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর, এক ঘেয়ে বলে মনে

হয়েছিল প্রথম প্রথম। ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে 'ড্রাজারি', ডাক বিলি করার কাজটাকে ঠিক তাই বলেই মনে হয়েছিল যুবক ওসমানের। অর্থাৎ একাজটা নিতান্তই পেটের দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে, কাজটার মধ্যে কোনো রকম আনন্দ বা আত্মপ্রসাদ নেই, একাজ করা যেন কোনোরকমে দিনগত পাপক্ষয় মাত্র। কিন্তু তার পুরো দৃষ্টিভঙ্গীটাই বদলে দিয়েছিল ডাক বিলির রোমান্টিক যাদুকর গৌর পিওন।

ডাক-পিওনের জীবন দর্শন সদ্য-পিওন যুবক ওসমান আলিকে বুঝিয়ে দিয়েছিল গৌর পিপন, সেই বোঝানো শুধু বোঝানো নয়, অনুপ্রাণিত করে দেওয়া। গৌর পিওন বলেছিল ডাক-পিওনকে শুধু একটা ভাবাবেগ হীন, অনুভূতিহীন চিঠি বিলি করে বেড়াবার যন্ত্র হলে চলবে না, তাকে হতে হবে একজন দরদী মানুষ, যে-সব পরিবার তার বীটে অর্থাৎ চিঠিপত্র বিলি এলাকার মধ্যে পড়বে, তাদের সঙ্গে থাকবে তার হৃদয়ের সম্পর্ক, সহানুভূতি, একাত্মতা।

"তুমি কত দেশ বিদেশ থেকে লেফাফার ভরা কাগজে আর খোলা পোস্টকার্ডে লেখা বার্তা কত বয়ে এনে কত বাড়িতে এনে পৌঁছে দিচ্ছ, ওসমান।" বলেছিল অভিজ্ঞতার আর অনুভূতিতে প্রবীন গৌর পিওন। "একি একটা কম দায়িত্ব আর কম গৌরবের কথা? সকালে আর বিকেলে যখন চিঠি বিলির সময়, তখন তোমার চলার পথের দুদিকের বাড়িতে বাড়িতে কত মানুষ প্রতীক্ষা করে থাকেন কখন এসে চিঠি পৌঁছে দিয়ে যাবে ওসমান পিওন। ভেবে দেখ তুমি তাঁদের কত প্রিয়, তাঁদের দূরের প্রিয়জনের সঙ্গে যোগসূত্র তুমি। কত মা-বাবাকে তুমি এনে দিচ্ছ প্রবাসী সন্তানের খবর, কত স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দিচ্ছ প্রবাসী স্বামীর চিঠি। কত হৃদয়কে এভাবে তৃপ্ত করছ রোজ দুবেলা। এই সূত্রে, ওসমান, তুমি তাঁদের আত্মীয়, তাঁরা তোমার আত্মীয়। এই আত্মীয়দের সেবা করছ তুমি, এইটে সর্বদা মনে রেখো।"

মনে রেখেছিল ওসমান আলি। তারপর থেকে সে ডাকপিওনগিরিকে আর বিরক্তিকর সরকারী চাকরি বলে ভাবেনি কখনও, চিঠি বিতরণে সে উপভোগ করেছে পরিচিত প্রিয় মানুষদের সেবা করার আনন্দ। গৌর পিওনের পিওনগিরির কথা আমার মনে নেই, মনে রাখবার মতো নজর আমার হবার আগেই সে পেন্‌শন নিয়েছিল। কিন্তু ডাকপিওনের কথা ভাবলেই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওসমান মিয়ার ছবি। দোলাইগঞ্জ রেল স্টেশন (পাকিস্তান হবার পর যার নাম হয়েছে পাড়ার নামানুসারে গেণ্ডারিয়া) থেকে একটি লম্বা সোজা রাস্তা (দোলাইগঞ্জ স্টেশন রোড) আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গিয়ে পড়েছিল আমাদের দক্ষিন গেণ্ডারিয়া পাড়ায় পশ্চিম সীমান্তে ফরিদাবাদ রোডের বুকে। এই পুরো রাস্তাটা ছিল ওসমান মিয়ার চিঠি বিলির এলাকা, এই রাস্তার দুধারের প্রত্যেকটি বাড়িতেই ওসমান নামটি ছিল সবারই প্রিয়। ভারি মিষ্টি মানুষটি, মুখে নির্মল হাসি ফুটে আছে সর্বদা, প্রত্যেক বাড়ির মানুষদের পরিচয় তার নখদর্পনে, আর কুশল প্রশ্নে সত্যিকারের আন্তরিকতা। গেণ্ডারিয়া ছিল প্রায় পুরোপুরি হিন্দু এলাকা, শুধু আমাদের বাড়ির পুবদিকে কয়েকটি দরিদ্র মুসলিম পরিবারের 'বসতি'—বস্তি নয়। চিঠি বিলির মাধ্যমে এতগুলি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে প্রীতিমধুর অন্তরঙ্গতার ফলে আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, পুজো-পার্বন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকখানি ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিল ওসমান আলি। ভিন্ন ধর্মের প্রাচীর বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি কিছুমাত্র, এতগুলো সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবারের ছোটবড় সবার স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসায় ধন্য হয়ে সে গৌর চাচার প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে নি।

গৌর চাচার বাড়ির উঠোনে হিন্দী যাত্রা শুনতে আসে নি ওসমান মিয়া। বোধ হয় সে খবর বা আমন্ত্রণ পায় নি। সে এসেছিল যাত্রা সম্রাটের 'দক্ষযজ্ঞ' দেখতে, দেখেছিল গৌর চাচার পাশেই বসে।

কিন্তু এবার ফিরে যাই সিরাজ মিয়া আর গৌর পিওনের উঠোনে হিন্দী যাত্রানুষ্ঠান প্রসঙ্গে। বিহার্শালী

তোড়জোড়ের শোরগোল শুনে সিরাজ বলল, "গৌর চাচার পোলায় লটারি জিতল, তোমরা ঠ্যাটার করবা, আমরা কিছু করুম না?" সিরাজ যেমন হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে পাড়ার সবারই প্রীতিভাজন, গৌর পিওনও তেমনি। এমন একটা উপলক্ষ আর কোনোদিন আসবে কিনা বলা যায় না তো। সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া চলে না সিরাজের আগ্রহ দেখে গৌর পিওন খুব খুশী—তার ছোট ছেলের সম্মান অনুষ্ঠানে শুধু দর্শকের ভূমিকা নিয়ে খুশী থাকতে রাজি না হয়ে সক্রিয় অংশ নেবার দাবি করছে সিরাজ। এ দাবি মানতেই হবে।

"নিশ্চয় করবা। ঝগড়ুর সগে ঠিক কইরা লও, সিরাজ।" বলল গৌর পিওন, কারণ অনুষ্ঠানের পরিচালক ঝগড়ু। ঝগড়ুর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা কি হয়েছিল সিরাজের তা জানি না, আমি শুধু তার ফলটুকু দেখেছিলাম আর খুব উপভোগ করেছিলাম প্রহ্লাদ চরিত্র যাত্রাভিনয়ের সন্ধ্যায়। প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের দুই অর্ধের মাঝখানে 'কমিক ইনটারলিউড' হিসেবে ছোট্ট একটি কৌতুক নক্‌শা অভিনয় করেছিল সিরাজ মিয়া, তার পাসের প্রতিবেশী ফন্নু মিয়া, ফন্নু মিয়াব ভ্রাতুষ্পুত্র সফর (ওরফে 'সফইয়া') এবং ঝগড়ু। নকশাটির পরিকল্পনা বা রচনায় সিরাজ আর ঝগড়ুর অবদানের অনুপাত কি রকম ছিল বলতে পারি না, কিন্তু সেটি খাপছাড়া উদ্ভট্‌ব সত্ত্বেও—অথবা হয় তো ঐ উদ্ভটত্বের জন্যেই—খুব উপভোগ্য হয়েছিল। নক্‌শাটির নাম 'লে-ভাগা'। নাম ভূমিকায় নেমে প্রচুর হাসিয়েছিল ঝগড়ু, যে প্রচুর রুদ্ররসের সৃষ্টি করেছিল 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'তে মহাদেবের ভূমিকায়।

নক্‌শাটির কাহিনী এই রকম। স্টেশনে ট্রেন থেকে একটা ছোট্ট স্যুটকেস হাতে নামলেন এক অতি সৌখীন ভদ্রলোক (সিরাজ মিয়া)। ডাকলেন 'কুলি! কুলি! কিন্তু সেদিন হরতাল। একটিও কুলি নেই, একটিও ঘোড়ার গাড়ি নেই। এমন সময় মাথায় পাগড়ি বাঁধা হাবাগোবা চেহারার একটি লোক (ঝগড়ু) এসে হাজির। ভদ্রলোক শুধালেন, "তোমার নাম কি?"

লোকটি বলল, "লে-ভাগা।"

"ভারি আজব নাম দেখছি।"

"বাপমানে দিয়া, হুজুর।"

অর্থাৎ বাপমারদেওয়া এ নাম, এর ওপর তার কোনো হাত ছিল না। এই কথা বলে মৃদুস্বরে বিড় বিড় করে লোকটা একটা মন্তব্য জুড়ে দিল।

"জ্যায়সা নাম, ঐ সী কাম।" (অর্থাৎ যেমন নাম, তেমনি কাজ।)

মন্তব্যটা সেই স্যুটকেস বিড়ম্বিত সৌখীন ভদ্রলোকটির কানে গেল কিনা জানি না; কিন্তু আমরা ঠিকই শুনলাম, এবং শুনে কৌতুক আর কৌতূহল বোধ করলাম।

পুরো সংলাপটি দেবার দরকার নেই, সংক্ষেপে বলি ভদ্রলোক বললেন, "এই স্যুটকেস্‌টা তুমি নেবে?" (তাঁর মনের ভাবটা এই যে লোকটা তার সঙ্গে স্যুটকেসটাকে বয়ে নিয়ে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেবে।)

লোকটা লুব্ধ দৃষ্টিতে স্যুটকেসটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপ হুকুম করনেসেই লে লেঙ্গে, হুজুর।"

হুজুর কুলি পেয়েছেন,, ভেবে খুশী হয়ে যেমনি বললেন, "লে লেও" অমনি ছোঁ মেরে স্যুটকেসটিকে নিয়ে ভেগে গেল লে-ভাগা (অর্থাৎ ঝগড়ু)। এক মুহূর্ত থমকে থেকে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ডাকলেন "পুলিশ! পুলিশ!"

সঙ্গে সঙ্গে ইয়া গোঁফ নাকের তলায় লাগিয়ে পুলিশ কনস্টেবল্‌বেশী সফর এসে হাজির। চোর কোনদিকে গেছে জেনে নিয়ে সে ছুটে মাল শুদ্ধ তাকে ধরে নিয়ে এলো। তারপর ফরিয়াদী ভদ্রলোক আর আসামী লে-ভাগাকে হাজির করল হাকিম সাহেবের (ফন্নু মিয়া) এজলাসে। হাকিম সাহেব খুব অভিনিবেশ সহকারে কনস্টেবল্‌, ভদ্রলোক আর লে-ভাগার বক্তব্য শুনলেন এবং তাদের জবর ভঙ্গীতে জেরা করে যা যা জানবার জেনে নিলেন।

ফন্নু মিয়া হাকিমের ভূমিকায় অভিনয় করতে

রাজি হবার আগেই পরিষ্কার বলে নিয়েছিল থিয়েটারী ভাষায় সে অভিনয় করতে পারবে না (ভদ্রলোক বেশী সিরাজ মিয়ার মতো), যেমন ভাষায় সে হরদম কথা বলে হাকিমের ভূমিকাতেও সে তার ব্যতিক্রম করতে রাজি নয়। সেই চুক্তি অনুসারে বিশুদ্ধ ঢাকাই বাঙাল ভাষায় (এবং 'হালায়' অব্যয়টির প্রচুর প্রয়োগ করে) সে যে অভিনব রায় দিয়েছিল, তার চুম্বক এই রকম।

"ওহে ভদ্রলোক, তুমিই এই লোকটিকে স্যুটকেসটা নিতে বলেছিলে, সে তাই নিয়েছে। তোমাকে সে তার নামও বলেছিল লে-ভাগা, যেমন নাম তেমনি কাজ সে করেছে। তুমি মিথ্যা চোর অপবাদ দিয়ে গ্রেপ্তার করে এনে এই নিরীহ ভাল মানুষটার মানহানি আর হয়রানি করেছ। এই অপরাধে আমি তোমার একশ টাকা জরিমানা করলাম। এই টাকা তুমি জলদি ওকে দিয়ে দাও।"

ভদ্রলোক সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাতেই হাকিম চটে গিয়ে জরিমানা বাড়িয়ে হাজার টাকা করে দিলেন, অনাদায়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, এবং শাসিয়ে দিলেন জরিমানা দিতে দেরি করলে বা আবার প্রতিবাদ করলে জরিমানা এবং অনাদায়ে কারাদণ্ডের মেয়াদ বেড়ে যাবে।

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে তৎক্ষণাৎ লে-ভাগাকে হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে স্যুটকেসটা ফেরৎ নিতে গিয়েই প্রচণ্ড হাকিমী ধমক খেলেন: 'খবরদার, ওটা এখন লে-ভাগার সম্পত্তি, ওটার ওপর তোমার অস্ত হক নেই। এই বলে স্যুটকেসশুদ্ধ লে-ভাগাকে ভাগিয়ে দিলেন হাকিম সাহেব। সেই সঙ্গে 'লে-ভাগা' কৌতুক নক্সাটির সমাপ্তি ঘটল আমাদের প্রচুর হাসিয়ে। তারপর মঞ্চ (অর্থাৎ মেটে উঠোনের ওপর পাতা সতরঞ্জি) ছেড়ে এসে আবার দর্শক মহলে বসল সিরাজ মিয়া, ফন্নু মিয়া আর সফর। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম মনে আছে। ওরা এর আগে অভিনয় কখনো করে নি, গৌর পিওনের ছোট ছেলের অসাধারণ কৃতিত্ব উপলক্ষে ওদের এই হঠাৎ গাঁজিয়ে ওঠা শখ। তা যে এমন মজা দিতে পারবে, কে ভাবতে পেরেছিল? আর একটু পরেই শুরু হল 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দ্বিতীয় ভাগ। এবং যথাকালে শেষও হল, কিন্তু একটা আশ্চর্য মিষ্টি রেশ থেকে গেল মনে, যা মন থেকে এখনও মিলিয়ে যায় নি, ঢাকা শহরে ইহাহিয়াবাহী তাণ্ডবের পর আরো বেশী করে মনে পড়ছে।

উমানাথ ঘোষালের দলের যাত্রা দেখেই গৌর পিওনের হিন্দী মাতৃভাষী ভক্তদল হিন্দী যাত্রাভিনয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, কিন্তু ঘোষালের দলের অনুকরণ করে হিন্দী যাত্রায় কোনো পুরুষ দাড়ি গোঁপ কামিয়ে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করে নি। অথচ তাদের স্ত্রীলোকদেরও তারা অভিনয়ের আসরে নামাতে রাজি ছিল না। তাই তাদের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটিকায় স্ত্রী ভূমিকা যা ছিল তা নেপথ্যে, মঞ্চে কোনো স্ত্রী চরিত্রের প্রবেশ ঘটেনি। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে রাণী কয়াধু পুত্র প্রহ্লাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে কি রকম বিলাপ করেছেন, আমাদের তা মঞ্চে এসে শুনিয়েছে কোনো পুরুষ চরিত্র। স্ত্রী ভূমিকা সমস্যা সমাধানের অতি সরল এবং উত্তম পন্থা।

গোঁফ কামিয়ে স্ত্রী ভূমিকায় নামতে রাজি হয় নি ঐ গৌরভক্ত হিন্দী সমাজের কোনো পুরুষ। একথা বলতে গিয়েই কৌতুকের সঙ্গে মনে পড়ছে প্রহ্লাদ চরিত্রে নৃসিংহ অবতারের ভূমিকায় নেমেছিল যে ভোলা পাণ্ডে ওরফে ভোলা পালোয়ান (কুস্তি করে বেশ তাগড়া চেহারা বানিয়ে সে পালোয়ান উপাধিটি পেয়েছিল), সেই কিন্তু ওদের প্রধান আমোদের পরব হোলি উৎসবে চুনরী সাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনে গোপবালা সেজে হোলি মিছিলের আগে আগে নৃত্য ভঙ্গীতে এগোতে এগোতে গলা ছেড়ে অগোপীজনোচিত কণ্ঠে গাইত:

"সাঁবরিয়াকে রঙ্গঢঙ্গমে
ক্যায়সে হোলি খেলুঁ রে?

অর্থাৎ দুষ্টু শ্যামলিয়া এমন রঙ্গ ঢঙ্গ করছে, এর ভেতর হোলি খেলব কেমন করে?"

তার পশ্চাৎবর্তী এবং পশ্চাৎবর্তীনীরা (এরা সংখ্যায় অল্প কিন্তু শূন্য নয়) ঢোলক, করতাল, হাততালি প্রভৃতি সহযোগে তার গানের দোহারকি করতে করতে অগ্রসর হত। মাঝে মাঝে কীর্তনের আখরের মতো হোলি গানেও এমন আখর দিত কেউ কেউ, যা খুব শালীনতা সম্মত নয়, কিন্তু এই হোলির মরশুমে সেই অশালীনতা কেউ যেন গায়েই মাখত না, হয়তো গায়ে মাখবার মতো খেয়ালই করত না। এখন ভাবছি ভোলা পালোয়ান যদি এভাবে হোলি মিছিলে গোপবালা সেজে নেচে নেচে এগোতে পারে, তাহলে ওদের যাত্রাভিনয়ে পুরুষকে মেয়ে সাজালে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো ?

সিরাজ মিয়া এবং তার সম্প্রদায় হোলির গানে বা রঙের খেলায় প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও হোলি মরশুমের আনন্দের মেজাজ তাদেরও মনকে রাঙিয়ে তুলত অনেকখানি, বিশেষ করে চূর্ণ আবীর আর তরল রঙে রঙীন হোলিওয়ালারা যখন হোলি-উল্লাসে সমবেত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠত :

"সা-রা-রা-রা, দেখ্ চলি যা,
দেখ্ চলি যা, সা-রা-রা-রা" ইত্যাদি।

সেই সোল্লাস চীৎকারে সুরের ওঠানামা ছিল না, ছিল শুধু ছন্দ আর তাল আর কণ্ঠস্বরের ওজন-পরিবর্তন।

'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটিকায় নৃসিংহ অবতারের ভূমিকায় ভোলা পালোয়ানের সিংহ-গর্জন, আর উরুর ওপরে রেখে হিরণ্যকশিপু সংহার সিরাজ মিয়াকে এত অভিভূত করেছিল যে অভিনয়ের পরদিন বিকেলে স্টেশনের ধারে বেড়াবার সময় সে আমাকে ধরেছিল ঐ ব্যাপারটা তাকে একটু বুঝিয়ে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, নাটিকার পুরো কাহিনীটার একটু বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা সে চায়।

কিছুদিন আগেই ঢাকা শহরে সাড়া জাগিয়ে গিয়েছিল নির্বাক চলচ্চিত্র 'জয়দেব'। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে করোনেশন পার্কের ধারে 'সিনেমা প্যালেস' ছবিঘরে হাউস ফুল গিয়েছিল অনেকদিন—ঢাকা শহরে আর কোনো ছবি একটানা এত বেশীদিন চলে নি। এতে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন একটি বালিকা, পরবর্তী যুগে যিনি স্বনামধন্যা কাননদেবী, এবং ভক্ত কবি জয়দেবের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী, পরবর্তী যুগে যিনি কৌতুক অভিনেতা রূপে স্বনামধন্য। (বিধাতার এও হয় তো এক পরম কৌতুক।)

'সিনেমা প্যালেস'-এর কর্তৃপক্ষের ছিল চমৎকার কবি সুলভ কল্পনা আর ব্যবসা বুদ্ধি। তাই তাঁরা নির্বাক 'জয়দেব'-কে সঙ্গীত মুখর করে তুলবার জন্য সাহায্য নিয়েছিলেন ঢাকা শহরের তখনকার জনপ্রিয়তম গায়ক নিত্যগোপাল বর্মণের। তিনি প্রেক্ষাগৃহে অরকেস্ট্রার পাশে বসতেন আর যথাস্থানে 'জয়দেব' নাটকের জনপ্রিয় গানগুলি গাইতেন। মাইক ছিল না, মাইকের দরকারও ছিল না, নিত্যবাবুর আশ্চর্য সুরেলা, উদাত্ত কণ্ঠস্বর গম গম করত সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে। যেমন ছবি, তেমন গান—সোনায় সোহাগা, অথবা মণিকাঞ্চন যোগ। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় শোন। 'জয়দেব' ছবির পটভূমিকায় নিত্যবাবুর গানের জয় জয়কার—সে গান কোনোদিন ভুলতে পারব না।

বুড়িগঙ্গা নদীর সেই ঘাটের নাম সদর ঘাট, তারই অনতিদূরে সিনেমা প্যালেস 'জয়দেব' ছবির কল্যাণে হয়ে উঠেছিল ভক্তদের পরম তীর্থ। কবিগুরুর ভাষায় 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে' যে ঢাকায় সদরঘাটে সিনেমা প্যালেসে অপূর্ব সুযোগ এসেছে একসঙ্গে ভক্তিরসের অতুলনীয় ছবি দেখবার আর অতুলনীয় গান শুনবার। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে 'জয়দেব'-দর্শন-শ্রবণেচ্ছু ভক্ত যাত্রী আর যাত্রিনী বোঝাই হয়ে নৌকোর পর নৌকো এসে ভিড়তে লাগল বুড়িগঙ্গার সদরঘাটে। এরা সব 'জয়দেব স্পেশাল'। আমার এই বর্ণনায় হয়তো অতিরঞ্জন মনে হচ্ছে, কিন্তু এতে অতিরঞ্জন একটুও নেই। বরং সেই ব্যাপক উচ্ছ্বাস আর শিহরণের ছবি যথোচিতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না বলে আমি দুঃখিত।

'জয়দেব নাটক এর আগে কলকাতায় দেখেছিলাম—

বন্দু্র মনে পড়ে মিনার্ভা থিয়েটারের স্টেজে। নাটকটি কলকাতা শহরে আশ্চর্য সাড়া জাগিয়েছিল, তার গান-গুলি আমার মতো অনেকেরই বোধ হয় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। নিত্যবাবুর মুখে সেই সব গান বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে সিনেমা প্যালেসে শুনে যেন আরো ভাল লেগেছিল। সবচেয়ে বেশী ভালো লেগেছিল নিত্যবাবুর গাওয়া জয়দেব-কৃত দশাবতার স্তোত্র, এইভাবে যার শুরু :

"প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং,
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদং
কেশব-ধৃত মীন-শরীর
জয় জগদীশ হরে।"......

দোলাইগঞ্জ স্টেশনের ধারে বেড়াতে বেড়াতে সিরাজ মিয়া যখন 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটিকায় নৃসিংহ অবতারের প্রসঙ্গ তুলল, তখন আমার মনে পড়ে গেল নিত্যবাবুর গাওয়া দশাবতার স্তোত্রের কথা। মনে পড়ল এই স্তোত্রে বর্ণিত চতুর্থ অবতার :

"তব কর কমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গং,
দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গং,
কেশব-ধৃত নরহরি রূপ
জয় জগদীশ হরে।"

সিরাজ মিয়াকে বললাম ভোলা পালোয়ান যে নৃসিংহ রূপে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিল, তিনি হচ্ছেন বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে চার নম্বর অবতার, যার মানে হচ্ছে দেহ ধারণ করে ভগবানের অবতরণ।

কিন্তু সিরাজ যেমন কৌতূহলী, তেমনি চিন্তাশীল আর সতর্ক। সে বলল, "ভগবান? তবে যে আগে কইল্যান বিষ্ণু?"

বিষ্ণু যে ভগবানই, সে কথা বললাম সিরাজকে। তাকে বুঝিয়ে দিলাম ভগবানের তিন রূপ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহাদেব। এঁরা যথাক্রমে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং সংহারকর্তা, ঋতুচক্রের মতোই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের চাকা ঘুরে চলেছে অবিশ্রান্ত। মহাদেবকে আমরা শিব, শঙ্কর, ভোলানাথ, শম্ভু প্রভৃতি নামেও অভিহিত করে থাকি, একথাও বললাম সিরাজ মিয়াকে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র, এমন একজন কৌতূহলী আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে তার ওপর মাষ্টারি করতে বেশ ভালোই লাগল।

সিরাজ মিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে মনে মনে একবার গুছিয়ে নিয়ে বলল, "তার মানে হইল আপনেগো (আপনাদের) তিন কিসিমের (রকমের) ভগবান, আবার তাগো মইধ্যে (তাদের মধ্যে) একজনের দশ কিসিমের অবতার। বাকি যে দুই কিসিমের ভগবান, তাগো কোনো অবতার নাই?"

এ রকম প্রশ্নের প্রত্যাশা (বা প্রত্যাশঙ্কা) করি নি। দ্রুতবেগে চিন্তা করে ব্রহ্মা আর মহাদেবের কোনো অবতারের কথা মনে করতে না পেরে বললাম, "না তাঁদের কোনো অবতার নেই, সিরাজ।"

সিরাজ মাথা নেড়ে 'অ' বলে বুঝে নিল অবতরণ লীলা বিষ্ণুতেই (অর্থাৎ ভগবানের বিষ্ণু রূপেই) সীমাবদ্ধ।

"তুমি একটু ভুল করেছ, সিরাজ মিয়া। আমাদের তিন কিসিমের ভগবান নয়; ভগবানের তিন কিসিম বলতে পারো" বললাম আমি। ভাবলাম ভগবানের তিন রূপ হয় তো সিরাজ মিয়ার মাথায় ঢুকবে না, সে 'রূপ-এর বদলে 'কিসিম' ভাবলে ক্ষতি নেই।

"তিন কিসিম আর দশ অবতার। তিন আর দশে হইল গিয়া তের।" সরব চিন্তায় হিসাব করল সিরাজ মিয়া।

অবতারের ফর্দ এবং তত্ত্ব নিয়ে তখন আমার মনে একটু খটকা ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক করেই কবি জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে দশ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণ নেই কেন, সেটা বুঝতে পারিনি। অবশ্য প্রত্যেক অবতার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "কেশব ধৃত অমুক রূপ", এবং কেশব মানে শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে আমরা অবতার বলেই জানি। দশটি অবতারের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই জয়দেব বলেছেন "কেশব ধৃত," অর্থাৎ কেশব এই রূপ

ধারণ করে অবতার হয়েছেন। কিন্তু অবতারের আবার অবতার হয় কি করে? এটাই আমার কাছে সমস্যা ছিল।

সিরাজকে পুরো দশাবতার বোঝাতে হলে ফ্যাসাদে পড়ে যাব ভেবে বললাম, প্রহ্লাদ-চরিত্র বুঝবার জন্য তার নৃসিংহাবতার ছাড়া অন্য কোনো অবতার নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু সিরাজ মিয়ার ওপর বোধ করি জেরায় ওস্তাদ দার্শনিক সক্রেটিসের আত্মা ভর করেছিল। সে আমাকে প্রশ্ন করল আপনি বলেছেন মহাদেব হচ্ছেন সংহারকর্তা কিন্তু কি, তিনি তো সংহার করলেন না হিরণ্যকশিপুকে, বরং নাটিকার প্রথম দিকেই এসে তার প্রার্থনা মাফিক, রক্ষা পাবার বর দিয়ে গেলেন, যেটা রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর এখতিয়ারে। আর নাটকের শেষ দিকে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করলেন কে? নৃসিংহ, যিনি রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর অবতার, সংহারকর্তা মহাদেবের অবতার নয়। এটা কেমন হল? ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল না?

আশ্চর্য চিন্তাভঙ্গী অশিক্ষিত সিরাজ মিয়ার। আমি এভাবে কখনও ভাবি নি, প্রশ্নের জবাবটা চটকরে মাথায় এলো না। কিন্তু আমি তখন পূর্ব বাংলার সেরা সরকারী বিদ্যালয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র, দুবছর বাদেই স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেব। তাই ভাবলাম সিরাজ মিয়ার প্রশ্নের ভালো জবাব দিতে না পারলে আমার মান থাকবে না। একটু ভাবতেই জবাব পেয়ে গেলাম, বললাম:

"তুমি একটু ভুল করছ, সিরাজ। মহাদেব হিরণ্যকশিপুকে রক্ষা তো করেননি, হিরণ্যকশিপু যে বর চেয়েছিলেন সেই বর তাঁকে দিয়েছিলেন মাত্র।"

দেব বিদ্বেষী দৈত্যরাজ দেবতাদের নাস্তানাবুদ করবার জন্য মহাদেবকে তপস্যা তুষ্ট করে বর আদায় করে নিয়েছিলেন দিনে বা রাত্রে, জলে বা স্থলে বা শূন্যে, নর অথবা পশু অথবা পক্ষীদেহধারী কোনো প্রাণী তাকে বধ করতে পারবে না। বর প্রার্থনা শুনে মহাদেব বলেছিলেন 'তথাস্তু', আর হিরণ্যকশিপু ভেবেছিলেন এই বরে তিনি ত্রিভুবনে সবার অবধ্য হলেন, এখন তিনি নির্ভয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন, কারণ সাধ্য হবে না তাঁকে বধ করবার। বেচারা কল্পনাও করতে পারেন নি যে বরটি চেয়ে নিয়েছেন সেটি সম্পূর্ণ ছিদ্রহীন নয়, তাতে এমন ফাঁক রয়ে গেছে যার মধ্য দিয়ে বরটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করেই মৃত্যু আসবে। সেটি কিভাবে সম্ভব হল? যিনি তাঁকে বধ করলেন, তিনি নর পশু বা পক্ষী এই তিনের কোনো পর্যায়েই পড়েন না, তিনি নর সিংহ, নর ও সিংহের সমন্বয়। বধের সময়টা দিনও নয়, রাত্রিও নয় দুয়ের মাঝামাঝি গোধূলি লগ্ন। এবং নরসিংহ তাঁর সংহার কার্যটি সম্পন্ন করলেন হিরণ্যকশিপুকে নিজের উরুর ওপর রেখে—জলে নয়, স্থলে নয়, শূন্যেও নয়। এভাবে হিরণ্যকশিপু বধ হল, অথচ মহাদেব প্রদত্ত বরের সত্যতাও অক্ষুণ্ণ রইল।

এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে সিরাজকে বলেছিলাম মহাদেবের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে আশু অর্থাৎ চটপট তুষ্ট হয়ে যাওয়া, যেজন্যে তাঁর আরেক নাম আশুতোষ। তাই তিনি হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় চট্‌পট তুষ্ট হয়ে প্রার্থিত বর দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে রক্ষা করবার ভার নেননি এবং রক্ষাও করেন নি।

আর সব শেষে রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর অবতার নৃসিংহ যে হিরণ্যকশিপুকে সংহার করলেন, ওটা তো আসলে রক্ষাই, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই তো অমর হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন হিরণ্যকশিপু। স্বর্গে অমর দেবতারা বাস করেন বলেই তার আরেক নাম অমরাবতী। সব জীবন থেকে অমর জীবনে বদ্‌লি করে দিয়ে নৃসিংহ অবতার তো—তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়—হিরণ্যকশিপুকে রক্ষাই করলেন—বিষ্ণুর যা কাজ।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

মূল প্রস্তাবের কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাবের বড় নোটীশ দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য সভাপতি মশায় পণ্ডিত রাধাকিষণ ভার্গবকে আহ্বান করলেন। তখন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বিঠলভাই প্যাটেল একটি বৈধতার প্রশ্ন (point of order) তুলে বললেন যে কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে কোন সংশোধনী প্রস্তাব প্রথমে বিষয় নির্বাচনী সভায় আলোচনা না করে প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করা যায় না, সভাপতি মশায় রায় দিলেন এটা কংগ্রেসের সংবিধানের কোন ধারার সংশোধনের প্রস্তাব নয়—গান্ধীর প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব সুতরাং এক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করা যেতে পারে।

পণ্ডিত রাধাকিষণ ভার্গব তখন তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলেন। তাঁর প্রস্তাবে মূল প্রস্তাবের "বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ" শব্দগুলির পরিবর্তে "বৈধ কার্য্যকরী এবং শান্তিপূর্ণ" শব্দগুলি রাখার কথা ছিল।

সমর্থকের অভাবে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর মাদ্রাজের উদীয়মান নেতা ও সুবক্তা এস, সত্যমূর্তি তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। এই প্রস্তাবে মূল প্রস্তাবের স্বরাজ্য শব্দের সঙ্গে "পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট" (of full responsible Government) শব্দগুলি সংযোগ করার কথা বলা হয়েছিল।

প্রস্তাব উপস্থিত করতে উঠে তিনি জানালেন যে এই পরিবর্তন দ্বারা আমরা কি রকম স্বরাজ চাই তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। তাঁর আশঙ্কার কারণ হচ্ছে এই যে স্বরাজ্য শব্দ ভারতের রাজনৈতিকক্ষেত্রে পূর্বে ব্যবহৃত হয় নি। এই শব্দের অর্থ হচ্ছে ভারতীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করা। কিন্তু এই গভর্ণমেণ্ট রাজতান্ত্রিক, সোভিয়েট বা অন্য যে কোন প্রকারের হতে পারে। কিন্তু পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্টের অর্থ হচ্ছে যে শাসকগণ বিধান পরিষদের নিকট এবং বিধান পরিষদ ভারতের জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকবে। এই প্রকার গভর্ণমেণ্টই ভারতের কাম্য।

তিনি কর্ণেল ওয়েজউডকে সম্বোধন করে বললেন যে, ক্রীড যাই হোক না কেন তিনি যেন পার্লামেণ্টে—ভারতের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকেন, যেমন তিনি আয়ারল্যাণ্ডের জন্য করেছিলেন।

কর্ণেল ওয়েজউড উত্তরে জানালেন যে ক্রীড যাই হোক না কেন তিনি ভারতের জন্য লড়ে যাবেন।

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর মাদ্রাজের কে, আর ভেঙ্কটরমণ আয়ার আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে :—

(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বয়ং শাসিত ডোমিনিয়নগুলি যে রকম পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট ভোগ করছে তাদের সহিত সমপর্য্যায়ে সর্বপ্রকার বৈধ ও সম্মানজনক উপায় দ্বারা সেই প্রকার গর্ণমেণ্ট অর্জন করা।

(২) জনগণের প্রত্যেক শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে দেশ প্রেম উদ্বোধিত করে ভারতের একতা বর্দ্ধন করা।

(৩) ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকগণের নৈতিক ও আর্থিক গতিকে ত্বরান্বিত করা।

তিনি প্রস্তাব উপস্থিত করে জানালেন যে তিনি বর্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বরাজ অর্জনের পক্ষপাতী। ভবিষ্যৎ স্থির করবে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি থাকবে না।

প্রস্তাবটি যথারীতি সমর্থিত হওয়ার পর সভাপতি

মশায় ঘোষণা করলেন সংশোধনী প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হবে না। প্রস্তাবগুলির উপর ভোট নেওয়া হবে প্রতিনিধিদের বিভিন্ন শিবিরে এবং পরে তার ফল জানানো হবে।

তারপর সেদিনের মত সভার কার্য্য শেষ হল। স্থির হল পরবর্তী অধিবেশন হবে ৩০শে ডিসেম্বর, প্রাতঃকাল ৮টার সময়; ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন হবে।

(৯)

পরদিন বেলা ১১টার সময় বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন হল। সভা আরম্ভ হওয়ার কিছু পূর্বে আমি সভাগৃহে প্রবেশ করে শেষ সারির একটি চেয়ারে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে জিন্না সাহেব ও ওমর শোভানী আমার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ালেন। পরে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। এক সময় ওমর শোভানী জিন্নাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে গতকাল কংগ্রেসে মহম্মদ আলীকে তিনি মৌলানা বললেন না কেন? জিন্না উত্তর দিলেন মৌলানা বলব কেন? শোভানী বললেন যে মহম্মদ আলী পণ্ডিত ব্যক্তি এই কারণে তিনি মৌলানা। জিন্না প্রত্যুত্তরে বললেন যে আমরা সকলেই পণ্ডিত সুতরাং আমরাও মৌলানা। তখন শোভানী জিজ্ঞাসা করলেন গান্ধীকে তিনি কেন মহাত্মা বললেন। উত্তরে জিন্না জানালেন যে গান্ধী সত্যই মহাত্মা, তাঁর অন্তঃকরণ মহৎ এই কারণেই তাঁকে আমি মহাত্মা বলেছি। আমি তিলককে লোকমান্য বলতাম কারণ তিনি লোকমান্য ছিলেন, লোকে তাঁকে সম্মান করত। তখন শোভানী জিজ্ঞাসা করলেন তা হলে মহম্মদ আলী কি? তদুত্তরে জিন্না বললেন যে সে বদমাস। যে কথাগুলি তাঁদের মধ্যে ব্যবহৃত তা ফুটনোটে দেওয়া হল।(১)

যথাসময়ে বিষয় নির্বাচনী সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

এক প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ কমিটি তার মুখপত্র 'ইণ্ডিয়া' উঠিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত হল।

আর এক প্রস্তাবে পররাষ্ট্র সমূহে ভারতবর্ষের সংবাদ প্রচার করা সাব্যস্ত হল।

তারপর অন্যান্য প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল। এই সময় একবার আমাকে বাইরে যেতে হয়েছিল। যাওয়ার সময় দেখলাম যে একটি তাঁবুতে মহাত্মা গান্ধী ও দাশ মশায় কোন বিষয় তন্ময় হয়ে আলোচনা করছেন। তখনই আমার মনে হল দাশ মশায় মহাত্মার প্রভাবের আওতায় পড়ে গেলেন। ফিরে এসে আমার অনুমান অনেকের নিকট বললাম।

কতকগুলি প্রস্তাব আলোচনার পর তখনকার মত সভার কার্য্য শেষ হল। স্থির হল যে সন্ধ্যা ৮টার সময় পুনরায় বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন হবে।

সন্ধ্যা ৮টার সময় বিষয় নির্বাচনী সভার অধিবেশন আরম্ভ হল। প্রথমেই অসহযোগ প্রস্তাব আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হল। দেখা গেল আমার অনুমানই ঠিক। দাশ মশায় এবং মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ প্রস্তাব সম্বন্ধে একটা মীমংসায় এসেছেন এবং তাঁরা উভয়ে অসহযোগ প্রস্তাব তৈরি করেছেন এই প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করা হল এবং দীর্ঘকাল আলোচনার পর তা গৃহীত হল।

তারপর ৩৬ ধারা সম্বলিত কংগ্রেসের সংবিধান সভায়

---

(১) Sobhani—Well, Jinnah, why did you not call Mahammud Ali Maulana Mahammud Ali.
Jinnah—Why should I call him Maulana.
Sobhani—He is a learned man. Therefore he should be called Maulana.
Jinnah—Everyone of us is a learned man. As such we should be all called Maulanas.
Sobhani—Why did you call Gandhi Mahatma Gandhi?
Jinnah—Because he is a Mahatma, a great soul. Therefore I called him Mahatma. I used to call Tilak Lokamanya Tilak because he was Lokamanya, respected by the people.
Sobhani—Then what is Mahammud Ali.
Jinnah—He is a blackguard.

আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হল, আলোচনান্তে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা ৬০০০ হাজার নির্দিষ্ট হল। দীর্ঘকালে আলোচনার পর মাত্র কয়েকটি ধারা গৃহীত হল। স্থির হল বিষয় নির্বাচনী সভায় পরবর্তী অধিবেশনে অবিশিষ্ট ধারাগুলি এবং অন্যান্য প্রস্তাবের আলোচনা হবে।

॥ ১০ ॥

৩০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮টায় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হল।

ব্রিটিশ লেবার পার্টীর প্রতিনিধিস্বরূপ মিঃ বেন স্পুর ভারতবর্ষে পৌঁছে সেই দিনই কংগ্রেসে যোগ দিতে উপস্থিত হলেন। সভাপতি মশায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবং নিজ পক্ষ থেকে তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানালেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি লেবার পার্টীকে ধন্যবাদ দিতে উঠে হিন্দীতে বক্তৃতা দিলেন।

তারপর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ধন্যবাদ দিতে ইংরাজিতে বললেন যে অন্যান্য অনেকের মত তাঁরও ইংলণ্ডের জনমতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীতে তা অনেকটা হ্রাস হয়েছে বটে তবে মিষ্টার বেন স্পুর যে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি আশ্বাস দিলেন এবং বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করেছেন তাতে—আমাদের গৌরব করার যথেষ্ট কারণ আছে।

এর পর একটি প্রস্তাব দ্বারা ব্রিটিশ লেবার পার্টী ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মিষ্টার বেন স্পুর তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য কংগ্রেসকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বললেন যে এ দেশে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে অত্যন্ত বিরূপ কথা শুনে এসেছিলেন কিন্তু এখানে এসে কর্ণেল ওয়েজউড, মিষ্টার হল ফোর্ড নাইট এবং তিনি আন্তরিক অভিনন্দন ছাড়া আর কিছুই পান নি। তিনি তাঁদের দলের সহযোগিতার ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রমিকদলের জুন মাসের একটি প্রস্তাবের প্রতি, দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে ঐ প্রস্তাবে বর্তমান ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় বলা হয়েছে কিন্তু এই প্রস্তাবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার ভারতের জনগণের উপর। তাঁরা ভারতকে স্বাধীন দেখতে চান। তারপর তিনি জানালেন যে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান দেখে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

পরিশেষে তিনি বললেন যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর কয়েকটি ভাষণ শুনেছেন। তাঁর বাসনা যে তাঁদের মধ্যেও এই রকম আধ্যাত্মিক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তার পর তিনি জানালেন যে পূর্বের পক্ষে পশ্চিমের সাহায্য যেমন প্রয়োজন তেমনি পশ্চিমের পক্ষেও পূর্বের সাহায্য প্রয়োজন।

মিষ্টার স্পুর আসন গ্রহণ করার পর সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশকে অসহযোগ প্রস্তাব উপস্থিত করতে আহ্বান করলেন যে, দাশ মশায় গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করে কলকাতা থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে নাগপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর এমনি যাদুকরী প্রভাব যে তিনি সেই দাশমশাকে দিয়েই অসহযোগ প্রস্তাব কংগ্রেসে পেশ করালেন।

দাশ মশায় প্রস্তাব উপস্থিত করতে মঞ্চোপরি দাঁড়াতেই প্রতিনিধিরা প্রবল হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা করল। দাশ মশায় সুদীর্ঘ অসহযোগ প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত করলেন—

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

যেহেতু কংগ্রেসের মতে বর্তমান ভারত গভর্ণমেণ্ট দেশের আস্থা হারিয়েছে এবং

যেহেতু ভারতের জনগণ স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েছে এবং

যেহেতু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিগত বিশেষ অধিবেশনের পূর্বে ভারতের জনগণ কর্তৃক গৃহীত কোন পন্থাই তাদের অধিকার ও দায়িত্বের ন্যায্য স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে নি এবং তাদের গুরুতর অন্যায় অবিচারের

বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও খিলাফৎ সম্বন্ধে অবিচারের কোন প্রতিকার করতে পারে নি।

অতএব এই কংগ্রেস কলকাতার বিশেষ অধিবেশনের গৃহীত অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব পুনরায় স্বীকার করে ঘোষণা করছে যে অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনার কর্মসূচী যা বর্তমান গভর্ণমেন্টের সহিত স্বেচ্ছায় সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অথবা তার কোন অংশ কার্য্যে পরিণত করার সময় স্থির করবে—হয় জাতীয় কংগ্রেস অথবা অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি এবং অন্তর্বর্তী কালে দেশকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হতে থাক—

(ক) ১৬ বৎসরের কমবয়স্ক স্কুলের বালক বালিকাগণের পিতা মাতা এবং অভিভাবকদের (স্কুলের বালক বালিকাদের নয়) গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত, সাহায্যপ্রাপ্ত বা যে কোন ভাবে নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলি ঐ সকল বালক বালিকাগণকে সরিয়ে আনতে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয়ে অথবা তদাভাবে তাঁদের সাধ্যমত অন্য কোন প্রকারে ঐ সকল বালক বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য অধিকতর চেষ্টা করতে আহ্বান—

(খ) ১৬ বা তদূর্দ্ধ বয়সের ছাত্র ছাত্রীগণকে যদি তাঁরা মনে করে যে, যে গভর্ণমেন্টের অবসান ঘটাতে জাতি প্রতিজ্ঞাপূর্বক সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত, সাহায্যপ্রাপ্ত বা যে কোন প্রকারে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান গুলির সহিত যুক্ত থাকা তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে তা হলে ফলাফল বিবেচনা না করে তাদের সরে আসার আহ্বাম এবং তাদের হয় অসহযোগ সংক্রান্ত কোম—বিশেষ কাজে আত্মনিয়োগ করতে অথবা জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উপদেশ দান

(গ) গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত অছি (ট্রাষ্টি) ম্যানেজার ও শিক্ষকদের এবং মিউনিসিপ্যালিটী ও লোকাল বোর্ডগুলিকে সেগুলি জাতীয়করণে সাহায্য করার জন্য আহ্বান

(ঘ) আইন ব্যবসায়ীদের, তাঁদের ব্যবসা স্থগিত রাখার জন্য অধিকতর প্রয়াস করতে এবং মামলার পক্ষগণকে এবং সমব্যবসায়ীদের আদালত বয়কট, এবং বেসরকারী সালিশদ্বারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি প্রভৃতি জাতীয়তামূলক কার্য্যে মনযোগ দিতে আহ্বান।

(ঙ) ভারতকে অর্থনৈতিক স্বাধীন ও স্বনির্ভর করার জন্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক বানিজ্য সম্পর্ক বয়কট করতে। হাতে সূতা কাটা ও কাপড় বোনার উৎসাহ দিতে এবং তদুদ্দেশে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটার মনোনীত বিশেষ কমিটী—কর্তৃক পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক বয়কটের কার্য্যক্রম, তৈরি করার আহ্বান।

(চ) এবং সাধারণত যেহেতু আত্মত্যাগ,—অসহযোগের সাফল্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক সেই হেতু, দেশের প্রত্যেক শ্রেণী এবং প্রত্যেক নরনারীকে জাতীয় আন্দোলনের জন্য যতদূর সম্ভব আত্মত্যাগ করার আহ্বান।

(ছ) অসহযোগের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান সহরে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীন প্রত্যেক গ্রামে অথবা গ্রামসমষ্টিতে কমিটী গঠন।

(জ) ভারত জাতীয় সেবা সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করে তার কাজের জন্য এক দল জাতীয় কর্মী সংগঠন।

(ঝ) উপরোক্ত জাতীয় সেবা এবং সাধারণতঃ অসহযোগের অর্থ সাহায্যের প্রয়োজনে নিখিল ভারত তিলক মেমোরিয়াল স্বরাজ্য ফাণ্ড নামে একটি জাতীয় ফাণ্ড গঠন করতে পন্থা অবলম্বন।

ক্রমশঃ—

নারীশালা—হারেম—নার

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

নারীশালা (১)

এদেশে আমাদের ২০০।২৫০ বছর আগে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মধ্যে বহু পত্নীক মানুষ ছিলেন। স্ত্রী তাঁহাদের শোনা গেছে ৫০।৬০।।১০।১০০।১.০ সংখ্যকও থাকত অনেকেরই। কোনো কোনো সময় তিন চারটী কুলীন কন্যা ভাগিনীরা একটী সংপাত্রেই সমর্পিত হতেন। আমিও দু'একজন বৃদ্ধা রূপবতী কুলীন বধু শ্বশুর বাড়ীতে ক্রিয়াকর্মে দেখেছি ছেলেবেলায়। তাঁরা রান্না ও অন্য কাজে খ্যাতনামা। অন্য সুনামও কারুর কারুর শোনা যেত নানা ইঙ্গিতে। স্পষ্ট নয় যদিও। এঁদের এই কুলীন জায়াদের কথা 'হারেম' কাহিনীর সঙ্গে বলার উদ্দেশ্য—এর কৌতুকময় দিক হ'ল এঁরা কেউই স্বামীদের 'ভার্য্যা' বা 'ভরণীয়া' হতেন না। স্বামী মহাশয়রা বিয়ে করেই খালাস। ভার্য্যারা ছিলেন ভরণীয়া পিতা, ভাই ও স্বজনদের। আর সেই আশ্রয়েই থাকতেন। খেটে খেতেনও দুর্যোগের দিনে। পতিগৃহে 'পত্নী' নিবাস বা 'হারেম' থাকত না কারুরই। অর্থাৎ 'নারীশালা, ছিল না।

এই প্রসঙ্গটি মনে আসার কারণ হল, সম্প্রতি ফাল্গুন ১৩৭৭ আর পরের কয়েক সংখ্যা একটী পত্রিকায় মোগল বাদশাদের—আকবর শার হারেম প্রসঙ্গ দেখলাম।

তাতে বলা হয়েছে, আকবর শাহের অন্তঃপুরে পাঁচ হাজার নারী ছিল। সেটা কিন্তু প্রসঙ্গ নয়। বক্তব্য, কথা ও প্রশ্ন ছিল, তাদের সকলের থাকার জন্য এক একখানি ঘর বা ঘরদুয়ার পৃথকভাবে ছিল কি না।

নারীশালা (২)

দিল্লী আগ্রার মোগল প্রাসাদ যতটুকু দেখা আছে তাতে পাঁচ হাজারখানি অথবা হাজার দু হাজার ঘর বিশিষ্ট 'হারেম' দেখা যায় না। আছে মস্ত মস্ত দালান। কারুকাজময় খিলান ও থামওয়ালা বড় বড় ঘর। দুয়ার জানালার বালাইহীন। প্রাসাদের কোন দিকে কোন নিবাস, কোনখানে বাঁদী ও রক্ষিতা নারী নিবাস, তার কোন বিশেষ নিদর্শন এখন আর দেখা যায় না। যদিও 'মহলিভবন' (স্নানাগার) 'দশ পঁচিশ খেলার ঘুঁটী' ঘর আর ওখানে দরবার কক্ষ আদি নানা নামের ঐ দালান ঘর তাতে আছে। যদিও ছোটবড় আখ্যার কোন নারীদের পৃথক আবাস বা কক্ষময় বিভাগীয় প্রাসাদ ছিল কাহিনী (এখন দেখা যায় না) শোনা আছে। কিন্তু বাঁদী বা পরিচারিকা অথবা রক্ষিতাশালা পৃথকভাবে দেখা যায় না।

নারীশালা (৩)

কিন্তু মোগল পাঠানদের অনুকরণ করে সেকালে রাজা নবাব মহারাজা যাঁরা জীবন যাপন করতেন, এই প্রসঙ্গে তাঁদের জীবনযাত্রার ধরণ দেখলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হতে পারে।

আমি দেখেছিলাম একটী এই ধরণের 'হারেম' বা নারীনিবাস। দেশটী হল রাজস্থানের জয়পুর। ঐ কালটা এই সেদিনো ছিল। হয়ত এখনো কোনো কোনো রাজ্যে আছে। বহুবিবাহ আইনে নিষিদ্ধ হলেও বহু নারী জমা করতে তো নিষেধ বা বারণ নেই। ১৩১১'১২ সাল থেকে এ দেখা আমার ১৯০৭ অবধি। বলা যায় মোগল প্রাসাদের ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ এই সব রাজামহারাজাদের রাজপ্রাসাদ। প্রাচীর ঘেরা সহরের প্রায় দু আড়াই ভাগই এই প্রাসাদ এলাকা। কিন্তু দেখেছি সেই পর্দানসীন দেশ ও কালে। কাজেই কোন এলাকা কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে, আর কোথায় তার সীমানা, তা আমাদের মেয়েদের জানা দেখা সম্ভব ছিল না সেকালে। সহরের সাতটী গেট। লোক

চলাচল ৪,৫টায় বেশী। বাকিগুলো প্রায় বন্ধ। দরবারে এবং উৎসবের দিনে ব্যবহার হত। যেমন সুরয়পেলসের (অম্বর) আমেরী গেট। রাজপ্রাসাদের এলাকার প্রধান তোরণদ্বার হল ত্রিতোরণ বা ত্রিপোলিয়া এবং গণগৌরী দরওয়াজা। এ দুটী মঙ্গল তোরণদ্বারও বটে। অফিস এলাকা 'ত্রিপোলিয়া' (তেমাথাও) পথে তার প্রধান প্রবেশ দ্বারও সেটা। অন্যদিকে শ্রী জী রাজা অর্থাৎ রাজকীয় তোরণ দ্বার। সে পথে গেলে পড়ে অফিস আদালত রাজপ্রাসাদের দরবার প্রাসাদের পথ। দিকে দিকে হাতিশালা (পিলখানা), অশ্বশালা (তবেলা) গোশালা, উটশালা, রথশালা ঐ সব রক্ষক পালকদের আবাসগৃহ—কি নয়। একদিকে অন্যত্র জ্যোতির্বিদ জয়সিংহ রাজার বিখ্যাত মানমন্দির। যন্ত্রমন্দির= যন্তর মন্দর—যন্ত্রর মন্তর। অন্য দিকেও একটীর পর একটি করে চারটী তোরণ পার হয়ে একদিকে পড়ে গোবিন্দজী গোপালজী; গঙ্গাজীর মন্দির। গোবিন্দজীর মন্দিরই সবচেয়ে বড়। ঐ প্রবেশ-তোরণের বাঁদিকে পড়ে বিখ্যাত প্রাসাদ হাওয়া মহল। আর মন্দিরের সামনে বিশাল বাগানের ওধারে ওপারে দেখা যায় চন্দ্রমহল। রাজার শয়নপ্রাসাদ।

তারপরেই তার সঙ্গে সুরু হয়ে যায় প্রাসাদ সীমানা। কতদূর বিস্তৃত কোনখানে তার অন্তঃপুর বা নারীশালার এলাকা সীমানা আরম্ভ আর শেষ কোথায় আমার জানা নেই। সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ নরনারী নির্বিশেষে। শুধু খোজা প্রহরী বাঁদী আর দাসীরা যাওয়া-আসা করে। তাও 'পাশ' অর্থাৎ ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাকৃতি (পিতলের বা তামার) দেখিয়ে। যাকে মোগলহারেমে বলা হত পাঞ্জা।

নারীশালা (৪)

এখন নারীশালা বা হারেমের অধিবাসিনীদের অভিধা বা সংজ্ঞানামের কথা বলি।

কয়েকবার প্রাসাদের জলসা-উৎসবে যাবার সুযোগ হয়েছিল। রাধাষ্টমী উৎসবে (রাজার ইষ্টদেবী তিনি, 'লাড়লী'জী (আরাধণীয়া নামে) একবার যাওয়া হয়। সে উৎসব রাজার নিজ মহলে। সেটা বাৎসরিক উৎসব। তাতে 'খেতাব' 'খেলাত' 'পুরস্কার' দেওয়া হত প্রিয়পাত্র ও অনুগ্রহভাজনদের। নানারকম সে পুরস্কার। (১) তাজিমী সর্দার। রাজা তাঁদের দেখলে উঠে সম্মান জানাবেন। তাঁদের সোনার মল দেওয়া হ'ত পাঁইজোড়ও। রাজপুত সর্দারদের মল পায়ে দেওয়া (কড়া) রেওয়াজ ছিল। মোটা দুটী সাদা বালার মত মল দুটী। (২) 'শিরোপা' মাথায় পাগড়ী ও গহনা। (৩) জায়গীর—নিষ্কর জমিদারী। (৪) নামের খেতাব যেমন 'খুশনজর', 'দিলখুশ', 'খুশবদন', চোখ প্রীতকারী হৃদয় খুশীকারী। এগুলো প্রায় সর্দার খোজাদের দেওয়া হ'ত। এই সময়ের সর্দার খোজা ছিলেন খুশনজরজী।

এই প্রাসাদের জলসায় দেখেছিলাম যাঁদের—যে নারীদের তাঁরাই হচ্ছেন নারীশালার চির অধিবাসিনী। এই নারীশালায় অধিবাসিনী হলেন সাত শ্রেণী। (১) মহারাণী (২) অন্য রাণীরা (৩) পাশোয়ানজীরা (রাজপ্রেয়সীর দল) (৪) পর্দায়েতজীরা (এঁরাও রাজপ্রিয়া) (৫) সখিদের দল (৬) পাত্রী নামে বলিকার দল (৭) দাসী শ্রেণী বাঁদী শ্রেণী।

মহারাণীর নারীশালা (ক)

মহারাণীর বিশাল প্রাসাদ, বিরাট অট্টালিকা। বড় বড় দালানের মত ঘর ও সামনে দালান। পাশে ছাত। ছাতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সীমা কম নয়। নিচে একদিকে প্রাঙ্গণ প্রাসাদের তলায় সম্ভবতঃ নিম্নস্তরের দাসী শ্রেণীর ঘর। কিন্তু পাত্রী ও সখিদের ঘর দুয়ারও থাকতে পারে। কিন্তু একদিক দিয়ে চলেছে বিশাল সুড়ঙ্গ পথ। সেই সুড়ঙ্গ পথে এ প্রাসাদ থেকে অন্য রাণীদের প্রাসাদে যাওয়া চলে। অলি গলির মত বাঁকা চোরা জানলা দরজাহীন নিরালোক অদ্ভুত সুড়ঙ্গ পথ। দিনে বা রাত্রে সব সময়েই মানুষের বুক সমান উঁচু বড় বড় পিলসুজের ওপর সরার মত প্রদীপ জ্বালা থাকত সুড়ঙ্গের প্রতি মোড়ের কোণে কোণে।

এক প্রাসাদের সুড়ঙ্গ থেকে অন্য প্রাসাদে যাবার

সুড়ঙ্গ পথ চাবী বন্ধ। সে চাবী কুলুপের চাবী খোজাদের হাতে। সর্দার খোজার হেপাজতে। যারা অন্তঃপুরের দ্বিতীয় হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বিশেষ। রাজার প্রতিভূ। এবং আশ্চর্য্য, এই খোজারা সবাই মুসলমান। তবু হিন্দুর শুদ্ধান্তপুরচারী। রাজার একান্ত বিশ্বাস-ভাজন। রাণীদের কাছেও সম্মানিত এবং সমাদৃত। দেখেছি অনায়াসে মহারাণীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জনান্তিকে অথবা প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কয়। হাসে। কারুর কাঁরুর কাধে হাত রেখে দাঁড়াতেও দেখেছি সখি পর্দায়েত 'পাশোয়ানদের।'

এইসব রাণী মহারাণীর এক একজনের সখি সঙ্গিনী অনেক। দুশো আড়াইশো তার বেশী কম ও সখিশ্রেণী ও পাত্রীদল থাকত। কিছু তারা রাণীদের পিতৃগৃহ থেকে পাওয়া। কিছু পতিগৃহেও সংগ্রহ করে নেওয়া হ'ত পদানুসারে। কিনে আনা, স্বেচ্ছায় আসা, পূর্ব্বও বিগত রাণীদের 'বেওয়ারিশ সখি পাত্রীদেরও আবার পরবর্ত্তী রাণীদের মহলে জায়গা মিলে যেত।

তখনকার মহারাণীর ছিল প্রায় আড়াইশো সখিপাত্রী। দলের বালিকা মেয়েদের বলা হ'ত পাত্রী। ৫।৬ বছর থেকে ১৫।১৬ বছর অবধি। তারপরে তারা সখি পর্য্যায়ে উন্নীত হত। সখি থেকে যদি রাজার নেত্রগোচর হয়ে 'নেকনজরে' পড়ত, তখন তাদের খেতাব ও আখ্যা হত 'পর্দায়েত'। এই পর্দায়েতরা আরো বিশেষ সম্মান পেলে হতেন 'পাশোয়ান'।

এই সখিদের ও পাত্রীদের কাজ ছিল অন্তঃপুরে নাচ গান করা, অভিনয়, গল্প শোনানো আদি নানারকম ভাবে একঘেয়ে জীবন রাণীদের চিত্ত বিনোদন। চুল বেঁধে দেওয়া। গা হাত টেপা মার্জনা সেবা। মেহেদী লাগান করা। ছোটখাটো শিল্প কাজ। চুমকী পুঁতির কাজ। ছবি আঁকা। পড়াশোনার আলাপ। নাটক রচনা। নানা রকম রাধাকৃষ্ণলীলা, ধ্রুব প্রহ্লাদ চরিত্র, রামায়ণ মহাভারতের ছোট বড় কাহিনী থেকে নাটক রচনা করে তারা অভিনয় করত বিশেষ বিশেষ জলসার দিনে। সে অভিনয় এবং শিল্প-কাজ ও আমন্ত্রিতা অন্য রাণীরা সখি পাত্রীসহ দেখতে আসতেন। এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত কর্মচারীর বাড়ীর মেয়েরাও আমন্ত্রিত হতেন। সে সব উৎসব বা জলসা কখনো ঘণ্টাদুয়েকের মত। কখনো সারারাত্রি ধরে। রাজা ও রাণীদের 'মর্জি' ও প্রথানুসারে হ'ত।

অন্য রাণীর প্রাসাদ (খ)

এঁরা হারেমের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধানার দল। এঁদেরও জলসা উৎসব সখি পাত্রীর সমাবেশ প্রায় মহারাণীর মতই। সকলেরই সখিদের দল পাত্রীরাও যেমন রূপবতী তেমনি নাচগান কারুকাজে অভিনয়ে সুপটু সুশিক্ষিত। মহারাণীর পরে অন্য রাণীদের প্রাসাদও বিশাল। এই সখিরা শিক্ষা পেত কোথা থেকে? পেত পূর্বরাণীদের বড় বড় সখিদের কাছে। রাণীদের (রাজকন্যা) পিত্রালয় থেকে আসা-পাওয়া আরেক ধরণের রাজপরি-বারের শিক্ষা থেকে। রাণীরা নিজেরাও বেশ লেখাপড়া জানা হতেন। মাতৃভাষায় রামায়ণ মহাভারত কথা-কাহিনী ইতিহাস পড়তে পারতেন। অনেক সময়ে রাজকন্যা না হয়েও মহারাণী হতেন কেউ কেউ। এক্ষেত্রে মহারাণী ছিলেন পোষ্যপুত্র জায়া। এই রাজার পোষ্যপুত্ররূপে নেওয়ার আগের বিবাহিতা পত্নী। 'ঠাকুর' (জমীদার ঘরের) লোকদের ঘরের মেয়ে। আর অন্য রাণীরা রাজার রাজা হওয়ার পরে বিবাহিতা রাণী। তাঁরা চারজনই ছিলেন ছোটবড় রাজ্যের রাজকন্যা। তাঁদের মেজাজ এবং দর্প তেজও খুব। কিন্তু প্রধানা মহিষীকে তো অতিক্রম করে যাবার প্রথা নেই। হয়ত পিত্রালয়ে যৌতুকে জায়গীরে সখি সমারোহে এবং চেহারায় আকৃতিতে বিশিষ্ট, কিন্তু সম্মানে মেজ, সেজ, বা ছোটরাণীই থাকতে হত। অনেক সময়ে তাঁরা বয়সে রাজার চেয়ে বড়ও হতেন। এক রাজকন্যা তো দশ বছরের বড় ছিলেন স্বামীর চেয়ে।

এদেরও সখি পাত্রীর সংখ্যা দু'শোর ওপরে ছিল জানি।

পাশোয়ানজী (গ)

এঁরা হলেন রাজার নেকনজরে পড়া প্রেয়সীর দল।

সখিদের পদ থেকে পদোন্নতি। দু তিন জন ছিলেন। নানা জলসায় সখি সমাবেশেই নজরে পড়তেন। কখনো রূপে কখনো নাচ-গানের অভিনয়ে নয়ত কলা কুশলতা কিছুতে এই রাজনজরে পড়া সখিরা 'রাজপ্রেয়সীর' মর্য্যাদা পেতেন।

এঁদেরও মর্য্যাদানুসারে ছোট বড় মহল থাকবার জন্য দেওয়া হত। সেগুলিকে বলা হত 'রাওলা'। ঠিক প্রাসাদ নয় রাণীদের মত। কিন্তু পৃথক পৃথক মহল। ভবন। আবাস। দাসী সখি-সঙ্গিনী ভরা সে অন্তঃপুরও। কখনো দেখিনি। শুধু গল্প শুনেছি।

এঁদের সন্তানাদিরা জায়গীর 'তাজিমী' খেতাব পেতেন। সংজ্ঞা (ছেলে) লালজী সাহেব। (কন্যা) বাঈজীলাল। এঁদের বিবাহ গৃহস্থর সব ভালরকমই হত। কারণ এই সব এঁদের বিয়ে কুটুম্বিতাও হত অন্য রাজ্যের লালজী সাহেবদের ঘরে। মোটকথা এঁদের সবাইকে মহাভারতের 'বিদুর ভাই' বলা যায়। রাজ-কার্য্যে সম্মানিত পদও পেতেন এঁরা। ঠিক দাসীপুত্র বা বাঁদী সখিপুত্রের মত দাস চাকর ভৃত্যশ্রেণী নয়। এঁদের জলসার দিনে অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার থাকত। এঁদের জননীদের দু'একজনকে দেখেছি মহারাণীর প্রাসাদের জলসায়।

তখনো 'পর্দায়েত' পদ। পাশোয়ামের পদের চেয়ে নিচু পদ। এইসব পর্দায়েত এই পাশোয়ানের নাম বা খেতাব ছিল রায়। রাণীর পরেই 'রায়' পদ। নতুন নাম ও পদ।

পর্দায়েত (ঘ)

এঁরাও রাজার প্রিয়া। জলসা উৎসবে চুপচাপ একগলা ঘোমটা দিয়ে রাণীদের সারির পাশের বা পিছনের সারিতে বসতেন। রূপ রায়, বসন্ত রায়, লছমী রায় নাম খেতাব তাঁদের। আবক্ষ অবগুণ্ঠন সত্বেও দুজনকে পাকেচক্রে দেখতে পেয়েছিলাম।

আশ্চর্য্য হয়ে দেখেছিলাম মোটেই সুন্দরী সুশ্রী নয়। একজন রং ফর্সা হলেও বেশ ট্যারা। অন্যজনের চেহারা মোটেই ভাল নয়। রংও ময়লা। অনেক সখী তাঁদের চেয়ে রূপবতী। সুন্দরী।

অবাক হয়ে ভেবেছিলাম কি রূপে বা গুণে রাজাকে মুগ্ধ করেছিলেন এঁরা। নাচে? না গানে? অথবা সেবা করে। প্রেমের লীলা কে জানে। এবং ছেলেমেয়েও এঁদের ছিল। একজনের চার ছেলে। একজনের তিনটী। কন্যাও ছিল শুনেছি। ছেলেরা তখন বেশ বড়। নিশ্চয় বিবাহ হয়েছিল। অভয় সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, গোপাল সিংহ নাম কটা মনে আছে। চেহারা কারুর ফর্সা। কারুর একটু শ্যামবর্ণ। সবাই 'জায়গীর' পেয়েছে। অবশ্য বড় জন। এদের এক্ষেত্রে জননীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাব। বাকি সব ছুট ভাইয়া ছোট ভাই, যারা পোষ্য হয়ে থাকবে বড়র আশ্রয়ে।

আরো আশ্চর্য্য এই যে রাজার এই 'সখি' রক্ষিতাপুত্র এতগুলি থাকলেও পাঁচ জন রাণীর একজনেরও সন্তান হয়নি।

কে বলবে এই কেনর উত্তর। এছাড়া আরো কত কাহিনী কত সন্তানের জন্ম-মৃত্যু কথা কোন্ যবনিকার আড়ালে আছে তা শুধু খোজারা আর রাজকর্মচারীরা কেউ কেউ জানেন। সাধারণ মানুষের জানা নেই।

সখি (ঙ)

এইবার দেখা যাবে সখিদের দলকে।

এক এক রাণীর অনেক শতাধিক সখি আর পাত্রী থাকত আগেই বলেছি।

এই সখিরা কিছু পিত্রালয় থেকে পাওয়া। কিছু পতিগৃহে সংগ্রহ করা। কিছু পরে কিনে বা অনাথ দরিদ্র বালিকা সংগ্রহ করে নেওয়া হত। রাজভবনে স্থান পাবে, খেয়ে পরে সুখে বেঁচে থাকবে। হয়ত পরে যৌবনে রাজার 'নেক-নজরে'ও পড়তে পারে। 'অবিবাহিতা রাণীর' মর্য্যাদা 'রায়' উপাধি লাভ করে। 'লালজী সাহেব'দের জননী হলে তো কথাই নেই, পুরুষ-মানুষদের জায়গীর সম্পত্তি লাভ করবে সন্তানরা।

এইসব সখিদের রূপ অসামান্য। কেউ কারুর মত হোক বা না হোক সকলেই রূপবতী। রং আকৃতি সুগঠিত দেহ, কেউ তন্বী নৃত্য কুশলা, কেউ সুগায়িকা, তার সঙ্গে কারুর কারুর বা এমনি রূপ দেখে দেখে চোখ ফেরে না।

প্রতিটি জলসায় এদের কখনো নাচ গান কখনো অভিনয় হতো পালা করে সারারাত্রি ধরে। যেন হারেমের ভোগের নরক সিংহদুয়ারে সন্ধ্যা বাতি জ্বালাতো তারা। রাজারও নিজের একদল সখি ছিল। প্রথমে তারা একদল নাচ গান করে যেত। শতাধিক সখি থেকে বাছা বাছা নাচ গানে নিপুণা কয়েকজন। তারপর মহারাণীর সখিবাহিনীর পালা। পরে পরে অন্য চার রাণীর সখিদের পালা আসত। প্রায় দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধরে সেই নৃত্যগীতের এক এক দলের পালা। গান রাধাকৃষ্ণলীলাই বেশী। কখনো বা রামায়ণ নিয়ে। এক এক জলসায় প্রত্যেক দলের উৎসবের পোষাকের রং আলাদার প্রথা ছিল। সবুজ, লাল, হলদে, বেগুনী, আসমানী, গোলাপী ইত্যাদি।

এদের পরিধেয় ঘাগরা, লুগড়ী (ওড়না), কাঁচুলি, বড় গা ঢাকা জামা 'সদরি' পায়ে অনেক গহনা নূপুরের সঙ্গে। কানে এবং গায়েও কিছু গহনা। নাকে বেশর। নথ। চোখে 'সুরমা' কাজল। হাতে পায়ে মেহেদীর রংয়ের ফুলকাজ যা দুমাসেও ওঠে না। পায়ে জরীর বা রঙীন রেশম সুতোর ফুল তোলা ক্ষুদ্র নাগরা—পিছন দিক মোড়া। অর্থাৎ গোড়ালী মোড়া। গোড়ালী উঁচু জুতা পরে বারনারীরা। গৃহস্থবধূরা নয়। একসঙ্গে প্রায় হাজারখানেক সখি পাত্রীর দলে সিঁড়ি বারান্দা প্রকাণ্ড দরবার ঘরখানি ভরে যেত। রূপও অতুলনীয়। আকৃতি গড়ন সুন্দর। নৃত্যও লীলায়িত ললিত। গান ও গানের সঙ্গত সারেঙ্গী তানপুরা, তবলা, ঢোল, বাঁয়া সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়মে নৃত্যের তালে তালে অপূর্ব। সবই আশ্চর্য্য হবার মতন অপূর্ব।

শুধু দেখিনি সহজ আনন্দ সহজ স্বাভাবিক মধুর হাসি কারুর মুখে। একটা গানের লাইন মনে আছে "কে শিখায়া শ্যাম তুমে মিঠা বোল না" "বোলো রাধা প্যারী হমারি।"

পাত্রী (ক)

ওরা এই পাত্রী নামধেয় বালিকার দলগুলি কচি মেয়ের দল।

এদের সাধারণ পোষাক। গায়ে লাল আঙাখা (অঙ্গরক্ষা), কুর্ত্তা জামা। পরিধানে লাল বা সাদা চুড়ীদার সরু পাজামা। মাথায় রাঙা ওড়না। হাতে কাঁচের বা গালার চুড়ী অথবা রূপার চুড়ী। কানে মাকড়ি। নাকে কারুর কারুর নথ। সোনা বা রূপার। কচি কচি সুন্দর কোমল মুখগুলি ত্রস্ত কৌতূহল ও হাসি ভরা। অনেক পাত্রীই রাণীদের খুব আদরের স্নেহের পাত্রীও ছিল। অনেকেই বড় বড় সখিরাও তাদের খুব ভালোবাসত। ছোট ছোট ভাইবোনের ছেড়ে-আসা স্মৃতি হয়ত মনে পড়ত। এখনো বড় হয়নি বলে তারা ঐ নারীশালার ঈর্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কূটচক্রের কথা কিছুই না জানায় কচি কোমল মুখের সহজ মধুর হাসিটা হারায় নি।

মাথার চুল জড় করে লাল নীল সবুজ জরদ রং জড়ানো বেণী। বিনুনী করে নয় শুধু গোল করে পাকানো। ওদেশে বলে 'টোটী'। বিনুনী বেঁধে বেনী খোঁপা করতে জানে না।

সকলেরই পায়ে জুতো আর মল মুরাঠি (পায়ের গহনা) কড়া। সখিদেরও তাদের আদি নাম কি ছিল কেউ জানে না। তারাও না। প্রাসাদের নামকরণ রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ থেকে। আমাদের হাসি এসেছে কিছু যথেচ্ছ অদ্ভুত নামে। যেমন একটি চমৎকার সুন্দরী পাত্রীর নাম ছিল গন্ধমাদনবাই। রামায়ণ ভক্তি থেকে নামকরণ। অহল্যা, কৌশল্যা, জানকী, কৃষ্ণা, রাধা, গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, লছমী, কেশর, পদ্মিনী তো ছিলই। তাছাড়া ঋষ্যমুক, চম্পা, গোদাবরী মাল্যবান, রামেশ্বরী, লাড়লী, যশোদার তো ছড়াছড়ি।

হনুমান তো পুরুষ নামে আছেনই নারীতেও আছেন। গন্ধমাদনবাঈ কিশোর বয়সেই মারা যায়। আর অন্তঃপুরের সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে অলিগলি নিরালোক পথে মেয়েরা সখি পাত্রীরা তাকে দেখতে পায়। কাহিনী রটে যায় প্রাসাদে প্রাসাদে ছায়ামূর্ত্তি মৃতা বালিকা পাত্রীকে দেখতে পাওয়া যায়।

বাঁদী ও দাসী (ছ)

এরা দুই শ্রেণী নারী দাসীর পর্য্যায়েরই। কিন্তু বাঁদীরা অন্তঃপুর থেকে প্রায়ই বেরুতো না। তারা পর্দানসীন দাসী শ্রেণী। যদিও তাদেরও ঘরকরনা নেই। কাজও দাসীদের মত ঠিক নয়। দাসী বা ঝিয়েদের মাঝামাঝি একটি শ্রেণী। অনেকটা যেন খাস দাসীর মত। বেশ প্রতাপশালিনী ও পুরোণো ঝিয়েদের মত। 'রাজসিংহ' বইয়ের দরিয়া বিবির মত। অনেক সময় 'উভচর'। তবে দাসীদের ঘরকরনা গৃহস্থালী ছিল। বাহিরে আবার অন্তঃপুরে সদর অন্দর দুইয়েই যাওয়া-আসার অধিকার ছিল। কিন্তু অনুমতি সাপেক্ষ। ভিতরে যারা থাকত তাদের পুরুষ আত্মীয়দের নিয়ে সেখানে থাকার যাওয়া-আসার অধিকার কখনোই ছিল না। হয় তারা 'পাশ' নিয়ে বাইরে দেখা করতে যেতে-আসতে পারে। যাবে। নইলে চিরকালের মত 'হারেমেই' থাকবে।

খোজাদের হুকুমে বড় প্রধানা সখির আদেশ নির্দেশে সমস্ত অন্তঃপুরের অধিবাসিদের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত। খোজাদের ক্ষমতা রাজার পরেই। এইসব দেখাশোনা উৎসব দিনেই আমাদের। এবং এক মহল থেকে অন্য মহলে আসার জন্য 'পাশ' লাগত অন্য রাণীদেরও। প্রাসাদ থেকে মহল থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসা সখি পাত্রীদেরও। অভিনয় বা নাচের জন্য তাদেরও আনা হ'ত। এক এক রাণীর সখিদের বসন-ভূষণ ওড়না ঘাগরা কাঁচুলী সদরি (ওপরের জামা) সব রং পৃথক পৃথক হওয়ার নিয়ম ছিল। এগুলি উৎসব দিনের বিশেষ রং। গোলাপী, সবুজ, নীল, (শোষনাই) বেগুনী (নারেঙ্গী) কমলা নানা রং। এই থেকে আমাদের অভ্যাগতদের চোখে তাদের সংখ্যা ও আকার চেহারা রূপের একটা আভাস ও আন্দাজ পাওয়া যেত। এ সব কথা পূর্বেই বলেছি।

সখিদের বসনভূষণ একরকম রংয়ের হলেও কিছু উৎকৃষ্ট। পাত্রীদের শুধু লাল কুর্তা পাজামা ওড়নাই। একই রকম পোষাক (ইউনিফরম্ মত)। জুতা সকলেরই পরার নিয়ম ছিল। অতিশীত ও অতিগরমের জন্য।

থাকার ঘর (১)

এখন গোড়ার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসায় আসি। বাদশা আকবরশার হারেমের পাঁচ হাজার নারী পৃথক পৃথক থাকার ঘর পেতেন কি না?

তাহলে আমাদের এই ছোট রাজ্যেয় রাণী মহারাণী-দের প্রাসাদে কতগুলি করে ঘর ছিল? নিজেদের ব্যবহারযোগ্য ঘর দালান ছাত ছাড়া কতগুলি উদ্বৃত্ত থাকত সখিদের পাত্রীদের ও বাঁদীদের জন্য—এও প্রশ্ন হিসাবে রাখা যায়।

আমার হিসাবে 'নারীশালা'র 'বাঁদী' অধিবাসিনী-দের বিষয়ে পৃথক করে বলা হয়নি। বাঁদীরাও অন্তঃপুর-বাসিনী বটে। কিন্তু এরা উভচর। অর্থাৎ অন্তঃপুরের দাসী চাকরাণী স্তরের মানুষ তো অন্তঃপুরের বাইরেও এদের ঘর সংসার ছিল। থাকত। এদের প্রাসাদের বাইরেও যাতায়াতের অধিকার ছিল। আবার ভিতরেও গতিবিধির অধিকার ছিল। অবশ্য খোজাদের প্রধানা সখির অনুমতি নিয়ে।

এছাড়া ছিল মহারাজার বা রাজার নিজস্ব সখিই প্রায় তিনশো। মহারাণীরও তিনশোর কাছাকাছি সংখ্যা। অন্য চার রাণী ও পাশোয়ান, পর্দায়েতদের সখির সংখ্যা একশো দুশো করে আন্দাজী ধরলেও পনেরশোর কাছাকাছি হয় মোট সংখ্যা।

প্রশ্ন, এদের থাকার ঘর? প্রাসাদে পৃথক পৃথক ছিল কি না? এমনকি কয়েকজনে মিলেও একখানি করে ঘর পেত কি না?

মনে হয় ঐ সব প্রাসাদে ছোট ছোট ঘর কক্ষ দেখিনি। খুব বড় বড় প্রাঙ্গণ। খুব বড় লম্বা চওড়া ছাত। তার কোলে সারি সারি দালানের মত হল-ঘরই চোখে পড়েছে।

একবার একদিন জলসার মাঝে মহারাণী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর শোবার ঘর (সাময়িক বিশ্রামের) খানিতে পিতামহীর পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। আধুনিক আসবাব নেই।

একখানি লম্বা চওড়া মার্বেল পাথরের মূল্য লতাপাতা

আঁকা খোদা বড় ঘর। চারদিকে বড় জানলা দরজা নেই কিন্তু। দুটী মাত্র দরজা। দালানের মত খিলান, খিলানে পর্দা টাঙানো। মেঝেতে মস্তবড় গালিচা ও চাদরের 'বিছায়েত' বা ফরাস পাতা। একপাশে একখানি হালকা কাঠের ওপর হাতির দাঁতের ও রূপা সোনার কারুকাজ করা সুন্দর খাটে (নেওয়ারের) একটী শয্যা। আমাদের এদেশী বিরাট পালঙ্ক নয়।

মহারাণী সারারাত্রি ধরে দেখা নাচ গানের ও মদিরা পানের অবসরে একটু ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছিলেন সেই খাটে। অবশ্য সেইটাই বিশ্রাম কক্ষ বা প্রতিদিনের শয়ন কক্ষ কি না জানতাম না। অনেক রূপবতী সখি সহচরী চারদিকে। তারি মাঝে আমরা জনতিনেক ছোট ছোট পিসি ভাইঝি উঁকি দিচ্ছিলাম। সেই ঘরের এদিকে ওদিকে আরো সব বড় বড় দালান ধরণের ঘর ছিল মনে হয়। আগ্রা দিল্লীর ও অম্বর প্রাসাদে এবং মোগল রাজপুত চিত্রাবলীতে ওই ধরনেরই ঘর দেখা দেখা যায় অলিন্দ বারান্দা ছাত সমন্বিত। গরমের দিনে রাত্রে ছাতে শোওয়া। ছাতেই স্নানাদির ব্যবস্থা।

বাসকক্ষ (২)

যাই হোক আলাদা বাস-কক্ষ পাত্রীদের থাকত না। সখিদের মনে হয় ২০।২৫ জন মিলে একত্রে থাকত রাণীদের অনুগ্রহভাজন হিসেবে পদমর্য্যাদা হিসেবে। রূপ, গুণ ও সেবিকা হিসেবেও বটে।

নাচ গানের জলসায় দেখা গেছে একতলায় বিশাল প্রাঙ্গণ। ওপরে মস্ত ঢাকা দালান সামনে পিছনে ছাত আলো বাতাসে ঝলমল করা। ছাতে তৈরী করা বাগান। কমলা লেবু থেকে ফলসা কুল পেয়ারা নানা ফুল ফলের মাটী জমা করে কষ্টসাধ্য বাগান। তারি এক পাশে গৃহশ্রেণী। কখনো ঢুকিনি সেখানে সখিদের পাত্রীদের আবাস দলে। মোট কথা দেড় হাজার সখির জন্য রাণীদের মহল ছাড়াও দেড় হাজার ঘর ছিল না।

তারা কি ভাবে থাকত? কল্পনা করে নেওয়া যায় সারারাত্রি ঘুঁটি খেলে পাশা তাস নাবা খেলে গান গেয়ে নেচে নেচে গান শিখে বড় বড় ঘর দালানে একত্রেই থাকত। ঝগড়াঝাঁটি কলহ-বিবাদ ঈর্ষাও পরস্পরে করত। 'চুকলী' খাওয়া লাগানো ভাঙানোও নিশ্চয় চলত। ভয়াবহ শাস্তি দণ্ডের কাহিনীও জনরবে কানে এসেছে।

শেষকথা হল পৃথক বাসকক্ষ তারা পেত না। খোঁয়াড়ের মতই চিরকাল এক ঘরেই বাস করত। বড় বড় ঘরে ৪০।৫০ জনে মিলে।

তারপর?

তখন ১৫।১৬ বছর বয়সে মন কি দেখেছিল, ভেবেছিল জানিনা। আজ মনের চোখের সামনে ভেসে আসে সেই অসংখ্য রূপবতী সুন্দর স্বাভাবিক নারীর ম্লান মূঢ় জীবন্মৃত আকৃতি চেহারা।

যারা এক স্বাভাবিক জীবনে বঞ্চিত নিষ্ঠুর অস্বাভাবিক জগতের অধিবাসিনীর দল।

তাদের ঘর ভোজ্য ও শয্যা (৩)

গরমের দিনে ঐ সব ঘরের সামনে লম্বা ছাতে শোওয়ার ব্যবস্থা হত। সব ঘরের সম্মুখেই বড় বড় ছাত। সেখানেও ঐ ছোট ছোট (একলার) 'একানে' খাটিয়া বা খাট পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা হত।

খাওয়া বা খাদ্য সরবরাহ হত নিচের 'রাজকীয়' প্রাসাদের সর্বজনীন রন্ধনশালা থেকে। যার নাম ওদেশী ভাষায় 'রসোড়া'। সবচেয়ে সাধারণ লোকেরা ওদেশের ডাল রুটী বা একটি তরকারী রুটী, কিংবা একটু আচার বা ঘি দিয়ে রুটী—এই খায়। রুটী গমেরও হয়। দরিদ্র দীনেরা যবের রুটীই খায়। এদের কি খাদ্য আসত আমার ঠিক জানা নেই, তবে যতদূর শুনেছি রাজভোগ্য খাদ্য সব দেশের দুঃখীদের মত এরাও পেত না। এদের চেয়ে উচ্চ স্তরের বড় বড় সখিরা কিছুটা পেত। রাণীদের অনুগ্রহভাগিনীরাও পেত।

"রসোড়া" বা রান্না মহলের চার পাঁচটি বিভাগ।

(১) একেবারে দুধ ক্ষীরের মিষ্টান্ন বিভাগ যার নাম (পেঁড়া বরফি) 'শাগারী' (শাকাহার।) বিভাগ। অর্থাৎ রান্না করা রুটী ভাত তরকারী বা মাংস মাছ নয়। বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য।

(২ 'পাক্কি'। রুটী লুচি তরকারী আচার ভাজাবড়া। নিরামিষ খাদ্য।

(৩) 'কাচ্চি'। ভাত ডাল তার মত তরকারী নানাবিধ।

(৪) ভাজা মিষ্টান্ন ও নোস্তা। জিলাপী কচুরী গজা ঘিয়ের নানারকম লাড্ডু, পেড়া বরফি বোঁদে অমৃতি সে দেশে যতরকম জানা আছে 'দুধ-রুটি' নানখাতাই' আদি নানা খাদ্য।

(৫) মাংস ও মাছ। ওদেশের রাজপুত জাতি ক্ষাত্রিয়রা প্রায় সব রকম মাংস মাছই খান। গোরু মহিষ হাতি ঘোড়া উট ইত্যাদি বাদে ছাগল ভেড়া মুরগী বন্য বরাহ (শূকর) নানা ধরণের পাখী হাঁস তিতির 'বটের' খেচর ভূচর জলচর জীবজন্তু তাঁদের খাদ্য ও ভোজ্য এলাকায় তালিকায় পড়ে।

মনে হয়েছে থাকবার জন্য বাসকক্ষ যদি তারা অথবা মোগল প্রাসাদবাসিনীরা" পেত তাহলেই বা তাতে তাদের কি লাভ হত?

আর না পেয়েই বা তাতে তাদের কি-বা ক্ষতি লোকসান হয়েছিল?

বালিকা কিশোরী কাল থেকে যৌবনকাল থেকে মৃত্যুকাল অবধি তারা মানুষের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের মত, কোনও স্বাভাবিক অধিকার নরনারীর কোনো সহজ স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ আনন্দ স্বাচ্ছন্দ্য কি জিনিস তারা অনুভব হয়ত করেছিল কিন্তু করলেও পায় নি তো কোনও দিন তা।

উৎসব 'জলসা'য় তাদের নৃত্য গীত দেখা চেহারা আমার আজো মনে আছে। সে দেখা 'পুতুল' বললেও তাদের সব বলা হয় না। এবং সমস্ত 'হারেমেই' যে রূপে সাজে উল্লাসে উৎসবে নাচে গানের মাঝেও এমন মূর্ত্ত নিষ্প্রাণ হতে পারে এ চোখে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবেন না।

সারারাত্রি ধরে মহারাণী অন্য রাণীদের রাজার সখিরা নানা রংয়ের বসন ভূষণে সেজে নেচে গান গেয়ে গেছে রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীত। প্রেম সঙ্গীত। "কে শিখায়া শ্যাম তুমে মিঠী বোলনা" "শুনি ময় হরি আওয়ান কি আওয়াজ" মীরা সুরদাসের গান—প্রেম সঙ্গীত। বাৎসল্য সঙ্গীতও কখনো হত। নানা রসের গান মধুর বিরহ মিলন রস। আর আমরা সারারাত্রি রাজা রাণী সাহেবদের এবং অন্য আমন্ত্রিতাদের সঙ্গে বসে সেই খোজা শাসিত প্রহরী খোজা রক্ষিত=সখি পাত্রীদের দলে দলে পালা করে 'পুতুল নাচ' অথবা যাত্রা থিয়েটারে অভিনয়ের মত 'হারেম'বাসিনীদের নাচ গান লীলা দেখে বাড়ী ফিরেছি।

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

জয়তী কাজে মন দিল। কর্মপ্রবণ স্বভাব তার, চিত্রকলায় দক্ষতা অর্জনের জন্যই সে বিদেশে এসেছে, মনের থেকে সকল অবসাদ ঝেড়ে ফেলে সংযত হয়ে কাজ শুরু করলো। কর্ডিয়ার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব প্রতিদিন দৃঢ় হতে লাগল—পরস্পর কোন বিষয় আলোচনা করতে আর সঙ্কোচ বোধ করতো না। উয়োগোস্লাভিয়ায় জয়তী একদিন যাবেই—কর্ডিয়ার সঙ্গে গেলে সে যে একান্তই খুসী হবে তা সন্দেহ নেই—তবে আপাতত জয়তী কিছুই মনস্থ করতে পারলো না।

এদিকে আমেরিকায় বসে মন্নুয়া ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—যোসেফের চিঠিপত্র কিছুই পায় নি। জয়তীকে তাগাদা দিয়েছে যোসেফের খবর দিতে। সে লিখেছে, বোম্বেতে ভাল একটি চাকরীর সন্ধান পেয়েছি কিন্তু যোসেফ সেখানে নেই খবর পেলাম, লণ্ডন থেকে সে কি ফিরে গেছে?' মন্নুয়ার চিঠিতে এলোমেলো নানা কথা, নূতন চাকরীর বিষয় সে কিছু লেখেনি। জয়তী উত্তর দেবার জন্য ব্যস্ত হল। 'যোসেফ আজই লণ্ডন ছেড়ে গেছে। বন্ধু মহলে তার চিত্র প্রদর্শনীর প্রশংসা সবত্রই শুনছি—নানা স্থান থেকে বহু বিদেশী দর্শক ও শিল্পী এসেছিলেন, এখানকার সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে। কাগজ থেকে লেখাগুলি কেটে তোমায় পাঠাচ্ছি, দেখে সুখী হবে। তুমিই কেবল আসতে পারলে না। প্রদর্শনী সংক্রান্ত সব কিছু কাজের ভার আমিই নিয়েছিলাম—এই সুবর্ণ সুযোগ পাওয়াতে আমার অনেক উপকার হ'ল—অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জন করলাম। এখানকার শিল্পীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু ধারণা হ'ল। যোসেফের মত উঁচুদরের মানুষ কমই আছে, সে কত কথা বললে তোমার বিষয়। সত্যিই সে তোমায় ভালোবাসে, এতদিনে বিশ্বাস হ'ল আমার। তোমাদের শীঘ্রই বিয়ে হওয়া উচিত—দুজনে একত্রে বোম্বেতে কাজ করতে পারবে এও তো সৌভাগ্য। এদিকে কর্ডিয়া তো আমায় তার দেশে নিয়ে যাবার জন্য বসে আছে, তার ছোট ভাই নাকি চিত্রকলায় বিশেষ পটু। ওদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর তুলনা নেই সে বলে। নীলাকাশ, নীলপাহাড় ও নীল জলের অপরূপ লীলাখেলা। তা ছাড়া ওরা বেশ মিশুকে স্বভাবের মানুষ বলে মনে হয়।

ছোটদার চিঠি পাই মধ্যে মধ্যে—মা ও বাবা দেশ বিদেশ ঘুরছেন। দাদার বড় ছেলে বাদল ঠিক দাদার মত দেখতে হয়েছে। ছোট ছেলের নাম মাদল। বিস্তৃত খবরাখবর দিও আন্তরিক ভালোবাসা জানাই, জয়তী।'

মন্নুয়াকে একটি চিঠি লেখার পর জয়তীর মন আরও হাল্কা হ'ল। যোসেফের কাছে তার ক্ষণিকের দুর্বলতাও যে ধরা পড়েছিল এ কথা সে মন থেকে মুছে ফেলতে নিতান্তই ব্যস্ত, খানিক ক্ষোভ ও লজ্জা এখনও নাড়া দিচ্ছে, দূর করতে পারছে না সহজে। জয়তী স্বাভাবিক ভাবে যোসেফের বিষয় কথা বলতে চায়, বন্ধুরা কিছুতেই বোঝে না কেন সে এত উদ্বিগ্ন। ক্ষণকালের ভ্রান্তির কথা নিজের কাছে স্বীকার করতেও সে সঙ্কুচিত—বন্ধুদের কছে বলল—

'যোসেফের মত মানুষ অতি দুর্লভ—কত দুঃখের মধ্যে সে দিন কাটিয়েছে তবু সে নীরস নির্মম হয়ে যায় নি। সে বড় দরদী, অন্যের দুঃখ বোঝে।' বন্ধুরা কিছুই বুঝতে পারলো না। মন্নুয়ার সঙ্গে যোসেফের বিয়ে হয়ে গেলেই যেন জয়তী বাঁচে, তার সয়ে যাওয়া ভুলে যাওয়া সবই সহজ হয়।

হেমেন যদিও মেধাবী ছাত্র ছিল না তবু সে ব্যারিস্টারিতে বেশ উন্নতি করছিল। প্রথমদিন থেকেই সে কাজে মন দিয়েছিল, অন্য কোনোদিকে তার চোখ ছিল না। তার স্ত্রী পুত্রকে দেখা শোনার চেষ্টাও সে করে নি, মাথার ওপর মা ও বাবা ছিলেন—সে নিশ্চিন্ত ছিল। শীলাকে শান্তা সংসারের কাজকর্ম শিখিয়ে রীতিমতো সুগৃহিনী করে তুলেছিল, বৃহৎ পরিবারের খুঁটিনাটি সমস্যা সে ভাল করেই বুঝে নিয়েছিল। দেবাশিস ও শান্তা তারপর থেকে একটু সরে গেছে। সুদীর্ঘ তিনটি বছর কেটে গেল জয়তী তবু ফিরলো না। শান্তা যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিল না। সন্তানদের সঙ্গে মনোমালিন্যর কোন আভাসও দেবাশিস সহ্য করতে পারতো না তাই সে এ বিষয় কথা বিশেষ বলত না। ছেলেমেয়ের ওপর রাগ তার ছিল না, কিন্তু সে ভালো করে বুঝতে পেরেছিল নূতন যুগের আদর্শই আলাদা, তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পৃথক। জয়তী পুরাতন আবহাওয়ার মধ্যে থেকে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারবে কিনা দেবাশিসের সন্দেহ ছিল। সে বলত—

'জয়তী চিত্রকলায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছে, সে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। আমাদের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা তার পক্ষে কি সম্ভব?' কিন্তু কন্যার অনুপস্থিতিতে তার অভাব সে প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করেছে। সে ছেলেমেয়েদের আধুনিক চাল চলনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার চেষ্টা করেছিল, মনকে বিরূপ হতে দেয় নি। কিন্তু তার পারিবারিক জীবনের আনন্দ ও সহজ সরল হাসির ফোয়ারা ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছিল। বন্ধুরা ও প্রতিবেশীরা তার সংসারের পারিপাট্য সর্বদা লক্ষ্য করেছে, সন্তান সুখও ও পারিবারিক স্বচ্ছলতার পরিচয় পেয়ে অল্প বিস্তর ঈর্ষাও করেছে, কিন্তু আজ দেবাশিসের সে সব গর্ব কিছুই স্থায়ী হ'ল না। 'জয়তী যে কাকে বিয়ে করবে তাই ভাবি। স্নেহ মমতাও যেমন চায়, কাণ্ডারীও সে চায়, শিল্পীর জীবনে সঙ্গীত দিতে পারে এমনও প্রয়োজন। কোন্ ছেলের এতগুলি গুণ আছে বল তো?' দেবাশিস শান্তাকে মনের কথা খুলে বলল। দুজনে বসে গবেষণা করছে এমন সময় ডাক পিওন কতগুলি ডাকের চিঠি দিয়ে গেল—তারই মধ্যে একটি বিদেশের ছাপ মারা চিঠি ছিল। জয়তীর কী বক্তব্য কে জানে!' বলে শান্তা চিঠিখানা খুললো।

শ্রীচরণেষু বাবা,

আমায় লিখেছ বিয়ের বিষয় মতামত জানাতে। উপযুক্ত সঙ্গী জীবনে পাওয়াই ভার, তোমরা আমার মতামত জানতে চাও বুঝি—আরও কিছুদিন না গেলে ওবিষয় কিছু বলতে পারছি না। সংসারে নিজেকে বাঁধতে ইচ্ছা করে না, যদি কোনদিন মনের মানুষ পাই তবেই বিয়ে করবো—এখন আর একলা বোধ করি না—কাজ শিখতেই ব্যস্ত। দিন ভালোভাবেই কাটছে। তোমরা ভেবো না।

শান্তার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌লো—' নিজেকে একটুও চেনে না সে, এ কী কথা বলে মেয়ে?' এই বলে শান্তা গুম্ হয়ে রইলো।

দেবাশিস ও শান্তা পুনর্বার দেশ ভ্রমণে বেরুলো। দক্ষিণ ভারতের খ্যাতনামা মন্দিরগুলি খুঁটিনাটি করে দেখলো, মনোরম বাগানের সদ্য ফোটা ফুলের মেলা—অতীতের কত মধুর স্মৃতি জাগিয়ে তুললো। সূর্যাস্তের সময় হলে নির্জন সৈকতে রোজই একত্রে এসে খানিকক্ষণ বসতো, অরুণরাঙা দিগন্তের দিকে দুজনে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকতো। সুদীর্ঘ পথ শেষ করে একদিন পাহাড়ের দিকে রওনা দিল। পর্বতমালার অলৌকিক দৃশ্য এবং গিরিশৃঙ্গের বিচিত্ররূপ দেখে প্রবীণ দম্পতির মনেও দোলা লাগলো। ছোট ছোট ঝরণাগুলি কলকল শব্দে নেমে আসছে দেখে দেবাশিস বলল—

'মানব জীবনের অভিযোগ, তর্ক, বিষাদ, বিদ্রূপ, ক্ষোভ সবই যেন এই ভাবে নেমে নেমে বিশ্বব্যাপী মঙ্গল কামনার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পুণ্যসলিলা প্রশস্ত নদীর জলপ্রবাহ মানুষের সকল গ্লানি নিয়ত ধৌত করে দিচ্ছে, তাই মানুষ পাহাড়ে পাহাড়ে, নদী ও সমুদ্র তীরে ঘুরে বেড়ায়—অমৃতকে খোঁজে। শৈল

শিরের উচ্চতার মধ্যে উদ্ধতভাব নেই, ধীর অটল নম্রতা। নদীর প্রবলবেগের মধ্যে প্রগলভতা বা ক্লান্তি কিছুই নেই—শুধু গভীর শান্তি। এই নির্মল স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক শোভা জীবনের উঁচু নিচু সব সমতল করে দেয়।'

*　　*　　*　　*

হেমেন বহু বছর পর শীলার পরামর্শ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হ'ল। বিরাট বাড়ীখানা শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল, মেরামত না করলে, রঙ্ না করালে নিতান্তই কুৎসিত দেখাচ্ছিল। ঘর ভরা জিনিস তবু চোখে পড়ছিল না কিছুই। বড়ী মেরামত শুরু হ'ল। শীলা প্রায় সব দায়িত্বই নিল। সে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মিস্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে বক্‌ছে, কাজ আদায় করছে। যে ঘরে যেমন রঙ দিলে মানায়, তাই করিয়ে নিচ্ছে। পুরাতন আবেষ্টনে শীলা নূতনকে খুঁজল—জীবনে যে রস সে পায় নি, যে রঙ সে দেখেনি ঘরে, দেয়ালে, মেঝেতে, ছাদে তাই ফুটিয়ে তোলবার তার আপ্রাণ চেষ্টা। বাড়ীখানা একেবারে অন্য ধরণে সাজালো। প্রত্যেক ঘরেরই পর্দা, আসবাবপত্র সুনিপুণভাবে গুছিয়ে রাখলো, প্রশস্ত দেওয়াল জোড়া জানালায় হাল্কা সবুজ রঙের পর্দা টাঙালো। এম্‌ব্রয়ডারি করা ফুলগুলি পর্দার ওপর রীতিমতো জম্‌কালো দেখাচ্ছিল। উচু দরজাগুলিতে পর্দাগুলি মানিয়েছিল বেশ। বহু দেশ-বিদেশের পুতুল, মূর্তি, সিগারেট বাক্স, ছাইদানী, ফুলদানী এতদিন এলোমেলোভাবেই এখানে ওখানে পড়ে থাকত আজ প্রত্যেকটি যেন একটি বিশেষ স্থান পেলো। হেমেন বাড়ীখানা দেখে মনে মনে খুশী হ'ল কিন্তু সে শীলাকে একটিও ভাল কথা বলল না। সে সর্বদাই ভুলে যায়। হেমেনের এ অভ্যাস নূতন কিছুই নয়, তার স্বভাবই শীলাকে ভাল মন্দ কিছু না বলা। তাই শীলা আর এ নিয়ে কিছুই ভাবে না। কাপড় গহনা, ঝি চাকর, সখের জিনিসপত্র সবই ছিল, সংসারে প্রাচুর্যের অভাব ছিল না কোথাও। কিন্তু হেমেনকে সে আর পেলো না কোনদিন। বন্ধুরা সহানুভূতি দেখালে শীলা বিরক্ত হ'ত, তাদের প্রশ্রয় দেয়নি কখনও, বরং তাদের বলেছে—'যে ব্যারিস্টারিতে এতটা উন্নতি করেছে তার পক্ষে সংসারের পাঁচটা কথা চিন্তা করা কি সম্ভব? সে রাত্রিদিন এক চিন্তা নিয়েই পড়ে আছে, ছেলেদের সঙ্গেই বা দেখা হয় কোথায়? আমার জীবনের শূন্যতার কথা প্রশ্রয় দেব কেন? আমারও কাজের অভাব নেই।'

জয়তীর বন্ধুরা কখনও কখনও শীলার কাছে এসে জয়তীর খবর নিয়ে যায়—দীর্ঘ চারটি বছর কেটে গেল, জয়তী তখনও ফিরলো না। হেমেনের দিকে তাকিয়ে শীলা বলে—'নিজের কথা তো কিছুই লেখে না জয়তী, বন্ধুদের বিষয় তবু লেখে অনেক।' '"শীলা লেখো না, জয়তীকে একটা ছুটি অন্তত এখানে কাটিয়ে যাক।' হেমেন উত্তর দেয়।

'জয়তী কি জানে না আমরা তার পথ চেয়ে বসে আছি?' এখানে তার ভাল লাগে না বুঝি। আর আমিও কি রকম 'ভোঁতা' হয়ে যাচ্ছি মনে হয়'। শীলার মুখ দিয়ে কথাটা যেন হঠাৎই বেরিয়ে গেল। হেমেন সামান্য চম্‌কিয়ে উঠ্‌ল—শীলা সচরাচর তো এভাবে কথা বলে না।

'গান বাজনার চর্চা করো না কেন?' সে বলল।

'তুমি কি কোনদিন গান শুনতে পাও নি? আমি গানের চর্চা তো কতই করেছি। রেকর্ডগুলি তো এসেছে, আমার গানগুলি শুনেছ কি তুমি?'

শীলা রেডিওগ্রামের দিকে তাকিয়ে রেকর্ডগুলি দেখাতে যাবে এমন সময় হেমেন চলতে শুরু করে দিল। নিজের ঘরখানায় আবার ফিরে যাবার জন্যই সে ব্যগ্র। উকিল, সলিসিটার, জজ, মক্কেল এদের নিয়েই তার কর্মজগৎ, তাদেরই নিয়ে সে নিমগ্ন হয়ে থাকে। তার স্ত্রী কখনো বিবাদ করে না—আব্দার করে না, কোন দাবী করে না—তাই সে কাজে মন দিতে পারে। প্রথম প্রথম শীলা অভিমান করতো, কিন্তু সে এখন একেবারেই চুপ করে গেছে, কিছুই বলে না। হেমেনের তাই ভাল লাগে, তার কাজের সুবিধা হয়। কারুর জন্য কিছু ভাবতেও হয় না। শীলা হেমেনের মুখের

দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, হেমেন কিন্তু অর্ধেক পথ বেরিয়ে গেছে তখন—কথাটা শেষ হ'ল না। বারান্দায় পা দিতেই হেমেন দেখতে পেলো একখানা পরিচিত মোটর গেটের ভিতর ধীরে ধীরে ঢুকছে—প্রায় নিঃশব্দে গাড়ীখানা বৈঠকখানা ঘরের সামনেই এসে থামলো।

'অলোক যে।' হেমেন আশ্চর্য হয়ে বলল—

'কতদিন পর এ বাড়ীতে পা দিয়েছ আবার বলো তো?' অলোককে দেখে হেমেন বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলো। খুশী হয়ে অলোক বলল—

'আমি তো দেশের বাইরে গিয়েছিলাম আবার, স্টেট্স (states) এ ছিলাম, বলো তো কার সঙ্গে দেখা? জয়তীর প্রাণের বন্ধু মন্নুয়া। এক বন্ধুর বাড়ী বসে চা খাচ্ছিলাম, হঠাৎ সেখানে আলাপ হ'ল। জয়তীর কথা আমায় বার বার জিজ্ঞেস করলো, আমি কিন্তু বাধ্য হলাম বলতে যে জয়তী আমার কোন খবরই রাখে না। কি বল হেমেন?' অলোক হাসতে লাগলো।

ইতিমধ্যে হেমেন ধীরে ধীরে তার আপিস্ ঘরে গিয়ে বসলো। 'সে কি? মন্নুয়া তো জয়তীকে নেমন্তন্ন করে লণ্ডন নিয়ে গেল, হঠাৎ তাকে ছেড়ে গেল কেন?' শীলা অলোককে প্রশ্ন করতে সে বলল—

'জয়তী সর্বদাই স্বাধীনতা চায়, ছেড়ে দাও না তাকে, যা চায় তাই তো দেবে?'

অলোকের কথার মধ্যে সহানুভূতির চাইতে ব্যঙ্গই ছিল বেশী—শীলা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে অলোকের দিকে তাকালো—

'মন্নুয়া কেমন দেখতে? শুনেছি নাকি খুব সুন্দরী? যোসেফের সঙ্গে বিয়ে হবে তো?'

অলোক হাস্‌ল। 'তুমি কি চাও আমি কেবল মন্নুয়া আর যোসেফের কাহিনী আলোচনা করি? তাদের বিষয় আমার কোনই কৌতূহল নেই। তবে এটুকু বলতে পারি জয়তী আবার সেই আধপাগল দলের সঙ্গেই ভিড়েছে, ওর ওপর তাদের প্রভাব কিছু কম নয়।' অলোক খানিক দুঃখ প্রকাশ করলো—মুখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছিল। একটি নূতন ছবির দিকে তার চোখ পড়াতে থেমে গেল। ছবিটির দিকে এ বাড়ীর আর কারুর বিশেষ নজরে পড়েনি। অলোকের মনে হ'ল এ ছবি জয়তীরই আঁকা, কিন্তু সে এ বিষয় কিছু প্রশ্ন করলো না।

শীলার গায়ে শ্যাওলা রঙের ছাপা শাড়ী, লাল পাড়টা বেশী চওড়া নয়। ছোট হাতকাটা ব্লাউজ, ছড়ানো গলা—নিটোল গড়নখানি যেটুকু দেখা যাচ্ছে অতি কমনীয়। সোণার হারখানা বুকের ওপর মৃদু মৃদু দুলছে। চুলগুলি তার ঢেউ খেলানো, সাধারণভাবে উঁচু একটি হাত খোঁপা জড়িয়েছে। টানা ভ্রূ দুটি ঘন কালো। চোখের চাউনিটি অতি করুণ, চোখের পাতাগুলি সুদীর্ঘ। নাসিকাটি তীক্ষ্ণ হলেও লম্বায় খাটো। মুখখানা লালিত্যে পরিপূর্ণ এবং মনে হয় স্বভাবটি অতি কোমল। অন্তরের গভীর কোণে জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের যা অভিযোগ আছে বাইরে কেউ কোনদিন তার একটুও আভাস পায় নি, কিন্তু তাকে দুটো মিষ্টি কথা বললে সহজেই তার মন গলে যায়। পরের জন্যই সে ভেবেছে শুধু, তার নিজের কোন কথা সে কাউকে জানতে দেয় নি।

'অলোক, যোসেফ কি ডিভোর্স পেয়েছে? সে কি মন্নুয়াকে বিয়ে করতে পারবে?' শীলা আবার প্রশ্ন করল।

'শীলা, আর পারি না তোমায় নিয়ে।' অলোক ভ্রূ কুচকিয়ে উঠ্‌ল। যে সব মেয়েদের বিষয় আমার কোনই উৎসাহ নেই তাদের কথা বারবার জিজ্ঞেস কর কেন? তোমার কথা ভাল করে বল, তাই তো শুনতে চাই,' অলোকের কথা শুনে শীলা যেন কেমন রাঙা হয়ে ওঠে—ঠাট্টার কথা হলেও তার ভাল লাগে, মনে কেমন যেন একটু দোলা দেয়। সে মৃদু কণ্ঠে বলল—

'হেমেন তো সর্বদাই ব্যস্ত, শনি রবি সবই সমান তার, দু একজন দেখা করতে আসে তাই একা পড়ি না আজ তুমি এসেছ বলে বিকেলটা ভাল কাটল। অলোকের দুটি মিষ্টি কথা শীলা নিতান্ত অগ্রাহ্য করতে পারলো না।

'বাড়ীখানা এত সুন্দর করে রেখেছো, এত বড় সংসারটা ঠিকমত চালানো সহজ কথা নয়, বাহাদুরী আছে তোমার।' কথাগুলি অলোক সরলভাবেই বলে কিন্তু—তাতে শীলা মৃদু হেসে উত্তর দেয়—

'একজনও যদি সেটা লক্ষ্য করে থাকে তাও ভাল লাগে।' শীলা অলোকের দিকে কেমন যেন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়? অলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। শীলার স্বভাবের উদারতা তাকে স্পর্শ করেছিল সন্দেহ নেই, তাকে কারুর বিরুদ্ধে কখনও অভিযোগ করতে শোনে নি সে। বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভে পুত্রবধূর কর্তব্যগুলি শীলা নিপুণভাবেই করেছে, সুগৃহিনীর পদ পেয়েছে অনেক পরে। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব একাহাতেই সামলিয়েছে। পাঁচ জনের সংসারের নানান কর্তব্য ও তাদের সুখ দুঃখ ভালো মন্দ সব কিছুর জন্য সে একাই দায়ী হয়েছে। নিজেকে সে একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল, কতদিন যে নিজস্ব বলে কিছু পায় নি বা চায় নি সে কথা তার মনে পড়ে না।

অলোককে এক পেয়ালা চা ঢেলে দিতে দিতে সে বলে—'জানো অলোক, হেমেন এখন BAR এ বেশ নাম করেছে—সময়ের তার অভাব আরও তাই। কিন্তু তাকে একটু যদি টেনে না বার করে আনো, তার স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। আমি তো পারলাম না বোঝাতে, তুমি যদি জোর করে নিয়ে আসতে পারো।'

'তোমার মতো সুন্দরী বৌ যদি তা না পেরে থাকে আমার ধৃষ্টতা নেই চেষ্টা করবার, আমি কি তাকে জাদু করতে পারবো?' অলোক হাসতে শুরু করলো দেখে শীলা আবার বলল—'জোয়ার ভাঁটা' বলে রঙ্গমঞ্চে যে একটা অভিনয় হচ্ছে তাতে গেলেও তো হয়। বল না হেমেনকে চলে আসতে, যাও অলোক...'

শীলা খুব আশা করছিল অলোকের কথায় হেমেন হয়তো রাজী হবে। খবরের কাগজখানা ভাঁজ করতে করতে অলোক হেমেনের অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক পা যেতেই দেখলো হেমেন ছুটতে ছুটতে ওরই দিকে অগ্রসর হচ্ছে, কাছে এসেই স্নেহভরে অলোকের হাতখানা চেপে ধরলো।

'মন দিয়ে শোন অলোক, একটা বড় হাঙ্গামার ক্রিমিন্যাল (criminal) কেস্ নিয়েছি, দিনেরাতে কাজ করতে হবে ক'দিন? তা এক মাস তো বটেই। তোমার সাহায্য চাই।'

'সেকি? আমার দ্বারা ওকালতি?' অলোক ভান করলো সে কিছু বোঝে নি—কিন্তু সত্যিই সে হেমেনের অনুরোধের অর্থটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি।

'তবে শোন, তুমি শীলাকে নিয়ে যাবে তো থিয়েটারে? যেটা গত ছ' মাস ধরে চলছে এমন একটা ঠিক করে ফেলো, চলে যাও এখনই যদি টিকিট পাও। ও খুব আশা করছিল আমি যেতে পারব।'

হেমেনের মুখের অবস্থা দেখে অলোকের মায়া হ'ল, অলোক যদি শীলাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসে, সে যেন বিপদ থেকে রক্ষা পায়। দুজনকেই অলোক অতি নিকট বলে মনে করতো, তাদের জন্য দুঃখই হ'ল তার। শীলাকে সে 'জোয়ার ভাঁটায়' নিয়ে যাবে হেমেনকে কথা দিল। হেমেন দাঁড়িয়ে ছিল অলোকের উত্তরের জন্য। অলোক আর চুপ থাকতে পারলো না—

হেমেন তোমারই কাছে যাচ্ছিলাম, শীলাই পাঠিয়েছিল তোমায় জোর করে অর্থাৎ bodily carry করে নিয়ে আসতে। বেচারা শীলা বড়ই দমে যাবে। তবে ভেবো না, আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো। কিন্তু দুঃখিত হবে সে সন্দেহ নেই।'

হেমেন নিশ্চিন্ত হয়ে তার কাজে ফিরে যেতে অলোক ধীরে ধীরে আবার শীলার কাছে ফিরে গেল—

'বেচারা হেমেন, কাজ ফেলে নড়তেই পারে না সে'—

'আমি জানি' শীলা উত্তর দিল।

'তাকে পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই, তার কাজে বাধা দিয়ে ফেল্লাম আবার ভুল করে।' সে মুখখানা নিচু করে রইলো যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছে—নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করতেও সে লজ্জা পাচ্ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে শীলা অলোককে বলল সে তার সঙ্গে যেতে রাজী আছে। তৈরি হয়ে আসতে গেল। অলোক অপেক্ষা করবে বলল। শীলার ছেলেদের ছবিখানা তার চোখের সামনে—দুইটি ভাইয়ের মাঝখানে শীলা দাঁড়িয়ে, দুজনকে গলা জড়িয়ে ধরেছে যেন তাদের বড় দিদি। বাদল ও মাদলকে অলোক ডাকল। সাড়া পেয়ে তাদের ঘরে গেল। দুজনে দুখানা কমিক নিয়ে পড়ছিল—অলোককে দেখে বিছানায় উঠে বসলো।

'মা কোথায় যাচ্ছে? প্রশ্ন করলো বাদল। ভাল করে উত্তর না শুনেই বলল—

'থিয়েটারের গল্পটা এসে বোলো কিন্তু।

অলোক 'হ্যাঁ' বলে বেরিয়ে গেল।

শীলাকে সাদাসিধে পোষাকে দেখে অলোক যেন একটু বিস্মিত হ'ল—একখানা সাদা তাঁতের সাড়ী পড়েছে সে—গোলাপী পাড়, ব্লাউজও ঐ রঙের। কানের মুক্তোজোড়া যেন দুটি অশ্রুবিন্দু। গলায় সরু মুক্তোর মালা। কান দুটি সম্পূর্ণ ঢেকে একটি আল্গা খোঁপা করেছে,খোঁপার নিচে কয়েক গাছা চূর্ণকুন্তল দেখা যাচ্ছে। বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল শীলাকে। নিতান্ত সরল ও সহজ ভাবে এসে দাঁড়ালো কিন্তু মুখে তার আজ প্রশান্ত হাসি। দুজনে গাড়ীতে উঠতেই অলোক ষ্টার্ট দিল। কিছুদূর যেতেই শীলা বলল—

'জোয়ার ভাঁটা দেখতে যাবার তোমার খুব সখ আছে কি অলোক? আমার জন্যই যেতে বাধ্য হলে বোধ হয়। কেমন জানি দোষী লাগছে নিজেকে।'

'সত্যি কথা বলতে কি আমার এমন কিছুই ইচ্ছা ছিল না তবে অনুমতি দিলে তোমায় গাড়ীতে খানিক পথ ঘুরিয়ে আসতে রাজী আছি। অবিশ্যি থিয়েটারে যাবার উৎসাহ যদি তোমার না থাকে।'

শীলা সহজেই মত দিল। অলোক বহুদিন পর নিরিবিলি রাস্তায় গাড়ী চালাচ্ছে, বেশ জোরে গাড়ী ছুটলো, শীলা প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে তন্ময়। গাছ, পাতা, ফুল, প্রশস্ত মাঠগুলি, আঁকা বাঁকা রাস্তা, যেন অন্তবিহীন পথ চলেছে। ঝড়ো বাতাস বইতে লাগল, শীলার চুল এলোমেলোভাবে তার কপাল ঢেকে তার চোখ ঢেকে অস্থির করে তুললো। গাড়ীর কাঁচখানা তুলে দিতে শীলা স্থির হয়ে বসতে পারলো। সারাদিনের ক্লান্তি, কতদিনের মানসিক ক্লান্তি যেন হঠাৎই ঘুচে গেল।

'বহুদিন লম্বা পাড়ি দিইনি, আগে সখ ছিল গাড়ী নিয়ে দুশো আড়াইশো মাইল ঘুরে আসতাম। এই রাস্তাগুলো ড্রাইভিং-এর পক্ষে বেশ ভাল, কি বলো শীলা?' অলোক তার প্রশ্নের কোন উত্তর পেলো না। তাকিয়ে দেখলো শীলা হঠাৎই ঘুমিয়ে পড়েছে। বিশ পঁচিশ মাইল রাস্তা অলোক বিনাবাক্যে গাড়ী চালিয়ে গেল—রাস্তার চৌমাথায় এসে গাড়ীখানা একটু জোরে থামতে শীলা চম্‌কে উঠে বসল—

'স্বপ্ন দেখছিলাম অলোক—জাহাজে করে কোন একটা নতুন দেশে গিয়েছি, কি কাণ্ড! সারা রাস্তা ঘুম দিয়ে কাটালাম? ছি ছি—কি যে ভাবছো তুমি। গত কয়েকদিন ভালো করে ঘুমুই নি, ড্রাইভটা তাই বেশ ভালো লাগলো? কিছু মনে করোনা।

'ড্রাইভটা ভালো লাগল না, ঘুমটা?' দুজনে হেসে উঠলো। বাইরের আলো বাতাস আমায় যেন কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

অলোকের আজ আর বুঝতে বাকি রইলো না শীলা জীবনে নিতান্তই একাকী। সে সর্বদাই একা, শতলোকের মাঝখানেও একা। শুধু কর্তব্যের মধ্যে তার আনন্দ নেই, বর্ণহীন এক ঘেয়ে জীবন সে মানিয়ে নিয়েছে কিন্তু সে যে ক্লান্ত তা কাউকে বলেনি।

অলোকের মনে অশেষ সহানুভূতি হয়। জয়তী যে তাকে গ্রহণ করেনি অলোক সেইজন্যই নিঃসঙ্গ। শীলার জন্য একটা অকারণ মমতা তার সর্বাঙ্গে নিবিড় বেদনা জাগিয়ে তোলে কেন? শীলাকে দেখলে দুঃখ হয় আবার ভালও লাগে—তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আসতে। অন্তরের গভীর শূন্যতা কিভাবে আজ ব্যক্ত হয়ে গেল সে নিজেকেই বোঝাতে পারলো না। শীলা তার দুঃখ চেপে রেখেছিল বছরের পর বছর,

অলোক তাই যেন তাকেই বুঝতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে—তাকেই আপন করতে পারলো। শীলার বুক ভেঙে আজ কান্না ফেটে পড়ে, সে এভাবে নিজেকে ধরা দেবে কখনও ভাবেনি। তার যে কোথায় শূন্যতা সে কাউকে বলতে চায় নি, এতদিনে কি একজন তারও যে সত্যিই দুঃখ আছে তাই বিশ্বাস করলো? নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে শীলা আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে সরে বসলো, অলোকের দিকে সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

হেমেনকেই সে চেয়েছিল, চিরদিন তাকেই ভালো বেসেছিল এবং হেমেন তা স্পষ্টই জানতো। কিন্তু কই কিছু তো পায় নি সে হেমেনের কাছে, এতদিন শীলা তার মান অভিমান দমন করে রেখেছিল, নানাভাবে চেষ্টা করেছিল, তার সর্বস্ব দিয়ে যদি হেমেনকে একটুও নিকটে পায় কিন্তু বুঝেছিল হেমেন রক্ত মাংস দিয়ে শুধু গড়া নয়, হয়তো খানিক পাথরের, অতি কঠোর, নিতান্তই আত্মকেন্দ্রী। বাড়ী, গাড়ী, সম্পত্তি, আত্মীয়কুটুম্ব এই দিয়ে শীলার যৌবনের দিনগুলি হেমেন ভরিয়ে দিতে চেয়েছিল, শীলাকে সে আর কিছু দিতে পারবে না পরিষ্কার করে বার বারই জানতে দিয়েছে। হেমেনের সান্নিধ্য বা স্পর্শ পায় নি শীলা কতকাল তার হিসাব নেই। তার চোখ জল দেখে হেমেন কোনদিন প্রশ্নও করেনি কী হয়েছে। মানুষ যতই শক্তিশালী হোক—যতই স্বাধীন হোক, স্থূল ঐশ্বর্য তার সব চাওয়া পূরণ করতে পারে না, কিছুতেই হেমেন তা স্বীকার করতে চায় নি, শীলাকে সংসারে তাই একাই বিরাজ করতে দিয়েছিল—সেই কি মানুষ চায়?

কিন্তু শীলা তার অন্তরের দীনতার কথা সমাজ সংসার বা আত্মীয়বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে নি—হেমেনের উদাসীন ব্যবহারে সে যে কতখানি দুঃখ পেয়েছিল সে কথা হেমেনকেও কোনদিন বলেনি। হেমেন তাই ধরা পড়েনি—শীলাকে যে সে তিলে তিলে ক্ষয় করে ফেলছিল, হেমেন তা বুঝেও বুঝতে দেয়নি অপরকে। শীলাকে হেমেনের প্রয়োজন ছিল না কিছুই। এমনই একটা ভয়ঙ্কর সত্য শীলা নিজগুণেই গ্রহণ করে নিয়েছিল এবং সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে এত বড় অবিচার গোপন করে রেখেছিল।

অলোক ভাবে নি এমন ঘটবে। বহু বছর সে জয়তীর কাছ থেকে শুধু প্রত্যাখ্যান পেয়েছে। তার চোখ দুটির মধ্যে শুধু অব্যক্ত অভিমান। ছ'ফুট লম্বা—দীর্ঘকায়া, গৌর চেহারা, চুলগুলি তার ঘন কালো, তাকে সুপুরুষ বলা যায়। কিন্তু হৃদয় তার বিদীর্ণ। দেহখানা শীর্ণ হয়ে পড়েছে—কেমন অসহায় ভাবে তাকালো—

'শীলা বল কি ভাবছো?' অলোক কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, মনটা আজ যেন কেমন বাধন ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল—

'ক্ষমা করতে পারবে কি?' সে বলল—

'কিন্তু শীলা, তোমার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে আমার একার জীবনের কোথায় যেন সামঞ্জস্য আছে, তোমায় ভালোবাসতে দাও আর কিছু চাই না। আমরা যদি পরস্পরকে না বুঝতে পারি আর কে বুঝবে আমাদের?'

কি যেন মহাসম্পদ খুঁজে পেয়েছে অলোক কিন্তু শীলাকে কোনভাবে আঘাত দিতে সে চায় নি—বিপুল সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেল। কেমন একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষণের আর্তনাদ তার মনকে আলোড়িত করে তুলছে—অনিশ্চিতের মহাপ্রলয় তাকে স্তম্ভিত করে দিল। ধীরে ধীরে অলোক বাড়ীর দিকে রওনা দিল। পথে নিবিড় ঘন অন্ধকার, চারিদিক কালোয় কালো, বিদ্যুতের আলো মধ্যে মধ্যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তার মনে হল ভবিষ্যৎ জীবনে হয়তো চকিতের আনন্দই তার প্রাপ্য—তড়িৎ রেখার মতই সে আসবে আর যাবে—অতি ক্ষণস্থায়ী অনিশ্চিত। ক্রমশঃ

চট্টগ্রামের ছেলে ভুলানো ছড়া

শিপ্রা দত্ত

লোকসাহিত্যে ছেলেভুলানো ছড়ার মূল্য অনস্বীকার্য। সরল গ্রাম্য মেয়েরা সন্তানদের নানা গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে থাকে। এই সব ছড়া গানে কোন, সঙ্গতি অর্থ হয়ত অনেক সময় থাকে না। ভাষা ও ব্যাকরণের ত্রুটি বহুল। তবু এই ছড়া গানগুলিতে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। এই জন্য অতি দুর্দ্দান্ত শিশুও এই ছড়া গানের মাদকতায় ঘুমিয়ে পড়ে।

তাই তাই তাই, মামীর বাড়ীত্ যাই।
মামীর বাড়ীত্ ভাত ন দিলে,
পাতিলা ভঙ্গি খাই।
পাতিলা ভিত্তর ধোরা হাপ
ফাল্দি উঢ্যে বোঅর বাপ।
বউঅর বাপে চাতুরায়,
খালর পানী মধুরায়।
অবউ বউ ন কান্দিস,
বদ্দা আইলে কই দিস।

অর্থাৎ তাই তাই মামীর বাড়ী যাই, মামী ভাত না দিলে হাঁড়ি ভেঙ্গে খাই। হাঁড়ির ভেতর ঢোঁড়া সাপ। তা দেখে বউ এর বাবা লাফ দিয়ে উঠেছে। বউ এর বাপের রসালাপ করে, খালের জল কমে যায়। ও বউ, বউ কেঁদো না। বড়দা এলে বলে দিও।

আলি আলি ফুলর কলি,
বেল ফুলে ঘিরি ধরগ্যে
খোকা মিয়ার বাড়ী।
খোকার বাবা আইস্তে,
আইঠ্যা কেলা লই।
খোকা কান্দের যে
পথে পথে ঝিঁ ঝি ডাকি অই।

খোকা মিঞার বাড়ী বেল ফুলের কুড়িতে ঘিরে ধরেছে। খোকার বাবা কলা নিয়ে এসেছে। খোকা কাঁদছে, পথে পথে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে।

তাই তাই মামুর বাড়ী যাই,
মামু দিল দুধ কেল,
দুয়ারত্ বই খাই।
মামী আইল লাড়ি লই ধাই ধাই।

অর্থাৎ মামার বাড়ী যাই। মামা দিল দুধ কলা, দরজায় বসে খাই, মামী লাঠি নিয়ে এল, ছুটে পালাল।

ও বনর ফাকী ডাকস্ কারে এন্ গরি?
আঁই যারে পারি তারে ডাকি।
ও বনর ফাকী দিয়া ফাঁকি,
তুই ডাকস্ কারে বারে বারে।
আঁই যারে পারি তারে ডাকি।

হে বনের পাখী, এমন করে কাকে ডাকছ? আমি যারে পারি তাকে ডাকি। হে বনের পাখী ফাঁকি দিয়ে তুই কাকে বার বার ডাকছিস্? আমি যাকে পারি তাকে ডাকি।

শীত করাজ্জে পরান যারজে,
ভাত বাড়েজ্জে কনে খাজ্জে?
বৌ কট্টা নায়র যারজে;
ধাম কট্টা কৈতরে খাজ্জে।

শীত করছে, প্রাণ যাচ্ছে। ভাত দিচ্ছে, কে খাচ্ছে? বৌ কয়জন বেড়াতে গেছে। ধামগুলি পায়রা খাচ্ছে।

শরম ঝিঝির খড়ম পা,
হাটতে ঝিঝির লরে গা।
ক্যানে ঝিঝি হাড়ত্ যা,
হাড়ত্ যাই পান কিনি খা।

শরম বিবির খড়মের মত পা হাঁটতে তার শরীর দুলে। কি করে বিবি হাটে যায়? হাটে যেয়ে পান কিনে খায়।

নাতিন বড়ই যা বড়ই যা হাতে নুন,
বৈইল্যা ভাঙ্গি পইড়গ্যে নাতিন বড়ই গাচ তুন।

নাতি হাতে লবন নিয়ে কুল খায়। ডাল ভেঙ্গে নাতি কুল গাছ হতে পড়ে গেছে।

ঘুম পরোনী মাসী পিসী আঁর বাড়ীত্ আইঅ,
ভাত দিয়ম্ ডাইল দিয়ম দোয়ারত্ বই খাইঅ।
ইচা মাছর সালন দিয়ম কোনত বই খাইঅ,
খিড়খিড়ি দোয়ার খুলি দিয়ম, পুরুৎ করি খাইঅ।

শিশুকে উপলক্ষ করে ঘুম পাড়ানী গান গাওয়া হয়েছে। ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী আমার বাড়ী এসো। ভাত দেবো, ডাল দেবো, দরজায় বসে খেও। চিংড়ি মাছের তরকারী দেবো ঘরের কোণে বসে খেও। খিড়কীর দরজা খুলে দেবো, তাড়াতাড়ি চলে যেও।

ও বাছা, ন কাঁন্দিঅ ন কাঁন্দিও ন ফাডিও গলা,
কাইল বেয়ানে আনি দিয়ম বক্সীর হাডর কলা।

হে বাছা গলা ফাটিয়ে কেঁদ না। কাল সকালে বক্সীর হাটের কলা এনে দেবো।

এক্কানা মনা ঘুরঘুরি ঠেং,
ক্যানে মনা রঙ্গুম গেল?
আতর বাশী পেলাই গেল।
মা ভইনরে কান্দাই গেল।

ছোট্ট ময়না পাখীর ছোট্ট ছোট্ট পা। কি করে ময়না রেঙ্গুন গেল। হাতের বাঁশী ফেলে গেল। মা বোনকে কাঁদিয়ে গেল।

দহ্ দহ্ লাইল্যা কডে?
পানী লাই গিয়ে।
পানী কডে?
ফুরায় গিয়ে দহ্ দহ্।
মাছ কডে?
বগায় খাইয়ে,
বগা কডে?
উড়ি গিয়ে দহ্ দহ্।

দোল দোল লাইল্যা কোথা? জলের জন্য গেছে? জল কোথায়? ফুরিয়ে গেছে। মাছ কোথায়? বকে খেয়েছে। বক কোথায়? উড়ে গেছে।

দাদা কেতা দে কেতা দে শীতে মরি,
কইলকাতার তুন আইয়ে কেতা বোমবাট গরি।
আঁর কেতার নাম তুলতুল হাঁ,
নাকে মুখে দিলে কেতা মাতে বুলে না।
আঁর কেতার ভিতর চাম্বা ফুল।
জজ সাবে জানে আঁর কে ।র মূল।
দাদা কেতা দে কেতা দে শীতে মরি।

দাদা কাঁথা দাও, কাঁথা দাও শীতে মরি। কলকাতা হতে কাঁথা এসেছে আমার কাঁথার নাম তুলতুল হাঁ। নাকে মুখে দিলে মাথা ঢাকে না, আমার কাঁথার ভেতর চাপা ফুল। জজসাহেব জানে তার মূল্য।

টুমকি নাচে ঝুইল্লা ইন্দুর।
ফালদি নাচে বুইল্যা ইন্দুর,
লেজ লারি লারি।
আর কাডে চেড়া।
কাডে চালের কোনা।
আর কাডে বিবির মাথার সিঁন্দুর
রাইত ও নিশি কাডে,
বিবির নাকের নোলোক,
আর কাডে বেত,
কাডে বিবির গলার হার।
টুমকি নাচে ঝুইল্যা ইন্দুর।

ইন্দুর রাতদিন কি ভাবে কি কি নষ্ট করে তার কথাই বলা হয়েছে উপরোক্ত ছড়ায়।

বনের ভাল্লুক্যারে বনে যায়,
বনের গোঁডা খায়।
বনের ভাল্লুক্যারে, গলার পুতি লইবানি?
ভাতর মার খাইবানি।

ভাল্লুক বনে থাকে, বনের ফল খায়। বনের ভাল্লুক, পুঁতির মালা নেবে কি? ভাতের ফেন খাবে কি?

এইভাবে শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য বা ছেলেদের ভুলাবার জন্য নানা পশু পাখী ফুল ও শিশুর প্রিয় নানা প্রসঙ্গ দিয়ে ছড়া গীত হয়ে থাকে সুরের মাধুর্যে ও ছড়ার বৈচিত্র্যে এমনিতর কত সহস্র আকর্ষণীয় চিত্র পূর্ব বাংলার পল্লীমায়ের মণি, কোঠায় লুকিয়ে আছে তা কে জানে? এই ধরণের মিষ্টি মধুর বহু নার্সারী রাইম লোকসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। সযত্নে চয়নের অভাবে এমন অনেক অমূল্য সম্পদের বহুলাংশ হারিয়ে যাচ্ছে।

কারণ আধুনিক গ্রাম্য জীবনের পট পরিবর্তন হচ্ছে। এই সব সরল গ্রাম্য গানের স্থল পূর্ণ করছে রেডিও, গ্রামাফোনের নানা গান। তাই সরল পল্লীমায়ের নিজস্ব ধারায় রচিত এই যে অমূল্য ছড়া, তাও যেন আজ ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে। তবু দূর গ্রাম গ্রামান্তরে এই ধরণের যে সব ছড়া শোনা যায় তার মূল্যও কম নয়।

চট্টগ্রামের কিছু ছড়া গান এই প্রবন্ধে পরিবেশন করা হল।

মোহমুদ্গর

অনিলকুমার আচার্য

শিশু পাঠ্যপুস্তকে যে সকল নীতিবাক্য আমরা ছেলে মেয়েদের শিখাই, বাস্তব জীবনে তা কতটুকু পালন করা সম্ভব, তা বোধহয় আমরা ভেবে দেখি না। ছোটবেলায় ছেলেমেয়েরা শিখে, "সদা সত্য কথা কহিবে," "পরের দ্রব্যে লোভ করিও না," "কপটতা ভাল নয়," "শঠতা সদা বর্জনীয়"—আরও কত কী? কিন্তু বাস্তব জীবনে এসব সুভাষিতাবলী তথা নীতিবাক্য কতটুকু কাজে লাগে?

আপনারা ভাববেন না—আমি নৈতিবাদী, ছেলে-মেয়েদের মস্তিষ্ক চর্বন করতে বসেছি। গুরু গম্ভীর তত্ত্ব কথা আলোচনা করে আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা করাও আমার ইচ্ছে নয়।. তবু চারদিকের রকমসকম দেখে আমার মনে যে সব খট্‌কা লেগেছে, সেগুলি আপনাদের কাছে না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না। আমরা যে সব সত্যকে চিরন্তর বলে জেনে এসেছি, যে সব মূল্যবোধ মানবসত্তার গভীরে শীকড় চালনা করে আবহমানকাল শাশ্বত মহিমায় বিদ্যমান্ ছিল; নানা বিরুদ্ধ আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতে আজ তাদের সমূলে উৎপাটিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কি ব্যক্তি জীবনে, কি সমাজ-জীবনে সেই পুরানো প্রত্যয় ও মূল্যবোধ আজ আর পূর্বের নিরুদ্বেগ প্রশান্তিতে অব্যাহত নেই। যুদ্ধ মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগে নানা স্বার্থের সংঘাত ও সমস্যার টানা পোড়েনে আমাদের নৈতিক অবনতি ঘটেছে, মূল্যবোধ পাল্টেছে—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু রাজনীতির নামে, জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে জাতিতে জাতিতে যে জঘন্য স্বার্থের সংঘাত চলেছে, তাতে

আমাদের সেই পুরানো প্রত্যয় ও মূল্যবোধ অনবরত পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের কথাটাই একবার ভেবে দেখুন। আমি আপাতত অতীতের কথাটাই বল্‌ছি। নেহেরু লিয়াকত। নেহরু-নুন চুক্তির পূর্বাহ্নে ক্যামেরার সম্মুখে হাস্যরত দুই প্রধানমন্ত্রীর আলিঙ্গনবদ্ধ দেহ যুগলের দিকে তাকিয়ে মনে হয় নি কি,এঁদের দুই দেহই শুধু আলিঙ্গনে মিলিত হয় নি। এঁদের দুই আত্মাও একত্রে মিলে এরা হরিহরাত্মা হয়ে গেছেন? এই আত্মিক মিলনের এতটুকু যে নড়চড় হতে পারে, সংবাদপত্রে দুই প্রধানমন্ত্রীর আলিঙ্গনাবদ্ধ আলোক চিত্রের দিকে তাকিয়ে কারও কি তা মনে করার উপায় ছিল? এমন সব ছবি দেখে কেউ কি ভাবতেও পারে, দুই দেশের মধ্যে অলিখিত যুদ্ধ-প্রায় একটা অবস্থা বছরের পর বছর চলে আস্‌ছে? ১৬ই আগষ্টের সেই ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কিছু পূর্বে গান্ধী জিন্নার এমনই একটি আলোকচিত্র সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় সাড়ম্বরে ছাপা হয়েছিল। দেশের দুই ভাগ্যবিধাতার এই মিলন স্নিগ্ধ হাস্যমধুর দৃশ্যের অন্তরালে সাম্প্রদায়িকতার ধারালো ছুরিকা লুকানো ছিল, একথা কে কল্পনা করেছিল?

নেহরু-নুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে থেকেই ভারতসীমান্তে পাকিস্থানের পক্ষ থেকে অনবরত গুলি বর্ষণ চলে আস্‌ছিল। একদিকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হল —সীমান্তে এখন থেকে গুলিবর্ষণ বন্ধ। স্বাক্ষরের কালি চুক্তিপত্রে শুকোতে না শুকোতেই শোনা গেল—অমুক সীমান্তে পাকিস্থানের পক্ষ থেকে প্রবল গুলিবর্ষণ আরম্ভ হয়েছে। একদিকে ভারতবর্ষ আকস্মিক আক্রমণে অস্থির হয়ে বল্‌ছে—পাকিস্থান গুলি থামাও। অপরদিকে পাকিস্থান তার-স্বরে বলছে—তোমরা আগে গুলি চালিয়েছ বলেই না নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে আমাদের পাল্টা গুলি চালাতে হয়েছে। আমরা নিছক সাধারণ মানুষ। কোন্ কথাটা সত্য বলে মানব? ছোটবেলায় পড়েছি—মিথ্যা কথা, কপটতা ভাল নয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে কপটতা বোধহয় সর্বপ্রধান অস্ত্র —যা রাজনৈতিকদের হাতে নিত্য প্রয়োগে বর্তমানে অতিশয় শানিত হয়ে উঠছে। আমি বল্‌ছিনা-মিথ্যা কথা কপটতা আগে ছিল না। এসব আগেও ছিল— বর্তমানে আছে। কিন্তু বর্তমানে এদের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যেমন আর্টে পরিণত করা হয়েছে, এমনটি আগে কখনও ছিল না।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দিকেই একবার তাকিয়ে দেখুন না। সেখানে পৃথিবীর প্রায় তাবৎ জাতি বিশ্বশান্তি রক্ষার মহান্ আদর্শ নিয়ে মিলিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও স্নায়ুযুদ্ধ, ঠাণ্ডা লড়াই—এক কথায় এই কপটতারই খেলা। দলাদলি, রেষারেষি, চোখরাঙ্গানি। আপনি আপনার স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত, অপর পক্ষ তাঁদের। তাতে ন্যায়নীতি টিকল কি টিকল না—সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। একপক্ষ যা বলবে—অপর পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে তার প্রতিবাদ করবে। জাতিতে জাতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এই স্বার্থপরতার, কপটতার খেলাই চলেছে। এর থেকেই জন্ম নিয়েছে ন্যাটো, মেডো, বাগদাদ্-চুক্তি প্রভৃতি নানা সামরিক জোট।

কয়েক বছর আগে একটা দৃষ্টান্ত হুড় হুড় করে আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল। তারও কিছু আগে চৌ-এন লাই যখন ভারত সফরে আসেন, তাঁর অমায়িক ব্যবহার, বিনয়নম্র হাসি ও স্নিগ্ধ প্রশান্ত সৌম্যকান্তির প্রশংসায় ভারত পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। যেন দ্বিতীয় বুদ্ধদেব আড়াই হাজার বছর পরে আবার ভারতে নেমে এলেন। নেহরু-লাই এর আলিঙ্গনবদ্ধ সেই দৃশ্যের দিকে একবার কল্পনামেত্রে তাকান। কি মধুর স্বর্গীয় দৃশ্য। সে স্বর্গীয় মিলনের ফলে পঞ্চশীলের জন্ম হল। পৃথিবী ভাবল—এবার রণদুর্মদ পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী অস্ত্র তৈরী হল। পঞ্চশীলের শান্তির প্রলেপে অন্ততঃ এশিয়া ভূখণ্ড বেশ কিছুকাল শান্তিতে ঘুমুতে পারবে। পশ্চিমী বন্ধুদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে

ভারতবর্ষ বছরের পর বছর রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের ওকালতি করল। এমন কি, তিব্বতের ঘটনার পরও ভারতবর্ষের সেই নীতির পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু হায়! "প্রেমের পূজায় এই কি লভিলি ফল?" আমাদের শত শত পত্রের উত্তরে পঞ্চশীলের বন্ধুর মুখে রা ফোটে না, আমাদের রাষ্ট্রদূত মাথা খুঁড়ে তার দেখা পান না। বন্ধু প্রীতির উত্তর তিনি দিলেন শেষ পর্যন্ত বেয়নেট দিয়ে। তাঁর লালবাহিনী ভারত সীমান্তে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে পঞ্চশীলজাত আমাদের মোহ নিদ্রা ভেঙে দিল। ছোট বেলায় অন্যান্য নীতিবাক্যের মত একথাও পড়েছি—"কখনও উপকারীর অপকার করিও না। বন্ধুর অপকার করিও না।" অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে নয়াচীন পুরানো নীতিবাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। বেয়নেটের আঘাতে আমাদের মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়ে পঞ্চশীলের বন্ধু সত্যিকারের বন্ধুকৃত্য করে ছিল।

সম্প্রতি আর একটা ঘটনা হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল। আমরা পাকিস্থানের নব্বই লক্ষাধিক উদ্বাস্তুর বোঝা ঘাড়ে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলাম। পাকিস্থান বলছিল—নব্বই লাখ কোথায়, মাত্র তো কুড়ি লাখ। অবস্থাটা বুঝুন! পশ্চিমী বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ একের পর এক এসে বৃহৎ উদ্বাস্তু সমস্যা নিষ্ঠার সঙ্গে বহনের জন্য আমাদের প্রশংসা করে যাচ্ছে। কিন্তু এই বাহবা ছাড়া বাস্তব সমস্যার এতে কতটুকু সমাধান হয়েছে?

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—পাকিস্থান পূর্ববঙ্গে গণতন্ত্রে অনুরক্ত নিরীহ নিরস্ত্র সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর যে নরমেধ যজ্ঞ এক তরফা চালিয়ে গেল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির মিলে না। চেঙ্গিস খাঁর বংশধর ইয়াহিয়ার কপটাচারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সে শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার ভাওতা দিয়ে কালহরণ করে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পূর্ববঙ্গবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু এ ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভূমিকা কি? রাষ্ট্রপুঞ্জ মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন—এ ব্যাপার দেখেও দেখে না। আমেরিকা মুখে এক কথা বলছে—অথচ তলে তলে শক্তি সাম্যের অজুহাতে পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য দিয়েই চলেছে। আমাদের মন্ত্রীবর্গ একে একে পৃথিবীর প্রায় তাবৎ বৃহৎ রাষ্ট্রের নিকট ধর্ণা দিয়ে ফিরে এল। কিন্তু কার্যত ফল কতটুকু হয়েছে? তুরস্ক, ইরান তো পাকিস্থানকে সরাসরি সাহায্য করছে, আর মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি জেনেশুনেও চোখ বুজেই আছে। স্বাধিকারকামী সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর এ বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম অত্যাচার। বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলশ্রুতিস্বরূপ মানুষ চন্দ্রলোক জয় করছে। এ নিয়ে সভ্যতা-গর্বিত মানুষের অহঙ্কারের সীমা নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম, যে আদর্শ রক্ষার সঙ্কল্প বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ কথায় কথায় ঘোষণা করে, পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে তাদের আচরণে তা ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বৃহৎশক্তিবর্গের বুলিসর্বস্বতা ও কপটাচরণ এবার যেরূপ নগ্ন ও কুৎসিৎ ভাবে আত্মপ্রকাশ করল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর আছে কিনা সন্দেহ।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওরা নৌকা বেয়ে চলে যায়, জেলখানার ঘাট পর্য্যন্ত। কোন কোনদিন নদীর ওপারে চলে যায়। উমেশ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, ওই যে গাঁটা দেখা যাচ্ছে—

অভয় অবাক হয়ে বলে, কই কোথায় গাঁ, খালি জঙ্গল তো—

—আছে আছে। এ সব আমবাগান। মস্ত বড় বড় আমবাগান। ঐ আমবাগান পার হয়ে গেলেই গাঁ। ঐ গাঁয়ের নাম মহেশগঞ্জ। আমাদের ড্রিলমাষ্টার ভুজঙ্গবাবুর বাড়ী ঐ গাঁয়ে।

অবাক হয়ে অভয় বলে বাঃ নাকি? তবে উনি রোজ রোজ নৌকা করে স্কুলে আসেন। বাঃ বেশ মজাতো। দুবার নদী পার—আমার ভাবতেই ভারী ভাল লাগছে।

উমেশ বলে-একদিন তোকে নিয়ে যাব আমার কাকার বাড়ীতে। কাকা মহেশগঞ্জে থাকেন। দেখবি গাঁ খানা। বিন্নী ধানের মুড়ি, কলা, আমসত্ব খেয়ে আসবো। ওরা নৌকা বেঁধে চড়ার ওপর ওঠে। ধু ধু করছে বালির চড়া—মাঝে মাঝে পায়ে চলার সরু পথ। গাঁয়ের লোকজনেরা স্নান করতে আসে নদীতে। গাঁয়ের বৌঝিরা নদীতে স্নান সেরে পূর্ণ কলসীতে জল নিয়ে ফিরে যায় ঐ চড়ার ওপর দিয়ে।

শীতকাল বেশ ভাল। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে। তখন বালি তেতে আগুন। শুধু পায়ে হাঁটাই দুঃসাধ্য ব্যাপার। অভয়রা চড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মাঝে মাঝে বাবলা গাছ, আর এটা সেটা আগাছা জন্মেছে। হঠাৎ একটা শুকনো লতায় পা আটকে যেতে অভয় একটান দিতেই অবাক্ কাণ্ড। বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মস্ত এক পাকা তরমুজ।

—বাঃ এ কি রে?

উমেশ তাড়াতাড়ি এসে তরমুজটা তুলে নিয়ে নাকের কাছে গন্ধ শোঁকে। বলে, খাসা গন্ধ বেরুচ্ছেরে অভয়। তবে দ্যাখ, একেই বলে কপাল। এখানে তরমুজের ক্ষেত ছিল, এটা কোনরকমে বালিচাপা পড়েছিল। ভগবান আমাদের জন্যই এটা মাপিয়ে রেখেছেন।

অভয় বলল, তা এরকম আরো তো থাকতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু ভগবান না দিলে তুমি পাবে কি করে? এটা কিন্তু মনে রেখো। ভগবান আমাদের জন্যেই এটা এখানে রেখেছিলেন। নইলে আমরা এখানেই বা আসব কেন? আর পায়েই বা তরমুজের লতা লাগবে কেন? কই, আর কারুর পায়েও তো লাগেনি। এখন চ নৌকায় যাই। মজা করে খাওয়া যাকতো। অভয় আর উমেশ নৌকায় বসে সমস্ত তরমুজটা পরম তৃপ্তিতে খেতে লাগল। আঃ—কি মিষ্টি। ভেতরটা ঠিক আলতার মতন লাল। দুজনে নাক ডুবিয়ে সেই সরস তরমুজ খেতে লাগল।

উমেশের সঙ্গ ভারী ভাল লাগে অভয়ের। সহরের চালবাজ ছেলেদের মত বড় বড় কথা বলে না উমেশ। এর ভেতর পাওয়া যায়, গাঁয়ের অকৃত্রিম সরলতা। গ্রাম্য জীবনের ছোঁয়া। গাঁয়ের সেই নির্মল বাতাস যেন এর মনের ভেতর খেলা করেছে। উমেশ সহরে থেকেও শহুরে হয়ে যায় নি। উমেশ তাকে নেমতন্ন করে রাখল তার কাকার বাড়ী যাবার জন্যে। আগামী সপ্তাহে যে কোনদিন ওরা যাবে। ঠিক হল আসছে শনিবার দিন, বেলা দেড়টার পরই ওরা রওনা হ'বে। অভয়ের বইপত্র উমেশের বাড়ীতে রেখে, ওরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ফিরবে সেই সন্ধ্যে বেলায়।

উমেশ বলে—হ্যাঁরে অভয়, তোর জ্যেঠাবাবুতো মস্ত বড় লোক। তা আদর যত্ন করে তো—

অভয় সংক্ষেপে উত্তর দেয়—হুঁ। বাঃ কেন করবেন না। স্কুলের মাইনে পত্র, বই কিনে দেওয়া,—সমস্তই তো করছেন।

—আহাঃ তাতো ঠিকই। তবে ঠিক মত আদর যত্ন অনেকেই করে না কিনা। ওই তো শিশিরও রয়েছে তার আপন কাকার বাড়ী। কিন্তু থাকে যেন চোরের মত। ঠিক্ চাকর বাকর যেমন থাকে, তেমনি ভাবে থাকে। শিশির সেদিন খুব দুঃখ করছিল। ওর কাকা কাকী পেটভরে খেতে পর্য্যন্ত নাকি দেয় না—। স্কুলের ছুটীর পর ওর কাকার ছেলেরা জলখাবার খেতে বসে, কিন্তু ওকে ডাকে না। বেচারা, ক্ষীদের জ্বালায় গ্লাস দুই জল খায় শুধু। অথচ একটা মুনিষের কাজ করিয়ে নেয়। রবিবার দিন্ হলে, ওর ডিউটি হ'ল, বাগানের গাছে জল দেওয়া। বাগানে কুয়ো আছে—কুয়ো থেকে জল তুলে গাছে গাছে জল দিতে হয়। মজাটা দেখ, কেমন আদর যত্নের ঘটা। নিজের ছেলেরা একটা কাজও করে না। সেদিন ও দুঃখ করছিল, বলে, লেখা পড়া করার সময় পাব কখন। হাট, বাজার, দোকান করা, জলতোলা সমস্ত কাজই করতে হয়।

অভয়ের বড় দুঃখ হয়। বেচারা শিশির। ওর মনে হয়, জগৎ সংসার শুধু দুঃখী লোকে ভরা। তাই সে দেখে, শিশিরের কাপড় চোপড নোংরা, মাথায় তেল নেই, মুখখানা প্রায়ই শুকনো। অভয় নিঃশ্বাস ফেলে সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। যারা এমন ব্যবহার করে, তারা কি রকম লোক। নিজেদের তো ছেলে মেয়ে আছে। তাদের যেমন ক্ষিদে লাগে, তেমনি ওরও তো লাগে। হলেই বা পরের ছেলে। একেবারে পর নয়। নিজের খুড়তুতো ভাই। কি করে ওরা একজনকে উপোসী রেখে নিজেরা খেতে পারে?

তার কপালও শিশিরের মত। সেও বাড়ীর একজন ছেলে। তবুও সে যেন ঘরের নয়। ঠিক পরের মত। ঠাকুর চাকর বুঝে নিয়েছে, অভয় দাদাবাবু ওঁদের মত নয়। একে মান্য করা, সমীহ করা, ভয় করার কোন কারণই নেই। অভয় নিঃশ্বাস ফেলে। মনে পড়ে, গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টার মশায়ের কথা। তাকে এগিয়ে যেতে হ'বে—আরও এগিয়ে যেতে হ'বে। পরের ওপর নির্ভর করে নয়—নিজের পায়ের ওপর শক্ত ভাবে দাঁড়াতে হ'বে। সহায় ঈশ্বর।

উমেশ বলে, কি হ'ল অভয়? একেবারে চুপচাপ যে—

—নাঃ এমনি। হঠাৎ উমেশ বলে, আচ্ছা অভয় একটা কাজ করলে কেমন হয়। আমি বলছিলাম কি—

উৎসুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে অভয় বলে, কি বলছিলে বল না কেন। কি ব্যাপার—

উমেশ বলল, আমরা কয়জন মিলে, একটা ছোটখাট ক্লাব করলে কেমন হয়। ছোট্ট একটা লাইব্রেরী,—কিছু ভাল বই থাকবে—দৈনিক পত্রিকা একখানা। শরীর চর্চ্চা করতেই হবে। আজে বাজে আড্ডা না দিয়ে এ গুলো কি ভাল নয়।

উৎসাহিত হয়ে অভয় বলে, এতো ভাল কথা। কিন্তু এসব ব্যাপারে টাকা কড়ির প্রশ্নও আছে। টাকা চাই তো—

—তা চাই। কিন্তু ভাল কাজ সুরু করলে টাকার অভাব হ'বে না। আমার মনে হয় অভাব হ'বে না।

আমাদের মধ্যে যাদের দেবার ক্ষমতা আছে—তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে, এর ওর কাছ থেকে বইপত্র চেয়ে, প্রথমে আমরা সুরু করে দি। তারপর আপনা আপনি, টাকা পয়সা এসে যাবে। আমি বলি, ওদের পাঁচজনকে ডেকে একটা মিটিং করা। খুব বড় মিটিং নয়—এই ঘরোয়া মিটিং—ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করা—

অভয় বলল, খুবই ভাল। কিন্তু কাকে কাকে ডাকবে, কি হ'বে কি ভাবে লাইব্রেরীর গঠন হ'বে, সে সব ভার তোমার—

উমেশ বলল, সে ভার আমি নিলাম। প্রথমে আমার বাড়ীতেই ক্লাবের পত্তন হোক। তারপর এটার প্রচার করব—তার আগে নয়। কি রাজী ?

অভয় বলল, তা বেশত—। অভয়ের মনে হ'ল, এ একটা কাজের কথা বটে। লেখাপড়া করা, শরীর চর্চ্চা করা, এতো প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। এর ভেতর দিয়েই তো মানুষ গড়ে ওঠে—। একটা নূতন উৎসাহে—অভয়ের মন ভরে উঠল। এতদিনে সে যেন একটা কাজ পেয়েছে। অতি উৎসাহে, উমেশের হাত চেপে ধরে, বলল, উঃ—ভাল প্ল্যানটা তোমার মাথায় এসেছে হে। কিন্তু ক্লাবটার কি নাম দেওয়া যায়, তা ঠিক করেছ।

—মোটামুটি তাও ঠিক করেছি। 'সবুজ সংঘ' নামটা রাখলে কেমন হয়। অবশ্য তোমরাও ভেবে দেখো। এর চেয়ে অন্য কোন ভাল নাম রাখা যায় কিনা—

অভয় বলল—না—না। ঐ তো বেশ নাম। এই নামটাই খাসা হয়েছে। উমেশ তখন নৌকা খুলে দিয়েছে। এখন শীতের শেষ। জল খুব কম। নদী শীর্ণ হ'তে—শীর্ণতর হচ্ছে। স্রোত নেই—জলও শান্ত অচঞ্চল স্থির। যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায়, নদীর উভয় তীরে আমবন। গাছে—গাছে এখন মুকুল দেখা দিয়েছে। মুকুলের সুঘ্রাণে মধুলোভী মৌমাছিরা—গুণ্ গুণ্ করে ঘুরছে। নৌকা অতি ধীরে ধীরে চলছে। উমেশের হাতে লগি—কোথাও জল একটু বেশী কোথাও কম। মাঝে মাঝে নদীর বুকে বালীর চর। এর মধ্যে শির শির করে হাওয়া বইছে। একটু ঠাণ্ডা বাতাস—বেশ ফুর ফুরে হাওয়া—আর ভারী সুন্দর। মনে ইচ্ছা হয়, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে, নদীর এই—বিশুদ্ধ হাওয়া, শরীরের অভ্যন্তরের কোষে কোষে ভরে নিই। সূর্য্যাস্তের আবির রং, নদীর এপারে ওপারে, বিস্তৃত বালুচরায়,—নদীর জলে ও তীরবর্ত্তী বিশাল আম বাগানে ছড়িয়ে পড়েছে। কী অপরূপ—আর কী আশ্চর্য্য এই দৃশ্য। জলে, স্থলে, শুধু গলিত সোনা কে যেন ঢেলে দিয়েছে। উপরের সীমাহীন, দিকহীন অনন্ত আকাশের কোন্ সুদূর দেশ হ'তে, সূর্য্যদেব এই গলিত স্বর্ণ স্রোত, অকৃপণ হাতে, এই গ্রহের সমগ্র প্রাণী, বৃক্ষ, লতা—জলস্থলের উপর উদার হস্তে দান করছেন। এ যে বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ নেমে এসেছে পৃথিবীতে এই অকৃপণ আলোকদানে তাঁর কোনও কার্পণ্য নেই, নিষেধ নেই। এই পূণ্য আলোকের স্পর্শে মনে হয় মনের সকল কালিমা যেন আপনা থেকেই কেটে গেল। সংসার সমাজে দিনে দিনে যে মলিনতা জমা হয়ে উঠে, সুধা বলে যে বিষ আমরা পান করি, বিষয়ের আর অর্থ লালসায় উদভ্রান্ত হই তখন দৈবাৎ যদি প্রকৃতির এই অফুরন্ত ভাণ্ডার-ঐশ্বর্যের মধ্যে ঘটনাচক্রে এসে পড়ি যদি সেই দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরের কিছুটা অনুভব করি, তখন এই পরিদৃশ্যমান সমাজ সংসার জগতকে অতি হীন বলেই মনে হয়। তখন কাছাকাছি এসে পড়ি অন্য আর এক জগতের কাছে। কিন্তু সচরাচর সেই দুর্লভ দর্শন ঘটে ওঠে না।

হঠাৎ উমেশ নৌকা ফিরিয়ে বলে, চ, ওপারে যাই। আমার কাকার বাড়িতে যাবি—

অভয় সামান্য চিন্তা করে বলে, কিন্তু ফিরতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। জানিসতো বাড়ীর ব্যাপার। সন্ধ্যের পর বাড়ী ঢুকলে, হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে।

উমেশ বলল,—না—না। সন্ধ্যে হ'বে কেন। আর যদিও বা একটু—আধটু কোনদিন দেরী হয়, তাতে

জবাবদিহীর কি আছে? উমেশ নৌকার মুখ ফিরিয়ে দিল। তবুও অভয় বলল দেখিস ভাই—যেন দেরী না হয়ে যায়।

হেঁসে উমেশ বলে, ঐ ভয়টা ছাড়্। ভয়টা জয় কর। ঐ ভয়ই তো আমাদের সর্বনাশ করেছে। জুজুর ভয়, বাঘের ভয়, ভূতের ভয়। এমনি নানান্ ভয় পেয়ে পেয়ে আমরা বড় হয়ে উঠি। হাঁ—ভাল কথা রে কাল নীচুতলা মাঠে মস্ত মিটিং হ'বে—

—মিটিং কিসের?

—বাঃ জানিসনে। মহাত্মা গান্ধীর যে আন্দোলন হচ্ছে না—তাই কলকাতা থেকে—সব বড় বড় নেতারা আসবেন। কাল মিটিং শুনতে যাবি তো।

অভয় আঁতকে উঠে—বলে, ও বাব্বাঃ তবেই হয়েছে।

তা হ'লে আমার এখানে থাকার পাঠ ওঠাতে হ'বে। যে আমার জাঁদরেল জ্যেঠাই মা। একেবারে সাক্ষাৎ মিলিটারী কাপ্টেন।

স্বদেশী সভা গেছি শুনলে, আর আস্ত রাখবেন না। তক্ষুনি বলবেন, পোটলা পুটলি গুটিয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে যাও—গাঁয়ে গিয়ে লাঙ্গল ধরগে—

উমেশ বলল, বলিস্ কিরে? নৌকা তখন ওপারে পৌঁচেছে। অভয় নৌকা থেকে লাফ্ দিয়ে ডাঙায় নেমে বলল—জানিসনে, এই মাসেই নাকি জ্যেঠাবাবু রায় বাহাদুর খেতাব পাবেন।

—রায়বাহাদুর খেতাব। ছিঃ—ছিঃ—। এখন কি কোনও লোক ঐ সব খেতাব নেবার জন্যে চেষ্টা করে। ছিঃ—ছিঃ—। একটা বিশ্রী ঘৃণায় উমেশের মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে।

অভয় বলল, সেদিন মোনাদাকে নিয়ে কত কথাই না জ্যেঠাইমা আমায় শুনিয়ে দিলেন।

—মোনাদা? মোনাদা আবার কে রে?

আমাদের দেশের একটি ছেলে। নাম তার মন্মথ। সংক্ষেপে আমরা মোনাদা বলে ডাকি। ঐ মোনাদা এখন আলীপুর জেলে। স্বদেশী করে জেল্ খাটছে—

উমেশ অতিশয় উৎসাহিত হয়ে বলল—সাবাস্—সাবাস। এই তো চাই। তোর মোনাদার জীবন ধন্য রে। দেশের জন্য দেশমাতার জন্যে এই তো চাই। তুই সবই গোড়া থেকে বল।

অভয় বলল—আচ্ছা বলব পরে। এখন চ—। বুঝলি উমেশ, নৌকায় চড়ে এপারে এসে আমার খালি মনে হচ্ছে—আমি যেন দেশে ফিরে এসেছি। এই বন বাদাড়—নদীর ধার—বালির চড়া—আমবাগান—, এখানেওখানে ঝোপঝাড়—আহাঃকি সুন্দর। পাখীগুলো কেমন ডাকাডাকি করছে,—গাঁয়ের বৌরা ঘাটে কলসী নিয়ে জল নিতে আসছে। এ যে কি ভাল লাগছে, তা তোকে কি করে বোঝাব। যেন আমি আমার দেশে ফিরে এসেছি—আমার পলাশপুর গাঁয়ে। সহর আমি ভালবাসিনে। মনে হয় যেন আমি বন্দী হয়ে আছি। এত লোকজন গাড়ী কোটকাচারী এসব আমার ভাল লাগে না ভাই। সব যেন আড়ষ্ট মনে হয়—। মনে হয় সব সাজান গোছান—কৃত্রিম। সহরের এই ভোগ বিলাসিতা—বাবুগিরী বড় মানুষী চাল, এসব বিশ্রী লাগে। মনে হয়, আমরা - আমাদের আসল জীবনটাকে গলা চেপে মারছি। যেন আমরা সবাই নিজের মুখের ওপর একটা মুখোশ এঁটে—চলা ফেরা করছি।

ওরা এখন মহেশগঞ্জের ভেতর ঢুকেছে। সরু সরু কাঁচা রাস্তা। দুদিকে বন জঙ্গল আর শুধু আমবাগান। অত্যন্ত বিরল বসতি গ্রাম। ওপারে সহর কত লোকজন গাড়ী ঘোড়া কত আলো কত হাসি তামাসা আর এপারে নির্জ্জন অজ পল্লী। সেই কাঁটাবন সরু সরু রাস্তা মশা-মাছি। রাতে বাঘ শেয়ালের ডাক। চাষীরা লাঙ্গল ঘাড়ে করে মাঠে যাচ্ছে, রাখাল বালকের দল গরু, মোষ চরাতে বেরিয়েছে। রাস্তায় এক হাঁটু ধুলো, আদুড় গায়ে রাশি রাশি উলঙ্গ ছেলের দল ধুলো নিয়ে খেলা করছে।

উমেশ বলে, ওকি হাঁ করে চেয়ে থাকলে হ'বে না।

চল্ পা চালিয়ে যাই। কাকার বাড়ী আরও ভেতরে। সন্ধ্যে হয়ে গেলে আমার দোষ ধরলে চলবে না।

হাঁটতে হাঁটতে অভয় বলে, আমার খালি খালি দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ভ'ই। এই বন বাদাড় কাঁচা রাস্তা আম কাঁঠালের বাগান, বাঁশঝাড় দেখে খালি দেশের কথা মনে পড়ছে। খালি মনে হয়, কবে দেশে যাব কবে বাড়ী যাব। গরমের ছুটীতো এখনো একমাসের ওপর। আমি খালি দিন গুণছি। ভাবছি. কবে গরমের ছুটী আসবে।

সেদিন সকাল প্রায় আটটা। আজ আর স্কুল নেই —রবিবার। অভয় একমনে কি একটা বই পড়ছিল। আর কিছুক্ষণ পরই সে বেরুবে ঠিক করেছে। শুভময়ের সঙ্গে দেখা করা দরকার। হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে অভয় অবাক হয়ে গেল। একি মিনতি এসে যে পেছনে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীর অন্য কেউ এ ঘরটায় ঢোকে না। বীরুরা তার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্টতা করে না। অথচ অভয়ের ভারী ইচ্ছা করে, ওরা ঠিক আপন ছোট ভা:য়ের মত আসবে যাবে, গল্প করবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ওরা তাকে এড়িয়ে চলে। কেন যে এড়িয়ে চলে তা অভয় বুঝতে পারে না। মনে হয় এ বুঝি তারই দোষ। সেই বুঝি ওদের সঙ্গে মিশতে জানেনা। তার কোন ত্রুটী বা ভুলের জন্য ওরা আপনজন পর হয়ে গেছে। মিনতি আর প্রণতি ওরা তো তার ঘরের ত্রিসিমানায় আসে না। এখানে আসার পর থেকে, কই মনে তো পড়ে না যে, ওদের সঙ্গে তেমন কোন কথা হয়েছে। সম্ভবতঃ জ্যেঠাইমার বারণও হ'তে পারে। তাই অভয় মিনতিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। মৃদু হেঁসে অভয় বলল,—কি ব্যাপার হঠাৎ যে—

মিনতি বলল—দেখছি ছুটির দিন কি করছেন। বাব্বাঃ এত পড়তে পারেন।

—বীরু কোথায়?

—বীরু? কি জানি। বোধহয় কোনও বন্ধুর বাড়ীতে গেছে। মিনতি চকিতে দরজার দিকে তাকিয়ে বলল—রাতেও তো পড়েন। অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘরে আলো জ্বলতে দেখি—

অভয় বলল—নাঃ খুব বেশী রাত জাগিনে। আচ্ছা ভোরবেলায় গান করে কে? ভারী সুন্দর লাগে—নিশ্চয়ই তুমি—

হাস্যমুখে মিনতি বলল—কি করে বুঝলেন। আর শুনলেন কি করে—

—বাঃ—শুনতে পাবনা কেন? ভোরবেলাকার গান শুনতে ভারী ভাল লাগে।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ হতেই, মিনতী আর দাঁড়াল না। তার আর উত্তর দেওয়াও হ'ল না। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎই চলে যায়। অভয় অত্যন্ত অবাক হয়ে যায়। এখন যেন বুঝতে পারে, জ্যাঠাইমার ভয়েই মিনতি চলে গেল। কিন্তু কেন? তাকে ভয় কিসের? অভয় জামা টেনে নিয়ে উঠে পড়ে।

শুভময়ের সঙ্গে আলাপ করে ভারী খুসী হল অভয়। বড়লোকের ছেলে, কিন্তু টাকার গরম নেই। তার বিরাট রাজপ্রাসাদ সদৃশ বাড়ীতে অতি মনোরম, সাজান গোছান পড়বার ঘরে বসিয়ে, শুভময় যেন নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠেছে। ঘরের দেয়ালে দামী দামী অয়েল পেন্টিং, কৌচ, সোফা, চেয়ার টেবিল প্রভৃতির দিকে একবার তাকিয়ে শুভময় লজ্জিত হাসি হাসল। শেষে যখন অতি সুদৃশ্য ট্রেতে চা আর খাবার এল আর বাড়ীর চাকরের অতি বাহারী কাপড় জামার দিকে তাকিয়ে আরও বিমনা আর লজ্জা অনুভব করল শুভময়। শুভময়ের বার বার মনে হচ্ছিল, হয়তো অভয় এগুলো তাকে, তাদের বড় মানুষী চাল দেখান হচ্ছে ভেবে না নেয়। এর জন্যে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ী চাকরটাকে বিদেয় করে নিজেই চা ঢেলে দিল, অভয়ের কাপে।

অভয় আশ্চর্য হয়ে গেল, খাবারের পরিমাণ, তার বিভিন্নতা দেখে।—একি ব্যাপার হে। এযে বিরাট আয়োজন—

লজ্জিত হয়ে শুভময় বলল, না—না—। প্রথমদিন এলে—তাই—

অভয় বলল, বাঁচা গেল। এরপর এলে, শুধু এককাপ চা দেবে নতুবা মাঝে মাঝে আসতে আমার নিজেরই লজ্জা করবে। যেদিন সত্যি খিদে লাগবে, সেদিন চেয়ে খাব। এতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু এ ছাড়া অন্যদিন শুধু চা দিও—

শুভময়ের পড়ার ঘরে বড় বড় আলমারী শুধু বইয়েতে ভর্ত্তি। লোভীর মত, সেদিকে তাকিয়ে, সে উঠে বই দেখতে লাগল। শুভময় তাড়াতাড়ী একটা আলমারী খুলে বলল, নাও না। বাড়ীতে পড়তে নিয়ে যাও দুচার খানা বই—

বই পড়তে অভয় খুব ভালবাসে। সে যেন অযাচিত ভবে, হাতে স্বর্গ পেল। লোভীর মত অনেক বই দেখে দেখে খানকয় বই বেছে নিল।

অনেকক্ষণ গল্প করার পর, বই হাতে যখন সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, মনটা ভারী ভাল লাগতে লাগল। অনেক চিন্তা মনে এল এখন। বাড়ীতে চিঠি দিতে হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, জ্যেঠাইমার কথা। তার সব চিঠি তাঁকে দেখিয়ে দিতে হ'বে। কিন্তু কেন? সেকি জেলের কয়েদী নাকি? জ্যেঠাইমার মুখখানা মনে হতেই মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। না—চিঠি সে দেখাবে না। বাড়ীতে চিঠি লিখে, আজই ডাকে দেবে। মিনতির কথা, মনে হতেই ভাবল আজ হঠাৎ মিনতি তার ঘরে কেন এল। এর কারণ কি? মিনতির হাসি হাসি মুখখানা মনে হতেই, অভয়ের সমস্ত মনটা কোমল হয়ে গেল। আহা বেচারী আলাপ করতে এসেছিল। ওরা এক বাড়ীতে থাকে—সমবয়সী তারা, অথচ, মায়ের ভয়ে কথা বলার পর্য্যন্ত সাহস নেই। কিন্তু কেন? তারা গরীব বলে না গেঁয়ো অসভ্য বলে, এই নিষেধ আজ্ঞা। মনটা আবার যেন ভারী বিশ্রী হয়ে গেল। ওর মনে হ'ল, আশ্চর্য্য এই সব লোকগুলো। আজ সারা দেশে বিরাট আন্দোলন সুরু হয়েছে, ইংরেজদের সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে, সহযোগীতা বর্জ্জন করার পালা চলছে—অথচ তারই জ্যেঠামশাই,একটা খেতাবের লোভে কত নীচেই না নেমে যাচ্ছেন। রায়বাহাদুর খেতাব পেয়ে, কী এমন হাতী ঘোড়া লাভ হবে. একথা বুঝতে পারে না অভয়। অভয়ের মনে হয়,—আশ্চর্য্য। পৃথিবীতে কত অদ্ভুত লোকই না জন্মায়।

উমেশের খড়ের ঘরে সভা বসেছে। সভাপতি কেউ না—সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব কারুর নেই। এখানে চেয়ার, টেবিল, ফুল, মালা এসব কিছুই নেই। মাটির ওপর ছেঁড়া চাটা', তার ওপর বসেছে দশবারজন ছেলে সবাইকে অভয় চেনে না। কেউ স্কুলে পড়ে—আর কেউ বা পড়ে না। কারুর দোকান আছে কেউ বা বাবার হোটেলে খেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সকলের নাম না জানলেও মুখ সব চেনা। তাদেরই পাড়ার ছেলে সব।

উমেশ বলল, আমাদের এই সভা—যা হচ্ছে, এটাকে আমরা স্থায়ী করা বা একটা সঙ্ঘ করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সঙ্ঘে বসে বসে শুধু রাজা উজীর মারার গল্প হবে না, বা বসে বসে শুধু রাজা উজীর মারার গল্প চলবে না—

সকলে সমস্বরে বলল—ঠিকই—ঠিকই।

—তবে কি করব আমরা। আমরা গড়ে তুলব একটা ভাল লাইব্রেরী। একটা ব্যায়ামাগার। বই পত্র প্রথম চেয়ে চিন্তে আনব। একটা আলমারী দরকার। একখানা খবরের কাগজ আমাদের রাখতে হবে। এটাই সবচেয়ে দরকারী জিনিষ। খবরের কাগজ না পড়লে আমরা কিছুই জানতে পারব না, বা শিখতে পারব না। গোটা ভারতবর্ষে, কোথায় কি হচ্ছে বা কি হ'তে চলেছে, এ সব জানা যাবে খবরের কাগজ পড়ে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, সারা পৃথিবীর কথা আমরা ঘরে বসে জানতে পারব।

—সত্যি কথাই।

—তবে। আর এই যে দেশে গান্ধী মহারাজ আন্দোলন সুরু করেছেন, এটার সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার। ঐ যে জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি চলল, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ কোথায় বা কেন গুলি চালাল এ সব খবর, খবরের কাগজ মারফৎ আমরা জানতে পারি নয় কি? উমেশ সকলের মুখের দিকে চাইল।

উমেশ বলল, তাই চাই লাইব্রেরী। আর শরীরকে শক্ত মজবুত করে গড়ার জন্য চাই ব্যায়ামাগার।

একজন বলল, কিন্তু এসব করলে পুলিশ যে কেউয়ের মত পেছনে লাগবে।

—হাঁ, তা সেই ভয় আছে বটে। কিন্তু এটা আমাদের নির্দ্দোষ জিনিষ। তাই এই সঙ্ঘের সভাপতি হবেন, রায়সাহেব চুনীবাবু। উনি মাথার ওপর থাকলে, এ ভয়টা থাকবে না। কেমন—বুদ্ধিটা কেমন মনে হচ্ছে।

সকলে বলল, তা ভাল। কিন্তু চুনীবাবু কি রাজী হবেন? উনি এই সব শুনে পিছিয়ে না যান।

উমেশ হেঁসে বলল, পিছিয়ে যাতে না যান তার ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ সঙ্গে ঠিক করা হয়েছে প্রতি রবিবার রাত্রে এখানে হরিনাম সংকীর্ত্তন করা হবে—প্রার্থনা করা হবে। জানই তো চুনীবাবু আবার ভারী বোষ্টম মানুষ। হরি সংকীর্ত্তন উনি ভারী পছন্দ করেন। ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছে উনি খুব খুসী। প্রথম দিন উনিই আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানদান করবেন। সেদিনকার যৎসামান্য যা খরচ হবে তা উনিই বহন করবেন।

নিশিকান্ত বলল, উমেশদা, আপনি এই ক্লাবের সেক্রেটারী হন। এখন খাতাপত্তর কিনে সব ঠিকঠাক করে ফেলুন।

অভয় বলল, কিন্তু একটা ঘর তো চাই।

—তা চাই। উপস্থিত ফেলুদার বাইরের ঘরই আমরা ব্যবহার করব। ফেলুদার বাড়ীর পেছনে মেলা জায়গা। ওখানেই হবে আমাদের ব্যায়ামাগার। জোড়া দুই মুগুর, একটা স্প্রীং ডাম্বেল, প্যারালাল বার, এই দিয়ে এখন সুরু হ'বে। প্যারালাল বার করতে যে কাঠ লাগে তা আমি দেব। ফেলু মিস্ত্রী বিনি মজুরীতেই তৈরী করে পুঁতেটুতে দেবে। সকলে সানন্দে হৈ চৈ করে উঠল। সভাভঙ্গের মুখে সভ্যগণের প্রস্তাবে এল এক ধামা মুড়ি, গুড়। আবার একটা বিরাট জয়ধ্বনি জেগে উঠল। সবাই চলে যাবার পর অভয় বসে থাকল। উমেশ বলল, বস্। ঐ সামান্য কটা মুড়ী খেয়ে পেট ভরেনি। আরও গুড়, মুড়ি, নিয়ে আসি। দুজনে নূতন করে, আবার মুড়ী খেতে লাগল। উমেশ বলল, ব্যাপার কি জানিস? শুধু কি চুনীবাবু রাজী হয়েছেন। সামনে আসছে মিউনিসিপ্যালটীর ইলেকসন। আমি বলেছি, আমাদের ক্লাবের ছেলেরা আপনার হয়ে খাটবে। বুঝলিনা এতে উনি খুব খুশী।

অভয় বলল, আয়না একটু। এখন বাড়ীর দিকে যাই। কিন্তু ভাবছি ক্লাবের নাম শুনে জ্যেঠাইমা আবার তেলেবেগুনে জলে না ওঠেন। চিন্তিত হয়ে উমেশ বলল, তোর তো দেখছি ভারী মুস্কিল। পর ঘরী হয়ে থাকা, এই মস্ত দোষ। কথায় বলে, পরভাতি ভাল কিন্তু পর ঘর ভাল নয়। কোনও স্বাধীনতা থাকে না।

বসন্ত কাল। ফাল্গুন মাসের শেষ—চৈত্র আসতে আর দেরী নেই। আমবাগানে গাছে গাছে আমের রাশি। সকলেই বলছে, এবার যা আম হয়েছে এমন ধারা অনেকদিন হয়নি। মালদার আমের নাম কে না জানে। অভয় এতদিন ভুগোল বইয়েতেই পড়েছিল, এবার চাক্ষুষ দেখল। কত বড় বড় বাগান—আর কত রকমের নাম। প্রত্যেকের স্বাদ গন্ধ আর বৈচিত্র্য পৃথক। অভয় দিন গুনতে থাকে, কবে আসবে গ্রীষ্মের ছুটি। এখনও পাকা তিনটে মাস। তার মনে হয় কতদিন যে বাড়ী যায়নি। কতদিন যে বাবা মা খোকন গীতাকে দেখেনি। তার গাঁয়ের কথা মনে হয়। চোখের ওপর ভাসতে থাকে রেল স্টেশনটা। রেল স্টেসনের পাশ দিয়ে রাস্তা। সে রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে। কিছুদূর আসার পর, বাঁ হাতি ডিষ্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা এঁকে বেঁকে গিয়েছে। গরুর গাড়িতে আসতে হ'লে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু হেঁটে গেলে, দিব্বি রেল লাইনের পাশ দিয়ে যাওয়া যায়। দুধারে আম কাঁঠালের গাছ, তাল বাঁশবন খেজুর গাছ। ছোট ছোট ঝোপঝাপ আঁটি সেওড়া, বিছুটি, কাল কাসুন্দের জঙ্গল। একটু দূরেই গঙ্গা প্রায় রেল লাইনের পাশ দিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে কদাচিত দু একজনের সঙ্গে দেখা হয়। সবাই চেনা। হেঁসে বলবে, আরে

বাসরে কোথা থেকে আসা হচ্ছে এখন। বেশ বেশ সব ভালত। ব্যাস্। লোকটি হন্ হন্ করে চলে যাবে। তুমি আর কাউকে দেখতে পাবে না। ঘন জঙ্গলের মাঝে—শুধু দু একটা শেয়ালকে দেখতে পাওয়া যাবে। পায়ের শব্দে ছুটে এসে এ জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। গাছে গাছে পাখীরা ডাকছে। সমস্ত ঘন বনজঙ্গলের ওপর শুধু চলছে সূর্য্যের আলোর আলো ছায়া খেলা। তারপর দেখা যাবে সেই পরিচিত ঘুমটি ঘর। দূর থেকে ঘুমটি ঘরের ছাদের ওপর ছাওয়া রানীগঞ্জের লাল টালি নজরে পড়বে, মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য আনন্দ জেগে উঠবে, যাক দেশে এলাম। সেই পরিচিত পথ ওদিকে বাজার আর খানকয় দোকানঘর। অভয় তার চোখের সম্মুখে, সমস্ত পলাশপুরের ছবি দেখতে পায়। দেশে ফিরে যাবার জন্য, তার প্রাণ ছট্‌ফট্ করতে থাকে। একটা সীমাহীন বেদনায় সমস্ত মনটা ভরে যায়। সহর তার ভাল লাগে না। হৈ—চৈ অসহ্য। অপরিচিত লোকগুলির সঙ্গে আজও তার মনের মিল হয়ে ওঠে নি। সে অজস্রের মধ্যে একা। যারা একান্ত আত্মীয় তারাও পর। তাদের সঙ্গে এখনও কোন নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে ওঠে নি। সে যে ওদের করুণার পাত্র বা দয়ার পাত্র হিসাবে বড়লোক জ্যেঠার বাড়ীতে স্থান পেয়েছে, এইটুকু মাত্রই জানে। এখানে তার নিজের দাবী কিছুই নেই। এঁদের দেখে মনে হয়েছে, এঁদের স্নেহের ভেতর কোন আন্তরিকতা নেই। মুখে কৃত্রিম হাসি—কৃত্রিম ভালবাসার কথা। মেয়েদের আটপৌরে সাজও বাহারের সাজ সে দেখেছে। খেঁদি বুঁচি যখন ঘরে থাকে, সে একরকম, আর যখন বাইরে যায়, তখন আট পৌরে ঘরের খেঁদি বুঁচিকে চেনা যায় না। জামায়, কাপড়ে আর রংয়ে সে তখন আলাদা। সহরের মানুষেরাও তাই। এখানে সমস্তই কৃত্রিম। উকীল, মোক্তার, ডাক্তার সব যেন ছুরি নিয়ে গাঁয়ের লোকগুলোর বুকে ছুরি বসাবার জন্যে সেজে গুজে রয়েছে।

সেদিন রাতে খেতে বসে অভয় অবাক হয়ে যায়। একি আশ্চর্য্য কাণ্ড। অন্যদিন শুধু ভাতের ওপর থাকে ডাল, ভাজা, তরকারী। কোনদিন মাছ পায় বা কোন দিন পায় না। আজ কিন্তু অবাক কাণ্ড। আজ ভাজা তরকারী যেমন বেশী, তেমনি মাছও বেশী। আর আছে এক বাটি মাংস। এ বাড়ীতে সপ্তাহে অন্ততঃ চারদিন মাংস হয়, আর ডিমের তো কথাই নেই। এতদিন শুধু ডিম মাংসের সুগন্ধটাই নাকে এসেছে। খেতে বসে বহু আশা করেছে, মাংস বা ডিম পাতে পড়বে কিন্তু হায় কপাল। কোথায় ডিম বা মাংস। সেই পরিচিত ডাল তরকারী শুধু। তাই আজ একসঙ্গে, মাছ ও মাংস দেখে অভয় অবাক হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, ঠাকুর কি ভুলে দিয়ে গেল নাকি? কার মাংস, মাছ, কার পাতে দিল। কিন্তু ভুল নয়। হাসিমুখে মৌজী ঠাকুর বলল। খেয়ে লিন অভয়বাবু। আজ মাংস মাছ এক সঙ্গে—। খুব উমদা জিনিষ হইয়াছে। অভয় বলল, তা কপাল ফিরল কেন ঠাকুর ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার, কুছু না। মাজীর হুকুম যা হ'ল তাই দিলাম। এখন মজা করে খাইয়ে লিন অভয়বাবু।

অভয় হেসে বলল· নাঃ—মাংস সত্যিই ভাল হয়েছে। এমনটি খাই নি কখনও। হঠাৎ মৌজী ঠাকুরের সুর পালটিয়ে গেল। গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলল, মাইনের অঙ্কা বড়াতে বলেছিলাম। তা মাজী কি বললেন জানেন অভয়বাবু। বললেন, রান্না খুব খারাপ। ঐ ভাদুড়ী বাবুরা আমায় কত খোসামুদ করছে—কিন্তু অনেকদিন আছি তাই মন সরে না। কি বলুন কিনা—

অভয় বলল—তা বটে। তবে কিনা, তোমার যা গুণ,—তেমনি মাহিনা হওয়া উচিত।

মৌজী কি বুঝল সেই তা জানে। উৎসাহিত হয়ে বলল। কাউকে বলবেন না অভয়বাবু। বাবু লোক ভাল, কিন্তু ঐ মাইজী—উঃ ওঁনার মন ভাল না। ঐ দেখুন ওঁনারা কত ভাল ভাল খাবার সন্দেশ ডিম মাংস খান, কিন্তুক আপনার পাতে সেই ডাল তরকারী, আর

কুছু না। আর হামি লোক গরীব আদমী, পেটের দায়ে না, এ কাম করি। কিন্তুক অভয়বাবু, এ কথা কাউকে বলবেন না—ফাঁস করবেন না।

—আরে না—না—। তা ঠাকুর এবার খেয়ে নিন, সারা দিন তো খাটুনি যাচ্ছে—

মৌজী ঠাকুর বিগলিত হয়ে বলল, আপুনি খুব ভাল আছেন। এসব কথা আর কেউ বলে না। এই যে, হামি সারাদিন খাটি—গরম—আগুণ—,এ সবের কথা কেউ বলে না।

মৌজী ঠাকুর উৎসাহিত হয়ে, বহুদিন পর একটি উৎকৃষ্ট ভাল শ্রোতা পেয়ে, বোধ করি উদার হস্তেই আর এক হাতা মাংস এনে অভয়ের পাতে দিল।

অভয় মনে মনে হেঁসে, লোক দেখান ভাবে বলল, উহুঃ ওকি ঠাকুর। হায় হায়, আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ আপনার যে কম পড়ে যাবে।

—উহুঃ—কুছু না। কুছু না। কুছু কম পড়বে না। হাঁ আমি ভাল ব্রাহ্মণ আছি। হামার দেশের হামি খুব উঁচু ব্রাহ্মণ আছি অভয়বাবু। আভি—এ কথা কারুকে না—বলবেন। কপালদোষে রান্না করছি। কিন্তুক হামি ব্রাহ্মণ—সৎ ব্রাহ্মণ আছি। হামার দাদা পিয়ারীও খুব বড়া পণ্ডিত। ইংরেজী জানে—সমসকৃত ভাষা ভাল জানে। স্কুলের মাষ্টার সে—খুব বড়া স্কুলের পণ্ডিত হচ্ছে হামার দাদা—পিয়ারী পণ্ডিত।

চুলোয় যাক্ পিয়ারী পণ্ডিত। অভয় মনে মনে হাসল। অভয় আজ বহুকাল পর, তৃপ্তির সঙ্গে অনেক ভাত খেল। অনেক দিন সে মাংস খায়নি। দেশ ছাড়ার আগে, সেই মোনাদা তাকে লুচি মাংস খাইয়েছিল তারপর কতদিন চলে গেছে। নবদ্বীপের হোটেলে সে মাংস লুচি খেয়েছিল, সিনেমা দেখেছিল। হায়, আজ কোথায় মোনাদা। না জানি, জেলে কত কষ্টই না পাচ্ছে। সে খবরের কাগজে পড়েছে, ভলেন্টিয়ারদের ওপর পুলিশরা খুব অত্যাচার করে, ভাল খেতে দেয়না—অনেক কষ্ট দয়। কেউ ঘানি ঘোরায় ঘাস কাটে, কেউ কাতার দড়ি পাকায়—পাথর ভাঙ্গে—এমন কত কি।

অভয় তার মোনাদার কথা ভেবে গভীর নিঃশ্বাস ছাড়ে। খাওয়া শেষ হ'লে অভয় ঘরে এসে বসে। দুকুটি সুপুরি মুখে দিয়ে ভাবে, বাবাকে পত্র লিখতে হ'বে। গরমের ছুটী আসতে এখনও অনেক দেরী। এখন পলাশপুরের আম গাছে গাছে, আমের গুটি ধরেছে। তাদের বোশেখী আম গাছটায় না জানি কেমন আম এসেছে এবার। মনে পড়ে যায়, বোশেখী গাছে আম পাড়ার কথা। আম বাগানে ঘুরে ঘুরে আম কুড়োনোর কথা। একবার যে ঝড় হয়, তাতে বাগান একেবারে সাফ্ করে দেয়। নিকিরিরা তাদের কপাল চাপড়ায়। কিন্তু ঝড়ের সময়, আম কুড়োনো কি মজা। হু-হু-শব্দে ঝড় বয়ে যায়—আম গাছের ডাল মড়্ মড়্ শব্দে ভেঙ্গে যায়। সেবার তো দুটো ছেলে, গাছ চাপা পড়লো। পবনা বাগদীর বড় ছেলেটা গাছ চাপা পড়ে মরে গেল। আর ছোটটা তো জন্ম খোঁড়া। তাই বলে কি আম কুড়োনোর মজা থেকে কেউ বঞ্চিত থাকবে নাকি? আবারত সেই দিন আসছে।

অভয় পোষ্টকার্ড খানা বের করে, দোয়াত কলম নিয়ে বসে। তার বহু কথা লেখার আছে। গীতা, খোকন পড়া শোনা করছে কিনা লেবু গাছগুলোতে লেবু ধরেছে কিনা, ঘরের ছাদ দিয়ে হয়ত এবারও জল পড়বে, তা মেরামত দরকার। বাবাকে সে লিখবে চিঠির উত্তর যেন, এ বাড়ীর ঠিকানায় না দেয়। সে নূতন ঠিকানা দেবে। উমেশের কেয়ার অবে তার পত্র আসবে। মোনাদার খবরটা তার জানা দরকার। আচ্ছা, মোনাদা যে তার জন্যে অনেক করেছে। দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য সে আজ ইংরেজের জেলে বন্দী। এমন লোককে কি ভোলা যায়? যে লোক নিজের সকল সুখ, সুবিধা, স্বার্থ ত্যাগ করে, শুধু দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের পরাধীনতা ঘোচাবার জন্যে আজ জেলে বন্দী, আর আজ তাকেই এরা ঘৃণা করছে। অভয়ের মনে, জ্যেঠা জ্যেঠীদের জন্য করুণা হয়। ওঁরা বড়লোক সুখভোগী, ওঁরা কি বুঝবেন পরাধীনতার কী জ্বালা যন্ত্রণা।

রাত বাড়তে থাকে। অভয় একমনে চিঠিখানা

লিখে শেষ করে ফেলে। আলো নিভিয়ে, মাথার বালিশ ঠিক করতে গিয়েই, বালিশের তলায় শক্ত মতন কি হাতে ঠেকে। ওঃ—হরি—সেই বইখানা—। উমেশ তাকে পড়তে দিয়েছিল কিন্তু একদম মনে নেই। আলোর সামনে, বইখানার মলাট দেখল অভয়। কার্ড বোর্ডের শক্ত বাঁধাই। সামনের মলাটে একটা রিভলবারের ছবি। রিভলবারের নলের মুখ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। বইখানার নাম কানাইলাল—

অভয় বইখানার পাতা ওলটাতে লাগল। উমেশ বলেছে, বইটা খুব সাবধানে পড়তে। কিন্তু কেন? নাকি এই বইটা খুব সংঘাতিক। পুলিশ দেখতে পেলে, আর নাকি রক্ষে নেই। হঠাৎ অভয়ের মনে হ'ল পুলিশ যদি হঠাৎ বাড়ী সার্চ্চ করে, তবে বাড়ী শুদ্ধ কি সবাইকে ধরবে নাকি?

যাই হয় হোক—, তবে জ্যেঠাবাবুর আর রায় বাহাদুরী খেতাব জুটবেনা। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল অভয়।

কিন্তু ঘুম আর আসছেনা। একটা ভয় তার বুকে বাসা বেঁধেছে। কি দরকার ছিল উমেশের এই সব সংঘাতিক বই পড়তে দেওয়া। এর আগে, যে সব বই পড়েছে, তা ভালই লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের গোরা, বিবেকানন্দের বই, জীবনী বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ আহাঃ কী ভাল বই। কিন্তু এই কেন দিল? সে অতি গরীব বাপ মায়ের ছেলে। বড়লোক জ্যেঠামশায়ের দয়াতে পড়তে এসেছে মাত্র। তীর্থ-পতি মাষ্টারের কথা কানে বাজছে—এগিয়ে যাও—এগিয়ে চল থামলে চলবে না, পেছনে ফিরে তাকাবে না। এতদিনে একটু একটু করে, ঐ কথার অর্থ বুঝতে পারছে।

অনেকদিন আগে তীর্থপতি মাষ্টার সেক্সপীয়ারের একটা কবিতা বলেছিলেন। এখনও মনে পড়ছে—

—There is a tide in the affairs of men,
Which taken at the flood, leads on to fortune,
Omitted, all the voyage of their life.
Is bound in shallows and in miseries.

কবিতাটি খুব ভাল লেগেছিল, তাই ওটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অভয় ভাবে, জোয়ারের প্রথম ধাপে সে এসেছে, এতে যদি তার নৌকা ভাসিয়ে দিতে পারে, তবেই লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে, নতুবা নৌকা থাকবে অচল মরা গাঙে। ভগবান না করুন, আজ যদি হঠাৎ পুলিশ এই বই নিয়ে তাকে ধরে, তবে সমস্ত জীবন মাটি। এতে, তার কোনদিকে তৃপ্তি নেই। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, সত্যি সে কোনও কাজ করেনি। যদি সত্যিকারের কিছু কাজ করত, তবু তাতে একটা তৃপ্তি ছিল। কিন্তু এতে কি হবে? না হোম না যজ্ঞ।

অভয় এপাশ ওপাশ করতে থাকে। না—রাত পোহালেই সে বই ফেরৎ দেবে। সামান্য একখানা বইয়ের জন্য এত ঝুঁকী নিতে পারবে না। তার ঘর সব সময় খোলা। যে জ্যেঠাইমা - হয়তো দুপুরের সময় বালিশ বিছানা খোঁজ করতে এসে, বইখানা পেতে পারেন। তখন তো আর, এ বাড়ীতে জায়গা হবে না। লেখাপড়া সবই ইতি হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে মাকে। মা ডাকছেন—খোকা—ও খোকা, ভাল করে পড়া কর বাবা। তোর উপর যে সব নির্ভর। মায়ের হাতে সেই লাল শাঁখা—মাথায় সিঁদুর—ছেঁড়া সবুজ পেড়ে শাড়ী তাও আধ ময়লা। মা যেন উঠোনের পেয়ারা গাছটার গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে, একহাত গোবর মাখা। মা যেন ডাকছেন—খোকা—ও খোকা—। ঘুমের ঘোরে অভয় সাড়া দিল—মা যাই যাই—মায়ের শুকনো রোগা মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—মা যেন তাকে ডাকছেন—খোকা ও খোকা—

অভয়ের দিনটা আজ সকাল থেকেই খারাপ। নতুন একটা সুন্দর উড্ পেনসিল দিয়েছিল শুভময়। এটা তার ভারী সখের বস্তু। একদিক নীল রং অন্যদিকে লাল রং। ওটা ও বইয়ের ভেতর রাখত। কিন্তু আজ আর পেল না। কে যেন নিয়েছে? এখন কাকে ধরবে সে। সামান্য উড্ পেনসিল বটে, কিন্তু এটা বন্ধুর দান। তাছাড়া এমন সুন্দর পেনসিলটা গীতাকে দেবে বলে

রেখেছে। গরমের ছুটীতে যখন সে বাড়ী যাবে গীতা খোকনের জন্য গোটা কয় ছবি, পেনসিল নিয়ে যাবে। অভয় ভাবে, ওটা বাক্সে রাখলেই ভাল ছিল। এখন কাকে জিজ্ঞাসা করবে।

অতি যত্নে পেনসিলটা কেটেছিল; খুব সাবধানে তার নিজের নামের প্রথম অক্ষরটা লিখেছিল। পেনসিলটা কি সুন্দর টকটকে লাল রং।

অভয়ের মনটা ভারী খারাপ হয়ে যায়। মিঠুয়া যখন চা দিয়ে গেল, ভাবল পেনসিলটার কথা শুধোয়। কিন্তু সাহস হ'ল না। মিঠুয়া হয়তো নানান্ কৈফিয়ৎ দেবে বড় গলা করে। ওর গলা শুনে হয়তো স্বয়ং জ্যেঠাবাবু এসে পড়বেন। তখন কি হবে?

বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে বসে থাকে অভয়। হঠাৎ বীরুর ছোট ভাই সিধু এসে দাঁড়ায়। অভয় বলে, বাঃ আজ হঠাৎ সিধুবাবু যে। তা কি মনে করে—

সিধু চোখ বড় বড় করে বলে, জান অভয়দা আজ আমরা থিয়েটার দেখতে যাব। দাদা, আমি, দিদি, মা সব সব—। আজ খুব ভাল থিয়েটার—

—থিয়েটার দেখতে, বেশ বেশ। সিধু আর দাঁড়াল না। অভয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। কই তার কথা তো বলল না। থিয়েটার দেখতে তার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছাই কি পূর্ণ হয়। আশা করল, হয়তো যাবার আগে নিশ্চয়ই বীরু তাকে ডাকবে। অভয় বীরুর পায়ের শব্দ শুনবার জন্য কান পেতে থাকে। কিন্তু না—। বীরু দু একবার তার ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু তার দিকে তাকাল না। বীরু এমনই তার সঙ্গে মিশতে চায় না কেমন যেন আলাদা ভাবে থাকে—তফাতে তাফতে থাকতে চায়। নাঃ স্কুলের বেলা হচ্ছে অভয় ভাবে।

ক্রমশঃ

ছেলেদের পাততাড়ি

পিনাকী ভূষণ

শান্তা দেবী

জেলের উনুনে একটা কড়াচাপানো রয়েছে, তাতে পেঁয়াজ ও কাঁচালঙ্কা ভাজা হচ্ছে। তার সুগন্ধে পিনাকীর মুখে জল এসে গেল! কিন্তু তারপর দেখা গেল জেলে জাল থেকে একটা একটা মাছ বার করে ময়দা গোলায় ডুবিয়ে কড়ায় ছেড়ে দিচ্ছে। একটার পর একটা মাছ ময়দামাখা হয়ে কড়ায় ভাজা হতে লাগল। ভয়ে পিনাকীর বুক কাঁপতে লাগল। শেষে যা হবার তাই হল। জেলে জাল থেকে পিনাকীকে টেনে তুল্‌ল। ওকে দেখে বলল, "একি অদ্ভুত মাছ!"

পিনাকী বললে, "আমি মাছ নই। আমাকে ছেড়ে দাও।"

কিন্তু জেলে তা শুন্‌ল না, ওকেও ময়দা মাখিয়ে কড়ায় ছাড়তে যাচ্ছিল এমন সময় একটা কুকুর মাছের গন্ধে গুহার মধ্যে এসে ঢুক্‌ল। এ হচ্ছে সেই কুকুর যাকে পিনাকী জল থেকে টেনে তুলেছিল।

পিনাকী বললে, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

কুকুর একলাফে এসে জেলের হাত থেকে পিনাকীকে ছিনিয়ে নিলে। ওকে মুখে করে অনেক দূর দৌড়ে গিয়ে তবে সে পিনাকীকে নামিয়ে দিল। ওর হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "পরস্পরের সাহায্য সর্ব্বদাই করা উচিত।" এই বলে সে নিজের কাজে চলে গেল।

পিনাকী সমুদ্রতীরে একজন বুড়োকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা যে ছেলেটা মারামারি করতে গিয়ে আজ মাথায় চোট খেয়েছিল তার কি হল জানেন?"

বুড়ো বললে। "সে ত ভাল আছে, নিজের বাড়ী চলে গেছে। আমি শুনেছিলাম পিনাকী বলে একটা ছেলে ওকে বই ছুঁড়ে মেরেছিল। কি দুষ্টু ছেলেরে বাবা!"

পিনাকী বললে, "মোটেই না। আমি তাকে ভাল করে চিনি, সে খুব ভাল ছেলে, পড়াশুনো করতে ভাল বাসে, বাবার কথার খুব বাধ্য।"

মিথ্যা কথাগুলো মুখ থেকে বেরোবামাত্র পিনাকীর নাকটা আবার লম্বা হতে লাগল। নিজের এই অবস্থা দেখে ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "আমার কথাগুলো একটাও বিশ্বাস কোরো না। পিনাকী ভারী দুষ্টু ছেলে কুঁড়ে আর অকর্ম্মাও বটে।"

এই কথা বলার পর ওর নাকটা ছোট হতে লাগল। ক্রমে ঠিক মাপসই হয়ে গেল। তখন বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে পিনাকী নিজের কাজে চল্‌ল।

এইবার রাত হয়ে এসেছে, বৃষ্টিও পড়ছে। বৃষ্টিতে ভিজে পিনাকীর ক্ষতি কিছু হল না, তার গায়ের ময়দা গুলো ধুয়ে গিয়ে তাকে নূতন চক্‌চকে দেখাতে লাগ্‌ল। তবে পরীর বাড়ীতে ভিজে চুপচুপে আর শীতে হি হি করতে করতে সে পৌঁছল।

পরীর বাড়ী পৌঁছে দরজায় কড়া নেড়ে কিন্তু

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কারণ পরীর যে ঝি উপর থেকে নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দেয় সে হল শামুক। শামুক কিরম ধীরে চলে জান ত। যখন ভোর হয়ে আসছে তখন আর পিনাকীর ধৈর্য্য ধরে থাকবার ক্ষমতা নেই, সেই অধীরভাবে দরজায় লাথি মারতে আরম্ভ করল। তার পাটা দরজার তক্তা ফুঁড়ে ভিতরে চলে গিয়ে আটকে রইল। বাকি রাতটা এক পা মাটিতে আর এক পা শূন্যে রেখে তাকে কাটাতে হল। ভোর বেলা যখন পরীর সঙ্গে খেতে বসতে যাবে তখন তার অবস্থা কাহিল। দুধ রুটি খেতে খেতে সে প্রতিজ্ঞা করল এরপর থেকে সে সত্যি ভাল ছেলে হয়ে চলবে।

পিনাকী এবার কথা রেখেছিল। বছরের শেষে এবার ইস্কুলে সে পড়ায় সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পেল। নীলপরী তাতে এত খুসী হলেন যে বললেন, 'কাল তোমার প্রিয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি আর কাঠের পুতুল থাকবে না, এবার তুমি সত্যি মানুষ হবে।"

পিনাকী খুসীতে ফেটে পড়ে আর কি!

কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে সব মাটি হয়ে গেল। পিনাকীর এক বন্ধু ছিল যে কখন পড়া তৈরী করতনা। তার নাম ছিল বাতির সল্‌তে। কারণ সে ছিল সল্‌তের মত সরু আর লম্বা। সেদিন সন্ধ্যা বেলা পিনাকী দেখল্ সলতে রাস্তার ধারে লুকিয়ে রয়েছে; খোঁজ করে জানল যে ও বাড়ী ছেড়ে পালাবার মতলবে আছে।

সলতে বললে—"আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে ইস্কুল নেই বছরের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্য্যন্তই ছুটি। পিনাকী এস আমার সঙ্গে চল।"

ব্যাপারটা শুনতে সরেস লাগল পিনাকীর। সে বললে "কোথায় সে দেশ?" প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেল। সলতে বললে, "চল না, খুঁজে বার করব।"

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে; একটা জোনাকি বাতির কাছে ঘুরছিল। সেই কইয়ে ঝিঁঝিঁর বাতি। সে বললে, "পিনাকী, ফিরে এস।"

ঠিক তক্ষুনি ছয় জোড়া গাধায় টানা একটা বড় গাড়ী এসে হাজির হল। গাধাগুলো খটাখট্ করে পা ফেলে চলছিল।

মুখে পিনাকী তখনও যদিও বল্‌ল, "আমি এবার বাড়ী যাব। কিন্তু তার পা দুটো নড়ল না।

সল্‌তে বললে, "আমার যাত্রাটা অন্তত দেখে যাও। দেখ কি রকম সব ফুর্তিবাজ ছেলে চলেছে।" কোচম্যানটা বললে, "উঠে পড় ছোকরা, উঠে পড়।" কিন্তু সলতে ছাড়া আর কারুর মত জায়গা গাড়ীতে ছিল না। তবু পিনাকী বললে, "থামাও।" নিজের কথায় সে নিজেই অবাক হল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে একটা গাধার পিঠে উঠে বসল। বসে বসে ভাবতে লাগ্‌ল। "কি মজাই না হবে। সারাদিন খেলা করা ছাড়া কোনও কাজ থাকবে না। যেখানে কোনো ইস্কুলই নেই সেখানে ইস্কুলে কি করেই বা যাওয়া যাবে?" যে গাধার পিঠে পিনাকী চড়েছিল, সে হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে ওকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। পিনাকী আবার তার পিঠে লাফিয়ে উঠ্‌ল। এবার গাধাটা মাথা ঘুরিয়ে বললে, "আরে বোকা, তোর মাথাটা নিশ্চয় কাঠের তৈরী।"

পিনাকী এতক্ষণে লক্ষ্য করলে যে গাধাগুলো ইস্কুলের ছেলেদের মত জুতো পরেছে, আর তাদের চোখে জল। পিনাকীর ভারি আশ্চর্য্য বোধ হল। গাধাগুলো খুব জোরে ছুটে চলছিল। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। ওরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছল। সেখানে লেখা রয়েছে:—

"নির্বোধদের দেশ।"

এই দেশ। চারধারে ছেলেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে, কেউ থিয়েটারে ভীড় করছে, কেউ মিষ্টি খাচ্ছে কেউ পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পতাকায় লেখা আছে "ইস্কুল গোল্লায় যাক্।" তাদের দেখে মনে হয় ছেলেরা মুখ ধোয় নি। চুল আঁচড়ায় নি, ঘুমিয়েছিল কিনা সন্দেহ।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। পিনাকীর মনে হতে লাগ্‌ল সারাক্ষণ খেলা করাও একটা কাজ, কুঁড়েমিতে সে ক্লান্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একদিন

সন্ধ্যেবেলা সে একটা জলের ডোবায় নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠল। দেখলে তার গাধার মত লম্বা লম্বা কান হয়েছে। তার এমন লজ্জা করতে লাগল যে সে কানের উপর দিয়ে একটা রঙ্গীন কাপড় জড়িয়ে রাখল। পরদিন দেখলে কানে আবার গাধার মত লোমও গজিয়েছে। সলতের সঙ্গে দেখা করলে; দেখলে সেও মাথায় কাপড় বেঁধেছে।

সলতে বললে, "তুমি মাথায় ওটা পরেছ কেন?"

পিনাকী হেসে বললে "আমি ধাক্কা খেয়েছিলাম বলে। তোমার মাথার ফেট্টিটা খুলবে?"

সে বললে, "তুমি না খুললে আমিও খুলব না।" দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে কাপড় দুটো খুলে ফেললে। বন্ধুর মাথায় গাধার কান দেখে পিনাকী হেসে দুপাট হয়ে পড়ল। সলতেও অবশ্য পিনাকীকে দেখে সমানই হাসছিল।

হাসতে হাসতেই তারা লক্ষ্য করলে যে তাদের পায়ে গাধার খুর আর পিছনে লেজও গজিয়েছে। হাঁ করে কি বলতে গেল। কিন্তু গাধার ডাক ছাড়া মুখ দিয়ে আর অন্য শব্দ বেরোল না।

পিনাকী বলতে চেষ্টা করল। "আমি গাধা হব না মোটেই। কিন্তু মুখ দিয়ে গাধার ডাক ছাড়া কিছু বেরোল না। খাড়া হয়ে দাঁড়াতেও আর পারল না। চার পায়ে চলতে হল।

শুধু তাই নয়, কোচম্যান এইবার তাদের দুজনের জন্যে দু প্রস্থ লাগাম নিয়ে এল। সে ওদের নাকের উপর থাবড়া দিলে। পকেট থেকে লোম আঁচড়ানো চিরুনী বার করে সারা গা আঁচড়ে চক্‌চকে করে দিল। সব হয়ে গেলে তাদের নিয়ে বাজারে গেল। সলতেকে একটা চাষীর কাছে বিক্রী করল আর পিনাকীকে সার্কাস ওয়ালার কাছে।

সার্কাসওয়ালা পিনাকীকে একটা বড় গামলায় জাব খাওয়াতে নিয়ে গেল। পিনাকী মুখ ডুবিয়ে এক গ্রাস তুলল। কিন্তু তার একটুও ভাল লাগল না। পরদিন সকালে কিন্তু এত খিদে পেল যে জাব খেতেই হল। এরপর সুরু হল খেলা শেখা।

সার্কাসওয়ালা বললে, "এ গাধাটার বুদ্ধি আছে। আমি ওকে চাকার ভিতর দিয়ে লাফাতে শেখাব।"

পিনাকীর জীবনটা অদ্ভুত হল। খেলা না দেখালে খেতে দেওয়া হত না, তাই সর্ব্বদাই তার খিদে লেগে থাকত। বেচারী বড় দুঃখী গাধা।

শেখার দিনগুলি কেটে গেলে খেলা দেখাবার পালা। মস্ত একটা তাঁবুতে অসংখ্য ছেলে মেয়ের ভীড়। "বিখ্যাত গাধা পিনাকীর প্রথম খেলা" দেখতে সবাই এসে হাজির। আলো বাজনায় চতুর্দিক উজ্জ্বল, উচ্ছল। মুঠো মুঠো চীনা বাদাম কিনে সবাই খাচ্ছে। পিনাকী লাল লাগামের সাজ আর ফুলের মালা পরেছে।

সার্কাসওয়ালা মঞ্চের উপর পিনাকীকে নিয়ে এসে নিজে নীচু হয়ে নমস্কার করল। তারপর চাবুক দিয়ে পিনাকীর হাঁটুতে একটা ঘা মেরে বলল "পিনাকী নমস্কার কর।" পিনাকী দুটো হাঁটু মুড়ে মাটিতে ঠেকাল।

যেই সার্কাসওয়ালা বললে "ওঠ, ধীরে হাঁট" তখুনি পিনাকী উঠে পড়ল। তারপর কদমে চলা দৌড়ানো নানারকম হুকম হতে লাগল। যখন সে দৌড়ে চলেছে তখন সার্কাসওয়ালা বন্দুক ছুঁড়লে পিনাকী মরার ভান করে মাটিতে পড়ে গেল। এই একটা খেলা ওকে শেখানো হয়েছিল।

এবার উঠে দেখল একটা জায়গায় দর্শকদের আসনে নীলপরী বসে আছেন। তাঁর মুখটা ভারী বিষণ্ণ, তাই পিনাকীর ইচ্ছা করছিল ওঁকে ডেকে নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু গাধার ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরোলো না। ছোট ছেলেরা হাসতে লাগল। কিন্তু সার্কাসওয়ালা পিনাকীর মুখের উপর চাবুক বসিয়ে দিল। এমন ব্যথা লাগল যে চোখের জলে যেন সে এক মুহূর্ত্ত অন্ধ হয়ে গেল। যখন আবার তাকাল, তখন পরী চলে গিয়েছেন।

এইবার একটা বিশেষ বাজনা বাজতে সুরু হল। এর সঙ্গে পিনাকীর চাকার ভিতর দিয়ে লাফাবার কথা।

পায়ে জোর নেবার জন্যে সে চাকাটার চার ধারে দৌড়তে লাগ্‌ল। কিন্তু সার্কাসওয়ালা চাকাটা এত উঁচু করে ধরল যে বেচারী ছোট গাধা অতোখানি লাফাতেই পারল না। সে চাকার তলা দিয়ে দৌড়ে গেল বারে বারে। ছেলেরা অবশ্য খুব হাসতে লাগল আর হাত তালি দিল, কারণ তারা মনে করছিল যে পিনাকী ভাঁড়ামি করছে। কিন্তু সার্কাসওয়ালা রাগে চাবুক আছড়াতে লাগল।

পিনাকী জানত লাফ না দিতে পারলে রাত্রে খেতে পাবে না। আর একবার চারধারে দৌড়ে সে লাফ দেবার জন্য পাগুলো গুটোল। কিন্তু চাকায় একটা পা বেধে সে পড়ে গেল। যখন দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল তখন পাটা এমনই খোঁড়া যে হাঁটতেই পারে না।

সার্কাসওয়ালা তার খোঁড়া পা টা দেখে ঠিক করল যে পিনাকীর দ্বারা আর সার্কাসের কোন খেলা হবে না। সে সহিসকে বললে "একে নিয়ে যাও।" পরদিন সহিস পিনাকীকে বিক্রী করে দিল। যে লোকটা কিনল সে দেখে বলল, "দেখছি এর চামড়াটা বেশ শক্ত। আমি গ্রামের বাজনার দলের জন্যে যে ঢাকটা তৈরী করব তার জন্য এই চামড়াই আমার দরকার।" কিভাবে চামড়াটা ছাড়িয়ে নেওয়া যায় তার চিন্তা সে করতে বসল।

ঠিক করলে আগে পিনাকীকে জলে ডুবিয়ে দেবে। তাই তাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে তার গলায় একটা পাথর বেঁধে তাকে জলে ডুবিয়ে দড়ির আর একটা দিক ধরে রইল ওকে তুলে নেবার জন্য। গাধাটা ত জলে ডুবে গেল। ডুবে যেতে যেতে তার মনে হল যেন এক মুহুর্ত্তের জন্য নীলপরীকে দেখলে তাঁর যাদু দণ্ডটা ঘোরাচ্ছেন। তারপর মনে হল চারদিকে সব কালো অন্ধকার। একটু পরে মনে হল তাকে টেনে তোলা হচ্ছে, কিন্তু আবার সে সেই পুতুলের মত হাল্কা।

পিনাকী অবাক হয়ে দেখল যে সে আবার কাঠের পুতুল হয়ে গিয়েছে। বেঁচে ওঠা এমনই আশ্চর্য্য যে এই সব কাণ্ড তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

ঢাকওয়ালা ত আরোই অবাক হল। সে কি করে এসব বিশ্বাস করে? মরা গাধার বদলে দড়িতে জ্যান্ত পুতুল তুলে এনে সে কি রকম তাজ্জব বনে গেল বুঝতেই পার। ভাবলে স্বপ্ন দেখছি নাকি। পিনাকী হেসে বললে, "আমিই সেই বাচ্চা গাধা। আমাকে খুলে দাও, আমি সব কথা বলছি।"

লোকটা দড়ি খুলে নিল, পিনাকীও সব গল্পটা বলল। লোকটা বল্‌ল, "কিন্তু জলের মধ্যে কি হল? আমি ত তোমায় গাধা দেখে জলে ফেললাম আর তুমি পুতুল হয়ে উঠে এলে?"

পিনাকী বললে, "সে কথাও বুঝিয়ে বলছি। যখন আমার চার পাশ অন্ধকার কালো হয়ে এল্‌ ঠিক তার আগে এক ঝাঁক মাছ আমার দিকে সাঁতরে আসছিল। নিশ্চয় নীলপরী তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা আমাকে খেতে আরম্ভ করল; আমার লোম ওয়ালা কান দুটো গেল। লেজটা তারপর গেল। এমনি করে আমার কাঠের শরীরের উপরটা সবই তারা খেয়ে ফেল্‌ল। কাঠ খেতে তারা ভাল বাসে না, কাজেই আমাকে আর না খেয়ে তারা সাঁতরে চলে গেল। তাই যখন তুমি আমায় টেনে তুললে তখন গাধাটাকে আর পেলে না, কাঠের পুতুলকেই পেলে।"

এখন যা তার কোনোই কাজে লাগবে না এমন জিনিষের পিছনে টাকা খরচ করেছে বলে লোকটা এতই রেগে গেল যে সে বললে পিনাকীকে আবার বাজারে নিয়ে গিয়ে জ্বালানি কাঠ বলে বিক্রী করে দেবে। কিন্তু পিনাকী হেসে টুপ্‌ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে চলে গেল।

* * *

পিনাকী ভাবলে এবার সে ঠিক গোষ্ঠকে খুঁজে বার করবে। সে সারাদিন ধরে সাঁতার দিল। সন্ধ্যা বেলা মনে হল যেন একটা দ্বীপের কিম্বা পাহাড়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের মাঝখানে।

সেই পাহাড়টার একদিকে একটা গুহা হাঁ করে রয়েছে একটা বড় ঢেউ এর ধাক্কায় পিনাকী সেই গুহাটার ভিতর

সাঁতরে চলে গেল। এক ঝাঁক ছোট মাছও সেই সঙ্গে ঢুকে পড়ল।

তারপর একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল। গুহার মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। ও হরি! গুহা ত নয়, এ যে একটা রাক্ষুসে মাছের মুখ। ভিতরটা এত অন্ধকার যে পিনাকী কিছুই দেখতে পা্চ্ছিল না। তার জীবনে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে এটার তুলনা নেই। অতি ভয়ঙ্কর।

পিছন থেকে কে বললে, "সাহস কর।" সে একটা কাৎলা মাছ। "এ রাক্ষসটার দাঁত নেই। যাও বা আছে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।"

কথাটা সত্যি। পিনাকী গুহার পাশে হাত দিয়ে দেখে নিল। তারপর একটা অতি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখল। রাক্ষুসে মাছের পেটে একটা আলো জলছে। ছোট্ট একটা মোমবাতির আলো বটে, কিন্তু পথ দেখবার পক্ষে খুব সুবিধে।

রাক্ষসের গলা দিয়ে ঐ দিকে যেতে যেতে সে দেখল যে বাতিটা একটা কাঠের বাক্সের উপর বসানো রয়েছে। বাক্সটা একটা নৌকার মধ্যে বসানো।

নৌকায় একটি বুড়ো মানুষ বসে। সে হচ্ছে গোষ্ঠ, তাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

পিনাকী চীৎকার করে উঠ্‌ল, "বাবা, বাবা, গোষ্ঠ বাবা, সত্যি তুমি?" এই বলে সে তার গলা জড়িয়ে ধরল দুই হাতে।

গোষ্ঠ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "ওকি আমার পিনাকী সোনা?" গোষ্ঠ পিনাকীর মুখে অনেকগুলো চুমো দিলে।

আনন্দে তাদের দুজনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। শেষে পিনাকী বল্‌লে, "বাবা, তুমি কি ভাল আর আমি তোমার কি রকম দুষ্টু ছেলে। কিন্তু তুমি ত আর আমার উপর রাগ করে নেই বলত? তুমি যদি জানতে আমি কত কষ্ট পেয়েছি।" সে একের পর এক নিজের সব দুঃখের কথা বলে যেতে লাগল, কথা আর শেষ হয় না। শেষে সে বললে, "বাবা আমি তোমাকে তোমার নৌকোতে দেখেছিলাম, আমি তোমায় দেখে হাত নেড়েছিলাম।"

গোষ্ঠ বললে, "হ্যাঁ আমিও হাত নেড়েছিলাম। কিন্তু বাতাসটা এমন ঝোড়ো ছিল যে আমি তীরের দিকে দাঁড় বেয়ে আসতে পারছিলাম না। তারপর একটা বড় ঢেউ এসে নৌকোটা উল্টে দিলে, আমি জলে পড়ে গেলাম। এই রাক্ষুসে মাছটা আমায় দেখে গিলে ফেল্‌ল। পিনাকী, ভাব দেখি একবার যে এই রাক্ষসটার পেটে আমি প্রায় দু বছর বন্ধ হয়ে আছি।"

পিনাকী বললে, "তুমি কি করে বেঁচে আছ বাবা?" গোষ্ঠ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে "একটা জাহাজ ডুবি হয়েছিল, রাক্ষুসে মাছটা সেটা শুদ্ধ গিলে ফেলেছিল। সেটাতে প্রচুর খাবার বাতি পানীয় এমন কি কম্বল পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু এখন সব ফুরিয়ে গেছে। আর খাবার কিছু নেই। রাক্ষসটা যে সব জ্যান্ত মাছ গেলে সেইগুলো কাঁচা খেতে হয়। আর এই মোম বাতিটা নিভে গেলে আমরা অন্ধকারে পড়ে থাকব।"

পিনাকী বললে, "তবে ত আর সময় নষ্ট করা চলে না। আমরা যে ভাবে ঢুকেছি সেই ভাবেই আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।"

বুড়ো বেচারী বললে, "কিন্তু আমি ত সাঁতার দিতে পারি না।"

পিনাকী বল্‌লে, "উঃ তাতে কি? আমি দুজনের হয়ে সাঁতার দিতে পারি।"

কাৎলা মাছটা বললে, "হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি লক্ষ্য রাখছি বার বার রাক্ষসটা মুখ হাঁ করে আর যতক্ষণ না এক ঝাঁক মাছ ভিতরে ঢুকে পড়ে ততক্ষণ মুখটা খোলাই রাখে। ঐ সময় আমাদের বেরোবার সুযোগ নিতে হবে।"

যেই রাক্ষসটা মুখ খুলতে সুরু করল অমনি পিনাকী বলল, "এইবার আমার সঙ্গে এস।" বিরাট একটা ঢেউ রাক্ষুসে মাছের গলা দিয়ে পেটে ঢুকে পড়ল, তারপর যেই জলটা আবার বেরিয়ে যেতে সুরু করল, তথখুনি পিনাকী সাঁতার আরম্ভ করল। গোষ্ঠকে সে পিঠে তুলে নিল আর কাৎলা মাছটা ওর পিছন পিছন চলল।

রাক্ষস মুখ বন্ধ করবার আগে বেরিয়ে পড়তে হবে ঝট্ করে। ভয়ে পিনাকীর বুক ধড় ফড় করতে লাগল। কিন্তু যাহোক করে পিনাকী সদলে সমুদ্রে বেরিয়ে এল। তার পর সাঁতার আর সাঁতার, সারারাত ধরে সাঁতার। মনে হচ্ছিল তীর যেন আর আসবে না। বেচারী পিনাকীর শক্তি যেন শেষ হয়ে আসছিল।

শেষে কাৎলা মাছ বললে, তোমরা দুজনে আমার পিঠের উপর চড়ে বস না কেন? আমি কখনও শ্রান্ত হই না। তখন তারা দুজন তাই করল। ভোর হতেই তারা বেশ তাজা অবস্থায় ডাঙ্গায় এসে পৌছল। পিনাকী একলাফে নেমে পড়ে বৃদ্ধ গোষ্ঠর হাতটা ধরল। কাৎলাকেও বলল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এস।" কাৎলা বললে, "না আমি যাব না। আমি ডাঙ্গার মাছ হতে চাই না।" কাৎলা ওদের কাছে বিদায় নিয়ে জলে নেমে গেল, গোষ্ঠ আর পিনাকী রাস্তা ধরে চলতে লাগ্‌ল।

গোষ্ঠ এমনি ক্লান্ত হয়েছিল যে দাঁড়াতেও তার কষ্ট হচ্ছিল। তা দেখে পিনাকী বল্‌ল, "বাবা, আমার উপর ভর দাও। একটা বাড়ী দেখতে পেলেই আমি কিছু খাবার চাইব আর রাতের মত কোথাও একটু মাথা গোঁজবার জায়গা পাই দেখব।"

কিছুদূর যেতে না যেতেই তারা দেখ্‌ল সেই দুষ্টু বেড়ালটা আর শেয়ালটা রাস্তার ধারে ভিক্ষে করছে। তাদের এখন সত্যি সত্যিই ভিক্ষে করা প্রয়োজন। এতদিন তারা ভান করে একজন খোঁড়া আর একজন অন্ধ সেজে বেড়াত। কিন্তু এখন তারা সত্যিই খোঁড়া আর অন্ধ হয়েছে। ওদের অবস্থা শোচনীয়। শেয়াল বললে, "পিনাকী। দুটো অসহায় জীবের উপর দয়া কর।"

পিনাকী বললে, "না করাই উচিত। তোমরা একবার আমাকে বোকা বানিয়ে ঠকিয়েছ আর ঠকাতে দেব না। আমি বুঝতে পেরেছি তোমরাই সেই দুষ্টু দুটো জানোয়ার যারা আমার টাকা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল এবং আমাকে প্রায় মেরে ফেলছিলে।"

শেয়াল বল্‌ল, "বিশ্বাস কর, এবার আমরা ঠাট্টা করছি না। বিশ্বাস কর সত্যিই আমরা ভারী দরিদ্র।" পিনাকী বললে, "উচিত ফলই পেয়েছ তাহলে।" এই বলে পিনাকী গোষ্ঠর সঙ্গে চলে গেল।

খানিক পরে তারা একটি ছোট্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটিরের কাছে এল। মনে হল যেন কেউ সেখানে বাস করে না। ভিতরে গিয়ে চার ধারে তাকিয়ে দেখে কিনা ওমা! দেয়ালে তাদের সেই পুরানো বন্ধু কইয়ে ঝিঁঝিঁ বসে আছে।

ঝিঁঝিঁ পিনাকীকে দুষ্টু ছেলে হওয়ার জন্যে খুব বকল। পিনাকী বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ, ঝিঁঝিঁ। আমার সঙ্গে কড়া ব্যবহার করাই উচিত। কিন্তু আমরা বাবা বেচারীর উপর দয়া কর। আর বল দেখি এমন সুন্দর বাড়ী তুমি কোত্থেকে পেলে।"

ঝিঁঝিঁ বল্‌ল, "নীলপরী আমাকে এই বাড়ীটা দিয়েছেন। রাক্ষুসে মাছ তোমাদের খেয়ে ফেলেছে মনে করে তিনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছেন। পিনাকী কেঁদে বললে "তাহলে কি আমি তাঁকে আর দেখতে পাব না?"

গোষ্ঠকে একটু আরামে শুতে বসতে দিয়ে পিনাকী তার জন্য একগেলাস দুধ কোথায় পায় ঝিঁঝিঁকে জিজ্ঞাসা করল। ঝিঁঝিঁ বললে যে মাইল খানিক দূরে এক চাষী থাকে, তার গরু আছে। তাই শুনে পিনাকী সেই দিকে চল্‌ল। কিন্তু দুধ কেনবার ত তার পয়সা ছিল না। তাই সে বললে তোমার কাজ করে দুধের দাম শোধ দেব।" কাজই পেল। কুয়া থেকে একশ বালতি জল তুলে দিয়ে সে এক গেলাস দুধের দাম দিল। জল তোলবার সময় চাষী বলল যে তার একটা

গাধা ছিল সেই জল পাম্প করার কাজ করত। কিন্তু এখন বেচারীর মর মর অবস্থা।

পিনাকী বললে, "তুমি আমাকে একটু তার কাছে নিয়ে যাবে ?"

চাষী পিনাকীকে নিয়ে গেল। পিনাকী দেখলে গাধাটা খড়ের উপর শুয়ে আছে। দেখেই ও চিনতে পারল সলতেকে। তার পুরানো বন্ধুর এমন অবস্থা দেখে ও কাঁদতে লাগ্‌ল।

সেদিন থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত পিনাকী রোজ ভোর পাঁচটায় উঠ্‌ত আর চাষীর জন্যে জল তুলে দিত, যাতে গোষ্ঠ শরীর সারবার জন্যে দুধ খেতে পায়। সে অন্যান্য কাজও করত আর গোষ্ঠর জীবনটাতে একটু আনন্দ দেবার এইভাবে চেষ্টা করত। পরিশ্রম করে করে যখন সে যথেষ্ট টাকা জমিয়েছে, তখন ঠিক করলে নিজের জন্যে নূতন কাপড় চোপড় কিনবে। একদিন সকালে খুসী মনে শিষ দিতে দিতে সে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল কাপড়ের দোকানে। হঠাৎ শুনল কে যেন তাকে ডাকছে। দেখল নীলপরীর সঙ্গে যে শামুক থাকৃত সেই শামুক ডাকছে। সে একটা খারাপ খবর দিলে। বল্‌লে "পরীর বড় অসুখ, তিনি হাসপাতালে আছেন। আবার এমনই দুর্দ্দশা যে খাবার কেনবার পয়সা পর্য্যন্ত নেই।

শুনে পিনাকী কেঁদে বল্‌ল, "আমার এই টাকা ক'টা নিয়ে পরীকে দাও। আমার নূতন কাপড় পরার চাইতে পরীর সেরে ওঠা অনেক বেশী দরকার।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পিনাকী অন্য দিনের চাইতেও বেশীক্ষণ কাজ করল যাতে বেশী টাকা রোজগার করে পরীকে আর একটু সাহায্য করতে পারে।

তারপর হল একটা আশ্চর্য্য ঘটনা। পরদিন সকালে সে যখন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌ল তার আনন্দ দেখে কে ? সে আর কাঠের পুতুল নেই, জলজ্যান্ত একটা ছেলে। দেখলে চেয়ারের উপর একটা নূতন পোষাক, নূতন টুপি, নূতন এক জোড়া জুতো সাজানো রয়েছে। পোষাকের একটা পকেটে একটা টাকা পয়সা রাখবার ব্যাগ, তার ভিতরে একটা কাগজে লেখা রয়েছে :—"পরী তাঁর আদরের পিনাকীকে তার টাকা ফিরে দিচ্ছেন এবং তার অমন সদয় মনের জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।"

চল্লিশটা পয়সার বদলে চল্লিশটা ঝকঝকে সোনার মোহর ব্যাগে রয়েছে।

পিনাকী ছুটে পাশের ঘরে গোষ্ঠকে বলতে গেল। সেখানে গিয়েও একটা আনন্দকর জিনিষই দেখল। দেখল গোষ্ঠ সেরে উঠে হাসি মুখে আবার কাঠ খোদাই এর কাজ করছে। পিনাকী বললে "দেখ বাবা দেখ, আমি সত্যি মানুষ হয়েছি। কাঠের পিনাকীর কি হল ?"

গোষ্ঠ বলল, "ঐ যে রয়েছে দেখ।" পিনাকী দেখলে একটা মস্ত পুতুল পা উঁচু আর মাথা নীচু করে পড়ে রয়েছে।

পিনাকী ভাবলে, "যখন কাঠের পুতুল ছিলাম তখন আমি কি হাস্যকরই ছিলাম। এখন সত্যি ভাল ছেলে হয়ে মনে কি আনন্দই হচ্ছে।"

ক্রমশঃ

ভুবন ও তার মাসী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

(পূর্ব কথা বিদ্যাসাগর থেকে)

ভুবন নামে এক বালক ছিল একশো বছর আগে।

এবং তার ছিল এক মাসী।

আর একদা তার হয়েছিল ফাঁসী।

(ছেলেটার যে রূপ ছিল তা কিন্তু জানা ছিল না।)

*　　*　　*　　*

পরের কথা

১৯৪২ সালে ভুবনরা সুরু করল দেশের কাজ।

পোড়ালো ট্রাম বাস, পোষ্ট অফিস রেলপথ। ওড়ালো টেলিফোন টেলিগ্রাফ।

মাসী বনাম মামা খুড়োরা বললেন বেশ করছ বাপ।

বাহবা বাহবা বেশ।

এবং সাহেবরা ভয়ে পালালো। (তাঁরা বললেন)। স্বাধীন হল: দেশ।

আবার এসেছে তারা।

একটু বেশী করে দেশের কাজ করছে ঘুরে ঘুরে।

সেকেলে নির্বোধ মনীষীদের ছবি মূর্ত্তি স্কুল-কলেজ লাইব্রেরী ভেঙে চুরে।

হাতে বোমা ছুরী। ঘোরে ফেরে। যাকে খুসী মেরে।

তাদের ফাঁসী হয় না আর।

কারণ তারা ভোটার।

"তাদের নইলে ভুবনেশ্বরদের দেশপ্রেম যে মিছে।"

আর মাসী ওরফেদের কাল?

কেউ তার পায় না সন্ধান।

———

চৌদ্দ দিনে যুদ্ধ শেষ

২-১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১

চিত্তরঞ্জন দাস

পাক-ভারত যুদ্ধ।

পাকিস্থানের বড় সাধ হ'য়েছিল ভারতের সঙ্গে লড়াই করবার। তাই ডিসেম্বরের শুরুতেই তারা অকস্মাৎ ভারত আক্রমণ করল। ভারতীয় জওয়ানগণও ছিলেন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। মাত্র চৌদ্দ দিনে মিটিয়ে দিলেন পাকিস্থানের রণ-সাধ। ১৬ই ডিসেম্বর পাক-দখলদারবাহিনী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ করল। যুদ্ধ হল শেষ।

বিগত আট মাস যাবৎ পূর্ব্ব-বঙ্গে চলেছিল পশ্চিম পাক্-সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর অবিরাম সংগ্রাম। উভয় পক্ষের হতাহতও প্রচুর। হঠাৎ ১লা ডিসেম্বর রাত্রে পাক্-বাহিনী কর্তৃক পূর্ব্বখণ্ডে ভারতীয় এলাকা হ'ল আক্রান্ত। অতঃপর শুরু হ'ল অঘোষিত পাক-ভারত যুদ্ধ।

ডিসেম্বর-১।

রাত ৮টা থেকে পাকিস্থানী কামানের প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ শুরু হয়েছিল তিনদিক থেকে, আগরতলা শহর ও শহরতলীর শরণার্থী শিবিরগুলি এবং ঘন বসতি পূর্ণ বাজার এলাকা লক্ষ্য করে। ফলে বহু অসামরিক লোক সেখানে হতাহত হ'ল।

ডিসেম্বর-২।

আক্রান্ত অঞ্চলে কারফু জারি করা হয়েছিল ভোর ৬টা থেকে বেলা ১২টা; এবং এক ঘন্টা বিরতির পর পুনরায় ১টা থেকে রাত ৯টা। উক্ত বিরতির মধ্যেই আগরতলা বিমান ঘাঁটিতে হ'ল পাকিস্থানী বিমান হানা।

তিনটি পাকিস্থানী স্যাবার জেট বিমান বৃহস্পতিবার বেলা ১২-৩৫ মিঃ এ আগরতলা বিমান ঘাঁটি এলাকার উপর ছোঁ মেরে নেমে এসে আশেপাশে চতুর্দ্দিকে এলো পাথাড়ী বোমা ফেলে যায়। শহরেও ঝাঁকে ঝাঁকে পাক্ কামানের গোলা এসে পড়তে থাকে। স্যাবার জেটের অতর্কিত আক্রমণ ও গোলা বর্ষণের ফলে বহু জীবন ও ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়।

আগরতলায় বিমান হানার সংবাদ নয়াদিল্লিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এক জরুরী বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং শ্রীরাম, স্থলবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ এবং প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী কে, বি, লাল। উক্ত বৈঠকে শুধু আগরতলা নয়; বিভিন্ন সীমান্তে যুদ্ধ পরিস্থিতিও আলোচিত হয়। বৈঠক চলাকালীন বারবার খবর আসে আগরতলা সহরের দিকে দিকে পাক কামানের গোলা ছুটে এসে পড়ছে। পূর্ব্ব খণ্ডে শুধু আগরতলাই নয়; কমিরগঞ্জ সীমান্তে এবং মেঘালয়ের খাসি জয়ন্তিয়া সীমান্তেও তখন অবিরাম কামানের গোলা পড়ছে।

বালুরঘাটে তো পড়ছেই এবং গোলাবর্ষণের ফলে সেখানে তখন হতাহতের সংখ্যা যথাক্রমে পঞ্চাশ ও শতাধিক। অবশ্য ভারতীয় কামানও তখন সব ক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত জবাব দিয়ে চলেছে।

উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবারই (২রা ডিসেম্বর) নয়াদিল্লি থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আগরতলা খণ্ডের সেনাপতির কাছে নির্দেশ প্রেরিত হল: "আগরতলা বিমান ঘাঁটি ও শহরে পাক হামলার যথাযোগ্য জবাব দিতে এবং আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অবিলম্বে পাক এলাকাতেই ঢুকে পড়।" নয়াদিল্লির নির্দেশ পেয়েই পাক গোলা স্তব্ধ করবার জন্য ভারতীয় বাহিনী অনতিবিলম্বে অগ্রসর হ'লেন পাক এলাকার দিকে। শুরু করলেন পাল্টা আক্রমণ।

ডিসেম্বর-৩।

পাকিস্থানী স্যাবার জেট বিমান আজ একাধিকবার আগরতলা বিমান ঘাঁটিতে হানা দেয় এবং বেলা ৩টায় রকেট বৃষ্টি ক'রে বিমান ঘাঁটির প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। পি, টি, আই-এর সংবাদে প্রকাশ: পাক স্যাবার জেট আজ কয়েকবার আগরতলায় গুলিবৃষ্টি ও বোমা বর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু মাটি থেকে প্রচণ্ড রকম কামান দেগে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়।"

আগরতলা থেকে ইউ, এন, আই-এর খবরে প্রকাশ: "চারটি পাক স্যাবার জেট বিমান ঢাকা থেকে উড়ে এসে বেলা ৪-১৫ মিঃ এ আগরতলার দিকে এগোচ্ছিল। সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তার মধ্যে তিনটিকে ভালমত জখম করেন। বিমানগুলি ব্যর্থ হ'য়ে ঢাকার দিকে ফিরে যায়।" আগরতলার বিশেষ সংবাদ দাতার খবর: "সম্ভবত আখাউড়া ও ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মধ্যে কোথাও মুক্তিবাহিনীর গোলায় উক্ত বিমানের তিনটি জখম হ'য়েছে।"

ভারতীয় সৈন্যগণ সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলা [illegible] দিকে আগরতলার পশ্চিমে আখাউড়া এলাকায় পাক বাহিনীর সঙ্গে আজ জোর হাতাহাতি লড়াই সুরু করেছেন। উক্ত লড়াইয়ে পাকিস্থানের শক্তি এক ব্রিগেড।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাত্র ছয় ঘণ্টার জন্য আজ কলিকাতায় এসেছিলেন। বিকাল ৪-৪২ মিঃ-এ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে নব কংগ্রেস আয়োজিত জনসভায় বক্তৃতা করতে ওঠেন এবং ৫-৩২ মিঃ এ জয়হিন্দ ও ভারত মাতা কী জয়ধ্বনি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন। ইতিমধ্যে এখানে শ্রীনগর, অমৃতসর, পাঠানকোটে পাক বিমান বাহিনীর আক্রমণের খবর এসে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে রাজভবনে পৌছে উক্ত খবর শুনেই তাড়াতাড়ি দিল্লী রওনা হয়ে যান।

আজ অধিক রাত্রে সারাদেশে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরি। পাক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই ঘোষণা জারি করা হল। মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির বৈঠকে পাক হামলার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করে দেখার পরেই রাষ্ট্রপতি আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন। স্থল, নৌ ও বিমান—এই তিন বাহিনীর প্রধানরাও উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমনকারী তিনটি পাক বিমান ভারতীয় কামানের গোলায় ধ্বংস হয়।

ডিসেম্বর—৪

পাক প্রেসিডেণ্ট জেঃ ইয়াহিয়া আজ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

পাকিস্থানের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ভারতীয় সংসদে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন সংসদ সদস্যবৃন্দ সকলে একযোগে।

বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা আজ সাংবাদিকদের বলেছেন, পূর্ববঙ্গ দখল

ভারতীয় বাহিনীর দখলে
ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি
ভারতীয় নৌবাহিনী অবস্থান
শিলিগুড়ি
নেপাল
জলপাইগুড়ি
কোচবিহার
ঠাকুরগাঁও
ধুবড়ী
রংপুর
দিনাজপুর
মানকেরচর
তুরা
শিলং
রায়গঞ্জ
হিলি
ডাউকি
মালদহ
বগুড়া
শ্রীহট্ট
ময়মনসিংহ
রাজসাহী
নাটোর
লালগোলা
হবিগঞ্জ
কৈলাসহর
সারাসেতু
পাবনা
শিকারপুর
পদ্মা
কুষ্টিয়া
মেঘনা
আগরতলা
আইজল
ঢাকা
ময়নামতী
ফরিদপুর
কুমিল্লা
বিলোনিয়া
বয়রা
যশোর
চাঁদপুর
বনগাঁ
নাভারণ
নোয়াখালি
রামগড়
খুলনা
হাসনাবাদ
চালনা
বরিশাল
কলকাতা
চট্টগ্রাম
কক্সবাজার
বঙ্গোপসাগর
ব্রহ্মদেশ
১০০ কিলোমিটার
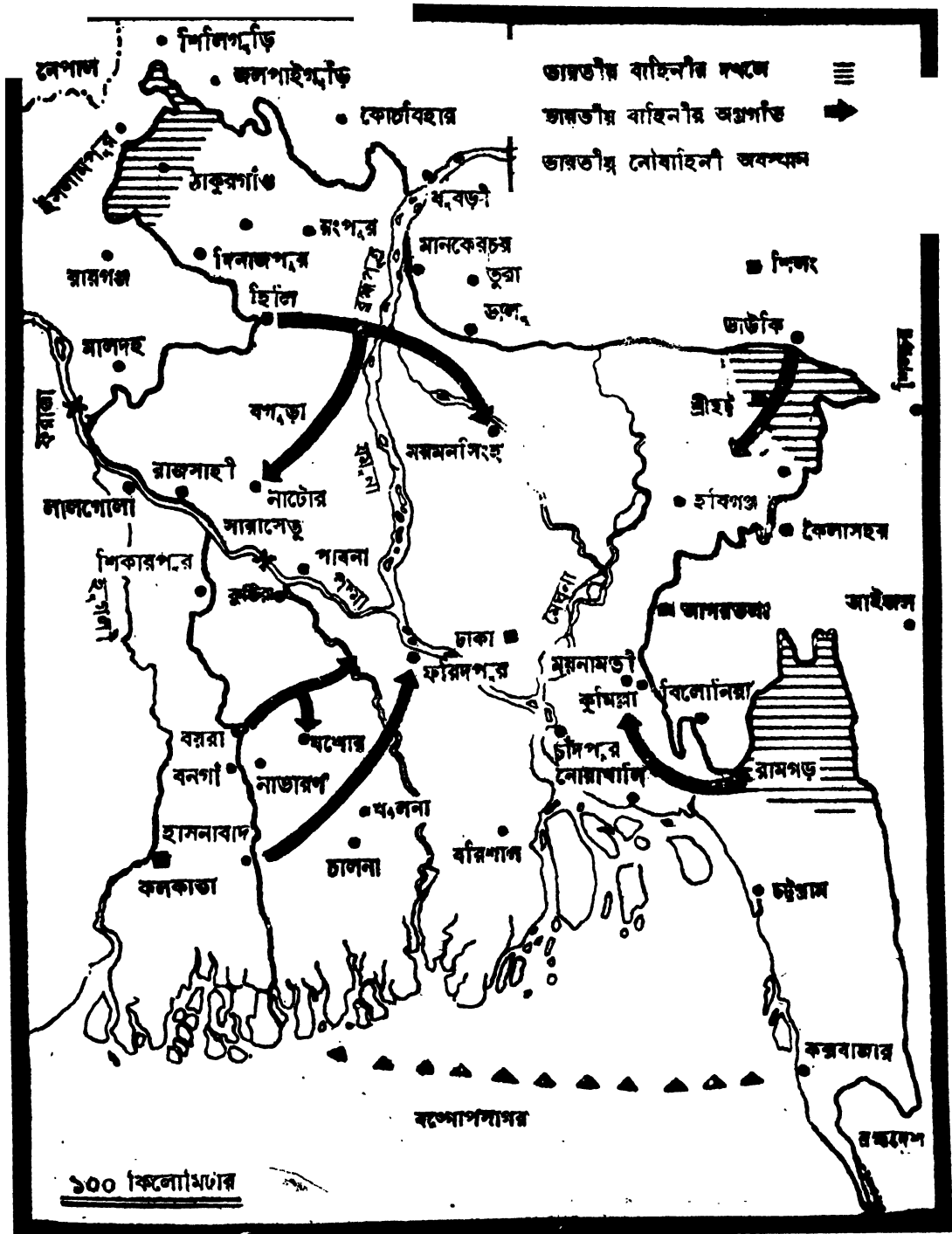
করা ভারতীয় বাহিনীর উদ্দেশ্য নয়। এ সম্পর্কে আমার সরকারের নীতি খুবই পরিষ্কার। আমার সরকার চান, বাংলাদেশে যথার্থ জন প্রতিনিধিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। পূর্ব্ববঙ্গে পাক বাহিনীকে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

পাকিস্থানের যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পূর্ব্ব খণ্ডে ভারতীয় জওয়ানরা দুর্বার গতিতে পাক সেনাদের আঘাত হানতে থাকেন। আজ সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ভারতীয় জওয়ানরা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষ্যে একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছেন।

ভারতীয় বিমানবাহিনী আজ বাংলাদেশে ১৪টি পাক বিমান ঘায়েল করেছেন। ঝাঁকে ঝাঁকে মোট ১৭০ বার আক্রমণ চালিয়েছেন। কুর্মিতলা, তেজগাঁও, যশোর, হিলি, লালমণিরহাট, আখাউড়া ও জামালপুরসহ বাংলাদেশের মোট ১১টি বিমানক্ষেত্রের উপর আজ ভারতের বিমান আক্রমণ চলে।

গতকাল রাত একটা থেকে আজ সারাদিন ধরে বাংলাদেশে পাক বিমান ঘাঁটি, গুরুত্বপূর্ণ ফেরী, রেল স্টেশন, সরবরাহ ট্রেন, চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা জাহাজ ও পেট্রোলের গুদামে বোমা ও গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্থানী জাহাজগুলিকে একেবারে অচল করে দেওয়া হয়েছে।

একজন সরকারী মুখপাত্র বলেছেন, বাঙলাদেশে পাকিস্থানের আর দুই একটি বিমান থাকলেও থাকতে পারে। তবে তাদের বিমান শক্তি একেবারেই পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। পাক বিমান বাহিনী পূর্ব্বখণ্ডে আর আক্রমণ করতে পারবে না। প্রতিরোধের ক্ষমতাও আর তাদের নেই।

গতরাত্রে চট্টগ্রামের তৈল শোধনাগার ও নারায়ণগঞ্জ বিমানবন্দরেও বোমা বর্ষণ করা হয়েছে।

ভারত তিনটি হান্টার ও একটি এস, ইউ ২২ বিমান অর্থাৎ মোট চারটি বিমান হারিয়েছে।

ইউ এন আই এর খবরে প্রকাশ: বাংলাদেশে প্রথম দিনের যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্যদের প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে ২০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল দখল করেছে। সিঙ্গারডিল, কোডাল, বরিশাল, দেবগ্রাম, নরপুর, গঙ্গাসাগর, ইমামবাড়ী ও গোপীনাথপুর শহর ভারতীয় বাহিনীর দখল ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পশ্চিম পাকিস্থানের যে সব সৈন্য ত্রিপুরা অঞ্চলে ধরা পড়েছে, তারা জানিয়েছে যে, পাকিস্থান আগরতলা দখলের উদ্দেশ্যে আজ অপরাহ্নে একটি অভিযান চালাত। এই উদ্দেশ্যে কুমিল্লা থেকে ১১১ ব্রিগেডকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আনা হয়েছে।

আজ রাত্রে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, গত ১৮ ঘণ্টায় তিনটি মিরাজ এবং দুটি এফ—১০৪ ষ্টার ফাইটারসহ ৩৩টি পাকিস্থানী বিমান ভূপতিত অথবা ধ্বংস করা হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্থানী বিমান বাহিনী প্রায় খতম হ'য়েছে, আর দু'তিনটি বিমান সম্ভবত অক্ষত আছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১১টি বিমান ধ্বংস হয়েছে। ৬টি পশ্চিম পাকিস্থানে, ৫টি বাংলাদেশে।

পূর্ব্ব সীমান্তে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর ঘাঁটির পতন ঘটেছে। এই ঘাঁটির ৩১তম বালুচ বাহিনী ও ভেজটি রেঞ্জাররা ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আজ চট্টগ্রাম ও কক্স বাজার বন্দর এবং শহরের উপর ভারতীয় নৌবহর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং বাংলাদেশের পাক দখলীকৃত এলাকার বন্দর গুলোকে অবরুদ্ধ ক'রে রাখে। আজ অপরাহ্নে দ্বিতীয়বার চট্টগ্রাম পোতাশ্রয় আক্রমণ ক'রে প্রভুত ক্ষতি সাধন করে।

পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী শত্রু এলাকার ৭কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে খেরি ও নুনিসহ পাকিস্তানের ৯টি গ্রাম দখল করেছে। মেনদ্ধার খণ্ডের বিপরীত দিকে ১টী পাকিস্থানী ঘাটি দখল করেছে। এখানে বহু পাকিস্থানী সৈন্য হতাহত হ'য়েছে। ভারতীয় বাহিনী ছাম—জোরিয়ানা খণ্ডের বিপরীত দিকে মাতোয়ালী শহরটিও দখল করেছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী করাচী বন্দর ও নৌ বন্দর সারগোদা, পোরকোট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির উপর বোমা ফেলে এসেছে। এই সীমান্তে ১৯টি পাক বিমান ধ্বংস করা হ'য়েছে। বিভিন্ন স্থানে ৮০জন পাকসৈন্য ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্ম সমর্পণ করেছে। হুসেনিওয়ালাতে ১২টি পাকিস্থানী ট্যাংক্ ধ্বংস হ'য়েছে। হুদিয়ারানালায় এক কনটিনজেন্ট পাক সৈন্য অবরুদ্ধ হ'য়েছে।

শনিবার রাত্রে ভারতীয় সৈন্যগণ দর্শনা শহরটি দখল করেছেন। শুক্র-শনিবার মধ্য রাত্রে ৪ ঘণ্টা লড়াই করে পাক বাহিনীকে পর্যুদস্ত ক'রে ফেলেছে। পাক বাহিনীর বহু সৈন্য খতমের পর অবশিষ্ট সেনাবাহিনী পিছু হ'টে যেতে বাধ্য হ'য়েছে। ভারতীয় বাহিনী চুয়াডাঙ্গা হ'য়ে কুষ্টিয়া শহর দখল করবার জন্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে চ'লেছে।

লড়াই শুরু হবার ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই স্বাধীন বাংলার আকাশ সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে দখলদার পাকিস্থানী সেনাবাহিনী এখনও বিপর্য্যস্ত না হোক, সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। রবিবার গোটা বাংলাদেশের আকাশে ভারতীয় জঙ্গী বিমানগুলি বিনা বাধায় উড়ে বেড়িয়েছে। ঢাকার কুরমিটোলা সহ বিভিন্ন পাক বিমান ঘাঁটিতে টন টন বোমা ফেলে এসেছে। পাক সেনাবাহিনীর অসংখ্য গাড়ী, ষ্টীমার এবং বাংকার ধ্বংস করে দিয়েছে—কিন্তু তবুও কোন পাকবিমান তাদের বাধা দিতে আসে নি। অতএব বাংলাদেশে যে আর কোন পাকিস্থানী বিমান নেই, ইহা সহজেই অনুমেয়।

ডিসেম্বর-৫

আজ আন্তর্জাতিক আসরের সব চেয়ে বড় খবর—ভারতকে জব্দ করবার জন্য মারকিন প্রস্তাব সোভিয়েট ভিটোতে বরবাদ॥ রাশিয়ার হুঁশিয়ারী—"ভারত পাক সংঘর্ষ থেকে অন্যান্য রাষ্ট্র যেন তফাৎ থাকে।"

ভারতীয় নৌ-বহর থেকে আজ করাচি ও চট্টগ্রাম বন্দরে অবিরাম গোলাবর্ষণ করা হ'য়েছে। ভারতীয় বাহিনী রাজস্থান সীমান্ত দিয়ে সিন্ধু দেশের ভিতরে প্রবেশ করেছে। জওয়ানরা এখন পশ্চিম পাকিস্থানের ৪০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে এবং পূর্ব্বখণ্ডে ঢাকা থেকে ৬০ মাইল দূরে। ঢাকার তেজগাঁও আর কুর্ম্মিটোলা এবং রাওয়ালপিণ্ডির সারাগোদা প্রভৃতি ঘাঁটিতে অবিরাম বোমা বর্ষণ চল্‌ছে।

আজ রাত ১২টা পর্য্যন্ত পাকিস্থানের ক্ষতির খতিয়ান:—ট্যাংক্—৩৫, বিমান—১৪, ডেষ্ট্রয়ার—২, সাবমেরিন—১, বাণিজ্য জাহাজ—১।

ডিসেম্বর-৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সংসদে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন—"ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এই সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।"

বাংলাদেশে আজ ভারতের স্বীকৃতি পেল আর সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডিও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল।

বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের এই ঐতিহাসিক ঘোষণার পরই অনান্দ এবং হর্ষ প্রকাশের জন্য সোমবার লোক সভার অধিবেশন এই দিনের মত স্থগিত রাখা হয়।

পূর্ব্ব রণাঙ্গনে যশোরে প্রায় চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ পাক সেনা বাহিনীকে সোমবার রাত্রে ভারতীয় বাহিনী আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছেন। যশোর এখন ঢাকা ও খুলনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ক্যান্টনমেণ্টে ও তার আশে পাশে পাক বাহিনীর অন্তত বিশ হাজার অফিসার ও সেনা র'য়েছে। ভারতীয় সেনা বাহিনী চতুর্দিক থেকে যশোর খণ্ডে পাক সেনা বাহিনীকে ঘিরে রেখেছে, কিন্তু তাদের উপর বড় রকমের কোনও আক্রমণ চালায় নি।

ইতিমধ্যে ফেনীর পতন হ'য়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া

এবং লালমনির হাটের পতনও আসন্ন। নানা পথে রংপুর এবং দিনাজপুর শহরের দিকেও ভারতীয় সেনা বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে। খোদ ঢাকার অবস্থাও কাহিল। এদিন ভারতীয় জঙ্গী বিমান বহুবার উড়ে গিয়ে ঢাকার কুরমিটোলা বিমান ঘাঁটিতে বোমা ও রকেট নিক্ষেপ করে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে এসেছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে বারমার খণ্ডে হাজার বর্গ মাইল পাক এলাকা এখন ভারতের দখলে।

ক্ষতির খতিয়ান :—যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ পাকিস্তান ৫২ খানি বিমান ও ৮৯ খানি ট্যাংক্ খুইয়েছে। জনৈক সরকারী মুখপাত্র এই তথ্য আজ রাত্রে প্রকাশ করেন। উক্ত ৫২ খানি পাক বিমানের মধ্যে আজ ধ্বংস হ'য়েছে চারখানা এবং ট্যাংক্ ধ্বংস হ'য়েছে পাঁচখানা। উক্ত মুখপাত্র বলেন, আজকের দু'খানা নিয়ে ভারত মোট ১৯খানা বিমান হারিয়েছে। ভারত কখানা ট্যাংক্ হারিয়েছেন, উক্ত মুখপাত্র তার হিসাব দিতে পারেন নি। পাকিস্থান এযাবৎ ৮খানা জাহাজ ও একখানা সাবমেরিন হারিয়েছে।

ডিসেম্বর-৭

পূর্বাঙ্গনে সর্বত্র খান সেনারা পালাচ্ছে। ভারতীয় জওয়ানদের জয় জয়কার। যশোর ও শ্রীহট্ট মুক্ত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে দ্রুত ও যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম পাক সেনার ঘাঁটির পর ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। হানাদারদের বড় বড় আর মাত্র দু'টি ঘাঁটি বাকি—ঢাকা আর কুমিল্লা। রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা পালাচ্ছে আর পালাচ্ছে। পূর্বাঙ্গনে তাদের পৃষ্ঠ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মেহেরপুর, ঝিনাইদা, লালমণির হাট সব পর পর মুক্ত হ'য়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকেও পাক সেনা বাহিনী দ্রুত গতিতে পালাচ্ছে। আজ মঙ্গলবার বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তি সেনারা একের পর এক সাফল্য অর্জন করেছেন। অতঃপর চতুর্দিক থেকে এগিয়ে চ'লেছেন রাজধানী ঢাকার দিকে। এখন শুধু ঢাকা চলো।

আজকের অপর একটি উল্লেখযোগ্য খবর—ভূটানও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ উভয় পক্ষের ক্ষয় ক্ষতির খতিয়ান :—

	পাকিস্থান	ভারত
বিমান—	৫৩	২২
ট্যাংক্—	১৩৮	১৫
জাহাজ—	৮	০
সাবমেরিণ—	১	০

ডিসেম্বর-৮

ঢাকা থেকে জাঁদরেল জঙ্গী চাঁইদের চম্পট। ছয় দিক থেকে মিত্র আর মুক্তিসেনা রাজধানীর দিকে।

ভারতীয় সেনা বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ আজ বুধবার আবার বাংলাদেশে পাক-সেনাদের অবিলম্বে আত্ম সমর্পণের আহ্বান জানিয়েছেন। ব'লেছেন না হ'লে আপনাদের মৃত্যু অবধারিত।

এদিন কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাগুরা, সাতক্ষিরা প্রভৃতি শহর সম্পূর্ণরূপে পাক কবল মুক্ত করা হ'য়েছে। ময়নামতি সেনানিবাস দখলের জন্যও জোর লড়াই চলছে।

বঙ্গোপসাগরে বন্দী ৬টি পাক জাহাজ আজ কলকাতায় আনা হ'য়েছে। বিকেল ৩টায় কড়া পাহারার মধ্যে উক্ত জাহাজগুলি পরপর কিংজরজেস ডকে ঢোকে। অফিসার এবং নাবিকসহ জাহাজ ছয়টি আপাতত এখানেই আটক থাকবে।

বাংলাদেশ সরকার মুক্ত যশোরে শ্রীওয়ালিউল ইস্‌লামকে জেলা শাসকের পদে নিয়োগ করেছেন। শ্রীইস্‌লাম আজ সকালে যশোরে তাঁর নতুন কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন।

এদিন সকালে ভারতীয় বাহিনী কুমিল্লা বিমান বন্দর সহ কুমিল্লা শহরটি দখল করেন। অতঃপর বাংলাদেশ ও ভারতের পতাকা লাগিয়ে পূর্বাঞ্চলের জি, ও, সি, লেঃ জেঃ জে, এস, অরোরা আজ কুমিল্লা বিমান বন্দরে গিয়ে পৌঁছলে বিরাট জনতা হর্ষধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানান। **জেনারেল অরোরাই প্রথম ভারতীয় পদস্থ অফিসার, যিনি বিমানে বাংলাদেশে গেলেন।**

পশ্চিম পাকিস্থানের লাহোর থেকে ১৫০ জন সশস্ত্র বাঙালী সৈন্য আজ চলে এসেছেন বাংলাদেশের রাজধানী মুজিবনগরে। এঁরা সকলেই এদিন মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছেন। মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক কর্ণেল ওসমানী এঁদের স্বাগত জানিয়েছেন।

ক্ষয়-ক্ষতির-ক্ষতিয়ান :

	পাকিস্থান	ভারত
বিমান	৭২	২৬
ট্যাংক্	১১৫	১৭
জলযান	১১	০
সাবমেরিন	১	০

ডিসেম্বর-৯

চাঁদপুর ও চুয়াডাঙ্গা মুক্ত। জওয়ানেরা কুষ্টিয়ার উপকণ্ঠে।

আজ সংসদে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবনরাম বলেন, রংপুর দিনাজপুর পতন আসন্ন। ভারতীয় বাহিনী নবোদ্যমে রংপুরের দিকে এগিয়ে চ'লেছে। আর দিনাজপুর শহরের দশ মাইল ভিতরে কাউঠানগর সেতুর উপর এখন তীব্র লড়াই চল্‌ছে।

মুক্তি সংগ্রাম ঢাকার দ্বার প্রান্তে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই এখন রাজধানীর অতি সন্নিকটে। চতুর্দ্দিক থেকে ভারতীয় সেনা বাহিনী এবং মুক্তি সেনারা ঢাকার দিকে এগোচ্ছেন। মাঝে কয়েকটি নদী, পদ্মা আর মেঘনার শাখা প্রশাখা। তার পরই ঢাকা। এবং ঢাকার লড়াই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত লড়াই।

এদিন পাকিস্থানের জলপথের শেষ ভরসারও হয়েছে ভরাডুবি। দক্ষিণ ও উত্তর বাংলাদেশে ভারতীয় বিমান বারে বারে ছোঁ মেরে নেমে এসে ডুবিয়ে দিয়েছে ছোট বড় শতাধিক শত্রুপোত—জাহাজ, ষ্টীমার, গানবোট আর মোটরবোট।

পশ্চিম রণাঙ্গণেও সলিল সমাধির পর সমাধি। করাচিতে বন্দরের পনেরো কিলোমিটার ভিতরে ভারতীয় নৌবাহিনীর দুঃসাহসিক আঘাতে চারটি শত্রু জাহাজ হয় নিমজ্জিত নয় ঘায়েল হ'য়েছে। উপকূল ভাগ বরাবর আমাদের নৌবহর আক্রমণ চালিয়ে যায়। পাক্ ইরান সীমান্তের কাছে 'জওয়ানী' ও 'সওদার' জাহাজকে আঘাত ক'রে দারুণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে।

ক্ষয়-ক্ষতির-খতিয়ান :—

	পাঃ	ভাঃ
বিমান—	৭০	৩১
ট্যাংক্—	১২৪	৪৯
রণতরী—	৩	০
গানবোট—	৯	০
সাবমেরিণ —	২	০

ডিসেম্বর-১০

ভারতীয় বিমানবাহিনীর রকেটের ঘায়ে ঢাকার পাক-বেতার কেন্দ্র স্তব্ধ।

হেলিকপটার ও ষ্টীমারে মেঘনা নদী পার হয়ে আমাদের বহু সৈন্য গতকাল বৃহস্পতিবার রাত্রেই ভৈরব বাজারের কাছে ঘাঁটি করেছে। সেখান থেকে সেনাবাহিনী সোজা ঢাকার দিকে এগোবে। পথে আর কোন বড় নদী নেই। ভৈরববাজার—ঢাকা সড়ক দিয়ে এগোলে আমাদের সেনাবাহিনী আগে কুরমিটোলা ক্যানটনমেন্টের কাছে গিয়ে পড়বে। তারপর খোদ ঢাকা শহর। ভৈরববাজার থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় ৩৫ মাইল আর ক্যানটনমেন্টের দূরত্ব ৩০ মাইলেরও কম।

আজ ভারতীয় নৌবাহিনী বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর চালনা মুক্ত করেছে। মুক্তিবাহিনী মিত্র

বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে নোয়াখালী জেলা শহরটি দখল করেছে। খুলনার পথে ভারতীয় বাহিনী চেঙ্গুটিয়া, হরি বাংকরা ও ডাঙ্গামারা দখল করে ফুলতলিতে পৌঁছে গেছে। এখান থেকে খুলনার দূরত্ব মাত্র ১৬ মাইল। রাত ১০টার খবরে প্রকাশ, খুলনা থেকে পাক বাহিনীর পালাবার পথ অবরুদ্ধ। আরও খবর আমাদের জওয়ানরা এখন কুষ্টিয়া শহর প্রবেশের মুখে।

এদিন ভারতীয় বাহিনী পাক ফৌজের হাত থেকে বহু এলাকা মুক্ত করে নিয়েছে। নোয়াখালী মুক্ত হওয়ার পর ভারতীয় বাহিনীর চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার আর কোন বাধা থাকল না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ ভারতীয় সেনা বাহিনীর অফিসারদের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে বলেছেন, "সমগ্র দেশ আপনাদের প্রশংসায় মুখর। সমগ্র জাতি আপনাদের পেছনে রয়েছে। লড়াই চালিয়ে যান। আমাদের জয় সুনিশ্চিত। জয় হিন্দ।"

ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান :—

	পাঃ	ভাঃ
বিমান—	৭৫	৩৩
ট্যাংক—	১৩১	৪৯
জলযান—	১৮	০
সাবমেরিন—	২	০

ডিসেম্বর—১১

কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহসহ ১২টি শহর মুক্ত। মেঘনার পূর্ব্বতীরে খানসেনা নিশ্চিহ্ন।

কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, জামালপুর, হিলি ও নোয়াখালি মুক্ত। রংপুর জেলার গাইবাঁধা, ফুলছাঁর, বাহাদুরিয়া, পিশাপাড়া, দুর্গাদিকি, বিগ্রাম ও চণ্ডীপুর স্বাধীন।

ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকিস্থানী সৈন্যরা আর কোথাও দাঁড়াতে পারছে না। সর্ব্বত্র বাধা পাওয়ায় মরিয়া হ'য়ে চেষ্টা চালিয়ে হয় পালাচ্ছে, আর না হয় আত্মসমর্পণ করছে। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও দু'শ গাড়ী পাওয়া গিয়েছে। আজ বিকেল পর্য্যন্ত প্রায় দু'হাজার পাক সৈন্যের আত্মসমর্পণের খবরও পাওয়া গেছে।

ভারতীয় জওয়ানরা ভৈরব বাজারের দক্ষিণে সড়ক পথ ধরে ঢাকার দিকে এগিয়ে চলেছেন। কুমিল্লাখণ্ডে মেঘনার পূর্ব্ব দিকে এদিন শত্রুবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হয়েছে। জওয়ানরা এখন খুলনা থেকে দশ মাইলের মধ্যে।

পাক বাহিনী পালাবার সময় পাবনা জেলায় ঈশ্বরদির কাছে হারডিনজ সেতু বা সারা ব্রীজ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। ১৯১৪ সালে তৈরী এক মাইলের বেশী দীর্ঘ এই সেতুটি বাংলা দেশে সবচেয়ে বড়। আর পৃথিবীতেও দীর্ঘতম সেতু।

ভারতীয় বিমানবাহিনী এদিন খুলনা অঞ্চলে মাঝারী ধরণের ৬টি জাহাজ ও সিরাজগঞ্জে ১০টি ষ্টীমার ও বজরা নষ্ট করে।

এদিনকার আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর—ঢাকার পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষ আগে থেকে কথা দিয়েও তিনটি বিমানকে (দুটি বৃটিশ ও একটি ক্যানাডীয়) ঢাকা বিমান বন্দরে নামতে দেয়নি। বিমানগুলি সেখান থেকে বৃটিশ নাগরিকদের আনতে গিয়েছিল। এই নির্লজ্জ ধাপ্পাবাজীদ্বারা পাকিস্থান দু'টি মতলব হাসিল করেছে। (১) ওই সব বৃটিশ নাগরিকদের জামিন হিসাবে জবরদস্তি আটক রেখেছে। (২) শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরদিন রবিবার সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ১৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ রানওয়ে মেরামত করে নিয়েছে। বিমানগুলি যাতে সেখানে নামতে পারে সেজন্য ভারত ঐ সময় আক্রমণ বন্ধ রেখেছিল।

এদিন স্থলবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক জেঃ মানেকশ বেতার মারফৎ বাংলাদেশে দখলদার পাক বাহিনীর সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে আবার হুঁশিয়ারী দিয়েছেন:

"খবরদার। পালাবার চেষ্টা করবেন না। যদি করেন, তাহলে যে পাঁচখানি বাণিজ্যিক জাহাজে পালাবার মতলব করছেন, উক্ত জাহাজগুলি তো ধ্বংস হবেই, সেই সঙ্গে আপনারাও প্রাণ হারাবেন।"

ক্ষয়-ক্ষতির খতিয়ান :—

	পাঃ	ভাঃ
বিমান—	৭৭	৩৭
ট্যাংক্—	১৪১	৫২
যুদ্ধ জাহাজ—	৩	০
গানবোট—	১৫	০
সাবমেরিন—	২	০

ডিসেম্বর-১২

ঢাকার লড়াই শুরু : শেষ পর্য্যায়ে মুক্তি-যুদ্ধ।

ঢাকা শহরের আশেপাশে ছত্রী সৈন্য নেমেছে। একটি বাহিনী নরসিংদি পৌঁছে গেছে, ময়মনসিংহ থেকে আসছে আর একটি।

ষ্টীমার ও হেলিকপটারে মেঘনা ও যমুনা নদী পার হ'য়ে ভারতীয় বাহিনী স্থলপথে ঢাকায় উপনীত জওয়ানদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে এক বিরাট সেনা বাহিনীর সৃষ্টি করেছে। **আজই—ঢাকা অপারেশন, রাজধানী ঢাকা দখলের শেষ পর্য্যায়ের মুক্তি-যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেল।**

পাক্-ফৌজ ও পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছিল, কিন্তু তাদের সব রকম চেষ্টা হ'য়ে গেল ব্যর্থ।

এদিন খুলনা, বগুড়া, চট্টগ্রামেও ভারতীয় বাহিনী আঘাতের পর আঘাত হেনেছে। পূর্ব্ব খণ্ডে এযাবৎ ৪ হাজার পাক-বাহিনীর অফিসার ও সৈন্য-আত্মসমর্পণ করেছে।

ভারতীয় নৌ-সেনার পূর্ব্বাঞ্চলীয় বাহিনীর সদর দফতর থেকে বলা হ'য়েছে, আজ সারাদিন ধরে এই বাহিনীর বিমানগুলির আক্রমণের ফলে শত্রুপক্ষের সৈন্যসমেত ছয়টি শত্রুপোত নিমজ্জিত হ'য়েছে।

ক্ষয়-ক্ষতির-খতিয়ান :—

	পাঃ	ভাঃ
বিমান—	৮০	৩৯
ট্যাংক্—	১৪৮	৫৪
রণতরী—	৩	০
ফ্রিগেট—	০	১
গানবোট—	১৬	০
সাবমেটরিন—	২	০

পি, টি, আই; ইউ, এম, আই।

ডিসেম্বর-১৩

আন্তর্জাতিক আসরের আজ জবর খবর : ভারত দরিয়ার দিকে মারকিন সপ্তম নৌ-বহর।

ঢাকায় জঙ্গী শাহীর বিশেষ বশংবদ, আস্থাভাজন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি, পুতুল গভরনরের সামরিক উপদেষ্টা—অথচ তিনিই এখন খান-সেনাদের হাতে স্বগৃহে বন্দী। গত সপ্তাহের শেষের দিকে ফরমান আলি রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেলের কাছে আর্তস্বরে জরুরী বার্ত্তা পাঠিয়েছিলেন :—

"বাঁচান, পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্যদের বাংলাদেশ থেকে পালাবার পথ করে দিন।" রেডিও পাকিস্থান থেকে অবশ্য আজ প্রচার করা হ'য়েছে, ফরমান আলি নাকি ব'লেছেন, তিনি কারও কাছেই আত্মসমর্পণের কোন প্রস্তাব দেন নি। এ সংবাদ ইউ, এন, আই-এর।

যুদ্ধ এখন ঢাকায়, দখলদারেরা ভারতীয় কামানের পাল্লার আওতায়। খান সেনারা তিন দিক থেকে বেষ্টিত হ'য়ে পড়ছে। তাদের স্বরচিত এবং স্বনির্বাচিত মৃত্যু ফাঁদ ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে আসছে।

আজ-লাকসাম ও কুমিল্লায় আরও এক হাজার একশ চৌত্রিশজন পাক-সৈন্য আত্ম-সমর্পণ করেছে, তাদের মধ্যে চৌদ্দজন অফিসার ও পঁচিশজন জে, সি, ও, আছেন।

জেনারেল মানেকশ আজ ঢাকাস্থ পাকিস্থানী সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল ফরমান আলির উদ্দেশ্যে এক বার্তায় বলেছেন :—"আমার সেনারা এখন

ঢাকা শহরকে ঘিরে ধরেছে। আর রক্তক্ষয় কেন? আত্মসমর্পণ করুন।"

ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিয়ান :—

	পাঃ	ভাঃ
বিমান—	৮০	৩৯
ট্যাংক—	১৬৩	৫৪
রণতরী—	৩	•
ফ্রিগেট—	•	১
সাবমেরিন—	২	•
গানবোট—	১৬	•

ডিসেম্বর-১৪

বগুড়া মুক্ত। চট্টগ্রাম ও ঢাকার গভর্ণরের প্রাসাদ জ্বলছে। ঢাকা দখলের প্রচণ্ড লড়াই। খান শাহীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মন্ত্রীসভাসহ ডঃ মালিকের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ। ইণ্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে পলায়ন।

ঢাকার শহরতলীতে প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াই চলেছে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় জওয়ানগণ তীব্র বেগে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। সব রণাঙ্গনেই ভারতের সাফল্য। পাকিস্থানের মতলব সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ক্ষয় ক্ষতির ক্ষতিয়ান :—

	পাঃ	ভাঃ
বিমান—	৮৩	৪১
ট্যাংক—	১৭৫	৬১

আর সব যথা পূর্ব্বম।

ডিসেম্বর-১৫

ঢাকায় নিরুপায় পশ্চিম পাকিস্থানী সেনানায়ক নিয়াজি এখন নতজানু। রণ-সাধ তার মিটেছে। তাই এখন তিনি চান যুদ্ধ বিরতি। তার এই আরজি ভারতের সেনানায়ক জেনারেল মানেকশ সমীপে পাঠিয়ে মিলেছে জেনারেলের উত্তর। তিনি বলেছেন: "যুদ্ধ বিরতি নয়, আত্ম-সমর্পণ করুণ। আমি আশা করি বাংলাদেশে আপনার আজ্ঞাবহ সৈনিকদের অবিলম্বে যুদ্ধ থামাতে বলবেন এবং আমার আগুয়ান সেনা-বাহিনীকে যেখানেই দেখা যাবে, সেখানেই তাঁদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবার হুকুম দেবেন।"

বিশ্বাসের প্রমাণ হিসাবে জেঃ মানকেশ জানিয়েছেন যে অবরুদ্ধ ঢাকার উপর আজ বিকাল পাঁচটা থেকে আগামী কাল সকাল নয়টা পর্য্যন্ত বিমান বাহিনীর আক্রমণ বন্ধ। তবে স্থলবাহিনী এবং মুক্তিফৌজ যথারীতি কাজ চালিয়ে যাবেন। জেঃ মানেকশর উত্তরও গিয়েছে মারকিন দূতাবাস মারফৎ। জেঃ নিয়াজির বার্ত্তায় সাক্ষী হিসাবে সই করেছেন পূর্ব্ববাংলার জঙ্গী শাহীর গভর্ণরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেঃ ফরমান আলি। এবং ধারণা, নিয়াজির ওই আরজিতে রয়েছে পাক-প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার গোপন সমর্থন।

ভারতীয় পদাতিক সৈন্যরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর কামান দেগে চলেছেন। ঢাকায় যে সমস্ত অসামরিক লোকজন বাড়ী ঘর ফেলে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, শত্রু সৈন্যরা অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার আশায় সেইসব পরিত্যক্ত বাড়ীঘরে ঢুকে ঘাঁটি গেড়েছে। একজন বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র বলেন—আমাদের সৈন্যবাহিনী সেই সমস্ত বাড়ীগুলিকে সামরিক লক্ষ্য বলেই গণ্য করছেন।

মারকিন সপ্তম নৌবহর বুধাবারই বঙ্গোপসাগরে এসে হাজির হ'য়েছে। এই বহরে আছে পরমাণু শক্তিচালিত বিমান বাহী জাহাজ—"এন্‌টারপ্রাইজ।" সঙ্গে এসেছে আরও সাতটি রণতরী। অপর দিকে কুড়িটি সোভিয়েট রণতরীও ভারত মহাসাগরে এসে জড়ো হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়তে পারে এমন জাহাজও এর ভেতরে আছে।

বাংলাদেশে পাক-বাহিনীর আত্ম সমর্পণের ব্যাপারে মতানৈক্য হেতু পশ্চিম পাক-পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো আজ নাটকীয়ভাবে সব কটি খসড়া প্রস্তাব

ড়ে ফেলে সদলবলে নিরাপত্তা পারিষদ থেকে বেরিয়ে ান। ভুট্টোর শেষ কথা :—"চললাম যুদ্ধ করতে।"

ক্ষয়-ক্ষতির-খতিয়ান :—

	পাঃ	ভাঃ
বিমান—	৮৬	৪২
ট্যাংক্—	১৮৬	৬৬
রণতরী—	৪	০
সাবমেরিন—	২	০
গানবোট—	১৬	০
ফ্রিগেট —	০	১
অন্যান্য যান—	১২	০

ইউ, এন, আই।

ডিসেম্বর-১৬

ঢাকার পতন—পাক বাহিনীর আত্ম-সমর্পণ।

সেই জেঃ নিয়াজি আজ মুক্ত ঢাকায় হাজার হাজার মানুষের আকাশ ফাটানো জয়বাংলা ধ্বনির মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করেছেন। কার্য্যত বাংলাদেশের দখলদার পাক্ বাহিনী আত্ম-সমর্পণ করে। আজ যখন ভারতীয় জেঃ জ্যাকব ঢাকায় পৌছান তখন দুপুর বেলা বারোটা। আনুষ্ঠানিক আত্ম-সমর্পণ হয়- ভারতীয় সময় বিকাল চারটা একত্রিশ মিনিটে। জেঃ অরোরার কাছে জেঃ নিয়াজি আত্ম অস্ত্র ও ফৌজ সমর্পণ করেন। জেঃ অরোরা যখন ঢাকায় বিরাট রেস্ কোরস্ মাঠে আত্ম-সমর্পণ অনুষ্ঠানে ফৌজী রীতি অনুসারে নিয়াজির কলার থেকে জেনারেলের ব্যাজ ছিঁড়ে ফেলেন, তখন গোটা রেস্‌কোর্স স্বাধীন বাংলা জয়ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে।

ঢাকা এখন স্বাধীন বাংলার স্বাধীন রাজধানী

—জয় বাংলা, জয়হিন্দ—

রামমোহন জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশ :

সম্প্রতি বাংলা দেশ হইতে উদ্বাস্তু-আগমন-জনিত সমস্যা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষকে গুরুতররূপে বিব্রত করিয়াছে। তৎসহ যুক্ত হইয়াছে প্রতিবেশী পাকিস্থান রাষ্ট্রের যুদ্ধের হুঙ্কার। এই পরিস্থিতির অন্যতম শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে এই যে অদূর ভবিষ্যতে জাতির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য রামমোহন জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উপর যথেষ্ট পরিমাণ মনোযোগ এ যাবৎ আমরা দিতে পারি নাই। অথচ আগামী ২২ মে, ১৯৭২ নব্যভারতের মানসপিতা রামমোহন রায়ের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ণ হইবে। এই সম্পর্কে আমরা দুঃখের সহিত ইহাও লক্ষ্য করিতেছি যে কিছু ব্যক্তি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ রামমোহনের জন্ম-দ্বিশত-বার্ষিক বৎসর কি না এই বিষয়ে অনাবশ্যক প্রশ্ন তুলিয়া জনচিত্তকে দ্বিধাগ্রস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রামমোহনের জন্ম বৎসর যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ এ বিষয়ে রামমোহনের দুই পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ও রমাপ্রসাদ রায়-এর পরোক্ষ সাক্ষ্য বর্তমান (দ্রষ্টব্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৬৯৭-৯৯ ; Collet, Life and Letters of Raja Rammohun Roy, 3rd edition p. In.)। রামমোহনের উভয় জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ ও কোলেট ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দকেই রামমোহনের জন্ম বৎসর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার জন্ম বৎসর এইরূপ একটি মতও প্রচলিত আছে বটে কিন্তু তাহার স্বপক্ষে কোনও বিশ্বাসযোগ্য সমসাময়িক প্রমাণ নাই। ইহার সমর্থকগণ দুইটি যুক্তি প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন : প্রথমতঃ রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু জন্ ডিগ্‌বী ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত রামমোহনের Kena Upanishad ও Abridgment of the Vedant নামক পুস্তকদ্বয়ের সংস্করণে যে ভূমিকা সংযোজিত করেন তাহাতে না কি তিনি বলিয়াছিলেন রামমোহনের জন্মসাল ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধিতে যে স্মৃতিফলক আছে তাহাতে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ডিগ্‌বী যদি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত উক্তি করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দকে রামমোহনের জন্মকাল মানিয়া লইবার পক্ষে উহা শক্তিশালী যুক্তি হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ডিগ্‌বীর উল্লিখিত ভূমিকা পড়িয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে সেখানে তিনি রামমোহনের জন্মবৎসরের কোনও উল্লেখই করেন নাই। তিনি মাত্র বলিতেছেন; (১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে) রামমোহনের বয়স আনুমানিক তেতাল্লিশ বৎসর (about forty-three years of age)। ইহা হইতে পশ্চাদ্‌গণনাপূর্বক কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন রামমোহন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মূল্য কি? ডিগ্‌বী রামমোহনকে দেখিয়া নিছক অনুমানের ভিত্তিতে তাঁহার বয়স সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন—সুনিশ্চিত ভাবে কিছুই বলেন নাই। জন্মসাল জানা থাকিলে তাহা তিনি সুস্পষ্ট উল্লেখ করিতেন অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না। বয়স সম্পর্কে আনুমানিক সিদ্ধান্ত প্রায়শঃ নির্ভুল হয় না। বিশেষতঃ কোনও বিদেশীর পক্ষে এ-দেশীয় কাহারও বয়স যথার্থ অনুমান করা তো আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। সিপাহী-বিদ্রোহের অন্তে যখন মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ দিল্লীতে বন্দীদশায় ছিলেন তখন যে ইংরেজগণ তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহার বয়স অনুমান করিয়াছেন সত্তর, কেহ কেহ নব্বই। সুতরাং

ডিগ্‌বীর অনুমান-প্রসূত উক্তি হইতে তাঁহার জন্মসাল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অবিবেচিত কার্য হইবে। ইংলণ্ডে স্মৃতিফলকে উল্লিখিত তারিখেরই বা প্রামাণিকতা কোথায়? ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও সহকর্মী দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রিস্টলে রামমোহন-সমাধি সংস্কার করাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ স্মৃতি ফলক তিনি উৎকীর্ণ করান নাই। রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ ও দ্বারকানাথের মৃত্যুর প্রায় ত্রিরিশ বৎসর পরে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে উহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল—কে ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা বর্তমানে জানিবার উপায় নাই। দ্বারকানাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ তারিখ মানিয়া লইবার বাধা থাকিত না। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে কৃত অর্বাচীন উল্লেখকে রামমোহনের পরিবারে প্রচলিত তাঁহার পুত্রগণ কর্তৃক সমর্থিত জন্মবৎসরের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা চলে কি? এই অর্বাচীন উল্লেখ ব্যতীত অপর কোনও সমসাময়িক সরকারী বা বেসরকারী দলিলে কুত্রাপি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দকে রামমোহনের জন্মসাল বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই বিতর্কে এমন অনেকে যোগ দিয়াছেন—যাঁহারা কস্মিনকালেও গবেষক নহেন; ইঁহারা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের স্বপক্ষে একটি অতিরিক্ত প্রমাণও উপস্থিত করিতে পারেন নাই; জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভুল বা বিকৃত তথ্য পরিবেশন করিতেও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দ্বিধা করেন নাই। জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে না করিয়া ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে করা হউক ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য। কিন্তু কেন? ভিত্তিহীন অনুমান ও যুক্তিহীন সিদ্ধান্তের বলে অবশ্য করণীয় পুণ্য কার্যকে অনাবশ্যক স্থগিত রাখিলে কাহার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? এই তথাকথিত গবেষকগণের চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিবার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে জাতীয় জীবনে বর্তমানে যে সংকট উপস্থিত হইয়াছে—সেই মুহূর্তেই রামমোহনকে স্মরণ করিবার আরও বেশী প্রয়োজন আছে। মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা। যুগপ্রবর্তক এই মহামনীষীর জন্মদ্বিশতবার্ষিকী উপযুক্তভাবে পালন জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর পবিত্র কর্তব্য। সেই কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যেন আমরা অযথা বিলম্ব না করি।

কম্যুনিষ্ট অর্থে কি বুঝিতে হয়?

অধীররঞ্জন দে বামপন্থী লেখক বলিয়া মনে হয়। তিনি যুগজ্যোতি পত্রিকায় যাহা লেখেন তাহা হইতে তাঁহাকে বামপন্থী বলিতেই হয়। তিনি কিছুকাল পূর্বে ঐ পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে অল্প কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে:

তরুণ বয়সে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিনের লেখা পড়িয়া কমিউনিজমের যে অর্থ বুঝিয়াছিলাম—পরিণত বয়সে কমিউনিষ্ট বলিয়া ঘোষিত রাষ্ট্রগুলির হালচাল দেখিয়া সে অর্থ ভুল বুঝিয়াছিলাম বলিয়া বুঝিতেছি। সোভিয়েট রাশিয়ার গণতান্ত্রিক ইজরাইলের বিরুদ্ধে মোল্লা তন্ত্রীদের সাহায্য, চীনা কম্যুনিষ্টদের প্রকাশ্যে নিরস্ত্র স্বদেশীয় জনতাকে হত্যা করিতে একজন ফ্যাসিষ্ট মোল্লা ডিকটেটারকে দেদার মদত দিতে দেখিয়া মনে হইতেছে—ইহাই যদি মার্কসবাদ হয় তবে এই "বাদ"কে আমাদের দেশ হইতে ঝাঁটাইয়া বাদ দেওয়াই উচিত হইবে।

চীনে কী ঘটিয়াছে

চীনদেশে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অনেক কিছু ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। অনেকে বলেন যে চীনের কয়েকজন উচ্চ পদস্থ সামরিক ব্যক্তি একটা "কু দে'তা" বা অভ্যন্তরীন বিপ্লব চেষ্টা করিয়া মাও সে তুঙকে সরাইয়া অপর কাহাকেও তাহার আসনে বসাইবার চেষ্টা করেন ও সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বহু সামরিক কর্মচারীর চাকুরী বা প্রাণ গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন এই সকল লোকের সহিত লিন্‌পিয়াও জড়িত ছিলেন এবং সে কারণে তিনিও নিজ পদ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। "যুগবাণী" পত্রিকাতে বলা হইয়াছে:

চীনের ভিতরে পরিবর্তনের কোন ধারা এখন চলছে তা ঠিক বলা যায় না, কারণ সে দেশ থেকে খবর সহজে ও সঠিকভাবে বেরোয় না। তবু গোপনীয়তার হাজার

ব্যবস্থার ভিতর দিয়েও যেসব খবর আসে তা নিয়ে গবেষকরা গবেষণা করে চলেন। কিছুকাল আগে মনে হয়েছিল মাও সে তুঙ আর নেই; তারপর জানা গেল যে মাও সুস্থভাবে বর্তমান, কিন্তু লিন পিয়াওয়ের গতিবিধি রহস্যাবৃত। লিন কি মারা গিয়াছেন? তিনি কি ক্ষমতাচ্যুত বা গুরুতর অসুস্থ? জল্পনা যখন এই নিয়ে চলেছে তখন "চায়না পিক্টোরিয়াল" নামক একটি মাসিক পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় মাওসহ লিন পিয়াওয়ের ছবি বেরিয়েছে, যার তলায় লেখা যে মাওয়ের কমরেড ইন্ আর্মস লিন মাওয়ের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। ঐ পত্রিকার ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাও রেড গার্ড চিহ্ন ধারণ করে আছেন, পাশেই দাঁড়িয়ে লিন পিয়াও, চৌ এন লাই, মাওপত্নী চিয়াং চিং ও কাঙ শেঙ। এই ছবির তাৎপর্য কি? বোঝা যাচ্ছে যে মাও নিজেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হোতা—আর ছবিতে উপস্থিত নেতৃবর্গ তাঁর আস্থাভাজন। কিছুকাল থেকে শোনা যাচ্ছিল যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় উগ্রতার বাড়াবাড়ি দেখানোয় চিয়াং চিং ও কাং শেঙ মাওয়ের অপ্রীতিভাজন হয়েছেন—ক্ষমতার আসন থেকে তাঁরা বিতাড়িত হবেন। "চায়না পিক্টোরিয়াল" তাই প্রমাণ করতে চাইছে যে আসল ব্যাপার তা নয়—উক্ত নেতারা মাওয়ের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হননি।

ঐ পত্রিকায় চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্যদের ছবিও আছে। পলিটব্যুরো হচ্ছে চীনা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিরও পরিচালকমণ্ডলী। ছবিতে সব সদস্যকেই দেখা যাচ্ছে, কেবল দুজন অনুপস্থিত—চেন পো তা ও লি সুয়ে ফেং। অথচ সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারাল হুয়াং ইয়ুং-সেঙ এবং বিমানবাহিনীর কমাণ্ডার উফা সিয়েনকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে। এঁরা নাকি নিজ নিজ পদ থেকে বিতাড়িত, এমনকি মৃত বলেও শোনা যাচ্ছিল। "চায়না পিক্টোরিয়াল" জানাতে চায় যে সে গুজব সত্য নয়।

পত্রিকাটিতে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসব পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে সেটা কিন্তু চীনের প্রধান তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রে ১লা জুলাইয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পুনমুদ্র'ণ। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে ১লা জুলাইয়ের প্রবন্ধের অবিকল পুনমুদ্র'ণ করা হয়নি—বেশ কিছু লাইন বাদ গিয়েছে। নতুন লাইন বসানো হয়েছে। এবং তাতে এটাই বোঝা যায় যে ১লা জুলাইয়ের বক্তব্য থেকে চীনা নেতৃত্বের বক্তব্য এখন আলাদা হয়ে গিয়েছে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়েও এই মত পরিবর্তনের ইঙ্গিত ঐ পরিবর্তিত আকারে পুনর্মুদ্রিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে নেই।

কাছাড় কি আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে?

করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" লিখিতেছেন:

কাছাড় জেলাকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে একটি সংবাদ ইদানিং কাছাড়ের রাজনৈতিক মহলে বেশ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হওয়ার পর এই সংবাদটি অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। শিলচর থেকে পাওয়া খবরে জানা যায় যে, জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নাকি তাঁর স্থানীয় অনুগামীদের জানিয়েছেন যে কাছাড় শীঘ্রই একটি ইউনিয়ন টেরিটরীতে পরিণত হচ্ছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাছাড়কে কেন্দ্রীয় শাসনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোনও কোনও মহল থেকে কিছু দিন ধরে দাবী জানানো হচ্ছে। আবার কাছাড়ের জনপ্রতিনিধিদের একটি দল সম্প্রতি দিল্লী গিয়ে এই দাবীর বিপক্ষে তাঁদের বক্তব্য রেখে এসেছেন। এই মহল মনে করেন যে কাছাড়কে কেন্দ্রীয় শাসনে নিয়ে যাওয়ার বর্তমান সংবাদ একটি গুজব মাত্র, সাধারণ নির্বাচনের আগে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রভাব যাতে জেলার কংগ্রেস কর্মীদের উপর কার্য্যকরী না হয়, সেজন্য এই গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তারা মনে করেন যে সম্প্রতি

পূর্বাঞ্চল কাউন্সিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হচ্ছে, এই সংবাদ সত্য হলে তাতে কাছাড়ের স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ও উল্লেখ করা হত। তাছাড়া আসামকে আরো খণ্ডিত করতে হলে সংবিধান সংশোধন করাও প্রয়োজন হবে।

ইসরায়েলের সাহায্য দিবার আগ্রহ

জেরুসালেম পোষ্ট পত্রিকায় প্রকাশ যে বাংলা দেশের শিশু ও বালক বালিকাদিগের সাহায্যার্থে যে সংঘ গঠিত হইয়াছে সেই সংঘ ২০০০ ইসরায়েল পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন ও সেই অর্থ বাংলা দেশের অল্প বয়স্কদিগের সাহায্যের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্থানে পাঠান হইবে। একটা চাঁদা তুলিবার নিলামে ৫০টি শিল্প বস্তু বিক্রয় করা হয়।

লিম গ্যালারীতে যে প্রদর্শনী খোলা হয় তাহাতে স্থানীয় শিল্পীদিগের শিল্পকার্য্য প্রদর্শিত হয়। জেরুসালেমে আর একটি প্রদর্শনী শীঘ্রই উদ্‌ঘাটিত হইবে।

একজন বক্তা সংঘের তরফ হইতে বলেন যে ঐ সংঘ কর্তৃক ২৫০০০ জনের একবার খাইবার মত প্রোটিন সার খাদ্য পূর্ব্ব বাংলায় প্রেরিত হইবে। উহা বিমান যোগে চালান করা হইবে যাহাতে অল্প বয়স্কগণ উহা শীঘ্র শীঘ্র পাইয়া যান। তাঁহারা ঐ খাদ্য আরও দশ লক্ষ মাত্রা টাকা সংগ্রহ হইলেই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

ঐ সংঘ আরও ১০০০০০ মাত্রা ভিটামিন এ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন যাহাতে যে সকল অল্প বয়স্ক গণ ভিটামিন এ না খাইবার ফলে অসুস্থ আছে তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইতে পারে।

শুশুনিয়ার গিরিলিপি কোন নৃপতির ?

শাশ্বত ভারত মাসিক পত্রিকাতে শ্রী সুখময় সরকার লিখিয়াছেন :

১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাস। "বারুণী" উপলক্ষ্যে 'শুশুনিয়া ধারায়' স্নান করতে এবং মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। শুশুনিয়ার গিরিলিপির কথা আগেই পড়েছিলাম। দেখতে কৌতুহল হ'ল। কিন্তু সঙ্গী পেলাম না। শুনলাম শুশুনিয়া ধারার বিপরীত দিকে (উত্তরে) পাহাড়ের অনেকটা ওপরে শিলালিপি। একাই এগিয়ে গেলাম সে দিকে। দুটি সাঁওতাল কিশোর গোরু-ছাগল-ভেড়া চরাচ্ছিল। তাদের অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে যেতে। আট আনা পয়সা বখশিস দিলাম অগ্রিম। একজন বললে "চাঁদ-বঙ্গা দেখতে যাবি? চল্।" চাঁদ-বঙ্গা! শুনে প্রথমটা ঘাবড়ে গেলাম। কী বলতে চাইছে এরা? কোথায় নিয়ে যাবে? হঠাৎ মনে পড়ল, আচার্য যোগেশ বিদ্যানিধি মশায়ের মুখে শুনেছিলাম, শুশুনিয়ার গিরিলিপির সঙ্গে একটী চক্র খোদিত আছে। তাহলে এই সাঁওতাল কিশোর দু'টি সেই চক্রটিকেই চাঁদ-বঙ্গা অর্থাৎ চন্দ্র দেবতা বলছে। শুনেছি, সাঁওতালেরা চাঁদবঙ্গাকেই পরম দেবতা পরব্রহ্ম মনে করে। অথবা গিরিলিপিটি যেহেতু রাজা চন্দ্রবর্ম্মার, সেই চন্দ্রবর্ম্মাই শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে এই আদিবাসীদের মুখে 'চাঁদবঙ্গা' হয়ে গেছেন? যাইহোক, একজন গোরু-ছাগল চরাতে লাগল, আর একজন চলল আমার সঙ্গে। বেশ খাড়াই পাহাড়, পাথরগুলো আলগা-আলগা, পড়ে যাওয়ার ভয়। কাঁটা গুল্মে রাস্তা আরও দুর্গম। সাঁওতাল ছেলেটি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে লাগল। আমি অতি কষ্টে তার অনুসরণ করতে করতে পৌঁছালাম প্রায় ১০০ ফুট উপরে। একটা ছোট ঝরণার কাছে। সাঁওতাল কিশোর বললে, "এই দেখ্—এইটা যমধারা। আর ঐ দেখ্—চাঁদবঙ্গা।" ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য ঝরণা 'যমধারা'র পাশে দেখলাম, গুহা গাত্রে একটি গিরিলিপি। পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড পাথরকে সমতল করে তাতে উৎকীর্ণ হয়েছে লিপিটি। লিপির সঙ্গে উৎকীর্ণ একটি চক্র। চক্রটি বিচিত্র। ব্যাস প্রায় ২ফুট। 'নেমি' আলিম্পনের ন্যায় চিত্রিত। 'অর' পঞ্চাশটি। 'নাভি' থেকে একটি অগ্নিশিখা চিত্রিত হয়েছে। এ রকম চক্র তো আর কোথাও দেখা যায় না। অশোক স্তম্ভে, বৌদ্ধ বিহারে কিংবা বুদ্ধমূর্ত্তির নীচে যে চক্র দেখা যায়, তার সঙ্গে এই চক্রের মিল নেই। লিপিটির দু ছত্র চক্রের নীচে এবং এক ছত্র ডান পাশে। এ লিপির পাঠোদ্ধার আমার

সাধ্য ছিল না; রাজা চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি—এইটুকুই তখন জানা ছিল।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে (প্রথম পর্ব্ব—১১পৃষ্ঠা) লিখেছেন, "বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ সংস্কৃতে রচিত মহারাজ সিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার লিপি... শুপ্তযুগের প্রাচীনতম অক্ষরে উৎকীর্ণ। সুতরাং ইহা চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লেখা হইয়াছিল। লিপিটির শুদ্ধ পাঠ এই:—

পুষ্করণাধিপতেম্মহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ
চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ।

[পুষ্করণার অধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মার কৃতি, চক্রস্বামীর (অর্থাৎ বিষ্ণুর) দাসশ্রেষ্ঠের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।]

লিপিটি যে চতুর্থ শতকে উৎকীর্ণ, এর স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। দিল্লীর নিকটে চতুর্থ শতকে রাজা চন্দ্রের লৌহস্তম্ভে যে লিপি ক্ষোদিত আছে, তার সঙ্গে শুশুনিয়া গিরিলিপির অবিকল সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার এলাহাবাদে কবি হরিষেণ কৃত 'প্রশস্তি'তে ঐ একই লিপির ব্যবহার দেখা যায়। কবি হরিষেণ ছিলেন সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি—সুতরাং তিনিও খ্রীঃ ৩য়-৪র্থ শতকে জীবিত ছিলেন।

লিপির কথা এখন থাক। গিরিলিপির বিষয়বস্তুতে আসা যাক। মহারাজ সিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা উৎকীর্ণ করেছিলেন এই লিপি। তিনি ছিলেন পুষ্করণার অধিপতি। চক্রস্বামীর দাসগণের প্রধানরূপে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কে এই মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা? কোথায় ছিল তাঁর পুষ্করণা রাজ্য? চক্রস্বামী কোন্ দেবতা?

ভারত-ইতিহাসে এক চন্দ্রবর্ম্মার কথা আছে—সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল; সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপ্তের হাতে তিনি নিহত হ'ন। এলাহাবাদ 'প্রশস্তি' থেকে জানা যায়, আর্য্যাবর্তের যে সকল রাজাকে পরাস্ত করে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত 'রাজোচ্ছেত্তা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন—মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই চন্দ্রবর্ম্মাকে রাজস্থানের পুষ্কর রাজ্যের অধিপতি বলেছেন। কিন্তু তিনি কেন বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে লিপি উৎকীর্ণ করতে এসেছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় তার সন্তোষ-জনক কারণ দেখাতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে পুষ্করণা শুশুনিয়া থেকে বেশী দূরে নয়। শুশুনিয়া থেকে মাত্র ২৫ মাইল পূর্বে দামোদর নদের তীরে (বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী থানায়) একটি প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে—এর বর্তমান নাম পোখন্না। পশ্চিম রাঢ়ে আন্ত 'ও' বর্ণকে 'অ'-বর্ণরূপে উচ্চারণের প্রবণতা-হেতু স্থানীয় লোকেরা 'পখন্না' বলে। পুষ্করণা > পোখরণা > পোখন্না। এই বিবর্তন ভাষাতত্ত্ব-সম্মত মনে হয়, 'নগর' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ "না"। যেমন,—কালীনগর > কালনা; রায়নগর > রায়না; বিক্রম নগর > বিকনা, ইত্যাদি। আদৌ নামটি ছিল 'পুষ্কর নগর'। এখনকার পোখন্না গ্রামই ছিল দেড় হাজার বছর আগে রাজা চন্দ্রবর্ম্মার রাজধানী পুষ্করনগর। গ্রামটির পশ্চিমপ্রান্তে এখনও একটা উঁচু ঢিপিকে বলা হয় 'রাজগড়'। এখানে ছড়িয়ে আছে পুরাণো ইটের টুকরো, পোড়ামাটির অলঙ্করণ এবং বহু পুরাকৃতি চিহ্ন? সরকারী তত্ত্বাবধানে পোখন্নার 'রাজগড়' খনন করা হলে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হতে পারে।

সাময়িকী

মুক্তিযোদ্ধাদিগের আত্মবলিদান ও বীরত্বের কাহিনী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসের অপরাপর স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার মত প্রথমে শুধু একটা আন্দোলন ছিল। যুদ্ধ করা অথবা রক্তপাত করিয়া বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিবার কথা প্রথমে উঠে নাই। পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণ পূর্ব্ববাংলার মানুষকে যে ভাবে শোষণ করিতেছিল ও যেভাবে তাহাদের সাহায্য বা উন্নতির জন্য কোন কিছুই করিত না, তাহা দেখিয়া বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রেহমান বহুকাল হইতেই সামরিক শাসকদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছিলেন। এই কারণে তাঁহাকে একবার একটা ষড়যন্ত্রের মামলাতেও জড়িত করা হয়, যদিও তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কিছুই প্রমাণ করিতে সামরিক শাসকগণ সক্ষম হয় নাই। যখন পূর্ব্ব বাংলা ঝড় তুফানে বিদ্ধস্ত হইয়া বিশেষভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া বিশ্বের নিকট হাত পাতিতে বাধ্য হয় ও যখন বহু জাতি অর্থ সাহায্য করিয়া পূর্ব্ববাংলার মানুষকে বাঁচাইবার চেষ্টা করে তখনও সামরিক শাসকগোষ্ঠী সেই মহাপ্লাবনের পরে প্রায় দশদিন কাল পূর্ব্ববাংলায় কোন সাহায্য পাঠাইবার চেষ্টাও করে নাই। বাহির হইতে যে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য আসিয়াছিল সামরিক কর্ত্তাগণ তাহা নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এই সকল নিষ্ঠুর সহানুভূতিহীনতা দেখিয়া শেখ মুজিবুর রেহমান সামরিক শাসন পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শনকে দেশব্যাপী রূপ দান করিলেন।

সেই সময় হইতেই শেখ মুজিবুর রেহমান মুক্তি যোদ্ধা দল গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কেননা তিনি বুঝিলেন নির্ম্মম সামরিক গোষ্ঠীর স্বৈরাচারী শাসকগণ তাঁহার আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিলেই সেই আন্দোলন দমন করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে না। তখন পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবার ইচ্ছা কাহারও থাকিবে না বলিয়াই কিছুটা দলবদ্ধভাবের সংগঠন রাখা সুবিধাজনক হইবে মনে করিয়াই মুজিবুর রেহমান দূরদর্শিতা দেখাইয়া মুক্তিযোদ্ধা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন।

সরকারী কেন্দ্র হইতে দূরে মুক্তি যোদ্ধাগণ নিজেদের শিবির স্থাপন করিলেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্র হইতে দূরে থাকিলে তাহাদের উপর সরকারের নজর পড়িবে না এই ভাবিয়াই তাহারা দূরে অরণ্য অঞ্চলে থাকিবার আয়োজন করিলেন। ভাওয়ালের জঙ্গলে, সুন্দরবনের গভীরে তাহারা ঘাঁটি বাঁধিয়া নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। তাহারা অস্ত্র সংগ্রহও করিয়াছিল এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধও করিতে পারিত, কিন্তু পাকিস্থান সমরশক্তি যতদিন তাহাদের উপর নির্ম্মমভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই ততদিন তাহারাও সরকারী কাহারও উপর কোন প্রকার আক্রমণ করে নাই। যখন ২৫ শে মার্চ্চ পাকবাহিনী পূর্ণ শক্তিতে বাংলাদেশের মানুষের উপর গণহত্যাকর্ম আক্রমণ আরম্ভ করে এবং শিক্ষিত মানুষ বাছিয়া বাছিয়া হত্যা করিতে লাগিল তখন মুক্তিযোদ্ধাদিগের কর্ত্তব্য তাহাদের নিকট আর অজানা রহিল না। হত্যা হইতে ও জঘণ্য আক্রমণ হইতে লাগিল স্ত্রীলোকদিগের উপর। মুক্তিযোদ্ধাগণ দীর্ঘ কয়েকমাস ধরিয়া সুবিধা পাইলেই পাকবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইতেন ও যাহাতে আরও জোরাল অস্ত্র সংগ্রহ করা যায় তাহার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যখন ভারত সীমান্ত অঞ্চলে আসিয়া পাকবাহিনীর সৈন্যদিগের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিলেন তখনই শুধু তাহাদের সহিত বহির্জগতের বন্ধুদিগের সংযোগ স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল। ভারতের

বন্ধু, ইংলণ্ডের বন্ধু আরও কত কেহ টাকা ও অস্ত্র দিয়া মুক্তি যোদ্ধাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এমন কি বিদেশে তাঁহাদিগের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিতে লাগিল। শুনা যায় তাঁহাদের জন্য তোপ, মেশিন গান, বিমান প্রভৃতিও ক্রয় করা হইতেছিল। পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণ কিন্তু কল্পনাশক্তিহীনতার জন্য ধরিয়া লইয়া ছিলেন যে মুক্তি বাহিনী যদি তোপ ব্যবহার করে তাহা হইলে সে তোপ ভারত সরকার দিয়াছে। এই ভাবিয়া পাকিস্থানী সৈন্যগণ মুক্তিবাহিনীর নিকট শক্তিশালী অস্ত্র আসিতেছে দেখিয়া ভারতীয় সেনার উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। ইহার ফলে শেষ অবধি যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে বাংলা দেশ পাকিস্থানের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। মুক্তিবাহিনী এই যুদ্ধে একটা মহামূল্যবান কার্য্য করিয়া পাকিস্থানের পরাজয় সহজ করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ দেশের পথঘাট এতই উত্তম রূপে জানেন যে তাঁহারা সকল সময়েই পাকিস্থানী বাহিনীর বিরুদ্ধের অভিযানগুলিকে যথাশীঘ্র অল্প সময়ে ও অল্প কষ্টে লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সাহায্য না পাইলে মাত্র চৌদ্দ দিনে নানা স্থানে সুরক্ষিত ঘাঁটিতে অবস্থিত পাক সৈন্যগণকে পরাজিত করা কখনও সম্ভব হইত না। এই জন্যই আমরা বলি যে বিজয় গৌরবের একটা বৃহৎ অংশ মুক্তিবাহিনীর প্রাপ্য।

ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধের ইতিবৃত্ত

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্থান কোন যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া গুপ্ত ঘাতকের ঘৃণ্য পন্থা অনুসরণে হঠাৎ অনেক গুলি ভারতীয় বিমান বন্দরের উপর প্রায় একই সময় বোমা বর্ষন করে। এই স্থানগুলি ছিল অমৃতসর, শ্রীনগর, পাঠান কোট, অবন্তিপুর, ফরিদকোট, উত্তরলাই আগ্রা ও আম্বালা। এই সময় তিনটি পাকিস্থানী বিমান ভূপাতিত করা হয়। ঐদিন ঐ ঘটনার পরে ভারতীয় সৈন্যগণ আখাউড়া ঘাঁটি (আগরতলার নিকটে) আক্রমন করে।

৪ঠা ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মুক্তিফৌজের সহিত সহযোগে বাংলাদেশে বহু স্থানের উপর আক্রমন করে। ভারতীয় বিমান বাহিনী বাংলাদেশে ঢাকা ও যশোহরে এবং পশ্চিম পাকিস্থানে চান্দেরি, শেরকাট, সারগোদা, মুরিদ, মিয়ানওয়ালি, মুসরুর, রিস্থিওয়ালা ও চাঙ্গামাঙ্গা বিমান কেন্দ্র বোমার আক্রমনে বিদ্ধস্ত করে। জেনারেল অরোরা বাংলাদেশে কেহ বাহির হইতে প্রবেশ করিতে অথবা বাংলাদেশ হইতে বাহিরে যাইতে পারিবেন না নির্দ্দেশ জারি করেন।

৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় নৌবাহিনী করাচির নিকটে দুইটি পাকিস্থানী ডেষ্ট্রয়ার জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। বঙ্গোপসাগরে একটি পাকিস্থানী ডুবো জাহাজ ধ্বংস করে। ভারতীয় সৈন্যগণ আখাউরা দখল করে। আমেরিকার প্রস্তাবিত যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব ইউ এন ও তে রুশিয়া ভিটো করেন। সোভিয়েট আরও বলেন যে বৃহৎ বৃহৎ শক্তিগুলি যেন এই যুদ্ধে জড়িত না হ'ন।

৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে ভারত স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ইসলামবাদ ভারতের সহিত সকল রাষ্ট্র সম্বন্ধে ছেদন করে। আমেরিকা ভারতকে সকল প্রকার সাহায্যদান বন্ধ করে।

৭ই ডিসেম্বর যশোহর ও সিলেট দখল করা হয় ও ঢাকার উপর ভারতীয় সেনাগণ দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে।

৮ই ডিসেম্বর কুমিল্লার পতন হয়। ঢাকার উপর আক্রমন একাধিক দিক হইতে চালিত হয়।

৯ই ডিসেম্বর চাঁদপুর ও ভৈরব বাজার দখল করা হয়। পাকিস্থানী ডুবো জাহাজ 'গাজী" জলমগ্ন করা হয়।

১০ই ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যগণ মেঘনা পার হইয়া ঢাকার দিকে আগুয়ান হ'ন এবং ঢাকার পতন অনিবার্য্য বলিয়া দেখা যায়। ছাম্ব অঞ্চলে পাকসৈন্যের আক্রমন ব্যর্থ করা হয়। পিকিং রেডিও ভারতকে লজ্জাকর ভাবে পরাজিত হওয়ার ভয় দেখায়।

১১ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে ময়মনসিংহ ও কুষ্টিয়ার পতন হয়। ছাম্ব অঞ্চলে পাকিস্থানী সৈন্যগণকে

মুন্নাওয়ার টাওয়ারের পশ্চিম তীরে পলায়ন করিতে বাধ্য করা হয়।

১২ই ডিসেম্বর ভারতীয় সৈন্যগণ প্যারাসুট যোগে ঢাকার নিকটে অবতরণ করে।

১৩ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল দখল হইয়াছে। ঢাকা হইতে যাওয়া আসার সকল পথ বন্ধ হইয়াছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন সেই দেশের সপ্তম নৌবহরকে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে ভারত মহাসাগরে যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তিব্বতে চীনা সৈন্যদিগের মধ্যে গতিবিধি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

১৪ ডিসেম্বর পূর্ব্বপাকিস্থানের রাজ্যপাল, এ, এম, মালিক কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া রেডক্রসের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতীয় সৈন্যগণ ঢাকা হইতে ৬।৭ মাইলের মধ্যে আসিয়া যায়। একজন পাকিস্থানী ব্রিগেডিয়ার আর্তসমর্পণ করে। চট্টগ্রাম বন্দর জ্বলিতে থাকে।

১৫ডিসেম্বর দেখা যায় লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল নিয়াজি যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করিয়াছেন। জেনারেল মানেকশ তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়াছেন ভারতীয় সৈন্যদল ঢাকার ঠিক বাহিরে উপস্থিত রহিয়াছে। আমেরিকার সপ্তম নৌবহরের আশেপাশে কুড়িটি সোভিয়েট যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া ঘোরা ফেরা করিতেছে।

১৬।১৭ই ডিসেম্বর অতঃপর বাংলাদেশে সকল পাকসৈন্য আত্মসমর্পণ করে ও পশ্চিম পাকিস্থানেও যুদ্ধ বিরতি হয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া অল্প স্ত্রীলোকেরই নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হয়। ইহার কারণ এই যে শিল্পকলা সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজ সেবা ধর্ম্ম ইত্যাদিতে মানুষের প্রতিষ্ঠা শুধু নিজগুণের উপরেই হয়। বহু সংখ্যক সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ সম্ভব হয় না। এই কারণে নারীদিগের পক্ষে কোন দেশের রাষ্ট্রনেত্রী হইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করা ততটা সহজ নহে। কিন্তু মানব চরিত্রের বৈচিত্র এমনই যে কোন সাধারণ রীতি অনুসরণ করিয়া মানুষ নিজ প্রতিভা প্রদর্শন করে না। হঠাৎ হঠাৎ কোন পথে কেমন করিয়া কে যে অনন্য সাধারণ ক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করিবে তাহার কোন স্থির নিশ্চয় রীতি বা পদ্ধতি নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেদিন শ্রীমোরারজি দেশাইকে সহজ হস্তে শাসন কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া নিজের উপর সকল রাষ্ট্র কার্য্যের দায়িত্ব তুলিয়া লইয়াছিলেন ও তৎপরে যখন দেশব্যাপী নির্ব্বাচনে অভাবনীয়রূপে জয়লাভ করিয়াছিলেন তখন হইতে ক্রমে ক্রমে দেশবাসী বুঝিতে লাগিলেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ় সংকল্প, সংকটে বিপদে অবিচলিত, ন্যায়বুদ্ধিতে নির্ভুল বিচারক্ষম এবং অগ্রগমনে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া স্থিরপদক্ষেপে চলিতে সুকৌশলী। তাঁহার মধ্যে দেশবাসী সেই সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাইলেন যে গুণাবলী না থাকিলে নেতৃত্ব জাতিকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় না। তাই যখন পাকিস্থানীগণ পাশবিকতাকে প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া বাংলাদেশের এক কোটি নরনারী শিশুকে বিতাড়িত করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিল; লক্ষ লক্ষ নির্দ্দোষ মানুষকে হত্যা করিল এবং ৫০০০০ হাজার নারীর চরম অপমান ঘটাইল তখন ইন্দিরা গান্ধী যে ভাবে সজাগ সদা প্রস্তুত থাকিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন তাহা দেশবাসীকে তাঁহার উপর সর্ব্বভাবে নির্ভর করিতে শিখাইল এবং দেশবাসী বুঝিলেন যে রাষ্ট্রক্ষেত্রের চির পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা বিপর্য্যয় সম্ভাবনা সঙ্কুল বিপদারম্ভে তিনি জাতিকে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া নিরাপত্তা বিসর্জ্জন না দিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। যুদ্ধ যখন ঘনাইয়া আসিল তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নির্ভয় কণ্ঠে জাতিকে প্রস্তুতির বানী শুনাইলেন। যুদ্ধ যখন প্রবল গতিতে চালিত হইল, শত্রু যখন সকল সুনীতি ভুলিয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনার পথে ভারতকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইল, চীন ও আমেরিকা যখন ভারতকে হুমকি দিয়া পাকিস্থানের পাপ পঙ্কিল পথ

সুগম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; শ্রীমতী গান্ধী তখন একমাত্র বন্ধু সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সখ্য স্থাপিত ও রক্ষা করিয়া চলিতে থাকিলেন ও সর্ব্বক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রত্যাক্রমন প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আমেরিকা তাহার যুদ্ধ জাহাজের ভারত সমুদ্রে প্রবেশ আয়োজন করিলে ইন্দিরা বলিলেন আমরা নিজ পথেই চলিতে থাকিব; নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রগমনেই তৎপর হইব; কোন জাতি বা কোন দেশ আমাদিগকে চাপ দিয়া কিছু করাইয়া লইতে পারিবে না। কারণ আমরা এই অবস্থা উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বদা স্থিরভাবে ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করিয়াই চলিয়া আসিতেছি। যে অন্যায় ও অধর্ম্মে লিপ্ত নহে তাহার ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই জন্যই আজ জয়মাল্য কণ্ঠে পরিয়া বিজয়ানন্দে দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতবাসী তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া এখন নিজেদের দারিদ্রের অবসান চেষ্টাতে মনোনিয়োগ করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে আমাদের শত্রু বিলাসিতা, লোভ, পরধন শোষণ, পরমুখাপেক্ষিতা ও সামাজিক দুর্নীতি। আমাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস যে ভারত অতি অবশ্যই ন্যায়ের ও ধর্ম্মের পথে থাকিয়া তাহার সকল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে এবং সেই কার্য্যের নেতৃত্ব গৌরবের অধিকারিনী হইবেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

দেশ-বিদেশের কথা

বেনগুরিয়ান

আচার্য্য কৃপালানি নিউস ফ্রম ইসরায়েল পত্রিকায় ইসরায়েলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়ানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের বিষয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বেনগুরিয়ানের পুরা নাম ডেভিড বেনগুরিয়ান। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে পোলাণ্ডের প্লন্স্ক সহরে। তিনি ১৯০৬ খৃঃ অব্দে প্যালেষ্টাইনে বসবাস আরম্ভ করেন। তুর্কী শাসকগণ তাঁহাকে ১৯১৫ খৃঃ অব্দে সেথান হইতে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া দেন। কারণ তিনি ইহুদি দিগের নিজেদের দেশ নিজেদের অধীনে রাখিবার আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি আমেরিকায় গিয়া ইহুদি বাহিনীর একজন প্রধান সংগঠক হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। অ্যালেনবি ইহার নেতৃত্ব করিতেন। বেনগুরিয়ন ১৯৩৫-৪৮ এ প্যালেষ্টাইনের ইহুদি কার্য্যকরী দলের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং ১৯৪৮ খৃঃঅব্দে তিনিই ইসরায়েলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে তিনি মাপাই বা শ্রমিক দলের নেতা হ'ন এবং ১৯৪৯-৫৩ তে প্রধান মন্ত্রীত্ব ও ১৯৫৫-৬১তে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কার্য্য করেন।

আচার্য্য কৃপালানি যখন ইসরায়েলে গমন করেন (১৯৫৯) তখন বেনগুরিয়ান কাজের সময় টেল আভিভ ও অবসর থাকিলেই নিজের সমবায় কেন্দ্রের বাসস্থান স্দে বোকারে গিয়া বাস করিতেন। এই বাসস্থান নেগেভে অর্থাৎ মরুভূমি অঞ্চলে। ইহা টেল আভিভ হইতে ৮০ মাইল দূরে এবং রাজপথ হইতে কিছুদূরে অবস্থিত। আচার্য্য কৃপালানি ও তাঁহার দলের সকলে রাজপথে গাড়ী রাখিয়া পদব্রজে ঐ কিবুৎসে (যেখানে সকল সম্পত্তি ও কার্য্যে সকলের অংশ আছে) গমন করিলেন। কিন্তু হঠাৎ খুব বৃষ্টি পড়াতে সকলেই ভিজিয়া চুপচুপিয়া যাইলেন।

বেন গুরিয়ান ও তাঁহার পত্নী সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া শুষ্ক বস্ত্রাদি দিয়া বসাইলেন। চা ও গৃহে প্রস্তুত বিস্কুট প্রভৃতি আনা হইল কারণ সময়টা ছিল অপরাহ্ন কাল। তিনি সৌম্যমূর্ত্তিপুরুষ ও তাহার বয়স সে সময় ছিল ৭০।৭১ বৎসর। তিনি আচার্য্য কৃপালানিকে কোন রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন করিলেন না। আরম্ভ করিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম ও উপনিষদের সম্বন্ধে আলোচনা। বেনগুরিয়ানকে আচার্য্য কৃপালানি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি শক্তিশালী লেখক ও অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন নানা বিষয়ে।

বেনগুরিয়ান বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন ও কর্ম্মক্ষেত্রে ইসরায়েল রাষ্ট্রের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার এখন বয়স হইয়াছে ৮৫ বৎসর। তিনি যদিও অবসর লইয়া শান্তভাবে জীবন কাটাইতেছেন তবুও আচার্য্য কৃপালানি মনে করেন যে তাঁহার উপদেশ ইসরায়েলের সকলেই সর্ব্ব সময়ে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবেন ও তদ্বারা লাভবান হইবেন।

পাকিস্থান হইতে পলাতকদিগের কথা

পোলাণ্ডের ট্রিবুনালুডু পত্রিকায় বহুলক্ষ মানুষের মহা দুর্দশা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে বিগত পঁচিশবৎসর কালের মধ্যে যে সকল চরম দুর্ঘটনা মনুষ্য জাতিকে মহা কষ্টের জাঁতায় পিষিয়া মারিয়াছে তাহারই একটি অতি বৃহৎ দুর্ঘটনা ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার তীরে এখন ঘটিতেছে। বিগত পাঁচমাস কাল ধরিয়া দলে দলে বুভুক্ষু ও ভীতত্রস্ত মানুষ দেশ ছাড়িয়া প্রাণ রক্ষার জন্য ভারতের দিকে প্রবল বন্যায় ছুটিয়া চলিয়া চলিয়াছে। পাকিস্থানী শাসকগণ যদিও বারবার পূর্ব্ব পাকিস্থানের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া যাইবে বলিতেছেন তাহা হইলেও বাস্তব পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী সে কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে না। আশি লক্ষ মানুষ পূর্ব্ব পাকিস্থান ছাড়িয়া পলাইয়াছে। (নিম্নে ট্রিবুনালুডুর লেখার ভাবার্থ দেওয়া হইল)

"এই সকল মানুষের ভবিষ্যত বড়ই নৈরাশ্যজনক। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বাঁচিবে না, যদিও চেষ্টা করিলে বাঁচিতেও পারে। যদি এরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে মানুষ পালান বন্ধ হয় ও পলাতকগণ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে এই মরণের খেলা থামান যাইতে পারে। এইরূপ কোন ব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহা শুধু ভারত চাহিতেছেন না, যদিও এই ব্যাপার ভারতের পক্ষে আর শুধু পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ ঘটনা থাকিতেছে না। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই ইহা চাহেন কেননা গৃহহারা নরনারী ও শিশুদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া কাহার প্রাণে বেদনা জাগ্রত না হইয়া থাকিতে পারে? ইহা ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান না হইলে এশিয়াতে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা'ও সম্ভব হইবে না।"

ঐ পত্রিকাতে লেখা হইয়াছে যে "প্রথম হইতেই ইসলামাবাদ পূর্ব্ব পাকিস্থানের সকল কথাতেই একটা লোকভুলানো মিথ্যার আশ্রয় লইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সময় পূর্ব্ব পাকিস্থানে মহালোকক্ষয়কর যুদ্ধ চলিতেছে ঠিক সেই সময়েই পাকিস্থান রেডিও প্রচার করে যে পূর্ব্বাঞ্চলে সর্ব্বত্র পূর্ণ শান্তি বিরাজমান।

"অতি নির্দ্দয় পাশবিক অত্যাচার ও জনসাধারণের রক্ত পাতের চূড়ান্ত করিয়া এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশ ছাড়া করিয়া পাকিস্থানী শাসকগণ নির্লজ্জভাবে এই সকল ঘটনাবলীর জন্য ভারতকে দায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও সামরিক হুমকি দিয়া পাকিস্থান পৃথিবীর জনসাধারণকে বিষয়টির সত্যকার স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে না দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখন ইসলামাবাদ আর একটি অভিনয় করিয়া বিশ্ববাসীজনকে উল্টা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা হইল একটা অসামরিক শাসন ব্যবস্থা করা হইতেছে দেখাইবার চেষ্টা।

"ইসলামাবাদকে বহু দেশ আর সাহায্য দান করিতেছেন না। ফলে ঐ দেশের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। শান্তি স্থাপন ও অসামরিক সাধারণ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানান মিথ্যা অভিনয় করিয়া কোন সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

কারণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সমানে চলিতেছে। সামরিক শক্তি পূর্ণভাবে জনসাধারণের বক্ষে জগদ্দল প্রস্তরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অবস্থায় কোনও দেশত্যাগী উদ্বাস্তুগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে বলিয়া আশা করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না।"

আরব জাতিদিগের পাকিস্থানকে সাহায্যদান

আরব জাতিগুলির সামরিক শক্তি সম্বন্ধে কাহারও কোনও বিশ্বাস নাই। কারণ তাহারা যেভাবে ক্ষুদ্রজাতি ইসরায়েলের নিকট মার খাইয়া আরবের বহু অঞ্চল ইসরায়েল কবলে সমর্পণ করিয়া স্থির চিত্তে বসিয়া আছে তাহাতে মনে হয় না যে তাহারা যুদ্ধ করিয়া কাহাকেও পরাভূত করিতে সক্ষম। কিন্তু তাহাদের "ইসলামী" বন্ধু পাকিস্থানের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঐ সকল আরবজাতি, অর্থাৎ সাউদি আরব,জর্ডান ও কুয়ায়েত ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতে মনস্থ করিয়াছে। জেহাদ শুধু কাফেরদিগের উপরেই হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভারত যদি বা অমুসলমান বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে; মুক্তিবাহিনী কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই মুসলমান প্রধান ছিল। সুতরাং মুক্তি বাহিনীর উপর আক্রমণকে জেহাদ বলা যায় না। অবশ্য জেহাদ ঘোষণা করিলেই যে সামরিকভাবে কোন আক্রমণ করা হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ কুয়ায়েতের সৈন্যসংখ্যা কয়েক শত মাত্র ও বিমান বাহিনী মাত্র ১৬টি বিমানে গঠিত। সাউদি আরব সেনাবাহিনীতে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক সৈন্য থাকিলেও সে বাহিনীও প্রবল শক্তি শালী নহে। তাহা ব্যতীত সাউদি আরবের ৩০টি বিমান আছে। এই যুদ্ধ শক্তি যত্রতত্র পাঠাইলে সাউদি আরব রাজত্বে বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটিয়া যাইতে পারে কারণ রাজা বিতাড়ন ও পরিবর্ত্তন আরব মুল্লুকের অতি সাধারণ ঘটনা। তুলনায় জর্ডান অতি মহা পরাক্রম শালী; কারণ জর্ডানের সৈন্য বাহিনীতে প্রায় ৫৩০০০ সৈন্য আছে। বিমান শক্তিও কিছু কিছু আছে। কিন্তু জর্ডান আরব গেরিলা আক্রান্ত হইয়া ঐ গেরিলাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া সর্ব্বত্র সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিল। আর তাহার দ্বারদেশে রহিয়াছে ইসরায়েল। অধিকশক্তি পাকিস্থানের জন্য অন্যত্র প্রেরিত হইলে ইসরায়েল জর্ডানে অনুপ্রবেশ করিতে পারে তাহা জর্ডানের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। আর একটি কথা এই যে আরব জাতিগুলি যখন ইয়াহিয়া খান লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করাইতেছিল ও তাহাদের স্ত্রী কন্যার চরম অপমান করাইতেছিল তখন নিজেদের বিবেককে ঘুমের ঔষধ খাওয়াইয়া নিশ্চেষ্ট ও নীরব ছিল কেন? আরব জাতিগুলিকে ভারত সর্ব্বদা বন্ধু ভাবে সাহায্যই করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহাদের নিলর্জ্জতা আমরা হতবাক হইয়া দেখিতেছি। তাহাদের সামরিক সাহায্যের কোন মূল্য নাই; কিন্তু সেই কারণে তাহাদের ন্যায়বোধ ও সত্যানুসরণ আগ্রহ থাকিবে না এমন কোনও কথা থাকা উচিত নহে।

ভারত অপ্রতিরোধ্য

ভারতকে দমন করিবার জন্য চীন ও আমেরিকা কি সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে? রুশিয়া তাহা হইলে কি সেইযুদ্ধে ভারতের সহায়তায় অস্ত্রধারণ করিবে? এই সকল প্রশ্নের পূর্ব্বের প্রশ্ন হইতেছে, ভারত কি আক্রান্ত হইলে প্রাণপাত করিয়া বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ শক্তির সহিত সংগ্রামে নামিবে? আমরা মনে করি আমাদের সেই পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এবং আমরা যুদ্ধে পশ্চাদপদ হইব না। "যুগবাণী" সাপ্তাহিক বলেন:

ইউ এন ও কাঁপিতেছে, আমেরিকার মুখ শুকাইয়াছে হিমালয়ের নিরাপদ আড়াল হইতে চীন আস্ফালন করিতেছে—কারণ এশিয়ার বুকে ভারত সম্পূর্ণ নতুন শক্তি লইয়া, দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয় লইয়া, বিজয়ীর বেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত ভাগ করিয়া পাকিস্থানের জন্ম দিয়াছিল: চব্বিশ বছর পর তাসের ঘরের মতো সেই পাকিস্থান ধ্বসিয়া পড়িতেছে এবারকার যুদ্ধ ১৯৬৫ সালের পুনরাবৃত্তি নয়। এবার ভারতের আপসহীন জাতীয়তাবাদ পূর্ণ বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আমরা বারবার বলিয়াছি, আজ সম

আসিয়াছে তাই ইঙ্গিত ছাড়িয়া কথাটা আবার সরাসরি, বলি। এই আপসহীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রশ্নেই মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল, রাজাগোপালাচারি চক্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসিতেছে, তাই সেই সুযোগে ইংরেজকে চরম আঘাত হানিতে হইবে ও পূর্ণ স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম চালাইতে হইবে—এই ছিল সুভাষচন্দ্রের দাবী। সেই দাবীকে নস্যাৎ করার অভিপ্রায়ে প্রথমে মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি হইতে বাধা দিয়াছিলেন, তারপর দ্বিতীয় দফার আক্রমণে তাঁকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া ছাড়িলেন। সুভাষচন্দ্র উপযুক্ত ক্ষণ আসিলে তাঁর আপসহীন জাতীয়তাবাদের আদর্শকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভারতের বাহিরে গিয়া আজাদ হিন্দ সৈনবাহিনী গঠন করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ থামে নাই। ১৯৪৫ সালে জার্মাণী আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, জাপান আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—কিন্তু সুভাষচন্দ্র পরাজয়, আত্মসমর্পণ, নতি কিংবা সন্ধি কোনটাই স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, ভিন্ন রণাঙ্গন হইতে, ভিন্ন পরিবেশে ও ভিন্ন সমরকৌশল লইয়া তিনি অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চালাইবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে শেষ পর্যায়ের লড়াই তিনি ভারত উপমহাদেশে দাঁড়াইয়াই করিবেন—বাহির হইতে নয়। আজ কি তাঁর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে না?

১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধ আপসচুক্তিতে শেষ হইয়াছিল। ঐ আপস হইয়াছিল আমাদের জাতীয় স্বার্থের মূল্যে। ঐ আপসে খুশি হইয়াছিল ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া সবাই – কারণ ভারতকে আবার দাবাইয়া দেওয়া গিয়াছিল। তখনো ভারতে চলিতেছিল গান্ধীযুগ। গান্ধীমাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ভীরু, পরমুখাপেক্ষী, দুর্বলচিত্ত নেতারাই তখনো ভারতকে চালাইতেছিল। আজ দেখিতেছি পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটাইয়াছে। জহরলাল নেহেরু ও তাঁর কন্যার মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যাইতেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চিন্তাধারা ভারতের আপসহীন জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তিনি গান্ধীবাদ ও নেহেরুবাদকে কার্যত দূরে সরাইয়া দিয়া সুভাষবাদকেই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁর কথায় ও কার্যে যে স্বচ্ছদৃষ্টি, বীর্য ও দেশপ্রেমের পরিচয় মিলিতেছে তাহা গান্ধী-নেহরু ঐতিহ্যের ধারাবাহী নয়, তাহা সুভাষচন্দ্রের ঐতিহ্যের অনুসারী। তাহারই ফলে ভারত আজ এশিয়ার বুকে, বিশ্ববাসীর নয়নের সামনে নতুন রূপ ও চরিত্র লইয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই ভারত দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য, শত্রুত্রাস। এই ভারত তেজবীর্যময়, আত্মপ্রত্যয়ের দ্যুতিতে দীপ্তিমান। এই ভারত বিশ্বসাম্রাজ্যবাদীদের আতঙ্কের কারণ।

পুস্তক পরিচয়

ভগ্ন দেউলের ইতিবৃত্ত : শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী, জয়ন্তীপুর, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর। মূল্য ২·৫০।

আমাদের দেশে প্রাচীন দেব-দেউলগুলি একটি বড় সম্পদ। বাংলাদেশে—শুধু বাংলাদেশে কেন সমগ্র ভারতবর্ষে এই মন্দিরগুলি ইতঃস্তত ছড়াইয়া আছে। ইহা ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়। কত দিনের কত স্মৃতি ইহার সহিত জড়িত। ইটের উপর খোদাই করা কারুকার্যগুলি আজও তেমনি অক্ষত আছে। এই শিল্প-কাজ দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ইহার ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছেন। এই জীর্ণ মন্দিরগুলি সংস্কারাভাবে হয়ত একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক দেশবাসীরও একটা কর্ত্তব্য আছে।

প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে পূর্বে অনেক গ্রন্থই রচিত হইয়াছে। তবে এখনও অনেক অলিখিত আছে। বর্তমান গ্রন্থখানি তাহারই প্রমাণ।

গ্রন্থকার মেদিনীপুরের লোক। তাই এই গ্রন্থে তিনি স্থানীয় মন্দিরগুলির কথাই বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া চন্দ্রকোণার নিদর্শনগুলি যেভাবে উদঘাটন করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

ইহাতে আছে, চন্দ্রকোণা শহরের পূর্ণ ইতিহাস, এবং ইহার পার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণভূম, বকদ্বীপ, চেতুয়া ও বরদা প্রভৃতির বিভিন্ন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রাচীন জাগ্রত দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কথা, বিভিন্ন ঐতিহাসিক পুষ্করিণী এবং ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের কাহিনী ও তাহার নিদর্শন। বিশেষ করিয়া এই নিদর্শনগুলির ছবি থাকায় পাঠকের জানার কৌতূহল অনেকখানি মিটিয়াছে।

যখন কলিকাতা শহরের পত্তন হয়নি, তখনও সে চন্দ্রকোণার শিল্প সমৃদ্ধি, ব্যবসা বাণিজ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি কত উন্নত ছিল এবং ঐদুলের মহাপ্রতাপশালী স্বাধীন রাজন্যবর্গের বিদ্রোহের ফলে কলিকাতা, চুঁচুড়া চন্দননগর এবং সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতো পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সেকথাও বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ ও গ্রন্থ দিয়ে প্রমাণ ক'রেছেন লেখক। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানের শিলালেখের সুন্দরভাবে বাংলা অর্থ, স্থানীয় গ্রামাঞ্চ লোকগীতি ও কবিতাগুলির পরিবেশন করেছেন তিনি। গবেষক হিসাবে শ্রীদীর্ঘাঙ্গী বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান সমূহের মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে প্রাপ্ত জৈন ও বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি এবং বহু মূল্যবান জিনিষের তথ্য সংগ্রহ ক'রেছেন। তিনি নিজের দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধেও অত্যন্ত সজাগ তাই অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় জন সমক্ষে সে গুলিকে উপস্থাপিত ক'রেছেন। লেখকের চিন্তাধারা জাতি ধর্ম্ম, দলমত ও ভেদাভেদের বহু উর্দ্ধে, যেহেতু তিনি হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের মঠ মন্দিরকে সমান চোখেই দেখেছেন।

গ্রন্থকার তাঁর অমর গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু যে যুগে কালের করাল দংষ্ট্রাঘাতে মানুষের জীবন যাত্রা দুর্বিসহ যে যুগে রাজারামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহাপুরুষ গণের বহু স্মৃতি অবলুপ্তির পথে ধাবমান এবং বহুবিখ্যাত গ্রন্থাগার গবেষণাগৃহ, বিজ্ঞানমন্দির ও দেশ প্রেমিক মহা-পুরুষগণের প্রতিভাচিহ্ন ধ্বংসের সম্মুখীন— সে যুগে যে এখন এমন মানুষ আছেন যিনি নিজের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা চিন্তা করেন একথা ভাবতেও যেন আশ্চর্য্য লাগে। তাহ'লে সত্য সত্যই কি এই সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হবে?

এই আলোচ্য ঐতিহাসিক ধর্ম্মগ্রন্থখানি রাজধানী শহরের আলো থেকে বহুদূরে গ্রামের অন্ধকারের নানারূপ অসুবিধার মধ্যে মুদ্রণ করতে গিয়ে হয়তো কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রচ্ছদপট ও অভ্যন্তরের দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি অপূর্ব্ব হয়েছে।

লেখক বহু পরিশ্রম করিয়া ইহার পুরাবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। লেখকের এই সযত্ন প্রয়াস সত্যই প্রশংসনীয়। সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। কিন্তু ইহার উপাদান প্রচুর। গবেষকদের ইহা কাজে লাগিবে। লেখক এই কাজে ব্রতী থাকিলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবেন। আমরা সেই আশাই করিব।

গৌতম সেন

যোগেশচন্দ্র বাগল

জন্ম—২৭শে মে ১৯০৩ মৃত্যু—৬ই জানুয়ারী ১৯৭২

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৭৮

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিদেশের নিকট সাহায্য গ্রহণ

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সূচনা হইতেই বিদেশের নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ ভারতের রাজস্ব সংগ্রহের একটা সর্ব্বজন গ্রাহ্য উপায় বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সমালোচনাতে কোনও ফল হয় নাই। অর্থ আসিয়াছে; ঋণ বা দান হিসাবে; তৎসঙ্গে আসিয়াছে নির্দ্দেশ যে ঐ অর্থ কোথায় কি ভাবে ব্যয় করা হইবে। কোন যন্ত্র কাহার নিকট হইতে ক্রয় করা হইবে, সেই যন্ত্র ব্যবহারে চালিত কারখানা যে চালাইবে ও তাহার কত বেতন বা খাওয়া-থাকা-যানবাহন—চিকিৎসা-ছুটি-ভ্রমণ ইত্যাদি প্রাপ্য হইবে; সকল বিষয়ই দান বা ঋণ গ্রহণের অঙ্গ বলিয়া সঠিক ভাবে নির্ণীত হইত। ইহার ফলে উত্তমর্ণ দেশের প্রভূত লাভ হইত ভারতের ততটা সুবিধা হইত না। যন্ত্রাদির মূল্য বাড়াইয়া ধরা হইত, অনভিজ্ঞ যন্ত্র বা কার্য্য পরিচালক বিদেশী কর্ম্মীদিগকে ভারতের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বিদেশীগণ নিজেদের কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলি যে পরে লোকসানের ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে সম্ভবতঃ দেখা যাইত যে বিদেশীর বদান্যতার ফলেই ঐরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। বহুক্ষেত্রেই যেরূপ ব্যয় হইবার কথা বিদেশীদিগের সাহায্য গ্রহণের ফলে তাহার প্রায় দ্বিগুণ ব্যয় হওয়া একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ রাওরখেলার ইস্পাত কারখানার নাম করা যাইতে পারে। বিদেশের সাহায্য গ্রহণের জের টানিয়া বহুদূর অবধি চলিত। মেরামত আকার বৃদ্ধি প্রভৃতি সকল কার্য্যেই সেই পূর্ব্ব অনুসৃত পথে চলিতে ভারত বাধ্য হইত ও তাহার ফলে বিদেশীদিগের প্রভাব ভারতের কারখানাগুলিতে অটুট

ভাবে বর্ত্তমান থাকিত। সকল অবস্থা বিচার করিয়া দেখা যায় যে ভারত বিদেশের নিকট ঋণ বা "দান" গ্রহণ করিয়া সর্ব্বেবভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। প্রথমতঃ ভারতের কারখানা গঠন ও কারখানার উৎপাদন কার্য্য খরচ অনুপাতে ঠিকমত হয় নাই এবং তৎপরে যাহা হইয়াছে তাহাও একটা টানা অপব্যয় এবং ক্ষতির কারণ হইয়া ভারতের গলায় প্রস্তরের নালের মতই ঝুলিয়া রহিয়াছে। ঋণ গ্রহণ না করিলে এবং আমলাদিগের হস্তে অর্থনৈতিক গঠন কার্য্যভার ন্যস্ত না করিয়া ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসাব মাপিয়া তাহা গঠন করিলে কার্য্য যথাযথভাবে সুগঠিত হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকিত। কিন্তু "স্টেটিস্‌ম্" বা রাষ্ট্রীয় করণের নেশায় বিভোর হইয়া তোষামুদপ্রিয় রাষ্ট্রনেতাগণ আমলাদিগের উপর নির্ভর করিয়া ভারতকে মহা ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে একদিকে ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতাদিগের জ্ঞানচক্ষু কিছুটা খুলিয়াছে ও অপর দিকে বিদেশীদিগের দম্ভ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষুধা বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদের "ঋণ বা সাহায্য দিব না" বলিয়া ভারতকে ভীতি প্রদর্শনও বাড়িয়াছে। ভারতও এই শাসান সহ্য করিতে না পারিয়া কোন কোন বিদেশী দাতা দিগকে "জহান্নম যাও" বলিয়া বিদায় করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা বিশেষ সুফল প্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহতে ভারত আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখিবে। মূলধন প্রবল কারখানা গঠন না করিয়া ভারত এইরূপ হইলে শ্রমিক প্রধান কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিবে ও তাহাতে ভারতের বেকার সমস্যা আরও দ্রুতগতিতে সমাধানের দিকে অগ্রসর হইবে। আমাদের বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনও ইহাতে বাড়িবে; কারণ যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হইতে আমরা বিদেশী অর্থ অর্জ্জন করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই শ্রমিক প্রধান কৃষি কার্য্য হইতে উৎপন্ন। সুতরাং বিদেশের নিকট অর্থ লইয়া ক্রমে ক্রমে আর্থিক অবনতির পথে না চলিয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া শ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়া উন্নতি সাধনেই মঙ্গল ইহাই আমরা এখন বুঝিতে সক্ষম হইব।

ভারতীয় ভারত মহাসাগর

পূর্ব্বকালে ভারত মহাসাগর ভারতেরই মত বৃটিশের দ্বারা অধিকৃত ছিল। এমন কি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময়েও ভারত মহাসাগর একান্তভাবে পর হস্তে চলিয়া যায় নাই। যদি ভারত মহাসাগর পূর্ণরূপে জাপানের দখলে চলিয়া যাইত তাহা হইলে আই এন এ বর্ম্মার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পথহীন পার্ব্বত্য অরণ্যের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ চেষ্টা না করিয়া অনায়াসেই সমুদ্র পথে যত্রতত্র সৈন্য বাহিনী নামাইতে পারিতেন ও তাহা হইলে সহজেই ভারত হইতে বৃটিশ সামরিক শক্তি বিতাড়িত হইতে পারিত। কিন্তু বৃটিশের নৌ-বাহিনী যদিও সিংহপুরে কঠিন আঘাতে আহত হইয়াছিল তাহা হইলেও ভারত মহাসাগর ছাড়িয়া পলাইয়া যায় নাই এবং জাপান বর্ম্মা ও আন্দামান দখল করিয়া লইলেও কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতিতে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইতে পারে নাই। ভারত মহাসাগর তখনও বৃটিশ-ভারতের সামরিক প্রভাবেই আন্দোলিত ছিল এবং রুশ, জাপান, আমেরিকা বা চীনের নৌ শক্তি সেখানে যথেচ্ছা আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখাইতে পারিত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর সকল সমুদ্রেই রুশ ও আমেরিকান নৌবহরের আবির্ভাব সুরু হইল। বৃটিশ নৌশক্তিও তৎসঙ্গে ক্রমশঃ হৃতগৌরব হইতে লাগিল। পরে যখন ভারত মহাসাগর তটের বিভিন্ন দেশগুলি আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইল না; ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, সিংহল, পাকিস্থান, মলয় প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র জগৎ রাষ্ট্রক্ষেত্রে আবির্ভূত হইল; তখন বৃটিশ রণতরীগুলিও ক্রমে ক্রমে সংখ্যায় হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। আমেরিকা ও রুশিয়া ধীরে ধীরে চেষ্টা আরম্ভ করিল কেমন করিয়া ভারত মহাসাগরের নৌ শিবির স্থাপন করা সম্ভব হয়। প্রথমে তাহারা ভাবিয়াছিল যে পাকিস্থানের আশ্রয়ে সেই কার্য্যসিদ্ধি করা যাইবে

কিন্তু পরে সে ধারণা তাঁহারা অনুসরণ করে নাই। ভারতের কোন বন্দর পাওয়া যাইবে না ইহাও স্থির নিশ্চয় ছিল। সুতরাং সমুদ্র মধ্যস্থিত কোন দ্বীপে আখড়া গড়িয়া তোলাই উত্তম পন্থা বলিয়া ধার্য্য হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবরূপ গ্রহণ করিতে এখনও বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয়; কারণ ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধকালে আমেরিকা যখন ভারতকে হুমকি দিবার জন্য তাহার সপ্তম নৌ বাহিনীকে ভারতের দিকে যাইতে আদেশ দিল তখন সে নৌবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও স্থলে ছিল ও তাহাকে কয়েক সহস্র মাইল জলপথ অতিক্রম করিয়া ভারতের সন্নিকটে পৌঁছাইতে হয়। রুশিয়ার ডুবো জাহাজগুলিও ঐ সপ্তম নৌ বহরের পশ্চাতে ধীরে ধীরে ভারতের দিকে চলিয়া আসে।

এই সকল ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রমান হয় যে ভারতকে যদি কোন দেশ আক্রমণ করিতে চায় তাহা হইলে সে আক্রমণ যে বিশেষ করিয়া শুধু স্থল পথেই আসিবে এমন কথা ভাবিবার কোন কারণ নাই। নৌ শক্তি যদি কাহারো যথেষ্ট প্রবল হয় ও বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ যথেষ্ট সংখ্যায় থাকে তাহা হইলে ভারতকে জল ও আকাশ পথে আক্রমণ করা সহজেই সম্ভব হইবে। সুতরাং এইরূপ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ভারতের নৌ শক্তি ও বিমান বাহিনী বৃদ্ধি একান্তভাবে আবশ্যক। বর্ত্তমানে ভারতের যে অল্প সংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ আছে তাহা দিয়া বৃহৎ নৌ বহরকে প্রত্যাক্রমণ করিয়া ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না। অন্ততঃ ২৫।৩০টি ডুবো জাহাজ ও ৫।১০টি ক্রুজার জাতীয় জাহাজ না হইলে ভারতের চলিবে না তৎসঙ্গে ভারতের বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজও অন্ততঃ ৩।৪টি আবশ্যক এবং যুদ্ধ বিমান এখন সংখ্যায় যাহা আছে তাহার অন্ততঃ দ্বিগুণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই সকল ব্যবস্থা করিতে হইলে কয়েক সহস্র কোটি টাকা প্রমান বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন। ইহা সংগ্রহ করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। কি উপায়ে ইহা করা যাইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বৎসরে ১০০০।১৫০০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র শিশা, দস্তা, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতু ঋণ করিয়া লইলে তৎ পরিবর্ত্তে সহজেই বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইতে পারে যে সকল খনিজ হইতে বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাষিত হয় সেই সকল খনিজ বিক্রয় করিয়াও বিদেশী মুদ্রা আহরণ সহজ হইতে পারে। ইহা ব্যতীত যে সকল বস্তু রপ্তানি করিয়া বর্ত্তমানে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাইয়া থাকে সেই সকল বস্তু যাহাতে আরও অধিক করিয়া রপ্তানি করা যাইতে পারে সেই চেষ্টাও বিশেষ করিয়া করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বীকৃতি

বাংলাদেশের জনসাধারণ আর পাকিস্থানে থাকিতে চাহেন না একথা তাঁহারা প্রায় এক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছেন। নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তাঁহারা এই স্থির নিশ্চিত জাতীয়ভাবে গৃহিত অভিপ্রায় বিশ্ববাসীকে জানাইবার পরে, পাকিস্থানী দখলদারবাহিনী তাঁহাদিগের উপর যে চরম বর্ব্বরতা প্রদর্শক সামরিক আক্রমণ চালায়, সভ্য জগতের ইতিহাসে তাহার কোন তুলনা কোথাও কেহ দেখাইতে পারে না। বাছিয়া বাছিয়া সহস্র সহস্র শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা, সহস্র সহস্র নারীদিগকে চরম অপমান ও নির্য্যাতন করা, লক্ষ লক্ষ কর্ম্মীকে দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য করা প্রভৃতি সেই গণহত্যা ও গণলাঞ্ছনার নিদর্শন। দখলদারবাহিনী এইরূপ অত্যাচার, অনাচার, বর্ব্বরতা ও পাশবিক কার্য্যকলাপ করিয়া নিজেদের ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহস বৃদ্ধির ফলে ভারতের উপরেও আক্রমণ আরম্ভ করিতে থাকে ও ফলে ভারত বাংলাদেশের মুক্তি-বাহিনীকে সাহায্য করিয়া পাকিস্থানের উপর প্রত্যাক্রমণ করিয়া ঐ বর্ব্বর জাতির সামরিক শক্তিকে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করিয়া মুক্তিবাহিনীর বিজয়যাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দেন। যে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছিল প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে এখন তাহা বর্ব্বর শত্রুকে দমন করিয়া পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু পাকিস্থান সভ্যতার সকল আদর্শ ভূলুণ্ঠিত ও মানবতাকে জ্বালাইয়া অঙ্গারে পরিণত করিয়া নিজের সকল অধিকার ও দাবি হারাইয়া থাকিলেও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি, নিক্‌সন ও চীনের একাধিপতি মাওৎসেতুঙ্গ পাকিস্থানের সমর্থনে বহুমুখী মিথ্যার অবতারণা করিয়া ঐ অমানুষ নেতৃত্বের দাস রাষ্ট্রটিকে তাহার হৃতশক্তি ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে তৎপর থাকেন। ফলে যদিও বাংলাদেশ বর্ত্তমানে পূর্ণ স্বাধীন ও যদিও বাংলাদেশের শতকরা ৯৮ জন মানুষ ঐ দেশের সংখ্যাগুরু দলের অনুগামী তথাপি বহু দেশ চীন ও আমেরিকার প্ররোচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তা মানিয়া লইতে চাহিতেছেন না। কিন্তু অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। যথা ভারতবর্ষ, ভুটান' পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, পূর্ব্ব জার্ম্মাণী ও ব্রহ্মদেশ এই স্বীকৃতি সাক্ষাৎভাবে দিয়াছেন। যাঁহারা এখনও দেন নাই কিন্তু কার্য্যতঃ নানাভাবে বাংলাদেশের সহায়তা করিয়া বুঝিতে দিয়াছেন যে ঐ স্বীকৃতি শীঘ্রই আসিবে সেই সকল দেশের মধ্যে রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়। যে সকল দেশ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই পশ্চিম ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলি কি করিবে তাহাই দেখিতেছেন। অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবার পরে মনে হয় অনেকগুলি দেশ তাহাদিগের অনুসরণে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করিবে না।

আমেরিকা ও চীন কতদিন নিজেদের মিথ্যার অভিনয় চালাইয়া চলিবে তাহা বলা কঠিন। যদি পাকিস্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতা মানিয়া লয় তাহা হইলেও ঐ দুই মহাশক্তিমান রাষ্ট্র নিজেদের বিরুদ্ধতার অপপ্রচার চালিত রাখিতে পারিবে কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিও সবল ও নিশ্চিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। যেকোনও সময়ে পাঠান জাতীয় পাকিস্থানীগণ নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে। বালুচিস্থানও টলায়মান। যদি পাকিস্থান আরও একাধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে জগৎ রাষ্ট্র মহলে পাকিস্থান সম্বন্ধে কি মনোভাব জাগ্রত হইবে তাহাই বা কে ঠিক করিয়া বলিতে সক্ষম হইবে?

বঙ্গভূমি ও বাংলাদেশ

পূর্ব্ব বাংলার নাম দেওয়া হইয়াছিল পূর্ব্ব পাকিস্থান। ভারতীয় উপমহাদেশের সকল মুসলমান এক জাতির অন্তর্গত বলিয়া প্রচার করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারত খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া পাকিস্থানকে পৃথক রাষ্ট্র বলিয়া খাড়া করেন। সেই এক জাতি পরে প্রমাণ হইল একজাতি নহে। বাঙ্গালী মুসলমান, পাঞ্জাবী, বেলুচি, সিন্ধি, অথবা পাঠান মুসলমানের তথা কথিত এক জাতীয়তার ভিতরে আত্মবিলোপ করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রথমেই ভাষা লইয়া দ্বন্দ্বের সূচনা হয় ও কিছু কিছু রক্তপাত ও হিংসাত্মক কলহের পরে বাংলা ভাষা উর্দ্দুর সহিত পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু ইহাতেই দ্বন্দ্বের অবসান হয় নাই। পশ্চিম পাকিস্থানের মুসলমানগণ সংখ্যায় বাঙ্গালীদিগের তুলনায় অল্প হইলেও গায়ের জোরে সমগ্র পাকিস্থান ভোগ দখল করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। শোষণ ও প্রভুত্ব যখন অসহ্য হইল পূর্ব্ব বাংলার বাঙ্গালী তখন পাকিস্থানের সামরিক শাসকদিগের সহিত অহিংস অসহযোগ আরম্ভ করিল। ইহার পরিণতি কি হইল ও কি করিয়া শেষ অবধি যুদ্ধের সূচনা হইল ও পাকিস্থান পরাজিত হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল সে কথা এখন সর্ব্বজনজ্ঞাত। এখন কথা হইতেছে বাংলাদেশ বলিতে যদি বিশ্ববাসী শুধু পূর্ব্ব বাংলাই বুঝেন তাহা হইলে ভারতের অন্তর্গত যে বাংলাদেশ যাহাকে ভারতীয় সংবিধানে পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ও যাহা ভারতীয় রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ, সেই পশ্চিমবঙ্গের নামটি এখন পরিবর্ত্তন করিয়া এরূপ করা আবশ্যক যাহাতে পরিস্কার বুঝা যায় যে স্বাধীনবাংলাদেশে বাহিরেও আর একটি বঙ্গদেশ আছে ও থাকিবে আমাদিগের মতে এই প্রদেশের নাম দেওয়া উচি

বঙ্গভূমি। এইরূপ নামকরণ না করিয়া যদি পশ্চিমবঙ্গ নামটিই রাখিয়া চলিবার চেষ্টা হয় তাহা হইলে কথা উঠিবে পূর্ব্ববঙ্গ কোথায়। পূর্ব্ববঙ্গকে যদি বাংলাদেশ বলা হয়। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে পশ্চিমবঙ্গ কি বাংলাদেশ নহে? যদি বলা হয় উহাও বাংলাদেশ তাহাহইলে পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সে কথাটি পরিস্কার ভাবে লোকে বুঝিবে না। সুতরাং নাম পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক এবং নামটি বঙ্গভূমি হইলেই বিষয়টির অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্পন্ন হইবে।

চৈতন্যদেব, কৃত্তিবাস, জয়দেব, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহামানবের জন্মভূমি বঙ্গদেশকে যদি উচিত ও উপযুক্ত নামে আখ্যায়িত করিতে হয় তাহা হইলে নামটি নিশ্চয়ই হওয়া চাই 'বঙ্গভূমি।' ইহা ইংরেজীতে লিখিলেও শ্রুতিকটু হয় না। ঠিকানাতে Banga Bhumi, India লিখিত হইলে ভালই শুনায়। এই সকল আলোচনান্তে বলা আবশ্যক যে পশ্চিমবঙ্গ নামটি পাল্টান একান্ত প্রয়োজন এবং তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা যাহাতে হয় সেই চেষ্টা সকল বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। বাংলা ভাষায় ভূমি কথাটির একটি ঘনিষ্ঠ, নিকট ও অন্তরঙ্গ ব্যবহারজাত অর্থ আছে যাহা দেশ শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় না। জন্মভূমি মাতৃভূমি, পিতৃভূমি প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে জন্মদেশ, মাতৃদেশ কথা চলে না। এই কারণে বঙ্গদেশ অপেক্ষা বঙ্গভূমি নামে একটা প্রাণের সহিত যোগের রেশ আসিয়া যায় যাহার মাধুর্য্য অস্বীকার করা যায় না। আমরা আশা করি ভারত সরকার অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ নামটি বদলাইয়া আমাদের দেশের নাম বঙ্গভূমি দিবেন।

ভারতে আমেরিকার গুপ্তচর

গুপ্তচরদিগের কার্য্য নানা প্রকার হইয়া থাকে। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচরগণ অপর দেশে গমন করিয়া নিজ দেশের মতলব সিদ্ধি কি ভাবে করিতে পারে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। গোপনে রাজনৈতিক সামরিক ও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ ত গুপ্তচরগণ করিতই, তাহা ব্যতীত গুপ্তচরগণ শিক্ষক, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, গায়ক, নাট্যকার, ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতির ভেক ধরিয়া অপর দেশের মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার চেষ্টা করিত। এমন কি ভূতের ভয় দেখাইয়া মানসিক ভাবে শত্রুপক্ষকে কমজোর করিবার চেষ্টাও হইত। নিজ দেশের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া পর দেশের জনসাধারণকে নিজ দেশ সম্বন্ধে ভক্তিমান হইতে শিখান হইত ও ইহা দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার সহজ হইত। অপর দেশে গিয়া তাহাদিগের ধর্ম ও কৃষ্টি রপ্ত করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের দ্বার খোলাইয়া বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টাও করা হইত। একবার হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইলে পর তখন জনসাধারণকে বশ করিয়া অথবা উস্কাইয়া যাহা ইচ্ছা করান সম্ভব হইত। শুনা যায় নাগাদিগের বিদ্রোহের মূলে ছিল কিছু ধর্ম্মপ্রচারক যাঁহারা তাহাদিগকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কেমন করিয়া অতিবড় ধর্ম্মের কাজ সেই কথা শিখাইতেন। আজকাল দেখা যায় ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র বহু আমেরিকান নানারূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। কেহ কবি, কেহ ধ্যানী, কেহবা পরম বৈষ্ণব। ইঁহারা কি উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিয়া দরিদ্র দেশের কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহা সহজবোধ্য নহে। তবে ইহারা দল জোটাইতে বিশেষ করিয়া সক্ষম তাহা সহজেই দেখা যায়। দল জুটিলে তাহার ভিতর অপরিণত বয়স্ক মানুষই সংখ্যায় অধিক হয়। সেইরূপ কিশোর ও যুবকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নানা প্রকারের অভিপ্রায় সিদ্ধি হইতে পারে। আমেরিকানের মুখ হইতে যেমন ভক্তির কথা শুনিয়া ভক্তিমান হওয়া যায়; তেমনি ইহাও শিখা যাইতে পারে যে কোন মানুষ, মত, আদর্শ অথবা রাষ্ট্রীয় দলের উচ্ছেদের মধ্যেই কোন মহান নীতিবাদের বীজ নিহিত আছে। তখন ঐ সকল অপরিণত বয়স্কদিগকে সংগ্রামে অবতীর্ণ করান কঠিন হইবে না।

আমাদের সরকারের দেখা প্রয়োজন যে এই সকল বিদেশীরা এদেশে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। তাহারা যে শুধু গঞ্জিকা সেবন, কীর্ত্তনগান অথবা ধর্ম্মজ্ঞান

লাভের আশায় এখানে আছে তাহা অনেকেরই বিশ্বাস হয় না।

কৃষ্টি কৌশলী রসদক্ষ সকল কলাপারগ গুণীজনের অভাব

আজকাল বিদ্যা, অধ্যাপনা, শিক্ষা ও সাধনার কথা বলিলেই শুনা যায় অমুক হইলেন টেকনিক্যাল বিদ্যা-বিশারদ, তমুক হইলেন একজন টেকনোক্র্যাট ও সর্ব্বজনের উপর প্রভুত্বের অধিকারী এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইল টেকনিক বা যন্ত্র কৌশল আয়ত্ত করা। অর্থাৎ কৌশল, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা লাভ হয় শুধু যন্ত্র চালাইয়া, যন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ পরীক্ষণ করিয়া এবং যন্ত্রকলা পারগ না হইলে সর্ব্বগুণাধার হইবার কোনও সম্ভাবনা কোথাও লক্ষিত হয় না। যন্ত্র চালনা খুবই আবশ্যক। যন্ত্র না চালাইলে বহু দ্রব্যই উৎপাদন অসম্ভব হয়, বিভিন্ন যন্ত্রযান জল স্থল ও আকাশপথে না চলিলে গমনাগমন ভার বহন প্রভৃতি বন্ধ হয়, এবং জীবনযাত্রার নানান অঙ্গেই অভাবের আড়ষ্টতা আসিয়া পড়িয়া মানব জীবন "নাই নাই" এর তাড়নায় ক্লেশাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে কৌশল, দক্ষতা, কর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতির শুধু যন্ত্রচালনার সহিতই সম্বন্ধ আছে। অথচ কৃষ্টির ক্ষেত্রে কর্ম্মকৌশল না থাকিলে কোনও কিছুই যথাযথভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। নৃত্যে, সঙ্গীতে, বাদ্যে, অভিনয়ে, বসনভূষণ ব্যবস্থায়, কেশ বিন্যাসে, রন্ধনে - যে দিকেই দেখা যাইবে নীতিরীতি পদ্ধতি সর্ব্বত্র তেমনি করিয়াই উপস্থিত থাকে যেমন যন্ত্র কৌশল ক্ষেত্রে টেকনিক সদা বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। সকল কলাই কৌশলের ও দক্ষতার আশ্রয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। রস অনুভূতি ও অভিব্যক্তি রসবোধ হইতেই জীবন্তরূপ ধারণ করে এবং সেই বোধের নির্ভর রীতিনীতি পদ্ধতির জ্ঞানের উপর। ভাষা যেরূপ ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে সেইরূপ ভাবেই সকল শিল্পকলারই নিজ নিজ এক একটা ব্যাকরণের দিক থাকে। একটা গণিতের ন্যায় মাপজোকের দিকও থাকে। অর্থাৎ যন্ত্রাবস্থা যেরূপ গঠন, গণনা, বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল রস অভিব্যক্তি ও কলাবেত্তা সেইরূপই নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয়। যেখানে কৌশল ও দক্ষতা আহরণ প্রচেষ্টা নাই সেখানে কৃষ্টিও সেইভাবেই চলনশীল হয় যেরূপ হয় অজ্ঞ যন্ত্র নিম্মাণকারীর জোড়াতাড়া লাগান অচল যন্ত্র। আধুনিক কালেরই গায়ক সাহিত্যিক চিত্রকর প্রভৃতি কৃষ্টির বাজারের পণ্য বিক্রেতা কৌশল ও দক্ষতা না থাকায় যথেচ্ছা সৃজন কার্য্য চালাইয়া মানব সভ্যতা ও কৃষ্টিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির অশিক্ষিত ও অপটু প্রচেষ্টা নিচয় কৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসজ্ঞলোকের শিরঃপীড়ার বিশেষ কারণ হইয়া দেখা দিয়াছে। যন্ত্রের বাজারে একটা সুবিধা আছে যে বংশখণ্ড রজ্জু বন্ধনে সংযুক্ত করিয়া মোটর গাড়ী হইতে পারে না ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কৃষ্টি ও রস অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু বহু কাঠের বন্দুক, বাঁশের মোটর গাড়ী ও ব্লটিং কাগজের নৌকা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। ইহার কোন প্রতিকার এখনও সম্ভব হয় নাই।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তা স্বীকারে পাকিস্থানের আপত্তি

কয়েকটি রাষ্ট্র এখন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলি ভুট্টো মহা আপত্তি জানাইয়াছেন ও সেই আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন স্বীকৃতিকারী রাষ্ট্রগুলির সহিত পাকিস্থানের সকল কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া। এই ভাবে বর্ত্তমানে পাকিস্থান যে সকল রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়াছে তাহার মধ্যে পোলাণ্ড, পূর্ব্ব জার্ম্মানী, বুলগেরিয়া ও ব্রহ্ম দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। পোলাণ্ড এই সম্বন্ধ বিচ্ছেদের কথা শুনিয়া বলিয়াছেন যে পাকিস্থান বাস্তব সত্তাকে স্বীকার করা ন্যায্য পন্থা বলিয়া মনে করে না। কারণ আমরা দেখিতেছি যে আমাদের কূটনৈতিক সম্বন্ধ এখন রহিয়াছে মাত্র পশ্চিম পাকিস্থানের ৫॥ কোটি

মানুষের সহিত। আমরা সেই জন্য বাংলাদেশের ৭॥. কোটি মানুষের সহিতও সেই সম্বন্ধ নিশ্চয় ভাবে গঠিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে পাকিস্থান যদি অসন্তুষ্ট হ'ন তাহা সে ক্ষেত্রে উক্ত রাষ্ট্রের বাস্তবকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা বলিয়াই ধার্য্য হইবে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ক্রমে ক্রমে আরও বহুদেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মানিয়া লইবে অর্থাৎ পাকিস্থান যদি বাংলাদেশকে স্বীকার করিলে স্বীকৃতি কারী রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ কাটিয়া দেওয়া অভ্যাস করে তাহা হইলে ক্রমশঃ এই সম্বন্ধ কর্ত্তন ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে থাকিবে। এবং ফলে অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্থান দুই একটি ব্যতীত প্রায় সকল রাষ্ট্রের সহিতই সম্বন্ধ কাটাইয়া চলিতে বাধ্য হইবে। শ্রীভুট্টোর ইহাতে অবশ্য খরচ কমিবে। কারণ বিদেশে দূতাবাস চালাইয়া রাখিতে বহু অর্থ ব্যয় হয়। লোকসানও হইবার সম্ভাবনা আছে। কূটনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা না করিলে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া রাখা কঠিন হয়। পাকিস্থান যতই রবিনসন ক্রুসো সাজিয়া একলা চলিবার চেষ্টা করিবে ততই তাহার আর্থিক অবস্থা কাহিল হইবে। ইহা ব্যতীত যে সকল রাষ্ট্র পাকিস্থানের প্রতি সহানুভূতি শীল, যথা বৃটেন, সে রাষ্ট্রগুলিও ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে। তখন পাকিস্থান কি করিবে? সুতরাং শ্রীভুট্টোর পক্ষে সময় থাকিতে ভুল পথ ছাড়িয়া বুদ্ধির সুগম ও লাভজনক পথে ফিরিয়া যাওয়াই মঙ্গলজনক হইবে। পাকিস্থান একটা মহা পাতকের ফলভোগ করিতেছে। যদি পাপের জন্য অনুতাপ না করিয়া মেজাজ দেখাইয়া পাকিস্থান দিন কাটাইবে স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে উহা একটা আকাশ কুসুম বলিয়াই শীঘ্রই দেখা যাইবে।

যুদ্ধের নামে ঘৃণ্য অপরাধকারীর শাস্তি বিধান

যুদ্ধকালে অকারণে নিরস্ত্র জন সাধারণের উপর অত্যাচার, নির্ম্মম ভাবে নির্দ্দোষজনকে হত্যা করা, নারী শিশু বৃদ্ধবৃদ্ধাদিগের উপর নির্য্যাতন, নিষ্ঠুর ভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়া হত্যা করা প্রভৃতি অপরাধের জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকার উদ্যোগে অনেক জাপানী ও জার্ম্মান মন্ত্রী সেনাধ্যক্ষ প্রভৃতির প্রাণদণ্ড হয়। এই সকল ব্যক্তিরা যুদ্ধকালে যুদ্ধকার্য্যের সহিত সম্পর্কহীন পরিস্থিতিতে অন্যায় আবেগজাত হিংসা প্রণোদিত হইয়া বহু নরনারী শিশুকে পাশবিক ভাবে নির্য্যাতন করিয়া হনন করে। যুদ্ধকালীন এই সকল জঘন্য অপরাধগুলিকে War Crimes বলা হয় যদিও এই সকল অপরাধের সহিত যুদ্ধের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না।

সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্থান দ্বন্দ্বের সহিত জড়িত ভাবে আমরা পাকিস্থানী সৈন্যদিগের যে সকল বর্ব্বরতার কাহিনী শুনিয়াছি তাহা জার্ম্মান অথবা জাপানীদিগের যুদ্ধকালীন অপরাধের সহিত তুলনায় বহুগুণ জঘন্য নির্ম্মম ও পাশবিক। কিন্তু পাকিস্থানী অপরাধীগণ যুদ্ধে আত্ম সমর্পণ করিয়া সাময়িক ভাবে শাস্তির হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে সকল পাপ কার্য্য করিয়াছে তাহার জন্য তাহাদের কঠোর হস্তে শাস্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যে সকল পামর নির্ম্মম ভাবে নির্দ্দোষ বুদ্ধিজীবিদিগের হত্যার আদেশ দিয়াছিল সেইসকল সামরিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সুতরাং তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। শেখ মুজিবুর রেহমানেরও ইচ্ছা এই সকল পাপাত্মাদিগের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা। কি হইবে তাহা ঠিক এখনও বলা যাইতেছে না; কিন্তু কিছু না কিছু হইবে বলিয়াই মনে হয়। এই সকল দুরাত্মাদিগের শাস্তি না হইলে আমাদিগের একটা মানবীয় কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

যোগেশচন্দ্র বাগল

সাহিত্যসাধক যোগেশচন্দ্র বাগল গত ৬ই জানুয়ারী মধ্য রাত্রিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর হইয়াছিল। সাহিত্যসাধনা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক গবেষক। প্রবাসীতে থাকাকালীন তাঁহার এই গবেষণা-লব্ধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য ইহাও অনস্বীকার্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রবাসীর সঙ্গে তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শেষের দিকে দৃষ্টি হারাইয়া অবসর লইতে বাধ্য হ'ন। কিন্তু দৃষ্টি হারাইয়াও তাঁহার এই গবেষণার কাজ বন্ধ হয় নাই। অপরের সাহায্য লইয়া তিনি ঐ সময় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এমনি ছিল তাঁহার নৈষ্ঠিক সাধনা।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারত, বিশেষ করিয়া সেই শতকের বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল। তাঁহার গবেষণার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত, অখ্যাত তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

১৯০৩ খৃঃ অব্দের মে মাসে বাখরগঞ্জের কুমীরমারা গ্রামে যোগেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি ১৯২৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতার সিটি কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ উপাধি লাভ করেন। ইহার পরে তিনি "প্রবাসীর" সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারীর কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন (১৯২৯) কিন্তু কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পরে তিনি ঐ পদত্যাগ করিয়া "দেশ" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি "দেশ" হইতে চলিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার "প্রবাসী"তে কার্য্য আরম্ভ করেন ও ২০ বৎসর সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ১৯৬১ খৃঃ অব্দে তিনি দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাগল মহাশয় দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি ১০৫৬খৃঃ অব্দে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার লাভ করেন ও পরে ১৯৬২ খৃঃ অব্দে সরোজিনী বোস্ স্বর্ণপদক এবং ১৯৬৬ খৃঃ অব্দে শিশিরকুমার পুরস্কার প্রাপ্ত হ'ন। তিনি ১৯৫৮খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর বক্তা ও ১৯৬৮খৃঃ অব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন ও রিজ্যনাল রেকর্ডস কমিশনের সভ্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাগল প্রায় ৪০টি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি শিশু সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ। তিনি সাহিত্য সেবাকার্য্য দৃষ্টিশক্তি হারাণ সত্ত্বেও প্রায় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী, দুই কন্যা ও দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রও ছিল অসাধারণ। তিনি যেমন ছিলেন সরল, তেমনি নিরহঙ্কারী। যোগেশচন্দ্র ছিলেন অনাড়ম্বর, নিরভিমান, মিষ্টভাষী ও বন্ধুবৎসল। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হইল।

কবি গালিব ঃ কাব্যের আলোকে

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়

কবি গালিবের পুরো নাম ছিল মির্জা অসদুল্লা খাঁ গালিব। আগ্রার এক অভিজাত পরিবারে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাটে দুঃখ দুর্দশায়। তবুও সম্মানকে তিনি সাংসারিক সুখ সুবিধার উপরে স্থান দিতেন। দিল্লী কলেজের পারস্য ভাষার অধ্যাপকের কাজ তিনি গ্রহণ করেন নি এ কারণে যে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বাড়ীর গেটে কর্তৃপক্ষের কেউ উপস্থিত হন নি।

আত্মসম্মানের দিকে তাঁর একাগ্র দৃষ্টি আমাদের স্মরণ করায় তাঁর কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার বাঙালী কবি কৃত্তিবাস ওঝাকে, যিনি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে ধন নয়, সম্পদ নয়, 'যেথায় সেথায় যাই সম্মান যে চাই।' যোদ্ধা পিতার সন্তান গালিব নিজে পেশায় যোদ্ধা ছিলেন না, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু মাসিক বৃত্তির সঙ্গে 'ফাইটিং স্পিরিট'টা লাভ করেছিলেন, তা না হলে এত দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন কাটিয়েও আমাদের জন্য তিনি কৌতুকরস সমৃদ্ধ এত মনোহর শের (দ্বিপদী) রেখে যেতে পারতেন না।

তাঁর এই মহৎ মানসিক দৃঢ়তার কথা যখন ভাবি তখন এক বাঙালী কবির সঙ্গে তাঁর মানসিক আত্মীয়তা লক্ষ্য করে পুলকিত হই। ভাবি, মাইকেল মধুসূদন এবং গালিব—অসমবয়স্ক এই দুই সমসাময়িক কবি ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমে বসে নিজেরা গরল পান করে আমাদের জন্য কী সুধাই না রেখে গেছেন। কী করে তা করেছেন তার জবাবে গালিবের সেই স্মরণীয় শেরটি আমরা স্মরণ করতে পারি :

নক্শে ফরিয়াদী হ্যায় কিসকী শওখী তহরীর কা;
কাগজী হ্যায় পিরহন হর পয়করে তসবীর কা।

কাগজের পরিধান পরিহিত চিত্রের সম্ভার;
আনন্দের যত লেখা, বেদনায় জেনো জন্ম তার।

অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলেছেন :

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার।

বহু দুঃখকষ্ট কবি গালিবের জীবনের পথ আকীর্ণ করেছে, যার ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর কবিতায়। অসীম সাহসে তিনি এই দুঃখকষ্টের মোকাবিলা করেছেন। তিনি বলেছেন অসুখ আমার সারেনি, তাতে দুঃখ নেই। ভালোই হল ওষুধের কাছে আমাকে নত হতে হল না :

দর্দ মিন্নৎকশে দওআ ন হুআ,
ম্যঁায় আচ্ছা ন হুআ বুরা ন হুআ।

ঔষধেরে তোষামোদের রইল নাকো ধন্দ,
ভালো যে আমি হলাম নাকো হ'ল না কিছু মন্দ।

শিশু বয়সে গালিব পিতাকে হারান। পালক পিতৃব্যও তাঁকে নিশ্চিন্ততা দিতে বেশিদিন বেঁচে রইলেন না।

অল্প বয়সেই গালিবের বিবাহ হয়। জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে এই বিবাহ তাঁর সহায়ক হলেও পারিবারিক সুখশান্তি তাঁর ভাগ্যে বিধাতা লেখেন নি। স্ত্রী মুখরা, সন্তানগুলি একে একে পরলোকের পথে পাড়ি দিয়ে গৃহকে আরো নিরানন্দ করে গেল। কবি শান্তি খুঁজলেন সুরায়। এই সুরাসক্তি তাঁর বহু অহিতের কারণ হয়েছিল। রোজগার নেই, পেন্সন ও ভাতা সম্বল। কিন্তু উৎকৃষ্ট সুরা ছাড়া তিনি কিছু ছোঁবেন না। ফলে দেনা দাঁড়াল পর্বত প্রমাণ। জুয়ায় 'ইজি মানি' পাবেন, হয়তো এই ভরসায় যেয়ে হাজির হলেন জুয়ার আড্ডায়। ফলে কারাবাস। দুঃখের ষোলকলা পূর্ণ হল। কিছুই আর বাকি রইল না। মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে গালিবের জীবনের সাদৃশ্যের উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। গালিবের ন্যায় মাইকেলেরও বিদেশে কারাবাস প্রসঙ্গ স্মরণীয়। তবে তার জন্য দায়ী ছিল মাইকেলের দেনা, জুয়া নয়।

এক হিসেবে মাইকেল গালিবের চেয়ে ভাগ্যবান ছিলেন। পুনঃপুনঃ সন্তানবিয়োগ ব্যথা মাইকেলকে সহ্য করতে হয়নি। তাছাড়া মাইকেলের স্ত্রীও (হেনরিয়েটা) ছিলেন প্রেমময়ী, গালিবের স্ত্রীর ন্যায় নয়।

সুরাসক্ত গালিব সুরা প্রসঙ্গে বহু দ্বিপদী রচনা করেছেন। একটিতে কবি বলছেন :

গো হাথোঁ মেঁ জুম্‌বিশ নহীঁ আখোঁ মেঁ তো দম হায়,
রহনে দো অভী সাগর ও মীনা মেরে আগে।

বাহুতে আজি মোর যদিও নাহি জোর
আঁখিতে তেজ তবু জাগে,
রাখো হে সুরা আর রাখো হে সুরাধার
রাখো হে রাখো মোর আগে।

আর একটিতে তিনি বলছেন—

ফির দেখিয়ে আন্দাজে গুলে অফসানী এ গুফ্‌তার,
রখদে কোই পয়মানা ও সহবা মেরে আগে।

পাত্র মদ্য দেখো মোর সম্মুখেতে ধরি'
বচনের ফুলঝুরি ছোটাই কি করি'।

কবি হয়তো বুঝেছিলেন যে তাঁর মাত্রাতিরিক্ত সুরাসক্তির এ যথেষ্ট কৈফিয়ৎ নয়। তাই পরিশেষে এমন একটি কারণ তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরলেন যার মধ্যে তাঁর জীবনের সকল কারুণ্য যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন

ময়সে গর্জে নিশাৎ হায় কিস রূসিয়াহ কো,
এক গুনহ বেখুদী মুঝে দিনরাত চাহিয়ে।
স্ফূর্তির তরে কালোমুখদেরই মদ্য চাই;
রাতদিন চাই ভুলিয়া থাকিতে
আমি তাই সুরা খাই।

মধুসূদনের সঙ্গে উপমার জের টেনে এবার আমরা উভয়ের বন্ধু ভাগ্যে আসতে পারি। মাইকেলের বহু খ্যাতনামা ও সম্পন্ন বন্ধু ছিলেন, যাঁদের সর্বাগ্রে বিরাজিত ছিলেন মাইকেল যাঁকে দয়ার সাগর বলে অভিহিত করেছিলেন সেই পুণ্য শ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জননীর মতো স্নেহ মমতায় বিদ্যাসাগর তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট এই অবুঝকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিপদে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেও তাঁরই সাহায্যে বিপদোত্তীর্ণ মাইকেল পরে আর বিদ্যাসাগরের বাস্তব উপদেশ গ্রাহ্য করেন নি। ফলে অশেষ দুর্দশা এবং অবশেষে হাসপাতালে অকাল মৃত্যু। কৃতজ্ঞ মাইকেল বিদ্যাসাগরের ঋণ সানন্দে স্বীকার করেছেন। যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি সেই সুন্দর সনেটটি :

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু।

গালিবের ভাগ্য ততো খারাপ ছিল না। তাঁকে অনাহারে অকালে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়নি; দীর্ঘ ৭২ বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন।

গালিবের বন্ধু ভাগ্য মাইকেলের বন্ধু ভাগ্যের

ছায়েই ভালো ছিল। কিন্তু বিপদে বন্ধুর সাহায্য নেব, বিপদ কেটে গেলে তার সৎপরামর্শ শুনব না, এ রকম একতরফা বন্ধুত্ব বেশিদিন টেঁকে না। গালিবের সে জ্ঞান ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন :

আহকো চাহিয়ে এক উমর অসর হোনে তক্,
কওন জীতা হ্যায় তেরী জুল্ফ্‌কে সরহোনে তক।
বহুকাল হবে আপেক্ষিত আকুতির সুফল চাহিয়া,
যতক্ষণ বিন্যাসিবে কেশ ধৈর্য কার রহিবে বাঁচিয়া।'

বন্ধুজনের প্রতি কটাক্ষ গালিবের বহু দ্বিপদীতে দেখা যায়। এই বন্ধুজনের মধ্যে যেমন সম্রাট বাহাদুর শা' জফর আছেন, তেমনি তৎকালীন প্রতিষ্ঠাপন্ন সমৃদ্ধ অন্য লোকেরও অপ্রতুলতা নেই।

বাহাদুর শা' সম্বন্ধে গালিব কোনো বক্রোক্তি করেন নি, বরং দীনতাই প্রকাশ করেছেন। একটি দ্বিপদীতে গালিব বলছেন—

হুয়া হ্যায় শাহকা মুসাহব ফিরে হ্যায় ইতরাতা,
ওগরনহ্ শহর মেঁ গালিব কী আব্রু ক্যা হ্যায় ?
গর্বিত আমি ফিরিপথ হয়ে মোসাহেব বাদশার,
নয়তো শহরে কিবা ইজ্জৎ গালিবের আছে আর ?

অপর দ্বিপদীতে বলেছেন—

গালিব, ওজীফাখার হো দো শাহ্‌কে দুআ,
ওহ দিন গয়ে কে কহতে হে নওকর নহী হুঁ ম্যাঁয়।
পেনসনভোগী তুমি হে গালিব দাও বাদশাহে দোয়া
'নই দাস আমি' বলিতে যেদিন সেদিন গিয়াছে
খোয়া।

এই শেষোক্ত দ্বিপদীটিতে একদিকে যেমন বাদশাহেরপ্রতি কবির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে 'সেদিন গিয়াছে খোয়া' কথাগুলির মধ্য দিয়ে তার অসহায়তা করুণভাবে ফুটে উঠেছে। অন্য একটি দ্বিপদীতে আত্মবিলোপ করেও কবি বাদশার মঙ্গলকামনা করেছেন :

গালিবভী গর্ ন হো তো কুছ্ অ্যায়সা জরুর নহী,
দুনিয়া হো ইয়ারব্ অওর মেরা বাদশাহ হো।

ক্ষতি নাই কিছু গালিবও যদি না রহে এই দুনিয়ায়,
খোদা, থাক তব এ দুনিয়া আর রাখো মোর
বাদশায়।

সম্রাট বাহাদুর শা' জফরের প্রতি গালিব সশ্রদ্ধ উক্তি করলেও অন্য বন্ধুদের তিনি অব্যাহতি দেন নি। কবির প্রতি তাদের অনাসক্তি, তাঁদের দয়াবানরূপে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিন্তু অন্তরে দয়াহীনতা প্রভৃতি কিছুই তাঁর ব্যঙ্গের কশাঘাত থেকে অব্যাহতি পায়নি। তিনি বলছেন :

বনা কর্ ফকিরোঁকা হম্ ভেস্ গালিব
তমাশা এ অহল্ করম্ দেখতে হ্যাঁয়।
ধারণ করিয়া বেশ ফকিরের
দেখছি তামাশা দয়াবানদের।

তবে কবি অবিবেচক নন। বাস্তবজ্ঞানও তাঁর আছে। নিজ অবস্থা তিনি জানেন। সে অবস্থায় বন্ধুজনের সাধ্য কতটুকু তাও তাঁর অজ্ঞাত নয়। দুনিয়ার হালচাল তো তিনি জানেন। দুঃখের কথা সয়ে তিনি জেনেছেন—

কয়দে হায়াৎ ও বন্দেগম অসলমেঁ দোনো এক হ্যায়,
মওৎ সে পহলে আদমী গমসে নজাৎ পায়ে কিউঁ।
জীবনবন্ধন আর দুঃখের শৃঙ্খল,
আসলে সে দুই একই ভাই।
মরণের আগে বন্ধু জানি
দুঃখ হ'তে পরিত্রাণ নাই।

আবার

গম হস্তীকা অসদ্ কিসসে হো জুজমর্গ ইলাজ,
শমা হর রঙ্গমেঁ জলতী হ্যায় সহর হোনে তক।
মৃত্যু বিনা হে অসদ কোথা ব্যথা প্রতিকার ?
দীপশিখা জ্বলা শেষ সমাগমে হে উষার।

তাঁর এই পেসিমিজমই তাঁকে শিখিয়েছে জীবনটি দুঃখের শৃঙ্খলেই বিধৃত। এক দুঃখ অবসানে অপর দুঃখের আবির্ভাব। এক ক্ষত ভরতে না ভরতে দ্বিতীয় ক্ষতের সৃষ্টি।

দোস্ত গমখারী মেঁ মেরী সায়ী ফরমায়েঙ্গে ক্যা ?
জখমকে ভরনে তলক নাখুন ন বঢ়ায়েঙ্গে ক্যা ?
আমার ক্ষতে কি আর প্রলেপ পারবে দিতে
বন্ধু ইয়ার,
জখম ভরে ওঠার আগে নখ কি রে ভাই বাড়বে
না আর ?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাহাদুর শা' জফরের একটি অনুরূপ শের

কোনই উপায় পারেনি আমার হৃদয়ের ক্ষত ভরতে,
এক ভরে আর আর গবাক্ষ খুলে যায় পরিবর্তে।

বেদনা প্রণয়ে আছে, জীবিকায়ও আছে। একটির হাত থেকে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয়টি হাজির। মোট কথা অব্যাহতি কিছুতেই নেই। 'গমে ইশক গর ন হোতা গমে রোজগার হোতা'।

যতক্ষণ হিয়া আছে ভাই ব্যথা হতে কোথা পরিত্রাণ ?
না থাকিলে প্রণয়ের ব্যথা, জীবিকার ব্যথা হানে বাণ।

প্রণয় ও জীবিকা ছাড়া কবিখ্যাতির জন্যও গালিব বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন। সমসাময়িক বহু কবি তখন উর্দু'র দরবারে ভিড় করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আতিশ, নাসেখ, জওক, মোমিন, নসীম নিজাম রামপুরী প্রভৃতি। সর্বোপরি ছিলেন দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শা' জফর। দিল্লী তখন উর্দু'র এক শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। বাহাদুর শা' জফরের দৌলৎ না থাকলেও ইজ্জৎ ছিল এবং তিনি স্বয়ং উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন বলে তাঁকে কেন্দ্র করে দিল্লী দরবারে একটি সাহিত্য মজলিস গড়ে উঠেছিল। জওক ছিলেন বাহাদুর শা' জফরের কাব্যগুরু। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সম্মান ছিল সর্বাধিক। কিন্তু ন' বছরের কনিষ্ঠ গালিব তখন জওকেয় কবি খ্যাতির হাই ওয়াটারমার্ক ছুঁই ছুঁই করছেন। অন্যান্য কারণের সঙ্গে এও মনে হয় উভয়ের বিরোধে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

পূর্ববর্তীদের মধ্যে খসরু ও মীর সম্বন্ধে গালিব উচ্চ প্রশংসা বাণী বলে গেছেন এবং সমসাময়িকদের মধ্যে নাসেখের উল্লেখ করেছেন। খসরু সম্বন্ধে গালিব বলছেন—

গালিব, মেরে কলাম মেঁ কেওঁন মজা হো,
পীতা হুঁ ধোকর খসরু শিরী সুখন কে পাও।
হে গালিব, কেন নাহি মোর বাণী হইবে মধুর,
মধু যার প্রতিকথা পান করি ধুয়ে নিত্য
দু'চরণ সেই খসরুর।

খসরু গালিবের বহু পূর্ববর্তী, ১৩শ।১৪শ শতাব্দীর লোক। মীর তকী মীর গালিবের অল্প পূর্ববর্তী। মীরের যখন মৃত্যু হয় গালিব তখন ত্রয়োদশ বৎসরের বালক। কিন্তু তখনই পারসী কবিতায় তিনি হাত জমাতে শুরু করেছেন। গালিবের এ সময়কার রচনার উল্লেখ করে মীর বলেছিলেন, উপযুক্ত পরিচালনা পেলে এই বালক শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারবে। পরবর্তীকালে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত মীরের কবি খ্যাতির স্বীকৃতি দিয়ে এবং সমসাময়িক কবি নাসেখের কথার সমর্থনে গালিব বলেছেন

বলেছে যেমন নাসেখ তেমন মোর বিশ্বাসও এই,
মীরের নামটী শোনেনি যে তার শ্রবণেন্দ্রিয় নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন দেখি যে জওক সম্বন্ধে গালিবের আন্তরিক সশ্রদ্ধ উক্তি তেমন নেই, তখন পূর্বে উল্লিখিত বিরোধ বা অন্তত উভয়ের অপ্রীতির কল্পনা করতে সাধারণ পাঠকেরও কষ্ট হয় না। জওকের কথা বিশেষ করে এখানে বলছি এজন্য যে সমসাময়িক কবিকুলের মধ্যে কাব্যোৎকর্ষে একমাত্র জওকই গালিবের কাছাকাছি আসতে পেরেছেন। সার্ধশতাব্দীর ব্যবধানে আজও উর্দু কাব্যজগতে জওকের কবিখ্যাতি অম্লান রয়েছে।

স্বভাবতই জওকের সঙ্গে অসম বিরোধে গালিব ছিলেন দুর্বলতর পক্ষ। সম্রাট বাহাদুর শা'র কাব্যগুরুর যিনি প্রতিপক্ষ তাঁর পক্ষে কাব্যকৃতির উৎকর্ষ সত্ত্বেও প্রভাবশালী সমর্থক জোটানো সহজ ছিল না। তাছাড়া এ কথাও স্বীকার্য যে বহুবিধগুণ সত্ত্বেও গালিবের 'ভাইস'

ও উপেক্ষণীয় ছিল না। ফলে কবিকে হতে হয়েছিল অপদস্থ ও নতশির। কয়েকটি দ্বিপদীতে তাঁর এই সময়কার মনোভাব প্রতিফলিত দেখতে পাই। একটিতে কবি সখেদে আত্মাবমাননা করে বলছেন

হম কহাঁকে দানা থে কিস হুনর মেঁ একতা থে,
বেসব হুআ গালিব দুশমন আসমাঁ অপনা।
আমি কোথাকার জ্ঞানী কোন্ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কলাকার
অকারণ হে গালিব হল সবে দুশমন তোমার।

যাঁরা ছিলেন তাঁর ব্যথার ব্যথী, দুঃখ সুখের সঙ্গী, তাঁরাও একসময় তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যান। সেই বেদনা কবিকে গভীরভাবে বেজেছিল। নিজের দুঃখ দারিদ্র্যে তিনি জরজর। তার উপর নিকটতম বন্ধুদের এই বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর পক্ষে সহ্যের অতীত হয়েছিল। তাই দেখি একটি দ্বিপদীতে কবি আর্তনাদ করে উঠেছেন

কিয়া গমখারনে রিসোয়া, লগে আগ ইস মুহব্বৎ মেঁ,
ন লাওয়ে তাব জো গমকী ওহ মেরা রাজদা কেওঁ হো।
সমব্যথী মোর করে অপযশ, লাগুক আগুন, এই
তো প্রণয়।
দুঃখের তাপ সহেনা যাহার বন্ধু আমার কেন সে হয়।

আবার দুনিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত কবি গভীর হতাশায় বলছেন

বদ্‌নী কী উসনে জিসসে হমনে কী থী বারহা নেকী।
কি আর গালিব কহিব বারতা আপনার জমানার,
সেই করে বদী যার সনে আমি নেকি করি বারবার।

তবে কবি তো অবিবেচক নন। নিজের সম্পর্কে বা জাগতিক পরিস্থিতিতে তাঁর দৃষ্টি ছিল নির্মোহ, স্বচ্ছ। যখন আর সহ্য করতে পারেননি তখন হয়তো মর্মজ্বালায় আর্তনাদ করে উঠেছেন। কিন্তু স্বচ্ছদৃষ্টিতে সবকিছু বিচার করার মানসিকতায় ফিরে আসতে তাঁর বিলম্ব হয়নি। তাই যেমন দেখি পরাজিত কবি আপন দীনতা প্রকাশ করছেন বা কখনো বন্ধুজনকে করছেন দোষারোপ, তেমনি এ কথাও তিনি ভোলেন নি যে

নেকী—ভালো। বদী—মন্দ।

তাঁর ব্যথার প্রশমন করা সহজসাধ্য নয়। বস্তুত কবির দৃষ্টিতে জীবনের সঙ্গে ব্যথার সম্বন্ধই বোধ হয় অঙ্গাঙ্গী। তিনি বলেছেন, 'জীবন বন্ধন আর দুঃখের শৃঙ্খল আসলে সে দুই একই ভাই।' তাঁর এ জ্ঞানও ছিল যে দুঃখের দাবানল বহুদূর পরিব্যাপ্ত। তার খাণ্ডবদাহন থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। আমরা সকলে একই ব্যথার ব্যথী, একই দুঃখে দুঃখী। তাই যদিও নিদারুণ অভিমানে কবি বলেছেন :

করতে কিস মুহসে গুরবৎ কী শিকায়ৎ গালিব,
তুমকো বেমেহরীয়ে ইয়ারানে ওত্তন ইয়াদ নহীঁ।
কোন মুখে বিদেশের জানাইব অভিযোগ সব ?
ভুলি নাই দেশে মোর আছে কত নির্মম বান্ধব।

আবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি একথাও স্মরণ করেছেন, কার কাছে অভিযোগ জানাবেন ? কার কাছে দুঃখের প্রতিকার চাইবেন ? কেননা

দুঃখে আমার চাহি প্রতিকার যাহারে করি ভরসা,
হায় দেখি সেই মোর চেয়ে বেশি সয়েছে
দুঃখের কশা।

আগেই বলা হয়েছে যোদ্ধা পিতার সন্তান গালিব যোদ্ধা না হলেও ফাইটিং স্পিরিটটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। সারা জীবনই তিনি দুঃখের সঙ্গে জুঝে গেছেন, সাময়িক নতিস্বীকার করলেও চূড়ান্ত পরাজয় কখনও মেনে নেননি। দুঃখের পর দুঃখ এসেছে। কবি ঈশ্বরকে বলছেন, দুঃখ যখন এত দিলে তখন সে দুঃখ সহ্য করার জন্য আরো হৃদয় কেন দিলে না ? কেননা এত দুঃখ সহ্য করা তো একটা হৃদয়ের পক্ষে সম্ভব নয়—

মেরী কিসমৎ মেঁ গম গর ইতনা থা,
দিল ভী ইয়ারব কই দিয়ে হোতে।
এত দুঃখ হে বিধাতা লিখিলে গো ললাটে আমার
কেন তবে দিলে নাকো আরো হিয়া ব্যথা সহিবার।

বিধাতার কাছে তিনি অভিযোগ করেছেন, জীবন যদি আমার এত দুঃখকষ্টেই শেষ হয়ে যায়, তবে তুমি যে আমার রক্ষাকর্তা একথা আমি কি করে ভাবব ?

জিন্দগী অপনী যব ইস সকল সে গুজরী গালিব,
হমভী ক্যা ইয়াদ করেঙ্গে কে খোদা রখতে থে।
এমন করেই জীবন যদি কাটল গালিব ওরে,
কেমন করে ভাববো আমি রাখত খোদা মোরে।

তবে প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রলেপদাত্রী। সে এক হাতে লয় বোঝা, শূন্য করে দেয় অন্য হাতে। নতুবা মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে, সংসারে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না। সে কথারই প্রতিধ্বনি করে আমরা কবি গালিবকে বলতে শুনি:

ইশরতে কতরা হ্যায় দরিয়ামেঁ ফনা হো জানা,
দর্দকা হদ্‌সে গুজরনা হ্যায় দওয়া হো জানা।
জলের কণা যখন মেলে এসে নদীর বুকে সেইতো
শান্তি তার,
ব্যথার সীমা ছাড়ায় ব্যথা যবে সেই তো তখন
ব্যথার প্রতিকার?

আপন জীবনের ক্ষেত্রে এই উপমা টেনে এনে যেন সলজ্জ করি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—

রঞ্জকা খুঁগর হুআ আদমী তো মিটযাতা হ্যায় রঞ্জ,
মুশকিলে মুঝপর পড়ী ইতনী কে আসাঁ হো গয়া।
দুঃখ দহনে দহে যারে নিশিদিন, দুঃখ তাহার নাই,
আমি যে সয়েছি এত, সহা মোর সহজ হয়েছে তাই।

অভিজ্ঞ কবি শমার মতো নিজেকে জ্বালিয়ে তার আলোকে জীবনের পাঠ গ্রহণ করেছেন। সে পাঠ আমাদের জানাতে তিনি ভোলেন নি। তাঁর সে বাণী জ্ঞানের বাণী, গীতায় আমরা বহু পূর্ব্বেই তার সমার্থক বাণী শুনেছি। সে বাণী হল 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহঃ'। কবি জীবনে বহু দুঃখ সয়েছেন। সুখও যে না পেয়েছেন তা নয়। কিন্তু সে সুখ তাঁকে মাত্রা ছাড়াতে দেয়নি। গীতার ঐ বাণীর প্রতিধ্বনি করে কবি বলছেন, সুখ যদি আসে, শান্ত চিত্তে তাকে গ্রহণ কর। তাহলে দুঃখ যখন আসবে তা তোমাকে দগ্ধ করতে পারবে না:

'শাদীসে গুজর কে গম ন হোয়ে'।

আনন্দে লহ শান্ত চিত্তে দুঃখেতবে না রহিবে জ্বালা,
বসন্ত যেথা অনাগত, সেথা নাই হেমন্তের পালা।

আনন্দের স্বাদ তিনি জীবনে যে বেশি পেয়েছেন তা নয়। গৃহে শান্তি ছিল না। বাইরেও বহু ধোঁকা খেয়েছেন, যার উল্লেখ করে তিনি বলছেন, 'সেই করে বদী যার সনে আমি নেকি করি বারবার'। তবে সুখ যা পেয়েছেন তা পেয়েছেন সহানুভূতিশীল গুণীজনের সহবাসে। এর স্মরণে তিনি বলেছেন

ইশরতে সুহবতে খোবাহী গনীমৎ সমঝো,
ন হুয়া গালিব অগর উমরতবায়ী ন সহী।
গুণী সহবাসে শান্তি সর্বশুভকর,
না থাকে না থাক আয়ু শতেক বছর।

আর ভরসা ছিল তাঁর আপন অসীম সাহসে এবং আশাবাদে। আশার বাঁধনে বুক বেঁধে ছিলেন তিনি। দুঃখকষ্ট তো ছিলই। তবে তিনি জানতেন না তার মধ্যে কতগুলি স্থায়ী, কতগুলি সাময়িক। জফর একটি দ্বিপদীতে বলেছেন

হাজারো দুঃখকষ্ট হিয়ার, নাহি জানি তার কত
হৃদয় আগারে মালিক, কত বা আছে অতিথির মত।

কিন্তু গালিবের আশা অপরিসীম। তিনি জানেন

রাতদিন গরদিশমেঁ হ্যাঁয় সাত অসমাঁ,
হো রহেগা কুছন কুছ, খবরায়েঁ ক্যা!
সপ্ত আকাশ হয় ঘূর্ণিত নিত্য দিবসযামি,
হতেই থাকবে কিছু নয় কিছু, ঘাবড়াই কেন আমি।

আর স্মরণীয় তাঁর সেই অতুলনীয় সাহস, যার বলে তিনি এমন কথা বলতে পেরেছেন যাতে গোঁড়া ধর্মধ্বজীদের ভ্রূ উত্তোলিত না হয়ে পারে না

ওফাদারী বশর্ত্তে উস্তোয়ারী অসলে ইমাঁ হ্যায়,
মরে বুৎখানেমেঁ তো কাবেমেঁ গাড়ো বরহমনকো।
আসল ধরম রয় অবিচল নিষ্ঠার আধারে,
মন্দিরে মরিল বিপ্র, সমাধি কাবায় দেও তারে।
ইমাঁ মুঝে রোকে হ্যায় তো খীচে হ্যায় কুফর,
কাবা মেরে পিছে হ্যায়, কলিসা মেরে আগে।
এক দিকে মোর ধর্ম, অন্য দিকে অন্য ধর্ম টানে,

পশ্চাতেতে কাবা মোর, দেবালয় সম্মুখের পানে।

অথবা স্মরণ করা যেতে পারে তাঁর সেই অবিশ্বাস্য সদম্ভ উক্তি :

গিরণী থী হম পে বর্কে তজল্লী ন তুর পর,
দেতে হ্যায় বাদহ জর্ফে কদহখার দেখ কর।
ঠিক ছিল পড়া মোর 'পরে বাজ তুরের উপরে নয়,
তাকত দেখিয়া পান কারকের মস্তো দেওয়া হয়।

অথবা

কফসমেঁ রুদাদে চমন কহতে ন ডর হমদম,
গিরীহো জিসপে কল বিজলী ওহ মেরা আশিয়াঁ কেওঁ হো।

বন্ধু, বাহিরে বাগিচার কথা কহিতে কর না ডর,
কালিকে বজ্র পড়েছে যেথায় হোক না সে মোর ঘর।

কিন্তু হায়, এত সব বলা কওয়ার পরেও 'বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি'র ন্যায় আমাদের মনে সেই মর্মান্তিক লাইনগুলি জেগে থাকে, যার কারুণ্য থেকে কোনো গালিব পাঠকেরই অব্যাহতি নেই। কি করুণ ক্যানডিড ও অসহায় সেই লাইনগুলি। ভাবতে অবাক লাগে, আরবের তুর পাহাড়ের পরিবর্তে নিজ শিরে যিনি বজ্রকে আহ্বান করেছেন, নিচের লাইনগুলি কি সেই মহাবীর্যধরেরই লেখা। আর যদি তাঁরই লেখা হয় তবে কত গভীর ও মর্মান্তিক সেই বেদনা যার কাছে পরাজয় স্বীকার করে অসহায় কবি এমন করুণ হাহাকার করেছেন :

রহিয়ে অব অ্যায়সী জগহ্ চলকর জহাঁ কোই ন হো
হম সুখন কোই ন হো অওর হমজবাঁ কোই ন হো।
বেদর ও দিওয়ার সা এক ঘর বনানা চাহিয়ে,
কোই হমসায়া ন হো অওর পাসবাঁ কোই ন হো।
পড়িয়ে গর বীমার তো কোই ন হো তিমারদার
অওর অগর মর জাইয়ে তো নোহাখার কোই ন হো।

সেই ঠাঁই যেয়ে রহিব এবার যেথানে কেহই নাই,
লেখার সঙ্গী নাহিক, কথার সঙ্গী কেহই নাই।
দরোজা দেওয়াল রবে না এমন বানাব একটি ঘর,
প্রতিবেশি কেহ নাহি, রক্ষক আমার কেহই নাই।
যদি ব্যাধি হয় সেবার হস্ত বোলাতে রবে না কেউ,
আর যদি মরি দু' ফোঁটা অশ্রু দেবারো কেহই নাই।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত কাব্যানুবাদগুলি প্রবন্ধকারের স্বকৃত।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

১২

বন্দরের কাল হল শেষ।

জাহাজ তার দড়িদড়া খুলে নোঙর তুলে আবার নতুন করে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে আর এক নতুন দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

জর্জ কার্ভার আইওয়া কৃষি বিদ্যালয় ছেড়ে টাস্কেগিতে চলে যাওয়া স্থির করলেন। এমন চমৎকার চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া তাঁর বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই অনুমোদন করলেন না। কিন্তু তাঁর এ সিদ্ধান্ত সব দিক দিয়েই যে একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ আইওয়া রাষ্ট্রীয় কৃষি বিদ্যালয় শুধু সুপ্রতিষ্ঠিতই নয় তার খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং জর্জ কার্ভারের চাকরিও পাকা। অল্পদিনের মধ্যে তিনি যে সুখ্যাতি করেছেন তাতে এখানে থাকলে ভবিষ্যতে আরো অর্থ, আরো খ্যাতি অর্জন করার তাঁর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও, এর আগেও আরো বহু বড় বড় এবং বিখ্যাত কলেজ থেকে তাঁর ডাক এসেছিল, কিন্তু সব আহ্বানই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই সবগুলি বিচার করলে টাস্কেগি কলেজ একেবারেই নগণ্য, সেখানে উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

১৮৮১ সালে টাস্কেগি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বুকার টি ওয়াশিংটনের বিরাট স্বপ্নের উপরই শুধু এই কলেজ দাঁড়িয়ে আছে—অর্থ-ভাণ্ডার শূন্য, দেশে এত তো ধনী কোটিপতি ব্যক্তি আছেন কিন্তু কেউই কলেজটিকে বাঁচাবার জন্য বদান্যতা দেখান না। এখানে যারা অধ্যাপনার কাজ করতে আসেন তাঁরা অর্থের প্রয়াসী হয়ে আসেন না। আসেন আদর্শের জন্য যুদ্ধ করতে। নিগ্রোজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধই তাঁদের এখানে টেনে আনে। তাঁরা বেতন পান যৎসামান্য। ছাত্রদের পায়ে জুতো নেই, তারা নগ্নপায়ে চলাফেরা করে, অর্ধাশনে দিন কাটায়। সবচেয়ে বড় কথা, যে জমির ওপরে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত সে জমি কৃষিকাজের মোটেই উপযুক্ত নয়, মাটি তার রুক্ষ, কঙ্করময়, অনুর্বর। তথাপি বুকার টি ওয়াশিংটন এখানেই তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন, নিগ্রোজাতির শিক্ষকদের শিক্ষণ দেবার উদ্দেশ্যে টাস্কেগি শিক্ষায়তন গড়ে তুলেছেন। জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের মতো তিনি নিজেও একজন ক্রীতদাস হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একমাত্র নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে জীবনে উন্নতি করতে পেরেছেন, শিক্ষাজগতে বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়েছেন। নিজের জন্য তাঁরও উজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত এক ভবিষ্যৎ ছিল, বিপুল সমৃদ্ধি ও সম্মানের সম্ভাবনাময় জগৎ ছিল, খ্যাতির সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করার সোপানশ্রেণী তাঁর সামনে ছিল, কিন্তু সে সবই তিনি হেলায় অগ্রাহ্য করেছেন শুধু একটিমাত্র লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য—সে লক্ষ্য হল নিগ্রোজাতির উন্নতিকল্পে তার সেবায় আত্মনিবেদন।

জর্জ কার্ভারের মন এক বিষম ঝড়ে প্রবলভাবে আন্দোলিত হতে লাগলো, নিজেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমিও কেন তবে এমন হতে পারবো না? জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গকারী বলিষ্ঠ আদর্শে অনুপ্রাণিত এমনি একজন যোদ্ধা? বহুদিন আগে পড়েছিলেন ডাঃ ওয়াশিংটনের কয়েকটি বক্তৃতা, তার কথাগুলি জর্জ কার্ভারের মনের মধ্যে উদিত হল। আটলান্টা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়

ডাঃ ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছিলেন, তাদের মতো এত ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, বিশ্বাসী এবং ন্যায়পরায়ণ ও আইনভীরু জাতি পৃথিবীতে খুব কম আছে। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সমাবেশে সংগঠিত নিখিল মানবজাতির প্রতীকরূপে তিনি তাঁর নিজের পেশীবহুল বলিষ্ঠ হাতখানি ঊর্ধ্বে উত্থিত ও আন্দোলিত করে বলেছিলেন, "সম্পূর্ণরূপে সামাজিক যে জিনিষগুলো সেগুলোকে আমরা আমাদের হাতের পাঁচটা আঙ্গুলের মতো একের থেকে অন্যকে আলাদা করতে পারি, কিন্তু প্রত্যেকটা আঙ্গুলই যেমন আমাদের কাজে লাগে ঠিক তেমনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের সব মানুষের মধ্যেকার বিভেদ ও বৈষম্য দূর করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলা একান্ত আবশ্যক।"

ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন নিজের জাতির লোকদের দাবিয়ে রেখে তাদের ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাননি, বরং তাদের সবার সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে তাদের সুখে দুঃখে সমব্যথী হয়ে, তাদের আপনজন হয়ে তাদের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, সর্বপ্রকার অসাম্য, দারিদ্র্য এবং দুঃখ থেকে মুক্ত করে তাদের আগাতে চেয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন নিগ্রোজাতির কল্যাণেই তাঁর নিজের কল্যাণ, তাদের উন্নতি সাধন করে আপন উন্নতি চেয়েছিলেন তিনি। জর্জ কার্ভারেরও এখন থেকে জীবনের এই একই-ই উদ্দেশ্য হবে। তিনি ডাঃ ওয়াশিংটনের চিঠির উত্তরে লিখলেন "আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম। আমি শীঘ্রই আসছি।"

১৩

এম্‌স ছেড়ে জর্জ কার্ভার যেদিন টাস্কেগি অভিমুখে রওনা হলেন সেদিনটির কথা তাঁর জীবনে অম্লান অক্ষয় হয়ে রইলো। সেদিনের স্মৃতি তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি। অধ্যাপক এবং ছাত্ররা এক সভায় মিলিত হয়ে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন। অধ্যাপক উইলসন তাঁর স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ জর্জ কার্ভারকে বেশ বড় ও চমৎকার একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র উপহার দিলেন। বিদায় নেবার সময় জর্জ দেখলেন ছাত্র এবং অধ্যাপক সবার মন প্রিয়জন বিচ্ছেদে ভারাক্রান্ত, সবার চোখই অশ্রুসজল।

ট্রেনে যেতে যেতে সারাক্ষণ জর্জ কার্ভারের এই বিদায়ের দৃশ্যই মনে পড়লো। তাঁকে নিয়ে ট্রেন দক্ষিন দিকে ছুটে চললো, পিছনে পড়ে রইলো মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার সুসমৃদ্ধ সমতল ভূমি এবং শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সুবিশাল বিস্তৃত অঞ্চল। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন প্রবেশ করলো তুলার সাম্রাজ্যে। যেদিকেই দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে দিগন্তবিস্তৃত তুলার ক্ষেত। নদীর ঢেউয়ের মতো বাতাসে তুলার গাছগুলি দুলছে। ট্রেনে যাবার সময়ে পথের দুধারে যেসব জিনিষ জর্জ কার্ভার দেখলেন সবই যেন তাঁর ভালো লাগলো, সবকিছুই তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেললো, তিনি এসব জিনিষ আগে কখনো নিজের চোখে দেখেননি, বই পড়ে জানা এক কথা এবং নিজের চোখে দেখে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা অন্য কথা।

এখন ফসল কাটার মরশুম। গাছ থেকে তুলা আহরণ করার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ঝুড়ি নিয়ে মাঠে নেমেছে। ঝুড়ি ভরে আহরণ করার কাজে সবাই ব্যস্ত কোন দিকে তাকাবার বা এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেবার কারুর সময় নেই। সবাই মাথা নীচু করে তুলা আহরণ করছে, তবু এরই ফাঁকে ট্রেনের আওয়াজ শুনে অনেকে মাথা উঁচু করে একবার তাকায়, ট্রেন দেখে তারপর মুহূর্তের মধ্যে আবার কাজে ডুব দেয়। কিন্তু জর্জ কার্ভার কী দেখলেন লোকগুলির মধ্যে? দেখলেন, ম্লানমুখ, শুকনো চোখ, উপবাসে ক্ষীণ কতগুলি মানুষ পশুর মতো খাটছে। তারা আজন্ম ক্রীতদাস, জন্ম থেকেই শ্বেতাঙ্গ মালিকদের হুকুমের দাস, তাদের সেবার জন্য জন্ম থেকেই বলি হয়ে আছে। কিন্তু এ অবস্থা শুধু কি এখানে এই জায়গাটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে? না, জর্জ কার্ভার যদি পুবে, পশ্চিমে কিংবা দক্ষিণে আমেরিকার আরো হাজার হাজার মাইল পথ ঘুরে বেড়ান তবে এমনি অগণ্য অসংখ্য, আরো কয়েক লক্ষ

হতভাগ্য মানুষের সাক্ষাৎ পাবেন। তাদের সবার এই একই দুঃখ, একই বেদনা, একই অভিশাপ।

জর্জ কার্ভার আজ চলেছেন তাদের সবার জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে, যে সুবিপুল কর্মভার সামনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে তাও তো তাদেরই মঙ্গলের উদ্দেশ্যে।

এ রাজ্যে শুধু একটাই ফসলের চাষ, সে হচ্ছে তুলো। দিগ-দিগন্ত জোড়া মাঠগুলিতে তুলোর গাছগুলি বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছে, যেদিকে চোখ ফেরানো যায় সেদিকেই চোখে পড়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপরকার শাদা ফেনার মতো রাশি রাশি সাদা তুলো। কালো মানুষগুলির কুঁড়েঘরগুলির দরজা অবধি তুলোর ক্ষেত এগিয়ে এসেছে। কোথাও একটুকু ফাঁকা জায়গা নেই। ফুল, লতাপাতা, শাকসব্জী অথবা অন্য কোন রকমের কোন গাছ বলতে গেলে প্রায় চোখেই পড়ে না। তুলোর ব্যবসা সব চাইতে লাভজনক বলে সবাই তুলো ছাড়া আর কিছুরই চাষ করে না। প্রতি গাঁইট তুলো বিক্রী করে তুলোর ব্যবসায়ীরা আশাতীত মুনাফা লাভ করে, এই কারণেই শ্বেতাঙ্গ মালিক কিংবা ভাগ্যক্রমে দুএকজন নিগ্রো যদি কোনভাবে জমির মালিক হয়ে বসতে পারে তারা সবাই-ই তুলোর চাষ ছাড়া আর কিছুর চাষ করতে চায় না। এমনি ভাবেই তুলোর চাষ এত জনপ্রিয় হয়েছে এবং দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকার ফলে আমেরিকার দাক্ষিণাঞ্চলে এখন শুধু তুলোর চাষেরই একাধিপত্য। বছরের পর বছর ধরে একই জমিতে বারংবার শুধু তুলোরই চাষ চলতে থাকার ফলে জমির মাটি রসহীন শুষ্ক ঝাঁকড়া হয়ে গিয়েছে। আরো জমি চাই, আরো জমি—জমির মালিকদের অনন্ত জমির ক্ষুধা, যতই জমি তারা পায় ততই আরো চায়। নতুন নতুন জমি, অনেক, অফুরন্ত জমি। ঝোপ-ঝাড় বনজঙ্গল আবাদ হয়ে জমি তৈরী হচ্ছে। বড় বড় গাছগুলি শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে লাঙ্গল দিয়ে চষে মাটি সমান করে নিয়ে হাজার হাজার মাইল জায়গা জুড়ে তৈরী করা হয়েছে তুলোর ক্ষেত।

এমনিভাবে বনজঙ্গল কেটে সব পরিষ্কার করে ফেলার ফলে বৃষ্টি গিয়েছে কমে, মাটির রস গিয়েছে শুকিয়ে, তৃষাদীর্ণ পাণ্ডুর সেই মরুক্ষেত্রে উর্বরা শক্তি লোপ পেয়েছে। কোথাও যদি একটুও উর্বরা মাটি অবশিষ্ট থেকে থাকে প্রবল বর্ষার জলধারার সঙ্গে মিশে সেই মাটিটুকুও ধুয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে। বন্যা প্রতিরুদ্ধ হয় না, ঝড় যখন আসে, তাণ্ডব নৃত্যে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়; তুলোর গাছগুলি মাটিতে শুয়ে পড়ে। আবার গ্রীষ্মকাল যখন আসে, তার দারুণ দাবদাহে মাটি ফেটে চৌচির হয়, আর মাটির সেই অসংখ্য ফাটলের মধ্য দিয়ে উষ্ণ বাষ্প ধোঁয়ার আকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো গর্জাতে গর্জাতে বেরিয়ে আসে, ফোঁস ফোঁস শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। বিষের মতো তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসা সেই উষ্ণ বাষ্পের। সে বাষ্প নাকে গেলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

১৮৯৬ সালের ৮ই অক্টোবর খুব ভোরবেলায় জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার টাস্কেগি শহর থেকে চার মাইল দূরবর্তী চেহ নামে ক্ষুদ্র একটা রেল স্টেশনে নামলেন। লোকজনের একদম ভিড় নেই। শাখা রেলপথের একটা ক্ষুদ্র স্টেশন। গাড়ী থেকে নেমে জর্জ কার্ভার চারদিকে তাকাতে লাগলেন, পথের সন্ধান জেনে নেবার জন্যে কাউকে পান কিনা, অথবা তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন কারুকে স্টেশনে পাঠিয়েছেন কিনা।

একটি ছোট ছেলে দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। বালকটি জর্জকে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনিই কি অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার?"

জর্জ কার্ভার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। ছেলেটি বললো, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি, ডাঃ ওয়াশিংটন আমাকে পাঠিয়েছেন।" এই বলে ছেলেটি একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে নিয়ে এলো।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সেই গাড়ীতে উঠে বসলেন, ছেলেটি তাঁর দিকে মুখ করে সামনের আসনটাতে বসলো।

ফিটন গাড়ীটা চলতে আরম্ভ করলো।

গ্রীষ্ম কাল।

সারা রাস্তা পাউডারের মতো লাল ধুলোয় ভরা। ঘোড়ার খুরের আঘাত লেগে সেই লাল ধুলো কেবলই আকাশে উঠছে, মনে হচ্ছে আকাশ যেন রক্তবর্ণ মেঘে ঢাকা। সমস্ত দেশটাই থকথকে লাল রঙের কাদামাটি দিয়ে ভর্তি। গাড়ীর দুপাশে তাকিয়ে দেখলেন জর্জ কার্ভার, গাছপালা ঝোপঝাড় কিছু বলতে কিছু নেই। ফুল নেই, ফুল গাছও নেই মানুষের নেড়ামাথার মতো মাঠঘাট সব পরিস্কার। অনাবৃষ্টির দরুণ জলের অভাবে গাছ—গাছালি সব মরে শুকিয়ে গিয়েছে।

যেতে যেতে পথের দুধারে কতগুলি জীর্ণ ছাউনি দিয়ে আবৃত খামারবাড়ী আর ঠেকনো দেওয়া কুড়ে ঘর দেখা গেল। ঘরবাড়ীর এমনি হতভাগ্য জীর্ণ চেহারা যে, দেখে কোন ক্রমে মনেই হয় না এখানে মানুষ বাস করে। গাড়ী যতই টাস্কেগি শহরের দিকে এগোতে থাকে দুপাশের ভাঙা তালি দেওয়া কুড়েঘরগুলি দেখে জর্জ কার্ভারের মন ততই ব্যথায় ভারী হয়ে ওঠে। কী শোচনীয় আর পঙ্কিল দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা! অপমান, লাঞ্ছনা আর দারিদ্র্যের এমন মেশামেশি জর্জ কার্ভার জীবনে আর কখনো দেখেননি। তাঁর দুচোখ কখন যে জলে ভরে গিয়েছে তা তিনি টেরও পাননি।

এইসব দৃশ্য দেখে জর্জ কার্ভারের মনে চিন্তা দেখা দিল—স্কুলবাড়ীটারও হয়তো এমনি জীর্ণ দশাই হবে, এমনি ভাঙাচোরা, এমনি দারিদ্র্যের ছাপ গায়ে জড়ানো কিংবা হয়তো অন্যরকমও হতে পারে।

জর্জ কার্ভার মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলেন, স্কুলবাড়ী দেখে প্রথম তাঁর কোন কথাটা মনে হবে! তিনি কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলেন, আসবার সময়ে পথে দেখে আসা দিগন্তজোড়া মাঠের মতো প্রকাণ্ড একটা তৃষাদীর্ণ মাঠের মধ্যস্থানে স্কুলবাড়ীটা ঠিক যেন মরুভূমির মাঝখানে ওয়েসিসের মতো, শস্যশ্যামল এবং ফুলে ফলে ভরা নয়ন মন জুড়ানো বনবীথি দিয়ে ঘেরা মরুদ্যান। স্কুলের সামনে রয়েছে মখমলের মতো সবুজ নরম ঘাসে ঢাকা মাঠ আর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সুবিন্যস্ত একটি প্রাঙ্গণ।

জর্জ কার্ভার একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, তাই জানতে পারলেন না তাঁর গাড়ী কখন এসে টাস্কেগি শিক্ষাভবনের প্রাঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। যেদিকে দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে বালি, শুধুই বালি চারদিকে। আর থকথকে লাল রঙের কাদা। বৃষ্টি পড়ে তা আঠার মতো চট্‌চটে হয়ে আছে। হাঁটতে গেলে সেই কাদায় মধ্যে পা ডুবে যায়। পায়ে একবার সেই কাদা লাগলে সহজে আর তা ছাড়ানো যায় না। কোথাও কোথাও সেই কাদার স্তর এত গভীর যে, একবার তার মধ্যে গিয়ে পড়লে তা চোরাবালির মতো দেহটাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। তার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে মানুষ অনায়াসে মারা যেতে পারে।

জর্জ কার্ভার গাড়ী থেকে নেমে প্রধান সড়ক দিয়ে এগিয়ে চললেন। রাস্তা হাঁটু সমান ধুলোয় ভর্তি। বর্ষার সময়ে এই ধুলোও কাদার সমুদ্রে পরিণত হয়। এগিয়ে যেতে যেতে জর্জ কার্ভার দেখলেন, রাস্তার দুধারে এখানে সেখানে মোটা মোটা অক্ষরে সাইন বোর্ড লেখা আছে "ঘাসের ওপর দিয়ে চলা নিষেধ", কিন্তু কোথাও ঘাসের চিহ্ন পর্যন্ত জর্জ কার্ভারের চোখে পড়লো না।

সেই পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে জর্জ কার্ভারের চোখে পড়লো কোথাও নড়বড়ে কাঠের বাড়ীর ভগ্নপ্রায় অন্তিম অবস্থা, কখনো বা ভাঙা অট্টালিকার স্তূপ। তেমনি একটা ইটের তৈরি বাড়ীর গায়ে নাম লেখা রয়েছে, চোখে পড়লো জর্জ কার্ভারের 'অ্যালবামা হল,,। বাড়ীটা বেশ বড়। তার পিছন দিকে আকাশের গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন মনের সুখে পাখা মেলে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

শহরের এক প্রান্তে পোড়ো বাড়ীর মতো নির্জন নিস্তব্ধ এই স্কুলবাড়ীটা দেখে প্রথম দিন জর্জ কার্ভারের মনে হয়েছিল, এমন হতশ্রী ও হতভাগ্য চেহারার বাড়ী তিনি জীবনে দেখেননি। বহুদিন পরে একবার মিস বাডের কাছে একখানি চিঠিতে এই স্কুল প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, এমন হতশ্রী দৈন্যদশার চেহারা আমি আর কখনো দেখিনি। বাড়ীগুলোর মাঝে মাঝে

জায়গায় জায়গায় এত বড় সব ফাটল রয়েছে যে, তার মধ্য দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় পর্যন্ত অনায়াসে গলে যেতে পারে।

স্কুল বাড়ীতো নয়, মাটির বুকে নুয়ে পড়া কতগুলি সারি সারি ঝুপড়ি ঘর। ভিতরে ঢুকতে হলে মাথা নুইয়ে যেতে হয়। এইগুলি হল ক্লাশ ঘর, একটা অর্ধেক তৈরি করা ধোপাখানা, একটা ক্ষুদ্র কামারশালা, আর কাঠ চেরাই করার করাতকল বসানো ছুঁতোর মিস্ত্রীর একটা কারখানা। এই কয়েকটা জিনিষই হল টাস্কেগি শিক্ষাভবনের মোটামুটি উল্লেখ করার মতো বিষয়।

জর্জ কার্ভারকে যে ছেলেটি স্টেশন থেকে গাড়ী করে নিয়ে এসেছিল এবং এইসব জিনিষগুলি তাঁকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল, একটা প্রশ্নের জবাবে সে জানালো, এ স্কুলে কোন ফুলফলের বাগান নেই, গাছগাছালি সংরক্ষিত করে রাখার জন্য কোন কাচের আধার নেই, এমন কি একটা গবেষনাগার পর্য্যন্ত নেই বিজ্ঞান শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য। শিক্ষাভবনের অগোছাল কাজকর্ম এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা রকম গলদ দেখে জর্জ কার্ভার যেন কিছুটা আশাভঙ্গ জনিত বেদনায় নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু সঙ্কিত হলেন।

শিক্ষাভবনের পিছন দিকে আকাশের বুকে দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা শকুন শোঁ করে আকাশ থেকে নেমে এসে রান্নাঘরের কাছে জমা করা জঞ্জালের স্তূপের উপর বসলো, একটা নর্দমা কেটে তার মধ্যে রাশিকৃত আবর্জনা জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখান থেকে জঞ্জাল অন্যত্র সরিয়ে নেবার কোন বন্দোবস্ত করা হয়নি।

ছেলেটি জর্জ কার্ভারকে টাস্কেগি শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষের অফিস ঘরে নিয়ে গেল। অতি সাধারণ, আসবাবপত্র হীন এবং বাহুল্যবর্জিত একখানা ঘর। টেবিল, চেয়ার ঘড়ি এবং আরো কয়েকটা একান্ত আবশ্যক জিনিষ ছাড়া আর কিছু নেই সে ঘরের মধ্যে।

কিন্তু যে মুহূর্তে ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটনের সঙ্গে জর্জ কার্ভারের প্রথম দেখা হল সেই মুহূর্তেই তাঁর মনের সমস্ত হতাশার ভার দূর হয়ে গিয়ে মন স্বচ্ছ ও পরিস্কার হল। নবসূর্য্যালোকদীপ্ত মেঘমুক্ত নির্মল নীল আকশের মতো তাঁর ম্লান মুখখানাও আশায় আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। ডাঃ ওয়াশিংটনের সঙ্গে করমর্দন হল তাঁর। কী বিরাট বৃষস্কন্ধ পুরুষ, মুখে তাঁর এক দৃঢ় বলিষ্ঠ সঙ্কল্প এবং কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের ভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা। তাঁর দিকে একবার দৃষ্টি পড়লে প্রথমেই মনে হবে তিনি কারুর হুকুম তামিল করার জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নি, বরং অন্যে তার হুকুম তামিল করবে, তাঁর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব মেনে চলবে, এইটাই স্বাভাবিক। অন্যের ওপরে আধিপত্য করার সহজাত ক্ষমতা নিয়েই যেন তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁকে দেখে জর্জ কার্ভারের আর বিস্ময়ের অবধি রইলো না গ্রীসের পুরাণে বর্ণিত বীর অ্যাটলাসের কথা তাঁর মনে উদিত হল। পৃথিবীকে অ্যাটলাস আপন শক্তিবলে নিজের পিঠের উপর ধারণ করে রেখেছিল। তথাপি ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটনের চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তাঁর বিরাট কষ্টিপাথরে তৈরি কালো মূর্তি ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। তা হল তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় উদ্দীপ্ত স্বপ্নভরা আয়ত দুইটি চক্ষু, আর তার জলন্ত দৃষ্টি।

জর্জ কার্ভারকে দেখে ডাঃ ওয়াশিংটন নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে গভীর আগ্রহে তাঁকে স্বাগত জানালেন, স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের এই শিক্ষাভবন দেখে আপনার মনে কি ধারণা জন্মালো, বলুন"।

জর্জ কার্ভার উত্তর দিলেন, "মনে হচ্ছে এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।"

প্রথম দর্শনেই ডাঃ ওয়াশিংটন এবং জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার দুজনেই দুজনের প্রতি এমন গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁদের মধ্যে এমন একটা প্রীতি ও সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে উঠলো যে সম্পর্ক কোনদিনই ভাঙেনি। তাদের মধ্যেকার এই আত্মীয়তার গ্রন্থিবন্ধন চিরস্থায়ী হয়ে নিগ্রোজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করেছিল। ডাঃ

ওয়াশিংটন জর্জ কার্ভারকে বললেন, "আপনার মতো একজন প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক যে আমাদের এই ক্ষুদ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে যোগ দেবেন এ আমরা আশাই করতে পারিনি। আপনি দয়া করে এসেছেন, এতে আমরা কত যে আনন্দিত তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। বহুদিন ধরে আপনার মতো অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক আমি খুঁজছিলাম। কিন্তু আমাদের আর্থিক সামর্থ্য কম বলে আমরা আপনার মতো বড় অধ্যাপককে পাবার আশা করতে পারিনি। আমাদের এই শিক্ষায়তনে যিনি আসবেন শুধু শিক্ষাদানের যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাঁর বিচার করলে চলবে না। আমি এমন একজন শিক্ষককে পেতে চেয়েছিলাম যার মন হবে হীরকের মতো ধারালো উজ্জ্বল আর হৃদয় হবে স্বার্থলেশহীন, উদার এবং মহৎ। আপনাকে পেয়ে মনে হচ্ছে, আমার সেই আশা পূর্ণ হবে।

জর্জ কার্ভার বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, "আমি জানি না আপনার প্রত্যাশা আমি কতখানি পূর্ণ করতে পারবো। আপনি আমার সম্বন্ধে যে ছবি মনের মধ্যে এঁকে রেখেছেন আমি তার উপযুক্ত হতে পারবো কিনা, তাও ঠিক জানি না। কিন্তু একটা কথা স্থির জানি এবং আপনাকে বলতেও পারি সে কথা, আমি আমার চেষ্টার ত্রুটি করবো না।

ডাঃ ওয়াশিংটন বললেন, "কৃষিভবন নির্মাণ করার জন্য আমাদের জায়গা ঠিক করে রাখা আছে। এখন অবশ্য সেখানে শুধু মাত্র একজন লোকের জন্যই বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়েছে, সেই ঘরখানাই হবে একাধারে তার ড্রয়িং রুম এবং শয়নকক্ষ। আপনাকে যে বিভাগটির দায়িত্ব দেব বলে আমরা স্থির করেছি বাস্তবে তা এখনো রূপ পায়নি, শুধু পরিকল্পনার মধ্যেই নিবদ্ধ রয়েছে। আরও একটা কথা, আপনাকে গবেষণাগার তৈরি করে দেবার ক্ষমতা বা অর্থ কোনটাই নেই আমাদের, কাজেই আপনার গবেষণাগার আপনাকেই বানিয়ে নিতে হবে আপনার নিজের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যে কর্মশালায় প্রতিনিয়ত আপনার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই কর্মশালায়।

জর্জ কার্ভার উত্তর দিলেন, "সে সব ব্যবস্থা আমি করে নেব।"

টাস্কেগি মহাবিদ্যালয়কে গড়ে তোলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব জর্জ কার্ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন। সেই কাজই হল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। সেই কাজেই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। কাজ তো নয়, রীতিমত কঠোর সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন প্রাণান্তকর পরিশ্রম। জর্জ কার্ভার সেই প্রাণান্তকর পরিশ্রমই করতে লাগলেন অসীম অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে।

অর্থ নৈতিক সংকট তো রয়েছেই, সেটা বড় কথা নয়, তার উপরেও আছে দাক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী স্বার্থবুদ্ধিপরায়ণ কিছু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ মালিকদের বিরুদ্ধাচরণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তখন শাদা-কালার ব্যবধান সুস্পষ্ট করে রাখার জন্য অনেক অন্যায় ও অপমান জনক নিয়ম শ্বেতাঙ্গরা প্রবর্তন করে রেখেছিল। তার মধ্যে একটা নিয়ম ছিল শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে কালা আদমি অর্থাৎ নিগ্রোদের মাথা থেকে টুপি খুলে হাতে নিয়ে নিতে হত—সে শ্বেতাঙ্গ একজন কুলি অথবা দিনমজুর হলেও কালা আদমিরা তাকে এই সম্মান দেখাতে অবশ্যই বাধ্য। একজন ভদ্র ও শিক্ষিত নিগ্রো শিক্ষকের কাছ থেকেও শিক্ষা সংস্কৃতিহীন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ কুলি এই সম্মান দাবী করে এবং না পেলে তাকে অপমান করে, অত্যাচার করে, তার কাছ থেকে জোর করে এই সম্মান আদায় করে নেয়। শুধু কি তাই? সসম্মানে পথচলার অধিকার পর্যন্ত নিগ্রোদের নেই। একজন শ্বেতাঙ্গকে দূর থেকে পথ দিয়ে আসতে দেখলেই নিগ্রোকে পথ ছেড়ে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। শ্বেতাঙ্গরা এইভাবে প্রতি পদে পদে নিগ্রোদের অপমান করে সমাজে ও রাষ্ট্রে তাদের স্থান কত নীচে সেটা স্পষ্টাক্ষরে বুঝিয়ে দেয়।

শ্বেতাঙ্গদের এই নিষ্ঠুরতা, অন্যায় অত্যাচার ও ঘৃণ্য

ব্যবহার সময়ে সময়ে এমন চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে তার ফলে হিংসা, হানাহানি ও প্রচুর রক্তপাত পর্যন্ত ঘটেছে। একদিন আমেরিকার উত্তরাঞ্চল থেকে সদ্য আগত একজন নিগ্রো শিক্ষক পার্শ্ববর্তী শহর মণ্টগোমারিতে একটা দোকানে নেকটাই কিনতে গিয়েছিলেন। শো কেসে সাজিয়ে রাখা নেকটাইগুলির মধ্যে একটাও তার পছন্দ না হওয়ায় যেই তিনি দোকান থেকে বের হবার জন্য পা বাড়িয়েছেন অমনি দোকানী কর্কশ গলায় বলে উঠলো, "এতগুলি টাইর মধ্যে একটাও পছন্দ হল না?"

"না, এর একটাও আমি পছন্দ করতে পারছি শিক্ষকটি উত্তর দিলেন।

কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো দোকানদার হঠাৎ এমন ভয়ঙ্কর রেগে চীৎকার করে উঠলো কেন, শিক্ষকটি তা বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এ কথাটা জানা ছিল না যে, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে নিগ্রোদের কথা বলতে হলে প্রথমেই "আজ্ঞে, হ্যাঁ" ইত্যাদি কথাগুলো বলে বাক্যালাপ শুরু করতে হয়। শিক্ষকটি তা করেননি বলেই এই বিভ্রাট।

কিন্তু এ বিভ্রাট সহজেই শেষ হল না। শিক্ষকটি আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য কি যেন বলতে গেলেন অমনি সেই দোকানদার অতর্কিতে একখানা ছুরি বের করে তাঁর গায়ে বসিয়ে দিল, কিন্তু আঘাত তত গুরুতর নয় বলেই শুধু রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা শেষ হল।

সেই নিগ্রো শিক্ষকও এই মাশুল দিয়ে বেশ ভালো করেই উপলব্ধি করলেন, তাঁর যথার্থ স্থান কোথায়।

এই অসাম্য ও অবিচার, নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার দেখে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে জর্জ কার্ভারের মনে একটা বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠলো, তাঁর সমস্ত অন্তর তীব্র ঘৃণা ও অপমানের বিষাক্ত জ্বালায় বারবার আলোড়িত হতে লাগলো। এই অবস্থা খুব বেশীদিন চলতে দিলে গুরুতর বিপর্যয় ঘটবার আশঙ্কা আছে। তাই ডাঃ ওয়াশিংটন ভালো ভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে জর্জ কার্ভারকে শান্ত করলেন। সব শ্বেতাঙ্গরাই একরকম স্বভাবের নয়, তাদের মধ্যে অনেক ভালো লোকও আছে। তাদের আচরণ ভদ্র, স্বভাব মিষ্ট ও সৌজন্যপূর্ণ, ব্যবহার সংযত, তাদের অন্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত। জীবনের পথে চলতে চলতে এইসব লোকদের সঙ্গেও অনেক সময় দেখা হয়, কাজেই এদের কথা ভুললে চলবে না।

জর্জ কার্ভারের মন অবশেষে ডাঃ ওয়াশিংটনের উপদেশে শান্ত হল। তিনি শিক্ষাদান ব্রতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলেন। ছাত্রসমাজ জাতির মেরুদণ্ড, তাদের মানুষ করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে তিনি জাতিগঠনের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ছাত্রদের তিনি শেখাতে লাগলেন আত্মবিশ্বাস, স্বনির্ভরতা ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে কিভাবে জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করে মানুষের মতো বাঁচতে হয়, সেই সংগে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় হাতেকলমে কৃষিকাজও করতে শেখালেন।

টাস্কেগি শিক্ষায়তনের ছাত্ররা কৃষি কাজকে ছোট কাজ বলে মনে প্রাণে ঘৃণা করে, লেখাপড়া শিখে শেষে চাষা হবে; এই মনোভাবই তাদের ঘরছাড়া করেছে। কৃষিকাজ এড়াবার জন্যই তারা বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। অভাব, অনশন আর দারিদ্র্য—এই নিয়ে তারা বেঁচে ছিল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন লাঙল নিয়ে মাঠে জমি চাষ করেও তারা উপবাসী থাকতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের রৌদ্রদগ্ধ এবং পাথরের মতো কঠিন, অনুর্বর মাটিতে হাল চালনা করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে, কিন্তু তারা পায়নি কিছুই, শুধু কঙ্কালসার দেহ নিয়ে অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করাই সার হয়েছে, তাদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও অভাব অনটন দিনের পর দিন বেড়ে গিয়েছে।

জর্জ কার্ভার ছাত্রদের শুধু কৃষিকাজ শিখিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না, নতুন নতুন পদ্ধতিতে কিভাবে চাষ করতে হয় তা শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য জগতের সমুদয় বৃক্ষ লতা তৃণগুল্মের প্রতি তাদের অন্তরে মমত্ববোধও জাগ্রত

করলেন। গাছগাছালি, লতাপাতাকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে এবং গভীরভাবে ভালোবাসতে শেখালেন, গাছপালা কিভাবে জন্মগ্রহণ করে, ধীরে ধীরে বড় হয় সে সবের কিছুই তারা এতদিন জানতো না। জর্জ কার্ভার ছাত্রদের অন্তরে সেই জ্ঞানপিপাসা জাগিয়ে তুললেন, গাছপালার রহস্য জানবার জন্য তাদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করলেন। নতুন নতুন অনেক তথ্য ও জ্ঞানের সন্ধান দিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই জর্জ কার্ভার ছাত্রদের হৃদয় জয় করলেন, তাদের একান্ত প্রিয় শিক্ষক হলেন।

জর্জ কার্ভারের কৃষিশিক্ষার ক্লাশে প্রথম দিন ছাত্র হল মাত্র তেরজন। একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি ছাত্রদের ডেকে বললেন, "আজ আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিষ করতে যাচ্ছি। আমরা একটা কৃষি গবেষণাগার নির্মাণ করবো।"

একজন ছাত্র বললো, "কিন্তু স্যার, এ রকম গবেষণাগার নির্মাণ করার মতো জিনিষপত্র তো নেই আমাদের।"

জর্জ কার্ভার হেসে উত্তর দিলেন, "তোমরা ভাবছো কেন? জিনিষপত্রের কি কোন অভাব আছে? ভগবান আমাদের চারিদিকে কত অজস্র জিনিষ ছড়িয়ে রেখেছেন। কুড়িয়ে নিতে জানা চাই। সেইসব জিনিষ যদি আমরা কুড়িয়ে নিতে পারি তবে অনায়াসেই গবেষণাগার নির্মাণ করতে পারবো। চলো, এবার বেরিয়ে পড়া যাক।"

ছাত্রদের সংগে করে নিয়ে জর্জ কার্ভার সম্পূর্ণ অভিনব এক দিগ্বিজয়ে বের হলেন।

টাস্কেগি শিক্ষায়তনের প্রকাণ্ড বাড়ীটার পিছন দিকে রান্নাঘরের কাছে যে জঞ্জালের স্তূপ অনেক দিন ধরে জমা করে করে পাহাড়ের মতো করে রাখা হয়েছিল সেই স্তূপের মধ্য থেকে বেছে বেছে যতো রাজ্যের তুচ্ছ ও আবর্জনায় ফেলে দেওয়া জিনিষ যেমন, ভাঙা শিশি বোতল, মর্চে ধরা টিনের টুকরো, বৈয়ামের ঢাকনা, কড়াইয়ের হাতল, লোহার জাল ছাত্রদের সংগে একত্র হয়ে পরম উৎসাহে কুড়িয়ে এনে একটা জায়গায় জড়ো করলেন। ছাত্ররা পাগলা মাষ্টারমশাইর এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক না হয়ে পারলো না। এইসব বাজে জিনিষ যে খেয়ালী শিক্ষক মশাইর কোন্ মহা-উপকারে লাগবে অনেক চিন্তা করেও ছাত্ররা তার কূল-কিনারা খুঁজে পেলো না।

শিক্ষায়তনের চারপাশের এতদিনকার জমানো জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবার পরে এবার তারা রওনা হল শহরের দিকে। যাবার সময়ে পথের দুপাশে যতগুলি বাড়ী পড়লো সেইসব বাড়ীর দরজার কড়া নেড়ে বাড়ীর গৃহিনীদের কাছ থেকে অকেজো সব জিনিস যেমন, রবারের টুকরো, পুরনো কেটলি, চীনামাটির তৈরী বাসন এবং ভাঙা বৈয়াম ইত্যাদি জর্জ কার্ভার চেয়ে চেয়ে নিলেন।

পাগলা মাষ্টারের কাণ্ড কারখানা দেখে দেশশুদ্ধ লোক ত অবাক। ক্রমশঃ

স্থানান্তরিত নরক

(গল্প)

সন্তোষকুমার ঘোষ

না—আফিং ঘটিত কোনরকম ব্যাপার নয়। গঞ্জিকাসম্ভূতও নয়। ওসব নেশায় বুঁদ হয়ে বুড়োহুড়োদের মধ্যে অনেকে দিব্যদৃষ্টি আর দিব্যকর্ণ লাভ করেন শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তা ছাড়া বয়েসটাতেও আমার তেমন পাক ধরেনি।

আমি হয় ম'রে ঘুমিয়েছিলুম—নয়ত ঘুমিয়ে মরেছিলুম। চোখ মেলতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। অবাক কাণ্ড। কোথায় বা আমার স্বদেশ—কোথায় বা আমার স্বভূমি আর স্বধাম। দেখি—আসল যমপুরীতে বিচরণ করছি আমি। পাশ দিয়ে তরতর করে বৈতরণী বহে চলেছে। উত্তপ্ত রক্ত আর পচা হাড়-মাংসে ভরা নদী। তার উপর আবার গিজ্ গিজ্ করছে কুমীর আর হাঙর। যেমনি বীভৎস আর ভয়াবহ—তেমনি দুর্গন্ধে ভরা। আকাশ বাতাসও বিশ্রী রকমের পচা গন্ধে ঠাসা। প্রতি মুহূর্তে নাড়ীভুঁড়ি গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে। কোনদিকে দুপা বাড়িয়ে গিয়ে একটু দম নেবারও উপায় নেই। আশপাশে শুধু নরক আর নরক। নরকেরই নানান বিভাগ আর উপবিভাগ। সামনেই সোনার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট অট্টালিকা। অট্টালিকার মাথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রেতনাগরী অক্ষরে লেখা রয়েছে—যম ভবন। উপরে দোতলায় যমরাজের খাস কামরা আর খাস দপ্তর। তলায় লম্বা লম্বা হলঘরে ঘেরা বিশাল চত্বর। হলঘরগুলোর মাথাতেও বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—চিত্রগুপ্তের দপ্তরখানা।

সিংদরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই যমভবনের ভীষণ চেহারাওলা দ্বারীটি দুশমনের মত এগিয়ে এল। লগুড়টিকে বগলদাবা করে রেখে হাতের বানানো খইনিটুকুর উপর গোটাকয়েক থাপ্পড় মেরে নিয়ে দরোয়ানি কেতায় প্রশ্ন করলে—'কস্ত্বং? কস্মাজ্জনপদাৎ আগতোহসি?'

চমকে উঠলুম। ঘাবড়েও গেলুম খানিকটা। প্রেত ভাষায় আমার বিদ্যের দৌড় অস্তি গোদাবরীতীরে বিশাল শাল্মলী তরু' পর্যন্ত। সুতরাং ও-ভাষায় উত্তর দিতে গেলে আবার টুলো পণ্ডিত আমদানি করতে হয়। ভাবলুম—সাতরাজ্যের ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার এদের। রাষ্ট্রভাষার চলন আছে নিশ্চয়ই এখানে। না হ'লে—বাতচিত চালায় কি করে। কিন্তু তাও কি ছাই রপ্ত আছে ভালরকম। চাকরি পাবার আশায় দিনকতক রাষ্ট্রভাষায় তালিম নিয়েছিলুম বটে। তাও নিতান্ত বেগার-ঠেলাগোছের। সাতপাঁচ ভেবে শেষে মাতৃভাষার মারফৎই উত্তরটুকু নিবেদন করলুম। বললুম—আমি বেকার বাউণ্ডুলে। পশ্চিম বাংলা মায়ের ছেলে। খাস কোলকাতার বাসিন্দে। সেখান থেকেই আসছি আমি।

উত্তরটুকু শুধু শেষ হওয়ার ওয়াস্তা। দ্বারীর মুখ

থেকে যেন একগণ্ডা বাজ একসঙ্গে ফেটে পড়ল।—নিকলো য়হাঁসে—অভী নিকলো।

আচমকা রাষ্ট্রভাষা মারফৎ এমন অভ্যর্থনার ঘটা দেখে প্রথমটায় বেশ খানিকটা ভড়কে গেলুম। কিন্তু চট করে এ্যাবাউট টার্ণ করবার মত পাত্রও নই আমি। কোলকাতার সন্তান আমি। ছুরি-ছোরা আর পিস্তল পাইপগান চালানোয় রীতিমত পোক্ত। গলার ওরকম বাজফাটানো আওয়াজ নিমেষের মধ্যেই ঠাণ্ডা করে দিতে পারি। সে হিম্মৎ আছে আমার। মনে মনে বললুম—নে ব্যাটা, গলা ফাটিয়ে কামান দেগে নে। নেহাৎ খালি হাতে এসে পড়েছি এ চুলোয় –তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি ভালো।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল—আরে! অস্ত্র দাওয়াই তো আমার প্যাণ্টের পকেটের মধ্যেই রয়েছে। তাড়াতাড়ি একখানা বড় সাইজের নোট বের করে দ্বারীর সামনে বর দেবার মত ভঙ্গী করে এগিয়ে ধরলুম। ঠোঁটের কিনারায় একছিটে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে আধা রপ্ত রাষ্ট্রভাষাতেই কোন রকমে বললুম—বিগড়তে হৈঁ কিয়ুঁ—খইনি খানেকে লিয়ে কুছ লিজিয়ে মহারাজ।

চকিতের মধ্যে চড় চড় করে মেঘ ফেড়ে গিয়ে যেন ঝকঝকে রোদ হেসে উঠল। দ্বারী মহারাজ একগাল হেসে আমার হাত থেকে নোটখানা নিয়েই চট্ করে চাপকানের তলায় লুকিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে কোমর দুমুড়ে সেলাম দিয়ে বেশ খানিকটা কৃতার্থ হওয়ার ভাবও দেখালেন। তারপর ভক্তিগদগদকণ্ঠে চোস্ত বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন—কার সঙ্গে এসেছেন বাবুজী? কত নম্বরের ছড়িদারজী এখানে এনেছেন আপনাকে?

ছড়িদার! পুরী বৃন্দাবনের মত যমপুরীতে ছড়িদার আছে নাকি রে বাবা! হাঁ করে ভাবছি। দারোয়ানজী হেসে সংশয় ঘোচালেন। বললেন—যমদূতদের নতুন নামকরণ হয়েছে হালে—ছড়িদারজী। আমরাও 'দারোয়ানের' বদলে দ্বারপালজী পদবী পেয়েছি। সেরেস্তার চাকর বেয়ারাদেরও নাম পাল্টেছে। হুঁকোদারজী, হুকুমবরদারজী, নথিবাহকজী, পানিবাহকজী—এসব বলে না ডাকলে এখন আর সাড়াই দেয় না কেউ।

অল্প হেসে বললুম—এ এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়। আমাদের মুলুকে সরকারী বেসরকারী সব আপিসেই এ ব্যবস্থা কবে চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা যাক। এখানকার কোন যমদূত খুড়ি, আপনাদের কোন ছড়িদারজীর ল্যাংবোট হয়ে আসিনি আমি দ্বারপালজী।

মহাবিস্ময়ের সুরে দ্বারপালজী বললেন—সে কি! এখানে বেওয়ারিশ কেউ আসতে পারে না বাবুজী। কী করে এলেন আপনি?

বেশ খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললুম—আমিও তো ভাবছি তাই! কী ক'রে এলুম রে বাবা!

দ্বারপালজী উৎকণ্ঠাভরা স্বরে বললেন—নাঃ, আপনাকে নিয়ে মহা ফেঁসাদ বাধবে দেখছি। বহুকাল আগে নচিকেতা বলে এক ছোকরা ঋষি আপনার মত বেওয়ারিশ অবস্থায় এসে হাজির হয়েছিল। মহা টেঁটিয়া ছিল ছোঁড়াটা। অনশন সত্যাগ্রহ করে ভারি হুজ্জোত বাধিয়েছিল। বেয়াড়া রকমের সব প্রশ্ন করে করে মহারাজকেও নাকাল করে ছেড়েছিল। কিন্তু যাক সে কথা। কার সঙ্গে দপ্তরখানায় পাঠাই বলুন দেখি আপনাকে? নামটা তো রেজিষ্টারী করাতেই হবে। বেওয়ারিশ এসে পড়েছেন শুনলেই মহামন্ত্রীজি মহা খ্যাপ্পাই হয়ে উঠবেন। রেগেমেগে হয়ত ছড়িদার বিভাগের অধিকর্তাজীকে ইয়া লম্বা চার্জশিট দিয়ে বসবেন।

ভাবছি—আরে, এখানেও চার্জশিট দিয়ে কর্মচারীদের টিট করবার ব্যবস্থা আছে নাকি! হঠাৎ দেখি—মোষের মত প্রকাণ্ড মুণ্ডুওলা ভীষণ আকারের এক যমদূত যমভবন থেকে বেরিয়ে সিংদরজার দিকে এগিয়ে আসছেন। দ্বারপালজীও মুখ ফিরিয়ে দেখলেন। ফিস্ ফিস্ করে বললেন—ভালই হয়েছে। মহাচণ্ডজী

আসছেন। মহারাজের খাস তল্পিদার উনি। সেরেস্তা-মহলে ভারি খাতির ওঁর। মহামন্ত্রীজিও ভারি পেয়ার করেন ওঁকে। ওনার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।—বলে মাথার পাগড়ি সামলাতে সামলাতে ফিস ফিস করে বললেন ঘুষ দেওয়া মহাপাপ এখানে। ঘুষ নিলেও মহাসাজা পেতে হয়। তবে, সওগাৎ কি ভেট দেওয়া নেওয়ার রেওয়াজ আছে বাবুজী? মোটা রকম সওগাৎ দিতে পারলে আপনার যে কোন মতলবই হাসিল হতে পারে।

বেশ কথা—বলে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দুখানা বড় নোট বার করে দ্বারপালজীর হাতে গুঁজে দিলুম।

যমরাজের খাস তল্পিদারজী কাছে এসে পড়লেন। দ্বারপালজী জঙ্গীকেতায় পাদুকা ঠুকে সেলাম দিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও সামলে সুমলে আদবদুরস্ত হয়ে দাঁড়ালুম। দ্বারপালজী ফিসফিস করে তল্পিদারজীর কানে কানে আমার বিষয়ে সব কথা বললেন। বলা শেষ করেই নোট দুখানা তাঁর লম্বা চুড়িদার চোগার পকেটে সাঁদ করিয়ে দিলেন।

তল্পিদারজী একটি প্রশ্ন করলেন না। শুধু আমার আপাদমস্তকে একবার বেশ কড়া করে নজর বুলিয়ে নিলেন। তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—'ভৈরবী প্রেরিতোঽহম্, মাম্ অনুসর।'

ভাবলুম—ব্যাটার খাঁই নিশ্চয়ই জেয়াদা। দুখানা নোটে মন ভরে নি। তাই প্রেতভাষায় অমন করে চিল্লে মরছে। কুছ পরোয়া নেহি। পকেটে ব্যাঙ্ক লুটকরা নোটের পাঁচ পাঁচটা তাড়া রয়েছে এখনো। সুড় সুড় করে তল্পিদারজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যমভবনের দিকে এগিয়ে চললুম। যেতে যেতে পকেট থেকে আর দুখানা বড় নোট বার করে তল্পিদারজীর হাতে গুঁজে দিয়ে বললুম—খইনি খানেকে লিয়ে আউর কুছ লিজিয়ে মহারাজ।

অমাবস্যার আকাশে যেন পূর্ণচন্দ্র হেসে উঠল। তল্পিদারজীও একগাল হেসে কৃতার্থ হওয়ার ভাব দেখালেন। চোস্ত বাংলায় বললেন—কিছু ভাবতে হবে না বাবুজী। মহামন্ত্রীজিকে বলে আমি সবকিছু করাতে পারি। লেকিন—ব'লে আমার দিকে চেয়ে মাথা চুলকতে চুলকতে বললেন—মোটা রকমের সওগাৎ লাগবে বাবুজী।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললুম—সেজন্যে ভাববেন না তল্পিদারজী। মহামন্ত্রীজিকে খুশি করে দেবার মত রেস্ত আমার পকেটেই আছে।

যমভবনে প্রবেশ করলুম। ধড়াস ধড়াস করে হৃৎপিণ্ডে যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। হল ঘরগুলোর ভিতর দিয়ে হাঁটছি তো হাঁটছিই। বাপ্‌স্! শুধু করনিক মহল পেরুতেই দম ছুটে গিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়বার জোগাড়। কত বড়ো সেরেস্তাখানা রে বাবা! তল্পিদারজী আমাকে সটান হাঁটিয়ে একেবারে মহামন্ত্রীজির খাসকামরায় নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন।

মহামন্ত্রী চিত্র গুপ্তজীকে দেখলুম। কোঁদানো পায়াওলা সোনার খাটিয়া। তার উপর বেশ পুরু করে কম্বল বিছানো। উনি খাটিয়ায় বসে একমনে নথিপত্র দেখছেন কানে খাগের কলমটি গোঁজা রয়েছে। বেশ বুড়োসুড়ো হয়ে পড়েছেন দেখলুম। নজরও বেশ খাটো হয়েছে বলে মনে হ'ল। সামনের প্রকাণ্ড গোলাকার জলচৌকিটার উপর ঝুড়িকয়েক নথিপত্র জড় হয়ে রয়েছে। দুধারে কেঁদো কেঁদো সলতেওলা দুটি—হাইপাওয়ারের পিদিম জ্বলছে। তল্পিদারজী সেলাম দিয়ে দাঁড়াতেই আমিও আদব মাফিক কোমরটা অল্প দুমড়ে হাতটা বার তিনেক কপালে ঠুকলুম।

ঝাড়া আধঘণ্টা পরে চিত্র গুপ্তজী নথিপত্র থেকে মাথা তুললেন। আমার দিকে কৃপাদৃষ্টিও নিক্ষেপ করলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে চকিতের মধ্যে আমার সারা দেহটাকে একবার সার্ভে করে নিলেন। প্রথম সম্ভাষণেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন—তুম কৌন হো!—ভাগো হঁহাসে—জল্‌দি ভাগো।

ভাবলুম—প্রেতভাষার বদলে বুড়োর মুখ দিয়ে রাষ্ট্রভাষার গোলাগুলি বেরুতে শুরু হ'ল যে! বুড়োটা তলে তলে মহাখ্যাপ্পাই হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই।

তল্পিদারজী চোখ টিপে আমাকে ইসারা করলেন। ইসারার অর্থ বুঝলুম। চিত্র গুপ্তজীকে জল্দি ঠাণ্ডা করতে হবে। তাড়াতাড়ি সওগাৎ হিসেবে একতাড়া নোট তল্পিদারজীর হাতে গুঁজে দিলুম। তল্পিদারজী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মহামন্ত্রীজির কম্বলাসনের তলায় সওগাতের তাড়াটা রেখে ওঁর কানে ফিস ফিস করে মহামন্ত্র শোনালেন। ব্যস্! জ্বলন্ত বারুদ চকিতের মধ্যে নিউড়ে বরফ হয়ে গেল। মহামন্ত্রীজির মুখে চোখে খুশির ঢেউ উঠল সঙ্গে সঙ্গে। উনিও তখন চোস্ত বাংলায় বললেন—নাম কি বাবাজীর? নিবাস কোথায়? কী করা হয়?

মনে মনে হাসলুম। সেই সঙ্গে নাম ধাম ইত্যাদি সবিনয়ে নিবেদন করলুম। চিত্র গুপ্তজী সঙ্গে সঙ্গে পাশে ঝোলানো ঘন্টাটায় হাতুড়ি দিয়ে একটা ঘা মারলেন। খাইনি ডলতে ডলতে হুকুমবরদারজী ছুটে এলেন। মহামন্ত্রীজি বললেন—পাপ পুণ্যের হিসেব দেখতে হবে। চারশো বিশ নম্বরের খতেন খানা চট্ করে আনো তো হে?

ঝাড়া একঘন্টা কেটে গেল। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। হুকুম তামিল করবার নাম গন্ধ নেই। চিত্র গুপ্তজীও মহাবিরক্তিতে বারবার দাঁতে দাঁত ঘষে মুখ বিকৃত করতে লাগলেন। আবার ঘন্টাটায় কষে ঘা মারলেন উনি। হুকুমবরদারজীও আবার ছুটে এলেন। রিমাইণ্ডার গেল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে। এক আধবার নয়—তা প্রায় বিশবার। ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বান দুর্ভোগ সইবার পর খতেন বই এসে হাজির হল। গণ্ডারের চামড়া দিয়ে বাঁধানো জগোদ্দল আকারের খাতাখানাকে চারজন রেকর্ড বাহকজী বহে নিয়ে এসে জলচৌকির উপর রাখলেন।

তাড়াতাড়ি সূচীপত্র দেখে চিত্র গুপ্তজী বললেন—চার কোটি সাতাত্তর লক্ষ সাত হাজার সাত শো সাত।—পাতাটা তাড়াতাড়ি খোলো তো হে?

হুকুমবরদারজী চট্পট পাতা উল্টে উল্টে যথা নম্বরের পাতাটা বার করে দিলেন। আমার সম্বন্ধে রেকর্ডের বহর দেখেই চিত্র গুপ্তজীর চোখজোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল। মহাবিস্ময়ের সুরে বললেন করেছ কী হে বাবাজী! বয়েস তো দেখছি সবেমাত্র তেইশ বছর। তা—এই বয়েসেই কীর্তির হিমালয় গড়ে এসেছে যে হে! তোমার জন্যে বরাদ্দ করা সবক'টা পাতাই তো দেখছি কীর্তি কথায় ভরে গেছে। আরে! জায়গায় জায়গায় আবার লালকালির ঢ্যারা দেওয়াও রয়েছে দেখছি!—সাধু—সাধু!

পয়লা নম্বরের ঢ্যারা দেওয়া অংশটুকু পড়েই চমকে উঠলেন উনি। বললেন—সাবাস! এই বয়েসেই ডজনখানেক মাথা খেয়ে বসে আছো! আরে, কয়েক জনের ইহকাল পরকালও ঝরঝরে করে ছেড়েছো দেখছি! করেছ কি হে?

লাজলজ্জার মাথা খেয়ে কোন রকমে বললুম—বিশ্বাস করুন স্যার, ওরাই প্রথমে আমার মাথা চিবিয়েছিল। হাল আমলের নমুনা সব যে কত বেপরোয়া—আর কী ধরণের চিজ তা তো আর জানেন না স্যার আপনি। তা ছাড়া, এসব আর অপরাধ বলেই গণ্য হয় না। ফ্রয়েড বলেছেন—।

চিত্র গুপ্তজী সঙ্গে সঙ্গে বাঁধানো দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—দ্যুৎ তোর নিকুচি করেছে। এটা জ্যাঠামো করবার জায়গা নয় বাপধন। স্পষ্ট লেখা রয়েছে। অবৈধ প্রণয়—ইত্যাদি। নানা রকমের অপরাধ। এর যথাবিহিত শাস্তি হচ্ছে ন'হাজার বছর সশ্রম নরকবাস। তিন হাজার বছর তামিস্র নরকে থাকতে হবে। তিন হাজার বছর অন্ধতামিস্র নরকে। আর বাকি তিন হাজার বছর কালসূত্র নরকে।

ভাবলুম—এক আধ বছর নয়। পর পর তিন হাজার বছর ধরে এক একটা নরকে কাটাতে হবে! বলে কি বুড়োটা! ডিফেণ্ড করবারও নেই কেউ। এক তরফা বিচার। গাটা যেন ইসপিস করতে লাগল।

চিত্রগুপ্তজী দুনম্বরের ঢ্যারা দেওয়া অংশটুকু পড়তে পড়তে বললেন—আরে, হালে দলবেঁধে ব্যাঙ্ক লুট করেছ যে দেখছি! এঁ্যা বিশ কোটি টাকা! তা—কালো

এ্যামবাসাড়ার গাড়ি, পিস্তল, স্টেনগান—এসব পেলে কোথায় হে? এঁ্যা চুরি করেছ—ছিনতাইও করেছ দেখছি। সাবাস! ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি আর তার সহকারী—দুজনকেই খতম করেছ। আরে, লুট করে পালাবার সময় পাঁচ পাঁচটা ডাহা নিরীহ পথচারীকেও খতম করেছ দেখছি। এদের মধ্যে ত্রিসন্ধ্যা জপ আহ্নিক করা দুটি ব্রাহ্মণ সন্তানও ছিল দেখছি। এঁ্যা একসঙ্গে তিন রকমের অপরাধ। ডাকাতি—নরহত্যা—ব্রহ্মহত্যা।

কৃতাঞ্জলি হয়ে বললুম—নরহত্যাই বলুন আর ব্রহ্মহত্যাই বলুন—ওসবের জন্য আমি আদৌ দায়ী নই স্যার। দায়ী—দেশের শাসন ব্যবস্থা—অর্থাৎ দেশের শাসকমহাত্মারা। এ্যাকে বেকার—তায় সংসারের ডাহা অচল অবস্থা। বর্তমানটা ঘোলাটে—ভবিষ্যৎও অন্ধকার। পেটের জ্বালা বোঝেন স্যার? পেটের জ্বালায় অনেক কিছু করতে হয়। তাছাড়া বিশ্বাস করুন—লুট করা টাকার সাড়ে নিরেনব্বই ভাগ পার্টি ফাণ্ডে জমা দিতে হয়েছে। নিজেদের খরচের জন্যে যা পেয়েছি—তাতে মজুরী পোষায় না। সত্যি বলছি স্যার।

চিত্রগুপ্তজী দাঁত খিঁচিয়ে বললেন—ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এসেছেন উনি। আবার লায়েকের মত চিমটি কাটা বুকনি আছে।

সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলেন উনি। তপ্তকুর্মি নরকে তিন লক্ষ বছর থাকতে হবে। সারাদিন জলন্ত ডাঙশের ঘা মেরে মেরে ঘানিতে ঘোরাবে। আর রাতভোর বিশ লাখ তেঁতুলে বিছে আর বিশ কোটি বিচ্ছু নাগাড়ে হুল বেঁধাতে থাকবে।

উনি তাড়াতাড়ি তিন নম্বরের ঢ্যারা দেওয়া অংশটুকু পড়তে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে চোখজোড়া ড্যাবডেবে করে বললেন—আরে, বন্ধুহত্যা—পড়শী হত্যা মায় ভ্রাতৃহত্যাও করেছ যে দেখছি! এঁ্যা—স্রেফ রাজনীতি আর দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে এন্তার হত্যা করে এসেছ। কোনরকম বাছবিচার করো নি দেখছি। বলিহারী রাজনীতি! বলিহারি দেশপ্রেম! বোমা-পট্‌কা, ছুরি-ছোরা, পিস্তল-পাইপগান—সবই চালাতে জানো যে দেখছি। এঁ্যা করেছ কি হে? এরই মধ্যে বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী আর আত্মীয়-স্বজন সমেত দুশো জনকে খতম করেছ। সাবাস!

সবিনয়ে বললুম—ওসব ঠিক হত্যা নয় স্যার। বদলার বদলে বদলা নেওয়া। তাছাড়া, একে যদি অপরাধ বলেন—তা হ'লে অপরাধটা আমার নয় স্যার—পার্টির। পার্টির খাতিরেই গণ্ডাগণ্ডা হত্যা করতে হয়েছে আমাকে। বিশ্বাস করুন—আমি খাঁটি অপাপবিদ্ধ।

চিত্রগুপ্তজী দাঁত খিঁচিয়ে বিকৃত কণ্ঠে বললেন—অপাপবিদ্ধ! ডেঁপোমি করবার আর জায়গা পাও নি?

সঙ্গে সঙ্গে, রায় দিলেন উনি।—রৌরববাস। মিয়াদ—সাতকোটি বছর। মহারৌরববাস - ন'কোটি বছর। শাস্তিরও বিধান দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। সারাদিন তপ্তশলাকাবিদ্ধ অবস্থায় নরকের পথ দুরমুশকরণ। মধ্যে মধ্যে জলন্ত সন্দংশিকা সহযোগে মাংসোৎপাটন। এবং রাতভোর বিশমনী মুষলাঘাতে মুণ্ডবিদারণ ও অস্থিবিমর্দন।

হাতটা ইসপিস করতে লাগল। নিদেন পক্ষে একটা পাইপ-গান থাকলেও বুড়োর মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে মোকাবিলা করা যেতো। কিন্তু উপায় কি? কথায় বলে—পড়েছি যবনের হাতে। এও তাই। পকেটে নোটের তাড়া ক'টা আছে—এই যা ভরসা।

চিত্রগুপ্তজী এরপর রেকর্ডের উপর দিয়ে তরতর করে নজর বুলিয়ে চললেন। চার নম্বরের ঢ্যারা দেওয়া অংশটুকু পড়তে পড়তে বললেন—আরে, লেখাপড়া তো মন্দ করো নি হে দেখছি! এঁ্যা, চার চারটে পাশ করা ছেলে তুমি। তা বেশ। কিন্তু হরি হরি! বিলকুল টুকে পাশ করেছ? ঘটে এক কড়াও বিদ্যে সেঁদোয় নি দেখছি। হায়—হায়! গার্ড আর পরীক্ষকদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে আর ছোরা ছুরি দেখিয়ে দেখিয়ে কেল্লা ফতে করেছ দেখছি। আরে, ইস্কুল কলেজ ভেঙে পুড়িয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়কে তচনচ করে মহা মহা কীর্তি

করে এসেছ দেখছি। করেছ কি হে? সাবাস! গুরুহত্যাও করেছ দেখছি! এঁ্যা, ঠাকুদ্দার বয়েসী হেডমাষ্টার মশায়ের পেট হাঁসিয়ে দিয়েছ! মাথায় বোমা মেরে ইতিহাসের অধ্যাপকমশাইকেও ঠাণ্ডা করে দিয়েছ দেখছি। বলিহারি! বলিহারি বুকের পাটা তোমার! বলিহারি শিক্ষা তোমার!

কোনরকম ইতস্ততঃ না ক'রে সঙ্গে সঙ্গে বললুম— আমি সাধে বেগড়াইনি স্যার! সাধ করে আর মহাজনদের মুণ্ডপাত করি নি! দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী এর জন্যে। তাছাড়া, হাল আমলের শিক্ষাগুরুও সব ধোয়া তুলসীপাতা নন। বিশ্বাস করুন স্যার—তাঁরাই আমার চোখের সামনে আদর্শের বেদীটাকে উল্টে দিয়েছেন। অপকর্মে দীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাই। অনেকে আবার তলে তলে মদৎ জুগিয়েছেন আমাকে। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

চিত্রগুপ্তজী আবার খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন— ফাজিল কোথাকার! গুরুহত্যা করে আবার সাফাই গাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলেন উনি—সব দণ্ড ভোগ শেষ হওয়ার পর অনন্ত কাল ধরে কুম্ভীপাকে থাকতে হবে। পর্যায়ক্রমে বিশকোটি বছর ধরে নাগাড়ে হাণ্ডিকাসিদ্ধ হতে হবে—আর বিশকোটি বছর ধরে তপ্ত তৈলকটাহে প'ড়ে প'ড়ে অবিরাম ভর্জিত হতে থাকবে।

রায় শুনে পিলে চমকে উঠল। নতুন করে জন্ম নেবার দফা গয়া। অনন্তকাল ধরে নরকেই কাটাতে হবে তা হলে। বলে কি বুড়োটা!

রায় মাফিক ব্যবস্থা করবার জন্যে উনি তাড়াতাড়ি হুকুমজারি করতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই তল্পিদারজী ইসারা করলেন। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটের তাড়া ক'টা বার করে তল্পিদারজীর হাতে চালান দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সওগাৎ গিয়ে যথাস্থানে জমা পড়ল। সওগাতের পরিমাণ কতটা তল্পিদারজী তাও মহামন্ত্রীজিকে ফিস ফিস করে জানিয়ে দিলেন।

চিত্রগুপ্তজী আমার আপদমস্তকে আবার একবার নজর বুলিয়ে নিলেন। হেসে বললেন-দণ্ডের ভার কিছু কমাতে চাইছো—এই তো? তা—কী হ'লে খুশি হও বাবাজী?

কৃতাঞ্জলি হয়ে বললুম—দয়া যদি নিতান্তই করেন স্যার—তা হ'লে নরকের দিকে না ঠেলে—স্বর্গের দিকে কোন চুলোয় পাঠিয়ে দিন কাইণ্ডলি।

চিত্রগুপ্তজী চমকে উঠলেন। মহাবিস্ময়ের সুরে বললেন—সে কি! আগাগোড়া সব রেকর্ডই পাল্টাতে হয় তা হলে। সে যে মহা হাঙ্গামার ব্যাপার।

বিনীতভাবে বললুম—আপনার দদিচ্ছেয় সব কিছুই হ'তে পারে স্যার। মহারাজ তো আর নিজের চোখে কিছু দেখেন না। চোখ বুজে সই করেন। রেকর্ডের পাতা ক'খানা ছিঁড়ে—নতুন পাতা লাগিয়ে দুকলম পুণ্যির কথা একটু বাড়িয়ে চড়িয়ে লিখে দিলেই তো সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায় স্যার। আমাদের ওখানকার আপিসে আদালতে হামেশাই তো এধরণের সৎকর্ম করা হয়।

চিত্রগুপ্তজী বললেন—তাই নাকি! আচ্ছা দেখি, কী করতে পারি। তা তুমি পাশের ওই বিশ্রামাগারে গিয়ে একটু অপেক্ষা করো বাবাজী। স্বর্গে পাচার করতে গেলে হাঙ্গামা অনেক। মহারাজকে দিয়ে ছাড়পত্র সই করাতে হবে। দেবদূত ডাকতে হবে। তা ছাড়া—।

উনি কথাটুকু শেষ করতে না করতেই এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। কোটি কোটি প্রেতাত্মার আকাশ-ফাটানো চীৎকার শোনা গেল হঠাৎ। পিলে চমকে দেওয়ার মত আওয়াজ। মহামন্ত্রীজিও চম্‌কে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণাকারের এক যমদূত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে মহামন্ত্রীজিকে প্রেতভাষায় যা বললেন —তার মর্মার্থ হচ্ছে—কয়েদী প্রেতরা সবকটা নরকেরই গেট ভেঙে দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে। বিক্ষোভ দেখাবার জন্যে মিছিল বার করেছে ওরা। মিছিল বন্যা বেগে এগিয়ে আসছে। এখন যমভবন ঘেরাও করবে।

স্লোগান দিতে দিতে প্রেত মিছিল এগিয়ে আসছেই বটে। স্পষ্ট শোনা গেল—

যমপুরীর অত্যাচার——চলবে না, চলবে না।

যমরাজের জুলুম——চলবে না, চলবে না।

আমাদের দাবি——মানতে হবে, মানতে হবে।

স্বর্গের সুখ-সুবিধে——দিতে হবে, দিতে হবে।

তল্পিদার মহাচণ্ডজী মুহূর্তের মধ্যে অন্য মূর্তি ধরলেন। আমার নড়া ধরে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টানতে টানতে একেবারে যমভবনের বাইরে এনে ঘাড়ে একখানি রামরদ্দা দিয়ে ভাগিয়ে দিলেন। মেজাজে আগুন ধরে গেল। প্রেত মিছিল এগিয়ে আসতেই আমিও তাতে যোগ দিলুম।

তিনদিন তিনরাত। আবদ্ধ ঘরের মধ্যে ঠায় ঘেরাও হয়ে রইলেন মহামন্ত্রীজী। যম মহারাজের বরাত ভালো। শুনলুম—নরকগুলোকে ঢেলে সাজা যায় কি না—সে সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করার জন্যে কাল ব্রহ্মালয়ে গেছেন উনি। দরকার হ'লে সেখান থেকে বৈকুণ্ঠের দিকেও পাড়ি দিতে পারেন।

চারদিনের দিন সকালে যমপুরীর বিভিন্ন ভাষার দৈনিক কাগজগুলোয় ব্যানার হেড্-লাইন দিয়ে মহা চাঞ্চল্যকর খবর বেরুল।—ঘেরাওয়ের ফলে মহামন্ত্রী চিত্রগুপ্তজী প্রথম দিনেই ভির্মি গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার নাভিশ্বাস উঠতে শুরু হয়। গতরাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। যমালয়ের প্রহরীরা বিলকুল সুরাসক্ত, উৎকোচগ্রাহী এবং অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। খাস নরকের প্রহরীদের তো কথাই নাই। যমপুরীর প্রশাসন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যম মহারাজ সুদূর ব্রহ্মলোক হইতে এক জরুরী আইন জারি করিয়াছেন। সেই আইন বলে—সবকটি নরককেই অবিলম্বে মর্ত্যে স্থানান্তরিত করা হইবে। এখন হইতে পাপী ও মহাপাপীরা মর্ত্যে থাকিয়া জীবিত অবস্থাতেই নরকদণ্ড ভোগ করিতে থাকিবে। বিশ্বস্তসূত্রে আরও জানা গিয়াছে যে, নূতন মহামন্ত্রী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এবম্বিধ ব্যবস্থাই চালু থাকিবে।

নরকের প্রেত-সংখ্যা তো বড় কম নয়। নরকের সংখ্যাও শুনেছি একুশটি। গোটা মর্ত্যই তো তা হলে নরককুণ্ড হয়ে উঠবে। সে যে কী অবস্থা দাঁড়াবে নাক সিঁটকে তা আন্দাজ করতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। ইলেকট্রিক ফ্যানটা বিগড়ে গিয়েছিল কাল রাতে। সারারাত গরমে ছটফট করে ভোরের দিকটায় মড়ার মতই ঘুমিয়েছিলুম। চোখ মেলে দেখি সকাল হয়ে চারিদিকে দিব্যি রোদ ফুটে গেছে। এমন হয় না বড় একটা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম।

'নরক! নরক! কর্পোরেশনের মুখে আগুন। রাস্তা নয় তো নরককুণ্ড! কোনোদিকে পা বাড়াবার জো নেই গা।'—ঠাকুরমা গঙ্গাস্নান করে ফিরছেন। অপবিত্র কিছু মাড়িয়ে ফেলেছেন বোধ হয়। ঠাকুরমা রোজই প্রায় চেঁচান্ ওভাবে। গুরুত্ব দেয় না কেউ বড় একটা। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঝি টেঁপির মা বাসন মাজতে এল। তার মুখেও ওই বুলি। বাড়ীতে পদার্পন করামাত্রই তার উদাত্ত কণ্ঠস্বর সকলকে সচকিত করে তুলল।—নরক! নরক! না হ'লে আর এমন কাণ্ড ঘটে গা! মাকে দেখেই হঠাৎ স্বরটাকে বেশ খানিকটা খাদে নামিয়ে এনে বললে—গাঙ্গুলী বাবুদের সেজো বউটার কাণ্ড শুনেছো বউদি? ছি—ছি!—কী ঘেন্নার কথা গো! শুনলেও কানে আঙুল দিতে হয়। তিন তিনটে ছেলে মেয়ের মা তুই। নরক! নরক আর কাকে বলে!

পাশের বাড়ীর মুখুজ্যেদাদু রোজ সকালে ঠিক এই সময়টায় এসে আমাদের দেউড়িতে বসে খবরের কাগজটায় একবার করে নজর বুলিয়ে নেন। তিনিও তারস্বরে একই বুলি আওড়াতে লাগলেন।—নরক! নরক! এযেন নরককুণ্ডে বাস করছি। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই রাহাজানি, মারামারি দাঙ্গা এ তো লেগেই আছে নিত্য। তার উপর আবার পথে ঘাটে খুনের হাঙ্গামাও দিন দিন বাড়ছে। আজ পুলিশ খুন—কাল মাষ্টার খুন—পরশু লিডার খুন। খুনের আর ঘাটতি নেই—বিরামও নেই। হ'ল কী দেশটা! এর চেয়ে নরকবাস ঢের সুখের।

অবাক হয়ে ভোরে দেখা স্বপ্নটার কথা ভাবতে লাগলুম।—ব্যাপার কী! যমপুরীর সব কটা নরককেই সিফ্ট ক'রে পোড়া পশ্চিমবাংলার মধ্যেই ঠেসে-গুঁজে দিলে নাকি রে বাবা! শেষ পর্যন্ত স্বপ্নটা সত্যি ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে নাকি!

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায়

পরদিন ভোরে শীলা, উষার আলোতে অজানা এক আনন্দের আভাস পেলো। রোজই তো প্রভাতের আলো চারিদিকের অন্ধকার দূর করে দেয়, রোদ এসে চারিদিক তপ্ত করে তোলে, কিন্তু কই প্রত্যহ এই দৃশ্য তো এতো মনোহর লাগে না? পৃথিবী যেন কেমন সেজেছে, তার গায়ে পুলক লাগলো কিসের? দক্ষিণের এ বিশাল গাছটাকে কত বছর থেকে দেখছে শীলা। গাছটি প্রশস্ত ছায়া বিস্তার করাতে বনের ঘাসগুলো বাড়তে পায় না—যত পুষ্টি, বৃষ্টিধারা সূর্যের উত্তাপ—সবই বাধা পায় ঢুকতে। কিছুই জমির ওপর এসে পৌছয় না—বাগানের বহুস্থানে টাক পড়ে যাচ্ছে তাই। এই গাছটি কেটে ফেলবার জন্য মালিকে কতবার বলেছে সে, কিন্তু আজ এত মায়া কিসের? থাক্ থাক্ মনে হল। ঘন কালো বৃক্ষকাণ্ড একটি অক্ষম দৈত্যের মতো বিরাট স্থির মূর্ত্তি যেন, ডাল পাতাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কোথাও সবুজ, কোথাও ঘন সবুজ, কোথাও পীতবর্ণ; শুকিয়ে গেলে পাতাগুলি আপনিই ঝরে পড়ে যায়। অর্থহীন মমতা শীলার সমস্ত দেহমন আলোড়িত করলো। কি আশ্চর্য। এই শুষ্ক শাখাগুলি হঠাৎ আজ ফুলে ঢেকে গেছে কখন? শীলা কি এই প্রথম লক্ষ্য করলো? অতি ক্ষুদ্র ক্ষীণ কুঁড়িগুলো রাতারাতি ফুটলো কি করে? কই শীলা তো পূর্বে কখনও এদের পরিচয় পায় নি? সবই কি এমনই ছিল, না আজই তার চোখে পড়েছে? আশপাশের মাধুর্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো আজই কি? বহু যুগ পরে যেন বিশ্বভুবন আবার হেসে উঠেছে।

ভোর না হতেই পাখীরা জানালার কাঁচে মুখ ঠুকতে শুরু করে দেয়—অন্যদিন শীলা তাদের দিকে ফিরেও চায় না। আজ জানালা খুলে দিয়ে পাখীদের সে দু'একবার ডাকলো তাদের নকল করে শিস দিল। খানিক রুটির গুঁড়ো মুঠো খুলে খুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে, তারা যেন শীলারই নিমন্ত্রণে এসেছে। শৈশবে এ খেলা তার প্রিয় ছিল—মনে পড়লো আবার বহু বছর পর পাখীরা তার হাত থেকে খেতে চাইছে। ভিক্ষুকের দল তো রোজই রাণীমা বলে ডাকে—চাকরদের হাতে সে পয়সা, মুড়ি-মুড়কি পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু না-না—আজ সে মুখ ফিরিয়ে নেবে না, তাদের কাছেই ডেকে আনলো। উঠোনে বসিয়ে নিজের হাতে শাড়ী কাপড় দান করলো, পুরোনো বাসন, জুতো অনেক কিছু দিয়ে দিল। একদল শিশু ছুটতে ছুটতে এসেছে, তারা ঠোঙা ভরে গুড়মুড়ি নিয়ে যাবে। মন তার শুধু দিতেই চাইছিল, আজ এ কী অকারণ আনন্দ! দৈনন্দিন কাজেও তার উৎসাহ জেগেছে চেয়ার টেবিল নিজেরই আঁচল দিয়ে মুছে পরিষ্কার করল। সব কাজ শেষ করে ঘরের কোণ থেকে তানপুরাটা কোলে তুলে নিলো। কতমাস এই তানপুরা ধুলোমেখে কোণে পড়ে থাকে কেউ তার

বাঁধে না, সুর মেলায় না। শীলা এখনই গান করবে—কে যেন শুনছে তার মনে হল। ভারী মধুর সুরে গাইতো শীলা—সেই গান মুহূর্ত্তের মধ্যে কণ্ঠে ফিরে এলো আবার। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল। আকাশে এতো পুঞ্জিত মেঘ কেন? এ ঘন গম্ভীর মেঘের ভার আজই নেমে যাবে নিশ্চয়। ঝড়ো হাওয়া ক্রমশঃ চারিদিক কাঁপিয়ে তুললো—দূর পাহাড়ের গা বেয়ে যে বর্ষণধারা নেমে আসছে বন্যা বেগে তা বাগানে ঢুকে ঘাস পাতা ফল ফুল সিক্ত ও সবুজ করে দিচ্ছে। এই উতলা জলধারা শীলার হৃদয়ের সকল শুষ্কতা দূর করে দেবে। প্রাচীন বেদনার ক্ষোভ, বিচ্ছেদের গভীর অবসাদ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে—গান গাইতে গাইতে শীলার দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। সমস্ত পুঞ্জীভূত অভিমান শান্তি বারির মত ঝরে গেল।

এই আকুল গীতোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কী এক নিবিড় প্রেমের পরশ পেলো যা শুধু আত্মপ্রেমের জয়োৎসব নয়। সজীব, নির্জীব জড় বস্তুর মধ্যেও সে এক অমূল্য কোমলতার সন্ধান পেয়েছে কি? কি জানে! যে উদার প্রেম সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ জয় করে, পরকে আপন করে, সেই বিশ্বব্যাপী সুর শীলার বুকে বেজে উঠলো—ভালোবাসা শুধু দিতে সে কুণ্ঠিত নয় আর, এবং অপরের জন্যই যে তার জীবনের সার্থকতা এই মহাসত্য অতি সহজেই উপলব্ধি করলো। এই বিশ্বাস তাকে নূতন পথে অগ্রসর করে নিয়ে যাবেই, তার নৈরাশ্যপূর্ণ বৈরাগী মন সংকীর্ণ ধূলিপথ অতিক্রম করে প্রশস্ত রাঙা পথে এসে মিশল। শীলা নবজীবন লাভ করলো সন্দেহ নেই।

ছেলেদু'টি বড় হয়েছে, তাদের নিজস্ব শক্তি বাড়াতে দিতে হবে, তবু তাদের জন্য সে সব কিছুই ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু সাথীহারা জীবন যে অর্থহীন। অলোক তাকে সঙ্গ দিতে চায়? সে নিজেও জীবনে সঙ্গীহীন, শীলার কাছে কতটুকুই বা চেয়েছিল। কেনই বা সেটুকু দিতে পারবে না শীলা? হেমেনের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই কেবল কিছুই তাকে দিতে পারে নি এই অভিমান। অলোক তার সান্নিধ্য চায়, সহানুভূতি চায়, হেমেনের তাতে কোনই অমত নেই। এখন হেমেন তার নিজস্ব গড়া জীবনের মধ্যে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না—ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীর ওপারে তাই শীলারও স্থান নেই। কিন্তু শীলার আর দুঃখ হয়না। হেমেনের উদাসীনতা তাকে আর আঘাত দেয় না—দাবী তার অনেকদিনই ফুরিয়ে গেছে, সেজন্য গ্লানি নেই আর। এখন সমস্ত জগৎকে, সারা সংসারকে সে ভালোবেসেছে—প্রীতি ও স্নেহ দিয়ে ভরে দিতে পারবে। কার যেন কোমল করস্পর্শ করেছিল, আশ্বাস দিয়ে কী বলেছিল তাকে?—গভীর অন্তরে বড়ই আন্দোলন করেছিল সেই বচন সুধা—মর্মে মর্মে লেগেছিল সেই করুণ মিনতি। অলোকের কথাগুলি বাজতে থাকে। জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে শীলা ভাবছিল সেদিনকার কথা। অলোকের মুখের কাতর ভাব, তার মনে অসহায়তা সংশয়ের রেখা সব কিছুই চোখে ভাসছিল। শীলা কি তাকে নিতান্তই উপেক্ষা করতে পারে? গোপন বেদনার নিঃশব্দ বাণী পরস্পর অতি স্পষ্টই শুনেছিল—অলোক তো অপরাধ করে নি কিছু! —আজ সেই বিশ্বাস তাকে সকল বিদ্রূপ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে নিয়ে আসলো। কেউ যে তাকে অন্তরে চাইছিল এই তার সান্ত্বনা। অভয় ও উদারতা দিয়ে এই প্রেমকে পবিত্র করে নেবে শীলা। সত্যের দ্বারা সকল ত্রুটি ক্ষমা করে নেবে। ক্রমাগত নিজেকে বোঝাচ্ছে অলক, তা প্রীতির সম্পর্ক অতি মধুর। গভীর শান্তি না অ পরীক্ষা তাই কি সে জানে? শুধু কি দীর্ঘ দিবসে বিরহ বহ্নি? সে কিছুই অনুমান করতে পারলো না অলককে এমন আপন মনে হয় কেন? সবই রহস্য র গেল।

সোমেন এতদিনে মনস্থির করে সকলকে জানতে দি মালাকে সে বিয়ে করতে বিশেষ উৎসুক। নির্মল পারিজাত বিশেষ সুখী হ'ল। মালা তাদের একা

কন্যারই মতো, তার সরলতা সোমেনের মনকে স্পর্শ করেছে, এতো সৌভাগ্যের কথা।

গ্রীষ্মের প্রখরতাপে অধীর হয়ে দেবাশিস ও শান্তা কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিল। তাদের শীঘ্র ফেরবার ইচ্ছাও বিশেষ ছিল না কিন্তু সোমেন এই প্রচণ্ড গরমের সময়েই বিয়ের কথা তুললো। তাকে ব্যবসার ব্যাপারে শীঘ্রই বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে—অনেকদিন হয়তো কলকাতায় ফিরতে পারবে না। সোমেনের বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হলে দেবাশিস ও শান্তা নিশ্চয় ফিরবে আশ্বাস দিল। ইতিমধ্যে সোমেন ঘনঘন নির্মলের বাড়ী যাতায়াত শুরু করেছে। মালার সঙ্গে দেখা করাই তার উদ্দেশ্য, সে অনুমতি নিয়ে মধ্যে মধ্যে মালার সঙ্গে গোপনে দেখা করে আসতো। সোমেন একা থাকলে মালা তবু কথা বলে, হাসে। কিন্তু আর একটি প্রাণী সামনে এসে পড়লেই সে সরে পড়ে। তার সঙ্কোচ কাটে না।

নির্মলের বাড়ীর পাশেই একটি খোলা জায়গা খালি পড়ে আছে তাতে সামিয়ানা লাগাতে বিয়ে বাড়ীর গোড়া পত্তন হল। পারিজাতের তো কাজের অন্ত নেই। সূর্যোদয়ের পূর্বেই সে উঠে পড়ে, শুতে তার মধ্যরাত্রি। মালার গহনা, কাপড়, বিছানাপত্র নূতন করে তৈরি করাতে সে ব্যস্ত। নিজের গায়ের তোলা গহনাগুলি সুন্দর করে পালিশ করিয়ে মালাকে পরিয়ে দিল। সোনার চুড়, কন্তি, কানবালা পুরোনো দিনের গহনাগুলি ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল। ছেলেরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলো, তাদের বাড়ীতে এই প্রথম বিয়ে কিভাবে মাকে সাহায্য করবে তাই ভেবে আকুল। পড়াশুনার কথা একেবারেই ভুলে গেল। রাত জেগে গল্প করা, রেডিও খুলে গান শোনা—যতভাবে পারে সময় অতিবাহিত করার শত উপায় খুঁজে নিল। নির্মল তার গৃহিনীকে একটি কোণে ডেকে নিয়ে গোপনে বলল—

'তোমাকেও সাজতে হবে, সুশ্রী চেহারায় সুন্দর কাপড় পড়লে তবে তো মানায়।' পারিজাত তো অবাক—

'সে কি? আমার কাজ রান্নাঘরে, ভাঁড়ারে, উঠোনে, ভাল কাপড় পরে সেজেগুঁজে বসে থাকবো কি করে?'

'তাতে কি। একবার তো একটু সুন্দর করে সেজে সকলকে অর্ভ্যথনা করবে—তারপর আবার হলুদ লঙ্কা মাখানো আটপৌরে সাড়ী তোমার পরে নিও।'

চুপে চাপে একটি বস্ত্রালয়ে গিয়ে নির্মল একখানা সাড়ী এনে পারিজাতের হাতে তুলে দিল। জরিকালো জরির পাড়ের সাড়ীখানা পেয়ে পারিজাত আহ্লাদে আটখানা, নির্মলের এত খানি দরদ দেখে মনে মনে বড় খুশী হ'ল সে।

শীলা ও হেমেন স্পষ্টই বুঝতে পারলো সোমেনের বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়ীতে বিশেষ ভীড় হবার সম্ভাবনা। শুভ বিবাহের উদ্দেশ্যে বন্ধু জ্ঞাতি অনেকে আসতে প্রস্তুত।

দেবাশিস ও শান্তা কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরবে। অলোক একবার দুবার এসে জানিয়ে গেল সে যদি কলকাতায় উপস্থিত থাকে, সে নিশ্চয় সাহায্য করবে। লোক সমাগম শুরু হওয়াতে বাড়ীতে নানারকম কোলাহলও শোনা গেল। ময়রা, ভিয়ান, স্যাঁকরা, বাসনওয়ালা, কে যে না আসছে তার ঠিক নেই। হট্টগোল, গণ্ডগোল দিন দিনই বাড়ছে। শীলার ওপর বিশেষ দায়িত্ব পড়ছে। সমস্ত বাড়িটিকে তার আয়ত্বে এনে সকলের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতে সে ব্যস্ত। হেমেন তার অভ্যাস মতো গা ঢাকা দিয়েছে—তবু শীলাকে আশ্বাস দিয়ে গেল আসল কাজের সময় তাকে ঠিক পাওয়া যাবে। বাদল আর মাদল তো তর্জন গর্জন করে বেড়াচ্ছে—তাদের হুকুমের তাড়নায় সকলে অস্থির। মাকে কি ভাবে সাহায্য করা যায় তারা সবই স্থির করে ফেলেছে, শীলা তাতে খানিক ভীত। জয়ন্তীর বন্ধুরা সকালে বিকেলে খোঁজ নিয়ে যায়, তারা

চায় নানাভাবে সাহায্য করতে—জয়তীর অনুপস্থিতিতে তারা মনঃক্ষুণ্ণ। শীলার হাতে অনেক কাজ, সহানুভূতি সে যেটুকু পায় সেটুকুও আশা করে না—পরকে আনন্দ দিয়ে সে নিজেই তৃপ্তি পাচ্ছে। যে ক'টি ঘর ছিল প্রত্যেকটি আত্মীয় স্বজনের বাসের উপযুক্ত করে দিতে হ'ল। দূর থেকে বহুলোক এসেছে, কিছুদিন দেবাশিসের ও শান্তার সঙ্গে একত্রে থাকবে তাদের ইচ্ছা। শীলা তার কর্তব্য বুদ্ধিতে যা বলে সেই বুঝে সে কাজ করতে লাগল। ভিড়ের মধ্যে তার মন সময় সময় ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে সে আবার সকলকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত। যে সকল কুটুম্ব ও জ্ঞাতি এই বিয়ে উপলক্ষে ক'দিন স্ফূর্তি করতে এসেছিল, শীলা তাদের কাছে কিছুই আশা করেনি তার সুখ দুঃখের খোঁজ এরা কোনদিন নেবে না সে জানতো। যৌথ পরিবারের আনাগোনার মধ্যে স্বার্থপরতাই বেশী, অন্তরের যোগাযোগ কমই থাকে। চাকর ঝিদের জন্য, কর্মচারী ও তাদের শিশুদের জন্য শীলা নামে নামে কাপড় কিনলো, তারা আনন্দে বিহ্বল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সকলের শেষে সে বিছানায় যায়।

মধ্যরাতে হঠাৎ একটি টেলিগ্রাম এলো। শীলা রাতে 'তার' খুলতে বড়ই ভয় পায়। কিন্তু বিয়ে বাড়ীতে শুভ সংবাদেরই সম্ভাবনাই বেশী তাই মনে করে খাম খুলে পড়লো—

'বুধবার পৌছবো গাড়ী পাঠিও এয়ারপোর্টে—আবার 'তার' করবো'—জয়তী। শীলা নিমেষের মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে দিল—হেমেন তো উল্লসিত হয়ে উঠলো—

'পাঁচ বছর পর জয়তী বাড়ী ফিরছে—হয়তো সঙ্গে বরও আসছে কে জানে? সঙ্গে একটা সাহেব আনছে না তো?'

'হেমেন আজ সত্যিই খুশী, নইলে এতো কথা সে কখনই বলে না।

'ছোটদার বিয়ের খবর পেয়ে জয়তী আর না এসে পারলো না', হেমেন বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। শীলা উত্তর দিল—

'আমিই তাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসবো, তুমি ভেবো না। শীলার গলার স্বর শুনতে শুনতেই হেমেন ঘুমিয়ে পড়ল। শীলার একটি কথা শোনবারও তার ধৈর্য নেই, শীলা 'তার'টি হাতে নিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুম তার এলো না কিছুতেই। নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলবে সে স্থির করলো।

'অলোক জয়তীকে ভালবেসেছিল একদিন, আজ জয়তীর বিয়ের জন্য আমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে—আমারই এ বিষয় উদ্যোগ দেখানো কর্তব্য।' তার মনে আজ নূতন প্রশ্ন।

'পাঁচ বছর পর জয়তীকে কাছে দেখে অলোকের সব অভিমান ঘুচে যাবে নিশ্চয়। এমন মানুষ জয়তী পাবে কোথায়? সে এতদিনে অলোককে ভাল করে চিনবে।'

হেমেন স্টেশন থেকে দেবাশিস ও শান্তাকে বাড়ী নিয়ে এলো। মা ও বাবার চুল অনেক পেকেছে, তাঁদের শরীরে মনে আগের মত শক্তি আর নেই তবু এতগুলি আপন জনকে কাছে পেয়ে তাঁরা উৎফুল্ল। বাদল ও মাদলকে কাছে টেনে নিয়ে শান্তা বুকে জড়িয়ে ধরল। মোটর গেটের কাছে থামতেই সোমেন ছুটে আসছিল। তাকে দেখে দেবাশিস বলল—

'সোমেন, মালাকে কেমন দেখছো? বেচারা ঘাবড়িয়ে যায় নি তো? তোমার মাকে যখন আমি বিয়ে করতে গেলাম উনি তো ভয়ে প্রায় মূর্চ্ছা গেলেন। মালাও অতি কোমল প্রকৃতির মেয়ে, তাকে একটুও বদলাতে চেষ্টা ক'রো না। উদাসীন ব্যবহার করবে না কখনো—জীবনের সব রস তাহলে শুকিয়ে যাবে। দেখো তো, তোমার মাকে কেমন যত্নে রেখেছি, বল তো?' দেবাশিস ছেলের সঙ্গে রসিকতা করতে ব্যস্ত—শান্তা বলল—'আমি বুঝি তোমার জন্য কিছুই করি নি? বুড়ো বয়সে মেয়ে হ'ল সে কী ভাবনায় দিন

গেছে দুজনের বলতো? হীরের ফুল দিয়েছিলে মনে আছে? দেখো সর্বদা কানে থাকে আমার। মনে পড়ে জয়তীর জন্মের কথা? কি নিটোল মুখখানা ছিল তার? জন্ম থেকে ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল আমি আশ্চর্য হয়ে দেখতাম—এমন পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে কেউ জন্মায় বিশ্বাস হ'ত না। এখন তো সে চুল সোজা হয়ে গেছে, সে তাই ভালবাসে। কখন পৌছবে জয়তী?' শান্তা অনর্গল বকে চলেছে এত চঞ্চল হয়ে পড়েছে যেন কথার বেগ সামলাতে পারছে না। জয়তীর পথ চেয়ে সে বসে আছে। শীলা সকলেরই মনের ভাব বুঝতে পারছে।

'আজ পাঁচ বছর জয়তী ঘরের বাইরে—যা শিখতে গিয়েছিল সে তা ভাল করেই শিখেছে—কিন্তু এবার তার ঘর সংসার পাততেই হবে—বিয়ের জন্য তাগাদা দেব তাকে।' দেবাশিস শীলার দিকে তাকিয়ে বলল—

'তোমার তো এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই শীলামা? কত পরিশ্রম করছো প্রত্যেকের জন্য—এক দণ্ড তো বসতে দেখি না তোমায়।' শান্তাও অন্তরের সহিত শীলাকে আশীর্বাদ করলো ও আদর করে বললো—

'একা আজ কত দায়িত্ব নিয়েছ মাথার ওপর, আমার চেয়ে তুমি অনেক বড় গৃহিনী হয়েছ।'

অলোক এসে দেবাশিস ও শান্তাকে প্রণাম করতে তারা ভারী সুখী হ'ল এবং ভাবল জয়তী আসছে খবর শুনেই অলোক আবার যাতায়াত শুরু করেছে।, জয়তীর সঙ্গে পূর্বের যোগাযোগ যে আবার নূতন করে জাগিয়ে তোলা যায় তারা তাই আশা করছিল। অলোকের সঙ্গে শীলার দেখা প্রায় হোতই না—শীলা সর্বদাই ব্যস্ত। সে নিজেকে দুর্বল হতে দেবে না মনস্থ করেছিল। অলোককে দূর থেকে দেখে তার বুকে যেন একবার ধাক্কা লাগলো—সংশয়ও জেগে উঠলো তখনি। মৃদু সম্ভাষণ জানিয়ে সে সরে গেল। শীলার ক্রমাগত এড়িয়ে যাওয়া দেখে অলোক অত্যন্ত মর্মাহত হল। দুটো কথা বলতেও শীলা নারাজ। অলোক যেন প্রচণ্ড ঘা খেলো। শীলার সঙ্গে অলোকের সামনা সামনি দেখা হয়ে যাওয়াতে শীলা স্বাভাবিক ভাবে বলল—

'জয়তী তো শীঘ্র এসে যাবে, এয়ারপোর্টে তুমি আমাদের নিয়ে যাবে অলোক।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলে অলোক শীলার মুখের দিকে তাকালো। তার মুখে একটা রহস্যপূর্ণভাব দেখে অলোকের মোটেই ভাল লাগল না। সে এগিয়ে গিয়ে বলল—

'রায় পরিবারের সরকারী চাকরীটা খুব পছন্দ তোমার দেখছি শীলা। বেশ মেতে আছ এই নূতন পদে।

'ঘরগুলো কেমন দেখাচ্ছে বল তো অলোক?' প্রত্যেকের আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়েছে—ছেলে বুড়ো নানা রকম অতিথি দেখছো তো।'

অলোক আর সহ্য করতে পারলো না—শীলা তাকে একেবারেই যেন এড়িয়ে যাচ্ছে—সে শীলার হাতখানা ধরে তাকে একটি কোণে নিয়ে গিয়ে বসাল।

'শীলা কি হয়েছে তোমার? তুমি আমায় কেমন যেন সরিয়ে দিচ্ছো—আজ চারিদিকের পরিজন তোমায় ঘিরে রেখেছে বলে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই? আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তোমার কোন আগ্রহ দেখি না। যদি বল আমিও সরে যেতে পারি।' অলোকের মুখ হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠলো- কপালের নীল শিরাটি কেমন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল—কি রকম লজ্জিত মুখের ভাব। নারীমাত্রই যেন ওকে অগ্রাহ্য করে।

'দাও, দাও, তোমার হাতখানা শেষ বারের মতো একবার ধরতে দাও' বলে শীলা অলোকের হাতে হাত দিল। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক লাগলো না—মুখখানা নিচু করে অলোকের হাতে মাথাটা ঠেকাল, তারপর আর যেন মাথা তুলতেই পারলো না। কিছু বলবার যেন আর শক্তি তার নেই, অলোকের চোখের দিকে তাকাবার সাহস হল না তার।

'এ সব কি শীলা? পরিষ্কার করে বল না কিছু। তুমি জান আমি তোমাকেই বুঝেছি, ভালবেসেছি, বিশ্বাস কর আমি তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না—আমি এখানে আসা বন্ধ করে দিলেই ভাল কি? শীলা বাধা দিয়ে বলে উঠলো—

'কখনই না। তোমার আসা যাওয়া এ বাড়ীতে অতি স্বাভাবিক—জয়তীকে তোমার বিয়ে করতেই হবে এই প্রতিজ্ঞা কর'। অলোক সরে গেল, ভ্রু কুঁচকে বলে উঠলো—

'তুমি ভেবেছ আমায় তোমার ইচ্ছামতো চালাবে? রায় পরিবারের সুবিধা অনুসারে আমায় বিয়ে করতে হবে? এখানে কি সেইজন্যই আসি? হেমেনকে তোমাকে ও তোমার ছেলে দুটিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তোমাদের মঙ্গল কামনা করি, শুধু তোমাদের জন্যই যদি আসি তাতে আপত্তি কি? একমাত্র তোমাকেই জেনেছি —যদি আমি এখান থেকে সরে গেলে তোমার মঙ্গল হয়, খুলে বল। বলছো না কেন স্পষ্ট করে? জয়তীকে আমার বিয়ে করতেই হবে এ কথা বলবার অধিকার কারুরই নেই যদিও তার বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। কিন্তু তোমার জন্যই যে আমার প্রাণ কাঁদে, তুমি না চাইলেও.........'

অলোক আজ সমস্ত মনের কথা খুলে বলে দিল। ঘর্মাক্ত কপালখানি বড় রুমাল দিয়ে মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, এমন উদাস দৃষ্টি তার আর কেউ দেখেনি। বহু বছর পূর্বে প্রথম যৌবনে সে জয়তীকে চেয়েছিল, জয়তীর কাছে সে কিছুই পায় নি। স্নেহপরায়ণ মন তার, জীবনে সে কোন কিছুই দিতে পারে নি কাউকে। শীলাকে অনেক বছর ধরে দেখে আসছে, ক্রমশঃ তার সুখ দুঃখের সঙ্গে সে যেন জড়িয়ে পড়েছে—তার নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা নিয়মিত অনুভব করছে এবং নিজের জীবনের সঙ্গে তা সর্বদাই তুলনা করেছে। শীলার প্রকৃত সুখই সে কামনা করে। এ তো ক্ষণিকের আকর্ষণ নয়। অলোক তার মনের উত্তেজিত ভাবকে দমন করে নিতে পারলো সহজেই, সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শীলাকে বলল—

'আর উৎপাত করবো না এখানে, তোমায় বিরক্ত করছি বড়, কিন্তু ভুল বুঝো না। হেমেনকে ছেড়ে চলে এসো এ কথা কোনদিন বলবো না—ছেলেদেরও কোনভাবে আঘাত দিতে চাইনি। বিশ্বাস রেখো। কিন্তু যদি আমার ভালবাসার কোন মূল্য না থাকে তোমার কাছে তাহলে আর আসবার প্রয়োজন নেই। এ তো অভিনয় নয়, তোমার নিরানন্দ দেখতে চাই না। কই আর তো তোমার মনে স্ফূর্তি দেখি না? আর আসতে ইচ্ছা করে না।'

শীলা হতভম্ব হয়ে গেল, সত্যিই কি অলোক তাকে এতই ভালবেসেছে যে জয়তী তার কাছে কেউই নয়? ভাবতেও পারে নি সে, অলোক মোহবশে তো এ কথাগুলো বলে নি? তার অন্তরের স্পষ্ট কথাগুলো সত্য যা তা প্রমাণ করে দিলো? শীলা অলোকের বুকের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথাটি রাখল, কি অভয়বাণী সে যে শুনতে পেলো শীলাই তা জানে। নিষ্কাম ভালবাসার কোন তত্ত্ব আছে বলে সে কি শুনেছে? প্রেমের কোন তত্ত্ব বা লীলা কিছুই যে তার জানা ছিল না। পাপ, মোহ, স্বেচ্ছাচারিতা এসব—কথাগুলির অর্থ অভিধানে দেখেছে কিন্তু অর্থ বোঝবার চেষ্টাও করেনি—প্রয়োজনও হয়নি কোনদিন। কোথায় যে খটকা লাগছে তাও সে বুঝিয়ে দিতে পারে না।

'নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমায় ভালবেসেছি অলোক, তোমায় যেতে দিতেই হবে কিন্তু তবু এখনি যেও না, অনেক কিছু বলবার আছে মনে হয়।' শীলা অতি কোমল সুরে কথাগুলি কোনরকমে বলে শেষ করলো। আকাশও অন্ধকার হয়ে এলো—শ্রাবণের বন্যাধারা চারিদিককে মাতিয়ে তুলেছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দলকে হাত ধরে কোলে তুলে শীলা ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো: সারা বাগানখানা যেন একটি বিশাল সবুজ কার্পেটের মতো দেখাচ্ছিল। বেড়ার ওপরকার লতাগুলি চারিদিকের ঘাসপাতা সব সজীব হয়ে উঠল—

শ্যামল সৌন্দর্যে মাঠঘাট সমস্ত ঢেকে গেল। নীলাকাশ পুনর্বার উঁকি দিচ্ছে দেখে শীলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। অদূরে একটি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে গেল। বহুকাল পূর্বে এই বাড়ীতে তাঁরা এসেছিলেন—আজও শান্তা ও দেবাশিসের কাছেই এসেছেন। জয়তীকে দেখে যাবেন এই ইচ্ছা। শীলা দুটি নিচু মোড়া সামনে এগিয়ে দিতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আরাম করে বসলেন। শান্তা জমিয়ে গল্প করতে লাগল।

'ভারি মিষ্টি বউটি, খুব কাজের মেয়ে মনে হয়' বৃদ্ধা বললেন।

'খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে হেমেনের সঙ্গে—দু'টি ভারী সুন্দর ছেলে আছে, আমার নাতিদের দেখবেন?'

আমার ছেলের বয়সও কম, কিন্তু হেমেন ব্যারিস্টারিতে খুব উন্নতি করেছে।'

শান্তা ছেলেদের কথা বলতে বড় গর্ব বোধ করে, কিন্তু পুত্রবধূর প্রশংসা করতে সে কুণ্ঠিত নয়। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে থেমে থেমে—বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়াতে চারিদিক ঠাণ্ডা হ'ল। ভোরের আলো একটু দেরীতেই দেখা গেল, কিন্তু আকাশ যখন পরিষ্কার হ'ল তখন চারিদিক আলোয় উদ্ভাসিত। জয়তীর প্লেন দু'ঘন্টা দেরীতে আসবে শীলা এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল, ভোর থেকে সে সেখানেই বসে আছে। অলোক এল না। সোমেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌছোল। যাত্রীদল সিঁড়ি দিয়ে একে একে নামছে জয়তী ধীরে ধীরে নেমে এল, মুখে তার উজ্জ্বল হাসি। ক্ষীণ দেহ তার একটু ভরেছে তাই চেহারার পরিবর্তন হয়েছে কিছু। চুলগুলি পেছনে ঠেলে দিয়ে, একটি উঁচু খোঁপা করেছে। গাঢ় নীল রঙের রেশমের শাড়ীখানার সারা গায়ে ছোট ছোট সাদা ময়ূর ছাপা। গায়ে সাদা ব্লাউজ। হাতে একটি মস্ত নীল চামড়ার ব্যাগ। সাধারণ এক জোড়া জুতো পায়ে জয়তী নেমে এলো।

সোমেন ও শীলাকে দেখতে পেয়ে সে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে।

'কই তোর বর কই জয়তী? এতদিনে একটা সাহেব সঙ্গে আনতে পারলি না—আবার বর খুঁজতে হবে এখানে?' সোমেন বহুদিন পর আবার বোনের সঙ্গে রসিকতা করবার সুযোগ পেল।

'কে বলল পাইনি? আসছে, শীঘ্রই আসছে' জয়তী হাসল।

সোমেনের বুঝতে বাকি রইলো না জয়তী পুরাতন অভ্যাসমতো দাদাকে ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ করেছে। জিনিসগুলি একত্র করে নিয়ে বাদল মাদল সোমেন ও শীলা গাড়ীতে গিয়ে বসলো, জয়তী আগেই গাড়ীতে উঠেছে। সারাপথ মাদলের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জয়তী প্রায় হার মেনে গেল। মোটর বাগানের রাস্তায় এসে পৌছতে সকলেই ছুটে এলো, দরজার কাছে গাড়ী থামতেই জয়তী লক্ষ্য করল দেবাশিস ও শান্তা উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে। চারিদিকে এত লোক দেখে জয়তী বেশ যেন দমে গেল। সে দেখল অপরিচিত অগুন্তি অতিথি জানালা দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। গাড়ী থেকে নেমেই সে মা ও বাবাকে প্রণাম করলো। হেমেনকে দেখতে পেলো না। বাড়ী যেন একেবারে নতুন দেখাচ্ছে—জয়তী একটু হাসলো তারপর নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগল। শান্তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসালো।

'মা এ কী করেছ? এত লোক কোথা থেকে জোগাড় করলে? যেন হাট বসেছে। সকলের সঙ্গে আলাপ করতে বোল না লক্ষীটি, তুমি বাবাকে বল আমি এত ভিড় অনেকদিন দেখিনি, কি রকম যেন লাগছে। তুমি বাবাকে বলবে তো?'

'সোমেনের বিয়ের জন্য তো মাসতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসেছে, কাকা, জ্যেঠা তো আছেই।

অলোকের সেই মাসী ও মেসো এসেছেন, তোমার ফিরে আসার খবর পেয়ে দেখা করতে চান।'

'ওঁদের আবার এ বাড়ীতে আসার এতো উৎসাহ কেন?'

'জানই তো, অলোকের তো তোমার ওপর নজর ছিল, সেই সূত্রেই এসেছেন ওঁরা।'

শান্তার কথা শেষ করবার আগেই জয়তী বিরক্ত হয়ে উঠলো—

'মা কি যে—সেই প্রাচীন ইতিহাস আবার—পাঁচ বছর তো সম্পর্ক নেই। আবার ও সব কথা বলছো কেন? ভালো লাগে না।'

'ব্যস্ত হয়ো না জয়তী, বাবার কাছে যাই সোমেনের বিয়ের ব্যাপারে কতগুলো কথা আছে বলে আসি। তুমি তৈরি হয়ে নাও, এই নাও সরবৎ।'

শান্তা তাড়াতাড়ি দেবাশিসের কাছে গিয়ে বসতে দেবাশিস আন্দাজ করলো, শান্তা হয়তো জয়তীকে বেফাঁস কিছু বলেছে।

'ওকে কিছু বোলো না, বিয়ের বিষয় আর কথা তুলো না শান্তা ছুটিতে আনন্দ করতে দাও'। হেমেন জয়তীর ঘরের দিকে ছুটছে—দরজায় খুব ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল—

'দরজা খোল জয়তী দেখি চেহারাটা॥

'দাদা এসো' জয়তী হেমেনকে প্রণাম করলো।

'ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এল—মস্তবড় আর্টিষ্ট এখন, এবার আমাদের বাড়ীর জয়জয়াকার।'

'বৌদি যে বাড়ীখানা কি সুন্দর করে সাজিয়েছে: চমৎকার। এতো সব ওরই পছন্দে সাজানো হয়েছে আমি জানি।' জয়তী আনন্দ করে কথাগুলি বলছিল—কিন্তু হেমেন কথাটা প্রায় উড়িয়ে দিল।

'জয়তী আবার পরে গল্প হবে—এবার কাজে যাই, বলে হেমেন বেরিয়ে গেল আর ফিরলো না শীঘ্র।

এবার একটা ভাল কাজ পাবে তো? তাই তো তুমি চাও?

এতদিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনি। শীলা দীর্ঘকাল পর জয়তীকে কাছে পেয়ে দ্বন্দের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। আন্তরিকভাবে তাকে নানান প্রশ্ন করতে জয়তী তার নিজের বিষয় বলতে কিছুই দ্বিধা করলো না।

'দিল্লীতে একটি ভাল কাজের সন্ধান পেয়েছি বৌদি, এক সপ্তাহের মধ্যেই যেতে হবে—ছোটদার বিয়ের জন্য ছুটি নিলাম নইলে সোজাই যেতাম। এর মধ্যে কেউ আমার খোঁজ নিয়েছে কি?'

'হ্যাঁ, তাই তো'—শীলা বলল—

'একজন ফোন করেছিলেন—নম্বর রেখেছেন এনে দিচ্ছি। নম্বরটি জয়তীকে দিয়ে শীলা অন্য ঘরে চলে গেল।

ক্রমশঃ

এক বিস্মৃত কথাশিল্পী প্রসঙ্গে ঃ স্বগতচিন্তা

ভাগবতদাস বরাট

জলস্রোতের ন্যায় কালের গতি। অর্থাৎ যে স্রোত বহে যায় তা যেমন আর ফিরে না,—কালও সেইরূপ। আবার স্রোতের ধর্ম্মের মতই কালের ধর্ম্ম। প্রবাহমান স্রোতের মুখে যেমন অনেক কিছু বিলীন হয়, কাল ক্রমেও সেইরূপ বহু স্মৃতি ও স্মরণ সম্ভার বিস্মরণের চৌকাঠ ডিঙ্গায়। তবে যিনি হিমাচলের ন্যায় সুদৃঢ়, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। মৃত্যুর পরও অমর তিনি।

বিস্মৃত কথা-শিল্পীর নাম অমলা দেবী। তাঁর পরিচয় আজ নূতন করেই দিতে হবে, কারণ তাঁকে মনে রাখার কথা আমাদের মত অনেকেই ভুলে গেছেন। অথচ একদিন তিনি স্বীয় আলোকে সমুজ্জ্বল ছিলেন। আজ তা নিভে গেছে।

অমলা দেবী ছদ্মনামের আড়ালে যিনি এককালে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন তাঁর নাম অধ্যাপক ললিতানন্দ গুপ্ত।

বছর তিনেক আগের কথা। বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক লাইব্রেরীতে 'পারাবত' পত্রিকায় পাতা উল্টিয়ে স্তব্ধ ভাবে বসে পড়লাম। বুঝলাম, অধ্যাপক ললিতানন্দ গুপ্ত মারা গেছেন। এই পত্রিকাটা তাঁরই স্মৃতি সংখ্যা। বিষণ্ণতায় বিমর্ষ হলাম। নিজেকেও অপরাধী মনে হল। তার কারণ, আপন সীমিত গণ্ডীর মধ্যে নিজে এতখানি জড়িত ছিলাম যে ললিতবাবুর কোন খবর রাখার সময় পাই নি। কখন তাঁর পা ভাঙ্গল, কখন তিনি মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে ভর্ত্তি হলেন, তাঁর শরীরের আরও নানাবিধ অসুখ বিসুখের সংবাদ, এই সব কিছুই তো জানতাম না। কারো মুখ থেকেও শুনি নি। তারপর তিনি যে কখন ইহজগৎ হতে সরে গেলেন তাও জানলাম না। থিতানো পুকুরের জলে ছোট একটি ঢিল ফেললে জলে আলোড়ন উঠে পরক্ষণেই যেমন তা আপনা আপনি মিলিয়ে যায়, আমার মনেও সেইরূপ নানা চিন্তার ঢেউ উঠে তখনই মিলিয়ে গেল। নানা কথা ও কাহিনী একসঙ্গে মনের কোঠায় ভীড় জমিয়ে আবার তা মনের অতলে তলিয়ে গেল। কিছু লিখে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপনেরও ইচ্ছা হল না। অথচ তিনি ছিলেন আমার হিতাকাঙ্খী ও পরম বন্ধু। নিজের মনটাকে আর চিনতে পারলাম না।

আমি সাহিত্যিক বা প্রাবন্ধিক নই। কোনদিন সাহিত্য নিয়ে চর্চ্চা বিচারও করি নি। সুতরাং ললিতানন্দের সাহিত্যের মান নির্ণয় ও তাঁর সৃজনী শক্তির পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর চরিত্র সৃষ্টির বাস্তবতা দূরদর্শিতার পরিচয় আমার কাছে ঘোল খেয়ে দুধের স্বাদ বোঝার মত অলীক কল্পনা মাত্র। আমি শুধু এই কথাই বলব যে ললিতানন্দের ঐকান্তিক নিষ্ঠাই ওঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন। যুগ ও কালের পরিবর্ত্তনে মানুষের যেমন রুচিনীতি পাল্টে যাচ্ছে, তেমনি সাহিত্যের গতি প্রকৃতিও লক্ষ্যণীয়। তবু বলব তার লেখা মুষ্টিমেয় হলেও সর্ব্বকালের পাঠক মনে আনন্দের খোরাক মেটাতে সক্ষম হবে।

বাঁকুড়ার নূতন চটি পল্লীতে ললিতবাবুর বাড়ীর সামনে এককালে আমার বাসা ছিল। শৈশবে জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে জানতাম। তখন তিনি বাঁকুড়া কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। বয়সের তফাৎও অনেকখানি। তাঁহার দুই ছেলেই আমার চেয়ে দু'ক্লাস নীচে পড়ত। তাঁহার ছাত্রও ছিলাম না। কারণ, আমি ছিলাম কলা বিভাগের ছাত্র। সুতরাং ললিতবাবুর সঙ্গে কোন দিক থেকেই সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হওয়ার কথা নয়। আর এমন কিছু একটা কেউ কেটাও নই যে

তিনি এসে আপনা আপনি আলাপ জমাবেন। কিন্তু দেখা গেল নূতন চটির বাড়ী ছেড়ে আমরা যখন আমাদের চকবাজারের বাড়ীতে বাস করছি তার পাঁচ ছ'বছর পরই তিনি আমার সান্নিধ্যে এসে গেলেন।

পাড়া প্রতিবেশী হিসাবে অনেকদিন ওঁদের কাছাকাছি ছিলাম। তারপর হঠাৎ রাতারাতি অদর্শন। আর কোন দিনই ওঁদের পাড়ায় আমাদের দেখবেন না, এই সব সাতপাঁচ ভেবেই কি দেখা হওয়া মাত্রই উনি স্মিতহাস্যে দাঁড়িয়ে পড়ে এনিয়ে বেনিয়ে নানা কথায় মেতে উঠতেন। তখন বুঝলাম, উনি কত সরল ও মিশুক স্বভাবের। ভাবতেই ভুলে যেতাম যে এই সামনের মানুষটি বিজ্ঞানের অধ্যাপক। এবং ইনি একজন সাহিত্যিক। মনে বিন্দুমাত্র অংমিকা নেই আর দম্ভও নেই। আর বুঝলাম, দূর থেকে মানুষের দৈহিক অবয়ব দেখে তার দেহের পরিচয়ই মিলে- কিন্তু স্বভাব বা মনের হদিস মিলে না।

আমার পিতৃদেব ৺উপেন্দ্র চন্দ্র বরাট রিটয়ারড' হয়ে বাংলা শব্দ গঠন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলেন। সেটা ১৯৬৮-৬৯ সালের কথা। এখন ওসব প্রতিযোগিতা উঠে গেছে। সেই সময় আমাদের বাড়ীতে বাংলা ক্রশ ওয়ার্ড প্রতিযোগিতার শ্রীলেখা রেনুকা, কহিনুর, সুরধনী প্রভৃতি নানা পত্র পত্রিকা আসত। বাবার সঙ্গে আমিও শব্দ গঠন প্রতিযোগিতার সূত্রকথা চিন্তা করতাম। পড়ার বই ফেলে রেখে বাংলা অভিধান নিয়ে ঘাঁটা ঘাঁটি সুরু করতাম ফলে কখনও কখনও ছোট খাটো চার ছ'লাইনের নীতি মূলক কবিতাও কলমের ডগা হতে আপনা আপনি খসে আসত। লিখব না ভেবে নিশ্চুপ থাকতেও পারতাম না। না লিখা পর্য্যন্ত মনের কেমন যেন এক ছটপটানি ভাব। সেই আমার রোগের সূত্রপাত। হয়ত এটা রোগ নয় নেশা। আর এই নেশায় মশগুল হয়ে দু, একটা ছোট গল্পও লিখতাম। সেই সময় ঐ সব গল্প কবিতা শ্রীলেখা, রেনুকা প্রভৃতি কাগজে ছাপা হত। তখন আমি স্কুলের ছাত্র আর ঐ নূতন চটিতেই আমার বসবাস। কিন্তু তা হলেও ললিতবাবুর পক্ষে আমার ঐ তথ্য জানা সম্ভব ছিল না। কারণ, একথা আমি কাউকেই জানাতাম না। আর ঐ সব পত্র পত্রিকাও ললিতবাবু হয়তো কোন দিন পড়ে নি।

কেউ যদি মাটি কাটার নেশায় মত্ত হয়ে কেবল মাটিই কাটতে থাকে তা হলে তার সেই নেশার থেকে যে একটা পুকুরের সৃষ্টি হচ্ছে সে দিকে যেমন তার খেয়াল থাকে না, তেমনি আমার পিতৃদেব বাংলা শব্দ গঠনের কোন সূত্র আমার মনে ধরিয়ে দিয়ে আমাকে চিন্তিত করে করে সমাধানের সঠিক উত্তর চেয়ে বসতেন; কিন্তু সেই চিন্তায়থেই ধরে সঙ্গোপনে আমি যে আর এক মাদকতায় কবিতা লিখছি সেদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। ছাপা হলে জানতে পারতেন কিন্তু উচ্ছ্বসিত হতেন না। শুধু বলতেন লেখা হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের। কিন্তু আমি যে নেশার ঘোরে একটা বিশেষ রোগে আক্রান্ত হচ্ছি তা তিনি বুঝতেন না। জানতে পারলে কঠিন হস্তে দমন করতেন। খুব সম্ভব সেই সময় ললিতবাবু শনিবারের চিঠিতে অমলা দেবী এই ছদ্মনামে ধারাবাহিক ভাবে "ন্যাড়া" উপন্যাস লিখছেন। হঠাৎ দেখি পাড়ায় কয়েকটি ছেলে মেয়েও গল্প লিখতে সুরু করেছে। আর তাতে তাদের বাবা মায়েরও বারণ নিষেধ ছিল না। আগুন যেমন বাতাসের আসকারা পেয়ে দাউ দাউ শব্দে জ্বলে উঠে, তেমনি আমরাও মেতে উঠলাম। আমরা সেই সময় হাতের লেখা পত্রিকা "উর্বসী" ও পরে "শ্রী" প্রকাশ করেছিলাম। ললিতবাবু নয়, তাঁহার ছেলে সলিল আমাদের সঙ্গে মেতে উঠেছিল। ফলে সলিলের লেখা নিয়ে এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল যাতে ললিতবাবুও আমাদের উপর চটে উঠলেন। তিনি সরাসরি আমাদের কাছে আসেন নি। ওঁর ছেলেই বলেছিল,—বাবা রেগে গেছেন।

যাক্ সে কথা। শৈশবের এসব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। ভুলে যাওয়ারই কথা। কিন্তু এখন দেখছি ভুলি নি।

বাঁকুড়ার চকবাজারের ঘরে পাঁচ ছ'বৎসর বাস করছি। নূতন চটির সঙ্গে কোন সংস্রব ও সম্পর্ক নেই।

বাবার দুরারোগ্য এক রোগ দেখা দিল। চিন্তিত হলাম। রীতিমত চিকিৎসা হল। কিন্তু কোন সুবিধা হল না। অবশেষে বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশনের দাতব্য হোমিও প্যাথিক চিকিৎসালয়ে কোন এক রবিবারে বাবাকে নিয়ে হাজির হলাম। সেইখানেই নূতন করে ললিতবাবুর সঙ্গে পরিচয়। উনি আমাকে দূর থেকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কেন যে তাঁর উচ্ছ্বাস তা ওঁর সঙ্গে কথা না বলেও বুঝেছিলাম। এবং বিস্মিতও কম হয় নি। কারণ, শব্দ গঠন প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হওয়ায় ঐ সব ছোট বড় পত্রিকা গুলোও লুপ্ত হল। কিন্তু তারপর যে সব কাগজে আমি লিখতাম সেগুলোও ওঁর হাতে পড়ার কথা নয়। কিন্তু তখন জানলাম পৌঁছেছে। স্মিতহাস্যে ওঁর কাছে এগিয়ে যেতেই উনি বললেন, দেখছি বাঁকুড়ায় তুমি আর শক্তিপদ রাজগুরু ছাড়া আর তো কেউ বড় একটা লিখছে না।

আমায় কেউ প্রশংসা করলে আমি স্বভাবতঃ লজ্জিত হয়ে পড়ি। তাই লজ্জিত ভাবেই বললাম, কৈ আর তেমন লিখছি। মাঝে সাজে হেথা হোথা লেখা বেরোয়। উনি বললেন,—কেন সচিত্র ভারতেও তো তোমার কয়েকটা লেখা দেখেছি। কথাটা শুনে চমকে উঠি। সচিত্র ভারতে কয়েকটা হাসির গল্প পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তা প্রকাশ হয়েছে বলে তো জানতাম না। উনি তখুনি বললেন, ওদের কাছ থেকে টাকা পাও নি? ওরা তো লেখকদের টাকা দেয়।

মনে হল আমি যেন রামকৃষ্ণ মিশন মঠের দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসি নি। ভুল করে অন্য কোথাও পৌঁছেছি। আমার চোখে মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখে উনি বললেন,—এই তো দু'সপ্তাহ আগে তোমার গল্প 'কানাকড়ি' ওতে ছাপা হয়েছে। তখন বুঝলাম, আমার নামে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। বললাম,—টাকা তো দূরের কথা একটা বই পর্য্যন্ত পাঠায় না। উনি বললেন,—সচিত্র ভারতে আমিও মাঝে সাজে লিখি। আমার ঘরে আরও যে সব কাগজ আসে তাতেও তোমার লেখা দেখতে পাই। যাক্ তুমি আমাদের বাড়ী যেও। তুমি তো ঘরের ছেলে। আমি না থাকলেও তোমার মামীমা তো থাকবেন। তোমার যে সব কাগজে লেখা দেখবে সেগুলো নিয়ে আসবে।

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলেও তিনি চুপ্ করলেন না। আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ধারণ করলেন। আর বললেন,—কাশী হতে ভারতজ্যোতি নামে একটা কাগজ বেরুচ্ছে। তার এক কপি নিয়ে আসবে। ওখানে লেখা পাঠাও। সেই থেকেই ওঁর সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য। আমার লেখা লিখির ব্যাপারে উৎসাহদাতা ছিলেন দু'জন। একজন ডাঃ কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর জন সুধীরকুমার পালিত। সেই তালিকায় ওঁর নামও লিখে রাখলাম।

তারপর যখন যেখানেই দেখা হয়েছে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে স্মিত হাস্যে নানা কথায় মেতে উঠেছেন। নানা প্রশ্নে আমার মনের কথা যেমন জেনেছেন, আমিও জেনেছি তেমনি অনেক কিছু। বলেছেন,—গল্প লেখার ব্যাপারে আগে গোটা গল্পটা মনের মধ্যে ছকে রেখে লিখতে সুরু করি। লিখতে লিখতে যখন লেখার কিছু থাকে না তখন আপনা আপনি কলম থেমে যায়। গল্পের ফিনিসিং এর কথা আমাকে ভাবতে হয় না। আর নাম করণ? গল্প শেষ হলেই গল্পই বলে দেবে তার নাম করণ কি হবে। উনি আরও বলেছিলেন,—আমাদের দেশের মুনি ঋষিরা যে আমাদের দেহস্থিত ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন তা নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। আমি তার প্রভাব লক্ষ্য করেছি। তোমার মত অবস্থায় পড়লে আমি একটা প্রসেস এপ্লাই (Process apply) করি। সেই সময় আমি সুষুম্না নাড়ীর সাউণ্ড মারফৎ লেখার ফিনিসিং ও তার নাম করনের সমস্যার সমাধান করি। কি করে যে সেই সাউণ্ড পাওয়া যাবে এবং তার প্রসেস (Process) যে কি তাও তিনি জানিয়ে ছিলেন। মনে আছে, কিন্তু চেষ্টা করি নি। বলতেন, লিখে যাও, এখন তোমার বড় হওয়ার সময় যথেষ্ট আছে। কুড়ি বছর আগে থেকেই তিনি একথা শুনিয়ে আসছিলেন। কিন্তু আমি লিখি

নি। বছর কয়েক কিছু না লিখেও কাটিয়ে দিয়েছি। সেই সময় ওঁকে দূর থেকে দেখে লুকিয়ে পড়তাম।

কয়েক বছর আগের কথা। সেবার আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির জন্মশতবার্ষিকী বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত হল। বাঁকুড়া কলেজেই সেই সভা। উদ্যোক্তা ছিলেন উক্ত কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক সুখময় চট্টোপাধ্যায়। সভাপতি প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি সজনীকান্ত দাস। আমরা লেখা পড়ব সেইজন্য প্রথম সারিতেই আমাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। ললিতবাবুও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ ছিলেন না। আমি ছাড়া ডাঃ কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুখময় চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপাল লাল দে, বাঁকুড়া গোয়েঙকা স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচজনের লেখা পড়া হবে। কিন্তু সভাপতিমশায় আমাদের লেখা পড়তে দিলেন না। লেখার পাণ্ডুলিপি পকেটেই রয়ে গেল। বললেন,—কেউ কিছু পড়তে পাবেন না। বক্তব্য বিষয় মুখে বলুন। কিন্তু মুখে বলতে কেউ রাজি নন। সুতরাং কারো লেখা যেমন পড়া হল না, তেমনি মুখেও কিছু বলা হল না। আমার তৎকালীন পত্নী স্বর্গীয়া সুষমা দেবী তখন তাঁর পিত্রালয়ে—ওন্দাগ্রামে। আমি সভা ভাঙ্গার আগে সভাকক্ষ ত্যাগ করে বাঁকুড়া ষ্টেশনে হাজির হলাম। রাত ন'টার ট্রেন ধরে ওন্দা যাব। টিকিট নিয়ে প্লাটফর্মে এসেই দেখি ললিতবাবুও দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, কোথাও যাবেন না। ওঁর বড় ছেলে সমীরের কর্মস্থলে ওঁর স্ত্রী গেছেন। এই ট্রেনেই ফিরবেন।

ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। ললিতবাবু সেই সময় প্লাটফর্মের পূব দিকের কোন একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে আমার পাশে বসে ওঁর জীবনের সব কথাই খুলে বললেন। ওর ছাত্র জীবনের কথা। অমলা দেবীর সঙ্গে ওর বিবাহ। ওঁর শ্বশুরমশায় যে সজনীকান্তের বাবার বন্ধু ছিল সে কথাও জানালেন। ওঁর সুধার প্রেম উপন্যাস যে ছায়াছবির রূপ নিল তাও সজনীকান্তের চেষ্টায়। সেই সময় তিনি যে কত পেয়েছিলেন তা জানালেন। আবার ওঁর ন্যাড়া উপন্যাসও যে সিনেমার রিলে তোলা হবে তাও জানালেন। বললেন—আমার স্ত্রী আর সজনীর মধ্যে ভাইবোনের সম্পর্ক। আর তা ওদের ছেলেবেলা থেকেই। আরও বললেন,—শনিবারের চিঠি ছাড়া সজনীবাবু একদা আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকার যে কি নাম ছিল তাও তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে নাম মনে পড়ছে না। ললিতবাবু সেই কাগজে লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে সজনীবাবুকে চিঠি লেখার জবাবে সজনীবাবু জানিয়ে ছিলেন,—যদি অমলার নামে লেখা আসে তাহলে সেই লেখা শনিবারের চিঠিতে প্রকাশ করব।

সেই থেকে ললিতবাবু ওঁর স্ত্রীর নাম অমলা দেবীকেই ছদ্মনাম রূপে গ্রহণ করে শনিবারের চিঠিতে লিখতে থাকেন। ১৯৩১-১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত একটানা এই স্বল্প ক্ষণে ললিতবাবু যা লিখেছেন তার পরিমাণ আয়ও স্বল্প। মাত্র পাঁচ ছ'খানি উপন্যাস ও আট দশখানা ছোট গল্প ওঁর সারা জীবনের সাহিত্য কীর্ত্তি। পাঠকের বিচারে তার দাম ন্যূনতম হলেও তাঁর কাছে তাঁর কীর্ত্তি অমূল্য সম্পদ। আবার স্বীয় কীর্ত্তির মাঝে তিনিও মহান। বিদেশীর বহু ভাষায় তাঁর ন্যাড়া উপন্যাস ও কয়েকটি ছোট গল্প অনূদিত হয়েছে। ললিতবাবু বলেছিলেন এই সবই সজনীর প্রচেষ্টায়।

সেইদিন তিনি আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ভেবে কেন যে এত কথা বলেছিলেন তা তখন বুঝি নি। ট্রেন আসায় ট্রেনের কামরায় চেপে বসে সেই কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিল,—উনি যখন এই জগতে থাকবেন না তখন তাঁহার বিষয় লেখার যদি বাসনা জাগে তাহলে যাতে না কোন অসুবিধা হয়,—তাই কি সব জানালেন? আজ আবার ট্রেনের কামরায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদঃ পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রকার বা শ্রেণীর মানুষের জন্য একই রাষ্ট্রনীতি, এবং সকলের জন্য অবাধ বাণিজ্যনীতির মধ্যে আমাদের দেশের লোক হয়ত গর্ব করিবার মত কিছু দেখিতে না পাইতে পারে, কিন্তু ইংল্যাণ্ড যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা অন্যের অনুসরণ যোগ্য। হিন্দুগণ এই নীতি প্রাচীনকালে অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহাদের অধঃপতনের সময়েও ইহা ত্যাগ করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাহার ঘুণ ধরা জাতীয় জীবন পশ্চিমের উত্তাল জীবন তরঙ্গের স্পর্শমাত্র চূর্ণ হইয়া যাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাহার নীতি অব্যাহত ছিল। আমি এক ব্যক্তির লেখা হইতে ইহা প্রমাণ করিতে পারি। তিনি আমাদের প্রতি খুব বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন না, নাম তাঁহার কামাল উদ-দীন আবদার রাজ্জাক। তিনি সমরখন্দের জালাল-উদ-দীন ইশাকের পুত্র, জন্মস্থান হিরাট, জন্ম তারিখ ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর। তিনি ১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কালিকাট সম্পর্কে তাঁহার উক্তি—"কালিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ বন্দর, এবং হারমুজের মত পৃথিবীর সকল স্থান হইতে বণিকেরা এখানে আসিয়া থাকে। অনেক দুর্লভ জিনিস এখানে আসে, বিশেষ করিয়া অ্যাবিসিনিয়া, জিরবাদ এবং জানজিবার হইতে। মক্কা হইতে মাঝে মাঝে জাহাজ আসে, হিজজাজ হইতেও আসে, এবং যতদিন ইচ্ছা থাকিয়া যায়। এটি অমুসলমানদের শহর, অতএব আইনত ইহা আমাদের দখলের যোগ্য। এখানে অনেক মুসলমান বাস করে। তাহাদের দুইটি মসজিদ আছে, প্রতি শুক্রবার সেখানে তাহারা নমাজ পড়ে। তাহাদের একজন ধার্মিক কাজি আছেন। মুসলমানেরা এখানে অধিকাংশই সুফী সম্প্রদায়ের। এখানে পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচার অধিষ্ঠান করে। বণিকেরা এখানে পণ্যদ্রব্য আনিয়া যতদিন ইচ্ছা পথের উপরে অথবা বাজারে রাখিয়া দেয়, এবং কাহারও উপর তাহা দেখাশুনার ভার না দিয়া চলিয়া যায়। শুল্ক বিভাগের লোকেরা এই সব পণ্য-দ্রব্যের প্রহরায় লোক নিযুক্ত করে।" আমি আবু আদদালা মহম্মদ অল ইদ্রিসির কথাও প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিতে পারি। তিনি ছিলেন মরোকোর বিখ্যাত ভূগোলবিদ, একাদশ শতাব্দীর মানুষ তিনি। তাঁহার লেখাতে দেখা যায়, ন্যায়পরায়ণতায় হিন্দুরা বিখ্যাত ছিলেন। অল ইদ্রিস বলিতেছেন—"হিন্দুরা স্বভাবতঃই ন্যায়ের পক্ষে। তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে কখনও ইহা হইতে ভ্রষ্ট হইতেন না। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতিতে সততা এবং আনুগত্য সুবিখ্যাত। এবং তাঁহারা এই

সব গুণাবলীর জন্য এমনই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহু লোক তাঁহাদের দেশে আসিত। দেশের উন্নতির মূলেও তাহাই।”

এই জন্য আমার দেশবাসীরা ইংল্যাণ্ডে যে স্বাধীনতা এবং ন্যায় ধর্ম আছে তাহার মূল্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহাদের মতে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, ইহাই ত মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের ভাগ্য এমন একটি যুগের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে যুগে যুক্তিবাদজাত মতান্ধতা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, যে যুগে চিন্তানায়কেরা প্রকাশ্যে এমন সব মতবাদ প্রচার করিতেছেন যাহা ক্ষুধান্ধ বর্বরেরা পুরাতন পৃথিবীতে তাহাদের অজ্ঞাতসারেই অনুসরণ করিত। সেই মতান্ধতা, সেই ঠগী ধর্ম এখন সভ্য জগৎকে অনুসরণ করিতে বলা হইতেছে। তাহাদের শিখান হইতেছে ইহা দ্বারা তাহারা অনুন্নত জাতিকে উৎপীড়িত করুক; শিখান হইতেছে প্রাবল্যের কাছে ন্যায়ধর্ম পরাভূত হউক, প্রবল দুর্বলকে শিকার করুক, এবং সর্বাপেক্ষা সকল নরহন্তাই পৃথিবীতে শুধু টিকিয়া থাকুক। সিংহের শক্তি, শৃগালের ধূর্ততা এবং পুরাকালের হইলে যে জ্ঞান ও ক্ষমতা অতি মানবীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, তাহা দ্বারা এই মতবাদসমূহ পৃথিবীর সকল অনুন্নত জাতির উপর প্রযুক্ত হইতেছে। এইভাবে আমরা দেখি স্পেনের হাত আমেরিকাবাসীদের রক্তে গভীরভাবে রঞ্জিত হইয়াছে, তথাপি অ্যাটলান্টিক পারের “স্পেনের ইতিহাসে, পর্টুগালবাসীরা ব্রাজিলে যে মহা অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহার সহিত অন্য কিছুর তুলনা হয় না। এই পর্টুগীজরা ব্রাজিলে তথাকার অধিবাসীদের শিকারের স্থান সমূহে তাহাদিগের মধ্যে মড়ক ছড়াইবার উদ্দেশ্যে মারাত্মক ছোঁয়াচে স্কারলেট-ফিভার ও বসন্ত রোগীর কাপড়চোপড় ফেলিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অ্যামেরিকাতেও ইউরোপীয়গণ হীনতম অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সেখানে উটা অঞ্চলের প্রান্তর প্রদেশে যেখানে অ্যামেরিকান ইণ্ডিয়ানদের বিচরণ ভূমি সেইখানকার কূপ সমূহে স্ট্রিকনিন (কুঁচিলা বিষ) ছড়াইয়া দিয়াছে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা দুর্ভিক্ষে ক্ষুৎকাতর হইয়া যখন শ্বেতকায়দের দ্বারে আসিয়াছে কিছু খাইতে পাইবে আশায়, তখন শ্বেত গৃহিণীরা খাদ্যের সঙ্গে আরসেনিক (সেঁকো বিষ) মিশাইয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এবং টাসমানিয়ার ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা কি করিয়াছে? তাহাদের কুকুরের জন্য ভাল খাদ্যের অভাব ঘটিলে তাহারা স্থানীয় মানুষদের গুলি করিয়া মারিয়া তাহাদের মাংস কুকুরকে পরিবেশন করিয়াছে।” (উদ্ধৃতি চিহ্নিত অংশটি অসকার পেশেল লিখিত মূল জার্মাণের অনুবাদ লণ্ডনে ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত “দি রেসেস অভ ম্যান” নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।)

বাঙালীরা যেমনই হউক, কালো হউক, ক্ষীণ দেহ অথবা ভীরু হউক, একথা গর্বের সঙ্গে বলিতে পারে যে, তাহারা এমন একটি জাতি যে জাতি এতখানি নৈতিক নোংরামির অনুষ্ঠান কখনও করে নাই। ইংল্যাণ্ডে বর্তমানকালে, আমার মনে হইয়াছে, ন্যায় ও করুণার স্বপক্ষে অধিক সংখ্যক লোক আকৃষ্ট হইতেছে। অন্য কোনও যুক্তিবাদের দেশে এরূপ দেখা যায় না। ইংল্যাণ্ডের সংশ্রবে না আসিলে আমাদের দেশ সম্ভবতঃ তুরস্ক কিংবা পারস্যের মত হইত, কিন্তু জাপানের মত হইতে পারিত না। ইংল্যাণ্ড ইংরেজের দেশ ততটা নহে, যতটা সে সাম্রাজ্যবাদের, উদারনীতির এবং মানবিক স্বাধীনতার দেশ। প্রকৃতপক্ষে এটি সকল জাতীয় মানুষের স্বদেশ। যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা স্বীকার করিবেন। বহু বিভিন্ন জাতীয় লোক এখানে পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। বেণী ঝোলানো চীনা মেয়ে, কৃষ্ণকায় লস্কর, কোঁকড়া চুল আফ্রিকান, সরলনাসা ইহুদী, তাহা ভিন্ন জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকও আছে। সেখানে যাহারাই বাস করুক, এখনও বহুদিন যাবৎ ইংল্যাণ্ড তাহার সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক অবস্থার দরুন সাম্রাজ্যাধিকারী শ্রেষ্ঠ দেশ হইয়াই

থাকিবে। আমরা যদি ঐ ছোট্ট দেশটিকে সাম্রাজ্যের সবার দেশ বলিয়া মনে করি তবে ক্ষতি কি? ওটা যেন এক বিরাট শহর এবং আমাদের ভারত তার একটি বড় অংশ। আমরা কলিকাতা লইয়া যেমন গর্বিত, ইংল্যাণ্ড রূপ বড় শহর লইয়াও গর্বিত হইতে পারি।

আমরা ইংল্যাণ্ডের লোকদের সে দেশে বাসের ব্যয় কমাইয়া দিয়া বস্তুতঃ সাহায্য করিতে পারি। বিরাট ভারত ভূমিতে নানা খাদ্য বস্তু রহিয়াছে, তাহা উচ্চ হিমালয়ের হুনিয়ারা, নীলগিরি অরণ্যের বাদাগরেরা অথবা মহীশূরের মালভূমিবাসী কুরুম্বারা যেভাবে খাইয়া বাঁচে, ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র লোকেরাও তেমনি বাঁচিতে পারে। চাউল, গম, ডাল এবং আলুর মত পুষ্টিকর আমাদের যোয়ার প্রভৃতি অনেক শস্য আছে। ইহার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারিলে, ছোটনাগপুর, মধ্য প্রদেশ, মধ্য ভারত, মহীশূর, আসাম এবং বর্মায় যে সব বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনাবাদী পড়িয়া আছে, তাহাতে যোয়ারের (Sorghum vulgare) শ্বেতগুচ্ছ, কোডোর (Paspatum scaobulrtum) সোনার শীষ, চুযার (Amarantus blitum) রক্ত শীর্ষ এবং রাগীর (Eleusine coracana) ব্রাউন রঙের নথর মাথা তুলিবে। ইংল্যাণ্ডে শস্তা খাদ্যের প্রচলন করিয়া আমরা কি সুবিধা ভোগ করিব তাহার কথা আপাতত ভাবিতেছি না। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ভারতের লোকেরা কি মর্মান্তক দুঃখ ভোগ করে, অথবা ইউরোপের দরিদ্রের মধ্যে চির খাদ্যাভাব তাহাদিগকে যে দুঃখ দেয়,ইহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে মানুষের দুঃখ ঘুচাইবার প্রবল বাসনা ভিন্ন অন্য কোনও বাসনা স্থান পাইতে পারে না। ইংরেজ মানবপ্রেমীগণের পক্ষে উত্তর ভারতের একবেলা খাওয়া লোকদের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করা প্রশংসাযোগ্য সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ইংরেজরা চার বারে যতটা খায়, ইহারা একবারেই ততটা খাইয়া থাকে। আমাদের দেশবাসীরাও, ইংরেজ. আমাদের দুঃখে অশ্রুপাত করিতেছে দেখিয়া বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিতে পারে। কিন্তু আমি বলিতেছি না যে আমাদের কৃষক শ্রেণীর অবস্থা আশানুরূপ ভাল। যদি তোমরা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন কর যাহাতে যাহারা অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় বাস করিতেছে, তাহাদের খাজনা কমিতে পারে, গভর্মেণ্টকে বল খাজনা টাকায় অথবা উৎপাদিত জিনিসে গ্রহণ করিতে কিন্তু তাহা অবস্থার উন্নতি অবনতির সঙ্গে উঠানামা করা চাই। তাহার পর কৃষকদের স্বাধীনভাবে ভোগ করিবার জমি দাও, প্রজাদের সঙ্গে খাজনা বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর, চাষের জমি অন্যকে উপস্বত্ব দেওয়া বা বণ্টন করা নিষিদ্ধ কর, সামাজিক প্রথার বিশেষ করিয়া বিবাহের খরচ বিষয়ে যে রীতি আছে তাহার সংস্কার সাধন কর; জীবনের মান উন্নত করিবার এবং সেই লক্ষ্যে খাটিবার শিক্ষা দাও। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, স্বাভাবিক সময়ে আমাদের দেশ যে, অভাব অনটন দেখা যায় তাহা ঠিক ইউরোপীয় দারিদ্রদের অভাব অনটনের ন্যায় অতখানি দুঃসহ নহে। ইংল্যাণ্ডে কোনও ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহে অক্ষম হইলে যে চরম অসহায়তার মধ্যে পড়ে, তাহাতে তাহার অবস্থা দুইদিক হইতে অসহনীয় হয়। এমন কোনো নদী তাহার জন্য নাই যাহাতে সে একটি মাছ ধরিতে পারে, এমন কোনও জঙ্গল নাই যেখান হইতে সে কোনও মূল বা পাতা সংগ্রহ করিয়া খাইতে পারে, এমন কোনও প্রতিবেশী নাই যাহার অপ্রচুর খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ গ্রহণ করিতে পারে। তাহার গৃহ নাই যেখানে সে বাস করিয়া জীবন কাটাইতে পারে। সেখানকার ভূমি কয়েক জন মাত্র ব্যক্তির অধিকারে, এবং প্রত্যেকের জমি তারের বা ছোট ছোট গাছের বেড়ায় ঘেরা। অতএব সে যে আমাদের দেশের দরিদ্রের মতো আম বাগানে তাহার ক্লান্ত দেহটি বিছাইয়া ক্লান্তি দূর করিবে এমন স্থান তাহার কোথাও নাই। ইহার উপর আবার তাহার আয়ের উপর নির্ভরশীল ছোট ছেলেমেয়ে থাকিলে দুঃখের অন্ত থাকে না। এরূপ অনেক হতভাগ্য সেখানে জলে ডুবিয়া মারা পড়ে। সাম্প্রতিক মিডল্যাণ্ড রেলওয়ের

ধর্মঘটের সময়, এক ইংরেজ পুনরায় চাকরিতে বহাল হইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তাহার পরিবার সমেত জলে ডুবিয়া দুঃখদুর্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। অবশ্য এমন অবস্থায় তাহারা নিঃস্বালয়ে গিয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু যাহার কিছুমাত্র আত্মসম্মানবোধ আছে, তাহার পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। আমি সেখানে থাকা কালীন আর একটি অতি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি। এক দরিদ্র বিধবা, তাহার তিনটি সন্তান। বড়টি মেয়ে, বয়স সাত বৎসর, ছোটটি কোলে। সকাল ৭টায় সে কাজ করিতে বাহির হইয়া যাইত, ফিরিত রাত্রি ১১টায়। অনেক সময় ১২টাও হইত। এমন কি ১টাও বাজিয়া যাইত। এই সময় ঐ শিশুটিকে সে তাহার সাত বৎসরের মেয়ের উপর দেখাশোনার ভার দিয়া যাইত। রাখিয়া যাইত মাত্র একফার্দিং (এক পয়সা।) মূল্যের সামান্য একটুখানি দুধ। বেচারী ইহার বেশি আর খরচ করিতে পারিত না। কারণ কাজের শক্তি বজায় রাখিতে তাহাকেও কিছু কিনিয়া খাইতে হইত। শিশুটি মরিয়া গেল। ডাক্তার বলিল অনাহারে ও অযত্নে মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমার মনে হইল এই শিশুটি এই দুঃখ ভোগ করিত না, তাহার মৃত্যুও হইত না যদি সে তাব এই এক পয়সার দুধের সঙ্গে আধ পয়সা দামের ভারতীয় খাদ্য রাগি (Eleusine coracana) মিশাইয়া খাইত। ইংরেজদিগকে এই খাদ্যে অভ্যস্ত হইতে, অথবা বজরার (Pennisetum typhodeum) রুটি এবং ভাত ও ডাল খাওয়া অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিই, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই। আমাদের দেশেও দরিদ্র আছে, এবং তাহাদিগকেও নূতন খাদ্যে অভ্যাস করাইয়া দিতে হইবে। আমাদের হিতব্রত সর্বদাই বস্তুনির্ভর, অর্থাৎ কিছু দানের উপর নির্ভরশীল, তাই আমরা কোনও নূতন নীতির পরিকল্পনা ও তাহা কার্যকর করিয়া হিতসাধনের কল্পনা করিতে পারি না।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দরিদ্রের প্রতি আমাদের ব্যবহার ইউরোপীয়দের অপেক্ষা ভাল। আমাদের বিভিন্ন জাতি বা অবস্থার লোকদের পরস্পরের ভিতর একটা ভ্রাতৃত্ব বোধ আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এরূপ নাই। আমাদের ধর্ম হিতব্রতকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে করা হয়, সামাজিক দায়িত্ব মনে করা হয় না। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা ও ন্যায়ের বোধ বৈষয়িক হিসাবে তাঁহাদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নৃপতি, বণিক এবং ধনীসম্প্রদায়ের লোকদিগের দারিদ্র্যের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য করিয়াছেন। আমাদের দেশে ঐশ্বর্য তাই ইউরোপের মত সম্ভ্রমলাভের অধিকারকে একচেটিয়া করিয়া রাখে নাই। আমাদের জাতিভেদ সত্ত্বেও মানুষে মানুষে পরস্পর যে সমবেদনাবোধ আমাদের মধ্যে রহিয়াছে ইউরোপে তাহা নাই। পল্লীগ্রামে বিভিন্ন জাতি ও অবস্থার লোকদের ভিতর আমরা যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অনুভব করি তাহা ইউরোপে অজ্ঞাত। বিপদে আপদে পরস্পরকে ইহারা সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পরস্পর একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লয়, এবং ভাই, দাদা, চাচা ইত্যাদি সম্বোধন করে। যদি ইংরেজরা দেখিতে চাহে শিক্ষায় এবং সামাজিক মর্যাদায় ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কিভাবে একত্র এক পরিবার ভুক্ত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের ভারতীয় পল্লীগ্রামে আসা উচিত। আমাদের জীবন বীমা নাই, নিঃস্বালয় নাই, চাকুরিজীবী নার্স নাই, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পৃথক বৃত্তিধারী সংস্থা নাই। আমাদের প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে কোনও গোপনীয়তা নাই। বন্ধ তাক খুলিয়া নরকঙ্কাল আবিষ্কার কথার অর্থ আমরা জানি না।

ইংল্যাণ্ডের অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে প্রতিবেশীদের বিষয়ে কাহারও মাথা ব্যথা নাই। পাশের বাড়ির ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ অশিষ্টাচার মনে করা হয়। আমার বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না, "It is my business" অন্যায় কৌতূহলীকে এই রকম জবাবই চিরকাল শুনিতে হয়। সেখানে জনের ব্যাপার জনেরই, টমের নহে। আমাদের দেশে অল্পবিস্তর রামের ব্যাপার প্রতিবেশী শ্যামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপীয়

মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ জীবনের গোড়া হইতেই আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে তাহারা আমাদের অপেক্ষা প্রকৃতিকে অধিক অনুসরণ করিয়া থাকে। পাখীরা উড়িতে শিখিলে বাসা ছাড়িয়া যে যাহার পথ দেখিতে বাহির হইয়া যায়। আমরা পৈতৃক বাসা ছাড়ি না। আমরা স্ত্রীদের সেইখানে আনিয়া হাজির করি। বিবাহ করিতে যাইবার সময় মাকে বলি, "তোমার জন্য দাসী আনিতে চলিলাম।" ইহাই প্রচলিত রীতি। নববধূ সত্যই কন্যারূপে পরিবার আসিয়া যোগ দেয়। আমাদের ছোটছোট অ্যালিস বা অ্যাগনিস উড়িতে শিখিয়া খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া পৃথক বাসা বাঁধিতে চায় না, কারণ তখন তাহার বয়স হয় ত মাত্র পাঁচ বৎসর। ইংল্যাণ্ডে ছেলেমেয়েরা একুশ বৎসর বয়স উপস্থিত হইলে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে পৃথক বাস ও জীবিকা নির্বাহ পছন্দ করে। ঐ বয়স পর্যন্ত সন্তানদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদি দিয়া তাহাদের প্রতি কর্তব্য বা আইনতঃ কর্তৃত্ব শেষ হইয়াছে মনে করে। এইভাবে যে সব সন্তান পৃথক হইয়া যায় তাহাদের জন্য অবশ্য পৈতৃক গৃহের দ্বার উন্মুক্তই থাকে। তাহাদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে বাড়ী তাহাদেরই মনে করে, অনেক সময় ছুটির দিন সেখানে আসিয়া কাটায়। বিবাহের পরে আর তাহা থাকে না। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রীতি কিছু অন্য রকম, বিশেষ করিয়া কন্যাদের সম্পর্কে। ইঁহারা যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রাপ্ত বয়স্কা হইলেই কন্যাদের প্রতি কর্তব্য শেষ করেন না। তাহাদের জন্য এমন সংস্থান রাখেন যাহাতে তাহারা তাহাদের বংশ মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে। ইঁহাদের শ্রেণীর ছেলে মেয়েরা বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত পিতৃগৃহেই থাকে এবং অনেক সময় পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নিজের পছন্দ মত বিবাহও করে। এবং এই সব বিদ্রোহী পুত্র কন্যাদের বিষয়েই উপন্যাস লেখকেরা খুব রোমাঞ্চকর সব কাহিনী রচনা করিতে ভালবাসেন। অভিজাত পরিবারের মেয়ে অথচ অর্থাভাব, এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা অন্য লেডির সঙ্গিনী অথবা তাঁহাদের গৃহে সন্তানদের শিক্ষিকার কাজ করে।

ক্রমশঃ

কবি মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা

অশোককুমার নিয়োগী

পূর্বে, বাংলা কাব্য সাহিত্যে চতুর্দশপদী কবিতা ছিল না। কবি শ্রীমধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তন করেন। ইহার ইংরাজী নাম "সনেট"। কবি মধুসূদন বাংলা কাব্য সাহিত্যে চতুর্দশপদী কবিতা সৃষ্টি করিয়া, স্বীয় কাব্যের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—"...if cultivated by men of genius our sonnet in time would rival the Italian."

এই সনেটের আদি জন্মভূমি হইতেছে ইতালী। ইতালীর কবি পেত্রার্ক সনেট প্রনয়ন করিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই সনেটের ধারা ক্রমশঃ ইতালী দেশ থেকে য়ুরোপে বিস্তার লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে, কবি পেত্রার্ক সনেটের জনক নহেন। ইংরাজী সাহিত্যের ক্ষেত্রের সর্ব প্রথম সনেট আনয়ন করেন কবি ওয়াট ও সুরে। তবে, ইতালী কবি পেত্রার্কের হাতেই সনেট প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ফ্রান্সের ভার্সাইয়ে অবস্থান কালে কবি মধুসূদন পেত্রার্কের সনেটের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন (১৮৬৫)। চতুর্দশপদী কবিতা চৌদ্দ পংক্তির কবিতা। এই চৌদ্দ পংক্তির সমাবেশ থাকিলেই চতুর্দশপদী কবিতা হয় না। ইহার বহু লক্ষণ আছে। ইহাতে একটি গুরু গম্ভীর ভাবকে মাত্র চৌদ্দটি পংক্তির মাধ্যমে, প্রকাশ করা হয়। চতুর্দশ পংক্তির কবিতায় দুইটি ভাগ আছে। একটিকে 'octave' (অষ্টপদী) অপরটি 'Sestet' (ষট্‌পদী) বলা হয়। প্রথম আটটি পংক্তিতে ভাবটির বিকাশ ও শেষ ছয়টি পংক্তিতে তাহার পরিনতি। চতুর্দশপদী কাবতায় মিত্রাক্ষর যোজনার প্রণালী এইরূপ :—ক--খ--খ--ক + ক--খ--খ--ক + গ--ঘ--ঙ + গ--ঘ--ঙ ; অথবা ক--খ--ক--খ + ক--খ--ক--খ + গ--ঘ--গ + ঘ--গ--ঘ ; অথবা গ--ঘ--ঙ + ঘ--গ--ঙ। এই মিত্রাক্ষর স্থাপনের বিষয়ে মধুসূদন সাধারণতঃ পেত্রার্কীয় আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। কবি মধুসূদনের বিখ্যাত "বিজয়া-দশমী" কবিতাটি হইতে তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় :—

"বিজয়া-দশমী"

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরান যাবে !—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মনি মোর নয়ন হারাবে !
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুণ্ডলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এমন জুড়াবে ?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ কুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি !"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী !

চতুর্দশপদী কবিতা কবি হৃদয়ের চিত্রস্বরূপ। ইহার ভিতর দিয়া কবি হৃদয়ের একটি নিগূঢ়তম আবেগ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কবি মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাতে এই সত্য বর্তমান। চতুর্দশপদী কবিতা কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা, আবেগ ও অনুভূতির পরিচায়ক। সেইজন্য কবি মধুসূদনের

চতুর্দশপদী কবিতাতে তাঁহার হৃদয়ের ব্যক্তিগত ভাবাবেগ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

কবি মধুসূদন মাতৃভূমিকে যে কত গভীর ভাবে ভাল বাসিতেন, তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার বিভিন্ন কবিতাগুলিতে। বিদেশে অবস্থান কালে কবি মধুসূদনের ভাব কল্পনায় সর্বদাই প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত বাঙলাদেশের চিত্র। ইহার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহার "কপোতাক্ষ নদ" "বিজয়া-দশমী," "বঙ্গ ভাষার প্রতি" প্রভৃতি কবিতাতে। ইহা ব্যতীত, কবি মধুসূদন বাংলা. সংস্কৃত ও বিদেশী কাব্যের আদর্শে অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "অন্নপূর্ণার ঝাঁপি", "কৃত্তিবাস", "কমলে কামিনী", "দান্তে" প্রভৃতির নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কবি মধুসূদন যে সময়ে চতুর্দশপদী কবিতা প্রনয়ন করেন, সেই সময়ে কবির জীবনে দুঃখ-দুর্দশা, অভাব অনটনের ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছিল। এইরূপ নিদারুণ অবস্থার কবল হইতে মুক্তি পাইবার আশায় কবি কেবলই অতীতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার অধিকাংশ চতুর্দশপদী কবিতা তাঁহার জীবনের বিগতদিনের স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া রচিত। কবি মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার সুর "যশ," "নূতন বৎসর" প্রভৃতি কবিতার মধ্যে সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে।

কবি মধুসূদন বিভিন্ন বিষয় লইয়া অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। দেশে ফিরিবার পর তাঁহার "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র চুরানব্বইটি কবিতার মধ্যে, সমস্ত কবিতার বিষয় বস্তু এক নহে। বিষয়বস্তু অনুসারে কবিতাগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—আত্মপরিচয়, প্রকৃতি, বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি প্রভৃতি।

চতুর্দশপদী কবিতায় কবি মধুসূদনের কল্পনাপ্রবণ মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবি এই কবিতায় কল্পনাকে অধিক প্রাধান্য দিয়াছেন। কবি মধুসূদন তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে অতীতের অনাড়ম্বর ঘটনার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত হৃদয়ের নিবিড় আবেগময় স্পর্শ মিশ্রিত করিয়া তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যকে বহুগুণে বর্ধিত করিয়াছেন।

মহাকাশ-বিজ্ঞানে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সন্তোষকুমার দে

সভ্য জগত যন্ত্রযুগ অতিক্রম করে তিন দশক আগে পারমানবিক যুগে এসে পৌঁছেছিল। তার অগ্রগতি সেখানেই থমকি থেমে যায় নি। আগে সে পারমানবিক যুগ অতিক্রম করে মহাকাশ যুগে (স্পেস্ এজে) উত্তীর্ণ হয়েছে। জয়যাত্রা তার অনিবার্যবেগে আগে চল, আগে চল ভাই বলে এগিয়ে চলেছে। কোথায় এর বিরতি কেউ জানে না।

দুই মহাশক্তিধর দেশ রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে আজ ছ-দশক ধরে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মহাকাশ গবেষণা নিয়ে চলেছে প্রবল প্রতিযোগিতা। ভাবতে অবাক লাগে আজকের রাশিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের পরও বলদ, ঘোড়া ও মান্ধাতার আমলের কাঠের লাঙল দিয়ে মামুলি প্রথায় চাষ করত। মোটর কার তখন পর্যন্ত তৈরি করতে পারে নি। হেনরি ফোর্ডই সে দেশে প্রথম মোটর তৈরির কারখানা করেন। শেষ জারের আমল পর্যন্ত লিখন পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা সেখানে ছিল অত্যন্ত কম। দেখতে দেখতে যারা ছিল একদিন ব্রাত্য তারা হয়ে উঠল ব্রতধারী। তাই দেখতে পাই সেই অনগ্রসর দেশ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলল। ১৯৪৭ সালে ঘটালো আণবিক বিস্ফোরণ—জন্মনিল আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা। ১৯৫৭ সালে সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের রূঢ় দীপের আলোকে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—তারা চমকে চেয়ে দেখল রাশিয়ার প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক—১ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে পৃথিবী পরিক্রমণে রত। তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না সেদিনের সেই অর্ধসভ্য দেশের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন কি করে সম্ভব হল। এর ঠিক একমাস পরেই কুকুর লাইকাকে নিয়ে স্পুটনিক-২ আবার পৃথিবী পরিক্রমা করতে লাগল—জীবন্ত প্রাণীর মহাকাশে নিরাপদে ভ্রমণ করা সম্ভব কি না পরীক্ষা করবার জন্যে। ক্ষোভে,দুঃখে আমেরিকা প্রতিবাদ জানাল--এক অসহায় জীবকে নিয়ে এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা অ-মানবোচিত। তাঁরা সোভিয়েট দূতাবাসের সুমুখে একটা কুকুর পাঠিয়ে দিলেন—সে বিষণ্ণবদনে প্রতিবাদ-লিপি নিয়ে ঘোরা ফেরা করতে লাগল। শুধু প্রতিবাদ জানালেইত বিজ্ঞানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না। তাঁরা এবার তাঁদের দুর্বলতা, দোষ ত্রুটি কোথায় তাই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, সোভিয়েট রাশিয়া মহাকাশ গবেষণায় যে বিপুল পরিমান অর্থ বরাদ্দ করেছে, তার তুলনায় তাঁরা কিছুই করেন নি।

১৯৬১ সালে এপ্রিল মাসে আবার একটা চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল। সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখল, সোভিয়েট রাশিয়া য়ুরি গ্যাগারিন নামে এক মহাকাশচারীকে মহাকাশযানে পাঠিয়ে, তাঁকে দিয়ে

পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমা করিয়ে আবার তাঁকে নিরাপদে এই ধূলির ধরণীতে ফিরিয়ে আনলেন।

এখনও পর্যন্ত আমেরিকা কিছুই করে উঠতে পারে নি; কাজেই এ-অপমান তার সহ্যের অতীত। সারা বিশ্বে তার সম্মান যে ধুলায় লুণ্ঠিত হবার যোগাড় হল। ১৯৬১ সালে জন কেনেডি প্রেসিডেন্ট হয়েই বুঝতে পারলেন, মহাকাশ অভিযানে রাশিয়ার পিছনে পড়ে থাকলে বিশ্বের নেতৃত্ব ত করাই যাবে না উপরন্তু আমেরিকার নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হতে পারে। তাই ন্যাশনাল এয়ারোনটিক্স এণ্ড স্পেস এডমিনিসট্রেসনকে (নাশা) ২৫ বিলিয়ন ডলার দিয়ে বললেন, ১৯৭০ সালের মধ্যেই চাঁদের ভূমিতে মানুষ নামিয়ে তাঁরা যেন প্রমান করেন রকেট ও মহাকাশ-বিজ্ঞানে আমেরিকা রাশিয়ার চেয়ে অনেক উন্নত। প্রেসিডেন্ট কেনেডি নাশাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিলেন অথচ দারিদ্র্য ও রোগ প্রশমনের জন্যে বা শিক্ষার প্রসারের জন্যে নতুন করে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দর ব্যবস্থা করলেন না। যাইহোক আমেরিকা এবার মরিয়া হয়ে চাঁদে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগল। সুফলও সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল। গ্যাগারিনের সফল প্রত্যাবর্তনের একমাস পরেই আমেরিকা এলান সেপার্ডকে মহাকাশযানে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠাল এবং তাঁকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেপার্ড ঠিক পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে পারেন নি; তিনি যেটা করেছিলেন সেটা হল—sub orbital flight। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আমেরিকা রাশিয়ার পিছনে থেকে গেল। তারপর ১৯৬২ সালে, ২০শে ফেব্রুয়ারী লেফট্যান্ট কর্ণেল জন গ্লেন সত্যি সত্যি মহাকাশযানে তিনবার পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমা সেরে ফিরে এলেন।

১৯৬৩-৬৬ সালে আমেরিকা "জেমেনি" শ্রেণীর কয়েকটা মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করলেন, শেষ সংখ্যা 'জেমেনি' ভারশূন্য অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকলে মানুষ ও মহাকাশযানের ওপর কি প্রতিক্রিয়া হয় তার চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ করলেন। তারপর আরম্ভ হল 'এপলো' পর্যায়ের মহাকাশযানগুলো নিয়ে পরীক্ষা। এদের কর্মসূচী হল মানুষকে চাঁদের ভূমিতে নামিয়ে তাকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার পরীক্ষা সফল করে তোলা। অবশ্য এর আগে 'সারভেয়ার' পর্যায়ের কয়েকটি মহাকাশযান পাঠিয়ে চাঁদের দেশের অনেকগুলো মানচিত্র নেওয়া হয়েছিল এবং যন্ত্রের সাহায্যে একটা ছোট শাবল চাঁদের বুকে ছুঁড়ে দিয়ে, চাঁদের মাটি মহাকাশযানের ভার সহ্য করবার মত কঠিন কিনা পরীক্ষা করা হল। এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলত; কিন্তু ১৯৬৭ সালে ২৭শে নভেম্বর তিন মহাকাশচারী গ্রীসম, হোয়াইট এবং শেফ পরীক্ষাকালে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ফলে আমেরিকার প্রচেষ্টা কয়েকমাসের জন্যে বন্ধ ছিল। তারপর আবার ১৯৬৮র নভেম্বরে মনুষ্যহীন স্যাটার্ণ-৫ এবং এপলো-৪কে মহাকাশে পাঠানো হল; কিন্তু স্যাটার্ণ-৫ যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়ায়, কবে নাগাদ চাঁদে মানুষ পাঠানো সম্ভব হবে সে বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিল! তবু ঠিক হল যেমন করেই হোক ১৯৭০ সালের মধ্যেই চাঁদে মানুষ নামানো হবে।

অবস্থা দেখে সোভিয়েট রাশিয়ারও আর চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব হল না। তারাও পরপর কয়েক বছরে কয়েকটা স্পুটনিক, লুনা ও ভোষ্টক নামে মহাকাশযান সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে পাঠালেন। তাঁদের 'কসমস' মহাকাশযান সর্বপ্রথম এক মহিলাকে নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিলেন, চাঁদের বিভিন্ন স্থানের অনেকগুলো ফটো নিলেন, চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত হানলেন ও পরিশেষে এক মনুষ্যহীন মহাকাশযান ধীরে ধীরে চন্দ্রে অবতরণ করালেন ১৯৬৭ সালে, ২৪ শে এপ্রিল সোভিয়েট মহাকাশচারী ভলাদিমির কোমারভ মহাকাশযানের প্যারাসুটের দড়িতে আটকে গিয়ে পৃথিবীতে ভূপাতিত হলেন। এর আগেও অনেক রুশ মহাকাশচারী পরীক্ষা নিরীক্ষায় মারা গিয়েছিলেন বলে লোকে সন্দেহ করে, তবে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু সবকে ছাড়িয়ে গেল ১৯৬৮ সালে এপ্রিল মাসে রাশিয়া যে চমকপ্রদ

খেলাটি দেখিয়ে আমেরিকার মুখ কালি করে দিল। সেই খেলাটি হল, ঐ বছর রাশিয়া ছুটি মনুষ্যহীন মহাকাশযান আলাদা আলাদা ভাবে পাঠিয়ে মহাকাশেই তাদের মেলবন্ধন করলেন। এ এক অতি আশ্চর্য কৃতিত্ব। আমেরিকা বুঝতে পারলে, এটা হল ভবিষ্যতে মহাকাশে এক স্পেসষ্টেসন বা মহাকাশ ঘাঁটি স্থাপন করবার পূর্ব্ব সুচনা। এই মহাকাশ ঘাঁটি সফল ভাবে মহাকাশে স্থাপন করতে পারলে, সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও যন্ত্রাগার গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং সেখান থেকে আবার দূর দূরান্তের গ্রহ উপগ্রহে অতি সহজে ও অনেক দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে মহাকাশযান প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

রাশিয়া না আমেরিকা কে আগে চাঁদে মানুষ নামাতে পারবে, তাই নিয়ে এবার নতুন করে দু দেশের মধ্যে আবার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯৬৮ সালে, এপ্রিলের পর, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরে পর পর দুবার সোভিয়েট রাশিয়া আবার দুটি মনুষ্যহীন মহাকাশযান—zond-5 ও zond-6কে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করলেন। এই যান দুটি চাঁদের কক্ষপথে পরিক্রমা সেরে ও অনেক তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরে এল। সকলে বুঝতে পারল, এর উদ্দেশ্য হল পরবর্তী পর্যায় সাফল্যের সঙ্গে মানুষ অবতরণ করান।

আমেরিকা ছেড়ে কথা কইল না। সেও সঙ্গে সঙ্গে ঐ বছরেই ২১শে ডিসেম্বর এপলো-৮কে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করল। সে চাঁদের কক্ষপথে দশবার প্রদক্ষিণ করে চাঁদের ব্রণ কণ্টকিত মুখের টেলিভিসন ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিল। ১৯৬৯ সালে ৩রা মার্চ আমেরিকা আবার পাঠাল এপলো-৯কে। সে চাঁদে অবতরণের সমস্ত সম্ভাব্যতা আর একবার ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখে নিল। তারপর ঐ বছরই ২২শে মে এপলো-১০ যাত্রা করল মহাকাশে। এই মহাকাশযানের সঙ্গে অবতরণের জন্যে যে চন্দ্রভেলাটি ছিল, সেটি মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের ভূমির ৯ মাইলের মধ্যে এসে ফিরে গেল। এবার চাঁদে অবতরণের সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলা হল। ঠিক হল পরের পর্যায় এপলো-১১ চাঁদে অবতরণ করবে।

৫ই মে ১৯৬১ সালে মহাকাশচারী এল্যান সেপার্ড চাঁদে পাড়ি দেবার যে দুরূহ ব্রতের সুচনা করেছিলেন, তিনহাজার দিন পরে নীল আর্মষ্টং, মাইকেল কলিনস্ ও এড্রুইন ২ শে জুলাই, ১৯৬৯ সালে এপলো ১১এ উড়ে এসে চাঁদের দেশে অবতরণ করে তা সফল করলেন। যা ছিল কবির কল্পনায় তা হল বাস্তবে পরিণত—যুগ যুগান্তের স্বপ্ন সফল হল। এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "পৃথিবীর ইতিহাসে, সৃষ্টির পরই আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" আর্মষ্ট্রং চাঁদের দেশ থেকে বলে উঠলেন, That's one small step for a man, one giant leap for mankind." এপলো ১১ চাঁদের দেশের মাটি ও পাথর নিয়ে হাসতে হাসতে পৃথিবীতে ফিরে এল। আমেরিকার প্রেসটিজের পারদ চড়চড় করে ওপরে উঠে গেল। এপলো—১১ চাঁদে অবতরণের ঠিক চার মাস পরেই গেল এপলো—১২। এবারও মহাকাশচারীরা চাঁদে নেমে সাড়ে একত্রিশ ঘন্টা চাঁদের বুকে বেড়িয়ে ৯০ পাউণ্ড পাথর আর আগেকার পরিত্যক্ত সারভেয়ার—৩-এর কিছু অংশ নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

এবার বিশ্ববাসী বললে—দুয়ো, দুয়ো, রাশিয়া আমেরিকার কাছে হেরে গেল, পারবে কেন কুবেরের দেশ আমেরিকার সঙ্গে। আমেরিকা এখন জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে। সাফল্যের পর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পাঁচ কোটি ডলার ব্যয়ে তৈরি এপলো—১৩ কে আবার পাঠাল মহাকাশে— নব নব জ্ঞান নূতন চেতনার সন্ধানে; কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল বিজ্ঞানীদের একটি মাত্র ভুলে। সে-ভুলটা হল, মহাকাশযান যদি মাঝপথে বিকল হয়ে যায়, তাহলে তাকে আবার সচল করতে হলে যে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্র কুশলীদের সঙ্গে রাখা দরকার সেই কথাটা তাঁদের মনে না পড়া।

এদিকে রাশিয়াই কি চুপচাপ বসেছিল? তা ত

মনে হয় না। চাঁদের বুকে মানুষ না নামিয়ে মনুষ্যহীন মহাকাশের সাহায্যে চাঁদের সমস্ত রহস্য আয়ত্ত করতে সে চেয়েছিল বলে মনে হয়। ঠিক কি উদ্দেশ্য জানা যায় না, সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা—১৫, এপলো—১১র চাঁদে অবতরণের কিছু আগেই মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিল কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে চাঁদের বুকে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

ভগ্নোদ্যম হল না রাশিয়া। মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণায় তারা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরী করেছিল তাতে এরকম সামান্য ক্ষয়ক্ষতিতে পিছু হটতে পারে না। তারা আরও কয়েকটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাল চন্দ্র, মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের কাছাকাছি। এপলো—১১ ও ১২ চাঁদে অবতরণ করার পর রাশিয়া চাঁদে মানুষ নামানোর বদলে একটা নতুন ধরণের চমকপ্রদ কাজ করল। ১৯৬৯ সালে অক্টোবর মাসে সয়ুজ—৬, ৭, ও ৮ নামে তিনটি মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করল। মহাকাশচারীরা সেখানে ধাতব পদার্থ পিটিয়ে জোড়া দিয়ে নিখুঁতভাবে ওয়েলডিং কাজ শেষ করল—ভবিষ্যতে মহাকাশে গবেষণাগার স্থাপিত করতে হলে এ-কাজটা একান্ত অপরিহার্য। পৃথিবীর কক্ষপথে পরিক্রমনশীল মহাকাশ ঘাঁটি প্রস্তুতিতে রাশিয়া আমেরিকাকে পিছনে ফেলে অনেকটা আগিয়ে গেল। তারপর আবার ১৯৭০ সালের ১২ই ডিসেম্বর 'ভেনেরা'—৭ দূর থেকে চাঁদের ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিল।

আমেরিকাও এপলো—১১র অভিযানের অল্প পরেই নবোদ্যমে মেরিনো—৬ ও ৭ নামে দুটি মনুষ্যহীন মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহের দিকে পাঠিয়ে দিল। মেরিনো—৬ অক্লান্তবেগে ছুটে ১৫৬ দিনে ৩৮ কোটি, ৮০ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ৩১শে জুলাই, ১৯৬৯ সালে; অর্থাৎ এপলো—১১র চন্দ্রাবতরণের ১১ দিন পরে মঙ্গলগ্রহের নিরক্ষ বৃত্তের ৩২০০ কিঃ মিঃ মধ্যে এসে উপস্থিত হল। পথের নিশানা পেয়ে যাত্রা করল মেরিনো—৭। তার লাগল অপেক্ষাকৃত কম সময়। ১৩০ দিনে অবিশ্রান্ত বেগে ছুটে সে ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে মঙ্গলগ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ৫ই, আগষ্ট ১৯৬৯ সালে পৌছল।

এই মহাকাশযান দুটির প্রত্যেকের ওজন ছিল ৩৮২ কিলোগ্রাম এবং এতে যে সমস্ত অতি আধুনিক সংবেদনশীল ক্যামেরা ও বেতারযন্ত্র ছিল; সেগুলি ৯ কোটি ৬০ লক্ষ কিঃ মিঃ দূর থেকে সংবাদ ও আলোক চিত্রাদি পাঠিয়েছিল। মঙ্গলগ্রহের দুই মেরুর বিশেষ বিশেষ স্থানের যে ২২টি আলোকচিত্র আকাশ সংস্থা পেয়েছেন, সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের মনে হয়েছে মঙ্গলগ্রহও চন্দ্রের মত উল্কাবিধ্বস্ত, ব্রণকণ্টকিত, কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরিকীর্ণ এক বিশাল ভূখণ্ড।

এখন আমেরিকার মহাকাশচারীরা বলছেন, ১৯৮০-৯০ সালের মধ্যেই তাঁরা দশ বার জন আরোহি সমেত মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহে পাঠাতে পারবেন—যদি তাঁদের সরকার এ-বিষয়ে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য দেন। তাঁরা বলছেন মঙ্গলগ্রহে মানুষ গিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতে সময় লাগবে প্রায় দু-বছর।

আমেরিকার এ চ্যালেন্জ সোভিয়েট সরকার গ্রহণ করেছেন। এবার "লুনা" পর্যায়ের মহাকাশযানগুলোর একটু খবর নেওয়া যাক। ১৯৬৬ সালে মনুষ্যহীন মহাকাশযান লুনা—৯ চাঁদের বুকে অবতরণ করে। পরে লুনা-১৩ চাঁদের কক্ষপথে গিয়ে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসে। এরপর লুনা—১৬ সব চেয়ে আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাল। পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় চাঁদের মাটি ও পাথর নিয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করল। এ থেকে প্রমাণ হল মানুষ না পাঠিয়ে এই পৃথিবীতে বসেই চাঁদের দেশের সব গুপ্ত তথ্য জানা সম্ভব। অজস্র টাকা খরচ করে এবং তার সঙ্গে অনেক ঝুঁকি নিয়ে চাঁদে মানুষ পাঠাবার কোন দরকার নেই। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। এবার লুনা—১৭ ন-চাকাযুক্ত ৭৫৬ কিলোগ্রামের 'লুনো খোদ' নামে একটি বিস্ময়কর চন্দ্রযান ১৯৭০ সালে, ১৭ই নভেম্বর

চাঁদের মাটিতে নামিয়ে দেয়। পৃথিবী থেকে সংকেত পাঠিয়ে এই যানটিকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এর কাজ হল চাঁদের দেশের সমস্ত তথ্য বেতার সংকেতে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া। যন্ত্রযানটি খানাখন্দ, উচু ঢিপি প্রভৃতি সমস্ত বাধার পাশ কাটিয়ে মনুষ্য চালিত যানের মত সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে। যানটি প্রথম পর্যায় তিন দিনে ৩৬০০ মিটার লম্বা ও ১৫০ মিটার চওড়া একটি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। সৌর ব্যাটারিচালিত হওয়ায় রাত এলে সে নিশ্চল হয়ে পড়ে। আবার দিন এলে ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১ সালে সচল হয়ে ওঠে এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আরও ৫৭৮ মিটার পথ অতিক্রম করেছে। ১ই মার্চ পর্যন্ত চাঁদের "বর্ষণ সাগর" এলাকায় মোট ৭৭৭০ মিটার পথ পরিভ্রমণ করে দুটি বড় বড় জলামুখী আবিষ্কার করেছে। আজ পর্যন্ত সক্রিয় আছে বলে জানা যায়। চন্দ্র পৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ এলাকার ভূমির নমনীয়তা, কাঠিন্য ও ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে।

১৯৭১ সালে ২২শে এপ্রিল রাশিয়া আর এক আশ্চর্য খেলা দেখাল। তিনজন মহাকাশচারী 'সয়ূজ-১০' এ চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এর একটু আগে 'স্যালুট' নামে আর এক মহাকাশযান, যা পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছিল, তার পিছনে ৪১ ঘণ্টা ধাওয়া করে মানুষসমেত সয়ূজ-১০ তার সঙ্গে সংযুক্ত হয় ২৪শে এপ্রিল। মহাকাশে এই মিলন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। তার পরই হয় বিচ্ছেদ। আবার নানান পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যায়। এরপর স্যালুটের এক প্রান্তে বাঁধা থাকবে সয়ূজ—১০ আর এক প্রান্তে বাঁধা পড়বে সয়ূজ—১১। এই তিনে মিলে গড়ে উঠবে মহাকাশে মানুষের প্রথম ঘাঁটি বা স্পেস ষ্টেসন। সেই ঘাঁটিতে থাকবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার। আর এই ঘাঁটি থেকেই মানুষ চন্দ্রালোকের দিকে বা সৌর মণ্ডলের আরও দূরবর্তী লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে পারবে। এই বিচরণশীল মহাকাশ ঘাঁটি, মহাকাশ দ্বীপে রূপান্তরিত হবে। যদি তা সম্ভব হয়—সম্ভব হবার সম্ভাবনাই বেশী—তাহলে মহাকাশ প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্তত দু বছর পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। ১৯৭৩ সালের আগে আমেরিকা এ-ধরণের কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। সোভিয়েট মহাকাশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান আকাদমির সদস্য পেটরোভ বলেছেন, পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণ রত মহাকাশ ঘাঁটিতে বসে পৃথিবীর আবহাওয়া, সমুদ্র, শস্যক্ষেত্র ও অরণ্য সম্পর্কে গবেষণা চালানো সহজ হবে। সয়ূজ—১০ স্যালুটের বন্ধনমুক্ত হয়ে ২৫শে এপ্রিল পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। ৮-৫-৭১ তারিখে রাশিয়া আবার এক নতুন খেলা দেখাল। একটি রকেটের সাহায্যে ৮টি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত করল। 'কসমস' পর্যায়ের এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি (কসমস ৪১১-১৮) সারিবদ্ধ ভাবে মহাকাশে পরিভ্রমণ করছে। তাদের উর্ধ্ব বিন্দু হল ১৫৩০ কি: মি: এবং অধ: বিন্দু হল ১৪০৮ কি: মি:। কি উদ্দেশ্যে তাদের মহাকাশে পাঠানো হল, তা প্রকাশ করা হয় নি।

এর আঁচ পেয়েই আমেরিকাও ৮ই মে-র শেষ রাতে ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী এক আরোহীহীন মহাকাশ-যান—ম্যারিনো-৮ উর্ধাকাশে উৎক্ষিপ্ত করলেন। কিন্তু বিধি বাম। তাই পৃথিবীর আকাশ সীমার সামান্য দূরে প্রথম পর্যায়ে মাত্র ১৪শ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পরই সে দিগভ্রান্ত হয়ে বিপুল বেগে ৯ই মে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে আছড়ে পড়ল। ম্যারিনো-৮র পেছনে পেছনে ম্যারিনো-৯ উপগ্রহটি যাত্রার কথা ছিল। ঠিক হয়েছিল, দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ মিলে তিন মাস ধরে মঙ্গলের আকাশ প্রদক্ষিণ করবে এবং মঙ্গলের আকাশে সদাধাবমান লোহিত মেঘপুঞ্জের রহস্য উদ্ঘাটন করবে আর সেই মেঘছায়ার অন্তরালে সূক্ষ্মতম কোন জীবনের অস্তিত্ব সম্ভবপর কি না তা পরীক্ষা করে দেখবে। আরও ঠিক হয়েছিল, ভাবীকালে মানুষের পদার্পণের নির্ভরযোগ্য স্থানটিও তারা বাছাই করবে। কিন্তু সবই বিফল হল। আগামী ৯ দিনের মধ্যে ম্যারিনো-৯কে পাঠাবার কথা আছে। ম্যারিনো

-৯কে যদি পাঠাতে হয়, তবে অবশ্য ৯ই জুনের মধ্যেই পাঠাতে হবে। নইলে এরপর দুবছর কাল পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের পরস্পর অবস্থান পথের দূরত্ব অত্যন্ত বেড়ে যাবে। এই বিফলতায় মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অতি মাত্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছেন। তবে একেবারে ভগ্নোদ্যম হননি; তাই বলছেন আরও কয়েকটি এপলো পর্যায়ের মহাকাশযান পাঠাবেন এবং শেষ মহাকাশযান এপলো-২০ চাঁদে জল সংগ্রহের চেষ্টা করবে। তারপর ১৯৭৩ সালে দুটি অতি উন্নত ধরণের মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হবে। এই ২টি মহাকাশযান থেকে চাঁদের ভেলার মত দুটি মঙ্গল-ভেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করে সেখান থেকে যাবতীয় তথ্য পৃথিবীতে পাঠাবে; অর্থাৎ চাঁদে অবতরণের সময় যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, হুবহু সেই কৌশলই অবলম্বন করা হবে। মঙ্গলগ্রহে মানুষের পদচিহ্ন পড়বে কি না আগামী কয়েক বছরেই তা জানা যাবে। সেখানে পৌছতে পারলে মানুষের অবতরণ করা কঠিন হবে না, কারণ মঙ্গলগ্রহে "প্রসন্ন প্রভাত-সূর্য প্রতিদিন কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে তার শিশির বিন্দু" মুছে না দিলেও, পরিবেশ সেখানে অনুকূল।

চাঁদে আমেরিকার মানুষ সকলের আগে পৌছেছে। এখন দেখা যাক মঙ্গলে কে আগে পৌছায়— রাশিয়া না আমেরিকা? আমরা সে দিনের জন্যে পথ চেয়ে আছি —"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"। মনে হয় রাশিয়া সেখানে আগে মানুষ নামাবে না, যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করবে, তারপর মানুষ নামাবে। তারপর? মঙ্গল অভিযানের পরই কি মানুষের অনুসন্ধিৎসা শেষ হবে? মনেত হয় না। মনে হয় তারপরই আরম্ভ হবে সৌরজগত অভিযানের প্রথম বৃহৎ পদক্ষেপ। আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ মানুষের বুধ হতে প্লুটো পর্যন্ত সমস্ত সৌরজগত বিজয় প্রকল্প সম্পূর্ণ হবে বলে মনে হয়। তারপর শেষ গ্রহটিকে লক্ষ করে রকেট বিজ্ঞানী বলবেন,—

"দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহা জনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।"

দেখা যাক এ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে জয়লাভ করে। পরিস্থিতি যে রকম তাতে মনে হয় রাশিয়ার জয় সুনিশ্চিত; কারণ প্রযুক্তি বিদ্যা ও মহাকাশ বিজ্ঞানে সে যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে তার মূলে রয়েছে বহুদিনের একনিষ্ঠ সাধনা ও এক ত্রুটিহীন শিক্ষা-পরিকল্পনা। আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আজ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় রাশিয়া সত্যই জয়লাভ করেছে। হারভার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সভাপতি ডাঃ জেমস্ ব্রায়ান্ট কনান্ট বলছেন, "এখনও সময় আছে চেষ্টা করলে এখনও আমরা রাশিয়ার সমকক্ষ হতে পারি; কিন্তু তা করতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলোকে দূর করে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে।" তিনি বলছেন, "আমেরিকান ছাত্ররা বুদ্ধিতে রুশ ছাত্রের চেয়ে কম নয়; তারা শুধু বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না; ফলে কত অজানা প্রতিভা অকালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

সমগ্র দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত করবার জন্যে সারা আমেরিকায় একুশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত করা হয়েছে, কিন্তু এ বিদ্যালয়গুলি এত ছোট এবং এত বিরল বসতি স্থানে স্থাপিত হয়েছে যে সে সব বিদ্যালয়ে ছাত্র পাওয়াই দুর্ঘট এবং পেলেও সেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এই সব বিদ্যালয়ে সাত থেকে ন মাসের বেশী পড়াশুনা হয় না; বিদ্যালয়গুলিতে সাজ সরঞ্জাম বলতে কিছুই নেই ভাল শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নয়, যারা শিক্ষকতা করতে আসেন তাঁদের প্রতিদিন চারটি থেকে সাতটি,এখনও কখনও এগারটি পর্যন্ত ক্লাস নিতে হয়; ফলে তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান এবং তাঁদের শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্যে যে এক লক্ষ দশ

হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁদের গুণগত যোগ্যতা বলে কিছুই নাই, কোন রকমে কাজ চালিয়ে যান। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এইরকম অবস্থা চলতে থাকে। ১৯৫২ সালে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এইরকম ছোট ছোট বিদ্যালয়ে পড়ছে। এই সব বিদ্যালয় থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে আসছে তাদের পক্ষে ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, টেকনিসিয়ান বা ডাক্তার হওয়া সম্ভব নয়; কারণ তারা গণিত, পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যা, রসায়ন জ্যোতিষ, জীববিদ্যা প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা পায় নি। এই সমস্ত বিষয় এইসব ছোট ছোট বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়; কারণ ঐসব বিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষক গ্রামে পাওয়া যায় না। গ্রামের প্রতিভাবান ছাত্রদেরও পাশ করবার জন্যে কামার, কুমার, ছুতার, দরজির কাজ প্রভৃতি যে সমস্ত বিকল্প বিষয় আছে, সেইগুলো নিয়ে পাশ করতে হয়। শহরাঞ্চলে যে সব দুই তিন হাজারী ছাত্রের অতিকায় বিদ্যালয় আছে এবং যেখানে দেশের এক তৃতীয়াংশ ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা পাচ্ছে সেখানকার পঠন পাঠনের ব্যবস্থাও খুব সন্তোষজনক নয়। বড় বড় আকাশচুম্বী অট্টালিকা আছে। প্রচুর সাজসরঞ্জাম আছে, সুবৃহৎ এসেম্বলি হল, প্রশস্ত ভোজন প্রকোষ্ঠ, জিমনেসিয়ম, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতির কোন অভাব নেই; কিন্তু যা থাকা সবার আগে দরকার তা নেই; ভাল শিক্ষক। কম মাহিনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা গ্র্যাজুয়েটরা আসতে চান না। একুশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র বার হাজার স্কুলে পদার্থবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এখানেও শিক্ষণে শিক্ষাপ্রাপ্ত বা উচ্চ গুণগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। শিক্ষার এই দুরবস্থা দেখে Dr. Kandel নামে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিক্ষাবিদ দুঃখ করে বলেছেন,—"The faith of the Amerìean public in education manifests itself more in expenditure on buildings than in appreciation and remuneration of teachers."

আমেরিকার একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় একজন লেখক লিখেছেন, "আমেরিকার বিদ্যালয়গুলি এক সঙ্কটময় অবস্থার ভিতর দিয়ে চলছে; খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মূল বিষয়গুলি পড়ছে; মাত্র ১২·৫% ছাত্রছাত্রী ১২ ক্লাসে গণিত নেয় এবং ২৫% নেয় রসায়ন, আর ১৫% এর কম নেয় বিদেশী ভাষা। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান, জ্যামিতি এলজেবরা, পদার্থবিদ্যা না নিয়ে বিকল্প সহজ সহজ বিষয়গুলো বেছে নেয়।" সরকারী পরিসংখ্যান—The Biennial Survey of Education in the U. S.A'র ১৯৫১ সালের সংখ্যায় এই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

শিক্ষার এই দুরবস্থার কারণ হল, জুনিয়রস্কুলে অঙ্ক ইতিহাস ইংরাজী ও পৌরবিদ্যা এই চারটি বিষয় ছাড়া বাকি সব বিষয় ঐচ্ছিক; কাজেই জুনিয়র স্কুল থেকে বিনা পরীক্ষায় পাস হয়ে (জুনিয়র স্কুলে পরীক্ষা দেবার নিয়ম নেই) ছাত্র-ছাত্রীরা যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় (মাধ্যমিক স্তরে আবার কোন বিষয়ই আবশ্যিক নয়) তখন তারা ২৫০টি ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্য থেকে নিজেদের ইচ্ছামত অতি সহজ বিষয়গুলো বেছে নেয়; গণিত রসায়ন, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি যেসব বিষয়ে মাথা ঘামাতে হয় সেগুলোর ধারে কাছে যায় না। সহজে সস্তা ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এবার যারা বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হচ্ছে তাদের কথা আলোচনা করা যাক। এখানেও দেখা যাচ্ছে আমেরিকার বিমান ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রযুক্তি বিষয়ক ডিগ্রি গুলিও রাশিয়া ত বটেই, ইংলণ্ডের ডিগ্রির চেয়েও অনেক নিম্ন স্তরের। ১৯৫১ সালে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে আমেরিকায় পাঠানো হয়, ঐ দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলির শিক্ষার মান নির্ণয় করবার জন্যে। পরবর্তী সময় এই কমিটি যে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে বলা হয়েছে :—

"আমরা আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একমত হয়ে বলছি যে, আমেরিকার বিজ্ঞান বা

ইঞ্জিনিয়ারীং ডিগ্রি (B. S,) ইংলণ্ডের অনুরূপ ডিগ্রির (B. S. C.) তুলনায় অন্তত এক বছরের নিচে এবং আমেরিকার এম. এস সি ডিগ্রী ইংলণ্ডে বি, এস সি ডিগ্রির উপরে নয়।”

এ বিষয়ে রাশিয়ায় এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন চিত্র দেখা যায়। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়েও অন্তত একটি বিদেশী ভাষা, গণিত, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য পাঠ্য এবং এগুলির জন্যে পাঠ্যসূচিতে ৪১ শতাংশ সময় নির্ধারিত করা আছে। উপরের ক্লাসে জ্যোর্তিবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি অবশ্য পাঠ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমেরিকার মতন কোন বিষয় ঐচ্ছিক নয়—বিজ্ঞানের সমস্ত মূলশাখাগুলি আবশ্যিক এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে সেগুলি বিভিন্ন গুরুত্বের সঙ্গে পড়ান হয়। (Ashly—Science in Russia দ্রষ্টব্য) সোভিয়েট রাশিয়ায় কলেজে ৫৭% ছাত্র ছাত্রী বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও ৪৩% হিউম্যানিটি শাখায় ভর্তি হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতেই বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়ার কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার পক্ষে নাৎসি জার্মানীর আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন।

আমেরিকার বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা যখন এই রকম নিম্নস্তরের তখন কিভাবে আমেরিকার রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব? এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে ডাঃ কনানুট বলেছেন, প্রথমেই আমাদের একুশ হাজার স্কুলকে ভেঙ্গে ১২৬০০ বড় ও মাঝারি স্কুলে পরিণত করতে হবে এবং তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে এই সংখ্যক বিদ্যালয় থাকলে দেশের শিক্ষার চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। কোন ক্রমেই ২০০-৩০০ ছাত্রের নিচে কোন স্কুল যদি রাখা না হয়, তাহলে এইসব বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি পড়াবার মতন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া দুর্ঘট হবে না। সমস্ত স্কুলে গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ছাড়া আরও অসুবিধে রয়েছে। আমেরিকায় শিক্ষকদের বেতন (আমাদের দেশেরই মত) অন্যান্য চাকুরির তুলনায় অত্যন্ত কম; সেই জন্যে কেউ পারত পক্ষে শিক্ষাবিভাগে আসতে চায় না। এলেও বেশী দিন থাকে না। ১৯৪২ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে আমেরিকায় সাড়ে তিন লক্ষ শিক্ষকদের মধ্যে এক লক্ষ বিশ হাজার শিক্ষক শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। তাই ডাঃ কনানুট বলেছেন, ভাল শিক্ষক পেতে হলে এবং ছেলেমেয়েদের ভাল ভাবে শিক্ষা দিতে হলে, শিক্ষকদের মাহিনা অন্তত সাড়ে চার হাজার ডলার দিতে হবে। এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করতে হলে, আমেরিকার সাড়ে তিন কোটি ছাত্র ছাত্রীর জন্যে শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে বাৎসরিক ১৮.৯ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ১৯৫৯ সালে আমেরিকা এই খাতে ব্যয় করেছে মাত্র ১০·৭ বিলিয়ন ডলার; তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘাটতি হয়েছে ৮·২ বিলিয়ন ডলার।

যে সব পরিসংখ্যান আমাদের হাতে রয়েছে; তা থেকে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে যে হারে আমেরিকায় লোক সংখ্যা বাড়ছে তা যদি অব্যাহত থাকে; তাহলে ১৯৭০-৭১ সালে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ কোটির মত। তা যদি হয়, বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বাড়তে হবে এবং এইসব বিদ্যালয় চালাতে শিক্ষকের সংখ্যা আরও ৫% বেশী দরকার হবে। তার ফলে শিক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৮·৬ বিলিয়ন ডলার, আর শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহলে ঘাটতির পরিমান দাঁড়াবে ৩৭·৯ বিলিয়ন ডলার। এটাও অনুমান সাপেক্ষ, প্রকৃত পক্ষে ঘাটতি হবে আরও বেশী। আমেরিকা শিক্ষার জন্যে যে বেশী ব্যয় করতে রাজী হবে তা বলে মনে হয় না; কারণ দেখা যাচ্ছে ১৯৩৯ সাল থেকে আমেরিকার জাতীয় আয় দ্বিগুণের ওপর বেড়ে গেছে। প্রতি বৎসর দেশ রক্ষার খাতেই ব্যয় বেড়ে চলেছে; কিন্তু সে অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয়

বাড়ছে না। ১৯৫০ সালে আমেরিকা শিক্ষখাতে ব্যয় করেছিল ৪.৭১৯ মিলিয়ন ডলার। আর ১৯৫৬ সালে সেটা কমে এসে দাঁড়ালো ২,৬০০ মিলিয়ন ডলারে। এই টাকার মধ্যে ছাত্রদত্ত বেতন হল ৬৭০ মিলিয়ন ডলার আর ধনীদের দেওয়া গচ্ছিত টাকার সুদ পাওয়া গিয়েছিল ১৪০ মিলিয়ন ডলার; তাহলে দেখা যাচ্ছে সরকার খরচ করেছেন মাত্র ১৮০০ মিলিয়ন ডলার। এই খরচও ক্রমশই কমে আসছে, বিশেষ করে ভিয়েট নামের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া থেকে। ১৯৬৯ সালে আমেরিকা শিক্ষার জন্যে ব্যয় করেছিল ৪'১ বিলিয়ন ডলার, মহাকাশ গবেষণায় জন্যে ৪.৮ বিলিয়ন ডলার আর ঐ বৎসর ভিয়েটনাম যুদ্ধের জন্যে খরচ করেছিল ২৮.৮ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭০ সালে শিক্ষা ও মহাকাশ গবেষণা খাতে বিপুল পরিমানে ব্যয় সংকোচ করা হয়েছে; অথচ যুদ্ধের খাতে ব্যয়ের পরিমান বেড়েই চলেছে।

অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে ১৯৬০ সালে সুপ্রিম সোভিয়েট। (রুশ পার্লামেন্ট) শুধু বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যা শিক্ষার জন্যে ব্যয় করেছেন ৩২,৬০০ মিলিয়ন রুবল অর্থাৎ ২৯১০ মিলিয়ন ষ্টারলিং। ১৯৬১ সালে বাজেটে খরচের অঙ্ক ধরা হয়েছিল ৭৭,৫৮৯,৮২৯,০০০ নয়া রুবল (পুরাণ রুবলের চেয়ে এর দাম অনেক বেশী)। এই টাকার মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের কথা জানতে পারা যায় নি। ১৯৭১ সালের বাজেট জানা যায় নি। তবে মনে হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে; কারণ রাশিয়া আমেরিকার মত ভিয়েটনাম যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়ে নি।

সোভিয়েট রাশিয়া বিশ্বের সর্বপ্রধান শক্তি আমেরিকার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে যাচ্ছে। সে খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে, এ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হতে হলে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনশক্তির সাহায্যে তা সম্ভবপর নয়। তাই সে তার সুচিন্তিত শিক্ষানীতির মাধ্যমে দ্রুতপদবিক্ষেপে জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে, সমস্ত বিষয় খরচ কমিয়ে জাতিকে কৃচ্ছসাধনায় ব্রতী করে জ্ঞানের দীপকে শুধু অনির্বাণ নয়, দীপ্তোজ্জ্বল রাখবার চেষ্টা করছে। সে চেষ্টা তার সফল হয়েছে। তাই দেখতে পাচ্ছি প্রতি বছর রাশিয়ায় সত্তর হাজারের বেশী ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হচ্ছে আর আমেরিকায় হচ্ছে মাত্র ত্রিশ হাজার। জ্ঞান বিজ্ঞানে রাশিয়া যে উন্নতিলাভ করেছে, সে মাত্র কম বেশী এক পুরুষের চেষ্টার ফলে; আরও দু'তিন পুরুষ পরে রাশিয়া কত দূর এগিয়ে যাবে, সেকথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্দেশ্যে বলা চলে, তার—

"চরণে ঝটিকা গতি, ছুটিছে উধাও দলি নীহারিকা,
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্রে হেরিছে নির্ভয়ে সপ্তসূর্য শিখা।"

পরিশেষে বলা চলে শুধু টাকা খরচ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। আমেরিকা মহাকাশ গবেষণায় খরচ কমই বা কি করছে? ১৯৬০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত শুধু এপলো পর্যায়ের রকেটগুলোর জন্যেই প্রতিদিন এক কোটি ডলার হিসেবে খরচ করছে। ষাট হাজার বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন; অথচ সারা দেশের স্বাস্থ্য প্রকল্পে (National Institute of Health) মাত্র পনের হাজার বিজ্ঞানী নিযুক্ত। আমেরিকা আজ পর্যন্ত এ-বাবদ ৫০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, আর রাশিয়া খরচ করেছে ২৫ বিলিয়ন ডলার, তাহলে দেখা যাচ্ছে দুই মহাশক্তিধর জাতি মোট ৭৫ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন।

কেন এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই দুই দেশের মধ্যে? দেশে দুঃখ দারিদ্র, অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও একমাত্র মহাকাশ বিজ্ঞানেই কেন এঁরা জলের মত টাকা খরচ করছেন? শুধুই জ্ঞানের নব দিগন্ত উন্মোচন করাই কি এর একমাত্র উদ্দেশ্য? (পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার গত দশ বছরে দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে, একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে) না অন্য কোন উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে জড়িত আছে? অনেকে মনে করেন শুধু জাতীয় গৌরব বৃদ্ধিই নয়, এর গোপন ও একমাত্র উদ্দেশ্য হল সামরিক প্রাধান্য লাভ। এঁরা কি গ্রহান্তর হতে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন?

মহাকাশ ঘাঁটি থেকে ভবিষ্যতে Gigaton bomb, neutron bomb, plasma bomb প্রভৃতি নিক্ষেপ করবেন, তারই কি প্রভৃতি এটা? কে এর উত্তর দেবে? বিপুলা পৃথিবী, কাল নিরবধি। কালেই এ-প্রশ্নের সমাধান হবে। আর একটা কথা, মঙ্গলে মানুষের পদার্পণ বা পৃথিবীর কক্ষপথে যন্ত্রাগারে বসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, এর মধ্যে কোনটি বড় বা কোনটি বেশী বিস্ময়কর, সেটাও বোধ হয় এবার ভেবে দেখবার সময় এসেছে। পৃথিবীর কক্ষপথে কসমোড্রোম বা মহাকাশ ভবন নামে যে সোভিয়েট বিজ্ঞান গবেষণাগারটি স্থাপিত হয়েছে, বিজ্ঞানী মহলের ভবিষ্যদ্বাণী সেই ভবনটি ঘিরেই পৃথিবীর মানুষের প্রথম মহাকাশ-উপনিবেশ গড়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে কসমোগ্রাড বা মহাকাশ নগর। গবেষণাগারটি পাছে পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রভাবে নিচে নেমে আসে, তাই তাকে উচ্চতর কক্ষপথে নিয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ষ্টেশনটিকে ইচ্ছামত ওঠানামা করানোর এবং সেখান থেকে মানুষের গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়াবার ব্যবস্থাও সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের করায়ত্ব। তাই মনে হয়, মঙ্গলে অবতরণের চেয়ে এই গবেষণাগারটি বেশী বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় মহাকাশযান সয়ুজ-১১র তিন মহাকাশচারী লেঃ কঃ জর্জি দবরোভলস্কি, ভ্লাদিস্লাভ ভলকভ এবং ভিক্টর পাতসায়েভ ২০শে জানুয়ারী যখন ২৪ দিনের পর মর্তলোকে ফিরে এলেন, দেখা গেল তাঁরা মহাকাশে মহামরণের কোলে ঢলে পড়েছেন। সয়ুজের এই দুর্ঘটনা হয়ত মহাকাশ অভিযানে রুশ অগ্রগতিতে ছেদ টানবে, অন্তত এখনকার মত। এদিকে তিনজন আমেরিকান মহাকাশচারী এপলো-১৫ মহাকাশযানে গত জুলাই চাঁদে রওনা হয়ে গিয়েছেন। তিনদিন পরে আপনাইন পর্বতমালার পাদদেশে নেমে জীপে করে তারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াবেন। এই গাড়ি অসমান খাদ ও সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করে যাবে। তারপর পৃথিবীর সন্তান আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। কিন্তু মঙ্গল অভিযানে দেখা যাক ভাগ্যদেবী কার গলায় বিজয়মালা ঝুলিয়ে দেন।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেই দিনই তাদের ক্লাসে একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল। অঙ্কের মাষ্টার ননীবাবু তখনও ক্লাসে আসেন নি। লাইব্রেরী ঘরে হেড্-মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে কাগজপত্র নিয়ে কি যেন লেখাপড়া করছিলেন। ব্রজ-রাখাল কাপ্তেন এতক্ষণ সামনে খাতা খুলে হাতে উদ্ধত পেনসিলটা নিয়ে দুই চোখে যতটা সম্ভব কঠিনতা ফুটিয়ে সমস্ত ক্লাসে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। কে কোথায় কি কথা বলে—ফিস্ ফিস্ করে হাসে, এসব খাতায় লিখে রাখাই তার প্রধান কাজ। উদ্ধত পেন্সিল হাতে করে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক প্রহরীর মতন, ক্লাসে শৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষা করছে ক্লাসের মনিটর কাপ্তেন ব্রজ রাখাল। মাষ্টার মশাই ক্লাসে এলেই খাতাখানা শুধু এগিয়ে দেবে। তারপর মাষ্টার মশাই প্রত্যেক আসামীর কৈফিয়ৎ তলব করবেন। এটাই হ'ল এই স্কুলের রীতি। কঠোর 'ডিসিপ্লিন' রাখাই নাকি বিদ্যালয়ের ধর্ম্ম। যাহা হউক ব্রজরাখাল নিজ কর্ত্তব্যই করছিল। ব্রজরাখালের বেশ বয়স হয়েছে—দাড়ি গোঁপ উঠেছে। এর মধ্যে বিয়েও হয়ে গিয়েছে—আর শোনা যায় একটি মেয়েও নাকি ব্রজরাখালের হয়েছে। কিন্তু তথাপি ব্রজরাখাল স্কুল ছাড়েনি। ম্যাট্রিক যে কবে পাশ করবে তা বোধ হয় জানেন ঈশ্বর। ব্রজরাখাল সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক। মাছ মাংস পেঁয়াজ বা রসুন খায় না। একাদশীর দিন উপবাস করে, নানা বার ব্রত করে। গলায় একটি তুলসীর মালা - মাথার পেছনে ছোট্ট একটি সূক্ষ্ম শিখা। মাষ্টার মশাই ক্লাসে এসেই হাতে চক্ তুলে নিয়েছেন। এবার সুরু হ'বে বোর্ডের কালো বুকে বীজ গণিত আর পাটি গণিতের যুদ্ধ। ব্রজরাখাল তার মারাত্মক খাতাখানি তুলে নিয়ে মাষ্টার মশাইয়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে, গালে হাত দিয়ে গুম্ হয়ে বসে রইল। কি হ'ল আবার ব্রজরাখালের। ব্রজরাখালের দুই চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। কে যেন বলল স্যার আমাদের কাপ্তেন কাঁদছে—।

—কাঁদছে কেন? কে ব্রজরাখাল? কি হয়েছে ব্রজ? জিজ্ঞাসা করলেন ননীবাবু। কিন্তু একি কাণ্ড। ক্লাসের অতন্দ্র শান্তির প্রহরী দুর্দ্ধর্ষ কাপ্তেন ব্রজরাখালের চোখে জল। ননীবাবুকে আরও আশ্চর্য্য করে দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল ব্রজরাখাল।

—কী ব্যাপার। ননীবাবু বোর্ড ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন ব্রজরাখালের কাছে।

— কি ব্রজ কাঁদছ কেন? কাঁদতে কাঁদতে ব্রজরাখাল উত্তর দিল, ভাল লাগে না। আমার কিছু ভাল লাগে না। এ স্কুল সংসার ঘর বাড়ী স্ত্রী পুত্র কিছু ভাল

লাগেনা। শুধু ভাল লাগে তাঁকে ডাকতে। তাঁকে ভালবাসতে—তাঁকে পুজো করতে—

ননীমাষ্টার আরও অবাক হয়ে বললেন—তাঁকে মানে ভগবানকে।

—হাঁ স্যর। কৃষ্ণ—শুধু কৃষ্ণকে—শুধু তাঁকে ডাকতেই ভাল লাগে।

ব্রজরাখাল আবার ডুকরে কেঁদে উঠল!

ননীমাষ্টারের দুই চোখে বিস্ময়। চশমা খুলে চশমা মুছে বললেন—হুঁ বুঝেছি। আচ্ছা—আমার বাড়ী আসিস্। ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। এখন শান্ত হও, অথবা ছুটি নিয়ে বাড়ী যাও। অভয় তো অবাক। অতবড় জোয়ানমর্দ্দ লোকটা এক ক্লাস ছেলের সম্মুখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। এমনকাণ্ড কখনও তো দেখেনি। কিন্তু কেন সে কাঁদছে তা বুঝতে পারল না অভয়। শুনলো ভগবান কৃষ্ণের জন্য কাঁদছে। কিন্তু ভগবানের জন্যে হাউ-মাউ করে কাঁদার কি আছে? অভয় এর ওর মুখের দিকে চায়। কারুর মুখ গম্ভীর আবার কারুর ঠোঁটে এক চিলতে সূক্ষ্ম হাসি যেন লেগে রয়েছে।

ননীমাষ্টারের হুঙ্কারে ক্লাস জেগে উঠল। ঘস্ ঘস্ করে জ্যামিতির চতুর্ভুজ এঁকে চলেছেন ননীবাবু।

—দেখ বোর্ডের দিকে—। প্রমাণ কর—if both pairs of opposite angles of a quadrilateral are equal the quadrilateral is a parallelogram. কিন্তু কে প্রমাণ করবে? অভয় তো অবাক। ক্লাসের মনিটার কাপ্তেন ব্রজরাখাল জাঁদরেল লোক। তার শাসন আর গাম্ভীর্য্যে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রদের টুঁ শব্দ করা দায়। কিন্তু এ হেন ব্রজরাখালের হাউমাউ করে কান্না, চোখ দিয়ে অনর্গল জল ফেলা—এ যে রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার। অভয় ইতিপূর্ব্বে এমনটি দেখেনি বা শোনেনি। ব্রজরাখাল ছুটি নেয়নি। সেই যে ঘাড় নীচু করে বসে আছে, চোখ তুলে আর কারুর দিকে চায় নি। বোধকরি ঘাড় কাৎ, করে নতনেত্রে কৃষ্ণকেই দর্শন করছে। একসময় অভয়ের কানে কানে অক্ষয় বলল, সব বুজরুগী গুল্—। বুঝলিনা—কেষ্টর জন্যে কাঁদছে না ছাতী। অংকের গুঁতোয় বাছাধন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। দেখিস্ আমি বলে দিলাম ব্রজরাখাল আর স্কুলে আসবে না। গঞ্জে গঞ্জে গামছা বিক্রী করে, ও তাই করবে আর সন্ধ্যে বেলায় হেঁড়ে গলায় গান ধরবে—

অভয় বোর্ডের দিকে তাকাল। ননী মাষ্টার সবাইকে তাড়া লাগিয়েছে—। কেউ পারছে না, প্রমাণ করতে। সব গাধা, বেতের আগায় সব গাধাকে তুলোধনা করব। কিন্তু দেখা গেল, ননী মাষ্টার চক্ নিয়ে বোর্ডের কাছে গেলেন জ্যামিতি বোঝাতে।

মনে কর A B C D একটি চতুর্ভুজ, এবং ইহার $\angle A$=বিপরীত $\angle C$, এবং $\angle B$=বিপরীত $\angle D$ প্রমাণ করিতে হইবে যে, চতুর্ভুজ A B C D একটি সামন্তরিক—। ননী মাষ্টার বলিয়া যাইতে থাকেন।

স্কুলের ছুটি হইলেই, অভয় দেখে সামনে দাঁড়িয়ে শুভময়। শুভময় হাসিমুখে বলে, চল ভাই আমার সঙ্গে। এখন বাড়ী গেলে হবে না।

—তা বেশ। আজ ক্লাসে একটা মজা হয়েছে।

—কি হ'ল আবার। যদিও তারা একই ক্লাসে পড়ে, তবে ওদের সেকস্ন আলাদা। তাই তাদের সেক্সনের মজার খবরটা জানাতে লাগল অভয়। শুভময় তো হেঁসেই খুন।

প্রায় সন্ধ্যার সময় অভয় বাড়ীর দিকে চলল। গোটা বিকেল কেটেছে। শুভময়ের সঙ্গে গল্প করেছে—ওখানে ভারী রকমের জল খাবার খেয়েছে। ওদের বাগানের হরেক রকম ফল ফুলের গাছ দেখে দেখে বেড়িয়েছে। শুভময় ধনীর ছেলে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মনে এতটুকু অহংকার নেই। ঠিক আপন ভায়ের মত তার সঙ্গে ব্যবহার করছে। শুভময় বার বার বলেছে—রোজ রোজ কিন্তু আসতে হ'বে—

অভয় কিন্তু লজ্জা পেয়ে বলেছে—না—না—। রোজ কি আসা হয়।

—বাঃ রে, তাতে কি? তোমার এত লজ্জা। এতে

লজ্জা কি তোমার। কিন্তু কোথায় যে লজ্জা, সে কথা কোন মুখে মুখ ফুটে বলবে। সমস্তদিন স্কুলে থেকে, বিকেলে যে দারুণ ক্ষুধা পায়, সে কথাতো কাউকে বলতে পারে না। এক একদিন তেলাভাজার সঙ্গে মুড়ি মুড়কী কিনে খায়। কিন্তু রোজ তাও খরচ করতে পারে না। বাবা যে টাকা কড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন। তা থেকে অতি কৃপণের মত দু চারটে পয়সা বার করে জলখাবার খায়। যেদিন অসহ্য ক্ষুধা লাগে, শুধু মাত্র সেই দিনই পয়সা খ৹চ করে খায়। কিন্তু পাছে, শুভময়ের বাড়ীর লোক ভাবে, শুধু ভাল খাবারের লোভেই অভয় বেড়াতে আসে এ যে কত বড় লজ্জার কথা। এ ভাবতেই মরমে মরে যেতে হয়। এ ছাড়া শুভময়ের বাড়ী যাতায়াতের খবরটা সে কাউকে জানাতে চায় না। কারণ, ক্লাসের ছেলেরা বলবে, কি রে অভয় আজকাল যে চেনাই যায় না বড়লোকের সঙ্গে আন্‌কোরা নূতন ভাব তো। শেষ পর্য্যন্ত বীরুর মারফৎ জেঠাইমার কানে আবার না যায়।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালটীর কেরোসিন আলো জ্বালা হচ্ছে। একটা মই ঘাড়ে করে, ওরা ল্যাম্প পোষ্টে মই লাগিয়ে আলো জ্বেলে দিচ্ছে। মোষের গাড়ীতে করে, মেথররা জল এনে রাস্তায় রাস্তায় ছিটিয়ে দিচ্ছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। । কেউ ধুনো গঙ্গাজল দিচ্ছে—কেউ বলছে হরি বোল—হরি বোল—নারায়ণ—নারায়ণ। রাত আসছে—দিন শেষ হ'ল। লণ্ঠন—আর—বাতির আলো —রাস্তার ধুলোর ওপর জল পড়ে—কেমন একটা সোঁদা সোদা গন্ধ বেরুচ্ছে। কর্ম্মক্লান্ত দেহ নিয়ে, উকীল, মোক্তার, মুহুরীরা বাড়ী ফিরছেন। অফিসের বাবুরা ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে ফিরছেন। বাঁধারাস্তার ওপর লোকজন যাতায়াত সুরু করেছে—। স্বাস্থ্যান্বেষীর দল নদীর ধারে ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছেন। চারদিকে একটা ঢিলে ঢালা ভাব। মাঠে ছেলেরা তখনও বেদমভাবে বল পিটুচ্ছে। বই কখানা হাতে নিয়ে অভয় আস্তে আস্তে চলছে। আজ আর কোনও ক্ষুধা নেই। শুভময়ের ওখানে বহু ভালমন্দ খেয়েছে সে।

অভয়ের মনে পড়ছে, গায়ের বাড়ীতে মা এখন খুব কর্ম্মব্যস্ত। তুলসী তলায় গোয়াল ঘরে, লক্ষ্মী পুজোর ঘরে, মা এখন প্রদীপ দেখাচ্ছেন। বাছুরটা হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। খোকন গীতা বোধ করি খেলা শেষ করে এখনও বাড়ী ফেরেনি। বাবা বোধহয় মাঠে। রান্না ঘরে টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে আর তুলসী তলায় মাটির পিদীমটা। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস এসে, প্রদীপের শিখাকে শুধু কাঁপাচ্ছে। আস্তে আস্তে পাতলা অন্ধকারটা ঠিক একটা কাল চাদরের মত সমস্ত গাঁ খানাকে ঢেকে দিচ্ছে মুড়ে দিচ্ছে। ওপাড়া এপাড়া থেকে শাঁকের শব্দ ভেসে আসছে। এতক্ষণে গীতা তুলসী তলায় দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজায়—অভয়ের বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল। উঃ—আজ কতদিন হয়ে গেল, সে বাবা, মা, ভাই বোনদের দেখেনি।

অভয় বাড়ীর দিকেই পা চালাল। আজ উমেশের সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিল। তাদের ক্লাব সংক্রান্ত কি কি বিষয় নিয়ে নাকি আলোচনা হ'বে। আজ আর তেমন উৎসাহ বোধ করল না। অভয় উমেশকে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না। ঐ বইখানা দেবার পর থেকেই,অভয় কিছু সন্দেহ করছে। শেষকালে কি এক বিপাকে জড়িয়ে পড়বে না তো। দেশের স্বাধীনতা সেও চায়। ইংরেজ এ দেশ থেকে চলে যাক্ এটাও তার কাম্য। কিন্তু তার জন্যে, মানুষকে হত্যা করা কেন? ওর চেয়ে সেদিন কার সভায় মহাত্মাজীর সম্বন্ধে, তাঁর আদর্শ আর মতামত সম্বন্ধে যা শুনেছে তাই তার ভাল লেগেছে। এটা একটা নূতন কথা। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু সত্যি সত্যি এটা সম্ভব কিনা তা অভয় বুঝতে পারছে না। না পারলেও, এই মতটা ভারী ভাল আর নূতন। মোনাদা তো এই মতের পথিক। মাতালের পা জড়িয়ে ধরে বলেছে ভাই আর মদ খেওনা। বিলিতি কাপড়ের দোকানে গিয়ে বলেছে ভাই আর বিলিতি কাপড় কিনো না। দেশের শিল্প দেশে গড়—দেশের তৈরি জিনিষ কেনো। এর জন্যে

মোনাদা বহুবার মাতালের হাতে, বিলিতি কাপড় কেনা ক্রেতার হাতে মার খেয়েছে কিন্তু কোনদিনই মার ফেরৎ দেয়নি। বরং বলেছে মেরেছো বেশ করেছো। এই আমি বুক পেতে দিলাম, আমার বুকের ওপর দিয়ে কিন্তু যেতে হবে। যাও আমায় মাড়িয়ে যাও, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। অভয় ভাবতে ভাবতে পথে চলে। এতক্ষণে চারিদিকে আলো জ্বলেছে। অভয় ভাবে আজ বুঝি বাড়ী ফিরতে দেরি হয়ে গেল। অভয়ের সন্দেহ হল, উমেশের বোধ করি ঐ রকম কোন গুপ্ত স্বদেশী দলের সঙ্গে যোগ আছে। একটা কাঁটা যেন অভয়ের বুকে খচ্ খচ্ করতে থাকে। সুন্দর শান্ত মনে একটা সন্দেহের কালো ছায়া এসে মনের শান্তি সব নষ্ট করে দেয়। অভয় ভাবে, না সে ওসব দলের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখবে না। সে গরীব বাপ মায়ের ছেলে। তাদের কোনদিন অন্ন জোটে কোনদিন জোটে না। বর্ষার জলে ঘর ভেসে যায়, এদিক ওদিক করে বিছানা সরিয়ে সরিয়ে রাত কাটে। শীতে আগুণ জ্বালায় আগুণের পাশে বসে শীত কাটে। কতদিন তারা খেতে পায়নি। খিদের জ্বালায় ছোট ভাই বোন কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বাবা, মা গোটা রাত বসে বসে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছেন। রাত্রির কালো অন্ধকারের দিকে চেয়ে শুধু বার বার ডেকেছেন ভগবানকে। লোকে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে হেঁসেছে কেউ বিদ্রূপ করেছে। কিন্তু কেউ তবুও সাহায্য করেনি। অনাহারে দেহ ভেঙ্গে পড়েছে দেহ শীর্ণ হ'তে শীর্ণতর হয়েছে। না তাকে এগিয়ে যেতে হ'বে—তাকে মানুষ হ'তে হবে। বাবা মার দুঃখ তাকে ঘোচাতে হ'বেই। অভয় শূন্যপানে চেয়ে, অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম জানায়।

হঠাৎ অভয়ের মনে পড়ে, ওহোঃ কালই তো থিয়েটার। ক্লাসের অনেক ছেলে থিয়েটার দেখতে যাবে। স্কুলের রসময় মাষ্টার, রবীন মাষ্টার মশাই থিয়েটার করবেন। তাই ক্লাসের বহু ছেলে টিকিট কেটেছে। থার্ড ক্লাস টিকিটের দাম, মাত্র চার আনা। তারা অভয়কে অনেক সাধাসাধি করেছে। ওরাই তার টিকিটের দাম দেবে। কিন্তু অভয়ের সাহস নেই। জেঠামশায়কে না বলে কোথাও রাত কাটান, বা যাত্রা থিয়েটার দেখার সাহসই নেই। একে তো বাড়ী শুদ্ধ সবাই থিয়েটারে যাবে, অথচ এখন পর্য্যন্ত তার যাওয়ার কথা কেউ বলে নি। একি কম লজ্জার কথা। সেও তো বাড়ীর ছেলে।

অভয় পা চালিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরতে সুরু করে। তার আশা, হয়তো গিয়ে শুনবে, তার যাওয়ার কথাও হয়েছে। বাহিরের ঘর শূন্য। শুধু মাত্র টেবিলটার ওপর আলো জ্বলছে। ওদের মাষ্টার মশাই আজ আর আসেন নি। বোধ করি তাঁকে আজ বারণ করে দেওয়া হয়েছে। অভয় নিজের ঘরে এসে জামা জুতো ছাড়লো, আশা করছে হয়তো, এখুনি শুভ সংবাদ দেবে হয় বীরু না হয় সীধু। হাত মুখ ধুয়ে ঠাকুরের কাছে এক গেলাস জল চেয়ে নিল। নিঃশব্দে—মৌজী ঠাকুর এক গেলাস জল দিল, কিন্তু আশ্চর্য্য—তার যাওয়ার কথা বলল না। অভয় ভাবল, হয়তো ঠাকুর জানে না কিছুই।

অভয় একমনে পড়তে লাগল। কিন্তু আজ আর পড়তে মন বসছে না। প্রত্যেকটি শব্দ, পায়ের কোনও মৃদুতম শব্দে বুকটা নেচে উঠছে। বহুদিন আগে একবার থিয়েটার দেখেছিল। কি আলোর বাহার, কত রকম গান বাজনা। সেই ড্রপ সিনটার কথা বেশ মনে পড়ছে। বিরাট সমুদ্র। লাল সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে,—আর একটা মস্ত বড় জাহাজ জল কেটে ছুটে যাচ্ছে। তারপর কী সুন্দর থিয়েটার, তার সাজ পোষাক আর গান বাজনা। ঐ কথা ভাবতে ভাবতেই অভয়ের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তাদের ক্লাসের প্রায় সব ছেলেই আজ থিয়েটার দেখতে যাবে। তাদের স্কুলের দু জন শিক্ষকও প্লে করবেন কিনা। অভয়ের মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেউ তার খোঁজ নিল না। ওপরে ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। ঠাকুর খুব তাড়াতাড়ী রান্না—বান্না করছে। মিঠুয়া বার বার ওপর নীচ করছে। মৌজী ঠাকুর বার কতক উপরে গেল। অভয় বুঝতে পারল, ওদের খাওয়া সুরু হয়েছে। অভয় আর তাকাল

না, বইয়ের ওপর চোখ রেখে চুপচাপ বসে রইল। একটা দারুণ অভিমান সমস্ত বুকখানাকে যেন গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। বুকের ভেতরটায় একটা জ্বালাকর বিষাক্ত বাতাস যেন আটকে রয়েছে। সেটা আর ওপরে উঠছে না,—শুধুই বুকের ভেতরে যেন পাক-দিচ্ছে।

অভয় ভাবতে লাগল, আজ যদি মা, বাবা থাকতেন এখানে, তবে সে কি থিয়েটার না দেখত। মাত্র-তো চার আনা পয়সা। সে হেঁটেই যেতো আর হেঁটেই বাড়ী ফিরত। তার জন্যে মাত্র চার আনা পয়সা খরচ করলে, জ্যেঠাবাবু গরীব হয়ে যেতেন না।

সেই নিরূপিত সময় এসে গেল। সিঁড়িতে দুপ্‌দাপ্‌ করে জুতোর শব্দ হ'তে লাগল। জেঠাইমা, মিনতি, প্রণতি. বীরু সিধু আর মিঠুয়া পর্য্যন্ত সেজে গুজে নেমে এসেছে। দামী কাপড় চোপড়, গহনা সেন্ট ও দামী পাউডারের গন্ধে অভয়ের নীচের ঘর,—দালান সব ভরে গেল। জেঠাইমা বললেন, ঠাকুর—রান্না শেষ হ'লে ঝিকে খেতে দেবে। ও আজ আর বাড়ী যাবে না। আজ এখানেই শোবে। বাবুর খাবার খুব ভাল ভাবে নীচের জাল আলমারীতে রাখবে। বাবু খেতে বসলে তবে দুধ গরম করে দেবে। বদরী বাবুর সঙ্গে গেছে —আর অভয়ের পড়া শেষ হলে খাবে। জেঠাইমা বললেন, অভয় আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি। তোমার জ্যেঠাবাবু পরে আসবেন, অবশ্য জেগে থাকবে। উনি সাড়ে দশটার মধ্যে ফিরবেন। তাই জেগে থাকবে। আর—রাত দশটার মধ্যেতো ছাত্রদের ঘুমোবার কথা নয়। মনে রেখো পরের বাড়ীতে খেয়ে থেকে পড়ছ—। এখন সেই পড়া করো। বাবুর কোন দরকার আছে কি না জিজ্ঞাসা করবে—

মিঠুয়া বলল, মাজী চলুন। খুব দেরী হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল, ওরা বার বার তাগাদা দিতে থাকে। চল না মা—সবাই যে চলে গিয়েছে? একটা সিন্ হয়তো আরম্ভ হয়ে গেছে।

দলটি আর দাঁড়াল না। বাইরের গেট্ বন্ধ হ'বার শব্দ হ'ল। একরাশ সুগন্ধ, বাতাসে ভাসতে ভাসতে,—কিছুটা এদিক ওদিক ভেসে গেল। কিছুটা এসে গেল, অভয়ের নাকে।

অভয় নিঃশব্দে—এই তাচ্ছিল্য আর অপমান সইল। সে বুঝল, সে অতি তুচ্ছ। সে যে এ বাড়ীর কেউ নয়, এটাও প্রমাণ হ'ল। সে মাত্র এঁদের গলগ্রহ স্বরূপ। এঁরা দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, খেতে দিচ্ছেন, তার ওপর আর কি চাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য—মিনতি কি একবারও তার যাওয়ার কথা বলতে পারত না? পারত নিশ্চয়ই। অভয় বুঝল, ওঁরা বড়লোক। তার বাবা গরীব—গরীবের ইচ্ছা বা আশা সম্বন্ধে ওঁরা একান্ত উদাসীন। তাই এই প্রভেদ—। তারা যদি বড়লোক হত তবে অনাদর হ'ত না—হত সাদর আমন্ত্রণ। কিশোর বালকের বুকে এই ব্যথা, এই অপমান শেলের মত বিঁধে রইল। আপন আর পর এ সবের জ্ঞান, এইরকম ছোট খাট আঘাতের দ্বারাই সৃষ্টি হয়। বড়দের সামান্য ভুল ত্রুটী, আপন পরের তফাতের জন্য, এমনি যে কত বিষ, মানুষের অজান্তে অলক্ষ্যে, লোকচক্ষুর অগোচরে মানুষের মধ্যে ঢুকে যায় তার হিসাব কে রাখে। মানুষ বুঝি অন্য মানুষকে আঘাত দিতেই ভালবাসে। অপরকে আঘাত দিয়েই যেন মানুষ খুসী হয়। মনের এই আদিম প্রবৃত্তি আজও তথাকথিত শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রতি স্তরেই সমভাবে বিদ্যমান। এই হানাহানি, যুদ্ধ, বিগ্রহ, হিংসা, এ সবই মানুষের মনের অন্তঃস্থলে যে বিষ তাও লুক্কায়িত রয়েছে, এ সবই তারই বহিঃপ্রকাশ।

দলটি চলে যাবার পর, অভয় নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। এমন ব্যবহার, যে প্রত্যাশা করেনি। সামান্য ব্যাপারে, মানুষ যে এত ছোট হ'তে পারে, এসব তার ধারণাতীত। অভয়ের মনে পড়ে, তার বাবার কথা। বাবা, মার মনে কোনদিনই যে বিন্দুতম নীচতা দেখে নাই। তাঁরা গরীব বটে, কিন্তু মানসিক ঐশ্বর্য্যে এঁদের চেয়ে অনেক উন্নত। মনে পড়ে যায়, আর একজনের কথা। সে তার মোনাদা। অনেকদিন সে মোনাদার

সঙ্গে চলাফেরা করেছে, কিন্তু মনের সামান্যতম সঙ্কীর্ণতা দেখে নাই। আশ্চর্য্য, কী অদ্ভুত এই মোনাদা। নিস্তব্ধ ঘরে, একলা বসে বসে, অভয় মন্মথর কথা ভাবতে থাকে। মন্মথ অনেক সময় তাকে অনেক কথাই বলেছিল। একটা কথা তার মনে পড়ে মোনাদা বলেছিল—চট্ করে, শুধুমাত্র একটা কাজ দেখেই, মানুষকে বিচার করতে যেওনা। তা হ'লে ঠকতে হয়, নিরাশ হ'তে হয়। কথাটা সত্যি। তাড়াতাড়িতে কোন মানুষকে ভাল মন্দ বিচার সম্ভব নয়। অভয় আশ্চর্য্য হয়, নিজের মনের গতি দেখে। মিনতির উপর তার এত ভরসা কেন? তাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে, মিনতির তো সত্যি কোনও হাত নেই। সে তো তার মায়ের আদেশ বা ইচ্ছার ওপর কোন কথা বলতে পারে না। অভয় এখন বেশ বুঝেছে, তার জ্যেঠাবাবুর সংসারে প্রকৃত মালিক বলতে বোঝায় জ্যেঠাইমাকে।' জ্যেঠাবাবু টাকা রোজগার করেন। বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন, ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণ স্ফীত হতে স্ফীততর করেন। কিন্তু কর্তৃত্ব করেন জ্যেঠাইমা।

হঠাৎ বাইরে জুতোর শব্দ হয় জ্যেঠাবাবু ডাকেন মিঠুয়া।—মিঠুয়া, অভয় তাড়াতাড়ি বাইরে এসে বলে, মিঠুয়া তো বাড়ী নেই—ওঁদের সঙ্গে থিয়েটারে গেছে।

—থিয়েটারে? তা তুমি যাওনি কেন? একসাথে গেলেই তো হ'ত। অভয় উত্তর করে না। ঠাকুর এসে খাবারের কথা বলল। জ্যেঠাবাবু, কি যেন বলে উপরে চলে গেলেন।

মৌজী ঠাকুর বলল। অভয় দাদাবাবু, এবার ভাত খাইয়ে লিন।

থিয়েটারে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে অন্য কেউ ভুলে গেলেও, অভয় ভুলতে পারেনি। একটা অভিমান ও ব্যথায় তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। পারত পক্ষে বাড়ীর ভেতর যায় না দোতলা বা তে তলায় ত নয়ই। বীরু সাধুর সঙ্গ ইচ্ছা করেই এড়িয়ে যায়। সাধু ছেলে মানুষ ও মাঝে মাঝে ছুটে আসে। এটা সেটা নেড়ে চেড়ে, একথা সেকথা বলে চলে যায়।

কিন্তু বীরু যেন তার সঙ্গ বা তাকে ইচ্ছা করেই পরিহার করে চলে। বীরু ঠিক তার মায়ের স্বভাবই পেয়েছে। অহঙ্কারী আর দেমাকী ভাবটাই তার বেশী। অভয় একমাত্র খাওয়ার সময় ছাড়া অন্দরে পা দেয় না। একমনে নিজের পড়াশোনা করে। অনেকদিন দেশের চিঠি পায় নি। তার চিঠি আসে এখন তাদেরই ক্লাসের ভবেশের বাড়ীতে। আজও গোঁজ করবে, কোন পত্র এসেছে কিনা। শীত শেষ হয়ে এসেছে। এখন চৈত্র মাসের অর্দ্ধেক। গাছে গাছে আমের গুটীগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছে। অভয় তার দেশের কথা ভাবে। তার বাড়ীর কথা। বাড়ীর বাগানে বোশেখী আম গাছটার কথা মনে হয়। পৌষ মাসেই ঐ গাছে মুকুল আসে। সারাগাছ মুকুলে ভরে যায়। মুকুলের মধু লোভে মৌমাছিরা দিনরাত গুণ গুণ করে মধু খেতে আসে। সেই মুকুল ক্রমশঃ গুটী হয়ে রসাল ফলে পরিণত হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে দুপুরের তপ্ত হাওয়ায় বড় বড় আমের গুটী ঝর্ ঝর্ করে ঝরে যায়। ভোর বেলা সে সবার আগে উঠত। একটি দুটী করে অনেক বড় বড় আম কুড়িয়ে পেত। নূতন আমের টক্—সে কি চমৎকার আর অদ্ভুত খেতে। এখানে আম কুড়োনোর মজা বেশী নেই। চৈত্র মাসে কোন কোন দিন, হঠাৎ বেলা তিন চারটের সময়, পশ্চিম আকাশে কালো করে মেঘ জমে উঠত দেখতে দেখতে সারা আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যেত। হঠাৎ উঠত বাতাস—সোঁ সোঁ শব্দ করে, সেই বাতাস বয়ে যেত। ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ত আমের গুটী। সেই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে, তারা ভাই বোন আম কুড়োত। বোসেদের বোশেখী গাছের আম, আর তাদের বেঁকী গাছের আম কুড়িয়ে আনত। অভয় দিবাস্বপ্ন দেখে থাকে। মনে হয়, সে সব দিনগুলো,—সবই স্বপ্নের মত। যেদিন চলে যায়—আর তা ফিরে আসে না। বোধ করি, সেই তেমন দিন,—ঠিক তেমন ঘটনা, আর কোন দিনই দেখা দেবেনা—ফিরে আসবেনা।

মনে পড়ে যায়, পালেদের বাগানের কথা। ওদের

খিড়কীর বাগানের জোয়ালে আম গাছ, বেল খাস আম আর বেঁকী আম কি সুন্দর। বাগানের মধ্যখানে মুণ্ডমালা আম। গোল গোল বৃহৎ আকারের আম। রংটা ঘোর কাল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—। পাকার পর ভেতরটা ঠিক আলতার মত লাল। যেমন মিষ্টি তেমনি সুঘ্রাণ। ওতে আঁশের লেশ মাত্র নেই। পালেদের বাড়ীতে শুধু বুড়োবুড়ি থাকে। ছেলেরা বিদেশে থাকে। তারা কালভাদ্রে বাড়ী আসে। অত বড় বাড়ী বাগান, পুকুর সমস্ত আগলিয়ে আছেন দুজন কর্ত্তা গিন্নী। বুড়ো কর্ত্তাতো, দিনরাত—একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে, ঠুকঠুক করে, এ বাগান সে বাগান করে বেড়ান। মাঝে মাঝে লাঠির ওপর ভর দিয়ে, মাজাটা সোজা— করে, চোখের ওপর হাতটা আড়াল করে, হেঁকে ওঠেন —ওরে বাঁশ কাটছিস্ কে রে? অ্যা—কে রে তুই—

দূরের কোন গাছকে মানুষ বলে কল্পনা করে নিয়ে, এটা একটা জানান যে, গৃহস্থ সতর্ক আছে। অতএব বাঁশ বা গাছ কাটতে এসোনা। কিছুক্ষণ সারা বাগানে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে, আবার চলে সারা বাগানে পাহারা আর চক্কর দেওয়া। সন্ধ্যের কিছু আগে এই কাজটা বন্ধ করে, বাড়ীর দিকে চলেন। বাড়ীতে যে এখন নানান কাজ। গরু বাছুরের তদারক এমনি অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ছেলেরা বলে, বাবা আর কেন? ও বিষয় সম্পত্তি—ঘর বাড়ী যা হয় হোক্। আপনি আমাদের কাছে এসে থাকুন। কিন্তু পালগিন্নী বা বুড়ো কর্তা ছেলেদের কথা কিছুই কানে তোলেন না। হেঁসে বলেন, বাপুরে, এসব সম্পত্তি কি অমনি অমনি হয়েছে। বহু দুঃখ কষ্ট করে, বিষয় সম্পত্তি তৈরি করেছি। আমরা না থাকলে, সব যে লুটপাট হয়ে যাবে। কিন্তু ভাবেন না, ওঁরা চিরকাল বাঁচবেন না। কেউ যদি বলে, আচ্ছা দাদামশাই, এ-সব আপনার অবর্ত্তমানে কি হবে?

—আরে বাপু পরের কথা পরে। তা বলে, যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন তো দেখে যাই। বাপু, বিষয় সম্পত্তি, ঘর বাড়ী সমস্তই তো ছেলেদের জন্যে করা আমি মরে গেলে, এসব সঙ্গে নিয়ে যাব? না —তা যাব না। সবই থাকবে, কিন্তু ছেলেরা অবুঝ ওরা বলে কিনা সব পড়ে থাকুক, আপনারা চলে আসুন। পাগল, এখন বুঝছিস্‌নে। বিষয়ের ব্যাপার পরে বুঝবি।

অভয় ভাবে, মাকে চিঠি লিখে জানবে, বুড়োকর্ত্তা, আর পাল গিন্নী কেমন আছেন। আহাঃ-ওরা কিন্তু লোক ভাল। পালগিন্নী, কতদিন যে তাদের—চাল ডাল দিয়েছেন। আমের সময় আম, কাঁঠাল আরও কত যে ফল দিয়েছেন, তার ঠিক নেই। শীতকালে পিঠে পুলি খাইয়েছেন, আবার কলাপাতা করে, পুঁটুলী বেঁধে বাড়ী নিয়েও এসেছে। গাছের কলা, বাতাবি, পেয়ারা, জাম, খেজুর, এ সবই কতই না খেয়েছে।

অভয়, ভাবে, হায় কবে আসবে গরমের ছুটী। অভয় দিন গুণতে থাকে।

দিনকয়পর অভয় ঘরে বসে পড়ছে, হঠাৎ-জেঠাইমা ঘরে ঢুকে বলেন। কি অভয় পড়ছ? তা বেশ। অভয় অবাক হয়, তারপর তাড়াতাড়ি—উঠে, দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়। মৃদুস্বরে বলে—হাঁ—পড়ছি।

—বেশ পড়ছ পড়। কিন্তু আর বুঝি বাড়ীতে চিঠিপত্র দাও না। তোমার বাবা মার চিঠি পত্র অনেকদিন ধরেই তো আসে না। অভয়ের মনে সামান্য দ্বিধা এল। কিন্তু পরক্ষণেই বলল। ঠিক জানি না। আমিও অনেকদিন পত্র দিই নি। এবার লিখব।

জেঠাইমা আশালতা, ঘরের চারদিকে তাকালেন। টেবিলের ওপর অভয়ের সমস্ত বইগুলো দেখলেন উলটিয়ে পালটিয়ে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, আবার ধীর পদে চলে গেলেন।

অভয় চুপ করে বসল। ঠিক বোঝা গেল না, হঠাৎ কেন জেঠাইমা ঘরে এলেন?

এর কারণ কি? অভয় ভাবল, তবে কি ভবেশের ওখানে চিঠিপত্তর আসার কোন খোঁজ খবর পেয়েছেন? না।—এমনি কিছু সন্দেহ করেই কথাটা তুলেছেন। অভয়

ভাবল, যা হয় হোকগে। ভবেশকে জিজ্ঞাসা করলেই হ'বে। তাকে সাবধানকরে দিতে হবে যেন খবর্দার তার চিঠিপত্র সম্বন্ধে ক্ষুর্ণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ না করে। একটা ভয় মিশ্রিত সন্দেহ অভয়ের মনে খচ্ খচ্ করতে থাকে। ইচ্ছা হ'ল, এখনই ভবেশের ওখানে যায়। কিন্তু জেঠাইমার চোখকান সব দিকে। মিঠুয়া চাকরটা কম নয়। হয়তো মিঠুয়া, জেঠাইমার গুপ্তচরের কাজ করে। সারাক্ষণ ও ওপরে থাকে। কিন্তু বাড়ীর কোথায় কি হচ্ছে, সব খবর কানে যায়। মিঠুয়া, বা মৌজী ঠাকুর কাউকেই বিশ্বেস নেই। অভয় ভাবে, জেঠাইমার এভাবে হঠাৎ আসার কারণ কি?

বিকেলে উমেশের সঙ্গে দেখা হতেই উমেশ, বলল, বইখানা হঠাৎ আবার ফেরৎ দিলি কেন রে? খুব ভাল বই এটা।

অভয় বলল, না ভাই ওসব বই পড়ব না। জানিস্নে জেঠাইমাকে। এই সব বই আমার কাছে আছে জানলে, আর দেরী করবেন না, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী থেকে দূর করে দেবেন। বলা যায় না, হয়তো পুলিশকেও ডাকতে পারেন। ওঁরা সব ইংরেজ ঘেষা লোক। ওঁরা চান ইংরেজ যেন চিরকাল এদেশে রাজত্ব করে। ওঁদের ধন সম্পত্তি, প্রাণ মান, সবই সাহেবদের হাতে তুলে দিয়ে, দিব্বী নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে চান।

উমেশ বলল, এটা তো অবশ্যম্ভাবী। বহুকাল পরাধীন থাকলে, এই রকম মনোবৃত্তিই দেখতে পাওয়া যায়। তখন পরাধীনতাই বেশ ভাল লাগে। একটা জন্তু জানোয়ারকে বহুদিন পোষার পর, তাকে তুমি ছেড়ে দাও, দেখবে সে স্বাধীনতা চায় না। ঘুরে ফিরে তোমার আস্তানাতেই ফিরবে। সবাই নূতন জীবনকে ভয় পায়। পুরাতনকেই আঁকড়ে ধরে ভাবে আঃ বেশ আছি বাবু। তোমার জেঠাইমার মনোবৃত্তি আজ সারা ভারতের অধিবাসীদেরই পেয়ে বসেছে। নূতন করে কোন কিছু ভাবনা, চিন্তা করতে পারছে না। যতদিন আমরা ইংরেজদের দাসত্বগিরি করব, ততদিন এই মনোবৃত্তির হাত থেকে আমরা উদ্ধার পাব না। আমাদের এখন জোর করে এই সর্ব্বনাশা শেকলকে কাটতে হ'বে। তাতে লাভ ক্ষতি বা দুঃখকষ্ট পেলে, পিছিয়ে গেলে চলবে না। আমি, বলেছি তো—বইখানা ভাল বই। অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে, আমাদের জানা আর জ্ঞানলাভ করা একান্ত দরকার। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস, নিশ্চয়ই একদিন লেখা হ'বে। কানাইলাল, ক্ষুদিরাম এই সব দেশ ভক্তদের জীবনী একদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হ'বে, সেদিন তোমার জেঠাবাবুদের মতন লোকের কথা, কোথায় তলিয়ে যাবে। আর একটা বিশেষ কথা আছেরে—

অভয় বলল, কি কথা—

উমেশ বলল, একটা ছেলের ভারী অসুখ। আজ প্রায় পঁচিশদিন হয়ে গেল। তুমি ছেলেটাকে দেখেছ নিশ্চয়ই। জেলা স্কুলে পড়ে। ক্লাস সেভেনে পড়ে। এই শহরেই ওর আত্মীয় রয়েছে। আত্মীয়টা বেশ হোমড়া-চোমড়া। শান্তিকে কি তুমি দেখনি। ছেলেটা কিন্তু খুব শান্ত। কথা খুব কম বলে। আর ভারী ভালমানুষ।

ঐ যে সত্যদার বাইরের ঘরের পাশে ছোট্ট ঘর, ঐখানে ও থাকে। ওর থাকার ব্যবস্থা আমরাই করেছি। ওর কাকা একজন সাব-ডেপুটী। কিন্তু সাব্-ডেপুটির ভাইপো হয়েও ও থাকছে এখানে।

অভয় বলে, তাই নাকি? তবে ও এখানে কেন? একাই থাকে নাকি?

—হাঁ একাই থাকে। সত্যদার বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করে। শান্তির বাবা নেই, খালি মা আছেন। ওর আর ভাই বোন কেউ নেই। 'ওর কাকারা পূর্ব্ব থেকেই পৃথক। শান্তির বাবা শিক্ষিত লোক ছিলেন, কিন্তু কোনও চাকরি-বাকরি করতেন না। গাঁয়ে জমি জমা চাষ বাস করেই সংসার চালাতেন। কিন্তু তিনি অকালে মারা গেলেন। দেখা গেল, দেনা অনেক। বাকী খাজনার দায়ে বহু জমি নিলাম হয়ে গিয়েছে। শান্তির মা বাকী জমিজমা বাড়ীঘর, বিক্রী করে দেনাত্নান শোধ করে একরকম শুধু হাতে এসে

এখানে উঠলেন। কোন সূত্রে আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়, আমরাই শান্তিকে ও তার মাকে এখানে এনে থাকা খাওয়ার পড়ার ব্যবস্থা করি। আজ, সেই শান্তির কঠিন অসুখ।

অভয় বলল, শান্তির মাও এখানে, কিন্তু তার নার্সিং-এর কাজ ঠিকমত চলছে না। অন্য দু-একজন লোক দরকার। আমরা পালা করে, দিনরাত রুগীর কাছে রয়েছি। আজকে ভাই তোমাকে থাকতে হ'বে।

—রাতে? ভারী মুস্কিলের কথা যে। কি করে আমি রাতে আসি?

উমেশ বলল, রাত দশটার পর, যেমন করেই হোক আসতে হ'বে। ভোর বেলায় কাক কোকিল ডাকার আগে, বাসায় চলে যাবে। যেমন করে হোক, বুদ্ধি খরচ করে, তোমার এর ব্যবস্থা করতে হ'বে। তুমি শুধু একা থাকবে না। আমরাও থাকব। আজকের রাতটা ভারী সঙীন রাত। একটা মনে হয়, হেস্তনেস্ত হ'বে—তাই ডাক্তারবাবু ভয় করছেন।

অভয় চিন্তিত হয়ে বলল, এতদূর? তবে কি আর আশা নেই।

—চুপ চুপ। ওর মাকে আজ সাতদিন পর ছেলের কাছ থেকে ওঠাতে পেরেছি। ঠিক সাতদিন, উনি শুধু চা ছাড়া আর কিছু খান নি। রাতে ওঁকে যেমন করে হোক, বাড়ীর মধ্যে বিশ্রামের জন্য পাঠাতে হবে। আমরা সবাই মিলে পালা করে জাগব। মায়ের একটি মাত্র ছেলে। ভগবান যে কি করবেন তা জানি না। জানিস অভয় আমি মা কালির কাছে, সওয়া পাঁচ আনা মানত করেছি। বলেছি, হে মা কালি, শান্তিকে বাঁচিয়ে দাও। মায়ের একটি মাত্র ছেলে তুমি বাঁচিয়ে দাও মা—তুই কি বলিস অভয়। আমাদের পাড়ার মা কালী খুব জাগ্রত। আমাদের কথা কি মা শুনবেন না। তুই-ই বল, ওর মায়ের আর কেউ নেই। শুধু ঐ একটি মাত্র ছেলে। স্বামী নেই বিষয় সম্পত্তি নেই। বড় লোক আত্মীয়রা খোঁজ খবর নেয় না। মায়ের আশা, শান্তি বড় হবে, মানুষ হ'বে—তাদের দুঃখ কষ্ট ঘুচবে। পরের অনুগ্রহে ও এখন লেখাপড়া করছে। দুটো খেতেও পায়। তুই-ই বল, মা কালী কি সব দেখছেন না।

অভয় বলল, হাঁ দেখছেন তো সবই। তবে কিনা, যার যতদিন পরমায়ু সে ততদিন বাঁচবে।

—পরমায়ু। আরে বোকা, সেও তো মা কালীর হাত। মা কালীতো, সবই করতে পারেন। কি পারেন না। মনে করলে এক নিমিষে এই পৃথিবীটাই ধ্বংস করতে পারেন। কিন্তু তিনি করেন না। বুঝলি অভয়, মনে মনে মাকে তুই ডাক। মনে মনে বলবি, হে মা কালী শান্তিকে ভাল করে দাও মা। বিধবা মার একটি মাত্র ছেলে,—তাই বলছি, তোমার রাতে আসা চাই-ই। এক কাজ করবি কিন্তু। সবার খাওয়া শেষ হ'লে, যখন সবাই ঘুমুতে যাবে, সেই সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে, আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে আসবি—

অভয় বলল, কিন্তু রাতে যদি চোর ঢোকে।

—চোর? চোর কোথারে? না—তোর জেঠার বাড়ীতে চোর ঢুকবে না। শুনেছি, দুটো সাংঘাতিক কুকুর আছে। তাদের ভয়ে চোর ঢুকবে না। ঠিক চলে আসবি কিন্তু—।

অভয় দোমনা হয়ে বলে, ভাই ঠিক বলতে পারছিনে। যদি সুবিধে করতে পারি, তবেই আসব। নইলে আসতে পারব না। জানিস্ তো, আমি থাকি ওদের দয়াতে। ওঁদের অমতে কোন কাজ করতে পারিনে। যদি ওঁরা তাড়িয়ে দেন তবে দাঁড়াব কোথায়? আমার লেখাপড়া শেখা তবে এই খানেই শেষ।

—না—না। অত ভয় করলে কি চলে? তুই তো আসছিস একটা মস্ত কাজ করতে। তোদের আসাতেই একটা প্রাণ রক্ষা হ'বে। একটা প্রাণের মূল্য কত জানিস। ঐ শান্তি যদি বাঁচে, তবে আমাদের কত সুখ কত শান্তি বলত। ওকে দেখার যে কেউ নেই ভাই। ধর যদি তোর ভাইয়ের এমন অবস্থা হত—

আর বলতে হল না। অভয় কি যেন ভাবল। সত্যই তো তার ছোট ভাই খোকনের যদি অসুখ করত তবে কি সে চুপ করে বসে থাকতে পারত? না—না—।

উমেশ তার ভাইয়ের নাম উল্লেখ করায়, তার হৃদয় নিখিল জগতের সমগ্র বালকগণের জন্য, নিজ কর্ত্তব্য, স্নেহ-দয়া মায়া উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। একটা করুণ স্নেহ ও বেদনায়, অভয়ের সমগ্র অন্তর ভরে গেল। অভয় দৃঢ় কণ্ঠে বলল, যাক্ বলতে হ'বে না। আমি আসব—নিশ্চয়ই আসব।

—বাঁচিলাম ভাই। ও আমি জানতাম—

রাত এগারটা নাগাৎ দত্ত বাড়ীর সব কাজকর্ম্ম শেষ হয়। বাবুর খাওয়া-দাওয়া, ঠাকুর চাকরদের খাওয়া শেষ হয় এগারোয়। প্রায় রাত বারটার সময় সমস্ত বাড়ী একরূপ নিস্তব্ধ হয়। শুধুমাত্র বড়বাবুর ঘরে আলো জ্বলতে থাকে। যোগেশ্বরবাবু অনেকরাত পর্য্যন্ত কাগজপত্র দেখেন, হিসেব নিকেশ করেন। তাঁর ব্যবসাতো অনেক রকমের। দোকান, কনট্রাক্টরী,ইটের ভাটা, সুরকীর কল, এই সব ব্যাপারে দিনরাতই ব্যস্ত থাকেন। দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে যায়।

আজ সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। অন্যদিন অভয় রাত দশটা পর্য্যন্ত পড়ে। আজ আর আলো নেভাল না। তার মনটা পড়ে রয়েছে, কখন বাড়ীর সকলের খাওয়া শেষ হয়ে যাবে। উপরের খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে। নীচে ঠাকুর চাকর তখন খেতে বসেছে। যোগেশ্বরবাবু তখনও আসেন নি। এক একদিন খুব রাত হয়। খাবার ওপরে ঢাকা থাকে। তখন আর ঠাকুর চাকরের দরকার হয় না। আজ রাত দশটার পর তখনও যোগেশ্বরবাবু বাড়ী ফিরে আসেননি। অভয় প্রতি মুহূর্ত্তেই, বাইরের দরজায় রোলিং ফেলার শব্দ শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে। অভয় বই খুলে চুপচাপ বসে থাকে। মন যখন অশান্ত, তখন বই, কলম চোখ, সবই তো অচল। চোখ শুধুমাত্র তাকিয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃত পড়াশোনা হয় না। চোখকে যে চালাবে—সেই মন তখন চলে গেছে অন্যখানে। তখন কে পড়বে আর।

মৌজী ঠাকুরের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। মুখেতে পান চিবুতে চিবুতে এসে বলল। আরে অভয় দাদাবাবু আজ যে এখনো জেগে। মৌজী ঠাকুরের হাতে খৈনী দোক্তা। খৈনিকে হাতের তালুতে রেখে ভালভাবে ডলে ডলে তৈরী করতে থাকে।

অভয় বলল। না এখনো পড়া শেষ হয়নি।

—অঃ—। ঠোঁট উলটে তার মধ্যে খইনী রেখে, মৌজী ঠাকুর বাইরে চলে গেল। কাছেই শিবালয়, ওখানেই দেশ-ওয়ালী ভাই ব্রাদাররা এসে আড্ডা দেয়, বাস করে, চাকরীর সন্ধান করে। ওরা অনেক রাত অবধি—ঢোল, খঞ্জনী পিটিয়ে গানে শেষ করে তারপর ঘুমোয়।

মৌজী ঠাকুর চলে যাবার কিছু পরেই,—পায়ের শব্দ শোনা যায়। রোলিং ফেলার শব্দ হয়। বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ হয়। যোগেশ্বরবাবু বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে, অভয়ের ঘরের পাশ দিয়ে উপরের সিঁড়িতে উঠে গেলেন। অভয় নড়ে চড়ে বসল। কিন্তু এক্ষুনি যাওয়া যায় না। কি জানি, হঠাৎ তাকে ডাকতেও পারেন। এমনি ঘটনা এক একদিন হয়েছে। অনেক রাতে বাড়ী এসে, খেতে বসেছেন, খাওয়া শেষ করে, হঠাৎ নীচে এসে, অভয়ের ঘরে ঢুকেছেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, শুধু বলেছেন—এখন পড়া বন্ধ কর। দেখছ, রামনগরের দিকে কেমন শেয়াল ডাকছে। দেশেতে ঠিক এমনি শেয়ালের ডাক শুনতাম। তবে মনে হয় আর কয় বছর পর ওদের আর দেখতে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা বলত—যামঘোষ মানে কি ?

এমনি মাঝে মাঝে, অনেক রাতে বাড়ী ফিরে, অভয়কে দু একটা প্রশ্ন করতেন। মন কেমন করছে কি না—বা কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা—এমনি অনেক প্রশ্ন। তাই অভয় চুপ করে বসে থাকে।

কখনও বা বইয়ের পাতা ওল্টাতে থাকে। জেঠাবাবুর খাওয়া শেষ হ'লে, তারপর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে রওনা হ'বে। যেতে হ'বে খুব সাবধানে।

মিঠুয়াকে কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। ও জেঠাইমার একটি গুপ্তচর। বাড়ীর যেখানে যা হয়, সব খবর সঙ্গে সঙ্গে কানে তুলে দেওয়া ওর কাজ। তাই—অভয় মিঠুয়ার সংস্রব থেকে সব সময় সরে থাকে। আরও ঘন্টাখানেকের পর, অভয় দেখল, বাড়ী বেশ নিস্তব্ধ কোথাও আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। শুধু জেঠাবাবুর ঘরে আলো জলছে। সম্ভবতঃ আজ আর তিনি নেমে আসবেন না। অভয় আস্তে আস্তে উঠে, ঘরের দরজা বেশ ভাল ভাবে ভেজিয়ে দিয়ে, বাইরে এলো! অল্প অল্প জ্যোৎস্নার আলো সম্মুখের ফুল বাগানের রাস্তায় পড়েছে। রাস্তা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ফুল বাগানে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে, সামান্য শিশিরে, সযত্ন রক্ষিত কচি ঘাসগুলো, একটু ভিজে। বাগানে অনেকগুলো গোলাপ ফুলের গাছ, অজস্র ফুল ফুটেছে,—একটা মনোরম সুগন্ধ এসে লাগল অভয়ের নাকে। অভয় আস্তে আস্তে রেলিং খুলে বাইরে নেমে এল। সদর রাস্তা এড়িয়ে অলি গলিতে হাঁটতে লাগল। কারণ সদর রাস্তায় হঠাৎ পাহারাওয়ালা পুলিশের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তবে আজ জ্যোৎস্না রাত—আজ আর পাহারায় পুলিশ থাকবে না। এ ছাড়া, পুলিশ কি সত্যি সত্যি সারারাত পাহারায় থাকে? যদিও থাকে, তবে কোনও বাড়ীর দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে ঘুম দেয়। রাত জেগে, নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার জন্য, অত দায় পুলিশ বাবাজীর পড়েনি। না—সমস্ত রাস্তা ফাঁকা—জনহীন। জ্যোৎস্নার আলোয় ছুঁচ পর্য্যন্ত দেখা যায়—। সমস্ত রাস্তা ঘাট জ্যোৎস্নায় ধপ্ ধপ্ করছে।

সত্যদার বাড়ীর দরজায় একটু শব্দ করতেই, উমেশ দরজা খুলে দিল।

—রুগী কেমন?

—কিছু ভাল না। জ্ঞান নেই। দুজনে রুগীর ঘরে চলল। ঘরে টিপ্ টিপ্ করে আলো জলছে। ঘরের একপাশে মেজের উপর, পাতলা চাদরে ঢাকা, একটা কিশোর বালক। রোগ যাতনায় মুখ ম্লান। খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে মাত্র। মনে হয়, বুঝিবা এখনই থেমে যাবে। একপাশে জলের গেলাস ঔষধের শিশি পত্র,—কিছু ফল মূল। ঘরে, আর দু তিনটি ছেলে, নিঃশব্দে বসে আছে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। রুগীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে, ওরা খুব সতর্ক ভাবে পাহারা দিচ্ছে। ফিস্ ফিস্ করে উমেশ বলল, ঔষধ খাওয়ান এখন হবেনা। যখন ও জাগবে তখন খাওয়াতে হ'বে।

অভয় তাকাল শান্তির দিকে। কপালের ওপর এক গোছা চুল এসে পড়েছে। দুই চোখ বোজা। মুখ সাদা ফ্যাকাশে রক্ত হীন। দেখিলে মনে হয় জীবনের কোনও চিহ্ন নেই।

—ডাক্তারবাবু কি রাতে আসবেন—

—বলেছেন, বিশেষ দরকার হলেই যেন খবর দেওয়া হয়। কিন্তু রুগীতো, সেই সন্ধ্যে থেকে নিঝুম হয়ে ঘুমুচ্ছে।

ক্রমশঃ রাত গভীর হতে গভীরতর হয়। রুগীর সেই নিস্তব্ধ ভাব। কোন সাড়া শব্দ কিছু নেই। ঘড়ির শুধু শব্দ হচ্ছে টিক্-টিক্-টিক্—

ওর-মা পাশের ঘরে। অনেকদিন এক সাথে রাত জেগে, অভাগিনী মায়ের দুই চোখে নেমে এসেছে, রাজ্যের ঘুম। একি ঘুম? না—ঠিক এ ঘুম নয়। ভীষণ ক্লান্তির পর শরীরের এটা তীব্র অবসন্নতা। অবসন্নতা—আর ঘুম দুই পৃথক বস্তু। মনের প্রকৃত শান্তির মাঝেই তো প্রকৃত ঘুম। দুঃস্থ, অভাবী আর রুগীর কখনও প্রকৃত ঘুম আসে না। সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ মনেই আনে প্রকৃত ঘুম।

একসময় রুগী যেন, ঈষৎ চমকে চমকে ওঠে। আবার এক অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। উমেশ আস্তে আস্তে মুখে একটু ফলের রস দেয়। কিছু পেটে যায়—কিছুটা কস্ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। চোখ সম্পূর্ণ খোলা, কেমন যেন বিহ্বল ভাব। একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, আবার চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

অভয় সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ওর মনে হয়,

এই চোখ বন্ধ করা চোখ খোলা, এগুলো স্বেচ্ছাকৃত নয়—। মনে হয় ওটা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। অভয়ের মনে হয় রোগ কঠিন। রুগীর জীবনের আশাও কম। একমাত্র যদি ঈশ্বর রক্ষা করেন, তবেই আশা। নতুবা ঔষধ বা ডাক্তারের কোনও সাধ্য নেই। নিস্তব্ধ ঘর মৃদু আলো জ্বলছে—ঘরে একটা যেন কি গন্ধ। গন্ধটা অস্বস্তিকর! এই রকম অস্বস্তিকর গন্ধ পাওয়া যায়, হাঁসপাতালে। সুস্থলোকের গা গুলিয়ে ওঠে-শরীর বিশ্রী লাগে। সমস্ত মন এক অজানা ভয়ে কাঁপতে থাকে। হাঁসপাতালের বাইরে এসে, বাইরের বাতাসে মনে হয়—আঃ বাঁচলাম।

অভয় বসে বসে ভাবে, শান্তির হতভাগিনী মায়ের কথা। এই একটি মাত্র সন্তানকে নিয়ে মায়ের কত আশা ভরসা। একেই অবলম্বন করে, দুঃখিনী মায়ের কত সাধ আহ্লাদ। কিন্তু ভগবানের মনে কি আছে তা তিনিই জানেন। স্তিমিত প্রদীপের ম্লান আলোয় ঘর সামান্য আলোকিত। বাহির যেমন শব্দহীন ঘরের ভিতরও তেমনি নিস্তব্ধ নিঃশ্চুপ। মনে হয়, একটা মৃত্যুর আবছায়া; সমস্ত ঘরটির ভিতর বাহির, বেষ্টন করে আছে। নির্ম্মম শাস্তিদাতার করধৃত শাসনের ইঙ্গিতে যেন জীবনের সমস্ত আনন্দ-এখানে রুদ্ধ ও স্তব্ধ।

হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ হয়-উঃ-মা—। সকলে চমকিয়ে ওঠে, নড়ে চড়ে বসে। একি সেই ক্ষণ এখুনি এল নাকি।

উমেশ বলে—শান্তি শান্তি—

—উঃ -

—কি হচ্ছে? কি কষ্ট হচ্ছে এখন—

আর কোনও শব্দ নেই। শান্তি কোন মতে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় কি যেন খুঁজছে। কাকে যেন খুঁজছে যেন কোনও পরিচিত মুখ দেখতে চায়। অসীম ক্লান্তিতে, শান্তি আবার চোখ বন্ধ করে। রাত ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। রুগীর ঘরে, তেমনি ভয়াবহ নিস্তব্ধতা নেমে আসে। রুগীর বিছানার কিছু দূরে, দুইজনে মাদুরের উপর একটু শুয়ে পড়ে। সবারই এখন রাত জাগার দরকার নেই। পালা বদল করে জাগলেই চলবে। এখন অভয় জেগে থাকল। ওকে, খুব ভোরে ভোরে চলে যেতে হ'বে। দিনমানে তো ও আসতে পারবেনা। অভয় নির্নীমেষ নয়নে, শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, জীবন ও মৃত্যু এই—এই দুটী জিনিষ একই সূত্রে, সমস্ত জীবগণের গাঁথা। ক্ষীণ একটি সূত্রের মাঝে, দুই বস্তুই দুলছে। কখন যে, সেই ভঙ্গুর সংযোগ সূত্রটী ছিন্ন হবে, তা কেউ জানে না। জীবনের একদিকে আলো আর অন্যদিকে গাঢ় অন্ধকার। সেই গাঢ় অন্ধকারের মাঝে—সেই অনিশ্চিত অদৃশ্য মৃত্যুজগতে কি আছে, তা কেউ জানে না। আজ শান্তির জীবন ঐ ক্ষীণ সূত্রের মাঝে দোদুল্যমান। কেউ জানে না কখন যে, ঐ সংযোগকারী ক্ষীন সূত্রটী ছিঁড়ে যাবে। এই জড় জীবন হ'বে অদৃশ্য। অভয় নিস্তব্ধ ভাবে, এই ক্ষুদ্র কিশোর বালকের রোগ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চারদিক নিস্তব্ধ আর গভীর রাত। কোনদিকে কোন সাড়া নেই শব্দ নেই। পাশে সঙ্গীরা ঘুমে অচেতন। ঘরের আলো অত্যন্ত মৃদু ভাবে জ্বলছে একটা ছায়া ছায়া ভাব একটা অনিশ্চিত ভয়ের কিছু সন্দেহ সমস্ত ঘরকে যেন পরিব্যপ্ত করে রেখেছে। এরই মধ্যে শুয়ে আছে এক কিশোর বালক। যার সর্ব্বাঙ্গে মৃত্যুর ছায়া,—চেতনাহীন নিষ্পন্দ দেহ। অভয়ের মন ভয় বিস্ময় উৎকণ্ঠার একটা জটিল উদ্বেগে পূর্ণ হয়ে যায়। মনে হয়, সেও যেন, সমস্ত জীবনের উত্তাপের বাইরে চলে গেছে। সেটা এমন জগৎ যে, সেখানে জীবনের কোন স্পন্দন নেই, উত্তাপ নেই, আলো নেই। যেন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন হীম শীতল অজানা দেশে, সে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। অপরিচিত লোক আর অপরিচিত দেশ। চারদিকে শুধু ঠাণ্ডা হিম—তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে, এক জমাট অন্ধকার এসে ঢেকে দিচ্ছে। অভয় শিউরে ওঠে।

অভয় তাড়াতাড়ি আলো উসকে দেয়। সঙ্গীদের ঠেলা দিয়ে, জাগায়।

উমেশ বলে, কি—কি—

অভয় ফিস্ ফিস্ করে বলে, একা ভাল লাগছে না। আর ঘুমিও না—ওঠ। উমেশ আড়মোড়া ভেঙ্গে বলে, কয়েক রাত তো ঘুমুই নি কি না—তাই। এখন ভারী ঘুম আসছে। এস, এক কাজ করা যাক্, পাশের ঘরে ষ্টোভ আছে, চা, চিনি আছে। একটু চা করলে ভাল হয়।

—অভয় বলল, তা ভাল। তুমি ষ্টোভ্ জ্বাল। আমি ওটা জ্বালতে জানিনে—আর ভয় করে। উমেশ উঠে বসে।

রাত ক্রমশঃ কেটে আসতে থাকে। কিন্তু রুগীর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। জানালা দিয়ে, বাইরে তাকিয়ে, অভয় বলে, উমেশ, এবার তবে যাই ভাই চারটে বেজে গেছে। এর পরই সকাল হ'বে। জেঠাবাবু পাঁচটার অনেক আগে ওঠেন। গিয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে যাব।

অভয় আস্তে রাস্তায় নেমে আসে।

মিঠুয়ার ডাকাডাকিতে চোখ মেলে চায় অভয়।

মিঠুয়া বলে। আরে অভয়দাদাবাবু আজ খুব ঘুম দিচ্ছেন।

উঠুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—। মিঠুয়া টেবিলের ওপর এক কাপ চা, আর বরাদ্দমাফিক দুখানা বিস্কুট রেখে গেল। অভয় তাড়াতাড়ি উঠে বসল। চোখে মুখে জল দিয়ে চা খেয়ে নিল। কালরাতে পড়াই হয়নি। মনটা ছিল চঞ্চল, বোধ করি আজকের রাতেও যেতে হ'বে। অভয় বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে রইল। তার বার বার শান্তির মায়ের কথাই মনে হ'তে লাগল। কী দুঃসহ ব্যথা, আর শোক নিয়ে, সেই দুর্ভাগিনী বেঁচে থাকবে। সেই দুঃখের ভাগ এ পৃথিবীতে কেউ নেবে না। এই পৃথিবীর সমস্ত সুখ আনন্দ থেকে, বঞ্চিত হয়ে বিধবা অভাগীর দুর্ব্বহ জীবন, ভারবাহী পশুর মতই কাটবে। কী আশ্চর্য্য এই পৃথিবী এখানে সবইতো অনিত্য—। কিন্তু এই চির-সত্য অনিত্যের মাঝেও, মানুষ কেমন আনন্দে দিন কাটায়, এই আশ্চর্য্য। আমরা সব সময়, জীবনের দুঃখকর দিক থেকে, মনটাকে সরিয়ে নিয়ে থাকি। ভ্রমেও আগামী দুঃখ ও চরম দিনের কথা ভাবিনা। যদি আনতাম, তবে বোধ করি পৃথিবীর এই হানাহানি চেহারাই পালটে যেত। সৃষ্টিকর্ত্তার কী অদ্ভুত সৃষ্টি কার্য্য। এই ক্ষণ ভঙ্গুর পৃথিবীর মাঝে মানুষ কীট, পতঙ্গ, সমস্ত জীব জগৎ শুধু ক্ষণিক সুখ আনন্দে মগ্ন—

অভয়ের বইয়ের পাতা খোলাই থাকে। অন্যমনস্ক ভাবে, শুধু পাতার পর পাতা উলটে যায়। বার বার মনে পড়ে, নিজ মায়ের কথা। তার বাবা, খোকন আর ছোট বোনটি গীতার কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অভয় ভাবল, আজ বাবাকে সে চিঠি লিখবে। অনেক দিন তো খবর আসেনি। অভয় বইয়ের ওপর মনোযোগ দেয়। কিন্তু মন বসে না। মন চলে যায় রোগ শয্যায় শায়িত কিশোর বালকের পাশে। সেই মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের চিত্রখানা অভয়ের মনে ভেসে ওঠে। গত রাত্রের নিস্তব্ধতা, মনের ওপর এক বিভীষিকার কালোছায়া ফেলেছিল, কিন্তু আজ দিনের আলোয়, রাতের সেই চেহারার কথা মনে হ'লে, মনে হয়, সে এক দুঃস্বপ্নই শুধু দেখেছে। রাতের সেই রূপ আলাদা। জানালা দরজা বন্ধ ঘর। ঘরে স্তিমিত আলো। পাশে শায়িত মৃত্যু পথ যাত্রী বালক। এমনটিতো ইতিপূর্ব্বে সে দেখেনি এমন কোনও রোগীর পাশেও বসে নেই। জীবনের এই ভয়বিহ রূপের সঙ্গে তার তো কোন পরিচয়ই নেই।

অভয়ের সমস্ত দিনটা কেমন এক বিশ্রী অবস্থার মধ্যে কেটে গেল।

ক্লাসের কোন পড়াতেই মন দিতে পারল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে, সমস্তক্ষণই থাকল। একটা দারুণ উৎকণ্ঠায় সমস্ত চিন্তা যেন ভরে গেছে। কি জানি কি সংবাদ সে শুনবে। বিকেল হ'লে, সে সরাসরি বাড়ী ফিরে গেল না।

উমেশের সঙ্গে দেখা হ'তেই, উমেশ বলল, বাঁচার কোন আশাই নেই। জ্ঞান নেই—নিঃশ্বেস পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। শান্তির মাও যেন বুঝেছেন, আর কোন আশাই নেই। সেই সকাল থেকে, ছেলের মাথার কাছে বসে—উঃ কী কষ্ট আর কি দুর্ভোগ—

অভয় চুপ করে থাকে। উমেশ বলে, আজ আর তোর এসে কাজ নেই। যাহোক, আজ মনে হচ্ছে, একটা নেস্ত নেস্ত হয়ে যাবে। আজ নিয়ে ছাব্বিশ দিন চলছে।

অভয় আর কি বলবে। উমেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই ছাব্বিশ দিন শুধু যমে মানুষে লড়াই চলছে। কিন্তু যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে উমেশ। জিতবার কোন আশাই নেই। যমের সঙ্গে লড়াইয়ে, উমেশ হেরে গেল।

উমেশ বলল, তবুও হাল ছাড়িনি ভাই। শেষ চেষ্টা দেখছি। আজ রাতে প্রমথবাবু আসবেন। এখন কবরেজের ওষুধ চলছে—এই শেষ চেষ্টা—

প্রমথবাবু কি বলেছেন জানিস? উমেশ দম্ নিয়ে বলল -আজ রাত বারটায়, অথবা ভোর ছটায়—

—অ্যাঃ—

ঘাবড়াসনে। কি আর করা যাবে বল্। আমাদের তো .এই নিয়তি জন্ম যখন হয়েছে তখন মৃত্যুও জীবনের পেছন পেছন চলছে। জীবনের পরম বন্ধু তো একমাত্র মৃত্যু। দুঃখে, সুখে, শোকে আনন্দে সব সময় পিছু পিছু চলছে। একদণ্ড কাছ ছাড়া থাকছে না। বল্, এর মত বন্ধু আর কে আছে? উমেশ অন্য দিকে তাকায়। ওর দুচোখে জল। হঠাৎ বহুদিন পর অভয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

উমেশ বলল, চুপ, চুপ। এখুনি ওদের কানে যাবে। এখন না। চোখের জলকে এখন ঠেকিয়ে রাখ ভাই। কাঁদবার সময় অনেক পাবি। তবে এখনও আশা ছাড়ছিনে। এতে হারি আর জিতি।

ক্রমশঃ

একটি ভুলের মাশুল

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

প্রতিশ্রুতি পালনের গৌরবে গরীয়ান কৃতিত্বধারী কোন এক হতাশ যুবককে নিয়েই আজকের এই কাহিনী। সে দিনের দৌড়ে জন ল্যাণ্ডী (John Landy) হয়ত বিশ্বের একজন সেরা দৌড়বীর হতে পারতেন। পরিবর্তে তিনি দেশের একজন ভাল দৌড়বীর রূপেই স্বীকৃতি পেলেন।

অষ্ট্রেলিয়ার জন ল্যাণ্ডী ক্রীড়া জগতের এক জন প্রিয় নাম। সহযোগীদের প্রতি বন্ধুত্ব সুলভ মনোভাব, কিশোরদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার এবং ক্রীড়ার প্রতি আসক্তির জন্যই ল্যাণ্ডীর কাহিনী ইতিহাসে বোধহয় এক কল্পকাহিনীতে পর্য্যবেশিত হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত ল্যাণ্ডীর দেশে ঐ নামটিই বোধহয় সবচেয়ে বরণীয় নাম।

পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে চার মিনিটের কম সময়ে মাইল দৌড়ানর জন্য তখন যেন কেমন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অষ্ট্রেলেয়াবাসী ল্যাণ্ডীও তখন এ বিষয়ে একটু সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে দৌড়ানর ফলে ইতিপূর্বে তিনি পর পর কয়েকটি ১ মাইল ৪ মিনিট তিন সেকেণ্ডে দৌড়েছেন। ল্যাণ্ডীর এই মাইল বিজয় প্রচেষ্টা তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু বিশ্ববাসীর নিকট অজ্ঞাত ছিল

এরপর রোজার ব্যানিষ্টার বিশ্বের মধ্যে সর্ব প্রথম ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল দৌড়ানোর পর ল্যাণ্ডীও ম্যালমোতে (Malmo) তার চেয়ে কম সময়ে (৩মিঃ ৫৮সেঃ) মাইল দৌড়িয়ে বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করে দেন।

অতঃপর ভ্যাঙ্কুবারে (Vancuver) ব্রিটীশ এম্পায়ার গেমস্-এ এই দুই খ্যাতনামা দৌড়বীর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন।

সমস্ত জগৎ উদগ্রীব চিত্তে ভ্যাঙ্কুবারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল সেদিন। কেন না এই প্রতিযোগিতায় এমন দুজন প্রতিযোগীতা করছিলেন সেদিন যাদের মধ্যে একজন সর্ব প্রথম বিশ্বের মধ্যে ৪ মিনিটের কম সময়ে মাইল দৌড়েছেন। আর অন্যজন পরবর্তী কালে তার চেয়েও কম সময়ে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করার গৌরবের অধিকারী হয়েছেন।

ভ্যাঙ্কুবার থেকে তাদের বিষয়ে বহু সংবাদই তখন বিশ্ব সমক্ষে প্রচার হচ্ছে। ভ্যাঙ্কুবারে বহু লোকের সমাগম হয়েছে তখন।

জন ল্যাণ্ডী বুঝতে পারেন না ট্রেনিং এর সময়ে কেন তাকে এত লোক দেখতে আসে। এই সময় কোন এক সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন "বোধহয় হেলসিঙ্কী অলিম্পিকের থেকে আমার দৌড় আরও কিছু দ্রুততর হয়েছে। এই জন্যই বোধহয় এখানে এত জন সমাগম। কিন্তু আমার দৌড়ভঙ্গীর তো কোনও পরিবর্তন হয় নি। সেটি তো আমার একই রকম আছে। তবে কেন এত জন সমাগম।

বর্তমান পর্য্যায়ে ল্যাণ্ডী প্রচারকেই সবচেয়ে ভয় করেন। কিন্তু এই সময়েই তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচার হয়েছিল।

ল্যাণ্ডী জানতেন তিনি তখন জনসাধারণের নিকট বিখ্যাত আর তার সম্বন্ধে সামান্যতম সংবাদেও জন সাধারণের তখন অসীম আগ্রহ। ল্যাণ্ডী অনুভব করেন শত চেষ্টা সত্বেও নিজের সম্বন্ধে কোনও সংবাদই তিনি গোপন রাখতে পারেন না। কোথায় কখন, কোন সাংবাদিক কোন সংবাদ সংগ্রহ করে গা ঢাকা দিচ্ছেন তিনি তার কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।

বর্তমানে সাংবাদিকদেরই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করেন। সাংবাদিকদের উপস্থিতি অনুমান করলেই

তিনি ধীরে ধীরে তাদের এড়িয়ে অন্যত্র চলে যাবার চেষ্টা করেন। তবে তিনি তাদের অবহেলা করেন না। প্রয়োজন হলে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ভাবে এবং বিনয় সহকারে তিনি তাদের প্রশ্নের জবাব দেন। খ্যাতির বিষয় উদগ্রীব হলেও তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। প্রকাশ্য প্রচার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সদা সন্ত্রস্ত।

জন ল্যাণ্ডী এবার এই প্রতিযোগিতায় দ্রুতগতিতে ছুটতে চান। 'কি উপায়ে ছুটবেন'—সেই চিন্তাই করে চলেছেন তিনি তখন। লোকে জানে তিনি ধীর কদমে মন্থর গতিতে ছোটেন, দ্রুতগতিতে নয়। বোধহয় এর মধ্যে কিছুটা সত্যতা ছিল। কিন্তু লোকের এ ধারণা যে ভুল সেটাই তিনি প্রমাণ করতে চান। ম্যালমোতে চ্যাটাওয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তিনি এ বিষয়ে অবশ্য কিছুটা সফলকামও হয়েছেন।

চ্যাটাওয়ের সঙ্গে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি তিন মিনিট আটান্ন সেকেণ্ডে মাইল দৌড়েছেন। এই দৌড়ের পর তিনি সমর্থকদের সঙ্গে পাগলের মতন নেচেছেন। এই সমর্থকদের উৎসাহ ব্যতিরেকে তিনি বোধ হয় এ রকম দৌড় দৌড়তে পারতেন না। এ দৌড়ে দর্শকদের প্ররোচনায় তিনি তাঁর পুরাতন দৌড় কৌশলের পরিবর্তন করেন। ইতিপূর্বে তিনি এমন কোন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পান নি যাদের বিরুদ্ধে কৌশল পরিবর্তনে কোন ফল পাওয়া যায়। তিনি বরাবরই দৌড়ের প্রথম দিকে পিছিয়ে থেকে পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রুতগতির দৌড়েরই পক্ষপাতী। কিন্তু এ দৌড়ে পূর্বাহ্নেই দ্রুতগতিতে দৌড়েছেন তিনি এবং একটা মনের মতন সময়ও করেছেন তিনি।

কৌশল উদ্ভাবনের বিষয় চিন্তায় চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্থ ল্যাণ্ডী জীবনের কঠোরতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন আজ। এ বিষয়ে কি রকম যেন একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। তিনি জানেন ধীর কদমে ব্যানিষ্টারকে অনুসরণ করে পরে দ্রুতগতিতে দৌড় শেষ করে হয়ত তিনি জয়লাভ করবেন। মাইলের সময় কিন্তু তাতে আশানুরূপ হবে না। সে মাইল দৌড়ের সময় জানতে পেরে বিশ্ববাসী হয়ত হতাশ হয়ে পড়বেন। অতএব এ রকম দৌড় কখনই নয়।

তিনি মনস্থ করেন—"দৌড়ে তাকে নেতৃত্ব দিতেই হবে। দৌড়ের সময় ভাল করার জন্য তাকে পুরোভাগে থাকতেই হবে।"

ল্যাণ্ডী ভুলে গেলেন তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে চক্রপথ পরিক্রমা। ভুলে গেলেন তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী দৌড়। সময় এবং দূরত্বটাই এখন বিচার্য্য নয়। বিচার্য্যের বিষয় এখন এগিয়ে থাকার।

ল্যাণ্ডী অতঃপর তাঁর সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেলন—'যা হবার তবে তাই হোক এগিয়ে তাকে থাকতেই হবে।'

প্রতিযোগিতার আগের দিন রাত্রিতে গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে নগ্নপদে ভ্রমণ কালে পায়ের খানিকটা কেটে যাওয়ায় প্রচুর রক্তপাত আরম্ভ হলো। অনন্যোপায় হয়ে ল্যাণ্ডীর পায়ে অতঃপর সেলাই দিতে হল।

ল্যাণ্ডী চিন্তা করতে থাকেন ক্ষতের জন্য শ্লথ গতির দৌড়ের অজুহাত দ্বারা সান্ত্বনা দিয়ে মনকে তিনি ভোলাবেন না। পায়ের তলার ঢাকা ক্ষত জুতার আবরণে আবারত করে দৌড়লে সময়ের কোন তারতম্যই হবে না। যে কোন রকমেই হোক—এগিয়ে তাকে থাকতেই হবে।

চার মিনিটের কম সময়ে মাইল দৌড়ে স্বদেশবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে তাকে।

পরদিন শেষবেলায় আটজন বিখ্যাত দৌড়বীরকে দৌড়চক্রে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল ল্যাণ্ডীকে দেখা গেল। সবচেয়ে ভেতরের চক্রটিতে।

ষ্টার্টারের (Starter) নির্দেশে প্রস্তুত হয়ে নিয়েই পিস্তল গর্জনে তারা বেরিয়ে পড়লেন তাঁদের চক্রপথ পরিক্রমায়।

শুরু হয়েছে দৌড় এইবার। উল্কার গতিতে বেরিয়ে পড়েছেন ল্যাণ্ডী। সাবলীল গতি, সুন্দর ছন্দ ও রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছেন ল্যাণ্ডী। পেছনের প্রতি যেন তাঁর আর কোনও আকর্ষণই নেই। এগিয়ে চলার মন্ত্রেই তিনি যেন দীক্ষিত হয়েছেন। এগিয়ে তাকে যেতেই

হবে। এগিয়ে গিয়েই তবে তাঁকে মাইলের সময় কমিয়ে দিতে হবে। ফলাফল যাই ঘটুক না কেন। শতাব্দী ব্যাপী মানুষের সকল সন্দেহের নিরসন তাঁকে করতেই হবে।

প্রথম চক্র পার হয়ে গেলেন ল্যাণ্ডী। সময় দেখা হল আটান্ন সেকেণ্ড।

এই রকম উদ্দাম উচ্ছল গতিতে ছুটে চলেছেন ল্যাণ্ডী। গতিবেগের খুব বেশী তারতম্য না ঘটিয়ে দ্বিতীয় চক্র অতিক্রম করলেন তিনি মাত্র ষাট সেকেণ্ডে। বিচারকদের বলাবলি করতে শোনা গেল মাত্র এক মিনিট আঠান্ন সেকেণ্ডে তিনি আধমাইল অতিক্রম করেছেন। সকলেই আশা করছেন এ দৌড় তার চার মিনিটের নীচেই হবে।

এরপর শোনা গেল তৃতীয় চক্র অতিক্রম করেছেন· তিনি সর্বসমেত ২ মিনিট আঠান্ন সেকেণ্ডে।

ল্যাণ্ডী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছেন আর চিন্তা করছেন—'তবে আবার তিনি চার মিনিটের কম সময়ে মাইল দৌড়িয়ে বিজয়ী হতে চলেছেন। সহসা চক্রপথের ওপর লম্বমান একটি ছায়াকে এগিয়ে আসতে দেখে ল্যাণ্ডী আশঙ্কা করেন ব্যানিষ্টার কি তবে তার ঠিক পেছনেই এসে গিয়েছেন।

শরীর এবং মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দাঁতে দাঁত চেপে ল্যাণ্ডী দৌড়ের শেষ সীমার দিকে এগিয়ে চলেছেন তখন। যন্ত্রণায় পা দুটি তখন কন্‌কন্ করছে। কিন্তু এগিয়ে চলেছেন তিনি ঠিক একই ভাবে।

তা'হলেও এই সময় কিন্তু ছায়ার ভূতই যেন ল্যাণ্ডিকে পেয়ে বসল। ছায়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সোজা ছুটে চলেছেন তিনি। এই ছায়াই যেন তার মনঃসংযোগে আজ কিছুটা বিচ্ছিন্নতা ঘটাল।

দৌড়ের শেষ সীমানায় ছায়ার কায়াকে ভাল করে দেখার জন্য যে মুহূর্তে ল্যাণ্ডী একটুখানি তাঁর মাথা হেলিয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি লক্ষ্য করলেন কায়ারূপী ব্যানিষ্টার তাঁর পাশ দিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম ফিতা স্পর্শ করলেন। সময় দেখা হলো তিন মিনিট আটান্ন সেকেণ্ড।

দেশবাসীর নিকট প্রতিশ্রুতি পালনে ল্যাণ্ডীও কোন ভুল করেন নি সেদিন। তিনিও সময় করেছিলেন তিন মিনিট উনষাট দশমিক ছয় সেকেণ্ড (৩ মিঃ ৫৯.৬ সে)। অর্থাৎ তাঁরই কৃত ম্যালমোর (Malmo) রেকর্ডের চেয়ে দেড় সেকেণ্ড বেশী সময়ে।

দেশের নিকট স্বীকৃতি পেয়েও ল্যাণ্ডী কিন্তু জগৎ-শ্রেষ্ঠ হতে পারলেন না। ল্যাণ্ডীর অতীতের দৌড়ের স্মৃতিকে তৎকালীন বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে হয়ত আমাদের মনে হবে—বিশ্ববাসীর ভুল ভাঙতে গিয়ে ছায়া ভুতের ভয়ে ভীত ল্যাণ্ডি ভুল করে পেছনে তাকিয়ে হয়ত একটু ভুল করেছিলেন সেদিন।

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

অসহযোগের কর্মসূচী রূপায়নে এ পর্য্যন্ত যতটা সাফল্যলাভ হয়েছে বিশেষ করে ভোটদাতাগণের কাউনসিলের বয়কট ব্যাপারে তজ্জন্য এই কংগ্রেস জাতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং দাবি করছে যে যে পরিস্থিতিতে কাউনসিলগুলির সৃষ্টি হয়েছে তাতে নূতন বিধানসভাগুলি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে না বরং আশা করছে যে যাঁরা তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি স্বত্বেও নিজেদের নির্বাচিত হতে দিয়েছেন তাঁরা তাঁদের কাউনসিলের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেবেন এবং যদি তাঁরা গণতন্ত্রের নীতি সোজাসুজি অস্বীকার করে তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচন কেন্দ্রের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের পদ আঁকড়ে থাকেন তা হলে নির্বাচকমণ্ডলী সেই সকল বিধান সভার সদস্যদের নিকট কোন রাজনৈতিক সেবার জন্য প্রার্থনা থেকে সুচিন্তিত ভাবে বিরত থাকবে।

পরিশেষে যাতে খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকার হয় এবং এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য এই কংগ্রেস সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে তো কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাক বা না থাক) অহিংসা এবং গভর্ণমেন্টের সহিত অসহযোগের প্রসার জন্য তাদের একান্ত মনযোগ দিতে আহ্বান করছে এবং যেহেতু জনসাধারণের পারস্পারিক পরিপূর্ণ সহযোগিতার দ্বারাই কেবল অসহযোগ আন্দোলন সাফল্য লাভ করতে পারে অতএব এই কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান ঐক্যকে দৃঢ়তর করতে সমুদয় প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করছে এবং কংগ্রেসের হিন্দু প্রতিনিধিদল হিন্দু প্রধানদের ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের বিরোধ (যেখানে বর্তমান) নিষ্পত্তি করতে এবং হিন্দু সমাজকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে আহ্বান করছে তা; এবং সশ্রদ্ধভাবে ধর্মনায়কদের নিকট অবদমিত শ্রেণীর প্রতি ব্যবহার বিষয়ে হিন্দুধর্ম সংস্কারের ক্রম বর্দ্ধমান চেষ্টাকে সাহায্য করতে আবেদন জানাচ্ছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করে অন্যান্য কথার পর দাশ মশায় বললেন যে অনেকে মনে করেন বিষয় নির্বাচনী সভায় অনুমোদিত বর্তমান প্রস্তাব কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব জোরালো নয় বরং তার অপেক্ষা নরম। এই মনোভাবের কারণ খিলাফৎ ও পাঞ্জাব সম্বন্ধে অবিচার। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে এই সকল অত্যাচারের একমাত্র প্রতিকার হতে পারে শুধু স্বরাজ্য অর্জন দ্বারা এবং তা অর্জন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। তিনি দাবি করলেন যে বর্তমান প্রস্তাব কলকাতার প্রস্তাব অপেক্ষা জোরদার পূর্ণতর এবং বলিষ্ঠতর। কলকাতার প্রস্তাবে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করা পর্য্যন্ত অসহযোগের সম্পূর্ণ কর্মসূচী কার্য্যকরী করার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। তিনি জানেন যে কংগ্রেসের ডাকে ভারতের জনগণ অসহযোগের কর্মসূচী কার্যে পরিণত করবে না কিন্তু যতদিন সেই ডাক না দেওয়া হচ্ছে ততদিন প্রত্যেক আইনজীবি প্রত্যেক ছাত্র, প্রত্যেক ব্যবসায়ী, প্রত্যেক কৃষক, তার যথাসাধ্য করে যাবে, এর অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে এই যে ইংরাজ যা ইচ্ছা তাই করুক না আমাদের হস্ত তাদের যন্ত্র চালনায় নিযুক্ত হবে না।

সর্বশেষে দাশ মশায় অত্যন্ত আবেগের সহিত সকলকে ঐক্যমতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে আহ্বান করে বললেন "তোমরা জাতির নিকট ঘোষণা কর যে তোমরা তোমাদের বিধিদত্ত অধিকার অর্জন করবে।"

এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি দাঁড়াতেই চতুর্দ্দিক থেকে "মহাত্মা গান্ধী কী জয়" ধ্বনি হতে লাগল।

সভা শান্ত হলে প্রস্তাবের সমর্থনে—মহাত্মা কিছুক্ষণ হিন্দীতে বললেন। তারপর ইংরাজিতে তাঁর বক্তব্য শোনালেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি হসরত মোহানীর সংশোধনী প্রস্তাবের উল্লেখ করলেন। হসরত মোহানী তাঁর প্রস্তাবে মূল প্রস্তাবে উল্লিখিত বিবেক শব্দ বাদ দিতে চেয়েছেন মহাত্মা জানালেন যে কংগ্রেস কোন প্রস্তাব দ্বারাও কারুর বিবেককে বাঁধতে চায় না। তার নিজের কংগ্রেসের কোন ফেটিশ নেই।

লালা লাজপত রায় পুলিশের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। মহাত্মা বললেন কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের কোন সামরিক, অসামরিক পুলিশ বা কোন কর্মচারীর চাকুরির দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করতে চায় না, কংগ্রেস কেবল তাদের বলতে চায় যেন তারা তাদের বিবেক ধ্বংশ না করে। মহাত্মা বললেন যে যদি তিনি জেনারেল ডায়ারের অধীনে সৈন্যভুক্ত থাকতেন তাহলে জালিয়ানওয়ালা বাগের নিরপরাধী জনগণের উপর গুলি বর্ষণ করা পাপ মনে করতেন এবং এরকম আদেশ অমান্য করা কর্তব্য মনে করতেন।

পরিশেষে তিনি সকলকে পরস্পরের সম্পর্কে চিন্তায় বাক্যে এবং কার্য্যে হিংসা পরিহার করতে উপদেশ দিলেন এবং তিনি পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাহলে স্বরাজ্য অর্জন করতে এক বৎসরের সময়ও লাগবে না।

প্রস্তাব সমর্থন করায় তিনি জানালেন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য অসুস্থতার দরুণ কংগ্রেসে আজ উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি ক্রীড পরিবর্তন ও অসহযোগ প্রস্তাব দুটিরও বিরোধী।

লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ডঃ কিচলু, হাকিম আজমল খাঁ, কস্তুরীবাই অমেক্কার, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদা মঠের শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য, প্রফেসর রামমূর্তি, রামস্বামী আয়েঙ্গার, আজাদ শোভানী প্রভৃতি দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর কিছুক্ষণের জন্য সভার বিরতি হল।

বিরতির সময় আমরা প্যাণ্ডেলের বাইরে গেলাম। একটু পরেই দাশ মশায়ও বাইরে এলেন। তিনি আসতেই বাংলার প্রতিনিধিদের অনেকেই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল, সুধীর চন্দ্র রায় (দাশ মশায়ের জামাতা) পি, এন্ ব্যানার্জি (ব্যারিষ্টার দাশ মশায়ের জুনিয়র) শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, অসহযোগ প্রস্তাবের আলোচনা চলতে লাগল। কথা প্রসঙ্গে দাশ মশায় তাঁর আইন ব্যবসা ত্যাগের কথা বললেন, বিপিন বাবু এতে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করে বললেন "কিন্তু, একাজ করা কখনও তোমার উচিত হবে না। সুধীরবাবু ও ব্যানার্জি মশায়ও বিপিন বাবুর সঙ্গে যোগ দিলেন। দাশ মশায় এক সময় বললেন যে ব্যারিষ্টারি ছাড়লে আন্দোলন চালানোর টাকা পাব কোথায়। আমি মন্তব্য করলাম "আপনি দেশের কাজে নেমে পড়ুন। টাকার অভাব হবে না। লোকমান্য তিলকের টাকা ছিল না কিন্তু তিনি যখনই টাকার জন্য লোকের নিকট আবেদন করেছেন তখনই তাঁর দেশবাসী মুক্ত হস্তে তাঁকে টাকা দান করেছে।" শচীনবাবু আমাকে সমর্থন করলেন। অবশ্য তখন কিছুই স্থির হল না। দাশ মশায়কে অত্যন্ত বিচলিত দেখলাম। পরে তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করে প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেছেন। বহুকালের অভ্যাস সুরাপান ত্যাগ করে আশ্চর্য্য মনবলের পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি তামাক ও সিগার খাওয়ার অভ্যাসও ত্যাগ করেছেন।

বিরতির পর কংগ্রেসের সভা আরম্ভ হলে ক্রীড পরিবর্তনের প্রস্তাবের উপর প্রদেশানুসারে ভোট নেওয়া আরম্ভ হল। এমন সময় বক্তৃতা মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হল বাংলার একজন প্রতিনিধি হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেছেন। এই ঘোষণায় বাংলার সমস্ত প্রতিনিধিকে প্যাণ্ডেল্ থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। এবং জানানো হল যেখান থেকে প্রতিনিধির মৃতদেহ শোভাযাত্রা সহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমরা বাংলার প্রতিনিধিগণ অবিলম্বে প্যাণ্ডেলের বাইরে এসে একত্রিত হলাম।

জানা গেল হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র দাস বাংলার প্রতিনিধিরূপে—নাগপুরে এসেছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানে সন্ন্যাস রোগে (appoplexy) মারা যান।

প্যাণ্ডেল থেকে দাশ মশায়কে পুরোভাগে রেখে আমরা দলবদ্ধভাবে হাসপাতালে উপস্থিত হলাম। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে ধূলিধূসরিত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা হাসপাতালে উপস্থিত হলাম এবং সেখান থেকে সতীশবাবুর দেহকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করে দূরবর্তী শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। দাহকার্য্য শেষ হওয়ার পর আমরা আমাদের শিবিরে ফিরে এলাম।

এসে শুনলাম যে ক্রীড পরিবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন মাত্র তিনজন—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত রাধাকান্ত মালব্য ও সিন্ধুপ্রদেশের সন্ত দাস।

পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১২-৩০ মিনিটের সময় কংগ্রেসের অধিবেশন সময় স্থির হয়।

(১১)

৩০শে ডিসেম্বর বেলা ১২॥ টার সময় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল। এদিনের সভায় প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

যথারীতি সভাপতি মশায় শোভাযাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে পৌঁছে মঞ্চোপরি তাঁর আসনে উপবেশন করলেন। একটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য সুরু হল।

কংগ্রেসের গত দুই দিনের অধিবেশনে মাত্র কংগ্রেসের ক্রীড পরিবর্তন ও অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব দুটি আলোচিত ও গৃহীত হয়েছিল। অবশিষ্ট প্রায় ১৬।১৭টি প্রস্তাব আলোচনার জন্য শেষ দিনের জন্য রাখা হয়েছিল। সুতরাং প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ ছিল না।

প্রথমেই সভাপতি মশায় স্বয়ং দুটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তার মধ্যে একটি প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটী ও তার মুখপত্র "ইণ্ডিয়া" পত্রিকা তুলে দেওয়া হল।

অন্য প্রস্তাব দ্বারা আয়ারল্যাণ্ডের নেতা ম্যাকসুইনীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হল। প্রস্তাব দুটি গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন বোম্বাইয়ের শিল্পপতি এস্, আর বোমানজী।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যেহেতু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের জনমত যা কারেন্সী কমিটির সংখ্যালঘুদের রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অভূতপূর্ব ষ্টার্লিংয়ের মুদ্রা বিনিময়ের মূল্যবৃদ্ধি এবং রিভার্স কাউনসিলের ব্যবহার করে ব্রিটিশ উৎপাদন কারীদের স্বার্থে যে সুদূর প্রসারী চতুরতা অবলম্বন করেছে যার ফলে ভারতীয় ব্যবসা বানিজ্যে চরম অব্যবস্থা হয়েছে অথচ যার ফলে ভারতের নিকট ব্রিটেনের ঋণ বহুল পরিমানে কমে গিয়েছে এবং ব্রিটিশ ধনপতি ও উৎপাদনকারীদের যে মাল তারা তাদের পুরাতন বিক্রয় কেন্দ্র জার্মানী বা অন্য দেশে বিক্রয় করতে পারেনি সেই সকল মাল ভারতে স্তুপিকৃত করার প্রভূত সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আরও ঘোষণা করছে যে ব্রিটিশ পন্যের আমদানী ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে বর্তমান মূল্য বিনিময়ে মূল্যের হারে চুক্তি পালন করতে অস্বীকার করতে সম্পূর্ণ সম্মত হবে এবং এই কংগ্রেস বর্তমান পরিস্থিতির ফলপ্রসূ মোকাবেলার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করছে।

প্রস্তাব পেশ করতে উঠে বোমানজী মশায় রিভার্স কাউনসিলের অপকৌশলে কিভাবে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ কোটি কোটি টাকার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার বিবরণ দিলেন।

বোম্বাইয়ের অন্যতম ব্যবসায়ী নারায়ণ দাস পুরুষোত্তম এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে অন্যান্য কথার পর জানালেন যে রিভার্স কাউনসিলের ফলে বিদেশী

দ্রব্যের জন্য ভারতকে প্রতি ষ্টার্লিংয়ের জন্য ১৫৲ টাকা দিতে হচ্ছে অথচ ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য বাবদ বা ইংলণ্ডের ভারতের নিকট দেনা শোধের সময় প্রতি ষ্টার্লিংয়ের জন্য ভারত ৭৲ থেকে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাচ্ছে।

চিত্তরঞ্জন দাসের সমর্থনের পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

এর পরের প্রস্তাবও বোমানজী মশায় উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস অভিমত প্রকাশ করছে যে অসহযোগের নীতি অনুসারে ডিউক অব কেন্টের ভারত ভ্রমণের সময় তাঁর অভ্যর্থনার জন্য আয়োজিত কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বা আমোদ প্রমোদের আয়োজনে ভারতের জনগণ যোগদানে বিরত থাকবে।

প্রস্তাব পেশ করে বোমানজী মশায় বললেন যে এই প্রস্তাব দ্বারা রাজপরিবারের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে না। এতে নির্ভুলভাবে বলা হয়েছে ডিউক যে সংশোধিত ভারতীয় সংবিধান চালু করতে এসেছেন ভারত তাতে কোন অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

এই প্রস্তাব রামভুজ দত্তচৌধুরী ও আসফ আলী দ্বারা সমর্থিত হয়ে গৃহীত হল।

তারপর দেওয়ান চামনলাল নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

ভারতের শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ম গুলির মাধ্যমে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম করছে তজ্জন্য এই কংগ্রেস শ্রমিকদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানাচ্ছে এবং আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার মিথ্যা অজুহাতে ভারতের শ্রমিকদের (যেন তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই) প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহারের নিন্দা করছে।

মাদ্রাজের ভি. চাক্কারী চেটি, বিহারের কে, পি, এন্ সিংহ এবং মাদ্রাজের ই, এল, আয়ার দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব পাশ হল।

চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের শ্রমিক সম্বন্ধে পরবর্তী ? প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস মনে করে যে ভারতের শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি ও তাদের ন্যায় দাবি, আদায়ের প্রয়োজনে এবং ভারতীয় শ্রম ও কাঁচা মাল বৈদেশিক এজেন্সিগুলির কাজে লাগান বন্ধ করতে ভারতীয় শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ করা প্রয়োজন অতএব অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে তদ্দেশে সফল পদক্ষেপের জন্য একটি কমিটী গঠনের নির্দেশ দিচ্ছে।

স্বামী গোবিন্দানন্দ এবং পণ্ডিত মুনিলাল দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এন্, সি, কেলকার পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন প্রদেশের পুঁজিপতিদের বিশেষতঃ বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভূমি গ্রহণ (ল্যাণ্ড অ্যাকুই জিশন) আইনের বেপরোয়া ও অসঙ্গত প্রয়োগ দ্বারা জমি জবর দখল করার মতলব বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট হাসিল করছে এবং যার ফলে দরিদ্রশ্রেণী ও ভূম্যাধিকারীগণের আবাসগৃহ ও নিয়মিত পেশা ধ্বংস হচ্ছে তৎপ্রতি জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কংগ্রেস অভিমত প্রকাশ করছে যে এই সকল কাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগের আরও কারণ যোগাচ্ছে। এই কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট ভারতীয় পুঁজি পতিদের দরিদ্র কৃষকদের আসন্ন ধ্বংসের গতিরোধ করতে আহ্বান করছে।

কেলকার মশায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন যে জমি দখল করা হচ্ছে জন সাধারণের প্রয়োজনে নয়। পুঁজিপতিদের কাজে লাগানোর জন্য। এদ্বারা দরিদ্রদের ক্ষতি করে ধনবানদের আরও ধনী করা হচ্ছে।

যুক্ত প্রদেশের গৌরীশঙ্কর ভার্গব বিহারের আবদুল বারি এবং মাদ্রাজের রামভদ্র ও ডেয়ার কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব পেশ করলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে সকল রাজনৈতিক বন্দী বিনা অভিযোগে এবং বিনা প্রকাশ্য বিচারে ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং এখন পর্য্যন্ত রাজবন্দী হিসাবে কারাগারে আছেন এবং যাদের গতিবিধি ও

যেসব দেশের স্বাধীনতা সরকারি হুকুমদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে তাঁদের প্রতি এই কংগ্রেস গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করছে এবং আশা করছে যে দেশের প্রতি ভক্তি এবং অনতিবিলম্বে স্বরাজ্য প্রাপ্তির আশা তাঁদের বর্তমান ক্লেশ ও দুঃখময় জীবনে শক্তি যোগাবে।

প্রস্তাবের সমর্থনে অন্যান্য কথা বলার পর পাল মশায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় রাজবন্দীদের জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী শোনালেন।

শার্দুল সিং, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শচীন্দ্র নাথ সান্যাল কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর রামভূজ দত্ত চৌধুরী 'এষার কমিটী' সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এষার কমিটীর গঠন ও কার্য্য প্রণালী এবং তার রিপোর্ট (তদনুসারে কার্য্য করা হলে ভারতের পরাধীনতা ও অকর্মণ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে) আলোচনা করে এই কংগ্রেস অভিমত প্রকাশ করছে যে ঐ রিপোর্ট অসহযোগ আন্দোলনের অধিকতর জোরদার অতিরিক্ত কারণ যোগাচ্ছে এবং প্রমান করছে যে অবিলম্বে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কার্য্য মুলতুবি রাখা কত বিপদ জনক।

প্রস্তাব সম্বন্ধে দত্ত চৌধুরী মশায় বললেন যে ভারতে সংস্কৃত সংবিধান চালু করা হচ্ছে সেই সময় আসন পরিচালনার ক্ষমতা যা এ পর্য্যন্ত ভারত গভর্ণমেন্টে ন্যস্ত ছিল তা হোয়াইট হলে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে যাতে ভারত পূর্বের চেয়েও অধিকতর অকর্মণ্য হয়।

যমনা দাস মেহেতা প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন নূতন ব্যবস্থায় ভারতের রাজস্বের বৃহত্তম অংশ নূতন কাউনসিলারদের আয়ত্তের বাইরে রাখা হয়েছে কারণ তাঁদের সামরিক ব্যয় সম্বন্ধে ভোট দেবার অধিকার নেই। যখন দেশের শাসন ভার কিয়দংশ ভারতীয়দের উপর দেওয়া হল তখন সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্টের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শাসনযন্ত্র হোয়াইট হলের কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হল। সাম্রাজ্য বাদের প্রসারের মতলব হাসিলের জন্য ভারতীয় সৈন্য ব্যবহার করার প্রস্তাব হচ্ছে দাস ভারতবর্ষকে বলা অন্যান্য দেশকে দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাবগুলি সভাপতি মশায় স্বয়ং উপস্থিত করলেন।

ভারত গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ ঘোষণা সত্বেও এই কংগ্রেস পাঞ্জাব দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে নির্য্যাতনের পুনঃ প্রবর্তন লক্ষ্য করছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশ দিচ্ছে যেন তাঁরা সহিষ্ণুতার সহিত সমস্ত কষ্ট সহ্য করেন এবং আইন সম্মত হুকুম মেনে নিয়েও দ্বিগুন তেজে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যান।

যেহেতু অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের জন সাধারণের প্রধান ও জরুরি প্রয়োজন সেই হেতু এই কংগ্রেস সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ এলাকায় তা প্রবর্তন ও কার্যকরী করতে আহ্বান করছে।

ভারতের অয়ুর্বেদীয় ও উনানী ঔষধের ব্যাপক প্রচলন ও সাধারন কর্তৃক স্বীকৃত উপকারিতা বিবেচনা করে দেশী প্রণালী মত শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে এই চিকিৎসা প্রণালীকে আরও জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক।

এই কংগ্রেস ভারতের সার্বভৌম রাজন্যবর্গকে তাঁদের রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করার পন্থা অবিলম্বে অবলম্বন করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছে।

এই কংগ্রেস মিষ্টার বি, জি, হর্ণিম্যানের প্রতি কৃতজ্ঞতার মনোভাব প্রকাশ করছে যিনি তাঁর পরিশ্রম ও বলিষ্ঠ সমর্থন দ্বারা ভারতের সমস্যাকে ভারতে ব্যাপক ভাবে পরিচিত করেছেন এবং গভর্ণমেন্টের পলিসিকে ধিক্কার দিচ্ছে যা এখনও ভারতের জনসাধারণ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

এই কংগ্রেস গো-হত্যার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণের জন্য মুসলিম এসোসিয়েসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

এই কংগ্রেস গো-রক্ষার অর্থ নৈতিক আবশ্যকতা স্বীকার করছে এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারতে

জনসাধারণকে বিশেষতঃ গরু ও চামড়া রপ্তানী করতে অস্বীকার দ্বারা বিশেষ চেষ্টা করতে আহ্বান করছে।

প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল।

এরপর কংগ্রেস সব কমিটী দ্বারা রচিত এবং বিষয় নির্বাচনী সভা দ্বারা অনুমোদিত কংগ্রেসের নূতন সংবিধান গ্রহণ জন্য একটি প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত করলেন।

মহাত্মা গান্ধী একটি চেয়ারে বসে নূতন সংবিধানের ধারাগুলি পড়ে শোনালেন। তিনি কোন বক্তৃতা দিলেন না। এই সংবিধানে মোট ৩৬টি ধারা ছিল। একটি ধারা দ্বারা কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা ৬০০০ নির্দিষ্ট করা হল।

যথারীতি সমর্থিত হওয়ার পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

তার পরের প্রস্তাবগুলিও সভাপতি মশায় স্বয়ং উপস্থিত করলেন।

প্রস্তাবগুলি নিম্নে দেওয়া হল :—

এই কংগ্রেস পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের উপর পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেন্ট যে অত্যাচার করছে যার ফলে তাদের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে তাদের বীরোচিত ও বলিষ্ঠ সংগ্রামের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছে।

আইনের চোখে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমান অধিকার অর্জনের জন্য পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়গণ যে শান্তিপূর্ণ অসহযোগের নীতি অবলম্বন করেছে এই কংগ্রেস তা অনুমোদন করছে।

এই কংগ্রেস অত্যন্ত বেদনার সহিত উপলব্ধি করছে যে দেশের বর্তমান দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ দশার জন্য ফিজিতে তাদের দেশের লোকদের উপর গভর্ণমেন্ট ও প্ল্যান্টাররা যে অমানুষিক অত্যাচার করছে যে অত্যাচারের ফলে ঐ সকল দরিদ্র নরনারী সারা ফিজিকেই তাদের বাসভূমি করেছিল তারা ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে সেই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছে না।

এই কংগ্রেস মনে করে যে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিতে ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে জাতির অসহায়তা স্বরাজ অর্জনের জন্য অসহযোগের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করছে।

ফিজি ও অন্যান্য স্থানে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক এবং পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য মিষ্টার সি এফ্ এন্ড্রুজ যে মূল্যবান ও নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন ও করছেন তা এই কংগ্রেস কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছে।

জনসাধারণের আশু প্রয়োজনীয়তা অগ্রাহ্য করে খাদ্য বস্তু বিশেষতঃ চাল ও গম রপ্তানী সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের হৃদয়হীন নীতিকে এই কংগ্রেস তীব্র নিন্দা করছে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম উপশম করার জন্য এই কংগ্রেস ভারতীয় ব্যবসাদারদের খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে চাল ও গম রপ্তানী না করার জন্য উপদেশ দিচ্ছে এবং উৎপাদনকারী ও জনসাধারণকে এই সকল খাদ্যদ্রব্য রপ্তানীকারী ব্যবসায়ী অথবা এজেন্সীর নিকট বিক্রয় না করার জন্য এবং কোন প্রকারে এই সকল দ্রব্য রপ্তানীর সাহায্য না করার জন্য উপদেশ দিচ্ছে।

প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন পাঞ্জাবের দেওয়ান চামনলাল।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ভারতের শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মাধ্যমে যে সংগ্রাম চালাচ্ছে তার প্রতি এই কংগ্রেস পূর্ণ সহানুভূতি জানাচ্ছে এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মিথ্যা অজুহাতে ভারতীয় শ্রমিকদের উপর অমানবিক নীতিকে ধিক্কার দিচ্ছে।

মাদ্রাজের ভি চাক্কারী চেট্টী, বিহারের কে পি এন্ সিংহ এবং মাদ্রাজের ই এল আয়ার দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিম্নলিখিত দুটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই কংগ্রেস ১৯২২ সালের জন্য পণ্ডিত মতিলাল

নেহেরু, ডাঃ আনসারী এবং সি রাজাগোপালাচারিয়াকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করল এবং আরও প্রস্তাব করল যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর প্রধান কার্য্যালয় এলাহাবাদে স্থাপিত হবে।

এই কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক ভি জে প্যাটেলের ভারতে এবং ইংলণ্ডে আমাদের দেশের জন্য যে মূল্যবান কাজ করেছেন তজ্জন্য এবং অপর সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র ও ডাঃ আনসারীর সেবার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছে।

প্রস্তাব দুটি গৃহীত হল।

এরপর বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদে পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন সহর্ষে তাঁর নিমন্ত্রণ গৃহীত হল।

সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মুঞ্জে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপক এক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তিনি সভাপতির নানাবিধ গুণাবলীর কথা বললেন।

মিষ্টার বেন স্পুর এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে সভাপতির গুণ বর্ণনা করলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে ভারতের অধিকার সম্বন্ধে তাঁর কার্য্যাবলীর ভুয়সী প্রশংসা করলেন এবং ষড়যন্ত্র আইনের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করলেন।

মৌলানা সৌকত আলী প্রস্তাব সমর্থন করতে গভর্ণমেণ্ট হুঁসিয়ারী দিলেন যে যদি তারা পাঞ্জাব এবং খিলাফতে অবিচারের প্রতিকার না করে এবং স্বরাজ্য না দেয় তা হলে তাদের তল্পিতল্পা সহ চলে যেতে হবে।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর মৌলানা সৌকত আলী স্বেচ্ছাসেবকগণ ধন্যবাদ জ্ঞাপক এক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন এবং ডাঃ কিচলু তা সমর্থন করলেন।

প্রস্তাব গৃহীত।

সভার কার্য্য শেষ হওয়ায় পর মহাত্মা গান্ধী তিলক স্বরাজ্য স্মারক তহবিলে অর্থ প্রদানের জন্য সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট আবেদন করলেন। তিনি বললেন যে এই ফাণ্ড হোমরুল অর্জন করার জন্য ব্যবহৃত হবে যে হোমরুল স্থাপন লোকমান্য তাঁর প্রতিদিনের মন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন।

এই আবেদনের ফলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ যমনালাল বাজাজ এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর প্যাণ্ডেলের ভিতরেই মহাত্মার আবেদনে চারদিকে অর্থ আসতে লাগল।

অর্থ সংগ্রহের পর সভাপতি মশায় তাঁর বিদায়ী অভি-ভ ষণ দিতে উঠলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা যাই বলুক না কেন গৃহীত অসহ-যোগ প্রস্তাব একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই দেশের ইতিহাসে নাগপুর থার্মপলি বলে গণ্য হবে। পরিশেষে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ পর্য্যন্ত যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন জনসাধারণের মনবল বজায় রাখতে হবে এবং এ না করলে যে কোন প্রতিক্রিয়া উদ্ভব হয়ে দেশের. সর্বনাশ হবে। তারপর তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্য-গণকে এবং স্বেচ্ছাবাহিনীকে ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মশায়ের শেষ অভিভাষণের পর একজন মহারাষ্ট্রীয় কবি কবিতা পাঠ করলেন। তারপর বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশন শেষ হল।

কংগ্রেস অধিবেশনান্তে আমরা কয়েকজন টাঙ্গা ভাড়া করে নর্মদার জলপ্রপাত ও মার্বেল পাহাড় দেখতে গেলাম। পথে ইতিহাস প্রসিদ্ধা রাণী দুর্গাবতীর মদন মহল দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলাম. সেবার দুর্গ দেখার অবকাশ হয় নি। পরে এই দুর্গ বার দুই দেখেছি।

টাঙ্গা আমাদের নর্মদার ভেড়াঘাটের সন্নিকটবর্তী উচ্চভূমিতে নামিয়ে দিল। সেখানে অনেকগুলি মন্দির ছিল। তার মধ্যে চৌষট্ট যোগিনীর মন্দিরটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। মন্দিরের চৌষট্টি যোগিনীর মুর্তিগুলি ছাড়াও আরও অনেক পাথরের মূর্ত্তি শোভা পাচ্ছিল।

মন্দিরগুলি পরিদর্শন করে আমরা ভেড়াঘাটে নেমে গেলাম। সেখানে নৌ ভ্রমণের জন্য অনেকগুলি ভাড়াটে ছোট ছোট নৌকা ছিল। তার মধ্যে একখানি ভাড়া করে আমরা নদী পথে রওনা হলাম। স্বচ্ছ সলিলা নর্মদা উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ মার্ব্বেল পাহাড় শ্রেণীর মধ্য দিয়ে বিসর্পিত গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর জল এত স্বচ্ছ যে নদীগর্ভের বালুকা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছিল।

উভয় পার্শ্বস্থ পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা অগ্রসর হলাম। সাদা মার্বেল ছাড়াও অন্যান্য অনেক রংয়ের পাথর নজরে পড়ল। খরস্রোতা নদী দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছিলাম তখন তথাকার অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা আমরা মুগ্ধ চিত্তে দেখছিলাম। এ-রকম অপূর্ব শোভা ইতিপূর্বে দেখিনি।

নৌকারোহীদের মধ্যে একজন এই সময় সিগারেট ধরাতে উদ্যত হতেই মাঝি নিষেধ করে জানালেন যে এখানে ধূমপান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে অনেক মৌচাক আছে। আগুন জ্বাললে সেই মৌমাছির আক্রমণের ভয় আছে। এ সম্বন্ধে মাঝি একটি কাহিনী শোনাল। কিছুকাল পূর্বে একজন সাহেব এইরূপ নদী ভ্রমণের সময় মাঝির কথা অগ্রাহ্য করে সিগারেট ধরান। এর ফলে অনতি-বিলম্বে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি পর্বতের শৃঙ্গদেশ থেকে নেমে আসতে লাগল। মাঝি প্রাণরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল। ইতিমধ্যে মাছিগুলি সাহেবের সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলল। তাদের দংশন অসহ্য হওয়ায় সাহেব পরিচ্ছদ ত্যাগ করবার অবসর না পেয়ে কোটপ্যান্ট ও বুট সহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কিন্তু তিনি আর নদী থেকে জীবন্ত উঠতে পারলেন না।

নদী ভ্রমণ শেষ করে আমরা ভেড়া ঘাটে ফিরে এলাম। পুনরায় উচ্চভূমিতে উঠে অন্যপথে নর্মদার জল প্রপাত দেখতে গেলাম। এই প্রস্রবনকে স্থানীয় লোকেরা ধোঁয়াধার বলে। নির্ঝরিণীর অপূর্ব শোভা আমরা গভীর আনন্দের সঙ্গে দেখলাম। আমি ও আমার কয়েকজন সঙ্গী নর্মদার উচ্চ পাড় থেকে নেমে জলপ্রপাতের খানিকটা দূরে অবগাহন স্নান করলাম।

আমরা যখন নদীবক্ষে ভ্রমণ করছিলাম তখন আমাদের বাঙালীর আর একটা দল নৌকা ভাড়া করার সময় একজন ইংরাজের সঙ্গে কোন একটা বিষয় নিয়ে বচসা আরম্ভ হয়। সাহেব রাগান্বিত হয়ে একজনকে ঘুঁসি মারে। সঙ্গে সঙ্গে তার ৪।৫ জন সঙ্গী সাহেবকে উত্তম মধ্যম দেয়। এই দৃশ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য একটু দূর থেকে দেখছিলেন।

ভ্রমণান্তে সেই দিনই জব্বলপুর থেকে ফেরার জন্য বোম্বে মেল ধরতে জব্বলপুর রেল ষ্টেশনে গেলাম। সেখানে পূর্বোলিখিত দলকেও দেখলাম। খানিক বাদে মালব্যজীও ট্রেন ধরতে ষ্টেশনে উপস্থিত হলেন। আমরা তখন সকলেই ট্রেনের অপেক্ষায় প্লাটফরমে পায়চারী করছিলাম। পণ্ডিতজী প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হওয়ায় উপরোক্ত দলকে দেখতে পেয়ে তাদের নিকটে গিয়ে বললেন যে সাহেবের মুষ্ঠাঘাতের জন্য পাল্টা সাহেবকে মারা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু তিনি বললেন যে একজনের বিরুদ্ধে ৪।৫ জনের সংগ্রাম করা উচিত নয়। একজনের বিরুদ্ধে একজনকেই লড়তে হবে।

ফেরবার পথে কাশীধামে গিয়েছিলাম। একদিন গঙ্গাস্নান করার জন্য দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে যাওয়ার সময় পথে পট্টবস্ত্র শোভিত তিলক চর্চ্চিত নামাবলী গায়ে সৌম্যদর্শন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সি বিজয় রাঘবাচারিয়াকে দেখলাম। তিনি সদ্য গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলেন।

কাশীতে ২।১ দিন থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম।

ক্রমশঃ

ভারতে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্ষান্তিক কলাছত্র
ত্রিয়েনাল ইণ্ডিয়া

কিছুদিন হল ললিতকলা অকাদেমির উদ্‌যোগে বিরাট্ এক চারুকলা-ছত্রের অধিবেশন হয়ে গেল। এর নাম দেওয়া হয়েছে "Triennalle India, এবং এই ত্রিয়েনালের এটি ছিল দ্বিতীয় ত্রিবর্ষান্তিক অধিবেশন। প্রথমটিও অনুষ্ঠিত হয় এই দিল্লীতেই বৎসর তিনেক আগে, ললিতকলা অকাদেমিরই উদ্‌যোগে, এবং সেটি মোটের উপর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বলেই অনেকের ধারণা।

বিভিন্ন দেশের চিত্রশিল্পী, অঙ্কনশিল্পী, তক্ষণ-শিল্পীদের নানা ধরণের হাতের কাজ একত্রিত করে প্রদর্শিত হয় এই ধরণের চারুকলা-ছত্রের দ্বিবর্ষান্তিক (Biennalle) অধিবেশন প্যারিস, টোকিও, ভেনিস, সাওপলো প্রভৃতি শহরে অনেক কাল থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উপর্যুপরি দুটি অধিবেশন সফলতা অর্জন করায় অনেকের মনে আশা হচ্ছে, দিল্লীতেও এই ত্রিয়েনালের অধিবেশন অতঃপর সুনিয়মিতভাবেই অনুষ্ঠিত হতে থাকবে।

এবারকার ত্রিয়েনাল ইণ্ডিয়া আয়তনে ছিল যে কি বিরাট্, তা উপলব্ধি করা সহজ হবে যদি মনে রাখা যায়, যে, এতে যোগ দিয়েছিলেন ভারতবর্ষকে নিয়ে সাতচল্লিশটি দেশ, ৫৪ জন ভারতীয় শিল্পীর ১০৫টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছিল এতে, আর যোগদানকারী বৈদেশিক শিল্পীদের সংখ্যা ছিল ৩০০ এবং তাঁদের বিচিত্র রকমের প্রতিভার পরিচয় বহন করেছিল এতে প্রদর্শিত ৬৮০টি শিল্পকর্ম।

একই প্রদর্শনী ক্ষেত্রে এতগুলি শিল্পবস্তুর স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই রবীন্দ্রভবন, ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্ট এবং ত্রিবেণী কলা-সঙ্গম, এই তিনটি কেন্দ্রে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও জিনিষগুলিকে খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে সাজাতে হয়েছিল কোনো কোনো জায়গায়।

মাস-দুয়েকের কিছু বেশী সময় খোলা থাকার পর এই দ্বিতীয় ত্রিয়েনাল ইণ্ডিয়ার চারুকলা-ছত্র গত ৩১শে মার্চ তারিখে বন্ধ হয়ে যায়। রুমানিয়া এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডের শিল্পীদের কাজগুলি মার্চের শেষ সপ্তাহে এসে পৌছবার দরুণ, মূল প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যাবার পরেও আর এক সপ্তাহ ধরে সেইগুলি প্রদর্শিত হয়।

শেষের দিন ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীপাঠক যোগদানকারী শিল্পীদের মধ্যে ছ'জনকে স্বর্ণ-পদক দিয়ে পুরস্কৃত করেন। এঁদের একজন এ-দেশীয়, অন্যেরা বৈদেশিক। বিদেশী শিল্পীদের হয়ে তাঁদের স্ব স্ব দেশের দূতাবাসের কর্তারা পদকগুলি গ্রহণ করেন। এ-দেশীয় যে শিল্পীটি পুরস্কার লাভ করেন তাঁর নাম শ্রীঈশ্বর সাগর। তিনি পদকটি নেবার জন্যে পুরস্কার বিতরণ সভায় নিজে উপস্থিত ছিলেন। যে ছ'জন শিল্পী স্বর্ণ পদক লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইনি হলেন বয়ঃকনিষ্ঠ। ১৯৪২ সালে অহমদাবাদে এঁর জন্ম হয়। কোনো বাঁধাধরা পদ্ধতি অনুসারে শিল্প শিক্ষার সুযোগ এঁর হয়নি, নিজের ভ্রাতা শ্রীপিরাজী সাগরের কাছে ইনি ছবি আঁকা শেখেন।
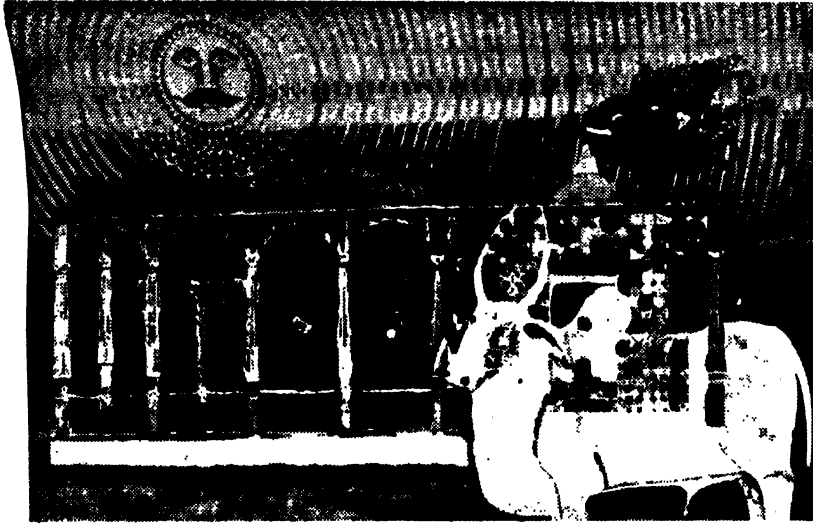
মন্দির

শিল্পী ঈশ্বর সাগর

পিরাজী সাগর রঙীন কাষ্ঠফলক, টিনের পাত, পিতলের পাত, পেরেক ইত্যাদির সহায়তায় কতকটা নির্বস্তুক ধরণের চিত্র-পরিকল্প রচনা করে থাকেন। শ্রীঈশ্বর সাগরের যে বৃহদাকার তৈলচিত্রটি পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, সেটির নাম Hungry Souls। কালো রঙের জমির উপর হালকা ধরণের হলদে, লাল ও বাদামি রঙে আঁকা কয়েক সার ঘরবাড়ী; একপাশে সবুজ রঙের ডালপালার একটি ঝাড়; ডানদিকে মস্ত বড় একটা প্যাঁচা চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে; বাঁদিকে একটি বাড়ীর দরজার পাশে যেন কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে—এক নারী; উপরে নিকষ কালো আকাশে চাঁদের বুকে একটি হরিণ, আর ঢেউ খেলানো সমান্তরাল কয়েকটি রশ্মিরেখা টকটকে লাল থেকে বাদামি রঙে আঁকা। ১৯৭০ সালে ললিতকলা অকাদেমি কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশন্যাল এগ্‌জিবিশন অব আর্ট বা জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে এই ছবিটি পুরস্কৃত হয়েছিল, এবারের ত্রিয়েনালে এটা তাঁর দ্বিতীয় পুরস্কার। ভারতবর্ষের মানসিকতা শিল্প-শৈলী, দুয়েরই প্রচুর পরিচয় রয়েছে ছবিটিতে, যদিও ছবিটি তেলের রঙে আঁকা, এবং ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যে তেলের রঙের ব্যবহার নেই।

বিদেশী যে শিল্পীরা স্বর্ণপদক লাভ করেছেন এবারে তাঁদের কথায় আসা যাক।

ফ্রান্সের জাঁ পিএর ঈভ্‌রাল এঁদের একজন। এঁর বয়স ৩৭। যে শিল্পকর্ম্মটির জন্যে ইনি পুরস্কৃত হ'য়েছেন সেটির নাম Plan Escape।[১] এটির গঠন একটি টোপরের মত, পরিভাষায় যাকে বলা যায় শঙ্কুবৎ। এর তলাটি গোলাকার, তার সর্বদিক্ থেকে অনেকগুলো কালো রঙের সুতো গিয়ে টোপরের শীর্ষস্থানটিতে মিলেছে, আর তলায় কালো জমিতে অনুরূপভাবে অনেকগুলো সাদা রঙের সুতো কেন্দ্রবিন্দু থেকে বৃত্তটির পরিধিতে গিয়ে মিলেছে। চোখে একটা গতির অনুভূতি এনে এ জাতীয় শিল্পচাতুর্য্য দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করে। প্রচলিত রীতিবিরোধী যে সমস্ত প্রতীক-ভিত্তিক শিল্পশৈলীকে Futuristic আখ্যা দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে এই গতি-বেগের বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস অনেক দেখা গেছে,

---

১। ছবি ৪৪১ পৃষ্ঠায়।
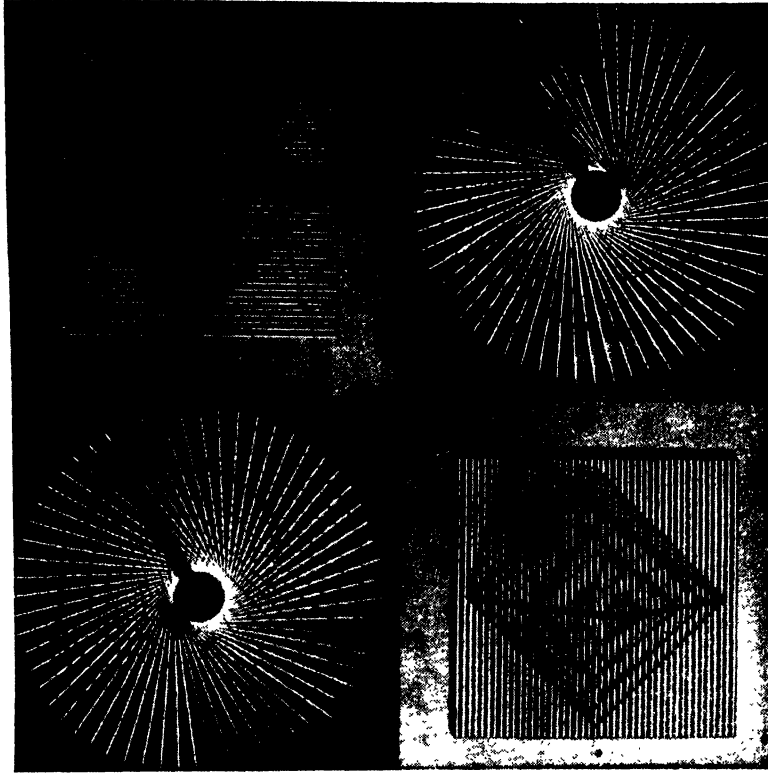
নকশা মুক্তি ও প্রতিবন্ধক
শিল্পী জাঁ পিএর ঈভ্রাল

কিন্তু সেগুলি কোথাও এত সফলকাম হয়েছে বলে মনে হয় না।

পোল্যাণ্ডের জেরী পেনেক-এর বয়স ৫৩। ইনি যে wood cut বা কাঠ-খোদাইয়ের ছাপের কাজটির জন্যে পুরস্কার পেয়েছেন সেটিতে কালো জমির উপর শাদা কতগুলি সমচতুর্ভুজ (square) এবং সমকোণী চতুর্ভুজ (rectangle) ব্যবহার করে একটি টুপি পরিহিত মানুষের মুখের আদল আনা হয়েছে।২

জিরো ইয়োশিহারার জন্ম হয় ওসাকাতে ১৯০৫ সালে। তিনি জাপানে abstract art বা নিরবস্তুক চিত্রকলার একজন প্রবর্তক। শাদাতে আর কালোতে নানা ধরণের অসংখ্য বৃত্ত এঁকে ইনি যশস্বী হয়েছেন। ইনি বলেন, "যত বড়ই তোমার ক্যানভাস হোক, একটি বৃত্ত তাকে ঠিকই ভরিয়ে দিতে পারে।" দুটি বৃত্তের ছবি এঁর প্রদর্শিত হয়েছে; একটি শাদা জমির উপর কালো বৃত্ত, অপরটি কালো জমির উপর শাদা বৃত্ত।৩ দ্বিতীয় ছবিটি দেখে মনে হয়, কালো আর শাদা যেন দুটি পৃথক্ স্তরে রয়েছে।

কিউবার মারিও কালার্ডোর বয়স ৩৪, এঁর যে ছবিটি পুরস্কার পেয়েছে তার নাম Play in the Tower। সূক্ষ্ম কালো রেখায় আঁকা আংশিক প্রতিরূপাত্মক এই ছবিটি চোখে একটি যন্ত্রের গতিশীলতার বিভ্রান্তি জাগায়। শিল্পী একথা স্বীকার করেন না যে, তাঁর ছবিগুলি বস্তু নিরপেক্ষতা বা abstract art-এর পর্য্যায়ে

২। ছবি ৪৪১ পৃষ্ঠায়।
৩। ছবি ৪৪৯ পৃষ্ঠায়।
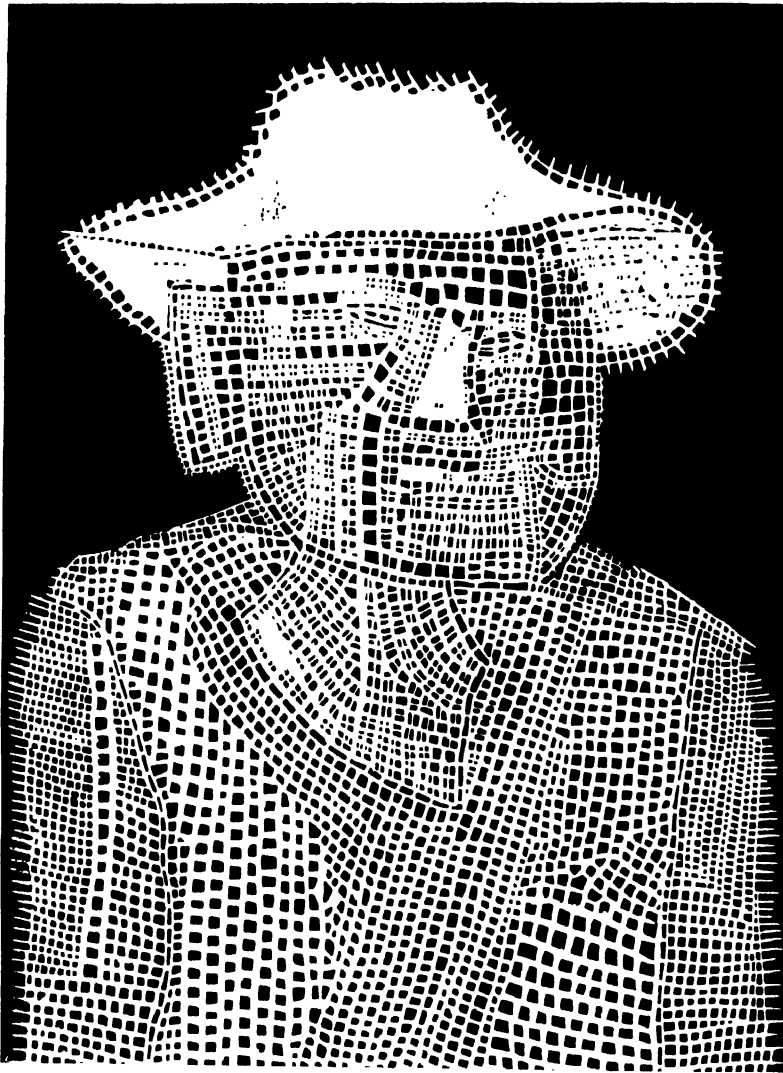
টুপি-পরা নিজের প্রতিকৃতি

শিল্পী জেরী পেনেক

পড়ে। তিনি খুঁটিনাটি এড়িয়ে গিয়ে ব্যাপকতার বিচারে বিষয়বস্তুর উপাদানগুলির পারস্পরিক অবস্থানের উপর নির্ভর করেন তাঁর শিল্পকর্মের সার্থকতার জন্যে।

মূলতঃ ইতালীয় কিন্তু অধুনা ব্রাজিল-নিবাসিনী মিরা শেণ্ডাল-এর বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর। গাছেরবাকল থেকে তৈরি পাৎলা চীনা কাগজ, যাকে rice paper বলা হয়, তাইতে ইনি কালি দিয়ে ছবি আঁকেন। দুখানি পটে এদিকে ওদিকে ছড়ান অল্প-সংখ্যক কয়েকটি কালো বৃত্ত, তার সঙ্গে হয় একটি মোটা রেখা কিংবা ক্রুশ-চিহ্ন দিয়ে তাদের পারস্পরিক সংস্থানের মধ্যে নিজের গভীর শিল্প-চেতনার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। অপর দুটি পটে কতগুলি তীর উপরে উঠছে ও নীচে নামছে। এঁর রকেট এবং চন্দ্রযানের ছবিতেও বিষয়-বস্তুগুলির যথাযথ পারস্পরিক সংস্থান, এবং বিভিন্ন
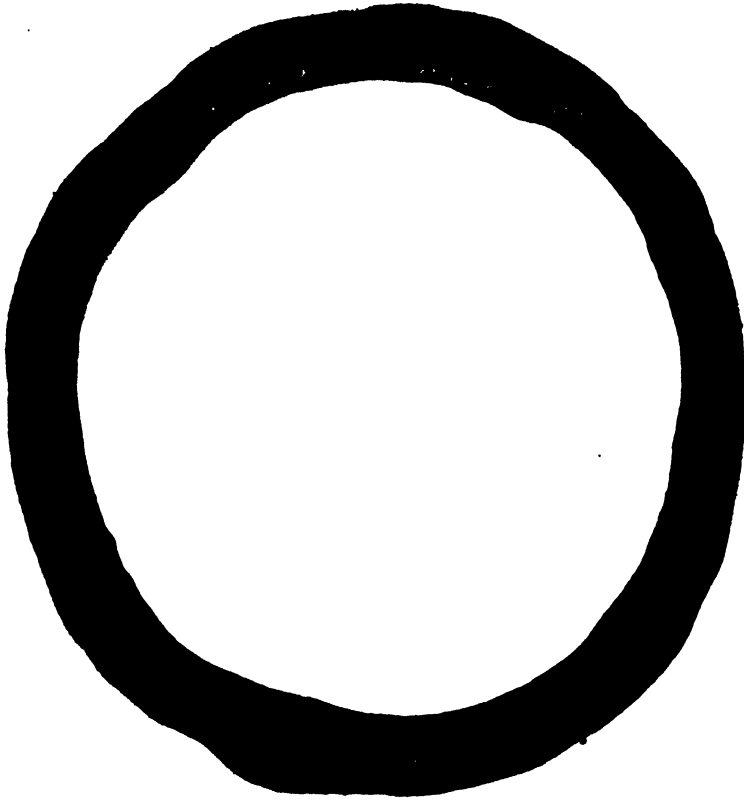
শাদার উপর কালো বৃত্ত

শিল্পী জিরো ইয়োশিহারা

বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে রয়েছে মর্ম্মিতা এবং গূঢ়ার্থ-দ্যোতমার ইঙ্গিত। এঁর এই শিল্পকর্ম্মগুলির নাম দেওয়া হয়েছে Graphic Study।

যাঁরা স্বর্ণপদক পেয়েছেন তাঁদের কথা বলা হ'ল। এঁরা ছাড়া "Honours of Mention," যাকে বাংলায় বলা যায় উল্লেখের সম্মান, বা উল্লেখযোগ্যতার সম্মান: তা পেয়েছেন আরও দুজন শিল্পী। এঁদের একজন পশ্চিম জারমেনীর পিটার হ্যাগেল। এঁর বয়স ৩০ বৎসর, কিন্তু চিত্রবিদ্যার শিক্ষক রূপে এরই মধ্যে ইনি বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এঁর যে ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তাদের একটির নাম "The Spotted Dog"।৪ বাদামি রংএর গায়ে সরু কালো রেখার চৌখুপ-কাটা পশ্চাৎপট এধারে একটা কুকুর রবারের বল্ নিয়ে খেলা করছে। বলটির পটিগুলির রং সবুজ, লাল, বেগুনী এবং সাদা। মোটের উপর প্রতিরূপাত্মক এই ছবিটি বেশ চমকপ্রদ। অন্য যে শিল্পীটির ছবি উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হয়েছে তাঁর নাম মিরোস্লাভ সুটেজ। ইনি যুগোস্লাভিয়ার অধিবাসী, বয়স ৩৫। কালো, আসমানী, সবুজ এবং বেগুনী ঘেঁষা নীল রঙের তীরের ফলার মত কতগুলি নকসার সঙ্গে মিলিয়ে তামাটে ঘন লাল, হালকা সবুজ-ঘেঁসা হলদে, সাধারণ লাল ও সাধারণ হলদে রঙের ঘনক বা cube-এর নকসা কেটে সাজানো ছবিটি যেন খেয়াল খুশিতে করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে সব শিল্পীর অভ্যুদয় হয়েছে, তাঁদের অনেকেরই স্বধর্ম্ম এই খেয়াল-খুশি; কল্পনা-জগতে বিচরণের বিলাসিতা এরা পরিহার করেই চলেন।

৪। ছবি ৪৫০ পৃষ্ঠায়।

দাগী কুকুর

শিল্পী পিটার হ্যাগেল

৫৪ জন ভারতীয় শিল্পীর ১০৫টি শিল্পকর্ম এবারকার ত্রিয়েনাল ইণ্ডিয়াতে প্রদর্শিত হয়েছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের বাইরেকার কোন্ কোন্ দেশ থেকে ক'জন ক'রে শিল্পীর ক'টি ক'রে শিল্পকর্ম এসেছিল এই প্রদর্শনীর জন্যে এবারে তার একটি তালিকা দিয়ে শেষ করা যাক। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভাল, মন্দ, মাঝারি সব স্তরের শিল্পসৃষ্টিই ছিল এই প্রদর্শনীতে।

দেশ	শিল্পীর সংখ্যা	প্রদর্শিত শিল্পকর্মের সংখ্যা
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৩ (?)	?
অস্ট্রেলিয়া	১	৪
অস্ট্রিয়া	২	১৪
ব্রিটেন	১	২০
বেলজিয়াম	৪	৮
ব্রাজিল	৪	১৬
বুলগেরিয়া	৩	১০
কেনাডা	১	৮
কিউবা	৬	২০
সিংহল	৫	৫
সাইপ্রাস	৩	১৫
চেকোস্লোভাকিয়া	৩	২০
ডেনমার্ক	১	৪
পশ্চিম জারমেনী	৭	২০
ফিজি	?	?
ফিনল্যাণ্ড	৪	২০

ফ্রান্স	৪	১৯	নাইজিরিয়া	১২	১৭
পূর্ব্ব জারমেনী	৬	২০	নরওয়ে	১	৭
গ্রীস	৪	১৪	ফিলিপাইন্স্	১৩	২০
হংকং	৪	৪	পোল্যাণ্ড	৫	২০
হাঙ্গেরী	৩	২০	রুমানিয়া	৩	২০
ইন্দোনেশিয়া	১৬	২০	সিকিম	৩ ?	?
আয়ার্ল্যাণ্ড	১	৫	স্পেন	৫	১৬
ইটালী	২০	২০	সুইডেন	৫	১৭
জাপান	৭	২০	সুইজার্ল্যাণ্ড	৬	১৮
দক্ষিণ কোরিয়া	১০	১০	সিরিয়া	৮	৮
কুওয়াইত	১০	১১	তুরস্ক	৪ ?	?
মালয়েশিয়া	৪	২০	রুশিয়া	৮	১৭
মরিশাস	৮	১৪	যুগোস্লাভিয়া	৩ ?	?
নেপাল	১২	২০	ভেনেজুয়েলা	১	১১
নিউজীল্যাণ্ড	৭	১৪	জাম্বিয়া	১৩	১৪

(নভেম্বর, ডিসেম্বর, ১৯৭১, মডার্ন রিভিউয়ে প্রকাশিত U.S.A.এর প্রবন্ধ অবলম্বনে)

সে যুগের নানা কথা

সীতা দেবী

এলাহাবাদে থাকাকালীন গোড়ার দিকে বন্ধু-বান্ধব আমাদের বিশেষ কেউ ছিল না। এলাহাবাদে বাঙালী তখন অনেক ছিলেন, বাবাকে চিনতেনও প্রায় সবাই, তবু আমাদের বড় একটা যাওয়া-আসা ছিল না, অন্যান্য বাঙালী পরিবারের সঙ্গে। মাঝে মাঝে যেতাম অবশ্য, আব্ছা আব্ছা অনেককে মনে পড়ে। অ-বাঙালী বাড়ীতেও দু-একবার গিয়েছি। এজন্য আমাদের বিশেষ কোনো আক্ষেপ ছিল না। নিজেদের মধ্যে খেলাধুলো করেই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। সাউথ রোডের বাড়ীতে যখন থাকতাম তখন অতিথি অভ্যাগত অনেক আসতেন এবং কাছাকাছি আর দুটো বাড়ীর বাসিন্দারাও ছিলেন। Civil Lines-এ Alfred Park বলে একটা বড় বাগান ছিল সেখানে শনি রবিবারে military band বাজত, সেই গোরার band শুনতে যাওয়া আমাদের একটা মস্ত আকর্ষণের ব্যাপার ছিল। আর পীরের দরগা একটা ছিল কাছাকাছি, সেখানে হিন্দু মুসলমান অনেকেই মানত করত। সন্ধ্যা বেলা সেখানে বেড়াতে গেলে সর্ব্বদাই 'গুলাবি রেউড়ি" নামক মিষ্টান্নের প্রসাদ পাওয়া যেত। এতে আমরা বেজায় খুশী হতাম। অবশ্য তখনকার দিনে খুশী হতে আমাদের বেশী কিছু উপাদানের প্রয়োজন হত না। মনটা তখন অকারণ খুশিতে ভরাই থাকত। মই কাঁধে করে যে লোকটি রাস্তার আলো জ্বালিয়ে যেত তাকে দেখেও আমার মহা খুশী লাগত।

বাবার পিছন পিছন ছুটে আমি অনেক সময় তাঁর কলেজে গিয়ে হাজির হতাম। ছেলেরা আমাকে খুবই সমাদর করত। বাবা যখন ক্লাসে পড়াতেন তখন আমার সেখানে যাওয়া বারণ ছিল। আমি ছাদে উঠে বড় বড় ventilatorএর ভিতর দিয়ে নীচে অধ্যাপনারত বাবার দিকে চেয়ে থাকতাম। এ সবও আমার খেলার সামিল ছিল।

খানিকটা বড় হয়ে যাবার পর অবশ্য আলাপ পরিচয় হয়েছিল কিছু পরিবারের সঙ্গে। সব চেয়ে বেশী হয়েছিল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু ও তাঁর ভাই ডাঃ শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর পরিবারবর্গের সঙ্গে। দুই ভাই এঁরা একসঙ্গে থাকতেন। বাহাদুরগঞ্জ বলে পাড়ায় এঁদের বিরাট বাড়ী ছিল। এ বাড়ীতে বারো মাস ত্রিশ দিন মিস্ত্রি লেগেই থাকত। বাড়ীতে ক্রমাগত নূতন নূতন আত্মীয় কুটুম্বের আবির্ভাব হত, এবং তাঁদের জন্যে ঘর-দোর বাড়ান হত। অতিথি অভ্যাগতের স্রোতও ছিল নিত্য প্রবহমান। যে জায়গায় অন্য লোকে বিরক্ত হয়, এঁরা সেখানে দারুন খুশী হয়ে উঠতেন। যাঁরা একবার এসে তাঁদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন তাঁরা যদিআবার এসে অন্য কোনো বাড়ীতে অতিথি হতেন তাহলেই এঁরা ক্ষুব্ধ বোধ করতেন। যখনই যেতাম, মনে হত বাড়ীটি একটি বিরাট অতিথিশালা। এখানে অতিথিদের দাবী আগে, তাদের অধিবাসীদের দাবী পরে। বাড়ীটির নাম ছিল "ভুবনেশ্বরী আশ্রম", দুই ভাইয়ের জননীর নামে।

গৃহকর্ত্তা দুই ভাই, মহা পণ্ডিত ও অতি উদারচেতা মানুষ ছিলেন। সংসার করতে হলে অর্থ দরকার হয় কাজেই দুই ভাইই চাকরি করতেন। একজন ছিলেন আইনের লাইনে আর একজন ছিলেন চিকিৎসক। শেষোক্ত জন I. M. S. ছিলেন। কাজে তাঁর একেবারে মন ছিল না, যতদিন না করলে নয়, করে, একটা কাজ চলা গোছের পেন্‌শন্ নিয়েতিনি এলাহাবাদে ফিরে আসেন এবং বাকী জীবন লেখাপড়ার চর্চ্চাতেই কাটিয়ে দেন। এঁর লেখা নানা বিষয়ে ভাল ভাল কয়েকখানি বই আছে। ইনি বাবার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে অতি সুদক্ষ হওয়াতে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে তাঁর নিরন্তর ডাক পড়ত ডাক্তারি করবার জন্য।

কারো কাছে তিনি টাকা নিতেন না। নানারকম টোটকা ওষুধ নিজে আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি ব্যবহারে লোক খুব উপকার পেত। আমার ছোটভাই মুলু বাল্যকাল থেকেই অতি রুগ্ন ছিল। ডাঃ বসুই তার চিকিৎসা করতেন। যদি দৈবাৎ কখনও তিনি অনুপস্থিত থাকতেন এলাহাবাদে, তা হলে মুলুকে নিয়ে মহা হাঙ্গাম বেধে যেত। অসুখ করলে সে আর কোনো ডাক্তারকে কাছে আসতে দেবে না, "আমাল ডাকাল বাবুর" জন্যে মহা সোরগোল জুড়ে দিত।

শ্রীশবাবু সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণ প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁর বই আছে। ওঁদের একটা publishing concern-ও ছিল, নানারকম বই প্রকাশিত হত সেখান থেকে। শ্রীশবাবু ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য দুটি চমৎকার গল্পসংগ্রহ বার করেছিলেন, এগুলির নাম Folk Tales of Hindusthan এবং Adventures of Guru Noodle। এগুলি আমরা দুই বোনে পরে বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম।

এঁদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। শ্রীশবাবুর দুই মেয়ে ইন্দিরা আর সুজাতা এবং তাঁদের একটি জ্যাঠতুতো বোন মৃণালিনী আমাদেরই কাছাকাছি বয়সের ছিলেন। এঁদের বাড়ী ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে কোনো বিরূপতা ত ছিলই না, বরং এঁরা খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমাদের মেসোমশায় ইন্দুভূষণ বাবুর কাছে মেয়েরা পড়তেন। বিবাহও এঁদের খুব ছেলেমানুষ বয়সে হয়নি। ওঁদের নিজের ছোট পিসীমা এবং ছোট পিসেমশাই ব্রাহ্ম ছিলেন। ওঁদের বাড়ী প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমাদের সারাক্ষণই যাতায়াত ছিল। ডাঃ বসু বাড়ীর যেদিকটায় থাকতেন সেটি ছিল combined লাইব্রেরী এবং যাদুঘর। সিলিং অবধি র‍্যাকে বই ও পত্রিকা ভর্ত্তি আর ঘরের মেঝেতে মূর্ত্তি, ছবি আরো কত কি। দাদার আর আমার কাছে দারুণ লোভের বস্তু ছিল ঐ ম্যাগাজিন আর বই ভর্ত্তি র‍্যাকগুলো। যতই পড়ি আর শেষ হয় না। গল্প পড়া আর পত্রিকা পড়ার আমার যে চিরজীবনের নেশা, তার জন্ম এখানেই।

এলাহাবাদে দেওয়ালি আর রামলীলার ঘটা খুব হয়। তখন বিজলিবাতির যুগ ছিল না কিন্তু প্রদীপ আর ঝাড় লণ্ঠনের সাহায্যে দুজন ধনী লালার বাড়ীতে যে আলোকসজ্জা হত, তা দেখতে সারা সহরতে ভেঙে পড়তই, আশে পাশের গ্রামগুলির থেকেও লোক আসত। আমাদের চোখে যে এগুলি কি অপরূপ লাগত, তা বলে বোঝাবার ভাষা নেই। মনে হত ইন্দ্রপুরীও বোধহয় এত সুন্দর এত উজ্জ্বল নয়।

রামলীলাটা ছিল আরো উপভোগ্য ব্যাপার। সেটা দুতিন দিন ধরে চলত। তার মিছিল ছিল, যাত্রা অভিনয়ের মত অভিনয় ছিল। এখানের বাঙালীরাও রামলীলায় খুব দলে দলে যোগ দিতেন। দুর্গাপূজা এখানে তত জমত না, অল্পস্থানেই হত, এবং সেগুলি সর্ব্বজনীন ছিল না, এক এক গৃহস্থের বাড়ীতেই হত, কাজেই জনসাধারণ তাতে যোগ দিত না। রামলীলাটাই ছিল এখানকার জাতীয় শারদীয় উৎসব। শ্রীশ বাবুদের যে পাড়া বাহাদুরগঞ্জ, সেখানের বড় রাস্তা দিয়েই রামলীলার মিছিল যেত। কাজেই এ-ক'দিন তাঁদের বাড়ীতে যেন মেলা বসে যেত। তাঁদের যত বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, বাঙালী বা অবাঙালী, সবাই স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে মিছিল দেখবার জন্যে উপস্থিত হতেন। যেতাম দুপুরের খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে, আর বাড়ী ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যেত। শুধু ত মিছিল দেখা নয়, এত লোকজন এসেছে, তাদের দেখতে হবে, গল্পগুজব করতে হবে। সকলের সাজসজ্জা দেখাও এক ব্যাপার ছিল। উত্তরপশ্চিমে পোশাক-পরিচ্ছদের রংএর খুব বাহার। পুরুষদের পোশাকে তত ঘটা নেই বটে কিন্তু ছেলেপিলে ও মহিলারা রংএর বৈচিত্র্যে এবং উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। খুব যে দামী কাপড়-চোপড় পরে তা নয়, তবে রঙীন চুমরী শাড়ী, ও জরি ও অভ্রের টুকরো বসান ওড়নার ঝল্‌কানিতে চারিদিকে যেন ইন্দ্রধনু খেলতে থাকত। হাতে পায়ে অল্পবয়সীরা মেহেদী পাতার রস মেখে বেশ টকটকে করে তোলে। গহনা দামী না হলেও অষ্টঅঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার পরতে

ভোলে না, তা রূপোরই হোক বা কাঁসা, পিতল, শিশারই হোক। দাম যেমন হোক, সেগুলির ভার যথেষ্ট। পায়ের গহনাগুলি এত মোটা আর ভারি, যে সেগুলি পরে এরা চলাফেরা করে কি করে তাই ভেবে পেতাম না। বাচ্চাদের মাথার টুপী, গায়ের জামা খুব চটকদার, তবে পরিষ্কার তত নয়। জুতা অনেকে পায়ে দেয় বটে, তবে শক্ত চামড়ার নাগরী জুতো বেশীক্ষণ পায়ে রাখতে পারে না।

রাস্তার দুধারের সব পাকা বাড়ীর ছাদে, জানলায়, বারান্দায়, এমন কি জায়গায় জায়গায় সিঁড়িতেও মানুষের ভিড়। এর মধ্যে আবার প্রচুর দোকানদার জুটে গেছে। কেউ বিক্রী করছে খাবার, কেউ খেল্‌না, কেউ ফুল। ফুলগুলি মিছিলের দেব-দেবীদের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেবার জন্য। বেশীর ভাগ গ্যাঁদা ও অন্যান্য কম দামী ফুল, তবে রং খুব ডগ্‌ডগে। ওদিকে ছানার তৈরি মিষ্টি তখন ত কিছু দেখতাম না, বেশীর ভাগই ডালের বা আটার লাড্ডু জাতীয় মিষ্টি। দুগ্ধজাত খাবারের মধ্যে মাঝে মাঝে প্যাঁড়া দেখা যেত। খাবারগুলি খোলা অবস্থায় বড় বড় পিতলের পরাত অথবা কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রাখা হত, ঢাকা দেবার বালাই কিছু ছিল না। ফলে সেগুলি মাছি, বোলতা ও ভীমরুলের আস্তরণে আচ্ছাদিত হয়ে থাকত। তখন এ সবেকেউ ভয় পেত না। ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে সবাই পেট ভরে এসব খাবার কিনে খেত। খুব যে তার ফলে মহামারী একটা লেগে যেত, তাও ত বোধ হয় না। অবশ্য এলাহাবাদে মহামারীর অভাব ছিল না। প্লেগে একেবারে বস্তিকে বস্তি উজাড় হয়ে যেত মাঝে মাঝে। তবে তার সঙ্গে এই সব দূষিত খাবার খাওয়ার কোনো যোগ ছিল বলে কেউ বলত না। খেলনাগুলি শস্তা ধরণেরই বেশীর ভাগ, কারণ ঐ প্রদেশের সাধারণ মানুষ বেশ গরীব, তাদের ক্রয়-ক্ষমতা খুবই কম। বিকেল যখন প্রায় পড়ে আসে তখন আমাদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটত। প্রবল বাদ্য-ভাণ্ডের রোল শোনা যেত, এবং মিছিল আসতে আরম্ভ করত। কত রকম চৌকি যে যেত তার ঠিক নেই। দেব-দেবী, পৌরাণিক ঘটনা, ঐতিহাসিক ঘটনা, নিছক ভাঁড়ামি, কত কিছুর চৌকি। সাজসজ্জা আমাদের তখনকার চোখে ত অপূর্ব্ব লাগত, এখন মায়া অঞ্জনহীন চোখে দেখলে হয়ত crude মনে হত। জয়ধ্বনিতে ত আকাশ ভেঙ্গে পড়ত। ছোট্ট ছেলে-পিলেরা নাচতে আরম্ভ করত। সর্ব্বশেষে বৃহৎ গজপৃষ্ঠে সমাসীন রাম ও লক্ষ্মণ, পিছনে তাদের দুজন অনুচর ছড়ি হাতে করে। চারদিক থেকে বৃষ্টির জলের মত মুষলধারে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। ছড়িদাররা মাঝপথে ছড়ি দিয়ে সেগুলিকে আটকাচ্ছে, না হলে রাম-লক্ষণের মুখে চোখে এসে পড়বে। গগনভেদী জয়ধ্বনির ভিতর হাতীটি বেশ ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভীড় দেখতে, চীৎকার শুনতে সে অভ্যস্ত, এইভাবেই তাকে শিক্ষাদান করা হয়েছে। প্রয়াগের পাণ্ডাদের সম্পত্তি সে, বড় হয়ে অবধি সে এই কাজই করছে এবং যতদিন কর্ম্মক্ষমতা থাকবে, এই কাজই করবে। যে ছেলেগুলি রাম লক্ষ্মণ সাজে তারাও যে সে ছেলে নয়, শোনা যেত এরা কুড়নো ছেলে, পাণ্ডাদের দ্বারা পালিত হয়েছে। এদের রাম লক্ষ্মণ সাজার জন্য নাকি বিশেষভাবে তালিম দিয়ে মানুষ করা হয়। বড় হওয়ার পর এদের কি হয় তা কখনও শুনিনি।

মিছিল চলে গেলে জলযোগান্তে আমরা যে যার বাড়ী ফিরে যেতাম। রামলীলার মাঠ ছিলএকটা, সেখানে রামায়ণের যাত্রা অভিনয় প্রভৃতি হত। এখানে তত ঘনঘন যাওয়া হত না, কারণ এখানে কারো বাড়ীতে বসে আরাম করে দেখার সুযোগ ছিল না। ঘোড়ার গাড়ীতে ঠাশাঠাশি করে বসে দেখতে হত। যখন বেশ ছোট ছিলাম তখন চাকর-বাকররা ধরাধরি করে গাড়ীর চালে তুলে দিত, বড় হবার পর সে সুবিধাও ছিল না। হনুমানের ল্যাজে করে লঙ্কায় আগুন লাগান, জটায়ুর সঙ্গে রাবণের লড়াই এইগুলি আমার খুব ভাল লাগত।

তখন একটা যুগপরিবর্তনের সময় আসন্ন। বঙ্গভঙ্গ হবে বলে গুজবে চারদিক্ সরগরম। একটা নূতন

জাতীয়তাবোধের ঢেউ উঠতে আরম্ভ করেছে বাংলা-দেশে। সুদূর প্রবাসে বসেও আমরা তার একটু আধটু স্পর্শ পেতে শুরু করেছিলাম। অনেক সভা-সমিতি হত, অনেক মিছিল হত, সঙ্গে গানের দল থাকত। এইরকম একটা মিছিলের সঙ্গেই আমি প্রথম শাড়ী পরে যোগ দিই, তাতে পাড়ার একদল মন্তব্য করল, "দেখেছ, ওদের ছেলেটাকে কি রকম মেয়ে সাজিয়েছে।"

উত্তর-পশ্চিমে পরদার খুব ছড়াছড়ি, তবে এ সব সভা মিছিল প্রভৃতিতে বাঙালীরাই প্রধান ভূমিকা নিতেন, কাজেই মেয়েদের জন্যে সব সভাতেই পৃথক্ ব্যবস্থা থাকত। তাদের অবশ্য চিকের আড়ালে বসতে হত। ছোট মেয়েরা মিছিলেও যোগ দিত। এখানে বাঙালী-দের উদ্যোগে "বাঙালী সম্মিলনী" বলে একটা বড় সভা হত, দুচারদিন ধরে চলত। এলাহাবাদের বাঙালীরা ত এতে যোগ দিতেনই, প্রবাসী বাঙালীরাও অন্য অনেক জায়গা থেকে আসতেন। বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি হতই তা ছাড়া লাঠিখেলা, ছোরা খেলা এ সবও হত। ছোট ও কিশোরী মেয়েরা গান আবৃত্তি প্রভৃতিতে যোগ দিত, প্রাপ্তবয়স্কা বাঙালী মেয়েরা সভায় এসে যোগ দিতে পারছে এটাই তখন মহা আধুনিকতার পরিচায়ক মনে হত, তারা সভাস্থলে গান করবে বা বক্তৃতা করবে এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবত না। যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মেয়েরা বেশ সক্রিয় অংশ নিতে আরম্ভ করেছিলেন।

বাঙালী সম্মিলনীতে আমরা খুব নিয়মিত যেতাম। কর্মকর্তাদের মধ্যে বাবা ত নিশ্চয়ই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। একবার কলকাতার থেকে একজন প্রসিদ্ধ গায়ককে তিনি আনিয়েছিলেন সম্মিলনীতে গান করবার জন্যে। এঁর নাম ভবসিন্ধু দত্ত। ইনি বাবার ছাত্র ছিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে গায়ক হিসাবে এঁর খুব নাম ছিল। ইনি এসে সভায় রবীন্দ্রনাথের নবরচিত গান "হে ভারত আজি তোমারই সভায় শুন এ কবির গান" গাইলেন। বক্তা হিসাবে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তখন বেশ নামডাক ছিল। যারা সভায় আবৃত্তি করত তাদের মধ্যে জীবনদার বেশ সুনাম হয়েছিল, এবং প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একটি বালিকাও বেশ প্রশংসা পেয়েছিল। এর বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওখানকার প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন, শ্রীশবাবুদের বাড়ীর পাশেই এঁদের বাড়ী ছিল।

মেঘরাজ লুনিয়ার বাড়ীতে থাকাকালীন আর কোনো গল্প বিশেষ মনে পড়ে না। শহর থেকে অতদূরে থাকায় বেশ অসুবিধা হচ্ছিল বোধ হয়। অন্য বাড়ী খোঁজাও হচ্ছিল। অত লোকের একসঙ্গে থাকার মত বাড়ী পাওয়া সহজ নয়। নানাকারণে এ ব্যবস্থার পরিবর্তনও প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। এবার কোঠাপার্চ্চা বলে একটা পাড়ায় তিনটা বাড়ী নেওয়া হল। একটায় আমরা থাকব, আমাদের অতিথি-অভ্যাগতের দল অবশ্য এখানেই উঠবেন। আর একটা বাড়ীতে পিছনদিকের অংশে মাসীমা, মেসোমশাই সপরিবারে থাকবেন, সামনের বড় হলটি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহরূপে ব্যবহৃত হবে। বাকি ঘরে গিরীশবাবু ও অনাথবাবু থাকবেন। অনাথবাবু বহুকাল আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রবাসী কার্য্যালয়ের দেখাশুনা করতেন। এই বাড়ীতে থাকা-কালীন দুরন্ত বসন্ত রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মাসীমা এই কালব্যাধিকে কোনরকম ভয় না করে এঁর সেবা করেছিলেন অক্লান্তভাবে।

নেপালবাবু এই সময় পরিবার নিয়ে এলেন। মাসীমাদের বাড়ীর পাশে একজন পাঞ্জাবী সাধুর বাড়ী ছিল। বাড়ীটি পাকা, তবে দোতলার ঘরগুলির উপরের চাল খাপরার। দোতলাটি সাধু ভাড়া দিতেন। নীচে নিজে থাকতেন। এই দোতলাটি ভাড়া নিয়ে নেপালবাবু সপরিবারে এসে রইলেন। গৃহস্বামী সাধুটি অন্ধ ছিলেন। তাঁর রান্নাবান্না করে দেবার লোক কেউ ছিল না। তিনি থেকে থেকে মাসীমার কাছে এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সুজি, চিনি, ঘি আর মেওয়া পাঠিয়ে দিতেন। বলে দিতেন, সম পরিমাণ ঘি যেন সুজি চিনির সঙ্গে দেওয়া হয়। হালুয়াটা খুবই উপাদেয় হত সন্দেহ নেই, যদিও কখনও আমরা চেখে দেখিনি। ঠাওার

সময় জমাট পাথরের মত শক্ত হয়ে যেত। এই খাদ্যই সাধু বারমাস খেতেন। একবার করে কয়েক সের তৈরী করিয়ে নিলে তাঁর দুচার মাস বেশ চলে যেত।

মাসীমাদের বাড়ীর পিছনদিকে একটি প্রশস্ত মাঠ ছিল। এখানে মুসলমানরা নমাজ পড়তেন ঈদ্ ও বকর্ ঈদের সময়। শাদা কাপড় পরা ঐ বিশাল জন-সমাবেশ যখন একসঙ্গে নমাজ পড়তেন তখন ভারি সুন্দর দেখতে হত। আমরা ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ খাড়া থাকতাম এই দৃশ্য দেখবার জন্য।

বাড়ীর বাঁদিকে ছিল একটা খোলার চালের বড় ঘর, ও বড় একটা উঠান, চারিদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এটা একটা পঞ্চায়েতের বাড়ী। প্রায়ই এখানে পঞ্চায়েতের বৈঠক বসত। অনেক লোক আসত, তারা হিন্দু, কিন্তু কোন্ জাতের জানি না। রীতিমত সভাপতি নিযুক্ত করে আইনকানুন মতে নানা সমস্যার বিচার হত। বেশী হট্টগোল হলে যিনি সভাপতি থাকতেন, তিনি দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠতেন "রাম রাম কহো ভাই।" অমনি সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। নানারকম দণ্ড দেওয়া হত বিচারের পর। একটা খুব চালু দণ্ড ছিল আসামীকে বেশ কয়েক সের ভেলি গুড় জরিমানা করা। জরিমানা আদায় হওয়া মাত্র তখনি তার সদ্গতি হয়ে যেত। একটি মামলায় দণ্ড ছিল, বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। এটি আমার চোখে দেখা নয়, আমাদের বাড়ীর এক ঝিয়ের কাছে শোনা। এটি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা। প্রথমে সমবেত পঞ্চ বিচার করবেন বিবাহ বিচ্ছিন্ন করা হবে কি না। যদি বিচ্ছিন্ন করাই ঠিক হয়, তবে কার দোষ? স্বামী যদি দোষী বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাঁকে উঠানে উবু হয়ে বসতে হবে এবং স্ত্রী গুনে গুনে তাঁর পিঠে তিনবার লাথি মারবেন। তাহলেই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। দোষটা যদি স্ত্রীর হয় তাহলেও অনুরূপ ব্যবস্থা হত কি না জানি না। যে মহিলা গল্পটা বলেছিলেন, তাঁর নাকি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল, তাই গল্পটা তখন বিশ্বাসই করেছিলাম।

বাবা যে বাড়ীটা ভাড়া করলেন, সেটা আমাদের পরিচিতা এক বাঙালী খ্রীষ্টান মহিলার। ইনি লেডী ডাক্তার ছিলেন, এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে এঁর অনেক দিনের পরিচয় ছিল। বাড়ীটা বেশ বড়, দুটো বাড়ী একসঙ্গে জোড়া বলা যেতে পারে। পাকা বাড়ীটাতেই সাত আটটা ঘর ছিল। এতে আমাদের থাকা, অতিথিদের থাকা, প্রবাসী কার্য্যালয় এবং কিছু পরে Modern Review কার্য্যালয়, সবেরই বেশ স্থান সঙ্কুলান হয়ে যেত। এ ছাড়াও মাটির দেওয়াল এবং খাপরার চালের ছোট একটা বাড়ী ছিল, তাতে গোটা দুই থাকার ঘর, স্নানাগার, শৌচাগার, রান্নাঘর সব ছিল। এগুলি চাকর-বাকরের জন্য নির্দ্দিষ্ট। একটা গুদাম ঘরও ছিল, সেটাতে আমাদের কোনো প্রয়োজন না থাকাতে বাড়ীর অধিকারিণী সেটা তালা-বন্ধ করে রেখেছিলেন। চাকররা বেশ সুখেই বাস করত, বউ ছেলেপিলে নিয়ে, তাদের অতিথি অভ্যাগতও আসত মাঝে মাঝে।

আমাদের বাড়ীটার সামনা-সামনি রাস্তার উল্টো দিকে একটা মস্ত তিনতলা বাড়ী ছিল। বাড়ীটায় অসংখ্য ঘর। একতলায় একদল পাণ্ডা বাস করত, দোতলা তিনতলার ঘরগুলি বন্ধ থাকত, যাত্রী-সমাগম হলে খোলা হত। আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটা ত্রিবেণী সঙ্গমে যাবার পথ। গঙ্গাস্নানের জন্য সেখান দিয়ে তীর্থযাত্রী সারাক্ষণই যাতায়াত করত। পাণ্ডারা যেন ওৎ পেতে বসে থাকত। পথে দু-দশটা লোক এক সঙ্গে যেতে দেখলেই প্রাণপণে চীৎকার করত, "গঙ্গাবিষ্ণু ছোটেলাল, গয়াদ্বিকা পাণ্ডা, সাড়ে সাত ভাই।" ভাই আবার সাড়ে সাতটা কি করে হয়, একদিন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তাতে তারা বলল যে, ভাই আসলে আটজন, তবে একজন বিবাহ করেনি বলে তাকে আধখানা ধরা হয়।

এই বাড়ীতে যখন এলাম, তখন খানিকটা বড় হয়ে গিয়েছি। শাড়ী পরছি, এবং অল্পস্বল্প পর্দানশীন হবার ব্যর্থ চেষ্টাও হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের রস

আস্বাদনও এখন থেকে খোলাখুলি ভাবে করতে পারছি। তবে censorship একেবারে উঠে গিয়েছিল বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের লেখা মোটামুটি সবই পড়তে পেতাম। বঙ্কিমচন্দ্রের বই বেছে দেওয়া হত। "বিষবৃক্ষ" ও "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়তে বারণ করা হত। অন্য লেখকদের বই অভিভাবকরা নিজেরা পড়ে তবে ছেলেমেয়েদের পড়তে অনুমতি দিতেন। কিন্তু গল্প পড়ার বাতিক একবার যাদের ধরে গেছে, তারা নিয়মভঙ্গ করতে পেছোয় না। আমিও নিষিদ্ধ বই অনেকগুলিই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। তারকনাথ গাঙ্গুলীর লেখা "স্বর্ণলতা" বইটি এইভাবে প্রথমে পড়ি বলে মনে আছে।

বাংলাদেশে এই সময় দেশভঙ্গের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। তার ঢেউ প্রবাসী বাঙালীদের গায়েও এসে লাগতে লাগল। আমরাও বিদেশী কাপড়-চোপড়, কাঁচের চুড়ি, বিদেশী রেশমের রিবন এ সব বর্জ্জন করলাম। বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মোটা শাড়ী, ময়নামতীর ছিটের জামা এ-সব পরেই খুশী থাকতাম। মিলের শাড়ীর পাড় ভাল ছিল না, ধোবার বাড়ী একবার গেলেই রং উঠে যেত, তাতে কেউ দমত না। কাঁচের চুড়ি পরা আমাদের অভ্যাস ছিল না, খালি হাতে থাকাটাই পছন্দ করতাম। যাঁরা ঐ সব চুড়ি পরতেন তাঁরা তা ত্যাগ করে শাঁখার চুড়ি, গালার চুড়ি পরতে আরম্ভ করলেন। ৩০শে আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসবের প্রবর্ত্তন করলেন। আমরাও বাড়ীতে দেশী পাটের সুতায় রাখী বানিয়ে সবাইকে পরিয়ে বেড়াতাম। অরন্ধনও পালন করা হত। সভা সমিতি হত, তাতে যোগ দিতাম। মিছিলেও আমি দু-একবার যোগ দিয়েছিলাম।

তখন ব্রিটিশ শাসনের উৎপীড়নের যুগ। বাবার বিরুদ্ধে শাসকদের একটা খুব বিরুদ্ধ মনোভাব যে গড়ে উঠছে, তা আমরা পরে বুঝেছিলাম। তখন কিছুই বুঝিনি, কারণ এ-সব কথা বাবা বা মা আমাদের সামনে কখনও উচ্চারণ করতেন না। কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সঙ্গেও বাবার খুব বিরোধ বাধছিল, এ কথাও পরে শুনেছিলাম।

এই বিরোধের ফলে বাবা কলেজের কাজ ছেড়ে দিলেন। "প্রবাসী" ত ছিলই এবার বেরোল ইংরেজী পত্রিকা Modern Review। বাবার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল যে এ গুলির সাহায্যেই তিনি সংসার প্রতিপালন, আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য সবই চালিয়ে যেতে পারবেন, কোনোদিকে কোনো অভাব পড়বে না। হলও তাই। সংসারের কোনো কিছুই বদলাল না। কলেজের ছাত্ররা অনেক কান্নাকাটি করে বাবাকে বিদায় দিয়ে গেল। আমরা এতে খুব কষ্ট পেলাম তবে দুদিন পরে ভুলেও গেলাম। যে বাড়ীতে ছিলাম সেখানেই রইলাম, যেমন পড়াশুনা করছিলাম তাই করতে লাগলাম। আহার-বিহার, বসন-ভূষণ চিরদিনই আমাদের সাদাসিধা ছিল। তাইই রইল। অতিথি অভ্যাগত যেমন আসতেন তেমনই আসতে লাগলেন। মা বাবার সংসারে কোনোদিনই বিলাসিতা ছিল না কোনোদিকে কাজেই তার অভাব কিছু অনুভব করলাম না। বাবা বিলাতী কাপড়চোপড় চিরকালের মতই প্রায় ছেড়ে দিলেন, আমরাও দিলাম, অন্ততঃ বেশ কয়েক বৎসরের জন্য। চরকা কাটাও দু-চার জায়গায় চলতে লাগল, যদিও আমরা সেটা ধরিনি।

অতিথি সমাগম সমানেই চলত। তখন খানিকটা বড় হয়েছি, কাজেই অনেকের কথা বেশ মনে পড়ে। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত তখন ঐদিকেই কোথাও বড় কাজ করতেন, তিনি মধ্যে মধ্যে আসতেন। একবার এলাহাবাদের বাজারে হঠাৎ ঝাঁক বেঁধে ইলিশ মাছের আবির্ভাব হল। বাঙালীরা ত আনন্দে আত্মহারা, দু হাতে কিনতে লাগলেন সকলে। অপূর্ব্ববাবু তখন এসেছিলেন, তিনিও সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য এক রাশ মাছ কিনলেন। দেখা গেল, সবগুলি ডিমে ভর্ত্তি। পাছে তাড়াতাড়ি পচে যায় গরমের দেশে, তাই তিনি সেগুলির পেট চিরে সব ডিম বার করে দিয়ে মাছগুলি নিয়ে গেলেন। তারপর সেই পর্ব্বত প্রমাণ মাছের

ডিমের সদ্গতি করা এক প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার। ওখানের উঁচু জাতের চাকর-বাকররা আবার মাছ খায় না। শেষে অনেক ফেলেই দিতে হল।

বরিশালের কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী একবার এসেছিলেন বলে মনে পড়ে। সেই স্বদেশী যুগে এঁর আর সন্তোষের প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর কবিতার বেশ নামডাক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে তাঁর একটি ছোট গল্প দিলেন, নাম 'মাষ্টারমশাই'। এর কিছু পরে আরম্ভ হল 'গোরা।' তখনকার অল্প বয়সের নির্বুদ্ধিতায় পাণ্ডুলিপিখানি রাখবার কথা মনে করিনি, মনে করলে একটি অমূল্য সম্পদ্ আমার কাছে থেকে যেত।

আর-একজন অতিথিকে বেশ পরিষ্কার মনে পড়ে। ইনি চেহারায় যে রকম অসাধারণ ছিলেন, মানুষ হিসাবেও তেমনি। এঁর নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নাম নেন নিরালম্ব স্বামী। প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া দেখতে ছিলেন, রংও ছিল পরিষ্কার। দেখে বাঙালী বলে একেবারেই মনে হত না। তখনও গেরুয়া কাপড়ই পরতেন এবং নিরামিষ আহার করতেন। কলেজে কিছুকাল বাবার ছাত্র ছিলেন, এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ। অতিথিরা অনেকে বাইরের ঘরেই থাকতেন, সেখানেই আহারাদি করতেন, আবার যারা পরিবারের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা ভিতরে এসে আমাদের সঙ্গেই খেতেন। যতীন্দ্রনাথকে আত্মীয়ের মত মনে করে তাঁকে অন্দর মহলেই স্নানাহার করতে ডেকে আনা হত। আমিই সদর ও অন্দর মহলের ভিতর দৌত্যকার্যটা করতাম, সুতরাং আমার সঙ্গেই তাঁর ভাব হয়েছিল সবার আগে। পরে বিপ্লবী নেতা বলে তাঁর খুব নাম হয়েছিল, আমরা তখনও তাঁর সে পরিচয় পাই নি। আমাকে নানারকম গল্প বলতেন, বেশীর ভাগই তাঁর নানা স্থানে ভ্রমণের কথা। কৈলাস, মানস সরোবর, প্রভৃতি দুর্গম তীর্থযাত্রার কথা খুব মন দিয়ে শুনতাম। এক বার এক যাত্রাপথে বিরাট এক পাথরের চাঁই তাঁর সামনে পড়ে পথ আটকায়। হাত পা দিয়ে ঠেলে সেটাকে সরাতে না পারে, শেষে তিনি মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে সেটাকে নড়ান, এই গল্পটা আমি খুব বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে শুনতাম।

একবার কুম্ভমেলার সময় এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গাগর্ভের চড়ায়, যেখানে সাধু সন্ন্যাসীরা আস্তানা গেড়ে ছিলেন, সেখানে বেড়িয়ে আসেন। কতরকম সন্ন্যাসীই যে দেখেছিলাম তখন। যতীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করতেন, রাজনীতিও বাদ যেত না। শীতকালে ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছেন দেখে মা তাঁকে একটি নূতন কম্বল দিতে গেলেন। তিনি তখন পুরান কম্বলটি মাকে দিয়ে বললেন, "মা এটি আপনি রেখে দিন, কারণ সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় আচ্ছাদন রাখতে নেই। সন্ন্যাসীর কম্বল বাড়ীতে থাকলে মঙ্গল হবে।" কম্বলটি অনেকদিন মায়ের কাছে ছিল। আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে চলে আসার পরও তাঁর সঙ্গে কলকাতায় একবার দেখা হয়েছিল। তখন তিনি পুরাদস্তর সন্ন্যাসী।

আর একজন অতিথি এই সময় আসেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের চিরকালের আত্মীয়তার সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল। ইনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবার সঙ্গে এঁর আগের থেকে কোনো পরিচয় ছিল কি না, তা আমার এখন আর মনে নেই। তবে তিনি সবে তখন সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেছেন, সেই সূত্রে পরিচয় হয়েও থাকতে পারে। ইনি প্রথম এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাজ নিয়ে এসেছিলেন। বয়সে নবীন ছিলেন, সবে আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে এসেছেন, আমাদেরই নূতন আত্মীয়রূপে গ্রহণ করে নিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে "মা" বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন, দিদিকে ডাকতেন "মাসীমা"। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন, বাংলাদেশের এক জমিদার বাড়ীর দৌহিত্র ছিলেন, কাজেই সাজ-পোশাকের দিকেও খুব নজর ছিল। এখানের 'বাঙালী

সম্মিলনী”তে স্বরচিত একটি বড় কবিতা পাঠ করে প্রথমে এখানের বাঙালী মহলে সুপরিচিত হন। এঁর লেখা এর পর থেকে প্রবাসীতে প্রায়ই বেরোতে শুরু হয়। ইণ্ডিয়ান প্রেসের জন্য ছোট ছোট বাংলা বইও লিখেছিলেন। বহুদিন ইনি একটানাই আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। ঘরের লোকই হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা বরাবরের মত কলকাতা চলে আসবার কিছুদিন আগে অন্য জায়গায় বাসা করে উঠে যান। এটা সঙ্কোচ বশতঃই করেছিলেন বোধহয়। বাবা খরচ হিসাবে কোনো অতিথির কাছেই কিছু নিতেন না, শুধু শুধু এতকাল একজনদের সংসারে বাস করাটা চারুবাবুর ভাল লাগেনি বোধহয়। কিন্তু এর জন্য আমাদের ভিতরের আত্মীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি, যোগসূত্রও ছিন্ন হয়নি। আমরা কলকাতা চলে আসবার কিছুদিন পরেই তিনি এলাহাবাদের কাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং প্রবাসীর সহকারী সম্পাদকের কাজ নেন। এই কাজ বহু বৎসর তিনি সুযোগ্যতার সঙ্গে করে যান। কর্ম্মজীবনের শেষের দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপকের কাজ নেন। কয়েক বৎসর ঢাকাতে বাস করার পর আবার কলকাতায় চলে আসেন। জীবনের শেষ দিনগুলি তাঁর কলকাতাতেই অতিবাহিত হয়। খুব দীর্ঘজীবন তাঁর হয়নি। রবীন্দ্রনাথের তিনি অতি অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, যখন থেকে তাঁর সঙ্গে আলাপ তখন থেকেই তিনি আমাদের দুই বোনকে রবীন্দ্র-সাহিত্য-অনুরাগী করে তোলার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা খুব ভাল ভাবেই সার্থক হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প উপন্যাস ত এতদিন নিজের গরজেই পড়তাম, এখন চারুবাবুর উৎসাহে কাব্যপাঠও আরম্ভ করলাম। তিনিই আমার জন্য প্রথম রবীন্দ্র গ্রন্থাবলি কিনে এনেছিলেন। তিনি নিজেও কবিতা লিখতে পারতেন, তবে সাহিত্যের এদিকটায় নজর দেবার খুব সময় পাননি। গল্প উপন্যাস প্রচুর লিখেছিলেন। যতদিন বেঁচেছিলেন সাহিত্য জগতে তাঁর বেশ নাম ছিল। তিনি যতদিন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদকের কাজ করে ছিলেন, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের সেই ছোট বিজলী বাতিহীন অফিস ঘর দুটিতে একটা ছোটখাট সাহিত্যচক্র গড়ে উঠেছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এখানে নিয়মিতভাবে আসতেন। আর আসতেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে কাজ নিয়ে আসেন। সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি অনেকে পরে কাজ নিয়ে আসেন। অফিস তখন অন্যত্র উঠে গেছে।

চারুবাবু আমাদের আর একটি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেটি ফরাসী সাহিত্য। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তখন ফরাসী শেখানর ক্লাস হত। চারুবাবু নিজে তাতে যোগ দিয়ে বেশ ভাল ফরাসী শিখে গিয়েছিলেন। আমাদেরও শিখবার খুব ইচ্ছা, অথচ ঐ ক্লাসে যোগ দিতে যাওয়ার অসুবিধা ছিল। তিনি বইপত্র কিনে এনে নিজেই আমাদের পড়াতে আরম্ভ করলেন। বেশ তাড়াতাড়িই কাজচলা গোছের বিদ্যা আমার আয়ত্ত হয়েছিল। অনেকগুলি মূল ফরাসী গল্প অনুবাদও করেছিলাম। চর্চ্চা রাখলে এ বিদ্যাটা থেকেই যেত, দুঃখের বিষয় সংসারের নানা আবর্ত্তে পড়ে সেটা আর সম্ভব হয়নি। এখন আর ফরাসী ভাষার কিছুই মনে নেই। চারুবাবু নিজেও ফরাসী সাহিত্য থেকে অনেক অনুবাদ করেছিলেন।

এলাহাবাদের এই বাড়ীতে থাকতে থাকতে দুটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে। অনাথবাবু বলে একজন যুবক প্রবাসীর জন্মসময় থেকেই তার কাজকর্ম্ম দেখার ভার নিয়ে আসেন। এঁর আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিলেন বলে কোনোদিন শুনিনি। আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন। এই বাড়ীতে আসার সময় তিনি মাসীমাদের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে রইলেন। এইখানেই তিনি দুরারোগ্য বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং তাতেই তাঁর জীবনান্ত হয়। মাসীমা নির্ভয়ে এই কালব্যাধিগ্রস্ত যুবকের সেবা শুশ্রূষা করেন। একেবারে শেষের দিকে একজন নার্স ও রাখা হয়েছিল।

আর একজনও এই বাড়ীতে থাকতে থাকতে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি সোহিনীদিদি,

মাসীমা-মেসোমশায়ের একমাত্র মেয়ে। নিদারুণ ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি এখানেই কিছুকাল ভোগেন। তারপর চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে আলমোরা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অল্পদিন থাকার পর তিনি মারা যান। মাসীমা-মেসোমশায় ফিরে এলেন। মাসীমা কান্নাকাটি করলেন আমাদের দেখে, মেসোমশায় নীরব হয়ে রইলেন। এই সময় থেকেই তিনি যেন সংসারে বীতস্পৃহ হয়ে গেলেন। জীবনের শেষের ক'টা বছর তিনি একলা একলা নানাস্থানে থাকতেন। মাসীমা ছেলেদের সঙ্গে থাকতেন। কিন্তু এ-সব এলাহাবাদ থেকে চলে আসার পরের কথা।

এদিকে বাবার উপর শাসনকর্ত্তাদের শ্যেনদৃষ্টি যেন ক্রমেই বেশী করে পড়তে লাগল। বোঝাই যেতে লাগল যে, এলাহাবাদে বাস আমাদের আর বেশীদিনের নয়। তলে তলে বাবা-মা প্রস্তুত হতে লাগলেন। এখান ছেড়ে গেলে কলকাতায় গিয়ে থাকাই স্থির হল। আমার মন ত একেবারে ভেঙে যাবার জোগাড়। জীবনের আরম্ভ থেকে এখানেই আছি, এরই আলো-বাতাসে বেড়ে উঠেছি। অন্য জায়গায় গিয়ে কি করে বেঁচে থাকব? কলকাতা দেখেছি বটে, দু-একটা মানুষকে চিনিও বটে, কিন্তু চিরকালের মত থাকব কি করে সেখানে? মন খালি আকুল হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু ছেড়ে যাবার দিন অনিবার্য্যভাবে এসেই গেল। বাবার উপর নির্দ্দেশ জারি হল, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ ছেড়ে যেতে হবে। বাবা আগেই চলে গেলেন, আমাদের থাকার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করতে। মা কিছুদিন পরে গেলেন, আমাদের সকলকে নিয়ে। এতদিনের সংসার ভেঙে তুলে নিয়ে যাওয়া ত কম ব্যাপার নয়? সঙ্গী সাথী সকলের কাছে বিদায় নেওয়া হল। তারপর এক দিন যাত্রা করতে হল, নূতন দেশ, নূতন জীবনের উদ্দেশে। এই ছাড়াছাড়ির বেদনা আমি অনেক দিন ভুলতে পারিনি। জীবনের শেষ সীমায় এসে এখনও যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন এলাহাবাদকে যেন রূপকথার রাজ্যের মত সমুজ্জ্বল দেখি। ক্রমশঃ

কর্ম্মবীর বিনয়ভূষণ ঘোষ

শিবাজী সেনগুপ্ত

শ্রীবিনয়ভূশণ ঘোষ বরিশাল শহরে ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর পিতা ৺শ্রীনাথ ঘোষ মহাশয় বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। বরিশালে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট এবং সৎসাধারণের কাছে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

বিনয় ভূষণ ঘোষ

বিনয় ভূষণের শিক্ষারম্ভ হয় সে যুগের প্রখ্যাত নেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে। সাধুচরিত্র চিরকুমার জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর এবং এই বিদ্যালয়ের অন্যান্য আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকদের হাতে গড়া একদল ছাত্র শুধুই বাঙলাদেশের নয়, বস্তুত সমগ্র ভারতের গৌরব বৃদ্ধি ক'রেছিল; একজন বিশিষ্ট বৃটিশ রাজপুরুষ এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে ব'লেছিলেন—

"B. M. Institution is Oxford of India"

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বরিশালে জাতীয় জাগরণের সূচনা হ'য়েছিল, পরে সমগ্র ভারতে তা ছড়িয়ে প'ড়েছিল। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, বাঙলাদেশ থেকে সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত সেদিনকার মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হ'য়ে সমগ্র ভারতের নরনারীকে একসঙ্গে মিলিত ক'রে এক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?" বরিশাল শহরের রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হ'য়েছিল, সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রেছিলেন আবদুল রসুল সাহেব। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই সভায় দাঁড়িয়ে বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণে দেশবাসীকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে তারই পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে আমরা দেখেছি।

এই পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং ব্রজমোহন

বিদ্যালয়ের মতো একটি জাতীয় বিদ্যানিকেতনে ভর্তি হ'য়ে একদল দেশপ্রাণ ও বলিষ্ঠ আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সংস্রব লাভ করার ফলে বিনয় ভূষণের প্রাণেযে গভীর স্বদেশানুরাগ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছিল উত্তরকালে তা এক মহীরুহের আকার গ্রহণ ক'রেছিল এবং সেই মহীরুহের নিবিড় ছায়ায় বহু ব্যথিত ও হতভাগ্যদের আশ্রয় ও সান্ত্বনা লাভ করার সুযোগ হ'য়েছিল। আগেই ব'লেছি বরিশালে যে সময়ে তাঁর জন্ম হয় তখন বিক্ষুব্ধ বরিশাল বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সত্য সংগ্রাম মুখর। বরিশালের মুকুটহীন রাজা অশ্বিনী কুমারের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে তিনি সে সময়ে প্রেম পবিত্রতার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে এবং কর্মবীর ও পরসেবায় উৎসর্গিত প্রাণ কালীশ পণ্ডিতের Little Brothers of the Poor-এর সক্রিয় কর্মীরূপে দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পথ থেকে সহায়সম্বলহীন অনাথ আতুর কলেরা ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের তুলে নিয়ে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করতেন, Little Brothers of the Poor-এর কর্মীরা, সর্বপ্রকার ঘৃণা ও ভয় বিসর্জন দিয়ে নিজেরাই অকুণ্ঠিত ও নির্বিকার চিত্তে তাদের পরিচর্যা করতেন। বিনয় ভূষণের হৃদয়ে এই কাজের ফলে দরিদ্রদের প্রতি গভীর মমত্ববোধের সঞ্চার হয় এবং এই মমত্ববোধ তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মের উৎসরূপে কাজ করেছে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায় এমন একদল নিষ্কাম পরহিতব্রতী ছাত্র তৈরী ক'রতে চেয়েছিলেন যারা তাঁরই মতো চিরকুমার থেকে গিয়ে দরিদ্র ও নিঃসহায় জনগণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করবে। তাঁর সে প্রয়াস সার্থক হ'য়েছিল। বিনয়ভূষণ ঘোষ সেই ছাত্রদেরই মধ্যে একজন। তিনিও ছিলেন চিরকুমার ভগবৎভক্তি পরায়ন। তিনি ও তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সহায় সম্বলহীন শত শত অনাথ আতুর ও দারিদ্র নরনারীর অশ্রুমোচনে। তিনি সারাজীবন ধরে নিয়মিতভাবে বহু ছাত্রছাত্রীর স্কুলের ও কলেজের বেতন ও পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করার জন্য অর্থ দান ক'রে গিয়েছেন, যাদের দেখবার বা ভরণপোষণ করার কেউ নেই এমন অসংখ্য দুস্থ নরনারীকে তিনি মুক্তহস্তে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রে তাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর একজন শিক্ষককে তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল মাসিক ত্রিশ টাকা ক'রে গুরু-দক্ষিণা হিসাবে সাহায্য দিয়েছেন। এইভাবে তিনি তাঁর উপার্জিত অর্থের তিন চতুর্থাংশেরও বেশী পরের উপকারের জন্য দান ক'রে গিয়েছেন। তাঁর দ্বারা উপকৃত শোকবিহ্বল এমনি বহু নরনারীকে সেদিন তাঁর শবাধার ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে ও অশ্রুবিসর্জন করতে দেখেছি।

বিনয়ভূষণ ভগবৎভক্তি পরায়ণ ছিলেন এ কথা আগেই ব'লেছি। হিন্দুর সব পুণ্য তিথিতে তিনি উপবাস পালন ক'রতেন এবং তীর্থযাত্রীর মতো তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড়মঠে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল, শুধু যাতায়াতই ছিল না তিনি সেখানে সারাদিন অতিবাহিত করতেন এবং ভক্তিনম্র চিত্তে প্রার্থনা ক'রতেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রমের মতো বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তিনি মোটা টাকার চাঁদা দিতেন। তাঁর অন্তরের এই কোমল দিকটার কথা অনেকেরই জানা নেই।

বিনয়ভূষণের ছাত্রজীবন সম্পর্কে কিছু না ব'ললে তাঁর কথা সম্পূর্ণ বলা হবে না। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের তিনি একজন সেরা ছাত্র ছিলেন এবং পরীক্ষায় বরাবর উচ্চ স্থান অধিকার ক'রতেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ যিনি ছিলেন এই উপলক্ষে তাঁর নাম উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না— স্বাধীনতা সংগ্রামের সরিক বিপ্লবী সাহিত্যিক বিমল সেন ১৯৩৪ সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। গোর্কীর মাদার-এর ভারতবর্ষে প্রথম অনুবাদক রূপে তাঁর খ্যাতি অম্লান হয়ে আছে। ১৯২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এঁরা দুজনেই পাঁচটি লেটার এবং ষ্টার পান এবং বিনয় দুই নম্বর বেশী পেয়ে ডিভিশনাল

স্কলারশিপ লাভ করেন। উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিনয়ভূষণ কলকাতা গিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু বিমল ইংরেজের গোলামখানা ব'লে কোন কলেজে ভর্তি হ'লেন না। তিনি যাদবপুর টেকনিকাল কলেজে চার বছর পড়াশুনা চালিয়েও অর্থাভাবে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারেন নি। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি জড়িয়ে পড়েন এবং স্বাধীনতা, আত্মশক্তি, লিবার্টি প্রভৃতি নানা পত্র পত্রিকায় তাঁর অগ্নিগর্ভ রচনা প্রকাশিত হ'তে থাকায় অল্পদিনের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকার তাঁর লেখা বই ফুলঝুরি এবং স্বাধীনতার জয়যাত্রা বাজেয়াপ্ত করে, তিনি রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হ'য়ে কারাবাস এবং পুলিশের নিষ্ঠুর নিগ্রহ ভোগ করেন। এই পুলিশী অত্যাচারের ফলেই অকালে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

বিনয়ভূষণ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এম এস সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি বি সি এস পরীক্ষাতেও প্রথম হন কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি না নিয়ে এক বছর পরে ফাইন্যান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন।

তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অব্ বেঙ্গল রূপে, তারপর তিনি ভারত সরকারের বহু সংস্থায় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। দিল্লীতে খাদ্য মন্ত্রকের সচিবরূপে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং দশ বছর কাজ করেন। শেষে তিনি রাষ্ট্রপতির শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন। তিনি যে একজন দক্ষ প্রশাসনিক ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সংকটকালে সরকারের প্রধানরূপে তাঁর কাজ অনেকেরই প্রশংসা পেয়েছে, আবার অনেকে তাঁর কঠোর ও দৃঢ় প্রশাসনে সন্তুষ্ট হতে না পেরে যথেচ্ছ নিন্দাও ক'রেছেন। কিন্তু যারা তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তারা জানেন ছোটবেলা থেকে তিনি এমন এক বলিষ্ঠ আদর্শবাদের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন যে আদর্শবাদ তাঁর সমগ্র জীবনকে সঞ্চালিত ও পরিচালিত করেছে।

বিনয়ভূষণ দক্ষ প্রশাসক রূপে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রেছিলেন অতুল কর্তব্যনিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের ফলেই তা সম্ভব হ'য়েছিল। তাঁর কনিষ্ঠ ভাইয়ের মুখে শুনেছি রাত দেড়টা দুটা পর্যন্ত তিনি কাজ ক'রতেন আবার ভোর পাঁচটায় উঠে তিনি কাজ নিয়ে বসতেন। তিনি সি এম ডি এ'র চেয়ারম্যান এবং একই সঙ্গে ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় ডাইরেক্টর, গার্ডেনরিচ সিপ বিল্ডিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিকনষ্ট্রাকশন কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় যাদুঘরের সেক্রেটারি ছিলেন। ভগবৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও কর্মের সাধনায় উৎসর্গিত প্রাণ নিষ্কাম জনসেবক এই কর্মযোগসাধক পুরুষের তিরোধানে বঙ্গজননী তাঁর একটি মহান সন্তানকে হারালো।

কুটজ বন্দনা

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

মন্ত্র জানি নাই জানি, তুমি মোর সে-মুহূর্তগুলি
পূজার নৈবেদ্যসম শুভ্র তনুপুটে লহ তুলি,'
যুগ যুগান্তর ধরি' বর্ষে বর্ষে উঠিবে আন্দুলি'
লভিয়া সুন্দর নব সাজ।
যখন রবো না আমি, তখনও রহিবে তারা জাগি'
অমর যৌবন মোর অমর প্রেমের অনুরাগী
প্রণয়ের শতদলে আপনার জাগরণ-লাগি'
তোমারে বন্দিল কবি আজ।
কুটরাজ! ওগো কুটরাজ!

রবীন্দ্রনাথ ঃ স্মরণ

॥ শান্তশীল দাশ ॥

কত না ঐশ্বর্য দিয়ে তোমার ভাণ্ডারখানি ভরা;
সীমা নেই, শেষ নেই, সে ঐশ্বর্য অমেয় অপার।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি, আর মনে মনে
তোমাকে প্রণাম করি বারংবার বিনম্র হৃদয়ে।

আমাদের প্রতিদিন কাটে কী যন্ত্রণা সয়ে সয়ে;
কত রিক্ত, কত ক্ষুদ্র আমরা যে প্রাত্যহিকতার
গ্লানির বেদনা বয়ে; সেই গ্লানি, সেই বেদনার
শেষ কোথা, বুঝি এর শেষ হবে নাক' কোনদিন।

সেই রিক্ত জীবনের মাঝে কী আলোর সমারোহ!
কী উদার প্রসন্নতা, কী আনন্দ! সর্বতমোহর
আলোকের বিচ্ছুরণে জীবনের সর্ব গ্লানি ক্ষয়—
সেই আলো, সেই দীপ্তি সে তোমার ভাণ্ডারে সঞ্চিত।

সে ভাণ্ডার আমাদের হাতে তুমি তুলে দিয়ে গেছ;
সেই ধনে অধিকারী আমরা—তবুও ঘোচেনাক'
আমাদের এ রিক্ততা—কেন যে শুধুই কেঁদে মরি!
এ এক বিস্ময় বড়, প্রাচুর্যের মাঝে কী রিক্ততা!

তোমার আলোর রঙে রাঙাবো না আমরা জীবন?
কবে হবো ও মহান ঐশ্বর্যের যোগ্য অধিকারী?

জতুগৃহে

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আমার আত্মাই কুন্তী, বসুদেব সহোদর। সে-সংসারের
কানাই, বলাই আর সুভদ্রারা সকলেই রথের ঠাকুর।
অথচ দত্তক কন্যা হয়ে আসি রাজা কুন্তী ভোজের সংসারে;
আমার সম্মতি কেউ নেয়নি তো। দুর্বাসার পরিচর্যায়
নিযুক্ত হয়েছিলাম, আমার সম্মতি কেউ তখনো নেয়নি।
অবশেষে সূর্যের আলিঙ্গনে আমি হই কর্ণের জননী,
সে-শিশু ভাসাই জলে, যেহেতু করেনি সূর্য সহধর্মিনী।
হলাম পাণ্ডুর রাণী,—সে মাকে সন্তান দিতে অক্ষম
অথচ আমার পিত্রালয়ে সব পুণ্যশ্লোক রথের ঠাকুর,
আর আমি স্বর্গভ্রষ্ট, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুময় পাণ্ডুর সংসারে।

চেয়েছি অভ্যুদয়, আর তারই সাধনায় ডেকেছি ধর্মদেবতাকে,-
যিনি সাক্ষাৎ যম অথবা নিয়ম এই বিশ্বজগতের,
যার প্রতি কক্ষে সূর্য, যার তাপ স্পন্দিত সকল শরীরে।
খুঁজেছি বিশ্বের সেই ধর্মকে, যেই যম, সেই নিয়মেরে;
আর সেই নিয়মের স্পন্দিত উত্তাপের অগ্নিদেবতাকে।
তাইতো পেলাম দেহে সংযমে সক্ষম স্থির যুধিষ্ঠির।

কিন্তু কেবল এই শরীরী সত্তা নিয়ে থামতে পারি না।
আমার অভ্যুদয়ে চাই প্রাণবায়ু, চাই বায়ু-দেবতাকে।
আমার আহ্বানে সেই প্রাণশক্তি নামিয়েছি, আমার শরীরে
দুর্জয় ভীমপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি আর বিশ্বজগতের
সক্ষম শরীরগুলি সেই প্রাণে স্পন্দিত জীবন্ত সচল।
কিন্তু কেবল এই প্রাণীর সত্তা নিয়ে থামতে পারিনা।

ডেকেছি ইন্দ্রিয়-পতি সেই ইন্দ্র, মন-পুরুষেরে
পেয়েছি শরীরে তাই মনস্বী অর্জুন আর লক্ষ্যভেদী চোখ।
রথের ঠাকুর কৃষ্ণ তার সখা আর তার রথের সারথি।
আরো অভ্যুদয় চাই, আরো ঊর্ধ্বে দেবতার আলিঙ্গন চাই,
কিন্তু বিমুখ দেহ, আরো তেজ এ-শরীর ধারণে অক্ষম,
মাদ্রীকে দিলাম তাই আমার [illegible]

যুগপৎ মর্ত্য-স্বর্গ, সীমা-অসীমের যুগ্ম অশ্বিনীকুমার
মাদ্রীর দেহে নামে, নকুল ও সহদেবে শরীরে জাগায়।
এই পঞ্চ পাণ্ডবেরে' এই পঞ্চ পল্লবেরে একটি আধারে,
একটি মঙ্গলঘটে কী ক'রে প্রতিষ্ঠা করি, আমি তা জানি না।

পাঞ্চালী জানতে পারে, শুধু তার আলিঙ্গনে এই পঞ্চবটী
জীবনকে জাগ্রত পীঠস্থান মহাতীর্থ ক'রে দিতে পারে।
একমাত্র যাজ্ঞসেনী হতে পারে সব দেবতার বিগ্রহ,
আমি তার বোধনের অপেক্ষায় জতুগৃহে আগমনী গাই।

———

সূর্য-প্রণাম

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়

ছায়াচ্ছন্ন বনতলে তৃণশয্যা' পরে
ছিনু পড়ি' জড়তার অবসাদ ভরে
ক্ষুদ্র মৃত্তিকার ঢেলা—শীতল ধূসর;
সহসা স্পর্শিল আসি' তব দীপ্ত কর
মধ্যাহ্ন-গগন হতে, তব শুভ্র জ্যোতি
বর্ষিল অজস্র ধারে   ছিল না শকতি
সে রশ্মি ফিরায়ে দিব স্ফটিকের মত
বিচ্ছুরিয়া জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ শত শত।
মলিন মাটির অঙ্গে তবু জ্বলেছিল
দু'চারটি বালুকণা, তবু চলেছিল
হিম দেহে মৃদু তপ্ত জীবনের স্রোত
প্রাণের বিচিত্র ছন্দ বহি'—ওতপ্রোত।
তার পরে অরণ্যের অবকাশ পথে
হেরিনু তোমার যাত্রা জ্যোতির্ময় রথে
পশ্চিম দিগন্ত পানে।

অস্তে গেছ তুমি,
অন্ধকার ঘিরে অসে মৌন বনভূমি।
প্রাণতপ্ত জীবনের প্রবাহ আবার
হিম হয়ে আসে, ছায়া-ম্লান দেহে আর
জ্বলে না বালুকাকণা; তবু রাখিলাম
তোমার উদ্দেশে এই অক্ষম প্রণাম।

গর্জে ওঠে বারিধি

এপারে ওপারে

শ্রীবাণীকুমার দেব

পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরীর ঘুম ভেঙেছে আজ
গঙ্গা শিপ্রা বেত্রবতীর বান ডেকেছে আজ
ঝিলম নদীর ঝিল্‌মিলানি
গুপ্তবার্তা দেয়রে আনি
তাই শোনে দেখ শীতলক্ষা রক্তে রাঙায় তাজ ।

তিতাস নদীর পিয়াস পায়রে শত্রু শোণিত লাগি
ময়নামতী কর্ণফুলী ওঠল ফুলে রাগি
চূর্ণীনদী উর্ম্মিমালায়
লক্ষ ফণার অগ্নিজ্বালায়
ব্রহ্মপুত্র শত্রুসেনায় হানল মরণ বাজ ।

মাতলা নদী মাতাল হাসির ফেণায় ফেনায় কয়
রণং দেহি রণং দেহি জাগাইবে বিস্ময়
পিয়ালী ওই আওলা কেশে
আড়িয়ালখা জাগল হেসে
সিন্ধু নদও শান্ত নয়রে রুদ্ধ ক্ষিপ্ত আজ ।

ভৈরবের ঐ ঘূর্ণীপাকে মৃত্যু নেচে উঠে
কালিন্দীর ঐ ক্রুদ্ধ বারি গর্জ্জে গর্জে ছুটে
ঘর্ঘরা আজ খড়্গা লয়ে
মধুমতি মত্ত হয়ে
ময়ূরাক্ষীর ময়ূরী-ঢেউ পরল রণের সাজ ।

শিক্ষাব্যবস্থার কথা

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় "দেশ" পত্রিকায় লিখিয়াছেন :

আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে অস্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছে, তারও কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের শিক্ষাকে প্রকৃত জ্ঞান আহরণের বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ ও চরিত্র গঠনের উপায় হিসাবে অবলম্বন না করে তাকে শুধু যে-কোন উপায়ে জীবিকা অর্জনের একমাত্র পন্থা হিসাবে সীমিত করে রেখেছি। জীবিকা অর্জনই যে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় সেই সহজ ও সত্য কথাটি শিক্ষার্থীদের মনে জাগিয়ে তুলতে পারিনি। জীবিকা অর্জনে পশু ও মানুষে কোন প্রভেদ নেই—উভয়েরই বেঁচে থাকার জন্য আবেগ এবং প্রয়োজন আছে প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন তাই এ হতে অন্য কিছু অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি। এখানেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা। ফলে, আমরা মানুষ না গড়ে আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে সৃষ্টি করেছি কতকগুলি যেনতেন প্রকারেণ জীবিকা অর্জনের বিচার মূঢ়, উদ্ভাবনী শক্তিহীন, অপটু, শ্রমকাতর কর্তব্যবিমুখ কলের পুতুল বা তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত মূর্খ। তাই শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের বেশীর ভাগ পরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা একপ্রকার ব্যর্থ হতে চলেছে।

স্বাধীন ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে আমাদের দেশের একজন বরেণ্য মনীষী চিন্তানায়কের উক্তি মনে পড়ে। তিনি তাঁর একটি রচনায় লিখেছিলেন—বেদের যুগে আমাদের দেশ ছিল ঋষিপ্রধান, মনুর সময় ছিল ব্রাহ্মণপ্রধান, ব্যাসের সময়ে ছিল ক্ষত্রিয়প্রধান, শ্রীমন্ত সদাগরের সময়ে ছিল বৈশ্যপ্রধান এবং মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বকালে ছিল শূদ্রপ্রধান। এই উক্তিটির সঙ্গে এখন জুড়ে দিতে হয় যে স্বাধীন ভারতে আমরা হয়েছি অসুর বা বর্বরপ্রধান। অনেকেই জানেন যে, আর্য্যদের ভারতে প্রবেশ কালে তাঁদের সঙ্গে অসুররা বা দস্যু নামক অনার্য জাতির সংঘর্ষ ঘটেছিল। সুতরাং এদের আর্যসমাজের গণ্ডির বহির্ভূত শূদ্রেরও অন্ত্যজ বলা যায়; অপর কথায় আমাদের আচরণ আসুরিক মনোবৃত্তির অনুযায়ী। এই আসুরিক মনোবৃত্তি বললে কি-বুঝায় তা যদি কেউ বিস্তারিতভাবে জানতে চান তবে তিনি গীতায় দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগ যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায়টি পাঠ করতে পারেন। এখানে আমি অধ্যায়টি হতে একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে সংক্ষেপে তার পরিচয় দিচ্ছি :

> "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
> অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্"

ইহার অর্থ ;"হে পার্থ, দম্ভ, দর্প, অহংকার, ক্রোধ নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানই হচ্ছে আসুরিক সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোবৃত্তি।

আজ স্বাধীন ভারতে বিশেষত পশ্চিম বাংলায় যে সব পাশ্চাত্য সাম্যবাদপন্থী বা তান্ত্রিক দল জনকল্যাণের নামে সমবুদ্ধির দোহাই দিয়ে মহাকলরবে শুধু ভেদবুদ্ধির প্রচার করছেন, তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে হিংসা বিদ্বেষ, বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি আত্মঘাতী তামসিক মনোবৃত্তি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের দেহমনকে রোগের বীজাণুর মত ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। একমাত্র যাঁরা আপনার স্বার্থের ও পরের স্বার্থের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন না, অর্থাৎ যাঁরা নিজের কল্যাণকে সকলের কল্যাণ বলে এবং সকলের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ বলে মনে করেন তাঁরাই একমাত্র জনকল্যাণ কার্যের উপযোগী। আজ

আমাদের দেশে এরূপ নেতারই প্রয়োজন হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এক কথায়, স্বার্থের সঙ্গে যেন পরার্থের প্রত্যাশা করতে পারি। সদুপায়ে জীবিকা অর্জনের ইহাই একমাত্র পথ।

সোভিয়েতের সাহায্য দান

ইউ এস এস আর কনসুল কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ সরবরাহ পত্রে প্রকাশ:

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সোভিয়েত সাহায্যে তিন শতাধিক প্রধান প্রধান শিল্পপ্রকল্প গড়ে উঠছে। সোভিয়েত সাহায্যে এই সমস্ত দেশে ইতিমধ্যেই চার শতাধিক কল-কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রেলওয়ে ও মোটর হাইওয়ে তৈরির কাজ শেষ হয়েছে, ভারতে ভিলাই লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, মিশরে আসোয়ান জলবিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং আফগানিস্থানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-নির্মাণ কারখানা তার অন্যতম।

এই সমস্ত দেশের মানুষকে বিশেষজ্ঞরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারেও সোভিয়েত সাহায্য করেছে। সোভিয়েত কারখানায় তারা উৎপাদনের কাজে হাত রপ্ত করেছেন। নূতন নূতন যন্ত্র কেনার জন্য ও প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহজ সর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়েছে। এই ঋণের পিছনে কোন রাজনৈতিক সর্ত নেই।

অবৈধভাবে অস্ত্র সংগ্রহ

পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রনীতিতে কিছুকাল পূর্ব্বে নরহত্যা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। পাক সৈন্যদিগের বর্ব্বরতা দেখিয়া বর্ত্তমানে ঐ হত্যাকাণ্ডে কিছুটা ভাটা পড়িয়াছিল। কিন্তু ঐ পাশবিক প্রবৃত্তির পুনর্জাগরণ হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং "ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে প্রকাশিত, এই স্থলে উদ্ধৃত খবরটি বিশেষ উৎসাহজনক নহে:

বাংলাদেশে সর্বত্র আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রচুর পাওয়া যায়। দামেও সস্তা, নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যেও কেহ কেহ আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে। পাক বাহিনী আত্ম-সমর্পণের পূর্বে তাহাদের অস্ত্রাগার উজাড় করিবার নিমিত্ত অবাঙ্গালী লোক-জনদের ডাকিয়া আনিয়া অস্ত্র-শস্ত্র বিলাইয়া দিয়াছিল। ঐ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাহারা অনেকে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে ভারতেও প্রবেশ করিয়াছে অনুমান করা যাইতেছে। তাহারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত তথা নিরাপদ আশ্রয়ের বিনিময়ে ঐ সকল অস্ত্র আশ্রয়দাতাগণকে দিতেছে। ভারতের কোন কোন রাজনৈতিক দল ঐ অস্ত্র সংগ্রহে সবিশেষ তৎপর হইয়াছে।

ভিয়েৎনাম মার্কিন হত্যা কার্য্যের হিসাব

ইউ এস এস আর কনসুল কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ সরবরাহ পত্রে প্রকাশ:

পেন্টাগণের কম্পিউটার যন্ত্রগুলি বড় চমৎকার। সত্যি সত্যি আশ্চর্য্য ব্যাপার—আধ সেকেণ্ডের মধ্যে তারা মেলডিন লেয়ার্ডের জন্যে যে কোন হিসাব তৈরী করে দিতে পারে। দেখে মনে হয় যে, যিশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করতে কত খরচ পড়েছিল এই হিসাব চাইলে কম্পিউটারগুলি তৎক্ষণাৎ তাদের রক্তবর্ণ চক্ষুগুলি মিট্ মিট্ করে কত ডলার কত সেন্ট খরচ হয়েছিল বলে দেবে। যে জল দিয়ে পনটিয়াস পিলাটাস তার হাত ধুয়েছিল এবং ক্রুসে যেসব পেরেক মারা হয়েছিল সে সবের জন্য খরচের হিসাবও বাদ যাবে না। কিন্তু পেন্টাগণে কি একজন ভিয়েৎনামী সৈন্যকে বধ করতে কত খরচ হয় তা' হিসেব করা হয়নি? একটা বুলেটের দাম গড়ে পাঁচ সেন্ট, আর একজন ভিয়েৎনামী সৈন্যকে খুন করতে গড়ে এক লাখ বুলেট খরচ হয় (৯৯,৯৯৯টি বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নষ্ট হয়)। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে নিহত সৈন্যপ্রতি বোমা, গ্যাস ও সাজসরঞ্জামের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ খরচা; যারা গুলি ছুঁড়ছে ও বোমা ফেলছে তাদের মাইনে, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজসরঞ্জাম বাবদ ব্যয়; রণক্ষেত্রে ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে থাকার জন্য ভাতা এবং পরিবহন ও অন্যান্য জিনিস বাবদ ব্যয়।

দেখা যাচ্ছে একজন ভিয়েৎনামী সৈন্যকে বধ করতে খরচ পড়ছে প্রায় দশ হাজার ডলার।

এই হিসাব প্রকাশ করা হয় ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মকালে এবং ওয়াশিংটন পোস্টএর ২১শে জুনের সংখ্যায় এই হিসাব উদ্ধৃত করা হয়। খুনের খরচ বড় বেশী বলে সাব্যস্ত হয় এবং ভিয়েতনামে আগ্রাসন বাবদ ব্যয়ের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক স্বাস্থ্য রীতিমত ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে পেণ্টাগণের বিশেষজ্ঞদের খরচ কমানোর উপায় খুঁজে বের করার হুকুম দেওয়া হয়। আমরা যে কি বলতে চাচ্ছি তা' বোধ হয় পাঠকরা স্মরণ করতে পেরেছেন। আমরা বলছি কুখ্যাত ভিয়েৎনামীকরণের কথা। মার্কিন সৈন্যদের স্থান গ্রহণ করল সাইগণের ভাড়াটিয়া সৈন্যের দল। তাদের জন্য টাকা কম দিতে হবে, কাজেই যুদ্ধের খরচা কমে যাবে।

এক বছর অতিক্রান্ত হল। কমপিউটার চালকরা আবার কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মশার মত ঝাঁকে ঝাঁকে অঙ্ক দেখা দিতে লাগল, আর প্রত্যেকটি অঙ্কই ভিয়েৎনামীকরণের ধারণার প্রবর্তকদের হুল ফুটিয়ে দিতে থাকল। যুদ্ধের তা শেষ নেই, কিন্তু খরচা যে ভীষণ বেশী পড়ছে। অঙ্কটঙ্ক কোন কোন লোকের কাছে বড় বাজে ঠেকে, কিন্তু আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে এখানে আপনারা যে সব অঙ্ক দেখবেন তাতে আপনারা উদাসীন থাকতে পারবেন না। মার্কিন সংবাদপত্র, প্যারিসের মঁদ এবং হামবুর্গের ড্যের স্পিয়েগেল থেকে এইসব অঙ্ক ধার করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় দলের ন্যায়বোধ

ফণিভূষণ দাস "যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে লিখিয়াছেন :

কথায় বলে 'যা রটে, তা কিছুটা বটে'। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগতে এক রটনার মূলে যে ঘটনা ঘটে গেল, তারই এক কাহিনী তুলে ধরছি। সাপ্তাহিকী স্বস্তিকা (৬।১২।৭১) লিখেছেন- 'প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, শ্রীপ্রিয়দাস মুন্সী ল'য়ের ইণ্টারমিডিয়েট ও ফাইনাল পরীক্ষা এক সঙ্গে দিয়েছিলেন। ফল প্রকাশের পূর্বে তিনি জানতে পারেন যে ইণ্টারে নাকি তিনি ফেল করেছেন। এই কথা জানতে পেয়ে শ্রীমুন্সী দিল্লী থেকে উপাচার্যকে চিঠি লেখেন যে, ল' পরীক্ষায় প্রচুর টোকাটুকি হয়েছে। এ পরীক্ষার কোন মানে হয় না। আবার তিনি যেন পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং তা না করলে পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে আলোচনা হবে।' উপাচার্য যথারীতি সিনেটের মিটিং মারফৎ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এদিকে ছাত্র-পরিষদের পাণ্ডারা জানতে পারে যে তাদের পরীক্ষার্থীরা সব পাশ করেছে। সুতরাং পরীক্ষা বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁরা মুখর হয়ে ওঠেন এবং হাইকোর্টে এই আদালতের বিরুদ্ধে আপীল করেন। হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখলে ছাত্রপরিষদের সদস্যরা দারুণ ক্ষেপে যায়। তারপর গত ২৩শে নভেম্বর তারিখে উপাচার্যের কামরায় ঢুকে বর্বর আচরণ করে এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়। সবচেয়ে দুঃখের কথা হল উপাচার্যের ঘরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবিটি ছাত্রপরিষদের সমর্থকরা একেবারে ছিঁড়ে ফেলেছেন।'

এতদিন জানতাম মার্কস্‌বাদী পার্টিগুলোই এইসব হামলা করে। এখন দেখছি নির্ভেজাল গান্ধীপন্থী নবকংগ্রেসের বীর সৈনিক ছাত্রপরিষদও কম যায় না। ভারতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান সংকল্প ও আদর্শ ঘোষণা করেছেন নবকংগ্রেস। তবে স্বার্থে আঘাত লাগলেই সাধারণতঃ আদর্শ বিচ্যুতির ঘটনা ঘটে। যন্তর মন্তর রোড ও মেদিনীপুরে কংগ্রেস ভবন জোরপূর্বক দখলের দৃষ্টান্তে ছাত্রপরিষদ অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

"যুগবানী" সাপ্তাহিকে অধীর দাসশর্মা শিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

ভারতীয় প্রাচীন রাজা রাজড়াদের মধ্যে সবাই যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন তা নয়। অনেকেরই ধর্মীয় উদারতা এবং মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা

ধর্ম প্রবর্তকের আবির্ভাব হয়। কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধবাচার্য, বল্লভ প্রমুখ ধর্ম প্রবর্তকগণ হিন্দুধর্মের পুনরুভ্যুদয় ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা সঞ্চারে বিশেষ সহায়তা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রভূত উন্নতি হয়। ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহট্ট, সন্ধ্যাকর নন্দী ও কবি জয়দেব বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। নবশক্তিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নবজাগরণ হয়। জাতীয়তাবাদের যে রূপ একদিন বুদ্‌বুদের মত দেখা গিয়েছিল, তা নিঃশ্বাসেই শেষ হয়ে যায়। তার পরিণাম রাজ্যায় রাজ্যায় যুদ্ধ। খণ্ড খণ্ড জাতির অভ্যুত্থান। তুর্কী আক্রমণ। পরবর্তী ইতিহাস আমাদের সুন্দর জানা। নবদ্বীপ ছেড়ে লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন। বিশ্বাসঘাতকদের হাতে সিরাজদৌল্লার পরাজয়। মুসলমান শাসনের অবসান। ইংরেজ আমলের প্রতিষ্ঠা। একাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল পর্য্যন্ত এই সব ঘটনার সাথে যদিও রাজনীতির সম্যক পরিচয়, কিন্তু এই উত্থান পতনের সাথে জনসাধারণের যে একটা ভূমিকা আছে বা থাকতে পারে সেটা অস্বীকার করা যায় না। বহিঃশত্রুর দ্বারা ভারতবর্ষ বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে। দেবমন্দির ধ্বংস জনসাধারণের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও গণহত্যা সবই সংঘটিত হয়েছে। এই সব আক্রমণের মুখে জাতীয় চরিত্র বারে বারেই ভেঙ্গে পড়েছে। ঐশ্বর্য যেমন জাতির স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজন, জাতি গঠনের জন্য তেমন প্রয়োজন শিক্ষার। ঐশ্বর্য যদি হয় দেহের মাংসপেশী, শিক্ষা হল তাহলে মেরুদণ্ড। এই দুয়েরই দরকার।

বৌদ্ধযুগের পর সার্বজনীন শিক্ষার প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণ্য যুগে আর লক্ষ্য করা যায় না। এই অরাজকতার মধ্যে সংস্কৃতের সাথে সাথে আরবি ফারসি ভাষারও চর্চা হতে থাকে। রাজা রামমোহন রায় যে ইংরেজী শিক্ষার কথা বলেছিলেন সেই ভাষাও নিরক্ষর কৃষকের কাছে অভিজাত শ্রেণীর ভাষা বলেই পরিগণিত হয়েছিল। মধ্যযুগে সংস্কৃতের সাথে আরবি, ফারসি ভাষাও অভিজাত শ্রেণীর ভাষা হিসেবেই গণ্য হয়।

এখন ভারতবর্ষে প্রাদেশিক ভাষার অভাব নেই। এই প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ইংরেজী বিদেশী ভাষা। ইংরেজীর প্রতি আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা নেই। কিন্তু ভারতীয় ভাষা বলে আজও কিন্তু কোনো ভাষা ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে নি। জাতির ক্ষেত্রে এটা যেমন একটা ব্যর্থতা, সেইরূপ শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা একটা অপূর্ণতা। বিশ্বের রাজনীতি বর্তমানে অনেক পালটিয়েছে। উপনিবেশিকতা হয়ত চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা তো আর চলে যায় নি।

সেখানে জোড়াতালি চলে না। আর জোড়াতালি দিয়ে চালাতে গেলে দেশের উন্নতি যে বিশেষ হবে বলে মনে হয় না।

সাময়িকী

শেখ মুজিবুর রেহমানের স্বদেশে প্রত্যাগমন

সভ্যজগতের সকল মানুষ ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ সমাপ্তির পরে একটি কথা লইয়া বিশেষ চিন্তাক্রান্ত হইয়াছিলেন; কথাটি হইল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রেহমানের দৈহিক স্বাস্থ্যের কথা এবং তিনি সুস্থদেহে থাকিলে তাঁহার যথাশীঘ্র মুক্তি ও স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থার আবশ্যকতা। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছিলেন যে ইয়াহিয়া খান যেরূপ পাশবিকতার ক্ষেত্রে কীর্তিমান তিনি হয়ত তাঁহার স্বভাব সুলভ মিথ্যাজাল বুনিবার প্রেরণা শেখ মুজিবুর রেহমানের বিষয়েও পূর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া জগতকে শেখ মুজিবুরের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। হয়ত ঐ মহানচেতা মানুষটিকে তিনি সকলের অজ্ঞাতে হত্যা করিয়া বসিয়া আছেন। যে ব্যক্তি নরহত্যাকে কোন পাপ বলিয়া মনে করে না ও যাহার হুকুমে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু নির্ম্মমভাবে হত আহত ধর্ষিত নিপীড়িত হইয়াছে সে যদি কোন শত্রুপক্ষের নেতাকে হত্যা করায় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকে না। শুনা যায় যে ইয়াহিয়ার আদেশে শেখ মুজিবুর রেহমানকে প্রাণে মারিবারই ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ ক্রমাগত তীব্রগতিতে পরাজয়ের গভীরে চলিয়া যাইবার কারণে সে আদেশ পালন করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাঁহার জন্য কবর খনন করাও হইয়াছিল, কিন্তু কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে সরাইয়া ফেলাতে ইয়াহিয়ার রক্ততৃষ্ণা আংশিক ভাবে অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। ইহা বিশ্বমানবের মঙ্গলের দিক দিয়া উত্তমই হইয়াছিল; কেননা শেখ মুজিবুর রেহমানকে হনন করিলে তাহার ফল বিষময় হইত সন্দেহ নাই। পাকিস্থানের মানুষ সেরূপ হইলে বহুযুগ ধরিয়া সেই পাপের জন্য শাস্তি পাইতে থাকিত এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পাকিস্থানের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো কিছুদিন পূর্ব্বেও সর্ব্বতোভাবে বাংলা দেশের শত্রুতা করিয়াই চলিতেন। তিনি শেখ মুজিবুর রেহমানকে মুক্তি দান বিষয়ে কিছুটা সুবুদ্ধি কি করিয়া দেখাইয়া ফেলিলেন তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার পরামর্শদাতা বিদেশী শ্বেতকায়গণ তাঁহাকে বলিয়া থাকিবে যে তাঁহার ও তাঁহার দেশের পক্ষে ঐ পন্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। শেখ মুজিবুর জীবন্ত ও সুস্থ অবস্থায় স্বদেশে ফিরিয়া না যাইলে পাকিস্থানকে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াই থাকিতে হইত এবং তাহার ফলে পাকিস্থান সমূলে বিনষ্ট হইত। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্থান বাংলাদেশে স্থান না পাইলেও অন্য সকল প্রদেশগুলি লইয়া নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে।

ভুট্টোর আশা ছিল বাংলাদেশের সহিত পাকিস্থানের হয়ত একটা নাম বাঁচান সংযোগ রক্ষা সম্ভব হইবে। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের ঐরূপ কোন ব্যবস্থা একান্তই অপ্রিয় মনে হওয়াতে পাকিস্থানের সহিত সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাই শেষ অবধি সর্ব্বজন মনঃপূত হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। ভুট্টো মুখে যাহাই বলুন কার্য্যতঃ বাংলাদেশের সহিত সংযোগ সৃষ্টি তাঁহার অভিপ্রেত নহে বলিয়াই আমরা মনে করি। কারণ তিনি ৫॥০ কোটি মানুষকে যে ৭॥০ কোটি মানুষের উপর প্রভুর আসনে বসাইতে পারিবেন এমন কথা কখনও ভাবিতেও পারেন নাই। সুতরাং নিজের দেশের স্বাধীনতা সহজভাবে উপভোগ করিতে হইলে ভুট্টোকে বাংলাদেশ বর্জ্জন করিতেই হইবে একথা ভুট্টো বুঝিয়াছিলেন। পাকিস্থানের সেনাবাহিনী বাংলা দেশের ঘরে ঘরে রক্ত বহাইয়াছে, নারীদিগকে চরম অপমান করিয়াছে, বালকবালিকা ও শিশুদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে—এমত অবস্থায় বাংলাদেশ কখনও পাকিস্থান অন্তর্গত থাকিতে চাহিবে ইহা মনে

করা যায় না। ইয়াহিয়া খানই ইহার জন্য দায়ী এবং ইহার কোনও প্রতিবিধান এখন আর সম্ভব নহে। বাংলাদেশ পাকিস্থান হইতে পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া গিয়াছে ও সেই পার্থক্য নতুন সৃষ্ট কোনও ব্যবস্থা করিয়া দুর করা যাইবে না; কারণ ভৌগলিক, জাতি, ভাষা কৃষ্টি অনুগত সকল বৈশিষ্ট বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে বাংলাদেশের মানুষ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্থান ও পাখতুনিস্থানের মানুষের সহিত এক জাতির নহে। এক রাষ্ট্রে বহুজাতি মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে যদি সকল জাতির মানুষ অপর সকল মানুষের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার স্বীকার ও রক্ষা করিয়া চলে। পাকিস্থানে পশ্চিম পাকিস্থানীগণ পূর্ব্ব পাকিস্থানকে উপনিবেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। নানাভাবে নানা উপায়ে পশ্চিম পাকিস্থানী মানুষ পূর্ব্ব পাকিস্থানের মানুষকে শোষণ করিয়া নিজের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া লইত। অনেকের মতে বিগত ২৪ বৎসরে এই শোষণের আর্থিক হিসাব ৫০০০ হাজার কোটি টাকার উপরে যায়। সকল উচ্চপদের চাকুরী, সকল প্রভুত্বের অধিকার, সকল ব্যবসায় যে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্থানের একাধিপত্যের অধিকারে প্রায় সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকিত, সেখানে পূর্ব্ব পাকিস্থানের লোকেদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোনও না কোন সময়ে অবশ্যই আরম্ভ হইত। ইয়াহিয়া খান শুধু পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক শাসন শৃঙ্খল আরও কঠিন ও গুরুভার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া সংগ্রাম আগ্রহকে দ্রুততালে গতিশীল করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার উপর ছিল ইয়াহিয়ার মিথ্যা ও মতলববাজীর খেলা। ঝঞ্ঝা ও বন্যা বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে কোন সাহায্য না করিয়া, এমনকি অপর দেশ প্রদত্ত সাহায্যের টাকা ও দ্রব্যসম্ভার গায়েব করিয়া লইয়া; সামরিক শাসক প্রথমত নিজেদের স্বার্থপরতা অতি প্রকটভাবে প্রদর্শিত করিলেন। পরে যখন বাংলাদেশবাসী সাধারণ প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন তখন ইয়াহিয়া খান তাঁহাদিগকে ক্রমাগত নানান মিথ্যা প্ররোচনায় শান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন ও শেষ পর্য্যন্ত একটা শাসনভার জনগণ হস্তে তুলিয়া দিবার মিথ্যা অভিনয়ের সূচনা করিয়া বিষয়টাকে সহজ ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনার বাহিরে ঠেলিয়া দিলেন। একটা নির্ব্বাচন করিয়া যখন দেখা যাইল যে ইয়াহিয়া খানের শাসন অধিকার বজায় রাখা আর কোন মতেই চলিবে না; তখন গোপনে সৈন্যবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা চলিতে লাগিল এবং স্থির হইল যে বাঙ্গালী জাতিকে বিনাশ করা ব্যতীত অন্য উপায়ে দমন করা সম্ভব হইবে না। তাহার পরে যাহা করা হইল তাহা সকলেই জানেন। বাঙ্গালী জাতি বিনষ্ট হইল না। পাকিস্থানেরই বিনাশ ঘটিল।

সৈন্যদল ও সাধারণ নাগরিক

সৈন্যবাহিনীর লোকেরা যখন সাধারণ নাগরিকের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য হয়, যথা, যখন কোন সহরে সেনাবাহিনীর ছাউনী স্থাপিত হয়, অথবা যখন যুদ্ধ চলিতে থাকে ও সৈনদল বহু সহরের ভিতর দিয়া গমনাগমন করে তখন সৈন্যদিগের ব্যবহার লইয়া নানান আলোচনা—সমালোচনা না হইয়া যায় না। আসাম হইতে প্রকাশিত "যুগশক্তি" পত্রিকায় এই বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া সকলেই ভারতীয় সৈন্যদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে আনন্দিত হইবেন। আমরা সেই মন্তব্যগুলির কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

সেনা বাহিনী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা ভীতি আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মিত্র বাহিনীর সৈন্যরা (যার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যরাও ছিল) নাগরিক জীবনে অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার যে বন্যার সৃষ্টি করেছিল, মুখ্যতঃ তা থেকেই এই ভীতির জন্ম। গৌহাটি বা শিলচরেও কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে সেনা বাহিনীর লোকদের মনোমালিন্য ও পরিনামে অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদও আছে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কারণ অত্যন্ত নগণ্য। তবুও এ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে করিমগঞ্জ শহরের বুকে যখন বেশ কিছু সৈন্য

সমাবেশ ঘটল, তখন অনেকেই আশঙ্কা বোধ করেছিলেন, সেই পুরণো ভয়ের সূত্রে।

কিন্তু গত ক' মাসে শহরবাসী আমাদের সৈন্যদের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছেন, তাতে এদের শৃঙ্খলা পরায়ণতা, সৌজন্যবোধ ও পরিচ্ছন্ন নাগরিক চেতনা সম্পর্কে অতি বড় সমালোচকও সোচ্চার না হয়ে পারেন নি। সেনা বাহিনীর আবাসস্থল ছিল শহরের ঠিক মধ্যস্থলে তিনটি প্রতিষ্ঠানে, যার অতি সংলগ্ন মেয়েদের কলেজ এবং একটি মেয়েদের স্কুল। এমন একটি ঘটনাও কেউ উল্লেখ করতে পারেন নি যে আমাদের জোয়ানদের আচরণে পথচারিণী অজস্র ছাত্রীদের বিব্রতবোধ করার একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের জোয়ানদের যুদ্ধ যাত্রা দেখার জন্যে অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে পুরনারীরাও পথের পার্শ্বে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ভীড় জমাতেন, কোনও দিনই কোনও অশালীন দৃষ্টি তাদের বিব্রত করে নি। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে এটা ধারণার অতীত ছিল। সেনা বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছি তাঁরা প্রথমেই জোর দিয়ে বলেছেন যে নাগরিক জীবনের কোনওরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিয়ে কোনও সুযোগ তাঁরা নিতে চান না। তাঁদের অধীনস্থ জোয়ানরা অক্ষরে অক্ষরে সে কথার মর্যাদা রেখেছেন। শহরের ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, রিক্সাচালক, মুটে-মজুর অনেকের সঙ্গেই সেনা বাহিনীর লোকদের প্রয়োজনে সংশ্রব রাখতে হয়েছে কিন্তু কোনও ক্ষেত্রে দাপট দেখানোর কোনও প্রবণতা দেখা যায় নি। বরঞ্চ জনসাধারণের কৌতূহলী ভীড় জোয়ানদের কর্তব্য কর্মে কোনও কোনও সময় অসুবিধা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ওরা হাসিমুখে সেটুকু সহ্য করে যথাসম্ভব জনতার কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করেছেন। জকিগঞ্জ অপারেশনের সময়ে এবং তারপর নদীর পারে অজস্র জনতার ভীড় সেনা বাহিনীকে পর্য্যাপ্ত ঝামেলায় ফেলেছে, কিন্তু খোদ যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমাদের জোয়ানদের সৌজন্যবোধে ঘাটতি দেখি নি।

এই সংক্রান্ত আর একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতীয় সৈন্যগণ যে বাংলাদেশের জন সাধারণের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু যাহাদের পরাস্ত করিয়া তাঁহারা বাংলা দেশকে স্বাধীনতা পাইতে সক্ষম করিয়াছেন সেই পাক্ বাহিনীর সৈন্যদিগের প্রতি তাঁহাদিগের ব্যবহার পৃথিবীর সকল ব্যক্তিকেই আশ্চর্য্য করিয়াছে। পাক সৈন্যগণ যদিও সামরিক সকল সেনাদিগের বীর ধর্ম্ম ভুলিয়া বর্ব্বরতা ও জঘন্য পাশবিক নৃশংসতায় ডুবিয়া ছিলেন; ভারতীয় সৈন্যগণ সেই কারণে নিজেদের কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া "যেমন কুকুর তেমনি মুগুর" নীতি অনুসরণ করেন নাই। সেই কর্তব্য-জ্ঞান পাক সৈন্যদিগকে তাহাদিগের পাপের শাস্তি হইতে সাময়িক ভাবে বাঁচিয়া যাইতে সক্ষম করিয়াছে। এইরূপ না হইলে তাহাদের যে চরম দুর্গতি হইত তাহা তাহাদের ন্যায়ত প্রাপ্য বলিয়া ধরিলেও সেইরূপ ব্যবহার না করাতে ভারতীয় সৈন্যদিগের সুনাম বিশ্ব-ব্যপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দেশ-বিদেশের কথা

পাকিস্থান ধ্বংস হইল

ঢাকা হইতে প্রকাশিত "ফ্রিডম" পত্রিকাতে শ্রীতাজুদ্দিন আহমেদ মুজিবনগর হইতে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশ রিপাবলিক সংস্থাপন ঘোষণা করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন তাহা ইংরেজীতে মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইহা ২৫শে মার্চ্চ হইতে যে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয় তাহা সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া পড়িবার পরে লিখিত। আর ঐ ঘোষণার সারমর্ম নিম্নে দিতেছি।

"বাংলাদেশ যুদ্ধেলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে স্বায়ত্ব শাসন অধিকার পাওয়া অসম্ভব দেখিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের উপনিবেশ স্থাপন-কারী উৎপীড়কদিগের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম চালনা আরম্ভ করিতেই হইতেছে।

"পাকিস্থান সরকার বিশ্ববাসীকে নিজেদের গণহত্যা কার্য্য সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখিবার জন্য ক্রমাগত যে অপপ্রচার চালাইতেছে তজ্জন্য বাংলাদেশকেও প্রকৃত অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতে হইতেছে। শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশবাসী সাধারণতন্ত্র অনুগত পথ ছাড়িয়া কি কারণে যুদ্ধের পথে চলিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা সকলকে জানান আবশ্যক।

"পাকিস্থানকে যদি প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয় তাহা হইলে বাংলাদেশবাসী কি সর্ত্তে সেই প্রতিষ্ঠান অন্তর্গত থাকিতে পারেন তাহা ছয়টি সর্ত্তগত করিয়া আওয়ামী লীগ দেখাইয়াছেন। জাতীয় নির্ব্বাচনে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন দখল করেন। মোট আসন সারা পাকিস্থানে ছিল ৩১৩টি। আওয়ামী লীগ সারা দেশের মোট আসনের শতকরা ৮০টি দখল করেন ও তাঁহাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিঃসন্দেহে স্থির হইয়া যায়।

"নির্ব্বাচনের পরবর্ত্তি সময় আশায় পূর্ণ ছিল, কেননা এত পরিষ্কার ভাবে কেহ প্রায় কখন কোন দলের সপক্ষে ভোট পড়িতে দেখেন নাই বলা যাইতে পারে। সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে পূর্ব্ব উল্লিখিত ছয় দফা সর্ত্ত বিষয়ে যখন পশ্চিম পাকিস্থানের পিপল্‌স্ পার্টি কোনও বিরুদ্ধ কথা বলেন নাই তখন সহজ ভাবেই কোনও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করিয়া বিষয়টার মিমাংসা হইয়া যাইতে পারিবে।

"বালুচিস্থানে জাতীয় আওয়ামী পার্টি ঐ ছয়দফা সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছিলেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জাতীয় আওয়ামী পার্টি পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। নির্ব্বাচনে প্রমাণ হইয়া যায় যে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির আর কোন প্রভাব নাই এবং সেই কারণে পাকিস্থানে সাধারণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতে কোন বাধা থাকিবে না।

"জাতীয় বিধান সভা আহুত হইবার পূর্ব্বে প্রধান প্রধান দলগুলি মিলিত ভাবে সকল কথা আলোচনা করিয়া ঠিক করিয়া লইবেন মনে করা হয়। আওয়ামী লীগও সকল সময়ে সকল কথা প্রকাশ্য আলোচনাতে স্থির করার পক্ষপাতি ছিলেন।

"আওয়ামী লীগ বহু পরিশ্রম করিয়া সংবিধানের একটি পূর্ণায়তন খসড়াও তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা ঐ ছয় দফা সর্ত্ত অনুযায়ী ছিল ও সংবিধান যাহাতে সকল দিক দিয়া আশানুরূপ হয় সে সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন ছিল।

"শেখ মুজিবুর রেহমান ও জেনারেল ইয়াহিয়া খান জানুয়ারী মাসে সর্ব্ব প্রথম আলোচনা করেন। জেনারেল এই সময় আওয়ামী লীগ কতদূর নিজেদের মতবাদ অবলম্বন করিয়া কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিতে প্রস্তুত আছেন তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করেন। তিনি ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারেন যে আওয়ামী লীগ

নিজ কার্য্য সম্বন্ধে সহজ, সরল ও সত্যের পথেই চলিবেন। কিন্তু ইয়াহিয়া সংবিধান প্রনয়ণ বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করিলেন না। শুধু মনে হইল যেন তিনি অন্য সকলের মতের ভিতরে বিশেষ আপত্তিজনক কিছু লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তিনি অবশ্য পাকিস্থান পিপল্‌স্ পার্টি'র সহিত মিলিত ভাবে চলিতে পারার মূল্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

"ইহার পরে জানুয়ারীর শেষে আবার এক দফা আলোচনা হয় ঐ সংবিধান লইয়া এবং শ্রীভুট্টো ও তাঁহার অনুচরগণ সেই আলোচনাতে বহুদিন ধরিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

"ইয়াহিয়া যেরূপ কোন আলোচনাতেই সংবিধান সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করেন নাই, শ্রীভুট্টো সেইভাবেই নিজমত ব্যক্ত করিতে কদাপি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তিনি ও তাঁহার সহযোগীদিগের আওয়ামী লীগের পুর্ব্বোক্ত ছয় দফা সর্ত্ত থাকাতে ফল কি হইতে পারে তাহা লইয়াই যত শিরঃপীড়া ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের নিজস্ব কোন মতামত ছিল না সুতরাং ঐ সকল আলোচনা সংবিধান গঠন বিষয়ে ফলবান হইতে পারে নাই। শ্রীভুট্টোর কোনও মত ছিল না বলিয়াই তিনি কোন গঠনমূলক কথা বলিতে সক্ষম হয়েন নাই।

"পাকিস্থান পিপল্‌স্ পার্টি'র সহিত আওয়ামী লীগের কোন মতানৈক্য ঘটে নাই বলিয়াই ঐ সকল আলোচনাতে কোনও অলঙ্ঘ্য বাধা উপস্থিত হইতেছে কেহ মনে করে নাই। বরঞ্চ ইহাই মনে হইয়াছিল যে আলোচনার সকল পথই উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং পশ্চিম পাকিস্থানী নেতাদিগের সহিত কথাবার্ত্তাও সহজেই চলিতেছে। ঐ পশ্চিম পাকিস্থানী দলের লোকেরা পুনর্ব্বার আলোচনাও চালাইতে পারে অথবা জাতীয় বিধান সভার কমিটিতেও আলোচনা করিতে পারে বলিয়াই সকলের মনে হইয়াছিল।

"শ্রীভুট্টো যখন জাতীয় বিধান সভা বয়কট করিবেন বলিলেন তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। ইহা আরও আশ্চর্য্য মনে হয় এই কারণে যে শ্রীভুট্টো উহার অধিবেশনের তারিখ বদলাইবার জন্যেও একবার দরবার করিয়াছিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর পরিবর্ত্তে ৩রা মার্চ্চ তারিখ স্থির করা হয়।

"কেন্দ্রীয় বিধান সভা বয়কট করিবার পরে শ্রীভুট্টো পশ্চিম পাকিস্থানের অপর সকল রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে ভয় দেখাইয়া যাহাতে তাহারাও ঐ বিধান সভাতে না যায় সেই চেষ্টা করিতে থাকেন। এই ক্ষেত্রে যিনি ঐ সকল রাষ্ট্রীয় দলগুলির উপর চাপ দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন তিনি হইলেন লেঃ জেঃ উমার। এই ব্যক্তি জাতীয় নিরপত্তা দলের সভাপতি ও রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এইভাবে চাপ দিবার আয়োজন থাকিলেও পশ্চিম পাকিস্থানে দুইটি রাষ্ট্রীয় দল ব্যতীত অপর সকল দলই ৩রা মার্চ্চের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "কইয়ুম মুসলীম লীগ ও পাকিস্থান পিপল্‌স্ পার্টি'র অনেক সভ্যও পরিস্কার ভাবেই ঢাকা যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু ইয়াহিয়া খান যখন এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ভুট্টোর মতলব মত কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি ভুট্টোর সাহায্যহেতু ১লা মার্চ্চ ঐ জাতীয় অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখিবার আদেশ দিলেন। তিনি তদুপরি পূর্ব্ব পাকিস্থানের রাজ্যপাল অ্যাডমিরাল এস, এম, আহসানকে বরখাস্ত করিলেন। ইহার কারণ আহসান নরম পন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। সেই সময় যাঁহারা শাসন কার্য্য চালাইতেন তাঁহাদিগের মধ্যে যতজন বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের সরাইয়া দিয়া পশ্চিম পাকিস্থানী সামরিক গোষ্ঠীর লোক আনিয়া স্থান পূর্ণ করা হইল। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে ইয়াহিয়া খান জাতির ইচ্ছাকে অবহেলা করিয়া ভুট্টোর ইচ্ছাই বলবৎ রাখিবার জন্য তৎপর হইলেন। জাতীয় বিধান সভাই একমাত্র আসর ছিল যেখানে বাংলাদেশ নিজ ইচ্ছা ও রাষ্ট্রীয় শক্তির অভিব্যক্তি করিতে পারিতেন। তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা দেখিয়া বুঝা গেল যে পার্লামেণ্ট আর পাকিস্থানের রাষ্ট্র শক্তির আধার বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

"এইভাবে জাতীয় বিধান সভার অধিবেশন রহিত করার প্রকৃত অর্থ জনসাধারণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না; এবং সর্ব্বত্র প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ হইল যে সামরিক শাসকদিগের স্বৈরাচার বরদাস্ত করিলে কোনও ভাবেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। ইয়াহিয়া খানের গুপ্ত অভিপ্রায় যে নিজ হস্তে সকল ক্ষমতা রাখিয়া সাধারণতন্ত্রকে একটা হাস্যকর অভিনয়-মাত্র করিয়া তোলা তাহাও সকলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। জনসাধারণ বুঝিলেন যে পাকিস্থানের ভিতরে থাকিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রাধিকার লাভ সম্ভব হইবে না কারণ সকলেই দেখিল ইয়াহিয়া কিভাবে নিজের আহুত জাতীয় বিধান সভা যথেচ্ছা বন্ধ রাখিতেছেন। সকলে শেখ মুজিবুর রেহমানকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যই অগ্রসর হইতে বলিতে লাগিলেন।

"শেখ মুজিব কিন্তু তখনও রাষ্ট্রীয় পথেই সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিতেছিলেন। ৩রা মার্চ্চ তিনি যখন অসহযোগ পন্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন, তখনও তিনি সামরিক দখলদার গোষ্ঠীকে শান্তিপূর্ণ উপায়েই বুঝাইতে চাহিতেছিলেন যে তাহাদের কার্য্য নীতি বিরুদ্ধ হইতেছে। এইভাবে শান্তি রক্ষা করিয়া চলা একটা কঠিন কার্য্যই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যেহেতু মার্চ্চ মাসের ২ ও ৩ তারিখে সামরিক শাসকগণ জনসাধারণের উপর গুলি চালাইয়া প্রায় সহস্রাধিক মানুষকে হতাহত করে।

"বাংলাদেশের অসহযোগ আন্দোলন এখন ইতিহাসের কথা। কোনও দেশে কোনও সময় এ জাতীয় অসহযোগ আন্দোলন এত পূর্ণ ও সফল হইতে দেখা যায় নাই। ১লা মার্চ্চ হইতে ২৫শে মার্চ্চ অবধি এই অসহযোগ পূর্ণরূপে চালিত ছিল। নুতন রাজ্যপাল টিক্কাখানকে শফত গ্রহণ করাইতে কোন বিচারপতি পাওয়া যায় নাই। সাধারণ ভাবে সকল সরকারী দফতরের সকল কর্ম্মী কার্য্যে অনুপস্থিত ছিলেন। পুলিশের লোকও কেহ কার্য্যে যাইতেন না। সামরিক বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ বন্ধ। নিরাপত্তা বাহিনীরও সকল কার্য্য বন্ধ।

"এই অসহযোগ শুধু কার্য্যে যোগ না দেওয়াতেই শেষ হয় নাই। সকল কর্ম্মী, পুলিশের সহিত, শুধু শেখ মুজিবুর রেহমানের আদেশে চলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

"এই অবস্থায় আওয়ামীলীগকে সকল শাসন কার্য্য চালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই কার্য্যে তাঁহারা সকল মানুষের সহায়তা পাইয়াছিলেন। শাসন ক্ষেত্রের কর্ম্মী, ব্যবসায়ী ও অপর সকলের। সকলেই আওয়ামী লীগের আদেশ নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে প্রস্তুত ছিলেন।

"এই অবস্থায়, যে স্থলে শাসন শক্তি আড়ষ্ট ও অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই সময় শুধু আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকগণ শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য কার্য্য উত্তমরূপেই চালাইয়া রাখিয়াছিল। আইন ও শৃঙ্খলা মানিয়া ও রক্ষা করিয়া চলা অত্যন্তই সহজ ও কার্য্যকরী হইয়াছিল।

"আওয়ামী লীগের উপর সর্ব্বসাধারণের এই রূপ পূর্ণ বিশ্বাস নির্ভর দেখিয়া ইয়াহিয়া খান নিজের কর্ম্ম ও শাসন পন্থা কিছুটা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মার্চ্চ ৬ তারিখে তিনি একটা বক্তৃতা দেন যাহাতে তিনি তৎকালীন অবস্থার জন্য আওয়ামী লীগকেই সম্পূর্ণ দায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন; সকল নষ্টের মূল শ্রীভুট্টোর নামও উল্লেখ করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে ৭ই মার্চ্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইবে। সামরিক বাহিনীকে তিনি প্রস্তুত থাকিতে নির্দ্দেশ দেন এবং টিক্কাখানকে বিমান যোগে আনাইয়া লইয়া লে, জে, ইয়াকুবের হস্ত হইতে হুকুমত সরাইয়া লওয়া হইল। ইহাতে বুঝা গেল যে অতঃপর কঠিন হস্তে কর্ম্ম পরিচালনা করা হইবে।

"শেখ মুজিব তখনও রাষ্ট্রীয় পথে চলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; যদিও দেশবাসী চাহিতে ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি যে চার দফা চাহিদা দেখাইয়া জাতীয় বিধান সভায় যোগদান করিবার কথা তুলিলেন তাহাতে তিনি জন সাধারণকে খুসী রাখিয়া এবং

ইয়াহিয়া খানের শান্তিপূর্ণ ভাবে চলিবার পথ খুলিয়া রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"একথা এখন সর্ব্বজনজ্ঞাত যে ইয়াহিয়া খানের কোন সময়েই শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্যা সমাধান ইচ্ছা ছিল না। তিনি ও তাঁহার সামরিক সেনাপতিগণ শুধু সময় কিনিতেছিলেন যাহাতে বাংলাদেশে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইতে পারে। ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন ছিল তাঁহার গণহত্যা পরিকল্পনার সুচিন্তিত অঙ্গমাত্র। এই হত্যালীলা কি ভাবে চালান হইবে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; সে কথা এখন আরও উত্তমরূপে বোধগম্য হইয়াছে।

"১লা মার্চ্চের পূর্ব্বেই রংপুরে প্রেরিত ট্যাঙ্কগুলিকে ঢাকায় ফিরাইয়া আনা হয়। ঐ সময় হইতেই পশ্চিম পাকিস্থানী সেনাধ্যক্ষদিগের পরিবার বর্গকে স্বদেশে ফেরত পাঠান হইতে থাকে। ব্যবসাদারদিগেরও পরিবারবর্গকে কিছু কিছু করিয়া বাংলাদেশ হইতে বাহিরে পাঠান আরম্ভ হয়।

মার্চ্চ ১লা তারিখ হইতে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা ক্রমাগতই চলিতে থাকে এবং মার্চ্চ ২৫ তারিখ অবধি তাহার প্রশমন হয় নাই। সেনাবাহিনীর লোকেরা সাধারণ মানুষের বস্ত্র পরিধান করিয়া পাকিস্থান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়েস এর বিমানে চড়িয়া সিংহল হইয়া পূর্ব্ব বাংলা গমন করিতে লাগিল এবং সি ১৩০ বিমানে অস্ত্রশস্ত্র মালমশলা লইয়া ঢাকা যাইতে লাগিল। এইভাবে প্রায় এক ডিভিশন সৈন্য ও তাহার সহায়ক জনবল ১লা মার্চ্চ হইতে ২৫ মার্চ্চের মধ্যে বাংলাদেশের দখলদারদিগের শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রেরিত হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ঢাকা বিমান কেন্দ্র বিশেষ করিয়া সুরক্ষিত করা হয়—তোপ ও মেশিনগান দিয়া এবং এই কার্য্যের ভার গ্রহন করে পাকিস্থান হাওয়াই সেনাবাহিনী। সাধারণ যাত্রীদিগের চলাচল বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। গুপ্ত ঘাতকের কার্য্যে বিশেষভাবে শিক্ষিত একদল এস এস জি কমাণ্ডো সৈন্য বাংলাদেশের নানান বৃহৎ বৃহৎ কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং আমাদের অনুমান এই যে ইহারাই ২৫ শে মার্চ্চের পূর্ব্বে দুই দিন বাঙালীদিগের উপর ঢাকা ও সৈয়দপুরে আক্রমন চালায়। এই কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল সৈন্য বাহিনীকে জনসাধারণের উপর জোর জুলুম করিবার একটা অজুহাত দেওয়া।

"এই প্রতারণার খেলা যাহাতে আরও সফল হয় সেইজন্য এই সময়ে ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সহিত কথাবার্ত্তার ধরণ খুবই বন্ধুজনোচিত করিয়াছিলেন। ১৬ তারিখ মার্চ্চ যে সকল কথা হয় তাহাতে ইয়াহিয়া বিবিধ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কি করিয়া রাষ্ট্রীয় ভাবে সকল দ্বন্দ্বের অবসান সম্ভব হয় তাহার আলোচনা করেন। যে ভাবে মতানৈক্যের সমাধান সম্ভব হইতে পারে তাহার উপায় চারটি দেখান হয়।

১ম: সামরিক শাসন শেষ করিয়া রাষ্ট্রপতির আদেশে অসামরিক সাধারণের হস্তে শাসনভার অর্পণ করা।

২য়: প্রদেশে প্রদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করা।

৩য়: ইয়াহিয়া কেন্দ্রীয় শাসনকার্য্যে রাষ্ট্রপতি থাকিবেন ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনা করিবেন।

৪র্থ: জাতীয় বিধান সভার অধিবেশন পৃথকভাবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে হইবে এবং পরিশেষে যখন সংবিধান নির্ণয় সম্পূর্ণ করা হইবে তখন মিলিত অধিবেশন হইবে।

"বর্ত্তমানে যেভাবে সকল কথার বক্র অর্থ সৃজন করিয়া ইয়াহিয়া ও ভুট্টো জগৎকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন সে কথার আলোচনা না করিয়া শুধু বলা যায় যে প্রদেশ হিসাবে পৃথক অধিবেশনের ব্যবস্থা ইয়াহিয়া করিতে চাহিয়াছিলেন শুধু ভুট্টোর সুবিধার জন্যই। ইহা ব্যতীত আওয়ামী লীগ দ্বন্দ্বের মিমাংসার জন্য যে ছয়টি সর্ত্ত করিয়াছিলেন তাহাতে এমন কিছুই ছিল না যাহাতে উভয় অঞ্চলের নানান ক্ষেত্রে সমবেত প্রচেষ্টা চলিতে পারিত না। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রী এম এম আহমেদকে যখন বিমানযোগে লইয়া আসা হয় তখন তিনিও আওয়ামী লীগের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হ'ন যে যদি

রাষ্ট্রীয় ভাবে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান সম্ভব হয় তাহা হইলে অপর কোন প্রবল অন্তরায় কোথাও থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আওয়ামী লীগ ২৪শে মার্চ্চ এই কথাই স্থির করিয়াছিলেন যে। যে সর্ত্তগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া মিলিতভাবে সংবিধান গঠন অসম্ভব হইবে না।

কোন সময়েই জেঃ ইয়াহিয়া খান এরূপ কোন মত প্রকাশ করেন নাই যে মতের প্রাকার অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল।

আইনত সামরিক শাসকগণ শাসন শক্তি অসামরিক জনসাধারণকে দিতে পারেন না বলিয়া যে একটা মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া ইয়াহিয়া ও ভুট্টো নিজেদের অন্যায়কে সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন তাহাও পরে নিতান্তই একটা মিথ্যা অজুহাত বলিয়াই প্রমাণ হয়, কারণ রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশে এইরূপ শাসনশক্তি অপর হস্তে দেওয়া যে আইনত গ্রাহ্য একথা সকল আইনজ্ঞই স্বীকার করেন।

"ইয়াহিয়া খান যদি বলিতেন যে শাসনশক্তি নূতন ভাবে ন্যস্ত করিতে হইলে বিধানসভা ডাকিয়া তাহা করিতে হইবে তাহা হইলে আওয়ামী লীগ সে কথাতে যে রাজী হইতেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ যে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বিশেষ করিয়াই সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলেন সে ক্ষেত্রে কোন বিধান সভা ডাকাতে তাঁহাদের আপত্তি হইবার কোনও কারণই ছিল না। পৃথক পৃথক অধিবেশন ভুট্টোর সুবিধার জন্যই করিবার কথা উঠিয়াছিল।

"ভুট্টো পরে নানান মিথ্যা কথা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে শেখ মুজিবুর রেহমান ক্রমাগতই দাবীর আকার বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু ইয়াহিয়া খানের সহিত যে সকল আলোচনা হয় তাহাতে কোনও সময়েই শেখ মুজিবুর রেহমান ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে কোনও কলহ হয় নাই। সকল দ্বন্দ্বের মিমাংসা যথাযথ ভাবেই সম্পন্ন হইবে এইরূপ আশাই সকলে করিয়াছিলেন।

"যে সময় শান্তিপূর্ণভাবে সকল ঝগড়ার নিষ্পত্তির আশা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়েই, চট্টগ্রাম বন্দরে এম ভি সোয়াট নামক জাহাজ হইতে বহু অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া লইবার ব্যবস্থা হয়। বৃগেডিয়ার মজুমদার নামক এক উচ্চ পদস্থ বাঙালী সামরিক কর্ম্মচারীকে হঠাৎ ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়া তাহার স্থলে একজন পশ্চিম পাকিস্থানী কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়। বৃঃ মজুমদারকে সম্ভবত পরে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার তারিখ ২৪শে মার্চ্চ। ইহার ১৭ দিন পূর্ব্ব হইতেই ঐ বন্দরে অসহযোগ চালিত থাকায় জাহাজ খালাস হইতেছিল না। এখন নূতন সামরিক কর্ম্মচারীর আদেশে সেই কার্য্য হইবে দেখিয়া চট্টগ্রামের প্রায় একলক্ষ জনসাধারণ বন্দরের দিকে যাইতে চেষ্টা করেন। ফলে সেনাবাহিনী তাহাদের উপর গুলি চালাইয়া একটা হত্যাকাণ্ডের সূচনা করিল। জেঃ পিরজাদাকে যখন আওয়ামী লীগ প্রশ্ন করিলেন কেন এইভাবে শান্তি ও বন্ধুত্বের আবহাওয়া নষ্ট করিয়া নিদারুণ অশান্তি ও রক্তপাত আরম্ভ করা হইতেছে তাহার উত্তরে পিরজাদা কিছু না বলিয়া কথাটা তিনি ইয়াহিয়া খানকে বলিবেন বলিয়াছিলেন।

"ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত আলোচনার পরে ২৪শে মার্চ্চ যখন শ্রী এম এম আহমেদ নিজের অদল-বদল গুলি পেশ করিলেন, তখন কথা হয় যে শেষ আলোচনাতে জেঃ পিরজাদাও উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু সে আলোচনা আর হইল না। কারণ শ্রী এম এম আহমেদ নিজের কার্য্যের গুরুত্ব থাকা সত্বেও ২৫শে মার্চ্চের প্রাতঃকালে আওয়ামী লীগকে কিছু না জানাইয়া করাচিতে ফিরিয়া চলিয়া যাইলেন।

"২৫শে মার্চ্চ রাত্রি ১১টার সময় সকল কিছু স্থির করিয়া সৈন্যগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমা হইতে লাগিল এবং রাত্রি ১২টার সময় পৃথিবীর ইতিহাসে যেরূপ জঘন্য ও নৃশংস গণহত্যা কখনও হয় নাই সেইরূপ একটা নির্ম্মম ও বর্বর অমানুষিকতাজাত হত্যাকাণ্ডের রক্ত বন্যাতে ঢাকার নিরস্ত্র ও অসহায় জনগণকে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। ঘুমন্ত জনগণ যখন গুলির আওয়াজে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল চতুর্দ্দিকে আগুন লাগিয়াছে তখন পলাইতে

গিয়া তাহারা মেশিনগানের গুলি খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

"পুলিশ ও ইষ্ট বেঙ্গল রাইফল্ সৈন্যদল সশস্ত্র সেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর সহিত সংযুক্তভাবে নির্ভিক বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল, নির্দ্দোষ ও শঙ্কাহীন তাহারা সহস্রে সহস্রে নিহত হইল। নিষ্ঠুরতা পাশবিকতা যাহা দেখা যাইল সভ্য জগতে তাহার তুলনা কখনও কোথাও পাওয়া যায় নাই।

"জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ্চ রাত্রে ঢাকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি যাইবার পূর্ব্বে পাকিস্থান সেনাবাহিনীকে সকল বাঙ্গালীকে হত্যা করিবার অনুমতি ও নির্দ্দেশ দিয়া যাইলেন। তিনি পরদিন রাত্রি ৮টার সময় এই বর্ব্বর হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে অনেকগুলি মিথ্যা কথা প্রচার করিলেন। পৃথিবী শুনিল তাঁহার বর্ব্বরতার কষ্ট কল্পিত সাফাই। তিনি যে রাষ্ট্রীয় দলের সহিত ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বেও রাজশক্তি হস্তান্তর করার আলোচনা করিতেছিলেন তাহাদের এখন বলিলেন রাজদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক। যাহারা তাঁহার প্রবর্ত্তিত নির্ব্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল প্রমাণ হইয়াছিল, তাহারা হইয়া যাইল রাজদ্রোহী। ৭৫০ লক্ষ বাঙ্গালীর দ্বারা নির্ব্বাচিত নেতৃবৃন্দের পাকিস্থান রাষ্ট্রে কোনও সম্মানের স্থান রহিল না। ইয়াহিয়া খান ন্যায়বিচার ও সুনীতি বর্জ্জন করিয়া নির্লজ্জভাবে জঙ্গলের পাশবিকতাকেই অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেওয়া।

"পাকিস্থান এখন একটা বিরাট ধ্বংস স্তূপ। মৃতদেহের উপর মৃতদেহ জমিয়া পর্ব্বত প্রমাণ হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ নির্দ্দয়ভাবে নিহত মানুষ পশ্চিম পাকিস্থান ও বাংলাদেশের মধ্যে এমন একটা ব্যবধানের সৃজন করিয়াছে যাহার অপসারণ অসম্ভব। গণহত্যা আরম্ভ করিয়া ইয়াহিয়া খান নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে তিনি নিজ হস্তেই পাকিস্থানের কবর খনন করিতেছেন। তাঁহার নির্দ্দেশে যে ভাবে হত্যাকাণ্ড চলিয়াছে তাহার মূল প্রেরণা জাতি গঠন চেষ্টা নহে। ক্রোধ ও হিংসাই তাহার মূলে আছে। এক জাতির অন্য এক জাতির প্রতি আক্রোশ ও শত্রুতা।

"পেশাদার সৈন্যগণ নিজেদের বীরধর্ম্ম ভুলিয়া হিংস্র পশুর স্বভাব অবলম্বন করিয়া অসহায় নরনারী শিশুদিগকে হত্যা করিয়া সভ্যতার সকল আদর্শ বর্জ্জন করিয়াছে বলিতে হইবে। ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি মহাপাপ পাকিস্থানকে মানবীয়তার সীমানার পরপারে স্থাপন করিয়াছে। জেঃ ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালীদিগকে অন্য জাতি বিবেচনা করেন নতুবা তিনি নিজ জাতির মানুষের উপর এইরূপ জঘন্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে পারিতেন না। জেঃ ইয়াহিয়া খানের গণহত্যা দ্বারা পাকিস্থানের ইতিহাসের শেষ কথা বাঙ্গালীর রক্তে লিখিত হইবে। ইয়াহিয়া আমাদের জাতির সকল ক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোন রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য এই জাতিকে সর্ব্বভাবে শেষ করিয়া দেওয়া।

"যে সকল শক্তিশালী জাতিগুলি ভাবিতেছেন যে এই অমানুষিকতা সত্ত্বেও পাকিস্থান তাঁহাদিগের সমর্থনের জোরে টিকিয়া যাইবে তাঁহাদিগকে বলা আবশ্যক জেঃ ইয়াহিয়া খান পাকিস্থানকে শেষ করিয়াছেন। পাকিস্থান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ও সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশবাসী আজ একটা নুতন জাতির স্থান গ্রহন করিয়াছে। এই জাতি অতি শীঘ্রই জগত জাতি সভায় নিজ স্থান উজ্জ্বল করিয়া অধিষ্ঠিত হইবে।"

[শ্রীতাজুদ্দিন আহমেদ তাঁহার প্রবন্ধের শেষাংশে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ১১ই এপ্রিলের পরবর্ত্তি ঘটনাদির সম্ভাবনা সম্বন্ধে। পরে কি হইয়াছিল তাহা এখন ইতিহাসের কথা। সঃ প্রঃ]

বাংলাদেশের ও ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রী

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৭৮

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পরলোকে রাজা মহেন্দ্র

নেপাল-অধীশ্বর রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম শা দেব ৩১শে জানুয়ারী প্রত্যূষে ৩-৪৫ মিনিটে খাটমাণ্ডু হইতে ২০০ কিঃ দূরস্থ ভরতপুর নগরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫১ বৎসর। সেই দিনই তাঁহার মরদেহ হেলিকপ্টর যোগে খাটমাণ্ডু লইয়া যাওয়া হয় ও বাঘমতী নদীতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাণী রত্নাদেবী মৃত্যুকালে তাঁহার নিকটেই ছিলেন। হৃদ্‌রোগের আক্রমণ হইবামাত্র চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবন রক্ষার্থে বহু চেষ্টা আরম্ভ করেন কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। রাজার দেহান্তের কথা খাটমাণ্ডুতে পৌঁছাবামাত্র সর্ব্বত্র প্রবল শোকাবেগ লক্ষিত হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্রকে অতঃপর হনুমানধোকা প্রাসাদে হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে সিংহাসনে

রাজা মহেন্দ্র ১৭ বৎসরকাল নেপালের রাজত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা ত্রিভুবন ১৯৫৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে দেহত্যাগ করিলে পরে মহেন্দ্র সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। নেপালের রাণাদিগকে শাসনশক্তিচ্যুত করিবার পরে নেপালের রাজাদিগের হস্তে ঐ শক্তি ফিরিয়া আইসে এবং রাজা ত্রিভুবনই, এক কথায় বলিতে গেলে, এই নূতন পরিবেশের প্রথম রাজা। মহেন্দ্র ১৭ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহার বংশের লোকেদের স্বল্পায়ুতা হিসাবে তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন বলা যাইতে পারে। রাজা মহেন্দ্র নিজ পুত্রকে বিলাতে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাদান ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না কিন্তু রাজা হইবার পরে তিনি ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইতিহাস প্রভৃতি পাঠেও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া-

আহরণের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেশে ভ্রমণ করিতে যান, যে সকল দেশে পূর্ব্বে নেপালের রাজারা কদাপি যাইতেন না। রাজা মহেন্দ্র বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান গঠন সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু রাজকার্য্যে তাঁহার আস্থা ছিল একাধিপত্যে। এই কারণে তাঁহার সহিত তাঁহার মন্ত্রীদিগের সর্ব্বদাই মতানৈক্য হইত। ১৯৬০ খৃঃ অব্দে তিনি কইরালা মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত মতামতের বৈপরীত্যহেতু ডিসেম্বর মাসে সকল মন্ত্রীকেই কার্য্যভারচ্যুত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি রাজ্যের অবস্থা সংকটাপন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়া সকল শাসনশক্তি নিজহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি নেপালের সংবিধান নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখেন কিন্তু এই ঘটনার এক বৎসর পরে তিনি ১৯৬১খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরে নিজ রাজ্যের প্রজাদিগকে মানবীয় মূল অধিকারগুলির কিছু কিছু ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যের সংকটাপন্ন পরিস্থিতি তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন।

১৯৬২ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে রাজা মহেন্দ্রকে প্রাণে মারিবার জন্য কোন ব্যক্তি কিছু বিস্ফোরক নিক্ষেপ করে। সৌভাগ্যক্রমে এই চেষ্টা সফল হয় নাই ও কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই। রাজা মহেন্দ্রর সহিত ভারতের বরাবরই বন্ধুত্বের সম্বন্ধই ছিল। রাজা মহেন্দ্র কখন কখন এমনভাবে সাহায্য গ্রহণ করিতেন যাহাতে ঠিক বুঝা যাইত না যে, তিনি সবিশেষভাবে প্রীত হইয়াছেন কি না। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে তিনি কখনও নিজের অন্তরের কথা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। তিনি যে কেন ব্যক্তিগত রাজ অধিকারে বিশ্বাসী হইলেও চীনের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতেন সে কথারও সঠিক উত্তর কেহ দিতে পারে না। রাজা মহেন্দ্র নিজ দেশের লোকের শিক্ষার জন্য বিশেষ করিয়াই সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা প্রচেষ্টার জন্য ইউনেস্কো তাঁহাকে একটি স্বর্ণ পদকে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কবিতা রচনায় সুপটু ছিলেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিজ শক্তি খর্ব্ব হইতে দিতে তাঁহার আপত্তি থাকিলেও মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য প্রগাঢ় চেষ্টা করিতে তিনি কখনও কোন আলস্য প্রদর্শন করেন নাই।

নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গত ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতার নিজ বাসভবনে শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের একজন স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ছিলেন ও সংবিধান সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। আইনের ক্ষেত্রে তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। দেশবাসীর নিকট তাঁহার যে সম্মান ছিল তাহা আসিয়াছিল তাঁহার রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচেষ্টা হইতে। তিনি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মীরূপে হিন্দুজাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ঢাকা ও নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক কলহ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্য্যে ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বজাত গোলযোগের পরে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন ও তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ সুনাম হইয়াছিল। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, নির্ম্মলচন্দ্রের উপর পূর্ণরূপে আস্থাবান্ ছিলেন ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের বহু কার্যের জন্য তাঁহার উপরেই নির্ভর করিতেন। নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এদেশে ও ইংলণ্ডে ছাত্র অবস্থায় অশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি এদেশে এম. এ. ও এল. এল. বি. পরীক্ষাতে উচ্চ স্থান অধিকার করেন ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি অর্জ্জন করেন। পরে তিনি ইংলণ্ডে আইন শিক্ষার্থে গমন করেন ও শেষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের কার্য্য আরম্ভ করেন ও ঐ কার্য্যে সুযশ আহরণ করেন। পরে কিছুদিন হাইকোর্টে বিচারকের কাজ করিয়া তাহাতে ইস্তফা দেন ও দিল্লীতে চলিয়া গিয়া সেখানে সুপ্রীম কোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। তিনি শীঘ্রই সাংবিধানিক আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হ'ন ও তাঁহার খ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

আইনের ক্ষেত্রে তিনি নানা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি, সহ-সভাপতি ইত্যাদি হইয়াছিলেন। বিদেশে, যথা সালসবুর্গ, মস্কো প্রভৃতিতে, বৃহৎ বৃহৎ আইন সভায় ভারত হইতে প্রতিনিধিরূপে নির্ম্মলচন্দ্র গমন করেন। রান অফ কচ্ছ লইয়া পাকিস্থানের সহিত আন্তর্জাতিক আদালতের মামলায় তিনিই ভারতের তরফ হইতে হেগের বিশ্ব আদালতে গিয়াছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন ব্যবস্থাকারী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী, তিন কন্যা ও দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভুট্টোর চীনদেশে দরবার

পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলি ভুট্টো ষাটজন সাঙ্গো-পাঙ্গ লইয়া পিকিং-এ দরবার করিতে গিয়াছেন। উদ্দেশ্য চীনদেশের প্রভুদিগের দ্বারা ভারতবর্ষকে শাসাইবার ব্যবস্থা করা ও ভারত ভয় পাইয়া নিজ সৈন্যাদি বাংলাদেশ হইতে সরাইয়া লইলে পরে ঐ দেশে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া মুজিবুর রেহমানকে উচ্ছেদ করিয়া আবার পূর্ব্ব পাকিস্থান কায়েম করা। চীনের যদি পাকিস্থানের সুবিধার জন্য ভারতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে চীন, ভারত যে সময় পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল সেই সময়েই ভারতকে আক্রমণ করিত; কারণ তাহা করিলে ভারতকে এককালীন বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম চালাইতে হইলে বিপদে পড়িতে হইত। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে চীন তখনও যেরূপ বাক্যে সাহায্য করিবার আশা দিয়া কার্য্যতঃ কোন সাহায্য করে নাই, এখনও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া শুধু কথাই বলিবে, কার্য্যে কিছু করিবে না। হইতে পারে যে ভুট্টো চীনের নিকট অর্থ সাহায্য লাভের আশাতেই পিকিং গিয়াছেন এবং কিছু টাকা পাইলেই হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন। তবে চীন কিছু কিছু গরম কথা বলিয়া প্রতিক্রিয়ায় ভারত ও অন্যান্য দেশও কথায় যুদ্ধে যোগদান করিতে থাকিবে। ইহাতে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ক্ষেত্রে গরম হাওয়া বহিয়া আবহাওয়া খারাপ হইবে। চীন অবশ্য একথা জানে যে তাহার তিব্বত অধিকার কাজটা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই এবং ভারতের সহিত কলহ হইলে তিব্বতের কথা স্বভাবতই উত্থাপিত হইবে। যুদ্ধ যদি হয় তাহা হইলে আমাদের দেশে বোমা ও রকেট পড়িবে কিন্তু তিব্বতে ভারতীয় সৈন্যগণের অনুপ্রবেশও ঘটিবার সম্ভাবনা। ১৯৬২ খৃঃ অব্দের মত চীনদেশের সৈন্য ভারতে ঢুকিয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয় না।

আমেরিকা যদি চীনকে সাহায্য করে তাহা হইলে বিষয়টা আরও জটিল হইয়া দেখা দিবে; কিন্তু সে-রূপ হইলে রুশিয়াও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া যাইবে ও ব্যাপারটা তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে পরিণত হইবে। এই রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত; কারণ পাকিস্থানের মতলব হাসিল করিবার জন্য আমেরিকা বা চীন বিশ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমেরিকার বহু লোক নিকসনের রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে। আমেরিকার আর্থিক অবস্থাও সুবিধার নহে। চীন বর্ত্তমানে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে বৃহৎ যুদ্ধ চালাইতে বিশেষ সক্ষম নাও হইতে পারে। এই সকল বিষয় বিচার করিলে মনে হয় না যে, ভুট্টোর চীন দেশ গমন বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। কিছু অর্থ লাভ হইতে পারে। দুই-একটা ভব্যতা-বিরুদ্ধ চিঠিপত্র পিকিং-দিল্লী ও দিল্লী-পিকিং-এর মধ্যে অদল বদল হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু হইবে বলিয়া কেহ বলিতেছেন না।

প্লাষ্টিক

যে-সকল বস্তু কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হয়; নানা প্রকার রাসায়নিক সার বস্তু সংমিশ্রণে; সেলুলয়েড 'গাটা পার্চ্চা', সেলোফেন, ব্যাকেলাইট প্রভৃতি কৃত্রিম পদ্ধতিজাত বস্তুই বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বাধিক উৎপাদন করা হইয়া থাকে। এই সকল বস্তুর জাতিগত নাম হইল

শিল্পের উপকরণগুলিও ঐ একই জাতির দ্রব্য। যে-সকল সার বস্তু হইতে এই সকল প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্য সকল তৈয়ার হয় তাহার মধ্যে আছে কয়লা, কেরোসিন তেল, উদ্ভিজ্জ পদার্থ সকল এমন কি জলও। কর্পূর ও নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারেও প্লাষ্টিক তৈয়ার হয়। অ্যাসবেস্টস, কাচ, দুগ্ধ ও বিভিন্ন ধুলা জাতীয় বস্তু দিয়াও প্লাস্টিক হইতে পারে।

প্লাষ্টিক বজ্রাদপি কঠিন ও কুসুমাপেক্ষাও কোমল। ষ্টীল হইতেও শক্ত এবং রেশম হইতেও নরম। বর্ত্তমানে প্লাষ্টিক হইতে বৃহৎ বৃহৎ গৃহ, গাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে। বিমান নির্ম্মাণে প্লাষ্টিক একটি অবশ্য ব্যবহৃত উপকরণ। গৃহ নির্ম্মাণে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে প্লাষ্টিক ব্যবহার চলিতেছে। মেঝেতে প্লাষ্টিকের পাত বসাইয়া সিমেণ্ট বা প্রস্তরের স্থান পুরণ করা হইতেছে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্লাষ্টিক প্রস্তুত করা হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে শীঘ্রই মোট উৎপাদনের পরিমানে উহা লৌহ ও ইস্পাতকে ছাড়াইয়া যাইবে। ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, কঠিন হইতে কঠিনতর কার্যে ঐ কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন মূল উপকরণ ব্যবহার হইতে থাকিবে। গৃহ, রেলগাড়ী, রাস্তা, জাহাজ প্রভৃতি প্লাষ্টিকে গঠিত হইবে। খেলার মাঠের সরঞ্জাম, গৃহের, দফতরের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসবাব প্রভৃতিতে প্লাষ্টিকের ব্যবহার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিবে। প্লাষ্টিকের যুগ বলিয়া আধুনিক কালের পরিচয় দেওয়া হইবে।

বক্রপথে রাজত্ব বিস্তার

নিজ দেশের প্রভুত্ব অথবা প্রভাব অপর দেশের উপর বিস্তার করিতে হইলে তাহার জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতে হয়। নিজ দেশের মানুষের মহত্ব প্রচার নিজ সভ্যতার উন্নত রূপ যথাযথারূপে ব্যাখ্যা করা; অপর দেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, অপর দেশকে সাহায্য করিবার আগ্রহ প্রদর্শন প্রভৃতি অপর দেশের সহিত সখ্য স্থাপনের উপায়। অপর দেশ যদি সাহায্য গ্রহণ করে, উপদেশ দিলে শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গীতে উপদেশ গ্রাহ্য করে, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে অপর দেশের মানুষ উপদেষ্টাদিগের প্রতি গুরুর প্রতি শিষ্যের মনোভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ মানসিক সম্বন্ধ বাস্তব ক্ষেত্রে উত্তমর্ণ দেশের সুদূর প্রসারিত ও গভীর সুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বৃটেন আমাদের দেশের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া থাকিলেও আমাদের দেশের মানুষ বিলাতি মাল অতি উৎকৃষ্ট, বিলাতি মানুষও মহা পণ্ডিত ও অশেষগুণের আধার বলিয়া বিশ্বাস করিত। ফলে মাল বিক্রয় ও অসংখ্য বৃটিশ জাতীয় মানুষের সংস্থান ভারতে হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। বৃটিশের প্রতি ভক্তি নানা ক্ষেত্রে এখনও যে কিছু কিছু নাই এমন কথা বলা যায় না। বৃটিশ রাজত্বে বহু কোটি লোক অনাহারে ও অল্পাহারে প্রাণ হারাইত, দারিদ্র্য অনন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তৎকালীন শাসন বিধান ইত্যাদির প্রশংসা অনেকে এখনও করিয়া থাকেন। নিজ দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও বৃটিশ সভ্যতা ও কৃষ্টিকে স্বর্গীয় গৌরব মণ্ডিত মনে করা কিছু কিছু উচ্চশিক্ষিত লোকের মধ্যেও দেখা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বুঝা যাইতে পারে যে উহা দাস-মনোভাবজাত; কিন্তু সে বিশ্লেষণ করিয়া বৃটিশের কোন ক্ষতি হইবে না। মাল বিক্রয় ও চাকুরী প্রাপ্তিতে কোনও ঘাটতি পড়িবে না।

বর্ত্তমানে আর একটি মহা শক্তিশালী জাতি পৃথিবীর নানা দেশের উপর প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তার আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রসম্মত উপায়ে লোকজন নিয়োগ করিয়া নানা দেশের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে। শাস্ত্রসম্মত বলিবার কারণ এই যে, প্রভাব বিস্তার, পরদেশের মানুষের মধ্যে অক্ষমতা ও তুলনামূলক ভাবে নিজেদের গুণহীনতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জাগ্রত করা, ভিন্ন ভিন্ন পথে আত্মনির্ভরশীলতা নষ্ট করা, গুপ্তচর নিয়োগ, ধর্ম্মপ্রচার, পরদেশের কৃষ্টি নিজেদের লোক পাঠাইয়া রপ্ত করা, সঙ্গীত বাস্ত সাহিত্য কাব্য ও বিভিন্ন শিল্পকলা লইয়া গভীর অন্তরঙ্গতার অভিব্যক্তিকরণ—এই সকল উপায়ই

কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র অনুমোদিত পন্থা। পর দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা সৃজন চেষ্টা; যুদ্ধের, মহামারীর অথবা নৈসর্গিক প্রলয়ের ভীতি সঞ্চার—প্রভৃতিও শাস্ত্রসম্মত পন্থা। এই সকল উপায় অনুসরণ যে জাতি এখন বহু ব্যয়সাধ্য ভাবে করিতেছে সে দেশ হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। আর্থিক সাহায্য দান, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্ম্মপ্রচার, ভীতিসঞ্চার প্রভৃতি সকল কার্য্যই আমেরিকানগণ করিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকান না হইয়া অন্য জাতির মানুষ আমেরিকার নির্দ্দেশে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছে। অনেক আমেরিকান গঞ্জিকাদি সেবন করিয়া "হিপি" সাজিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। ইহাদিগের মধ্যে কে গুপ্তচর বা কে খোস মেজাজে ও বহাল তবিয়তে নেশার জন্যই আকুল তাহা বলা সম্ভব নহে। কোন কোন আমেরিকাবাসী মস্তক মুণ্ডন করিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বনে ঢোল পিটাইয়া, শাঁখ বাজাইয়া ভোর রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যারাত্রি অবধি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া পাড়া-প্রতিবেশীর ঘুমের ব্যাঘাত ও শান্তিতে বাস করা অসম্ভব করিতেছে। ইহার কোনও প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে না; কারণ ভারতবাসী ভক্তগণ শ্বেতকায় মার্কিনদিগকে টিকি রাখিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দাশ্রু-প্লাবিত মুগ্ধ প্রাণ ও একান্তভাবে ভক্তিরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই সকল স্বদেশবাসীগণ বৃটিশ আমলের রাজভক্তির প্রক্ষিপ্ত আলোকে ঝলসান চক্ষু শুদ্ধবুদ্ধি ও ইহাদের সমর্থনে মার্কিন কর্ম্মীদিগের নিজ কার্য্যসিদ্ধি সহজ ও সরল হইয়া যাইতেছে। যে-সকল ভারতবাসীর দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন নহে ও যাঁহারা চাহেন যে ভারত নিজশক্তিতে নিজ অধিকারে স্বাধীন পরিস্থিতিতে বিশ্বের দরবারে নিজের গৌরবময় স্থানাধিকার করিয়া থাকিবে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য বর্ত্তমান সময়ে মার্কিন "সাম্রাজ্য"বাদকে প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করা। এ সাম্রাজ্য রাষ্ট্রীয় নহে; ইহা আর্থিক, সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতির সকল শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত। যাহারা এই সাম্রাজ্য বিস্তার করে ও তাহার পরিচালনা করে তাহারা নানা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র উপস্থিত রহিয়াছে। ভুল বিশ্বাস ও আচ্ছন্ন দৃষ্টির মোহ ও মায়াকে কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তবেই ইহাদিগকে দেখিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য জন্মায়। নহিলে ইহারা বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া যথেচ্ছা নিজ অভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়া লইবে। ইহাদিগকে দমন করা যাইবে না। ভারতবাসীদিগের দুর্ব্বলতা আছে যে তাঁহারা শ্বেতাঙ্গদিগের সাহচর্য্য লাভ করিলে নিজেদের ধন্য মনে করেন সেই দুর্ব্বলতার জন্যই শ্বেতাঙ্গগণ নানাপ্রকার ভারত-বিরুদ্ধতা করিতে সক্ষম হয়। ভারতবাসীদিগের মনে রাখা উচিত যে ভারতীয় সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য অথবা ভারতীয় ধর্ম্ম ও তাহার আচার পদ্ধতি সম্বন্ধে অতি অল্পই বিদেশী আছেন যাঁহারা ভারতীয়দিগকে কীর্ত্তন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম অথবা অন্যান্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ বা প্রেরণা দান করিতে পারেন। সুতরাং কোন শ্বেতকায়ের হস্তে ঢোলক দেখিলেই তাঁহাকে কীর্ত্তনের তাল সম্বন্ধে মহা কৌশলী মনে করিবার কোন কারণ থাকে না অথবা কেহ যদি শিখা রাখিয়া নগ্ন গাত্রে ঘোরাফেরা করেন তাহা হইলে তিনি এদেশের বৈষ্ণবদিগের তুলনায় অধিক ভক্তিমান্ অথবা কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহা জ্ঞানবান্ এরূপ চিন্তা করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না। অকারণে বিকট নিনাদে দশা প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া যাইলেও নহে। কারণ পাশ্চাত্ত্য দেশীয় মানুষ মানব-ব্যবহারের লক্ষণ বিচার করিয়া অনুকরণ করিতে বিশেষ তৎপর। মনের গভীরে যে ভাব ও অনুভূতি হইতে বাহ্যিক ব্যবহারের জন্ম হয় তাহার উপলব্ধি কিছুমাত্র না থাকিলেও হাবভাব ও কথার অনুকরণ করিয়া উপর উপর একটা সাদৃশ্য সৃজন করিয়া মানুষকে নিজেদের সম্বন্ধে ভুল বুঝাইবার কার্য্যই মতলব হাসিল করিয়া দেয়।

কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য

সংবাদপত্র ছাপিবার উপযুক্ত কাগজ ভারতে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া যাওয়াতে পত্র-পত্রিকাদি পরিচালনা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যেটুকু কাগজ বিদেশ

হইতে আমদানী করিবার আদেশ ভারত সরকার পত্রিকার প্রকাশকদিগকে দিয়া থাকেন তাহা প্রথমত: সরকারী দফতর হইতে যোগাড় করিতে করিতে প্রকাশক দিগের মাথার চুলে পাক ধরিয়া যায়। ক্রমাগত নানা প্রকার বাধার সৃষ্টি করিয়া সরকারী আমলাগণ সময় কাটাইয়া দিয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকেন যে, মালিকদিগকে কাগজের অভাবে অতি মহার্ঘ স্বদেশী মিলের কাগজ শতকরা দুইশত পঞ্চাশ টাকা অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া পত্রিকা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহার পরেও আমদানী কাগজ আনাইবার লাইসেন্স আনিতে বছর প্রায় ঘুরিয়া যায়। প্রায়ই শুনা যায় ভারত সরকার নানা ভাবে পত্র-পত্রিকা-প্রকাশক-দিগকে সাহায্য করিবেন মনস্থ করিয়াছেন; কিন্তু সে সাহায্যটাত পাওয়া যায়ই না উপরন্তু বিদেশ হইতে সস্তা কাগজ আনাইয়া যে সুবিধা হইত তাহাও আমলাদিগের যথেচ্ছাচারের ফলে বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। ভারত সরকার অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন কাহার কাহার লাইসেন্স আটকান আছে। সেই লাইসেন্সগুলি শীঘ্র শীঘ্র বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেই সকল পত্রিকা-প্রকাশকগণ ভারত সরকারকে ধন্য ধন্য বলিতে আরম্ভ করিবেন। যদি লাইসেন্সগুলি যথাসময়ে না পাওয়া যায় অথবা পূর্ণরূপেই খারিজ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে শুধু ফাঁপা কথার আওয়াজে প্রকাশকদিগের কার্য্যে সাহায্য করা সুসাধিত হইতে পারিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় যে-সকল পত্রিকার, অর্থাৎ যাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি প্রতি সংখ্যা ১৫০০০ অপেক্ষা কম ছাপা হয়, সেই-সকল পত্রিকার জন্য সরকার বাহাদুর অধিক সহানুভূতিশীল বলিয়া বলা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, ঐ-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণই কাগজ আমদানীর লাইসেন্স পাইতে সর্ব্বাধিক বিড়ম্বনার ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশী কাগজ পাওয়া সংবাদপত্র পত্রিকাদি প্রকাশ করার জন্য একান্ত আবশ্যক। উহা না পাইলে বহু পত্রিকার প্রকাশ রহিত হইয়া যাইবে ও মুদ্রণ ব্যবসায়ে বেকারী আরম্ভ হইবে। এই কারণে সরকারী ভাবে দেখা আবশ্যক যাহাতে সকলের লাইসেন্স যথাযথ ভাবে অবিলম্বে দেওয়া হইয়া যায়।

বাংলাদেশ প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীকৃতি পাইয়াছে

২১শে মাঘ অনেকগুলি রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে রাষ্ট্রীয় অধিকারে ন্যায়তঃ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মানিয়া লওয়াতে এখন পৃথিবীর বহু দেশই ঢাকাতে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইতে আরম্ভ করিবেন। যে সকল দেশ এখন অবধি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, পূর্ব্ব জার্ম্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ইউগোস্লাভিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্ম্মানী, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, ইসরায়েল, ব্রহ্মদেশ, ও নেপাল। যে-সকল দেশ এখনও স্বীকৃতি দান করেন নাই তাহার মধ্যে প্রধান হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্থান। ফ্রান্স ও ইতালী শীঘ্রই স্বীকৃতি দিবেন বলিয়া সকলে মনে করেন। আরব, ইরাক ও তুর্ক দেশীয় রাষ্ট্রগুলি এখনও পাকিস্থানের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বাংলাদেশকে পূর্ব্ব পাকিস্থান বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, এবং জর্ডান দুই নৌকায় পা রাখিয়া ভারসাম্য রক্ষায় অসমর্থ। জর্ডান ব্রিটেনকে খুশী করিবার জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধতা করিতে কিছুটা নারাজ এবং নিজ ইসলামী-ঐক্য-প্রীতি দেখাইবার জন্য কিছুটা পাকিস্থান-সমর্থক—শেষ অবধি কোন্ দিকের ওজন অধিক হইবে এখনও বলা সহজ নহে। তবে মনে হয়, অর্থের ওজন ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক হওয়ারই সম্ভাবনা।

আমেরিকা ও চীন পাকিস্থানকে নিজেদের ভারত-বিরুদ্ধতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারেচ্ছুক ও সেইজন্য পাকিস্থানকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া ভারতকে বিপর্য্যস্ত করিতে সদা তৎপর। কিছুকাল পূর্ব্বেই পাকিস্থান ভারতকে আক্রমণ করিয়া চৌদ্দ দিবসের সময়ে নিঃসন্দেহভাবে পরাজিত হইয়া প্রায় একলক্ষ সৈন্যকে ভারতের নিকট আত্মসমর্পণ করাইয়াছে

কিন্তু যুদ্ধ রহিত হইবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই পাকিস্থান সর্ব্বত্র ঘুরিয়া অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। উদ্দেশ্য, ভারতের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া। শুনা যায়, আমেরিকা ও চীন পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দান আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং বাংলাদেশকে মানিয়া লইবার পরে বিশ্বজাতি সকল আমেরিকা ও চীনকে কিভাবে পাকিস্থানকে ভারতের সহিত যুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়া হইতে ক্ষান্ত করিবেন তাহা একটা ভাবিবার বিষয়। আমেরিকা আর একটা বিশ্ব মহাযুদ্ধ ঘটাইয়া নিজের কম্যুনিষ্ট বিরুদ্ধতা সফল করিতে চাহেন। এই কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য সাময়িকভাবে চীনের সহিত সখ্য স্থাপন চেষ্টাও আমেরিকা করিতেছে। উদ্দেশ্য, চীন ও রুশিয়ার দ্বন্দ্ব ঘটাইয়া উভয় শক্তিকেই কমজোর করিয়া ফেলা ও তৎপরে সুবিধা মত উভয়ের বিরুদ্ধে এককালীন বা বিভিন্ন সময়ে এমন কিছু ব্যবস্থা করা যাহাতে পৃথিবী হইতেই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রবাদ অপসৃত হইয়া যায়। বাংলা দেশ ও ভারত এখন অবধি ন্যায় ও সুবিচারের পথের পথিক। এই দুই দেশ আমেরিকার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ মানিয়া লইয়া আমেরিকার পক্ষে থাকিয়া রুশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধতা করিবে বলিয়া মনে হয় না। অপরদিকে এই দুই দেশ যে রুশিয়া ও চীনের সহকারী হইয়া কম্যুনিষ্ট দলে চলিয়া যাইবে এরূপ ভাবিবারও কোন কারণ নাই। রুশিয়াকে যদি অকারণে চীন বা আমেরিকা আক্রমণ করে তাহা হইলে ভারত রুশিয়াকে সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা, সন্ধির শর্ত্ত পালনার্থে—মতবাদের ঐক্যহেতু নহে। সে যাহাই হউক, আমেরিকা ও চীন পাকিস্থানের মত ফুটা নৌকায় যাত্রারম্ভ করিয়া রাষ্ট্রপথে কোথাও পৌঁছাইতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে হয় না। সে পথে তাঁহারা শেষ অবধি চলনেচ্ছুক থাকিবেন বলিয়াও মনে করা যায় না। পাকিস্থান ত একবার দ্বিখণ্ড হইয়াছে। তাহা যে আরও দুই-তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? সে অবস্থায় যদি পাকিস্থান না থাকে তাহা হইলে আমেরিকা ও চীন কাহার সাহায্যে ভারত-বিরোধ চালাইবে?

আর একটা কথাও চিন্তা করা আবশ্যক। ভারত এখন অবধি রুশের সহিত সখ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সন্ধি করিয়াছে। সাক্ষাৎ ভাবে ভারত রুশিয়াকে কোন সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য সাহায্য করে নাই। কিন্তু ভারতের নৌ- ও বিমান-বন্দরগুলি যদি ভারত রুশিয়াকে ব্যবহার করিতে দেয় তাহা হইলে রুশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া হইতে আমেরিকাকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় করিয়া দিতে পারিবে। সেরূপ হইলে আমেরিকার পক্ষে তাহা বিশেষ সুখকর হইবে না। ক্রমে ক্রমে আমেরিকাকে প্রশান্ত মহাসাগরেও হীনবল হইয়া পড়িতে হইবে। কারণ, জাপানও যে চিরকাল আমেরিকার সহিত মিলিয়া চলিবে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

আয়রল্যাণ্ডে বৃটেনে কলহ-বিবাদ

আয়রল্যাণ্ড যখন আইরিশ রিপাবলিক গঠন করিয়া স্বাধীন হয় তখন বৃটেন তাহা ভাগাভাগি করিয়া নিজ অধিকার রক্ষা করিবার পাপ নীতি অনুসরণ করিয়া উত্তর আয়রল্যাণ্ডের ছয়টি কাউণ্টিকে ভাগ করিয়া পৃথক্ করিয়া দেয়। তখন হইতেই ঐ দেশে সমগ্র অ্যায়রল্যাণ্ড এক রাষ্ট্র করিয়া লইবার চেষ্টা চলিতে থাকে ও বৃটিশের প্ররোচনায় উত্তর আয়রল্যাণ্ডের কিছু কিছু মানুষ বৃটিশের সপক্ষে ও আইরিশ রিপাবলিকের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া গঠিত হয়। বর্ত্তমানে উত্তর আয়রল্যাণ্ডে যে গোল-যোগ চলিতেছে তাহাতে ধর্ম্মের কথা, মিলিত এক জাতি এক দেশ গঠনের কথা, আই আর এ প্ররোচক বনাম বৃটিশ প্ররোচক প্রভৃতি নানা কথা উঠিতেছে। গুলি চালনা, বোমা নিক্ষেপ, মিছিল বাহির করা ইত্যাদি পুরাদমে চলিতেছে। বৃটিশের সৈন্য পাঠানর ফলে আবহাওয়া আরোই বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির সৈন্যগণও ছদ্মবেশে উপস্থিত থাকিতেছেন বলিয়া বৃটেন রটনা করিতেছেন। যে কেহ বৃটিশ সৈন্য অথবা বৃটিশ ভক্ত পুলিশের উপর গুলি চালাইলেই তাহাকে আই আর এ অন্তর্গত ছদ্মবেশী সৈন্য বলা হইতেছে।

৩০শে জানুয়ারী ১৯৭২-এ উত্তর আয়রল্যাণ্ডের লণ্ডনডেরি সহরে একটা গোলযোগের সূত্রপাত হইলে পরে বৃটিশ প্যারা-সৈন্যদিগের গুলিচালনার ফলে ১৩ জন নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। নিহতদিগের মধ্যে যে-সকল লোককে আই আর এর চর বলিয়া সন্দেহ করা হয় সেই জাতীয় মানুষও কয়েকজন ছিলেন ও এই ঘটনার পরে দারুণ আন্দোলন আরম্ভ হয়। গুলি চালানটা প্যারা-সৈনিকগণ অযথা করিয়া নরঘাতকের কার্য্য করিয়াছে, তাহারা মাই লাইএর হত্যাকারীদিগের সহিত তুলনীয়, ইত্যাদি তীব্র সমালোচনায় দেশ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ তরফ হইতে বলা হইতেছে যে আই আর এর গুপ্ত-সৈন্যগণ প্রথমে গুলি চালাইয়াছিল ও প্যারা-সৈন্যগণ শুধু আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাইয়াছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু সকলে বলিতেছেন যে, আত্মরক্ষা করাটা একটু অতিরিক্ত প্রবল হইয়াছিল। বৃটিশ প্যারা-সেনাগণ নাকি তাঁহাদের নির্ম্মম নরহত্যা কর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তাহারা যেভাবে মালয়েশিয়া, এডেন, সাইপ্রাস ও কিনিয়াতে তদ্দেশীয় জনগণের উপর নিধন-আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে তাহাদিগের এই ক্ষেত্রে নরহত্যা দোষ প্রমাণ করিবার আবশ্যক হয় না। আলস্টারের ইউনিয়নিষ্ট ও তদ্বিপরীত দলের যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে ব্যাপক ভাবে জাতির আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের আকার গ্রহণ করিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞদিগের মনে হইতেছে। বৃটিশের ফোড়ন দিবার ফলে এই আশঙ্কা ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইতেছে।

দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজের পত্তন কবে হইবে?

কলিকাতার উন্নতি সাধন লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার যাহা কিছুই করিবেন বলেন তাহাতেই দেখা যায় কোনকিছুই হয় না, অথবা হব হব করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়, নতুবা নানা প্রকার ওজর আপত্তি সৃজিত হইয়া শুধু তর্কাতর্কিই চলিতে থাকে। কলিকাতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কথার মধ্যে রাস্তা মেরামত একটা অতি বড় কথা। এই বিরাট সহরের রাস্তার অবস্থা দেখিলে মনে হয়, সহরের অসহায় নিরাশ্রয় অনাথ ও আতুর অবস্থা। কিন্তু এই সহরের রক্ষণাবেক্ষণ, জল সরবরাহ, সহর পরিষ্কার রাখা, আলোকিত রাখা, প্রভৃতি কার্য বহু অর্থব্যয় করিয়া করা হয়। এত পুলিশ অন্য সহরে দেখা যায় না, ক্রমাগত পাইপ মেরামতও এমন আর কোথাও হয় না, ঝাড়ুদার ও আবর্জ্জনা লইয়া যাইবার গাড়ীও অসংখ্য এবং আলোর থাম্বার অরণ্যে রাস্তা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু চুরী ডাকাইতি, খাদকাটা পথ ঘাট, আঁস্তাকুড়ের মত স্তূপাকৃত-আবর্জ্জনা-বহুল রাজপথ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিগলি কলিকাতার মত অপর কোন "প্রথম শ্রেণীর" সহরে লক্ষিত হয় না। এই ভাবে সহর নষ্ট করিবার যে-সকল কারণ আছে তাহার মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের অকর্ম্মণ্যতা প্রধান। জনসাধারণের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির মধ্যে পরিচ্ছন্নতার অভাব, অসংখ্য গৃহহীন মানুষের পথে বাস করা, ফেরিওয়ালাদিগের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব, নিজ সুবিধার জন্য সহর নষ্ট করার অভ্যাস, প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার উন্নতি হওয়া কঠিন এবং উন্নতি করিবার সজাগ আগ্রহও কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহারা নিজেদের বাসস্থান, শয্যা, বস্ত্র প্রভৃতি অপরিষ্কার হইলে কষ্ট অনুভব করে না তাহারা সহর পরিষ্কার যে রাখিবে না বা রাখাইবার চেষ্টা করিবে না তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি থাকিতে পারে? গৃহ, রাজপথ, বস্তি সকল-কিছুই যেভাবে রাখা হয় তাহার মূলে আছে জনসাধারণ, তাহাদের প্রতিনিধি ও শাসক সকলেরই সহর নির্ম্মাণ ও রক্ষণ বিষয়ে অনুন্নত দৃষ্টিভঙ্গী। যানবাহনের অবস্থা তথৈবচ। শুনা যায় যে, ভূগর্ভে রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের যাতায়াত-ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু সেকথা এখন অবধি কথাতেই আছে। যে সহরে অতিরিক্ত টেলিফোন, বিদ্যুৎশক্তি, গ্যাস বা জল পাইতে ৫।১০ বৎসর চেষ্টা করিতে হয় সেখানে পাতাল পথে রেলগাড়ী চালাইতে ১০০ শত বৎসরও লাগিয়া যাইতে পারে। ১০০টা বাস অথবা ৫০০ শত

মানসিকের দেবদেবী

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

মানুষের মনও যেমন চিরকাল আছে, 'মানসিক'ও বোধ হয় তেমনি চিরকাল আছে।

"পুত্র-বিত্ত-যশ-রূপ শত্রু জয়" কোনও মানসিকই তারা দেবতাদের কাছে করতে বাকি রাখে নি। যখন যে আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়েছে মন ঐ মানসিক নিয়ে সেখানে ছুটেছে।

রামায়ণে পাই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। মহাভারতে একটু অন্যরকম ভাবে পুত্র কামনায় ক্ষেত্রজ পুত্রদের জন্ম। অশ্বপতি রাজার সূর্যপূজা করে কন্যা সাবিত্রী লাভ। চণ্ডীতে সুরথ রাজা সমাধি বৈশ্যের হৃতরাজ্য উদ্ধার—আবার পরাজ্ঞান লাভ। প্রেমের জন্য ব্রজ গোপীদের কাত্যায়নীপূজা ব্রত।

লৌকিক কাহিনীতেও রূপ-(অবশ্য কম)-বিত্ত-পুত্র যশাকাঙ্ক্ষা দেখতে পাওয়া যাবে। এর সঙ্গে রোগ মুক্তি-শত্রু-নিধন (অর্থাৎ মামলা জয়) ইচ্ছাও আছে। পুরাণ থেকে লোক-কথা অবধি সর্বত্রই সব মানুষেই এই আকাঙ্ক্ষা-কামনা সিদ্ধির নানা অনুষ্ঠান কাহিনীর কথা পাওয়া যাবে।

এবং 'সেকেলে মতের' মানুষ ও একালের শিক্ষিত মানুষ, যে যতই সংস্কারমুক্ত হোন না কেন, নরনারী নির্বিশেষে সন্তান কামনা আধি-ব্যাধি-রোগ মুক্তির মানসিক করে থাকেন। না করতে চেয়েও সঙ্গোপন মনে যেন একটু বিশ্বাসও করেন।

এবং সবচেয়ে বড় চাওয়া হ'ল সন্তান চাওয়া (যতই না কেন পরিবার সংক্ষেপ পরিকল্পনা প্রচার করা হোক)। আরেক বড় চাওয়া রোগ-মুক্তি, নিজের চেয়েও—স্বজন ও সন্তানদের জন্য।

দুর্গা কালী শিব বিষ্ণু সূর্য চন্দ্র বায়ু বরুণ এবং 'দশাবতার' বা 'দশমহাবিদ্যা'দের সগোত্র নন। পূজা পাঠ মন্ত্র নৈবেদ্যও তাঁদের মত নয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতও সে ধরণের লাগে না।

এঁরা কবে কোন্ দেশে আবির্ভূত হয়েছেন তারও ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঠাকুর দেবতাও ঠিক বলা যাবে না। 'অপ' 'উপ' দেবতার মত অনেকে আছেন।

এঁদের নাম হল পাঁচু ঠাকুর, ক্ষেত্রপাল, সতীমা, পঞ্চানন্দ, সত্যপীর, কবরবাসী নানা নামের ফকীর, পীর সাহেব। সন্ন্যাসী, সাধু এবং বৃক্ষ দেবতাও। ঠিক দেবদেবী নন।

একটুখানি এখন প্রথম বলি পাঁচু ঠাকুরের কথা।

এই পাঁচু ঠাকুরের 'দোর ধরা' অর্থাৎ ধরণা দিয়ে মানসিক করে শরণাগত হয়ে মৃতবৎসার পুত্র রক্ষা বা পুত্র লাভ। কামনা পূর্ণ হলে সন্তানের নাম করণেই পাঁচু ঠাকুরের মহিমা জ্ঞাপন। এবং তাঁর ব্যাপক খ্যাতি পরিচয়ের প্রতিষ্ঠার পরিচয়। হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল, বুনো, হাড়ি, বাগদী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ সব বর্ণেই ঐ পাঁচু পেঁচো পাঁচকড়ি পঞ্চানন পাঁচি ছাঁচু ছাঁচি (স্ত্রী সন্তান) ঐ নাম রাখার প্রথা। আপনারা পাঁচু সেখ, পাঁচু গোপাল, পাঁচু হাড়ি, পাঁচি বামনী, পাঁচি বাগদিনী, ছাঁচি গয়লা, আবার পাঁচু গোপাল—চাটুয্যে মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে সেন গুপ্ত মিত্র ঘোষ বোস সব পাবেন যাঁরা সকলেই "পাঁচু ঠাকুরের প্রসাদ জীবিত"।

যদি এক বাড়ীতে তিনচার জন জননী মৃতবৎসা বা কাক বন্ধ্যা (যাঁর একটি মাত্র সন্তান হয়ে আর হয় না) থাকেন সেখানে ঐ পাঁচু নাম; বড় পাঁচু ছোট পাঁচু

রাম পাঁচি শ্যাম পাঁচি ছোট পাঁচি বড় পাঁচি নাম রাখে লোকে। অর্থাৎ পাঁচু ঠাকুরের নামেই তাদের জীবন পরিচয়।

পাঁচু ঠাকুরের আদি নিবাস অথবা আস্তানা বা স্থান হল গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের কাছে। খাস কৃষ্ণনগর কি না বলা যায় না। পাঁচু ঠাকুর দেবাংশী অথবা 'পুরা' দেবতা কি না তাও বলা যাবে না। ভীত নারীরা জননীরা দেবতাই বলেন। পাঁচু ঠাকুরের পূজা ভোগ রাগ একটা প্রথামত হয়। অন্য সব দেবতাদের মত নয়। ফল ফুল বাতাসা প্রণামী পাঁচ পয়সা, পাঁচ আনা, পাঁচ টাকা, পাঁচ সিকা সবই 'পাঁচের অঙ্ক' হিসাবে চলে। সন্তানের পাঁচ দশ বছর মানসিক মত বয়স মেনে প্রতি শনি মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় কিছু বাতাসা, এক ঘটী জল একখানি পিঁড়ি পেতে তাঁর জন্য রাখতে হয় একটি ছাঁচতলায়। অর্থাৎ প্রাঙ্গন বা উঠান নয়, ঘরও নয়। দালানের বা দাওয়ার প্রান্তদেশের নাম 'ছেঁচ তলা' বা 'ছাঁচ তলা'। যারা পাঁচু ঠাকুরের মানসিক সন্তান তাদের জননীর মানসিকের 'কাল' (সময় বছর) অনুযায়ী সেই ততদিন (আসন) পিঁড়ি জল মিষ্টি দেওয়া নিয়ম। তাঁরা যে দেশে যেখানেই থাকুন না কেন, উদ্দেশে ঐ আসন দিতে হয়।

যদি অত সব করেও সন্তান আবার জননীকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে গত হয়ে যায়? তার জন্যও কঠিন বিধি-নিষেধ আছে। আচার শুচিতায় শয়নে ভোজনে বিচরণে। আর আছে শিশুর জন্মের পর তার জন্য কিছু তুক্‌তাক্‌। যেমন 'মড়ুঞ্চে' জননীর (মৃতবৎসা) গত হওয়া শিশুর পরবর্তী ভাই বা বোন হলে (ভাইয়ের সম্পর্কেই বেশী কড়াকড়ি বিধি-নিষেধ) তার নাক বিঁধিয়ে একটি নথ পরিয়ে দিতে হবে 'বেটাছেলে' হলেও। আর পায়ে লোহার মল একটি পরাতে হবে। যে কোনো লোহার তৈরী নয়।—জেলখানার কয়েদীর পায়ের বেড়ীর লোহাতে সেই মল তৈরী করিয়ে নিতে হবে। পুত্রটির ডান বা দক্ষিণ নাকে নথ পরানো, আর ডান পায়ে মল পরানোর প্রথা। অর্থাৎ চিহ্নিত জাতক। উচ্চ বর্ণ ব্রাহ্মণাদি হলে তার পৈতার সময়ে (দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ কালে উপনয়নে) তার ঐ নাকের নথ পায়ের চোরের বেড়ী খুলে নেওয়া হবে। এবং তার নাম যে পাঁচু ঠাকুরের নামে হবে বলা বাহুল্য।

আমাদের একটি আত্মীয়ের ঐ নথ বেড়ী পরা দেখেছিলাম। নিতান্ত বালক বলেই সে ক্ষেপালেও ক্ষেপতো না। আর ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, বড় একটা কেউ ক্ষেপাতোও না সেকালে।

বিধি-নিষেধগুলি তখন না বুঝলেও এখন বুঝি। সবটাই বেশ স্বাস্থ্যবিধান সম্মত। যদিও কিঞ্চিৎ ভয় দেখানো সহ। শুচিতার ব্যাপার পরিচ্ছন্নতা প্রায় সবই মেয়েলী শাস্ত্রসম্মত হলেও সেকেলে মেয়েদের ভয় পাওয়ানোতে কাজ হত। অন্ধকার রাত (পাছে ভয় পায়)—সন্ধ্যাবেলা এখানে সেখানে ছাতে উঠানে যাবে না। এলোমেলো থাকবে না। চুল খুলে বেড়াবে না। মাথায় ফুল গুঁজবে না। শুচিতা বিধান, দিনের মধ্যে বার পাঁচ-সাত কাপড় বদলাতে হত। ভাত খাওয়া কাপড় স্নানের ঘরের 'ঘাটের' অর্থাৎ ছোটখাটো কারণে কাপড় বদলাতে হ'ত। শোওয়ার খাওয়ার বিধান, মাংস পেঁয়াজ ডিম নিষিদ্ধ বস্তু। বিছানা শুচি শুদ্ধ রাখা। ব্যাখ্যা লাগবে না। মেয়েরা সব বুঝবেন। পুরুষরাও জানেন আন্দাজী। মোটামুটি বেশ একটু বিধি-নিষেধের ভয়ের ভাবনার কড়া শাসনে পাঁচু ঠাকুরের "মাসীমা ঠাকুরাণী" ঐ সব সন্তানবিয়োগকাতর জননীগুলিকে নিয়মে সংযমে রেখে পরবর্তী সন্তানগুলিকে জীবিত কোলে তুলে দিতেন। পাঁচু ঠাকুরের প্রসাদে।

হ্যাঁ। পাঁচু ঠাকুরের 'মাসীমা' একজন ছিলেন! আছেন। থাকেন। সেই 'মাসীমা'ই তাঁর সেবাইত বা সেবিকা। পাঁচু ঠাকুরের অভিভাবিকা। ঠাকুরের 'থান' বা বাড়ীর গৃহিণী। পূজা ভোগরাগের ব্যবস্থা-কারিণী। সর্বোপরি তিনিই শরণাগত জননীদের বিধান নিয়ম সংযম নির্দেশ, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা কত বছর অবধি বালক-বালিকাদের ও জননীদের কি করা উচিত তার নির্দেশ দেন। নামও পাঁচু ঠাকুর

চিহ্নিত নাম রাখা হয়। পাঁচুগোপাল ক্ষীরোদগোপাল নাড়ুগোপাল নবগোপাল, প্রায়ই শেষাংশ গোপাল। প্রথমাংশ পাঁচু ও তার মত অর্থ ও দেবতামাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক নাম। প্রথম পাঁচুগোপালের পরেও সব সন্তানের নামেই 'গোপাল' কথাটা থাকত।

পাঁচু ঠাকুরের কিন্তু মূর্ত্তি নেই। গল্প শোনা যায় একটা অন্ধকার ঘর পর্দা ফেলা বা দরজা বন্ধ করা। দুয়ারের সামনে মাসীমা ঠাকুরাণী বসতেন। যত কিছু চিঠিপত্র, জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর, পরামর্শ দিতেন। দেশ-দেশান্তরের জননীরা উপস্থিত না হলে আসতে না পারলে—প্রায়ই আসতে পারতেন না—তাঁদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু (কর্মচারী ভৃত্য দাসীও) তারা এসে উপদেশ ও বিধান নিয়ে যেতেন। মাদুলী কবচ ধারণ করতে দিতেন পাঁচু ঠাকুরের নামের।

পাঁচু ঠাকুরের ভোগের গল্পও সব ঠাকুর দেবতার ভোগের কাহিনীর মত নৈবেদ্য 'দর্শন'-ভোগ্য নয়।

একটি ঘরে 'ঠাঁই' করে (আসন করে) প্রচুর অন্ন-তার মত ব্যঞ্জন, নানাবিধ পাত্রে তরকারী মাছ পায়েস দধি মিষ্টান্ন সব উপচার সাজানো হ'ত। এবং পাঁচু ঠাকুর সন্ধ্যার পর স্বয়ং এসে ভোজন করতেন সেই সব। রক্ত-মাংসের দেহী দেবতার মত আহার করে আচমন করে প্রস্থান করতেন বিশ্রামের জন্য।

কিন্তু কেউ তাঁকে দেখেনি। 'জনশ্রুতি বলে চেহারা তাঁর মানুষের মত নয়—দেবতাদের মতও নয়।—তবে? সেটা ভয়াবহ কিছু। শোনা যায় এখন ক্রমে কাছাকাছি আরো ক'একটি গ্রামে পাঁচু ঠাকুরের আস্তানা হয়েছে।

এখন আর এক দেবতা ক্ষেত্রপালের কাহিনী শোনা যাক।

'ক্ষেত্রপাল' নামেই বোঝা যায় ধরিত্রী জননীর কোল বা "ক্ষেত্র' রক্ষক তিনি। তাই থেকে ক্রমে বোধ হয় মানবী জননীরাও সন্তানের কল্যাণ কামনায় ক্রোড় দেবতাদের রক্ষক হিসাবে বিপদে বিপর্য্যয়ে তাঁর শরণাগত হয়েছেন। ইনি সাধারণতঃ গ্রামেরই বাস্তু বাড়ীতে ব্রাহ্মণের ঘরে বাস করেন। বৃক্ষমূল বেদী ঘট পীঠে আবাস। মূর্ত্তি এঁরও বিশেষ আকারে নেই। কোনো গাছে বা শিলা দেবতা। ভোগরাগের স্পষ্ট খবর জানা যায় না। মনে হয় ফলমূল নৈবেদ্যই ভোজ্য বস্তু। আহার করেন না। দৃষ্টিভোগ। সাধারণ সব দেবতাদের মত।

এঁর নিয়ম নীতি অত কড়া নয়। খুব স্পষ্টও নয়। ব্রাহ্মণ অভিভাবক অভিভাবিকারা সব স্পষ্ট করে দেন না। কিছুটা রহস্যময় করে রাখেন। আকার নেই বটে; কিন্তু 'ভয়ের আকার' একটা কিছু আছে। লোক কথায় বলে এবং এঁরও 'প্রতাপ' আর 'প্রচার' কম নয়। অসংখ্য লোকের 'ক্ষেত্র' নামেই বোঝা যাবে। লৌকিক আকার মূর্ত্তি ধারণ করেন। কৃপা হলে। আমাদের অনেকের প্রথমেই মনে পড়ে যাবে "কঙ্কাবতী"—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের—গল্পের ক্ষেতু। যে কঙ্কাবতীর নায়ক 'হীরো' যাই বলুন। তারপর আমাদের আশপাশের জগতে ক্ষেত্রমোহন, ক্ষেত্রদাস, ক্ষেত্রকৃষ্ণ, ক্ষেত্রগোপালদের পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতুদিদি, ক্ষেতুপিসী, ক্ষেতুমাসী, ক্ষেত্রঠাকুর্ঝি, ক্ষেত্রমোহিনী, 'ক্ষেত্তর'দাসী, ক্ষিতিবাসিনী, ক্ষিতি-মেথরাণীও হাড়িনীও পাওয়া যাবে। এক আমাদেরই সম্পর্কীয় চার-পাঁচ সম্পর্কের কয়েকজন 'ক্ষেতু' পুরুষ ও 'ক্ষেতু' মেয়ে ছিলেন বাড়ীতে। তাঁদের সকলের জননীই বোধ হয় 'ক্ষেত্রপালক', 'ক্ষেত্র'বিপদ্‌বারণ, ক্ষেত্ররক্ষক দেবতার শরণাগত হয়েছিলেন। মাসী, বোনঝি, ভাইঝি, ভাইবোন ক্ষেতু এক পরিবারেই তখন অনেক পাওয়া যেত। যাবেও এখনো হয়ত। গ্রামাঞ্চলে।

এঁর নিয়ম আচার বিবরণ স্পষ্ট এখনো পাইনি। তবে নিয়ম আচারের কঠোরতা কম। মাদুলী বা 'রজ ধুলো' খাওয়া মাটি ফুল নির্মাল্য কবচ পরার নিয়ম।

এঁর পরে 'সতী'মার কথা। এই 'সতীমা' হলেন, ছিলেন, কর্ত্তাভজাগুরু আউল চাঁদের প্রিয় শিষ্য রামশরণ পালের পত্নী। পরম ভক্তিমতী সাধ্বী নারী। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মাতৃস্থানীয়া। সতীমার পীঠ

হল। ঘোষপাড়া নামের একটি জায়গায়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদি গুরুর নাম ছিল আউল চাঁদ—। এঁরা আউল বাউল নামেও পরিচিত। এঁদের দলেই 'সতীমা'র আবির্ভাব। এই সতীপীঠে সতীমার পুজায় সন্তান কামনায় সন্তানের আয়ু মঙ্গল কামনায় বহু নারী গিয়ে থাকেন। খুব বেশী দিনের এই পীঠ আবির্ভাব না হলে এঁর ভক্ত শরণাগত নরনারীও অনেক। দোলের সময় খুব বড় উৎসব হয়। বিধি নিষেধ আচার নিয়ম সংযমের বেশী কঠোরতা নেই। 'সতীমার' দোর ধরা'। অর্থাৎ শরণাগতিই আদি কথা ও প্রথা। পুজার জন্য পয়সা তুলে রাখা হয়। উৎসবে দেওয়া হয়। একটি 'এঁদো ডোবা' এঁদের পরম পবিত্র জলাশয় এখনো। এই সতীমার প্রসাদে পাওয়া সন্তানদের নামও সত্যদাস, সত্যগোপাল, সত্যসখা, সত্যচরণ,—সত্য দিয়েই নাম রাখা নিয়ম। মেয়েদেরও সত্যদাসী, সত্যবালা, সত্যময়ী, সত্যমণি নাম হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য 'সতী' নাম রাখা হয় না। যে সংস্কারে জন্মদুঃখিনী 'সীতা' নাম রাখা প্রচলন ছিল না হিন্দু সমাজে। 'সতী' নামও দুর্লভ দেখা যাবে।

তারপরে কেন বা কবে থেকে জানা যাবে না পীর ফকিরের কাছে মানসিক করে সন্তান লাভ কিম্বা সন্তানের অসুখ বিসুখ 'ফাঁড়া কাটানো, জীবনাশঙ্কা নিরাময় নিবারণ কামনায় এঁরা সকলেই পীর সাহেব, সাঁইবাবা, সৈয়দ সাহেব নামে খ্যাত। এঁদের কথায় পরে আসব। সত্যপীর বা সত্যনারয়ণ তো 'মানসিক' জগতে এখনো প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্টতম। এই সব মানসিক দেবতাদের মানসিক কামনার সিদ্ধির প্রসিদ্ধি আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গাদেবী দেবতাদের চেয়ে বেশী। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুর্গা কালী কৃষ্ণ পুজা ব্যয়-সাধ্য এবং মন্দির-পুরোহিত-সাধ্য। মন্দিরে প্রবেশ ও পাঁচু বাগদীর বা ক্ষেত্তর হাড়িনীদের সতীমার বা পীর ফকিরের কবচ ধারকদের মাদুলীওয়ালাদের অনধিগম্য ব্যাপার। কাজেই লৌকিক মানসিকের দেবতাদের একটা প্রধান অংশ হ'ল জনসাধারণ। তারা ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকলেও,না থাকলেও, কোথাও 'ভরমা' কোথাও 'মাসীমা' কোথাও 'দেবাংশী' কেউ মারফৎ তাদের পুজা মানসিক নিবেদন অর্চনা করে যায়। আশ্চর্য্য তারা জাতিতে 'জেলে' 'মালো' অন্য নানা অব্রাহ্মণ জাতি মুসলমানও হয়। তাতে মানসিক-কারীর কোনো বাধা হয় না। জাতিগতভাবে।

পঞ্চানন্দ। আমাদের হাওড়া জেলায় আছেন প্রসিদ্ধ দেবতা পঞ্চানন্দ ঠাকুর। পঞ্চানন তলা নামে স্থান। প্রসিদ্ধ জায়গায় জায়গায় আবির্ভূত হ'ন। একটা বড় মাপের উপবিষ্ট পুরুষদেবতা মূর্ত্তি। দ্বিভুজ। বলিষ্ঠ চেহারা। হাঁটুর ওপর পা তুলে বসা মূর্ত্তি। মাথায় জটার মত চুল। কালো গোঁফ। হাতে ত্রিশূল কিনা মনে নেই। বাঘছাল বসন মনে হচ্ছে। মনে হয় মহাদেবই পঞ্চানন্দ ঠাকুর হয়েছেন। পূজক আছেন। ব্রাহ্মণ। মানসিক করে যারা, কোনো ফুল নিয়ে দিয়ে দেয় পায়ে। সেই ফুল চরণ থেকে খসে পড়ায় একটা বিধি আছে। তাতেই বাসনা কামনা সিদ্ধ হবে কি না বোঝা যায়। শনি-মঙ্গলবারে পূজা বিধি। বেশীর ভাগই নারীর ভিড়। এবং এখানেও বেশী সব মানসিক সন্তানদের জন্যই। নাম পঞ্চানন্দ, পঞ্চানন, পঞ্চাননী কিন্তু পাঁচু নয়। পাঁচকড়িও নয়। পূজার কিংবদন্তী কাহিনীটি খুঁজে পাই নি। কত দিনের এ পূজা তাও জানা যায় নি।

আর ওদিকে হুগলী জেলায় প্রসিদ্ধ তারকেশ্বর শিব। স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। বহু কিংবদন্তী আছে দেবতার আবির্ভাব নিয়ে। মুকুন্দ ঘোষ আগে স্বপ্নাদেশ পান। লিঙ্গের উপর ভাগটাকে রাখাল বালকরা ঢেঁকির মত ব্যবহার করায়—একটি উদুখলের মত গর্ত্ত মাথায় আছে। মহাজাগ্রত দেবপীঠ।

আধি-ব্যাধি-সন্তান-সংসার নিয়ে যত কামনা মানসিক আছে লোকে করেন। দুরারোগ্য রোগমুক্তি সন্তান কামনাই বেশীর ভাগ কামনা। নাট মন্দিরের একদিকে ছোট ছোট ঢিল ইটের কুচি টুকরা বেঁধে 'ভারা' বেঁধে দেয় লোকে—মানসিক করে

কামনা পূর্ণ হলে 'ভারা' খুলে পূজা দেবার নিয়মও আছে। নাট মন্দিরে অনাহারে পড়ে থেকে 'হত্যা'ও দেয় মানসিক করে। গল্প কাহিনী কিংবদন্তীতে ভরা দেবমাহাত্ম্য লীলা। অসুখ সারে। প্রত্যাদেশও পায়। নামও তারকনাথ, তারকদাস, তারকদাসী, তারকপ্রসাদ, তারকরাণী, তারকেশ্বরী, তারিণী—নাম রাখা হয়—'প্রসাদ' সন্তানদের। গুজরাটি হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী শেঠ নানা ভিন্ন প্রদেশীয়েরা শুধু যান তা নয়, অকাতরে খরচ করে পূজা দেন, গহনা অলঙ্কারেও ভূষিত করেন। মানসিক করেন। হত্যা উপবাস 'দণ্ডী' খাটাও (শুয়ে শুয়ে পথ বা মন্দির পরিক্রমা করেন)।

পার্লামেন্টের 'তারকেশ্বরী সিংহের' নামটিও মনে হয় ওখানকারই 'প্রসাদী' নাম।

বীরেশ্বর। ইনি কাশীধামের বিখ্যাত শিব। সম্ভবতঃ আরো চিহ্নিত বিখ্যাত হয়েছেন—বীরেশ্বরপ্রসাদী বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দের আবির্ভাবে। (ভক্ত প্রসাদাৎ মহিমা প্রচার।)

এঁর মানসিক ও নামের পূজারও বিশেষ বিধি 'সোমবার' ব্রত করা, ফল অথবা হবিষ্যান্ন খেয়ে। আর পূজা দেওয়া।

বিবেকানন্দ-জননী কঠোরভাবে নিয়ম অনুষ্ঠান করে বীরেশ্বর নামে পুত্র লাভ করেন। (বিবেকানন্দ, নরেন্দ্র) বীরেশ্বর শিব তো চিরকালই ছিলেন তিল ভাণ্ডেশ্বর বিশ্বনাথ। বিশ্বেশ্বর শিবের সংখ্যার তো সীমা নেই।

কিন্তু বীরেশ্বর 'প্রসাদ' বিবেকানন্দ বীরেশ্বরকে জগদ্বিখ্যাত করে দিয়েছেন। এঁর প্রসাদী সন্তানদের নামও বীরেশ্বর, বীরেশ্বরী, আদি শিবনাম।

এই হলেন বিশিষ্ট কয়েকজন মানসিকের দেবতা ও দেবী। কিন্তু এইসব দেবতা দেবী ছাড়াও একটী বিপুল সংখ্যক উপাস্য ঠাকুর আছেন পুণ্য নদী, পুণ্য বৃক্ষ, পুণ্য স্থান, 'বাবার থান' বা 'মায়ের থান স্থান' নামে অভিহিত। পীরসাহেব সাঁই সৈয়দ ফকীরের কবর সমাধি স্থল ও গ্রামে সহরে হাটে বাটে মাঠে যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যায়।

সোমড়ায় আছেন জাগ্রত ৺পীরসাহেব ফকীরের আস্তানা, নাম নোয়াজন ফকীর। যাঁর প্রসাদে মৃতবৎসা নারী জীবিত সন্তান কোলে পায় বন্ধ্যা নারী পুত্র পায়।

এবং সেইসব সন্তানদের নামও 'দোয়াদাস' 'নোয়ারাম', কিছু বদলে 'লোহারাম' (স্মরণীয় লোহারাম শিরোমণির ব্যাকরণ)। 'লোহাদাস' নামও হয়।

বিহারে, পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, বিশাল উত্তরপ্রদেশেও এই 'মাতা ও সন্তান তীর্থের' অভাব নেই। স্রষ্টা জননী ও সৃষ্ট ক্রোড় দেবতার লীলাপীঠ। তাদের নামও হনুমানজী মহাবীরজী বজ্রাঙ্গজী (বজরং) দেবতা সব হনুমানেরই (ভৈঁরোজীও) নামে। মহাবীরকে লাড্ডু ভোগ, ডোরা বাঁধা ভারা বাঁধার প্রথা সর্বত্র সব দেবদেবীর মন্দিরের মতই। মায়েরা কাছাকাছি কোনো পবিত্র কুণ্ড বা পুকুরে স্নান করে নেয় কিংবা গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী কাবেরীতেও স্নান করে নিয়ে ভারা বা ডোরা বেঁধে সন্তান কামনা, সন্তানের রোগমুক্তি, জীবিতবৎসতার জন্য মানসিক করে আসে।

একবার পাঞ্জাবে আছি অমৃতসরে। আমার একটা শিখ দাসী ছিল। অকালী শিখ। ভারি ভদ্র আর ভক্তিমতী। কাছাকাছি রামতীর্থ নামে এক গ্রাম। সেখানে তার বাড়ী।

রামতীর্থে খুব বড় মেলা হয় রামনবমীতে। এমনিতে বারো মাস 'সদাব্রত' আছে (লঙ্গরখানা), শিখদের বিনামূল্যে আহার্য দেওয়া হয়। ওদেশের মতে এই রামতীর্থেই সীতাকে বনবাস দেওয়া হয়। এবং সেইখানেই বাল্মীকির আশ্রম ছিল। সেইখানেই লবকুশের জন্মও হয়। এককথায় শ্রীরাম তো সর্বভারতীয় নরদেবতা। তাঁর নামের মহাতীর্থ সর্ব্বত্রই থাকবে। তাই পাঞ্জাবেও আছে। তাই সীতার বনবাসভূমি, লবকুশের জন্মভূমি, বাল্মীকির আশ্রমও সেখানে আছে। শিখেরা 'নিরংকার' 'একেশ্বরবাদী' যতই হোন, রামতীর্থ হিন্দু শিখ সবারিই মহাতীর্থভূমি। একত্র উৎসবময় তীর্থ।

গেলাম দেখতে। একটী প্রকাণ্ড জলাশয়। পাশে পাশে অনেক ভাঙাচোরা অট্টালিকা প্রাসাদের কেল্লার মত। সবই ধ্বংসাবশেষ। মনে হয় কোনো সামন্ত জমীদার রাজার দুর্গ ও আবাসভবন ছিল। জলাশয়টী খুব ভালো করে বাঁধানো। কাছেই অনতিদূরে খুব উঁচু পাড় একটী নদী আছে দেখা যায়। নদীটির নাম চন্দ্রভাগা (চেনার)। আমায় মনে হল এ নদীটিরই এটী কন্যা। একটী ছোট ধারা কোনো বর্ষার প্লাবনে এই দুর্গ পরিখায় এসে জমেছিল। আর ফিরে মার কোলে যায় নি। ক্রমে সেইটাই একটী পুণ্য জলাশয় তীর্থ হয়ে উঠেছে রাম-সীতা নামের মহিমায় ও ঘাট। দু'ধরণের সিঁড়িওয়ালা আর 'ঢালু' বাঁধানো। শুনলাম জীবজন্তু গরু মহিষের জল খাবার জন্য ঢালু করা। ভাঙা অট্টালিকার একদিকে সারি সারি ঘর।

সেখানে ত্রেতাযুগের সীতাদেবীর আঁতুড় ঘর। লবকুশের খেলা ঘর। বাল্মীকি মুনির বাসগৃহও। সীতাদেবীর রান্নাঘরও। আর লবকুশের তীর ধনুক কাঁথা বালিশ বিছানা কন্দুক (বল) সব জমা করা আছে। মেলার দিন দেখানো হয়।

আমি তো মেলার সময়ে যাইনি তাই দেখা হল না। প্রীতমকুমারী (আমার ঝি) বললে 'এসো মাতাজী, একটু স্নান করে নিয়ে ফিরব।'

ওদের স্নান মানে শুধু গায়ে জল দেওয়া। মাথায় নয়। আমি দু একটা ডুব দিয়ে নিলাম। পাঞ্জাবী গরম। কয়েক নিমেষে জামা সেমিজ শুকোলো। বাঁধানো সিঁড়ির দুধারে তারের বেড়া। দেখি তাতে 'ভারা' বাঁধা। অর্থাৎ ছোট ছোট পাথর ঢিল ইটের কুচি বাঁধা, আমাদের তারকেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী তলা সর্বত্রের মতই। প্রীতম বললে 'এসব মানসিকের ভারা বা ডোর বাঁধা। সীতাদেবী বাল্মীকিমুনির আশীর্বাদপূত জলাশয়।

জয়পুরে রাজস্থানেও এই মানসিকের দেবদেবী আছেন, ঠিক দেবতা নন যদিও।

অবশ্য আছেন বিখ্যাত বিশাল গণেশজী মতিডুংরী পাহাড়ের ওপর। লাল রং সাদা পাথরের মূর্ত্তি। নানা কামনায় লোকে যায় সর্ব সিদ্ধিদাতার কাছে। সন্তান, বিবাহ, অবাধ্য স্ত্রী, মামলা, আধিব্যাধি, কত কি। গণেশজীকে বিয়ের নিমন্ত্রণও করে আসে লাড্ডুপুরী খাবার। শুভকাজ হয়ে গেলে নানাবিধ উপচারে ভোগ দক্ষিণা দেয়।

আছেন চাঁদ পোল গেটের (চন্দ্রতোরণ দ্বার) পাশে মহাবীরজী হনুমানজী। লাল রংয়ের সিঁদুরলিপ্ত মূর্ত্তি। লাল রং বিস্তৃত বদন। দু পাটি দাঁতের সারি। দুটি হাত। একটীতে লাল রং গদা। লোকে মানসিক করে নানা বিষয়ে। হাতে মুখে বড় বড় লাড্ডু দেয়, গলায় মালা দেয়।

কৌতুক এই, রামচন্দ্রজীর কাছে মানসিক বড় একটা হয় না। তাঁর সেবক ও ভক্তের মাহাত্ম্যই বেশী প্রচারিত। (রাজবাড়ীর দ্বারপাল অথবা মন্ত্রী মশাইদের সেক্রেটারী।)

এবার বলি, সৈয়দবাবা অথবা সাঁইবাবা নামে পীর সাহেবের কথা। এও আধি ব্যাধি নিরাময়, সন্তানলাভ, রোগমুক্তি নানা প্রকাশ্য ও জনান্তিক মানসিকের ব্যাপার। আমাদের বাড়ীরই দুটী অসুখের ঘটনার দু'একবারের গল্প বলি।

একবার গৃহস্বামীর কানে কি এক বর্ষার পোকা ঢুকে অসম্ভব যন্ত্রণা হয়। ট্রেণে সিমলা যাবার পথে সেটা হয়। ডাক্তার তখনকার বড় মেজ এবং সাহেব ডাক্তারও দেখলেন, যন্ত্রণা তো কমেই না, শেষে তাঁরা বললেন কর্ণ পটহ ফুটো করে দিতে পারে পোকাটা। তাহলে কান অকর্মণ্য হয়ে যাবে। কাজে বেরুতে পারেন না, রাত্রে ঘুমোতে পারেন না।

শেষে একজন কে বললে সৈয়দ বাবাকে ডেকে একটু ঝাড়িয়ে নিন। কমে যেতে পারে।'

যা কষ্ট তখন। তাই হোক। সাঁইজীকে ডাকা হল। ছোট্ট একটি খড়ের ঘরে একটী কবরের পাশে তাঁর আস্তানা। কিছুই জমজমাট ভাব আশপাশে নেই।

সাঁইজী এলেন। মুসলমান। ঠিক ৺সত্যনারায়ণ

কথার গল্পের মত "হাগলের ছেঁড়াছিঁড়ি" মলিন ছেঁড়া কাঁথা গায়ে। হাতে একটি লাঠি। মুখে দাড়ি। ক্ষীণকায় বৃদ্ধ। দেখেশুনে চলে গেলেন। বললেন, "আচ্ছা, 'বাবা'কে বলব (বাবা অর্থাৎ পীর সাহেব) ঝেড়ে দেবেন।" নিজেও কি একটু ময়ুর ভস্ম দিয়ে পাখা দিয়ে ঝেড়ে গেলেন।

গরমকালে সে দেশে ছাতে শোওয়া। রাত্রে হঠাৎ রোগী চেঁচিয়ে উঠে স্ত্রীকে ডাকলেন, "দেখ, দেখ, একটা লোক আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ঐ বারান্দার দিকে পালাল। দেখ কোথায় গেল।"

সে বারান্দা থেকে একতলায় নামার কোনো উপায়ই নেই। উঁচুও বটে। লাফিয়ে পড়ারও বা নেমে যাবার মত সুবিধে নেই। কার্নিশ বা থাম নেই।

দেখেশুনে এসে স্ত্রী বললেন "তুমি স্বপ্ন দেখেছ। ক'দিনতো ঘুমোতে পারনি।" একান্নবর্ত্তী বাড়ী। বাড়ীশুদ্ধ লোক জেগেছে। নিচে উঠানে, বাইরে, সর্ব্বত্র। কেমন দেখতে লোকটা? সবাই বলে।

কর্ত্তা বললেন "লোকটা একেবারে বিবস্ত্র নয়।"

যাই হোক, ঐ বর্ণনা মত কোনো লোককেই হাতার (বাড়ীর এলাকার) মধ্যে পাওয়া গেল না। না বাইরে না ভেতরে। লোকজন শান্ত্রী দারোয়ান বাড়ীতে সেকালে ছিল।

বেশ বেলা হলে সাঁইবাবা এলেন। এবং কর্ত্তার কানে যন্ত্রণা নেই। মুখ প্রফুল্ল।

তিনি দু'একটা কথা বলে বললেন "কাল 'পীরবাবা' এসে তোমাকে ঝেড়ে দিয়ে গেছেন।"

"ঝেড়ে দিয়েছেন? কে? কখন?" হতবুদ্ধি মুখে জিজ্ঞাসা করেন।

'ঝাড় ফুঁক' 'মাদুলী' 'বিভূতি ভস্ম' এসবই মানসিকের প্রসাদ-শাস্ত্র এলাকার বিষয়। আর মেয়েলী শাস্ত্রমতে মেয়েরা তা বিশ্বাসও করেন। মেনেও চলেন বৃদ্ধা জননী পুত্রের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন বলাই বাহুল্য।

প্রশ্নোত্তরে জানা গেল সেই স্বপ্ন (?) বা অলৌকিক দৃষ্ট নগ্ন ফকীর লোকটাই পীর সাহেব! তিনি ঝেড়ে দিয়ে গেছেন!

সাঁইজীর প্রশ্ন। "কত রাত্রি?"

রোগী। "তা রাত্রি ১২টা হবে।"

সে যাই হোক। ডাক্তার বৈদ্য সমারোহ সমাবেশের মধ্যে একটা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে একটা সাঁইবাবা, তাঁর নগ্ন ফকীর পীর সাহেব—তাঁদের ময়ূরপাখার চামরের ঝাড়ানো আর ধুনি থেকে এক চিমটি ভস্ম একটু রেউড়ী প্রসাদ মাত্র! বেদনা যন্ত্রণা শ্রুতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবার ভয় সব নিরাময় করে দিয়ে গেল।

তারপরে ওই বাড়ীতে একটী জননীর অপরিণত কালে একটা শিশুর জন্ম হল। তাঁর প্রথম সন্তানটীও ঐ অপরিণত সময়ে জন্মগ্রহণ করে। আর গত হয়। কিশোরী জননী ব্যাকুল। তার পিতামাতা পিতামহী সবাই আকুল।

শিশুটী শুকিয়ে যাচ্ছে দিনেদিনে। রোগ নাই অথচ।

একমাসের শিশু যেন পাখীর ছানা।

সৈয়দবাবা বা সাঁইবাবা এলেন তাঁর ছেঁড়া মলিন ধুকুড়ি বা ধোকড়া গায়ে। শান্ত উদাসীন মুখ সব বিষয়ে। অট্টালিকা, পাহারাদার, লোকজন ভ্রূক্ষেপ নেই। তারাও জোড়হাতে তটস্থ। যেন স্বয়ং পীর সাহেব।

সেও একরাত্রে পিতামহী শুনতে পেলেন শিশুর জননীর আকুল চাপা ক্রন্দন। উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি নিচে উঠানের বিছানায় উঠে বসলেন। কি হল? শিশুটীর অসুখ হল নাকি?

কিন্তু কান্না থেমে গেল সহসা।

তিনি শুলেন বিছানায়।

একটী নগ্নদেহ লোক এসে তার ছেলের দিকে চেয়ে ছিল তাই তিনি ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঘুমিয়ে না জেগে? অতঃপর সাঁইজী এলেন দেখা করতে। বলে গেলেন, "তোর ছেলেকে 'বাবা' ঝেড়ে দিয়ে গেছেন। ভাল হয়ে যাবে।"

তারপরও অন্য গল্প আছে। কিন্তু তার আর দরকার নেই।

দেখা গেছে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, দুর্গা কালী আদি সব বড় বড় দেবদেবীরা সহ স্বয়ং ঈশ্বরও আছেন; কিন্তু সংসারের তাপ জ্বালায়—ত্রিতাপ নয়—দু'তাপের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক নয় আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জ্বালা বিপদে আমরা যাঁদের শরণ নিই তাঁরা ঐ সব দেবতা ঠাকুর নামে লৌকিক দেবদেবী। (অপ-উপদেবতাও বলা যায়)। বড়রা নন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি নন। সিদ্ধ ফকীর, সাধু মহাত্মা, পীর ফকীর কবর, 'ভরমা'—জেলে কালী, (অষ্টসিদ্ধি) সিদ্ধাই সম্পন্ন—সন্ন্যাসী সাধুসন্তরাই তাঁদের খড়ের কুঁড়েঘর কুটীর গেরুয়া আলখাল্লা ছেঁড়া কাঁথা মলিন আচ্ছাদনীর ভিতর থেকে আশ্বাসের অমৃত স্পর্শ দিয়ে বিভ্রান্ত আর্ত্ত মানুষকে, আতুর মানুষকে বাঁচিয়ে তোলেন। মনের ঘরে দুয়ারে শান্তিজল ছিটিয়ে দেন।

অথচ তাঁদের 'চাহিদা' বা ধনাকাঙ্ক্ষা খুব আছে, খুব বেশী তাও নয়। যেন অন্য মনেই পরোপকার করে যান। উদাসীন চিত্ত তাঁদের। মোহান্ত হয়ে উঠেন পরবর্ত্তীরা। এঁরা নেন কয়েক আনা পয়সা, কিছু বাতাসা, রেউড়ী, কিছু প্রণামী, পূজা দেওয়া। এবং পরিবর্ত্তে 'জলপড়া, ধুলো পড়া, এবং বিভূতি অথবা ঝেড়ে দেওয়া। এইটুকুতেই সংসার ক্লেশ-দগ্ধ-সাধারণ মানুষের শরণাগতির সীমানা গতিবিধি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে।

আরেকবার দেখেছিলাম একটী নারী উপযাচিকা হয়ে স্ত্রীরোগের ওষুধ মাদুলী দেন। পূজা? বলেন বদরীনারায়ণ-এ পূজা ১৲ দিয়ে পাঠিও। তিনি আদিষ্ট হয়েছেন, বরদিতেই হবে।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সংগ্রহ করা এইসব জিনিষ স্কুলবাড়ীতে এনে যখন এক জায়গায় জমা করে রাখা হল তখন তেরজন ছাত্রের সংশয়ভরা চোখে ফুটে উঠলো গভীর বিস্ময় এবং কৌতূহল, তারা ভেবেই পেলো না, মাষ্টার মশাই এই জিনিষগুলি দিয়ে কী করবেন? কী কাজে লাগবে এসব?

জর্জ কার্ভার ছাত্রদের দিকে চেয়ে তাদের কৌতূহল উপলব্ধি করে বললেন, "এখন অবশ্য এ জিনিষগুলোকে জঞ্জাল ছাড়া তোমাদের আর কিছুই মনে হচ্ছে না, তা আমি জানি। কিন্তু আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে যতক্ষণ এগুলোকে আমরা কাজে না লাগাবো ততক্ষণ এগুলো শুধুই জঞ্জাল থেকে যাবে। আবিষ্কারের মন নিয়ে যদি এগুলোকে দেখ, বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করো, দেখবে এই জঞ্জাল থেকেই কত রকমের আশ্চর্য্য আর সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরি করে তোমরা লোককে অবাক্ করে দিতে পারবে। আচ্ছা এসো এবার আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।

ছাত্ররা নির্বাক্ বিস্ময়ে মাষ্টার মশায়ের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলো। যেটা ছিল একটা ভাঙা চায়ের পেয়ালা, ওজনে ভারী, সেটা দেখতে দেখতে মাষ্টার মশায়ের যাদুস্পর্শে, হয়ে গেল একটা হামামদিস্তা, মশারি খাটাবার একটা ভাঙা দণ্ড থেকে তিনি তৈরী করলেন মশলা পেশাই করার নোড়া, ভাঙা কালির দোয়াতের ছিপি খুলে তার গর্তের ভিতর দিয়ে সুতো পরিয়ে সেটাকে তিনি বানালেন বুন্সেন বার্নার। এমনিভাবে ভাঙা শিশিবোতলগুলো সমান মাপের কেটে নিয়ে জর্জ কার্ভার সেগুলোকে পরিবর্তিত করলেন পানীয় জলের গ্লাস ও বক যন্ত্রে। সযত্নে ফল রাখার জন্য ব্যবহৃত লেবেল আঁটা বৈয়মের ঢাকনির মধ্যে রেখে দেওয়া হল পাঁচমিশেলী রাসায়নিক পদার্থ। অনেকগুলি টিনের টুকরো নিয়ে তার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেঁদা করে নেবার পর সেগুলো হয়ে গেল আটা-ময়দা চালাবার চালুনি। আবার এই চালুনিরই সাহায্যে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে জর্জ কার্ভার সেই নমুনাগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষণার কাজ চালালেন।

ছাত্ররা ভয় ও ভক্তি মেশানো কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাদের অদ্ভুত শিক্ষকটীকে গভীর মনযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলো। তিনি কোন্ জিনিষ দিয়ে কখন যে কি পদার্থ তৈরি করেন তা ছাত্ররা ঠিক মতো আগে থাকতে বুঝতে পারে না বটে, কিন্তু বিরাট একটা কিছু না হলেও ছোট খাটো ধরণের একটা গবেষণাগার তৈরি করে ফেলতে তাদের মাষ্টার মশাইর বেশী সময় লাগলো না। তাদের চোখের সামনেই একটা গবেষণাগার গড়ে উঠলো।

টাস্কেগির এই গবেষণাগারটি আজো পরম যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কার্ভার স্মৃতি যাদুঘরে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে।

ছাত্ররা এইভাবে যে শিক্ষা পেলো সেই প্রথম

শিক্ষাই হল বোধ হয় তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং সবচেয়ে মূল্যবান্ সম্পদ্। আজ পর্যন্ত কত অসংখ্য ছাত্র বছরের পর বছর টাস্কেগি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে ও ডিগ্রী নিয়ে বের হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হয়তো এমন সব খামারে গিয়ে কাজে নিযুক্ত হল যেখানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা ভালো গবেষণাগার কিছুই নেই, তখন তারা কাজ করতে গিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়লো সন্দেহ নেই, কিন্তু জর্জ কার্ভারের শিক্ষাগুণে তারা এমনভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, নিজেদের বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে সেই অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে তাদের খুব বেশী বেগ পেতে হল না। জর্জ কার্ভার তাদের যে ব্যবহারিক শিক্ষা ও জ্ঞান দান করেছিলেন সেই জ্ঞান তাদের সঙ্কটের মধ্যে পড়েও বিচারবুদ্ধি বজায় রেখে চলবার ক্ষমতা দিয়েছিল। যন্ত্রপাতি সুসজ্জিত ভালো গবেষণাগার নেই, না থাক, কুছ পরোয়া নেই। যা যতটুকু আছে তাই দিয়ে তারা গবেষণাগারের অভাব মিটিয়ে নেয়।

কিন্তু নতুন শিক্ষক মশাইর আশ্চর্য ও বিরাট প্রতিভার অতি সামান্য পরিচয়ই ছাত্ররা পেয়েছিল এবং তাইতেই তারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিল। জর্জ কার্ভার যে কত বড় একজন গুণী ব্যক্তি এবং কী বিরাট প্রতিভার অধিকারী তা জানতে তখনো তাদের ঢের বাকী ছিল।

প্রথম যে বছর জর্জ কার্ভার টাস্কেগি শিক্ষায়তনে গিয়ে যোগ দিলেন। তখন বিদ্যাভবনের খামারের কৃষিফলন মোটেই সন্তোষজনক ছিল না, বিশ একর জমিতে সব মিলিয়ে যে ফসল উৎপন্ন হত তাতে গড়পড়তা হিসাবে দৈনিক পাঁচ গাঁইট অতি সাধারণ পর্যায়ের তুলো ১০০ বুশেল মিষ্ট আলু এবং কয়েক আউন্স মাত্র ষ্ট্রবেরি পাওয়া যেত। জর্জ কার্ভার পরে এক সময় প্রসঙ্গক্রমে এই জমির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন "এখানকার লোকেরা আমাকে বুঝিয়েছিল অ্যালবামায় এই জমিটাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমি, এর চাইতে খারাপ আর একটা জমিও এখানে নেই। আমিও তাদের কথা বিশ্বাস ক'রছিলাম।"

কিন্তু এই জমিতে ফসল ফলাবার জন্য কাজ করতে আরম্ভ করে জর্জ কার্ভার জমির উর্বরা শক্তির পরিচয় পেয়ে লোকের কথায় বিশ্বাস করার ভুল বুঝতে পারলেন। এইটেই টাস্কেগির প্রথম শস্য-খামার। জর্জ কার্ভার একই কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করে এখানেও কাজ শুরু করেছিলেন। সংসারে যেসব জিনিষ কখনো কারুর কোনো উপকারে লাগে না, মানুষ অকাজের জিনিষ বলে তাচ্ছিল্য করে সে সব জিনিষ আস্তাকুড়েতে ফেলে দেয়, যার কানাকড়িও দাম নেই জঞ্জালস্তূপের মধ্য থেকে সেই সব আবর্জনা কুড়িয়ে এনে তিনি মানুষের কাজে লাগবার মতো সুন্দর সুন্দর শক্ত ও মজবুত এমন কতকগুলি জিনিষ তৈরী করলেন যা দেখে সবাই অবাক্ হল। কস্মিনকালেও মানুষ যা কল্পনা করতে পারেনি তাই তিনি হাতে-কলমে করে দেখিয়ে দিলেন এ সংসারে কোন জিনিষই অবহেলা করে ফেলে দেবার নয়। কোন জিনিষই মূল্যহীন বা অকিঞ্চিৎকর নয়। তিনি যে বিশ একর জমি পেয়েছিলেন তা ছিল শহর ছাড়িয়ে লোকবসতির বাইরে এবং আবর্জনা ও জঞ্জালে ভর্তি। শূয়োর চরাবার জায়গা।

জর্জ কার্ভার প্রতিদিন ভোর হতে না হতেই দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন সেই জমির উদ্দেশে, সঙ্গে তাঁর বহু ছাত্রও থাকে। এইভাবে সেই বিশ একর জমির জঞ্জালের স্তূপ সরিয়ে আবর্জনা সাফ করে তাকে ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে ফিতে দিয়ে মেপে নিলেন। সব জিনিষ সঠিক ভাবে মাপজোক করে নেবার উপরে জর্জ কার্ভার সব সময় বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন "মনে করো পাঁচ ফুট চওড়া একটা পরিখা লাফ দিয়ে পার হতে হবে, কিন্তু লাফ দিতে গিয়ে দেখলে চার ফুটের বেশী আর তুমি যেতে পারলে না, তখন তোমার অবস্থা কি হবে ভাবতে পারো? ওপারে পৌঁছাতে না পেরে নিশ্চয় তুমি পরিখার মধ্যে পড়ে যাবে এবং খানিকটা নাকানি চোবানিও যে না খাবে এমন নয়। তখন গড়পড়তা মাপ তোমার আর কোন কাজে লাগবে না। কাজেই, গড়ে এত ফুট কথাটার কোন মানে নেই।"

জর্জ কার্ভার তাঁর প্রিয় ছাত্রদের সহায়তায় জমির জঞ্জাল পরিষ্কার করে জমিতে লাঙ্গল চালালেন। জমি চাষ করে ফসলও বুনলেন, কিন্তু ফল হল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। পাশের জমির মালিকরা জর্জ কার্ভারের বিফলতায় যারপরনাই খুসি হল, মজা পেয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিল। কেউ কেউ আবার গরজ করে এসে মৌখিক সহানুভূতি পর্যন্ত জানালো— "খাটুনিই তোমাদের সার হল। সময়ও নষ্ট হল, পয়সাকড়িও নষ্ট হল কিন্তু সুফল কিছুই লাভ হল না।" কিন্তু জর্জ কার্ভার এসব সমালোচনা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ একদমই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি তাঁর ছাত্রদের দিয়ে আগের মতোই কাজ করে যেতে লাগলেন। ছাত্রদের কিন্তু এইসব সমালোচনা বিদ্রূপে মন অনেক সময়ে সংশয়ে দুলে উঠতো, ভবিষ্যৎ তাদের কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হত। "জর্জ কার্ভার একজন সুযোগ্য ও বিচক্ষণ শিক্ষক একথা মানি, কিন্তু তিনি তো আর যাদুকর নন যে, যাদুদণ্ড বুলিয়ে শূয়োরের আস্তানা আবর্জনা ভর্তি জমিকে শস্যশ্যামল উদ্যানে পরিণত করবেন।"

ছাত্রদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরূপ মনোভাব জর্জ কার্ভার যে জানতে পারেন নি তা নয়, তিনি তিন বছর ব্যাপী একটা কৃষিগবেষণা শুরু করবেন বলে মনে মনে স্থির করলেন। সেই গবেষণার কাজে হাত লাগাবার আগে জমিতে সার দিতে হবে কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সার? তিনি ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটনকে অ্যাটলান্টা ফার্টিলাইজার কোম্পানীর কাছে একশো পাউণ্ড ফসফেট সার পাঠাবার জন্য অর্ডার দিতে বললেন। জর্জ কার্ভার নিজেও মনে মনে একটা পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন। তারপর ছাত্রদের সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সারের সন্ধান করতে, জঙ্গল জলাভূমি থেকে সংগ্রহ করলেন পাঁক, বনের মধ্যে গিয়ে গাছের তলা থেকে পচা পাতার রাশি এবং মাঠের মধ্যে মড়া জীবজন্তুর হাড়গোড়। "চমৎকার সার ফসফেট ও মিশ্রসার ক্ষেতে বেশ করে ছড়িয়ে দেবার পরে ছাত্ররা ভাবলো, জমি এবার চাষ করে ফসল ফলাবার উপযুক্ত হয়েছে। তারা লাঙ্গল নিয়ে মাঠে নামবার জন্য তৈরি হল, ফসল বুনতে হবে। কিন্তু তাদের মাষ্টার মশাইর সেজন্য কোন গরজ দেখা গেল না। তিনি বললেন, "এতে হবে না, আরো বেশী পরিমাণে এবং আরো কয়েক রকমের সার দরকার। এ জায়গায় ঠিক সে জিনিষগুলি পাওয়াও যাবে না।"

জর্জ কার্ভার তাঁর ছাত্রদের নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। তিনি তাদের নিয়ে একটা জঞ্জালের স্তূপের কাছে উপস্থিত হলেন। সেই স্তূপের মধ্যে ছিল কত রকমের যে জিনিষ তার ইয়ত্তা নেই। উনুনের ছাই, তরকারির খোসা, ভাঙা বাসনপত্রের সেই জঞ্জালের স্তূপ থেকে ছাত্ররা বালতি ভরে ভরে সেইসব তরকারির খোসা, শস্যগোলা থেকে ফেলে দেওয়া আবর্জনা এবং এমনি আরো হরেক রকমের জিনিষ যা মানুষের কোনই কাজে লাগে না, শুধু আস্তাকুড়ে গিয়ে ঠাঁই পায়, সেইসব জিনিষ সংগ্রহ করে এনে একটা ঢিপি বানিয়ে ফেললো। বসন্তকালে এইসব নোংরা জিনিষগুলি পচে চমৎকার মূল্যবান্ কালো সারে পরিণত হল। বিশ একর জমিতে সেই সার যত্ন সহকারে পরিপাটিরূপে প্রয়োগ করার ফলে পাথরের মতো কঠিন মাটি মাখনের ডেলার মতো নরম ও সরস হয়ে চাষের উপযুক্ত হল এবং জমির উর্বরা শক্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলো। ছাত্ররা ভেবেছিল সেই জমিতে তারা তুলোর চাষ করবে। কিন্তু মাষ্টার মশাই তাদের বাধা দিলেন। বললেন, "না, এ জমিতে আমরা প্রথম ফসল বুনবো কলাই।"

জর্জ কার্ভারের মুখ থেকে একথা শুনে ছাত্ররা হতাশ শুধু নয়, দস্তুরমতো স্তম্ভিত হল। "কলাই? মাষ্টার মশাই বলেন কি?" প্রায় একসাথেই সব ছাত্র কাতরোক্তি করে উঠলো। এত কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা বোঝা বোঝা জঞ্জাল বয়ে এনে সার তৈরি করে জমিতে ছড়িয়েছে, জমিকে উর্বর করেছে, কঠোর

শেষকালে তার ফল এই হল? তাদের প্রাণান্তকর পরিশ্রম কোন কাজেই লাগলো না? শুধুই কলাইয়ের চাষ হবে এ জমিতে? আর কিছু নয়?

সংশয়মিশ্রিত ধৈর্যের সঙ্গে জর্জ কার্ভার ছাত্রদের সমস্ত অভিযোগ শুনলেন, তাদের মনোবেদনার কারণ উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেন। পরে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে বললেন, "বেশীর ভাগ চারা গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়ে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা হয়েছে।" তিনি এ কথাও বললেন, "তুলো সব চাইতে কম পরিমাণ নাইট্রোজেন সার টানে, কিন্তু কলাইয়ের মতো শক্ত শুঁটি-জাতীয় শস্য আলো-বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করে মাটিকে তা ফিরিয়ে দেয়। জমিকে উর্বরাশক্তি সম্পন্ন করে তোলে। এ রকম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা সারের উপাদান, বাজারে কিনতে গেলে যার দাম অনেক, বিনা পয়সায় পাওয়া যাবে।"

একজন ছাত্র প্রশ্ন করলো, "কিন্তু এত প্রচুর কলাই আমাদের কী কাজে লাগবে?"

"ফসল ঘরে তোলা অবধি অপেক্ষা করেই দেখ না।"

তারপর ঋতুর শেষে ক্ষেত থেকে ফসল যখন কেটে আনা হল জর্জ কার্ভার বললেন, "এবার আমি একটা জিনিষ দেখাবো। তোমরা প্রশ্ন করেছিলে না, কলাই আমাদের কি কাজে লাগবে? আমি তোমাদের কলাই দিয়ে কত রকমের উপাদেয় খাবার তৈরি করা যায় তা হাতেকলমে করে কলাইয়ের উপকারিতা তোমাদের কাছে প্রমাণ করে দেব।"

এই বলে জর্জ কার্ভার ছাত্রদের সামনেই উনুন জ্বালিয়ে মশলা মাখিয়ে কলাই দিয়ে এমন একটা চমৎকার খাবার তৈরি করলেন যে তার স্বাদ অমৃতের মতো লাগলো তাদের রসনায়, সে রকম খাবার তারা জীবনে কখনো খায়নি। শুধু একটা খাবারই নয়, অনেকগুলি মুখরোচক মিষ্ট খাবার তৈরি করলেন জর্জ কার্ভার একমাত্র কলাই থেকে।

"এবার থেকে এখানকার সব লোক তাদের রোজকার খাবারের সঙ্গে বাড়তি আরো একটা খাবারও পাবে এবং খাবারটা নিঃসন্দেহে খুব উপভোগ্যও হবে।" জর্জ কার্ভার ঘোষণা করলেন।

সে বছর শেষের দিকে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে টাস্কেগি শিক্ষায়তনের সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের খাদ্যের চাহিদা পূর্ণ করেও খামারের মোটা লাভ হল কলাই বিক্রী করে। গ্রীষ্মকালে জর্জ কার্ভার ছাত্রদের সহযোগিতায় সেই বিশ একর জমিতে দ্বিতীয় ফসল মিষ্টি আলুর চাষ করলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগারে বসে কড়াইশুঁটি জাতীয় অন্যান্য কয়েকটি ফসল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন।

পরের বছর জর্জ কার্ভার তাঁর জমিতে একর প্রতি ২৬৫ বুশেল মিষ্টি আলু উৎপন্ন করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন। সে জমিতে এর আগে আর কখনো এত অপর্যাপ্ত ফসল ফলেনি। সাধারণত উৎপাদনের হার যা এবার তার ছয় গুণেরও বেশী ফসল হল।

সব শেষে জর্জ কার্ভার তাঁর জমিতে তুলোর চাষ দিলেন। প্রতি একর জমিতে তুলো উৎপন্ন হল পাঁচশো পাউণ্ড গাইট করে।

পাশাপাশি সব জমির মালিক শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষ সকলেই জর্জ কার্ভারের এই অভূ পূর্ব ও অসামান্য সাফল্যে যারপরনাই বিস্মিত হল। এই সাফল্যকে এক বিরাট অসাধ্যসাধন বললেও কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হবে না। এর আগে আর কখনো সেই এলাকার কোনও জমিতে এত উৎকৃষ্ট জাতের এবং এত প্রচুর পরিমাণ তুলে উৎপন্ন হয়নি। জর্জ কার্ভারের এই অসামান্য সাফল্যকে সবাই-ই যে খুসি মনে গ্রহণ করলো তা মনে করলে ভুল করা হবে। অনেকেই ঈর্ষ্যার কাঁটায় বিদ্ধ হতে লাগলো। তারা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে জোর আলোচনা শুরু করলো। উত্তরাঞ্চল থেকে আগত সামান্য একজন শিক্ষক এখানে এসেই তাদের সবার ওপরে টেক্কা দিল, মনে মনে এটা তারা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। জর্জ কার্ভারের তুলোর চাষ

সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। অথচ পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও এত উৎকৃষ্ট জাতের এত বেশী পরিমাণ তুলো উৎপাদন করা তারপক্ষে কেমন করে সম্ভব হল সে কথা তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে বের করতে পারলো না। আর তারা জন্ম অবধি সারাজীবন ধরে তুলোর চাষ করছে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তাদের কম নয়, অথচ তারা পারলো না, পারলো ওই ছোকরা শিক্ষক। তারা জর্জ কার্ভারের কাছে গিয়েও প্রশ্ন করেছিল, তার সাফল্যের কারণ জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। এসব প্রশ্নের জবাবে জর্জ কার্ভার শুধু একটা কথাই তাদের বার বার বলেছেন, কথাটা হল এই, তৃণগুল্ম, বৃক্ষলতা, সমুদয় উদ্ভিদের কতগুলো জিনিষের জরুরী চাহিদা আছে যেগুলি ঠিক মতো না পেলে তারা বাঁচতে বা শক্তিশালী হতে পারে না, অথচ সব জমিতে সব সময়ে সে জিনিষগুলি থাকে না, ফলে গাছের জীবনীশক্তিতে ভাঁটা পড়ে এবং জমির উর্বরাশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসে তাই জমিতে মাটি উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কৃষককে উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় সারের জোগান অবশ্যই দিতে হবে, তবেই ভালো হবে। মাটির উপযুক্ত উর্বরতা এবং ফসলের উপযুক্ত ফলন এই দুটোর মধ্যে সমন্বয় বিধান করাই হল সারের কাজ।

পাশাপাশি অনেক গ্রাম থেকে বহু কৃষক-ছাত্র এসে টাস্কেগি শিক্ষায়তনে ভর্তি হল। তারা ইতিপূর্বে লোকমুখে জর্জ কার্ভারের নামই শুধু শুনেছিল, কলেজে ছাত্ররূপে প্রবেশ করার পর এবার তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসবার সুযোগ পেলো। প্রথম দর্শনেই তারা তাঁর প্রতি মুগ্ধ হল। তাদের মধ্য থেকে একজন ডাঃ কার্ভারকে জিজ্ঞাসা করে বসলো, "আপনার এই বিরাট সাফল্যের আসল রহস্য কি আমাদের খুবই জানতে ইচ্ছা হয়।"

"রহস্য কিছুই নয়। প্রধানতঃ দুটো জিনিষের ওপরে এই সাফল্য নির্ভর করে, তার একটা হচ্ছে মাটির খোক্ষু মটাবার জন্য তাকে আহার্য দিতে হবে, সে আহার্য হল সার। প্রচুর পরিমাণ সার প্রয়োগ করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে হবে। এবং দ্বিতীয় জিনিষটা হচ্ছে জমির বিশ্রামের জন্য তাকে কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ শস্য উৎপাদন থেকে অব্যাহতি দেওয়া অর্থাৎ জমিকে বিশ্রাম দেবার জন্য সেই জমিতে একই ফসল বছরের পর বছর ধরে বার বার না উৎপন্ন করে জমির মুখের স্বাদ বদল করার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতি বারে একটার পর নতুন আর একটা ফসলের চাষ করা। এতে একঘেয়েমিও ঘুচবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জমির দানের ক্ষমতাও বাড়বে।" একটুক্ষণ থেমে আবার তিনি বললেন, মানুষের যেমন নিত্য তিরিশ দিন একই খাবার খেতে ভালো লাগে না, মুখে অরুচি ধরে যায়, উদ্ভিদ জগতেরও সেই একই নিয়ম। রুচি বদলাবার জন্য জমিকেও একটার পর আর একটা নতুন খাবার পরিবেশন করা দরকার, না হলে তার অজীর্ণ রোগ সারে না। জীবনে বৈচিত্র্য না থাকলে জীবন যেমন বিস্বাদ বিরক্তিকর হ'য়ে ওঠে, উদ্ভিদের জীবনেও তেমনি বৈচিত্র্যের প্রয়োজন রয়েছে। নিত্য নবীনের স্পর্শ পেলে তবেই তরুলতা মঞ্জরিত পল্লবিত হয়ে ওঠে—মানুষ কিংবা জীবজন্তু অথবা তরুলতার মতো অবচেতন প্রাণী বৈচিত্র্যহীন জীবন এরা কেউই বেশী দিন বহন করতে পারে না।"

অধ্যাপক জর্জ কার্ভার নিজের জীবনেও এই নীতি অনুসরণ করে চলেন। প্রত্যহ একই রকমের খাদ্য গ্রহণের একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং স্বাদ পরিবর্তন করে আহারে বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যহ নতুন নতুন রকমের খাদ্য গ্রহণ করেন সব খাদ্যই যে সুস্বাদু এবং মুখরোচক তা অবশ্য নয়, কিন্তু সব খাদ্যই ভিটামিন সমৃদ্ধ।

জর্জ কার্ভার এত যে খাটেন, উদয়াস্ত কঠোর এবং অমানুষিক পরিশ্রম করেন, কিন্তু তবু তিনি তাঁর মনকে নিঃস্ব বা দেউলিয়া হতে দেন না। তাঁর সংগীত-চর্চা ও শিল্পসৃষ্টির অভ্যাস তিনি অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর দিনরাত্রের এত কাজের মধ্যেও প্রতি ঘন্টা প্রতি মুহূর্ত তাঁর কাজ দিয়ে ঠাসা, একটুখানি অবসর পেলেই তিনি

হয় গান-বাজনা নিয়ে বসেন, না হয় তো রঙ আর তুলি নিয়ে ছবি আঁকেন, কিংবা একা একা উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়েন, বনের পথে। বনের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়ান সময়ের খেয়াল থাকে না, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে রাত্রি নেমে আসে। তখন তাঁকে খুঁজে আনবার জন্য ছাত্ররা তাঁর সন্ধানে বের হয়।

সূর্যোদয়ের অনেক আগে জর্জ কার্ভারের ঘুম ভাঙে, বিহঙ্গের কলকাকলি শুনবার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে তিনি যখন পথে বের হন তখনো গাছের ছায়ায় রাতের আধ অন্ধকার লুকিয়ে থাকে। মাঠে মাঠে তিনি ঘুরে বেড়ান আর সংগ্রহ করেন নানান ধরণের মৃত্তিকা, শামুক, প্রজাপতি, তৃণলতার নমুনা। এমনি হাজারো রকমের বিচিত্র এবং বিভিন্ন সংগ্রহে তাঁর সংগ্রহশালা ভরে ওঠে। আর, এই ভাবে নিরুদ্দেশ পথিকের মতো ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কতো জিনিষ তাঁর চেনা হয়ে যায়, কতো পথের তিনি সন্ধান পান, কতো অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং যার সঙ্গে একবার পরিচয় হয় সে-ই জর্জ কার্ভারের বন্ধু হয়ে যায়। এমনিভাবে বেড়িয়ে বেড়িয়ে সারাটা দেশের নাড়ীনক্ষত্র জর্জ কার্ভার চিনে নিলেন। এইভাবেই একদিন তিনি আবিষ্কার করে বসলেন শুধু এই অ্যালবামা রাজ্যে যতো বিভিন্ন জাতের এবং বিচিত্র ধরণের গাছপালা ও তৃণগুল্ম আছে সারা ইউরোপের সবগুলি দেশ মিলিয়েও তা পাওয়া যাবে না।

ক্রমশঃ

প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিকঃ হিরণ্ময় ঘোষাল

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাবলে ব্যথাহত বিস্ময়ে মন মুষড়ে পড়ে যে, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কথাসাহিত্যিক পরম মনস্বী ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল সুদূর পোল্যাণ্ডে পরলোক গমন করলেন প্রায় সঙ্গোপনে, এক রকম অকালে—অথচ এখানে তার জন্যে কোন আলোড়ন জাগল না, দেখা গেল না সামান্য শোক প্রকাশ বা স্মৃতিচারণার ক্ষীণতম প্রয়াস। বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি বটে, কিন্তু সেই বিস্মৃতির পরিমাণ কি এত ভয়াবহ, এমন শোচনীয়?

বাঙালির আত্মবিস্মৃতির জন্যে শোক প্রকাশ করা পণ্ডশ্রম। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, পাঠকদের কাছে অধুনা পরলোকগত সুসাহিত্যিক হিরণ্ময়বাবুর রচনাবলীর উৎকর্ষের অল্প একটু পরিচয় দেওয়া যাতে তাঁর সূর্যকরোজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্ত স্পর্শে বাঙালি পাঠকের মনের অনবধানতার অসাড়তা একটুও দূর হয়। হিরন্ময়বাবুর অনন্ত মনীষা ও অতি সুখপাঠ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলীর সামগ্রিক মূল্যায়ন দীর্ঘ নিবন্ধ সাপেক্ষ একটি বিশেষ সাধনার বিষয়। এই প্রবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে পাঠককে একটু সজাগ করার চেষ্টামাত্র থাকবে।

ডক্টর হিরন্ময় ঘোষাল কলিকাতার একটি অতি শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের অন্যতম কৃতী সন্তান। ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ ক'রে ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ষাট বছর বয়সে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্স বা ভার্সাভা শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ দুএক ছত্রে কলিকাতার দুএকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়—তার বেশি কিছু নয়। হয় তো এখনও অনেকে জানেন না তাঁর মৃত্যু সংবাদ, যাঁরা তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন।

দুবছরের বেশি অপেক্ষা করার পর যখন তার সাহিত্য সৃষ্টি ও মনীষার মূল্য অবধারণের জন্যে সুযোগ্য কোন গুণী লেখককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না, তখন এই অক্ষম লেখককেই সীমিত সামর্থ্য নিয়ে অগ্রসর হতে হল। আশা করি, বর্তমান লেখকের দুর্বল রচনা থেকে হিরণ্ময়বাবুর মনঃশক্তির জ্যোতির্ময়তা সম্পর্কে কেউ ভুল ধারণা পোষণ করবেন না।

১৯৪০ সালে হিন্দু স্কুলের ছাত্র থাকা কালে ইতিহাস শিক্ষক করুণাকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রথম ডক্টর ঘোষালের নাম শুনি এবং ছাত্র হিসেবে তাঁর বিস্ময়োদ্দীপক কৃতিত্বের সংবাদ পাই। তারপর জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মহামনীষী দিলীপকুমার রায় মহাশয়দের রচনায় তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখার পর তাঁর প্রতিভার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হল। আমার ফরাসির অধ্যাপক পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র মহাশয়ের মুখে হিরণ্ময়বাবুর ভাষাজ্ঞান, রূপজ্যোতি, কর্মোন্নতি ও পদাবনতির রহস্যময় কারণসমূহ জানতে পেরে আমি তাঁর প্রতি আরো আকর্ষণ বোধ করি। লণ্ডনে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে অল্প বেতনের সামান্য কাজে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁর পোলিশ স্ত্রী হালিনা দেবীর মাত্র ৪৫ বছর বয়সে মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দুঃখবোধ করলেও কয়েক বছর পরে তিনি যখন আবার "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে" রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর আশ্চর্যজনক হাসির আভায় বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত রামধনুদীপ্তিতে রাঙিয়ে দিয়ে, তখন মনে হয়েছিল, স্থিতিলাভ ক'রে তিনি হয়তো পাকাপাকি ভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হবেন। কিন্তু এখানে তাঁর যোগ্য সমাদরের কোন ব্যবস্থাই হয় নি। তিনি পোল্যাণ্ডে আবার অধ্যাপনার কাজে ফিরে যান এবং যতদূর জানি, সেখানেই কর্মরত অবস্থায় মহাপ্রয়াণ করেন।

হিরণ্ময়বাবুর বহিরঙ্গ জীবন উপন্যাসের মতো বিচিত্র, চমকপদ এবং পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় যুগ যুগ ধরে ধাবিত। উপন্যাসের নায়ক হবার উপযুক্ত সমস্ত গুণই তাঁর ছিল এমন কি চেহারাটিও, যা সচরাচর বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু সে সম্বন্ধে বলবার অনেক থাকলেও এ-প্রবন্ধে নয়। "বুঝ লোক যে জানো সন্ধান।"

প্রথমে অধ্যাপক-ভাষাবিৎ-রম্যরচনাকার কথা-সাহিত্যিক সুপণ্ডিত ডক্টর ঘোষালের মনীষার সম্বন্ধে সুনীতিকুমার ও দিলীপকুমারের অভিমত উদ্ধৃত করা হল। দিলীপকুমারের অভিমতের মধ্যে অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র মহাশয়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। সুতরাং হিরণ্ময় প্রসঙ্গে তাঁর মতামতের গুরুত্বও অনুধাবনীয়।

সুনীতিবাবু লিখেছেন ঃ—

"ভার্শাভাতে একটি প্রিয়দর্শন যুবক আমায় বললে যে, "আপনার দেশের একটি যুবক আমাদের ভারতীয় বিভাগে কাজ করছেন, তাঁর নাম হিরণ্ময় ঘোষাল, তিনি ভারতীয় ভাষা পড়ান।' এই দূর দেশে একজন স্বদেশবাসী আর বাঙালি যে এখানকার শিক্ষায়তনে একটা স্থান ক'রে নিয়েছেন, শুনে বড়োই আনন্দ হল। আমরা পূর্বপরিচিত, একথা তিনি আমায় স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমরা কলকাতায় 'ভারত-রোমক-সমিতি' নাম দিয়ে একটা সমিতি করেছিলুম। ১৯২৯ সালে শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষাল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন আর এর উৎসাহী সদস্য আর সম্পাদক ছিলেন। পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। হিরণ্ময়বাবু তখনই ফরাসি বেশ শিখে নিয়েছিলেন, আর রুষ পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। ইংলাণ্ডে আসেন আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে, ব্যারিস্টারি পড়তে, কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্যের দিকে। রুষ ভাষাটা ভালো ক'রে শিখেছেন; আই-সি-এস পরীক্ষায় ফরাসি ও রুষ ভাষা আর সংস্কৃতিতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ইউরোপের নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে ভার্শাভাতে এসে গত তিন বৎসর ধরে আছেন। মাঝে সুইটজরলাণ্ডে একটি ইস্কুলে ইংরাজি শিক্ষকতা করেন ফরাসি আর জরমানের মাধ্যমেই পড়াতে হত,

ভার্শাভাতে বাংলা, হিন্দি আর ইংরেজির শিক্ষক হয়ে আসেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে ভার্শাভা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে তাতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৯৩৭ সালে। তাঁর অধীত বিষয় ছিল পোলীয় ও শ্লাব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। উপস্থিত (১৯৩৮) তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট পরীক্ষার জন্য থিসিস রচনা করতে নিযুক্ত আছেন। নিবন্ধের বিষয়: রুষ নাট্যকার আন্তন চেখভ, পোলীয় ভাষায় এটি লিখতে হবে। হিরণ্ময় বাবু পরে আমাকে তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধ দেন—যুগোশ্লাবিয়ার শ্লোভেন ভাষায় রচিত ও ঐ ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় মুদ্রিত, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপরে প্রবন্ধটি। ভারতবাসী বাঙালির ছেলে, এই সব অখ্যাত ভাষা আয়ত্ত ক'রে তাতে আমাদের কথার প্রচার করছেন· শুনেও আনন্দ হয়। ১৯শে আগষ্ট, ১৯৩৮, শুক্রবার। আজ সকাল ন'টার দিকে হিরণ্ময়বাবু আমাদের হোটেলে এলেন। সুগৌর প্রিয়দর্শন যুবক। টেলিফোন ক'রে মেজর বর্ধনের স্থানীয় হাসপাতাল দেখার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আর আমাকে ভার্শাভা বিশ্ববিদ্যালয় দেখাবার জন্য নিয়ে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাকে রেক্টর বা অধ্যক্ষের ঘর আর অন্য ঘর কতকগুলি যা ছুটির জন্য বন্ধ ছিল তা খুলিয়ে দেখালেন। পাঠাগার দেখলুম। শুনলুম, প্রায় আট লাখ বই আছে। পাঠাগারে হিরণ্ময়বাবুর একটি পোলীয় ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হল, ছাত্রীটি সংস্কৃত আর হিন্দি পড়ছে। সংস্কৃতের অধ্যাপক আর হিরণ্ময়বাবুর বিভাগের কর্তা ডাক্তার শায়ের-এর সঙ্গে দেখা হতে পারে এই অনুমানে আমায় হিরণ্ময়বাবু সেখানে নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক শায়ের এঁর প্রতি যে বিশেষ স্নেহের সঙ্গে ব্যবহার করছিলেন তা দেখে খুবই ভালো লাগল। পোলদেশের সাংস্কৃতিক, মানসিক আর রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্বন্ধে হিরণ্ময় বাবুর কাছে অনেক খবর পেলুম। তিনি স্থানীয় ভাষা খুব ভালো জানেন।

"হিরণ্ময়বাবু তাঁর নিজের সাহিত্যবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা আর পরিশ্রমের কথা আমায় বললেন। রুষ আর অন্য শ্লাব ভাষাগুলি তিনি বেশ ক'রে শিখে নিয়েছেন। এখন যদি তাঁর এই জ্ঞান মাতৃভাষার সেবায় লাগাতে পারেন, তা হলেই তাঁর শ্রম সার্থক হয়। আমারও আশা হচ্ছিল, তিনি দেশে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ায় বসে শ্লাব ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতি নিয়ে দেশের লোককে কিছু যেন দিতে পারেন। তিনি দেশে ফিরলেন, তখন ইউরোপে রুদ্রের ধ্বংসতাণ্ডব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ডক্টরেটের নিবন্ধ সম্পূর্ণ করে তিনি ইতিমধ্যে ভার্শাভাতে একটি পোলীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। ভার্শাভা নাৎসিদের দখলে আসবার পরেও কিছুকাল সস্ত্রীক সেখানেই তাঁকে থাকতে হয়। পরে তিনি কোনও ক্রমে ভার্শাভা থেকে বেরিয়ে প'ড়ে সস্ত্রীক ইটালিতে আসেন আর শেষে স্বদেশে ফিরে আসতে সমর্থ হন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি দেশে ফিরে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ক'রে প্রকাশিত করেছেন—তিনি এখন বাঙালি পাঠকসমাজে সুপরিচিত। স্বাধীন দেশ হলে রুশ, পোল প্রভৃতি শ্লাব ভাষায় আর শ্লাব সংস্কৃতিকে তাঁর যে অনন্যসুলভ দখল—যা ভারতবর্ষে আর কারো আছে ব'লে জানি না—তাকে কাজে লাগাতে পারা যেত। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সে সব কিছু হল না। এঁকে পেয়ে আমাদের ভাষাসঙ্কটের সমাধান হয়েছিল।" (ইউরোপ, ১৯৩৮, দ্বিতীয় খণ্ড।)

হিরণ্ময়বাবু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়ে দেশে ফিরে এসে যখন তাঁর একাধিক বাংলা গ্রন্থের জোরে পাঠক সমাজে সুপরিচিত হন তখন দেশ পরাধীন বটে, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরেও তাঁকে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সরকারী অনুগ্রহ না পেয়ে, সুতরাং সুনীতিবাবুর উদ্ধৃতির শেষাংশ পড়ে যে কেউ করুণ হাসি হাসবেন। হিরণ্ময়বাবুকে মাসিক আঠারো শত টাকা দক্ষিণার চাকরি ছেড়ে দিয়ে লণ্ডনে সস্ত্রীক সাব-পোষ্টমাষ্টারের চাকরি নিয়ে থাকতে হয়েছিল যে কারণে তা কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে গৌরবজনক নয়। এত বড় মনীষীর এমন অসম্মান তীব্র প্রতিবাদের যোগ্য।

যাই হোক, সুনীতিবাবুর রচনা থেকে হিরণ্ময়বাবুর জ্ঞান, কর্ম ও প্রতিষ্ঠার যে পরিচয় পাওয়া গেল, তা এক কথায় অনবদ্য।

অতঃপর হিরন্ময়বাবুর সোনালি প্রতিভার সম্বন্ধে দিলীপকুমারের মন্তব্য অতীব চিত্তাকর্ষক :—

"মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় নামে যে বইটি সবে বেরিয়েছে সেটি পড়ে তোমাকে লিখেছিলাম বইটি মন দিয়ে পড়তে আর ঐ সঙ্গে লেখকের একটু খোঁজখবর নিতে। ১৯৩৯ সালে উনি পোলাণ্ডের রাজধানীতে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। উনি নানা ভাষাবিৎ। এ-খবর ইতিপূর্বে আমি আমার বন্ধু সোমনাথ মৈত্রের কাছে পেয়েছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, নানা বিদেশী ভাষায় এরকম আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি তিনি অদ্যাবধি তাঁর আর কোনো বাঙালি বন্ধুর মধ্যে দেখেন নি। লেখকের পত্নী পোল রমণী ও বীরনারী। অনাহারে অনিদ্রায় বিরতিহীন জর্মন বোমাপ্রপাতের মধ্যে যে নারী সপ্তাহের পর সপ্তাহ অকুতোভয়ে পথ চলতে পারেন। কাল রাত দশটার সময় বইটি পড়া শেষ হল। গ্রন্থকার শক্তিশালী লেখক। কারণ, জানোই তো, আমরা সবাই দেখতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না কী দেখলাম। গ্রন্থকার পারেন। বেগময়ী তাঁর ভাষা, স্বচ্ছ তাঁর আন্তরিকতা, উজ্জ্বল তাঁর সাংবাদিক প্রতিভা (কত খবর যে তাঁর নখদর্পণে!)—সর্বোপরি তীক্ষ্ণ ও গভীর তাঁর অনুভবশক্তি। তাই শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল মহাশয়কে অভিনন্দন ক'রে বলতে হবে বৈ কি যে, এটি যে শুধু একটি বইয়ের মত বই তা-ই নয়, এমন বই যার ধাক্কা খেয়ে আমাদের অনুভূতির তামসিকতা কেটে যায়, দরদের অসাড়তা লজ্জা পায়।"

হিরণ্ময়বাবুর মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হরিনাথ দে, বিনয়কুমার সরকার এবং প্রমথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, সৈয়দ মুজতবা আলি—এই ছ'টি পণ্ডিত লেখক গোষ্ঠীর ধারা একত্র সুসমন্বিত হয়েছিল। তাই সুনীতিবাবু তাঁকে অসঙ্কোচে নিজের চেয়ে বড় ভাষাবিৎ এবং দিলীপকুমার তাঁকে নিজের চেয়ে বেশি শক্তিমান্ বর্ণনাদাতা ব'লে উল্লেখ করেছেন। দিলীপকুমার লিখেছেন : "লেখক শুধু সাহিত্যিক নন—চিত্রীও বটেন। তাই যা চোখে দেখেছেন ভাষায় এমন দরদের সঙ্গে উজ্জ্বল রঙে খুঁটিয়ে বর্ণনা করতে পেরেছেন।" এই বর্ণনাশক্তির পরিচয় আমরা তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রচুর পরিমাণে পাই।

হিরণ্ময়বাবুর সমগ্র বাংলা রচনাবলীর পরিমাণ উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্যবশত তাঁর অধিকাংশ রচনা গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় নি। প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিক বিদেশ থেকে তাঁর ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা রচনাগুলিকে সম্পাদিত ক'রে গ্রন্থরূপ দিয়ে যেতে পারেন নি। এদেশের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকাগুলিকে তাঁর রচনা সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করার জন্যে উদ্যোগী হতে দেখা যায় নি। প্রকাশকদের মধ্যেও তাঁর ছড়িয়ে পড়া রচনাগুলিকে কুড়িয়ে নেবার কোন ব্যস্ততা দেখা গেল না। আজ এদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বিনয়কুমার সরকারের কোন মুদ্রিত বাংলা বই কোথাও পাওয়া যায় না। হিরণ্ময়বাবুর মতো দীপ্ত প্রতিভাময় পুরুষের রচনাবলীরও সেই অবস্থা। এর জন্যে বাঙালির জাতিগত দুর্বলতা ভিন্ন অন্য কোন কিছুকে দায়ী করা শোভন নয়।

হিরণ্ময়বাবুর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর মাতৃভাষাপ্রীতি। এমন বঙ্গভাষাপ্রেমিক শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে কমই দেখা যায়। বিখ্যাত ফরাসিভাষাবিৎ নগেন্দ্রনাথ চন্দ্রের মুখে শুনেছি, তিনি অন্তত তেরোটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের পাণ্ডিত্য গর্বে তিনি স্বভাষাকে অবহেলা করেন নি। বরং নগদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্য, কথাসাহিত্য, রম্যরচনা এমন কি শিশু-সাহিত্যকেও অভিনব সমৃদ্ধি দিয়ে গেছেন। প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ছাড়া এত বেশি আন্তর্জাতিক খ্যাতি আর কারো ভাগ্যে জোটে নি। তবুও তিনি ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়,

স্লোভেন, সার্বোক্রোট, বুলগার, পোল, বড় রুশ, শাদা রুশ, লাল রুশ, পোল, স্পেনীয়, ইংরেজি প্রভৃতি সম্পন্ন ভাষাও ও সাহিত্যের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করেছিলেন :—

"একটি জিনিস ছিল যার মাহাত্ম্যে আমি বিশ্বাস করি। তা এই বাংলা ভাষা। শুধু এইটুকু জানি, এই ভাষার দরদ, সূক্ষ্মতা ও লাস্য আমায় মুগ্ধ করে। আমার কাছে সমস্ত ভাষার প্রণব এই বাংলা ভাষা।"

হিরণ্ময়বাবুর বাংলা রচনাগুলি মুখ্যত গল্পভারতী ও রামধনু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে হয়তো সে-সব সঙ্কলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। তাঁর রচনাবলী অনুবাদ সাহিত্য, রম্য রচনা কথাসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য এই চার ভাগে বিভক্ত হতে পারে। পাণ্ডিত্য তাঁর রচনায় এমন কি ছোটদের জন্যে লেখাতেও এমন সরস ভঙ্গিতে অনায়াস ছন্দে প্রকাশিত হত যে, পড়লে মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়। তিনি বিদ্যাকে শুধু মননশীলতা দিয়ে অর্জন করেন নি, তাকে অঙ্গীকার করেছিলেন, নিজের অসামান্য তারুণ্য ও যৌবনের প্রাণশক্তি দিয়ে প্রতিভার জারক রসে সঞ্জীবিত ক'রে পাঠকের কাছে প্রাণদ ও উপাদেয় ক'রে তুলেছিলেন। তাঁর ললাটিকা বুদ্ধি তাঁর সাহিত্যসাধনায় অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিল। অকালমৃত্যু তাঁকে অসময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এইজন্যে আরো বলতে হয় যে, কোন সময়েই তিনি ফুরিয়ে যান নি, শেষ লেখা পর্যন্ত তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রাণস্পন্দন অক্ষুণ্ণ থেকেছে, যা খুব কম প্রবীণ লেখকের মধ্যে দেখা যায়।

হিরন্ময়বাবুর যে বই তাঁকে সর্বাধিক খ্যাতি দিয়েছে তা হল "মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়।" বইটি ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হল তাঁর "কুলটুর কাম্প্ফ্"। এ-দুটি বইকে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি ব'লে লেখক স্বয়ং পরিচিত করেছেন। এই দুটি বই উৎকৃষ্ট রম্য রচনার পর্যায়ভুক্ত। সৈয়দ মুজতবা আলির "দেশে বিদেশে" আবির্ভূত হবার অনেক আগে বই দুটি রচিত। বৈদেশিক সংস্কৃতির রস দেশীয় ভাষায় যাতে মনের ভিতর দিয়ে মরমে পশে তার সাধনায় লেখক তখনই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনটি ছোটগল্প গ্রন্থও পর পর প্রকাশিত হয়। লেখকের পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞান ভুবনচারী হলে কি হবে, তাঁর অন্তরাত্মা যে নিতান্ত স্বাদেশিক, তা "হাতের কাজ", "শাকান্ন" ও "দিবানিদ্রা" পড়লে বোঝা যায়। বইগুলি আকারে ছোট, মাসিক পত্রে প্রকাশিত গল্পগুলির সমষ্টিসংগ্রহ। কিন্তু অল্পসংখ্যক রচনা থেকে লেখকের প্রভূত রসসৃষ্টি-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ছোটদের জন্যে "ছেলেমানষি" ও "রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী" রচনাদুটি উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, শেষবার ভারত ত্যাগের আগে তাঁর লেখা রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী অপরূপ একটি সৃষ্টি। এর ভাষাশিল্প, রসিকতাসৃষ্টি সামর্থ্য, গল্প জমাবার ক্ষমতা — যে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের গৌরবের বিষয়।

প্রথমে হিরণ্ময়বাবুর হাস্যরসসৃষ্টির সঙ্গে পাঠকের একটু পরিচয় হোক :—

"জীবনে বিস্তর গোঁফ দেখেছি। যেমন ধরো— সাইকেলের হ্যাণ্ডেল মার্কা গোঁফ, দই সন্দেশ গোঁফ, আতরের ছিপি-বোলানো গোঁফ, পর্দা তোলা হাসি হাসি গোঁফ, কিছুতেই প্রমোশন দেবোনা গোঁফ, দাঁতের বুরুশ গোঁফ, জুতো সেলাই করা ছুঁচ মার্কা গোঁফ, চড়াই ডানা গোঁফ, জী হুজুর গোঁফ, বার-কার্ত্তিক গোঁফ, গলবস্ত্র গোঁফ, এই রকম সব কত কী। সবগুলো জড়ো করলে একখানা গোঁফের শিশুভারতী হয়ে যাবে।" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সম্পাদিত শিশুভারতীর পাঠককে বলে দিতে হবে না যে, এই উদ্ধৃতির মধ্যে কত রস আছে।

আরো একটু সূক্ষ্ম ভাবের পরিবেশন :—

"কেউ কিছু দিতে চাইলে আমি আবার 'না' বলতে পারি না। ওটা আমার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা, ছেলেবেলায় ছোট ভাইদের ভক্তি করে দেওয়া মাছ আর কমলালেবু লবেঞ্চুস্ থেকে আরম্ভ করে বুড়ো বয়েসে বিন্দী ঝির দেশ থেকে আনা চ্যাপ খইয়ের মুড়কি পর্যন্ত আমি কিছুই গ্রহণ করতে অস্বীকার করি নি। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ সজ্জনের পাওনা টাকাটা সিকেটা

তো আছেই। কারো মনে দাগা দেওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ।”

সৌন্দর্য সৃষ্টির নিদর্শন :—

“অপরূপ চাঁদের আলো সে রাত্রে। হাওয়ায় কুয়াশা নেই। জ্যোৎস্না ম্লান ব'লে তা চারিপাশের গাছপালা, বন আর দূরে দূরে পাহাড়গুলোকে দিনের আলোর মত নির্লজ্জ উল্লাসে ব্যক্ত ক'রে দেয় নি। দিগ্‌দিগন্ত আবছা মায়ায় আচ্ছন্ন। জেগে দেখা স্বপ্নের মত। প্রকৃতির শোভা উপজাতির মনকে গভীরভাবে অধিকার করে। জীবনের সকল শোককে ভুলিয়ে দিয়ে আনে এক নিবিড় কবিতার আকূতি, হর্ষ ও বিষাদে মেশানো পরম আনন্দ। চাঁদ হেলে পড়েছে চক্রবালের দিকে। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে নীলাভ পীত আকাশের বুকে। পেঁজা তুলোর মত মেঘের টুকরোগুলোয় ফ্লেমিঙ্গোর বুকের পালকের লালচে আভা। পূর্বদিকের আকাশে নানারঙের চাঞ্চল্য।”

পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব শ্লাভ ভাষার সাহিত্যের উৎকৃষ্ট অনুবাদ হিরণ্ময়বাবু করে গেছেন। তাঁকে যে ভারতে যোগ্যতানুরূপ কাজ দিয়ে ঐ সব সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন ও অনুবাদ করানো হয় নি, তা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক। যতদূর জানা যায়, ভারতে পরলোকগত হরিনাথ দে এবং অধুনা বিখ্যাত দুই ভাই প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা ছাড়া হিরণ্ময়বাবুর মতো এত বড় নিপুণ ভাষাবিৎ আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। সুনীতিবাবুর মতো শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর মূল্য স্বীকার করেছেন। তাঁর অদ্ভুত ভাষাজ্ঞান যে তিনি অবলীলাক্রমে বাংলা সাহিত্যে সরস ভাগীরথী প্লাবনে রূপান্তরিত করতে পারতেন, সেই দক্ষতা তুলনারহিত। এ ক্ষমতা এখন আর কোন বাঙালির নেই।

হিরণ্ময়বাবুর লেখা অজস্র মৌলিক ও অনূদিত গল্প এবং সরস হাসির ফোয়ারা প্রবন্ধাবলীর সুসম্পাদিত সঙ্কলন শীঘ্রই দেখার আশা নিয়ে এ প্রবন্ধ শেষ করা গেল। তাঁর যে গল্পগুলিতে তাঁর নাতিদীর্ঘ মধু-করুণ দাম্পত্য জীবনের ছায়াপাত হয়েছে, সুষমায় সেগুলি অতুলনীয়। তাঁর বিপত্নীক জীবনের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত তাঁর শেষ জীবনের গল্পগুলি এখনও পাঠককে উন্মন ক'রে অতি বাস্তবতার স্থূল মর্ত্যভূমি থেকে নিয়ে যাবে রোমান্টিক স্বপ্নলোকে যেখানে বৈদেশিক কুসুমগন্ধ স্বদেশের পবনসম্ভার মন্দমন্থর করে রাখে। সেই রসলোকে স্বপ্নচারণের চাবি কাঠিটি পাঠক-সমাজকে তাঁদের সহৃদয় হাতে তুলে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদঃ পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরিবারের বিভাজন ইংল্যাণ্ডে একটি স্বাভাবিক ঘটনা মনে করা হয়। আমাদের দেশে ইহাকে মনে করা হয় স্বার্থপরতা। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছেই ইহা স্পষ্ট যে আমাদের সামাজিক পদ্ধতি ঠিক পথে চলে নাই। ইহা হইতে আর কি সিদ্ধান্ত করা যায়? আমি ত ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে গৌরবময় জাতীয় জীবনের বহু সূত্র হইতে আরোহ প্রণালীতে যাহা যুক্তিসঙ্গত তাহাতে উপনীত হইতেছি। এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমি এক বিরাট ব্যর্থতা হইতে অবরোহ প্রণালীতে যাহা ভ্রমাত্মক সেই সিদ্ধান্তে পৌছাইতেছি। বহু ভ্রান্তিপূর্ণ ঘটনা একের পর এক জমা হইয়া তাহাদের অশুভ প্রভাবে শেষ পর্যন্ত ভারতের অধঃপতন ঘটাইয়াছে। অনেক সময়েই আমাদের গুণগুলিই আমাদের দোষে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহাদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি গুণে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদের পূর্ব দিগন্তে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিয়াছে। আমাদের জগৎকে যে অন্ধকারে ঢাকিয়াছে তাহাকে কি আমরা মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আমাদের আলোকোজ্জ্বল বন্ধুদের তাহা দেখিতে দিব না? দিব না এই ভয়ে যে তাহারা যদি সে অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, অথবা তাহাদের উগ্র আলোকে তাহা যদি মিলাইয়া যায়? অহমিকা, মিথ্যা দেশপ্রেম, উন্মাদনাপূর্ণ ধর্মশীলতা যেন আমাদের বুকের মধ্যে কখনও এই সাপকে দুধকলা দিয়া না পালন করে। হয় তো আমি ইংল্যাণ্ডের আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়াছি, কোনও মেঘ ভ্রুকুটি-কুটিল, কোনটি বা সরিয়া যাইতেছে, কোনটি শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, কোনটি মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এবং ইহাই চিরকাল চলিবে। ক্ষয়িষ্ণুতার চির উপস্থিতিও ব্রিটিশ জাতীয় দেহকে সহজে ক্ষয় করিতে পারিবে না, তাহাকে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ, আমি যতদূর বুঝিয়াছি এই দেহের জীবনীশক্তি এখনও পূর্ণ শক্তিতে সক্রিয় রহিয়াছে। এখনও সে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। সেখানকার লোকেরা তাহাদের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। তাহারা ক্রমেই অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, পরিবর্তনে তাহারা ভীত নহে, এবং সমস্বার্থে তাহারা সকলে মিলিত ভাবে কাজ করিতে পারে। মোটের উপর তাহাদের শক্তি সুদৃঢ় হইতেছে, ভাঙিয়া যাইতেছে না। সেখানকার লোকদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধীশক্তি ক্রমেই উচ্চ গৌরব লাভ করিতেছে, জাতিভেদের অসঙ্গতিসমূহ ক্রমেই দূর করা হইতেছে, ভূমিতে একচেটিয়া অধিকার ক্রমে ভাঙিয়া দেওয়া হইতেছে, এবং দরিদ্রদের প্রতি সযত্ন মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। একথা ঠিক যে এখনও অনেক বাকি,

অনেক বিষয়ে আরম্ভ মাত্র হইয়াছে, তবু দানবেরা ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনের চাকায় ঘাড় লাগাইয়া বীর্যের সঙ্গে চাকাটাকে ঘুরাইয়া দিতেছে, এ দৃশ্যকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

সৃজনমূলক কাজে ব্যক্তির যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা এইভাবে ইউরোপের লোকদের মনে জীবনের প্রথম থেকেই অনুভূত হইতে থাকে। ইহার যেমন একটি ভাল দিক আছে, তেমনি ইহার একটি মন্দ দিকও আছে। ইহাতে যেমন কোনও ব্যক্তিকে আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী হইতে শিক্ষা দেয়, তেমনি সেই সঙ্গে ইহাতে আত্মপ্রেম অযথা বাড়াইয়াও দিতে পারে। এই রকম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ইংরেজদের আছে, সেজন্য আমার কিছু ভয় আছে। এবং এই ভয় হইতেই আমি আমার দেশবাসীকে বলিতে চাহি যে উহাদের পথে অকারণ বাধা সৃষ্টি না করা ভাল। উহাদের দেশে জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে ব্যক্তি কিছু উপরে উঠিতে পারিয়াছে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে আরও উপরে উঠিতে সাহায্য করে, এবং যে নিচে তলাইয়া যাইতেছে তাহাকে আরও নিচে নামাইয়া দেয়। অতএব অংশতঃ আত্ম-গরিমার জন্য এবং অংশতঃ এই ভয়ের জন্য সে তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রতিবেশীর নিকট হইতেও তাহার ব্যক্তিগত অবস্থা গোপন রাখিয়া যায়। সেজন্য প্রতিবেশীরা পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে সব সময় যায় না, যদি কখনও যায় তাহা হইলে বাড়ির সকল অংশে প্রবেশ করে না। রান্নাঘরে যায় না, এবং সেদিন কে কি রান্না করিয়াছে বা খাইয়াছে, তাহা লইয়া পরস্পর আলাপ করে না। তাহারা বসিবার ঘরে থাকে, অথবা ডাইনিং রুম পর্যন্ত যায়। মেয়েরা কেবল তাহাদের স্বামীদের আচরণ লইয়া অথবা সন্তান-দের কার্যকলাপ লইয়া আলাপ করে। অথবা তখন যদি দেশে কোনও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা লইয়া আলোচনা করে। তাহাদের ভাল দিকটাই সব সময়ে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশীদের সম্মুখে প্রকাশ করে। তাহাদের প্রধান চেষ্টা পরস্পরকে সব বিষয়ে হারাইয়া দেওয়া, মনে মনে তাহারা এই ইচ্ছাই পোষণ করিয়া থাকে। বহু ব্যয়সাপেক্ষ "অ্যাট হোম" "টী পার্টি" "গার্ডেন পার্টি"গুলিও কি এই উদ্দেশ্যেই? কে জানে। যাহাই হউক অনেক জিনিসই উহাদের দেশে শুধুই প্রথাপালন এবং আনুষ্ঠানিক। প্রথমতঃ এসব ব্যাপার কর্তব্যবোধ হইতে, দ্বিতীয়তঃ ইহার পিছনে সামাজিক দিক হইতে আবশ্যকতাবোধ এবং সবশেষে আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, কিন্তু ইহাতে সেন্টিমেণ্ট অথবা হৃদয়ের স্পর্শ বা ভাব লালিত্য খুব কমই আছে। কর্তব্য-বোধের কাছে মনের কোমল ভাবসমূহকে বিসর্জন দেওয়াই ইংরেজ চরিত্রের বিশিষ্টতা। আর ভারতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হইল সেণ্টিমেণ্টের কাছে কর্তব্যকে বিসর্জন দেওয়া। ইংরেজ চরিত্রেও যথেষ্ট সেণ্টিমেণ্ট আছে, কিন্তু তাহা আমাদের মত অতটা উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ নহে। তাহাদের যাহা আছে তাহা অত্যন্ত দৃঢ় তাহা ভাঙে কিন্তু নোয়ায় না। তাহারা কি ভালবাসা, স্নেহ, বদান্যতা ও দয়া-ধর্মকে কোমল ভাব বলে? সম্ভবত আমারই ভুল, কারণ আমার মনে হইয়াছিল, কোমল কোষদেহ গাছের চারা শুষ্ক ভূমিতে আনিয়া পুতিলে দৃঢ় হয় এবং তাহাতে কাঁটা গজায়। ওদেশের নরনারীর উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ, উহাদের জীবন বেষ্টন করিয়া যে শুষ্ক লৌকিকতা, যে লৌহদৃঢ় জাতিভেদ, এবং সরল বিশ্বাসী মানুষেরা যেভাবে দেশের সর্বত্র ছড়ান চোর জুয়াচোর এবং নরপশুদের হাতে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত হয়, তাহাতে আমাদের দেশের মত তাহাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় কঠিন হইয়া উঠে। অতএব আমরা ভারতবর্ষে যেভাবে দানের যোগ্য স্থানকে বা পাত্রকে সোজাসুজি দান করি ইংল্যাণ্ডে সেরূপ হইতে পারে না। প্রথমতঃ দানের যথার্থ স্থান বা পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ যাহার স্বভাবে দানপ্রবণতা আছে, এ ভাবে দান করিলে অল্পদিনের মধ্যে তাহার অবস্থা অচল হইয়া উঠিবে। কেহ হয় তো মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষের জন্য শত শত পাউণ্ড দান করিল, সেই সময়েই সম্ভবতঃ তাহার অট্টালিকার কয়েক হাত দূরে কোনও শিশু অনাহারে

মরিতেছে। কাজেই বদান্যতা ওদেশে একটি সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র আদর্শ রূপ লইতে বাধ্য। ইহা যে কোনও চাঁদার তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে। দাতার সংখ্যা অগণিত। তাহারা ব্যক্তিগত কাহাকেও দান করে না। প্রতিষ্ঠানকে দান করে।

ইংরেজদের জাতিভেদ প্রথা লইয়া আমি ইতিপূর্বে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। বৃত্তি ও ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া আমাদের দেশে যেভাবে জাতিভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে, ইংল্যাণ্ডের জাতিভেদ সেরূপ নহে। এই দুটি জিনিস সেখানে যে ভাবে পরস্পরকে জড়াইয়া আছে, একে অন্যের সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে কোথায় একটা জাতি শেষ হইল এবং অপরটি আরম্ভ হইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবু ইহা বলিতে আমি বাধ্য যে, জাতি বিষয়ে কুসংস্কার বা পক্ষপাতিত্ব ওদেশে আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রবল। ওদেশের এবং আমাদের দেশের দুই জাতীয় জাতিভেদ প্রথা মিলিয়া আমাদের দুটি দেশের লোকের মধ্যেই সামাজিক সম্পর্ক আশানুরূপ গড়িয়া উঠে নাই। আমাদের দেশে ইউরোপীয়দের জাতির ভিত্তি প্রধানতঃ অর্থ ও পদমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ততঃ আমাদের সম্পর্কে এ কথা অবশ্যই সত্য। ইহা উভয়ের মধ্যে এক দুস্তর বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষার বা সংস্কৃতির অসমতা বড় কিছু নহে, কারণ ইহার প্রতিকার আছে, এবং ইংরেজরা দেশী নৃপতি বা ধনকুবেরের ক্ষেত্রে জাতিভেদের কোনও তোয়াক্কা করে না। তাই দেখা যায় তাহাদের নেটিভদের সঙ্গে সামাজিক মেলা-মেশা কয়েকজন রাজা মহারাজা অথবা যে অল্পসংখ্যক লোকদের মনে কোনও সংস্কার নাই, অথবা যাহারা এদেশের মানুষ হইয়াও এদেশের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহা ভিন্ন "জেণ্টলম্যান"-এর সংজ্ঞা বিষয়েও ওদেশের সঙ্গে এদেশের আদর্শভেদ আছে। এদেশে আগের কালে নীতিজ্ঞান, শিক্ষা, এবং বংশ—এই তিনটির যোগে ভদ্রলোক হওয়া চলিত। এখন ইহার সঙ্গে ঐশ্বর্য, জমিদারি, এবং গভর্ণমেণ্টের অধীন একটি বড় চাকরি, অথবা কোনও ভদ্রবৃত্তিজাত আর্থিক সাফল্য যুক্ত হইয়াছে। প্রথম তিনটি গুণ প্রাচ্য দেশের ভদ্রলোকের আদর্শ, এবং শেষের আধুনিক গুণ পাশ্চাত্ত্য দেশের আদর্শ। এবং এইগুলিই তাহাদের 'জেণ্টলম্যান' রূপেগণ্য হইবার একমাত্র গুণ। অন্যত্র বলিয়াছি যে, ইউরোপের বর্তমান জাতিভেদ প্রথা ক্রমে ভাঙিয়া যাইতেছে। ইত্যবসরে আমার আশা করিতে বাধা নাই যে, এ দেশে ইউরোপীয়দিগের সহিত সামাজিকতায় কোনও ভারতীয় যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার নিজস্ব সম্মানবোধ না হারায়। এবং প্রত্যেকটি ভারতীয়ের যেমন বড় কর্তব্য তাহার জাতিভেদ প্রথার অসঙ্গতিগুলি পরিহার করিয়া চলা, কারণ ইহা মানবিক কর্তব্য, উদারতা, এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী, এবং জাতীয় উন্নতিরও পরিপন্থী, তেমনি তাহার উচিত, সে যে গৌরব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছে, তাহার যেন সে উপযুক্ত হয়, এবং তাহাকে বাঁচাইয়া চলে। আত্মসম্মান বোধের দাবি উভয়ের প্রতিই।

ইলেকশন অনুষ্ঠানের পরদিন সকালে আমি ঐ অঞ্চলের পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গিয়া অনু-সন্ধান করিলাম, যে মারামারি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার জন্য কোনও পক্ষ মামলা দায়ের করিয়াছে কি না। কেহই এ কার্য করে নাই। ওখানে উহাদের মামলা করিবার সময় নাই। প্রয়োজন হইলে অবশ্যই যায়, মামলা করার আমোদ উপভোগ করিতে যায় না। মোকদ্দমার বিলাস, ইহার উত্তেজনা এবং বিষণ্ণতার মুহূর্ত, ইহার আনন্দ এবং বেদনা, ইহার জয় ও পরাজয়ের অভিজ্ঞতা হইতে ওদেশের মূঢ়গণ বঞ্চিত। আমাদের দেশের বিচারালয়গুলি দীর্ঘজীবী হউক। আমাদের হাজার হাজার দরিদ্র কৃষিজীবী ফসল কাটা হইলে অপর্যাপ্ত সময় হাতে পায়, তাহা লইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না। তাহাদের কাছে আদালত সুখের ও সান্ত্বনার আকর। ইংল্যাণ্ডের লোকেদের জুয়ার আড্ডা আছে, উহা মোকদ্দমার নিকৃষ্ট বিকল্প। আমি যে

আদালত দেখিতে গিয়াছিলাম তাহার আশেপাশে অলস প্রকৃতির লোকেদের উপস্থিতি লক্ষ্য করিলাম না। এই জাতীয় লোক আমাদের দেশের আদালতের কাছে গাছের তলায় ধৈর্যের সঙ্গে বসিয়া থাকে এবং কেহ সে-দিকে আসিতেছে দেখিলে তাহার দিকে আড়চোখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, সাক্ষী দরকার আছে কি? 'অ্যালিবাই' দরকার আছে? অর্থাৎ খুন জাতীয় অপরাধ করিয়া থাকিলে অপরাধী অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় অন্য স্থানে ছিল প্রমাণের জন্য এই জাতীয় লোক কিছু টাকার বিনিময়ে সেরূপ সাক্ষী হইতে রাজি থাকে। এই নূতন ব্যবসাটি ব্রিটিশ বিচারবিধির ফলে জন্মিয়াছে। ঝানু লোক ভিন্ন নবাগতরাও এই কাজ করিয়া থাকে। কোনও একটিমাত্র ফৌজদারি মামলাতেও ধনী ব্যক্তি জড়িত থাকিলে কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নাই ইহা কি কোনও ম্যাজিস্ট্রেট বা ব্যারিস্টার কিংবা উকিল আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন? ধনীর হাতে মিথ্যা সাক্ষীরূপ অস্ত্রটি বড়ই ভয়ঙ্কর। ইহাদ্বারা তাহারা দুর্বলকে নতি স্বীকারে বাধ্য করিতে পারে। মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে কতজনে দণ্ড পাইতেছে, ব্যারিস্টার মিথ্যার পক্ষে লড়িতেছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ড দিতেছেন। ইহা আমাদের দেশে একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। ইহার বিপরীত ঘটনা এককালে ঘটিত স্মরণ আছে। সরলপ্রাণ পল্লীবাসী সাক্ষীর সমন পাইলে, পাছে আদালতে গিয়া অসতর্কতাবশতঃ কোনও অসত্য বলিয়া বসে, সেজন্য সে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে দূরে পলাইয়া যাইত। বর্তমান বিচার-রীতিই ইহার জন্য দায়ী, অথচ ইহা অপেক্ষা ভাল কোনও রীতি কি হইতে পারে তাহাও আমি বলিতে পারি না। জাতীয় জীবনের এই সব চাপল্য বিষয়ে যখন চিন্তা করি তখন মাঝে মাঝে মনে অবসাদ আসে। জাতীয় জীবনে জাতীয় গৌরববোধ প্রথম কথা। যাহা আমাদের জাতীয় লজ্জার কারণ, পুরুষের মত তাহার মোকাবিলা করার যদি সাহস না থাকে তবে আর সে কি গৌরব? জাতীয় গৌরব রক্ষার খাতিরেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া দরকার। এই হীন এবং নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে কঠোরতম আইন হইলেও মনে করিব, তাহা যথেষ্ট কঠোর হইল না। মিথ্যা সাক্ষ্যের চাহিদা বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে খুবই কম। এবং যেটুকু চাহিদা আছে, সমাজের গণ্যমান্য অংশ হইতেই তাহার যোগান দেওয়া হইয়া থাকে। চাহিদা বাড়িলে অবশ্যই অনেক সাক্ষী জুটিবে এবং কম দামেই পাওয়া যাইবে। ইহার যে সম্ভাবনা একটা দেখা দিয়াছে তাহা দ্বিতীয় চার্লস্-এর সময়ে ক্যাথলিকদের ভীতি, কিংবা গত শতাব্দীতে যখন লাইসেনসিং অ্যাক্টের সাহায্যে মদ্যবিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হয় সে সময়ে। সব রকম অপরাধেরই প্রথম চিহ্নগুলি সকল জাতির ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। দণ্ড হইতে মুক্ত থাকা, সুযোগলাভ এবং অর্থপ্রাপ্তি এই জাতীয় লোকের বংশবৃদ্ধি ঘটায়। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্মানবোধ ইংল্যাণ্ডে এমনই প্রবল যে সেখানে এ রকম ঘৃণ্য জীবের চাহিদা বৃদ্ধি হইতি পারে না। জনমতও প্রবলভাবে ইহার বিপক্ষে। পূর্বেই বলিয়াছি সেখানকার লোকেদের মোকদ্দমা করিবার সময়ের অভাব। মারামারি হইল, তাহার পর এক গ্লাস উগ্র পানীয় পেটে পড়িলেই সব মিটিয়া যায়। লণ্ডনের আদালতে যেসব কেস্ আসে তাহা গুরুতর কিছু নহে, তাহার মধ্যে মাতলামি অন্যতম।

ইংল্যাণ্ডে বা ইউরোপের অন্যত্র মাতলামি একটি নিন্দনীয় অভ্যাস। ইহার কোনও প্রতিকার নাই, কারণ কোনও না কোনও জাতীয় সুরাপান সেখানে জাতীয় পান রূপে স্বীকৃত। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর একটা অংশ থাকিবেই যাহারা মদ্যপান করিলেই মাতাল হইয়া পড়ে। মৃদু তিক্ত পানীয় হইতে ক্রমশঃ কড়া 'এল' ও 'স্টাউট' এবং তাহার পর হুইস্কি ব্রাণ্ডি জাতীয় উত্তপ্ত পানীয়। ইহার অভ্যাস ছাড়া কঠিন হয়, শেষে ব্যাধিতে পরিণত হয়, এই অভ্যাস ছাড়া আফিং ছাড়ার মতই কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় স্ত্রীলোকদের মাতাল হওয়ার

অভ্যাস। তাহারা খোলা পথে মাতলামির অপরাধে ধরা পড়িয়া আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়, এরূপ ঘটনা মনকে পীড়া দেয়। স্ত্রীলোকরা যে জাতীয় অপরাধই করুক, তাহা অস্বাভাবিক বোধ হয়, এবং এরূপ দৃশ্যে অনভ্যস্ত চোখে আরও বেশি অস্বাভাবিক ঠেকে। যে গৃহে স্বামী স্ত্রী উভয়েই মাতাল হয়, সে গৃহের দুর্দশার কথা আলোচনা না করাই ভাল। তবে সুখের বিষয় এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে না।

এই জাতীয় দৃশ্যই ইউরোপে সুরাপানের বিরুদ্ধে একটা বিরূপতা জাগাইয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হয়, পানবিরোধীরা আর এক চরম প্রান্তে গিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে যাহাতে কেহ এক ফোঁটা মদও না খাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা হিসাব কষিয়া দেখাইয়া থাকেন বৎসরে কত কোটি টাকা ইহাতে ব্যয় হয় এবং কত হাজার লোক মদ্যপানের ফলে প্রতি বৎসর মারা যায়। আমাদের মধ্যে কত না ভবিষ্যদ্বক্তা আছেন তাঁহারা গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারেন কবে বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। কত না জ্যোতির্বিদ্ আছেন যাঁহারা ধূমকেতুর পুচ্ছের ঘায়ে পৃথিবী ভাঙিয়া পরমাণু পুঞ্জে পরিণত হইবে ভয়ে সর্বদা কাঁপিতেছেন। কত না জীবাণুবিদ্ আছেন যাঁহারা ধ্বংসের জীবাণু লইয়া আন্দোলন করিয়া আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতেছেন। কত না দার্শনিক আছেন যাঁহারা বলিতেছেন মাংসাহার করিয়া আমরা ক্রমে পশুতে পরিণত হইতেছি। (তাঁহারা কি নিরামিষ খাইয়া উদ্ভিদে পরিণত হইতেছেন?) অতএব আমাদের মধ্যে সুরা-বৈরী আছেন, আফিং-বৈরী আছেন, তামাক বৈরী আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই সব সেবীদের ধ্বংসের পরিণামটা দেখাইয়া দিতেছেন। জীবন-প্রবাহ তথাপি বহিয়া চলিতেছে।

ক্রমশঃ

আমি ডাক্তার

(গল্প)

অর্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী

ডাঃ লিখন মারাণ্ডিকে রোজ সকাল বিকেল খালাসি মহল্লার পথে পথে দেখা যায়। শুধু খালাসি মহল্লা নয়। আশপাশের মদিনা রোড, লর্ড সিংহ রোড, এমনকি মধুপুর শহরের কাছে-কিনারের গ্রামেও ওকে যেতে দেখা যায়।

লিখন মারাণ্ডি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কালো কুচকুচে রং। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। চোপসানো গাল। চোখদুটো দুধের মতন সাদা। পাতলা চুল। পুরু ঠোঁট। দাঁতের ফাঁকে কালো কালো দাগ। কখনো টেরিলিনের শার্ট-প্যান্ট আবার কখনো ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে। চোখে গগলস্ থাকে প্রায় সব সময়। হাতে রোল্ড গোল্ডের ঘড়ি। সব মিলিয়ে লিখন মারাণ্ডি বেশ ফিটফাট।

সাইকেলটা বেশ পুরনো। পেছনের ক্যারিয়ারে থাকে ছোট্ট একটা টিনের বাক্স। ওতে থাকে ওষুধপত্র। স্টেথোটা কখনো ওর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে গলাতে ঝুলিয়ে রাখে। সাইকেলে করে চিকিৎসায় বেরোয় ডাঃ মারাণ্ডি।

দূর থেকে সাইকেল দেখলেই চেনা যায় লিখন ডাক্তারকে। বিশেষতঃ সাঁওতালদের মধ্যে ওর পরিচিতি বেশ ভালোই। ডাক্তার হিসেবে ওরা ওকে সমীহও করে বেশ ওরা বলে লিখন ডাক্তারের ওষুধে কাজ হয় ম্যাজিকের মতন।

লর্ড সিংহ রোডের ওপর লিখন ডাক্তারের "মারাণ্ডি হোমিও ক্লিনিক্।" সামনে ডাক বাংলোর প্রশস্ত সবুজ মাঠ। ক্লিনিকের বাঁদিকে একটা বড় ইউক্যালিপটাস্ গাছ। ক্লিনিকে একজোড়া টেবিল-চেয়ার। পেছনদিকে একটা আলমারি। তাতে ওষুধপত্র আর গোটা কয়েক হোমিওপ্যাথির বই। টেবিলের এপাশে দুটো বেঞ্চ। রোগীদের বসার জন্যে। বাইরের বারান্দায় দরজার পাশে কাঠের বোর্ডে লেখা: "ডাঃ এল মারাণ্ডি, ডি-এম-এস।" নামের নিচে রোগী দেখার সময় নির্দেশ: "সকাল ৭টা—১১টা, বিকেল ৫টা—৯টা।" লেখাগুলো অবশ্য ইংরেজিতে। ঘরের দেয়ালে অনেক গুলো ছবি আর ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একখানা বাঁধানো ছবি। আলমারির মাথায় ছোট একখানা মা কালীর ছবি।

ডাক্তারকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডাক্তারি বিদ্যের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন নাকি?

কবিগুরুর ছবির দিকে দুহাত তুলে নমস্কার করে ডাক্তার বললো, এ গ্রেট্ পোয়েট্ ইন্ডিড। আপনাদের বাঙ্গালীদের সত্যিই গর্বের বিষয়।

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী এটাই কি কবিগুরুর একমাত্র পরিচয় ডাঃ-মারাণ্ডি? তিনি কি গোটা ভারতের নন?

ডাক্তার বললে, নিশ্চয়ই। তিনি গোটা ভারতের ও। আমি কবিগুরুকে ছোট করছি না। তবে জন্মসূত্রে তাঁর বাঙ্গালী পরিচয়টা তো মুছে ফেলা যায় না।

নীরবে একটু কি ভাবে ডাক্তার।

তারপর বলে, ছোটবেলায় বাংলা স্কুলে পড়তাম। কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথকে তখনই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আর···আপনার সঙ্গে এই যে বাংলায় কথা বলছি সেও ওই বাংলা স্কুলে পড়ার দৌলতে।

হ্যাঁ—ডাক্তার আমার সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কার বাংলায়। কখনো-কখনো ইংরেজিতে। হিন্দিও বলে মাঝে মাঝে। কিন্তু সাঁওতালিতে কখনো নয়। ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিল কয়েকদিনের মধ্যেই।

একদিন বললাম, কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ডাক্তার?

নিশ্চয়ই ক'রবেন।

আচ্ছা, আপনার সংগে যখন কথাবার্তা হয় আমি কিন্তু আমার মাতৃভাষা বাংলায়ই বলে থাকি। কিন্তু... আপনি সাঁওতালিতে একদম বলেন না...।

একটু গম্ভীর হয় ডাক্তারের মুখটা। একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

তারপর বলে, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দুঃখজনক। হয়তো আপনাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। ভাবছেন আমি আমার মাতৃভাষাকে অবহেলা করছি। আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয়। আমাদের ভাষার উন্নতির জন্যে এতদিন আমাদের ভেতর থেকে কোন চেষ্টাই হয়নি। এখনো যে খুব একটা হচ্ছে এমন নয়। তাই...

ডাক্তারের মাথাটা টেবিলের দিকে নিচু করেছে। ক্ষোভ আর হতাশায় পাংশু মুখটা বোধহয় আড়াল করার চেষ্টা করছে। একজন রোগী এলো। আমরা বেরিয়ে এলাম।

* * * * *

মধুপুর আসার কয়েকদিন পর প্রথম পরিচয় হয়েছিল লিখন ডাক্তারের সঙ্গে।

বিকেলে ঘুরে বেড়াই ডাক বাংলোর খোলা মাঠে। কখনো সন্ধ্যার পর পর্যন্ত। কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বসি কখনো সখনো। সঙ্গে থাকে কমল। গল্প করি ওর সঙ্গে। কখনো নীরবে বসে থাকি। একটা গম্ভীর নীরবতা বিরাজ করে চারপাশে। নীরবতার মধ্যে "মারাণ্ডি হোমিও ক্লিনিক"-টা চোখে পড়ে। ঠিক যেন একটা নীরব ছায়াছবি। দরজা খোলাই থাকে। ঘরের আলোর খানিকটা দরজা পেরিয়ে ঠিকরে এসে বাইরে পড়ে ইউক্যালিপটাসের পাশে। লিখন ডাক্তার রোগীদের সঙ্গে কথা বলে। আলমারী খুলে রোগীদের ওষুধ দেয়। রোগী না থাকলে হয় বই খুলে নিবিষ্ট মনে পড়তে থাকে, নয়তো চেয়ারে গা এলিয়ে গালে হাত দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে কি ভাবতে থাকে।

কমল একদিন বললো, চলুননা পরিচয় করিয়ে দিই লিখন ডাক্তারের সঙ্গে। খারাপ লাগবে না আলাপ করতে। বলা যায় না ওকে নিয়ে লেখারও খানিকটা মেটিরিয়াস্‌স্‌ পেতে পারেন। তাছাড়া ডাক্তার বাঙ্গালীদের সঙ্গে পরিচিত হতে খুব পছন্দ করে।

আমি বললাম, ডাক্তারদের আমি খুব ভয় করি। ওদের দেখলে আমায় রোগে ধরে।

বেশ খানিকটা হাসলো কমল। লিখন ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হবার বেশ কিছুদিন পর একদিন ডাক্তারকেও এই কথাই বলেছিলাম।

—দুনিয়ায় আমার সব চাইতে বড় শত্রু ডাক্তার জাতটা।

ডাক্তার মারাণ্ডি খুব জোরে হাসলো।

বললো, ডাক্তারকে যারা শত্রু মনে করে তাদেরই আমরা বেশি পছন্দ করি।

দাওয়াইয়ের রেজাল্ট সেখানেই খুব প্রমিনেন্ট হয়।

কমলের কথার সত্যতা বুঝলাম। আর পাঁচজন ডাক্তারের মতন লিখন ডাক্তার একেবারে রসবোধহীন নয়।

কমলের সঙ্গে চললাম ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করতে। ক্লিনিকে এখন রোগী নেই। লিখন ডাক্তার ডাক্তারীর একটা বই গভীর মনোযোগে পড়ছিল। আমরা ঢুকতেই মুখ তুলে চাইলো। আমাকে দেখিয়ে কমল বললো, আমার জ্যেঠতুত দাদা। কোলকাতা থেকে এসেছেন।

নমস্কার বিনিময় করি আমরা।

সামান্য হেসে ডাক্তার বলে, নিশ্চয়ই জলহাওয়া বদল করতে?

ঘাড় নেড়ে বললাম, আপনাদের প্রাকৃতিক প্রকৃতির

অকুণ্ঠ দয়া এমন জলহাওয়ার দেওয়া জন্যে। ক'দিনেই মন্ত্রের মতন কাজ করছে। কোলকাতায়, সঙ্গের সাথী ঢেকুর আর অম্বলকে এমন তাড়া করেছে যে বেচারিরা ভয়ে বোধহয় হার্ট্‌ফেলই করেছে।

ডাক্তারের সঙ্গে কমলও হাসলো।

আমি বললাম। আমি তো প্রায় ঠিকই করে ফেলেছি রিটায়ারের পর এখান থেকে কোলকাতায় স্রেফ জলের ব্যবসা করবো। বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নেওয়া যাবে। অথচ মোটা ক্যাপিটালের দরকার নেই।

ডাক্তার বললো, আপনার চিন্তাশক্তির প্রশংসা না করে পারছিনা। তবে বেশি পয়সা রোজগারের বিপদ্‌ আজকাল বড় বেশি নয় কি?

আমি বললাম, বুঝতে পারছি বর্তমান সমাজের পরিবর্তনশীলতা আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। পরিবর্তনকে মেনে নেওয়াই তো উচিত। নইলে যে আমরা পিছিয়ে পড়বো।

ডাক্তার নীরবে কি ভাবতে থাকে।

আমিই আবার বলি, অবশ্য সচ্ছলভাবে বাঁচার মৌলিক অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। তাতে শোষণ না থাকলেই হ'লো।

একটা সিগারেট এগিয়ে দিল ডাক্তার। সিগারেট ধরিয়ে নীরবে ধোঁয়া ছাড়তে থাকি আমরা দুজনেই। নীরবতা ভাঙ্গে কমল।

ডাক্তারকে বললো, আমার দাদা কিন্তু লেখক।

ট্রেঞ্জ...। এতক্ষণ আলাপ করছি অথচ একবারও বলেননি।

আমি বললাম, বলবার মত তেমন কিছুই নয়, তাই বলিনি। কেননা বাংলাদেশে বর্তমান লেখকদের নাম লিখলেই একটা মোটা ডিক্‌শনারি হয়ে যায়। ভিড়ের হাটে আমাদের মতন কত লেখক চোখের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে তার কোন হদিস নেই।

ডাক্তার বললো, কথাটা ঠিক। কিন্তু যার যেটুকু ক্ষমতা সেটুকুই কি মাতৃভাষার জন্যে করা উচিত নয়? লেখক সংখ্যা বৃদ্ধি তো আপনাদের সাহিত্যের উন্নতির চিহ্নই বলতে হবে। আমি বললাম, তা বলতে হয় বৈ কি। কিন্তু ডামাডোলের মধ্যে অনেক মেকি জিনিসও বিকিয়ে যাচ্ছে না কি?

ডাক্তার বললো, খানিকটা তা হয় বৈ কি। কিন্তু খাটি জিনিসের মূল্য বিচার হতে সময় লাগে। খানিক নীরব থেকে ডাক্তার আবার বললো, তবু আপনাদের ভাষায় লেখকের অভাব হয় না। কিন্তু...আমাদের মধ্যে ওইটিরই বড় অভাব।

* * *

শীত পড়তে শুরু হয়েছে সাঁওতাল পরগণায়। ভোরের কুয়াশায় ঢাকা থাকে গাছপালা, গ্রাম আর দূরের পাহাড়গুলো। রোজকার মতন বেরিয়েছি কমল আর আমি। রবিশস্যের গাছগুলো মাথা দুলিয়ে চলেছে শিশির ভেজা হিমেল হাওয়ায়।

মেঠো পথ দিয়ে কুয়াশা ফুঁড়ে একটা সাইকেল এগিয়ে আসছে। সাইকেলের ওপর ডাঃ মারাণ্ডিকে দূর থেকে আবছা কুয়াসাতেও চিনতে অসুবিধে হয় না। আমাদের সামনে এসে সাইকেল থেকে নামলো ডাঃ মারাণ্ডি। চিন্তার গভীর ছাপ ওর মুখে। ক্লান্তিও রয়েছে খানিকটা। গলায় কমৃফর্টার জড়ানো। কপালের ওপর বেরিয়ে আসা চুলে বিন্দু বিন্দু কুয়াশা জমে রয়েছে।

আমি বললাম, গুড মর্নিং ডাক্তার। নিশ্চয়ই পেশেন্ট দেখে?

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে ডাক্তার বলে, গুড্‌ মর্ণিং উইথ এ স্মোক। শরীরটা স্লাইট গরম করুন। আমাদের ডাক্তারদের কথা আর বলবেন না। সারারাত যমে-মানুষে টানাটান করলাম। শেষ পর্যন্ত যমকে হারিয়ে এই ফিরছি। অথচ—

থামলো ডাক্তার। সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটে কষে টান দিল। শূন্যে জমে থাকা কুয়াশার দিকে ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

বললো, আমরা স্পেস্ সায়েন্সের যুগে বাস করছি, তাই না লেখক ? অথচ আমাদের হাতটা এখনো পড়ে রয়েছে সেই আদিম যুগে।

আমি বললাম, সকালবেলায় হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন ?

ডাক্তার শুকনো হাসি হাসলো।

বললো, ওদের অজ্ঞতা আর সরল বিশ্বাস দেখলে যেমন হাসি পায় তেমনি রাগও হয়। ইচ্ছে হয় গালে চড় মেরে ওদের ওই যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের চট্কা ভেঙে দিই।

কাদের কথা বলছেন ডাঃ মারাণ্ডি ?

বলছি আমাদের কথা—আই মিন্ আমাদের এই সাঁওতালদের কথা। ওদের মধ্যে না গেলে আপনি ওদের অজ্ঞতা সম্পর্কে ঠিক ধারণা করতে পারবেন না। ঝাড়ফুঁকের ওপর ওদের যে কি গভীর বিশ্বাস চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

আমি বললাম, কেবল এদের মধ্যেই নয়, সব জাতের মধ্যেই এমন কুসংস্কার রয়েছে।

ডাক্তার বলে, আমরা দেশোদ্ধারের নামে অনেক বড় বড় নীতি আউড়ে চলেছি। অথচ এই সব মানুষের সাধারণ বুদ্ধিটুকু জাগিয়ে তোলার কোন চেষ্টাই করছি না।

আমি বললাম, এর জন্যে তো সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন দরকার। সেটাই ঘটতে চলেছে দেশজুড়ে। এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন ওরা নিজেদেরকে ভাবতে পারবে, নিজেদের মূর্খামিও বুঝতে পারবে।

দূরের কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়টার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে থাকে ডাক্তার।

একসময় বলে, রোগের জ্বালায় মরে যাবে তবু ওরা ওষুধ খাবে না। যদিও বা রাজি হলো তাও লাল মিক্‌চার ছাড়া খাবে না।

আমি আর কমল হেসে উঠলাম।

আমি বললাম, হয়তো ওরা হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করে না।

ডাঃ মারাণ্ডি গম্ভীর হলো। একটা নিঃশ্বাস ফেলে। বলে, শুধু ওরাই বা কেন, বিশ্বাস অনেকেই করে না।

কমল বললো, আমার দাদার বিশ্বাস নেই ডাঃ মারাণ্ডি।

ডাক্তার বলে, সে আমি ওঁর কথাতেই বুঝেছি। কিন্তু জিনিসটা এত খাঁটি যে আপনাকে আমি কি দিয়ে বোঝাবো। আপনাদের মতন শিক্ষিত লোকেরাও যদি এর মূল্য বুঝতো আমাদের কোন দুঃখ থাকতো না।

অনুশোচনার সুর ডাঃ মারাণ্ডির কথায়।

ডাক্তারই আবার বললো, জিনিসটা যে কত সূক্ষ্ম বিজ্ঞান। সে আপনাকে কি করে বোঝাই ? আসল ব্যাপারটি কি জানেন ? চিকিৎসাটি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি কঠিন। ডাক্তার আর রোগীর দরকার অসীম ধৈর্য। বিশেষতঃ ডাক্তারের তো বটেই। কিন্তু এই জিনিসটাই যে আজকাল সবার পক্ষে রাখা সম্ভব হয় না। কারণ আমরা যে আর্জেন্ট নেসেসিটির কাছে বাঁধা পড়ে আছি। তার ওপর কমার্শিয়াল সাইডটাও দেখতে হয়।

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তার আবার বললো, হ্যানিম্যান তো গাদায় গাদায় জন্মায় না। এ লাইনে আমরা যারা আসি আমাদের অনেকেরই নেই কোন কৌতূহল। রোগের সিম্‌প্‌টম নিয়েও মাথা ঘামাই না আমরা। তাই আমাদের চিকিৎসাটাও অনেকটা অন্ধের হস্তীদর্শনের মতন।

কমল বললো, কিন্তু সিম্‌প্‌টম্ খুঁজতে গেলে অনেক সময়ই পেশেন্টের বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়ে। কমলের কথায় ডাক্তার কান দিলো না মনে হলো।

ডাক্তারই বললো আবার, সামান্য এক ডোজ্ ওষুধ এ্যাটমিক ফ্র্যাক্‌শানে ভাগ হয়ে ম্যাজিক্যাল ওয়েতে কিভাবে রোগ সারায় চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না লেখক।

কথাগুলো বলার সময় ডাক্তারের মুখটায় আবেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বুঝতে অসুবিধে হয় না ডাক্তার হোমিওপ্যাথিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। বিরুদ্ধে যে কোন যুক্তিই খণ্ডন করতে বদ্ধপরিকর ডাক্তার।

* * * *

বাহান্ন বিঘের চওড়া লাল মাটির পথ। আমি আর কমল হাঁটছি। দুপাশে ইউক্যালিপ্টাসের সারি। ফাঁকে ফাঁকে সাজানো বাগান বাড়ি। বিকেলের রঙিন সূর্যালোক মাখামাখি করছে চারদিকে। ডাঃ মারাণ্ডির সাইকেল এগিয়ে আসছিল। কিন্তু ডাক্তার আজ থামলো না। মুখটা গম্ভীর। পাশ কাটিয়ে গেল। আশ্চর্য্য হলাম। পরিচয়ের পর থেকে পথে দেখা হলে কথা না বলে যায় না ডাক্তার।

কমলকে বললাম, ব্যাপার কি বল তো? ডাক্তার এভাবে কোনদিন তো চলে যায় না?

কমল বললো, হুঁ—ব্যাপার একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই। আমার মনে হয়, হোমিওপ্যাথির আপনি প্রশংসা করেননি, এটাই ওকে আঁতে ঘা দিয়েছে।

ও—তাই বলো! ওই তো বেশিদূর যায়নি ডাক্তার। হাঁক দাও।

কমল জোরে হাঁক দিলো, ডাক্তার মারাণ্ডি!...

ডাক্তারের সাইকেল থামলো। নেমে পড়ে ডাক্তার। আমরাই এগোই ওর দিকে।

ডাক্তারের সাইকেলে একটা হাত রেখে বললাম, এক্সকিউজ মি ডাক্তার। আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার সেণ্টিমেণ্টে ঘা দেবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। স্রেফ একটু রসিকতা করতে চেয়েছিলুম আপনার সঙ্গে।

ডাক্তার বললো, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না লেখক?

সেদিন আমি হোমিওপ্যাথিকে ঠিক খাটো করতে চাইনি ডাক্তার।

হো হো করে হেসে উঠলো ডাক্তার।

বললো, আপনারা বাঙ্গালীরা বড্ড ইমোশনাল। একটুতেই কেমন যেন গলে পড়েন। অবশ্য মানুষের মধ্যে এই সফ্‌ট্‌নেসটুকু থাকা দরকার। নইলে মানুষ একেবারে ড্রাই হয়ে যায়।

আমি বললাম, কারও প্রফেশন নিয়ে ঠাট্টা করাটা ক গুরুতর অন্যায় নয় ডাক্তার?

ডাক্তার কোন কথা বলে না। দূরের পাহাড়টার দিকে চেয়ে যেন কি ভাবতে থাকে। খানিক পর সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ পাল্টে ডাক্তার বললো, সাঁওতালি নাচে দেখেছেন?

আমি বললাম, সিনেমার পর্দায় দেখেছি। বাস্তবে দেখার ভাগ্য এখনো হয়নি।

ডাক্তার বললো, আসছে পরশু পূর্ণিমা। নানান জায়গায় নাচ হবে। বিকেলে প্রস্তুত থাকবেন। অবশ্য দেহাতে যেতে হবে কিন্তু।

আমি বললাম, সে তো আরও ভালো। শহর দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। দেহাত দেখতে পেলে তো সেটা উপরি পাওনাই হয়ে যাবে।

ডাক্তার বললো, পায়ে হেঁটে অবশ্য যেতে হবে না। গরুর গাড়ি ঠিক করে রাখবো। সন্ধ্যে নাগাদ বেরিয়ে পড়লেই নাচ শুরু হবার আগে পৌঁছে যাবো।

আমি বললাম, হেঁটে গেলেই বা আপত্তি কি? বেশ তো চরাই উৎরাই ভেঙ্গে গ্রাম দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

ডাক্তার একটু হাসলো। বললো, এখানকার দেহাতের ডিস্ট্যান্স সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণাই নেই লেখক। আপনারা শহরে মানুষ কিনা?

ডাক্তারের কথাটা আমাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। এক মুহূর্তে আমার মনটাকে নিয়ে যায় ব্রহ্মপুত্র পাড়ের সেই গ্রামে, যার স্মৃতি ধীরে ধীরে বিলীন হতে চলেছে শহরের ঔদ্ধত্যের কাছে। বাল্যের চাপল্যভরা দিনগুলিতে সেখানে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতাম ধান ক্ষেত পাট ক্ষেত দিয়ে।

বললাম, আপনার একটু ভুল হয়েছে ডাক্তার। জীবিকার প্রয়োজনে শহুরে জীবনে কলুর বলদের মতন বাঁধা পড়লেও আমি গ্রামেরই ছেলে।

ডাক্তার বললো, আমি লজ্জিত লেখক। তবে একটা কথা কি জানেন? এখানে গ্রামের লোকদের দূরত্বজ্ঞান বড় অদ্ভুত। ওদের কথায় বিশ্বাস করে পায়ে হেঁটে কোথাও রওনা হলে নির্ঘাৎ ঠকতে হবে। ওরা চার

মাইল বললে সঙ্গে আরও দু'তিন মাইল ধরে রাখতে হয়।

ডাক্তারের সৌজন্যে সাঁওতালি নাচ দেখতে চলেছি। এজন্যে ডাক্তারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছিলাম মনে মনে। কেননা এ তো আমার জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা। নাচ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অন্ধের হস্তীদর্শনের মতন। হাত-পা নাড়াচাড়ার মধ্যে কোন ভাব কখন মূর্ত হয়ে ওঠে বুঝিয়ে দিলেও আমার ভোঁতা মগজ তা গ্রহণ করতে পারে না। সত্যেন দত্তের কবিতায় সাঁওতালি নাচের বর্ণনা পড়েছি। কিন্তু স্কুল জীবনের অপরিণত মগজে সেদিন তার কতটুকুর সত্যিকারের প্রবেশ ঘটেছিল আজ বুঝতে পারছি। তাই কবির সেই বর্ণনার সঙ্গে আজকের দেখা নাচের সঙ্গতি খুঁজব আশায় গরুর গাড়িতে বসে আছি।

সন্ধ্যের খানিক আগে গরুর গাড়িতে চাপলাম। আমি কমল আর ডাক্তার। গরুর গাড়ি তার স্বাভাবিক শব্দে এগিয়ে চলেছে। চরাই উৎরাই লালমাটির পথ পেরিয়ে যাচ্ছি দূর দেহাতের দিকে। দুপাশে ছোট ছোট গ্রাম পড়ছে মাঝে মাঝে। ছোট ছোট মাটির ঘর। অদ্ভুত পরিষ্কার। ঠিক ছবির মতন। চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। গোধূলির আলো পরিবেশটাকে আরও মায়াময় করে তুলেছে। দূরের মাঠ থেকে রাখালরা ফিরছে গরু নিয়ে। কোথাও দু'তিনটি সাঁওতালি মেয়ে বোঝা মাথায় উঁচুনিচু পথে এগিয়ে চলেছে। কেমন একটা স্প্রিংএর মতন ছন্দ ওদের মধ্যে।

গরুর গাড়ির ঝাঁকুনির তালে আমার চিন্তাও ওঠানামা করছে। ওয়াজেদ আলির মতন আমিও যেন দিব্যচক্ষু পাচ্ছি। ভাবছি আমরা শহুরে মানুষরা একেক জন জাত অভিনেতা।

আমাদের চারপাশে কৃত্রিমতার বহুল আয়োজন। ভেতর বাইরের ওই কৃত্রিমতাকে ঢাকতে কত সূক্ষ্ম ভাবে আমরা অভিনয় করে চলেছি। মেপে পা ফেলি। কথা বলি মেপে। একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির ছায়ায় যে যার নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছি। বাড়ি...আপিস... বাড়ি। এই বৃত্তের মধ্যে চলতে ফিরতে আমরা সবাই যেন অভিনয়ের মুখোস পরে রয়েছি। বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক শহরে সভ্যজীবনের কত সুযোগ আমরা হাত বাড়ালেই পাই। অথচ অভাব আর সমস্যার তাড়নায় রাতে আমাদের ঘুম হয় না।

কিন্তু এখানকার এই মানুষগুলো? কোন মিল নেই আমাদের সঙ্গে। আধুনিক সমাজ কতদূর এগিয়েছে ওরা খোঁজ রাখে না। আধুনিক জীবনের অনেক সুযোগ থেকেই ওরা বঞ্চিত। অথচ ভেতরে বাইরে ওরা কত স্বচ্ছ, কত সরল। কোন অভাব বোধই দুষ্টগ্রহের মতন ওদের প্রাণের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করতে পারেনি। আমরা শহুরে মানুষরা আভিজাত্যের চশমা চোখে দিয়ে ওদের এই জীবনধারাকে হয়তো 'ভালগার' বলে নাক সেঁটকাতে পারি। কিন্তু আমি তো তা মানতে পারছি না। ওদের এই 'ভালগারিটিই' যে কত সুন্দর, চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

এক জায়গায় গরুর গাড়ি থেকে নামতে হ'লো। বেশ খানিকটা খাড়াই পথ। খাড়াই পথে গরুর উঠতে কষ্ট হয়। হেঁটে ওপরে উঠতে লাগলাম আমরা।

হঠাৎ ডাক্তার প্রশ্ন করে বসলো, আচ্ছা লেখক, কোন মানুষই বোধহয় পুরোপুরি সুখী হতে পারে না?

ডাক্তারের প্রশ্নের কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। মনে হলো ডাক্তার যেন গভীরভাবে কি ভাবছে। আমি বললাম, দেখুন ডাক্তার, স্যাটিস্ফ্যাকশান ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। যার যার মনের ওপর নির্ভর করে। তবে অলরাউণ্ড স্যাটিস্ফ্যাকশান বোধ হয় কেউই পায় না।

ডাক্তার বলে, বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই পায় না। সব চাইতে তৃপ্ত বলে যে গর্ব করে তার মধ্যেই থাকে অতৃপ্তির গভীর খাদ। ওটাকে ঢাকতেই ওরা ফুঁপিয়ে ফাঁপিয়ে তৃপ্তির কথা বলে থাকে।

আমি বললাম, হ্যাঁ—এ একরকম আত্মদহন আর কি। এতে অনেকেই ভোগেন। তবে বাইরে প্রকাশ করেন না।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার। একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি ওর মধ্যে। 'মারাণ্ডি হোমিও ক্লিনিক'-এর লিখন ডাক্তারের সঙ্গে যেন ওর অনেক তফাৎ।

একসময় ডাক্তারই বলে, আমিও পুরোপুরি স্যাটিস্‌ফায়েড হতে চাইনি। ডাক্তারি পাশ করেছি। মোটামুটি সুনামও পেয়েছি এখানে। পয়সার অভাব আমার নেই। তবু...একটা জায়গায়...।

এ বাবু, গাড়ি পর উঠ্‌ যাও।

গাড়োয়ানের হাঁকানিতে ডাক্তারের কথার ছেদ পড়ে। খাড়াই পথ কখন পেরিয়ে এসেছি খেয়াল নেই। সন্ধ্যে হয়েছে। চাঁদের আলো অন্ধকার দূর করছে। চাঁদের ঝকমকে আলোয় পেছনে ফেলে আসা আঁকা-বাঁকা উঁচু-নিচু লাল মেঠো পথটা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি এগিয়ে চলে আবার। আমি নীরব। ডাক্তারও নীরব। শুধু গাড়োয়ানের 'হেট্‌ হেট্‌' শব্দ নীরবতা ভাঙছিল।

* * * *

অবশেষে দেহাতে পৌছনো গেল।

সাঁওতালদের গ্রামে এই প্রথম এসেছি। আমাদেরকে নাচের আসরে নিয়ে যাওয়া হলো। কলকাতা মহানগরীর অভিজাত নাচের আসর এ নয়। বাজনার ঝংকার, পোশাকের ছটা নেই। নেই বিজলি বাতির বাহার। সমঝদার দর্শকও নেই। শাল মহুয়ায় ঘেরা একটা সমতল জায়গাতে আসর বসেছে। চাঁদের আলোই যথেষ্ট। জনা তিরিশেক নারী পুরুষ হাজির হয়েছে। সাঁওতাল নাচের স্বাভাবিক পোশাক ওরা পরেছে। মেয়েরা খোঁপাতে মহুয়া ফুল গুঁজেছে। হাতে বালার মতন বেঁধেছে। বাজনার জন্যে মাদল আছে। নাচ এখনো শুরু হয়নি। তবে বাজনার মহড়া চলছে।

গুটি কয়েক বেঞ্চ আর তক্তপোশ পাতা দর্শকদের জন্যে। আমি আর কমল বেঞ্চে বসতে যাচ্ছিলাম। ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে, উঁহু—ওখানে নয়। চেয়ার আসছে আপনাদের জন্যে।

আমি বললাম আবার চেয়ার কেন। এই পরিবেশে চেয়ার যেন বেমানান।

ডাক্তার বলে, হয়তো তাই। কিন্তু সাঁওতালরা তাদের অতিথি সৎকারে ত্রুটি সইতে পারে না। ডাক্তারের খোঁচাটুকু হজম করে চেয়ারে বসে পড়ি। ডাক্তার ওদের সর্দারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

আমাকে দেখিয়ে সর্দারকে বললো, আমার খুব পেয়ারের দোস্ত। বই লেখেন। কলকাতা থেকে এসেছেন। আমরা নমস্কার বিনিময় করলাম। বয়স হয়েছে সর্দারের। দাঁতগুলো পোকায় খাওয়া কালসে পড়া। কিন্তু কালো কুচকুচে শরীরটা চাঁদের আলোর ইস্পাতের মতন দেখাচ্ছে।

একটি সাঁওতাল মেয়ে রূপোর থালায় চারটি গ্লাস এনে হাজির করলো।

আমি বললাম, এসব আবার কি করেছেন ডাক্তার?

ডাক্তার বলে, কিছুই নয়। শুধু নাচ দেখলে তো চলে না? স্লাইট রিফ্রেশমেন্টও দরকার। তাছাড়া ইউ আর আওয়ার গেস্ট টু-নাইট্‌। সেটুকুও অতিথি সৎকারের মধ্যেই পড়ে।

দুটো গ্লাস আলাদা করে ডাক্তার বললো, এতে আছে সাধারণ সরবৎ। একটু গলা ভিজিয়ে নিন। আর এই গ্লাস দুটোয় আছে মহুয়ায় তৈরী একটু ড্রিংক। খুব লাইট করে বানানো আপনাদের জন্যে। অভ্যেস নেই কিনা আপনাদের? মহুয়া না খেলে সাঁওতালি নাচ ঠিক এন্‌জয় করা যায় না।

ডাক্তার মারাণ্ডির কথায় আমার চোখ খুললো। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি আসরে যারা এসেছে তারা সবাই মহুয়া খেয়েছে। ওদের চোখমুখই তা বলে দিচ্ছে। অনেকে বেশি খেয়ে ঢুলছে। যারা মাত্রা কম রেখেছে তারা গল্পগুজব করছে। হাসি-ঠাট্টায় মেতে রয়েছে। কাছে কোথাও ভাটিখানা আছে কি না জানি না। না থাকলেও ওদের অসুবিধে হয় না। মহুয়া দিয়ে ওই বিশেষ ধরণের দেশী পানীয় ওরা নিজেরাই বানায়। খাওয়ার কোন মাত্রা থাকে না। থাকে না বাঁধাবিধে।

সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যে বেলায় চারপাইয়ের ওপর বসে পরিবারের সবাই মিলে ওরা মহুয়া খায়। মহুয়াটা ওদের ঠিক নেশার জন্যে নয়। পানীয়জলের মতনই ওরা ব্যবহার করে।

নাচ শুরু হল। মাদলের তালে তালে নাচিয়েদের পা ফেলা, শরীর নাড়াচাড়ার ভঙ্গি সত্যিই আমায় মুগ্ধ করছে। সাঁওতালি মেয়েদের দেহ-সৌষ্ঠব নাচের মধ্যে আরও বেশি শৈল্পিক হয়ে উঠছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে ওদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য সত্যিই উপভোগ্য। একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে নাচ বিশেষভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। অন্যান্যদের চাইতে ওর দেহ সৌষ্ঠবও সুন্দর। বেশ উচ্ছল। মাত্রা ছাড়িয়ে মহুয়া খাওয়ায় সে উচ্ছলতা আরও প্রকট। চোখে মাদকতা। কিন্তু আশ্চর্য! নেশার ঘোরে নাচের একচুলও ভুল হচ্ছে না।

কমল বললো, নাম ওর মতুয়া। লেখাপড়া না জানলেও খুব আপ্-টু-ডেট্।

হঠাৎ নজরে পড়লো ডাক্তার মারাণ্ডি ওর জায়গায় নেই। এমনকি নাচের আসরেও নেই। আরও নজরে পড়লো মতুয়া নেই অথচ নাচ যেমন চলছিল তেমনি চলছে। অনেকে এখানো মহুয়া গিলছে। একটি সাঁওতাল ছেলে এগিয়ে এসে বললো, লিখন ডাক্তার আপনাকে ডাকছে।

আরেকটু বিস্ময়ের পালা। ডাক্তার যেন নাটকের একেকটা অঙ্ক খুলে দেখাচ্ছে। ছেলটিকে অনুসরণ করে এগোই আমরা। বেশ খানিকটা দূরে নির্জন একটা জায়গায় এসে দাঁড়াই। একটা মহুয়া গাছের গোড়ায় মতুয়া বসে। ডাক্তার সামনে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার ঘুরে দাঁড়ালো আমাদের দেখে। বললো, দেখুন তো লেখক, কি মুশ্‌কিলে পড়েছি। মতুয়া আমাকে কিছুতেই ডাক্তার বলে মানবে না। কোন মতেই ওকে বোঝাতে পারছি না। আর......এজন্যেই আমাদের বিয়েটাও হতে পারছে না।

সাপের মতন ফুঁসে ওঠে মতুয়া। বলে, হুঁঃ— হোমিওপ্যাথি আবার ডাক্তারি। সুঁচ নেই। অসুখ হ'লে ভালো হয় না। তোকে পেয়ার করি কি করে?

আমাদের সামনে মতুয়ার এই আক্রমণে ডাক্তারের মুখটা পাংশু হয়ে যায়। কথা যোগায় না মুখে। নীরবে অপমান হজম করতে থাকে। মতুয়ার চোখে বিজয়িনীর চাউনি। ওদের এই সমস্যাটাকে আমি হালকা করতে চাই।

সামান্য হেসে বলি, আপনি ডাক্তার কি না জানি না। তবে কোলকাতা থেকে এখানে এসে আমি কিন্তু আপনার ওষুধেই ভালো হয়েছি।

ডাক্তার চমকে উঠে আমার এই মিথ্যে কথায়। আমার দিকে একবার চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নেয়। পরের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যে বলার দোষ নেই জেনেই আমি বলেছি তবু ডাক্তারকে আমার এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ এক আলাদা মানুষ মনে হচ্ছে।

মতুয়া বললো, সত্যি বলছো লেখক?

আমি বললাম, সত্যি বৈ কি? ডাক্তার মারাণ্ডির খুব সুনাম হবে। অবশ্যই তোমার সাহায্য দরকার।

মতুয়া মাথা নিচু করলো। ডাক্তার আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমার মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। ওদের মুখের সেই পাংশু ভাবটা আর নেই।

* * * * *

সকালের গাড়িতে কোলকাতায় ফিরছি। আমাকে তুলে দিতে এসেছে কমল। ডাক্তারের দেখা পাইনি। দু দিন ক্লিনিক্ বন্ধ। খানিকটা বিস্ময় বোধ হচ্ছে। কিন্তু করার কিছু নেই। ডাক্তারের খবর কেউ বলতে পারলো না।

গাড়ি আসার খানিক দেরী আছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে শান বাঁধানো চেয়ারটায় বসে গাড়ির অপেক্ষা করছি। ডাক্তার মারাণ্ডির জন্যে মনটা উস্‌খুস্ করছে। হয়তো আর কোনদিন দেখা হবে না ওর সঙ্গে।

গাড়ি এলো। গাড়িতে উঠে মালপত্র গুছিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালাম। প্লাটফরমের ওপ্রান্ত থেকে ডাক্তার মারাণ্ডি ছুটে আসছে। পেছনে মতুয়া।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো ডাঃ মারাণ্ডি। আমার হাত চেপে ধরলো।

বললো, আমাকে মার্জনা করবেন লেখক। আমি আমি জানতাম আজ আপনি যাচ্ছেন। জানতাম বলেই দেহাত গিয়েছিলাম ওকে আনতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবেই।

প্লাটফরমে নেমে এলাম আমি। ডাক্তার ওর হাতে আমার হাতটা পিষতে থাকে। পেছনে মতুয়া হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার বললো, আমাদের জীবনের একটা নিউ চ্যাপ্টার আপনি ষ্টার্ট করে দিয়ে গেলেন। সত্যি লেখক......আপনি যদি সেদিন রাতে আমাকে সার্টিফাই না করতেন তবে হয়তো মতুয়া আমাকে কোনদিন মেনে নিতে পারতো না। তাই...আপনাকে যে কি বলে—

ডাক্তারকে থামিয়ে দিয়ে আমি বলি, ধন্যবাদ দেবেন তাই তো? ধন্যবাদের পাটটা না হয় এখন রাখুন ডাঃ মারাণ্ডি। সত্য কোনদিন লুকিয়ে থাকে না। আজ না হলেও একদিন মতুয়া আপনাকে মেনে নিতই।

ডাক্তার বললো, আপনি জানেন না লেখক, মতুয়া আপনাকে কতখানি শ্রদ্ধা করে, কতখানি বিশ্বাস করে।

মতুয়া একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়।

ডাক্তার বলে, একটা কথা ভেবে আমার বড় খারাপ লাগছে। আমার বিয়ে পর্য্যন্ত আপনাকে রাখতে পারলাম না।

আমি বললাম, বেশ তো, খবর দেবেন। আমি চলে আসবো।

ডাক্তার বলে, আমাদের বিয়েতে কতকগুলো ফর্মালিটিজ্ আছে, ওগুলো না থাকলে আমি এখুনি একটা কিছু ব্যবস্থা করতাম।

গাড়ি ছাড়ার হুইস্ল্ বাজে। আমি উঠে দরজায় দাঁড়াই।

মতুয়া বলে, আবার আসবেন লেখক।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই আসবো।

গাড়ি ছাড়লো। গাড়ি প্ল্যাটফরম্ ছেড়ে আসা পর্য্যন্ত ওরা আমায় হাত নেড়ে বিদায় জানাতে লাগলো। সিটে বসে সাঁওতাল পরগণার প্রাকৃতিক পটে দুটি মুখ আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। একটা ডাক্তার লিখন মারাণ্ডির। সে মুখ বলছে, 'আমি ডাক্তার—আমি ডাক্তার।' আরেকটি মতুয়ার। উচ্ছল দেহ হেলিয়ে দুলিয়ে খিল্‌খিল্ করে হাসছে মতুয়া আর বলছে, 'ডাক্তার না ছাই'। মতুয়ার চোখে দুষ্টু হাসি।

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১

আমেদাবাদ কংগ্রেসের পর সারা দেশে ধরপাকড় ও দমনকার্য্য পুরো মাত্রায় চলতে লাগল। ফরিদপুর জেলের ভিতরে নৃশংসভাবে বেত্রাঘাত করা হয় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর।

অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তার দেখে রাজকর্মচারী ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষিত ইংরেজদেরও মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে তা বেশ বোঝা যাবে।

আন্দোলনেয় গতি লক্ষ্য করে সেন্ট জেভিয়ার্স্ কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজের গেটের সামনে নিরাপত্তার জন্য একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মচারীর মোতায়েনের ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিন ঐ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একজন খদ্দরের পোশাক পরিহিত ছাত্রকে দেখে প্রহরারত পুলিশ কর্মচারী ভীতিগ্রস্ত হল। ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ পুঙ্গব কলেজের রেকটারের নিকট হাজির করল। খদ্দর দেখেই রেকটার মশায়ও হরিফাইড হলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছাত্রটির নাম রেজিষ্টার থেকে কেটে দিয়ে তাকে কলেজ ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। এতে বালকটি কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ করে নি। অসহযোগ আন্দোলন ব্রিটিশ কর্মচারীদের মনে কি প্রকার বিভীষিকা ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এই সামান্য ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সে যাই হোক, দেশের সর্বত্র অসহযোগের প্রচার পুরো দমে চলতে লাগল। ভারতের সর্বত্র অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রচারের সভা-সমিতি হতে লাগল। কলকাতায় একই দিনে হ্যালিডে পার্ক (বর্তমানে মহম্মদ আলী পার্ক), কুমারটুলি স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার (বর্তমান রবীন্দ্র কানন) এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) আহুত সভাগুলি পুলিশ জোর করে ভেঙ্গে দেয়।

পাঞ্জাবেও পুলিশের জোরজুলুম চলতে লাগল। সেখানে সর্বজনমান্য পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়, ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব, লাল খাঁ প্রভৃতি নেতাদের গ্রেপ্তার করে একটা বিচারের প্রহসনের পর কারাগারে আবদ্ধ করা হল।

অসহযোগ আন্দোলনের অগ্রগতি দেখে গভর্ণমেণ্ট ক্ষেপে গেল। স্বেচ্ছাবাহিনীর সদস্যদের গ্রেপ্তার করে তাদের উপর অমানুষিক ভাবে পুলিশ বেত্রাঘাত প্রভৃতি অকথ্য অত্যাচার চালাতে লাগল।

দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি আলোচনার জন্য পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, মহম্মদ আলী জিন্না, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, মুকুন্দ আর. জয়াকর, জি. এন্. ভুরগুরি প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের একটি সভা বম্বেতে ১৪ই জানুয়ারী আহ্বান করলেন।

নির্দিষ্ট তারিখে ঐ সভার অধিবেশন হল। সভায় নেতৃত্ব করলেন স্যার শঙ্করণ নায়ার। এই সভায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না। স্যার শঙ্করণ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বললেন, গান্ধীজি ও অন্যান্য অসহযোগী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গান্ধীজি এবং তাঁর অনুচরদের সঙ্গে আর আলোচনা করা বৃথা। তিনি জানালেন, সম্মানজনক

মীমাংসার জন্য তাঁরা যা সমীচীন বিবেচনা করবেন তাতে তিনি (গান্ধীজি) মত দেবেন না অথবা কোন সিদ্ধান্ত বিশ্বস্তভাবে কর্য্যে পরিণত করবেন না।

এদিকে ধরপাকড় ও অত্যাচার চলতেই লাগল। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ধৃত হয়ে এক বৎসরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

৩০শে জানুয়ারী ফরবেশ ম্যানশনে অবস্থিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অফিসে পুলিশ চড়াও হয় কমিটীর সভাপতি প্রবীণ নেতা হরদয়াল নাগকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। তাঁর স্থলে ময়মনসিংহের অন্যতম নেতা সূর্য্যকুমার সোম সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

এই সময় আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে কংগ্রেস ও খিলাফৎ অফিস থেকে দৈনিক বুলেটীন বের করা হতে লাগল।

এই রকম পরিস্থিতিতে মহাত্মা গান্ধী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভাইসরয়ের নিকটে একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখলেন। তাতে তিনি জানালেন যে, ভারত গভর্ণমেন্টের বর্তমান মনোভাবের দরুন হিংসামূলক প্রভাব সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে বর্তমানে দেশের অপ্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে মালবীয় কনফারেন্স, যার উদ্দেশ্য হল একটি গোল টেবিল কনফারেন্স আহ্বান করতে ভাইসরয়কে সম্মত করা, সেই কনফারেন্সের সঙ্গে অসহযোগীরা কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। কিন্তু গভর্ণমেন্টের বে-আইনী অত্যাচার অবিলম্বে গণ-আইন-অমান্য নীতি গ্রহণ অপরিহার্য্য কর্তব্য করে তুলেছে। বর্তমানে এই আন্দোলন বরদৌলিতে সীমাবদ্ধ থাকবে কিন্তু তিনি তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা বলে গুনটুর জেলার ১০০গ্রামের একটি দলকে (গ্রুপ) আবশ্যকীয় সর্তাবলী কঠোর ভাবে পালন করার সর্তে এতে সম্মতি জানাতে পারেন।

মহাত্মা ঐ চিঠিতে আরও জানালেন যে বরদৌলির জনগণ প্রকৃতপক্ষে গণ-আইন অমান্য আরম্ভ করার পূর্বে "ভারত গভর্ণমেন্টের প্রধান হিসাবে আপনার নিকট আপনার নীতি সংশোধন করে যে-সকল অসহযোগীদের অহিংস কার্য্যের জন্য শাস্তি দিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়েছে অথবা যাঁরা বিচারাধীনে আছেন তাঁদের মুক্তি দিতে এবং দেশের সমুদয় অসহযোগ কার্য্যে বা খিলাফৎ অথবা পাঞ্জাবের অন্যায়ের জন্যই হোক অথবা স্বরাজ অর্জন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যের জন্যই হোক, এবং যদি তা পেনাল কোডের বা ক্রিমিনাল প্রসিডিউয়রের অথবা অন্যান্য দমন-মূলক আইনের আওতাতেও পড়ে, তথাপি সেগুলি যদি অহিংস হয়, সেই-সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করার নীতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করার জন্য আমি সম্মানের সহিত সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।

"আমি আরও অনুরোধ করছি সংবাদপত্রগুলিকে সমুদয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে এবং সমুদয় জরিমানার টাকা ও বাজেয়াপ্ত দ্রব্যাদি ফেরত দিতে।

"এই সকল অনুরোধ করে যে-সকল দেশ সুসভ্য গভর্ণমেন্টের অধীনে আছে সেই সকল দেশে যা হচ্ছে তাই আপনাকে করতে বলছি।

"এই মেনিফেষ্টো প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আপনি যদি আবশ্যকীয় ঘোষণা করা সঙ্গত বিবেচনা করেন তা হলে যতদিন পর্য্যন্ত কারামুক্ত কর্মীরা সমস্ত পরিস্থিতি আলোচনা করে পুনরধিকার না করছে ততদিন পর্য্যন্ত আগ্রাসী আইন আন্দোলন স্থগিত রাখতে আমি উপদেশ দিব।

"যদি গভর্ণমেন্ট আবশ্যকীয় ঘোষণা করেন তা হলে সেটাকে আমি গভর্ণমেন্টের পক্ষে জনমত মান্য করার সদিচ্ছা বলে মনে করব। সে ক্ষেত্রে আগ্রাসী আইন আন্দোলনে কেবল তখনই করা হবে যখন গভর্ণমেন্ট তার নিরপেক্ষতা নীতি থেকে ভ্রষ্ট হবে অথবা ভারতের জনগণের বিপুল সংখ্যাধিক্যের স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত অভিমতকে অগ্রাহ্য করবে।"

ভাইসরয় গান্ধীজীর এই আবেদন ৬ই তারিখে অগ্রাহ্য করলেন। নেতারা এর জন্য হতাশা প্রকাশ করলেন।

এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল। যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) গোরখপুর জেলার চৌরী চৌরা গ্রামের একটি জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় পুলিশ থানা আক্রমণ করে ভস্মীভূত করল এবং কয়েকজন কনষ্টেবলকে নৃশংস ভাবে হত্যা করল। সুবিশাল ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র কোণের এই ঘটনায় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা আলোচনার জন্য ১১ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী বরদৌলিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটীর একটি অধিবেশন হল। আলোচনার ফলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গণ-আইন-অমান্য ওয়ার্কিং কমিটী স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করল।

চৌরী চৌরার হত্যাকাণ্ডের জন্য আইন অমান্যের প্রবর্তক হিসাবে মহাত্মা গান্ধী নিজকে দায়ী করলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ৫ দিনের জন্য অনশন ব্রত গ্রহণ করলেন। এই উপবাস ১৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী শেষ হল।

এদিকে গভর্ণমেণ্টের দমনকার্য্য চলতেই লাগল।

১৪ই ফেব্রুয়ারী আদালতের বিচারে—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ৬ মাসের জন্য কারাবাসের দণ্ড হল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদও ১৫ই তারিখে কারাগারে অবরুদ্ধ হলেন।

ভারতবর্ষের পরিস্থিতি নিয়ে এই সময় ভারত-সচিব মণ্টেগুকে লণ্ডনে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সদস্যদের অভিযোগ ছিল এই যে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক গান্ধীকে এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার না করে কেন বাইরে রাখা হয়েছে। মণ্টেগু সাহেব জানালেন যে কিছুকাল পূর্বেই গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট হুকুম দিয়েছিল কিন্তু মিষ্টার গান্ধী এবং তাঁর সহকর্মীরা অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য বে-আইনী কাজ না চালানো সিদ্ধান্ত করায় গভর্ণমেণ্ট সেই সিদ্ধান্তের ফলাফল পরীক্ষা করার জন্য গ্রেপ্তারের হুকুম মুলতুবি রাখা হয়েছে।

এই বিবৃতির পর মহাত্মাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হতে লাগল। বাংলায় জনপ্রিয় তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ৬ মাসের জন্য জেলে পাঠানো হল।

বরদৌলিতে গৃহীত ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত আলোচনার জন্য ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন আহ্বান করা হল। ঐ অধিবেশনে আলোচনার জন্য বিলাসপুরের নেতা রাঘবেন্দ্র রাও (পরবর্তী কালে ইনি মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন) একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিলেন। ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বরদৌলি প্রস্তাব দ্বারা দেশে যে রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অন্যায়ের প্রতিকার ও স্বরাজ অর্জনের জন্য আরও উপযুক্ত পন্থা বিচারান্তে গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান।

নির্দিষ্ট তারিখে দিল্লীতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হল, বরদৌলি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিপুল-সংখ্যক সদস্য তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আলোচনার সময় দেখা গেল যে একটি দল মহাত্মা গান্ধীকে বাতিল (back number) বলে মনে করা সত্ত্বেও উক্ত দলের সদস্যগণ মহাত্মার নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে পালন ও তাঁর কর্মসূচী কার্য্যকর করতে প্রস্তুত থাকবেন বললেন। এই দল বেশ শক্তিশালী ছিল কিন্তু তার সমর্থকদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কাজেই যা অনিবার্য্য তাই তাদের মেনে নিতে হল। অনুরূপ কারণে ব্যক্তিগত ভাবে বরদৌলি সিদ্ধান্তের সমর্থক থাকা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর বহুসংখ্যক অনুগামীদের চাপে অনিবার্য্য ভাবে ব্যক্তিগত আইন অমান্য ও বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করার দাবি মেনে নিতে হল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন কিন্তু তা পাশ হল না। মালবীয়জীর অভিমত ছিল যে, দুই মাস পরে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজন হলে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা যেতে পারে।

মহারাষ্ট্রের সদস্যরা কিছুকালের জন্য আইন অমান্যের প্রশ্ন স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নি।

বাংলার প্রতিনিধিদের একটা বৃহৎ অংশ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, যদি রাজনৈতিক আব হাওয়া অহিংস থাকে এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তা যদি ন্যায্য শান্তিপূর্ণ এবং 'মরাল' হয় তা হলে খদ্দর, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় সর্তগুলি আইন অমান্য করার জন্য অবশ্য-পালনীয় করা উচিত হবে না, বলা বাহুল্য যে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একটি প্রস্তাব দ্বারা—আইন অমান্য আন্দোলন পরিত্যাগ করে বিধান সভাতে প্রবেশের কথা বলেন কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করল না।

অবশেষে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হল। তাঁর এই প্রস্তাবে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষার্থ উভয় প্রকারের ব্যক্তিগত আইন অমান্য মঞ্জুর করা হল এবং মদ ও বৈদেশিক বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার অনুমতি দেওয়া হল।

এই সভার অব্যবহিত পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কারাগার থেকে ৩রা মার্চ মুক্তি লাভ করলেন কিন্তু তার কয়েক দিন পরেই ৯ই মার্চ লালা লাজপত রায়কে কারাগারে এক বৎসরের জন্য বন্দী করা হল।

(২)

ভারতবর্ষে এই সকল ঘটনা যখন ঘটছিল সেই সময় ১১ই মার্চ তারিখে ইংলণ্ডে ভারতসচিব মণ্টেগু হঠাৎ তাঁর পদে ইস্তফা দিলেন।

মার্চ মাসের শুরু থেকেই মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের জোর গুজব দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মণ্টেগু সাহেবের পদত্যাগের ফলে মহাত্মার গ্রেপ্তার আসন্ন বলে মনে হল। এবং ১১ই মার্চ এই গুজব সত্যে পরিণত হল।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার এবং তাঁর ঐতিহাসিক বিচারের কাহিনী নিয়ে প্রদত্ত হল।

গত কিছুদিন যাবৎ মহাত্মা গান্ধী এবং ব্যাংকার মশায় তাঁদের আসন্ন গ্রেপ্তারের কথা অবগত ছিলেন। বোম্বাইয়ের ধনী শঙ্করলাল ব্যাংকার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তার সম্পাদক।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য আবু পাহাড়ে হাওয়া পরিবর্তন করতে যাওয়ার পথে ব্যাংকার মশায় আমেদাবাদে এসে শ্রীমতী অনসূয়া সারাভাইয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা উলেমাদের সম্মিলনে যোগদান করার জন্য আজমীর গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ১০ই মার্চ অপরাহ্নে আমেদাবাদে ফিরে আসেন। সেই সংবাদ পেয়ে ব্যাংকার মশায় এবং অনসূয়া দেবী গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে সবরমতী আশ্রমে যান।

রাত্রি ১০টার সময় যখন অনসূয়া বাই ব্যাংকার মশায়কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন তখন পথে তাঁদের সঙ্গে আমেদাবাদের জেলা পুলিশ সুপারিন-টেমডেন্ট হিটলীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি তাঁদের গ্রেপ্তারের পরওয়ানা দেখালেন এবং এই সংবাদ গান্ধীজিকে জানাতে বললেন।

যখন তাঁরা আশ্রমে ফিরে গেলেন তখন মহাত্মাজি স্নান করছিলেন। তাঁকে এই সংবাদ জানানো হল। স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আশ্রমবাসীদের ডাকলেন এবং একসঙ্গে গীতা পাঠ ও উপাসনা করলেন। হিটলী সাহেব সর্বক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উপাসনান্তে গান্ধীজি হিটলীর নিকট গেলেন। অনসূয়া বাই বললেন যে মহাত্মা গান্ধী এবং ব্যাংকার উভয়েই অসুস্থ। তিনি তাঁদের সঙ্গে যেতে চান। হিটলী এই

অনুরোধ রক্ষা করার অসামর্থ্য জানালেন তবে সবরমতী জেল পর্য্যন্ত তাঁকে এবং শ্রীমতী গান্ধীকে সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন। সেখানে উভয় আসামীকেই অবরুদ্ধ করা হল।

তার পরদিন ১১ই মার্চ বেলা ১১টার সময় আমেদাবাদ সহরের সাহাবাদে কমিশনারের বাংলোতে এসিস্টেন্ট কলেক্টর ব্রাউন সাহেবের নিকট বিচার আরম্ভ হল।

গভর্ণমেন্টের পক্ষে সরকারী উকিল রাও বাহাদুর গিরধারীলাল মোকর্দ্দমা চালালেন।

গভর্ণমেন্ট পক্ষের প্রথম সাক্ষী আমেদাবাদের পুলিশ সুপার ইয়ং ইণ্ডিয়াতে ১৯২১ সালের ১৫ই জুন প্রকাশিত প্রবন্ধ "অসন্তোষ একটি গুণ" (Disaffection a Virtue), ২৯শে সেপ্টেম্বরে তারিখে প্রকাশিত "রাজভক্তির উপর হস্তক্ষেপ করা" (Tampering with Loyalty), ১৫ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত "ধাঁধা এবং তার সমাধান" (The Puzzle and its Solution) এবং ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত 'কেশর কাঁপানো' (Shaking the Manes) প্রবন্ধ চারটির জন্য নালিশ দায়ের করতে বোম্বাই গভর্ণমেন্টের হুকুমনামা দাখিল করলেন। মূল স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ ও পত্রিকার সংখ্যাগুলিও দাখিল করা হল।

বোম্বাই হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার চারদা এবং আমেদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট চ্যাটফিল্ড ইয়ং ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ও প্রকাশক যে যথাক্রমে গান্ধী ও ব্যাংকার সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন।

সাক্ষীগণকে কোন জেরা করা হল না।

জিজ্ঞাসিত হয়ে মহাত্মা জানালেন যে তাঁর বয়স ৫৩ বৎসর। পেশাতে তিনি একজন কৃষক ও তন্তুবায় এবং তাঁর বাসস্থান সবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রম। তিনি এই মাত্র জানাতে চান যে উপযুক্ত সময়ে গভর্ণমেন্টের প্রতি অপ্রীতি সম্বন্ধে তিনি নিজেকে দোষী বলবেন। এটা সত্য যে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক এবং যে-সকল প্রবন্ধ পঠিত হল তা তাঁরই লেখা এবং পত্রিকার নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পত্রিকার মালিক ও প্রকাশক তাঁকেই দিয়েছেন।

ব্যাংকারও বললেন যে তিনি উপযুক্ত সময়ে প্রবন্ধগুলি প্রকাশের জন্য দোষ স্বীকার করবেন।

এর পর ভারতীয় পেনাল কোডের ১২৪এ ধারানুসারে চার্জ তৈরি করে তাঁদের দায়রায় সোপর্দ করা হল এবং দায়রা বিচারের তারিখ ধার্য্য হল ১৮ই মার্চ।

বিচারের দিন বিচার আরম্ভ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় বেলা ১২টার বহুপূর্ব থেকেই আমেদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের আদালতের বিচার কক্ষ দর্শক দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। কক্ষের উভয় দিকের বারান্দাতেও দর্শকদের জন্য স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কক্ষের মধ্যে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে ভি জে প্যাটেল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, সদ্য কারামুক্ত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, টি প্রকাশন, অম্বালাল সারাভাই ও তাঁর ভগ্নী শ্রীমতী অনসূয়া সারাভাই উপস্থিত ছিলেন।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী মোতায়েন ছিল। আদালত ভবনের হাতার চতুর্দিকে পুলিশ ও হাতার ভিতরে সৈন্য মজুত ছিল। ৬ জন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কর্মচারী পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব করছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ও ব্যাংকার পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সমভিব্যাহারে ১১-৩০ মিনিটের সময় বিচারকক্ষে প্রবেশ করলেন। যাঁরা কক্ষমধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জজ সাহেবের বিচারাসনের বামপার্শ্বে রক্ষিত চেয়ারে আসন গ্রহণ না করলেন ততক্ষণ সকলে দাঁড়িয়েই রইলেন।

সরকারের পক্ষে মামলা চালনার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট জেনারেল স্যার টমাস স্ট্র্যাংম্যান আমেদাবাদ এসেছিলেন। তিনি ১১-৫০ মিনিটের সময় আদালত কক্ষে প্রবেশ করে শির সঞ্চালন পূর্বক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করলেন।

ঠিক ১২টার সময় জজ সি ব্রুমফিল্ড বিচারকক্ষে প্রবেশ করে বিচারাসনে উপবেশন করলেন।

উভয় আসামীর বিরুদ্ধে চার্জগুলি পড়ার পর জজ সাহেব পেনাল কোডের ১২৪ এ ধারার ব্যাখ্যা করে বললেন যে অপ্রীতি (disaffection) শব্দে রাজভক্তির অভাব (disloyalty) এবং শত্রুতার ভাবও বোঝায়। বোম্বাই হাইকোর্ট এর অর্থ বিচ্ছেদ (alienation) এবং অসম্মানও হয় বলেছে।

এই ব্যাখ্যার পর তিনি গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি (গান্ধীজি) দোষ স্বীকার করবেন, না বিচারের দাবি করবেন। মহাত্মা সমুদয় অভিযোগ স্বীকার করে নিজেকে দোষী বললেন এবং অভিমত প্রকাশ করলেন যে, অভিযোগগুলির বয়ান থেকে রাজার নাম বাদ দেওয়া সঙ্গতই হয়েছে।

জিজ্ঞাসিত হয়ে ব্যাংকারও অনুরূপভাবে দোষ স্বীকার করলেন।

তারপর বিচার-পদ্ধতি নিয়ে জজ সাহেব ও এডভোকেট জেনারেলের মধ্যে তর্কাতর্কি হল। জজ সাহেব মত প্রকাশ করলেন নিম্ন আদালতে যে সকল সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে তাতেই কাজ হবে। এখানে আর নূতন করে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই। নিম্ন আদালতের সাক্ষ্য ও আসামীদের দোষ-স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। এখন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। এ সম্বন্ধে তিনি মহাত্মার অভিমত জানতে চান কিন্তু তার পূর্বে এডভোকেট জেনারেল এ সম্বন্ধে কি বলেন তা তিনি জানতে চান।

এডভোকেট জেনারেল বললেন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি, যার জন্য এই অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলি প্রকাশ্যে অসন্তোষ এবং গভর্ণমেণ্টকে অচল ও উৎখাত করার আন্দোলনের প্রচারের অংশ। প্রবন্ধগুলি একজন অজ্ঞাত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির রচনা নয় সুতরাং এর কি ফল হতে পারে তা আদালতকে বিবেচনা করতে বলেন। তারপর তিনি গত কয়েক মাসে বোম্বাই চৌরীচৌরায় অনুষ্ঠিত ঘটনার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন জখম এবং জনসাধারণের দুঃখকষ্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন যে, যদিও প্রবন্ধগুলিতে অহিংসার উপর জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার মূল্য কি, যদি অনবরত গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রকাশ্য ভাবে সকলকে গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করতে প্ররোচনা দেওয়া হয়। দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার সময় এই সকল বিষয় বিবেচনা করতে জজ সাহেবকে অনুরোধ করলেন।

ব্যাংকার সম্বন্ধে এডভোকেট জেনারেল বললেন, প্রকাশক হিসাবে তাঁর অপরাধের গুরুত্ব কম। এঁর প্রতি দণ্ডাজ্ঞার সময় কারাদণ্ডের সঙ্গে যেন অর্থদণ্ডও করা হয়।

এডভোকেট জেনারেলের আসন গ্রহণ করার পর মহাত্মা গান্ধী জজ সাহেবের অনুমতি নিয়ে প্রথমে মৌখিক বিবৃতি দিলেন। তারপর তিনি লিখিত বিবৃতি পাঠ করলেন। তিনি জানালেন যে, এডভোকেট জেনারেল তাঁর সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করেছেন তা সঙ্গতই হয়েছে। তারপর তিনি বিবৃতি পড়ে শোনালেন; "আমি আদালতের নিকট লুকোতে চাই না যে বর্তমান গভর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ প্রচার করা আমার প্যাশনে (passion) পরিণত হয়েছে, এডভোকেট জেনারেল ঠিকই বলেছেন যে অসন্তোষ প্রচার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে আমার সম্পর্কের সময় থেকে আরম্ভ হয় নি। তার বহু পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছে।"

তিনি আরও জানালেন যে তাঁর দায়িত্ব নিয়েই তিনি এই অপ্রীতিকর কর্তব্য পালন করেছেন এবং বোম্বাই মাদ্রাজ ও চৌরীচৌরার ঘটনার জন্য এডভোকেট জেনারেল তাঁর উপর যে দোষারোপ করেছেন তা তিনি মেনে নিচ্ছেন। আর যদি তিনি মুক্তিলাভ করেন তা হলেও আগুন নিয়ে তিনি খেলা করবেন কিন্তু, অহিংসা তাঁর বিশ্বাসের অঙ্গীভূত। তিনি এখানে হাজির হয়েছেন লঘু শাস্তি গ্রহণের জন্য নয়, সর্বোচ্চ দণ্ড গ্রহণের জন্য। জজ সাহেবকে সঙ্গত ভাবে আইন

প্রয়োগ করতে হবে অথবা তাঁকে কাজে ইস্তফা দিয়ে যেমন তিনি (গান্ধীজি) করছেন সেইভাবে তাঁকেও (জজ সাহেবকেও) অসন্তোষ প্রচার করতে হবে।

তাঁর সুদীর্ঘ লিখিত বিবৃতিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বললেন যে, যে-সকল কারণে তাঁকে গোঁড়া রাজভক্ত ও সহযোগী থেকে আপোষহীন অসন্তোষবাদী ও অসহযোগী হতে হয়েছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করে অন্যায়ের প্রতিকারের এই একমাত্র পথ হিসাবে একে সমর্থন করলেন, তিনি তারপর অভিমত প্রকাশ করলেন যে নাগরিকগণের স্বাধীনতা বিনষ্ট করার জন্য ১২৪এ ধারা, যে ধারা অনুসারে তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন, তা পেনাল কোডের সর্বোচ্চ সম্মান-জনক রাজনৈতিক ধারা (Prince among the political sections of the Indian Penal Code)। যদি কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যের প্রতি কারও সস্নেহভাব না থাকে তা হলে তার সেই অসন্তোষ প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, অবশ্য যতক্ষণ সে অহিংসার পরিকল্পনা করবে না অথবা অহিংসার জন্য কাউকে উত্তেজিত করবে না বা তা প্রচার করবে না ততক্ষণ তার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

তারপর তিনি জানালেন যে "এই ধারানুসারে যে সকল বিচার হয়েছে তার কতকগুলি বিবরণ আমি পড়েছি এবং আমি জানি যে, বহু জনপ্রিয় ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকরা এই ধারানুসারে দণ্ডিত হয়েছেন। আমি আমার অসন্তোষের কারণ অতি সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করলাম। আমার কোন শাসকের প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিরূপতা নেই। রাজার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে অসন্তোষ ত দূরের কথা। আইনের চোখে যা সুচিন্তিত অপরাধ কিন্তু যা আমার নিকট নাগরিকের সর্বোচ্চ কর্তব্য মনে হয় তার জন্য সর্বোচ্চ দণ্ড গ্রহণ করতে আমি সানন্দে প্রস্তুত আছি।"

তারপর জজকে সম্বোধন করে তিনি বললেন যে, "আপনি যদি মনে করেন যে-আইন প্রয়োগের জন্য আপনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসৎ এবং প্রকৃত পক্ষে আমি নির্দোষী তা হলে আপনার সম্মুখে একমাত্র পন্থা হচ্ছে এই পদত্যাগ করে অসৎ কাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা অথবা আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, যে আইন প্রয়োগে আপনি সাহায্য করছেন তা দেশের লোকের পক্ষে কল্যাণজনক এবং সেই হেতু আমার কার্য্যাবলী সাধারণ জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তা হলে আমার প্রতি চরম দণ্ড প্রয়োগ করা।" ক্রমশঃ

অবজ্ঞাত

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

চৌধুরীদের লিলি প্রাতরাশ করছিল। পাঁউরুটি আর দুধ। লিলির পাঁউরুটিগুলোকে অখাদ্য মনে হ'ল। দুধটুকু খেয়ে পাঁউরুটির টুকরোগুলো বাইরে বাগানে ফেলে দিয়ে এল। চৌধুরীদের ঠিকে ঝিয়ের ছেলে খ্যাঁদা দূরে দাঁড়িয়ে লোলুপ চোখে চেয়ে ছিল। লিলি দাম্ভিক চালে ভেতরে চলে যেতেই খ্যাঁদা নেড়ি কুত্তার মত ছুটে এল। হাউহাউ করে লিলির পরিত্যক্ত রুটি মুখে তুলতে লাগল। চৌধুরীদের ছোটছেলের দৃশ্যটা চোখে পড়ল। হেঁই হেঁই করে সে তেড়ে এল খ্যাঁদার দিকে। খ্যাঁদা কেঁচোর মত কুঁকড়ে গেল।

—"ব্যাটা লিলির খাবার চুরি করে খাচ্ছিস।"

খ্যাঁদার মা ছুটে এল। ছেলের দু গালে দুই থাপ্পড় মেরে বলল—"হতচ্ছাড়া বদমাইশ।" মনিবের ছেলের দিকে চেয়ে করুণাভিক্ষা করল খ্যাঁদার মা।

—"কতদিন তোমায় বলেছি না, ছেলে টেলে নিয়ে এখানে আসবে না। কথা শোন না কেন?—"চৌধুরী গিন্নী বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনিই বললেন কথাটা।

"আমার ছেলেমেয়েরা বাবু নোংরা ছেলেপুলে মোটে দেখতে পারে না।"

—"শুধু নোংরা?—ছ্যাংলা।—ভীষণ ছ্যাংলা। লিলি বোধহয় আজও খাবার খায় নি। এই ব্যাটা খাবার চুরি করে খাচ্ছে"—ছোটছেলের মন্তব্য।

—"ওমা—। লিলির খাবার চুরি করে খাচ্ছে নাকি? লিলি কোথায়?-না বাপু খ্যাঁদার মা। ছেলে টেলে আনলে তোমাকে কাজ করতে হবে না।"

খ্যাঁদার মা'র মুখ শুকিয়ে আমসি হ'ল।

—"মা ঠাকরুণ, আর এমনটি হবেক না।" খ্যাঁদাকে আরও দুতিন চাপড় মেরে বলল—"বদমাইশ ছেলে। আমি কী জানি? হাঁড়হাভাতে আমার পেছা পেছা চলে আসেক।"

এরপর বেশ কিছুদিন খ্যাঁদাকে সঙ্গে আনে নি খ্যাঁদার মা। কিন্তু চৌধুরীদের চা-রুটির টানে খ্যাঁদা কিন্তু ক'দিন পরেই যথারীতি মায়ের পিছু পিছু এসে হাজির। মা অবশ্য পথে দুতিনবার গাল দিয়ে তাড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু খ্যাঁদা নাছোড়বান্দা।

লিলি সেদিন বাগানে 'ব্রেকফাস্ট' করছিল। মেজাজ তার সেদিন তেমন ভাল ছিল না। রোজকার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাচ্ছিল সেদিনও। খ্যাঁদা একটু দূরে দাঁড়কাকের মত দাঁড়িয়ে লিলির খাওয়া দেখছিল। লিলি চলে গেলেই ছোঁ মেরে নেবে ওর পরিত্যক্ত পাঁউরুটি। কিন্তু লিলির মেজাজটা সেদিন মোটেই সুবিধের নেই। খ্যাঁদার ওরকম চিলের মত তাকিয়ে থাকাটা লিলির অভিজাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত বিশ্রী লাগল। হঠাৎ সে ছুটে গিয়ে খ্যাঁদার হাতটা কামড়ে ধরল। খ্যাঁদা শকুনি-বাচ্চার মত চীৎকার জুড়ে দিল।

খ্যাঁদার মা, চৌধুরী-গিন্নী ও লিলির চাকর প্রায় এক সঙ্গে দৌড়ে এল।

—"লিলি, ও কী। ছেড়ে দাও—"গিন্নীর সস্নেহ কণ্ঠস্বর। লিলি এক কথাতেই হাত ছাড়ল খ্যাঁদার।

খ্যাঁদার হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে। খ্যাঁদার মা মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে। কী করবে বুঝছে না।

লিলিকে আদর করতে করতে চৌধুরীগিন্নী ফেটে পড়লেন—"ফের তুমি খ্যাঁদাকে এনেছ? জানোই তো নোংরা-কালো ছেলেপুলে দেখলে লিলির মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। লিলির কী দোষ।"

লিলির চাকর ফোড়ন কাটল—"লিলি কেন ও

কামড়াবে না মাইজী? ও ব্যাটা লিলির খাবার খাওয়ার জন্য কুত্তার মত দাঁড়িয়ে থাকে।”

খ্যাঁদা তখনও পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল। আর লিলি ওর চীৎকার শুনে রাগে গজরাচ্ছিল। গিন্নী লিলিকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। যাওয়ার আগে খ্যাঁদার মাকে উদ্দেশ করে বললেন—“ছেলেটা বড্ড বিটকেল চীৎকার করছে। নিয়ে যাও। নয়তো, বাবু এখুনি রাগারাগি করবেন।

খ্যাঁদার মা খ্যাঁদার হাত ধরে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে নিয়ে চলল। খ্যাঁদার কান্না আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল। মাঝে মাঝে ফোঁপানি আসছিল। মায়ের ধমকানিতে ফোঁপানিও থেমে গেল।

রাত্রে মায়ের কোলের কাছে কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়েছিল খ্যাঁদা। ছেঁড়া কাঁথায় অঘ্রাণের শীত আটকায় না, খ্যাঁদার শরীরটা বেতস পাতার মত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হঠাৎ তার মনে পড়ল, লিলির শীতের জামাটার কথা। লিলির ঘাড় থেকে পেটের ওপর অবধি গরম কাপড়ের জামায় ঢাকা থাকে। লিলির খুব ভাল গরম কম্বল আছে। লিলির শীত করে না। দাঁতে দাঁতে লেগে যাচ্ছিল খ্যাঁদার। মায়ের বুকের উষ্ণতায় একটু আরাম পেতে চাইল খ্যাঁদা। চোখের সামনে কালো রঙের লিলির জামাটা ভাসছে।

খ্যাঁদা বিড় বিড় করে বলল—“আমি বাবুদের কুকুর লিলি হলে আমার জাড় লাগত না।”

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

মালা ও সোমেনের বিয়ে উপলক্ষ্যে বাড়ীতে যাঁরা এসেছিলেন ক'টা দিন তাঁদের আনন্দেই কাটলো। ব্যবস্থার কোথাও কিছু ত্রুটি ছিল না। বিয়ে বাড়ীর কর্তব্য সকল সুসম্পন্ন হওয়াতে নির্মল ও পারিজাত নিশ্চিন্ত হ'ল।

এখন রায় বাড়ীতে বৌ-ভাতের আনন্দোৎসব ঘটা করে বৌ নিয়ে আসার জন্য মস্ত দল জুটলো, শাস্তা বরণ করে বৌ ঘরে তুললো। জয়তী ও শীলার উপর বড়ীঘর সাজানোর ভার পড়েছে। বাগানে ও ছাদে চীনে লণ্ঠন ঝুলছে। ফুল সাজানোর ঢং অতি মনোরম, উভয়েরই নিখুঁত দক্ষতা—এ ধরণের কাজে তাদের অদম্য উৎসাহ। ঘর জোড়া আল্পনা, প্রবেশদ্বারে, সিঁড়িতে, কোথাও শুধু কলকার বাহার, কোথাও নক্সা করা মাছ, অতিথিদের চোখ জুড়াল। এমন সৌখীন বিবাহবাসর কমই দেখা যায়—অপরূপ দীপান্বিতা সকলকে মুগ্ধ করলো।

অলোককে কোথাও দেখা গেল না, সে আসেনি বলেই শীলা অনুমান করল। তার মনে খোঁচা লাগছিল বার বার, এতবড় উৎসবের দিনে অলোক উপস্থিত হল না কেন? আত্মীয় বন্ধু সকলেই এক কথাই বলাবলি করতে লাগল, শীলার ভাল লাগল না।

সাড়ে সাতটায় অতিথি সমাগম শুরু হবার কথা—জয়তী তার একঘণ্টা আগে থেকেই সেজে গুজে তৈরি। ময়ূরকণ্ঠী রঙের বেনারসী সাড়ীখানা আলমারী থেকে বের করে আনলো, সোণালি জরির কল্কা তার সারা গায়ে—মানিয়ে ব্লাউজ পরলো। মার গহনার বাক্স থেকে

প্রাচীন কালের ভারী হার খানা তুলে নিয়ে পরলো। সোনার শঙ্খ জুড়ে জুড়ে হারখানা তৈরি। বালা জোড়া প্রায় এক ধরণের। খোঁপাটি অতি যত্নে বেঁধেছে, বেলের কুঁড়ির মালা দিয়ে খোঁপা প্রায় ঢেকে দিল। শান্তা বড় খুশী—জয়তীর কাছে গিয়ে বলল—

'আজ সোনার দুলজোড়া পরে নাও, বেশ লাগবে সব মিলে—নইলে কানটা খালি দেখাচ্ছে।'

'নিশ্চয় পরবো মা'—জয়তী সহজেই রাজী হয়ে গেল। সে প্রাণভরে সাজবে ঠিক করেছে,—শুধু তাই নয়, শীলার ঘরে গিয়ে তাকেও নাচিয়ে দিল। একটি হাল্কা জাম রঙের বেনারসী দেখিয়ে শীলা হাসল—

'এই দেখো, এইটা পরবো ভাবছি'—সাড়ীর গায়ে সাদা জরির ছোট ছোট বুটি ছড়ানো দেখে জয়তী উল্লসিত হ'ল। কানে গলায় হাতে মুক্তোর গহনা পরে শীলাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনের ভার সে নামাতে চায়, নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতেই যেন তার ভাল লাগে।

দেবাশিস মেয়ে ও বৌকে দেখে রীতিমত উৎফুল্ল, সোমেনের বৌভাতে সকলে একত্র হয়েছে বলে দেবাশিস বড় খুশী। জয়তী যদিও বলেছিল সে ভিড় পছন্দ করে না তবু আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সে সহজেই মেতে গিয়েছিল। বহুকাল পর নিজের বাড়ীতে এসে শ্যামাকে খুঁজে বেড়ায়। সে এবার বৃদ্ধাদের দলে, অল্পই দেখা যায় তাকে।

মালা যেন লক্ষ্মী প্রতিমা, নিখুঁত শ্রী, কোমলতায় পরিপূর্ণ। চাঁপাফুল রঙের সাড়ীখানা মসৃণ গায়ের ওপর বড়ই মানিয়েছে। তার মুখখানা এক এক-সময় কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল, নতুন আবেষ্টনে সে দিশাহারা। একদিকে বিচ্ছেদের ব্যথা, অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজনের আহ্বানবাণী, মিশ্রিত মনোভাব তার। কতশত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ, কত সমালোচনা। কেউ তার গহনা দেখছে, কেউ তার কাপড় দেখছে, কেউ বা তার মুখের গড়ন বর্ণনা করছে। মালা শান্ত হয়ে বসেছিল, লোক আনাগোনা, হাসি কৌতুক, সামাজিক আচার বিচার সবই নীরবে দেখে যাচ্ছে। এতবড় অনুষ্ঠান আর পূর্বে সে কখনও দেখেনি। মানুষের কৌতূহল-পূর্ণ দৃষ্টি, কানাকানি, প্রসাধনের বাহুল্য, সবই নজরে পড়লো—যেন স্বপ্ন-মেলা বলে মনে হচ্ছিল।

জয়তী ক্ষিপ্র গতিতে চলছে, এদিক ওদিক ঘুরে দেখছে, চোখে তার অসাধারণ দীপ্তি, কার জন্য সে যেন প্রতীক্ষা করছিল। মুকুট গুপ্ত জয়তীর শিল্পগুরু। জয়তী তাকে ছোটদার বিয়েতে তাই নিমন্ত্রণ করেছিল। মোটরখানা দূর থেকে আসছে দেখতে পেলো। মুকুট ঐ গাড়ীতেই ছিল, গাড়ী থামতে জয়তী তাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলো। পরিবারের আর কারুর সঙ্গে মুকুট গুপ্তর পরিচয় পূর্বে হয় নি। জয়তী আগ্রহভরে মা ও বাবার সঙ্গে মুকুটের আলাপ করিয়ে দিল। গুরুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে জয়তী একটুও দ্বিধা করল না। মা ও বাবাকে মুকুটের পাশে বসিয়ে সে বলল—

'উনি আমাদের সময় প্যারিসে ছিলেন। বিদেশে ওঁর ছবিগুলির খুব আদর, বড় পোর্ট্রেটগুলির (potrait) জন্য বিশেষ সম্মানিত হয়েছেন। লক্ষ্ণৌ-এর নবাব পরিবারের সঙ্গে উত্তর প্রদেশের তালুকদারদের সঙ্গে ওঁর বহুকালের পরিচয়, তা ছাড়া ছিলেনও ওদিকে বহুদিন। তারপর চীন, জাপান, আমেরিকায়, ইউরোপে কাজ করেছেন। এদিকে ইন্দোনেশীয়ায়, শান্তিনিকেতনে কোথাও বাদ দেন নি। আমাদের দলের মধ্যে তাই উনি গুরুর স্থান অধিকার করেন সহজেই। এত অভিজ্ঞতা, এত দক্ষতা কমই দেখা যায়। কিন্তু উনি মদ্যপান ছাড়তে নারাজ।' কথাটি বলেই জয়তী হাসলো। এক নিঃশ্বাসে এত প্রশংসা করে গেল, তারপর মদ্যপানের খবরটি দেওয়াতে মুকুট একটু চমকে উঠলো। দেবাশিস স্বাভাবিক ভাবে বলল—

'স্বনামধন্য গায়ক, বাদক বা শিল্পীদের সাধারণত দু'টি জিনিস প্রিয় হয়, তাঁরা সুন্দরী রমণীদের উপাসক হন আর মদ্যপান করতে ভালোবাসেন। গুপ্ত সাহেবের যদি এই দুটি প্রিয় হয় তাহলে উনি নিশ্চ

বিশেষ গুণী।' মুকুট দেবাশিসের রসিকতা শুনে বেশ মন খুলে হাসল—

অন্য সকলেও হেসে উঠলো। জয়তী মুকুটের সঙ্গে একটু রগড় করতেই চেয়েছিল, মুকুট তাই রাগ করতে পারলো না। তার কারুকর্মের বিষয় দেবাশিসের বিশেষ কৌতূহল দেখতে পেয়ে মুকুট মনে মনে বেশ সন্তুষ্ট হল—তার উদার স্বভাবের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'লও সে।

'আপনি কি এখন কলকাতায় থাকবেন?' দেবাশিস প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, আপাতত এখানেই আছি। কিন্তু গত এক বছর দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরেছি। ভবিষ্যতে হয়তো দিল্লীর দিকে যাব—সেখানে আমার ছবিগুলির আদর আছে যা বুঝলাম। একটি বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ওগুলির ভার নিতে চায়—তাছাড়া নির্দিষ্ট ফরমাসও অনেক পেয়েছি—শীঘ্র যাবো হয়তো।' শান্তা ও দেবাশিসের আন্তরিকতা মুকুটকে স্পর্শ করলো। দেবাশিস সরলভাবেই তাকে বলল—

'ছোটবেলা থেকে জয়তীর ছবি আঁকায় বিশেষ ঝোঁক, ঐ নিয়ে সে পাগল—আপনার মত গুরু পাওয়া তার সৌভাগ্য।'

বৌভাতের খাওয়া দাওয়া অনেকক্ষণ চলল—ভিড় যথেষ্ট ছিল তবু আলাদা করে এক কোণে মুকুটকে যত্ন করে খাওয়ানো হ'ল। সে দুটি পান একত্র করে মুখে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—বাড়ী ফেরার জন্য সে ব্যস্ত। বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা অভ্যাস নেই তার, নিজের কাজে সে রীতিমত মশগুল থাকে—কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে বিদায় নিল। দেবাশিস ও সোমেন অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, শান্তা মালার কাছে বসে ছিল। জয়তী মুকুটকে গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়ে কি মনে হল তার নিজেও গাড়ীতে উঠে বসল। গাড়ীতে দুজনে নানান কাজের কথা বলছিল, তখন রাত প্রায় এগারোটা। ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে বলল।

মুকুট গুপ্তর বয়স চল্লিশ বা দু'এক বছর বেশী হবে। মানুষটি যদিও রীতিমত লম্বা তবু শরীরের গড়ন এত ভারী যে তার দেহের দৈর্ঘ্যতা লক্ষ্যই হয় না। গাড়ী মুকুটের বাড়ীর গেটে আসতেই দুজনেই নামল—জয়তী কয়েক মিনিট বসতে রাজী হ'ল। ঘরে গিয়ে বসে মুকুট বলল—'ঐ বৃদ্ধাকে দেখছ তো? উনি এখানে কিছুদিন আশ্রয় নিয়েছেন। আমার এক বন্ধুর দিদিমা—আগামী সপ্তাহে গ্রামে ফিরবেন। এ রকম অনেকে আসেন।

'জয়তী' তোমার মা ও বাবাকে বলেছ তো আমাদের কথা? তুমি বোঝ নিশ্চয় আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই?' হঠাৎ এ বিষয়ে কথা হবে জয়তী ভাবে নি, সে মুকুটের দিকে অবাক্ হয়ে তাকাতে মুকুট কাছে একটি চেয়ার নিয়ে এসে বসলো—পিঠে একটু হাত দিয়ে স্নেহভরে বলল—

'এত অবাক্ হয়ে দেখছো কি? এতদিন ধরে কি কিছুই বুঝতে পারনি? তোমার প্রতি আমার টান যে আর সকলের চেয়ে বেশী তাও কি বুঝতে পার নি? তুমি বয়সে অনেক ছোট হ'তে পার কিন্তু তাতে কী যায় আসে? আমাদের দুজনের জীবনে শিল্পই প্রধান বস্তু, পরস্পরের হৃদয়ের যোগ হবে এরই মধ্যে দিয়ে —এক চিন্তাধারা একই ধ্যান তপস্যা: মনের মিল এতেই হবে ক্রমশঃ। তোমার দ্বিধা কিসের?"

জয়তীর মুখ দিয়ে একটিও কথা বেরুচ্ছে না মনে হল—

'কিন্তু কিন্তু...আপনাকে তো শুধু বন্ধু বলে ভাবিনি, শিক্ষককে ছাত্রী যে চোখে দেখে সেই ভাবেই তো দেখেছি...'

'আর অবিনাশকে বরের বেশে চেয়েছ? বল না কি বলছিলে?' মুকুট কিঞ্চিৎ হাসল। তারপর বেশ জোরেই হেসে উঠল।

'কেন, অবিনাশ কেন? সে তো আমার বহুদিনের বন্ধু, একত্রে ছাত্র ছিলাম আপনারই কাছে। কখনও হয়তো একসঙ্গে এদিক্ ওদিক্ বেড়িয়েছি...' জয়তীর মুখ রাঙা হয়ে উঠলো, সে অপ্রত্যাশিতভাবে এ কথাগুলি শুনবে কল্পনাও করে নি। মুকুটের অন্যায় অভিযোগ।

'অবিনাশ আমার কাছে এসেছিল। তোমার পিছু পিছু সে আছেই, সর্বদা। দিল্লীতে কাজ নিয়েছে জান তো? সে ছেলেমানুষ। ও কি তোমার ভার নিতে পারে?'

এ সব কথা এ রকম সহজভাবে মুকুট কি করে বলতে পারে, জয়তী বুঝতেই পারলো না। অবিনাশ তার বন্ধু নিশ্চয় কিন্তু সে তো প্রেমের কথা কোনদিন তোলে নি, তার সঙ্গে কোন কথাই হয় নি এ বিষয়। মুকুটকে জয়তী শ্রদ্ধা করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু সে যে জয়তীকে বিয়ে করতে চাইবে এ কথা সে একটুও আন্দাজ করে নি। চিত্রকলার সমালোচনা, ছবি নিয়ে তর্কাতর্কি, অনেকবারই হয়েছে কিন্তু বিয়ের কথা সে তো ভাবে নি। মুকুটের অসাধারণ পটুত্ব ছিল শিল্পে, জয়তী তার সূক্ষ্ম কাজ দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বার বার। জয়তী ফিরে যাবে বলে উঠছিল, আবার কি ভেবে বসে পড়ল। চিন্তার স্রোত যেন পাহাড়ী পথ ধরে চলেছে—উঠছে, নামছে, পড়ছে। বুকের মধ্যে দ্বিধা সংশয়, আশা, দ্বন্দ্ব সহস্রভাবের সৃষ্টি করছে—ঘূর্ণিপাক খেতে খেতে স্রোত যেন হঠাৎ থেমে গেল। অনিশ্চিতের গগন পটে অরুণ রেখার মত আশার আলোক দেখা দিল, এই বিশিষ্ট আলোরেখা স্পষ্ট করে তার চোখের সামনে ভবিষ্যতের ছবি এঁকে দিল। অন্তরের দৃষ্টি জয়তীকে সঠিক পথ দেখিয়ে নিশ্চিন্ত করল। জয়তী মনে মনে ভাবতে লাগল—

'মুকুটই আমার জীবনের সাথী হতে পারে—আমার জীবনের প্রেরণা—' সে মুকুটের দিকে মৃদু হেসে তাকালো—

'মাকে আর বাবাকে বলবো সব, কিন্তু মদ্যপানের বদ্ অভ্যাসটি আপনাকে ছাড়তেই হবে—শিল্পীর জীবনে নইলে সাধনায় বাধা পড়ে। আমার ভাল লাগে না।'

'আমায় তুমি আরও দু'একবার উপহাস করে এই কথাই বলেছ, কোনদিন তো দুর্ব্যবহার করি নি। তোমার কোন বন্ধুই তো মদ্যপান করে না। কেবল আমায় বল কেন? অবিনাশ ও তার বন্ধুরা যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করে কিন্তু তুমি আমাকেই এ বিষয় বলেছ। ধারণা তোমার ভুল, মিথ্যা দোষ দিও না।'

মুকুটের এই অভিযোগের পর জয়তী আর কিছু বলতে পারল না। গাড়ীতে উঠতেই ড্রাইভার গাড়ীতে স্টার্ট দিল। গভীর রাত্রি মহানগরের রাস্তায় জনমানব নেই, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে ক্ষুধার্তের করুণ ক্রন্দন বা দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। বাস্তুহারা উলঙ্গ উন্মাদ গাড়ীর সামনে এসে পড়ছে। জয়তী এতক্ষণ ভয়শূন্য মনে নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিল, ঘুমন্ত সহরের বীভৎস দৃশ্য সম্বন্ধে তার কিছুই ধারণা ছিল না। ড্রাইভারকে অনুরোধ করল—'শীঘ্র বাড়ী পৌঁছে দাও যোগেন।' গাড়ী ছুটতে লাগল।

সহরের থেকে বেশ ৭।৮ মাইল পথ। প্রশস্ত মাঠের মাঝখানে ছোট একটি বাড়ীতে মুকুট থাকতো। ছবি, রঙ তুলি কাগজ ক্যানভাস চারিদিকে ছড়ানো কোথাও বিশেষ পারিপাট্য নেই। সূক্ষ্ম কাজের অপূর্ব চিত্রগুলি এদিক্ ওদিক্ পড়ে আছে। মুকুটের মুখখানা গোলাকার, স্থূল গড়ন, শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ। ঘন চুলগুলি উচ্ছৃঙ্খল, নাক অতি খাটো। জোড়া ভুরু-দুটি ঘন ও টানা। চোখদুটি অতি স্নিগ্ধ—ভাবুকের মত চাহনি। চেহারায় শ্রী বিশেষ ছিল না বটে তবে স্বভাবে দৃঢ়তার আভাস পাওয়া যেতো। সে অল্পতেই ঘেমে ওঠে তাই রুমাল সর্বদাই দু পকেটেই থাকে। কখনও সারারাত কাজ করে সে সারাদিন পড়ে ঘুমোয়। আহার নিদ্রা সম্বন্ধে সে উদাসীন ছিল কিন্তু নিয়মিত সুরাপান সে রীতিমত অভ্যাস করে ফেলেছে। পোষা বিড়াল, ময়না, টিয়া, পায়রা তাকে ঘিরে থাকত। কেষ্ট ছিল মুকুটের প্রিয় বালক দূত, অতি স্নেহের পাত্র। মাতৃপিতৃহীন শিশুকে নিকটের কোন গ্রাম থেকে মুকুট নিয়ে এসেছিল, এখন সে বাড়ীর কাজ সব একাই চালায়। প্রতিবেশীদের কাছে কেষ্ট জানিয়ে এল, জয়তী হয়তো শীঘ্রই তার মনিবের মনিব হবে। পাড়ার লোক তো প্রায় কেষ্টকে মারতে যায়। মুকুট তাদের এত

স্নেহ করতো, অভিভাবকের মত দেখাশোনা করতো, তাদের একমাত্র কামনা মুকুট যেন এভাবেই বাকি জীবন কাটিয়ে যায়। সপ্তাহে দু-চারবার শিশুদের ডেকে মুকুট দুধ, মুড়ি, আম, কাপড়-চোপড় দিতো, আর বাগানের কলা না দিলেও তারা পেড়ে নিয়ে যেতো। নিকট বস্তির গরীব দুঃখীরা বড়ই কৃতজ্ঞ ছিল তাই। মুকুট যখন অতি মাত্রায় মদ খেয়ে পড়ে থাকতো, কেষ্ট ভাবতো পেটের ব্যথাই তার কর্তার সবচেয়ে বড় শত্রু। পাড়ার লোকও তাই বিশ্বাস করতো। গ্রামের ও বস্তির ছেলেবুড়োদের জন্য মুকুট অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে নিতো। আত্মীয়বন্ধু বলে বিশেষ কারুর সঙ্গে তার আসা যাওয়া ছিল না। মাঠের পর মাঠ, তালগাছ, কলাগাছ আর কত জংলি ফুল চারিধারে। কোথাও কৃষকেরা লতা লাগিয়েছে, ক্ষেত করেছে, কোথাও প্রচুর কচুর শাক। সন্ধ্যা নামলে বড় গাছগুলির ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো উঁকি দেয়। এই মন ভোলানো পূর্ণ চাঁদের মায়ায় কেষ্টর মনে কবিত্ব জেগে ওঠে—একটা বাঁশী কিনে নিয়ে এসে একা বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেসুরো সুর বাজিয়ে যায় কিন্তু কারুরই সে সুর মন্দ লাগে না। ঝিঁঝিঁ পোকা এক সুরে ডেকে চলেছে—পুকুরে মাছ লাফিয়ে উঠল—সহরের দূর প্রান্তে গ্রাম্য আবহাওয়া অতি সুমধুর ও নির্মল এই আবহাওয়ার সঙ্গে কেষ্টর বাঁশীও বেশ মানিয়ে যায়।

* * *

বিয়ের পর সোমেন মালাকে নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাবে। বেশ কিছুদিনের জন্য ঘুরবে আর, কাজও করবে। অলোক সোমেনের বিয়েতে যে উপস্থিত ছিল না সকলেই তা লক্ষ্য করল—দেবাশিস ও শান্তা বিশেষ ক্ষুন্ন হ'ল। পরে জানা গেল অলোক বিদেশ গেছে, অফিস থেকেই তাকে পাঠিয়েছিল তারপর সে আর দেশে ফেরেনি।

জয়তী দিল্লীতে কাজ নিয়েছে—সোমেনের বিয়ের জন্যই সে কলকাতায় ছিল। সে দিল্লীর দিকে রওনা দিতে প্রস্তুত। দেবাশিস ও শান্তা বাকি বছরটা বাইরে বাইরে ঘুরবে বলে ঠিক করল। অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় সকলেই এক এক করে বাড়ী ছাড়লো—হেমেন যেন একটু নিশ্চিন্ত। সে এখন পুরোদমে কাজ করতে পারবে—আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই। শীলা যে বাড়ীতে আছে সে কথা তার মনে রাখবার প্রয়োজন নেই—সে এখন আর কিছুই বলে না—হেমেন বড়ই কৃতজ্ঞ।

রাতের ট্রেনে জয়তী দিল্লী রওনা দিল। সারা পথ সে মুকুটের কথাই ভাবছিল—মা ও বাবাকে তার বলতে দ্বিধা হচ্ছিল, কি জানি তাঁদের মুকুটকে কেমন লেগেছে। কিন্তু মুকুটকে বিয়ে করার বিরুদ্ধে সে কিছুই খুঁজে পেল না—বরং মনে হ'ল এই তার মনের মানুষ যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে।

দিল্লী স্টেশনে ট্রেন পৌঁছোতে জয়তী তাকিয়ে দেখল সামনেই পরিচিত মুখ। অবিনাশ তাকে দেখে হাসল, ক্রমশ এগিয়ে এল। ধীরে ধীরে সে কথা বলে, যেন কোন তাড়া নেই কিছুতেই, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে জয়তীকে তার সঙ্গে এগোতে বলল। জয়তী বলল,—'আমি আসছি জানলে কি করে?'

'মুকুটদা খবর দিয়েছে।' সে উত্তর দিল।

সহরের মাঝখানে ব্যবসাদারদের পাড়ায় অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী আছে তারই একটি ছোট ফ্ল্যাটে জয়তী গিয়ে উঠল। অফিস থেকে এইখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ঘরগুলিতে বিশেষ আলো বাতাস আসে না—একটু অন্ধকার। তবু বাড়ীখানা তার কর্মস্থলের কাছেই। অবিনাশের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই নিজের flat-এ জয়তী গুছিয়ে বসল। কয়েকটি রঙিন সতরঞ্চি কিনে এনে এদিক্ ওদিক্ পেতে দিলো। চেয়ারগুলির কোণে রঙ বেরঙের তাকিয়া বসিয়ে দিল, পর্দা লাগালো হাল্কা এক-রঙা। প্রত্যেক ঘরের দেয়ালগুলিই বেশ চওড়া হওয়াতে বড় বড় ছবি টাঙাতে সুবিধা হ'ল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটি বিশাল তৈল চিত্র দেখা যায়। রাজস্থানের গ্রাম্য মেয়ে ঘুরে ঘুরে বাদাম বিক্রী করছে—পরনে জড়ানো ঘাগরা, অতি ছোট কাঁচলী গায়ে—তারই ফাঁক দিয়ে পরিপূর্ণ স্তন দু'টি দেখা

যাচ্ছে—নিখুঁত নারীমূর্তি। গাঢ় রঙের ভারী ঘাঘরার ওপর 'সাঙ্গেনে'র ছাপ দেওয়া। পায়ে তার শক্ত চামড়ার নাগরা জুতো—খানিক যেন ক্ষয় হয়েছে শুষ্ক সুদীর্ঘ বালুময় পথ দিয়ে যায়। ক্ষীণ কটিদেশ দুলিয়ে দুলিয়ে চলে, সপ্রতিভ ও সুদর্শনা। বাদাম বিক্রী করে, নানান সুরে ডেকে ডেকে-চেঁচিয়ে কান ফাটিয়ে দেয় যদি বাদাম বিক্রী না হয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তন্বী—যুবতীর মতন গঠন কিন্তু পাঁচটি সন্তানের জননী।

অবিনাশ ছবিখানা প্রায়ই দেখে আর চেয়ে থাকে। সে পরিহাস করে বলল—'কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারি না একে দেখে'—

জয়তী বলল—'তাও তো 'শুধু পটে লিখা'—অনেক বয়স পর্যন্ত কিশোরীর মত থাকে—এমনি একটি মেয়ে যদি সত্যি তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় কি করবে বলো তো অবিনাশ?'

'যেদিন সত্যিই একজন এ রকম মেয়ে সামনে দেখতে পাবো সেদিন বলবো মনের ভাবটা।' দুষ্টুমিতে ভরা মুখ অবিনাশের। 'বাদাম বাদাম' বলে চ্যাঁচালে সুর ধরব 'ঐ ভুবনমনোমোহিনী—মা...' দুজনে হাসতে লাগল। জয়তীকে দেখে অবিনাশ খুসী কিন্তু তার বন্ধুর অভাব নেই।

জয়তী নিজের রান্না সেরে নেয় খুব সকালেই, চা খেয়ে কাজে চলে যায়। দুটি ডিজাইন সেন্টারে তাকে অল্পক্ষণের জন্য যেতে হয়। একটি কাপড়ের মিলে অধিক সময় কাজ করে। জয়তীর দেহে মনে কাজের উৎসাহ লেগেছে, সে পরিশ্রম করতে কোনদিন ভয় পায় নি। তার ছবি আঁকার দক্ষতার বিষয়ও প্রশংসা শোনা গেল। বেশ কয়েকটি অয়েল পেন্টিং-এর অর্ডার পেতে লাগলো বিভিন্ন কাজের মধ্যে তার দিন কাটে। মুকুট গুপ্তর সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক আছে এমন একটি গুজব সকলেই শুনেছে। মুকুটের কয়েকটি ভাল ছবি তার কাছে থাকাতে সে দু একবার প্রদর্শনীতে সেগুলি দেখিয়েছে। ছবিগুলির সুখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে মুকুটের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। দিল্লীতে পৌঁছবার পূর্বেই মুকুটের ছবির কথা বিশেষভাবে আলোচনা হতে লাগল। জয়তী মুকুটকে জানতে দিলো যে তার এই বিয়েতে মত আছে, এবং দিল্লীতেই সংসার পেতে বসলে সে সুখী হবে—তার ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা এইভাবেই পূর্ণ হওয়া সম্ভব।

মা বাবাকে জয়তী বিস্তৃতভাবে সব কথা জানাবে ভাবছে। কিন্তু সে বিয়ের ব্যাপারে আড়ম্বর কিছুই চায় না। সোমেনের বিয়েতে যে ধুমধাম হয়েছিল, জয়তী সে রকম ঘটা কিছুতেই হতে দেবে না, কলকাতায় গিয়ে পড়লে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সবই হয়তো মেনে নিতে হবে সেই আশঙ্কায় সে দিল্লীতেই থেকে যেতে চায়। মা বাবা ও দাদারা সকলে দিল্লীতে আসুক এই তার ইচ্ছা, কিন্তু মুকুটই জানিয়ে দিল সে চায় জয়তী কলকাতায় ফিরে আসে। সেখানেই বিয়ে হবে এবং দিল্লীর নতুন বাড়ীতে একত্রে যাবে। দিল্লীতে মুকুট প্রায় আড়াই বিঘা জমিতে একটি বাড়ী পছন্দ করে রেখেছিল, ঐ বাড়ীতেই নতুন সংসার পাতবে তার ইচ্ছা। জয়তীকে এই বাড়ীর সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে। বাগানটাও সুন্দর করে তৈরি করে নিতে হবে। জয়তীর চিঠি পেয়ে মুকুট নিশ্চিন্ত হ'ল এবং বাড়ীখানা কিনে ফেললো। দেবাশিস ও শান্তাকে মুকুট অনুরোধ জানালো জয়তীর বিয়ের পর তাঁরা এসে এই বাড়ীতে কদিন থাকলে সে বিশেষ সুখী হবে।

এদিকে দীর্ঘদিন সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে থেকে দেবাশিসের শরীরের ক্লান্তি দূর হ'ল। জয়তীর মনোভাব অনিশ্চিত, সে তার শিল্পকলার উন্নতির জন্যই উদ্বিগ্ন, সে কোন একটি শিল্পীকেই হয়ত বিয়ে করবে দেবাশিস অনুমান করেছিল কিন্তু কাকে যে হঠাৎ সে বরমাল্য পরাবে তা কেউ আন্দাজ করে নি। জয়তীর চিঠি পেয়ে দেবাশিস ও শান্তা রীতিমতো বিস্মিত হ'ল।

'মুকুটকে জয়তীর চেয়ে বয়সে অনেক বড় দেখায়'—দেবাশিস বলল।

'অবশেষে মুকুটকে তার পছন্দ হ'ল? শিল্পী হলেই হ'ল, তার স্বভাবের মধ্যে কী এমন দেখল সে?' শান্তা আর চুপ থাকতে পারলো না।

দেবাশিস তাতে উত্তর দিল 'জয়তীকে যদি জোর করতাম অলোককে বিয়ে করতে তাহলে সে বাড়ী ছেড়ে হয়তো চলেই যেতো, বোঝ না কেন শান্তা ?'

'বাড়ীতে কি আছে সে ? আমাদের সঙ্গে কতটুকুই বা সম্পর্ক রাখে বল তো ? সবই তো নিজের ইচ্ছায় করছে। নিজের সন্তানকেও ভালমন্দ কিছু যদি না বলতে পারি তাহলে পরের সঙ্গে আর প্রভেদ কি আছে বল ?' শান্তার দুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে গেল। অনেকদিনের জমাট, আজ ভেঙে পড়লো। চোখের সামনে জয়তীকে দেখছে তার নিজের ইচ্ছামত সে চলছে—অনেক আশা ছিল একটি মাত্র মেয়েকে নিজের আদর্শমত গড়ে তুলবে,—সবই যেন উল্টে গেল—শান্তা আজ বড় ভেঙ্গে পড়েছে। দেবাশিস শান্তার পাশে গিয়ে বসে বলল—

'মুকুটকে সে নিজেই পছন্দ করেছে। তার যাকে পছন্দ তাকেই তো সে বিয়ে করবে।'

'শিল্পকলার চিন্তাই সে করে, সব বিচার তার ওপরই নির্ভর করে, মুকুটকে তাই তার পছন্দ—কিন্তু সে কি জয়তীর স্বামী হবার উপযুক্ত ?'

শান্তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না মুকুটকেই জয়তী বিয়ে করবে এবং তাতেই তার সুখ হবে। দেবাশিস তাকে সাধ্যমত বোঝাবার চেষ্টা করল—

'জয়তী তো সাধারণ একটি মেয়ে নয়, তার নিজের ওপর বিশ্বাস আছে। যা বুঝতে পারছি—বিয়েও নিজের ইচ্ছামতই করবে। ভুল করলেও সে নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করবে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রায় অনেকেই তাই ভাবে। তারা কত দুঃখকষ্ট ডেকে আনে, তবু অন্যের পরামর্শ নিতে চায় না। সম্পূর্ণ নিজেদের ওপরই নির্ভর করতে চায়। ভবিষ্যতের কতখানি আমরা অনুমান করতে পারি বল তো। কেন ব্যস্ত হচ্ছ শান্তা ?'

দেবাশিস কিছুতেই শান্তাকে অধীর হ'তে দিল না —নানাভাবে বুঝিয়ে তার মন শান্ত করে কাছে বসাল। শান্তা আবার স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে লাগল। দিনান্তের রাঙা আলো বালুর চরের ওপর মরীচিকার মতো ঝিকমিক করছিল, ক্রমশঃ সোনালি রূপালি আভা ম্লান হতে লাগল,ক্লান্ত সূর্য একটি বিশাল গোলাকার লাল মূর্তি ধারণ করলো। তীরের ওপর পলাতক ঢেউগুলি তাল ফেলে ফেলে আসছে আর যাচ্ছে—দেবাশিস এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে। এত প্রশান্ত মুখশ্রী তার, শান্তা যেন সহ্য করতে পারছিল না, কিভাবে সে এমন অটল থাকতে পারল শান্তা তাই ভাবছিল। জয়তীর বিয়ের জন্য শান্তা কলকাতায় যেতে উৎসুক নয়, তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না দেবাশিস তাই ভাবছিল। শান্তা প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ল—যাওয়া সম্ভব হল না।

জয়তী তিনদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় গেল। সামান্য ঘটা করে মুকুট ও জয়তীর বিয়ে হ'ল। শীলা ও হেমেন কয়েকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ডেকেছিল, তাদের পরিপাটি করে খাওয়ালো। মুকুটের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ও বন্ধুরা এসে পড়ায় মুকুটের বাড়ীতে নবদম্পতির অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হ'ল। মুকুট যাদের সঙ্গে কাজ করে এবং যারা তার প্রতি অনুরক্ত সেই রকম কয়েকটি বন্ধুদের প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রণ করে আনলো। পাকা ঠাকুর রান্না করাতে ভাল করে খাওয়ানো হ'ল। শান্তা এই অনুষ্ঠানে আসতে পারল না বলে তার চিঠি পড়ে সকলকে শোনানো হ'ল। শুভদিনে মা ও বাবার আশীর্বাদ পেয়ে জয়তী ও মুকুটের মনস্তুষ্টি হ'ল।

কয়েক দিনের মধ্যে মুকুট জয়তীকে নিয়ে দিল্লী এসে পৌঁছোলো। মুকুটের সুন্দর বাড়ীখানা দেখে জয়তী খুব খুশী। যতদূর দৃষ্টি যায় চোখদুটি মেলে দিল—চারিদিকের সবুজ গাছপালা দেখে জয়তী বলল—

'পুরোনো দিল্লীর চারিদিক্ সবুজ ও স্নিগ্ধ—কত গাছপালা কত রাস্তা—এতদিন নিউ দিল্লীর ফ্ল্যাটে থেকে যেন বন্দিনীর মতো দিন কাটিয়েছি।'

'দিল্লী চিরদিনই সুন্দর। ইতিহাসে পড়বে—কতদিনের কথা কত প্রাচীন রাজধানী উঠেছে পড়েছে—ওদিকে পুরান কিল্লা এদিকে কুতুব, নিজামুদ্দিন—নতুন

সহর তো সেদিনের—না আছে বৈশিষ্ট্য, না আছে প্রাণ। সহরের যে চঞ্চল গতি তাও বিশেষ দেখি না—কেবল বিরাট অট্টালিকা, নিত্য নূতন তৈরি হচ্ছে, সৌখীন হাট বাজার—গরীব দেশের মানুষের জীবন-ধারার সঙ্গে এই রাজ্যের বিশেষ সামঞ্জস্য নেই। একটু রাত হতেই চারিদিক্ অন্ধকার—কেমন জানি শূন্য দেখায় কেনা বেচা বন্ধ হয় তাড়াতাড়ি।'

মুকুট তার মতামত বলে চলেছে, জয়তী তার সঙ্গে মত দিয়ে বলল—

'একটা বড় সহরে তো লোক চলাচলের আওয়াজও শোনা যায়, এখানে সন্ধ্যা বেলায় জনরবও শুনি না—শহরের আনন্দ কোলাহলও দেখি না—তবে কাজের পক্ষে এই চুপচাপ জায়গাই তো ভাল।'

মুকুট তার অভিজ্ঞতার কথা বলল—'জান তো কলকাতায় গিয়ে যখন বসলাম—প্রথমে সহরেই ছিলাম কিন্তু মন স্থির করে কাজ করতে পারছিলাম না। বহুদূর চলে গেলাম—ঐ প্রান্তে যেখানে প্রায় জনমানব নেই। কেবল গ্রাম্য শিশু আর সরল কৃষকের দল। সুদীর্ঘ পথ যেতে যেতে বাংলা দেশের শ্যামলতার স্পর্শ পেতাম। ওখানে বসে যত ছবি এঁকেছি এমন অনেকদিন হয়নি। এ জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।'

মুকুট ও জয়তী একত্রে একখানা চিঠি লিখে দেবাশিস ও শান্তাকে নিমন্ত্রণ করলো। জয়তীর অভিমান ছিল মনে মনে মা ও বাবা বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু সে এ বিষয় কোন উল্লেখ করতে রাজি নয়।

বাড়ীর নাম 'দিগন্ত'—চারিদিকের সুশোভন শ্যামল আবেষ্টন জয়তীকে গভীরভাবে অভিভূত করলো। নিজে যে ফ্ল্যাটটায় ছিল সেটা অবিনাশকে দিয়ে দিল—জয়তীর অফিসের তরফ থেকে কোন আপত্তি করল না। অবিনাশ একটি সাজানো বাসস্থান পেয়ে বিশেষ খুশী হ'ল। কয়েকটি বন্ধুদের সঙ্গে থাকত, এখন স্বাধীন বসবাস হওয়ায় সে শান্তি পেল।

'দিগন্ত' সাজাতে অনেক সময় লাগলো। ততদিন কিছু মালপত্র অবিনাশের কাছে রেখে দিতে জয়তী দ্বিধা করলো না—বরং নিশ্চিন্তই হ'ল। অতখানি জমি বাগানে পরিণত করা একটি মালীর কাজ নয়—তাই বেশ কয়েকজনকে নিযুক্ত করা হ'ল। ঘাস ছাঁটাই করানো, বেড়ার ওপর লতার গাছ লাগানো, ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করানো, নিত্য নূতন সমস্যা জয়তীকে উদব্যস্ত করে তুলল কিন্তু মনে তার নবীন উৎসাহ। 'দিগন্ত' হবে মুকুট ও তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র—সযত্নে বাড়ীটি সাজাতে আরম্ভ করলো।

ধূসর রঙের বাড়ীতে দরজা ও জানালাগুলি হাল্কা নীল রং করানো হল। প্রবেশদ্বারটি রীতিমতো জমকালো। পেতলের জানোয়ার দু'চারখানা, জালির ওপর লাগানো পেতলের ময়ূর, হাতী, উট, রাজস্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ঘরে ঢুকতেই একটি বাউলের বিরাট চিত্র চোখে পড়ে। হাতে একতারা—মুখে ঘন দাড়ি আলখাল্লা পরা যুবক গান গেয়ে চলেছে—যেন চোখের সম্মুখেই দাঁড়িয়ে গাইছে। ছবিখানায় মানুষটিকে সজীব করে তুলেছে। মুকুট বোলপুরে যখন ছিল, এই বাউল নিয়ত তাকে গান শুনিয়েছে, তার গান রেকর্ডে তুলে নিয়ে এসেছে আর ঘরে বসে শুনেছে। জীবন্ত মানুষটি মুকুটের স্মৃতিরাজ্যে সর্বদাই গীতসুধা বর্ষণ করছে। চির অজানার সঙ্গে বাউলের যোগাযোগ।

দীর্ঘ দ্বারের দু'পাশে ফিকে গোলাপ রঙের পর্দা ঝুলছে। ছাই রঙের দেয়ালের সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে। ঘরজোড়া কার্পেটখানা দেয়ালেরই রঙ। কোণায় কোণায় পেতলের দাঁড়করানো দীপালোক—শেড্গুলি অতি মনোরম, তসরের ওপর বাটিকের অপরূপ কাজ তাতে। কোথাও হাতের সেলাই দিয়ে মস্ত জানোয়ার নক্সা করা—আলো জ্বলে উঠলে ঘরখানা যেন হেসে ওঠে। মুকুট শৈশব থেকে মাতৃহারা।—তার বিগত জননীর মস্ত ফটো থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি বিরাট ছবি এঁকেছিল সে, গৃহের কোণ জুড়ে ছবিখানা

টাঙ্গানো হল। বারান্দায় একটি চিত্রে কেষ্টর সরল মুখখানা দেখা যাচ্ছে। কৌতূহলপূর্ণ চাউনি, কম্পমান অধর দুটি দেখে গ্রাম্য ছেলের বাস্তব স্বভাবটি সহজেই অনুমান করা যায়। কেষ্ট মুকুটের অতি'স্নেহের পাত্র, প্রকৃত পোষ্যপুত্র, তার দুরন্তপনা সে অম্লানবদনে মেনে নিয়েছে। জয়তী তার নিজের আঁকা ছবি এখনই 'দিগন্তে' টাঙ্গালো না, আপাতত শুধু মুকুটের আঁকা ছবি দিয়েই বাড়ী সাজানো হ'ল।

জয়তীকে 'দিগন্তে'র সমস্ত দায়িত্ব মুকুট নিজে হাতেই তুলে দিয়েছিল—এবং চেয়েছিল চিত্রজগতে জয়তীও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মুকুট বিখ্যাত চিত্রকর—তার দক্ষতা অসামান্য, জয়তীর ছবির সঙ্গে মুকুটের ছবির তুলনা করা অবিচার। জয়তী এখনও ছাত্রী আর মুকুট অভিজ্ঞ শিক্ষক। কিন্তু মুকুট জয়তীকে শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য বিশেষ উৎসুক। এতখানি প্রেরণা জয়তী আর কারুর কাছে পায় নি।

অল্প দিনের মধ্যে মুকুট মনস্থ করল জয়তীর ছবিগুলি নিয়ে সে প্রদর্শনীর আয়োজন করবে—'দিগন্তে' বহুলোক নিমন্ত্রিত হবে। জয়তীর কল্পনার অতীত এই প্রস্তাব। সে মনে মনে উল্লসিত হ'ল তবু তা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করল। গত কয়েক বছর ধরে জয়তী ছবি আঁকার সাধনা যে করে নি তা নয় দীর্ঘদিন ধরে সময় নিয়ে ছবি এঁকেছে, কিন্তু সে ভাবতেও পারে নি মুকুট তার এত মূল্য দেবে।

বিখ্যাত চিত্রকর বন্ধুর অভাব নেই দিল্লীতে। একটি তালিকা লিখে নিয়ে মুকুট নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠালো। তিন সপ্তাহের মধ্যে সেই সেই বিশেষ দিন এসে পড়ল। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, কলকাতা থেকে কয়েকটি পুরাতন বন্ধু 'দিগন্তে'ই এসে উঠলো। জয়তীর আন্তরিকতায় সকলেই মুগ্ধ। সে বাইরের আড়ম্বর বিশেষ পছন্দ করতো না। মুকুটও জাঁকজমকের চেয়ে স্বচ্ছতারই বেশী মূল্য দিত। তিনদিন ধরে বিরাম বিশ্রাম নেই, জয়তীর। এতো লোক আসবে আশা করেনি, - প্রদর্শনীতে নিমন্ত্রিত প্রায় সকলেই এলো এবং বেশ কয়েকখানা ছবি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রী হয়ে গেল। জয়তীর এতদিনের আকাঙ্ক্ষা বুঝি পূর্ণ হ'ল—তার এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হ'ল। তিনদিন ধরে যেন 'দিগন্তে' উৎসব চলছিল।

'ভাবিনি এতো লোক আসবে—এতটা যে উৎসাহ তাদের তা কল্পনাও করিনি—' জয়তীর আবেগপূর্ণ কথাগুলি শুনে মুকুট গর্বিত ভাবে হাসলো ও উৎফুল্ল হয়ে বলল—

'আমি জানতাম এরা সকলেই আসবে, যাঁরা পুরোনো বন্ধু ও আমার হিতাকাঙ্খী তাঁরা আমায় ভুলতে পারেন না—তোমার সঙ্গেও তাঁদের আজ যোগাযোগ হ'ল।'

জয়তী বিবাহের পূর্বেই তার পুরোনো চাকরি পরিত্যাগ করেছিল। মনে মনে আশঙ্কা ছিল হয়তো সে আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু আজ তার আর কোন সংশয় রইল না। সে যে স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে পারবে। শিল্পজগতে তার সম্মান কেউ কেড়ে নিতে পারবে না সে বুঝতে পারল। চিত্রকরের জীবনে সমস্যার অন্ত নেই—এ যেন অনাবিষ্কৃত গুহা, জয়তী অভয় চিত্তে তারই মধ্যে প্রবেশ করল। মুকুটেরই সাহায্যে তার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হবে সে বিষয় তার আর দ্বিধা রইলো না। একই চিন্তা নিয়ে তাদের জীবনের উদ্ভব —এক পথ, এক তপস্যা—এক সংগ্রাম। মনে পড়ল সোমেনের বিয়ের রাতে মুকুট এই কথাই বলেছিল।

ভোরের আলোর ফাঁকে ফাঁকে পাখীরা শিষ দিয়ে গেল। চারিদিকে নির্মল শান্তি বিরাজ করছে। জয়তী বাবাকে চিঠি লিখতে বসলো।

বাবা,

আমার এতদিনের স্বপ্ন সত্যি হ'ল, আমি এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি এই আমার বিশ্বাস। কোনদিন তুমি ভাবতে পারনি আমার ছবির এত মূল্য হবে। তোমায় শুভ সংবাদ দিই, প্রদর্শনীতে আর্থিক লাভও হ'ল। বলা বাহুল্য

ছবির সুখ্যাতি শুনে মনটা আনন্দে ভরে উঠছে। তোমরা আশীর্বাদ কর। আমার চেয়ে মুকুটেরই অধিক কৃতিত্ব, সুযোগ সেই দিতে পেরেছে আমায়। তার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা মুকুটের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত তাঁরা প্রায় সকলেই এসেছিলেন—প্রদর্শনীর সফলতার জন্য তাঁদের কাছে আমরা দু'জনেই কৃতজ্ঞ। মাকে নিয়ে তুমি শীঘ্র এখানে আসবে। মুকুট ও আমি তোমাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

চিঠি পড়ে দেবাশিস ও শান্তা উৎসাহিত হ'ল—'দিগন্তে'র বিস্তৃত বর্ণনা পড়ে, কন্যার সুপরিচালিত গৃহস্থালি দেখবার জন্য শান্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। মুকুটের প্রতি বিরুদ্ধভাব তার ক্রমশ দূর হতে লাগল। অবশেষে স্বামীর দিকে অনেকদিন পর হাসিভরা মুখে চাইল।

'এতদিনে জয়তী সুখী হয়েছে মনে হয়। বিবাহিত জীবন তার আনন্দের হয়েছে জেনে খানিক নিশ্চিন্ত লাগছে। তার জীবনের ধ্যান তপস্যা যা ছিল সে-সবের উন্নতি যে সে দেখতে পাচ্ছে, সেও তো সৌভাগ্য; আজ মনে হয় যেন ষোল কলা পূর্ণ হ'ল।'

দেবাশিসের মুখে উচ্ছ্বাসের ভাব কিছুই ছিল না—সে ধীর কণ্ঠে বলল—

'জীবনে যেন পরস্পরকে বুঝতে শেখে এই কামনা করি। এত ব্যস্ততার মধ্যে কর্ম-মুখর সংসারে সহজেই সকল মাধুর্য হারিয়ে যায়—শিল্পীদের জীবনে বাইরের ভিড়ই বেশী উৎপাত করে।'

শান্তা দেবাশিসের কথায় বিশেষ কান দিল না—দুজনেই স্থির করল দিল্লী রওনা দেবে।

ক্রমশঃ
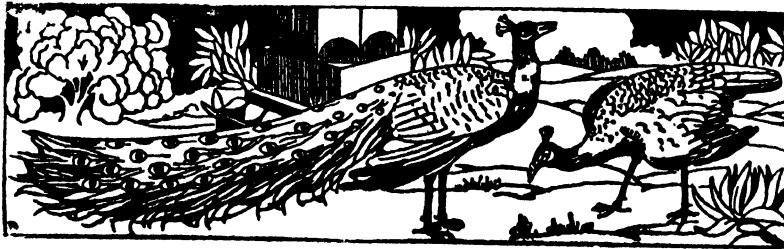
প্রেমের গানে অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

বহুদিন আগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন—"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।" আজ বহুদিন পরে বিংশ শতাব্দীর আঙিনায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে বঙ্গজননী প্রকৃত পক্ষে রত্নপ্রসূ। অনন্ত রত্নরাশির আভায় উদ্ভাসিত তাঁর উন্নত মুকুট। অতুলপ্রসাদ সেন সেই রত্নরাজির একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর প্রেম-সংগীতের ডালি আজও আমাদের কাছে আনন্দের পশরা। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীর উজ্জ্বল মণি ও বাংলা, ভারত তথা বিশ্বের চিত্ত-উদ্ভাসনী প্রতিভা। আজ রবীন্দ্রনাথের পাশে অতুলপ্রসাদকে বসিয়ে তুলনামূলকভাবে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার নয়, অতুলপ্রসাদ সেনের প্রেমসংগীতের রসমাধুর্যকে উপলব্ধি করার জন্যেই এ নিবেদন।

রবীন্দ্রনাথ এমনই এক যুগান্তকারী প্রতিভা যে সর্বত্রই তাঁর অসামান্য প্রভাব। রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত হয়েও উত্তর ভারতের একজন ব্যবহারজীবী জনচিত্তে ঢেউ তুলেছিলেন, তিনি অতুলপ্রসাদ। বয়সে অনুজ ও সাহিত্য কর্মে উত্তরসূরী হ'লেও অতুলপ্রসাদ রবিচ্ছায়ায় ম্লান নন বরং উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের এ অনন্য-সাধারণ প্রতিভাকে অভিনন্দিত করে তাঁর পরিশেষ গ্রন্থখানি অতুলপ্রসাদকেই উৎসর্গ করেছিলেন।

"......................আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হ'তে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণ ধারা দিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দ বেগে পশ্চিমে উত্তরে,
দিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।"

অতুলপ্রসাদের প্রেমবিষয়ক সংগীত বৈষ্ণব প্রভাবে মিশ্রিত। বিশেষতঃ বৈষ্ণবীয় সহজিয়া ভাবটি তাঁর প্রেম-সংগীতের অঙ্গে লাবণ্য বিস্তার করেছে। অতুলপ্রসাদ ভক্তবাব। প্রেমসংগীতে তিনি কখনই প্রিয়তমের (জীবনদেবতা) সমান হতে চাননি, তাঁর ঝোঁক বরাবরই চরণতলে। তাই তিনি গেয়েছেন—"তব চরণতলে সদা রাখিও মোরে...।" রবীন্দ্রসংগীতেও এই বৈষ্ণবীয় দাস্য ভাব ও আত্মনিবেদন একাকার হ'য়ে গেছে—"আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে।" আত্ম-নিবেদনের এই বিশেষ ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ এক হ'য়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা প্রেমাস্পদ কিন্তু তাঁর রূপ নিরাকার ব্রহ্ম। "যিনি অখণ্ড পরমানন্দ, নিত্য সুখের সুর ও ছন্দ" সেই প্রাণপ্রিয়কে তিনি বন্দনা করেছেন। অতুলপ্রসাদ এখানে অনেক স্পষ্ট, তিনি হরির অনন্ত রূপের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন "দীনবন্ধু করুণাসিন্ধুকে।" রবীন্দ্র অনুসারী না হলেও রবীন্দ্র ভাবনার সঙ্গে অতুলপ্রসাদের মিল আছে, বিশেষত পরিণামে। জগৎসমুদ্র পারাপারের জন্যে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বন্দনা করেছেন তাঁর প্রাণপ্রিয়কে—"তব পারে যাব কেমনে হরি।" রবীন্দ্রনাথ এখানে অস্পষ্ট বিশেষ করে ব্রহ্ম ভাবনার জন্যে হয়ত—"তুমি এপার ওপার কর কেগো ওগো খেয়ার নেয়ে।"

জগৎপিতাকে রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রণাম জানিয়েছেন, কখনও প্রেম নিবেদন করেছেন, কখনও মনে করেছেন, তিনি সেই অখণ্ডমণ্ডলাকারের অবিচ্ছিন্ন অংশ। প্রণামের গান—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে"র আকূতি প্রেমের ভঙ্গিমায় দুর্বার হ'য়ে উঠেছে কখনও—"ধরা দেব তোমায় আমি ধরব যে তাই বলে।" এই বিচিত্র প্রেমানুভূতিতেই তাঁর মনে হয়েছে মানব ও জগৎসংসারের সঙ্গে বিশ্বপিতার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে ও সে বন্ধন আনন্দের—"তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।"

অতুলপ্রসাদের আধ্যাত্মিক প্রেমসংগীতে প্রেমই মুখ্য ও সেই প্রেম যেন দয়িত ও দয়িতার। প্রেমের

দেবতাটি তাই পূজাঞ্জলি উৎসর্গের দেবতা ; আর কবিমন সেখানে ভক্তিময়ী রাধা। অতুলপ্রসাদের ভক্তির এতই প্রাবল্য যে কোথাও মিশেছে তন্ময়তা—

"মিছে দাও কাঁটার ব্যথা
সহিতে না পার তা,
...আমার আঁখি জল তোমায় করে গো চঞ্চল।"

সারাদিনের কর্মের ঝুলিটি দুই কবি নিবেদন করেছেন তাঁদের প্রাণপ্রিয়ের হাতে। রবীন্দ্রনাথ সাংসারিক ভালোমন্দের ভার দিয়েছেন জীবনদেবতার হাতে—"আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।" অতুলপ্রসাদ সেখানে ভক্তিভাবে নিশ্চিত, কিছুটা বা নিঃসংশয়—

"কলুষ আমার দীনতা আমার
তোমারে আঘাত করে শতবার,
আর কেহ যদি না পারে সহিতে তুমি তো বন্ধু সহিবে।"

রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনকে শুধু পরমের দিকে উৎসর্গ করেননি, সংগীতে বরং মানবদেহকে তুলনা করেছেন পূজোর থালারূপে। তাঁর "হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান-এর" আকুল বিস্ময় আরও পরিণত হয়েছে বেলাশেষের গানে—'না গো এই যে ধুলো আমার না এ' অতুলপ্রসাদ সেখানে দুঃখের অন্তরে দুঃখকেই দেখেছেন জীবনদেবতার দান হিসেবে, নিজের অচরিতার্থতার প্রশ্ন বড় নয়।

"সকলে আনিল মালা,
ভক্তি চন্দন থালা,
আমার এ শূন্য ডালা তুমি ভরিও।"

রবীন্দ্রনাথের আত্মনিবেদনের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ ভাব আছে তাই রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্বের গানগুলির মধ্যে রয়েছে তারই দ্যোতনা। কিন্তু অতুলপ্রসাদ সব জায়গাতেই নম্রতার প্রতীক। রবীন্দ্রসংগীত আনন্দ-বেদনার মুক্ত বেণী হলেও রবীন্দ্রসংগীতের মূল সুর আনন্দ অভিসারী। অতুলপ্রসাদের গান আনন্দঅভিসারী হ'লেও গানের কাঠামোয় রয়েছে কারুণ্যের প্রশ্নহীন প্রকাশ। যেমন "বঁধু ধর ধর" গানটির একটি স্থানে—"কাঁটার ঘায়ে কিংবা দুঃখরাতে" কথাগুলো যেরকম বিষাদ ভাবের সৃষ্টি করে, রবীন্দ্রনাথের 'উদাসী হাওয়ার পথে পথে" গানটির—

"যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে
আমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদন ভরে
যেন তোমায় স্মরণ করে"—

একই অনুভূতি জাগায় কী? এর কারণ নিহিত রয়েছে উভয় কবির জীবনধারার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক মর্যাদা কিংবা অতুলপ্রসাদের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রশ্ন জীবনকে অনুভব করার ব্যতিক্রমে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেন—"বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা।" অতুলপ্রসাদ সেখানে আরও স্পষ্ট—"দুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম, ক্ষমিও হে শিব।" রবীন্দ্রনাথ যেখানে সুখ-দুঃখের পেয়ালাটি ব্যথাভরে জীবনদেবতাকে সমর্পণ করেছেন অতুলপ্রসাদ সেখানে ক্ষমাপ্রার্থী। সাধারণ প্রেম-সংগীতের ক্ষেত্রে দুই কবিরই এক অনন্যসাধারণ লাবণ্য-ময়ী প্রতিভা স্ফুরিত হ'য়েছে। আজকের আধুনিক সংগীতের চটুলতার কথা আলোচনা না করেও বলা যায় উভয়ের প্রেমসংগীতে একটি উচ্চমানের আভাস পাওয়া যায় যা সাধারণ কবিদের রচিত প্রেমসংগীতে পাওয়া যায় না। উচ্চমান বলতে বোঝায় রসাভাস—কথা, ছন্দ ও সুরে যার প্রকাশ। অতুলপ্রসাদের "নিদ নাহি আঁখি পাতে, আমিও একাকী তুমিও একাকী, আজি এ বাদল রাতে"র আকুতি কি সাধারণ শ্রেণীর? এর সঙ্গে তুলনা চলে "জাগরণে যায় বিভাবরীর" আকুলতার।

"মনপথে এল বণহরিণী" চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও উত্তেজনা সৃষ্টি করেনা যেরকম উত্তেজনা থেকে অনেকদূরে রবীন্দ্রনাথের বহু পরিচিত প্রেমসংগীতের কলিটি—"মায়া বন বিহারিণী।"

পদাবলীসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দুই কবিরই ছিল। কাজেই তাঁদের প্রেমসংগীতে সেই বিশিষ্ট অনুরাগ বারবারই ধরা দিয়েছে।

"গগনে বাদল, নয়নে বাদল
জীবনে বাদল আছে ছাইয়া,
এসো হে আমার বাদলের বঁধু চাতকিনী আছে চাহিয়া।"

অতুলপ্রসাদের এই গানটির সঙ্গে অদ্ভুত ভাবসাদৃশ্য আছে রবীন্দ্রনাথের "মেঘের পরে মেঘ জমেছে" গানটির। দীর্ঘ বিরহের পর মিলনরাগিণী চমৎকার ফুটেছে "কেন এলে মোর ঘরে নাহি আগে বলিয়া"য়। রবীন্দ্রনাথের "যামিনী না যেতে জাগালে না"র কথা মনে পড়ে যায়। প্রিয় প্রাপ্তির আনন্দ দুই কবির অন্তরে একই ধরণের। রবীন্দ্রনাথ যেমন গেয়েছেন—"তুমি যেও না আমার বাদলের গান হয়নি সারা।" অতুলপ্রসাদের একটি জনপ্রিয় গানের শেষ কলিটি অনেকটা এরকমই—"আর ছেড়ে যেওনা বঁধু জন্মজন্মান্তর।" প্রিয় আহ্বানেও অফুরন্ত মিল।

"এসো আমার ঘরে এসো" থেকে "এসো হে এসো হে প্রাণে প্রাণ সখা"কী আলাদা ?

প্রকৃতির আকর্ষণও দুজনারই তীব্র। অতুলপ্রসাদ প্রকৃতি-প্রেমে মত্ত হ'য়ে বলেন—"যাব না ঘরে।" রবীন্দ্রনাথও বলেন—"আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট করে।" প্রকৃতি প্রেমের উদাহরণ এতই ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে যে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করতে গেলে শব ব্যবচ্ছেদ হ'য়ে যাবে। বরং দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিরহের গানে যেমন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে দুই কবিই ব্যক্ত করেছেন হৃদয়ের গোপন কথাটি।

"ডাকে কোয়েলা বারে বারে, হা মোর কান্ত কোথা তুমি হা রে...। অতুলপ্রসাদী এ গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার একটি গানের সুন্দর মিল পাওয়া যায়—

"সজল হাওয়ার বারে বারে সারা আকাশ ডাকে তারে।"

প্রেমের গানের তালিকায় দেশপ্রেমের গানও এসে পড়ে। দেশপ্রেমিক হিসেবে দুজন কবিই গান রচনা করেছেন আর দুজনের মধ্যেই রয়েছে মিল যদিও সংখ্যার দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের সংখ্যা অতুলপ্রসাদের দেশাত্মবোধক গানের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়। এর কারণ মূলতঃ দুটি। প্রথমতঃ ওপারের হাতছানিতে বড় তাড়াতাড়ি সাড়া দিয়েছেন অতুলপ্রসাদ। দ্বিতীয়তঃ তিনি ভক্তকবি। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের শুদ্ধ রূপটি আত্মাকে জাগানো—"আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে।" অতুলপ্রসাদেও তেমনি—"আপন কাজে অচল হলে চলবে না।" অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের গানেই আমরা যে চিত্র পাই তাতে দেশ দেশমাতৃকা ও দৈন্য থেকে তার আশু মুক্তি প্রয়োজনীয়। অতুলপ্রসাদ তাই গেয়েছেন—"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী।" রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—"কেন চেয়ে আছ গো মুখপানে...।" দেশপ্রেমিক দুজনের মতেই হবে ধর্মনিষ্ঠ ও সত্যসন্ধানী। অতুলপ্রসাদ যেখানে বলেন—"হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর," রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেন—"বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি।"

তাই রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদকে এক পর্যায়ে ফেলা না গেলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে আন্তরিকতায়, গভীরতায় ও সৌন্দর্য্যবোধে দুই কবির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। রবীন্দ্রপ্রতিভায় ম্লান না হ'য়েও অতুলপ্রসাদের এই রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। সূর্যের পাশে বুধের মতোই রবীন্দ্রনাথের পাশে অতুলপ্রসাদ বিস্ময়কর।

নীলাচলে

কানাইলাল দত্ত

সব মানুষের মধ্যেই একটা যাযাবর মন সর্বদাই কম-বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। তাই বোধকরি পরিচিত পরিবেশের বাইরে কোথায়ও যাবার অবকাশ ঘটলে মনটা আমাদের 'অকারণ পুলকে' চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার মত যাদের সম্বল সামান্য, সুযোগ সীমিত তাদের পক্ষে ইচ্ছে মত ভ্রমণ সম্ভবপর নয়। বহুদিন অপেক্ষা করার পর অনেক কষ্টে একদিন হয়তো বেরোবার বন্দোবস্ত করা যায়। ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করার একটা সুফল আছে। সুধীজনে বলে থাকেন ভ্রমণের মূলধন হলো আনন্দ। এই রকম বিলম্বিত ভ্রমণের বেলায় আনন্দটা কিঞ্চিৎ বেশিই হয়ে থাকে। তেমনি একটা বহু আকাঙ্ক্ষিত ভ্রমণের মনভরা আনন্দ নিয়ে পুরী থেকে ফিরেছি এই অক্টোবরের শেষে।

ইয়ারো দেখে ওয়ার্ডসোয়ার্থ হতাশ হয়েছিলেন। কল্পলোকে তিনি যে রূপ-সমৃদ্ধ ইয়ারো রচনা করেছিলেন আসল ইয়ারো তার ধারে কাছে পৌঁছোতে পারে নি। কিন্তু অনেক বছর ধরে জগন্নাথদেব সেবিত সমুদ্র বন্দিত যে পুরীধাম আমার কল্পরাজ্যে ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল বাস্তব পুরী তার চেয়েও মনোমুগ্ধকর বলে মনে হয়েছে। এই কারণেই পুরী ভ্রমণ নিয়ে দুটো কথা লিখতে সাহসী হয়েছি। পুরীর কথা কম-বেশি আমরা সকলেই জানি। এ সম্পর্কে বই-পত্রও বিস্তর প্রকাশিত হয়েছে। আমার এ লেখায় ইতিহাস-আশ্রিত কোন তথ্যাদি নিয়ে আমি আলোচনা করব না। পথ চলতে পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে নানা কথাবার্তা দেখাশুনা হয়েছে। সেই সব কথার মধ্যে নানা গালগল্প কিংবদন্তি সংস্কার ইত্যাদি মিলেছে। এর একটা নিজস্ব রূপ আছে। সেই রূপটিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। বিদগ্ধ পাঠক—যাঁরা তথ্য ও তত্ত্বের খোঁজ করেন অথবা ধ্রুব পরিণতি প্রত্যাশা করেন তাদের আমি এ রচনা না পড়তেই অনুরোধ করব।

পুরীর কথা। সুতরাং পুরী পৌঁছানো থেকেই শুরু করা যাক। অক্টোবরের এক প্রসন্ন প্রভাতে আমাদের গাড়ি পুরী স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। আধুনিক সুদৃশ্য স্টেশন। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। প্রথম অভিজ্ঞতা কিন্তু বড়ই করুণ। কুলি আছে। কিন্তু ডাকলে কেউ কাছে আসে না। অনেকেই দেখি নিজ নিজ মালপত্র নামাচ্ছেন। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলাম। নামানো না হয় গেল কিন্তু কুলির সাহায্য ছাড়া স্টেশনের বাইরে নিয়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়। একটা কুলিকে পাকড়াও করলাম। সে অন্ধ্রের লোক। আর এক অন্ধ্রভাষী যাত্রী তাকে মাতৃভাষার বুকনি দিয়ে নিয়ে গেলেন। অপর একজন লোক পেলাম অনেক কষ্টে, সে দু টাকা দর হাঁকে। নির্ধারিত মজুরী ৩৫ পয়সা। দরদস্তুরের অবকাশ পেলাম না। অন্য লোক তাকে সেই দাম কবুল করলেন। মনটা গোড়াতেই বিগড়ে গেল। আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে এও তো এক প্রকার শোষণ। কুলিরা যা খুশি দাম চাইবে আর তাই দিতে হবে, এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলাম না। হোল্ড অলটা সরাসরি মাথায় করলাম।

ভাবটা দেখে সঙ্গীরাও হাত লাগালেন। কুলি ছাড়াই কাজ হাসিল। এতদিন জানতাম মালিক ও ধনিকেরা শোষণ করে—কুলিরাও যে সুযোগ পেলে শোষণ করতে পিছ্‌পা হয় না এটা এতদিন শুনেছি—দু চার আনা বেশি নিয়েছে, গায়ে লাগে নি। এবার রেটটা বড় বেশি হয়েছিল বলেই বোধকরি অমন একটা বোধ আমার মনে জেগেছিল।

গেটে একজন ওড়িয়া টিকেট কালেক্টার। বুঝতে পারলাম আমরা তাদের বিস্মিত দৃষ্টির শিকার হয়েছি। আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁর একজন বাঙ্গালি সহকর্মীকে বলছেন—: এ বোসদা, বাঙ্গালিরা সবাই বুঝি এবার পালিয়ে পুরী চলে আসছে। বোসদা কি বললেন শুনতে পেলাম না। কথাটা আমার ভাল লাগল না। এর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ আছে। বিশেষ করে ঐ "পালিয়ে" শব্দটির মধ্যে। বন্যার জন্য দার্জিলিং-এর পথ খারাপ থাকায় এবার পূজার সময়পুরীতে অস্বাভাবিক ভিড় হয়েছিল। আসবার সময় জনৈক রেলকর্মী বন্ধু বলে দিয়েছিলেন, পুরীতে নেমেই ফিরতি টিকিটটা কেটে নিও। দেড় ঘণ্টা মত সময় লাগলো ঐ টিকিট কাটতে ও রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা করতে। পরে জেনেছিলাম পাণ্ডাদের কিছু বাড়তি পয়সা দিলে যে-কোন দিনের টিকিট ওরা বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন। সে যাই হোক, কলকাতার রেলকর্মী বন্ধুর সুবাদে পুরীর রেল কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট সহৃদয় ও সজ্জন ব্যবহার করেছেন। ষ্টেশনে প্রচুর দেখলাম, পাণ্ডা ঠাকুরের লোকজন ঘোরাঘুরি করছেন। কোন কোন যাত্রীকে ধরছেনও। আমাদের কাছে কেউ আসেন নি। সম্ভবতঃ কোন স্ত্রীলোক আমাদের দলে ছিলেন না বলেই ওরা বুঝে নিয়েছে পাণ্ডার প্রয়োজন নেই। এবার আস্তানা খোঁজার পালা।

রিক্‌শাওয়ালা ভাই জানতে চাইলেন কোথায় আমরা যাব? যাবার কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। ভারত সেবাশ্রমে গেলে থাকার জায়গা পাই না পাই একটা সৎপরামর্শ পাব এই ভরসায় সেই দিকেই যেতে বললাম। পুরী শহরটির সঙ্গে অন্য পাঁচটি আধুনিক শহরের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কলকাতা থেকে গেলে প্রথম দৃষ্টিতে যেটা চোখে পড়ে তা হলো এর প্রচুর খোলামেলা জায়গা ও জনসংখ্যার স্বল্পতা। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সমুদ্র কিনারে পৌঁছালাম। হঠাৎ একটা মোড় ঘুরতেই গোটা সমুদ্রটা যেন আচমকা চোখের সামনে আছড়ে পড়ল।

অনন্ত প্রসারিত সুনীল নিস্তরঙ্গ জলরাশির যেমন অপরূপ শোভা তেমনি এর অনির্বচনীয় মহিমামণ্ডিত রূপ প্রথম দর্শনেই সহগ্র হৃদয়টিকে উদ্বেল করে তোলে। যথাস্থানে ও-প্রসঙ্গে ফিরে আসব। আপাতত আশ্রয় সন্ধানে যাওয়া যাক।

ইতিমধ্যে আমরা ভারত সেবাশ্রম সংঘ ধর্মশালায় পৌঁছে গেছি। স্থানটি সমুদ্রের নিকটেই। নাম স্বর্গদ্বার। ধর্মশালা প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। দু জন মহারাজ বসে লোকজনের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আমিও পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে নিবেদন করলাম—থাকতে চাই। সকলের মত সহাস্যে একই উত্তর দিলেন, জায়গা নেই। প্রস্তাব দিলাম, এ বেলা বারান্দায় অপেক্ষা করি, রাত্রে ঘর খালি হলে ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে চারিপাশ থেকে নানা জনে বিবিধ প্রশ্ন করছেন। খানিকটা অপেক্ষা করতেই বুঝলাম, কিছু হবে না! ভিড়ের চাপ সামালতে এরা হিমশিম খাচ্ছেন। কত লোকের কতই না বিচিত্র প্রশ্ন। একটি মহিলা জানতে চাইলেন, কোন্ হোটেলে ভাল খাবার পাওয়া যায়। মহারাজ প্রধান সমান সহৃদয়তার সঙ্গে তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে এ সব দেখছিলাম।

এক সময় তাঁর দৃষ্টি আমার উপরে পড়লো। তিনি একটি লোক ডেকে দিয়ে আমাকে বললেন—এর একটা ভাঁড়ার ঘর আছে, সেখানে এখন উঠুন, পরে ধীরে সুস্থে ভাল কোন ব্যবস্থা করে নেবেন। গেলাম লোকটির সঙ্গে ঘর দেখতে।

অল্পদূরেই একটি বাড়ির নীচের তলায় একখানা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। ঘরখানা অন্ধকার। পাঁচ টাকা দৈনিক ভাড়া। তাতেই অসন্তুষ্ট চিত্তে রাজি হয়ে গেলাম। জিনিসপত্র আনতে যাব তখন একটি দালাল গোছের লোক এসে বলল ভাড়া লাগবে দৈনিক ছ' টাকা। মনটা বিগড়ে গেল। গোড়াতেই এরা এই রকম গোলমাল করছে যখন, তখন বোধ করি এখানে থাকা নিরাপদ্ হবে না। পাঁচ টাকার এক পয়সা বেশি দেব না স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম। অতএব ঘরও পাওয়া গেল না। এর পর অনেকগুলো হোটেলের দরজায় দরজায় হানা দিয়ে ফিরলাম। কোথায়ও একটা আসনও খালি নেই। দেড়া ও ডবল দাম নিচ্ছে তারা। দুজনের ঘরে কমপক্ষে চার-ছজন করে ঢোকাচ্ছে। আদর্শ হিন্দু হোটেল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসবার পথে একটি অপরিচিত যুবক গভীর মমতার সঙ্গে বললেন হোটেলে বুঝি সীট হলো না। লোকটির চেহারা বা পোশাক আশাকের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। মলিন ধুতি ও শার্টে দেহ আবৃত। পানের দাগে দাঁতগুলি লাল্‌চে। কিন্তু মুখখানা যেন সরলতার প্রতীক। যায়গা পাইনি শুনে তিনি আমাকে সামনের একটি পানের দোকানে নিয়ে গেলেন। ঐ ভদ্রলোকের হেপাজাতে একখানা ঘর ছিল। হিন্দু হোটেলের লাগোয়া বাড়ি। ন্যম গড়াই ভবন। ভাড়া দৈনিক আট টাকা। খোলা মেলা বাড়ি। প্রচুর আলো হাওয়া। কলের জল, সেফটি পায়খানা এবং বিজলি বাতি আছে। ঘরে একখানা খাটও আছে তা সত্বেও দৈনিক ভাড়া আট টাকা খুবই বেশি। আমরা তখন একান্তই ক্লান্ত। থাকবো তো মাত্র সাতটা দিন—ক' টাকা আর বাড়তি খরচ হবে—মনকে এই রকম একটা সান্ত্বনা দিয়ে ঢুকে পড়লাম সেই ঘরে। বেলা তখন প্রায় ১২টা।

আশ্রয় পেয়ে মনটা প্রসন্ন হলো। যে যুবকটি আযাচিতভাবে আমাদের এই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি তখনও রয়েছেন। ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কার ছিল। তবু তিনিই কোথা থেকে একটি খেজুর পাতার ঝাড়ু নিয়ে এসে ঘরটিতে ঝাড়ু লাগাতে শুরু করলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঝাড়ুখানা তাঁর হাত থেকে নিয়ে কাজটুকু শেষ করলাম। যুবকটির সারল্য এবং সেবা-প্রবণতা আমাদের খুবই আকৃষ্ট করলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেলেন। এই পুরী শহরে তাঁর বাস। জগন্নাথ মন্দিরের নিকট বালিশাহী পথে আঠগড়িয়া বাড়িতে তিনি থাকেন। রুজি রোজগারের জন্য পৈতৃক ব্যবসায়—ভীম সেন পাণ্ডার চেলাগিরি করেন। নাম কাশীনাথ মিশ্র। অচিরে তিনি আমাদের কাশীভাই বনে গেলেন।

তালা জলের কুজো ইত্যাদি দু-চারটি টুকিটাকি খুচরো জিনিষপত্র কিনে দিয়ে কাশীভাই এ বেলার মত উঠে পড়লেন এবং জানিয়ে গেলেন বিকেলে আবার আসবেন। আমাদের জন্যই যে তাঁকে বিশেষ করে আসতে হবে তা নয়, এখানে এখন তাঁর অনেক যজমান। রেণুকা ভবন অর্থাৎ আদর্শ হিন্দু হোটেল, গ্রাণ্ড হোটেল ইত্যাদি এক গাদা হোটেল ও বাড়ির নাম করে গেলেন। কত নম্বর ঘরে তাঁর ক'জন যজমান রয়েছেন তাও নামতা পড়ার মত আবৃত্তি করেছিলেন। কাশীভাই উড়িয়া টানে বাংলা বলেন। শুনতে বেশ লাগে।

পুরীধামে আমরা সাতটা দিন ছিলাম। বলতে কি, এই ভদ্রলোকের সৌজন্যেই কোন অসুবিধা আমাদের ভোগ করতে হয় নি। পাণ্ডাদের অনেক অপবাদ শুনি। কিন্তু কাশীভাইয়ের মত পাণ্ডার সংস্পর্শে এলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে সেবা, যত্ন ও সহৃদয় সাহায্যের দ্বারা ওঁরা তীর্থযাত্রীর পরম সহায় হয়েও ওঠেন। বিনিময়ে স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা কিছু অর্থ প্রত্যাশা করে থাকেন। এ আকাঙ্ক্ষাকে অন্যায় বলতে পারি না। কোন্ কাজটা আজ পয়সা ছাড়া হয়? হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, রিক্‌শ, মুলিয়া সকলকেই পয়সা দিতে হয় সে তুলনায় পাণ্ডারা বেশি দাবি করেন বলে আমার মনে হয় নি। এ কথা যথাস্থানে বলা যাবে। আপাতত

কাশীভাইয়ের সঙ্গে আমরাও খাবার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা তখন প্রায় ১॥টা ইতিমধ্যে খুব করে চান করে নিয়েছি। অঢেল জলের ব্যবস্থা। হোটেল দেখিয়ে দিয়ে কাশীভাই বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

হোটেলে এসে তো চক্ষু চড়ক গাছ। স্বর্গদ্বারের মুখেই তিন-চারটা পাইস হোটেল আছে একই জায়গায়। ছোট ছোট হোটেল, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, বহু পরিশ্রমে কর্মীরা ক্লান্ত। পনের-বিশ জনের বেশি একবারে বসতে পারেন না। লোক সর্বত্রই উপ্‌চে পড়ছে। বাইরে কাঠফাটা রোদ্দুর। তারই মধ্যে অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রতিটি হোটেলেই বিশ-ত্রিশজন অপেক্ষমান আহারার্থী। কলকাতার বিয়েবাড়ির চেয়ে খারাপ অবস্থা। সেখানে দেখেছি, খাবার চেয়ার খালি হলেই লোকগুলো এঁটো কাটা সরাবার আগেই হুড়মুড় করে বসে পড়ে। আর এখানে দেখলাম, যাঁরা খাচ্ছেন তাঁদের পেছনের দিকে অভুক্ত কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্দেশ্য চেয়ারখানা দখল করা। দেখে শুনে খাবার প্রবৃত্তি রইল না। বন্ধুবর সুধীর কর মশায়ের বাস্তব বুদ্ধি খুব প্রখর। তিনি ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়েছেন, একটু দূরে আর একটা হোটেল আছে, সেখানে ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। সেই কাঠফাটা রৌদ্র সত্ত্বেও সেদিকে পা বাড়ালাম। পাওয়া গেল দুটো আসন। কিন্তু খাদ্যাবস্তু সবই অখাদ্য। চড়া হারে দক্ষিণা দিয়েও পেটের ক্ষিধে পেটে নিয়েই ফিরতে হলো। এতক্ষণে প্রায় তিনটা বেজে গেছে। তেমন কোন শ্রান্তি বোধ নেই। তবু আরাম করে শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় কাশী-ভাইয়ের ডাকে ঘুম ভাঙল। তার সঙ্গে একটা নতুন লোক এসেছে মিষ্টিওয়ালা।

কয়েকটি এলুমিনিয়ম ডেকচি বাঁকে বাঁকে ঝোলানো। তাতে রসগোল্লা, চমচম, পানতুয়া ইত্যাদি মিষ্টি। ঘরের সামনে সে ভদ্রলোক পসরা সাজিয়ে বসল। প্রতেকটি পাত্রের ঢাকা খুলে রেখেছে। মুখে তার দুটি মাত্র বাক্য—গরম টাট্‌কা খাবার। মিষ্টি খাবে না বাবু? কণ্ঠে তার মিনতি ভরা। পেটেও আমাদের ক্ষুধা ছিল। দুজনে চার টাকার মিষ্টি খেয়ে ফেল্লাম। মিষ্টিওয়ালা আমাদের খুবই শাঁসালো খরিদ্দার ঠাউরে নিল। এরপর থেকে প্রত্যহ দুই বেলা নিয়মিত সে হানা দিত। তার পেড়াপীড়িতে ইচ্ছে না থাকলেও কিছু মিষ্টি কিনতে হতো। সমুদ্রতীরের হোটেল ও বাড়িগুলির অতিথি অভ্যাগতরাই এদের প্রধান খরিদ্দার। এই অঞ্চলটার মোট আয়তন ধরা যেতে পারে পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ গজ। সারাদিন ধরে এই এলাকায় চক্কর দেবার ফলে মিষ্টি-ওয়ালার সঙ্গে আমাদের হরবখৎ মোলাকাৎ হয়ে যেত। প্রতিবারই সে একগাল হেসে বলত—আমি যাইব বাবু? মিষ্টি লাগিব না?

কাশীভাই স্মরণ করিয়ে দিলেন, তীর্থে এসে ধুলো পায়ে দেবতা দর্শন করতে হয়।

তীর্থ করতে আসিনি। এসেছি বেড়াতে। পুরীর সমুদ্র দেখব। জগন্নাথও দেখব। মন্দিরের বিস্ময়কর স্থাপত্যকলা, শিল্পসৌন্দর্য্য, যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বের মানুষকে প্রলুব্ধ করেছে। আমরা যদিও বস্তুতঃ এ পাড়া ও পাড়ার লোক, তথাপি জীবনের অর্দ্ধেক অতিক্রান্ত করেও সেই মহাসম্পদ্‌ দেখবার সুযোগ করতে পারি নি। এ আক্ষেপ অনেক দিনের। কিন্তু জগন্নাথ দর্শন করে ইহকাল পরকালের অক্ষয় সম্পদ্‌ সঞ্চয় করব এমন কথা ঘুণাক্ষরেও কখন মনে পড়ে নি। আজ কাশীভাইয়ের কথায় মুহূর্তেই মনটা বদ্‌লে গেল। অনুভব করলাম, সর্বাগ্রে জগন্নাথ দর্শনের আগ্রহ আমার হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছে। অনুকূল পরিবেশে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার অভ্রভেদী হয়ে উঠল। মনের এই বিবর্তনের ধারার মধ্যে ভারতীয় হিন্দু মনের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই আমার ধারণা। এই পথেই হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের তীর্থভূমিগুলি আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তির রসে প্লুত ও পবিত্র হয়ে জাতিকে সঞ্জীবিত রেখেছে। কাশীভাইকে পথপ্রদর্শক করে জগন্নাথ দর্শনে বের হলাম। তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে।

পথে পথে বিজলি আলো জলে উঠেছে। সমুদ্রতীরে আনন্দিত মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। সব পেছনে ফেলে আমরা চলেছি জগন্নাথ দর্শনে।

আমাদের আবাস থেকে মন্দির মাইলটাক হবে। হেঁটে হেঁটেই গেলাম। সব বড় তীর্থস্থানের মতই এখানকার পথে পথে ভক্তজনের ভিড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিখারির সংখ্যাও বেড়েছে। ভিখারীর অধিকাংশই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। প্রায় সকলেই কিছু না কিছু দিলেন এদের। পরদিন সকালে দেখেছিলাম, মহিলা পুণ্যার্থীরা প্রত্যেকটি ভিখারীর দিকে গুটি-কয়েক করে চাল ছুঁড়ে দিচ্ছেন। দেবার ভঙ্গিটি কেমন যেন তাচ্ছিল্য ভরা। ছড়িয়ে যাওয়া চালগুলি ভিখারীরা যত্নে কুড়িয়ে নিচ্ছে। তাতেও তাদের সঞ্চয় তেমন ফেলনা হয়নি।

রাস্তার পাশে অনেকগুলি বাড়ির ভিত দেখলাম প্রায় একতলা সমান উচু। সমুদ্রের ভয়েই এমন অস্বাভাবিক উঁচু করে তৈরী করা হয়েছিল।

মন্দিরে পৌঁছে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। অগণিত মানুষের স্তূপাকার ভিড়। ওর মধ্যে ঢুকে দেব দর্শন সম্ভবপর হবে না আশঙ্কা করে থেমে গেলাম। কিন্তু কাশীভাই খুব করিৎকর্মা লোক। এখন তিনি আমাদের চালক। বেশ আদেশের ভঙ্গিতে বলছেন, এটা করুন, ঐ পথ দিয়ে চলুন। তাঁরই আদেশে জুতা জমা দিলাম। পর পর দুটো পাঁচিল দিয়ে মন্দির ঘেরা। তার মধ্যে জুতো পায়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। আগে বিধর্মী অর্থাৎ অহিন্দুদের এবং হিন্দু অস্পৃশ্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এখন সব জাতের হিন্দুরাই ঢুকতে পারেন, বিধর্মীরা নন। কিন্তু বিধর্মী কেউ ঢুকছে কি না তা কাউকে তদারকী করতে দেখা গেল না। কাশীভাইয়ের কৃপায় সেই উত্তাল ভিড় ঠেলে বিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করে এলাম। দেখা হলো না কিছু ভাল করে। ফিরবার পথে মন্দির বিগ্রহ ও সেবা পূজা নিয়ে কয়েকটি চলতি কিংবদন্তী কাশীভাই শোনালেন। এর পরেও তিন-চার দিন মন্দিরে গিয়েছি, পুজো দিয়েছি, শুনেছি দেখেছি বিস্তর, তবু তা ভগ্নাংশ মাত্র। এ কথা পরে বলা যাবে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার পথে দোলমঞ্চ প্রাঙ্গণে একটি মুক্ত অঙ্গন প্রদর্শনী আছে। পুরাণ কথার কিছু আধুনিক দেওয়াল মূর্তি। রচনা শৈলীর কোন বিশিষ্টতা নেই। মূর্তিগুলির কোন পরিচয় লেখা নেই—বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থারও অভাব। সেজন্য পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত লোকের পক্ষে এগুলির আবেদন খুবই সীমাবদ্ধ। আজকালকার যুবজনেরা পুরাণাদি পড়েন বলে তো মনে হয় না। তাঁরা পরীক্ষার পড়াই পড়েন না, তাঁদের পুরাণ পড়ার গরজ হবে কেমন করে? তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী জানালেন, দৈনিক গড়ে আট-দশ জন মাত্র দর্শক এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন। দক্ষিণা মাথা-প্রতি পাঁচিশ পয়সা। দর্শনার্থীর সঙ্গে পাণ্ডা বা পাণ্ডাদের লোকজন বিনা দর্শনীতে যেতে পারেন। তাঁরাই কিছু কিছু গাইডের কাজ করেন।

দোলমঞ্চ থেকে বেরিয়ে একটু এলেই অতি প্রশস্ত রাজপথ। এই পথে রথযাত্রার সময় জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার রথত্রয় টানা হয়। ঐ সময় সারা ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসেন। এতবড় চওড়া রাস্তা সচরাচর দেখা যায় না। রাস্তার দুধারে একাধিক সারি সারি অস্থায়ী দোকান ঘর উঠেছে। রথের সময় ওগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রতি বৎসর তিনখানা নতুন রথ তৈরি করা হয়। এ বছরের রথের চাকাগুলি দেখলাম রাস্তার একদিকে পড়ে আছে। নীলামে বিক্রীত ঐ চাকাগুলি ক্রেতা এখনও সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

এই পথের পাশে মন্দিরের নিকটেই উৎকল সাহিত্য সম্রাট্ গোপবন্ধুর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ জগন্নাথ। তার পরেই বুঝি গোপবন্ধু। সুতরাং মন্দিরের পাশেই গোপবন্ধুর শান্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখে ভাল লাগল। উৎকল সাহিত্যে গোপবন্ধু একটি অক্ষয় নাম। প্রিয়রঞ্জন সেনের মুখে শুনেছিলাম যে, কয়েকটি পরিবারের প্রচেষ্টায় বাংলা ও ওড়িশার সাহিত্য

সংস্কৃতি এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রে সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। গোপবন্ধু তাঁদের অন্যতম প্রধান। গোপবন্ধুকে প্রণাম জানিয়ে আমরা গৃহাভিমুখী হলাম। এবার আবার খাবার ভাবনা। দুপুরে যে দুর্ভোগ পুইয়েছি তার স্মৃতি সহজে যাবে না। ঐ গাঁটের কড়ি খরচা করে অখাদ্য গিলব তারপর লাঞ্ছনাও সহ্য করব। এভাবে খাওয়ায় যে স্বাস্থ্যরক্ষা হবে তার চেয়ে উপোষ দিলে বেশী সুস্থ থাকা যাবে। অতএব আজকের রাত্রে খাওয়া বাতিল। সকালে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

আমাদের বাড়িওয়ালা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য রংপুরের লোক। শরণার্থী হয়ে এদেশে আসেন। অতীত জীবন সম্পর্কে অনাগ্রহ সুস্পষ্ট। কোথায়ও বাংলাদেশের মানুষের সন্ধান পেলে তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই ভদ্রলোক এড়িয়ে যেতে চাইলেন আমাকে। সাধারণ ভদ্রতায় আমাকেও চুপ করে যেতে হলো। সরকারী রাস্তায় একটা ঘর তুলে পান বিড়ির দোকান দিয়েছেন। দোকানের কোন জৌলুষ নেই। তবে বিক্রীবাটা ভাল বলেই মনে হলো। রাস্তার অপর দিকে তাঁর সহধর্মিণীর একটি চায়ের দোকান। ফুটপাতের দোকান যেমন হয় ঠিক তেমনি। রিক্‌সওয়ালা হুলিয়া আর ফেরিওয়ালারাই তার খরিদ্দার। ভদ্রমহিলাকে সকলেই দিদি বলে ডাকে। মহিলাটির দাবরাব খুবই। আমিও তাঁকে দিদি বলে ডাকতে শুরু করলাম। কেন জানি না তিনিও আমাকে দাদা বলে ডাকতেন। যতই দিদি বলি না কেন, ঐ দোকানের চা খেয়ে ঠিক তৃপ্তি হয় না। পথ চলতে ভাল চা জোগাড় করা বোধ করি সবচেয়ে দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই কিছু কফি সঙ্গে করে এনেছিলাম। দিদিকে নিবেদন করলাম ব্যাপারটা। গতরাত্রে কিছু খাওয়া হয়নি তাও জানালাম। চায়ের দোকানীই হোন আর যাই হোন, বাঙালী নারী বলেই বোধ করি অভুক্ত আছি জেনে তিনি বিশেষ স্নেহার্দ্র হলেন। কফি করার জন্য গরম জল তো দিলেনই উপরন্তু সামনের প্রাণ্ড হোটেলে যাতে আমাদের খাবার ব্যবস্থা হয় তারও উপায় করে দিলেন।

আমাদের বাড়ি গড়াই ভবন। তার সামনেই রাস্তার অপর পারে প্রাণ্ড হোটেল। পুরীর চলতি নামানুসারে প্রথম শ্রেণীর আবাসিক হোটেল। মিল প্রতি আড়াই টাকা দামে এরা বাইরের কয়েকজন লোককে খেতে দেন। টাকার কথা তখন আর ভাবছি না। রাজি হয়ে গেলাম। দাম যাই হোক, খাওয়া ভাল, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবহারও সদয়। খেতে দিতেন দুপুরে মাছ ও রাত্রে মাংস। পরিমাণও যথেষ্ট। এছাড়া সকালে ও বিকালে চা ও জলখাবারের দাম ছিল দেড় টাকা করে তিনটাকা। সকালে কয়েকদিন চা খেয়েছি এখানে। দিতেন দু টুকরো টোষ্ট, ডিম ও কলা একটা করে। পুরীর বাজার দরের অনুপাতে দাম খুবই চড়া তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। আমার কয়েকজন স্নেহভাজন প্রতিবেশী পুণ্য-রতন প্রভৃতিরা এখানে আমাদের ঠিক আগে আগে এসেছিলেন। তারা আদর্শবাদী মানুষ, শিক্ষক। এই অব্যবস্থা ও অত্যাচারের সঙ্গে আপোষ করে চলতে পারেন নি। নিজেরাই বাজার-হাট করে রান্নাবান্না করেছেন। সংখ্যায় ওরা বেশি ভারি এবং সঙ্গে কয়েকজন মহিলা ছিলেন বলে অপেক্ষাকৃত সহজে ও শৃঙ্খলার মধ্যে ওরা এটা করতে সক্ষম হন। তাছাড়া পুরীতে খাট বিছানা থেকে সুরু করে হাঁড়ি, কড়াই, বালতি, ষ্টোভ যা কিছু মানুষের দরকার সবই ভাড়া পাওয়া যায়। আর পাণ্ডা ঠাকুরের চেলারা এ ব্যাপারেও সর্বদাই সাহায্য করে থাকেন।

আজই সকালে সুস্থ মনে সমুদ্র দেখলাম। অন্ধকার থাকতে থাকতে চলে এসেছি সমুদ্রতীরে। তখনই দু-চারজন করে ভ্রমণার্থী আসতে সুরু করেছেন। প্রথম দর্শনে সমুদ্র আমাকে অভিভূত করেছিল। হৃদয় আমার অপূর্ব আনন্দে নৃত্যগীতময় হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ সমুদ্র কিনারে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমগ্র দেহ মন নত হয়ে প্রণতি জানাতে চাইল। আনুষ্ঠানিক প্রণাম

করিনি। কিন্তু মনটা আমার প্রণাম নিবেদন করেছিল। বিশাল সমুদ্রের সীমাহীন মহিমার নিকট আমার মানব অস্তিত্ব কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র এবং কত অসহায় তার যাথার্থ্য উপলব্ধি না হলেও এই মুহূর্তে সে সম্পর্কে আমার চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। মহাজনেরা বলেছেন, পর্বত ও সমুদ্রের সামনাসামনি না দাঁড়ানো পর্যন্ত মানুষ তার ক্ষুদ্রত্ব যথাযথভাবে অনুভব করতে পারে না। আর ক্ষুদ্রত্বের অনুভূতি ছাড়া আমরা কেউ ত্রুটি মুক্ত হতে পারি না। এই দিক দিয়ে আমার সমুদ্র দর্শন অসার্থক হয়নি। কিন্তু সূর্যোদয় দেখা গেল না। আকাশে কুয়াশা ছিল।

ভোরের আলো ভাল করে ফুটবার আগেই ছোট ছোট কাঠের ভেলা সম্বল করে জেলে ভাইরা মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছেন। ভেলাগুলি বিচিত্র। নৌকার মত করে কাটা আস্ত আস্ত কয়েক টুকরো কাঠ নারকেলের দড়ি দিয়ে একত্রে বাঁধা। তার বুকে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে মাছ ধরা ও মাছ রাখার জাল। প্রতিটি নৌকায় দুজন করে আরোহী। হাতিয়ার হলো দুখানা বৈঠা। তটভূমি থেকে সমুদ্র অভ্যন্তরে খানিকটা দূর পর্যন্ত ঢেউগুলি নিরন্তর ভাঙছে। স্বাভাবিক অবস্থায় নৌকা নিয়ে এইটুকু পার হওয়া একটু কঠিন কাজ বৈ কি। আবহাওয়া একটু প্রতিকূল থাকলে তো কথাই নেই। ঘূর্ণিঝড়ের পরের দিন দেখেছিলাম প্রথম দুশো গজ পেরোবার জন্য অনেকগুলি জেলেনৌকা ঘণ্টা খানেক ধরে চেষ্টা করে তবে সফল হয়েছেন। এর মধ্যে কতবার যে তাদের নৌকা ঢেউয়ের তলায় ডুবে গেছে—তার ইয়ত্তা নেই। কষ্টেসৃষ্টে কেউ বা পঞ্চাশ গজ গিয়েছেন—একটা ঢেউ এসে তাদের আবার কিনারায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। তবু তারা পরাজয় স্বীকার করেন না। ক্লান্ত বোধ করে ছেড়ে দেন না কাজ। চেষ্টা করতে করতে এক সময় ভাঙা ঢেউয়ের সীমানা পেরিয়ে অভঙ্গ ঢেউয়ের অপেক্ষাকৃত শান্ত রাজ্যে তারা উপস্থিত হন এবং ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে দূর সমুদ্রে মাছ ধরা সুরু করেন।

মাছের সঙ্গে শঙ্খ ও কড়িও সংগৃহীত হয়। এগুলির বাজার দর মাছের চেয়ে খুব একটা কম নয়। এই যে জীবনকে হাতের তালুতে নিয়ে মাছ ধরা, শঙ্খ কুড়নো তাতে কিন্তু জেলেভাইদের পেট ভরে না। সবদিন সকলের দুবেলা পেটভরে ভাত জোটে না। একজন জেলে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এরা তেমন মিশুক নন। এড়িয়ে চলতেই আগ্রহী। তারই মধ্যে দুই একটা কথা যা বললেন তাতেই বুঝলাম নোনা জলে নৌকো ও জাল ঠিক রাখা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সে ব্যয় মিটিয়ে লাভ করা কঠিন কাজ। তারপর সকলেই তো সস্তা কিনতে চায়। পুরীর মরশুম কেটে গেলে জলের দামেও মাছ কেনার লোক মেলে না।

কড়ি ও শঙ্খের বাজার বেশ তেজী। ছোট শঙ্খের মালা, ছিনুকের নানা রকম সৌখীন জিনিসপত্র এবং ফু দিয়ে বাজাবার শাঁখ বেশ চড়া দামেই বিক্রী হতে দেখলাম। জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝিনুক তীরে এসে বালিতে আটকে পড়ে। ভ্রমণকারীর কেউ কেউ ওগুলি খুটে নিচ্ছেন। ভিখারী ভবঘুরে ছেলে মেয়েরাও ওসব কুড়িয়ে বিক্রী করে। ঝিনুকগুলির আকার বিচিত্র রকমের। রঙীন বর্ণাঢ্য ঝিনুকও বিস্তর। একটি ভিক্ষাজীবী শিশুকে বলা হলো ভিক্ষা কেন মা—ঝিনুক কুড়িয়ে আন, পয়সা দেব। সে পনের বিশ মিনিটের মধ্যে আধ কেজি খানেক ঝিনুক খুটে এনে দিল এবং বিনিময়ে দাবি করল আট আনা পয়সা। তার সঙ্গে আরও জনা দু তিন সহচর-সহচরী হাত লাগিয়েছিল। তারও এসে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। সুধীরদা ওদের চার আনা পয়সা দিলেন। ওতে ওরা রাজি হলো না। আরও বেশি পাবার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে বকবক করতে থাকে। সুধীরদা হিসাব করেন বিশ মিনিটে চার আনা হলে কত করে রোজ পড়ে হিসাব করেছ? হিসাবে তারা ধার ধারে না। কিচির-মিচির করে সুধীরদার কাছ থেকে আরও দশটি পয়সা আদায় করে নিয়ে পলকে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা ততক্ষণে বালির উপরে বসে পড়েছি। ব জনেই বসেছেন। দামী দামী জামা, প্যান্ট, সাড়ী, ব্লাউ

পরা নরনারী বালির উপরে নিশ্চিন্ত মনে বসেছেন। দলে দলে নরনারী শিশু জলের কিনার ধরে পায়চারি করছেন। এক একবার ঢেউগুলি তাদের ভিজিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কোনটা হয়তো ছুঁইছুঁই ক'রে না ছুঁয়েই ফিরে গেল। জলের স্রোতটা যখনই আসছে তখনই একটা সশব্দ চঞ্চল আনন্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। জল সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বালুময় তটভূমি ঝর ঝরে শুকনো হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্ত পূর্বে এখানে জল এসে ছোবল মেরে গেছে তার চিহ্ন টুকুও অবশিষ্ট থাকে না। জলের কিনারে এই সব মানুষগুলো, বিশেষতঃ শিশুগুলি জলের তোড়ে হঠাৎ ভেসে যাবে না তো—ঢেউটা যখন আসে তখনই মনটা আমার আতঙ্কিত আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ঢেউ আসে যায়—কিন্তু কোন বিপদ ঘটে না—দেখে দেখে আশ্বস্ত হয়ে গেছি। বুঝে ফেলেছি জলের এই ছোঁয়া একান্তই নিরাপদ।

আমার এই আশঙ্কার কথা শুনে কাশীভাই বললেন—সমুদ্র কাকে কখন নেবে কোথা থেকে নেবে তা অনুমানই করা যায় না। প্রসঙ্গত কোন এক রাজার ছেলের ভেসে যাওয়ার কথা বললেন। এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে গিয়ে ভেসে গেল রাজপুত্র। তবে হাঁ, সমুদ্র কারো ধার রাখে না। সে যা নেয় তা অবশ্যই ফিরিয়ে দিয়ে যায়। এক ঢেউতে ভেসে যায় আর এক ঢেউতে ফিরে আসে। সমুদ্র জলে ভেসে আসা নারকোলের মুছি গুলো অনেকে জলে ছুড়ে দিচ্ছিলেন। সেগুলি আবার ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে তটভূমিতে ফিরে আসছিল। রাজার ঐ ছেলেকেও ফিরে পাওয়া গিয়েছিল পরের দিন, তখন সে মৃত। গতকালই কাশীভাইয়ের পাড়ার দুটি কিশোর-কিশোরী ভাই-বোন সমুদ্রে চান করতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। জন্মাবধিই তো এরা সমুদ্রে চান করছে। অথচ শান্ত সমুদ্রে কোথায় যে ভেসে গেল তার হদিশ মিলছে না। দুদিন পরে চোখের সামনে দেখলাম ওড়িশারই একটা ছেলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

আমরা তখন জেলে ভাইদের জাল মেরামত দেখছিলাম। একটা ঝালমুড়িওয়ালা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে তাদের খবর দিল একটি ছেলে 'কারেণ্টে পড়ে' ভেসে যাচ্ছে শীঘ্র চলো। জেলে ভাইরা দ্বিতীয় প্রশ্ন না করেই হাতের কাজ ফেলে দিয়ে তার পেছন পেছন ছুটলেন এবং বিনা দ্বিধায় জলে নেবে গেলেন। ভয়চকিত চিত্তে মা কালীর স্মরণ করতে করতে আমরা যখন অকুস্থলে গিয়েছি তখন উদ্ধারকারী দল (চারজন) তীব্র স্রোতের মধ্যে আবর্তমান সেই ছেলেটিকে ধরে ফেলেছেন এবং তীরে উঠবার চেষ্টা করছেন। মিনিট দশেকের মধ্যে ছেলেটিকে নিয়ে তারা তীরে এসে উঠলেন। কৌতূহলী জনতা ছেলেটিকে ঘিরে ধরলো। জেলে ভাইরা কারো ধন্যবাদের অপেক্ষা না রেখে নিজেদের কাজে গিয়ে মন দিলেন। মনে মনে এদের আমি প্রণাম করলাম। বিপদের ঝুকি নিয়ে আর্ত মানুষকে রক্ষা করার মহৎ মনুষ্যত্ব আজ বাঙ্গালি সমাজ থেকে লুপ্ত হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় ঘরের দুয়ারে বীভৎস হত্যার নৃশংস লীলা যখন চলে তখন আমরা তথাকথিত শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী মানুষ দরজা জানালা রুদ্ধ করে আত্মরক্ষা করি। মনুষ্যত্বের এই নিত্য গ্লানি আমাদের জীবনকে ক্লেদাক্ত করে দিয়েছে—তাই জেলে ভাইদের নিকট, তথা সকল সার্থকনামা মানুষের নিকট যা স্বাভাবিক কর্ম বলে বিবেচিত সেটাই আমাদের কাছে অপার বিস্ময়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা ও বিত্তের বড়াই সত্ত্বেও ওদের তুলনায় কত ছোট আমরা।

জেলে ভাইয়ের পাশে একটি উলঙ্গ শিশু আপন মনে বালির পাহাড় তৈরি করছে আর ভাঙছে। জীবনের ভাঙ্গাগড়া খেলার শিক্ষানবিশী করার এমন সুন্দর ক্ষেত্র আর বুঝি কিছু নেই। অদূরে একটি শহুরে শিশু এক হাতে মুঠো মুঠো বালুকা তুলছে আর ছড়াচ্ছে। অন্য হাত মা শক্ত করে ধরে রেখেছেন। শহুরে মায়েদের এই অতি সতর্কতা সেখানকার ছেলেদের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে আর একটা দুস্তর বাধা। ওদের তাই চিরকালই একহাতে কাজ করতে হয়—অর্থাৎ ওরা পূর্ণ বিকশিত হবার সুযোগ পায় না।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে স্নানার্থীর আগমন সুরু হয়। স্থানীয় লোকজন সমুদ্রকে চিনে ফেলেছেন। তারা নির্ভয়ে চান করছেন। নতুন যারা তাদের সাহায্য করার জন্য আছেন শিক্ষিত নুলিয়ারা। এরা মাথায় এক প্রকার ত্রিভুজাকৃতি টুপি পরেন। ঐটিই ওদের পরিচয় পত্র। তাতে ইংরেজিতে হোটেলের নাম লেখা থাকে। এদের হাত ধরে ধরে অনেকটা নির্ভয়ে জলে নামা যায়। অনেক দূর পর্যন্ত সমুদ্র অগভীর কিন্তু স্রোত আছে বেশ, ঢেউয়ের ত কথাই নেই। একটা একটা ঢেউ এমন জোরে আঘাত করে যে খুব কম লোকই তা সামলাতে পারেন। ঢেউ এলে ডুব দিতে হয়। মাথার উপর দিয়ে ঢেউটা নিমেষে চলে যায়। গায়ে আচড়টি লাগে না। জল লবণাক্ত। তাই স্নানে ঐ আনন্দই সম্বল, তৃপ্তি হয় না। বাড়ি ফিরে আর একবার স্নান করতেই হবে।

ভীত সন্ত্রস্ত স্নানার্থীকে স্নান করানোর দৃশ্যটা তীরবর্তী মানুষ সাধারণত খুবই উপভোগ করে থাকেন। স্নানার্থী ভয়ে এগোতে নারাজ—নুলিয়া তার দুহাত ধরে হেচড়ে নিয়ে চলেছেন। ঢেউ আসছে—নুলিয়া বলছেন বসে পড়ুন, কিন্তু স্নানার্থী ঢেউয়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। ঢেউয়ের ঝাটকায় হয়তো নুলিয়া ও স্নানার্থী উভয়েই ছিটকে পড়লেন। ঘটনা যাই হোক নুলিয়া হাত থেকে স্নানার্থীকে ফস্‌কে যেতে দেন না। দাক্ষিণা খুবই সামান্য গড়ে জনপ্রতি আট আনা।

সমুদ্র জলে এক পা এক পা করে চলা প্রায় অসাধ্য। নুলিয়ারা বা জেলেরা মনে হয় জোড়পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন। ওদের এই চলার একটা ছন্দোময় গতি আছে। দেখতে ভাল লাগে।

তীরভূমিতে বসেই একদিন দেখলাম বালুময় তটভূমির বিবর থেকে অসংখ্য কাঁকড়া একবার বেরিয়ে আসছে আবার ঢুকছে। ঢেউয়ের জল আসবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের নিমিষে তারা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আবার জল সরে যেতেই তর তর করে ত্রস্ত চরণে বেরিয়ে এসে চলাফেরা সুরু করে। সে এক ভারি মজার খেলা। সমুদ্রকে এরা থোড়াই কেয়ার করে। দেখে দেখে টিট্টিভ পাখীর সমুদ্র শাসনের গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটা সকলেরই জানা। তবু যারা জানেন. না, তাদের জন্য সংক্ষেপে বলি।

সমুদ্র তীরে কোন এক টিট্টিভ পাখী ডিম পাড়ে। ঢেউ এসে সে ডিম ভাসিয়ে নিয়ে যায়। টিট্টিভ তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সমুদ্রকে শাসন করার জন্য ঠিক করে মাটি দিয়ে সমুদ্র গহ্বর ভরে দেবে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। ক্ষুদ্রপাখী অনন্য কর্মী হয়ে তার ক্ষুদ্রতর ঠোটে করে মাটি এনে এনে সমুদ্রে ফেলতে লাগল। পাখিটির এই অদ্ভুত আচরণ সমুদ্র লক্ষ করতেন। কিছুকাল পরে তিনি এর কারণ জানতে চাইলে পাখি বললে—সমুদ্র তার ডিম নিয়ে গেছে তাই সে সমুদ্র বুজিয়ে দিতে চায়। উত্তরে সমুদ্র কি বলেছিলেন জানি না। তবে তিনি টিট্টিভের ডিম ফেরত দিয়েছিলেন। ছোট টিট্টিভ, ক্ষুদ্র কাঁকড়া, এরাও সমুদ্রকে কেয়ার করে না, আর আমরা ভয়ে মরি। না, কথাটা ঠিক হলো না। আমাদেরই ভাই-বন্ধুরাও তো বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে কাঠের ভেলা চড়ে মাছ ধরে—জাহাজ তৈরি করে এপার ওপার করে। মহাশূন্যযান সত্বেও আকাশ ও নক্ষত্রলোক বা ব্রহ্মাণ্ড যেমন এখনও মহাবিস্ময় তেমনি জাহাজ টর্পিডো ও ভেলা সত্বেও মহাসমুদ্রও রহস্যখনি হয়েই আছেন। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র ঐ দূরে যেখানে মিলেছে সে স্থানটায় কোন-দিনই পৌছনো যাবে না। তাই বুঝি এই বিস্ময় মিশ্রিত ভয়ের ভাবনা।

কপাল গুণে এর মধ্যে দুদিন ঘূর্ণি ঝড় হয়ে গেল। উত্তাল ও বিক্ষুব্ধ সমুদ্র দেখবার বিরল সৌভাগ্য হলো। ঝড়ে বালি উড়ে পথ ঘাট সব ভরে দিল। ঘরদোরও বাদ গেল না। বায়ুতাড়িত বালুকণাগুলি চোখে মুখে তো বটেই, দেহের অন্যান্য অনাবৃত অংশে আঘাত করতে থাকে। তা কেবল যে বিরক্তিকর তাই নয়, বেদনাও

বেশ অনুভূত হয়। কয়েকগজ বালুময় বেলাভূমির বালুকণার এই দৌরাত্ম্য দেখে মরুভূমির বালি-ঝড় সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যায়। সেখানে নাকি পর্বতাকার বালুরাশি ঝড়ে উড়ে চলে আর তার তলায় পড়ে জীবজন্তু মারা পড়ে। মনে বড় আপশোষে অক্টোবরে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র দেখতে যদিও পেলাম কিন্তু সূর্যোদয় দেখা হলো না। বাসনা-পুর্তির জন্য সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা জানালাম। প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল। আসবার দিন সকালে অপূর্ব বর্ণাঢ্য সমারোহে সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করেছি। পাঁচটা থেকেই পূব আকাশের রং বদলাতে শুরু হয়েছিল। সূর্যোদয়ের সময় যত নিকটবর্তী হতে থাকে রঙীন আকাশ ততই উজ্জ্বলতর এবং মুহুর্মুহু রঙ বদলের পালা শুরু হয়। পৌনে ছটা নাগাদ সমুদ্র-জল থেকে টকটকে লাল রঙের একটি গোলাকার অগ্নিপিণ্ড মাথা উঁচু করে উঁকি দিল। কয়েক মুহুর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ গোলকটি দৃষ্টিপথে এসে গেল। টকটকে লাল রঙ ততক্ষণে সোনালীতে রূপান্তরিত হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন চোখের পলকে ঘটে গেল। আনন্দ তখন আমার সর্বাঙ্গে। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সূর্যপ্রণাম মন্ত্র :

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।

পুরীধামে আমাদের আর এক সাথী হলেন রিকশওয়ালা ভাই। এটি নবীন যুবক। বাড়ী অন্ধ্রে। স্থানীয় লোকেরা ওদের বলেন তেলেগু লোক। বাংলার চেয়ে ওড়িয়া সহজে বলতে পারেন। বাংলাও বলেন, তবে একটু কষ্টে। বলবার অসুবিধার জন্যই বোধ করি ছেলেটি একান্তই স্বল্পবাক্। ও আমাদের পাকড়াও করেছিল আসবার দিন রেলস্টেশনে। প্লাটফরমের মধ্যেই ওর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলো রিকশা চাই কি না। মনে মনে ভাবলাম ওর দ্বারা কুলি-বিভ্রাটের দুঃখ যদি কিছু কমে। না, প্লাটফরমের ভেতরে ও কোন সাহায্য করতে পারে না। এই নিয়ম না মানলে কুলিরা মারধোর করতেও কসুর করে না। প্রত্যেকটি রেলস্টেশনে কুলিদের এক-একটি সাম্রাজ্য আছে। সে সাম্রাজ্যে শোষণ শাসন সবই অব্যাহত রাখার নানা অলিখিত নিয়ম-কানুনও রয়েছে,—আর তা সকলকে মেনে চলতে হয়। যাই হোক, প্লাটফরম গেট পার হলেই রিকশাওয়ালা আমার মাথা থেকে হোল্ড-অলটি নিতে চাইলেন। আমি জানালাম টিকিট কাটব, দেরি হতে পারে। সে অপেক্ষা করতে রাজি হলো। প্রায় দেড় দু ঘন্টা নীরবে অপেক্ষা করেছিল। বেশি দেরি হচ্ছে দেখে ওকে একবার চা খাইয়ে নিলাম। এই যে পরিচয় হলো তা আসার দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল।

আমাদের বাড়ির সামনে সর্বদাই কয়েকখানা রিকশা মজুদ থাকতো। রিকশাওয়ালাদের একটা 'পুল' আছে। এই ছেলেটি যখন উপস্থিত থাকত না অথচ আমাদের বাইরে যাবার সম্ভাবনা থাকত, তখন ও ঐ পুলের কাউকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যেত। ওর নাম ছিল বোধ হয় রামানুজ। লোকে বলতো রামু। আমি বলতাম রামচন্দ্র। ওর ঐ নীরব অপেক্ষা করাটা আমার হৃদয় স্পর্শ করত। ন্যায্য ভাড়ার পরে দু-দশটা পয়সা বেশি দিলেও কিন্তু এদের মন পাওয়া যেত না। প্রত্যাশা অনেক। পুরীতে পাণ্ডাঠাকুরের 'পর ভাড়া নির্ধারণ ব্যাপারে নির্ভর করলে ঠকবার ভয় থাকে না। চায়ের দোকানের দিদির সুবাদে সব রিকশাওয়ালারাই আমাদের একটু নেক নজরে দেখতো। রিকশা ভাড়া এখানে পশ্চিম বঙ্গের যে কোন শহর থেকে সস্তা। রাস্তাগুলি সর্বত্র সমতল নয়। তার ফলে মধ্যে মধ্যে চালকের বেশ কষ্ট হয়। ঘুর্ণি ঝড়ের পরে কয়েকদিন সমুদ্র-কিনারের পথে বালু জমা ছিল, তখনও পথে রিকশা চলাচল কঠিন ব্যাপার। ফিরে আসার দিন রামচন্দ্রকে অন্য শাসালো খদ্দের সামলাতে হয়েছিল বলে তার দাদাকে আমাদের বরাত করে গিয়েছিল। বিদার বেলায় ওর সঙ্গে দেখা না হবার জন্য মনটা একটু বিষণ্ণ হয়েছিল বৈ কি।

পুরীর সব চেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি কাশীভাই। ওর বাড়ি

একদিন গিয়েছিলাম। দম বন্ধ হওয়ার মত একখানা বস্তি ঘর। কাশীর মা-বাবা নেই। মাসীমা ঘর সংসার দেখেন। তিনি কালা এবং বোবা। প্রৌঢ়া এই বিধবা মহিলা নীরবে আমদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে দুটি টাকা দিলাম। পাশের ঘরগুলির কৌতূহলী দৃষ্টি এসে পড়েছে ততক্ষণ। আমরা বিদায় নিলাম। কাশীও বসবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না।

আট মাস আগে কাশীর বাবা মারা গিয়েছেন। তিনি ভয়ানক আফিঙখোর ছিলেন। যাজন ক্রিয়ার দ্বারা যা উপার্জন করতেন তা থেকে সংসার চালিয়ে আফিঙের পয়সা জুটতো না। তাই তিনি জমিজমা সব বিক্রীবাটা করে কাশীকে পথে বসিয়ে গেছেন। এরই মধ্যে কাশী একটা বিয়ে করবে ঠিক করেছে। সম্বন্ধ পাকা হয়েছে। ভাবী বউকে কিছু কিছু গয়নাগাটি ইতিমধ্যে উপহার পাঠিয়েছে। বাবা মারা যাবার জন্য এক বৎসরকাল কালাশৌচ থাকবে, এ সময়ে বিবাহাদি নিষিদ্ধ। তাই আর চার মাস পরে, খুব সম্ভব ফাল্গুন মাসে তার বিয়ে হবে। একটু দরদ দিয়ে কথাবার্তা বললে বোঝা যায়, কী গভীর আগ্রহে সে ঐ ফাল্গুন মাসের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যে কারণেই হোক কাশী ভাই তার বাবার প্রতি খুবই অপ্রসন্ন। ওকথা শুনতে আমার কষ্ট হতো। সন্তান কোন অবস্থাতেই পিতৃনিন্দা করতে পারেন এটা আমি ভাবতেই পারি না। তাই কাশীভাইয়ের পরিবার-পরিজনের কথা নিয়ে বেশি আলোচনা পরিহার করেই চলতাম। তবু সুযোগ পেলেই ও ঘর-সংসারের কথায় ফিরে আসত।

ওর আর একটা ভয়ের কেন্দ্র ছিল বাড়ীর মধ্যকার একটি পাতকুয়ো। বিয়ে সাদীর পর ঘর-সংসার যখন পাতবে তখন যদি কোন কারণে বউ-এর সঙ্গে কখন ঝগড়াঝাঁটি হয়ে যায় তা হলে রাগের মাথায় বউটা ঐ কুয়োয় যে ঝাঁপ দেবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তখন কি উপায় হবে? কুয়োটা যে বন্ধ করে দেবে তারও উপায় নেই। বাড়ির অন্য লোকেরা আপত্তি করে। আর ভয়ের আসল কারণটা তাদের সঙ্গে খোলাখুলি বলা চলে না। তাই ও ঠিক করেছে, এ বাড়িটা বিক্রী করে দিয়ে অপেক্ষাকৃত জনবিরল পাড়া সিদ্ধ বকুলতলার দিকে নতুন একটা ঘর ওঠাবে। কলকাতায় ওর একজন ধনী বাঙালি যজমান আছেন। তাঁরা ব্যবসায় করেন। কি যেন সাহা তাদের নাম। রথের সময় এসেছিলেন। জগন্নাথের রথের 'পরে তুলে তাঁদের দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। এজন্য তখনই নগদ ৬০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছিল কাশী। ও যখন ঘর করবে তখন তারা ওকে নিশ্চয়ই মোটা সাহায্য করবেন।

কাশীভাই এখন কথায় কথায় 'জগন্নাথ শান্তি রহো' বললে কি হবে—ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিল, পড়াশুনা করতে ওর ভাল লাগত না। ছাত্রাবস্থায়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে বিনা টিকিটে কলকাতা বোম্বাই ঘুরে এসেছে। তখনকার সঙ্গীরা এখন আর কেউ নেই সাথে। এসব কথা সে অকপট সরলতায় বলে। তাই বোধ করি তার প্রতি অশ্রদ্ধা হয় নি। লেখাপড়া শিখেছে অল্প। বয়স কম বলেই অভিজ্ঞতা সামান্য—নিজের জীবিকার জন্য যে জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য তাও ওর সম্পূর্ণ হয়নি। জগন্নাথদেব সম্পর্কিত ইতিহাস বা কিংবদন্তি কিছু কিছু আয়ত্ত করেছে কিন্তু জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য যথাযথভাবে উপস্থিত করতে পারে না। অনেক কথার উত্তরে বলে, শুনে এসে বলব। জেনে নেবার আগ্রহ আছে তার। কিন্তু কোথা থেকে জানবে? ভীমসেন পাণ্ডাকে বলেছিলাম, আপনারা চেলাদের একটা ট্রেনিং স্কুল করুন। তিনি একটু হেসেছিলেন। কোন উত্তর দেন নি।

ভেক না হলে ভিখ্ মেলা ভার। কাশীভাই এ কথা জানে। কিন্তু তার গভীর বিশ্বাস জগন্নাথের কৃপায়। দৃঢ়তম প্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলে, 'বাবু, মিছা কথা বলিবি না। জগন্নাথ যা দিব তা ঠেকাইব কো।' আমি তার এই সরলতা ও অতলস্পর্শী বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করি বলেই অনেক ত্রুটি সত্বেও ওকে তীর্থগুরু রূপে বরণ করতে দ্বিধা করিনি। কাশীনাথ আমার বাঙালি মনকে তৃপ্ত করার জন্য

সাধক হরিদাসের সিদ্ধস্থল সিদ্ধবকুলতলা, মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের পীঠস্থান চৈতন্য গম্ভীরা এবং জগন্নাথ মন্দিরে আঙ্গুলের ছাপ খুব যত্নসহকারে দেখাল। আমাদের পুজা অর্চনায় সাহায্য করা তার কর্তব্য কিন্তু ওসব দেখাশুনার ব্যাপারটা সে এড়িয়ে যেতে পারত। সিদ্ধবকুল ও চৈতন্য গম্ভীরা দেখবার পূর্বে ও সম্পর্কে কোন আকুলতা ছিল না। আমি ওর পাণ্ডা মারফত মিলিত অন্নভোগ দিয়েছি, ওটাই এখানকার পুজা এবং তার থেকেই কাশীভাই তার প্রাপ্য পাবে। তবু ও আমাদের নিকট কিছু প্রত্যাশা করে। বললাম, তুমি কি চাও কাশীভাই? ও আমাকে ভরসা করে কিছু বলতে পারেনি। একান্তে সুধীরদাকে বলেছে "বাবু, একটা জামা-কাপড় কিনে দেবেন।" একটা জামা-কাপড় মানে গড়পড়তা বিশ টাকা। অতটার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দশটা টাকা ওকে আমরা দিলাম। বললাম, এখন এই নিয়ে খুশি হও। পরে যদি কোনদিন তোমার জগন্নাথ আমাদের বা আমাদের কোন আত্মীয়বন্ধুদের টেনে আনেন তবে তাঁরা তোমারই যজমান হবেন। মুখটা একটু ম্লান হলো কিন্তু মুখে কিছু বলে নি। 'জগন্নাথ শান্তি রহো' বলে সে আমাদের মঙ্গল কামনা করেছে। আসবার পূব মুহূর্তে প্রসাদ, পুজোর ফুল বেলপাতা এবং জগন্নাথের পরিত্যক্ত বস্ত্রাংশ এনে পৌছে দিয়ে গেছে। দুই-একটি টুকিটাকি কেনাকাটাও করে দিয়েছে হাসিমুখে। বিদেশ বিভূঁইয়ে এমন বান্ধব অর্থের বিনিময়ে কিছুতেই মিলতে পারে না। কাশী-ভাইয়ের সঙ্গে একবার পরিচয় হলে আর-একবার তার খোঁজ আপনার করতে হবেই। আপনজনের মত সে বললে গিয়ে চিঠি দেবেন বাবু। আমি বললাম কাশীভাই আমি তো ওড়িয়া জানি না, কেমন করে তোমাকে চিঠি লিখব? উত্তর দিলে: বাবু, আপনি বাঙলায় লিখবেন, এখানে অনেক বাঙালি বাবু আছেন, কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নেব। আবার প্রশ্ন করি, আমার খবর পেয়ে কি লাভ হবে তোমার? কাশীভাই বলে—লাভ কিছু নয় বাবু। জগন্নাথের কৃপায় আপনারা সুস্থ মত পৌঁছেছেন, ভাল আছেন এই জেনে আমার শান্তি হবে। এসে আমি কাশীকে আনন্দিত চিত্তেই চিঠি লিখেছিলাম।

জগন্নাথদেবের শ্রীক্ষেত্র প্রসঙ্গ শুরু করার আগে কোণার্ক ঘুরে আসি চলুন। পুরী থেকে অনেকগুলি ভাল বাস এই সময় প্রত্যহ কোণার্ক যাতায়াত করে। সরকারী টুরিস্ট ব্যুরো ছাড়া জগন্নাথ মন্দির কমিটি, মুখার্জী ট্রানস্পোর্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সুন্দর সুন্দর লাক্সারি বাস আছে। সকাল ৬৷৷টায় ছাড়ে। ফিরে আসে রাত ৭৷৷টায়। ভাড়া জনপ্রতি দশ টাকা। শিশুদের জন্য আধা ভাড়া। যতটা আসন ঠিক ততজন যাত্রীই নেওয়া হয়। এই অক্টোবর নভেম্বরে খুব ভিড় থাকে বলে সময় হাতে করে আগাম টিকিট করতে হয়। আমরা গিয়েছিলাম মন্দির কমিটির বাসে। বাসটি আরামদায়ক তবে সিটগুলি একটু ছোট। আমাদের মত ক্ষুদ্রকায় মানুষের কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু স্বাভাবিক আকারের মানুষের পক্ষে আরামে বসা শক্ত। ঘুর্ণিঝড়ের জন্য নির্দিষ্ট দিনের একদিন পরে আমরা যাই। বাস্ কর্তৃপক্ষ বাড়ি এসে জেনে গেলেন ঝড়ের মধ্যে বেরোব কি না? এদের এই সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ঝড় বর্ষার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য আধঘণ্টার মত দেরিতে আমাদের বাস ছাড়লো। বাস সাক্ষীগোপাল, পিপলি হয়ে সোজা কোণার্ক যায়। সেখানে সরকারী পান্থনিবাসে দুপুরে আহারের ব্যবস্থা থাকে। সেজন্য অবশ্য আড়াই টাকা মূল্য দিতে হয়। কোণার্ক সূর্যমন্দির ও মিউজিয়ম দেখার পর খেয়ে দেয়ে ফিরতি যাত্রা শুরু হয় বেলা একটা নাগাদ। পথে দেখানো হয় ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, বিন্দু সরোবর, কেদার গৌরী, মুক্তেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দিরদ্বয় জৈনতীর্থ উদয়গিরি, খণ্ডগিরি এবং নতুন ভুবনেশ্বর শহর।

সাক্ষীগোপাল মন্দিরটি পল্লীর অভ্যন্তরে। পথঘাটের চেহারা বাংলা থেকে খুব একটা ভিন্নরূপ নয়। মন্দিরে জুতাপায়ে প্রবেশ নিষেধ, চামড়ার জিনিসও ঢুকবে না। সুতরাং কণ্ডাকটর জানিয়ে দিলেন, জুতা ক্যামেরা ছেড়ে যান। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসুন। এখানে পাণ্ডা

অনেক। সকলেই কিছু রোজগার করে নিতে চায়। ফাঁকি দিয়ে টাকি বাঁধবার মতলব বলে একটা গ্রাম্য কথা শুনতাম। এরা সেই ধান্দায় থাকে। আমার ধারণা ওরা পয়সার জন্য ছটফট না করলেই বেশি পেতে পারে। কোন কোন পুরোহিত পাণ্ডা ভগবান্‌কে পণ্যবস্তু করে তুলেছেন বলে পাণ্ডাদের এত বদনাম। ওদের হাত এড়িয়ে গেলাম নীরব থেকে। সাক্ষীগোপাল মন্দির চত্তরে অনেকগুলো ছোট বড় মন্দির আছে। তার মধ্যে গণেশ, নবগ্রহ, ছোট গোপীনাথ ও গোপীনাথের কথা আমার স্মরণে আছে। আর একটি মূর্তি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। এটি হলো পদ্মাসনে বসা নারীর মাথায় তুলসীমঞ্চ। এঁরা বলেন পাদপদ্ম। এখানে একটি তমাল গাছ আছে। তার গোড়ায় একজন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে লোক-জনকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছেন আর পয়সা মাঙছেন। তমাল গাছ ইতিপূর্বে দেখিনি। তাই একটু বেশী সময় বোধহয় দাড়িয়েছিলাম। গাছের তখনকার মালিক আমাকে গানের দুটো কলি শুনিয়ে দিলেন—

> না পোড়াইও রাধা অঙ্গ
> না ভাসাইও জলে
> মরিলে ঝুলাইয়া দিও তমালেরই ডালে।

দুটি তমাল পাতা সংগ্রহ করে নিলাম।

সাক্ষী গোপাল নামটা কেন হলো? গোপাল কী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন? এসব ব্যাপারের ইতিহাস কি জানি না। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মুখে মুখে একটি মধুর কাহিনী এখনো ফেরে। সেটা শুনতে মন্দ লাগে না। কাহিনী আরম্ভ করার আগে একটা কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। এখানে ঠাকুরের গঠন, বেশবাস ও ধরণ-ধারণ সাধারণ মানুষের মতই।

এখানকার দুজন ব্রাহ্মণ, একজন বয়স্ক অন্যজন যুবা—একজনকে বলা হয় বড় বিপ্র, অন্যজনকে বলা হয়েছে ছোট বিপ্র,—একদা বৃন্দাবন ধামে তীর্থ করতে যান। সেখানে বড় বিপ্র গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েন। তখন ছোট বিপ্র ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। এতে বড় বিপ্র খুশি হয়ে বৃন্দাবনের গোপালের সামনে ছোট বিপ্রকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সামাজিক কারণে বড় বিপ্রের পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়জনেরা এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারলেন না। তখন ছোট বিপ্র বললেন, গোপালের সামনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তোমরা ভঙ্গ করবে? বড় বিপ্রের পুত্রেরা ছোট বিপ্রকে বললেন, গোপাল যদি সাক্ষ্য দেন তবেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। ছোট বিপ্র আবার বৃন্দাবনে গেলেন। ধরলেন খুব করে গোপালকে। গোপাল কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে সম্মত হন না। যাই হোক, শেষ মেশ গোপাল এক মাত্র শর্তে ছোট বিপ্রের সঙ্গে আসতে স্বীকৃত হলেন। শর্তটি হলো, ছোট বিপ্র আগে আগে যাবেন, গোপাল চলবেন পিছন পিছন। কেমন করে বুঝা যাবে ঠাকুর আসছেন কি না? কেন, পায়ে তো নূপুর আছে। তাঁর নূপুর-নিক্কণ থেকে জানবে ঠাকুর আসছেন পিছন পিছন। কিন্তু হ্যাঁ, পেছনে তাকানো মাত্রই কিন্তু ঠাকুর সেখানেই নিশ্চল পাথরের মূর্তি হয়ে যাবেন। বিপ্র তাতেই রাজি। সারা পথ নূপুরের ধ্বনি শুনতে শুনতে এসেছেন সেই বৃন্দাবন ধাম থেকে ওড়িশা পর্যন্ত। সাক্ষীগোপালে এসে সে নূপুর-ধ্বনি থেমে গেল। কিন্তু কেন? ঠাকুর কি ঘরের দোরে এসে পালিয়ে যাবেন? ছোট বিপ্র বিচলিত বোধ করলেন। তাঁর খেয়াল হলো না, বালুময় পথে চলতে ঠাকুরের নূপুরে বালি ভরে গেছে, পা অনেকটা বালুর তলায় ঢুকে যাচ্ছে, তাইতো নূপুর আর ঝংকার তুলতে পারছে না।

বুদ্ধিভ্রংশ না হলে তো বিপদ্ ঘটে না। বিপ্র গোপালের সন্ধানে যেই মাত্র পেছনে ফিরেছেন অমনি সেই দাঁড়ানো অবস্থাতেই গোপাল নিশ্চল পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন। সারা দেশে হৈ হৈ পড়ে গেল, গোপাল সাক্ষ্য দিতে এসেছেন। সেখানেই মন্দির নির্মিত হলো। ভোগরাগ পূজা আরতির আয়োজন হলো। নাম হলো সাক্ষী গোপাল। এ কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। ঠাকুরকে আমরা আমাদের প্রতিদিনকার রাগ অনুরাগ আনন্দ বেদনার সাক্ষী করে

নিয়েছি। আমাদের মানবীয় প্রেম প্রীতি ঠাকুরকে কেন্দ্র করে অলৌকিক কাহিনী হয়ে আজও লোকমুখে ফেরে। এর কতটা ইতিহাস আর কতটুকুই বা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা রচিত তা অবশ্যই বিতর্কিত ব্যাপার। এ কথা স্বীকার করেও বোধ করি নির্ভয়ে বলা চলে, ভগবান্ এবং ভক্তের এই একাত্মতা ও পারস্পরিক নির্ভরতার স্বর্ণসূত্রে ভারতীয় হিন্দু মন সেই হিমালয়-শিখর থেকে বঙ্গোপসাগরের তটভূমি পর্যন্ত একই ভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। আর এই মানসিক ঐশ্বর্যের জন্যই ভারতবর্ষ ইতিহাসের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সহস্র সহস্র দুর্যোগ অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে এসেছে বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না।

সাক্ষীগোপাল থেকে বাস এসে দাঁড়ালো একটি ক্ষুদ্র বাজারের মত জায়গায়। নাম তার পিপলি। যাত্রীরা এখানে জলযোগ করে নেন। সরকারী টুরিস্ট ব্যুরো থেকে যে প্রচারপত্র দেওয়া হয়েছিল তাতে লেখা আছে : A prosperous village popular for the typical applique work on colourful cloth. আশেপাশেই দেখা গেল নানা রঙের কাপড়ের টুকরো বসিয়ে বসিয়ে চন্দ্রাতপ জাতীয় জিনিস তৈরি করছেন কেউ কেউ। চা পর্ব শেষ হলেই বাস আবার চলতে শুরু করলো।

আমরা কোণার্ক চলেছি। সুন্দর পাকা রাস্তা। চারিদিকে ঝোপঝাড়, অগণিত নারকেল গাছ আর দিগন্তপ্রসারিত সবুজ ধানের সজীব সমারোহ। গতকাল পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি ও ঘূর্ণি ঝড় ছিল। ঝড়ের ফলে এদিকে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। তবে বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। ধান ক্ষেতে বোধ করি প্রয়োজনাতিরিক্ত জল জমে গেছে। সর্বত্রই দেখা গেল চাষী ভাইরা ক্ষেতের জল সরানোর কাজ করছেন। সেই স্রোতের জলে বোধ করি মাছও আছে যথেষ্ট। বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি বোচ্‌নো জাতীয় একপ্রকার বিচিত্র মাছ ধরার যন্ত্রের ব্যবহার এখানে প্রচুর। জলস্রোতের মুখে এগুলি শক্ত করে বসিয়ে রাখা হয়। জলের টানে মাছগুলি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বোচনোর মধ্যে ঢুকে পড়ে। কিন্তু মুখটা এমন করে তৈরি যে চেষ্টা করেও তারা আর বেরোতে পারে না।

পথ চলতে আমরা একাধিক বালুগর্ভ ছোট নদী পার হলাম। আমাদের অগ্রজেরা কোণার্ক গিয়েছেন গরুর গাড়িতে। তখন না ছিল পাকা পথ, না মোটর যান। শীতকালে গরুর গাড়ি আরোহী সমেত নদী পার হয়ে যেত। তখন নদীগর্ভে খুব কমই জল থাকতো। এখন দেখলাম্ নদীতে জল বেশ। লোকে জাল দিয়ে মাছ ধরছে। বাংলা দেশে যেমন খেপলা জাল দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এ জালগুলি তেমন নয়। এগুলি দেখতে অতিকায় পোলোর মত। এটলাস্ সাইকেলের ট্রেডমার্ক এটলাসকে যেমন ভঙ্গীতে পৃথিবী ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, এরাও ঠিক তেমনি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাসটা আমাদের সমান গতিতে চলছে। রাস্তা জনবিরল। অন্য মোটরযান বিশেষ নেই। দু-এক স্থানে পথ প্লাবিত। পথের পাশে সামান্য কয়েকটা গ্রাম মাত্র চোখে পড়লো। সেগুলি দৃশ্যতঃই দরিদ্র পল্লী। মধ্যে দু-একটি হাটবাজার পড়ে। চা, পান বিড়ি, মুদি মনোহারি দোকান, ডাক্তারখানা ইত্যাদি সর্বত্রই যা দেখা যায় এখানেও তাই। বাড়তি ব্যাপার হলো, পাকা কলা ও নারকেলের প্রাচুর্য। মধ্যে মধ্যে ঝাউবন, সযত্ন রচিত ঝাউবন দেখা গেল। ঝাউ গাছ এখানে সরল রেখার মত আকাশে উঠে গেছে। এমন ঝাউ গাছ আমি ইতিপূর্বে দেখি নি। দৌলতপুর কলেজে কয়েকটি ঝাউ গাছ ছিল। প্রত্যেকটিই তার বট গাছের মত বিশাল। ছোট বেলা থেকে এগুলি দেখতে দেখতে ঝাউগাছ সাপর্কে আমার ঐ রকম ধারণা হয়েছিল। তাই নতুন ঝাউ গাছের এই নতুনত্ব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

মধ্যাহ্নের কিছু আগে আমরা কোণার্ক পৌঁছিলাম। আগে কয়েকখানি যাত্রী বাস ও ট্যাক্সি এসে পৌঁছে গেছে। সরকারী পান্থনিবাসের পোর্টিকোতে আমাদের

নামিয়ে দেওয়া হলো।—পুরীর সকলেই সহজে বাংলা বলতে পারেন। কনডাকটর ভাই বাংলায় জানিয়ে দিলেন—আগে খাবার ব্যবস্থা করবেন, নইলে পরে পস্তাবেন। পুরী থেকেও এ কথা আমরা শুনে এসেছিলাম। নেমেই পান্থনিবাসের ভেতরে খাবার সন্ধানে গেলাম। সুসজ্জিত আবাসিক হোটেল। মোটামুটি অল্প ভাড়ায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। ঘরগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আরামপ্রদ। খাবার নানা শ্রেণী বিভাগ আছে। দামও রকমারী। এখানে টাকা জমা দিয়ে আমরা কোণার্কের দিকে পা বাড়ালাম। অলক নামে একটি ছেলে গাইড হতে চাইল। বহু বর্ষ ধরে কোণার্ক দেখার বাসনা পোষণ করে আসছি। তাই কোণার্ক ভূমিতে প্রবেশ-মুখে আমি দারুণ উত্তেজনা বোধ করছিলাম।

অলক ভাইকে হ্যাঁ না কিছুই বলি নি। সেও আমাদের পিছন পিছন আসতে শুরু করল। ক্রমশঃ

শোক সংবাদ

গত ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭২ প্রখ্যাত কৃষি-বিশেষজ্ঞ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। সাবোর কৃষি কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি অবিভক্ত বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং সহকারী উন্নয়ন কমিশনার রূপে ১৯৪৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে কৃষিকর্মে উৎসাহী করিবার জন্য তিনি বিভিন্ন কার্যকর পরিকল্পনা রচনা করেন এবং কৃষির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য শ্রী মিত্র স্বগ্রাম আঁটপুরে কৃষি মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেন। রাজ্যপাল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এই মেলায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র কৃষি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মূল্যবান্ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং "খাদ্য উৎপাদন" শীর্ষক একটি কৃষি পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউ পত্রিকার সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ৬০ বৎসরের অধিক। কলেজের ছাত্রাবস্থায় মর্ডান রিভিউ ও প্রবাসী পত্রিকায় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার স্নেহের সম্পর্ক ছিল। প্রবাসীর রামানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কৃত স্মৃতিচারণ এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। কৃষি বিষয়ক, পল্লীগ্রামের সমস্যা বিষয়ক বহু প্রবন্ধ তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি পত্রিকার তিনি ছিলেন লেখক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকালটির প্রাক্তন সদস্য দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বহুবিধ জন হিতকর ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৩।

সুভাষচন্দ্রকে যেমন দেখেছিলাম

কিরণশশী দে

শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার পর ভারতীয় চিত্রকলা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার কাজে আমন্ত্রিত হয়ে আমি সিংহলে যাই ১৯৩৬ সালে। সেখানে বৎসর দুই কাটিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসি। অতঃপর বোম্বাই ছিল আমার কর্মস্থল। বোম্বাই বাসকালীন, যতদূর মনে পড়ে ১৯৩৯ থেকে ৪০ সালের মধ্যে একদিন, বাবুলনাথ রোডের কোন এক বাড়িতে গান শেখাতে গিয়ে সেখানে অপ্রত্যাশিত ভাবেই শ্রদ্ধেয় সুভাষচন্দ্র বসুর দেখা পেয়েছিলাম। এগিয়ে এসে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে আপনজনের মত সস্নেহে নিজের পাশের আসনে টেনে বসালেন। ঐ জায়গায় আগে থেকেই আরো জনকয়েক (ওঁরা সবাই অবাঙ্গালী) পুরুষ ও মহিলার ভিতর ঘরোয়া কথাবার্তা চলছিল, কখনও ইংরেজিতে কখন বা হিন্দীতে। তাই কোন এক ফাঁকে খুব নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম: আমাকে কি চিনেছেন আপনি ?

'কলকাতায়ই দেখেছি মনে পড়ছে'—অল্পক্ষণ থেমে, ভেবে আবার বললেন: 'হ্যাঁ, সেই কংগ্রেসের সময়, —না? আমার সঙ্গে একবার দেখাও করেছিলেন।'

অতি সামান্য ব্যাপারে এমনতর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি বস্তুত বিস্ময়ে অভিভূত; —আরো এই ভেবে যে, মনে রাখবার মত এমন কে-ই বা আমি। তাছাড়া খুব কি আলাপ-পরিচয় হয়েছিল ওঁর সঙ্গে। কৈ, আমার ত মনে পড়ে না।

এখানে পাঠকদের কিছুটা পিছনে তাকাতে অনুরোধ করব......

বাংলাদেশে ইংরেজি দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' ছিল এককালে। ছেলেবেলায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২১ সালে) দেখেছি, আমার বাবা ছিলেন ঐ পত্রিকার গ্রাহক। পরবর্তীকালে বোধকরি সেটাই 'লিবার্টি' নামে চলত। এর খবর আমার তেমন জানা নেই। তবে উক্ত কাগজে কোনো একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। বড় হয়ে কলকাতায় যখন পড়তে এলাম,—সেই কাগজ সংক্রান্ত কি এক বিষয় নিয়ে (অন্যের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে) বাবা আমাকে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাতে নির্দেশ ছিল, আমি যেন সুভাষচন্দ্র বসু মশায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে তাঁর পত্রে উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করি। গিয়েছিলাম পর পর দুই দিন তাঁদের উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে। এসব, সেই কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের যে প্রস্তুতি চলছিল—তার মাস কয়েক আগের ঘটনা।...প্রথম দিন, আমি বাবার লিখিত পত্রের প্রয়োজনাংশটুকু পড়ে শুনিয়েছিলাম এবং মুখেও সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলাম আরো অনেক কথা। জবাব পেলাম: 'ঠিক আছে। এ বিষয়ে আমি সিলেটেই জানিয়ে দেব 'খন।'—এইটুকু বলেই সুভাষচন্দ্র ভিতরে চলে গেলেন; আমার সঙ্গে কোন আলোচনা করা ত দূরের কথা ফিরেও তাকালেন

না আর। আমার অনেকগুলি কথার বিনিময়ে অতি সংক্ষেপে জবাব সেরে বিদায় নিলেন তিনি—এটুকু ভাবতে গিয়ে সেদিনকার তরুণচিত্ত স্বভাবত কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছিল বৈকি। তবু কেন জানি তাঁর প্রতি এক অসম্ভব রকমের আকর্ষণ অনুভব করলাম।—সেই টানে পরের দিনই আবার গেলাম তাঁর কাছে। তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে করে হতাশ মনে ফিরে আসছিলাম; তক্ষুণি গাড়ি এসে ঢুকল গেটের ভিতর। আমাকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারলেন, বললেন: 'আমি ত লিখে দিয়েছি।'

ব্যস্, ফুরিয়ে গেল সব কথা। হায় রে—তাঁর চিঠি লেখার ব্যাপার নিয়ে যে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, আর আমি ত আজ সেজন্যও আসিনি—সেটা তাঁকে বোঝাব কি করে। তাই বাড়িতে ঢোকবার মূল পথে প্রশস্ত সিঁড়ির উপরেই নির্বাক্ নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম—তাঁর সুন্দর সুগম্ভীর শান্তোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে। বোঝা যাচ্ছিল তাঁর ব্যস্ততার অন্ত নেই—তবু এরই ভিতর মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন: 'কি। আর কিছু বলবে?'

সত্যই ত কত কিছু বলব বলে তৈরি হয়ে এসে-ছিলাম, কিন্তু এবার সব যে হঠাৎ কি রকম এলোমেলো হয়ে গেল। ঢোঁক গিলে কোনোক্রমে বললাম: 'শুনেছি আসছে কংগ্রেস অধিবেশনে ভলানটিয়ার্স নেওয়া হবে,—আমি কি ওতে যোগ দিতে পারব?'

'তুমি কি পড়?' আমার সম্পর্কে কিছু না-কিছু জানতে চেয়েছিলেন সেই খুশির আতিশয্যে বলে গেলাম একটানা—কি পড়ি, কোন্ কলেজে পড়ি, থাকি কোথায়। থাকতাম তখন ভবানীপুর—নফর কুণ্ডু রোডের ৪নং বাড়িতে—শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর অতি নিকট প্রতিবেশী ছিলাম আমরা। অর্থাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়েই সামনের রাস্তাটি পূব মুখো হয়ে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ওপর গিয়ে যেখানটায় মিশেছে—ঠিক ঐ কোণে একটি ভাড়াটে বড় বাড়িতে বাসন্তী দেবী থাকতেন তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে। আরো জানা ছিল,—হয় স্কটিশে নয় ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর এক্সপেরিমেন্ট্যাল সাইকোলজির ক্লাসে কিছুকাল আমার কাকামশায়ের সহপাঠী ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু,—তা সঠিক ভাবে বলতে না পারলেও ঘনিষ্ঠতা লাভের প্রত্যাশায় নিজের সমস্ত খবরের সঙ্গে এটুকুও তাঁকে সযত্নে পরিবেশন করলাম।

এ সব শুনে সুভাষচন্দ্র যে কি ভেবেছিলেন বলতে পারব না। তবে, নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় তিনি আমাকে এক ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন—পুজোর ছুটির পর যেন সেখানে যাই। কলেজের আরো অনেক ছেলেরা থাকবে। তিনিও ওদের বলে রাখবেন আমার কথা। কিন্তু দৈহিক উচ্চতায় মনোনীতদের সংজ্ঞায় আমি নাও পড়তে পারি; তাহলেও আশ্বাস দিলেন, একটা সুযোগ আমাকে দেওয়া হবে সেখানে গেলে পর। এই সূত্রে আমার নামটিও জিজ্ঞেস করে জেনে রাখলেন তিনি।

তারপর-পুজো এল, পুজোর ছুটিও শেষ হল। ইতিমধ্যে আমার উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে অনেকটা। তবু একদিন বিকেলবেলা খুঁজে পেতে সেই ঠিকানায় হাজির হলাম। সামনে যা দেখলাম,—বাস্তবিক আমার তখনকার অল্প বয়সের অভিজ্ঞতায়—সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য—প্রাণমাতানো ত বটেই। যেন কোন বিরাট মহোৎসবের আয়োজন চলছে—পার্ক সার্কাসের নূতন ময়দানে,কলকাতার প্রশস্ত রাস্তার বুকে কি দুর্দমনীয় উদ্যম নিয়েই না ভলান্টিয়ারদের গড়ে তুলছিলেন সুভাষচন্দ্র;—আমি শুধু নিঃশব্দে দূরে দাঁড়িয়ে ডাইনে-বাঁয়ে, সম্মুখে-পশ্চাতে নানা দিক্ থেকে নিরীক্ষণ করছিলাম তাঁর নিষ্ঠামগ্ন আত্মস্থ গতিবিধি। তখনই সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞেস করেছিলেন, সাইকেল চড়া জানি কি না,—তাহলে সাইকেল-আরোহী ভলান্টিয়ার হিসাবেই আমাকে নেওয়া হবে—এই রকমের ইঙ্গিতও একটা পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই উচ্ছলিত প্রাণবন্ত দলের ভিতর কোনো অংশ নেবার সাহস আমার আর হল না। বুঝেছিলাম, এ তো শুধু শুধু খেলা নয়, এও একধরণের কৃচ্ছ্র সাধনা—তদুপরি সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সান্নিধ্যঅর্জন, বিশেষত তাঁর

আদর্শের মর্যাদা বহন আমার সাধ্যাতীত। সে-কথাটা অকপটে তাঁকে জানিয়ে আপনা থেকেই সরে পড়েছিলাম।...সেবারই ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক, ওরফে জি-ও-সি (এই আখ্যাটাই মুখে মুখে ফিরত সকলের) হয়েছিলেন আমাদের প্রিয় সুভাষচন্দ্র বসু। তখন ত আর আজকের মত বিশ্ববন্দিত 'নেতাজী' নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না, বয়স বোধকরি তখন তাঁর ত্রিশ পেরিয়েছে মাত্র। অতঃপর তাঁর জীবনের গৌরব-উজ্জ্বল ঐতিহাসিক কাহিনী ত সর্বদেশ- সর্বজন-বিদিত—অবশ্য সেসব আমার আলোচ্য নয়।

* * * *

এবার এখনকার কথায় ফিরে আসি।

সেই সুভাষচন্দ্রকেই কিনা ১৯২৮ সালের পর এই ১৯৩৯-৪০ সালে, অর্থাৎ প্রায় সম্পূর্ণ এগার বৎসর কাল বাদে দৈবাৎ পেলাম ঘরের লোকের মত অত্যন্ত সহজ সুন্দর নিখুঁত বাঙালীর বেশে—একেবারে কাছে—আমারই এক গুজরাতী ছাত্রীর বাড়িতে, যে প্রসঙ্গ নিয়ে এই লেখাটির সূত্রপাত।...

আগের দিন বাবুলনাথ রোডের কাছেই সমুদ্রের ধারে চৌপাটিতে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে গিয়ে ছাত্রীর জল্পনা-কল্পনা শুনেছিলাম, সে আমার পরামর্শ চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল: 'মিষ্টার বোসকে একবার কি করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই, বলুন ত স্যার ?'—কেবল এইটুকুনই। স্বভাবত ভেবেছিল সুভাষ বোসের সঙ্গে আমার চেনাশোনা আছে হয়ত। কিন্তু সে যে তড়িঘড়ি এতটা এগিয়ে গেছে আপনা থেকে, তা আমি ভাবতে পারি নি। আজ সেই ছাত্রী ইহজগতে নেই—তার কথাটিও মনে পড়ে,—সে ভালবাসত বাংলা গান বাংলাদেশের যাবতীয় কৃষ্টির প্রতি পরম অনুরাগ, সম্ভ্রম ছিল তার। তাই বাঙালী মাত্রকেই, সামান্যতম পরিচয় কিংবা সুযোগ পেলে, নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাত। বস্তুত অন্তরের এই সরল ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির গুণে সুভাষচন্দ্রকেও সে নিয়ে আসতে পেরেছিল তাঁর বাড়িতে।

স্মিতমুখে সুভাষচন্দ্র আমাকে বলেছিলেন: আপনার ছাত্রী বলে কি জানেন। যদি এক মিনিট না পারেন এক সেকেণ্ডের জন্যেও আসুন, কৃপা করে চরণধূলি দিন। বেশ ত বাংলা শিখিয়েছেন।'

এই প্রশংসায় মনে মনে খুশি হলেও কুণ্ঠা বোধ করলাম কিছুটা: "আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করবেন না"—করজোড়ে অনুরোধ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: "ওর মুখে বাংলা গান শুনেছেন, রবীন্দ্রনাথের গান ?"

আমার ছাত্রী কিন্তু এবার নিজে থেকেই গান শোনাবার আগ্রহ দেখাল, যন্ত্রপাতি সঙ্গে সঙ্গে বয়ে নিয়ে এসে বোধকরি ঐ আগ্রহেরই উদ্দীপনায় হঠাৎ বললে: 'মিষ্টার বোস, আপনি কেন কবিগুরুর আশ্রমে চলে গিয়ে সেখানে থাকেন না, গুরুদেবেরই সাথে ?'

প্রশ্ন শুনে সুভাষচন্দ্র আমার প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরবে তাকালেন মাত্র, অর্থাৎ এ কিসের ইঙ্গিত; আমি এ নিয়ে ওকে কিছু বলেছি কি-না। হয়ত বা বলে থাকব, কেননা শুনেছিলাম গুরুদেব তাঁর আশ্রমের ভার নিতে সুভাষবাবুকে একবার অনুরোধ করেছিলেন। সংবাদটা মুখে মুখে তখন বেশ ছড়িয়েও ছিল সেই বোম্বাই পর্যন্ত—এর মধ্যে তথ্য-প্রমাণ কতটুকু আছে ঠিক জানতাম না। তাই জানবার ইচ্ছায় এই সুযোগে পরিষ্কার ভাবেই বললাম: 'ওরা তো হামেশাই শান্তিনিকেতনে যাওয়া-আসা করে, হয়ত সেখানেই এ নিয়ে কথাবার্তা কিছু শুনে থাকবে। আপনি ওকেই জিজ্ঞেস করেন না কেন।'

সুভাষচন্দ্র নীরব হাস্যে একথা এড়িয়ে গিয়ে কেবল মাত্র বললেন: 'যাব মা, সময় হলেই যাব। কিন্তু এর আগের কাজগুলি সব গুছিয়ে নিই।'

'বাঃ তাহলে খুব ভালো হয়, আমরা সবাই দল বেঁধে চলে যেতে পারি শান্তিনিকেতনে' বলতে বলতে

এবার মাষ্টারের দিকে তাকিয়ে ছাত্রী একটু জোর দিয়ে বললে : 'Sir, you should also accompany us'—আর তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে কে সঙ্গী হবার সম্ভাবনা—খুশি হয়ে সেই নামের একটা লম্বা ফিরিস্তি তক্ষুণি তৈরি করে ফেলল মুখে মুখে।

তার এই কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে সুভাষচন্দ্র মৃদু মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না।

এমনি ধরণের আরো সামান্য আলাপ-আলোচনার পর গান শুরু হল,—ছাত্রী মাষ্টার উভয়েরই। মনে আছে আমাদের প্রথম গানটা ছিল: 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী।'

মুহূর্তে শ্রোতার ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম। খানিক আগে কথাপ্রসঙ্গে যিনি তাঁর ছেলেবেলায় মিশনারীদের (?) স্কুলে গান শেখার গল্প শোনাচ্ছিলেন হাসতে হাসতে, বলছিলেন : সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি এসবের পরিবর্তে কী কৃত্রিমরীতিতেই যে ইংরেজি উচ্চারণে ডো (doh) রে (Ray)-মি (Me)-ফা (Fa)-সো (soh)-লা (lah) টি (te) ইত্যাদি শিখতে হয়েছিল তাঁকে,-সে সব জায়গায় নাকি আবার প্রার্থনা-সঙ্গীত হিসাবে God save the King গাওয়া হত। সুভাষচন্দ্র নিজে গাইতে পারতেন কি না কা কিছু বলেন নি, আমারও জানা নেই। তবে নানা দেশের সংগীত যে বেশ মনোযোগ সহকারে শুনে এ নিয়ে রীতিমত চিন্তা করতেন এর প্রমাণ পেয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম যখন তিনি সেদিন কথায় কথায় অতি সহজভাবেই বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাদের ভারতীয় সংগীতে গায়কদের স্বরক্ষেপণ প্রণালী যেমন স্বাভাবিক—অন্য দেশে কিন্তু তেমন নয়, ওরা অনেকটা কৃত্রিমতা-প্রিয়। এই রকমের আরো কত গল্প শুনছিলাম, আমাদের গান আরম্ভ করার আগে তাঁরই মুখ থেকে।... এবার সন্দেহ হল, সেই বক্তাই কি আমাদের গানের শ্রোতা! আগে বিস্মিত হলাম, 'অয়ি ভুবনমনো-মোহিনী' গানটি শুনতে শুনতে তাঁর চোখদুটি ক্রমশঃ জলে ভরে উঠছিল দেখে।...এর পরেও আরেকটি গান গাইলাম : 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে।'

গান থামলে পর শুনলাম তাঁর শান্ত ধ্যানমগ্ন কণ্ঠস্বর : "ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র' কবি ডি-এল-রায়ের এ গানটি শিখিয়ে দিয়ো তোমার ছাত্রীকে।"

এবার তাঁর উঠবার সময় হল।

তবু এরই মধ্যে একটা প্রশ্ন করার অনুমতি চেয়ে নিলাম। আমার বক্তব্য ছিল এই: আচ্ছা মনে করুন, আমরা বৃটিশকে তাড়িয়ে দিলাম এখান থেকে তারা নিষ্ঠুর শাসক—চলে গেল। ওদের হাত থেকে সবাই রেহাই পেলাম, এটা কার না কাম্য। কিন্তু তার পরেও ত প্রয়োজন আছে দেশ শাসনের; তখন শাসনকর্তা হবেন কারা? শুনেছি, সত্যযুগেও দেশ শাসিত হত একটা কঠিন রীতি ও শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে। সেই বোধ সম্পর্কে আমরা কি সত্যিই সচেতন? যদি আমরা নিজেরাই শাসন করতে চাই তাহলে সে রকমের শিক্ষা, সে যোগ্যতাই বা আমাদের কতটুকু। এত দলাদলি ভেদা-ভেদ ঝগড়া মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, এমনিতর কত অসংখ্য ক্ষুদ্রতা হীনতা আমাদের মনের মধ্যে জমে আছে সে-সব কি আর রাতারাতি নির্মূল হতে পারে কখনও? আত্মদোষ চেপে রেখে প্রকাশ্যে গায়ের জোরে নিজ নিজ ত্রুটি অস্বীকার করতে পারলেই কি আর আমরা সবাই নিষ্কলুষ সাধু হয়ে উঠতে পারব, আপনার কি তাই মনে হয়?'

'অ্যাঃ, এইভাবে কি বলতে আছে'—অবিকল এই কথাটি বলে তিনি আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন। আমাদেরই গোড়ায় গলদ, এ-নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করার যে একটুখানি স্পর্ধা জেগেছিল তা আর মাথা-চাড়া দেবার অবকাশ পেল না।

স্পষ্ট দেখলাম, যেন এক নিষ্ঠুর আঘাতে ধ্যান ভঙ্গ হল তাঁর।......অপ্রস্তুত হলাম আমি। আরো এই জন্যে,তাঁর প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমারই প্রগলভতামণ্ডিত কথা শুনে বিষাদে ম্লান হয়ে উঠল বলে।......আমি ত মোটেই ভাবতে পারি নি যে, এই কথার ভিতরেও আছে রাজনীতির ছায়া—তাই বোধকরি, যার যে

কাজ নয় সে-কাজ অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত চিত্ত নিয়ে করতে যাবার চেষ্টাতেই বিশৃঙ্খলা জন্মে, ছোট বড় সব কাজের ব্যাপারে ঐ একই যুক্তি প্রযোজ্য, এটুকু আমাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি ক্ষণিকের জন্য খেদ প্রকাশ করেছিলেন। আমি ভাবছিলাম, প্রশ্ন করার অনুমতি নিয়ে এ প্রসঙ্গটি এখানে না তুললেই হয়ত ভাল হত। কিন্তু তাহলে যে আবার পরবর্তী উপদেশটুকু পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম।

সুভাষচন্দ্রের সেই সময়কার উক্তির হুবহু অনুলিপি সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি, তবে সারমর্ম বেশ মনে আছে। তিনি শান্ত গলায় বলছিলেন: 'মনে রেখো রাজনীতি শিখতে হয়, তারও পাঠ নিতে হয় দীর্ঘকাল গুরুর কাছে গভীর শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা নিয়ে—যেমন করে এই গান-বাজনা তোমরা শিখেছ;—কত বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়েই না সাধনা করে আসছ নানা শিল্পের,—তেমনি করে। তার জন্যে সৎগুরুর প্রয়োজন। তা নৈলে নোংরামি এসে পড়ে।'—বলেই কথার মোড় ফিরিয়েছিলেন: 'তোমরা শান্তিনিকেতনের ছাত্র—বিশ্বকবির সান্নিধ্য পেয়েছ। যতদূর পার, তাঁর মন্ত্র মেনে চলবে—তাঁর কবিতা, তাঁর গান দিয়েই সেবা করবে মাতৃভূমির,—এতেই কাজ দেবে প্রচুর।'

......কথা শুনতে শুনতে ওঁর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসেছিলাম। ইতিমধ্যে আরো দুই একটি কথা তিনি কি বলেছিলেন—সে-সব যথাযথ মনে করতে পারছি না। তাছাড়া তাঁর তদানীন্তন অনুগামীদের সুরের সঙ্গে সুর মেলাবার অক্ষমতা আমাকে সেখানে কেমন যেন একটু সংকুচিত করে রেখেছিল।

যাই হোক—এর পর সময় কেটে গেছে ত্রিশ বৎসরের বেশি।......আজ সেই অতীত স্মৃতি খুঁজতে গিয়ে শুধু মনে পড়ে,—তাঁকে প্রণাম করে সেদিন বিদায় নেবার কালে আমার কাঁধে হাত রেখে তিনি বলেছিলেন:

'আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
ওরা যতই গর্জাবে ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে, মোদের
তন্দ্রা ততই ছুটবে!'......

গাড়ি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে চোখের বাইরে চলে গেল।......আর তাঁকে দেখবার সুযোগ পাইনি কখনও।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙ্গে যায়। আশ্চর্য্য একটা সুর। একটা গানের সুর। ছোট্ট সোনালী পাখীর মত, মিষ্টি সুর শুধু ভেসে আসছে। যেন দূরাগত কোন বাঁশীর ধ্বনি—সবটাই স্পষ্ট কানে আসে না। সুরের মায়াজাল সবখানে ছড়িয়ে যায়। এখন তো সব নিস্তব্ধ, বাইরে অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া। অন্ধকারের বুকে সাদা ধোঁয়াটে আলো সামান্যভাবে প্রকাশ হচ্ছে। ঠিক যেন সাদা ফুলের কুঁড়ি। অবরুদ্ধ সেই কুঁড়িটা এখনই দল মেলবে। অর্দ্ধস্ফুট ভোরের কুঁড়ির ভেতর লুকিয়ে রয়েছে দিনের সবটুকু আলো। অভয় কাৎ হয়ে শোয়। আরও স্পষ্ট করে শোনার জন্য জানালাটা অল্প খুলে দেয়। ঠিক তেতলার কোন ঘর থেকে, ভেসে আসছে গান। এ মিনতিরই গলা—। বাঃ বেশ গায় তো—ভারী মিষ্টি গলা।

একরূপ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে, অভয় গান শুনতে থাকে। মধুক্ষরা গলায় কী অমৃতঝরা সুর। গলার শোভাই বা কি মনোহারী। অভয় তন্ময় হয়ে যায়। সব চিন্তা ভাবনা, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, এই সুরের মায়াজালে ডুবে যায়। এ যেন এক বিস্ময়। তারপর আস্তে আস্তে এক সময় গান বন্ধ হয়ে যায়। অভয় আবার শুয়ে পড়ে। ভোরের স্বল্প আলো ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে যায়। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ীর শব্দ হয়—ওদিকে ঝি-চাকরদের কাজ শুরু হয়েছে। রান্নাঘরের বারান্দায়, উনুনের ওপর প্রকাণ্ড কেটলিটা বসান রয়েছে। চায়ের জল টগবগ্ করে ফুটছে। তৈরী হবে ভোর বেলাকার চা। ভোর বেলাকার এই চা-টা অভয়ের ভারী ভাল লাগে। মিঠুয়া চা তৈরী করতে ওস্তাদ।

বাহিরে এখন বেশ পরিষ্কার। সকালের রাস্তা একরূপ এখন জনহীন। রাস্তার ওধারে মালোপাড়ায় মালোরা কোলাহল করছে। সারারাত নদীতে মাছ ধরে এখন সব বাড়ী ফিরছে। মাছ চলে যাবে বাজারে। ওরা মাছ বাছাই করছে, জাল রোদে দিচ্ছে। অভয় চুপ করে সব দেখতে থাকে। ওদের কর্মব্যস্ততা দেখতে অভয়ের খুব ভাল লাগে। মালোরা সারারাত ছিল নদীতে। নৌকার দাঁড় টেনেছে—মাছ তুলেছে—জাল ফেলেছে। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মধ্যে ওদের কত আনন্দ। অভয় আশ্চর্য্য হয়ে যায়। চা খেয়ে পড়তে বসে। কিন্তু পড়াতে মন বসে না। শান্তির কথাই মনে হয়। না জানি ছেলেটা কেমন আছে। আশা তো কিছুই নেই। একটা গভীর ঘুমের মধ্যে, শান্তি যেন ঘুমুচ্ছে। চেতন-অচেতন অবস্থার মাঝে, অতি ক্ষীণ প্রাণধারাটি শুধু দোল খাচ্ছে। কখন যে ছিঁড়ে যাবে, সেই অতি সুক্ষ্ম সুত্রটি তা কে জানে। একবার সেই যোগ সূত্রটী ছিঁড়ে গেলে, এই জগতের সঙ্গে তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হ'বে। অভয় ভাবে, ঐ প্রাণধারাটি কি একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি? আমরা তো ঠিক ঐ শান্তিকেই ফিরে পাব না—ঠিক ঐ চেহারা, ঐ স্বভাব? যে অদৃশ্যপ্রাণ ধারাটি সর্ব লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য থেকে, ওর দেহে প্রবহমান, তার পরিণাম ভেবে লাভ কি? সেই অদৃশ্য সুক্ষ্ম প্রাণধারায় যে গতিই হোক না কেন, তাতে ইহজগতের কি লাভ বা কি ক্ষতি।

অভয় হঠাৎ চমকে ওঠে। এ কি, মিনতি যে। একটা খাতা আর পেনসিল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

—কি ব্যাপার—

মৃদু হেসে, মিনতি বলল, এই অঙ্কটা মিলছে না।—বুঝিয়ে দিলে ভাল হয়।

—মিলছে না? কই দেখি—

অভয় বোঝাতে থাকে। এ তো কঠিন নয়। ৫ জন পুরুষ ও ৯জন বালক একত্রে ১১ দিনে যে কাজ করতে পারবে, তখন ৯জন পুরুষ ও ১২ জন বালক কত দিনে সেই কাজ করবে? এই তো—এখানে দেওয়া রয়েছে, ২ জন পুরুষের কাজ, ৩ জন বালকের কাজের সমান। তার মানে ৩জন বালকের কাজ=২জন পুরুষের কাজ। অতএব ১জন বালকের কাজ, সমান ২ এর ৩ জন পুরুষের কাজ……অভয় অঙ্ক বোঝাতে থাকে। মিনতির মাথা অঙ্কের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়েছে, ওর মাথার চুল থেকে, অতি ক্ষীণ সুগন্ধ ভেসে আসে। বাতাসে চূর্ণ চুল এলোমেলো হয়ে যায়, দুএক গাছি চুল ওর মুখে এসে পড়ে। অঙ্ক বোঝাতে বোঝাতে অভয় মিনতির মুখের দিকে তাকায়। চোখে চোখ রেখে বোঝাতে থাকে। মিনতির মুখে এক অদ্ভুত সলজ্জ হাসি। সাদা সাদা দাঁতগুলি ঠিক মুক্তোর মত। পুরন্ত ফরসা গালে লালের আভা আর দুই চক্ষুপল্লব ভারাতুর। এত ঘনিষ্ঠভাবে, এত কাছ থেকে অভয় মিনতিকে দেখেনি। কয়েক মিনিটের মধ্যে অঙ্ক শেষ হয়ে গেল।

অভয় বলল—কি, বুঝলে তো—। মাথা হেলিয়ে মিনতি বলল, হাঁ কিন্তু আরও কটা অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে হবে। আমাদের দিদিমণি ঠিকমত অঙ্ক বোঝাতে পারেন না। উত্তরটা অবশ্য হয়, কিন্তু আমাদের বুঝতে ঠিকমত পরিষ্কার হয় না।

অভয় মিনতির পানে চেয়ে থাকে। অভয় বলে, ভোরবেলায় গান করছিলে, নয় কি? খুব চমৎকার—ভারী ভাল লাগছিল—

—সত্যি? আমি তো ভাবি, গানের জন্য বুঝি অন্যকে বিরক্ত করছি—ভোরের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম—

—না—না। ঘুম ভাঙ্গবে কেন? কি যে সুন্দর গলা। আমার খুব ভাল লাগে—

—সত্যি—।

—হাঁ। আমার কি যে ভাল লাগে—আমি রোজ কান পেতে থাকি। অঙ্ক আরো শিখিয়ে দেব কিন্তু তার বদলে—

মিনতি ওর মুখের দিকে তাকায়, তারপর চুপি চুপি বলে, তার বদলে কি চাই? দুই চোখ মেলে, অভয়ের মুখের দিকে তাকায় মিনতি।

—রোজ গান শোনাতে হবে—

ওঃ। তা বেশ—খাতাখানা নিয়ে উঠে যায় মিনতি—।

অভয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়, হঠাৎ মিনতি এখানে এল কেন? জেঠাইমা কি তাকে অনুমতি দিয়েছে? হয়তো বা বলেছেন। একই বাড়ীতে তারা থাকে, আর সে পরও নয়। তবু সে এ বাড়ীতে থাকে, ঠিক পরের মতন। বাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার মেশামেশি নেই। পরের মতন বাইরের ঘরে থাকে, চাকর-বাকরদের খাওয়ার মতই তার ভাগ্যে সেই ভাত ডাল জোটে। অবশ্য এর বেশী সে আশাও করে না। এই বিভেদ, পার্থক্য সে বুঝতে পেরেছে। এর একমাত্র কারণ সে গরীব। তার বাবা গরীব। ওঁদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা থাকলেই বা কি? অর্থের মাপকাটিতে তারা অনেক উঁচু, আর অভয় সে তুলনায় অনেক নীচে। এ জগতে একমাত্র টাকাই তো, কুলীন অ-কুলীন, আপন পর প্রভৃতির মাপকাটি। সেই মাপকাঠির মাপে, তারা সত্যই অ-কুলীন বৈকী। এতে দুঃখ বা রাগের বা অভিমানের কিছুই নেই। আজ যদি তারা হঠাৎ ভাগ্যক্রমে বা দৈবানুগ্রহে অর্থশালী হয়ে ওঠে, তবে এই পার্থক্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাবে। তখন তারা আপনজনই হবে। কিন্তু সে আশা কম। আজ অভয়ের মনটা যেন বেশ প্রফুল্ল মনে হয়। লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত, তার মনটাও যেন অমন সুন্দর ও হালকা হয়ে যায়। আজ বহুদিন পর, এক অজানা আনন্দের পুলক-স্পন্দন, বুকের এক নিভৃত কোণে জেগে ওঠে। কেন কেন? মিনতির গান ভাল লাগে—তার মুখখানি আরো সুন্দর। ওর সান্নিধ্য ভারী মধুর। তার একটিমাত্র বোন আজ দূরে। ও যদি ঠিক তাকে, দাদার মত ভালবাসে, অমনি আপনজনের মত আবদার ধরে, তাতে কি না আনন্দই হয়। কিন্তু এক দুস্তর নিষেধ বাধা, এই স্নেহ

ভালবাসার পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। তবুও আজ এইটুকু সময়ের জন্য, শিনতির সান্নিধ্য বড় মধুর, বড় আনন্দের মনে হয়। অভয় ভাবে, হায়, মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন? শান্তির কথা মনে হয়। অভয় ভাবে, বৈকালে এক খবর পেতে পারে। এক অক্ষয় যদি খবর দেয়। স্কুলে অক্ষয় যায়নি। শান্তির খবরের জন্যে, ওর মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু কোন খবরই পেল না অভয়। ইচ্ছে ছিল, স্কুলে যাওয়ার আগে একবার খোঁজ নেবে, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। টিফিনের সময় শুভময়ের সঙ্গে দেখা।

শুভময় বলল, বাঃ, অনেকদিন আর যাননি। আজ চলুন। বাবা অনেক নূতন নূতন বই কিনে এনেছেন। সেই যে, বিলাত ভ্রমণ, বইখানার কথা বলেছিলেন। সেই বইটা, তারপর আফ্রিকার জঙ্গলে, আফ্রিকার গহন বুকে, এই রকম বই অনেক এনেছেন। অভয়েব মুখ খুশীতে নেচে উঠল। এই বইগুলি পড়ার বড় ইচ্ছা। একজনের কাছে, মাত্র একঘণ্টার জন্যে পেয়েছিল, কিন্তু সবটা পড়া হয়নি। বহুদিন থেকে, ও ঐ বইগুলোর জন্যে সন্ধান করছিল।

অভয় বলল—সত্যি—সত্যি—

হেসে শুভময় বলল, বাঃ, তবে আমি কি মিথ্যে কথা বলছি? এছাড়া বাবা, অনেক ইংরাজী বইও এনেছেন। পাতায় পাতায় সব ছবি। মোটা মোটা বই সব। সোনার জলে নাম লেখা। স্কুলের ছুটীর পর, অভয় বেরিয়ে পড়ল। বাইরে শুভময় দাঁড়িয়ে ছিল। অভয়ের যেন তর্ সইছিলো না। বহুদিনের আগের সিকি পাতা পড়া বইগুলো তাকে প্রবল বেগে টানছে। নূতন বইয়ের আকর্ষণ কম নাকি? চকচকে বাঁধান বই, কত তার ছবি—আর নূতন বইয়ের গন্ধই আলাদা। অভয় নূতন বই হাতে পেলেই, নাকের কাছে এনে বই শোঁকে। আঃ, প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যায়। বইগুলোর গায়ে হাত বুলোয়। মনে মনে ভাবে, তার নিজের যদি ঐ রকম কতকগুলো বই থাকত। অভয় ভাবতে থাকে। তবে বইগুলোকে বেশ সুন্দর করে মলাট দিয়ে, অতি সুন্দর করে নিজের নাম লিখত। নামের তলায়, অতি সুন্দর করে, লতাপাতা আঁকত। সমস্ত বইগুলো রেখে দিত, তার মাথার কাছে। রাতে ওদের গায়ে হাত বোলাত, বইয়ের ওপর হাত রেখে সে পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়ত। অভয় শুধু বইয়ের স্বপ্ন দেখে। ধন দৌলত টাকাকড়ি এ সবের স্বপ্ন সে দেখে না—সে চায় শুধু বই আর বই। লাইব্রেরী থেকে যে সব নূতন নূতন বইয়ের তালিকা বেরোয়, অভয় তা সব যোগাড় করে। প্রত্যেকটী তালিকা ভালভাবে পড়ে, কোন্ কোন্ বই কিনতে ইচ্ছে—তার পাশে পাশে লালকালি দিয়ে দাগ দেয়। কালির দাগ দিতে দিতে দেখা গিয়েছে প্রায় চার পাঁচশো বইয়ের নামের পাশে দাগ দিয়েছে। অভয় ভাবে যদি তার অনেক টাকা থাকত, অথবা যদি কোথাও সে দু-দশ হাজার টাকা কুড়িয়ে পেত, তবে প্রথমে কিনবে বই আর বই, আর বইয়ের জন্য সুন্দর সুন্দর কাঁচের আলমারী। ঘরের মধ্যখানে মস্ত টেবিল, টেবিলের ওপর একটা ভাল্ আলো, টেবিলের চার পাশে বেশ গদি আঁটা চেয়ার। ঠিক যা দেখেছে শুভময়দের বাড়ীতে। চেয়ারের কত রকম গঠন। কত রকম ঢং কত রকমের রং। কোনটার গায় কাল—কোনটার সোনালী রং, কোনটা বা পার্টিকেলে রংএ বার্ণিশ করা।

ওপরের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকেই, অভয় বলে—বই কোথায়? বই—

শুভময় বলে, বাঃ, এই তো এলাম। বসুন, আমি আসছি।

শুভময় বাড়ীর ভেতর চলে যায়। কিছুক্ষণ পর চাকরে নিয়ে আসে, চা আর খাবার। চাকরটা চলে যেতেই, অভয় বলে, ভাই, আমার কিন্তু ভারী লজ্জা লাগে—

—লজ্জা। লজ্জা কিসের জন্যে? অভয় খেতে খেতে বলে, রোজ রোজ এসে এই খাওয়া—। শুভময় আশ্চর্য্য হয়ে বলে, রোজ রোজ আবার কবে এসেছেন। আর খাবার তো খাওয়ার জন্যেই। আপনি খাচ্ছেন এতে লজ্জার কি আছে অভয়দা। আমিও তো খাচ্ছি।

অভয় আর কথা বলে না। সত্যি, খাওয়ার জন্য এই সব খাবার। যে খায় সেই এই সব বস্তুর মালিক। কিন্তু এইসব খাদ্য, বাইরে এর ব্যবহার করতে গেলে অনেক পয়সাই ব্যয় করতে হয়। এমন দামী দামী খাবার, তাদের মত গরীব ঘরের ছেলেদের অদৃষ্টে জোটে না। এত পয়সাই বা তারা কোথায় পাবে? তার জেঠা জেঠীরাও বড় লোক। কিন্তু কই একদিনও তো বৈকালে খাবার কথা বলেন না। তাদের ছেলেরা খায় দুধ, মিষ্টি, নানারকম ফল আরও কত কি। স্কুলে তারাও পড়ে, আমিও পড়ি। ক্ষুধাটা শুধু তাঁদের ছেলেমেয়েদের একচেটিয়া নয়, গরীবের ছেলের ক্ষুধা লাগে। বরং বেশী খিদেই লাগে। সে দামী খাবার চায় না—একবাটি মুড়ি হলেও হয়। তাই তার কাছে অতি দামী। বহুদিন শুধুমাত্র একপেট জল খেয়েই পেটের ক্ষুধাকে মারতে হয়। এক একদিন মুড়ি আর তেলেভাজা কিনে খায়। কিন্তু রোজ রোজ মুড়ি আর তেলেভাজার জন্য দু আনা পয়সা খরচ করার সামর্থ্য কোথায় তার। অভয়ের নিঃশ্বাস পড়ে ও খাওয়া শেষ হলে, হাত মুখ ধুয়ে, মশলা মুখে দেয়।

শুভময় আলমারী খুলে নূতন বইগুলো বের করে। উঃ কত বই। মোটা মোটা ইংরাজী বই, ওর পাতায় পাতায় কত ছবি। দেশ-বিদেশের নানান্ লোক, নানা ছেলেমেয়েদের ছবি, কত রকম জীবজন্তুর ছবি। অদ্ভুত আশ্চর্য্য দেশ—আর আশ্চর্য্য সব লোকজন। অভয় দেখে আর আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

—দাদা—হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে, পেছন ফিরে তাকায় অভয়। বছর বার তের বয়সের একটি বেশ সুন্দরী মেয়ে ডাকছে শুভময়কে। ঘরে অভয়কে দেখে পালাতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু শুভময়ই ডাকল, আ রে পালাচ্ছিস্ কেন? এ তো আমার অভয়দা—আয় এখানে, অভয়দার সঙ্গে তোর আলাপ করে দিই। মেয়েটি কিন্তু কাছে এল না। দাদার মস্ত বড় ইজিচেয়ারের পাশে, মুখ লুকিয়ে দাঁড়াল। শুভময় বলল, এ আমার বোন। গার্লস্ স্কুলে পড়ে, নাম অমিয়া তবে এর একটা ডাকনাম আছে—

অমিয়া গর্জ্জে উঠল—দাদা ভাল হবে না কিন্তু—

অভয় কৌতুক চোখে দেখছিল অমিয়াকে। পাতলা গঠন বেশ ফরসা, চোখ মুখ অতি সুন্দর। অমিয়া ততক্ষণে শুভর মুখ চেপে ধরেছে।

—আঃ, ছাড়। বলব না—আচ্ছা বলব না—

অভয় বলল, ডাকনামটা বাপ-মা আদর করে রাখে। তাতে দোষ কি—

শুভময় বলল, শ্রীমতী অমিয়ার ডাকনাম যদি মুসুরি হয়, তাতে লজ্জা কি? আমারও একটা ডাকনাম আছে, কিন্তু আমি কি তাতে রাগি—

অভয় বলে, আমার ডাকনাম বিশেষ নেই। মা খালি ডাকেন, খোকা বলে। মায়ের কাছে আমি চিরকালই খোকা। কিন্তু শুভময়, তোমার ডাকনামটা আমার জানা নেই। ওটাও জানা সরকার—

শুভময় বলল, সেটা মুসুরির চেয়েও খারাপ। মায়ের উচিত ছিল, আমার নাম রাখা, ছোলা, মুগ অথবা মটর। কিন্তু তা না রেখে রাখলেন কি না ন্যাড়া। বোধ করি খুব ছেলেবেলায় মাথায় নিশ্চয়ই চুল ছিল না, তাই ঐ নামের উৎপত্তি।

—যাক্, তবুও ডাকনামটা জেনে রাখলাম। এখানে এসে শুভময় বলে কেউ উত্তর না দিলে, ন্যাড়া নামেই ডাকব। কিন্তু ভাই শুভময়, তোমার বোনের ডাকনাম তো খারাপ নয়। কিন্তু মুসুরি নামের উৎপত্তি কিভাবে হল তাই ভাবছি।

সম্ভবতঃ মুসুরির ডালটা ও বেশী পছন্দ করে। তবে, সঠিক খবর জানিনে। মুসুরি তখন অভয়ের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে। দাদাকে সজোরে একটা চিমটি কেটে পালিয়ে যেতে যেতে বলল, দাদা যেন কি—

শুভময় হেসে বলল, ও পালিয়ে গেল। সম্ভবতঃ মায়ের কাছে নালিশ করতে গেল। ভাবছি—কপালে দুঃখ আছে আমার—

অভয় বলল, তা সম্ভব। বাইরের লোকের কাছে এভাবে মুসুরি নামটা চালু করলে রাগ হবারই কথা। আচ্ছা—এখন চলি অনেকক্ষণ কেটে গেল। শুভময়

একখানা বই দিয়ে বলল, এখানা পড়ুন, তারপর অন্যগুলো দেব। ঘরের ভেতর এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। বাইরে এসে অভয় দেখল, বেলা আর বেশী নেই। সন্ধ্যা প্রায় হ'ব হ'ব। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটীর গাড়ীগুলো জল দিয়ে গেছে। চারদিকে বেশ একটা সোঁদা গন্ধ। মই ঘাড়ে করে, আলো জ্বালার জন্য লোকটি হন্ হন্ করে যাচ্ছে। লাইট পোষ্টে মই ঠেস্ দিয়ে তর তর করে উঠে, একে একে রাস্তার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অভয়ের ভারী ভাল লাগে। এই কাজটা ভারী মজার। লোকটা অন্ধকার দূর করছে। সহরের অন্ধকার রাস্তার অন্ধকার দূর করে দিচ্ছে মাত্র ঐ একটা লোক। লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকে অভয়। চেহারায় কোন বিশেষত্ব নেই। সাদাসিধে চেহারা। গায়ে ছিন্ন ফতুয়া, কোমরে ছোট্ট একটা কাপড়—অথচ লোকটা কি কাণ্ডই না করছে। ঘরের, বাইরের, গলি ঘুঁজি সদর রাস্তা—সব—সব—সমস্ত সহরের অন্ধকার দূর করে দিচ্ছে, মাত্র একটা লোক। কী অদ্ভুত কাণ্ড, কী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এখন দোকানে দোকানে আলো জ্বালবার ব্যবস্থা হচ্ছে। দোকানে এখন বেশ ভিড়। কাছারী শেষ হয়ে গিয়েছে। কোর্টের সামনের দোকানে বেশ ভিড়। আদালত ফেরৎ মক্কেলরা, মুহুরী, মোক্তার, উকীলবাবুরা এটা সেটা এখন কিনছেন। ওদিকের চৌধুরী বাবুদের বাস্খানা অনবরত হর্ণ বাজাচ্ছে। দূর গাঁয়ের লোকেরা জিনিষপত্র নিয়ে বাসে উঠছে। আবার অনেকগুলো গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে। তারাও যাত্রী নিয়ে যাবে—। এ বেশ সুন্দর লাগছে অভয়ের। বাঁধের ওপর দিয়ে, মানুষ জন ধীরে ধীরে হাঁটছে। মাঠের মধ্যে এতক্ষণ ফুটবল খেলা হচ্ছিল। খেলার শেষে খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে বসে গল্পগুজব করছে। অভয় তার নূতন বইয়ের গায়ে হাত বুলোতে থাকে। উঃ-, এই বইখানা পড়বার তার বহুদিনের আশা। রাত জেগে, বইখানা শেষ করে ফেলতে হ'বে। মিঠুয়া আবার তার লণ্ঠনে খুব কম তেল দেয়। যাহক্ তাকে আবার তেল জোগাড় করতে হ'বে। নিজেই লণ্ঠনে তেল ভর্ত্তি করে নেবে। অভয়ের মনে হয়, কলকাতার মতন অমন ইলেক্‌ট্রিকের আলো থাকলে বেশ হ'ত কিন্তু। লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়, মালদা সহরেও নাকি ইলেকট্রিক আসবে। কিন্তু কবে যে আসবে, তা ভগবানই জানেন। ইলেকট্রিক এলে, এখানে নাকি বায়স্কোপের ঘর হ'বে। একটা মেলাতে অভয় বায়স্কোপ দেখেছিল। মস্ত বড় একটা কাপড়ের পর্দার ওপর—কত ছবি। ঠিক যেন সব সত্যিকারের। তারা হাঁটছে, মুখ নাড়ছে —। সামনের একটা লোক সব বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। বেশ সুন্দর ছিল সেই ছবিটা। ছ পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে তারা মাটির ওপর বসে সেই বায়োস্কোপ দেখেছিল। উঃ—কত যে লোক—। অভয় মনে মনে তারিফ করে—আচ্ছা মজার কল বটে। ঠিক যেন সব সত্যি—

অভয় হাঁটতে থাকে। ভাবে, উমেশের কাছে সে শান্তির খবর নেবে। আর দেখেও আসবে—। আহা বেচারা ছেলেমানুষ কত কষ্টই না পাচ্ছে। বিধবা মায়ের কী কষ্ট। এ সংসারে কেউ দেখার নেই। শান্তির এক কাকা নাকি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অথচ কাণ্ড দেখ, ডেপুটি বাবুর ভাইপোর আজ কী অবস্থা। ভাবতেই আশ্চর্য্য লাগে অভয়ের। কিন্তু অভয় আর আশ্চর্য্য হয় না। সংসারে সবই ঘটতে পারে। সেও নিজে তো বড়লোক জ্যাঠার ভাইপো। জেঠাবাবু লোক খুব ভাল, কিন্তু জেঠাইমা যেন কেমন।

এক বাড়ীতে থেকেও ঠিক যেন পরের মতন থাকে সে।

অভয় হাঁটতে থাকে। শান্তিকে দেখেই সে বাড়ী ফিরবে। মনে মনে বলে, ঠাকুর, শান্তিকে ভাল করে দাও। ওর মার যে কেউ নেই আর। কিন্তু যতই কাছে আসে, ততই বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে। কি দেখবে সে? ওখানে কি কথা শুনবে দূরে দূরে মিউনিসিপালিটীর আলোগুলো টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে—। রাস্তায় যৎসামান্য আলো এসে পড়েছে। দোকানের আলো এসে পড়েছে। দোকানের আলো রাস্তাকে কিছু আলোকিত করেছে।

গলির ভেতর সত্যবাবুর বাড়ীর সম্মুখে এসে অভয় দাঁড়াল। এ কি, সমস্ত বাড়ি যে অন্ধকার! আস্তে আস্তে রোয়াকের ওপর উঠে, ঘরের দিকে চাইল অভয়। নীচের একতলার সেই ঘর অন্ধকার—ঘর ফাঁকা, শূন্য। একটা অজানিত ভয় নেমে এল অভয়ের সারা দেহে। সব শূন্য, হাঁ—হাঁ করছে ঘর। অভয় ভয় পেয়ে রোয়াক থেকে নেমে আসে। একটা দুঃসহ নীরবতা আর শীতলতা চারদিকে। জনমানবহীন শূন্য গলি আর সম্মুখে সেই শূন্য ঘর...অভয়ের বুঝতে আর দেরী হয় না।

অনেক রাত পর্য্যন্ত অভয় জেগে থাকে একদম ঘুম আসে না। শিয়রের কাছে লণ্ঠনটা জেলে পড়তে বসে অভয়। ক্রমশঃ ডুবে যায় বইয়ের পাতার মধ্যে। রাত বাড়তে থাকে আর অভয় বইয়ের পাতার পর পাতা পড়ে যায়। অবশেষে বই পড়া শেষ হয়,—তখন রাত তিনটে। আলো নিভিয়ে চোখ বোজে অভয়। একসময় ঘুম ভেঙ্গে যায়—আর রাত নেই—ভোর হয়ে আসছে। একটা স্বপ্নের মধ্যেই অভয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হয়, কে যেন এসেছিল—কে যেন তার পাশে বসেছিল। কার যেন চুলের সুগন্ধ,খোলা চুলের দু এক কুচি চুল তার এসে চোখে, মুখে পড়েছিল। অভয় মাথা তুলে এদিকে ওদিকে তাকায়। দরজাটা আধ ভেজান। সামনের জানালা খোলা। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। এটা স্বপ্ন—না সত্যি। অভয় ঠিক বুঝতে পারে না। ভাবে এটা বোধ করি স্বপ্নই। অভয়ের খালি মনে হয়, ভোর বেলায় আধ ঘুম আধ জাগরণের মধ্যে যে গান সে শুনতো,—যে সুর তার কানে মধু ঢালত, ঠিক যেন সেই সুরের সব মধু, এসে ছোঁয়া দিয়ে গেছে তার বুকে। একটা আশ্চর্য্য অব্যক্ত আনন্দ-বেদনায়, অভয়ের তরুণ বুক দুলতে থাকে।

সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে, ভোর বেলাকার ঐ অদ্ভুত স্বপ্নই, সারা মনকে ছেয়ে থাকে। সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বিকেলে স্কুল ছুটির পর আজ আর কোথাও যায় না। বাড়ী ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে আশ্চর্য্য হয়ে যায়—মিনতি বইখানা দেখছে—

—এ কি? তুমি—

মিনতি হাসে। বলে, বাঃ, খাসা বই। আমি কিন্তু পড়ব—

অভয় বলে—বেশ, কিন্তু জেঠাইমা—।

দরজার দিকে তাকিয়ে মিনতি বলে—মা দেখতে পাবে না—।

অভয় সরে আসে মিনতির কাছে। সারাদিন যে বেদনা মনের ভেতর গুমরিয়ে মরছিল—সব যেন শান্ত হয়ে যায়। হঠাৎ বলে, ভোর বেলা তুমিই তবে—

—বাঃ, কে বলল? বাঃ—আমি—আমি কেন—

—না তুমিই। অভয় সরে এসে হঠাৎ হাত চেপে ধরে বলে—না। সে তুমি, তুমি, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

মিনতি পরিপূর্ণ ভাবে তাকায়—হাঁ আমি—

—সত্যি—সত্যি—

—হাঁ।

—কিন্তু কেন? কেন—

—জানিনে। আর দাঁড়ায় না। বইখানা নিয়ে চলে যায়।

অভয় অবাক্ হয়। এ কেমন করে হয়। একজন ঘরে এল, অথচ কেন এল এর কারণ জানে না। ভোর বেলাকার সেই মধুর সুর ওর ঘুমভাঙ্গা কানে কি যে আশ্চর্য্য সুন্দর লাগে, তা তো ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারবে না। ওর মন একটা মধুর স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সেই মধুর সুরের মধ্যে—সারা মন ভাসতে থাকে। ওর মনে হয়, ঠিক সাদা পরীর মত, আধ ভাঙ্গা ঘুমের মাঝে, আবছা আলো আঁধারের ভেতর এক রূপকুমারী চকিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কেন সে এসেছিল—তা জানা গেল না—

মৃদু হেসে মনে মনে অভয় ভাবে—আশ্চর্য্য অদ্ভুত মেয়ে। কিন্তু কিছুটা ভয়ে, ওর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। যদি জেঠাইমা জানতে পারেন? তবে, কি তাঁর ক্রোধ থেকে, মিনতি বাঁচাতে পারবে? তাঁর কাছে মিনতির কোন কথার মূল্য নেই। জেঠাইমার হুকুমই শেষ

কথা। অভয় খানিকটা বিমর্ষ হয়ে যায়। তবুও অভয় ভাবতে থাকে, আবার ভোর বেলা ও আসবে। ঠিক পরীর মত। ওর ঘুমভরা চোখের ওপর ওর চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়বে, একটা মধুর সুগন্ধ ছড়িয়ে যাবে সারা ঘরে। ওর আসাটাই যে মধুর—। অভয় কামনা করে, হে ভগবান্, জেঠাইমা যেন জানতে না পারেন। না—সে মিনতিকে নিষেধ করতেও পারবে না।

অভয় খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। গরমের ছুটি আসতে আর দেরী নেই। আগামী শনিবার সকালে স্কুল হয়েই একমাস সাতদিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকবে। অভয় আজ একমাসের আগে থাকতে ঐ দিনটি গুনছে। এখানে অনেক ছেলের বাড়ী কাটোয়া, দাঁইহাট, ঐ সব জায়গায়। তারাও ঐ দিনেই বাড়ী রওনা হবে। মাঝে মাত্র আর সাতদিন। সাবান দিয়ে জামা, কাপড়, গেঞ্জী পরিষ্কার করেছে। কাপড় তো বেশী নেই তাই ধোপার বাড়ী দেয় না। জেঠাবাবুর কাছে বলতে লজ্জা লাগে—আর জেঠাইমার কাছে যাওয়ার সাহসই নেই। একটা ভয় সব সময় যেন তার ভেতর ছড়িয়ে রয়েছে। কাপড়ের কথা বললে, হয়তো জেঠাইমা কোন কথাই বলবেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চলে যাবেন। তাঁর প্রকৃতিই এই। উনি তুষ্ট হলেন, কি রুষ্ট হলেন, তা বোঝা বড় কঠিন। অভয় এই কয়মাসেও জেঠাইমার প্রকৃতি যে কি তা বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু জেঠাবাবুকে বুঝতে কষ্ট হয় না। উনি কাজের লোক, মনটাও সরল আর উদার। অভয় অনেকবার তার প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু জেঠাবাবুর একটা দুর্ব্বল দিক্ হ'ল, জেঠাইমার ওপর হুকুম চালাবার অক্ষমতা। তাই, অভয় মনে মনে জেঠাবাবুকে শ্রদ্ধাও করে আর ভালবাসে। বীরু হয়েছে ঠিক তার মায়ের মত। ভারী একঁগুয়ে স্বভাব আর মনটাও বেশ খল। মনে হয়, বীরু অভয়কে পছন্দ করে না। অভয় যে তাদের গরীব কাকার ছেলে, আর তাদের আশ্রয়ে মানুষ হচ্ছে, তাদের দয়া করুণা ও সাহায্যে মানুষ হচ্ছে, এ জ্ঞান বীরুর বেশ টন্‌টনে। মাঝে মাঝে, কিছু কথাচ্ছলে এমন আভাস ইঙ্গিতও দিয়েছে। কিন্তু অভয় কোন প্রতিবাদ করেনি। কারণ যা সত্য সে কথার প্রতিবাদে কি ফল। তবুও সব জিনিষ, সব কথা সকলের মুখে মানায় না,—বা শোভাও পায় না। কিন্তু শোভা না পেলেও, এ ক্ষেত্রে অম্লানমুখে সমস্ত কিছুই নির্ব্বিবাদে শুনতে হয়। রাগারাগিতে কোন ফলই নেই। তার একমাত্র লক্ষ্য সম্মুখদিকে এগিয়ে যাওয়া। এই এগিয়ে যাওয়ার পথে কত যে বাধা-বিপত্তি, তার কি কোন সীমা সংখ্যা আছে?

অভয়ের মন এখন শরতের সাদা মেঘের মত,—শুধু আনন্দের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। উঃ—আজ কতদিন পর সে তার নিজ দেশে ফিরবে, তার বাবা, মা, গীতা, খোকনকে আবার দেখবে। সেই পরিচিত গাঁ, রাস্তাঘাট, আমবাগান, শিবমন্দির, রথতলা,—তাদের গাঁয়ের হাট, বাজার, গাঁয়ের পুরোণো বন্ধুরা, কত আপনজন যে সেখানে ছড়িয়ে আছে। সে গাঁয়ের প্রত্যেকটি অকিঞ্চিৎকর বস্তু, পথের ধুলোবালি, সবই যে তার কাছে মধুর হতে মধুরতর। অভয় শুধু দিন গুনতে থাকে।

সেদিন শুভময় ওকে বলল, অভয়দা, আজ চলুন অনেক নূতন বই এসেছে—

—সত্যি। অভয়ের মন নেচে ওঠে। পয়সা দিয়ে বই কেনার তার সাধ্য নেই। বইয়ের ওপর তার টান যে কী অসম্ভব, তা কল্পনা করা যায় না। বই সে নূতনই হোক আর পুরোনই হোক, অভয়ের কাছে তা সব সমান। সবই নূতন আর সব বই-ই আশ্চর্য্য। কৃপণের যেমন অর্থপ্রীতি, নারীর যেমন অলঙ্কার-প্রীতি, চাষীর যেমন জমির উপর লোভ আর প্রীতি ঠিক তেমন উদগ্র লোভ আর প্রীতি নিয়েই—একনিষ্ঠ ভক্তের মত, অভয় বইগুলির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর, ক্ষুধিতের মত গিলতে থাকে।

অভয় বলে, বাঃ, নিশ্চয়ই যাব। দু-একখানা বই আনব। জান শুভ, গরমের ছুটিতে বাড়ী যাব। অনেকদিন মা-বাবাকে দেখিনি—

শুভ বলে, খুব মন কেমন করছে, না?—আচ্ছা, এই

যে একমাস বাড়ীতে থাকবেন, আমাদের কথা ভুলে যাবেন না তো। চিঠি দেবেন কিন্তু।

—নিশ্চয়ই দেব। তোমার ঠিকানাটা ভাল করে লিখে নেব। আমার ঠিকানাও দেব। ছুটির পর দাঁড়িও।—

শুভ বলল, আপনার একটি ভক্ত জুটেছে অভয়দা।

অভয় বড় বড় চোখ করে বলে, ওঃ বাব্বাঃ। আমার ভক্ত। সে আবার কি? আমি আবার মহাপুরুষ বনে গেলাম কবে থেকে। তা, ভক্তটির নাম কি?

—মুন্নুরি—

—মুন্নুরি? মুন্নুরি আবার নাম হয় নাকি?

শুভময় বলল, এর মধ্যে ভুলে গেলেন। ওর ডাক নাম মুন্নুরি। আমার বোন অমিয়ার ডাকনাম মুন্নুরি।

—ও হোঃ। ঠিক-ঠিক। কিন্তু হঠাৎ মুন্নুরির ভক্তির কারণটা কি?

—তা তো জানিনে। তবে মাঝে মাঝে বলে, দাদা তোমার সেই অভয়দা তো আর আসেন না? বেশ ভাল ছেলে কিন্তু—

অভয় হাসতে থাকে। মনে পড়ে অমিয়ার কথা। ভারী মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। যেমন সুন্দর মুখশ্রী,—তেমনি চমৎকার শরীরের গঠন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় গীতার মুখখানা। অতি দরিদ্র বাপ-মায়ের মেয়ে। সময় মত খেতে পায় না, একটির বেশী দুটি জামা নেই। মাথার চুলে তেল নেই। ভাল জামা, কাপড়, সাবান, তেল, ভাল খাবার, এসবের কথা ভাবতেই পারে না। ভাতের ওপর একটা তরকারি একটু ডাল পেলে মনে হয় এ যে অনেক পেলাম, তারা কি করে আরও ভাল ভাল খাবার, ভাল জামা-কাপড়ের কথা চিন্তা করতে পারে? অসুখ হলে যারা ওষুধ বা পথ্য পায় না, শুধুমাত্র অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে থাকে তারা নিজ নিজ দেহশ্রী বজায় রাখার কথা ভাবতেই পারে না। অভয় ক্ষণেকের জন্য বিমনা হয়ে যায়। এই বৈষম্য কেন, এই বৈষম্যের মূল কি, তাও বুঝে উঠতে পারে না। চোখের উপর লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোককে দেখতে পাচ্ছে আর বহু ধনীলোকও দেখছে। এসব কি ঈশ্বরের ইচ্ছা না আরও অন্য কোনও কারণ, তাই অভয় ভাবে। অভয় ভাবে সোনা-রূপা, লোহা এসবই থাকে মাটিতে খনিতে। মানুষ তাদের খনি থেকে যখন তোলে, তখন কত ময়লা মাটি কাদা। সেই সব পরিষ্কার করে মানুষই তো তাদের কত বিভিন্ন রূপ দেয়। কিন্তু মানুষের জীবনের বেলায় এই বৈষম্য কেন? সবাই তো মানুষ। সবাই তো জন্মগ্রহণ করেছে আবার মৃত্যুও হচ্ছে। এর মধ্যে কেউ মরে অনাহারে, কেউ বা অজস্র ভোগ-বিলাস নানা ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ হয়—এর কারণ কি? আমরা তো সবাই এক খনির লোক। খনির সব ধাতুকে যখন নূতন রূপ দেওয়া যায়, তবে মানুষেরই বা উন্নততর রূপ হবে না কেন?

স্কুলের ছুটির পর, অভয় শুভময়ের জন্য রাস্তার ওপর অপেক্ষা করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুভময় হাজির হয়। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। একটু পরেই ওরা আসে দোতলার লাইব্রেরীতে। লাইব্রেরী ঘরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দুটো নূতন চেয়ার, সোফা, গদী আঁটা চেয়ার, আলমারী আর টেবিল এসেছে। দেওয়ালের সেই পুরোনো ঘড়ি আর নেই। তার জায়গায় এসেছে নূতন ধরণের লম্বা মতন একটা দেয়াল ঘড়ি। টেবিলের ওপর শোভা পাচ্ছে ভারী সুন্দর একটি টেবিল ল্যাম্প। মাথার ওপর ঝুলছে অতি সুন্দর কাঁচের ঝাড় লণ্ঠন। দেওয়ালে দেওয়ালে কত সুন্দর সব ছবি। অভয় আশ্চর্য্য হয়ে যায়—অভিভূতের মতন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। অভয় অতি সন্তর্পণে লোভীর মতন বইগুলোর গায়ে হাত বোলাতে থাকে। অভয়কে বসিয়ে রেখে শুভময় চলে যায়। অভয় সমস্ত বই উল্টে পাল্টে দেখতে থাকে। কী সুন্দর সব বই—আর কত মজার মজার বই।

শুভময় আসে আর আসে চাকরের হাতে দু থালা খাবার।

শুভময় বলে, যা, চা নিয়ে আয়। দুজনে খেতে বসে। অভয়ের এখন আর আগের মতন লজ্জা করে না। এখানে এলেই যে, খাবার ও চা খেতে হয়—এটা

যেন তার সহজপ্রাপ্য। আজ খেতে খেতে অভয় বলল, কই মুস্থরিকে দেখছিনে যে। ডাক তাকে—

—আসবে। তবে বোধ করি লজ্জায় আসছে না।

—লজ্জা! ঐটুকু মেয়ের আবার লজ্জা কি—

চা খাবার পর অভয় বই দেখতে থাকে। এইসব বই পড়বার তার কত আগ্রহ ছিল। কিন্তু সাধ থাকলেও তার কোন সাধ্য ছিল না। আজ সেই সাধ মিটেছে। দুখানা বই বেছে নিয়ে অভয় বলল, এ দুখানা নিয়ে যাব। দিনকয় পরেই ফিরিয়ে দেব।

শুভময় বলল, কই, দেখি। বই দুখানা নিয়ে, হঠাৎ শুভময় এক কাণ্ড করে বসল। কলম বের করে, বই দুখানাতে লিখে দিল—অভয়দাকে প্রীতি উপহার, ইতি, শ্রীশুভময়।

অভয় অবাক্ হয়ে বলল, একি? বাঃ—এ কি করলে?

হেসে শুভময় বলল, উপহার দিলাম—।

অভয়ের জীবনে, উপহার পাওয়া এই প্রথম। ভালবেসে এমনি উপহার তো আজ পর্য্যন্ত কেউ দেয়নি। হাঁ, শুভময়ের পাশাপাশি আর একজনের নাম মনে পড়ে, আর এক-জনের মুখ মনে পড়ে, সে তার মোনাদা। অভয়ের দুই চোখে নেমে আসে, অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার মত এক সকরুণ বিহ্বলতা। তার গ্রাম। সেই গাঁয়ের ধুলো ভরা রাস্তা, বন বাদাড় মাঠ, ছাড়া ছাড়া ঘর বাড়ী, মোনাদার ছোট্ট মুদীখানা দোকান। কিন্তু আজ কোথায় তার মোনাদা—

অভয় গম্ভীর হয়ে যায়। শুভময় বলে, কি হ'ল অভয়দা। হঠাৎ এত চুপচাপ যে?

—না এমনি। কিন্তু মুস্থরি কই—

—এই যে। মুস্থরি এসে তার দাদার পেছনে লুকিয়েছে।

অভয় বলে, বাঃ দাদার পেছনে কেন? ডেকেছি আমি। এস কাছে এস। কিন্তু মুস্থরি আরও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, এক পা নড়ল না।

অভয় বলল, আমি ভাব করতে এলাম। কিন্তু তুমি চুপচাপ থাকলে কি করে কথা হয়। এসে বস, এখনও অনেক চা রয়েছে। একটু চা খাও।

এবার মুস্থরি বলল, আপনি খান। আমি খেয়ে এলাম—

—তাতে কি? চা খাওয়ার মজা হচ্ছে গল্প করতে করতে খাওয়া। একা বসে বসে চা খেয়ে আরাম নেই। গল্পের মধ্য দিয়ে চা খাওয়ার একটা আলাদা আনন্দ আছে—

শুভময় বলে, তোর চেয়ে অভয়দা বড় তা জানিস, গুরুজন যখন, তখন বসে গল্প কর্ না। অভয়দা যে রকম সাধ্য সাধনা করছে, ওতে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়।

অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মুস্থরিকে। আজ যেন ও ভারী সুন্দর সেজেছে। ফ্রকটা অতি চমৎকার। গায়ের রংএর সঙ্গে অতি চমৎকার মানিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ওর দুটি চোখ। এমন সুন্দর যে, বার বার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। অভয়ের মনে হয় তার বোনের কথা। এর সঙ্গে তার কত তফাৎ।

শুভময় বলল, অভয়দা, ম্যাট্রিক পাস করার পর, কোথায় পড়বেন? এখানে তো কলেজ নেই।

ম্লান হাসি হেসে অভয় বলল, পরের পয়সায় স্কুলে পড়ছি। কলেজে পড়া আর অদৃষ্টে নেই। কে আমায় কলেজের খরচ দেবে? জান তো আমরা গরীব। দুবেলা অন্ন জোটে না—

—কেন। আপনার জেঠা মশায় পড়াবেন না।—

—না, মনে হয় না। জেঠাবাবুর ইচ্ছে থাকলেও, তা হবার উপায় নেই। জেঠাইমার ইচ্ছেই সব। আমি যে এখানে আছি সেটাও জেঠাইমার পছন্দ নয়। কারণটা যে কি, তা বলা কঠিন। ম্যাট্রিকটা পাস করলে, যাহোক একটা কিছু চাকরি জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করব। যাতে দুবেলা দুমুঠো শাক-ভাত জোটে তারই ব্যবস্থা করব। এর বেশী আর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। শুভময় চুপ করে রইল। মুস্থরি বড় বড় চোখ করে, একটা গালে হাত দিয়ে সব শুনছে। বোধ করি ও ভেবে উঠতে

পারছে না। ওরা তো অভাব কাকে বলে তা জানে না। তাই আজ এই সুসময় ব্যয়বহুল পরিবেশের মধ্যেও অভয়ের কথা শুনে বেশ অবাক্ হয়েই যায়। অবাক্ হবারই কথা। যারা বিনা প্রয়োজনে অজস্র ভোগ্য বস্তু পায়, অজস্র সুখাদ্য খেয়ে থাকে, তাদের কাছে এসব শাক-ভাতের কথা বোধগম্য হয় না। মানুষ যে না খেতে পেয়ে মারা যায়। ওরা দারিদ্র্য অভাব বা অনাহারের কষ্ট কোনদিনই টের পায়নি। হঠাৎ অভয় একটু গম্ভীর হয়ে যায়, বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। নিজের দৈন্য এমনভাবে প্রকাশ করে যেন সে লজ্জিত হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবে, এমনভাবে শুভময়ের কাছে না বলাই ছিল ভাল। কিন্তু আর তো কোন উপায়ই নেই।

শুভময় বলে, আচ্ছা অভয়দা, বইয়ে পড়েছি, কত লোক কত পরিশ্রম ক'রে হোটেলে চাকরি ক'রে পড়াশোনা চালিয়ে শেষে মস্ত ধনী হয়েছে—কেউ কেউ বড় জ্ঞানীগুণী হয়েছে। যদি ওগুলো সত্যি হয়, তবে আপনিই বা পারবেন না কেন? বাবা বলেন—

উৎসুক হয়ে অভয় বলে—কি বলেন?

—বলেন, মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। যে লোক নিজের পরিশ্রমে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে যায়, ভগবান্ তাকে পথ দেখিয়ে দেন—ভগবান্ তাকে অবশ্য সাহায্য করেন। জানেন অভয়দা, বাবাও খুব গরীব ছিলেন। আজ শুধু নিজের চেষ্টাতেই এতবড় ধনী হয়েছেন। শুধুমাত্র নিজের চেষ্টাতেই। তবে, আপনিই বা কেন পারবেন না—

অভয় বলে ঠিক বলেছ শুভ। আমায় এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে। অভয়ের মুখ চোখ অস্বাভাবিক ভাবে লাল হয়ে ওঠে। মুস্থুরি আশ্চর্য্য হয়ে যায়। ও শুধু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

অভয় বই দুখানা হাতে করে বলে, আচ্ছা ভাই চলি এখন।

অভয় ঘর হতে বেরিয়ে যায়। মুস্থুরি চেয়ারের হাতল দুটো চেপে ধরে অভয়ের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা কথাও বলে না। আস্তে আস্তে ঘর হতে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। অভয়কে রাস্তায় দেখা যায়। বই হাতে করে ঘাড় হেঁট করে চলছে। একসময় পথের বাঁকে আর দেখা যায় না। বারান্দায় রেলিং ধরে মুস্থুরি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস শুধু বের হয়। কেন যে চুপ করে থাকে, কেন যে নিঃশ্বাস পড়ে—সে কি সে বিষয়ে সচেতন? অস্ফুট ফুলের কুঁড়ির এই সামান্য স্পন্দন, এ কি ভবিষ্যৎ কিছুর নির্দেশ করবে? তা ভবিষ্যৎই জানে।

দেশ থেকে বাবা চিঠি লিখেছেন। পোষ্টকার্ডের তলায় গীতা খোকনও চিঠি লিখেছে। গীতা লিখেছে—দাদা, তোমার জন্য খুব মন কেমন করে এবার বোশেখী আম গাছটায় খুব আম ধরেছে। তোমার পোঁতা বাতাবী লেবু গাছে অনেক ফল ধরেছে। বাড়ীর উঠোনের কাশীর পেয়ারা আর ডালিম গাছে কত ফল ধরেছে। আমাদের কালি গাইয়ের কোঁয়ালে বাছুর হয়েছে। বাছুরটার রং সাদায় কালোয়। আমার বেড়ালের সাদা ধপধপে বাচ্চা হয়েছে। তুমি আসার সময় আমার জন্য কি আনবে? আর খোকন লিখেছে—দাদা কেমন আছ তুমি। মায়ের শরীর ভাল নয়।

অভয় চিঠিখানা দুতিনবার পড়ে। গীতা আর খোকনের হাতের লেখাটার ওপর বার বার আঙ্গুল বুলোতে থাকে। এইখানে ওদের হাতের ছোঁয়া লেগে আছে। অভয় যেন স্পর্শ পাচ্ছে ওদের দেহের। অভয় ভাবে, সত্যি, ওদের জন্য কি নিয়ে যাওয়া যায়। কি কি নিয়ে যাবে সে? লজেন্স, বিস্কুট, চুলের কাঁটা, লাল ফিতে, রবারের বল, গোটাকয় পুতুল, কাঁচের চুড়ি। তার হাতে তো বেশী টাকা নেই? ইচ্ছে হয়, মায়ের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় পাবে টাকা? জেঠা বাবু ভাড়ার জন্য টাকা দেবেন বলেছেন। কিন্তু তা ছাড়া তার কাছে আছে সামান্য দু-একটা টাকা। অভয়ের মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। মায়ের সেই ছেঁড়া কাপড় পরা চেহারা মনে পড়লে বুকটা ফেটে যায়। এখানে জেঠাইমার কত কাপড় কত জামা। কি সুন্দর সুন্দর দামী দামী কাপড়। ওঁর পুরোনো কাপড়গুলোও

তো একেবারে নতুনের মত। ওই থেকে খান-কয় পেলে, তাতেও মার মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু অভয়ের চাইতে লজ্জা করে। এ কথা সে কোনমতেই বলতে বা চাইতে পারবে না। মাঝে তো মাত্র কটা দিন।

অভয় ভাবতে থাকে দেশের কথা। আবার ফিরে যাবে নিজের দেশে নিজ গাঁয়ে। আবার দেখতে পাবে তার মা, বাবা, ভাই বোনকে। বাবা নিশ্চয়ই ষ্টেশনে থাকবেন। হয়ত, বাবার সঙ্গে খোকনও আসতে পারে। সে কি না এসে ছাড়বে? হয়ত আগের দিন থেকে মাকে বিরক্ত করবে। কখন দাদা আসবে—বলে বার বার শুধোতে থাকবে। অভয় চিঠিখানা হাতে করে চুপচাপ বসে থাকে।

শুভময়ের উপহার দেওয়া বই-দুখানার দিকে নজর পড়ে। কিন্তু আজ আর বই পড়ার বিশেষ উৎসাহ জাগে না। তাড়াহুড়ো করে, গো-গ্রাসে গিলবার মত করে, আজ আর বই পড়তে মোটেই ইচ্ছে করে না। পুরনো দিনের শত সহস্র সুখদুঃখের কথা, শত সহস্র স্মৃতি আজ একসঙ্গে ভিড় জমিয়েছে মনের দরজায়। এখানে এখন অনেক ভিড়, তুচ্ছ বই পড়ে এইসব সুমধুর স্মৃতিগুলোকে সরিয়ে দিতে চায় না। এইসব সু-মধুর স্মৃতিচারণ যে কত মধুর, তা অন্যকে বোঝান কঠিন। এ জিনিষের মর্ম্ম অন্য কেউ বুঝতেও পারবে না।

আশ্চর্য্য হয় অভয়। তার মনের কথা কি টের পেয়েছেন জেঠাবাবু? সেদিন সকালে বাইরে বেরুবার আগে, জেঠাবাবু তাকে ডাকলেন। সকাল তখন সাতটা। অন্যদিন এর আগে বের হয়ে যান যোগেশ্বরবাবু। আজ অফিসঘরে বসে কি সব কাগজপত্র দেখছিলেন। মুখ গম্ভীর, চোখে চশমা। টেবিলের ওপর অনেক কাগজপত্র দেখছিলেন। লাল পেনসিল দিয়ে কাগজে তখন কি সব লিখছিলেন।

অভয় ঘরে ঢুকতেই চশমা খুলে তাকালেন যোগেশ্বর। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, গরমের ছুটি কবে থেকে হচ্ছে?

অভয় বলল, মাঝে আর মাত্র পাঁচদিন। শনিবারে মর্নিং স্কুল হয়ে ছুটি হবে।

—শনিবার। আমি থাকছিনে, কাল কলকাতা যেতে হচ্ছে। তোমার জেঠাইমার কাছে ভাড়ার টাকা চেয়ে নেবে। আর—এই পঞ্চাশটা টাকা রাখ। সাবধানে রাখবে। এ থেকে তোমার বাবা-মার জন্য কাপড় কিনে বাকী টাকা বাবার হাতে দেবে। আচ্ছা এখন যাও। যোগেশ্বরবাবু আবার কাজে মন দিলেন। অভয় অবাক্ হয়ে, জেঠাবাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটু দাঁড়াল। না,—আর কিছু বললেন না। কাগজপত্রে আবার মন দিয়েছেন। অভয় টাকা-গুলো হাতে নিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। বাক্সটা আছে চৌকীর তলায়। বাক্সটা টেনে বের করে টাকাগুলো বাক্সের একেবারে তলায় রেখে চাবি বন্ধ করে, আবার বাক্সটা রাখল চৌকীর তলায়। অভয় বেশ বুঝল, জেঠাবাবু টাকাগুলো কেন তার হাতে আগেই দিলেন। জেঠাইমা না জানতে পারেন, তাই এই ব্যবস্থা। ভাড়ার টাকাটা মাত্র জেঠাইমার হাতে দিয়েছেন। কিন্তু বাড়তি এই পঞ্চাশটা টাকা তাঁকে জানতে দেননি। নিজের স্ত্রীকে তিনি চিনে নিয়েছেন। এই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষটির অন্তর যে কত বড় মহৎ,—তা আজ আর অভয়ের জানতে বাকী রইল না। কি জানি কেন, অকারণে অভয়ের চোখে জল এসে গেল। ভগবান্, তার মনের একান্ত ইচ্ছা যে এই রকম ভাবে পূরণ করবেন, তা স্বপ্নেও মনে স্থান দেয় নি।

চায়ের কাপ আর একটা প্লেটে বিস্কুট এনে সামনের টেবিলে রাখল মিনতি।

—এ কি? অত্যন্ত অবাক্ হয়ে গেল অভয়।

—চা খেয়ে নিন অভয়দা। মিঠুর আজ শরীর খারাপ—জ্বর হয়েছে। খেয়ে দেখুন চা কেমন হ'ল—

চায়ে চুমুক দিয়ে, অভয় বলল,—বাঃ চমৎকার হয়েছে। মনে হচ্ছে আর এক কাপ খাই।

—আচ্ছা। আর এক কাপ আনছি। বাঃ, নতুন বই দেখছি যে। মিনতি সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বেরিয়ে পড়ল উপহারের পৃষ্ঠাটা।

—ওঃ, এ যে উপহারের বই। শুভময়? কে শুভময়?

কিন্তু অভয় আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, মিনতি আজ কোন্ সাহসে, এমন খোলাখুলি ভাবে, তার সঙ্গে কথা বলছে। জেঠাইমার কথা কি ওর মনে নেই? তার সঙ্গ তো ওরা দু বোনে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।

মিনতি আবার প্রশ্ন করল—শুভময় কে?

—ও আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড। গিরিজাবাবু উকিলের ছেলে।

—বুঝেছি, অমিয়ার দাদা। অমিয়া তো আমাদের স্কুলেই পড়ে। ওখানে বুঝি যাতায়াত কর? খুব বুঝি ভাব? খুব ভাব নইলে কেউ উপহার দেয়?

হঠাৎ আপনি থেকে তুমি বলাতে অভয় আরও অবাক্ হয়ে যায়। মিনতি কোনদিন এমন খোলাখুলি মেশেনি। এ যাবৎ আপনি আপনি করেই এসেছে। তার নিজের প্রতিবাদে আপনি আপনি বলা মাঝে মাঝে ছেড়েছিল।

অভয় বলল, না, রোজ যাব কেন? মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তবে শুভর সঙ্গে স্কুলে রোজই দেখা হয়।

মিনতি চুপ করে যায়। হঠাৎ বলে, ওর বোনও বেশ সুন্দরী। তাই না—

—কে?—ওঃ। ওর বোন? তা মন্দ চেহারা নয়।

বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মিনতি এক সময় বলে—ওঃ হরি—যাই চা এনে দিই। মিনতি চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে, আর এক কাপ চা নিয়ে এসে মিনতি বলে, দুদিন পরেই তো গরমের ছুটি। শনিবারেই বুঝি যাবে?

অভয় বলল, হাঁ, শনিবারেই যাব। ওরাও সব যাবে। এক সঙ্গে হৈ হৈ করে যাব। প্রতুল, ভূদেবদা, রমেন, দিবাকরদা সব একসঙ্গে যাব। উঃ—কতদিন পর যাচ্ছি।

—খুব আনন্দ হচ্ছে, না?

—বাঃ তা হবে না? একমাস সাতদিন গরমের ছুটি। এতদিন বাড়ী ছেড়ে কোথাও আগে থাকিনি। গীতা, খোকন ওদের জন্যে ভারী মন কেমন করে। কতদিন ওদের দেখিনি।

মিনতি এটা সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে। তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়। অভয়ের মনে হয়, কদিন আর উমেশের সঙ্গে দেখা হয়নি। ছুটি হ'তে মাঝে মাত্র চারদিন বাকী। আজ উমেশকে সঙ্গে করে বাবা-মার কাপড় কিনে ফেলবে। গীতা আর খোকনের জন্যে, উপহারের জিনিষগুলো কিনে সব উমেশের বাড়ীতে রাখবে। এখানে আনলে জেঠাইমা জানতে পারবেন। টাকা দেওয়ার কথা জেঠাইমা যাতে না জানতে পারেন, সেইজন্যেই জেঠাবাবু তার হাতে টাকা দিয়েছেন। যদিও স্পষ্টাস্পষ্টি এ কথাটা বলেন নি। কিন্তু এতেই তার বুঝে নেওয়া উচিত। জেঠাবাবু তো এখন কলকাতায়। ফিরতে আট-দশদিন হবে। আজ দুপুরে বইপত্র গুছিয়ে রাখবে। স্কুল ত এখন ভাল হয় না এখন চারদিকে কেবল ছুটির আবহাওয়া। ছাত্ররা এখন থেকেই ক্লাসে অনুপস্থিত হতে শুরু করেছে। যারা বড়লোক, সেই সব ছাত্ররা কেউ কলকাতা, দার্জ্জিলিং কেউ বা অন্য কোথাও রওনা হয়ে গিয়েছে। অভয় ভাবতে থাকে শনিবার দিন ট্রেণে কী দারুণ ভিড়ই না হবে।

তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে অভয় ঠিক করে, অক্ষয় আর ভবেশের সঙ্গে দেখা করে উমেশের কাছে যাবে। অভয় এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে তক্তাপোশের তলায় রক্ষিত বাক্সটিকে দেখে নেয়। না—বাক্সের তালা ঠিক দেওয়াই আছে। জুতো পায়ে দিয়ে, অভয় আস্তে আস্তে বের হয়ে যায়।

উমেশ বলে, কি রে খবর কি? একবারে যে ডুমুরের ফুল হয়েছিস্। একেবারে তোর দেখাই পাওয়া যায় না।

—উমেশদা, আমি এখন ব্যস্তই আছি। শনিবারে স্কুল বন্ধ হচ্ছে—ঐদিনই বাড়ী যাচ্ছি কিনা—তাই—

—বাঃ, তবে তো খুব মজা রে। অনেকদিন পর বাড়ী যাচ্ছিস, তা যেন আমাদের ভুলে থাকিসনে। গিয়ে চিঠি দিবি। না খুব মজা করে বেড়াবি।

অভয় বলল, পাগল, ভুলব কেন? মজা করে বেড়ান চলবে না ভাই। ছুটি ফুরুলেই তো পরীক্ষা। খুব ভাল করে পড়তে হবে—

উমেশ বলে, আমার ভাই পড়াশোনা মাথায় উঠেছে! ঐ এক লাইব্রেরী নিয়ে পড়েছি। ওতে নানান ঝামেলা। তার ওপর সেবা-সমিতির কাজ। বাবার শরীর খারাপ হ'লে, নৌকো নিয়ে বেরুতে হয়। এই সব নানান ঝঞ্ঝাটে আছি।

অভয় বলে, না—না। লেখাপড়ায় ঢিল দিলে হবে না ভাই। তুই তো বলেছিলি, তোর কে ম্যাট্রিক পাশ করা দাদা আছে। সে জাহাজে কাজ করে। তাকে ধরে জাহাজে চাকরি নে না? আমি বলি ওটা ভাল কাজ। দেশ দেখাও হবে, টাকা রোজগারও হবে। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা। না—আগে পাস করে, তবে অন্য কথা।

ইচ্ছে তো তাই। এখন ভগবান্ যা করেন। আমার আর এ সব ভাল লাগছে না। দিনরাত—মন উড়ু উড়ু করছে। জাহাজে করে সমুদ্রের মাঝ দিয়ে যাব, কত দ্বীপ কত সাগর পার হয়ে, কত অজানা অচেনা দেশ ছাড়িয়ে যাব সাহেবদের দেশে। সাহেবদের দেশে যাব, এ আমার বহুদিনের সাধ। জানি না, এ সাধ সফল হবে কি না, তাই ইংরেজীটা কষে পড়ছি। ওখানে তো বাংলা চলবে না। ইংরেজী শেখা চাই। আমাদের করুণাবাবু মাষ্টার খুব ভাল ইংরেজী জানেন। ইচ্ছে করে, ওঁর কাছে ইংরেজী পড়ি। কিন্তু ভাই, ওঁর ভারী টাকায় খাঁই, টিউশনের ফি মাসে পনের টাকা—। এত টাকা কোথায় পাব।

অভয় চোখ বড় বড় করে বলে, মাসে পনর টাকা? ওঃ বাব্বাঃ—ও যে অনেক টাকা। আমি বলি এক কাজ করলে হয়। লাইব্রেরীতে রোজ একখানা করে ইংরেজী কাগজ নে। ইংরেজী কাগজ রোজ পড়লে তবে ইংরেজী শেখা যায়। একটা ভাষা শিখতে আর কতদিন লাগবে? তা ছাড়া আমরা যা হোক কিছু ইংরেজী জানি। শুধু চর্চ্চার অভাবে বলতে বাধ বাধ লাগে। ওসব দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে?

উমেশ বলল, তা ঠিকই। চর্চ্চা করলে সবই শেখা যায়। আমরা যদি ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা বলি, তা ভুল হয়, তা হোক না কেন, তাতে কথা বলাটা আর আটকাবে না। আস্তে আস্তে আমরাই তখন গড় গড় করে ইংরেজী বলতে পারব।

অভয় বলল, ভাল কথা। আজ একটু কাজ করতে হবে ভাই। আমার সঙ্গে বাজারে যেতে হবে, কিছু কাপড় আর এটা সেটা জিনিষ কিনব।

—খুব—খুব। কখন যাবি—

—এই ধর চারটের সময়। আমি এসে ডাকব।

অভয় মনে মনে ভাবল, আজ শুভময়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

আজ আর অভয় স্কুলে গেল না। বেলা বারটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফেলল। সবাই এখন স্কুলে, দরজা বন্ধ করে অভয় একটা বই পড়তে শুরু করল। বৈকালে চারটের সময় উমেশের কাছে যেতে হবে। মা-বাবার কাপড়, গীতা-খোকনের জন্য কিছু কিনে বাক্সটা গুছিয়ে রাখতে হবে। শুভময়ের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। অভয়ের মন প্রজাপতির পাখার মত বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। আজ তার কী ভালই না লাগছে। এ আনন্দ অপরকে বোঝান যায় না। এতদিন পর দেশে ফেরার আনন্দ যে কী মধুর তা অপরকে কি করে বোঝাবে? সে এখান ওখান থেকে নানা ছবি, ছোট ছোট বই খেলনা, এসব যোগাড় করছে। সস্তায় যা কিছু সুন্দর লেগেছে তাই বোনের জন্যে কিনে কিনে সঞ্চয় করেছে। বাবার জন্যে গেঞ্জী, একজোড়া কাপড়, মার জন্যে দুখানা সাড়ী, কাঁটা ফিতে আর নারকেল তেল কিনেছে। উমেশ বেশ দর-দস্তুর করতে পটু, আর ভাল জিনিষ কিনতেও দক্ষ। কোথায় কোন জিনিষ সস্তায় পাওয়া যায়, তা জানে উমেশ। অভয় উঠে, বাইরের ঘড়িটার দিকে তাকায়। না—এখন মাত্র বেলা দুটো। সমস্ত বাড়ীটা নিঃশব্দ। জেঠাইমা বোধ করি, উপরে দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। মিঠুয়ার শরীর খারাপ, দুধ-সাবু খেয়ে ঘুমুচ্ছে। মৌজী ঠাকুর শিবালয়ে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। বদরী, ঝি ওরাও এখন নেই। সমস্ত বাড়ীটা আবার জেগে উঠবে, সেই বৈকাল চারটের সময়। এখন নিঃশব্দ—নিস্তব্ধ।

ক্রমশঃ

তুমি আছো অবিচল ॥

মনোরমা সিংহরায়।

মেঘ বৃষ্টি ঝড় বজ্র একে একে আসে দূরে চলে যায়।
তুমি ঠিক আছো সূর্য অবিচল হ'য়ে
পৃথিবী শুধুই কাঁদে হাসেও কখনো ফোটে ফুল
সব কিছু দুঃখ ব্যথা নিয়ে তবু পৃথিবী একেলা।
দুহাতে ছড়াও আলো। দেখলে না রৌদ্রতপ্ত
পৃথিবী ব্যাকুল। ঝরো ঝরো বর্ষণ ধারায় কান্না তার
দুরান্তে ছড়ায়। তুমি হাসো, ভাবো বুঝি কেঁদে দুঃখ শান্তি হয়।

তবুও ভাঙে না ভুল। ছাখো চেয়ে তোমাকেই কেন্দ্র করে
পৃথিবীর চির আবর্তন। তবুও আপন মনে একা তুমি
মগ্ন তপস্যায়। তোমার আলোতে শুধু তোমাকেই করেছে কঠিন।

তপোক্লিষ্ট ধরণীর গভীর বেদনা কখনো বা ফেলে ছায়া
উজ্জ্বল ওমুখে। আবার মিলায়। লোকে ভাবে রাহু গ্রস্ত তুমি
তুমি আছো অবিচল। আর সে বেদনা ধরণীর—
কোনো লোক সে কথা ভাবে না।

বন্দনা

(সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে গেয়)

দিলীপকুমার রায়

বন্দন লহ মা বঙ্গভূমি চিরকান্তিময়ী, অধরা অজরা।
জাতির জাগরণে তব আগমনী অভিরামা প্রাণভরা।

জ্যোতির্মালা। তব শুভ উদয়ে তামস সৈন্য বিমূর্ছিত পায়
মঞ্জুল মধুধারা নির্ঝরণে স্বর্গ রাজ্য আনো বসুধায়।
মুক্তিবাহিনী বীর দুলাল তবে তুমি দুর্জনশাস্তিপরা।
মহিমময়ী মা। তব অমিতাভা দর্পিত দানব আয়ুহরা।

অপরাজেয়া শক্তিময়ী। জয়শঙ্খবরাভয় স্বনিলে, মা।
পরবশতার নিশা দলিয়া কী দীপ্তিফুলে মঞ্জরিলে, মা।
সুজলা সুফলা শান্তিময়ী মা। ঢালো পুণ্যসুধা অমরা।
আলো নব সঞ্জীবন আলো, নবরবি-ধাত্রী। কলস্বরা।

"বসন্ত বিলাপ"

স্বপ্না বসু

খোলা নর্দমা থেকে ভেসে আসে উৎকট দুর্গন্ধ।
রাশিকৃত আবর্জনার স্তূপ।
গতিহীন জলের নীরব উচ্ছ্বাসে
সৃষ্টি হল,
এনোফিলিস্ আর কিউলেক্সের অনাড়ম্বর জন্মতীর্থ॥
তারাই বুঝি—
মূর্ত প্রতিবাদ, দৃপ্ত আবির্ভাবের ঘোষণা
ব্যর্থহীন রঙিন রেখায়।
গজিয়ে উঠা—কলাবতী ফুল আবর্জনায়।
দিনান্তের দিগন্তে যাবে ঝরে।
আরো প্রকট করে তুলবে শুধু—
খোলা নর্দমার নোংরা আবর্জনার রাশি॥

রামমোহন রায়ের জন্মদ্বিশতবার্ষিকীর তারিখ

ও অন্যান্য আলোচনা

অশোক চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ২২ মে ১৭৭২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতে সর্ব্বত্র সকল রামমোহন-ভক্তের বিশ্বাস। এই দিবসের যাথার্থ্য লইয়া কিছুদিন হইতে দুই-একজন ধীমান্ অকারণ আগ্রহাতিশয্যে প্রপীড়িত হইয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অকারণ আগ্রহের কথা এইজন্যই উঠিতেছে যেহেতু রামমোহন দুই-এক বৎসর অগ্রে পশ্চাতে জন্মাইলে তাঁহার জাতিগঠন ক্ষেত্রের গুরুত্ব কোনও ভাবেই লঘু হইয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগে রামমোহনই ভারতের প্রথম ও প্রধান বিশ্বমানবতা ও জাতীয়তাবাদের প্রবর্ত্তক। বিদ্যা, জ্ঞান ও কৃষ্টির নবজন্মের উৎস বলিতে রামমোহনকেই এই যুগে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সুতরাং যে সময় যুগপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়ের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র জাতি উৎসাহী হইয়া সেই শুভকার্য্য করিতে উদ্যত, সেই সময়ে নানা প্রকার কূটতর্কের অবতারণা করিয়া ঐ মহাপুরুষের জন্মকাল লইয়া বাদানুবাদ আরম্ভ করা পাণ্ডিত্যের অপব্যবহার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এবং যাঁরা এই সকল বিতর্কের ফলেই জন্মদ্বিশতবার্ষিকী একের পরিবর্ত্তে দুই বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত করিবেন বলিয়াছেন তাঁহারা সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন বলা যাইতে পারে। কারণ, শতবার্ষিকী যদি এক বর্ষকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান দুই বৎসর চলিলে তাহা ন্যায্য বলিয়াই ধর্ত্তব্য। রাজা রামমোহনের জন্ম যদি ২২শে মে ১৭৭২ খৃঃ অব্দে না হইয়া ২২শে মে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে হইয়া থাকিত তাহা হইলে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বহু তারিখের সম্বন্ধেই নানা প্রকার অসম্ভাব্য অবস্থা সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় যেরূপ কখনও হইতে পারে না। যথা রাজা রামমোহন হাতে খড়ি হইবার পরে ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে রাধানগরের পাঠশালায় বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি যদি ১৭৭৪এ জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে হাতে খড়ির সময়ে তাঁহার বয়স ৩ বৎসর ছিল ধরিতে হয়। ইহা সামাজিক সকল রীতি ও প্রথার বিপরীত। হাতে খড়ি দিয়া লেখাপড়া আরম্ভ পাঁচ বৎসর বয়সেই হইয়া থাকে। তৎপূর্ব্বে শিশুর লালন পালনই চলিতে থাকে, পাঠের তাড়না পাঁচের পূর্ব্বে হয় না। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে রামমোহন পাটনাতে চলিয়া গিয়া তৎস্থলে ফারসী ও আরবী শিক্ষা আরম্ভ করেন। তখনই তিনি প্রথম আরবীর ভিতর দিয়া ইউক্লিড, প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল্ প্রভৃতি গ্রীসদেশীয় মনীষীদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে তিনি তাঁহার প্রথম পৌত্তলিকতা-বিরুদ্ধ পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁহার জন্মদিন ১৭৭৪এ ধরিলে তিনি পাটনা গমন করেন ৮ বৎসর বয়সে ও পৌত্তলিকতা-বিরুদ্ধ পুস্তিকা রচনা করেন ১০ বৎসরে ধরিতে হয়। ১২ বৎসর বয়সে পুস্তিকা রচনা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নহে। ১০ বৎসর বয়সে পৌত্তলিকতা লইয়া গভীর গবেষণা অসম্ভব বলিলেই চলে। এই পুস্তিকা রচনা লইয়া রামমোহনের পিতার সহিত বিচ্ছেদ হয়। রামমোহন আরবী ফারসী ভাষা শিক্ষার পরে ১৫ বৎসর বয়সে উত্তর ভারতে ভ্রমণে

বাহির হইয়াছিলেন ও ১৭ বৎসর বয়সে তিব্বত গমন করিয়া সেই দেশে এক বৎসর অবস্থান করিয়া মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের রীতিনীতি আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম্মমতবাদ চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় লামাদিগের সহিত তাঁহার তর্ক-বিতর্কের ফলে তাঁহাকে লামাগণ হত্যা করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তিব্বতের লামাদিগের গৃহের কোন কোন মহিলা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন। ১৫ বৎসর বয়সে এইরূপ হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। ১৭।১৮ বৎসরে সুকঠিন হইলেও একান্ত অসম্ভব নহে। বয়স সম্বন্ধে তাহা হইলে বলা যায় যে, তাঁহার বয়ঃক্রম দুই বৎসর কমাইলে বহু ঘটনাই অসম্ভাব্যরূপ ধারণ করে।

যে সকল পণ্ডিতপ্রবরদিগের মস্তকে রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিবার আগ্রহ হইয়াছে তাঁহাদিগের আগ্রহের মূলে আছে কৃতজ্ঞতার ও সত্যাশ্রয়-বোধের অভাব। যাঁহার নিকট যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা পাই নাই অথবা অপর কাহারও নিকট হইতে পাইয়াছি বলা কোন কোন ব্যক্তির স্বভাবে থাকে। তাঁহাদিগের তর্কবিতর্কের অনুসরণে তাঁহারা মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন করেন না। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্থির করেন যে, কিরূপ মীমাংসা হইলে তাঁহাদিগের মতলব হাসিল হয় ও তৎপরে তাঁহারা সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে প্রমাণ উত্থাপন করিতে তৎপর হয়েন। রামমোহন রায় একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ভারতীয় মানব তাহার আধুনিক প্রগতি, বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট ও প্রদর্শিত পথে চলা, সমাজিক কুপ্রথা বর্জ্জন, শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে নবদৃষ্টিজাত অভিনিবেশ নিয়োগ, নারীজাতির প্রতি অন্যায় ব্যবহার ত্যাগ, প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে আত্মনিয়োগ করার জন্য যে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট একান্ত ভাবে ঋণী একথা স্বীকার করিতে এই-সকল সুধীজনের প্রাণে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সুতরাং তাঁহারা বলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত রাজা রামমোহন রায় ভারতবাসীকে বিজ্ঞান চর্চ্চায় ও আধুনিক জীবনযাত্রা পদ্ধতির অনুসরণের সুবিধার জন্য ইংরেজী শিক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন নাই। করিয়াছিলেন রবার্ট ক্লাইভ; কেননা তিনিই পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ভারতে ইংরেজ ও ইংরেজীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্লাইভ যদি না হয় তাহা হইলে আর কোনও ইংরেজ নিশ্চয়ই ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। একথা চাপা দিয়া যাইতে তাঁহাদের কোনও লজ্জা হয় না যে রাজা রামমোহন রায় প্রথম জীবনে ফারসী ও আরবী শিক্ষা করিয়াই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে ইংরেজদিগের নিকট মুন্সির কাজ করিবার সময় ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে যখন তিনি একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে আরবী ভূমিকা সমন্বিত ফারসীতে লিখিত পুস্তক তুহ্‌ফাতুল—মুয়াহিদ্দিন রচনা করেন তখনও তাঁহার ইংরেজী জ্ঞান প্রগাঢ় ছিল না। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে দেখা যায় তিনি ইংরেজীনবীশ হইয়াছেন ও ইংরেজীর মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চা করিতেছেন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে যখন তিনি জন ডিগবির সহিত পরিচিত হ'ন, তখনও তিনি ইংরেজী শিক্ষাতে বিশেষ অগ্রসর হয়েন নাই। তবে ইহার পূর্ব্ব হইতেই তিনি, ইংরেজী না শিখিলে কার্যক্ষেত্রে উন্নতি করা যাইবে না, ইহা বুঝিয়াছিলেন ও নিজেই বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইংরেজীর জ্ঞান অর্জ্জনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। জন ডিগবির কথামত রামমোহন ২২।২৩ বৎসর বয়সে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন কিন্তু ১৮০১খৃঃ অব্দেও তিনি ঐ ভাষা ভালমত আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। পরে তিনি যখন দেওয়ান নিযুক্ত হ'ন তখন বহু ইংরেজদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া ও ইংরেজী সংবাদপত্রাদিতে ইংলণ্ডের ইয়োরোপীয় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় বিশেষ করিয়া বুৎপত্তি লাভ করেন। (ডিগবির লিখিত "বেদান্তের সারাংশ"-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ১৮১৬ তারিখ ৯ জুন তিনি কেনোপনিষদের ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশ করেন। ইহার একমাস চারদিন পরে ১৩ই জুলাই ঈশোপনিষদের ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশিত হয়। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তিনি হিন্দুধর্ম্মে একেশ্বরবাদ ও বেদে একেশ্বরবাদ প্রমাণ করিয়া নিজ

লিখিত পুস্তিকাদি প্রকাশ করেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে কঠোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সময় বহু পণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহার বহু বিষয়ে বাদানুবাদ হয় ও তাহাতে রাজা রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র-জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮১৯ খৃঃ অব্দে তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহা এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক, যেহেতু তাঁহার সতীদাহ নিবারণ কার্য্যে যে কৃতিত্ব তাহাও অপ্রমাণ করিতে কোন কোন ইতিহাসের মর্য্যাদা-নাশক ইতিহাসবেত্তা আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। ১৮২০ খৃঃ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি একটি সতীদাহ নিবারক ও সমর্থক-দিগের আলোচনার বিবৃতি প্রকাশ করেন। নিবারক-দিগের মধ্যে প্রধান তাঁহাকেই বলা যায় এবং সমর্থক-গণ যাঁহারা ছিলেন খণ্ডন করিবার জন্যই তাঁহাদিগের কথাগুলি উল্লিখিত ছিল। ইংরেজীতে যাহাকে বলে arguments for and against। সুতরাং যদি কেহ সতীদাহ-সমর্থকগণ যাহা বলেন, সেই কথাগুলিই রামমোহনের পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ঐ কথাগুলি রামমোহন প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত তাহা হইলে রামমোহন সতীদাহ-সমর্থক ছিলেন বলিয়া ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু সেইরূপ কথা প্রচার করা সততা-বিরুদ্ধ। এইরূপ কথা প্রচার যে কেহ করেন নাই তাহাও বলা যায় না।

ভারতবর্ষের এক মহা পণ্ডিত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মনীষীর লিখিত একটি পুস্তিকা হইতে অতঃপর কিছু উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা শেষ করা হইবে। এই পুস্তিকার লেখক ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। এইজন্য তাঁহার কথা বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার লিখিত পুস্তিকা হইতে অল্প কিছু এইখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে:

The period in which the Raja was born and grew up was, perhaps, the darkest age in modern Indian history. An old society and polity had crumbled down, and a new one had not yet been built in its place. Devastation reigned in the land. All the vital limbs of society were paralysed; religious institutions and schools, villages and homes, agriculture, industry and trade, law and administration, were all in a chaotic condition. An all-round reconstitution and renovation were necessary for the continued existence of social life and order. But what was to be the principle of organisation? For, there were three bodies of culture, three civilisations, which were in coflict—the Hindu, the Moslem and the Christian or Occidental; and the question was—how to find a point of rapport, of concord, of unity, among these heterogeneous, hostile and warring forces. The origin of Modern India lay there.

The Raja by his finding of this point of concord and convergence became the Father and Patriarch of Modern India—an India with a composite nationality and a synthetic civilisation; and by the lines of convergence he laid down, as well as by the Type of Personality he developed in and through his own experiences, he pointed the way to the solution of the larger problem of international culture and civilisation in human history, and became a precursor, an archetype, a prophet of coming Humanity. He laid the foundation of the true League of Nations in a League of National Cultures.

অর্থাৎ—'যে সময় রাজা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন ও ক্রমশঃ পরিণত-বয়স্ক হইয়া উঠেন সে-সময়টা সম্ভবতঃ ভারতের বর্ত্তমান যুগের গভীরতম তমসাচ্ছন্ন যুগ। পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্র তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং তৎস্থলে নূতন কিছু গড়িয়া উঠে নাই। দেশ তখন ধ্বংসস্তূপের গভীরে নিহিত। সমাজের সকল অঙ্গ পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষালয়, গ্রাম ও গৃহস্থের গৃহ, কৃষিকার্য্য, কারুকলা ও ব্যবসায়, আইন ও শাসন ব্যবস্থা সকল কিছুই ছিন্নভিন্ন ও বিশৃঙ্খল।

সর্ব্বব্যাপী পুনর্গঠন ও সংস্কার কার্য্যের পুনরাবির্ভাব ব্যতীত সমাজে প্রাণশক্তি, শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতে পারে না। কিন্তু সেই সংগঠনের মূল নীতি কি হইবে? কেননা সভ্যতা ও কৃষ্টির তিনটি পৃথক ধারা দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলি পরস্পরের সংঘাতে নিযুক্ত—হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান বা পাশ্চাত্য; এবং প্রশ্ন উঠিতেছে, এ-সকল ধারার মিলন কোথায় কি ভাবে সম্ভব, ইহাদের সামঞ্জস্য বা সমন্বয়-কেন্দ্র যদি থাকে তাহা এই সকল নানা বিচিত্র, বিরুদ্ধ, বিবাদাক্রান্ত সত্তার মধ্যে কোন্‌খানে থাকিতে পারে। বর্ত্তমান ভারতের উৎপত্তি সেইখানেই থাকিবে।

'রাজা রামমোহন সেই মিলন-সঙ্গম আবিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান ভারতের জন্মদাতা-জনক বলিয়া অভিহিত হইলেন। এই ভারতের জাতীয়তা ও সভ্যতা সংযোজন ও সমন্বয় সৃজনের উপর নির্ভরশীল; এবং তিনি সেই মিলনের পথ অনুসরণে ও নিজ ব্যক্তিত্ব গঠনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে বৃহত্তর মানবীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার সমন্বয় স্থাপনের পথও দেখাইয়া দিলেন, যেজন্য তাঁহাকে মানবতার আদর্শ-প্রবর্ত্তক আদিপুরুষ বলা যায়। তিনি সত্যই আদর্শ বিশ্বজাতি সংঘের ভিত্তিস্থাপক ও বিশ্বের সকল জাতির কৃষ্টি সমন্বয়ের মূল উদ্ভাবনা-কর্ত্তা।'

তিনি সকল কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্ম্মমত প্রভৃতির পূর্ণ উপলব্ধির জন্য বহু ভাষা শিক্ষা করিয়া সকল কিছুর অন্তরের সত্য নিজমনে জাগ্রত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সংস্কৃত, পালি, আরবী, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি অনেক ভাষাই তিনি উত্তম রূপে জানিতেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে রবার্ট ওয়েন লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি যদি ইয়োরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে ইরাসমাসের সমতুল্য বিবেচনা করা হইত, জেরেমি বেন্থাম তাঁহাকে একটি পত্র লেখেন ও তাঁহাকে বলেন: Your works are made to be known to me by a book in which I read a style which but for the name of a Hindoo I should certainly have ascribed to the pen of a superiorly educated and instructed Englishman. পরে আরও লেখেন যে, জেম্‌স্‌ মিল লিখিত ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহার মনে হয় যে উহা উত্তম পুস্তক though as to style I wish I could with truth and sincerity pronounce it equal to yours.

(অনুবাদঃ "আপনার লেখার সহিত আমার পরিচয় হয় একটি পুস্তকের মাধ্যমে যে পুস্তকটির লেখকের নামের স্থলে একজন হিন্দুর নাম না থাকিলে আমি লেখার কায়দা দেখিয়া মনে করিতাম উহা কোনও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজের দ্বারা লিখিত।" জেম্‌স্‌ মিলের ভারতের ইতিহাসের প্রশংসা করিয়া শেষে মন্তব্য করেন "যদিও লিখিবার কায়দা দেখিয়া আমার পক্ষে সত্যই উহা আপনার লেখার সহিত তুলনীয় বলা সম্ভব হইতেছে না।")

রাজা রামমোহন রায় নারীজাতির উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি যে আন্দোলন করিয়াছিলেন ও ঐ সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত তিনটি পুস্তিকা, রক্ষণশীল সনাতন-পন্থী প্রচলিত প্রথায় অন্ধবিশ্বাসীদিগের সহিত তাঁহার নিদারুণ দ্বন্দ্বের কারণ হয়। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বহু প্রমাণ ও কারণ দেখাইয়া সতীদাহ যে অশাস্ত্রীয় তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। নারীজাতির সমান অধিকার প্রাপ্তির সপক্ষে তিনি বলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা না দিয়া ও ঘরে বন্ধ রাখিয়া তাঁহারা মানসিক দৈন্যজাত কারণে জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা বলা অন্যায্য ও সকল সুবিচারের রীতি-বিরুদ্ধ। লীলাবতী, ভানুমতী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি উচ্চ-শিক্ষিতা নারীদিগের উল্লেখ করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে, সমানভাবে শিক্ষা পাইলে নারীগণ পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন ও হইয়া থাকেন। চরিত্রের দিক্‌ হইতে বলা যায় যে, মৃত্যুর নাম শুনিলেই যে স্থলে পুরুষদিগের হৃৎকম্প হইতে থাকে সেই স্থলে বহু নারী নির্ভীক ভাবে স্বামীর সহিত সহমরণে প্রস্তুত হইতে দ্বিধা করেন না। পুরুষজাতি নানা প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়াও

সমাজে নিজ স্থান রাখিয়া চলিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের সামান্য অন্যায়ও সমাজ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। পুরুষ অনায়াসে দুই বা দশটি বিবাহ করে; নারী কিন্তু একাধিক বিবাহ করিতে পারে না। সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ করিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বহু বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথাও তিনি সমাজ হইতে তুলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সকলই ছিল তাঁহার ভারতকে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে গঠিত দেশে পরিণত করিবার পরিকল্পনার অঙ্গ।

ইয়োরোপের যে সকল রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও সংগ্রাম সেই যুগে চলিত, রাজা রামমোহন রায় তাহার সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ তাঁহার প্রাণে মানব প্রগতির বাণী ধ্বনিত করিয়াছিল ও তিনি রুশোর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া শুধু মানবস্বাধীনতার কথাই বলেন নাই, তাহা অপেক্ষা অধিক যাহা সেই স্বাধীন মানুষের বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বের ও মিলনের কথাও বলিয়াছিলেন। নেপলস্‌এর মানুষের স্বাধীনতার দাবি, দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনদেশীয় উপনিবেশের স্বাধীনতার কথা, সকল কিছুই রাজা রামমোহন রায়কে চঞ্চল করিয়া তুলিত। তিনি ঐ সকল কথা শুনিয়া বাকিংহাম মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলেন... my miud is depressed by the late news from Europe......I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy...... Enemies to liberty and friends of despotism have naver been, and never will be, ultimately successful. (Letter dated Aug. 11, 1821) (অনুবাদঃ আমার মনে ইয়োরোপের বর্ত্তমান সংবাদ শুনিয়া নৈরাশ্যের উদ্ভব হইতেছে...হয়ত আমার জীবদ্দশায় আমি ইয়োরোপের জাতি-সকলের মুক্তি *হইতে দেখিব না, এবং এশিয়ার জাতিগুলিরও, বিশেষ করিয়া যেগুলি ইয়োরোপের উপনিবেশ, এখন অপেক্ষা* অধিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করা সম্ভব হইবে না... স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের সহায়কগণ কখনও সফলকাম হয় না ও শেষ অবধি কখনও সক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে না।)

স্পেনের উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীনতা অর্জ্জনে সক্ষম হয়, তিনি তখন মহা আনন্দে টাউন হলে বহুলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি ভোজ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন যে, তিনি সকল মানবের দুঃখ ও অপমানে ব্যথিত, যাহার যে ভাষা, জাতি, দেশ বা ধর্ম্ম হউক না কেন।

ভারতবর্ষে ঐ সময় মুদ্রাযন্ত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার জন্য বড়লাটের একটা বিশেষ নির্দ্দেশ জারি করা হয় (Press Ordinance)। রাজা রামমোহন রায় ইহার উচ্ছেদের জন্য ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আবেদন পেশ করেন। ইহাতে তিনি বলেন যে, মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনভাবে চলিলে কোথাও কখনও বিপ্লব বা বিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। স্বৈরাচারী শাসকগণ সর্ব্বদাই মুদ্রাযন্ত্র নিজ কবলিত রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে শেষ অবধি সমাজের মুখ বন্ধ রাখিয়া জাতীয় অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রবল হইয়া উঠে। ইহা কাহারও পক্ষে কল্যাণকর হয় না। যখন বৃটিশ শাসকগণ আদালতে বিচারকালে খৃষ্টানদিগের দ্বারা হিন্দু বা মুসলমানের বিচার গ্রাহ্য করেন কিন্তু মুসলমান বা হিন্দু দ্বারা খৃষ্টানের বিচার করিবার ব্যবস্থা উঠাইয়া দেন, তখনও রামমোহন ঐ নিয়মের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টে হিন্দু ও মুসলমান সাধারণের সাক্ষরিত একটি দরখাস্ত পেশ করেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই সকল কথার অবতারণা প্রয়োজন হইত না যদি না কোন কোন রামমোহন-বিদ্বেষী এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ মনোভাব

সত্যমিথ্যা-মিশ্রিত অপপ্রচার অবলম্বনে ব্যক্ত করিতেন ও বহু নিরপেক্ষ সজ্জন তাঁহাদের বিষোদ্গার সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া ভারতের এক মহান্ পুরুষের স্মৃতি কিছুটা নিষ্প্রভ আলোকে দেখিতে প্ররোচিত হইতেন।

ভাষার ক্ষেত্রে রামমোহনের যে অসামান্য প্রতিভা ছিল তাহা লইয়াও মিথ্যা প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহাকে বাংলাভাষার গদ্য রচনার বর্ত্তমান রীতি ও পদ্ধতির জন্মদাতা বলা হইয়া থাকে। একজন বিজ্ঞ সমালোচক ইহার বিরুদ্ধে বলিয়াছেন যে, রামমোহনের পূর্ব্বেও বাংলা গদ্য লিখিত হইয়াছে সুতরাং তাঁহাকে গদ্যের জন্মদাতা কেমন করিয়া বলা যায়, ইত্যাদি। বাল্মীকি অথবা হোমারকে কাব্যের জন্মদাতা বা আদি কবি বলিলে তাহা হইলে আপত্তি করা যায় যে, তাঁহাদের পূর্ব্বেও বহু ছড়াকার রচনাশৈলী-বর্জ্জিত ভাবে ছড়া কাটিয়াছেন ও সেইজন্য আমাদিগের ঐ দুই মহাকবিকে কোনও বিশেষ স্থানে বসাইবার প্রয়োজন নাই। রামমোহন সংস্কৃত ও বাংলার সম্বন্ধকে যেভাবে সংরক্ষণ করিয়া উভয় ভাষার নিজত্বকে প্রকৃষ্ট রূপ দান করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার লিখিত বাংলা গদ্যকে আমরা বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান বাংলা গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্যের উৎস বলিয়া ধরিয়া থাকি। ডাঃ সুকুমার সেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ্। তাঁহার "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন "গীর্জা ও পাঠশালার বাহিরে আনিয়া, বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া বাংলা গদ্যকে জাতে তুলিলেন আধুনিক কালের পুরোভূমিকায় সবচেয়ে শক্তিশালী ও মনস্বী ব্যক্তি রামমোহন রায়...তাঁহার হাতে বাঙ্গলা গদ্যের যে রূপ গঠিত হইল তাহাতে মাধুর্য না থাক স্পষ্টতা ছিল, কার্য্যোপযোগিতা ছিল...ঈশ্বর গুপ্তের মত প্রাচীনতার ভক্তও বলিয়াছেন 'দেওয়ানজী জলের মত বাঙ্গালা লিখিতেন।' রামমোহনের প্রতিপক্ষ মৃত্যুঞ্জয়ও তাঁহাকে গালি দিতে গিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন 'সাধুভাষার কাছ না ঘেঁষিয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিস্তার করিয়া (রামমোহন) অসৎ আচরণ করিয়াছেন'।"
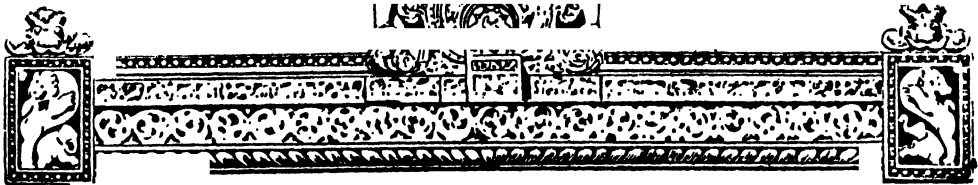
৪৮৮ পৃষ্ঠার পর

ট্যাক্সি সংগ্রহ করা অনেক সহজে হইতে পারে, কিন্তু তাহাই বা হয় কোথায়? কেন্দ্রীয় সরকার করিয়া দিবে? কেন্দ্রীয় সরকারের মহারথীগণ ঐ একই দেশের একই জাতির মানুষ। তাঁহারা এখন অবধি সকল ভারতবাসীর অক্ষর-পরিচয় করাইবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

শুনা গিয়াছিল কলিকাতা বন্দরে যাহাতে উত্তমরূপে জাহাজ চলাচল করিতে পারে সেইজন্য ফরাক্কা বাঁধ হইতে খাল কাটিয়া কলিকাতার ভাগীরথীর জলবৃদ্ধি করা হইবে। ফরাক্কা হইয়াছে ও তাহার উপর দিয়া রেলপথ, মোটরগাড়ীর চলাচল পথ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে মূল উদ্দেশ্যে বাঁধটি বাঁধা হইয়াছিল—ভাগীরথীর জলবৃদ্ধি, তাহার জন্য খালটা এখনও কাটা হয় নাই। কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কয়েক মাস পূর্ব্বে সমস্বরে বলিয়াছিলেন খালটার শতকরা ৬০ ভাগ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বাট ভাগ আর বাড়িতেছে না। সুতরাং জাহাজও চলিতেছে না তেমন সংখ্যায় ও আকারের।

এখন দেখা যাক হাওড়ার দ্বিতীয় সেতুর কি হইতেছে। চার বৎসর পূর্ব্বে উহার জন্য ১০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে আসিবে শুনা গিয়াছিল। কিন্তু আসিবার পূর্ব্বেই দীর্ঘদিন হিসাব করিয়া স্থির হইল উহা এশিয়ার একটা অদ্বিতীয় সেতু হইবে এবং খরচ হইবে ২৮ কোটি টাকা। কিন্তু নক্সা ও খরচের হিসাব লইয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইল ও তাহা চলিতেই থাকিয়া যাইল। এখনও বোধহয় আপত্তির ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘই আছে ও তাহা কমিয়া যাইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এমন সময় নির্ব্বাচন আসিয়া পড়িল। যদি নূতন শাসকমণ্ডলী আসিয়া রাজ্য শাসন করেন, তাঁহারা কি হাওড়া সেতু লইয়া কিছু বলিবেন না? অসম্ভব। তাঁহারা নিজেদের মন্তব্য বক্তব্য লইয়া কিছু সময় কাটাইবেন নিশ্চয়ই। তাহার পরে ঐ ২৮কোটি টাকার হিসাব বাড়িয়া ৪৮ কোটি হইলেই কেন্দ্র টাকা দিতে কি আর অতটা ক্ষিপ্রগতিতে নড়িবেন চড়িবেন? এক-আধ বৎসর কাটিয়া যাইবেই এবং সেতু গঠনের সময়ও ৫ বৎসর না হইয়া ৭ বৎসর হইয়া যাইতে পারিবে। সকল কথা বিবেচনা করিয়া মনে হইতেছে, ঐ সেতু নির্ম্মাণ শেষ পর্যন্ত নাও হইতে পারে। মনুষ্য-সভ্যতা প্রগতিশীল। সেতু না গড়িয়া নদীগর্ভে সুড়ঙ্গ কাটিয়া যানবাহন চলাচল হইলে তাহা বিমান-আক্রমণে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এবং সহরের মানুষ যখন সুড়ঙ্গ দিয়াই রেলগাড়ী চড়িয়া চলাচল করিবে সেখানে সেতু খাড়া না করিয়া সুড়ঙ্গ কাটাই শ্রেয় হইবে, বলিয়া মনে হয়। সুড়ঙ্গগামী রেলগাড়ীগুলি সেইরূপ হইলে আর উর্দ্ধে উঠিয়া সেতুপথে নদী পার হইতে বাধ্য হইবে না। সুড়ঙ্গ ধরিয়াই হাওড়া পৌঁছাইয়া যাইবে।

সে যুগের নানা কথা

সীতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এলাহাবাদ থেকে চলে আসার পর কলকাতায় প্রথম যে বাড়ীটিতে উঠেছিলাম, সেটি ছিল কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, এখন যার নাম হয়েছে বিধান সরণী। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পাশে সরু একটি গলির ভিতর এই বাড়ী। চার-পাঁচ বছর আগেও মাঘোৎসব উপলক্ষে যখন মন্দিরে গিয়েছি, তখন ঐ বাড়ী দেখেছি। খুবই নড়বড়ে হয়ে গেছে, দেখলে মনে হয় পড়ে যাবে, তবু এখনও টিকে আছে, তাতে মানুষ এখনও বাস করছে।

আমরা যখন গিয়ে উঠলাম, তখনও বাড়ীটা পুরনো এবং খানিকটা বিবর্ণও, তবে এতটা নড়বড়ে ছিল না। তিনতলা বাড়ী, এক-এক তলায় দুখানা করে ঘর। প্রতি তলায় কাজ চলা গোছের বাথরুম ছিল, একটা রান্নাঘর ছিল দোতলায়, তিনতলার ছাদের উপর একটা কাঠের ঘরও ছিল। এলাহাবাদে আমরা এর চেয়ে অনেক বড় বাড়ীতে থাকতাম, এখানে একটু ঠেশাঠেশি করে থাকতে হল। একতলার দুটি ঘরে বাবার পত্রিকা-দুটির অফিস হল, উপরের চারটা ঘরে আমাদের সংসার পাতা হল। ঝি-চাকর, লোকজনের সংখ্যা কমে গেল, অতিথি-অভ্যাগতও আর আসত না, দু-চারজন নিকট আত্মীয় ছাড়া। কলকাতায় তখন বেশ ইলেকৃট্রিক ট্রাম চলছে, অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন লোকদের বাড়ীতে বিজলী বাতি জলছে, বিজলীর পাখা ঘুরছে। আমাদের বাড়ীতে অবশ্য ইলেকৃট্রিক সংযোগ ছিল না, আমরা সাবেকি মতে কেরোসিনের আলো জেলেই কাজকর্ম চালাতাম। গরম কালে তালপাখা ছাড়া আর কোনো পাখা ছিল না, তবে সামনে খানিকটা খোলা জমি থাকাতে হাওয়া আসত বেশ, কোনো কষ্ট হত না। দোতলা ও তিন তলায় সরু টানা বারান্দা ছিল, গরম কালের রাত্রে সেখানেও শুয়ে ঘুমনো যেত। বিছানার দরকারও হত না, কাঠের বারান্দা পরিষ্কার করে ঝাঁট দিয়ে সেখানেই ভাইবোনরা শুয়ে পড়তাম। এই খোলা জমিটাকে আমরা একটু গৌরবদান করে উল্লেখ করতাম "মাঠ" বলে।

পাড়াটির নাম ছিল "সমাজপাড়া"। এই পাড়ার বাসিন্দারা সবাই প্রায় ব্রাহ্ম ছিলেন বলে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় তাড়াতাড়িই হয়ে গেল। আমাদের পাশের বাড়ীতে তিনতলায় বাস করতেন পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। তাঁর ছ'জন কন্যা ছিলেন। চতুর্থ কন্যা সুধাময়ী প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন। তিনি বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। স্থির হয়ে গেল যে আমিও গরমের ছুটির পর ঐ স্কুলেই ভর্তি হব।

মাঝে মাঝে মাঘোৎসবের সময় কলকাতায় আসতাম বলে এই পাড়ার পুরাতন বাসিন্দাদের কয়েক-জনের সঙ্গে আগের থেকেই আলাপ ছিল। এর ভিতর ছিলেন ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয়ের পরিবারবর্গ ও গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয়ের পরিবারবর্গ ও অন্যান্য দুচারজন। প্রথম কয়েকটা দিন বড় মনমরা অবস্থায় কেটেছিল, এলাহাবাদকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। কিন্তু

"বিস্মৃতির মুক্তিপথ" ভগবান্ বাল্যে ও কৈশোরে অবারিত করে খুলে রাখেন, তার ভিতর দিয়ে জীবনের ডাক ক্রমাগত এসে পৌঁছতে থাকে, মানুষ সেদিকে কান না দিয়ে পারে না। ক্রমে ক্রমে ক্ষতস্থানের উপর একটা সূক্ষ্ম আচ্ছাদন পড়ে যেতে লাগল। একেবারে ভুলে কোনোদিন গেলাম না, কারণ ভোলা যায় না। পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে ক্রমেই বেশী করে আলাপ-সালাপ হতে লাগল। সমাজপাড়ায় সৌভাগ্যক্রমে তখন আমার সমবয়সী মেয়ে বেশ অনেকগুলিই ছিল। স্থির হল গরমের ছুটির পরই বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে আমাদের ভর্ত্তি করে দেওয়া হবে, কারণ এখানে ত আর মেসোমশায়ের মত শিক্ষক পাবার সম্ভাবনা নেই? দাদা এখানে এসে সিটি কলেজে ভর্ত্তি হলেন। ছোট ভাই অশোকও স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ মুলুকে তখনি স্কুলে দেওয়া গেল না, কারণ সে তখন বেশ ছোট এবং স্বাস্থ্যও তার বেশ দুর্ব্বল। বাড়ীতেই তার একটু আধটু পড়া চলতে লাগল।

প্রথম যেদিন স্কুলে গেলাম, সে ত প্রায় ৬৩।৬৪ বৎসর আগের কথা, অথচ সেদিনকার কথা এখনও পরিষ্কার মনে আছে। বাবার সঙ্গে দুই বোনে গেলাম। বেথুন কলেজের তখনকার চেহারা দেখতে বেশ সুন্দর ছিল, এখন নানাদিকে নানারকম ঘর উঠে তার মূর্ত্তি বদলে গেছে। কিন্তু প্রথম দিন এ-সব তত লক্ষ্য করিনি। ভয়মিশ্রিত কৌতূহল নিয়েই চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম। স্কুলে ত আগে কখনও পড়িনি, এক সঙ্গে এত মেয়ে দেখা অভ্যাস ছিল না।

বেথুন স্কুলের হেড্‌মাষ্টার তখন ছিলেন শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয়। এঁর সঙ্গে বাবার আগে থাকতেই পরিচয় ছিল। এঁর কন্যা তটিনী পরে আমার সহপাঠিনী হন। ইনি ছাত্রী জীবনে খুব সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, একাধিক বার। পরে ইনি বেথুন কলেজের লেডী প্রিন্‌সিপ্যাল হয়েছিলেন।

আমার ভয় ছিল হেড্‌মাষ্টার মশায় হয়ত আমাদের পরীক্ষা করে দেখবেন বিদ্যে-বুদ্ধি কতটা আছে, এবং সেই অনুসারে ক্লাস ঠিক করবেন। কিন্তু তিনি সে-সব কিছু করলেন না। কতদূর পড়াশুনা করেছি সেটা বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিলেন, এবং সেই অনুসারে ক্লাস ঠিক করে ভর্ত্তি করে নিলেন। বাবা যখন আমাদের রেখে দিয়ে চলে গেলেন, তখন মনটা ভয়ানক দমে গেল।

তখন বড় একটা হলে পাঁচ-ছ'টা ক্লাস হত। ছাত্রীর সংখ্যা কোনো ক্লাসেই বেশী ছিল না। যত উঁচু ক্লাস, তত কম মেয়ে। ঐ হলেরই এক কোণে হেড্‌মাষ্টার মশায়েরও টেবিল চেয়ার। হলের মাঝখানে বেথুন সাহেবের আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি। স্কুল শেষ হবার পর স্কুলের ঘোড়ায় টানা বাসেই বাড়ী ফিরলাম। পরদিন থেকে শুরু হল, ছাত্রী জীবন। তারপর ত এই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন দিলাম, এই কলেজে পড়েই স্নাতক হয়ে বেরোলাম। দীর্ঘদিনের পরিচয় হল এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

সহপাঠিনীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। ভালই লাগত মোটামুটি। তবে বাল্যকালে ভাইবোন ছাড়া অন্য সঙ্গী সাথী বিশেষ ছিল না বলে সারাক্ষণ হৈ চৈ-এর মধ্যে থাকতে খুব ভাল লাগত না। যেদিন স্কুল খোলা থাকত আর যেদিন বন্ধ থাকত, তার মধ্যে বন্ধ থাকার দিনগুলিই বেশী পছন্দ করতাম। মাষ্টার-মশায়দের সঙ্গেও চেনাশোনা হল। পড়াশুনা হত এক রকম, চলনসই বলা চলে, সব বিষয়ে যে খুব ভাল পড়ান হত তা নয়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী দু রকমই ছিলেন তখন, পরে অনেক জায়গায় মেয়েদের স্কুলে পুরুষ শিক্ষক রাখার প্রথা উঠে যায়।

শিক্ষয়িত্রীদের ভিতর হেমপ্রভা বসুকে বেশ মনে পড়ে। ইনি বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন। নিজে বোটানীতে এম. এ. পাস করেছিলেন এবং কলেজের ক্লাসে বোটানীই পড়াতেন। তবে স্কুলে তাঁকে কেন ইংরেজী পড়াতে দেওয়া হয়েছিল জানি না। আমাদের ক্লাসে তিনি ইংরেজীই পড়াতেন। এলাহাবাদে থাকা কালে শ্রীশবাবুদের

বাড়ীর লাইব্রেরীর কল্যাণে অসংখ্য ইংরেজী নভেল আর ম্যাগাজিন পড়ার সুযোগ ছিল। সুতরাং মোটামুটি ও ভাষাটার উপর দখল জন্মে গিয়েছিল। এই কারণেই হয়ত হেমপ্রভাদির আমার সম্বন্ধে একটা পক্ষপাতিত্ব জন্মে গিয়েছিল।

স্কুলে পড়ার সময় আরো দুজন মহিলার সংস্পর্শে এসেছিলাম, যাঁদের কথা এখনও মনে পড়ে। একজন হিরণ্ময়ী সেন আর একজন জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

হিরণ্ময়ীর কাছে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তাঁকে চিরদিন মনে রাখবেন স্বভাব-চরিত্রের মাধুর্য্যের জন্য। এমন সাদাসিধা সরল মানুষ আমি কমই দেখেছি। তখনকার কালে বি. এ. এম. এ. পাস বঙ্গ-মহিলা খব কমই ছিলেন। যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজেদের কৃতিত্বে একটু গর্ব্বই অনুভব করতেন। হিরণদির কথায় বা কাজে অহঙ্কারের নামগন্ধও ছিল না। ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতই ব্যবহার করতেন। পোশাক পরিচ্ছদে সাজগোজের কোনো ইচ্ছা তাঁর কোনোদিনই দেখা যায়নি।

জ্যোতির্ম্ময়ী ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। অতি অল্পবয়সেই এম. এ. পাস করে তিনি স্কুলের কাজে যোগ দেন। তিনি প্রথম বঙ্গমহিলা graduate কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। কলেজের অনেক মেয়েই তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিল। খুব হাসিখুশি আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। মেয়েদের সঙ্গে তাঁরও ঠিক বন্ধুর মত সম্পর্ক ছিল। অথচ জীবনের গভীরতর দিক্‌গুলিকে যে তিনি উপেক্ষা করে চলতেন তা নয়। সাহিত্যিক জগতে সকলে তাঁকে চিনত, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই ক্ষেত্রেই কাজ করতে করতে তিনি প্রায় শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

পুরুষ শিক্ষকদের গোড়ার দিকে তেমন কাউকে মনে পড়ে না। একজন একটু হাস্যরসিক ছিলেন। ক্লাসের একটি মেয়ের নিয়ম ছিল, শিক্ষক মশায় কোন প্রশ্ন করলে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বসত, প্রশ্নটা যাকেই করা হয়ে থাক না কেন। উত্তরগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হত। শিক্ষক মশায় অতি কাতর মুখে বলতেন, "এই মেয়েটি যেচে ভুল বলবে।"

শ্যামচরণ গুপ্ত মশায় বছর দুই বাদে অন্যত্র বদ্‌লি হয়ে চলে যান। হেডমাষ্টার হয়ে আসেন তখন কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত মশায়। ইনি খুব কড়া মেজাজের মানুষ বলে খ্যাত ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ প্রায় আত্মীয়ের মত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এক কন্যা আমার সঙ্গে পড়তেন, তাঁর সঙ্গে অনেকবারই কালীপ্রসন্নবাবুদের বাড়ীতে গিয়েছি, এবং সর্ব্বদাই অত্যন্ত আদর পেয়েছি।

বেথুন স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে আমি আট বৎসর ওখানে পড়েছিলাম। কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার ত গোনাগুন্তি নেই। কত সহপাঠিনী যাত্রাপথে এক সঙ্গে পা বাড়ালেন তারপর বিদ্যাচর্চ্চা শেষ করে বিধিনির্দ্দিষ্ট পথে চলে গেলেন তারই বা কি হিসাব দিতে পারি? দুচারজনের সঙ্গে পরবর্ত্তী জীবনে দেখা হয়েছে, বেশীর ভাগই বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছেন। তটিনী গুপ্তকে মনে পড়ে কারণ পরের জীবনেও তাঁর সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাঁর অকাল তিরোধানে আত্মীয়বিয়োগের ব্যথাই অনুভব করেছি। আরো দুতিন জনের সঙ্গে বহুকাল ধরেই মধ্যে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, তবে সংসারের গোলকধাঁধায় পড়ে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতে পারিনি।

কলেজের প্রফেসরদের অনেককে এখনও মনে পড়ে। আমাদের কালে যে দুজন ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন, পরেশচন্দ্র সেন ও বিজয় গোপাল মুখোপাধ্যায়, তাঁদের খুবই মনে পড়ে। ভাল পড়ানোর জন্যে এঁদের খুবই সুখ্যাতি ছিল। বিজয় গোপাল মুখোপাধ্যায় মশায়কে কলেজ ছেড়ে দেবার পর আর দেখিনি, তিনি পরিণত বয়সে বেথুন কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের মানুষ ছিলেন, কাজেই কলেজ ছাড়বার পর অনেক বারই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

স্কুল কলেজে মন্দ লাগতনা, তবে ভাল ছাত্রী বলতে যা বোঝায়, তা আমি কোনোদিনও ছিলাম না। বই পড়তে ছেলেবেলার থেকেই খুব ভালবাসতাম, তবে সেগুলি অধিকাংশই "অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব" নয়। তবে এই অনর্গল পড়ার চোটে বাংলা ও ইংরেজী দুটো ভাষাতেই মোটামুটি বেশ দখল জন্মে গিয়েছিল। স্কুল কলেজের পড়াতেও এই ভাষা জ্ঞানটা অনেকটা সাহায্য করত। লিখবার একটা ইচ্ছা ছোট বেলার থেকেই মনে মনে অনুভব করতাম। এলাহাবাদে থাকা কালীন শ্রীশ-বাবুদের প্রকাশন বিভাগ থেকে Folk Tales of Hindusthan বলে একটি ছোটদের গল্পের বই বেরয়। ঐ বইটি দু-তিন বৎসর পরে আমরা দুই বোনে মিলে অনুবাদ করি। এটির নাম হয়েছিল হিন্দুস্থানী উপকথা, রচয়িত্রীর নাম দেওয়া হয়েছিল সংযুক্তা দেবী। কিশোর কালের কাঁচা হাতের রচনা হলেও বইটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং এখনও বাজারে চালু আছে। এর ছবিগুলি এঁকেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়, এটাও বইটির জনপ্রিয়তার একটা কারণ হতে পারে।

বেথুন স্কুল ও কলেজে খুব ঘটা করে বাৎসরিক প্রাইজ দেওয়া হত। গভর্ণমেণ্টের স্কুল, কাজেই সব সময়ই প্রায় লাট বেলাট ও তাঁদের পত্নীদের আগমন হত। ঠিক করে, কি ভাবে ঐ সব মহামান্যা মহিলাদের অভিবাদন করা হবে ও ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হবে, তাই সব ভেতো বাঙালী মেয়েদের শেখাতে গিয়ে লেডী প্রিন্‌সিপ্যালরা হিমশিম খেয়ে যেতেন। বেশ মাস দেড়-দুই আগে থেকে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের জন্য গান আবৃত্তি অভিনয় প্রভৃতি শেখান হত। সকলে এগুলিতে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিত। সরকারী স্কুল ত, টাকা-পয়সার কোনো অভাব ছিল না, মেয়েরা বেশ ভাল ভাল দামী দামী বই প্রাইজ পেত। আমাদের স্কুলেরই এক মাষ্টার মশায়ের উপর ভার ছিল এইসব বই কিনবার। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করতেন Dictionary প্রভৃতি কাজের বই দিতে, আর মেয়েরা চাইত গল্পের বই, উপন্যাস, প্রভৃতি। এই নিয়ে প্রতি বৎসর দারুণ ঝগড়া বেধে যেত। আর একটি অনুষ্ঠান হত প্রতি বৎসর, সেটার জন্যও আমরা খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতাম। সেটি পুরাতন ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী-দের সম্মিলন। এখানে স্বনামধন্যা অনেক বয়স্কা মহিলাকে দেখা যেত, যাঁরা এককালে বেথুনের ছাত্রী ছিলেন। অনেক বিখ্যাতা রূপবতীকেও দেখা যেত। বেথুন কলেজের compoundএর মধ্যে তখন দুটি lawn ছিল, এবং একসার খুব সুন্দর দেবদারু গাছ ছিল, এই জায়গাটিতেই বেশীর ভাগ ঐ সম্মিলন হত। রাস্তায় বেশ ভিড় জমে যেত, অভ্যাগতা মহিলাদের দেখবার জন্য। স্বর্ণকুমারী দেবীকে এখানে প্রথম দেখি।

আমাদের সেকালে কলকাতার মহিলাদের মধ্যে তখনও বেশ খানিকটা পর্দা প্রথার চলন ছিল। ট্রামে বাসে ভদ্রমহিলা প্রায় দেখাই যেত না। রাস্তায় পদব্রজে হেঁটেও খুব কম মহিলাই যেতেন। মেয়েদের স্কুল ও কলেজে সকলেই প্রায় গাড়ী করে যেতেন। একেবারে বাচ্চা মেয়ের দল মাঝে মাঝে ঝিয়ের অভিভাবকত্বে ছোট ছোট স্কুলে যেত। হাইস্কুলের মেয়েদের সেসব রেওয়াজ ছিল না। গাড়ী করে গিয়েই কি রক্ষা ছিল? মেয়ে স্কুলের গাড়ী দেখলেই পাড়ার মানবকের দল ছড়া বলতে রাস্তায় অলিতে গলিতে দাঁড়িয়ে যেত। দুটি ছড়ার খুব প্রচলন ছিল। একটি হল—

"মহাকালী পাঠশালা,
বিদ্যা হবে কাঁচকলা।"

আর একটি—

"বেথুন কলেজ
have no knowledge,
মোটা মোটা থাম,
কুছ্ নেহি কাম।"

যে সব ছেলের বয়স একটু বেশী, এবং প্রাণে কিঞ্চিৎ রসাধিক্য, তাঁরা মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন "চাপা পড়তে হয় ত এই গাড়ীর নীচে।" আমাদের তাতে খুবই সম্মতি ছিল তবে মুখ ফুটে কখনও কিছু বলিনি।

ঘোড়ায় টানা বাস্ খুব দ্রুতগামী ছিল না। এক বাস্এ মেয়েও ঠেশে দেওয়া হত প্রচুর, কাজেই বাড়ী ফিরবার সময়ে এক ট্রিপ ঘুরে আর এক ট্রিপ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। সেই কোন্ সকালে তাড়াহুড়ো করে আগুনের মত ডাল ভাত খেয়ে স্কুলে যেতাম আর সন্ধ্যা অবধি বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগত না। আমরা আবার বেশীর ভাগ সময় টিফিনের সময়ও কিছু খেতাম না। কাজেই খুবই শ্রান্ত ক্লান্ত লাগত। সমাজপাড়া এবং আশপাশ থেকে আমরা অনেকগুলি মেয়ে বেথুনে যেতাম। শেষে সবাই মিলে ঠিক করলাম যে আমরা হেঁটেই বাড়ী ফিরে যাব, স্কুলের পরে। ব্রাহ্মসমাজে পর্দার চলন নেই, কাজেই অভিভাবকরা কিছুই বলবেন না। আর অতজন একসঙ্গে যাব, রাস্তার লোকই বা এমন কি বলতে পারে?

কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে, রাস্তার লোকও ব্যাপারটাকে খুব হেলাফেলার জিনিষ মনে করে না, অন্ততঃ তরুণের দল ত নয়ই। হেদুয়া দীঘির অপর পারের কলেজে বেশ সাড়া পড়ে গেল এবং আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, একদল ছেলে দেহরক্ষীর মত ঠিক আমাদের পিছন পিছন হাঁটতে আরম্ভ করেছে। তারা যে সব সময় নীরব থাকত, তাও নয়। নানারকম মন্তব্য আমরা শুনতে পেতাম। আমি ছিলাম বিশেষ করে তাঁদের মন্তব্যগুলির লক্ষ্যস্থল। নাম ধাম কি উপায়ে তারা সংগ্রহ করত জানি না। আমি কোনদিন দলে অনুপস্থিত থাকলে, অন্য মেয়েদের কানের কাছে প্রশ্ন দাখিল করে যেত, আমি কেন আসিনি।

এ হেন উৎপাতে মর্মান্তিক বিরক্ত হয়ে প্রায়ই বাড়ীতে নালিশ করতাম। মা শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে এক দারুণ ষণ্ডামার্কা হিন্দুস্থানী দরোয়ানকে আমাদের নিয়ে আসবার জন্য পাঠাতে লাগলেন। এই গদাধারী ভৃত্যটির আবির্ভাবের পর থেকেই ছেলেদের দলে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ করল।

এখন ত রাস্তা ঘাট, মাঠ ময়দান কোথাও মেয়েদের অভাব দেখা যায় না। না দেখাটাই অস্বাভাবিক। ট্রাম বাসে মেয়ের দল ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলে। সবই এখন লোকের চোখে সয়ে গেছে। অতি রক্ষণশীল গোঁড়া মানুষ ছাড়া এ-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এদের দেখি আর ভাবি, আমরা কত পরিহাস, কত উৎপাত সহ্য করে এই-সব কন্যা ও নাতনী স্থানীয়াদের জন্য এই-সব পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আমাদের বাল্যকাল আর কৈশোরে দেখতাম, বড়লোকের বাড়ীর নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে রাস্তার উপর দুধারে পরদা ধরে চাকর দাঁড়াত, তার মধ্যে দিয়ে মহিলা অভ্যাগতরা হেঁটে গিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকতেন। আর এখন ত মেয়েরা মোটর হাঁকান নিজে, স্কুটার ও মোটর বাইকে উঠে বসতেও আপত্তি করেন না। বিমান চালাতেও দু-চারজন শিখেছেন শুনেছি।

সমাজপাড়ার ঐ বাড়ীতে আমরা দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর কাটিয়েছিলাম। জীবনের সব চেয়ে সুখের, আনন্দের, নিশ্চিন্ততার দিনগুলি আমার ওখানেই কেটেছিল। কিন্তু তখন কি আর সেগুলির যথার্থ মূল্য দিতে পেরেছিলাম? দাঁত থাকতে ত লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না? ভাবতাম, হয়ত এই ভাবেই সব মানুষের জীবন কাটে। এলাহাবাদের জীবনটাও আমাদের আনন্দেরই ছিল, কিন্তু সেটা ছিল মোটামুটি শৈশবের আনন্দ। পারিবারিক জীবনের বাইরে যেতে পারিনি সেখানে, দেশের ও দশের সঙ্গে তেমন কোনো সংযোগ ছিল না। কিন্তু কলকাতায় এসে পাড়া প্রতিবেশী, স্কুলের মেয়ে, নানা জনের সঙ্গে মিলে মিশে সামাজিক জীবনে খানিকটা স্থান পেলাম। সাহিত্য জগতের সঙ্গেও নূতন করে পরিচয় হতে লাগল।

সমাজপাড়ায় থাকার সময় মাঘোৎসবটা আমাদের খুব একটা উপভোগ্য ব্যাপার ছিল। পৌষ মাসটা পড়তে না পড়তেই উৎসবের জন্য যেন আমরা তৈরি হতাম। নূতন শাড়ী জামা কেনা হত। তখনকার দিনে ভদ্র ঘরের গৃহিনী বা বয়স্থা মেয়েরা বিশেষ বাজার করতে বেরোতেন না। বাবুরাই কেনাকাটা করতেন। বলা বাহুল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি মহিলাদের পছন্দ-

মত হত না। এই অসুবিধা ঘোচাবার জন্য একদল শাড়ীওয়ালী প্রায়ই শাড়ীর পুঁটলি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতেন। এঁরা বেশীর ভাগই ছিলেন দুঃস্থ ভদ্র ঘরের মেয়ে। আমরা তাঁদের দিদি বলেই সম্বোধন করতাম। তাঁরা ঘরের লোকের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের কাছেই আমরা শাড়ী নিতাম। যেরকম চাইতাম, সেরকমই তাঁরা এনে দিতেন। কত অল্পদামে কত সুন্দর সুন্দর শাড়ী তখন পাওয়া যেত, এখন ভাবলে অবাক্ লাগে। কয়েক আনা দামে তখন ছোট মেয়েদের শাড়ী পাওয়া যেত, এখন শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে?

মাঘোৎসবে অনেক অতিথি মফঃস্বল থেকে আসতেন। সাধনাশ্রমের বাড়ীতে অনেকে উঠতেন, সেখানে স্থান সংকুলান না হলে ভাড়া বাড়ীতে যাত্রী-নিবাস খোলা হত। এঁদের জন্য রান্নাবান্না সবই সাধনাশ্রমে হত, খাওয়ান হত মন্দিরের পিছনে চালা বেঁধে। এটি অনেক আগেই তৈরি করা হত। উৎসবের প্রতীক ছিল এটি। এইখানেই উৎসবের খাওয়া, ১১ই মাঘের খাওয়া, বালক-বালিকা সম্মিলনের খাওয়া। বাইরের অতিথি অভ্যাগতও ত কম ছিলেন না, দুবেলা তাঁদের জন্য যা রান্না হত, তার তরকারি কোটাও এক বিরাট্ ব্যাপার ছিল। সমাজ পাড়ার সব বাড়ী থেকেই গৃহিনী ও মেয়েরা বঁটি হাতে করে দলে দলে তরকারি কুটতে যেতেন। এটা আমাদের এক উপভোগ্য আড্ডা ছিল। কাজ গিন্নীবান্নীরাই বেশীর ভাগ করতেন, গল্প করাটা আমরা করতাম। পরিবেশন করতেও উৎসাহ সহকারে সবাই অগ্রসর হতাম, কাজ খানিক খানিক করতাম বটে, সঙ্গে সঙ্গে গরম গরম বেগুনি ভাজা অনেকগুলি করে উদরসাৎ করে আসা হত।

উৎসবের জন্য ১১ই মাঘ মন্দির বিশেষভাবে সাজান হত। আমাদের চেনাশোনা ছেলেরাই বেশীর ভাগ সাজাতেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ত সুকুমার রায়কে। কাজে যোগ না দিয়েও শুধু সাজান দেখবার জন্যেই অনেক সময় মন্দিরের ভিতরে গিয়ে বসে থাকতাম। ১১ই মাঘ কে কত ভোরে উঠে গিয়ে মন্দিরে হাজির হতে পারে, সে বিষয়ে প্রতিযোগিতা লেগে যেত। আমরা ত মন্দিরের পাশেই থাকি, আমাদের ভোরে গিয়ে জায়গা নিয়ে বসার কোনো অসুবিধা ছিল না। তবে যাঁরা অনেক দূর থেকে আসতেন, তাঁদের সময় মত এসে পৌঁছানর খুবই অসুবিধা ছিল বই কি? দেরি হলেই আর বসবার জায়গা পাওয়া যেত না, অন্ততঃ ভাল জায়গা ত নয়ই। এই অসুবিধা এড়াবার জন্য অনেকে ১০ই রাত থেকেই সমাজপাড়ায় কোনো বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন রাতটুকুর জন্য। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তিন-চারজন সব বৎসরেই ঐ রাত্রে এসে জুটতেন। উৎসাহের আতিশয্যে ঘুমই হত না অনেক সময়। ভোরে গিয়ে বসা ঠিকই হত, তবে উপাসনা আরম্ভ হতে না হতে ঘুম পেতে আরম্ভ করত। এই দিন সমবেত সকলকে প্রীতি ভোজনে নিমন্ত্রণ করা হত। লোক ত যথেষ্ট জমা হত, কাজেই সকলের খাওয়া শেষ হতে বেলা গড়িয়ে যেত। আমাদের তাতে আপত্তি ছিল না, সন্ধ্যা হয়ে গেলেও ১১ই মাঘ উৎসবের নিমন্ত্রণ না খেয়ে বাড়ী ফিরতাম না। মহিলা উৎসবেও খাওয়ান হত, যুব উৎসবেও, তবে ১১ই মাঘের মত জনসমাগম কোনদিনই হত না।

তখনকার দিনে প্রতি বৎসরে উদ্যান সম্মিলনও হত একটি করে। এই দিনটাও বড় আনন্দের দিন ছিল। কলকাতার সহরতলিতে রাজা-মহারাজা ও অন্যান্য বড় লোকদের বড় বড় বাগানবাড়ী আছে। তারই কোনো একটি জোগাড় করা হত, বেশীর ভাগই বেলগাছিয়ার দিকে। খুব বড় গোছের পিক্‌নিক্ আর কি। অবশ্য সকালের দিকে ব্রহ্মোপাসনাও হত। ট্রামে করেই যাওয়া হত। এত লোক এক সঙ্গে যেতাম যে ট্রাম আমাদের জন্যে প্রায় রিজার্ভ হয়ে যেত। এই রকম দু-একটা ব্যাপার ছাড়া ট্রামে চড়া আমাদের ঘটে উঠত না। তারপর সারাদিন দলে দলে গল্প করা ও বেড়ান। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা অন্যরাই করত আমাদের শুধু আনন্দ করা। এইসব বাগানে অনেক জায়গায় পুকুর থাকত; ছেলেরা সাঁতার কেটে খানিক সময় কাটিয়ে দিত।

সারাদিন এই রকম করে কাটিয়ে বিকেলের দিকে ফেরা হত। উদ্যান সম্মিলন চুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঘোৎসবও শেষ হয়ে যেত। উৎসবের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি মণ্ডপ প্রভৃতি যখন খুলে ফেলা হত, তখন বড়ই খারাপ লাগত।

তখনকার দিনে রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকীও ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে খুব ঘটা করে পালিত হত। এখানে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হতেন, সুতরাং এমন ভীষণ ভিড় হত, যে প্রাণ নিয়ে, অন্ততঃ অক্ষত দেহ নিয়ে ফিরে আসাই কঠিন ছিল। পুরাকালের সিটি কলেজের যে বাড়ী ছিল কলেজ স্কোয়ারে, সেইখানে সভা হত। পুরনো বাড়ীটা যেন লোকের চাপে টলমল করে দুলতে থাকত, খালি ভয় হত কখন না-জানি ভেঙে উল্টে পড়ে। যাঁকে দেখবার জন্য, যাঁর কথা শুনবার জন্য এত ভিড়, সেই রবীন্দ্রনাথকে তিনতলার হলে নিয়ে আসা এবং সেখান থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা অসাধ্য সাধনের ব্যাপার ছিল।

সমাজপাড়ায় সমবয়সী এবং প্রায় সমবয়সী অনেকগুলি ছেলেমেয়ে থাকায় আড্ডা দেওয়ার সুবিধা ত ছিলই। আরো একটা ব্যাপারে বেশ আনন্দ পাওয়া যেত। অনেকগুলি বাড়ীতেই খোকা-খুকী ছিল অনেক জন। তারা কি কারণে জানি না, আমাদের বাড়ীটাকে, বিশেষ করে আমাকে বিশেষ রকম পছন্দ করত। ফলে সারাক্ষণই আমাদের বাড়ীতে এই বাচ্চার দলের দুচার জন করে বিচরণ করে বেড়াত এবং নানারকম আশ্চর্য্য কথাবার্ত্তা বলে সকলের মনোরঞ্জন করত। একটি তিন বছরের ছেলেকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেই বলত "জগদীশ, কাঁচকলা ভাতে দিস্। না খাবি ত বউকে দিস্।" এই শ্রীমানই একদিন দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে খেলা করতে গিয়ে নিজের মাসীমার বিছানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। বেশ ভাল করে কানমলা খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে যখন বাড়ী থেকে বার হয়ে এল, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছে জগদীশ?" কান্নার ভিতর হাসতে হাসতে বলল, "আজ একতা মস্ত বল কাঁচকলা ভাতে দিয়েছি।"

আর একটি বাচ্চার নিয়ম ছিল, সদর দরজার কাছে এসেই জিজ্ঞাসা করা "ওপলে (ওপরে) কে আছে?" বললাম হয়ত কারো নাম, তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বলল, "আল (আর)?" আবার একজনের নাম বলতে হল। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। আবার একই প্রশ্ন হল "আল?" তাকে থামাবার জন্য আমি পাল্টা প্রশ্ন করতাম "তোমাদের ওপরে কে আছে?" আমার এ রকম অনধিকার-চর্চ্চা সে বরদাস্ত করত না, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত "কেউ নেই।"

আমার খোঁপাটা সেকালে খুব মস্ত বড়ই ছিল, সেটা দেখে দুটি বাচ্চা মেয়ের খুব ভাল লাগাতে তারা আমার সঙ্গে খুব ভাব করত। ছোটটি একদম বাচ্চা, বছর তিনের হবে। একদিন দেখি বিকেলবেলা মন্দিরের পিছনের মাঠে বসে সেই বাচ্চাটি একটি অতি ছোট বেড়ালছানাকে একটা খালি বিস্কুটের টিনে পুরবার চেষ্টা করছে। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "ও কি করছ? তোমাকে যদি কেউ ওরকম করে বন্ধ করে?" সে বলল "তা হলে নিস্কেস্ (নিশ্বাস) বন্ধ হয়ে মরে যাই।" আমি বললাম "তা হলে ওকে টিনে ভরছ যে?" খুকী অম্লান বদনে বলল, "ছোটগুনোর ত নিস্কেস্ থাকে না।" প্রাণীবিজ্ঞানের এমন আশ্চর্য্য পরিচয় পেয়ে আমি ত থ। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরণের অনেক অদ্ভুত ধারণা আছে, সেগুলো কি কারণে তাদের মাথায় আসে বোঝা যায় না। আমার এক জ্যাঠতুতো দাদার স্ত্রী অল্পবয়সে মারা যান দুটি বাচ্চা মেয়ে রেখে। আমাদের সেই দাদা মেয়েদুটিকে মামার বাড়ী থেকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছিলেন, মাঝে দিন-দুইয়ের জন্যে কলকাতায় আমাদের বাড়ী উঠেছিলেন। বড়টির বয়স বছর চার, ছোটটির বছর দুই। সন্ধ্যাবেলা বড়টি মুখ ভার করে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কি হয়েছে?" তাতে বলল "মন করছে।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "ছোট খুকীরও কি মন করছে?" বড়টি উত্তর দিল "ছোট খুকীর ত মন নেই।"

তখনকার দিনের সামাজিক জীবনে অনেক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা দেখতাম যাতে ছোট ছেলেরা বড় হয়ে নিজেদের সামাজিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গড়ে ওঠে। তারা যে মনুষ্যসমাজের কাছে শুধুই নিতে আসেনি, দিতেও তাদের কিছু হবে. এ বিষয়ে তারা নানাভাবে শিখত। এখনকার মত শুধুই দাবী. তার সঙ্গে দায়িত্বের সম্পর্কও নেই, এ ধারণা তখনকার মাতাপিতা বা ছেলেমেয়ে কারো ছিল না। আমরা যখন নিজেরা ছোট তখনও শিশুসমিতি করতাম, বাল্য-সমাজ করতাম। শিশুসমিতি ছোটদের club-এর মত ছিল। বাচ্চারা নিজেরাই গান করত, আবৃত্তি করত, ছোট নাটক অভিনয় করত। যাঁরা তাদের চালাতেন, তাঁরাও শিশুদের চেয়ে খুব বেশী বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন না। বাল্যসমাজ করার উদ্দেশ্য ছিল, রবিবারে সমাজ মন্দিরে যখন উপাসনা হত, তখন ছেলেপিলেরা যাতে গোলমাল করে উপাসকমণ্ডলীকে বিরক্ত না করে, এরজন্য তাদের এক জায়গায় বসিয়ে নানারকমে entertain করে শান্ত করে রাখা। এইসব কাজে আমরা বারো-তের বৎসর বয়স থেকেই হাত লাগিয়েছি। গরীব দুঃখী ঘরের ছেলেপিলেরা লেখাপড়া কিছুই শিখতে পায় না; তাদের জন্য অবৈতনিক নৈশ স্কুল প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ-তরুণীরা সর্ব্বদাই করতেন, তাঁদের দেখাদেখি ছোটরাও করত। এখনকার ছেলেমেয়েরা বোধহয় এসব কথা স্বপ্নেও ভাবে না। সব মানুষ বড়লোক হয় না, ভাড়া করা নার্স বা শুশ্রূষাকারক রাখতে পারে না, কিন্তু গরীবের সংসারেও রোগপীড়া সমানই হয়, তখন তাদের দেখে কে? আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, আমাদেরই পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে, ছেলেরা nursing brotherhood গড়ছে। তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে দুঃস্থ রোগীদের সেবা করে আসত। বয়স্কা গৃহিণীরাও গিয়ে রোগিণীদের দেখাশোনা করতেন। কারো বাড়ীতে, বেশ বেশী রকম বড়লোক ছাড়া, বেতনভুক nurse দেখাই যেত না। এখন এ হেন দৃশ্য ত একমাত্র স্বপ্নেই দেখা সম্ভব। মানুষের যা নিকটতম সম্পর্ক তাও আজকাল কত সহজে যে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। সমস্ত দেশের নৈতিক অবনতির মূলে যে এই সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার অভাব তা কে অস্বীকার করবে?

ক্রমশঃ

আসামের রাষ্ট্রনীতি

কেহ দেখিয়া শেখে না, কিন্তু ঠেকিয়া শেখে। আবার এমন মূর্খও থাকে যাহারা ঠেকিয়াও শেখে না। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি করিমগঞ্জ আসামের 'যুগশক্তি' সাপ্তাহিক হইতে প্রাপ্ত। পড়িলে বুঝা যাইবে যে, আসামের রাজনীতিবিদ্‌দিগের নিজ প্রদেশের বহু অংশ কর্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য গঠিত হওয়ার পরেও গোঁয়ারতুমি পরিত্যাগ করিবার সুবুদ্ধি হইতেছে না। ভারতীয় সংবিধানে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সকল ন্যায্য অধিকার সুসংরক্ষিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে নিজ মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার একটা বিশেষ অধিকার। ইহা লইয়া বিহার ও আসামের বাঙ্গালী সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের উপর অন্যায় উৎপীড়ন দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা চলিতে থাকিলে ফলে বিবাদ কলহের সূচনা হইবে।

"মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী সম্প্রতি কাছাড় সফর কালে আসামে বাংলা ভাষার স্থান সম্পর্কে একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও বঙ্গভাষী ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ পাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় অসম সাহিত্যসভার সম্পাদক মুখ্যমন্ত্রীকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে, এরূপ হইতে পারে না, কারণ আসাম সরকারী ভাষা আইন অনুযায়ী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙলাকে দ্বিতীয় সরকারী ভাষারূপে চালাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। অতএব মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হইয়াছে, যেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কেবল অসমীয়া ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করা হয় এবং অসমীয়া স্কুল-সমূহে অসমীয়া ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

"নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আসামের রাজ্য ভাষা সম্পর্কে অসম সাহিত্যসভার কর্মকর্তাদের মনোভাব অনমনীয় রহিয়াছে দেখা যায়। আসামের বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক ভাষা রূপে একমাত্র অসমীয়া মাধ্যমে শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় অনসমীয়া ভাষাভাষীদের যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা নিয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সরকারের সিদ্ধান্তরূপে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত না হইলে এবং আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন না হইলে আসামের বঙ্গভাষী লক্ষ লক্ষ নরনারী নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না।"

আমেরিকা ও চীনের বন্ধুত্বের স্বরূপ

ত্রিপুরা পত্রিকা লিখিতেছেন :

পশ্চিম পাকিস্তানের শাহানশা বাদশা জনাব ভুট্টো পাকিস্তানের অন্তিম দশা সম্পর্কে নিক্সন সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে গিয়াছিলেন। নিক্সন সাহেব জনাব ভুট্টোর গণ্ডপৃষ্ঠস্থ চড় লাথির উপর হাত বুলাইয়া, ধূলাবালি ঝাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, ঘাবড়াও মৎ! জবরদস্ত হাতিয়ার লে লও, রুপেয়া লেও—ফিন্ লড়নে কি লিয়ে তৈয়ার হো যাও। বদলা লেনে কি লিয়ে দুষমন কো খতম করনে চাহিয়ে।" জনাব ভুট্টো বেশি কিছু বলেন নাই। মামুর পদ চুম্বন করিয়া বিদায়-ভাষণ দিলেন—"আমরা মারাত্মক ঘায়েল হইয়াছি, এখন রেহাই দিন।" অতঃপর জনাব মাও সে তুং এবং চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য চীনেও যাইবেন। তালাতো মামুদেরও তিনি সাফ জবাব দিতে

চান। কারণ তাহারাও আমেরিকার ন্যায় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে অক্ষমতা জানাইয়াছেন। ভুট্টো সাহেব আশা করিয়াছেন মামুরা সৈন্য সহ সমরোপকরণ ও অর্থ দিয়া ভারত ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে দিল্লীর মসনদে বসাইবেন। তিনি খোয়াব দেখিয়াছিলেন, যে বিশ্বশক্তি জোট পাকিস্তান পয়দা করিয়াছে, সেই বিশ্বশক্তি জোট (বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা) নিজেদের গরজেই (স্রষ্টা তাহার সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে বাধ্য) পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভারত জয় না করুক, অন্ততঃ বাংলাদেশ সৃষ্টির সমস্ত সম্ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করিবে। বৃটেনও ফ্রান্স জনাব ভুট্টোর বিচারে বিশ্বাসঘাতক অপদার্থ ক্লীবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং চীন ও আমেরিকা করিয়াছে খেল।। সেই খেলায়, পাক সামরিক শক্তি পরাজিত ও অপদস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীন-আমেরিকা-কেও ললাটে কলঙ্ক-তিলক পরিধান করিতে হইয়াছে। তাই একজন বলিতেছে, এখনই বাংলা দেশের অভ্যন্তর হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের কথা, অন্যজন বলিতেছে ঢাকার পতন ভারতের জয়ের সাক্ষর নহে, বরং গভীর সঙ্কট ও ভারতের পরাজয়েরই সূচনা। প্রথম ব্যক্তি (আমেরিকা) বড় গলায় ইহাও বলিতেছে যে, যুদ্ধ-বিরতির কৃতিত্ব নিক্সন সাহেবের। মার্কিন সরকারের দৌলতেই পাকিস্তানের বাকী অংশটুকু রক্ষা পাইয়াছে। তাহা না হইলে উহাও যাইত। বাংলা দেশ মুক্তির পর পশ্চিম পাকিস্তানকে খতম করিবার পরিকল্পনা ভারতের ছিল বলিয়া মার্কিন সরকার প্রচার করিতেছে; বিশেষ করিয়া ভুট্টো মিঞাকে বুঝাইতে চেষ্টার অবধি রাখে নাই। দ্বিতীয় জনও (চীনও) ছোটখাটো পেপার টাইগার (কাগজে বাঘ) নহে; একেবারে সুন্দরবনের ডোরা কাটা বাঘের ন্যায় পাকিস্তানকে অভয় দিতে যাইয়া বলিয়াছে, চিন্তার কোন কারণ নাই, তামাম দুনিয়ায় শান্তিকামী মানুষ (ভারতকে গিলিয়া খাইবার জন্য) তাহাদের সাথে আছে।

আমেরিকা এবং চীন ঠিকই বলিয়াছে। মানবিকতা-বর্জিত সামরিক শক্তিতে শক্তিমান্ এবং একান্ত নির্ভরশীল এই রাষ্ট্র-দুইটি রাষ্ট্রনীতি ও আদর্শের প্রশ্নে অন্য কোন রাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত বলিয়া ভাবিতেই পারে না। ইহাদের মগজের দৌড় আত্মবৎ মন্যতে পরম্—অর্থাৎ সকল মানুষের মধ্যেই ইহারা নিজেদের প্রতিচ্ছবিই দেখিতে পায়। অতএব বাংলাদেশকে মুক্ত করার ব্যাপারটা উহাদের বিচারে ভারতীয় বাহিনীর পূর্ব্ব পাকিস্তান জয় বলিয়া বিবেচিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তাহারা যদি খোয়াব দেখে যে, ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের পর পশ্চিম পাকিস্থান খতম করিবে—তাহাতে বাধা দিয়াও কোন লাভ হইবে না। কিন্তু তাহারা যখন বলে, চাপ দিয়া ভারতকে যুদ্ধ হইতে বিরত করা হইয়াছে, এখনই বাংলাদেশ হইতে ভারতীয় সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে—তখন নিশ্চয়ই আমাদের বক্তব্য আছে। আমাদেব প্রধান মন্ত্রী পূর্বাপর সর্ব্বদাই বলিয়া আসিতেছেন, চাপের নিকট কখনই কোন অবস্থাতেই নতিস্বীকার করিব না। আদর্শের জন্য যদি মৃত্যু হয় সেও ভাল। নতিস্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। সৈন্য অপসারণ কাহারো নির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখে না। ভারত আমেরিকার ন্যায় ভিয়েৎনাম জয় করিবার জন্য বাংলাদেশে সৈন্য পাঠায় নাই, পাঠাইয়াছে বাংলাদেশকে হানাদার-মুক্ত করিতে। জয় করা আর মুক্ত করার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা অনুধাবন করা চোরের পক্ষে অসম্ভব। যুদ্ধবিরতি। ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই; বিরতির দায়িত্বটা তাহার পক্ষে নেহাতই অনুকম্পা। প্রতিরক্ষার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইয়া যখন সে বুঝিতে পারিয়াছে পাকিস্তানের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মরণ আসন্ন—তখন খেমা দিয়াছে। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যায় যে, উদর বিচ্ছিন্ন হইলে দেহী যেমন প্রাণে বাঁচিতে পারে না সেইরূপ পূর্ব পাকিস্তান বিলুপ্তির দ্বারাই পশ্চিমের হৃদস্পন্দন আপনা হইতেই বন্ধ হইতে বাধ্য। অতএব পাকিস্তান খতম করার বদনামের বোঝা বহনের দায় এড়াইবার জন্যই ভারত যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির দূরদর্শিতা ইহা।

পাকিস্তান টিকিবে না, টিকিতে পারে না। ইহা জাতীয়তার প্রশ্ন। যে জাতীয়তার প্রশ্নে বাংলাদেশ সৃষ্টি হইয়াছে সেই জাতীয়তাই সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান ও পাকতুনিস্থান সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তান খতম করিবে।

উপনিষদো আত্ম কি ?

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় একটি নাতিদীর্ঘ সুলিখিত প্রবন্ধে যে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া কতটা সমীচীন তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-বস্তু ছাড়া আর যে কিছু থাকিতে পারে তাহা যুবকদের নিকট একেবারেই সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আর উপনিষদের ঋষিরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিতেন। তাঁহাদের নিকট আত্মারক্ত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকৃত হইত না। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাই উপদেশ দিয়াছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি বা অরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে সর্বমিদম্ বিদিতম্।" এখানে বলা প্রয়োজন যে ঋষিরা দেশকালে ব্যাপ্ত বস্তুগুলির সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্কশূন্য কোন শক্তিকে আত্মা বলিয়া বুঝিতেন না। ঐতরেয় উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে: "কোঽয়ম্ আত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? কতরং স আত্মা ?" অর্থাৎ আত্মরূপে আমরা কাহার উপাসনা করি ? ইন্দ্রিয় বা শক্তির মধ্যে কোনটি আত্মা ? উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, "যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বা বাচান্ ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদুচাস্বাদুচ বিজানাতি"; অর্থাৎ যদ্দ্বারা লোকে রূপ দেখে, শব্দ শোনে, গন্ধ আঘ্রাণ করে, ইত্যাদি, তাহাই আত্মা। বর্তমান কালে হোয়াইট-হেডের মত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি কোন একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। অর্থাৎ কৌষিতকী উপনিষদের ঋষি যে ভূতমাত্রা ও প্রজ্ঞামাত্রা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহাই আজ সকল বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্ত। হোয়াইটহেডের দর্শনে world loyalty কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপনিষদ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের জীবন-মৃত্যুর সম্ত্বনার কারণ হইয়াছিল। বর্তমান কালের মার্কিন পণ্ডিত উইল ডুরাণ্ট তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Story of Civilization-এ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সভ্যতা গৌতম বুদ্ধ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। অবশ্য আজিকার দিনে যদি যুবকরা বুর্জোয়া সভ্যতার ফল বলিয়া ইহাকে বর্জন করে তবে তাহার দায়িত্ব যুবকদেরই। যাহোক শোপেনহাওয়ারের মত জার্মান দার্শনিক এই আত্মবাদ এমনই গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তাঁহার মত সন্ন্যাসীর একমাত্র স্নেহের পাত্র একটি কুকুর "আত্মা" নাম পাইয়াছিল। বার বার এই কথাটি উচ্চারণ করিতে হইবে তাই ইহা যেন জপের মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল। উপনিষদ ভাল করিয়া পড়িলে দেখা যায় যে বর্তমান মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান, ও ইচ্ছা বলিতে যাহা বোঝায় ঐতরেয় উপনিষদের ঋষি তাহা স্পষ্টই নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন: "যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি"; অর্থাৎ—এই যে হৃদয়, এই যে মন, সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতনা, অজ্ঞান অর্থাৎ কর্তৃভাব, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি অর্থাৎ তৎপরতা, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু অর্থাৎ অধ্যবসায়, অসু (প্রাণনাদি) কাম অর্থাৎ বিষয়াকাঙ্ক্ষা, বশ অর্থাৎ অভিলাষ,—এই সমুদয় প্রজ্ঞানের নামমাত্র। এই প্রজ্ঞান বা আত্মাকেই যাজ্ঞবল্ক্য বার বার দেখিতে, শ্রবণ করিতে, মনন করিতে, নিদিধ্যাসন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর এই শ্রুতির ব্যখ্যো করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যো", ইহার অর্থ—আত্মদর্শনই

উদ্দেশ্য, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন উপায় মাত্র। এই ব্যাখ্যা পড়িয়া আমার মনে হয় শঙ্কর মধ্যযুগের লোক, প্রাচীনকালের ঋষিদের যে জীবনী শক্তি তাহা তাহাতে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তাই প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াতে যে ব্রহ্মের পরিচয় তাহা স্বাভাবিক ভাবে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি যে সাধনপন্থার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য। একবার এক ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শনের অভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়; তখন তিনি তাহাকে স্থূলদৃষ্টি দেখিয়া বলিয়াছিলেন: "নৈতৎ দ্রষ্টুং শক্যতে গবাদিবৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন গরু, ঘোড়া প্রভৃতি দেখার মত নয়।

এই ভূমিকাটুকু যথেষ্ট বলিয়া মনে না করিলেও আমরা এখন ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠাতা উদ্দালক আরুণির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদের সমগ্র ষষ্ঠাধ্যায় তাঁহার কথায় পূর্ণ। আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু বেদাধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ হও। কেবল ব্রাহ্মণের পুত্র অতএব ব্রাহ্মণ এরূপ 'ব্রহ্মবন্ধু' হইয়া জীবনধারণ বৃথা।' ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত রহিলেন। যখন গৃহে ফিরিলেন তখন তিনি জ্ঞানাভিমানী ও স্তব্ধ। পুত্রের এই শুষ্কভাব দেখিয়া আরুণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি সে বিদ্যালাভ করিয়াছ কি, যে বিদ্যা আয়ত্ত হইলে অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত জ্ঞাত হয়'। শ্বেতকেতু উত্তরে বলিলেন, 'আমার উপাধ্যায় এ বিদ্যা জানিতেন না, তাহা না হইলে নিশ্চয় আমাকে এ বিদ্যা শিক্ষা দিতেন'। শ্বেতকেতুর আগ্রহ দেখিয়া আরুণি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ, যেমন একটি মৃত্তিকাপিণ্ড দেখিয়া মৃণ্ময় সমস্ত বস্তু জানা হয়, যেমন একটি সুবর্ণময় বস্তু জানিলে সুবর্ণের সকল বিকার জানা হয়, যেমন একটি লোহার নরুণ দেখিলে সমস্ত লৌহময় বস্তু জানা হয়, তেমনি এক অদ্বিতীয় বস্তু আছে যাহা দ্বারা সকলই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে জানিলে আর সব জানা হয়।...সদ্‌বস্তু বলিলেন আমি বহু হই। প্রথমে তিনি তেজ হইলেন, পরে হইলেন অপ্‌ তার পর অন্ন। এই তিনের মিশ্রণে সকলই উৎপন্ন হইল। ইহাকে ত্রিবৃৎ করণ বলে। সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।...তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। সেই সদ্‌বস্তুই তুমি শ্বেতকেতু"। আরুণি নয় বার এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে যে সৃষ্টিতত্ত্ব আরুণি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সদবস্তুই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। আধুনিক দর্শন এই মতেরই সমর্থক। দ্বৈতবাদী বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্ত স্বীকার করেন না। শঙ্কর তো সৃষ্টিই স্বীকার করেন না। যাহোক এই ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায়েই অতিবিখ্যাত "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আরুণির শিক্ষার সার এই: "শ্বেতকেতু তুমি সেই বস্তু।" জীব-ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। জীবের সুষুপ্তির অবস্থা অভেদতত্ত্বের দ্যোতক। এই তত্ত্ব আরুণির প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আরও বিস্তারিত আকারে বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও উপনিষদে মায়াবাদ নাই, মায়াবাদের প্রেরণা এই নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ হইতেই আসিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের বিষয় পরে বিস্তারিতভাবে লিখিবার আশা রাখি। এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ডে দস্যু কর্তৃক বদ্ধচক্ষু গন্ধার-দেশীয় পথিকের দৃষ্টান্ত দ্বারাও তত্ত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর এই অংশের ব্যাখ্যা করিতে করিতে ধর্মজীবনে মানুষের যে অবস্থা-পরম্পরার সম্মুখীন হইতে হয় তাহার অতি উপাদেয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন। চোখবাঁধা বলদের মত আমরা সংসারচক্রে ঘুরিতেছি। আবরণমুক্ত হইতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হইবে। শঙ্কর-দর্শনে "আবরণ" কথাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয় এই উপনিষদখানি হইতেই তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। জার্মান দার্শনিক রুডল্‌ফ অটোও তাঁহার 'শঙ্কর ও এখার্ট' গ্রন্থে এই কথাটির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন এই উপমাটি শঙ্কর জীবনে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর এই মহাবাক্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন

তাহাকে বলা হয় ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণা। তাঁহার মতে জীবব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানের ভূমিতে নয়. কারণ জীব অল্পজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তাই জ্ঞান-অজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া চিৎ অংশে ঐক্যের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। জীব তো শঙ্করের নিকট ব্রহ্মই, অপর নহে। সত্যই যে জীব আছে তাহা শঙ্কর স্বীকারই করেন না। অতএব শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যা তো করিবেনই। রামানুজ 'তত্ত্বমসি' বলিতে "তস্য ত্বম্ অসি" অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রভূ ও জীব তাঁর দাস এই ভাবে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ঠিক উপনিষদের ধারা রামানুজের ব্যাখ্যায়ও ধরা পড়ে নাই। মধ্ব 'তত্ত্বমসিকে' 'অতত্ত্বমসি' বলিয়া সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদীর মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন: "তুমি ব্রহ্ম নও"। আমি যতগুলি ব্যাখ্যা পড়িয়াছি তাহার মধ্যে বল্লভাচার্যের ব্যাখ্যাই উপনিষদের ধারা ঠিক বজায় রাখিয়াছে। বল্লভ জীবনকে ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আরুণি যে সকল উদাহরণ দিয়া দিয়া শ্বেতকেতুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সকলই গ্রহণ করিয়াছেন। আমি নিম্বার্কের ব্যাখ্যা পড়ি নাই তবে শুনিয়াছি তিনি ও বল্লভ এবিষয়ে এক-মতাবলম্বী: জীবের জীবত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহারা ব্রহ্ম কোথায় পান? ব্রহ্ম যে ব্রহ্ম তাহা জীবই বলিতে পারে। জীব ও জগৎ বাদ দিলে ব্রহ্ম তো অসীম হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার ব্রহ্মত্বই থাকে না। ব্রহ্ম মানে তো বৃহৎ বস্তু—যাহার বাহিরে কিছু নাই। থিবো সাহেব বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ভেদাভেদবাদই সূত্রকারের মত। মায়াবাদীর ব্যাখ্যা কষ্ট-কল্পিত।

এতক্ষণ ঋষিদের কথা যতটুকু বলা হইয়াছে তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আরুণি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেখাইয়াছেন, যে সকল বিচিত্রতার মূলে আত্মিক ঐক্য বর্তমান। এখানে যদি কেহ উদ্দালক আরুণির নিকট Blanshard-এর Nature of Thought নামক বিখ্যাত পুস্তকের যুক্তিতর্কের ও রাসেল প্রমুখ নাস্তিক দার্শনিকদের শক্তিশালী খণ্ডনের ক্ষমতা আশা করেন তবে তিনি নিশ্চয় নিরাশ হইবেন। সভ্যতার সেই উষাকালে যে আরুণি গ্রীক দার্শনিকদের মত স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন ইহা কি কম গৌরবের বিষয়?

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে উপনিষদের ঋষিরা আত্মা বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহাতে ফ্রয়েডের Libido, বের্গসোঁর Elan Vital ও রুডলফ অটোর Mysterium Tremendrum এগুলিরও ভাবধারা বর্তমান। আচার্য কেশবচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি উপদেশে বলিয়াছেন "অবাক্ ভক্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর।" ইহাতে নিগূঢ় সাধন-সঙ্কেত দেওয়া হইতেছে না কি? উপনিষদ কথার অর্থই হইতেছে রহস্যময় শাস্ত্র। আজ আমরা মনে করি কার্যকারণশৃঙ্খলে ফেলিয়া আমরা জগতের সব রহস্যই উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সত্যই কি সব ফুরাইয়া গিয়াছে? জানিবার আর কিছুই কি বাকী নাই? গীতাকারও আত্মা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্, আশ্চর্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।" গীতা যদি "সর্বোপনিষদো গাবঃ দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ" হয় তবে এই আত্মদৃষ্টি মানুষকে অবাক্ বিস্ময়ে অভিভূত করিবেই করিবে। আরুণি পুত্রকে সেই বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যাহাকে জানিলে অশ্রুত শ্রুত হয়, অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়। কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গীতে আছে, "দেখেছ না যাহা দেখিবে এবার হইবে বিহ্বলম্।"

সাময়িকা

পাকিস্থান কমনওয়েলথ ত্যাগ করিল

রাষ্ট্রীয় অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্থানের সকল কার্য্যই রীতি-বিরুদ্ধ, সুনীতি-নাশক ও ন্যায়-বিচার বহির্ভূত ভাবে ঐ রাষ্ট্রের জন্মকাল হইতেই চালিত আছে। পাকিস্থানকে সাহায্য ও প্রশ্রয় দিয়া পাশ্চাত্য জাতিগণ তাহার চরিত্রহীন ব্যবহার সভ্য সমাজে চালাইয়া লইয়া এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যে পাকিস্থান যথেচ্ছাচার করিতে কখনও কোন লজ্জা বোধ করে নাই। পরদেশ লুণ্ঠন ও আক্রমণ করিয়া তাহার কষ্টকল্পিত সাফাই গাওয়া ও নিজদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সামরিক শাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রণে শোষণ ও উৎপীড়ন করিয়া শেষ অবাধ একটা জঘন্য বর্ব্বরতার চূড়ান্ত করা—এই সকল কার্য্যকলাপ পাকিস্থানের নিত্য-কর্ম্ম পদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। পাকিস্থানের নিকট কেহ কোন রীতিনীতি, আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা আশা করিতে পারে না।

সম্প্রতি পাকিস্থান বাংলা দেশে বর্ব্বর অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া ও পরে ভারতকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ লাগাইয়া তাহাতে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার জগৎ জাতিসভায় নিজ রীতিনীতি-বর্জ্জিত উন্মত্ত যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্থান আর নাই। তদ্দেশীয় জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজেদের পূর্ব্ব পাকিস্থান নাম ত্যাগ করিয়া বাংলা দেশ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। পৃথিবীর বহু দেশ বাংলা দেশের নবলব্ধ রাষ্ট্রীয় স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ রাষ্ট্রের সহিত নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। পাকিস্থান ইহাতে ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া প্রথমে যে যে জাতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছিলেন তাঁহাদের সহিত রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ছেদন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখন রুশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল তখন সম্পর্ক ছেদন করা হইল না। এখন ইংলণ্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবেন বলাতে পাকিস্থান কমনওয়েলথ ত্যাগ করিয়া ফেলিলেন কিন্তু ইংলণ্ডের পাকিস্থানী হাই কমিশনারকে নাম বদলাইয়া অ্যামব্যাসাডার নামে অভিষিক্ত করিলেন। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এই হাস্যরসের অবতারণা ভাঁড়-শ্রেষ্ঠ জুলফিকার আলি ভূট্টোর নিকট হইতেই বিশ্বজন আশা করিতে পারেন। শুধু জুলফিকার আলি ভূট্টো যদি ভাঁড়দিগের চির প্রচলিত পন্থা অনুসরণে হিংস্রতা বর্জ্জন করিয়া চলিতেন তাহা হইলে সকলে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া হাস্যই করিত, তাঁহার নিকট হইতে কোন বিপদাশঙ্কা করিয়া সংশয় অনুভব করিত না। পূর্ব্বের ব্যবহার হইতে ভূট্টোকে অতটা নির্দ্দোষ বলিয়া মনে হয় না পূর্ব্ববাংলায় ইয়াহিয়া খানের চরম বর্ব্বরতার প্রেরণাদান কার্য্যে ভূট্টোর হাত ছিল বলিয়াই সকলেই মনে করেন। শেখ মুজিবুর রেহমানের সহিত যাহাতে কোন শান্তিপূর্ণ পন্থানুসরণে ঠিকঠাক হইয়া না যায়, ভূট্টো সেই চেষ্টা ক্রমাগতই করিয়াছিলেন। তিনি এখনও সুবিধা পাইলেই অন্যায় পথে চলিয়া মতলব হাসিল চেষ্টা করিবেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তাঁহার ভাঁড়ের মুখোসের আড়ালে যে করাল সর্ব্বনাশের হিংস্ররূপ লুক্কায়িত আছে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করে। অবশ্য একথা বলিতেই হয় যে, আমেরিকা ও চীনের প্ররোচনা না থাকিলে ভূট্টো নিজবুদ্ধি ও নিজশক্তিতে কিছু করিয়া উঠিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং ভূট্টোর মুখোসের অন্তরালে নিক্সন ও মাওৎসেটুঙ্গের প্রতিচ্ছায়াও লক্ষিত হয়।

———

দেশ-বিদেশের কথা

কাছাড়ে [আসাম] শিক্ষার মাধ্যম

যুগশক্তি পত্রিকায় (৭. ১. ৭২.) প্রকাশ "২৯শে ডিসেম্বর সুগার মিলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরীর সঙ্গে করিমগঞ্জ সার্কিট হাউসে কাছাড় ছাত্র পরিষদের কতিপয় সদস্য সাক্ষাৎ করেন। কাছাড়ে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, কাছাড়ে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষাই হবে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এতে আপত্তি থাকলে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে মুখ্যমন্ত্রীর কোন আপত্তি থাকবে না বলে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়।"

ইসরায়েলে বাংলাদেশ সাহায্য প্রচেষ্টা

ইসরায়েল ক্ষুদ্র দেশ। কিন্তু আকারের তুলনায় ঐ দেশের বাংলাদেশ সাহায্য চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষনীয় হইয়াছে। ইসরায়েলে ঘরে ঘরে যাইয়া বাংলাদেশ সাহায্যকারীগণ আবেদন করিতেছেন। তাঁহারা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বারে বারে বিমান-যোগে শিশুদিগের খাদ্যবস্তু বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদিগের জন্য পাঠাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইসরায়েলের পত্র-পত্রিকাদিতে বাংলা দেশে পাকিস্থানী বর্ব্বরতা সম্বন্ধে সকল তথ্য পরিষ্কার ভাবে প্রচার করা হইয়াছে। ইসরায়েলের জন সাধারণ উত্তম রূপেই জানিতে পারিয়াছেন যে, বিংশ শতাব্দীতে সভ্যজাতি বলিয়া পরিচিত পাকিস্থান যে অসম্ভব নির্ম্মমতা, চরম বর্ব্বরতা ও জঘন্য পাশবিকতা প্রদর্শন করিয়া নিজেদের চূড়ান্ত অমানুষিকতা প্রমাণ করিয়াছে তাহার কোন তুলনা পওয়া সহজ নহে। হিটলারী অত্যাচার ইহার সহিত তুলনীয় হইলেও তাহা অধিক ভাবে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের উপর হইয়াছিল। পাকিস্থান যে দশ লক্ষ নরনারী শিশু হত্যা করিয়াছে ও এক কোটি মানুষকে উৎপীড়ন করিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই সকল বিতাড়িত ও নিহত মানুষের অধিকাংশই পাকিস্থানী বর্ব্বরদিগের সহিত এক ধর্ম্মাবলম্বী ও দীর্ঘ ২৪ বৎসর কাল তাহারা এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। গণহত্যা ও জননিপীড়ন ইসরায়েলের মানুষ বহু যুগ হইতেই সহ্য করিয়া আসিয়াছে। বাংলা দেশের সাধারণের উপর দিয়া যে অসহ্য নিষ্ঠুরতার ঝড় বহিয়া গিয়াছে ইসরায়েলবাসী জনগণ সে সম্বন্ধে সহজেই সহানুভূতি প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছেন।

পৃথিবী সকল প্রাণীর বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে

অনেকদিন হইতেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতি এমনই আবর্জ্জনা-সৃষ্টিকরে যে তাহার ফলে পৃথিবীর জল-হাওয়া ও ভূ-ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়া সর্ব্বজীবের প্রাণধারণের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রথমতঃ কাষ্ঠ, কয়লা, তৈল প্রভৃতি জ্বালাইয়া জলে, আকাশে ও স্থলদেশে যান-বাহন চালাইয়া, কল-কারখানা গতিমান্ করিয়া ও অসংখ্য চুল্লিতে রন্ধন, জল গরম প্রভৃতি করাইয়া যে ধূম্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল নিশ্বাস-গ্রহণ-সহায়ক আর থাকিতেছে না। ইহা ব্যতীত কারখানাগুলি হইতে নানান প্রকার বাষ্প নিঃসৃত হয় যেগুলির মধ্যে বিষাক্ত বাষ্প ও প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান থাকতে দেখা যায়। সেই সকল বাষ্পের উৎপত্তি হ্রাস না করিলে জীবজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ও অদূর ভবিষ্যতে বায়ু সংস্কার ব্যবস্থা না করিলে আর বাঁচিতে পারিবে না। মানুষ যেখানেই থাকে সেখানেই জল ব্যবহার হয় এবং ঐ জল নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়া দূষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ নদনদী হ্রদ, সমুদ্র

ইত্যাদিতে গিয়া পড়িয়া থাকে। ফলে সর্ব্বত্র জল ক্রমশঃ দূষিত হইয়া পানের অযোগ্য হইয়া যায়, জলচর জীবগণ স্থান ত্যাগ করিয়া পালায় বা মরিয়া যায়। স্থলেও মানুষের উৎপাতে বহু ক্ষেত্র আঁস্তাকুড়ে পরিণত হয়। এবং জীবাণুনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি ব্যবহারের ফলেও জীবজন্তুর প্রাণহানিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। সর্ব্বোপরি রহিয়াছে আণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে তেজস্ক্রিয়তা জন্মায় তাহা ক্রমে ক্রমে ঘাস-পাতা শস্য প্রভৃতিতে সংক্রামিত হইয়া জীবজন্তুকে আক্রমণ করে। মানুষের খাদ্য ও দুগ্ধ, মাংস, ডিম প্রভৃতির মাধ্যমে সংক্রামিত হইয়া মানুষকেও রোগাক্রান্ত করে।

বর্ত্তমান কালে সকল সভ্যদেশেই পারিপার্শ্বিক সংশোধন লইয়া আন্দোলন ও গবেষণা, চলিতেছে। প্রথম চেষ্টা হইতেছে অগ্নি প্রজ্বলন না করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারে গাড়ী, জাহাজ, বিমান প্রভৃতি চালনার চেষ্টা। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনেও সূর্য্যালোক, বায়ুর গতি ও জলের স্রোত বা জোয়ার ভাটার গতিবেগ ব্যবহার লইয়া নানাবিধ ব্যবহার-চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশে ঐ সকল চেষ্টাত হইতেছেই না, এমন কি ধূম্র উৎপাদন শুধু অকারণেই করা হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ চুল্লি জ্বালান, গাড়ীর এঞ্জিন যথাযথ ভাবে মেরামত না করা, কারখানার চিমনি ইত্যাদি অনায়াসেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধূম্র উৎপাদন হ্রাস করা যায়, কিন্তু কোনও চেষ্টা কেহ করে না। জলে অপরিষ্কার ও বিষাক্ত নর্দ্দমাজাত বস্তু ছাড়িয়া দিয়া নদনদীর অবস্থা ক্রমে অধিকতর ভাবে অব্যবহার্য্য ও মৎস্যের জীবনধারণের অনুপযুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। পারিপার্শ্বিক শুদ্ধ করিয়া রাখার চেষ্টা এখন হইতেই করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দিগের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা আবশ্যক। সম্প্রতি বৃটেনে একটি "জীবন রক্ষার নক্‌সা" প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহাকে "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো"র সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ৩৩ জন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই নকসাতে স্বাক্ষর সংযোগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অ্যালডাস হাক্‌সলি, ভি. সি. উইন-এডওয়ার্ডস, এডওয়ার্ড সলগবেরী ও সি. এইচ. ওয়াডিংটনের নাম রহিয়াছে। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকদিগের কথায় দেখা যাইতেছে যে পারিপার্শ্বিক সংশোধন ব্যবস্থা না করিলে এই শতাব্দীর অন্তেই পৃথিবী মনুষ্য বাসের অযোগ্য হইয়া যাইবে। এই কার্য্য করিতে সকল রাষ্ট্রকেই পাশ্চাত্যে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলিতেছে। এ অবস্থায় ভারতকেও নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেওয়া চলিতে পারে না।
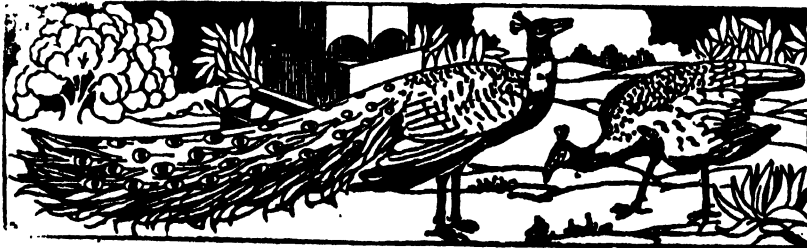
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭১তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৭৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

চীন ও আমেরিকার মিতালি

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং গনতান্ত্রিক চীন বহুদিন হইতেই পরের দেশে সৈন্য পাঠাইয়া নিজের শক্তি বা প্রভুত্ব স্থাপন বিষয়ে বিশ্ববাসীর নিকট প্রকটভাবে দুর্নাম অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। সৈন্য প্রেরণ ব্যতীত অন্য উপায়ে বিভিন্ন জাতিকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিবার জন্যও ঐ দুই দেশের অখ্যাতি সুদূর ও সর্ব্ব প্রসারিত। এই উপায়গুলির মধ্যে অপর জাতির বিদ্রোহকারীদিগকে গোপনে যুদ্ধ শিক্ষাদান, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য মাল-মশলা ও অর্থ দিয়া যুদ্ধক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা—এই সকল কার্য্যই চীন ও আমেরিকা করিয়া ও করাইয়া থাকেন। নাগাদিগকে গোপনে চীন দেশে অথবা পাকিস্থানে লইয়া গিয়া যুদ্ধ শিক্ষা ও অস্ত্রাদি দিবার ব্যবস্থার মূলে পূর্ব্বোক্ত দুই জাতির প্ররোচনাই প্রধানতঃ লক্ষিত হয়। পাকিস্থানের ভারত আক্রমণ আমেরিকা ও চীনের দ্বারা প্রদত্ত অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যেই পাকিস্থান বারেবারে চালাইয়াছে। সাম্প্রতিক ১৪ দিবসের যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধের সময়েও; পৃথিবীর সকল জাতি যখন পাকিস্থানকে গণহত্যা হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন; আমেরিকা ও চীন তখন পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া চলিতে থাকেন ও ভারতকে নানা মিথ্যা আওড়াইয়া পাকিস্থানের হীন ও জঘন্য দুষ্কর্ম্মের জন্য কষ্টকল্পিত ভাবে দায়ী করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। এইরূপ মানসিক আবহাওয়া যে দুই দেশের শাসকদিগের উপর ব্যাপক ভাবে ঘিরিয়া আছে সেই দুই দেশের তথাকথিত বিশ্বশান্তির জন্য মিলিত প্রচেষ্টা শুধু হাস্যকর নহে: প্রকৃত ক্ষেত্রে অপর কোন প্রকার গুপ্ত অভিসন্ধি ও ষড়-

যন্ত্রের পরিচায়ক মাত্র। অর্থাৎ আমেরিকা ও চীন যে প্রকার রঙ্গমঞ্চ-সুলভ খেলা দেখাইয়া যাহাই বলুন না কেন, তাঁহাদের ভিতরের মিলিত অভিপ্রায় অন্য কিছু আছে বলিয়াই সকলে মনে করিবেন। সে অভিপ্রায় প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে শান্তি স্থাপন হইলেও নিশ্চয়ই অপর কোন অঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তার আকাঙ্ক্ষার উদ্ভাবনা নিদর্শক। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে আমেরিকা বিপুল সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া কি ভাবে কোরিয়া ও ভিয়েৎনামে যুদ্ধ চালাইয়াছেন ও চীন কেমন করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধ পক্ষকে প্রবলভাবে ঐ যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম করিয়া চলিয়াছেন। উভয় দেশই মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নরনারীশিশুর প্রাণনাশ ও সহস্র সহস্র গৃহস্থের গৃহ, ক্ষেত, খামার প্রভৃতি ধ্বংস করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করেন নাই। এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে চীন যখন অন্যায় ভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগে তিব্বত দখল করেন এবং তিব্বত হইতে দালাই লামাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন; তখনও চীনের এই মহা অন্যায় ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকা কোন কথাই বলেন নাই। তিব্বতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করিতেও চীনকে তৎপর হইতে দেখা যায় নাই। ইহা ব্যতীত যদিও পাকিস্থানের ধর্ম্মকেন্দ্রিক কারণে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থন করা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও জাতি-সংঘের সকলেই প্রায় পাকিস্থানের সেই অন্যায় "অধিকার" ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাহাহইলেও ঐ ধর্ম্মেরই কারণে তিব্বত যে কেন চীন হইতে পৃথক থাকিবে না, জাতি, ভাষা ও কৃষ্টির ঐতিহ্য পৃথক ও মূলতঃ বিভিন্ন হওয়া সত্বেও, সে কথার কোনও বিশ্বাস-যোগ্য কারণ পিকিং বা ওয়াশিংটন হইতে দেখান সম্ভব হয় নাই। চীনে বহু মুসলমান থাকেন। তাঁহাদের জন্যই বা পাকিস্থান গঠনের আদর্শে একটা পৃথক রাষ্ট্র কেন গঠন করা হয় নাই? পিকিং নিরীশ্বরবাদী; সুতরাং পিকিং হইতে মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের উপর সাম্রাজ্য পরিচালনা আরোই অন্যায় ও জনমনের উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ। জোর করিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠার সহিত জোর করিয়া ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করান ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিলে সমজাতীয় অত্যাচার, অনাচার, ও উৎপীড়ন। কম্যুনিষ্টদিগের এই প্রচেষ্টা বহু স্থলে বহুভাবে প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু সেইজন্য কেহ কখনও তাহাদিগকে এই রীতি পরিবর্ত্তন করিতে বলে নাই।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন পিকিং যাইয়া চীনের সহিত আমেরিকার সৌহার্দ্য স্থাপন চেষ্টা আরও জোরাল করিয়াছেন। এই সৌহার্দ্য স্থাপনের মূল আগ্রহ রুশিয়ার প্রতি চীন ও আমেরিকার বিরুদ্ধতাজাত। আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিস্তার নিরোধ চেষ্টা করিতে বহু অর্থ ও সৈন্যবল নষ্ট করিয়া উপযুক্ত ফল পাইতে সক্ষম হ'ন নাই। অপর দিকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব ইউরোপে কম্যুনিষ্ট জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী জাতি রুশিয়া ক্রমে ক্রমে সামরিক ক্ষমতায় আমেরিকার সমতুল্য হইয়া উঠিতেছেন এবং শীঘ্রই আমেরিকা অপেক্ষা অধিক বলশালী হইয়া দাঁড়াইবার সকল লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন। এই অবস্থায় আমেরিকাকে যেমন করিয়াই হউক রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি বন্ধ করিতেই হইবে এবং যদি সম্ভব হয় সেই কার্য্য চীনের সাহায্যে করাইতে পারিলে এক ঢিলে দুই পাখী মারার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এই অবস্থায় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন স্থির করিলেন যে তিনি যদি স্বয়ং চীনদেশে গমন করেন ও সেখানে চীন রাষ্ট্রনেতা মাওৎসেতুঙ্গ ও প্রধান মন্ত্রী চু-এন-লাইএর সহিত নূতন করিয়া চীন-আমেরিকা সৌহার্দ্য গঠন ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার ফল নিশ্চয়ই রুশিয়ার শক্তিহানিকর হইবে। ঠিক কি ভাবে কি করা যাইবে—তাহা স্থির করিবার জন্য প্রথমতঃ ডাঃ কিসিঙ্গারকে রাষ্ট্রপতি নিকসন চীন দেশে পাঠাইলেন ও মোটামুটি সকল কথা যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত করিবার পরে রাষ্ট্রপতি নিকসন চীনযাত্রার দিন ক্ষণ স্থির করিলেন। ইহার মধ্যে নানাদেশের খেলোয়াড়দিগের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড়গণও চীনে পিংপং খেলিতে গমন করিল এবং এই আন্তর্জাতিক

শম্বন্ধ—নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার ব্যবস্থাকে নাম দেওয়া হইল পিংপং ডিপ্লোমেসি। পিংপং নূতন আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সৃজনের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল। পিংপং এর বল যেরূপ ক্রমাগত খেলোয়াড়দিগের চেষ্টায় টেবিল পারাপার করিতে থাকে কিন্তু তাহার ফলে কাহারও কোন লাভ হয় না, যতক্ষণ একপক্ষ কোন অক্ষমতা প্রদর্শন না করেন; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কূটনৈতিক খেলাও সেই ভাবে নিস্ফল গতিবেগ দেখাইয়াছে প্রচুর কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষের লাভক্ষতি কিছু হয় নাই। স্থির হইয়াছে আমেরিকা নিজের সকল সৈন্য ভিয়েৎনাম ও ফরমোজা হইতে যথাশীঘ্র সম্ভব সরাইয়া লইবেন। এ কথা আমেরিকা বহুবার বহুস্থলেই বলিয়াছেন কিন্তু কার্য্যত: তাহাতে আমেরিকা কোনও নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করেন নাই। আমেরিকার মানুষ চীন দেশে কিম্বা চীনের মানুষ আমেরিকায় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিবে; ইহাতেই বা কি লাভ হইবে কাহার? শক্তিবৃদ্ধি বা শক্তিহানীই বা কাহার হইবে? গায়ে পড়িয়া ভারত ও ও পাকিস্থানকে কিছু উপদেশ দিবার চেষ্টাও এই সঙ্গে কিছুটা করা হইয়াছে। কিন্তু সে উপদেশ ঐ দুই জাতি অগ্রাহ্য করিলেই বা কি হইবে?

মোট কথা নিকসন মহাশয় বহু মেহন্নত করিয়া পিকিং গমন-করিয়া শুধু পিংপং খেলা, চু-এন-লাই-এর কোট খুলিয়া দেওয়া, নূতন কেতায় বন্ধুত্ব স্থাপন ব্যবস্থা অথবা ভারত-পাকিস্থানকে উপদেশ দান প্রভৃতি উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টাই করিয়াছেন ধরিয়া লইলে তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা বা বুদ্ধি আছে প্রমাণ হয় না। নিশ্চয়ই নিকসন চু-এন-লাই-এর মিলিত আলোচনায় মনোভাব বিনিময়ের ফলে অপর এমন কিছু স্থিরীকৃত হইয়াছে যাহাতে চীন-রুশিয়ার পারস্পরিক সম্বন্ধ কোনও না কোন ভাবে—নূতন পথে চালিত হইবে। চীন অবশ্য সহজে আমেরিকার সুবিধার জন্য রুশিয়ার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। মার্কিন টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র পাইলে চীন তাহা দিয়া এশিয়ায় নিজ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়াই মনে হয়। আমেরিকার ইহাতে কি সুবিধা হইবে?

আমেরিকা ভাবিতে পারেন যে চীনদেশ আলোচনায় নির্দ্ধারিত পথেই চলিবেন ও আমেরিকার সাহায্যে শক্তিবৃদ্ধি করিয়া লইয়া রুশিয়াকে দমন করিতে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু আমেরিকা যাহা আশা ও ব্যবস্থা করেন তাহা সকল সময়ে ঠিক যথা আশা সেইভাবে হয় না। পাকিস্থান আমেরিকার নিকট অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিতে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া সকল ভাবেই সেই শক্তি বিশ্বের বৃহত্তম সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের উপরই নিয়োগ করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট মহাজাতি রুশিয়া ও চীনের সহিত পাকিস্থান মিতালি করিয়া আমেরিকার মতলবের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পাকিস্থানকে সমানে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া চলিয়াছেন। এখন চীন যদি রুশিয়া আক্রমণের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ না দেখাইয়া এশিয়ার অন্যান্য দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার চেষ্টা করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা সবলতর করিবার পথে চলেন; আমেরিকা তাহাতে কি ভাবে বাধা দিতে পারিবেন? পারিলেও বাধা দিবেন কি?

দুইটি কম্যুনিষ্ট শক্তিমান্ জাতির মধ্যে কোন্ জাতিটি সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র-সকলের পক্ষে অধিক বিপদের উৎস, তাহা বলা খুবই কঠিন। উচিত কোনও কম্যুনিষ্ট জাতির উপর অধিক নির্ভর না করা। অর্থাৎ আমেরিকা যদি সত্য সত্যই চাহেন যাহাতে রাষ্ট্রজগতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয় তাহা হইলে কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিবার কথা ছাড়িয়া সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমেরিকা তাহা করিতেছেন না। নিজের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিই আমেরিকার আসল লক্ষ্য। এই কারণে আমেরিকা শুধু কম্যুনিষ্ট-বিরোধী নহেন, তদুপরি পশ্চিম জার্ম্মানী, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের প্রতিও একনিষ্ঠ ভাবে বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা নহেন। অকম্যুনিষ্ট জাতি-সকল যতক্ষণ আমেরিকার প্রাধান্য

মানিয়া চলিবেন ততক্ষণ তাঁহারা; বন্ধু, নতুবা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হইলেই আমেরিকার সেই বন্ধুপ্রীতিতে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ করে।

সম্প্রতি যে চীন-আমেরিকা সখ্যস্থাপন চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে ও যাহার প্রথম চেষ্টা করিয়াছেন রাষ্ট্রপতি নিক্সন, পিকিং গমন করিয়া ও সেখানে প্রকাশ্য ও গুপ্ত আলোচনা চালাইয়া, সে চেষ্টা অতঃপর কিভাবে অনুসৃত হইবে তাহা এখন বলা যায় না। কারণ গুপ্ত আলোচনা কি হইয়াছে তাহা কেহ জানেন না। যতটা মনে হয়, আমেরিকাও হঠাৎ চীনকে আঢাঙ্গ সাহায্য দান আরম্ভ করিবেন না। লেন দেন চলিলে ক্রমে ক্রমে বুঝা যাইবে যে, ঐ নবসৃষ্ট সম্বন্ধ কোন পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ইহা প্রকাশ্যে যাহা হইবে তাহার কথা। গোপনে কি হইয়াছে বা হইতে থাকিবে তাহা অনুমানের কথা; সুতরাং তাহা লইয়া সহজে আলোচনা করা চলে না। শুধু যে-সকল জাতি চীন ও আমেরিকার সহিত সৌহার্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন, যথা রুশিয়া ও ভারতবর্ষ, তাঁহাদিগের বিশেষ ভাবে সজাগ ও সাবধান হইতে হইবে।

ভারত-বাংলাদেশ পারস্পরিক সামরিক সাহায্য সন্ধি

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন যে, কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে ও ভারতবর্ষকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা চালাইয়া চলিয়াছে। এই-সকল রাষ্ট্র নিজেদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য বিশেষ করিয়া চায় যাহাতে বাংলাদেশ হইতে ভারতীয় সৈন্যদল শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আইসে। কারণ সেইরূপ পরিস্থিতিতে বাংলা দেশের পাকিস্থান-সমর্থক দলের দুরাত্মাগণ সহজে দলবদ্ধ হইয়া বিপ্লবাত্মক কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। এমন কি শেখ মুজিবুর রেহমানের সমর্থকদিগকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়া রাষ্ট্র উল্টাইয়া নূতন গোষ্ঠীর শাসন প্রবর্ত্তন করিতেও পারিবে। কেননা শেখ মুজিবুর রেহমানের সমর্থকগণ সংখ্যায় অনেক হইলেও সামরিক শিক্ষা পাইয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শত্রু দমনে ততটা সক্ষম না হইতেও পারেন। পাকিস্থানের গুপ্তচরদিগের নিকট লুকান অস্ত্রশস্ত্র অনেক আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকে সামরিক শিক্ষালাভ করিয়াছে বলিয়াও শুনা যায়। সুতরাং তাহারা যদি দলবদ্ধ হইয়া শেখ মুজিবুরের সহায়কদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে যথেষ্ট সুশিক্ষিত সৈন্য না থাকিলে শেখ মুজিবুর রেহমানের দলের পক্ষে আক্রমণকারীদিগকে পরাস্ত করা সম্ভব নাও হইতে পারে। সেইজন্য বাংলা দেশের যতদিন যথেষ্ট লোকবলবিশিষ্ট সুশিক্ষিত সৈন্য-বাহিনী গঠিত না হয় ততদিন তদ্দেশে ভারতীয় সেনাদিগের অবস্থান বাঞ্ছনীয়। ইহাতে বাহিরের কোন রাষ্ট্রের সমালোচনা করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। ভারত যে বাংলাদেশ দখল করিয়া রাজত্ব বিস্তার করিবে না, সেকথা সর্ব্বজনস্বীকৃত। বাংলাদেশে যে বহু পাকিস্থানী রাজাকার এখনও গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহারা সুবিধা পাইলেই যে বর্ত্তমান শাসকদিগকে আক্রমণ করিবে সেকথাও সকলেই জানেন। বাংলাদেশ মাত্র কিঞ্চিৎ অধিক দুই মাস হইল পাক সৈন্যদিগের আত্মসমর্পণান্তে শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন ও এখনও তাঁহাদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী যথারীতি গঠিত হইয়া উঠে নাই। এমতাবস্থায় ভারতীয় সৈন্যদিগের আরো কিছুদিন বাংলাদেশে অবস্থান একান্ত প্রয়োজনীয়।

আর-একটি কথা এই যে, যখন দুই বা ততোধিক দেশ পরস্পরের প্রতিরক্ষার জন্য গভীর আশঙ্কা ও দায়িত্ব বোধ করেন; অর্থাৎ যখন এক এক করিয়া দেশগুলির নানান খণ্ডকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া ক্রমশ সমগ্র রাষ্ট্র-গোষ্ঠীকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিবে মনে করা হয়, তখন ঐ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে একটা সন্ধি করে যাহাতে যখনই কোন একটি রাষ্ট্র শত্রুর বা ভিতরের বিদ্রোহীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই সকল রাষ্ট্র মিলিত ভাবে সেই দেশে সৈন্য পাঠাইয়া শত্রু অথবা বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিবে।

রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব্ব জার্ম্মানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি "লৌহপর্দ্দার" আড়ালের রাষ্ট্রগুলি ঐরূপ একটি সন্ধি করিয়াছেন। ইহার নাম "ওয়ারস প্যাক্ট"। কিছুকাল পূর্ব্বে যখন চেকোস্লোভাকিয়া কম্যুনিষ্ট কেতা ছাড়িয়া জনমত অনুসরণ করিবার চেষ্টা করেন তখন "ওয়ারস প্যাক্ট"-অনুগত ভাবে রুশিয়ার সৈন্য আসিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার অপর পথে চলিবার আগ্রহ দমন করে। ভারত ও বাংলাদেশ যদি এমন একটা সন্ধি করে, যে সন্ধি অনুসারে বাহিরের শত্রু বা ভিতরের বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে সৈন্য প্রেরণ করিবে বলিয়া ধার্য্য হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী বৃহৎ না হইলেও বাংলাদেশের সাধারণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম থাকিতে পারিবে। এইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা হইতে পারে যে, ঐ রূপ হইলে জনমত অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব হইবে না; কারণ যদি ভারত বা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলেও ঐরূপ রাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তন চেষ্টাকে বিদ্রোহ বলিয়া সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র দাবাইয়া দিবে। কিন্তু ঐরূপ সমালোচনা ঠিক হইবে না এইজন্য যে, জনমত যুদ্ধ বা অস্ত্র ব্যবহার করিয়া ব্যক্ত হইবে না; সে অভিব্যক্তির উপায় হইবে ভোট দিয়া। যদি রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ কম্যুনিষ্ট হইতে চাহে তাহা হইলে তাহারা যথাযথভাবে সাংবিধানিক পথ অনুসরণেই তাহারা ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে। যদি তাহারা সশাস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা অবলম্বন না করে তাহা হইলে সৈন্য দিয়া তাহাদের দমনও কেহ করিতে পারিবে না।

ভারত ও বাংলাদেশের পরস্পরের সহায়তার সন্ধি করিবার আবশ্যকতার মূলে রহিয়াছে পাকিস্থান ও তাহার অপর দেশীয় সহায়কগণ। এই সকল জাতির বাংলা দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন একান্তভাবে অপছন্দ হইয়াছে। ইহারা প্রাণপন চেষ্টা করিবে যাহাতে বাংলা দেশের স্বাধীন রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যায়। ভারত ও বাংলাদেশের ভিতর পরস্পরকে সামরিক সাহায্যদানের সন্ধি হইলে উভয়দেশের শত্রুপক্ষই কিছুটা অসুবিধা অনুভব করিবে।

প্রবাসীর বয়স

প্রবাসী সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া ১৩৭৮ সালের বৈশাখ হইতে ৭১ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। এই সংখ্যায় প্রবাসীর ৭১ বৎসর সম্পূর্ণ হইল। মানুষের পরমায়ু তিন কুড়ি ও দশ বৎসর বলিয়া খৃষ্টানদিগের বিশ্বাস। মহাত্মা গান্ধী বলিতেন, মানুষের জীবন ১২৫ বৎসর হওয়া উচিত। বস্তুতঃ কোনও জীব অথবা প্রতিষ্ঠানের জীবনকালের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম নাই যে জীব বা প্রতিষ্ঠান যতদিন নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম থাকে ততদিন তাহার অস্তিত্বের অধিকার থাকিবে বলা যাইতে পারে। একটি মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য জনমত গঠনে সাহায্য করা, পাঠকদিগের চিত্তবিনোদন করা, জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির রূপায়িত অভিব্যক্তি; রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও অপরাপর সামাজিক বিষয়ের সমালোচনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে পত্রিকা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে যতদিন সক্ষম থাকে সে পত্রিকা ততদিন প্রকাশিত হইতে থাকিলে জনমঙ্গল-সহায়ক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।

প্রবাসী এতদিন নিয়মিত প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে ও সর্ব্বদাই জনহিত-চেষ্টায় নিবিষ্ট থাকিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতের বক্ষে জগদ্দল প্রস্তরের মতই চাপিয়া থাকিয়া জাতিকে নিষ্পেষিত করিতেছিল ও ভারতবাসী মুক্তির জন্য নানাভাবে আন্দোলন করিতেছিলেন, প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন সেই সাম্রাজ্যবাদের সুতীব্র সমালোচনা করিয়া বৃটিশ শাসকদিগের কূটতর্ক ও ভারত উদ্ধারের মিথ্যা অভিনয়ের প্রত্যুত্তর দিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরোও সবল ও কার্য্যকর করিয়া তুলিতেন। তাঁহার নির্দ্দেশিত পন্থা অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তীকালে

প্রবাসী পরিচালিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। প্রবাসীর এই যে ঐতিহ্য, তাহার রক্ষণ ও প্রসারই প্রবাসীর প্রচার কার্য্যের প্রধান অঙ্গ। প্রবাসী কোনও মানব অথবা মানবগোষ্ঠীকে সর্ব্বকালের জন্য অভ্রান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মানিয়া লওয়ার বিরুদ্ধে। রসানুভূতির ক্ষেত্রে নিরসকে নূতনত্বের দোহাই দিয়া সরসের আসনে বসাইতেও প্রবাসী নারাজ। বস্তুতন্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা, উভয়ক্ষেত্রেই প্রবাসী মানবতা ও জনমঙ্গলের মাপ-কাঠিতে সকল বিষয় মাপিয়া তাহাদের মূল্য বিচার করিবার পন্থায় বিশ্বাসী। রাষ্ট্রনীতির বাজারে যাহারা সংখ্যাধিক্য দেখাইতে পারে তাহাদের মতবাদ ও কর্ম্ম-পদ্ধতি নির্ভুল এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে মূলধন রাষ্ট্রের অধিকারে ন্যস্ত থাকিলেই অর্থনৈতিক সুবিচার চরমে পৌঁছিয়া যায় এইরূপ ধারণায় প্রবাসী সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহে। শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ ি ঃ ন্ত-ভাবে মহাভুল ও অন্যায় করিতে পারে ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন পারমার্থিক গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করা সঙ্গত নহে। মানব অধিকার সর্ব্বদাই ন্যায়, সুবিচার ও জনমঙ্গলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোন সামাজিক শ্রেণীর সুবিধা বা অভিরুচি বিচারে অধিকার গঠন চলিতে পারে না। যেমন রাজা, মহারাজা, জমিদার বা কারখানার মালিক অন্যায় ও অধর্ম্ম করিতে পারে; তেমনই দুর্নীতির আশ্রয় লইতে পারে অল্পবিত্ত মানুষ। এবং দমন আবশ্যক অন্যায় ও অধর্ম্মের; কোন জাতি বা শ্রেণীর মানুষের নহে। সমাজ, জাতি, শ্রেণী বা ব্যক্তির উন্নতির জন্য প্রয়োজন সকল রীতি, নীতি, কার্য্যপদ্ধতি প্রভৃতিকে ধর্ম্মের মানদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিবার। নীতিগতভাবে সামাজিক সকল কিছুর বিচার করিবার চেষ্টা প্রবাসীতে সর্ব্বদাই হইয়া আসিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। বঙ্গসাহিত্য, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবাসীর যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী উপরোক্ত আলোচনা হইতে তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

ভারতে কর্ম্মশক্তির অপচয়

বৎসরে একবার করিয়া আমাদিগকে শাসকগণ জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করি'া রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া থাকেন। সারা বৎসর কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার জন্য কেহ কোনও আগ্রহ অথবা ব্যস্ততা প্রদর্শন করেন না। জাতীয় কর্ম্মশক্তির ব্যবহার গতানুগতিক ভাবেই চলিতে থাকে। কি করিলে কর্ম্মীমাত্রেরই শ্রমশক্তি পূর্ণরূপে উৎপাদনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা কেহ কোথাও করে না বলিলে ভুল কথা বলা হয় না। ইহার উপরে যদি উৎপাদন কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক করিবার প্রয়োজনীয়তা লইয়া আলোচনার উত্থাপন করা হয় তাহা হইলে বিষয়টা আরোও জটিল হইয়া দাঁড়ায়। একজন মানুষ যদি প্রাণপাত করিয়া মাত্র এক বিঘা জমি চাষ করে তাহা হইলে তাহার শ্রমলব্ধ উৎপাদিত বস্তুর মূল্য যেভাবেই হউক বার্ষিক এক হাজার টাকার অধিক হইতে পারে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি যন্ত্র ব্যবহার করিয়া একশত বিঘা জমি চাষ করে তাহা হইলে তাহার শ্রমশক্তি দ্বারা এক লক্ষ টাকা মূল্যের ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে ঐ শ্রমিক যদি উৎপন্ন বস্তুর মূল্যের অর্দ্ধেক অংশ মজুরী হিসাবে পায় তাহা হইলে সে বার্ষিক পাঁচশত টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি উৎপন্ন বস্তুর মল্যের এক চতুর্থাংশও একজন প্রধান কর্ম্মী ও তাহার দুইজন সহকারীকে দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রধান শ্রমিক মাসিক এক হাজার টাকা ও সহকারীগণ পাঁচশত টাকা হারে বেতন পাইলেও সে ব্যবস্থা সহজেই করা সম্ভব হয়। সুতরাং শ্রমশক্তি যদি সর্ব্বাধিক লাভজনকভাবে ব্যবহার করা না হয় তাহা হইলে শ্রমিকের মহা ক্ষতি হয় ও তৎসঙ্গে জাতিরও অর্থ-নৈতিক বিলিব্যবস্থার অধঃপতন ঘটে।

আমাদের জাতির বহু কর্ম্মীরই কর্ম্মক্ষমতা ব্যবহার না করার ফলে কোন কিছু উৎপাদন না করিয়া নষ্ট হইয়া যায়। অনেকের কর্ম্মশক্তি কিছু কিছু কার্যে

নিযুক্ত হয় ও ফলে তাহারা যাহা সম্ভব তাহার একটা অংশমাত্র উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। ভারতে অতি অল্প কর্ম্মীই আছেন যাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাধিক লাভজনক ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণেই ভারতের জাতীয় বার্ষিক উপার্জ্জনের পরিমাণ অন্য দেশের তুলনায় অত্যন্তই অল্প। ইহার বর্ত্তমান পরিমাণ ২৫।৩০ হাজার কোটি টাকা হইতে পারে। কিন্তু যদি ভারতের অর্দ্ধেক লোকও মাসিক ১৫০।২০০ টাকা উপার্জ্জন করিত তাহা হইলে আমাদিগের জাতীয় বার্ষিক আয় ষাট হাজার কোটি টাকার কম হইত না। এই জাতীয় আয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যদি দুই লক্ষ কোটি টাকা হইত (২০০০০০০০০০০০০৲) তাহা হইলে ভারতীয় মানুষ আর্থিক উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইত। সকল ভারতবাসীর যদি উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, আমোদ-আহ্লাদ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে ঐ-রূপ মোট জাতীয় উপার্জ্জন না হইলে তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

ভারতীয় জনসাধারণের যে শ্রমশক্তি ব্যবহৃত হইতেছে না ও তাহার যে অংশ যেন তেন প্রকারে ক্ষতিকর ভাবে কার্য্যে লাগান হইতেছে, সেই বিরাট শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমে একটা হিসাব করা প্রয়োজন যে, ভারতের সকল মানুষের উপযুক্ত ভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে ভোগ্য বস্তু-সকলের কোন্ কোন্টির কতটা করিয়া উৎপাদন আবশ্যক। তৎপরে দেখিতে হয় কি ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও লাভ-জনক উপায়ে সেই উৎপাদন কার্য্য সাধিত হইতে পারে। অতঃপর দেখিতে হইবে যে, উৎপাদনের মূল উপকরণ ও সহায়ক বস্তুসকল কি ভাবে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যাইবে। ইহার মধ্যে ভূমি, জলক্ষেত্র, যন্ত্র, কাঁচামাল, শ্রমিক, নগদ মূলধন প্রভৃতি সকল কিছুই হিসাব করিয়া. দেখিয়া লইতে হইবে। যতদূর জানা যায়, ভারতীয় অর্থনীতিকে আধুনিক আকার দান করিবার চেষ্টাতে যে পরিমাণে ভারত সরকার নানাভাবে অর্থব্যয় করিয়া যেরূপ ফল পাইয়াছেন; যদি এখন নূতন পথে চলিয়া সকল মানুষের শ্রমশক্তির পূর্ণ ও যথাযথ ব্যবহার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে ভারত সরকারের সে ব্যবস্থা করিতে অবস্থায় কুলাইবে না এ রূপ ধরেণার কোনও কারণ দেখা যায় না। এই ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যায় এবং করিলে ভারতের বেকার সমস্যার একটা সমাধান সম্ভব হয়। তদুপরি আমাদের যে-সকল বস্তু বা ব্যবস্থার অভাবে জীবনযাত্রা সহজ ও উপভোগ্য হইতে পারে না সেই সকল বস্তু ও ব্যবস্থাও এইরূপ আয়োজন হইলে সকলের পক্ষেই পাওয়া সম্ভব হইবে। যথা, একটা উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। আমাদের যত সুনির্ম্মিত রাস্তার প্রয়োজন তাহার অর্দ্ধেকও এখনও নির্ম্মাণ করা হয় নাই। গ্রামে গ্রামে গৃহ নির্ম্মাণ এখনও প্রয়োজনের এক-চতুর্থাংশও করা হয় নাই। রাজপথ নির্ম্মাণ হইলে ক্রমে ক্রমে গ্রাম-সংস্কার এবং যানবাহন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইবে। গোযান উঠিয়া গিয়া যন্ত্রযান চলিবে। সমবায় ব্যবস্থা পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষকগণ ক্রমশঃ বৃহত্তর ক্ষেত্র গঠন করিয়া যন্ত্র ব্যবহার করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে। ফলে অনেক কৃষক কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া অপর কার্য্য করিবে এবং যাহারা যন্ত্র ব্যবহারে চাষ করিবে তাহারা মাসিক দুই শত হইতে পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

ভারতীয় অর্থনীতি এই বৎসর হইতে যদি নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ভারতীয়দিগের জীবন সত্যই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। ইহার জন্য ভারতের গঠনশীল রাষ্ট্রনেতাদিগের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাহা কি হইবে?

ভারত-বাংলাদেশ-আমেরিকা-চীন

আমরা অপর প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, ভারত যদি বাংলাদেশের সহিত একটা পারস্পরিক সহায়তার সন্ধি না করে তাহা হইলে বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে একটা অনিশ্চিত বিপদের উৎসরূপে চিরবর্ত্তমান থাকিবে।

কারণ এই যে, পাকিস্থান, আমেরিকা ও চীন ক্রমাগতই চেষ্টা করিতে থাকিবে যাহাতে তাহারা বন্ধুভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়া গুপ্তচর ও পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যে ঐ দেশে বিদ্রোহ করাইয়া শেখ মুজিবুর রেহমান প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রী সমাজবাদী রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন করিয়া তৎস্থলে অপর কোন ভারতবিদ্বেষী বিদেশী-নিয়ন্ত্রিত শাসনপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। আমেরিকার টাকার জোর আছে। বাংলাদেশ দরিদ্র ও তাহার জনগণ বিদেশীর সাহায্য গ্রহণ করিতে সহজেই প্রস্তুত থাকিবে। আমেরিকা যদি একবার বাংলাদেশকে অর্থ সাহায্য করিতে আরম্ভ করিতে পারে তাহা হইলে আমেরিকার তাঁবেদারদিগের শক্তিবৃদ্ধি হইবে ও আমেরিকার মতলব অনুসারে বিভিন্ন ব্যবস্থা সহজেই হইতে থাকিবে। চীনও এখন আমেরিকার সহায়ক ও সকল ষড়যন্ত্রের অংশীদার। চীনের বিশেষ আগ্রহ হিমালয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব ধীরে ,ধীরে বাড়াইয়া চলা ও শেষ অবধি ভারতকে পূর্ণরূপে সমতল অঞ্চলে নামাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা। পাকিস্থান রাষ্ট্র যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহা ভাড়াটিয়া গাড়ীর মত যে পয়সা দিবে তাহারই আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিবে বলিয়া সকলে মনে করেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সেই আমেরিকার কথাই নূতন পথে আসিয়া উঠিতেছে। পাকিস্থানের রাজাকার ও গুপ্তঘাতক-বাহিনীর "সেনা" গণ এখনও বাংলাদেশে অধিক সংখ্যাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল ব্যক্তিকে দমন করিবার মত সৈন্যবল বাংলাদেশ সরকারের আছে কি না তাহা বলা যায় না। যদি বিদেশীর অর্থে এই সকল দুর্নীতির উপাসকগণ বৃহদাকার ধারণ করিয়া বলবান হইয়া উঠে তাহা হইলে শুধু নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বাংলাদেশ সরকার আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভারত যদি প্রয়োজন হইলেই সামরিক শক্তি প্রয়োগে বাংলাদেশের শাসকদিগকে শক্তিমান্ করিয়া রাখিতে পারে তাহা হইলেই সেই দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্র স্থায়ী হইতে পারে। নতুবা তাহার অবস্থা যে কোন সময় সঙ্গীন হইয়া উঠিতে পারে। এই সকল কারণে ভারত-বাংলাদেশ সামরিক সাহায্য সন্ধি স্থাপন একান্ত আবশ্যক। ভারতের নিজের নিরাপত্তার জন্যও ইহা বিশেষ ভাবে আবশ্যক।

ভাগীরথীর জল বৃদ্ধির ব্যবস্থা

ভাগীরথীর জল বৃদ্ধির জন্যই ফরাক্কা বাঁধ বাঁধিবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদিগের কূটবুদ্ধির মায়াজালে জড়াইয়া পড়িয়া সেই পরিকল্পনা অন্য রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ ফরাক্কা বাঁধের উপর দিয়া রেল ও মোটরগাড়ী চলিবার আয়োজন হইল মহাসমারোহের সহিত, ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হনুমন্তাইয়া মহাশয়ের কথায়-বার্ত্তায় এমন কিছু রহিল না যাহাতে মনে হইতে পারে যে ফরাক্কা বাঁধের প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় নাই। বরঞ্চ এইরূপই মনে হইতে লাগিল যে, বাঁধ বাঁধাটা বস্তুতঃ সেতুবন্ধনের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন করিতেছেন অনেকেই যে, ভাগীরথীর জল বাড়িয়া সমুদ্রগামী জাহাজগুলি কবে আবার অধিক সংখ্যায় কলিকাতা বন্দরে আসিতে আরম্ভ করিবে? সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে যে, যে খাল কাটিয়া জল আনা হইবে সেই খালটির শতকরা ৬০।৭০ ভাগ শেষ করা হইয়াছে। এই ৬০।৭০ ভাগের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, হয় খালের দৈর্ঘ্যে নয় প্রস্থে, নয়ত গভীরতায় শতকরা ৩০।৪০ অংশ অনির্ম্মিত রহিয়াছে। কেন রহিয়াছে তাহার উত্তরে বলা হইতেছে মাটি কাটার কার্য্য পূর্ণরূপে করা হয় নাই। ভারতবর্ষে মাটি কাটিবার লোকের অভাব আছে বলিয়া আমরা কখনও শুনি নাই। এই কথাই শুনা যায় যে, কোটি কোটি শ্রমিক সর্ব্বদাই অল্প বেতনে মাটি কাটিতে প্রস্তুত থাকে। ইহার কারণ এই যে, মাটি কাটিতে কোন বিশেষ শিল্পকৌশল আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয় না। কোদাল, গাঁইথি চালনা সকল মানুষের স্বভাবজাত ক্ষমতার অন্তর্গত। সুতরাং মাটি কাটা না হইলে তাহার

এরপর ৭০৯

একটি নাম

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

১৩৬০ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ। তারিখ মনে রাখা যে পথে শক্ত—ভগবানের দিনরাত্রির তারিখই সেখানে নির্দেশক। সেই পথে অসংখ্য যাত্রীর সঙ্গে সহযাত্রী আমরাও কয়েকজন। পথটা হল কেদার-বদরী তীর্থের পথ।

হরিদ্বার, হৃষীকেশ থেকে হিমালয়ের পাহাড়ী কেল্লা বা দুর্গের মধ্যে ঢুকে পাহাড় পর্বত নদী ঝরণা ঘন দেবদারু-চীড়-পাইন-অরণ্যময় জঙ্গল ভেদ করে ঘুরে ঘুরে যাত্রীরা চলেছেন। আমরা হাঁটা পথের যাত্রী।

আমরা পৌঁছলাম বদরিকাশ্রমে বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটায়। ধর্মশালায় পৌঁছতে জিনিষপত্র খুলতে খুলতেই বারোটা বেজে গেল। এবং মন্দির বন্ধ হয়ে গেল।

পাণ্ডা বললেন, এবেলা দর্শন হবে না, প্রসাদ পাঠিয়ে দেব, স্নানাহার করে জিরিয়ে নিন।

কনকনে শীত। খর রৌদ্র যদিও। আমরা একটু বসেই বেরিয়ে পড়লাম পথে।

প্রকাণ্ড উপত্যকা। দূরে দূরে পাহাড় ছোট বড়। বড় বড় পাহাড়ের নদী শুকিয়ে বরফ জমে রয়েছে সাদা হয়ে। নিচের দিকে ঝরণা হয়ে নেমে এলে অলকনন্দা, মন্দাকিনী, ভোগবতী, ধবলা, গঙ্গা আদি নানা নাম ধরেন।

উপত্যকায় পৌঁছলে ডানদিকে খরস্রোতা বরফ-গলা অলকনন্দা নামে প্রবাহিত হয়ে গেছেন। খানিকদূরে মন্দাকিনী ও গঙ্গাতে মিশে ত্রিবেণী বা তিন ধারাও হয়ে গেছেন। কাছেই ছোট ছোট পাহাড়। ব্রহ্ম-কপাল একটির নাম, পিতৃকৃত্য করা হয় সেখানে। তার নিচেই ঠাণ্ডা বরফ অলকনন্দা। আর কাছেই পাহাড়ের গায়ে একটি গরম জলের ঝরণা। অবিশ্রান্ত গরম জল পড়ছে লোকেরা স্নান ও কাপড় কাচা, নানা কাজ করছে তাতে। একটি কুয়ো-ও তার পাশে রয়েছে।

উপত্যকায় তিনটি বড় বড় পথ সমান্তরাল ভাবে চলে গেছে। একটি নদীতীরবর্ত্তী। অন্য পাশে ধর্মশালা যাত্রীনিবাস। মাঝের পথটি মন্দির অভিমুখী। সেখানে দুধারে নানাবিধ জিনিষের বাজার। পূজার ফল ফুল, বাসন, বাঘছাল, মৃগছাল। জুতা ছাতা কম্বল লাঠি খড়ম, পাহাড়ী প্রয়োজনীয় বস্তু। আর অনেক খাবারের দোকান, মুদিখানা। কাপড়-চোপড়, চশমা, কম্বলের আসন, চন্দনকাঠ, শিলাজতু, পাহাড়ী জড়ীবুটী ওষুধও। এবং সারিসারি ভেড়া ছাগল চলেছে পিঠে ঐ সব জিনিষের বোঝা নিয়ে।

মন্দিরের পথের পাশের পথটি মন্দিরের পাশের দিয়ে নিচে গেছে উপত্যকায় খোলা প্রান্তর-সীমা অবধি।

সেইখানে পাণ্ডাদের পূজারী ও সেবক কর্ম্মচারীদের সব বাসগৃহ। ছোটবড় বাড়ীঘর।

আমরা দেখতে দেখতে সেই শেষ পথে এসে পৌঁছলাম। মন্দির তখনো বন্ধ দেখে মন্দির থেকে নেমে ঐ পথে এলাম।

নামতেই কাছে একটি চায়ের দোকান দেখতে পেলাম। খান-কয়েক বেঞ্চি টুল পাতা। একদিকে প্রকাণ্ড একটি কালীবর্ণ কেতলীতে চায়ের জল বসানো হয়েছে। বেলা প্রায় তিনটা। তখনো মন্দির খুলতে দেরী। আমরা ভাবলাম, একটু ভাঁড়ের চা খেয়ে নেওয়া যাক, আর তো যোরার জায়গা জানা নেই।

দোকানীরা সকলেই কিছু হিন্দী জানে। বাংলাও বোঝে। বসতে বলল। সহসা ঐ আন্দাজী তিনটায় একদল ছোট ছোট জুতা খড়মের শব্দ কানে ভেসে এলো। আর দেখি দশ বারো বছর ছেকে ৫।৭ বছর বয়সী ১৪।১৫জন শিশু বালক এসে দাঁড়াল দোকানে।

কাঁধে ঝোলানো বইয়ের বস্তা বা থলে। হাতে

হাতে কাঠের স্লেট বা পট্টী বলে ওদেশে কয়লা দিয়ে অক্ষর লেখে তাতে। গায়ে নানা রকমের গরম জামা। কম্বলের চকমায় জমানো লোমের জামা, তুলোর জামা পরা। হাসি হাসি ফরসা মুখগুলি। প্রায় সকলেরই রংপরিষ্কার। চোখ মুখ উজ্জ্বল। এবং একসঙ্গে নিজেদের ভাষায় অনেক কথা কিচ্‌মিচ্‌ করে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

আমরা অবাক্‌ হয়ে দেখছি।

সহসা তারাও আমাদের দুজনকে, আমাকে ও আমার বোনকে, দেখতে পেয়ে একটু থমকে গেল। তারপর কি যেন ভেবে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল। যেন আমাদের কাপড়-চোপড় দেখে। সহসা তাদের মধ্যে একটি বড় ছেলে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা বাঙালী? কলকাতা থেকে এসেছেন?'

আমরাও একটু অবাক্‌ হয়েই বললাম, 'হ্যাঁ আমরা বাঙালী আর কলকাতার লোক।'

এবারে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা সুভাষচন্দ্র বসুর কে হ'ন? ('রিস্তেদার' আত্মীয়) বাংলাদেশের লোক তো আপনারা?'

আমরা আরো আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। থমকে গিয়ে একটু বিব্রতভাবে বললাম, 'হ্যাঁ, আমরা কলকাতারই লোক বটে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের তো আপনার লোক হই না।'

তারা হয়ত ভেবেছিল, ঐ পাহাড়ের উপত্যকাটুকুর মত কলকাতা তথা বাংলাদেশের সীমা। যেখানে সবাই সকলের স্বজন, আত্মীয় বা কুটুম্ব। সকলে সকলের চেনা। তারা যেন একটু হতাশ হল। বাঙালী মাত্রেই তাহলে স্বজন বন্ধু নয়। এই শাদা কাপড় পরা বাঙালী মেয়েরা সুভাষ বোসের কেউ নয়।

তবু জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা তাঁকে দেখেছেন? 'কি রকম দেখতে তিনি? ছবির মতই? চিনতেন তাঁকে?'

এবার আমরা উত্তর দিতে পারলাম। 'দেখেছি, আমরা তাঁকে দেখেছি। তাঁর কথা শুনেছি। বক্তৃতা শুনেছি। তিনি ছবিতে দেখা ছবির মতই দেখতে।'

তারা সুভাষ বোসের গল্প শুনতে চায়। জানতে চায় বাংলাদেশের মানুষের কাছে সুভাষচন্দ্রের জীবন কথা, কর্মকথা।

আমাদের ঘিরে দাঁড়াল।

আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। শুধু এক দেশের মানুষ আমরা, তাতেই এত সশ্রদ্ধ কৌতূহল তাদের। ওদের দূর বাংলাদেশের সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধা প্রীতিতে আমাদের যেন চোখে জল এসে গেল। কবে শুধু পরেশনাথের বাগানে এক মেয়েদের সভায় দেখেছিলাম। সেই সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শোনা, চেহারা দেখা ঘটনাটি বললাম।

অভিভূত মনে আর বললাম, 'তোমরাও বড় হবে। অত বড়ই হতে পারবে। ঐরকমই গুণে বিদ্যায় সুভাষ-চন্দ্রের মতই কোনো না কোনো ভাবে কীর্ত্তিমান্‌ হতে পারবে চেষ্টা করলে।

আমাদের পিছনের দেওয়ালে কি সুভাষচন্দ্রের ছবি দেওয়া ক্যালেণ্ডার টাঙানো ছিল?

না, ওদের সকলের মনে মনেই সুভাষ বোসের ছবি আর নাম আঁকা ছিল?

সেই ১৩৬০ সালের পর আঠারো বছর কেটে এসেছে। সেদিনের সেই বালকগুলি কত বড় হয়েছে, কোথায় কি কাজ করছে জানি না। কোন্‌ পাণ্ডাদের ঘরের বালক তারা তাও জিজ্ঞাসা করে রাখি নি।

তবে এ জানি, তাদের শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। তাদের সামনে তো সে সময়ে আরো নেতারা ছিলেন, তারা তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করেনি। তারা সুভাষচন্দ্রের সব কথাও, জীবন কথাও জানত না, তবু এই অনাবিল শ্রদ্ধার নিশ্চয় তারা স্বদেশেই বড় হয়ে উঠেছে।

আর জানি, তাদের পিতা ভাইয়েরা বাংলা জানেন। তারাও বাংলা জানে। শিখে নেবে। হয়ত তাদের জন্য লেখা একথাগুলি তারা পড়তে পারবে। সুভাষচন্দ্রের আত্মার আত্মীয় হবে আদর্শে।

অভয়

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সেই প্রার্থিত দিনটা আসবে কাল। আজ শুক্রবার। সমস্ত দিন অভয় ভারী ব্যস্ত। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে খালি দেখা করছে। দুবার গেল দিবাকর আর রমেনের বাড়ী। ওরা ঠিক দুটোর সময় রওনা দেবে। হেঁটে যাবে, ফেরী ঘাট পর্য্যন্ত। তারপর নৌকায় পার হতেও সময় লাগবে। আজ ভিড় তো কম হবে না। তাই আগে ভাগে যাওয়াই ভাল। উমেশ একটা মুটে ঠিক করে দিয়েছে। স্টেশনে তুলে আসবে—চার আনা পয়সা নেবে। সেও ঠিক দুটোয় আসবে—

বেলা তিনটের সময় অভয় বেরিয়ে পড়ল। উমেশ তখন ঘুম থেকে উঠে, মুখ ধুচ্ছে। ওকে দেখে বলল, আয় আয় বস্। এখন তো মাত্র তিনটে। দাঁড়া কিছু খেয়ে নিতে হবে।

দু বাটি মুড়ি, গুড়, আর ছোলার ছাতু নিয়ে এল উমেশ। উমেশের মা দিল কিছু দুধ। অভয়ের বাটিতে অনেকটা দুধ ঢেলে দিয়ে উমেশ বলল, না। এ আমাদের ঘরের গরুর দুধ। গোয়ালায় জল মেশান দুধ নয় রে—

অপূর্ব্ব দুধ—ঠিক যেন ক্ষীরের মতন। এমন সুন্দর দুধ অনেকদিন খায়নি অভয়।

অভয় বলল, এমন জিনিষ দুচার দিন খেলে, চেহারা মোটা হয়ে যাবে। হাঁ রে উমেশ, তোদের গাই গরু কটা আছে?

উমেশ বলল, তিনটে গাই আছে। এখন দুটোতে দুধ দেয়। তা দুটো গরুতে সের পাঁচ-ছয় দুধ দেয়। আমরা দু সের রেখে, বাকী দুধ বিক্রী করে দিই। গরুর পেছনে খরচ তো অনেক। খোল, খড়, ভুষি এসব দিতে হয়। চরাতে হয়, অনেক যত্ন নিতে হয়, তবে দুধ দেয়। মা সর তুলে ঘি করেন। তোকে শিশি করে খানিকটা ঘি দেব, খেয়ে দেখিস্ কেমন ঘি।

অভয় বলল, তবে আজই দিস্। বাড়ী নিয়ে যাব।

—বাড়ী নিয়ে যাবি? তবে একটা বড় শিশিতে দেব। মা, বাবা, ভাই বোনরা খাবে।

ওদের খাওয়া শেষ হ'লে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। মাঠের মধ্যে একটা সাঁকো পার হয়ে, বাঁধের রাস্তা দিয়ে ওরা চলতে লাগল। সম্মুখে ফুটবল খেলার মাঠ—তার পাশ দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা। রাস্তা বরাবর চলে গিয়েছে ইংরেজ বাজারে।

বিকেল বেলা। ছেলেরা মাঠে খেলা করছে। অনেকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নদীতে নৌকা আর মাঝিদের ভিড়।

উমেশ বলল, তাড়াতাড়ি চল্। এ দোকান সে দোকান দেখতে হবে তো। হুট্ করে কিনে ফেললে ঠকতে হয়। আগে যেতে হবে কাপড়ের দোকানে। সিংহ ব্রাদার্সের দোকানটা ভাল। দরও সস্তা—আর জিনিষও ভাল। কি কিনবি? সাড়ী আর ধুতি তো?

অভয় বলল, বাবার জন্যে ধুতি আর গেঞ্জি। মার জন্যে ভাল একখানা সাড়ী আর আটপৌরে সাড়ী। জমিটা যেন শক্ত হয় আর পাড় যেন দেখতে ভাল হয়।

—বেশ। ঠিক আছে। চ এখন।

সিংহ ব্রাদার্সে বেশ ভিড়। এখন আদালত শেষ হয়েছে। মফঃস্বলের বহু লোক জিনিষপত্র কিনছে। ওরা গরুর গাড়ী করে, মফঃস্বল থেকে এসেছে মকর্দ্দমা

করতে। সার সার গরুর গাড়ী রয়েছে রাস্তার এক পাশে। কেউ যাবে গাড়ীতে, কেউ মোটর বাসে, কেউ হেঁটে। একখানা মাত্র মোটর বাস এই শহরে। ওটা চৌধুরী বাবুদের। লোকে কাপড়, বালতি, ছাতা, লণ্ঠন, কড়াই, হাতা এই সব কিনছে। কেউ জামা তৈয়ারী করাচ্ছে। সুগন্ধি তেল, আলতা, এমনি সব মনিহারী জিনিষপত্র খরিদ করছে। এখনকার মত এত দাম তখন ছিল না। সস্তায় অতি সুন্দর আর ভাল ভাল সাচ্চা জিনিষ পাওয়া যেত। এখনকার মত ভেজাল আর ফাঁকিবাজি ছিল না। দশ টাকার কাপড় কিনলে, কাপড় বাঁধার জন্য দোকানদার বিনামূল্যে একখানা বড় গামছা দিয়ে দিত। তখনকার দিনে টাকার দাম ছিল। দশ টাকায় কাপড় হ'ত একবস্তা।

উমেশের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অভয় জিনিষপত্র কিনতে লাগল, এ দোকান সে দোকান করে। যখন জিনিষ কেনা শেষ হ'ল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অভয় বলল, খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার খাই গে।

সামনেই মস্ত বড় খাবারের দোকান। গরম বোঁদে, লুচি আর হালুয়া খেল দুজনে। ঘরের মধ্যে, টেবিলের ওপর পদ্মপাতায় খাবার দিয়ে গেল। ভঁয়সা ঘিয়ে লুচি ভাজা। এক একখানা লুচি অন্ততঃ আধ পোয়া করে আটা দিয়ে তৈরী। লুচির সঙ্গে তরকারী আর হালুয়া বিনা মূল্যে। তিন আনায় ছ' খানা লুচি, আর তিন আনায় আধসের বোঁদে। খাওরা শেষ হলে, জল খেয়ে পান কিনল দুটো। উমেশ বিড়ি খায়। তাই দুপয়সায় মোহিনী বিড়ি আর হাতী মার্কা একটা সিগারেট কিনল। অভয় ওসব নেশা করে না! পানও বিশেষ খায় না।, কখন সখন দু-একটা খায় এই মাত্র।

অভয় বলল, দিবাকর আর রমেনের বাড়ী হয়ে যাব ভাই। ওদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। কাল যাবে ঠিকই। তবুও আর একবার সঠিক ভাবে জেনে নিই।

দুজনে হাঁটতে লাগল। কাপড়ের আর জিনিষ-পত্রের পুঁটুলি দুহাতে ঝুলিয়ে, অভয় যেন উড়তে উড়তে হাঁটছে। দোকানে দোকানে তখন আলো জ্বলছে। রাস্তার কেরোসিনের আলোগুলো টিপ্ টিপ্ করছে। দোকানের বড় লাইটের আলোতেই রাস্তাঘাট দিনের মত ঝকমক্ করছে। দিবাকর বাড়ী ছিল না। ধোপা-বাড়ীতে কাপড় জামা আনতে গিয়েছে। রমেশের সঙ্গে দেখা হ'ল। রমেশও খুব ব্যস্ত।

রমেশ বলল, চ, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। যাচ্ছি, জ্ঞানচাঁদের দোকানে। বাড়ীর জন্যে দু টাকার রস কদম্ব করতে দেওয়া আছে। আগে নিয়ে আসি। এসে আবার গোছগাছ করতে হবে। আমরা ঠিক দুটোয় বেরুব। খুব ভিড় হবে কিনা? তুইও ঐ সময় বেরোস্। নৌকা পার হ'তে হবে, তারপর হেঁটে স্টেশন। ওখানে গিয়ে টিকেট কাটা, সেও এক হাঙ্গামা। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে জামা কাপড় না ছেঁড়ে, তাই খালি ভাবছি। বুঝলি অভয়, এক কাজ কর্। ভাইবোনদের জন্যে দু টাকার রসকদম্ব নিয়ে যা।—নিবি কি?

একটু ভেবে অভয় বলল, হাঁ নেব। কিন্তু যাওয়ার সময় ঠিক ঠিক পাব তো?

বাঃ, পাবিনে মানে? চ, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। ওরা কি একটা আধটা হাঁড়ি সাজাচ্ছে? দেখ গা—দু টাকার চার টাকার কত হাঁড়ি। হাঁড়ির গায়ে সবার নাম লেখা।

সত্যই তাই। জ্ঞানচাঁদের খাবারের দোকানে সারি সারি হাঁড়িতে অর্ডারি মাল। সব হাঁড়ির গায়ে নাম লেখা। অভয় এক টাকার ক্ষীরের প্যাঁড়া আর দু টাকার রসকদম্ব নিল। টাকা আগাম দিয়ে হাঁড়ির গায়ে নাম লিখে রাখল। কথা হ'ল, ওরা মুখে সরা দিয়ে এঁটে দেবে। হাঁড়ির তলায় তলায় বিঁড়ে বেঁধে শক্ত দড়ি দিয়ে মুখ বেঁধে ঝোলাবার মতন করে দেবে। অভয় বলে, বেশ। আমি দুটোর পরই স্টেশনে যাবার সময় নিয়ে যাব।

অভয় রমেনকে বলল, শুধু দড়ির ওপর বিশ্বেস নেই। নূতন গামছা দিয়ে হাঁড়িটাকে বেঁধে ঝুলিয়ে নেব। ওঠা নামার মধ্যে ঠুক করে লাগলেও খাবার পড়ে নষ্ট হবে

না। গামছা দিয়ে বেশ শক্ত করে বাঁধা থাকবে। আজ আর শুভময়ের সঙ্গে দেখা হ'ল না। অভয় ভাবল, সকাল বেলা এসে, অবশ্যই দেখা করা যাবে। আজ আর বিশেষ তাড়া নেই। একটু অন্ধকার হলে বাড়ী ফিরবে। হাতের জিনিষগুলো ঘরের মধ্যে, তক্তাপোশের তলায় রেখে দিল, রাতে বাক্সে পুরে ফেলবে।

উমেশের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগল অভয়। আজকের রাত বড় মধুর। কাল ছুটি হচ্ছে। সকালে হৈ হৈ করে, বেলা সাড়ে আটটা কিংবা নটার মধ্যেই স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুলের বোর্ডিং-এর ছেলেরা এর মধ্যেই চলে যেতে শুরু করেছে। কেউ গিয়েছে বিকেলে,—কেউ কেউ যাবে রাতের গাড়ীতে, কেউ বা যাবে গরুর গাড়ীতে। দীর্ঘ অবকাশের সময়, ছেলেদের বাড়ী যাবার যে আনন্দ, এ আনন্দের খবর অন্য কে বুঝবে? কতদিন পর তারা বাড়ী যাচ্ছে। বাবা, মা, ভাই, বোন, নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে দেখা হবে। একটা হৈ হৈ পড়ে যাবে পাড়ায় পাড়ায়। কে কে এল, কে কবে আসছে, তাই নিয়ে চলবে কিছু আলোচনা। ফুটবল খেলে, হা ডু-ডু খেলে, দল বেঁধে বেড়িয়ে, হু-হু শব্দে ছুটির দিনগুলো যাবে ফুরিয়ে। বইয়ের পাতা আর খোলাই হবে না। আজ যাক, কাল যাক করে, শেষে বই আর খোলাই হবে না। আম, কাঁঠাল, লিচু খেয়ে,—এর ওর বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাওয়ার পর আর সময় কোথায় থাকবে?

স্কুল খুলবে পরীক্ষার কাছাকাছি। তখন চলবে, রাত জেগে পড়ার সাধনা। এখন কি আর কেউ বই খুলবে?

মাত্র এক মাসের জন্যে এসে, বাবা-মার কাছে গল্প করে, আর আবদার করে, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেই তো দিন ফুরিয়ে যাবে। আম, কাঁঠাল তো চিরকাল থাকে না? এক বছর পর আবার আসবে। কিন্তু সে অতি দূর ভবিষ্যতের কথা। হয়ত সে বছর আম হবে না। কিংবা নানাবিধ অন্য কারণেও, ঠিক এই দিনের আনন্দটুকু কপালে নাও জুটতে পারে।

আজ বহুকাল পরে মনের সুখে রাত করে বেড়াল অভয়। আজ সে স্বাধীনতা পেয়েছে। অন্যদিন সন্ধ্যা হতেই বাড়ী ঢুকতে হ'ত। ভয় হ'ত জেঠাইমার অলঙ্ঘ্য আদেশ মানায় বুঝি নড়াচড়া হয়ে গেল। কিংবা বীরুর মাষ্টার মশাই ছাত্র পড়াচ্ছেন, আর সে কিনা রাত করে বাড়ী ফিরছে। এ যে নিজের কাছেই বড় লজ্জা লাগে। কিন্তু আজ আর সেই ভয় বা লজ্জা নেই। কাল স্কুলের ছুটি হয়ে যাচ্ছে, স্কুলের পড়া তো ক'দিন আগে থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

উমেশের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাজারের ভেতর দিয়ে, রাস্তায় নেমে পড়ল অভয়। উমেশ বাঁধের রাস্তা দিয়ে সাউজী পাড়ার ভেতর দিয়ে বাড়ীর দিকে গেল। অভয় অরুণের বাড়ীতে ডেকে কোন সাড়া পেল না। বগলে রয়েছে কাপড়ের বাণ্ডিলটা। খুচরো জিনিষগুলো অন্য একটা প্যাকেটে। এখন নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকে, সকলের অজ্ঞাতসারে তক্তাপোশের তলায় লুকিয়ে রাখাই প্রথম কাজ। তারপর রাত্রিবেলায় বাক্স গোছালেই চলবে।

নিজের ঘরে ঢুকে দেখে, টেবিলের ওপর টিপ্ টিপ্ করে আলো জ্বলছে। শুভময়ের দেওয়া বইখানা রয়েছে বালিশের তলায়। অভয় জিনিষপত্রগুলো তক্তাপোশের তলায় রেখে নিশ্চিন্ত হ'ল। কিন্তু ভাবল, এই বই দিল কে? তবে কি মিনতি? গায়ের জামা খুলে, হাত মুখ ধুতে যাবে, ঠিক সেই সময়ে ঢুকল মিনতি। মিনতি একটু হেসে বলল- ওঃ, আজ যে খুব রাত করে বেড়ান হচ্ছে। বাড়ী যাবার আনন্দে বুঝি। আমি দু-দুবার এসে দেখলাম, ঘর অন্ধকার।

অভয় বলল, আলো কে জ্বালাল? তুমি বুঝি? ওই বই পড়লে?

—হাঁ পড়লাম, কাল কখন যাবে অভয়দা?

—বিকেলের ট্রেণে। রওনা হ'ব দুটোয়। কাল ছুটি হচ্ছে, ভিড়ও হবে খুব। এতখানি যেতে হবে, নৌকা পার হতে হবে।

—ওঃ। হাঁ, মা বলছিলেন কিনা তাই। গোটা

রাত জাগতে হবে? মা বলেছেন খাবার করে দেবেন। রাতে—ট্রেণে খাবার জন্যে। বাবা ভাড়ার টাকা দিয়ে গেছেন পাঁচ টাকা। তা এতে হবে? মিনতি তাকিয়ে রইল।

—মনে হয় হয়ে যাবে।

মিনতি বলল, রাস্তাঘাটে ঐ সামান্য টাকায় কি হয়? কাল পৌঁছাতে তো সেই বেলা বারোটা একটা। আজিমগঞ্জে তো ঝাড়া কয়েক ঘণ্টা বসে থাকতে হবে।

আঁচলের মধ্য থেকে একটা খাম বের করে বলল, এর ভেতর ক'টা টাকা আছে, নাও অভয়দা।

—বাঃ, কে দিল?

—চুপ। কে আবার দেবে? আমার টাকা।

হাত পেতে অভয় খামখানা নিয়ে বলল, এর জন্যে কোনও গোল হবে না তো?

ফিস্ ফিস্ করে মিনতি বলল, না, না। এখন কিন্তু খুলো না। লুকিয়ে রেখে দাও। আমি চললাম।

মিনতি চলে যেতেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অভয়। মিনতিকে এক এক সময় ভাবত দাম্ভিক বলে। বাইরে থেকে সত্যই মানুষকে চেনা যায় না। চেহারা দেখে মানুষের অন্তরের রূপ চেনা কঠিন। কার্য্য কলাপেই প্রকৃত চেহারা জানা যায়।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে,—অবশেষে অভয় বাক্স গোছাতে বসল। মিনতির খামখানা খুলে অবাক্ হয়ে গেল। এ যে অনেক টাকা। দশ টাকার নোট দশখানা। তার সঙ্গে একটা চিঠি। মস্ত বড় চিঠি,—অভয় পড়তে থাকে কিন্তু সব কথা ভালমত বুঝতে পারে না। পড়া শেষ হ'লে অভয় চিঠিখানা হাতে করে বসে থাকে। জানালার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। এও এক আশ্চর্য্য বস্তু। তার এই নিভৃত ঘরে, জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে যে সামান্য জ্যোৎস্না আসতে পারে, এ ধারণা অভয়ের ছিল না। অনেক রাত পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়ে বই পড়েছে, তখন মন থাকত বইয়ের দিকে। জানালার গোপন ফাঁক দিয়ে, জ্যোৎস্নার এই আসা যাওয়ার খবর কোনদিনই জানতে পারেনি। আজ অনেক কিছুই যেন নূতন মনে হচ্ছে।

মিনুর প্রকৃত পরিচয় তার অজানা ছিল। এই এতগুলো টাকা দেওয়া, এও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই টাকাগুলো যে তার গরীব মা-বাবার কত উপকারে লাগবে তা আর বলা যায় না। বাগানের এককোণে ছিল একটা হাসনুহানা ফুল গাছ। অভয় অনেকবার গাছটিকে দেখেছে কিন্তু ওর এই ছোট ছোট ফুলে যে এত সুগন্ধ তা কে জানত? আজ এই এখন, তার বিছানার ওপর পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে হাসনুহানার মিষ্টি সুবাস। অভয় আবিষ্টের মতন নিজ বিছানার ওপর চুপ করে বসে থাকে। জ্যোৎস্নার আলোটা জানালার দুই গরাদের মধ্য দিয়ে এসে পড়েছে বিছানায়। এও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রতিদিনই তো বহু আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটছে। গ্রামে যখন থাকত, তখন মনে হত,- পৃথিবীর গতি অতি ক্ষীণ,—বেগ নেই, কোন গতি নেই, আর নেই নূতনত্ব।

সহরে এসে দেখল, ঘড়ির কাঁটাগুলো যেন ঘোড়ার মত ছুটছে, দেখতে দেখতে সময় ফুরিয়ে যায়। অন্য কোনদিকে চোখ যায় না। কখন সূর্য্য ওঠে আবার কখন যে অস্ত যায় তার কোন হিসেব থাকে না। জ্যোৎস্নার আলো কখন যে ওঠে, কখন নেভে, অথবা ফুলের ছোট্ট কুঁড়িটি কখন যে পাপড়ি মেলছে, আবার কখন যে ঝরে যাচ্ছে সেদিকে কোন লক্ষ্যই থাকে না। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে যে জীবন চলে তাতে মনে হয় সমস্ত জীবনটাই আমরা ঘড়ির দাসত্ব করছি। একটু এদিক্ ওদিক্ হবার উপায় নেই। ওর সঙ্গে তাল রেখে, তোমাকেও ছুটতে হবে—নতুবা লেট্ হবে যে। এই লেট্ হবার ভাবনা, সহরবাসীর বুকে পাথরের মত চেপে বসে আছে। ঘড়ির কাঁটা যেন সব সময়ই তর্জ্জনী উঁচিয়ে বলছে লেট্ হয়ো না, লেট্ হয়ো না।

অভয় ঘুমিয়ে পড়ে। এ কি স্বপ্ন না সত্য? ঘুম পাড়ানি গানের মত একটা মিষ্টি সুর ভেসে আসছে

অভয়ের কানে। মুখের ওপর পড়ছে কার গরম নিশ্বাস। কে যেন গা ঘেঁষে বসেছে আর আদর করে কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে ডাকছে। ঘরের মাঝে আবছা আলো, জানলা দিয়ে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস, ঘরের একপাশে লণ্ঠনটা শুধু টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে। অভয় তাকায়। এ কি সত্যি? চোখ বন্ধ করে আবার তাকায়। তার বিছানায় বসে মিনতি, সে ডাকছে, তার হাত দিয়ে কপালের চুলগুলোকে যেন আদর করছে। অভয় চোখ মেলতেই মিনতি বলল, বাব্বাঃ, কী ঘুম। সেই থেকে ডাকছি। চা এনেছি—এত ঘুম? সকাল হয়ে গিয়েছে যে। অভয় চোখে মুখে জল দিয়ে, চায়ের কাপ্ টেনে নেয়।

—সকাল! কোথায় সকাল? এ তো ভোর বেলা। কিন্তু এত ভোরে উঠেছ কেন? ছুটিতে কিন্তু খুব ভাল করে পড়াশোনা করবে। এবার ফার্স্ট হওয়া চাই। তোমাদের কবে বন্ধ হচ্ছে? আজকে তো—

—না। সোমবার দিন। তুমি থাকলে বেশ মজা হ'ত। বাবা বলেছিলেন, গরমের ছুটির সময় দার্জ্জিলিং যাবেন। আমরাও যাব। থাকলে বেশ একসঙ্গে যাওয়া হ'ত।

কিন্তু অভয়ের মনে পড়ে গেল, সেই থিয়েটারে যাবার ব্যাপার। দার্জ্জিলিংএ সবাই গেলেও নিশ্চয়ই তাকে ওঁরা সঙ্গে নিতেন না। কিন্তু এসব কথা তো মিনতিকে বলা যায় না; ছেলেমানুষ,—শুধু শুধু মনে কষ্ট পাবে। নিজের মায়ের অদ্ভুত আচরণে মিনতি যে বেশ কষ্ট পায়, তা বুঝতে পারে অভয়। কিন্তু কোনও উপায় নেই। মায়ের ইচ্ছাতেই চলাফেরা করতে হয়। সম্ভবতঃ মিনতির এই আসা-যাওয়া, জেঠাইমা জানেন না।

অভয় বলল,—না। কতদিন বাড়ী যাইনি। তা তোমরা বেড়িয়ে এস, গল্প শুনব। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, আজ নিশ্চয়ই গান শোনাবে।

—না। আজ আর ভাল লাগল না। চিঠি লিখলে উত্তর দেবে তো?

—উত্তর? বাঃ, কেন দেব না? আচ্ছা, এখন যাই।

অভয়ের মনে পড়ে গেল শুভময়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এ ছাড়া আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করা দরকার। ক্লাসের একটা ছেলে একখানা বই দেবে বলেছিল, সেটা চেয়ে নিতে হবে। উমেশের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। অভয় জামা গায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

তখনও শহরের ঘুম ভাঙেনি। মিউনিসিপ্যালিটির ঝরঝরে গাড়ীখানা ধীরে ধীরে চলেছে। দু-একটা দোকানের বন্ধ ঝাঁপ খুলছে। কেউ গঙ্গাজল ছিটচ্ছে, দোকান ঝাঁট-পাট দিচ্ছে। মকদমপুরের বাজারের টিনের ঘর তখনও ফাঁকা। আর ঘন্টাখানেকের পর বাজার বসবে। সামান্য তরি-তরকারি কিছু মাছ। দেহাতের গাঁ থেকে, নাগরাসীরা আনবে ছোলা ভাজা, মুড়ি, মটরভাজা এই সব।

ভবেশ ভোরবেলায় উঠে আখড়ায় কুস্তি লড়ছিল। সারা গায়ে ঘাম—আর ধুলো। ঘামেতে আর ধুলোতে মিলে সারা গা যেন কাদায় মাখামাখি। লেঙ্গট পরে তখন বাইরের রোয়াকে পায়চারি করছিল।

ভবেশ ডাকল, কি রে অভয়? আজ এত সকালে যে? এখন কোথায় চললি?

—যাব একবার শুভময়ের কাছে।

—শুভময়? তা সে তো এখন ঘুমুচ্ছে। এখন আয়, আয়, ছাদে আয়। বাদামের সরবৎ খেয়ে যা।

ভবেশের সঙ্গে ওদের ছাদে গেল অভয়। ছাদের ওপরে একখানা মস্তবড় ঘর। সেই ঘরে থাকে ভবেশ। একধারে মেঝের ওপর বিছানায় নানা বই। অন্যদিকে রয়েছে একটা এস্রাজ আর একটা হারমোনিয়ম। ভবেশ সঙ্গীত চর্চ্চাও করে। ভবেশ বলল, বাড়ী যাবি বুঝি? আমাদের ব্যায়ামাগারে আসছে সপ্তাহে মস্ত একটা উৎসব হবে। নানারকম কসরৎ দেখান হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব নিজে আসবেন। থাকলে বেশ মজা হত রে।

বাদামের সরবৎটা খেতে ভারী সুন্দর। অভয় বলল, বাঃ, ভারী সুন্দর খেতে। আমারও যে কুস্তি শেখার লোভ হচ্ছে। কুস্তির পর এমনি সরবৎ যদি রোজ পাই—

—বেশ ত। রোজ শিখবি, রোজই সরবৎ পাবি। আচ্ছা, বাড়ি থেকে ফিরে আয়, এসে ভর্ত্তি হবি আখড়াতে। একটু বসে যা. অভয়। রুটি হচ্ছে, রুটি খেয়ে যাবি।—

ভবেশ হেঁড়ে গলায় হাঁক দিল, এই টুনি, টুনি,—অভয় এসেছে। রুটি খানকতক বেশী করে কর।

ভবেশের ডাকের জোরে শেষে টুনিকে ওপরে আসতে হ'ল। ভবেশের বোন টুনি। বছর চোদ্দ বয়স পাতলা চেহারা, কিন্তু গায়ের রং বেশ ফরসা। এর আগে টুনি অভয়কে দেখেছে, কিন্তু এত কাছে কখনও দেখেনি। টুনি একটু লজ্জিত হ'ল। ও এতক্ষণ ময়দা মাখছিল, সারা হাতে ময়দা লেগে রয়েছে। পিঠের দিকে, আঁচলটা টেনে বলল আচ্ছা। ভবেশকে বলল, আমাদের চা তৈরী হচ্ছে। অভয়দা চা খাবেন তো?

হুঙ্কার ছেড়ে ভবেশ বলল, চা? উঁ হুঃ, কভি নেহি। এই এক্ষুণি ও সরবৎ খেয়েছে। কুস্তি শিখলে চা খাওয়া চলবে না। চা খেলে তোদের মত ঐ প্যাঁকাটির মত চেহারা হয়ে যাবে।

অভয় তাড়াতাড়ি বলল, চায়ের তো এখনও দেরী আছে। তাছাড়া কুস্তি শিখতে এখনও প্রায় একমাসের পরে। এর মধ্যে সকালবেলার এক কাপ চা মারা যাওয়াটা ভাল নয়। না—না—চা একটু খেতে হবে।

হতাশভাবে ভবেশ বলল, তবেই কুস্তি শিখেছ। জান, শরীর চর্চ্চার সঙ্গে কাপ কাপ চা গিললে কিস্যু উন্নতি হবে না। হাঁ,—দুধ খাও, সরবৎ, রুটি, মাংস, ছোলা, এইসব খাও। কিন্তু চা—উঁহু—ও চলবে না। এই চা খেয়েই বাঙ্গালী জাতটা নষ্ট হয়ে গেল।

অভয় বলল, আচ্ছা, কুস্তি যখন শিখব তখন না-হয় ঐ ছাতু ছোলা ঐসব খাব। উপস্থিত যাত্রাটা চা খেলে বোধহয় দোষ হবে না—

টুনি মুখে আঁচল দিয়ে নীচে নেমে গেল। ভবেশ ছাদের ওপর পায়চারি করতে করতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে লাগল। এরপর বেলা আটটা থেকে শুরু তার সঙ্গীত চর্চ্চা। সঙ্গীত চর্চ্চা শেষ হবে বেলা এগারটায়। তারপর শুরু হবে সমস্ত গায়ে তৈল মর্দ্দন, তার স্থিতিকাল পূর্ণ এক ঘণ্টা।

ভবেশ ম্যাট্রিক পাস করেছে। কিন্তু তারপর আর পড়েনি। সংসারে তার বাবা ও একমাত্র বোন ছাড়া আর কেউ নেই। মা অনেকদিন হ'ল গত হয়েছেন। বাবা কোন্ এক জমিদারের নায়েব। এই শহর থেকে দূরে এক গ্রামে ভবেশদের বাড়ী। সেখানে ঘর বাড়ী আছে. বাগান পুকুর জমি-জমা আছে। ভবেশ কুস্তি করে, গান বাজনা করে। শোনা যায়, সে নাকি মোক্তারি পড়ছে। কিন্তু কবে যে পাস করবে, বা কোর্টে যাবে, তা ঈশ্বর জানেন।

টুনির হাতে গড়া, ঘি দিয়ে মাখা মোটা মোটা রুটি, আর আলুর দম খেয়ে বেরিয়ে পড়ে অভয়। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। তার অনেক কাজ। শুভময়ের সঙ্গে, উমেশের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। অভয় হন্ হন্ করে হাঁটতে থাকে। ভবেশ পায়চারি করতে করতে হাঁক দেয়, টুনি, এই টুনি।

আবার কি হুকুম? বিরক্ত মুখে, সিঁড়ি ভেঙ্গে টুনি ছাদে হাজির হয়।

—কি বলছ?

পায়চারি থামিয়ে ভবেশ বয়ল, বলছি ঐ অভয়টার কথা। কুস্তি শেখা ওর হবে না। সাত সকালে অত চা খেলে কি কুস্তি শেখা যায়। বুঝলি, এ হ'ল শরীর চর্চ্চা। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এর নিয়ম মেনে চলতে হয়।

—তা না-হয় হ'ল। আমার রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে। আর কি হুকুম তাই বল।

ভবেশ বলল, তোদের এই ভোরবেলায় ঠোঁটের কাছে চায়ের কাপ ধরা আমার দু চক্ষের বিষ। ঐ জন্যেই বাঙ্গালী জাতটা উচ্ছন্ন গেল।

টুনি বলল, ঐ চা খেয়েই নাকি?

—একশ বার, হাজার বার। জানিস্, এই চা খাওয়া বিষ খাওয়া?

কৃত্রিম আতঙ্কে টুনি চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ। বল কি, বিষ? কিন্তু কাপ কাপ এত বিষ লোকে খায় কেন? তা যাই বল দাদা—এমন সুন্দর বিষ, এ বিষ হলেও ভারী ভাল বিষ। টুনি আর দাঁড়াল না। বোধ করি রেগে তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নীচে ঝি ডাকাডাকি করছে তখন।

স্টেশনে এসে অভয় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তার খালি মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ট্রেন এসে পড়ে। বুঝি ট্রেন ফেল করে। সবাই এসেছে, একসঙ্গে নৌকা পার হয়ে হেঁটে স্টেশনে এসেছে। স্টেশনে বেশ ভিড়। টিকিট কাটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সবাই মরি কি বাঁচি করে টিকিট কাটতে ছুটল। টিকিট ঘরের সম্মুখে বেশ ঠেলা-ঠেলি চলছে। কে আগে টিকিট কাটবে, তার প্রতিযোগিতা। আস্তে আস্তে টিকিট কাটার ঝামেলা শেষ হ'ল। নিজ বাক্স বিছানা, টিনের সুটকেস, সন্দেশের হাঁড়ি প্রভৃতি গুছিয়ে, তাকিয়ে রইল লাইনের দিকে। ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল তো পড়েছে, আর ট্রেন আসার দেরী নেই। মিনতি অভয়ের জন্য খাবার করে দিয়েছে। মিনতির কথা মনে করে অভয়। মিনতির সেই হাসি-মুখখানা যেন দেখতে পায় অভয়। একটা করুণ বেদনায় অভয়ের সারা মন ভরে যায়। আজ এখানে এই স্টেশনে দাঁড়িয়ে, আবার কাল থাকবে বাড়ীতে। অভয় মনে মনে ভাবে আর আশ্চর্য্য হয়ে যায়। তার মা, বাবা, খোকন, গীতা, উঃ তাদের কতদিন দেখেনি। সে মায়ের জন্য কিনেছে শাড়ী, একটা সেমিজ, এক শিশি আলতা, চুলে দেবার জন্য সুগন্ধি তেল। অভয় খুব ছোট বেলায় দেখেছে মাকে সাজগোজ করতে। ও পাড়ার পদী নাপতিনী এসে হাতে পায়ের নখ কেটে দিত, পায়ে আলতা পরিয়ে দিত, ছোট এক টুকরো ঝামা দিয়ে, পায়ের দুপাশ ঘষে ঘষে, তবে আলতা পরিয়ে দিত। তখন অভয় দেখেছে, মা নারকোল তেলের ভেতর কতকগুলো সুগন্ধি আর কি সব মশলা দিয়ে দিতেন। দু-একদিনের মধ্যেই, শিশির নারকেল তেল লাল হয়ে উঠত আর সমস্ত তেলটা হত সুগন্ধি। অভয় কতদিন সেই তেল মাথায় দিয়েছে। আঃ, আজও যেন সেই তেলের সুবাস সে পাচ্ছে।

হঠাৎ অভয় সচকিত হয়ে উঠল। ঐ ট্রেন আসছে। দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্লাটফর্মের চেহারা গেল পাল্‌টে। কুলিদের হাঁকাহাঁকি, হৈ হৈ শব্দ, গোলমাল চলতে লাগল। অভয়রা একসঙ্গে নিজ নিজ মালপত্র নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। ট্রেন থামবে মাত্র দু-মিনিট, আর এরই মধ্যে মালপত্র নিয়ে জায়গা দখল করতে হবে।

গাড়ীর ভেতর বসে অভয় নিঃশ্বাস ছাড়ে—আঃ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। হু-হু শব্দে গাড়ী ছুটছে, দূর মাঠের মধ্যে রাখাল ছেলেরা গরু চরাচ্ছে, সূর্য্যের আলোয় ঝলমল করছে সারা মাঠ। ছোট ছোট দু-একটা নদী, পুলের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একপাল গরু—একদল রাখাল ছেলে, কোথাও সাঁওতালদের মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ী দেখছে। কেউ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কেউ বা গান গাইছে, লাঠির ওপর ভর দিয়ে নাচছে। লাইনের দুপাশে ক্ষেত, কোথাও ছোট ছোট গ্রাম একক ও নিঃসঙ্গ। সব যেন ঠিক একখানা ছবি। এদিকে বেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে, ডুবন্ত সূর্য্যের আলোর রং ঠিক যেন আবির গোলা। পশ্চিম আকাশ ছায়া ছায়া, একটা মিঠে আলোর সাথে মেলা আবিরের রং সারা পৃথিবীতে যেন মাখামাখি হয়ে গেছে। দক্ষিণ দিক্ থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। গাড়ীর কামরার ভেতর যাত্রীরা কথা বলছে। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। ওধারের বেঞ্চিতে বসে, একজন বৃদ্ধ লোক, দিব্য শান্তমনে হুঁকো টানছেন। যেন এই রেলের কামরা তাঁর নিজস্ব ঘরবাড়ী। সঙ্গীরা সবাই গল্প করছে শুধু অভয় চোখ বন্ধ করে বাড়ীর কথাই ভাবতে থাকে। মনে পড়ছে তাদের স্টেশনে নেমে, রেল লাইনের ধার দিয়ে তাকে যেতে হবে। দুপাশে আমবাগান, কাঁঠাল, তাল, আর খেজুর গাছের সারি।

লাইনের একধারে মালোদের খানকয় বাড়ী, তার ওপাশে হাড়ী ও বাউরীদের ঘর। অভয় ভাবতে থাকে, যদি বাবা চিঠি না পান, তবেই হবে মুশকিল। স্টেশনের কুলি কি অতদূরে যেতে রাজী হবে? চার আনায় যদি যেতে না চায়, তবে গণ্ডা ছয় পয়সা দেবে। এতক্ষণ কামরায় কামরায় আলো জলে উঠেছে।

আজিমগঞ্জে যখন ওরা পৌঁছাল, তখন রাত দুটো। এখন আর ট্রেন নেই। ট্রেনের সময় সেই সকাল আটটায়। এই দীর্ঘ সময় থাকতে হবে স্টেশনে। প্লাটফর্মের পাশে আচ্ছাদন বিহীন খানিকটা জায়গা, ওটাই তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগার। তখনকার দিনে, তৃতীয় শ্রেণীর লোকজন দের জন্য এর বেশী কিছু করার প্রয়োজন রেল কোম্পানী বোধ করেনি। জ্যোৎস্না রাত, তাই সেদিন কোন অসুবিধে হল না। জায়গাটা কিছু পাতা দিয়ে পরিষ্কার করে অভয়রা শতরঞ্চি বিছিয়ে বসল। সবাই মিলে ঘুমিয়ে পড়লে চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই শুয়ে বসে, গল্প করে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়াই ভাল, এই কথা সবাই মনে করল। কিন্তু ট্রেনের ধকলে একে একে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। জ্যোৎস্নারাত, তার উপর ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, আর ওপাশে গঙ্গা। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। মাঝিরা এখন নৌকার ভেতর চুপচাপ শুয়ে। মাছে মাঝে দু একখানা নৌকা থেকে অস্ফুট শব্দ আসছে। স্টেশন এখন নিস্তব্ধ। শুধু স্টেশনমাষ্টারের ঘরের বন্ধ কাঁচের দরজা ভেদ করে সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে।

রাত যে কখন শেষ হয়েছে, কারুর খেয়াল নেই। চোখের ওপর সূর্য্যের আলো আসতেই অভয়ই প্রথমে ধড়মড় করে উঠে বসল। অবাক্ হয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখল। নিরাপদ, রমেশদের ডেকে তুলে বলল, চল একে একে মুখ হাত ধুয়ে আসি।

আবার স্টেশন সচকিত হয়ে উঠল। একখানা আপ ট্রেন আসবে। ওরা গঙ্গার ধারে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে এল। সামনেই চায়ের দোকান। মাটির ভাঁড়ে ভাঁড়ে চা বিক্রী হচ্ছে। বেশ বড় ভাঁড়। এক ভাঁড় চা দু পয়সা। খাবারের দোকানে নানান্ খাবার তৈরী হচ্ছে বড় বড় সিঙ্গাড়া, কচুরী, মাত্র দু পয়সা দাম। ঘিে ভাজা লুচি, তার দাম দু পয়সা আর তার সঙ্গে ফাউ দে কুমড়োর তরকারী। আলুর দম পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। তবে, এক পয়সায় অনেকটা।

আপ্ গাড়ী চলে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই টিকি কাটার ঘণ্টা বেজে উঠল। এবার ভিড় খুব কম তাড়াহুড়ো নেই, হৈ চৈ শব্দও নেই। নিঃশব্দে অনায়াে টিকিট্ কেটে অভয়রা প্রস্তুত হ'ল। সেই সাড়ে বারোটা ট্রেন পৌঁছবে। অভয় ভাবে, বাবা যদি চিঠিখানা ঠিক মত পান, তবেই স্টেশনে লোক পাঠাবেন।

ট্রেন এল, সবাই উঠে বসল। রমেশ বলল, কাটোয়া পরই সবই এ ওকে ছেড়ে যাবে। একটা কথা, মালদা ফিরবার দিনও কিন্তু সবাই একসঙ্গেই ফিরব। এক একা যেতে ভাল লাগেনা। মা-বাবাকে ছেড়ে একা একা যেতে মনটা খুবই খারাপ লাগে। আমরা যদি একসঙ্গে ফিরি, তবে কষ্টটা কমই হবে। বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আমি পত্র দিয়ে জানাব আর ছুটির পরই তো পরীক্ষা। দুএকদিন বিশ্রাম নিয়ে কষে পড়াশোনা করতে হবে।

—তা বটে। কিন্তু ভাই সত্যি বলছি, ছুটিতে কিন্তু বিন্দুমাত্র পড়াশোনা হয় না। আজ নয়, কাল নয়, করে কোথা দিয়ে যে ছুটি ফুরিয়ে যায় তার আর খেয়াল থাকে না।

কথা বলতে বলতে ওরা ঘুমের ঘোরে ঢুলতে থাকে। মাঝে মাঝে দুএক জন ওঠে নামে। অভয়ের ঘুম আসে না আর। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাখাল ছেলেরা মাঠের মধ্যে গরু চরাচ্ছে—কোথাও চাষীরা মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছে। এর মধ্যে এদিকে বৃষ্টি হয়েছে। তাই ফসল বোনার জন্য জমি তৈরী করছে। আউশ ধান, আর পাটের চারা বেশ বড় বড় হয়ে উঠেছে। রেল লাইনের ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত সব বৃষ্টির জলে ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। রেল লাইনের ধারে ধারে প্রচুর আম কাঁঠালের গাছ। এবার আম ধরেছে যথেষ্ট। অভয় তাকিয়ে দেখে। তাদের উঠোনে

সিঁদুরে আম গাছটায় নিশ্চয়ই আম ধরেছে। একটু বাতাস লাগলেই টুপটাপ করে আম পড়তে থাকবে। বেঁকী আম, মুণ্ডমালা, মধু কুলকুলি, বাবু ভোলান্ আম-গুলো কী সুন্দর। যেমন রং তেমনি মিষ্টি। রং-এর বাহার, তার সঙ্গে কী সুন্দর সুবাস। অভয় এই আম পেলে অন্য আম খেতে চায় না। গোপেশ্বর হাট থেকে বোম্বাই আম আনতেন। সরোজিনী ছেলের জন্যে বোম্বাই আম তুলে রাখতেন। কিন্তু অভয় বলত, মা, ও আম খাব না। আমায় বেঁকী, মুণ্ডমালা আম দাও। এদের কাছে বোম্বাই আম লাগে না।

সরোজিনী এই আম দিয়ে ভাল আমসত্ত্ব, আচার করতেন। আচার আমসত্ত্ব করা সহজ ব্যাপার নয়। ভাল ভাল আম বেছে রাখতে হত। ঘরের চৌকীর তলা থেকে, বেতের চুবড়ি আর সিন্দুকের ভেতর থেকে, কাশীর বড় বড় কাল আর সাদা পাথরের থালা বের হ'ত। নকসা করা পাথরের রেকাবী, বড় বড় নূতন কাঁসার থালায় দেওয়া হত আমসত্ত্ব। নূতন মাটির তিলে হাঁড়িতে হ'ত আচার। কিন্তু আচার করা, আমসত্ত্ব করা সহজ কাজ নয়। ভোরবেলায় স্নান সেরে শুদ্ধ কাপড় পরে, এলো চুলে, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, তবে এই সব আচার দেওয়া হ'ত। অভয়, গীতা, খোকন সব সময় লাঠি হাতে করে পাহারা দিত। পাছে কাক বা বাঁদর আসে। সদা সতর্ক পাহারায়, দিনের পর দিন রোদে দেওয়া হ'ত আমসত্ত্ব আর আচার। কত রকমের মশলা মিশিয়ে আচার হ'ত, তাই অভয়রা বসে বসে দেখত।

সরোজিনী বলতেন, ও রে, খুব আচার-বিচের করেই এসব তৈরী করতে হয়। স্নান করে, গায়ে মাথায় গঙ্গা-জল দিয়ে, খুব পরিষ্কার হয়ে, শুদ্ধাচারে তবে এসব জিনিষ হয়। নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। এসব ছুঁতে নেই, হাত দিতে নেই।

ছেলেরা কেউ ছুঁতো না—বা হাত দিত না। ওরা জানত, বাসি কাপড়ে, তেল মেখে তুলসী তলা, ধানের গোলা ছুঁতে নেই। ওরা জানে হাত-পা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে তবে ঘরে ঢুকতে হয়। ওরা জানে পায়খানা গেলে গামছা পরে যেতে হয়, গা ধুতে হয়, মাথায় গঙ্গাজল দিতে হয়।

সরোজিনী বলতেন, আচারে লক্ষ্মী আর বিচারে পণ্ডিত। যাদের আচার নেই, তাদের লক্ষ্মীও নেই।

ভাবতে ভাবতে অভয়ের মনটা হু-হু করে ওঠে। মনে হয়, গাড়ী যেন চলছে না, কখন পৌঁছাবে তাদের স্টেশনে। দেখতে দেখতে এসে পড়ে কাটোয়া স্টেশন। এখানে গাড়ী থামে অনেকক্ষণ। বেশ বড় জংশন। ওদিকে ছোট গাড়ী। একটা যাবে আমেদপুর, অন্যটা বর্দ্ধমান। কেমন খুদে খুদে গাড়ী আর তেমনি তার ছোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন চলছে ঝিক ঝিক করে। রমেশ আর নিরাপদ নেমে গেল। যাবার সময়, বার বার বলল, গিয়ে চিঠি দিবি অভয়। আবার সব একসঙ্গেই ফিরব।

ওরা চলে গেল। এখন সঙ্গী থাকল, রাখাল আর সুনীল। ওরা দুজনে নামবে দাঁইহাটে।

রাখাল বলল, চা খাবি রে অভয়? কেন, খা, খা। তিন ভাঁড় চা কিনল রাখাল। সুনীল কিনল রসগোল্লা আর সিঙ্গাড়া। আট আনা সের রসগোল্লা। স্টেশনেই আট আনা—স্টেশনের বাইরে ছ'আনা সের। তিনজনে মিলে, বেশ আমোদ করে, খাবার খেয়ে পানি পাঁড়ের কাছে জল খেল। চায়ে চুমুক দিয়ে রাখাল বলল, বাঃ, বেশ চা তৈরী করেছে, না রে? এ তোর আজিমগঞ্জের চায়ের চেয়ে অনেক ভালো।

অভয় দেখল, একজন চটি জুতো বিক্রী করছে। দেখতে ভাল, মনে হয় বেশ টিকবে। অভয় দেখেশুনে এক জোড়া চটিজুতো কিনল, দাম চোদ্দ আনা।

অভয় ভাবল, বাবার পায়ে ঠিকই হবে। উনি তো খালি পায়ে মাঠে মাঠে ঘোরাঘুরি করেন। জুতো জোড়া পায়ে ঠিক লাগবে। খবরের কাগজ দিয়ে জুতো জোড়া ভাল করে মুড়ে, বাক্সর ভেতর রেখে দিল। ক্রমশঃ ঘণ্টা পড়ল—ট্রেনও নড়ে উঠল। অভয় নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবে, নাঃ, আর দেরী নেই। এরপর দাঁইহাট, তারপর

পাটুলী আর তার পরেই তো তার নামবার পালা। এতক্ষণে যেন দেশের মাটির গন্ধ পাচ্ছে সে। দেশের হাওয়া, যেন গায়ে লাগছে। ঐ যে খুদে পাখীটি টেলিগ্রাফের তারের উপর বসে রয়েছে, যে ছেলেটা উলঙ্গ হয়ে মোষের পিঠে চড়ে ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ঐ দূরের তাল গাছটা—আর যে ভিখিরীটা একঘেয়ে গান গেয়ে চলেছে, এখন এই মুহূর্ত্তে তাকেও ভাল লাগছে। ঝক্ ঝক্ করে ট্রেন ছুটছে, বার বার পঁ-উ-উ করে বাঁশী দিচ্ছে, কাল কাল গাঢ় ধোঁয়া চারদিকে এখন ছড়িয়ে পড়ছে আর তার সঙ্গে মিহি কয়লার গুঁড়ো।

তারপর নেমে গেল রাখালরা। অভয় হাত নাড়তে লাগল। একটা ব্যথা যেন মনে লাগছে আবার সেই সঙ্গে আসছে আনন্দের স্রোত। এ বিচ্ছেদব্যথা যেন আনন্দরসে মাখামাখি। এ বিচ্ছেদ তো ক্ষণিকের, তবুও এ বিচ্ছেদ আনন্দময় বিচ্ছেদ। কতদিন পর ঠিক তার মতই ওরা বাড়ী ফিরছে। ওরা দেখবে, ওদের মা, ঠিক তার মায়ের মত, উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন গাড়ীর শব্দ আর বার বার তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে। সূর্য্য কি মাথার উপর উঠল? কত যত্ন করে আজ তাই রান্না করছেন। গীতা খোকন যে দাদার আশাপথ চেয়ে, বার বার রাস্তা দেখছে আর বাড়ী আসছে।

তাদের আম গাছে, এখন আম পাকতে শুরু হয়েছে। কাঁঠাল দুদিন পর পাকবে। বোশেখ মাসে বৃষ্টি হয়েছে—তখন আউশের চারা নিশ্চয়ই বড় হয়েছে। হে ভগবান্ সু-বৃষ্টি দাও। অভয় মনে মনে প্রণাম জানায় ঈশ্বরকে। অভয় ভাবে, এই দারুণ রোদের মধ্যে বাবাকে আসতে হবে। বাবা যদি নিজে না এসে শুধু হারানকে পাঠান, তবেই ভাল। নইলে এই কাঠফাটা, ভরারোদে এলে, অসুখ বাধিয়ে বসবেন। একেই তো বাবার শরীর খারাপ। তার ওপর অযথা খাটুনি খাটতে হয়। মাঠে, বাগানে নিজেকেই কাজ করতে হয়। পয়সা কোথায় যে পয়সা খরচ করে রোজ মজুর মুনিষ লাগাবেন। অভয় জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। হট্ করে দরজা খুলে যায়। কালো প্যান্ট পরা চেকারবাবু, চলন্ত গাড়ীতেই টিকিট দেখে দেখে বেড়াচ্ছেন। অভয় টিকিট দেখায়। চেকারবাবু টিকিট দেখে আর কোথাও যান না। তারপাশে বসে, একটা সিগারেট ধরান। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখে। কি ভাবছেন চেকারবাবু? অভয়ের তো স্টেশন এসে গেল। কিন্তু চেকারবাবুর স্টেশন আসবে কখন? ওঁর সারা মুখে ক্লান্তি, মাথায় রুক্ষ চুল। উনি কি ভাবছেন? নিশ্চয়ই বাড়ীর কথা ভাবছেন। ঘরবাড়ী, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ওঁদের কথা। ঠিক তার মতই ভাবছেন চেকারবাবু।

হঠাৎ ট্রেনের গতি কমতে দেখে, অভয় লাফিয়ে ওঠে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, বাঃ, এ কি! এ যে তাদেরই স্টেশনে এসে গেছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে স্টেশনের নাম, বড় বড় করে লেখা। ক্রমশঃ

মহাননেতা লেনিন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভবেশচন্দ্র মাইতি

কয়েক বৎসর আগে ইউনেসকোর (U.N.E.S.C.O) প্রকাশিত সংবাদে পড়েছিলাম যে, বাইবেল জগতের ২৪৬টি ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে; কিন্তু লেখক হিসাবে ১৮৫টি ভাষায় লেনিনের লেখা অনুবাদিত হয়েছে, টলষ্টয়ের লেখা ১১৬টি ভাষায় আর ১০২টি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুবাদিত হয়েছে।

ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভের দ্বিতীয় পুত্র ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের (লেনিনের) জন্ম হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ই এপ্রিল রাশিয়ার মহানদী ভলগার তীরে সিম্‌বির্স্ক শহরে।

১৯০১ সালের শেষে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কিছু কিছু লেখার তলে লেনিন নামে স্বাক্ষর দিতে শুরু করেন। ভ্লাদিমির ইলিচের স্ত্রী ক্রুপস্কায়ার মতে 'লেনিন' এই ছদ্ম নামটি নেহাৎ আকস্মিক হতে পারে। প্লেখানভ এই সময়ে এক সঙ্গে ইলিচের সহিত কাজ করতেন। প্লেখানভ তাঁর লেখার তলে স্বাক্ষর করতেন ভল্‌গিন (রুশ নদী ভলগার নামানুসারে), লেনিন তাঁর ছদ্মনামের মূলটা নেন সাইবেরীয় মহানদী লেনা থেকে।

বিপ্লবী দলিলপত্র লেনিন লিখতেন বই ও পত্র পত্রিকার লাইনের ফাঁকে ফাঁকে দুধ দিয়ে। এমনিতে তা চোখে পড়ত না। কিন্তু কাগজটা আগুনে গরম করলে তা বেশ ফুটে উঠত। রুটি দিয়ে দোয়াত বানাতেন লেনিন, তাতে দুধ থাকত। পরিদর্শকেরা এলেই সেটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেলতেন।

তিনি জারের সাম্রাজ্যবাদের বদলে রাশিয়াতে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করেন। প্রয়োজন মত স্বদেশের বাহির থেকেও এবং নির্ব্বাসনের মধ্য দিয়েও।

বিশ্বের মেহনতীদের নেতা ও গুরু, মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌সের বৈপ্লবিক মতবাদের প্রতিভাবান্ উত্তরসাধক হচ্ছেন লেনিন। নির্বাসনে তাঁর একটি রচনায় তিনি লিখেছিলেন, আমরা মার্কসের তত্ত্বকে পরিসমাপ্ত ও স্পর্শাতীত কিছু একটা বলে দেখি না। উল্টে বরং আমরা এই বিশ্বাস করি যে, তা শুধু এমন একটা বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর পেতেছে, জীবন থেকে পিছিয়ে পড়তে না হলে যাকে সব দিয়ে আরো বিকশিত করতে হবে সামজতন্ত্রীদের।

[প্রোসেস প্রকাশনী, মস্কো]

ভারতবর্ষ সম্পর্কে লেনিনের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে—তাঁর রচনায়, বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে। তিনি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার চিঠির উত্তরে লেখেন:

প্রিয় কমরেড চট্টোপাধ্যায়

আপনার নিবন্ধ পড়িয়াছি, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভাঙিতেই হইবে। কখন আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে তাহা আমার সেক্রেটারি আপনাকে জানাইবেন।

ভি উলিয়ানভ (লেনিন)

পুঃ—আমার ভুল ইংরেজী অনুগ্রহ করিয়া মাফ্ করিবেন। লেনিনের পড়ার ঘরে তাঁর লাইব্রেরির তাকে এই সব লেখকের বই রয়েছে, লাজপৎ রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রপ্রতাপ, ইত্যাদি।

[লেনিন ও ভারতবর্ষ—চিন্মোহন সেহানবীশ]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য ১৯৪১ সালে বিদেশে গিয়ে জার্মানীতে

অবস্থান করেন। পুনরায় জার্মানী হতে জাপানে সাবমেরিন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ব্যাপী বিপদসঙ্কুল তাঁর দুর্গম সমুদ্রযাত্রায় যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন ইতিহাসে তার সমান দৃষ্টান্ত নাই বলা এবং এখানে সুভাষচন্দ্র অনন্য, অসাধারণ বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

On Feb 8th 1943 Netaji accompanying Hassan left Germany on board the submarine that had been waiting for him in the port of Kiel. On April 28th 1943, both were transferred to a Japanese submarine 400 miles Southwest of Madagaskar from where they sailed without any interruption to Sabang on the northeast of Sumatra. From Sabang they flew to Tokyo.

[Netaji in Germany by Alexander Werth]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র নানাপ্রসঙ্গে লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ১৯৩৮ সালে শুক্রবার লণ্ডনে তরুণদের সভায় বক্তৃতা দেবার সময়ে বলেন :

"সাফল্য শুধু জনগণের উপরে নয়, যোগ্য নেতৃত্বের উপরও নির্ভর করে, লেনিনের ব্যক্তিত্ব ভিন্ন রাশিয়ার কি হতো জানি না। লেনিন যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, যদি আমরাও তা যেতে পারি তাহলে, আমার বিশ্বাস, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

"আমাদের একথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, কার্ল্ মার্ক্সের প্রধান শিষ্য রুশগণ তাঁর চিন্তাধারাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেনি," সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেন। রুশিয়া মার্ক্সের মতবাদ গ্রহণ করবার সময় প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, বর্ত্তমানের আবহাওয়া এবং নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যায় নাই, ইহাও সুভাষচন্দ্রের অভিমত।

[আনন্দবাজার ২৩শে জানুয়ারী ১৯৫০]

সুভাষচন্দ্রের মতে ভারতকে তার অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী পথ কেটে চলতে হবে। ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি পরিষ্কার জানালেন, তার পক্ষে সর্বাংশে মার্ক্‌স্‌সিষ্ট হওয়া সম্ভব নয় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক থিয়োরীর ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সত্য কিছু থাকতে পারে না, সবই ইতিহাস, পারিপার্শ্বিক ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে রচিত হয় সুতরাং তা কাল-প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তনযোগ্য। বুদ্ধিবৃত্তিকে কোনো একটি মতের কাছে বন্ধক রাখতে তিনি গররাজী।

(সাপ্তাহিক বসুমতি, পৃ ৩২০১
সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শন)

এখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখলে।

কার্ল মার্ক্‌স্ দাবী করেছিলেন যে, আমেরিকা, ব্রিটেণ, ফ্রান্স ও জার্মানীতে শ্রমিকদের অভ্যুত্থান ঘটবে প্রথম। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন।

"Take it from me, the rising of Shudras will first take place in Russia and then in China."

(দৈনিক বসুমতী)

সবশেষে, সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসুর মনোভাব ব্যাখ্যা করিয়া বিখ্যাত সোভিয়েট ভারততত্ত্ব-বিদ্ অধ্যাপক এ এম দিনাকফ বলেন যে সুভাষ বসু যখন বার্লিন বেতার হইতে অক্ষশক্তির পক্ষে প্রচার চালাইতে ছিলেন তখনও তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি কথা বলেন নাই। সোভিয়েত সরকার যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উহার অভিযান আরম্ভ করেন, তখন বৃটিশ সরকার সুভাষ বসুর ঐ নাম প্রচার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সোভিয়েটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট সরকার উহাতে রাজী হন নাই।

(যুগান্তর ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩)

It is also significant to note that Netaji could reach Rome or Berlin only via Moscow. On the 18th March 194 , Netaji continued on his route to Moscow via Bokhara and Samarkhand. Netaji left Moscow by plane on March 28th 1941. The Soviet Union did not hinder Netaji crossing her territory on his way to Berlin, where he arrived on the third of April, 1941.

—Netaji in Germany by Alexander Werth.

নীলাচলে

কানাইলাল দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পান্থনিবাসের সামনে একটি ছোট পথ। বস্তুত সেটা পেরোলেই কোণার্ক সূর্য মন্দিরের চত্তর। রাস্তার পরে কতকগুলি বট ও ঝাউ গাছ জটলা করে আছে। তার তলায় অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান। কলা আর ডাব এখানে অবিশ্বাস্ত রকম সস্তা। ইতিমধ্যে আমরা মন্দিরের সামনে এসে গেছি। তখনও অলক ভাই সঙ্গ ছাড়েন নি। বয়স ওর বড় জোর ষোল আঠার বছর হবে। ও কি গাইডগিরি করবে? তাই ওকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো ওর কাছে। এমনই নাছোড়বান্দা হয়ে রইল যে শেষে মনটা আমার টলে গেল। তা ছাড়া একটাকা মাত্র দক্ষিণায় যখন ও তুষ্ট তখন এই আনন্দধামে ওকে নিরানন্দ করি কেন? গ্রহণ করলাম তাঁকে। অলক ভাই এখন আমাদের গাইড। মন্দিরের নাট মণ্ডপ গৃহটি ছাদ হীন। তারই উপর উঠে তিনি বল্লেন, দেখতে শুরু করার আগে ইতিহাসটা সংক্ষেপে শুনে নিন। পিলারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সূর্য মন্দিরের ইতিহাস শুনলাম। অলক ভাই বাংলায় বলেছিলেন। তার বলায় হয়তো সাল তারিখের ভুল ছিল, মিশ্রণ ঘটেছিল ইতিহাস আর জনশ্রুতির, তবু তা শুনতে খুবই ভাল লাগছিল। নাম ধামের কিছু ইতর বিশেষ ঘটলে আমার আনন্দের কোন ঘাটতি হয় না। হ্রাস হয় না জাতীয় গৌরব বোধের। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এমন বিস্ময়কর সৌন্দর্য সাধক ও কলাকুশলী শিল্পী ছিলেন, কাঠ মাটি পাথর লোহা যেন তাঁদের হাতে পড়ে বাঙময় হয়ে উঠেছে। স্থপতি বিদ্যার পারদর্শিতা এযুগের সেরা সেরা ইঞ্জিনিয়ারদেরও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই রকম কোন মন্দির-চত্বরে এসে দাঁড়ালে আমার রসলিপ্সার সঙ্গে জাতীয় গৌরববোধও তৃপ্ত হয়। অনেকদিন আগে ম্যাকসমূলারের একটা উদ্ধৃতিতে এই বিষয়টি পড়েছিলাম। তখন এর যাথার্থ্য ঠিকমত অনুভব করতে পারি নি। আজ এই কোণার্ক মন্দিরের ভগ্ন প্রাকারে দাঁড়িয়ে একজন সামান্য শিক্ষিত বালক গাইডের কথা শুনতে শুনতে ম্যাকসমূলার সাহেবের সেই কথাটা বার বার মনে পড়েছিল। কথাটি এই : A people that feel no pride in the past, in its history or literature has lost the mainstay of the national character."

মূল মন্দিরটি ভগ্ন ও বহুলাংশে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রেক্ষাগৃহটি মোটামুটি সুরক্ষিত আছে কার্জন সাহেবের দয়ায়। লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করে আমাদের অভিসম্পাত ও ঘৃণা নিয়ে ফিরেছিলেন। কিন্তু কয়েকটি ভাল কাজও যে করেছিলেন সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বোধকরি ভারতবর্ষের পুরাকীর্তি, পুরাতন স্থাপত্য ও শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়ক আইন প্রণয়ন এবং সে জন্য সরকারী কোষাগার থেকে অর্থব্যয় মঞ্জুর। এখানেই তাঁর প্রচেষ্টা থেমে যায় নি।

পুরাতন যে সব কীর্তি আমরা আজও দেখে পুলকিত হই তার সংরক্ষণের জন্য বাস্তব এবং কার্যকরী ব্যবস্থাও তিনি গ্রহণ করেন। এই কোণার্কে যে প্রেক্ষাগৃহটি এখনও খানিকটা অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যও আমরা অবশ্যই কার্জন সাহেবের নিকট ঋণী। মুসলমানরা এসে কিছু নতুন সৃষ্টি করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা পুরাতন যা-কিছু সবই ধ্বংস ও ধূলিসাৎ করে দিতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। এ ব্যাপারে ইংরেজদের ঔদার্য স্বীকার করতে হয়। তাঁরা রক্ষণকার্যে যত্নশীল হন। অবশ্য মূল্যবান্ অনেক শিল্প সম্পদ তাঁরা স্বদেশে নিয়ে গিয়েছেন। তাতে আমাদের ক্ষোভের কারণ আছে। কিন্তু অবলুপ্তির চেয়ে অন্যত্র সংরক্ষণ যে ভাল তা অস্বীকার করি কেমন করে?

কোণার্কের মূল মন্দিরটি নেই। এখন যেটা আমরা দেখি তা হলো দর্শকগৃহ। মন্দিরটি ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়েছিল বলেই তো ভেতরটায় বালি ভরে জাম করে দিয়ে একে খাড়া রাখা হয়েছে। বহু স্থান যে মেরামত করা হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এই গৃহে বসে দর্শকগণ মূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দর্শন করতেন। ভেতরে প্রবেশের এখন আর কোন উপায় নেই। কিন্তু বহিরঙ্গটি অপূর্ব কারুকার্য ও শিল্প-শোভায় বিধৃত। প্রেক্ষাগৃহকে চলতি নামে বলে জগমোহন। জগমোহনের সামনে হলো নাট মন্দির। বাড়ীটার ছাদ নেই। গাইড বল্লেন কোন কালেই ছিল না। এখানে দেবদাসীরা সূর্যদেবের উদ্দেশে নৃত্যগীতাদির আয়োজন করতেন। নাট মন্দিরের সামনে ছিল অরুণ স্তম্ভ। সেটি এখন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুরীতে শ্রীমন্দিরের সামনে। এ ছাড়া মন্দির চত্বরে রয়েছে সূর্যদেবের পত্নী বলে চিহ্নিত ছায়া দেবীর মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গনের ঠিক বাইরে একটা নতুন মন্দির নির্মাণ করে নবগ্রহ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। গাইড বল্লেন, মন্দিরটা নতুন কিন্তু মূর্তিগুলি পুরনো। একখানা গ্রানাইট পাথরে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি রাহু ও কেতু এই নয়টি মূর্তি খোদাই করা। পুরী বা ভুবনেশ্বরে যে-সব নবগ্রহ মূর্তি দেখেছি সে তুলনায় এখানকার মূর্তিগুলি সুস্পষ্ট এবং সুন্দর। নবগ্রহের একটি মাত্র মূর্তির মুখে দাড়ি আছে। মূর্তিটি বৃহস্পতির বলে পরিচয় দিলেন গাইড। বৃহস্পতি ছাড়া অন্য কোন হিন্দু দেবতার দাড়ি আছে বলে শুনিনি।

এয়োদশ শতাব্দীতে কলিঙ্গ রাজ নরসিংহ দেব যখন সূর্য মন্দির তৈরি করান তখন সমুদ্র ছিল অদূরে। এখন তা প্রায় দু মাইল দক্ষিণে সরে গেছে। উত্তরে চন্দ্রভাগা নদী, দক্ষিণে সমুদ্র, এর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে নরসিংহ দেব সূর্য মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিদেশী নাবিকেরা বিস্মিত হয়ে এর নাম দিয়েছিলেন ব্লাক প্যাগোডা। এই ভূ-ভাগ একদা বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্দেশীয় কেনাবেচার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বলে ইতিহাসে নাকি স্বীকৃত হয়েছে। স্থানটির কোন বিশেষ মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই ছিল নইলে এত জায়গা থাকতে মন্দিরটির জন্য এটি কেন নির্বাচন করা হবে।

কালের কঠিন হস্তাবলেপ সত্বেও ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়েও সূর্য মন্দিরের যতটুকু অবশিষ্ট তাও এক মহা বিস্ময়। আমার মত আনাড়ি মানুষও মোহমুগ্ধ হয়ে যান। প্রস্ফুট পদ্মের পাপড়ির মত বেদীর গড়ন। অতিকায় বলশালী অশ্বযোজিত রথচক্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই চাকা ও তার মধ্যকার শলাকার সর্বত্র নানা মূর্তি খোদিত।

যথেচ্ছ ভাবে বা খেয়ালখুশি মত এগুলি রচিত হয়নি। প্রত্যেকটির পেছনে সুন্দর অর্থবহ ভাবনা-চিন্তা এবং পরিকল্পনা রয়েছে এবং তা দুর্বোধ্য নয়। আমাদের গাইড বল্লেন, চাকায় আটটি শলাকা দিন রাত্রের আট প্রহরের প্রতীক। প্রত্যেক শলাকায় এক-একটি ছবি খোদাই করা। দিনমান অংশের চারটিতে প্রভাতে শয্যাত্যাগ থেকে সন্ধ্যাকালীন প্রসাধন পর্যন্ত। আর রাত্রাংশের চারটিতে নর্মক্রীড়া পর্যন্ত খোদিত রয়েছে।

ভূমি থেকে শীর্ষ-দেশ অবধি মন্দিরগাত্র নানা মূর্তিতে ভরা। তিনটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। সর্বনিম্ন অংশে পশু ও পাখীর মূর্তি। মধ্যভাগে নানা মনোহর

ভঙ্গীর প্রেমিক প্রেমিকার মূর্তির সঙ্গে বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের প্রতিকৃতি খোদিত হয়েছে। সব থেকে উপরে রয়েছেন দেব দেবী, পৌরাণিক কাহিনীর মূর্তি রূপ। ছোট বড় প্রতিটি মূর্তি নকশা, পরিকল্পনা এবং নির্মাণ-দক্ষতার নৈপুণ্যে মনোহর। বিষয়বস্তু সাজানোর মধ্যে মুনশিয়ানা কম নয়। অপেক্ষাকৃত কম বয়েসী যারা তারা হাতির সারি, জিরাফ, ঘোড়া, হাতি ধরার ছবি, মাছ, সাপ এই সব দেখে মুগ্ধ হবে। অন্য মূর্তি তাদের বোধগম্য হবে না। যুবক যুবতী যাঁরা তাঁরা মধ্যকার সমাজিক ও রাজনৈতিক ছবির সঙ্গে প্রেমিক প্রেমিকা দেখে আনন্দ পাবেন। এ দুটোর কোনটাতেই অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তিরা রস পাবেন না। তাঁদের জন্য রয়েছে উপরের দেবদেবী ও পুরাণ-কাহিনী।

মন্দিরগাত্রের মূর্তিগুলির মধ্যে বেশ বড় সড় মূর্তিও আছে অনেক। অনেকটা উঁচুতে দুর্বাসা ঋষি ও মেনকার দুটি বিরাট মূর্তি রয়েছে। দাড়ি গোঁপ সমম্বিত দুর্বাসার কঠিন আলিঙ্গনাবদ্ধ নর্তকী মেনকা। মূর্তিটি দেখতে হলে একটা বিশেষ স্থানে উঠতে হয়, সমভূমিতে থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। মানাহর ভঙ্গিতে পূর্ণযৌবনা নারী-দেহের কয়েকটি মূর্তি তো আজ ভুবনবিখ্যাত হয়েছে। এই খোদাই চিত্রগুলি থেকে সহজেই সে যুগের অর্থাৎ মন্দির নির্মাণকালে ঐ অঞ্চলের জনজীবন ও সমাজ সম্পর্কে বেশ একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা করা যায়। তরবারি হাতে একটি নারী মূর্তি দেখিয়ে আমাদের গাইড বল্লেন : এই ছবি দেখে অনুমান করা হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে উড়িষ্যায় নারী সেনানী ছিলেন। এখানকার প্রতিটি প্রতিমা মুখর। কথা না বলেও তারা বহু না-বলা কাহিনী শতাব্দীর পর শতাব্দী বলে চলেছে। বর-কনের শোভাযাত্রা দেখে মনে হলো—হাজার বছর পরেও বহিরঙ্গের বিশেষ ইতর-বিশেষ হয়নি। রাজা-রাজড়ার যুদ্ধযাত্রা, শিকার পর্বের বহর দেখে আজও বোঝা যায় রাজকীয় ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। মন্দিরগাত্রে জিরাফের ছবি দেখে অনুমিত হয়, বহির্বিশ্বের সঙ্গে কলিঙ্গরাজদের যোগাযোগ ছিল। জিরাফ তিনি সেখান থেকে পেয়ে থাকবেন। জিরাফ তো আর ভারতবর্ষে জন্মে না।

কামশাস্ত্রীয় রচনাগুলির কিঞ্চিৎ বাহুল্য স্বীকার করতে হয়। কিন্তু মনুষ্য জীবনে কামচর্চা স্বাভাবিক। আমাদের প্রাজ্ঞ পূর্বসূরীগণ একে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে অন্যতম শাস্ত্রের মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং ঐ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য এই সব চিত্র তাঁরা অনভিপ্রেত মনে করতেন না। শুনেছি নিকট অতীতে কিছু শহুরে লোক কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জন্তু উলঙ্গ বলে তাদের দিকে তাকাতেই লজ্জা বোধ করতেন। কেউ কেউ নাকি কুকুরকে প্যান্ট পরাতেও শুরু করেন। তেমন লোক এই মন্দিরগাত্রের কামশাস্ত্রীয় রচনার তারিফ করতে পারবেন না। ঐ সব তথাকথিত রুচি ও নীতি বাগীশদের বিরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও এগুলি যে সর্বৈব নিন্দনীয় এমন কথা রসিকজনের মুখ দিয়ে বেরোয় নি। কেবল কোণার্কে নয়, বহু মন্দিরে অনুরূপ চিত্রকলার অফুরন্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এ নিয়ে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক গবেষণা হয়েছেও যথেষ্ট। নানা জনে নানা কথা বল্লেও মূল শিল্পমহিমা কিন্তু সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। ও সব আলোচনায় লেখা ভারি হয়ে পড়বে। আমি এখানে চলতি দুটো মতের প্রতিই মাত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। এর সত্য মিথ্যা আমার জানা নেই। জানবার মত গভীর জ্ঞানও আমার নেই। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে আমি দুটোই বিশ্বাস করেছি।

প্রথমটি হলো এই :—দৈহিক ভোগবাসনার পরিপূর্ণ নিবৃত্তি না হলে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের অধিকার হয় না বলেই আমরা বিশ্বাস করি। মন্দিরগাত্রের কামশাস্ত্রীয় মূর্তি-চিত্রকলা দেখেও যাঁর চিত্তে বিকার ঘটে না তিনিই মাত্র দেবতার দরবারে নিজেকে উৎসর্গ করার অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা

আরও চমৎকার। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র কল্পনা বা সংশয়ের অবকাশ নেই। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচণ্ড প্রভাবে এক সময় সমাজের সেরা মানুষগুলি সন্ন্যাসী হয়ে যান। ফলে দেশে উপযুক্ত মানুষের অভাব দেখা দেয়। জীবনের সব বিভাগেই তার জন্য ক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা ঘটতে থাকে। দেশ ও জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় দুর্দৈব আর কিছু হতে পারে না। দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়ে কারো কারো মনে হয়ে থাকবে, মানুষকে ভোগ-সুখ-বঞ্চিত নির্বাণ-সাধনা থেকে নিবৃত্ত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো—পুরুষকে নারীর বাহুবন্ধনে কামশাস্ত্রের শিক্ষায় শিক্ষিত করা। শত শত মন্দির গাত্রে সহস্র সহস্র অনুরূপ ছবি উৎকীর্ণ করে সন্ন্যাসীদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা হয়। যারা তখনও সন্ন্যাসী হয়নি সেই সব যুবজনের চিত্তে এই কামলীলার ছবি সহস্র বর্ষ পূর্বে ঠিক যে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হয়তো আজ আর যথাযথ ভাবে অনুমান করা যাবে না। তবে এ কথা ঠিক যে, সন্ন্যাসী হওয়ার ঢেউ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছিল। ছবিগুলি যে কামনা বাসনা জাগিয়ে তোলে তা তো স্বীকার করতেই হবে। অনেক কৌপীন পরা, কমণ্ডলু হাতে দাড়িওয়ালা লোক নারীর বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছেন এমন কিছু রচনা এই মন্দিরগাত্রে রয়েছে। তার থেকে অনুমিত হয়, নির্বাণ লাভের আশায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরাও আবার সংসার-জীবনে এসেছিলেন।

মন্দিরে মূল সূর্যমূর্তি নেই। উপরে উঠে শূন্য বেদীটা দেখলাম। তবে বাইরের দিকে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরে যথাক্রমে বাল সূর্যমূর্তি, মধ্যাহ্ন সূর্যমূর্তি এবং অস্তাচল সূর্যমূর্তি রয়েছে। আস্ত পাথর কেটে কেটে মূর্তি তৈরি করা। উপরের তিনটি মূর্তির বেশবাস এবং মুখের চেহারা ভিন্ন। এ সকল থেকে সকালের কমনীয়তা, দুপুরের তেজময়তা এবং অপরাহ্নের ক্লান্তি যে-কোন লোকের নিকট সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে।

অনেকগুলি মূর্তিই ভাঙ্গাচোরা। এ মন্দিরটিও যে কালাপাহাড়ী অত্যাচারের শিকার হয়েছিল, বহু বিকলাঙ্গ মূর্তির মধ্যে তার প্রমাণ আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। কালাপাহাড়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে এমন হিন্দু মন্দির ভারতবর্ষে বিরল। একজন কালাপাহাড় এত মন্দির ধ্বংস করল কেমন করে? ইতিহাসে একটি কালাপাহাড়ের স্থান হলে কি হবে, শতশত ছোট বড় মাঝারি কালাপাহাড়ে এক সময় সারা দেশ ভরে গিয়েছিল। বাংলার হোসেন শাহও মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসে কম পটুত্ব দেখান নি।

সত্য হোক চাই মিথ্যা হোক, কোণার্ক মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে একটি অপূর্ব করুণ জনশ্রুতি আজও শোনা যায়। সূর্যমন্দির তৈরি করতে এই রাজ্যের বার বছরের রাজস্ব ব্যয় হয়েছিল। সময় লেগেছিল বার বছর। স্থপতি ও কুশলী শ্রমিক ছিলেন বার শত। বিশু মহারাণা নামে জনৈক কুশলী স্থপতি এই মন্দিরের পরিকল্পনা করেন। মনে হয় স্থপতিদের সাধারণ ভাবে মহারাণা বলা হতো। কারণ পুরীর শ্রীমন্দিরের স্থপতির নামের শেষেও দেখি মহারাণা—অনন্ত মহারাণা। বার বছর ধরে অনন্যমনা হয়ে তিনি এর নির্মাণ কাজেরও তত্ত্বাবধান করেন। গৃহে যে স্ত্রী ও শিশুপুত্র রয়েছে তাদের দেখতে যাবার অবকাশ করতে পারেন নি। নির্মাণ কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কেবল চূড়াটি বসাতে বাকি তখন বিশু মহারাণার মন বাড়ি ফিরবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। দুএক দিনের মধ্যে চূড়াটা বসিয়ে তিনি গৃহাভিমুখী হবেন ঠিক করলেন। কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল ভিন্নরূপ। এতবড় বিস্ময়কর প্রতিভাধর স্থপতি সামান্য একটি চূড়া বসাবার হিসাব গোলমাল করে ফেললেন। চূড়া কিছুতেই ঠিকমত বসছে না। রাজা অধৈর্য হচ্ছেন, স্বয়ং বিশু মহারাণাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে বিশু মহারাণার শিশুপুত্র কৈশোর অতিক্রম করেছে। নাম হয়েছে ধর্মপাদ। তাঁর মা নিজেই তাঁকে, স্থপতি বিদ্যা শিখিয়েছেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি জীবিকা ও পিতৃদেব উভয়ের সন্ধানে বের হন। সূর্যমন্দির প্রাঙ্গণে এসে তিনি পিতার ভুল অঙ্ক শুদ্ধ করে মন্দির চূড়া বসিয়ে দিলেন।

বিশু-মহারাণা ও তাঁর সহ-স্থপতিদের জীবনব্যাপী কীর্তি এর ফলে ম্লান হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। ধর্মপাদ মন্দিরচূড়া থেকে চন্দ্রভাগার জলে আত্ম-বিসর্জন দিয়ে পিতৃদেব ও তাঁর সমকর্মীদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। এমনি সব আত্মভোলা পরার্থপরায়ণ মহৎ মানুষের পদরেণুই দেশ ও জাতিকে বড়, মহৎ করে। এঁরাই সৃষ্টি করেন অক্ষয় সাহিত্য ও কালজয়ী শিল্প ভাস্কর্য। ভারতের মহাকাব্যগুলির মত এর অনেক মন্দিরও নানা সময়ে বহুজনের রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে।

কোণার্কের ভৌগোলিক অবস্থান হেতু এখানে কোণ থেকে সূর্যোদয় ঘটে। অর্ক মানে সূর্য। কোণ থেকে যেখানে সূর্যোদয় হচ্ছে সেই স্থানের নাম করা হয়েছে কোণার্ক বা কোণারক। কিংবদন্তির দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ, সব ব্যাপারের সঙ্গে দেবদেবী জড়িয়ে আমরা মনোহর সব কাহিনী তৈরি করেছি। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে লোকমুখে এগুলি প্রচারিত হয়ে আসছে। কথক তার অভিরুচি অনুসারে নানাসময়ে কথাকে পল্লবিত করেছেন, অলঙ্কারে সাজিয়েছেন, আবার ছাঁটকাটও করেছেন। কিন্তু তার দ্বারা মূল কথাটা তেমন বিকৃত হয়নি কোথাও। কোণার্ক সম্পর্কে একাধিক পৌরাণিক কাহিনী আছে। দুর্বাসার অভিশাপে শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র সাম্ব কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হন। নিরাময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সূর্য-উপাসনা করতে বলেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মিত্রবনে সাম্ব সূর্যোপাসনা ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপস্থিত হলেন। বার বছর পরে সূর্য প্রসন্ন হন এবং সাম্ব নিরাময় হলেন। এই সাম্বই কোণার্ক ক্ষেত্রে প্রথম সূর্য মন্দির স্থাপন করেন বলে দাবি করা হয়। যিনিই করে থাকুন,আজ বহু শতাব্দী পরে এসেও আমরা তার মুগ্ধ উত্তরপুরুষগণ সেই যথানাম্না পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার প্রণাম রেখে ফিরতি বাস ধরলাম, তখন বেলা প্রায় ১॥টা। ভুবনেশ্বর এখান থেকে ৪১ মাইল বা ৬৬ কিলোমিটার।

ভুবনেশ্বরকে বলা হয় মন্দির শহর। এখানে এক সময় সাত হাজারেরও বেশি মন্দির ছিল। এখনও হাজার খানেক মন্দির আছে।

অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের সঙ্গে ভুবনেশ্বর নবীন আভিজাত্য লাভ করেছে—এখানে স্থাপিত হয়েছে ওড়িশার নতুন রাজধানী। হাল ফ্যাশানের শহর—প্রশস্ত রাজপথ স্ট্রীম লাইন আধুনিক ছোটবড় মাঝারি নতুন নতুন বাড়ি, বাজার, স্টেডিয়াম, মিউজিয়াম সবই আছে, কিন্তু শিল্পরুচির প্রকাশ তেমন নজর ধরে না কোথাও। এরই মধ্যে রবীন্দ্র মণ্ডপটি একটু বিশিষ্ট মনে হলো। আমি যেদিন দেখতে যাই তখন এখানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের একটি অনুষ্ঠান চলছিল। বাইরে তাই ছিল আলোর রোশনাই। সেজন্য হয়তো বা একটু বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকব। নতুন শহর বস্তুতঃ উদয়গিরি পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। উদয়গিরি আমরা গিয়েছিলাম কিন্তু সেটা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, কেদারগৌরী, বিন্দু সরোবর প্রভৃতি দেখার পর।

লিঙ্গরাজই ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। এখানে ভুবনের ঈশ্বর—ভুবনেশ্বরই আর পুরীধামে জগতের নাথ জগন্নাথ। যে আকারে হোক সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও বিশ্ব চিন্তা আমাদের চিত্তকে প্রভাবিত করেছিল বললে বোধ হয় ভুল হবে না। মন্দিরের আকার প্রকার সবই পুরীর শ্রীমন্দিরের মত। শিল্পসমৃদ্ধি এরই বেশি বলে বিজ্ঞ জনেরা বলে থাকেন। এখানেও দেউল, জগমোহন বা সভাগৃহ নাট মন্দির ও ভোগ মন্দির রয়েছে। হিন্দু মন্দিরের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে এইটিকে ফার্গুসন সাহেব চিহ্নিত করেছেন। মন্দিরে বিগ্রহ হলেন একটি অতিকায় শিবলিঙ্গ। এই চত্বরে আরও অনেকগুলি ছোট বড় মন্দির আছে। পাণ্ডারা বলেন, তাদের সংখ্যা শতাধিক হবে। পাণ্ডার জবরদস্তি খুব। সব মন্দিরের দ্বারে দ্বারে একজন করে লোক দাঁড়িয়ে দক্ষিণা দাবি করছে। না দিলে কটু কথা বলতেও অনেকে দ্বিধা করছে না। একজন তো অভিসম্পাত করে দিলেন—তোর ভাগ্যে দর্শন নাই। তুই পাপী। মহিলাটি কানে

আঙুল চেপে দ্রুত পা চালিয়ে পালিয়ে গেলেন। এখানকার কারুশিল্পকর্মের ছবি নিয়ে সাড়ী ও শাল আলোয়ান ইত্যাদির পাড়ের নকশা তৈরি করা হয়েছে বলে একজন পুরোহিত জানালেন। এই চত্বরের একটি অতিকায় গণেশ মূর্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যেমন করেছিল সাক্ষীগোপালের সরস্বতী মন্দির। সরস্বতী মন্দিরের পুরোহিত জয় জয় দেবী চরাচর সারে ইত্যাদি সরস্বতী পূজার অঞ্জলি মন্ত্র উচ্চারণ করছেন আর দক্ষিণার প্রত্যাশায় হাতখানা বাড়িয়ে দিচ্ছেন দর্শনার্থীদের সামনে। ভুবনেশ্বরে একটি গর্ভগৃহে—পনের বিশটা সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামার পর এক শিবলিঙ্গের দর্শন মেলে। দেখেছিলাম কিন্তু কোন বিশেষত্ব খুঁজে পাই নি।

আমাদের হাতে সময় ছিল অল্প। ঐ সময়ের মধ্যে কোন কিছুই ভাল করে দেখা সম্ভবপর নয়। আমরা কেবল চোখ বুলিয়েছি মাত্র। এখানেও অন্নভোগের ব্যবস্থা—এবং তা মন্দিরে প্রধান প্রবেশ-পথের সামনে বসেই বিক্রী করাও হয়।

এখান থেকে আমরা কেদারগৌরী গেলাম। পথে পড়লো বিন্দু সরোবর। প্রকাণ্ড একটা দীঘির মধ্যে একটি মন্দির। কি মন্দির দেখা হয়নি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে :

সর্বতীর্থ-জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দু সরোবর শিব সৃজিলা আপনি॥

বাস এখানে থামেনি। সরোবরের একপারে বাস চলার রাস্তা, অন্য পারটিতে পার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। বাস এসে দাঁড়াল কেদারগৌরী মন্দিরের সামনে। মন্দির প্রাঙ্গণ ছোট। প্রবেশ-পথের দুধারে দুটো মন্দির, একটা কেদারেশ্বরের—অন্যটা গৌরী দেবীর। মন্দির পেরিয়ে ছোট্ট একটি সিমেন্ট বাঁধানো নোংরা জলের আধারকে গৌরীকুণ্ড বলা হয়। অনেক স্ত্রীভক্তকে এই জল মাথায় দিতে দেখা গেল। এই মন্দিরের উত্তর দিকে দুটো শিব মন্দির দৃশ্যতঃই অবহেলিত। কিন্তু চত্বরটি পরিপাটি করে সাজানো। মন্দিরের মধ্যে ঢুকলে একটা বোটকা গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে। পুরোহিত বল্লেন, চামচিকার গন্ধ। ও জীবগুলোর হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন তাও কবুল করলেন অকপটে। এ দুটি শিব মন্দিরের নাম হলো—শৈলেশ্বর ও মুক্তেশ্বর। অনেক প্রাচীন মন্দির। এখান থেকে বাস সোজা গিয়ে দাড়ালো উদয়গিরি খণ্ডগিরির মাঝখানটাতে। দু পাশে দুটো পর্বত, মাঝখানটা অপেক্ষাকৃত সমতল। সেটাই রাস্তা। জৈন মন্দির আছে। পাহাড়ে ওঠার সুবিধার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত ঢালু অংশটিকে সমান করে বাঁধিয়ে দেওয়ার ফলে যাত্রীরা সিঁড়ি ভাঙ্গার কষ্ট ছাড়াই হেঁটে হেঁটে ওঠা নামা করতে পারেন। এখানে কতকগুলি সুন্দর গুহা আছে। আমি তখন খুবই ক্লান্ত। তাই ভাবলাম, পাহাড়ে উঠে আর কাজ নেই। চেহারা তো দেখে গেলাম এখন বই পড়ে জেনে নেব। তবু উঠেছিলাম খানিকটা। বর্ষণধৌত পরিচ্ছন্ন পাথরগুলির একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে।

ওড়িশার প্রতিটি দর্শনীয় বস্তু সম্পর্কে সরকারী পুস্তিকাদি আছে। এখানে ওগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেই। পুরী ও কোণার্কে বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে বই পাই নি। কিন্তু উদয়গিরিতে একটি ছেলে নানা রকমের বই বিক্রী করছে দেখে কৌতূহলী হলাম। দাম যা চাইলে তাতেই রহস্যটা স্পষ্ট হলো। ভুবনেশ্বর পরিচয়-এর সরকারী দাম ১.২০ পয়সা, বিক্রেতা চাইলেন দুই টাকা। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য যে ওড়িশা গাইড তার জন্য তাকে কম করে ষাট পয়সা দিতে হবে। এই রকম আরও অনেক ফোল্ডার ও বই তার কাছে ছিল। বইয়ের চোরাবাজার থাকলেও একটা ব্যাপারে এখানকার সাধারণ মানুষের সাধুতার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। আমাদের বাসের জনৈকা মহিলা যাত্রী তাঁর মানিব্যাগটা খণ্ডগিরির পথে হারিয়ে ফেলেন। তাতে ছিল ৮০ টাকা। বাসে ফিরে এসে তাঁদের খেয়াল হলো টাকার ব্যাগ পড়ে গেছে। বেশি কথা বলেন এমন এক ভদ্রলোক আমার পাশের সীটে

ছিলেন। তাঁর কথাবার্তা বলার ধরণধারণ খুবই গ্রাম্য, সেজন্য বিরক্ত হয়েছিলাম। তিনিই হাঁকডাক করে বাসওয়ালাকে দাঁড়াতে বলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন খণ্ডগিরির পথে। যাকে দেখেন তাকেই বলেন—মানি-ব্যাগটা হারিয়েছি—পেয়েছেন? কেউ জবাব দেন, কেউ শুধু চেয়ে থাকেন। খানিকটা যেতেই একটি লোক বল্লে, হ্যাঁ, একজন একটা ছোট ব্যাগ পেয়ে ঐ দোকানে জমা দিয়েছে। পাওয়া গেল মানিব্যাগ এবং টাকা সমেতই। ভদ্রলোকের 'পর আমার আর বিরক্তি রইল না। বইয়ের ৰালোবাজার দেখে যে বিরূপ ধারণা হচ্ছিল তাও মুছে গেল। আরও একটা কথা বলা দরকার—এখানে পাণ্ডা নেই। আমাদের বাস চলতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। বৃষ্টিও পড়ছে। নতুন ভুবনেশ্বর শহর দেখতে দেখতে আমরা এবার পুরী ফিরব। রাত আটটার কাছাকাছি সময়ে আমরা পুরী প্রত্যাবৃত্ত হলাম। বৃষ্টি তখন নেই তবে জোর হাওয়া ছিল।

স্নানাদি সারতে সারতে কাশীভাই এসে গেলেন। 'জগন্নাথ শান্তি রহ' বলে করদ্বয় উত্তোলন করে আশীর্বাদ ও মঙ্গল-কামনান্তে জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তায় কোন কষ্ট হয়েছিল কি না। আমরা বল্লাম, রাস্তায় তো ভাই কষ্ট তেমন কিছু হয়নি, কিন্তু আজ যে জগন্নাথ দর্শন হলো না। তিনি বল্লেন: এই শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের প্রভাবে দশ যোজন পর্যন্ত ভূমিতে বসবাস করলেই জগন্নাথ সান্নিধ্যে থাকা হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেছেন, নিদ্রাতে যে স্থানে সমাধি ফল হয়। শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥ প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ। কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন।

পুরীধাম বহু নামে পরিচিত—'শ্রীক্ষেত্র, পুরী, পুরুষোত্তম, শ্রীজগন্নাথ, নীলাচল প্রভৃতি। পুরী ছাড়া শ্রীক্ষেত্র ও নীলাচল আমাদের পরিচিত নাম। গৌড়ীয় মিশনের "শ্রীক্ষেত্র" নামে একখানি পুস্তকে এই সব নামকরণ ও বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রীক্ষেত্র নাম সম্পর্কে ঐ বইতে আছে:

"ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ শক্তি—শ্রীদেবী। শ্রীবিষ্ণুর যে ক্ষেত্র বা ধাম শ্রীশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাহাই শ্রীক্ষেত্র; অথবা 'শ্রী' শব্দে সর্বলক্ষ্মীময়ী অংশিনী শ্রীরাধিকা। মধুর রসের উপাসকগণের অনুভবে যে স্থানে শ্রীশ্রীরাধিকার সেবামাধুর্যৌদার্য প্রভাব প্রকটিত, তাহাই শ্রীক্ষেত্র।"

'শ্রীক্ষেত্র পরিচয়' নামে জগন্নাথ মন্দির পরিচালনা কমিটির একটি ছোট পুস্তিকা আছে। বইখানি অযত্ন-রচিত। বহু মুদ্রাকর-প্রমাদও দৃষ্ট হয়। এই বইতে পুরীধামের এগারটি নাম দেওয়া হয়েছে: (১) উচ্ছিষ্ট ক্ষেত্র, (২) উড্ডীয়মান ক্ষেত্র, (৩) পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, (৪) জমনিক তীর্থ, (৫) কুশস্থলী, (৬) শঙ্খক্ষেত্র, (৭) নীলাদ্রি, (৮) শ্রীক্ষেত্র, (৯) মর্ত্যবৈকুণ্ঠ, (১০) পুরী, (১১) শ্রীজগন্নাথধাম। মানুষ যেমন পুত্রকন্যা প্রভৃতি আদরের ধনকে সোনা, মণি, বাছা প্রভৃতি নানা নামে ডেকে থাকেন—এক্ষেত্রেও অনুরূপ মানসিকতা সহজবোধ্য। তবে তাতে আমরা খুশী হই না। প্রত্যেকটি নামের যে একটি মাহাত্ম্য আছে নানা শাস্ত্র-গ্রন্থাদি খুঁজে তা প্রমাণ করতে চাই। শাস্ত্রের সমর্থন না পেলে আমরা জোর পাই না, বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। এই মানসিকতার ভিন্ন প্রকাশ দেখি তীর্থস্থানের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে ছড়া রচনার মধ্যে। গঙ্গাসাগরে শুনেছিলাম—"সব তীর্থ বার বার। গঙ্গাসাগর একবার।" এখানে শুনলাম—

সকল তীর্থ বেনী হরি।
নীল কোন্দার বিজয় করি॥

* *

সকল তীর্থ তো চরণে।
বদ্রিকা যাবি কি কারণে॥

* *

কোন ক্ষেত্রে করতে পাপ।
এ ক্ষেত্রে বিনশ্যতি॥

ছড়াগুলি শুনিয়েছিলেন কাশীভাই। এর মধ্যে ভুল থাকতে পারে। তবু এর একটা অর্থ হয়। একথা বুঝতে

অসুবিধা হয় না যে গর্বোদ্ধত মনের অহমিকার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তহৃদয়ের মাধুরী এতে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। তাই এগুলি তেমন খারাপ লাগে না।

সনাতন গোস্বামীর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের একটি বক্তব্যকে স্থানীয় মানুষ নিজেদের মত করে নিয়েছেন। কাশীভাইয়ের কণ্ঠে এটি শুনতে ভাল লেগেছিল :

কোন ক্ষেত্রে করতে পাপ এ ক্ষেত্রে বিনশ্যতি
এ ক্ষেত্রে করতে পাপ পুনর্জন্ম ন লভতে।

এর প্রকৃত অর্থ আমি বুঝতে পারি নি। কাশীভাইও জানেন না। পরে জেনেছিলাম। শ্রীক্ষেত্রে একবার পদার্পণ করলেই মানুষ পুনর্জন্মের আবর্ত থেকে উদ্ধার পেয়ে যায়। এই মাহাত্ম্যকে প্রসারিত করে বলা হয়েছে, অন্যত্র যতই পাপ করুক না কেন শ্রীক্ষেত্রে এলে সব ধুয়ে মুছে যাবে। আর এখানে যদি কেউ পাপ করেনও তথাপি তাঁর পুনর্জন্মের কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

কেবল পাপীদেরই নয় পতিত ও নীচদেরও উদ্ধার কল্পে নীলাচলে ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছেন। শবর পূজিত নীলমাধব এখানে জগন্নাথরূপে প্রকটিত। তথাপি মজা এই যে জগন্নাথ মন্দিরে তথাকথিত অচ্ছুৎদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। প্রবেশাধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তাদের জন্য জগন্নাথদেবের একটি প্রতিলিপি প্রবেশ-পথে স্থাপন করা হয়েছে। সেই মূর্তি দর্শন করেই তাদের খুশী থাকতে হতো। আজকাল অবশ্য একমাত্র বিদেশী ও বিধর্মীরা ছাড়া সকল শ্রেণীর হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রবেশাধিকার আছে। আর বিধর্মী কেউ ঢুকছে কি না তা সহজে ঠাহর করা যায় না।

বহু ছোট বড় মন্দির দ্বারা মূল শ্রীমন্দির পরিবৃত। মন্দিরগুলি একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের বাইরে প্রশস্ত ভূভাগ, সেখানে আনন্দবাজার, রন্ধনশালা ও বাগিচা অবস্থিত। হাতার মধ্যকার পাঁচিলের নাম মেঘনাদ প্রাচীর। সমুদ্র-গর্জন যাতে মন্দিরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা বা বিধর্মীদের হাত থেকে বিগ্রহকে রক্ষা করার মতলবে তা আজ নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই। মেঘনাদ প্রাচীর ২০ থেকে ২৪ ফুট উঁচু এবং ৬॥ ফুটের মত চওড়া প্রাচীর অতিক্রম করলে আর-একটি পাঁচিল চোখে পড়ে। সেটি অপেক্ষাকৃত ছোট। নাম কূর্মবেড়। চার দিক্ থেকেই মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। পূর্বদ্বার হলো প্রধান প্রবেশ-পথ। এটিকে বলে সিংহদ্বার। সম্মুখে একটি সিংহমূর্তিও স্থাপিত রয়েছে। উত্তর দরজা হস্তিদ্বার, পশ্চিম দ্বার ব্যাঘ্রদ্বার এবং দক্ষিণ দরজা অশ্বদ্বার নামে পরিচিত। একমাত্র দক্ষিণ দ্বার ব্যতীত অন্য দরজায় নামানুসারে প্রাণীমূর্তি স্থাপিত রয়েছে। দক্ষিণ দিকে দুটি অশ্বারোহী মূর্তি আছে। তাদের বলে কাল বিকাল। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথের বিশেষত্ব সুস্পষ্ট। পূর্বদ্বার সম্পর্কে এইমাত্র কিছু বলা হলো। বিগ্রহ-দর্শনার্থীরা এই পথেই প্রবেশ করে থাকেন। পশ্চিম দ্বার দিয়ে ঢুকলে ভারতের প্রধান চারিটি তীর্থক্ষেত্রের চারিটি বিগ্রহ দর্শন করা যায়। তাঁরা হলেন শ্রীরামেশ্বর-মহাদেব, শ্রীদ্বারকানাথ, শ্রীবদ্রীনাথ ও শ্রীজগন্নাথ। কথিত আছে, হিন্দু ভারতবর্ষের চারিটি প্রসিদ্ধতম তীর্থ বদরীনারায়ণ, দ্বারকা, রামেশ্বর এবং পুরী দর্শনের ফললাভ হয় এই দরজা দিয়ে ঢুকলে। জগন্নাথ নাকি বদরীনারায়ণে স্নান করেন, দ্বারকায় পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন, পুরীতে অন্নভোগ নিয়ে রামেশ্বরে শয়ন করেন। এই দিক্কার দ্বিতীয় তোরণের প্রবেশ পথে জগন্নাথ দেবের পুষ্প-উদ্যান রয়েছে। উত্তর দরজা দিয়ে ঢুকলে জগন্নাথ দেবের স্নান-জলের কূপ দেখতে পাওয়া যায়। নীলমাধবের বট গাছটিও এই পথে পড়ে। দক্ষিণ দরজা থেকে রন্ধনশালা ইত্যাদি দর্শন করা সুসাধ্য। যাত্রীসাধারণ তাদের ধর্ম ও সংস্কার বিশ্বাস অনুসারে বিভিন্ন দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করেন।

পূর্ব দ্বার প্রধান প্রবেশ-পথ। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের প্রথা অনুসারে এখানেও একটি অরুণ স্তম্ভ এখন প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান স্তম্ভটি কোণার্ক থেকে এনে বসানো। একে কেহ কেহ গরুড় স্তম্ভও বলেছেন। প্রাচীন প্রথা অনুসারে এই স্তম্ভের সামনে দেবদাসীরা

দেবতার প্রীত্যর্থে নৃত্যগীতাদির আয়োজন করতেন। পূর্বেই বলা হয়েছে মন্দিরের প্রবেশ-পথে অন্ত্যজদের জন্য জগন্নাথ দেবের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে। অন্ত্যজদের উদ্ধারার্থে এইস্থানে জগন্নাথের আবির্ভাব বলে ঠাকুরের নাম হয়েছে পতিত-পাবন। তার পরেই শুরু হলো প্রশস্ত সিঁড়ি। এর স্থানীয় নাম 'বাইশ পাহাচ।' পাহাচ শব্দের অর্থ সিঁড়ি। কাশীভাই বলেন, সিঁড়ির সংখ্যার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে মানুষের ২৬টি প্রয়োজনীয় গুণের উল্লেখ আছে। মানুষের দোষের বিবরণের তালিকা কোথায়ও দেখিনি। কিন্তু কাশীভাই বল্লেন মানুষের ২২টি দোষ আছে। কি কি তা তিনি জানেন না। এক-একটি সিঁড়ি অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি দোষ মানব জীবন থেকে খসে পড়ে। এই ভাবে দোষমুক্ত নির্মল হয়ে মানুষ দেবতা দর্শন করার অধিকারী হন। মূল মন্দিরের সামনে ২০টি ও ডান দিকের কক্ষে প্রবেশের দুটি সিঁড়ি নিয়ে সোপানাবলীর সংখ্যা বাইশ।

মন্দিরে প্রবেশ করতে করতে কাশীভাই জানান—এই বিশাল মন্দিরের একস্থানে এক হাত মন্দিরে বাইশ হাত দেবতা আছে। কথাটার মধ্যে চমক আছে। চমক ভাঙাবার আগেই তিনি ডান হাতের দেওয়ালে একটি এক হাত পরিমিত কুলঙ্গীর মধ্যে নৃসিংহ মূর্ত্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নৃসিংহের হাতের সংখ্যা বাইশ। এখানকার অন্যান্য বহু মূর্তির মত এটিও সিঁদুর লেপার ফলে অস্পষ্ট। মূর্তির প্রকৃত চেহারা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সিঁড়ির দু-ধারে নানা দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

হনুমান এখানে নানা মূর্তিতে বিরাজিত। দুটো চেহারা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। একটি হলো কান পাতা হনুমান। কানটা দক্ষিণমুখী করে রাখা। তিনি সমুদ্রগর্জনের অতন্দ্র প্রহরী। অন্যটি হলো ফতে হনুমান। 'ফতে' মানে সিদ্ধ। হনুমানের কৃপা না হলে দেবদর্শন অভিলাষ সিদ্ধ হতে পারে না। তাই হনুমানকে প্রথম দর্শন করে দেবমন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা।

তৃতীয় সোপানে কাশী বিশ্বনাথ রয়েছেন। প্রচলিত কিংবদন্তি হলো : অহঙ্কার-প্রমত্ত হয়ে এসেছিলেন বলেই কাশী বিশ্বনাথ তিন ধাপের উপরে আর উঠতে পারেন নি। অহঙ্কার পতনের মূল, এই শাশ্বত সত্য এই মন্দির যুগ যুগ ধরে ঘোষণা করছে না কি!

এখানে এত মন্দির আর দেব দেবতা যে তাদের বিবরণ মনে রাখতে হলে দীর্ঘ কাল নিত্য দর্শন করা প্রয়োজন। যে ক'টি বিগ্রহ আমার মনে সাময়িক দর্শনের ফলেও দাগ কেটেছেন সেগুলি সম্পর্কেই সামান্য মাত্র উল্লেখ করছি।

পাথরের দেওয়ালে তিনটি আঙুলের ছাপ দেখিয়ে কাশীভাই বল্লেন—এ হলো চৈতন্য মহাপ্রভুর আঙ্গুলের ছাপ। এখানে দাঁড়িয়েদেওয়ালে হাতের ভর দিয়ে তিনি জগন্নাথ দেবের দর্শন করতেন। সেই হাতের চিহ্ন পড়েছে দেওয়ালে। নিষ্প্রাণ শক্ত পাথরের গায়ে এমনি চিহ্ন যে কারণেই ঘটে থাকুক না কেন মহা বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন মন্দিরে শিলাসনে মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন রক্ষিত আছে। তা পূজিতও হয়। ভক্ত জনের বিশ্বাস ভগবদ্ ভাবে তদ্গতচিত্ত মহাপ্রভুর চরণস্পর্শে পাষাণ পর্যন্ত বিগলিত হতো। সেই গলিত পাথরে মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন আঁকা হয়ে রয়েছে।

জগন্নাথ দেবের মূল মন্দির গৃহের নাম মণিকোঠা। স্থানীয় ভাষায় কেউ কেউ 'বড় দেউল' বলে থাকেন। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মন্দির অতিক্রম করে এখানে আসতে হয়। সেগুলি হলো যথাক্রমে (১) ভোগমণ্ডপ, (২) জগমোহন এবং (৩) মুখশালা ব শ্রীমুখশালা। প্রতিটি মণ্ডপ এক-একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মিত হয়েছে। নাম থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়। ভোগমণ্ডপে দিন রাত্রে সাধারণতঃ সাতবার ভোগ নিবেদনের জন্য রাখা হয়। ভোগ প্রস্তুতের

জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণেই বিশাল রান্নাশাল আছে। সে এক বিরাট ব্যাপার। মোট প্রায় ২০০ কাঠের উনুনে ১০০ সুপকার (স্থানীয় ভাষায় বলে সুআর বা মহাসুআর) ভোগ রান্না করে থাকেন। সহায়ক কর্মীর সংখ্যাও হবে প্রায় দুইশত। প্রতিটি উনুনে নয়টি করে মাটির হাঁড়ি চাপিয়ে ভোগ রান্না করা হয়। হাঁড়িগুলি একবারই মাত্র ব্যবহার করা হয়। রান্নাঘর থেকে ভোগ ভোগমণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার সমগ্র পথটিই আবৃত। দিন রাত্রে মোট সাতবার বিভিন্ন প্রকার ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে। ভোগ নিবেদনের মন্ত্র খুবই সাধারণ এবং স্থানীয় ভাষায় উচ্চারণ করা হয় বলে শুনেছি। গৌড়ীয় মঠের "শ্রীক্ষেত্র" পুস্তকে মন্ত্রটির উল্লেখ এইরকম :

"শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুঙ্ক অমৃত-মনহি (ভগবানের উদ্দেশে প্রস্তুত সুস্বাদু ভোগসামগ্রী) ছেক (এককালীন অর্পিত ভোগসামগ্রী) যেনিবা হেউ (গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়)।" দিনরাতে যে ভোগ দেওয়া হয় তার নাম যেমন কৌতূহল উদ্রেক করে, পদগুলির বৈচিত্র্যও তেমনি বিস্ময়ের সঞ্চার করে। পূর্বোক্ত শ্রীক্ষেত্র পুস্তক থেকে নামগুলি মাত্র তুলে দেওয়া হলো।

(১) সকাল ৮টা। বাল্য বা বল্লভভোগ। উপকরণ : মুড়কি, খৈ, দুধের সর, মাখন, দৈ, ক্ষীরের নাড়ু, নারকেল কোরা, ছমড়ো নারকেল ফালি, জল, ও কিছু ফল।

কলাই বাটা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন প্রকার খাবার, খিচুড়ি দুই প্রকার—

( ) সকাল ১০টা। রাজভোগ, উপকরণ : কলাই ও কলাই বাটা দিয়ে তৈরি কয়েক প্রকার ঝাল মিষ্টি খাবার, একাধিক ধরণের খিচুড়ি, নটে শাক, আলুকলা ভাজা, পিঠাপুলি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন।

(৩) বেলা ১২টা। ছত্রভোগ। সাধারণের পক্ষ থেকে এই ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। এখন এর নাম হয়েছে মিলিত অন্নদান ভোগ। উপকরণ : ভাত, ডাল, তিতো তরকারি (গোলআলু টমাটো প্রভৃতি কয়েক প্রকার সর্বাজ অচল); চাল কুমড়ার তরকারি বেগুন, গোটাকচুর তরকারি, চালতার অম্বল তেঁতুলের আচার, দইয়ের খাবার ইত্যাদি।

(৪) অপরাহ্ন ২টা। মধ্যাহ্ন ভোগ। ৩৬ প্রকার অন্নব্যঞ্জনমিষ্টান্নাদির ভোগ। অনেক নামই তার দুর্বোধ্য। কয়েকটি সহজবোধ্য পদ এই : সুগন্ধ অন্ন, আটার গজা, ময়দার খাজা, বিউলির ডালের সরপুলি ইত্যাদি।

(৫) সন্ধ্যার সময়—সান্ধ্যভোগ। কলাইয়ের ডালের বিবিধ খাবার, দুধ ও ছানার মিষ্টি, মালপুয়া, ইত্যাদি বহুপ্রকার খাদ্য এই সময় নিবেদিত হয়।

(৬) রাত্রি। বড়শৃঙ্গার ভোগ। পিঠা, বড়া, দই, সরপুলি ইত্যাদি আট পদের ভোগ দেওয়া হয়।

(৭) শয়নের সময়। শয়ন ভোগ। সুগন্ধ জল, ডাব ও পান নিবেদিত হয়।

ভোগের এই বিপুল আয়োজন করতে বহু শত মানুষকে সারা দিনরাত্রি ব্যাপৃত থাকতে হয়। স্ত্রীলোক এখানে কাজের অধিকারী নন। নানা মহলে তাই রান্নাবাড়ি ভাগ করা। কোথাও ঢেঁকিতে চাল কোটা হচ্ছে। ঢেঁকি ঘরে কোন জানালা নেই। সারি সারি লোক বৃহৎ আকারের শিল নোড়ায় বাটনা বাটছে। কুটনো কুটছেই বা কত লোক। কাঠ ও মাটির হাঁড়ির সরবরাহ আসছে দিনে অনেকবার। এলাহি ব্যাপার।

ভোগ নিবেদনের পর সামান্য অংশ উপস্থিত ভিখারী এবং ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অবশিষ্ট ভোগ পাণ্ডারা নিয়ে যান এবং বিক্রী করেন। দক্ষিণ দুয়ারে আনন্দবাজারে ভোগ প্রকাশ্যে বিক্রয় হয়। শ্রীক্ষেত্রের অন্নভোগ উচ্ছিষ্ট হয় না। এখানে তথাকথিত নীচ জাত অচ্ছুৎ এবং ব্রাহ্মণ একই পাত্র থেকে নিয়ে আহার করেছেন, তাতে জাতপাত নষ্ট হচ্ছে না। বিধবা একাদশীর দিনও এই অন্নভোগ গ্রহণ করলে পতিতা হন না। শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে নাকি একাদশী দেবী বন্দিনী হয়ে আছেন। ছোট্ট একটি গহ্বরে দুটি 'বিড়াল চোখ' দেখিয়ে বলে, এইখানে ঠাকুর জগন্নাথ একাদশীকে বন্দী করে রেখেছেন।

শ্রীক্ষেত্রে এই মহাপ্রসাদের কল্যাণে কেউই অভুক্ত থাকেন না। এখন যদিও বিনামূল্যে বিতরণের পরিমাণ কমে গেছে তথাপি খুব অল্প মূল্যে ভাত ও তরিতরকারি প্রসাদ পাওয়া যায় বলে অল্প সংস্থান যাদের তাঁরাও পেট পুরে খেতে পারেন।

ভোগমণ্ডপ অতিক্রম করে রয়েছে জগমোহন সভাগৃহ ও নাট মন্দির। এখানে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভবা যুবতী দেবদাসীগণ নৃত্যগীত করেন। এর পরের ঘরটিকে কেহ কেহ শ্রীমুখশালা নামে অভিহিত করেন। এখান থেকে ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শন করে থাকেন। প্রতিটি মণ্ডপ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এগুলি একই সময়ে তৈরি নয়। ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা নানা সময়ে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও এর কোনটাই বেমানান নয়।

মূল মন্দিরে লক্ষ শালগ্রাম দ্বারা রত্নসিংহাসন নির্মিত। পাণ্ডা বল্লেন, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের রত্নবেদীতে একটি শালগ্রাম কম আছে। এর দ্বারা জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। যাই হোক, রত্নসিংহাসনের ডাইনে শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু, মধ্যে শ্রীসুভদ্রা এবং সবদক্ষিণে শ্রীবলরাম দারু ব্রহ্মরূপে বিরাজিত। জগন্নাথদেব সম্পর্কে কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে। এসব কথা প্রাচীনরা কম বেশি জানেন। নবীন কোন পাঠক যদি পড়েন, তাঁর জ্ঞাতার্থে এখানে সেই বহুশ্রুত কাহিনী সংক্ষেপে নিবেদন করি।

বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ভগবানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হলে স্বয়ং ভগবান জনৈক বৈষ্ণব মারফত রাজাকে নীলমাধবের কথা জানান। অন্যান্য বহু ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি নীলমাধবের খোঁজ করতে করতে নানা দেশ পরিক্রমা করে অবশেষে নীলগিরির পশ্চাতে শবর দ্বীপে শবর নামক এক অনার্য জাতির দেশে উপনীত হন। সেখানে তিনি বিশ্বাবসু শবরের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং শবরকন্যা ললিতার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিশ্বাবসু প্রতিরাত্রে নীলমাধবের পূজা করতেন। পূজা সমাপন করে আসার পর দিব্য সুগন্ধ তাঁকে ঘিরে থাকত। বিদ্যাপতি পত্নী ললিতার কাছ থেকে এই সংবাদ সংগ্রহ করেন। পাছে কোন বলবান্ নৃপতি নীলমাধবকে কেড়ে নিয়ে যান এই আশঙ্কায় বিশ্বাবসু ভগবানকে গোপন স্থানে রেখে কেবলমাত্র রাত্রে পূজার্চনা করতেন। সেই মন্দিরের পথ অন্য কারো জানা ছিল না। কাউকে তিনি কোন কারণে সেখানে যেতে দিতেন না। কিন্তু ভগবানের বিচিত্র লীলা বোঝে কার সাধ্য!

কন্যা ললিতার আবদারে বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে এক রাত্রে নীলমাধব দেখাতে স্বীকৃত হলেন। ঠিক হলো, তাঁকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে, আবার চোখ বেঁধেই দর্শনের পর ফিরিয়ে আনা হবে। বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ তাতেই রাজি হলেন। নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ সকলের অলক্ষ্যে বস্ত্রাঞ্চলে ছোট্ট একটি ছিদ্র করে সামান্য কিছু সরিষা বেঁধে নিলেন। যথাসময়ে বিশ্বাবসুর সঙ্গে চোখবাঁধা অবস্থায় তিনি নীলাচল-প্রভুর উদ্দেশে রওনা হলেন। পথ চলবার সময় বস্ত্রাঞ্চলের পুঁটুলি থেকে দু-চারটি সরিষা পড়তে থাকল। পরে বহু বিপত্তির মোকাবিলা করে বিদ্যাপতি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নীলমাধবের সংবাদ দিলেন। সৈন্যসামন্ত লোকলস্কর নিয়ে মহারাজ নীলমাধবকে আনবার জন্য হাজির হলেন। বিদ্যাপতির বস্ত্রাঞ্চল থেকে ঝরে পড়া সর্ষেগুলি ইতিমধ্যে কুসুমিত গুল্মে পরিণত হয়েছে। ঐ গাছ আজ পথপ্রদর্শকের কাজ করল। কিন্তু নীলমাধব বিগ্রহ পাওয়া গেল না। রাজা ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই বিশ্বাবসু শবরের নষ্টামি। তিনি তাকে বন্দী করলেন। তখন দৈব্যবাণী হলো—"শবরকে ছাড়িয়া দাও। নীলাদ্রির উপর একটি মন্দির নির্মাণ কর। তথায় দারুব্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে। নীলমাধব মূর্তিতে তুমি দর্শন পাইবে না।"

মহারাজ নীলমাধবের দর্শন না পেয়ে অনশনে জীবন ত্যাগের সঙ্কল্প করলেন। তখন স্বপ্নাদেশ হলো—"সমুদ্রের বাঙ্কিমুহান নামক স্থানে দারুব্রহ্মরূপে আমি উপস্থিত হইব।" স্বপ্নাদিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে শঙ্খপদ্ম-

গদাচক্র লাঞ্ছিত দারুব্রহ্ম পাওয়া গেল। বিষ্ণুর অঙ্গ থেকে স্খলিত রোম দারুরূপ ধারণ করেছেন বলে প্রচলিত বিশ্বাস। কিন্তু কেউই তা তুলতে সমর্থ হলো না। জগন্নাথদেব আবার স্বপ্নাদেশ করলেন। তিনি তাঁর পূর্বসেবক বিশ্ববাসু শবরকে নিয়ে আসতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি এসে হরিধ্বনি দিয়ে দারুব্রহ্মকে সহজেই তুলে আনলেন।

দারুব্রহ্মকে শ্রীমূর্তিতে প্রকটিত করার ব্যাপারেও নানা সমস্যার উদ্ভব হলো। বহু কুশলী শিল্পী নাজেহাল হয়ে ফিরে গেলেন। কাঠের গায়ে একটি ছিদ্র করতেও সমর্থ হলেন না। রাজা প্রমাদ গণলেন। অতঃপর ভগবান্ স্বয়ং বৃদ্ধ অনন্ত মহারাণা নাম ধারণ করে এসে এই কাজের ভার নেন। রাজার সঙ্গে শর্ত হলো, বন্ধ ঘরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে তিনি ২১ দিনে শ্রীমূর্তিত্রয় প্রকটিত করবেন। ঐ সময়ের মধ্যে কেউ সে ঘরে ঢুকতে পারবে না। দুই সপ্তাহ কাল পরে রাজা ধৈর্যহারা হয়ে পড়লেন। ভেতর থেকে কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে তাঁর আশঙ্কা হলো, বৃদ্ধ শিল্পী হয় তো বা মারাই পড়েছেন। শুভানুধ্যায়ীদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি দরজা উন্মোচন করে দেখেন যে, দারুব্রহ্ম তিনটি শ্রীমূর্তি পরিগ্রহ করেছেন কিন্তু তাঁদের হাতের আঙুল এবং পাদপদ্ম প্রকটিত হয়নি। বৃদ্ধ অনন্ত মহারাণাকেও দেখা গেল না। এই ভাবে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সকলেই নিঃসন্দেহ হলেন, স্বয়ং ভগবান্ই শিল্পীর রূপে দেখা দিয়েছিলেন।

শ্রী জগন্নাথদেবের নির্দেশেই ঐ অসমাপ্ত শ্রীমূর্তিত্রয় এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রভুর আজ্ঞায় বিশ্বাবসু শবরের বংশধরগণ দয়িতা সেবক রূপে চিহ্নিত হলেন। আজও শ্রীক্ষেত্রে শবর পাণ্ডারা বর্তমান রয়েছেন। বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সন্তানগণ হলেন অর্চক। আর বিদ্যাপতির শবর পত্নীর সন্তানেরা হলেন সুয়ার বা ভোগ রান্নার ঠাকুর। অপর দিকে রাজার প্রার্থনা ক্রমে ভগবান্ বর দিলেন,—যে বৃদ্ধ শিল্পী শ্রীমূর্তি নির্মাণ করেছেন তাঁর বংশধরগণ যুগে যুগে তিনটি করে রথ তৈরী করে দেবেন। শ্রীমন্দির সারা দিনে তিন ঘণ্টা ছাড়া সর্বদাই দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সারাদিন ধরে ঠাকুরের সেবা চলবে। তাঁর হাতের জল কখনও শুকোবে না। সব শেষে রাজা নির্বংশ হবার প্রার্থনা জানালেন। রাজপুত্রেরা মন্দিরের মালিকানা ভাগ নিয়ে গোলমাল করতে পারে এই আশঙ্কার ফলে তিনি এমন অদ্ভুত প্রার্থনা জানান। ভগবান্ এ প্রার্থনা মঞ্জুরও করেছিলেন। কিন্তু তাতে মন্দিরের সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া দ্বন্দ্ব কিছুমাত্র কমেনি বল্লেই চলে।

জগন্নাথ দেবের মন্দির সহ ওড়িশার তৎকালীন প্রত্যেকটি মন্দিরগাত্র অপরূপ ভাস্কর্যে প্রাণবন্ত হয়ে আছে। শিল্প-নৈপুণ্যে, স্থাপন-কৌশলে এবং পরিকল্পনায় এগুলির জোড়া মেলা ভার। সেই রকম একটি মন্দিরে এই রকম সাদামাঠা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার যে কারণই উল্লেখ করা হোক না কেন, অনেকেই তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। সেজন্য বহু মত নানা সময়ে প্রচারিত হয়েছে। এমন কি বৌদ্ধদের সর্বগ্রাসী প্রভাবের সঙ্গে কোন প্রকার সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে ভারতীয় হিন্দু মূর্তি-পূজার মধ্যে বৌদ্ধ ভাবকে লীন করে নেওয়া হয়েছে এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রাধান্য এখানে সুস্পষ্ট। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নাকি বলা হয়েছে, শবর হলো দস্যু জাতি। এদের অর্চিত দেবতা নীলমাধবকে শ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা রূপে প্রকটিত করে জাতি-বিভক্ত ভারতীয় হিন্দুকে একটি ঐক্য সূত্রে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা অনুমিত হয়। হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য এমন প্রয়োজন তখন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই জন্যই কি ভগবান্ শ্রীমূর্তির এবম্বিধ রূপদান করেন?

মন্দির এখন সরকারের পরিচালনাধীন। সরকার নিযুক্ত একটি কমিটি এর পরিচালনা করেন। পুরীর রাজা হলেন কমিটির সভাপতি, জেলা-শাসক সম্পাদক। শ্রীজগন্নাথ ঠাকুরের দেবোত্তর ভূসম্পত্তি থেকে লব্ধ খাজনা ইত্যাদি ছাড়া যাত্রীদের নিকট থেকে মন্দিরের আয়ই নাকি কয়েক লক্ষ টাকা। এত বিপুল অর্থের উৎস

বলেই নানা স্বার্থের কোন্দল সহজেই দেখা দিয়েছিল এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা থেকে শুরু করে কোর্ট কাছারি পর্যন্ত তার রেশ চলত। ঐ সব কাজে যত উৎসাহ বাড়ত, আসল সেবা পূজা ও ভোগরাগের ক্ষেত্রে ততই ভাটা পড়ত। বিশৃঙ্খলা অবহেলা ও অযত্নে দেবস্থানের মাহাত্ম্য মলিন হত, ভক্তেরা এসে অত্যাচারিত ও প্রতারিত হতেন। এক সময় পাণ্ডাদের হাতে যাত্রীদের সর্বস্ব তুলে দিয়েও নিস্কৃতি পাওয়া ভার ছিল। এই অবকাশে কয়েক শ বছরের মন্দির পরিচালনার একটু সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রীজগন্নাথের উপর দীর্ঘকাল ওড়িশার বিভিন্ন রাজবংশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁরা প্রচুর ভূসম্পত্তি ও অর্থাদি দান করেন। অনেকে মূল মন্দিরের সঙ্গে নতুন নতুন মন্দিরাদিও নির্মাণ করান। ঐ সব রাজাদের মধ্যে অনঙ্গভীম দেব একজন জবরদস্ত লোক ছিলেন। তিনিই ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ প্রভুর স্বপ্নাদেশে বর্তমান শ্রীমন্দির নির্মাণ করান। জনশ্রুতি এই, অনঙ্গ ভীম দেব নানা সৎকর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হত্যার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন। তাঁর সৎকর্মের তালিকা দীর্ঘ। শ্রীমন্দির যে সেই দীর্ঘ তালিকার উজ্জ্বলতম নাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য কাজও বিশেষ ব্যয়বহুল এবং কল্যাণকর। হান্টার সাহেবের ওড়িশার ইতিহাস পাঠে জানা যায়--অনঙ্গভীম দেব ৬০টি পাথরের মন্দির স্থাপন করেছিলেন। জনহিতকর কাজকর্মও করেছিলেন তিনি প্রচুর। এর পরই যে নামটি আমাকে সর্বাধিক আকর্ষণ করে তা হলো প্রতাপরুদ্র দেব। ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি ওড়িশার অধিপতি ছিলেন। ওড়িশা থেকে কালাপাহাড়কে তিনিই বিতাড়িত করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্ব স্বীকার করে তিনিই জগন্নাথ অঙ্গনে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দারুময়ী মূর্তি স্থাপন করান। ইহা গুপ্ত গৌরাঙ্গ নামে খ্যাত।

বিধর্মীরা, বিশেষতঃ মুসলমান শাসকরা বার বার এই মন্দিরের ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছে। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ এবং কালাপাহাড়ই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। শেষোক্ত ব্যক্তি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিল। মুসলমানী বিয়ে করে মুসলমান হয় এবং ক্ষমতালাভ করে। সে কেবল লুণ্ঠন করেই তৃপ্ত হয়নি। ওড়িশার প্রায় প্রতিটি মন্দিরের দেবদেবী ও শিল্পকর্ম তার অত্যাচারের নীরব সাক্ষ্য আজও বহন করছে। ভারতের অন্যান্য মন্দির ও দেবমূর্তি কালাপাহাড়ী অত্যাচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মুসলমান রাজত্বকালে তীর্থযাত্রীদের নানাবিধ কর দিতে হতো। আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ যখন ওড়িশা দখল করেন তখন মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচিত হন খুরদার রাজা। পরে এই কর্তৃত্ব মহারাষ্ট্রীয়দের হাতে চলে যায়। এরপর আসে ইংরেজ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজ ওড়িশা দখল করে। তারা মহাপ্রভুর প্রচলিত পূজাদি কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করে নি। ১৮৪০ সনে যাত্রিকর রহিত হয়। খুরদার রাজারা ঐ সময় থেকে আবার শ্রীমন্দিরের ভার পান। মন্দিরই একটি বিশাল কর্মশালা। একে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক হাজার লোকের জীবিকার সংস্থান হয়। মন্দিরের অর্থনীতি আলোচনা খুবই চিত্তাকর্ষক হতে পারে। অনেকের অনুমান, এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই ওড়িশার অর্থনীতি একদা সুস্থির হয়েছিল। এ সম্পর্কে পরে কিছু বলা যাবে।

আয়ের অধিকাংশ আসে দেবোত্তর ভূসম্পত্তি থেকে এবং যাত্রীসাধারণের প্রদত্ত অর্থ থেকে। নানা ফি ইত্যাদি ধার্য করে আজকাল কিছু বাড়তি আয় হয়। যেমন প্রসাদ বিক্রী করার লাইসেন্স ফি।

মন্দিরকে কেন্দ্র করে অর্থচিন্তা একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে চিরকালই প্রবল! তারা এখানে সরলপ্রাণ ভক্তদের সহজ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে শত শত বৎসর আগেও যেমন ঠকিয়ে মুনাফার অঙ্ক বাড়াতো, আজও তেমনি করে। কঠিন ও বিতর্কিত বিষয় থাক, ছোট্ট একটি ঘটনার কথা বলি। মন্দিরে লক্ষ লক্ষ ঘৃত প্রদীপ প্রতিদিন প্রজ্জ্বলিত হতে দেখলাম। কিন্তু প্রদীপে এখন আর গাওয়া বা ভঁয়সা ঘি দেওয়া হয় না। কি

দেওয়া হয় জানেন? ডালদা। ঘৃত প্রদীপের মূল্যে লক্ষ লক্ষ ডালদার প্রদীপ নিরুপদ্রবে বিনা প্রতিরোধে বিক্রীত হচ্ছে। এই রকম একজন বিক্রেতার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, মন্দির অভ্যন্তরে মহাপ্রভুর সামনে যে ঘৃত প্রদীপ প্রজ্বলিত আছে তাহাতেও এখন ডালদা ব্যবহার করা হয়। খাদ্য ও ঔষধেও যে দেশে ভেজাল চলে সেখানে ডালদার প্রদীপকে ঘৃত প্রদীপ বলে চালানোর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই।

সমগ্র মন্দির এখন বিজলি আলোয় ঝলমল করে, কিন্তু মূল শ্রীমন্দিরের মণিকোঠায় বিগ্রহের সামনে এখনও ঘৃত প্রদীপ (মতান্তরে ডালদা প্রদীপ) জ্বলে। প্রভু এখানে পূর্বাস্য। পশ্চিমবঙ্গে দেবদেবী সাধারণত দক্ষিণমুখী, ক্বচিৎ পশ্চিমমুখী। কোন কোন বৈষ্ণব বাড়িতে বিগ্রহ দেখেছি পূর্ব দিকে মুখ করে বসান। পূর্বমুখী অন্য কোন দেবস্থান দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাই জগন্নাথকে পূর্বাস্য দেখে কারণ জানতে ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু সদুত্তর সংগ্রহ করতে পারিনি। জনৈক পুরোহিত জানালেন: বিগ্রহের দিকে মুখ করে বসে পূজা করা হয় না। সে যাই হোক, সারাদিনের পূজা পাঠ বা এককথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দিনচর্চা এক মহা বিস্ময়কর ব্যাপার।

আরতির পর শ্রীবিগ্রহত্রয়কে শয়নের জন্য পালঙ্ক এবং রাত্রে আহারের জন্য সুবাসিত পানীয় ডাব ও তাম্বুল দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে গীত-গোবিন্দ নাচ গান বেদপাঠ ইত্যাদি সমাপন হয়েছে। বন্ধ দরজার কড়া-দুটি দড়ি দিয়ে বেঁধে তাতে কাদা লেপে দেওয়া হয়। ঐ কাদার উপর মোহন মুদ্রা নামক সিল মোহর লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে। পরের দিন সকালে এই সিল মোহর অক্ষত আছে কি না তা দেখে নিয়ে তবে মন্দির-দ্বার উন্মোচিত হয়। 'মণিমা' ধ্বনি দিতে দিতে সেবকগণ মন্দিরে প্রবেশ করেন। শুরু হয়ে দিনচর্চা। চলে দফায় দফায় নিত্য কর্ম।

প্রথমে আরতি। বেশবাস পরিবর্তন। সারাদিন বেশ কয়েকবার বেশবাস পরিবর্তন হয়। অতঃপর দন্ত ধাবন, স্নান, শ্রীঅঙ্গমার্জন। এইবার ভোগ রাঁধার উদ্যোগ শুরু হয়। রান্নাঘর পরিষ্কার করে সূর্য ও দ্বারপাল পূজা করানোর পর রান্না আরম্ভ হয়। দিনরাত্রে সাতবার ভোগদানের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। মাধ্যাহ্নিক সেবার পর ঠাকুরের পহর অর্থাৎ শয়ন হয়। রাত্রের মত এই সময় দরজা বন্ধ করে সিল করাই নিয়ম। সন্ধ্যার পূর্বে আবার দ্বার উন্মোচিত হয়। আবার আরতি। বার তিথি পর্ব ও নক্ষত্র বিশেষে দিনচর্চার রকমফের হয়, ভোগরাগেরও পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধন ঘটে।

ছাপান্ন ব্যঞ্জন নানা জাতি
ভোগ লাগে দিন রাতি।

ভোগের প্রধান অংশ এখনও ভক্তরা দিয়ে থাকেন। মিলিত ভোগের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরে ভক্ত নিজে কোন পূজাদি করতে পারেন না। ভোগ কমিটির হাতে প্রয়োজনীয় অর্থদান করলেই পূজা দেওয়া হলো বলে বিবেচিত হয়।

কাশীভাই আমাদের তাঁর প্রধান ভীমসেন পাণ্ডার নিকট নিয়ে গেলেন। ভীমসেন-বাবু পরিণত বয়সের মানুষ। শান্ত কথাবার্তা বলেন। পূর্ববঙ্গে আমার পূর্ব নিবাসের সমীপবর্তী অঞ্চলের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা জানালেন। জগন্নাথ দেবকে কেন্দ্র করেই এই পরিচয় গড়ে উঠেছে। এটা হলো পাণ্ডাদের একটা প্রচার পদ্ধতি। পাণ্ডার খাতায় কারো নিজের নাম বা পিতৃপুরুষের নামধাম লেখা থাকলেই তিনি সেই পাণ্ডার যজমান বলে সকলেই মেনে নেন। আজকাল ভক্তজনকে নিজের হাতে নাম ঠিকানা এবং গোত্র লিখে সই করে দিতে হয়। আমিও দিলাম। গয়াতীর্থের পাণ্ডারা সব চেয়ে দড় বলেই আমার মনে হয়। পুরীতে কোন দরদস্তুর নেই। নাম ঠিকানা লেখা হয়ে গেলে পাণ্ডার একজন কর্মচারী মিলিত ভোগদানের নির্ধারিত ব্যয়ের একখানা তালিকা আমাদের এনে দিলেন। তালিকাখানি খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। আট টাকা পঁচিশ পয়সা থেকে

১৩২০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় ধার্য হয়েছে। ভক্ত যেমন খান জগন্নাথও তেমনি আহার ভক্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রহণ করবেন। আট টাকা পঁচিশ পয়সাও যাঁদের দেবার ক্ষমতা হয় না তাঁরা একাধিক জনে মিলে ঐ টাকা দিতে পারেন। তালিকাটি ইংরেজিতে মুদ্রিত। তার বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায় :

ভোগের নাম	সর্বোচ্চ অর্থ মূল্য	সর্বনিম্ন অর্থ মূল্য
মাখন মিছরি ভোগ	১৩২০০০৲	৮২৫০৲
ছপন (৫৬ প্রকার)	৫৬০০০৲	৭৫০০৲
মোহন ভোগ	১৫৫০৲	৯৬৮৵০
লাড্ডু	১৫০০৲	৯১৮৲
সিরাপুরী পায়স	৭৫০৲	৪৬।০
মালপোয়া	৫৬২৲	৩৫৵০
কর্মবাঈ মিঠা খিচুড়ি ভোগ	৪০৪৲	২৫।০
নিমকদার	৩৬০৲	২২॥০
কাঁচা ডাল ভাত	১৩২৲	৮।০

এই মূল্যের উপর মন্দির কমিটির ফি ধার্য আছে। ২৫।০ আনার ভোগের মূল্য তাতে দাঁড়ায় ২৯৲ টাকা। আমি ও সুধীরদা দুজনে মিলে এই ভোগ নিবেদন করলাম। আমাদের পৃথক পৃথক মুদ্রিত রসিদ দেওয়া হলো। রসিদের উপর লেখা ছিল "Approved by the Administrator"। এরপর পাণ্ডাঠাকুর আমাদের পৃথক পৃথক ভাবে 'গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি' মন্ত্রটি পাঠ করালেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ করে প্রণামী চাইলেন। একটা টাকা তাঁকে দিলাম। হাসি মুখে ভীমসেন পাণ্ডা ঠাকুর তা গ্রহণ করে আবার আমাদের কল্যাণ কামনা করলেন। সামান্য অর্থ পেয়ে তিনি হাসিমুখ করলেন দেখে খুবই আনন্দ বোধ করেছিলাম। এমনিভাবে পূজা দিতে আমরা অভ্যস্ত নই। তবে এতে ঝঞ্ঝাট কম।

পরের দিন ঘূর্ণিঝড়ের দারুণ দুর্যোগের মধ্যে মহাপ্রসাদ আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পোলাও, তরকারী, কাঁচালঙ্কা এবং করকোচ। খেতে পারিনি। কেমন একটা বিশ্রী গন্ধে সমস্ত গা ঘুলিয়ে উঠেছিল। চায়ের দোকানের সেই দিদি আমাদের রক্ষা করেছিলেন। লোক পাঠিয়ে সেগুলি নিয়ে নিয়েছিলেন। পরে জানতে পারলাম, পোলাও এখানে আজকাল ডালদা দিয়ে রান্না হচ্ছে।

ক্রমশঃ

সাধনার জয়যাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

বরফাচ্ছন্ন দেশ সাইবেরিয়া। তুষারাবৃত সাইবেরিয়ায় শোনা যায় কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না। সেখানকার লোকের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশু পালন এবং পশুর লোমের ব্যবসায়। অতি সহজ সরল ছিল তাদের জীবনযাত্রা।

একসময় রুশদেশ থেকে অপরাধীদের সাইবেরিয়ার দূরতম দুর্গম অঞ্চলে দ্বীপান্তরের জন্য পাঠান হত। অতি শীতল এই সাইবেরিয়ার জলবায়ু।

আধুনিক রাশিয়ায় সাইবেরিয়ার মতন অঞ্চলকেও বর্ত্তমানে মনুষ্যবাসোপযোগী করে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। পূর্ব্বতন জনবসতিহীন সাইবেরিয়ায় বর্ত্তমানে বহু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভূবিদ্যাশিক্ষণ বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে ছোট-বড় বহু শহর গড়ে উঠেছে।

এই রকম একটি ছোট্ট শহরের কোন এক সহজ, সরল মেয়েকে নিয়েই আজকের এই গল্পের অবতারণা।

সাইবেরিয়ায় সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত আঙ্গারাস্ক শহর থেকে ৪০/৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত ইউসোলি সিরবস্কোয়া শহর।

শহরের একটি ছোট্ট মেয়ে নাজেদা সিজোভা। মাঠে মাঠে আপনার মনে খেলে বেড়ায় সে। খ্যাতকীর্ত্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই সেদিন তার মধ্যে দেখা যায় নি। একবার খেলার ছলেই সে সট্‌পুট ছুঁড়েছিল মাত্র সাত মিটার। এর বেশী তার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে পারেনি সেদিন, এর বেশী তার কাছে কেউ কিছু আশাও করেনি সেদিন।

মেয়েটির অসীম ক্রীড়ানুরাগ লক্ষ্য করে তাকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের [illegible]শিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্ত্তি [illegible] নেওয়া হল।

এই শিক্ষাকেন্দ্রেরই সুযোগ্য শিক্ষক ভিকটর আলেকসিয়েভের তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে সিজোভার ক্রীড়া-প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। সম্পূর্ণ রূপে যাচাই করে আলেকসিয়েভ সিজোভাকে সট্‌পুট বিভাগের জন্যই উপযুক্ত মনে করলেন। অতঃপর শক্তি, সামর্থ্য ও গতির সমন্বয়ে তীব্র বেগে লৌহগোলক নিক্ষেপ করার কৌশল আয়ত্তাধীনে আনার জন্য চলল তার সুদীর্ঘ অনুশীলন। সিজোভা তার প্রবল বাসনা, অবিচলিত নিষ্ঠা ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার মাধ্যমে দৃঢ় সঙ্কল্পে তার সাধনায় নিরত হয়ে ধীরে ধীরে একজন খ্যাতকীর্ত্তি খেলোয়াড় রূপে পরিগণিত হলেন।

ক্রীড়াজগতে সিজোভা যখন উদীয়মান, তামারা প্রেস তখন খ্যাতির মধ্যাহ্ন গগনে স্বীয় দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে বিরাজ করছেন। অলিম্পিক বিজয়িনী (১৯৬৪) তামারা তখন রাশিয়ার একজন বরেণ্য গরীয়সী, শক্তিময়ী শ্রেষ্ঠা ক্রীড়াবিদ্‌। তিনি ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে ১৮.১৪ মিটার দূরে গোলা নিক্ষেপ করে অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করে বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করে দেন।

ইতিমধ্যে সিজোভা ইউরোপীয়ান গেম্‌সে জুনিয়ার বিভাগে ১৬.৬ মিটার দূরে লৌহ বল্‌ নিক্ষেপ করে রেকর্ড করলেও তখনও পর্য্যন্ত কিন্তু কেহ তাহাকে তামারার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে কল্পনা করে উঠতে পারেনি। তবুও উৎফুল্ল-হৃদয়া যুবতীর মনে একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছিল সেদিন—হয়ত বা বিশ্ববিজয়িনী তামারার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্যও তার আসবে কোনদিন।

অতঃপর ১৯৬৬ সালের কোন এক শীতের সকালে লেনিনগ্রাডে সিজোভার সেই আশার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত হতে দেখা গেল।

সেদিন একদিকে দেখা গিয়েছিল শক্তিধন্যা, পরাক্রমশালিনী তামারাকে নির্ভীকতার সঙ্গে দূরে লৌহ বল্ নিক্ষেপ করতে। আর অপরদিকে ক্রীড়া জগতে নবাগতা, অসীম মনোবল-সম্পন্না সিজোভাকে দৃঢ়চিত্তে তামারার সীমানা অতিক্রম করে বল্‌টিকে অধিকতর দূরে পাঠিয়ে দিতে দেখা গিয়েছিল। অচিন্তনীয় কোন কিছু ঘটতে দেখে দর্শকেরা সেদিন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, মাত্র দু'বৎসরের মধ্যে তামারার রেকর্ড ভঙ্গ করে অসম্ভবকে সম্ভব করার মতন মেয়েও তবে এখনও পর্য্যন্ত তাঁদের দেশে আছে।

এর পরের বৎসর আগষ্ট মাসে বুদাপেষ্টে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ক্রীড়ানুষ্ঠানে সিজোভাকে সোভিয়েট দলের নেতৃত্ব করার ভার অর্পণ করা হয়। সিজোভাও সেই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনীর স্বর্ণপদক লাভ করে স্বীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন সেদিন।

অতঃপর দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক। সকলেই সেদিন সিজোভাকে অলিম্পিকের সট্‌পুট বিভাগের সাম্ভাব্য বিজয়িনী বলে ধরে নিয়েছিলেন। এবারও দেখা গেল সেই পুরাতন রেকর্ড ভাঙ্গার পালা।

এবার জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দেখা দিলেন পূর্ব্ব জার্ম্মানীর শক্তিমতী মেয়ে মার্গিটা গামেল। তিনি ১৯·৬১ মিটার দূরে বল্ নিক্ষেপ করে সিজোভা কৃত রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রথম হলেন। অপর এক পূর্ব্ব জার্ম্মান দুহিতা ১৮·৭৮ মিটারের দূরত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তৃতীয় স্থানটি রেখে দিলেন সিজোভার জন্য। সমবেত দর্শকদের সকলকে নিরাশ করে মাত্র ১৮.১৯ মিটারের দূরত্বে সিজোভা এবার তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন।

সকলে নিরাশ হলেও সিজোভা কিন্তু এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হতোদ্যম হননি। পর বৎসরই স্বীয় একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় তিনি ২০·০৯ মিটার দূরে বল্ নিক্ষেপ করে পুনরায় বিশ্ব রেকর্ড করতে সমর্থ হলেন। পূর্ব্ব জার্ম্মান প্রতিনিধি গামেলও এতদিন কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। এরপর তিনি সিজোভার থেকে মাত্র ১ সে. মি. দূরে বল পাঠিয়ে পুনরায় বিশ্ববাসীর নিকট নিজ শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখলেন।

এই রকম করে আজও পর্য্যন্ত চলেছে এই 'পালা বদলের পালা'। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে এথেন্সের ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ২০·৪৮ মিটার দূরে বল্ পাঠিয়ে দিয়ে সিজোভা পুনরায় একটি রেকর্ড ভাঙ্গার খেলা দেখিয়েছেন।

পাল্লা দিয়ে 'রেকর্ড ভাঙ্গার পালার' পরবর্ত্তী অঙ্কটি জানার জন্য জগৎবাসী ১৯৭২-এর মিউনিক অলিম্পিকের দিকে অধীর আগ্রহে চেয়ে আছেন।

দেখা যাক্ কোন স্বয়ংসিদ্ধা এবার এগিয়ে আসেন তাঁর সাধনার জয়যাত্রাপথে।

পুণা আশ্রমে

দিলীপকুমার রায়

এক

নানা অপ্রাকৃত দর্শনাদির রকমারি গাল ভরা নামকরণ করেছেন য়ুরোপীয় নেপথ্যবিৎরা, যথা: টেলিপ্যাথি, প্রফেটিক ভিশন, প্রফেটিক ড্রীম, ক্লেয়ারভয়ান্স, ক্লেয়ার-অডিয়েন্স, লেভিটেশন, প্রিকগ্‌নিশন, বাইলোকেশন, টেলেস্থেসিয়া, এক্সট্রাসেন্সারি পার্সেপ্‌শন...আরো কত কী।১ (নামকরণের প্রতিভায় ওরা চিরদিনই অগ্রণী)। আমি যৌবনে এসব নামের ধুমধামে মুগ্ধ হয়ে জানতে চাইতাম বৈ কি—কী ব্যাপার, যদিও তা ব'লে কোনদিনই অতিকৌতূহলী ছিলাম না। ইন্দিরার সঙ্গে সংস্পর্শে এসে এসব অলৌকিক কাণ্ড-কারখানার খবর পেয়ে আমার এইটুকু লাভ হয়েছিল যে, আমি কিছুটা নম্র হয়ে মেনে নিতে শিখেছিলাম অনেক কিছু এবং নামকরণের ধুমধড়াক্কায় মেতে উঠে ভাবিনি—নামকরা মানে হ'ল অবোধ্য যা তা সব বুঝে ফেলেছি দুটো বুলি আউড়ে।

এ বিনতির দ্বিবিধ সুফল আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম: এক, চিন্তা মনকে পাশ কাটিয়ে একটু পাখা মেলতে চাইত অচিন্তনীয় লোকের দিশা পেতে; দুই, মানস বুদ্ধির ভাষ্য টীকা মন্তব্যকে বড় করে দেখার মোহ থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম—খানিকটা অন্ততঃ। এছাড়া শ্রীঅরবিন্দের তীক্ষ্ণধী তথা ভূয়োদর্শী চেতনার কিঞ্চিৎ আলোও পেয়েছিলাম তো তাঁর নানা পত্রাদি থেকে। সে আলোয় শুধু যে অচিন পথে পা ফেলা একটু সহজ হয়েছিল তাই নয়, দেখতে পেয়েছিলাম—শিষ্যা কীভাবে গুরুর পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যদিও ইন্দিরা নিজে একথা জানত না। কিন্তু আমি ক্রমশ দৃষ্টি-পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম—কেন গুরুদেব আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন ইন্দিরাকে শিষ্যা বরণ করতে। তবে ইন্দিরার সহযোগিতায় আমার সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল এই যে, দিনের পর দিন ভাগবতী কৃপার বহু দৈবী নিদর্শন পেয়ে আমার বিশ্বাস সবল, চেতনা দীপ্ত ও অন্তর উধ্বমুখী হয়ে উঠেছিল। তাই ইন্দিরার মাধ্যমে আর-একটি দৈবী অঘটনের কাহিনী পরিবেষণ ক'রেই ঠাকুরের অঘটনী অধ্যায়ের সমাপ্তি টানব।

এ-অঘটনটির কথা আমি লিখেছিলাম মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকে কারণ, জানতাম তিনি অবিশ্বাস করবেন না। প্রথমতঃ তিনি নিজে নানা দৈবী অঘটন চাক্ষুষ করেছেন ব'লে, দ্বিতীয়তঃ আমার সত্যনিষ্ঠায় তাঁর আস্থা আছে ব'লে। সে-চিঠিটি পরে ছাপা হয়েছিল ব'লে সুবিধা হয়েছে উদ্ধৃত করবার। ব্যাপারটা এই:

ডানলাভিল কটেজ স্যর চুনিলালের প্রাসাদের একটি অ্যানেক্সে (annexe) মতন। স্যর চুনিলাল আমাদের বিকেলে চা-য়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে সময়ে আমাদের অতিথি ছিল দুটি সাধক, যাদের নাম উল্লেখ করেছি—বিমল মৈত্র ও যোগেন্দ্র রস্তোগি। আমরা পাঁচজনে চা পান ক'রে বিশ্রম্ভালাপ করতে করতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল নির্মল আকাশে।. স্যর চুনিলালের

বাগান জ্যোৎস্নালোকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। জুন মাস, ১৯৪৪ সাল।

হঠাৎ ইন্দিরার ভাবাবস্থা—যেমন ওর প্রায়ই হয়। ভাবমুখে বলল আমাকে: "বাগানের মাটি হাতে নিয়ে ধ্যান করা যাক।" অবাক্! বাগানের মাটি মুঠো ক'রে ধ'রে ধ্যান! যাহোক, বসলাম স্যর চুনিলালের প্রশস্ত বারান্দায় অর্ধচন্দ্রাকারে বৃত্তে পাঁচটি চেয়ারে—আমার বাঁ পাশে স্যর চুনিলাল ও যোগেন্দ্র। প্রত্যেকের মুঠিতেই বাগানের মাটি।

খানিকক্ষণ পরে ইন্দিরা (ভাবমুখেই) বলল, "দাদা, প্র—প্রসাদ, ঠা—ঠাকুর।" ব্যস। আমরা চোখ চেয়ে তার দিকে তাকাতে দেখি সে ভাবাবস্থায় অল্প দুলছে—যাকে বলে swaying—আমরা সবাই নিশ্চুপ, স্যর চুনিলাল আমাকে ফিশ ফিশ ক'রে কি বললেন শুনতে পেলাম না। এর পরেই ঘটল অঘটন—ইন্দিরা তার হাতের মাটি আমাকে দিল: "ধর দাদা—ঠাকুরের প্র—প্রসাদ।" আমি প্রসাদ শুনে ডান হাতের মুঠোয় ধরা মাটি বাঁ হাতে চালান ক'রে ডান হাত পাতলাম—ইন্দিরা তার মুঠোয় ধরা মাটি পরিবেষণ করল। এ কী কাণ্ড! নীললোহিতাভ ঝিকমিকে (crystalline) হালুয়া! আর কী মিষ্টি রে! প্রত্যেকের মুঠোর মধ্যেকার মাটি মাটিই আছে, কেবল ইন্দিরার মুঠোয় ধরা মাটি মিষ্টান্ন প্রসাদে রূপান্তরিত—transformed !!২

স্যর চুনিলাল উঠে সাশ্রুনেত্রে ইন্দিরাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন—বিমল ও যোগেন্দ্রও নিল ওর পায়ের ধুলো। আমি ওর মাথায় হাত রেখে ঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলাম।

কিন্তু ঠাকুরের লীলার এখানেই শেষ নয়। এ-অঘটনটি ঘটেছিল—বলেছি—স্যর চুনিলালের প্রাসাদে। তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হবে। তারপরে আমরা পাঁচজন ডানলাভিল কটেজে ফিরে এসে ধ্যানে বসলাম আমার শয়ন কক্ষে:—আমি ধ্যানে বসবার আগে আমার হাতের মধ্যেকার কালো মাটি ও প্রসাদে রূপান্তরিত মাটি দুটি খামে পুরে হলঘরে একটি আলমারিতে রেখে দিলাম—evidence রক্ষা করতে।

ইন্দিরার বসতে না বসতে ফের ভাবাবস্থা, বলল (ইংরেজীতে): "যাই কেন না ঠাকুরকে নিবেদন করা যাক্, প্রসাদ হয়ে যায় দাদা। দেখলে তো হাতে হাতে প্রমাণ—মাটিও মিষ্টান্ন-প্রসাদ হয়ে গেল।" বলতে বলতে ওর চোখে জল—মুখে অপার্থিব হাসি। তারপরেই আমাকে বলল: "যাও দাদা, তোমার হাতের যে-মাটি খামে পুরে রেখে দিয়েছ সে-ও প্রসাদ হয়ে গেল।"

আমি চমকে উঠে ছুটে আলমারি থেকে আমার মাটিভরা খামটি বের ক'রে দেখি: সেটিও নীললোহিতাভ প্রসাদে রূপান্তরিত। অন্য খামটির প্রসাদের ঠিক যেন যমজ ভাই। হুবহু এক রঙ, নীললোহিত, ঝিকমিকে। ঠাকুরের লীলা কে বুঝবে? ইন্দিরারই একটি গানে আছে:

হারকী গতি কোঈ নাহিঁ জানে অম্বর বহ মৈ পাখী
হরির লীলার কে পেয়েছে পার? সে আকাশ, আমি পাখী।

* * *

আমার এক বিজ্ঞানবিৎ অধ্যাপক আমার 'অঘটন আজো ঘটে' প'ড়ে লিখেছিলেন: "দিলীপ, অঘটন কস্মিনকালেও ঘটেনি, আজও ঘটছে না। তবে তুমি অঘটনে বিশ্বাস ক'রে একটি লাভ করেছ মানব—যে, তুমি শান্তি পেয়েছ—আমরা সংশয়ের জগতে অবিশ্বাসের গোলকধাঁধায় পথ খুঁজে না পেয়ে অশান্ত হয়ে উঠেছি।" মাষ্টার মহাশয় আমাকে স্নেহ করেন তাই তাঁর সঙ্গে তর্ক করিনি—সমানে লিখে গেছি আমার নানা অঘটনী রমন্যাস—অকুতোভয়েই বলব—কারণ আমি জানি—এ-ধরণের অভিজ্ঞতা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় ব'লেই বুদ্ধিবাদীদের কাছে উপহসিত হবেই হবে। হোক না—ইন্দিরাকে মীরা একবার বলেছিলেন—আমার মন নিয়েছিল: যে, সত্যনিষ্ঠ সাধকেরা সাধনায় যা যা উপলব্ধি করেছেন তাকে অবিশ্বাসী বুদ্ধিবাদীরা নামঞ্জুর করলে সত্যের মানহানি হয় না—ক্ষতি হয় তাদেরই যারা

এসব নিয়ে হাসাহাসি করে। তাই আর একটি অঘটনের কথা সংক্ষেপে বলব, যাকে বলে to keep the record straight।

অঘটনটি ঠাকুরের আলো জ্বালা নিয়ে। আমার Miracles Do Still Happen ('অঘটন আজো ঘটে'-র ইংরেজী সংস্করণ) রমন্যাসটির পরিশিষ্টে ৩৯২—৩৯৮ পৃষ্ঠায় এবিষয়ে আমার যা বক্তব্য বিশদ ক রেই বলেছি। আমার 'ছায়াপথের পথিক' রমন্যাসটিরও ৪৬৫-৪৭৫ পৃষ্ঠায় বেশ খোলাখুলিই লিখেছি, অদৃশ্য হাতে সুইচ টিপে আলো জ্বালানোর কাহিনী—যদিও একটু অন্য পরিবেশে। এখানে বলব ঠিক যে পটভূমিকায় ঠাকুর আলো জ্বালিয়েছিলেন—অর্থাৎ কল্পনার মিশেল না দিয়ে।

বলেছি, পুনায় আমার শয়নকক্ষে ঠাকুরের মর্মর বিগ্রহ রাখা হয়েছিল। ইন্দিরা একটি কাঠের সুন্দর মণ্ডপে ঠাকুরের মূর্তি বসিয়ে, মণ্ডপের উপরে বোতাম-সুইচ রেখেছিল—বোতাম একবার টিপলে বাল্‌ব্‌ জ্বলে, দুবার টিপলে নিভে যায়।

ডায়রিতে লিখে রেখেছি—আলো জ্ব'লে নিভে ছিল ২৫-এ আগষ্ট (১৯৫৫) তারিখে।

আমার মন সেদিন নানা কারণে: অবসন্ন বলব না, তবে বিষণ্ণ ছিল। মনে হচ্ছিল, এ জন্মটা বোধ হয় বৃথাই গেল। গুরুদেব থাকতে যখন ইষ্টদর্শন হয়নি তখন তাঁর তিরোধানের পর বস্তুলাভের সম্ভাবনা খুবই কম। কাঁদুনি গাইলাম, আমি সঙ্গীত ও সাহিত্য সাধনায়ই বারো আনা সময় ও শক্তি নিয়োগ ক'রে ভুল করেছি, জপতপেই ষোলো আনা মন দেওয়া উচিত ছিল। এখন 'টু লেট'—৫৮ বৎসর বয়সে রক্তের জোর তথা উৎসাহ ঢিমিয়ে আসার পরে কেমন ক'রে রুখে উঠে জপতপে মন বসাব...ইত্যাদি ইত্যাদি হার-মানার স্বপক্ষে চোখা চোখা যুক্তি। রাত্রে শুতে যাব সাড়ে দশটায়। ঠাকুরের বিগ্রহটি আমার খাটের ডানদিকে তিন-চার গজ দূরে মণ্ডপে আসীন। বোতাম টিপে মণ্ডপের আলোটি নিভিয়ে ঘুম যাবার আগে ইন্দিরাকে ডাক দিলাম: "এক গেলাস জল।" ইন্দিরা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—হাতে জলের গেলাস। আমি করুণ হেসে বললাম: "ইন্দিরা, মীরার ভবিষ্যদ্বাণী ফলবে হয়ত পর-জন্মে—এ জন্মে আর ঠাকুরকে পাব না।" ইন্দিরা কিছু বলল না, আঁচলে চোখ মুছে জল হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ মণ্ডপের আলো জ্ব'লে উঠল। চম্‌কে উঠলাম। "দেখ দেখ ইন্দিরা! কে জ্বালালো আলো?" ইন্দিরা নিশ্চুপ। অমনি ফের আলো নিভে গেল—কার অদৃশ্য হাত ফের টিপল বোতাম?—ও মা, ফের—"কিম্‌ অদ্ভুতম্‌!"—আবার আলো জ্ব'লে ওঠে যে!

আমরা দুজনেই একদৃষ্টে চেয়ে অবাক্‌ হয়ে। তারপর একেবারে রীতিমত নাটক—ড্রামা—বাতি জ্বলে আর নেভে, জ্বলে আর নেভে, জ্বলে আর নেভে! এইরকম পনেরো-ষোলোবার আলো নিভবার পরেই জ্বলে উঠে শেষবার নিভে গেল—আর জ্বলল না। আমি রসিকতা করলাম ব্ল্যাসফেমির সুরে: "ইন্দিরা! বাইবেলের খৃষ্টান ঈশ্বর যখন বলেছিলেন 'Let there be light' তখন 'there was light—not darkness'। আমাদের হিন্দু ঠাকুর আলো জ্বালতে পারেন কিন্তু জ্বালিয়ে রাখতে পারেন না। তাঁর শক্তির দৌড় দেখ একবার!" যেই বলা অমনি আলো জ্বলে উঠল—আর নিভল না।।

আমরা দুজনে বিগ্রহের সামনে প্রণাম করলাম, তারপর আমারই একটি গান গাইলাম—পণ্ডিচেরিতে বেঁধেছিলাম ১৯৩৯ সালে:

জ্বলে কি আলোর আলো তুমি যদি নাহি জ্বালো?
পারি কি বাসিতে ভালো তুমি না বাসালে ভালো?
তুমি ধরো বাঁশি বলে সুরধুনী সে ঝরালো।
নয়নে নয়ন মণি, জীবনে জয়ধ্বনি,
কাননে কুসুম বীথি, পরাণে চির অতিথি।
কে বলে তোমায় কালো?
তুমি যে আলোর আলো।
(তালফের ঝাম্পাত্রিক)

এসো হে গগন গানে
প্রিয়তম!
বিরহে মিলন তানে
নিরুপম।
এসো হে বাজায়ে বাঁশি করুণে অরুণ হাসি'
শিখাও বাসিতে ভালো।

দুই

তা বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, আমাদের পুণা আশ্রমে শুধু দৈবী অঘটনই ঘটত একের পর এক। মঝে মাঝে মুখরোচক (থুড়ি, কর্ণরোচক) ভাষণও শুনতে হ'ত নানা বিচিত্র অতিথির মুখে। একজনের কথা বলি, যিনি আমাদের নিরন্তর স্তম্ভিত করতে চেয়েই আরো হাসাতেন।

তাঁর নামটি ভুলে গেছি। গৈরিক ধুতি পিরাণ। মুখে গাম্ভীর্যের ঘনঘটা—হাসি তাঁকে দেখে ভয়ে চম্পট দিত।

গম্ভীর বাণীর তিনি ছিলেন দুর্দান্ত উদ্‌গাতা।

এসে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের অতিথি হলেন। সে সময়ে বন্ধু নরসিংহদাস মানি সামনের যে আটচালাটি ভাড়া নিয়েছিলেন সেখানেই সাধুজিকে রাখা হ'ল। খাওয়া-দাওয়া হ'ত অবশ্য ডালসোভিল কটেজেই।

তিনি একের পর এক ব'লে যেতেন, কোথায় কবে কী মহাকীর্তি করেছিলেন, মহাসাধনায় কী ধরণের যোগ-বিভূতি লাভ করে মহীয়ান্ হয়ে উঠেছিলেন। দৃষ্টান্ত দিতে একদা বললেন: "এই দেখ ধূপ। এমন চমৎকার গন্ধ কোনো পার্থিব ধূপের নেই—থাকতে পারে না।"

"কেন সাধুজি?" শুধালাম সভয়ে।

"কারণ যোগবলে এ-ধূপ আমিই গড়েছি cosmic ray থেকে।"

"বলেন কি? সত্যি?"

"সত্যি? মিথ্যা আমাকে দেখলে মুখ লুকোয় গুরুদেবের বরে—জানো না?"

আমি: আপনার গুরুদেবের নামটি জানতে পারি কি, সাধুজি?

সাধুজি (হুঙ্কার দিয়ে): আমার গুরুদেবের নাম? সাবধান। আগে যোগ্য হও তাঁর নাম শোনার।

আমি (করজোড়ে): বলেন কি সাধুজি। শুনেছি সাধকেরা যোগসিদ্ধি বা যোগবিভূতির কথা কাউকে বলেন না। কিন্তু গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করাও যে বারণ এমন কথা তো কস্মিন্‌কালেও শুনি নি।

সাধুজি (আরো গম্ভীর): কী-ই বা শুনেছ তোমরা শুনি? মীরার নাম শুনেছ কি?

(আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম—তাঁকে মীরার কথা কখনো বলিনি, যদিও মীরাভজন তিনি রোজই শুনতেন খুশী মনে।)

বন্ধুবর: মীরার নাম কে না জানে সাধুজি?

সাধুজি: নাম জানা আর মীরাকে জানা সমার্থক নয় হে বিজ্ঞবর। জানো কি মীরার জীবনকাহিনী?

আমি: আপনিই বলুন না, শুনে শিখি।

সাধুজি (প্রসন্ন সুরে): পথে এসো। মাথা নিচু আর কান খাড়া ক'রে শোনো গম্ভীর হয়ে। (একটু থেমে) আমি গিয়েছিলাম বিন্দ্রাবনে মীরার প্রাসাদে।

আমি: মীরার প্রাসাদ শুনেছি উদয়পুরে।

সাধুজি: চোপরাও। আমি গিয়েছিলাম বিন্দ্রাবনে। সেখানেই আছে মীরার প্রাসাদ। সে প্রাসাদের মন্দিরে এসেছিলেন মুসলমান সম্রাট্ আকবর। তিনি মীরাকে উপহার দিয়েছিলেন একটি সোনার হার। মীরার স্বামী একদিন সে-হার দেখে স্তম্ভিত হয়ে বললেন: "এ কী! এ যে মুসলমানি হার! কাজেই তোমার প্রাণদণ্ড।" মীরা বললেন: "প্রভু, প্রাণদণ্ড যদি দেন তবে রন্থন—আমি আমার অন্তিম প্রার্থনা সেরে নিই।" ব'লে পূজার ঘরে গিয়ে গাইলেন সাশ্রুনেত্রে:

চিদানন্দরূপ: শিবোঽহং শিবোঽহম্।

ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে যার মার নেই: "It takes all sorts to make a world!

ভগবান্‌কে ধন্যবাদ—তাই তো ধরাধাম চিরপুরাতন

হয়েও চিরনূতন—বৈচিত্র্য না থাকলে কি জীবনের একঘেয়ে মরুভূমি কেউ সইতে পারত?

সাধুজির কথা বলতে মনে পড়ল এক সাধ্বীর কথা। তাঁর নাম ভুলে গেছি কিন্তু নিষ্করুণ মুখটি মনে আছে। বঙ্গবালা—না, প্রায় বৃদ্ধা কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ। থাকতেন আমাদের দীন কুটিরের কাছেই এর অতিরম্য নিলয়ে। তাঁর পুত্রবধূ ইংরেজ মহিলা। একদিন এসেছিলেন আমাদের মন্দিরে। কিন্তু শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী কোনদিন আমাদের ছায়াও মাড়াননি। শুনেছিলাম সেই (চিরন্তন কাহিনী) শাশুড়ী বৌমার বেবনাত। তবে এ শুধুই গুজব, কারণ, বৌমার সঙ্গে মাত্র সেই একদিন দুচারটি কথা হ'লেও শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর পাত্তা আমরা কেউই কখনো পাইনি। মরুক গে। যেজন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা—বলি। আমরা একবৎসর পাশাপাশি থাকার পর তিনি দূরে এক নব নিলয়ে প্রয়াণ করলেন--পুত্রবধূকে নিয়ে কি না জানি না। প্রস্থানের আগের দিন আমাকে একটি ঝুড়িতে বিবিধ ফলমূলমিষ্টান্ন পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে এক চিঠি, দীর্ঘ পত্র, তার মর্মগ্রহণ করা দুঃসাধ্য—তবে দার্শনিকতার দুর্ভিক্ষ নেই। সংস্কৃত শ্লোকও বোধহয় ছিল, মনে নেই। যেটা মনে আছে সেটা এই যে, তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন সমাধি কয়প্রকার এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সঙ্গে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মিল কতটুকু, অমিলই বা কতখানি। আমি তাঁকে উত্তরে লিখেছিলাম: "শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক মহাপণ্ডিতের কথা বলতেন, নাম পদ্মলোচন। একদা পণ্ডিতদের মধ্যে বাধে ঘোর বিতণ্ডা: শিব বড় না ব্রহ্মা বড়, না বিষ্ণু। যখন পরস্পরের অভ্রান্ত শ্লোকের তীরন্দাজিতে তাঁরা সবাই ক্ষতবিক্ষত তখন পণ্ডিতবৃন্দ ডেপুটেশনে এসেছিলেন পদ্মলোচন মহাপণ্ডিতের কাছে—তিনি রায় দিন। পদ্মলোচন বলেছিলেন হেসে করজোড়ে:

"আমার চোদ্দপুরুষ কেউ কখনো শিবকে দেখেনি, না বিষ্ণুকে না ব্রহ্মাকে। তাই আমি রায় দেব কোন্ এক্তিয়ারে বলুন?" লিখে আমি মন্তব্য করেছিলাম: "ভদ্রে। আমারও এই-ই উত্তর। আমার চোদ্দপুরুষে কেউ অসম্প্রজ্ঞাত বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বুঁদ হয়ে ধন্য হন নি। তাই এ-নিরীহ দিলীপ কী রায় দেবে বলুন দেখি?'

* * * *

আর একটি অঘটন ঘটেছিল বড় বিচিত্র পটভূমিকায়। বলি সংক্ষেপে।

প্রায়ই শোনা যায়—বিশেষ ক'রে সাহেব মনস্তত্ত্ববিৎদের মুখে যে, ক্রমাগত দেখব দেখব ভাবতে ভাবতে সত্যিই দেখা যায়—যার নাম অটোসাজেস্‌চন। দেওয়ান সিং এ-রটনাটির মূর্ত প্রতিবাদ।

বলেছি, আমাদের কটেজের সামনে ছিলেন মান্না পরিবার একটি আটচালায়। এর পশ্চিমার্ধ ভাড়া নিয়ে ছিলেন দেওয়ান সিং। গোঁড়া শিখ, কিন্তু অতি সজ্জন। প্রতিমার্চনায় বিশ্বাস করতেন না—তাই আমাদের ঘরে কোনোদিন ঢোকেননি বিগ্রহ দেখতে। কিন্তু আমাদের ভজন সত্যিই ভালোবাসতেন। বাইরে বারান্দায় ব'সে ভজন শুনে নীরবে প্রস্থান করতেন। কখনো কখনো এসে ধর্মালোচনা করতেন, তবে গুরু নানককে কেন্দ্র করে। ইন্দিরাও গুরুগ্রন্থের অনুরাগিণী ব'লে তাকে বিশেষ স্নেহ করতেন এই তেজস্বী বৃদ্ধ নানকপন্থী।

হঠাৎ একদিন তিনি ভজনের শেষে ঘরের মধ্যে এসে আমাকে শুধালেন: "বিগ্রহ কোথায়? বিগ্রহ?"

'কী ব্যাপার?'

দেওয়ান সিং-এর চোখে জল। বললেন: "আপনি যখন ইন্দিরাজির ভজনটি গাইছিলেন না? আমি হঠাৎ বারান্দা থেকে তাঁর দিকে তাকাতেই দেখি—এক রাজপুতানী, অতি শোভনা। নিশ্চয় মীরা। আমার সব ধারণা ওলট পালট হয়ে গেছে জী! বুঝতে পেরেছি আমার সঙ্কীর্ণতা। তাই এসেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে—ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যাব।"

আমি অবশ্য নিজের ভাষায়ই সাজিয়ে বললাম। তবে আসল ব্যাপারটা হুবহু সত্য—এই অলৌকিক দর্শন। এর মূল্য আমার কাছে বেশি মনে হয় আরো এই জন্যে যে, তিনি মোটেই চাননি এসব দর্শন—যারা

প্রতিমা-সংশ্লিষ্ট। তাই একে অটোসাজেস্‌চন নাম দিয়ে বাতিল করা যায় না। সত্য হ'ল এই যে, মীরা পরে যেমন ইন্দ্রাণীকে দর্শন দিয়ে আমাদের কাছে টেনে এনেছিলেন—তেমনি দেওয়ান সিংকেও ছুঁয়েছিলেন তাঁর করুণাস্পর্শে, তাকে প্রতিমা-বিমুখতার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে। এখানে ব'লে রাখি—স্বর চুনিলালকেও মীরা দর্শন দিয়েছিলেন ইন্দিরার মধ্যে।

* * *

সাধুজির আবির্ভাবের পরে এলেন শ্রীপ্রকাশ—বিদ্যাসিন্ধু শ্রীভগবান্‌দাসের রসিক ও কৃতী পুত্র—নানা প্রদেশে রাষ্ট্রপাল হয়েছিলেন। আমি শিলঙে একদা তাঁর অতিথি হয়েছিলাম রাজভবনে। আমাকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করতেন, বিশেষ করে আমার গানের জন্যে। তাঁর কাছে নানা সংস্কৃত স্তোত্র গাইতাম পরমানন্দে—জর্মন গানও। এ-দুটি ভাষায়ই তাঁর অধিকার ছিল মনে হয়, কেননা এ-দুটি ভাষায় আমার উচ্চারণের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন শিলঙে। বলেছিলেন তাঁর ভাষণে: "বাঙালীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ কদাচ শোনা যায়। ভাগ্যক্রমে দিলীপকুমার এই কদাচদের দলে পড়েছেন, তাই তাঁর সংস্কৃত স্তোত্র এত সুবোধ্য তথা রসাল......" ইত্যাদি। তিনি বাংলাও জানতেন—বিশেষ ভালোবাসতেন পিতৃদেবের বিখ্যাত "ধনধান্য পুষ্পভরা" গানটি শুনতে। তাঁর অনুরোধে মাদ্রাজে এক আসরে এ-গানটি গেয়েছিলাম—যে আসরে আমার আগে কিন্নরকণ্ঠী শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী সমানে দুঘণ্টা গেয়ে রসনির্ঝর বইয়ে দিয়েছিলেন।

পুণায় যখন তিনি আসেন তখন তিনি বম্বের রাজ্যপাল পদে আসীন- কিন্তু এসবই অবান্তর—আজ তাঁর নামোল্লেখ করতে চাই শুধু তাঁর প্রীতিসুন্দর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরূপের তর্পণ করতে। তাঁর স্নেহের কোনো প্রতিদানই আমি দিতে পারি নি, কিন্তু তিনি চিরদিন আমাকে তাঁর প্রীতির মাল্যদানে ধন্য করে এসেছেন। পুণায় এসেছিলেন আমাদের নিমন্ত্রণে (ইন্দিরার ভজনাবলির উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করে তিনি আমাকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন)। আমার মুখে মীরাভজন শুনে তৃপ্ত হয়ে তাঁর অনুপম মঞ্জুল হিন্দি ভাষণে বলেছিলেন (কী সুন্দর হিন্দিই যে তিনি বলতেন—কাশীর কুলীন হিন্দি!) "দিলীপকুমারকে তাঁর নানা গুণের দৌলতে সবাই জানেন"—ব'লে আমার নানা গুণগান করে শেষে বলেছিলেন: "কিন্তু আমি তাঁকে চিনেছি সুরমধুকর ব'লে—যেখানেই তিনি যান গ'ড়ে তোলেন মধুচক্র—যার টানে বহু অনামী মধুপ ছুটে আসে দলে দলে। তাই পুণায় বিদেশী হয়ে এসেও তিনি গড়ে তুলেছেন স্বদেশ—এ আনন্দনিলয়ে......"

পুণা আশ্রমে ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরে শুধু যে একের পর এক অঘটন ঘটা শুরু হ'ল তাই নয়, ইন্দিরার অলৌকিক দর্শনশক্তি (power of supraphysical vision) যেন দলের পর দল মেলতে লাগল। কত রকমের যে ওর দর্শন হ'ত—কত দেবদেবী মুনি ঋষি যোগী যতি জটাধারী...। আমি প্রথম প্রথম আমার ডায়েরিতে বা No Reason Can Explain-এ লিখে রাখতাম কিন্তু পরে মনে হ'ল—এত শত অলৌকিক দর্শনাদির নথিপত্র জমিয়ে রেখে কি হবে—কে-ই বা পড়বে—আর পড়লেই বা কার কতটুকু সত্যিকার লাভ হবে? এ-সব অনুভূতি উপলব্ধি সাধক-সাধিকার জীবনে আসে মুখ্যত: তাদের অন্তরে প্রার্থনা জাগিয়ে নব দৃষ্টিদানের প্রসাদে অলক্ষ্য কৃপাকে মনের গোচর করতে, আর গৌণতঃ, নানা অধ্যাত্মশক্তি তথা গুহ্যলোকের সুখবর দিতে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে লিখেছেন:

"The earth alone is not our teacher and nurse,
The powers of all the worlds have entrance here,"

শুধু এ-পৃথিবী নয় আমাদের ধাত্রী, দিশারিণী,
অগণ্য বিশ্বের শক্তি হয় অনুপ্রবিষ্ট এখানে।

আরো

"There are brighter earths and wider heavens than ours."

আছে আমাদের চেয়ে দীপ্ত, ব্যাপ্ততর ভুবর্লোক।

নানা প্রখ্যাত সাধকই তাঁদের অলোক দর্শনে এসব রাজ্যের সংবাদ পেয়েছেন, আজও পান, সব দেশেই। শ্রীঅরবিন্দ 'সাবিত্রী'তে ধ্যানলোকে অশ্বপতি ও সাবিত্রীর কীভাবে স্তরের পর স্তর উর্ধ্বতর লোকের আভাস ফুটে উঠত তার বিশদ বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব-বিশ্রুত জর্মন ধ্যানসিদ্ধ সাধক জ্যাকব বোহেমেরও (Jakob Boehme) নানা অলোকদর্শন হত—তাঁর Aurora ও অন্যান্য গ্রন্থে এসব দর্শনের বর্ণনা পাই। স্পেনের বিশ্ববিশ্রুত সাধিকা সেন্ট তেরেসার নানা লেখায়ও পাই এ-সব গুহ্য খবর। কিন্তু তার ফলে আমাদের জ্ঞানচক্ষু কিছুটা খুললেও এ-সব দর্শনের শক্তির স্ফুরণ না হ'লে শুধু বর্ণনা থেকে নানা দিব্য জগতের একটু আভাস পাওয়া যায় মাত্র, এ-দিব্য দর্শনের ফলে ঐশ প্রেম ও করুণার যেসব শক্তি জেগে ওঠে তার খবর পাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রেম ও করুণাশক্তির উপলব্ধিই সবচেয়ে বড় কথা। যাদের ঠিক ঠিক দর্শন হয় তাঁরা পান এই প্রেমের বর, তাই পারেন সবাইকে স্নেহের চোখে দেখতে। অর্থাৎ, হাজারো মানবিক ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি চ্যুতির জন্যে তাদের কৃপার অযোগ্য মনে না ক'রে তাদের চোখ ফুটিয়ে দিতে চান—যার আভাস পাই বিখ্যাত একটি গুরুবন্দনার শ্লোকে :

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অর্থাৎ, যিনি তাঁর জ্ঞানের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আমাদের অজ্ঞান আঁধার থেকে জাগিয়ে তোলেন, দেখতে শেখান, তাঁরই নাম প্রণম্য সদ্‌গুরু—কেননা তিনি প্রেমের বাউল হয়ে আমাদের মরুপ্রাণে শুধু-যে প্রেমের ঠাকুরের কথামৃত বর্ষণ করেন তাই নয়, আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে টানেন তাঁদের প্রেমের ডোরে বেঁধে। এ যে কথার কথা নয়, আমরা জানতে পারি সাধু সন্ত ও উচ্চকোটির সাধকের সংস্পর্শে এলে। আমরা এ-সত্যের যেন নতুন ক'রে পরিচয় পেয়েছিলাম একটি যোগিপুরুষের প্রেমস্পর্শ পেয়ে, যিনি সবাইকেই কাছে টানতেন তাঁর অপার্থিব প্রেমস্পর্শে। তাঁর নাম শ্রীকালীপদ গুহ রায়। ১৯৬৬ সালে মহাষষ্ঠীর পুণ্যাহে তিনি দেহরক্ষা করেন পুণ্য বারাণসীর গঙ্গাতীরে।

তাঁর কথা আমার স্মৃতিচারণ ২য় ভাগে লিখেছি—কী ভাবে হঠাৎ মাদ্রাজে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর এক অনুরাগী বন্ধু হেরম্ব মুখোপাধ্যায়(তার কথাও লিখেছি কালীদার প্রসঙ্গে) আমাকে প্রথম তাঁর কথা বলেছিল পণ্ডিচেরিতে—তাঁকে "প্রেমিক পুরুষ" উপাধি দিয়ে। হেরম্বকে আমি ইন্দিরার 'শ্রুতাঞ্জলি' ভজনবলি উপহার দেই। বইটি সে কালীদাকে দেখায়। কালীদা তখন কলকাতায়। বইটিতে ইন্দিরার একটি ভাবসমাধিস্থ ছবি দেখে কালীদা হেরম্বকে বলেছিলেন যে, এ-রকম সমাধির ফটো ছাপা ঠিক নয়। তাতে আমি হেরম্বকে বলি : "আমার মনে হয় সমাধির ছবি ছাপানো সব দিক্ দিয়েই ভালো, লোকে জানুক না— এযুগেও সাধিকাদের মধ্যে কারুর কারুর সমাধি হয় ঠাকুরের কৃপায়।" কালীদা হেরম্বর কাছে আমার এ-মন্তব্য শুনে আর কিছু বলেন, নি কেবল বলেছিলেন, ইন্দিরা উচ্চকোটির সাধিকা —a being of love and light—কিন্তু বেশিদিন বাঁচবে না।

তারপরে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয় কলকাতায়। যখনই বাংলাদেশে যেতাম, কালীদার ওখানে আসর জমাতাম। একবার কলকাতায় তিনি তাঁর একটি অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন ইন্দিরার ছবি সম্পর্কে ১৯৫৩ সালে ডিসেম্বর মাসে। তিনি তাঁর ঘরে আমাদের সাদরে বসিয়ে জলযোগ করিয়ে একটি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন : "এই চেয়ারটিতে কাল 'বন্ধু' এসে অনেকক্ষণ ছিলেন।" ('বন্ধু' কালীদার প্রায় নিত্য সঙ্গী ছিলেন—কেউ কেউ বলত তাঁর গুরু বা alter ego—তাঁর কথা পরে বলছি।)

আমাকে কালীদা ভালোবাসতেন ব'লেই আরো তিরস্কার করতেন। আমি হেসে বলতাম : "আপনার স্নেহের তিরস্কার পুরস্কার—মানি। কিন্তু আমি চলব আমার নিজের পথেই।" শুনে কালীদা

হাসতেন। একবার বলেছিলেন: "ইন্দিরা যেদিন থেকে আপনার ভার নিয়েছে সেদিন থেকে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।" আমি বলেছিলাম খুশী হয়ে: "জানি। কিন্তু তবু তো আপনি চাননি যে, ওর সমাধির ছবি দেখে আর কেউ নিশ্চিন্ত হয়।" উত্তরে কালীদা বলেছিলেন: "আমার সে মত বদলিয়েছি, বলতে পারি যদি কাউকে বলবেন না কথা দেন।" আমি প্রফুল্ল হয়ে বললাম: "দিচ্চি কথা।" তখন কালীদা বললেন ইন্দিরার একটি ফ্রেমে বাঁধা সমাধির ছবি দেখিয়ে: "এ-ছবিটি আপনিই প্রথম আমাকে পাঠান। তখন আমি দেখতে পেয়েছিলাম ইন্দিরার অমূল্য জীবনে অনেক আঘাত আসবে, ও উচ্চ আধার বলেই। কেন অমূল্য বলছি শুনুন। একদিন ঘরে ব'সে আছি, হঠাৎ দেখি ছবিটি থেকে আলো ও সুগন্ধ নিঃসৃত হচ্ছে। ভাবলাম: কী ব্যাপার? সব জানলা বন্ধ ক'রে ঘর অন্ধকার ক'রে ছবিটির দিকে চেয়ে দেখি—আর সন্দেহের পথ নেই—ছবিটি আলোয় ঝলমল করছে—সুগন্ধও গাঢ় হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। মনে হ'ল—আর ভয় নেই, ওকে ঘিরে আছে এক দৈবী করুণা।"

---

১ Telesthesia—সুদূর ঘটনা জানতে পারা; Bilocation—একসময়ে দু জায়গায় আবির্ভূতা হওয়া; Levitation—শূন্যে উত্থান; Extrasensory Perception (E. S. P.) অতীন্দ্রিয় নানা বোধশক্তির উন্মোচন—E. S. P. আজকাল পাশ্চাত্ত্যে সংস্বীকৃত মান পেয়েছে।

২ এ অঘটনটি দ্বিতীয় বার ঘটেছিল তিন বৎসর পরে খাণ্ডালয়ে—পুণা থেকে ৪০ মাইল দূরে—২৪-এ এপ্রিল (১৯৫৮) তারিখে। অঘটনটির সাক্ষী ছিল চার জন (ইন্দিরা ছাড়া): নরসিংহদাস মানি, শ্রীকান্ত, ইন্দিরার বালকপুত্র প্রেমল। এ-কাহিনীটির বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য আমার Flute Calls Still-এ—শ্রীকান্তের রিপোর্ট সমেত।

ক্রমশঃ

সমান্তরাল

(গল্প)

বাণীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়

দোষটা ঠিক আমার তরফের একার নয়। কেননা সুপ্রিয়কে বিশ্বাস করার পেছনে অনেক যুক্তি আছে। সাধরণতঃ যে সমস্ত গুণ থাকলে মেয়েদের মন জয় করা যায় তা সুপ্রিয়র মধ্যে ছিল কি না তা জানি না, তবুও আমাকে সুপ্রিয় টেনেছিল।

প্রথম পরিচয়টার সম্পর্ক গভীর শ্রদ্ধার ছিল। কেননা প্রবীরকে পড়াতে সুপ্রিয় আমাদের বাড়ীতে আসতো। সেদিন কালবৈশাখে যখন সুপ্রিয় আমাদের বাড়ীতে ঢুকছিল তখন আমিও ঢুকছিলাম কলেজ থেকে ফিরে।

আমাদের বাড়ীর সমস্ত আকাশটা মেঘে ঢেকেছিল এবং জলও নেমেছিল—ঝড়ও ছিল।

সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তে, সেই বিষণ্ণ প্রচণ্ড সন্ধ্যায় সুপ্রিয় আমাকে জয় করে নিল।

উঁহু, সেদিনকার সেকথা কেউ জানে না। রোম্যান্স আরম্ভ সেইদিন থেকেই।

বৃষ্টিতে যে সে ভিজে যাচ্ছিল, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না বলে আমিই পেছন থেকে তাড়া দিলাম, সুপ্রিয় বাবু! ভিজে যাচ্ছেন যে? তাড়াতাড়ি চলুন। লোকটা একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বললে, নাঃ, ভিজলে কিছু হবে না আমার।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এমনিতেই তো আপনার শরীর খারাপ শুনি, তার উপর ভিজছেন।

সুপ্রিয় হেসে উড়িয়ে দিল।

ব্যস্, এই প্রথম সূত্র। যৌবনের প্রারম্ভে মনটা একজন ছেলে সঙ্গীর জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল। ঠিক তখনই সুপ্রিয় আমাদের বাড়ীতে আসতো। প্রতিদিন। ছেলেটা অসম্ভব ফর্সা, ভালো আর ভালো, সবাই কানের গোড়াতে ওর প্রশংসা করতো আর আমার বিরক্ত লাগতো। আসলে আমি মনে মনে অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। মার অনুরোধে মাঝে মাঝে চা দিতে যেতাম ওদের দুজনকে। দূর থেকে শুনতাম ওর ইংরেজী কবিতার উচ্চারণ—বাংলার ছন্দ বৈশিষ্ট্য। আবার কখনো বা দেখতাম ডুবে আছে অঙ্কে। বাবা মাঝে মাঝে ওর ইংরেজী লেখা দেখতো; আমিও চুরি করে হাতের লেখা দেখতাম।

এই অবধি আমি সুপ্রিয় মজুমদারকে জানি।

সেদিনকার সেই ঘটনা আমাকে এই সুপ্রিয় মজুমদারের অনেকটা পরিচয় দিল।

লোকটা নাকি ডেয়ারীং—দারুণ ডেয়ারীং অ্যাড্‌-ভেঞ্চার আর রোমান্সে ভরা ওই লোকটার জীবনের প্রতি ক্ষণ। মেজদার সঙ্গে ততদিনে ওর ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে গেছে।

মেজদা, ওর প্রশংসাকারীদের দলে ভিড়ে গেল। এমনি করেই সুপ্রিয় মজুমদার আমার ধ্যানে-জ্ঞানে স্বপ্নে জড়িয়ে গেল। মেজদার কাছ থেকে অনেক ইনটারেষ্টিং গল্প শুনতাম। লোকটা নাকি সাহিত্যও করে, রাজনীতিও করে আবার—চালচলনে একদম বাউণ্ডুলে। মোট্ট ভ্যাগাবণ্ড টাইপের চরিত্র সুপ্রিয়র।

সেদিন রবিবার সকালে, আমি, মেজদি, ছোড়দি, মেজদা সবাই মিলে গান করছিলাম। ঠিক এমনি গান নয়—রবীন্দ্রসঙ্গীত।

ঠিক সেই সময়ে সুপ্রিয় মজুমদার এসে হাজির। আমি একটু বিচলিত হলাম, কেননা মেজদার বিয়ে হয়ে গেছে, অবিবাহিত আবার সমবয়সী বলতে আমি ছিলাম ওখানে।

মেজদা ভেতরে এনে ওকে গানের মজলিশে বসিয়ে দিলে। আমি বিপন্ন বিস্ময়ে উঠে যাচ্ছিলাম। মেজদা

আটকে দিল। সুপ্রিয়কে সবাই মিলে গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করলো।

আমার খুব হাসি পাচ্ছিল, কেননা, লোকটা লেখা-পড়ায় ভালো হ'তে পারে, তাই বলে গানেও হবে এমন হতে পারে না, তাছাড়া গাইবেই বা কেন?

পরেই সেদিন সন্ধ্যেবেলার কথা মনে হওয়াতে ভাবলাম, গাইলেও গাইতে পারে।

সবাইকার অনুরোধে ঠেললেও, মেজদি যখন বললে. গাও না সুপ্রিয়--এটা তো নিজেদের মধ্যে—কি আছে!

—মেজদি, আমি গান একদম জানি না, তারপর আমার গলার স্বর এত খারাপ যে কাছোপঠের জামা কাপড় পরিষ্কার যারা করছে তাদের ভারবাহী সবাই এখানে চলে আসবে।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কিন্তু জেদটা আমাদের দারুণ ভাবে জোরালো হয়ে উঠলো। সুপ্রিয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাইতে আরম্ভ করলো।

"খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে।"

আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠলো। কিন্তু ওর রাবীন্দ্রিক ঢঙের গান শুনে সবাই একদম চুপচাপ।

তাই তো বলছি, দোষ আমার একার নয়। দোষ মেজদির, মেজদার, পরিবেশের!

সুপ্রিয় বার বার গাইতে লাগল,

"এমনি দুই পাখী, দোঁহারে ভালবাসে,
তবুও কাছে নাহি পায়,
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।"

আমার ভেতরে গানটা দারুণ ভাবে বাজছিল। এ কি আমাকে উদ্দেশ্য করেই নাকি?

গানটা শেষ করতে, সবাই আবার গাইবার জন্যে বলতে, সুপ্রিয় একটু অস্বস্তি অনুভব করে বললে, দেখুন, আমার ছাত্র শুনলে কি ভাববে? বরঞ্চ আপনারা গান করুণ আমি শ্রোতা হই।

মেজদা হঠাৎ করে আরম্ভ করলে,

একি সত্য সকলই সত্য, হে আমার চিরভক্ত।

আশ্চর্য্য লোকটার ক্ষমতা। হ্যাঁ, সুপ্রিয় সত্যিই বহুগুণসম্পন্ন। মেজদা কোথায় সুর পাল্টাচ্ছে, ভাষা পাল্টাচ্ছে, সব ব্যাখ্যা করতে লাগল।

আমি আসর থেকে সরে পড়লাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বারবার গুনগুন করছিল

"একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে।"

আমি বুঝলাম, আমি প্রেমে পড়েছি। সুপ্রিয়র জীবনের বিচিত্রতা আমাকে সম্পূর্ণ টেনেছে।

দিনরাত—রাতদিন, সুপ্রিয় আমার কাছে চরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে উঠল। কিন্তু সে? সে কি আমাকে চায়?

প্রশ্নটা আমাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। আমাদের তখন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটা পড়ানো হ'ত, সেখান থেকে জানলাম, প্রেমে যখন কেউ পড়ে, তখন দুজনেই পড়ে; একা কেউ নয়। তবুও জিজ্ঞাসা—অবিশ্বাস—আমাদের বাস্তব জীবনের নিদারুণ কশাঘাত।

সেই কশাঘাতে আমি জর্জ্জরিত হয়ে পড়লাম।

রোমাঞ্চ বা রোমান্স আমার জন্যে অনেকটা ছিল, তাই এই প্রশ্নটা যাচাই করবার সুযোগ এসে গেল একদিন বাড়ী ফেরার পথে।

আমি যে ট্রামটাতে ফিরছিলাম সেই ট্রামে বসেছিল সুপ্রিয়। আমি ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওর কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ নেই আশে পাশের বস্তুতে। গভীর ভাবে আত্মমগ্ন।

আমি বললাম, কি ব্যাপার, সুপ্রিয়বাবু? কি ভাবছেন?

সুপ্রিয় চমকে উঠল। একটুখানি সময় নিয়ে কি যেন ভাবল আমার মুখের দিকে চেয়ে, তারপর বললে, আরে আপনি? বসুন। নিজের জায়গাটা সহজে আমাকে ছেড়ে দিল। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরে কি না তা জানবার জন্যে আমি একটা অদ্ভুত কথা বললাম।

—আপনি আছেন দেখেই উঠলাম এ ট্রামে, একটু সাহায্য করবেন ?

লোকটা বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, সাধ্য হলে করব। বলুন।

—আমি একটু বেলগাছিয়াতে এক বন্ধুর বাড়ী যাবো, রাত হয়ে গেছে তো ? একটু যদি সঙ্গে থাকেন।

সুপ্রিয় কেমন বিস্মিত হয়ে পড়ে বললে, আপনার বন্ধু আছে নাকি ?

আমি একটু হেসে বললুম, বাড়ীতে বলবেন না যেন! আমাদের ফ্যামিলী তো কনজারভেটিভ, অথচ বুঝছেন তো, কলেজে পড়ি।

লোকটা দার্শনিকের মত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সেটা সম্মতি কি অসম্মতি তা বুঝবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

কলেজ ষ্ট্রীট ছাড়িয়ে ট্রামটা হু হু করে চলেছে। আমার পাশের বসে থাকা ভদ্রলোক নেমে গেল। আমি সুপ্রিয়কে বসবার সম্মতি দিলাম।

লোকটা বিনা সঙ্কোচে বসে পড়ল।

হঠাৎ একজন মাঝবয়সী লোক এসে ওর সামনে দাঁড়াতেই ও তাকে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে বললে, বসুন মহিমদা।

লোকটা বললে, না: আমি নামবো এখুনি, তোমাকে দেখে এলাম, তোমার গল্পটা পড়লাম। আমাকে এবার একটা দাও না ?

—কোন্‌টা ? 'অপ্রকাশ' ? কেমন লাগল ?

—তোমার গল্প আবার লাগা না লাগা। এবারের শারদীয়াতে একটা দাও না, সেটা না হয় প্রকাশ হ'ল।

সুপ্রিয় একটু হেসে বললে, খুব চেষ্টা করবো। আজকাল আর কিছু ভালো লাগে না।

—তা জানি না সুপ্রিয়, একটু কলম চালিয়ে দাও। মহিমবাবু আর কিছু বলার আগেই নেমে গেলেন।

আমার বিস্ময় আরো বাড়ল। লোকটা আশ্চর্য্য। ভালো ছেলে, ভালো গাইয়ে, ভালো লিখিয়ে, ভালো চাকরি করে, আবার যাদের পড়ায় তাদের ভালো পড়ায়। আশ্চর্য্য!

তাই বলছি দোষটা আমার একার তরফের নয়।

—বা:, আপনার 'অপ্রকাশ' আমাদের কাছেও অপ্রকাশিত রেখেছেন ? প্রশ্ন করলাম।

সুপ্রিয় একটু হেসে বললে, না, তো।

—বা:, কোনদিন কিছু বলেননি তো ? গান যে জানেন তা জেনেছিলাম সেদিন আর আজ জানলাম লেখেন।

সুপ্রিয়ার হাতে একটা ব্যাগ ছিল,—তার থেকে একটা বই বার করে আমার হাতে দিল, এই নিন—কিন্তু কি বলে উপহার দেব—

আমি দেখলাম নীলরঙের মলাটে সবুজ আর লালে লেখা 'অপ্রকাশিত' কথাটা। বইটা নিয়ে বললাম, না, এটা আমাকে দেবেন না, মেজদাকে দেবেন—এমনি এমনি উপহার।

সুপ্রিয় ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, আপনি চাইলেন তাই দিলাম। না নেবেন ফেরত দিন। কেন, বাজার থেকে কি কেউ বই কিনে পড়ে না ?

—বা: বেশ ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন তো ? কিন্তু কি মূল্যে ?

সুপ্রিয় বললে, ওটা পড়লেই মূল্য দেওয়া হবে।

ট্রামটী বেলগাছিয়া ডিপোতে ঢুকে পড়বার আগেই নেমে এলাম। আমার পেছনে সুপ্রিয়।

—আপনি কফি খান ?

সুপ্রিয়র প্রশ্নটা আমাকে চমকে দিল। হঠাৎ একথা কেন, বুঝতে পারলাম না। আমার বিস্ময়টা ধরে নিয়ে বললে, আমি একটু কফি না খেলে পারি না, যদি আপনি খান, তাহলে একটু খেতে পারি।

যা চাইছিলুম তা পেলাম। এই তো চান্স! কফি খেতে খেতে সুপ্রিয় কোন কথাই বললে না। যেই মাত্র শেষ হ'ল অমনি বাইরে এসে বললে, আপনার বাড়ী ফিরতে যে রাত হচ্ছে এতে কেউ ভাববে না ?

—না। মাকে বলেছি আমি আপনার বাড়ীতে যাবো।

—আই সি। আপনাদের মিথ্যে আটকায় না?

আমি হেসে বললাম, তবুও তো আপনাদের মত পারি না।

—তার মানে?

—কেন? ছাতা নেই, সেটা স্বীকার না করে বলে ফেললেন, জলে ভিজলে কিছু হয় না!

লোকটা বললে, আমার কাজ আছে, দয়াকরে একটু তাড়াতাড়ি আপনার বন্ধুর কাছ থেকে ঘুরে আসবেন।

আমি হাতের খাতা বই খুঁজে যেন ঠিকানাটা কত নম্বর তা পেলাম না, এমনি নিরাশ ভাব করে বললাম, আশ্চর্য্য!

—কি আশ্চর্য্য?

—ঠিকানাটা একদম হারিয়েছি। কি আশ্চর্য্য বলুন!

—ও, মনে লেখেন নি। তাহলে তো হারাবেই। চলুন, বাড়ী ফিরে, রাত বেশ হচ্ছে।

—তাই চলুন।

লোকটা নিতান্তই নিরাসক্ত। অথচ আমি ওর ওপর সম্পূর্ণ মুগ্ধ। কি অদ্ভুত অবস্থা!

সেদিন লোকটাকে এইটুকু চিনলাম, যে আমি যদি টানি তাহলে খুব যে আনিচ্ছুক তা নয়। বাড়ী ফিরে এসে ছটফট করতে লাগলাম।

আপন মনে 'অপ্রকাশ' পড়ছিলাম, মেজদা এসে বললে, এই রে মেয়ে? তুই সুপ্রিয়র বই পড়ছিস?

আমি আপন মনে পড়ছিলাম, ঠিক কানে নিলাম না। মেজদা সেটা কেড়ে নিয়ে বললে, তুই এ বই কিনে পড়ছিস্? আমাকে কত দিয়েছে? এ কে চিনিস্ না?

আমি যেন সত্যিই চিনি না এমনি ভান করে বললাম, কে ও? একি মাষ্টার মশাই সুপ্রিয় মজুমদার?

—আরে, হ্যাঁ রে। প্রবীরের মাষ্টার সুপ্রিয়। ও আবার কবিতাও লেখে। ওর কবিতা পড়িসনি?

—না তো! তোমার কাছে আছে?

মেজদা কোন কথা না বলেই কবিতা বলতে আরম্ভ করলে:

"মথিত নীলাক্ত বিষ আপ্লুত বন্যায়,

যেন কোন অবরুদ্ধ মশারির এ বড় অন্যায়

মশাকে আটকানো তার বাঞ্ছিত রক্ত থেকে—।

আমি বললাম, থাক্ এই কবিতা। বাবা!! আধুনিক কবিতা শুনলে আমার জ্বর আসে।

—চিনলি না তো। ছেলেটা জিনিয়াস।

আমার মনে যে সুদৃঢ় আসন তার আছে তা বেশ বুঝতে পারছি—আর পরিচয় দরকার নেই।

মেজদা চলে গেল।

লোকটার বিচিত্র স্বভাব আমাকে তাড়া করে নিয়ে চললে—এই কি প্রেম? এর পরিণতি কি।

কিছু দিন বাদে বাইরে আমাদের মেলামেশা দারুণ ভাবে বেড়ে গেছে, অথচ বাড়ীর মধ্যে—নিদারুণ সংযমকে কেউই সন্দেহ করতে পারে না। সুপ্রিয়র অবস্থা আমি বুঝি অথচ আমারই বা করার কি আছে?

সমবয়সী ছেলে মেয়ে সুযোগ পেলেই মিলবে মিশবে এটাই তো স্বাভাবিক।

হঠাৎ মেজদা একদিন বাড়ী ফিরে এসে বাবাকে বললে, বাবা, সুপ্রিয়র আর আমাদের বাড়ী আসা উচিত নয়।

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল। মেজদা কি আমাদের ব্যাপার জানতে পারলে? সর্ব্বনাশ। আমার সমস্ত রক্তটা বুকের মধ্যে দপদপ করতে লাগল। কান খাড়া করে রইলাম।

—সুপ্রিয় ড্রিঙ্ক্ করে। আজ ওর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, দেখলাম পুরো মাতাল। কথা বলছে এড়িয়ে এড়িয়ে। ছি!

বাবা, বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, ঠিক বলছিস ?

আমারও স্বপ্নে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। আশ্চর্য্য, যে লোকটার প্রশংসা আমাকে সুন্দর জীবনে টেনেছে সে মাতাল! এও কি সত্য? মেজদা বললে, লেখকরা বোধহয় অমনিই হয়। ওর কিছু শকিং পাষ্ট আছে মনে হ'ল, তাই মদ গেলে।

না, সুপ্রিয় আর নিজের পক্ষে ওকালতি করবার কোন সুযোগ পেল না।

প্রবীরের পরীক্ষা চুকে গেছে। সুতরাং ওকে বারণ করতে বেশী কষ্ট করতে হ'ল না। অথচ আমার অবস্থা আরোও কাহিল। কলেজ বন্ধ, সামনে পরীক্ষা, ওকে চোখে দেখতেও পাবো না। আবার ঘৃণাও এল।

আমি ভুলতে পারছি না, অথচ সুপ্রিয় আমাকে ভুলে গেল? আশ্চর্য্য। এই প্রেম? এত অসত্য? দারুণ দোটানায় আমি অস্থির হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আবার পেলাম সুপ্রিয়কে। পুরোনো ভাবে ভিক্টোরিয়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে ওর মদ খাওয়ার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলাম।

ও বেশ বলিষ্ঠ ভাবে বললে, তুমি মাতালকে ঘৃণা করো তো? তা হ'লে আমাকেও করো।

—তুমি মদ খাও?

খুব স্থির ভাবে বললে, না ওটা মদ নয়। একটা ওষুধ, ঘুমের জন্যে ওষুধ খেতে খেতে এখন কিছুটা নেশা হয়ে গেছে।

—ঘুমের বড়ি? সে তো আরও বিষ।

—আমাকে ডাক্তারই বিষ দিয়েছিল। এখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু বিশ্বাস হ'ল না আমার, তাই সরে এলাম। মেজদাকে বললাম, জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার, কেন সুপ্রিয় আসেন না।

মেজদা বেশ রোমান্টিক করে ওর ড্রিঙ্কের ব্যাপারটা বলে বললে, কত বড় জিনিয়াস, কিন্তু কত স্যাড্ বল তো?

আমি মৌন হয়ে থাকলাম।

হঠাৎ সুপ্রিয় মজুমদার আমাকে উপহার পাঠালো ওর 'অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি' বলে একটি কবিতার বই।

বাড়ী থেকে লুকোতে পারলাম না। অবশ্য আমার হাতে সোজা এসেছিল বলে, তাই ব্যাপারটা অন্য ভাবে নিল—আমি বইটা যেন কিনেছি, যেটা আমার আসক্তি প্রমাণ করে দিল। মন্তব্য আর বিদ্রূপে আমার জীবন বিষাক্ত হয়ে উঠল।

মেজদা ছোড়দা সবাই আমাকে ক্ষ্যাপাতে লাগল। হঠাৎ মা আমাকে ডাকলেন। চুপচাপ মার কাছেগেলাম।

...হ্যাঁ মা, সেদিনটা তোমার মনে থাকাই উচিত কেননা তুমি আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলে অপমান করলে, কিন্তু ভাবলে না যে দোষটা তোমারও ছিল। আমার কানের কাছে অত প্রশংসা না করলে তোমার কি ক্ষতি কিছু থাকতো? তাছাড়া তুমি মিথ্যে সম্ভাবনায় আমাকে বাড়ী ছাড়ার নির্দেশ দিলে।

"আমি হতভম্বের মত সুপ্রিয়র বাসাতে এলাম। সব কথা খুলে বললাম, আমাকে সঙ্গে করে তোমার মিথ্যা সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাকে আশ্বস্ত করে বাড়ী নিয়ে গেল।

'তারপরে মা? তোমার মনে আছে? কুকুরকেও মানুষ যেভাবে তাড়া করে না সেই ভাবে আমাদের তাড়িয়ে দিলে।

"আমি কিন্তু সুপ্রিকে বিয়ে করতে পারি নি। সেই দুর্যোগে আমাকে নিয়ে বিব্রত হয়েছে। বার বার বলেছে, না সুমিতা হয় না, তুমি আমাকে একবার যখন ঘৃণা করেছো ও আর যাবে না। কি দরকার? মিলনের চেয়ে বিরহেই সার্থকতা। আমাকে হোষ্টেলে রেখে পড়িয়েছে সুপ্রিয়। তারপর? তারপরের ঘটনা আরো সুন্দর। একটা স্কুলে মাষ্টারী যোগাড় করে আমাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে।

"মাগো! প্রথম সাক্ষাতের সেই রোম্যান্স শেষ দিনেও বজায় রেখেছিল।

"তারপর গত পরশু লোকটা মারা গেছে। তোমরা কাগজে পড়েছো? বিস্মিত হয়েছো, সাহিত্যিক সুপ্রিয় মজুমদারের স্ত্রী নেই? তাই না? ঠিকই তো? আর তাই আমাকে চিঠি লিখেছো? কেন? কেন আমাকে প্রশ্ন করছো এ সমস্ত। তাই দোষটা আমার একার তরফের নয়। দোষ সুপ্রিয় মজুমদারের ছিল না, দোষ আমাদের মনের, আমাদের পরিবেশের, আমাদের সময়ের, বয়সের। আজ সে বাধা কাটিয়ে উঠে বেশ স্বচ্ছন্দে বিদায় দিলাম পরমাত্মীয় সুপ্রিয়কেও।

"সুপ্রিয়র দর্শন আমাকে এই তো শিখিয়েছে।

বনের পাখী বলে, 'না, কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।'

খাঁচার পাখী বলে, 'হায়, মোর শকতি নাই উড়িবার।'

এই তো তার সবচেয়ে প্রিয় গান ছিল।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে তাই তো সে লিখেছে :

'মৃত্যু কি জীবনের পরম প্রশান্তি?

এই সব বন্ধু পরিজন, জীবন, চাকরি—

প্রেয়সী নারীর মুখ, রাতের—বৃষ্টির জল

ভিজে ঘাসে সকালের রোদ, আবিষ্ট ধানের ক্ষেত

তাদের সকলের কাছে কি হারিয়েছি প্রত্যয়?

জানি না জীবনের পরম প্রশান্তি—সে পেয়েছে কি না, তবে মা, আমি তো পেয়েছি।

সমান্তরাল জীবনেই মানে পেয়েছি—তাই আর কি দরকার?

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্মরণাতীত কাল হইতে মানবজাতি সুরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তথাপি মানবজাতি বিলুপ্ত হয় নাই, স্বল্পায়ু হয় নাই, অথর্ব হয় নাই। পূর্বে যেমন চলিতেছিল, দুনিয়া আজিও তেমনি চলিতেছে। সর্বাপেক্ষা বীর যাহারা, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যাহারা, সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ যাহারা, সেইরূপ সকল জাতিই আগেও যেমন সুরা ব্যবহার করিত, এখনও তেমনি করিতেছে, তথাপি তাহারা আগের মতই বাঁচিয়া রহিয়াছে, আগের মতই বৃদ্ধি পাইতেছে। মাতলামি সর্বথা নিন্দনীয়, কড়া মদ খাওয়ার নেশা যেমন নিন্দনীয় ঠিক তেমনি। কিন্তু এ কথা এখনও অপ্রমাণিত আছে যে, ওয়াইন বা দ্রাক্ষাসুরা অথবা বিয়ার পরিমিত মাত্রায় পান করিলে দেহের পক্ষে তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। এক পাত্র বিয়ার অথবা এক পাইপ তামাক লক্ষ লক্ষ মানুষের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কিছু আনন্দ দিয়া থাকে। যে-সব বৃদ্ধ বই পড়িতে অথবা ধর্মকর্মে নিযুক্ত হইতে পারে না, তাহারা তাহাদের দুর্বল দেহকে একটুখানি চাঙ্গা করিয়া তুলিতে এক পাত্র সুরা পান করিয়া থাকে। শ্রমিক ও বৃদ্ধদের এই একমাত্র আনন্দ হইতে শুধু এই কারণে বঞ্চিত করিব যে, অল্প কয়েকজন মানুষ ইহার অপব্যবহারের দ্বারা নিজেদের পশুতে পরিণত করিয়াছে? মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন আমাদের দেশের লোকের কাছে চিত্তাকর্ষক বোধ হইলেও কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে আমাকে উৎসাহীদের কার্যকলাপের সুফল বিষয়ে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশে আমরা একটি ভুল করি এই যে, সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাজ বা সৎকাজ কত দূর টানা যাইতে পারে তাহার বিষয়ে উদাসীন থাকি। সীমা ছাড়াইয়া গেলে ভাল জিনিসও মন্দে পরিণত হয়। আমাদের দেশের অনেকেরই জানা নাই যে, দ্রাক্ষাসুরা বা বিয়ার সামাজিক রীতি সঙ্গত ভাবে গ্রহণ করা, আর পান করিয়া মাতাল হওয়া বা পানে অতি অভ্যস্ত হওয়া এক কথা নহে। তাহার কারণ আমাদের দেশে যাহারাই মদ্য গ্রহণ করে তাহারাই মাতাল হওয়ার জন্য উহা করে। ইহাতে তাহাদের দোষ নাই, কারণ সুরা তাহারা একটু একটু আস্বাদ করিয়া পান করা অভ্যাস করে নাই। বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন স্বাদ, বিয়ার চিরেতার জলের মত তিক্ত স্বাদের, পোর্ট ওয়াইন অতিরিক্ত মিষ্ট এবং কড়া স্বাদের, ড্রাই শ্যাম্পেন ধারালো এবং উগ্র স্বাদের, হুইস্কি ধোঁয়াটে। কিন্তু পানীয় যে জাতেরই হউক, ভারতীয়রা তাহা কুইনিন মিক্সচারের মত এক ঢোঁকে গিলিয়া ফেলে উদ্দেশ্য অব্যবহিত ফললাভ, অর্থাৎ মাতাল হওয়া। ইউরোপে এরূপ করা হয় না। সেখানে উহা জল খাওয়ার সামিল। ইউরোপের সর্বত্র ভদ্রগৃহে প্রতিদিন দামী মদ পান করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কেহই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে না। মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়া রীতিসঙ্গত নহে। তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত হইবে। ব্রাণ্ডির গন্ধ নিশ্বাসে ছড়াইয়া কোনও জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান অন্য জেণ্ট্‌ল্‌ম্যানের বাড়িতে যাইবার কল্পনা করিতে পারে না। ইহা ঘৃণ্য বলিয়া মনে করা হয়।

মদ জ্ঞানী লোকের নিন্দার কারণ হয়, ইহা ভুল। পক্ষান্তরে হীন লোকের হাতে পড়িলে মদেরই বদনাম হয়। একথা বলিয়াছেন হাফিজ।

মদ্যবিরোধীদের মতে মদের জন্য গ্রেট ব্রিটেনে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। আমার কিন্তু মনে হয় মৃত্যু ঠিক ঐ কারণে নহে। বৃদ্ধত্ব, বাত ও ফুসফুসের অসুখেই তাহাদের বেশি মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেশে যেরূপ কলেরা কিম্বা জ্বর হয়, ইংল্যাণ্ডে তাহা প্রায় অনুপস্থিত। যে-সব কষ্টকর অসুখ তাহাদের সর্বদা উত্তেজনার মধ্যে রাখে তাহা হইতেছে, সর্দি, ডিসপেপসিয়া ও দাঁতের ব্যথা খুব অল্প বয়স হইতেই নারী পুরুষ উভয়েই দাঁত তোলাইয়া থাকে। সতেরো বৎসরের ছেলেরও দাঁত তোলাইতে দেখিয়াছি, ইহার পূর্বেও কেহ কেহ তোলাইয়া থাকে। এখন সেজন্য কৃত্রিম দাঁত তৈয়ারির দিকে উহারা বিশেষ মন দিয়াছে। এখন চীনামাটির দাঁত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। ভারতের অনেক অংশের আবহাওয়া অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া অনেক ভাল। সেখানে উষ্ণ শীতল এবং কর্মপ্রেরণাদায়ক। ইউরোপের ন্যায় এখানকার শীত অতি ঠাণ্ডা নহে, গ্রীষ্ম অতি গরম নহে। গ্রেট ব্রিটেনের চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, তাহা হইতে প্রচুর বাষ্প ইহার উপর আসিয়া থাকে, এবং তাহা ইহার আকাশকে পর্দার মত ঢাকিয়া রাখিয়া জমির উত্তাপকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় না। এবং সেই সঙ্গে সূর্যকেও তাহার পূর্ণ উত্তাপ জমিতে পৌছাইতে দেয় না। এই সব বাষ্প প্রায়ই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়িতে থাকে। নদী এই কারণে পূর্ণ থাকে এবং মাঠ সুন্দর সবুজে ভরিয়া তোলে।

গোরু ভেড়ার প্রচুর খাদ্য মেলে এখানে। আমি একবার এক ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "যদি কখনও নৌযুদ্ধে ইল্যাণ্ডের পরাজয় ঘটে এবং শত্রু দ্বীপটিকে চারিদিক্ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, বাইরের কিছু এখানে প্রবেশ করিতে না দেয়—এবং যদি তাহা অন্তত মাস দুই কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ইংরেজরা কি করিবে? খাদ্যাভাবে তোমাদের দারুণ কষ্ট হইবে না?" ইংরেজটি খুব গর্বের সঙ্গে জবাব দিল, "আমরা যতদিন ভাল বীফ ও মাটন উৎপাদন করিতে পারিব, ততদিন আমাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না।" গুঁড়া বৃষ্টির ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে কিন্তু জমি ভিজা থাকে না। জমির পরিমাণ কম, সে জন্য বাড়ির নিচের তলাটা জমি খুঁড়িয়া জমির নিচে তৈয়ার করে। মাটির নিচের এই তলায় রান্নাঘর করে, এবং জমি শুষ্ক থাকে বলিয়া কোনও অসুবিধা হয় না। অনেক গরিব লোক এই রকম মাটির নিচের ঘরেই বাস করে। সাধারণ গুঁড়ি বৃষ্টির বদলে যদি ধারা বর্ষণ হয়, তৎক্ষণাৎ সেখানকার সংবাদপত্র এমন ঘটনাকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ধারাবর্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিবে। বলিবে "rain fell in tropical torrents।" ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য—উহার যখন তখন বদল ঘটিতেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহু রকম ঋতু-পরিবর্তন ঘটিবে। এখন হয়ত দারুণ শীত, উত্তর দিক্ হইতে হাড় কাঁপান বায়ু বহিতেছে, পরক্ষণেই বৃষ্টি হইতেছে, আবার রোদ উঠিতেছে, সহৃদয়তার উষ্ণতা সঞ্চার করিতেছে। আমরা ভারতীয়রা অনেক সময় হাঁফাইয়া উঠি। ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া ইংরেজদের ধাতে এই সব আবহাওয়ার খাম-খেয়ালিপনা সহিয়া গিয়াছে, এবং ইহারই জন্য তাহারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িতে পারে, উপনিবেশ গড়িতে পারে।

সম্প্রতি একদিন লর্ড নর্থব্রুক অনুগ্রহ পূর্বক "পীপ্‌ল্‌সট্রিবিউন" নামে খ্যাত মিষ্টার জন্ ব্রাইটের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। সে সময়ে তাঁহার একটি কন্যা তাঁহার সঙ্গে ছিল। অল্প কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া আমি লর্ড নর্থব্রুককে তাঁহার নিকটে রাখিয়া নিকটস্থ আর-একটি ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। আমি তাঁহাকে গিয়া বলিলাম, ভারতের শিক্ষিত সমাজ জন্ ব্রাইটকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ভদ্রলোক আমার অভিমত শুনিয়া তাহা জন্ ব্রাইটকে বলিতে

বলিলেন। ব্রাইটের কন্যার দিকে ফিরিয়া চাপাস্বরে বলিলাম, "আমরা শান্তিপ্রিয়, আমরা যুদ্ধকে পাপ বলিয়া গণ্য করি, আমরা প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণীকে আত্মীয় জ্ঞান করি—অতএব এটি সহজেই বুঝা উচিত যে, আমরা তোমার পিতাকে গভীর শ্রদ্ধা না করিয়া পারি না। ভারতবাসীরা সত্যই মিষ্টার ব্রাইটকে ভালবাসে।" পরে আমি স্বয়ং ব্রাইটকেই বললাম, তিনি মানবতার কল্যাণে এ পর্যন্ত যে-সব মহৎ কাজ করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আরও বলিলাম, "এবং আশা করি ভারতবাসীর জন্য এ যাবৎ যাহা করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও তাহা করিতে থাকিবেন।" ব্রাইট বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, এবং শীঘ্রই কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিব, কিন্তু সব সময়েই আমি ভারতের প্রতি মনোযোগী থাকিব, এবং ব্রিটিশ শাসনে ভারতের উন্নতি হইতেছে শুনিলে আমি সব সময়েই আনন্দ লাভ করিব।"

আরও একজন ভারত বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম, তাঁহার নাম মিস্ ম্যানিং। এই উদার-প্রাণ মহিলা ভারতবাসীদিগকে তাঁহার পোষ্য সন্তান বলিয়া অনুভব করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি অবিরাম কাজ করি া যাইতেছেন। ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তিনি প্রাণ স্বরূপ। তাঁহার গৃহে যে সব সান্ধ্যকালীন আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাহাতে ভারতীয়গণ ইংরেজদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়, এই সুযোগ তাহারা অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারিত না। তিনি যে মহৎ কাজ করিতেছেন, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাঁহার সহায়ক হইব, এমন ইচ্ছা আমার কাজের দায়ে দমন করিতে হইয়াছিল। আমি শুনিয়াছি, আমার কোনও কোনও দেশবাসী অল্প সম্বল লইয়া ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহার উদারতার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা নিতান্তই লজ্জার কথা।

আমাদের দেশের দায়িত্বহীন যুবকদের কি করিয়া বুঝাইব যে, এরূপ সম্বলহীন অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে যাওয়া বড়ই অন্যায়। ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষ নহে। আমাদের দেশে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় যে কোনও স্থানে গিয়া আশ্রয় ও অন্নবস্ত্র পাওয়া সম্ভব, এমন কি বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থাও লাভ করা যায় সচ্ছল অবস্থার লোকের নিকট হইতে। আতিথেয়তা ও অর্থদান প্রশংসাযোগ্য, এবং আমার দেশবাসী গণ - হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই বহু কাল অবধি এই সব গৌরবজনক গুণের জন্য খ্যাত। কিন্তু আতিথেয়তা ও দানের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা প্রশংসাযোগ্য নহে।

এইরূপ আচরণ আমাদের দেশে আত্মসম্মানবোধ এবং মনুষ্যত্বের গৌরব নষ্ট করিয়াছে, এমন কি অপেক্ষা-কৃত সচ্ছল শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে ভিক্ষুক, নিষ্কর্মা এবং অপদার্থ শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করা খুব একটা কৃতিত্বের কাজ, স্বর্গে যাইবার বাঁধা পথ। ভিক্ষাবৃত্তিকে আমাদের দেশের একটি পবিত্র বৃত্তি গণ্য করা হয়, কারণ অনেক ধর্মাচারী এদেশে ভিক্ষাকে জীবিকার উপায় রূপে গ্রহণ করিয়াছে। আর কিছুই না, কেবল কাজকর্ম ছাড়িয়া নিষ্কর্মা হইয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকা, তাহা হইলে স্বর্গের সকল দেবদূত—নারী পুরুষ—সবাই দিনরাত কোদাল কুড়ুল হাতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া তোমার জন্য স্বর্গের পথ প্রস্তুত করিয়া দিবেন। এইভাবে যিনি ধর্ম প্রচার করেন এবং যিনি তাহা গ্রহণ করেন উভয়েরই মনে এমন একটি বোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা, ভিক্ষার সঙ্গে যে হীনতা এবং স্বার্থপরতা অচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া থাকে, সেই সচেতনতাকে নষ্ট করিয়া দেয়।

আরও এক মহিলার সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ আমার হইয়াছে—তিনি বিশ্ববিখ্যাত মিস্ ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেল। সার এডওয়ার্ড বাক্ তাঁহার সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়া দেন। ভারতের প্রতি তাঁহারও সহানুভূতি গভীর। জাতীয় সমস্যার সমাধান চিন্তা করিতে পারেন এমন গুণসম্পন্না নারী আমাদের দেশে কখন দেখা দিবেন? নারীর শক্তিকে ভোঁতা হইবার সুযোগ করিয়া দিয়া আমরা যে সামাজিক

বিবর্তনের ধারা ব্যাহত করিতেছি, এ কথা কি কেহ কখনও চিন্তা করিয়া থাকেন? পিতা ও মাতা উভয়ের পরিপুষ্ট শক্তি যদি সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, তাহা হইলে ইহা কি সত্য নহে যে, বর্তমানে ভারত-সন্তানগণ অর্ধেক শক্তিমাত্র লাভ করিতেছে? প্রকৃতপক্ষে ঘরে বদ্ধ রহিয়া এবং পঙ্গু হইয়া রহিয়াও মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল মানব-কল্যাণ-চিন্তাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। পৃথিবীর কোথায় স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থা কেমন তাহার সমস্ত তথ্য তাঁহার নখদর্পণে। এবং পার্ক লেনের ছোট্ট ঘরখানিতে বাস করিয়া তিনি তাহার নৈতিক প্রভাব এমনভাবে বিস্তার করিতেছেন যাহার কাছে দেশের শাসকগণ নত-মস্তক। তথ্য জানিবার ব্যাকুলতা আমি অন্য কোনও নারীর মধ্যে এমন দেখি নাই। তাঁহার প্রশ্নগুলি সর্বদাই খুব বাছাই করা এবং যথাযথ বিষয়ে। ইহাতে তাঁহার চিন্তার যে গভীরতা প্রকাশিত এমন আমরা দেখায় অভ্যস্ত নহি। ইহা আমার কাছে একটি বিস্ময় বলিয়া বোধ হইয়াছে। ভারত ও ভারতবাসীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার সমস্তই জানা আছে বলিয়া আমার বোধ হইল। ভারতের দ্রুত উন্নতির পথে কি কি বাধা রহিয়াছে, তাহাও তাঁহার জানা। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকেই ভারতেও আছেন ইংল্যাণ্ডেও আছেন। কিন্তু আমরা যদি উন্নততর জীবনাদর্শে উঠিতে না চাহি, তবে তাঁহারা কি করিতে পারেন?

আরও একজন ভারতমিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইঁহার নাম মিস্টার পিয়ের ডাফ, ইনি আমাদের পরিচিত বিখ্যাত ডক্টর ডাফের পুত্র। একদিন তিনি লণ্ডনের নিকটস্থ ডেনমার্ক হিলে অবস্থিত তাঁহার বাড়িতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। আমাদের উপভোগ্য অনেক কিছুরই আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন। মিস্টার ডাফ আমার কাছে বলিলেন, লণ্ডনে ইংরেজদের 'হোম ফর এশিয়াটিক্স্' নামক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু ভারতীয় রাজামহারাজারা ইংল্যাণ্ডে গিয়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনওরূপ আগ্রহ দেখান না, ইহার প্রতি তাঁহাদের কোনও আকর্ষণ নাই। ডেনমার্ক হিলে আমি মিস্টার বার্লেন স্মিথকে প্রথম দেখিলাম। ইনি এখন আর জীবিত নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আরও একজন বন্ধুকে হারাইলাম। ভারতের কল্যাণ বিষয়ে আগ্রহশীল যত নরনারীকে আমি সেখানে দেখিয়াছি তাঁহাদের মাত্র কয়েকজনের সম্পর্কেই আমি আলোচনা করিলাম। অন্যদের নাম আমাদের দেশে অপরিচিত বলিয়া তাঁহাদের সম্পর্কে আর কিছু বলিলাম না।

ক্রমশঃ

ফ্রয়েডিয়ান দৃষ্টিতে গল্পগুচ্ছের "বোষ্টমী"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী গল্পটী পড়ছিলাম। যতবারই পড়ি ততবারই নতুন লাগে, যেমন পূর্বদিগন্তে সূর্য্যোদয়ের মহিমা আমাদের চোখে কিছুতেই পুরোনো হ'তে চায় না। শেষ পর্য্যন্ত আন্দী বোষ্টমী দেবতুল্য পতির গৃহ ছেড়ে সত্যকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো পথের বুকে। মিথ্যের সঙ্গে আপোস ক'রে মিথ্যের সংসার করতে আন্দী বোষ্টমীর মন কোনমতেই সায় দিল না। হায়, বোষ্টমীর অবচেতনায় স্বামীর বাল্যবন্ধু দিব্যকান্তি গুরুঠাকুর কখন্ যে সঙ্গোপনে এমন একটী স্থান অধিকার করেছিলেন যেখানে ছিল শুধু স্বামীর অধিকার। গুরুঠাকুর আন্দীর মন চুরি ক'রে নিয়েছিলেন। সেই মনে স্বামীর জন্য আর কোন ঠাঁই রইলো না।

আন্দীর অবচেতন মনের গোপন স্তরে একটা চুরির ব্যাপার অনেকদিন ধরেই চল্‌ছিল। ডুবে ডুবে সে জল খাচ্ছিল। গোপনে গোপনে ভক্তির মুখোস-পরা একটা অনুরাগের প্রবাহ গুরুঠাকুরের পানে কখন যে বইতে শুরু করেছিল, নিজে তা জানতো না।

সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি শুধু উপরের তরঙ্গলীলা। সমুদ্রের গভীরে যে-সকল শক্তিমান্ জলজন্তুর বসতি তাদের আমরা দেখতে পাইনে। মানুষের মনটাও যেন অতল সমুদ্রেরই মতো। সেই অতল সাগরের গভীরে চিত্তের অবচেতনার রাজ্যে লুকিয়ে থেকে এমন সব জোরালো প্রবৃত্তি তার মনের ঝুঁটি ধ'রে টান মারে যাদের অস্তিত্ব চিরদিনই তার চৈতন্যের অগোচরে থেকে যায়। ফ্রয়েডের কল্যাণে আমরা জান্‌তে পেরেছি, যাঁরা খুব মার্জ্জিতরুচি নর-নারী তাঁদেরও মগ্নচৈতন্যে এমন সকল প্রবৃত্তি বাসা বেঁধে থাকে যেগুলি ধর্ম্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসনের দিক থেকে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। আমাদের মনের যে নির্জ্জন প্রদেশে আমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই কতকগুলো আসুরিক প্রবৃত্তিকে বহন ক'রে চলছি সেই "dangerous unconscious" world সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানবার কথা নয়। যারা জানে তারাও কি নৈতিক সংগ্রামে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়? মানব সভ্যতার কোন্ উষাকাল থেকে আমাদের প্রতিটী প্রয়াস পরিচালিত হ'য়েছে যুক্তির আর ধর্ম্মের বাঁধের পর বাঁধ বাঁধার দিকে, যাতে অন্তরের প্রবৃত্তির সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে ব্যক্তিগত জীবন এবং সমাজ-জীবনকে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিতে না পারে। কিন্তু কখন ঝড়ের মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়, উদ্বেলিত হয়ে ওঠে আদিম যৌনক্ষুধার সমুদ্র, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় সামাজিক আর ধর্মীয় অনুশাসনগুলির দুর্লঙ্ঘ্য যত বাঁধ, জীবনের রঙ্গমঞ্চে শিকল-ভাঙ্গা অসুরদের উদ্দাম নৃত্য হয় শুরু, আসঙ্গলিপ্সার প্রাবল্যে নর-নারী পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশে হয় বদ্ধ, 'ভ্রমর'-এর সাজানো বাগান যায় শুকিয়ে। কিন্তু হায়, গোবিন্দলালকে কে রক্ষা করবে উত্তপ্ত কামনার মৃত্যুজাল থেকে? সমুদ্র যে বাঁধ ভেঙে সব কিছু লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিয়েছে! কে সেই উন্মত্ত ফেনিল সিন্ধুকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তার আপন সীমানার মধ্যে? জীবনের সেই নিদারুণ নৈতিক দুর্য্যোগের রাতে বিপন্ন মানুষ ব্যগ্র বাহু-দুটী বাড়িয়ে দিয়েছে তাঁরই দিকে যাঁর মধ্যে নিঃসীম শক্তির আর করুণার ঘটেছে মিলন। মানুষের আর্ত কণ্ঠের হাহাকার লুটিয়ে পড়েছে সমুদ্রের দেবতা বরুণের পদপ্রান্তে।

রোমা রলাঁ (Romain Rolland) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস John Christopher-এর শেষ খণ্ডে নায়কের আকস্মিক পদস্খলনের কারণ দর্শাতে গিয়ে একটী মন্তব্য করেছেন যা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঔপন্যাসিক লিখেছেন: We have little

notion of the demons who lie slumbering within ourselves." "আমাদের মধ্যে যে-দৈত্য-দানোরা ঘুমিয়ে আছে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অচেতন বললে ভুল হয় না।" আসলে আমাদের এই জীবনটা আদৌ একটা সহজ ব্যাপার নয়। মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। সমাজ-জীবনকে স্বীকার না ক'রে মানুষের তো গত্যন্তর ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদে, আত্মরক্ষার তাগিদে আমরা সমাজের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে একটা রফা ক'রে চলতে বাধ্য হই। কিন্তু আগেই তো বলেছি যাকে আমরা মানব-স্বভাব বলি তার মধ্যে জটিলতার অন্ত নেই। একথা ঠিক, সহস্রবার ঠিক যে, মানুষ বিধাতার তৈরী এক অত্যাশ্চর্য্য জীব। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায়ঃ নক্ষত্র-খচিত আকাশ আর ধূলিমাটির পৃথিবী—এ দুয়ের মিলনে মানুষের সৃষ্টি। একদিকে স্বর্গলোকের জ্যোতির্ম্ময় খিলান, আর একদিকে নরকের অন্ধকার গুহা—এ দু'য়ের মাঝে মানুষ যেন দোদুল্যমান ত্রিশঙ্কু।"

আমরা ভারতবর্ষের মানুষেরা মানব প্রকৃতির এই জটিলতাকে স্বীকার ক'রে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেছি: "মানুষের অন্তরে একদিকে পরম মানব আর একদিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব।" মেটারলিঙ্কের "The Treasure of the Humble" আমার কাছে যেন হীরার একটা খনি। ঐ গ্রন্থের The Inner Beauty প্রবন্ধটীতে মানব-স্বভাবের একটী অন্তর্নিহিত সুষমায় গ্রন্থকারের কী বিপুল শ্রদ্ধার প্রাণময় প্রকাশ। মেটারলিঙ্ক লিখেছেন:

> "There needs but so little to encourage beauty in our soul ; So little to awaken the slumbering angels ; or perhaps is there no need of awakening—it is enough that we lull them not to sleep. It requires more effort to fall, perhaps, than to rise."

"আমাদের অন্তর্নিহিত সুষমাকে জগ্রত করবার জন্য কতই না অল্প প্রয়াসের প্রয়োজন হয়; আমাদের আত্মায় স্বর্গলোকের সে-দেবদূতেরা ঘুমিয়ে আছেন তাঁদের জাগানো কতই না সহজসাধ্য; অথবা জাগানোর বোধ করি দরকারই হয় না—তাঁদের ঘুম না পাড়ালেই যথেষ্ট হোলো। আমাদের পক্ষে ওঠা এমন কিছু কঠিন নয়; পতনই বোধ হয় কঠিনতর।"

মানবজীবনের অসীম সম্ভাব্যতায়, মানুষের মধ্যে যে একটী দিব্যসত্তা রয়েছে তার অনির্ব্বচনীয় মহিমায় যে শ্রদ্ধা পাশ্চাত্যের মেটারলিঙ্কের সমস্ত লেখায় ফুটে উঠেছে সেই শ্রদ্ধাই রবীন্দ্রনাথ নিবেদন ক'রে দিয়েছেন নর-দেবতার পাদপদ্মে। মানুষের রক্ত-মাংসের খাঁচার মধ্যে একটী জ্যোতির শিখা জ্বলছে যা হচ্ছে তার আত্মা অনন্ত শক্তির আধার—এই পরমতত্ত্বটী জাতির হৃদয়-কন্দরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই কি স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বেদান্তের বাণী প্রচার করেন নি?

রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম্ম পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে কেবলই মনে হচ্ছিল: রাসেলের মতোই কবি মানুষের স্বভাবের স্বর্গ আর নরক, দেবতা আর পশু, শ্রেয় আর প্রেয় দুটোকে স্বীকার করলেও চরম স্বীকৃতি দিয়েছেন মানুষের মহামানবকে। সেই মহামানবকে আহ্বান করেই তিনি বারম্বার বলেছেন অপরিমাণ প্রেমে অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে প্রকাশ করতে। তিনি ছিলেন কবি, দ্রষ্টা। তাই মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বলেই জানতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে গেছেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। মানুষের উপরে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর বিশ্বাস এতটুকু ম্লান হয় নি। মানুষের ধর্ম্মগ্রন্থে সোহম্‌ তত্ত্বের যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেছেন তিনি তাতে বিস্মিত হই মানবস্বভাবের একটি ঋজুশুভ্র চিরন্তন মহিমায় তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে।

কিন্তু মানুষের স্বভাবের মধ্যে কি শুধু দেবদূতেরাই ঘুমিয়ে আছেন? ঘুমিয়ে নেই একটা আদিম পশু যে মানুষকে কেবলই টানছে তামসিকতায়, মূঢ়তার দিকে? ফ্রয়েড্‌ থেকে শুরু ক'রে আমাদের দেশের ডাঃ গিরীন্দ্র

শেখর বসু পর্য্যন্ত সাইকোঅ্যানালিসিস্ নিয়ে আলোচনা করেছেন যাঁরা তাঁদের লেখায় মানব-স্বভাবের আদিম পশুটার দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত যেন একটু বেশী ঘন-ঘন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন, মানুষের সংস্কৃতির ও সভ্যতার গভীরতা তার চামড়ার নীচে পর্য্যন্ত ? মানুষ তার মর্ম্ম-মূলে স্বভাবের গভীরে আজও বহন ক'রে চলেছে সেই আদিকালের বর্ব্বর গুহা-মানবকে। ঐ বর্ব্বরটা কখন্ যে সামাজিক এবং ধর্ম্মীয় অনুশাসনের সমস্ত শৃঙ্খল ছিঁড়ে জীবনে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়ে বসে - তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে ?

এতক্ষণ ধ'রে মানব-স্বভাবের অদ্ভুত জটিলতা নিয়ে যা কিছু আলোচনা করা গেল তারই পরিপ্রেক্ষিতে আনন্দী বোষ্টমীর কাহিনীটীকে তলিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করলে উদ্যমের, বোধ করি, অপচয় হবে না। আনন্দী বোষ্টমীর অবচেতনার সর্ব্বনেশে চোরাকুঠুরিতে গুরু ঠাকুরের প্রতি প্রেম কখন্ যে চোরের মতো প্রবেশ করেছিল নিঃশব্দে চুপে চুপে অতি সন্তর্পণে—বেচারা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারে নি। প্রতিদিন সকালে উঠেই আনন্দীর মনে জাগত গুরুঠাকুরের প্রসাদ পাওয়ার কথা। তাঁর জন্যে তরকারি কুটতে কুটতে আনন্দীর আঙুলের মধ্যে আনন্দধ্বনি বাজতো। আনন্দীর কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যায় গুরুঠাকুরের উৎসাহ একটু যেন বেশী প্রবল। এখন একটা আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে আনন্দীর দিন কাটছিল একটা স্বপ্নাবেশের মধ্য দিয়ে। তরুণীর জীবনের সমস্তটাকেই জুড়ে আছে গুরুঠাকুর। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তার অনুক্ষণ-ভাবনায় গুরুসেবার চিন্তা বয়ে যায় অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো। চেতনারকোন প্রত্যন্ত প্রদেশে মিতভাষী শান্তশিষ্ট স্বামীর অস্তিত্ব থেকেও যেন নেই। স্বামীর প্রায় সমবয়সী শাস্ত্রজ্ঞ গুরুঠাকুর যেমন সুপণ্ডিত তেমনি সুদর্শন। সেবা-বুদ্ধির ছদ্মবেশে কামনা কি অবচেতনায় বাসা বেঁধেছে আনন্দী বোষ্টমীর ? পুরুষের মনেরই তল পাওয়া কঠিন ; নারী-চিত্তের গভীর থেকে গভীরে যে ভাবের তরঙ্গগুলি খেলে যায় তাদের কথা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। আনন্দী বোষ্টমীর স্বীকারোক্তিতে আছে :

"এমনি করিয়া চার পাঁচবছর কোথা দিয়া যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা চোখে দেখিতে পাইলাম না।

সমস্ত জীবনই এমন করিয়া কাটিতে পারিত। কিন্তু গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্য্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তারপর একটা মুহূর্ত্তে সমস্ত উল্‌ট-পাল্‌ট্ হইয়া গেল।"

এই চুরির ব্যাপারটাকে আনন্দীর মতো রক্ষণশীল পরিবারের একটা গ্রাম্য নারীর পক্ষে নিজের কাছে নিজে স্বীকার করা সত্যই কি কঠিন ছিল না ? এটা খুবই সম্ভব যে অকুতোভয়ে আমরা যখন একটা প্রলোভনের সম্মুখীন হই, প্রলোভনের মধ্যে আমাদের অন্তর্নিহিত আদিম পশুটাকে চিন্‌তে ভুল করিনে, পশুকে পশু বলেই সরাসরি স্বীকরে করতে সাহস পাই, তখন আশ্চর্য্য একটা ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সাহসের সঙ্গে যা অধর্ম্ম, যা সামাজিক এবং নৈতিক দৃষ্টি-কোণ থেকে অসঙ্গত, তাকে অধর্ম্ম এবং অসঙ্গত বলে খোলাখুলি স্বীকার করার ফলে প্রলোভনকে আমরা জয় করি, পাপ করবার প্রবণতা নির্ম্মূল হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় এমন প্রকৃতির মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ নয় যারা প্রলোভনের সম্মুখীন হলে পাপকে সরাসরি পাপ বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্ খ্যাতনামা William McDougall তাঁর Psychology: The Study of Behaviour গ্রন্থে বেশ একটা কৌতুকের কথা বলেছেন যা সুধীজনের প্রণিধানযোগ্য। কথাটা নারী-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। ম্যাক্‌ডুগ্যাল বলছেন, "প্রলোভনের মুখে বিশেষ করে মেয়েরা, বোধ হয়, পাপকে পাপ বলে খোলাখুলি স্বীকার করতে শিউরে ওঠে। যারা নৈতিক বাধানিষেধের মধ্যে গোঁড়া পরিবারে মানুষ হয়েছে সেই শ্রেণীর মেয়েদের সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।"

"But it seems (and this is the essential novelty

in Freud's teaching) that many natures especially perhaps women brought up in a strictly conventional manner react in a different way to their temptations : they are so horrified at the first dim awareness of the nature of their temptation that they never frankly recognise it, never bring it out into the light in order to confront it in open conflict."।

"কিন্তু মনে হচ্ছে (এবং এইটাই হচ্ছে ফ্রয়েডের শিক্ষার মৌলিক নূতনত্ব) এমন স্বভাবের মানুষ অনেক আছে যাদের মধ্যে, বোধ করি, বিশেষ করে পড়ে রক্ষণশীল পরিবারের কঠোর বাধা-নিষেধের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত মেয়েরা—যারা প্রলোভনের সামনে উপস্থিত হ'লে তাকে কিছুতেই প্রলোভন বলে স্বীকার করতে চায় না। প্রলোভনের আসল রূপটার প্রথম আভাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কে এমন শিউরে ওঠে তারা যে, কখনই পাপকে সরাসরি পাপ বলে স্বীকার করে না, প্রকাশ্যে চৈতন্যের আলোয় প্রচ্ছন্ন কামনাকে কখনো নিয়ে আসে না অবচেতনার অন্ধকার থেকে, উপযুক্ত সংগ্রাম-ক্ষেত্রে নিজেদের কলুষিত প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বুঝা-পড়ায় আসতে তারা কিছুতেই প্রস্তুত নয়।"

একটা প্রলোভনের সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যখন পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির আলোয় আমরা পাপকে সরাসরি পাপ বলেই জানি, যা রিরংসার পাঁকে পঙ্কিল তাকে পঙ্কিল বলেই খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করি এবং এই অকুণ্ঠ বলিষ্ঠ স্বীকৃতির দ্বারা প্রলোভনকে জয় করি তখন পাপের প্রবণতার গোড়া ঘেঁসেই কি আমরা কোপ মারিনে? তবে সম্মুখ-সংগ্রামে এই আত্মজয় চরমসাফল্যের পরিচায়ক সর্ব্বক্ষেত্রে না-ও হতে পারে। পরাজিত প্রবণতা অথবা প্রলোভন সহজে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'তে চায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে পরাজিত শত্রু পুনরায় নৈতিক জীবনের রঙ্গমঞ্চে উৎপাত শুরু করতে পারে এবং তখন প্রয়োজন হতে পারে কলুষিত প্রবণতাকে চেতনার ক্ষেত্র থেকে জোর ক'রে সরিয়ে দেবার। তবে একথা মনস্তত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন; মনের গোপন পাপকে সরাসরি পাপ বলে জানলে এবং চেতনার আলোকিত রণরঙ্গভূমিতে প্রকাশ্যে সেই পাপের সম্মুখীন হ'তে পারলে কলুষিত কামনার বিষদাঁত ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

আনন্দী বোষ্টমীর অবচেতনার গোপনে গুরুঠাকুরের প্রতি যে একটা অবৈধ আকর্ষণ সেবার মুখোস প'রে দিনে দিনে পল্লবিত হয়ে উঠছিল তার আসল রূপটা ধরা পড়েনি তার কাছে। নিজের মনের কোণের গোপন কলুষ বোষ্টমীর কাছে অকস্মাৎ ধরা পড়লো তার জীবনের সেই এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্তে যখন ফাল্গুনের সকালবেলায় ভিজা কাপড়ে ঘরে ফেরার পথে সে শুনতে পেলো গুরুঠাকুরের মুখে 'তোমার দেহখানি সুন্দর'। নব বসন্তের সেই সঙ্গীত-মুখরিত, আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে আমোদিত প্রভাতে গুরুঠাকুরের ঐ কয়টা কথায় আনন্দী বোষ্টমীর রক্তধারায় যেন তরঙ্গ দুলে উঠলো। ঐ আকস্মিক প্রেমনিবেদনের আভায় আনন্দী নিজের মনের চেহারা-টাকে বেশ স্পষ্ট করেই চিনতে পারলো। কখন সে নিজের অজ্ঞাতসারে মনঃপ্রাণ সমস্তই দিয়ে ফেলেছে স্বামীর বাল্যবন্ধু দিব্যকান্তি গুরুঠাকুরকে। স্বামীর কোন স্থান নেই তার হৃদয়ের চতুঃসীমানায়। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা অধিকার করে আছে গৃহদেবতা নয়, স্বামী নয়, হারিয়ে যাওয়া পুত্রও নয়। তবে সে কে? গুরু-ঠাকুর, তার জীবননাট্যে গুরুর ভূমিকায় আবির্ভূত এক মহাপুরুষ।

যে-মুহূর্ত্তে আনন্দী বুঝতে পারলো তার মন চুরি ক'রে নিয়েছে গুরুঠাকুর, ব্যস্, সমস্ত সম্পর্ক সে ছিন্ন করে ফেললো গুরুঠাকুরের সঙ্গে। যার রূপসুধা পান করবার জন্য নয়ন তার তৃষিত ছিল, রক্তের কণায় কণায় একটা আকৃতি সে অনুভব করছিল যার সান্নিধ্য পাবার জন্য, সে যখন আহার করতে বসলো, দেখা গেল আনন্দী গৃহের ত্রিসীমানার মধ্যে নেই। খুঁজে খুঁজে কোথাও স্বামী তার সন্ধান পেলো না।

আনন্দী নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে নিম্ন স্তরের

নারী হ'লে প্রেমতৃষাকে চরিতার্থ করবার জন্য গুরুর শারীরিক নৈকট্য কামনা করতো। বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিক্রমা করলে দেখা যাবে, অনেক শক্তিমান্ puritanও নারীর-মায়ায় অভিভূত হয়ে ধীরে ধীরে পঙ্ককুণ্ডের গভীরে তলিয়ে গেছে। ব্যাভিচারের মুখে এসে তারা দাঁড়িয়েছে, আসন্ন নৈতিক প্রলয়ের আশঙ্কায় বুক তাদের দুরু দুরু কেঁপে উঠেছে—কিন্তু নারীর সান্নিধ্য থেকে নিজেদের ছিনিয়ে আনতে পারেনি তারা। আনন্দী বোষ্টমীর ইচ্ছাশক্তি কী দুর্জ্জয়! যাকে দেখবার জন্য লালায়িত ছিল তার সমস্ত চিত্ত—তার কাছ থেকে জোর করে সে নিজেকে দূরে নির্ব্বাসিত করে রাখলো। দুর্গেশনন্দিনীর নবাবকন্যা আয়েষা প্রিয়তম জগৎসিংহের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত আর দেখা করতে সাহসই করলো না। জগৎসিংহকে লেখা আয়েষার সেই অপূর্ব্ব পত্রখানিতে আছে :

> "কিন্তু আমার সঙ্গে আর সন্দর্শন হইবে না। পুনঃ পুনঃ হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিয়া ইহা স্থির করিয়াছি। রমণীহৃদয় যেরূপ দুর্দ্দমনীয় তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত।"

আনন্দী যে-মুহূর্ত্তে মনের দুর্ব্বলতার হদিস পেয়েছে সেই মুহূর্ত্ত থেকেই সে নিজেকে কড়া পাহারায় রাখবার ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। রমণীহৃদয় দুর্দ্দমনীয়। তাই আয়েষা নিজেকে এমন কঠিন করে তুলেছিল। আনন্দী মনোবলের দিক থেকে আয়েষার সগোত্র। প্রলোভনকে দূরে রাখাই তো ভালো। স্বামীর কাছে সংসারত্যাগের বাসনা জানালে স্বামী যখন গুরুর সঙ্গে পরামর্শের কথা বললেন, আনন্দী জবাব দিলো, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।' আনন্দীর মন টলেছে ঠিকই—কিন্তু প্রলোভনের মধ্যে না যাওয়ার সংকল্পে সে অটল। মনের ভালোবাসা কি দৈহিক মিলনের মধ্যে প্রেমাস্পদের সঙ্গে ঐক্যকে পরিপূর্ণতায় পৌছে দিতে চায় না? 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' —বৈষ্ণব কবির এই আকুতির মূলে কি শুধু রূপজমোহ? দেহের জন্য দেহের লালসা? তবু আনন্দী বুঝেছিল, গুরুঠাকুরের প্রতি তার অন্তরের আকর্ষণের মধ্যে কোন কল্যাণ ছিল না। অবচেতনা থেকে যে কামনা তার চেতনায় ভেসে উঠেছে তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই চলে না। দিলে মনের ভালোবাসা দেহের স্তরে নামতে কতক্ষণ? The precarious balance may be upset at any moment

কিন্তু আনন্দী গুরুঠাকুরকে ছেড়েই শান্ত থাকলে পারতো। অমন শিবতুল্য শান্তপ্রেমিক স্বামীকে ছাড়তে গেল কেন? পৃথিবীতে দুটী মানুষ আনন্দীকে সবচেয়ে ভালোবেসেছিল, তার ছেলে আর তার স্বামী। ঘাট থেকে ঘরে ফেরার ছায়াপথে গুরুর সঙ্গে যে-দিন তার দেখা ফাল্গুনের সকালবেলায় রাস্তার বাঁকে আমতলায় —সেদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের মুহূর্ত্তেও সে কি জানতো, যার সঙ্গে এতকাল ধরে সে ঘর করে এসেছে তাকে সে আর ভালোবাসে না? তার মনে স্বামীর জন্য শ্রদ্ধা থাকতে পারে, কৃতজ্ঞতা থাকতে পারে—কিন্তু ভালোবাসার নামগন্ধ নেই। আর স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ককে সত্য এবং প্রাণময় করতে পারে শুধু উভয়ের মধ্যে একটী চিরসবুজ জীবন্ত প্রেম। একজনের জন্যে আরেকজনের হৃদয়ে অনুরাগের বিন্দুবিসর্গ যখন রইলো না, স্ত্রীর জীবনের চরম বিপদের দিনে স্বামী এসে তাকে বাহুবেষ্টনে জড়িয়ে ধরলো না, তাকে অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রাখলো অথবা স্বামীকে চূড়ান্ত দুঃখের আগুনে নিক্ষেপ করে আত্মকেন্দ্রিক স্ত্রী যেখানে নিজেকে নিয়ে বিব্রত, সেখানে দাম্পত্য-জীবন তো একটা প্রহসন। প্রেম যখন বিদায় নিলো দম্পতির বিবাহিত জীবনের লীলাভূমি থেকে তখন আর কিসের জোরে স্বামীস্ত্রী একসূত্রে বাঁধা থাকবে?

ইবসেনের Doll's House নাটকের নায়িকা 'নোরা' আটবছর স্বামীর ঘর করেছে এবং তিনটী পুত্রকন্যার জননী হয়েছে। পতিব্রতা স্ত্রী নিজেকে স্বামীর সেবায় আনন্দে উৎসর্গ করে দিয়েছে। স্বামীর জন্য হেন ত্যাগ নেই যা বরণ করতে নোরা প্রস্তুত ছিল না। একবার

স্বামী হেলমার (Helmer) এমন অসুখে পড়লো যে আরোগ্য লাভের আর কোন আশা নেই। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তন ব্যতীত মৃত্যু নিশ্চিত। নোরার আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে নিয়ে হাওয়া বদল করতে দূর দেশে যেতে পারে। উপায়? উপায় বাপের নাম জাল ক'রে ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। স্বামীর জন্য এত বড়ো একটা অপরাধের মধ্যে নোরা ঝাঁপ দিলো। আপাততঃ স্বামী তো বাঁচুক। পরের কথা পরে।

অপরাধের কথা শেষ পর্য্যন্ত চাপা থাকলো না। কথাটা স্বামীর কানে উঠলো। ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল হেল্‌মার ফেটে পড়লো ক্রোধে। ক্রুদ্ধ স্বামী অপরাধিনী স্ত্রীকে বললো, "কিন্তু আমি আর তোমাকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে দেবো না। আমি সাহস করিনে তাদের ভার তোমার হাতে ছেড়ে দিতে।" নোরার মর্ম্মমূলে শেল হেনে হেল্‌মার্ তাকে শোনালো, "এই আট বৎসর ধরে কার গর্ব্বে আমি গর্ব্বিত ছিলাম? কে ছিলো আমার আনন্দ? এখন দেখছি সে একজন কপট মিথ্যাচারিণী—না, না, আরও খারাপ —সে একজন অপরাধিনী।"

এইবার জবাব দিলো নোরা: "আমি নিঃসংশয়ে এতই জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করেছিলাম যে, তুমি আগিয়ে আসবে, সমস্ত কলঙ্কের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলে নেবে এবং বলবে, অপরাধী আমি। আমি এখন উপলব্ধি করেছি, আট বছর ধরে আমি একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে বাস ক'রে এসেছি এবং তার তিনটী পুত্রকন্যা ধারণ করেছি গর্ভে।"

নোরা যখন স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে যেতে উদ্যত, হেলমারের খেলার পুতুল হয়ে স্ত্রীর অভিনয় করতে আর প্রস্তুত নয়, হেল্‌মার বললো, "কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রে যাও।" নোরা প্রত্যুত্তর করলো, "অপরিচিত লোকের গৃহে আমি রাত্রি যাপন করতে পারিনে।" নোরাকে মরিয়া দেখে স্বামী বললো, 'নোরা, আমি কি কি তোমার কাছে চিরদিন অপরিচিতই থেকে যাবো? তারবেশী কি কিছুই হতে পারবো না?" এই প্রশ্নে নোরার শেষ জবাব, "হায় ট্রোভাল্‌ড্, যা সব-চেয়ে বিস্ময়ের ঘটনা সেই আশ্চর্য্য ঘটনা যদি কখনো ঘটে।" পৃথিবীর সেই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা তো প্রেম। নোরা যেদিন বুঝলো স্বামী তাকে কোনদিনই ভালোবাসেনি, কী মর্ম্মান্তিক বেদনায় তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে: "You have never loved me. You have only thought it pleasant to be in love with me." "কখনো তুমি ভালোবাসোনি আমাকে। আমাকে ভালবাসার ব্যাপারটায় বেশ একটা আমোদ আছে—এটা তুমি মনে করতে।" "I have been your doll-wife, just as at home I was Papa's doll child." আমি ছিলাম তোমার স্ত্রী—কিন্তু স্ত্রী না ব'লে পুতুল বলাই ঠিক। আমি ছিলাম তোমার পুতুল-স্ত্রী যেমন বাড়ীতে আমি ছিলাম বাবার পুতুল-কন্যা।"

যাকে ভালোবাসি আমরা তাকে কখনো খেলার পুতুল বানাই নে। তার জীবনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সেই জীবনকে আমরা ততটা গুরুত্ব দিই যতটা গুরুত্ব দিই আমরা নিজেদের জীবনকে। তার গৌরবে আমরা গর্ব্ববোধ করি, তার কলঙ্কের ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে বলি, "তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।"

পারলোনা হেল্‌মার এই সকল-ডোবানো প্রেম ঢেলে দিতে নোরাকে। কর্ত্তব্যের নামে সে আবেদন করলো, নোরার মধ্যে মাতৃরূপে এবং স্ত্রীরূপে যে দুই নারী ছিলো তাদের কাছে। মরিয়া হয়ে স্বামী তিন পুত্রকন্যার জননী ও ভার্য্যাকে বললো: Before all else you are a wife and a mother." "সর্ব্বাগ্রে তুমি একজন পত্নী এবং একজন জননী।" উত্তর দিলো নোরা, "I don't believe that any longer. I believe that, before all else, I am a reasonable human being, just as you are—or, at all events, I must try and become one" 'আমি একথা আর বিশ্বাস করিনে। আমি বিশ্বাস করি, সর্ব্বাগ্রে আমি একজন বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ ঠিক তোমার মত—অথবা আমি যেমন করেই

পারি একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হ'তে চেষ্টা করবো এবং হবোই।"

নোরা ঘর ছাড়লো--কারণ তাকে স্বামী খেলার পুতুল ক'রে রাখলো, তাকে হৃদয়ের ভালোবাসা দিলোনা। সেই ভালোবাসাই তো নোরার ভাষায় "The most wonderful thing of all." আনন্দী বোষ্টমী ঘর ছেড়েছে একই ভালোবাসার কারণে। শুধু আনন্দীর বেলায় স্বামীর দিক থেকে প্রেমে কোন দীনতা ছিলো না। ভালোবাসার দৈন্য এলো স্ত্রীর দিক থেকে। আনন্দীর হৃদয় চুরি ক'রে নিলো স্বামীর বাল্যবন্ধু সুদর্শন এবং সুপণ্ডিত গুরুঠাকুরটি। আনন্দীর ভালো-মানুষ স্বামী এমন যে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেননি। আনন্দী তাঁকে সংসারত্যাগের সংকল্প জানালো। স্বামী বললেন, "দুজনে একবার গুরুর কাছে যাই।" আনন্দী অস্বীকার করলো যেতে। স্বামী তার মুখের দিকে তাকাতে স্ত্রী মুখ নামালো। স্বামীর স্বচ্ছ মনের মুকুরে স্ত্রী মনের গোপন প্রেমের রূপটি প্রতিফলিত হ'তে বিলম্ব লাগলো না। চুপ করে রইলেন তিনি। আনন্দী গৃহত্যাগ করলো। ভালোবাসা ছিলো আনন্দীর নারায়ণ। তাই সেই ভালোবাসা মিথ্যা সইতে পারল না। স্বামীর উপর থেকে যখন ভালোবাসা চলে গেল তখন দাম্পত্য জীবনের প্রাণই তো চলে গেল। সেই নিষ্প্রাণ দাম্পত্য জীবন-নাট্যে স্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে থাকা তো মিথ্যের মধ্যে মিথ্যেহয়ে থাকা। মিথ্যের সঙ্গে এমন ক'রে গলাগলি ক'রে স্বামীর ঘর করতে আনন্দীর বলিষ্ঠ-ঋজু চরিত্রের কোথায় যেন কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করছিল। এমন একটা জীবন্ত সত্যানুরাগের কাছে মাথা আপনাথেকেই নত হয়ে পড়ে। নির্বোদিতা ক্রবের গল্পের মধ্যে ঠিকই লিখেছেন, "But even a child knows that a strong man or woman is the greatest thing in the whole world." "সমস্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে গৌরবের যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে মনোবল সম্পন্ন পুরুষ অথবা নারী।" বসেনের নোরা অথবা রবীন্দ্রনাথের 'বোষ্টমী' মনের উপরে এমনই একটি রেখাপাত ক'রে যায় যা আমৃত্যু কিছুতেই মুছতে চায় না চিত্তপট থেকে।

বোষ্টমীর জীবনের কাহিনী ফুরালেও একটি প্রশ্ন মনের কোণে থেকেই যায় এবং প্রশ্নটা হলো : গোপনে আনন্দীর অবচেতনার অন্ধকারে যখন ভাবের ঘরে একটা চুরির কারবার চলছিল, তার বিন্দুবিসর্গও কি তরুণীর চৈতন্যের আলোয় ধরা দেয়নি? চেতনার ক্ষেত্রে চুরিটা যদি একটা সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে আগেই ধরা দিতো, আনন্দীর সত্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ চিত্ত তখনই সাবধান হয়ে একটা রাস্তা গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু প্রলোভনের আসল চেহারার ক্ষীণতম আভাসও কি কচিৎ কখনো তার চেতনায় উঁকি মারেনি? গুরুদেব খাবেন। তাঁর আহারের জন্য তরকারি কুটতে ব্যস্ত আনন্দীর অঙুলের মধ্যে যখন আনন্দধ্বনি বাজতো, জ্ঞানের সমুদ্র গুরুর সান্নিধ্যে উপবিষ্ট হয়ে সে যখন শাস্ত্র-কথা শুনতো তন্ময় হ'য়ে তখন কি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব একটা প্রেমের অনুভূতি রক্তে তার চকিতে দোলা দিয়ে যেতো না? হয়তো যেতো—কিন্তু পরপুরুষের প্রতি সেই আসক্তি চেতনার রাজ্যে প্রকাশ্যে জানান্ দেবার আগেই নারীর নৈতিক সত্তার কঠিন শাসনে তা কতবার আত্মগোপন করেছে অবচেতনায় কে জানে? ফ্রয়েড্‌ বলছেন, আমাদের সামনে যখন কোন প্রলোভন এসে উপস্থিত হয় এবং আমরা যখন সরাসরি তাদের স্বীকার করতে শঙ্কায় শিউরে উঠি, আমরা যখন প্রলোভনের বস্তুকে চেতনার প্রকাশ্য আলোয় আনতে ভয় পাই এবং তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করতে কুণ্ঠিত হই তখন আমাদের মনের পঙ্কিল প্রবণতাকে আমরা অবচেতনায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিই। সেই প্রবণতা কিন্তু বেঁচে থাকে মনের গভীরে গা-ঢাকা দিয়ে এবং গোপনে গোপনে তার কাজ করে যায়; মনের অবচেতনায় অবদমিত প্রবণতা তখন একটা পরগাছার মতোই বাড়তে থাকে। সতত সেই অবদমিত প্রবণতার চেষ্টা থাকে জোর করে চেতনায় ঠাঁই ক'রে নেবার দিকে অর্থাৎ প্রলুব্ধব্যক্তির জাগ্রত চিত্তের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত

করার দিকে। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক নর-নারীরই মনে আবাল্য-সঞ্চিত একটা নৈতিক সংস্কার থাকে। অবৈধ কোন কুচিন্তা অবচেতনা থেকে উড়ে এসে চেতনাকে জুড়ে বস্‌তে চাইলেই কি সেই নৈতিক সংস্কার তাকে সহজে পাত্তা দেবে? কখনোই নয়। সেই সংস্কার গোপনে গোপনে তার কাজ ক'রে যাবেই, অবৈধ প্রবণতাকে বলবে, 'খবরদার, দূর হয়ে যাও আমার চেতনার ত্রিসীমানা থেকে', and so there goes on a perpetual subterranear or subconscious conflict. অবচেতনার মনের অগোচরে একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলতেই থাকে।

এইভাবে আনন্দীর অবচেতন মনের অন্ধকারে তার নৈতিক সংস্কারের সঙ্গে অবৈধ আসক্তির একটা নিরন্তর সংগ্রাম যদি দীর্ঘকাল ধরে চলেই থাকে তার অজ্ঞাতসারে, বিস্মিত হবার নেই কিছু। এই আসক্তির গোপন কথাটা যখন ফাল্গুনের এক পাখী-ডাকা প্রভাতে আনন্দীর চেতনার আলোয় ধরা পড়লো, এক নিমেষে সব উলট-পালট হয়ে গেল। অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার পথ থেকে আনন্দী একটা নৈতিক বিপর্য্যয়ের ঝড়ের ঝাপটায় ছিটকে পড়লো যেখানে, সেখানে সে প্রলয়ের তীরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রলয়ের তীরে আনন্দী নতুন আলোর সন্ধান পেলো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সত্যে আঁট থাকলে ভগবান্ তাকে কোল দেন। আনন্দীর মুখের এই কথাটা দিয়ে এ প্রবন্ধ এখানেই শেষ করি: "দয়াল ঠাকুর মারিতে মারিতে তবে মারকে খেদান। শেষ পর্য্যন্ত যে সহিতে পারে সেই বাঁচিয়া যায়।"

শেষ পর্য্যন্ত আনন্দী বোষ্টমী বেঁচেই গেল একটা আনন্দোজ্জ্বল নব-জীবনের মধ্যে। সত্যানুরাগিণী, পথের বাঁশিতে পাগলিনী আনন্দীকে ভগবান্ কোল দিয়েছেন।

এখন থেকে সাতান্ন বছর আগে ১৩২১-এ বোষ্টমী লেখা হয়েছিল। তখন ভিয়েনার ডাক্তার ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের নূতনত্ব জগৎ জুড়ে চিন্তাশীল নর-নারীর মনে একটা আলোড়নের সূত্রপাত করেছে। বিশ্বসাহিত্যের মহলে মহলে ফ্রয়েডের আবিষ্কার আনন্দিত স্বীকৃতি পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের লেখার উদ্যম যেমন ছিল অপরিমাণ, পড়ারও উদ্যম ছিল তেমনই অপরিমাণ। ফ্রয়েডের বৈপ্লবিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল—এমন আঁচ করা খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রসাহিত্য কি ফ্রয়েডের প্রভাব থেকে একেবারেই মুক্ত?

সে যুগের নানা কথা

সীতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সমাজপাড়ায় আমাদের পাশের বাড়ীটি ছিল সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। চারতলা বাড়ী, তিনি নিজে এখানে থাকতেন, অন্যান্য তলায় বিভিন্ন ভাড়াটিয়ারা থাকতেন,তাঁদের মধ্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজনও কিছু কিছু ছিলেন। একতলাটা তিনি জন-সাধারণের কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। এখানে ছোট একটি লাইব্রেরীও ছিল। এই ছোট প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল 'দেবালয়।' এখানে গান, কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা নানারকম কাজ হত। রবিবারে এখানে বাল্য-সমাজও বসত। লাইব্রেরীটি কোনো বিদেশী কর্ম্মীসঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত ছিল বোধ হচ্ছে, কারণ, প্রায়ই দেখতাম কয়েকজন মেম-সাহেব এসে বসতেন, এবং পাড়ার ছেলেমেয়ের দল ভিড় করে এসে জুটলেই তাদের মধ্যে ছবির কার্ড, বিস্কুট, লজেন্স প্রভৃতি বিতরণ করতেন। আমি এই লাইব্রেরীতে সারাক্ষণই যাওয়া-আসা করতাম বই নেবার জন্যে। বই পড়ার বাতিকটা ছিল খুবই প্রগাঢ়, কিন্তু এখানে ত আর শ্রীশবাবুদের লাইব্রেরী ছিল না যে, সারাক্ষণ ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসব? স্কুলের মেয়েদের বেথুন কলেজের লাইব্রেরী থেকে বই নিতে দেওয়া হত না। তবুও আমি আমার প্রিয় শিক্ষয়িত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলির কৃপায় এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধাই পেয়েছিলাম। তিনি নিজের নামে বই বার করে নিয়ে সর্ব্বদাই আমাকে পড়তে দিতেন। কিন্তু যথেচ্ছ যখন তখন ত নেওয়া যেত না? বাড়ীর পাশের এই ছোট লাইব্রেরীটি সেইজন্যে খুবই কাজে লাগত। মনে আছে এখান থেকে Wizard of Oz বইখানি সংগ্রহ করে পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। পরে এই বইখানি আমি অনুবাদ করেছিলাম "আজব দেশ" নাম দিয়ে। ইংরেজী বইটিতে ছবি ছিল সব চমৎকার। সে রকম ছবি, বাঁধাই বা কাগজ দেবার ক্ষমতা ত তখন আমাদের দেশের কোথাও কারো ছিল না? তবুও সুকুমার রায় ছবি এঁকে দিয়েছিলেন এবং দুচারজন চরিত্রের নামকরণও করে দিয়েছিলেন বলে বইখানি খুবই সুখ্যাতি পেয়েছিল। এটি এখনও বাজারে চালু আছে এবং C.L.T.র দ্বারা অভিনীতও হয়েছে।

এই 'দেবালয়ে' রবীন্দ্রনাথ বার-দুই নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। তাঁর আসার কথা কোথা দিয়ে যে কে ছড়িয়ে দিত তা জানি না। বিজ্ঞাপন ত কোথাও দেওয়া হত না অথচ দেখতাম পিল্ পিল্ করে লোক আসছে। ঘর ভরে গেল, পিছনের ছোট উঠোন ভরে গেল, তারপর সামনের গলি, মাঠ ভরতে ভরতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটেও ভিড় জমতে আরম্ভ করল। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যই ভিড় অথচ তাঁকেই ভিড় ঠেলে ভিতরে নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠত। আমরা অবশ্য পাশের বাড়ীতে থাকি, কাজেই অনেক আগে গিয়ে সুবিধামত জায়গা নিয়ে বসেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথকে আমার বছর-চার বয়সে প্রথম দেখেছিলাম, তারপর এতদিন পরে আবার দেখলাম।

তখন যুবাপুরুষ ছিলেন, এখন প্রৌঢ়ত্বের ছায়া এসে পড়েছে চেহারার উপরে। কিন্তু তখনও মূর্তি সেই রকমই অনিন্দ্যসুন্দর। চুলে অল্প অল্প পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। সেদিন খুব বেশীক্ষণ বসলেন না, দুচারটি কবিতা পড়ে শোনালেন, এবং শ্রোতাদের আবেদনে একটি নবরচিত গান গেয়েও শোনালেন। গানটি 'মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে।'

কয়েক মাস পরে আবার ঐ দেবালয়ের ঘরেই তাঁকে আর-একবার দেখলাম। এবারও গান শুনলাম, 'তোরা শুনিস্‌নি কি শুনিস্‌নি তার পায়ের ধ্বনি।'

তাঁকে আরো ভাল করে কাছে বসে দেখবার ও তাঁর কথা শুনবার একটা ক্রমবর্দ্ধমান ঔৎসুক্য মনকে পেয়ে বসতে লাগল।

দিদি এই সময়ে ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষা দিলেন। এরপর দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি। স্থির হল এই ছুটিতে দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাওয়া হবে, এবং সেখানে মাসদেড়েক থেকেও আসা যাবে। হিমালয় ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখিনি। এলাহাবাদ থেকে কলকাতা যাওয়া-আসার পথে বিন্ধ্যাচল চোখে পড়ত, এছাড়া কোন বড় পাহাড় তখন পর্য্যন্ত চোখে দেখিনি। আমার মেজ জ্যাঠামশাই তখন দার্জ্জিলিং জেলের jailor ছিলেন। সেখানে অবশ্য গিয়ে উঠবার আমাদের কোনো plan ছিল না। বাড়ী ভাড়া করার জন্য লেখা হল বন্ধু-বান্ধবের কাছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মেয়ে হেমমাসীমা (হেমলতা সরকার) আমাদের জন্য তাঁর বাড়ীর কাছে Daisy Bank বলে একটি ছোট বাড়ী ঠিক করে দিলেন। বাড়ীটির মালিক ছিলেন বিখ্যাত তিব্বত-পর্য্যটক শরৎচন্দ্র দাস। এটা শুনে আমি খুব interest অনুভব করে-ছিলাম কারণ, উক্ত ভদ্রলোকের এক কন্যা আমার সহপাঠিনী ছিলেন একসময়। আমি তখন প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি। লক্ষ্য করলাম যে,একপাল ১২/১৩ বছর বয়সের বালিকার মধ্যে একজন তরুণীও আছেন। শুনলাম, ইনি শরৎচন্দ্র দাসের কন্যা, কিছুদিন আগে একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছেন। আবার পড়াশুনা resume করবার ইচ্ছায় স্কুলে এসে ভর্ত্তি হয়েছেন। তাঁকে মনে রাখবার আমার আরো বিশেষ একটা কারণ ছিল। বহুকাল পড়াশুনো ছেড়ে দেবার পর আবার নূতন করে সব আরম্ভ করাতে মধ্যে মধ্যে তাঁর একটু ঠেকে যেত, বিশেষ করে ইংরেজীতে। আমাকে বললেই আমি তাঁকে সাহায্য করতে বসে যেতাম। এতে খুশী হয়ে তিনি প্রায়ই আমাকে খুব ভাল ভাল আচার এনে খাওয়াতেন।

যাই হোক, দার্জ্জিলিং যাওয়া হবে শুনে আমরা ত মহা উৎসাহে গোছ-গাছ শুরু করলাম। শীতের দেশ, কি রকম কি লাগবে সব অভিজ্ঞ বন্ধু-বান্ধবের কাছে খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম। বেশ শীতের দেশে বাস করা অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু পাহাড়ে শীত কেমন তা ঠিক জানতাম না। ওভারকোট কোনোদিন পরিনি, এলাহাবাদের খুব শীতেও বোধহয় না। সকলের উপদেশে দুই বোনে ত দুই কোট জোগাড় করলাম, তবে মা সাবেকী শালই সম্বল করে রইলেন, কোট টোটের ধার ধারলেন না। একটা কথা শুনে কিছু সন্ত্রস্ত হলাম যে, ওখানে নাকি বাইরে বেড়াতে বেরোলেই রেশমের শাড়ী পরতে হয়, নইলে সুতী শাড়ী পরলে লোকে আয়া ভাবে। আমরা ভাবলাম, তাহলে বেশীর ভাগ সময় আমাদের লোকে আয়াই ভাববে, কারণ পোশাক-আশাকের মধ্যে সুতী শাড়ীই ত বেশী। যাই হোক, আয়া বলে কেউ ভেবেছে এমন কোনো প্রমাণ পরবর্ত্তী কালে পাইনি।

দার্জ্জিলিং যাবার ঝামেলা ছিল তখন অনেক। সোজা ট্রেণে উঠে চলে যাবার ব্যাপার নয়। প্রথম শিয়ালদহে ট্রেণে উঠে দামুকদিয়া ঘাট অবধি যেতে হবে। সেখানে নেমে পড়ে পদ্মার বিশাল চড়ার উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ষ্টীমারে গিয়ে উঠতে হবে। ইচ্ছা করলে ষ্টীমারে বসে খুব পরিতোষ পূর্ব্বক প্রাতরাশ সম্পন্ন করা যায়। তারপর নামতে হবে গিয়ে সারাঘাটে। সেখানে আবার ট্রেণে উঠতে হবে। সকালবেলা শিলিগুড়ি ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণ দাঁড়াবে। এখানেও ট্রেণ বদল। তবে এবার যে গাড়ীতে উঠতে হবে সেটি toy

train বলা যায়, এতই ছোট। সোজা বসে যাওয়া যায়, শোবার মত জায়গা নেই। সঙ্গে বাথরুম নেই। জিনিষপত্র সঙ্গে নেওয়ার উপায় নেই, ছোট হাতব্যাগ ছাড়া। ট্রেণ দেখে ত আমাদের চক্ষুস্থির! কিন্তু ওতেই যেতে হবে, আর কোন উপায় নেই। বেশ শীত করতে শুরু করল, অতএব ওভারকোট বার করে পরে নেওয়া গেল।

ট্রেণ ত ছাড়ল। শীত বেশ, ভয়ও রয়েছে কিছু কিছু। এ রকম অদ্ভুত যানে আগে চাড়িনি ত কখনও? কিন্তু কি অপূর্ব্ব সুন্দর চারিদিকের দৃশ্য। নগাধিরাজ হিমালয়ের এই পেলাম প্রথম দর্শন। যতই উপরে উঠতে লাগলাম ততই চারিদিকের দৃশ্য বেশী করে মনোহরণ করতে লাগল। এত রকমের এত গাছ কোনোদিন একসঙ্গে দেখিনি। লতা, গুল্ম, ফার্ণ এতরকম যে আছে তাই ত জানতাম না। ঝরণা কথাটা জানা ছিল, কিন্তু দু'হাত দূরে জলকণা গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে এমন নাচতে নাচতে কলহাস্যে যে চলে যাবে তা ত কখনও ভাবিনি। 'পাগলা ঝোরা' ত পাগলাই বটে, যেমন তার রুদ্র রূপ, তেমন তার ভীম গর্জ্জন। এর উপর যখন গায়ের উপর দিয়ে মেঘ ভেসে যেতে আরম্ভ করল, তখন ত আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। নিতান্তই সমতল ভূমির মানুষ আমরা, গিরিরাজের রাজ্যে এসে কত রকম চমকপ্রদ জিনিষই যে দেখলাম, তার ঠিকানা নেই। স্টেশনগুলোর নামগুলোও বেশ ঝঙ্কারময়। শুকনা, রংটং, তিনধরিয়া, কার্সিয়ং, টুং, সোনাদা, ঘুম। ঠিক যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে কেউ। ছোট ভাই ত একটা গানই বানিয়ে ফেলল।

গিরিরাজের কোলের অধিবাসী মানুষগুলিও একটু নূতন ধরণের ঠেকে। বেঁটে খাটো বলিষ্ঠ চেহারা, দেহের রং লালচে ফরশা, চোখ ছোট ছোট, মুখ গোল, নাকটা তত চোখা নয়। অবশ্য এর ভিতরও শ্রেণীবিভাগ আছে। বেশ রীতিমত সুশ্রীও যেমন কতগুলি আছে, প্রায় কুৎসিৎও আছে অনেক। এরা নানা জাতের। দেখে অবাক্ লাগল, স্টেশনগুলোতে মালবাহী কুলীর কাজ সব মেয়েরা করছে। কপালে বেতের strap বেঁধে, বিশাল বিশাল ভারী মোট পিঠে তুলে নিয়ে, পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে অনায়াসে সব মেয়েরা চলে যাচ্ছে। বাচ্চা-কাচ্চা বহন করছে ঐ রকম পিঠে বেঁধে, কোলে নেবার রীতি নেই। হাত-দুটো অন্য কাজ করে চলেছে।

দার্জ্জিলিং এসে ত পৌঁছলাম। হেম-মাসীমার সাহায্যে সোজা গিয়ে বাড়ী উঠলাম। বাড়ীঘর ত তিনিই পরিষ্কার করিয়ে রাখিয়েছিলেন, একজন কর্ম্মিষ্ঠা পাহাড়ী ঝিও ঠিক করে রেখেছিলেন। দুপুরের খাওয়া-টাও তাঁর বাড়ীতেই হল, সুতরাং এসেই হাঁড়ি চড়াতে হল না। খেয়ে দেয়ে নূতন বাড়ীতে গিয়ে অধিষ্ঠিত হলাম। ছোট জায়গা, তিনখানি ঘর, এ ছাড়া রান্নাঘর ও বাথরুম। একপাশে ছোট একটা গোলাপ ফুলের বাগান, আর একপাশে ঐ রকম তিন কুঠরীওয়ালা আর-একটি flat। সেখানেও বাবার খুব পরিচিত এক ভদ্র-লোক তাঁর গোটা-দুই ছাত্র নিয়ে এসে উঠেছেন দেখা গেল। কাছেই বর্দ্ধমানের মহারাজার বিশাল compound যুক্ত বাড়ী Rose Bank। সে একটা ছোটখাট শহর বললেই হয়, বাগান, বাড়ী, পুকুর, কি নেই সেখানে? তবে বরাবর কেউ থাকে না সেখানে, মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করে। প্রথম দিনটায় ক্লান্ত ছিলাম, তবু বিকালে একবার বেড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বেশী ভাল লাগল না। এখানে কোনো রাস্তাই ত সমতল নয়, Cart Road ছাড়া, তাই একটু ঘুরেই হায়রান হয়ে এসে বসে পড়লাম। শীতটাও বেশীই লাগছিল। রাত্রে ভাত খাবার পর যেই এক গেলাস জল খেয়েছি, অমনি হাড়ের ভিতর শুদ্ধ কাঁপুনি ধরে গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

দার্জ্জিলিং-এ প্রথমবার দিনগুলো মন্দ কাটেনি। প্রথম প্রথম রাস্তাগুলো tackle করতে একটু অসুবিধে বোধ হত, কোনোটা সোজা খাড়া উপরে উঠে গেছে, আবার কোনোটা গড়গড়িয়ে নীচে নেমে গেছে। অবশ্য রিক্শ বা ডাণ্ডি চড়া যেত, কিন্তু তাহলে আর বেড়ান হল কি? আর, যেখানে বাবা-মা

দিব্যি হেঁটে চলেছেন সেখানে আমরা আর কোন্ লজ্জায় রিক্শ চড়ি? ক্রমে এ-সব উঁচু নীচু পথে হাঁটা অভ্যাস হয়ে গেল। সকাল বিকাল ত ঘুরেই কেটে যেত। রোজ একবার Mall-এ গিয়ে বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত নারী পুরুষ আর বাচ্চার ভিড় দেখা, এবং কলকাতার ট্রেণ আসবার সময় স্টেশনে গিয়ে আর কেউ চেনা মানুষ এল কি না তাই দেখা ত নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির একটা বড় স্থান অধিকার করল। নারী মালবাহিকারা আমাদের খুবই কৌতূহল জাগাত। বিরাট বিরাট বোঝা কি অক্লেশে নিয়ে যায়, ঐ কপালে ফিতে বেঁধে। আমাদের একটি মেয়ে কয়লা দিয়ে যেত ঠিক ঐরকম করে। বেশ দেখতে, তবে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব মোটেই নয়। বেশ পরিপুষ্ট সুস্থ চেহারা অথচ একেবারেই পুরুষালি বা কঠোর নয়। তার যা দুটো বাচ্চা ছেলে ছিল, এত সুন্দর বাচ্চা আগে আর কোথাও দেখিনি। ঠিক যেন র‍্যাফেলের আঁকা দেবশিশুর ছবি মানুষের জগতে নেমে এসেছে ছবির বুক থেকে। কিন্তু যেমন সুন্দর, তেমন নোংরা, ছুঁতে কোনদিন ভরসা পাইনি। জন্মাবার পর আর কোনো কারণেই জল স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না।

ভোরবেলা একটা অদ্ভুত মত শব্দ শুনে অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওটা আবার কি?" শুনলাম যে সেটা কাকের ডাক। কাকের ডাক ত জন্মাবধি শুনেছি, কিন্তু এমন উৎকট আওয়াজ ত কখনও শুনিনি। শোনা গেল যে, বর্দ্ধমানরাজের বাবা প্রথম যখন এখানে থাকতে এলেন তখন সকালবেলা কাকের ডাক না শুনে বেজায় ক্ষেপে গেলেন। সবাই বলল যে, এখানে ত কাক নেই ত ডাকবে কি করে? তিনি ওখানে এক বিরাট খাঁচা ভর্ত্তি কাক পাঠাবার ফরমাশ দিলেন। কাক ত এল, কিন্তু দারুণ শীতে এসেই বেচারীদের গলা ভেঙে গেল। এমনিতেই কাকের ডাক যা মধুর, আরো বিকট হয়ে গেল। সেই সুরেই ডাকে, যা দুচারটে বেঁচে আছে। বেশীর ভাগই শীত সইতে না পেরে মরে গেছে।

জ্যাঠামশায়ের বাড়ীটা ছিল অনেক নীচে, প্রায় Race Course-এর কাছাকাছি। সেখানে একবার নামলে উঠে আসা দায়। তবুও দু-চারবার সেখানে গিয়েছিলাম। জ্যাঠামশায়ের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তাঁর প্রথম পক্ষের বড় ছেলে বিশ্বেশ্বর তখন সেখানে স্ত্রী এবং মেয়ে নিয়ে ছিলেন, তাছাড়া আমাদের কাকার একমাত্র ছেলে হেমন্তও তখন সে বাড়িতেই থাকত। সে বাল্যেই মাতৃপিতৃহীন।

সেবার দার্জ্জিলিং থাকাকালীন আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল। Halley's Comet দেখা গিয়েছিল সে বৎসর। আমরা ওখানে থাকতে দেখতে পেতাম, বিরাট একটা আগুনের গোলা যেন ক্রমেই পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে, তার পিছনে আবার একটা সুদীর্ঘ ঝাঁটা। বেশ ভয়াবহ চেহারা। লোকেরা যথারীতি ভয়ও পেত। কিছু একটা দারুণ অমঙ্গল ঘটবে এই ধারণা ছিল অনেকের। তবে ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড মারা যাওয়া ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে পড়ে না। প্রত্যেক রাত্রেই মনে হত, ঐ ধূমকেতুর মত বিরাট মুণ্ডুটা যেন আরো কাছে এসে পড়েছে। নানা গুজব শুনতাম এবং সেগুলো বিশ্বাস না করেও একটু ভয় পেতাম। কিন্তু ধূমকেতু মশায় কারো কোনো ক্ষতি না করে এক সময় নিজের পথে চলে গেলেন।

দার্জ্জিলিং-এর আর একটা ঘটনা মনে পড়ে। এক রাত্রে নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী ফিরছিলাম আমি দিদি, আর দাদা। তখনকার কালে সব জায়গায়ই গোরার উৎপাত ছিল অল্প বিস্তর। দার্জ্জিলিং-এর কাছেই বড় সেনানিবাস ছিল, সেখান থেকে অনেক সময়ই দল বেঁধে গোরা সৈনিকরা দার্জ্জিলিং বেড়াতে আসত এবং তাদের খেয়ালখুশি মত লোকেদের উপর উৎপাত করত। এদের সম্বন্ধে সকলেরই ভয় ছিল, বিশেষ করে মেয়েদের। যেদিনকার কথা বলছি, সেদিন ফিরতে আমাদের বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, রাত প্রায় তখন দশটা হবে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছি, হঠাৎ কার্ট রোডের পাশের একটা রাস্তা দিয়ে তিনটা গোরা শিস্ দিতে দিতে নেমে এল বড় রাস্তার উপরে। আমাদের

পিছন পিছন হাঁটতে আরম্ভ করল। আমরা ত বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। দাদা মনে কি ভাবল জানি না, মুখে আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, "তোরা দৌড়ে বাড়ী চলে যা। আমি ততক্ষণ মারামারি করে ওগুলোকে ঠেকিয়ে রাখব।" আমরা দৌড়লাম না অবশ্য, তবে যতদূর সম্ভব জোরে জোরে পা চালিয়ে চললাম। সৌভাগ্যবশতঃ গোরাগুলির কোনো বদ্ মতলব ছিল না, তারা শিস্ দিতে দিতে যেমন চলছিল, চলেই গেল। দাদার সাহসটার তারিফ না করে পারলাম না, সে তখন আঠারো উনিশ বৎসরের ছেলে, তিনটা গোরার সঙ্গে একলা লড়তে প্রস্তুত হয়েছিল ত?

দার্জ্জিলিং থেকে মাস-দেড় পরে ফিরে এলাম কলকাতায়। এর পরেও দু চারবার দার্জ্জিলিং গিয়েছে, কিন্তু প্রথমবারের মত মুগ্ধ আর হইনি। দার্জ্জিলিংএর সৌন্দর্য্য যে কিছু কমে গিয়েছিল তা নয়, তবে একেবারে প্রথম দেখা জিনিষ চোখে যেমন লাগে বারবার দেখা জিনিষ তেমন আর লাগে না, যত অপূর্ব্ব সুন্দরই হোক।

দিদি এসে বেথুন কলেজেই ভর্ত্তি হলেন, অন্য কোথাও আর যেতে হল না। অবশ্য তখন মেয়েদের কলেজ আরো অনেক যে ছিল তা নয়, দু-একটা সবে উঠব উঠব করছে। ছেলেদের কলেজেও দু-চার জন অসমসাহসিকা গিয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের বড় মেয়ে নলিনী এবং তাঁর ভাগিনেয়ী সুবীতি। এঁদের কাছে সহপাঠী ছাত্রদের অনেক মজার গল্প শোনা যেত।

দিদি বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হলেন বটে, তবে তাঁর অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে Mathematics নেন। কিন্তু বেথুনে তখন কলেজে অঙ্ক নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। তবু তিনি অঙ্কই নিলেন, এবং তাঁকে পড়াবার জন্য সিটি কলেজের একজন গণিতের অধ্যাপককে নিযুক্ত করা হল। তিনি দিদি, দাদা ও আমাদের প্রতিবেশী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, এই তিনজনকেই পড়াতে লাগলেন। এঁর নাম ছিল সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বরিশালের লোক, বোধ হয় ওখানের ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন আগে। ওখানকার স্বদেশী আন্দোলনের একজন নেতা হিসাবে পুলিশের বিষনজরে পড়েছিলেন। সেই কারণেই বোধহয় সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একেবারে বাড়ীর লোকের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কত রকম গল্পই যে তাঁর কাছে শুনতাম তার ঠিক নেই। ওঁর বাড়ীর সকলের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল। স্যার নীলরতনের বাড়ীতেও তিনি গণিতের অধ্যাপনা করতেন। খুব বলিষ্ঠ লোক ছিলেন।

মহলানবীশ মশায়দের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর যাওয়া-আসা ছিল। এই সময় ঠিক হল যে, শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবে প্রশান্ত, তাঁর বোন ও মামাতো বোনরা কয়েকজন যাবেন। আমার দিদি সেই দলে যোগ দিলেন। আমি ঠিক সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারলাম না। ওরা ফিরে এসে এমন উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আরম্ভ করল যে আমার আর দুঃখ রাখবার জায়গা রইল না। ঠিক করলাম যে, সামনের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে যে উৎসব হবে তাতে নিশ্চয়ই যাব। তখন থেকে তোড়জোড় চলতে লাগল এবং ২৫শে বৈশাখের দিন-দুই আগে বেশ একটি বড় দল শান্তিনিকেতনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দলটিতে ছেলে মেয়ে দুইই ছিল, অভিভাবক হিসাবে বাবা এবং স্যার নীলরতনের ভগিনী ক্ষীরো পিসীমা ছিলেন। আমরা 'নীচু বাংলা' নামক বাড়ীটিতে উঠেছিলাম। বাড়ীটাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ হেমলতা দেবী দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতি দিনেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী কমলা থাকতেন। ঐ সময়টায় তাঁরা পুরীতে বেড়াতে

গিয়েছিলেন বলে সমস্ত বাড়ীটাই অতিথিদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা দিন-চার-পাঁচ রইলাম ওখানে। 'রাজা' নাটক অভিনীত হল। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'রাজা' ও 'ঠাকুরদাদা'র ভূমিকায় অভিনয় করলেন। ওখানে ত তখন মেয়েদের স্কুল ছিল না, কাজেই অভিনয়ে মেয়েদের ভূমিকা ছেলেরা এবং অল্পবয়স্ক শিক্ষকরাই করতেন। 'রাজা'তে রাণী সুদর্শনা এবং সুরঙ্গমার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অজিত কুমার চক্রবর্তী ও তাঁর ছোট ভাই সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী।

রবীন্দ্রনাথকে এতদিন দূর থেকেই দেখেছিলাম। এবার সাক্ষাৎ ভাবেই পরিচিত হলাম। অনেক জিনিষ আছে যাকে দূর থেকে সুন্দর দেখায়, কাছে এলে ততটা ভাল আর দেখায় না। মানুষের বেলায়ও এ কথা খাটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখলাম তার বিপরীত। এতদিন তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাঁর লেখা তখন খানিক খানিক মাত্র পড়েছি। এবার কাছে থেকে তাঁকে দেখলাম। আমাদের তিনি এত সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, যে, এখন সে-কথা ভাবলেই অবাক্ লাগে। কোন্ পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতির ফলে এ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তা জানি না। এখানে এসে আমার যেন নবজন্ম হল। জীবনকে যে দৃষ্টিতে এতদিন দেখতাম সে দৃষ্টিভঙ্গীই গেল বদলে। শান্তিনিকেতন হয়ে দাঁড়াল আমাদের তীর্থক্ষেত্র। এর পর যখনি ওখানে উৎসবাদি কিছু হত, আমরা গিয়ে উপস্থিত হতাম। দল ক্রমে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠতে লাগল।

ক্রমশঃ

বিঘ্নিত সুখ

ভাগবতদাস বরাট

সেদিন আজ অস্তমিত। তখন যা ভাবতাম, আজ তা অভাবনীয়। অর্থাৎ তৎকালীন সুখ বিপর্য্যস্ত—বিস্মৃত। আমি কিন্তু বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত নয় বলেই বিপাকে পড়লাম।

বাপ-ঠাকুর্দার আমলে অনেককে অনেক কিছুই করতে দেখলাম। নরহরির মাথায় ধুলো উড়তো। তারপর টাকা হতেই তেল পড়ল টেকো মাথায়। বিষয়সম্পত্তি কিনে ফেলল রাতারাতি। রোজগার করল না। ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুলে সম্পত্তির স্বত্ব ভোগে দিনরাত কাটাতে লাগল। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। বিষয় এখন বিষের সামিল।

লোকে বলে, তুমি বিজ্ঞ হয়েও বিকৃতের মত কাজ করলে। চোখ থাকতেও কানা সেজে আইন-কানুন না দেখে হঠ করে হঠকারী হয়ে পড়লে। জমানো টাকা কি এতই জঞ্জাল হয়েছিল? দু'একটা টাকা নয়, এক সঙ্গে সাত হাজার ফুঁকে দিলে। পুকুরের জলে পড়লেও শব্দ হত। গরীবদের বিলিয়ে দিলেও বিখ্যাত হতে।

কিন্তু সে-সব কিছুই করি নি। স্বীকার করি ঐ টাকায় বহু কিছু শিকার হত। অনেক কিছুই করা চলত। চাল কিনে চেপে রেখে চড়া দরে ছেড়ে দিলেও জমার অঙ্ক চড়ে উঠতো। কিম্বা কোন প্রতিষ্ঠানে দান করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম। প্রতিপত্তি বেড়ে যেত। পপুলার হয়ে পাঁচজনের সম্মান কুড়াতাম। আর সেই সঙ্গে শেফালিকে বিয়ে করলে ওর ইন্‌কামও কায়েম করতাম। কিন্তু মনটা যে সেই সময় ওসব দিকে টানে নি। তাই এই অঘটন।

এখানে নানা জনের নাক সিটকানো কথা। উপদেশে উপহাস। বলছে, এটা খুবই বাড়াবাড়ি। বাড়ী থাকতেও কি কেউ বাড়ী কেনে? বাড়তে গেলেই পড়তে হয়। তাই পড়েছ।

আমি পড়েছি না উঠেছি তা জানি না। ভাবছি—পাড়ি দেব। কোথাও পালাব বা লুকাব। তা না হলে সবাই আমায় পাগল করে ছাড়বে। ফলে একদিন প্রলাপ বকতে শুরু করব।

আমি বাড়তে চাইনি। জমানো টাকাকে জঞ্জালও ভাবিনি। যমের মত ভয় করতাম। তখন বুঝেছিলাম টাকায় সুখ টানলেও জ্বালা বাড়ায়। সে কি কম জ্বালা? রাতে ঘুম নেই, পাছে চোর আসে। দিনে স্বস্তি নেই, পাছে পুলিশে ধরে। হুট করে ছুটে এসে জেরা করবে, কোথায় পেলেন এত টাকা? আপনি নিশ্চয়ই চোরা কারবারী। বাবরি কাটা চুল দেখে ভুলবে না। তুলবে থানায়। পেটে না খেয়ে যে পয়সা জমিয়েছি—সে কথা তো শুনবে না। ওদের মনমত জবাব না দিলে পেটেই গুঁতো মারবে।

এসব কথা মনে ভাবলেও বলব কাকে? সাতজনের সাত রকম কথা। আমি নাকি সাতকড়ির প্রতি দয়া-পরবশ হয়েছিলাম। পরে ওর বশীভূত হয়েছি। এই সবই ওদের অনুমান।

আমি চেয়েছিলাম, সম্পত্তির ভোগদখলের অধিকারী হতে। হাঁটাহাঁটি ও খাটাখাটি না করে উপস্বত্ব ভোগের ইচ্ছা ছিল। তাই সাতকড়ির কথায় টাকা কড়ি যা ছিল তা দিয়ে ওরই বাস্তবাড়ী কিনেছিলাম।

মন মুখ এক করেছিলাম। ভেবেছিলাম কিনব না। আর তা বলেও ছিলাম। বাড়ী তো আছে। বাসোপযোগী পাকা বাড়ী, এবং তা থাকতে তোমার পড়ো বাড়ীটা কিনব কোন্ দুঃখে?

সাতকড়ি তখন সাতপাঁচ কথা আওড়িয়েছিল—

আরে আমি কি বেচতাম বাড়ী? বাস্তবাড়ী বেচে ফেলতে কে চায়? তবে কিনা এখানে যখন বাস করছি না তখন খামকা বাড়ীটা পড়ে থেকে উই ইঁদুরের রাজত্ব কেন হয়। তালাবন্ধ অবস্থায় আবদ্ধ থেকে নষ্ট হচ্ছে বই তো নয়।

বলেছিলাম—আমি কিনলেও তো মূষিকরা মুশকিলে পড়ছে না। যেমন আছে তেমনি থাকবে। আর উইদেরও উৎসাদন হচ্ছে না। আমারও তো বাড়ী রয়েছে। ঘরের অভাবে গরজে পড়ে তো ঘর কিনছি না, যে ঐ ঘরের বাসিন্দা হব। সুতরাং তালা খুলে উই ইঁদুরদের তাল সামলাতে পারব না। তার চেয়ে না কেনাই ভাল।

সাতকড়ি সহাস্যে বলে, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। বাড়ীটা কিনে ভাড়া দাও। আয়ের সংস্থান যেমন হবে তেমনি সেই সঙ্গে ঘরেরও ব্যবহার হবে। তখন দেখবে উই ইঁদুরদের উচ্ছেদ হয়েছে।

এখন দেখছি সাতকড়িই আমার শনি। ওর বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি হয়েছি উজবুক। শনৈঃ শনৈঃ উকিলের কাছে এগিয়ে গেছি। না গিয়ে যে উপায় ছিল না। নিরুপায় হয়ে নিরুপদ্রবে ঘুম আসছিল না চোখে। বাড়ী কিনে চোখে সর্ষেফুল দেখছিলাম।

প্রথমে ভাড়াটে জুটেছিল। পাঁচ ঘরে পাঁচ ফ্যামিলি। ঘর পিছু কুড়িটাকা ভাড়া। সেদিকে সস্তায় ঘর ছেড়েছিলাম। ভাড়াও আদায় হয়েছিল মাস দুই। পরে আর হয় নি। চেয়েও পাই নি। তাগাদা করে তাক লেগেছে ভাড়াটেদের কথা শুনে।

—ভাড়া এখন দিতে পারব না বাবু। দিনকাল খারাপ। যা রোজগার করছি তার সবই তো খাওয়া-পরায় বেরিয়ে যাচ্ছে। আগে খেয়ে বাঁচি, পরে ভাড়ার কথা চিন্তা করব।

—বা রে, তা হলে ঘর খালি করে দাও। ভাড়া না দিলে তোমাদের তো রাখব না। আমারও টাকার দরকার।

—তা টাকার দরকার সবারই। আমরাও ঘর দেখছি। ঘর খালি করে সরে পড়ব।

—তা তো পড়বেই। কিন্তু ছাড়ার আগে বাকী বকেয়া মিটিয়ে দাও।

—তা দিতে হবে বৈকি। যখন ছাড়ব তখন দেব। এখন তো ছাড়ছি না।

একসঙ্গে সবাই ভাড়া বাকী ফেলল। কেউ বলল না যে, আসুন, নিয়ে যান ভাড়াটা। একসঙ্গে সবাই বোধ হয় যুক্তি করেছে। ভাবলাম, ওরা সবাই বেকুব। তা না হলে এমন বেআইনি কাজ করে? ঘরে বাস করব অথচ ভাড়া দেব না,—এ কেমন কথা? মামলা করলে উঠতে হবে। ঘর ছেড়ে পালাতে পথ খুঁজবে। আর ঘরই বা পাবে কোথায়? মামলা-হামলায় ঘর-ছাড়া হলে কেউ ওদের ঘর দেবে না। পথে বসে মারা পড়বে।

কিন্তু তা হয়নি। আমিই মামলা জুড়ে মালসা হাতে ঘুরপাক খাচ্ছি। মালিকানাও যেতে বসেছে। আইন যে এত আজগুবি তা জানতাম না। আর উকিলরা যে এত কুটিল তাও জানা ছিল না। এখন জাহান্নমে যেতে বসেছি—।

নালিশের আগে নোটিস ছাড়লাম। এক মাসের মধ্যে ঘর না ছাড়লে ঘর খাসে পেতে মামলা রুজু হবে। আর হলও তাই। আইন মাফিক কাজ হল। কিন্তু উচ্ছেদ হল না।

উমেশ উকিল বলেছিল—শুধুমাত্র ভাড়া বাকীর গ্রাউণ্ড দেখালে ওদের খেদান যাবে না। সেই সঙ্গে বলতে হবে, ঐ ঘরে আমি বাস করব।

—যা বাবা, আমার যে বাসের ঘর রয়েছে। বাঁশ ঝাড়ের ধারে ঐ যে পাকা বাড়ী,—ওটাই তো আমার। ওঘর ছেড়ে এঘরে কেন বাস করব?

—তা হোক, তা হলেও তা জানাতে হবে। ডিফল্টার এবং বোনাফাইড্ রিকোয়েরমেন্ট এই দুই গ্রাউণ্ড আর্জিতে লিখতে হবে।

তাও লিখা হল। আর্জি বেশ আঁটসাট করে পেশ

করলাম। কিন্তু ভাড়াটেরা উঠল না। হাকিমের হুকুম হল, এদের উচ্ছেদ হলে এরা সব যাবে কোথায়? বাড়ীওয়ালার তো বাস করার বাড়ী আছে। এদের তা নেই। নিজস্ব বাড়ী না থাকায় ভাড়াবাড়ীতে বাস করছে। অভাবে পড়ে ভাড়া দিতে পারেনি বলে কি বাসেরও অভাব হবে? কিস্তি করে বাকী ভাড়া শোধ করুক।

হাকিমের রায় দেখে উকিলের রা পাল্টে গেল। বললে,—আজকাল এই রকমই আইন হয়েছে। ভাড়াটে তাড়ান সহজ নয়।

আমি তো অবাক্! বলি, সে কি মশায়, আগে তো ওকথা বলেননি। মামলা দায়েরের আগে যখন দায়ে পড়ে আপনার কাছে ছুটে গেছলাম, তখন বলেছিলেন ভাড়াটেরা নির্ঘাৎ উঠবে। ভাড়া বাকী করলে নিস্তার নেই। উঠতে বাধ্য। কিন্তু এখন আপনার উল্টো কথা যে!

উষ্মাপ্রকাশ করে উমেশ উকিল বলেন,—আমি কি করব বল? আইন আমি হাকিমকে দেখিয়েছি। কিন্তু তা যদি সে দেখেও না দেখে তাহলে আপিল করতে হয়। আর আপিলে তোমার জিৎ হবেই।

—না, আর জিতে দরকার নেই। তার চেয়ে আপিল না করে ওদের সঙ্গে আপোষ করি গে।

কিন্তু আপোষ করব কার সঙ্গে? ওদের পাঁচ ঘরের তিন ঘর পালিয়েছে। ঘর খালি। বাকী দুঘরে যারা আছে তারা বলে বাড়ীটা আমাদের দু'হাজার টাকায় বেচে দিন।

সাতকড়ির তো সাক্ষাৎ নেই। আমার এক বন্ধু বলে,—এছাড়া উপায় কি? এখনকার দিনে সম্পত্তির কোন দামই নেই দেখছি—।

তাই ভাবছি। আর ভাবতে গিয়ে সম্পত্তি কথার উৎপত্তির একটা হদিস পাই। "সম" আর "পতি" এই দুটি শব্দের মিলনেই বোধ হয় সম্পত্তি কথার উদ্ভব হয়েছিল। তার কারণ, নারীর পতির সম সম্পত্তির দরদ ছিল সে যুগে। কিন্তু এখন যুগের পরিবর্ত্তনে সম্পত্তির দাম নেই। ওর আদর-কদরও পরিবর্তিত উৎপত্তির উক্তিও সেই সঙ্গে ওলট-পালট হয়ে গেছে এখন বলব, 'সঙ' আর 'পতি' এই দু'টি শব্দের মিলনেই সম্পত্তি কথার উদ্ভব। অর্থাৎ সম্পত্তি এখন সঙ্ সাজার সামিল।

দেখছি কাঠামো ঠিকই আছে। শুধু কাঠের পরিবর্ত্তন।

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মহাত্মার বিবৃতিপাঠ শেষ হলে জজ সাহেব গান্ধীজিকে সম্বোধন করে বললেন—"আপনি আপনার দোষ স্বীকার করে আমার কাজ একভাবে সহজ করে দিয়েছেন। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে আমি এ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যক্তির বিচার করেছি এবং পরে বিচার করার সম্ভাবনা আছে, আপনি সেই সকল ব্যক্তিদের থেকে ভিন্ন শ্রেণীর লোক এবং এটাও অস্বীকার করা যায় না যে -আপনার দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে আপনি একজন দেশপ্রেমিক এবং বড় নেতা এবং এমন কি যাঁরা রাজনীতিতে আপনার মতের সমর্থক নন তাঁরাও আপনাকে উচ্চ আদর্শের মানুষ বলে গণ্য করেন এবং আপনি উচ্চধরণের এমন কি সাধুর জীবন যাপন করেন বলে বিশ্বাস করেন।

"আমি আপনার একটি চরিত্র সম্বন্ধেই আলোচনা করব। জজ হিসাবে আমি আপনার একটি দিকই দেখব। আপনি নিজ স্বীকারোক্তিতে আইন ভঙ্গ করেছেন যা আপনার বিরুদ্ধে ভয়ানক অপরাধ বলে গণ্য জজ হিসাবে আমার কর্তব্য সে সম্বন্ধে বিচার করা। আমি একথা ভুলিনি যে আপনি বরাবর হিংসার— বিরুদ্ধে প্রচার করে এসেছেন এবং আমি এ কথাও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছি যে আপনি অনেক ক্ষেত্রে হিংসা প্রতিরোধ করতে যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু আপনার রাজনৈতিক প্রচার এবং যাদের নিকট তা করা হয়েছে তাদের স্বভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি করে বিশ্বাস করতে থাকলেন যে তার অনিবার্য্য ফল হিংসাত্মক কার্য্য হবে না তা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

জজ সাহেব আরও বললেন যে, সকলে একথা স্বীকার করবেন যে, কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গান্ধীকে মুক্ত রাখা তিনি অসম্ভব করে তুলবেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্বে এই একই ধারানুসারে বালগঙ্গাধর তিলকের বিচার হয়েছিল, তখন তিলকের প্রতি কি করা হয়েছিল এবং বর্তমানে গান্ধীর প্রতি কি করা হবে তা তিনি তুল্যভাবে বিবেচনা করেছেন এবং জানালেন যে, তিলকের প্রতি যে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি গান্ধীর প্রতি সেই দণ্ডাদেশই দেবেন অর্থাৎ ৬ বৎসরের বিনাশ্রমে কারা-বাস।

দণ্ডাজ্ঞার পর জজ সাহেব গান্ধীজিকে লক্ষ্য করে বললেন যে "ভারতবর্ষের ঘটনা প্রবাহে যদি কারা-বাসের মেয়াদ হ্রাস করা এবং আপনাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় তা হলে আমার অপেক্ষা কেউ বেশী সন্তুষ্ট হবে না।"

ব্যাংকারের প্রতি ১ বৎসরের বিনাশ্রমে কারা-বাস ও এক হাজার টাকা জরিমানার হুকুম হল।

দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির পর মহাত্মা গান্ধী দাঁড়িয়ে বললেন যে "যেহেতু আপনি পরলোকগত লোকমান্য তিলকের বিচারের সহিত আমার বিচারের তুলনা করে আমাকে সম্মানিত করেছেন সেই হেতু আমি এই বলতে চাই যে, তাঁর নামের সহিত যুক্ত হওয়া আমি সম্মানজনক বলে মনে করি। আমি এই শাস্তিকে লঘু শাস্তি বলে গণ্য করছি। আদালত সম্বন্ধে আমি এই বলতে চাই যে, এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করিনি।"

জজ সাহেব বিচারকক্ষ ত্যাগ করার পর—যাঁরা কক্ষে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই মহাত্মার নিকট গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

স্তর টমাস স্ট্রংম্যানও সহাস্ত মুখে—মহাত্মাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন।

মহাত্মা গান্ধীকে যারবেদা জেলে নিয়ে গিয়ে সেখানে আবদ্ধ করা হল।

এই ভাবে একটি ঐতিহাসিক বিচারের পরিসমাপ্তি ঘটল।

মহাত্মা গান্ধীকে যারবেদা জেলে সাধারণ কয়েদীর মত রাখা হয়েছিল। জেলে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ-কারের যে বিবরণ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে, এই সাক্ষাতের সময় যখন জেল সুপারিন্‌টেনডেন্ট্‌ চেম্বারে বসে ছিলেন তখন মহাত্মা গান্ধীকে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। প্রতিদিন তাঁর খাবার জন্য একবার ছাগলের দুধ ও রুটি দেওয়া হত। তাই তিনি দুবেলা খেতেন। যদিও একই কারাগারে ব্যাংকার বন্দী ছিলেন তথাপি তাঁর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি মহাত্মাকে দেওয়া হয়নি। নির্জন কারাবন্দীদের জন্য নির্মিত একটি সেলে তাঁকে রাখা হয়েছিল এবং রাত্রে সেই সেলের দ্বার রুদ্ধ করে তালাবদ্ধ করা হত। তাঁকে তাঁর নিজের বিছানাপত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি। ব্যবহার করার জন্য মাত্র দুইটি কম্বল দেওয়া হয়েছিল। মাথা রাখার জন্য কোন বালিশ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। তাঁকে জেলের মগ ও ডিশ ব্যবহার করতে হত। পড়ার জন্য কোন গ্রন্থ এমন কি ধর্মগ্রন্থ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি, খবরের কাগজও তিনি পড়তে পেতেন না। অবশ্য উর্দ্দু শিখবার জন্য তাঁকে লিখবার সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেই সময় নিজ চেষ্টায় উর্দ্দু শিখেছিলেন। রাজাগোপালাচারীর মতে মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, যদিও সুপারিনটেনডেন্টের মতে তাঁর ওজন বেড়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করতে মহাত্মা রাজাগোপালচারীকে নিষেধ করেছিলেন।

॥ ৩ ॥

মহাত্মার কারাদণ্ডের পর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। অসহযোগ প্রচারের জন্য তিনি দেশময় পরিভ্রমণ করে বৃহৎ বৃহৎ জনসভায় সকলের নিকট অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে আবেদন জানাতে লাগলেন। কোন কোন স্থানে তাঁর জন্য আয়োজিত সভা কর্তৃপক্ষ জোর করে বন্ধ করে দিল।

বোম্বাই শহরে ৩১শে মার্চ একটি জনসভায় মালবীয়জি ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ পালন করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন এবং ১৩ই এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করলেন। তাঁর আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। দেশের সর্বত্র জাতীয় সপ্তাহ পালিত হল এবং ১৩ই এপ্রিল পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হল।

১৫ই এপ্রিল চট্টগ্রামে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ঐ সম্মিলনে যোগদান করার জন্য কলকাতার প্রতিনিধিরা একটি ষ্টীমার চার্টার করেন। সভানেত্রীসহ আমরা সকলে চাঁদপাল ঘাটে ষ্টীমারে চড়ে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে কর্ণফুলী নদীতে প্রবেশ করে ঐ নদীর তীরে অবস্থিত চট্টগ্রাম শহরে উপস্থিত হয়েছিলাম।

ঐ সভায় সভানেত্রী অভিভাষণে বলেছিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোক তাদের ন্যায্য প্রাপ্য না পাচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের সমুদয় কাজে—তা ভালই হোক বা মন্দই হোক—বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অসহযোগীদের বিধান সভায় প্রবেশ করা প্রয়োজন।

অনুরূপ মত বিদর্ভের অমরাবতী ও আকোলার সভাতেও প্রকাশ করা হয়েছিল।

১১ই মে তারিখে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু জেলে তাঁর পিতার সহিত সাক্ষাতের সময় গ্রেপ্তার হন।

দেশের বর্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী তাদের একটি সভা ৭ই জুন আহ্বান করে।

ঐ সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর তরফ থেকে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তাতে প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার কথা ছিল। বলা বাহুল্য প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

বাংলার একজন সদস্য ১লা সেপ্টেম্বর থেকে আইন অমান্য শুরু করার প্রস্তাব করেন। তাও অগ্রাহ্য হয়।

আইন অমান্য সম্বন্ধে দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট রিপোর্ট দেওয়ার জন্য একটি আইন অমান্য তদন্ত কমিটী গঠন করা হল। তার সদস্য হলেন হাকিম আজমল খাঁ, মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, কস্তুরিরঙ্গ আয়েঙ্গার ও ডাঃ এম্. এ. আনসারী।

॥ ৪ ॥

এদিকে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনেরও তোড়-জোড় চলতে লাগল!

রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য গত আমেদাবাদ কংগ্রেসে পরবর্তী কংগ্রেসের স্থান নির্দেশ করা সম্ভবপর হয়নি। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার ভার অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী অথবা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর উপর অর্পিত হয়েছিল। এপ্রিল মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী কলকাতার অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করে, পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশন হবে বিহার প্রদেশে এবং স্থান নির্বাচন করবে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী। তদনুসারে মে মাসে দীপনারায়ণ সিংহের সভাপতিত্বে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভা গয়াতে আহুত হয়। ঐ কমিটী স্থির করে, কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য গয়া সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। উক্ত কমিটী কংগ্রেসের জন্য একটি অভ্যর্থনা কমিটী গঠন করে। অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হন ব্রজকিশোর প্রসাদ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

বেরার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গয়া কংগ্রেসের সভাপতির জন্য ১৫ই জুন অরবিন্দ ঘোষ, সি আর দাশ, এন্ সি কেলকার ও ডাঃ মুঞ্জের নাম সুপারিশ করে অভ্যর্থনা সমিতির নিকট পাঠায়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী—২৮শে জুন সি আর দাশ, এস্ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম সুপারিশ করে।

রাজপুতানা, মধ্যভারত ও আজমীর মাড়োয়ারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলি সি আর দাশ, গুরদিত সিং ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম সুপারিশ করে।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সুপারিশ করে সি আর দাশ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী ও আব্বাস তায়েবজীর নাম।

যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী, কেরল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ও হিন্দুস্থানী মধ্যভারত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এবং তামিলনাড়ু কংগ্রেস কমিটীগুলি একমাত্র সি আর দাশের নাম সুপারিশ করে অভ্যর্থনা সমিতির নিকট পাঠায়।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সভাপতির জন্য মহাত্মা গান্ধী, তাঁকে না পাওয়া গেলে দেশবন্ধু দাশ এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম সুপারিশ করে।

বোম্বাই ও সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীদ্বয় মহাত্মা গান্ধীর নাম এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সি আর দাশের নাম সভাপতি পদের জন্য সুপারিশ করে।

সভাপতির নাম চূড়ান্ত ভাবে স্থির করার জন্য ২৭শে আগষ্ট অভ্যর্থনা সমিতির সভা ডাকা হল। সমিতি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলির সুপারিশ আলোচনা করে চিত্তরঞ্জন দাশের নাম সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করল।

॥ ৫ ॥

ইতিমধ্যে ধরপাকড় চলতেই লাগল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে গ্রেপ্তার হয়ে এক বৎসরের জন্য বিনাশ্রমে কারাগারে প্রেরিত হলেন। ইতিপূর্বে সুভাষচন্দ্র বসু ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আইন অমান্য তদন্ত

কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হল। আইন অমান্য সম্বন্ধে কমিটী মত দিলেন যে, দেশ আইন অমান্য বা ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য এখন প্রস্তুত নয় তবে তাদের মতে সীমাবদ্ধ আইন অমান্য আরম্ভ করা যেতে পারে।

কাউনসিলে প্রবেশ সম্বন্ধে কমিটী দ্বিধাবিভক্ত হল। হাকিম আজমল খাঁ, মতিলাল নেহেরু ও বিঠলভাই প্যাটেল আইনসভাগুলি দখল করে গভর্ণমেন্টকে অকর্মণ্য করার জন্য মত দিলেন। অপর পক্ষে রাজাগোপালাচারী, কস্তুরিরঙ্গ আয়েঙ্গার এবং ডাঃ এম্ এ আনসারী কাউনসিল বর্জন করার পক্ষে মত দিলেন।

উভয় দলই নিজ নিজ মত প্রচারের জন্য দেশময় ভ্রমণ করতে লাগল। দেরাদূনে (যুক্তপ্রদেশ) আহুত প্রাদেশিক সম্মিলনীতে ১লা নভেম্বর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বললেন যে, কংগ্রেস তিনটি বয়কট সম্বন্ধে পুনর্বিচার করতে প্রস্তুত আছে এবং প্রকৃতপক্ষে পুনর্বিচার করছে।

দেশবন্ধু দাশ অমরাবতী থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও বিঠলভাই প্যাটেলের মত সমর্থন করে কাউনসিলে প্রবেশের পক্ষে মত দিলেন।

এই মতানৈক্যের জন্য অসহযোগীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। যাঁরা কংগ্রেসের অসহযোগের নীতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চান তাঁদের নাম হল "নো-চেঞ্জার" আর যাঁরা পুরাতন নীতি ত্যাগ করে কাউনসিলে প্রবেশ করার পক্ষে তাঁদের নাম হল "প্রো-চেঞ্জার"।

আইন অমান্য তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট আলোচনার জন্য ২৪শে নবেম্বর অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর একটি সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় কাউনসিলে প্রবেশের স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। স্বামী সত্যদেব বল্লভভাই প্যাটেলকে সমর্থন করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মূল প্রস্তাব সমর্থন করে তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ দীর্ঘ ভাষণ দেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এ বিষয়ে মতৈক্য আনার জন্য সভা মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করেন। অবশেষে গয়া কংগ্রেস পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের মীমাংসা মুলতুবি রাখা হল।

এই সকল ঘটনা যখন হচ্ছে তখন উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বহুস্থানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছিল। দিল্লীতে আহুত খিলাফৎ কনফারেন্সে কতকগুলি মুসলমানের কার্য্যকলাপের বিশেষতঃ মন্দির, গুরুদ্বার, গুরুগ্রন্থসাহেব পোড়ানো, মেয়েদের অপহরণ ও শান্ত নাগরিকদের উপর আক্রমণের নিন্দা করা হয়।

এই রকম পটভূমিকায় গয়া কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

॥ ৬ ॥

নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, কন্যাদ্বয়, শ্যালক সুরেন্দ্র নাথ হালদার এবং সুভাষচন্দ্র বসু ও একদল বাংলার প্রতিনিধিসহ ট্রেনে রওনা হয়ে ২১শে ডিসেম্বর গয়ায় পৌছান। ঐ ট্রেনেই পথে হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত উঠেছিলেন। ট্রেন গয়া ষ্টেশনে পৌছুলে প্ল্যাটফরমে অপেক্ষমান দর্শক-দের ভিড়ে প্রতিনিধিদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্ল্যাটফরমে খদ্দরশোভিত স্বেচ্ছাসেবকগণ মোতায়েন ছিল।

'মহাত্মা গান্ধীকি জয়', 'দেশবন্ধু কি জয়' ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দেশবন্ধু দাশ সদলবলে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে অবতরণ করলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ দেশবন্ধুকে পুষ্পমাল্যে শোভিত করলেন।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর নির্বাচিত সভাপতি ও শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে একটি ল্যাণ্ডোতে বসিয়ে সুসজ্জিত পথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হ'ল। রাস্তাগুলির উভয় পার্শ্বে সভাপতিকে দেখার জন্য অগণিত জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা মুহুমুর্হু হর্ষধ্বনি দ্বারা সভাপতিকে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

দেশবন্ধুর গাড়ীর পেছনের গাড়ীতে ছিলেন হাকিম আজমল খাঁ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। আর যাঁরা শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিলেন তাঁরা হলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দেশবন্ধুর অন্যতমা ভগ্নী শ্রীমতী উর্মিলা দেবী ও দীপনারায়ণ সিংহ।

শোভাযাত্রা করে সভাপতিকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান স্থানীয় জমিদার শ্যামবাবুর গৃহে নিয়ে যাওয়া হল।

পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় এবারও আমি রাজশাহী জেলা কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে বাংলার প্রতিনিধি স্বরূপ কংগ্রেসে যোগ দেই। বাংলার প্রতিনিধিদের একটি অংশের জন্য লুপ লাইনের (ভায়া কিউল) গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটি সুবৃহৎ তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা হয়েছিল। আমরা ২১শে ডিসেম্বর রাত্রে রওনা হয়ে পরদিন প্রাতঃকাল প্রায় ৮টার সময় গয়া স্টেশনে পৌছলাম।

আমাদের কামরায় অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন কুমিল্লার প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা বসন্ত কুমার মজুমদার ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার। বসন্তবাবুর তাঁর স্ত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি ছিল। যখনই কোন ষ্টেশনে ভাল খাবারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল তখনই তা কিনে হেমপ্রভা দেবীকে পরম সমাদরে খাওয়াতেন। একটি ষ্টেশনে গভীর রাত্রে মালাই বিক্রী হচ্ছিল। বসন্তবাবু স্ত্রীর জন্য তা কিনলেন কিন্তু তখন হেমপ্রভা দেবী গভীর নিদ্রাভিভূতা। তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁর শায়িত অবস্থায় বসন্তবাবু নিজ হাতে স্ত্রীর মুখে মালাই তুলে দিতে লাগলেন। আমাদের উপস্থিতি বসন্তবাবু ভ্রুক্ষেপও করলেন না। আমরা সকলে সকৌতুকে সেই দৃশ্য উপভোগ করলাম। হেমপ্রভা দেবীকে আমি প্রথম দেখি অসহযোগ আন্দোলনের কিছু পূর্বে মেদিনীপুরে ফজলুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশনের সময়। বসন্তবাবু স্ত্রীকে সঙ্গে করে কনফারেন্সে গিয়েছিলেন। তখন তিনি অবগুণ্ঠিতা লজ্জাশীলা বাংলার বধূ ছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দর মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢেকে রাখতেন। অপরিচিত কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেই হেমপ্রভা দেবীই প্রকাশ্য জন-সভায় বক্তৃতা দিতেন। তখন আমি তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলাম।

আমার বন্ধু ও সহপাঠী সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আমাদের কামরায় ছিলেন। তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন মহিলা কর্ম মন্দিরের শ্রীমতী উমা দেবী। সেদিনের যাত্রা-সঙ্গিনী পরে সত্যেনের জীবন-সঙ্গিনী হন।

গয়া ষ্টেশনে আমাদের ট্রেণ পৌছুলে ষ্টেশনে অপেক্ষ-মান স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের বাংলা প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট ছাউনিতে নিয়ে গেল।

রেল ষ্টেশন থেকে ৫ মাইল ও সহর থেকে ২ মাইল দূরে সরযূ নদীতীরে একটি আম্রকাননে শোভিত প্রশস্ত স্থানে প্রতিনিধিদের বাসের জন্য প্রায় দুই বর্গ মাইলের বৃত্তের মধ্যে তিনটি নগর নির্মিত হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জন্য নির্মিত শহরের নাম রাখা হয়েছিল স্বরাজ্যপুরী। খিলাফৎ কনফারেন্সের প্রতিনিধিদের ও আকালী শিখদের জন্য নির্মিত শিবিরের নাম রাখা হয়েছিল যথাক্রমে খিলাফৎ নগর ও আকালীগঞ্জ।

স্বরাজ্যপুরীতে বহু রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। রাস্তার দুধারে প্রতিনিধিদের বসবাসের জন্য বাঁশের বেড়া ও খড়ের ছাউনী দিয়ে নির্মিত কুটীরগুলি বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছিল।

অতি প্রত্যুষে বিউগলের ধ্বনির সঙ্গে দলে দলে স্বেচ্ছসেবকদের কুচ-কাওয়াজের আওয়াজ এবং বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও শ্লোক আবৃত্তি সহ—স্বরাজ্য-পুরীর রাস্তা ও গলিগুলির ভিতরে শোভাযাত্রার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যেত। প্রত্যহ প্রত্যুষে বিভিন্ন প্রদেশের প্রভাত ফেরীর দল গান গেয়ে ঘুরে বেড়াত। এটা একটা অভিনব অভিজ্ঞতা। এর পূর্বে কংগ্রেসের কোন অধিবেশনের সময় এ রকম দেখিনি। বিশেষত

আকালীদের জাঁকজমক পূর্ণ শোভযাত্রা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বিভিন্ন ব্লকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রুচি অনুসারে রান্না ও খাবার ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দৈনিক ১॥ টাকা খরচে দুবেলার আহার্য সরবরাহ। এ ছাড়া কয়েকটি হোটেলও খোলা হয়েছিল। ছোটখাটো একটি বাজারও বসান হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত পন্থা অনুসারে শৌচাগারের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সারি সারি চটের দ্বারা বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে গভীর গর্ত কেটে পায়খানা নির্মিত হয়েছিল। গর্ত খোঁড়ার সময় যে মাটী তোলা হয়েছিল তা গর্তের পাশেই রাখা হয়েছিল এবং তার নিকট একটি করে ছোট হাতা (শোভেল) রাখা হয়েছিল। শৌচান্তে ঐ শোভেল দ্বারা মাটী তুলে গর্তে ফেলতে হত। এটা খুব সুন্দর স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা।

আমেদাবাদ কংগ্রেসের সময় আমি হলুদ জমির উপর কালো কালো ছাপযুক্ত একটী খদ্দরের লেপ তৈরি করিয়েছিলাম। ও রকম লেপ আর কারও ছিল না। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজনীমোহন উত্তরবঙ্গের অন্যান্য প্রতিনিধি সহ কাটিহারের পথে গয়ায় উপস্থিত হয়ে স্বরাজ্যপুরীতে আমার অনুপস্থিতিতে আমার সেই লেপ দেখেই আমার আস্তানা চিনেছিল এবং সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল।

আমাদের সঙ্গে সুরসিক সুলেখক বিপ্লবী উপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁর কৌতুকময় কথা-বার্তায় সময় বেশ ভাল ভাবেই কেটে যেত।

আমরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে সরযূ নদীতে স্নান করতে যেতাম। সেখানে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ (পরে বিহারের মুখ্য মন্ত্রী) ও অনুগ্রহনারায়ণ সিংহের সঙ্গে দেখা হত। শ্রীকৃষ্ণবাবু ও আমি একই বৎসরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ. পাস করি।

এবার স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ছিল দেড় হাজার। তার মধ্যে বাঙালী ও শিখের সংখ্যাও কম ছিল না।

এবারকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—বহু আদিবাসীর উপস্থিতি। প্রায় পাঁচ শত সাঁওতাল, মুণ্ডা ও ওরাওঁ কংগ্রেসে যোগদান করতে এসেছিল। তারা বহু দূর থেকে, কেউ কেউ ২০০ মাইল দূর থেকে খাবার সঙ্গে করে পায়ে হেঁটে গয়ায় উপস্থিত হয়েছিল।

অত্যুৎসাহী চারজন তামিল যুবক মাদ্রাজ থেকে খালি পায়ে হেঁটে কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যর আশুতোষ চৌধুরী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে গয়া কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁরা সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে জানান যে তাঁদের উপস্থিতিতে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল, লণ্ডনের 'ইনার টেম্প্‌ল্' মহাত্মা গান্ধীর নাম কেটে দিয়ে তাঁর ব্যারিষ্টারির সনদ বাতিল করে দিয়েছে।

ক্রমশঃ

দেশসেবক স্বর্গীয় ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন

ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

জীবন-সায়াহ্নে অতীত জীবনের স্মৃতি একদিকে যেমন অফুরন্ত উপভোগ্য ভাণ্ডার, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণাপ্রদ। স্মৃতিরাজ্যে এমন কতক শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আছেন যাঁদের কথা এখন ভাবলে নিজের জীবনের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। তাঁদের মহত্ত্ব আরও বেশি অনুভব করতে পারি। ময়মনসিংহের স্বর্গীয় ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন মহাশয়ের কথা ভাবলেও আমার এইরূপই অনুভব হয়। তখন তিনি ছিলেন আমাদের সবার কাছে বিপিনবাবু বা ডাক্তারবাবু। এখন দীর্ঘ অপূর্ণ জীবনের দৃষ্টিতে তাঁর কথা যখন ভাবি তখন দেখতে পাই, তিনি ছিলেন নানা গুণসম্পন্ন অসামান্য পুরুষ, সুচিকিৎসক, আদর্শনিষ্ঠ, উদারচিত্ত, পরহিতৈষী, সরলপ্রাণ, দেশভক্ত, জনসেবক।

আজকাল বাংলাদেশে গতযুগের পরলোকগত এমন জন-হিতৈষী অনেক ব্যক্তিরই জন্মদিনে বা মৃত্যুদিনে তাঁদের স্মরণ করার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। কারো বেলায় স্মৃতিরক্ষার অন্য কিছু ব্যবস্থাও হয়েছে। অখণ্ড বাংলার ময়মনসিংহ শহরে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে 'বিপিন পার্ক' ছাড়া ডাক্তার বিপিনবিহারী সেনের স্মৃতিরক্ষার আর কোনো চেষ্টা হয়েছে কি না জানি না। পশ্চিম বাংলায় তাঁর কথা বোধ হয় খুব কম লোকেই জানেন। ইংরেজের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সুদীর্ঘ সাধনায় ভারতের নানা স্থানে কত লোক তাঁদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করে মহাকালে বিলীন হয়েছেন। তাঁদের সাধনার ফল আমরা ভোগ করছি, কিন্তু তাঁদের অনেকেরই নাম পর্যন্ত আমরা জানি না। বিপিনবিহারী এখন তাঁদেরই একজনের মতো। বিভিন্ন সময়ে তিনবার আমার ময়মনসিংহ শহরে থাকার কালে তাঁকে দেখার ও কিছু জানার সুযোগ হয়েছিল। তাই স্মরণ করতে চেষ্টা করছি। তাঁর কথা স্মরণ করতে গিয়ে আমার নিজের ও দেশের যে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁকে দেখেছি সে-সব কথাও এসে পড়ছে।

তাঁকে আমি প্রথম দেখি আমার বাল্যকালে ১৯০৭।১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। পল্লীগ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করে ময়মনসিংহ শহরে পড়তে আসি। দেশগৌরব স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি হয়ে বছর দেড়েক ওখানে পড়ি। তখন স্বদেশীযুগ। বিলাতী জিনিস বর্জন, স্বদেশী শিল্পের পুনর্গঠন, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ও ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সভাসমিতি ও আন্দোলন ইত্যাদি চলছে। এই ভারতীয় জাতীয় জাগরণের পশ্চাতে ছিল তার পূর্ববর্তী কয়েক যুগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা। স্বদেশীযুগের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে তারই প্রভাব স্পষ্ট ছিল। তাঁদের চরিত্র, উচ্চচিন্তা, আত্মত্যাগ ছাত্রসমাজের আদর্শস্থানীয় ছিল। বাংলাদেশে বরিশালের স্বনামধন্য বিপ্লবী শিক্ষাগুরু অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনস্বী যোগী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের প্রভাবেই ছাত্ররা বিশেষ অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু তাঁদের সবারই শিক্ষা ছিল—দেশোদ্ধারের জন্য যেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল চাই, তেমনি চাই শারীরিক বল ও কৌশল।. সেজন্য ছাত্রসমাজে তখন একদিকে ছিল গীতা, চণ্ডী, ব্রহ্মচর্যবিষয়ক পুস্তক ও স্বামী বিবেকানন্দের ওজস্বী প্রবন্ধাদির আদর, অন্যদিকে ছিল শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষা আক্রমণাদির নানা কৌশল শিক্ষার আগ্রহ। প্রায় প্রত্যেক শহরে ও অনেক গ্রামে ব্যায়াম সমিতি হয়েছিল। তাতে ডন,

বৈঠক, কুস্তি, লাঠি, ছোরা, কুচকাওয়াজ ইত্যাদি শিখানো হত। ঢাকার প্রখ্যাত বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসদের অনুশীলন সমিতির একটি শাখা তখন ময়মনসিংহেও হয়েছিল। কিন্তু আমি, বাড়ির বড়ো ছাত্রদের সঙ্গে যেখানে যেতাম তার নাম ছিল 'সাধনা সমাজ।' সেখানেই আমি বিপিনবাবুকে প্রথম দেখি। বোধহয় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী পরিচালকদের একজন ছিলেন।

তখন তিনি যুবক। মাঝারি লম্বা; দৃঢ় গড়ন, সপ্রতিভ মুখশ্রী। বরিশাল থেকে এসে ময়মনসিংহে ডাক্তারি করতে বসেছেন। তখন কলেজ-পাস বেসরকারী ডাক্তারের সংখ্যা খুব কমই ছিল। বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে আচার্য্য অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তাঁর আদর্শ সহকর্মী জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষায় ও সংস্পর্শে তখন বহু যুবক উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের নানাস্থানে সেবাব্রত গ্রহণ করেছিলেন বলে শুনেছি। বিপিনবাবুর ছাত্রজীবনও হয়তো তাঁদের আদর্শেই গঠিত হয়েছিল। ঐ সময়ে ময়মনসিংহে ঐ অঞ্চল থেকেই আরও একজন দেশভক্ত, তেজস্বী ও সুপণ্ডিত লোক ময়মনসিংহে ন্যাশনাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করতে এসেছিলেন স্বর্গীয় অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। এঁরা উভয়েই তরুণদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্নবাবু পরে দীর্ঘকাল কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যাপকরূপেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

দেড় বছর ময়মনসিংহে থাকার পর আমি এক দাদার কাছে কুমিল্লায় ও পরে গৌহাটিতে পড়তে যাই। ছয় বছর পর দুবছর (১৯১৩-১৯১৫) ম্যাট্রিক পড়ার সময় আবার ময়মনসিংহে থাকি। তখন বিপিনবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। ইংরেজ শাসকদের নিপীড়ন-নীতির ফলে দেশপ্রাণ যুবকদের অনেকেই নানা গুপ্তদলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে শাসকহত্যা আর অস্ত্র-লুট ও অর্থলুট চলেছে। নেতৃস্থানীয় অনেক বিপ্লবী তখন রাজবন্দী হয়ে আছেন, বা কারাগারে, বা দ্বীপান্তরে, বা অজ্ঞাতবাসে। ব্যায়ামের বা লাঠি ইত্যাদি খেলার আগেকার সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বত্র গুপ্তচরের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাদের সন্দেহের অতীত হয়ে নিজেদের বাড়িতেই তখন সাধারণ ব্যায়াম করা সম্ভব হত। বিপিনবাবুর কোনও গুপ্ত বিপ্লবীদলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কি না জানি না। দুঃস্থ লোকের চিকিৎসা করাই বোধহয় তখন তাঁর জনসেবার বা দেশসেবার প্রধান কাজ ছিল। সদাশয় সুচিকিৎসক বলেই তাঁকে জানতাম ও দূর থেকে শ্রদ্ধা করতাম; বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ তখনও হয়নি।

সে সুযোগ এসেছিল আরও ছ-সাত বছর পরে, ১৯২১ থেকে ১৯২৪ এর ভিতরে, যখন নিজের জেলায় বছর তিনের কিছু বেশি সময় পল্লীসেবার কাজ করি। তখন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশে এক অভাবনীয় শুভপ্রবৃত্তির বন্যা এসেছিল। তাতে একদিকে লোকের মন থেকে ব্রিটিশ শাসনের ভয়, লোভ ও মোহ ভেসে যাচ্ছিল, আর অন্যদিকে অনেকের মনেই নানা ভাবে দেশের কিছু সেবা করার প্রবৃত্তিও এসেছিল। বিপিনবাবুর চিরাভ্যস্ত স্বভাবগত সেবাবৃত্তি তখন চিকিৎসাক্ষেত্র ছাড়িয়ে আরও নানাদিকে লোকহিতকর কাজে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল। আমাদের মতো স্বার্থলুব্ধ বিদ্যাব্যসনীও দেশের সেই শুভস্রোতে সেবার ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিল। এখন তা স্মরণ করেও মন বিস্মিত ও পুলকিত হয়। যে ঘটনাস্রোতে আমার ঐ সাময়িক ব্যসনমুক্তি সম্ভব হয়েছিল তার সম্বন্ধে এখন এইরূপ স্মরণ হচ্ছে :—

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যখন গান্ধীজির প্রস্তাবে কলকাতাতে কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন আমি ওখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ ক্লাসে পড়াশোনাতে মগ্ন। "পাস করে গবেষণা করব, বিদেশে যাব, শিক্ষা বিভাগে কাজ করব"—এইসব বহুদিনের স্বপ্ন ও বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টা করছি। গান্ধীজির আহ্বানে হাজার হাজার লোক পড়া ছেড়ে, ব্যবসায় ছেড়ে, চাকুরি ছেড়ে দেশের নানা কাজে যোগ দিয়েছে

বা জেলে যাচ্ছে। আমার মনেও আন্দোলন চলছে; কিন্তু পড়াশোনার বাসনাও ত্যাগ করতে পারছি না— বিশেষ করে যখন দেখছি, অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' বলে ছেড়ে দিয়ে, দুচারদিন জেলে থেকে আবার ওখানেই পড়তে আসছে। গান্ধীজি বলছেন—'যারা দেশের কাজ আর কিছু না করতে পার, অন্তত: চরকা চালাও, খদ্দর পর, হিন্দী শেখ।' আমরা কয়েকজন তাই করছি; তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য টাকাও তুলে দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাও করছি। আমাদের ভাইসচ্যান্‌সেলার শ্রদ্ধাভাজন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইংরেজ শাসকদের প্রবল বাধা অমিতবিক্রমে অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তখন প্রথম স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন। সর্বভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়কে তখন দেশের প্রথম ও প্রধান কলা ও বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র করে গড়ে তুলেছিলেন। সাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনায় যাঁরা তাঁর সেই সাধনালব্ধ বিদ্যা-মন্দিরকে অপবাদ দিয়ে নষ্ট করার চেষ্টা করছিলেন, তিনি তাঁদের প্রবল প্রতিবাদ করে আমাদের মানসিক চাঞ্চল্য দূর করছিলেন। এইভাবে আমি পড়াশোনা দোটানায় শেষ করে তারই প্রতিচ্ছবি নিয়ে পরীক্ষাগারে প্রবেশ করলাম—গায়ে নিজের কাটা সুতার তৈরি পাঞ্জাবী আর চাদর, আর হাতে আমার চিরবাসনার আদেশপালিকা লেখনী। এম. এ. পরীক্ষার ফল আশানুরূপই হল। আবার নূতন উৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও পড়াশোনা করতে লাগলাম।

কিন্তু তখন অন্যদিকে গান্ধীজির আন্দোলন দমন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শাসকগণের নিপীড়ননীতি চরমে উঠেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অনেক নেতা কারাগারে কলকাতার পথে খদ্দর নিয়ে বার হওয়াও অপরাধ হয়ে উঠল। দেশবন্ধু-পত্নী শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হলেন, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে লাঞ্ছিত হলেন। আমার দৃঢ়মূল বাসনাও সেই আঘাতে শিথিল হয়ে পড়ল। তার কিছুকাল পূর্বেই বোধহয় ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তখনকার দিনে ভারতীয়র পক্ষে দুষ্প্রাপ্য টাঁকশালের বড়ো চাকরি পেয়েও তা ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় নিজগ্রামে গান্ধীজি-সম্মত গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ঢাকা কলেজে যখন আমরা (১৯১৫-১৯১৭) আই. এ. পড়ি তখন তিনি সেখানে রসায়নে গবেষণা করতেন। তাঁর একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্যা, কঠোর পরিশ্রম, স্বদেশানুরাগ ও সরলজীবন তখনই আমাদের আদর্শস্বরূপ ছিল। তাঁর চাকরি ছেড়ে দেশের কাজে দারিদ্র্যবরণ আর-একটি আদর্শ স্থাপন করল। অন্তত: তিন বছর গান্ধীজির উপদেশমতো পল্লী-সংগঠনের কাজ করার সংকল্প করে আমি ময়মনসিংহে নিজগ্রামে চলে গেলাম। সকলের সমবেত চেষ্টায় অহিংস অসহযোগের দ্বারা দুতিন বছরেই স্বরাজ হবে গান্ধীজি এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন ও সে-মতে কি একটা তারিখও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন; তা ঠিক এখন স্মরণ হচ্ছে না।

শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লদার সঙ্গে আমাদের পূর্বপরিচিত আরও কিছু ত্যাগী ও বিদ্বান্ লোক গ্রামের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের কাজের পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জানতে মাঝে মাঝে তাঁদের কেন্দ্রে (ঢাকা জেলায়) যেতাম। কতকটা সে-মতেই নিজগ্রামে ও আশে পাশে চরকা খাদি ইত্যাদির কাজ করতে লাগলাম; আর সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয়, নমঃশূদ্র বিদ্যালয় ও বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, কৃষকদের জন্য ধর্মগোলা, পঞ্চায়েতী সালিশী বিচার ইত্যাদি গঠনমূলক কাজ চলতে লাগল। সর্ব-সম্প্রদায়ের লোকের তখন দেশের কাজে উৎসাহ জেগেছিল। গান্ধীজির সাধুনেতৃত্বই ছিল তার কারণ, আমরা ছিলাম মাত্র তার প্রতীক।

এইভাবে সব কাজ বেশ চলতে লাগল। ময়মনসিংহের জিলা কংগ্রেস অফিসের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না; প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিছুদিন পর ওখান থেকে প্রস্তাব এল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে, আবশ্যক সাহায্য নিয়ে আরও বড়ো কয়ে কাজ করতে। ওখানকার নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার তখন অপরিচিত, অসহযোগী প্রাক্তন উকিল-মোক্তার। সেজন্য আমার সংকোচ ছিল।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁকে স্বদেশীযুগ থেকেই দেখেছি ও শ্রদ্ধা করেছি। তিনিই ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন। চিকিৎসক হিসাবে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত। শহরে ও চারদিকে জমিদার-বহুল স্থানে তাঁর ব্যবসায় বিস্তার লাভ করেছে। শহরের একপ্রান্তে ব্রাহ্মপল্লীতে তাঁর পাকাবাড়ি, ঘোড়াগাড়ি ও শহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁর ঔষধালয়। দীর্ঘকালের লোকসেবা, সাধুচরিত্র ও স্বদেশানুরাগের জন্য তিনি এমনিই সর্বসাধারণের কাছে সুপরিচিত ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। মহাত্মাজীর আন্দোলনে তাঁর সাত্ত্বিক প্রকৃতিবশে সর্বান্তঃকরণে যোগ দিয়ে তিনি অযাচিত নেতৃত্বও পেলেন। আগের যুগের গুপ্ত বিপ্লবীদেরও কতক হিংসানীতি অন্তরের সহিত ত্যাগ করে, কেউ বা তখনকার মতো কাজের সুবিধা ভেবে, গান্ধীজির প্রকাশ্য বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের একদলের নেতৃস্থানীয় 'মধুদা'ও (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ময়মনসিংহের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতাই তাঁর আবাল্য একমাত্র ধ্যেয় ছিল। তাঁর প্রাক্তন জীবনের অনেকাংশ বন্দীদশাতেই কেটেছিল, প্রচুর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আর অসাধারণ সংগঠনবুদ্ধি ছিল। তিনিই ওখানে কর্ম্মী ও কার্যালয় পরিচালনার নেতৃত্ব পেলেন। ডাক্তারবাবু ও সুরেনবাবুদের প্রস্তাবে আমি সম্মত হয়ে কংগ্রেসের সাহায্য গ্রহণ করলাম। কিন্তু নিজগ্রামেই আমার কাজের কেন্দ্র রইল। শহরে মাঝে মাঝে আসতাম, তখনই ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে দেখা হত। ক্রমশঃ পরিচয় হতে লাগল।

কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁরা আমাকে আরেকটি বড়ো সুযোগ দিলেন যার জন্য আমি তাঁদের এখনো কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তখন গান্ধীজির প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল গুজরাতের প্রধান নগর আহমেদাবাদের অপর পাশে সবরমতী নদীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রমে। মনে পড়ছে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তাঁর আশ্রমে খাদিকর্মীদের সবরকম শিক্ষার জন্য ছয় মাসের একটা ভালো ব্যবস্থা হয়েছিল। আমাকেও তাঁরা সেখানে পাঠালেন। বর্মা থেকে, গুজরাত ও নেপাল থেকে সিংহল পর্য্যন্ত বিশাল ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলের দুচারজন করে কর্মী ঐ শিক্ষার জন্য এসেছিলেন। তাঁদের নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা রীতি, তাঁদের আগেকার জীবনের শিক্ষা ও অভ্যাস নানা স্তরের ছিল। এইসব বিভেদ সত্ত্বেও একই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে, আশ্রমের সকল নিয়ম পালন করে, এক সঙ্গে আট ঘণ্টা কায়িকশ্রমবহুল শিক্ষা গ্রহণ করে ও ছ মাস একত্র বাস করে আমাদের বিচিত্র দেশকে জানার অপূর্ব সুযোগ হয়েছিল। অখিল ভারতীয় দৃষ্টিরও আমার তখনই প্রথম উন্মেষ হয়েছিল। গান্ধীজির পরিবারের এবং ঘনিষ্ঠ অনুযায়ীদের আদর্শ ও দৈনন্দিন আচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগও হয়েছিল। সেই আশ্রম-জীবনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনো জীবনে প্রতিদিন অনুভব করি।

গান্ধীজির আশ্রম থেকে খাদির কাজের শিক্ষা নিয়ে ময়মনসিংহ ফেরার পর শহরেই কংগ্রেসের কার্যালয়ে আমার কাজের কেন্দ্র হল। ডাক্তারবাবু তখন শহরের কংগ্রেস-কর্মীদের একাধারে চিকিৎসক, বন্ধু ও বিপদে আশ্রয়। স্বদেশীযুগ থেকেই তাঁর চিকিৎসালয় দুঃস্থদের জন্য অবারিত ছিল। অসহযোগের সময়ে তাঁর সেবার পরিধি আরও বেড়ে গেল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ও তাঁদের আত্মীয়-পরিচিত বহু লোকের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা ও ঔষধ দেওয়া তাঁর এক বড়ো কাজ হল। ধনীদের চিকিৎসা করে যা পেতেন তা দিয়েই কোনো প্রকারে চালাতেন মনে হয়।

গৃহস্থ হয়েও ডাক্তারবাবু আচরণে সন্ন্যাসীই ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা স্মরণ করছি তার অনেক আগেই তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। তাঁর নিজ পরিবারে তখন মাত্র দুটি মাতৃহীন ছেলে, মানিক ও পুলিন, আর তাদের দিদিমা। কিন্তু তাঁর বাড়ি ছিল অনেক নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরন্নের অন্নশালা। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন; আহারও ছিল সাদাসিধে। কিন্তু সবাইকে নিয়ে

একসঙ্গে বসে খেতে তিনি ভালোবাসতেন। আমারও তাঁর সঙ্গে বসে পরমতৃপ্তিতে নিরামিষ আহার করার সৌভাগ্য হয়েছে। খাবার সময়ে তাঁর কাছে গরীবের খেসারির ডালের নাইট্রোজেন-ঘটিত পুষ্টিকর উপাদানের কথাও শুনেছি।

তাঁর ছেলেদুটির দেখাশোনা দিদিমাই বোধহয় করতেন। কিন্তু অন্য বিষয়ে তারা যেন তাঁর সেই ধর্মশালার আশ্রিতের মতোই ছিল। তখন ডাক্তারবাবুদেরই উদ্যোগে শহরে, প্রথমে স্বদেশীযুগে, পরে আবার অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে জাতীয় বিদ্যালয় হয়েছিল, নিজের ছেলেদেরও তাতেই পড়তে দিয়েছিলেন। তাঁর অকপট চরিত্রের এটাও একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ছিল। বড়ো হলে মানিককে যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিদ্যালয়ে ও পুলিনকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠিয়েছিলেন।

আমাদের কাজের জন্য যখন অর্থসংগ্রহের প্রয়োজন হত তখন ডাক্তারবাবু আমাদের নিয়ে সদাশয় ধনীদের কাছে যেতেন। তাঁর সঙ্গে একবার মুক্তাগাছার কোনও জমিদার-বাড়িতে ও আরেকবার গৌরীপুরের জমিদার-বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি, আমাদের মোটা খদ্দরধারী ডাক্তারবাবুর সেখানে কত সমাদর। দীর্ঘকালের পরীক্ষিত দেশসেবক বলে ডাক্তারবাবু উদারচিত্ত ধনীদের বিশেষ বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁকে নিরাশ হতে হত না। কংগ্রেসের নেতাদের কাছে তাঁর আদরের এটাও একটা কারণ ছিল। তাঁর সাহায্য অনেকেরই কাম্য ছিল।

রাজনীতিক্ষেত্রে বাগ্মিতা, দলগঠন, কূটনীতি ও অন্য যেসব কৌশল চির-প্রচলিত, তখনকার নেতাদের মধ্যেও সে-সবের একান্ত অভাব ছিল না। কিন্তু আমাদের ডাক্তারবাবুকে জনসভায় বক্তৃতা দিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দলগঠনের স্পৃহা বা সময় তাঁর ছিল না। কূট কৌশল তাঁর প্রকৃতিরই বিরুদ্ধ ছিল। সেবালব্ধ শ্রদ্ধাই ছিল তার অযাচিত নেতৃত্বের ভিত্তি। তাই তাঁর নেতৃত্ব দলগত ছিল না; ব্যক্তিগতই ছিল। উপকৃত ও গুণগ্রাহী বহু ব্যক্তির হৃদয়েই শ্রদ্ধার আসন তাঁর ছিল।

তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেখিনি। সমাজের উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। সমাজের কাজে সাহায্যাদিও করতেন শুনেছি। তাঁর মুখে স্বধর্মের স্তুতি বা পরধর্মের নিন্দা শুনিনি। তাঁর বাড়িতে জাতিধর্মনির্বিশেষে অনেক অসহায় লোকই আশ্রয় পেয়েছে। নিজের ধর্মে দৃঢ় আস্থা ও নিষ্ঠা রক্ষা করে যে সব উদার গুণের অনুশীলন করলে যে কোনো ধর্মের লোক সকল ধর্মের লোকের শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে, ডাক্তারবাবুর চরিত্রে ও আচরণে সে-সব অনেক গুণই ছিল। যে-কয়জন খাঁটি ব্রাহ্মের সংস্পর্শে এসে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জন্মেছিল, তিনি তাঁদেরই একজন ছিলেন।

মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের শেষ দিকে, বাংলাদেশেই প্রধানতঃ, স্বরাজ্যদলের উদ্ভব হল। কংগ্রেসের গঠনমূলক সেবার ক্ষেত্র পরিবর্তনবাদী দেশবন্ধু-পক্ষ ও অপরিবর্তনবাদী গান্ধী-পক্ষের আত্মকলহের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। আমার সাময়িক ও অপরিপক্ব ত্যাগবুদ্ধি দলগত হিংসাদ্বেষের তরঙ্গে আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে খাদির কাজে ঘুরে স্বাস্থ্যভঙ্গও ঘটেছিল। বোধহয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি শহর ছেড়ে নিজ গ্রামে চলে গেলাম। কিছু সুস্থ হয়ে স্থান পরিবর্তন ও গবেষণার একটা সুযোগ পেয়ে বোম্বাই প্রদেশে গেলাম। তিন-চার বছরের অভিজ্ঞতায় রাজনীতিক্ষেত্রে স্বদেশসেবা আমার পক্ষে অনুকূল নয়, স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম। 'স্বধর্মে'র অনুযায়ী গবেষণা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের বাইরে কর্মজীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছি, তাই ময়মনসিংহের সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ ছিল না।

ডাক্তারবাবু দীর্ঘকাল ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির পরিচালনার কাজেও পরিশ্রম করেছেন। চিকিৎসার কাজে শহরের নানাস্থানে যাবার সময় সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতেন।

মিউনিসিপালটির কাজ তখন তাঁর জনসেবার একটা নূতন ক্ষেত্র হয়েছিল। কিন্তু তাঁর উদারতার ফলে তাঁর ঔষধালয়টি নাকি 'দাতব্যে'র চাপে অচল হয়েছিল। তাঁর ব্রাহ্মপল্লীর বাড়িটিও একবার বন্ধক দিয়েছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর চালের দাম বৃদ্ধি পেলে অধিকমূল্যে চাল সংগ্রহ ক'রে দরিদ্র সাধারণের জন্য স্বল্পমূল্যে চাল দিতে গিয়ে।

গৃহীর পক্ষে এমন ত্যাগবহুল দেশসেবা ও জনসেবার জীবন কত কঠিন গৃহীমাত্রেই তা জানেন। দেশের জন্য ক্ষণিক সাহসিকতার কাজে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের তুলনায় এমন ত্যাগী লোকের চরিত্রবল ও সাহস অন্যপ্রকারের হলেও উৎকর্ষে ও পরিমাণে কোনো অংশেই কম নয়। দীর্ঘজীবনের প্রতিদিনই তাঁর নানা ভোগ-বাসনা ও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়। এই বিজয়ের অনেক সময়েই একমাত্র সাক্ষী অন্তরাত্মা ও একমাত্র পুরস্কার আত্মতৃপ্তি। পরের উপকার দৈনিক জীবনে যাঁরা দীর্ঘকাল করেন তাঁদের ভাগ্যে প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই বেশি জোটে। উপকৃত আরও উপকার চায়, উপকারার্থীর সংখ্যাও বাড়ে। সবাইয়ের জন্যে করা সম্ভব হয় না। তাই বঞ্চিত ও নিন্দুকের সংখ্যাও বাড়ে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। আমাদের ডাক্তারবাবুর যে চেহারা আমার মনে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে তাতে বিরক্তির কোনো আভাস নেই; প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখে তাঁর ত্যাগময় জীবনের আত্মতৃপ্তিই যেন ফুটে উঠেছে।

দূর দিগন্তের গাছপালা ও বাড়িঘর যা চোখে পড়ে তাদের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই চোখে আসে না। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন্‌টি বড়ো কোন্‌টি ছোটো তা সহজে ধরা পড়ে, যা কাছ থেকে ধরা শক্ত। দূর অতীতের স্মৃতির চোখে দেখা লোকদের বেলায়ও অনেকটা তাই হয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে নানা অবস্থার ও নানা লোকের ভিতরে ডাক্তার বিপিনবিহারী সেনকে যেমন আমি দেখেছি তার অনেক কিছুই এখন স্মৃতির চোখে অস্পষ্ট ও ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মহত্ত্ব আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাঁর সমগ্র জীবনের উচ্চ আদর্শ ও ঊর্ধ্বমুখী কর্মপ্রবৃত্তিগুলি এখন বিশেষভাবে অনুভব করছি। এই স্মৃতিতর্পণ তাই এত আত্মতৃপ্তিরও কারণ হয়েছে।

———

প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র

চিত্তরঞ্জন দাস

সফল যুদ্ধ

প্রবাসীর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বর্তমান চিত্রের তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হয়েছিল, পাক-ভারত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং উহা যত শীঘ্র শুরু ও শেষ হয়, ভারত এবং বাংলাদেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কার্য্যতঃ হয়েছে ঠিক তাই। যুদ্ধ শুরু হলো দোসরা ডিসেম্বর, পনরই হ'ল শেষ। দখলদার বাহিনী অস্ত্র এবং আত্ম সমর্পণ করলো ষোলই ডিসেম্বর, ৭১। ফলে পাক-কবল-মুক্ত বাংলা-দেশ হ'ল স্বাধীন ও সার্বভৌম, আর ভারতের পক্ষে হ'ল এক কোটি শরণার্থী সমস্যা সমাধানের একটা বাস্তব সুরাহা।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অতুল্য অবদান

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশ সফর অন্তে তাঁর নিকট থেকে ভারত ও বাংলা দেশের জনগণ প্রকৃত পক্ষে যে সিদ্ধান্ত আশা করেছিলেন তিনি তখন সেই সঠিক সিদ্ধান্ত ও সক্রিয় পন্থা গ্রহণ ক'রে উভয় দেশের জনচিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ব্যাপারে শুধু ভারত ও বাংলাদেশ কেন, বিশ্বের সর্বত্রই আজ শ্রীমতী গান্ধীর এবম্বিধ সৎসাহস ও মানবিকতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনের নিমিত্ত প্রশংসা-মুখর। বিশ্ব ইতিহাসে তিনি এখন ভারতের অবিসম্বাদী এক মহীয়সী নারী তথা "ভারত রত্ন"। শ্রীমতী গান্ধীর পরম শত্রুও সম্ভবত আজ আর কেহ এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করবেন না। স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের সুকঠিন সংগ্রামে ভারত তথা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অতুলনীয় অবদান বিশ্ব-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকবে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ

পূর্বপ্রদর্শিত চিত্রে উল্লেখ ছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। বিশ্বের কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হবে না বাংলাদেশের অবশ্যম্ভাবী বাস্তব স্বাধীনতা প্রতিরোধ করা। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বপ্রথম ডাকও এসেছিল এই বাংলাদেশ থেকেই এবং বাংলার মানুষই ছিল তখন উক্ত সংগ্রামে সর্ব্বাগ্রণী। এই বাংলা দেশেরই হাজার হাজার তরুণ ও যুবকের তাজা রক্তে লালে লাল হয়েছিল তখন সারা বাংলার উত্তপ্ত মাটি। শহীদ এবং দ্বীপান্তরীণও হয়েছিল বাংলা মায়ের বহু বীর সন্তান। সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলেই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পরাধীন ভারত হ'ল স্বাধীন। কিন্তু সে স্বাধীনতার পটভূমিকায় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল যার, সেই বাংলাদেশেই এসেছিল তখন এক মহা বিপর্য্যয়। বৃটিশ প্রদত্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির অন্যতম শর্ত মহাকাল দেশবিভাগের মারাত্মক ভুলের সমুদয় মাশুল পরিশোধ করতে হয়েছে বাংলা ও বাঙালীকে। একদিকে যেমন স্বাধীনতা প্রাপ্তির অসীম আনন্দ, অন্যদিকে তেমনই দেশ বিভাগের কুফল-জনিত অপরিসীম বিষাদ। বিষাদ এবং আনন্দের অপূর্ব সংমিশ্রণ। অখণ্ড বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে সৃষ্ট হ'ল পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ। দুই বঙ্গের অন্তর্ভুক্তি হ'ল তখন যথাক্রমে নবগঠিত পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে। পূর্ব বঙ্গের নাম অবলুপ্ত হয়ে নতুন নামকরণ হ'ল "পূর্ব পাকিস্তান" অর্থাৎ পশ্চিম পাক শাসকবর্গের জঙ্গী শাসন ও শোষণ স্থান। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্য হয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট। একের উপর অপরের তিক্ত মনোভাব হ'ল অধিকতর তিক্ত।

ফলে বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জলিত হ'ল দেশের সর্বত্র এবং সেই ভয়ঙ্কর দাবানলে ভস্মীভূত হ'ল বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাই পশ্চিম বঙ্গে স্থায়ী বসবাসের কোন অসুবিধা হয়নি বাঙ্গালী কি অবাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের। কিন্তু পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি হ'ল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানকার স্থায়ী বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর নৃশংস অত্যাচারের ফলে অধিকাংশ হিন্দুই হয়েছিল তখন হতাহত এবং বিতাড়িত। অবশিষ্ট যারা সহায়সম্বলহীন হিন্দু সেখানে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল সম্পূর্ণ জীবন্মৃত অবস্থায় এবং ক্রমশঃ তাদের ভাগ্যও যুক্ত করে নিয়েছিল তারা স্থানীয় বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাগ্যের সঙ্গে। তাই এযাবৎ কাল পূর্ব বঙ্গে পাক জঙ্গীশাহীর দানবীয় অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রধান শিকার হয়েছিল উভয় সম্প্রদায়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী।

শোষিত, নিপীড়িত মানব মনে ক্রমশঃ জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা, তুচ্ছ হয়ে যায় দুঃসহ জীবনের মিথ্যা মায়া, শুরু হয় তখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জীবন-পণ মুক্তিসংগ্রাম। পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি শোষিত নিপীড়িত বাঙ্গালীও ক্রমশঃ হয়ে উঠল তাই চরম বিদ্রোহী। সর্ব্ব শক্তি নিয়ে শুরু করল তারা অত্যাচারী পাক জঙ্গী শাসকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক মুক্তি সংগ্রাম। সম্পূর্ণ অঘোষিত সে সংগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গে চলেছিল দীর্ঘকাল। সুসংহত উক্ত বিদ্রোহী বাঙ্গালী দলের অবিসম্বাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সংগ্রামের চরম পর্য্যায় ঢাকার রমনা ময়দানে ৭ই মার্চ ৭১ বিরাট জনসভায় ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। অতঃপর সুদীর্ঘ ন'মাস কাল বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায়। বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণরূপে পাক-কবল-মুক্ত, স্বাধীন, সার্বভৌম। যে কোন বাঙ্গালীর পক্ষেই উহা অতীব গৌরব এবং অসীম আনন্দের বিষয়। এক কালে স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিলাম বলেই সম্ভবত বর্ত্তমান স্বাধীন বাংলার বিজয়োৎসবে ব্যক্তিগত ভাবে অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও, যেন মনে হয়, এই প্রবীণ বয়সে বুকের স্বাভাবিক সঙ্কুচিত ছাতি পুনরায় বহুগুণ বর্দ্ধিত হ'য়েছে। মনে হয় যেন স্বাধীন বাংলার সামগ্রিক উন্নয়ন দর্শনার্থ আরও বেশ কিছুকাল সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম হ'ব। স্বাধীন বাংলা যেন পুনরায় সমগ্র দেশ ও জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে অতীতের সেই সোনার বাংলার স্বরূপ ও লুপ্ত গৌরব অর্জন করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়। আজকের দিনে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে জয়-যাত্রার এই শুভ লগ্নে ভগবানের নিকট ব্যক্তিগত ভাবে ইহাই আমার সর্বান্তরিক কামনা।

যুদ্ধের পরবর্ত্তী চিত্র

পাক-ভারত যুদ্ধের দৈনন্দিন চিত্র পঞ্জী প্রদর্শিত হয়েছিল ইতিপূর্বে প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায় "চৌদ্দ দিনে যুদ্ধ শেষ" শীর্ষক সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মাধ্যমে। ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ হয়েছিল যুদ্ধের অবসান পাক-দখলদার বাহিনীর নিঃশর্ত আত্ম ও অস্ত্র সমর্পণের পর। ফলে প্রায় এক লক্ষ পরাজিত পাক-সেনাবাহিনী হয়েছে বাংলাদেশে ভারতের যুদ্ধ-বন্দী।

১৪–ডিসেম্বর: সংবাদে প্রকাশ, আজ বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির-খতিয়ান:—

নিহত প্রায়.........১০০০
আহতপ্রায়.........২৮০০
নিখোঁজ............১৯

১৯—ডিসেম্বর: স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের সেক্রেটারিয়েট চালু হয়।

২০–ডিসেম্বর: পূর্ব্ব পাকিস্তান হারাবার ফলে, পাক অধিনায়ক জেঃ ইয়াহিয়া খাঁর উপর পশ্চিম পাকিস্তানী জনরোষ এত তীব্র আকার ধারণ করে, যে, তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টোকে জরুরী তলব ক'রে এনে তাঁর হাতে আজ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্ব ক্ষমতা অর্পণ করেন। তাঁকে শপথবাক্যও

পাঠ করান স্বয়ং ইয়াহিয়া খাঁ। জনাব ভূট্টো এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক। আর বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ নর-ঘাতক কুখ্যাত ইয়াহিয়া খাঁ আজ পাক জনগণের কাছে একমাত্র বিশ্বাসঘাতক,বেইমান ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কি রাওয়ালপিণ্ডিতে বিরাট মিছিল ক'রে ইয়াহিয়ার ফাঁসির দাবী করা হয়। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস!

২১—ডিসেম্বর : রাত্রে মিঃ ভূট্টো জানান শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং গৃহবন্দী করে রাখা হবে।

গত ২৫শে মার্চ থেকে সুদীর্ঘ ন'মাস ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ডাক চলাচল বন্ধ ছিল। ২১-ডিসেম্বর উহা পুনরায় চালু হয়েছে।

২২—ডিসেম্বর : সুদীর্ঘ ন'মাস যাবৎ পাক কারা বন্দী বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান আজ প্রেঃ ভূট্টোর নির্দেশে কারা-মুক্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার করা হয়েছে গৃহবন্দী। উক্ত গৃহটি রাওয়ালপিণ্ডিতে পাক-প্রেসিডেন্টের বাসভবনের সন্নিকট। জনাব ভূট্টো এখন পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের পুনর্মিলনের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী।

বাংলাদেশের রাজধানী ১৭ই এপ্রিল থেকে ছিল মুজিবনগরে। আজ ২২শে ডিসেম্বর উহা স্থানান্তরিত হ'ল শত্রু-মুক্ত ঢাকা শহরে। তৎসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইস্‌লাম, প্রধান মন্ত্রী তাজুদ্দীন ও তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলে হাজার হাজার মানুষ তাঁদের বীরোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। জনগণের জয়ধ্বনি ওঠে : জয় বাংলা। জয় ইন্দিরা। জয় মুজিব। ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব অটুট হোক। শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, ইত্যাদি।

পূর্ব্ব বাংলার "মীরজাফর" এবং পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীনুরুল আমীনকে প্রেঃ ভূট্টো ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে নিয়োগ করেছেন। শ্রীআমীনকে শপথবাক্য পাঠ করান আজ ২২শে ডিসেম্বর পাক প্রেঃ শ্রী জেড এ. ভূট্টো।

আজ পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক মুখপাত্র জানান যে, সরকারী উদ্যোগে আগামী পহেলা জানুয়ারী থেকে শরণার্থীদের বাংলাদেশে পাঠানোর কাজ শুরু হবে। তিনি এ কথাও বলেন যে, ইতিমধ্যে প্রায় এক লক্ষ শরণার্থী বাংলাদেশে ফিরে গেছেন নিজেদের উদ্যোগে।

২৪—ডিসেম্বর : পাক-জঙ্গী-শাসনাধীন পূর্ব্ব বাংলার প্রাক্তন গভর্নর ডঃ এ. এম. মালিক ও তাঁর মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যান্য যাদের আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন নিষিদ্ধ কন্‌ভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি শ্রীফজলুর কাদের চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ সজ্জাদ হোসেন। বাংলাদেশ সরকার আজ রাত্রে এই গ্রেপ্তারের সংবাদ ঘোষণা করেছেন।

প্রাক্তন যে সব মন্ত্রীদের আটক করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন :—সর্ব্বশ্রী আবদুল কাসিম, নওয়াহিয়া আমেদ, আব্বাস আলি খাঁ, আখতার উদ্দিন আমেদ, মহম্মদ ঈশাক, জসিমুদ্দিন, এ. কে. ইউসুফ ও এ. এস. সুলেমান।

জঙ্গী শাসকবর্গের সহযোগীদের আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তারের সংবাদ ঘোষণা করে আজ রাত্রে এক সরকারী বুলেটিনে বলা হয়েছে, মুখ্যসচিব ও অন্যান্য কয়েকজন সচিব সহ ২১ জন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার এই তালিকায় রয়েছেন। এঁরা প্রায় সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানের লোক।

বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের সর্ব্ববিধ কাজকর্ম এক মাত্র বাংলা ভাষায় চলবে।

২৮—ডিসেম্বর : ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স্ কর্ত্তৃক কলিকাতা ও ঢাকা শহরের মধ্যে দৈনিক বিমান চলাচল আজ থেকে শুরু হয়েছে। এই ব্যবস্থা গত ছ'বছর বন্ধ ছিল।

২৯—ডিসেম্বর : ভারত বাংলাদেশ ট্রেণ চলাচল আজ থেকে শুরু হয়েছে। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের

পর এই রেলপথের যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়েছিল। জয় বাংলা ধ্বনির মধ্যে আজ বনগাঁ-যশোর সরাসরি ট্রেণ চালু হয়।

৩১-ডিসেম্বর: বাংলাদেশ সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি ক'রে দেশের সমস্ত বেসরকারী অফিস, কোম্পানী ও শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও বেতনের সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০০টাকায় নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। এদিন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই মর্মে এক আদেশ জারি করেন। উক্ত আদেশ অমান্যের ক্ষেত্রে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আদেশ জারি করা হয়েছে।

শরণার্থীদের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশে যুদ্ধবিরতির পর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ শরণার্থী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী ব্যবস্থায় ১লা জানুয়ারী, ১৯৭২ থেকে দৈনিক যথাসম্ভব বিপুলসংখ্যক শরণার্থী বাংলাদেশে প্রেরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে কয়েকশত অস্থায়ী শরণার্থী শিবির স্থাপন করেছেন যেখানে ভারত সরকার প্রেরিত শরণার্থীগণ অন্ততঃ পক্ষে দু'একদিন অবস্থানেরপর স্বস্থানে গমন করতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পাক দানবীয় অত্যাচারের ফলে পূর্ব্ববঙ্গে নিহত হয়েছে কমপক্ষে তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালী এবং আহতও হয়েছে ততোধিক। তদ্ভিন্ন প্রায় তিন কোটি বাঙ্গালী হয়েছে বাস্তহারা। সমগ্র পূর্ব্ব বাংলা হয়েছে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত। সুতরাং উক্ত মহা শ্মশানে তিন কোটি বাস্তহারার আশু পুনর্বাসনের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করবার অতীব কঠিন কাজ এখন বাংলাদেশ সরকারের নিকট সব চেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যা। উক্ত সমস্যার প্রকৃত সমাধান কতদিনে সম্ভব হবে, সে প্রশ্নের জবাব প্রদান সম্পূর্ণ অসম্ভব। সরকারী খবরে প্রকাশ এ যাবৎ অর্দ্ধেকের বেশী শরণার্থী বাংলাদেশে ফিরে গেছেন।

বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদান

৪—ফেব্রুয়ারী '৭২ পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত তিরিশটি দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান করেছেন। যথা:— ভারত, ভূটান, পূর্ব্ব জারমানি, পোলাণ্ড, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, ব্রহ্ম, নেপাল, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী, বারবাডোজ, যুগোস্লাভিয়া, ফিজি, টঙ্গা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কামবোডিয়া, সেনেগল, সাইপ্রাস, ব্রিটেন, পশ্চিম জারমানি অস্ট্রিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ইস্রায়েল।

ক্রমশঃ

বাংলা বানান

অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, তাঁর উপন্যাসের নায়ক বি-এ পাশ করলো, কিন্তু এখনও লেখে—I has.

আমাদের বর্ত্তমান নিবন্ধের বক্তব্য কিন্তু ঠিক তা নিয়ে নয়। আজকালের সাধারণ বি. এ. পাশ মানুষ ইংরেজি লিখতে বড় একটা ভুল করে না। তাদের কাছে সমস্যা দেখা দেয়, বাংলা লেখার ক্ষেত্রে। আমার এক ছাত্রের অভিভাবক একবার অনুরূপ অভিযোগ করেছিলেন, আজকালের গ্র্যাজুয়েট ছেলেরাও বাংলা ঠিক মত লিখতে পারে না। তাই, স্কুল-মাষ্টার ছাড়া কাউকে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পরাঙ্মুখ।

বাংলা বানানের গতি প্রকৃতি নিয়ে সম্প্রতি শিক্ষিত সমাজে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুকাল আগে 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার মাধ্যমে কিছু কিছু বানান সংস্কার করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথিগণও তা মেনে নিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে সাগরে মিশেছে। আবার নতুন করে তা সংস্কারের দরকার হয়ে পড়েছে। কিংবা পূর্ব্বসূরীদের অনুসৃত নিয়মই জোর করে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে পড়েছে। কারণ, বাংলা বানান নিয়ে বর্ত্তমানে এমন একটা নৈরাজ্য চলতে শুরু করেছে, যা বিনা পরোয়ানায় চলতে দেওয়া উচিত হবে না। আমরা বাঙালী হয়েও সব সময় বাংলা বানান ঠিক করে লিখতে পারি না। অনেক বিদেশীও আজকাল বাংলা ভাষা শেখায় আগ্রহী। তাঁরা ব্যাকরণ মারফৎ এক বানান শিখবেন, আর কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখবেন ভিন্ন রীতি। এ ব্যবস্থাকে অনাচার ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে?

শ্রদ্ধেয় কবিশেখর কালিদাস রায় মাঝে-মাঝে এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের দুটি কিস্তিতে লেখিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদার প্রধানতঃ বাংলা বানান সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেছিলেন, দেখেছি। আলোচনা যত হয় ততই ভালো। শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ইংরেজি লেখা সম্বন্ধে যে অধ্যবসায় ও অনুশীলন লক্ষ্য করেছি, বাংলা সম্বন্ধে সে আগ্রহ, যত্ন বা দরদ আদৌ দেখতে পাই না। নবাগতদের কাছে মাতৃভাষা তো বৃদ্ধা মাতার মতই অবহেলিতা। বানান-রীতি উন্মার্গগামী হলে ভাষার পক্ষেও তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

বলা বাহুল্য, যুক্তাক্ষর বা সন্ধ্যক্ষর সম্বন্ধে বর্ত্তমান নিবন্ধের অন্বেষা সীমিত। তা অপর প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হতে পারে। 'ষ্টেশন' কি 'স্টেশন' লিখবো, তার হিসাব-নিকাশ আপাততঃ থাক।

ছাত্রদের লেখার খাতায় 'ভুল' বানানের বোঝা মাষ্টার মশাই বা অধ্যাপকগণের 'শিরঃপীড়া' ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সে ভুলের মূল কোথায়, তা কি কেউ তলিয়ে দেখেন? ছাত্রগণ দৈনন্দিন জীবনে বাড়িতে, গাড়ীতে, পথে, পোস্টার-বিজ্ঞাপনে বা প্রাচীরপত্রে এমন কত ভুল চোখে দেখে। সিনেমার পর্দায়ও প্রতিফলিত হতে দেখে। কিছু কিছু সাময়িকপত্র নিত্য তাদের হাতে আসে। আমরাও নির্ব্বিচারে তাদের কোমল হাতে সেগুলি তুলে দিই। কি পড়ছে, কি লিখছে সেদিকে খেয়াল করি না। সুকুমারমতি বালক-বালিকারা একবার যা দেখে বা লেখে তার প্রতিচ্ছবি তাদের অবচেতন

মনে দৃঢ়ভাবে গাঁথা হয়ে যায়। এইভাবে তারা বড় হয়। আমার কন্যাটিকে দিয়ে (যে বর্ত্তমানে বি-এ ক্লাসের ছাত্রী) এখন পর্য্যন্ত 'অপরাহ্ন' বানান ঠিকমত লেখাতে পারলুম না। দোষ আমার নয়। তার শিক্ষিকারাও কম চেষ্টা করেছেন, বলতে পারবো না। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা তাকে যে ভুলের মধ্যে ফেলে গ্রাস করে বসেছে তার শোধন হবে কেমন করে?

বাংলা বানানের প্রশ্নটা প্রধানতঃ ই, ঈ; উ, ঊ; আর ণত্ব ষত্ব-এর মধ্যেই সসীম। দু'একটা সমাস-ঘটিত, সন্ধির ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ব্যাকরণজ্ঞানহীনতা বানানের আওতায় আসে না।

করছি-করচি, বলল-বললো ইত্যাদি বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন যেভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখি না কেন, তা নিয়েও আলোচনায় আমাদের অনীহা। দেশী বা বিদেশী শব্দের বানান ঘাঁটাঘাঁটিতে আমাদের জিজ্ঞাসাও স্তব্ধ। এই কথাটা আমরা বিশেষ করে বলতে চাই যে, তৎসম শব্দ নিয়ে স্বাধিকার-প্রমত্ততা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। তৎসম শব্দে হস্তক্ষেপ চলবে না—চলবে না। কারণ, তা হলো সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বভারতীয় সম্পদ্। শুধু পশ্চিম বঙ্গ তাকে শোধন করার অধি নয়। অর্দ্ধ তৎসম বা তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রেও একটা সমদর্শী নীতি গ্রহণযোগ্য বলে আমরা মনে করি।

পূর্ব্বে উল্লেখিত 'অপরাহ্নে'র মত পূর্ব্বাহ্ন কিন্তু সায়াহ্নের তফাৎ অনেকেই ধরতে পারেন না। খনিতে 'ধস' নামা দেখেছি। চলন্তিকায় তার বিহিত বিধান আছে। কিন্তু 'ধসে বিধ্বস্ত' পাশাপাশি চলে কি করে? কিছুদিন পূর্ব্বে এক টুথ পেস্টের 'দুর্গন্ধে' শ্বাসকষ্টে পড়েছিলাম, এখন সে দুর্গন্ধ দূর হয়েছে। সুগন্ধ আসছে। হিন্দীওয়ালাদের কারসাজিতে 'বনস্পতী' আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে। ভারতীর 'আরতী' দেখতে আমাদের পথে বের হওয়া কি বন্ধ হবে? সরকারের 'অনুমত্যানুসারে' বাস্-এ যাতায়াত কি আমাদের কাছে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে? 'দুর্গাপূজা' আজকাল 'সার্ব্বজনীন' হয়েছে। সেখানে চোখ ধাঁধানো আলো কিন্তু আমার পূজার দেউলে চির 'আমাবস্তা'। কলকাতায় রাতে মশারি ছাড়া ঘুমানো যায় না, কিন্তু দিনে ঐ 'মশারী'র উৎপাতে বহুবাজার ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোডে চলা দায়। সুধাংশুর দেখাদেখি 'সুভ্রাংশু'ও কোন এক বই-এর নায়ক। 'দুরাবস্থা'র কথা আকার দেখেই বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তা ঠিকই বুঝেছিলেন।

অর্ঘ=মূল্য। আর, অর্ঘ্য=সশ্রদ্ধ পূজা, নিবেদন। আমরা বর্ত্তমানে শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। কারণ, দেশে অর্থস্ফীতি (মুদ্রাস্ফীতি?) ঘটেছে। রেফ-এর পর দ্বিত্ব লোপ, আর অর্ঘ্য-এর য-ফলা লোপ এক কথা নয়। কিন্তু 'কে শুনিবে দগ্ধ এ মরমের জ্বালা'। স্বাক্ষর আর সাক্ষর-এর প্রভেদ চিরকালই কি দুর্ব্বোধ্য থাকবে?

এভাবে, 'লক্ষ্য'কে 'লক্ষ' লেখার প্রয়াস প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তা হোক্। 'লক্ষ'-(শতসহস্র)-কে 'লক্ষ্য' (দৃষ্টি) রেখে পথে অগ্রসর হলে পথচলা লাভের হয়ে যেতে পারে। চাই কি, রাজ্য সরকারের কোন একটা খুঁটি ভাগ্যে লটকে যেতে পারে। বিচিত্র-রূপিণীদের মধ্যে আজকাল আর 'বৈচিত্র্য' দেখতে পাই না কেন? শুধু শাড়ি আর টপ্‌লেস্-এর 'বৈচিত্র' কি তাঁদের অকৃত্রিম কাম্য?

'আশীষ'-এর সঙ্গে পথে ঘাটে আমাদের হামেশা দেখা হয়ে যায়। 'আশিস্' (আ—শাস্+ক্বিপ্) এখন দ্বীপান্তরিত হয়ে আছে, 'দ্বীপান্বিতা' পূজার পর থেকে। ভৌগোলিক বানান ঠিকমত লিখতে হলে শিক্ষকের পৌরোহিত্য স্বীকার করতেই হবে। নতুবা 'ভৌগলিক'-এর 'পৌরহিত্যে' পিতৃপুরুষের পিণ্ড চটকানোই সার হবে। দায়িত্ব আর আয়ত্তের তফাৎ খুঁজতে সকলের আকাঙ্ক্ষা উৎসুক নয়। মন না মতি, মুক্তা=মোতি আর শ্রীমতী—সবই কি এক মন্ত্রে অভ্যর্থনা নেবে? মুমূর্ষু আর মুহূর্ত্ত-বানান রীতি একই।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে (১৯৬৯) রামানুজ লক্ষ্মণকে 'লক্ষণ' হতে দেখেছি। শিক্ষা-নিয়ামকদের

এ দুর্দ্দশার 'লক্ষণ'। ফল ভালো নয়-অন্তে পরে কা কথা রেফ-এর পর দ্বিত্বের বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেও সর্ব্বত্র এক নিয়মে চলার বাধ্যবাধকতা শিক্ষা-নিয়ামকগণ ঐ প্রশ্ন-পত্রে মানেন নি। একই অনুচ্ছেদে 'বিসর্জ্জন' ও 'নির্জন' পাশাপাশি সহাবস্থান নীতি মেনে নিয়েছে। সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদের যুগপৎ ব্যবহার-প্রশ্নপত্রগুলিতে খুঁজলে সহজেই পাওয়া যাবে।

পুণ্যের দেখাদেখি 'শূণ্যে' মাথা তোলা অনেকের স্বভাবদোষ। উচ্চারণ-দোষে 'ব্যাথা' আর 'ব্যাভিচার' দেশে বেশ বেড়ে চলেছে! 'করুণ' আর 'করুন'এর মাথামাখি বড়ই করুণ ব্যাপার! এখন একযোগে তা বন্ধ করুন। উর্দ্ধ বানান লেখা যদি কষ্টকর হয়, উর্ধ্ব-লোকে যান। কিন্তু 'তিন বছরের উর্দ্ধে পুরা টিকেট' দেবার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও আমরা একটি পয়সা দিতে নারাজ। 'সত্ত্ব' (গুণ বিশেষ), 'স্বত্ব' (স্বামিত্ব, অধিকার), আর 'সত্তা' (অস্তিত্ব, নিত্যতা) আমরা যে এক বানানে চালিয়ে যাই, এটা আমাদের স্বভাব-ঔদার্য্য। 'বন্দ্যোপাধ্যায়' য-ফলা বিবর্জ্জিত হয়ে অপূজ্য হয়ে পড়েছেন বেশ কিছুদিন থেকে। 'গড্ডালিকা' প্রবাহহীন, আর 'জগবন্ধু' কারও বন্ধু নন। ঈশ্বর হলেন জগদ্বন্ধু। তাঁর ভজনায় ১৪৪-ধারা জারি নেই।

'তুমি যাবে কি?' 'আমি কী দিলেম কারে', বা 'এ কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে'—পার্থক্য বুঝবো কতোদিনে? 'উজ্জ্বল' আর 'প্রজ্বলিত' এক বানানে আসে না। গুণবান্‌কে আহ্বানে 'গুণি' বলতে পারি, কিন্তু 'সুধী'কে 'সুধি' বলে নিমন্ত্রণ পত্র দেবো না। 'প্রাঙ্গণ' তাঁরা আলো করবেন ঠিকই, কিন্তু 'অঙ্গণ' মাড়াবেন কি না ভেবে দেখতে বলবেন। 'শারীরিক' কুশল জিজ্ঞাসার আগে 'শরীর'টা চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে গোল মিটে যায়।

মুরারিবাবুর আসন এখন 'মুরারী' বেমালুম দখল করে নিয়েছে। তীর্থক্ষেত্র এখন 'হৃষিকেশ'এ পরিণত হয়েছে। 'হনুমান' আর 'হনূমান' (রামদাস) কি এখন এক গাছের ডালেই লাফালাফি করে?' 'ত্রিভুবন' যৌবন-চঞ্চল' হলে লাভ-লোকসান কি হবে, তা নিয়ে হিসাব-নিকাশ চলুক, কিন্তু 'ভুবন' বাবুকে ত্রিভুবনে কদাচ ঠাঁই দেবেন না যেন।. হাঁস পুষুন, কিন্তু 'হাঁসপাতালে' যাবেন না। 'নিজ সংবাদদাতা'কে আর 'স্ব সংবাদদাতা'কে আমরা বেতন দিয়ে যাবো, কিন্তু 'নিজস্ব'কে দেশছাড়া করবো। 'কেবলমাত্র' না লিখে 'কেবল' বা 'মাত্র' লিখলে পরিশ্রম বাঁচবে। মৎস্য-চাষ আমরা বাড়িয়ে চলবো, কিন্তু 'বন্দুকের নল আমাদের শক্তির উৎস্য' মানতে পারবো না। কালিদাস কবিকুলে শ্রেষ্ঠ হলেও 'কালিপদ' নয়। 'চণ্ডীদাস' আমাদের অচেনা, কিন্তু চণ্ডিদাস আমাদের প্রিয় কবি। নদীর কূল বাঁচাতে পারলে সবকুল রক্ষা পায়। নীর (জল), নীড় (পাখির বাসা), অথবা রাঢ় (বঙ্গ) লেখায় রাম-এর র, গুড় এর ড়, আর আষাঢ়-এর ঢ় বাঁচিয়ে চলুন সাহিত্যক্ষেত্রে। চাঁদের 'হাঁসি' যেন বাঁধ ভেঙে না আসে। 'লক্ষী' যেন লক্ষ্মীশ্রী হারিয়ে না বসেন লক্ষ্য রাখুন। তরী নিয়ে নদী পার হওয়া যায়, কিন্তু ধন্বন্তরির দাওয়াই ছাড়া রোগী বাঁচানো যায় না। আহার্য্য, কিন্তু 'সাহার্য্য' নয়। সাহায্য। অনেকের রেফ্-এর প্রবণতা দেখেছি।

নীচ (ঘৃণিত) কিন্তু নিচে (ক্রি-বিণ), বেশী (বেশধারী) কিন্তু বেশি (অধিক), অসীম কিন্তু অসিত, কৌতুক কিন্তু কৌতূহল, বধূ কিন্তু বঁধু, রথী কিন্তু দাশরথি। তিনি রাম কিন্তু মহারথী নন,—মহারথ। সুপ্ত কিন্তু সুষুপ্তি, পরিষ্কার কিন্তু পুরস্কার, সরোদ কিন্তু নীরদ, গুণ কিন্তু ফাল্গুন, রবি কিন্তু রবীন্দ্র (রবিন্দ্র-জয়ন্তী চোখে পড়েছে), মণি কিন্তু মনীন্দ্র, আবার ফণি কিন্তু ফণীন্দ্র, ভুত কিন্তু অদ্ভুত, সূক্ষ্ম কিন্তু রুক্ষ। এমন আরও রাশি রাশি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, মানুষে যা সাধারণ ভাবে খেয়ালখুসী মত লিখে যায়।

এতৎ+দ্বারা=এতদ্দ্বারা, উপরি+উক্ত=উপর্য্যুক্ত। এতদ্বারা, উপরোক্ত—তাই সন্ধিঘটিত ভুল। এ সম্বন্ধে অনবধানতা ঠিক নয়। উৎ+শ্বাস=উচ্ছ্বাস, কিন্তু উচ্ছল ব-ফলা বিবর্জ্জিত।

প্রসঙ্গত না হলেও একটা কথা এখানে উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। অনেকানেক সাহিত্যিককেও লিখতে দেখেছি—বাঁশবন নুইয়ে পড়েছে। এরূপ লেখা কি ঠিক? নুইয়ে ব্যবহৃত হবে ণিজন্ত (Causative) হিসাবে। উচিত হবে—বাঁশবন নুয়ে পড়েছে বা নুইয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য—আলোকের এই ঝরণা ধারায় (ধারা দিয়ে) ধুইয়ে দাও। রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ অভ্রান্ত। যা লেখেন অন্যে, তা ভ্রমাত্মক। অপ্রধান, অশিক্ষিত-অধ্যুষিত গ্রামকে অনেকে লেখেন—গণ্ডগ্রাম। কিন্তু গণ্ডগ্রাম, ঠিক অর্থে প্রধান গ্রাম। স্তিমিত লেখা হয় নিবু নিবু অর্থে কিন্তু প্রকৃত অর্থ স্থির, অচঞ্চল।

বানান-রীতি সংস্কার করে লেখ্য বাংলাকে শুদ্ধরূপ দেওয়া হোক, আমরা তা চাই। কিন্তু নানাজনে নানা-ভাবে যুক্তিগ্রাহ্য পথে না গিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষা-দীক্ষাকে কীটগ্রস্ত করে রেখে দিক্, এ দুর্নীতির শিক্ষা। তা কোনরকমেই মানতে পারি না। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষা খুঁড়িয়ে চলবে কেন?

মানুষ কোথায়

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সেই সব মানুষ কোথায়?
অখণ্ড ভারত ছিল যাহাদের প্রকৃত স্বদেশ;
পরবশ্যতার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ;
আর্য্যধর্ম্মবিদ্বেষ্টারে যারা কভু করে নাই ক্ষমা:
নারীদের ভাবিয়াছে রমা;
সতীত্ব নাশিতে যারা দেখাইত জঘন্য দুর্ম্মতি,
ঘটাইত তাদের দুর্গতি;
সমাজ স্বদেশ আর সর্ব্বোপরি স্বধর্ম্মের তরে
প্রাণ ঢেলে দিত অকাতরে;
ঝুলিয়াছে ফাঁসিকাষ্ঠে, বরিয়াছে নির্ব্বাসনে,
দলিয়াছে মরণেরে সুদৃঢ় চরণে,
জাতিশত্রু দেশবৈরী করিতে নিপাত
কোনোদিকে বিন্দুমাত্র করে নাই কোনো দৃক্‌পাত,
অসময়ে তারা সবে কোথা গেল হায়!
সেই সব মানুষ কোথায়!

২

কোথা সব মানুষ মহান্ ?
ভেঙে-চুরে বর্ত্তমানে দৃঢ়পদে হয়ে আগুয়ান
দেশেরে নূতন রূপ করিবে প্রদান।
ভেজাল ভুলিয়া গিয়া প্রাণভয়ে 'কুক্কুর' 'শৃগাল'
বিদূরিবে স্বহস্তে জঞ্জাল ;
সর্ব্বনাশ করে যারা মঞ্চোপরি বসিয়া রহিয়া
গুপ্তভাবে পরামর্শ দিয়া ;
অভাবের অজুহাতে কুমারীর সর্ব্বনাশ করে ;
মরিবার আগে যারা মরে ;
তাদেরে বাঁধিয়া সদা মৃত্যুভীতি উগ্র করি'
শৃঙ্খলা আনিতে হবে অতন্দ্রপ্রহরী ;
সর্ব্বান্তঃকরণে করি তাদের আহ্বান্।
এসো এসো শহীদেরা, এসো ওগো মহামহীয়ান্।
অখণ্ড ভারত শুধু এর প্রতিকার।
নবরূপে এসো পুনর্ব্বার।

৩

যত শীঘ্র পারো এসো ভবে।
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি' উদ্বাস্তরা সুস্থ হোক্ সবে।
লাঞ্ছিত বঞ্চিত হয়ে আসিয়াছে তারা,
তাহারা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বরূপে আজি সর্ব্বহারা ;
সকলি তো ছিল তাহাদের,
প্রধান অভাব ছিল একমাত্র সমাজবোধের ;
বিধর্ম্মীরা সংহতির বলে
সর্ব্বরূপে হীন হয়ে দলিয়াছে চরণের তলে।
ভাখে নাই বানর হরিণ।
বন্য জন্তু-জানোয়ার নহে এত অর্ব্বাচীন।
আত্মরক্ষা করে তারা যূথবদ্ধ হয়ে,
মরিবার আগে তারা মরে না তো ভয়ে।—
হে অতন্দ্রপ্রহরীরা, আগ্নেয়াস্ত্র লয়ে এসো হাতে।
নিদ্রা যে আসে না আঁখি-পাতে।

অন্য গ্রাম : অন্য মানুষ

—নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে মা ব'লে ডাকতাম।
তোমার কোলে শুয়ে শুয়ে
চাঁদের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা
পদ্মার ঢেউ গুনতাম।
আমার চুলে কলমীলতার মতন
তোমার নরম আঙুল বুলাতে বুলাতে
একদিন প্রশ্ন করেছিলে তুমি :
খোকন, যখন অনেক বড় হবি, তুই
তখন ভুলবি না ত দুঃখিনী এই মাকে ?
তখন কি বুঝেছিলাম
তোমার প্রশ্নের জবাব
কোনদিনই দিতে পারব না।
ঠিক একটা অতিকায় বৃক্ষের মতন
নির্মমভাবে ভয়ানক বড় হয়ে
আজ স্বীকার করতে দুঃখ নেই :
সব খোকা অনেক বড় হয়েও
নিঃসঙ্গ কবির মতন বিষণ্ণ এবং
অনেক দুর্দান্ত হয়েও ছিন্নভিন্ন।
তাই—
অনেক বড় হয়েও
আকাশের চারদিকে খুঁজে
কোথায়ও তোমাকে দেখতে পাই না।
অগ্নিগর্ভ পৃথিবীর মাটি।
আকাশে মেঘ ও বিদ্যুৎ।
কখন যে বাজ পড়বে তার ঠিক নেই।

ছেলেদের পাততাড়ি

আহাম্মকের কথা

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিনের কথা—পারস্যদেশের একটি গ্রামে দুই ভাই বাস করত। ছোটজন ধনী কিন্তু বড়জন অতি গরীব ছিল। একদিন ফকির মিঞা যে সময় তার ভাইয়ের ঘোড়াগুলি চরাচ্ছিল, সেই সময় সে দেখতে পেল যে, একটি লাল পোষাক পরা, অচেনা লোক, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। সে এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো—"তুমি কে হে? তোমাকে ত কখন দেখিনি।"

লোকটি উত্তর দিলো—"আমি তোমার ভাইয়ের সৌভাগ্য—তার উপরে নজর রাখতে এসেছি।"

ফকির মিঞা বল্লো—"ওহো! তবে তোমারই জন্য আমার ভাইয়ের এত ধনসম্পত্তি। আচ্ছা বল তো, আমার সৌভাগ্যকে কোথাও দেখেছ?"

লোকটি বল্লো—"তোমার সৌভাগ্য ওই দূরের পাহাড়ের গুহার ভিতরে ঘুমিয়ে আছে।"

—"তবে আমি তার ঘুম ভাঙ্গাই গিয়ে এক্ষুণি"—এই বলে ফকির মিঞা তখুনি পাহাড়ের দিকে চলতে শুরু করল।

যেতে যেতে পথে একটি সিংহ দেখলো। সিংহ বল্লো—"ওহে, তুমি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?"

ফকির বল্লো—"আমার সৌভাগ্য ওই গুহার ভিতরে ঘুমাচ্ছে—তাকে জাগাতে যাচ্ছি।"

সিংহ বল্লো, "বেশ বেশ,—আচ্ছা, একটা কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে পার—আমি যতই খাই না আমার কেন পেট ভরে না"—

ফকির বল্লো—"ঠিক আছে, তোমার প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করব।"

চলতে চলতে সে একটি সুন্দর বাগানে এসে পৌঁছল। সেখানের মালিক তাকে বল্লো—"ওহে বন্ধু, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

ফকির বল্লো—"আমার সৌভাগ্য ঘুমিয়ে আছে, তাকে তুলতে যাচ্ছি।"

মালিক বল্লো—"বাঃ, এত বেশ কথা। আচ্ছা আমার একটি প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো? আমি যে এত খাটি বাগানে কিন্তু কেন আমার বেদানা গাছে ফল ধরে না, বা গোলাপ গাছগুলিতে ফুল ফোটে না?"

ফকির তাকে আশ্বাস দিয়ে আবার এগোতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একটি শহরে এসে পৌঁছল ও সেখানে রাজার হুকুমে তাকে রাজসভায় এনে উপস্থিত করল।

রাজা বল্লেন—"তুমি আমার রাজধানীতে কি করছ?"

ফকির মিঞা বল্লো—"আমি এখানে বাস করতে আসিনি মহারাজ; কেবল অনেক দূরের পথে যাচ্ছি আমার সৌভাগ্যের খোঁজে, আর আপনার রাজধানী পার হয়েই আমায় যেতে হচ্ছে।"

রাজা বল্লেন, "বেশ, বেশ। তোমার সৌভাগ্যকে জিজ্ঞেস করো ত যে আমার রাজ্যের কেন উন্নতি হয় না।"

বহু দিন বহু দেশ অতিক্রম করে ফকির মিঞা শেষে সেই পাহাড়ের গুহায় পৌঁছল। তার ভিতরে গিয়ে দেখল যে, একটি লোক প্রচণ্ড নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। পা দিয়ে তাকে ঠেলে দেওয়ায় সে ধড়মড় করে উঠল।

ফকির তাকে বল্লো—"আমি তোমাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।"

লোকটি হাই তুলতে তুলতে বল্লো,—"বেশ। কি প্রশ্ন শুনি।"

সেগুলি শোনামাত্রই সে উত্তর দিল। দিয়েই আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও ফকির মিঞা সঙ্গে সঙ্গে ফিরতি পথে রওনা হলো।

যেতে যেতে ফের সেই রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছল। রাজা তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—"কি হে, তোমার সৌভাগ্যকে পেলে? আর আমার প্রশ্নেরই বা উত্তর কি?"

ফকির বল্লো—"সে বলেছে, তোমার রাজ্যের উন্নতি হয় না কারণ তুমি ছদ্মবেশী মেয়েমানুষ, আর পুরুষের মত রাজ্যের তদারক করতে পার না।"

রাজা বল্লেন—"এ কথাটা সত্য—তা তুমি যখন এই গোপন কথাটি জানতে পেরেছ তখন আমাকে বিয়ে কর আর রাজ্য শাসন কর।"

ফকির বল্লো—"ওরে বাবা, সে কি হয়! আমার তো বাড়ী ফিরতেই হবে। এখন আমার সৌভাগ্যকে জাগিয়েছি কাজেই আমিও ভাইয়ের মত বড়লোক হব।"

রাজা বল্লেন—"আরে বোকা—আমি তোমাকে তার থেকে হাজার গুণ বেশি ধনী করব।"

কিন্তু ফকির কিছুতেই এসব কথা শুনল না, আবার সে দেশের পথে রওনা হলো।

যেতে যেতে আবার সেই বাগানে এসে পৌঁছলে বাগানের মালিক জিজ্ঞেস করল—"কি হে, তোমার সৌভাগ্যকে পেলে?"

ফকির বল্লো—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়েছি বৈকি। সে বলেছে, তোমার বেদানা গাছে ফল ধরে না আর গোলাপ গাছে ফুল ফোটে না কারণ ওই জমিতে গুপ্তধন পোঁতা আছে। যখন এটি খুঁড়ে বার করবে, তখন তোমার বাগান ফুল ও ফলে ভরে যাবে।"

মালিক দৌড়ে গিয়ে কোদাল নিয়ে এসে মাটি খুঁড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই সাত হাঁড়ি মোহর বের করল। ফকিরকে ডেকে বল্লো—"এসো, এগুলি আমরা সমান ভাগ করে নিই।"

কিন্তু ফকির মিঞা তাতে রাজি হলো না। কেবল বলতে থাকল—'আমায় এই মুহূর্ত্তেই বাড়ি ফিরতে হবে। আমার সৌভাগ্য যখন জেগেছে, আমিও আমার ভাইয়ের মত ধনী হব।"

বাগানের মালিক তাকে বারবার অর্দ্ধেক মোহর নিতে বল্লো কিন্তু ফকির মিঞা তার কথায় কান না দিয়ে হনহন করে চলে গেল।

যেতে যেতে আবার সিংহর সঙ্গে দেখা হলো। সে বল্লো—"এই যে মিঞা, তোমার সৌভাগ্যকে জাগাতে পারলে?"

"হ্যাঁ পেরেছি বইকি", বলে ফকির সিংহকে তার ভ্রমণকাহিনী বলতে আরম্ভ করল—কিভাবে রাজা তাকে বিয়ে করতে চাইল, বাগানের মালিক মোহর দিতে চাইল ও সে কোনটাই না নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চলেছে।

সিংহ তখন বল্লো—"আর আমার প্রশ্নের কি উত্তর?"

ফকির বল্লো—"তোমাকে বলেছে যে, যখনি তুমি একটি আহাম্মক দেখবে তাকে তখুনি খেয়ে ফেলো। তাহলেই তোমার ক্ষিদে মিটে যাবে।"

সিংহ বল্লো—"তাই নাকি? তা সত্যি কথা বলতে আমি তোমার থেকে বড় আহাম্মক কখনও দেখিনি।"

এই বলে ফকির মিঞাকে তক্ষুণি গিলে খেয়ে ফেল্লো।

পশ্চিমবঙ্গের নাম রাখা হোক "বঙ্গভূমি"

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

মাঘ মাসের "প্রবাসী"র "বিবিধ প্রসঙ্গে" এইরূপ একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে। প্রস্তাবটির অনুকূলে নানা যুক্তি আছে:—

"*** পশ্চিমবঙ্গের নামটি এখন পরিবর্ত্তন করিয়া, এরূপ করা আবশ্যক যাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে স্বাধীন বাংলাদেশের বাহিরেও আর একটি বঙ্গদেশ আছে ও থাকিবে। আমাদিগের মতে, এই প্রদেশের নাম দেওয়া উচিত—বঙ্গভূমি। এইরূপ নামকরণ না করিয়া যদি পশ্চিমবঙ্গ নামটিই রাখিয়া চলিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে কথা উঠিব—পূর্ববঙ্গ কোথায়? পূর্ববঙ্গকে যদি "বাংলাদেশ" বলা হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে—পশ্চিমবঙ্গ কি বংলাদেশ নহে? যদি বলা হয় উহাও বাংলাদেশ, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গ যে "বাংলাদেশের" অংশবিশেষ নহে, উহা যে) ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, সে কথাটি পরিষ্কার ভাবে লোকে বুঝিবে না। সুতরাং নাম পরিবর্তন অত্যাবশ্যক এবং নামটি বঙ্গভূমি হইলেই বিষয়টির অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা সম্পন্ন হইবে।

"চৈতন্যদেব, কৃত্তিবাস, জয়দেব, (চণ্ডীদাস), রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, (বিদ্যাসাগর) রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহামানবের জন্মভূমি বঙ্গদেশকে যদি উচিত এবং উপযুক্ত নামে আখ্যায়িত করিতে হয়, তাহা হইলে নামটি নিশ্চয়ই হওয়া চাই—'বঙ্গভূমি'।

"*** বাংলাভাষায় ভূমি কথাটির একটি ঘনিষ্ঠ, নিকট ও অন্তরঙ্গ ব্যবহার জাত অর্থ আছে। যাহা দেশ শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় না। জন্মভূমি, মাতৃভূমি, পিতৃভূমি প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে, জন্মদেশ, মাতৃদেশ কথা চলে না। এই কারণে বঙ্গদেশ (বঙ্গ প্রদেশ) অপেক্ষা বঙ্গভূমি নামে একটা প্রাণের সহিত যোগের রেশ আসিয়া যায়, যাহার মাধুর্য অস্বীকার করা যায় না।"

"প্রবাসী"র ঐ প্রস্তাবটি আমিও সবিনয়ে সমর্থন করি। পশ্চিম-বঙ্গের "বঙ্গভূমি" নামটিই যথোপযুক্ত হবে। এর সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের এক প্রসিদ্ধ কাব্যাংশ উদ্ধৃত করছি:—

"নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ—
স্তব্ধ অতল দিঘি-কালোজল—নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু, বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।"

"দুইবিঘা জমি"—রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম, ৬৭৯ পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের এই "বঙ্গভূমি" কি পশ্চিমবঙ্গের রূপ আমাদের চোখের সামনে ছবির মত তুলে ধরবে না?

"ভূমি" শব্দ বৈদিক যুগ হতে, এইরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অথর্ববেদের এই সূক্তাংশটি লক্ষ্য করুন:—

"পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রাহং পৃথিব্যাঃ।"

"হে মাতা ভূমি (মাতৃভূমি)! পবিত্র করো। আমি পৃথিবীর পুত্র।"

অথর্ববেদ, ১২/১/১৯

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মুকুট ও জয়তী দিল্লীবাসী হয়ে বসেছে। রাজধানীর জীবনযাত্রায় সামাজিকতার যে বাহুল্য তাতে দু'জনেই অভ্যস্ত হয়ে গেল। চিত্রকরের জীবনে কোন একটি সচ্ছল শহর তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়—পেশাদার শিল্পীরও সেখানে বিশেষ সম্মান। উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পীর দল দিল্লীতে কাজের সুযোগ পায় সন্দেহ নেই। শিল্পীর জীবনে মুক্তহস্ত বন্ধুরও যেমন প্রয়োজন, সমালোচকেরও তেমন আবশ্যক। তারাই প্রেরণা জোগায়। শত সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে গেলেও আত্ম-বিশ্বাস অটল থাকে—ক্রমশঃ কাজের উৎসাহ বেড়ে চলে। মুকুট সহজেই একটি কর্মঠদলের সভাপতি হয়ে গেল। সে চিত্রকলায় যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে কেউ অস্বীকার করতে পারল না।—ক্রমশ সে সকল শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বাণিজ্যের আদান-প্রদান, ললিতকলার প্রদর্শনী, নৃত্যগীত বিলাস, কিছুর অভাব নেই, যাদুর খেলার মত নিত্য নূতন আনন্দোৎসবের আয়োজন, শিল্পীর সাহায্য বিনা কিছুই রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিরাট হোটেলের ফ্রেস্কো থেকে শুরু করে শিশুদের স্বহস্তে রঙ থাবড়ানো ছবিরও এখানে মূল্য আছে। শিল্পকলার প্রগতিস্রোতের মুখে জয়তী ও মুকুট অদম্য উৎসাহে ঝাঁপ দিল।

কমলকান্তি নাম করা ভাস্কর, মুকুটের বিশেষ বন্ধু। সে প্রায়ই দিল্লীতে আসাযাওয়া করে এবং শিল্পের এবং শিল্পসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মুকুটের সঙ্গে আলোচনা করতে ভালবাসে। একদিন জয়তী, কমলকান্তি ও মুকুট একত্রে বসে চা খাচ্ছে, জয়তী প্রশ্ন করল—

'কমল, অবিনাশকে তোমার মনে আছে কি?'

'মনে আছে বৈকি, অবিনাশ আমার ছাত্র ছিল। দিল্লীতে থাকে নাকি? আমায় একদিন নিয়ে যাও ওর কাছে—বহুদিন দেখিনি তাকে।' কমলকান্তির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অনেকদিনের স্মৃতি জেগে উঠল।

'অবিনাশ এক সময় আহ্‌মেদাবাদে ছাত্র ছিল আমার। ওর মা ও বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। অবিনাশের পিতা গুজরাটের লোক—মা অর্ধেক ম্যাঙ্গালোরিয়ান। অতি চমৎকার লোক ওরা।'

জয়তী হেসে উঠল—

'তাই ওর নামটি একটু অদ্ভুত লেগেছিল—অবিনাশ কুমার। তারপর আর কিছু নেই। একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল আমায়—আমি half and half and half। অর্থাৎ তিনজাতের রক্ত তার শরীরে।'

কমল জয়তীর কথা শুনে ভাবছিল ওর আহমেদাবাদের দিনগুলির কথা তারপর বলল—

'অবিনাশের হাত বেশ ভাল—আমার ওর মার্বেল ও ব্রঞ্জের কাজগুলো ভাল লাগত, টেরাকোটাও ভালই করে কিন্তু সে একটা কাজ নিয়ে বড় বেশীদিন পড়ে থাকে—এগোতে চায় না। আর একটু যদি খাটতে পারত ভাল হত। সহজে দায়িত্ব নেয় না কাজের। এই দুটি গুণ থাকলেই শিল্পীর জীবনে উন্নতির আশা থাকে। কি রকম যেন কুঁড়েমি করে। কিন্তু যাই হোক্, আমি ওকে বড় ভালবাসি। কি একটা আছে ওর স্বভাবে, বড় ভাল লাগে। কথাগুলো এমন মজা করে বলে, কখনও রাগ করা যায় না। সুমার্জ্জিত ব্যবহার—সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে কিন্তু অতি সাদাসিধে।'

জয়তী কমলকান্তির কথা শুনছিল, মৃদু হেসে বলল—

'বন্ধুরাও খুব ভালবাসে ওকে। সর্বদাই দেখি সখা-সখী পরিবৃত হয়ে আছে। আমার ফ্ল্যাটটা ওকেই দিয়েছিলাম, সেখানেই আছে। আমাদের জিনিষপত্র কিছু কিছু ওখানেই থাকে—ছবিগুলোও সুন্দর করে রেখেছে—তবে সারাক্ষণই আড্ডা ওর বাড়ীতে।'

'তুমি আমায় নিয়ে চল সঙ্গে, একবার অবিনাশকে দেখে আসি।' কমলকান্তি ব্যস্ত হয়ে উঠল—

'কিছু জানিও না ওকে, চমকে উঠবে আমাদের দেখে।'

'সাড়ে চারটেতে রওনা দেব—চা হয়তো আমাকেই করতে হবে। প্রায়ই তাই হয়'। জয়তী বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

মুকুট একতাড়া টাইপ করা কাগজে পিন গুঁজছিল, জয়তীর দিকে চোখ তুলে বলল—

'একটি ভদ্রলোক দেখা করতে আসছেন, আমার সঙ্গেই কথা বলতে চান, পরিচিত নন বিশেষ। তোমার উপস্থিত থাকবার প্রয়োজন নেই। কমলকে তুমিই অবিনাশের ওখানে নিয়ে যাও—আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

জয়তী উত্তর দিল—'হ্যাঁ, এখনই যাচ্ছি আমরা।'

মুকুট একটা ফাইল বন্ধ করে রাখল, জয়তীর দিকে তাকিয়ে বলল—

'চায়ের সঙ্গে দেবার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে রেখে যেয়ো। আমার অতি পুরাতন বন্ধু রিসাদের ইনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

মুকুটের যা কিছু প্রয়োজন জয়তী সবই জোগাড় করে রাখত, কিন্তু মুকুটকে সে একা কোন সময় দেখেনি।—মুকুট জয়তীকে ডেকে বলল—

'খুশী হবে জেনে জয়তী, আজই দুটো খুব বড় অর্ডার পেলাম দুখানা পোর্‌ট্রেটের। মোরাদাবাদে এক নবাব আছেন যাঁর নাম হয়ত বিশেষ কেউ জানে না—অতি মূল্যবান্ collection আছে তাঁর, তিনি এসেছিলেন দেখা করতে। জয়তী, এ কি কম সম্মান? বোঝ কি কিছু তুমি?'

'কেন বুঝব না মুকুট? তোমার কাজের সুখ্যাতি শুনলে আমার কতখানি গর্ব হয় সে তুমি বোঝ না।' গুণমুগ্ধ ছাত্রীর মত জয়তী অভিভূত হয়ে কথা বলে। মুকুটের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ছিল তার সে তা স্বীকার করতে কোনদিন কুণ্ঠিত হয়নি কিন্তু মুকুটের ব্যবহারের মধ্যে আন্তরিকতার কোনরকম প্রকাশ ছিল না, জয়তী তা অত্যধিক অনুভব করেছে। কিন্তু তবু সে জানত মুকুট তাকে গভীর স্নেহ করে। মুকুটকে বাইরের জগতে ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া যেত সহজে। সে নিজেকে সেখানে ব্যক্ত করতে চাইত এবং দ্বিধা করত না। রাষ্ট্রদূতই হোক, বিখ্যাত ব্যবসায়ী হোক আর প্রধান মন্ত্রীই হোক—মুকুটের বাড়ীতে বিশিষ্ট লোকের আনাগোনা ছিল। কিন্তু অন্য সকল অতিথিও একভাবেই আদর যত্ন পেত। জয়তীর আন্তরিক ব্যবহারে সে প্রত্যেককেই আপন করে নিত। কোন একটি সভা শেষ হলে মুকুট ও জয়তী দাঁড়িয়ে ছিল—মুকুট শুনতে পেল—একটি যুবক তার বন্ধুকে বলছে—

'এঁদের দুজনকে খুব শ্রদ্ধা করি। এঁরা দুজনেই বিশেষ গুণী। এঁদের অহঙ্কার আছে বলে মনে হয় না।'

মুকুট কথাগুলি শুনতে পেয়ে ছেলেটিকে বলল—'আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই এস, উনিই প্রধান শিল্পী। আমার বাড়ীখানা কি রকম সুন্দর

সাজিয়েছেন, দেখে যেও। এই নাও ঠিকানা—দিগন্তে এস একদিন।'

'দিগন্ত' ক্রমশ ভিড়ের বাড়ী হয়ে উঠছিল। মুকুট কখন কখন সকাল বেলা বেরিয়ে পড়ত আর রাতে ফিরত। ছবির ধান্দায় ঘুরছে, কোথাও ছাত্রদের সঙ্গে, কখনো প্রদর্শনীর ব্যাপারে—বাড়ী আসত প্রায় আধমরা অবস্থায়। সে যতই ভাবছিল এবার স্থির হয়ে বসবে ততই যেন বাইরের জগৎ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। 'না' বলতে সে পারত না কাউকে। সারাদিন পর বাড়ী এসে কোন রকমে দুটি খেয়ে নিয়ে—প্রাণহীন দৈত্যের মত বিছানায় পড়ে ঘুমোত। জয়তী ছবি আঁকায় আবার মন দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু আগের মত নিশ্চিন্ত দিনগুলি খুঁজে পাচ্ছিল না। বাড়ীতে দুচারটি ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে মুকুট আর জয়তী কাজ করত, তা ছাড়া এলোমেলো ব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটত। মুকুট কাজ আর লোক ছাড়া বাঁচতে পারত না কিন্তু জয়তীকে তার নিজের শিল্প-জগৎ থেকে বেশ খানিকটা দূরেই রেখেছিল। একলাই বেরিয়ে যেত অনেক সময়—জয়তীর কাজের বিষয় তার কৌতূহল ক্রমশ কমে গেল। দুজনের শিল্প-জগৎ দুভাগ হতে শুরু করল। জয়তীর যে ধাক্কা লাগল তাতে তার একনিষ্ঠতা নষ্ট হ'ল।

কমলকে সঙ্গে নিয়ে জয়তী অবিনাশের বাড়ী যখন পৌঁছল, অবিনাশের সবে একটু তন্দ্রা লেগেছিল—বইখানা বুকের ওপর খোলা পড়ে আছে। চশমা জোড়া পাশেই পড়ে আছে চৌকীর তলায়। জয়তীর কণ্ঠস্বর শুনে চিৎকার করে অবিনাশ বলল—

'কি হয়েছে জয়তী, এ রকম সময় হঠাৎ?'

'চুপ কর না, দেখ কাকে এনেছি সঙ্গে...'

অবিনাশ লাফিয়ে উঠল, মাথার চুল, চোখের চশমা সব ঠিক করে বই বন্ধ করে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াল—

'আসুন, আসুন—কমলদা—কেমন আছেন?'

'অবিনাশ, দাঁড়াও দেখি ভালো করে, সত্যিই তো বড় হয়েছ দেখছি'—কমল স্নেহভরে অবিনাশকে আলিঙ্গন করল।

'সত্যিই তো মাতৃমুখী হয়েছ দেখছি। তোমার পিতৃদেবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি পেয়েছ তো?'

'অনেকে তো বলেন আমি বাবার মতই দেখতে এবং মার কোপন স্বভাবটি পেয়েছি। কিন্তু আপনি যা বলছেন সেইটাই ভাল, জয়তীকে বলুন তো আর একবার।'

অবিনাশ মুচকি হেসে জয়তীর দিকে তাকিয়ে বলল—'ভাল করে শুনলে তো আমার বিষয়?—ভাল কথা-গুলো শুনবে কেন, মার মুখশ্রী অর্থাৎ সুশ্রী চেহারা, বুঝলে?' জয়তী যেন কথাটার দামই দিল না।

'পুরুষ মানুষের চেহারার জন্য কেউ মাথা ঘামায় না। তাহলে কি আর মুকুটকে বিয়ে করেছি?'

'গুণ থাকলে আর চেহারার কথা কেউ ভাবে না'—অবিনাশ বলল। 'মুকুটের মত একটি পরিপূর্ণ গুণী মানুষ কম আছে—তা ছাড়া কী নিখুঁত শিল্পী।' অবিনাশ সুযোগ পেয়ে মুকুটের প্রশংসা করল। জয়তী এ বিষয় আলোচনা করবার কিছু পেলো না। অবিনাশ এবার কমলের দিকে তাকিয়ে বলল—

'কমলদা, জয়তী কিন্তু দারুণ আঁকছে, বেজায় নাম করেছে। এক আমিই কিছুই করলাম না। ভাবছি একজন মহিলা ভাস্করকে বিয়ে করব, সে-ই আমার ভরণ পোষণের ভার নেবে আর মূর্তিগুলো আগলাবে। নাম তো হল না এখানে—দেশের বাইরে নাম করার কথা তো ভাবিই না। গবর্ণমেন্টের একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ভাস্কর মূর্তি অর্ডার পেলাম—'কৃষক-কন্যা।' দর্শকেরা বলেছিল, মূর্তির মুখের ও দেহের গড়ন আমার সংস্কৃত পণ্ডিতের মত হয়েছে। মডেল তো নেই আমার, জয়তীকে অনুরোধ করেছিলাম মডেল হতে, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে নাক তুলে চলে গেল। ধোপার বৌ প্রায়ই আসত কাপড় নিয়ে, তাকে ধরে বসাব ভাবলাম—কিন্তু সে নিতান্তই যুদ্ধং দেহি। কৃষক-কন্যাকে যতই মাধুর্য ও

শ্রী দিতে চাইলাম মূর্তিখানা হ'ল কুস্তিগীরের মত। ধোপার বৌয়ের ঐ চেহারাখানা মনে গেঁথে ছিল বোধ হয়। আর অর্ডারে যে পাব তা আশা করি না।'

অবিনাশ নিজেকে নিয়ে বিদ্রূপ করে আর পরকে হাসায়—এই আনন্দটুকু জয়তীর মনকে হাল্কা করে রাখে। জয়তীর শৈশবের কথা মনে পড়ে যায়—কলকাতার বাড়ীতে সেই যে ছবি নিয়ে বসতো, শ্যামা ঝি এসে ক্ষ্যাপাতো,সেই কথা কেন আজ এতবার মনে উঁকি দিল তাই ভাবছিল। সে কি কৈশোরের আনন্দটুকু ধরে রাখতে চায়? পুরাতন স্মৃতি কেন জাগিয়ে তুলতে চায়? কেন বার বার তার উপস্থিত জীবন ছাপিয়ে সেদিনের কথা মনে পড়ে? ইচ্ছা করেই তার জীবনকে সে নূতন ছাঁচে ফেলেছে, পুরাতনকে সরিয়েছে সে নিজেই, প্রাচীন মতামত জীবনধারা কিছুই সে চায়নি আর। মা বাবা দাদা বৌদি আত্মীয়স্বজন তার প্রিয় সকলেই, কিন্তু তাদের খুব নিকটে সে থাকতে চায়নি কোনদিন। সে পুরাতন আবেষ্টনকে কিছুতেই গ্রহণ করতে চায়নি, এই জীবনকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই গড়ে তুলেছে। তবে এখন ঘুরে ফিরে কেবল কৈশোরের দিনগুলি মনে পড়ে কেন?

অবিনাশ চা ঢেলে দিল কমলকে আর জয়তীকে। কতগুলি বিস্কুট এনেছিল জয়তী, সেগুলি এগিয়ে দিয়ে অবিনাশ বলল—'তোমার ওখানে চা খেতে বললেই তো পারতে। পরের বার যখন এদিকে আসবে এক সপ্তাহের মত বিস্কুট ও অন্যান্য খাবারও নিয়ে এসো, আমার ভাবনা দূর হবে।'

জয়তী তার নিজের সংসারে মতামত বিশেষ জাহির করতে সুযোগ পেত না, মুকুট তার নিজের ইচ্ছা মতই চলত, জয়তী প্রায় কলের মত তার ইচ্ছাগুলি পালন করে যেত। মনে করেছিল তাতেই নৈকট্য বেড়ে উঠবে। অবিনাশের বাড়ীতে এসে জয়তীর তাই নিজের মতামত বিশেষ ভাবেই প্রকাশ হয়ে যেত, খানিক মাতব্বরিতাও করে ফেলতো সে। অবিনাশ কিছুই বাধা দিত না, ঠাট্টার ভেতর দিয়ে মতামত প্রকাশ করত, তাতে বন্ধুত্বই জমে উঠেছিল। কমল, জয়তী ও অবিনাশ চা খাওয়া শেষ করে নানান্ গল্পে মেতে গেল।

এদিকে মুকুট তার অতিথিকে চা খাইয়ে আরাম কেদারায় বসিয়েছে। দিনান্তে সূর্য বিদায় নিল। সন্ধ্যারতির ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। কয়েকখানা বেতের চেয়ার বাগানে পড়ে আছে—রাস্তার আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল। মুকুট ভাবতে লাগল, জয়তী ও কমল ফিরতে দেরী করছে কেন। অতিথির সঙ্গে হাত মিলিয়ে গেটের কাছে মুকুট দাঁড়িয়েছে, জয়তী তখনই এসে পৌছল। দুজনে বাগানে ঢুকল।

'এক্ষুণি বলছিলাম তুমি দেরী করছ কেন?' মুকুট কথা বলতে বলতে কাগজ, ফাইল, কলম, টেবিল থেকে গুছিয়ে একটা থালার একধারে নিয়ে রাখছিল। টেবিল ল্যাম্প-এর আলোয় মুকুটের ক্লান্ত মুখখানা পরিষ্কার দেখা গেল। সোডার বোতলগুলি কেমন যেন ঝলমল করে উঠল—জয়তীর চোখ পড়ল।

'তোমার মাথায় একটা কি যে ঘুরছে—এ স্কুলের কথা বোধ হয়। আবার মদ খাওয়া চলছে সারা বিকেল? শরীর কিন্তু তোমার অসুস্থ হবে।'

বোতলগুলির দিকে তাকিয়ে জয়তীর মন ভার হয়ে উঠল—সে মুকুটের থেকে যেন আজ অনেক দূরে সরে গেছে বুঝল। মুকুট যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তা জয়তী জানে কিন্তু জয়তীকে সে কিছুই বলতে চায় না—কোনদিনই না, কোন সময় না। জয়তীর মনে তাই অভিমান জমে উঠেছে এতকাল। মনে হয় মুকুট ক্রমাগত কেন জানি অবজ্ঞা করছে তাকে।

'আজ রাতে বন্ধুদের সঙ্গে কি বিষয় আলোচনা করবে আমায় বল না একবার' জয়তী আবদারের সুরে অনুরোধ করল, কিন্তু মুকুট তখনি উত্তর দিল—

'আজকের মিটিং হয়ে গেলে তারপর বলব, একটু গেলাসে ঢেলে দাও তো। এখন ক্লান্ত লাগছে।'

জয়তীর মনের কোণে আজ প্রচণ্ড অভিমান। বহু বছর পেরিয়ে গেছে তার বিয়ের পর, মুকুট তো একা

বসে মদ্যপান করতে চায়নি, আবার কেন সেই পর্ব শুরু হল? মুকুট তো একা পড়ে না কোন সময়? তারই ইচ্ছামত সব হচ্ছে, শিল্প জগতের আকাঙ্ক্ষাও তার ধীরে ধীরে পূর্ণ হচ্ছে, তবে কিসের জন্য এতটা সুরাপানে প্রলোভন? কি দুঃখ সে ঢাকতে চায়?

জয়তী চুপ করে থাকতে পারল না। শান্ত হয়ে বলল

'অতিরিক্ত পরিশ্রম করে নিজেকে সামলাতে পারছ না বলে কি এই অবস্থা আবার? তোমার সঙ্গ তো আমি এক মুহূর্তও পাই না—শুধু তোমার আর আমার একটা নিজস্ব জীবন নেই কি? আমি যে তোমার শিল্প জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলাম, এ কী করে হ'ল?'

'তোমার কি হয়েছে জয়তী? আমি লক্ষ্য করছি তুমি আমাদের কাজের গুরুত্ব বুঝলে না কোনদিন। আমাদের আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতের দায়িত্ব কিছুই কি বোঝ তুমি?' মুকুট কথাগুলি বলতে বলতে গেলাসের মদ শেষ করল। জয়তী তার কথা শেষ হতেই একটু তীব্র কণ্ঠে বলল—

'কেন? আমাদের জীবন তো বেশ চলছিল, বাসনার তো একটা সীমা আছে? তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তীব্র বাসনা আমার মনে যেন আতঙ্ক এনে দিয়েছে—তোমার উচ্চাভিলাষ আমায় হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। এ বাড়ীতে কি আমার নিজস্ব বলে স্থান একটুও আছে? এত মায়া করে, এত যত্ন করে প্রত্যেকটি গৃহকোণ মনের মতো করে সাজিয়েছিলাম—কত আশা, কত আনন্দ, কত উৎসাহ ছিল—ভেবেছিলাম এখানে দুজনে একত্রে কাজ করব—কিন্তু সে সব কী হ'ল? এ তো যেন দোকান, ব্যবসা, আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম—হোটেল বললেই হয়......' জয়তী নিজেকে আজ আর দমন করে রাখতে চাইল না—সে বলেই যাবে যা মনে আছে—মুকুট তাকে এভাবে কথা বলতে কোনদিন শোনেনি। অতি কঠোর দৃষ্টিতে জয়তীর দিকে তাকালো, তাকে যেন গ্রাহ্য না করেই কাগজগুলির দিকে মন দিল। তারপর চেয়ার ছেড়ে জয়তীর পাশে চেয়ার নিয়ে বসল।

'মন দিয়ে শোন, জয়তী, এতদিনকার সাফল্যের কারণটা ভেবে দেখেছ কোনদিন? দুজনে হাত ধরাধরি করে বসে শুধু আকাশের তারা গুণলে আর পাখীর কূজন শুনলে ছবি আঁকার কথা আর কাউকে বলা হ'ত না—কেউ জানত না তোমায় আর আমায়। এই শিল্প-জগৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, কুটিলতায়, ঈর্ষায় পরিপূর্ণ—বসে থাকলে কাজ চলে না। দেখাশোনা, আলাপ-পরিচয় করা একান্তই প্রয়োজন। মানুষকে বোঝাতে হয়, কাজ দেখাতে হয়, তাদের সন্তুষ্ট করতে হয়, নইলে হয়ত সবদিকেই ফাঁকি দেখবে। অবিনাশকে দেখ। কার্তিক, নবীন, অরুণিমা—এদের গুণের অভাব কারুরই নেই, কিন্তু কখনও ঠিক লোকেদের কাছে গেছে কি? লোককে না বুঝিয়ে শুধু ভোলাতে গেলে চলে না। দক্ষতা কিছু পরিমাণে প্রায় সকল শিল্পীরই আছে কিন্তু মানুষকেও বোঝাতে হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। অনেকেই সে বিষয়ে উদাসীন। অবিনাশ তো সুযোগ পেলেও নিমেষে হারায়, মতামতের বিষয় সে উদাসীন, বড় কোন কাজে তার নিতান্তই উৎসাহের অভাব। কমলের কাছে শুনি, অবিনাশের বেশ শক্তি আছে, ভাস্কর হিসাবে সে বিশেষ নাম করতে পারত—কিন্তু সে অবহেলা করে কতদিন যে কাটিয়েছে তার ঠিক নেই। তবে তার ভাগ্য আছে নইলে যেটুকু এগিয়েছে সেটুকুও পারত না। চিরকাল ভাগ্য একরকম থাকে না—অসাবধান বা উদাসীন হলে ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধান হওয়া আশ্চর্য্য নয়।'

মুকুট দ্বিধাশূন্য হয়ে বিস্তৃতভাবে সকল মন্তব্য আজ খুলে বলল। জয়তী মন দিয়ে শুনল কিন্তু তার মুখে শুধু বিষাদের ছায়া দেখা গেল। তার মনকে যেন কিছুই স্পর্শ করল না। অনেক স্বপ্ন এক এক করে মিথ্যা হয়ে গেল।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি আর কমল? এত দেরী হ'ল কেন?' মুকুট ক্লান্ত, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, উত্তরের

জন্য সে প্রশ্ন করেনি—অন্যমনস্ক হয়ে কথাগুলো বলে গেল।

জয়তী তার দিকে মুখ তুলে বলল, 'আমরা বাগানে আর একটুক্ষণ বসি। কেবল তুমি আর আমি।'

'আমি বড় ক্লান্ত' মুকুট উত্তর দিল। 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেই ভাল।'

'কেন, তুমি কি নিতান্তই অসুস্থ বোধ করছ?' জয়তীর প্রশ্নের মধ্যে সহানুভূতির চেয়ে সন্দিগ্ধভাবই যেন বেশী।

কপাল তুলে মুকুটের দিকে তাকাতেই মুকুট আর আসল কথা ঢেকে রাখতে পারল না—'রাতের খাওয়ার পর একদল লোক আসবে—তাদের সঙ্গে কথা আছে।' বলেই সে চলতে লাগল।

'কেন মুকুট? আমি তো তাড়াতাড়ি করে ফিরে এলাম, খানিক তোমার সঙ্গে বসব, সব কথা জানব এই আশায়—নইলে তো আরও দেরিতে ফিরতে পারতাম।'

'কিন্তু জয়তী, আজকের সভাটা নিতান্তই জরুরী, দশ-বারোজন লোককে ডেকেছি, তাদের সঙ্গে সব কথা পাকা করতে হবে, যে স্কুলটার কথা বলেছিলাম—সেই বিষয় আজই স্থির হবে। তারাও টাকা ঢালছে আমার সঙ্গে, দায়িত্ব আছে আমার। পানীয় কিছু অর্থাৎ Black and White-এর বোতলটা বার করে রেখো। সঙ্গে একটু ভাজাভুজি। White Horse আর নেই।'

মুকুটের কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোথাও দ্বিধা বা চাঞ্চল্য নেই, সে দৃঢ়ভাবেই জয়তীকে অনুরোধ করল।

'নিশ্চয় —ও হ্যাঁ, তোমার সেই বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রর কথা আমায় বললে না তো কিছুই?' জয়তী মর্মাহত হয়ে বিশেষ কিছু বলল না।

'নিতান্ত কৌতূহল থাকলে আমাদের সঙ্গে বসতে পার, আপত্তি নেই।' মুকুটের এই কথায় জয়তীর মনে আরও আঘাত লাগল, সে মনে মনে স্থির করল যে মুকুট তাকে যতই অবজ্ঞা করুক তবু সে উপস্থিত থাকবেই। জয়তী স্পষ্টই বুঝল যে, সে উপস্থিত না থাকলেই মুকুট সন্তুষ্ট হবে। যদিও সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তবু মনের ভাব না প্রকাশ করারই চেষ্টা করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আহারের দ্রব্যাদি টেবিলে এসে গেল, মুকুটের পাশে বসে জয়তী অন্যান্য বিষয়ে কথা তুলল। নিজের মনকে খানিক হালকা করে নিল। মুকুটও যোগ দিয়ে বলল—

'অবিনাশ তো বেশ বুদ্ধিমান্ ছেলে, কমল তাকে বড়ই ভালবাসে, আমারও বেশ লাগত তাকে। ছাত্র ছিল আমার কিন্তু তার একনিষ্ঠতা কিছুই নেই—উন্নতির বিষয় মোটেই চিন্তা করে না। এক-একবার ভাবছিলাম এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ওর সাহায্য নেব।'

'বেশ তো, তাকে বলে দেখো না,' জয়তী উত্তর দিল।

'ভেবে দেখব,' মুকুট কথাগুলি শেষ করতে করতে মস্ত রুমাল দিয়ে মুখখানা ভাল করে মুছল।

খাওয়া শেষ হলে দুজনে বাগানে গিয়ে বসেছে—অল্পক্ষণের মধ্যে অতিথিদল এসে পড়লেন। একটি গাড়ী থেকে এক নব দম্পতি একত্রে নেমে এলেন—মহিলাটি বিশেষ সুন্দরী। জয়তী কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে ঐ মহিলার দিকে চেয়ে বলল—

'ভালই করেছি আজ উপস্থিত থেকে। সুন্দরী কি বলেন শুনে যাব।'

মুকুট অতিথিদের আপ্যায়িত করতে ব্যস্ত। তাদের দেখাশোনার ভার যেন তারই ওপর পড়েছে, জয়তী যে উপস্থিত ছিল সে কথা সে সম্পূর্ণ ভুলেই গেল। এমন উচ্ছ্বাসের সহিত তাদের তদারক শুরু করল যে জয়তী রীতিমতো অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল। অতিথিদের উপস্থিতিতে মুকুট জয়তীর অস্তিত্ব ভুলেই গেল। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে নানা বিষয় আলোচনা, মদ্যপান ও ডালমুঠ খাওয়া চলল। সভা জমে উঠল বেশ, কিন্তু জয়তীর সঙ্গে বিশেষ কেউ কথা বলল না। সে অপ্রস্তুত বোধ করছিল এবং তার উপস্থিত থাকা যে নিতান্তই অপ্রয়োজন তাও পরিষ্কার অনুভব করল। রাত প্রায়

একটায় সকলে বাড়ি গেলে ক্লান্ত অবস্থায় মুকুট ও জয়তী বিছানায় গেল।

এইভাবে বেশ ক'দিন মুকুট একটানা ব্যস্ত ছিল, ক্রমাগত মিটিং, আলোচনা সভা, তর্কসভা, ইত্যাদি নিয়ে দিন কাটিয়েছে, জয়তীকে কিছুই বলতে চায়নি। সে বুঝতে পারল, সে মধ্যে মধ্যে সরে গেলেই ভাল। ইঙ্গিত পেল, আবার পরদিনই সভা বসবে।

মুকুটকে ডেকে বলল—'নিউ দিল্লী থেকে বেশ কয়টি জিনিস আনবার আছে, আমার তো আজকের মিটিং-এ উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই ?'

'কিছু দরকার নেই জয়তী—ভেবো না। সারা বিকেল আমি ব্যস্ত থাকব, রাত হতে পারে। এখানেই আসবে ওরা, কিছু খাবার রেখে যেও, দেরী হলে ওদের খেয়ে যেতে বলব। গাড়ীটা যদি দরকার হয় তাই ভাবছি তোমায় পৌঁছে যেন ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে এখানেই আসে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ সেরে নিও।'

মুকুটের কথার ধরণ শুনে জয়তী আন্দাজ করল তার শিক্ষায়তনের প্ল্যান বোধহয় এগিয়েছে, মুকুটের মুখে একটু নিশ্চিন্ত ভাব। আশার আলো দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়। জয়তী খবর নিয়ে জানল যে, একটি বিখ্যাত ব্যবসায়ী দুচারজন চিত্রকর ও কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে আসছেন। জয়তী শীঘ্র যাতে বেরিয়ে পড়তে পারে তারই চেষ্টা করল।

'আমি সাড়ে নটার মধ্যে ফিরে আসতে চাই, হয়ত ফিরে এসে দেখব অতিথিরা বসে আছেন, গাড়ী অবিনাশের ওখানেই পাঠিও।' সাতটার মধ্যে জয়তী রওনা দিল। ঘর থেকে বেরুবার আগে বাগানের একটি কোণ সে আলো দিয়ে সাজিয়ে দিল। ছাইদানী, সিগারেট, দেশলাই, পাখা সব কিছু যথাস্থানে রেখে গেল—অতিথি-সেবায় যেন কোন ত্রুটি না হয় সে বিষয় তার লক্ষ্য সর্বদাই থাকত। মুকুটের দিকে দু-একবার তাকিয়ে তারপর গাড়ীতে উঠে বসল।

'কাল কয়েকটি ছেলে এখানে আসবে, কিছু জল-খাবার নিয়ে এস ফিরতি পথে'—মুকুট মনে করিয়ে দিল।

উদীয়মান শিল্পীদের জন্য একটি বৃহৎ শিক্ষায়তন নির্মাণ করা মুকুটের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। বহু লোকের মতামত, বহুজনের অর্থ এবং বিখ্যাত শিল্পীদের শুভেচ্ছা একত্র করতে মুকুটের বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছে। 'দিগন্ত' একদণ্ডের জন্য নীরব থাকে না, মুকুটের প্রয়োজন অনুসারে জয়তী আসা-যাওয়া করে।—এইভাবে অনিশ্চিতের মধ্যে তার দিন কেটে যায়। জয়তীকে অবিনাশের বাড়ী পৌঁছে গাড়ী ফিরে এল।

সিঁড়ি উঠতে উঠতে জয়তী উচ্ছ্বসিত হাস্যধ্বনি শুনতে পেল। অবিনাশ তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

'এসো এসো জয়তী। কি! পা ব্যথা করছে নাকি এত ধীরে ধীরে উঠছ কেন ?' অবিনাশ জয়তীর হাত ধরে নিয়ে এসে বন্ধুদের কাছে বসিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। অনিতা মেয়েটি বেশ সুশ্রী, তার দিকে তাকিয়ে অবিনাশ রসিকতা করে বলল—

'এই দেখো, আমার ভবিষ্যৎ মডেল। অনেক টাকা চাচ্ছে, কোথা থেকে দেব তাই ভাবছি। খুব গুমর ওর।'

কথাটি অবিনাশ ঠাট্টা করেই বলেছিল এবং অনিতাও বেশ খুশী হল কিন্তু সে ভান করল যেন কথাটা তার মোটেই ভাল লাগেনি। সে তীক্ষ্নস্বরে চীৎকার করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। জয়তী বিরক্ত হল—বিশেষ করে কার ওপর রাগ করল তা বলা কঠিন নয়। সে যেন কেমন অপ্রস্তুত বোধ করছিল,—একটি ছোট মোড়া টেনে নিয়ে খানিক দূরে সরে গিয়ে বসল। অনিতা রুক্ষ, ঢেউ খেলানো চুলগুলি ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে, মাথা নেড়ে চুলগুলি দোলাতে লাগল, একবার অবিনাশের দিকে তাকাল তারপর জয়তীর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল—

'আজ অবিনাশকে শুভেচ্ছা জানিয়েছ তো ? আজ

তার জন্মদিন। তুমি জান না? আমি তো গোপনে প্রেমের কথা শুনলাম'—বলেই অনিতা হেসে আকুল।

জয়তীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, রাগ চাপতে চাইল, অবিনাশ তো তাকে কিছু বলেনি? অনিতার ধরণ ধারণ দেখে তার প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব জেগে উঠল। ফলে অবিনাশেরই ওপর তার রাগ হ'ল। জয়তী আশা করেছিল, সন্ধ্যায় সে অবিনাশের সঙ্গে গল্প করে খানিক সময় কাটাবে, কিন্তু সে যে এত ভিড়ের মধ্যে এসে পড়বে তা ভাবতেও পারেনি। 'ন্যাকা বোকা মেয়ে'—অনিতার বিষয় এই মন্তব্য প্রকাশ করতে তার প্রবল ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু সুযোগ পেল না। গাড়ীও সে ফিরিয়ে পাঠিয়েছে—তা ছাড়া মুকুট তো তাকে আজ দূরেই রাখতে চেয়েছিল। অবিনাশকে একা পেলে সে বেশ বকতে পারত, কিন্তু সে সুযোগও তার জুটল না।

জয়তীর বিশেষ অভিমান হ'ল অবিনাশ তাকে কিছুই জানায় নি বলে। সে বন্ধুদের আড্ডা থেকে সরে যেতে চাইল, অবিনাশকে ডেকে বলল সে এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ফিরে আসবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে এমন সময় অবিনাশ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—

'কোথায় যাচ্ছ জয়তী?'

'একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে—কথা দিয়েছিলাম আটটার মধ্যেই যাব—আমি নটার মধ্যে ফিরে আসব—আমার গাড়ী এখানেই আসবে আমায় তুলতে।'

'কি হয়েছে জয়তী তোমার? ম্লান মুখ কেন? মুকুট কেমন আছে?'

'ভালই আছে।—সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ?' জয়তী থেমে দাঁড়াল। বুঝতে পারল, অবিনাশ তাকে বাধা দিতে চায়। বলল—'তোমার অতিথিদের ফেলে তুমি যেতে পাবে না।' জয়তীর সঙ্গে অবিনাশ সিঁড়ি নামতে লাগল আর বলল—

'ওরা কুড়িজন একত্র হয়েছে, আড্ডা মশগুল। আমি তোমার সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্য বেরুলে ওরা কিছুই মনে করবে না। শুধু তাই নয়, কেউ লক্ষ্যও করবে না।'

জয়তীর মুখের গম্ভীর ভাব ও মনের অস্বাভাবিক চপলতা অবিনাশের বিশেষ ভাল লাগল না, সে গাড়ী নিয়ে এসে জয়তীর দিকে তাকিয়ে বলল—

'কোথায় পৌঁছে দেব বল, গাড়ীতে ওঠ। যেখানে যেতে চেয়েছিলে সেখানেই নিয়ে যাব কিন্তু কোথায় যাচ্ছ ভাল করে বল তো?'

অবিনাশ জয়তীর খেয়ালী স্বভাবের পরিচয় অনেক দিন পেয়েছে, সে ভাল করেই বুঝতে পারল, জয়তীর বিশেষ কোথাও যাবার কথা ছিল না—সে লোক দেখে সরে যেতে চাইছিল, হয়ত দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াবে। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে অবিনাশ বলল—

'কই, বললে না কোথায় যাবে? আমায়'তো দিন রাত উপদেশ দাও তুমি। এদিকে নিজে এমন ছেলে-মানুষি কর, আমার মনে হয় তোমার আমাকে ঠাকুরদা বলে ডাকা উচিত।'

'চুপ কর অবিনাশ, সব সময় রসিকতা ভাল লাগে না। অনিতার মত মেয়েরা এখন তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছে—তাছাড়া কী সব মেয়েদের সঙ্গে আজকাল মিশতে শুরু করেছ? নীপা, লোলা,...যে কোন পুরুষকে গলা জড়িয়ে ধরতে এদের দ্বিধা নেই।'

'জয়তী, চুপ কর। আমার বন্ধুদের তুমি এ রকম যা ইচ্ছা বলে ছোট করতে পার না।—অনিতা আমার জন্মদিন উপলক্ষেই আনন্দ করতে এসেছিল...এবং ঠাট্টা করেই...'

'তুমি আমায় তো বলনি কিছু?' জয়তী অভিযোগ করল।

'আমি কাউকেই নেমন্তন্ন করিনি। রবি জানত আজকের তারিখটা, সেই সবাইকে একত্র করে আমায় একটু আনন্দ দিতে এসেছিল, এখন আবদার করছে তাদের খাওয়াতে হবে।' অবিনাশ সরলভাবে হেসে উঠল। জয়তীর একটু সহানুভূতি হল কিন্তু সে হাসতে পারল না, তার রাগ তখনও কমেনি। অবিনাশ আবার বলল—

'ভেবেছিলাম তোমায় একবার টেলিফোন করব।

কিছু চপ কাটলেট আনতে যাচ্ছিলাম—সময় হল না—তাছাড়া তুমিই তো এখন সাহায্য করতে পার। কিন্তু তোমার রাগ দেখে আর কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। অদ্ভুত ব্যবহার করলে তুমি।'

জয়তী এবার নিজেকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করল স্বরটা নিচু করে বলল—

'ঐ কোণার দোকানটাতে নিয়ে চল, আমি কিছু নিয়ে আসছি এখনই।' জয়তীর মনের ভার তখনও নামেনি কিন্তু অবিনাশের জন্মদিনে সে রাগ প্রকাশ করতে পারল না। নিতান্তই সংযত হয়ে থাকল, অবিনাশের সঙ্গে তাকে ফিরে আসতেই হ'ল।

ফ্ল্যাটে ফিরে অবিনাশ ও জয়তী দেখল, অন্য বন্ধুরা সকলে চলে গেছে। একটা কাগজ সামনে পড়ে আছে তাতে লেখা—

'তোমাদের দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরাও বেরুলাম—সাড়ে দশটায় ফিরব সকলে। জয়তীকে চিঠিখানা দেখিয়ে অবিনাশ একটু হাসল, জয়তীও না হেসে পারল না।

'ওরা সত্যিই পাগল'—অবিনাশ বলল। 'জানে না তো গুরুপত্নীকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম—কি বল?'

একটা সিগারেট ধরিয়ে অবিনাশ বড় তক্তপোশের ওপর বসল—আর বন্ধুদের চিঠির কথা ভেবে হাসল।

ক্রমশঃ
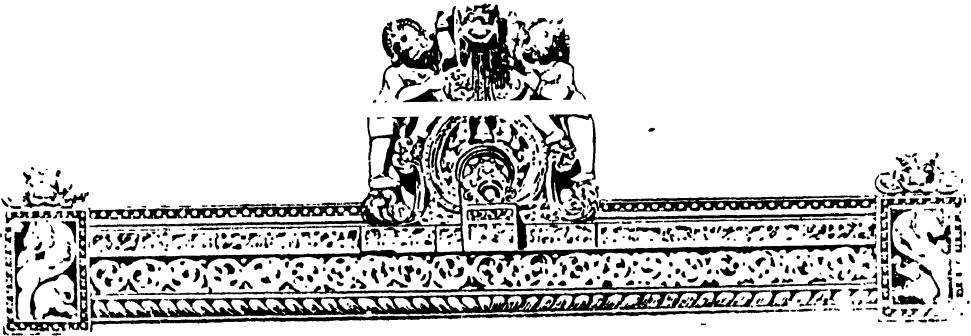
৬০৮ পৃষ্ঠার পর

জন্য অন্ততঃ শ্রীহনুমন্তাইয়া অথবা ডাঃ কে. এল. রাও-এর পদত্যাগ দাবি করা যাইতে পারে। কেননা এই দুই কর্ম্মী মহাপুরুষ গঙ্গা হইতে কাবেরীতে জল লইয়া যাওয়া অথবা উত্তর প্রদেশ, বিহার কিম্বা পূর্ব্ব পাকিস্থানের গঙ্গাজলের আবশ্যকতা লইয়া মাথা ঘামাইতে পারেন কিন্তু মাটি কাটাইতে পারেন না—এইরূপ পরিস্থিতিতে তাঁহারা মন্ত্রিত্ব কার্য্য বিষয়ে অক্ষম ধরা যাইতে পারে। আর একটা কথা এই যে কলিকাতা বন্দর, শিল্পক্ষেত্র ও নগরের মূল্য বিচার করিলে তাহা সহস্র সহস্র কোটি টাকাতে দাঁড়াইবে। এই বিরাট মূল্যবান্ শহরটি রক্ষণ ভারতীয় অর্থনীতির একটা অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তাহা অবহেলা করিয়া যে-সকল ব্যক্তি কাবেরীর জলবৃদ্ধি অথবা উত্তর প্রদেশ ও বিহারের গ্রামাঞ্চলের সেচন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহাদের স্থান প্রাদেশিক কর্ম্মকেন্দ্রে, ভারতীয় রাষ্ট্র অথবা অর্থনীতির ক্ষেত্রে নহে। আমাদের মতে এই সকল মন্ত্রীগণ নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপ্তিহীনতাহেতু সর্ব্বভারতীয় জনমঙ্গলের কথায় অকর্ম্মণ্য প্রমাণ হইয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের স্বদেশের স্থানীয় কংগ্রেস দলের উপর যতটাই প্রভাব থাকুক না কেন তাঁহাদের কার্য্যের উদ্দেশ্যের সংকীর্ণতার ফলে ভারতের জাতীয়তা আহত হইতেছে দেখা যাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যাঁহারা লাগামধারী পরিচালক হইবেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে থাকা আবশ্যক সর্ব্বভারতীয় নজর। তাঁহারা যদি মনে মনে শুধু নিজ নিজ প্রদেশের সুবিধার কথাই চিন্তা করেন; অথবা সকল কর্ম্মী নিয়োগে বা কনট্রাক্ট দিবার সময় নিজ প্রদেশের মানুষ ডাকিয়া আনিয়া অপর প্রদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে মোতায়েন করিতে চাহেন, তাহা হইলে বিষয়টা প্রাদেশিকতা-দোষদুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়।

ভাগীরথীর জল বৃদ্ধির কথা হইতে যদিও এই আলোচনার উদ্ভব, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ জাত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে প্রাদেশিকতার বিষ বহুক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় দফতর হইতেই উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কেন্দ্রীয় দফতরগুলিতে যাহাতে প্রাদেশিকতা শিকড় গজাইতে না পারে সেজন্য সকলের বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। যে-সকল রাজনীতিবিদ্গণ ভারতের রাষ্ট্রতরণীর কর্ণধার তাঁহারাই যদি ভিতরে ভিতরে এই মহাজাতির সর্ব্বনাশ করিতে তৎপর হ'ন তাহা হইলে ভারত অদূর ভবিষ্যতেই সেই পাপের ফল ভোগ করিবে সন্দেহ নাই।

মধ্যবিত্ত সমাজ

বিধুভূষণ জানা

"মধ্যবিত্ত" নামের বৈশিষ্ট এই যে, এই শ্রেণীটি শ্রমিক, মালিক, জোতদার, জমিদার, ব্যাবসায়ী, বৃত্তিজীবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মাধ্যমিক এবং সকল ব্যক্তির এই স্বাবলম্বীও সচ্ছল অবস্থাটাই একান্ত কাম্য। তাহার নিম্ন পর্য্যায়ের পরনির্ভরশীল অবস্থা কেহ স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইতে চায় না—তাহা সকলের নিকট দুর্ভাগ্যজনক। পারিবারিক ভিত্তিতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ মাত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী থাকিয়া সর্ব্ববিষয়ে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চায়। এই অবস্থাটা সুসংযত তৃপ্তির মধ্যে এমন একটি মাঝারী অবস্থা যাহা উপরের স্তরকে ঈর্ষা করে না এবং নিম্ন স্তরকে ঘৃণা করে না। উভয়ের নিকট সে তাহার আপন আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের (দেশাত্মবোধ) জন্য আদরণীয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বৈশিষ্ট্য ও অবদান লইয়াই ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস, শিক্ষা, ধর্ম ও রাজনীতির ইতিহাস, খেলাধুলার এবং যাবতীয় আবিষ্কারের নৈপুণ্যের ও শিল্পসাধনার ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক শ্রেণীটি আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে ধর্মের অনুগামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া ন্যায়নীতিতে সদাজাগ্রত থাকিত। এই গৌরবময় অবস্থাকে কেহ হারাইতে চায় না। এই শ্রেণীর অবলুপ্তি যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর। স্বাচ্ছন্দ্যময় স্বাধীন জীবনের এই উৎসটি মানুষের নিতান্তই কাম্য। অপর দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হয় তাহার প্রজনন ও অবস্থার স্বাভাবিক অথবা অনিবার্য্য গতি ও পরিণতি হইতে। তাহাকে নিরোধ প্রক্রিয়া অথবা তরবারী, এ্যাটম কিংবা কামান বন্দুক দিয়া বেশীদিন অবরোধ করা যাইবে না। বস্তুতঃ ধন ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদাই বণ্টনের বস্তু; কিন্তু ঐশ্বর্য্যকে ও দারিদ্র্যকে বণ্টন করিয়া স্থায়ী করা যায় না। যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জ্জন করেন, তিনি নিঃশেষে তাহা ভোগ করেন না। যাহার ঐশ্বয্য ও সম্পদ্ যত বেশী তাহার পোষ্য ও অবদান ততই বেশী। সুতরাং বাস্তব ভিত্তিক গঠনমূলক ব্যবস্থার দ্বারা যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধন ঐশ্বর্য্যকে, যাবতীয় উপার্জ্জনকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেশবাসীর দারিদ্র্যকে দূর করা সম্ভব হইত; কিন্তু নেতৃত্ববাদী চক্রান্তের ফলে পুঁজিবাদী নেতাদের কৃপায় ধনী আরও ধনী হইয়াছে, দরিদ্রের দারিদ্র্য আরও বাড়িয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রাম বাংলা ব্যতীত শহর এলাকার অধিবাসীদের ধন-সম্পদ্ বাড়িতেছে, বৃত্তিজীবী ও চাকুরীজীবীদের উপার্জ্জন বাড়িয়া চলিয়াছে, সরকারী ব্যয় অপব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে—আর কৃষিতে নির্ভরশীল গ্রামবাসীর দারিদ্র্য চরমে পৌঁছিয়াছে। তাহাদের সঙ্গতিকে আরও হ্রাস করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিবার চক্রান্ত চলিয়াছে। বিগত কালের ভারতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল ইহার বিপরীত। পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তিগত ভোগবাদ ও জড়বাদের প্রভাবাধীন পুঁজিবাদীদের হাতে সংস্থাটির কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি হওয়ার সময় হইতে স্থায়ীভাবে তাহাদের প্রভুত্বকে কায়েম করিবার জন্য অবাঞ্ছিত কমিউনিষ্টদের সাহায্য লইতে গিয়া সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের বিপদ্ বৃদ্ধি করা হইয়াছে, এখনও তাহা অব্যাহত আছে। পিকিং পন্থীরা পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইয়া, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ভূমির দাবীকে ও খাদ্যসঙ্কটকে চরম সীমায় লইয়া গিয়া সকল বিষয়ে একটা উচ্ছৃঙ্খল ও অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ভিন্ন রাষ্ট্র হইতে ঐ নবাগত বাহিনীকে সকল রাজ্যে বণ্টন করা হইয়াছে, যেন যথাসময়ে সর্ব্বভারতে বাংলার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ সকল দল এখন মহৎ

আদর্শকে বিসর্জন দিয়া নিছক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য-ঈর্ষা ও হিংসাকে বিভিন্ন প্রকারে উস্কানী দিয়া জনসাধারণকে, উদ্বাস্তদের ও ভাব প্রবণ ছাত্রদের বিশেষ কিছু একটা করার প্রবণতাকে আজ ধ্বংসাত্মক কাজে নিযুক্ত করিয়াছে। যেহেতু ডিক্টেটারী শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উচ্ছৃঋল জনতার সন্ত্রাস এবং প্রশাসনিক সন্ত্রাস একান্তই প্রয়োজন।

কমিউনিষ্ট জগতে আজ যে প্রবণতা (trend) দেখা দিয়াছে তাহা সকলকে সর্ব্বহারা করিয়া কয়েকটি ব্যক্তির অধীনে সকলকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় খাদ্য বস্ত্র জীবিকা বন্টনের মাধ্যমে আয়ত্তাধীন করিয়া তাহাদের সকল প্রকার স্বাধীনতাকে বিলোপ করা। তাহার পরিণতিটি স্পষ্টতঃ দেখা যায়—রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ বৈভব ও ভোগবিলাসের অধিকারী হইতেছে কয়েকটি ব্যক্তি ও প্রশাসনিক দল; কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে, যার ব্যতিক্রম করিলেই মৃত্যুদণ্ড। কমিউনিষ্ট জগতে প্রাথমিক যে বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহা উচ্ছৃঋলতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হইয়াছে, আবার ঐ সকল মনার্ক বা ডিক্টেটারদের আদর্শকে রূপদান করিবার জন্যও ঐ হতভাগ্য উচ্ছৃঋলদের নিঃসঙ্কোচে হত্যা করা হইয়াছে, অন্যথায় কোন প্রশাসন চলিতে পারে না। এই বর্ব্বর পথ ব্যতীত আজ ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষার উপযুক্ত রক্ষক ও ধারক স্বরূপ এ দেক নেতার আসন শূন্য আছে এবং তথাকথিত গণতন্ত্র আজ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিয়াছে।

আজ আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি তাহা সরকারী পুঁজিবাদীদের তুলনায় অন্যের সঙ্গতি ও প্রতিপত্তি যেন বেশী না থাকে। তার জন্য একদিকে আইন সৃষ্টি ও আর একদিকে শ্রেণী সংগ্রামের বিভীষিকা। শ্রেণী সংগ্রামের বিভীষিকার মাধ্যমে হিংসা ও অহিংসা দুই দলের পক্ষে ভোট বা সমর্থন অনায়াসলব্ধ হইতেছে, উচ্চ আদর্শবাদীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। দেশাত্মবোধের বালাই কোন দলের নাই, নেতারাই পুঁজিবাদী ও বিরাট শোষক। ফলে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী জাতীয় জীবনের গতি ও তার নিজস্ব অর্থনীতি অবলুপ্ত হওয়ায় সর্ব্বহারার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু ইহা মনুষ্যজীবনের কাম্য নয়।

বস্তুতঃ পক্ষে সকল সমস্যার যথাযথ সমাধান নির্ভর করে দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তিদের মহান্ আদর্শের উপর। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সে উচ্চ ও মহান্ আদর্শ কয় জনের আছে, তাহাই এখন বড় প্রশ্ন। অধিকাংশ নেতা বিরাট পুঁজিবাদী ও বিপুল সম্পদের মালিক। তাঁহাদের মুখে সমাজতন্ত্রের উচ্চাদর্শের কথা শোভা পায় না, যেহেতু কার্য্যতঃ তাহা নিজের রুচি ও স্বভাব বিরুদ্ধ। এই শ্রেণীর নেতৃত্ব হইতে, তথা শয়তানী হইতে জনতাকে ও রাষ্ট্রকে মুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বশ্রেণীর বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

পুঁজিবাদ বা জড়বাদ-ভোগবাদের উৎপত্তি পাশ্চাত্য দেশে, যে দেশে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা বিরল। তাহারা সাধারণতঃ এদেশবাসীর ন্যায় ত্যাগধর্মী ও সমাজদরদী নয়। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যে দেশে আধ্যাত্মিক চর্চ্চা বেশী। সেজন্য জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে রাজা-প্রজা ধনী দরিদ্র সমন্বয়ে এ দেশে নিজস্ব এক অপূর্ব্ব সমাজতন্ত্র গঠিত ছিল। অবস্থা প্রসঙ্গে ঈর্ষা ঘৃণা ছিল না। তাহার মধ্যমে ছিল এই কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ। যেহেতু এই স্বাবলম্বী শ্রেণীটির জ্ঞানী গুনী হওয়ার অবকাশ বেশী ছিল—সমন্বয় সৃষ্টি ও দেশ রক্ষার কাজে তাহার অবদান ছিল সর্ব্বাধিক। এ দেশে এই শ্রেণী সংখ্যা গরিষ্ঠ। রাজনৈতিক চক্রান্তে ও দলবাজীতে এই সমাজ এখন বিভ্রান্ত ও ঐক্যহীন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তেরাও ইহাদেরই গোষ্ঠী। আজিও সমাজের ধনী-দরিদ্র ইহাদেরই শাখা-প্রশাখা। এই সমাজে ঐক্যবদ্ধ হইলে ও চেষ্টা করিলে পুঁজিবাদী ও ডিক্টেটারী নায়ক দুই শোষকের বিভিন্ন চক্রান্তকে স্তব্ধ করিয়া জাতিয় ঐক্য ফিরাইয়া আনিতে পারে এবং তাহাদের পরিকল্পিত সর্ব্বহারা সমাজের পরিবর্তে আবার স্বাচ্ছন্দ্যময় সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ইতিহাসে ভারতবর্ষই ইহার দৃষ্টান্ত ছিল। ভারতবর্ষই আবার বিশ্ব-প্রশাসনের নূতন পথ দেখাইয়া দিতে পারে। এ দেশের অর্থনীতি অপর যে কোন দেশের অর্থনীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ইহাতে পুঁজিবাদী ও ডিক্টেটারীর স্থান নাই। ধনী-দরিদ্রের সংগ্রামের প্রয়োজন নাই। তাহা মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পরদেশী বিদেশী মতবাদের অন্ধ অনুসরণকে সর্ব্বাগ্রে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। মধ্যবিত্ত সমাজের নিজস্ব সংস্থা "মধ্যবিত্ত সমিতি" এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ ভারতবর্ষে যে সমাজবাদের কথা বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে এবং যে 'রূপ" লইয়াছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করিবে এবং নিরক্ষরদের "জনতার সরকার" নামক একটি অগণতান্ত্রিক ডিক্টেটরী শাসনের প্রচলন করিবে ইহা নিছক কাল্পনিক নয়।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

এবার জর্জ কার্ভার এক নতুন আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলেন। সংগৃহীত এইসব তৃণগুল্ম ও গাছগাছালির ভেষজগুণ আবিষ্কার, তারপর তাই দিয়ে মানুষের রোগ সারাবার ঔষধ তৈরি করা। ফলে লোকের কাছে তাঁর নামই হয়ে গেল 'গাছের শিকড়ের ডাক্তার'।

কিন্তু জর্জ কার্ভার কোনো একটি মাত্র জিনিষ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, সন্তুষ্ট থাকতে চান না। নতুন জিনিষ জানার, নতুন জ্ঞান আয়ত্ত করার দুর্নিবার লোভ তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং এই লোভই তাঁকে নব নব আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। পাশাপাশি যে গ্রামগুলি রয়েছে সেই সব গ্রামে গিয়ে নানা জাতীয় কাদামাটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তা থেকে ছবি আঁকবার রঙ আবিষ্কার করতে বসলেন জর্জ কার্ভার, কয়েকদিন তাঁকে কেউ তাঁর গবেষণাগারের দরজাই খুলতে দেখলো না। যেদিন তিনি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন সেদিন সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলো তাঁর চোখে মুখে এক অপূর্ব আনন্দের জ্যোতি, নতুন একটা কিছু আবিষ্কারের তৃপ্তি ও আনন্দের জ্যোতিরেখা। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসা সেই কাদামাটিকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন তাঁর বিজ্ঞান সাধনার বলে হরিৎ পীত লাল নীল প্রভৃতি নানান বর্ণে। এখন এইসব রঙ দিয়ে অনায়াসে সুন্দর ছবি আঁকা যায়। জর্জ কার্ভার তুলি নিয়ে বসলেন এই রঙ দিয়ে তাঁর কল্পনাকে ক্যানভাসের গায়ে ফুটিয়ে তোলার জন্য—শিল্পী কার্ভারের হাতে আঁকা হল অনবদ্য একখানি চিত্র।

অ্যালাবামার কাদামাটি থেকে রঙের আবিষ্কার যে কতো বড় একটা আবিষ্কার আজকের এই চন্দ্রাভিযানের যুগে তার মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই সহজ নয়। তিনি সেই বিভিন্ন ধরণের কাদামাটি থেকে তৈরি করলেন লাল, নীল, বেগুনী, বাদামী ও হলুদ রঙ এবং তিনি প্রমাণ করে দেখালেন সমগ্র অ্যালাবামা দেশের সব মাটিই এই সব রঙের সম্পদে কতো সমৃদ্ধ। জর্জ কার্ভার বললেন, আমরা জানিও না যে, আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে প্রতি মুহূর্তে বিধাতার এই অপূর্ব সম্পদ পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলি।

হঠাৎ কিভাবে একদিন জর্জ কার্ভার কাদায় ভরা একটা গর্তের মধ্যে পিছলে পড়ে গেলেন। গর্ত থেকে উপরে উঠে পকেট থেকে রুমাল বের করে হাতের কাদা মুছে ফেলতে লাগলেন। হঠাৎ অবাক্ হয়ে দেখলেন রুমালখানায় নীল রঙ লেগে গিয়েছে। গোটা রুমালখানাই নীলে নীলময় হয়ে গিয়েছে। এমন চমৎকার নীল রঙ তিনি আর কখনোই দেখেন নি। নিকটবর্তী একটা পাহাড়ী ঝরণায় তিনি রুমালখানা ধুয়ে নিলেন, কিন্তু রঙ সম্পূর্ণ উঠলো না। কিছুটা রঙ তখনো রুমালে লেগে রইলো। অ্যালাবামার মাটি থেকে আবিষ্কৃত রঙ শিল্পীর ছবি আঁকার কাজে এক মহামূল্য সম্পদ রূপে পরিগণিত হল।

জর্জ কার্ভার অভ্যাসমতো তাঁর এই নতুন আবিষ্কৃত রঙ ও অন্যান্য রঙের সঙ্গে সমানে ছবি আঁকায় ব্যবহার করতে লাগলেন। এখন এদিকে একটা মজার ব্যাপার হল। পাশের গ্রামেই কৃষকরা মিলে নিজেদের কায়িক পরিশ্রমে একটা গির্জা নির্মাণ করলো, কিন্তু রঙের

অভাবে সেই গির্জাটা কি রকম যেন ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হতে লাগলো। তারা ঠিক করলো রঙ লাগাতে হবে গির্জায়, কিন্তু তারা তো নিজেরা তা পারবে না, একজন কাউকে দিয়ে করাতে হবে। কে করতে পারে? কাকে দিয়ে করানো যায়? এমন সময়ে জর্জ কার্ভারের রঙ আবিষ্কার ও তা দিয়ে তাঁর ছবি আঁকার খবর তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছোলো।

ডাক পড়লো জর্জ কার্ভারের। কয়েকজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেখানে গেলেন এবং সেখানকারই একটা জায়গা থেকে রঙ সংগ্রহ করে নিয়ে সম্পূর্ণ গির্জাটায় রঙ করে ফেললেন। রঙ দেবার কাজ সারা হবার পরে গির্জার উজ্জ্বল নীল চূড়া যখন আকাশ ভেদ করে উর্ধ্বে শোভা পেতে লাগলো, সেই দিকে তাকিয়ে কৃষকদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না। তারা মুগ্ধনেত্রে চেয়ে দেখতে লাগলো, যতো দেখে তাদের বিস্ময় ততোই বাড়ে। তারা জর্জ কার্ভারের চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো, নিজেদের মধ্যে কতো কি কথা বলাবলি করতে লাগলো। তারপরে একসময়ে সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে সোল্লাসে চীৎকার করে বলে উঠলো, "ধন্যবাদ, আপনাকে আমাদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ডাঃ কার্ভার।"

জর্জ কার্ভার বিনীত ভাবে হাতজোড় করে বললেন, "আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না, ধন্যবাদ যদি দিতে হয় মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। তিনি আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আমাদের যখন যা প্রয়োজন তিনিই দিচ্ছেন, কাজেই তাঁর প্রতি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

জর্জ কার্ভার ঈশ্বরের চিরভক্ত। তাঁর সমগ্র জীবন ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গিত করা। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের কর্মক্ষেত্রে একজন দীন সেবক, একজন শিক্ষানবিশ রূপে গণ্য করে এসেছেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন দুটি মহৎ কাজে উৎসর্গ করেছেন—ছাত্রদের শিক্ষাদান ব্রত এবং স্বসমাজের দীন দরিদ্র জনসাধারণের অর্থাৎ নিগ্রোদের উন্নততর জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাঁর কাজের কেউ কোন প্রশংসা করলে তিনি খুবই বিব্রত বোধ করতেন, কেবলই মাথা নাড়তেন আর লজ্জিতভাবে বলতেন, "ঈশ্বরের কাজ তিনিই আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন, তাঁর আশ্চর্য মহিমা আমি এখনো কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।"

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "'রামমোহনের 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম' ও দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম্ম'" সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

রামমোহন নিরাকার একেশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত হিন্দুর জন্য 'প্রস্থানত্রয়'কে শঙ্করাচার্য্যাদি দার্শনিকগণের প্রদর্শিত পথেই শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'প্রস্থানত্রয়'-মধ্যে কোনো অবতার, প্রতীক বা মূর্তির উপাসনার বা পূজার স্থান ছিল না। নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণরূপে উপাসনা সম্ভব ইহা স্বীকৃত হয় তবে সগুণ উপাসনা ও সাকার উপাসনা এক নহে তাহা স্পষ্ট এই প্রস্থানত্রয়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'প্রস্থানত্রয়'কে অনুসরণ করিলেন না এবং 'বেদান্ত'কে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহাও ত্যাগ করিলেন। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে সংকলন করিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন হিন্দুসমাজ তাঁহার আদর্শায়িত হিন্দুধর্মকে তার নিজস্ব সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিবে। তাহা যে সফল হয় নাই, সেকথা বর্তমান 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'-এর দিকে দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট হইবে। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্তীগণ সর্বধর্ম-সমন্বয়-মানসে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, ইসলামীয় শাস্ত্র চর্চায় প্রবৃত্ত হন। 'প্রস্থানত্রয়'কে অনুসরণ না করিয়া নববিধান হইতে বেদান্ত-সমন্বয়ভাষ্য, গীতাসমন্বয়ভাষ্য ও ব্রহ্মগীতোপনিষদ প্রকাশিত হয়—কিন্তু এগুলিকে হিন্দুসমাজ গ্রহণ করে নাই, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থগুলির কোনো প্রচার নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নবীনতমেরা যুক্তি ও ভক্তি—দুইয়েরই যুগপৎ আশ্রয় হইলেন। কালে এই নবীনতমদের মধ্যে একদল কঠোর যুক্তিবাদী, তর্কাশ্রয়ী (rational) ব্রাহ্ম, অপরদল ভক্তিবাদী, বিশ্বাসী ব্রাহ্ম (emotional) রূপে দেখা দিলেন; ইহাদের মধ্যে এই কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে। মোট কথা এই নবীনদের মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রচর্চার উৎসাহ দেখা গেল না। তবুও একটি ক্ষুদ্র দল 'প্রস্থানত্রয়'কে ব্রাহ্মধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করিলেন। ঐ কার্যে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীশচন্দ্র রায়, প্রতুলচন্দ্র সোম ও বিশেষ ভাবে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম স্মরণীয়। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রেরণায় 'প্রস্থানত্রয়' প্রকাশিত হয়। তিনি দার্শনিক ছিলেন; তাই 'বেদান্তসূত্র' তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তিনি লিখিলেন—"আমার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে প্রধান উপনিষদগুলি—যাহা বেদান্ত নামে খ্যাত—তাহাতে যে ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই মূলতঃ ব্রাহ্মধর্ম এবং সেই ব্রহ্মধর্মকেই আমি গ্রহণ করি। আমি বুঝিতে পারিলাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই বেদান্তধর্মকে—যাহা তাঁহার পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মরূপে জ্ঞাত ছিল, পরিত্যাগ করিয়া ভুল করেন। মনে হয় তাঁহার এরূপ ধারণা জন্মে যে বেদান্তধর্ম গ্রহণ করায় উপনিষদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিয়া লইতে হয়; তিনি তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার এইরূপ ধারণা ভুল।......প্রকৃত পক্ষে মহর্ষির ধারণার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ বেদান্তধর্মকে পরিহার করিয়া মস্ত ভুল করিয়াছেন।"

রামমোহন রায় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মে গায়ত্রীমন্ত্রকে সর্বজনের ধ্যানের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে বলিলেন—বাংলাভাষায় গায়ত্রীমন্ত্রের অনুবাদ ও মুদ্রণ হিন্দুধর্ম-বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। গায়ত্রীমন্ত্রধ্যানে ব্রাহ্মণের একমাত্র অধিকার ছিল—এমনকি অন্যের শ্রবণও নিষিদ্ধ ছিল। অন্য হিন্দু-সম্প্রদায় বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্র জপিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া গায়ত্রীর অনুরূপ মন্ত্র রচনা করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ গায়ত্রীর স্থলে 'সত্যং, জ্ঞানং, অনন্তং' ইত্যাদি মন্ত্র নির্বাচন করিলেন। যে গায়ত্রীমন্ত্র প্রচলিত হইলে ঐ

মন্ত্র উচ্চারণে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার বা জাতিভেদের জড় ধ্বংস করিতে পারিত, তাহা এই নূতন মন্ত্রের দ্বারা কি পূর্ণ হইল ?

দেবেন্দ্রনাথ প্রস্থানত্রয়-মতে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যান না করিয়া 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থকেই শাস্ত্রের মর্যাদা দান করিতে চাহিলেন। তিনি মনে করিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যাবলী উপনিষদভাবে সংকলিত হইলে তাহা হিন্দুরা সাদরে শাস্ত্রগ্রন্থরূপে মানিয়া লইবে। তিনি ১৮৬৪ সালে লিখিয়াছিলেন 'হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম"। তাঁহার আশঙ্কা নবীন ব্রাহ্মরা 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' হইবার পথে অগ্রসর হইতেছেন। তাই বলিলেন—"হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এদেশের ব্রাহ্মধর্মে প্রচার বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিব না"।৭

৫। সংস্কৃতে নানা ধর্ম-সম্প্রদায় মধ্যে গায়ত্রী নামে প্রচলিত মন্ত্রগুলি লইয়া একটি অতি মনোজ্ঞ নিবন্ধ রচিত হইতে পারে।

৬। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ইত্যাদি ব্রহ্মোপাসনামন্ত্র নানা উপনিষদ হইতে সংকলিত মন্ত্র।

৭। পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, পৃ, ৩৬।

কালো সম্পদ বৃদ্ধি

"যুগবাণী"তে প্রকাশ :—

প্রত্যক্ষ করারোপণ তদন্ত কমিটি (Direct Taxation Inquiry Committee) সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। ঐ কমিটির নেতৃত্ব করেছেন জাসটিস ওয়াঞ্চু। কমিটির মতে ভারতে প্রতি বছর ১৪০০ কোটি কালো টাকা সৃষ্টি হয়। কমিটির কোনো কোনো সদস্যের মতে বছরে কালো টাকা জমে ৩০০০ কোটি টাকা। এই টাকার দাপটে এক শ্রেণীর লোক গোটা সমাজের ওপর প্রভুত্ব করে ও সমাজের বনিয়াদকে ধ্বংস করে দেয়। কালো টাকার সমস্ত কুফল ভোগ করে জনসাধারণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ঐ টাকা ফাটলও নিয়ে আসে। সরকার তার যোজনাগুলিকেও সফল করতে পারিবে না কালো টাকার মালিকদের কোণঠাসা করে জব্দ করে ফেলতে না পারলে। কমিটি সেজন্য কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। যেমন, সরকারী ও বেসরকারী কোম্পানীগুলির ওপর এক-শতাংশ ক্যাপিটাল লেভি ধার্য করা। দ্বিতীয়ত, জাতীয় উন্নয়ন তহবিলে সকল করদাতাদের তাদের আয়ের শতকরা দশভাগ পর্যন্ত জমা দেবার সুযোগ দান। তারা ঐ তহবিলে যে টাকা জমা দেবে সে টাকা আয়করের আওতা থেকে বাদ যাবে। কালো টাকা আজকাল কৃষিক্ষেত্র, বাগিচা, ডেয়ারী ও পোলট্রিতে বিনিযুক্ত হচ্ছে বলে ওয়াঞ্চু কমিটি ঐ সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আয়কর ধার্য করতে বলেছেন। সেজন্য প্রয়োজন হলে সংবিধান পরিবর্তন করতেও তাঁরা বলেছেন। কমিটির আরও অভিমত হল যারা সততার সঙ্গে কর দেয় তাদের পুরস্কৃত করা ও যারা ফাঁকি দেয় তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। কর ফাঁকি দাতাদের কোনো সরকারী সংস্থায় স্থান থাকা উচিত নয়, ব্যাঙ্কও তাদের ঋণ দিতে পারবে না। তাদের নির্বাচনে দাঁড়ানোও বন্ধ করে দিতে হবে।

নির্বাচনের আগে সরকার এই সুপারিশগুলিকে কার্যকর করবেন বলে মনে হয় না। যদিও সরকার বলেছেন ৫০০ কোটি আয়কর টাকা ফাঁকি ধরা পড়েছে—তবু ঐ টাকা আদায়ের কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। কালো টাকার একাংশ পার্টি ফাণ্ডে আসে ও নির্বাচনে খাটে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অনেকেই ঐ টাকার সূত্রে টাকার মালিকদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। তাই তাঁরা চুপ করে থাকতে বাধ্য হন। কৃষিক্ষেত্রের ওপর কর ধার্যের ক্ষমতা সরকারের নেই। কারণ গ্রামাঞ্চলের ভোট হারাবার ভয় কংগ্রেসেরও আছে।

ওয়াঞ্চু কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী হবে না এই কথা জেনেও বলব যে সরকার যদি জাতীয় অর্থনীতিকে সবল করতে চান তাহলে কালো টাকার প্রতাপকে দমন করতেই হবে। না করলে শ্রীমতী গান্ধীর বর্তমান জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

দেশ-বিদেশের কথা

ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রপতি নিকসন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত বার্ত্তায় বলা হইয়াছে:

১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার পর মিঃ নিকসন পৃথিবীর আঠারোটি দেশ সফর করে এসেছেন। তাঁর সফরের এই তালিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ১৯তম রাষ্ট্র। চীন সফর সমাপ্ত হলে তাঁর মোট পথপরিক্রমার পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৮০০০০ কিলোমিটার।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টগণের বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে তিনি এখনও রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর আগে প্রেসিডেন্ট জনসন ২০টি, প্রেসিডেন্ট কেনেডী তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালে ১১টি, আর প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ২৬টি দেশ সফর করেছেন। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের আমলে জেট বিমানের আবির্ভাব হয় নি। তিনি ঐ সফর কালে ৩৪টি বিভিন্ন নগর ও শহরে পদার্পণ করেছিলেন আর প্রেসিডেন্ট নিকসন করেছেন ২৮টি নগর ও শহর তাঁদের আগে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গিয়েছিলেন মাত্র চারটি দেশে।

তবে সাধারণ নাগরিক, কংগ্রেসসদস্য, সেনেটর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে মিঃ নিকসন কমপক্ষে পৃথিবীর ৭৭টি রাষ্ট্র সফর করেছেন। এছাড়া তিনটি বৃটিশ উপনিবেশ, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের চারটি বৈদেশিক অঞ্চলও তিনি দেখে এসেছেন। ঐ সকল সফরকালে তিনি ঐ সকল দেশের ১৮৮টি স্থানে সাময়িকভাবে অবস্থান করেছিলেন। তবে এই সকলের মধ্যে বহু সহরেই তিনি বহুবার গিয়েছেন। যেমন তিনি আটবার গিয়েছেন প্যারিস ও লণ্ডনে, সাতবার ব্যাংকক, ম্যানিলা, রোম, সায়গন, তাইপে ও করাচীতে এবং ছবার গিয়েছেন টোকিওতে। বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মিঃ নিকসন রেকর্ড স্থাপন করতে না পারলেও সরকারী বা বেসরকারীভাবে এরকম বহুব্যাপক অঞ্চলে সফর পূর্বতন কোন প্রেসিডেন্টই করেন নি।

মিঃ নিকসন প্রায় সকল মহাদেশ ও উপমহাদেশেই সফর করে এসেছেন, বহুবার গিয়েছেন ইউরোপে। তবে নরওয়ে, সুইডেন, বুলগেরিয়া ও অ্যালবেনিয়ায় তাঁর এখনও যাওয়া হয়নি।

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল ছাড়া এশিয়ার বহুব্যাপক অঞ্চল তিনি দেখে এসেছেন। যাত্রাপথে বেইরুট ও তেহরাণে তিনি অবস্থান করেছিলেন। বিরাট আফ্রিকা মহাদেশের সকল অঞ্চলও তাঁর দেখা হয়নি। তিনি রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অ্যালজিরিয়ায় যান নি। আফ্রিকার বহু সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশেও তাঁর যাওয়া হয়নি। সুরিনাম, গায়না মেকসিকো এবং সেন্ট্রেল আমেরিকান প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহ ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার বহুদেশ তিনি সফর করে এসেছেন।

ভারতীয়দিগের সহিত রুশিয়ার জনগণের সৌহার্দ্য

নিকোলাই ফিরিউবিন (বৈদেশিক সম্বন্ধ মন্ত্রীর সহকারী) সোভিয়েত ল্যাণ্ড পত্রিকার একটি গোল টেবিল বৈঠকে বলেন যে বিগত আগষ্ট মাসে ভারত রুশিয় যে সন্ধি সাক্ষরিত হইয়াছে তাহা একটি দীর্ঘকাল হইতে ক্রমশঃ সুগঠিত আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপনেরই পূর্ণতর অভিব্যক্তি। ভারতের সহিত রুশিয়ায় সম্বন্ধ গঠনের ইতিহাস দীর্ঘ এবং ভারত স্বাধীন হইবার পূর্ব্ব হইতেই দুই জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহায়তা দানের আগ্রহ আকার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল দেখা যায়। ১৩ই এপ্রিল এই আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপনের বিভিন্ন চেষ্টার ২৫ বৎসর পূর্ণ হইবে বলিয়া সোভিয়েত

ল্যাণ্ড পত্রিকা কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ঐ বৈঠক ডাকিয়াছিলেন। ফ্রিরউবিন মহাশয় একথাও বলেন যে রুশদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় অভিযান যখন সক্ষম হইল তখন হইতেই ভারতীয় জন সাধারণ রুশিয়াকে একটা বিশেষ প্রেরণার উৎস হিসাবে দেখিতে আরম্ভ করিলেন ও রুশিয়ার সহিত ভারতের নিকটতর বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহও তাহার পর হইতেই রূপায়িত হইবার দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

বৈদ্যুতিক উপায়ে চালিত যান বাহন

পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সকল কোটি কোটি যান বাহন পেট্রোল ডিজেল জ্বালাইয়া চালিত রহিয়াছে সেই সকল যান বাহন হইতে নিসৃত বিষাক্ত বাষ্প চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়া ক্রমশঃ মানব জীবন যাত্রার পক্ষে অব্যবহার্য্য করিয়া তুলিতেছে। এই কারণে যে সকল দেশে যান বাহনের সংখ্যা অধিক সেই সকল দেশে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে কোন প্রকার তৈল বা কয়লা না জ্বালাইয়া যান পরিচালনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মানুষের এই চেষ্টার মধ্যে অধিক নির্ভর বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের উপর। নানাদেশেই বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যান বাহন নির্ম্মান করা হইতেছে কিন্তু এখনও শক্তিশালী ভারবাহী বিদ্যুৎ চালিত যান নির্ম্মাণ সম্ভব হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা হয় মূল্যেরদিক দিয়া নয়ত শক্তি হীনতার কারণে সর্ব্বজন ব্যবহার্য্য হইতে পারিতেছে না। রুশিয়া একটি গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। যাহা নুতন করিয়া বিদ্যুৎ সংগ্রহ না করিয়াই প্রায় ১০০শত কিলোমিটার চলিতে পারে। এই গাড়ী আকারে কত বড় ও কতটা ভার বহন করিতে পারে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বৃটেনের ইসরায়েলকে ডুবো জাহাজ বিক্রয়

ইসরায়েল শুনা যাইতেছে যে কোন বৃটিশ যন্ত্র নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে দুইটি ডুবো জাহাজ ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে অনেকে সমালোচনা করিতেছেন যে বৃটেন যে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করিয়াছেন সে নিয়ম যদি বৃটিশ কারখানাগুলি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে বৃটেনের "অস্ত্র সরবরাহ করিব না" বলা একান্তই নিস্ফল ও অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। বৃটেন বলিতেছেন যে ব্যক্তিগত ভাবে যদি কোন বৃটিশ কারখানা কোন সামরিক সরঞ্জাম বিদেশীদিগকে বিক্রয় করে তাহা হইলে সে বিক্রয় চেষ্টা আইন বিরুদ্ধ বলা যায় না। অবশ্য যখন ঐ অস্ত্র শস্ত্রাদি বিদেশে পাঠান হইবে সেই সময় তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে। যাহাই হউক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ হইতে থাকিলে যুদ্ধ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এ কথা সর্ব্বজনজ্ঞাত। সেই জন্য সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ, কোন ভাবেই অস্ত্র সরবরাহ যাহাতে না হয় সেইরূপ ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়।

সাময়িকী

ডাঃ বিজলী বিহারী সরকার

বিগত ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ প্রাতে ডাঃ বিজলীবিহারী সরকার কলিকাতায় নিজ বাসভবনে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডাঃ সরকার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেহতত্ত্ব বা শরীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন ও উক্ত বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রচেষ্টা ব্যাপক ও মূল্যবান বলিয়া বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রাহ্য হইয়াছে। ডাঃ বিজলী বিহারী সরকার ১৭ই নভেম্বর ১৮৯৩খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা হেমলতা দেবী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের খ্যাতনামা নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাঁহার পিতা ছিলেন দার্জ্জিলিং এর প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ বিপিন বিহারী সরকার। বিজলী বিহারী পিতামাতার প্রথম সন্তান। তিনি জীবনের প্রথমাংশে বহু বৎসর দার্জ্জিলিংয়ে কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২১ খৃঃ অব্দে ডি, এসসি উপাধি লাভ করিয়া। এডিনবরা গমনের পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শারীর বিদ্যা চর্চ্চা সম্পূর্ণ করেন ও সুকবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। এডিনবরাতে তিনি ডি, এস সি উপাধি লাভ করেন ও এডিনবরার রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হ'ন তিনি পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন। ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দেহতত্ত্ব শাখার সভাপতি নিযুক্ত হ'ন। সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বিশিষ্ট ছিল। তিনি মৃত্যুকালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ছিলেন। তিনি জাঁকজমক পছন্দ করিতেন না এবং সকল সুযোগ সুবিধা বর্ত্তমান থাকিলেও আড়ম্বর বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া জীবন নির্ব্বাহই তাঁহারা অভ্যাস ছিল। তাঁহার গবেষণাজাত বহু বিষয় সক্রান্ত লেখন নানান বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিও একটি লেখা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরলোকে মৃণালিনী সেন

৭ই মার্চ্চ ১৯৭২ খৃঃ অব্দে প্রায় ৯৩ তিরানব্বই বৎসর বয়সে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ মৃণালিনী সেন দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লাডলি মোহন ঘোষ তাঁহাকে ১৩ বৎসর বয়সে পাইক পাড়ার রাজার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাজা ইহার দুই বৎসর পরেই দেহত্যাগ করেন। বাল্যবিধবা রাণী মৃণালিনী অতঃপর কাব্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন ও কয়েক বৎসরের মধ্যেই চারটী কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত করান। "প্রতিধ্বনি", "নির্ঝরিনী", "কল্লোলিনী" ও "মনোবীণা" সে যুগের সমালোচকদিগের নিকট উচ্চ শ্রেণীর কবিতা পুস্তক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর এই ভাবে জীবন যাপন করিয়া ২৬ বৎসর বয়সে মৃণালিনী দেবী কেশব চন্দ্র সেনের দ্বিতীয়পুত্র নির্ম্মল চন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন। তিনি অতঃপর স্বামীর সহিত দুইবার ইংলণ্ড গমন করেন। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি ১৬ বৎসর সেইদেশেই বসবাস করেন। এই সময় তিনি ইংরেজীতে লিখিতে আরম্ভ করেন ও বহু রাষ্ট্রনৈতিক ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সহিত তাঁহার পরিচয় ও যোগ স্থাপিত হয়। তিনি নানান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন ও ভারতীয় মহিলাদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে মনোপ্লেনে আরোহন করিয়া আকাশ ভ্রমণ করেন। ইংলণ্ডে তাঁহার গৃহে বহু স্বনাম খ্যাত ভারতবাসী গমন করিতেন।

ইঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ঘোসের নাম করা যাইতে পারে। বার্দ্ধক্য তাঁহাকে অথর্ব করিতে পারে নাই। তিনি শেষ অবধি মানসিক ভাবে সবল ও সজাগ ছিলেন। সামাজিক ক্ষেত্রেও তাঁহার উপস্থিতি বহুস্থলেই দেখা যাইত!

লেঃ কর্ণেল অনাথ নাথ পালিত

রাঁচী নিবাসী লেঃ কঃ অনাথ নাথ পালিত ২ তারিখ মার্চ্চ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে হুগলি জেলার বেইরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বৃটেনে গমন করেন ও সেইখানে এডিনবরার এফ, আর, সি, এস, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'ন। ইহার পরে তিনি আই, এম, এস পরীক্ষা দিয়া ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় ও লেঃ কঃ পালিত মেসোপটেমিয়া ও ফ্রান্সে যুদ্ধকালে কাজ করেন। তিনি মনস মেডেল পাইয়াছিলেন। পরে তিনি অধিকাংশ সময়ই উত্তর ভারতেই কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২২ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে বিহার ও ওড়িষায় কার্য্যে প্রেরণ করা হয় ও তিনি ১৯৩৮এ অবসর গ্রহন করা পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশেই ছিলেন। বৃটিশ শাসকগণ তাঁহাকে ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ও, বি, ই, উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িবার পরে দুই বৎসর কাল চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের ভার গ্রহণ করেন ও তৎপরে দারভাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন। লেঃ কঃ পালিতের পত্নী শ্রীমতী মারী পালিত শিকারের ক্ষেত্রে স্বনামধন্যা। লে., ক. পালিতের এক কন্যা ও তিন পুত্রও বর্ত্তমান আছেন।

ডাঃ জে, বি, চ্যাটার্জ্জি এম, ডি ; এফ, এন, আই

স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনের ডিরেক্টর প্রসিদ্ধ শোনিত গুনাগুন বিজ্ঞান বিদ ডাঃ জে, বি, চ্যাটার্জ্জি এম, ডি ; এফ, এন, আই হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ২ তারিখ মার্চ্চ কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৫৩ বৎসর। ডাঃ চ্যাটার্জ্জি ১৯৪২ খৃঃ অব্দে মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতা হইতে উপাধি লাভ করেন ও ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে এম, ডি, প্রাপ্ত হ'ন। অতঃপর তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বোষ্টনে গিয়া রক্তের স্বাস্থ্য ও ব্যাধির বৈজ্ঞানিক বিচার লইয়া প্রফেসর দামশেকের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ঐ বিষয়ের গবেষণাতে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে আত্মনিয়োগ করেন ও শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি স্বদেশে ও বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহাকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের ফেলো নির্ব্বাচন করা হয় ও পরে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হ'ন। তিনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিসিয়ানস এরও ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ও (who) বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। তিনি ১৯৬৬।৬৭তে ভাটনগর পুরস্কার লাভ করেন ও ইহা ব্যতীত কোটস্ স্বর্ণপদক ও অর্জ্জন করেন। তাঁহার লিখিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পন্ন মূল অনুসন্ধান শীর্ষক কার্য্যাবলীর সংখ্যা ২০০ শতাধিক হইবে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতের বিজ্ঞান অনুশীলনের বিশেষ ক্ষতি হইল।

প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :

(ফরম নং ৪)

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২। কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩। মুদ্রাকরের নাম—	শ্রী শমীন্দ্র নাথ সরকার
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৪। প্রকাশকের নাম	ঐ
জাতি	ঐ
ঠিকানা	ঐ
৫। সম্পাদকের নাম	শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-৬
৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা এবং (খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকায় অধিক অংশের অধিকারী-দের নাম-ঠিকানা—	১। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, ১ উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	২। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	৩। শ্রীমতী ঈশিতা দত্ত, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	৪। শ্রীমতী সুনন্দা দাস, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	৫। শ্রীমতী নন্দিতা সেন, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	৬। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
	৭। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
	৮। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৭
	৯। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
	১০। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড কলিকাতা-১৬

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ— প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীশমীন্দ্রনাথ সরকার

১।১২।৭৮